ইসলামী বিশ্বকোষ

সপ্তম খণ্ড



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

الموسوعة الاسلامية

باللغة البنغالية

المجلد السابع

ইসলামী বিশ্বকোষ

[৭ম খণ্ড]

কানূন — কিতমীর

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী বিশ্বকোষ (সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০০)
ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)
প্রকল্পের আওতায় (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত

ই.বি.প্র. প্রকাশনা ৫৫
ইফাবা প্রকাশনা ১৬৩২/১
ইফাবা গ্রন্থাগার 297.03
ISBN : 984—06—1235—2

বিষয় ঃ ইসলাম— বিশ্বকোষ ও অভিধান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জুমাদা আস-ছানী ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মদ হাবিবুল মতিন সরকার
পরিচালক (চ.দা.)
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা - ১০০০
ফোন : ৯৫৫১৯০২

কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ
গ্রাফিক আর্টস

মূল্য : ৫৯০.০০ টাকা মাত্র

ISLAMI BISWAKOSH : The Encyclopaedia of Islam in Bengali, 7th vol. complied and edited by the Board of Editors and published by Muhammad Habibul Matin Sarker on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Islam Project.

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation-org.bd.

Price : Tk 590.00 June 2008
U.S.$: 27.00

সম্পাদনা পরিষদ (১ম সংস্করণ)

সম্পাদনা পরিষদ (২য় সংস্করণ)

অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দিন	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সদস্য
প্রফেসর মোঃ আবদুল মান্নান	"
ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম	"
ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন	"
ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক	"
ড. শব্বির আহমদ	"
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম	"
মাওলানা ইমদাদুল হক	"
ড. এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ	"
ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন	"
মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	"
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	"
মুহাম্মদ হাবিবুল মতিন সরকার	সদস্য সচিব

আমাদের কথা

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে মুদ্রিত বিপুল সংখ্যক কপি এই কয় বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ইহার পাঠকচাহিদা, জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠি সহজেই অনুমান করা যায়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক একটি বিষয় তথ্যপঞ্জীসহ প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ করিয়া লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও তথ্যানুসন্ধানীদের জন্য বিশ্বকোষ একটি অপরিহার্য ইসলামভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত ভৌগোলিক স্থান, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, মূল্যবান গ্রন্থাবলী, কুরআন, হাদীছ, উসূল, ফিক্হ ইত্যাদি এবং এইগুলির সংশ্লিষ্ট পরিভাষা, মূলনীতি, বিধিবিধানসমূহ, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরিভাষা, দুনিয়াব্যাপী বসবাসকারী মুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয়, বাংলাদেশের বহু বিষয় সংক্রান্ত নিবন্ধসমূহ ইত্যাদি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি দ্বারা এই বিশ্বকোষকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে।

মানবজাতির জন্য দীন ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। বর্তমানে দীন ইসলাম মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একটি জাগরণমুখী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফলে ব্যাপক পরিসরে ইসলামী জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ইসলামী বিশ্বকোষ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমাজতন্ত্রের পতনের পর এখন মতাদর্শ হিসাবে দীন ইসলামই পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ। শত বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করিয়া অচিরে ইসলামই হইবে মানবজাতির একমাত্র জীবন বিধান। বর্তমান বিশ্বের ধর্মান্তর গ্রহণের পরিসংখ্যান এই সাক্ষ্যই বহন করিতেছে।

ইসলাম এক অজেয় শক্তি। ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও দুর্দশার শিকার হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের মসজিদকে গোশালায় পরিণত করা হইয়াছিল এবং কুরআন মজীদের মুদ্রণ ও আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। তাহাদের অমূল্য ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে আজ সেসব দেশেও ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধীরে ধীরে তাহাদের পথের বাধা দূর হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকোষ অসামান্য অবদান রাখিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বর্তমান খণ্ডের পূর্বতন সম্পাদনা পরিষদের ৮ জন সদস্য এবং কয়েকজন লেখকও ইনতিকাল করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন তাহাদের কর্মক্ষম সুস্বাস্থ্য কামনা করি। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা পরিষদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রজ্ঞাপন করিতেছি।

ইসলামী বিশ্বকোষের বর্তমান খণ্ডটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেইসাথে বিশ্বকোষকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য পাঠকবৃন্দকে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানেরও আহ্বান জানাই। আল্লাহ্ আমাদের পরিশ্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমীন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

মহান রব্বুল আলামীনের অসংখ্য প্রশংসা যিনি বাকশক্তি দান করিয়া মানব জাতিকে মর্যাদাবান করিয়াছেন। তিনি সর্বজ্ঞানের মালিক ও দাতা। তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার বিশাল, যাহাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াতের সরল পথের জ্ঞান দান করেন। আমরা সবাই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। আমরা তাঁহার নিকট সঠিক পথের জ্ঞানদানের জন্য প্রার্থনা জানাই।

বিগত ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২৬টি খণ্ডের সহিত অতিরিক্ত দুইটি খণ্ডসহ মোট আটাশ খণ্ডে প্রথম প্রকাশের কাজ ২০০০ সালে শেষ হয়। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মধ্যে ইহার চাহিদা প্রচুর। তাই বিগত ২০০৪ সাল হইতে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্ধন ও নূতন প্রবন্ধ সংযোজন করা হইতেছে। ইতিপূর্বে ছয়টি খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে সপ্তম খণ্ড প্রকাশ করিয়া পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় মহান আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করিতেছি। ৮ম, ৯ম ও পরবর্তী খণ্ডসমূহ যথাসময়ে প্রকাশ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করি সকলের সহযোগিতায় আল্লাহ্র মর্জি যথাসময়ে সেইগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইবে।

ইসলামী বিশ্বকোষ ৭ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে যাহার নিকট হইতে সহযোগিতা, পরামর্শ ও আগ্রহ লাভ করিয়াছি তিনি হইলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান। এই খণ্ডের গুণগত মান বৃদ্ধি করিতে তাঁহার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা আমাদিগকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যগণ এবং লেখকবৃন্দের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই আমরা যথাসময়ে এই খণ্ডটি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। গ্রন্থকে নির্ভরযোগ্য ও সমাদৃত করিয়া তোলার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টাই মুখ্য। এইজন্য আমরা তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এতদভিন্ন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যেভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির পথে নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন, এইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষত প্রকল্পে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য কর্মচারীগণ নিরলসভাবে যে পরিশ্রম ও সেবা দ্বারা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করিয়া যাইতেছেন সেইজন্য তাঁহাদেরকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। তাহা ছাড়া প্রেস ব্যবস্থাক মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখসহ ইসলামী বিশ্বকোষ মুদ্রণ বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ যেভাবে ইহা মুদ্রণের কাজে অবদান রাখিয়া চলিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়, আমি তাঁহাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদানে ধৈন্য করুন, মহান আল্লাহ্র দরবারে ইহাই আমাদের মুনাজাত।

পরিশেষে প্রকল্পের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতেছি যে, এই খণ্ড প্রকাশে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা পাঠকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছি। সম্মানিত পাঠকগণের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, কাহারও নযরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়িলে বিনা দ্বিধায় আমাদিগকে অবহিত করিবেন। পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করা হইবে। এই গ্রন্থকে ভবিষ্যতে অধিকতর উন্নত ও তথ্যসমৃদ্ধ করিতে সকলের সহায়তা কামনা করি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন ! আমীন !!

মুহাম্মদ হাবিবুল মতিন সরকার
পরিচালক (চ. দা.)
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইবিপ্র/মুঃবাঃ/৪(৩)/৩১/০৫(২২৫০)

ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ-সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/ সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

(১) বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি ঃ

'আরবী, ফারসী ও ইংরেজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

ا = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
ا = ই i	چ = চ ć	ژ = ঝ zh	غ = গ gh	ن = ন n
ا = উ u	ح = হ h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক, k, q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত t	ذ = ড ḍ	ض = দ/য-d	گ = গ g	ے = ে ay
ث = ছ th	ذ = য dh	ط = প t	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ z		
	ڑ = ড় ŕ			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (َ) আ, ا احد = আহাদ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = া حلال = হালাল

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = কাওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দা,

যের ( ) = ই/ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ/ী عيسى = ঈসা, نسيم = নাসীম

যের (ফারসী শব্দ) = এ/ে پيش = পেশ,

পেশ (ُ) উ/ু احد = উহুদ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = له = লাহূ

পেশ + و = ঊ /ূ قعود = কু'ঊদ, موسى = মূসা,

যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যু حيٌّ = হায়্যু, যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = সাওওয়ারা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত وٌّ =ব্বি مصوّر = মুসাব্বির/মুসাওবির, পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত وٌّ = ওউ تصوّف = তাসাওউফ, যবরের পর ا সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর ا সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর ا সাকিন مؤمن = মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وتر = বিত্‌র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ' (উযূ-');

খাড়া যবর = া قتل = কাতালা, قاتل = কাতিল, اوى = আওয়া,

খাড়া যের = ী, ربه রাব্বিহী, يحيى = য়ুহ্য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) جنة জান্নাঃ জান্‌নাঃ, عائشة ঃ 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন হ্‌ = الله আল্লাহ্, نامه নামাহ্।

ع ه و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ	عبد = 'আব্দ	و = বি	وتر = বিত্‌র
ع = 'ই	علم = 'ইল্‌ম	وَ	وحى = ওয়াহ্‌য়ি
ع = 'উ	عثمان = 'উছ্‌মান	و = উ	وضؤ = উদূ' (উযূ-')
عا = 'আ	عابد = 'আবিদ	و + ا = ওয়া	واجب = ওয়াজিব
عى = 'ঈ	عيد = 'ঈদ	و + ع = ওয়া'	وعظ = ওয়া'জ
عو = 'ঊ	عود = 'ঊদ		
و = ওয়া	ولد = ওয়ালাদ	و + ى = ওয়ায়	ويل = ওয়ায়ল
ى = য়া	يهود = য়াহূদ	و + يُ = য়ূ يوسف = য়ূসুফ	يَ + يْ = য়ায় ييئس = য়ায়'আস

a, A = ॥, আ I = ী U = ূ = ঊ

অনুলিখনের বেলায় নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে ঃ

ব্যতিক্রম

(ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাঁহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(খ) যে সকল 'আরবী, ফারসী ও উর্দূ শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্‌তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযূ, কদর, কবর, কলম, কানূন, কাফির, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, খান, গযব, জনাব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারীফ, দওলত (দৌলত), দফতর, দরূদ, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্‌যিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা, মুতাবিক, মুনাফিক, মৌলবী, যাকাত, রওযা, রমযান, রহমত, শহীদ, সালাম, সুন্নত, সুফারিশ, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

(২) বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

(৩) পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	অনুবাদ, অনূদিত
'আ	'আরবী
আনু.	আনুমানিক
আবি.	আবির্ভাব
('আ)	'আলায়হি'স্‌-সালাম
ই.	ইত্যাদি
ইং.	ইংরাজী
এ. ব.	এক বচন
ঐ	ib. ibid, وهى كتاب
ঐ লেখক, ...	id. Idem, وهى مصنف

ক	a
খ	b
খৃ. খ্রী	খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টাব্দে, ء
খৃ. পূ.	খৃষ্টপূর্ব
জ.	জন্ম
ড.	ডক্টর, (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা.	ডাক্তার (চিকিৎসক)
তথা	Sc.
তা. বি.	তারিখবিহিন, n. d.
তু.	তুলনীয়, ef., قب
দ্র.	দ্রষ্টব্য, q. v., s. v., رك بان
নং	নম্বর, No.
প.	পরবর্তী, sq., Sqq., f., ff., يبعد
পত্র, পত্রক	fols.
প-দ্র.	পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
পরি.	পরিশিষ্ট, suppl...supplement
পাণ্ডু.	পাণ্ডুলিপি, MS
পূ. গ্র.	পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit., كتاب مذكور
পূ. স্থা.	পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব. ব.	বহু বচন
মূ. পা.	Sic, মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল, অনুরূপ)
মৃ.	মৃত, মৃত্যু, م
(র), ...	রাহ্মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা)	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
লা., ছত্র	line, লাইন, س
শা/ ধা	শাখা/ ধারা section mark فصل
শিরো. ধাতু	শিরোনামে, s. v بذيل مادة
(স)	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সং.	সংস্করণ
স. প.	সম্পাদনা পরিষদ
সম্পা.	সম্পাদিত, ed.
সৌর	সৌর বৎসর (ইরানী)
স্থা.	বিভিন্ন স্থানে, passim, مواضع كثيره
হি.	হিজরী, হিজরীতে, ه
১খ, ৪০	প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ খণ্ডে	3 volumes

৩ ঃ ৭ ... ... সূরা ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)

৪৫০/১০৫৮ ... . হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যু সন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

(৪) নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

(৫) বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

আওফী, লুবাব = লুবাবু'ল-আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লণ্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.।

আগানী¹ অথবা² অথবা³ = আবু'ল ফারাজ আল-ইসফাহানী, আল-আগানী, বূলাক ১২৮৫ হি.; কায়রো ১৩২৩ হি., ³কায়রো ১৩৪৫ হি.।

আগানী, Tables = Tables alphabetiques du কিতাবু'ল-আগানী, redigees par I. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।

আগানী, Brunow= কিতাবু'ল-আগানী, ২১খ, সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা', তাকবীম = তাকবীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা', তাকবীম, অনু. = Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ, ২খ, ১খ, by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮ খৃ.;,২খ, 2 by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আন্‌বারী, নুযহা = নুযহাতু'ল-আলিব্বা' ফী তাবাকাতি'ল-উদাবা', কায়রো ১২৯৪ হি.।

'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তা'রীখ ওয়া জুগরাফিয়া লুগাতি, ইস্তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।

ইদরীসী, মাগরিব = Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

ইব্‌ন কুতায়বা, আশ-শি'র = ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শির ওয়া'শ-শু'আরা', সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার = কিতাবু'ল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি; বূলাক ১২৮৪ হি.।

ইব্‌ন খালদূন, মুকাদ্দিমা = Prolegomenes d'Ebn khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ খৃ. (Notices et Extraits xvi-xviii)

ইব্‌ন খালদূন-Rosenthal=The Muqaddimah, Trans. from the Arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লণ্ডন ১৯৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন-de Slane = Les prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de Slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইব্‌ন কুতায়বা, আশ-শি'র = ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার = কিতাবু'ল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি; বূলাক ১২৮৪ হি.।

ইব্‌ন খালদূন, মুকাদ্দিমা = Prolegomenes d'Ebn khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ খৃ. (Notices et Extraits xvi-xviii)

ইব্‌ন খালদূন-Rosenthal=The Muqaddimah, Trans. from the Arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লণ্ডন ১৯৫৮ খৃ.।

ইব্ন খালদূন-de Slane = Les prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de Slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইব্ন খাল্লিকান = ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্বা'উ আব্বা'ই'য্-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of bigraphies)॥

ইব্ন খাল্লিকান বূলাক = the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।

ইব্ন খাল্লিকান=de Slane=কিতাবু ওয়াফায়াতি'ল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১।

ইব্ন খুর্রাদাযবিহ = আল মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ (BGA VI)।

ইব্ন তাগরীবির্দী = আন-নুজূমু'য-যাহিরা ফী মুলূক মিস্‌র ওয়া'ল-কাহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.

ইব্ন তাগরীবির্দী, কায়রো=the Same, সং কায়রো ১৩৪৮ হি.।

ইব্ন বাতূতা=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪খ, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮।

ইব্ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স-সিলা ফী আখবারি আ'ইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ (BHAII)।

ইব্ন রুসতা=আল-আ'লাকু'ন-নাফীসা, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৯০৫-৪০।

ইব্ন হাওকাল = কিতাবু সূরাতি'ল-আর্দ, সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ (BGA VII, ২য় সং)।

ইব্ন হিশাম = সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottinen 1859-60।

ইব্নু'ল-আছীর=কিতাবু'ল-কামিল, সম্পা. C. J. Tornberg,লাইডেন ১৮৫১-৭৬।

ইব্নু'ল-আছীর, trad, Fagnan=Annales du Maghreb et de l'Espagen, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.

ইব্নু'ল-আব্বার=কিতাবু তাকমিলাতি'স-সিলা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ (BHA V-VI)।

ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত=শাযারাতু'য-যাহাব ফী আখবার মান যাহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries)।

ইব্নু'ল-ফাকীহ=মুখতাসার কিতাবু'ল-বুলদান, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ (BGA V)।

ইস্‌তাখ্‌রী=আল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭)।

কুতুবী, ফাওয়াত=ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফাত, বূলাক ১২৯৯ হি.।

খাওয়ানদামীর=হাবীবু'স-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।

ছা'আলিবী, য়াতীমা-য়াতীমাতু'দ-দাহর ফী মাহাসিনি'ল-'আস্‌র, দামিশক ১৩০৪ হি.।

জুওয়ায়নী=তা'রীখ-ই জিহান-গুশা, সম্পা. মুহাম্মাদ কাযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ (GMS XVI)।

তা. আ. (TA) = তাজু'ল-'আরূস, মুহাম্মাদ মুরতাদা ইব্ন মুহাম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।

তাবারী=তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মূলুক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901

তা'রীখ-ই গুযীদা=হামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-কাযবীনী, তা'রীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.

তা'রীখ দিমাশ্‌ক=ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।

তা'রীখ বাগদাদ=আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।

দাওলাত শাহ=তাযকিরাতু'শ-শু'আরা', সম্পা. E. G. Browne, লণ্ডন-লাইডেন ১৯০১।

দাব্বী=বুগ্‌য়াতু'ল-মুলতামিস ফী তা'রীখ রিজালি আহলি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera. মাদ্রিদ ১৮৮৫ (BAH III).

দামীরী=হায়াতু'ল-হায়াওয়ান (quoted according to titles of articles)।

ফারহাংগ=রাযমারা ও নাওতাশ, ফারহাংগ-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩।

ফিরিশতা=মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশ্‌তা, গুলশান-ই ইবরাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২।

ফিহ্‌রিস্ত=ইব্নু'ন-নাদীম, কিতাবু'ল-ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. G. Flugel, Leipzig 1871-72.

বাগদাদী, ফার্ক=আল-ফার্কু বায়না'ল-ফিরাক, সম্পা. মুহাম্মাদ বাদ্‌র, কায়রো ১৩২৮/১৯১০।

বালাযুরী, আনসাব=আনসাবু'ল-আশরাফ, ৪খ, ৫খ, সম্পা. M. Schlossinger এবং S. D. F. Goitein, জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।

বালাযুরী, ফুতূহ=ফুতূহু'ল-বুলদান, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬।
মাককারী, Analectes=নাফহু'ত্-তীব ফী গুস্নি'ল-আনদালুসি'র-রাতীব (Analects sur l'histoire et la litterature des Arabes de l'Espagne, লাইডেন ১৮৫৫-৬১।
মাস'উদী, তানবীহ্ = কিতাবু'ত-তান্বীহ্ ওয়া'ল-ইশ্রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1894 (BGA VIII).
মাস'উদী, মুরূজ-মুরূজু'য-যাহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭।
মীরখাওয়ানদ=রাওদাতু'স-সাফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।
মুকাদ্দাসী=আহসানু'ত-তাকাসীম ফী মা'রিফাতি'ল-আকালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ (BGA III)।
মুনাজ্জিম বাশি=সাহা'ইফু'ল-আখবার, ইসতাম্বুল ১২৮৫ হি.।
যাহাবী, হুফ্ফাজ=আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, ৪ খণ্ডে, হায়দারাবাদ ১৩১৫ হি.।
যুবায়রী, নাসাব-মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কুরায়শ, সম্পা. E. Levi=Provencal, কায়রো ১৯৫৩।
য়াকূ'ত, উদাবা=ইরশাদু'ল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-31 (GMS. VI)।
য়াকূত=মু'জামু'ল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)।
য়া'কূবী=তা'রীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.
য়া'কূবী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII)।
লি. 'আ. (LA)=লিসানু'ল-'আরাব।
শাহরাস্তানী=আল-মিলাল ওয়া'ন্-নিহাল, সম্পা. W. Cureton, লণ্ডন ১৮৪৬।
সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্-সাব, সম্পা. in facsimile by D. S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX)।
সার্কীস=সার্কীস, মু'জামু'ল-মাতবূ'আতি'ল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।
সিজিল্ল-ই 'উছমানী=মেহমেদ ছুরিয়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।
সুয়ূতী, বুগয়া=বুগয়াতু'ল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।
হাজ্জী খালীফা=কাশফু'জ-জুনূন, সম্পা. S. Yalthaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩।
হাজ্জী খালীফা=জিহান-নুমা, ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।
হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্ফু'জ-জুনূন, Leipzig 1835-58.
হামদানী=সিফাতু জাযীরাতি'ল-'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Leiden 1884-91.
হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. D. H. Muller, Leiden 1884-91.
হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. G. le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)।
হুদূদু'ল-'আলাম=The Regions of the world, অনু. V. Minorsky, London 1937 (GMS, N. S. XI)।

ABBREVIATED TITLES
OF SOME OF THE MOST OFTEN QUOTED WORKS

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist. ed., Leiden 1927.

Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV ve XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.

Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold Turkestan[2]=the same, 2nd edition, London 1958.

Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.

Brockelmann, I. II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplemenbanden angepasste Auflage, Leiden 1943-49.

Brockelmann, SI, II. III=G. d. A. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.
Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earlist times until Firdawsi, London 1902.
Browne, ii=A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sa'di, London 1908.
Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cabridge 1920.
Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times. Cambridge 1924.
Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milano 1905-26.
Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden 1847-51.
Dozy, Recherches3=Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyen-age, third edition, Paris and Leiden 1881,
Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint Leiden-Paris 1929).
Fagna, Extraits=E. Fagnan, Estraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qourans, new edition by F. Schwally, g Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.
Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90.
Goldziher, Vorlesungen=I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.
Goldziher, Vorlesungen^2=2nd, ed Heidelberg 1925.
Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1910.
Hammer-Purgstall GOR = J. von Hammer (-Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
Hammer-Purgstall GOR^2=the same, 2nd ed. Pest 1840.
Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellart, 18 vols. Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.
Hammer-Purgstall, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
Houtsma, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.
Ibn Rusta-Wiet=Les Atours precieux, traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.
Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols. Paris 1836-40.
Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.
Lane=E. W. lane, An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint New York 1955-6).
Lane-Poole. Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coinss in the British Museum, 1877-90.
Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmans de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.
Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad=G. Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxfor 1924.
Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.
Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. ed. Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO XXXVI).
Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
Mayer, Astrolabists=La. Mayer, Islamic Metalworkers, and their Works, Geneva 1959.
Mayer, Woodcarvers=L.A. Mayer, Islamic Woodcarvers and their Works, Geneva 1958.
Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.
Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.
Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.
Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols, Istanbul 1947 ff.
Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des klassischen Alterums.
Pearson=J. D. Pearson, Index Islamicus, Cambridge 1958.
Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografica sobre los historiadores y geografos arabigo-espanoles, Madrid 1898.
Santillana, Istituzioni=D. Santillana Instituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronge, Verspreide Geschriften Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources, inedites de l'Histoire du Marcoc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905—Deuxieme Serie, Paris 1922.
Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
Spuler Iran=B. Spuler, Iran in fruh-islamischer Zeit, Wiesbaden 1952.
Spuler, Mongolen^2=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.
Storey=C. A. Storey, Persian Literature : a bio-bibliographical survey, London 1927.
Survey of Persian Art=ed. by A. U. Pope, Oxford 1938.
Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
Taeschner, Wegeneta=Franz Taeschner, Die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
Tomaschek=W. Tomachek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelater, Vienna 1891.
Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen., Mannheim-Stuttgart 1846-82.
Wensinck, Handbook=A. J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de genealogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).
Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanichen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC.

Abh. G. W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
Abh. K. M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.
Abh. Pr. Ak. W.=Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften
Afr. Fr.=Bulletin du Comite de l'Afrique francaise.
AIEO Alger=Annales de l'Institut d'Etudes Orientale de l'Universite d'Alger.
AIUON=Annali dell' Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Anz. Wien=Anzeiger der (kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosphisch-historische Klasse.
AO=Acta Orientalia.
ArO= Archiv Orientalni.
ARW=Archiv fur Religionswissenschaft.
ASI=Archaelogical Survey of India.
ASI, NIS=ditto, New Imperial Series.
ASI, Ar=ditto, Annual Reports.
AUDTCFD=Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.
BAH=Bibliotheca Arabico-Hispana.
BASOR=Bulletin of American Schools of Oriental Research.
Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).
BFac. Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.
BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Francais de Damas.
BGA=Bibliotheca geographorum arabicorum.
BIE=Bulletin de l'Institut d'Egypte.
BIFAO=Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale du Caire.
BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.
BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopedia (Large Soviet Encyclopaedia) Ist. ed.
BSE^2=the same 2nd ed.
BSL (P)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.
BSO (A) S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.
BTLV=Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch=Indie).
BZ=Byzantinische Zeitschrift.
COC=Cahiers de l'Orient contemportain.
CT=Cahiers de Tunisie.
EI^1=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.
EIM=Epigraphia Indo-Moslemica.
ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.
GGA=Gottinger Gelehrte Anzeigen.
GMS=Gibb Memorial Series.
Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.
IA=Islam Ansiklopeisi.
IBLA=Revue de l'Institut des Belles Letters, Arabes, Tunis.
IC=Islamic Culture.
IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.
IHQ=Indian Historical Qurterly.

IQ=The Islamic Quarterly.
Isl.=Der Islam.
JA=Journal Asiatique.
JAfr. S=Journal of the African Society.
JAOS=Journal of the Anthropological Institute.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JE=Jewish Encyclopaedia.
JESHO=Journal of the Economic and Social History of the Orient.
J (R) Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.
JNES=Journal of Near Eastern Studies.
JPak. H. S.=Journal of the Pakistan Historicl Society.
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.
JQR=Jewish Quarterly Review.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.
J [R] ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.
JPGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.
JSFO=Journal de la Societe Finno-ougrienne.
JSS=Journal of Semitic Studies.
KCA=Korosi Csoma Archivum.
KS=Keleti Szemle (Oriental Review).
KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).
LE=Literturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).
MDOG=Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.
MEA=Middle Eastern Affairs.
MEJ=Middle East Journal.
MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de l'Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO=Melanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE=Memoires de l'Institut d'Egypte.
MIFAO=Memoires publies par les membres de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjama' al-'Ilmi al-'arabi, Damascus,
MO=Le Monde oriental.
MOG=Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Soviet Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-ougrinne.
MSL (P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.
MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Westasiatische Studien.
MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGW Gott.=Nachrichten von der Gesellschft der Wissenschaften zu Gottingen.

OC=Oriens Christianus.
OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.
OM=Oriente Moderno.
PEFQS=Palestine Exploration Fund. Quarrterly Statment.
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire chronologique d'Epigraphie arabe.
REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze moralí, storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHR=Revue de l'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de l'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue de Monde Musulman.
Ro=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de l'Orient Chretin.
ROL=Revue de l'Orient Latin.
RSO=Rivista degli studi orientali.
RT=Revue Tunisienne.
SBAK. Heid=Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.
SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.
SBPMS Erlg.=Sitzungsberichte der Physihalischme dizinischen Sozietat in Erlangen.
SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenchaften zu Berlin.
SE=Sovetskay Etnografiya (Soviet Ethnography).
So=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).
Stud. Isl.=Studia Islamica.
S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie (Soviet Lingustics).
TBG=Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetensehappen.
TD=Tarih Dergisi.
TIE=Trudi instituta Etnografiy (Works of the Institute of Ethnography).
TM=Turkiyat Mecmuasi.
TOEM=Ta'rikh-i-'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmu'asi.
Verh. Ak. Amst.=Verhandelingen der Koniklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.
Versl. Med. Ak. Amst.=Verslagen en Medeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.
VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).
WI=Die Welt des Islams.
WIn.s.=ibid., new series.
Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlades.
ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.
ZATW=Zeitschrift fur die altestamentliche Wissenschaft.
ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.
ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.
ZGErdk, Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.
ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

কানূন (قانون) ঃ বহুবচন কাওয়ানীন, গ্রীক Kanon শব্দ হইতে উদ্ভূত 'আরবী শব্দ, প্রথমত ইহা "যে কোন সরল দণ্ড" বুঝাইলেও পরবর্তী সময়ে "পরিমাণ অথবা বিধান" এবং শেষত (৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর প্যাপীরাস দলীলে) "কর নির্ধারণ", "রাজকীয় কর", 'শুল্ক' ইত্যাদি অর্থ বুঝায় (Liddell and Scott, সংশোধিত সং., লন্ডন ১৯৪০ খৃ. ; ধর্মীয় সাহিত্যে ইহার অর্থসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, অক্সফোর্ড ১৯৬১ খৃ.। শব্দটি সম্ভবত মিসর ও সিরিয়ায় মুসলিম বিজয়ের পর প্রাক-ইসলামী কর পদ্ধতির অব্যাহত অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে আরবীতে গৃহীত হয় (C. H. Becker, Islamstudien, লিপযিগ ১৯২৪ খৃ., ২১৮-৬২; F. Lokkegaard, Islamic taxation, কোপেনহেগেন ১৯৫০ খৃ., ১১৮-২০)। ইসলামী দেশসমূহে সার্বিকভাবে যদিও শব্দটি ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি বিশেষ অর্থ ব্যবস্থামূলক শব্দ হিসাবে ইহার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখে, একই সঙ্গে তাহা 'আইনবিধি', 'রাষ্ট্রীয় আইন' (অমুসলিম উৎসের অন্তর্গত) ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করে। এই দুইটি পৃথক অর্থ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। আইন (Law) ঃ তাত্ত্বিক দিক হইতে শারী'আ সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ফিক্হ গ্রন্থাবলী কদাচিৎ সাধারণ আইনের বিধানাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং যেইহেতু প্রাথমিক যুগেই ইহা উপলব্ধি করা হয় যে, মুসলিম দণ্ডবিধির ক্ষেত্র সীমিত, সেই কারণে জন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (বিশেষত গভর্নরগণ) এই দুইটি ক্ষেত্রে আইন (কাওয়ানীন) জারী করিতে আরম্ভ করেন যদিও এই সম্পর্কে কোন প্রকার আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব তাঁহাদের ছিল না। উক্ত সময়ে এই কার্যকলাপ নিষ্ঠাবান 'উলামাকেও বিব্রত করিতে পারে নাই। কারণ প্রশাসনিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে কানূন ও শারী'আ-র মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না এবং শেষোক্তটি এই সকল বিষয়ে মোটের উপর নীরব ছিল। অনুরূপভাবে দণ্ডবিধি আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও কানূন শারী'আ-র নিয়ম লংঘন করিয়াছিল এমন কোন নজীর দেখা যায় না। কারণ গভর্নরগণ এই সকল ক্ষেত্রে হাত কাটিয়া দেওয়া বা প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায় যে সকল কঠোর শাস্তির বিধান কুরআন-এ রহিয়াছে (হুদূদ, হাদ্দ-এর বহুবচন) তাহা করিতেন না।

'উছমানী সুলতানগণের আমলে কানূন শব্দটি প্রধানত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক আইন এবং দণ্ডবিধি আইনের আওতাভুক্ত বিধিসমূহকে নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হয়। ২য় মুহাম্মাদ (৮৫৫-৮৬/১৪৫১-১৪৮১)-এর জারীকৃত প্রথম কানূননামা বস্তুতপক্ষে এই সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এক শতাব্দী পরে ইস্তাম্বুলের গ্রান্ডমুফতী (৯৫২-১৫৪৬ হইতে ৯৮২-১৫৭৪ পর্যন্ত) [দ্র.] আবু'স-সু'উদ-এর তৎপরতায় কানূননামা এমন সকল প্রশ্নের আইনগত সমাধান প্রদান করা শুরু করেন যাহা এতকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শারী'আ আইনের ইখতিয়ারভুক্ত ছিল, বিশেষভাবে সম্মতি সংক্রান্ত আইনসমূহ। আইনজ্ঞ হিসাবে আবু'স-সু'উদের দক্ষতা এত অসাধারণ ছিল যে, এই কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে একবারের জন্যও কানূন ও শারী'আ পরস্পর বিরোধী হয় নাই।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশেই কানূন শব্দটি কেবল পাশ্চাত্য আইন পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত আইন ও বিধিসমূহ, যথা দীওয়ানী ও বাণিজ্যিক আইন, প্রশাসনিক ও দণ্ডবিধি আইন ইত্যাদি বুঝায় না, বরং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শারী'আ-র যে সকল আইন ও বিধান সরলীকরণ করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে সেইগুলিও বুঝায়। কয়েকটি উদারহণ উল্লেখ করা যাইতে পারে— ব্যক্তিগত মর্যাদা সংক্রান্ত সিরীয় বিধান (কানূন) ১৯৫৩ খৃ., ব্যক্তিগত মর্যাদা সংক্রান্ত ইরাকী আইন (কানূন) ১৯৫৯ খৃ. এবং মিসরীয় পারিবারিক বিধান (কানূন নামে পরিচিত)। পরিষদের আদেশকে নূতন শব্দ মারসূম বি-কানূন দ্বারা আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য কানূন শব্দটি মূলত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জারীকৃত বিধি নির্দেশ করিলেও বর্তমানে তাহা আর এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না; ইহার পরিবর্তে মিসরে লা'ইহা (ব. ব. লাওয়াইহ) এবং অন্যত্র নিজাম বা তারতীব শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য আইন পদ্ধতি দ্বারা ইহা অনুপ্রাণিত হউক বা কেবল মুসলিম আইন হইতে গৃহীত বিধানাবলীর সমন্বয়ে গঠিত হউক, মূল কানূনটি একটি কমিশনের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়। প্রয়োজনবোধে স্বয়ং কমিশন বা বিধান সভার মাধ্যমে অনুমোদিত হয় এবং প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে তাহা জারী করা হয়, উভয় ক্ষেত্রেই এই কার্যপ্রণালী অনুসৃত হয়। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত মর্যাদা অথবা উত্তরাধিকার আইনসমূহ যাহা মুসলিম আইন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সকল কানূনের ক্ষেত্রে পরিষদে অনুষ্ঠিত আলোচনা কেবল আনুষ্ঠানিকতামাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়টি যাহা কমিশনের মাধ্যমে বিকাশ সাধন করা হয় তাহাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচ্যে জন্মলাভকারী কানূন শব্দটি আইন-বিধির চূড়ান্ত রূপ নির্দেশক অর্থে (আইন ও বিধি) বর্তমানে কেবল মধ্যপ্রাচ্য অথবা অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে সেই সকল দেশেই প্রচলিত যেইগুলি কোন না কোন সময়ে কিছুকালের জন্য হইলেও ইস্তাম্বুলের প্রভাবাধীন হইয়াছিল। সা'উদী আরব 'উছমানী কর্তৃত্ব এড়াইয়া যাইতে পারিয়াছিল বলিয়া তথায় শব্দটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়; প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আইন প্রণয়ন কার্যাবলী বুঝাইতে সেখানে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহা হইতেছে নিজাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) O. L. Barkan, Kanunlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ. ; (২) J. Schacht, An introduction to Islamic Law, ১২শ অধ্যায়; (৩) ঐ লেখক, Abu'l-Su'ud, in EI^2; (৪) C. Chehata, Droit musulman, applications au

Proche Orient, প্যারিস ১৯৭০ খৃ., ১১-২১। প্রাক 'উছমানী যুগের কানূন-এর জন্য দ্র. B. Lewis, in BSOAS (১৯৫৪ খৃ.), ৫৯৯; (৫) V. Minorsky, in ibid. (১৯৫৫ খৃ.), ৪৪৯ প.।

Y. Linant de Bellefonds (E.I.²)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

২। কর নির্ধারণী জমি জরিপ ঃ কর সংক্রান্ত প্রশাসন সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ একটি বিভাগ কর নির্ধারণ এবং অপর বিভাগ কর আদায়ের জন্য নিয়োজিত। করের পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত এবং ইহার ফলে কর নির্ধারণের একটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে; আসল কানূন বলিতে সামগ্রিকভাবে এই নীতি এবং করদাতা হইতে প্রাপ্য করের পরিমাণ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি মাত্র সম্পত্তি অথবা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত সকল সম্পত্তি একত্রে উভয়ই হইতে পারে। কোন ভূ-সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত খাজনার নির্ধারিত পরিমাণ 'ইব্রা নামে পরিচিত ছিল। সমগ্র মুসলিম জগতে না হইলেও যে সমস্ত অঞ্চলে কানূন পদ্ধতির মাধ্যমে আধিকাংশ জমির কর নির্ধারণ করা হইত, তথায় এই শব্দটি ভূমিকর ব্যবস্থার একটি প্রকরণের অর্থ বহন করিত। মিসরে ঐতিহ্যগতভাবে একটি বিশেষ প্রশাসকের আওতায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও যাহা মোটের উপর বিস্তারিতভাবে দলীলবদ্ধ ছিল; এই ক্ষেত্রে ভূমিকর নিরূপণে প্রতি খণ্ড জমির আয়তন নির্ধারণ করিয়া নীলনদের প্লাবন হইতে ইহার অবস্থান ও কি প্রকার শস্যের জন্য ইহা উপযুক্ত তাহা নির্ধারণ করা হইত। অতঃপর কোন প্রকার অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে কি পরিমাণ কর প্রাপ্য হইতে পারে তাহা অগ্রিম নিরূপণ করা হইত। ভূমিকর নিরূপণে সার্বিক পদ্ধতিটি রাওক (দ্র.) নামে পরিচিত ছিল (ক্রিয়া রাকা)। এই সকল প্রশাসনিক কার্যাবলী তিনটি দলীলের সৃষ্টি করে ঃ (ক) একটি মৌলিক (আসল) কানূন যাহা কোন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়া স্থায়ী ভিত্তিতে তাহার 'ইব্রা নির্ধারণ করিবে। আল মাকরীযীর মতে তাঁহার যুগে এই কানূনটি প্রতি ত্রিশ বৎসর অন্তর সংশোধিত হইত। (খ) স্থানীয় একটি দলীলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি বার্ষিক কানূন। পূর্বোক্ত কানূনের ভিত্তিতে গঠিত এই কানূনে প্লাবনের পরে প্রতিটি ভূমিখণ্ডের অবস্থা বর্ণিত হইত, এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কি প্রকারের শস্য চাষ করা হইবে তাহা দলীল স্থির করিত। (গ) জমির প্রকৃতি অনুযায়ী সর্বাধিক উপযুক্ত ফসল নির্ধারণ করিয়া এবং জমির পরিমাণ ও ফসলের পরিমাণ উভয়ের ভিত্তিতে উক্ত জমির জন্য প্রদেয় কর নির্দেশক একটি কানূন। ইহার অতিরিক্তি অপরাপর আরও কয়েকটি দলীলের অস্তিত্ব ছিল যাহা প্রধানত কর আদায় সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল (দ্র. খারাজ)।

জমির পরিমাপ করিত একজন কাসসাব (কাসাবা, দৈর্ঘ্যের একক হইতে উদ্ভূত)। গৃহীত পরিমাপের উপর ভিত্তি করিয়া মাসিহ (কানূনগো) জমির আয়তন নির্ধারণ করিত। এইরূপ মনে করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে যে, মাসিহ ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সময় প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে এবং ইব্ন মামমাতী তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের নিয়মাবলী সম্পর্কে তাঁহার পাঠকদের বারংবার সতর্ক করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার জমি, ইহার ধরন, প্লাবনের মাত্রা এবং বিভিন্ন সময়ের শস্যাদির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করা হইত এবং এই সকল বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দাবলী অংশত অ-আরব এবং প্রাক-ইসলামী বলিয়া প্রতীয়মান হয় (দ্র. JESHO, ৫খ, ১৯৬২ খৃ., ২৫৯-৬০, ইব্ন মাম্মাতী ও মাখযূমী হইতে)।

প্রকাশিত প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিসমূহকে উল্লিখিত সমবৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রেণীসমূহে শ্রেণীবদ্ধ করা সুবিধাজনক হইবে। ফায়্যুম সম্পর্কে আন-নাবুলুসীর-র বিবরণ (আয়্যূবী যুগ) বাস্তবপক্ষে সার্বিকভাবে কর ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত চিত্র প্রদান করে; কিন্তু প্রদেশটির শ্রেণীভিত্তিক এবং স্থান ও অঞ্চলভিত্তিক তফসিলভুক্ত করিবার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে তথ্যের পরিমাণ আরও অল্প, তথাপি প্রধান প্রধান রূপরেখা মোটের উপর সুস্পষ্ট। এই সকল অঞ্চলে কর নির্ধারণের জন্য উৎপন্ন শস্যের সুনির্দিষ্ট জরিপ করা অথবা তাহা হইতে সম্ভাব্য প্রাপ্য করের পরিমাণ অনুমান করা ছিল কার্যত অসম্ভব। কারণ সেই সকল অঞ্চলে নিয়মিত প্লাবন অথবা যথেষ্টভাবে কার্যকর কোন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিল না; তথাপি অন্ততপক্ষে জমির আয়তন পরিমাপ করা এমন কি জমির গড় উৎপাদনশীলতার নিরিখে তাহার শ্রেণীকরণ করা সম্ভব ছিল এবং তাহা হইতে ধার্যযোগ্য কর নির্ধারণ করা যাইত, যাহা প্রকৃত উৎপাদনের আলোকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। যেই সকল এলাকায় উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ কর হিসাবে ধার্য করা হইত তাহার তুলনায় বেশীর ভাগ অঞ্চলেই এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইত এবং আয়তন ও শস্যের উপর ভিত্তি করিয়া একটি পরিমাণ অর্থ কররূপে ধার্য করা হইত। ইহা ভিন্ন কতিপয় অঞ্চল ছিল যেখানে রোমান পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। এই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদনক্ষম একটি নির্দিষ্ট আয়তনের উপর ভিত্তি না করিয়া জমির ব্যবহার ও নিযুক্ত শ্রমের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হইত, যাহার ফলে বিভিন্ন আয়তনের ভূমি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপাদন করিত। মিসরের ব্যবহৃত শব্দাবলীর তুলনায় কম জটিল একটি প্রাচীন শব্দমালাও বিভিন্ন প্রকার জমির শ্রেণী নির্দেশ করে। মিসরের ন্যায় প্রথমে 'ইব্রা নির্দিষ্ট করা হইত। জমির পরিমাপ করিতেন একজন মাসিহ এবং এই কার্যে মাঝে মাঝে একজন নিয়ন্ত্রক (মু'আবির) অথবা একজন বণ্টক (কাসসাম) তাহাকে সহায়তা করিতেন। বস্তুতপক্ষে আইনের মাধ্যমে স্থির না হইলেও তাহাদের প্রাপ্য বেতন একটি অতিরিক্ত দেয়রূপে পরিগণিত ছিল, তথাপি মিসরেও এমন অনেক ভূ-সম্পত্তি থাকিয়া যায়, যাহা কোন না কোন হেতুবশত মিসাহা ব্যতীত রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছিল। ফলে এই প্রকার কোন জরিপ ব্যতিরেকে সরাসরিভাবে কর নির্ধারণ করা হইয়াছিল। দলীল সংক্রান্ত বিষয়ে 'দাফতার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য এবং তা'রীখ-ই কুম্ম-এর অনুসরণে A. K. S. Lambton Landlord and Peasant in Persia, ১৯৫৩, ২য় অধ্যায়, দ্রষ্টব্য। পশ্চিমাঞ্চলে অথবা অন্ততপক্ষে মাগরিব অঞ্চলে কর নির্ধারণী জমি জরিপ প্রক্রিয়া ছিল মন্থরতর এবং কম নির্ভুল। ইহা খুবই সম্ভব যে, আল-মুওয়াহহিদগণের পূর্বে মরক্কোতে ইহার প্রবর্তন হয় নাই এবং ইব্ন তুমারত প্রাচ্যে তাঁহার ভ্রমণের পর তথা হইতে ইহা আনয়ন করেন। এই ক্ষেত্রে এমন কি প্রাচ্যের তুলনায় বহু ভূ-সম্পত্তি এই জরিপের আওতাভুক্ত ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে বহু তথ্যগ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গ্রন্থসমূহ এইখানে উল্লেখ করা হইল ঃ (১) ইব্ন মাম্মাতী, কাওয়ানীনু'দ-দাওয়াবীন, সং. 'আতিয়্যা, ১৯৪৩ খৃ., অনু. R. S. Cooper, Ibn Mammati's rules for the ministries, Ph. D. thesis, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, Berkeley ১৯৭৩ খৃ., অপ্রকাশিত; (২) তা'রীখ-ই কুম্ম, সং. জালালু'দ-দীন তিহরানী, তেহরান ১৯৩৪ খৃ.; (৩) The analyses

of Makhzumi and Nabulusi in the articles by Cl. Cahen cited below; (৪) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ৭খ. ; (৫) খাওয়ারিযমী, মাফাতীহু'ল-'উলূম, সং. Van Vloten এবং (৬) The papyit, especially the Cairo ones published by Grohmann where an index of technical terms facilities consultation, আধুনিক গ্রন্থসমূহ ঃ ধারাবাহিকভাবে কিছু নাই, তবে আমরা উল্লেখ করিতে পারি— (৭) E. Lokkegaard, Islamic Taxation, নির্ঘণ্ট; (৮) A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ.; (৯) Cl. Cahen, Quelques problems economiques et fiscaux de le, Iraq buyide, in AIEO, Algiers (১৯৫২ খৃ.); (১০) ঐ লেখক, Les impots du Fayyum ayyubide, in Arabica (১৯৫৫ খৃ.); (১১) ঐ লেখক, Contribution a l'etude des impots dans l'Egypte medievale in JESHO (১৯৬২ খৃ.); (১২) Hassanein Rabie, The financial system of Egypt A. H. ৫৬৪-৭৪১/১১৬৯-১৩৪১, লন্ডন ১৯৭২ খৃ.; (১৩) Daftar and Kharadj প্রবন্ধদ্বয়ও দ্র.।

Cl. Cahen (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

৩। অর্থনৈতিক ও লোকপ্রশাসন

১। বিজয় প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতে পরবর্তীকাল পর্যন্ত কানূন শব্দটি "ভূমিকর লিপিবদ্ধ করিবার রেজিস্টার ও তালিকাসমূহ (কানূনুল-খারাজ অথবা জারা'ইদ) এবং ইহাতে লিপিবদ্ধ বিধানসমূহ (আল-কাওয়ানীনু'ল-মুকাররারা, তু. আল-মাওয়ারদী, সং. কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৬, পৃ. ২১৫, অনু. Fagnan, ৪৬২) এই অর্থ বহন করিতে থাকে। কর নির্ধারণের এই নীতিমালাটি দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা)-এর আমল পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায় এবং সাওয়াদ অঞ্চলে জমির পরিমাণ নির্ধারণ ও জমির নির্দিষ্ট আয়তনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আরোপের ব্যবস্থাটি তাঁহা দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল (আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, কায়রো ১৩০২ হি., ৩৬-৮, ৪৮, ৬০, ৮৫,২১৮; আল-মাওয়ারদী, ১৪৮-৫২, ১৭৪-৬ ; Lokkegaard, ১০৬-২৫)। এই ব্যবস্থা কর নির্ধারণের সামানীয় পদ্ধতির ধারাবাহিকতা হিসাবে বিবেচিত হইত (আবূ য়ূসুফ, পৃ, ৩৮, ৫৭ ; আল-মাওয়ারদী, পৃ. ৭৮, ১৪৮, ১৭৩-৫ ; তাবারী, ১খ, ৯৬২)। ইরানের সাসানীয় পদ্ধতির ন্যায় ইসলামী যুগেও সরকারী নথিপত্র (হিফজু'ল-কাওয়ানীন, আল-মাওয়ারদী, ২১৫) নির্দেশিত বিধিবিধান কঠোরভাবে পালন করাকে ন্যায় ও স্থিতিশীল প্রশাসনের ভিত্তিরূপে গণ্য করা হইত (আল-মাওয়ারদী, ১৫১, ২১৫-৮)। ঐতিহ্যবাহী খিলাফাতের যুগে ফারসী শব্দ দাসতূর ও আওয়ারাজ কানূনের সমার্থক শব্দ হিসাবে "কর-তালিকা" বুঝাইবার অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে (Lokkegaard, ১৭৯, ২৬৫)। কানূন একই সঙ্গে মুকাতা'আ (দ্র.) পদ্ধতিতে ভূমিকর আরোপের সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী (শুরূত)-ও নির্দেশ করে (Lokkegaard, ১০৭)। কানূন শব্দটি কেবল ইরাক ও প্রাচ্যের প্রদেশসমূহে নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যদিও পরবর্তীকালে আল-মাওয়ারদীর (মৃ. ৪৫০/১০৫৮) রচনায় ইহার বহু ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আবূ য়ূসুফের (মৃ. ১৮২/৭৯৮) রচনায় শব্দটির কোন উল্লেখ নাই। 'আব্বাসী যুগের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক পরিভাষারূপে কানূন শব্দটির ব্যবহার মিসরে অব্যাহত থাকে (ইব্ন মাম্মাতী, কিতাব কাওয়ানীনি'দ দাওয়াবীন, সম্পা. A. S. Atiya, কায়রো ১৯৪৩, পৃ. ৩০৫; উছমান আন-নাবূলুসী, K. Luma` al-kawanin, দ্র. Brockelmann, GALS, S. i, ৫৭৩)। পারস্যে (রাওয়ানদী, রাহাতু'স-সুদূর, সম্পা. এম. ইকবাল, ৩৫৬, ৩৮১, ৩৯৮ ; নাসীরু'দ-দীন আত-তূসী, রিসালা, published in THITM, ২খ., (১৯৩২-৯ খৃ.) এবং BSOAS, ১০খ. (১৯৪০-২ খৃ.), ৭৫৯-৬২ ; রাশীদু'দ-দীন, তা'রীখ-ই মুবারাক-ই গাযানী, সং. Jahn, GMS. ৩০৬ ; 'আবদুল্লাহ ইব্ন কিয়া, রিসালা-ই ফালাকিয়্যা, সম্পা. W. Hinz, Wiesbaden ১৯৫৩ খৃ., ১৮২-৪, ২৩, ১৭২; (৭) মুহাম্মাদ ইব্ন হিন্দুশাহ আন-নাখজুওয়ানী, দাসতূরু'ল-কাতিব, ১খ, সম্পা. A. Alizade, মস্কো ১৯৬৪ খৃ. (ফাসল দার কানূন ওয়া য়াসামীশী), আনাতোলিয়ায় (কারীমু'দ-দীন আল-আকসারায়ী, মুসামারাতু'ল-আখবার, সং. O. Turan, আঙ্কারা ১৯৪৪ খৃ., ২৫৭- ২৯৮ ; ইব্ন বীবী, আল-আওয়ামিরু'ল-'আলা'ঈয়া, আঙ্কারা ১৯৬৬ খৃ., ৭২১) এবং মুসলিম ভারতে (ইরফান হাবীব, The agrarian system of Mughal India, লন্ডন ১৯৬৩ খৃ., ১৮৬, ২০২; কানূনগো, দাসতূর, জাবতী) শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। রিসালা-ই ফালাকিয়্যা (পৃ. ১৮২), "কানূন-ই মামলাকাত" কর সংক্রান্ত কোন রেজিস্টারে আগামভাবে নির্ধারিত ও নির্দেশিত এলাকার জন্য সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত করের পরিমাণ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তহসীলদারগণকে এই রেজিস্টার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করিতে হইত। শেষত 'উছমানী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভূমিকরসমূহ এবং তাহা আদায় করার পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যে তাহরীর (দ্র.) রেজিস্টার (defter, তু. আল-মাওয়ারদী, ৮২, দাফতারু'স-সাওয়াফী) প্রচলিত ছিল তাহাকে এবং প্রতিটি সানজাকের কানূননামা-সমূহকে এই একই পদ্ধতির বিস্তারিত অংশমাত্ররূপে গণ্য করিতে হইবে। যেই সকল গৃহে এই সকল রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হইত তাহা ঈলখানী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বায়তু'ল-কানূন এবং 'উছমানী সাম্রাজ্যে দাফতারখানা বলা হইত।

২। অর্থনৈতিক বিধি-বিধানসমূহ ঃ এই অর্থের ক্রমবিকাশরূপে কানূন শব্দটি ক্রমান্বয়ে আইনগত নির্দেশনা অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে, যাহা দেশের শাসনকর্তারূপে সুলতান প্রণয়ন করিতেন এবং তাহা শারী'আ নির্ভর ছিল। এই রূপটি 'আব্বাসী যুগের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে [তু. আল-মাওয়ারদী, ৩২ ঃ আল-কাওয়ানীনু'স-সিয়াসিয়্যা ; এবং আরও বিস্তারিতভাবে (পৃ. ৩৩) ঃ আল-কাওয়ানীনু'শ-শার'ইয়্যা]। নিম্নোক্ত শব্দসমূহ এই অর্থে কানূনের সমর্থক ঃ (১) হুকুম অথবা (ব. ব.) আহকাম (তু. আল-মাওয়ারদী, ২০৭ ঃ আহকামু'ল-খারাজ); (২) কা'ইদা অথবা (ব. ব.) কাওয়া'ইদ (আল-মাওয়ারদী, ১৬৬, ২৬০, ৩৮ ; নিজামু'ল-মুলক, সম্পা. Darke, ৮৯, ৯৫, ১২৬; রাশীদু'দ-দীন, পৃ. গ্র., ৩০৪, ৩২৩; মুহাম্মাদ ইব্ন হিন্দুশাহ, ৩২৩; Code de lois coutum rdes Mehmed II, সম্পা. N. Beldiacnu, Wiesbaden ১৯৬৭ খৃ., fol 1. v.); (৩) দাসতূর হিলাল আস-সাবি, কিতাবু'ল-বিযারা, সং. Amedroz, ৭৮, রিসালা-ই ফালাকিয়্যা, ৫৭; H, Busse, Untersuchungen zum isl, Kanzleiwesen, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ৮৫, ১২৯; তাযকিরাতু'ল-মুলূক, সম্পা. V. Minorsky, ১৭৬; Ottoman destur, as in Barkan, Kanunlar, ১খ, ২৫৯ ; (৪) দারিতা অথবা (ব. ব.)

দাওয়াবিত (রিসালা-ই ফালাকিয়্যা, ২৩ দিয়া'উ'দ-দীন বারানী, ফাতাওয়া-ই-জাহানদারী, অনু. এম. হাবীব এবং এ. ডি. সালিম খান, ৬৪-৭১, ১৩৬-৪৩ ; 'উছমানী দাওয়াবিত, as in দাওয়াবিত-ই মেসা'ইল-ই 'উরফিয়্যা, ইস্তাম্বুল Un. Lib. MS. ১৮০৭, ১) ; (৫) আ'ঈন, বিশেষভাবে বিভিন্ন অমুসলিম উৎস হইতে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত বিধিসমূহের জন্য, যেমন আ'ঈন-ই শাহান, আ'ঈন-ই শাহরিয়ারী, আ'ঈন-ই জিহানবানী অভিব্যক্তিসমূহ (দ্র. F. Wolff, Glossar zu Firdosis Schahname, বার্লিন ১৯৩৫ খৃ., ৪৬, তু. নিজামু'ল-মুলক, সং. Darke, ১৩৮, ২০৯); তবে আরও সামগ্রিকভাবে ব্যবহৃত অর্থে আ'ঈন-ই নারখ-ই আজনাস (আ'ঈন-ই আকবারী, সম্পা. Blockmann, ৬০ এবং তু. Code de lois, ..., পৃ. স্থান); (৬) রাসূম অথবা (ব. ব.) রুসূম প্রচলিত রীতিনীতি অর্থে (আল-মাওয়ারদী, ২১৫; নিজামু'ল-মুলক, ১৩৩; রাওয়ানদী, ১৩৭)। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতে থাকিলে কানূন শব্দটি য়ূরোপীয় আদর্শে প্রণীত সকল প্রকার ব্যবহারিক আইনের (তানযীমা, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ১৩৯-২০৯) অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং কানূন-ই আসাসী শব্দটি 'শাসনতন্ত্র' নির্দেশ করিতে থাকে।

কানূন শব্দটি যে কোন সংগঠনের কার্য-নিয়ন্ত্রক বিধিবদ্ধ আইনসমূহ নির্দেশ করিতেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'উছমানী আমলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্যগণ দ্বারা রচিত ও কাযীর নিকটে নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আইনসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত (তু. F. Dalsar, Bursa'da ipekcilik, ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ., ২৭৪-৬, ৩১৮)। শেষত কানূন দ্বারা আচরণের আনুষ্ঠানিক বিধিমালাবোধক অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে (যথা কানূনু'স-সা'আদা, রিসালা-ই ফালাকিয়্যা, ২)। ইহা ছাড়া শব্দটি দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যে কোনটির মৌলিক তথ্য অথবা সার্বিক নীতিও নির্দেশ করা যায় (যথা কানূনু'ল-বালাগা অথবা কানূন ফি'ত-তিব্ব)।

৩। কানূন (ধর্ম বহির্ভূত আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অর্থে) এবং ইহার শারী'আর সাথে সম্পর্ক। প্রথম যুগের খলীফাগণের সময় হইতেই এমন কিছু আইনগত নজীর পাওয়া যায় যাহা কেবল উলু'ল-আমর (দ্র.)-এর ইচ্ছানুসারে আরোপিত হইয়াছিল, যথা ঃ সাওয়াদ (আবূ য়ূসুফ, ৪৭-৫৬, ৯৭)-এর ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে 'উমার-এর সিদ্ধান্ত। এইরূপ নির্দেশাবলী সাধারণত সুনির্ধারিতরূপে শারী'আ-র অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত। সুন্না (দ্র.) সংক্রান্ত ধারণার অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান এবং ইসতিহসান (দ্র.) নীতির ব্যাপক প্রয়োগের কারণে 'উরফ এবং 'আদা (দ্র.)-এর ন্যায় প্রশাসনিক প্রবিধান এবং বিধিমালাও (দ্র. 'আমাল, আমর) শারী'আর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত (দ্র. J. Schacht, Origins, ৯৯-১১২)। কিন্তু আশ-শাফি'ঈ, বিশেষভাবে ইব্ন হাম্বাল ও দাঊদ ইব্ন খালাফ (দ্র.)-এর ইসতিহসান-এর প্রত্যাখ্যান ও সুন্নার সংকীর্ণতর ব্যাখ্যার কারণে এই পদ্ধতির অবসান ঘটে।

শারী'আর কাঠামোর মধ্যে সাধারণ আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলী প্রথমত ভূমিকর সংক্রান্ত প্রবিধান (উদা. আবূ য়ূসুফ, য়াহয়া ইব্ন আদাম, আবু'ল-ফারাজ, কুদামা) এবং পরবর্তীকালে (৪র্থ/১০ম শতাব্দীর হইতে) সাধারণ বিষয়াবলীর সহিত সশ্লিষ্ট বিধানসমূহ বিবেচিত হইতে থাকে ঃ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস (দ্র. ইমাম), প্রশাসনিক আইন (দ্র. বিলায়া, সিয়াসা, মাজালিম) বাজার সংক্রান্ত প্রবিধান (দ্রষ্টব্য হিসবা) এবং দণ্ডবিধি (দ্র. তা'যীর) [দ্র. আল-মাওয়ারদী, আবূ য়া'লা, ইব্ন জামা'আ' ইব্ন তায়মিয়্যা ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, স্থা.]। আশ-শাফি'ঈ-র পর হইতে উসূলু'ল-ফিকহ-এর গণ্ডি এত সংকীর্ণভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, নূতন প্রশাসনিক বিধানাবলী ইহার আওতার বাহিরে গড়িয়া যায় এবং তাহা একটি নূতন "রাষ্ট্রীয় আইন" বা শাসনকর্তার আইনের আওতাভুক্ত হয়। খিলাফাতের মধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন এই পদ্ধতিকে উৎসাহ প্রদান করে ঃ পারস্যের বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত সালতানাতসমূহের (বুওয়ায়হী, সামানীয়, গাযনাবী, সালজূকী), স্থানীয় আমলাতন্ত্র [দ্র. কাতিব] রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রাচীন ইরানী ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে এবং ইহার মাধ্যমে সালতানাতসমূহের মালিকগণের একচ্ছত্র ক্ষমতা শক্তিশালী করিতে সচেষ্ট হয়। এই সময়েই আল-মাওয়ারদী (৭৭-৮) শারী'আ আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা (তানফীযু'ল-আহকাম) এবং মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় ও পার্থিব অধিকার সংরক্ষণ (হিরাসাতু'দ-দীন ওয়া সিয়াসাতু'দ-দুনয়া) করার জন্য পার্থিব শক্তির (কুওয়াতু'স-সালতানা বা ইমারা) প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রণয়ন ও প্রবিধান প্রচলন করার ক্ষেত্রে ইহার যোগ্যতা প্রমাণ করিতে একটি মৌলনীতি হিসাবে শারী'আ প্রদত্ত জনস্বার্থকে [দ্র. মাসলাহা] স্বীকৃতি দান করা হয়। এই যুক্তিটি মুসলিম সালতানাতসমূহে ('উছমানী সালতানাতসহ, তু. Tursun, তা'রীখ-ই আবু'ল -ফাতহ, (১৩) আইন প্রণেতা হিসাবে সুলতানের ক্ষমতার ভিত্তিরূপে বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই একই সময়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে ইরানী দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সম্পর্কিত 'আদালা (দ্র.) ও কানূন সম্পর্কিত ধারণাবলী, রাজনীতি সম্পর্কে লিখিত ফাকীহগণের রচনাবলীতে পৃথক পৃথক বিষয়রূপে স্থান পাইতে থাকে (তু. আল-মাওয়ারদী, ৭৭-৯৫)।

পার্থিব আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ বিষয়াবলী স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ আইনের গণ্ডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়— এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে আল্-'আমালু'ল-'আম্মা, সিয়ার (দ্র.) এবং হুকূকুল্লাহ (দ্র.) নামকরণ করিয়া শারী'আ হইতে ইহার বিশেষত্ব প্রদান করা হয় এবং সামরিক ও সরকারী সংগঠন, কর ব্যবস্থা, বিশেষত ভূমিকর (দ্র. খারাজ) এবং ইহার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ভূমি আইন, বায়তু'ল-মাল [দ্র.] সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রশ্ন ইহার আওতাভুক্ত ছিল। শারী'আ অমুসলিমপ্রদত্ত করসমূহের মাত্রা, বিজিত ভূমি বা মাওয়াত (দ্র.) ভূমি কি কার্যে ব্যবহৃত হইবে, তা'যীর (দ্র.) শাস্তি প্রদানের কঠোরতা এবং জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার (দ্র. হিসবা) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রবিধানসমূহ জারী ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা ইমামগণের হস্তে ন্যস্ত করে। যে কোন বিষয়ে যাহা শারী'আ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেই সম্পর্কে জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইমাম বা সুলতানের কর্তৃত্বও শারী'আ স্বীকার করিয়া নেয়। ক্রমে ইহাতে ঐকমত্যে উপনীত হয় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নাস্‌স (দ্র.) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ যে কোন বিষয়ে সুলতানের আদেশ পালন করিতে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য থাকিত (তু. কানূননামা-র ভূমিকা, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, MS, T ১৮০৭)।

অধিকন্তু কতিপয় ফুকাহা' শাসনকর্তার কর্তৃত্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে শারী'আ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন (তু. আবু'স-সু'উদ-এর মা'রূদাত-এ প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহ, MTM, ১খ, ৩৩৭-৪৮=p.Horster, Zur Anwendung des Islamischen Rechts im 16.

Jahrhundert, Stuttgart ১৯৩৫ খৃ.)। যেই সকল ক্ষেত্রে শারী'আত দুইটি সমাধান অনুমোদন করিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে উলু'ল-আম্‌রের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত (আবূ য়ূসুফ, অনু. Fagnan, ১০৩-৪)। আবার ফুকাহা'-র মধ্যে গুরুতর ইখতিলাফ (দ্র.) দেখা দিলে শাসনকর্তা জনগণের সংগে রীতি পদ্ধতির ঐক্যরূপ নিশ্চিতকরণ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি রোধ করার স্বার্থে এইরূপ বিধান জারী করিতে পারেন যে, কোন বিশেষ মাযহাব (দ্র.)-এর প্রদত্ত নীতিমালা পালন করিতে হইবে ঃ এই প্রথার অনুসরণ 'আব্বাসীগণের অধীনে (দ্র. ইবনু'ল-মুকাফ্‌ফা') এবং পরবর্তী কালে সালজূকী [দ্র. মালিক শাহ] এবং 'উছমানীগণের (তু.মা'রূদাত, ২৪৭) আমলে কাযীগণের আদালতে হানাফী আইন অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে আইন উন্নয়নের পথনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। হানাফী মাযহাব [দ্র. আবূ হানীফা]-এর বৈশিষ্ট্যময় উদার ও বিস্তারিত নীতিমালা একটি নূতন পর্যায়ের সূচনা করে, এই পর্যায়ে একদিকে যেমন ফাতওয়া [দ্র.]-এর রূপে—অপর দিকে কাযীগণের আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সুলতানের জারীকৃত প্রবিধানসমূহের মাধ্যমে নূতন আইনগত বিধি প্রণয়ন করা যাইত। মঙ্গোল আক্রমণের পরবর্তী যুগে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আইনের ধারণা আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে 'উছমানী সাম্রাজ্য মধ্যএশিয়ায় উপমহাদেশে এবং তৈমুরী স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশসমূহে রাষ্ট্রীয় সংগঠন, সামরিক বিষয়াবলী, কর ব্যবস্থা, ভূমি প্রশাসন এবং দণ্ডবিধি সম্পর্কিত বিষয়ে শাসনকর্তার জারীকৃত বিধানসমূহ শারী'আ নিরপেক্ষ একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে।

ঈলখানী রাষ্ট্রে পারস্যের আমলাগণের প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন আইনের প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রাচীন ইরানী ধারণা ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতেছিল অপরদিকে মঙ্গোল অভিজাত সম্প্রদায় য়াসা (yasa) [দ্র.]-র আইন পদ্ধতির প্রাধান্য নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট ছিল। মধ্যএশিয়ায় শুষ্ক তৃণাবৃত (steppe) অঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের প্রচলিত বিশ্বাস ঐতিহ্যসমূহ এই ধারণাকে উৎসাহ প্রদান করে যে, রাষ্ট্র মূলত কাগান-এর নির্দেশিত তোরূ ('আরবী তুরা দ্র.-এর তূযুক)-এর প্রয়োগের মাধ্যমেই টিকিয়া থাকিতে পারে (দ্র. H. Inalcik, kutadgu Bilig'de Turk ve Iran devlet ve siyaset nazariye ve gelenekleri, in Resit Rahmeti Arat icin, আনকারা ১৯৬৭ খৃ., ২৫৯-৭১)। এই ধারণা তুর্কী ও মঙ্গোল বংশসমূহের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে আমদানী হয় এবং তথায় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহে ইহা টিকিয়া থাকে (ইহাদের মধ্যে 'উছমানী রাষ্ট্রও অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'উছমানীগণের জন্য কোন এলাকায় তাহাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা সেই অঞ্চলে কানূন-ই 'উছমানী প্রবর্তনের উপর নির্ভরশীল ছিল)। ইহা উপেক্ষা করা যায় না যে, কতিপয় প্রাথমিক যুগের 'উছমানী গ্রন্থকার [উদাহরণ ঃ আহমেদী, দ্র. TM, ৬খ. (১৯৩৬-৩৯ খৃ.), ১১১] চিঙ্গীয খানের য়াসা-র প্রশংসা করিয়াছেন যে, ইহাতে ন্যায়বিচারের স্থান নিশ্চিত করা হইয়াছে এবং 'উছমানী রাষ্ট্রীয় বিধানসমূহ প্রায়শ য়াসাক বা য়াসাকনামারূপে পরিচিত। মিসর এবং সিরিয়াতেও সিয়াসার সহিত মিলিতভাবে য়াসা আইনের একটি বৈধ উৎসাহরূপে স্বীকৃত হইতে থাকে [দ্র. D. Ayalon, in St. Isl., ৩৮খ, (১৯৭৩ খৃ.), ১১৫]।

এই সকল নূতন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আইন ও শারী'আর মধ্যে বিদ্যমান সংঘাত বস্তুতপক্ষে আমলাতন্ত্র, 'উলামা' শ্রেণী এবং সামরিক শ্রেণীর মধ্যকার রাজনৈতিক সামাজিক সংগ্রামেরই বহিঃপ্রকাশ। পারস্য ও আনাতোলিয়ার মঙ্গোল শাসনের অবসানের পর তুর্কী মঙ্গোল রাষ্ট্রীয় আইনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় ('আযীয আসতারাবাদী, বাযম-উ রাযম, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ২২৩; Z. V. Togan, Umumi Turk tarihine, giris, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., ২৭১, ৩২০, ৩৭৬; শাহরুখ-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে দ্র. MTM, ২খ, ৩৫৭; সিরিয়া ও মিসর সম্পর্কে দ্র. D. Ayalon, in St. Isl. ৩২খ, ৯৭-১৪০; ৩৪খ, ১৫১-৮০; ৩৬খ, ১১৩-৫৮; ইরানের জন্য দ্র. Spular, Mongolen, বার্লিন ১৯৬৮ খৃ., ২৩৫-৪৪)। রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে নিযুক্ত কতিপয় 'উলামা' ইসতিহসান, মাসলাহা, বিশেষত 'উরফ (দ্র.)-এর ন্যায় ইসলামী নীতিমালার প্রতি নির্দেশ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আইনের নীতির বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

পরবর্তী বৎসরসমূহে এই সকল নীতির ভিত্তিতে যে সকল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিধি সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে তাহাদের মধ্যে ছিল 'উছমানী সাম্রাজ্য ও উপমহাদেশের তুর্ক-মঙ্গোল রাষ্ট্রসমূহ। 'উছমানী আইনবেত্তাগণ এই সকল শর্তের গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই নীতিগ্রহণ করেন যে, যেহেতু প্রাচীন যুগ হইতে রাষ্ট্রীয় আইন স্বাধীন য়ারগু (yargu দ্র.) আদালতের বিবেচ্য ছিল সেই কারণে কাযীগণের ইহা প্রয়োগ করা উচিত অবশ্য সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্বের আদালতসমূহ বহাল থাকে; প্রধান উযীরের জানিসারীগণের আগা, কাপুদান পাশা এবং দেফতেরদারগণের বিশেষ দীওয়ানসমূহ। 'উছমানী রাষ্ট্রে শারী'আ এবং শাসনকর্তা প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘাত কয়েকটি পর্যায়ে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে। এককেন্দ্রিক ও চরম রাজকীয় পদ্ধতির প্রবর্তণ ২য় মেহমেদ [দ্র.] কানূন ও 'উরফ সংক্রান্ত নীতিসমূহ শক্তিশালী করেন। তিনি 'উছমানী কানূননামা জারী করেন এবং 'উলামা'কে অধিকতর নিবিড়ভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সুসংহত সংস্থায় সম্মিলিত করেন। আমলাতন্ত্রের অন্তর্গত একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিকের (তুরসুন, ১৩) মতে এই বিশ্বের সুশৃঙ্খলার (নিজাম) জন্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই সুলতানের চরম কর্তৃত্বে (য়াসাগ-ই পাদিশাহী) এবং সুলতানের একক ইচ্ছা হইতে উৎসারিত তাঁহার জারীকৃত বিধানসমূহ প্রয়োজন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় বায়াযীদের শাসনামলের প্রথম দিকে তাঁহার প্রতিবন্ধকতাহীন শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শারী'আ আইনের সমর্থকগণের জোরাল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১ম সেলীম রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীতে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষসমূহের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেন (তু. 'আলী জেমালী, গ্রন্থপঞ্জীতে উদ্ধৃত)। ১ম সুলায়মান যদিও রাষ্ট্রীয় আইনের উপর শারী'আ-র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি রাষ্ট্রীয় আইন নিশানজী (দ্র.)-এর আওতাভুক্ত হওয়ায় ইহা নিজস্ব স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শারী'আ ও কানূন-এর তুলনামূলক প্রভাব সংশ্লিষ্ট মাযহাবের বৈশিষ্ট্যের মাত্রার উপর নির্ভর করিত ঃ এই প্রসঙ্গে আবু'স-সু'উদ ওয়াকফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবহারকে ইসতিহসানের ভিত্তিতে শারী'আ অনুযায়ী সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। অপরপক্ষে মেহমেদ বিরগেরী (দ্র.) ইহাকে সম্পূর্ণভাবে বেআইনীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিরগেরী ও কাদী যাদেশীগণ নিঃসন্দেহে হাম্বালী মাযহাব অনুসরণ করিতেন। ১১শ/১৭শ শতাব্দী হইতে পরবর্তীকালে অবশ্য কানূন-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সংকুচিত হইতে থাকে এবং পাশাপাশি শারী'আ-র প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মুফতীগণের প্রদত্ত ফাতওয়া ক্রমবর্ধমানভাবে নিশানজীগণের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংকুচিত করিতে

থাকে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় শায়খু'ল-ইসলাম-এর প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ১২০৭/১৬৯৬ সালে সুলতানের এক ফরমানের মাধ্যমে শারী'আ-র পাশাপাশি কানূন শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় (ও. নূরী, মেজেল্লি-ই বিলিদিয়্যে, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯২২ খৃ., ৫৬৮)।

তথাপি পরবর্তীকালে সংস্কারবাদী যুগে শারী'আ নিরপেক্ষ কানূন প্রণয়নের কর্মতৎপরতা আর একবার বৃদ্ধি পায় এবং কানূন ও শারী'আ-র মধ্যে দ্বন্দ্ব তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিক্ত হইয়া প্রকাশ্য সংঘাতে আত্মপ্রকাশ করে (দ্র. ৩য় সেলীম, নিজাম-ই জেদীদ, ২য় মাহমূদ, ইসলাহ)। ইহা সত্য যে, এই সকল কানূন সব সময়েই ইসতিহসান-এর যুক্তিতে ধর্মীয় আইনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং দীন ও উম্মাহর মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয়রূপে প্রদর্শন করা হইত। প্রায়শই ইহারা 'উলামা'র নিকট হইতে গ্রহণযোগ্যতার সনদবাহী ফাতওয়া লাভ করিত ; আমলা শ্রেণী এই সংস্কারগুলি প্রবর্তন করে, তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অপরাপর সকল বিবেচ্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে তাহারা যে সকল উৎস হইতে প্রেরণা লাভ করে সেই সকলই ছিল ইসলামের অজ্ঞাত (প্রাচীন ইরানী, তুর্কী রাষ্ট্র অথবা ১৯শ শতকের বিভিন্ন য়ুরোপীয় রাষ্ট্র)। এইভাবে আধুনিকায়নের পথে প্রবেশ করিতে উদ্যোগী বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীতে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তাহার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কানূন ও শারী'আ-র মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে। তানজীমাত (দ্র.) যুগে 'উছমানী রাষ্ট্র শাসনকর্তা প্রণীত আইনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহে (প্রশাসন, কর ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি আইন ইত্যাদি (য়ুরোপীয় আইন পরিবর্তিত অবয়বে অথবা অপরিবর্তিভাবে প্রবর্তিত হয় (দ্র. H. Veldet, kanunlasterma hareketleri, in Tanzimat, ১খ, ১৩৯-২০৯)।

য়ুরোপীয়করণ ও আধুনিকায়নের চ্যালেঞ্জের ফলে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। একদিকে তরুণ বুদ্ধিজীবী ও 'উলামা "ইজতিহাদের দ্বার" উন্মুক্ত করা যাইবে কিনা এই প্রশ্নের বিরোধতা করেন [দ্র. নামিক কামাল, জামালু'দ-দীন আফগানী, মুহাম্মাদ 'আবদুহু], অপর দিকে 'উছমানী বুদ্ধিজীবিগণের একাংশ [দ্র. য়েনী 'উছমানলিলার] ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানের অনুসারিগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দাবি করিতে থাকেন যে, মু'আমালাত [দ্র.] প্রসঙ্গে শারী'আ হইতেছে মু'আমালাত সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি মাত্র এবং তাহা সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনশীল প্রয়োজনসমূহ একটি জাতীয় পরিষদ (শূরা দ্র.)-এর মাধ্যমে এবং নাসস (মৌল বিধি)-এর কাঠামোর মধ্যে নূতন আইন প্রণয়নের দ্বারা মিটানো যাইতে পারে।

এই সকল চিন্তাধারা ১৯১৭ সালের পারিবারিক আইনের আমূল পরিবর্তনে সহায়ক হয়। ইহার ফলে কাযীর আদালতসমূহ শায়খু'ল-ইসলামের নিয়ন্ত্রণ হইতে অপসারণ করিয়া বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে অবশ্য আইনের ইসলামী উৎসের সহিত একটি যোগসূত্র রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা বর্তমানকাল পর্যন্ত বলবৎ রহিয়াছে (দ্র. ইসলাহ)।

৪। 'উছমানী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কানূন প্রণয়ন ও জারী করার পদ্ধতি ঃ কানূন-আইন প্রণয়নের উৎস ও যৌক্তিকতা 'উরফ [দ্র.)-এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা সুলতানের অপ্রতিহত নির্বাহী কর্তৃত্ব (এবং ইহার সমার্থক য়াসাক) প্রকাশ করিত। ফলে কোন প্রকার কানূন সুলতানের একটি হুকুম [দ্র.]-রূপে প্রকাশ করা যাইত। ইহার স্বাভাবিক ভাষ্য ছিল ঃ Kanun emr edub buyurdum ki. ..." একটি কানূন হুকুমনামা ঘোষণা করিয়া (কানূন জারী করিয়া) আমি এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতেছি যে, ..." [তু. Belletin, ১১/১৪খ. (১৯৪৭ খৃ.), ৭০০, দলীল নং ১০]। বাস্তব অবস্থায় প্রচলিত পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ নিশানজী অথবা দেফতেরদার-এর দফতরের সহিত সংযুক্ত কোন একজন কেরানী, একটি বেরাতের অথবা একটি ফরমানের রূপে একটি হুকুমনামা রচনা করিত। এই খসড়াটি নিশানজী অথবা দেফতেরদার কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পর প্রধান উযীর তাহা সাহীহ ('সঠিক') শব্দটি দ্বারা অনুমোদন করিতেন। গুরুত্বপূর্ণ কানূনসমূহ এবং সুলতানের খাত্ত (যথাযথ স্বাক্ষর) প্রাপ্ত হইয়া অনুমোদন লাভ করিত। এইরূপ প্রমাণ রহিয়াছে যে, কতিপয় কানূন স্বয়ং সুলতানের নির্দেশে লিখিত হইয়াছে (তু. ইসতাম্বুল, সুলায়মানিয়া গ্রন্থাগার, পাণ্ডু. Reisulkuttab ১০০৪, ক পত্র ৩৪ক)। তীমার কৃষি-কর এবং ভূমি আইনসমূহ সম্পর্কিত কানূনসমূহ নিশানজীর আওতাভুক্ত ছিল। অপরাপর অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত কানূনসমূহ দেফতেরদার-এর অধীনে বাশমুহাসিবির দফতরে নিবন্ধন করা হইত। কানূনসমূহের প্রতিলিপি ইহাদের প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরিত হইত কাযী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মুলতিযিম, শুল্ক বিভাগের আমিনগণ প্রমুখ। কাযী এবং প্রাদেশিক প্রশাসকগণ ইহাদের নিবন্ধন (রেজিস্ট্রি) করিতেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা অন্তর্ভুক্ত করিতেন—উপযুক্ত দস্তাবেজে হয় পৃষ্ঠায় উপান্ত-টীকায়—নয় তো সংক্ষিপ্ত চিরকুটে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা সংযোজন করা হইত। জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কানূনসমূহ বাজার অথবা মসজিদের অঙ্গনের ন্যায় উপযুক্ত স্থানে ঘোষণাকারীর মাধ্যমে (মুনাদী) উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হইত অথবা কাযী তাহা আ'য়ান (দ্র.) এবং আশরাফের নিকট পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন; শেষোক্তগণকে এই উদ্দেশে কাযীর দরবারে আনয়ন করা হইত। মূল দলীলটি শহরের বেদেসতান অথবা কাযীর নজরের মধ্যে রক্ষিত একটি সিন্দুকে সংরক্ষিত করা হইত (ত্র. Paris, Bibl. Nat., Ms. anc, fonds turc ৪১, পৃ. ২৫)। যেহেতু কানূন ছিল সুলতানের ব্যক্তিগত নির্দেশ সেইহেতু ইহা বলবৎ থাকার জন্য ইহাকে নূতন শাসকের অনুমোদন লাভ করিতে হইত, এমন কি স্বয়ং ২য় মেহমেদ ইহা মানিয়া লন এবং উল্লেখ করেন যে, কানূনসমূহের উন্নতি ও পরিবর্তন প্রয়োজন হইতে পারে। কোন তাহরীর (দ্র.) পরিচালনা কালে রাজ্য বিজয় 'আদালাতনামা জারী করা [অপব্যবহার রোধ করে জারীকৃত এই সকল প্রচারিত ফরমানের জন্য দ্র. Belgeler, ২/৩-৪খ. (১৯৬৫ খৃ.), ৪৯-১৪৫] অথবা কোন সংস্কার ত্বরিৎ বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য কানূনের ঘোষণা সাধারণত বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

'উছমানী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কানূনসমূহ যে স্বাধীন মর্যাদা ভোগ করিত, তাহার ইঙ্গিত এই বাস্তবতার মাধ্যমে পাওয়া যায় যে, ইহারা সম্পূর্ণভাবে নিশানজীর তদারকে ছিল। কানূনসমূহের চূড়ান্তকরণ এবং সরকারীভাবে জারীকরণ তাঁহার হাতে ছিল। কেননা কানূনসমূহকে প্রামাণিক করিবার জন্য তুগরা (দ্র.) সংযোজন করার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কোন কানূন আর বলবৎ থাকিবে কিনা তাহা নির্ধারণ করা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রচারিত নূতন হুকুমসমূহ প্রচলিত বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাহা বিচার করাও ছিল তাঁহার দায়িত্ব। যেহেতু কানূন

অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ভূমি সম্পর্কিত বিষয় ও তীমার পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিল, সেইহেতু শেষোক্ত ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কানূন সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া পড়ে এবং নিশানজী তাঁহার সাবেক গুরুত্ব হারাইয়া ফেলেন।

ইহা মোটেও আকস্মিক নয় যে, 'উছমানী সাম্রাজ্যের বাহিরে, বিশেষভাবে উপমহাদেশে এবং ঐ সকল মুসলিম রাষ্ট্রে যাহা মধ্য এশিয়া হইতে আগত তুর্ক বংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—তথায় কানূনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার নীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। এ সকল অঞ্চলেও কানূন বা ঐ সকল অঞ্চলে অধিকতর প্রচলিত শব্দাবলী দাবিতা, আ'ঈন, দাসতূর অথবা শাহী ফরমানসমূহ শাসনকর্তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়রূপে ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ইরানী ধারণার এবং মধ্যএশিয়া তোরু বা তুবুক শব্দের উত্তরসুরিরূপে চিহ্নিত করা যায়। দিয়া'উদ-দীন আল-বারানীর মতে (আনু. ৭৬০/১৩৫১ সালে লিখিত) কোন যাবিতা (ضـــابـطـة) বা রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে এমন একটি কার্যপ্রণালী যাহা একজন সুলতান রাষ্ট্রের কল্যাণ অর্জনের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় দায়িত্বরূপে নিজের উপর চাপাইয়া দেন এবং যাহা হইতে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন না (অনু. M. Habib and Salim Khan, Political theories, পৃ. ৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Y. Karayalcin ve A. Mumcu, Turk Hukuk Bibliyografyasi, আনকারা ১৯৭২ খৃ.; (২) M. Khadduri and H. J. Liebesny, Law in the Middle East, ওয়াশিংটন ডি.সি ১৯৫৫ খৃ.; (৩) M. Khadduri, The Juridical Theory of the Islamic State, in MW, ৪১খ. (১৯৫১ খৃ.), ১৮১-৮৫; (৪) J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence[2], অক্সফোর্ড ১৯৫৯ খৃ.; (৫) E. Tyan, Methodologie et sources du droit en Islam, in SI, ১০খ. (১৯৫৯ খৃ.), ৭৯-১০৯; (৬) N.P. Aghnides, Mohammadan Theories of Finance with an Introduction to Mohammedan Law, ১৯১৬ খৃ.; (৭) C. H. Becker, Steuerpacht und Lehnwesen", in Isl, ৫খ. (১৮১৪ খৃ.), ৮১-৯২। খারাজী সম্বন্ধে পুস্তকাদির জন্য দ্র. (৮) I. Goldziher, Deutsche Lit. Zcitung, ১৭খ. (১৮৯৬ খৃ.), পৃ. ১৫১৪, প.; (৯) H. F. Amedroz, The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi, in JRAS (১৯১১ খৃ.), ৬৩৫-৭৪; (১০) H. A. R. Gibb, The Evolution of Government in early Islam, in SI, ৪খ. (১৯৫৫ খৃ.), ১-১৭; (১১) Reuben Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge ১৯৫৭ খৃ., ২৪২-৭০; (১২) Gibb, The Fiscal Rescript of 'Umar II, in Arabica, ২খ. (১৯৫৫ খৃ.), ২-১৬; (১৩) M. J. Coulson, Doctrine and Practice in Islamic Law, in BSOAS, ১৮খ. (১৯৫৬ খৃ.), ২১১-২৬; (১৪) 'Ali 'Abd al-Razik, L'Islam et les bases du pouvoir, অনু. L. Bercher, in REI, ৩-৪ খ. (১৯৩৩ খৃ.); (১৫) A. d'Emilia, Roman Law and Muslim Law, a Comparative Outline, in East and West, ৪খ., (১৯৫৩ খৃ.), ৭৩-৮০; (১৬) H. Busses, Chalif und Grosskonig, die Buyiden in Irak, বৈরূত ১৯৬৯ খৃ., ১৩১-৮৮; (১৭) I. Goldziher, Les Bida', in BEA, ২খ. (১৯৪২ খৃ.), ১৩১-৪; (১৮) 'আযীয আহমাদ, The Nature of Islamic Political Theory, in IC, ১৭খ. (১৯৪৩ খৃ.), ৩৯-৪৮; (১৯) Barthold, Etudes sur la notion islamique de souverainete, in RMM (১৯২৫ খৃ.); (২০) Dijelal Noury, Le droit public et l'Isalm Constantinople ১৯০৯ খৃ.; (২১) M. Hamidullah, The Quranic Conception of the State, in Quranic World, হায়দরাবাদ, এপ্রিল ১৯৩৬ খৃ.; (২২) M. M. Siddiqi, The Development of Islamic State and Society, লাহোর ১৯৫৬ খৃ.; (২৩) M. Fuad Koprulu, Les institutions juridiques turques au Moyen-Age, y-a-t-il un droit public turo distinct du droit public musulman? in Congress of Turkish History, ১৯৩৭ খৃ.; (২৪) P. Wittek Islam und Kalifat, Islam und Kalifat, in Arch. F. Sozialwiss. u. Sozialpolitik, ৫৩ খ. (১৯২৫ খৃ.), ৩৭০-৪২৬; (২৫) E. Tyan. Institution du droit public musulman. প্যারিস ১৯৫৪-৬ খৃ.; (২৬) ঐ লেখক, Hist. de l'lorganisation judiciaire en pays d'Islam, লাইডেন ১৯৬০ খৃ., ৪৩ ৩-৬৫০; (২৭) F. Lokkegaard, Islamic Taxation in the Classical Period, কোপেনহেগেন ১৯৫০ খৃ.; (২৮) M. Habib and Afsar Umar Salim Khan, Political Theories of the Delhi Sultanate, যিয়াউ'দ-দীন বারানীর ফাতওয়া-ই জাহানদারীর একটি অনুবাদ সমেত, ১৩৫৮-৯ খৃ, Allahabad-Bombay-Delhi, n.d. (বিশেষত অধ্যায় ৪); (২৯) W. Husain, Administration of Justice during the Muslim Rule in India, ক্যালকাটা ১৯৩৪ খৃ. (কানূন-ই শাহী এবং Jus gentium, ১৩৪-৪৫); (৩০) Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India (১৫৫৬-১৭০৭ খৃ.), বোম্বে ১৯৬৩ খৃ.; (৩১) আবু'ল-ফাদল, আঈন-ই আকবারী, অনু. Blochmann, কলিকাতা ১৮৬৭-৭৭ খৃ.; (৩২) Persian Sources of Indian History, সং. G. H. Khare, Poona ১৯৩৭ খৃ.; (৩৩) D. Ayalon, The Great Yasa of Chingiz Khan a reexamination, in SI, ৩০খ, ৯৭-১৪০, ৩৩-৩৪খ, ১৫১-৮০; ৩৬খ, ১১৩-৫৮, ৩৮খ, ১০৭-৫৬; (৩৪) R. Anhegger and H. Inalcik, Kanunname-i Sultani ber muceb-i` orf-i `Osmani, আনকারা ১৯৫৬ খৃ.; (৩৫) R. Anhegger, Beitrage zur Geschichte des Bergbaus im osmanischen Reich, 2 vols. and Nachtrag, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩-৫ খৃ.; (৩৬) N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans, II. : Les lois miniers, প্যারিস-দি হেগ; (৩৭) কানূননামা-ই আল-ই 'উছমান, সম্পা. এম 'আরিফ, TOEM, পরিশিষ্ট, ইস্তাম্বুল ১৩২৯-৩০ খৃ.; (৩৮) কানুনি-ই কানূননামে, in Monumenta Turcica, ser. I, নং ১, সম্পা. B. Durdev

এবং অন্যরা; (৩৯) Paul Horster, Zur Anwendung des islamischen Rechts im 16; (৪০) Jhdt, Bonner Orientalist Studien, Heft 10 stuttgart ১৯৩৫ খৃ.; (৪১) G. D. Galabov and H. W. Duda, Die Protokolbucher des Kadiamtes Sofia, Munich ১৯৬০ খৃ.; (৪২) O. L. Barkan, XV ve XVI inci asirlarda Osmanli Imperator Iugunda zirai ekonominin-hukuki eve mali esaslari, I, Kanunlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (৪৩) S. J. Shaw The financial and administrative development of Ottoman Egypt, ১৫১৭-১৭৯৮ খৃ., Prinecton ১৯৬১ খৃ.; (৪৪) Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Penal Law, সম্পা. V. L. Menage, অক্সফোর্ড ১৯৭৩ খৃ.; (৪৫) R. Mantran and J. Sauvaget, Reglements fiscaux ottomans, Les provinces syriennes বৈরুত ১৯৫১ খৃ.; (৪৬) A. S. Tveritinova, xvi. Yuzyil Osm. Imp. mali ve. idari sistemini ilgilendiren bazi delgeler, in Tarih Arastirmalari, ৭/১২-১৩ খ. (১৩৬৯ খৃ.), ৬৫-৮৮; (৪৭) H. Scheel, Die stastsrechtliche stellung der okumenischen Kirchenfursten, in der alten Turkei, বার্লিন ১৯৪৩ খৃ.; (৪৮) F. Selle, Prozessrecht des 16. Jahrhumderts im osmanischen Reich. Wiesbaden (১৯৬২ খৃ.); (৪৯) Osmanli Kanumnameleri, in MTM, ১/১খ. (১৩৩১), ৪৯-১১২, ১/৩, ৪৯৭-৫৪৪; (৫০) Ottoman colleotion of Kanuns from 1839 onwards, in Dustur, ১ম সিরিজ, ৪ খণ্ড, ১৮৮১-৫ খৃ. এবং ৪ সম্পূরক খণ্ড, ১৯৩৭-৪৪ খৃ.; (৫১) দ্বিতীয় সিরিজ, ১২ খণ্ড, ১৯১৩-২৮ খৃ.; (৫২) J. Schaoht, Sari'a und Qanun im modernen Agypten, in isl., ২০খ. (১৯৩২ খৃ.), ২০৯-৩৬; (৫৩) W. Padel, La legislation fonciere Ottoman, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.; (৫৪) A. Heidborn, Manuel de droit public et sdministratif de E`empire ottoman, ভিয়েনা-লাইপযিগ ১৯০৮-১২ খৃ.; (৫৫) J. N. D. Anderson, The Shari`a and Civil Law, in IQ, ১খ. (১৯৫৪ খৃ.), ২১-৪৬; (৫৬) S.S. Ansay. Das Turkisohe Recht, in Orientalisches Recht. Hanbuch, der Orientalistik, লাইডেন ১৯৬৪ খৃ., ৪৪১-৬১; (৫৭) E. Pritsch, Die Moxlerntsierung des turkischrn Reohta, in Juristitche Monatschrift, lv (১৯২৬ খৃ.), ২৮-৩৫; (৫৮) L. Ostrorog, The Angora Reform, লন্ডন ১৯২৭ খৃ.; (৫৯) G. Jaschke, Die rechtliche Bedeutung der in den Jahren ১৯০৯-১৯১৬ volizogenen Abanderungen des turkischen Staatsgrundgesctzcs, in Wl, ৫খ. (১৯১৭ খৃ.), ১৭-১৫২; (৬০) G. Jaschke, Die Entwicklung der Turkischen Verfassung ১৯২৪-১৯২৭, in Orient-Nachten, নং ৯-১০ (১৯৩৭ খৃ.); (৬১) Aristarchi Bey and D. Nikolaides, Legisiation Ottomane, ইস্তাম্বুল ১৮৭৩-৭৮ খৃ.; (৬২) L. Ostrorog, Pourla reforme de la rjuristice Ottomane, প্যারিস ১৯১২ খৃ.; (৬৩) A. du Velay, Histoire Financiere de la Turquie, প্যারিস ১৯০৩ খৃ.; (৬৪) Medeni Kanunun XV. yildonumuicin, ইস্তাম্বুল ১৯৪৪ খৃ.; (৬৫) E. Pirtsch, Die turkische Verfassung, in MSOS, ২৬-২৭ খ. (১৯২৪ খৃ.), ১৩৮-২৫১ ; (৬৬) B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, লন্ডন ১৯৬১ খৃ.; (৬৭) N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Montreal ১৯৬৪ খৃ ; (৬৮) H. Inalcik, On the Secularism in Turkey, in OLZ lxiv/9-10-10 (১৯৬১ খৃ.), ৪৩৮-৪৬।

Halil Inalcik (E. I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

৪। বারবার ব্যবহার ঃ বিভিন্ন বারবার গোষ্ঠী, বিশেষত কাবিলিয়া এবং অয়েস অঞ্চলের গোষ্ঠীসমূহে কানূন শব্দটি কোন বিশেষ একটি গ্রাম সম্পর্কিত, প্রধানত দণ্ডবিধি সম্পর্কে প্রচলিত রীতিনীতির অর্থে ব্যবহৃত হয়। কতিপয় সংখ্যক কানূন প্রকাশ করা হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে A. Hanoteau and A.Letourneux প্রকাশিত উদাহরণসমূহ অন্যতম (La Kabylie et les coutumes kabyles, প্যারিস ১৮৭২-৩, ১৮৯৩, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। বারবার (৪) সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীর সহিত C. Lacoste, Bibliogrphie ethnologique de la Grande Kabylie, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬২ খৃ., ৭২-৬, সংযুক্ত করিতে হইবে, অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য 'আদাত আইন এবং 'উরফ প্রবন্ধদ্বয়।

সম্পাদনা পরিষদ E.1.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কানূন আসাসী (দ্র. দাসতূর)

কানূন-ই ইসলামী (দ্র. শারী'আত)

কানূন-ই যারাজ (দ্র. দাফ্তার)

কানূন-ই মুহাম্মাদী (قانون محمدى) ঃ বক্সার-এর যুদ্ধের (১৭৬৪ খৃ.) পর মুগল সম্রাট শাহ্ 'আলাম বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ান (দীওয়ানী) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট অর্পণ করিবার সনদ (সানাদ)-এ এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, কোম্পানী ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী মুসলিমগণের মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিবে। ১৭৫৭ খৃ. পর্যন্ত কোম্পানী মুগল সম্রাটের নামে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার কার্য করিতে থাকিল, হিন্দুদের বেলায় হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী বিচার চলিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে বিধিবদ্ধ হয় যে, মুসলিমদের বেলায় উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব, বিবাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী বিচার করা হইবে। অতএব বিচারকার্যে সহযোগিতার জন্য সমস্ত বিচারালয়ে ইসলামী আইনজ্ঞ উপদেষ্টা ও মুফতী নিযুক্ত হইল এবং সমস্ত অপরাধের বিচার শারী'আত অনুযায়ী করা হইত। ১৭৯০ খৃ. হইতে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের নিজস্ব আইনের অনুপ্রবেশ শুরু হইল। ১৮৬২ খৃ. সর্বপ্রথম যখন ইংরেজী আইন অনুযায়ী দণ্ড বিধান শুরু হইল তখন শারী'আত আইনের গুরুত্ব অনেকখানি খর্ব হইল। ১৮৭২ খৃ. যে আইনের আওতায় সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানে পরিবর্তন সাধন করা হইল উহার নাম Indian Evidence Act। তৎপূর্বে সাক্ষ্য ব্যাপারে শরী'আত আইন প্রচলিত ছিল [দ্র. শাহাদাত]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুগল শাসনামলে এই উপমহাদেশে সুন্নী আইন প্রচলিত ছিল, যাহার অধিকাংশই ছিল হানাফী ফিক্হ অনুযায়ী। আমজাদ 'আলী শাহের পূর্ব আমল পর্যন্ত অযোধ্যার নওয়াবগণের আদালতে সুন্নী ফিক্হ-এর ভিত্তিতে বিচার চলিত। আমজাদ আলী শাহ্ প্রথমে শী'আ মুফ্তী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুন্নীদের মামলায় সুন্নী ফিক্হ অনুযায়ী রায় প্রদান করা হইত। উল্লেখ্য, বিবাহ ও তালাক-এর ক্ষেত্রে সুন্নী ও শী'আ আইনে কিছু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। উপমহাদেশে যখন ইংরেজ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল তখন শারী'আত আইন এক নূতন এবং বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিল। তখন উহা এই দেশের আইনরূপে কার্যকর রহিল না, বরং ইংরেজ শাসকদের ফরমানের মাধ্যমে আংশিক কার্যকর করা হইত। কালক্রমে দণ্ডবিধি, ভূমিস্বত্ব, সম্পত্তি হস্তান্তর, কর আরোপ, সাক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কীয় শারী'আতী আইনগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইতে লাগিল এবং তৎপরিবর্তে ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ এ্যাক্ট (Act) প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, শুধু মুসলিমদের পারিবারিক সম্পর্ক, যথা বিবাহ, তালাক, নাবালিগদের অভিভাবকত্ব (حضانة), হিবা (هبة), ওয়াক্ফ (وقف) ও ওসিয়াত (وصية) সূত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর, মাযহাবী দাসতূর ও অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে personal Law-রূপে শারী'আত-ই ইসলামের বিধি-বিধানের প্রচলন স্বীকৃত হয়। উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী حق الشفعة অর্থাৎ বিক্রয়োন্মুখ সম্পত্তি ক্রমে অংশীদার বা প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার (right of pre-emption)-ও স্বীকার করা হইত। কোন বিশেষ মুসলিম সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিশেষ আইন বা রীতিও স্বীকৃত হইতে থাকে ; যথা right of primo-geniture অর্থাৎ সর্বজ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভ।

মুফ্তী-মৌলবীগণকে আইন উপদেষ্টা পদ হইতে বরখাস্ত করার পর ইংরেজদের বিচারালয়ের পক্ষে ইসলামী আইন কার্যকর করার ব্যাপারে বাস্তব জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ আরবী ভাষায় রচিত ইসলামী আইনের উৎস অর্থাৎ কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ ইত্যাদির সহিত বিচারকগণের পরিচয় ছিল না। তাহারা ইসলামী দলীল-প্রমাণের প্রয়োগ বিধি জানিত না এবং আইনের দৃষ্টিভংগীতে ইসলামী আইন-কানূনের বিশেষ অধ্যয়নও তাঁহারা করে নাই। ফাকীহ্দের মতানৈক্য আরও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মতানৈক্যের আইনগত গুরুত্ব অনুধাবনে তাহারা ছিল অপারগ। এই জটিলতা নিরসনের জন্য রচিত কিছু প্রশংসনীয় প্রকাশনার উল্লেখ করা যায়। যথা Hamilton-কৃত ফিক্হের বিখ্যাত পুস্তক হিদায়া-র ইংরেজী অনুবাদ Baillie, A Digest of Moohummedan Law (২খ., ২য় মুদ্রণ, লণ্ডন ১৮৮৭ খৃ.)। ঐ লেখক, Moohummedan Law of Sale এবং Muhammadan Law of Inheritance, Sir W. Machaghten Bast. Prnciples and precedents of Muhammadan Law; Sir Roland Wilson, Anglo-Muhammedan Code; Sir William Tancs, Digest; সায়্যিদ আমীর আলী, Muhammedan Law (নির্ভরযোগ্য আরবী উৎসসমূহের ভিত্তিতে রচিত), দুই খণ্ড, ১৮১২-১৮১৪ খৃ.; মুহাম্মাদ য়ূসুফ খান, Muhammedan Law, কলিকাতা ১৮৯৫ খৃ.; Sir William Jones, Mohommedan Law of Inheritance (আস্-সিরাজিয়্যা-র ইংরাজী অনু.), কলিকাতা ১৭৯২ খৃ.; ফিদা' হুসায়ন, Musalman Law of Waqf, নাগপুর ১৯৩৯ খৃ.; Dinshah Fardunji Mulla, Principles of Mahomedan Law, বোম্বাই ১৯২৬ খৃ.; Maneh Mohan Lal Dayalji, Hand Book of Mahomedan Law, বোম্বাই; H. R. Sodhi, Marriage under Muhammadan Law; C.M. Shaqat, Muslim Marriage, Dower and Divorce, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; Asaf Ali Asghar Fyzee, Outline of Muhammadan Law, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ.; ঐ লেখক, Cases in the Muhammadan Law of India and Pakistan, ১৯৬৫ খৃ.; আহমাদ শুকরী, Muhammedan Law of Marriage and Divorce, নিউ ইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ.। উপরিউক্ত প্রকাশনাগুলি বৃটিশ আদালতের বিচারকদের সহায়ক হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত সূত্রাদি ব্যতীত (১) স্যার আবদুর রাহীম, Muhammadan Jurisprudence, লাহোর ১৯৫৮ খৃ.; মাস্'উদ 'আলী, উসূল-ই ফিক্হ-ই ইসলাম (উরদূ অনু.), হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯২৯ খৃ.; (২) 'আবদুল্লাহ্ য়ূসুফ 'আলী, Cultural History of India during the British Period, ৮০-৮১; (৩) S. M. Ikram, History of Muslim Civilization, লাহোর ১৯৬১ খৃ., ১৪৩-৪১৪।

'আবদুল-কায়্যূম (দা.মা.ই.)/আ. ফ. সাইয়েদ মাস্উদ হোসেন

কানূননামা (قانون نامه) ঃ 'উছমানী শাসন বিধিতে পরিভাষাটি সাধারণত সুলতানগণের জারীকৃত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনগত বিধানসম্বলিত ফরমান বুঝাইত। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে বিছাকনামা শব্দটি একই অর্থ বুঝাইত এবং আরব খিলাফাতের যুগে কাওয়ানীন শব্দটি "আইন বিধি" অর্থে ব্যবহৃত হইত। উছমানী সাম্রাজ্যে অবশ্য মাঝে মাঝে কানূননামা বলিতে ব্যাপক অর্থে উযীর অথবা পাশাগণ কর্তৃক প্রণীত বিধান (দ্র. কাসিম পাশা কানূননামেসি, in M. T. Gokbilgin, Edirne vc Pasa livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ৪৩৪), কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন (উদা. The Kanunname of the nishandji Djelalzade) অথবা সংস্কারমূলক পরিবর্তন (উদা. the kanunname of Ibshir Pasha., দ্র. নাঈমা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮০ হি., ৫খ., ১৯৯)-কে বুঝাইত। অবশ্য কোন কানূননামা সাধারণ কানূনের ন্যায় শুধু সুলতানের ফরমান প্রাপ্তির পরই সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করিত। কেবল একটি ফরমান (ফেরমান অথবা বেরাত) এবং সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন একটি কানূননামা গঠন করিতে পারিত, তেমনি অন্যান্য কতিপয় কানূননামা ছিল যেইগুলি সমগ্র সাম্রাজ্যে অথবা কোন বিশেষ এলাকা বা সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য ছিল।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে সরকারী বিধিবদ্ধ কানূননামা প্রকাশের প্রচলিত নীতির আপাততভাবে দুইটি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি হইতেছে প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং অপরটি তুর্কী মোঙ্গল খানেতসমূহের ঐতিহ্য (দ্র. কানূন)। সরকারী কর্মকর্তাগণ যাহাতে আইনের অপপ্রয়োগ করিতে না পারেন সেইজন্য প্রাচীন ইরানী সাম্রাজ্যে আইন সংক্রান্ত বিধানসমূহ, বিশেষত কর সংক্রান্ত আইনসমূহ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করিয়া সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থার রীতি প্রচলিত ছিল। এই রীতিটি সম্ভবত প্রাচীনতর মেসোপটেমীয় সভ্যতার ঐতিহ্য হইতে উদ্ভূত [দ্র. M. Tosun Sumer, Babil Vel Asurlularda Hukuk, in Belleren ৩৭/১৪৮ (১৯৭৩ খৃ.),

৫৬৫; W. Hinz, Steuerinschriften aus dem mittelalterichen vorderen Orient, in Belleten, ১৩/৫২ (১৯৪৯ খৃ.), ৭৪৫-৫৩]। অনুরূপভাব খিলাফাতের আমলে নিশ্চিতভাবেই কানূননামা-র আকারে কতিপয় রেজিস্টার ছিল যাহাতে ভূমিকর সম্পর্কিত শর্তাবলী (ওরূত) ও আদেশসমূহ (আহকাম) ঘোষণা করা হইত। এই সকল ফরমান কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দাস্তূর (দ্র. কানূন) হিসাবে সরকারীভাবে সকল প্রশাসক ও কর সংগ্রাহক (মুস্তাযিম)-এর নিকট প্রেরিত হইত (কিয়ামামানদারানী, রিসালা-ই ফালাকিয়া, সম্পা. W. Hinz, ৫৭)। মঙ্গোল-ইরানী সাম্রাজ্যে য়াসা-ই কাদীম-ই চিনগীয খান, যারপুনামা (রাশীদু'দ্-দীন, তা'রীখ-ই মুবারাক-ই গাযান খান, সম্পা. K. Jahn, ১৪৯) অথবা বিছাক-ই বুযুর্গ নামে পরিচিত চিন্গীয খানের য়াসা (ওয়াসিয়া) [দ্র.] বিচার বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি অথবা সামরিক-রাজনৈতিক বিষয়াবলী পরিচালনা কার্যের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইত, এমন কি মুসলিম গাযান খানের সময়কালেও চিনগীয খানের য়াসা পালন করাকে রাষ্ট্রের কল্যাণের ভিত্তিরূপে বিবেচনা করা হইত (রাশীদু'দ্-দীন, পূ. গ্র., ৩০৪)। মঙ্গোল শাসনের পতনের পরবর্তী কালেও এবং য়াসার বিরুদ্ধে 'উলামা' শ্রেণীর শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ সংগ্রহের নাম হিসাবে বিছাকনামা অথবা সংক্ষেপে বিছাক শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। দেশীয় কর্মকর্তাগণের প্রচেষ্টার ফলে য়াসা ইরানী ইসলামী ঐতিহ্যের মাজালিম এলাকার সহিত একীভূত হইয়া পড়ে (মুহাম্মাদ ইব্ন হিন্দুশাহ-ই নাখজেভানী, দাস্তূরু'ল-কাতিব, সম্পা. আলীযাদা, ১খ, ২১২, ৩২২, ৩২৫)। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিধিবদ্ধ কানূননামা কেবল যে সকল অঞ্চলে শক্তিশালীভাবে তুর্কী-মঙ্গোলীয় ঐতিহ্য এবং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যথা ইরান, আনাতোলিয়া, ইরাক এবং ভারত, সেই সকল অঞ্চলে এবং 'উছমানী সাম্রাজ্যের যেখানে খাঁটি 'উছমানী আইন ও প্রশাসন বলবৎ ছিল, যথা রুমেলিয়া ও আনাতোলিয়া, সেই সকল স্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

কানূননামার মধ্যে সরকারী আইন, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, প্রশাসন, কর ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি এবং হিসবা [দ্র.] অন্তর্ভুক্ত ছিল (আহকাম-ই দীওয়ানী, ইস্তিফা'-ই মামালিক, তাহ্দীদ ভিসিয়াসাত-ই মুজরিমান, দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন হিন্দুশাহ-ই নাখজেভানী, পূ. গ্র., প্রথম খণ্ড, ১ম অধ্যায়)।

'উছমানীগণ যখন কোন নববিজিত এলাকায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতেন তখন সাধারণত তাহারা সেই সকল স্থানের প্রচলিত কানূনসমূহকেই রক্ষা করিতেন। এইভাবেই মামলূক কায়িত বায়, আক-কোয়ুনলু উযুন হাসান এবং দুলকাদিরলী 'আলাউদ দাওলা-এর বিধিসমূহ ইহাদের অবিকৃত মৌলিকরূপে কিন্তু 'উছমানী কানূননামা বেশে বর্তমানে পৌঁছিয়াছে। একটি আক-কোয়ুনলু উৎস হইতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উযুন হাসান [দ্র.] একটি দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং এই কানূননামাটি তাঁহার ভূখণ্ডের সর্বত্র সাধারণ ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য এবং ইহার ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল (M. Schmidt-Dumont, Turkmenische Herrscher ... nach dem Tarih al-Giyati, ফ্রাইবার্গ ১৯৭০ খৃ., ২৯৯; J. Woods, From clan to empire, Akkoyunlus. ... Dissertation, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪ খৃ.)। উযুন হাসানের কানূননামা বা য়াসা পূর্ব আনাতোলিয়া, আযারবায়জান, 'ইরাক-ই 'আরাব এবং 'ইরাক-ই 'আজাম-এ প্রচলিত ছিল (শারাফ খান, শারাফনামা, ২খ, ১২০, J. Woods কর্তৃক উদ্ধৃত, পূ. গ্র.)। 'উছমানীগণ পূর্ব আনাতোলিয়ায় প্রচলিত বিধিসমূহ গ্রহণ করেন এবং ৯২২/১৫১৬ হইতে ৯৫৫/১৫৪৮ সাল পর্যন্ত তাহা ব্যবহার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'উছমানীগণ ইরাক বিজয়ের পর সাফ্ফারী কানূনসমূহ বিলুপ্ত করিলেও উযুন হাসানের কানূন কার্যকর রাখেন [দ্র. H. Inalcik, Adaletnameler, in Belgeler, ২/৩-৪ (১৯৬৫ খৃ.), ১৪০-২]। এই সকল কানূননামাসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'উরফী কর এবং বাজার কর বা বাজসমূহের [দ্র. তামগা] হার ও তাহা প্রদানের পদ্ধতি প্রদর্শন করা। দুক্বাদিরলী (যু'ল-কাদিরিয়্যা) কানূননামাসমূহ হইতেছে মূলত ফৌজদারী কানূননামা (দ্র. O.L. Barkan, Kanunlar, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., ১১৯-২৯)। সিলিসিয়া, সিরিয়া এবং মিসরের জন্য প্রযোজ্য 'উছমানী কানূননামাসমূহ কায়িত বায় নামে পরিচিত কানূননামাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এবং এইগুলি 'উরফী (সাধারণ কর) শুল্ক রাজস্ব এবং উপহার সম্পর্কে প্রযোজ্য (দ্র. Barkan, পূ. গ্র., ২০০, ২২৩, ২২৬, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭০)। সুলতানী আইন এবং প্রবিধানসমূহ কতিপয় ভারতীয় সংগ্রহ অত্যন্ত পরিচিত। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে তায়মূরের নামে পরিচিত তুযুকাত (দ্র. তুযুকাত-ই তায়মূরী, সম্পা. Major Davy, অক্সফোর্ড ১৭৮৩ খৃ.) আঈন-ই আকবারী অথবা আহকাম-ই 'আলামগীরী। কিন্তু প্রথম আলামগীরের ফৌজদারী বিধিই কেবল 'উছমানী কানূননামার সহিত তুলনীয়। কারণ ইহা রাজকীয় ফরমান হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্র. J. N. Sarkar, Mughal Administration, U. Heyd Studies in Old Ottoman Criminal Law, অক্সফোর্ড ১৯৭৩ খৃ., ৩১৭)।

এই প্রকার সংকলনের বিরুদ্ধে 'উলামা'র বিরোধিতার জন্য সাধারণত সুলতানগণ বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশনার মাধ্যমে এই সকল কানূনকে একটি স্থায়ী রূপ প্রদানে অনীহা পোষণ করিতেন। বরঞ্চ তাঁহারা কোন বিশেষ বিষয়ে একটি মাত্র রাজকীয় ঘোষণার (ফরমান) মাধ্যমে কানূন প্রচলনে আগ্রহী ছিলেন এবং ইহার ফলস্বরূপ বর্তমানে নগণ্য সংখ্যক বিধিবদ্ধরূপে সংকলিত কানূননামার সন্ধান পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সুলতান ২য় মুহাম্মাদ (দ্র.)-ই ইসলামী সার্বভৌম শাসক যিনি এমন একটি বিধিবদ্ধ ও সরকারীভাবে প্রণীত কানূননামা ঘোষণা করেন যাহা তাঁহার উত্তরসুরিদের সময়েও বলবৎ ছিল। তিনি দুইটি কানূননামা প্রণয়ন করেন, ইহাদের একটি প্রজাদের জন্য ও অপরটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

প্রজাদের (রি'আয়াগণের) জন্য প্রণীত ২য় মুহাম্মাদ-এর কানূননামার লক্ষ ছিল, প্রথমত 'আসকারী (দ্র.) শ্রেণীর (সামরিক বাহিনীর) দুর্নীতি রোধ করা। ইহারা সরাসরিভাবে প্রজাদের (রি'আয়া) নিকট হইতে কতিপয় কর সংগ্রহ করিত এবং দ্বিতীয়ত কর ও অর্থ জরিমানাসমূহের হার নির্দিষ্ট করা ও ইহার মাধ্যমে প্রজার (রি'আয়ার) জন্য নিরাপত্তামূলক সুবিচার প্রদানে রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জন করা। এই কানূননামাটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশাসকবর্গ ও কাযীগণের জন্য ব্যবহারিক বিধির আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রজাদের (রি'আয়া) জন্য কানূননামা একটি বিশেষ বিন্যাসে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল (কানূননামা নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুসরণ করে না—এই তত্ত্বের জন্য দ্র. O.L. Barkan, পূ. গ্র., ৪৪-৬৩)। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে মুসলিম ও অমুসলিম প্রজা (রি'আয়া)—উভয়ের

জন্য প্রযোজ্য ফৌজদারী আইন বিধি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস ফিক্হ পুস্তকাবলীর অনুরূপ। সুনির্দিষ্টভাবে ইহাতে প্রজার (রি'আয়া) নিকট হইতে 'আসকারী শ্রেণীর প্রাপ্তব্য জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে [দ্র. Inalcik Osmani, hukukuna giris, 117, U. Heyd. পূ. গ্র., মূল পাঠ Fr. Kraelitz কর্তৃক সম্পা., ১খ. (১৯২১-২২ খৃ.), ১৩-৪৮ ; তু. Inalcik, Qsmanlilarda raiyyet rusumu, in Belleten, ২৩/৯২, ৫৭৬-৭৮]। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের সহিত কাযীর ফরমান অনুযায়ী জারীকৃত অপরাপর কতিপয় করের হার সংযুক্ত করা হইয়াছে (দ্র. Kraelitz, পূ. গ্র., বিধানাবলী ৯১-৯৮)।

প্রজাস্বত্ব (রি'আয়া) কানূননামা-র চতুর্থ অধ্যায়ে সিপাহীগণকে প্রজারা নিয়মিতভাবে যে কর প্রদান করিত তাহার তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা সাতটি ধারার সমন্বয়ে গঠিত, প্রজাগণ কর্তৃক সিপাহীগণের জন্য যে সাতটি কর্তব্য সম্পাদন করা আবশ্যক এবং এই সকল কর্তব্য পালনের পরিবর্তে তাহারা যে নির্দিষ্ট পরিমাণে কর প্রদান করিত, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত (দ্র. Inalcik, পূ. গ্র.)।

এই অংশটিও একটি সুস্পষ্ট বিন্যাস অনুসরণ করে। প্রথমত ইহাতে 'চিফত' (দ্র.) কর প্রদানে বাধ্য মুসলিম প্রজাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পরবর্তী একটি অংশে যূরূক (কানূন-ই যূরূকান)-এর সংগঠন ও দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে, যাহারা সকল প্রকার কার্য ও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। পরবর্তী অংশে ইসপেনজি-র আওতাভুক্ত খৃস্টান প্রজাদের জন্য প্রদেয় সকল করের তালিকা প্রদান করা হইয়াছে (দ্র. Inalcik, Osmanlilarda raivvet rusumu, ৬০২-৮)। শেষ অংশে শহর বাজারসমূহে প্রদেয় বাজ করসমূহের তালিকা সংযোজিত হইয়াছে ; ইহা খৃস্টান ও মুসলিম—উভয়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল (Kraelitz, পূ. গ্র., বিধানাবলী ৯-২৮)।

সার্বিকভাবে 'উছমানী কানূননামাসমূহ 'উছমানী কর ও প্রশাসনিক পদ্ধতির যুক্তি অনুসারে পদ্ধতিগতভাবে সংগঠিত ছিল। কেবল পরবর্তীকালে সংযোজিত কানূনসমূহ এই পদ্ধতির সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। বিজয়ী মুহাম্মাদ-এর কানূননামার যে চারটি অধ্যায়ে প্রজা ও সিপাহীগণের মধ্যে সম্পর্ক ও কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা সানজাক কানূননামা এবং তাহ্রীর রেজিস্টারে অনুরূপ পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছে। ইহাতে পুনরায় পর্যায়ক্রমে চিফ্ত কর ও অন্যান্য অনুরূপ আমদানী, ভূসম্পত্তি (আ'শার), ফল বাগানের উপর ধার্য কর, মধুচাষ কর এবং অনুরূপ কর এবং ইহার পর জন্তু-জানোয়ারের উপর ধার্য কর এবং শেষে জরিমানা (জারা'ইম) এবং অনিয়মিত করসমূহ (বাদ-ই হাভা) তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। বিজয়ী মুহাম্মাদ-এর কানূননামার ন্যায় কোন কোন সানজাক কানূননামায় বাজ-কর প্রদর্শন করিয়া একটি পরিশিষ্ট সংলগ্ন থাকে (তু. আয়দীনের কানূননামা, বারকান, পূ. গ্র., ৬-১৮)। অধিকাংশ 'উছমানী কানূননামা গঠন অনুযায়ী চারটি প্রধান শ্রেণীর শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় ঃ

১. সুলতানের জারীকৃত ফরমানরূপে প্রকাশিত কানূননামাসমূহ ঃ এই প্রকারের কানূননামা কোন নির্দিষ্ট প্রশাসনিক সমস্যা অথবা প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে রাজকীয় ফরমান অথবা বেরাত হিসাবে ঘোষিত হইত এবং প্রশাসন ও কাদীগণকে তাহা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত কানূননামার আকারে প্রকাশিত এবং কোন বিশেষ বিজয় সম্পর্কে কতিপয় বিধানের সমন্বয়ে গঠিত হইত। রাজধানীর সরকারী দপ্তাবীয় অথবা প্রাদেশিক প্রশাসনে কাযীর দফতরে ইহার সম্পূর্ণ অথবা সংক্ষিপ্তাকারে নকল সংরক্ষিত থাকিত। এই সকল ঘোষণার বৈধ সরকারী নকল এই সকল উৎস হইতে প্রদত্ত হইত [দ্র. Belleten, ১১/৪৪ (১৯৪৭ খৃ.) ৬৯৩-৭০৩]।

ইহা সম্ভব যে, রাজকীয় ঘোষণার আকারে প্রকাশিত এই সকল কানূন সচিবদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পুস্তকাকারে সংগৃহীত ও সংকলিত করা হইয়াছিল। সর্বপ্রাচীনতম যে সংগ্রহটির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা ২য় বায়াযীদের শাসনামলের [দ্র. R. Anhegger এবং H. Inalcik (সম্পা.) কানূননামা-ই সুলতানী বার মুচেব-ই 'উরফ-ই 'উছমানী, আনকারা ১৯৫৬ খৃ.। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর সময়কালীন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে Library of the Topkapi Sarayi, MSS, Revan নং ১৯৩৫, ১৯৩৬; ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাণ্ডুলিপি নং T. ২৭৫৩; বৃটিশ মিউজিয়াম, পাণ্ডুলিপি Or, নং ১৫০৩; প্যারিস, Bibliotheque Nationale, ancien fonds turo. MSS নং ৩৪, ৮৫; Sarajevo, Orientalni Institur, MS Turceia নং ৩; ইস্তাম্বুল বায়াযীদ গ্রন্থাগার, MS Veliyuddin নং ১৯৭০; ইস্তাম্বুল সুলায়মানিয়্যা গ্রন্থাগার, MS Reisulkutab, নং ১০৮৫]।

২। সানজাক কানূননামা ঃ ঈলখানী ইরানে সরকারীভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য কর ব্যবস্থা ও প্রবিধান প্রদর্শন করিয়া পৃথক পৃথক রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হইত। ইহারা কানূন-ই মামলাকাত নামে পরিচিত ছিল। নিঃসন্দেহে এই প্রথাটি 'আব্বাসীগণের মাধ্যমে ইরান হইতে আগত। 'উছমানীগণ ও তাহাদের আঞ্চলিক বিলায়েত অথবা সানজাক' (লিভা) কানূননামাসমূহের ব্যবহার অব্যাহত থাকে।

এই সকল কানূননামা সুলতানের সংকেত লেখা (তুগরা) [দ্র.] দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিটি প্রদেশের পূর্ণাঙ্গ (মুফাসসাল) জরিপ সংক্রান্ত রেজিস্টারের প্রারম্ভে স্থান লাভ করিত। যে সকল প্রদেশে রাষ্ট্রীয় (মীরী) জমি এবং তীমার [দ্র.] প্রথার প্রচলন ছিল সেই সকল স্থানে ইহা কার্যকর ছিল এবং ইহার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রজা এবং তীমার প্রাপ্তদের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত রোধ ও সমাধান করা।

ঘোষণার আকারে জারিকৃত কানূননামা-র ন্যায় ইহাও একটি নির্দিষ্ট তারিখে সরকারীভাবে বলবৎ হইত। বেয়লেরবেয়ি-এর পরিষদ এবং কাযীর আদালতে এই সকল বিধি অনুসারে রায় প্রদান করা হইত। 'উছমানী সানজাক কানূননামা বিভিন্ন বিধানসম্বলিত একটি নির্দিষ্ট ছকে বিন্যস্ত হইত (উপরে দ্রষ্টব্য)। ভূমি আইন এবং রি'আয়া কর প্রণয়নে সানজাক কানূননামা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত মূলনীতি অনুসরণ করিত। এই সকল নীতি ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অথবা সম্ভবত ইহার সামান্য কিছুকাল পূর্বে একটি পদ্ধতির অবয়ব ধারণ করে এবং কানূন-ই 'উছমানী নামে তাহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব প্রদর্শন করে [দ্র. Inalcik, Sulaiman the Lawgiver, in Archivum Ottomanicum., ১খ. (১৯৬৯ খৃ.), ১২৮-৩৫]। বিজয়ী মুহাম্মাদ প্রথম এই সকল নীতিকে বিধিবদ্ধ রূপ প্রদান করেন এবং তাঁহার রি'আয়া কানূননামা নামে তাহা সাম্রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ ছিল। স্পষ্টই রাজকীয় ঘোষণার রূপধারী কানূন হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত কতিপয় আইনগত বিধান ব্যতিরেকে বিজয়ী মুহাম্মাদ-এর রাজত্বকালের বিস্তারিত জরীপ রেজিস্টারে কোন প্রকার সানজাক কানূননামা-র সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম যে সানজাক কানূননামা বর্তমানে টিকিয়া আছে তাহা

৮৯২/১৪৮৭ সালের প্রণীত খুদাওয়ানদিগার (বুরসা)-এর বলিয়া পরিচিত (দ্র. Barkan, পৃ. গ্র., ১-৬)।

প্রতিটি সানজাকের জন্য বিস্তারিত কিস্তোয়ার জরিপের মুখবন্ধে উক্ত সানজাকে বলবৎ কানূন প্রদর্শন করিয়া পৃথক পৃথক কানূননামা অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা শুরু হয় সুলতান ২য় বায়াযীদের রাজত্বকালে। ৮৯২/১৪৮৭ সালের খুদাওয়ানদিগার কানূননামাটি সম্ভবত পরবর্তীকালীন অন্যান্য উদাহরণের জন্য সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে (Barkan, পৃ. গ্র., প্রায় ৮০টি সানজাক কানূননামা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে J. von Hammer, des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ১ম, ভিয়েনা ১৮৯৫ খৃ.; কানূন-ই কানূননামে, Monumenta Turcica, ১ম, সিরিজ ১, নং ১, সারাজেভো ১৯৫৭ খৃ.)।

'উছমানী আইন যেহেতু সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী আইনের ভিত্তিতে রচিত ছিল, তাই সানজাক কানূননামা-কে কালপঞ্জী এবং স্থান অনুযায়ী সম্পর্কিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। কর আরোপের হারকে ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, পশ্চিম আনাতোলিয়ায় অবস্থিত আনাদোলু ইয়ালেত হইতে প্রাপ্ত কানূননামা এবং খুদাওয়ানদিগারের কানূননামা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মধ্যআনাতোলিয়া—কারামান, ইচেল এবং আনকারা প্রথমটি অনুরূপ দ্বিতীয় একটি শ্রেণী গঠন করে। অপরপক্ষে পূর্ব আনাতোলিয়া— মালাতিয়া, দিয়ারবাকর, এরজুরুম, মাওসিল, খারপূত ও মারদীন এবং সিরিয়ার সানজাক দুইটি বিশেষ শ্রেণী গঠন করে।

রুমেলীয় সানজাক কানূননামা একটি বিশেষ শ্রেণী গঠন করে। এই শ্রেণীতে কানূন-ই 'উছমানীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিধানাবলী এবং বায়যানটাইন ও স্লাভের প্রথাসিদ্ধ আইন ও বিধানসমূহ অবস্থান করিতেছে। বেশ কয়েকটি আইন সম্পূর্ণভাবে প্রাক-'উছমানী প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত ঃ ভূমির একক হিসাবে বাশতিনা এবং রি'আয়া করে একককরূপে ইসপেনজী [দ্র.]-এর ব্যবহার, বলকান সামন্তপ্রথা হইতে প্রাপ্ত খড় ও কাঠের উপর নির্ধারিত কর এবং দুই গম ও বার্লি দুই প্রকার মাপের জন্য শস্য কর।

সদ্য প্রস্তুতিতে ধার্যকৃত অন্যান্য কর ও উছমানী রাজত্বকালের পূর্বকালীন পিপে কর, ওবরুচুনা এবং মোনপলয়া 'আদেতি। রুমেলীয় কানূননামায় যুরূক, মুসেল্লেম, ভয়নুক, Vlachs, তাতার এবং ফিলোরিজি-এর ন্যায় শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত আইনের বিধানাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। রুমেলীয় কানূননামার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাতে রি'আয়া এবং সিপাহীগণের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবস্থাবলীর নিয়ন্ত্রক সানজাক কানূননামার (উদা. ৯৭৭/১৫৬৯ সালের সিলিসট্রার কানূননামা, in Barkan, পৃ. গ্র., ২৭৮-৮৯) পাশাপাশি অন্যান্য কানূননামা (বর্তমানে যেইগুলি কেবল 'আসকারী শ্রেণীর সদস্যগণের মধ্যে সম্পাদিত) ব্যবস্থাবলী নিয়ন্ত্রণ করিত [উদা. নিগরোলু (নিকোপোল)-এর কানূননামা in Barkan, পৃ. গ্র., ২৬৭-৭১]।

হাঙ্গেরীর জন্য প্রযোজ্য সানজাক কানূননামাসমূহ ১০ম/১৬শ শতাব্দীর অন্যান্য রুমেলীয় কানূননামা-র অনুকরণে গঠিত। ইহাতে ব্যতিক্রম হিসাবে রাজতন্ত্রের আমলে কতিপয় কর ও আইন বলবৎ রাখা হয়। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, কোন অঞ্চল অধিকার করার পর 'উছমানীগণ তৎসংলগ্ন এলাকার সানজাক কানূননামা-কে নূতন বিজিত এলাকার জন্য প্রযোজ্য আদর্শরূপে গ্রহণ করে। কতিপয় স্থানীয় আইন ও কর ব্যবস্থা চালু থাকায় এবং সময় সময় 'উছমানী আইনে সার্বিক পরিবর্তনের ফলে অসংগতির উদ্ভব ঘটে। অবশ্য ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, জমির মালিকানা ও প্রজাদের মর্যাদার প্রশ্নে সব সময়েই কানূন 'উছমানী প্রযোজ্য হইত।

৩। বিশেষ বিশেষ শ্রেণী সম্পর্কিত কানূননামাকে ইহাদের প্রাদেশিক কানূননামাসমূহের সহিত এই শ্রেণীতে বিবেচনা করা যাইতে পারে। বিশেষ কানূননামা সাধারণত কোন নির্দিষ্ট পদে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত রি'আয়া শ্রেণীর জন্য জারী করা হইত (দ্র. Inalcik, Osmanlilarda raiyyet rusumu, ২৯৫-৩০০)। ইহারা সাধারণত সামরিক বাহিনীর সহযোগী ব্যবস্থাসমূহের সহিত সম্পর্কিত ছিল। ইহাদের সর্বপ্রধান শ্রেণী ছিল য়ায়া এবং মুসাল্লেম (কানূননামা-এর জন্য ঐ, ২৪৭-৮), এশকিনজি যুরূক ও এশকিনজি তাতার [কানূননামা-এর জন্য দ্র. M. T. Gokbilgin, Rumeli'de yurukler, tatarlar ve evlad-i fatihan, ইস্তাম্বুল ১৯৫৭), Vlachs (ইফলাক)। কানূননামা-এর জন্য দ্র. B. Durdev এবং অন্যান্য (সম্পা., কানূননামা) সারাজেভো ১৯৫৭ খৃ., ১২-১; N. Beldiceanu and I. Beldicearu-Steinhepr, Quatre actes de Mehmed II Concernant les valaques des Balkans slaves. Sudost Forschungeb. ২৪খ, ১৯৬৫ খৃ., ১১৫ এবং voynuk [কানূননামা-এর জন্য দ্র. Osmanische Turkische Quellen zur Bulgarischer Geschichte, ৩খ, সোফিয়া ১৯৪৩ খৃ.]।

এই সকল শ্রেণীর কানূননামা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের সংগঠন ছিল সহযোগী সামরিক দলের বিন্যাসের এবং সেইহেতু তাহারা কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিত (দ্র. Inalcik, Osmanlilarda raiyyet rusumu, ৫৯৪-৬০১)। ৯ম/১৫ম শতাব্দীতে এই সকল শ্রেণীর 'আসকারীগণের সমমর্যাদা ছিল। কিন্তু ইহাদের সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে তাহারা রি'আয়া মর্যাদায় নামিয়া আসে এবং ইহার পর হইতে তাহারা নিজস্ব কানূননামা-এর পরিবর্তে সাধারণ সানজাক কানূননামা-এর ইখতিয়ারভুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের জন্য উৎপাদনে নিয়োজিত কতিপয় শ্রেণীর নিজস্ব কানূননামা ছিল। যথা ধানক্ষেতে নিযুক্ত শ্রমিক (চেলতুক্চী) (কানূননামা-এর জন্য দ্র. Library of the Topkapi Sarayi, Revan নং ১৯৩৬) এবং খনি শ্রমিক (মা'আদেনজি) [কানূননামা-এর জন্য দ্র. R. Anhegger' Beitrage zur Geschichte des Bergbaus im osmanischen Reich, ২ খণ্ড এবং ক্রোড়পত্র, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩-৫ খৃ., N.Beldiceanu, Les actse des premiers sultans, ২খ; Regelments miniers, ১৩৯০-১৫৭২, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬৪খৃ.]।

খনি শ্রমিকদের কানূননামাসমূহের অধিকাংশ স্থানীয় প্রাক-'উছমানী বিধিবদ্ধ আইনের অনুবাদ মাত্র, কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপনকারী যুদ্ধবন্দিগণ (Ortakci kullar) এই সকল শ্রেণীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে to Barkan, Osmanli imperatorlugunun toprak (দ্র. sisiliginin orgniza-syonu sekillteri, in Iktisat Fakultesi Mecmuasi, ১/১-৩)। একইভাবে রুমেলিয়ায় বেদে সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব কানূননামা অনুযায়ী বিবেচিত হইত (Barkan, Kanunlar, ২৪৯-৫০)।

৪। রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কিত কানূননামা, ইহারা তৃতীয় একটি শ্রেণীর অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের জন্য প্রণীত ২য় মুহাম্মাদ-এর কানূননামা-এর [দ্র. M. 'Arif (সম্পা.), in TOEM সংযোজনী, ইস্তাম্বুল ১৩৩০ হি.; মক্কো ১৯৬১ খৃ., ২৭৭খ-২৮৩খ] প্রারম্ভে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইহা সালতানাতের বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে রচনা করা হইয়াছে। ইহা 'উছমানী সরকারী পদ্ধতির যুক্তি অনুসারে বিন্যস্ত এবং একই সঙ্গে ইহাতে প্রাসাদ, সরকার ও আচার-আচরণ সম্পর্কে বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার দাবি অনুসারে ইহা সরকারের গঠন, সরকারের প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁহাদের কার্যকারিতার ক্ষেত্র, সুলতানের সহিত তাঁহাদের পদ এবং মর্যাদা, উন্নতি, ভাতা, অবসর এবং শাস্তি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে। ২য় মুহাম্মাদ-এর কানূননামা এই প্রকারের একমাত্র উদাহরণ। পরবর্তী সুলতানগণও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের জন্য আইনের যে বিধান জারী করিয়াছিলেন তাহা কোন অবস্থাতেই ইহার ন্যায় ব্যাপক ছিল না।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালীন অন্যান্য কানূননামা এবং বিধিমালা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারী কর্মকর্তাগণ দ্বারা সংকলিত [সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে 'আয়নী 'আলী আফেনদী, কাওয়ানীন-ই 'উছমান দিলখুলাসা-ই মাদামীন-ই দাফতার-ই দীওয়ান, ইস্তাম্বুল ১২৮০ হি; নিশানজী 'আবদু'র-রাহমান পাশার কানূননামা, in M. T. M., ১/৫খ. (১৩৩১ হি.), ৪৯৪-৫৪৪; আয়্যূবী আফেনদী-এর কানূননামা ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, MST ৭৩৪; হেযারফেন্ন হুসায়ন আফেনদী, তালকীসু'ল-বায়ান ফী কাওয়ানীন-ই 'উছমান, দ্র. H. Wurm, Der osmanische Historiker Huseyn b. Ga'fer, genamnt Hezarfenn, ফ্রেইবুর্গ ১৯৭১ খৃ.; I. H. Uzun Carsili (সম্পা.), কানূন-ই 'উছমানী মাফহূম-ই দাফতার-ই খাকানী, in Belleten, ১৫/৫৯ (১৯৫১ খৃ.), ৩৮১, ৯৯ এবং রচনাটির একটি দীর্ঘতর ভাষ্য, H. Hadzibegic, Rasprava Ali causa. ... 'in Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosnii Hercegovini, ২খ., সারাজেভো ১৯৪৭ কৃ., ১৪৬-৭৩)।

তথাপি 'উছমানী মাহাফিজখানাসমূহে কতিপয় পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে যেইগুলি মূলত আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কিত সরকারী কানূননামা (ইস্তাম্বুল বাসভেকালেত আরসিভি, কামিল কেপেচী তাসনীফী, তাস রীফাত দাফতারলেরি) এবং এইগুলি ভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার সহিত জড়িত সরকারী কর্মকর্তাগণের রচিত রচনাবলীও রক্ষিত আছে (উদা. নাইলী 'আবদুল্লাহ পাশা, দাফতার-ই তাশরীফাত, Turkish Historical Society Library, পাণ্ডু. নং Y ৪৯, TOEM, ১৬খ.; ২৪৯-৬০-এ আংশিকভাবে প্রকাশিত, আস'আদ আফেনদী, তাশরীফাত-ই কাদীমে, ইস্তাম্বুল ১২৯৩ হি.; অতিরিক্ত কানূননামা-ই তাশরীফাত, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, MS. T ২০০)।

সুলতান বা প্রধান উযীরের জন্য ব্যবহারিক গ্রন্থরূপে প্রণীত অথবা সংস্কারমূলক উপদেশপূর্ণ রচনাবলীতে রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহের সহিত সম্পর্কিত কানূনস্‌হ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (উদা. লুতফী পাশা, কিতাব-ই মুসতাতাব, সম্পা. য়াসার মুচেল, আনকারা ১৯৭৪ খৃ.; হিরযু'ল-মুলূক, MS. Library of the Topkapi Sarayi, Revan ১৬১২; দ্র. K. Rohrborn, Untersuchungen zur osmanisehen Verwaltungsgeschichte, বার্লিন ১৯৭৩ খৃ., কোচিবেগ, রিসালা, সম্পা. A. K. Aksut, ইস্তাম্বুল ১২৩৯ হি.; Sari Mehmed pasha, নাসাইহু'ল-উমারা' ওয়াল-উযারা' সম্পা. ও অনু. W. L. Wright, প্রিন্সটন ১৯৩৫ খৃ.। প্রাসাদ বিধি ও সংগঠন সম্পর্কে রচনাবলীঃ মুহাম্মাদ খালীফা, তা'রীখ-ই গিলমানী, in TOEM, পরিশিষ্ট, ১৩৪০, ইলয়াস, লাতাইফ-ই ইনদিরান, A. A'ta. তা'রীখ-ই 'আতা', ইস্তাম্বুল ১২৯১-৩ হি.)।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কোন বিশেষ দিক বিবেচনার জন্য কানূননামা ছিল উদাহরণস্বরূপ কাওয়ানীন-ই য়েনিচেরিয়ান (Library of The Topkapi Sarayi, MS Revap নং ১৩২০; ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাণ্ডু, নং T ৩২৯৩), জানিসারীগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইহা ভিন্ন তীমার কোষাগার পরিচালনা, মুকাতা'আ, শুল্ক, টাঁকশাল, মুদ্রা, কাপী কুল্লারী, 'উলামা', কর নির্ধারণী জরীপ, সামরিক অভিযান ইত্যাদি সম্পর্কে পৃথক পৃথক কানূন ও কামূননামা রহিয়াছে (দ্র. Library of Topkapi Sarayi, MSS Revan নং ১৯৩৫, ১৯৩৬, বাগদাদ নং ৩৪৬; সুলায়মানিয়্যা গ্রন্থাগার, রাইসুল-কুত্তাব নং ১০০৪, আস'আদ আফেনদী নং ২৩৬২, বায়াযীদ গ্রন্থাগার, ওয়ালীয়্যুদ্দীন নং ১৯৬৯, ১৯৭০; শহীদ আলী পাশা, নং ৩৮৩২; ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার MS নং T. ১৪৩৮; আতিফ আফিনদী গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুল, নং ১৭৩৪; Staatsbibliothek, Vienna Mixt. ৪৭৮, H. O. ১৫৪; Bibliotheque Nationale, Paris, ancien fonds ture, নং ৩৫, ৮৫; Westbeutsche Staatsbibliothek, Marburg, Orient No. ২৭৩০; Staats-bibliothek, Munich, co. true nos. ১১৭, ১১৮)।

৫। সাধারণ কানূননামাসমূহ

এই প্রকারের কানূননামা সাম্রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ ছিল। ২য় মুহাম্মাদ-এর রি'আয়া কানূননামা পরবর্তী সুলতানগণের জন্য আইন বিধির ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কানূননামাটি ২য় বাযায়ীদের রাজত্বকালে আনুমানিক ৯০৭/১৫০১ সালে কিতাব-ই কাওয়ানীন-ই 'উরফিয়্যা-ই 'উছমানিয়্যা শিরোনামে পরিবর্তিত ও অত্যন্ত পরিবর্ধিতরূপে জারী করা হয় (Koyunoglu MS facsimile ediion, N. Beldiceaneu, Fode de lois coutumieres de Mehmed!!. Wiesbaden ১৯৬৭ খৃ.)। ইহাতে হারসেকযাদা আহমাদ পাশা [দ্র.]-এর সম্পাদিত সংশোধনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে ইহাকে ১ম সুলায়মানের বলিয়া কথিত কানূননামাটির ভিত্তিরূপে ব্যব্‌র করা হইয়াছে (দ্র. Inalcik, Adaletna,meler, ৫৬; Suleiman the Lawgiver, ১১৭-২৬; U. Heyd ঐ, ১৮২৪)। ইহাদের ভূমিকা ও অধ্যায়ের শিরোনামসমূহ সম্পূর্ণভাবে একই প্রকার। ইহাকে তিনটি বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়টি ২য় মুহাম্মাদ-এর ফৌজদারী কার্যবিধির একটি বর্ধিত ও অধিকতর সুসংহত ও সুচারুভাবে সজ্জিত ভাষা (Koyunoglu MS. ১-৯; ম. 'আরিফের সংস্করণ, TOEM Supplement, ১-১০)। দ্বিতীয় অধ্যায় সিপাহী শ্রেণীর কর্তব্য এবং উক্ত শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য আইনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পর ইহাতে সাহিব-ই রাইয়্যাত এবং সাহিব-ই আরদ-এর ভূমিকায় রি'আয়া শ্রেণীর উপর সিপাহীদের দাবি এবং তাহাদের প্রাপ্য বিভিন্ন কর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে খাস্‌স এবং তীমার আয়ের সহিত সম্পর্কিত একটি বাজ কানূন এবং য়ায়া

ও মুসাল্লামগণের জন্য একটি অতিরিক্ত কানূননামাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রি'আয়াগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং জমির অধিকারের শর্তাবলী আলোচিত হইয়াছে। ইহার পরে রহিয়াছে সামরিক কর্তব্য পালনকারী রি'আয়া শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য বিশেষ কানূননামা, ইহাদের জন্য বিশেষ বিধি বলবৎ ছিল-'আযাব, য়ুরুক, হারমানা এবং এফলাক। উপসংহারে দুইটি বিশেষ কানূন রহিয়াছে যেইগুলি স্পষ্টতই কানূননামা সংকলনের সময়ে জারী করা হইয়াছে। একটি কোনয়া অঞ্চলে আইনগত নূতন প্রথা (বিদ'আত) প্রবর্তন সম্পর্কিত। কানূন-ই 'উছমানীর নিয়ম ভঙ্গের জন্য তাহা বাতিল করা হয়। অপরটিতে প্রাসাদের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ সম্পর্কে প্রযোজ্য শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কানূননামা-এর সংকলনটি আপাতদৃষ্টিতে এই বিন্যাসটি অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, ইহাতে ৮৯২/১৪৮৭ সালের খুদাওয়ান্দিগার কানূননামা অনুরূপভাবে আনাদোলু, কারামান এবং রূম (আমাসিয়া) সানজাক-এর কানূননামা হইতে বিস্তৃতভাবে তথ্য ও ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রায়শই সীমান্তবর্তী সানজাকসমূহ যথাক্রমে রূমেলিয়ার ভিদির এবং সেমেনদিয়ার (স্মোদেরোভো)-এর কানূননামার নির্দেশ রহিয়াছে। স্পষ্টতই ইহার কারণ এই যে, এই সকল অঞ্চলে কানূন-ই 'উছমানী বহির্ভূত আইন প্রচলিত ছিল। সেমেনদিয়ারের কর নির্ধারণ জরিপের রেজিস্টার হইতে বিধানসমূহ সরাসরি কানূননামা-তে সংযুক্ত করা হয় (দ্র. Inalcik, Suleiman the Lawgiver, ১২০)। কর সংক্রান্ত আইনসমূহ ছিল আঞ্চলিক চরিত্রের এবং এই কারণে কানূননামাতে এই বিষয়ে কোন সার্বিক নীতিমালা প্রদত্ত হয় নাই। অপর দিকে ভূমি আইন তীমার সম্পত্তি এবং ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে কানূননামা সার্বিকভাবে প্রযোজ্য হইত।

ফারমান-এর আকারে প্রকাশিত নূতন কানূন এবং নূতন সানজাক কানূনসমূহের প্রবর্তনের ফলে এই কানূননামাটি পরবর্তী কালে পরিবর্তিতরূপে অন্যান্য সুলতানের নামে পুনরায় আবির্ভূত হয়। ১ম সেলীমের কানূননামা (বিভিন্ন ভাষ্যের জন্য দ্র. A. S. Tveritinova, Kniga zakonov Sultan Selima I, মস্কো ১৯৬৯ খৃ.) বিস্তৃত পরিচিতি লাভ না করিলেও ১ম সুলায়মান-এর রাজত্বকালে জারীকৃত পরবর্তী ভাষ্যটি বিস্তৃতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় (ভাষ্যের জন্য দ্র. U. Heyd, পৃ. গ্র., ২৪-৩২)। এই সময়ে নিশানজী জালাল যাদা সাধারণ কানূননামায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার নামের শিরোনামে সংগৃহীত কানূনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (উদা. সুলেয়মানিয়ে গ্রন্থাগার, Reisulkuttap নং ১০০৪)। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে পতনের যুগে ১ম সুলায়মানের কানূননামা শ্রেষ্ঠতম 'উছমানী রাজত্বের মূল ভিত্তিরূপে আদর্শে পরিণত হয় (দ্র. Inalcik Suleiman the Lawgvier, না'ঈমা, তা'রীখ, ৫খ., ১০১); তথাপি তীমার ব্যবস্থার অবক্ষয়ের পর ইহার অনেকাংশ অব্যবহার্য হইয়া পড়ে এবং ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে একটি নূতন কানূননামা ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এই নূতন কানূননামাটি কানূননামা-ই জাদীদ নামে পরিচিত। এই যুগের 'উছমানী আদালতসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই সংকলনটি ছিল অত্যন্ত বিস্তারিত। এই ভাষ্যটির কোন সমালোচনামূলক নিরীক্ষা নাই। বেশীর ভাগ ভাষ্যেই সমাপ্তিপর্বে ১০৮৪/১৬৭৩ সালের একটি ফারমান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ইহার বিবেচ্য বিষয় ছিল ভূ-সম্পত্তির ন্যায় কর ('উশর) [তু. MTM, ১খ, ৩৩০]। কোন কোন ভাষ্য আকারে সংক্ষিপ্ততর। সংযোজনসহ একটি ভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে ঃ MTM, ১খ, ৪৯-১১২, ৩০৫-৪৮। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যের মধ্যে রহিয়াছে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার MSS. T. ৩৯৮, ৪০০, ৪৭৫, ৯৬৯, ২৬৬৪, ২৭৩০, ৩৫৮৬, ৪১০৭, ৫৮২৮, ৫৮৪৫, ৫৮৪৬, ৯৬২৩, ৯৫৫০, ৯৭৩৭; বুরসা পাবলিক লাইব্রেরী, নং ১৯৯৬; Library of the Topkapi Palace, বাগদাদ নং ৩৪৭, ৪০৪; ইস্তাম্বুল মিল্লাত গ্রন্থাগার, ফাতিহ্ আলি এমিরি নং ৭২, ৭৬, ৮০; তিরানা জাতীয় গ্রন্থাগার নং ১৫৪, পৃ. ২৭-৬৭; ভিয়েনা Staatsarchiv, Kraft নং ৪৭০; ভিয়েনা, Staatsbibliothek, Flugel নং ১৪৯, ff. ১-৪৩; Munich, Staatsbibliothek, cod. turc. nos. ১১৩, ১১৪, ১১৫; মারবুর্গ, Westdeutsche Staatsbibliothek, Hs. or. quart. nos. ১০২৩, ১১০২, ১৮৩৫, Hs. Or. oct. nos. ৮০৯, ৮৪৩, ৮৯২; সোফিয়া, জাতীয় গ্রন্থাগার, তুর্কী পাণ্ডু. ১৩৩২/১৬৬, facsimile সংস্করণ G. Galabov কর্তৃক, Turki Izvori..., সোফিয়া ১৯৬১ খৃ., ১৬৭-২০০; প্যারিস, Bibliotheque Nationale, E. Blochet. Supplement, ৩৮, ৭১, ৭৮, ৭৯, ১৩১১; বৃটিশ মিউজিয়াম, Rieu Add. ৭৮৩৪, ৭৮৪০; ইস্তাম্বুল সুলায়মানিয়া লাইব্রেরী, ফাতিহ্ নং ৫৪২৪; কোনিয়া কোয়ূনগলু মিউজিয়াম, নং ১২৩৩৭, ১১৩৩৭, ১২৩৯৬, ১২৩৩৪, ১২৩৯৫; আনকারা, Library of the Turkish Historical Society, Y ৩২১, ৩২৫, ৩৯৬।

এই কানূননামাটি নিশ্চিতভাবেই ১০৮৪/১৬৭৩ সালের পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। স্পষ্টত ইহার লক্ষ্য ছিল ক্ষয়িষ্ণুকালের সমস্যাবলী, বিশেষভাবে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাদি মুকাবিলা করা। শ্রেষ্ঠতম যুগে নিশানজী জালাল যাদা কর্তৃক রচিত কানূনসমূহ এবং ১৭শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বহু সংস্কারমূলক আইনের প্রণেতা নিশানজী হামযা পাশা রচিত কানূনসমূহ এই কানূননামাটির বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ১০১২/১৬০৩ এবং ১০১৯/১৬১০ সালের মধ্যে জারীকৃত কানূনসমূহ এই কানূননামাটির বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। একই সংগে ইহা কানূননামা-ই সুলতান আহমাদ খান-এর উল্লেখ করিয়াছে। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ইহা পূর্ববর্তী সংকলনসমূহ হইতে পৃথক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যটি হইতেছে ১ম আহমাদ-এর সময়কাল হইতে অন্তর্ভুক্ত করা মুফতীগণের প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহ, এই সকল ফাতওয়ার বিষয়বস্তুসমূহ, বিশেষত ভূমি আইন সংক্রান্ত সমস্যাবলী এবং কোন কোন সময় সিপাহীগণ সম্পর্কিত আইন পূর্বে নিশানজীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত (দ্র. MTM, ১খ., ৩২০)।

সংকলক স্পষ্টতই এই সকল প্রধানত পীরী মুহাম্মাদ-এর ফাতওয়া সংগ্রহ [দ্র.] হইতে জড় করিয়াছেন (দ্র. জাহিরুল-কুদাত MS, Library of the Topkapi Sarayi Revan no. ১৯৩৮; সুলায়মানিয়া, আসাদ আফিন্দী নং ১০৯৪; গ্রন্থটির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Heyd, পৃ. গ্র., ১৮৯-১০), শায়খুল-ইসলাম য়াহ্য়া (ইহার ফাতওয়া সংগ্রহের বহু সংখ্যক নকল বিদ্যমান, উদা. সুলেমানিয়া, আসাদ এফেন্দি নং ১০৮৮; বাসির আগা নং ৩৩২) এবং শায়খুল-ইসলাম বাহা'ঈ (তাঁহার ফাতওয়া সংগ্রহের একটি কপি, Library of Topkapi Sarayi, Revan নং ১৯৩৮, প. ১৫১-১৬৬)-এর ফাতওয়া হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিশানজীগণের প্রণীত এবং সুলতান দ্বারা অনুমোদিত যুগের

কানূননামা, যাহাতে কেবল 'উরফী কানূনসমূহ (দ্র. কানূন) অন্তর্ভুক্ত হইত, তাহার তুলনায় কানূননামা-য়ি জেদীদ ছিল পৃথক ধরনের।

এইরূপ দাবি করা হইয়া থাকে যে, সাধারণ কানূননামা কোনটিই আদালত এবং রাষ্ট্রীয় দফতরে কার্যকর করিবার মত ক্ষমতাপূর্ণ সরকারী বিধি ছিল না (দ্র. Barkan, Kanunlar, ১খ, ২০-৩৪; Osmanli imperatorlugu teskilat ve muesseselernin ser'iligi meselesi, in Istanbul Universitesi Huku Fakultesi Memuasi, ১১/৩-৪ (১৯৪৫ খৃ.), ২১৪-১৫; art. Kanunname, in IA)।

ইহা সত্য যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য বৈধ আইনটি ছিল সর্বশেষ রাজকীয় ফরমান অথবা সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিককালে সানজাক কানূননামা-এর একটি বিধি, তথাপি আদালতসমূহ এবং বেয়লেরবেয়িগণের সভায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত আইনসমূহ প্রদর্শনকারী কানূননাামা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উৎস ও নির্দেশিকারূপে ব্যবহৃত হইত। সাধারণ কানূননামায় যেই সকল বিধান সংশোধনের প্রয়োজন হইত তাহা হয় কাযী অথবা বেয়লেরবেয়ি সরাসরিভাবে সংযোজিত করিতেন অথবা প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য তাহা রাজধানীতে নিশানজীর নিকট প্রেরিত হইত (দ্র. Inalcik, Suleiman the Lawgvier, ১২০-৩)। অবশ্য ইহা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শার'ঈ ফিক্হ পুস্তকের নির্দেশ অনুযায়ী কাযীগণ যেমন স্বাধীনতার সহিত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিতেন, তাঁহাদের নিকটে সংরক্ষিত অনুমোদিত কানূননামা অনুসারেও তাঁহারা সাবলীলতার সহিত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেন। বর্তমানে এইরূপ বহু সহস্র কানূননামার সন্ধান পাওয়া যায়, যেইগুলি পূর্বে কাযী অথবা আদালতের কেরানীর অধিকারে ছিল। অত্যন্ত দুর্বল ক্ষেত্রবিশেষেই, এই সকল কর্মচারী তাহাদের ব্যক্তিগত পদ্ধতি অনুসারে আইনগত বিধানসমূহকে অধ্যায় ও উপশিরোনামে বিন্যাস করিতেন (উদা. ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, MS T ১৮০৭)। সাধারণ কানূননামা-র বেশ কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী টিকিয়া আছে। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর দলীলপত্রে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল কানূননামা সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী প্রযোজ্য সাধারণ দণ্ডবিধিরূপে জারী করা হইয়াছিল এবং সরকারী বিধিরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের জারীকৃত এই আদেশসমূহের প্রয়োগ আদালতগুলিতে বাধ্যতামূলক ছিল (দ্র. Inalcik, Suleiman the Lawgiver, ১১৫-১১৭; U. Heyd, পূ. গ্র., ১৭১-৮০)। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত (মা'মূলুন বিহি) একটি সরকারী কানূননামা রাঈসুল-কুত্তাব-এর নিকট থাকিয়া যাইত এবং অন্যান্য কানূননামা-র সংশোধন অথবা দীওয়ানে কোন দলীলপত্র সম্পাদন এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশনা পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত (Barkan, Kanunlar, ১খ., ৩২)। কাযীগণ সরকারী কানূননামাটি সরকারী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিতেন এবং ইহার পর হইতে তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিতেন। ২য় মুহাম্মাদ, ২য় বায়াযীদ এবং ১ম সুলায়মানের বিধিমালার ভূমিকায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইহাদের প্রকাশনা একটি রাজকীয় ফরমান এবং ইহাদের প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়। এই বক্তব্যটি সুস্পষ্ট করার জন্য মা'মূলুন বিহি অথবা মু'তাবার শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে। য়ূরোপীয় আইনের পরিভাষার ভাবার্থে সরকারী বিধির ধারণাটি 'উছমানী সাম্রাজ্যে আগমন করে ১৩শ/১৯শ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতে কানূননামা, নিজামনামা, এমন কি মেজেল্লি [দ্র.]-এর বিধিবদ্ধকরণ ও প্রচলনে য়ূরোপীয় আইনের প্রভাব বজায় রাখে [দ্র. তানজীমাত]। ৩য় সেলীমের রাজত্বকালে সামরিক বিধিসমূহে ইতোমধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠা এই প্রভাব তানজীমাত যুগের বিধিসমূহে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি য়ূরোপীয় আইনের সরাসরি অনুবাদ (দ্র. হিফজী ভেলদেত, Kanunlastirma hareketleri ve Tanzimat, in Tanzimat, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ১৩৯-২০৯; Dustur, tertib-i evvel, ইস্তাম্বুল ১২৭৯ হি., Aristarchi Bey, Legislation Ottomane, ১৮৭৩-৪ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধগর্ভে উদ্ধৃত বরাতের অতিরিক্ত) (১) O. L. Barkan, Osmanli imperatorlugunda zirai ekonominin hukuki ve mali esaslari, ১খ., Kanunlar., ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ. ; (২) H. Inalcik, Osmanli hukukuna gisis, in Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, ১৩খ. (১৯৫৮ খৃ.) ; (৩) ঐ লেখক, Suleiman the Lawgiver and Ottoman Law, in Archivum Ottomanicum, ১খ. (১৯৬৯ খৃ.), ১০৫-৩৮; (৪) U. Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, সম্পা. V. L. Menage, অক্সফোর্ড ১৯৭৩ খৃ.; (৫) N. Baldiceanu, Les actes des Premiers sultans conserves dans les manuscrits tures de la Bibliotheque Nationale a Paris, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬০-৪ খৃ.।

H. Inalcik (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কানূরী (کانوری، کنوری) ঃ নামটি একটি ভাষা ও একটি জাতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহা সাম্প্রতিক কালের উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনতম জ্ঞাত লিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার উৎপত্তি। কানূরী দৃশ্যত চাদ (Chad) হ্রদের পূর্বে অবস্থিত টেডা-দাযা (teda-Daza) সম্প্রদায়ের ভাষা। সর্বশেষ অনুমান এই যে, কানেম রাজ্যের ভাষা কানেম্বু বিভিন্ন পুরাতন দাযা ভাষাগুলি হইতে উদ্ভূত। কেননা দাযাভাষীরা দক্ষিণে কানেম রাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। বস্তুত চাদ হ্রদের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলে Chadio গোষ্ঠীর কানেম্বু ভাষার প্রভাবে কানেম্বুভাষীদের মধ্যে কানূরী ভাষা কিছুটা বিস্তার লাভ করে। কেননা ইহারা ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বোরনূ রাজ্যে পৌঁছে। কানেম্বু ভাষা এখনও বোরনূ রাজ্যে তাফসীর (দ্র.)-এর চিরায়ত (classical) ভাষারূপে সম্মান লাভ করে। বোরনূর রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে কানূরী ভাষা সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। ইহা প্রাচীন ট্রান্স-সাহারা মহাসড়কের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ত্রিপোলি পর্যন্ত বিস্তৃত বোরনূ রাজ্যে ইসলামের খ্যাতি ও মর্যাদার প্রসারতা দান করিয়াছিল।

কানূরী জনগণ অনুরূপ অগ্রগতি লাভ করিয়াছিল। ঐতিহ্য পরম্পরায় জানা যায় যে, আরবীয় লোককাহিনীর মহাবীর সায়ফ ইব্ন যী য়াযান মাগুমী যাযাবরদের নেতা ছিলেন। কানেম এলাকাধীন অন্যান্য দলের মধ্যে মাগুমীরা ক্রমশ নিজদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। খৃষ্টীয় নবম অথবা দশম শতাব্দীতে কানেম রাজ্যে খণ্ড খণ্ড দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একরূপ সংগঠিত রাষ্ট্রের উদ্ভবের পশ্চাতে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর আরোপিত যাযাবর উদ্বাস্তুদের শাসন অপেক্ষা যাযাবর ও স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল

বলিয়া সম্প্রতি অনুমিত হয়। প্রাচীন সেফাওয়া শাসনকর্তাগণ অর্থাৎ সম্ভবত পৌরাণিক সায়ফ-এর প্রখ্যাত বংশধরগণ, যাহাদিগকে আরও নির্ভুলভাবে মাগুমী গোত্রের সেফাওয়া বংশোদ্ভূত প্রধান বলিয়া চিহ্নিত করা যায় তাহারা বিভিন্ন দলের মহিলাগণকে বিবাহ করেন। ফলে ইহারা পরবর্তী পর্যায়ে কানূরী ভাষার বিকাশে সহায়ক হন এবং এই অ-মাগুমী মহিলাগণের সন্তানাদি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও হইয়াছিলেন।

এই পর্যায়ে কানেমের জনগণের জন্য কানূরী নামকরণ যুক্তিযুক্ত কিনা ইহাই বিচার্য বিষয়, যদিও অনেক আধুনিক বিশেষজ্ঞ ঐরূপই করেন। চাদ হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বোরনূতে জনগণের অনুপ্রবেশ প্রকৃতপক্ষে পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। ইব্ন খাল্দূন ও ইব্ন বাত্তূতা— উভয়ের নিকট বোরনূ রাজ্যের নাম জানা ছিল। ১৩৯০ খৃ. প্রতিদ্বন্দ্বী বালুলাদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া কানেম রাজ্যের শাসনকর্তা তাঁহার সভাসদসহ বোরনূ রাজ্যে পলায়ন করেন। ক্রমশ এই নির্গমনের পরে ঐ অঞ্চলে কানেম অপেক্ষা বোরনূই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়, এমন কি কানেমের পুরাতন রাজধানী Njimi খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুনর্দখল করা হইলেও সেফাওয়ার শাসনকর্তা আর কখনও সেইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য প্রত্যাবর্তন করেন নাই। বোরনূ রাজ্যে রক্ষণীয়ভাবে মিশ্রণ প্রক্রিয়া চলিতেছিল যাহা প্রাকৃতিক রাজ্যসীমার অভাবে সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল কানেম হইতে আগত শরণার্থী, স্থানীয় জনগণ [যাহাদিগকে তাচ্ছিল্যভরে সো (So) বা সাও (Sao) বলা হইত], যাযাবর আগন্তুক ও অন্যান্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বহু সংখ্যক ক্রীতদাস। এই জীর্ণাবস্থা হইতে প্রকৃত কানূরী ভাষার আবির্ভাব ঘটে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী অপেক্ষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বেশী সমপ্রকৃতির ভাষা গঠিত হইয়াছিল। এই আত্মীকরণ প্রক্রিয়া অদ্যাবধি চলিতেছে। এইভাবে প্রচলিত নিয়মে কানূরী হাওয়ার মত একটি ছোট গোত্র নয়, বরং একটি সাধারণ ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের একটি জাতি। উনিবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আল-কানেমী বোরনূ রাজ্যকে ফুলানী জিহাদের সন্ত্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রধানত কানেমবু সৈন্যদলের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। তাহারা বোরনূ'র কানূরী হইতে স্পষ্টতই স্বতন্ত্র ছিল।

কাওয়ার ও ফাযযান রাজ্যের মধ্য দিয়া ত্রিপোলী রাজ্য পর্যন্ত ট্রান্সসাহারা জনপথটি চাদ (Chad) হ্রদ অঞ্চলটিকে অনেক আগে হইতেই সুবিধা প্রদান করিয়া আসিতেছিল। ক্রীতদাসই তখন প্রধান রফতানীযোগ্য পণ্য ছিল। আল-য়া'কূবী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৩য়/৯ম শতাব্দীতে ফাযযানের কেন্দ্রীয় শহর ছিল যাবীলা যেইখানে, এমন কি এশিয়া হইতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ইতোমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান গড়িয়া তুলিয়াছিল। আল-ইস্তাখরী ৪র্থ/ ১০শ শতাব্দীতে যাবীলার মধ্য দিয়া আগত ক্রীতদাসের সঙ্গে আফ্রিকার যানূজ ক্রীতদাসের তুলনা করিয়াছেন। এমন হইতে পারে যে, ৩য়/৯ম শতাব্দীর শেষাংশে ইরাকে যে ক্রীতদাস-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া যানূজ ক্রীতদাসদের সম্পর্কেই ছিল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলিতে এই বিদ্রোহ সম্ভবত অন্যান্য গোষ্ঠীর ক্রীতদাসদের সপক্ষে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আল-বাক্রী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৫ম/১১শ শতাব্দীতে ফায্যান হইতে ক্রীতদাস রফতানী করা হইত। ইব্ন বাত্তূতা বোরনূর সুন্দরী কুমারী ক্রীতদাসী, খোজা বালক ক্রীতদাস এবং জাফরান রংয়ের সুন্দর পোশাকের উল্লেখ করিয়াছেন। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বোরনূ'তে ব্যবসা সম্পর্কে লিও আফ্রিকানাস (Leo Africanus) একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। 'বারবার' বণিকেরা ক্রীতদাসদের পরিবর্তে নৃপতিগণকে অশ্ব সরবরাহ করিত। ক্রীতদাস এবং অন্য দ্রব্যাদির ব্যবসা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চালু ছিল।

চাদ (Chad) রাজ্যে উত্তরাঞ্চল হইতে বাণিজ্য পথে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ৪৬/৬৬৬-৭ সালে 'উকবা ইব্ন নাফি' কাওয়ারে পৌঁছেন। আল-বাকরী উল্লেখ করিয়াছেন যে, উমায়্যা উদ্বাস্তুদের বংশধরেরা কানেমে বসবাস করিতেছিলেন।

যাহা হউক, উমায়্যাদের দ্বারা প্রচারিত উপাখ্যানগুলি প্রায়ই শোনা গেলেও এইগুলিকে সব সময় গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ না করাই শ্রেয়। সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষভাগে সেফাওয়াদের মধ্যে হুমাই(Humai) অর্থাৎ 'মাই' ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা। পক্ষান্তরে আল-মাকরীযীর মতে ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে বিখ্যাত মাই দুনামা দিব্বালেমীর আমলে কানেম রাজ্য চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, দুনামা দিব্বালেমী কানেম রাজ্যে পবিত্র কবচ বা মাদুলী প্রথা চালু করিয়াছিলেন। যদিও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না তবুও ইহা সম্ভব যে, তিনি স্থানীয় ইসলামের সংস্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন কি অমুসলিমদের পুনঃজাগরণের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন। কয়েকজন মাই হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হুমাই-র উত্তরাধিকারী (দুনামা নামেই অভিহিত) দুইবার মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তৃতীয় যাত্রায় পানিতে ডুবিয়া ইনতিকাল করেন। ১২৪০ খৃ. সম্ভবত দুনামা দিব্বালেমীর রাজত্বকালে কানেম রাজ্যের হজ্জযাত্রী ও ছাত্রদের জন্য কায়রোতে একটি হোস্টেল স্থাপিত হয়। অনুমিত হয় যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে দুইজন মাই হাজ্জযাত্রী ছিলেন। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে ইদরীস আলুমা ঐতিহ্যের নবায়ন করেন যাহা বিশেষ করিয়া ১১শ/১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কানূরী ভাষা বোরনূতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তাহার পশ্চিমী প্রতিবেশী হাউসা ভাষাকে প্রভাবিত করিতে থাকে। হাউসা ভাষার শব্দগুলি যেমন বন্দুক, নগর প্রাকার, বাজার এবং অনুরূপ বহু মূল শব্দ লিখনে ও পঠনে কানূরী ভাষার মাধ্যমে আরবী ভাষা হইতে কিংবা সরাসরি কানূরী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নিয়মতান্ত্রিক ধাচেও ইহা বিস্তার লাভ করিতে থাকে, যেমন গালাদীমা উপাধি মূলত বোরনূর পশ্চিমাংশের প্রদেশগুলির শাসনকর্তার জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহা সোকোতো ভাষায় গৃহীত হইয়াছে এবং ফায্যান ও আদামাওয়ার মত দূরবর্তী অঞ্চলেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ফুলানী জিহাদের সময় কানূরী রাজ্যে ইসলাম ধর্ম ফুলানী সমালোচকদের দ্বারা নির্মমভাবে সমালোচিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপিও সোকোতোর সুলতান বেল্লু স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্বের শাসনকর্তাগণ সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেই হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন।

কানূরী ভাষাভাষীদিগকে নিকটস্থ বহু স্থানে, যেমন মান্দারা, বাগিরমী এবং কাওয়ারে দেখিতে পাওয়া যায়। কানূরী রাজ্যে অনেক 'আলিম জন্মলাভ করিয়াছিলেন (আরও দ্র. বোরনূ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Barth রচিত ৫ খণ্ডে সমাপ্ত Travels and Discoveries in North and Central Africa, London 1857-8, ইহাতে একজন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীর বিস্তারিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণী স্থান পাইয়াছে। অবশ্য Denham ও

Clapperton-এর মত আগের পরিব্রাজগণও মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়াছেন। (২) R. Cohen, The Kanuri of Bornu, New York 1967, ইহাতে নৃতত্ত্বীয় বিবরণাদি স্থান পাইয়াছে; (৩) J. H. Greenberg, The influence of Kanuri upon Hausa, in Journal of African History (১৯৬০ খৃ.), ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা রহিয়াছে; (৪) J. E. Lavers, Islam in the Bornu Caliphate, in Odu : A Journal of West African Studies (April 1971), co-published by Oxford University Press; (৫) A. M. D. Lebeuf, Les Populations du Tchad, Paris 1959; (৬) J. Lukas, A Study of the Kanuri Language, London 1937; (৭) B. G. Martin, Kanem, Bornu and the Fazzan : notes on the political history of a trade route, in Journal of African History (1969); (৮) G. Nachtigal, Sahara und Sudan, ৩ খণ্ড, repr. Graz 1967; (৯) H. R. Palmer, Bornu, Sahara and Sudan, London 1936 ; (১০) ঐ লেখক, The First Twelve Years of the Reign of Mai Idris Alooma, Lagos 1926; (১১) ঐ লেখক, Sudanese Memoirs, reprinted London, 1967; উপরিউক্ত তিনটি পুস্তকে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য আছে। (১২) Abdullahi Smith, The early states of the Central Sudan, in J. F. A. Ajayi and M. Croder (eds.), Hisotry of West Africa, i, London 1972, ইহাতে অনেক আধুনিক তথ্য ও উৎসের উল্লেখ আছে; (১৩) Y. Urvoy, Histoire de l'Empire du Bornau, Paris 1949.

H. Fisher (E.I.[2])/মোহাম্মাদ মোমতাজ হোসেন

কানেম (كـانـم) ঃ বর্তমানে চাদ প্রজাতন্ত্রের একটি প্রশাসনিক এলাকার নাম [রাজধানী মাও-Mao]। ইহা উত্তরে বোরকৌ [Borkou], পূর্বে বাথা (Batha), দক্ষিণে চারি বাগুইরমি (Chari-Baguirmi), দক্ষিণ-পশ্চিমে ল্যাক-(Lac) প্রদেশ এবং পশ্চিমে নাইজেরিয়া প্রজাতন্ত্র দ্বারা বেষ্টিত। লোকসংখ্যা এক লক্ষ সত্তর হাজার। অতি প্রাচীন কালের সীমার সহিত ইহার বর্তমান সীমানার হুবহু মিল নাই। ব্যাপকভাবে গৃহীত অভিমত অনুযায়ী সেই রাজ্যটির সীমানা এইভাবে নির্ধারণ করা যায় ঃ পশ্চিমে সুদূর কাওয়ার (Kawar) হইতে উৎপন্ন চাদ হ্রদ পর্যন্ত দীর্ঘ কারাভান সড়ক, দক্ষিণে বাহ্‌রু'ল-গাযাল (দ্র.), পূর্বে ইগুঈ (Eguei)-এর নিম্নাঞ্চল এবং উত্তরে বেলগাশিপারী (Belgashipari) হইতে বিরপো (Birpo) পর্যন্ত সৃষ্ট হ্রদ। কানেম-এর প্রধান ভূমির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বমুখী আড়াআড়িভাবে অসংখ্য বালিয়াড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি কয়েক গজ প্রশস্ত এবং কোথাও কোথাও চার-পাঁচ মাইল দীর্ঘ গহ্বর দ্বারা পরস্পর বিভক্ত। বালিয়াড়ি এবং নিম্ন ভূমিগুলি বিশেষভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। ওয়াদ (ওয়াদা) নামে পরিচিত এই বালিয়াড়িগুলি বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শুষ্ক থাকে। বর্ষকালে ইহাদের গভীরতম অংশে পুকুরের সৃষ্টি হয়। ইহাদের তলদেশ নাট্রন (Notron) [এক প্রকার স্ফটিকাকার খনিজ] মিশ্রিত মাটি দ্বারা গঠিত। এই তলদেশের আরও নীচে ৩ হইতে ৩০ ফিট গভীরতায় পানিবাহী ভূ-স্তর বিদ্যমান। কানেম-এর জলবায়ু গ্রীষ্মমণ্ডলের অনুরূপ। এখানে সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। দক্ষিণ হইতে উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ লঘু। অনেক ওয়াদ-এ বন্য খেজুর গাছ জন্মে। ফলে মাও (Mao) অঞ্চলে, এমন কি নিয়মিত মরূদ্যানও সৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু বালিয়াড়ির ঢালুদেশে গঠিত গ্রামগুলির আশেপাশে কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। জোয়ার অতি সাধারণ কৃষি পণ্য, ইহার সহিত গম, শিম এবং তূলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অশ্ব, মেষ, উট ও গবাদি পশু পালন স্থানীয় অধিবাসিগণের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই অঞ্চলের পশুগুলি উন্নত জাতের এবং বৈচিত্র্যময়। কানেমের সদর অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে সিংহ, মহিষ, চিতাবাঘ, গণ্ডার ও জলহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ সমজাতীয় নহে। আংশিক নিগ্রো ও আংশিক আরব জাতীয় উপাদান লইয়া তাহাদের বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছে। কানেম্বু, বুদ্দূমা ও কুরী প্রথম শ্রেণীর, উলাদ-স্লীমান ও শোয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং জুনজু ও তুবু জাতীয় লোকেরা উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত। কানেম-এ প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের উত্তর পুরুষ কানেম্বু জাতীয়রাই এখানকার জনসংখ্যার মূল অংশ , যাহারা অন্য অধিবাসিগণের উপর তাহাদের ভাষা চাপাইয়া দিয়াছে। তাহারা কৃষ্ণ ধূসর বর্ণের [আয়রাক] দীর্ঘকায় মানুষ। পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয় এই জনগোষ্ঠী সেখানে বসতি স্থাপন করিয়া কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করে। তাহরা নিষ্কলুষ একনিষ্ঠ মুসলিম। তাহাদের মধ্যে হাদ্দাদ [কানেমবু ভাষা Dogoal নামক এক জাতীয় লোক বাস করে, যাহারা ভাষা ও শারীরিক আকৃতির দিক হইতে কানেমবুদের তুলনায় ভিন্ন না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই জাতীয় লোকেরা যোদ্ধা-চরিত্রের ; তাহারা তীরধনুকে সজ্জিত হইয়া গত শতাব্দীর গৃহযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছেন, যে যুদ্ধের পরে দেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

বুদ্দূমা এবং কুরি জাতীয় জনগোষ্ঠী চাদ হ্রদের দ্বীপাঞ্চলে বাস করে। 'উত্তর দ্বীপপুঞ্জ" অঞ্চলের অধিবাসী বুদ্দূমা জাতীয় লোকেরা মৎস্য শিকার, পশু পালন এবং জোয়ার চাষ করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের অধিকাংশই জড়বস্তু-পূজক। একই প্রকারের জীবিকা নির্বাহ করিলেও কুরি জাতীয় লোকেরা মুসলিম।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিপলিতানিয়া ও ফেয্যান হইতে আগত উলাদ স্লীমান জনগোষ্ঠীর ভাষা আরবী। যাযাবর ও দস্যু প্রকৃতির এই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার পন্থা ছিল দাস ব্যবসায় ও দস্যুবৃত্তি। দীর্ঘকাল পূর্বে কানেম-এ প্রতিষ্ঠিত শোয়া জাতীয় লোকেরাও আরবী ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণের জনগোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাহারা নিষ্ঠাবান মুসলিম। মরুভূমির সন্নিহিত শুষ্ক অঞ্চলে এই যাযাবর লোকেরা আর্দ্র দক্ষিণভাগে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

Marquart [দ্র. গ্রন্থপঞ্জী] কর্তৃক অধীত আরবী সূত্রসমূহ অনুসারে কানেম রাজ্য যাগাওয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কানেম-এর অধিবাসিগণকে আল-বাকরী [de slane, পৃ. ২৯] মূর্তিপূজক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানাম শহরের নামোল্লেখকারী আল-ইদরীসীও [সম্পা. Naples, Rome 1970, i, 29] তাহাদিগকে মূর্তিপূজক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তুবু (Teda) জনগোষ্ঠী কর্তৃক ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে

এখানে ইসলামের সূত্রপাত হয়। ইসলাম প্রচারের কাজ য়াযালীগণের সিংহাসনারোহণের সময়ে শুরু হয় বলিয়া মনে হয়। য়াযালীগণ শাসক ইব্ন যীয়াযান-এর বংশধর বলিয়া দাবি করে এবং য়াযালীদের পূর্বপুরুষ আল-হাদী আল 'উছমানী ইসলাম প্রচারের যে কাজ শুরু করিয়াছিলেন তাহারাও উহা জারী রাখে। কিতাবু'ল-ইসতিব্সার গ্রন্থে (সম্পা. von Kremer, ভিয়েনা ১৮৫২ খৃ., পৃ.৩২, অনু. Fagnan, পৃ. ৬১) এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় প্রায় ৫০০/১১০৬-৭ সন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি হাউসা [Hausa] লোককাহিনী মতে আবূ যায়দ আল-ফাযারী (৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৭ম/১৩শ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে) কানেম ও বোরকু (Borku) অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। অপর একটি সূত্র অনুসারে সুলতান ওউমি (Oume) (১০৮৫-৯৭ খৃ.)-এর অধীনে ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষদিকে এখানে ইসলামের সূচনা হয়। উক্ত সুলতান সম্ভবত হজ্জযাত্রায় মক্কার পথে নিহত হন।

সুলতান সিল্মা ['আবদু'ল-জালীল] (১১৯৫-১২২০ খৃ.) রাজ্যটির সম্প্রসারণ করেন। তাঁহার পুত্র ১ম দুনামা [১২২১-৫৯ খৃ.] ইহাকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া ফেয্যান ও ওয়াদা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সুদূর নাইজার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। শেষোক্ত সুলতানের আমলে কানেম-এর কিছু সংখ্যক মুসলিম [৬৪০/১২৪২ এবং ৬৫০/১২৫২-এর মধ্যবর্তী সময়ে] কায়রোতে একটি মালিকী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ৬৫৭/১২৫৭ সালে তিউনিস-এর হাফসী রাজদরবারে একজন দূত প্রেরণ করেন। এই রাজত্বের অবসান পর্যন্ত সায়ফ-এর বংশধর বলিয়া দাবিদারগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুলালা ও সো (So) জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট বিদ্রোহের অশান্ত যুগে কানেম-এর চারজন রাজা বুলালাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে রত হইয়া নিহত হন। শতাব্দীব্যাপী অবিরাম যুদ্ধের পরিবেশে বুলালাগণ দেশটি জয় করে। সুলতান দাঊদ (১৩৭৭-৮৫ খৃ.)-কে রাজধানী জিমি (Ndjimi) হইতে বিতাড়িত করা হয়। 'উমার ইব্ন ইদরীস (৭৬৯/১৩৯৪-৮০০/১৩৯৮) চাদ হ্রদের পশ্চিম তীরে হটিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেইখানে তাঁহার জনৈক বংশধর বোরনু (দ্র.) রাজ্যের পত্তন করেন। খৃ. ষোড়শ শতাব্দীতে নূতন রাজ্যের স্বাধীন শাসকগণ বুলালাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদেক্ষপ গ্রহণ করেন। 'আলী দুনামা [৮৭৬/১৪৭২-৯০৯/১৫০৪] এবং তাঁহার পুত্র ইদ্রীস কাতাকারমাবি [৯০৯/১৫০৪-৯৩২/১৫২৬] বুলালাগণকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তাহাদের প্রাচীন রাজধানী জিমি পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতিনিধি হিসাবে একজন আলিফা (খলীফা-প্রতিনিধি)-এর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিজেরা বোরনুতে অবস্থান করিতে থাকেন এবং কানেমকে বোরনু-র একটি প্রদেশে পরিণত করেন। কিন্তু বুলালাদের বশ্যতা স্বীকার অনিশ্চিত থাকিয়া যায়। ফলে ইদ্রীস আলাওমা (৯৭৮/১৫৭১-১০১১/১৬০৩) বুলালাদের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযান পরিচালনা করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে বিজয় লাভ সত্ত্বেও বোরনু দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে অচিরেই বুলালাগণ হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়াদায় হইতে আগত তুনজুর-এর নিকট তাহারা পরাজয় বরণ করে। তুনজুর প্রথমে বাহরু'ল-গাযাল এবং পশ্চিম তীরে এবং পরে ফিতরিতে বসতি স্থাপন করে। ইত্যবসরে তুনজুরকে বোরনু-র শাসকদের আক্রমণের মুকাবিলা করিতে হয়। ফলে তাহাদের এলাকা বোরনুদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তাহাদের প্রধান 'আলিফা' হিসাবে মাও-এ অধিবাস গ্রহণ করেন। খৃ. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাগিরমি (দ্র.)-র শাসক মুহাম্মাদ আল-আমীন কানেম-এর কিয়দংশ জয় করেন। ১৮০৯ খৃ. বোরনু-র রাজা পিউল (Peuls)-গণ কর্তৃক নিজস্ব বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া আল-আমীন-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, যিনি দেশাত্মবোধ ও পরাক্রমশালিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হ্রদ অতিক্রম করিয়া পিউল সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু তখন হইতে কানেম বোরনূর নিছক আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। শায়খ উপাধি ধারণ করিয়া আল-আমীন আল-কানেমী কুকা-য় তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করিয়া বাগিরমিদিগকে বশে আনয়ন করেন (১৮১৭ খৃ.)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উলাদ স্লীমান আরবগণ বোরনূ আগমন করিলে সুলতান ওয়াদায়-এর আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষার কাজে তাহাদিগকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তাহারা সীমান্ত রক্ষার সুযোগে দেশ লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়। ১৮৭১ খৃ. ন্যাকটিগাল (Nachtigal)-এর কানেম সফরের সময় তাহারাই ছিল তথাকার প্রকৃত শাসক।

'উমার ইব্ন আল-আমীন স্বীয় রাজধানী কুকা-য় স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় তিন পুত্র, যথাঃ ১ম আবূ বাক্র, ইবরাহীম ও হাশিম উত্তরাধিকার লাভ করেন (১৮৮৪-৯৩ খৃ.)। রাবাহ দুর্গবেষ্টিত শহর মামফা অধিকার করিয়া নিজেকে বোরনু-র সুলতান ঘোষণা করেন। হাশিম তাঁহাকে বাধা দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে ১৯০২ খৃ. হাশিম-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'উমার সাওদা জার্মান বোরনু-র সুলতান হিসাবে অধিষ্ঠিত হন।

১৮৯৯ সালের ২১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত ইঙ্গ-ফরাসী সম্মেলনে কানেম-কে ফ্রান্সের প্রভাবাধীন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাহা ১৯০১ এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দখল করা হইয়াছিল। য়ূরোপীয় শাসন সানুসিয়্যা (দ্র.) বিদ্রোহকে উৎসাহিত করে। কিন্তু য়ূরোপীয়গণ ১৯০২ খৃ. বি'র আলালি-র নিকট অবস্থিত যাবিয়া দখল করিলে বিদ্রোহিগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৯০৫ খৃ. বিদ্রোহীদের নেতা শায়খ আহমাদ আত্মসমর্পণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Barth, Travels and Discoveries in North and Central Africa, লন্ডন ১৯৫৭-৮ খৃ., ৫খ, নির্ঘণ্ট, দ্র. Kanem Kanembu; (২) G. Nachtigal, Sahara und Sudan, লাইপযিগ ও বার্লিন ১৮৭৯-১৮৮৯ খৃ., ২খ, অধ্যায় ৫; (৩) H. Carbou, La region du Tchad et. du Ouadai, প্যারিস ১৯১২ খৃ. [Publications de l'Ecole des Letters d'Alger, vols. xlvii and xlviii]; (৪) Cornet, Au Tchad, প্যারিস ১৯১০ খৃ.; (৫) G. Destenave, Le lac Tchad. Rev. Generale des Sciences 1903; (৬) Fouques, Le Kanem, in Revue des troupes coloniales 1906; (৭) F. Foureau, D'Alger au Congo par le Tchad, প্যারিস ১৯০২ খৃ.; (৮) Mission Foureau-Lamy, Documents scientifiques, প্যারিস ১৯০২ খৃ. ; (৯) A. Foureau, Deux annees dans la region du Tchad, in Bulll, du Comite de l'Afrique francaise, Renseignements coloniaux, 1904; (১০) M. Hartmann, Schoa und Tundscher [Der islamische Orient, i]; (১১) Cl. Huart, Le Tchd et ses habitants.

in La Geographie, 1904; (১২) P. Joalland, De Zinder au Tchad et conquete du Kanem, in La Geographi, 1901; (১৩) Labatut, Le territoire militaire du Tchad in Bull, de la Soc, de geogr. d'Alger et de l'Afrique du Nord, 1911; (১৪) C. Largeau. Situation des pays et protectorats du Tchad au point de vue economique. in Revue colonial 1903-1904; (১৫) Marquart. Die Benin-Sammlung. pp. ixxi-ixxxviii; (১৬) Becker, Zur Gesch. des ostlichen Sudan [Der Islam, i, 153 পৃ.]; (১৭) S. Passarge. Zur Oberflachengestalltung von Kanem, in Peterman's Mitteil, 1904; (১৮) Jean Chapelle, Nomades Noirs de Sahara, Paris 1957; (১৯) E. Gentil, La Chute de l'empire de Kabah, Paris 1902; (২০) Maillard, Histoire de Kanem, Memoires Cheam, 1951; (২১) A. Masson -Detour bet and J. P. Le Boeuf. Les population du Tchad, au Nord du 10^{e} parallele, Paris 1959; (২২) P. Gen-til, Les treize Prefectures de la Republique du Tchad Chad Ministry of Information and Tourism, 1962; (২৩) ঐ লেখক, La conquete du Tchad 1894-1916, Paris 1970; (২৪) A. Le Reouvreur, Sahariens et Saheliens du Tchad, Paris 1962; (২৫) J. Le Cornce, Histoire Politique du Tchad 1900-1962, Paris 1963; (২৬) P. Hugot, Le Tchad, Paris 1965; (২৭) Documentation francaise, La Republique du Tchad, Notes and studies, doe. no. 3411 of 18 July 1967; (২৮) Ministry of Information Fort-Lamy, Annuaire Officiel du Tchad 1970 [আরও দ্র. বাগিরমি, বোরনূ, ওয়াদায়]।

G. Yver (E. I.[2])/সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

কানেম, বোরনূ (كانم؛ بورنو) ঃ (কানিম) আফ্রিকার একটি অঞ্চলের নাম। কানিম-এর প্রাচীনতম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় মাসঊদীর মুরূজুয-যাহাব ওয়া মাদিনু'ল -জাওয়াহির গ্রন্থে (রচনাকাল ৩৩২/৯৪৩)। লেখক উহার তেত্রিশতম পরিচ্ছেদে বানূ কাশা' (হাবশীগণ)-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে নুবিয়া, বাজা এবং যানজ গোত্রসমূহের লোকেরা আল-মাগরিব অর্থাৎ পশ্চিম অফ্রিকায় গিয়া বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলটি যাগাওয়া, কানিম, মারকা এবং ঘানা-র আশেপাশে অবস্থিত। তাহারা এতদ্ব্যতীত হাবশ্-এর অন্যান্য অঞ্চলে এবং দামদামা এলাকায়ও বাস করে (মাসঊদী, মুরূজ, সম্পা. do Meynard এবং Courteille, প্যারিস ১৮৬৪ খৃ., ৩খ., ১-২)। স্পেনীয় ভূগোলবিদ আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-বাক্রী কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক (সম্পা. Slane, আলজিরিয়া ১৯১১ খৃ.) গ্রন্থে ত্রিপোলী শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত যুওয়ায়লা নামক একটি স্থানের নামোল্লেখ করত লিখিয়াছেন যে, 'যুওয়ায়লা মরুভূমির অপর পাশের উক্ত শহর হইতে চল্লিশ দিনের পথের দূরত্বে কানিম অবস্থিত। সেখানে হাব্শী পৌত্তলিকদের একটি গোত্র বাস করে যাহাদের নিকট পৌঁছান অত্যন্ত কঠিন (পৃ. ১১)।

আল-মাক্রীযী (মৃ. ৮০৩/১৪০০) নূবিয়া সম্পর্কে পরিচয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, নীল নদের এক তীরে কানিম নামক একটি দেশ আছে, যাহার বাদ্শাহ্ মুসলিম। দেশটি মালী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। উহার রাজধানীর নাম আল-জামী' (আল-জাম')। মিসরের পার্শ্বে উক্ত দেশের প্রথম শহরটি যালা নামে অভিহিত। যালা শহর হইতে কানিমের বিপরীত সীমান্তে অবস্থিত 'কাকা' শহরে যাইতে পূর্ণ তিন মাসের পথ পাড়ি দিতে হয়। ইফরীকিয়্যা এবং বারকা-র মধ্যে অবস্থিত কানিম দেশটি মধ্যআফ্রিকা বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। দেশটির ভূমি শুষ্ক প্রস্তরময় ও অনুর্বর (উদ্ধৃতি Quatremere, Memoires, ২খ, ২৭-২৮)। আরব লেখকগণ নাইজারকে 'নীল' নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের ধারণা ছিল, শ্বেত নীল নদ সুদানের দক্ষিণে পৌঁছিয়া নাইজারে গিয়া মিলিত হইয়াছে। আর কানিম হইতেছে এইরূপ একটি অঞ্চল যাহাকে নীল নদ যথেষ্ট পরিমাণে সিক্ত করে। আর আল-জাম' এবং আত-তাজূ-এর মধ্যবর্তী এলাকার দূরত্ব দশ মন্যিলের সমান (উদ্ধৃতি, Hamker, spec. cat., পৃ. ২০৬)। আন-নূবিয়া-র নিকটেই আল-কানিম অবস্থিত। কানিমের অধিবাসিগণ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী। তাহাদের অধিকাংশই মুসলিম। তাহাদের শহরের নাম আল-জিমাহ্ (আল-জাম' পৃ. গ্র., পৃ. ২০৫)। আল-মাক্রীযীর যুগে কানিমের বাদশাহ ছিলেন আলহাজ্জ ইবরাহীম ইব্ন আল-সায়ফ ইব্ন যীয়াযান। কানিম এখানকার প্রধান শহর ছিল যাহা বোর্নূ দেশের রাজধানী ছিল (পৃ. গ্র., পৃ. ২০৭)। দেখা যায় যে, দেশের ও রাজধানীর নামের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছে।

অনুমিত হয় যে, ৮০৩/১৪০০ সনের কিছু পূর্বে 'কানিম' বা 'বোরনু' দেশে যাহার প্রধান শহর ছিল আল-জিমাহ, কানিমে জিমী (Njimye)-রূপে উচ্চারিত হিউম (Hume) নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন যিনি মুসলিম ছিলেন। তিনি সেই দেশে একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বার্বারী ও বার্দূ'আ গোত্র বংশোদ্ভূত ছিলেন। কানিমের অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে। H. Barthold (Travels and Discoverise in North and Central Africa, ইং অনু., ১৮৫৭-১৮৫৮ খৃ., পৃ. ২৬৪-২৬৫, টীকা) বোর্নূর অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এই বর্ণনার বরাতে উল্লেখ করেন যে, সায়ফওয়াহ্ (سيفوه) গোত্রটি মিসরে বসবাস করাকালীন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রেরিত একজন বিশেষ দূত (সাহাবী) তাহাদের মধ্যে ইসলামের তাব্লীগ করেন। উক্ত বর্ণনার সত্যতার সমর্থনে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বোর্নূতে লোকমুখে প্রচারিত উহা একটি সাধারণ বর্ণনা। Mischlich কর্তৃক রচিত এবং Journ. Afr. Socy., ৪খ., (১৯০৮-১৯০৫ খৃ.), ৪৫৫-৪৭৯ পৃ. প্রকাশিত Contributions to the History of the Hausa States নিবন্ধে উক্ত বর্ণনা কিয়ৎ পরিমাণ ভিন্নরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্ণনা অনুসারে বোর্নূর দালমী নামক জনৈক রাজা ইসলামের প্রসার ও প্রচারের সংবাদ শুনিয়া একজন প্রতিনিধি পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেন এই অনুরোধসহ যে, খলীফার একজন মুবাল্লিগ তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। ইহাতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) ১৪-২৩ হি. হযরত 'আম্র ইবনু'ল-'আস (রা)-এর

নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে বোরনূতে প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দল তথায় বিপুলভাবে সমাদৃত হন এবং সেখানকার সকল লোক ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-বাকরীর এই বর্ণনা 'তাঁহার যুগে বোর্নূর অধিবাসিগণ পৌত্তলিক ছিল এবং সেই দেশে পৌছান সহজসাধ্য ছিল না' সঠিক বলিয়া মনে হয় না।

আল-মাক্রীযীর যুগে যে মুসলিম রাজবংশ কানিমে রাজত্ব করিত, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, উক্ত রাজবংশটি তিন শত বৎসর ধরিয়া সেই দেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ইসলামের মুবাল্লিগ হিসাবে কানিমে সর্বপ্রথম পৌছেন হাজ্জী হাদী আল-'উছমানী নামক এক ব্যক্তি। তিনি নিজেকে হযরত 'উছমান (রা)-এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। অতঃপর সেই দেশের শাসন কর্তৃত্ব য়াযানী গোত্রের হাতে চলিয়া যায়। উক্ত গোত্রটি সা'ঈদ ইব্ন যীয়াযান-এর বংশধর ছিল। কানিমের অধিবাসিগণ মালিকী মায্হাবের অনুসারী এবং 'আকীদা ও বিধি-বিধানে নিষ্ঠাবান মুসলিম। তাহারা মালিকী মায্হাবের ফিক্হ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ৬৪০/১২৪২ সালে ফুস্তাত (প্রাচীন কায়রো) শহরে একটি মাদরাসা কায়েম করেন যাহা ইব্ন রাশিক-এর নামে নামকরণকৃত হইয়াছিল। উক্ত মাদ্রাসায়ই তাহাদের প্রতিনিধি আসিয়া অবস্থান করিতেন (আল-মাকরীযী, এতদ্ব্যতীত দেখুন Quatremere, Memoires, ২খ, ২৮)। হাদী সম্বন্ধে, যিনি ইতিহাসে তেমন বিখ্যাত ব্যক্তি নহেন, বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত 'উছমান (রা)-এর বংশধর। তাঁহার আল-'উছমানী নিসবা দ্বারা উহা সমর্থিত। তবে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার হযরত 'উছমান (রা)-এ বংশধর হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। হযরত 'উছমান (রা) কুরায়শ গোত্রের উমায়্যা শাখার লোক। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, পরবর্তী কোনও এক যুগে উমায়্যা বংশের কিছু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী অথবা তাহাদের মিত্র পক্ষের কিছু সংখ্যক লোক আফ্রিকার কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক আল-মাকরীযী তাঁহার গ্রন্থে অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, কানিমে বানূ সায়ফ গোত্র রাজত্ব করিত। তা'রীখ-ই বোর্নূ (Chronicle of Bornu) গ্রন্থের বর্ণনা হইতেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থখানা হি. দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে এবং লাইপযিগ ওরিয়েন্টাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা "Journal"-এ (১৮৫২ খৃ., পৃ. ৩০৫ প.) M. Blau-এর অনুবাদ ও ভাষ্যসহ উহা হইতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনানুসারে ও বোর্নূ দেশের মুসলিম শাসক বংশের পুরুষানুক্রম উপরের দিকে সায়ফ ইব্ন যীয়াযান পর্যন্ত পৌছে। এই কারণেই উক্ত বংশের শাসনকর্তাগণ সায়ফওয়াহ্ অথবা য়াযানী নামে পরিচিত হইয়াছেন। উক্ত বংশের লোকগণ কর্তৃক গৃহীত সায়ফওয়াহ বা সাফওয়াহ্ নামের সহিত বর্তমানে বোরনূর কেহই আর পরিচিত নহে (Doc. reient, de la Mission Tilho, প্যারিস ১৯১১ খৃ., পৃ. ৩৫২)।

প্রাচীন যুগে কানিমের শাসনকর্তাগণ তুব্বা' নামে আখ্যায়িত হইতেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত উপাধি য়ামান দেশের প্রাচীন শাসনকর্তাদের জন্য ব্যবহৃত হইত। কানিম ও বোরনূর শাসনকর্তাদের তালিকা মুতাবিক (পূ. গ্র., পৃ. ৩৪২-৩৫১) তাঁহাদের প্রথম পূর্বপুরুষ ছিলেন সায়ফ ইব্ন আইস্সাতা (Aissata) যিনি মাক্কাতাহ (মাক্কী) নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ দাবি করা হয় যে, উক্ত শাসনকর্তাগণ আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তুব্বা' ও কূইহাদের একই পূর্বপুরুষ বলিয়া দাবি করা হয়। তুব্বাদের ন্যায় তাহারাও ক্রমে য়ামান হইতে কানিম-এ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সফরে তাহারা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ন্যায় দীনহীন জীবন যাপন করিত। য়ামান হইতে তাহাদের কানিমে আগমনের উক্ত ধারা সম্ভবত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত ছিল। তাহারা দাইরাবিয়্যা (Dieraoua) অঞ্চলে খৃ. সপ্তদশ শতাব্দীতে বসতি স্থাপন করিতে থাকে। সেই যুগে তুব্বা'গণ কাযার সূমূ (Kazer Soumo) অঞ্চলে রাজত্ব করিত। তাহারা সমগ্র কানিম-এর উপর স্বীয় আধিপত্য কায়েম করিয়াছিল। তাহাদের সাম্রাজ্যের সীমানা চাদ হইতে আরম্ভ করিয়া নাইজার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (পূ. গ্র., পৃ. ২১৬)। ইহা কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণভিত্তিক বর্ণনা নহে, বরং উহা শুধু লোকমুখে প্রচলিত বর্ণনামাত্র। কানিমের সাফওয়াহ্ অথবা তুব্বা' মূলত য়ামানদেশীয় অথবা মক্কাবাসী এই বর্ণনাটি সম্ভবত পরবর্তীকালের কল্পিত বর্ণনা।

'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'ইমরান ইব্ন 'আমির—যিনি সীদী তিমবাকতু নামে বিখ্যাত–তাঁহার তা'রীখু'স-সুদান ইতিহাসে (O. Houdas কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত, প্যারিস, মূল গ্রন্থ, ১খ, ১৮৯৮ খৃ., অনু. ২খ, ১৯০০ খৃ.) লিখিয়াছেন, কানিম ও বোরনূর শাসক বংশ য়ামান হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু উক্ত ইতিহাস গ্রন্থ খৃ. সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। এতদনুসারে উহাতে শুধু তৎকালে লোকমুখে প্রচলিত বর্ণনাসমূহই স্থান পাইতে পারে। আল-মাকরীযীর বর্ণনামতে কানিম ও বোরনূর ইসলাম-উত্তর যুগের সর্বপ্রথম বাদশাহ্ ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্ন জাবাল ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'উছমান ইব্ন মুহাম্মাদ (Hamaker, Spec. cat., পৃ. ২০৫)। কিন্তু পূর্বোক্ত তালিকায় তাঁহার নাম হিউম (Hume)-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দাগ বা দাক-এর বংশধর ছিলেন। প্রাচীন অমুসলিম শাসকবংশ, দাগূহ্ বা আল-দাগ নামে বিখ্যাত ছিল এবং পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকবংশ আল-হিউম নামে পরিচিত হইত। Barth-এর হিসাব মুতাবিক হিউমের শাসনকাল ছিল আনুমানিক ৪৭৯ হি. হইতে ৪৯১ হি. পর্যন্ত। Nachtigal-এর মতে তাঁহার শাসনকাল ৪৬০ হি. হইতে ৫২৪ হি. পর্যন্ত। আবার Mission Thilho-র মতে তাঁহার শাসনকাল ৪৬৩ হি. হইতে ৪৮৬ হি. পর্যন্ত (Doc. scient de la Miss, Tilho, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)। এই কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, কানিমের মুসলিম শাসনকাল হি. পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে আরম্ভ হইয়াছিল। এমতাবস্থায় আমাদিগকে হাদী আল-'উছমানীর পর কানিমের শাসন কর্তৃত্ব য়াযানীদের হাতে চলিয়া যায় আর-মাকরীযীর উক্ত বর্ণনার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, সর্বপ্রথম হাদী আল-'উছমানী-ই হি. পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমদিকে কানিমে ইসলাম প্রচার করেন।

হি. পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পরবর্তী কালের কানিমের মুসলিম অধিবাসী এবং মুসলিম নৃপতিগণ সম্বন্ধে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও উহার দূরবর্তী যুগ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই যুগে মুসলিমগণ দীন কায়েম ও প্রচার করিবার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া উত্তর দিক হইতে ক্রমে পশ্চিম সূদানে প্রবেশ করিতেছিল। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কানিমে ইসলাম আসিয়াছিল কি উত্তর দিক হইতে? আরনল্ড তাঁহার Preaching of Islam গ্রন্থের ৩২০ " লিখিয়াছেন যে, কানিমে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে মিসরের দিক হইতে। কিন্তু তিনি তাঁহার উক্ত দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার উক্ত

দাবির কারণ সম্ভবত এই যে, কানিমে অবস্থিত জাবালু'ন-নারীর মধ্য দিয়া একটি প্রাচীন রাস্তা একটি খেজুর বৃক্ষ অঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্ব ও উত্তর-পূর্বদিকে মিসরে পৌঁছিয়াছিল। খেজুর বৃক্ষের উক্ত অঞ্চলটি বর্তমানে আর আবাদ নাই। রাস্তাটির চিহ্ন এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমরা ইহাও জানি যে, বোরনূ অঞ্চলের হাজ্জীগণ পূর্ব যুগেও মিসরের মধ্য দিয়া পবিত্র মক্কায় যাতায়াত করিতেন এবং এখনও প্রায়ই যাতায়াত করেন।

তা'রীখ বোর্নূ গ্রন্থে সান্হাজাহ্ বারবারগণই বোর্নূতে ইসলামের তাবলীগ ও প্রসারের মহান ব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (Jour. Leipz. Or. Soc., পৃ. ৩০৫ প.)। সম্ভবত এই কারণেই হাউসা ভাষায় বারবারগণ বলিতে "বোর্নূ জাতি"কেই বুঝান হইয়া থাকে।

মুসলিম জাহানের সহিত বোরনূর যোগাযোগ ব্যবস্থা তিনটি পথে কায়েম ছিল ঃ (১) বোরনূর উত্তর-পূর্বদিক হইতে দক্ষিণ মিসরের মধ্য দিয়া; (২) বোরনূর উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আল-মাগ্রিব (তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কো)-এর মধ্য দিয়া। পূর্বদিকের কথা বাদ দেওয়া উচিত। কারণ সর্বপ্রথম খৃ. ষোড়শ শতাব্দীতে কুরদুফান (Kordofan) ও দারফূর অঞ্চলসমূহে ইসলাম ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বে পূর্ব দিক দিয়া বোরনূর উপর কোনরূপ ইসলামী বা আরবীয় প্রভাব পতিত হইবার কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃ. ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নূবিয়া এবং আবিসিনিয়ার কারণে পূর্বদিকের রাস্তাসমূহে বাধাবিঘ্ন ছিল; কিন্তু নূবিয়ার খৃস্টান শাসনের অবসানের পর পূর্বদিক দিয়া বোরনূ-র সহিত মুসলিম জাহানের যোগাযোগ কায়েম হইয়া যায়।

৭৮৮/১৩৮৮ সনে বোরনূ-র শাসক বংশকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাদিগকে বুলালাহ (Bulala)-এর পথে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়। অতঃপর মাই 'আলী গেজিদেনী (Mai Ali Ghejideni) নব্য বোরনী বা বোরনূ রাষ্ট্র কায়েম করেন। ১৮০৮ খৃ. 'ফালাহ' রাষ্ট্র বোরনূ আক্রমণ করে এবং পরবর্তী সনে উক্ত রাষ্ট্র প্রাচীন বোরনূ রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া দেয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের দিকে যুবায়র পাশার দাস রাবাহ্ হাব্শী, বাগেরমী (Bagermi) অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইয়া বোরনূ আক্রমণ করেন। ফলে তৎকালীন বোরনূর বাদশাহ আহ্সাম (Ahsem) দেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। রাবাহ বোরনূ-র রাজধানীতে প্রবেশ করত উহাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দেন। অতঃপর তিনি দিক্ওয়াহ (Dikwa)-তে তাঁহার রাজধানী নির্মাণ করেন। ১৯০০ খৃ. রাবাহ মারা যান। উহার দুই বৎসর পর ইংরেজগণ শেহূ গারবাই (Shehu Garbai)-কে কুকাহ (Kuka) নামক স্থানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

De Lacy O'Leary (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংক্ষেপিত)
(দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

আল-কানেমী (الكانمى) ঃ আল-কানিমী, [আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আল-আমীন ইব্ন মুহাম্মাদ নিন্কাহ] (জ. ১১৮৯/১৭৭৫-৬, মৃ. ১২৫৩/১৮৩৭) কানেমবু বংশোদ্ভূত একজন বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি বোরনূ (দ্র.)-র শেহূ বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি মুরযুক (ফায্যান)-এ লালিত-পালিত হন। এইখানে তাঁহার পিতার সম্পত্তি ছিল। এই স্থানেই তিনি আরবী শিক্ষা করেন। তিনি মিসর ও হিজায ভ্রমণ করেন এবং পরিশেষে পূর্ব বোরনূ-তে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং আরব ও কানেমবু উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে সংগৃহীত সমর্থকদের বলে তিনি ফুলানী বিদ্রোহকালীন বোরনূ-র রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে মাই ইব্রাহীম (১৮১৮-৪৬ খৃ.) সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসে এবং ১২৩৫/১৮১৯-২০ সালে তিনি নিজের নামে একটি সীল প্রস্তুত করেন।

মাইদের ক্ষমতার পিছনে শক্তি হিসাবে তিনি সাংঘাতিকভাবে বিপদাপন্ন বোর্নূ-র প্রাচীন সাম্রাজ্য রক্ষায় সফলকাম হন। মাই দূনামা-র প্রতি তাঁহার সমর্থন ফুলানী বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটায়। পশ্চিম দিকের প্রাচীন রাজ্যসমূহে সোকোতো আমীরাতের প্রতিষ্ঠারোধে অসমর্থ হইলেও তিনি সোকোতো 'আলিমগণকে একটি প্রসিদ্ধ আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত রাখিয়া বোরনূদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের জিহাদ পরিচালনার দৃঢ় প্রত্যয়কে খুব দুর্বল করিয়া দেন। তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের এক বৃহৎ অভিযানে কাটাগুম এবং হাদেজিয়া-র আমীরগণের রাজ্য প্রসার নিয়ন্ত্রিত করেন এবং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হওয়ার পূর্বে তিনি সুদূর কানো পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১৮২১-৪ খৃ. বগারমি-র বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তিনি চাদ হ্রদের দক্ষিণের পূর্ব সীমান্ত সুদৃঢ় করেন। এই সব কিছুর প্রথমে তিনি ফায্যান-এর 'উছমানী কা'ইম-মাকাম-এর নিকট হইতে সহায়তা পান এবং পরে তিনি আওলাদ সুলায়মান-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ফায্যানীদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখেন (এই সহযোগিতা বোরনূ-র বাণিজ্য ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল)। আওলাদ সুলায়মান তাঁহাকে কানেম-এ প্রভাব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করেন, যাহাতে কানেম ওলাদা'ইর বিরুদ্ধে একটি মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাইদের পুরাতন ও অযোগ্য সামন্ত-সেনার পরিবর্তে সেনাবাহিনীর নূতন কানেমবু পদাতিক বাহিনী ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী একটি মামলূক কর্মকর্তাদলসহ শুওয়া-র আরব অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করিয়া বোর্নূ সরকারী কাঠামোতে এক ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। পুরাতন কানূরী জায়গীর রক্ষাকারী কার্যালয়সমূহ টিকিয়া থাকে। কিন্তু জায়গীর ক্রমবর্ধমান গতিতে আল-কানেমীর সমর্থকদের হাতে স্থানান্তরিত হয় এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ সরকার পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই উপদেষ্টাগণ ছিলেন প্রধানত অ-কানূরী, তাঁহারা ছিলেন একটি নূতন এবং সংস্কারমুখী আন্দোলনের প্রতিনিধি।

একজন সুবিখ্যাত বিদ্বান হইলেও আল-কানেমী তেমন বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। তিনি কেবল ফিক্হ-এর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ নাসীহাতু'ল-হুক্কাম রচনা করেন। নাসীমু'স-সাবা নামে একটি কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তবে তাঁহার চিঠির অনেকগুলিই সংরক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ বেল্লোহ, ইনফাকু'ল-মায়সূর (১৮১৩), লন্ডন ১৯৫১ খৃ., কায়রো ১৯৬০ খৃ. ; (২) D. Denham এবং H. Clapperton, Narrative of travels and discoveries in North and Central Africa লন্ডন ১৮২৬ খৃ. ; (৩) Y. Urvoy, Histoire de l'empire du Bornou, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ. ; (৪) L. Brenner, the Shehus of Kukawa, অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. থিসিস, কলাম্বিয়া ১৯৬৮ খৃ.।

Abdullahi Smith (E.I.[2])/মোঃ শহীদুল্লাহ

কানো (كانو) ঃ কানূ, উত্তর নাইজেরিয়ার একটি নগরী, ১২১° উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৩০°/পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী ইহার লোকসংখ্যা ২,৯৫,৪৩২ বলিয়া নিরূপিত হয়। কানো রাজ্যের আয়তন ১৬,৬৩০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫৭,৭৪,৮৪২।

ইতিহাস ও রাজনীতি ঃ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর পূর্বে দাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে একটি পৌত্তলিক উপনিবেশ হিসাবে কানোর উৎপত্তি হয় বলিয়া কথিত। দাল্লা পাহাড় একটি বিশাল প্রস্তর স্তূপ, যাহা বর্তমান নগরীর উর্ধ্বে বিরাজমান। এই প্রাচীনকাল সম্বন্ধে ঐতিহ্যগত বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, অধিবাসীরা সর্বপ্রাণবাদ ও প্রেতাত্মাবাদে (spiri-possession) বিশ্বাসী ছিল, যাহা বোরি (bori) ধর্মীয় পদ্ধতির অনুরূপ ছিল এবং যে 'বোরি' ধর্ম অদ্যাবধি উত্তর নাইজেরিয়ায় টিকিয়া আছে এবং আরও মনে হয় যে, ঐ ধর্মীয় পদ্ধতির প্রধান তাহার রাজকীয় কার্যাবলী পার্থিব শাসকের কার্যাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছিল।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে নগরীতে অপরিচিত লোকদের আগমন ঘটে, যাহাদের নেতা ছিল Bagauda এবং যাহারা তাহাদের নিজেদের দেশে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া উত্তর দিক হইতে আসিয়াছিল। তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের সম্মতিক্রমে কানোতে বসতি স্থাপন করে এবং পরে উন্নততর কর্মকুশলতা ও চাতুর্যের বলে তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। এই বসতি স্থাপনকারীরা মুসলিম ছিল কিনা তাহা অনিশ্চিত, যদিও ঐতিহ্যগত বর্ণনানুযায়ী Bagauda দাঊদ নামও ধারণ করিত। কিন্তু স্পষ্টতই তাহারা স্থানীয় ধর্ম-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং কানো ঘটনাপঞ্জীতে (নিম্নের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) লিপিবদ্ধ আছে যে, ইহাতে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার পূর্বে কয়েক পুরুষ গত হইয়াছিল। কানোর উন্নয়নে তাহাদের অবদান এই মনে হয় যে, তাহারা বেশ সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানাযুক্ত এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগরীর অভ্যন্তরে প্রশাসনিক কেন্দ্রসহ একটি নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, পূর্বে যেখানে ছিল মাত্র একটি শিকারী, আদিম কৃষিকার্যরত রাষ্ট্রহীন সমাজ, যাহারা বিক্ষিপ্ত উন্মুক্ত পল্লীতে এবং ঝোপঝাড় সাফ করা স্থানে বাস করিত।

Bagauda-র পরে রাজাদের তালিকায় প্রথম যে ইসলামী নামের সাক্ষাত ঘটে তাহা হইল ওসুমানূ যামনাগাওয়া (Osumanu Zamnagawa)-র যিনি কানো ক্রনিকল তারিখ অনুযায়ী ৭৪৩/১৩৪৩ হইতে ৭৫০/১৩৪৯ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। একই উৎস অনুযায়ী তাঁহার রাজত্বের পরে কানোতে আগমন ঘটে ওয়াংগারা-ওয়ার অর্থাৎ য়াজির রাজত্বকালে (৭৫০-৮৭/১৩৪৯-৮৫) মালি হইতে আগত ইসলামী মিশনারীদের ; কিন্তু সাম্প্রতিক এক বিবরণী যাহার ভিত্তি ওয়ারাংগার ১৭শ শতাব্দীর এক ঘটনাপঞ্জীর আবিষ্কার, কানো স্টাডিজ, ১/৪ (১৯৬৮ খৃ.)-এর (মুহাম্মাদ আলহাজ্জ), (A Seventeenth century chronicle of the Origins and missionary Activities of the Wangarawa) অনুযায়ী এই ঘটনা ৯ম/১৫শ শতাব্দীই ছিল ঐ সময় যখন ইসলামের উপস্থিতি কানোতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও আরও পূর্বে হয়ত কতক অনির্ধারিত ইসলামী প্রভাব ইহার পূর্বেও সেখানে বিদ্যমান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৭৯৩/১৩৯০ এবং ৮১৩/১৪১০-এর মধ্যেই লেপে আবৃত অশ্ববর্ম (আরবী আল-লিব্দ, হাউসা লিফিদি) এবং তৎসহ বর্ম সার্টের প্রবর্তন ঘটে; এই ঘটনা ইসলামী উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। তদুপরি ৮২৪/১৪২১ এবং ৮৪১/১৪৩৮-এর মধ্যে বোর্নূ হইতে এক 'রাজকুমার' ও তাঁহার অনুসারিগণ নগরীতে আগমন করেন, এই বোর্নূ রাজ্যে ৫ম/১১শ শতাব্দীতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পরেই বোর্নূর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্মেষ ঘটে। ৮৫৬/১৪৫২-এর মধ্যে নগরীতে উট দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কথিত আছে এবং কানোর দক্ষিণে গ্রামাঞ্চলে ক্রীতদাস ধরা সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের জন্য লাভজনক পেশায় পরিণত হয়। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায় যে, ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কানো আন্ত-সাহারা বাণিজ্যে লিপ্ত হয় এবং অবশ্যই ইহা ইসলামীকরণের তারিখ নির্ধারণের এক নির্ভরযোগ্য নির্দেশনা।

এই তারিখ পরম্পরায় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আফ্রিকা হইতে সুপরিচিত 'আলিম ও ধর্মপ্রচারক আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাগীলী আত-তিলিম্সানী (মৃ. ৯০৯/১৫০৪)-র কানোতে আগমন। এই ব্যক্তিত্ব কানোতে এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র হাউসাল্যান্ডে ইসলামী ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। শরী'আ ও সূফীবাদ প্রবর্তন করেন বলিয়া তিনি আখ্যাত এবং বস্তুত সমস্ত ইসলামী বিষয়ই আল-মাগীলীর অবদান বলিয়া স্বীকৃত। নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু নগরীতে তাঁহার উপস্থিতির তাৎপর্য ইহাও যে, উহা ঐ সময়ের ইংগিত বহন করে যখন সাহারার জটিল বাণিজ্যিক লেনদেন ক্রমবর্ধমান ব্যাপৃতির ফলে এবং বোরনূর সংগে রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলে কানো পার্শ্ববর্তী উত্তর আফ্রিকা ও মিসরের ইসলামী অঞ্চলসমূহের জন্য উন্মুক্ত হইয়া উঠে।

পূর্ণতর ইসলামীকরণের দিকে আরও একটি পদক্ষেপ ঘটে মুহাম্মাদ রুমফা-র রাজত্বকালে (৮৬৭-৯০৪/১৪৬৩-৯৯)। তিনি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ইসলামী পর্দা প্রথার ও ইসলামী উৎসবে জনসাধারণের একত্রে ও প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন বলিয়া কথিত। ইহা ছাড়া তিনি নপুংসকদের অফিসে নিয়োগ করেন এবং এইভাবে সম্ভবত মামলূক ও 'উছমানী আমলে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন রাজদরবারে প্রচলিত রীতির অনুকরণ করেন।

ফুলানী জিহাদের পূর্বের সময়কালে অন্যান্য সূদানী এবং সাহারা অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কানোর সম্পর্ক একই সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং কখনও বা অস্পষ্ট। এইগুলি Johnston (পৃ. গ্র., গ্রন্থপঞ্জী), Hogben ও Kirk-Greene (পৃ. গ্র., গ্রন্থপঞ্জী)-তে আলোচিত হইয়াছে এবং মূলত ইসলামী ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি নিবন্ধে শুধু সংক্ষেপে পর্যালোচনা প্রয়োজন। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে কানো সম্ভবত বোরনূর অধীনে ছিল এবং করও প্রদান করিত। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা Songhai কর্তৃক পরাজিত হয় এবং Songhai-কে কর প্রদান করিয়া স্থানীয় রাজবংশ ক্ষমতায় বহাল থাকে এবং তথায় বাহ্যত শান্তি বজায় থাকে। সংহাই-নিয়ন্ত্রণ শীঘ্রই শেষ হইয়া যায় বলিয়া মনে হয় এবং তাহার প্রতিবেশী কাতসিন (Katsine)--এর বিরুদ্ধে কিছুকাল শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধের পরে এই শতাব্দীতে স্বল্পকাল পরে কানো কেব্বি (Kebbi) রাজ্যের শাসনাধীনে চলিয়া আসে। ১১শ/১৭শ শতাব্দী ব্যাপিয়া কানো নগরী ও রাষ্ট্র উভয়ই বেনুই (Benue) অঞ্চল হইতে যুদ্ধপ্রিয় কওয়ারারাফা কর্তৃক অবিরত আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বোরনূ পুনরায় কানোর শাসনক্ষমতা লাভ করে, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহার স্থান গোবির (Gobir) রাজ্য কর্তৃক অধিকৃত হয়, যাহার রাজা বাবারি (১১৫৫-৮৪/১৭৪২-৭০) আধিপত্য স্থাপন করে ও কর আদায়

করে। এই সমস্ত সামরিক পরাজয় কিন্তু নগরীর ঐশ্বর্য ও উন্নতির উপর অল্পই প্রতিকূল প্রভাব ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অপর দিকে শাসকবর্গ তাহাদের রাজত্বের মধ্যে তাহাদের সমস্ত কর্তৃত্বই বজায় রাখিয়াছেন এবং শান-শওকতও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাব্বা যাকী (১১৮২-৯০/১৭৬৮-৭৬) তাঁহার রাজসভায় উর্দি পরিহিত বন্দুকধারী দেহরক্ষী দলের প্রবর্তন করেন। কথিত আছে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আরবদের রীতিনীতি অনুকরণ করেন। অনুমান করা যায় যে, প্রথম পর্যায়ে কানোতে বসবাসরত আরব বণিকদের জীবনধারা অনুসরণ করা হয় এবং তাহাদের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকা ও মিসরীয় রাজসভার অনুষ্ঠান-প্রণালী ও কূটনৈতিক আদব-কায়দাও অনুকরণ করেন। তিনি দক্ষ কিন্তু নির্দয় একনায়ক হিসাবে শাসন পরিচালনা করেন। তাঁহার রাজদরবারে কিছু দলাদলিজনিত বিরোধ ছিল বলিয়া প্রমাণ আছে, অপরদিকে তাঁহার অন্যতম নিকটপূর্বপুরুষ কুমবারির (১১৪৩-৫৬/১৭৩১-৪৩) শাসনের বিবরণ হইতে অত্যধিক করারোপের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের কথা জানা যায়। এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত প্রমাণাদি এমন এক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে যাহা মুহাম্মাদ আলওয়ালি (১১৯৫-১২২২/১৭৮১-১৮০৭)-র শাসন আমলের ঘটনাবলীর উদ্রেক করিয়াছিলেন অর্থাৎ কানোতে সফল ফুলানী জিহাদ, আলওয়ালির বিতাড়ন এবং কানোতে প্রথম ফুলানী আমীর, ফুলানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, সুলায়মানু (১২২২-৩৫/১৮০৭-১৯)-র অভিষেক। এই বংশ ঐ সময় হইতে এই রাজ্যটি শাসন করিয়াছে। ১২৩৫/১৮১৯-এ সুলায়মানুর পরে আসেন বিখ্যাত যোদ্ধা ইব্রাহীম দাবো যিনি হাউসা উপাধি 'সি গারি' (নগরী বিজয়) লাভ করেন। পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া নগরীর উপর বিতাড়িত হাবে রাজবংশ কর্তৃক সংঘটিত পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছিল, অপরদিকে মিনৃগি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালানো হইতেছিল, যাহারা ছিল একটি শক্তিশালী দল। তাহারা তখন পর্যন্ত ঐ রাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমানায় একটি ছিট মহল দখল করিয়া রাখিয়াছিল। জিহাদের সময় তাহাদিগকে দমন করা হয় নাই। আমীর 'উছমান-এর শাসনকালে (১২৬২-৭২/১৮৪৬-৫৫) জার্মান অভিযাত্রী হাইনরিখ ব্যর্থ (Heinrich Barth) নগরীটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি উহাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করেন। উহার বাজারে য়ুরোপ ও আফ্রিকায় উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মওজুদ থাকিত। তিনি নগরীটির ঐ সময়ে উহা যেইরূপ ছিল তাহার একটি নক্শা মানচিত্রও সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং ইহার লোকসংখ্যা ৩০,০০০ বলিয়া নিরূপণ করেন (পৃ. গ্র., গ্রন্থপঞ্জী)।

সিংহাসনের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী য়ুসুফু ও তুকুরের মধ্যে উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদের ফলে ১৩১১/১৮৯৩ সালে কানোতে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়। Sokoto-এর জন্য খলীফার মনোনীত ব্যক্তি তুকুর কানোতে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু গণ্ডগোলের মূলে নিহিত ছিল সোকোতোর হস্তক্ষেপের প্রতি কানোর অসন্তোষ। প্রধান দুই নায়কের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ স্তিমিত হইয়া পড়ে, কিন্তু খলীফার কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করিতে কাজ করে। তখন হইতেই সোকোতো এবং তাঁহার শক্তিশালী করদ কানোর মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা ছিল তাহা তাহাদের সম্পর্কে অশান্তি সৃষ্টির একটি কারণ ছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সমস্ত ঘটনা বৃটিশের হাউসাল্যান্ড (Hausaland) অধিকারের দিকে চালিত করে, তাহাতে কানো সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃটিশ ধর্মপ্রচারক ক্যানন সি. এইচ. রবিনসন (Canon C. H. Robinson) এবং ২০শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একটি দল যাহার সদস্য ছিলেন ড. ওয়াল্টার মিলার উহা পরিদর্শন করেন। উভয়ই ইসলামের এবং কানো প্রশাসনের কিছুটা বিরূপ বিবরণী প্রদান করেন, যাহা সম্ভবত যুক্তরাজ্যে ঐ মতের পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে এবং ইহা দখল করা সম্ভব করিয়া তোলে। ঐ দখলকরণের প্রাক্কালে কানোর আমীর 'আলীউ (১৩১২-২১/১৮৯৪-১৯০৩) স্যার ফ্রেডারিক লুগার্ড-এর দূত ক্যাপ্টেন মোলোনি (Moloney)-র হত্যাকারী মাগাজিন কেফ্ফি (Magajin Keffi)-কে আশ্রয় প্রদান করে এবং যু'ল-কা'দা ১২২০/ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ সালে সংক্ষিপ্ত এবং নিষ্ফল প্রতিরোধের পরে বৃটিশ বাহিনীর নিকট নগরীটির পতন ঘটে।

উপনিবেশ থাকাকালীন নূতন প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে এবং চীনা বাদামের নূতন ব্যবসার কেন্দ্র (যাহার উপর উত্তর নাইজেরিয়ার অর্থনীতি বহুলাংশে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে) হিসাবে কানো বিকাশ লাভ করে। ঐ স্থানেই স্থাপিত হয় স্কুল ফর এরাবিক স্টাডিজ, উহা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা উপনিবেশ স্থাপনকারী সরকার আরবী ও ইসলামী বিজ্ঞানসমূহ আধুনিক অধ্যাপনা পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপন করে। আহমাদু বেল্লো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আবদুল্লাহি বায়েরো নামক একটি কলেজ কানোতে স্থাপিত হয়।

নগরীটি বরাবরই সূফী কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম আল-মাগীলী হাউসাল্যান্ডে সূফী মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে করা হয় এবং কানো ও কাতসিনা ছিল দুইটি কেন্দ্র যেইগুলি তিনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কাদিরিয়া (দ্র.) তারীকাই যে প্রথম তারীকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ধরিয়া লওয়া যায় এমন কি বর্তমান কালেও ইহা অধিকাংশের তারীকা। কিন্তু তিজানিয়ারাও শক্তিশালী, উপরে উল্লিখিত সোকোতোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবত উহা প্রতিফলিত করে। সোকোতো শাসক পরিবারকে কাদিরিয়ার সঙ্গে সনাক্ত করা হয় শাহ 'উছমান ইব্ন ফোদিও ('উছমান ইব্ন ফূদী) যাহাকে 'আবদু'ল-কাদির জীলানী (র)-র সংগে সংযুক্ত করা হয় তাঁহার সিলসিলার উপর তাহাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্ভবত এই কথার সঙ্গে সম্পর্কিত যে, কানোর পূর্ববর্তী আমীর মুহাম্মাদু সানুসী এক সময়ে উত্তর নাইজিরিয়ার তিজানিয়ার যথারীতি সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন।

ঔপনিবেশিক আমলের শেষ যুগে যখন উত্তর নাইজেরিয়ায় য়ুরোপীয় রীতির রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়, তখন তারীকা দুইটি ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে গভীরভাবে জড়াইয়া পড়ে যাহা স্বাধীনতার সম্ভাবনা জাগাইয়া তোলে। কানোতে কাদিরিয়াকে মোটামুটি এন.পি.সি. (N.P.C.)-র জন্য সমর্থনের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়। এন.পি.সি. প্রতিষ্ঠান সোকোতো শাসকগোষ্ঠীর রাজকুমার মরহুম স্যার আলহাজ্জ আহমাদু বেল্লোর নেতৃত্বে পরিচালিত; অপরপক্ষে তিজানিয়া উত্তর আফ্রিকার বিরোধী দল নেপু (NEPU)-র আনুকূল্য করে যাহার নেতৃত্বে ছিলেন মালাম মাইনু কানো অথচ কানো শাসকগোষ্ঠী তাহার মৌলিক স্বার্থের খাতিরে এন. পি. সি.-কে সমর্থন করিতে বাধ্য ছিল, সোকোতোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনক্রমেই প্রশমিত হয় নাই এবং ঐ সময়ে নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত স্যার আলহাজ্জ আহমাদু বেল্লোর নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল তাহার চাপে ১৯৯৩ খৃ. কানোর শাসনরত আমীর

স্যার মুহাম্মাদ সানুসি "পদত্যাগ" করেন। খৃষ্টীয় ১৯শ ঐতিহ্যগত "প্রদত্ত" কর্তৃত্ব ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে কানোর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা— এই উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। ফলে ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত কানো রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করে। বর্তমান সামরিক প্রশাসন কর্তৃক উহা কতক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত চাপা উত্তেজনা যাহা ছিল বাস্তব এবং যাহা সময় সময় প্রচণ্ড আকারে আত্মপ্রকাশ করে তাহা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত। যে সমাজের একটি দীর্ঘ ও জটিল রাজনৈতিক ঐতিহ্য রহিয়াছে তাহাতে ঐগুলি অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সামাজিক ও কৃষ্টিগত পর্যায়ে কানোর অধিবাসীরা এবং বস্তুত তাহার শাসকবর্গ সোকোতোসহ উত্তর নাইজেরিয়ার অবশিষ্ট অংশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাহাদের ইসলামী ঐক্যের প্রবল অনুভূতির এবং অনুরূপ একাত্মতার মনোভাবের অংশীদার ছিল এবং এখনও আছে।

শিক্ষা ও সাহিত্য ঃ কানোতে ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্য ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে 'আলিম ও ইসলাম প্রচারক আল-মাগীলীর দিকে লইয়া যায়, তিনি ৮৬৭/১৪৬৩ হইতে ৯০৪/১৪৯৯ পর্যন্ত কানোর শাসক মুহাম্মাদ রুমফা-র সুবিধার্থে এক ফাতাওয়া গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী পণ্ডিতবর্গ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন আহমাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ আকীত এবং জনৈক 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-কাসরী, আল-মাগীলীর অল্পকাল পরে কানো পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বলা হয়, যদিও তাঁহাদের পরিদর্শনের সঠিক সময়পরম্পরা অনিশ্চিত। তাঁহাদের লিখিত কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহারা ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্য লালন ও পোষণ করিয়াছিলেন, যাহা নগরীতে ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে আনুমানিক ৯৩৭/১৫৩০ সালে মাখ্লুফ ইব্ন 'আলী ইব্ন সালিহ্ আল-বিলবালী নগরীতে বাস করিতেন এবং হয়ত ফাকীহ্ আল-'আকিব ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-আনসামুনী আল-মাস্সূফীর সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বহু বিদ্যায় পারদর্শী মিসরীয় 'আলিম জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতীর সঙ্গে একটি যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন (আস-সুয়ূতী দ্র.) ; ক্লাসিক্যাল আরবীতে এবং দুইটি দেশীয় ভাষায়, হাউসা ও ফুলফুলদে উভয়টিতে, যাঁহার রচনাবলীর প্রভাব হাউসাল্যান্ডে স্থানীয় ইসলামী সাহিত্যের বিকাশে মৌলিক বলিয়া খ্যাত [দ্র. E. M. Sartain, Jalal ad-Din as-Suyuti's relations with the people of Takrur, in JSS, ১৬খ. (১৯৭১ খৃ.), ১৯৩-৮]। যতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম রচনা হইল আল-'আজিয়্যা লি'লমু'তী। ইহার রচয়িতা হইলেন হাউসাতে 'আবদুল্লাহি সিক্কা বলিয়া পরিচিত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'স-সালাম। উহা 'ইবাদাত এবং পরকাল সম্বন্ধে ইসলামী 'আকীদা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাসীত ছন্দে চল্লিশটি আবওয়াবের এক দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ (মানজূমা)। ইহার গুরুত্ব এই ঘটনায় যে, ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে যখন লেখক কর্মরত ছিলেন তখন কানোতে মৌলিক ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান যে পরিপূর্ণতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছে। অধিকন্তু কোন কোন আবওয়াব, যেমন বাবু'ল-জুলূস মিনা'দ-দুনয়া, বাবু 'আলামাত কুব্বি'স-সা'আ ইত্যাদি সূফী প্রভাবের অস্তিত্ব এবং এই প্রথম যুগেও মাহদী প্রত্যাশার প্রচলনের প্রতি ইঙ্গিত করে।

পরবর্তীকালে সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য কানো প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আশেপাশের ইসলামী অঞ্চল পরিধি হইতে আমদানীকৃত সাহিত্যের মাল-মসলার উপর এবং পরবর্তীকালে সোকোতোর ফলপ্রসূ বিদ্বান পরিবারদের সাহিত্যকর্মের উপর কানো নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্য, যাহা হাউসাল্যান্ডে আনুমানিক ১১৬৪/১৭৫০ সাল হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহাতে প্রথম যে কানো 'আলিম অবদান রাখিয়াছেন তিনি হইলেন 'উছমান, যিনি কানো আমীরাতে মিগার-এর একজন ইমাম। জন্ম সোকোতোতে, তিনি সুলায়মানুর শাসনকালে কানোতে বাস করিতে আসেন। সেখানে রচনা করেন তাঁহার সুদীর্ঘ হাউসা মানজূমা, মূসান সামুওয়ার জাল্লা, 'মহিমাময় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে জান'। ইহা তাওহীদের উপর একটি আদর্শ কাব্যগ্রন্থ। স্পষ্টতই মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস-সানূসীর সুপরিচিত উম্মু'ল-বারাহীন এবং ইবরাহীম আল্-লাক্কানীর জাওয়াহারাতু'ত-তাওহীদ-এর মত ক্লাসিক্যাল আরবী উৎসের উপর স্থাপিত।

কানোতে পরবর্তীকালে স্থানীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন আরেকজন লেখক আসিম দেগেল। তিনি আনু. ১২৬২/১৮৪৬ সালে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন সোকোতোর অধিবাসী। যখন যুবক ছিলেন তখন তিনি কানোতে হিজরত করেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর হাউসা ভাষায় একটি কবিতা রচনা করেন, যাহা ৮ম/১৪শ শতাব্দীর আবূ মুকরি নামে পরিচিত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হাক্ক এবং ১১শ/১৭শ শতাব্দীর 'আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্নু'ল-হুসায়ন ইব্ন ইসমা'ঈল আর-রাজরাজীর মত উত্তর আফ্রিকার জনপ্রিয় গ্রন্থকারদের রচনাবলী হইতে গৃহীত। আসিম দেগেল-এর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হইল তাঁহার 'ওয়াকার মুহাম্মাদু', "মুহাম্মাদ-এর গীতিকা", আরবী তাবীল ছন্দে হাউসা ভাষায় রচিত ইহা একটি দীর্ঘ কবিতা। ইহাতে মি'রাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য চিন্তাবিদের প্রভাব দৃষ্ট হয়, বিশেষত ইব্ন 'আরাবীর রচনাবলীর। পরবর্তীকালের আল-গায়ালী এবং আদ-দার্দীর-এর মত জনপ্রিয় লেখকদের সঙ্গে তাঁহার পরিচিতির আভাষও ইহাতে পাওয়া যায়।

আরেকজন সুপরিচিত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হইলেন আল-হাজ্জ 'উমারু সালাগা (জ. আনু. ১২৭১/১৮৫৪, মৃ. ১৩৫৩/১৯৩৪), যিনি কানোর অধিবাসী ছিলেন এবং উত্তর ঘানার সালাগায় বসবাস স্থাপনের পূর্বে কানোয় কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যতম সুপরিচিত হাউসা রচনা 'উয়াকার নাসারা' (খৃষ্টানদের গান), ইহাতে তিনি হাউসা দৃষ্টিতে দেখা বৃটিশদের হাউসাল্যান্ড দখলের বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার অন্যথায় বেনামী গ্রন্থ 'ওয়াকার বাদাউদা' (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) এবং 'বাকানদামিয়্যা' ও যাহা ঐ দখলের উপর হাউসা কাব্যগ্রন্থ তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়া থাকে, কিন্তু এই আরোপ অনিশ্চিত। তিনি হাউসার ন্যায় আরবীতেও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন।

ইসলামী ঐতিহ্যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের গ্রন্থকারদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হইলেন সম্ভবত আল-হাজ্জ মুহাম্মাদু ইব্ন আমু, হাউসা ভাষায় একটি দীর্ঘ কবিতা মাদীহ্-র লেখক, আরবী নাম 'মানজূমা ফী বায়ানি'দ্-দীন যাহা উত্তর নাইজেরিয়াতে বহুল পঠিত। এই সমস্ত ইসলামী রচনার অনেকাংশই 'আবদু'ল-কাদির জীলানী (র) এবং আহমাদ আত-তিজানীর স্তুতিবাক্যে পূর্ণ। এই জাতীয় রচনাবলীর মধ্যে মালাম আবূ বাক্‌র 'ইতকু-র রচনা আদর্শ স্থানীয়, তিনি ছিলেন কানোতে তিজানিয়ার একজন সুপরিচিত সদস্য। তাঁহার রচনার আরবী নাম 'আয়বাতু'ল-ফুকারা' এবং ইহা আরবী এবং হাউসার সংমিশ্রণে আত-তিজানীর প্রশংসায় রচিত একটি কবিতা। কানো নগরীর ইসলামী জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার স্কুলসমূহ "মাকারানুতান 'ইলমি"। কানো নগরীতে এই প্রকারের অন্তত বারটি সংগতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, বাস্তবপক্ষে যদিও মোট সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি। কেননা যে কোন মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ স্কুল স্থাপন করিতে পারে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান উচ্চতর ইসলামী বিদ্যা ফিকহ, হাদীছ, তাফসীর এবং মু'আল্লাকা, আল-হারীরীর মাকামা এবং ইব্ন 'আরাবীর রচনাবলীর মত সর্বোৎকৃষ্ট রচনাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে কানো ইহার উচ্চতর স্কুলের উৎকর্ষের জন্য সুপরিচিত এবং এমন একটি কেন্দ্র যাঁহাতে সমস্ত পশ্চিম ও মধ্যসুদান হইতে ছাত্ররা আসিয়া থাকে। "মাকারানতান ইলমি" যাহা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান, যাহা নগরীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামী শিক্ষার আরও অধিকতর প্রাণবন্ত ঐতিহ্য লালন করিয়া আসিতেছে এবং ইহা সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, উত্তর নাইজেরিয়ায় ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বর্তমানে কানো পূর্ববর্তী শিক্ষাকেন্দ্র কাতসিনা ও সোকোতোকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কানোর ইতিহাসের দুইটি প্রধান উৎস ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া যায় ঃ (১) "The Kano Chronicle". H. R. Palmer, Sudanese Memoirs, ৩খ.-এ, লাগোস ১৯২৮ খৃ.; ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে উক্ত ক্রনিকলের একটি আরবী সংস্করণও সংরক্ষিত আছে; ইহা একটি পদ্য রচনা মূলত আরবীতে যাহার লেখার তারিখ অনিশ্চিত। কিন্তু সম্ভবত ১২৯৮/১৮৮০ M. Hiskett, The Kano Chronicle, JRAS (১৯৫৭ খৃ.)-এ এবং খুব স্পষ্টত অতি পুরাতন একটি মৌলিক ঐতিহ্যের ইতিহাস ; (২) ওয়াকার বাগাউদা, হাউসা পদ্যে লিখিত একটি ইতিবৃত্ত, যাহা একটি প্রাচীন মৌখিক ঐতিহ্যের ১৯শ শতাব্দীর একটি ইতিহাস, সাধারণভাবে কানো ক্রনিকলের বিবরণী পুনরাবৃত্তি করাইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম দিকের ঘটনাপঞ্জীতে বেশ ভিন্ন, হাউসা মূল রচনা, ইংরেজী অনু. এবং সমালোচনামূলক ভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Hisket, BSOAS xxvii/3 (১৯৬৪ খৃ.) ; xxviii/1 (১৯১৫ খৃ.) এবং xxviii/2 (১৯৬৫ খৃ.)-এ। (৩) হাউসাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস আলহাজ্জ আবূ বাকর দোকাজি কানো, কানো তা দাবো সিগারি, যারিয়া, ১৯৫৯ খৃ. স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ইহা নগরীর ইতিহাস। এই সকল প্রাথমিক উৎস ছাড়াও আদেলেই (Adeleye) [পৃ. গ্র. নিম্নে] কর্তৃক তালিকাভুক্ত রহিয়াছে আরবী ভাষায় তারীক কানো, ইবাদান শিরোনামের অধীনে, ৮২/২১২ ; (৪) সোকোতোর উযীর মুহাম্মাদ বুখারী (মৃ. ১৩২৮/১৯১০) কর্তৃক আরবীতে লিখিত অপ্রকাশিত কানো গৃহযুদ্ধের একটি বিবরণী নাইজেরিয়ার জাতীয় আর্কাইভস কাদুনায় সংরক্ষিত (কাদকাপটরি ২,৩০)। ১৩২১/১৯০৩ হইতে ১৩৩৯/১৯২০ পর্যন্ত যারিয়ার আমীর 'আলিউ ইব্ন সিদী কর্তৃক কানো এবং ইহার প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রশংসায় রচিত অপ্রকাশিত একটি হাউসা কাব্যগ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে উত্তর নাইজেরিয়ায় প্রচারিত ; (৫) আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমুও, (উপরে দ্রষ্টব্য) নগরীর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের পদ্যে রচিত একটি অপ্রকাশিত ইতিহাস, যাহার একটি অনুলিপি প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত মাইক্রোফিলম সংগ্রহে আছে।

১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীর মধ্যে সর্বপ্রথম (৬) Denham, Clapperton এবং Oudney-এর Narrative of Travels and Discoveries in Northern and Central Africa, লন্ডন ১৮২৬ খৃ.; (৭) Heinrich Barth-এর Travels and Discoveries in Northern and Central Africa, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ.; (৮) P. L. Monteil, De St. Louis a Tripoli par le lac Chad, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., বিশেষভাবে সাহায্যকারী। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের এবং ২০শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের মতামতের জন্য দেখুন, বিশেষ করিয়া (৯) C. H. Robinson, Hausaland or Fifteen Hundred Miles through the Central Sudan, লন্ডন ১৮৯৬ খৃ. এবং (১০) W. R. S. Miller, Reflections of a Pioneer, লন্ডন ১৯৩৬ খৃ.; বৃটিশ প্রশাসনের প্রথম দিকের সরকারী বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত; (১১) W. F. Growers, Gazetteer of Kano Provincc, লন্ডন ১৯২১খৃ.; (১২) Annual Reports on Northern Nigeria 1900-11, লন্ডন ১৯১১ খৃ. এবং অন্যান্য বহু সরকারী দলীল-দস্তাবেজ যাহা নাইজেরিয়ার জাতীয় আর্কাইভস কাদুনায় এবং পাবলিক রেকর্ডস অফিস লন্ডনে সংরক্ষিত আছে। একজন কর্মরত সৈনিকের চাক্ষুষ দেখা কোন নগরী দখলের পূর্ববর্তী যুদ্ধের বিবরণী পাওয়া যাইবে। (১৩) F. P. Crozier, Five Years Hard, লন্ডন ১৯৩২ খৃ.।

কোন আধুনিক পণ্ডিতের প্রণীত কানোর সাধারণ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবরণী (১৪) S. J. Hogben এবং A. H. M. Kirk-Greene, The Emirates of Northern Nigeria, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ.; অনেক প্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণ; (১৫) H. A. S. Johnston, The Fulani Empire of Sokoto, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ. এবং (১৬) Mary Smith, Baba of Kano, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ.; (১৭) R. A. Adeleye, Diplomacy in Northern Nigeria 1804-1906, লন্ডন ১৯৭১ খৃ.; উক্ত গ্রন্থে কানো গৃহযুদ্ধের কিছু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে, নগরীর বৃটিশ অধিকারের আরেকটি বিবরণী যাহাতে অধিকতর পূর্ণভাবে সামরিক দিক আলোচিত তাহা (১৮) D. J. M. Muffett, Concerning Brave Captains, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ.। সাম্প্রতিক কালের কানো সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যাইবে 'Kano Survey', যারিয়া ১৯৫০ খৃ.-এ এবং কোনো স্টেটের তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনাবলীতে।

M. Hiskett (E. I.[2])/মু. আ. আজিজ

কাপ্তাই (كپتائى) ঃ কাপতাঈ (১) সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলার; বর্তমানে নবগঠিত রাঙামাটি জিলার চন্দ্রঘোনা উপজিলার অন্তর্গত একটি ছোট পার্বত্য উপশহর, কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত ; (২) একই জিলার অন্তর্গত উপরিউক্ত উপজিলার সংলগ্ন একটি উপজিলা, এই উপজিলার আয়তন ৭৬৪·৭৮ ব. কি. (২৯৫·২৮ ব. মা.) তন্মধ্যে ৭০১ ব. কি. পার্বত্য বনভূমি, ১০টি মৌজা ও ২১টি গ্রাম নিয়া গঠিত। জনসংখ্যা মাত্র ১৪,৪৮৩ জন (১৯৮১ আদমশুমারী). প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির গড় মাত্র ৪৯ জন। স্থানীয়ভাবে এই উপজিলাটিকে বেলাইছড়িও বলা হইয়া থাকে। সংলগ্ন স্থান বলিয়া এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যহেতু এখানে উভয় বিষয়ে একযোগে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাপতাই উপশহর (চন্দ্রঘোনা উপজিলার অন্তর্গত) আয়তন ৪,৪৮০ একর, জনসংখ্যা প্রায় ৮,০০০। কর্ণফুলী নদী এবং কাপতাই হ্রদ দ্বারা উজানে জিলা-সদর এবং চাকমা রাজার বাসস্থান রাঙামাটি (দ্র.)-র সঙ্গে এবং কর্ণফুলী নদী দ্বারা ভাটিতে চন্দ্রঘোনা (দ্র.) এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামের

সঙ্গে যুক্ত, কাপতাই হইতে ভাটিতে অনেকদূর পর্যন্ত নদী অত্যন্ত খরস্রোতা বলিয়া নৌ-চলাচল দুরূহ, কিন্তু হ্রদে পরিণত হইয়া যাইবার কারণে কাপতাই হইতে উজানে বর্তমানে নৌ-চলাচল সহজ হইয়াছে; চট্টগ্রাম হইতে কাপতাই পর্যন্ত একটি সুন্দর পাকা সড়ক আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, এই পথে নিয়মিত বাস চলাচল করে। সমগ্র অঞ্চলটি পার্বত্য ও ঘন বনে ঘেরা, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলিতে জুম চাষ এবং সাধারণ পদ্ধতির চাষাবাদ হয়, অধিবাসিগণের ৫৭% কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, বাদবাকীরা অন্যান্য পেশাতে নিয়োজিত। জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুধু উপজাতীয়রাই করে, তাহারা নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় ধান, তরিতরকারি, তূলা ও ফলমূল উৎপাদন করে, পশু পালনও তাহাদের অন্যতম পেশা। কেহ কেহ তীর দিয়া ও বন্দুক দিয়া বন্য পশুপাখী শিকার করিয়া খায়, মেয়েরা নিজেরা সুতা কাটে এবং ঘরে তৈয়ারী তাঁতে মোটা কাপড় বোনে। পাহাড়গুলিতে স্থানে স্থানে পাথরের স্তর দেখা যায় নতুবা সামগ্রিকভাবে পাহাড়গুলি মাটির এবং অত্যন্ত উর্বর, বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০´, জুন-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সর্বাধিক হয়। তাপমাত্রা সহনশীল, বাৎসরিক গড় ৭৫° ফা., সেই কারণেও ইহা পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়।

বহুকাল পূর্বে সমগ্র অঞ্চলটিতে এবং অন্তত সমগ্র সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলাতেই শুধু উপজাতীয়রা বাস করিত, তাহাদের জনসংখ্যাও এখনকার তুলনায় খুবই কম ছিল, ১৯০১ খৃ. হইতে নিম্নভূমিতে মুসলমান ও হিন্দুগণ ধীরে ধীরে গিয়া পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করিতে থাকে। ১৯৫৪ খৃ. পর হইতে সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসিগণের বসতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এখন পর্যন্ত উপজাতীয়দেরই সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে, ১৯৮১ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী এই অঞ্চলের জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক অনুপাত এইরূপ ঃ বৌদ্ধ অর্থাৎ উপজাতীয় ৫৫%, মুসলমান ৩২.৪% হিন্দু ১১.৪%, খৃষ্টান ০.৯%, ধর্মহীন ০.৩%। কাপতাই (বেলাইছড়ি) উপজিলা এলাকাতে মোট ২,০০৩ টি উপজাতীয় পরিবার বসবাস করে, তন্মধ্যে তঙচঙ্গ্যা পরিবার সর্বাধিক, ৮৩২; চাকমা পরিবার ৫৮৪, মারমা ২৪৬, টিপরা (ইহারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা) ১৬৬, ম্রো ২৩, বোম ১৯ এবং অন্যান্যা ১৩৩। সমগ্র কাপতাই (বেলাইছড়ি) উপজিলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মসজিদের সংখ্যা ১৬, বৌদ্ধ মন্দির ১৪, খৃষ্টান গির্জা ৫ এবং হিন্দু মন্দির ২; উপজাতীয়গণের রাজা চাকমা। তিনি জিলা সদর রাঙামাটিতে বাস করেন। পুণ্যাহের দিনে এখানকার বহু উপজাতি সেখানে গিয়া কয়েক দিনব্যাপী উৎসব ও মেলাতে অংশগ্রহণ করে এবং ঐতিহ্যগত রাজা ও রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে (রাঙামাটির রাজপরিবার অনেক পুরাতন, বৃটিশ শাসনামলে ইহা একটি দেশীয় করদ রাজ্য সমতুল্য ছিল)। কাপতাইয়ের বনভূমি যেমন সেইরূপ উপজাতীয়গণের বিশেষ ঘরবাড়ী ও জীবনযাত্রা, পোশাক, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পর্যটকগণের নিকটে বিশেষ আকর্ষণীয়।

কাপতাইয়ে সরকারের সংরক্ষিত বনভূমি রহিয়াছে। হ্রদ সৃষ্টির ফলে সেই মূল্যবান বনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং সমগ্র সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষিজমির ৪০% হ্রদের পানিতে তলাইয়া গিয়াছে; এক লক্ষেরও বেশী স্থানীয় অধিবাসী তাহাদের সাবেক বাসভূমি হইতে অপসারিত হইতে বাধ্য হইয়াছে (নিম্নে দ্র.)। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বর্তমানে প্রায় সকলই বাঁধের নিম্নভাগে কর্ণফুলী নদীর উভয় তীর ব্যাপিয়া অবস্থিত, সেখানকার মূল্যবান সেগুন গাছ সকলই পরিকল্পিতভাবে রোপণ করা। তাহা ছাড়া এখানে শিল-কড়ই, গর্জন, গামার, চম্পা, চাপালিশ ও অন্যান্য মূল্যবান কাঠের গাছ প্রচুর রহিয়াছে। পাহাড়-পর্বত ও সবুজ বনভূমি কাপতাইকে বিশেষ প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য দান করিয়াছে। সমগ্র এলাকাটিতে নানা প্রজাতির দুর্লভ বন্য পশুপাখী দৃষ্ট হয়। পূর্বে এখানে গণ্ডার ছিল, দুর্গম অঞ্চলে এখনও কিছু থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বন্য এবং পোষা হাতী যথেষ্ট দেখা যায়, পোষ মানানো হাতীর পাল দ্বারা দুর্গম পাহাড় হইতে সমভূমিতে কাঠ আনীত হয়।

বন্য হাতী মাঝে মাঝেই দল বাঁধিয়া নামিয়া আসিয়া কৃষকদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া দেয়, বন্য শূকরের দলও প্রায়শ কৃষকদের অনিষ্ট করে। এই অঞ্চলের অন্যান্য বন্য প্রাণীর মধ্যে রহিয়াছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার, বাঘ, চিতাবাঘ, প্যান্থার, ভল্লুক, সম্বর হরিণ, চিত্রা হরিণ, লাল-কুকুরে হরিণ বা মায়ামৃগ, শূকরে হরিণ, শূকর, বন্য কুকুর, শিয়াল, কয়েক শ্রেণীর বানর, খাটাস, সজারু, বনরুই, অজগর, গোক্ষরো, কেউটে এবং আরও কয়েক রকমের বিষধর সাপ। পূর্বে নদীতে কুমীর বেশি ছিল, বর্তমানে মাঝে মাঝে দেখা যায়। বনে অগণিত পাখীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বনমোরগ, কালিজ, মথুরা, কোড়া, ময়ূর, কোয়েল, নীল কবুতর, নীল ঘুঘু, টিয়া ময়না, কোকিল, ১৬ রকমের পেঁচা, ৮ রকমের মাছরাঙা, বুলবুল ও ধনেশ পাখী। পর্যটক ছাড়াও শিকারিগণের জন্য অনুমোদিত বন্য পশু ও পাখী শিকারের জন্য এই অঞ্চল এবং বস্তুত সমগ্র বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামই অতি আকর্ষণীয় এলাকা।

চন্দ্রঘোনা উপজিলার অন্তর্গত কাপতাইয়ের গুরুত্ব আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় যখন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার এখানে দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করে। পার্বত্য খরস্রোতা নদী কর্ণফুলী হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের বিভিন্ন শহরে এবং শিল্পকারখানাতে ব্যবহৃত হইবে, একই সঙ্গে নৌ-চলাচলেরও সুবিধা হইবে এবং বাঁধ নির্মাণ দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহা নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ১৯৫৬ খৃ. এই বহুমুখী প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের International Engg. so. Inc., তাহাতে মার্কিন কারিগরগণের সঙ্গে বাংলাদেশী কারিগরগণও অংশগ্রহণ করেন। সর্বমোট নির্মাণ ব্যয় ছিল তৎকালীন বাংলাদেশী টাকায় ৪৯ কোটি টাকা। ৩১ মার্চ, ১৯৬২ খৃ. সাবেক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফীল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আয়্যুব খান (দ্র.) ইহার উদ্বোধন করেন। বর্তমানে কাপতাই হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও রাজধানী শহর ঢাকাতে গৃহস্থালি এবং শিল্প-কারখানাতে ব্যবহৃত হইতেছে। আরিচা ঘাট হইতে যমুনা নদীর উপর দিয়া বর্তমানে উত্তরবঙ্গেও এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। ১৯৬৬ খৃ. এখানকার উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৪৫০.৯১৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কিছু অংশে কর্ণফুলী নদীর গতি কৃত্রিম খাতে প্রবাহিত করার এবং সেই সঙ্গে এক বিশাল বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। উহার ফলে ২৫৬ বর্গমাইল পরিমিত কৃষিজমি, বসতবাড়ী ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল পানিতে তলাইয়া যায়। লক্ষাধিক অধিবাসীকে ইতঃপূর্বে স্থানান্তরিত করিতে হয়। পরবর্তীতে হ্রদ আরও বিস্তৃত হইয়া ৩৫৬ বর্গমাইল হইয়াছে। এই হ্রদের পানির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০ ফুট উপরে। ইহাই উপমহাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ। এই হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম, চতুর্দিক পাহাড়বেষ্টিত, ছায়া ঢাকা, তীরে তীরে উপজাতীয়দের গ্রাম। পর্যটন সংস্থা আরামপ্রদ নৌযানযোগে ভ্রমণের চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ইহা পর্যটকদের বড় আকর্ষণ। হ্রদের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে নৌকা ও লঞ্চযোগে যাতায়াতের এবং মাল পরিবহনেরও সুবিধা হইয়াছে। হ্রদটি মাছের একটি বড় উৎস। মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা এখানে ৫৫ রকমের ছোট-বড় মাছের চাষ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ ও আহরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই হ্রদের মাছ কাপতাই, রাঙামাটি, চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরে চালান হয়। ১৯৬৪ খৃ. এখানে একটি মিঠা পানির মৎস্য গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাপতাইয়ের একটি নৌযান নির্মাণ শিল্প সংস্থা রহিয়াছে। সেখানে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাঠের নৌকা তৈয়ারি করা হয়। এখানে বন বিভাগের দফতর রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বনের কাঠ আহরণ ও নানা প্রয়োজনে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য ১৯৫৫ খৃ. একটি কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা (Timber Processing Complex) স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬১ খৃ. হইতে ইহার দায়িত্ব নিয়াছে বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা। সুইডেনের সহযোগিতায় ১৯৬৪ খৃ. এখানে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, নাম সুইডিস বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (SBIT)। এখানে বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, যানবাহন, ধাতু জোড়া দেওয়া, কাঠ-প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি কারিগরি একাডেমীও রহিয়াছে। এখানে একটি স্কুল, টেলিফোন অফিস, উপজিলা অফিসমূহ এবং দুইটি পোস্ট অফিস রহিয়াছে।

কাপতাই দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র, হ্রদে ভ্রমণের জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। সেইজন্য একটি ভি.আই.পি. রেস্ট হাউজসহ বন অফিস, পর্যটন সংস্থা, পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থার কয়েকটি সুন্দর বিশ্রামাগার ও ডাকবাংলা রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, নিবন্ধ কাপ্তাই, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৬৭; (২)Bangladesh District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts, Establishment Division, Govt. of Bangladesh, 1971; (৩) District Census Report : Ctg. Hill Tracts, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, 1974; (৪) Bangladesh Population Census 1981, Dist. Chittagong Hill Tracts, Banglasesh Bureau of Statistics, 1983।

হুমায়ূন খান

কাপলান গিরায় ঃ ১ম (Kaplan Giray I), Crimea-র তাতার ছিলেন খান হাজ্জী সেলীম গিরায় (দ্র.)-এর তৃতীয় পুত্র, জ. Rhodes-এ, শা'বান ১০৯১/ জুলাই ১৬৮০। তিনি ১১০৮/১৬৯৭ সনে বুজাক (দ্র.)-এ সামরিক বাহিনীর অস্থায়ী অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পোলান্ডে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। Carlowicz-এর আলোচনাকালে তিনি ফেরাহ-কেরমান রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু শিরিন বিদ্রোহিগণের বেগ (নেতা) ওরেক-তিমুর (Orek-Timur) তাঁহাকে কিলিয়্যাতে (Kiliya) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন (রাবী', ২- ১১১১/অক্টোবর ১৬৯৯)। পরবর্তীকালে তিনি Circassia-র সামরিক অধিনায়ক নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন কালমুক (Kalmuk)-দের বিরুদ্ধে (১১১২/১৭০০) এবং Besleney Circassian-দের বিরুদ্ধে (যু'ল-হিজ্জা ১১১২/ মে ১৭০১)। যাহা হউক, দাওলাত গিরায় তাঁহার নূরাদিন (নূরু'দ-দীন) দ্র. পদে পদোন্নতি দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি পলায়ন করিয়া Kefe (Feodosiya)-তে 'উছমানী পাশার নিকট গেলেন। তুর্কী সুলতানের দরবারে দাওলাত গিরায়-এর প্রভাবের কারণে তাঁহাকে Rhodes-এ নির্বাসনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পিতার অনুরোধে তাঁহাকে Yanbolu-তে প্রেরণ করা হয়। ২৬ শা'বান, ১১১৩/২৬ জানুয়ারী, ১৭৯২ তাঁহার পিতা খান পদ লাভ করিলে তিনি তাঁহাকে নূরাদিন পদে নিযুক্ত করেন। নোগায় (Noghay) উপজাতীয়গণের সাহায্যে পূর্ববর্তী খান বিদ্রোহ করিলে কাপলান গিরায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। নোগায় মীরাযাগণ দাওলাত গিরায়-এর পক্ষ ত্যাগ করিলে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। সেলীম গিরায়-এর মৃত্যুতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গাযী গিরায় খান-এর পদ লাভ করেন এবং ৩ রামাদান, ১১১৬/৩০ ডিসেম্বর, ১৭০৪ সনে তিনি কাপলান গিরায়কে কালগায় (Kalghay দ্র.) নিযুক্ত করেন। দাওলাত গিরায় এবং নব নিযুক্ত খান গাযী গিরায় যাঁহারা ক্রিমিয়ার মীরযাগণের অনুসরণে রাশিয়ার প্রতি শত্রুতামূলক নীতি অনুসরণ করিতেন, বিপরীতে কাপলান গিরায় 'উছমানী সরকারের শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের নীতি সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই কারণেই মুহাররাম ১১১৯/এপ্রিল ১৭০৭ সনে তাঁহাকে খান পদে নিযুক্ত করা হয়। রুশগণকে সুইডেনের বিরুদ্ধে অভিযানের সুযোগ প্রদান করিয়া কাপলান গিরায় Circassian-দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত উহাদের ওঁৎ পাতা অতর্কিত আক্রমণের কবল হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। সুলতান তাঁহাকে তৎক্ষণাত পদচ্যুত করেন (শা'বান ১১২০/ নভেম্বর ১৭০৮) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাওলাত গিরায় তাঁহার পরিবর্তে খান পদে নিযুক্ত হন। অবশেষে সুইডেনের রাজা ১২শ চার্লসের সমস্যা দাওলাত গিরায়-এর পদচ্যুতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং কাপলান গিরায়কে Rhodes হইতে ফিরাইয়া আনা হয় এবং ১৮ রাবী'-১, ১১২৫/১৫ এপ্রিল, ১৭১৩ সনে পুনরায় খান পদে নিযুক্ত করা হয়। রাশিয়ার সহিত একটি সুস্পষ্ট সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'উছমানী প্রধান সেনাপতি 'আবদী পাশার সহিত তিনি Khotin-এ গমন করেন এবং ১১২৫/১৭১৩ সনের গ্রীষ্মকালে পোলান্ডের আত্মরক্ষামূলক অভিযান সমর্থন করেন। তিনি নূরাদিনের অধীনে 'উছমানীদের Circassian এবং Noghay-গণের বিদ্রোহ তাঁহাকে ১১২৮/১৭১৬ সনের অস্ট্রীয় অভিযানে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। ঐ বৎসরের যু'ল-কা'দা/নভেম্বর মাসে পুনরায় খান পদ হইতে তিনি অপসারিত হন। যে বিদ্রোহিগণ ১১৪৩/১৭৩০ সনে ৩য় আহমাদ (দ্র.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল তাহারাই তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে, কিন্তু যেইহেতু পরবর্তীকালে তিনি বিদ্রোহিগণকে বিতাড়িত করিবার ব্যাপারে প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেই কারণে ১ম মাহমূদ (দ্র.)-এর অধীনে তিনি তাঁহার প্রভাবশালী অবস্থান বজায় রাখিয়াছিলেন। ১১৪৫/১৭৩২ সনে দাগিস্তান-এ রুশদের সহিত কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। চেচেন (Cecen) (দ্র.)-গণের সাহায্যে ক্রিমীয় সৈন্যগণ একটি রুশ আক্রমণ প্রতিহত করে। ১১৪৮/১৭৩৫ সনে তুর্কী সুলতানের উদ্যোগে খান স্বয়ং দাগিস্তান-এ অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু এই মুহূর্তে রুশ এবং কশাক(Cossack) সৈন্যদল Or-kapi (Perekop) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং ইহাতে ক্রিমিয়া আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন হয়। কাপলান গিরায় এই সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেন কিন্তু শত্রুপক্ষীয়

গোলা বর্ষণের মুখে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়া গেরিলাযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি সাফার ১১৪৯/জুন ১৭৩৬ সনে শত্রুদের ক্রিমিয়া আক্রমণ করিতে পারেন নাই এবং যখন তাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল তখনই তিনি তাহাদিগকে Or-kapi পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিলেন। এই মুহূর্তে ইস্তাম্বুল হইতে বৃদ্ধ এবং অসুস্থ কাপ্‌লান গিরায়-এর স্থলে ফাত্‌হ গিরায় খানকে নিযুক্তির একটি আদেশনামা আসে (রাবী'-১, ১১৪৯/আগস্ট ১৭৩৬) এবং কাপলান গিরায়কে চিওস (Chios)-এ নির্বাসিত করা হয়। সেইখানেই তিনি শা'বান ১১৫১/নভেম্বর ১৭৩৭ সনে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-গাফ্‌ফার কিরিমী, 'উম্‌দাতু'ত-তাওয়ারীখ, TOEM, Suppl., 142-78 ; (২) সায়্যিদ মুহাম্মাদ রিদা', আস-আব্‌'উ'স-সায়্যার, কাযান ১৮৩২ খৃ. ; (৩) রাশিদ, তা'রীখ, ৪খ, ৫খ, ইস্তাম্বুল ১৭৮৪, ১২৮২/১৮৬৫; (৪) সুব্‌হী, সামী এবং শাকির, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১১৯৮; (৫) A. N. Kurat, XII Karl'in Turkiye'de kalisi ve bu siralarda Osmanli Imperatorlugu Istanbul 1943; (৬) Metinler ve vesikalar, Istanbul 1943 ; (৭) মেহমেদ গিরায়, তা'রীখ, National bibliothek Vienna, MS O.H. 1080; (৮) 'আবেদী, তা'রীখ, সম্পা. F.R. Unat, Ankara 1943।

Halil Inalcik (E.I.[2])/আ.র. মামুন

কাপলান গিরায়, ২য় (Kaplan Giray II) ঃ Crimea-র তাতার খান (শাওওয়াল ১১৮৩-শা'বান ১১৮৪/ফেব্রুয়ারী-নভেম্বর ১৭৭০) নূরাদিন (নূরু'দ-দীন) পদে (১১৮২-১১৮৩/ ১৭৬৮-১৭৬৯) এবং খান পদে (১১৮৩ শাওওয়াল/১৭৭০ ফেব্রুয়ারী) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার আক্রমণ হইতে ক্রিমিয়া রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার কালগায় এবং নূরাদিন-কে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন; আর এই সময়ে 'উছমানী সেনানায়ক খালীল পাশা যোগাদান (Moldavia) হইতে রুশগণকে বিতাড়নের জন্য প্রেরিত অভিযানে যোগদানের জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন। প্রুট (Prut)-এ তিনি রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অকৃতকার্য হইয়া কালছি (Kalci)-তে সরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সেনাপতি Rumyantsev প্রুট নদী পার হইয়া 'উছমানী ক্রিমীয় সৈন্য বাহিনীকে ছত্রভংগ করিলেন। সৈন্যদের উচ্ছৃংখলার জন্য সেনানায়ক এবং খান তাঁহাদের পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না; ফলে Kiliya, Bender (Bendery) এবং ইসমাঈল—এই তিনটি দুর্গ রুশগণের হস্তগত হইল এবং Budjak নামক স্থানে নোগায় (Noghay) দল তখন রুশীয়দের সহিত যোগদান করিল। Ozi (Ochakov) দুর্গে অবরোধ অতিক্রম করিবার পর কাপলান গিরায় অবশেষে ক্রিমিয়ায় উপনীত হইতে সক্ষম হইলেন। এইখানে ১১৮৪/১৭৭০ সালের গ্রীষ্মে কালগায় ইসলাম গিরায় এবং 'উছমানী সেনানায়ক ইবরাহীম পাশা ওর কাপি (Perekop) দুর্গের সম্মুখ হইতে শত্রুগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ক্রিমিয়ার মীরযাগণ নোগায়গণের মত নিরপেক্ষ থাকিয়া আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় রুশগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিল। 'উছমানী সূত্রে দাবি করা হয়, কাপলান গিরায় এই নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন (TV. xiv, 138), কিন্তু ইহা সত্য মনে হয় না (V. Smirnov, ii, 127)। প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রিমিয়ার জন্য ইস্তাম্বুল হইতে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং কালমুক (Kalmuk)-গণকে রুশ মৈত্রীবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার 'উছমানী সেনানায়ক ইবরাহীম পাশা তাঁহার এই নীতির সহিত একমত ছিলেন, কিন্তু ১১৮৪ শা'বান/১৭৭০ নভেম্বর মাসে ইস্তাম্বুল হইতে খানের পদচ্যুতির আদেশ আসে এবং ১১৮৫ রাবী'-২/ ১৭৭১ জুলাই মাসে কাপলান গিরায় প্লেগাক্রান্ত হইয়া ৩২ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Enveri, তা'রীখ, Ms. Suleymaniye, Esad Efendi ১০৮৯; (২) ওয়াসিফ, তা'রীখ, বূলাক ১২৪৬/১৮৩০-১, ৩৭, ৫০-৬০ ৬৯, ৭৮; (৩) Nedjati Efendi, সেফারেত-নামে, সম্পা. F. R. Unat, TV. xiii—xiv (1944); (৪) Djevder, তা'রীখ, ১খ, ইস্তাম্বুল ১২৭১/১৮৫৪-৫, ৪৭-৪৯ ; (৫) হালীম গিরায় গুলবুন-ই খানান, ইস্তাম্বুল ১২৭৮/১৮৬১-২, ১১৮-২০, (৬) A. Resmi, খুলাসাতু'ল-ই'তিবার, ইস্তাম্বুল ১২৮৬/১৮৬৯, ৩৩-৩৭ ; (৭) V. Smirnov. Krimskoe hanstvo pod verhovenstvom ottomanskoy Porti v XVIII. stoletil, Odessa 1989; (৮) O. Retowski, Die Munzen der Girei Moscow 1905.

Halil Inalcik (E.I.[2])/আ.র. মামুন

কাপলিজা, কাপলুজা বা কাবলুজা (Kaplidja, Kapludja or Kabludja) ঃ তুর্কীতে ব্যবহৃত একটি সাধারণ শব্দ, যাহা দ্বারা স্নানাগারের (গোসলখানা) মত একটি স্থানকে বুঝায় যেখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। তুর্কীতে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ হইল কায়নারজা, আকারজা, ইলিসু, কুদরেত হামাদী, চারমিক, ইলিজা এবং গেরমাবে (দ্র. XIII Yuzyildan beri Turkiye turkeesiyle yazilmis kitaplardan toplanan tanklariyle Tarama Sozlugu, আংকারা ১৯৬৭ খৃ., ৩খ, ১৯৪২-৩)। আওলিয়া চেলেবী (দ্র.) ২খ, ২১, তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন প্রকারের উষ্ণ প্রস্রবণের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আনাতোলিয়া এবং তুর্কীস্তানের ইলিজা (ilidja) শব্দটি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলকান অঞ্চলে 'বানা' (Bana), (বাংগো হইতে উদ্ভূত), পারস্যে গেরমাবে, ক্রিমিয়ায় ইলিসী (ilisu), আররভূমিতে হাম্মাম এবং বুরসাতে কাপলিজা বলা হইয়া থাকে।

বর্তমানে তুর্কীস্তানের উষ্ণ স্নানাগারের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস এবং সংখ্যাভুক্ত করা হইয়াছে, যথা ঃ ২৬টি কাপলিজা, ৭৯টি চারমিক, ৬৭টি হাম্মাম, ১৫৮টি ইলিজা, ৩টি গেরমাবে (দ্র. Riza Reman, Sifali sulari kullanma ilmi : Balneologi, Turkiye'nin sifali kaynaklari, ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ.) J. von Hammer (Umblick auf einer Reise von Constantinople nach Brussa und Demolypos und von da zuruck uber Nicaea und Nicomedien, Pst ১৮১৮ খৃ., n. ১৩) দাবী করেন যে, 'কাপলিজা' গ্রীক শব্দ 'কাপ্‌নোস' (Kapnos) হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ 'ধূম্র' বা 'ধোঁয়া'। যাহা হউক, তুরস্কের উষ্ণ প্রস্রবণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ (কা) উছতু ইলিজা (usta acikilidja) (উন্মুক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ); (খ) এবং কাপালি ইলিজা (Kapali ilidja)। সম্ভবত 'কাপালি ইলিজা' শব্দটি প্রচলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত হইয়া 'কাপলিজা'

হইয়াছে (আচ্ছাদিত উষ্ণ প্রস্রবণ)। উষ্ণ এবং খনিজ প্রস্রবণ কেবল আনাতোলিয়াতেই দৃষ্ট হয় না, বরং চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ববর্তী তুর্কী সাম্রাজ্যের শাসনের অন্তর্ভুক্ত য়ূরোপীয় দেশসমূহেও দৃষ্ট হয়, যেমন, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, য়ুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই সমস্ত কাপলিজা এবং খনিজ প্রস্রবণের ভেষজ গুণাবলী স্বীকৃত। এই কারণে প্রস্রবণগুলির উপর অলৌকিক শক্তি আরোপ করা হয় এবং এইরূপ বিশ্বাস করা হইত যে, প্রতিটি উষ্ণ প্রস্রবণই স্ব স্ব দেবতা কর্তৃক সংরক্ষিত। ভারতীয় সকল মন্দিরে পরিষ্করণ এবং প্রক্ষালণের জন্য পূত-পবিত্র স্থান রহিয়াছে; আনাতোলিয়ার প্রাচীন অধিবাসী, গ্রীক এবং রোমানগণ উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ নানাভাবে ব্যবহার করিত, এমন কি বিশেষ স্নানাগার নির্মাণ করিয়াও ব্যবহার করিত, যাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে [K. Bertels and L. Huber (eds.), Lexikon der alten Welt, Zurich ১৯৬৫ খৃ.; ৩০৫৭-৬৩]। একদিকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অবহেলিত এবং অট্টালিকাসমূহ সংস্কারহীন অবস্থায় পড়িয়াছিল, অন্যদিকে আনাতোলিয়ার বসতি স্থাপনকারী তুর্কীগণ কোন কোন স্থানের পুরাতন স্নানাগারসমূহের সংস্কার সাধন ও নূতন স্নানাগার স্থাপনপূর্বক প্রাচীন সভ্যতার অভিজ্ঞতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা একটি বিশেষ কাপলিজা স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটায়। একটি অট্টালিকা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; সজ্জাকক্ষ, শীতলকরণ কক্ষ এবং নিয়মিত স্নান কক্ষ।

তুরস্কের কিছুসংখ্যক কাপলিজা আনাতোলিয়ার সালজূকগণ কর্তৃক নির্মিত হয় এবং উহা বর্তমানেও ব্যবহৃত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ ৫২৯/১১৩৫ সালে নির্মিত কারাকুরত (Kirseh), ৬৩০/১২৩৩ সালে নির্মিত Yoncali (Kutahya-কুতাহীয়্যা), ৬৩৩/১২৩৬ সালে নির্মিত ইলগিন (কোনয়্যা) এবং ইসকিসিহির (Eskisehir)। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষের দিকে Ak-Koyunlu শাসকগণ কর্তৃক উত্তর-পূর্ব তুর্কীতে অন্যান্য কাপলিজা নির্মিত হয়, যেমন Erzurum একটি (আওলিয়া চেলেবী, ২খ., ২০৩ পৃ. ; I. Hakki Konyali, Erzurum Tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৪৫২-৫) এবং হাসানকালে (১৩৯০ ; আওলিয়া চেলেবী, ২খ, ২২৩; I. Hakki Konyali, ঐ, পৃ. ৪৬৪-৭০)। এলগিন (কোনিয়া)-এ একটি কাপলিজার অবস্থিতি (পারস্য সাহিত্য উহাকে গেরমাবে বলে) তথায় একটি শহরের ভিত্তি স্থাপনে প্রণোদিত করে (ইব্ন বীবী তা'রীখ-ই আল-ই সালজূক', Recueil de Textes Relatifs a l' Histoire des Seldjoucides, iv, ed. M. Th. Houtsma, Leiden ১৯০২ খৃ., ১৫০)। তথায় একটি চমৎকার অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। চিকিৎসার জন্য আগমনকারিগণের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত মরমী কবি জালালু'দ-দীন রূমী। আনাতোলিয়ার চতুষ্পার্শ্বে স্বাভাবিক উষ্ণ স্নানাগারের সংখ্যা ছিল তিন শত যেইগুলি পীড়িত এবং পক্ষাঘাতগ্রস্তদের নিরাময়ের জন্য প্রলুব্ধ করিত (Fr. Taeschner, Al-`Umari's Bericht uber Antolien in seinem Werke Masalik al-absar fi Mamalik al-amsar, Leipzig ১৯২৯ খৃ., ৪৩)।

আনাতোলিয়ার কাপলিজা ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম দেশের জনগণের নিকটও উষ্ণ প্রস্রবণ পরিচিত ছিল এবং তাহারা উহা ব্যবহার করিত ; উদাহরণস্বরূপ, পারস্যে (The Book of Ser Marco Polo, ed. H. Cordier, London ১খ, ৩য় সং, ১৯২৯ খৃ.,১১০) এবং তাইবেরীয়া ও ফিলিসতীনে যেখানে মুসলমানগণ কর্তৃক পুরাতন রোমান স্নানাগারসমূহ সংস্কার করা হয় (Le Strange, Palestine under the Moslems, London ১৮৯০ খৃ., পুনর্মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৫৪ খৃ., ৩৩৫, ৩৩৬)। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইব্ন বাতূতা যখন বাগদাদ ভ্রমণ করেন, তৎকালে সেখানে প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল, জনগণের নিকট ইহা খুব আকর্ষণীয় ছিল।

তুর্কী শাসনামলে স্থাপত্য শিল্প হিসাবে কাপলিজার বিশেষ উন্নতি ঘটে। অট্টালিকাকে ঐ সময় চারি ভাগে বিভক্ত করা হইত ঃ (১) সজ্জাঘর, (২) বিশ্রাম কক্ষ (জামেকান), (৩) শীতলকরণকক্ষ এবং (৩) বিশেষ শয়নকক্ষ সংলগ্ন সাধারণ স্নানাগার; এই সমস্ত অট্টালিকা উষ্ণ প্রস্রবণের পার্শ্বে নির্মিত হইয়াছে। সাধারণত তুর্কী কাপলিজা সংলগ্ন বৃহৎ জলাশয় আছে, যাহার এক ছিদ্র দিয়া গরম পানি জলাশয়ে নীত হইত এবং অন্য ছিদ্র দিয়া উহা নিষ্কাশিত হইত। তুরস্কের কাপলিজা স্থাপত্য বুরসায় বিকাশ লাভ করে। তথায় ইস্কি কাপলিজা নামে পরিচিতি, তুরস্কের প্রথম কাপলিজা ১ম মুরাদ কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা পুরাতন বায়যান্টাইন কাপলিজার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেইজন্য বিশ্বাস করা হইত যে, [দ্র. A. Gabriel, Une Capitale Turque Broussa (Bursa), Paris ১৯৫৮ খৃ., ১৬৫-৭০] ইস্কি কাপলিজা বায়যান্টাইন স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। তুরস্কের কয়েকজন অমূর্ত চিত্রকলার ইতিহাসবিদ ইহার পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত নির্মাণের মৌলিকত্ব নির্দেশপূর্বক (Ekrem Hakki Ayverdi, Osmanli mima risinin ilk devri, ৬৩০-৮৫০, (১২৩০-১৪০২, ইস্তাম্বুল ১৯৬৬ খৃ., ২৮০, ২৮২, ২৮৩) এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইস্কি কাপলিজার স্থাপত্য শিল্প তুর্কী স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

'উছমানী তুর্কী শাসনামলে কতকগুলি কাপলিজা নির্মিত হইয়াছিল, যাহা এখনও তুরস্কে এবং ইতঃপূর্বেকার তুর্কী শাসিত অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে হাঙ্গেরীতে সুপ্রসিদ্ধ হইল ঃ বুদিন (Budapest ঃ বুদাপেস্ট), Yeshildirekli (Rudas) ১৫৫৬ সালে নির্মিত ভেলী বে-এর 'হাম্মাম' (Hammam of Veli Bey) [Csarzar] এবং Tabakkhane (আওলিয়া চেলেবী, প্রাগুপ্ত., ৬খ, ২৪২, ২৪৩, ২৪৯; V. Bierhauer, Les Bains Turcs en Hoagrie, Budapest ১৯৪৩ খৃ.)। তুর্কী শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত কিছু সংখ্যক কাপলিজা-বুলগেরিয়াতেও দৃষ্ট হয়; যথা সোফিয়ার সন্নিকটে (J. von Hammer, Rumeli und Bosna, Vienna ১৮১২ খৃ., ৫১, ৮৮), Islimye. Yeni Zagra এবং Bosnia Hercegovina-তে (H. Krsevlakovic Banya u Bosni i Hercegovin, i, ১৪৬২-১৯১৬, Sarajevo ১৯৫২ খৃ.)।

তুর্কী সাম্রাজ্যে কাপলিজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই যে, ইহা কবি ও সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয় [দ্র. নেজাতী বেগঃ দীওয়ান, সম্পা. আলী নিহাত তারলান, ইস্তাম্বুল ১৯৬৩ খৃ., ৪৩৪, ৪৩৫; "the ghazal kapludja" Mehmed Cavusoglu, Zati'nin Letayifi, in Edebuyat Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati, Dergisi, xviii ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.), ৭]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রের সহিত সংযোজন করা যাইতে পারে ঃ (১) নিশরী, জিহাননুমা, সম্পা. F. Taeschner,

Leipzig ১৯৫১ খৃ., ১খ, ৫৫, ৮৩, ৮৪ ; (২) উছমান তুরান, Selcuklular ve Turk-Islam medeniyeti, আঙ্কারা ১৯৬৫ খৃ., ২৫২, ২৫৩ ; (৩)A. Suheyl (Unver), Selcuk tababeti, আঙ্কারা ১৯৪০ খৃ., ১০১-৬; (৪) ইসমাঈল হাক্কী, Uzuncarsili, Kutahya sehri, ইস্তাম্বুল ১৯৩২ খৃ., ২১; (৫) Kamil Keppecioglu, Bursa hamamlari, Bursa ১৯৪৩ খৃ. ; (৬) Meral Guvenli, Bursa hamam ve Kaplicalari, Edebuyat Fakultesi Sanat Tarihi Kutuphanesi no. 306 (B. A. thesis), ১৯৭০ খৃ. ; (৭) Dr. Bernard, Les Bains de Brousse, ইস্তাম্বুল ১৮৪২ খৃ., তুর্কী অনু. ১৮৪৮ খৃ. (Kaplidja risalesi terdjumesi) ; (৮) Reza Reman, Kaplica bilgileri, Bursa ১৯৩৭ খৃ. ; (৯) Mehmed Ziya, Bursa'dan Konya'ya seyahat, ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি., ২১-৫, ৮৯-১১২ ; (১০)S. Ragib Atademir, Konya Ilgin, ilicasi ve sifali su tedavisinin esaslari, Konya ১৯৪৮ খৃ. ; (১১) মুসতাফা হাক্কী, Kaplicalar hakkinda genel bilgiler, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ. ; (১২) Tayyar Kuscu, Haymana Kaplicasi ve faydalan, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ.; (১৩) Karim Omer Caglar, Turkiye Maden sularive Kaplicalari, আঙ্কারা ১৯৫০ খৃ., fasc. ১-৩।

C. Orhonlu (E. I.[2])/মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

কাপান (দ্র. ইস্তাম্বুল, মীযান)

কাপাসিয়া (كباسيا) ঃ ১। ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ঃ বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জিলার সদর উত্তর মহকুমার এবং বর্তমান নবগঠিত গাজীপুর জিলার সর্বউত্তর-পূর্বে অবস্থিত উপজিলা (সাবেক থানা) ; মোট আয়তন ৩৫২.৮ বর্গ কি. মি. (১৩৬.২ ব. মা.), ৯.২ ব. কি. মি. নদীসমেত। জনসংখ্যা (১৯৮১ খৃ.) ২,৫০,৯৯৮ জন, তন্মধ্যে ১২৮,২৫,৭৭৯ জন পুরুষ, ১২২,৭৪১ জন মহিলা। শতকরা প্রায় ৮০ জন হানাফী সুন্নী মুসলমান, বাদবাকী হিন্দু। উপজিলা সদর লক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে ২৪°৫ উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৯০°৩৪ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। ঢাকা হইতে দূরত্ব ৭২ কি. মি. (৪৫ মাইল)। উপজিলার উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী ও পরপারে কিশোরগঞ্জ জিলার পাকুন্দিয়া উপজিলা, পূর্বে নরসিংদী জিলার মনোহরদী, উপজিলা, দক্ষিণে কালীগঞ্জ উপজিলা ও পশ্চিমে শ্রীপুর উপজিলা। ইতিহাসখ্যাত বানার ও লক্ষ্যা নদী উভয়ই পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া এই উপজিলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উপজিলা সদরের দক্ষিণে লাখপুর নামক স্থানে আসিয়া একত্র হইয়াছে এবং শীতলক্ষ্যা নামে কিছু দূর এই উপজিলার ভিতর দিয়া, অতঃপর কাপাসিয়া ও কালীগঞ্জ এই উভয় উপজিলার সঙ্গে পূর্বদিকের নরসিংদী জিলার সীমান্ত রচনা করিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে, নারায়ণগঞ্জ শহর ছাড়াইয়া কিছু দূরে গিয়া এই নদী মুন্সীগঞ্জ শহরের ঠিক বিপরীতে ধলেশ্বরী নদীতে পড়িয়াছে। প্রথমে কাপাসিয়া থানার আয়তন আরও অনেক বড় ছিল। পরে বর্তমান শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণের অংশকে আলাদা করিয়া কালিগঞ্জ (থানা উপজিলা) গঠন করা হয়। কাপাশিয়া বা কাপাসিয়া নামটি আসিয়াছে কার্পাস শব্দ হইতে। প্রাক-মুসলিম যুগ হইতে সমগ্র মুসলিম শাসনামলব্যাপিয়া উত্তরে এই স্থান হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণে সোনারগাঁও পর্যন্ত এলাকা জুড়িয়া উৎপাদিত হইত কিংবদন্তীর মসলিন কাপড়। সেই অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মিহি আঁশের কার্পাস তুলা উৎপাদিত হইত শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় তীরে। কাপাসিয়া ছিল মসলিন উৎপাদন ও বিক্রয়ের একটি বড় কেন্দ্র।

কাপাসিয়া, দুর্গাপুর, তরগাঁও, ঘাগটিয়া, সিংহশ্রী, রায়েদ, টোক, চাঁদপুর, বারিষাব, করিহাতা ও সনমানিয়া এই এগারোটি ইউনিয়ন লইয়া গঠিত সমগ্র উপজিলাটি বিখ্যাত ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত, মোট মৌজা ১৬৩, গ্রাম ২২৩। এখানকার যমিনকে সামগ্রিকভাবে ভাওয়াল-মধুপুর গড় এলাকা বলা হয়, পঞ্চাশ হইতে ষাট ফুট উঁচু অগণিত পাহাড় শ্রেণী। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলা হয় ট্যাক ; ট্যাকের ফাঁকে ফাঁকে উর্বরা নিম্নভূমি, সেগুলিকে বলা হয় বাইদ যমিন। অধ্যাপক দারা শামসুদ্দীন একটি নিবন্ধে লিখিয়াছেন, "ভূতাত্ত্বিকগণ বলেন যে, উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমি, ঢাকা-ময়মনসিংহের গড় অঞ্চল এবং কুমিল্লার লালমাই উৎপত্তিগত দিক হইতে একই শ্রেণীর অন্তর্গত। আনুমানিক দশ হইতে পনের লক্ষ বৎসর আগে সামুদ্রিক কিংবা জোয়ার-ভাটা পরিবেশে কাদামাটির পলি সঞ্চিত হয়। ... সম্পূর্ণ ভাওয়াল-মধুপুর অঞ্চলটি বর্তমানে একটি বিশাল চত্বরের আকার ধারণ করিয়াছে। ভূতাত্ত্বিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন প্লাইস্টোসিন চত্বর ... যাহার আনুমানিক বয়স দশ লক্ষ বৎসর।" এখানকার পাহাড় বা ট্যাক অঞ্চলের মাটিতে লৌহের পরিমাণ বেশি বলিয়া তাহা প্রায় টকটকে লাল রঙের এবং এটেল প্রকৃতির। এগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের কাঠের গাছ, ফলমূল ও তরিতরকারি প্রচুর উৎপাদিত হয়। নিচু বা বাইদ যমিন বর্ষাকালে সাত আট হাত পর্যন্ত পানিতে তলাইয়া যায় এবং সেই বর্ষার পানি কয়েক মাস থাকে, ক্রমাগত নদীবাহিত পলি পড়ে বলিয়া এই মাটি সাদা রঙের এবং দোআঁশ ধরনের। এখানেই ধান ও পাট জন্মে ; কাপাসিয়া সমগ্র দেশের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল। উপজিলা এলাকার, বিশেষ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়ের সারির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। বনাঞ্চলের প্রধান উৎপাদন বিখ্যাত গজারী গাছ, অন্যত্র কাঁঠাল, কড়ই, জাম, তাল এবং অন্যান্য নানা প্রকার কাঠের গাছ জন্মে।

ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, জাম, আতা, কলা, তাল ইত্যাদি প্রচুর জন্মে এবং মাটির গুণে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। শিমুল তূলাও যথেষ্ট উৎপাদিত হয়। কাপাসিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা। এখানকার বাইদ যমিনে ও সমভূমিতে ধান, পাট, গম, যব, ডাল, তৈলবীজ, তামাক ও ইক্ষু যথেষ্ট উৎপাদিত হয়। অধিকাংশ পাট দক্ষিণে কালীগঞ্জ ও পলাশ এলাকার পাটকলগুলিতে এবং নারায়ণগঞ্জে যায়, ইক্ষু চরসিন্দুরের চিনিকলে যায় এবং বাদবাকী দিয়া উৎকৃষ্ট মানের গুড় তৈয়ারি হয়। কাপাসিয়ার কতগুলি বিল অঞ্চলে অগণিত পদ্মফুল ফোটে।

১০০ বৎসর আগেও এখানকার গড় বা বন অঞ্চলে বন্যহাতী, রয়াল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রা হরিণ বাস করিত এবং ভাওয়াল গড় দেশের একটি আকর্ষণীয় শিকারের এলাকা ছিল। বর্তমানে বনাঞ্চল অনেক কমিয়া যাইবার ফলে বন্য প্রাণীও অনেক লোপ পাইয়াছে। বনে এখন ছোট বাঘ, চিতা বাঘ, ছোট ভল্লুক, বানর, শিয়াল, সজারু, বনবিড়াল ও অজগর বাস করে।

কাপাসিয়ার প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহন বানার ও শীতলক্ষ্যা নদীপথে হয়। দুই শত বৎসর আগে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান ধারা এই উপজিলার টোক নামক স্থানে আসিয়া ঢাকা জিলাতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া ভৈরব বাজারে গিয়া মেঘনার সঙ্গে মিশিত। পরে

১৭৮০ এবং ১৮৩০ সালের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র স্রোত পরিবর্তন করিয়া বর্তমান যুমনা ধারার সহিত প্রবাহিত হইতে থাকে। বর্তমানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের শীর্ণ ধারায় অল্পই নৌযান চলে। শীতলক্ষ্যা নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় বিধায় প্রায় সারা বৎসরই কমবেশী নাব্য থাকে। এই নদীতে সারা বৎসর ধরিয়াই কাপাসিয়া উপজিলার লাখপুর পর্যন্ত লঞ্চ চলে। বর্ষাকালে কাপাসিয়ার বাজার পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল কর। এই নদীপথে কাপাসিয়া দক্ষিণে ঘোড়াশাল শিল্প এলাকা, কালীগঞ্জ, কাঞ্চন, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত।

মুগল আমলে ঢাকা হইতে টঙ্গী পুল পার হইয়া কাপাসিয়ার টোক পর্যন্ত মোট ৫২ মাইল দীর্ঘ একটি সামরিক সড়ক ছিল। উহার চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। ইংরেজ আমলে শ্রীপুর হইতে গোসিঙ্গা হইয়া কাপাসিয়া পর্যন্ত এবং সেখান হইতে পুনরায় পশ্চিম দিকে রাজেন্দ্রপুর রেল স্টেশন পার হইয়া তুরাগ নদীর তীরবর্তী মির্যাপুর পর্যন্ত সড়কটি নির্মিত হয় ১৮৮৭-১৮৯২ খৃ.-এর মধ্যে। পাকিস্তান আমলে ঢাকা শহর হইতে টঙ্গী হইয়া কালীগঞ্জ পর্যন্ত যে পুরাতন সড়ক ছিল উহা উত্তর দিকে কাপাসিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করিবার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং পাকা সড়ক কালীগঞ্জ পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হয়, কিন্তু ১৯৬৮ খৃ. পরে উহার নির্মাণ কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। বর্তমানে পুরাতন সড়ক ধরিয়া ঢাকা হইতে রাজেন্দ্রপুর হইয়া কাপাসিয়া পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করে। এই একই পথে শ্রীপুর হইয়া ময়মনসিংহ পর্যন্ত পাকা সড়ক রহিয়াছে।

২। ইতিহাস ঃ ইখতিয়ারু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাখতিয়ার খিলজী লক্ষণাবতী বা গৌড় জয় করিলে (১২০১ বা ১২০৩ খৃ.) বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেন বিক্রমপুরে আসিয়া ১২০৬ খৃ. পর্যন্ত পূর্ব বাংলা শাসন করেন। কাপাসিয়া সমেত সমগ্র পূর্ব বাংলাতেই তাঁহার রাজত্ব ছিল। তাঁহার পরে তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ১২২৩ খৃ. রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই পূর্ব-বাংলায় একের পরে এক তুর্কী অভিযান শুরু হয়। ১২৪২ খৃ. মধ্যে সেন শাসনের অবসান ঘটে অতঃপর এই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। মার্কো পোলো লিখিয়াছেন যে, ১২৭২ খৃ. পূর্ব বাংলাতে তুর্কী খানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫৭/১২৫৮ সালে লক্ষণাবতীর শাসক (গভর্নর) মালিক 'ইয়যু'দ-দীন আইবাকী বলবনী ঢাকা জিলাসহ বঙ্গদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তী গভর্নর মালিক তাজু'দ-দীন আরসালান খান বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বাংলার উপরে অধিকার বিস্তার করেন; ৬৬৭/১২৬৮ সালে দিল্লীর সুলতান বলবান সহ-শাসক (ডেপুটি গভর্নর)-রূপে তুগরিল বেগকে নিয়োগ করিয়া পাঠান; এই তুগরিল বেগ বৃহত্তর ঢাকা জিলা এলাকাতে কয়েকটি যুদ্ধ করেন। তুগরিল সোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী লরিকেল নামক স্থানে কিল্লা নির্মাণ করিয়া সেখান হইতে অভিযান পরিচালনা করিতে থাকেন। এই সময়ে দনুজ রায় শেষ হিন্দু রাজ্য বৃহত্তর ঢাকা জিলাতে প্রভাব বিস্তার করেন। তুগরিল খান-এর নিকটে পরাজিত হইয়া তিনি দক্ষিণে চন্দ্রদ্বীপে (বরিশাল জিলা) গিয়া আশ্রয় নেন। অতঃপর ১২৭৫ খৃ. হইতে সমগ্র বৃহত্তর ঢাকা জিলাতে (কাপাসিয়াসমেত) মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর কখনও গৌড় হইতে, কখনও সোনারগাঁও হইতে শান্তিপূর্ণভাবেই এই এলাকা শাসিত হইতে থাকে। কাপাসিয়ার সন্নিকটেই শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে একডালা নামক একটি গ্রাম রহিয়াছে, সেখানে প্রাচীন নির্মাণ কাজের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই একডালা কিল্লা হইতেই সুলতান শামসু'দ-দীন ইলয়াস শাহ ১৩৫৩ খৃ. একবার এবং অতঃপর তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহ আর একবার দিল্লীর সুলতান ফীরূয শাহ তুগলাক-এর নৌ-অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিয়া বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই একডালাকে দিনাজপুরের কোথাও অবস্থিত স্থান বলিয়া চিহ্নত করেন, কিন্তু কাপাসিয়ার নিকটে লক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী একডালা কিল্লার সম্ভাব্যতা কেহই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ দ্বারা বাতিল করিতে পারেন নাই। সেন রাজবংশের পতনের পরে বর্তমান গাজীপুর জিলা এবং সেই সঙ্গে সাভার ও ধামরাই উপজিলা অর্থাৎ সাবেক ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা বা ভাওয়াল পরগনা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যশোপাল, শিশুপাল প্রমুখ কয়েকজন বৌদ্ধ ধর্মালম্বী পাল সামন্ত রাজা এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি শাসন করিতেন। বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া স্থানীয় হিন্দুরা সেই রাজাগণকে চণ্ডাল রাজ্য বলিত (কিংবদন্তী অনুসারে উল্লিখিত এই সমগ্র এলাকা ব্যাপিয়া প্রাচীন চেদীরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল)। সেন বংশের পতনের যুগে তাহাদের দুই সামন্ত প্রতাপ ও প্রসন্ন চণ্ডাল অর্থাৎ বৌদ্ধ রাজ্য হিসাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাহাদের রাজধানী ছিল কাপাসিয়ার সংলগ্ন শ্রীপুর উপজিলার চিনাশুখানিয়া গ্রামে। তাহাদের নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং খনন করা দীঘির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি সেখানে রহিয়াছে। বৌদ্ধ সামন্ত রাজাগণের পরে ভাওয়ালে বিখ্যাত গাযী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্ভবত পাহলওয়ান গাযী অথবা (তাঁহার পুত্র?) কায়্যুম গাযী। তাঁহারা খৃ. ১৪শ শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান কালীগঞ্জ (দ্র.) উপজিলার বিখ্যাত চৌড়া গ্রামে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কালীগঞ্জ উপজিলা পূর্বে কাপাসিয়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গাযী বংশ একেবারে খৃ. ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কাপাসিয়াসমেত সমগ্র ভাওয়াল পরগনার জমিদার ও শাসক ছিলেন। গাযীগণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া দুইজন-ফযল গাযী ও বাহাদুর গাযী (উভয় দ্র.) বস্তুত স্বাধীন ছিলেন এবং 'ঈসা খান ও তাঁহার পুত্র মূসা খান-এর নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলায় মুগল শক্তির বিরোধিতা করেন (নিম্নে দ্র.)। বাংলার রাজধানী যখন মুর্শিদাবাদে তখন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভাওয়ালের জমিদারী দখল করিয়া নেন গাযীগণেরই কর্মচারী জয়দেবপুরের হিন্দু জমিদারগণ। ১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভাগ পর্যন্ত তাঁহারাই ছিলেন ভাওয়ালের জমিদার।

গাযীগণের শাসনের প্রথম দিকে এই পরিবারের সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কিত একজন সূফী-দরবেশ হযরত শাহ কারফারমা (র) গাযীগণের শাসনকেন্দ্র বৌড়াতেই খানকাহ স্থাপন করিয়া জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ভাওয়াল এলাকাতে ইসলাম প্রচারে এই দরবেশ এবং তাঁহার শাগরিদগণের বড় অবদান ছিল, তাঁহার মাযার, মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (উহার উপরে সম্প্রতি নূতন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে) এবং তাঁহার খনন করা বিশাল তালাব বা দীঘি চৌড়া গ্রামে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

কাপাসিয়া এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অগণিত মুগল-পাঠান যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই উপজিলা সীমান্তের ঠিক পরপরই কিশোরগঞ্জ জিলার পাকুন্দিয়া উপজিলাতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর বিপরীত তীরেই অবস্থিত ঐতিহাসিক এগারসিন্দুর কিল্লা। সম্রাট আকবরের নৌ-সেনাপতি খান জাহান এক যুদ্ধে ঈসা খানকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও ধনরত্ন হস্তগত করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই 'ঈশা খান

তাঁহার অন্যান্য ভূঁইয়া মিত্রগণের সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিয়া ক্রমাগত মুগল নৌবহর আক্রমণ করিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মুগল নওয়ারাকে পর্যুদস্ত করিয়া দেন (১৫৭৬-৭৭ খৃ.)। ১৫৮৩ খৃ. মুগল সেনাপতি হইয়া আসেন শাহবায খান। সেই বৎসরই তিনি প্রথমে 'ঈসা খান-এর রাজধানী সোনারগাঁও ও পরে তাঁহার বাসস্থান কাতরাব (বাকারতাব, বর্তমানে রূপগঞ্জ উপজিলার মামুমাবাদ গ্রাম) দখল ও লুণ্ঠন করিয়া, অতঃপর শীতলক্ষ্যা নদীর উজান বাহিয়া কাপাসিয়ার উত্তর প্রান্তবর্তী এগারসিন্দুর কিল্লা দখল করেন এবং এই উপজিলারই টোক নামক স্থানে মজবুত নৌঘাঁটি স্থাপন করেন। 'ঈসা খান ও তাঁহার মিত্র মা'সূম খান কাবুলী লক্ষ্যা নদী বাহিয়া গিয়া সেখানে তাঁহাকে অবরোধ করেন। 'ঈশা খান প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাট যুদ্ধ করিয়া সময় নিতে থাকেন। বর্ষাকাল আসিলে একদিন অন্ধকার রাত্রে ঈসা খান পনের জায়গায় ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া মুগল নৌবহর ভাসাইয়া দেন। শাহবায খান বাধ্য হইয়া ভাওয়ালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৮৪ খৃ. ৩০ সেপ্টেম্বর এক সম্মুখ যুদ্ধে 'ঈসা খান মুগল সেনাপতি শাহবায-এর মুকাবিলা করেন। শাহবায সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও হাতী ফেলিয়া তানডাতে (বিহার) পশ্চাদপসরণ করেন। 'ঈসা খান মুগলদের সকল হাতী পরে সম্রাট আকবর-এর নিকটে ফেরত পাঠাইয়া দেন।

১৫৯৪ খৃ. আকবর মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠান। পরের বৎসর (১৫৯৭ খৃ.) তিনি 'ঈসা খান-এর সঙ্গে নৌ-সংঘর্ষে লিপ্ত হন। 'ঈসা খান কাপাসিয়ার বিপরীত পাড়ে বিখ্যাত ও সুরক্ষিত এগারসিন্দুর দুর্গে (দ্র.) অবস্থান নেন। মানসিংহ তাঁহার নওয়ারা নিয়া প্রথমে ব্রহ্মপুত্রের কাপাসিয়া পাড় হইতে সেই দুর্গে গোলা নিক্ষেপ করিতে থাকেন ও পরে নদী অতিক্রম করিয়া দুর্গের পার্শ্ববর্তী এক মাঠে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু সৈন্যদের যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া 'ঈসা খান এবং মানসিংহ উভয় সেনাপতির দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইবে সিদ্ধান্ত মানিয়া নিয়া দুই রাজপুত যুদ্ধে নামেন। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিজেদের অবস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই চমকপ্রদ দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপভোগ করিতে থাকে। কয়েক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে এবং লড়াই অমীমাংসিত থাকে। অবশেষে এক পর্যায়ে ঈসা খান-এর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহ-এর তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যায় এবং উদারতা দেখাইয়া 'ঈসা খান তাঁহাকে নিজের একটি তলোয়ার প্রদান করেন। আকবার-এর প্রধান সেনাপতি, রাজপুত বীর পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। মানসিংহের সঙ্গে 'ঈসা খান সকল সৈন্যসমেত আগ্রাতে গেলে আকবার তাঁহাকে মসনদ-ই-'আলা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং ভাওয়ালসমেত বাইশ পরগনার জমিদারী প্রদান করেন। কিন্তু ভাওয়াল 'ঈসা খান-এর মিত্র ফযল গাযীর অধিকারেই থাকিয়া যায়। 'ঈসা খান-এর পুত্র মূসা খান-এর আমলে মুগল-পাঠান মুকাবিলায় ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীর পানি আরেকবার আলোড়িত হয়। কাপাসিয়ার নিকটে শেষ নৌযুদ্ধটি করেন আলপ সিংহ ও বোকাইনগরের (ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ) পাঠান শাসক 'উছমান লোহানী। মুগল নৌবহর কাপাসিয়ার নিকটবর্তী টোক-এ অবস্থান নিয়াছিল। উছমান বৃহত্তর নৌশক্তি নিয়া আকস্মিক আক্রমণে মুগল নওয়ারাকে পরাজিত করেন এবং তাহারা ভাওয়ালে অর্থাৎ কাপাসিয়া অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। ইসলাম খান চিশতী যখন বাংলার সুবাদার ইহা তখনকার ঘটনা। জাহাঙ্গীরনগরের প্রতিষ্ঠাতা এই সুবাদার অত্যন্ত কঠোরভাবে বাংলার বার ভূয়াগণকে (দ্র.) দমন করেন এবং এখানে মুগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কাপাসিয়া অঞ্চলে এবং ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌযুদ্ধও তখন হইতে বন্ধ হয়। ব্রহ্মপুত্র নদী অতঃপর গতি পরিবর্তন করিয়াছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা উভয় নদীই পূর্বাপেক্ষা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা সময়ে বাংলার অধিবাসীদের শৌর্যবীর্যের এখনও কূলে কূলে কিংবদন্তী ও গাথা আকারে কীর্তিত হয়। সেই সকল বীরত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিবাহী টোক, লাখপুর ও একডালা এখন কাপাসিয়া উপজিলার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। টোক এবং লাখপুরে বড় বাজার রহিয়াছে। কাপাসিয়া বড় নদীবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে ধান-চাউল, পাট, গুড় ইত্যাদি রফতানী হয়। টোক ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের দরগাহপাড়া শাহী মসজিদটি 'ঈসা খান-এর আমলের, উহা এখনও ভাল অবস্থায় রহিয়াছে। কাপাসিয়া উপজিলায় ১টি কলেজ, ৪০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯টি মাদরাসা, ডাকঘর ও চিকিৎসালয় রহিয়াছে। উপজেলায় মসজিদের সংখ্যা ৫৮৯, মন্দির ৫টি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) East Pakistan District Gazetteer, Dacca, ed. S. N. H. Rizvi and Md. Ishaq, Servisces and General Administration. Govt. of East Pakistan, Dacca, উহার বিভিন্ন স্থানে; (২) দারা শামসুদ্দীন, নিবন্ধ কালিগঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তাহার পরিবর্তন, কালীগঞ্জ প্রবাহ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৫ খৃ., শেখ মোজাফফর হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত; (৩) মোঃ নূরুল ইসলাম, নিবন্ধ ভাওয়াল থেকে গাজীপুর, নবগঠিত গাজীপুর জিলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৪ খৃ.; (৪) Habiba Khatun, art In quest of Katrabo. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol XXXI, No. 2, Dce. 1981 ; (৫) Bangladesh Population Census, 1989, All Thanas of Dhaka, Part I, July 1985, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka p. CL-CLIK.

হুমায়ূন খান

কাপিজী (Kapidji) ঃ দ্বাররক্ষী (তু. 'আ. বাওওয়াব, ফা. দারওয়ান)। শব্দটি 'উছমানী শাসনামলে ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সুলতানী প্রাসাদের বাব-ই হুমায়ূন, ওরতাকাপি এবং বাবু'স-সা'আদাত নামক প্রধান তিনটি প্রবেশদ্বারের দ্বাররক্ষী অর্থে ব্যবহৃত হইত। প্রথম দুইটি প্রবেশদ্বারের রক্ষিগণ একই শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু সুলতানের ব্যক্তিগত বাসস্থান এবং হারেমের প্রবেশদ্বার বাবু'স-সা'আদাতের রক্ষিগণ কিয়ুলার আগাসীর অধীনস্থ কুলে সোফুলারী নামক একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজেতা ১ম মুহাম্মাদের কানূননামেতে কাপিজীদের বিষয় প্রথম উল্লিখিত হয়। কাপিজীগণ জানিসারীদের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত অথবা প্রাসাদের বিভিন্ন রক্ষী ছাউনি হইতে প্রাসাদ রক্ষীদের পদোন্নতি দিয়া কাপিজী পদে নিয়োগ করা হইত। ওরতা কাপি প্রবেশদ্বারের রক্ষীগণ বাব-ই হুমায়ূনে নিযুক্ত তাহাদের সহকর্মিগণ অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। মর্যাদাগত এই স্বাতন্ত্র্য দশম/ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৫০০ খৃ.-এর পূর্বে কাপিজীদের সংখ্যা ছিল ৫০। এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে ৩৫০-এরও অধিক হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাদের সংখ্যা হয় প্রায় ২,৪০০। অতঃপর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাব-ই হুমায়ূনের রক্ষিগণ ৫ দলে এবং ওরতা কাপির রক্ষিগণ ৪৫ দলে বিভক্ত ছিল। তারপর অষ্টাদশ শতকে

দলের সংখ্যা হয় ১৫, যদিও বাবু'স্-সা'আদাতের রক্ষীদলে দলের সংখ্যা ছিল ৭। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারগুলিতে তাহাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও কাপিজীগণকে মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রণাসভা অনুষ্ঠানের দিনে যে সমস্ত উমরা মন্ত্রণাসভায় অংশগ্রহণ করিতেন তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে হইত। কোন সুলতান সামরিক অভিযানে বাহির হইলে কাপিজীগণকে সুলতানের তাঁবুর প্রবেশ পথে উপস্থিত থাকিয়া ইহার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করিতে হইত।

বিজেতা ১ম মুহাম্মাদের শাসনকালে মাত্র একজন কাপিজী বাশী (রক্ষী দলপতি) ছিল। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪-এ, তারপর ১০, ১৩, ১৭, ২১-এ এবং সর্বশেষে দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৬০-এ উন্নীত হয়। কাপিজী বাশীগণ পশুলোমে প্রস্তুত পোশাক পরিধান করিত এবং পরিচয় চিহ্ন হিসাবে রৌপ্যনির্মিত দণ্ড বহন করিত। প্রতি রাত্রিতে তাহাদের একজন ওরতা কাপি প্রবেশদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত থাকিত এবং দিনে যখন মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রণাসভা অনুষ্ঠিত হইত তখন তাহাদের দুইজন উক্ত কক্ষের প্রবেশ পথে কর্তব্যরত থাকিত। সুলতান যখন শুক্রবার জুমু'আর সালাত আদায় করিতেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষে প্রধান মসজিদে যাইতেন তখন তাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইত। আবার যখন সুলতান কোন রাজদূতকে সাক্ষাত দান করিতেন তখন দুইজন কাপিজী বাশী রাজদূতকে সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অবনত এবং আভূমি প্রণত হইতে সাহায্য করিত। তাহাদেরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উযীরদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ফরমান ও গোপনীয় আদেশপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবার কাজেও নিয়োগ করা হইত।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কাপিজী বাশীগণ ১৯,০০০ রৌপ্যমুদ্রার জায়গীর ভোগ করিত। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষী-দলপতিগণ, যাহাদের উপাধি ছিল বাশকাপিজী বাশী, ৪০০,০০০ রৌপ্য মুদ্রার জায়গীর প্রাপ্ত হইত এবং তাহাদিগকে সানজাকদের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। তাহাদের উপর দ্বাররক্ষীদের নিয়োগ, অবসর প্রদান, বদলি পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের সকল দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। ৩য় মুহাম্মাদের শাসনকালে বাশকাপিজী বাশীদের প্রারম্ভিক সংখ্যা ২, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪-এ এবং তারপরে ৬-এ উন্নীত হয়। ১৮২৬ খৃ. জানিসারী বাহিনীর অবলুপ্তির পর মাত্র ৩০ জন কাপিজী বাশীকে বহাল রাখা হইয়াছিল ও ১৮৩৯ খৃ. ইহাদের পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪০-এ উপনীত হয় এবং তাহাদিগকে রাজকীয় আস্তাবল প্রধানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯০৮ খৃ. কাপিজী বাশীর সমস্ত পদ বিলুপ্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. H. Uzuncarsili প্রণীত, IA., দ্র. Kapici; (২) Mouradgea d'Ohsson, tableau general de l'Empire ottoman, প্যারিস্ ১৭৯১ খৃ., ৭খ, অধ্যায় ১; (৩) I. H. Uzuncarsili, Osmanli devletinin saray teskilati, আংকারা ১৯৪৫ খৃ., ৩৯৬-৯ (তুর্কী উৎসের অসংখ্য সূত্র); (৪) M. Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, ২খ, ১৬৭-৯ (নিবন্ধ Kapici)।

R. Mantran (E.I.[2])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

কাপী (قپى) ঃ তুর্কী ভাষায় ইহার আভিধানিক অর্থ 'ফটক', যাহার সম্প্রসারিত অর্থ "Ottaoma Parte" অর্থাৎ 'উছমানী সুলতানের প্রাসাদ। ইহা প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদ এবং রাজধানী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাপী শব্দটি আরবী বাব [যেমন বাব-ই 'আলী দ্র., ফার্সী দার, দের [যেমন দার-ই দেবলেতু (দাওলাত), দার-ই 'আলিয়া দার-ই সা'আদাত] শব্দের সহিত মিশ্রভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে হয়, 'উছমানী বাকধারায় কাপী শব্দটি অতুর্কী উপাধি বা বর্ণনামূলক বিশেষণ ব্যতীত কচিৎ ব্যবহৃত হইত যাহা বাব ও দার শব্দটির বেলায় প্রযোজ্য নহে। অপর দিকে শব্দটি সরাসরিভাবে সুলতানের অধীনস্থ সামরিক অথবা বেসামরিক কার্যাবলীর নামকরণে প্রায়শ ব্যবহৃত হইত। যেমন "কাপী কুল্লারী" শাব্দিক অর্থে "সুলতানের ক্রীতদাস" অর্থাৎ সুলতানের বাহিনী, "কাপী কেথুদাসী" অথবা কাপী বাহ্য়াসী" অর্থাৎ 'উছমানী সুলতানের সহিত ঘনিষ্ঠ কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রজা বা সামন্তের এজেন্ট।

১৬৫৪ সাল হইতে প্রধান উযীর একটি একান্ত প্রাসাদে বাস করিতেন যাহা সেই সরকারী মহল্লা (Imperial Saray) হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল যেই স্থানে প্রায়শ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় দীওয়ানের সভা অনুষ্ঠিত হইত। পাশা কাপীসী (সংক্ষেপে কাপী) নামে পরিচিত এই প্রাসাদটি পরবর্তী কালে বাব-ই 'আলী (Sublime Porte-মহান ফটক) নামে পরিচিত হইল এবং এইখানেই প্রকৃত রাজধানী অবস্থিত ছিল। পাশ্চাত্য লেখকগণ Porte নামে সুলতানের প্রাসাদ, আদালত, এমন কি 'উছমানী রাষ্ট্রকে অভিহিত করিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইস্ফাহানের বাব-ই 'আলী কাপু নামে পরিচিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. von, Hammer, Staatsverfassung ... ii, 44, 137-8; (২) I. H. Uzuncarsili, Osmanli devleti teskilatina medhal, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ., স্থা.; (৩) ঐ লেখক, Osmanli devleti teskilatindan kapukulu ocaklari, ২খ, আংকারা ১৯৪৩-৪ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Osmanli devletin saray teskilati, আংকারা ১৯৪৫ খৃ., Passim।

R. Mantran (E.I.[2])/পারসা বেগম

কাপী আগাসী (দ্র. কাপু আগাসী)

কাপু আগাসী, কাপী আগাসী (Kapu Aghasi, Kapi Aghasi) ঃ অথবা বাবু'স-সা'আদা আগাসী দশম/ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দারু'স্-সা'আদা আগাসী (দ্র.) কর্তৃত্ব করার পূর্ব পর্যন্ত ইঁহারাই ছিলেন 'উছমানী তুর্কী সম্রাটের প্রাসাদের উচ্চঃপদস্থ কর্মকর্তা। অব্যাহতভাবে কর্মরত অন্যান্য আগাদের ন্যায় ইঁহাদিগকেও সুলতান স্বয়ং মনোনীত করিতেন খোজা (প্রহরী)-দের মধ্য হইতে। প্রাসাদের কিঙ্করগণের, আগাগণের ও ইচ ওগলানদের (দ্র.) নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ব্যাপারে কাপু আগাসীগণ সুলতানের নিকট আবেদন করার ক্ষমতা রাখিতেন।

সুলতান এবং তাঁহার প্রাসাদের বাহিরের জগতের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তিনি অন্দর দরজা বা বাবু'স-সা'আদা (সংবর্ধনা-জ্ঞাপক দরজা) নামে পরিচিত সদর দরজায় উপবেশন করিতেন। এই সদর দরজাই বহিঃস্থ (Birun) প্রাসাদ হইতে অন্দর (enderun) প্রাসাদের বিভাজন হিসাবে বিদ্যমান ছিল। এই গেটের দক্ষিণ পার্শ্বেই তাঁহার অফিস বা দফতর স্থাপিত ছিল। সুলতান কাহাকেও অন্দর মহলে প্রবেশাধিকার প্রদান এবং সকল সরকারী নির্দেশাবলী কেবল তাঁহার মাধ্যমেই প্রেরণ করিতেন (Kanunname of Mehmed the Conqueror, TOEM, Suppl., ১৩৩০/১৯১২, পৃ. ২৩)। কাপু আগাসী উযীরের পদমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ যে কোন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান উযীর ও শায়খু'ল-ইসলাম (দ্র.)-এর নীচে মর্যাদা লাভ

করিতেন। তাঁহার দৈনিক বেতন ছিল ১০০ আকচে; ইহা জানিসারীদের আগাগণের ৫০০ আকচে-এর তুলনায় অনেক কম ছিল (অন্যদের বেতন সম্পর্কে অবগতির জন্য দ্র. I. H. Uzuncarsili, Osmanli devletinin saray teskilati, আঙ্কারা ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৩৫৫)।

প্রাক-'উছমানী শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের প্রাথমিক যুগে এই পদটি হাজিব, হাজিবু'ল-হুজ্জাব অথবা আমীর হাজিব প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে ইহা সাহিবু'স-সিতারা, আমীর-ই পারদারান, যিমামদার এবং ইশিক্যকাসিবাশী নামে আখ্যায়িত হয় [দ্র. M.F. Koprulu, THIM, i, ২০৮-২১১; হাজিব, ইসলাম-পূর্ব (in E.I.[2]); D. Ayalon, in St. Isl. xxxviii, ১০৭-৫৬]। মধ্যএশিয়ার তুর্কী রাষ্ট্রসমূহে ইহারা আগাজী (Aghadji) নামে পরিচিত ছিলেন, কখনও বা উলুগ হাজিব নামে (তুর্কী রাষ্ট্রসমূহে ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে দ্র. Kutadgu Bilig, সম্পা. R. R. Arat, আঙ্কারা ১৯৫৯ খৃ., ১৮১-৭)।

'উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যে এই কর্মকর্তা কখনও 'আব্বাসী এবং মামলূক রাষ্ট্রের ন্যায়—সুলতানের নিজস্ব সেনাদলের পরিচালনা এবং সর্বোচ্চ বিচারক সুলতানের পক্ষ হইতে শারী'আত সম্পর্কহীন মোকদ্দমা শুনানীর অতিরিক্ত দায়িত্ব দখল করেন নাই। সালজূক প্রশাসনের মত তিনি কখনও রাজপ্রাসাদের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা কিংবা প্রধান রাজকর্মচারী হিসাবে অপরকে ডিঙ্গাইয়া নিজ পদোন্নতি গ্রহণ করেন নাই। 'উছমানী সুলতানগণের ক্ষমতা অলংঘনীয় রাখা নিশ্চিত করার উদ্দেশে তাঁহার ব্যক্তিগত সৈন্যদলের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয় জানিসারীদের সেনাধ্যক্ষ 'আগার' উপর এবং অভিযোগ শ্রবণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় প্রধান উযীরের উপর। এই দ্বিমুখী ক্রিয়াকলাপ পৃথক রাখার জন্য যথেষ্ট ঝামেলা পোহাইতে হয়।

যাহা হউক, কাপু আগাসী রাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি সুলতানদের সিংহাসন প্রাপ্তিতে এবং তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিকন্তু খাস্‌মহলের একান্ত বিশ্বস্ত এবং এককালীন শাসক ও সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। নবম/পঞ্চদশ এবং দশম/ষোড়শ শতাব্দীতে কাপু আগাসীগণের ক্ষমতা ও প্রভাব কেবল প্রধান উযীরের সহিত তুলনীয় ছিল (কিতাবু'ল-মুস্তাতাব, সম্পা. Y. Yucel, আঙ্কারা ১৯৭৪ খৃ., (৪৪)। সুলতান ১ম সুলায়মানের রাজত্বকালে তাঁহাকে মক্কা ও মদীনার ওয়াকফ সম্পত্তির এবং পরে প্রায় ৭০টি বৃহৎ মসজিদেরও পরিচালনভার প্রদান করায় তাঁহার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

যাহা হউক, 'ওয়ালিদ' সুলতানগণের প্ররোচনায় তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দারু'স-সা'আদা আগাসীর উপর অর্পিত হওয়ায় দশম/ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। ৯৯৫/১৫৫৭ সালে এই কর্মকর্তাকে কাপু আগাসীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিয়া কালক্রমে রাজপ্রাসাদের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১১১৬/১৭০৪ সালে তাঁহার ক্ষমতা সিলাহ্‌দার বা অস্ত্রধারীকে প্রদান করার পর কাপু আগাসীদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া পড়ে।

৯ম/১৫শ-১০ম/১৬শ শতাব্দীতে কাপু আগাসীগণ রাজপ্রাসাদের বাহিরে রাজকর্মচারী হিসাবে বদলি হইতে পারিতেন এবং রুমেলিয়া ও মিসরের বেগলের বেগী পদের মত সর্বোচ্চ গভর্নরের পদও অলংকৃত করিতে পারিতেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাথমিক যুগে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদদের মধ্যে খাদিম 'আলী, খাদিম সিনান, খাদিম সুলায়মান ও খাদিম আহ্‌মাদ (দ্র.) ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২য় বায়াযীদ (দ্র.)-এর রাজত্বকালে নগর উন্নয়ন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনকারী হিসাবে ফীরোয হুসায়ন ও মারজান নামক আরও দুই ব্যক্তি খ্যাতি অর্জন করেন (তাঁহাদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে সবিস্তার অবগতির জন্য দ্র. E. H. Ayverdi এবং O. L. Barkan, Istanbul, vakiflari tahrir defteri, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.)।

১০ম/১৬ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে কাপু আগাসী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ শুরু করেন এবং প্রধান উযীরের সহিত প্রবল ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন (Mehmed তা'রীখ-ই গিলমানী, TOEM, Suppl., পৃ. ২৯, ৩৯)। এই প্রসঙ্গে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত একটানা ৩০ বৎসর যাবত কাপু আগাসীর পদে অধিষ্ঠিত গযন্‌ফর আগার কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাফতার-ই আগায়ান-ই দারু'স-সা'আদা, TTK গ্রন্থাগার, আঙ্কারা, Y ৮৬; (২) দারগাহ-ই 'আলী কাপুজুবাশী আগালারী দেফতেরী, TTK গ্রন্থাগার, আঙ্কারা, Y ২০৪; (৩) আহমাদ রেসমী, খামীলা আল-কুবেরা', TTK Library, Y 412; (৪) Danado da Lezze, Historia Turchesca, সম্পা. I. Ursu, Bucharest ১৯০৯ খৃ.; (৫) Th. Spandouyn Contacassin, Petit Traicte de l'origine des Turcqz, সম্পা. Ch, Schefer, প্যারিস ১৮৯৬; (৬) M. d'Ohsson Tableau general de l'empire ottoman, vii, প্যারিস ১৮২৪ খৃ.; (৭) তায়্যার যাদা 'আতা', তা'রীখ, i, এবং ii, ইস্তাম্বুল ১২৯১/১৮৭৪; (৮) হাফিজ ইলয়াস, লাতা'ইফ-ই আনদারুন, ইস্তাম্বুল ১২৭৬/১৮৫৯-৬০; (৯) B. Miller, The Palace school of Muhammad the Conqueror, Cambridge, Mass. ১৯৪১ খৃ.; (১০) M. Fuad Koprulu, Bizans, muesseselerinin Osmanli Muesselerine tesiri, in THIM, i (১৯৩১); (১১) ঐ, I. A., art, Hacib; (১২) I. H. Uzuncarsili, Osmanli devletinin saray teskilati; (১৩) E.I.[2], হাজিব।

Halil Inalcik (E.I.[2])/মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

কাপূচা ঃ ককেসাস অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম (নিজেদের প্রদত্ত পদবী ঃ কাপুচিয়াস সুকো বা বেঝত্‌লাস সুকো; রুশ ভাষায় কাপুচিনী বা বেঝিতিনী) যাহাদের ভাষা দিদো (দ্র.), গিনুথ, কুনযাল খভারশি এবং উত্তর-পূর্ব আইবেরো ককেসাসের আভার আনদি-দিদো গ্রুপভুক্ত দিদো শাখা ইত্যাদি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত আদমশুমারী অনুযায়ী ইহার জনসংখ্যা মাত্র ১,৪৪৮ জন। কাপুচাগণ স্বায়ত্তশাসিত দাগিস্তান A. S. S. R. (আযারবায়জান সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিক)-এর অন্তর্গত বেঝিতি ও খচারখতার গ্রামাঞ্চলে ও আভার-কয়সু-র উজান অববাহিকার তিলয়ার্দালে, তিলআরাতা জেলায় বসবাস করে। বিচ্ছিন্ন পার্বত্য উপত্যকায় বসবাস করার ফলে তাহারা বহির্জগতের প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিয়াছে এবং অনেক পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি মানিয়া চলে। তাহারা শাফি'ঈ মাযহাবভুক্ত সুন্নী মুসলমান। তাহাদের অর্থনীতি গতানুগতিক চাষবাস ও ছাগল-মেষ চারণের উপর নির্ভরশীল। হস্তশিল্পে, বিশেষ করিয়া স্বর্ণকার হিসাবে কাপুচাগণের কিছুটা সুনাম আছে। জনসাধারণ

কেবল প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে, লেখ্য ভাষা হিসাবে আভার ও রুশ ভাষা ব্যবহার করে। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে তাহারা আভারদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। ১৯৫৯ ও ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত আদমশুমারীতে তাহাদিগকে আভারভাষী আভার হিসাবে দেখানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেখুন, আভার, দাগিস্তান, আল-কাবক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Bennigsen and H. C. d'Fncausse, Une republique sovietique musulmane; le Daghestan, apercu demographique in REI, xxdii (1955), 7-56; (২) Geiger et al., Peoples and languages of the Caucasus, The Hague 1959; (৩) Narodi Kavkaza, Academy of Seiences, Moscow 1962, i; (৪) S. A. Tokarev, Ethongrafiya Narodov S. S. S. R., Moscow 1958।

R. Wixman (E. I.[2])/নূরুল আমিন

কাপুদান পাশা (Kapuden Pasha) ঃ [Kapudan-i Derya], উছমানী নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়কের উপাধি। যদিও শব্দটি স্পষ্টত ইতালীয় শব্দ কাপিতানু (capitano) হইতে উদ্ভূত (শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে দ্র. H. and R. Kahane and A. Tietze, The Lingua Eranca in the Levant, Urbana 1958, 139 প.), কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, উছমানী নৌ-বাহিনী (দ্র. বাহরিয়্যা, ৩খ) কোন বিদেশী নৌ-সংগঠনের অনুকরণে গড়িয়া উঠিয়াছিল (দ্র. M. F. Kopruluzade, Bizans muesseselerinin Osmanli muesseselerine te'siri hakkinda bazi mulahazalar, in THITM, i (1931), 205-7; I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devletinin merkez ve bahriye teskilati, Ankara 1948, 389 প.]। মুহিম্মে দেফতেরি (Muhemme Defteri)-তে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ দৃষ্টে বলিতে হয়, 'কাপুদান পাশা' আখ্যাটির ব্যবহার প্রচলিত হয় ৯৫৭/১৫৬৭ সালের দিকে যখন আলজিয়ার্সের beglerbegi 'আলী পাশাকে Djezair beglerbegisi ve kapudan pasha-রূপে আখ্যায়িত করা হইল (দ্র. Muhimme, vol. 7., nos. 502, 507, 587, 782)। সুতরাং প্রকৃত অর্থে নৌ-বাহিনীর পূর্ববর্তী অধিনায়কগণকে কাপুদান পাশা নামে অভিহিত করা ভ্রমাত্মক। সর্বপ্রথম কাপুদান বেগ উপাধি (Basbakanlik Arsivi Kamil Keleci, Ruus register no. 214, p. 17) ধারণ করেন 'আলী পাশার পূর্বসূরী পিয়ালে (piyale) পাশা যাঁহাকে উযীরের পদমর্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল এবং এই কারণে দীওয়ানে তাঁহার একটি আসন ছিল (দ্র. I. A., শিরো. পিয়ালে পাশা, রচনা S. Turan)। পরবর্তী কালে তিনিই Djeza'ir beglerbegisi এবং vezir ve kapudan আখ্যায় পরিচিত হন (দ্র. যথা মুহিম্মে, ১খ. নং ২৭৬; ৬খ, নং ২১২; ৭খ, নং ১৫৮, ১৬০)।

প্রাথমিক যুগে গেলিবলু (দ্র. Gelibolu)-তে অবস্থিত নৌ-বহরের অধিনায়কের উপাধি ছিল দারয়া বেগি (দ্র. Derya Begi), যিনি যুগপৎভাবে গেলিবলুর লিওয়া' (Liwa')-এর সানজাকবেগি-র দায়িত্বও পালন করিতেন। ৯২৪/১৫১৮ সালের গেলিবলু রেজিস্টারে তথাকার নৌবহর অধিনায়কের পদবী 'রেঈস কাপুদান' লিখিত হইয়াছে (F. Kurtoglu, Gelibolu yoresi ve tarihi, Istanbul 1938, 51)। ৯২৩/১৫১৭ সালে সুলতান ১ম সালীম যখন ইস্তাম্বুলের "নূতন অস্ত্রাগারে" (new arsenal) [তেরসানে-ই 'আমিরি] জাফার কাপুদানের তত্ত্বাবধানে একটি নূতন বহর নির্মাণের আদেশ দেন তখন পর্যন্ত গেলিবলু ছিল প্রধান নৌঘাটি [তু. S. Tekindag, Halic Tersanesinde insa edilen ilk Osmanli donanmasi ve Cafer Kapudan'in arizasi, in Belgelerle Turk Tarihi Dergisi, no. 7 (Nisan 1969), 66-70]।

যখন Barbarossa (খায়রুদ-দীন দ্র.) ৯৪১/১৫৩৪ সালে সুলতানের চাকুরীতে যোগদান করেন তখন তাঁহাকে আল-জাযাইর (আলজিয়ার্স) বিলায়েত-এর বেগলারবেগলিক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী কালে এই বিলায়ত (ولاية) কাপুদান পাশার শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয় A. S. Ilter, Simali Afrika'da Turkler, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ৯৪ প.)। এই নূতন বিলায়াতের সহিত যুক্ত করা হয় Anadolu-এর beglerbeglik হইতে তিনটি সানজাক Kodja-eli, Sughla ও Bigha এবং Rumeli-র বেগলারবেগলিক রুমেলি হইতে এগরিবয, beglerbeglik হইতে পাঁচটি সানজাক — Eghriboz, Aynabakhti, Karli-eli, Mizister এবং Midilli (দ্র. জাযাইর-ই-বাহ্‌র-ই সাফীদ)। সানজাকরূপে গেলিবলু বহাল থাকে। পরবর্তীকালে সাইপ্রাস-এর দুইটি সানজাক এবং আরও (Guzeldje 'আলী পাশার সময়ে, যিনি ১০২৬/১৬১৭ ও ১০২৭/১৬১৮ সালে পরপর দুইবার কাপুদান-ই দারয়া ছিলেন) তিনটি সানজাক—Sakiz, Naksha ও Mehdiye ইহার সহিত সংযুক্ত হয়। ১১শ/১৭শ শতকের প্রথমার্ধে কাপুদান পাশার বিলায়াত ছিল মোট ১২টি সানজাক লইয়া গঠিত (তু. S. Turan, XVII, yuzyilda Osmsnli Imparatorlugunun Idari taksimati, in Ataturk Universitesi 1961 Yilligi, 204)।

কাপুদান পাশার বাসস্থান ছিল ইস্তাম্বুলের অস্ত্রাগারের (Arsenal) দীওয়ান খানে। তাঁহার প্রধান প্রধান কর্তব্য ছিল ঃ অস্ত্রাগার তদারক, 'উছমানী নৌ-বহরের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ, কাপুদান পাশার বিলায়াত-এর শাসন এবং বিলায়াতের প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ। এই দায়িত্বের চাহিদা ছিল, প্রতিটি সানজাক প্রতি বৎসর একবার পরিদর্শন করা। এতদ্ব্যতীত ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের বাণিজ্য জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের কবল হইতে রক্ষা করাও তাঁহার দায়িত্ব ছিল (তু. Tevki-i 'Abdurrahman Pasha Kanunnamesi, in MTM., ৩খ. [১৩৩১/১৯১২], ৫৩৬-৮)। প্রয়োজনে তিনি স্থলবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেন (দ্র. যথা Muhimme, ১৪০খ., নং ১৯৩; ১০৫খ., নং ৪৮-৪৯)।

কাপুদান পাশার পদ অত্যধিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। ১১শ/১৭শ শতকে ইহার বার্ষিক রাজস্ব আয় ছিল ৮৮৫,০০০ আক্‌চেস [akces] (Ewliya Celebi, সিয়াহাত নামা, ৫খ., ৩১৫; P. Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire, London 1668, 54)। আরও আয় হইত ৭০,০০০ কুরুশ যখন বিলায়াত-এর ৩৩টি ইলতিযাম-এর জন্য Voyvoda-কে দেওয়া হয় (Ewliya, ৫খ., ৩১৬, D'ohsson, Tableau General de l'Empire Ottoman, vii, Paris 1791, 442)। ১২শ-১৩শ/১৮শ-১৯শ শতকের শেষদিকে এই পরিমাণ

৩০০,০০০ কুরূশে উন্নীত হয়। 'উছমানী নৌ-বাহিনীর সাফল্য সর্বদা কাপুদানগণ, বিশেষত কাপুদান পাশাগণের নাবিকসুলভ যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল। ১০ম/১৬শ শতকে ভূমধ্যসাগরে 'উছমানী নৌবাহিনীর প্রাধান্য ছিল অনেকাংশে যোগ্যতাসম্পন্ন কাপুদানগণের কারণে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে 'উছমানী সাম্রাজ্য ইহার নৌ-প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে। যদিও নীতিগতভাবে একজন এডমিরাল (কাপুদান-ই হুমায়ূন) বা Arsenal প্রধান (Tersane Ketkhudasi) অথবা অন্ততপক্ষে Rhodes-এর Sandjak-beyi কাপুদান পাশা পদের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে প্রার্থীর কর্মক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া নিয়োগ করা হইতে থাকে। ১০১৪/১৬০৫ সালে দারবীশ পাশা নামক প্রধান মালী (বোস্তানজী বাশী) উযীরের পদমর্যাদাসহ কাপুদান-ই দারয়া পদে নিযুক্ত হন (তু. C. Orhunlu Osmanli tarihine aid belgeler: Telhisler, Istanbul 1970, 118)। Janissary বাহিনীর জনৈক অফিসারকেও এক সময়ে কাপুদান পাশা পদে নিযুক্ত করা হয়, যদিও পূর্ব সাফল্যের বিবেচনায় হাসান কাপুদান ছিলেন যোগ্যতর প্রার্থীরূপে বিবেচিত (তু. Topkapi Sarayi Arsivi, Istanbul, nos. E. 4846 and 10321)।

সুলতান ৩য় সালীম-এর আমলে ১৮০৪ সালে নৌবাহিনীর পুনর্বিন্যাসকালে অস্ত্রাগার প্রধানের পদ রহিত করা হয় এবং নৌ-বিষয়ক ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়কের (উমূর-ই বাহ্রিয়্যা নাজারাতি) দফতর স্থাপন করা হয় [সাফবেত, উমূর-ই বাহ্রিয়্যা নেজারাতি, in TOEM, নং ২১, ১৩২৯/১৯১১, ১৩৫০-১]। ১৮৬৩ সালে কাপুদান পাশার পদবী পরিবর্তন করিয়া উমূর-ই বাহ্রিয়্যা নাজিরি করা হয়। চারি বৎসর পর উর্ধ্বতন এডমিরাল (বাশ আমিরাল) 'উছমানী নৌবাহিনীর অধিনায়ক হন এবং নৌবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রী বা বাহরিয়্যা নাজিরি নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাপুদান পাশার দফতর সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্যসমূহ রহিয়াছে ইস্তাম্বুলের Basbakanlik Arsivi-তে, নৌবাহিনী সংক্রান্ত দলীলপত্রাদি পাওয়া যাইবে তিনটি শ্রেণীবিন্যাস (Classifications)-এ, Cevdet, Kamil Kapeci and ibnu'l Amin, যাহা ১০ম/১৬শ শতক হইতে ১৯শ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত। একই আর্কাইভস-এ রক্ষিত ৯৬১/১৫৬৪ হইতে ১৩০০/১৮৮২ সাল পর্যন্তের Muhimee Register-গুলিও প্রণিধানযোগ্য। Topkapi প্রাসাদ আর্কাইভে রক্ষিত কাপুদান পাশা সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য দ্র. Arsiv Kilavuzu, ১-২খ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ খৃ.। অন্যান্য সূত্র ঃ (২) E. Alberi, Relazioni degli ambasciatori Veneti al Senado Series iii, Florence 1840-55, i, 20, 67, 136, 423, ii, 335, iii, 263; (৩) Pecewi, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮১-৮৩/১৮৬৪-৬৬, ১খ, ৪৮৬, ২খ, ২৫, ৯১, ২৮৫, ২৯২, ৩৩৩, ৩৪৪, ৩৫৪, ৪৬০; (৪) কাতিব চেলেবি, তুহ্ফাতুল-কিবার, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১১, স্থা.; (৫) সিলাহদার, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩২৮/১৯১০, ২খ., ২৫৩; (৬) Marsigli, L'Etat Militaire de l'Empire Ottoman, Amsterdam 1732, ১খ, ১৪৬; (৭) আহমাদ জাওদাত, তা'রীখ, ১২খণ্ড, ইস্তাম্বুল ১৩০৯/১৮৯১, স্থা.; (৮) মুহাম্মাদ হাফীদ, সাফীনাতু'ল-উযারা', ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ. (সম্পা. I. Parmaksizogle); (৯) M. Shukru, Esfar-i Bahriyyei Othmaniyye; (১০) ইস্তাম্বুল ১৩০৬/১৮৮৮, মুহাম্মাদ রাঈফ, মিরআত-ই ইস্তাম্বুল ১৩১৪/১৮৯৬, ৪৭৪ প.; (১১) এস. নুত্কী, কামূস-ই বাহরী, ইস্তাম্বুল ১৯১৭ খৃ.; (১২) I. H. Uzuncarsili, Osmanli devletinin Merkez ve Bahriye teskilati, Ankara 1948. 414-22; (১৩) N. Goyunc, কাপুদান-ই দারয়া কূচুক হুসায়ন পাশা, in Tarih Dergisi, ২/৩-৪খ. (ইস্তাম্বুল ১৯৫০-১ খৃ.), ৩৫-৫০; (১৪) H. Y. Sehsuvaroglu, Deniz tarihimize ait makaleler, Istanbul 1965; (১৫) S. Shaw, Selim III and the Ottoman Navy, in Turcica, i (Paris 1969), 212-41; (১৬) I. A., দ্র. কাপতান পাশা (by I. Parmaksizoglu)।

S. Ozbaran (E.I.[2])/নূরুল আমিন

কাফ (ق — قاف) ঃ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত মুকাত্তা'আত (দ্র.) হরফগুলির অন্যতম এবং কুরআন কারীমের একটি সূরার নামও বটে, যাহার তিলাওয়াত ক্রম ৫০ এবং নাযিল ক্রম ৩৪ (আল-কাশ্শাফ, ৪খ, ৩৭৯; আল-ইতকান, ১খ, ১০; লুবাবু'ত-তা'বীল ফী মা'আনি'ত-তানযীল, ১খ, ৮ প.)। এই সূরার অপর নাম আল-বাসিকাত যাহা ইহার ১০ম আয়াতে উল্লিখিত একটি শব্দ (রূহুল-মা'আনী, ২৬খ, ১৭০)। অধিকাংশ 'আলিমের মতে এই সূরার সকল আয়াতই মাক্কী। ইব্ন 'আব্বাস (রা) এবং কাতাদা (র) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, ইহার ৩৮তম আয়াত মদীনা মুনাওয়ারায় য়াহূদীদের এই ভ্রান্ত আকীদা অপনোদনের জন্য নাযিল হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সপ্তম দিন অর্থাৎ আস-সাবত (শনিবার)-এ বিশ্রাম করিয়াছেন (আল-কাশ্শাফ, ৪খ, ৩৯২; রূহুল-মা'আনী, ২৬খ, ১৭০; ফাতহু'ল-বায়ান, ১০খ, ৯০)। এই সূরায় তিনটি রুকূ' এবং পঁয়তাল্লিশটি আয়াত রহিয়াছে। আল-খাযিন-এর বর্ণনামতে ইহাতে ৩৫৭টি শব্দ এবং ১৪৯৪টি অক্ষর রহিয়াছে (লুবাবু'ত-তা'বীল, ৪খ, ১৮৬)।

পূর্ববর্তী সূরার সহিত ইহার যোগসূত্র সম্পর্কের জন্য দ্র. রূহুল-মা'আনী (২৬খ, ১৭০ প.); তাফসীরু'ল-মারাগী (২৬খ, ১৫০), আল-বাহরু'ল-মুহীত (৮খ, ১১৮) এবং শান-ই নুযূল-এর জন্য দ্র. আসবাবু'ন-নুযূল (পৃ. ২৬৬)। এই সূরার তাফসীর সম্পর্কীয় হাদীছসমূহের জন্য দ্র. আদ-দুররু'ল মানছূর ফিত-তাফসীরি'ল-মা'ছূর (৬খ, ১০১); ইহার আয়াতসমূহ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত সম্পর্কে দ্র. তাফসীর কাবীর (৭খ, ৫৮৭) এবং আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরি'ল-কুরআনি'ল-কারীম (২৩খ, ৪প.); সুলূক ও তাসাওউফ-এর মাসআলার জন্য দ্র. ইবনু'ল-'আরাবী, তাফসীর (২খ, ১৩০), বর্ণনাভঙ্গীর অলংকারিত্ব ও ই'জায এবং নূতন বিষয়াদির জন্য ফী জিলালি'ল-কুরআন (২৬খ, ১৫৩); ইহার বিভিন্ন আয়াত দ্বারা শারী'আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম এবং ফিকহী মাসআলা বাহির করার জন্য দ্র. ইবনু'ল-'আরাবী, আহকামু'ল-কুরআন (পৃ. ১৭১৫) এবং আল-জাসসাস, আহকামু'ল-কুরআন (৩খ, ৪০৯)।

এই সূরা শুরু হইয়াছে কাফ হরফ দিয়া যাহা আল্লাহ্র গুণবাচক নাম আল-কাদির-এর প্রথম অক্ষর (রূহুল-মা'আনী, ২৬খ, ১৭১ প.)। ইহা দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ইসলামের পয়গাম আল্লাহ্র নাযিলকৃত যিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান; ফলে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও সফলতা অবশ্যম্ভাবী। প্রাথমিক আয়াতসমূহে কাফিরদের নবূওয়াত এবং কিয়ামতের অস্বীকৃতি ও উহার খণ্ডনের উল্লেখ

রহিয়াছে। অতঃপর মানুষকে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিসমূহে নিহিত আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, যিনি এতই ক্ষমতাবান তিনি নবূওয়াত দান করা এবং কিয়ামত সংঘটন করার ক্ষমতাও রাখেন।

ইহার পর 'আদ (দ্র.) ও ছামূদ (দ্র.) জাতি এবং আসহাবু'ল-আয়কা (দ্র.)-র ঘটনা বিবৃত করিয়া বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং মানুষকে বলা হইয়াছে যে, সেই সর্বশক্তিমান যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর, তাঁহার নিকট কোনও অপ্রকাশ্য ও গোপন আমলই গোপন থাকে না এবং একদিন তিনি অবশ্যই ইহার হিসাব লইবেন। ইহার নিশ্চিত বিশ্বাস অবিশ্বাসী মানুষের তখনই হইবে যখন কিয়ামতের দিন তাহার সম্মুখে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। অতঃপর ইহাতে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি এবং কুরআন কারীম-এর উপদেশমূলক গ্রন্থ হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁহার দাওয়াতী কাজ চালু রাখার জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে (তাফসীরুল-মারাগী, ২৬খ., ১৭২; ফী জিলালি'ল-কুরআন, ২৬খ., ১৫৩ প.)। রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাফ তিলাওয়াত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা লাঘব করিয়া দিবেন (আল-কাশশাফ, ৪খ., ৩৯৪; তাফসীরুল-বায়দাবী, ২খ., ২২৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আদ-দুররুল-মানছূর ফিত-তাফসীরিল-মাছূর, কায়রো ১৩২৬ হি.; (৩) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, কায়রো ১৯৪৬; (৪) সিদ্দীক হাসান খান, ফাতহুল-বায়ান, কায়রো সং; (৫) তানতাবী জাওহারী, আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল-কুরআনিল-কারীম, কায়রো সং.; (৬) আবূ বাক্র আল-জাসসাস, আহকামুল-কুরআন, কায়রো ১৩২৩ হি.; (৭) আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, কায়রো সং.; (৮) আল-খাযিন, লুবাবু'ত-তা'বীল ফী মা'আনি'ত-তানযীল, কায়রো ১৩২৬ হি.; (৯) আল-কুরতুবী, আল-জামিল-আহকামিল-কুরআন; (১০) মুহয়িদ্-দীন ইবনুল 'আরাবী, তাফসীর ইবনিল-'আরাবী, কায়রো ১৩১৭ হি.; (১১) আল-বায়দাবী, আনওয়ারুত-তানযীল, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (১২) ইবনুল-আরাবী, আহকামুল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (১৩) আল-মারাগী, তাফসীরুল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (১৪) আবুল-হাসান আন-নায়সাবুরী, আসবাবুন্-নুযূল, কায়রো ১৯৬৬ খৃ.; (১৫) সায়্যিদ কুতুব, ফী জিলালিল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.।

জাহুর আহ্মাদ আজহার (দা.মা.ই.)/ড. আবদুল জলীল

কাফ (ك) ঃ আরবী বর্ণমালার ২২তম, ফারসীর ২৫তম এবং উর্দুর ২৮তম বর্ণ। আবজাদ (দ্র.) হিসাবে অক্ষরটির সংখ্যামান ২০। ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ নিঃসরিত নহে কিন্তু জোরদার (explosive)। প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ সীবাওয়ায়হ্-এর যুগ হইতে শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় বর্ণটির উক্তরূপ উচ্চারণ শ্রুত হয়। আজকাল প্রচলিত ভাষায় উহার ভিন্নতর উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয়, বিশেষত বর্ষণজনিত (affricate) উচ্চারণ, যাহা হইতে چ ق এবং তথা হইতে C' K' গঠিত হয়। দ্র. 'আরব নিবন্ধে 'আরবী বোলীয়া এবং Schaade, Sibawaih's lautlehre।

A. Schaade (দা. মা.ই.)/নাসীর আহ্মাদ

কাফ (قاف) ঃ মুসলিম মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে একটি পর্বতমালার নাম যাহা পার্থিব জগতকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই ধারণাটি যে ইরানে প্রচলিত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য হইতে গৃহীত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ খুব কমই আছে। এই ধারণা অনুযায়ী বলা হয়, পৃথিবীর প্রান্তদেশে আছে অতিকথা বা কিংবদন্তীর আলবুর্য (দ্র.) পর্বত যেখানে দেবতাদের অধিবাস। পৃথিবীর অন্য সকল পাহাড়-পর্বতই আলবুর্য পর্বতমালা হইতে উদ্ভূত; ভূপৃষ্ঠের নিচ দিয়া আলবুর্য পর্বতমালার সহিত সকল পাহাড়-পর্বতের শাখা-প্রশাখার সংযোগ রহিয়াছে। এই আলবুর্য পর্বত (অত্যুচ্চ পর্বত ঃ হারাবেরেযায়তি) সমগ্র পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া আছে। আর কেবল পৃথিবী নয়, উহা উরুকাশা নামে একটি হ্রদকেও ঘিরিয়া আছে। অবশ্য বুন্দাহিশ্ন-এর বিবরণ অনুযায়ী খোদ এই হ্রদটি পৃথিবীর কিনারে সীমিত, উহা পৃথিবীর চতুর্দিকে বেষ্টনীর আকারে পরিবেষ্টিত নয়। উল্লিখিত একই রচনায় ঐসব অতিকথামূলক অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনা দান প্রসঙ্গে একটি পর্বতের নাম করা হইয়াছে। পর্বতটির নাম 'কাফ' (তু. Windischmann, Zoroastrische Studien, Berlin 1863, 7, 73, 75, n. 1)। ঐ ভৌগোলিক বিবরণে আবার একটি পর্বতের কথা উল্লিখিত পর্বতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। তবে এই পর্বতের সীমা বা দিগন্তরেখা কেবল 'ইরানী দুনিয়াতেই' সীমিত, এই ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বকে হিসাবে ধরা হয় নাই। এখানে আলবুর্য হইতেছে এক পর্বত প্রাচীরবিশেষ যাহা ইরানের উত্তর সীমাবেষ্টনী নির্দেশ করে।

নিঃসন্দেহে এই আলবুর্যই হইতেছে সেই পর্বত, য়াকূত (৪খ., ১৮) যাহার ব্যাপারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আগে কাফ পর্বতকে আলবুর্য পর্বত নামে অভিহিত করা হইত (আরও তু. মুসতাওফী, নুযহাতুল-কুলূব, GMS, xxiii, i, 191-2)। Geiger (Ostiranische Kultur im Altertum, Erlangen 1882, 42-3) মনে করেন, গোড়াতে উরুকাশা হ্রদ বলিতে একটি নির্দিষ্ট স্থান (আরল বা কাস্পিয়ান সাগর হ্রদ)-কে বুঝাইত। কিন্তু উহার পর আভেস্তার যুগ হইতে ঐ হ্রদ অতিকথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আলবুর্য-হারাবেরেযায়তী পর্বতমালা ও উরুকাশা। হ্রদ (তারুকাশা) সম্পর্কে তু. Ritter, Die Erdkunde oder allgemeine vergleichende Geographie, Berlin 1822-9, viii, 42-3; F. Spiegel, in ZDMG, vi, 85, ও Eranische Altertumskunde, i, Leipzig 1871, 191 প.; W. Gieger, পূ. গ্র., 42-3; F. v. Adrian, Der Hohenkultus asiatischer und europaischer volker, Vienna 1891, 287-8.

ইরানী মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত হিন্দু বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে, বিশেষত হিন্দুদের পুরাণগুলিতে মহাবিশ্ব সৃষ্টিসম্পর্কিত কিংবদন্তীতে 'লোকালোকা' নামে এক পর্বতমালার উল্লেখ রহিয়াছে যে পর্বতমালা দৃশ্যমান জগত হইতে দৃষ্টির অগোচরে বিশ্বকে পৃথক করিয়াছে। আর এই লোকালোকা পর্বতমালা নিগূঢ় তমসালোকের ঊর্ধ্বে বিরাজমান। লোকালোকা পর্বতমালা সম্পর্কে তু. Spiegel, in ZDMG, vi, 86; J. Dowson, classical Dictionary of Hindu Mythology, London; জৈন মতবাদ অনুযায়ী পুসকার ওয়ারা মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত চক্রাকার মানুসোত্রা পর্বতই হইতেছে মানব সভ্যতার শেষ সীমানা; তু. Jacobi, in ZDMG, lx, 312।

সাধারণত পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে পর্বত বেষ্টনীর ধারণাটি আদি প্রাচ্যে অত্যন্ত বহুল প্রচলিত এক বিশ্বাস যেমনটি ইন্দো-ইরানী ধ্যান-ধারণায়

আমরা দেখিতে পাই। সম্ভবত চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহার আদি উৎসের সন্ধান ব্যাবিলনীয় মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে পাওয়া যাইতে পারে; তু. F. Delitzsch, Wo lag das paradies ? Leipzig 1881, 29, 117-8; F. Hommel, Aufsatze und Abhandlungen, ii, Munich 1900, 245-6; Zimmern, Die Keilinschriften und das alte Testament, Berlin 1903, 353, 355, 620. একই ধারণাসমূহের আখ্যান প্রাচীন হিব্রু রচনাসমূহেও পাওয়া যায়, তু. W. Gesenius, Kommentar uber deJesaia, ii, Leipzig 1821, 316-7 (এই সূত্রগুলিতে বাইবেল বহির্ভূত পরিসরে যেসব সামঞ্জস্যশীল মতামত পাওয়া যায় সেগুলিও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে); Dillmann-Kittel, Der Prophet Jesaia, Leipzig 1898, 134. আর হিন্দু পৌরাণিক মতবাদের দিকে পরিশেষে দৃকপাত করিলে দেখা যায়, সাধারণ বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে মেরুকে পৃথিবীর কেন্দ্র তথা নাভি মনে করা হয় (তু. W. Foy, in Festschrift E. Windisch, Leipzig 1914, 213-4; E. W. Hopkins, Epic Mythology, Strasbourg 1915, 253, নির্ঘন্ট; Roscher, Neue Omphalos-Studine, Leipzig 1915, 72)। এই 'কেন্দ্র' বা নাভি উল্লিখিত মতবাদ অনুযায়ী কোনও কোনও সময় মনে করা হয়, হিমালয় পর্বতমালা যাহা হিন্দু বিশ্বজগতকে উত্তর দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, গ্রীকগণও অলিম্পাস (Olympus) পর্বতকে তাহাদের দেবতাদের আবাস বলিয়া মনে করিত। আর ঐ পর্বতের অবস্থানও ছিল থেসালীতে (Thessaly) গ্রীক কল্পিত বিশ্বজগতের উত্তরে। Gesenius (পূ. গ্র., ৩১৭) ও Rosenzweig [জামী রচিত য়ুসুফ উ-যালীখা (যুলায়খা) গ্রন্থের তাঁহার নিজ সংস্করণ, Vienna ১৮২৪ খৃ., পৃ. ১৮৫] উপলব্ধি করিতে সক্ষম যে, কাফ পর্বতের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে মুসলিমগণ পূর্ব নজীর হইতে সাহায্য লইয়াছেন। এসব ধ্যান-ধারণার মধ্যে ইন্দো-ইরানী প্রচলিত কাহিনীই সর্বপ্রাচীন, যে সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছি।

প্রাচীন মুসলিম বিশ্বের সচরাচর প্রবণতা অনুযায়ী উল্লিখিত ধারণাগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, মুসলিমগণ প্রাচীন হিব্রু জাতির ও গ্রীকদের অনুসরণে পৃথিবীকে একটা সমতল চাকতি হিসাবে কল্পনা করেন। এই ধারণাটি জনসাধারণের ঐতিহ্যিক বিশ্বাস ও চেতনায় লক্ষ্য করা যায়। কাফ পর্বত ঐ ধরনের এক পার্থিব চাকতি হইতে এমন এক অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন যাহা মানুষের অতিক্রমের সাধ্য নাই। এই অঞ্চল বা এলাকাটি তমসাচ্ছন্ন এবং উহা পদব্রজে পার হইতে কয়েক মাস লাগিয়া যাইবে (তু. তাবারী-বাল'আমীর ফারসী ভাষ্য, অনু. Zotenberg, i, Paris 1867, 33) তবে কাফ পর্বত কেবল পৃথিবীকেই পরিবেষ্টন করিয়া নাই, ইহার পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী সমুদ্রকেও ঘিরিয়া আছে।

বিশেষত মুতাহ্হার ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী, য়াকূত, কাযবীনী ও ইব্নুল-ওয়ারদীর বিবরণ অনুযায়ী কাফ পর্বত সবুজ পান্না দ্বারা গঠিত। আকাশ ঐ পর্বতের সবুজ রংকে প্রতিফলিত করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যরা বলেন, কাফ পর্বত যে শিলার উপর অবস্থিত উহাই কেবল পান্না দ্বারা গঠিত। এই শিলাকে (আস-সাখ্রা) একটি অবলম্বন বা বুনিয়াদ (ওয়াতাদ) হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ্ এই পর্বতকে পৃথিবীর ভার ধারণ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা না থাকিলে পৃথিবী আপন কক্ষে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। আর এই কারণেই তাবারীর ফারসী ভাষ্যে বলা হইয়াছে, কাফ পর্বতের অস্তিত্ব না থাকিলে পৃথিবী মুহুর্মুহু কাঁপিতে থাকিত। ফলে পৃথিবীর কোনও প্রাণীই টিকিতে পারিত না। পবিত্র কুরআনে (১৩ ঃ ২ স্থা.) পৃথিবীর নির্মাণ কাঠামোতে পর্বতগুলি ভারসাম্য বিধানকারী কীলকের ভূমিকা পালন করে বলিয়া উল্লিখিত আছে।

পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উহার সমর্থনমূলক অন্যান্য যে ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলির সঙ্গে এই কাফ পর্বতের যুগপৎ অস্তিত্ব বর্তমান। কাযবীনীর (১খ, ১৪৬) বর্ণনায় এক কাহিনীতে আছে কী করিয়া সৃষ্টির প্রথম যুগে পৃথিবী সর্বদিকে ঘূর্ণায়মান ছিল। আল্লাহ্ ঐ অবস্থায় একজন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেন। ঐ ফেরেশতা পৃথিবীকে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া হাত দিয়া আঁকড়াইয়া রাখেন (গ্রীক অতিকথা ঃ Atlas-এর সঙ্গে তুলনীয়)। এদিকে ঐ ফেরেশতা যাহার উপর ভর করিয়াছিলেন তাহা ছিল সবুজ (hyacinth) প্রস্তর গঠিত এক শিলার উপর। ঐ শিলাটি আবার এক বিশাল আকার ষাঁড়ের দেহের উপর যে ষাঁড়টি আবার পানিতে সন্তরণরত একটি মাছের উপর দণ্ডায়মান। ইব্নু'ল-ওয়ারদী এই কাহিনীটিরই পুনরাবৃত্তি (পৃ. ১২, ৫-৬) করিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাফ পর্বতের মূল ভিত্তি 'hyacinth' প্রস্তর শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যত্র আবার এই একই গ্রন্থকার (১৩, ১৭-৮) পৃথিবী যেসব বস্তুর উপর ভর করিয়া আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয় তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন; তবে এই শেষোক্ত বর্ণনায় পৃথিবীর অবলম্বন হিসাবে ফেরেশতা অনুপস্থিত এবং ইতিমধ্যেই যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের অবস্থান ও মর্যাদা ভিন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে। অন্যান্য তারতম্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন A. J. Wensinck, The Ocean in the literature of the western Semites, in Verh. Ak Amst., Phil Sect., new series, xix/2 (1918), 18 ও n. 2 এবং J. Meyer, Die Holle im Islam, Basle 1901, 46. ইরানী মুসলিমগণ পৃথিবীকে স্কন্ধেধারী প্রাণীটিকে এখন ষাঁড় বলিয়া বর্ণনা করেন (তু. জামী, পূ. গ্র., ১৩; Rosenzweig, পূ. গ্র., 190b; Vullers, Lex. Pers.—Lat., ii, 946a), যাহা বর্তমানে একটি ষাঁড় ও মাছের মিশ্রণে সংকর প্রাণী (তু. ফিরদাওসী, শাহ্নামাহ্, সম্পা. Vullers-Landauer, Leiden 1877-84, 38, 444, Vullers, Lex Pers.—Lat, ii, 947a)। অনুরূপভাবে বাগদাদে বহুকাল ধরিয়া এই মর্মে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, একটি ষাঁড় ও মাছের উপর পৃথিবী দাঁড়াইয়া আছে (তু. H. Perermann, Reisen im Orient, ii, Leipzig 1861, 301)। লোহিত সাগর তীরের দেশগুলিতে জনসাধারণের মাঝে এই মর্মে জোরালো বিশ্বাসের বহুল প্রচলন রহিয়াছে যে, পৃথিবী একটি বিশালাকায় এক ষাঁড়ের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে (তু. E. Ruppel, Reise in Abyssinien, i, Frankfurtam-Main 1838, 256)। কাযবীনী এই ষাঁড় ও মাছের নাম বাইবেলে বর্ণিত এক ধরনের অতিকায় দানব সদৃশ প্রাণী Leviathan ও Behemoth নামে নামকরণ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি প্রমাণ দিয়াছেন, যে ধারণাগুলি মুসলিম দুনিয়ার ধারা ঐতিহ্যে গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রাচীন বাইবেলীয় ধ্যান-ধারণার সহিত সম্পর্কিত। আবার বাইবেলের ধ্যান-ধারণাগুলি ব্যাবিলনীয় বিশৃঙ্খল মহাবিশ্ব ধারণার সহিত সম্পর্কিত। অন্যদিকে আবার পৃথিবীর ভারবাহী ষণ্ড সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার সন্ধান

ভারতেও পাওয়া যায়। যে শিলার উপর কাফ পর্বত অবস্থিত নিঃসন্দেহে উহা য়াহূদী কিংবদন্তীতে বর্ণিত Shetiyya শিলার সহিত অভিন্ন। য়াহূদী কিংবদন্তী অনুযায়ী ঐ শিলাটি বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর কেন্দ্র বা নাভিশিলাবিশেষ যাহা আল্লাহ্ পৃথিবীর স্থিতি মযবুত করিবার জন্য বিশৃঙ্খল মহাবিশ্বের মাঝে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন [এই কিংবদন্তীর জন্য তু. Feuchtwang in MGWJ, liv (1910), 724-5; W. H. roscher, পূ. গ্র., 73-4]। অবশ্য ইহা এখানে একান্তভাবেই মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর ভার ধারণ করার এই সব আখ্যানের অবসান হিসাবে একটি ভিন্ন ধারণা বা বিশ্বাসও প্রচলিত রহিয়াছে (কাযবীনী, ১খ, ১৪৪)। উহাতে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ পৃথিবীর চতুর্দিকে কোন বেষ্টনী বা উহাকে স্থিতি দিবার কোনও ব্যবস্থা না দিয়াই মহাবিশ্বে উহাকে স্থাপন করেন।

কাফ পর্বতকে বিশ্বের সকল পর্বতমালার উৎস মনে করা হয়। ঐসব পর্বত ভূ-নিম্নস্থ শাখা-প্রশাখায়নের সূত্রে মূল কাফ পর্বতের সহিত যুক্ত। আল্লাহ্ যখন পৃথিবীবাসী মানুষকে শাস্তি দিতে চাহেন কিংবা কোনও দেশকে ধ্বংস করিতে চাহেন তখন তিনি ভূনিম্নস্থ ঐ পর্বতগুলির কোনও একটিকে নাড়া দেন। ফলে পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। অন্যরা মনে করেন, যে ষাঁড়টি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে সে কখনও পৃথিবীর ভার অসহ্য মনে হওয়ায় লাথি ছুঁড়িতে থাকে। ফলে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, কাফ শৃঙ্খলাময় মহাবিশ্বে এক অতীব জরুরী ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। এই আদি পর্বত সূর্যের গতিপথ অবলোকন করিতে সক্ষম। কথিত ধারণা অনুযায়ী কাফ পর্বতের আকৃতিতে এক ধরনের মানুষের আদল আছে। মানুষের মত ইহার মস্তক ও মুখমণ্ডল রহিয়াছে।

এই কাফ পর্বত মানুষের অনধিগম্য। ইহা পৃথিবীর প্রান্তদেশ নির্দেশ করে। সেইজন্য এই কাফ নামটি দিয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তকেই কার্যত বুঝানো হইয়া থাকে (তু. দৃষ্টান্তস্বরূপ জামী, পূ. গ্র., ১)। কেহই জানে না ঐ পৃথিবী প্রান্তের পরপারে কী আছে। তবে কেহ কেহ পরপারে অনন্ত জীবনময় জগত আছে—বলিতে চাহিয়া উহার আবার বিশদ বর্ণনাও দিয়াছেন। তাহাদের এই বর্ণনায় আছেঃ কাফ পরপারে যে দেশটি আছে তাহা রৌপ্যের মত শুভ্র। যে অঞ্চল জুড়িয়া ঐ দেশটির অবস্থান তাহা পদব্রজে পার হইতে লাগে ৪০ দিন। ফেরেশতাগণ এই দেশের অধিবাসী। কাফের পরপারে বিস্তৃত আছে একটি স্বর্ণময় দেশ, ৭০টি রৌপ্যময় দেশ আর কস্তুরী মৃগনাভির সুগন্ধিময় সাতটি দেশ। এই দেশগুলির এক একটি পরস্পরের দিকে এমন অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত যাহা ভ্রমণ করিয়া পার হইতে ১০ হাজার দিনেরও বেশী সময় লাগিবে। এই দেশগুলির প্রতিটিতে ফেরেশতাগণের বাস। কাফ পর্বতসহ উহার পরপারের সকল দেশে জিন্‌ন জাতিও বাস করে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সর্বোপরি কাফ পর্বতকে কিংবদন্তীর সীমুরগ' পাখির নিবাস মনে করা হয়। এই সীমুরগ' পাখিটি কার্যত এক ধরনের ঈগল-সিংহের মিশ্রিত আদলবিশিষ্ট অলীক পাখি, যাহার সহিত আরবদের 'আনকা' (দ্র.) পাখির মিল রহিয়াছে। পৃথিবীর সূচনা হইতে এই আশ্চর্য পাখিটি অস্তিত্বমান। পরে এই পাখিটি কাফ পর্বতের একান্ত নির্জনে চলিয়া যায় এবং সেখানেই অবস্থান করে। পাখিটির বিচক্ষণতার খ্যাতি আছে। আর তাই এই পাখিটি প্রাচীনকালের বাদশাহ ও বীরদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিত। বিভিন্ন রচনায়, বিশেষত কাব্যে কাফ ও উহার অবস্থানস্থলকে "জ্ঞানময় পর্বত" বা "আত্মতুষ্টিময় পর্বত" বলিয়া বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। মানতিকু'ত-তায়র কাব্যগ্রন্থে ফারসী কবি ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার (দ্র.) একজন সূফী সাধকের সাতটি স্থান হইয়া ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণের এক অধ্যাত্মবাদী কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন। কাহিনীটি মরমী, আর তাই স্বভাবতই রূপকাশ্রয়ী। ইহার মাধ্যমে মরমী সাধকের রূহ কীভাবে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে পৌছিয়া তাঁহার সহিত সম্পূর্ণভাবে লীন হইয়া যাইবার আগে সাতটি স্থানে দুরূহ ও রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ভ্রমণটি রূহ সম্পন্ন করে একটি পার্থিব দেহাকৃতিতে। ঐ পাখি সাতটি উপত্যকা পার হইয়া কাফ পর্বতে পৌছায় যেখানে অত্যন্ত জ্ঞানী বাদশাহ সীমুরগ' তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

এই কাফ নামটি সাহিত্যের নানা কাহিনীতেও একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। আরব্য রজনীর কাহিনীগুলিতেও এই কাফ পর্বতের উল্লেখ (৪৮৬, ৬২৪ ও ৭৭৮তম রজনীর কাহিনীতে) পাওয়া যায়। কুরআনের কোনও কোনও তাফসীরকারক কুরআনের ৫০ নং সূরার শীর্ষে প্রদত্ত কাফ হরফটি বলিতে কাফ পর্বতকে নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন (R. Blachere, Introduction au Coran, Paris 1959, 147-এ সূত্রগুলি উল্লিখিত)।

বিশুদ্ধার্থে পার্থিব ভূগোল কাফ পর্যন্ত পর্বত বলিতে (এখন আর কাফ পর্বত মহাবিশ্বে সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু নয়) মুসলিম দুনিয়ার সর্বোত্তম প্রান্তে যে উচ্চ এশীয় পর্বতমালা রহিয়াছে সেইগুলিকে, বিশেষত ককেসাস পর্বত এবং উত্তর পারস্যের পর্বতমালাকে বুঝান হইয়া থাকে। আর এই কারণেই শাহনামা কাব্যে দামারওয়ান্দ নামে যে স্থানটিকে প্রাচীন ইরানের সার্বভৌম শাসক, বাদশাহ ও বীরদের নানা বিস্ময়কর কার্যকলাপ ও অভিযানের স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেই স্থানটিকে সীমুরগের দেশ বলিয়াও নির্দেশ করা হয়। মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিসরের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সকল ধারণার গুরুত্ব লঘু হইয়া আসে। তবে বিশেষ করিয়া ককেসাস পর্বতমালা দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্তের কাহিনীগুলির মঞ্চ হিসাবে থাকিয়া যায়।

এখন চূড়ান্তভাবে কাফ সম্পর্কিত মুসলিম ধ্যান-ধারণা ও মানদীয় (Mandacans)-দের ধারণার মধ্যকার সম্পর্কটি লক্ষণীয়। মানদীয়দের মতে, চাকতির আকৃতিবিশিষ্ট পৃথিবীর একমাত্র উত্তর-প্রান্ত ছাড়া অন্য সকল দিক সাগরবিধৌত (তু. H. Petermann, পূ. গ্র., পৃ. ৪৫২)। উত্তর প্রান্তে বিশুদ্ধ নীলকান্ত প্রস্তর গঠিত এক বিশাল পর্বত সমুদ্রকে পৃথিবী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আর এই নীলকান্তমণির পর্বতের প্রতিবিম্বনের কারণেই আকাশের রং নীল, অপরপক্ষে de Goeje (তু. তাবারী ভূমিকা CDXXXVII) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবত মানদীয়গণই মহাবিশ্বের গঠন সংক্রান্ত এই ধারণাটি ইসলামী সূত্রসমূহ হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মূল পাঠে প্রদত্ত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) ইব্‌ন রুসতা, পৃ. ২৩-৪ ; (২) য়াকূত, ১খ, ১৫৪ ; (৩) আবু'ল-ফিদা, তাকবীম, ১৯, ৩৭৬ ; (৪) কাযবীনী, 'আজাইবু'ল-মাখলূকাত (সম্পা. Wustenfeld), ১খ, ১৭০; (৫) ইবনু'ল-ওয়ারদী, খারীদাতুল-'আজাইব, কায়রো ১৩২৪ হি., ১৩, ১১৮; (৬) ছা'লাবী, কিসাসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫ হি., ৪; (৭) মুতাহ্‌হার ইব্‌ন তাহির আল-মাকদিসী, কিতাবু'ল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, সম্পা. Huart, ২খ, ৬, ৩৫-৬, ৪৪-৬, ৩খ, ১৪০, ১৪৬; (৮) Vullers, পূ. গ্র., ২খ, ৭০৬; (৯) Gesenius, পূ. গ্র., ৩২৩-৪; (১০) Rosenzweig, পূ. গ্র., ২০০; (১১) Lane-Zenker, পূ. গ্র., ৩০, ২৩২, ২৩৫; (১২) Reinaud, আবু'ল-

ফিদা'-র তাকবীম-এর মুখবন্ধ, অনু., i, clxxi-ii; (১৩) A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad, ii, Berlin 1862, 469-70; (১৪) A. J. Wensinck, পূ. গ্র., ১৭-৮; (১৫) ঐ লেখক, The ideas of the western Semites concerning the Navel of the earth, in verh. Ak. Amst., xvii (1), 5-6, 37-8।

M. Streck [A. Miquel] (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

কাফ (قاف - ق) ঃ আরবী বর্ণমালার ২১তম (ফারসীতে ২৪তম ও উর্দূতে ২৭তম) বর্ণ, 'ক'রূপে বাংলায় অনুলিখিত, পূর্বদেশীয় ক্রম অনুযায়ী সাংখ্যেয় মান ১০০ (দ্র. আবজাদ)। ইহা সময়ে সময়ে غ ও ك-এ পরিবর্তিত হয়, যেমন (আকা) হইতে أغـا (আগা), ইসহাক (اسحاق) হইতে اضحاق (ইদহাক)।

সংজ্ঞা ঃ অবরোধক, আলজিহ্বাদেশীয় কণ্ঠ, অঘোষ। আরবী ব্যাকরণের ঐতিহ্যগত রীতি অনুযায়ী শাদীদা, মাজহূরা, মাখরাজ-এ; জিহ্বার সর্বপশ্চাৎ অংশ এবং ঊর্ধ্ব-তালুর সর্বোচ্চ অংশ (সীবাওয়ায়হ, ২খ, ৪৫৩, লা. ৫০৬, সং., প্যারিস; আয-যামাখশারী, মুফাসসাল, পৃ. ১৮৮, লা. ১৬-৭, ২য় সং, Broch) অর্থাৎ জিহ্বার মূল নরম তালুর একেবারে সর্বনিম্ন অংশের ও আল-জিহ্বার সংস্পর্শে থাকে এবং জোরাল উচ্চারণ ধারণ করিবার সময় আলজিহ্বাটি সরিয়া যায়। আল-খালীল যথার্থভাবেই ইহাকে বলিয়াছেন লাহাবিয়্যা "আলজিহ্বাগত" (আল-আযহারী, Le Monde Oriental, siv (1920), 45, হ 7-8; মুফাস্সাল, পৃ. ১৯০, লা. ১৯-২০)। আরব ব্যাকরণবিদগণ কাফকে মুতবাকা 'কণ্ঠীভূত' (স্বরসংঘাতমূলক) শ্রেণীতে না ফেলিয়া বরং মুসতালিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন, যাহা ইমালা (দ্র.) রোধ করে (সীবাওয়ায়হ, ২খ, ২৮৫, লা. ১৭-২০; মুফাস্সাল, ১৯০, লা. ৮)। বস্তুত আরবীতে কাফ একটি স্বরসংঘাতমূলক ধ্বনি নয় এইরূপে ইফতাআলারূপে, প্রথম মূলাগত ব্যঞ্জনধ্বনি হিসাবে আসিলে ক-এর উহার সহিত সংস্পৃষ্ট ত (ت)-এর উপর কোন প্রভাব থাকে না, যেমন সংঘাতমূলক ধ্বনিসমূহে থাকে। এইরূপে উদাহরণস্বরূপ আমরা পাই ইকতাতালা; স (س), (স > স), যাহা একই মূলের একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (সীবাওয়ায়হ, ২খ, ২৭৯, লা. ১৮; H. Fleisch, Traite, শা. IIc)। তবে স্বরসংঘাতমূলক ধ্বনিগুলির মত স্বরতন্ত্রে এক প্রকার আন্দোলন সৃষ্টি করাও ইহার বৈশিষ্ট্য। এই আন্দোলনটি একটি সংকোচন, যাহা অবরোধকতায় পরিণত হইতে এবং কাফ-কে হামযা-তে পরিণত করিতে পারে।

মন্তব্য ঃ যে সকল জনগোষ্ঠী জীবন্ত ঐতিহ্যের মাধ্যমে কাফ-এর উচ্চারণ বজায় রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বর্তমানে আরও গভীর উচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ গলনালীর গাত্রে এক ধরনের অবরোধন (Occlusion), যাহার ফলে উচ্চারণ ধারণের সময় আলজিহ্বাকে জিহ্বার উপর ছড়ান অবস্থায় দেখা যায় (দ্র. H. Fleisch, Etudes de Phonetique arabe, in MUSJ, xxviii 1949-50, 242, n. 2)।

সীবাওয়ায়হ (২খ, ৪৫৩, লা ১৭) হইতে আরম্ভ করিয়া আরব ব্যাকরণবিদগণ কাফ-কে মাজহূরা (ঘোষ) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; "তবে ক্লাসিকাল আরবীর ঐতিহ্যগত উচ্চারণে ইহা অঘোষ হইয়া যায়' (J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, in Memorial J. C., 67)। কাফ-এর একটি ঘোষ উচ্চারণ, অন্ততপক্ষে প্রাচীন আরব বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবশ্যই ছিল বলিয়া মনে হয়, অন্যথায় ইহা সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন হইবে যে, কিভাবে প্রাচীন কালের এই কাফ উচ্চারণের রীতিটি বর্তমানে ইহার ঘোষ উচ্চারণসম্বলিত যাযাবরদের মাতৃভাষা এবং ইহার অঘোষ উচ্চারণসম্বলিত অযাযাবর জনগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষার মধ্যে পার্থক্য করিবার সূত্রে পরিণত হইয়াছে (দ্র. H. Fleisch, Traite, শা. 46 h এবং সূত্রসমূহ; J. Cantineau, Cours, ঐ, 68 এবং সূত্রসমূহ)। যে সকল দেশীয় ভাষায় অঘোষ কাফ বা উহার হামযা-য় পরিণত রূপ রহিয়াছে (ঐ, ৬৮-৯) এবং যে সকল দেশী ভাষায় ঘোষ কাফ, গাফ রহিয়াছে (৬৯-৭০) সেইগুলি দেখুন।

কাফ একটি ধ্বনিমূল; যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈপরীত্যসমূহ ইহাকে সংজ্ঞায়িত করে উহাদের জন্য দেখুন J. Cantineau (Esquisse d'une phonologie fe l'arabe coassique, in Memorial J. C., 174; অসঙ্গতিসমূহের জন্য ঐ, ২০১)।

কাফ, যাহা ক্লাসিকাল আরবীতে স্বরসংঘাতমূলক নহে, এককালে স্বরসংঘাতমূলক ছিল এমন একটি সাধারণ সেমীয় (সেমিটিক) কাফ-এরই উত্তরসুরি (J. Cantineau, Le consonantisme du semitique, in Memorial J. C., 287; M. Cohen, Essai comparatif sur le Vocabulaire et la Phonetique du Chamito-semitique, Paris 1947, 123); তবে এই স্বরসংঘাতের প্রকৃতি যথাযথভাবে নির্দেশ করা কঠিন (J. Cantineau, ঐ, ২৯১) এবং M. Cohen (ঐ)-এর মত অনুযায়ী Hamito-Semitic ধ্বনিমূলটির অঘোষ কি ঘোষ উচ্চারণ ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইহার স্বরসংঘাতের তুলনায় অঘোষ বা ঘোষ হওয়ার বৈশিষ্ট্যটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত গৌণ।

পরিবর্তন ঃ একটি শব্দের শেষের কাফ পরবর্তী শব্দের শুরুর কাফ-এ আত্মীকৃত হইতে পারে, যেমন ক ক - (ق) > -ক - ক (দ্র. H. Fleisch, Traite, শা. ১২০)। আরব সূত্রসমূহে একটি নিঃশর্ত পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে ঃ কতকগুলি উপজাতিতে ক> ক (ق-এর ك-এ পবিবর্তন); এই সত্যটি ব্যাখ্যা করা কঠিন (দ্র. ঐ, শা. ৯ h)।

আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, আধুনিক উপভাষাসমূহে কাফ হইতে হামযা-তে রূপান্তর এবং ঘোষ কাফ-এর প্রশ্নটি রহিয়াছে। J. Cantineau (Cours, ঐ, ৭০) প্রাচ্যদেশীয় এবং উত্তর আফ্রিকার দেশীয় ভাষাসমূহে ত (ت)-এর পূর্বে অবস্থিত ক (ق) হইতে ক (ك)-এ এক প্রকার সম্ভাব্য পরিবর্তনের (dissimilation) কথা বলিয়াছেন। D. Cohen (Le dialecte arabe Hassaniya de Mauretanic, Paris 1963, 35)-এর নিকট এই পরিবর্তন জনিত ব্যাখ্যা একটি অপর্যাপ্ত সমাধান বলিয়া মনে হয়। কাফ-এর গায়ন (غ)-এ পরিবর্তনের উদাহরণও রহিয়াছে ঃ যেমন সিরিয়াতে [G. Bergstrasser, Sprachatlas von Syrien und Palestina, in ZDPV, xxxviii (1915), 216 (শা. ৯৫) Karte 37 ; J. Contineau, Cours, ঐ, ৭০-১] ; কতিপয় "উত্তর আরবীয় যাযাবর" দেশীয় ভাষায়, আলজেরীয় এবং দৃশ্যত মরক্কোর সাহারা অঞ্চলের অধিকাংশ দেশীয় ভাষায় (J. Cantineau, ঐ, ৭২) ; হাসসানিয়্যা-তে (D. Cohen ঐ, ৩৫-৭ এবং সূত্রসমূহ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া (১) H. Fleisch, Traite de Philologie arabe, I, Beirut 1961, শা. 2 c, শা. 44 c, j, n, শা. 46 a, 48 b, শা. 49 i; (২) M. Bravmann, Materialien und Untersuchungen zu den phonetischen Lehren der Araber, Gottingen 1934, 21, 45-6 এবং সূত্রসমূহ; (৩) A. Schaade, Sibawayhi's Lautlehre Leiden 1911, 14, 66 (n. 17); (৪) H. Blanc, Ibn Durayd on the Qaf of the Banu Tamim, in Proceedings of the International Conference on Semitic Studies, Jerusalem 1969, 33-4 ; আরও দ্র. ঐ, পৃ. ১৫-১৬, ২৮-৩২।

H. Fleisch (E.I.[2])/আবু মোহাম্মাদ আসাদ

আল-কাফ (الكاف) ঃ তিউনিসিয়ার একটি শহর, জনসংখ্যা ১৮,০০০, ইহা ৩ লক্ষ ৬ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত (৩ মে, ১৯৬৬-এর আদমশুমারী অনুযায়ী) একটি প্রশাসনিক জিলার রাজধানী, আলজেরিয়ার সীমান্ত হইতে ৩০ কিলোমিটার দূরে, হাওত-তেল (Haut-Tell) পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, উচ্চতা ৭০০ হইতে ৮৫০ মিটার পর্যন্ত। ১৯৬২ খৃ. হইতে অঞ্চলটিতে গতানুগতিক খাদ্যশস্য আবাদের পরিবর্তে একটি অধিকতর বৈচিত্র্যময় কৃষিব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে, যদিও সমবায়ী যৌথ কৃষি খামার সংগঠনের প্রচেষ্টাটি ১৯৬৯ সেপ্টেম্বরে পরিত্যক্ত হয়। ইহা ছাড়া শহরটি কিছু মাত্রায় নগরীকরণ এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উপকৃত হইয়াছে। এই লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর হইতে স্থানীয় বীরের মর্যাদায় উন্নীত জুগুরথা (Jugurtha)-এর সম্মানে একটি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আল-কাফ অঞ্চলটি প্রাচীন প্রস্তর যুগ হইতেই মানব অধ্যুষিত কিন্তু শহরটি ঠিক কখন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। সম্ভবত উৎপত্তিগত দিক হইতে ইহা লিবীয় অথবা পিউনিক। লিখিত গ্রন্থে এই নামটির প্রথম উল্লেখ দেখা যায় খৃ. পূ. ২৪১ সালে ; প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পর রাজধানীর প্রতি হুমকি প্রতিহত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় প্রেরিত কার্থেজ-এর ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনী প্রসঙ্গে। রোমানগণ, একজন পিউনিক দেবী, যাহাকে ভেনাস বলিয়া সনাক্ত করা হয়, তাহার নামানুসারে ইহার নামকরণ করে সিক্কা ভেনেরিয়া (Sicca Veneria)। ইহা নিঃসন্দেহে মনে হয় যে, উক্ত দেবীর মন্দিরের আশ্রয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক দেহব্যবসা প্রচলিত ছিল। সাম্রাজ্যের অধীনে শহরটিকে কলোনিয়া জুলিয়া সিরটা নোভা (Colonia Julia Cirta Nova) নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী কালে শহরটি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং শিক্কা বানারিয়া (Shikka Banariya, সিক্কা ভেনেরিয়ার অপভ্রংশ) নামে পরিচিত হয় এবং এই নামেই মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আরব ভাষ্যে নির্দিষ্ট হইতে থাকে। ইব্‌ন খালদূন (মৃ. ৮০৮/১৪০৬) ইহার অপর কোন নাম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। "আল-কাফ" নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইব্‌ন আবী দীনার-এর রচনায়, তিনি ১১১০/১৬৯৮-৯ সালের কাছাকাছি লিখিয়াছেন এবং আল-ওয়াযীর আস-সাররাজ (মৃ. ১১৪৯/১৭৩৬-৭) রচনাবলীতে। শেষোক্তজন সিক্কা বানিরিয়া প্রসঙ্গে ইব্‌ন সাববাতকে উদ্ধৃত করিয়া ইহা যোগ করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন, "সেই শহর যাহাকে বর্তমানে আল-কাফ বলা হয়" (হুলাল, ১/২খ, ৫২৫)। ইহা হইতে আভাস পাওয়া যায় যে, পুরাতন নামটি ইতোমধ্যে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। নামের এই পরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই 'উছমানী নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক যুগেই (১৫৭৪ খৃ.) শুরু হইয়াছিল, যাহা শহরটির জীবনে একটি নূতন পর্যায়ের সূচনা করে। তিউনিসিয়ার প্রায় বিশটি স্থান এমন নামের অধিকারী, যাহাতে আল-কাফ যুক্ত (R. Vaufrey, Prehistoire de 1' Afrique, নির্ঘন্ট খণ্ড ১ ও ২; L. Balout, Prehistorie de 1' Afrique du Nord, নির্ঘন্ট;J. Ganiage, Les origines du protectorat. ... ৩৫, ৬২; Guide Bleu de la Tunisie, নির্ঘন্ট)। ফেয-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে আল-কীফান (আল-কাফ-এর বহুবচন) নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (Leo Africanus, Description de l'Afrique, ১খ, ২২৯ নং ২৭০) এবং য়াকূত (বুলদান, ৪খ, ৪৩১) সিরিয়ার একটি দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার নাম আল-কাফ। নিঃসন্দেহে ইহা সেই একই দুর্গ যাহাকে ইব্‌ন খালদূন আল-কাফ নামে অভিহিত করিয়াছেন ('ইবার, ৫খ, ৮৪২) এবং যাহা জাহির বায়বারস (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭) ইসমা'ঈলীগণের নিকট হইতে দখল করিয়াছিলেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, স্থানীয় নাম আল-কাফ বহুল প্রচলিত। নিঃসন্দেহে আরবী শব্দ আল-কাফ (গুহা)-এ অনুচ্চারিত 'হ' পরিত্যাগের মাধ্যমে বিকৃত হইয়া যে কোন গুহার স্থল, বিশেষত উচ্চতা বৃদ্ধি করা এলাকাপুঞ্জ নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হয়। এই প্রেক্ষিতে আল-কাফ এই নামের যোগ্যতার দাবী করিতে পারে। "প্রাকৃতিক দুর্গবেষ্টনীরূপে বিবেচিত হইতে পারে এইরূপ পর্বতসমষ্টির একটি প্রধান স্কন্ধে স্থাপিত এই শহরটি সেরস, যানফুর, লোরেবুস এবং উয়েদ মেল্লেগু-এর বিশাল প্রান্তরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে এবং একই সঙ্গে ইহা তিউনিস হইতে আলজেরিয়া পর্যন্ত প্রধান সড়কটিকে নিয়ন্ত্রণ করে" (Tissot, Geographie comparee. ..., ২খ., ৩৭৮)।

জুগুরথাইন যুদ্ধের (Jugurthine war) সময় এই "প্রাকৃতিক নগর দুর্গটির পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তিনি ইহাকে তাঁহার অন্যতম ঘাঁটিতে পরিণত করেন। রোমান নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসার পর ইহা একটি উপনিবেশের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে প্রকৃত সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রখ্যাত অলংকারশাস্ত্রবিদ Arnob of Sicca (মৃ. আনু. ৩২৭ খৃ.) যখন এখানে শিক্ষকতা করেন তখন ইহা সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়। আল-কাফ-এর প্রাচীন ঐতিহ্যের বেশ কিছু চিহ্ন আজও বর্তমান (সেন্ট পিটারকে উৎসর্গকৃত দারু'ল-কুস-এর বাসিলিকা, বিশাল জলপাত্রসমূহ, বহু মূর্তি, উৎকীর্ণ লিপিসমূহ, মোজাইক ইত্যাদি) এবং সাম্প্রতিক খনন কার্যের মাধ্যমে বহু নূতন নিদর্শন (একটি বায়যানটীয় বাসিলিকা, জনসাধারণের স্নানাগার ইত্যাদি) আবিষ্কৃত হইয়াছে যেইগুলির বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। শহরের প্রধান মসজিদটি প্রকৃতপক্ষে একটি অতি প্রাচীন অট্টালিকা ; একটি মিনার ও একটি মিহরাবের সংযোজনের ফলে ইহা সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র।

আল-মাগরিবে (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা) মুসলিম অধিকার বিস্তৃতির সময়ে যুহায়র ইব্‌ন কায়স আল-বালাবী মামস (Mams) নামক স্থানে কুসায়লাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করিয়া এই এলাকার অন্যান্য স্থানের সহিত আল-কাফও জয় করেন (আনু. ৬৯/৬৮৮-৯ সালে; আল-মালিকী, রিয়াদ ১খ, ৩০ ; ইব্‌নু'শ্-শাব্বাত, সিলাতু'স-সিমৃত, পাণ্ডু. ৩২০৮, National Library of Tunis fol. 82v-83r)। তখন হইতে এবং সম্পূর্ণ

মধ্যযুগ ব্যাপিয়া আল-কাফের স্থান দখল করে লারিবুস শহর। তখন ইহা এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে পরিণত হয়। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও Leo Africanus লারিবুসের প্রশংসাগীতি গাহিবার মত সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন। বর্তমানে আল-কাফের ৩০ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত ইহা কয়েকটি ধ্বংসস্তূপমাত্র। আল-কাফ উহাকে সম্পূর্ণ ম্লান করিয়া দিয়াছে। আল-বাকরী (মৃ. আনু. ৪৬১/১০৬৮)-র পূর্বে কোন আরব ভৌগোলিক পুনরায় আল-কাফের উল্লেখ করেন নাই এবং তিনিও উল্লেখ করিয়াছিলেন কেবল ঘটনাক্রমে, প্রাচীন খৃস্টান যুগে শহীদ জনৈক বারবার ধর্মযাজক সংক্রান্ত একটি কাহিনী প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গে য়াকৃত (৫৭৪-৬২৬/১১৭৮-১২২৯)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে আল-কাফ সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ পায় (বুলদান, ৩খ, ৩৫৪) ঃ "শিক্কা বানিরিয়া ইফরীকিয়্যা-তে অবস্থিত কয়েকটি স্থান (আমাকিন বি-ইফরীকিয়া)।" মধ্যযুগের আল-কাফ সম্পর্কে প্রথম এবং একমাত্র বর্ণনা পাওয়া যায় ইব্নু'শ-শাব্বাত (৬১৮/৬৮১/১২২১-১২৮২)-এর লেখনী হইতে। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই গ্রন্থকার কেবল শহরটির প্রাচীন কীর্তিসমূহ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, যেইগুলি ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য।

ইহার খ্যাতির অবলুপ্তি ঘটিবার পরেও মধ্যযুগের ইতিহাসে মাঝে মাঝে আল-কাফের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭১/৭৮৮ সালে এখানে দাঊদ ইব্ন য়াযীদ আল-মুহাল্লাবীর শাসনামলে ইবাদী খারিজীগণ শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। কোন প্রকার সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই ফাতিমী দা'ঈ-এর হস্তে ইহার পতন ছিল লারিবুসে আগলাবী সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের সূচনামাত্র। যীরীগণের অধীনে শহরটি একদিকে বাদীস (৩৮৬-৪০৬/৯৯৬-১০১৬) এবং অপরদিকে তাঁহার বাবা হাম্মাদ-এর সংঘাতে একটি ভূমিকা পালন করে। হিলালী আক্রমণের সময়ে (৪৪৩/১০৫২) জনৈক 'আয়াদ (অথবা 'আব্বাস অথবা 'ইমাদ) ইব্ন নাসর আল-কিলাঈ একদল দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীকে নেতৃত্ব দান করিয়া এখানে একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন এবং সফলতার সহিত সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ৫৫৪/১১৫৯ সালে আল-মুওয়াহ্হিদগণ তাঁহার উত্তরসুরিগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় মাগরিবকে ঐক্যবদ্ধ করেন। হাফসীগণের অধীনে ৭২৪/১৩২৪ সালের গ্রীষ্মকালে এই স্থানের কাছাকাছি একটি যুদ্ধ সংঘটন ব্যতীত আল-কাফের অন্য কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

'উছমানী যুগের পূর্বে শহরটি আর তাহার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয় নাই। কন্সট্যান্টাইনের সামনাসামনি অবস্থানের জন্য ইহার দায়িত্ব ছিল আলজেরিয়া হইতে আগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তিউনিসের অন্তর্বর্তী শাসককে প্রতিরক্ষা প্রদান করা। আলজেরিয়া ও তিউনিসের মধ্যকার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত সংঘর্ষ (১৬২৮, ১৬৮৫, ১৬৯৪, ১৭০৫, ১৭৪৬, ১৭৫৬, ১৮০৭ খৃ.) এবং তিউনিসের সিংহাসনের প্রতি দাবিদার বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ইহা জড়িত হইয়া পড়ে। ১৬৭৫ খৃ. একটি 'কাসবা' নির্মাণ করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করা হয়। ১৭৩৯-৪০ সালে 'আলী পাশা শহরের চতুর্দিকে প্রাকার নির্মাণ করেন। বে হাম্মূদা পাশা (১৭৮২-১৮১৩) ১৮০৬ খৃ. কাসবাটি পুনর্গঠন করেন এবং প্রাকারটি আরও মজবুত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আল-কাফ ছিল তিউনিস, কায়রাওয়ান এবং বাজ-এর পাশাপাশি রাজ্যের চারিটি প্রধান দুর্গের অন্যতম যেখানে সর্বসময়ে স্থায়ীভাবে একজন আগা-র নেতৃত্বাধীনে কমপক্ষে ৫০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী থাকিত। তথাপি শহরটি সামরিক গুরুত্ব হারায়। ১৮৩৭ সালে কন্সট্যানটাইনে ফরাসীদের প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে ইহার দুর্গ এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

এই সময় হইতে ইহার পতন শুরু হয়। V. Guerdin ১৮৬০ সালের ৮ হইতে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে শহরটি পরিদর্শন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন ঃ "শহরটির দুইটি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং এখানে খুব অল্প লোকের বাস। ইহার অর্থ শহরটির জনসংখ্যা প্রাথমিকভাবে অনুমিত সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। সর্বমোট জনসংখ্যার মধ্যে রহিয়াছে ৪,৫০০ মুসলিম, প্রায় ৬০০ জন য়াহূদী, অল্প কয়েকজন মাল্টাবাসী এবং ফরাসী ডাক বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ" (Voyages, ২খ, ৫৩-৪)। ১৮৬৪ খৃ.। 'আলী ইব্ন গিযাহুমের বিদ্রোহের সময় ইহা অধিকৃত হয় এবং ১৮৬৭ খৃ. কলেরা মহামারী ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। ১৮৭৮ খৃ. নির্মিত তিউনিস ও সূকু'ল-আরবা' (বর্তমানে জানদূবা)-এর মধ্যে সংযোগ সাধনকারী রেলপথ ইহার পতনের গতি তরান্বিত করে; কারণ ইহার ফলে শহরটি আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে ইহার ঐতিহাসিক ভূমিকা হইতে বঞ্চিত হয়। শহরটির জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। ১৮৮১ খৃ. "ইহার ৪৫ হেক্টর এলাকা/ যেখানে সাধারণভাবে ৮,০০০ অধিবাসীর স্থান সংকুলানের জন্য যথেষ্ট, সেখানে কেবল সাড়ে তিন হাজার অধিবাসী বসবাস করিতেছিল" (Monchicourt, La region du Haut Tell. ... ৪০৮)। তিউনিসিয়া ফরাসী আশ্রিত রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে জেনারেল লোগেরোত (Logerot) ১৮৮১ সালের ২৬ এপ্রিল কোন প্রকার বাধা ব্যতিরেকেই শহরটি দখল করেন। তিন বৎসর পর ১৮৮৪ সালে জুন মাসে ইহার অভ্যন্তরে প্রথম ফরাসী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; একই বৎসর ৮ জুলাই এলাকাটিকে একটি কমিউনের মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৬ খৃ. হইতে ইহাকে উন্নত করিয়া এখানে একটি সিভিল কন্ট্রোলারের দফতর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই কর্মকর্তা কাইদ-এর সঙ্গে শাসন পরিচালনা করিতেন। ১৯১১ খৃ. পৌর আদমশুমারী ইহার জনগোষ্ঠীর নূতন গঠন নির্দেশক এবং ইহার পুনরুত্থানেরও সূচক। ইহার ৬,৩১২ জন অধিবাসীর মধ্যে ছিল ২৬৯ জন আলজিরীয়সহ ৪,৪৬২ জন মুসলিম, ৬৫০ জন য়াহূদী, ১,২০০ জন য়ূরোপীয়; ইহাদের ৮০০ জন ইতালীয় ও ৩৫০ জন ফরাসী। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিউনিসিয়ার যে সকল অঞ্চল অক্ষশক্তির অধিকারে পতিত হয় নাই সেই সকল এলাকার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এখানে একজন প্রতিনিধিকে অধিষ্ঠিত করা হয়।

আল-কাফ অতীতে আল-মুরাবিত কেন্দ্রসমূহের অন্যতম ছিল এবং এখনও এখানে প্রচুর যাবিয়া (খানকাহ) আছে, কিন্তু এই ভ্রাতৃসংঘের রাজনৈতিক প্রভাব অতীতে কিছুটা গুরুত্ব লাভ করিলেও বর্তমানে বস্তুতপক্ষে কিছুই নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (কালানুক্রমিকভাবে) উৎসসমূহের তালিকা ঃ (১) আল-মুকাদ্দাসী, আহসানুত-তাকাসীম, আংশিক অনু. ও সম্পা. Ch. Pellat, Description de l'Occident. এই শিরোনামে, আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৮, ১৯; (২) মালিকী, রিয়াদ, সম্পা. H. Mones, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ., ৩০; (৩) আল-বাকরী, মাসালিক, অনু. ও সম্পা. De Slane, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., ৩৩-৭৪; (৪) য়াকূত, দ্র. শিরো.; (৫) ইবনুশ-শাব্বাত, সিলাতুস্-সিমৃত, পাণ্ডু. ৩২০৮, Nat. Lib. of Tunis. fol. 82v. -83r; (৬) সাফিয়্যু'দ-দীন আল-বাগদাদী, মারাসিদু'ল-ইত্তিলা, সম্পা. 'আলী মুহাম্মাদ আল-বিজাবী, কায়রো ১৯৫৪

খৃ., ২খ. ৮০৫ ; (৭) কিতাবু'ল-ইসতিবসার, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৮ খৃ., ১৬৫ ; (৮) Pseudo-Rakik, তা'রীখ ইফরীকিয়্যা ওয়া'ল-মাগরিব, সম্পা. M. al-Kaabi, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., ৬৮, ১৬৯ ; (৯) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, বৈরূত ১৯৫৯ খৃ., ৮৪২, ৬খ, ২২৮, ৩৪৯, ৪০১, ৪৯৪ ; (১০) Leo Africanus, Description de l'Afrique, অনু. A. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ২২৯, নং ২৭০, ২খ, ৩৭৩; (১১) ইব্ন আবী দীনার, মু'নিস, সম্পা. এম. শাম্মাম, তিউনিস ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১২) আল-ওয়াযীরু'স-সাররাজ, হুলাল, সম্পা. M. H. al-Hila, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., ১/২খ, ৫২৫-৬ ; (১৩) G. Dupont, Recit d'un voyage de Tunis au Kef effectue en ১৭৪৪, in Revue de l'Afrique francaise, নং ৫০ (অক্টো. ১৮৮৮), ৩৪১-৪৪, নং ৫১ (অক্টো, ১৮৮৮), ৩৫২-৬০; (১৪) ইব্ন আবী দিয়াফ, ইতহাফ আহলি'য-যামান, তিউনিস ১৯৬৩ খৃ., ২খ, ৩৩, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৮-৬০, ৮৩, ১২৩, ১২৯, ১৪৮-৯, ৩খ, ৩৯, ৪১-২, ৪৫-৬, ৮৫ ; (১৫) V. Guerin, Voyage Archeologique dans la regencc de Tunis, প্যারিস ১৮৬২ খৃ., ২খ, ৫৩-৪, ৫৭ ; (১৬) R. Cagnat and Saladin, Voyage en Tunisie, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., ২০০-১৯। গবেষণামূলক পাঠ্য ঃ (১৭) R. Brunschvig, Hafsides, ১খ, ১৪৫, ৩০২; (১৮) P. L. Cambuzat, L'evolution des cites du Tell en Ifrikiya du VII au Xie siecle (thesis), ১খ, ১৭৩, ২২৯, ২৪৭, ৩২২, ২খ, ৩৩৭-৪৩ ; (১৯) P. Cintas, Elements d'etude pour une, protohistoire de la Tunisie, প্যারিস ১৯৬১ খৃ., ৮, ২৫, ১২৫ ; (২০) Ch. Diehl, L'Afrique byzantine, প্যারিস ১৮৯৬ খৃ., নির্ঘণ্ট ; (২১) E. Esperandieu, Epigraphie des environs du Kef, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, Etude sur le Kef, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ.; (২৩) J. Ganiage, Les origines du Protectorat francais en Tunisie (1861-1881), প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (২৪) S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. প্যারিস ১৯১৩-২৮ খৃ., ২খ, ৯৬, ৩খ, ১০১, ১০২, ৪খ, ৩৪৯, ৪০৩, ৫খ, ৩১,১৯২, ২৬৬, ৬খ, ১৫৬, ১৪৯, ৭খ, ১৯০, ১৯৭, ৮খ, ১৬৮, ১৯৭; (২৫) H. R. Idris, Zirides, ১১০,২২২, ২৩৫, ৩৯৯, ৪৭১; (২৬) Ch. A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ১১৬, ১৫৭, ১৭০, ২০৯, ইংরেজী অনু, লন্ডন ১৯৭২ খৃ.; (২৭) E. Makhlouf, Structures agraires et modernnisation de l'agriculture dans les plaines du Kef : Les unites cooperatives de production in Cahiers du CERES, geog. ser. নং ১, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ.; (২৮) A. Martel, Les confins saharo-tripolitains de la Tunisie (১৮৮১-১৯১১), প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., নির্ঘণ্ট; (২৯) P. Monceaux, Histoire litteraire de l'Afrique chretienne depuis les origines jusqu'a l'invasion arabe, প্যারিস ১৯০৫ খৃ., ৩খ, ২৪১-৮৬; (৩০) C. Monchicourt. La region du Haut-Tell en Tunisie, প্যারিস ১৯১৩ খৃ., ৪০৩-১৪; (৩১) P. Romanelli, Storia delle province romane dell' Africa, Rome 1959, নির্ঘণ্ট; (৩২) M. Speight, Temoignage des sources musulmanes sur la presence chretienne au Maghreb de 26/747a 184/800, in IBLA (তিউনিস ১৯৭২ খৃ.), no. 129 83.-6; (৩৩) M. Talbi, Emirat aghlabide, 678, 680; (৩৪) A. Temimi, Recherches et documents, d'histoire maghtebine, তিউনিস ১৯৭১ খৃ., ২১, ২৪, ৯৩, ২১২ ; (৩৫) Vaufrey, Prehistoire de l'Afrique, প্যারিস-তিউনিস ১৯৬৫-৯ খৃ., ১ম ও ২য় খণ্ডের নির্ঘণ্ট।

M. Talbi (E. I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাফ্ফ (كف) ঃ ছন্দশাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাবিশেষ, ইহার অর্থ কবিতার সপ্তবর্ণ চরণ (ركن سباعى) হইতে সপ্তম স্বরবিহীন (ساكن) বর্ণকে বিলুপ্ত করা। এইরূপ বিলোপ সাধন শুধু নিম্নোক্ত চারিটি আরকান (اركان)-এর মধ্যেই ঘটিয়া থাকে ঃ (১) مفاعيلن ; (২) فاعلاتن , مفروق) منفصل - فاع لاتن (৩) ; مجموع হউক বা متصل অথবা منقطع) এবং (৪) مس تفع لن — منفصل مفروق) অথবা منقطع)। نون ساكن বিলুপ্ত হইলে ঃ কিয়দংশ অন্য (১) مفاعيلن স্থলে হয় مفاعيل ; (২) فاعلاتن স্থলে থাকে فاعلات ; (৩) فاع لاتن হয় فاع لات এবং (৪) مس تفع لن-এর স্থানে হয় مس تفعل ; যথাক্রমে ل বা ت হয় مضموم অর্থাৎ পেশযুক্ত। নিম্নোক্ত দশ প্রকারের ছন্দে কাফ্য (كف) ঘটিয়া থাকে ঃ (১) هزج ; (২) طويل ; (৩) مضارع ; (৪) رمل ; (৫) مديد ; (৬) خفيف ; (৭) مجتث ; (৮) جديد ; (৯) مشاكل ; (১০) قريب।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য 'আরূদ' প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

হাদী 'আলী বেগ (দা. মা. ই.)/ মোঃ মাযহারুল হক

আল-কাফ্ফ (علم الكف) ঃ ইলমু'ল-কাফ্ফ চেহারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্র নির্ণয় পদ্ধতির আওতাভুক্ত একটি দৈব জ্ঞান সম্পর্কিত প্রক্রিয়া (দ্র. ফিরাসা)। অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে ইহা "হস্তআকৃতি পঠন" বা কোন ব্যক্তির হস্তদ্বয়ের আকার ও আকৃতি হইতে তাহার চরিত্র নিরূপণের বিশেষ কলাজ্ঞান নির্দেশ করে, অপরপক্ষে প্রকৃত "হস্তরেখা পঠন"শাস্ত্রকে বলা হয় 'ইল্মু'ল-আসারীর (হাতের রেখাসমূহ সম্পর্কিত বিদ্যা) অথবা খত্তু'ল-য়াদ। ইহা ব্যতীত নাজার ফি'ল-য়াদ, ফিরাসাতু'ল-কাফ্ফ, 'আলামাত আসারীরি'ল-কাফ্ফ নামেও ইহা পরিচিত (তু. T. Fahd, Divination arabe, পৃ. ৩৯৩ প.)। কিন্তু 'ইলমু'ল-কাফ্ফ শব্দটির ব্যবহার অধিকতর সার্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাই অন্যান্য সকল নামের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। ইহা হস্তরেখা পঠন এবং হস্তআকৃতি পঠন উভয়ই নির্দেশ করে এবং ইহার মধ্যে dactylomancy (অঙ্গুলি সন্ধির পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীকরণ) এবং onychomancy (আঙ্গুলের নখ নিরীক্ষণ হইতে প্রাপ্ত অভ্র-জ্ঞান)-শাস্ত্রও অন্তর্ভুক্ত।

যদিও এই প্রকার ভবিষ্যত কথন চীন দেশীয় লোক দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত সাধনার প্রথম পদক্ষেপরূপে বিবেচিত হইত এবং ইহা অতীতের ন্যায় বর্তমানেও বহুল প্রচলিত রহিয়াছে, তথাপি মধ্যযুগ পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর কোন প্রকার রচিত সাহিত্য কৃচিৎ দৃষ্ট হয় (উদাহরণস্বরূপ তুলনীয় সাম্প্রতিক সংকলনমূলক রচনা La divination, A Caquot and

M. Leibovici কর্তৃক সংগৃহীত পর্যালোচনাসমূহ, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., ইহাতে হস্তরেখা বিচার কেবল দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং মনে হয় ভবিষ্যত কখনে ইহার ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য ছিল)। এই সঙ্গে W. R. Craig প্রণীত Book of Hand (1868) এবং E. H. Allen প্রণীত A Mannual of Cosheirophy (1885) পুস্তকদ্বয়েরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে, একটি Pseudo-Ciromantia Aristotelis (তু. L. Thorndike and P. Kibre, A. catalogue of incipits of Mediaeval scientific writings in Latin, পরিশোধিত ও বর্ধিত সংস্করণ, লন্ডন ১৯৬৩ খৃ, The Mediaeval Academy of America, নং ২৯, পৃ. ২২৫, ৩০৩, ৮৩০) সম্ভবত Albertus magnus (পৃ. গ্র., ২৮২, ৩৫০),Michael, Scott (ঐ, ৫৩১) এবং অন্যান্য পণ্ডিত ধর্মতাত্ত্বিকের রচনা বলিয়া কথিত হস্তরেখা সম্বন্ধীয় কতিপয় সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মূলরূপে কাজ করিয়াছে। এই Ciromantia, কথিত আছে যে, John of Seville এবং Adelard (of Bath?) দ্বারা অনূদিত (গ্রীক মূল হইতে?) এবং মনে হয় ইহা এরিস্টটলের রচনাবলীর অনুবাদকারী আরব পণ্ডিতগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। খৃস্টান প্রাচ্যে এই ভ্রান্ত এরিস্টটলীয় প্রবণতার প্রবেশ মোটামুটিভাবে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন রচনাবলীর মাধ্যমে বিলম্বে ঘটে, আমাদের পরিচিত তিনটি খৃস্টান পাণ্ডুলিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; (ক) বৈরূত, Fac, Or. ২৭১ (নং ৫৭৯), ফারাসাতু'ল -কাফফ শিরোনামে, ইহার চব্বিশ অধ্যায়সম্বলিত প্রথম অংশে হাতের প্রকৃতি ও ইহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে (অমার্জিত অংকনসহ) আলোচনা করা হইয়াছে এবং ২৪টি অধ্যায় সম্বলিত দ্বিতীয় অংশে হাতের প্রকৃতি অনুসারে জীবনের রহস্যসমূহ বিবেচনা করা হইয়াছে; (খ) Aleppo, P. Sbath, ৫২৯, পূর্বোক্ত শিরোনামযুক্ত এবং জেরুসালেমের জনৈক পুরোহিত কর্তৃক ১৯শ শতাব্দীতে কৃত (8১p ; (গ) বার্লিন, Cat. Ahlwordt ৪২৫৫, একজন অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থকারের রচনা ৫৫ পত্রকবিশিষ্ট, ইহাতে অন্যদের মধ্যে এরিস্টটল, টমাস একুইনাস এবং এলবার্টস মাগনাস (Thomas Aquinas and Albertus Magnus)-এর উল্লেখ আছে।

এরিস্টটলের উপর ভিত্তি করিয়া প্রচলিত এই খৃস্টান প্রথাটি পাশ্চাত্যের বহু গ্রন্থকারই বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা Antiochus Tibertus, De chiromantia. ১৪৯৪ খৃ., সম্পা. Andrea Corvo, De chiromantia. ১৫১৩ খৃ. হইতে বারংবার সম্পা. Jean Indagine, Introduction in chiromantiam. ১৫৮২ সালে লিয়ন-এ প্রকাশিত, ঐশী ও দিব্য বিজ্ঞানের শিক্ষক Mil-Monts-এর Jeam Belet, Cure প্রণীত Traite de la chiromance, Joh. Meteham Treatise on chiromancy from the Latin of Aurelian, Joh. Montroy, Libellus de chiromantia, Laur. Mendelkern. Chiromancie.

প্রাচ্যদেশসমূহে একবারও এই কলার উদ্যোক্তা এরিস্টটলকে নির্দেশ করা হয় নাই; আরব দৈব জ্ঞানতত্ত্বে দুইটি ঐতিহ্য একত্র হইয়াছিল, বর্তমানে হারানো একটি অজ্ঞাত প্রণেতা দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় ঐতিহ্য, যাহা ইবনু'ন-নাদীম (ফিহরিসত, ৩১৪) তাঁহার কিতাব খাত্তু'ল-কাফফ ওয়া'ন-নাজার ফিল-য়াদ বি'ল-হিন্দ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রীক ঐতিহ্য, যাহার উদ্বোধন করেন স্মার্নার প্রখ্যাত তার্কিক পণ্ডিত Polemon of Laodicea (মৃ. ৯৪৪ খৃ.)। তিনি Fusiognomonikhe নামক পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন, ইহার মূল গ্রীক ভাষ্যটি বর্তমানে বিনষ্ট হইলেও ইহা ইহার ৩য়/৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃত একটি আরবী অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিচিত (তু. Divination arabe, পৃ. ৩৮৪, খুঁটিনাটি ও নির্দেশনার জন্য)।

ভারতীয় ও গ্রীক ঐতিহ্যের উপর সম্পন্ন এই মুসলিম ঐতিহ্যটির প্রতিনিধিমূলক রচনাবলীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। আরব Polemon, যিনি হস্তরেখা সম্পর্কে একটি অধ্যায় জুড়িয়া আলোচনা করিয়াছেন (তু. ৪র্থ অধ্যায়, লাইডেন পাণ্ডুলিপি, সম্পা. ও ল্যাটিন অনুবাদ G Hoffmann, in R. Forster, Scriptores Physiognomonici Graeci et Latini, ১খ, ২০১)। তাহার অতিরিক্তরূপে বুরসা হইতে প্রাপ্ত চেহারা দর্শনের মাধ্যমে চরিত্র বিচার সম্পর্কিত রচনাবলীর একটি সংকলনে দুইটি অনুচ্ছেদ রহিয়াছে। ইহার প্রথমটিতে হাতের আঙ্গুলগুলির পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইঙ্গিতসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (হুসায়ন চেলেবী, ৮৮২, পত্রক 64r-66r) এবং দ্বিতীয়টিতে বৃদ্ধাঙ্গুলির সম্মুখভাগের পরীক্ষা হইতে পবিত্র চিহ্নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সম্ভাব্য সন্তানের সংখ্যা স্বল্প অথবা বেশী হইবে তাহা নির্ণয় (ঐ, fol. 66r-67r ; তু. Divination arabe, ৩৯৫, নং ১, ইহাতে সংযুক্ত 'মিন' শব্দটি বাদ দিতে হইবে)। ইহার সহিত ইস্তাম্বুলে অবস্থিত কোপরুলু সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি (১৬০১ একটি পৃষ্ঠা (fol. 240v) এবং ফাখরু'দ-দীন আর-রাযীর বলিয়া কথিত ভ্যাটিকানের (৯৩৮, ১৪) একটি পত্রক (ppv-100) যুক্ত করিলে মোটের উপর এই সাহিত্য সম্পর্কে আবিষ্কৃত সকল নমুনার তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। Brockelmann (১খ, ৫০৮, SI, ৯২৪)-এ অন্যান্য নির্দেশনা। এই সম্পর্কে আরও অধিক জানিতে হইলে আমাদের অবশ্যই আস-সাব'উ'স-স্যায়্যার (السبع السيار) নামক পুনর্বার আবিষ্কারের অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে কতিপয় দৈব সাধনার পদ্ধতির উল্লেখ রহিয়াছে, যেইগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আল-কাফফ এবং মাকাদীরু'ল-আসাবি' (مقادير الاصابع) (শিরোনামদ্বয় বুরসা ভাষ্যদ্বয়ের কথা স্মরণে আনে, গ্রন্থকার এই শহরে বসবাস করিতেন); হাজ্জী খালীফা (৩খ, ৫৭৬)-এর মতে ইহার প্রণেতা ছিলেন ঐতিহাসিক (মুসতাফা ইব্ন হাসান আল-জান্নাবী, মৃ. ৯৯৯/১৫৯০)।

ইতোমধ্যে আরব গ্রন্থকারগণের মতে এই কলার লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য আমাদের আয়ত্তে দুইটি সংজ্ঞা রহিয়াছে: প্রথমটির সন্ধান পাওয়া যায় ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী প্রণীত কিতাবু'ল-ফিরাসা গ্রন্থে (সম্পা. ও অনু. Y. Mourad, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ., ১১ ; তু. উপরে উদ্ধৃত পত্রকসমূহ) এবং দ্বিতীয়টি হাজ্জী খালীফা, ১খ, ২৩৬-এ। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হস্তরেখা অধ্যয়নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা, তাহার নিয়তি, সুখী অথবা অসুখী, তাহার সমৃদ্ধি অথবা দারিদ্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব এবং ইহা করা হয় হাত অথবা পায়ের তালুরেখাসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া এবং সকল রেখা বদ্ধ অথবা প্রশস্ত এবং ইহারা যে সকল নকশা সৃষ্টি করে তাহা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শারী'আতে এইসব কথনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

পরিশেষে ফিরাসা (فراسة)-এর বর্ণিত অবস্থার ন্যায় 'ইলমু'ল-আসারির চিকিৎসা সংক্রান্ত পূর্বাভাসে ব্যবহার করা হইত। হিপোক্রাটিস (বুকরাত-Heppocrates) এবং গ্যালেন (Galen-জালীনূস) চেহারা বিশ্লেষণ শাস্ত্রের সাথে সাথে ইহারও ব্যবহার করিতেন (তু. Divination arabe, পৃ. ৩৮১; তু. R. Labat, Traite akkadien de diagnostics et pronostics medicaux, লাইডেন ১৯৫১ খৃ. ঃ ইহার একটি পরিশিষ্ট "pronostics akkadiens et pronostics grecs"-এর প্রতি উৎসর্গকৃত, পৃ. ৩৫-৪৫)। এই প্রসঙ্গে গ্যালেন (Galen)-এর বলিয়া কথিত কিতাব আসরার (-আর রাযীর মতে পূর্বোল্লিখিত স্থানে হাতের রেখাসমূহ ও পায়ের তালুর রেখাসমূহ) আন-নিসা' কিতাব আসরারি'র-রিজাল-এর আধেয় বিষয়সমূহের পরীক্ষা উপকারী হইতে পারে। হুনায়ন ইব্ন ইসহাক ইহাদের অনুবাদ সম্পাদন করেন (তু. AS. ৪৮৩৮, যথাক্রমে fol. 57v-74v এবং 76v--105v; Bagdatli Vehbi, ১৪০৯, fol, 19r-26r এবং 26v-32v)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত দ্র. (১) T. Fahd. La divination arabe, লাইডেন ১৯৬৬ খৃ., ৩৯৩-৭; (২) Doutte, Magie et religion dans I'Afrique du Nord, Algiers ১৯০৯ খৃ., ৩৭০; (৩) Osman Bey, Les Imams et les derviches, প্যারিস ১৮৮১ খৃ., ১৩২।

T. Fahd (E.I.²)/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাফফারা (كفارة) ঃ অর্থ জরিমানা, ক্ষতিপূরণ; আভিধানিক অর্থ যাহা গুনাহ 'ঢাকিয়া দেয়', উহা 'দূরীভূত' করিয়া দেয়। কুরআন ও হাদীছে কাফফারা আদায়ের নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ রহিয়াছে ঃ (১) দাস মুক্ত করা, (২) রোযা (صوم) এবং (৩) গরীব-মিসকীনকে খাদ্য বা বস্ত্র দান। কুরআন কারীম অনুযায়ী নিম্নলিখিত অবস্থায় এবং উপায়ে কাফফারা আদায় করা কর্তব্য ঃ

(১) হত্যা ঃ ভুলবশত কোন মুসলিমকে হত্যা করিলে (قتل الخطا) একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করিয়া দেওয়া এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত (دية-শোণিত পণ) [দ্র.] দেওয়া, সামর্থ্য না থাকিলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখা। নিহত ব্যক্তি অমুসলিম, তবে চুক্তিবদ্ধ মিত্র গোত্রের লোক হইলে উপরিউক্ত কাফফারা আদায় করা জরুরী হইবে ; নিহত ব্যক্তি মুসলিম কিন্তু শত্রু গোত্রের লোক হইলে একজন মুসলিম দাসমুক্ত করিয়া দেওয়া, সামর্থ্য না থাকিলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখা (দ্র. ৪ ঃ ৯২)।

(২) শপথ ঃ শপথ ভংগ করিলে দশজন মিসকীনকে আহার্য দান অথবা বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন দাস মুক্ত করিয়া দেওয়া; অপারগ হইলে তিনদিন রোযা রাখা (৫ঃ৮৯)।

(৩) জিহার (দ্র.)-এর ক্ষেত্রে কাফফারা একজন দাসকে মুক্ত করিয়া দেওয়া, সামর্থ্য না থাকিলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখা; অসমর্থ হইলে ৬০জন মিসকীনকে আহার্য দান। স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বেই কাফফারা আদায় করিতে হইবে (৫৮ ঃ ৪-১)।

হাদীছে রামাদানের রোযা ভঙ্গের কাফফারার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও দাস মুক্ত করা, অপারগতায় ৬০টি রোযা রাখা; সামর্থ্য না থাকিলে ৬০জন মিসকীনকে আহার্য দান কর্তব্য (দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু'স-সিয়ার; আল-জাযীরী, আল-ফিক্হ 'আলাল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাসিম আল-গুযযী, ফাতহু'ল-কারীব, সং L.W.C. Van-Berg, ২৬২, ২৬৬, ৫০০, ৫৬৮, ৬৬২; (২) Th. W. Juynboll, Handb. des islamischen Gesctzes, ১২২, ২২৫, ২৬৭, ২৯৮।

Th. W, Juynboll এবং সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ড. আবদুল জলীল

কাফসা (قفصة/Gagsa) ঃ (গাফসা) তিউনিসিয়ার একটি শহর, তিউনিসের ৩৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কায়রাওয়ান হইতে ২০০ কিলোমিটার এবং গাবিস (দ্র. কাবিস) হইতে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩০,০০০। ইহা ৩০০,০০০ জনবসতিপূর্ণ একটি প্রশাসনিক এলাকার প্রধান শহর, যাহার মধ্যে রহিয়াছে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদগুলি ঃ M'Dilla, Metlaoui, Redeyef এবং Moulares-এর ফসফেট আকরসমূহ। কাফসার মরূদ্যানে প্রায় ১০০,০০০ খেজুর গাছে ২য় শ্রেণীর খেজুর ফলে এবং ইহার সহিত আরও রহিয়াছে কমলালেবু, লেবু, খুবানি ও ডুমুর গাছের বাগানসমূহ, বহু দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং অতি সাম্প্রতিককালের জলপাই গাছের বাগান এবং পেস্তা জন্মাইবার প্রচেষ্টা। শহরের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত বহু সংখ্যক ঝরনার সাহায্যে এবং আর্টেজীয় (Artesian) কূপ খনন করিয়া সেচ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যেহেতু ইহা কায়রাওয়ান হইতে Chotts অঞ্চলের দিকে যাওয়ার রাস্তায় প্রথম মরূদ্যান এবং তদুপরি যেহেতু ইহার প্রাগৈতিহাসিক এবং সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পর্যটকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাদের কিছু সময় এই স্থানে অতিবাহনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং শহরটি পর্যটন ব্যবস্থার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কারণে শহরটি কতক সাম্প্রতিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছে, যেমন সড়ক উন্নয়ন ব্যবস্থা এবং হোটেল সজ্জা, প্রমোদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা, 'রোমীয় স্নানাগারগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কাসাবা এবং প্রধান মসজিদের পুনরুদ্ধার, বায়যানটাইন শহর-প্রাচীরের আংশিক পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি। হস্তশিল্প, প্রধানত জমকালো রঙ্গের কম্বল এবং সহজবোধ্য চিত্র motif শোভিত কার্পেট বুনন কিছুটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

ইতিবৃত্ত ঃ Capsa শহরের ক্লাসিক্যাল স্থানিক নাম toponym-এর আরবী প্রতিরূপ قفصة। কাফসার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ১৯০৯ সালে J. Morgan এই স্থানিক নামটি হইতে Caspian শব্দটি সৃষ্টি করেন Upper Paleolithic অথবা Mesolithic নমুনার সভ্যতা বুঝাইবার উদ্দেশে। এই কারণে এই শহরটি ছিল উক্ত সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র; বহু সংখ্যক "শামুখ খামার" Snailery ও অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের চিহ্নসমূহ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক যুগের কাফসার অতীত আরও কম পরিস্ফুট। কে, কখন এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করে, বিশেষত এই কথাটি স্পষ্ট জানা যায় না। কোন্ দেবতা এই নগর প্রতিষ্ঠিত করে এইরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায়। লিবীয় অথবা ফিনিসীয় হারকিউলিস অন্যান্য নিদর্শনসমূহের যোগে ইহার কার্থেজীয় (Punic) উৎসের ধারণা জন্মায়। যাহা হউক, এই অনুমানকে সমর্থনের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় না। আরবদের মতে শহরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শানতিয়্যান যিনি ক্যালদীয়া

(Chaldea)-র পৌরাণিক রাজা নেমরোদ (আল-বাকরী, মাসালিক, ৪৭/১০০)-এর দাস ছিলেন। বস্তুত অজ্ঞাত-উদ্ভূত শহরটির উৎপত্তির বর্ণনা দান করে ইহার অবস্থানের ভূ-বিবরণ (Topography)। S. Gsell-এর মতে (Histoire,v, 279) "সেইখানে Chotts-এর মরূদ্যান, গাবেস, বায়যাসেনা, মাকতার এবং তেবেসসাগামী প্রাকৃতিক রাস্তাগুলির একটি সংযোগ ছিল।" ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব নহে যে, ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য রাস্তাগুলির সংযোগস্থলে একটি কার্থেজীয় শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে শহরটি জুগুর্থা-র নুমিদীয় রাজ্যের অংশ ছিল এবং তিনি উক্ত রাজ্যটির প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করিতেন এবং কর্তৃত্বাধীন রাখার জন্য, এমন কি কর মওকুফ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের জন্য রাজ্যটি তাহাকে উচ্চ সম্মান ও আনুগত্য প্রদান করে।

রোম সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে জুগুর্থা-কে পর্যুদস্ত করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত Caius Marius এক দুঃসাহসী অভিযানে শহরটিকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া ইহাতে অগ্নিসংযোগ করে (১০৭ খৃ. পূ.)। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা পুনর্জন্ম লাভ করে এবং ট্রাজান-এর সময় (৯৮-১১৭) ইহা একজন কার্থেজীয়গণ প্রশাসক (Suffetes) শাসিত একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক অঞ্চল (Commune)-এ পরিণত হয়। ইহাই সাক্ষ্য বহন করে পরবর্তী কার্থেজীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার, যাহা রোমান সাম্রাজ্যেও বহাল রাখা হয়। তারপর আসে Diocletion-এর শাসনকাল (২৮৪-৩০৫)। বারবারগণ আরও আগ্রাসী হইয়া উঠে এবং রোমক সাম্রাজ্য ক্রমশ অঞ্চলটি ত্যাগ করিবার দুর্ভাগ্য মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই প্রত্যাহার Vandal-দের সময় পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং Genseric (৪২৮-৭৭)-এর মৃত্যুতে কাফসা একটি বারবার রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। তারপর ইহা বায়যান্টিয়ামের কর্তৃত্বে ফিরিয়া আসে Justinian-এর সময় (৫২৭-৬৫), যিনি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা এবং ঐক্য পুনঃস্থাপন করেন। এক সময়ে কাফসা Byzacena প্রদেশের প্রধান নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। ৫৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে Solomon একটি নূতন শহর-প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং ইহার নামকরণ করা হয় Capsa-Justiniana।

বর্তমানে কাফসায় বিগত দিনের প্রাচীন ঐশ্বর্যবান পুরাকীর্তির চিহ্ন খুব কমই আছে, যথা 'রোমক স্নানাগার', কয়েকটি স্তম্ভ এবং কারুকার্যময় শীর্ষ এবং অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির ধ্বংসাবশেষ যেইগুলি বহুলাংশে পুনর্ব্যবহৃত হইয়াছে সুবৃহৎ মসজিদটিকে এবং অবশ্য পুরাতন শহরটির ইমারতগুলিতেও। তথাপি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী পর্যন্ত শহরটি ইহার ক্লাসিক্যাল চেহারা বজায় রাখিয়াছিল, এমন কি ইফরীকিয়াতে অনন্য একটি রোমক ভাষা ব্যবহৃত হইত এবং অধিবাসিগণের একটি বিরাট অংশ খৃষ্টধর্ম পালন করিত। আল-বাকরী (মাসালিক, ৪৭/১০০), যাঁহার রচনাকাল ছিল ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ, উল্লেখ করিয়াছেন, "শহরটি সম্পূর্ণভাবে স্তম্ভের (আসাতীন) এবং মার্বেল (রুখাম) পাথরের খিলানের উপর নির্মিত", এবং ইহার প্রাচীন প্রাচীর এমন সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে যে, "মনে হয় যেন ইহা গতকল্য সমাপ্ত হইয়াছে।" এক শতাব্দী পরে আল-ইদরীসী (নুযহা, ৭৫) আরও সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন, "বিশেষত বারবারগণ এখানে বাস করিত এবং তাহাদের অধিকাংশই ইফরীকীয় লাতিন ভাষায় (আল-লিসানু'ল-লাতীনি'ল-ইফরীকী) কথা বলিত" [দ্র. Tewicki, Une langue romane oubliee de l'Afrique du Nord, in RO, xvii (১৯৫৩ খৃ.), স্থা.]।

Sbeitla বিজয় এবং প্যাট্রিসিয়ান গ্রেগরির মৃত্যুর পর ২৭/৬৪৭ সালে মুসলিম বিজয়ের প্রথম ঢেউ কাফসা-র দুর্গপ্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যায়। বিশ বৎসর পরে 'উকবা ইব্ন নাফি' শহরটি দখল করেন এবং তারপর আরবদের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া ৭৮/৬৯৭-৮ সালের কাছাকাছি হাসসান ইবনু'ন-নু'মান সমগ্র ইফরীকিয়া সমেত এই স্থানটি নিশ্চিতভাবে পুনর্দখল করিয়াছিলেন।

২য়/৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথম দিকে এই অঞ্চলটি ছিল খারিজী, যথা ঃ লুওয়াতা, যুওয়াগা এবং মিকনাসা অধ্যুষিত। ২২৪/৮৩৯ সালে তাহারা কাসৃতীলিয়া জিলার বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং আগলাবী আমীর আবু 'ইকাল কর্তৃক ভীষণভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল। আশ-শাম্মাখীর মতে (সিয়ার, ২০৩) সেখানে ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহহাব (১৬৮/৭৮৪-২০৮/৮২৩)-এর একজন 'আমিল (কর আদায়কারী) ছিলেন, যিনি ইবাদীগণের নিকট হইতে কুরআন-এ উল্লিখিত কর আদায় করিতেন এবং তাহা, কম বা বেশী, গোপনে/তাহার্ত (Tahart)-এ পাঠাইতেন। কারণ শহরটি কখনও রাজনৈতিকভাবে রুসতামী রাজ্যের অংশ ছিল না।

ফাতিমী এবং পরবর্তীকালে যীরিগণের শাসনাধীন থাকার পর কাফসা প্রায় এক শতাব্দীরও অধিক সময় কাসতীলিয়ার (বর্তমানে জীরিদ) সমগ্র ভূভাগসহ একটি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল (৪৪৫/১০৫৩-৫৫৪/১১৫৯)। হিলালী আক্রমণ অঞ্চলটির রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং জাতি বিভাগগত ভারসাম্যে প্রগাঢ় পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করে। শহরটি যীরী শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নি'র-রানদ অন্য সকলের ন্যায় নিজকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করেন (৪৪৫/১০৫৩—৪৬৫/১০৭৩) এবং আরব যাযাবর গোত্রগুলির, সর্বোপরি রিয়াহ গোত্রের সহিত মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করিয়া এবং তাহাদিগকে কর প্রদান করিয়া রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান এবং তাঁহার কর্তৃত্ব শক্তিশালী করিয়াছিলেন, কবি ও ফাকীহগণকে তাঁহার রাজসভার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

যাঁহারা সমগ্র মাগরিবকে একীভূত করিয়াছিলেন, সেই আল-মুওয়াহহিদূন (Almohads)-এর শাসনামলে কাফসার স্বাধীনতার অবসান ঘটে। ৫৫৪/১১৫৯ সালে কঠিন অবরোধের পর 'আবদু'ল-মুমিন ইব্ন 'আলী শহরটি দখল করেন। এই সময় হইতে ইফরীকিয়ার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের ন্যায় কাফসার কারাকুশ নামক একজন আর্মেনীয় দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী এবং সর্বোপরি বানূ গানিয়া (দ্র.) শহরটিকে আল-মুওয়াহহিদূনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য কয়েকটি প্রয়াস চালায়। অন্য পক্ষে বানু'র-রানদ তাহাদের পরাজয়ের কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। আল-মুওয়াহহিদ শাসনকর্তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে হত্যা করে এবং এই অধিবাসীদের অনুরোধে ইবনু'ল-মু'ইযয রাজবংশটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। খলীফা আবু য়া'কুব য়ূসুফ শহরটি অবরোধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং মাররাকুশ হইতে আসিয়াছিলেন (৫৭৫/১১৮০), কিন্তু ইহার আত্মসমর্পণ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নাই। বাস্তবে ইহা শীঘ্রই বানূ গানিয়ার হস্তগত হইল। ইহার পরে আসে আল-মানসূর-এর পালা, তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শহরটি অবরোধ করেন

(৫৮৩/১১৮৭-৮)। এইবার কাফসা চরম শাস্তি ভোগ করিল, ইহার দুর্গ-প্রাচীর সম্পূর্ণভাবে ভূমিসাৎ করা হইল এবং অধিবাসিগণকে তাহাদের জমি শুধু ভাগ-চাষী হিসাবে চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

হাফসী শাসনামলে শহরটির জীবনযাত্রা কখনও শান্ত ছিল না। একজন মিথ্যা দাবিদার অথবা অবৈধ দখলকার ইব্ন আবী 'উমারা (৬৮১-৩/১২৮-৪) ইহা ৬৮১/১২৮২ সালে দখল করেন। অতঃপর শহরটি ইহার পূর্ব-স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় একটি স্থানীয় রাজবংশ বানু'ল 'আবিদ-এর উত্থানের মাধ্যমে, যাঁহার ছিলেন আরব প্রাধান্যের পক্ষে। হাফসী আবূ বকর (৭১৮-১৩১৮-৭৪৭/১৩৪৭), যাঁহার গোলযোগপূর্ণ রাজত্বকালের শুরুতেই দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলি হস্তচ্যুত হয়। ৭৩৫/১৩৩৫ সালে তিনি ইহা অবরোধ করিয়া পুনর্দখল করেন এবং ইহার শাসনভার তাঁহার পুত্র 'আব্বাস-এর উপর অর্পণ করেন। একই সময়ে গরীবদিগকে জমি প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার শাসনের প্রতি তাহাদের অধিকতর অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, স্বল্পকালীন মারীনী আধিপত্যের (৭৪৮-৫০/১৩৪৮-৫০) পর অল্প দিনের মধ্যে আহমাদ ইব্ন 'উমার ইবনি'ল-'আবীদ-এর শাসনাধীনে এবং তারপর তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ-এর শাসনাধীনে আরও একবার কাফসা নিজ স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। আবু'ল-'আব্বাস (৭৭২/১৩৭০-৭৯৬১৩৯৪) তাঁহার রাজ্য পুনরায় জয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৭৮০/১৩৭৮ সালে তিনি কাফসা অবরোধ করেন, অধিবাসিগণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মানসে ইহার মরূদ্যানকে ধ্বংস করেন এবং পুত্র আবূ বাকরাকে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ফিরিয়া যান। গভর্নর আত-তুরায়কির মৃত্যুর (৭৯৩/১৩৯১) পর সংঘটিত গোলযোগের সুযোগে আ-দুনায়দিন নামক এক ব্যক্তি নিজ স্বার্থে বানু'ল-আবিদ রাজবংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আবুল আব্বাসকে আরও একবার হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। ৭৯৫ সালের মাঝামাঝি/ ১৩৯৩ সালের বসন্তকালে তিনি শহরটি পুনরায় অবরোধ করিয়াছিলেন, আবারও খেজুর বাগানগুলি ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থতার মুখোমুখী হইয়াছিলেন এবং বেশ কষ্টকর অবস্থার মধ্যে অবশেষে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অবস্থা মাত্র অল্পকাল স্থায়ী ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী আবূ ফারিস (৭৯৬/১৩৯৪-৮৩৭/১৪৩৪)-এর সময়ে বানু'ল-'আবিদ পুনরায় শহরটিতে বিদ্রোহ করিয়াছিল। ফলে আবূ ফারিস শহরটিকে দখল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (৮০২/১৪০০)। তিনি দুর্গ প্রাচীর ভূমিসাৎ এবং বিদ্রোহী রাজবংশকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কয়েক যুগ পরে আবু'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মুনতাসির (৮৩৭-৯/১৪৩৪-৫) শহরটি পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাসাবার উন্নতি সাধন করেন।

এই সময়ের পরে ইতিহাসে কদাচিৎ কাফসার উল্লেখ দেখা যায়। ৯৫৭/১৫৫০ সালে একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর মহামতি সুলতান সুলায়মান কর্তৃক নিয়োজিত ত্রিপোলীর শাসনকর্তা ড্রাগূত (দ্র. তুরগূদ) ১৭ সাফার, ৯৬৪/২০ ডিসেম্বর, ১৫৫৬ সালে ইহা দখল করিতে সক্ষম হন। তুর্কী অধিবাসী ইহার পূর্বশ্রী পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে যাযাবরগণের এবং রক্ষা করিতে অপরাগ কেন্দ্রীয় সরকারের যুগপৎ চাপে শহরটির অবনতি হইতে থাকে এবং ইহা স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়। অতঃপর যখন protectorate (আশ্রিত এলাকা) স্থাপিত হয়, তখন ফরাসীগণ অনায়াসে ইহা অধিকার করে (২০ নভেম্বর, ১৮৮১)।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক তথ্য ঃ কাফসা একটি শুষ্ক বৃক্ষহীন শহর। দক্ষিণ-পূর্বে Orbata পর্বতশ্রেণী এবং উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে আস্সালাহ এবং বেন ইউনেস পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অবস্থানে উত্থিত হইয়া একটি সুউচ্চ স্থানে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৫ মিটার উচ্চে ইহা অবস্থিত। ঐতিহাসিক কাল হইতে সর্বদা এই অবস্থান যেন একটি নির্জন নিরানন্দ ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহা দুর্গ-শহরের জন্য একটি বিশেষ আদর্শ। ঊষর এলাকায় অবস্থিত যে শহরের গুরুত্ব ইহার পানি-সম্পদের উপর নির্ভরশীল, এই দুর্গ-শহরটি তাহারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Ch. Tissot-এর মতে ইহা সাহারা মরুভূমির অন্যতম প্রবেশ ফটক এবং যুগপৎভাবে Tell পর্বত (?)-এর চাবিকাঠি (Geographie, ২খ., ৬৬৮)– কাফসার এই অবস্থানও দৃষ্টান্তমূলক। Sallust (৮৬-৩৫ খৃ. পূ.) ইহাকে একটি "প্রকাণ্ড এবং সুরক্ষিত" শহররূপে বর্ণনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিশাল এবং জনমানবশূন্য মরুভূমিগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যাহা কাফসাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আক্রমণকারী সৈন্যদলের পক্ষে ইহাতে প্রবেশ কষ্টসাধ্য করিয়া রাখিয়াছে।

এই সুবিধাগুলির কল্যাণে বায়যাসেনা (Byzacena)-র অবক্ষয় সত্ত্বেও কাফসা ইহার গুরুত্ব এবং সমৃদ্ধি ক্লাসিক্যাল যুগের শেষ পর্যায়ে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আরব বিজয়ের পর ইহার গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য করা যায় যে, ইহা বহুদিন ধরিয়া একটি ক্লাসিক্যাল শহরের রূপ এবং চালচলন বজায় রাখিয়াছিল। আল-য়া'কূবীই প্রথম ভূগোলবিদ যিনি এই শহরটি সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত নিজস্ব বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৩য়/৯ম শতকের প্রায় শেষ দিকে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন এইরূপ ঃ "একটি সুরক্ষিত নগরী, প্রস্তর-প্রাচীর বেষ্টিত, নগরীর অভ্যন্তরে পানির ঝর্ণা, রাজপথগুলি শান বাঁধানো, শহরতলিগুলি সমৃদ্ধ এবং তথাকার ফল বিখ্যাত" (Les Pays, ২১২)। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে ৩৩৬/৯৪৭ সালে ইব্ন হাওকাল কায়রাওয়ান-এ উপনীত হন (সূরাতু'ল-আরদ, ৯৪, অনু. Kramers-Wiet, 92)। তিনি বর্ণনা করেন, ৩৩০/৯৪২ সালে আবূ য়াযীদ (দ্র.) কর্তৃক বিধ্বস্ত (সূরাতু'ল-আরদ, ৯২, অনু. ৯৩) হইবার পূর্বে কাফসা ঃ ছিল একটি স্বায়ত্তশাসিত (مستقلة) শহর, ইহার সমৃদ্ধি ছিল পূর্ণাঙ্গ (فى غاية الكمال)। এই ধ্বংসকাণ্ড হইতে ইহা অতি দ্রুত মুক্তি লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ৪র্থ/১০ম শতকের শেষের দিকে আল-মুকাদ্দাসী (মৃ. ৩৭৮/৯৮৮) ইহাকে ইফরীকিয়ার প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি গণ্য করিয়াছিলেন। আল-বাকরী (মৃ. আনু. ৪৬১/১০৬৮) দেশটি পরিভ্রমণ করেন নাই এবং সাধারণ ইফরীকিয়াবাসী আল-ওয়াররাক (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩-৪)-এর উদ্ধৃতি দিয়াছেন, আল-বাকরী ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই শহরটির খুবই অনুকূল একটি বিবরণ দিয়াছেন। এই বর্ণনাটি আমাদের হস্তগত মধ্যযুগীয় এই সুরক্ষিত স্থানের বিবরণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তারিত এবং উহাতে ক্লাসিক্যাল স্মৃতিসৌধগুলি সম্বন্ধে জোরালো মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এইগুলি তখন পর্যন্ত বেশ সুমেরামতকৃত, ইহার বেগবতী ঝরনাগুলি বাগানে প্রচুর পানি সরবরাহ করিত। এই ফল বাগানগুলিতে একদা অন্যান্য ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পেস্তা উৎপাদিত হইত, যাহা ইফরীকিয়ার সকল অংশে, এমন কি মিসরে, সিজিলম্যাসা এবং স্পেনে রফতানী হইত। তিনি আরও বলেন, সেখানে কবুতরের ডিমের সমান বড় বড় খেজুর পাওয়া যাইত। পার্শ্ববর্তী এলাকায় অন্যূন দুই শত গ্রাম ছিল যাহা কুসূর কাফসা নামে পরিচিতি এবং বেশ সমৃদ্ধ। সর্বশেষ এবং ধন-সম্পদের সন্দেহাতীত

চূড়ান্ত নিদর্শক হিসাবে তিনি জানাইয়াছেন যে, আদায়কৃত কর হইতে রাজকোষে ৫০,০০০ দীনার-এর কম যোগান দেওয়া হইত না। ইহা নিশ্চিত যে, এই বিবরণটি শহরটির সমৃদ্ধির চরম পর্যায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, সম্ভবত আল-ওয়াররাক-এর আমলের অর্থাৎ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষভাগের। এই সমৃদ্ধি হিলালীদের আক্রমণ সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে পরবর্তী শতাব্দীতে অর্থাৎ আল-বাকরীর সময়েও বজায় ছিল। হিলালীদের সহিত বানু'র-রানদ একটি সাময়িক সমঝোতায় উপনীত হইতে সক্ষম হয়, চড়া দামে হইলেও তাহা অন্তত গ্রহণযোগ্য ছিল। শহরটি ৬ষ্ঠ/১২ শতাব্দী পর্যন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন আল-ইদরীসী ইহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে ইহা ছিল "একটি সুন্দর নগর" (مدينة حسنة) যাহার প্রাচীরগুলি এখনও অক্ষত, প্রচুর পানি সরবরাহ, বাজারগুলি প্রচুর দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত, বণিক সংখ্যা বিস্তর, শিল্পগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত (صناعة قائمة) বিস্তৃত খেজুর বাগানে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের (عجيب) খেজুর, গ্রামগুলি জনবহুল, ফলবাগানগুলির বৃক্ষাদিতে নানা প্রকারের ফল, যেমন হেনা, তুলা এবং জিরা উৎপাদিত হইত, যাহা মধ্যযুগে অত্যন্ত উচ্চ দরে বিক্রীত হইত।

আল-মুওয়াহহিদ বংশের আমল হইতে পট পরিবর্তিত হয়। স্বাধীনতার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী শহরটি পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ করিতে থাকে এবং অত্যধিক স্বাধীনতা প্রীতির চরম মূল্য প্রদান করে, বহুবার ইহার দুর্গপ্রাচীর ভূমিসাৎ এবং খেজুর বাগান ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার অর্থনৈতিক অবক্ষয় ঐ সময় হইতে আরম্ভ হয়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে য়াকূত (যদিও তিনি ইহার পূর্ব গৌরবের বর্ণনা দিয়াছেন) ঐ সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহা ইফরীকিয়া সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র শহর (بلدة صغيرة) অনুর্বর লবণাক্ত একটি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত" (বুলদান, ৪খ, ৩৮২)। লুণ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক কর্মের জন্য সর্বাধিক উন্মুক্ত ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইব্‌নু'শ -শাববাত-এর সময়ে (৬১৮/১২২১-৬৮১/১২৮২) আল-ওয়াযীরু'স-সাররাজ (হুলাল, ১খ, ৪৩৭) কর্তৃক অনুলিপিকৃত বর্ণনায় বলা হইয়াছে, "উহাদের কয়েকটি মাত্র টিকিয়া ছিল।" ১০ম/১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আল-মানসূর-এর আদেশে পরিচালিত ধ্বংসলীলার বিবরণ দেওয়ার পর Leo Africanus লিখিয়াছেন, "আজ কাফসা-কে আবার বসতিপূর্ণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার দালানগুলি খুবই ছোট, কেবল ব্যতিক্রম কয়েকটি মসজিদ। ইহার রাজপথগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং Naples ও Florence-এর রাস্তার মত কাল পাথর দ্বারা বাঁধানো। দেশের জনগণ নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তিউনিসের রাজা কর্তৃক চাপানো করের ভারে তাহারা দরিদ্র" (Description de l'Afreque, ২খ, ৪৪৪)। তিনি ইহার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার কাপড়ের, মৃন্ময় পাত্রের, খেজুরের ও কমলালেবুর প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার জলপাই বৃক্ষগুলিতে উৎপাদিত হইত "এক প্রকার তৈল যাহা স্বাদে ও বর্ণে অতুলনীয়"। ইহার পর (উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে নহে) Guerin, Zaccone, Mayet প্রমুখ পর্যটকের বর্ণনা হইতে শহরটির অন্যান্য যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বাস্তবে ইহা একটি তুচ্ছ পল্লীগ্রামের অধিক কিছু ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ভৌগোলিক উৎস (সময়ানুক্রমিকভাবে)ঃ (১) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ, মাসালিক এবং ইবনু'ল-ফাকীহ, বুলদান, আংশিক সম্পা. এবং অনু. Hadj-Sadok under the title Description du Maghreb:..., Algiers 1949, 6-7 and n 74. 30-1; (২) আল-য়া'কূবী, বুলদান, অনু. G. Wiet, Lea pays, Cairo 1937, 212; (৩) ইব্‌ন হাওকাল, সূরাতু'ল আরদ, বৈরূত তা. বি. ৮৭, ৯২ (অনু. Kramers-Wiet, 92, 93; (৪) মুকাদ্দাসী, আহসানু'ত-তাকাসীম, আংশিক সম্পা. এবং অনু. Ch. Pellat, under the title Description de l'Occident .... Algiers 1950, 4-5, 64-5; 64-5; (৫) বাকরী, মাসালিক, সম্পা. এবং অনু. de. Slane, paris, 1965, 14 and 35, 47 and 100-2; 75 and 153, 284; (৬) ইদরীসী, নুযহা, আংশিক সম্পা. H. Peres, Algiers 1957, 75, 80, 89 ; (৭) য়াকূত, বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৪খ, ৩৮২-৩; (৮) তিজানী, রিহলা, তিউনিস ১৯৫৮খৃ., ১১৪, ১৩৬-৯, ১৪৭, ৩৫৩, ৩৫৬-৭; (৯) সাফিয়্যু'দ-দীন আল-বাগদাদী, মারাসিদুল-ইততিলা' সম্পা. 'আলী মুহাম্মদ আল-বিজাবী, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ৩খ, ১১১৩; (১০) Jean-Leon l'Africain (Leo Africanus), Description de l'Afrique, অনু. A. Epaulard, Paris 1956, ii, 443-5; (১১) আল-ওয়াযীরু'স-সাররাজ, হুলাল, সম্পা. এম.এইচ. আল-হীলা, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., ১খ, ৩৬৮, ৩৭৯-৮১, ৩৮৮, ৪৩৬-৭, ৪৮৮, ১০০৫, ১০৭৩; (১২) V. Guerin Voyage archeologique dans la Regence de Tunis, Paris 1862, ১খ, 270-87; (১৩) Zaccone, Notes sur la regence de Tunis, Paris 1875, 208-16; (১৪) Cealis, De Sousse a Gafsa, Paris. d., 153-213; (১৫) V. Mayet, Voyage dans le sud de la Tunisie. Paris 1887, 171-86. অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থাদি ঃ (১৬) L. Balout, Prehistoire de l'Afrique du Nord, Paris 1955, 387-448; (১৭) Bodereau, La Capsa ancienne et la Capsa moderne, Paris 1907; (১৮) A. Bouhdibam, Les conditions de vie des mineurs de la region de Gafsa, Tunis 1968, Etudes de Sociologie tunisienne, i, 165-233 ; (১৯) R. Brunschvig. La Berberie orientale sous les Hafsides. Paris 1940-47, i, 3, 6-9, 21, 149, 150, 158, 174, 189-90, 207-8, 305, 328, ii, 105-6, 186, 199, 220, 280; (২০) J. Despois, l'Afrique du Nord, Paris 1958 (দ্র. নির্ঘণ্ট); (২১) Ch. Diehl, l'Afrique byzantine, Paris 1896, i, 126, ii, 388, 391, 529, 560, 572; (২২) L. Foucher, Hadrumetum, Paris 1964, 262, 321; (২৩) J. Ganiage, Les Origines du protectorat francais en Tunisie, Paris 1959, 138, 145, 171; (২৪) S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris 1913-28, ii, 89-9, v. 204, 278-9, vii, 231-5; (২৫) H. R. Idris, La Berberie orientale sous les Zirides, Paris 1962, i, 222-3, 396-9, ii, 470-1; (২৬) Ch.-A. Julien, Histoire de l'Afrique de Nord, Paris 1956, ii, 271; (২৭) A. Laroui, L'histoire du Maghreb, Paris 1970, 117, 175, 220, 309; (২৮)

A. Martel, Les confins saharotripolitains de la Tunisie, 1881-1911, Paris 1965, i, 243-4, 260-5, 276-8; (২৯) এ, সা'দ য়াগলূল, তারীখু'ল-মাগরিবি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., ১১৩, ১৪১-৩, ১৯০-১; (৩০) M. Talbi, L'Emirat Aghlabide, Paris 1966, 219-20, 356, 359, 672-7, 686; (৩১) Ch. Tissot, Geographie comparee de la province romaine d'Afrique, Paris 1884, ii, 264, 265, 268; (৩২) J. Toutain, Les cites romaines de Tunisie, Paris 1896 ; (৩৩) R. Vaufrey, Prehistoire de l'Afrique, i, le Maghreb, Paris 1955, 14, 127-95, 407-15।

M. Talbi (E.I.[2])/আ. র. মামুন

কাফাআ (كفاء) ঃ ('আ.) সাধারণ ব্যবহারে এই শব্দটি একই সঙ্গে এবং সমগ্রে সমতা, সমকক্ষতা ও পারদর্শিতা নির্দেশ করে, কিন্তু ফিক্হ-এর পরিভাষা অনুযায়ী ইহা সামাজিক মর্যাদা, সম্পদ, সম্পত্তি ও পেশার (যাহা স্বামী এবং শ্বশুর দ্বারা অনুসৃত সমকক্ষতা) এবং সেই সঙ্গে জন্ম সংক্রান্ত সমতা নির্দেশ করে, যাহা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে থাকা উচিত এবং যাহার অনুপস্থিতিতে কোন বিবাহকে মানানসই বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, যার ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে বলিয়া মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ফিকহশাস্ত্রে কাফাআ কেবল একদিকে কার্যকরী হয় এবং কেবল স্ত্রীকে সুরক্ষা প্রদান করে—যাহার পক্ষে তাহার নিজস্ব মর্যাদার নিম্নে বিবাহ করা উচিত নয় ; অপর দিকে ইহাতে যদি কোন পুরুষ তাহার অপেক্ষা সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট মর্যাদার কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তাহাতে কিছু যায় আসে না। অবশ্য ইহার দুইটি ব্যতিক্রম রহিয়াছে। কাফাআ তত্ত্বের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন মাযহাব বিশেষে বিভিন্ন রূপ এবং বেমানান বিবাহের ক্ষেত্রে ইহারা যে সমস্ত ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছে, সেই সম্পর্কে 'নিকাহ' প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে আমাদের আলোচনা শুধু এই তত্ত্বের প্রসার ও উন্মেষের পশ্চাতে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক হেতুসমূহের পর্যালোচনা এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত ইহার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ থাকিবে।

প্রাক-ইসলামী আরবদেশে ইহা অবশ্য পালনীয় ছিল যে, কোন বিবাহিত দম্পতির অবশ্যই জাতি ও গোত্রগত মানে এবং একই সঙ্গে সামাজিক মর্যাদায় যথেষ্ট সমকক্ষ হইতে হইবে। প্রাক-ইসলামী এই প্রথাটিকে আল-কুরআনের সূক্ষ্ম ভাষ্যের সহিত না হইলেও অন্তত পক্ষে ইহার বক্তব্যে মানুষ ও মানুষের মধ্যে তুলনামূলক যে অন্তর্নিহিত সমতার বাণী ও চেতনা রহিয়াছে তাহার সহিত আপোস করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ইসলামের অতি প্রারম্ভকাল হইতেই এই বিধি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় যে, কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত বিবাহে কাফা-আ-র অভাব ঘটিতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতীত অনুপযুক্ত বিবাহের ফলাফল খারাপ নয়। কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কাফা-আ-র অভাবের এই ব্যাখ্যা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে ফুকাহা'র মধ্যে দুইটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একপক্ষে ছিলেন মদীনার 'আলিমগণ যাঁহারা কাফাআ-কে কেবল কোন ধার্মিক নারীর পক্ষে কোন চরিত্রহীন পুরুষকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছাড়া বাকী সব বিষয়ে গুরুত্বহীন মনে করিতেন। অপর দিকে কূফার আইনবিদদের প্রবণতা যাহা হইতে সঠিক হানাফী মাযহাবের উল্লেখ ঘটে—সেই অনুসারে কোন স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত সর্বাঙ্গীণ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, যদি সে কেবল একই প্রকার বংশোদ্ভূত, একই প্রকার সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, ইসলামধর্ম গ্রহণের দিক দিয়া প্রবীণতর ও একই মানের নৈতিকতার অধিকারী হয়। ইহার অতিরিক্তরূপে হানাফী আইন অনুযায়ী অন্ততপক্ষে স্বামীর পেশা তাহার শ্বশুরের পেশার সমান সম্মানজনক। ইহা হইতে বিভিন্ন পেশার মধ্যে একটি পারস্পরিক তুলনামূলক তালিকা উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা প্রায় সকল হানাফী রচনাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা দুইটির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার কারণ হিসাবে তৎকালে যে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে উভয় ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কূফা শহরের জনসংখ্যার মধ্যে আরব ও অনারব মুসলিমগণ খুব পাশাপাশি বসবাস করিত, যাহা অতীতে সাসানী সাম্রাজ্যে অত্যন্ত গভীরে মূল বিস্তারকারী সামাজিক শ্রেণীর ভাবধারায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই প্রভাব হইতে মদীনার অধিবাসিগণ মুক্ত ছিল। এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সামাজিক অবস্থান বিবেচনা এবং স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে সম-অবস্থান, যাহা হানাফী ও শাফি'ঈ প্রাচ্যে বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, তাহা মালিকী আইন অনুসারী অঞ্চলসমূহে অজ্ঞাত, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও মালিকীপন্থী মাগরিবের মধ্যে কার্যত কোন প্রকার পার্থক্য বিদ্যমান নাই। এখানেও উক্ত অঞ্চলের ন্যায় পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সমতার প্রশ্নটি উহার সকল গুরুত্ব সহকারে বিরাজমান, যদিও মাগরিবের ন্যায় এখানেও মর্যাদায় অসমতা আইনগত বাধার লক্ষ্য হয়।

ফলে হানাফী পদ্ধতিতে কাফাআ-র প্রতি প্রদত্ত গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, সামাজিক হেতুর জন্য নয়, বরং এই কারণে যে, মাযহাবমতে কোন নারী সাবালিকা হইলে কোন ওয়ালী (দ্র.)-এর সহায়তা ব্যতিরেকেই তাহার নিজের বিবাহ সম্পাদনের ক্ষমতার অধিকারী হয়, যদিও এইরূপ কোন কার্য দূষণীয়রূপে বিবেচিত হয়। সেইজন্য এই সকল দেশে স্ত্রীর পরিবারের জন্য বৈবাহিক অনুপযুক্ততার ঝুঁকি মালিকী আইন অনুসারী দেশসমূহ হইতে অনেক বেশী। সেখানে ওয়ালী প্রদত্ত অপরিহার্য সহায়তা স্ত্রীর পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। ইহা হইতে কতিপয় মালিকী দেশে (উদাহরণস্বরূপ মরক্কো) বর্তমানে মহিলাগণ তাহাদের নিজস্ব বিবাহ সম্পাদনে যে তুলনামূলক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, তাহার প্রতি সাম্য আনয়ন করার প্রবণতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক তাহাদের ব্যক্তিগত মর্যাদাসূচক আইনে কাফাআ-র পরিবর্তিত রূপ প্রবর্তন করা হইয়াছে, যাহা প্রাচীন মালিকী আইনে অজ্ঞাত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. Goldziher, Muh. St., ১খ., ১৩০-৩ (ইং অনু., ১২৩-৫); (২) Farhat J. Ziadeh, Equality (কাফা'আ) in the Muslim Law of Marriage, in American Journal of Comparative Law, ৬খ. (১৯৫৭ খৃ., ৫০৩-১৭); (৩) R. Brunschivig, Metiers vils en Islam, in St. Isl., ১৬খ. (১৯৬২ খৃ.), ৫৫-৭, তৎসহ প্রাচীন গ্রন্থকারগণের প্রচুর নির্দেশনা; (৪) B. Lewis Race and color in Islam, নিউ ইয়র্ক ১৯৭১ খৃ., ৮৯ পৃ.; (৫) N. J. Coulson, A history of Islamic Law, এডিনবার্গ ১৯৬৪ খৃ. ৪৯, ৯৪; (৬) Y. Linant de Bellefonds, Traite de Droit

musulman compare, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬৫ খৃ., ২খ, ১৭১-৮১।

Y. Linant de Bellefonds (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

কাফালা (كفالة) ঃ (হানাফী মাযহাব ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে দামান (ضمان = যামানত), পাশ্চাত্যের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার যামিন মুচলেকার অনুরূপ একটি ব্যবস্থা; পার্থক্য শুধু এই যে, ফাকীহ্গণ (আইনবিদগণ) দুইটি পৃথক শ্রেণীর যামিন মুচলেকার মধ্যে প্রভেদ করেন। এক দিকে আছে এমন এক প্রকার যামানত যাহাতে যামিনদার (কাফীল) ঋণী ব্যক্তির (আসীল বা মাকফূল- مكفول/اصيل) কেবল আদালতে উপস্থিতির নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারে। কাফালা বি'ন-নাফস (كفالة بالنفس) নামে পরিচিত এই ব্যবস্থাটি কেবল মুসলিম আইনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা । ইহা ব্যতীত রহিয়াছে কাফালা বি'ল-মাল (كفالة بالمال) যাহার মাধ্যমে প্রদত্ত যামিনদার ব্যক্তি ঋণদাতাকে (মাকফূল লাহু (مكفول له) এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করে যে, প্রধান ঋণীর দায় পূর্ণভাবে পরিশোধ হইবে। উপরন্তু এই দুই প্রকার যামিন মুচলেকায় অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

উভয় প্রকার যামিন মুচলেকার জন্য প্রযোজ্য বৈধতার শর্তসমূহঃ

ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতামত ব্যতীত (যাঁহার মতামত শেষ পর্যন্ত টিকে নাই) হানাফী আইনে মুচলেকা দানকারী এবং ঋণদাতার মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক সম্মতিপত্র সম্পাদন আবশ্যক, আবূ য়ূসুফের মতে যামিনদাতার পক্ষে মুচলেকা প্রদান একটি সম্পূর্ণ একতরফা প্রতিশ্রুতি। এই ধারণাটি অপরাপর মাযহাবও গ্রহণ করে। তাঁহাদের মতে যামিন মুচলেকা সংক্রান্ত কার্যাবলী কেবল যামিনদাতার সদিচ্ছার মাধ্যমেই বৈধতা প্রাপ্ত হয়। যামিন মুচলেকাকে কেবল যামিনদাতার পক্ষে একটি উদারতাপূর্ণ মানবিক কার্যরূপে দেখা হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, একই সঙ্গে স্বাধীনভাবে তাহারও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা থাকিতে হইবে, তাহাকে তাহার সকল সামর্থ্যের ব্যবহারে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতে হইবে এবং তিনি কোন অবস্থায় নাবালক, উন্মাদ অথবা নিষিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পারিবেন না। অপর পক্ষে যেহেতু ঋণদানকারী একজন মুনাফাকারীর অবস্থায় থাকেন, তিনি হানাফী আইনে (যাহাতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়) অন্য কোন গ্রহীতার ন্যায় একই সুবিধা লাভ করেন। কোন যে সকল ঋণ ও প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে প্রধান ঋণগ্রহীতার স্থলে প্রদত্ত নিশ্চয়তা দ্বারা দায় পরিশোধের ক্ষমতা বিদ্যমান সেই ক্ষেত্রেই যামিন মুচলেকা সম্পন্ন করা যাইবে। সুতরাং শাস্তিমূলক দায় ও প্রতিশোধমূলক বিচার (কিসাস) ইহার বৈধতার বাহিরে, কেবল কাফালা বি'ন-নাফ্স ব্যতীত যাহাতে যামিন মুচলেকা শুধু ঋণী ব্যক্তির আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

(ক) কাফালা বি'ন- নাফস (كفالة بالنفس) ঃ যামিন মুচলেকার এই প্রাথমিক ও মৌল রূপটি ফিকহশাস্ত্রের সকল রচনাতেই, তাহা যে মাযহাবের অনুসারীই হউক না কেন, তাহার দীর্ঘ ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। প্রথম শাফি'ঈগণ এবং ইমাম আশ-শাফি'ঈ তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষায় ইহার বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে শাফি'ঈ মতাবলম্বিগণ "জনমতের চাপের মুখে ও প্রয়োজনের তাকীদে" শেষ পর্যন্ত ইহাতে অনুমতি প্রদান করেন। এই যামিন মুচলেকার ব্যাপারে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ঋণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যখন দেখা যায় যে, চুক্তি সম্পাদনের পর ঋণী ব্যক্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন ও কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা জানা সম্ভব নয়, তখন ইহা অবৈধ হইয়া পড়ে (শাফি'ঈ আইন ইহার ব্যতিক্রম, ইহাতে অনুপস্থিতিতে বিচার সম্পাদন বৈধ)। একই কারণে যদি ঋণী ব্যক্তি ইনতিকাল করে, তাহা হইলেও মুচলেকাটি অকার্যকর হইয়া পড়ে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপেই। যদি স্বয়ং যামিনদার ইনতিকাল করেন তাহা হইলে যামিনের পরিণতি একই রূপ হইবে।

অনুপস্থিত যামিনদারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ঋণী ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হন, এই প্রশ্নে বিভিন্ন মাযহাব বিভিন্নভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হানাফী মাযহাব মতে তাহাকে অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিশেষ সুবিধা প্রদান করার পরেও (কারণ ঋণী ব্যক্তির স্বল্পকালীন অনুপস্থিতি তাহার অপারগতার হেতু হইতে পারে) তিনি যদি তাঁহার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তবে তাহাকে কাদীর সিদ্ধান্তমতে কারারুদ্ধ করা যাইবে। এই সকল ক্ষেত্রে মালিকী ও হাম্বালীগণ যামিন প্রদায়ককে হানাফীগণের ন্যায় একই অপেক্ষমাণ সময়কালের সুবিধা প্রদান করে। ইহার পরও যদি ঋণগ্রহীতা আদালতে উপস্থিত না হয় তবে যামিনদাতাকে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করার শাস্তি প্রদান করা হয়। শাফি'ঈ আইন এই বিশেষ ক্ষেত্রে খুব অস্পষ্ট, কিন্তু ইহাতে কোন অবস্থাতেই অকৃতকার্য যামিনদাতার কারাদণ্ড প্রদানের কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই।

(খ) কাফালা বি'ল-মাল (كفالة بالمال) ঃ সকল ঋণই মুচলেকা প্রদত্ত হইতে পারে, যদিও চুক্তি সম্পাদনের সময় যামিনদার ঋণের সম্পূর্ণ পরিমাণ জ্ঞাত না থাকেন অথবা যদিও ইহা ঋণদাতার পৈতৃক সম্পত্তিতে অগ্রিম ঋণ সংক্রান্ত হয় (শাফি'ঈ আইন ব্যতীত)। এই ক্ষেত্রে ইহাই যথেষ্ট, যদি উল্লিখিত ঋণ কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঋণগ্রহীতার পক্ষে পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়; ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত (শারীরিক) দায়সমূহ ইহার আওতায় পড়ে না (হজ্জ, কিসাস, শর্তসাপেক্ষে মুক্তির জন্য প্রদেয় ফিস ইত্যাদি)।

যামিন মুচলেকাটি প্রধান দায় সম্পর্কিত সকল নিয়ন্ত্রিত শর্ত দ্বারা একইভাবে আবদ্ধ। ইহা হইতে ধারণা করা যায় যে, ঋণদাতা যদি যামিন প্রদাতাকে মুচলেকায় কোন প্রকার সীমা প্রদানে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে যে ঋণগ্রহীতা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেও ইহা হইতে সুবিধা লাভ করিতে পারে; তথাপি হানাফী আইন (যাহাতে যামিন মুচলেকাটি ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের রূপ গ্রহণ করে), ঋণদাতা যামিন প্রদাতাকে কোন সীমা প্রদান করার অনুমতি দানে স্বীকৃত হইলেও একই সঙ্গে সে এইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারে, যাহাতে ঋণগ্রহীতা কোন প্রকার সুবিধা লাভ করিতে না পারে। ঋণ প্রদাতা যামিনদাতাকে তাহার প্রদত্ত মুচলেকা হইতে মুক্তি দান করিলে তাহা ঋণগ্রহীতাকে মুক্ত করে না, কিন্তু বিপরীতক্রমে ঋণগ্রহীতার দায়মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যামিনদাতাকে দায়মুক্ত করে। যদি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের স্থলে যামিনদাতা উক্ত ঋণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে তাহাকে আর কাফালা বলা যাইবে না, তখন ইহা হইবে হাওয়ালা (দ্র.) অর্থাৎ ঋণের বাহন অথবা হস্তান্তরের দলীল।

যে মুহূর্তে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সময় আসিবে, তৎক্ষণাৎ ঋণদাতা তাহার ইচ্ছানুযায়ী প্রধান ঋণগ্রহীতা অথবা তাহার যামিনদাতা অথবা একই সঙ্গে উভয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার লাভ করে। সুতরাং মুসলিম আইনে যামিনদাতার পক্ষে আলোচনার কোন প্রকার

সুযোগ নাই, পাশ্চাত্য আইনে রহিয়াছে। সেখানে যামিনদাতা, ঋণদাতাকে ঋণী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি করিতে পারে, যদি ইহার বিরুদ্ধে কোন আইনগত বা প্রথাগত বাধা না থাকে। কোন কোন মালিকী মতাবলম্বী যামিনদাতাকে ঋণদাতা তাঁহার ঋণগ্রহীতার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করিতে বাধ্য করার সুযোগ দান করিয়াছেন, যদি ঋণগ্রহীতা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়; যদি ঋণগ্রহীতা অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলেও ইহা প্রযোজ্য হইবে, যদি তাহার মালামালের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব কোন প্রকার অসুবিধা ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই সকল শর্তাবলী বৈধ থাকিবে, যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত শর্ত ইহার বিরুদ্ধে না যায়। যে যামিনদাতা কোন ঋণগ্রহীতার হিসাবকৃত জমা পরিশোধ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে আইনের কোন সহায়তা থাকে না, যদি না শেষোক্ত জন তাহার যামিন প্রদানকারীরূপে কার্য করিতে আহ্বান জানায় আর যদি পরিস্থিতি সেইরূপ হয় তবে তিনি তাঁহার মালামাল বিক্রয় করিতে পারেন। এই সকল শর্তের কোনটির অনুপস্থিতিতে যামিনদাতা কোন প্রকার প্রতিকার লাভে অসমর্থ; ইহার ব্যক্তিক্রমরূপ মালিকী আইনে, তিনি সব সময়েই আইনগত প্রতিকার লাভের অধিকার পাইয়া থাকেন, যদি ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ফিক্‌হ সংক্রান্ত সকল রচনায় কাফালা সংক্রান্ত একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত আছে। হানাফী আইনের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ঃ (১) আল-মারগীনানী, হিদায়া, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ৩খ, ৬৪-৭৩। বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে তুলনার জন্য; (২) ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, কায়রো ১৩৬৮ হি., ৪খ, ৫৩৪-৬৬; (৩) ইব্‌ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ২খ, ২৯১-৪; (৪) দিমাশকী, রাহমাতু'ল-উম্মা, সম্পা. হালাবী, ১খ, ১৯৪-৬; (৫) শীরাযী, কিতাবু'ত-তানবীহ, ফরাসী অনু. Bousquet, আলজিয়ার্স. n. d., নং ১৩৬-৭; (৬) খালীল ইব্‌ন ইসহাক, মুখতাসার, ফরাসী অনু. Bousquet, আলজিয়ার্স ১৯৬১ খৃ., ৩খ, নং ২১৮-২০; (৭) J. Schacht, Islamic Law, অক্সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ., ১৫৮-৯।

Y. Linant de Bellefonds (E.I.[2]) আবদুল বাসেত

কাফিয়া (قافية) ঃ 'আ, বহুবচনে কাওয়াফিন (قواف) ছন্দশাস্ত্রের একটি শব্দ ; ইহার অর্থ কবিতার 'অন্ত্যমিল'। Goldziher [Abh. zur Arabischen Philologie, লাইডেন ১৮৯৬ খৃ., ১খ., ৮৩-১০৫; তু. R. Blacher, Deuxieme centribution. Arabica vi (১৯৫৯ খৃ.) -এ পৃ. ১৪১] উল্লেখ করিয়াছেন যে, শব্দটির প্রকৃত অর্থ "বিদ্রূপাত্মক ব্যক্তিগত কবিতা" (lampoon)। পরে ইহা কাব্যের চরণ এবং কবিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই প্রাচীন অর্থ ইসলামী যুগে শব্দটি "ছন্দ প্রকরণ"-এর পারিভাষিক অর্থে (অন্ত্যমিল) ব্যবহৃত হওয়ার পরেও প্রচলিত ছিল। কাফিয়া শব্দটি তাঁহার মতে কাফান (قفا) হইতে উদ্ভূত, অর্থ "গ্রীবাসন্ধি বা ঘাড়ের পশ্চাদ্ভাগ" [অনুরূপ ক্রিয়া "কাফা" (قفا) গ্রীবাদেশে আঘাত করা অর্থে ব্যবহৃত] এবং তিনি কাব্যের সেই ক্ষুদ্রাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যেইখানে তীব্র বিদ্রূপ ও অভিশাপকে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র (missiles)-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে যাহা মানুষের মস্তক বা শরীরের অন্য অংশকে ক্ষত করে। আদিম অভিধান লেখকগণ এই পদটিকে "অনুসরণ করা" অর্থে 'কাফা' ক্রিয়াটির সহিত বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করেন (যথাঃ "কবিতা-র প্রতিটি চরণে ইহার পুনরাবৃত্তি করা হয়")। তাঁহাদের মতে শব্দটির প্রকৃত অর্থ "কবিতার অন্ত্যমিল" এবং যৌগ অর্থ ঃ "কবিতা বা কাব্যের চরণ" (দ্র. Freytag, Darstellung, পৃ. ২৯৬-৭)।

তাত্ত্বিক দিক হইতে কাফিয়া সাধারণ একটি বিশেষ বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত, যাহা 'ইলমু'ল-'আরূদ (علم العروض) বা মাত্রাশাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র (দ্র. 'আরূদ)। ইহা শিক্ষা দেয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বিষয়ে কিভাবে শ্লোক (بيت) সমাপ্ত হইবে এবং অন্ত্যমিলের ব্যঞ্জনবর্ণ ছন্দাক্ষর হিসাবে কোন কোন বর্ণ ব্যবহার করা যাইবে না।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে খালীল ইব্‌ন আহমাদ (দ্র.) কাফিয়ার নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি দিয়াছেন। তাঁহার মতে কাফিয়া এমন একগুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণের সমাহার, যাহার আদ্যাক্ষর স্বর-চিহ্নযুক্ত একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (حرف متحرك) (অন্য এক ভাষ্য অনুসারে স্বরচিহ্নযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরবর্ণ) যাহা শ্লোকের শেষে দুইটি হসন্ত (সাকিন ساكن) ব্যঞ্জনবর্ণের অব্যবহিত পূর্বে অবস্থিত। কিন্তু তাঁহার প্রতি এবং পরবর্তীকালের অন্য বিশেষজ্ঞগণের প্রতি আরোপিত বিভিন্ন সংজ্ঞাও রহিয়াছে (ইব্‌ন কায়সান, কিতাব তালকীবি'ল—কাওয়াফী, পৃ. ৪৮, ৫৪) বলেন যে, খালীল ইব্‌ন আহমাদ কাফিয়া শব্দটি "অন্ত্যমিলযুক্ত হরফ" হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। আরবদের মতে কবিতার শ্লোক সর্বদা হসন্ত (সাকিন- ساكن) ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা সমাপ্ত হয়, যেহেতু তাঁহারা স্বরধ্বনির দীর্ঘায়ন (إشباع) হইতে উদ্ভূত 'আলিফ' (ا); 'ওয়াও' (واو) এবং 'য়া' (ى)-কেও সাকিন ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন। যাহা হউক, যেই কাফিয়ার ব্যঞ্জনবর্ণ و ও ى দ্বারা দীর্ঘায়িত করা হয় না, যাহাকে কাফিয়া মুকায়্যাদা (قافية مقيدة) বা "রুদ্ধ ছন্দ" বলা হয় (যেমন — يقتل) এবং যেই কাফিয়াতে এইরূপ দীর্ঘায়নের বর্ণ সংযুক্ত হয় (যেমন يقتلا يقتل ' يقتل-তে) তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যেই সমস্ত ক্ষেত্রে 'ঊ' এবং 'ঈ' উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত দীর্ঘায়িত উচ্চারণ চিহ্ন হিসাবে و এবং ى লিপিবদ্ধ থাকে না, বরং সেই ক্ষেত্রে (স্বরচিহ্নযুক্ত পাঠে) অন্ত্যমিলের ব্যঞ্জনবর্ণে কেবল পেশ (ُ) ও যের (ِ)-এর সংযোগে ইহাদের ধ্বনির প্রকাশ ঘটান হয়। এই ধরনের ছন্দ এমন কি আরও অন্যান্য ছন্দ, যেইখানে অন্ত্যমিলের ব্যঞ্জনবর্ণের পর হ্রস্ব এবং স্বরচিহ্ন বা হস্-চিহ্নযুক্ত 'হা' (ه) ব্যবহৃত হয় তাহাকে কাফিয়া মুতলাকা (قافية مطلقة) বা মুক্ত ছন্দ বলে। কেহ কেহ ইহাকে "রাবী মুকায়্যাদ" (روى مقيد) ও "রাবী মুতলাক" (روى مطلق) অথবা রুদ্ধ অন্ত্যমিল ব্যঞ্জনবর্ণ ও মুক্ত অন্ত্যমিল ব্যঞ্জনবর্ণ বলেন।

কাফিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ ছয়টি ঃ (১) রাবী (روى) বা অন্ত্যমিল বর্ণ যাহা প্রত্যেক প্রকার কাফিয়াতেই থাকে বলিয়া মূল ব্যঞ্জনবর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রায়ই বিখ্যাত কবিতাসমূহের নাম রাখা হয়, যথা ঃ 'আশ-শানফারা' রচিত 'লামিয়্যা' (لامية) এবং 'উমার ইবনু'ল-ফারিদ রচিত তা'ইয়্যা (تائية); (২) রাবী-র সহিত সংযোজিত ওয়াস্‌ল (وصل) বা সিলা (صلة) অর্থাৎ রাবীর সহিত সংযুক্ত দীর্ঘায়ন বর্ণ حرف المد (যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আলিফই একমাত্র অক্ষর যাহা এই নিয়মানুসারে লিখিত হয়)। ওয়াস্‌ল এমন স্বরচিহ্নহীন 'হা' [ها] বর্ণ দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যাহার পূর্বাক্ষরে হ্রস্ব স্বর থাকে (যেমন يقتله - يقتله - يقتله) অথবা এমন 'হা' বর্ণ

দ্বারা যাহার পরবর্তী অক্ষর দীর্ঘায়ন বর্ণ এবং পূর্বাক্ষর হ্রস্ব স্বর হয়। (৩) খুরূজ (خروج) এমন একটি দীর্ঘায়ন বর্ণ যাহা ওয়াস্‌ল-এর 'হা' (هاء الوصل)-এর পরে আসে (যেমন يقتله , قتلها , تعصيه) ইত্যাদিতে। দীর্ঘায়ন বর্ণ হিসাবে ইহাকে উহ্য ধরা হয়, কিন্তু কেবল আলিফের ক্ষেত্রে লিখিত হয়। (৪) রিদ্‌ফ (ردف) অর্থাৎ দীর্ঘায়ন বর্ণ হিসাবে রাবী-র অব্যবহিত পূর্বের 'ওয়াও' এবং 'য়া' অথবা যুক্ত ধ্বনি প্রকাশার্থে 'আও' এবং 'আয়' ও রাবী-র অব্যবহিত পূর্বের 'আলিফ'। (৫) তা'সীস (تأسيس), রাবী-র পূর্বে ব্যবহৃত দীর্ঘায়নের 'আলিফ' এবং ইহা রাবী হইতে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা বিযুক্ত যাহাকে দাখীল (دخيل) বলা হয় এবং ইহাকে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন করা যায়। তা'সীস এবং রাবী ভিন্ন শব্দের হইলে দ্বিতীয় শব্দটি একটি পৃথক সর্বনাম বা সর্বনামযুক্ত অব্যয় হয়। যেমন আন্নাহা হিয়া (انها هيا), বাদালিয়্যা (بداليا) প্রভৃতি ক্ষেত্রে, (কিন্তু তু. লুযূম, ১১-২ তানূখী, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ৮৪-৫); (৬) দাখীল ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে কাফিয়া-র স্বরচিহ্নগুলি (حركات) সংখ্যায় ছয়টি ঃ (১) মাজরা বা মুজরা, (مجرى), রাবী-র স্বরচিহ্ন, (২) নাফাস (نفاذ), হারফুল ওয়াসল, হা-এর স্বর চিহ্ন; (৩) তাওজীহ (توجيه), হসন্ত (সাকিন-ساكن) রাবীর পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্ন (অন্যদের মতে উহা স্বর চিহ্নযুক্ত (متحرك) রাবী-র পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্নও) ; (৪) হাযও (حذو) রিদ্‌ফ-এর পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্ন ; (৫) ইশ্‌বা' (إشباع), দাখীলের স্বরচিহ্ন (এই শব্দের প্রয়োগ ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ ইহা কখনও কখনও কাফিয়া মুতলাকা-র দাখীলের স্বরবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরও বর্ণিত আছে যে, তা'সীসবিহীন কাফিয়া মুতলাকার পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্নকে ইশবা' বলা হয়); (৬) রাস্‌স (رس), তা'সীসের আলিফের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্ন (অবশ্য সর্বদা ' َ ' হয়)।

কাফিয়া-র দুইটি সাকিন ব্যঞ্জনবর্ণকে সর্বাধিক চারিটি স্বরচিহ্নযুক্ত বর্ণ দ্বারা পৃথক করা যাইতে পারে। অতএব, ইহা পাঁচ প্রকার ঃ (১) মুতাকাবিস (متكاوس), এইখানে দুইটি সাকিন ব্যঞ্জনবর্ণকে চারিটি স্বরচিহ্নযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে (যেমন—فوق قدم-এ); (২) মুতারাকিব (متراكب), এইখানে তিনটি স্বরচিহ্নযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ দুইটি সাকিন বর্ণের মধ্যখানে বসে (যেমন—في جبل-তে) ; (৩) মুতাদারিক (متدارك), এইখানে দুইটি স্বরচিহ্নযুক্ত বর্ণ দুইটি সাকিন বর্ণের মধ্যখানে বসে (যেমন— قد فعل-এ) ; (৪) মুতাওয়াতির (متواتر), এইখানে দুইটি সাকিন বর্ণের মধ্যখানে একটি মাত্র স্বরচিহ্নযুক্ত বর্ণ বসে (যেমন—بال-এ); (৫) মুতারাদিফ (مترادف), এইখানে দুইটি সাকিন ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যখানে কোন ফাঁক না রাখিয়া ঠিক পাশাপাশি অবস্থান করে। ইহা কেবল রিদ্‌ফ (ردف)-যুক্ত কাফিয়া-র ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে ব্যবহৃত হয় (ليل , قل ইত্যাদি) এবং আন্‌-নাক্‌র (النقر)-এর মত রূপগুলি বিরল এমন কি কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা অনুমোদনও করেন না।

ভিন্নধর্মী দুইটি কাফিয়া-র ব্যবহার একই কবিতায় সঙ্গত নয়। কেবল সারী' এবং (কদাচিৎ) কামিল-এর কোন কোন রূপের ক্ষেত্রে, যেইখানে فعلن-কে فاعلن-এর সহিত পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। উপরে উল্লিখিত কাফিয়া-র ছয়টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পাঁচটিতেই কোন পরিবর্তন অনুমোদিত নয় [অবশ্য দাখীল (دخيل)-এর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়] এবং সাধারণত স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসৃত হয় (নিম্নের ব্যতিক্রমসমূহ দ্রষ্টব্য)। আদি কালে এই নিয়ম বরখেলাফের নামকরণ করা হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা এবং ইহাদের অর্থে প্রথমে বেশ অনিশ্চয়তা বিরাজ করিত (দ্র. Bonebakker, The Kitab nakd al-shi`r. লাইডেন ১৯৫৬ খৃ., ভূমিকা, পৃ. ২০-২, ২৫-৬, ৩৪-৫ ; পূ. গ্র., Blachere, পৃ. ১৩৭-৪০, ১৪৯-৫০); (১) ইকওয়া' (إقواء) মাজ্‌রা (مجرى)-র স্বরচিহ্নের পরিবর্তন। প্রাচীন কবিগণ কোন কোন সময় পেশ (ُ)-কে যের (ِ) দ্বারা পরিবর্তন করিতেন দ্র. J. Fuck, Arabiya, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৪১; আল-আখ্‌ফাশ আল-আওসাত (শিরো.) কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ৪২-এ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই ধরনের রদবদল অতি সাধারণ এবং পেশ (ُ) কিংবা যের (ِ)-এর পরিবর্তন যাবার (َ) দ্বারা খুবই বিরল। যদি ছন্দের রাবী (روى)-এর পরে ওয়াস্‌ল-এর 'হা' (هاء الوصل) হয়, তবে এই ক্ষেত্রে ইকওয়া' খুবই বিরল মনে হয় (লুযূম ; পৃ. ৩২-৩ ; কিন্তু তু. 'ইক্‌দ, ৫খ, ৫০৮) ; (২) ইক্‌ফা (إكفاء), প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণ দ্বারা রাবী-র পরিবর্তন, যেমন নূন (ن)-এর বদলে মীম (م)-এর ব্যবহার, আর কোন একটি বর্ণের পরিবর্তন অন্য একটি এইরূপ বর্ণ দ্বারা যাহা প্রায় সমুচ্চারিত নয়, উহাকে কখনও কখনও বিশেষ করিয়া ইজাযা (إجازة) বা ইজারা (إجارة) নাম দেওয়া হয় (এই পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যার জন্য 'উম্‌দা, ১খ. ১৩২-৩, ১৪৩-৪ ; তানূখী, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ১৩৪); (৩) সিনাদ (سناد) রাবী-র পূর্ববর্তী স্বরচিহ্ন ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলীর লঙ্ঘন। যথাঃ (ক) সিনাদু'ত-তাওজীহ, (سناد التوجيه), সাকিন রাবী-র অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্নের পরিবর্তন সাধন, যদিও পেশ (ُ) ও যের (ِ)-এর বিনিময় সাধারণত বৈধ, এমন কি যাবার (َ)-এর রদবদলও অন্য দুইটির সঙ্গে প্রায়ই হইয়া থাকে ; (খ) সিনাদু'ল-ইশ্‌বা' (سناد الإشباع) ঃ দাখীলের স্বরচিহ্নের পরিবর্তন সাধন, যের-এর সহিত পেশ-এর বিনিময়, অপর দুইটির সহিত বিনিময় অপেক্ষা লঘুতর ত্রুটি (বিশেষ করিয়া কাফিয়া মুকায়্যাদার ক্ষেত্রে, দ্র. লুযূম, পৃ. ২৫-৭, ৩১ এবং 'উম্‌দা, ১খ, ১৩৮); (গ) সিনাদু'ল-হায্‌ও (سناد الحذو), রিদ্‌ফ-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্নের পরিবর্তন সাধনকে বলা হয়। হায্‌ও এবং রিদ্‌ফ মুক্তভাবে দীর্ঘস্বর او (ঊ), اى (ঈ) ও যুক্ত স্বরধ্বনি او (আও) ও اى (আয়)-এর সৃষ্টি করে। কেহ ইচ্ছা করিলে او (ঊ)-কে اى (ঈ) দ্বারা এবং او (আও)-কে اى (আয়) দ্বারা পরিবর্তিত করিতে পারে। কিন্তু লুযূম, পৃ. ২৮-৯ অনুযায়ী ইহা কাফিয়া মুকায়্যাদার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ; অধিকন্তু তু. আখ্‌ফাশ, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ১৫ ; তানূখী, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ৯০, ১১০-১১), কিন্তু অন্যান্য সংযোজন, যথা ঃ اى (ঈ)-এর اى (আয়)-এর সহিত সংযোজন সিনাদ-এর আওতায় পড়ে। (ঘ) সিনাদু'র-রিদ্‌ফ (سناد الردف) রিদ্‌ফযুক্ত চরণের সহিত। রিদ্‌ফবিহীন চরণের ছন্দমিলবিশিষ্টকরণ [যদিও ইহা কখনও কখনও او (আও) ও اى- (আয়)-এর সহিত সংঘটিত হইয়া থাকে এই ক্ষেত্রে و (ওয়াও) ও ى (য়া)-কে ব্যঞ্জনবর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয় ; দ্র. লুযূম, পৃ. ২১-২ এবং Freytag, পূ. গ্র., পৃ. ৩১৩-৪] ; (ঙ) সিনাদু'ত-তা'সীস (سناد التأسيس), তা'সীসযুক্ত চরণের সহিত তা'সীসবিহীন চরণের ছন্দ মিলবিশিষ্টকরণ (যদিও কোন কোন কবিতায় এই ধরনের তা'সীসবিহীন বচনও থাকিতে পারে, বিশেষ করিয়া যেই ক্ষেত্রে দাখীল-এর স্বরচিহ্ন 'যাবার' হয় (দ্র. লুযূম, পৃ. ২০-১ ; তানূখী কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ১৩০-১ ও তু. আখ্‌ফাশ, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ১৫-৬)। উল্লেখ্য যে,

স্বরচিহ্নের পরিবর্তন কতটুকু অনুমোদিত সেই বিষয়ে ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না (কিন্তু যৌথ সঙ্গীত বা strophic poetry-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন নিয়ম পালিত হয়, দ্র. W. Hoenerbach, Die vulgarabische Poetik ... des Safiyaddin Hilli, Wiesbaden ১৯৫৬ খৃ., ভূমিকা, পৃ. ২২-৩) এবং মুক্ত ছন্দে (قافية مطلقة) রাবীর, অব্যবহিত পূর্বের হ্রস্ব স্বরটি (কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে ইশ্‌বা'- إشباع শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন) ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

এইখানে ছন্দের আরও দুইটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ ঈতা (إيطاء) ও তাদমীন (تضمين) বা তাত্মীম (تتميم)। ঈতা এমন সকল ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় যেইখানে একই শব্দ একই অর্থে কোন একটি কবিতার চরণসমূহের ছন্দের মধ্যে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ধরনের পুনরাবৃত্তি ঐ সমস্ত কবিতার ক্ষেত্রে অনুমোদিত যাহাতে ইহা সাতটির অধিক শ্লোকের পরে হইয়া থাকে, যেইখানে ভাবের রূপান্তর ঘটে অথবা যেইখানে দুইটি শব্দের একটিতে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় 'আল' (ال) থাকে এবং অপরটিতে থাকে না (ঈতা' সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য এবং কি কারণে ইহা সংঘটিত হয় সেই সম্পর্কে খালীল-এর বলিয়া কথিত, অধিকতর কঠোর ব্যাখ্যার জন্য দ্র. আখ্‌ফাশ, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ৫৫-৬৪ ; 'ইক্‌দ, ৫খ, ৫০৮ ; ওয়াফী, ২৪২-৩)। তাদ্‌মীন (تضمين - প্রবহন), যখন কোন কবিতার একটি শ্লোকের প্রবাহ অন্য একটি শ্লোকে এমনভাবে ঘটে যে, শ্লোকের শেষাংশ কেবল তখনই পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে যখন ইহার সহিত পরবর্তী শ্লোকের প্রথমাংশ যোগ করা হয় (আরও বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. তাদ্‌মীন)।

উল্লিখিত নিয়মাবলী ছন্দের সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয় এবং সাহিত্য সমালোচকগণ কর্তৃক প্রদত্ত এই সমস্ত ত্রুটির প্রদত্ত তালিকার জন্যও নয়। কবিতার দুইটি চরণ (hemistich)-এর পরস্পর অন্ত্যমিলের সাধারণ রীতির সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন ত্রুটির উল্লেখও এখানে করা হয় নাই (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। আরও বিস্তারিত অবগতির জন্য বিশেষভাবে দ্র. আখ্‌ফাশ, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ৬৪-৮ ; তানূখী, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ৬৫-৮, ১২৩-৪, ১৩৫-৬; 'উম্‌দা, ১খ, ১৪৯-৫৪ ; ওয়াফী, পৃ. ২৫০-৩।

সাধারণত। (আলিফ), ه (হা), و (ওয়াও) ى (য়া) ও বর্ণসমূহ কাফিয়া-র রাবীস্বরূপ ব্যবহৃত হয় না, যদি উহা কোন ক্রিয়া বা বিশেষ্যের ধাতু না হয়, তবে শব্দের অন্তে যুক্ত সর্বনাম হু (ه), হি (ه) ও দীর্ঘস্বর বা জাযমবিশিষ্ট হা' (ه)-যুক্ত স্বর আও او এবং আয় اى-এ ওয়াও ও য়া' ى ও যাহার পূর্বে দীর্ঘস্বর রহিয়াছে কিংবা নিজেই স্বরচিহ্নবিশিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নিস্‌বা (نسبة) অন্তে য়া' ى দীর্ঘস্বর ঈ ধ্বনিযুক্ত ('আদিয়্যি عدى-এর স্থলে 'আদী) عدى-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে। অনুরূপভাবে উদাহরণস্বরূপ, عصاه শব্দের ه , رموا শব্দের و এবং ارضى ও فواديا শব্দদ্বয়ের ى রাবী হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, যদিও এই সকল বর্ণ ধাতুর অংশ নয়, কিন্তু دخلا (দাখালা) [ক্রিয়ার দ্বিবচন রূপ] শব্দের। ; اقتلى (উকতুলী) এবং كتابى (কিতাবী) [যথাক্রমে ক্রিয়ার স্ত্রীবাচক রূপ এবং বিশেষ্যের অন্তে যুক্ত সর্বনাম শব্দদ্বয়ের ى, قتلوا (কাতুলূ) [ক্রিয়ার বহুবচন রূপ শব্দের و এবং كتابه (কিতাবুহূ) বিশেষ্যের অন্তে যুক্ত সর্বনাম] এবং رحمة (যেইখানে ه স্ত্রীবাচক বিশেষ্যের চিহ্ন ة-এর স্থলাভিষিক্ত হয়) শব্দদ্বয়ের ه ওয়াসল (وصل) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তানবীন (تنوين)-এর ن এবং ক্রিয়ার দ্বিতীয় মৌলিক ক্রিয়ারূপ রাবী কিংবা ওয়াসল হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল নিয়মের উপর কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এইগুলিতে ব্যতিক্রমও ঘটে এবং ধাতুমূলের বর্ণসমূহ, যেমন ب ل ه ধাতু হইতে উৎপন্ন ابلة শব্দের ه এবং ح ل و ধাতু হইতে উৎপন্ন يحلو শব্দের و-ও ওয়াস'লরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ কেহ শব্দের অন্তে দ্বিতীয় পুরুষ একবচনের সর্বনাম কা ك বা কি ك এবং ماضى বা অতীত কালের নামপুরুষ স্ত্রী লিঙ্গের একবচনের ত ت-কে রাবী হিসাবে ব্যবহার না করিয়া মূল ভিত্তি অপেক্ষা ওয়াসল হিসাবে ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, كتبت-এর কাফিয়া ضربت হইতে পারে, কিন্তু وزنت হইতে পারে না। যেই স্থানে কোন কবি অন্ত্যমিলের ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিগুণ করে, ইহার সহিত অন্য একটি ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করে অথবা নিজের উপর এমন অন্য কোন বিধি আরোপ করে, যাহা তাত্ত্বিকগণ অনুমোদন করেন না, তখন তাহাকে লুযূম মালা য়াল্‌যাম (لزوم ما لا يلزم দ্র.) অলঙ্কার নামে অভিহিত করা হয় এবং কখনও কখনও ইহাকে ইলতিযাম (التزام), ই'নাত (إعنات) বা তাশ্‌দীদ (تشديد)-ও বলা হয়।

কখনও কখনও কাফিয়া-তে শেষাংশের পরিবর্তন হয়। নিম্নে ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ নির্দেশ করা হইল ঃ (১) শব্দের শেষের হ্রস্ব স্বর লোপ কিংবা দীর্ঘায়িত করা হয় তৎসঙ্গে তানবীনও তিরোহিত হয় (যেমন—زيد-এর স্থলে زيدو বা زيد এবং النار-এর স্থলে النار বা النارو; (২) স্ত্রীবাচক শব্দের শেষাক্ষর ة-কে ه দ্বারা পরিবর্তন করা যায় এবং এই ক্ষেত্রে শেষাংশ লোপ পায় (যেমন رحمة-এর স্থলে رحمه হয়) ; (৩) কাফিয়া মুকায়্যাদা-তে শেষাক্ষরের স্বরচিহ্ন উহার পূর্ব বর্ণে স্থানান্তরিত কখনও উহার পূর্বাক্ষর দ্বারা রূপান্তর করা যায়, যদি উহা স্বরচিহ্নযুক্ত না হয় (النقر) (রু)-এর স্থলে النقر (কুর), অগ্রহণীয় রূপ النقر- (কুর)-কে এড়ানোর উদ্দেশে) ; (৪) একটি সাকিন ه-এর সংযোজন করা যায় যেইখানে ক্রিয়ারূপের ধাতুর লোপ পাইয়াছে (যেমন اقتد-এর স্থলে اقتده) এবং শব্দের অন্তে যুক্ত উত্তম পুরুষ একবচনে সর্বনামের শেষে; (৫) শব্দের শেষে ব্যবহৃত হাম্‌যা ء-কে দীর্ঘায়নের و কিংবা ى দ্বারা পরিবর্তন করা যায়, যাহা 'ওয়াসল হিসাবে গণ্য হইতে পারে (যেমন هازىء -এর স্থলে هازى)। ইব্‌ন কায়সান, তাল্‌কীব, (পৃ. ৫৩-৪, ৬০-১) তা'সীস, রিদ্‌ফ, সিলা এবং খুরূজ-এর সংগীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইগুলিকে স্বরবর্ণের ন্যায় গণ্য করেন, যেইগুলিকে সংগীত ও আবৃত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত করা যায় এবং এইভাবে ইহারা স্পষ্টত ছন্দের সমাপ্তি নির্দেশ করে। অন্যান্যরা তারান্নুম (ترنم) অর্থাৎ সংগীতে কাফিয়া মুত্‌লাকায় শেষ স্বরচিহ্নের দীর্ঘায়ন রীতি সম্পর্কে এবং ভাবগম্ভীর আবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনটি বিকল্প পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই পদ্ধতিত্রয় হইল ঃ (ক) হিজাযীদের পদ্ধতি, তাহারা সঙ্গীত ছাড়াও এই সমস্ত স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া থাকে ; (খ) তামীম গোত্রের রীতি (আখফাশ, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, পৃ. ১০৫ অনুযায়ী, কায়স গোত্রেরও বটে), এই গোত্রের লোকেরা শেষ স্বরচিহ্নকে তানবীন উচ্চারণ করে এবং (গ) শেষ স্বরচিহ্নসমূহকে প্রত্যাখ্যান, দৃশ্যত, এমন কি ঐ সমস্ত ক্ষেত্রেও যেইখানে এই তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটিতে কবিতার ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ হয় (দ্র. অধিকন্তু আখফাশ,

কিতাবু'ল-কাওয়াফী, ১২-৩, ৩৪-৭ ; Freytag, পূ. গ্র., পৃ. ৩২৩-৪, যেইখানে দীর্ঘ উচ্চারিত স্বরের জন্য স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে)। সকল প্রকার প্রাচীন কবিতায় আদ্যোপান্ত একই কাফিয়া-র ব্যবহার করা হইয়াছে। উপরন্তু প্রথম শ্লোক (بيت)-এর প্রথম চরণ (مصراع)-এর শেষেও কাফিয়া পাওয়া যায় রাজায (رجز দ্র.) ব্যতীত, কারণ এইখানে কোন অর্ধ-পঙক্তি (مصراع) নাই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার সর্বশেষ যাত্রা (foot, تفعيل)-এর হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘায়ন করা হয় যেন ইহা দ্বিতীয় অর্ধ-পঙক্তির মাত্রার অনুরূপ হয়। এই রীতিকে তাস্‌রী' (تصريع) বলে এবং সাহিত্য সমালোচকগণ উল্লেখ করেন যে, কোন কোন প্রাচীন কবি প্রথম পঙক্তিতে তাস্‌রী' রীতি অনুসরণ করেন নাই, বরং উহা কবিতার অন্যত্র কোথাও ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা শ্লোক (بيت)-এর অভ্যন্তরীণ শব্দের অন্ত্যমিলের প্রাচীন রীতির উদ্ধৃতিও দিয়াছেন (দ্র. কুদামা, নাক্‌দ, পৃ. ১৪-৯ ; এই সমস্ত উদাহরণের মধ্যে এবং প্রাচীনোত্তর (post-classical) যৌথ সঙ্গীত (strophic poetry) রীতির মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ স্থাপনের জন্য দ্র. E. Garcia Gomez, Una "pre-Muwassha" Al-Andalus-এ, ২১ খ., ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৪০৬-১৪; E. Wagner, Abu Nuwas, Wiesbaden ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২২৭ প.]। অভ্যন্তরীণ শব্দের অন্ত্যমিলের প্রচলিত সাধারণ পারিভাষিক শব্দ হইল তারসী, কিন্তু পরবর্তী কালের ছন্দতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন এবং কখনও কখনও জটিল পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের উদ্দেশে আরও অনেক পারিভাষিক শব্দের অবতারণা করিয়াছেন [দ্র. A. F. M. von Mehren, Die Rehtorik der Araber, ১৮৫৩ খৃ. (পুনঃমুদ্রণ Hildesheim ১৯৭০ খৃ.), পৃ. ১৬৮-৯, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা ও উদাহরণের জন্য]। অন্যান্য পদ্ধতি হইল পূর্ববর্তী শ্লোকের ছন্দ ঃ শব্দের পুনরাবৃত্তি পরবর্তী শ্লোকের প্রারম্ভে এবং সমগ্র কবিতার মধ্যে আগাগোড়া যুগ্ম কাফিয়ার ব্যবহার, যাহাতে প্রতিটি কাফিয়া হইতে মাত্রামূলক গঠনের সমাপ্তি নির্দেশক (দ্র. Mehren, পূ. গ্র., পৃ. ১৬৫, ১৭৩)।

সাহিত্য সমালোচকগণের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়া বলা যায় যে, কবিতার প্রতিটি শ্লোকের বক্তব্য যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অলংকারশাস্ত্রের সফল গ্রন্থ কাব্যের ধরন ও ভাষালঙ্কার যাহা ছন্দশব্দের নির্বাচনকে প্রভাবিত করে তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। উপস্থিত কাব্য প্রতিপাদন সম্পর্কে কতকগুলি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়াও সমালোচকগণ এমনভাবে শ্লোক (بيت) রচনার সুপারিশ করেন, যাহাতে শ্রোতৃবর্গ শ্রবণমাত্রই ইহার কাফিয়া কি হইবে সেই সম্পর্কে অনেকটা অনুমান করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দের বা কোন সমগোত্রীয় শব্দের পুনর্ব্যবহার অথবা শ্লোকের শেষ শব্দের উপর নির্ভরশীল অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক কোন কৌশল সম্পর্কে শ্রোতৃবর্গের ধারণার প্রাধান্য দ্বারাই ইহা লাভ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, حرام (হারাম-নিষিদ্ধ) শব্দের কাফিয়াতে ব্যবহার, যেন ইতঃপূর্বে শ্লোকের মধ্যে ব্যবহৃত محلل (মুহাল্লাল-বৈধ ঘোষিত) শব্দের সহিত ইহার বিরোধালংকার রচনা করা যায় (তাস্‌বীহ, তাওশীহ, ইরসাল, দ্র. Mehren, পূ. গ্র., পৃ. ১০২-৩ ; অধিকন্তু তু. ১৬১-৪)। কোন কোন বিশেষজ্ঞ (সম্ভব হইলে) এমন সব ছন্দ দ্বারা শ্লোকের ভিত্তি রচনা করার জন্য সুপারিশ করেন যাহা কেহ পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তবে সাফাদী (দ্র.) বলেন, দ্বিমুখী অর্থবোধক (তাওরিয়া - تورية) শব্দে এই ধরনের গঠন পদ্ধতির ফলাফল আরও অধিক আকর্ষণীয় হইবে যদি ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারণবিশিষ্ট শব্দ, যাহার উপর উহা নির্ভরশীল তাহা কেবল শেষে প্রয়োগ করা হয় (দ্র. Bonebakker, Some early definitions of the tawriya, দি হেগ ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৯৭)। কাফিয়া এমন কোন শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যাহা দ্বারা কোন অশুভ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাফিয়া-র আলোচনা, সাহিত্যতত্ত্বের এবং সমালোচনার প্রায় সকল কর্মেই দৃষ্ট হয় এবং ইহার ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী প্রদান করা সম্ভব হয়। পাশ্চাত্যের সারগ্রন্থসমূহে বা 'আরূদ' (عروض) নামক নিবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে যেই সকল পুস্তিকা এবং বিশেষ প্রকরণ গ্রন্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে নিম্নের তালিকাতে ঐগুলির উল্লেখ করা হয় নাইঃ

(১) আখ্‌ফাশ, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, সম্পা. 'ইয্‌যাত হাসন (দামিশক ১৩৯০/১৯৭০) [মৌলিক]; (২) কুদামা, নাকদু'ল-শি'র, সম্পা. Bonebakker, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২, ৭-৯, ১৯-২৩, ৯৬-৯, ১০৮-১১, ১৪০-২.; (৩) ইব্‌ন কায়সান, কিতাব তাল্‌কীবি'ল-কাওয়াফী, সম্পা. W. Wright, in Opuscula Arabica (লাইডেন ১৮৫৯ খৃ.) ; (৪) ইব্‌ন তাবাতাবা, 'ইয়ারু'শ-শি'র, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৫, ১০২-১১, ১২৭-৮ ; (৫) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ, সম্পা. আহমাদ আমীন এবং অন্যান্য, ৫খ. (কায়রো ১৩৬৫/১৯৪৬), ৪৯৬-৫০৮ ; (৬) 'আবদু'ল-রাকী আত-তানূখী, কিতাবু'ল-কাওয়াফী, সম্পা. 'উমার আল-আস'আদ ও মুহ্‌য়ি'দ-দীন রামাদান (বৈরূত ১৩৮৯/১৯৭০); (৭) আবূ হিলাল আল-'আসকারী, কিতাবু'স-সিনা'আতায়ন, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, পৃ. ৩৭৫-৮৮, ৪৪৫-৫১ ; (৮) মারযুকী, শারহ দীওয়ানি'ল-হামাসা, সম্পা. আহমাদ আমীন এবং 'আবদুস-সালাম হারূন (কায়রো ১৩৭১/১৯৫১-১৩৭৩/১৯৫৩) ; ১খ, ৯, ১১ ; (৯) আবু'ল-'আলা আল-মা'আর্‌রী, (শারহ) লুযূম মা লা য়ালযাম, সম্পা. তাহা হুসায়ণ এবং ইবরাহীম আল-আবয়ারী (কায়রো তা. বি.), ১খ, ৫-৫১, মৌলিক ; (১০) ইব্‌ন রাশীক, আল-'উমদা, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, ১খ, ১২৯-৫৮, ১৬৪, ২খ, ৩-৫, ২৫-৩৩, ৫৪-৭, ৬৯-৭০, ২৯২-৩ ; (১১) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-খাফাজী, সিররু'ল-ফাসাহা, কায়রো ১৩৭২/১৯৫৩, পৃ. ১৮০-১, ১৮৩; ১৮৬-৮, ২১০-৫, ২১৭-২৫ ; (১২) তিব্‌রীযী, আল-ওয়াফী ফি'ল-'আরূদ ওয়া'ল-কাওয়াফী, সম্পা. 'উমার য়াহয়া ও ফাখরু'দ-দীন কাবাওয়া (আলেপ্পো ১৩৯০/১৯৭০); (১৩) উসামা ইব্‌ন মুনকিয, আল-বাদী' ফী নাকদি'শ-শি'র, কায়রো ১৩৮০/১৯৬০, পৃ. ৬৩-৭২, ১১৬-২০, ১২৭-৮; (১৪) দিয়াউদ-দীন ইবনু'ল-আছীর, আল-মাছালু'স-সা'ইর, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, ১খ, ২৪২-৬, ২৬৪-৭৮, ২খ, ৩৪৮-৫৩, ৩৫৯-৬১; (১৫) ইব্‌ন আবি'ল-ইসবা', তাহরীরু'ত-তাহবীর, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩, পৃ. ১১৬-৮, ২২৪-৪১, ২৬৩-৭, ২৯৫-৩০৮, ৩১৬-২০, ৩৮৬, ৩৯১-২, ৫১৭-২৪, ৫২৭-৩১; (১৬) ঐ লেখক, বাদী'উ'ল-কুরআন, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ৩৬-৭, ৮৯-৯৩, ১০০-২, ১০৮-৯, ২২৭-৩৮ ; (১৭) হাযিম আল-কারতাজান্নী, মিন্‌হাজু'ল-বুলাগা', তিউনিস ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২০৬-৭, ২৭১-৮৪, ২৮৫-৬; (১৮) ইব্‌ন হিজ্জা, খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো ১৩০৪/১৮৮৬, পৃ. ৭৮-৯, ১০০-২, ১১৪-৬, ১১৯-২১, ১২৬-৩১, ১৬৯-

৭০, ১৭৩, ২৩৪-৫, ৩৬৬, ৩৭০-১, ৩৭৪-৫, ৪২২-৩, ৪৩৪-৫, ৪৩৮-৯; (১৯) ইব্ন মা'ছূম, আনওয়ারু'র-রাবী', নাজাফ ১৩৮৮/১৯৬৮-১৩৮৯/১৯৬৯, ২খ, ১৪৯-৫৮, ৩খ, ৩২-৮, ৪৫-৫১, ৭১-১০৮, ৪খ, ৩৩৬-৫৫, ৫খ, ১৮১-৪, ২৭১-৫, ৩৩৩-৭, ৬খ, ৯৩-১০০, ১৫১-২, ১৬২-৫, ১৯০-২০৩, ২৪৯, ৩১০-৩ (ইব্ন আবিল-ইস্‌বা, ইব্ন হিজ্জা এবং ইব্ন মা'সূম প্রণীত গ্রন্থাবলী Mehren-এর Rhetorik-এর পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে); (২০) G. W. Freytag, Darstellung der Arabischen Verskunst, বন ১৮৩০ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ Osnabruck ১৯৬৮ খৃ.), পৃ. ২৯৬-৩১৮ (পারিভাষিক শব্দসমূহের মূল ব্যুৎপত্তি); (২১) Silvestre de Sacy, Grammairc arabe, ২য় সং. প্যারিস ১৮৩১ খৃ., ২খ, ৬৫১-৬১; (২২) D. Vernier, Grammaire arabe, বৈরূত ১৮৯১ খৃ., পৃ. ৫২০-৩১; (২৩) W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, ৩য় সং., কেম্ব্রিজ ১৮৯৬-৮ খৃ., ২খ, ৩৫০-৮, ৩৬৮-৭৩ (অন্ত্যমিলসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের শব্দ); (২৪) A. Trabulsi, La critique Poetique des Arabes jus'qu au Ve siecle de l'Hegire, দামিশ্‌ক ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৭৭-৮৫; (২৫) Blachere, Litt., পৃ. ৩৫৯-৬০, ২৬৪-৫, ৫৫৫-৬, ৬৮৩; (২৬) H. Birkeland, Altarabische Pausalformen, ওসলো ১৯৪০ খৃ.; (২৭) H. Fleisch, Traisch, Traite de philologie arabe (বৈরূত ১৯৬০ খৃ.), ১৯২-৩ ; (২৮) M. C. Lyons এবং P. Cachia, The Effect of Monorhyme on Arabic Poetic Production in Journal of Arabic Literature, ১খ, ১৯৭০ খৃ.), পৃ. ৩-১৩; প্রবন্ধ সাজ'।

S. A. Bonebakker (E. I.[2])/মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

আল-কাফিয়া (الكافية) ঃ আরবী শব্দ। كافى বা كاف শব্দের مؤنث বা স্ত্রীলিঙ্গ। كفاية শব্দ থেকে উৎপত্তি। অর্থ যথেষ্ট, পর্যাপ্ত, প্রচুর, Enough, Sufficient। এই নামে আরবী ভাষায় একটি গ্রন্থ আছে। ইহার নাম الكافية فى النحو (পদবিন্যাস প্রকরণ বিষয়ে কাফিয়া গ্রন্থ) (হাজ্জী খালীফা কাশফু'জ-জুনূন, ২খ, পৃ. ১৩৭০)। বস্তুত ইহা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের পদবিন্যাস প্রকরণ বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিলে 'ইলমি নাহ্‌র জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়, নাহও বিষয়ের কোনও মাসআলা বা ব্যাকরণের কোনও তথ্য জানার জন্য এই গ্রন্থটি যথেষ্ট। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয় ঃ كافية كافيست يكن درد سر باقيست "আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে এই কাফিয়া গ্রন্থটিই যথেষ্ট, ইহার অধ্যয়ন যথেষ্ট হইলেও মাথার ব্যথা বাকী থাকিবে"। এই গ্রন্থের প্রণেতা ইবনুল হাজিব (দ্র.)। কাফিয়া গ্রন্থের কারণেই ইবনুল হাজিব মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন, (ডক্টর তারিক নাজম আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাজিব : হায়াতুহু ওয়া মুআল্লাফাতুহু, জেদ্দা, মাকতাবাতু দারিল ওয়াফা, ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ২১-২৪)।

কাফিয়া গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত নাহও (পদবিন্যাস প্রকরণ) শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য একটি বেনজীর গ্রন্থ। মুসলিম বিশ্বের ইসলামী পণ্ডিতবর্গ ও পাঠকবৃন্দ ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে অগণিত 'আলিম ও ব্যাখ্যাকার ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থটি মুখস্থকরণ, কাব্যাকারে মুদ্রণ, সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ ও অন্য ভাষায় অনুবাদ কার্য সম্পাদন পর্যায়ক্রমে অব্যাহত আছে। কোথাও ইহার গুরুত্ব কমে নাই, বরং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হওয়ার পর হইতে সকল স্থানে সকল যুগে এই গ্রন্থ সমাদৃত হয়। ইবনু'ল হাজিবের সমসাময়িক 'উলামায়ে কিরামই ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শুধু তাই নয়, ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যাকরণ বিষয়ক জ্ঞানী-পণ্ডিতদের মাঝে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। ইউরোপে মুদ্রিত প্রথম আরবী গ্রন্থাবলীর অন্যতম হিসাবে গৃহীত হয় এবং ইহার একটি কপি প্রকাশিত হওয়ার অল্পকিছু দিন পরেই ১৫৯২ খৃ. ইটালীতে তাহা মুদ্রিত হয় (ডক্টর তারিক নাজম আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)।

এই গ্রন্থের ভাষা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ ও মর্ম অতি ব্যাপক। এই গ্রন্থের লেখক 'ইলমি নাহও-এর প্রায় সকল মূলনীতি অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে একত্র করেন।। ডক্টর 'আবদুর-রহমান 'উতবা বলেন, নাহও বিষয় গ্রন্থের মধ্যে ইবনুল হাজিব রচিত কাফিয়া গ্রন্থের সুনাম (দিগদিগন্তে) ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে নাহ'ও শাস্ত্রের সকল বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (ডক্টর 'আবদুর রাহমান 'উতবা, মা'আ'ল-মাক্‌তাবাতি'ল-'আরাবিয়্যা, প্রথম সং, ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ২৯৮।) ডক্টর তারিক নাজ্‌ম 'আবদুল্লাহ্ বলেন, কাফিয়া গ্রন্থটি সত্যিই সপ্তম শতাব্দীর মণিমুক্তা (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫)। গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে আরব-অনারব, ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে। ইহাও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে। মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ বলেন, এই গ্রন্থটি প্রায় সাত শত বৎসর ব্যাপী বিশ্বের প্রায় সকল দীনি প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে (মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বিআহওয়ালিল-মুসান্নিফীন, করাচী, পৃ. ৩২০)। ডক্টর তারিক নাজম আবদুল্লাহ বলেন, একজন পাঠক বা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য নাহও শাস্ত্রের মূলনীতির সকল বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কাফিয়া গ্রন্থটিই যথেষ্ট, বিস্তারিত জানার প্রয়োজন নাই। এইজন্য তিনি পাঠকদের প্রয়োজনে একটি শ্লোকের মাধ্যমে ইহার গুরুত্বারোপ করেনঃ

يا طالبا للنحو إلزم حفظها ۔ واعلم يقينا أنها لك كافية

"হে 'ইলমি নাহও-এর জ্ঞানান্বেষণকারী ! এই গ্রন্থটি অবশ্যই মুখস্থ কর" নিশ্চিত জানিয়া রাখ যে, ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫)।

ইবনুল হাজিব প্রণীত আল-কাফিয়া ও আয-যামাখশারী প্রণীত আল-মুফাস্‌সাল পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কাফিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিন্যাস আয-যামাখশারী প্রণীত আল-মুফাস্‌সাল-এর মতই— তবে কাফিয়া গ্রন্থটি আল-মুফাস্‌সাল কিতাবের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই দাবিটা এত পূর্ণভাবে খাটে না, কারণ ইবনুল হাজিব যদিও কোনও কোনও অধ্যায় বিন্যাসে আয-যামাখশারীর আল-মুফাস্‌সাল-এর অনুরূপ করিয়াছেন তবুও অন্যান্য দিক দিয়া আয-যামাখশারীর সাথে তাঁহার পার্থক্য আছে।

অর্থাৎ তিনি (ইবনুল হাজিব) নাহও-এর বিষয়াবলী হইতে সার্‌ফের বিষয়াবলী আলাদা করেন, সার্‌ফকে অন্য একটি গ্রন্থে যাহার শিরোনাম আশ-শাফিয়া উহাতে পৃথকভাবে আলোচনা করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭)।

এই গ্রন্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ গ্রন্থকার নাহও-এর সকল বিষয় উপস্থাপনে উপযোগী সংক্ষেপণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং আল-কুরআনুল কারীম হইতে উদাহরণ, কাব্যিক প্রমাণ ও আরবদের উক্তি উপস্থাপন করেন। ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট আরবী ব্যাকরণবিদদের মধ্যে আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা, খালীল

আহমাদ, সীবাওয়ায়হ, কিসাঈ, আখফাশ, মুবাররাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মতামত সংযোজন করেন। কখনও কখনও আরব তথা হিজায, বানূ তামীম ও হুযায়ল প্রভৃতি গোত্রের উপভাষার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন। কখনও কখনও বাসরী ও কূফীদের মতভেদ জনিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন (ডক্টর তারিক নাজম আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮)।

বর্তমানে আরবী, বাংলা, তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় গদ্য ও পদ্যাকারে, বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তভাবে ইহার প্রায় দুই শত ভাষ্য আছে। ইবনুল হাজিব নিজেই গদ্য ও পদ্যাকারে ইহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার কয়েকটি ভাষ্য গ্রন্থ হইল : ইবনু'ল হাজিব প্রণীত ১৩১১ হিজরীতে ইস্তাম্বুলে একবার মুদ্রিত হয়।

২. আল-ওয়াফিয়া, ইহা নাহ্ও বা পদপ্রকরণ বিষয়ে ইবনু'ল হাজিব প্রণীত একটি গ্রন্থ, যাহা মালিক নাসির দাউদের অনুরোধে তাঁহার কাফিয়া গ্রন্থকে পদ্যাকারে বিন্যস্ত করেন। ইহার কয়েকটি অনুলিপি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

৩. শারহুল-ওয়াফিয়া, ইহা পদ্যাকারে রচিত 'আল-ওয়াফিয়া'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইবনু'ল-হাজিব নিজেই এই ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ১৯৮০ সালে বাগদাদে তাহা প্রকাশিত হয়।

৪. আওফাল-ওয়াফিয়া, ইহা হাজ্জী বাবা ইবরাহীম ইবন উছমান আত-তূসী (মৃ. ৮০৭ হি.) রচনা করেন।

৫. আত-তুহফাতুল-ওয়াফিয়া, ইহা তাকীয়ুদ-দীন আত-তাঈ রচনা করেন।

৬. শারহু আবী ইসহাক, আবূ ইসহাক আর-রাবাতী কর্তৃক ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ইহার একটি কপি রাবাতে সংরক্ষিত আছে।

৭. আল-আস্‌রারু'স-সাফিয়া ওয়া'ল-খুলাসাতুস শাফিয়া ফী কাশ্‌ফি'ল-মুকাদ্দিমাতি'ল-কাফিয়া। ইহা ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইবন আতিয়া আল-বাহরানী কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

৮. আন-নিহায়াতু ফী শারহিল কাফিয়া, গ্রন্থটি আহমাদ ইবন শামসুদ্দীন ইবনুল খাব্বাব আল-মূসিলী (মৃ. ৬৩৮ হি.) রচনা করেন।

৯. আশ-শাফিয়া ফী শারহি'ল-কাফিয়াহ, ইহা মাহদী আহমাদ ইবন ইয়াহয়া আল-মুরতাযী রচনা করেন।

১০. আল-মাওয়াহিবুল ওয়াফিয়া লি মুরাদি তালিবিল কাফিয়াহ, ইহা হাসান ইব্‌ন আহমাদ আল-জালাল (মৃ. ১০৮৪ হি.) রচনা করেন।

১১. গায়াতু'ত-তাহকীক ফী শারহিল কাফিয়াহ, ইহা সাফী ইব্‌ন নাসির আল-হিন্দী রচনা করেন।

১২. আল-হাদিয়াতু ইলা হাল্লিল কাফিয়া, ইহা 'আবদুল্লাহ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ রচনা করেন (মৃ. ৭০০ হি.)।

১৯. হাল্লি তারকীবি'ল-কাফিয়াহ, মুহাম্মাদ হাসান কূকীলাঈ গ্রন্থটি রচনা করেন।

২০. আত-তুহফাতু'শ-শাফিয়াহ ফী শারহি'ল-কাফিয়াহ, ইহা মুহাম্মাদ হাসান আর-রুউস রচনা করেন।

মুদ্রণ কার্য শুরু হওয়ার পর নাহ্ও বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থটি প্রথম পর্যায়ের একটি মুদ্রিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সংস্করণ সংখ্যা ৪০ (চল্লিশ) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল স্থান হইতে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছে, নিম্নে উহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান প্রকাশনা সালসহ উপস্থাপন করা হইল : ১৯৫২ সালে ইটালির রাজধানী রোমে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। বোম্বাই হইতে ১৩১১ হি., বূলাক হইতে ১২১৪ হি., ইস্তাম্বুল হইতে ১২৩৪ হি., দিল্লী হইতে ১২৭০ হি., কলিকাতা হইতে ১৮০৫ খৃ., তাশখন্দ হইতে ১৩১১ হি., লখনৌ হইতে ১৩১১ হি., কাযান হইতে ১৮৮৯ সালে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্থান হইতে গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছে যাহার প্রকাশনা সাল সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় নাই (ডক্টর তারিক নাজম আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; ব্রকেলম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-কিসমুছ ছালিছ, আল-হায়াতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ৩০৭)

এই গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা হানীফ গাংগূহী তাহার কিতাবে মীর আবদুল ওয়াহিদ বিলগিরামীর একটি মতামত উল্লেখ করেন। মীর আবদুল ওয়াহিদ বিলগিরামী কাফিয়া গ্রন্থকে 'ইলমুত তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্বের কিতাব হিসাবে উল্লেখ করেন এবং সূফীদের ভাষায় কাফিয়া গ্রন্থের مبحث غير المتصرف পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেন (মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গংগূহ- যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, পৃ. ৩২০)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনা, বৈরূত ১৯৭০ খৃ., ২য় সং., পৃ. ২৪৮-২৫০; (২) হাজ্জী খালীফাহ, কাশফুজ জুনূন আন আসামি'ল কুতুবি ওয়াল-ফুনূন, বৈরুত, দার ইহয়া আত-তুরাছিল আরাবী, ২খ, পৃ. ১৩৭০-১৩৭৬; (৩) ডক্টর তারিক নাজম আবদুল্লাহ, ইবনুল হাজিব : হায়াতুহূ ওয়া মুআল্লাফাতুহূ, জেদ্দা, মাকতাবাতু দারিল ওয়াফা, ১৪০৬/১৯৮৬; (৪) মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগুহী, যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, করাচী, দারুল ইশাআহ, তা. বি., পৃ. ৩১৮-৩২৩; (৫) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো, দারুল হিলাল, তা. বি., ৩খ, পৃ. ৫৬; (৬) আবুল ফিদা হাফিয ইবন কাছীর আদ-দিমাশকী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম সং., সপ্তম ভলিউম, ১৩খ, ১৪০৫/১৯৮৫, পৃ. ১৮৮-১৮৯; (৭) কারল ব্রকেলম্যান, তারীখু'ল-আদাবি'ল আরাবী, আল-কিসমুছ-ছালিছ, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়াহ, ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ৩০৬-৩৩৮; (৮) ডক্টর আশ-শাতির আহমাদ মুহাম্মাদ, আল-মুজায ফী নাশআতিন নাহও, আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ ১৩৯৮/১৯৭৮, পৃ. ৯৭-৯৮; (৯) ডক্টর শাওকী দায়ফ, আল-মাদারিসুন নাহবিয়াহ, দারুল মা'আরিফ, কায়রো ১৯৬৮ খৃ., ৫ম সং., পৃ. ৩৪৩; (১০) ডক্টর আবদুর রহমান 'উতবাহ, মা'আল-মাক্তাবাতি'ল 'আরাবিয়াহ, প্রথম সং., ১৩৯/১৯৭৮ খৃ., পৃ. ২৯৮।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

আল-কাফিয়াজী (الكافيجى) : মুহ্‌য়ি'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-হানাফী, ৯ম/১৫শ শতকের 'আলিম এবং বহু বিষয়ের লেখক। ৭৮৮/১৩৮৬-৮৭ সালে বা উহার পরে সারুখান (দ্র.)-এর কোকজেকি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানটি বেরগামার সন্নিকটস্থ হইয়া থাকিবে ; কেননা তাঁহার অতিরিক্ত নিসবা আল-বারগামী হইতে সেইরূপই অনুমিত হয়। ৮৩০/১৪২৭ সালের কিছু পরে তিনি মিসরে গমন করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সেখানকার বিদ্বান সমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। চাকমাক তাঁহাকে মাবিয়াতু'ল-আশরাফ শা'বান-এ অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদান করেন এবং পরে শা'বান-এর তুরবাতে মাশয়াখাতু'ত-তাদরীল (একাডেমিক ডীন) পদে উন্নীত করেন। ৮৫৮/১৪৫৪ সালে ঈনাল তাঁহাকে শায়খুনিয়াতে সমমর্যাদার পদ প্রদান করেন। তিনি যে একজন সফল শিক্ষক ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ছাত্রগণের নাম হইতে এবং আস-সাখাবী ও আস-সুয়ূতী

তাঁহার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে। তিনি শুক্রবার সকালে, ৪ জুমাদা-১, ৮৭৯/সেপ্টেম্বর ১৪৭৪ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার যে নিসবা, কাফিয়াজী, তাহা তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল ইবনু'ল-হাজিব (দ্র.)-এর ব্যাকরণ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ কাফিয়া-র প্রতি তাঁহার অনুরাগের কারণে। ইব্ন হিশাম-এর কাওয়া'ইদু'ল-ই'রাব (দ্র. Brockelmann, II, 29, SII, 18)-এর উপরে ব্যাকরণমূলক একটি টীকা গ্রন্থকে আল-কাফিয়াজীর জীবনীকারগণ তাঁহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখা ও আগ্রহের ক্ষেত্র ছিল অস্বাভাবিক রকমের ব্যাপক ; আইন এবং ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের সকল ক্ষেত্র, ইতিহাস, অংকশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা এবং সর্বোপরি তর্কশাস্ত্র। তর্কশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ হইতেছে আত-তাফতাযানীর তাহযীব গ্রন্থেরভাষা [Brockelmann, II, 278, তাহা ছাড়া পাণ্ডুলিপি লালেলি ২৫৯২ ও বুরসা হারাককি (Haracci) ১৩৭৮] উপরে লিখিত একটি টীকা গ্রন্থ। তাঁহার লিখিত বহু নিবন্ধের (প্রায় ক্ষেত্রেই সেগুলির শেষে রচনাকাল লিখিত রহিয়াছে) অধিকাংশ রক্ষিত আছে, কিন্তু মাত্র একটি ব্যতীত অন্যগুলি সম্পাদিত হয় নাই, সেগুলির পঠনপাঠনও হয় নাই। প্রায়গুলিই সংক্ষিপ্তাকারের প্রবন্ধ, বিশেষ কোন সমস্যার উপরে আলোকপাত করিয়া রচিত এবং বিষয়বস্তুকে সাধারণ ধারাতে গঠন করিয়া যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আস-সাখাবী যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহাই যথার্থ যে, আল-কাফিয়াজী সেই রচনারীতি দ্বারা নূতন একটি ধারার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বা প্রতিষ্ঠা করিবার ধারণা প্রদান করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক নিবন্ধসমূহ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সেরূপই করিয়াছিলেন (তু. গ্রন্থপঞ্জী) অথবা উদাহরণস্বরূপ আর-রাওহা ফী 'ইলমি'র-রূহ' নামক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের কথা বলা যায় (পাণ্ডু. আতিফ এফেনদী ২৮২৮, ১৬৭এ-১৬৯ বি, তাহা ব্যতীত বার্লিন ওরিয়েন্টাল পত্রক ৪২৪৯, তু. M. Weisweiler, Der islamische Bucheinband, Wiesbaden 1962, 83)। সেখানে আত্মা বিষয়ক রহস্যরঞ্জিত জ্ঞানকে বিশেষ ধারারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বক্তব্যকে সংক্ষেপে পরিবেশন করিবার বিষয়ে তাঁহার যে বোধ তাহা ছিল তৎকালীন পাণ্ডিত্যের ধারার ব্যতিক্রমী, যে কারণে কুরআন বিজ্ঞানভিত্তিক তাঁহার আত-তায়সির ফী কাওয়া'ইদ 'ইলমি'ত-তাফসীর গ্রন্থখানির বিষয়ে (এইখানে তিনি আবূ সা'ঈদ তিমুরবুগার জন্য ৮৫৬/১৪৫২ সালে রচনা করেন) তাঁহার সঙ্গে সুসম্পর্কিত সুয়ূতী তদীয় ইতকান গ্রন্থের ভূমিকাতে অসন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে আল-কাফিয়াজীর রচনাবলী এই কারণেই স্বীকৃতি ও পঠন-পাঠনের দাবি রাখে যে, সেগুলিকে মৌলিক এবং চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সাখাবী, দা'ও, ৭খ, ২৫৯-৬১ ; (২) 'আলী ইব্ন দাউদ আল-জাওহারী, ইনবা'উল-হাসর, কায়রো ১৯৭০ খৃ. নির্ঘন্ট; (৩) আস-সুয়ূতী, বুগায়া, পৃ. ৪৮ প. ; (৪) ঐ লেখক, হুসনু'ল-মুহাদারা, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, পৃ. ৩১৭ প. ; (৫) ইব্ন ইয়াস, Bibliotheca Islamica-তে লিখিত, পৃ. ৫০, ৯৪ প.; (৬) Brockelmann, II, 138-140, S. II, 140 প.; (৭) F. Rosenthal, A history of Muslim historiography, Leiden 1968, 245-62, 547-80; উহাতে মুখতাসার ফী 'ইলমি'ত-তা'রীখ গ্রন্থখানির মূল পাঠ ও অনুবাদ রহিয়াছে।

F. Rosenthat (E. I.[2])/হুমায়ূন খান

আল-কাফিয়াতুল বাদী'ইয়া (الكافية البديعية) ঃ কবি সাফিয়্যুদ-দীন আল-হিল্লী রচিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিমূলক একটি কাব্যগ্রন্থ। শায়খ আবুল বারাকাত আবদুল 'আযীয ইব্ন সুরায়া আল-হিল্লী ইরাকের হিল্লা নামক স্থানে ৬৭৫/১২৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদ শহরে ৭৫০/১৩৪৯ সালে ইনতিকাল করেন (হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবি'ল 'আরাবী, ১খ, পৃ. ১০৪৯; আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৯৮)। তিনি সফিয়্যুদদীন আল-হিল্লী নামে পরিচিত। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচিত গ্রন্থের নাম 'আল-কাফিয়াতু'ল-বাদী'ইয়া (ইয়াসীন আল-আয়্যূবী, সফিয়্যু'দদীন আল-হিল্লী, বৈরূত, দারুল-কুতুব লিল-লুবনানী, ১৯৭১, ১ম সং., পৃ. ৭১; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতি'ল 'আরাবিয়্যা, কায়রো, দারুল হিলাল, তা.বি., ৩খ, পৃ. ১৪০)। উল্লেখ্য যে, কোনও কোনও লেখক কাফিয়া শব্দটি তাশ্‌দীদ যুক্ত ইয়া উল্লেখ করেন। কাফিয়া শব্দের অর্থ যথেষ্ট, আর বাদী'ইয়্যা শব্দের অর্থ অলংকারপূর্ণ বা আলংকারিক। সাহিত্যের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিমূলক যে সকল কবিতায় কমপক্ষে ১৪০টি আলংকারিক পদ্ধতিতে রচিত শ্লোক সন্নিবেশিত হয় তাহাকে البديعية বলে, আর প্রত্যেকটি বায়ত বা শ্লোকেই একটি আলংকারিক পরিভাষা বিদ্যমান থাকিবে (মাজ্‌দী ওয়াহ্‌বা, মু'জামু'ল-মুসতালাহাতিল আরাবিয়্যা, পৃ. ৪৩)।

উল্লেখ্য যে, 'বাদী'ইয়্যা রচনায় কতগুলি শর্ত আছে ঃ ১. ميم (মীম) অন্ত্যমিল হওয়া; ২. ছন্দ বাহরুল-ওয়াফির বা বাহরুল বাসীতে হওয়া; ৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিমূলক হওয়া; ৪. علم البديع বা আলংকারিক পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকা (ইয়াসীন আল-আয়্যূবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩)। কবি আল-হিল্লীও 'মীম' অন্ত্যমিল দিয়া 'বাহরুল বাসীত' ওযনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় এই বাদী'ইয়া রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নিম্নে ইহার প্রথম শ্লোক উল্লেখ করা হইল। কবি আল-হিল্লী রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় বলেন ঃ

إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم + واقر السلام على عرب بذى سلم

তুমি "সালা' নামক স্থানে আগমন কর তবে 'আলাম নামক স্থানের প্রতিবেশীকে প্রশ্ন কর এবং আরবের যী সালামের অধিবাসী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সালাম কর" (হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, তা. বি., ২খ, পৃ. ১৩৬৯)।

এই কবিতায় ১৪৫টি শ্লোকে আছে। সবগুলিই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচিত, আর রাসূল প্রশস্তিই এই কবিতা রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। কবি ইহাতে علم البديع বা আলংকারিক পরিভাষার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য একত্র করেন। তিনি এই কবিতায় প্রায় ১৪৫টি আলংকারিক পরিভাষা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বাদী'ইয়া কবির যুগের নূতন উদ্ভাবন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও এই বাদী'ইয়া রচনায় অবদান রাখেন কবি সূফী শারাফুদ্দীন বূসীরী (র) তাঁহার বুরদা কবিতা রচনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে কবিদের এক বিরাট অংশ এই দীর্ঘ কবিতা রচনায় কবি আল-হিল্লীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ২২ (বাইশ)-এর বেশী হইতে পারে। কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, বাদী'ইয়া রচনায় কবি আল-হিল্লী

প্রথম ব্যক্তি না তাঁহার সমসাময়িক কবি ইব্ন জাবির আল-আন্দালূসী প্রথম ব্যক্তি যিনি শারাফুদ্দীন বূসীরী (র) রচিত 'কাসীদাতু'ল বুরদার অনুকরণ করেন (য়াসীন আল-আয়্যূবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২)। তবে যাকী মুবারাক স্বীয় গ্রন্থে ইব্ন জাবীর আল-আন্দালুসীকে বাদী'ইয়্যা রচনায় প্রথম ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেন এবং কবি আল-হিল্লীকে বাদী'ইয়্যা রচনার সারিতে অনুকরণকারী দলের অন্তর্ভুক্ত করেন (যাকী মুবারাক, আল-মাদাইহ আল-নাবাবিয়্যা ফি'ল-আদাবি'ল 'আরাবী, কায়রো, দারু'শ শা'ব, তা.বি., পৃ. ২২৪-২২৫)। আর মাজদী ওয়াহবা তাঁহার গ্রন্থে এই কথা স্বীকার করেন যে, এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হইল الكافية البديعية فى المدائح النبوية (মাজদী ওয়াহবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩)। এই কাসীদায় কবি শাব্দিক ও অর্থগত অলংকার সংযোজন করেন (হান্না আল-ফাখূরী, আল-মুজায ফি'ল-আদাবি'ল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, বৈরূত, দারুল জীল, আদাবু'ন-নাহদাতি'ল-হাদীছাহ, ৩খ, ২য় সং., ১৪১১/১৯৯১, পৃ. ৪৯০)।

যাকী মুবারাক স্বীয় গ্রন্থে এই কিতাবের নাম উল্লেখ করেন الكافية البديعية فى المدائح النبوية (যাকী মুবারক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫)। কবি নিজেই ইহার একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন, নামকরণ করেন النتائج الالهية فى شرح البديعية। কবির দুইটি গ্রন্থই (বাদী'ইয়া ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ) মুদ্রিত হইয়াছে। 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা' ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। বাদী'ইয়্যা ১৮৯২ খৃ. তাঁহার দীওয়ানসহ মুদ্রিত হয় আর ভাষ্য মিসরে ১৩১৬ হিজরীতে মুদ্রিত হয় (য়াসীন আল-আয়্যূবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; হাজ্জী খলীফা, প্রাগুক্ত, তা.বি., ২খ, পৃ. ১৩৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, কাশফুজ-জুনূন আন আসামীল-কুতুব ওয়াল-ফুনূন, বৈরূত, দার ইহয়া আত-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি., ২খ, পৃ. ১৩৬৯; (২) যাকী মুবারাক, আল-মাদাইহ আন-নাবাবিয়্যা ফি'ল-আদাবি'ল 'আরাবী, কায়রো দারুশ-শা'ব, তা. বি., পৃ. ২২৫; (৩) আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখু'ল-আদাবি'ল 'আরাবী, বৈরূত, লেবানন, দারুল মা'রিফাহ; ১৪১৬/ ১৯৯৫, নূতন সংস্করণ, পৃ. ২৯৮; (৪) মাজদী ওয়াহবা, মু'জামু'ল মুসতালাহাতিল 'আরাবিয়্যা ফি'ল-লুগাত ওয়াল-আদাব, বৈরূত, মাকতাবাতি লুবনান, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩; (৫) হান্না আল-ফাখূরী, আল-মু'জায ফি'ল-আদাবি'ল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, বৈরূত, দারু'ল-জীল, ৩য় সং., ১৪১১/১৯৯১, পৃ. ৪৯০; (৬) হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবি'ল 'আরাবী, আল-আদাবু'ল কাদীম, বৈরূত, দারুল জীল, ১ম সং, ১৯৮৬ খৃ., ১খ, পৃ. ১০৪৯; (৭) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি'ল-লুগাতি'ল 'আরাবিয়্যা, কায়রো, দারু'ল হিলাল, তা.বি., ৩খ, পৃ. ১৩৯-১৪১; (৮) গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৭৭ খৃ., প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৪৩-১৪৫; (৯) খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, বৈরূত, দারুল-'ইলম লিল-মালাঈন, ১৫তম সং., ৪খ, পৃ. ১৭-১৮; (১০) ইয়াসীন আল আয়্যূবী, সাফিয়্যু'দ-দীন আল-হিল্লী, বৈরূত, দারুল কুতুব লিল-লুবনানী, ১৯৭১ খৃ., ১ম সং.; (১১) মোহাম্মদ আবদুল মালেক, আরবী কাব্যে রাসূল (স) প্রশস্তি ঃ স্বরূপ ও শিল্প বিশ্লেষণ (পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ ২০০১ খৃ., পৃ. ১৯৫-১৯৬ (অপ্রকাশিত)।

ডঃ আবদুল মালেক

আল-কাফিয়াতু'শ-শাফিয়া ফিন-নাহ্ও (الكافية الشافية فى النحو) ঃ ইব্ন মালিক আত-তাঈ আন-নাহবী (দ্র.) (মৃ. ৬৭২ হি. /১২৭৪ খৃ.) রচিত আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের নাহও বা পদবিন্যাস প্রকরণ বিষয়ক একটি কিতাবের নাম (হাজ্জী খালীফা, কাশফুজ-জুনূন, ২খ, পৃ. ১৩৬৯; ডক্টর 'আবদুর-রাহমান 'উত্বাহ্, মা'আ'ল-মাক্তাবাতি'ল 'আরাবিয়া, পৃ. ৩০৩)।

গ্রন্থকার ইব্ন মালিক একই গ্রন্থকে বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত দুইটি নামে প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই দুইটি গ্রন্থই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (ডক্টর 'আবদু'র রাহমান 'উতবাহ, প্রাগুক্ত)। জুরজী যায়দানের বর্ণনা অনুযায়ী ইহা ২৭৫৭টি শ্লোকবিশিষ্ট রাজায ছন্দে রচিত একটি গ্রন্থ (জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল : লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, কায়রো, দারুল হিলাল, তা. বি., ৩খ, পৃ. ১৫২)। ব্রকেলম্যানও তাঁহার তারীখুল-আদাবিল 'আরাবী নামক গ্রন্থে এই কিতাবের শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ করেন ২৭৫৭টি, তিনি ইহাকে 'রাজায' ছন্দে রচিত নাহও ও সরফের একটি গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করেন (ব্রকেলম্যান, পৃ. ২৯২, ডক্টর শাওকী)। ডক্টর শাওকী দা'ইফ বলেন, এই গ্রন্থে ৩০০০ (তিন হাজার) শ্লোক আছে আল-মাদারিসু'ন-নাহবিয়্যা, কায়রো, দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৮ খৃ., ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৩১০)।

গ্রন্থকার নিজেই এই কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করিয়া ১০০০ (এক হাজার) শ্লোকের মধ্যে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'আল-খুলাসাহ' নামে ইহার নামকরণ করেন। এই গ্রন্থে আরবী ব্যাকরণের সকল বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্য এই গ্রন্থটি 'আল্ফিয়া' (এক হাজার লাইনের কবিতা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কেননা এই গ্রন্থে এক হাজার লাইনের কবিতা আছে। এই গ্রন্থটিও ইব্ন হাজিব রচিত কাফিয়ার মত আরবীয় সকল অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে ইব্ন হাজিবের কাফিয়া কাব্যাকারে রচিত নয়। নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা ইব্ন মালিকের কাফিয়া-এর সূচনা হয় ঃ

قال ابن مالك محمد و قد   نوى افادة بما فيه اجتهد
الحمد لله الذى من رفد   توفيق من وفق لحمده

ইহার একটি ভাষ্য গ্রন্থকার নিজেই রচনা করেন এবং الوافية (আল-ওয়াফিয়াহ) নামে নামকরণ করেন। পরবর্তীতে এই গ্রন্থে পার্শ্বটীকা সংযোজন করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পুত্র বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৮৬ হি.), ইহার ভাষ্য রচনা করেন এবং পরিশিষ্ট সংযোজন করেন আবু'ছ ছানা মাহ্মূদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন খাতীব আর-রীফাহ আল-হামাবী, যাহাতে রহিয়াছে ১০৫টি বায়ত বা শ্লোক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফুজ জুনূন 'আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, বৈরূত, দার ইহ্ইয়া আত-তুরাছিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ১৩৬৯; (২) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, কায়রো, দারুল হিলাল, তা. বি., ৩খ, পৃ. ১৫১-১৫২; (৩) কারল ব্রকেলম্যান, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল-কিসমুছ ছালিছ, আল-হায়াতু'ল-মিসরিয়্যা, ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ২৭৬-২৯২; (৪) ডক্টর আশ-শাতির আহমাদ মুহাম্মাদ, আল-মু'জায ফী নাশআতিন, আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারা ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১০০; (৫) ডক্টর শাওকী দায়ফ, আল-মাদারিসুন-নাহবিয়্যা, দারুল মা'আরিফ, কায়রো ১৯৬৮ খৃ., ৫ম সং. পৃ. ৩১০; (৬) ডক্টর আবদুর রহমান 'উতবা, মা'আ'ল-মাকতাবাতি'ল-'আরাবিয়্যা, প্রথম সং. ১৩৯৮ হি./ ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩০৩-৩০৪।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল মালেক

কাফির (كافر) ঃ 'আ., ব. ব. কুফ্ফার, ধাতু (مادة) ك - ف - ر। ইহার শাব্দিক অর্থ গোপন করা, ঢাকিয়া ফেলা। এইজন্যই অভিধানে 'কাফির' শব্দটির ব্যবহার রাত্র, সমুদ্র, বিশাল মরুভূমি, বৃহৎ নদী, কালো মেঘ এবং বর্ম অর্থেও হইয়া থাকে (আল-ফীরূয আবাদী, আল-কামূসু'ল-মুহীত, কায়রো ১৩৫৭ হি., ২খ, ১২৮, কুফর শিরো.)। কৃষককেও 'কাফির' বলা হয়। কারণ সে ভূমিতে বীজ বপন করিয়া ঢাকিয়া রাখে। কুরআন কারীম-এর আয়াত أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ (৫৭ ঃ ২০)-এর এক তাফসীরে ইহাও বর্ণিত আছে যে, কুফ্ফার অর্থ এখানে কৃষক। এই সূত্রে কুফূর (كفور) এবং কুফরান (كفران)-এর অর্থ নাশুকরী করা বা অকৃতজ্ঞ হওয়া, কুরআন কারীমের বেশ কিছু আয়াতে এই অর্থই ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা ঃ ১১ ঃ ৯ ; ২২ ঃ ৬৬ ; ৭৬ ঃ ৩, ২৪ প্রভৃতি)। অতঃপর 'কুফর'-এর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য ধর্ম অস্বীকার করার উপর হইতে থাকে এবং কাফির শব্দটি 'অমুসলিম'-এর সমার্থবোধক হইয়া যায়। কুরআন কারীমের অধিকাংশ আয়াতে এই অর্থই ব্যবহৃত হইয়াছে।

'কুফর'-এর যে পারিভাষিক সংজ্ঞা 'ইল্‌ম-ই ফিক্‌হ ও কালাম বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রসিদ্ধ ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তাহা হইল ঃ هو جحد كل ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ادعاؤه ضرورة (ইব্‌নু'ল-হুমাম, আল-মুসায়ারা, দেওবানদ ১৩৭৭ হি., পৃ. ১৪৯, ১৫০)। ইব্‌ন নুজায়ম-এর আল-বাহ্‌রু'র-রাইক (কায়রো সং, ৫খ, ১২৯)-এর সামান্য পরিবর্তনসহ এই সংজ্ঞাই উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ এমন যে কোন বিষয়কে অস্বীকার করা কুফর যাহা রাসূলুল্লাহ (স) দাবি করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিত ও স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যথা তাওহীদ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাত, তাঁহার উপর নবুওয়াত সমাপ্ত হওয়া, আখিরাতের জীবন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যাকাত, হজ্জ, রামাদান-এর রোযা ফরয হওয়া, মদ, ব্যভিচার হারাম হওয়া প্রভৃতি। এই সকল বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে নিশ্চিত এবং স্পষ্টরূপে বিধৃত হইয়াছে। এই ধরনের যে কোনও বিষয়ের অস্বীকার করা কুফরী এবং সেই অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়।

জামহূর আহলে সুন্নাত এই ব্যাপারে একমত যে, 'কুফর'-এর সম্পর্ক মূলত বিশ্বাসের সহিত। কেহ যদি 'আমলের দিক দিয়া দুর্বল হয় কিন্তু ইসলামের মৌলিক 'আকীদার প্রতি ঈমান রাখে, তবে সে কাফির হইবে না। তাহাকে বে-'আমল, ফাসিক'-ফাজির এবং এই ধরনের অন্য কোনও শব্দে আখ্যায়িত করা যাইবে (আবূ মানসূর আল মাতুরীদী, শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার, পৃ. ৪০, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হি.)। ইহা এই কারণে যে, উল্লেখ্য জামহূর-এর এই অভিমত সম্পর্কে প্রাচীন কিছু ফিরকা দ্বিমত পোষণ করিয়াছে। কাররামিয়্যা ফিরকার মত হইল, ঈমান শুধু اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -এর মৌখিক স্বীকৃতির নাম। যে ব্যক্তি কেবল মুখে মুখে এই কথা স্বীকার করিয়া লইবে সে কাফির হইবে না, যদিও তাহার আন্তরিক বিশ্বাস এবং 'আমলী যিন্দেগী এই স্বীকারোক্তির পরিপন্থী হয় (আল-ফারহারী, আন-নিবরাস 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ, মুলতান ১৩১৮ হি., ৩৯৯)।

অপর পক্ষে কিছু সংখ্যক খারিজীর মত হইল, প্রতিটি 'ইবাদতই ঈমানের অংশ, তাহা ফরয হউক বা নফল। সুতরাং একটি 'ইবাদত ছাড়িয়া দিলেও মানুষ কাফির হইয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ খারিজীর মত হইল, সাগীরা গুনাহ নহে, বরং কেবল কাবীর গুনাহ করিলেই মানুষ কাফির হইয়া যাইবে (আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, লাহোর, সং., ১খ, ১১১)। মু'তাযিলীগণের মধ্যে 'আবদু'ল-জাব্বার আবু'ল-হুযায়ল প্রমুখের কথা বলা হইয়া থাকে যে, তাহারা কোনও ফরয বা মুসতাহাব পরিত্যাগ করিলে অথবা সাগীরা গুনাহ করিয়া ফেলিলেও সে মানুষকে ঈমানবহির্ভূত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও তাহাদের মতে সে কাফির হইয়া যায় না। অবশ্য অধিকাংশ মু'তাযিলার মতে কোন নফল 'ইবাদাত পরিত্যাগ করিলে অথবা সাগীরা গুনাহ করিলে সে ঈমানবহির্ভূত হয় না। কেহ কোনও ফরয ছাড়িয়া দিলে অথবা কোন কাবীরা গুনাহ করিলে তাহাদের মতে সে ঈমান ও কুফর-এর মধ্যবর্তী স্থানে নামিয়া যায়। তখন না তাহাকে মু'মিন বলা যায় আর না কাফির। এই মতবাদকে মানযিলাতু বায়না'ল-মানযিলাতায়ন (منزلة بين المنزلتين)-এর আকীদা বলা হয় (এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-'আয়নী, 'উমদাতু'ল-কারী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হি., ১খ, ১২১, ১২২ প.; আরও দ্র. ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরু'ল-কাবীর, কায়রো সং., ১খ, ১৬৩ প.)।

কুরআন কারীমে (অবিশ্বাসী) কাফিরদের ছয়টি দলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে; (১) মক্কার মুশরিকগণ, যাহারা ছিল মূর্তি-পূজারী, যথা قل يا ايها الكافرون (১০৯ ঃ ১)-এ সরাসরি এই দলকেই সম্বোধন করা হইয়াছে; (২) নাসারা বা খৃষ্টান (ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী); ইরশাদ হইয়াছে ঃ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثة (৫ ঃ ৭৩) "তাহারা কুফরী করিয়াছে, যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে একজন"; (৩) য়াহূদী, যাহারা হযরত 'উযায়র ('আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া দাবি করে। কুরআন কারীম (৫ ঃ ১৫৫, ১৫৬)-এ তাহাদের সম্পর্কে 'কুফর' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে; (৪) সাবী (২ ঃ ৬২, ৫ ঃ ৬৯; ২২ ঃ ১৭) অর্থাৎ তারকাপূজারী (ইব্‌ন কাছীর, আত-তাফসীর, কায়রো ১৩৫৬ হি., ১খ, ১০৪); (৫) মাজূসী অর্থাৎ অগ্নিপূজক (২২ ঃ ১৭); (৬) মুনাফিক অর্থাৎ যাহারা মুখে নিজেদেরকে মু'মিন বলিয়া দাবি করে; কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া কাফির (৬৩ ঃ ১)।

কুরআন কারীম-এর বর্ণনা অনুযায়ী সকল কাফির-এর পরিণাম হইবে আখিরাতে জাহান্নাম (২ ঃ ২৪; ৩ ঃ ১০ প্রভৃতি)। অবশ্য পার্থিব বিধি-বিধানের দিক হইতে কাফির কয়েক প্রকারের ঃ

(১) যিম্মী (দ্র. যিম্মা) ঃ সেই সকল কাফিরকে বলা হয় যাহারা কোন ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের অনুমতি লইয়া বসবাস করে। তাহাদের নিকট হইতে সামান্য কর (جزية) আদায় করা হয় এবং তাহাদের জান, মাল ও সম্ভ্রম মুসলমানদের ন্যায় সংরক্ষিত হইয়া যায়। যদি কোনও মুসলমান কোনও যিম্মীকে হত্যা করে তবে (হানাফী মতানুসারে) তাহার নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার সম্পদ ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণ সম্পর্কেও সকল নিয়ম-কানুন মুসলমানদের মতই প্রযোজ্য হইবে (ইব্‌ন নুজায়ম, আল-বাহ্‌রু'র-রাইক, কায়রো সং., ৫খ, ১৮১; আরও দ্র. ইবনু'ল-কায়্যিম, আহকামু আহলি'য-যিম্মা)।

(২) মুসতা'মান (কাফির) ঃ সেই সকল কাফিরকে বলা হয় যাহারা সরকারের অনুমতি লইয়া অনধিক এক বৎসরের জন্য আগমন করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের নিকট হইতে জিয্‌য়া (কর) আদায় করা হইবে না এবং অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রে ইহারাও যিম্মীদেরই ন্যায় হইবে। মুসলমানদের জন্য তাহাদের জান, মাল ও সম্ভ্রমের হিফাজত করা অবশ্য কর্তব্য (আশ-শামী, রাদ্দু'ল-মুহতার, ইস্তাম্বুল সং, ৩খ, ৩৪৪)।

(৩) হারবী কাফির ঃ সেই সকল কাফিরকে বলা হয় যাহারা কোনও চুক্তিবিহীন অমুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা। যদি এই অমুসলিম রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির কোনও চুক্তি হয় তবে সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আচরণ করিতে হইবে। আর যদি কোনও চুক্তি না থাকে তবে এই সকল কাফিরের জান-মালের কোনও দায়-দায়িত্ব মুসলমানের থাকিবে না, তবে মুসলিমদের জন্য তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানাত এবং ধোঁকা ও প্রতারণা করা জা'ইয নাই (ইব্‌ন নুজায়ম, আল-বাহরু'র-রা'ইক, ৫খ, ১০৭), এমন কি যুদ্ধরত অবস্থায়ও যুদ্ধের সহিত জড়িত নহে এমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, খঞ্জ, পাগল এবং ধর্মযাজকদিগকে হত্যা করা জা'ইয নাই। এমনিভাবে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বন্দী হইয়া আসিয়াছে তাহাদেরকে মুছলা করা (কোনও এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলা) অথবা তাহাদেরকে আগুনে পোড়ানো জা'ইয নাই (আশ-শামী, রাদ্দু'ল-মুহতার, ৩খ, ৩০৯)।

(৪) মুরতাদ (দ্র.) ঃ সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে মুসলিম ছিল, পরে কাফির হইয়া গিয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্রে থাকিয়া এইরূপ করিলে হাদীছ-এর ভাষ্য অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তাহাকে হত্যা করিতে হইবে (আল-বুখারী, কিতাবু ইসতিতাবাতি'ল-মুরতাদ্দীন, দিল্লী ১৩৫৭ হি., ২খ, ১০২৩)। কিন্তু এই শাস্তি প্রয়োগের পন্থা হইল, প্রথমত তাহাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দিতে হইবে এবং তাহার অন্তরে কোনরূপ প্রশ্ন বা সন্দেহ সৃষ্টি হইলে তাহা দূর করিতে হইবে। ইহার পরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাকে আটক রাখিয়া ইসলাম গ্রহণের অবকাশ দিতে হইবে। ইহার পর হত্যা করিতে হইবে (ইব্‌ন নুজায়ম, আল-বাহরু'র-রা'ইক, ৫খ, ১৩৫)।

(৫) যিনদীক ঃ সেই সকল কাফিরকে বলা হয় যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতকে স্বীকার করে; কিন্তু তাহাদের অন্যান্য 'আকীদা কাফিরের ন্যায় (আত-তাহানাবী, কাশ্‌শাফ্ ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১৮৬১ খৃ., ৩খ, ১২৫২)।

কাফিরদের সহিত উঠা-বসা, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন কারীম, হাদীছ ও ফিক্হ গ্রন্থে বিস্তারিত ও ব্যাপক হুকুম-আহকাম পাওয়া যায়। যথা কাফিরদের পূজ্য দেবদেবীকে গালি দিতে নিষেধ করা হইয়াছে (৬ ঃ ১০৮) এবং কাফিরদের উপর জুলুম করার কারণে তাহারা যে বদ দু'আ' করে তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকার জোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ, বৈরূত সং., ৩খ, ১১৫৩)। এই বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, শুধু কুফরীর কারণে কাফিরের শরীর অপবিত্র হয় না। তাই তাহার সহিত মুসাফাহা প্রভৃতি না করা নিছক বাড়াবাড়ি যাহার কোন সনদ বা ভিত্তি নাই (কাদী ছানা'উল্লাহ, তাফসীর মাজহারী, দিল্লী ১৩৮০ হি., ৪খ, ১৭৬)। অমুসলিমদের সহিত লেন-দেন ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সদাচার করা এবং সদ্ব্যবহার করার তাকীদ রহিয়াছে (আল-বাবারতী, আল-ইনায়া মা'আ ফাতহি'ল-কাদীর, কায়রো সং., ১খ, ৭৫; ইব্‌ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, কায়রো ১৩৭৯ হি., ১খ, ২৮)। কাফিরদের পাত্র সম্পর্কে যদি পবিত্র কি অপবিত্র তাহার সঠিক জ্ঞান না থাকে তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাহা না ধুইয়া ব্যবহার করা পসন্দনীয় নহে। এই হুকুমটি ব্যাপক। স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে ফাসিক ফাজির সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু কেহ তাহা পবিত্র মনে করিয়া ব্যবহার করিয়া ফেলিলে জা'ইয হইবে। এমনিভাবে তাহাদের অসুখে সেবা-শুশ্রূষা করা, তাহাদেরকে দা'ওয়াত করা এবং তাহাদের দা'ওয়াত কবুল করা, তাহাদেরকে হাদিয়া (উপহার) দেওয়া বা তাহাদের হাদিয়া গ্রহণ করা যদি কোনও দীনী স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তবে জা'ইয। কোনও য়াহূদী বা অগ্নিপূজককে "হে কাফির" বলিয়া সম্বোধন করাও সঙ্গত নহে। কারণ ইহাতে তাহার মনে ব্যথা লাগিবে আর কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া না-জা'ইয। তবে কাফিরকে "আস-সালামু 'আলায়কুম" বলা অথবা লেখা জা'ইয নাই। কারণ সালাম ইসলামের একটি নিদর্শন। ইহা দ্বারা জাতির পরিচয় ও স্বকীয়তা নির্ধারিত হয়। ইহার পরিবর্তে السلام على من اتبع الهدى (যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তাহার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক), লেখা উচিত (ইহা ও এই ধরনের বহু হুকুম ফাতাওয়া 'আলামগীরী, বূলাক, কায়রো ১৩১০ হি., ৫খ, ৩৪৬-৩৪৮-এ উল্লিখিত রহিয়াছে)।

এই আচার-ব্যবহারের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে আহল-ই কিতাব ব্যতীত অমুসলিমদের সহিত বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করাও জা'ইয নাই এবং তাহাদের যাবেহকৃত পশুও আহার জা'ইয নাই। কিন্তু যাবহকৃত পশু ব্যতীত তাহাদের তৈরীকৃত অন্যান্য খাবার মুসলিমদের জন্য হালাল, যদি তাহাতে কোনও হারাম জিনিস না থাকে। আহল-ই কিতাব (য়াহূদী ও নাসারা)-এর যাবহকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল যদি তাহা আল্লাহর নামে যাবহ করা হইয়া থাকে এবং তাহাদের মহিলাদেরকে বিবাহ করাও জা'ইয (৫ ঃ ৫)।

তাসাওউফ-এর পরিভাষায় 'কুফর' এবং 'কাফির'-এর কিছু ভিন্ন অর্থও বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইল রূপক ও পারিভাষিক (দ্র. আত-তাহানাবী, কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১৮৬৩ খৃ., ৩খ, ১২৫২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াও দ্র. (১) ইব্‌ন মানজূর, লিসানু'ল-আরাব, বূলাক ১৩০০ হি., ৬খ, ৪৫৯-৪৬৭; (২) আজ-জাওহারী, আস-সিহাহ, কায়রো ১৩৭৫ হি., ২খ, ৮০৭; (৩) Winsinck, আল-মু'জামু'ল-মুফাহরাস, লাইডেন ১৯৬৭ খৃ., ৬খ, ৪০, শিরো.; (৪) আনওয়ার শাহ কাশমীরী, ইকফারু'ল-মুলহিদীন, করাচী ১৩৮৭ হি. (আরও দ্র. মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস মারাঠীকৃত উর্দূ অনু. করাচী সং.); (৫) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', ঈমান আওর কুফর কুরআন কী রওশনী মে, করাচী ১৩৯৩ হি.; (৬) মিফতাহু কুনূযি'স-সুন্না, আল-কাফির শিরো.।

মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী (দা. মা. ই.)/ড. আবদুল জলীল

কাফিরকূব (كافر كوب) ঃ ব. ব. কাফিরকুবাত, বহুবচনেই সাধারণত লিখিত। শব্দটি আরবী কাফির (দ্র.) এবং ফারসী কূব শব্দ যোগে গঠিত। ফারসী ক্রিয়া পদ কূবীদান (অর্থ আঘাত করা, নির্মূল করা) হইতে কূব-এর উৎপত্তি। ইহা দ্বারা মুগুর বা একেবারে শাব্দিক অর্থে কাফির নিধন করার অস্ত্র বুঝায়। শব্দটি ইরাকে ২য়/৮ম শতকের শেষভাগ হইতে আরব লেখক ও ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় ; যথা আল-জাহিজ, আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারী প্রমুখ (নিম্নে গ্রন্থপঞ্জী দ্র.), কিন্তু তাহার পূর্বেই আত-তাবারী ৬৬/৬৮৫ সালে আল-মুখতার (দ্র.)-এর নেতৃত্বে তাঁহার শী'আ অনুসারী দল খাশাবিয়্যা (দ্র.)-এর বিদ্রোহের সময়ে উদ্ভূত ঘটনাবলী বর্ণনা করিবার কালে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অনুসারিগণ খুশুব বা এক ধরনের মুগুর দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া সেই নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল

(দ্র. De Goeje, Glossary to al-Tabari, CCXXI, CDLV)। যাহা হউক, এই পন্থা অনুসারিগণের এইরূপ নামে অভিহিত হইবার অন্যান্য ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে (দ্র. তাজু'ল-আরূস)। আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারীর মতে (আল-আখবারু'ত-তিওয়াল, পৃ. ৩৪৩) কাফিরকুবাত উপাধিটির উদ্ভব হইয়াছিল যখন আবূ মুসলিম (দ্র.)-এর অনুসারিগণ খুরাসানে বিদ্রোহ করিয়াছিল তখন ঃ ইনজাফালা'ননাস 'আলী আবী মুসলিম মিন হারাত... ফা-তাওয়াফাও জামি'আন মুসাওবিদীছ-ছিয়াব ওয়া কাদ সাওওয়াদূ আনসাফা'ল-খুশুব আল্লাতী মা'আহুম ওয়া-সাম্মাওহা কাফিরকূবাত (লোকেরা হেরাত হইতে আসিয়া আবূ মুসলিমের চতুর্দিকে জড়ো হইল... তাহারা সম্পূর্ণ কালো রঙের পোশাকে সজ্জিত ছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ছিল কাঠের খাট মুগুর যাহাকে তাহারা কালো রঙ দিয়া লইয়াছিল এবং যাহাকে তাহারা কাফিরকূবাত বলিত)।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এই শব্দটি আরবী অভিধান যথা লিসানু'ল-আরাব, কামূস, তাজু'ল-আরূস ইত্যাদিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ Desmaison's F'rencl-Persian dictionary-তেও ইহা নাই। ইরাকী এলাকার বাহিরে কোথায়ও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। মিসরীয় লেখকগণের যথা আল-মাকরীযী বা আল-কালকাশান্দীর লেখাতেও এই শব্দটির ব্যবহার নাই, তাহারা মুগুর বুঝাইতে দাববূস কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইবন খালদূন এই শব্দটি ব্যবহার করেন নাই, Dozy-ও ইহার উল্লেখ করেন নাই। ফলে এইরূপ ধারণা হয় যে, শব্দটি সম্ভবত কোন একটি বিশেষ সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং তুলনামূলকভাবে কোন সীমাবদ্ধ এলাকাতে প্রচলিত ছিল, সেই এলাকা খুবই দ্রুত অপরিচিত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, বায়ান, সম্পা. সানদূবী, ১খ, ১৪২ (সেখানে কোন অজ্ঞাত লেখকের কবিতাতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়); (২) ঐ লেখক, রাসা'ইল, সম্পা. হারূন, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ২০ (সেখানে তুর্কীদের ধারণ করা অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে); (৩) আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত-তিওয়াল, কায়রো সং. ১৩৩০ হি., পৃ. ৩৪৩, ২য় সং., কায়রো ১৯৬০ খৃ. (সেখানে আবূ মুসলিমের অনুসারিগণের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে); (৪) তাবারী, ২খ, ৬৯৪, লাইন ১৫ (৬৬/৬৮৫ সাল, খাশাবিয়্যাগণের প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, ৩খ, ১৬৮৬, লাইন ১৩, ১৫৮৭, লাইন ৪, ১৬৮৯, লাইন ১৭ (২৫১/৮৬৫ সাল, সেখানে বাগদাদের আল-আমীন সমর্থক 'আয়ারূন বাহিনী আল-মা'মূন-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে ইহা ব্যবহার করিয়াছিল); (৫) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৬খ, ১১৪, সম্পা. Pellat, iv, শা. ২৩২৮, সেখানে খলীফা আস-সাফফাহ-এর বেগম উম্ম সালামা সম্বন্ধে একটি কাহিনীতে কাফিরকূবাত-এর বিকল্প ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে; (৬) আগানী, সং. দারু'ল-কুতুব, ৪খ, ৩৪৬ (এখানেও একই খলীফার সম্বন্ধে অপর একটি কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়); (৭) De Goeje, Glossary to Tabari, CDLV; (৮) I Friedlaender, The heterodoxies of the Shiites, in JAOS (xxix), 1908, 93—5।

M. Chouemi (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

কাফিরিস্তান (كافرستان) ঃ অর্থাৎ অমুসলিম কাফিরদের দেশ, বর্তমান নাম নূরিস্তান, হিন্দুকুশ পর্বতের একাংশের পার্বত্য জনপদ, উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের অংশ, ১৮৯৬ খৃ. পর্যন্ত মূল ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন অঞ্চল ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখে আফগানরা অঞ্চলটি জয় করিলে এখানে ইসলামের আলো প্রবেশ করে। অতঃপর ইহার নাম হয় নূরিস্তান বা আলোকপ্রাপ্ত দেশ। বর্তমানে এখানকার সকল অধিবাসী মুসলিম।

আগেকার কোন কোন য়ুরোপীয় লেখকের উল্লেখ অনুযায়ী "বৃহত্তর কাফিরিস্তান" বলিতে সীমিত অর্থে (নিম্নে দ্র.) এই কাফিরিস্তান, লাগমান, চিত্রল, সোয়াত, বাজাওর, গিলগিট ইত্যাদি সকল অঞ্চল অর্থাৎ আফগানিস্তানের উ. পূ. সীমান্ত অঞ্চল এবং পাকিস্তানের সর্বউত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সকলই বুঝাইত। ইহার সঙ্গে মোটামুটিভাবে মিল পাওয়া যায় মধ্যযুগের ইসলামী এলাকা বোলোর (চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের উল্লিখিত পো-লো, মার্কো পোলো উল্লেখ করিয়াছেন বোলোর বলিয়া), উহা সম্ভবত কাশ্মীর ও তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত বালতিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল; হুদূদু'ল-'আলাম গ্রন্থে (৪র্থ/১০ম শতকে রচিত, অনু. Minorsky, 121, 369-70) বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বোলোর ছিল একটি বিরাট দেশ। উহার শাসক ছিলেন বুলূরীন শাহ। তিনি ছিলেন সূর্যের সন্তান। আধুনিক কালে কাফিরিস্তানকে মোটামুটিভাবে ৩৫°-৩৬° উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৭০°-৭১°৩০ পূর্ব অক্ষাংশের মধ্যে সীমিত বলিয়া ধরা হয়। ইহার পশ্চিমে গাঞ্জশীর নদী উপত্যকা; পূর্বে চিত্রল হইতে কুনার-বাশগালি উপত্যকাকে বিচ্ছিন্নকারী পর্বতমালা (দ্র. আধুনিক পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত অঞ্চল লক্ষ্য করা যাইতে পারে); উত্তরে পর্বতমালা, তাহা কাফিরিস্তানের দক্ষিণবাহী নদীসমূহের এবং মিনজান ও বাদাখশানের উত্তরবাহী আমু দরিয়া অভিমুখী নদীসমূহের বিভাজনকারী পর্বতমালা এবং দক্ষিণে কাবুল নদী উপত্যকা। কাফিরিস্তানের শেষ যে দক্ষিণের প্রান্ত, লাগমান ও কুনার অঞ্চল (আফগানরা বলে কাফিরিস্তান-ই সুফলা), তাহা জাতিতাত্ত্বিকভাবে আফগান, সেখানকার ভাষা পশতু, অঞ্চলটি জালালাবাদের পশ্চাৎভূমি। আরও উত্তরের যে অঞ্চল (কাফিরিস্তান-ই 'উলয়া) তাহাই মূল কাফিরিস্তান, তাহা পশ্চিম হইতে পূর্বে আলিশাঙ ও আলিনগার নদীর পেচ বা প্রাইসুন এবং ওয়াইগাল ও বাশগাল নদীর অববাহিকা রচনা করিয়াছে। এই সকল নদীর উপত্যকার খাড়া দিকের অববাহিকার উপর হিন্দুকুশ পর্বতমালা প্রায় ২০,০০০ ফুট উঁচু হইয়া প্রসারিত। দুর্গম এলাকা বলিয়া এখানে বহু প্রাচীন একদল ইন্দো-য়ুরোপীয় অধিবাসী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সম্ভবত তাহারা আরও প্রাচীন কিছু সংখ্যক অধস্তন স্তরের সমগোত্রীয় লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছিল এবং এখানে একটি বৈশিষ্ট্যময় ইন্দো-ইরানী ভাষার, নাম কাফিরী ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল। এই ভাষা ব্যাপকতর দার্দী ভাষারই অংশ (দ্র. নিবন্ধ আফগানিস্তান)।

২. জাতিতত্ত্ব এবং দার্দী ও কাফির ভাষাসমূহ

স্থানীয় অধিবাসীদের একরোখা প্রকৃতিবাদে টিকিয়া থাকা এবং চতুর্দিকে ইসলামী অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও তাহারা যে এই ধর্ম গ্রহণ করে নাই সেই কারণেই অঞ্চলটি কাফিরিস্তান নামে পরিচিত হয়— যদিও কাফিরিস্তানের একটি জিলা কাতওয়ার বা কাতোর এবং জাতিতাত্ত্বিক নাম কাতি হইতেও প্রভাবিত হইয়া নামটি আসিয়া থাকিবে বলিয়াও কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে দুই প্রধান বিভাগ অনেক প্রাচীন। কিন্তু উহার কোন বিজ্ঞানভিত্তিক বা নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি নাই। একটি

বিভাগ হইল "কালো পোশাকধারী" (ফারসী সিয়াহ্ পূশ, পশ্তু তোরকাফির) পাঁচটি উপগোত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত, তাহারা কাতি ভাষায় কথা বলে; অপর বিভাগ হইল "সাদা পোশাকধারী" (ফারসি সাফীদ পূশ, পশ্তু স্পীনকাফির), ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে প্রাসুন্সেলি, ওয়াঙ্গেলি, ওয়ামাই ও আশকুনগণ। নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে কাফিররা হইতেছে দীর্ঘাকৃতির মাথার লোক, মাথায় যথেষ্ট, সাধারণত কালো চুল হয়, কিন্তু তাহাদের চোখের নীলচা বর্ণ বেশ লক্ষণীয়। (তাহা হইতেই একটি লোকশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে যে, কাফিররা হইতেছে মহাবীর আলেকজাণ্ডার-এর সৈন্যদের বংশধর, প্রথম আফগান-বৃটিশ যুদ্ধের সময়ে ১৮৩৯ খৃ. জালালাবাদ Sir William Macnaghten-এর নিকটে একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছিল)। যাহা হউক, সাধারণভাবে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, এখানকার অধিবাসিগণ প্রাচীন ইরানীদের বংশধর।

কাফিরিস্তানের কিছু কিছু অংশ খৃ. পূ. যুগে সম্ভবত গ্রীক রাজ্য (satrapy) Paropamisa-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কম্বোজ নামক অধিবাসীরা সেখানে বাস করিত, সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে তাহাদের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ অভিযানে আগমনকালে কুনার উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন (দ্র. Sir Thomas Holdich, The gates of India, London 1910, 102-4)। অতঃপর খৃস্টীয় যুগের প্রথম দিকে ইহা কুশান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বৌদ্ধ প্রদেশ কাপিসাভুক্ত হয়। উহার ফলেই দক্ষিণ কাফিরিস্তান অর্থাৎ যে অঞ্চলটা লামাকান, পরবর্তীকালে লামগান নামে পরিচিত হয় উহা খুবই বৌদ্ধ প্রভাবিত হয়, সেখানে অদ্যাবধি বিদ্যমান স্তূপ (stupa)-সমূহ হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায় (দ্র. L. Edelberg, Fragments d'un stupa dans la vallee du Kunar en Afghanistan, in Arts Asiatiques, iv/3, 1957, 199-206)। এইরূপ হইতে পারে যে, এই সময়ে কাফির জাতীয়গণ বর্তমান কাল অপেক্ষা অনেক বেশী ভৌগোলিক এলাকা ব্যাপিয়া ছিল, কিন্তু চাপের মুখে উত্তরে গিয়া পার্বত্য দুর্গমতায় অবস্থান নিতে বাধ্য হয়।

মুসলিমগণ কাফিরিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে পৌঁছাইতে সক্ষম হয় তখনই, যখন নাকি সাফ্ফারী শাসন কাবুল ও পাঞ্জশীর নদী উপত্যকাগুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয় (৩য়/৯ম শতকের শেষ ভাগ) এবং অতঃপর পূর্ব আফগানিস্তানে গাযনাবী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন। গাযনাবী ঐতিহাসিক বায়হাকীর লেখাতেই সর্বপ্রথম কাতোর/কাতওয়ার কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে সুলতান মাস'ঊদ ইব্ন মাহ্মূদ কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৪২৪/১০৩৩ বা ৪২৫/১০৩৪) (তারীখ-ই মাস'ঊদী, সম্পা. গানী ও ফায়্যাদ, তেহরান ১৩২৪/১৯৪৫, ৪০৭, অনু. Arends, Istorya Mas'uda[2], Moscow 1969, 504)। মাস'ঊদ-এর পিতা সুলতান মাহমূদ গাযনা তৎপূর্বে ৪১৭/১০২০-১ সালে সিংহ-পূজারী কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। গারদীযী লিখিয়াছেন যে, সেই অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল নূর ও কীরাত উপত্যকাতে, সেই নাম দুইটিই সম্ভবত সর্বপ্রথম আধুনিক নিম্ন কুনার উপত্যকার অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কাফিরিস্তানের স্থান-নাম নূরগালের সঙ্গে সম্পর্কিত; দ্র. (১) কিতাব যায়নি'ল-আখবার, সম্পা নাজিম, বার্লিন ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৭৮-৯, tr. in Bosworth, in East and West, N. S. xvi (1966), 341-2; (২) তু. Nazim, The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna, Cambridge 1931, 74-5; এবং (৩) Beveridge's Appendix X to her tr. of the Baburnama, xxiii— xxiv।

মার্কো পোলো বর্ণনা করিয়াছেন যে, Pascial মূর্তি পূজারীদের দেশ বাদাখশান হইতে দক্ষিণে দশ দিনের পথ, তাহা দ্বারা তিনি হয়ত কাফিরদিগকে বুঝাইয়া থাকিবেন, আবার কাফিরিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী পাশা'ঈদেরকেও বুঝাইতে পারেন; ১০ম/১৬শ শতকের একটি তথ্য উৎস ৯৯০/১৫৮২ সালের একটি মুসলিম অভিযানের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, (নিম্নে দ্র.) সেই সময়কার কিছু কিছু কাফির প্রকৃতপক্ষে পাশা'ঈ ভাষায় কথা বলিত। একটি বিষয় পরিষ্কারই যে, মার্কো পোলো নিজে কখনও এই অঞ্চলটিতে সফর করেন নাই, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি মঙ্গোল সেনাপতি নেকুদার (Nekudar) আনু. ৬৫৮/১২৬০ সালে বাদাখশান হইতে কাফিরিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া চিত্রল ও কাশ্মীরে যে অভিযান করিয়াছিলেন উহার বিবরণীর উপরে নির্ভর করিয়া থাকিবেন [দ্র. (১) Yule, The book of Ser Marco Polo the Venetian, London 1871, i, 155; (২) Cordier, Notes and addenda to Sir Henry Yule's edition, London 1920, 23, 25]।

তৈমুর লঙ ৮০০/১৩৯৮ সালে যখন ভারতবর্ষ অভিযানে যান, তখন পথিমধ্যে আন্দারাবের অধিবাসিগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিযোগ করেন যে, ধর্মহীন "কাতোর ও সিয়াহ্ পূশগণ" প্রায়ই আসিয়া তাহাদের এলাকা আক্রমণ ও লুটপাট করে। তখন তৈমুর খাওয়াক গিরিপথ দিয়া গমন করিয়া পশ্চিম কাফিরিস্তান আক্রমণ করেন। বলা হয় যে, কিছু কিছু কাফির ইসলাম কবূল করিয়াছিল, কিন্তু উহা একমাত্র সাময়িক ধর্মান্তরই হওয়া সম্ভব। তৈমূর-এর বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পর্বতে আত্মগোপন করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চাদপসরণ করেন [দ্র. (১) মালফূজাত-ই তীমূরী, in Elliot and Dowson; (২) The History of India as told by its own Historians, London 1866-77, iii, 400-8]। তৈমূরীয় বংশের মাহমূদ মীর্যা ইব্ন আবী সা'ঈদ (মৃ. ৯০০/১৪৯৫) দুইবার কাফিরিস্তান আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সেই অভিযানের পরেই তিনি গাযী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং মুহাম্মাদ হায়দার দুগলাত যিনি পরবর্তীকালে কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন, তিনি ৯৩৪/১৫২৭-৮ সালে তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী 'বুলুরিস্তানে' অভিযান করিয়াছিলেন [দ্র. (১) বাবুর নামাহ, অনু. A. S. Beveridge, London 1912-21, i, 46; (২) মুহাম্মাদ হায়দার, তা'রীখ-ই রাশীদী (মধ্য এশিয়ার মুগলদের ইতিহাস), অনু. E. Denison Ross and N. Elias, London 1895, 384-6]। সম্রাট বাবুর তাঁহার আত্মজীবনীতে দক্ষিণ কাফিরিস্তানের মূল্যবান ভৌগোলিক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই অঞ্চলটি ফলমূলে অতি সমৃদ্ধ, কাফিররা মদ উৎপাদন করে ও তাহা বাজারেও রফতানী করে। তিনি সেখানকার মিশ্র বংশীয় নীমচা মুসলিমদের কথাও লিখিয়াছেন। সম্ভবত উহারা ছিল ধর্মান্তরিত কাফির। ইসলাম গ্রহণের পরেও তাহারা কাফিরদের

সঙ্গে মেলামেশা করিত এবং কুনার ও পেচ নদীর সঙ্গমস্থলে চাগানসারায়-এ বসবাস করিত (দ্র. বাবুর নামাহ, অনু. i, 210-14, 371-2)। বাবুর নিজেও কয়েকবার লামগান জিলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ কাফিরিস্তানের প্রান্তবর্তী এলাকাসমূহে অভিযান পরিচালনা করেন। ৯১৩/১৫০৭-৮ সালের শীতকালে তিনি নিম্ন আলিসাঙ নদী উপত্যকা এবং কাবুল নদী-উপত্যকার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী বাদ-ই পীশ বা বাদ-ই পাখ্ত গিরিপথ অতিক্রম করেন এবং সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য গিরিপথের উপরে একটি শিলালিপি খোদাই করিয়া দেন (আধুনিক যুগে কয়েকজন পর্যবেক্ষকই এই শিলালিপির অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করা হয় নাই)। ৯২৬/১৫২০ সালে এই বাদ-ই পীশ গিরিপথেই আবার কিছু সংখ্যক কাফিরী গোত্রপ্রধান তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করেন, তাহারা তাঁহার জন্য মদ উপহার নিয়া আসেন (দ্র. বাবুর নামাহ, অনু., i, 209, 343-4, 421-3)।

মুগল শাসনামলে তাবাকাত-ই আকবারীতে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ৯৯০/১৫৮২ সালে সম্রাট আকবর জালালাবাদে অবস্থানকালে কাতওয়ারের ধর্মহীন কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন (দ্র. Eliott and Dowson, পূ. গ্র., ৫খ, ৪২৫)। উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমানে ভালভাবেই দেওয়া যায় কাদী মুহাম্মাদ সালিম-এর ১৬ দাসতান বা মহাকাব্যিক বর্ণনা হইতে। এই লেখক একজন ধর্মপ্রচারকরূপে উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মুসলিম সৈন্যদিগকে উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন। কাদী মুহাম্মাদ-এর গ্রন্থখানি সম্পাদনা করিয়াছেন G. Scarcia, নাম সিফাত-নামা-য়ি দারবীশ মুহাম্মাদ হান-ই গাযী, cronaca di una crociata musulmana controi-Kafiri di Lagman nell' anno I 82 (Rome 1965)। এই অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন আকবরের ছোট ভাই এবং কাবুলের সুবাদার মুহাম্মাদ হাকিম (মৃ. ৯৯২/১৫৮৪ বা ৯৯৪/১৫৮৬)। তিনি নাক্শবান্দিয়া সূফী তারীকার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন। তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন কাফিরিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং সেই সঙ্গে আলিসাঙ নদী ও আলিন্গার নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল। মুসলিম বাহিনী সেখানে কাফিরদের মুকাবিলার জন্য কয়েকটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার পরে একেবারে খৃ. ১৯শ শতক পর্যন্ত বস্তুত নিরাপত্তার কাল। অতঃপর বৃটিশ পর্যটকগণ ও কর্মকর্তাগণ কাফিরিস্তান সম্বন্ধে আগ্রহী হইয়া উঠেন, উহা তখনও পর্যন্ত বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্তান আমীরাতের মাঝখানে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন অঞ্চলরূপে বর্তমান ছিল। সেইভাবেই Mountstuart Elphinstone, "কাল পোশাক পরিহিত কাফির এক অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক মানুষ"-দের বাসভূমির ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করেন; এবং বাশগাল উপত্যকার কামদেশ-এ নিযুক্ত জনৈক মুসলিম দূতের দেওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করিয়া কাফিরদের রীতিনীতি ও সামাজিক সংগঠনের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদান করেন (An account of the Kingdom of Caubul and its, dependencies, in Persia, Tartary and India[2], London 1842, i, 130-2, ii, 373-87)।

D. Massan তাঁহার Narrative of various journeys in Balochistan, Afghanistan and the Punjab গ্রন্থে (London 1842) কাফিরিস্তান সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন। Col. J. Biddulph প্রথম দিকে এই সকল পূর্ববর্তী লেখকগণের ন্যায় কাফিরিস্তান সম্বন্ধে জানিতেন না, যদিও তিনি চিত্রল, হুনযা, গিলগিট ইত্যাদি সন্নিহিত অঞ্চল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং ১৮৭৮ খৃ. চিত্রলে কাফিরদের একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত Tribes of the Hindoo Koosh গ্রন্থে (কলিকাতা ১৮৮০ খৃ.) তিনি "সিয়াহ পোশদের" সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখিয়াছেন। সেখানে তিনি দক্ষিণ চিত্রলের কালাশদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন— এই কালাশরা অদ্যাবধি আংশিকভাবে প্রকৃতি-পূজারী— এবং বেশ যথেষ্ট ঐতিহাসিক কালপঞ্জী বিষয়ক তথ্য প্রদান করিয়াছেন এবং বাশগালি (অর্থাৎ কাতি) ভাষারও উদাহরণ দিয়াছেন (পূ. গ্র., 126—33, cxlvclii)। প্রথম যে য়ূরোপীয় ব্যক্তিগতভাবে কাফিরিস্তানের গভীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন Col. Lockhart, ১৮৮৫-৬ খৃ., তিনি একটি প্রতিনিধি দলের নেতারূপে হিন্দুকুশের গিরিপথসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য গমন করিয়া কয়েকদিন উচ্চ বাশগাল উপত্যকার কাতিদের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উহার অল্পকাল পরে Capt. (পরে স্যার) George Robertson, যিনি পরবর্তীকালে গিলগিটে বৃটিশ প্রতিনিধি হইয়াছিলেন, তিনি প্রায় এক বৎসরকাল (১৮৯০-১ খৃ.) চিত্রলের সন্নিহিত উচ্চ বাশগাল উপত্যকাতে কামদেশ-এ কাতিদের মধ্যে কাটান; কাফিররা তখন পর্যন্ত তাহাদের প্রাক-ইসলামী অস্তিত্ব লইয়া বসবাস করিতেছিল। উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার যে বর্ণনা, The Kafirs of the Hindu-Kush (London 1896) তাহা অদ্যাবধি জাতিতত্ত্ব বিষয়ক একখানি চিরায়ত গ্রন্থ।

কাফিরদের যে প্রকৃতবাদী ধর্ম ছিল তাহা ছিল নানা দেবদেবতাতে বিশ্বাস ও জড়বাদের মিশ্রণ। কাদী মুহাম্মাদ সালিম তাঁহার সিফাত-নামা গ্রন্থে কাফিরদের তিনটি দেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ঃ পানদাদ, সরওয়াই ও লামানদী। তাহারা ইসলামের তাওহীদ-এর বিরুদ্ধে এই তিন শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। Scarcia মনে করেন যে, উহারা সম্ভবত শৈব ছিল, কাবুল নদী-উপত্যকা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় প্রভাবাধীনে থাকিবার কারণেই হিন্দু ধর্ম সেখানে বিস্তৃত হইয়াছিল (পূ. গ্র., CLL প.)। Robertson বলেন যে, কাফিরদের পূজিত দেবতাগণের মধ্যে প্রধান ছিল সৃষ্টির দেবতা ইমরা। সেই আদি দেবতা হইতেই অন্যান্য দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, যেমন যুদ্ধের দেবতা গীশ, দেবী দীযান এবং আরও অন্য অনেক অপ্রধান দেবতা; তাহা ছাড়াও নানা অপদেবতা এবং ভূত-প্রেতের পূজা সব সময়েই করা হইত। রাজনৈতিক-সামাজিক পদ্ধতি স্থানীয়ভিত্তিক ছিল, উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রীয় প্রধানের শাসন প্রচলিত ছিল। উপজাতীয় ও গোত্রীয় বিষয়াদির মীমাংসা করিতেন বয়োবৃদ্ধ গোত্রপ্রধানগণ (জাসত) এবং ১৩ জন বিচারক (উর, উরির), সরকার বা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর নির্বাচিত হইতেন। পদমর্যাদা নির্ধারিত হইত সম্পদের মালিকানা দ্বারা, কে কি পরিমাণ ভোজ ও খানাপিনার ব্যবস্থা করিলেন তাহা দ্বারা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন দ্বারা— বিশেষ করিয়া কে কতজন মুসলিম মারিতে পারিল তাহা দ্বারা। পূর্ণ ৫০ একটি গোত্র যেমন ছিল, তেমনই আবার দরিদ্র একটি শ্রেণীও ছিল। প্রধানত পশু চারণকারিগণ কারুশিল্পীগণের একটি শ্রেণী ছিল। উহাদিগকে বলা হইত বারি এবং

একটি ক্রীতদাস শ্রেণীও ছিল। যুদ্ধের বন্দীদিগকে ক্রীতদাস করা হইত। উহাদিগকে অপবিত্র শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করা হইত। কাফিরী মেয়েদের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা কম ছিল, পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সচরাচর রীতি বলিয়া গণ্য হইত; নিজেদের গোত্রের বাহিরে বিবাহ করা বা দেওয়া বৈধ ছিল। কাফিরদের বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাহারা কাঠ খোদাই করিয়া বিভিন্ন দেব-দেবতার রূপ দিত এবং বিশেষ ধরনের টুল চেয়ার বানাইত। এইসবের প্রদর্শনী রক্ষিত আছে কাবুল যাদুঘরে এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন যাদুঘরে, যেমন স্টুটগার্ডের লিণ্ডেন যাদুঘরে; তাহাদের কারুশিল্প বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) R. Henkl, The wooden sculptures of Kafiristan, in JRAS Bengal, Letters, xvi/1, (1950), 65-72; (২) J. Auboyer, The art of Afghanistan, London 1968, Pls. 134-40।

১৮৯৩ খৃ. আফগানিস্তানের আমীর 'আবদু'র-রাহমান খান (দ্র.) এবং বৃটিশ পক্ষে স্যার মার্টিমার ডুরান্ড-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উহার ফলে কাফিরিস্তানকে বৃটিশ ভারতের বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অতঃপর আমীর ১৮৯৫-৬ খৃ. এক অভিযান দ্বারা কাফিরিস্তানকে আফগান রাজ্যভুক্ত করেন এবং অতঃপর কাফিররা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে (দ্র. মীর মুনশী সুলতান মুহাম্মাদ খান, The life of Abdur Rahman, London 1900, i, 199-202)।

ইসলামের আলোকপ্রাপ্তির পরে অঞ্চলটির নাম নূরিস্তান। বর্তমানে প্রশাসনিকভাবে ইহা লাগমান ও কুনার প্রদেশ দুইটির অন্তর্ভুক্ত (বিলায়াত), নিম্ন আলিনগার উপত্যকাতে অবস্থিত মিরতালাম সেখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান; নূরিস্তানের জনসংখ্যা ৪০,০০০ হইতে ৬০,০০০ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এখানকার উপত্যকাগুলিতে গম, যব, জোয়ার ও নানা ফলমূল জন্মে এবং পশুপালন করা হয়। নূরিস্তানের আসমার অরণ্য হইতে সমগ্র আফগানিস্তানের মোট ৮০% কাঠ আহরণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মধ্যে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। (১) কাদী মুহাম্মাদ সালিম-এর সিফাত-নামাহ গ্রন্থের Scarcia সংস্করণের CVICLVI অংশে কাফিরিস্তানের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। ভৌগোলিক বিবরণের জন্য দ্র. (২) W. Barthold, Istoriko-geograficeskii obzor Irana, St. Peterburg 1903, 56-7, (৩) M. Voigt. Katiristan, Breslau 1933 ; (৪) J. Humlum et alii, La geographie de l'Afghanistan, etude dun pays aride, Compenhagen 1959, 91-2, 107-10 ; Robertson ও প্রাথমিক যুগের লেখকগণের প্রদত্ত তথ্যাবলীর সংশ্লেষণ এবং কাফিরিস্তানে সাম্প্রতিককালে পরিচালিত জাতিতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক জরীপকার্যের ফলাফল জানিবার জন্য দ্র. (৫) P. Snoy, Die Kafiren, Formen der Wirtschaft und geistigen Kutlur, diss, Frankfurt a/M 1962 (এলাকাটির বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রণীত বিস্তারিত গ্রন্থ-বিবরণীসহ)। (৬) A. R. Palwal, History of former Kafiristan (10 parts in Afghanistan, xxi-xxiv. (Kabul 1968-71); (৭) Snoy, Nuristan and Mungan, in Tribus, Veroffentlichungen des Linden-Museums, no. 14 (Stuttgart 1965), 101-48, repr in Sonderdrucke der Mitglieder der Sudasien Institut der Universital Heidelberg, no. 8-এর বিষয়বস্তু হইতেছে এই দুই অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং অধিবাসিগণের নির্মিত শিল্প-সম্পদ এবং উহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। যে সকল গ্রন্থে আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং সাধারণ বিষয়াদি আলোচিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কাফিরিস্তানের উপরে লিখিত অধ্যায় রহিয়াছে বা সেই অঞ্চলটির বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে তন্মধ্যে দ্র. (৮) V. M. Masson and V. A. Romodin, Istoriya Afganistana, Moscow 1964-5, নির্ঘণ্ট ; (৯) D. N. Wilbur et alii, Afghanistan, its people, its society, its culture, New Haven 1962, 50-52 ; (১০) M. Klimburg, Afganistan das Land in historischen Spannungsfeld Mittelasiens, Vienna 1966, 133-4; (১১) W. K. Fraser, Tytler, Afganistan, a study of political developments in Central and Southern Asia[3], London 1967, 5, 57-60 ; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ, নিবন্ধ নূরিস্তান।

C. E. Bosworth (E. I. 2)/হুমায়ুন খান

আল-কাফিরূন (الكافـــرون) ঃ আল-কুরআনের সূরা। তিলাওয়াতের ক্রম অনুযায়ী ইহা কুরআন কারীম-এর ১০৯তম সূরা। ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হাসান, 'ইকরিমা ও ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে ইহা মাক্কী সূরা। জামহূর মুফাসসিরগণের অভিমতও ইহাই। ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর অপর এক বর্ণনা, কাতাদা ও দাহহাক-এর মতে ইহা মাদানী সূরা (কুরতুবী, ২০খ, ২২৪) এই সূরায় একটি রুকূ' ও ছয়টি আয়াত রহিয়াছে।

কাফীরূন শব্দটি কাফির (দ্র.)-এর ব. ব.। এই সূরায় কাফিরদেরকে সম্বোধন করিয়া বক্তব্য রাখা হইয়াছে বিধায় ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাকে সূরাতু'ল-মানাবাযা, সূরাতু'ল-ইখলাস এবং সূরাতু'ল-মুকাশকাশাও বলা হয় (আর-রাযী, তাফসীর কাবীর, ৩২খ, ১৩৬)।

শান-ই নুযূল ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, ওয়ালীদ ইবনু'ল-মুগীরা, আস ইব্ন ওয়া'ইল, আসওয়াদ ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্তালিব ও উমায়্যা ইব্ন খালাফ প্রমুখ কাফির নেতৃবৃন্দ একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ ! আসুন, আপনি যাঁহার ইবাদত করেন, এক বৎসর আমরা তাঁহার ইবাদত করি। আর এক বৎসর আমরা যাহাদের ইবাদত করি আপনিও তাহাদের ইবাদত করুন। এইভাবে আমরা পরস্পর পরস্পরের কাজে শরীক হইয়া যাই। ফলে আপনার আনীত বিষয় যদি আমাদের নিকট যাহা আছে তদপেক্ষা উত্তম হয়, তবে আমরা তাহাতে শরীক হইলাম, আর আমাদেরটি যদি আপনারটি অপেক্ষা উত্তম হয় তবে আপনিও তাহাতে শরীক থাকিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরা নাযিল করিলেন (কুরতুবী, ২০খ, ২২৪ প.; আসবাবুন'ন-নুযূল, ৩৪৩-৩৪৪)। খাঁটি তাওহীদ-এর স্বীকৃতি (اقرار) এবং শিরক হইতে পবিত্র হওয়ার ঘোষণাই হইল এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ফযীলাত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একদা এক সফরে বাহির হইয়া এক ব্যক্তিকে এই সূরা তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি শির্ক হইতে মুক্ত হইয়া গেল (ফাতহু'ল-কাদীর, ৫খ, ৫০৫ প.)।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, قل يا يها الكافرون সূরাটি কুরআন-এর এক চতুর্থাংশের সমতুল্য (তিরমিযী, ২খ, ১১৩)।

নাতফাল ইব্ন মু'আবিয়া আশজা'ঈ (রা) একবার শয়নের সময় কি দু'আ পাঠ করিবে — জিজ্ঞাসা করায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে এই সূরা পাঠের নির্দেশ দিলেন (হাক্কানী, ৫খ, ২৫৭; ফাতহু'ল-কাদীর, ৫খ, ৫০৫ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামি'ল-কুরআন, বৈরূত; তা. বি., ২০খ, ২২৪-২৯; (২) আশ-শাওকানী, ফাতহু'ল-কাদীর, বৈরূত তা.বি., ৫খ, ৫০৫ প.; (৩) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, বৈরূত তা.বি., ৩০খ, ২৪৯ প.; (৪) আবদু'ল-হাক্ক দিহ্লাবী, তাফসীর হাক্কানী, দেওবান্দ তা. বি., ৫খ, পারাহ 'আম্মা, ২৫৫ প.; (৫) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, বৈরূত তা. বি., ৪খ, ২৯২-৯৩; (৬) আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-ওয়াহিদী আন-নায়সাবূরী, আসবাবু'ন-নুযূল, বৈরূত তা. বি., ৩৪৩-৩৪৪; (৭) আর-রাযী, তাফসীর কাবীর, তেহরান তা. বি., ৩২খ, ১৩ প.।

ড. আবদুল জলীল

কাফিলা (দ্র. তিজারা)

কাফীয (দ্র. কায়ল)

কাফীল (দ্র. কাফালা)

কাফূর (كافور) ঃ বা কাফূর (قافور) বা কাফুর, অভিধান দ্র.; সংস্কৃত কর্পূর ও প্রাকৃত কাপ্পুর শব্দ হইতে গৃহীত, মালয় ভাষায় কাপুর। কর্পূর সাদা রঙের, প্রায় স্বচ্ছ পদার্থ, কর্পূর গাছ হইতে কর্পূর তৈলের সঙ্গে একত্রে ইহা পাতনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Cinnamomum camphora, ইহা পূর্ব এশিয়াজাত (চীন, তাইওয়ান, জাপান); ইন্দোনেশিয়া (সুমাত্রা, বোর্ণিও) হইতে আনীত Dryobalanops aromatica বৃক্ষ হইতে আহরিত বোর্ণিও কর্পূর হইতে ইহা ভিন্ন। এই উভয় প্রকার কর্পূরই সুগন্ধি এবং ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু শেষোক্তটি সম্বন্ধে সুমাত্রার ফানসূরের (উচ্চারণ ভেদে কানসূর, ফাইসূর বা অন্যরূপ) অধিবাসী মুসলিম লেখকগণ বলিয়াছেন যে, বর্তমান সময় অপেক্ষা মধ্যযুগে এই ইন্দোনেশীয় কর্পূরের উৎপাদন অবশ্যই অনেক বেশী ছিল এবং পূর্ব এশীয় কর্পূর অপেক্ষা উহার মূল্য অনেক বেশী ছিল ও উহা অভিষ্ট ফলদানে সক্ষম ছিল। পর্যটক মার্কো পোলো লিখিয়াছেন যে, এই কর্পূরের মূল্য ইহার সমপরিমাণ স্বর্ণের সমান ছিল।

প্রাচীন য়ূনানী (Greek) রোমকগণের নিকট কর্পূর পরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু নিকট প্রাচ্যে, সর্বশেষ সাসানী আমল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গরম মসলা এবং সুগন্ধিরূপে কর্পূর ব্যবহৃত হইত। আরবগণ ১৬/৬৩৭ সালে যখন টেসিফোন জয় করে তখন সেখানে তাহারা কর্পূরের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার লাভ করে, যাহাকে তাহারা লবণের স্তূপ বলিয়া মনে করিয়াছিল [দ্র. (১) বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ২৬৪; (২) ইবনু'ল-আছীর, কামিল, ২খ, পৃ. ৪০১]। প্রাচীন আরবেব কর্পূর পরিচিত ছিল, আল-কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, যে সকল পুণ্যবান মুসলমান জান্নাতে স্থান লাভ করিবে তাহাদেরকে কর্পূর সুবাসিত শরবৎ পান করিতে দেওয়া হইবে, সূরা ৭৬, আয়াত ৫। প্রাচীন আরব কবিগণ শুধু নামে হইলেও কর্পূরের কথা জানিতেন। কালো সাদার বৈপরীত্যের প্রতীকরূপে কাব্যে তাঁহারা প্রায়শই কস্তূরী [মিস্ক, মিশ্ক (দ্র.)] ও কর্পূরের উদাহরণ দিয়াছেন; যথা 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ, সম্পা. Schwarz, পৃ. ১০, ১৬; ১৬, ১৪; ৩২, ১খ, ১১৫, ১২; ১৭১, ৬; ১৮৩, ৩; ইমরু'ল-কায়স হামদানী জাযীরাত, সম্পা. Muller, পৃ. ১৯৮; অজ্ঞাতনামা রচয়িতা য়াকূত-এর মু'জাম, সম্পা. Geyer, পৃ. ৮০, ৬; আখতাল, সম্পা. সালহানী, পৃ. ৩৫; ইবনু'র-রূমী, ইব্ন আবী 'আওন-এ, তাশবীহাত, সম্পা. 'আবদু'ল-মু'ঈদ খান, পৃ. ৩২৩, ইত্যাদি। কর্পূরের শ্বেত রঙের বিষয়ে আরও দ্র. Dozy, ২খ, 447a এবং A. Dietrich, Zum Drogenhandel im islamischen Agypten, হাইডেলবার্গ ১৯৫৪ খৃ., ৩০।

কাফূর বা কর্পূর তৈয়ারীর পদ্ধতিগত জ্ঞান, ইহার উৎস, নির্যাস নিষ্কাশন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, ব্যবহার ইত্যাদি মোটামুটি বেশ বোধগম্য ও পরিচ্ছন্নভাবে ভৌগোলিকগণ ও ভূ-বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করিয়াছেন। কর্পূর গাছ নদীর তীরে জন্মাইত। একেকটা গাছ এত বড় হইত যে, তাহার তলায় এক শত লোক বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারিত। সাধারণভাবে গাছটিকে এইভাবে ব্যবহার করা হইত ঃ গাছের বাকল এমনভাবে কাটা হইত যাহাতে আঠালো কষ নির্গত হয়। সেই কষ সংগ্রহ করিয়া বড় পাত্রে ঠাণ্ডায় রাখা হইত। সাধারণত কর্পূর গাছ যে অঞ্চলে হইত সেখানে বাঘের উপদ্রব বেশী হইত (বাঘ বুঝাইতে নুমূর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে নুসুর, যাহার অর্থ ঈগল পাখী)। বৎসরের যে সময়টাতে বাঘের উপদ্রব কম থাকিত শুধু সে সময়েই গাছের কষ সংগ্রহ করা হইত। কর্পূর কাঠের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে, উহা সাদা বর্ণের, নরম এবং খুবই হাল্কা। যে গাছ হইতে একবার কষ আহরণ করা হইত উহা মরিয়া যাইত। উৎস-গ্রন্থসমূহে বর্ণনার বিভিন্নতা থাকিলেও কোন পরস্পর বিরোধিতা নাই; শুধু বিভিন্ন আহরণ পদ্ধতির বর্ণনার পাশাপাশি রহিয়াছে। এজন্য দ্র. (১) ইব্ন খুররাদাযবিহ (BGA, ৬), পৃ. ৬৫; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ১খ, ৩৩৮, ৩৪০, ৩খ, ৪৯, ৫৬, সম্পা. ও অনু. Pellat, ৩৭১, ৩৭৫, ৮৯২, ৮৯৯; (৩) কাযবীনী, Kosmographie, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ২৬২ প., অনু. Wiedemann, Aufsatze zur arabischen Wissueschaftsgeschichte, ২খ, বর্তমানে new impression Hildesheim ১৯৭০, খৃ. ৩৭৯; (৪) দিমাশ্কী, আল-ইশারা ইলা মাহাসিনি'ত-তিজারা, অনু. Wiedemann, পৃ. স্থা., Nuwayri, নিহায়া; অনু. Wiedmann, ৯, স্থা., পৃ. ২৩১; (৫) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, ৪৫৬; (৬) ইব্ন বাতূতা (প্যারিস), ৪খ, ১৪১।

কর্পূরের প্রধান গুরুত্ব ছিল ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণ হিসাবে। আল-কিন্দী ইতোমধ্যেই (The Medical Formulary বা আকরাবাযিন, অনু. M. Levey, ১৯৬৬ খৃ.) কর্পূর মিশ্রিত অনেকগুলি ঔষধের প্রস্তুতবিধি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি যকৃতের স্ফীতি, শ্বাসনালীর রোগ, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও অন্যান্য রোগের নিরাময় (নং ১১, ২৪, ৬১, ৭৭, ৮৯, ৯১, ১০৪, ১৫২)। একই গ্রন্থকার বা তাঁহার কোন

শাগরিদ একখানি দলীল রচনা করিয়া তাহাতে তাসঈদাত বা heightenings-এর (সুপ্রাচীন পাতন পদ্ধতির মাধ্যমে সুগন্ধি তৈল ও মলম তৈয়ারীর পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কাফূর বা কর্পূর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল ঃ কিতাব কীমিয়াতি'ল-'ইতর ওয়া'ত-তাস'ঈদাত, সম্পা. K. Garbers, লাইপযিগ ১৯৪৮ খৃ., ২৪২-৪৬)।

সুগন্ধি তৈরীর উপাদান হিসাবে, জ্বর, মাথা ব্যথা প্রভৃতি অসুস্থতার সেক দিবার জন্য কর্পূর বিশেষ উপকারী দ্র. (১) ইবনু'ল-কুফ্ফ, জিরাহা, H. G. Kircher, Die "Einfachen Heilmittel" aus dem "Handbuch der Chirurgie" des Ibn a-Quff, Diss. phil., বন ১৯৬৯ খৃ., নং ২১৪, (২) ইব্ন রাব্বান আত-তাবারী, ফিরদাওসু'ল-হিকমা, দ্র. W. Schmucker, Die pflanzliche und mineralische Materia medica im Firdaus al-hikma des 'Ali ibn Sahl Rabban at-Tabari, Diss. phil., বন ১৯৬৯ খৃ., নং ৬১০; (৩) ইব্ন হুবাল, মুখতারাত, হায়দরাবাদ ১৩৬২ হি, ২খ, পৃ. ১০৯; (৪) আল-মু'ইয্য ইব্ন বাদীস, 'উমদাতু'ল-কুত্তাব, দ্র. M. Levey, Mediaeval Arabic bookmaking and its relation to early chemistry and pharmacology (Transactions of the American Philosophical Society, N. S., খণ্ড ৫২/৪ (১৯৬২ খৃ.), পৃ. ১৭, ৪৭ প.; (৫) তুহ্ফাতু'ল-আহ্বাব, সম্পা. Renaud and Colin, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., নং ২১২। সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বর্ণনা এবং তথ্যের উৎস দিয়াছেন ইবনু'ল-বায়তার, আল-জামি' গ্রন্থে, কায়রো ১২৯১ হি., ৪খ, ৪২-৪৪, অনু. Leclerc, ৩খ, ১২৭-৩১। প্রাচীন সিরীয় সাহিত্যে কর্পূর সম্পর্কে দ্র. Brockelmann, Lex. Syr.[2] 341b 686a। এই একই শব্দ কাফূর দ্বারা (রূপভেদ কুফুর্‌রা, কিফির্‌রা, জুফুর্‌রা, et. al, Lane 2622b. লিসান (বৈরূত), ৫খ, ১৪৯ প.) তালপাতা বা আঙুরলতার বুনুনিকেও বুঝায়।

শব্দটি প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক আরামায়ী ভাষার গোপ্পার্‌রা-র মাধ্যমে সম্ভবত আক্কাডীয় মূল ভাষা হইতে আসিয়াছে। দ্র. (১) আস্‌মা'ঈ, আন-নাখ্‌ল ওয়া'ল-কার্‌ম, সম্পা. Haffner, বৈরূত ১৯০৮ খৃ., ৬; (২) ইব্ন সীদা, মুখাসসাস, ১১খ, ১১৯ প.; (৩) Maimonides, শারহ আসমাই'ল-'উক্কার, সম্পা. Meyerhof, নং ২০৬; (৪) Fraenkel, Aram. Fremdw, পৃ. ১৪৭; (৫) Brockelmann, Lex. Syr[2], প. 129a।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত) ঃ (১) A. Spitaler/M. Ullmann, Worterbuch d. Klass. arab Sprache, ১, ১০; (২) W. Heyd, Histoire du commerce du Levant, ২খ, ৫৯০-৫; (৩) Mez, Renaissance des Islams, পৃ. ৪১১, ৪৮০, ইংরাজী অনু., পৃ. ৪৩৬, ৫১৪; (৪) F. A. Fluckiger, Pharmakognosie des Pflanzenreiches[3], বার্লিন ১৮৯১ খৃ., ১৫০; (৫) Tschirch, Handbuch der Pharmakognosie, ২খ, ১১৩৩-৮; (৬) 'কাফূর' শীর্ষক প্রবন্ধ, দা. মা. ই., ১৭খ, ৩৯।

A. Dietrich (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

কাফূর (كافور) ঃ মালিক 'ইয্যু'দ-দাওলা তাজু'দ-দীন নামে পরিচিত। দিল্লীর সুলতান 'আলাউ'দ-দীন মুহাম্মাদ শাহ খিলজীর খোজা সেনাপতি ও মন্ত্রী। বলা হইয়া থাকে, কাফূর মারহাট্টা (বা মারাটিহা) বংশ সম্ভূত (দ্র. 'ইসামী, পৃ. ৩১৯)। যৌবনে কাফূর একজন ধনী খাওয়াজার (খোজা'-নিযারী ইসমাঈলী) ক্রীতদাস ছিলেন। মনিবের আবাস ছিল কানভআয়াত (ক্যাম্বে)। ৬৯৮/১২৯৯ সনে গুজরাটে মুসলিম বিজয় অভিযানের সময় সেনাপতি নুসরাত খান কাফূরকে দিল্লীতে সুলতান 'আলাউদ-দীনকে উপহার দেন। ইব্ন বাত্তূতা (৩খ, ১৮৭) সম্ভবত ভুলক্রমে ঐ খোজা ক্রীতদাসের প্রতি আরোপিত 'আলফী' নামে (হাযার দীনারী-"হাজার গিনিতে ক্রয় করা ব্যক্তি, S. Lane Poole, p. 113) হইতে এই ধারণা করেন যে, খোদ সুলতান কাফূরের জন্য ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়াছিলেন। কাফূর নিঃসন্দেহে দারুণ দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। বারানী অবশ্য খুব স্থূলভাবে এই দিকটি নির্দেশ প্রসঙ্গে পরোক্ষ সমকামিতার ও তাঁহার প্রতি সুলতানের অস্বাভাবিক আকর্ষণের ইঙ্গিত করিয়াছেন। কাফূরের কয়েক বৎসরের অগ্রগতির বিবরণের কোনও প্রামাণিক তথ্য বিবরণী নাই। তবে উহার পরেই দেখা যায়, তিনি একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ও সফল সমর অধিনায়ক হইয়া উঠিয়াছেন। আনুমানিক ৭০৫/১৩০৫-৬ সনে তাঁহার সৈনাপত্যে এক বাহিনী পাঞ্জাবে মঙ্গোল হানাদার Kebek/Kopek/KNK (পরবর্তীকালের চাগাতাঈ শাসকদের সহিত সম্পর্কিত করা একটু কঠিন; কেননা ভারতীয় সূত্রগুলিতে সর্বসম্মতভাবে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে দিল্লীতে হত্যা করা হইয়াছিল)-কে পরাজিত করে। অতঃপর কাফূরকে না'ইব-ই বারবাক "উৎসবসমূহের সহকারী অধ্যক্ষ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতেই তাঁহার নাম মালিক না'ইব নামেও অভিহিত হইতে থাকে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক ঐ নামের কারণে তাঁহাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কল্পনা করিয়া না'ইব সুলতান বলিয়া উল্লেখ করেন (দ্র. ত্রিপাঠি, পৃ. ১৮০)। তাঁহাকে ইহার পর দাক্ষিণাত্যে এক এক করিয়া কয়েক দফা বিরাট বিরাট সামরিক অভিযানের অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়। এই সকল অভিযানের ফলে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে। ঐ সকল অভিযানের প্রথমটিতে তিনি ১৯ রামাদান, ৭০৬/২৪ মার্চ, ১৩০৭ সনে দেবগীর (দেবগিরি)-এ উপস্থিত হন। দেবগীরের রাজা রামদেবকে (রামচন্দ্র) দিল্লীতে প্রচুর লুণ্ঠিত ধন-রত্নসহ লইয়া যাওয়া হয়। ২৫ জুমাদা-১, ৭০৯/২ অক্টোবর, ১৩০৯ সনে কাফূরকে আবার দাক্ষিণাত্য অভিযানে পাঠান হয়। তিনি এইবার ওয়ারাঙ্গালের কাকতীয় শাসক প্রতাপ রুদ্রদেবকে অবরোধ করেন। প্রতাপ রুদ্রদেব প্রচুর সম্পদ ও নযরানা দিতে সম্মত হওয়ার পর ঐ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। কাফূর ১১ মুহাররাম, ৭১০/৯ জুন, ১৩১০ সনে দিল্লীতে ফিরিয়া যান। ২৪ জুমাদা-১, ৭১০/১৯ অক্টোবর, ১৩১০ সনে তাঁহাকে তাঁহার তৃতীয় বিরাট আকারের সামরিক অভিযানে পাঠান হয়। তাঁহার এই অভিযান ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল অবধি পৌঁছায়। ৫ শাওওয়াল, ৭১১/২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৩১১ সনে তিনি ঢোরাসমুদ্র নামক স্থানে পৌঁছান। এখানে হোয়সালারাজ ৩য় বীর বল্লাল তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং ভারতের সর্ব দক্ষিণের পাণ্ড রাজ্য অভিযানে কাফূরের বাহিনীর সহিত স্বীয় সেনাবাহিনীসহ যোগ দেন। এই পাণ্ড রাজ্য হইতে কাফূর বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও বহু সংখ্যক হস্তী দখল করেন। তবে বৈরী পাণ্ডরাজ

বীর পাণ্ড কৌশলে গ্রেফতার এড়াইতে থাকেন। ৪ যুল-হিজ্জা/২৪ এপ্রিল তারিখে কাফূর মাদুরায় শিবির স্থাপন করেন এবং বিজয়ীর বেশে ৪ জুমাদা—২, ৭১১/১৮ অক্টোবর, ১৩১১ সনে দিল্লীতে পৌছান। তবে তখন হইতে সুলতানের দরবারে কাফূরের বিরুদ্ধে দৃশ্যত শত্রুতা শুরু হয়। ইহার নেতৃত্ব দেন 'আলা'উ'দ-দীনের ২য় পত্নী মাহরু মালিকা-য়ি জাহান, তদীয় ভ্রাতা আলূপ খান ও তাঁহার গর্ভে জন্ম 'আলা'উ'দ-দীনের জেষ্ঠ্য পুত্র খিদ্র খান। সম্ভবত কাফূরের নিজের অনুরোধে 'আলা'উ'দ-দীন কাফূরকে আনু. ৭১৩/১৩১৩-১৪ সনের দিকে পুনরায় দক্ষিণে অভিযানে পাঠান। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল মুসলিম শাসন সুদৃঢ় করা ও উত্তর দাক্ষিণাত্যে মুসলিম বসতি স্থাপনের জন্য দেবগীরের শাসন ক্ষমতা হইতে রামদেবের পুত্র সিংহানাকে অপসারিত করা। তিনি এই দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করিলেও দিল্লী হইতে জরুরী তলব আসে। দিল্লীতে ঐ সময় 'আলা'উ'দ-দীনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। কাফূর দ্রুত দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া সম্ভবত 'আলা'উ'দ-দীনের নীরব সমর্থনক্রমেই আলূপ খানকে হত্যা করেন এবং খিদ্র খানকে দিল্লী হইতে দূরে নির্বাসনে পাঠান। 'আলা'উ'দ-দীন ৬ বা ৭ শাওওয়াল, ৭১৫/৩ বা ৪ জানুয়ারী, ১৩১৬ সনে ইনতিকাল করেন। সমসাময়িক এক গুজব অনুযায়ী স্বয়ং কাফূর নাকি তাঁহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। কাফূর 'আলা'উ'দ-দীনের ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র শিহাবু'দ-দীন 'উমার-কে নূতন সুলতান হিসাবে স্বীকৃতির ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। এই শিহাবু'দ-দীন দেবগীরের রামদেবের কন্যার গর্ভজাত সন্তান। কোনও কোনও সূত্র অনুসারে কাফূর রামদেবের ঐ কন্যা চিতা'ঈকেও বিবাহ করেন। ক্ষমতার লড়াইয়ে কাফূর খিদ্র খানকে অন্ধ ও 'আলা'উ'দ-দীনের অপর দুই পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন। তবে 'আলা'উ'দ-দীনের অপর এক পুত্র ও ভবিষ্যৎ সুলতান কুতবু'দ-দীন মুবারাক তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হন। 'আলা'উ'দ-দীনের মৃত্যুর ৩৫ দিন পর প্রাসাদরক্ষী চারজন পাইক কাফূরকে হত্যা করে। ইহার পরবর্তী প্রক্রিয়া সুলতান শিহাবু'দ-দীন 'উমারকে পর্যায়ক্রমে সরাইয়া দিয়া কুতবু'দ-দীন মুবারাক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পরে কাফূরের হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমীর খুসরাও, খাযাই'নু'ল-ফুতূহ, Bibl., Indica, ১৯৫৩ খৃ.; (২) যি-য়াউ'দ-দীন বারানী, তা'রীখ-ই ফীরূযশাহী, Bibl. Indica, ১৮৬২ খৃ.; (৩) 'ইসামী, ফুতূহু'স-সালাতীন, সম্পা. এ. এ. ঊষা, মদ্রাজ ১৯৪৮ খৃ.; (৪) ওয়াসসাফ, তাজযিয়াতু'ল-আমসার, বোম্বাই ১২৬৯/১৮৫৩; (৫) ইবন বাত্তূতা, রিহ্‌লা, ৩খ, প্যারিস ১৮৫৫ খৃ.; (৬) ফারিশতা, তা'রীখ, ১খ, বোম্বাই/ পুন্য ১৮৩২ খৃ.। গৌণ সূত্রসমূহ ঃ (৭) K. S. Jal, History of the Khalijis, London 1967; (৮) R. P. Tripathi, Some aspects of Muslim Administration[2], Allahabad 1959; (৯) S. K. Aiyanga, South India and her Muhammadan invaders, Oxford 1921; (১০) J. D. M. Derrett, The Hosyalas, Oxford 1957; (১১) S. Lane Poole, Mediaeval India under Mohammedan rule, London 1912.

S. Digby (E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

কাফূর, আবুল-মিস্ক (كافور، أبو المسك) ঃ একজন কৃষ্ণকায় খোজা (আল-মুতানাব্বী তাঁহার নাম দেন 'আল-লাবী'; ইহা হইতে মনে হয় তাঁহার পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল নুবিয়ার অন্তর্গত লাব-এ)। তিনি মিসরের ইখ্‌শীদী (দ্র.) রাজবংশের প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উল্লিখিত শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগজ আল-ইখ্‌শীদ (দ্র.) তাঁহাকে দাস হিসাবে ক্রয় করেন। কাফূর তাঁহার নূতন মনিবকে এত মুগ্ধ করিতে সক্ষম হন যে, তিনি তাঁহাকে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জনে সাহায্য করেন। সমর ক্ষেত্রের অধিনায়ক হিসাবে কাফূর ৩৩৩/ ৯৪৫ সনে সিরিয়ায় মিসরের সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদের খলীফার সহিত আল-ইখ্‌শীদের কূটনৈতিক দৌত্যেও মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করেন। আল-ইখ্‌শীদের দুই পুত্রের রাজোপযোগী শিক্ষার তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্বও কাফূরের উপর অর্পিত হয়। বস্তুত এই নিয়োগ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইব্‌ন তুগজের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় ইখ্‌শীদের পুত্রদের উত্তরাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করিয়া কাফূর তাঁহার মনিবের বংশগত স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। ইখ্‌শীয়দের পুত্র আবু'ল-কাসিম আনূজূর (উনূজূর) ৩৩৪/৯৪৬ এবং অপর পুত্র 'আলী ইবনু'ল-ইখ্‌শীদ ৩৪৯/৯৬১ সনে ক্ষমতায় আসীন হন। যদিও ঐ সময়ে কাফূর পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তবুও ইখ্‌শীদী সরকার ব্যবস্থার নেপথ্যে থাকিয়া কাজ করাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। ৩৫৫/৯৬৬ সনে 'আলীর মৃত্যুর পরেই কেবল কাফূর নিজকে সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি অযৌক্তিক ছিল না, কেননা তখনকার সম্ভাব্য ইখ্‌শীদী উত্তরাধিকারী আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছিলেন। কথিত হইয়া থাকে যে, কাফূর বাগদাদের খলীফার নিকট হইতে তাঁহার অভিষেকের আনুষ্ঠানিক সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ২১ জুমাদা-১, ৩৫৭/২৩ এপ্রিল, ৯৬৮ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত মিসরের খুতবায় (দ্র.) ইখ্‌শীদীদের নামের পরিবর্তে কাফূরের নাম স্থান পায়। তাঁহার সরকারী খেতাব ছিল আল-উস্‌তায (দ্র.)। অবশ্য তাঁহার এই রাজনৈতিক উচ্চ মর্যাদার বিশেষ অধিকারসমূহের মধ্যে সিক্কা (দ্র.) বা তিরায (দ্র.) অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না।

ইসলামের ইতিহাসে কাফূরের ভূমিকার প্রধান তাৎপর্য তাঁহার ২২ বৎসরের সফল সরকার পরিচালনা, যেই সময়ে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সহিত ইখ্‌শীদী রাষ্ট্রকে বহিঃশক্তির (ফাতিমী, কারমাতী, নূবীয় ও হামদানীদের) বিপজ্জনক চাপ হইতে রক্ষা করেন। দেশের ভিতরে নানা রকমের রাজনৈতিক গোলযোগ (৩৩৫/৯৪৭-৩৩৬/৯৪৮ সনে গালবূনের বিদ্রোহ, ৩৪৩/৯৫৪ সনে আনূজূরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান; ইসমা'ঈলীদের ক্রমাগত অন্তর্ঘাতমূলক প্রচারণা এবং গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ৩৪৩/৯৫৪ সনে ফুসতাত নগরীর ব্যবসায় কেন্দ্র এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ৩৪৪/৯৫৫ সনে মিসরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প, বারংবার দুর্ভিক্ষ, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও উহার পরিণতিতে ৩৩৮/৯৪৯, ৩৪১/৯৫২, ৩৪৩/৯৫৫, ৩৫২/৯৬৩—৩৫৭/৯৬৮ সনে দেশে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা) সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। তাঁহার কার্যকর সামরিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ দামিশ্‌ককে হামদানীদের নিকট হইতে ইখ্‌শীদী অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ৩৩৫/৯৪৭ সনে সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। সর্বোপরি কাফূর মিসরে ফাতিমী শাসনের সম্প্রসারণ বিলম্বিত করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। মিসরে ইসমা'ঈলী প্রবক্তাগণ (তু. আল-মাক্রীযী, ইত্তি'আজু'ল-হুনাফা', কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৯৪৭) ক্ষুব্ধ চিত্তে এই বলিয়া অভিযোগ করেন, "ঐ কাল পাথরটি (কাফূর) আমাদের এবং আপনার (অর্থাৎ ফাতিমী খলীফার) মধ্যে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বিপুল সরকারী ব্যয় সত্ত্বেও কাফূরের প্রশাসন নিগ্রহমূলক রাজস্ব নীতি অনুসরণ হইতে বিরত থাকে। কাফূর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার ওজনে তারতম্য থাকিলেও বিশুদ্ধতার মানের দিক দিয়া বেশ স্থিতিশীল ছিল। অভ্যন্তরীণ দেশ শাসনে তাঁহার অসামান্য সাফল্যের একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, তিনি যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের অন্যতম ছিলেন খ্যাতিমান প্রশাসক য়া'কূব ইব্ন কিল্লিস (দ্র.)।

ইসলামের ইতিহাসে কাফূরের খ্যাতির আরও একটি কারণ হইতেছে, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ও লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। এই সকল মনীষীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী হইলেন বিখ্যাত কবি আল-মুতানাব্বী (দ্র.) যিনি বেশ কিছু প্রশংসামূলক এবং ব্যঙ্গ কবিতায় এই কৃষ্ণকায় শাসককে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। বলা হইয়া থাকে, কাফূর বেশ কয়েকটি ব্যয়বহুল প্রাসাদ, দুইটি মসজিদ (গীযা ও আল-মুকাত্তাম-এ), রাজধানীর হাসপাতাল ও কাফূরিয়্যা উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তবে তাঁহার কোন স্থাপত্য কর্মের কোনও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'ঈদ, কিতাবু'ল-মুগ্‌রিব ফী হুলা'ল-মাগ্‌রিব, ৪খ, যাহা K. N. Tallquist কর্তৃক আল-কিন্দীর তা'রীখ মিস্‌র হইতে উদ্ধৃতিসহ অনূদিত ও সম্পাদিত (Acta Societalis Scientiarum Fennicae, 25/i), এই পুস্তকটিতে প্রদত্ত কাফূরের জীবনীর সূচনাতে পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে (পৃ. ৭৮-৮৬; আরবী মূল পাঠ ৪৬-৪৮); (২) আল-হালাবী, Wustenfeld-এর Die Statthalter von Aegypten zur Zeit der Chalifen-এ (Abh. d. K. Ges. D. Wiss. zu Gottingen, ২১খ, ১৮৭৬ খৃ., পৃ. ৩৭-৫০ এবং ৫৯-৬১); (৩) ইব্ন খাল্লিকান, অনু. de Slane, ২খ, ৫২৪-৫২৮ এবং নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্ন তাগরীবিরদী, আন-নুজূমু'জ-জাহিরা, কায়রো (দারু'ল-কুতুব), ৩খ, ২৯১ প., ৪খ., ১-১৮; (৫) আল-মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ২৭ প.; (৬) ঐ লেখক, ইগাছাতু'ল-উম্মা, কায়রো ১৯৪০ খৃ., ১২-১৩ (তু. G. Wiet, Le Trate des famines de Maqrizi, JESHO-এ, ৪খ, (১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ১৩-১৪; (৭) আল-মুতানাব্বী, দীওয়ান (সম্পা. Dieterici), আল-কাফূরিয়্যাত, পৃ. ৬২৩ প.; (৮) হাসান ইব্রাহীম হাসান, কাফূর আল-ইখ্‌শীদী, in Bull. Fac. Arts Fu'ad Univ. ৪খ. (১৯৪২ খৃ.), পৃ. ২৩-৪৬; (৯) ইসমা'ঈল কাশিফ ও এইচ. আহমাদ মাহমূদ, মিস্‌র ফী 'আস্‌রি'ত-তূলূনিয়্যীন ওয়া'ল-ইখ্‌শীদিয়্যীন, কায়রো ১৯৬০ খৃ., স্থা.; (১০) P. Balog, Tables de references des monnaies ikhchidites, RBbN, ১০৩ খ. (১৯৫৭ খৃ.), ১০৭-১৩৪।

A. S. Ehrenkreutz (E.I.²) /আফতাব হোসেন

কা'ব (বানূ) (كعب بنو) ঃ বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের খূযিস্তান প্রদেশের কতিপয় এলাকায় বসবাসকারী একটি আরব উপজাতি। বানূ কা'ব কয়েকটি গোত্র লইয়া গঠিত, এইজন্য পূর্ব আরব ও দক্ষিণ ইরাকের অধিবাসীদের নিকট তাঁহারা আল-কু'উব (১৮শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় তথ্য উৎসসমূহে Chaub, বলিয়া উল্লিখিত) বলিয়া পরিচিত। আরব লেখক ও কুলজিবিদগণ ইহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বর্ণনা দেন নাই, ইহাদিগকে সাধারণত "কাব ইব্ন রাবী'আ" শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উল্লেখ্য, ইহারা মধ্য ও পূর্ব আরব অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী উপজাতি কায়স 'আয়লান-এর অন্তর্ভুক্ত। সেখান হইতে দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে তাহাদের হিজ্‌রত ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ডেনমার্কবাসী পর্যটক নাইবুহ্‌র (Niebuhr)-এর আগমনের (১৭৬৫ খৃ.) পূর্বেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বানূ কা'ব কিছুটা কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তুর্কী, ইরানী ও বৃটিশরা ইহাদের অত্যাচারের শিকার হয় এবং এই শক্তিত্রয়ের প্রত্যেকেই খৃস্টীয় ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কা'ব শাসক শায়খ সাল্‌মানকে বশীভূত করিতে ব্যর্থ হয়। বানূ কা'বদের সুরক্ষিত শহরগুলির মধ্যে কুব্বান, দাওরাক ও ফাল্লাহিয়্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। শায়খ সাল্‌মান-এর পর কা'বদের দ্বিতীয় বিশিষ্ট শাসক ছিলেন সাল্‌মানের প্রপৌত্র ছামির (১৮৩৭-৪০ খৃ.)।

ইরানে বসবাসরত অন্য আরব উপজাতিগুলির ন্যায় বানূ কা'ব-এর লোকেরাও অন্যান্য অনারব জনসাধারণের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকে এবং ধীরে ধীরে তাহারা নিজেদের আরবীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিতেছে। বানূ কা'ব উপজাতির প্রধান শাখাগুলি হইতেছে ঃ দ্রীস, মুকাদ্দাম, খানাফিরা ও হায়্‌বিহ।

বানূ কা'ব উপজাতিকে পুরাপুরি স্থায়ী বাসিন্দা বলা যায় না; আবার তাহাদের মধ্যে সত্যিকারের যাযাবর বেদুঈনের সংখ্যাও খুব বেশী নহে। বর্তমানে ইহাদের বৃহত্তর অংশ হইতেছে আধা-যাযাবর। ১৭৭৫ খৃ.-এর পরবর্তী আমলে যখন তাহারা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করিতেছিল তখন তাহাদের শাসকের কর্তৃত্ব বসরা'র নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে বিহ্‌বাহান-এর সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু মুহাম্মারা'র মুহায়সিন্‌দের অভ্যুদয়ের সময় হইতে বানূ কা'ব উপজাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাইয়া বানূ কা'ব সর্দারগণ মুহাম্মারা-র শায়খের অধীন অখ্যাত সামন্তে পরিণত হয়; বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুহাম্মারা'র শায়খ আবার ইরানী নৃপতিদের সামন্তে পরিণত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন দুরায়দ, কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক, সং. কায়রো ১৯৫৮ খৃ, ২৯৫; (২) ইব্ন রাসূল, তুর্‌ফাতু'ল-আসহাব ফী মা'রিফাতি'ল-আন্‌সাব, দামিশ্‌ক ১৯৪৯ খৃ., ১৫, ২৮; (৩) য়াকূত, ১খ, ৭৭৩; ৩খ, ৯০৮; (৪) আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-আরাব, সং. কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ২খ, ৩৩৮; (৫) কাহ্‌হালা, মু'জাম কাবাইলি'ল-'আরাব, দামিশ্‌ক ১৯৪৯ খৃ., ৩খ, ৯৮৪-৮৭; (৬) C. Niebuhr, Voyage en Arabie, Amsterdam 1780, ii, 160 প.; (৭) East India Company, Factory Records-Persia and the Persian Gulf, India Office Library, London, vols. 16 and 17; (৮) Baron C. A. de Bode, Travels in Luristan and Arabistan, London 1845, 111-19; (৯) A. H. Layard, A Description of the Province

of Khusistan, J. R. G. S., xvi (1846), 36-45-এ; (১০) W. K. Loftus, Travels and Researches in Chaldea and Susania, London 1857, 179-86; (১১) W. F. Ainsworth, A Personal Narrative of the Euphrates Expedition, London 1888, 205-18; (১২) G. W. Curzon, Persia and the Persian Question, London 1892, ii, 231-38; (১৩) J. G. Lorimer, Gazetter of the Persian Gulf, 'Oman and Central Arabia, Calcutta 1908, ii, 947-63.

A. M. Abu-Hakima (E.I.[2])/ শায়খ ফজলুর রহমান

কা'ব্ আল-আ'ওয়ার (كعب الاعور) ঃ (রা) ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন 'আওন ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌নি'দ্‌ দায়ল ইব্‌ন সুবাহ্ ছিলেন একজন সাহাবী। 'আল্লামা রাশাতী আবূ 'আম্‌র আশ-শায়বানীর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আবদু'ল-কায়স গোত্রের পক্ষ হইতে মুন্‌যির ইব্‌ন 'আ'ইয আল-আশাজ্জ-এর নেতৃত্বে নবী (স)-এর নিকট যে প্রতিনিধিদল আগমন করে, কা'ব আল-আ'ওয়ার সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। জাহিলিয়্যা যুগে তিনি 'আবদু'ল-কায়স গোত্রের অন্যতম সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং অন্যতম বীররূপে গণ্য হইতেন। তিনি এই গোত্রের সুবাহী শাখার নেতা ছিলেন।

'আবদু'ল-কায়স গোত্রের বাস ছিল বাহ্‌রায়নে। মুন্‌কিয ইব্‌ন হিব্বান নামক এই গোত্রের এক ব্যক্তি জাহিলিয়্যা যুগ হইতে য়াছরিব (বর্তমান মদীনা)-এ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিত। নবী (স)-এর মদীনায় আগমনের পর একবার সে পূর্বের ন্যায় পণ্য বিক্রয় করিতে আসিলে নবী (স)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে এবং নবী (স) তাঁহার মারফত তাঁহাদের গোত্রনেতার নামে ইসলামের প্রতি আহ্‌বান জানাইয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। নেতা মুন্‌যির ইব্‌ন 'আ'ইযসহ গোত্রের অনেকে এই পত্রের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর গোত্রনেতা মুন্‌যির ইব্‌ন 'আ'ইয আল-আশাজ্জ-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল নবী (স)-এর নিকট আগমন করে এবং ইসলামের মৌলিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন।

'আবদু'ল-কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনকাল ও দলের সদস্যবর্গের নাম ও সংখ্যা নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যথেষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এই গোত্রের পক্ষ হইতে দুইবার দুইটি প্রতিনিধি দল নবী (স)-এর নিকট আগমন করে। প্রথম দলটি আসিয়াছিল হি. ৬ষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টি ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে নবী (স)-এর যাত্রার প্রাক্কালে। প্রথম দলে সর্বমোট ১৪জন সদস্য ছিলেন এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন ৪০ জন।

প্রথম দলের কেহ কেহ দ্বিতীয় দলেও ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। গোত্রনেতা মুন্‌যির ইব্‌ন 'আ'ইয-এর সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত বলা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় দলেরও নেতৃত্ব দেন। কা'ব আল-আ'ওয়ার দ্বিতীয় দলের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৩০২, ক্রমিক নং ৭৪৩২; (২) ঐ লেখক, ফাত্‌হু'ল-বারী, বৈরূত ১৩৭৯ হি., ১খ, ১৩০-১৩১; (৩) বুখারী, সাহীহ, দিল্লী ১৩৫৭ হি., ১খ, ১৩৩; (৪) 'আয়নী, 'উম্‌দাতু'ল-কারী, বৈরূত ১৩৪ হি., ১খ, ৩০৮-৩০৯; (৫) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ্, মিশ্‌কাতু'ল-মাসাবীহ, দিল্লী ১৩৭৮ হি., ১খ, ৫; (৬) মুল্লা 'আলী কারী, মিরকাতু'ল-মাফাতীহ, মুলতান ১৩৮ হি., ১খ, ৮৮; (৭) মুস্‌লিম, সাহীহ, দিল্লী ১৩৭৮ হি., ১খ, ৩৩; (৮) 'আল্লামা নাওয়াবী, শারহু মুসলিম, বৈরূত ১৩৪৯ হি., ১খ, ১৮১; (৯) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৫৯, ৪৬-৪৮; (১০) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ১খ, ২৮৩, ৩১৪, ৪খ, ৩৬০, ৫খ, ৫৫৭-৫৬৪, ৭খ, ৮৬-৮৮।

লিয়াকত আলী

কা'ব আল-আকতা' (كعب الاقطع) ঃ (রা), একজন সাহাবী ছিলেন। য়ামামা (দ্র.)-এর যুদ্ধে তাঁহার হাত কাটা গিয়াছিল। ভণ্ড নবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে মুসলিমগণ বিজয়ী হইয়াছিলেন। যিয়াদ ইব্‌ন নাফি' কা'ব (রা)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম নিজস্ব সনদে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ "প্রতিটি দল এক রাক্'আত এবং দুই সাজদা সহকারে সালাতু'ল খাওফ (শংকাকালীন নামায) আদায় করিবে।" আবূ নু'আয়ম বলেন যে, ইব্‌ন মান্‌দা 'আবদু'ল-কারীম হইতে এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৩; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৯।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমাদ

কা'ব আল-আহ্‌বার (كعب الاحبار) ঃ (র) আবূ ইসহাক ইব্‌ন মাতি' ইব্‌ন হায়স্/ হায়নূ, একজন য়ামানী য়াহূদী, যিনি সম্ভবত ১৭/৬৩৮ সনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১খ, ২৫১৪)। তাঁহাকে য়াহূদী ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাচীনতম অথরিটি বলিয়া বিবেচনা করা হয়। (হিব্‌র/ হাব্‌র حبر) হিব্রু حابير (হাবীর) হইতে উদ্ভূত উপাধিটি (ব্যাবিলোনীয় য়াহূদী পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত) পণ্ডিতোচিত খেতাব রাব্বি-র অব্যবহিত নিম্নস্থানীয় হিবূরকে আরবী 'আলিম (عالم) শব্দের সমতুল্য বলিয়া ধরা হয় (আল-খাওয়ারিয্‌মী, মাফাতীহ, পৃ. ৩৫)। "কা'ব আল-আহ্‌বার"-এর বহুবচনটি নির্দিষ্টসূচক, প্রতিপূরক, পক্ষান্তরে স্বল্প ব্যবহৃত "কা'ব আল-আহ্‌বার"-এর শেষোক্ত শব্দটি 'কা'ব'-এর ব্যাখ্যাস্বরূপ (apposition = بدل)।

Lidzbarski (De propheticis ... legendis arabicis, লাইপযিগ-১৮৯৩ খৃ., পৃ. ৩৪-৫) অনুমান করেন যে, কা'ব প্রথমদিকে 'আকীবা (عقيبا) অথবা য়া'কূব (يعقوب) নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়, যদিও প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তিনি খলীফা 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে মদীনায় আসিয়াছিলেন এবং ১৫/৬৩৬ সনে তাঁহার সহগামী হইয়া জেরুসালেম গিয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১খ, ২৪০৮)। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি খলীফার ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন এবং খলীফার মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১খ, ২৭২২)। তিনি 'উছমান (রা)-এর অত্যুৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং ইহার জন্য এক সময় ধার্মিক আবূ যার্‌র (রা) তাঁহাকে শারীরিক শাস্তিও দিয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১খ, ২৯৪৬-৭)। পরবর্তীকালে সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) তাঁহাকে তাঁহার উপদেষ্টা হইবার জন্য দামিশকে লইয়া

যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হয় খুব সম্ভবত তিনি হিম্স-এ চলিয়া গিয়াছিলেন। হিম্সেই ৩২/৬৫২-৩ সালে ৩৪ হি. (আত-তাবারী, ৩খ, ২৭৭৪-৫) অথবা ৩৫ হি. (ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ১খ, ৪০) তিনি ইনতিকাল করেন। আল-হারাবীর মতে (যিয়ারাত, ৯-২০-১) তাঁহার মাযার এবং মাকাম এই শহরে অবস্থিত, কিন্তু য়াকূত (২খ, ৫৯৫) এবং ইব্ন বাত্তূতা (১খ, ২২২; অনু. গিব, ১খ, ৩৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে, দামিশকে তাঁহার সমাধিকক্ষ অবস্থিত (এইখানে তাঁহার নামাঙ্কিত কবরের একটি প্রস্তরফলক এখনও বিদ্যমান আছে (গিব, পূ. গ্র.)। ইব্ন জুবায়র (৫৫) এবং আল-মাকরীযী (সম্পা. Wiet, ৪খ, ৬) মনে করেন যে, ইহা মিসরের আল-জীযা-য় অবস্থিত, কিন্তু আল-হারাবী (১৪/৩৫) বর্ণনা করেন যে, কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, মদীনায় তাঁহার দাফন হইয়াছে ও বলিয়াছেন (৩৯/৯৪) যে, তাঁহার জনৈক পুত্রের মাযার জীযায় অবস্থিত।

যদিও লৌকিক উপাখ্যান এমনভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে যে, তাঁহার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য, তথাপি কা'ব বাইবেল এবং দক্ষিণ আরবীয় ঐতিহ্যের গভীর জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন। ইহা ছাড়াও তাঁহার প্রতি আরোপিত এমন বহু সংখ্যক পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, যেইগুলি কোন বিতর্ক ছাড়াই অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত, যেহেতু তিনি লোকজনের অতীব বিশ্বাসভাজন (আন-নাওয়াবী তাহযীব, পৃ. ৫২৩); 'উমার ইব্নু'ল-খাত্তাব (রা) সংশ্লিষ্ট হাদীছগুলিরও, যেইগুলি সত্য বলিয়া বিবেচিত, তিনি মূল প্রবক্তা। আল-জাহিয (হায়াওয়ান, ৪র্থ, ২০২-৩) তাঁহার নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার সপক্ষে যুক্তি অবতরণা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানি পুস্তক (Pantateuch)-এর বাহ্যিক উপাত্ত বিষয়ক আলোচনায় কা'ব এভাবে বলেন নাই, "ইহা তাওরাতে লিখিত আছে", বরং বলিয়াছেন, "নবীগণের কিতাবে আমরা ইহা দেখিতে পাই।" কোন কোন সময় তাঁহাকে ইসলামে য়াহূদী তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, তাবারী কর্তৃক সংরক্ষিত (১খ, ২৪০৮-৯) একটি কাহিনীতে কা'ব জেরুসালেমের একটি মন্দির টিলাকে পবিত্র স্থান হিসাবে সম্মান করিলে 'উমার (রা) তাঁহাকে য়াহূদীকরণের দায়ে দায়ী করিয়াছিলেন। আরও দেখুন ইসরা'ঈলিয়াত।

উত্তরপুরুষগণ বহুবিধ হাদীছের বর্ণনা, বিশেষত যেইগুলি নবীগণ সম্বন্ধীয়, যেমন হাদীছ যি'ল-কিফ্ল ১২৮৩ খৃ. বূলাকে মুদ্রিত (Brockelmann, পরি, ১, ১০১) অথবা য়ূসুফ ('আ)-এর কাহিনী (দ্র. য়ূসুফ) আল-যামিয়াদো (Aljamiado)-তে (দ্র. আল-যামিয়া), যোসেফের (দেখুন য়ূসুফ উপাখ্যান, যাহা F. Guillen ল্যাটিন বর্ণমালায় নকল করিয়া সম্পাদনা করিয়াছেন, (Legendas de Jose hijo de Jacoby de Alejandro Magno, সারাগোসা ১৮৮৮ খৃ. এবং Schmidt কর্তৃক বিশ্লেষিত Uber das altaspanische Poema de Jose, রোমান অক্ষরে Forschungen, ১১খ, ১৯০১ খৃ., ৩২১), প্রকৃতপক্ষে যাহা আছ-ছা'লাবী-র কিসাসু'ল-আম্বিয়া' হইতে ধার করা। আল-কিসা'ঈ তাঁহার য়ূসুফ-এর গল্পে কা'ব-এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ফিরদাওসীর য়ূসুফ ও জুলায়খাতে (সম্পা. H. Ethe, Anecdota Oxoniensa-তে, আর্য সিরিজে, ৬খ/১, অক্সফোর্ড ১৯০৮ খৃ., ২৫৮, শ্লোক ২৫৯৯) তাঁহাকে অথরিটি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও (১) ইব্ন সা'দ, ৭/২খ, ১৫৬; (২) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, নির্ঘণ্ট; (৪) ফিহরিসত, পৃ. ৩২; (৫) ইব্নু'ল-আছীর, ৩খ, ১২১; (৬) ইব্ন হাজার, ইসাবা, নং ৭৪৯৬; (৭) ঐ লেখক, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৮খ, ৪৩৮-৪০; (৮) আগানী, ২খ, ৫০; (৯) হাম্দানী, ইক্লীল, ৮খ, নির্ঘণ্ট; (১০) Weil, Biblische Legenden der Musulmanner, পৃ. ১০; (১১) M. Grunebaum, ZDMG-তে, ৪৪খ, ৪৫৮, ৪৭৭; (১২) Lidzbarski, পৃ. পৃ. ৩১-৪০; (১৩) H. Hirschfeld in Jewish Encycl.-তে, ৭খ, ৪০০; (১৪) B. Chapira, Legendes bibliques attribuees a Ka'b al-Ahbar, REJ-তে, ৬৯খ, ৮৬ প., ৭০খ, ৩৭ প.; (১৫) M. Perlmann, A legendary story of Ka'b al-Ahbar's conversion to Islam, The Joshua Starr Memorial Volume-এ, নিউইয়র্ক ১৯৫৩ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, Another Ka'b al-Ahbar story, The Jewish Quarterly Review-তে, ৪৫খ. (১৯৫৪ খৃ.), ৪৮-৫৮।

M. Schmitz (E.I.[2])/ আ. র. মামুন

কা'ব ইব্ন 'আদী আত-তানূখী (كعب بن عدى التنوخى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। বংশ পরিক্রমা এইরূপঃ কা'ব ইব্ন 'আদী ইব্ন 'আমর ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন 'আদী ইব্ন মালাকান ইব্ন 'উযরা ইব্ন যায়দ। মালাকান বানূ তানূখ গোত্রের হালীফ (মিত্র) ছিল বিধায় তাঁহার বংশধরদিগকে আত-তানূখী বলা হইয়া থাকে। তাহারা হীরার অধিবাসী ছিল। ধর্মবিশ্বাসে তাহারা ছিল খৃস্টান। কা'ব (রা)-এর পিতা তথাকার একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। বিশ্বস্ত সূত্রে কা'ব (রা)-এর জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের অন্তিম কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাহচর্য লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল-বাগাবী ও ইব্ন কানি' আবু'ল-আহওয়াস মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হায়ছাম হইতে তিনি সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন 'উফায়র হইতে, তিনি কা'ব (রা)-এর প্রপৌত্র 'আবদু'ল-হামীদ হইতে, তিনি 'আমর ইব্নু'ল-হারিছ হইতে, তিনি না'ইম ইব্ন উজায়ল হইতে, তিনি কা'ব ইব্ন 'আদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি হীরাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদলের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের সম্মুখে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করিলেন। ফলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আমরা হীরায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। ইহাতে আমার সঙ্গীরা সন্দিহান হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, যদি ইনি প্রকৃত নবী হইতেন তাহা হইলে ইনতিকাল করিতেন না। আমি বলিলাম, পূর্বেকার নবীগণও তো ইনতিকাল করিয়াছেন। এই বলিয়া আমি ইসলামের উপর অবিচল রহিলাম এবং অনতিবিলম্বে আমি মদীনার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। অতঃপর আমি আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার কাছে অবস্থান করিতে থাকিলাম। তিনি আমাকে মিসর শাসক মুকাওকিস-এর নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হযরত 'উমার (রা)-ও আমাকে দ্বিতীয় মুকাওকিস-এর দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। য়ারমূক-এর

যুদ্ধের পর আমি তাঁহার দরবারে 'উমার (রা)-এর একটি পত্র সহকারে উপস্থিত হইলাম। তখন আমার য়ারমূকের ফলাফল সম্পর্কে জানা ছিল না। মুকাওকিস আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান যে, রোমক বাহিনী আরবদেরকে পরাস্ত করিয়াছে? আমি বলিলাম, অসম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? বলিলাম, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে এই অঙ্গীকার দিয়াছেন যে, তিনি সকল দীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করিবেন। আর আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তখন তিনি বলিলেন, আরবরাই রোমকদেরকে পরাজিত করিয়াছে, তাহাদেরকে 'আদ জাতির ন্যায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। নিশ্চয়ই তোমাদের নবী সত্যই বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহাদের জন্য হাদিয়া প্রদান করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা 'আব্বাস (রা) জীবিত আছেন। তাঁহার সৌজন্য রক্ষা করুন।

কা'ব (রা) বলেন, আমি প্রাক-ইসলামী যুগে 'উমার (রা)-এর সহিত কাপড়ের ব্যবসায় অংশীদার ছিলাম। আল-বাগাবী ইব্ন কানি', ইব্ন শাহীন, আবূ নু'আয়ম ও ইব্নু'স-সাকান প্রমুখ ঐতিহাসিক উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন য়ূনুস তাঁহার তা'রীখ মিস্র গ্রন্থে কা'ব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের যেই বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত উল্লিখিত বর্ণনার কিছুটা বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণনার সূত্র হইল ঃ ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাউদ 'আম্র ইবনু'ল-হারিছ-এর স্বহস্তে লিখিত একটি গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন যে, য়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব না'ইম হইতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন 'আদী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা হীরার উসকুফ্ফ (খৃস্টান ধর্মগুরু, তাঁহার পদমর্যাদা কিস্সীস-এর উপরে এবং মাতরান-এর নীচে) ছিলেন। মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কথা ছড়াইয়া পড়িলে তিনি বলিলেন, তোমরা একদল প্রতিনিধিসহ এই ব্যক্তির নিকট গিয়া তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া আস। হইতে পারে বিলম্ব করিলে তাহার সাক্ষাত লাভ করিতে পারিবে না। তাঁহার মৃত্যু হইয়া যাইবে। তখন দুঃখ করিয়া বলিবে, যদি আমরা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে পারিতাম। নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর ছিলেন। সুতরাং তোমরা চার ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ কর। তখন আমি আমার পিতার নিকট আবেদন করিলাম, আমিও এই প্রতিনিধিদলের সহিত যাইব। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গিয়া কি করিবে? বলিলাম, তাঁহাকে দেখিব। তিনি অনুমতি দিলে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গিয়া উপনীত হইলাম। আমরা যখন সেইখানে গিয়া পৌছিলাম তখন তিনি সবেমাত্র ফজরের সালাত সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাণী এবং আল-কুরআনের তিলাওয়াত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ইহাতে কেহ আমাদের সহিত বিরূপ আচরণ করেন নাই এই দিকে কিছু সময় যাইতে না যাইতেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকাল হইল। ফলে আমার সঙ্গিগণ বলিতে লাগিল, ইনি যদি সত্যিকারের নবী হইতেন তবে ইনতিকাল করিতেন না। চল আমরা প্রস্থান করি। আমি বলিলাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। দেখ কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তখন হয়ত এই নূতন ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে অথবা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিবে। কিন্তু তাহারা আমার কথায় ভ্রুক্ষেপ করিল না। তাহারা তখনই ফিরিয়া গেল। আর আমি খৃস্টানও নহি এবং মুসলমানও নহি– এমন এক দোদুল্যমান অবস্থায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে যখন হযরত আবূ বাক্র (রা) খলীফা নিযুক্ত হইয়া য়ামামা-র দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন আমি তাহাদের সহিত যোগদান করিলাম। যুদ্ধশেষে সৈন্যবাহিনী প্রবর্তন করিলে আমি এক রাহিব (খৃস্টান ধর্মযাজক)-এর নিকট গেলাম। এই বলিয়া তিনি পূর্বোল্লিখিত ঘটনার বিবরণ দেন। অতঃপর বলেন যে, এইবার আমার অন্তরে ঈমান জাগ্রত হইল। আমি তখনই ঈমান আনয়ন করিলাম। কিন্তু হীরায় ফিরিয়া আসিলে সকলেই আমাকে নিন্দা করিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া আমি হযরত 'উমার (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হইলাম। তখন হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর ইনতিকাল হইয়াছে। 'উমার (রা) আমাকে শাসক মুকাওকিস-এর দরবারে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি মুকাওকিসের সহিত তাঁহার কথোপকথনের কথা বর্ণনা করেন। ইহার পর ইব্ন য়ূনুস সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র-এর বর্ণনা উল্লেখ করেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, মূলত ইব্ন য়ূনুস কা'ব (রা)-র জীবনী লেখায় সা'ঈদ-এর বর্ণনাকে অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই আঙ্গিকেই তিনি জীবনীর শুরুতে বলেন, তিনি হীরা-র প্রতিনিধিদলের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করেন। কিন্তু তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। আবূ বাক্র (রা)-র যামানায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাক-ইসলামী যুগে 'উমার (রা)-এর সহিত কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। হিজরী ১৫ সাল তিনি 'উমার (রা)-র পক্ষ হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় মুকাওকিস-এর দরবারে দূত হিসাবে প্রেরিত হন। তিনি মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তথায় সাদাকা উসূলের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। উমায়্যা খলীফা য়াযীদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর যামানায় মিসরের গভর্নর তাহাদেরকে বানূ কুদা'আ-র দীওয়ান সংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত করেন। কা'ব (রা)-র প্রপৌত্র 'আবদু'ল-হামীদ ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আলকামা-র মাধ্যমে মিসরে তাঁহার বংশবিস্তার ঘটে। তাঁহার সূত্রে মিসরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু হাদীছ প্রচার লাভ করে। হযরত কা'ব (রা)-এর জীবনী উপস্থাপনায় ইব্ন মানদা ইব্ন য়ূনুস-এর অনুসরণ করিয়াছেন। ইব্ন য়ূনুস-এর সনদে তিনি হযরত কা'ব (রা)-এর বর্ণিত হাদীছটি সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র ও য়াযীদ ইব্ন হাবীব উভয়ের সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার উপস্থাপনার বেলায় উভয়ের বর্ণনায় পার্থক্য রহিয়াছে। য়াযীদ ইব্ন হাবীব-এর বর্ণনায় প্রতিভাত হয় যে, কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, বরং হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর যুগেই তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, উভয় বর্ণনায় এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, য়াযীদ ইব্ন হাবীব-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে কা'ব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করা হয় নাই; বরং এই ব্যাপারে চুপ থাকিয়াছেন মাত্র। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পরের অবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তখন তিনি দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। আর সা'ঈদ-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁহার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাবে ধারণা করা যাইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর তিনি প্রথমে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি ইসলামের জয়-জয়কার প্রত্যক্ষ করিলেন তখন সন্দেহের ঘনঘটা বিদূরিত হইল এবং তাঁহার অন্তরে

আবার ঈমান বদ্ধমূল হইল এবং তিনি সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হইলেন। উল্লেখ্য যে, যেইসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর মুরতাদ হইয়া পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁহারাও সাহাবী হিসাবে গণ্য হইয়া থাকেন। আল-আশ'আছ ইব্ন কায়স প্রমুখ এই পর্যায়েরই সাহাবী। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, আমি প্রথমে ইব্ন য়ুনুস-এর গবেষণা অনুযায়ী কা'ব (রা)-কে মুখদারমীনের তালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু পরবর্তীকালে সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র-এর বর্ণনা আমার কাছে প্রবল প্রতিভাত হয়। সেই হেতু আমি তাঁহাকে সাহাবীদের প্রথম ভাগে শামিল করিয়াছি। ইব্ন মান্দা কা'ব (রা)-এর জীবনীতে তাঁহার একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি ইব্ন ওয়াহ্ব 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন শুরায়হ হইতে, তিনি য়াযীদ ইব্ন 'আমর হইতে এবং তিনি আবূ ছাওর আল-ফাহমী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কা'ব (রা) জাহিলী যুগে 'উমার (রা)-র সহিত ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকাকালে তথাকার একটি শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, পর্বশেষে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিল, লোকসকল ! বিগত শতবার্ষিকীতে উপস্থিত ছিলেন এমন কেহ আছে কি ? তাহা হইলে সে বলুক, উভয়টির মধ্যে কোন্টি উৎকৃষ্ট। লোকটি কয়েকবার একই আহবান জানাইল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আমাদের মধ্য হইতে কেহ আগামী শত বার্ষিকীতেও উপস্থিত থাকিবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৪; (২) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩১; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১৩২২; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৯৮-২৯৯, ৩০০।

মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন

কা'ব ইব্ন 'আমর আল-আনসারী (كعب بن عمرو الانصارى) ঃ (রা), আনসারী সাহাবী, বানূ'ন-নাজ্জার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। তাঁহার বংশ তালিকা এইরূপ ঃ কা'ব ইব্ন 'আমর ইব্ন 'উবায়দ ইব্নি'ল-হারিছ ইব্ন কা'ব ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন মালিক ইবনি'ন-নাজ্জার। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। উহুদ যুদ্ধে ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। য়ামামা-র যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৫; (২) আয্-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, মিসর, তা. বি., ২খ, ৩১; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৩০০; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১৩২১।

মুহা ঃ হেমায়েত উদ্দীন

কা'ব ইব্ন 'আমির আস-সা'দী (كعب بن عامر السعدى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। জা'ফার আল-মুস্তাগ্ফিরীর মত উদ্ধৃত করিয়া ইব্ন হাজার ও ইবনু'ল-আছীর উভয়ই বলিয়াছেন যে, তিনি একজন সাহাবী। ইব্ন হিব্বান সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া আস-সা'দী-র স্থলে তাঁহার নিসবা আস-সা'ইদী (الساعدى) বলিয়াছেন। 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী রাফি'-র সূত্রে আল-বাওয়ারদী 'আলী (রা)-র সঙ্গে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকায় কা'ব ইব্ন 'আমির (রা)-র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণিত কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৯৭, নং ৭৪১৭; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, উর্দূ অনু., লখনৌ ১৩২৭ হি., ৭খ, ৩৩০।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কা'ব ইব্ন 'আসিম (كعب بن عاصم) ঃ আল-আশ'আরী (রা) সাহাবী। ইমাম বুখারী বলেন, ইনি একজন সাহাবী। তবে এই সাহাবী এবং আবূ মালিক আল-আশ্'আরী একই ব্যক্তি কিনা, সেই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। তিনি সিরিয়া ও মিসর উভয় দেশে গমন ও বসবাস করিয়াছিলেন। এই কারণে কেহ কেহ সিরীয়, আবার কেহ কেহ মিসরীয় সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কা'ব ইব্ন 'আসিম আল-আশ্'আরী (রা) হইতে জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা), উম্মু'দ-দারদা (রা), 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন গানাম (রা) ও খালিদ ইব্ন আবী মারয়াম (রা) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আহমাদ আন-নাসা'ঈ, ইব্ন মাজা প্রমুখ কর্তৃক উদ্ধৃত এবং উম্মু'দ-দারদা (রা)-র সূত্রে তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ (জিহাদের) সফরে সিয়াম পালন কোন পুণ্যের কাজ নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৯৭, নং ৭৪১৬; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবু'ত-তাহযীব, সম্পা. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব 'আবদু'ল-লাতীফ, ২খ, ১৩৪; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, আল-ইসাবা, ৩খ-এর হাশিয়া, পৃ. ২৯৪; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, উর্দূ অনু., লখনৌ ১৩২৭ হি., ৭খ, ৩২৯।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কা'ব ইব্ন 'ইয়াদ (كعب بن عياض) ঃ আল-আশ্'আরী (রা) সাহাবী। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র ও ইবনু'ল-আছীর তাঁহার বর্ণিত একটি মাত্র হাদীছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটির সূত্র জুবায়র ইব্ন নুফায়র। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জবানীতে ফিত্না (বিপদ, বিপর্যয়) সংক্রান্ত ঐ হাদীছটি এইরূপ ঃ "প্রতিটি উম্মতের জন্য একটি বিশেষ ফিতনা থাকে, আমার উম্মতের জন্য ফিত্না হইল সম্পদ।" কিন্তু ইব্ন হাজার এই হাদীছ ছাড়াও কা'ব ইব্ন 'ইয়াদ বর্ণিত আরও তিনটি হাদীছের কথা বলিয়াছেন। প্রথমটি উল্লিখিত জুবায়র ইব্ন নুফায়র-এর সূত্রে ইব্ন কানি' ও ইবনু'স-সাকান কর্তৃক উদ্ধৃত কিসাস সংক্রান্ত হাদীছ, দ্বিতীয়টি একই সূত্রে আদ-দারিমী কর্তৃক উদ্ধৃত এবং তৃতীয়টি খালিদ ইব্ন মা'দান-এর সূত্রে আদ-দারু কুতনী কর্তৃক উদ্ধৃত। জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) ও উম্মু'দ-দারদা' (রা) এই কা'ব ইব্ন 'ইয়াদ আল-আশ'আরীর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া ইব্ন হাজার, ইবনু'ল-আছীর ও ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ 'উমার বলেন, তাঁহার বর্ণিত সম্পদের ফিত্না বিষয়ক হাদীছটি একটি সাহীহ হাদীছ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০১, নং ৭৪২৮; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবা, ৩খ-এর হাশিয়া, পৃ. ২৯৩; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, উর্দূ অনু., লখ্নৌ ১৩২৭ হি., ৭খ, ৩৩৩; (৪) ইব্ন হাজার, তাক্রীবু'ত-তাহ্যীব, সম্পা. 'আব্দু'ল-ওয়াহ্হাব 'আবদুল লাতীফ, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১৩৫।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কা'ব ইব্ন 'উজরা আল-বালাবী (كعب بن عجرة البلوى) ঃ (রা) সাহাবী, তাঁহার উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, কাহারও মতে আবূ 'আবদিল্লাহ এবং কেহ কেহ আবূ ইসহাকও বলিয়াছেন। বংশ পরিক্রমা এইরূপ ঃ কা'ব ইব্ন 'উজরা ইব্ন উমায়্যা ইব্ন 'আদী ইব্ন 'উবায়দ ইবনি'ল-হারিছ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওফ ইব্ন গানম ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন সুরায়্যি ইব্ন আরাশা ইব্ন 'আমির ইব্ন 'উবায়লা ইব্ন কাসমীল ইব্ন কিরান ইব্ন বালী। ইব্ন হাজার বর্ণিত বংশ তালিকায় 'উবায়দ-এর পিতার নাম হারিছ এর পরিবর্তে খালিদ উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে 'আওফ-এর স্থলে যায়দ এবং গান্‌ম-এর স্থলে লায়ছ লিখিয়াছেন। এই গোত্রটি আনসার-এর হালীফ ছিল। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী এবং ইমাম বুখারী (র) স্বয়ং এই গোত্রটিকে আন্‌সার-এর মধ্যে শামিল করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ তাঁহাদের এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করত বলেন ঃ আমি কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা)-র বংশ তালিকা আনসার-এর মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কোথাও পাই নাই। কা'ব (রা) কূফায় বসবাস করিতেন। বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত হইয়াছে। বায়'আতু'র-রিদওয়ান ও ইহার পরবর্তী অভিযানসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) হইতে তিনি আনুমানিক সাতচল্লিশটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশিষ্টগুলি সাহীহ মুসলিম-এ স্বতন্ত্রভাবে স্থান পাইয়াছে। 'উমার (রা)-এর সূত্রেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ইসহাক, 'আবদু'ল-মালিক, মুহাম্মাদ ও আর-রাবী' তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত আর যাঁহারা তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা), জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনি'ল-আস (রা), তারিক ইব্ন শিহাব, আবূ ওয়ায়ল, ইব্ন আবী লায়লা, যায়দ ইব্ন ওয়াহ্ব ও আশ-শা'বীর নাম উল্লেখযোগ্য। আল কুরআনের আয়াত فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (তাহা হইলে সিয়াম বা সদকা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্য়া আদায় করিতে হইবে) তাঁহার সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে। তিনি বলিতেন ঃ এই নির্দেশ বিশেষভাবে আমার জন্য এবং সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্য আসিয়াছে। এই নির্দেশ সম্পর্কিত তাঁহার ঘটনা সাহীহ আল-বুখারী ও সাহীহ মুসলিম-এ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, আবূ নুজায়হ মুজাহিদ হইতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুহরিম অবস্থায় ডেকচী-র নিচে আগুন জ্বালাইতেছিলেন। তাঁহার মাথায় অত্যধিক পরিমাণে উকুন জন্মিয়াছিল। ইহা তাঁহার মুখের উপর আনাগোনা করিতেছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিতেন ঃ তুমি মাথা মুণ্ডন করিয়া ফেল এবং ফিদয়া হিসাবে ছয়জন মিসকীনকে এক ফ্রক পরিমাণ আহার বিতরণ কর। কোন কোন সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ঃ আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, তুমি এত ক্লেশ পোহাইতেছ। ইবনু'ল-মুকরী তদীয় ফাওয়া'ইদ গ্রন্থে 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন সুলায়মান আত-তাবীল হইতে এবং তিনি নাফি' হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসার তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে,বানূ সালিম গোত্রের কা'ব ইব্ন 'উজরা নামক এক ব্যক্তির মস্তকে ব্যাধি ছিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি তাঁহার মাথা মুণ্ডন করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি কি কুরবানী করিব ? তিনি তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, যেন সে একটি কুরবানীর পশু হারামে প্রেরণ করে উহার কণ্ঠ মালা ভূষিত করিয়া উহাকে চিহ্নিত করে; অতঃপর উহাকে 'আরাফাতে নিয়া অবস্থান করায়। অবশেষে অন্যদের সঙ্গে যবেহ স্থলে প্রেরণ করিবে। 'আল্লামা আল-বাগাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটির সহিত উল্লিখিত বর্ণনার বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। তিনি আবান ইব্ন সালিহ হইতে, আর তিনি হাসান আল-বাসারী হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে আবূ মুহাম্মাদ ! আপনার ফিদ্য়া কি ছিল ? তিনি বলিলেন ঃ একটি বক্রী। আত-তাবারী তাঁহার আল-আওসাত গ্রন্থে দিমান ইব্ন ইসমা'ঈল হইতে, তিনি মূসা ইব্ন বিরদান হইতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম যে, তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। ফলে আমি প্রস্থান করিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম যে, জনৈক য়াহূদী তাহার উষ্ট্রকে পানি পান করাইতেছে। আমি এক একটি খর্জুরের বিনিময়ে তাহার উটকে কয়েক বালতি পানি পান করাইলাম। যখন বেশ কিছু খর্জুর জমা হইল তখন উহা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হইলাম . . . । কা'ব (রা) হিজরী ৫১ মতান্তরে ৫২ বা ৫৩ সালে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স ৭৫, ৭৬, বা ৭৭ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৯৮; (২) ইবনু'ল-আছীর আল-যাযারী, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৩; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩১; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১৩২১; (৫) মুহ্য়ি'দ-দীন ইব্ন শারাফ আন-নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর, তা. বি., ১ম ভাগ, ২খ, ৬৮; (৬) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ১খ, ৩০৫, ২খ, ১২৬, ৬খ, ১০৯; (৭) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ৮খ, ৪৩৫; (৮) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ২খ, ১৩৫; (৯) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৭৭/৩৯৭, ৩খ, ৩৫১; (১০) আল-বুখারী, আল জামে' আস-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ১খ, ২৪৪; (১১) মুসলিম, আস-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ১খ, ৩৮২।

মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন

কা'ব ইব্ন 'উমায়র (كعب بن عمير) ঃ আল-গিফারী (রা) প্রবীণ সাহাবীদের অন্যতম। মহানবী (স) তাঁহার নেতৃত্বে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন। ৮ম হিজরীর রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসে মহানবী

(স) তাঁহার নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি দল প্রেরণ করেন। সাহাবীদের এই দলটি সিরিয়ার অন্তর্গত ওয়াদি'ল-কুরার নিকটবর্তী যাতুত-তালাহ নামক স্থানে পৌঁছিলে বানূ কাযা'আ-র এক বিরাট বাহিনীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান হইলে তাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু তাহারা কা'ব (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া আক্রমণ চালায়। মুসলমানগণ অত্যন্ত বিক্রমের সহিত তাহাদের মুকাবিলা করিলেন। কাযা'আর বিরাট বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কা'ব (রা)-সহ ১৪ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। অবশিষ্ট একজন গুরুতর আহত অবস্থায় রক্ষা পাইলেন। তিনি মদীনায় আসিয়া মহানবী (স)-কে বিস্তারিত ঘটনা অবহিত করিলে মহানবী (স) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং কাযা'আ-র বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহারা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে এই মর্মে সংবাদ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে তিনি সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। ইবনু'ল-আছীরের বর্ণনামতে সাহাবীদের জীবনী সংকলক ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর ও আবূ মূসা তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ২খ, ১২৭; (২) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০১, ক্রমিক নং ৭৪২৭; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, ইসতী'আব, (ইসাবা, ৩খ, ২৯২, হাশিয়া); (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৬; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩২, ক্রমিক নং ৩৫০; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন্-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৪খ, ২৪১; (৭) ঐ লেখক, আস্-সীরাতুন'ন্-নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৪খ, ৪৫৪।

লিয়াকত আলী।

কা'ব ইব্‌ন 'উয়ায়না (كعب بن عيينة) ঃ (রা) ইব্‌ন 'আবিসা আত্-তামীমী, সাহাবী, ছিলেন। আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্ আল-হাকিম তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কা'ব ইব্‌ন 'উয়ায়না একজন সাহাবী ছিলেন। সালমুয়া ইব্‌ন সালিহ উল্লেখ করেন যে, কা'ব ইব্‌ন 'উয়ায়না (রা) খুরাসান প্রদেশের নীশাপুরে গমন করিয়া তথায় 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমিরের সহিত বসবাস করিয়াছিলেন। ইব্‌ন হাজার তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে কা'ব-এর পিতা 'উয়ায়নার জীবন বৃত্তান্তে উয়ায়না ইব্‌ন 'আইশা আল-মুররী বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইব্‌ন মাদান-এর বরাত দিয়া 'উয়ায়নাকে মুতা ও তৎপরবর্তী অভিযানসমূহে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ. ৩০১, নং ৭৪২৯; (২) ঐ লেখক, ৩খ., ৫৫, নং ৬১৫২; (৩) ইবনু'ল আছীর, উসদু'ল-গাবা, উর্দূ অনু., লখ্‌নৌ ১৩২৭ হি., ৭খ. ৩৩৪।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কা'ব ইব্‌ন 'উয়ায়না (كعب بن عيينة) ঃ (রা) ইব্‌ন 'আইশা আত-তামীমী একজন সাহাবী। তিনি খুরাসানের অন্তর্গত নীশাপুরে 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমির (রা)-র সহিত বসবাস করিতেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত; হাফিজ আবূ মূসা তাঁহার গ্রন্থে সাহাবীদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ. ৩২, ক্রমিক নং ৩৫৩৩; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ., ২৪৬;(৩) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ., ৩১, ক্রমিক নং ৭৪২৯।

লিয়াকত আলী

কা'ব ইব্‌ন কুতবা (كعب بن قطبة) ঃ (রা) একজন সাহাবী। আবূ রাযীন 'উকায়লী সংকলিত একটি হাদীছে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার সূত্রে একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ "আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কোন মিথ্যাচারের সমতুল্য নহে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (হাদীছ জাল করে) সে যেন তাঁহার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করিয়া লয়।" 'আলী ইব্‌ন রাবী'আ তাঁহার নিকট হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইসহাক আল-আযরাক-এর বরাতে আবূ রাযীন 'উকায়লী ইহা সংকলন করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম বুখারী, মুসলিম, তাবারানী, তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিছ আবূ নু'আয়মের বরাতে এই হাদীছটিকে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত বলিয়া সংকলন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীছটি বহু সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইবনু'ল-আছীরের বর্ণনানুসারে সাহাবীদের জীবনী সংকলক আবূ নু'আয়ম ও আবূ মূসা তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু সন অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০১-৩০২, ক্রমিক নং ৭৪৩১৩; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৭; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩২, ক্রমিক নং ৩৫৪।

লিয়াকত আলী

কা'ব ইব্‌ন জাম্মায (كعب بن جماز) ঃ (রা) আল-আনসারী একজন সাহাবী; পিতার নাম জাম্মায ইব্‌ন ছা'লাবা, হিম্মান ইব্‌ন ছা'লাবা তিনি মদীনার জুহায়না মতান্তরে গাসসান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। বানূ সা'ইদা গোত্রের সহিত তিনি মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশ তালিকা হইল ঃ কা'ব ইব্‌ন জাম্মায ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন খারশা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন রাশদান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জুহায়না। কা'ব (রা) বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনচরিত সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৬০; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৯৪, নং ৭৪০৬; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৩৯; (৪) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতীআব, মিসর তা.বি., ৩খ, ১২১২-১৩, নং ২১৮৯; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ২খ, ৩০, নং ৩২২; (৬) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি., ২খ, ২৫৫; (৭) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, ৬১৩।

ড. আবদুল জলীল

কা'ব ইব্‌ন জু'আয়ল আত-তাগলিবী (كعب بن جعيل التغلبي) ঃ প্রথম/সপ্তম শতাব্দীর একজন অপ্রধান কবি। ইব্‌ন সাল্লাম

(তাবাকাত, ৪৮৫-৯) তাঁহাকে ইসলামী কবিগণের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখায় তাঁহার বংশতালিকা বিভিন্নরূপ দেখা যায় (ইব্‌নু'ল-কাল্‌বী, সম্পা. Caskel, তালিকা ১৬৫, নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন) এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়। তিনি সম্ভবত হিজরী সনের একেবারে প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময় (৩৭/৬৫৭) মু'আবিয়া (রা)-র ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাগলিব (দ্র.) গোত্রের বেশীর ভাগ লোকের ন্যায়, তিনিও মু'আবিয়ার একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। 'আলী (রা)-র সহিত দ্বন্দ্ব তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে উৎসাহ যোগায়, বিশেষ করিয়া একটি কবিতা, যাহা মু'আবিয়া (রা) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট একটি পত্রের সহিত সংযোজিত করার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং আন-নাজাশী যাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন (আদ-দীনাওয়ারী, তিওয়াল, ১৭০; আল-মুবাররাদ, কামিল, ১খ, ২৮১-২)। তাঁহার অন্যান্য কবিতা হইল পরবর্তীকালে যুদ্ধে নিহত 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌নু'ল-খাত্তাব-এর প্রসঙ্গে রচিত কয়েকটি শোকগাঁথা (ইব্‌ন সাল্লাম, ৪৮৮-৯; আত-তাবারী, ১খ, ৩৩১৫; নাসাব কুরায়শ, ৩৫৫-৬; য়াকূত, দ্র. সিফ্‌ফীন, নাসর ইব্‌ন মুযাহিম, ওয়াক'আত সিফ্‌ফীন, ৩৩৬, ৪১০; শারহ্ নাহ্‌জি'ল-বালাগা, ১খ, ৪৯৮-৯; ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ৭খ, ২৬৫) এবং মু'আবিয়া (রা) ও 'আমর ইব্‌নু'ল-আস (রা)-এর প্রশংসায় রচিত একটি কবিতা (ইব্‌ন সাল্লাম, ৪৮৬-৭; আল-মারযুবানী, মু'জাম, ৩৪৪ ; ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, ৬৩২ ; য়াকূত, দ্র. আমরূহ)।

তাঁহার রচনার মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান অংশগুলির (প্রায় ৮০টি কবিতা) মধ্যে 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন খালিদ ইবনি'ল-ওয়ালীদ-এর প্রশংসায় রচিত স্মৃতিমূলক কয়েকটি কবিতা (নাসাব কুরায়শ, ৩২৫-৬), আল-মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (মৃ. ৫০/৬৭০) সম্বন্ধে একটি হিজা (বিদ্রূপাত্মক কবিতা) [আল-হামাসা আল-বাসরিয়্যা, ২খ, ১৮২] এবং ৫০-৫৬/৬৭০-৯-এর মধ্যে মদীনায় অবস্থানকালে রচিত কয়েকটি কবিতাও রহিয়াছে। মদীনায় সে সময়ে তাঁহাকে গভর্নর সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-'আস (ইব্‌ন সাল্লাম, ২৫৫, ২৭১ ; আত-তাবারী, ১খ, ২৮৩৮, তু. ২খ, ১০৭)-এর সান্নিধ্যে আল-ফারাযদাক-এর কবিতা উপভোগ করিতে দেখা যায়। কিংবদন্তী মতে কা'ব ইব্‌ন জু'আয়ল হইতেই তাঁহার স্বগোত্রীয় তরুণ আল-আখতাল (দ্র.) তাঁহার উপনাম লাভ করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সাল্লাম, ২৫০, ৩৯৬; আগামী, সং বৈরূত, ৮খ, ২৮০-১)। প্রায়শ উদ্ধৃত একটি বিবরণ অনুসারে (আল-জাহিজ, বায়ান, ১খ, ৬৩, ১৭২; ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, ৪৫৬, ৬৩১-২; আল-মুবাবরাদ, কামিল, ১খ, ১৫৩; আগানী, সং. বৈরূত, ১৫খ, ৮৩) কথিত আছে যে, ৬০/৬৮০-এর পূর্বে য়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা) তাঁহাকে 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতকে আক্রমণ করিয়া কবিতা রচনার আদেশ দিলে তিনি আল-আখতাল-কে এই কাজের দায়িত্ব দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কারণ তিনি নিজে একজন আনসার-এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কবিতা লিখিতে সম্মত ছিলেন না। কা'ব প্রদত্ত উত্তরের মধ্যে যে কিছু ভিন্ন তথ্য দেখা যায় (এবং প্রসঙ্গত যাহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না) তাহার উপর ভিত্তি করিয়া L. Cheikho (শু'আরা'উ'ন-নাসরানিয়্যা বা'দা'ল-ইসলাম, ২০৪) দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কবি তখন পর্যন্ত খৃস্টান ছিলেন, কিন্তু সকল প্রমাণ হইতে এই ধারণাই হয় যে, তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

তাঁহাকে আবার দেখা যায় (আগানী, বৈরূত সং, ৫খ, ১৩), কোন এক অজ্ঞাত সময়ে বসরার মিরবাদ-এ কয়েকজন কবির সঙ্গে, বিশেষ করিয়া আন-নাবিগ আল-জা'দী (ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য দ্র. M. Nallino. in RSO. xiv. 1934. 404-5 এবং Le Poesie di an-Nabigah. রোম ১৯৫৩ খৃ., ১২০)-এর সংগে। যদি আল-বালাযুরী প্রদত্ত তথ্য (আন-নাসাব, ১১খ, ২১২) নির্ভুল হয়, তাহা হইলে তিনি 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (৬৫/৬৮৫-৮৬)-এর প্রশস্তি গাথা রচনার সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন ঃ যেই পংক্তিগুলি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আল-কুতামী-র একটি দীর্ঘ কাসীদা-তে দেখা যায় (সম্পা. J. Barthe. Leiden ১৯০২ খৃ. (৮৮, পংক্তি ৮৯-৯০)।

কা'ব ইব্‌ন জু'আয়লকে মুফ্‌লিক কবি হিসাবে ইব্‌ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দীওয়ান সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যদিও তাঁহার কবিতাগুলি কিছু প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কেননা ইব্‌ন সুরায়জ (দ্র.) তাঁহার কিছু পংক্তিকে গানের রূপ দিয়াছিলেন (আগানী, বৈরূত সং, ৩খ, ২৭৫)। পরিশেষে সংকলকগণ প্রাক-ইসলামী কবি 'উমায়রা/ 'আমীরা ইব্‌ন জু'আয়ল (Cheikho, শু'আরাউন-নাসরানিয়্যা কাবলা'ল-ইসলাম, ১৯৫-৬)-এর কবিতাকে (কা'ব ইব্‌ন জু'আয়ল)-এর প্রতি আরোপ করিয়া অথবা এই কবিকে তাঁহার ভাই গণ্য করিয়া (ইব্‌ন কুতায়বা, শি'র, ৬৩১-২; আল-বাগদাদী, খিযানা, বূলাক, ১খ, ৪৫৮, কায়রো, ৩খ, ৪৪) ভুল করিয়াছিলেন। ইব্‌ন সাল্লাম (৪৮৬-৭) এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের উদ্ধৃতাংশ এই ভুল-ত্রুটিগুলির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিশেষ বৃত্তান্ত লওয়া হইয়াছে শু'আরা'উ'ন-নাসরানিয়্যা বা'দাল-ইসলাম, ২০৩-১২ হইতে। প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত উৎসগুলি ব্যতীত দ্রষ্টব্য ঃ (২) বুহতুরী, হামাসা, ৩৪৫; (৩) দীনা-ওয়ারী,তি ওয়াল, ১৯২; (৪) 'আমিদী, মু'তালিফ, ৮৪; (৫) আগানী, বৈরূত সং, ৯খ, ৭২; (৬) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশতিকাক ২০৩; (৭) শারীশী, শারহ্, ২খ, ৮৬; (৮) নাকা'ইদ, ৬১৯;(৯) য়াকূত, দ্র. আল-হীরা; (১০) Noldeke. Delectus, 79-80; (১১) C. A. Nallino. Letteratura. index; R. Blachere, HLA. iii, 65-6 and bibl under reference.

Ch. Pellat (E.I.[2])/আ. র. মামুন

কা'ব ইব্‌ন ফিহর আল-কুরাশী (كعب بن فهر القرشى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। ওয়াছীমা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) প্রেরিত সংবাদবাহক।

য়ামামা-র যুদ্ধ শেষ হইলে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) য়ামামায় অবস্থানরত থাকিতেই আবূ বাকর (রা) তাঁহার নিকট এই মর্মে নির্দেশ দান করিয়া পাঠাইলেন, আপনি ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হউন। সেখানে পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম ফারজু'ল-হিন্দু (আল-উবুল্লা)-এর প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং পারস্যবাসী ও তথাকার অন্য সম্প্রদায়গুলির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করুন। এই নির্দেশ সম্বলিত পত্রের বাহক ছিলেন কা'ব ইবন ফিহর আল-কুরাশী (রা)। ইহা ছিল হিজরী ১২ সনের মুহাররাম মাসের ঘটনা। মহানবী (স)-এর বিদায় হজ্জে কা'ব ইব্‌ন ফিহর (রা) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০১, ক্রমিক নং ৭৪৩০; (২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৬খ, ৩৪২; (৩) আত-তাবারী, তা'রীখু'ল-উমাম ওয়া'ল-মুলূক, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২; (৪) ইব্ন খালদূন, তা'রীখ, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ. ৭৮।

লিয়াকত আলী

কা'ব ইব্ন মালিক (كعب بن مالك) ঃ (রা) মদীনার একজন কবি, কুনয়া আবূ 'আবদিল্লাহ অথবা আবূ 'আবদি'র-রাহমান; হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সমর্থক কবিগণের অন্যতম এবং আল-খাযরাজ (দ্র.) গোত্রের সালিম বংশের একজন আনসারী ছিলেন। তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন কথিত আছে তিনি হিজরী সনের পূর্বে সংঘটিত মদীনার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন ও দ্বিতীয় 'আকাবা (দ্র.)-য় যখন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আনুগাত্যের শপথ গ্রহণ করা হইতেছিল, তিনি তখন উহাতে শরীক ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক পরিচালিত পরবর্তী প্রায় সকল অভিযানেই অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় আঘাত পাইয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ওফাতের সংবাদের গুজব রটনার পর তিনিই প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কোন কোন বিবরণী মতে আসলাম এবং গিফার গোত্র হইতে সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। কোন এক কারণে ৯/৬৩০ সালের শরৎকালে পরিচালিত তাবূক অভিযানের সময় তিনি মদীনায় রহিয়া গিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ৯ম সূরা, ১১৭-১৮ আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আরও দুইজনের সহিত তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। জাহিলী যুগে গাস্সান গোত্রের সহিত তাঁহার কোন যোগাযোগ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যখন মুহাজিরগণ প্রথম মদীনায় আসেন তখন তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহর সহিত তাঁহার 'ভাই' সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে তিনি 'উছমান (রা)-কে খলীফা হিসাবে সমর্থন করিয়া খলীফা 'উছমানের দলভুক্ত (উছমানী) হিসাবে পরিচিত লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাহাদাত বরণে একটি শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন। এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া তিনি খলীফা 'আলী (রা)-র প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ৫০/৬৭০ অথবা ৫৩/৬৭৩ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার বংশের অনেকেই কবিত্ব প্রতিভার জন্য খ্যাত ছিলেন। জনমত গঠনের ব্যাপারে কবিদের গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ (স) অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং সূরা ২৬ ঃ ২২৭ (দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর) অনুসারে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) (দ্র.) এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) (দ্র.)-এর সহিত কা'বকেও তাঁহার একজন কবি হিসাবে গণ্য করিতেন। কা'ব-এর অধিকাংশ কবিতা ইব্ন হিশাম-এর সীরা-তে পাওয়া যায়। এই সব কবিতার যথার্থতা বিতর্কিত হইলেও অধিকাংশই আসল বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার কাব্যে অনুভূতির ভাবাবেগ কবি হাস্সান-এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে ইসলামের প্রতি প্রকৃত গভীর আগ্রহ রহিয়াছে। কবিতাগুলি বদর, উহুদ, বি'র মা'উনা, বানু'ন-নাদীর, খন্দক, খায়বার, মু'তা এবং অন্যান্য অভিযানের উপর রচিত। কা'ব সম্পর্কিত ঘটনাবলী তাঁহার পরিবার কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদু'র-রাহমান এবং অন্যান্য বংশধরকে ইব্ন হিশাম ও আল-ওয়াকিদী উৎস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দীওয়ান, সম্পা. সামি মুহাম্মাদ আল-আনি, বাগদাদ ১৯৬৬ খৃ. ; (২) ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৯০, ২৯৪-৩০১, ৩১০, ৩৪৫, ৫৭৪ প. ৮৯৬, ৯০৮-১৩, ৫২০-৮৭১ স্থা., (কবিতাগুলি) ; (৩) আত-তাবারী, ১খ, ১২১৭-২৫, ১৪০৬, ১৬৯৫, ১৭০৫, ৩০৪৯, ৩০৭০ ; (৪) আল-ওয়াকিদী (সম্পা. Marsden Jones), ২৩৫ প., ২৪৯, ২৫১, ২৬০, ২৯৩, ৩৩৫, ৩৮৯, ৪৪৭, ৪৪৬, ৮০২, ৯৭৩, ৯৯৬ প., ১০৪৯-৫৬, ১০৭৩, ১০৭৫ ; (৫) আল-আগানী, ১৫ খ, ২৬-৩৩ ; (৬) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ২৯৫-৭ ; (৭) ইব্ন রুসতা, ২২৪; (৮) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, ৪খ, ২৪৭ ; (৯) আল-মুবাররাদ, কামিল, ৬৬ ; (১০) 'আবদু'ল-'আযীয আর-রীফা'ঈ, কা'ব ইব্ন মালিক আস-সাহাবী আল-আদীব, রিয়াদ ১৯৭১ খৃ.।

W. Montgomery Watt (E. I.[2])/আ. র. মামুন

কা'ব ইব্ন মুররা আল-বাহ্যী (كعب بن مرة البهزى) ঃ (রা) তাঁহাকে মুররা ইব্ন কা'ব আল-বাহ্যীও বলা হইয়া থাকে। তিনি বানূ সালামা গোত্রের লোক ছিলেন। প্রথম জীবনে বস্রা শহরে বসবাস করেন এবং পরে উরদুন (জর্দান)-এর স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। কা'ব সাহাবী ছিলেন, পঞ্চাশ হিজরীর পর শ্যাম (সিরিয়া) দেশে ইনতিকাল করেন। ইব্নু'স-সাকান বলেন যে, অধিকাংশের মতে তিনি কা'ব ইব্ন মুররা হিসাবেই পরিচিত। আবূ 'উমার বলেন যে, কা'ব ইব্ন মুররা (রা) নামই অধিক সঠিক। আল-বাগাবী বলেন যে, তিনি বহু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আল-বাগাবী, সালিম ইব্ন আবিল-জাদ-এর সূত্রে শুরাহবীল ইব্নু'স-সামত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শুরাহবীল বলিয়াছেন, আমি কা'ব ইব্ন মুররাকে বলিলাম, হে কা'ব! আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে কিছু হাদীছ বর্ণনা করুন। কা'ব বলিলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি মুদার (مضر) গোত্রের জন্য মহান আল্লাহর নিকট পানির জন্য দু'আ করুন। তিনি তখন দুই হাত তুলিয়া আল্লাহর নিকট পানির জন্য দু'আ' করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন। ইহার পর ঐ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবার আসিল এবং অধিক বৃষ্টি হওয়ার কারণে ফরিয়াদ করিল। তাহারা বলিল ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! অধিক বৃষ্টির কারণে আমাদের বহু বাড়ীঘর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আবী খায়ছামা বলেন যে, উপরোক্ত নামের দুই ব্যক্তি ছিলেন। একজন বসরা শহরে বাস করিতেন এবং বসরার অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট হইতে বহু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্যাম (সিরিয়া) দেশে বাস করিতেন। তিনি নবী কারীম (স)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আবু'ল-আশ্'আছ আস্-সান'আনী (ابو الاشعث الصنعانى) এবং শুরাহবীল ইব্নু'স-সামাত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। সালিম ইব্ন আবি'ল-জাদ হইতে বর্ণিত আছে যে, শুরাহবীল একবার কা'বকে বলিলেন ঃ হে কা'ব ইব্ন মুররা ! আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন। কা'ব বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ

(স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী জীবনাদর্শের মধ্যে থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিয়ামতের ময়দানে সে আল্লাহর নিকট হইতে একটি নূর (আলো) লাভ করিবে। তিরমিযী, ইব্ন মাজা এবং নাসা'ঈ এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছের কোন গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 'আম্র ইব্ন মুর্‌রা, সালিম ইব্ন আবি'ল-জা'দ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শুরাহবীল ইবনুস-সামাত কা'বকে বলিলেন ঃ হে কা'ব ইব্ন মুররা ! মুদার গোত্র সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শুনিয়াছেন। কা'ব বলিলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! মহান আল্লাহ আপনাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, অনেক ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন এবং আপনার সমস্ত 'আমল কবুল করিয়া লইয়াছেন ; অথচ আপনার জাতি (দুর্ভিক্ষে) ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আপনি তাহাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ' করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিলেন, "হে আল্লাহ ! আমাকে এবং আমার জাতির জন্য এমনভাবে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করুন, যাহাতে যমীনের ফসল ভাল হয় এবং আমার জাতির কোন ক্ষতি না হয়।" এইভাবে কূফা ও শাম দেশের লোকেরা কা'ব হইতে বহু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ. পৃ. ৩০২, নং ৭৪৩৪; (২) ইবনু'ল -আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, পৃ. ২৮৪; (৩) ইব্ন সা'দ, তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৭খ, পৃ. ৪১৪; (৪) ইব্ন হাজার, তাকরীবু'ত-তাহযীব, ২খ, পৃ. ১৩৫।

এ . এফ. এম. হোসাইন আহমদ

কা'ব ইব্ন যায়দ (كعب بن زيد) ঃ (রা) আল-আনসারী, একজন সাহাবী। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের শাখা আন নাজ্জার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণিক সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না। তাঁহার পিতার নাম যায়দ ইব্ন কায়স এবং মাতার নাম ছিল লায়লা বিন্ত 'আবদিল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা। কা'ব (রা)-র বংশ তালিকা হইল, কা'ব ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আবদি'ল-আশহাল ইব্ন হারিছ ইব্ন দীনার ইবনি'ন-নাজ্জার।

সাফার ৪ হি. সালে রাসূলুল্লাহ (সা) 'আমির ইব্ন মালিক আবূ বারা-র আবেদনক্রমে নাজদবাসীকে ইসলামের বাণী প্রচার করার জন্য ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবী ও কারীর যেই দলটি প্রেরণ করেন, কা'ব ইব্ন যায়দ (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ইহা ছিল পবিত্র, ধর্মনিষ্ঠ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গের একটি দল। তাহারা দিনের বেলায় জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন,সন্ধ্যায় উহা বিক্রয় করিয়া আসহাব সুফফা (দ্র.)-র জন্য খাবারের ব্যবস্থা করিতেন এবং রাত্রে কিছু অংশ কুরআন পাঠে ও তাহাজ্জুদের সালাতে কাটাইয়া দিতেন। তাঁহারা মক্কা ও 'উসফান-এর মধ্যবর্তী বি'র মা'উনা নামক স্থানে পৌঁছিলে বানূ 'আমির গোত্রের সর্দার 'আমির ইব্ন তুফায়ল-এর নির্দেশে সকলকে হত্যা করা হয়, কেবলমাত্র কা'ব (রা) প্রাণে রক্ষা পান। আঘাতে আঘাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। তিনি বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, কিন্তু তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। কাফিররা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়। হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি অতি কষ্টে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন (সীরাতু'ল-মুসতাফা, ১খ, ৭৩৮-৩৯)। কা'ব (রা) বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যু'ল-কা'দা, ৫হি., খনদক যুদ্ধে শহীদ হন। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক -এর বর্ণনা মতে একটি গুপ্ত তীরের আঘাতে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে দিরার ইবনু'ল-খাত্তাব আল-ফিহ্‌রীর হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। 'আবদুল্লাহ নামে তাঁহার এক পুত্র এবং জামীলা নাম্নী এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁহাদের মাতা ছিলেন উম্মু'র-রিয়া' বিনত 'আয়দ 'আম্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫২১; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২১৬-৯৭, নং ৭৪১২; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৪খ., ২৪১; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বারর, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১৩১৭ হি., নং ২১৯২; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩১, নং ৩৮৮; (৬) যূসুফ কানধলাবী, হায়াতু'স-সাহাবা, লাহোর, তা. বি., ১খ, ৫২৭; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ. ৩খ, ৩২৪, ৪খ, ৭৩; (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি., ২খ, ২৬২, ৩খ, ১১০; (৯) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, ৭৩৮-৩৯, ৬১৬।

ড. আবদুল জলীল

কা'ব ইব্ন যুহায়র (كعب بن زهير) ঃ একজন আরব কবি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমসাময়িক। তিনি আল-মু'আল্লাকা-র অন্যতম কবি। যুহায়র ইব্ন সুল্‌মা (দ্র.)-র পুত্র এবং অতি অল্প-বয়সেই তিনি কবি প্রতিভার পরিচয় দেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুযায়না গোত্রভুক্ত হইলেও তিনি যুবয়ান গোত্রের সহিত বসবাস করিতেন এবং তায়্যি, কুরায়শ এবং খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার গোত্রের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বুজায়র হিজরী ৭ সালের অল্প পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কা'ব এই বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে প্রবল অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কিছু বিদ্রূপাত্মক শ্লোক রচনা করেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) সরকারীভাবে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে কা'ব-এর জন্য "পৃথিবী অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে" এবং তাঁহার ভাই বুজায়র-এর পরামর্শে তিনি বশ্যতা স্বীকার করার মনস্থ করেন। কোন পূর্বাভাষ ছাড়াই হি. ৯ সালে মদীনার মসজিদে, সেখানে হযরত মুহাম্মাদ (স) উপস্থিত ছিলেন, সশরীরে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে [মুহাম্মাদ (সা-কে] তাঁহার প্রখ্যাত কবিতা বানাত সু'আদ (সু'আদ অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে) আবৃত্তি করিয়া শুনান। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) য়ামান হইতে আনীত তাঁহার নিজের ডোরাকাটা চাঁদর ও তাঁহার বুরদা কবিকে উপহার দেন। এই বুরদা হইতেই আল-বুরদা নামটি আসিয়াছে এবং সেই কাসীদাটির জন্যও এই নামটি প্রযোজ্য [একই নাম আল-বূসীরী (দ্র.) কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে]।

বানাত সু'আদ-এ ধর্মীয় কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ইহা জাহিলী যুগের কবিতার ভাবাবেগ হইতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহা সাধারণ নীতি অনুসারে আরম্ভ করা হইয়াছে। এই ধরনের কবিতা রচনার এই রীতি এত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত যে, হাম্মাদ আর-রাবিয়া (দ্র.) একই ধরনের প্রারম্ভসম্পন্ন ৭০০ কবিতা জানেন বলিয়া গর্ব করিতেন। যাহা হউক, ইহা তৎকালীন প্রশংসাসূচক কবিতার অতি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত;

সম্প্রসারিত বিষয়বস্তু, গতানুগতিক পদসমষ্টি পুনরাবৃত্তি, আঙ্গিকে এবং শব্দসম্ভারে চিরাচরিত রচনার সহিত ইহা তুলনীয়। এই রচনাটিতে প্রথম/সপ্তম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের প্রচলিত প্রশংসাসূচক কবিতার অপরিহার্য উপাদানগুলির পরিচয় পাওয়া যায় (R. Blachire)। ইহা তাশতীর এবং তাখমীস আকারে বার বার লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষ্যকারগণের সংখ্যাও অনেক। অতি প্রসিদ্ধ হইলেন ছা'লাব, ইব্ন দুরায়দ, আত-তাবরীযী (সম্পা. F. Krenkow, in ZIMG, lxv, 241-79),ইব্ন হিশাম (সম্পা. Guidi, Leipzig 1871), ইব্ন হিজ্জা, আস-সুয়ূতী এবং আল-বাজূরী (V. Brockelmann, 1, 38-9, S I, 68-9)। Lette কর্তৃক ইহা প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয় (Leiden 1748) এবং পরবর্তীকালে ইহার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া G. Freytag (ল্যাটিন অনুবাদসহ, ১৮২৩ খৃ.) এবং T. Noldeke (Delectus, Berlin 1890, 110-4) কর্তৃক। R. Basset ফরাসী ভাষায় অনুবাদসহ এবং দুইটি অপ্রকাশিত ভাষ্য সহকারে একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন (আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ.)। পরিশেষে ইহা T. Kowalski কর্তৃক প্রকাশিত (Cracow 1950) কা'ব -এর দীওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহাতে রহিয়াছে কাব-এর ৩৩টি কবিতা ও খণ্ড কবিতা। কা'ব-এর দীওয়ান আ'স-সুককারীর ভাষ্যসহ 'আবদু'ল-'আযীয আল-মায়মানী কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে ও কায়রোর দারু'ল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কা'ব-এর মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না, কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন বাঁচিয়া ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। একটি বর্ণনা মতে তিনি ২৪/৬৪৪ সালে ইনতিকাল করেন (আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৩৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Basset, La Banat So'ad, 14-82, এবং উল্লিখিত গ্রন্থকারগণ ৯-১৩; (২) R. Blachire, HLA, ii. 270 ও গ্রন্থপঞ্জী; (৩) আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১৩৫-৭; (৪) দা. মা. ই., ১৭ খ, ৩১৭-১৮।

R. Basset (E.I.[2]) ও সম্পাদনা পরিষদ/আ. র. মামুন

কা'ব ইব্ন য়াসার ইব্ন দান্না (كعب بن يسار بن ضنة) ঃ (রা) ইব্ন রাবী'আ ইব্ন কায'আ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মাখযুম ইব্ন গালিব ইব্ন কাতীআ ইব্ন 'আব্স আল-'আবাসী। ইব্ন য়ূনুস বলিয়াছেন যে, কা'ব সাহাবী ছিলেন এবং মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মিসরের জরীপ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কা'ব মিসরের কাদী-র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আদ-দাহহাক ইব্ন শুরাহবীল-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা) কা'ব ইব্ন দান্না-কে মিসরের কাদী নিযুক্ত করিবার জন্য 'আমর ইবনু'ল-আস (রা)-কে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কা'ব কাদী-র পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন ঃ না, ইহা হইবে না, জাহিলিয়্যা (অজ্ঞতা) হইতে আল্লাহ যাহাকে মুক্তি দিয়াছেন তাহার পক্ষে উহাতে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। ইহা শুনিয়া 'আমর ইবনু'ল-'আস তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র বলেন যে, ইসলামী শাসন আমলে কা'বই মিসরের প্রথম কাদী। ইসলাম-পূর্ব যুগেও তিনি কাদী ছিলেন। 'আবদু'র-রাহমান ইবনু'স-সা'ইব ইব্ন 'উয়ায়না ইব্নি'স-সা'ইদ ইব্ন কা'ব ইব্ন দান্না-র সূত্রে আবূ 'উমার আল-কিনদী তাঁহাকে (কা'ব) মিসরের কাদীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'আবদু'র-রাহমান বলেন ঃ আমার দাদা দুই মাস মিসরের কাদী ছিলেন। ইহার পর তাঁহাকে (কা'ব) পদচ্যুত করিবার জন্য 'উমার (রা)-র চিঠি আসে। আবূ নু'আয়ম তাঁহাকে (কা'ব) সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৩, নং ৭৪৩৫; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪৯।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

কা'ব ইব্ন সুলায়ম (كعب بن سليم) ঃ (রা) ইব্ন আসাদ আল-কুরাজী আল-আওসী, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বানূ কুরায়জা গোত্রীর য়াহূদী ছিলেন। তাঁহার গোত্র বানূ কুরায়জা ছিল আওস গোত্রের সহিত মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ। এই কারণেই তিনি আল-কুরাজী ও আল-আওসী উভয় নিসবায় পরিচিত। বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আলিম মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব তাঁহারই পুত্র। চুক্তি ভঙ্গকারী বানূ কুরায়জা গোত্রের যেসব য়াহূদী মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল, কা'ব ইব্ন সুলায়ম তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নাবালেগ হওয়ার কারণে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার হাদীছ বর্ণনা সম্পর্কে ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র বলেন, "তাঁহার কোন রিওয়ায়াত আমার জানা নাই।" কিন্তু ইব্ন হিব্বান নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করেন বলেন যে, তিনি হযরত 'আলী (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যদিকে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মানদা কা'ব ইব্ন সুলায়ম (রা)-এর জীবন বৃত্তান্তে তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু আবূ নু'আয়ম ইব্ন মানদার ঐ উক্তিকে ভুল আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইব্ন মানদার বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। কেননা তিনি একই হাদীছ 'আব্দু'র-রাহমান আল-খাতমীর জীবন বৃত্তান্তেও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৭৯, নং ৭৪১৪; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বাররর, আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবা, ৩খ-এর হাশিয়া, পৃ. ২৯৬; (৬) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবী, উর্দূ অনু, লখনৌ ১৩২৭ হি., ৭খ, ৩২৮।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কা'ব ইবনু'ল-আশরাফ (كعب بن الاشرف) ঃ মদীনা শরীফে হযরত নবী কারীম (স)-এর জনৈক শত্রু। সে বানূ নাদীর নামক একটি য়াহূদী গোত্রভুক্ত ছিল, অন্যমতে নাবহানী তায়্যি' গোত্রীয় ছিল। কারণ তাহার মাতা বানূ নাদীর বংশীয় ছিল। অন্য মতে সে "নাবহানী তায়্যি" গোত্রীয় ছিল। কারণ তাঁহার পিতা ঐ নাবহানী তায়্যি' বংশীয় একজন আরব ছিল। সে য়াহূদীদের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিল (দ্র. ইব্ন হিশাম, নিবন্ধ সায়্যিদু'ল-আহবার, পৃ. ৬৫৯)। তাঁহাকে পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিতে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যদিও একটি কাব্যে তাঁহাকে "সায়্যিদু'ল-আহবার" বলা হইয়াছে (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৫৯)। তাহাকে য়াহূদী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও যোগ্য কবিগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছিল। আরবদেশে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিতাবু'ল আগানী গ্রন্থে তাহাকে "ফাহলুন ফাসীহী (فحل فصيحى = অলংকার ও মার্জিতভাষী) বলা হইয়াছে। সে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। বদর

যুদ্ধে কুরায়শদের শিক্ষণীয় পরাজয়ের পর বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে সে কুরায়শদিগকে সান্ত্বনা ও উত্তেজিত করিবার জন্য মক্কা গমন করে। সেখানে বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে শোকগাথা রচনা করিয়া তাহাদের শোকাভিভূত আত্মীয়-স্বজনদেরকে উত্তেজিত করিয়া তুলে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কুরায়শদিগকে উত্তেজিত করে। তখন আবূ সুফয়ান হারাম শারীফের পর্দা ধরিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করে (দ্র. আদ-দিয়ারবাকরী, তা'রীখু'ল-খামীস, পৃ. ৫১৭)। মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর সে হযরত নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে কুৎসাব্যঞ্জক কবিতা রচনা করিয়া জনগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকে (দ্র. আবূ দাঊদ, ২খ, কিতাবু'ল-খারাজ ওয়া'ল-ইমারা)। এমন কি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রও করিয়াছিল (দ্র. ইব্‌ন হাজার, ফাতহু'ল-বারী, ৭খ, ২৫৯)। সে মুসলিম মহিলাগণকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রণয় সংক্রান্ত মিথ্যা অপবাদ দিয়া কবিতা লিখিয়াছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্র সীমা অতিক্রম করিলে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাহার উপর স্বীয় অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করিলেন এবং এই ব্যক্তির ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যখন কোন ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) তাঁহার অনুমতিক্রমে এবং আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শে তাহাকে (কা'বকে) হত্যা করেন (আয-যারকানী, ২খ, পৃ. ১২; সাহীহ বুখারী, কিতাবু'ল-মাগাযী, বাব কাতল কা'ব)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) এই হত্যাকাণ্ডে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্য চার ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে কা'ব ইব্‌ন আশরাফ-এর দুধভাই আবূ না'ইলা ইব্‌ন সালামা-ও ছিলেন। তাঁহারা সকলে একত্রে চাঁদনী রাত্রিতে কা'বকে তাহার দুর্গ হইতে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করেন। আল-ওয়াকিদী এই হত্যার তারিখ ১৪ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৩/৪ সেপ্টেম্বর, ৬২৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুআম্মার-এ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অভিযান ১২-২২ রাবী', ১/২-১২ সেপ্টে.) সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত তারিখের সহিত উক্ত তারিখের বিরোধ রহিয়াছে। কারণ তাহার হত্যাকাণ্ডের সময় রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং আল-হালাবী-র বর্ণনা অনুযায়ী কা'ব-এর হত্যাকাণ্ড বানূ নাদীর যুদ্ধের (রাবী'-১, ৪/আগস্ট ৬২৫) অল্প কিছুদিন পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ ঐ সময় বানূ নাদীর গোত্র কা'ব-এর হত্যার শোকানুষ্ঠান করিতেছে (ইব্‌ন হিশাম, ৬৫৮; ৬৫৯)। মদীনা শারীফে কা'ব-এর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল আলোচনায় উদ্ধৃত সূত্রগুলি ছাড়া (১) ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, ৫৪৮-৫৫১, ৬৫৭-৬৬৯; (২) আল-ওয়াকিদী, অনু. Wellhousen, ৯৫-৯৯ [সম্পা. Marsden Jones, ১২১ প., ১৮৪-১৯২]; (৩) আত-তাবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, পৃ. ১৩৬৮-১৩৭২ ; (৪) আল-হালাবী, ইনসানু'ল-'উয়ূন, কায়রো ১৩০৮ হি., ৩খ, পৃ. ১৭৬-১৭৯; (৫) আল-মাস'ঊদী, আত-তানবীহ, সম্পা. de Goeje, পৃ. ২৪৩; (৬) আল-আগানী, ১৯খ, ১০৬ প.; (৭) Caetani, Annali dell' Islam, ১খ, ৫৩৪-৫৩৭; (৮) Margoliouth, সং, ৩, পৃ. ২৮৬ প.; (৯) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Leiden ১৯০৮ খৃ. পৃ. ১৫২-১৫৫; (১০) R. Leszynsky, Die Juden in Arabien zur Zeit Muhammeds, বার্লিন ১৯১০ খৃ., ৬৬-৬৯; (১১) Fr. Buhl, Das Leben Muhmmeds, Leipzig ১৯৩০ খৃ., পৃ. ২৫০ প; (১২) M. J. Kister, The market of the Prophet, in JESHO, ৮খ, (১৯৬৫ খৃ.), পৃ. ২৭২-২৭৬; (১৩) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, আ'জমগড় সং. ৬, ১খ, পৃ. ৪০৫ প.; (১৪) আল-বুখারী, কায়রোতে মুদ্রিত, ৩খ, পৃ. ১২; (১৫) E. I.^{2}. 4/315।

FR. Buhl (দা. মা. ই.) এ. এফ. এন. হোসাইন আহমদ

কাব ইবনুল আশরাফ (كعب بن الاشرف) ঃ য়াহূদী নেতা, মূলত বনূ তায় গোত্রের শাখা বনূ নাবহানের অন্তর্ভুক্ত। তাহার মাতা বনূ নাযীর গোত্রের (তারীখুল উমাম ওয়াল- মুলূক, ২খ., পৃ. ৪৮৮)। তাহার পিতা জাহিলী যুগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মদীনায় আসে এবং বনূ নাযীর গোত্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে : এই গোত্রে সে সম্মান লাভ করে এবং উকায়লা বিন্‌ত আবিল হুকায়ককে বিবাহ করে। তাহাদের ঘরে কা'বের জন্ম হয়। কা'ব ছিল দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, হৃষ্টপুষ্ট ও বড় আকৃতির মাথার অধিকারী (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৬৯)।

কা'ব ইবনুল আশরাফ একজন বড় কবি ছিল। সে তাহার প্রতিভা শান্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করিত। সে ন্যায় ও শান্তির প্রতীক হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে সর্বদা কুৎসা রটনা করিত। সে মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদেরকে ক্ষেপাইয়া তুলিত (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৬৫)। ইহা ছাড়া সে মুসলিম নারীদের রূপ-যৌবন উল্লেখ করিয়া প্রণয়কাব্য রচনা করিত এবং মুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন করিত। সে যেসব নারীকে নিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিল তন্মধ্যে আব্বাস ইবনুন আবদিল মুত্তালিব (রা)-এর স্ত্রী উম্মুল ফাদল (রা) অন্যতম (আর-রাওদুল উনুফ, ৫খ., পৃ. ৪১৩)। কা'ব ইবনুল আশরাফ উম্মুল ফাদ্‌ল বিনতুল হারিছ (রা) সম্পর্কে জঘন্য অশ্লীল ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলে ঃ

ار احِلَ انت لمْ تحْلل بِمَنقبةٍ وتارك أنت أمَّ الفضل بالحرما

صنفر اءُ رادِعَةَ لوْ تعْصَرُ انعَصَرَت مِن ذِي اقوارير والحِناء والكتم

১. "(সে নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিল), তুমি কোন মর্যাদা অর্জন না করিয়াই চলিয়া যাইবে ? আর উম্মুল ফাললকে হারামে রাখিয়াই চলিয়া যাইবে ?

২. অথচ সেই নারী গৌরবর্ণের ও যৌনমিলন পিয়াসী। যদি তাহাকে (শৃঙ্গারে) প্রলুব্ধ করা হয়, তবে সে মাদকাসক্ত এবং মেহেদী ও কলপ ব্যবহারকারীর হাতে নিংড়িত হইতে সম্মত হয়"।

একবার কা'ব ইবনুল আশরাফ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রতারণামূলক দাওয়াত দেয়। অপরদিকে সে কতিপয় দুরাচার লোককে এই বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহারা যেন নবী (স)-কে আগমন করামাত্র হত্যা করে। নবী (স) যথাসময়ে কয়েকজন সাহাবীসহ আগমন করিয়া উপবেশন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জিবরাঈল আমীন আসিয়া অতি দুরাচার কা'ব ইব্‌নুল আশরাফের দুরভিসন্ধির কথা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে উঠিয়া জিবরাঈল (আ)-এর সহায়তায় বাহিরে চলিয়া আসিলেন। দুরাচারেরা তাঁহাকে না পাইয়া চলিয়া গেল (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৭০)।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুমতিতে মদীনায় এই সুসংবাদ প্রচার করেন হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)। এ সুসংবাদ মদীনায় পৌঁছার পর মুসলমানদের চিরশত্রু কা'ব ইব্‌নুল আশরাফ দুঃখে ও ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। সে বলে, যদি এই সংবাদ সত্য হয় যে, মক্কার প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছে এবং কতিপয় নেতা বন্দী হইয়াছে, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূগর্ভই উত্তম। অর্থাৎ জীবিত থাকা হইতে মৃত্যুই শ্রেয় (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৪৮৮)। তাহা হইলে এই অবমাননাকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইত না। এই খবর সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবার পর বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কা'ব ইব্‌নুল আশরাফ তাহার কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়া মক্কায় রওয়ানা হয়। সে মক্কায় আসিয়া মুত্তালিব ইব্‌ন আবী ওয়াদা'আ ইব্‌ন দুবায়রাহ আস-সাহমীর বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করে। তথায় মুত্তালিবের স্ত্রী ছিল 'আতিকা বিন্‌ত আসীদ ইব্‌ন আবিল 'ঈসা ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন 'আব্‌দ শামস। তাহারা কা'বকে খুবই যত্নসহ আপ্যায়ন করে। সে বদরে নিহত মুশরিকদের উদ্দেশ্যে কিছু শোকগাঁথা রচনা করে (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৭)। সে কুরায়শদের জন্য এই শোকগাঁথা রচনা করিল যাহার শুরু নিম্নরূপ ঃ

طحنت رحى بدر لمهلك اهله ولمثل بدر تستهل وتدمع

১. "বদর যুদ্ধের যাঁতা বদরের যোদ্ধাদেরকে পেষণ করিয়াছে। (বিষয়টি বড়ই কষ্টের; তাই) বদর যুদ্ধের মত (শোককাতর) বিষয়ে তুমি অশ্রু বর্ষণ করিতেছ এবং চোখের পানি বিসর্জন দিতেছ।

২. জননেতৃবৃন্দ বদর কূপের পার্শ্বে নিহত হইয়াছে। তোমরা ইহাকে অসম্ভব মনে করিও না। নিশ্চয় রাজা-বাদশাহগণও বিপর্যস্ত হইয়া থাকে" (কিতাবুল মাগাযী, ১খ, ১৮৫)।

কা'ব ইব্‌নুল আশরাফ মক্কায় পৌঁছিয়া স্বরচিত এই গাঁথাগুলি পাঠ করিয়া নিজেও ক্রন্দন করিত এবং অন্যকেও ক্রন্দন করাইত, আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করিত। সে একদিন কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে কা'বা প্রাঙ্গনে নিয়া আসে। সে সকলকে বায়তুল্লাহর পর্দা স্পর্শ করাইয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করায় (ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ২৭০)।

একদিন মক্কায় কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান কা'ব ইব্‌নুল আশরাফকে বলে, আমি তোমাকে শপথ দিয়া একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আসমানী কিতাব পাঠ কর, আর আমরা উম্মী। তুমি সঠিক করিয়া বল, আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের ধর্ম অধিক প্রিয়, না মুহাম্মাদের দীন ? তোমার দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে কে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং সত্যের অধিক নিকটবর্তী ? আমরা আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারতকারীদেরকে উট যবেহ করিয়া খাওয়াই এবং পানি পান করাই। ইহা ছাড়া সর্বদা যথাযথভাবে মেহমানদারী করি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি এবং আল্লাহ্‌র ঘরের সেবা করি। অথচ মুহাম্মাদ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন কা'ব ইব্‌নুল আশরাফ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমরাই সঠিক পথে রহিয়াছ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াত নাযিল হয় ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا.

"তুমি কি তাহাদেরকে দেখ নাই যাহাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা গায়রুল্লাহ ও তাগূতে (দেবদেবী) বিশ্বাস করে? তাহারা কাফিরদেরকে বলে, ইহাদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর" (৪ ঃ ৫১; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৮)।

কা'ব ইব্‌নুল আশরাফ মক্কার সকলের নিকট হইতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৮)।

নবী (স) কা'বের মদীনায় আগমনের সংবাদ শুনিয়া বলেন, হে আল্লাহ্ ! ইব্‌নুল আশরাফের কবিতা ও অকল্যাণের ঘোষণার ব্যাপারে আপনি আমার জন্য যথেষ্ট হউন, যেরূপ আপনি চাহেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮৭)।

কা'বের দুষ্কর্মগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল। এই প্রসঙ্গে মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন,

(১) বদর যুদ্ধের পূর্ব হইতেই মক্কার কুরায়শ ও মদীনার য়াহূদীদের মধ্যে যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কা'ব তাহার প্রধান নায়ক।

(২) বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়লাভের সংবাদ শ্রবণ করামাত্র নরাধম কা'ব ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যে ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত হইয়াছেন।

(৩) কা'ব বদর যুদ্ধের পর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করত প্রধান প্রধান য়াহূদী দলপতি ও পুরোহিতদেরকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় গমন করে এবং মদীনা আক্রমণপূর্বক বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরায়শদেরকে উত্তেজিত করিতে থাকে।

(৪) সে মক্কায় গিয়া প্রত্যেক নিহত কুরায়শের নামে এক একটি উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা রচনা করে এবং কুরায়শদের প্রতিহিংসাবৃত্তিকে শানিত করিয়া তোলে।

(৫) সে মক্কায় গিয়া কুরায়শদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে থাকে যে, মুহাম্মাদ একেশ্বরবাদী হইলেও কুরায়শদের পৌত্তলিকতার ধর্ম তাহার ধর্ম অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

(৬) কা'ব স্বজাতীয় প্রধান পুরোহিতদেরকে সঙ্গে করিয়া কা'বায় কুরায়শ দলপতিগণের সহিত মিলিত হয়। সেখানে উভয় দল প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করিবে।

(৭) ইহার পর আবূ সুফয়ানও গুপ্তভাবে মদীনায় আগমন করে এবং এই সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি-পরামর্শ স্থির করিয়া যায়।

(৮) কা'ব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের সহিত ষড়যন্ত্র পাকাইয়া এবং তাহাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিল।

(৯) মদীনায় সমস্ত য়াহূদী গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সে প্রথম হইতে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল। এমনকি এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমস্ত পুরোহিত ও যাজককে নিজের অনুগত করিয়াছিল।

(১০) সে নানা প্রকার কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশ্যভাবে মহানবী (স)-এর ও মুসলমানদের নামে নানারূপ গ্লানিকর কথা প্রচার করিত। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর সে মুসলিম পুরবাসী মহিলাগণের নামেও ঐ প্রকার জঘন্য কবিতা রচনা করিতে এবং তাঁহাদেরকে নানা প্রকারে নির্যাতিত করিতে আরম্ভ করিল।

(১১) মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার জন্য অভিসন্ধি আঁটিয়া তাঁহাদেরকে নিমন্ত্রণের অছিলায় রাত্রিকালে স্ব-গৃহে আহ্বান করিল। এদিকে হত্যার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া রহিয়াছে। য়াহূদী পল্লীতে উপস্থিত হইয়া হযরত এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন এবং অতি সঙ্গোপনে কা'বের বাটী হইতে সরিয়া পড়েন।

(১২) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কা'ব জন্মভূমির স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে এবং তাহাকে চিরকালের জন্য বিদেশী কুরায়শদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

এখানে কা'বের যে সকল নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে কিরূপ মারাত্মক, পাঠকগণ তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। এহেন নরাধমকে এই অবস্থায় আর কিছুদিন ছাড়িয়া দিলে সে যে হযরতকে ও মুসলিমদিগ্‌কে ভবিষ্যতে কি প্রকার বিপন্ন করিতে পারিত, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। সুতরাং এহেন কা'বের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া যে সর্বতোভাবে সঙ্গত ও সমীচীন হইয়াছিল, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে (মোস্তফা চরিত, পৃ. ৪৬২-৪৬৩)।

এতদসত্ত্বেও কতিপয় পাশ্চাত্য লেখক কর্তৃক কা'ব হত্যাকে "গুপ্ত হত্যা" আখ্যায়িত করা বিদ্বেষমূলক প্রচারণামাত্র। মাওলানা আকরাম খাঁর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, "স্যার উইলিয়াম মূয়র প্রমুখ খ্রিস্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে তাহাদিগের অভ্যাসমত নানা প্রকার প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদিগের খাতিরে নিম্নে একজন ইংরেজ লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

মিঃ স্ট্যানলি লেনপুল মিঃ E. W. Larse কৃত Seletion form the Koran নামক পুস্তকের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেনঃ

"The execution of the half dozen marked Jews is generally called assassination, because a Moslem was sent secretly to kill each of the criminals. The reson is almost too obvious to need explanation. There were no police or law courts, at Madina; some one of the followers of Muhammad must therefore be the exeecuter of the sentence of death, and it was better it should be done quitely, as the executing of a man openly before his clan would have caused a brawl and more bloodshed and Retaliation, till the whole city had become mixed up in the quarrel. If secret assassination is the word for such deeds, secret assassination was necessary part of the internal government of Madina. The men must be killed, and best in the way. In saying this I assume that Muhammad was cognisant of the deed, and that it was not merely case of private vengeance; but in several instances the evidence that traces these executions to Muhammad's order is either entirely wanting or is too doubtful to calim our credence." (মোস্তফা চরিত, ৫৭ নং পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪২৮-৯)।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কা'ব ইবনুল আশরাফকে হত্যা করিবার জন্য তোমাদের মধ্যে কে আছ ? সে তাহার কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দিয়াছে এবং মুশরিকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। তখন কা'ব ইবনুল আশরাফের ভগিনিপুত্র (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৭১) মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি সক্ষম হইলে কর। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) চলিয়া গেলেন। তিনি এ বিষয়ে চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পানাহার বর্জন করিলেন। এইভাবে তিনদিন গত হইল। নবী (স) এই খবর অবগত হওয়ামাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি পানাহার ত্যাগ করিলে কেন ? উত্তরে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিয়াছি। এখন তাহা পূর্ণ করিতে পারিব কিনা বুঝিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার দায়িত্ব হইল চেষ্টা করা। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) পুনরায় বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন কিছু অস্পষ্ট, রহস্যময় ও দ্ব্যর্থবোধক কথা বলার অনুমতি দিন, যাহা শুনিয়া সে খুশী হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা'ব ইবনুল আশরাফের দুধভাই বনূ আবদিল আশহাল গোত্রের আবূ নাইলা সিলকান ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াক্শ, বনূ আবদিল আশহালের 'আব্বাদ ইব্ন বিশর ইব্ন ওয়াক্শ, এই গোত্রেরই হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন মু'আয এবং বনূ হারিছা গোত্রের আবূ 'আব্স ইব্ন জাব্র (রা) প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সকলে অতি উদ্দীপনা সহকারে সম্মিলিতভাবে তাহাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ৮)। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) তাঁহার সঙ্গীদেরকে নিয়া কা'ব ইবনুল আশরাফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুমতি গ্রহণের জন্য গমন করেন। নবী (স) তাঁহাদেরকে বাকীউল গারকাদ পর্যন্ত আগাইয়া দেন এবং বলেন, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। হে আল্লাহ্ ! আপনি তাহাদের সাহায্য করুন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৭০)।

তাঁহারা কা'ব ইবনুল আশরাফের সহিত মিলিত হন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে কা'বকে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলেন, এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ স.) আমাদেরকে সঙ্কটে নিপতিত করিয়াছেন। তিনি দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করার জন্য আমাদের কাছে সাদাকা ও যাকাতের টাকা প্রার্থনা করেন। অথচ আমাদের নিকট নিজেদের আহার্যই নাই (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৭০)। আমরা এখন আপনার নিকট ঋণ নেওয়ার জন্য আসিয়াছি। কা'ব বলিল, এখনও ঢের বাকি। আরও কিছুদিন পর তোমরা তাহার উপর পুরাপুরি বিরক্ত হইয়া যাইবে। ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, আমরা তাঁহার অনুসারী হইয়া গিয়াছি। এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করিতেছি না। পরিণামের অপেক্ষায় আছি।

আমাদের প্রার্থনা, আপনি কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমাদেরকে ঋণস্বরূপ দিবেন। কা'ব বলিল, উত্তম ! তবে তোমরা কোন কিছু আমার

নিকট গচ্ছিত রাখ। আগন্তুকগণ বলিলেন, আপনি কী গচ্ছিত রাখিতে চাহিতেছেন ? চরিত্রহীন কা'ব ইবনুল আশরাফ বলিল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে রাখ। তাহারা বলিলেন, স্ত্রীদেরকে কীভাবে রাখিব, ইহা তো আত্মমর্যাদায় বাঁধে। ইহা ছাড়া আপনি অত্যন্ত সুন্দর, সুদর্শন ও নওজোয়ান পুরুষ। কা'ব বলিল, তোমাদের পুত্রদেরকে রাখ। তাঁহারা বলিলেন, ইহা হইবে সারা জীবনের জন্য লজ্জাকর ঘটনা। সকলে আমাদের সন্তানদেরকে অপমানিত করিয়া বলিবে, তোমরা তো এরূপ নিম্নপর্যায়ের লোক যে, দুই-তিন সের খাদ্যের জন্য তোমাদেরকে গচ্ছিত রাখা হয়। আপনি তো অবগত আছেন, আমাদের অস্ত্রের কত প্রয়োজন ! তৎসত্ত্বেও আমরা আমাদের অস্ত্রসস্ত্র আপনার নিটক রাখিতে চাহিতেছি।

কা'ব তাহা মনজুর করিল। স্থির হইল, তাঁহারা রজনীযোগে আসিয়া হাতিয়ার রাখিয়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইবেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহারা রাত্রিকালে আসিলেন। কা'ব ইবনুল আশরাফের দুর্গের সম্মুখে আসিয়া তাঁহারা আওয়ায দিলেন। কা'ব দুর্গ হইতে অবতরণের ইচ্ছা করিল। তাহার স্ত্রী তাহার বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া বলিল, কোথায় গমন করিতেছ। তুমি যোদ্ধা। তোমার ন্যায় ব্যক্তির এরূপ সময় অবতরণ করা সঙ্গত নহে। ইবনুল আশরাফ বলিল, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা এবং আমার দুধ ভাই আবূ নাইলা আসিয়াছে। অন্য কেহ নহে। আমি নিদ্রিত জানিলে তাহারা জাগাইত না। তুমি চিন্তা করিও না। স্ত্রী বলিল, এই আওয়ায হইতে আমি রক্ত ঝরার গন্ধ পাইতেছি। কা'ব ইব্নুল আশরাফ বলিল, ভদ্রলোকদেরকে যদি নিশীথকালে বর্শা দ্বারা আঘাত করিতে ডাকা হয়, তবে সেখানেও যাওয়া চাই।

ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) তাঁহার সঙ্গীদেরকে বলিলেন, কা'ব আগমন করিলে আমি তাহার চুলের ঘ্রাণ লইব। তোমরা যখন দেখিবে, আমি তাহার কেশগুচ্ছ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ তোমরা তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। কা'ব ইবনুল আশরাফ যখন নিম্নে অবতরণ করিল, তখন তাহার সারা শরীর হইতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, অদ্যকার মত সুঘ্রাণ আমি জীবনে কখনও পাই নাই। কা'ব বলিল, আমার নিকটে আরবের সর্বাধিক সুন্দরী ও সুবাসিনী নারী রহিয়াছে।

ইব্ন মাসলামা (রা) বলিলেন, আপনি কি আমাকে আপনার খুশবুযুক্ত কেশরাজির ঘ্রাণ নেওয়ার অনুমতি দান করিবেন ? কা'ব বলিল, অবশ্যই। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) অগ্রসর হইয়া নিজেও শুঁকিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও শুঁকাইলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি পুনরায় ঘ্রাণ লওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করিলেন। কা'ব ইব্নুল আশরাফ বলিল, প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ কর। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) উঠিয়া খুশ্বু গ্রহণে মশগুল হইয়া গেলেন। এইবার তিনি তাহার কেশরাজি দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্বক সঙ্গীদেরকে বলিলেন, আল্লাহ্র শত্রুকে হত্যা কর। সহসা সকলে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন (সাহীহ বুখারী, ২খ., কিতাবুল মাগাযী, হাদীছ নং ৮০)। তৃতীয় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের চতুর্দশ রজনীতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৮৯)।

তরবারির প্রথম আঘাতে কা'ব সজোরে চীৎকার করিয়া ওঠে। তাহার স্ত্রী উচ্চ কণ্ঠস্বরে দুইবার বলিল, হে কুরায়যা ও নাযীর গোত্রের লোকেরা (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৭২)। য়াহূদীরা এই ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনিয়া একত্র হইয়া মুসলিমদেরকে ধাওয়া করে। সাহাবীগণ ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াইতে থাকেন। ফলে য়াহূদীরা তাঁহাদেরকে ধরিতে সক্ষম হয় নাই। হারিস ইব্ন আওস (রা)-এর শরীরে সঙ্গীদের কাহারও তরবারির অগ্রভাগের আঘাত লাগে। এই আঘাত হইতে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক স্থানে আসিয়া সাহাবী হারিস ইব্ন আওস (রা) চলিতে অক্ষম হইয়া গেলেন। অবশিষ্ট চারজন সাহাবী অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহাকে না দেখিয়া পুনরায় পিছনে আসিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন (উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৩)।

সকলে বাকীউল গারকাদ নামক জায়গায় পৌঁছিয়া সমস্বরে আল্লাহু আকবার বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) রাতভর দণ্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের তাকবীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কা'ব ইবনুল আশরাফ নিহত হইয়াছে। তাঁহারা দ্রুতপদে আসিয়া দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদের দরোজায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চাঁদনী রাত। রাত্রির তৃতীয় প্রহর। তিনি তাহাদেরকে দেখামাত্র বলিলেন, এই চেহারাগুলি সফলতা লাভ করিয়াছে। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! সর্বপ্রথম আপনার চেহারা মুবারক সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাঁহারা কা'বের কর্তিত মস্তক নবী করীম (স)-এর সম্মুখে রাখিলেন। তিনি আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ১৯০)। নবী (স) হারিস ইব্ন আওস (রা)-এর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানে নিজের মুখের লালা লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে হারিস (রা)-এর বেদনা পুরাপুরি প্রশমিত হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৬৬)।

উষাকালে একদল য়াহূদী নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, আমাদের সর্দারকে এইভাবে হত্যা করা হইল। উত্তরে তিনি বলিলেন, সে মুসলিমদের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করিত, মানুষজনকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করিত। য়াহূদীরা নিরুত্তর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (স) য়াহূদীদের পক্ষ হইতে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে, তাহারা ভবিষ্যতে আর কখনও এইরূপ করিবে না। পরবর্তীতে এই অঙ্গীকারনামা হযরত আলী (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৬৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামিউস সাহীহ, ২খ., দেওবন্দ ১৪০৫ হি.; (২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., বৈরূত ১৯৮৪; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., বৈরূত, তা. বি.; (৪) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., বৈরূত ১৯৬৭; (৫) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ১খ., বৈরূত ১৯৯৪; (৬) আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., বৈরূত তা.বি.; (৭) আবদুর রাহমান সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৫খ., তা. বি.; (৮) বদরুদ্দীন 'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১৭খ., বৈরূত তা.বি.; (৯) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭খ., বৈরূত ১৯৮৮; (১০) ইদরীস কান্দলবী, সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., দেওবন্দ তা. বি.; (১১) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, অষ্টম মুদ্রণ, ঢাকা ১০০৫ খৃ.।

জুবাইর আহমদ আশরাফ

কা'ব ইব্‌নু'ল-খাযরাজ (كعب بن الخزرج) ঃ আল-আনসারী (রা), বানূ'ল-হারিছ ইবনি'ল-খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মায়মূন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহাকে সাহাবী বলিয়াছেন। তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিজের একটি বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। ইব্‌ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করিয়াছেন। পুত্র মায়মূন ও পৌত্র মুহাম্মাদের পুত্র কা'ব ইব্‌নু'ল-খাযরাজ (রা)-এর যে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ ঃ "তাবূক অভিযানে আল-হাকাম ইব্‌ন আবি'ল-হাকাম আমার সফর-সঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উত্তম সহচর।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৯৫, নং ৭৪১০; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, উর্দূ অনু., লখনৌ ১৩২৭ হি., ৭খ, ৩২৫।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুল রহমান

কা'ব ইবনু'ল খুদারিয়্যা আল-কিলাবী (كعب بن الخدارية الكلابى) ঃ (রা) বানূ বাকর ইব্‌ন কিলাব গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া নিস্‌বা আল-কিলাবী, সাহাবী ছিলেন। আবূ রাযীন লাকীত ইব্‌ন 'আমির আল-'উকায়লীর সুদীর্ঘ হাদীছে কা'ব ইবনু'ল-খুদারিয়্যার উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ লাকীত ইব্‌ন 'আমির তাঁহার জনৈক চাচাতো ভাই নাহীক ইব্‌ন 'আসিমকে সঙ্গে লইয়া বানু'ল-মুনতাফিক-এর পক্ষ হইতে দূত হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিতেছিল। তাঁহাদের আলোচনা ও কথোপকথনকালে কা'ব ইবনু'ল-খুদারিয়্যা (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আমাকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা সেইসব লোক যাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র জন্যই লোকদিগকে ভয় করিয়া থাকে।" তখন কা'ব ইবনু'ল-খুদারিয়্যা (রা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কাহাদের কথা বলিতেছেন?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, "তাহারা হইল বানু'ল-মুনতাফিক।" এই কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার বলিয়াছিলেন। আবূ রাযীন লাকীত ইব্‌ন 'আমির আল-'উকায়লীর ঐ সুদীর্ঘ হাদীছ পূর্ণ সনদসহ ইব্‌ন আবী খায়ছামা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৯৪-৯৫, নং ৭৪০৮, পৃ. ৩৩০, নং ৭৫৫৫; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবা, ৩খ.-এর হাশিয়া, পৃ. ৩০৭; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, উর্দূ অনু. লখনৌ ১৩২৭ হি., ৭খ, ৩২৫; ৩৬১; (৪) ইব্‌ন হাজার, তাকরীবু'ত-তাহযীব, সম্পা. 'আবদু'ল-ওয়াহহাব 'আবদু'ল-লাতীফ, ২খ, ৪২২।

ড. মুহাম্মাদ ফজলুল রহমান

আল-কাব্‌ক (القبق) ঃ জাবালু'ল-কাব্‌ক (সর্বাধিক প্রচলিত রূপ), আল-কাব্‌খ (মাস'ঊদী) অথবা আল-কাবজ (তাবারী, য়াকূত), তুর্কী কাভকায ককেসাব পর্বতমালার প্রতি মুসলিমদের প্রদত্ত নাম। 'কাবক' রূপটি মধ্যযুগীয় ফারসী 'কাফকোহ' অর্থাৎ কাফ পর্বত ও আর্মেনীয় 'কাপকোহ (Kapkoh) হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। ফিরদাওসীর রচনায় আমরা ককেসাসকে কূহ-ই কাফরূপে অভিহিত হইতে দেখি (Hubschmann, Armenische Grammatik, ১খ, -৪৫, তু. Marquart, Eransahr, ৯৪)। ইব্‌ন রুসতা (পৃ. ১৭৩, অনু. পৃ. ২০১) কাবক' নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা হারাত হইতে ইসফিযার ও সীসতানের পথে প্রথম মনযিল।

(১) ভূপ্রকৃতি ও জাতিত্ব ঃ মুসলমানগণ খুলাফা-ই রাশিদীনের সময় হইতেই ককেসাসের সহিত পরিচিতি হয়; ঐ সময়ে আযারবায়জানের মধ্য দিয়া আররান ও আরও দূরবর্তী অঞ্চলে প্রথম উত্তরাভিমুখী আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল। প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভূগোলবিদগণ আপাতদৃষ্টিতে ইরানী ধারণার ভিত্তিতে, যাহা আবার হয়তো ব্যবিলনীয় বিশ্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ধারণাসমূহ হইতে জ্ঞাত হইয়া থাকিবে, ককেসাস পর্বতশ্রেণীকে কাফ পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে এই পর্বতমালা পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার দক্ষিণে রহিয়াছে সভ্য দেশসমূহ। আর উত্তরে রহিয়াছে অন্ধকারের রাজ্য জুলমাতের দেশ। এইরূপে ইব্‌ন হাওকাল, হাস্‌দায় ইব্‌ন ইসহাকের বরাত দিয়া ককেসাসকে কার্পাথিয়ান, আল্পস ও পীরেনীযের সহিত যুক্ত করিয়া এমন একটি পর্বতশ্রেণীর বর্ণনা করেন যাহা য়ূরোপকে বিভক্ত করিয়াছে [সম্পা. Kramers, ১খ, ১৯২, ১৯৩ (-মানচিত্র), ১৯৪, অনু. Kramers and Wiet, ১খ, ১৮৮-৯ এবং মানচিত্র ৮ ; আরও দ্র. B Munkacsi, Der Kaukasus und Ural als G urtel der Erde, in Keleti Szemle, ১খ, (১৯০০ খৃ.), পৃ. ২৩৬ এবং কাফ]। কাফ পর্বতমালাকে এইরূপে সনাক্তকরণের ফলে মুসলিম ভাষ্যকার ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কুরআনে (১৮ ঃ ৬০-৮২) মূসা ('আ) ও আল্লাহর অনুগৃহীত জ্ঞানী বান্দা (তাফসীরকারগণের মতে) আল-খিদর ('আ)-এর উপাখ্যানে উল্লিখিত শিলাখণ্ড, সমুদ্র ও শহরের অবস্থান ককেসাস ও কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে নির্ণয় করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ইব্‌ন খুররাদাযবিহ (১২৪) ও ইব্‌নু'ল-ফাকীহ (২৮৭) বলেন যে, শিলাখণ্ডটি হইতেছে সারওয়ানের শিলাখণ্ড, সমুদ্রটি হইতেছে জীলানের সমুদ্র (কাস্পিয়ান) এবং শহরটি হইতেছে বাজারওয়ান শহর ("বাজার এলাকা", অ্যারোকসেস বা আরাস নদীর দক্ষিণে মুগানে অবস্থিত)। অধিকন্তু এই প্রাথমিক লেখকগণ, ককেসাস অঞ্চলকে য়া'জুজ (Gog) ও মা'জুজের (Magog) (দ্র. য়া'জুজ ওয়া মা'জুজ) বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাকল্পে যু'ল-কারনায়ন অর্থাৎ মহান আলেকজাণ্ডার যে 'সাদ্দায়ন' অর্থাৎ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান বলিয়া মনে করিতেন। তাবারী ও বায়দাবী প্রমুখ ভাষ্যকার আরমেনীয় ও আযারবায়জানের বিশাল পর্বতসমূহকে 'সাদ্দায়ন' বলিয়া সনাক্ত করেন এবং ইখওয়ানু'স-সাফা'র পুস্তিকায় যখন বাহরি য়া'জুজ ওয়া মা'জুজের কথা বলা হয় তখন তাহা স্পষ্টত কাস্পিয়ান সম্পর্কেই বলা হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নবান মুসলিম ভূগোলবিদগণ ককেসাসকে পঞ্চম জলবায়ু অঞ্চলের (হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, ৯১-৩, অনু. Le Strange, ৯২-৪) অথবা ষষ্ঠ জলবায়ু অঞ্চলের (মুকাদ্দাসী, ৬১, অনু. Miquel, ১৩৫) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী কাফ পর্বতমালার ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভূগোলবিদগণ তাঁহাদের পর্বতশাস্ত্রীয় ককেসাসকে আল-বুরয্ পর্বতমালার পশ্চিমাভিমুখী বিস্তার অথবা য়ামান ও হিজায হইতে আরম্ভ করিয়া গঠিত পর্বতসমূহের উত্তরমুখী প্রলম্বনরূপেও দেখাইয়াছেন। "হুদূদু'ল-'আলাম" শীর্ষক বেনামে লিখিত চতুর্থ/দশম শতাব্দীর শেষভাগের

ইরানী ভূগোল গ্রন্থে ককেসাসের ভূ-প্রকৃতির বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় (ইহার জন্য লেখক, যিনি উত্তর আফগানিস্তানের অন্তর্গত গুযগানে ইহা রচনা করেন এবং যিনি নিজে পর্যটক ছিলেন না, সম্ভবত আবূ যায়দ আল-বালখী -ইসতাখরীর বর্ণনার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছিলেন)। 'হুদূদ'-এ ককেসাসকে সিনাই-সিরীয় এবং আর্মেনীয় টরাস (Tauras) পর্বতশ্রেণীর উত্তরমুখী বিস্তৃতি বলিয়া মনে করা হয়, যাহা প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে উত্তর-পূর্বে আররান ও শারওয়ান অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর সারীর-এর দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া আলানদের (Alans) দেশে চলিয়া গিয়াছে (আললান, আধুনিক Ossetes; দ্র. Alan)। কিন্তু ইহার পর হুদূদ-এর মতে কাস্পিয়ান তীরের Darband বা বাবু'ল-আবওয়াব (দ্র.)-এর সহিত মধ্য ককেসাসের আলান তোরণ (Alan Gate) বা Darial Pass-কে মোটামুটি সংযুক্ত করিয়া পশ্চিমে ও কৃষ্ণ সাগরের দিকে অগ্রসর না হইয়া পর্বতশ্রেণী খাযার ও পেচেনেগ (Peceneg) অঞ্চলের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে সরাসরি পূর্ব রাশিয়ায় চলিয়া গিয়াছে। C. S. Bosworth (E.I.[2])-এর মতে আলান অঞ্চল পর্যন্ত পর্বতশ্রেণীকে কেবল কাবৃক. বলা হইত। তাহার পর এই পর্বতশ্রেণীর প্রতিটি অংশ পার্শ্ববর্তী নগর বা জিলাসমূহের নাম অনুসারে অভিহিত হইত। তিনি পূর্বদিকগামী একটি ক্ষুদ্রতর পর্বতশ্রেণীও উল্লেখ করেন, যাহা দাগিস্তান (দ্র.)-এর তেরেক (Terek) ও কোয়-সু (Koy-Su) উপত্যকাদ্বয় বিচ্ছিন্নকারী পর্বতশ্রেণীর হইয়া থাকিবে অর্থাৎ যাহা বর্তমান চেচেন প্রদেশের দক্ষিণ সীমানা চিহ্নিত করিতেছে। সর্বক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত ককেসাসের পশ্চিম প্রান্ত আলান তোরণের পরে এবং বর্তমানে মাউন্ট কাযবেক অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন (হুদূদ, অনু. Minorsky, শা. ১৮, ৪৮, ৪৯)।

এইরূপে মধ্যযুগীয় মুসলিমদের নিকট ককেসাস একটি বিন্যস্ত পর্বতশ্রেণী, যাহা গভীর দুর্গম উপত্যকাময়, রাজনৈতিকভাবে বহুধাবিভক্ত একটি অঞ্চলে হিসাবে পরিচিতি ছিল। ইহা ছিল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী, তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস-সমূহের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ইহার ভাষাতাত্ত্বিক জটিলতা ছিল অত্যন্ত সুবিদিত। ক্লাসিকাল যুগেই Strabo (১১খ., ৪) ককেসীয় আলবানিয়ায় অর্থাৎ আররানে ২৬টি ভাষা প্রচলিত আছে বলিয়া মনে করেন। প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভূগোলবিদগণের মতে ককেসাসে ৭০ বা ৭২টি বিভিন্ন ভাষা চালু ছিল, যেইগুলির প্রতিটি ভাষাভাষীর নিকট অন্য সকল ভাষা ছিল অবোধ্য (দ্র.য়াকূত, ৪খ, ৩১, এবং Barbier de Meynard. Dictionnaire geographique, historique et le litteraire de la Perse, ৪৩৭)। আবু'ল-ফিদা'র সময়ের (অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে) মধ্যেই আমরা ভাষার সংখ্যা দেখিতে পাই তিন শত এবং অঞ্চলটি জাবালু'ল-আলসুন বা "বহু ভাষাসমৃদ্ধ পর্বত" নামে অভিহিত হইতে থাকে (Geographie, সম্পা. Reinaud এবং de Slane, ৭১)।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহের কালেই ককেসাস ইউরেশীয় স্তেপসমূহ হইতে আগমনকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য নিকটপ্রাচ্যের একটি প্রধান প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এই কারণেই মধ্যযুগে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অদ্যাবধি ককেসাসে বিভিন্ন ইন্দো-য়ূরোপীয়, উগ্রীয় (Ugrain এবং তুর্কী (Turkic) জনগোষ্ঠীর লোককে দেখিতে পাওয়া যায়। আস (AS)-গণ বা আলানেরা (Alans) ওসেটিয়ায় (Ossetie) স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। মাইয়ার সেভোরদিরা (Mayyar Sevordi) (আর্মেনীয় ভাষায় Sewordiek "কৃষ্ণাঙ্গদের দল") Gandija-এর উত্তর-পশ্চিমে শামকূর (Shamkur) জিলাতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। তাহারা মাস'উদীর নিকট "সিয়ারওয়ারদিয়্যা' নামে পরিচিত ছিল, যাহারা ইরানী সৈন্যদের মধ্যে ব্যবহৃত উন্নত মানের যুদ্ধকুঠার প্রস্তুত করিত (যুরূজ, ২খ, ৭৫; Marquart, Streifzuge, ৩৬-৪০)। আর আভর (Avars), হুন (Hunnic) অথবা তুর্কী যে সব যাযাবর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ককেসাসে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহারা দাগিস্তানের মুসলিম যুগে 'সারীর' বলিয়া পরিচিত অঞ্চলটিতে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া গিয়াছে (দ্র. Minorsky, হুদূদু'ল-'আলাম, ভাষ্য, ৪৪৭-৮)।

ইসলামের অব্যবহিত পূর্বকালের যে সামান্য তথ্য আমাদের হাতে রহিয়াছে তাহা প্রধানত বহিঃককেসিয়া (Transoaucasia)-র ঘটনাবলীর সহিত সম্পৃক্ত। সেই সময়ে আন্তঃককেসিয়া (Ciscaucasia) ছিল বর্বর (barbarian) আক্রমণের পূর্ণ প্রচণ্ডতার সম্মুখীন এবং এই সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ককেসাস পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে আইবেরিয়া (Iberia)-র (জর্জিয়া দ্র. কুরজ) খৃস্টান রাজ্য এবং আইবেরিয়ার পর্বে আলবেনিয়া অঞ্চল কুর (Kur) নদী ও ককেসাসের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড, ইসলাম প্রভাবিত শারওয়ান এবং আররানের উত্তরাংশ (দ্র.) দীর্ঘস্থায়ী বায়যান্টীয়-সাসানীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত ছিল। সাধারণভাবে প্রাচীনকাল হইতে খৃস্টান অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও আলবেনিয়ায় পারস্য দেশীয় প্রভাব পড়িতে শুরু করে এবং এইভাবে উত্তরে দারবান্দা (Darband) পর্যন্ত পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে কাখেতিয়া (Kakhetia) ও জর্জিয়া ছিল বায়য্যান্টাইন ও খৃস্টান প্রভাবে অধিকতর প্রভাবান্বিত। পারসিকদের সার্বক্ষণিক লক্ষ্য ছিল উত্তরদিক হইতে –যেমন আভর, হুন, পশ্চিমী তুর্কী ও পরবর্তীকালে খাযারদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে ককেসাসের গিরিপথগুলি অধিকারে রাখা। সুতরাং দারবান্দ এবং শারওয়ান ও মাসকাত অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্রাট খুসরাও আনুশিরওয়ান কর্তৃক আনু. ৫৬০ খৃ. নূতন করিয়া সুরক্ষিত করিয়া তোলা হয়। তদুপরি পারসিকগণ আলান তোরণের (বিভ্রান্তিবশত প্রাচীন লেখকগণ কর্তৃক প্রায়ই কাস্পিয়ান তোরণ বলিয়া অভিহিত) ও দারবান্দাস্থিত প্রকৃত কাস্পিয়ান তোরণের দুর্গসমূহের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার ব্যয়ভার বহনে গ্রীকগণকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল (দ্র. Marquart, Eransahr, ৯৪-১১৮, এবং Christensen, L'Iran sous les Sassanidess, ২৩৮-৯, ২৮১, ৩৭৩, ৪৪৮)। বায়যান্টীয় সম্রাট হেরাক্লিয়াস সাসানীয় রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিলে খাযারগণ দক্ষিণদিকে দারবান্দে চলিয়া যায়। কিন্তু ২২/৬৪২ সনে যখন মুসলিমদের প্রথম সৈন্যদলগুলি বাবু'ল-আবওয়াবে পৌঁছে, তখনও সেখানে শাহরবারায নাম বা উপাধিধারী একজন গভর্নরের অধীনে একটি পারসিক প্রতিরক্ষা বাহিনী অবস্থানরত ছিল। যাহাই হউক, শাহরবারায, য়ামানের একইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া পারসিক গভর্নর বাযানের ন্যায় সুরাকা ইব্ন'আমরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন (তাবারী, ১খ, ২৬৬৩-৭১; ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত ১৩৮৫-৭, ১৯৬৫-৭; ৩খ, ২৮,

২৯-৩০; D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton ১৯৫৪ খৃ., ৪৭-৫০)।

খুসরাও আনূশিরওয়ান কর্তৃক ককেসাসের অঙ্গরাজ্যসমূহকে (Principalities) বিভিন্ন শাসকের হস্তে প্রদান সম্পর্কে বালাযুরী যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন অথবা আরও সম্ভবত সেখানকার প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে তিনি যে সমর্থন প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে মুসলিমদের আক্রমণের পূর্ব-মুহূর্তে ককেসাসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংগঠন এবং জাতিগত বৈচিত্র্যের কিছুটা ধারণা করা যায়। বালাযু'রী আর্মেনিয়া বিজয় (ফুতূহ, পৃ. ১৯৭) সম্পর্কে তাঁহার লিখিত অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, সম্রাট নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের হস্তে রাজকীয় ক্ষমতা (শাহিয়্যা) অর্পণ করিয়াছিলেন ঃ (১) খাকানু'ল-জাবাল বা সাহিবু'স-সারীর, যিনি ওয়াহরাযান শাহ নামে পরিচিত; (২) ফালান শাহ নামক ফীলানের শাসনকর্তা; (৩) তাবারসারান শাহ; (৪) খুরসান শাহ নামক লকাযের শাসনকর্তা; (৫) মাসকাতের শাসনকর্তা, "বর্তমানে যাহার রাজ্য অবলুপ্ত"; (৬) লায়যান-শাহ নামক লায়যানের শাসনকর্তা; (৭) শারওয়ানের শাসনকর্তা শারওয়ান শাহ; (৮) বালখের শাসনকর্তা এবং (৯) যিরীকারানের শাসনকর্তা। এই নামগুলির অধিকাংশই সনাক্ত করা যায় এবং তাহাদের অঙ্গরাজ্যসমূহের অস্তিত্বও ইসলামী আমলের বলিয়াও চিহ্নিত করা যায়।

সাহিবু'স-সারীর বা "সিংহাসনের অধিকারী" পরবর্তীকালে দক্ষিণ দাগিস্তানের কোয়-সু উপত্যকার ভৌগোলিক জিলা সারীরাকে নিজের নামানুসারে অভিহিত করেন। তাঁহার অপর উপাধি ওয়াহরাযান শাহ, সম্ভবত আভারগণের সহিত অর্থাৎ আর্মেনীয় ভাষায় আওরহাযক (Awrhazk)-গণের সহিত সারীরের অধিবাসীদের সন্দেহাতীত অভিন্নতার বিষয় নির্দেশ করে (দ্র. Minorsky, A History of Sharvan and Darband, Cambridge ১৯৫৮ খৃ., ৯৮-৯)। ফলানদের অস্তিত্ব কিঞ্চিৎ রহস্যময়; তবে তাহারা সম্ভবত দক্ষিণ দাগিস্তানের একটি আভার জনসমষ্টির অন্তর্গত। মাস'উদীর মতে (মুরূজ, ৪১-২) তাহার পরবর্তী সময়ে সারীর অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তাবারসারান হইল দারবান্দ হইতে মূল ভূখণ্ডের আরও অভ্যন্তরে একটি পর্বতময় অঞ্চল। ইহা পরবর্তী ইসলামী যুগে শারওয়ান শাহদের শাসনাধীন একটি অঞ্চল (suzerainty) ছিল। লাকযও দক্ষিণ দাগিস্তানে, মাসকাত (যাহা কাস্পিয়ান তীরে Darband-এর দক্ষিণ অবস্থিত) হইতে আরও অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত এবং ইহা উত্তর দিক হইতে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শারওয়ানের পক্ষে একটি মধ্যবর্তী বা বাফার স্টেট হিসাবে ব্যবহৃত হইত। মাস'উদী, (২খ, ৫) ইহাকে "শারওয়ান রাজ্যের প্রতিরক্ষা দুর্গ (মু'আওওয়াল) বলিয়া উল্লেখ করেন। লায়যান আর দক্ষিণ শারওয়ানের গারমাদান নদী অঞ্চলের বর্তমান লাহীজ উপত্যকা একই। ইহা পরে শারওয়ান রাজ্যের অংশবিশেষে পরিণত হয়। ককেশীয় বালখের (Minorsky কর্তৃক মূল পাঠের B. Kh-এর উদ্ধারকৃত সংস্করণ) সঠিক অবস্থান আজ অজ্ঞাত। তবে ইহা দাগিস্তানের বাকুর উত্তরে আধুনিক কালের বালখা বা বালখারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারে। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রথম ভাগের আররান, শারওয়ান ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্কিত একগুচ্ছ চিঠিপত্রে বালখকে লাকযের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে [Minorsky এবং Cl. Cahen, Le recueil trans-caucasien de Mas`ud b. Namdar, JA, ২৩৭, সংখ্যা (১৯৪৯ খৃ.), ১২১-এ]। যিরীকারানগণ ('যিরীহগারান'রূপে গঠিত, মুরূজ-এ, ২খ, ৪০, 'উম্মালু'য-যারদ অর্থাৎ "বর্ম প্রস্তুতকারিগণ"-রূপে সংকলিত) কোয়-সু-এর দক্ষিণ শাখা-অঞ্চলে সারীরের নিকটে এবং বর্তমান কুবাসির আধুনিক পল্লীতে (তুর্কী 'কুবেজি' [Kubedji] অর্থাৎ "ধাতব বর্ম প্রস্তুতকারী", তু. Radloff, Versuch eines Worterbuches der Turk-Dialecte, ২খ, ১৫১৭) বাস করিত। ওসেশিয়া ছাড়াইয়া উত্তর-পশ্চিম ককেসাস সম্পর্কে তথ্যের অভাব লক্ষ্য করার মত। এই অঞ্চল কুবান-ডন (Kuban-Don) অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী স্তেপবাসীদের প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (পূর্ব ককেসাসের ভূগোল ও জাতিতত্ত্বের একটি উত্তম মানের সমীক্ষার জন্য দ্র. Minorsky, A History of Sharvan and Darband, পৃ. ৭৫ প., বিশেষ করিয়া সারীর-এর জন্য দ্র. ঐ লেখক, "হুদূদু'ল-'আলাম", ভাষ্য, ৪৪৭-৫০)।

(২) প্রাথমিক ইসলামী যুগ ঃ আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া জয় করিয়া আরবরা ককেসাস প্রাচীরের পাদদেশে উপস্থিত হয়। এখানে তাহাদের সার্বিক অবস্থা পীরেনিস (Pyreness)-এর পদপ্রান্তে উপস্থিত স্পেনের আরবদের মতই হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই আরবরা প্রথমে পর্বতমালা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু তাহাদিগকে অপর পাড়ের খাযার, তুর্কী ও ফ্রাংক প্রভৃতি শত্রু ভাবাপন্ন ও শক্তিশালী জাতিগুলির সম্মুখীন হইতে হয়। স্পেনের আরবরা মাত্র কিছু সময়ের জন্য Narbonnaise-দেরকে দমিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল, আর পূর্ব ককেসাসে দারবান্দস্থিত নিজদের সুরক্ষিত অবস্থানের উত্তরে আরবরা কোন স্থানী বিজয় লাভ করিতে পারে নাই। খাযার (দ্র.) ও তুর্কীরা চার শতাব্দী পর্যন্ত ককেশীয় স্তেপ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের অন্তরায় ছিল। এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী খৃষ্টান ও পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাসসমূহের উপর কোন প্রকার পূর্ণ বিজয় লাভ ছাড়াই দাগিস্তানের এবং মধ্য ও পশ্চিম ককেসাসে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া কয়েক শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইসলামের বিস্তৃতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে খাযার রাজ্যের অস্তিত্বের গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য দ্র. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, পৃ. ৪৬-৭। কিন্তু K. Czegledy প্রণীত Khazar Raids in Trans-Caucasia in 762-764 A. D., AO Hung, ১১খ. (১৯৬০ খৃ.), ৭৬-৯-এ সারা ককেসাস অঞ্চলের যুদ্ধগুলির আলোচনায় অন্ততপক্ষে প্রাথমিক যুগে খাযারদিগকে তাহাদের পশ্চিম-তুর্কী সামন্ত রাজা খাকানগণ হইতে পৃথক বিবেচনা করার জন্য জোর দেওয়া হইয়াছে। এই খাকানদের রাজধানী ছিল আতিল (Atil) (দ্র.) বা ইতিল (Itil) নামক স্থানে। ইহা সন্দেহাতীত যে, বালাযুরী কিংবা তাবারী এই সকল আরব অভিযান প্রসঙ্গে "আত-তুরক ওয়া'ল-খাযার" এবং "খাকানু'ত-তুরক" শীর্ষক বক্তব্য রাখিয়াছেন।

উপরে উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী আরবগণ 'উমার (রা)-এর খিলাফাত শেষ হওয়ার পূর্বেই দারবান্দ পৌছিয়াছিল। এই সময়ে এবং 'উছমান (রা)-এর আমলে মুসলিম বাহিনী কূফা হইতে আমূ দরিয়া (Araxes) আক্রমণ করিয়া উপত্যকায় আররান ও অন্যান্য অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। হাবীব ইব্‌ন মাসলামা তিফলিসে প্রবেশ করেন এবং আররানের প্রশাসনিক কেন্দ্র বারযা'আ হইতে সালামান ইব্‌ন রাবী'আ আল-বাহিলীর সৈন্যদল ককেসাসের দক্ষিণ ঢালের বায়লাকান, কাবালা ও শামকীর প্রভৃতি অঞ্চল

দখল করিয়া লয় এবং শারওয়ানের স্থানীয় শাসনকর্তা নিয়মিত কর দানে সম্মত হয় (বালাযুরী, ফুতূহ, ২০১-৪)। সম্ভবত এখানেই খাযারদের কয়েকটি দলের প্রথম সাক্ষাত পাওয়া গিয়াছিল। কারণ সাসানী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে খাযারগণ পূর্ব ককেসাসের শাসন ক্ষমতায় শূন্যতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। (তু. বালাযুরী, ১৯৭)। তবে খাযারদের সহিত প্রথম পূর্ণ সংঘাত ঘটে ককেসাসের উত্তরে; তাবারী ইহার বর্ণনা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৩২/৬৫২-৫ সনে 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন রাবী'আ আল-বাহিলী পূর্ববর্তী অভিযানসমূহের বিরুদ্ধে নামমাত্র প্রতিরোধের নজীরে উৎসাহিত হইয়া খলীফা 'উছমান (রা)-এর ব্যক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাযারদের বালানজানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (ইহা সম্ভবত দাগিস্তানের কোয়-সু উপত্যকায় Darband-এর উত্তরে অবস্থিত ছিল) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যান। কিন্তু সেখানে আবদু'র-রাহমান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং ৪,০০০ কূফী সৈনিক নিহত হয় (তাবারী, ১খ, ২৮৮৯-৯৪, ২৮৯৬-৭; ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ৩খ, ১৩১-৩)।

খিলাফাতের অভ্যন্তরে 'ফিতনা' বা আভ্যন্তরীণ কোন্দলের উদ্ভব হইলে ককেসাস ও মধ্যে এশিয়ার ন্যায় বিপদসংকুল ও অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাজনক পার্বত্য এলাকায় আরব শক্তিসমূহের বিজয় কিছুকালের জন্য ব্যাহত হয়। তদুপরি খাযারদের প্রতি আক্রমণ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, উমায়্যাগণ সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ককেসীয় সীমান্তকে কোনক্রমেই অবহেলা করা হয় নাই। তাহা ছাড়া বন্দী ক্রীতদাস সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবেও ককেসাস ও খাযারিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন আক্রমণের অবশ্যই একটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। "আব্বাসী আমলে ফৌজী ক্রীতদাস ও অন্যদের মধ্যে "আল-খাযারী"-র নিসবা (সম্বন্ধ-বাচক) নামের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। ইহা ককেসীয় জনগণ এবং প্রকৃত খাযার তুর্কীদের একটি সাধারণ পদবীও (blanket designation) হইতে পারে। পূর্ব ইরানের বিজয়সমূহের বর্ণনার তুলনায় ককেসাসের এই যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনার ক্ষেত্রে আরবা উৎসগুলির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, বালাযুরী, ইব্ন আছাম আল-কূফী, তাবারী, ইবনু'ল-আছীর প্রমুখ প্রদত্ত তথ্যাদি হইতে প্রকৃত চিত্রের একটি রূপরেখামাত্র নির্ণয় করা যায়, ইহার বেশী কিছু নয়। Dunlop অভিমত প্রকাশ করেন যে (The History of the Jewish Khazars, ৫৮), 'আব্বাসী যুগে উমায়্যাগণ এবং তাহাদের সকল কৃতিত্বের প্রতি ঐতিহাসিকগণের বিরূপ মনোভাবের কারণে খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের দাসী-স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাসলামা (দ্র.) হিশামের চাচাতো ভাই এবং উমায়্যা ধারার শেষ খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় নাই।

Marquart, Streifzuge, ৪৪৩-এ উদ্ধৃত কতিপয় আর্মেনীয় সূত্র অনুযায়ী খাযারগণ য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার রাজত্বকালে জর্জিয়া আররান ও আর্মেনিয়ার অভ্যন্তরে আক্রমণ চালায়। তাহারা 'আবদু'ল-মালিকের আমলের শুরুতে দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালাইয়া আর্মেনিয়ার ম্যামিকনীয় (Mamikonian) শাসককে হত্যা করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, খাযারগণ ইহার অব্যবহিত পরেই দারবান্দ পুনর্বার দখল করিয়া তাহা সাময়িকভাবে সুরক্ষিত করে এবং সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানটির কর্তৃত্ব খাযার ও আরবদের মধ্যে হাতবদল হইতে থাকে। আর্মেনিয়ায় খাযারদের একটি আক্রমণের পরে এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে আল-জাররাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী আল-মাযহিজী ১০৪/৭২২-৩ সনে খিলাফাতের অধীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং আনুষঙ্গিক দায়িত্ব হিসাবে ককেসাস সীমান্তের প্রতিরক্ষার ভারও তাঁহার উপর বর্তায়। বারযা'আ হইতে দক্ষিণ দাগিস্তানে উপস্থিত হইয়া তিনি কোয়-সু-এর একটি শাখা অঞ্চলের বাসিন্দা গূমিকের জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করেন। ইহারা ছিল সেই ককেশীয় জনগোষ্ঠী, যাহারা পরবর্তীকালে গাযী বা কাযী-কুমূক অথবা লাক (দ্র.) নামে পরিচিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি কাবালা ও শাক্কীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাফল্যের সহিত খাযারদের বালানজারের কেন্দ্রভূমিতে পদানত করেন। পরবর্তী দুইটি অভিযান মৌসুমে আল-জাররাহ আলান তোরণের ভিতর দিয়া মধ্য ককেসাসে তৎপরতা চালান এবং ১০৫/৭২৩-৪ সনে খাযারদেরকে আক্রমণ করেন ও ১০৬/৭২৪-৫ সনে আলানদেরকে করদাতা প্রজায় পরিণত করেন। আলানদের অনেকেই খৃস্টান ছিল। তাহারা ছিল আরবদের বিরুদ্ধে বায়যান্টাইনের স্বাভাবিক মিত্র এবং বায়যান্টাইন সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন সাহায্যকারী দল হিসাবে তাহাদেরকে দেখা যাইত। এই কারণে মুসলিমগণ বহির্ককেসিয়া পর্যন্ত দারিআল গিরিপথের প্রবেশ পথ যতদূর সম্ভব নিরাপদ রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করে। এই সময়ে আল-জাররাহ কর্তৃক কাবলাতে (সম্ভবত যাহা ছিল প্রাচীনকালের শাক্কী শহরের সঙ্গে অভিন্ন, দ্র. Minorsky, E.I.2, 'Shekki') খাযার বন্দীদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইহা পরবর্তীকালে একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয় (বালাযু'রী, ২০৬; তাবারী, ২খ, ১২০০, ১৪৫৩, ১৪৬২, ১৪৭২; ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ৪খ, ৫৪০, ৫৫৫, ৫খ, ১১০-১৩; ১৩৪, Dunlop, The history of the Jewish Khazars, ৫৯-৬৬)।

১০৯/৭২৭ সনের পর উদ্যমী যোদ্ধার যুবরাজ মাসলামা ইব্ন 'আবদিল-মালিক-এর শাসনভার গ্রহণ ককেসাস সীমান্ত খলীফা হিশামের আরোপিত গুরুত্বের নির্দেশক। মাসলামা আলান তোরণের মধ্য দিয়া খাযারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁহার শাসনামলেরই কোন এক সময় এককালে পারস্যদেশীয় বীর ইসফান্দিয়ার কর্তৃক আলানদিগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে নির্মিত বলিয়া কথিত একটি মজবুত ঘাঁটিকে তিনি নূতন করিয়া সুদৃঢ় করেন। এই ঘাঁটিকেই মাস'উদী তাঁহার মুরূজ, ২খ, ৪৩-৪ এ "কাল'আতু'ল-লানা" বা "আলান দুর্গ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মাসলামার দক্ষতা সত্ত্বেও খাযারদের হিংস্রতা দমন করা সম্ভব হয় নাই। ১১২/৭৩০ সনে তাহারা আলান তোরণ অতিক্রম করিয়া আল-জাররাহকে পরাজিত ও হত্যা করে। অতঃপর আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া জয় করিয়া তাহারা দক্ষিণে দিয়ার বাক্র ও আল-জাযীরা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। এই পর্যায়েই মাসলামা আক্রমণ প্রতিহত করেন, যুদ্ধক্ষেত্রকে খাযার রাজ্যসমূহ পর্যন্ত হটাইয়া লইয়া যান। কথিত আছে যে, এই সময়েই মাসলামা শারওয়ান, লায়যান, তাবারসারান, ফীলান, খুরাসান ও মাসকাত প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণসহ "বিভিন্ন পর্বতের রাজাদিগের" আনুগত্য লাভ করেন। আনুগত্যের শর্ত হিসাবে ইসলাম গ্রহণ অপরিহার্য ছিল কিনা তাহা আজ অস্পষ্ট। সে যাহাই হউক, ইসলামের প্রভাব এই সময় নিশ্চয়ই অত্যন্ত অগভীর ছিল। আর্‌রান ককেসাস অঞ্চলের সাধারণ চিত্র আর্মেনিয়ারই অনুরূপ ছিল; আরবরা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং স্থানীয় শাসকদেরকে তাহাদের করদাতারূপে রাখিত।

১১২/৭৩০ সনে বৃহৎ খাযার অভিযানের কয়েক বৎসর পর নূতন গভর্নর মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ প্রথমে আর্মেনিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরে আলানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া জর্জিয়ার মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে (১১৮/৭৩৬) দারি'আল গিরিপথ ও তিনটি দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্তী বৎসরে তিনি খাযারিয়ায় প্রবেশ করিয়া খাযারীয় রাজধানীতে পৌঁছিয়া যান এবং তথাকার খাযারা রাজাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। Minorsky মারওয়ানের অভিযান নিম্ন ভল্গা অঞ্চলের পরিবর্তে নিম্ন ডন অঞ্চলের লক্ষ্যে চালিত হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেন। কারণ এই অভিযানে প্রচুর সংখ্যক সাকালিবা অর্থাৎ স্লাভ বন্দী হয়, যাহাদের কিছু সংখ্যক বালাযুরীর মতে (২০৭-৮) কাখেতিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে [দ্র. A new book on the Khazars, Oriens, ১১খ, ১৯৫৮ খৃ., ১২৭-৮]। ককেসাসের স্থানীয় রাজন্যবর্গের সহিত মাসলামার চুক্তি ছিল স্বল্পায়ু। স্বভাবতই মারওয়ানকে পুনরায় চুক্তির ব্যবস্থা করিতে হয় এবং দারবান্দ দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দাসদাসী ও শস্যের আকারে কর ধার্য করিতে হয়। মারওয়ান কর্তৃক পরাভূত বিদ্রোহীদের মধ্যে দূদানিয়্যাগণ (দিদূওয়ানিয়্যা পঠিতব্য), Minorsky-এর মতে মধ্য দাগিস্তানের অভ্যন্তরে দিদোগণ (Didos) ছিল অন্যতম। কিন্তু সেখানে ইসলামের উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব পড়িতে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল ও দিদোগণের একাংশ ১২শ/১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত পৌত্তলিক থাকিয়া যায় (দ্র. বালাযুরী, ১৯৭-২০৯; য়া'কূবী, তা'রীখ, ২খ, ৩৮১, ৩৯৫; তাবারী, ২খ, ১৫০৬, ১৫২৬, ১৫৩০-১, ১৫৬০, ১৫৭৩, ১৬৩৫; ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ৫খ, ১৪৫, ১৫৯-৬২, ১৭৩-৪, ১৭৭-৯, ১৯৮-২১৫, ২৪০; F. Gabrieli, Il califfato di Hisham, Studi di storia omayyade, in Mems. de la Societe d'Archeologie d'Alexandrie, ৭/১,(১৯৩৫ খৃ.), ৭৫-৮১; ঐ লেখক, L'eroe omayyade Maslamah ibn 'Abd al-Malik, Rend. Lin., Ser. ৮, ৫খ. (১৯৫০ খৃ.), ৩০-১; Dunlop, The history of the Jewish Khazars, ৬৭-৮৭; Minorsky, Studies in Caucasian history, লণ্ডন ১৯৫৩ খৃ., ২৮-৯; Czegledy, Khazar raids in Transcaucasia in 762-764 A. D., ৭৭-৮।

'আব্বাসীগণের আবির্ভাব ককেসাস অঞ্চলের সার্বিকভাবে দুর্বল আরব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে নাই। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ মুসলমানগণের কালেভদ্রে যখন চুক্তির বিভিন্ন ধারা কার্যকরী করার জন্য পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করিতে হইত তখনই মাত্র অর্থবহ ছিল। আরবদের যে সামান্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, তাহাই "আব্বাসী দা'ওয়ার" অগ্রগতির কারণে খিলাফাতের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা হেতু হ্রাস পাইতে থাকে। তুর্কী ও খাযার হুমকির মুকাবিলায় উমায়্যা সেনাপতিগণের মত যোগ্যতাসম্পন্ন সেনাপতি তখন আর অবশিষ্ট ছিলেন না।

আল-মানসূর কর্তৃক নিযুক্ত আর্মেনিয়ার গভর্নর য়াযীদ ইব্ন উসায়দ আস-সুলামী নাফথার (নাফফাতা) কূপ ও লবণভূমি (মাল্লাহাত)-সমৃদ্ধ পূর্ব ককেসিয়ায় শারওয়ানের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন (দ্র. Barthold, E.I.[1], Shirwan) এবং খলীফা ১৪২/৭৫৯ সনে য়াযীদ ইব্ন উসায়দের সহিত তুর্কী খাকান অথবা খাযার রাজার কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার উত্তরাঞ্চলীয় শত্রুদিগের শত্রুতা নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান। অবশ্য এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্রমেই সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে থাকে এবং ১৪৫/৭৬২ সনে Darband-এর মধ্য দিয়া আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা তুর্কী ও খাযারদের এক বিরাট আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ইহারই অনুসরণ করিয়া দুই বৎসর পরে আরও একটি ধ্বংসাত্মক হামলা সংঘটিত হয়। ফলে আর্‌রান, কাখেতিয়া, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া আক্রান্ত হয়। Czeledy এই আক্রমণের সেনাপতিকে দাগিস্তানের আভার বা হুনদের সর্দার জনৈক রাস (বা আস) তারখান বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন (দ্র. বালাযুরী, ৩০৯-১০; য়া'কূবী, ২খ, ৪৪৬-৭; তাবারী, ৩খ, ৩১৮, ৬৪৭, ৬৪৮ (১৮২ ও ১৮৩ হিজরী সনের প্রসঙ্গে); ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ৫খ, ৫৭১, ৫৭৭; Dunlop, পূ. গ্র., ১৭৯-৮১; এবং Czegledy, পূ. গ্র., ৭৮-৮৮)। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর সমাপ্তি বৎসরগুলিতে 'আব্বাসীগণ আর্মেনিয়ার বিদ্রোহের কারণে বিব্রত ছিল। সাধারণভাবে তুর্কী ও খাযাররা তাহাদের এই বিব্রতকর অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নাই, যদিও ১৮৩/৭৯৯ সনে খাযারগণ Darband-এর স্থানীয় অসন্তুষ্ট অভিজাত শ্রেণীর আমন্ত্রণে আর্‌রান আক্রমণ করে (তাবারী, ৩খ, ৬৪৮; ইব্নু'ল-আছীর, বৈরূত, ৬খ, ১৬৩; Dunlop, পূ. গ্র. ১৮৩-৫)।

আমু দরিয়ার দক্ষিণে বাযয-এ কেন্দ্রীভূত খুররামী ধর্মদ্রোহী নেতা বাবাক (দ্র.)-এর বিদ্রোহের ফলে বহিঃককেসিয়ায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শাক্কীর আর্মেনীয় শাসক সাহ্‌ল-ই সুম্‌বাতিয়ান বাবাককে বন্দী করিয়া ২২২/৮৩৭ সনে 'আব্বাসীদের নিকট হস্তান্তর করেন। এই শাসকই নিম্নে বর্ণিত স্থানীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে পরিচালিত বুগার অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত আর্‌রান এবং তৎসংলগ্ন আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার অংশসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখেন [দ্র. Minorsky, Caucasica, IV. I, Sahl ibn Sunbat of Shakki and Arran, in BSOAS, ১৫ সংখ্যা (১৯৫৩ খৃ.), ৫০৪-১৪]। আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফাতকালে তুর্কী সেনাপতি প্রবীণ বুগা (বুগা আল-কাবীর দ্র.) ২৩৭/৮৫১-২ সনে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী কয়েক বৎসর কিছু অভিযান পরিচালনা করিয়া তিনি তিফলীস অধিকার করেন এবং ইহার আরব আমীর ইসহাক ইব্ন ইসমা'ঈলকে পদচ্যুত করিয়া হত্যা করেন। এই আরব আমীরগণ কুরাশী বংশোদ্ভূত কিংবা শেষ উমায়্যা খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদের জনৈক মাওলা-র বংশধর। আমীরী শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন ককেসাসে আরব শক্তির কেন্দ্রবিন্দুরূপে বিদ্যমান ছিল এবং মাস'উদী, মুরূজ, ২খ, ৬৬-এ নির্দয় ধ্বংসলীলাকেই ককেসাসে আরব শক্তি ও প্রভাব হ্রাসের প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ বলিয়া চিহ্নিত করেন। বুগা জর্জিয়ার উত্তরে মধ্য ককেসাস অঞ্চলের খৃষ্টান শাসক সানারিয়্যাসহ (জর্জিয়ান ভাষায় তস'আনার) আর্‌রান ও কাখেতিয়ার বিভিন্ন খৃষ্টান ও অখৃষ্টান শাসককে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। [এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে দ্র. Minorsky, Hudud al-alam, ভাষ্য, পৃ. ৪০০-২; জাতিতাত্ত্বিক দিক হইতে তাহারা সম্ভবত চেচেনদের (Cecens) সহিত সম্পর্কিত, যদিও মাস'উদীর সময়ে তাহারা নিজদিগকে উত্তর আরবীয় 'উকায়ল গোত্রোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিত; দ্র. মুরূজ, ২খ, ৬৭]। বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেই বুগা কর্তৃক ইরাকে নির্বাসিত হয়। খাযার পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে তিনি পুনরায় ২৪০/৮৫৪ সনে নির্বাসন ও পুনর্বাসনের নীতি প্রয়োগ করেন। এই পরিবারসমূহকে

আর্রানে শামকূর-এর পুরাতন অবস্থানস্থলে স্থাপন করা হয়। পরে খলীফার সম্মানে এই স্থানের নূতন নাম রাখা হয় আল-মুতাওয়াককিলিয়্যা। বলা হয় যে, তিনি দারিআল গিরিপথ দিয়া ৩,০০০ আলান পরিবারকেও আনয়ন করিয়াছিলেন। দ্র. বালাযুরী, ২১১-১২; য়া'কূবী, ২খ, ৫১৮, ৫৯৮; তাবারী, ৩খ, ১৪০৭-৯; ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ৭খ, ৫৮-৯, ৬৭-৮; Marquart, Streifzuge, পৃ. ৪০৮ প. (আর্মেনীয় উৎসসমূহ); Minorsky, E.I.[1], Tiflis-এ; Dunlop, The history of the Jewish Khazars, ১৯৩-৪ এবং C. J. F. Dowsett, অনু. The history of the Caucasian Albanians by Moves Dasxuranci, লণ্ডন ১৯৬১ খৃ., ২১৮-১৯।

(৩) স্থানীয় ককেসীয়, দায়লামী ও কুর্দী রাজবংশের উত্থান ঃ ৪র্থ/১০ম শতকের প্রারম্ভে এমন এক যুগের সূচনা হয় যখন এই ককেসাস অঞ্চলে খলীফার প্রতিনিধিগণের যে সামান্য প্রভাব ছিল, তাহাও লোপ পায়। অঞ্চলটি বাগদাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বিষয়টি এই সময়ের 'আব্বাসী খিলাফাতের সার্বিক দৌর্বল্যের একটি দিকমাত্র, বিশেষ করিয়া এই সময় পর্যন্ত অবদমিত দায়লামী, কুর্দী প্রভৃতি পূর্ব ইরানী শক্তিবর্গের গতিশীল উত্থান পূর্ব ককেসাস ও বহিঃককেশিয়া দ্বারা প্রভাবিত হইতে শুরু করে, ৩১৭/৯২৯ সনে সাজিদ শাসকগণের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ লোপ পাইলে শতাব্দীকালের মধ্যেই তাহারা আমু দরিয়া-কুর উপত্যকায় এবং আরও দূরবর্তী অঞ্চলে তাহাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। এই সময়েই পূর্ব বহিঃককেশিয়ায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডরাজ্যের আবির্ভাব হয়, যথা ঃ দারবান্দ-এর আরব বানূ হাশিমগণের রাজ্য (বাবু'ল-আবওয়াব দ্র.), শারওয়ানের আরব বানূ য়াযীদগণের রাজ্য (শারওয়ান শাহ দ্র.) এবং আর্রানের দায়লামী মুসাফিরীগণের (Musafirids) রাজ্য, যাহা কুর্দী শাদ্দাদীয়গণের (Shaddadids) দ্বারা সেখানে ৩৬০/৯৭০ সনে স্থাপিত হয় (দ্র. মুসাফিরীগণ ও বানূ শাদ্দাদ)।

বলিতে গেলে পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহ ও নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে পার্শ্ববর্তী মুসলিম, জর্জীয় ও আর্মেনীয় খণ্ডরাজ্যত্রয়ের ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারকারী কতিপয় ঘটনা ব্যতীত অন্য সকল তথ্যই অপ্রতুল। এই যুগের মুসলিম ভূগোলবিদগণের রচনাবলীতে ককেসাস কিছুটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। হুদুদু'ল-'আলাম সম্পর্কিত তথ্য উপরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে দ্র. ইব্ন খুররাদাযবিহ, ১২৩-৪; ইব্ন রুসতা ৮৯, ১৪৭-৯, অনু. ৯৯, ১৬৫-৮; Minorsky কর্তৃক A history of Sharvan and Darband, ১৬৬-৯-এ বিশদভাবে আলোচিত; ইব্নু'ল-ফাকীহ, ২৮৬-৯৮; ইসতাখরী, ১৮০-৯৩; ইব্ন হাওকাল, ২য় সং, ২খ, ৩৩১-৫৫, অনু. ২খ, ৩২৫-৪৮ এবং মাকদিসী, ৩৭৪-৮৪।

এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক মাস'ঊদীর আনু. ৩৩২/৯৪৩ সনে প্রদত্ত ককেসাস সংক্রান্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা মুরূজ, ২খ, ১-৭, ১৯-২২, ২৫-৬, ৩৯-৫০, ৬৫-৭৭-এ সন্নিবেশিত হইয়াছে। Barbier de Meynard-কৃত নামসমূহের বানানের বহু সংশোধনসহ Minorsky (পূ. গ্র., ১৪২-৬৫) ইহার অনুবাদ করেন। মাস'ঊদীর ভাষ্য হইতে আমরা ককেসাসের সমকালীন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ তথ্য লাভ করিতে পারি। তিনি তদানীন্তন শারওয়ান শাহ, আরব ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইব্ন য়াযীদ (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) এবং সারীর-এর আভার রাজ্যের শাসককে সাসানী সম্রাট বাহরাম পূরের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করেন। বিষয়টি পূর্ব ককেসাসে ইরানী সংস্কৃতির বলিষ্ঠ প্রভাবেরই একটি নিদর্শন। মাস'ঊদীর সমকালেই কুর-এর উত্তরে অবস্থিত লায়যান ও মুকান (আমু দারিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত অধিকতর পরিচিত মুকান বা মুগান হইতে পৃথক বিবেচ্য) ইত্যাদি প্রতিবেশী রাজ্য এবং খুরসান শাহ ও ওয়ারদান শাহের রাজ্যসমূহ গ্রাসের উদাহরণ হইতে শারওয়ান শাহদের সম্প্রসারণবাদী প্রবণতার প্রমাণ মিলে। তাব্রাসারান Darband-এর হাশিমী আমিরগণের এক আত্মীয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অমুসলিম জনগণের মধ্যে তিনি দাগিস্তানের খায়দাক বা কায়তাকের জনগণের উল্লেখ করেন। ইহারা ছিল আভারদের উপর নির্ভরশীল এবং দারবানদের মুসলিম জনগণকে অবিরত উত্যক্ত করিত, যদিও তাহাদের শাসক ছিলেন একজন মুসলিম। গুমীক ও সারীর-এর শাসনকর্তা ছিল খৃষ্টান এবং আলানদের শাসকগণও খৃষ্টান ছিল। তবে মাস'ঊদী বলেন যে, ৩২০/৯৩২ সনে তাহারা খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে (ইহা একটি সাময়িক ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপার হইয়া থাকিবে, কারণ মোঙ্গলদের যুগে আলানগণ ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে গ্রীক Orthodox ছিল)। আলান রাজার বৃহৎ ক্ষমতা এবং তাহার দুর্গসমূহের দুর্ভেদ্যতার কথাও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আলান রাজধানীকে মাগাস বলা হইয়াছে, যাহার সঠিক অবস্থান অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে [দ্র. Minorsky, Caucasia, II. The Alan capital Magas and the Mongol Campigns, BSOAS, ১৪ সংখ্যা (১৯৫২ খৃ.), ২৩২-৮]। ককেসাসের দক্ষিণ ঢালসমূহে কতিপয় খৃষ্টান অথবা অংশত খৃষ্টান, অংশত মুসলিম, অংশত পৌত্তলিক খণ্ডরাজ্য ছিল, যেমন জর্জিয়া, সানার, শাক্কী এবং নিকবর্তী কাবালা ইত্যাদি। সর্বশেষে আমরা উত্তর-পশ্চিম ককেসাসের চেরকেস (Cerkes) সম্পর্কে জানিতে পারি—যাহাদিগকে কাশাক বা কাসাক নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে (পুরাতন রুশ ঘটনাপঞ্জীতে বর্ণিত কাস্গ = Kasog নিম্নে দ্র.); মাস'ঊদী ইহাদিগের সুদর্শন পুরুষ ও সুন্দরী রমণীকুলের প্রশংসা করিয়াছেন। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহারা মামলূক ও ক্রিমীয় তাতারদের নিকট ক্রীতদাস হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হইত। মাস'ঊদী তাহাদেরকে 'মাজূস' বা অগ্নি-উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সময়ের মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম স্থানীয় পৌত্তলিকতার মধ্যে অন্ততপক্ষে একটি আশ্রয় পাইয়া থাকিবে (আরও দ্র. চেরকেস)।

ভূগোলবিদগণের মধ্যে ইব্ন হাওকালের কিতাবু সূরাতি'ল-আর'দ, বিশেষত ২খ, ৩৪২-৪, ৩৪৮, ৩৫৪-৫, অনু. ২খ., ৩৩৫-৭, ৩৪১-২, ৩৪৭-৮-এ পরিবেশিত তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ ইহা মাস'ঊদীর পরবর্তী কোন এক যুগে রচিত এবং আর্রান, আর্মেনিয়া ও পূর্ব ককেসাসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইব্ন হাওকাল নিজে সম্ভবত আমু দরিয়ার উত্তরে খুব বেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন নাই। তবে এই ব্যাপারে তিনি 'প্রতিবেদনসমূহের' (আখবাব) উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

আর্রান ও আর্মেনিয়া সম্পর্কে এই বিবরণসমূহ Minorsky কর্তৃক [Caucasica IV-এ তাঁহার প্রবন্ধ The Caucasian Vassals of Marzuban in 344/955, BSOAS, ১৫ সংখ্যা, (১৯৫৩ খৃ.), ৫১৪-২৬] বিশদভাবে সমীক্ষিত হইয়াছে। এই সকল হইতে দেখা

যায়, অখ্যাত কিছু জাতির ইতিহাসের সম্প্রসারণের পর্যায়ে কিভাবে দায়লামীদের প্রভাব কাস্পিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত মূল দায়লাম হইতে উত্তরাভিমুখে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পূর্ব আযারবায়জানের আরদাবীলের একটি ঘাঁটি হইতে মারযুবান ইব্ন মুহাম্মাদ (৩৩০-৪৬/৯৪১-৫৭) নামক একজন মুসাফিরী আমু দরিয়া অতিক্রম করিয়া আরও অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য পূর্ব বহির্ককেশিয়ার সীমান্ত ও পার্বত্যাঞ্চলের কতিপয় রাজন্যকে স্বীয় প্রভাবাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব ছিল দায়লামী প্রভাববলয়ে শারওয়ানের অন্তর্ভুক্ত, দুইটি মুসাফিরী অভিযানের ফলে তাহা সম্ভব হইয়াছিল— প্রথমটি ৩৩৪/৯৪৫ সন ও ৩৩৭/৯৪৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে মারযুবান ইব্ন মুহাম্মাদ কর্তৃক এবং দ্বিতীয়টি আনু. ৩৫৭/৯৬৮ সনে তাঁহার পুত্র ইবরাহীম কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই ঘটনাদ্বয়ের প্রথমটির সময়ে শারওয়ান শাহ (সম্ভবত আবূ তাহির য়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ, দ্র. Minorsky, A history of Sharvan and Darband, শা. ৯) দশ লক্ষ দিরহাম কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্য যে সকল শাসনকর্তা এই সময়ে দায়লামীদের সহিত সন্ধি করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন শাক্কী-র অধিপতি যাঁহাকে আর্মেনীয় উচ্চারণের ইশখানীক (মূল পাঠ, ইশজানীক) নামে অভিহিত করা হয়, جرز -এর অধিপতি যাহাকে Minorsky বলিয়াছেন 'খাযার' এবং যাহাতে ইংগিত রহিয়াছে খাযারদের বহুদিনের আবাসস্থল (উপরে দ্র.) শাক্কী ও শারওয়ানের মধ্যবর্তী কাবালার প্রতি এবং জনৈক আবু'ল-কাসিম জা-য়-যানী; Minorsky মনে করেন যে, এই শেষোক্ত নামটি সম্ভবত মাস'উদী বর্ণিত (উপরে দ্র.) দাগিস্তানের খায়দাক বা খায়যাক অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা খাযাকী না হইয়া বরঞ্চ বাকূর উত্তর-পশ্চিমে কাস্পিয়ান তীরস্থিত খায়যানের সহিত সম্পর্কিত খায়যানীরূপে পঠিত হইতে পারে। মিসকাওয়ায়হ (Eclipse of the 'Abbasid Caliphate, ২খ, ১৬১, অনু. ৫খ, ১৭২) ৩৪৪/৯৫৫ সনে দারবান্দ অঞ্চলে একটি বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে সাফল্যের সহিত দমন করিবার কৃতিত্ব মারযুবানকে প্রদান করিয়াছেন। তবে মুসাফিরী রাজত্ব ককেসাসের উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত আসলে সম্প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব বহির্ককেশীয়ায় মুসাফিরী সাম্রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই; কুর্দী প্রভাবাধীন আরব পরিবার রাওওয়াদীগণের চাপের মুখে ৩৭৪/৯৮৪-৫ সনের মধ্যে আযারবায়জানও মুসাফিরীদের হস্তচ্যুত হয়। এই সময় হইতে মধ্য সালজূক যুগ পর্যন্ত ককেসাসের ইতিহাসের উপর আমাদের অতি মূল্যবান একক উৎস হইল বেনামে লিখিত "তা'রীখ বাবি'ল-আবওয়াব", ইহা মুনেজ্জিম-বাশি-র সংকলন "জামি'উ'দ-দুওয়াল"-এ সংরক্ষিত দারবান্দ, শারওয়ান ও আররানের স্থানীয় ইতিহাস। সংকলকের মতে ৬ষ্ঠ/১১শ শতকের প্রারম্ভ হইতে ইহার সূচনা; পূর্ব ককেসাসের এই ইতিহাস হইতে উদ্ধৃতিসমূহ Minorsky-এর Studies in Caucasian history (মুসাফিরী, শাদ্দাদীয় ও রাওওয়াদীগণের সম্পর্কে) ও A history of Sharvan and Darband-এ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দারবান্দের হাশিমী ও শারওয়ানের য়াযীদী বা মাযয়াদী মূলত আরব্য এই ধারা দুইটির ভাগ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। এই দুই শাসক পরিবারের মধ্যে প্রায়ই বিবাহবন্ধন স্থাপিত হইত (৪২৬/১০৩৫ সনে Darband-এর আমীর 'আবদু'ল-মালিক ইবন মানসূর 'আলী ইব্ন য়াযীদের ভগ্নীকে বিবাহ করেন (দ্র. A history off Sharwan, শা. ১৬, ৩৯)। তবে দুইয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কলহ-বিবাদও প্রায়ই ঘটিত। উত্তর শারওয়ানের মাসকাত ও শাবারানসহ ককেসাসের পশ্চিম তীরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ছিল তাঁহাদের বিবাদের বিষয়। দারবান্দের অধিপতিগণ বিশেষ উপলক্ষে সারীর-এর দাগিস্তানীগণকে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে শারওয়ানের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতেন ঃ উদাহারণস্বরূপ, শারওয়ান শাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ-এর রাজত্বকালে (৩৪৫-৭০/৯৫৬-৮১) এমনটি হইয়াছিল, দ্র. A history of Sharvan, শা. ১২। কিন্তু প্রায়ই উত্তরে ইসলামের দুর্গপ্রাচীর সদৃশ্য দারবান্দ এই পার্বত্য জনগণের লুণ্ঠতরাজের শিকার হইত। ৩৬০/৯৭১ সনে দারবান্দের বাহিরে সারীর-এর জনগণের সহিত এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে মুসলমানদের পক্ষে দারবান্দের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও বহিরাগত গাযীদের মধ্য হইতে ১,০০০ জনকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল (ঐ, শা. ৩৫)।

ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলিমগণ এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে শাস্তিমূলক অভিযান চালাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই অভিযান স্বেচ্ছা সৈনিকদের (গুযাত, মুত্তাওবি'আ) জিহাদী উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। এই অভিযানের ফলে মূল্যবান ককেশীয় দাস লাভের মাধ্যমে কিছুটা আর্থিক মুনাফাও হইয়াছিল। শারওয়ান শাহ আহমাদের পুত্র মুহাম্মাদ ৩৭১/৯৮১-২ সনে ককেসাসের অভ্যন্তরে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া শাসনকর্তা 'আবদু'ল-বারর ইব্ন 'আব্বাসার নিকট হইতে কাবালা নগর অধিকার করেন। অনুমিত হয় যে, এই শাসনকর্তা ছিলেন (মাস'উদী, মুরূজ, ২খ, ৬৮-এ উল্লিখিত) "চোর, রাহাজান ও দুষ্কৃতিকারীদের আশ্রয়দাতা"রূপে বর্ণিত আন্বাসা আল-আ'ওয়ার-এর পুত্র। শারওয়ান শাহ য়াযীদ ইব্ন আহমাদ ৩৮৯/৯৯৯ সনে সংঘটিত অপর একটি সংঘর্ষে ইব্ন 'আন্বাসাকে পুনরায় পরাজিত করিয়া গোক-চায় (Gok-cay) নদীর তীরবর্তী গুরযুল দুর্গ দখল করেন। এই সুদৃঢ় দুর্গটি সিকি শতাব্দী পরেও শাহের কর্তৃত্বাধীন ছিল; ইহা ককেসাস পর্বতের দক্ষিণ ঢালসমূহের অভিমুখে সামরিক দিক দিয়া গুরত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি হিসাবে গণ্য হইত (A history of Sharvan, শা. ১৩, ১৪)।

যাহা হউক, সম্পূর্ণ ককেশীয় ও বহির্ককেশীয় অঞ্চলেই মৈত্রী ও জোটবদ্ধতার ঘন ঘন পরিবর্তন হইত এবং কখনও কখনও ইহার ধর্মীয় ঐক্যের ভূমিকা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। দারবান্দের একজন আমীর পৌত্তলিক রুশদের (Rus) দেহরক্ষীরূপে নিযুক্ত করিতে পারিতেন (নিম্নে দ্র.)। তিফলীসে মুসলিম ও খৃষ্টানরা পাশাপাশি বসবাস করিত এবং ৫ম/১১শ শতাব্দীর চতুর্থাংশে নগরটির কর্তৃত্ব লইয়া জর্জিয়ার চতুর্থ বাগ্রাত (Bagrat) ও তাঁহার অধীনস্থ জায়গীরদার লিপারিত (Liparit) এবং তিফলীসের তদানীন্তন মুসলিম শাসক জা'ফার ইব্ন 'আলীর মধ্যকার ত্রিপাক্ষিক সংঘাতে বিভিন্ন সময়ে বাগ্রাত এবং জা'ফারকে লিপারিত-এর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। শাদ্দাদীয় ফাদল বা ফাদলূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শাদ্দাদের বিরুদ্ধে আনু. ৪১৭/১০২৬-৭ সনে জর্জীয় ও আর্মেনীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের একটি কোয়ালিশনেও জা'ফার যোগ দিয়াছিলেন (দ্র. Minorsky, Studies in Caucasian history, ৪৩-৪, ৫৬-৭)। আনাতোলিয়া ও আইবেরীয় উপদ্বীপের অনুরূপ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সচরাচর

বিবাহ দৃষ্ট হইত। History of Sharvan, শা. ৩৮-এ, ৪১৬/১০২৫ সনে দারবান্দ-এর আমীর মানসূর ইব্ন মায়মূনের সহিত সারীর-এর বুখত-য়িশু' (Bukht-Yishu)-র কন্যার বিবাহের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এই শাসনকর্তার ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার সিরীয় খৃষ্টীয় নাম হইতেই স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে রুশগণ (এখন সম্ভবত স্কাণ্ডীনেভীয় ও স্লাভদের মিশ্র জনগোষ্ঠী) (দ্র. রুশ-Rus) ককেসাস ও পার্বত্যাঞ্চলের উত্তরের স্তেপসমূহের ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। ৩৩২/৯৪৩-৪ সনে আর্রানের বারযা'আয় রূস আবির্ভাবের ফলে সৃষ্ট ভীতি ও সন্ত্রাসের কারণে উহা ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত। এই সময় অভিযানকারীরা কুর নদী ধরিয়া নগরটিতে লুণ্ঠন কার্য চালায় এবং কয়েক মাসের জন্য তাহা অধিকার করিয়া রাখে (দ্র. বারযা'আ)। ভল্গা অববাহিকায় রূস আক্রমণসমূহের প্রথম শিকার হইয়াছিল খাযারগণ এবং এই সকল আক্রমণের ফলে এককালের গৌরবোজ্জ্বল খাযার রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় অথবা নিদেনপক্ষে রাজ্যটি দারুণভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহা দক্ষিণের খাযারী এলাকাগুলিতে, বিশেষ করিয়া কুবান স্তেপ অঞ্চলে গিয়া ঠেকিয়াছিল। Russian Primary Chronicle অনুসারে কিয়েভের স্তিয়াতোস্লাভ ৯৬৫ খৃ. খাযার খানকে পরাজিত করিয়া Biela Vieza বা "শ্বেত তাঁবু দুর্গ" নামক শহরটি দখল করিয়া লন। এই শহরটিকে নিম্ন ডন এলাকার সারকিল (Sarkil) বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে— যাহা গ্রীক Aspron Hospition-এর সহিত অভিন্ন (Chronicle, শা. ৩২, অনু. S. H. Cross, Harvard Studies and Notes in Philology and Literature, ১২খ, ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৩০ খৃ., ১৭১; Dunlop, The history of the Jewish Khazars, ২৪০-১; তু. Marquart, Streifzuge, ২-৩, ৪৭৯)। ইব্ন হাওকাল (১খ, ১৫, অনু. ১খ, ১৪-১৫) বলেন যে, রূসগণ ৩৫৮/৯৬৯ সনে বুলগার এবং "খাযারান, সামান্দার (ভলগার মোহনার দক্ষিণে কাস্পিয়ান তীরে?) ও আতিল" অঞ্চলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে (Dunlop, পূ. গ্র., ২৪১ প.)। The Russian Primary Chronicle-এ আরও বর্ণিত আছে যে, Biela Vieza হস্তগত করিয়া সিভয়াতোস্লাভ য়াসগণকে (Yas) (অর্থাৎ অ্যাস্ [As] বা আলানগণ) ও কাসোগদিগকে (অর্থাৎ কাশাক বা কেরকেস) বশীভূত করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের আক্রমণ ককেসাসের উত্তর-পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় অংশগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ৯৬৫ খৃষ্টাব্দের রূস হামলাসমূহের পরে খাযার নেতৃবর্গ সম্ভবত শারওয়ান শাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদের [অথবা এই শাহের পিতা আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (যিনি ৩৭০/৯৮০-১ সন পর্যন্ত শারওয়ানে রাজত্ব করিয়াছিলেন) হইতে পারেন, যাঁহাকে ইব্ন হাওকাল সম্ভবত মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন] নিকট আতিল ও খাযারানে প্রত্যাবর্তনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া উহা লাভ করিতে সমর্থ হন (ইব্ন হাওকাল, ২য় সং, ২খ, ৩৯৭-৮, অনু. ২খ, ৩৮৮; Dunlop, পূ. গ্র., ২৪৬ ও আদিল দ্র.)।

এই সময়ে নিশ্চিতভাবেই রুশ জাহাজসমূহ কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীর বরাবর কর্মতৎপর ছিল। দারবান্দ-এর আমীর মায়মূন ইব্ন আহমাদ ১৮টি ভাড়াটিয়া জাহাজে ভাড়াটিয়া সৈন্য (গিলমান) হিসাবে আগত রুশদিগের কিছু সংখ্যককে ৩৭৭/৯৮৭ সনে তাঁহার অধীনে চাকুরীতে নিয়োগ করিবার প্রয়াস পান, যদিও এই সৈন্যরা তখনও পর্যন্ত ছিল পৌত্তলিক। এই রূসগণের বোধগম্য অর্জনপ্রিয়তার কারণে দারবান্দ-এ ৩৭৯-৮০/৯৮৯-৯০ সনে মায়মূনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের সূত্রপাত হয়, যাহার ফলে তিনি সাময়িকভাবে পদচ্যুত হন (A history of Sharvan, শা. ১৩, ৩৬)। রুশ আক্রমণকারীদিগের মুকাবিলায় নিম্ন ভল্গার প্রবেশপথ রুদ্ধ করিতে অবশিষ্ট খাযারদের অক্ষমতা হেতু রুশগণ প্রায়ই কাস্পিয়ানে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। ৪২১/১০৩০ সনে ৩৮টি রুশ জাহাজ শারওয়ানের নিকটবর্তী সমুদ্রাঞ্চলে আবির্ভূত হয় ও বাকূতে শাহ মানূচিহর ইব্ন য়াযীদকে পরাজিত করে। সম্ভবত তাহারা কুর নদী বাহিয়া অগ্রসর হইয়া নব্বই বৎসরের এই ধরনের কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা গাঞ্জার শাদ্দাদীদের আন্তঃপারিবারিক কোন্দলে বিবদমান একটি পক্ষের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে (ঐ. শা. ১৫, ৩৮)। ঘটনাচক্রে তাহারা পার্বত্য অঞ্চল ঘুরিয়া পশ্চিম ককেসাস ও কৃষ্ণ সাগরেও পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সম্ভবত ইহার পর তাহারা উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া তামান উপদ্বীপে পৌঁছায়, যেখানে ৯৮৮ খৃ. কিয়েভের নৃপতি Mstislav, Tmutorokan নামক রুশ খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (Russian Primary Chronicle, শা. ৪৩, অনু. ২০৭, তু. শা. ৫২, অনু. ২২৩)। আযোভ (Azov) সাগরের দক্ষিণে এই রুশ ঘাঁটি থাকার ফলে তাহারা পশ্চিম ককেসাসের চেরকেস ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপর চাপ প্রয়োগের সুযোগ পায়। Chronicle-এ উল্লেখ আছে যে, Mstislav রেদেদয়ার শাসনাধীন কাসগ্দিগকে আক্রমণ করেন এবং পরবর্তী বৎসর তিনি তাঁহার ভ্রাতা Yaroslav-এর সহিত পারিবারিক কোন্দলে কাসগ্ ও খাযার সৈন্যদিগকে (তামান উপদ্বীপ অঞ্চলের খাযারগণ ?) ব্যবহার করেন (শা. ৫২, অনু. ২২৩)। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ১০৬৬ খৃ., Mstislav-এর পুত্র Rostislav কাসগ্দিগের ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিকট হইতে Tmutorokan-এ কর গ্রহণ করেন। ১০৮৩ খৃ. পর্যন্ত এই অঞ্চলের খাযারদের উল্লেখ দেখা যায় (অনু. ২৩৪, ২৫৮)।

রুশ আক্রমণকারিগণ শুধু নৌ-পথেই আগমন করিত, তাহা নহে। ৪২১/১০৩০ সনে শারওয়ানের উপর আক্রমণের দুই বৎসর পর দারবান্দ-এর আমীর মানসূর ইব্ন মায়মূনের নেতৃত্বে গাযীদের একটি শাস্তিমূলক অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই অভিযানের দ্বারা শারওয়ান হইতে ককেসাসের মধ্য দিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ প্রত্যাবর্তনকারী রুশগণ খুবই নিগৃহীত হইয়াছিল। প্রতিশোধস্বরূপ রুশ ও আলানদের একটি সম্মিলিত বাহিনী কারাখের ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্যটিকে ধ্বংস করিয়া দিবার প্রয়াস পায়। এই কারাখ রাজ্যটি ছিল দারবান্দ-এর পশ্চিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং মাস'উদীর মতে ইহার শাসনকর্তার উপাধি ছিল মারযবান (মুরূজ, ২খ, ৪০)। কিন্তু মাত্র এক পুরুষ পূর্বেই ইসলাম গ্রহণকারী কারাখের যোদ্ধৃগণের নিকট রুশ ও আলানগণ চরমভাবে পরাজিত হয় (A history of Sharvan, শা. ১৫, ৩৬, ৩৮)।

(৪) সালজূক যুগ ঃ খুরাসানে গাযনাবী প্রতিরক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ামাত্র উত্তর ইরান ও আর্মেনিয়ার ওগুয তুর্কোমানগণের আবির্ভাব ককেশীয় রঙ্গমঞ্চে এক নূতন উপাদান সংযোজন করে। কারণ পশ্চিম বহির্ককেশীয়ার খৃষ্টান খণ্ডরাজ্যদ্বয় এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম খণ্ডরাজ্যগুলি উভয়, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, আযারবায়জান, আর্মেনিয়া ও

বায়যান্টাইন সীমান্তের বিশৃঙ্খলার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ওগুযদের ভয়ে ৪৩৬/১০৪৪-৫ বা ৪৩৭/১০৪৫-৬ সনের মধ্যেই শারওয়ান শাহ কুবায ইব্ন য়াযীদ সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর ও লৌহ-নির্মিত ফটকের দ্বারা তাঁহার রাজধানী য়াযীদিয়্যাকে (শারওয়ানের ঐক্য বিধানকারী আমীর আবূ তালিব য়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ কর্তৃক ৩০৬/৯১৮ সনে স্থাপিত, A history of Sharvan, শা. ৯ দ্র.) সুরক্ষিত করিয়া তোলেন (শা. ১৭)।

বাগরাতীয়দের ও গাজিক পরিবারদ্বয়ের শাসনাধীন খৃস্টান রাজ্যদ্বয়, যথাক্রমে পশ্চিম জর্জিয়া বা আবখায ও পূর্ব জর্জিয়া বা কাখেতিয়া ইহার পূর্বেই ইহাদের দক্ষিণাঞ্চলে তুর্কোমান হুমকির সম্মুখীন হইয়াছিল। কতিপয় সূত্রানুযায়ী, বিশেষত সিরীয় ও আর্মেনীয় খৃস্টীয় উৎসসমূহ অনুসারে পরবর্তী সালজূক সুলতান তুগরিলের ভ্রাতা চাগরি বেগ দা'উদের নেতৃত্বে ৪০৯/১০১৮ বা ৪১২/১০২১ সনে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার অভ্যন্তরে এক দীর্ঘ অঞ্চলব্যাপী তুর্কোমান আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য সূত্র অনুসারে এই আক্রমণ কয়েক বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, (তু. Bosworth, The Chaznavids, their empire in Afghanistan and eastern Iran, Edinburgh ১৯৬৩ খৃ., ২২৩-৪)। আক্রমণটি পূর্ববর্তী তারিখসমূহের কোন একটিতে সংঘটিত হইয়া থাকিলে, ইহা সর্বশেষ আরদুযরুনীয় (Ardzrunid) অধিপতি, সেনেক 'এরিম অথবা সানহারীব কর্তৃক আনাতোলিয়ার কিছু ভূ-সম্পত্তির পরিবর্তে বহিরাক্রমণের মুকাবিলায় অরক্ষিত ভাসপুরাকান (Vaspurakan) প্রদেশটি বায়যান্টীয়দের নিকট ছাড়িয়া দেওয়ার একটি কারণ হইতে পারে (১০২১ খৃ.)। অবশ্য এই উৎসগুলিতে অন্যান্য কারণও উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. E. Honigmann, Die Ostgrenze des byzantinschen Reiches von 363 bis 1071. ব্রাসেলস ১৯৩৫ খৃ., ১৬৮ প.)। যেই মুহূর্তে জর্জিয়া ও অবশিষ্ট আর্মেনীয় খণ্ডরাজ্যগুলির প্রতি হুমকির বৃহত্তর উৎস ছিল বায়যান্টাইন সম্রাট Basil II Bulgaroctonus-এর অনুসৃত শক্তিশালী নীতিমালা। কিন্তু ১০২৫ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পর জর্জীয় শাসনকর্তা Bagrat IV কাখেতিয়ার অধিপতি Kiurike III এবং জর্জীয় ও আর্মেনীয় নেতৃবৃন্দ আররানের শাদ্দাদীদের ও তিফলীসের আমীর জা'ফার ইব্ন 'আলীর বিরুদ্ধে কিছুটা বিভ্রান্তিকর কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারণবাদী নীতি অবলম্বন করে। ৪৩৮/১০৩৬-৭ সনে জা'ফারের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময়ে তিফলীস নগরী জর্জিয়দের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছিল (দ্র. Minorsky, E.I.[1], Tiflis এবং ঐ লেখক, Caucasia in the history of Mayyafariqin, BSOAS, ১৩খ, ১৯৪৯-৫০ খৃ., ২৯, ৩১-এ; ইবনু'ল-আযরাকের মতে তিফলীস-এ আমীর জা'ফারের কার্যাবলী অতীতে আনু. ৩১৫/৯২৭ সন পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়)।

দাগিস্তান ও পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য লুণ্ঠনকারীর কারণেও শাদ্দাদীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ৪৪১/১০৪৯-৫০ সনে আমীর লাশ্‌কারী 'আলী ইব্ন মূসার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, রাজ্যের বহির্ভাগে শাক্কী-র জনগণ, দাদীদিয়্যাগণ (Didos ?) আবখায বা জর্জীয়গণের এবং রূম বা বায়যান্টীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাকল্পে নির্মিত দুর্গসমূহ এই আশায় পরিত্যাগ করেন যে, ইহার ফলে এই জনগোষ্ঠীসমূহ আক্রমণে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে (Studies in Caucasian history, শা., ১৩, তু. পৃ. ২৭-৯)। সুতরাং যখন ইতস্তত ভ্রমণকারী ওগুযদের বিভিন্ন দল এবং পরে সালজূকগণ ও তাহাদের আমীরগণ বহির্ককেশীয়ায় (Transcaucasia) আবির্ভূত হয় তখন তাহারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে।

ওগুযগণ লাশকারী 'আলীর রাজত্বকালে (৪২৫-৪১/১০৩৪ হইতে ১০৪৯-৫০) আররানে হয়রানি সৃষ্টি করিয়াছিল (Studies in Cacausian history, শা. ১২)। কিন্তু ৪৪৬/১০৫৪-৬ সনে যখন তুগরিল আযারবায়জান ও আর্‌রান-এ আগমন করেন তখন শাদ্দাদীয় আবু'ল-আসওয়ার শাউর তাঁহার রাওওয়াদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াহসূদান ইব্ন মুহাম্মাদ এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য শাসক সকলেই এই সালজূক অধিপতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার নামে খুতবা দান শুরু করেন (ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ৯খ, ৫৯৮-৯; তু. Studies in Caucasian history, ৫৪)। ইহার পর শাদ্দাদীগণ জর্জীয়গণের চাপ উপলব্ধি করিতে থাকে এবং নিঃসন্দেহে জর্জীয় প্ররোচনার ফলেই জর্জীয়গণের 'আলান' মিত্রগণ ৪৫৪/১০৬২ সনে আর্‌রান-এ আক্রমণ চালাইতে উৎসাহিত হয়। ইহার ফলে আবু'ল-আসওয়ার শাউর গাঞ্জা নগরীকে সুরক্ষিত করিতে বাধ্য হইলেন (ঐ, শা. ১৫, তু. পৃ. ৭৪-৫)।

তুগরিলের উত্তরসূরি আল্‌প আরস্‌লান তুর্কোমান ও 'গাযীদিগকে পারস্য হইতে পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন এবং ৪৫৬/১০৬৪ সনে তিনি স্বয়ং আর্মেনিয়ায় অভিযান চালাইয়া বায়যান্টীয় ও আর্মেনীয়দের নিকট হইতে আনী (Ani) অধিকার করিয়া নেন (ইবনু'ল-আছীর, বৈরূত, ১০খ, ৩৭-৪১; অবশেষে নগরটিকে শাদ্দাদীদের একটি অংশের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছিল; Studies in Caucasian history, ৭৯ প.)। Bagrat IV-এর বিরুদ্ধে জর্জিয়ায় দুইটি অভিযান পরিচালিত হয় এবং সেখানকার রাজার জনৈক ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়া আল্‌প আরস্‌লান সেখানে স্বীয় প্রভাব সুদৃঢ় করেন (দ্র. W. E. D. Allen, A history of the Georgian people, লণ্ডন ১৯৩২ খৃ., ৯১-২)। শাক্কীর কাফিরগণের সাহায্যপুষ্ট আলান কর্তৃক দারিআল গিরিপথের মধ্য দিয়া আর্‌রান-এ পরিচালিত আক্রমণের সহিত ৪৬০/১০৬৮ সনে আল্‌প আরস্‌লান-এর দ্বিতীয় ককেশীয় অভিযান সম্পর্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আক্রমণকারীরা ভীত-সন্ত্রস্ত শাদ্দাদী সৈন্যদিগকে গাঞ্জার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করিয়া অনুপ্রবেশ করে এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মালামাল লইয়া আরাকসেস-এ প্রত্যাবর্তন করে (A history of Sharvan, শা. ৪০ ; Studies in Caucasian history, শা. ১৬)। তথাপি আবু'ল-আসওয়ার নিজে বিভিন্ন সময়ে শারওয়ানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হন এবং চারিটি বিভিন্ন উপলক্ষে ইহাকে আক্রমণ করেন ও শাহ্ ফারীবুরয ইব্ন সাল্লারকে কর দানে বাধ্য করেন। পরে ৪৫৭/১০৬৫ সনে দারবান্দ-এর একটি আন্তঃপারিবারিক কলহে ফারীবুরয হস্তক্ষেপ করেন এবং ৪৫৮/১০৬৬ সনে তাঁহার পুত্র আফরীদূনকে সেখানকার শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত করেন (A history of Sharvan, শা. ১৯, ৪১)।

বস্তুত ক্ষমতাসীন পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার এবং হাশিমী আমীর ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে দারবান্দ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিভিন্ন সময়ে সারীর-এর আভারগণের ও উত্তর দাগিস্তানের কুমিকগণের নূতন নূতন আক্রমণের সম্মুখে প্রতিরক্ষাহীন

হইয়া পড়িয়াছিল (দ্র. ঐ, শা. ৪০)। সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষভাগের কোন এক সময়ে পৌত্তলিক গুমিকগণের ইসলাম গ্রহণ এবং দারবান্দ-এ অবস্থানরত শারওয়ান শাহ ফারীবুরযের নীতির প্রতি তাহাদের সমর্থন হেতু গুমিকদের আক্রমণ হ্রাস পাইয়াছিল। কিভাবে কুওয়া বা ফুওয়া (বাকুর উত্তরে আজকের কুব্বা ?)-এর মুসলিম লাক্দের (Laks) মধ্যস্থতায় গুমিকগণ ইসলাম গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিল এবং কিভাবে শাহ তাহাদের নিকট ইসলামের মৌখিক বিষয়াদির শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার পুত্র 'আদুদের সহিত একজন ইমাম ও একজন খাতীব প্রেরণ করেন, তাহা শাহের দফতরের দুইটি পত্রের বর্ণনাতে পাওয়া যায় (Minorsky এবং Cahen, Le recueil transeaucasien de Mas'ud b. Namdar, ১১৮-১৯, ১৩১-৩, ১৩৮-৪১)।

তুগরিলের রাজত্বের শেষের দিকে তুর্কোমান লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা শারওয়ান আক্রান্ত হইতে শুরু করে। ৪৫৯/১০৬৬-৭ সনে ওগুয নেতা কারাতিজিনাত-এর দ্বিতীয় হামলার সময় য়াযীদিয়্যা ও বাকূ আক্রান্ত হয়, ইহার ফলে পরবর্তী বৎসর ফারীবুরয আক্রমণ হইতে তাহাদেরকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কর প্রদান করিতে সম্মত হন। আরও পরে এই বৎসরেই সুলতান আল্প আরসলান স্বয়ং গাঞ্জার শাদ্দাদীগণ এবং শারওয়ান শাহ উভয়েরই আনুগত্য লাভ করেন। যে সমস্ত তুর্কোমান দলপতি শারওয়ানকে তাহাদের নিকট ইকতা'রূপে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া দাবী করিত, তাহাদেরকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। অবশেষে ৪৬৮/১০৭৫ সনে "দুই ইরাকের আমীর" সাওতিগিন, যাঁহাকে ককেসাসের সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল ইকতারূপে প্রদান করা হইয়াছিল— সেখানে আগমন করেন। এই সময়ে শারওয়ান সম্পূর্ণভাবে সালজূকদের অধীনস্থ একটি সামন্ত ও করদ রাজ্যে পরিণত হয়। সাওতিগিন-এর আবির্ভাবের আরও একটি অর্থ হইল, ফাদলুন ইব্ন ফাদ্ল ইব্ন আবি'ল-আসওয়ার শাউরের পদচ্যুতি ও গাঞ্জায় শাদ্দাদীদের প্রধান শাখার পরিসমাপ্তির এবং তৃতীয়বারের মত সালজূকদের দারবান্দ দখল (Studies in Caucasian history, শা. ১৮-১৯; A history of Sharvan, শা. ২০-৯, ৪২, ৪৬)।

তা'রীখ বাবি'ল-আবওয়াব-এর ৪৬৮/১০৭৫-৬ সনের বর্ণনার সমাপ্তির সাথে সাথে পূর্ব বহির্ককেশিয়া ও ককেসাস সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত তথ্যের হ্রাস পায়। তবে মালিক শাহের অধীনে বিশাল সালজূক সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষের পরে যখন ইহা অভ্যন্তরীণ কলহদ্বন্দ্বের শিকার হয়, তখন শারওয়ান শাহের এবং দারবান্দ-এর আমীরগণের বংশধরগণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। Minorsky তাঁহার A history of Sharvan, ১৩৯-৪১-এ Annex II-রূপে পরবর্তী সালজূক যুগে দারবান্দ-এর বিক্ষিপ্ত বর্ণনাসমূহ একত্রে সন্নিবিষ্ট করেন। দারবান্দ-এর ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর কতিপয় আমীর পূর্ববর্তী হাশিমীগণের বংশধর ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুনেজ্জিম-বাশি, পরবর্তী শারওয়ান শাহদিগের সম্পর্কে, যাহাদিগকে তিনি কাসরানীদের (Kasranids) "তৃতীয় প্রজাতি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, কিছু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। তবে ষষ্ঠ/ দ্বাদশ শতকের এই 'কাসরানীগণ' স্পষ্টত পূর্ববর্তী য়াযীদীগণের প্রত্যক্ষ বংশধর, যদিও তাহারা উত্তরোত্তর পারস্য কৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিল (A history of Sharvan, ৬৮-৯ ও Annex I, ১২৯-৩৮ এবং Barthold, E.I.², শীরওয়ান শাহ)। মোঙ্গল আক্রমণের পূর্ববর্তী যুগে ফারীবুরযের বংশধরেরা চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। এই ফারীবুরয স্বয়ং, সাওতিগিন (Sawtigin) কর্তৃক চাপাইয়া দেওয়া সালজূক শাসকের মুকাবিলায়ও টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দক্ষতার ফলেই এই রাজ্যটি পুনর্বার শক্তভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। শারওয়ানের রাজসভা ইরানী সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল— যেখানে নিজামী ও খাকানীর (যাঁহার কবি নাম বা 'তাখাল্লুস' শাহ মানূচিহ্র ইব্ন আফরীদূন ইব্ন ফারীবুরয-এর গৃহীত উপাধি "খাকান-ই-কাবীর" হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল) ন্যায় কবিগণের এবং জ্যোতির্বিদ কবি ফালাকী শারওয়ানী প্রমুখের সমাবেশ ঘটিয়াছিল (দ্র. J. Rypka ও অন্যান্য, History of Iranian literature, Dordrecht 1968, পৃ. ২০২-৪, ২০৮-৯)।

শারওয়ান শাহগণ দারবান্দ-এর উপর তাঁহাদের আধিপত্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। তবে এই সময়ে তাঁহারা অনেকাংশে জর্জিয়ার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইয়া পড়েন। জর্জিয়ার রাজারাও শারওয়ান শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত শাহগণ নিজদেরকে অন্ততপক্ষে ইরাক ও পশ্চিম পারস্যের প্রতাপশালী সালজূকদের নামমাত্র অধীন রাজন্যরূপে স্বীকার করিয়া নেন। এই স্বীকৃতি ৫৯০/১১৯৪ সনে সর্বশেষে সালজূক অধিপতি তুগরিল ইব্ন আরসলানের মৃত্যু পর্যন্ত শারওয়ানে তৈরী মুদ্রাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। শাহগণ দারবান্দ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে জর্জীয়দের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তাহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনও সচরাচর দৃষ্ট হইত। শাহ আখসতান ইব্ন মানূচিহ্র ইব্ন আফরীদূন ছিলেন জনৈক জর্জীয় রাজকন্যার পুত্র।

অবশ্য এই শতাব্দী ছিল Dmitri I (১১২৫-৫৬ খৃ.), Giorgi III (১১৫৬-৮৪ খৃ.) ও রাণী Thamar (১১৮৪-১২১২ খৃ.) প্রমুখ শাসকবৃন্দের অধীনে জর্জীয় রাজত্বের সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ যুগ। এই সময় দক্ষিণ সীমান্তসমূহকে আযারবায়জান ও আররানের ইলদেগিযীয়দের (Ildegizids দ্র.) আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করা হয়, তখন জর্জীয় সৈন্যদলসমূহ কাস্পিয়ান তীরবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই অনুপ্রবেশ করিতেছিল। ১১২৪ খৃষ্টাব্দেই 'পুনরুদ্ধাকারী' (the Restorer) David II তাঁহার জামাতা শারওয়ান শাহের দাবীর সমর্থনে দারবান্দে একদল সৈন্যের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। মায়াফারিকীনের ইতিহাসবেত্তা ইবনু'ল-আযরাক কর্তৃক রাজকীয় সচিব হিসাবে দিমিত্রি-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ৫৪৮-৯/১১৫৩-৪ সনে দিমিত্রি-১ Ossetia-তে এবং দারবান্দ ও শারওয়ানের লায়যান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনায় রত ছিলেন (Minorsky, Caucasia in the history of Mayyafariqin, ৩১, ৩৩, ৩৫; এখানে Minorsky ইহাও উল্লেখ করেন যে, ইব্নু'ল-আযরাকের নিযুক্তি ছিল রাজধানী তিফলীস ও জর্জিয়ার অন্যান্য অংশে আরব সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের একটি নিদর্শন। এই সময়ে আরবী ভাষা একটি কূটনৈতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে)।

Giorgi III ৫৬৯/১১৭৩ বা ৫৭১/১১৭৫-৬ সনে দারবান্দ-এর আমীর বেগ-বার্স ইব্ন মুজাফ্ফারের শারওয়ান আক্রমণ প্রতিহত করেন। খাকানীর একটি কবিতায় পরাজিত দারবান্দ সৈন্যদলের অভ্যন্তরে আলান, সারীর-এর আভার এবং রুশ Rus খাযারদের (এই শেষোক্তরা Minorsky-এর গ্রহণযোগ্য অনুমান অনুযায়ী ইতিহাসখ্যাত খাযারদের পরিবর্তে বিসচাক বা polovtsi ছিল) অবস্থানের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দারবান্দ অভিযান আপাতদৃষ্টে একটি সম্মিলিত স্থল ও

নৌ-অভিযান ছিল, যাহাতে আপাতদৃষ্টে একটি সম্মিলিত স্থল ও নৌ-অভিযান ছিল, যাহাতে রুশরা নৌবাহিনী সরবরাহ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খাকানী (এই সময়ে যাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শারওয়ানের আখ্‌সাতান ইব্‌ন মানূচিহ্‌র) দাবী করেন যে, এই অভিযানে ৭৩টি রুশ জাহাজ ধ্বংস হয় এবং কুর নদীর মোহনার নিকট ও নদী বরাবর উজানের দিকেও সংঘর্ষ হয় (দ্র. Minorsky, Khaqani and Andronicus Commentus, in BSOAS, ১১খ, ১৯৪৩-৬ খৃ., পৃ. ৫৫৭ এবং আরও দ্র. Iranica, twenty articles, তেহরান ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১২৭ প.)।

সার্বিকভাবে সালজূক ও মঙ্গোল যুগে ককেসাস ও বহির্ককেশিয়ার বহু অংশ বিশেষত অপেক্ষাকৃত নিম্ন অঞ্চলসমূহে একটি ক্রমিক তুর্কীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। তুর্কোমান বেগগণ তাহাদের অনুসারীদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিত এবং আর্‌রান ও আযারবায়জানের অনেক অঞ্চল তাহাদের মেষপালগুলির জন্য ছিল উপযুক্ত। এই প্রদেশগুলিতেও ইলদেগিযীর আতাবেগগণের প্রতিষ্ঠা এবং তুর্কোমান ও কিপচাকদের সময়ে গঠিত একটি শক্তিশালী সামরিক প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে সেখানকার তুর্কী জাতিতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের বিকাশ ঘটিয়াছিল।

স্থানীয় রাজন্যগণ সহজেই বুঝিতে পারেন যে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদে তুর্কীরা ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে শারওয়ান শাহদের ও তাঁহাদের জর্জীয় মিত্রবর্গের চাপের মুখে দারবান্দ সালজূকদের সাহায্য চাহিয়াছিল। তবে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বড় ধরনের প্রত্যক্ষ সাহায্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ককেসাস-এ বিপুল সালজূক প্রভাব অন্ততপক্ষে শতাব্দীর প্রথমাংশে যাহা জর্জিয়ায় ও দক্ষিণ জর্জীয় সীমান্তে অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্যের সহিত বাস্তবায়িত হয়, তাহা রাজা Dmitri কর্তৃক তাঁহার মুদ্রার পৃষ্ঠে 'আব্বাসী খলীফাগণের এবং ইরাকের সালজূক সুলতানগণের নাম গ্রহণেরই একটি নিদর্শন।

জর্জীয় রাজন্যবর্গ প্রায়ই খৃস্টান আলানদের সহিত সামরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ থাকিতেন। রাজপরিবারদ্বয়ের মধ্যে এবং আলানদের ও বায়যান্টীয় সম্রাটদের মধ্যেও প্রায়ই বিবাহ বন্ধন ঘটিত, (দ্র. Studies in Caucasian history, ৭৪-৫)। আলান সৈন্যরা জর্জীয় সৈন্যবাহিনীতে নিয়োজিত হইত। পুনরুদ্ধারকারী ডেভিড আলান তোরণ ও Ossetia-র পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য বিশেষভাবে দুর্গ নির্মাণ করেন। ১১৮৯ খৃ. রাণী Thamar আলান রাজা ডেভিড সোসলান (David Soslan)-কে দ্বিতীয় স্বামীরূপে গ্রহণ করেন (Allen, A history of the Georgian people, ১০৪)। ১১১৮ (?) খৃ. ডেভিড ৫০০০ খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত কিপচাক যুদ্ধবন্দী দাসের সমন্বয়ে একটি বিশেষ রক্ষী বাহিনী গঠন করেন এবং ককেসাসের উত্তরাংশ হইতে আনীত কিপচাক পরিবারবর্গকে সম্প্রতি তৎকর্তৃক পুনর্বিজিত জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার বহু ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে পুনর্বাসিত করেন। Thamar-এর রাজত্বকালে জর্জীয় রাজ্যে কিপচাক সামরিক শক্তি মাঝে মাঝে প্রভাবশালী হইয়া উঠিত। ৫৯৯/১২০৩ সনে ইলদেগিযীয় (Ildegizid) অধিপতি নুসরাতু'দ-দীন আবূ বাক্‌র যখন জর্জীয় ও কিপচাক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আর্‌রান হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন তখনই এই প্রভাব সামরিক উদ্দেশ্যে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে শামকূর গাঞ্জা ও দভীন (Dvin) জর্জীয়দের হস্তগত হয় (Allen, পূ. গ্র., A. Z. V. Togan উমুমী তুরক তারিহিনে গিরিস, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., ১৯০-১)।

(৫) মঙ্গোল ও তীমূরীয় যুগসমূহ ঃ খাওয়ারাযমীয় ও মঙ্গোল আক্রমণের সময়ে ককেসাসে বিপর্যয় ও ওলট-পালট ঘটে এবং বলিতে গেলে জর্জিয়ার ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং বহির্ককেশিয়ায় আধিপত্য খাটাইতে পারে— এমন একটি বৃহত্তর জর্জিয়ার জন্য বাগ্‌রাতীয়দের উচ্চাভিলাষে চুরমার হইয়া যায়। চিঙ্গীয খানের সেনাপতি জবে ও স্যুবেতেয়ি খাওয়ারাযম শাহ 'আলা'উ'দ-দীন মুহাম্মাদ-এর তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ইলদেগিযদের আনুগত্য আদায় করেন। এই সেনাপতিদ্বয় ৬১৭/১২২০ সনে পশ্চিম-পারস্যের মধ্য দিয়া আযারবায়জানে পৌছেন এবং পরে আর্‌রানে প্রবেশ করেন। তাঁহারা বায়লাকান হইয়া শারওয়ানে পৌছিয়া শামাখী ধ্বংস করেন এবং দারবান্দ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহারা শারওয়ানীদিগকে কাস্পিয়ান তোরণ অতিক্রম করিবার পথপ্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করেন। 'আলানদিগকে অবনমিত করিয়া মঙ্গোলরা দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপসমূহে আবির্ভূত হয় এবং রুশ ও কিপচাকদের একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং মধ্য এশিয়ার চিঙ্গীয-এর সহিত পুনর্মিলিত হয় (তু. Djuwani-Boyle, ১খ, ১৪৮-৯)।

নূতন খাওয়ারাযম শাহ্ জালা'লু'দ-দীন ৬২২/১২২৫ সনে আযারবায়জানে আবির্ভূত হন। সেই বৎসর তিনি সিউনিকের গারনিতে জর্জীয়দিগকে পরাজিত করেন এবং পর বৎসর ৬২৩/১২২৬ সনে তিনি তিফলীস দখল করিয়া সেখানকার সকল জর্জীয় ও আর্মেনীয়কে হত্যা করেন (দ্র. Minorsky, E.I.1, Tiflis)। জালালু'দ-দীন শারওয়ানে মহান সালজূকদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকার প্রয়োগের দাবী করেন এবং শারওয়ান শাহ ফারীবুর্য ইব্‌ন গারশাসপ-এর উপর মালিক শাহের আমলের সম পরিমাণ কর আরোপ করেন— যতক্ষণ না শাহ এই প্রতিবাদ উত্থাপন করেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন দেড় শতাব্দীতে তাঁহার অধীনস্থ রাজ্যসমূহ বহুলাংশে সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে শারওয়ানের কর মাত্র ৩০,০০০ দীনারে নির্ধারিত হয়। বহির্ককেশীয়া বিশৃঙ্খল খাওয়ারাযমী সৈন্যদের লুট-পাটের শিকার হয়। ৬২৫/১২২৮ সনে খাওয়ারাযমী শাহ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি Lore-এর নিকটস্থ Mindor-এ জর্জীয় সৈন্যাধ্যক্ষ Iwane Mkhargrdzeli-এর নেতৃত্বাধীন ককেসীয় জাতিপুঞ্জের একটি মিত্র বাহিনীর সম্মুখীন হন। এই মিত্র বাহিনীর সদস্যরা ছিল ঃ জর্জীয়, আলান, আর্মেনীয়, সারীরের আভার, লাক্‌য, কিপচাক, সুওয়ানিয়ান অর্থাৎ উত্তর জর্জিয়ার পাহাড়ী জনগোষ্ঠী স্‌ভান (Svan), আখবায, চানীতে, সিরীয় ও রূমী বা আনাতোলীয়। কিন্তু তাহারা জালালু'দ-দীনের নিকট পরাজিত হয় (Djuwayni-Boyle, ২খ, ৪৩৮)।

জালালু'দ-দীন এই অঞ্চল ত্যাগ করিলে বহির্ককেশীয়ায় বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। অবশেষে ৬৩৩/১২৩৬ সনে মঙ্গোল আক্রমণরূপে আরও একটি বিপর্যয় ঘটে। পূর্ববর্তী বৎসর মঙ্গোল সেনাপতি চোরমাগুন দারবান্দ পর্যন্ত পূর্ব-ককেশিয়া ও শারওয়ানে হামলা চালান। এইবার তিনি গাঞ্জা হইয়া জর্জিয়া প্রবেশ করেন। তখন জর্জিয়ার রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। জর্জীয় অভিজাতদের মধ্য হইতে অনেককে যিম্মী করিয়া লওয়া হয় এবং মঙ্গোল 'কুরিল্‌তায়'সমূহে অংশ গ্রহণে রাজাদিগকে বাধ্য করা হয়। জর্জীয়দেরকে জোরপূর্বক মঙ্গোল সৈন্যদলসমূহে অন্তর্ভুক্ত

করা হয় এবং ৬৫৬/১২৫৮ সনে বাগদাদ পতনের সময় ও ৬৫৮/১২৬০ সনে 'আয়ন জালূতে বিশেষ জর্জীয় সৈন্যদল উপস্থিত ছিল। মঙ্গোল রাজপরিবারে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ফলে, বিশেষ করিয়া পারস্য ও ইরাকের ঈল-খানীয়দের (Il-Khanids) এবং Golden Horde-এর জোচীয় (Djocids) বা বাতূইয়দের (Batuids) মধ্যকার বিবাদের সুযোগে জর্জীয় রাজন্যবর্গ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা পান। বাতূ'ইরা দাবী করিত যে, জোচি ও তাহারা উত্তরাধিকারীগণ চেঙ্গীযের নিকট হইতে স্বাভাবিক পদমর্যাদা বলে আনাতোলিয়া এবং অধিকতর সঙ্গত কারণে ককেসাস অঞ্চল লাভ করিয়াছিল। আর্‌রান ও পূর্ব বহির্কেশিয়ায় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬৬১/১২৬৩ সনে হুলাগু (Hulegu)-এর সৈন্যরা বেরকে-র সৈন্যদের নিকট পরাজিত হওয়ার পূর্বে তেরেক নদী পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তিন বৎসর পরে বেরকে ককেসাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া গাঞ্জা অধিকার করে ও তিফলীসে লুণ্ঠনকার্য চালায়। তিফলীসেই ৬৬৫/১২৬৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয় (Spuler, Die Goldene Hode[1], ৪২-৪, ৪৯-৫১)। ঈলখানী অধিপতি ওলজেইতু (Oldjeitu)-এর রাজত্বের পরই মাত্র জর্জীয় রাজা Giorgi V (১৩১৬-৪৬ খৃ.) মঙ্গোলদেরকে বিতাড়ন করিতে এবং শারওয়ান ও আর্‌রানসহ বহির্কেসিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল জর্জীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হন। এইরূপে শারওয়ান প্রায়ই ঈলখানী ও বাতূ'ইদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইত। শারওয়ান শাহগণ কর্তৃক ঈলখানী যুগে কোন প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত না বলিয়া মনে হয় এবং ইহাতে স্থানীয় রাজবংশের ক্ষমতার কিরূপ সংকোচন হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও Ossetia মঙ্গোলদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রেহাই পায় নাই। দীর্ঘ অবরোধের পর ৬৩৯/১২৩৯ সনে আলান রাজধানী মাগাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (দ্র. Minorsky, Caucasica III, The Alan capital Magas and the Mongol campaigns)। এত সব সত্ত্বেও মঙ্গোল আক্রমণের ফলে খৃষ্টান আলানগণ তাহাদের সীমিত পাহাড়িয়া আড্ডা ছাড়িয়া য়ূরোপীয় এবং অন্তরেশীয় (Inner Asian) ইতিহাসের আরও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের নিকট পোপের বিশেষ দূতগণ পৌঁছিয়াছিল এবং অন্যদিকে মহান খৃষ্টান খান গুয়্যুকের দরবারে ও আলান দূতগণের উল্লেখ পাওয়া যায় (Djuwayni-Boyle, ১খ, ২৫৯)। Golden Horde-এর কেন্দ্র ভলগা তীরের সারায় ও ক্রিমিয়ার কেরচ প্রভৃতি স্থানে আলান উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল (Spuler, পূ. গ্র., ২৩৭, ২৩৯, ২৮৪, ৩১৪)। ইব্‌ন বাত্তূতার মতে (২খ, ৪৪৮, অনু. Gibb, ২খ, ৫১৬) সারায়তে আলানেরা একটি বিশেষ ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহারা মুসলিম হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও আলান সৈন্যরা পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।

ককেসাসের দক্ষিণ অঞ্চলে তীমূর (তৈমুর) কর্তৃক আরও ব্যাপক ধ্বংসকার্য সাধিত হয়। তীমূর ৭৮৮/১৩৮৬-৭ সনের শীতকালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়া খৃষ্টান জর্জীয়দের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' বা পবিত্র যুদ্ধ নামে কথিত অভিযান পরিচালনা করেন। বহির্কেশিয়ার প্রতিরক্ষাকল্পে জর্জীয়গণ শাক্কীর মুসলিম গভর্নর চাগাতায়ী 'উলূস'-এর আরুলাত গোত্রের সীদী 'আলীর নিকট হইতে সহায়তা লাভ করে। কিন্তু এই মৈত্রী আরও বহু তীমূরীয় আক্রমণের কারণ হইয়াছিল। এই আক্রমণের শেষ পর্যায়ে ৮০৫-৬/১৪০৩-৪ সনের অভিযানে তিফলীস পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আর্‌রান হইতে ত্রেবিযোন্দ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তীমূরের রাজন্য খালীল মীরযার নিকট অর্পিত হয়। তুর্কোমান কারা কোয়ুনলু বংশীয় আমীরগণের নিকট অর্পিত হয়। তুর্কোমান কারা কোয়ুনলূ বংশীয় আমীরগণের আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে জর্জীয় ইতিহাসে নবম/পঞ্চদশ শতাব্দী ছিল বিভ্রান্তিকর। ফলে এই শতাব্দীর শেষের দিকে রাজ্যটি তিনটি অংশে বিভক্ত হইয়া যায় (দ্র. Allen, A history of the Georzian people, পৃ. ১৩১ প.)।

শারওয়ান শাহ্ শায়খ ইবরাহীম (৭৮৪-৮২০/১৩৮২-১৪১৭) তীমূরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ৭৯৭/১৩৯৫ সনে Golden Horde-এর খান তোকতামিশের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও তিনি স্বীয় সিংহাসন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তীমূরীয়-উত্তর যুগে একটি ক্রমবিকাশমান সাংস্কৃতিক জীবন এবং বাকূ ও শামাখীতে স্থাপিত বহু সুরম্য অট্টালিকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শারওয়ান বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করে। পরবর্তীকালে শাহগণ আক-কোয়ুনলূ আমীরগণের বিশেষ করিয়া উযুন হাসানের সহিত মৈত্রীতে আবদ্ধ হন। কিন্তু ঘটনাক্রমে শাহ্ ফাররুখ-য়াসার ইব্‌ন খালীলুল্লাহ ৯০৬/১৫০০ সনে শামাখীর নিকটে ইসমা'ঈল সাফাবীর হস্তে নিহত হন এবং ৯৪৫/১৫৩৮-৯ সনে শারওয়ান পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। পার্শ্ববর্তী শাক্কী প্রদেশে সীদী 'আলীর পুত্র সীদী আহমাদ ৮০১/১৩৯৮-৯ সনে পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। পারস্যের Don Juan কর্তৃক কাবালার উল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ৯৫৮/১৫৫১ সনে সাফারীদের নিকট শাক্কীর পতনের পর যখন ইহা শেষ পর্যন্ত একটি 'উছমানী সানজাকে পরিণত হয় (৯৮৪/১৫৭৬), দশম/ ষোড়শ শতাব্দীর সেই পর্যায়েও কাবালার বিশেষ গুরুত্ব ছিল (দ্র. Allen Notes on Don Juan of Persia's account of Georgia, BSOAS, ৬খ, ১৯৩০-২ খৃ., ১৮১; Minorsky, in E.I[2], SHEKKI)।

ককেসাসের উত্তরাঞ্চলসমূহ Golden Horde-এর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ৭৯৭-৮/১৩৯৫-৬ সনে তীমুর কর্তৃক দাগিস্তানবিজিত হয়। কিন্তু প্রায় এই সময়েই দাগিস্তানের প্রধান শক্তিত্রয় কায়তাকগণ গাযী-কূমুকগণ এবং তাবারসারানের মা'সূমী রাজন্যবর্গের উত্থান হয় (দ্র. দাগিস্তান)। ককেস্যাসের উত্তর-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ সিরকাশিয়া (Circassia), Golden Horde-এর ঘটনা প্রবাহে, এমন কি সামরিক ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। চেরকেসরা তখনও মুখ্যত খৃষ্টান ছিল এবং ইব্‌ন বাত্তূতা (২খ, ৪৪৮, অনু. Gibb, ২খ, ৫১৬) উল্লেখ করেন যে, আলানদের ন্যায় (উপরে দ্র.) খৃষ্টান চেরকেস ও কিপচাকদেরও সারায়তে নিজস্ব এলাকা ছিল। সপ্তম/ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মিসর ও সিরিয়ায় মামলূক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কাফ্‌ফা-র জেনোয়ারবাসীরা (Genoese of Kaffa) ও অন্যান্য বণিক সিরকাশিয়া হইতে চেরকেসের যুদ্ধবন্দীদের আনয়ন করিতেন এবং উহারা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য নাগরিক হিসাবে পরিচিত হয় এবং ৭৮৪/১৩৮২ সনের পরে তাহাদের মধ্য হইতেই অধিকাংশ মামলূক সুলতানের উদ্ভব হয়।

অবশ্যই ককেসাস অঞ্চলের সাধারণ তুর্কীকরণ (Turkification) প্রক্রিয়া ফলত ইসলামের প্রসারে সহায়ক হয়। ককেসাসের উত্তরে

স্তেপরাজ্যসমূহ তথাকার খাযারদের পতনের অব্যবহিত পরেই ইসলামে দীক্ষিত হয় বলিয়া মনে হয়। ইব্ন বাত্তুতা কুমা নদী তীরে মাচার (Burgomadzary হিসাবে সনাক্ত করা হইয়াছে) পরিদর্শন করেন। তিনি ইহাকে একটি সুন্দর তুর্কী নগরী হিসাবে দেখিতে পান। একটি কায়সারিয়্যাসহ (প্রধান বাজার) ইহা ছিল Golden Horde-এর তাতারগণের একটি উন্নয়শীল ব্যবসায় কেন্দ্র এবং এখানেই রিফা'ইয়্যা ধারার বিখ্যাত সূফী শায়খ মুহাম্মাদ আল-বাতা'ইহীর 'যাবিয়া' অবস্থিত ছিল (রিহ্‌লা, ২খ, ৩৭৫-৯, অনু. Gibb, ২খ, ৪৭৯-৮১)। কিন্তু ইসলামের প্রসারের প্রক্রিয়াটি ছিল মন্থর এবং পার্বত্যাঞ্চলের এই কেন্দ্রভূমি বহুদিন পর্যন্ত ইসলামায়নকে প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী মিনগ্রেলিয়ার জর্জীয় বংশোদ্ভূত লাযগণ যাহারা ষষ্ঠ শতকের শুরু হইতেই খৃষ্টান পার্শ্ববর্তী Trebizond-এর বায়য্যান্টীয় খণ্ডরাজ্যের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের মাধ্যমে তাহারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 'উছমানী সুলতান ২য় মুহাম্মাদের হাতে ৮৬৫/১৪৬১ সনে ত্রেবিযন্দ-এর পতনের পরই লাযগণ ক্রমে ইসলাম ও শাফি'ঈ মাযহাব গ্রহণ করে (দ্র. Minorsky, E.I.[2], LAZ)।

'উছমানীদের উত্থান এবং আর্‌রান ও আযারবায়জানের মুসলিম শক্তিবর্গের হুমকির ফলে অত্যন্ত ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যে সম্ভবত নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশের দিক-দাগিস্তানে খৃষ্ট ধর্মের অবসান ঘটে। মঙ্গোল যুগে খৃষ্টধর্মের প্রাচ্যদেশীয় সকল শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া প্রাচ্যের সকল জাতিকে খৃষ্ট মতাদর্শে দীক্ষিত করিবার মানসে রোমান চার্চের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সপ্তম/ত্রয়োদশ শতকে তিফলীসে ডমিনিকানদিগকে (Dominician) অধিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তী শতকে মাতরেগা, (Matrega) বা আযোভ-এ একটি রোমান আর্চবিশপ (Archbishopric)-এর এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দাগিস্তানে শক্তিশালী ধর্ম প্রচার অভিযান পরিচালিত হয় (in Chaydakensi patria, অর্থাৎ কায়তাক বা খায়দাকগণের দেশ)। কাস্পিয়ানের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে একটি বাণিজ্যপথ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে জোনোয়াবাসীদের একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগের বদৌলত এই খৃষ্টীয় চার্চ বিকাশ লাভ করে। অবশেষে কৃষ্ণসাগর অঞ্চল হইতে এই জেনোয়াবাসীদের বহিষ্কার এবং সেখানে 'উছমানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে চার্চের তৎপরতা হ্রাস পায় [দ্র. J. Richard, Les missionaires latins chez les Kaitak du Daghestan (xiv^{e}-xv^{e} siecles), in Trudy xxv Kongressa Vostokovedov 1960, ৩খ. (মস্কো ১৯৬৩ খৃ.), ৬-১১]। যাহা হউক, ৮৭২/১৪৬৬ সনের দিকে যখন রুশ বণিক Afanasii Nikitin কাস্পিয়ানের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কায়তাকের শাসনকর্তা ছিলেন শারওয়ান শাহ ফাররুখ য়াসারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (শ্যালক বা ভগ্নীপতি) আলিল (খালীল ?) বেগ নামক জনৈক মুসলিম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ C. van Arendonck, E.I.[1]-এর নিবন্ধে পুরাতন ভৌগোলিক ও ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনাবলীর একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাতন গ্রীক রোমান যুগের (classical period) জন্য দ্র. Kaukharoz, in Pauly-Wissowa, Real Encyclopadie der classische Altertumswissenschaft[2]. ১১খ, ১, ৫৯-৬৩। ইসলামী ভৌগোলিক রচনাবলীতে একটি গরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল বেনামে লিখিত "হুদূদু'ল-'আলাম" অনু. Minorsky, GMS, লন্ডন ১৯৩৭ খৃ.। A. Sanders, Kaukasien, Munich, ১৯৪৪-এ ককেসাসের একটি ভৌগোলিক সমীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে এবং BSE[2], ১৯খ, ২৪৮-৬৩-এর Kavkaz নিবন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ আছে।

যথার্থ ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলী এই নিবন্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে V. Minorsky-এর রচনাসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁহার Studies in Caucasian history. লন্ডন ১৯৫৩ খৃ., A history of Sharvan and Darband, ক্যামব্রিজ ১৯৫৮ খৃ. এবং BSOAS, ১২-১৫ সংখ্যা (১৯৪৮-৫৩ খৃ.) এ প্রকাশিত তাঁহার Caucasica শীর্ষক চারটি নিবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরও দ্র. তাঁহার নিবন্ধ Transcaucasica in JA. ২১৭ সংখ্যা, ১৯৩০ খৃ., ৪১-১১১ (ইহা প্রধানত ভূপ্রকৃতি, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদির সহিত সম্পৃক্ত)। বিভিন্ন মুদ্রা বিষয়ক গবেষণার ফলে ককেশীয় ইতিহাসের অনেক অস্পষ্টতার উপর আলোকপাত হইয়াছে। বাকূ-র প্রাচ্যবিদ E. A. Pokhomov ছিলেন এই গবেষণার পথিকৃৎ। সম্প্রতি Dickran Kouymijian প্রণীত "The numismatic history of Southeastern Caucasia and Adharbayjan based on the Islamic coinage from the 5th/11th to the 7th/13th centuries" শীর্ষক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক-এ অপ্রকাশিত ১৯৬৯ সনের ph. D. থিসিসে রুশ ও আর্মেনীয় গবেষণার ফলসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে।

C. E. Bosworth (E. I.[2])/আবূ মুহাম্মদ আসাদ

ভাষাসমূহ ঃ ককেসাস অঞ্চলের স্থানীয় ভাষাসমূহ তিনটি পৃথক শাখাবিশিষ্ট একটি ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তগত। এতদঞ্চলে এই গোষ্ঠীর এখন পর্যন্ত কিংবা পূর্বে প্রচলিত ভাষাসমূহের প্রতিই "ককেশীয় ভাষাবলী" নামটি দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য কালের পরিক্রমায় ইন্দো-য়ূরোপীয় ও তুর্কী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষীরাও এই অঞ্চলে আবির্ভূত হয় এবং সম্পর্কের দৈর্ঘ্য ও ঘনিষ্ঠতা অনুসারে এই ভাষাসমূহ ককেশীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত হয়। এই ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আর্মেনীয় ভাষা যাহা ইন্দো-য়ূরোপীয় গোষ্ঠীর একটি স্বতন্ত্র শাখা এবং যাহাতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ধরনের সাহিত্যিক ঐতিহ্যই বিদ্যমান। ইহার আধুনিক প্রাচ্য উপভাষাটিতে আর্মেণীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এবং ককেসাস ব্যাপী নগরবাসী ও জনগোষ্ঠীগুলির বিশ লক্ষাধিক লোক কথা বলিয়া থাকে। ইন্দো-য়ূরোপীয় গোষ্ঠীর ইরানী শাখার বেশ কয়েকটি প্রতিনিধি ভাষাও এখানে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ওসসেটিক (Ossetic) প্রাচীনতম বলিয়া স্থিরীকৃত। মধ্যে ককেসাসেও তাহার দক্ষিণে জর্জিয়ায় বসবাসকারী আলানদের বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত এই পূর্ব ইরানীয় ভাষার দুইটি প্রধান শাখা রহিয়াছে ঃ ইরান (Iran), যাহা সাহিত্যের বাহনরূপে ব্যবহৃত এবং প্রাচীনতম দিগোরোন (Digoron)। এই শেষোক্ত শাখাটি অংশত মুসলিম - জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। ওসসেটিক আধুনিক ইরানী ভাষাসমূহের মধ্যে ইসলাম তথা আরবীয় ঋণের কিংবা পারস্যদেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব হইতে প্রায় মুক্ত একটি ভাষা হিসাবে অনন্য। অন্যান্য

ইরানী ভাষা হইতেছে প্রতীচ্য শাখাভুক্ত উত্তর কুর্দী, তালিশ ও তাতী। কুর্দরা আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 'তালিশ' কাস্পিয়ান তীরে ইরান-সোভিয়েত সীমান্তের উভয় পার্শ্বে এবং তাতী ককেসাস পর্বত শ্রেণীর পূর্ব প্রান্তের উভয় ঢালে ও আপশেরন উপদ্বীপে কথ্যভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। তাতী ভাষাভাষীদের প্রায় অর্ধেকই য়াহূদী; বাকী অর্ধেক এবং সকল তালিশী হইতেছে মুসলিম। ইন্দো-য়ূরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষা হইতেছে গ্রীক এবং সাম্প্রতিককালে বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা প্রবর্তিত জার্মান, রুশ ও উক্রাইনীয়।

তুর্কী ভাষাসমূহের মধ্যে সোভিয়েত ভূখণ্ডে বিশ লক্ষাধিক লোকের ব্যবহৃত 'আয়েরী' হইতেছে সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত ভাষা। ইহা অষ্টম/চতুর্দশ শতক হইতে একটি লিখিত ভাষা হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। ককেসাসের উত্তর পূর্বে কুমুক, কারাচায়, বালকার, নোগায় (Noghay) প্রভৃতি কিপচাক গোত্রীয় ভাষায় সন্ধান মিলে। এই তুকভাষী সকল জনগোষ্ঠীই মুসলিম। মঙ্গোলীয় ভাষা কালমুক্ত উত্তর ককেসাসে কথ্যভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। ককেসাসে প্রচলিত একমাত্র সেমিটিক (সামী) ভাষা তথাকথিত আসীরীয়গণের (Assyrians) ভাষা নব্য-সুরয়ানী (Neo-syriac)।

প্রকৃত ককেশীয় ভাষাসমূহ ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এই তিনটি শাখায় বিভক্ত। দক্ষিণ বা কার্তভেলীয় (Kartvelian) শাখাটিতে চারিটি ভাষা রহিয়াছে, যেইগুলি জর্জীয় সভানেতীয় (Svanetian), লায ও মিনগ্রেলীয়। শেষোক্ত দুইটির সমন্বয়ে যান (Zan) গোষ্ঠী গঠিত। ইহাদের মধ্যে একমাত্র জর্জীয়-ই হইতেছে সাহিত্যের ভাষা এবং এই ভাষার প্রাচীনতম রচনাসমূহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত। লাযগণ এবং জর্জীয় ভাষীদের দুইটি গোষ্ঠী, যেমন আচারগণ (Acar), কিছু সংখ্যক ইনৃগিলো (Ingilo) হইতেছে মুসলিম। উত্তর-পশ্চিম শাখাটিতে তিনটি ভাষা রহিয়াছে, যথাঃ আবখায, সিরকাশীয় ও উবোখ। কিন্তু বর্তমানে শেষোক্তটি ককেসাসে অপ্রচলিত; ইহা তুরস্কের হ্রাসমান কিছু সংখ্যক মুহাজিরের ভাষারূপে টিকিয়া রহিয়াছে মাত্র। সিরকাশীয়দের [চেরকেস অথবা ইদগে (Adighe)], কাবারদিয়ান (Kabardian) ও কিয়াখ-এই দুইটি উপভাষা রহিয়াছে এবং উভয়টিতেই আধুনিক সাহিত্যও বর্তমান। ককেসাসের দক্ষিণে বসবাসকারী আবখাযদের তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত উপভাষা রহিয়াছে। ককেসাসের উত্তরে সিরকাশীয়দের সহিত বসবাসকারী আবাযা নামে পরিচিত আবখায জনগণ দুইটি ভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। সিরকাশয়ি ও আবখাযদের বিপুল সংখ্যাগুরু হইতেছে মুসলিম।

ককেশীয় ভাষা গোষ্ঠীর উত্তর-পূর্ব শাখাটিতে বহু সংখ্যক ভাষা ও উপভাষা রহিয়াছে যেগুলি প্রধানত দাগিস্তানের প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম একটি জনগোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এই ভাষাগুলি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) তথাকথিত ভেইনাখ (Veinakh-"আমরা জনগণ") শ্রেণী, যাহাতে রহিয়াছে চেচেন, ইঙ্গুশ (Ingush) ও বাত্স (Bats) [শেষোক্তটি একটি ক্ষুদ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়] ; (২) আভারো-আন্দি (Avaro-andi) গোষ্ঠী যাহাতে আছে আভার, আন্দি ও অন্যান্য (সর্বমোট তিনটি) শ্রেণী, দিদো (চারটি ভাষা) এবং আরচি ; (৩) লাক-দারগওয়া (Lak-Dargwa) শ্রেণী, যাহা লাকের পাঁচটি ও দারগওয়ার তিনটি উপভাষার সমন্বয় গঠিত ; (৪) সামুরীয় (Samurian) শ্রেণী, যাহাতে রহিয়াছে লেযগিয়ান (Lezgian), রুতুল (Rutul), তসাখুর (Tsakhur), তাবাসারান (তাবারসারান), আগুল, বুদুগ ও জেক ; (৫) খিনালুগ এবং (৬) উদি (Udi), যাহা ককেসাসের আলবেনীয়দের বংশধররূপে বিবেচিত একটি খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর ভাষা। চেচেন, ইঙ্গুশ, আভার, লাক, দারগওয়া, লেযগিয়ান ও তাবারসারান হইতেছে লিখিত ভাষা। উদিও পূর্বে লিখিত হইত, বিশেষত আভার সমগ্র এলাকায় সাধারণ বোধগম্য ভাষা (lingua franca) হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ককেশীয় ভাষা গোষ্ঠীর তিনটি শাখাই সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি ব্যাপার ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে ইহাদের ব্যঞ্জন কাঠামোর ঋদ্ধি অন্যতম। যেমন, জর্জীয় ভাষায় ২৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে মহাপ্রাণ (aspirated) ও স্বরতন্ত্রায়িত (glottalized) অঘোষ (Voiceless), স্পৃষ্ট (stop) ও ঘৃষ্ট (affricates) বর্ণনিচয় রহিয়াছে। আর্মেনীয় ওরসেটিক ও উভয় কুর্দী ভাষাতেও এই বৈচিত্র্য দেখা যায়। কতকগুলি উত্তর ককেশীয় ভাষায় ওষ্ঠ্য (labialized) ও অনৌষ্ঠ্য (non-labialized) জোড়সহ পঞ্চাশেরও অধিক ব্যঞ্জন ধ্বনিমূল (phonemes) রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ধ্বনিমূলের সংখ্যা খুবই কম। জর্জীয় ভাষায় পাঁচটি স্বরবর্ণ রহিয়াছে এবং আবখায ও সিরকাশীয় উভয় ভাষাতেই স্বর ধ্বনিমূলের সংখ্যা দুইয়ে নামাইয়া আনা যায়। ককেশীয় ভাষাসমূহের একটি ব্যাপক পদবিন্যাসগত (syntactic) বৈশিষ্ট্য হইতেছে সকর্মক ক্রিয়াসমূহের কর্মবাচকমূলক (passive) গঠন যাহাতে এইরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে তীর্যকভাবে (obliquely) ব্যক্ত করা হয় এবং কর্মটি কর্তার স্থান অধিকার করে। উত্তর কুর্দীসহ অনেক ইরানী ভাষায় শুধু সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে এই ধরনের গঠন পাওয়া যায়। কার্তভেলীয় (kartvelian) ভাষাতেও ইহা অত্যন্ত সীমিত। তবে অন্যান্য ককেশীয় ভাষায় ইহা ক্রিয়ার সকল কালের জন্যই প্রযোজ্য। এইরূপে "আমি কাজটি করিতেছি" হইবে "আমা কর্তৃক কাজটি হইতেছে কৃত"। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সকর্মক ক্রিয়ার অবশ্যই একটি কর্ম থাকিবে এবং উদাহরণস্বরূপ জর্জীয় ভাষায় বাইবেলোক্ত ষষ্ঠ অনুশাসনটিকে (Sixth commandment) একমাত্র "তোমরা করিবে না হত্যা মানুষকে"-রূপেই ব্যক্ত করা যায়।

উত্তর-পশ্চিমের ভাষাসমূহের এবং কিছুটা স্বল্প পরিমাণে দক্ষিণের ভাষাগুলিতেও ক্রিয়ার সহিত যথাযথ স্থানে প্রযোজ্য একাধিক সর্বনামীয় প্রত্যয়ের (pronominal particles) সম্পর্কে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ "মা তাহার কন্যাকে যে রুটি দেন" বাক্যটি আবখায ভাষায় "মা তাহার কন্যা, যাহা তাহাকে তাহা কর্তৃক দেয়া রুটি-"রূপে ব্যক্ত হইবে। এখানে সর্বনাম প্রত্যয়গুলি পর্যায়ক্রমে কর্তা, গৌণ কর্ম (indirect object) এবং প্রযোজ্য কর্তা (agent) নির্দেশ করিতেছে। আধুনিক জর্জীয় ভাষায় দ্ব্যর্থহীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম অংশ রাখিয়া এই সর্বনামীয় প্রত্যয়সমূহের অনেকগুলিই লোপ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, গ.-ক্লাভ (g-klav) "(আমি)-তোমাকে হত্যা করি" ম-ক্লাভ (m-klavs) "(তুমি)-আমাকে হত্যা কর", ক্লাভ (klav) "(তুমি তাহাকে) হত্যা কর", ক্লাভস্ (klavs) "সে (তাহাকে)-হত্যা করে" একমাত্র উত্তর-পূর্ব শাখাটিতেই বিশেষ্যের

শ্রেণীবিন্যাস রহিয়াছে, যাহা দ্বারা বাক্যে ব্যবহৃত নামসমূহের শ্রেণীসূচক নির্দেশকগুলি (যেমন পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীব, বস্তু ইত্যাদি) দেখানো হয় ; তুলনীয় আভার be-ca-w ci ro qo-w w-ugo ঃ be-ca-y cu zu ro, qo-y y-lgo ঃ be, ca-b cu ro. qo-b b-ugo "অন্ধ লোকটি/মহিলাটি/ঘোড়াটি ঘরের ভিতরে আছে।" কর্মবাচ্যমূলক গঠনের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই বিন্যাস নিম্নরূপ জটিল অন্বয় (concord) সৃষ্টি করে। যেমন চেচেন ভাষায় "আমি কাজ ইহা হইতেছে কৃত আমি হই", "আমি কাজ করিতেছি"-এর জন্য এবং "আমা দ্বারা ইহা হইতেছে কৃত ইহা হয় কাজ", "আমি (বাস্তবিকই) কাজ করিতেছি"-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যদিও ককেশীয় ভাষাসমূহের এবং পীরেনীযের বাস্কের ও হুনযার বুরুশাসকীর আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে অদ্যাবধি কোনরূপ সম্পর্ক নির্ণীত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B. Geiger, T. Halasi-kun, A. H. Kuipers এবং K. H. Menges, People and Languages of the Caucasus, a synopsis, The Hague ১৯৫৯ খৃ.; (২) B. Deeters, Die kaukasischen Sprachen, in Handbuch der Orientalistik, Abt. I. VII Bd. Armenisch und kaukasische Sprachen, Leiden 1963.

D. N. Mackenzie (E.I.[2]) / আবু মুহাম্মদ আসাদ

আলকাবতাওরী (القبتورى) ঃ আবু'ল-কাসিম খালাফ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয 'আল-গাফিকী, গুয়াদালকুইভার (وادى الكبير)-এর অন্তর্গত কাব্তাওরা অথবা কাবতুরা নামক দ্বীপের (পূর্ব নাম Caput Tauri, ইব্ন খালদূন-de Slane, Hist. des berberes, ii, 113 ; বর্তমানে Isla Mayor, সেভিল-এর দক্ষিণে) অধিবাসী একজন কবি এবং পত্র-লেখক ছিলেন। একজন সেভিলবাসী সুশিক্ষিত ব্যক্তির পুত্র আল-কাবতাওরী শাওওয়াল ৬১৫/ডিসেম্বর ১২১৮-জানুয়ারী ১২১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সেভিলের পতনের পর (৬৪৬/১২৪৮) তিনি সিউটা (Ceuta) গমন করেন এবং সেখানে 'আযাফী আমীরাতের চ্যানসেলার (দূতাবাস)-এর প্রধান হন। আমীর আবু'ল-কাসিম আল-'আযাফী'র ইনতিকালের পর তিনি সিউটা ত্যাগ করিয়া তিউনিস গমন করেন এবং সেখানে হাদীছ অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হন। তিনি দুইবার মক্কায় হাজ্জে গমন করেন, প্রথমবার সিউটা হইতে এবং দ্বিতীয়বার ৬৯৬/১২৯৭ সালে তিউনিস হইতে। পরে তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং সেখানেই ৭০৪/১৩০৪ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আবু'ল-হাসান আদ্-দাব্বাজ ও ইব্ন আবি'র- রাবী' এবং পরে প্রাচ্য দেশে আল-গাররাফী। অন্যদিকে তাঁহার শাগরিদবৃন্দের মধ্যে আছেন ইব্ন সায়্যিদি'ন-নাস, ইব্ন জাবির আল-ওয়াদিয়াশী, 'আবদু'ল-মুহায়মিন আল-হাদ্রামী, আবু'ল-কাসিম আত্-তুজীবী এবং ইব্ন রুশায়দ্ (দ্র.)।

তাঁহার কাব্য সাধনার একটি অংশমাত্র বর্তমানে বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার জীবনীকারদের গ্রন্থে সংরক্ষিত তাঁহার রচনাবলীর অংশসমূহ এবং আত-তুজীবী ও ইব্ন রুশায়দের রিহলাসমূহের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যায়, আর-কাব্তাওরী একজন সাধারণ কবি ছিলেন। ইনি কেবল রীতিসর্বস্ব রচনা ধারার চর্চা করিয়া নিজ যুগের চাহিদার সহিত তাল মিলাইয়াছেন। তাঁহার পত্রাবলী রচনার যুগ আরম্ভ হয় সিউটাতে দূতাবাসের প্রধান থাকাকালে। M. H. El-Hila (Lettres d'al-afiqi, Sorbonne thesis 1967) তাঁহার এগারটি পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন যেগুলি তিউনিসের 'আব্দিল্লিয়্যা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (নং ২৮০৪) এবং অন্য দুইটি চিঠি আয-যাখীরাতু'স্-সানিয়্যায় নূতন করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, সম্পা. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯২০ খৃ., ১১৩-২৩ (ইহাতে রচয়িতার নাম উল্লিখিত নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত মূল রচনার অন্তর্নিহিত সমালোচনা মিলাইয়া দেখা যায় যে, কবিতাগুলি আল-কাবতাওরী-র প্রতি আরোপ খুবই সম্ভাব্য)। এই পত্রের বিষয়বস্তু হইতে দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে মাগরিবের দেশসমূহের মধ্যে এবং মাগরিব ও স্পেনের মধ্যবর্তী এলাকাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা নূতন তথ্য পাওয়া যায়। ইহাতে গ্রানাডার নাসরী রাজ্য এবং দুইটি মরক্কো রাষ্ট্রের (আল-মুওয়াহ্হিদ এবং মারীনী, মুকাবিলায় সিউটা রাজ্যের) গৃহীত নীতির উপরেও যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছে। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পত্রগুলি তৎকালীন প্রচলিত পত্রশ্রেণীর একটি মডেল, অতিশয়োক্তি সাজ'-এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং রূপক, বিরোধালংকারের সম্পদে এবং কুরআন ও হাদীছ হইতে আহরিত উপাদান সমৃদ্ধ। মাঝে মাঝে সাহিত্যিক রূপ দানের প্রচেষ্টার ফলে কোন কোন বাক্য একাধিক অর্থবোধক ধাঁধায় পরিণত হইয়াছে। এই পত্রগ্রন্থে একটি চমৎকার ও অদ্ভুত বিষয় রহিয়াছেঃ ইহার একটি পত্র মহানবী (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত। ইহাতে তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং মদীনায় তাঁহার রওযা মুবারাক যিয়ারত করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। বর্তমানে বিদ্যমান এই জাতীয় পত্রের মধ্যে সম্ভবত ইহাই প্রাচীনতম নমুনা। কারণ ইবনু'ল-খাতীব-এর যে দুইটি পত্রের কথা জানা যায়, ইহা সেইগুলিরও পূর্বে লিখিত (সুব্হ'ল-আ'শা, ৬খ., ৪৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাফাদী, ওয়াফী, পাণ্ডু. প্যারিস নং ২০৬৪, পত্রক ২২ ; (২) ইব্ন হাজার, দুরার, হায়দরাবাদ ১৯২৯-৩১ খৃ., ২খ, ৮৫ ; (৩) ইব্নু'ল-কাদী, দুররাতু'ল-হিজাল, রাবাত ১৯৩৯ খৃ., নং ৩৯৩ ; (৪) মাক্কারী, নাফ্হ, কায়রো ১৯৩৯-৪৩ খৃ., ৩খ., ৩৫২।

M. H. El-Hila (E.I.[2]) মোঃ মনিরুল ইসলাম

কাব্দ্ (قبض) ঃ (আরবী), ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যাহা "বাজেয়াপ্ত করা", "আকড়াইয়া ধরা", "সংকোচন", "বিরত থাকা" ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়।

১। ফিক্হশাস্ত্রে শব্দটি দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর করার তাৎপর্য বহন করে। মালিকী আইনে হিয়াযা শব্দটি অধিকতর ব্যবহৃত হয়, হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া বুঝাইতে তাসাল্লুম শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে বস্তুটি স্থানান্তরযোগ্য হইলে তাহার বস্তুগত স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়, স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাহা সূচিত হয় দখলের মাধ্যমে, অবশ্য প্রতীকীভাবে তাহা সম্পত্তিটির মূল দলীল বা চাবিসমূহের হস্তান্তরের মাধ্যমেও সাধিত হইতে পারে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কাবদ কেবলমাত্র সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রারম্ভ হইতেই এবং সকল ভাষ্যেই ফিক্হ কোন নির্দিষ্ট বস্তুর মালিকানা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই মালিকানার হস্তান্তর ঘটে বলিয়া স্বীকার করে।

উপহার (হিবা), ঋণ (কারদ), বন্ধক ('আরিয়্যা) এবং জামিন (রাহ্ন্)-এর ক্ষেত্রে কাব্দ কি ভূমিকা পালন করিবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের আইন বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান। মালিকীগণ ব্যতীত অধিকাংশ গ্রন্থকার এই মর্মে শিক্ষা দান করেন যে, যে সকল পক্ষের মধ্যে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হইবে তাহাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার উপর কোন আইনগত কর্তব্য বর্তায় অথবা প্রাপকের ক্ষেত্রে কোন প্রকার চূড়ান্ত অধিকার বহন করে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তাহার অংগীকারকৃত বস্তুসমূহ হস্তান্তরে বাধ্য করা যায় না বা শেষোক্ত ব্যক্তি উহার হস্তান্তর (কাবদ) দাবি করিতে পারে না। অতএব এই সকল চুক্তি 'ফলপ্রদ' হইবে কেবলমাত্র তখনই যখন শর্তহীনভাবে ঐকমত্যে ইহা কাবদ-এর ভিত্তিতে সম্পাদিত হইবে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের প্রদত্ত বিধি যাহার মতে কাব্দ এই সকল চুক্তি সম্পাদন (তামাম, লুযূম) সম্পূর্ণ করিবার জন্য উপকারী তাহা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুষ্ঠুভাবে বলিতে গেলে এই সকল চুক্তি কেবলমাত্র কাব্দ-এর কার্যকারিতার মাধ্যমেই আইনগতভাবে বৈধরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কেবলমাত্র মালিকী মতাবলম্বিগণ মনে করেন যে, কোন উপহার, ঋণ, বন্ধক অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মতৈক্যে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদার পক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষকে উক্ত বস্তু হস্তান্তর করিতে চাপ প্রয়োগ করিতে পারে (দারদীর, আশ-শারহু'স-সাগীর, ২খ, ৩৪৪, উপহার প্রসঙ্গে ; ২খ, ২২৬-৯, বন্ধকী প্রসঙ্গে; ২খ, ১২১, যামানত সম্পর্কে)।

অবশ্য ঐকমত্যে উপস্থিত হওয়ার সময় যদি বাস্তবে উক্ত বস্তুর হস্তান্তর না ঘটে এবং তাহার ফলে উক্ত চুক্তি বৈধতা দুইটি হারায়, তবে সেই সকল চুক্তির ক্ষেত্রে কাব্দ স্বয়ং চুক্তির বৈধতার (শারতু'স-সিহ্হা) জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার চুক্তি হইতেছেঃ সালাম অথবা অগ্রিম বিক্রয় (প্রদেয় মূল্য চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রদান করিতে হয়) এবং সারফ বিনিময়ের জন্য চুক্তি (বিনিময়কৃত মুদ্রা সেই মুহূর্তে এবং সেই স্থানে হস্তান্তর করিতে হইবে)।

কাব্দ আমানা ও কাব্দ দামান যে সকল চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষের নিকট কোন প্রকার বস্তু, বিশেষত ভাড়া, বন্ধকী, নিরাপদ গচ্ছিত আমানাত এবং ইখতিয়ার অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে যে, এই দখল গ্রহণকে "কাব্দ আমানাত"-রূপে গণ্য করা যায় কিনা, সে ক্ষেত্রে রক্ষক ব্যক্তি কেবলমাত্র তখনই দায়ী বিবেচিত হইবে, যদি সে দোষী হয় অথবা চুক্তির শর্তাবলীর বিপক্ষে (তা'আদ্দী) কাজ করে অথবা এই সকল ব্যাপারে প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে। অন্যথায় যদি ইহা কাব্দ দামানরূপে বিবেচিত হয় তবে আমানাত রক্ষক উক্ত আমানাতী বস্তুর যে কোন ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন ; এমন কি তাহা যদি উক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অতীত কোন হেতু বা পরিস্থিতির কারণে ঘটে তাহা হইলেও। হানাফীগণের মতে, কোন প্রকারের ব্যতিক্রম ব্যতীত এই সকল চুক্তির মধ্যে কেবল কাব্দ আমানাতই একমাত্র সম্ভাব্য। শাফি'ঈ এবং হাম্বালীগণ এই ব্যাপারে নিম্নোক্ত পার্থক্য করেন, যদি সম্পাদিত চুক্তি হেফাজতকারীর (বন্ধকী, ভাড়া) স্বার্থ রক্ষা করে তবে হইবে কাব্দ দামান ; যদি তাহা প্রধানত বস্তুর মালিকের জন্য লাভজনক করে তবে হইবে কাব্দ আমানাত। মালিকীগণ আবার অপর একটি শর্ত আরোপ করেন। উপরিউক্ত দুইটি চুক্তির আলোকে, যে বস্তুটিকে হেফাজতে রাখা হইয়াছে তাহা যদি সহজে লুক্কায়িত করা সম্ভব হয় (মায়ুগাবু 'আলায়হি) অথবা লুক্কায়িত করা কঠিন হয়, তবে প্রথম ক্ষেত্রে তাহারা কাব্দ দামান ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাব্দ আমানায় পরিণত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ য়ূসুফ মূসা, আল-আমওয়াল ওয়ান-নাজারিয়্যাতু'ল-'আকদ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ৪৪৯ ; (২) মুসতাফা আহমাদ আয-যারকা', আল-মাদখালু'ল-ফিকহি'ল-'আম্মা, দামিশ্ক ১৯৬৪ খৃ., নং ১৬৩। মালিকী আইনের জন্য (৩) দারদীর, আশ-শারহু'স-সাগীর (সাবী প্রদত্ত ভাষ্যসহ), বূলাক ১২৮৯ হি., ২খ, ২২৬-৭ (বন্ধকী), ২খ, ৩৪৪ (উপহার), ২খ, ১২১ (দামানাত) ; (৪) D. Santillana, Istituzionai di diritto musulmano malichita, রোম ১৯৩৮ খৃ., ১খ., ৩১৬, ২খ, ৩৭৯, ৪৭৭ এবং স্থা. ; (৫) Chafiq Chehata, Les concepts de qabd daman et de qabd amana en droit musulman hanefite, in St. Isl., ৩২খ. (১৯৭০ খৃ.), ৮৯ প.।

Y. Linant de Bellefons (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

২। সূফীবাদে শব্দটি পারিভার্ষিক অর্থ বহন করে, যাহা দ্বারা আত্মিক অবস্থার একটি 'সংকোচন' নির্দেশ করে, যাহা আত্মিক 'প্রসারণ' (বাসত্ দ্র.)-এর বিপরীত।

আল-কুশায়রী (দ্র.)-র মতে কাব্দ যেইরূপ খাওফ (ভীতি)-এর মাত্রার ঊর্ধ্বে, বাসত্ সেইরূপ রাজা' (আশা)-এর ঊর্ধ্বে, একইভাবে হায়বা (ভক্তিমূলক সম্ভ্রম) কাব্দ-এর ঊর্ধ্বে এবং উনস (অন্তরংগ স্বাচ্ছন্দ্য) হইতেছে বাসত্-এর ঊর্ধ্বে। এই ক্রমোচ্চ মানের বিন্যাসটির ব্যাখ্যা অত্যন্ত সহজ ঃ কাব্দ এবং বাসত্ হইতেছে 'আরিফ (অবগত)-এর অবিমিশ্র বিষয়বিমুখতার/বাস্তবতার নির্দেশক, যাহা আশা বা আশংকার ন্যায় কোন প্রকার ব্যক্তিগত আত্মিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, আবার অন্য দিকে হায়বা ও উনস্ আল্লাহ্র পক্ষে একটি অধিকতর উন্মোচনের অবস্থা নির্দেশ করে।

এই পথের সমাপ্তি তখন অর্জিত হইবে যখন আল্লাহ্র আত্মিকতা কাব্দ ও বাস্ত-এর বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলুপ্ত করিয়া এই দুইয়ের এক অতীন্দ্রিয় সংশ্লেষণের সৃষ্টি করে। সূফীগণের ব্যবহৃত রূপে শব্দগুলি স্বয়ং ঐশী নামকরণ হইতে উদ্ভূত (দ্র. আল-আসমা'উ'ল-হুসনা) আল-কাবিদ (যিনি সংকোচন আরোপ করেন) হইতেছে একটি ইসম্ জালালী বা মহত্ত্বপূর্ণ মর্যাদার নাম এবং আল-বাসিত (যিনি প্রসার ঘটান) হইতেছে একটি ইসম জামালী বা সৌন্দর্যের নাম) এবং সূফীগণ 'আরিফ-এর সমার্থকরূপে জালাল ও জামাল ব্যবহার করেন। আহমাদ আল-'আলাবী (দ্র. Ibn Aliwa) 'কাব্দ-এর মুহূর্তে তাঁহার শায়খ-এর যবানীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "আমার প্রভু হইতেছেন আমার সৌন্দর্যমণ্ডিত এক সত্তা" এবং তিনি ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, "যেহেতু গূঢ় তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারই সঙ্গে আছেন যিনি সংকোচন করেন, কার্যের সঙ্গে নয়—এবং তাঁহার সহিতই আছেন, যিনি প্রসারণ ঘটান কিন্তু প্রসারণের সঙ্গে নয়, তাই তিনি নিষ্ক্রিয় নন, বরং সক্রিয় এবং এইভাবে এরূপ হইয়া উঠেন যেন তাঁহার কোন কিছু ঘটে নাই ...... তোমার গুণাবলী কামাল (নিখুঁত) হোক, যাহা জালাল ও জামাল—উভয়েরই বেহেশতী সুখ।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুশায়রী, রিসালা ; (২) ইবনু'ল-আরাবী, রিসালাতু'ল-কুদ্‌স্‌ (কাবদ্‌-এর উদাহরণের জন্য) ; (৩) ইব্‌ন 'আলাবী, আল-মিনাহ্‌'ল-কুদ্দুসিয়্যা[২], ২৮৩-৫।

M. Lings (E.I.)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

(৩) ছন্দপ্রকরণে কাব্‌দ অর্থ 'সংকোচন'। 'আরূদ নামক প্রবন্ধে (৬৭১-২) এবং G. Weil, Grundriss und System der altarabischen Metern, Wiesbaden ১৯৫৮ খৃ., ২৭, ৩০-এ প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত নিম্নোক্ত অংশ যোগ করা যাইতে পারে (কাব্‌দ নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহের কোন কোনটির ক্ষেত্রে মতৈক্য নাই এবং একটি সম্পূর্ণ জরিপ এ স্থানে প্রদান সম্ভব নয়) কাব্‌দ হইতেছে ফা'উলুন এবং মাফা'ঈলুন পদদ্বয়ের পঞ্চম অনুচ্চারিত বর্ণের বিলোপ সাধন, যাহা তাবীল (দ্র.) হাযাজ, মুদারি' (দ্র.) এবং মুতাকারিব (দ্র.) ছন্দসমূহে বর্তমান। ফলে এই পদ দুইটি যথাক্রমে ফা'উলু এবং মাফা'ঈলুন-রূপে সংক্ষেপিত হয়। এই প্রকার পরিবর্তন সাধিত পদকে বলা হয় মাক্‌বূদ (শেষোক্ত এই শব্দটি ইতিমধ্যেই ইব্‌ন ইসহাক (দ্র.)-এর সীরাত গ্রন্থে কাব্য সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহার অর্থ অস্পষ্ট (দ্র. R. Blachere, Deuxieme contribution, in Arabica, ৬খ., ১৯৫৯ খৃ., ১৩৩, ১৪১)।

মাফা'ঈলুন হইতে মাফা'ইলুন-এ সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়া, তাবীল ছন্দের সকল রূপেই প্রথম শ্লোকার্ধ ('আরূদ)-এর শেষ পদে অবশ্যকরণীয়, যেন এই পদটি কোন অবস্থাতেই ইহার 'আদি'-রূপে আবির্ভূত না হয়, ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম যখন প্রথম শ্লোকার্ধ দ্বিতীয় শ্লোকার্ধের সহিত ছন্দোবদ্ধ হয় (তাসরী', দ্র. কাফিয়া)। দ্বিতীয় প্রকারের দ্বিতীয় শ্লোকার্ধের (দারব) শেষ পদ সম্পর্কেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য (ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্‌দ কেবলমাত্র যিহাফাত-এর অন্তর্গতই নয়, একই সঙ্গে তাহা 'ইলালেরও অন্তর্ভুক্ত (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আস-সাব্বান, আল-কাফিয়া আশ-শাফিয়া ফী 'ইলমায়ি'র-'আরূদ ওয়া'ল-কাফিয়া, কায়রো ১৩২১ হি., ১০)। তাবীল-এর তৃতীয় প্রকারের দ্বিতীয় উনশেষ (Penultimate) পদেও কাব্‌দ ব্যবহারের অনুমোদন রহিয়াছে (কাহারও কাহারও মতে ইহা অবশ্য করণীয়)। এই প্রকারভেদে দ্বিতীয় শ্লোকার্ধের অন্ত্যপদ সংক্ষিপ্ত হইয়া ফা'উলুন-এ পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় অন্ত্য, যাহাও ফা'উলুন ছিল তাহা এখন ফা'উলু-তে পরিণত হইবে। এই নিয়মটি তাসরী'-এর ক্ষেত্রে প্রথম শ্লোকার্ধের জন্য প্রযোজ্য। অপর পক্ষে মুতাকারিব ছন্দে কাব্‌দ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকিতে পারে, যদি উভয় শ্লোকার্ধের দ্বিতীয় অন্ত্য পদ একটি মাত্র হসন্ত শব্দাংশে সংক্ষেপিত হয় (ফাল অথবা ফা', কিন্তু তু. Darstellung, ২৮৩) এবং এইরূপ সকল ক্ষেত্রে যেখানে মাফা'ঈলুন পদটি ইতিমধ্যেই মাফা'ঈলু (কাফ্‌ফ)-এ সংক্ষেপিত হইয়াছে। শেষ অবধি ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুদারি' ছন্দে মাফাঈলুন পদটি কখনও ইহার আদিমরূপে আবির্ভূত হয় না; বরং ইহা সকল সময়েই মাফা'ইলুন অথবা মাফা'ঈলু-তে পরিবর্তিত করা হয় (তু. সাব্বান, আল-কাফিয়া, পৃ. ৩২, ছত্র ৭-৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তিবরীযী, আল-ওয়াফী ফিল-'আরূদ ওয়া'ল-কাওয়াফী, আলেপ্পো ১৩৯০/১৯৭০, স্থা. ; (২) যামাখ্‌শারী, আল-কিসতাসু'ল-মুসতাকীম ফী 'ইলমি'ল-'আরূদ, বাগদাদ ১৩৮৯/১৯৭০, স্থা.; (৩) G. W. Freytag, Darstellung der arabisschen Verskunst, বন ১৮৩০ খৃ. (পুনঃপ্রকাশ, Osnabruck ১৯৬৮ খৃ.), ৮০, ৮৯-৯০, ৯২, ৯৩-৯৪, ১০৮-১১, ১৬১, ১৬৩-৪, ১৬৬-৭০, ১৭২-৪, ১৭৬-৮, ২২৭-৮ ২৭২-৪, ২৮৩-৪; (৪) Silvestre de Sacy, Grammaire arabe[2], প্যারিস ১৮৩১ খৃ., ২খ, ৬২৬-৭ (এবং ছক), ৬২৯-৩০, ৬৩৬, ৬৪৩, ৬৪৫ ; (৫) D. Vernier, gramaire arabe, বৈরূত ১৮৯১ খৃ., ২খ, ৫১৬, ৫১৭, ৫২৯, ৫৩৪-৫, ৫৫৫, ৫৭৪, ৫৮০-১।

Moh. Ben Cheneb (S. A. Bonebakker)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাব্বান (দ্র. মীযান)

আল-কাব্বাব (القباب) ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুসায়ন আত-তামরূতী আদ-দার'ঈ আর-রাককী (তাঁহার জন্মভূমি আর-রাককা [দ্র.] শহর হইতে এই নিসবাত গৃহীত)। একজন বিখ্যাত মরক্কোবাসী সাধক। তাঁহার জন্ম সায়্যিদু'ন-নাস-এর যাবিয়াতে [ইহা রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর নামানুসারে পরিচিত]। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবূ ইসহাক আল-আনসারী যিনি সাধারণভাবে সায়্যিদ ইবরাহীম আল-হাজ্জ নামে পরিচিত ছিলেন, তথায় আল-কাব্বাব 'ইবাদত-বন্দেগী ও সাধনার মধ্যে লালিত-পালিত হন। শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র আহমাদ-এর সঙ্গীরূপে তিনি ৯৮৩ সালের রামাদান মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৫৭৫-৬), আবূ হাফ্‌স 'উমার ইব্‌ন আহমাদ আল-আনসারী প্রতিষ্ঠিত তামগ্রূত-এর যাবিয়াতে (খানকাহে) গমন করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ঐ স্থানে তিনি ১০৪৫ সালের ১২ জুমাদা-২, শুক্রবার (২৩ নভেম্বর, ১৬৩৫ খৃ.) ইনতিকাল করেন। সিজিলমাসাগামী সড়কের পার্শ্বে তাঁহার মাযার অদ্যাবধি রাওদাতু'র-আশায়াখ নামে পরিচিত। তাঁহার খ্যাতি বহু লোককে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাহাদের তিনি শাযিলী তরীকায় বায়'আত করেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয় মুরীদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যথা পূর্বোল্লিখিত আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এবং দুই ভ্রাতা মুহাম্মাদ এবং হুসায়ন ইব্‌ন নাসির আদ-দার'ঈ। আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ যাররুক হইতে গৃহীত। শেষোক্ত ব্যক্তির শিক্ষা আবু'ল-কাসিম আল-গাযী 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আস-সিজিলমাসী এবং 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ আর-রাশিদী কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Chorfa, ৩১৫ এবং নং ৪ ; (২) ইফরানী, সাফওয়া, ৭০; (৩) কাদিরী, নাশর, ১খ, ১৬৯ ; (৪) ঐ লেখক, ইলতিকাত, পত্র ১৪v; (৫) ঐ লেখক, আন-নাশরু'ল-কাবীর, ১খ, পত্রক ১৮v ; (৬) নাসিরী, তাল'আতু'ল-মুশতারী, ১খ, ১২৮-৩৬ এবং স্থা.; (৭) মাক্‌কী নাসিরী, দুরার (আল-হাশতূকী, ইনারাতু'র-রাসা'ইল এবং তাল'আতু'দ-দা'আ) ; (৮) হুসায়ন ইব্‌ন নাসির আদ-দার'ঈ, ফাহরাসা ; (৯) য়ুসী, মুহাদারাত, উপসংহার ; (১০) দা.মা.ই., ১৬/১খ, পৃ. ২৩১।

M. Lakhdar (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাব্‌র, কবর (قبر) ঃ (আ.), বহুবচনে কুবূর (قبور)। মৃত ব্যক্তির দেহ নিরাপদে রক্ষণের স্থান, যেইখানে মৃত ব্যক্তিকে মাটির নীচে শায়িত করিয়া চোখের অন্তরালে রাখা হয়। রাগিব ইস্‌ফাহানীর ভাষায় মৃত ব্যক্তির ঠিকানা ও অবস্থানস্থল (দ্র. মুফরাদাত, শিরো., কাব্‌র)। ইমাম রাগিবের ব্যাখ্যায় কবরের অর্থ ব্যাপক এবং ইহা শুধুমাত্র ভূতলে

আবদ্ধ না থাকিয়া মৃত্তিকার নিম্নে অথবা পানির নীচে কিংবা আকাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া মৃতদেহের অংশসমূহ যেইখানেই থাকুক না কেন, সেই স্থানটিই তাহার কবর। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেইখানে মৃত ব্যক্তির দেহ কিংবা উহার অংশবিশেষ স্থান পায় তাহাকেই তাহার কবর বলা যাইতে পারে।

কবরের একটি রূপক অর্থ হইতেছে–আদেশ ও নিষেধের বন্ধন হইতে মুক্তি, প্রাণ ও জীবনী শক্তির বিলোপ, নিশ্চল ও নিরুত্তাপ অবস্থা এবং চেষ্টা-প্রয়াস ও কর্ম হইতে বিচ্যুতি (দ্র. মাজ্‌মা'বিহারি'ল-আনওয়ার, শিরো. 'কাব্‌র')।

যেই স্থানে মানুষ মৃত্যুর পর হইতে হাশ্‌র ও পুনরুত্থান পর্যন্ত অবস্থান করে তাহাকে কবর বলা হয় এবং কখনও সেই মৃতাবস্থাকেও কবর বলা হয়, যাহাতে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর হইতে হাশ্‌র পর্যন্ত অতিবাহিত করে। কুর্‌আন মাজীদের আয়াত ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (৮০ ঃ ২১)-তে দুই অর্থই পাওয়া যায়। যে সকল মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয় নাই তাহাদের ক্ষেত্রে এই আয়াত বিশেষ করিয়া এইরূপে প্রযোজ্য যে, মৃত্যুর পর হইতে পুনরুত্থান পর্যন্ত সকল অবস্থাই মৃত্যুবরণকারীর কবর বলিয়া গণ্য হইবে। এই সময়কে বার্‌যাখ (দ্র.)-ও বলা হইয়া থাকে (দ্র. ২৩ ঃ ৯৯-১০০)।

মৃত ব্যক্তির লাশকে অসম্মান হইতে রক্ষা করিবার এবং উহার বিভিন্ন পরিবর্তন চোখের অন্তরালে রাখিবার জন্য কবর খনন করা হয়। কবরের গভীরতা মাঝারী ধরনের একজন মানুষের উচ্চতার ন্যূনপক্ষে অর্ধেক এবং উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মৃত ব্যক্তির আকৃতি অনুসারে হইবে।

কবর দুই প্রকারের, যথা ঃ 'লাহ্‌দ' ও 'শাক্ক'। একটি হাদীছেও বর্ণিত আছে "লাহ্‌দ আমাদের জন্য এবং শাক্ক অন্যদের জন্য" ('আবদু'র-রায্‌যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩খ, ৪৭৭)। লাহ্‌দকে 'বগলী' কবর বলা হইয়া থাকে, যাহা কবরের নিম্নাংশে দৈর্ঘ্য বরাবর কিবলামুখী এমন জায়গায় খনন করা হয়, যাহাতে মৃতদেহ কিবলামুখী স্থাপন করা যায়। অতঃপর উহাকে কাঁচা ইট, শিলা ও প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। লাহ্‌দ সাধারণত শক্ত মাটিতে খনন করা হইয়া থাকে। শাক্ক-এ সোজাসুজি গভীরাকারে গর্ত খনন করা হয় এবং উহার ভিতরে চতুর্দিকে কিছু খাঁজকাটা জায়গা ছাড়িয়া সিন্দুকের মত ঘেরাও করা হয়। উহাতে মৃতদেহ রাখিয়া কবরের খাঁজকাটা পার্শ্বদেশের উপর বাঁশ, তক্তা, পাথর ইত্যাদি রাখিয়া উহাকে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কবরের দিক এমন হওয়া উচিত যে, ইহাতে মৃত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করিয়া স্থাপন করা যায়।

কবরের উপর কুঁজের আকারে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু মৃত্তিকা রাখা বৈধ। কবর পাকা করা, চুন ও সিমেন্টের প্লাস্টার করা এবং উহাতে ফলক লিপি স্থাপন শারী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। তবে কবর চিনিবার জন্য অন্য কোন প্রকার নিদর্শন রাখার অনুমতি রহিয়াছে।

কবরের উপর সৌধ, মসজিদ কিংবা মাদ্‌রাসা নির্মাণ এবং উহার চৌহদ্দী টানা অপছন্দনীয়। কবরের বাহ্যিক চাকচিক্য, অলংকরণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি, দর্শনীয় করার অথবা গর্ব করার উদ্দেশ্যে হইলে হারাম বলা হইয়াছে। কবর ময়লা ও পুঁতিগন্ধময় আবর্জনা হইতে পরিষ্কার রাখা উচিত। কবরস্তানে মাহফিল করা বা উহার উপর দিয়া যাতায়াত করা অপছন্দনীয়। যতদিন পর্যন্ত কবরে মৃতদেহের হাড় অবশিষ্ট থাকে ততদিন উহা দ্বিতীয়বার খনন করা উচিত নহে। অবশ্য কোন অনুসন্ধানের খাতিরে কিংবা কোন বস্তু ভিতরে থাকিয়া গেলে কবর দ্বিতীয়বার খনন করা যাইতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনবশত এক কবরে একাধিক মৃতদেহ দাফন করা যাইতে পারে। মৃতদেহের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকিলে কবরস্তান অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়। আখিরাত ও মৃত্যুর স্মরণ পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য এবং সতর্কতা ও উপদেশ লাভের জন্য কবর যিয়ারাত মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাতের জন্য দু'আ করা উচিত। কবরস্তানে পৌঁছিয়া এই দু'আ পড়া সুন্নাত ঃ

السلام عليكم يا أهل القبور– يغفر الله لنا ولكم–
انتم سلفنا ونحن خلفكم– وانا إن شاء الله بكم لاحقون.

[আস-সালামু 'আলায়কুম য়া আহ্‌লা'ল-কুবূর। য়াগ্‌ফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহ্‌নু খালফুকুম। ওয়া ইন্না ইন্‌শা' আল্লাহু বিকুম লাহিকূন (হে কবরবাসিগণ ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ আপনাদেরকে ও আমাদেরকে মাফ করুন। আপনারা আমাদের অগ্রবর্তী এবং আমরা আপনাদের অনুগামী। আল্লাহ্ চাহেন আমরা অবশ্যই আপনাদের সহিত মিলিত হইব") আস-সিমাতী, কিতাবু'ল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল- আর্‌বা'আ, ১খ, ৪১৮-৪২৩]। কবরে বাতি দেওয়া, ফুল দেওয়া, আগর বাতি ও ধূপধুনা জ্বালান নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) "উঁচু কবরসমূহ সমতল করিয়া দেওয়ার আদেশ দিয়া হযরত 'আলী (রা)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবর আরাধ্য বস্তুতে পরিণত করা এবং উহাতে 'উর্‌স ও 'ঈদ-পুনর্মিলনী করাও রাসূলুল্লাহ্ (স) নিষেধ করিয়াছেন (ইবনু'ল-কায়্যিম, যাদু'ল-মা'আদ, ১খ, ১৪৬)।

কবর 'আযাব ও ছাওয়াব ঃ কুরআন মাজীদে কবরে 'আযাব সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। অবশ্য মৃত্যুর পর হইতে হাশ্‌র পর্যন্ত যে সময়টি মৃত ব্যক্তি অতিবাহিত করে এবং যাহাকে বারযাখও বলা হইয়া থাকে, উহার সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বারযাখে মৃত ব্যক্তি যে জীবন অতিবাহিত করে তাহার সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত কমই জানিতে পারি। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হইয়াছে, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ "আমি তাহাদিগকে দুইবার 'আযাব দিব। অতঃপর উহাদিগকে বৃহৎ 'আযাবের দিকে ধাবিত করা হইবে" (৯ ঃ ১০১)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) এবং কতিপয় মুফাস্‌সির মনে করেন যে, প্রথম 'আযাব দুনিয়াতে, দ্বিতীয়টি বার্‌যাখে এবং অবশেষে বৃহৎ 'আযাব কিয়ামতের দিন দেওয়া হইবে।

শহীদগণের প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "তোমরা তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না। তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত হইতেছে" (২ ঃ ১৫৪, ৩ ঃ ১৬৯)। ফির্‌আওন গোত্রের প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের বক্তব্য ঃ "ফির্‌আওন গোত্রকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নির 'আযাব পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। এই অগ্নিতে তাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিক্ষিপ্ত হইবে এবং যেইদিন কিয়ামত উপস্থিত হইবে সেইদিন বলা হইবে, ফির্‌'আওন-গোত্রকে কঠিনতম 'আযাবে প্রবিষ্ট কর" (৪০ ঃ ৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বর্ণিত হাদীছসমূহে কবরের 'আযাব সম্পূর্ণ ভয়াবহতা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তিনি দু'আ' করিবার সময় কবরের 'আযাব হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (স) ফরমাইয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটি অথবা তাহার উদ্দেশ্যে বিলাপ করিবার কারণে মৃত ব্যক্তিকে 'আযাব দেওয়া হয়। একটি হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিবার সময় বলিলেন ঃ "এই কবরবাসীদ্বয়কে অত্যন্ত সাধারণ কারণে 'আযাব দেওয়া হইতেছে। একজন পেশাব করিবার পর পাক হওয়ার খেয়াল রাখিত না আর দ্বিতীয়জন পরনিন্দা (চোগলখুরী) করিয়া বেড়াইত।" হযরত 'আই'শা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ "কবরে 'আযাব অবশ্যই হইবে" (দ্র. আল-বুখারীর, আস-সাহীহ, কিতাবু'ল-জানা'ইয)।

কবর 'আযাবে বিশ্বাসের উপকারিতা সম্পর্কে আল-বায়দাবী লিখিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তির এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, মৃত্যুর পরে কবরে মন্দ কাজের জন্য পাকড়াও করা হইবে ও 'আযাব দেওয়া হইবে অতঃপর জাহান্নামে আরও 'আযাব দেওয়া হইবে, তখন মন্দ কাজের প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে অধিকতর শক্তি লাভ করে (দ্র. আল-বায়দাবী, উসূলু'দ-দীন, পৃ. ৭৩২ ও ৭৩৩)।

'আযাবের অর্থ এমন "ক্লেশ, দুঃখ ও বিপদ" যাহা আল্লাহ্র নিকট হইতে অথবা আধিপত্যকারী মানুষের পক্ষ হইতে কাহারও উপর আপতিত হয়। ইহাতে শাস্তি ও দণ্ডের অর্থের সহিত শুধুমাত্র সর্বময় ক্ষমতার ধারণাই নয়, বরং উহার সহিত ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরাগও সম্পৃক্ত রহিয়াছে।

'আযাবু'ল-কাব্‌র ঃ কবরের 'আযাব অর্থাৎ সেই শাস্তি যাহা কবরে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাকে বার্যাখের (দ্র.) 'আযাবও বলা হয়। এই ধারণা এমন একটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মৃতুর পর কবরেও মৃত ব্যক্তির এক প্রকার সংবেদনশীল জীবন চলিতে থাকে। মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে যত কিছুই ঘটে তাহার সম্পর্কে বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন মতামত বর্ণিত আছে।

(১) কবর বেহেশতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের এটি গহ্বর। পুণ্যবান ও ঈমানদারদের রূহের জন্য রহমতের ফেরেশ্তাগণ আগমন করে আর কাফিরদের জন্য ও অসৎ মুসলমানদের জন্যও 'আযাবের ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। ঈমানদারগণের রূহ বেহেশতের বৃক্ষসমূহে পাখীরূপে অবস্থান করে এবং কিয়ামতের দিন উহারা স্বীয় দেহের সহিত মিলিত হইবে। শহীদগণ শাহাদাত প্রাপ্তির পর হইতেই বেহেশ্তে অবস্থান করে।

(২) বিলাপকারিগণ ক্রন্দন করিতে থাকিলে মৃত ব্যক্তিদের কষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া যখন বদকার ব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া দাফনকারিগণ চলিয়া যাইতে থাকে। ঈমামদার ব্যক্তি নিজের কবর সত্তর হাত প্রশস্ত দেখিতে পায়। আর অবিশ্বাসীদের কবর এমন সংকুচিত হইয়া যায় যে, তাহাদের পাঁজরসমূহ একটি অন্যটির ভিতর ঢুকিয়া যায়।

(৩) মুনকার ও নাকীর নামে দুইজন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে উঠাইয়া উপবিষ্ট করে ও তাহাকে তাহার ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশ্ন করে। মুমিন দৃঢ়কণ্ঠে (কাওল ছাবিত) (১৪ ঃ ২৭) এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। ইহার পর তাহাকে দোযখের সেই স্থান দেখান হয় যাহা হইতে সে নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে এবং বেহেশ্তের সেই স্থান দেখান হয় যাহা তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত একাকী থাকিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কাফির, ফেরেশ্তাগণের প্রশ্নের জওয়াব দিতে অক্ষম হয় বলিয়া তাহারা তাহাকে এমন একটি লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে থাকে যাহা হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকে। মানুষ ও জিন ছাড়া সমস্ত সৃষ্টিকুল এই প্রহারের শব্দ শুনিতে পায়। এক বর্ণনায় ইহাও আছে যে, এই শাস্তি শুধুমাত্র রূহের উপর হইয়া থাকে। আল্লাহ্ যতদিন চাহেন ততদিন এই 'আযাব স্থায়ী হয়। কয়েকজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মতে, এই 'আযাব শুক্রবার ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত অন্য সব দিন চলিতে থাকে। ফেরেশতাগণ দেহ হইতে রূহ বাহির করিয়া আনে। ঈমানদারগণের রূহ সহজেই বাহির হইয়া যায়। কিন্তু কাফিরদের রূহ টানা-হেঁচড়া করিয়া বাহির করা হয়, যাহার ফলে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। শহীদগণের, ছোট শিশুদের এবং কতিপয় নফল 'ইবাদত আদায়কারী ব্যক্তির কবরের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না।

কতিপয় সূত্রানুযায়ী কবরের 'আযাব ও কবরের চাপের (দাগতাতু'ল-কাব্‌র= ضغطة القبر) মধ্যে পার্থক্য দেখান হইয়াছে। ঈমানদার ও আল্লাহ্র অনুগত ব্যক্তিগণ কবরের 'আযাব হইতে রক্ষা পাইবে, কিন্তু "কবরের চাপ" ঠিকই তাহার উপর প্রয়োগ করা হইবে। আর কাফিরগণের উপর কবরের 'আযাব ও কবরের চাপ উভয়ই আরোপিত হইবে।

কুরআন মাজীদের কতিপয় আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ (৪৭ ঃ ২৭) অর্থাৎ "সেই সময় তাহাদের কি দশা হইবে যখন ফেরেশতাগণ তাহাদের রূহ বাহির করিবে এবং তাহাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠাদেশে প্রহার করিতে থাকিবে !"

অন্য একটি স্থানে বলা হইয়াছে, "যদি তোমরা সেই জালিম লোকদেরকে এমন সময় দেখিতে যখন তাহাদের প্রাণ সংহার করা হইতেছে এবং ফেরেশতাগণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছে, তোমাদের প্রাণ বাহির কর ; আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হইবে" (৬ ঃ ৯৩)। আরও এক স্থানে বলা হইয়াছে, "যদি তোমরা দেখিতে যখন ফেরেশতারা কাফিরদের রূহ কাব্‌দ (কবজ) করে এবং উহাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিতে থাকে ও বলিতে থাকে ঃ তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর" (৮ ঃ ৫০)।

কবর-'আযাবের বর্ণনা হাদীছে বহুস্থানে আসিয়াছে (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা ফেরেশতাদের উল্লেখ ছাড়াই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সব হাদীছে, যাহাতে ফেরেশতাদের উল্লেখ নাই, "কবরে মৃত ব্যক্তিগণের 'আযাব হইয়া থাকে" এইটুকুই মাত্র বলা হইয়াছে অথবা আযাবের কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, এমন সকল বিশেষ গুনাহের প্রসংগে আলোচনা করা হইয়াছে যেইগুলি করার দরুন মৃত ব্যক্তির "কবর-'আযাব" হইয়া থাকে। যেমন–হাদীছে আছে, "তোমরা পেশাবের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক। কেননা সাধারণভাবে কবরের 'আযাব উহার দরুন হইবে।" মুনকার ও নাকীরের নাম নির্ভরযোগ্য হাদীছসমূহে একবার মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে (আত্-তিরমিযী, জানা'ইয, অধ্যায় ৭)।

ফিকহ্ আকবারে (১ম সংস্করণ) যাহা হিজরী দ্বিতীয় বা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়, "কবর-'আযাব" সম্পর্কে একবার মাত্র সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করা হইয়াছে (অনুচ্ছেদ ১০)। "ওয়াসিয়্যাত-আবী হানীফা"-তে, যাহাকে হিজরী তৃতীয় শতক অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগের সঠিক 'আকীদাসমূহের

(বিশ্বাসসমূহের) প্রতিচ্ছবি মনে করা উচিত, কবরের 'আযাব এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নাবলী উভয়ই স্থান পাইয়াছে। "ফিক্‌হ আকবারে" (২য় সংস্করণ) যাহা হিজরী চতুর্থ শতাব্দী বা খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের যথার্থ 'আকীদাসমূহের ব্যাখ্যাকারী অনবদ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণযোগ্য, অত্যন্ত যত্নের সহিত ও স্পষ্টভাবে এই 'আকীদাসমূহের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে (অধ্যায় ২৩) ঃ "কবরে মৃত ব্যক্তিকে মুন্‌কার ও নাকীবের প্রশ্ন করার ঘটনা সত্য এবং রূহ ও দেহের মধ্যে পুনঃসংযোজন হওয়ার ব্যাপারও সত্য। কবরের চাপ এবং কবরের 'আযাবও অবশ্যই সত্য, যাহা সকল কাফিরের উপর এবং কিছু গুনাহ্‌গার মুসলমানের উপর প্রয়োগ করা হইবে।" পরবর্তী সময়ে 'আকীদা ও মৌলিক বিষয়াদির উপর যেই গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে সেইগুলিতে কবরের ভিতরে মুন্‌কার ও নাকীরের আগমন, প্রশ্ন করা ও 'আযাব দেওয়ার বিষয়সমূহ যথার্থ গুরুত্বের সহিতই বর্ণিত হইয়াছে।

মু'তাযিলাগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মুন্‌কার ও নাকীরের ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, মুন্‌কার হইল জওয়াব দেওয়ার সময় দ্বিধা-জড়তা হইতে সৃষ্ট কাফিরদের অনবরত বিড়বিড় শব্দ এবং নাকীর হইল তাহার উপর আপতিত এই কঠিন অবস্থা ও পরীক্ষার নাম। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, মুন্‌কার ও নাকীর বলিতে মাত্র দুইজন ফেরেশতা নয় বরং ফেরেশতাদের দুইটি শ্রেণী বুঝায়। কেননা প্রতি মুহূর্তে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে মানুষ ইনতিকাল করিতেছে এবং দুইজন ফেরেশতার পক্ষে একই সময়ে অসংখ্য স্থানে গমন করা সম্ভব নয়। আরও একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা এই যে, এই দুই ফেরেশতা মানুষের নিজের ভাল ও মন্দ কার্যের প্রতিকৃতি, যাহা দেহ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত মুক্তি (নাজাত) অথবা 'আযাবের অঙ্গীকার করে।

কাররামিয়্যা (দ্র.) দলের মতে মুনকার ও নাকীর দুইজন দেহরক্ষক ফেরেশতা, যাহারা মানুষের সঙ্গে অবস্থান করে ('আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী, উসূলু'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৪৬)। ইমাম গাযালী (র) বলেন যে, হাশর ও নাশ্‌র (পুনরুত্থান) সম্পর্কে যেই সকল কথা বলা হইয়াছে সেইগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং 'আলাম মালাকূত (অতীন্দ্রিয় জগত)-এ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আখিরাত ও উহার আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যক। উহা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হইতে পারে না। বিভিন্ন হাদীছে বলা হইয়াছে যে, কবরে শুধুমাত্র সৎ কর্মসমূহই কাজে আসে। কবরের অন্ধকারের মধ্যে আলো সৃষ্টি করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা-র রহমত ও নেক 'আমলের প্রয়োজন। এইরূপে কতিপয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ যেই ব্যক্তি "সূরাতু'ল-মুল্‌ক", যাহার অপর এক নাম 'আল-মানি'আ', তিলাওয়াত করে, সে কবর 'আযাব, মুন্‌কার ও নাকীরের শাস্তি হইতে মুক্ত থাকিবে (মাজদু'দ-দীন ফীরোযাবাদী, বাসা'ইর যাবি'ত-তাম্‌ঈয, ১খ, ৪৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিফতাহ কুনূযি'স-সুন্না, শিরো. আল-কুবূর আল-মায়্যিত; (২) E. Sell, The Faith of Islam, লন্ডন ১৮৮০ খৃ., পৃ. ১৪৫; (৩) মু'জামু'ল-ফিক্‌হি'ল-হাম্বালী, ২খ, শিরো. কাব্‌র, কুয়েত ১৯৭৩ খৃ.; (৪) Wensinck, The Muslim Creed, কেম্ব্রিজ ১৯৩২ খৃ., সাধারণ নির্ঘণ্ট, শিরো. Punishment-মুন্‌কার ও নাকীর; (৫) শারহ্ ওয়াসিয়্যাত আবী হানীফা, হায়দরাবাদ ১৩২১ হি., পৃ. ৪৪; (৬) আত-তাহাবী, বায়ানু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আ, আলেপ্পো ১৩৪৪ হি., পৃ. ৯; (৭) আবূ হাফস 'উমার আন-নাসাফী, 'আকা'ইদ, তাফতাযানীর ব্যাখ্যাসহ, ইস্তাম্বুল ১৩১৩ হি., পৃ. ১৩২; (৮) আল-গাযালী, ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন, কায়রো ১৩০২ হি., ৪খ, ৪৫১ প.; (৯) ঐ লেখক, আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরা, সম্পা. Gautier, পৃ. ২৩ প.; (১০) ইব্‌ন রাজাব আল-হাম্বালী, আহওয়ালু'ল-কুবূর ফী আহওয়াল আহলিহা ইলা'ন-নুশূর, মক্কা ১৩৫৭ হি.; (১১) কিতাব আহওয়ালি'ল-কিয়ামা, সম্পা. M. Wolff, পৃ. ৪০ প.; (১২) R. Eklund, Life between Death and Resurrection according to Islam, উপ্‌সালা ১৯৪১ খৃ.; (১৩) ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আর-রিসাতু'ল-কাব্‌রিয়্যা ফি'র-রাদ্দ 'আলা মুন্‌কির 'আযাবি'ল-কাব্‌র, "সিত্তাতু রাসা'ইল" সংকলনে, কায়রোতে প্রকাশিত।

A. J. Wensinck এবং A. S. Tritton (দা. মা. ই.)/
আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ঃ কবর শব্দটি প্রথমে 'দারীহ' শব্দটির ন্যায় মৃতদেহ দাফন করিবার জন্য ব্যবহৃত গর্তের জন্যই প্রয়োগ করা হইত এবং ইহা হইতে "হাযা কাবরু . . . . . " অর্থাৎ "ইহা হইতেছে কবর ..." এই বাক্যসম্বলিত অসংখ্য স্মৃতিলিপিতে (epitaph) শব্দটির রীতিসিদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মূলত 'সান্দূক' অর্থাৎ "দাফন করা ব্যক্তির সম্মানার্থ স্মৃতিস্তম্ভ" (cenotaph) (তু. J. Sauvaget, "Les perles choisies" d'Ibn ach-Chihna, বৈরূত ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ২১২ এবং "Les tresors d'or" de Sibt al-'Ajami, বৈরূত ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৮৪) হইতে পৃথকভাবে ইহাকে সাধারণ্যের দৃষ্টিগোচর করিবার উদ্দেশ্যে উহার উপস্থিত সমাধিস্তূপ বা কোন নির্মাণকার্যকে বুঝাইত। এই রীতিটি ইসলামের ৩য় শতাব্দী হিজরী সন হইতে মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত ছিল। "পীর বন্দনা" ও কবর পূজার বিভিন্ন আচারাদির [ভক্তিমূলক তীর্থযাত্রা বা 'সহ] প্রশ্নে মতবাদের বিতর্ক এবং আইন সংক্রান্ত আলোচনার আলোকে "তাসবিয়াতুল-কুবূর" (التسوية القبور) অর্থাৎ কবরকে চতুষ্পার্শ্বের ভূমিকে সমান উচ্চতায় রাখার জন্য হাদীছে দস্তর মাফিক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কখনও বা একটি উন্নত প্রস্তরখণ্ড সমেত কিংবা শুধু নুড়ি বা মৃত্তিকার অতি সাধারণ স্তূপ হইতে শুরু করিয়া বিশাল অবয়বসহ একটি বাস্তব স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন স্থাপনকারী সমাধি সৌধ পর্যন্ত সকল প্রকারের অন্ত্যেষ্টি-স্মারক স্তম্ভই সর্বকালে ইসলামী শিল্পকলায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

মুসলিম বিশ্বে কবরস্তান তথা কবরের ধারণার সহিত সম্পর্কিত আইন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও রীতি-নীতির প্রশ্ন স্থগিত রাখিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, 'কবর শব্দটি একটি বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক বাস্তবতা নির্দেশ করে, যদিও কখনও কখনও উহার সংজ্ঞা দান কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা অংশত অস্তিত্বমান স্মারক কর্মসমূহের নির্মাণের যুগ ও প্রাপ্তির অঞ্চল সম্পর্কে তথ্যাদির অভাবের কারণে হইয়া থাকিবে। আরও অধিকাংশে ইহাবিচিত্র শব্দের সাহায্যে বর্ণিত সর্বতোভাবে বিভিন্ন কবরস্তানকে একটি শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করিবার অনিচ্ছা হইতে উদ্ভূত। পরিভাষার এই বৈচিত্র্য শুধুমাত্র ভাষা ও উপ-ভাষায় ব্যবহার রীতির কারণেই নয়, বরং আকৃতি ও স্থাপত্যের পার্থক্যের কারণে [উদা. রাজাম, কারকূর (দ্র.) হাওশ, তাবূত, হাবীতা, মাকাবারিয়্যা, কুব্বা (দ্র.) কাস্‌র (দ্র.) গুনবায,

গূর, তুরবা বা তুরবে (দ্র.)] কিংবা এমন কি মৃত ব্যক্তির প্রতি, সুতরাং তাহার আশ্রয়স্থলের মূল্যমানের প্রতি আরোপিত গুণগত পার্থক্যের কারণেও হইয়া থাকিবে [উদা. রাওদা, মাশহাদ, ইমাম-যাদে (দ্র.), শাহযাদে, ওয়ালী, মারবূত, মাযার, মাকাম এবং এমন কি মাকান]। ইহা সত্ত্বেও Max van Berchem প্রস্তাবিত ও আরবী উদ্ধৃতির সাহায্যে সমর্থিত শব্দ প্রয়োগরীতি (তু. M. van Berchem, CIA Egypte, ১খ, ২৮৬, টীকা ও ২৯৩; CIA Jerusalem, ১খ, ৬, ১২৪) অনুসারে এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যেও প্রকৃত মাযার, যাহা এইখানে 'কবর' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে এবং মাযার সৌধের (mausoleum = কুব্বা বা তুরবা) মধ্যে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। মাযারসৌধ হইতেছে "মৃত ব্যক্তির প্রতি উৎসর্গিত নির্মাণ কর্ম, যাহা এককভাবে স্থাপিত অথবা অন্য একটি সৌধের সহিত সংযুক্ত" এবং ইহাকে কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত অন্য সেই সব অজ্ঞাত নির্মাণ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেইগুলিকে "স্মারক স্তম্ভরাজি" (commemorative monuments) শিরোনামে একত্র করা যায়।

সুতরাং ইসলামী শিল্পের অন্যতম প্রতিনিধিত্বমূলক একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য মাযারসৌধ বর্তমান নিবন্ধের আলোচনা বহির্ভূত। এই নিবন্ধে শুধুমাত্র মুক্ত আকাশের নিচে সমাধি-বেষ্টনী, গম্বুজাকৃতি ঘনমাত্রিক (cubic) সৌধ এবং মাযার সৌধের মীনার বা বুরূজ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বস্তুত এইগুলিই হইতেছে মাযার সৌধের ব্যবহারিক ধারণার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অভিব্যক্তি। এতদসত্ত্বেও একটি প্রকৃত কিংবা কল্পিত মাযারের ঠিক উপরে অবস্থিত সমাধিও একটি সরল ও সাধারণ আদর্শের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হইতে পারে না। ইহাও স্থান ও কালভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অনায়াসে সনাক্তযোগ্য একটি প্রাথমিক ও আদিম উপাদানের অস্তিত্ব, যথা ঃ মৃত্তিকাস্তূপ, আবার শিলা বা প্রস্তর নির্মিত বেঞ্চ, নুড়ি বা নিম্ন প্রাচীর দ্বারা নির্মিত আয়তাকার বেষ্টনী, মৃতদেহের শিয়র কিংবা পদযুগলের নিকট স্থাপিত প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি থাকিলেও পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, আকৃতি এবং এমন কি সাজসজ্জা ও উৎকীর্ণ লিপির পুঙ্খানুপুঙ্খতায় মুসলিম মাযারসমূহ এক বিরাট বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে যাহা বিভিন্ন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশিষ্টসমূহে পরিদৃষ্ট হয়। একমাত্র পরিতাপের বিষয় এই যে, এই স্মৃতিচিহ্নসমূহের কোন সম্পূর্ণ তালিকা অদ্যাবধি প্রস্তুত হয় নাই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত সালে, কায়রাওয়ান, কায়রো দামিশক ও ইস্তাম্বুলের ন্যায় বিভিন্ন নগরের সন্নিকটে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত গোরস্তানসমূহ যেখানে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক মাযারসহ প্রকৃত ভক্তিযোগ্য মাযার রহিয়াছে, অধুনা নগর উন্নয়ন ও বসত অঞ্চলের বিস্তৃতির মুখে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তথ্যের অভাব আরও প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। একই সঙ্গে কিছু কিছু জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি কিংবা বিশেষ স্থানসমূহে দর্শনার্থ নিয়মিত গমন ইত্যাদি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে (দ্র. Massignon, La cite des morts au Caire, Qarafa— Darb al-Ahmar, in BIFAO, ৫৭/১৯খ, ২৫-৭৯)। তবে সংরক্ষিত কিংবা দুর্গম স্থানসমূহে অবস্থিত অনেক কবরস্তান এখনও বহু মূল্যবান দলীল সরবরাহ করিতেছে যেইগুলি বিস্তারিত সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। একটি সুপ্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে এবং আরও বলিষ্ঠ কালানুক্রমিক ও পরিসংখ্যানিক ভিত্তিতে আমাদের উচিত আবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের সেই একমাত্র সুবিন্যস্ত প্রয়াসের দিকে ফিরিয়া তাকান, যাহা ছিল সালে ও রাবাতের গোরস্তানসমূহের ফলক বা স্তম্ভের (steles) জরীপ। ইহা মিসর ও তুরস্কের ন্যায় দূরবর্তী স্থানসমূহের নমুনাগুলির মধ্যেও তুলনা সহজ করিয়া তোলে (দ্র. J. Bourrilly ও E. Laoust, Steles funeraires marocaines, সংগ্রহ Hesperis IHEM, সংখ্যা ৩, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.)।

কোন প্রকার নূতন সমীক্ষার অনুপস্থিতিতে ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র নির্মিত মাযারসমূহের গবেষণা অপ্রতুল তথ্য এবং অন্যবিধ, বিশেষ করিয়া উৎকীর্ণ লিপি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সর্বপ্রথম প্রয়োজন শহর বা অঞ্চলের ভিত্তিতে প্রস্তুত আরবী উৎকীর্ণ লিপিসমূহের মৌলিক সংকলনগুলির (যেমন— Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum শীর্ষক রচনাবলী যাহা Max van Berchem কর্তৃক চমৎকারভাবে আরম্ভ হইয়াছে অথবা Corpus des Inscriptions arabes de Tunisie নামে প্রকাশিত কিঞ্চিৎ পরিবর্তনশীল মানদণ্ড অনুসারে সন্নিবিষ্ট কতিপয় রচনাখণ্ড) এবং সিসিলি অথবা স্পেনের ন্যায় একটি বিশেষ অঞ্চলের উৎকীর্ণ লিপিমালার বিশাল তালিকাসমূহের নিরীক্ষা (দ্র. M. Amari-কৃত Epigrafi sepolcrali অংশ, Le epigrafi arabiche di Sicilia নূতন সংস্করণে, যাহা F. Gabriali কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত, Palermo ১৯৭১ খৃ., বিশেষভাবে দ্র. E. Levi-Provencal, Inscriptions Arabes d'Espagne, লাইডেন-প্যারিস ১৯৩১ খৃ., যাহাতে ভূমিকার ২৩-২৫ পৃষ্ঠাসমূহে উৎকীণ লিপিশিলার আকৃতি বা সুশোভিতকরণের প্রসঙ্গে অবতারণা করা হইয়াছে)।

যাদুঘরে সংরক্ষিত আরব আমলের মাযার ফলকসমূহের অথবা বিচ্ছিন্ন কিছু নমুনার প্রকাশনার সহিত কিছু উৎসাহব্যঞ্জক বর্ণনামূলক টীকাও থাকিতে পারে মিসরের আরব মাযার ফলকসমূহের প্রকৃত দলীল-পত্রাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে Catalogue du Musee arabe du Caire, Les steles funerires গ্রন্থে, ১ ও ৩খ, H. Hawary ও H. Rached প্রণীত, কায়রো ১৯৩২ ও ১৯৩৮ খৃ., ২খ, ৪-১০ খ, G. Wiet প্রণীত, কায়রো ১৯৩৬-৪২ খৃ., যাহা একখানা বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ; অনুরূপভাবে G. Wiet প্রণীত L'exposition persane de 1931 [কায়রো ১৯৩৩ খৃ.,] গ্রন্থে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের ইরানী সমাধি ফলকসমূহের উপর তাঁহার মন্তব্যসমূহও অতি মূল্যবান। কতকগুলি সমজাতীয় উৎকীর্ণ লিপির উপর কেন্দ্রীভূত এবং লিপিসমূহ স্বস্থানে অবস্থান কালে প্রকাশিত কতিপয় দুর্লভ উৎকীর্ণ লিপি বিষয়ক রচনায় ও মূলোৎপাটিত উৎকীর্ণ লিপিসমূহের তুলনায় সঠিকতর তথ্যসহ, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় (দ্র. উদাহরণস্বরূপ, বর্ণনা B. Roy ও P. Poinssot-কৃত Inscriptions arabes de Kairouan-এ, IHET, প্যারিস ১৯৫০-৫৮ খৃ. এবং J. Sourdel-Thomine-কৃত Steles arabes anciennes de Syrie du Nord, Annales Arch. de Syrie-তে, ৬খ (১৯৫৬ খৃ.), পৃ. ১১-৩৮ অথবা Steles arabes de Bust (Afghanistan), Arabica-তে, ৩খ (১৯৫৬ খৃ.), পৃ. ২৮৫-৩০৬; আরও দ্র. B. Karmagarali কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত আখলাত ফলকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অতিশয় বর্ণনামূলক তালিকা আখলাত মেযারতাসলারি Ahlat mezartaslari, আংকারা ১৯৭২

খৃ.)। অবশেষে কতিপয় দুর্লভ সমীক্ষায় মাযার সুশোভিতকরণ বা উৎকীর্ণলিপি লিখনের শৈলীর বিবর্তনের ধারাটি আবিষ্কারের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় (দ্র. উদাহরণস্বরূপ, J. Strygowski, Ornamente altarabischer Grabstein in Kairo, Isl.-এ, ২খ, ১৯১১ খৃ., ৩০৫-৩৬ অথবা J. Sourdel-Thomine, Epitaphes coufiques de Bab Saghir apud Les monuments ayyoubides de Damas, ৪খ, প্যারিস ১৯৫০ খৃ. অথবা আনাতোলিয়ার আলঙ্কারিক বর্ণনাসমৃদ্ধ মাযারসমূহ সম্পর্কে রচিত নিবন্ধমালা, যেইগুলির সাম্প্রতিকতম নিবন্ধটি হইল B. Karamagarali, Sivas ve Toka'ttaki figurlu mezar taslarinin mahiyeti hakkinda, Selcuklu Arastirmalari Dergisi-তে, ২খ, ১৯৭১ খৃ., ৭৫-১০৯)।

তবে আমাদের প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার প্রণালী এত অসঙ্গতিপূর্ণ যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পর্যায়ে সেই মাযার শিল্প ও উৎকীর্ণ লিপিবিদ্যার বিকাশের একটি মোটামুটি নকশা অঙ্কন করাও সম্ভব নয়, যাহা ছিল প্রকৃত প্রস্তরাশ্রয়ী ভাস্কর্যকর্মসমূহের প্রসূতি এবং যাহা অনেকাংশে সর্বাপেক্ষা সুসম্পন্ন শ্রেণীর অলঙ্কারসমৃদ্ধ আরব হস্তলিপিশিল্পের উন্নতিতে অবদান রাখিয়াছিল। এই মুহূর্তে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় ইসলামী সভ্যতায়ও— স্বল্পস্থায়ী অনাড়ম্বর যুগসমূহ ব্যতীত— মাযারসমূহ যেই কোন যুগে সমাজের ঐশ্বর্য ও পরিশীলন-মাত্রার একটি সত্যিকার প্রতিফলন। এই মাযারসমূহ মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যসহ, যেই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ রচিত হইয়াছিল তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে।

পল্লী অঞ্চলের অজ্ঞাতকুলশীল সমাধিসমূহ ব্যতীত অধিকাংশ মাযারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ছোট বড় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের উৎকীর্ণ লিপি। যদিও আমরা এখানে শুধুমাত্র আরবী ভাষায় লিখিত মাযার লিপিসমূহেরই আলোচনা করিব, তথাপি ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, পরবর্তীকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লিপি অন্যান্য ভাষাতেও রচিত হইয়াছিল। এই উৎকীর্ণ লিপিসমূহ মাযার ফলক (stele), খণ্ডিত মাযার স্তম্ভ (cippi) কিংবা শূন্য সমাধির (cenotaph) গায়ে বিভিন্ন আকারের পৃষ্ঠদেশের উপর (সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষেত্রে আয়তাকার অথবা ফিতাকৃতি) লিখিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং পদ্ধতি ও বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইহারা সমাধির অবয়বের মুখ্য ভাগ অধিকার করিয়া রাখে। এই উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য দাফনকৃত ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করা এবং তাহার জন্য রহমত প্রার্থনাপূর্বক তাহার ঈমানের সাক্ষ্য বহন করা (কুরআনী উদ্ধৃতিসমূহের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের মাধ্যমে), ইহারা সর্বোপরি মাযার লিপি। আরবীতে 'কিতাব' (كتاب) নামক বহুবিধ অর্থবোধক পরিভাষাটির অধীনে ইহাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং ইহারা ২য়/৮ম শতকের শেষভাগ হইতে (আরও সঠিকভাবে ১৭৪/৭৯০ সন হইতে, যাহা হইল কায়রো যাদুঘরে সংরক্ষিত প্রাচীনতম ফলকের তারিখ) একটি প্রাচীন উদাহরণ অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

এই সময় হইতে উৎকীর্ণ লিপিসমূহে সাধারণত আবশ্যিক 'বাস্মালা' بسملة (বিসমিল্লাহ)-র পর তাসলিয়া تصلية (সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় সাধারণ প্রারম্ভিক বাক্যাদি অথবা কখনও কখনও 'হাম্দালা' حمدلة (আলহামদু লিল্লাহ) "কিংবা খোদায়ী ইখতিয়ারের কতিপয় পবিত্র শপথ এবং আল্লাহ্র আসমানী আদেশ অনুযায়ী সকল জীবনের মৃত্যু সংঘটনের দৃঢ় সমর্থন"- সম্বলিত ভক্তিমূলক বাক্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর উৎকীর্ণ হয় বিভিন্ন বাঁধা-ধরা রীতিতে ব্যক্ত এবং বংশানুক্রমের অথবা পদবীর উপর বিভিন্ন পরিমাণের বর্ণনাসহ মৃত ব্যক্তির নাম। ইহার পর সাধারণত মৃত ব্যক্তির সম্মানে এক বা একাধিক প্রশংসাবাক্য এবং কখনও কখনও "পত্রান্তরিত প্রশংসা বাক্যাদি" (transferred eulogies)-ও দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতের নাম উপস্থাপন করিতে সর্বপ্রথমে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি ছিল 'শাহিদা' (شهد) অর্থাৎ " সে সাক্ষ্য দিয়াছে", যাহা মিসরের প্রথম আরব মাযার লিপিগুলিতে দেখা যায়। ইহার পাশাপাশি প্রথম যুগে বিশেষত মৃত্যু তারিখ প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত তুবুফ্ফিয়া' (توفى) অর্থাৎ "অমুক ব্যক্তি ইনতিকাল করিয়াছে" এই বাক্যাংশটিই মাত্র পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত মাযারলিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ ৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতকে উত্তর সিরিয়ায়)। অনুরূপভাবে মিসরের প্রাচীনতম ইসলামী মাযার ফলকসমূহের এক-তৃতীয়াংশে দৃষ্ট উপরে উল্লিখিত "হাযা কাবর" শব্দগুলি পরবর্তীকালে ইফ্রীকিয়্যা, আল-আন্দালুস, সিরিয়া, আনাতোলিয়া এবং এমন কি পূর্ব ইরান হইতে সংগৃহীত সমাধি লিপিসমূহে ব্যতিক্রমহীনভাবে একমাত্র ধারা হিসাবে চলিয়া আসিয়াছে।

অন্ততপক্ষে প্রাথমিক যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল 'রিসালা'-সহ অথবা 'রিসালা' ছাড়া ঈমানের স্বীকারোক্তি, যাহাকে মাঝে মাঝে কুরআনের উদ্ধৃতি, যেমন— সূরা ৯, আয়াত ৩৩ দ্বারা সমর্থন করা হইত। পরবর্তীকালে কতিপয় অঞ্চলে (৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতকে খোদাইকৃত সিরিয়ার সমাধি ফলকাদি অথবা আনাতোলিয়ার সমকালীন সমাধিফলকসমূহ) এবং কতিপয় নমুনায় (উদাহরণস্বরূপ কায়রাওয়ান হইতে প্রাপ্ত নমুনার ন্যায় শিশুদের সমাধিফলক) 'শাহাদা'-র অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে ফাতিমী যুগ হইতে মিসরে ৯ ঃ ৩৩ আয়াতটির অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার দেখা যায়। একই যুগে ইফ্রীকিয়্যা ও আল-আন্দালুসে ইহার জনপ্রিয়তা বজায় থাকিলেও ৬ষ্ঠ/১২শ শতক হইতে সিরিয়া বা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে কিংবা আনাতোলিয়ায় ইহার আর কোন নিদর্শন মিলে না। এই বিবর্তন স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অন্যান্য কুরআনী আয়াতের ব্যবহারের বিবর্তনের পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ চূড়ান্ত ক্ষণের (ساعة) অনিবার্য আগমনের সমর্থনকারী আয়াত ২২ ঃ ৭ মিসরে ৪র্থ/১০ম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং ইফ্রীকিয়্যাতেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পার্থিব জীবনের অসারতা সম্পর্কে আয়াত ৩৫ ঃ ৫ আন্দালুসে এবং আয়াত ৩ ঃ ১৮৫, আয়াত ২১ ঃ ৩৫ অথবা আয়াত ৩৯ ঃ ৫৭ "প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে" সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রাচ্যে ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতক হইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। স্থান ও কালের উপর নির্ভর করিয়া মৌলিক ধর্মীয় উদ্ধৃতিসমূহ কখনও অধিক, কখনও কম সমাদর লাভ করিয়াছে। তবে আয়াতু'ল-কুরসী (২ ঃ ২৫৫), ৩ ঃ ১৮-২০ আয়াতসমূহ এবং সূরা আল-ইখলাস সর্বদাই জনপ্রিয় ছিল।

এইখানে মাযার ফলকে ধর্মীয় বাণীসমূহের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিও বিবেচনার বিষয়। "নবী (স)-এর জন্য" এই ধরনের উক্তির উপর কৃত সমীক্ষাসমূহ হইতে আমরা এই নৈতিক বাণীসমূহের সূক্ষ্ম অর্থ

জানিতে পারি (তু. L. Massignon, La Rawda de Medine, cadre de la meditation musulmane sur la destinee, du Prophete, annexe I, BIFAO-তে, ৫৯খ, ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২৬০-৭)। যেই কতিপয় নৈতিক বাক্য পরিপূরক দু'আসমূহ ও কিছু কাব্যিক উদ্ধৃতি এবং মৃত্যুর তারিখ সংক্রান্ত তথ্যের সমন্বয়ে মাযারের শিলালিপির 'অপ্রধান' অংশ গঠিত, সেই বিষয়সমূহও এইখানে বিবেচনাযোগ্য। হিজরী প্রথম চার শতাব্দীর মাযার লিপিসমূহের উপদেশমূলক ইঙ্গিত ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রাবল্যের বিপরীতে এই ঐতিহ্যমূলক ধারার দৈন্য একটি সাধারণ চিত্র হিসাবে দেখা যায়। অবশ্য নবতর প্রবণতা, যথা সমাজের নূতন রীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পদবী সম্বন্ধীয় বর্ণনা, আলঙ্কারিক নকশার প্রধান অংশ হিসাবে কুরআনে উদ্ধৃতির প্রাচুর্য (যেমন ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রথম দিকের 'মিহ্‌রাব' আকারের কতিপয় ইরানী কবর ফলকে), 'সাহিত্যিক' রীতির উত্তরোত্তর অধিক প্রবর্তন, যাহা একটি ক্রমবর্ধমান বাগাড়ম্বরপূর্ণ শৈলীতে পরিণত হইয়াছিল এবং নৈমিত্তিক কবিতার পক্তিসমূহের কিংবা ছন্দোবদ্ধ বা সমান ধ্বনিবিশিষ্ট গদ্যাংশের পরিবর্ধন ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে থাকে (দ্র. মালীয় বা সিসিলীয় মাযার ফলকের নমুনা)।

সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাধ্য মাযারসমূহ আবশ্যিকভাবে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হয়, কারণ সাধারণ প্রস্তর স্তূপসর্বস্ব মাযারসমূহেও প্রায়শ জনগণের ভক্তি নিবেদিত হইত— উৎকীর্ণ লিপি সম্পর্কে তাহাদের আকার, ব্যবহৃত দ্রব্য কিংবা অন্যান্য সাজসজ্জার উপাদান, যেইগুলির সহিত ইহা ছিল নিবিড় ও একাত্মভাবে সম্পৃক্ত, এই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর মেসোপটেমিয়ার শৈল্পিক প্রভাবসম্বলিত সিরিয়ার ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের অলঙ্কারবহুল উৎকীর্ণ লিপিসমূহের পক্ষে উৎপত্তি ও আবির্ভাবগত দিক হইতে অত্যন্ত বিশেষত্বপূর্ণ এক শ্রেণীর মাযারে বিকাশ লাভ করা কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে (দ্র. J. Sauvaget, La tombe de l'Ortokide Balak, in Ars Islamica ৫খ, ১৯৩৮ খৃ., ২০৭-১৫; তু. J. Sauvaget, La madrasa Djaharkasiya, apud Les momuments ayyoubides de Damas, পৃ. ৪১-৫০)। এই প্রকারের আরও অসংখ্য নমুনার, বিশেষত খিলানাকার মাযার ফলকের, যাহার শৈলীগত বিবর্তন সমতল 'মিহ্‌রাব' ও সমকালীন দ্বারা কাঠামোসমূহের অনুরূপ ছিল, উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন ধারায় মিলিত শক্তিতে মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কবর সৌধ নির্মাণের যেই অনুপম সাদৃশ্য বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না এবং এইজন্য আমরা নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণসমূহে নিজদেরকে আবদ্ধ রাখিব। প্রথমত আরবীতে শাহিদ অর্থাৎ সাক্ষী নামে কথিত বস্তুটি নির্মাণ করিতে ব্যবহৃত সমতল ফলকই (tabular stele) প্রাচীনতম মুসলিম মাযার ফলক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে (তু. E. Levi-Provencal, Inscriptions arabes d'Espagne, ২৩খ.)। এই শ্রেণীর ফলক ২য়/৮ম শতাব্দী হইতে মিসরে বর্তমান ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়, যাহা 'উছমানী যুগেও বিদ্যমান ছিল। এই 'উছমানী যুগের অনেক নমুনাও পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্নরূপে খোদাইকৃত এবং কখনও কখনও 'রুখামা' বা 'লাওহ' নামে অভিহিত এই ফলকসমূহকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবরের এক প্রান্তে কিংবা কখনও উভয় প্রান্তে স্থাপন করা হইত। ইহাদিগকে প্রাচীন বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ ইহাদের আকার হইতেছে পশ্চাৎপদ ও বিচ্ছিন্ন পল্লী অঞ্চলে পরিদৃষ্ট "ঢাকনাবিহীন বাক্স" আকারের অনুরূপ।

এই ফলকসমূহ বিভিন্ন আকৃতির হইয়া থাকে। এইগুলি স্পেন ও উত্তর সিরিয়ায় প্রাপ্তব্য স্ফীত কিংবা চ্যাপ্টা, মাঝারি আকারের। অত্যন্ত সাধারণভাবে সজ্জিত এবং কখনও কখনও উৎকীর্ণ লিপিবিহীন দুইটি আয়তাকার ফলক দ্বারা নির্মিত হইতে পারে। এইগুলি আবার প্রায়শ আকর্ষণীয়ভাবে অলঙ্কৃত এবং কখনও কখনও প্রচুর পরিশীলিত উৎকীর্ণ লিপিসম্বলিত একটিমাত্র বিরাট ফলকেরও হইতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, এই ধরনের ফলকসমূহ অদ্যাবধি সালে-এ বা আখ্‌লাত-এ স্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাদুঘরে উহাদের উদাহরণ হিসাবে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রথম ভাগের তথাকথিত আলমেরীয় সমাধি ফলক এবং একই যুগের অনুরূপ গুরুত্ববহ ইরানী ফলকসমূহকে নির্দেশিত করা হয়। এইগুলি ফাঁপা মাটির উপর কখনও বা সাধারণ কিংবা বিশেষ ভাস্করীয় কায়দায় রিলিফে খোদিত লিপিসমূহের চতুর্দিকে আয়তাকার ফ্রেমের ন্যায়ও হইয়া থাকে। হিজরী প্রথম কয়েক শতাব্দীতে মিসর হইতে স্পেন পর্যন্ত ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ধরনের। অন্যান্য প্রকারের মধ্যে কেন্দ্রভাগে উৎকীর্ণ লিপিসম্বলিত একক বা দ্বৈত খিলান ও তাহার চতুর্দিকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত আলঙ্কারিক রচনার সমাহার অন্যতম, যাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঞ্চলেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কখনও কখনও সমতল ফলকের স্থলে উৎকীর্ণলিপি শোভিত স্তম্ভদণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা 'আমূদ কাব্‌র ও সারিয়াত কাব্‌র নামে পরিচিত এবং ইহা ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতকে টলেডো ও কায়রাওয়ানের গোরস্থানসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল। এই ধরনটি অদ্যাবধি 'উছমানী কবরসমূহে দেখা যায়, যাহাতে স্তম্ভদণ্ডটির উপরিভাগ সাধারণত খোদিত মর্মরের একটি 'শিরস্ত্রাণ' দ্বারা আবৃত।

অন্যদিকে ৫ম/১১শ শতাব্দী হইতে ভাস্কর্য শিল্প অলংকৃত প্রস্তর নির্মিত বদ্ধ শবাধার (sarcophagi)-ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহা উপরোপরি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত প্রস্তর ফালি কিংবা "পাদমূলের উপর দণ্ডায়মান শ্বেত মর্মরের দীর্ঘ ও অনুচ্চ ফলকরাজি নির্মিত প্রিজম" (স্তম্ভ) হইয়া থাকে। ইহা অনেক সময় 'মাকাবিরিয়্যা' (مقابرية), 'জান্নাবিয়্যা' (جنابية) বা 'সানাম' (صنم) প্রভৃতি মাগরিবী নামে অভিহিত হয় এবং আদিম মৃত্তিকা স্তূপের ধারণাগত অনুকরণরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রস্তরখণ্ড বা নিম্ন অট্টালিকার সহিত উন্নত প্রস্তরফলকও থাকিতে পারে; এই সঙ্কর শৈলী বহু অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সিরিয়ায় আল-মা'আর্‌রীর প্রাচীন সমাধি (তু. J. Sourdel-Thomine, Inscriptions du mausolee d'Abu l-Ala a Ma'arrat al-Nu'man, Arabica-তে, ২খ, ১৯৫৫ খৃ., ২৮৯-৯৪), বিশেষভাবে আখলাতে'র কবরসমূহে দৃষ্ট বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয়ের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও খুব সম্ভবত আনুমানিক ৩৮৭/৯৯৭ সনে গাযনায় সুবুক্তাগীনের মাযার দ্বারা সমর্থিত প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (তু. S. Flury, Le decor epigraphique des monuments de Ghazna, Syria-তে ১২২৫ খৃ., পৃ. ৬১-৯০) হইতে শুরু করিয়া এক বিরাট আকৃতির বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদিগকে এমন বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় যাহারা স্থান ও কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সিরিয়ার আয়্যূবী

নমুনাসমূহকে অন্যত্র প্রচলিত ভাস্কর্য খচিত কাষ্ঠ-নির্মিত শূন্য সমাধি সৌধের (cenotaph) প্রস্তরীভূত অনুকরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় [মেসোপটেমীয়, সিরীয় ও মিসরীয় নমুনার উদ্ধৃতি, J. Sauvaget, Le cenotaphe de Salad, Revue des Arts Asiqtiques-এ, ৬খ (১৯২৯-৩০ খৃ.), ১৬৮-৭৫ অথবা G. Wiet, Les inscriptions der mausole de Bull. Shafi 'i, Bull Inst. Eg.-এ, ১৫খ (১৯৩৩ খৃ.) ১৬৭-৮৫]। অন্যান্য প্রিজমাকৃতি মাযার ফলকসমূহ ভিয়েনায় সংরক্ষিত একটি প্যাপাইরাস হইতে D. S. Rice কর্তৃক সনাক্তকৃত ও A. Grohmann কর্তৃক ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রতি আরোপিত সোপনাকৃতি তলবিশিষ্ট ধরনটির সদৃশ। ইহার আরও পরবর্তীকালের প্রতিনিধিত্বমূলক ইট ও প্রস্তরনির্মিত নমুনাও তিনি আল-হারীরীর 'মাকামাত'-এর অনেক অনুলিপির সহিত সংযুক্ত ক্ষুদ্রচিত্র (miniature)-তে দেখিতে পান (তু. D. S. Rice, The oldest illustrated Arabic manuscript, BSOAS-এ, ২২খ, ১৯৫৯ খৃ.), ২০৭-২০ ও চিত্র ২১৯ পৃষ্ঠায়)। অধিকতর মৌলিক একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রাণীর রিলিফচিত্র সম্বলিত কবর শিলা সম্পর্কে একটি নূতন অধ্যায় লিখিত হইতে পারে। তুরস্কে এই পদ্ধতিটির জনপ্রিয়তা অনেক সমীক্ষার বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে (উপরে উল্লিখিত অতি সাম্প্রতিক উদাহরণটি দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের অভ্যন্তরে বরাত।

J. Sourdel-Thomine (E.I.[2])/ আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

ফিক্‌হের রচনাবলীতে (বিশেষত জানাযা সংক্রান্ত অধ্যায়ে) কবরের সহিত সম্পর্কিত দুইটি প্রশ্নের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে কি কোন প্রকারে সজ্জিত করা যায় ? এইগুলিতে যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে গমন করার কি অনুমতি আছে ? প্রথম প্রশ্নে আশ্চার্যজনকভাবে লক্ষণীয় যে, ফাকীহগণ (মাযহাব নির্বিশেষে) সম্পূর্ণ একমত হইয়া, যত সাধারণই হউক না কেন, সকল প্রকার কবর অলঙ্করণ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থীরা কবরের স্থান নির্দেশ করিবার জন্য বেশির পক্ষে কাঁচা ইট (لبن) নির্মিত একটি স্তূপ অনুমোদন করিয়াছেন। পোড়া ইটের (آجر) ব্যবহার কড়াকড়িভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ ইহাই অলঙ্করণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করে। এই সাধারণ নির্মাণ কর্মটিতে কোন মোটা আস্তরণ থাকিতে পারিবে না (যদিও হানাফীরা ইহা অনুমোদন করেন) এবং ইহার গাত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে কোন উৎকীর্ণ লিপি থাকিতে পারিবে না (আশ্চর্যের বিষয় যে, ইব্‌ন হায্‌ম তাঁহার নাম উৎকীর্ণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন), এমন কি কুর'আন শারীফের কিছু আয়াতও না। কবরের উপর গম্বুজ বা কোন প্রকার সৌধ নির্মাণ করা দূষণীয়, তবে এই শিক্ষা, যাহা ফকীহদের দাবিমতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ হইতে প্রাপ্ত, দারিদ্র্যগ্রস্ত পল্লী সমূহ ব্যতীত অন্য কোথাও বিশেষ প্রয়োগ লাভ করে নাই। অবশ্য মুসলিম বিশ্বের সকল দেশে প্রচুর সংখ্যক সুসজ্জিত মাযারের উপস্থিতিতে বলা যায় যে, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে দূরত্ব কোন এলাকাতেই অতিরিক্ত হইয়া উঠে নাই। তবে আইনজ্ঞ 'আলিমগণ কবরের উপর নির্মাণকর্মকে দূষণীয় ও নিন্দনীয় (মাকরূহ) বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ হারাম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এইজন্য সাধারণের বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে যে, কবরসমূহের অলঙ্করণের ফলে নিশ্চিতরূপে ধর্মীয় আইন লঙ্ঘিত হয় না।

হাম্বালী এবং জাহিরীগণসহ সকল ধর্মীয় চিন্তা পদ্ধতির ধারকগণ ইজমা'-এর সাহায্যে প্রাথমিক যুগেই কবর যিয়ারতের অনুমতি দানে সম্মত হইয়াছিলেন। জাহিরীগণ এমন কি ঈমানদারগণকে খৃষ্টান তীর্থযাত্রার সহিত আচারসমূহ (মোমবাতি বহন, স্তবগান, ভিক্ষা দান) পরিত্যাগ করিতে সাবধান করিয়া, কবর যিয়ারতের রীতির পক্ষে সুপারিশ দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কুদামা, মুগ্‌নী, কায়রো ১৩৬৮ হি., ২খ, ৫০৭; (২) ইব্‌ন রুশ্‌দ, বিদায়াতু'ল-মুজ্‌তাহিদ, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ১খ, ২৩৫; (৩) খালীল ইব্‌ন ইসহাক, মুখতাসার, অনু. Bousquet, আলজিয়ার্স ১৯৫৬ খৃ., ১খ, নং ৪৬ ও ৪৭; (৪) যায়লা'ঈ, তাব্‌য়ীন, কায়রো ১৩১৩ হি., ১খ, ২৪৫; (৫) ইব্‌ন তায়মিয়্যা, ফাতাওয়া, কায়রো ১৩২৬ হি., ৪খ, ৩০২-৬; (৬) H. Laoust, Essai sur les doctrines . . . d'Ahmad b. Taimiya, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৩৩৪-৫, অধিকন্তু দ্র. জানাযা, যিয়ারা; (৭) ডঃ সিরাজুল হক, Ibn Taimiya and His Projects of Reform, published by the Islamic Foundation Bangladesh, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.।

Y. Linant de Bellefonds (E.I.[2])/ আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

কাব্‌রা (قبرة) ঃ স্পেনীয় ভাষায় কাব্রা (cabra), আন্দালুসিয়ার (স্পেন) পার্বত্য এলাকার একটি শহর। ইহা কর্দোভার দক্ষিণ-পূর্বে ক্যাব্রা শৈল শ্রেণীর (Sierra de Cabra) ঢালুতে, সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪৪৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বর্তমানে ইহা কর্দোভা প্রদেশের একটি বিভাগের (Partido Judicial) কেন্দ্র, ইহার জনসংখ্যা ২০,০০০।

মুসলিম শহর কাব্‌রা হইল রোমান ইগেব্রাম (Igabrum) নগরী প্লিনী (Pliny)-এর মতে ইহা বায়েটিকা (Baetica) বিভাগের প্রধান নগরসমূহের অন্যতম। কাব্‌রা আল-আন্দালুসের দুর্গসমূহের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইতেছিল। উমায়্যাদের অধীনে গভর্নর আবু'ল-খাত্তাব আল-কালবীর সময়ে ১২৫-১২৭/৭৪৩-৭৪৫ ইরাকে ওয়াসিতের বাহিনী (জুন্‌দ-ই ওয়াসিত) কর্তৃক এখানে উপনিবেশ স্থাপনের পর ইহা অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র জেলার (কূরা) কেন্দ্র ছিল এবং ইসতিজা (استجة)-ও এই জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুই শহরই একই কাদীর অধীনে ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে কাব্‌রা ছিল বিশপের এলাকা। উমায়্যা খিলাফাতের যুগ পর্যন্ত ইহা বর্তমান ছিল। আরব ভূগোলবিদদের প্রদত্ত অতি মূল্যবান এবং দুর্ভাগ্যক্রমে অতি সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা হইতে মুসলিম কাব্‌রার সুষম আবহাওয়া, অফুরন্ত পানির প্রবাহ, জলপাইকুঞ্জের প্রাচুর্য এবং ইহার প্রচুর উদ্ভিদ ও বনরাজি ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে একটি বিপণী বিতানসহ স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত তিন অংশবিশিষ্ট একটি বিরাট মসজিদের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। শহর হইতে অনতিদূরে কিছু কিছু সীসার খনিতেও কাজ চলিত।

মুওয়াশশাহ্‌-এর স্রষ্টা মুকাদ্দাম ইব্‌ন মু'আফা (মৃত্যু. ২৯৯-৩০০/৯১২ [দ্র.] কাব্‌রা শহরের স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন।

ক্যাস্তিলীয় এবং আন্দালূসীয় মুসলমানদের মধ্যে সীমান্ত বিরোধে কাব্‌রাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রানাডার যীর বংশীয় শাসক হাব্বূস ইব্‌ন ম্যাকসান (حبوس بن ماكسن) ৪১৯-২০/১০২৯-৩০ ইহা অধিকার করেন। তৃতীয় ফার্ডিন্যাণ্ড (সাধু ফার্ডিন্যাণ্ড নামে পরিচিত) কর্তৃক ৬৪১/১২৪৪ সালে অধিকৃত হওয়ার পর হইতে এই শহর ধারাবাহিকভাবে কর্দোভা

পরিষদ এবং ক্যালাট্রাভা সম্প্রদায়ের (order of Calatrava) অধীনে থাকে। ৭৩৩/১৩৩৩ সালে নাস্‌র বংশীয় শাসক ৪র্থ মুহাম্মাদ কাব্‌রা দখল করিয়া ইহার দুর্গের কিছু অংশ ও দুর্গ-প্রাচীরসমূহ ধ্বংস করিয়া দেন এবং ইহার বিদ্রোহী অধিবাসীদেরকে বন্দী করিয়া গ্রানাডায় প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরই ক্যালাট্রাভা সম্প্রদায়ের নেতার (Master of the order of Calatrava) প্রচেষ্টায় কাব্‌রা পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং ক্যাসটাইল শাসনের অধীনে (Crown of castile) ফিরিয়া আসে। ৮৪৯/১৪৪৫-এ ৪র্থ হেনরী কর্ডোভার দিয়েগো ফার্নান্দেয (Diego Fernandez)-কে তাঁহার কর্মের পুরস্কারস্বরূপ এই শহর প্রদান করেন এবং তাঁহাকে কাউন্ট অব কাব্‌রা খেতাবে ভূষিত করেন। মুসলিম আধিপত্যের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ, বিশেষ করিয়া একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ, এখনও কাব্‌রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদ্‌রীসী, Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. Dozy and De Goeje, ১৭৪, ২০৫; (২) ইব্‌ন আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী, La Peninsule Iberique ..., ed. Levi. Provencal, Leiden 1938, notice 134-149-50 (Araibc text), 178-9 (French tr.); (৩) ইবনু'ল-খাতীব, লামহা, ৭৮; (৪) ঐ লেখক, ইহাতা, সম্পা. ইনান, ১খ, ৪৪০, ৫৪১; (৫) ঐ লেখক, আ'মালু'ল-আ'লাম, ২২৯; (৬) Cronica de D. Alfonso XI, Biblioteca de Autores espanoles, lxvi, new ed. Madrid 1953; (৭)P. Madoz. Diccionario geografico - estadistico historico de Espana y sus posesiones de ultramar, v. Madrid 1840, 40-50; (৮) Sobre el nombre y la patria del autor de la muwassaha, in al-Andalus, ii (1934), 215-22; (৯) E. Levi-Provencal, H. E. M., iii, index; (১০) দা. মা. ই., ১৬/১ খ, পৃ. ২৫০-১।

R. Arie (E.I.[2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কাব্‌শ (দ্র. বাদ্‌ব)

কাবশা বিন্‌ত আওস (كبشة بنت اوس) ঃ (রা) একজন মহিলা সাহাবী এবং খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর জননী। আনসারদের বানূ খিত্‌মা শাখাভুক্ত। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। জীবনীকারদের মতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূল (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৪; (২) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৬; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত, তা.বি., ২খ., ২৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্‌ত 'আব্‌দ 'আম্‌র (كبشة بنت عبد عمرو) ঃ ইব্‌ন উবায়দ আল-আনসারিয়্যা (রা) আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মহিলা সাহাবী। বানু'ল-খায্‌রাজের শাখা বানূ সা'ইদা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনীকারদের মতে তিনি রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্‌ন হাবীব সাহাবিয়্যা হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুমায়দ আস-সা'ইদী (রা)-এর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কাবশা (রা)-এর গর্ভে তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা জানা যায় না। তাঁহার সূত্রে রাসূল (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ২৬২; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৩০০; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫; (৫) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ., ৩৫৭।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্‌ত আবী উমামা (كبشة بنت ابى امامة) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবিয়্যা, নাজ্জার গোত্রভুক্ত। পিতা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (দ্র.) একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। কাবশা-র জননী ছিলেন সাহ্‌ল ইব্‌ন ছা'লাবা-র কন্যা 'উমায়রা। তিনি ছিলেন মাতাপিতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। তাঁহার শৈশবেই পিতা আস'আদ (রা) ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁহার কন্যাদের সম্পর্কে ওসিয়্যাত করিয়া যান। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাদের লালন-পালন ও বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কাবশা-কে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হাবীবা-র সহিত বিবাহ দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৬; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ৪৪০; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৪; (৪) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্‌ত ওয়াকিদ (كبشة بنت واقد) ঃ ইব্‌ন 'আমর আল-আনসারিয়্যা (রা) একজন আনসার মহিলা সাহাবী, প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-র জননী। বানু'ল খায্‌রাজভুক্ত। মায়ের নাম হিন্দ বিন্‌ত রাহ্‌ম। তিনি বানূ তায়' গোত্রীয়া ছিলেন। কাবশা-র নাম অনেকে কুবায়শা বলিয়াছেন। রাওয়াহা ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন ইম্‌রু'উ'ল-কায়সের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। এই বিবাহে তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা ও 'আম্‌রা বিন্‌ত রাওয়াহা-র জন্ম হয়। রাওয়াহার ইনতিকালের পর কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাস (রা) তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কায়স (রা)-এর ঔসরজাত ছাবিত নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জীবনীকারদের মতে কাবশা বিন্‌ত ওয়াকিদ (রা) রাসূল (স)-এর নিকট বায়'আতকারিণী সাহাবিয়্যা হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭, ৫৩৮; (২) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৩০০; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫ নং ৯২১; (৪) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ৩৬৩।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্ত কা'ব ইব্ন মালিক (كبشة بنت كعب بن مالك) ঃ আল-আন্সারিয়্যা (রা) একজন মহিলা সাহাবী, মাতার নাম সাফিয়্যা (রা)। তিনি য়ামানের অধিবাসিনী ছিলেন। সাহাবী আবূ কাতাদা (রা)-র পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা)-র সহিত কাবশা-র পরিণয় হয়। ইব্ন সা'দ বলেন যে, আবূ কাতাদা (রা)-র পুত্র ছাবিত তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ছাবিতের ঔরসজাত সন্তানের জন্ম হয়। জীবনীকারদের বর্ণনানুসারে কাবশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হাদীছ বর্ণনার দিক হইতে ছিলেন তাবি'ঈ। কেননা তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে কোনও হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি সম্পর্কে তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ মুহাদ্দিছগণের আলোচনার বিষয়। হাদীছটি তিনি স্বীয় শ্বশুর আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি (কাব্শা) বলেন ঃ একদা আবূ কাতাদা (রা) আমার নিকট আগমন করেন। আমি তাঁহাকে উযূর পানি দিলাম। এমনি সময়ে একটি বিড়াল পানি পান করিতে আসিল। তিনি বিড়ালটির পানের সুবিধার্থে পাত্রটি কাত করিয়া দিলেন। বিড়ালটি পানি পান করিল। শ্বশুর দেখিলেন যে, আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রি ! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করিতেছ ? বলিলাম, তাই ত। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ ইহা (বিড়াল) অপবিত্র নহে। ইহারা তোমাদের মাঝে ঘোরাফেরা করে। হাদীছটি ইমাম মালিক (র) তাঁহার 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে, আন-নাসা'ঈ, আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী ও ইব্ন মাজা তাঁহাদের সুনান গ্রন্থসমূহে সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ৪৭৮; (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৩০০; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭; (৫) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আল-খাতীব, আল-ইক্মাল ফী আস্মা'ই'র-রিজাল (মিশ্কাতু'ল-মাসাবীহর শেষে যুক্ত, দিল্লী তা. বি., ৬১৫); (৬) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ., ৩৫৭; (৭) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১২খ, ৪৭৫; (৮) ঐ লেখক, তাক্রীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ., ৬১২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্ত ছাবিত (كبشة بنت ثابت) ঃ ইব্ন 'আতীক ইবনি'ন-নু'মান (রা) রাসূল (স)-এর সাহাবিয়্যা। উপনাম উম্মু সা'ঈদ, তাঁহার মাতা মা'আযা আনাস ইব্ন কায়স ইব্ন 'উবায়দের কন্যা। কাব্শা-র জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। য়াযীদ ইব্ন আবি'ল-য়ুস্র কা'ব ইব্ন 'আমরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে য়াযীদের দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদের নাম যথাক্রমে সা'ঈদ ও 'আবদু'র-রাহ্মান এবং কন্যার নাম উম্মু কাছীর। জীবনীকারদের মতে কাব্শা বিন্ত ছাবিত (রা) রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ তাঁহাকে বায়'আতকারিণী সাহাবিয়্যা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৪, নং ৯০৯; (২) আয-যাহাবী, মাজ্রীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্ত ছাবিত (كبشة بنت ثابت) ঃ ইব্ন হারিছা ইব্ন ছা'লাবা আল-আনসারিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবিয়্যা, আন্সারদের খাযরাজ গোত্রভুক্ত। তাঁহার মাতার নাম সালামা, হাসান ইব্ন 'আবদিল্লাহ-র কন্যা। জীবনীকারদের মতে কাবশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্ন হাবীব তাঁহার নাম বায়'আতকারিণী সাহাবিয়্যাদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ৩৬৫; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৪, নং ৯০৮; (৪) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্ত ছাবিত (كبشة بنت ثابت) ঃ ইবনু'ল মুন্যির (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবিয়্যা, নাজ্জার গোত্রভুক্ত। মাতার নাম সুখ্তা বিন্ত হারিছা আস-সা'ঈদিয়্যা। তিনি সাহাবী কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর বৈমাত্রেয়ী বোন এবং আল-বার্সা (البرساء) নামে সমধিক পরিচিতা। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন আবী 'আম্রা তাঁহার পৌত্র। জীবনীকারদের মতে কাবশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছ দ্বারা তাঁহার সাহাবিয়্যা হওয়া প্রমাণিত হয়। তাঁহার সূত্রে তদীয় পৌত্র 'আবদু'র-রাহমান বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি একটি ঝুলন্ত মশক হইতে দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করেন। আমি দ্রুত মশক্টির কাছে গেলাম এবং ইহার মুখের যে অংশ তিনি মুখ লাগাইয়া পানি পান করিয়াছেন তাহা কাটিয়া রাখিয়া দিলাম। ইমাম তিরমিযী, আবূ য়া'লা, ইব্ন মান্দা প্রমুখ তাঁহাদের গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। 'আবদুল-'আযীয ইবনু'ল-হুসায়নও হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কাবশা-র স্থলে তাঁহার উপাধি বারসা' উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন লাহী'আ-র বর্ণনায় কাবশা-র স্থলে কুল্ছূম নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কাবশা-র পরপর তিনটি বিবাহ হয়। প্রথম স্বামীর নাম ছিল 'আম্র ইব্ন মিহ্সান। তাঁহার ঔরসে কাবশা-র ছা'লাবা, আবূ 'আম্র ও আবূ হাবীবা নামক তিন সন্তান জন্মলাভ করে। অতঃপর আল-হারিছ ইব্ন ছালাবা তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেখানে উম্মু ছাবিত রাম্লা নাম্নী একজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সর্বশেষে হারিছা ইব্নু'ন-নু'মানের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। এই বিবাহে তাঁহার কোনও সন্তান হইয়াছে কিনা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৬; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ৪৪৯; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৪-৫, নং ৯১০; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, (আল-ইসাবা-র টীকা দ্র., মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৪, ৩৯৫); (৫) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ

(দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ., ৩৫৭; (৬) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১২খ., ৪৭৪; (৭) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ., ৬১২; (৮) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্‌ত মা'দীকারাব (كبشة بنت معديكرب) ঃ আল-কিনদিয়্যা (রা) মহিলা সাহাবী। বিখ্যাত সাহাবী মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজ (রা)-র জননী এবং আল-আশ'আছ ইব্‌ন কায়স (রা)-র ফুফু। জীবনীকারদের মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। তৎপুত্র মু'আবিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (স)-এর নিকট আগমন করিলাম; সঙ্গে ছিলেন আমার মাতা কাবশা বিন্‌ত মা'দীকারাব। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি শপথ করিয়াছি যে, হামাগুঁড়ি দিয়া কা'বা-র তাওয়াফ করিব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি দুই সাতবার পায়ে ভর করিয়া কা'বা-র তাওয়াফ কর। এক সাত হইবে পায়ের পক্ষে এবং অন্য সাতবার হইবে তোমার হস্তদ্বয়ের পক্ষ হইতে। ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানীর বর্ণনা মতে হাদীছটির সনদ দা'ঈফ (দুর্বল)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭; (২) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ৩০০; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্‌ত মা'ন (كبشة بنت معن) ঃ আল-আন্‌সারিয়্যা (রা) রাসূল (স)-এর এক আন্‌সারিয়্যা মহিলা সাহাবী। তাঁহাকে কুবায়শা-ও বলা হইয়া থাকে। ইনি আবূ কায়স ইব্‌নু'ল-আস্‌লাতের পত্নী। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুফাস্‌সির 'ইক্‌রামা-র সূত্রে ইব্‌ন জুরায়জ বর্ণনা করেন যে, তাঁহার (কাবশা) সম্পর্কে আল-কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল হইয়াছে ঃ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا "নারীদিগকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নহে" (৪ ঃ ১৯)। তাঁহার সূত্রে রাসূল (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭; (২) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ৩০০; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবশা বিন্‌ত রাফি' (كبشة بنت رافع) ঃ ইব্‌ন 'উবায়দ, ইব্‌ন ছালাবা আল-আন্‌সারিয়া (রা) একজন সাহাবিয়া। বিখ্যাত সাহাবী সা'দ ইব্‌ন মু'আয আল-'আসহালী (রা)-র জননী, খায্‌রাজ গোত্রের বানূ খুদ্‌রা শাখাভুক্ত। তাঁহার মাতার নাম উম্মু'র-রুবায়্যি বিন্‌ত মালিক। জীবনীকারদের মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী প্রমুখ তাঁহার নাম সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। মু'আয ইবনু'ন-নু'মান ইব্‌ন ইমরু'উ'ল-কায়স আল-আশ্‌হালী-র সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। সেখানে তাঁহার সা'দ, 'আম্‌র, ইয়াস ও আওস নামের চার পুত্র সন্তান এবং 'উরাব ও উম্মু হিযাম নাম্নী দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। পুত্র সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-র ইনতিকালের পরও তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম 'আমির ইব্‌ন সা'দ হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতা সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর জানাযা বাহির করা হইলে তাঁহার জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া 'উমার (রা) তাঁহাকে বলিলেন, লক্ষ্য করিও তুমি কি বলিতেছ। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, ويل ام سعد سعدا+ صراقة وجدا "সর্বনাশ উম্মু সা'দের, সা'দ চলিয়া গেল তরবারির আঘাতে।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ 'উমার ক্ষান্ত হও। সকল ক্রন্দনকারিণীই অতিশয়োক্তি করে। কিন্তু সা'দের জননী তেমন নহে। সে ভাল কথাই বলিতেছে। মিথ্যা বলিবে না কস্মিনকালেও। কাব্‌শা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫, নং ৯১২; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ., ৩৭০; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ., ৫৩৭; (৪) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা-র টীকা দ্র. মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ., ৩৯৫-৬); (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ২৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবা'ইর (كبائر) ঃ কাবীরা (كبيرة) শব্দের বহুবচন। ইহার বিপরীত সাগীরা (صغيرة) বহুবচন সাগা'ইর (صغائر) আভিধানিক অর্থ বড় বস্তু বা বড় কথা (দ্র. মুফরাদাত)। শারী'আতের পরিভাষায় কাবীরা এমন একটি মহাপাপ যাহা নিছক হারাম এবং শারী'আত এরূপ পাপীর জন্য একটি দলীল দ্বারা ইহ ও পরকালে শাস্তির বিধান করিয়াছে। 'আল্লামা দাওওয়ানী (দ্র. শারহু'ল-'আকা'ইদি'ল-'আদুদিয়্যা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু., পত্রক ৬৬) বলেন যে, কাবীরার সংজ্ঞায় 'আলিমগণের মতভেদ আছে।

কোন কোন 'আলিমের মতে কাবীর এমন একটি কর্ম যাহা করিলে শাস্তির বিধান রহিয়াছে। কোন কোন ফাকীহ-এর মতে কাবীরা এমন কতক গুনাহের নাম, যেইগুলির জন্য কুরআন ও হাদীছে হাদ্দ বা তা'যীর বা ওয়া'ঈদ নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উক্ত কর্মের ক্ষতির গুরুত্বভেদে তিন প্রকারের শাস্তির মধ্যে কোন একটি শাস্তি প্রদান করা হয়। হযরত 'আলী (রা)-র মতে কাবীরা ঐ সমস্ত গুনাহকে বলে যাহার পরিণাম দোযখ বা আল্লাহ্‌র গাদাব (গযব) অথবা লা'নাত কিংবা কোন শাস্তি নির্দিষ্ট রহিয়াছে (দ্র. আত-তাফসীরু'ল-মাজহারী, সূরা ৪ ঃ ৩১)। ইব্‌ন সীরীনের মতে কাবীরা এমন একটি কর্ম সম্পাদন করা যাহা করিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন। ইমাম হাসান বাসরী', সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র, দাহ্‌হাক প্রমুখ ইমামের মতে ঐ সমস্ত কর্মকে কাবীরা বলা হয়, যাহা কুরআন মাজীদে ভীতি প্রদর্শন সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. মুল্লা 'আলী কারী, শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার, পৃ. ৬৮)। কাবীরা শব্দটি কুরআন মাজীদে তিন স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে (আল-বাকারা ৪৫, ১৪৩; আল-কাহ্‌ফ ৪৯)। কিন্তু তিন আয়াতেই কাবীরা দ্বারা "বড় বস্তু" অথবা "ভারী বস্তু" উদ্দেশ্য। অবশ্য কুরআন মাজীদে অসৎ কাজ কিংবা গুনাহ-এর জন্য (কাবীরা-এর বহুবচন) কাবা'ইর শব্দের

ব্যবহার করা হইয়াছে এবং উহা নিম্নোক্ত তিনটি স্থানে যথাঃ সূরা ৪ ঃ ৩১; ৪২ ঃ ৩৭; ৫৩ ঃ ৩২।

তাফসীর ও হাদীছে বিভিন্ন গুরুতর পাপকর্ম কাবীরা-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "সাতটি ধ্বংসকর পাপ হইতে নিজদিগকে রক্ষা কর। আল্লাহ্র সহিত অংশী করা, যাদু করা, নিরপরাধ কাহাকেও হত্যা করা, সুদ খাওয়া, য়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা ও সতী সাধ্বী মু'মিন মহিলাকে অপবাদ দেওয়া।" 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়রের বর্ণিত হাদীছে আরও দুইটি ধ্বংসকর পাপ সংযোগ করা হইয়াছে, যথাঃ "মুসলিম মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া ও বায়তুল্লাহ্র অসম্মান করা" (দ্র. আবূ দাউদ, সুনান, কিতাবু'ল-ওয়াসায়া)। অপর একটি বর্ণনামতে একদা কোন এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করিল ঃ কাবা'ইয়ের সংখ্যা কি মাত্র সাতটি ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কাবা'ইয়ের সংখ্যা প্রায় সাত শত; তবে এই কথা স্মরণ রাখিও যে, তাওবা (অনুশোচনা) ও ইসতিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা)-এর পর সকল কাবীরা গুনাহ মাফ হইয়া যায়। কিন্তু সাগীরা গুনাহ পুনঃপুন করিলে উহা কাবীরায় পরিণত হয়।

শারহ 'আকা'ই'দ 'আদুদিয়্যায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কাবা'ইর-এর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে ঃ অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ব্যভিচার, সমকামিতা, মদ্য পান, অন্যের সম্পদ (কমপক্ষে এক দীনার) হরণ, ব্যভিচার ইত্যাদির অপবাদ দেওয়া, নেশা সৃষ্টিকারী কোন বস্তু ব্যবহার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সুদ খাওয়া, রামাদানে বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গ করা, মিথ্যা শপথ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা, য়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, মাপে কমবেশী করা, বিনা ওযরে সালাতের সময় হইবার পূর্বে অথবা সময় চলিয়া যাওয়ার পর সালাত আদায় করা, কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় নবী কারীম (স) সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা, কোন সাহাবীকে ভর্ৎসনা করা, বিনা ওযরে সত্য সাক্ষ্যকে গোপন করা, উৎকোচ গ্রহণ করা, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে অশ্লীল কাজের জন্য দালালী করা, শাসক বা বিচারকের নিকট পরনিন্দা করা, যাকাত না দেওয়া, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা হইতে বিরত থাকা, কুরআন মাজীদের শিক্ষা লাভের পর স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হওয়া, কোন প্রাণীকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করা, বিনা কারণে স্ত্রীর স্বীয় স্বামী হইতে দূরে থাকা, আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া এবং ছলনা তদবীর দ্বারা নিজকে নিরাপদ মনে করা, 'আলিম ও কুরআনের হাফিজদের ঘৃণা করা, জিহার (স্ত্রীকে মাতা বলা), ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা। কাদী ছানা'উল্লাহ পানীপথী লিখিয়াছেন যে, কাবা'ইর-এর তিনটি স্তর রহিয়াছে ঃ (১) আকবারু'ল-কাবা'ইরঃ অর্থাৎ আল্লাহর সহিত শরীক করা। হযরত 'আলী ও হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর মতে আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, আল্লাহ্র শাস্তি হইতে নিজকে নিরাপদ মনে করা এবং আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হওয়া সর্বাপেক্ষা বড় কাবীরা গুনাহ; (২) যে সকল কাবীরা গুনাহ বান্দার হকের সহিত সম্পৃক্ত কোন মুসলিমকে হত্যা করা, অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের জান, মাল ও 'ইয্যতের হানি করা, খাদ্যাভাবের দরুন স্বীয় সন্তান-সন্ততিদিগকে হত্যা করা, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সতীত্ব বিনষ্ট করা এবং মাতাপিতাকে গালিগালাজ করা ইহার অন্তর্ভুক্ত; (৩) যে সকল কাবীরা আল্লাহ তা'আলার হকের সহিত সম্পৃক্ত, যথাঃ ব্যভিচার, মদ্যপান, সমকামিতা, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি।

কাবীরা গুনাহকারীর ব্যাপারে ইমামদিগের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, শারী'আত তাহাদের প্রতি কি হুকুম প্রদান করে।

খারিজীগণের মতে সাগীরা ও কাবীরা উভয় প্রকারের গুনাহকারী কাফির। যদি সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহা হইলে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে। আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। মু'তাযিলাদের মতে কাবীরা গুনাহকারী ঈমান হারাইয়া ফেলিলেও কাফির হয় না। ওয়াসিল ইব্ন 'আতা'ও এই মত পোষণ করেন যে, কাবীরা গুনাহকারী ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে।

মুরজি'আ সম্প্রদায়ের একটি দল এই মত পোষণ করে যে, মু'মিনের ঈমান থাকাকালে কোন গুনাহ তাহাকে ক্ষতি করিতে পারে না, যেরূপ কুফরী অবস্থায় কাফিরের কোন নেক কাজ তাহার কোন প্রকার উপকার করিতে পারে না।

খারিজীদের মধ্যে আযারিকা নামে এক সম্প্রদায় কাবীরা গুনাহকারীকে মুশরিক বলিয়া গণ্য করে। যায়দী শী'আদের মতে এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহর নি'মাতের অস্বীকারকারী। ইমাম হাসান বাস্রী (র) এই ধরনের ব্যক্তিকে মুনাফিক বলিয়াছেন।

আহ্লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের 'আলিমগণ বলেন, কাবীরা গুনাহকারী ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন ঈমানের গণ্ডি হইতে বাহির হয় না। শারহু'ল-মাওয়াকিফ-এ বর্ণিত আছে যে, আহ্লু'স-সালাত অর্থাৎ আহ্লু'ল-কিব্লা-এর অন্তর্ভুক্ত কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মু'মিন (দ্র. পৃ. ৪৯৭; 'আকা'ইদু'ন-নাসাফীতে, উল্লেখ করা হইয়াছে, পৃ. ৮) ঃ والكبيرة لاتخرج المؤمن من الايمان ولاتدخله فى الكفر "কাবীরা গুনাহ মু'মিনকে ঈমান হইতে বহির্গত করে না, অন্য পক্ষে তাহাকে কুফরীতে প্রবিষ্ট করায় না।" আহ্লু'স-সুন্না এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, যদি কোন গুনাহগার মু'মিন তাওবা ব্যতীত ইনতিকাল করে, তাহা হইলে সে আল্লাহর ইচ্ছা ও করুণার উপর নির্ভরশীল হইবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাকে মাফ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে গুনাহ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই অভিমতও পাওয়া যায়, আমরা কোন মুসলমানকে তাহার গুনাহের কারণে কাফির বলি না, যদিও উহা কাবীরা গুনাহ্ হয়। তবে উক্ত গুনাহ্কে হালাল মনে করিলে সে ব্যক্তি কাফির বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা গুনাহ-এর কাজকে হালাল মনে করা অকাট্য দলীল অনুযায়ী আল্লাহ ও রাসূলকে অবিশ্বাস করার শামিল। আর তাই সে কাফির (দ্র. মাগনীসাবী, শারহু'ল-ফিক্হিল-আকবার, পৃ. ২৭)। এই ব্যাপারে মুল্লা 'আলী আল-কারী লিখিয়াছেন যে, ফরয ও ওয়াজিবকে ওযর ব্যতীত একবার পরিত্যাগ করাও কাবীরা গুনাহ। অনুরূপভাবে সুন্নাত ছাড়িয়া দেওয়া, মাকরূহ কাজ পুনঃপুনঃ করাও কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত (দ্র. শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার, পৃ. ৬৮; শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দিহ্লাবী, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-জুরজানী, শারহু'ল-মাওয়াকিফ, ২খ., পাণ্ডু., পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, লাহোর, তা. বি.; (২) ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিক্হু'ল-আকবার, উহার ভাষ্য; (৩) মুল্লা 'আলী কারী, সং., দিল্লী; (৪) আবূ মানসূর আল-মাতুরীদিকৃত, শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার,

হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হি.; (৫) মুনতাহা আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাগনীসাবী, ঐ শারহ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হি.; (৬) ইমাম আর-রাযী, মুহাস্সালু আফকারি'ল-মুতাকাদ্দিমীন ওয়া'ল-মুতা'আখ্খিরীন মিনা'ল-'উলামা' ওয়া'ল-হুকামা' ওয়া'ল-মুতাকাল্লিমীন, কায়রো তা.বি.; (৭) আর-রাযী, কিতাবু'ল-আরবা'ঈন, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৫৩ হি.; (৮) আদ-দাওওয়ানী, শারহু'ল-'আকা'ইদি'ল-'আদুদিয়্যা, পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, লাহোর তা.বি.; (৯) আল-বাগদাদী 'আবদু'ল-কাহির, উসূলুদ-দীন, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৩৪৬ হি.; (১০) আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১খ., কায়রো ১৩৬৮ হি.; (১১) আশ-শাহরাস্তানী, নিহায়াতু'ল-ইকদাম ফী 'ইলমি'ল-কালাম, A. Guelleume, লন্ডন ১৯৩৪ খৃ.; (১২) আত-তাফতাযানী, শারহু'ল-'আকা'ইদ আন-নাসাফিয়্যা, কায়রো ১৩৩০ হি.; (১৩) ইব্ন হাযম, আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ৩খ.; (১৪) আন-নাসাফী আবু'ল-বারাকাত, 'উম্দাতু 'আকীদাতি আহলি'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আ, লন্ডন ১৮৪০ খৃ. (নাজমু'দ-দীন আন-নাসাফী, 'আকা'ইদসহ); (১৫) A. Commentary of the Creed of Islam, by E. E. Elder, নিউ ইয়র্ক ১৯৫০ খৃ.; (১৬) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবী, আল-খায়রু'ল-কাছীর, সং বিজনৌর ১৩৫৩ হি.; (১৭) ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব, তা.বি.; (১৮) মুহাম্মাদ তাহির পাটানী, মাজমা' বিহারি'ল-আনওয়ার, সং নওল কিশোর, লখনৌ তা.বি.; (১৯) কাদী 'আবদু'ন-নাবী, দাসতূরু'ল-'উলামা', ৩খ., ১ম সং., হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য তা.বি.; (২০) ইবনু'ল-আছীর, আন-নিহায়া ফী গারীবি'ল-হাদীছ, মাতবা'আতু'ল-খায়রিয়্যা সং., কায়রো তা.বি.; (২১) Arabic-English Lexicon, by E. W. Lane, তা. বি.; (২২) আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, মুফরাদাতু'ল-কুরআন, নির্ঘণ্ট উর্দূ অনু. মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ আল-ফাল্লাহকৃত, লাহোর ১৩৮৩ হি.); (২৩) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, ১খ., দারু'ল-কুতুবি'ল-'আরাবী, বৈরূত তা.বি.; (২৪) মুল্লা জিয়ূন জৌনপুরী, আত-তাফসীরাতু'ল-আহমাদিয়্যা, বোম্বাই ১২২৭ হি.; (২৫) কাদী ছানা'উল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরু'ল-মাজহারী, ২খ., জায়্যিদ বারকি প্রেসে, দিল্লী; (২৬) Dictionary of Islam, by Haghes, লাহোর ১৯৬৪ খৃ.; (২৭) মুহাম্মাদ ফু'আদ 'আবদু'ল-বাকী, মিফতাহু কুনূযি'স-সুন্না, লাহোর ১৩৯১ হি.; (২৮) ইব্ন হাজার আল-মাক্কী, আয-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফি'ল-কাবা'ইর (৩ খণ্ডে), কায়রো ১৩৮৪ হি.।

আমীনুল্লাহ ওয়াছীর (দা. মা. ই.)/ আ. ন. ম. রফীকুর রহমান

কাবা'ইল (قبائل) ঃ ('আ) কাবীলা (قبيلة)-এর বহুবচন, এক পিতার সন্তান-সন্ততি; জনগোষ্ঠী, গোত্র। আল-কাবীল (القبيل) বলিতে তিন অথবা তিনের অধিক ব্যক্তির সমষ্টি বুঝায়। আল-কামূসু'ল-মুহীত গ্রন্থে আছে ঃ

القبيل ... الجماعة من الثلاثة فصاعدا من اقوام شتى وقد يكو نون من نجر واحد وربما كانوا بنى اب واحد

("কাবীল তিন বা ততোধিক বিভিন্ন জাতি যাহারা একই মূলোদ্ভূত, প্রায়ই একই পিতা হইতে উদ্ভূত)। কাবা'ইলু'র-রাস (قبائل الرأس) বলিতে প্রকৃতপক্ষে মাথার অস্থির টুকরাসমূহকে বুঝায় যাহা পরস্পর যুক্ত রহিয়াছে এবং কাবা'ইল (আরবী) উহা হইতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (এই কথাই আল-কামূস-এ বলা হইয়াছে)। কাবা'ইল শব্দটির উল্লেখ আল-কুরআনেও আসিয়াছে ঃ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا (৪৯ ঃ ১৩) ["তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পারে"]।

বংশবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ আরবদিগকে বংশের দিক দিয়া ছয়টি স্তরে (তাবাকা) ভাগ করিয়াছেন ঃ ১। আত-তাবাকাতু'ল-উলা (১ম স্তর) ঃ আশ্-শা'ব (الشعب) [বহুবচন শু'উব = شعوب], ইহা ব্যাপকতম বংশের স্তর, যাহাতে কাবীলাসমূহ বৃক্ষের শাখারাজির ন্যায় উদ্ভূত হয়, যেমন 'আদনান (আল-জাওহার-এর ভাষ্য মতে ইনি কাবীলাসমূহের পিতা বা মূল যাহার সহিত কাবীলাসমূহ সম্পর্কিত)। ২। আত-তাবাকাতু'ছ-ছানিয়া (২য় স্তর) ঃ আল-কাবীলা (القبيلة) [বহুবচন ঃ কাবা'ইল = قبائل], যেমন রাবী'আ ও মুদার। উহাদের এই কারণে কাবীলা বলা হয় যে, বংশসমূহকে পরস্পর তুলনা করিয়া দেখা হয় (ইহা ছাড়া এই কারণে যে, শা'ব, কাবীলাসমূহে বিভক্ত হয়)। কাবা'ইলকে 'জামাজিম' (جماجم)-ও বলা হয়। ৩। আত-তাবাকাতু'ছ-ছালিছা (৩য় স্তর) ঃ আল-'ইমারা (বহুবচন = 'আমা'ইর ও 'ইমারাত) [العمارة ব. ব. عمائر، عمارات] কাবীলা 'ইমারাত -এ বিভক্ত হয়, যেমন কুরায়শ ও কিনানা; ৪। আত-তাবাকাতু'র-রাবি'আ (৪র্থ স্তর) ঃ আল-বাত্ন (বহুবচন ঃ বুতূন ও আবতুন (ব. ব. ابطن، بطون البطن), যেমন বানূ 'আব্দ-মানাফ ও বানূ মাখযূম; ৫। আত-তাবাকাতু'ল-খামিসা (৫ম স্তর) ঃ আল-ফাখিয (ব. ব.আফখায) [فخذ ব. ব. افخاذ], যেমন বানূ হাশিম ও বানূ উমায়্যা ; ৬। আত-তাবাকাতু'স-সাদিসা (৬ষ্ঠ স্তর) ঃ আল-ফাসীলা (ব. ব, ফাসা'ইল), (فصيلة ব. ব. فصائل), যেমন বানূ 'আব্বাস ও বানূ আবী তালিব। উল্লিখিত স্তরসমূহের দিক দিয়া ফাখিয যেন ফাসা'ইল সমষ্টির নাম। অনুরূপভাবে বাতান, আফখায সমষ্টি, 'ইমারা বুতূন সমষ্টি ; কাবীলা, 'আমাইর সমষ্টি এবং শা'বা, কাবা'ইল সমষ্টির নাম। কোন কোন মনীষী উক্ত স্তরসমূহের উদাহরণ কিছুটা ভিন্নভাবে পেশ করিয়াছেন অর্থাৎ শা'ব হইল খুযায়মা ; কাবীলা হইল কিনানা ; 'ইমারা হইল কুরায়শ ; বাত্ন হইল কুসায়্যি; ফাখিয হইল হাশিম এবং ফাসীলা হইল 'আব্বাস।

আবার কোন কোন মনীষী তাবাকা (স্তর)-সমূহের বিভক্তি এইভাবে করিয়াছেন ঃ শা'ব, কাবীলা, ফাসীলা, 'ইমারা, ফাখিয, কেহ আবার ফাসীলা-র পূর্বে এবং ফাখিয-এর পরে অন্য এক স্তর "আশীরা (عشيرة)-র উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী আরব বংশসমূহকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ শা'ব (شعب), কাবীলা, 'ইমারা, বাত্ন, ফাখিয, জীল (جيل) ও ফাসীলা।

আল-মুখাসসিস (المخصص) [ইব্ন সায়্যিদা, আস-সাফরুছ-ছালিছ] মুতাবিক মানব সমাজকে উহার জনসংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত নামসমূহ (স্তরসমূহের বিন্যাস ব্যতিরেকে) হইল ঃ আর-রাহ্তু(الرهط) [বহুবচন ঃ আরহুত] (ارهط) নাফার (نفر)-এর অর্থসমূহে ব্যবহৃত হয় এবং নাফার (বহুবচন ঃ আনফার) [انفار] দশের কম সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। আল-'ইতরা-রাহ্ত-এর সমার্থবোধক।

আল-'উসবা (العصبة) [বহুবচন ঃ 'উসুল, 'আসা'ইব عصب، عصائب], দশ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত জনসংখ্যার জন্য।

আল-কাবীলা একই পিতার সন্তান-সন্ততি।

আল-কাবীল (القبيل) ঃ (বহুবচন কুবুল= قبل) দল, যাহাতে ন্যূনপক্ষে তিন ব্যক্তি শামিল থাকিবে। আবূ যায়দ বলেন ঃ কখনও আল-কাবীল একই পিতার সন্তান-সন্ততি দ্বারা গঠিত হয়। এই দিক দিয়া আল-কাবীল ও আল-কাবীলা একই অর্থে ব্যবহৃত।

আশ-শা'ব ঃ বংশ (আল-হায়্যি= الحى) যাহা কাবীলা হইতে উদ্ভূত (য়ানশা'ইব)। ইহাও বলা হয় যে, আশ-শা'ব কাবীলার-ই অপর নাম এবং ইহাই বলা হয় যে, শা'ব বলিতে এমন সকল গোত্রকে বুঝায় যাহা বিভিন্ন বংশের সহিত সম্পর্কিত, যেমন আল-'আজাম, আল-'আরাব, আল-হিন্দ, তুরক, ফারিস এই হিসাবে শা'ব বলিতে কাবীলা অপেক্ষা বৃহত্তর দলকে বুঝায়।

আল-হায়্যি (الحى) ঃ ক্ষুদ্র দল, যাহা বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও অবস্থান করে।

উসরাতু'র-রাজুল (اسرة الرجل) ঃ রাহতুহু'ল-আদনূন ঃ অর্থাৎ নিকট বংশীয় এবং অনুরূপভাবে ফাসীলাতু'র-রাজুল (فضيلة الرجل) এবং 'ইতরাতু'র-রাজুল (عترة الرجل) জিযা'উ'র-রাজুল (جذاع الرجل) ঃ লোকের গোত্রে।

আস-সিব্‌ত (السبط) আরবদের মধ্যে যেমন কাবীলা রহিয়াছে, অনুরূপভাবে য়াহূদীদের মধ্যে সিব্‌ত রহিয়াছে এবং সিব্‌ত পুত্রের পুত্র (পৌত্র)-কেও বলা হয়।

'ইতরাতু'র-রাজুল (عترة الرجل) অর্থাৎ মানুষের স্বজন, যেমন সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি।

আন-নুওয়ায়রী (النويرى) গোত্রসমূহের (কাবা'ইল) নিম্নবর্ণিত দশটি স্তরের (তাবাকাত) কথা বলিয়াছেন ঃ আল- জিয্‌ম, (الجذم), আল-জামাহীর, আশ-শু'উব আল-কাবা'ইল আল-আমা'ইর, আল-বুতূন, আল-আফখায, আল-'আশা'ইর, আল-ফাসা'ইল, আল-আরহ্‌ত।

অপর কিছু কুলজিবিদ কাবা'ইল-এর উল্লিখিত স্তরসমূহ নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জিযম, জামহূর, শা'ব, কাবীলা, রাহ্‌ত 'ইত্‌রা, যুর্‌রিয়্যা। আবার কেহ উহাতে অতিরিক্ত তিন স্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন অর্থাৎ বারাত, হায়্যি, জামা' (جماع)।

দক্ষিণ আরবে কাবীলাকে শা'বাম (شعبم) এবং শা'বান (شعبن) শব্দ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। দক্ষিণ আরবের অধিবাসীরা (যামান ও হাদরামাওত) কাবীলাকে বিভিন্ন স্তরে এইভাবে বিভক্ত করিত ঃ

রুব'উন (ربعن) ও ছুলুছুন (ثلثن), উহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইত কাবীলার এক-চতুর্থ এক-তৃতীয়াংশ।

কাবীলার যে বিভক্তি এবং উহার বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের যে উল্লেখ উপরে করা হইল, উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আরবদের দৃষ্টিতে কাবীলাও মানবদেহের ন্যায় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। এই কারণেই তাহারা উল্লিখিত বিভিন্ন স্তরের নামকরণ মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম অনুসারে করিয়াছে।

মানব দেহের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিলে সর্বপ্রথম মস্তক আসে, যাহা বিভিন্ন অস্থি সমষ্টির নাম, উহাকে কাবা'ইলু'র-রা'স (قبائل الراس) বলা হয় এবং উহার সহিত কাবা'ইলু'ল-'আরাবকে তুলনা করা হইয়াছে—যেন মানব দেহ এবং উহার সমাজ একটি অট্টালিকাস্বরূপ। শা'ব-এর ভিত্তি কাবীলার উপর এবং কাবীলা উক্ত মানব সমাজরূপে অট্টালিকার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ভিত্তির পর অট্টালিকার সূচনা হয়, যাহা গ্রীবা এবং বক্ষের স্বরূপ। গ্রীবা এবং বক্ষের পর উদর (পেট=বাত্‌ন) আসে। পেটের পর ফাখয (উরু)-এর স্থান এবং সর্বশেষে বংশের নিকটতম স্তর ফাসীলা আসে, মানব দেহে উরুর (ফাখ্‌য) পর যাহার স্থান (অর্থাৎ নলা ও পা)।

উল্লিখিত বর্ণনায় কুলজীবিদদের মধ্যে বিরাজমান যে মতভেদের উল্লেখ উপরে আমরা করিয়াছি, উহা কেবল গোত্রসমূহের শ্রেণী ও সেই স্তরের ক্রম এবং সীমারেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্বাপর হিসাবে এবং কোন কোন পরিভাষার পরিবর্তন কিম্বা সংকোচনের দিক দিয়া পরিদৃষ্ট হয়। পরিভাষার এই পূর্বাপর সম্পর্কে অথবা পরিবর্ধন ও সংকোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত ব্যতিরেকেই অধিকাংশ মনীষী এই মত পোষণ করেন যে, আরবদের গোত্র ও বংশের কয়েকটি স্তর ছিল। কিন্তু উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত পরিভাষাসমূহ ইসলামের আবির্ভাবের নিকটবর্তী জাহিলী যুগের সহিত সম্পৃক্ত এবং উহা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। জাহিলী যুগের দূর অতীত সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, এখন পর্যন্ত সেই সম্পর্কে আমাদের নিকট সঠিক কোন তথ্য নাই।

কাবীলা সংক্রান্ত উল্লিখিত এবং নিম্নে বর্ণিত পরিভাষাসমূহ নির্ধারণে বংশবিশেষজ্ঞদের মতভেদ এবং তাঁহাদের বর্ণিত শ্রেণী-বিন্যাসে ত্রুটি এই কথাই প্রমাণিত করে যে, জাহিলী যুগে উক্ত স্তরসমূহের সম্পর্কে পূর্ণ ঐকমত্য ছিল না, অন্যথায় পরিভাষা ও নামসমূহের ব্যাপারে এইরূপ প্রবল বিরোধ পরিদৃষ্ট হইত না। বরং বলা যায়, ইহা এক ইজ্‌তিহাদী বিন্যাস, যাহা পরবর্তী মনীষীগণ বর্ণনাকারীদের নিকট হইতে মৌখিকভাবে শ্রবণ করেন। অন্যদিকে তাঁহারা উহা নিজ যুগের গোত্রীয় ব্যবস্থা হইতে সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে মনীষীগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত ইজ্‌তিহাদ অনুযায়ী ইহার বিন্যাস সাধন করেন। প্রাচীন তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করিলে আরও একটি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহা এই যে, উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের মধ্যে অধিকাংশের অস্তিত্ব জাহিলী যুগের রচনায় এবং প্রাচীন কবিদের লেখায় পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, আল-কাবীলা সেই দলকে বলা হয়, যাহা একই বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং এই বংশ প্রপিতামহ (অথবা পিতামহ) পর্যন্ত পৌঁছায়। বংশ তালিকার ক্ষেত্রে 'কাবীলা' শব্দ আরবদের নিকট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং বেদুঈনদের মধ্যে যতদূর সম্পর্ক তাহার হিসাবে কাবীলাকেই সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী মনে করা হয় (আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী শা'ব খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়)। অতঃপর কাবীলা হইতে উহার শাখা-প্রশাখা বাহির হয়, যেন কাবীলা একটি বৃক্ষস্বরূপ যাহার ডালপালা (আগসান) বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। অবশ্য উক্ত বৃক্ষ (কাবীলা) হইতে নির্গত শাখাসমূহের সংখ্যার ক্ষেত্রে মনীষীদের মতপার্থক্য রহিয়াছে।

কাবীলা-র যে বিভক্তির উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে উহা বেদুঈনদের ছাড়া স্থায়ী বাসিন্দাদের (বিশেষ করিয়া হিজাযবাসী) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও ইহারা শহর-নগরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা বংশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবনকে পরিত্যাগ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে কাবীলা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল বেদুঈন জীবন ধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক চাহিদার অনুরূপ। মরুভূমিতে বিরাট জনবসতির জন্য খাদ্য ও পানীয় এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ যতই অপ্রতুল হইতে থাকে ততই মানব সমাজের বড় বড় গোষ্ঠী (কাবা'ইল) বিভক্তি ও

বিচ্ছিন্নতার শিকারে পরিণত হইতে থাকে। সুতরাং যখন উক্ত গোত্রসমূহ হইতে উদ্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল (বাত্ন, ফাখিয, ফাসীলা ইত্যাদি) বিভিন্ন শহর ও উপশহরে গিয়া বসতি স্থাপন করিতে থাকে, তখন তাহারা নিজদের মরু জীবনের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতির সংরক্ষণ করে এবং নিজদের সুশৃঙ্খল নগর জীবনেও রক্ত ও বংশের বন্ধন আঁকড়াইয়া থাকে। উল্লিখিত স্তর ও শ্রেণী বংশের দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং গোত্রীয় জীবনে বংশ ও মানবগোষ্ঠীর মাঝে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয়।

আল-কালকাশান্দী (সুবহু'ল-আশা, ১খ.) আরবের বংশ তালিকা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ এখানে বেশ চিত্তাকর্ষক হইবে ঃ

(১) মূলত কাবীলা বলিতে এক প্রপিতামহের সন্তানকে বুঝায় (কানূ আবিন্ ওয়াহিদিন)। কিন্তু কখনও কখনও এমন হয় যে, এক ব্যক্তি সন্ধি অথবা মৈত্রী সূত্রে অপর কোন গোত্রে প্রবেশ করে, অতঃপর তাহাকেও উক্ত নূতন গোত্রের সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহাকে 'হালীফ বানী ফুলান' অথবা 'মাওলা বানী ফুলান' বলা হইত।

(২) এক গোত্রের কোন ব্যক্তি যখন অন্য গোত্রে প্রবেশ করিত তখন তাহাকে উভয় গোত্রের (তাহার পূর্বের মূল গোত্র এবং পরবর্তী গোত্র) প্রতি সম্পর্কিত করা বৈধ মনে করা হইত— যেমন বলা হইত ঃ আত-তামীমী ছুম্মা আল-ওয়া'ইলী অথবা আল-ওয়া'ইলী ছুম্মা আত-তামীমী।

(৩) আরব গোত্রসমূহকে সাধারণত পিতার নামে নামকরণ করা হইত—যেমন রাবী'আ, মুদার, আওস, খাযরাজ। কিন্তু কখনও কখও কাবীলার নাম মাতার সহিতও সম্পর্কিত হইত, যেমন খান্দিফ (خندف), বাজীলা (بجيلة) ইত্যাদি। কখনও এমন হইত যে, কোন কাবীলা এমন এক ঘটনার সহিত সম্পর্কিত হইত যাহা তাহার জন্য স্থায়ী হইয়া যাইত, যেমন গাস্সান। তাহাদের এই নাম এইজন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তাহারা য়ামান-এ এই নামের এক জলাশয়ে অবস্থান করিয়াছিল।

(৪) আরব গোত্রসমূহের অধিকাংশ নাম সেই সকল প্রাকৃতিক উপাদান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল যাহার সহিত উহার সম্পর্ক স্থাপিত হইত। যেমন হিংস্র জন্তু, উদাহরণস্বরূপ আসাদ, নুমায়র অথবা উদ্ভিদসমূহ ঃ যেমন হানজালা (حنظلة) অথবা কীট-পতঙ্গ; যেমন হানাশ্ (حنش) অথবা ভূমির অংশ, যেমন ফিহ্র, সাখর ইত্যাদি।

(৫) আরবদের পরিভাষায় কাবীলার নামসমূহ পাঁচ প্রকারের ঃ (ক) কাবীলার উপর উহার পিতার নাম হইবে, যেমন 'আদ, ছামূদ, বানূ 'আদ' মাদ্য়ান দ্বারা বানূ ছামূদ এবং বানূ মাদ্য়ান বুঝায়। ইহা সাধারণত শু'উব ও কাবা'ইল-এর ক্ষেত্রে হয়, বুতূন ও আফখায'-এর ক্ষেত্রে নহে। (খ) কাবীলার আগে বানূওওয়া (বানূ শব্দ) বসিবে, যেমন বানূ 'আব্বাস ; ইহা সাধারণত বুতূন ও আফখায-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (গ) কাবীলার উল্লেখ বহুবচনের শব্দ দ্বারা, আলিফ ও লাম (ال) সংযোগ করিতে হইবে, যেমন আত-তালিবিয়্যিন (الطالبيون) ও আল-জা'আফিরা (الجعافرة)। ইহার ব্যবহার সাধারণত পরবর্তীদের ক্ষেত্রে হইয়াছে। (ঘ) কাবীলাকে আলু ফুলান (ال فلان) শব্দ দ্বারা নামকরণ করা, যেমন আল-উ রাবী'আ, আল-উ ফাদ্ল, আল-উ মুর্‌রা, আল-উ 'আলী। ইহার ব্যবহার সাধারণত পরবর্তী যুগসমূহে হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া সিরিয়াতে। এইখানে আল দ্বারা আহল বুঝানো হইয়াছে। (ঙ) 'আওলাদু ফুলান' দ্বারা কাবীলা বুঝানো হয়, যেমন আওলাদু যা'আযি' (زعازع), আওলাদু কুরায়শ। উহার ব্যবহার খুবই কম এবং তাহাও পরবর্তী আফখায-এ করা হইয়াছে।

ইব্ন হায্ম (জামহারাতু আনসারি'ল-'আরাব) লিখিয়াছেন যে, সকল আরব কাবীলার উৎস এক পিতা, কেবল তিনটি কাবীলা ব্যতীত এবং উহারা হইল তানুখ (تنوخ), 'উতুক (عتق) এবং গাস্সান। ইব্ন হায্ম-এর মত অনুযায়ী সকল আরব তিন ব্যক্তির সন্তান ঃ 'আদনান, কাহ্তান এবং কুদা'আ (قضاعة)।

কোন কোন মনীষী আরববাসীদিগকে দুইটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ 'আরব 'আরিবা (عرب عاربة) ও 'আরব মুসতা'রীবা (عرب مستعربة)। 'আরাব 'আরিবা-কে আল-'আরাবু'ল-'আরবা' (العرب العرباء)-ও বলা হয় এবং 'আরাব মুস্তা'রাবাঃ বুঝাইতে আল-মুতা'আররাবা শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

আরব ঐতিহাসিকগণ এই বিভক্তি অন্য এক পদ্ধতিতে করিয়াছেন ; ব্া'ইদা (باعدة) ও গায়র বা'ইদা। বা'ইদা হইল যাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং গায়্র বা'ইদা অর্থাৎ যাহারা ধ্বংস হয় নাই। যেমন কাহ্তানী ও 'আদনানী গোত্রসমূহ, যাহাদের সন্তান-সন্ততি অবশিষ্ট আরব গোত্রসমূহে রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে আরব গোত্রসমূহ নিম্নবর্ণিত তিন ভাগে সীমাবদ্ধ বলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

(১) 'আরাব বাইদা অর্থাৎ প্রাচীন আরব বাসিন্দা, ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং এখন আমরা তাহাদের সম্পর্কে কেবল ঐশী গ্রন্থ অথবা প্রাচীন আরবী কবিতার মাধ্যমেই পরিচিত। আন্-নুওয়ায়রী (النويري) উহাদিগকে নিম্নবর্ণিত নয়টি কাবীলা-তে গণ্য করিয়াছেন এবং উহাদিগকে ইরিম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ-এর সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'আদ, ছামূদ, উমায়ম (اميم), আবীল, তাস্ম, জাদীস, 'ইম্লীক, জুরহুম, ওয়াবার (وبار)। প্রখ্যাত জাহিলী কবি নাবিগা, যিনি ইসলামের কিছুকাল পূর্বে ইনতিকাল করিয়াছিলেন, এক কাসীদাতে বা'ইদা কাবীলাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে 'আদ এবং ছামূদ কাবীলা-র নামও রহিয়াছে।

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী 'আরাব বা'ইদা-র প্রসিদ্ধ শাখাসমূহ হইল ঃ 'আদ, ছামূদ, 'আমালিকা, তাসম, জাদীস, 'আব্দ দাখ্ম (عبد ضخم), জুরহুমু'ল-উলা, মাদ্য়ান। আল-কালকাশানদী উক্ত গোত্রসমূহের বসবাসের স্থান এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আদ য়ামান ও 'উমান-এর মধ্যবর্তী আহকাফ (বাহরায়ন হইতে হাদরামাওত পর্যন্ত) অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। ইহারা ছিল হযরত হূদ (আ)-এর জাতি। ছামূদ জাতি হিজায এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থল আল-হিজ্র ও আল-কুরা উপত্যকায় বসবাস করিত এবং ইহারা পাহাড় খনন করিয়া গৃহ নির্মাণ করিত। হযরত সালিহ ('আ)-কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল।

'আমালিকা ঃ (উহাদিগকে বানূ 'আমালীক কিম্বা বানূ 'আমলাকও বলা হয়) এক বিরাট জাতি যাহাদিগকে দীর্ঘ এবং মজবুত দেহের জন্য উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়। তাহাদের বিভিন্ন কাবীলা 'উমান, বাহরায়ন এবং হিজায-এ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ইরাক ও আরব দ্বীপের বাদশাহগণ, সিরিয়ার শাসকবৃন্দ এবং মিসরের রাজা-বাদশাহগণ তাঁহাদের মধ্য হইতেই ছিলেন।

তাস্ম (طسم) ঃ ইহারা আহকাফ (য়ামান)-এ এবং অনেকের মতে য়ামামা-তে বাস করিত।

জাদীস (جديس) ঃ ইহাদের বসবাস স্থল বানূ তাম্‌ম-এর নিকটবর্তী অর্থাৎ বাহ্‌রায়ন অথবা য়ামামা-তে ছিল।

'আব্‌দ দাখম (عبد ضخم) ঃ ইহারাও তা'ইফ-এ বসবাস করিত। বলা হইয়া থাকে— ইঁহারা সেই গোত্রের লোক, যাঁহারা সর্বপ্রথম আরবী লিপিতে লিখন চালু করেন।

জুরহুমু'ল-উলা ঃ ইহারাও এক আরব কাবীলা যাহারা 'আদ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল।

মাদয়ান ঃ ইহারা এক বিরাট গোত্র ছিল, যাহারা হিজাযের সীমান্তবর্তী সিরিয়া অঞ্চলে মা'আন ভূমিতে বসবাস করিত (লুণ্ঠন ও ওজনে কম দেওয়ার ন্যায় পাপ কাজ করিত)। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হিদায়াতের জন্য হযরত শু'আয়ব ('আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) 'আরাব 'আরিবা অর্থাৎ বিশুদ্ধ আরব; ইহারা হইল বানূ কাহ্‌তান গোত্রের লোক। ইহাদের প্রকৃত মাতৃভূমি ছিল য়ামান। কাহ্‌তান বংশধর ইব্‌ন 'আবির হইতে দুইটি জাতি জুরহুম [ইসমা'ঈল ('আ)-এর শ্বশুরকুল] এবং য়া'রুব (يعرب) প্রসিদ্ধ। প্রাচীন আরব কাবীলা সাবা' য়া'রুব-এর বংশধর ছিল।

কুলজীবিদগণ কাহ্‌তানী গোত্রসমূহকে দুইটি বৃহৎ অংশে বিভক্ত করেন ঃ বানূ কাহ্‌লান (بنو كهلان) ও বানূ হিময়ার (بنو حمير)। অতঃপর বানূ কাহ্‌লান কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত শাখাসমূহ ঃ

বানূ তায়্যি (بنو طيء) নাজ্‌দ অঞ্চলের দুইটি প্রসিদ্ধ, পাহাড়, উজ্জা (اجا) এবং সুল্‌মা (দ্র.) (سلمى)-তে তাহারা বসবাস করিত। দানশীলতার ক্ষেত্রে এই গোত্র জগদ্বিখ্যাত ছিল।

বানূ হাম্‌দান এবং বানূ মায্‌হিজ (مذحج) ইহাদের অধিকাংশ য়ামান-এ বসবাস করিত। বানূ মায্‌হিজ-এরই একটি শাখা ছিল। বানূ'ল-হারিছ যাহারা তা'ইফ-এর দক্ষিণ-পূর্বে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

বানূ 'আমিলা এবং বানূ জুযাম (جذام), ইহারা সিরিয়ার মরু অঞ্চলে বসবাস করিত, বানূ লাখ্‌ম, ফুরাত নদীর তীরে হীরা (حيرة) সাম্রাজ্যের ভিত্তি রাখিয়াছিল। বানূ কিন্‌দা, হাদরামাওতের শাসক ছিল, বানূ আয্‌দ এক পরাক্রমশালী গোত্র ছিল, যাহারা 'উমান-এ রাজত্ব করিত। বানূ গাস্‌সান হইল তাহাদের একটি শাখা, যাহারা পূর্ব সিরিয়ায় রাজত্ব করিত। খুযা'আ-ও হইল আয্‌দ গোত্রের একটি শাখা; য়াছরিব (মদীনা)-এর উভয় আনসার কাবীলা আওস এবং খাযরাজ ছিল তাহাদেরই বংশধর।

হিময়ার-এর প্রসিদ্ধ শাখাসমূহ হইল কুদা'আ (قضاعة), ইহারা হিজাযের উত্তরে বসবাস করিত। তানূখ (تنوخ), ইহারা প্রাচীনকালে উত্তর সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সিরিয়ার মরুভূমি এবং তাবূকে কাল্‌ব গোত্র বসবাস করিত। বানূ জুহায়না, কুরায়শদের অঞ্চল তথা হিজাযে বসবাস করিত। পরবর্তীকালে তাহারা মিসর এলাকায় ব্যাপক হারে বসতি স্থাপন করে। বানূ 'উযরা (بنو عذرة) আরবদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। 'উর্‌ওয়া ইব্‌ন হিযাম এবং জামীল বুছায়না (بثينة) উক্ত কাবীলারই অন্তর্গত ছিলেন।

(৩) 'আরাব মুসতা'রাবা (عرب مستعربة) অর্থাৎ ইসমা'ঈল ('আ)-এর বংশধরগণ। হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর মাতৃভাষা ছিল 'ইবরানী (হিব্রু) অথবা সুরয়ানী (সিরীয়)। কিন্তু যখন তিনি মক্কার কাহতানী গোত্র জুরহুম-এ বিবাহ করিলেন তখন আরবী বলিতে শিখেন, তাঁহার সন্তানগণও উক্ত ভাষা গ্রহণ করেন এই কারণে তাঁহাদিগকে মুসতা'রীব (আরবে প্রবেশকারী) বলা হয়।

'আরাব মুস্‌তা'রাবাদের বংশ লতিকা, 'আদনান ইব্‌ন উদাদ (عدنان بن ادد)-এর মাধ্যমে হযরত ইসমা'ঈল ('আ) পর্যন্ত পৌঁছে। এই কারণে উহাদিগকে বানূ 'আদনান নামেও ডাকা হয়।

বিশেষজ্ঞগণ 'আদনান গোত্রসমূহের মধ্য হইতে নিযার (نزار)-এর খান্দানে, বিশেষভাবে রাবী'আ এবং মুদার (مضر) গোত্র দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের বেশির ভাগ দাজলা (টাইগ্রিস) ও ফুরাতের (য়ূফ্রেটিস) তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করিত, যাহা দীয়ার-ই রাবী'আ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাবী'আ-র দুইটি প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল আসাদ ও দুবায়'আ (ضبيعة)। বানূ আসাদ, ইহারা আর-রিম্মা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে বসবাস করিত। বানূ আসাদ-এর আরও কিছু শাখা ছিল; তন্মধ্যে কয়েকটি শাখার বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

বানূ 'আবদি'ল-কায়স, তাহাদের বাসস্থান ছিল তিহামা, পরবর্তীকালে তাহারা বাহরায়ন অভিমুখে চলিয়া যায়।

বানূ ওয়া'ইল (بنو وائل), ইহারা বাক্‌র এবং তাগ্‌লাব নামক দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। এই দুই গোত্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ আরবের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর অন্যতম।

মুদার-এর প্রসিদ্ধ কাবীলাসমূহ; কায়স, 'আয়লান, হাওয়াযিন ও সুলায়ম। এই সমস্ত গোত্রের লোকেরা নাজ্‌দ-এর পশ্চিম অংশে বসবাস করিত। কায়স গোত্রের আর একটি প্রসিদ্ধ শাখা হইল বানূ গাতাফান— যাহার আরও দুইটি শাখা 'আব্‌স (عبس) ও যুবয়ান (ذبيان) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বানূ তামীম, বসরার মরু অঞ্চল ছিল তাহাদের বাসভূমি।

বানূ হুযায়ল (هذيل), ইহারা মক্কার নিকটবর্তী পাহাড়সমূহে বাস করিত।

কিনানা দক্ষিণ হিজায-এ বসবাস করিত; বানূ 'আদনান-এর এই শাখার সহিত কুরায়শদের সম্পর্ক ছিল। কুরায়শ গোত্র ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন কিনানা-র বংশধর। কুরায়শ ছিল ফিহ্‌র-এর উপাধি। ইহার ভিত্তিতে তাহার বংশধরগণ নিজদের জন্য বংশীয় পরিচয় হিসাবে 'কুরায়শ' গ্রহণ করে। কুরায়শদের মধ্য হইতে কুসায়্যি ইব্‌ন কিলাব মক্কাতে এক নগরী-গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রীসের শহর এথেন্স এবং স্পারটার শাসন পদ্ধতির এক অস্পষ্ট চিত্র পেশ করিত। কুরায়শ গোত্র দশটি বংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি বংশের অধীনে রাষ্ট্রের কোন না কোন পদ ন্যস্ত থাকিত। ইসলামের আবির্ভাবকালে এই সকল পদ নিম্নবর্ণিত বংশসমূহে বিভক্ত ছিল ঃ সিকায়া এবং 'ইমারা (হাজ্জীদের পানাহার, অবস্থান এবং কাবা শারীফের পরিচর্যা)-এর দায়িত্বে ছিল বানূ হাশিম রিফাদা (رفادة) [হাজ্জীদের আর্থিক সাহায্য দান] ঃ বানূ নাওফিল-এর জন্য; সিদানা এবং নাদওয়া (কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিচারকার্য)-এর দায়িত্বে ছিল বানূ 'আবদি'দ-দার; ইসার (ايسار) (তীর দ্বারা ভাগ্য) নির্ণয়, মূর্তির নিকট কল্যাণ প্রার্থনা ঃ বানূ জামহ (بنى جمح); আমওয়াল মুহাজ্জারা (মূর্তিদের প্রদত্ত মানত এবং উপঢৌকনসমূহের তদারক) ঃ বানূ সাহম; মাশওয়ারা (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ) ঃ বানূ আসাদ; আশনাক (اشناق) [রক্তপণ, জরিমানা ইত্যাদির ব্যবস্থা] ঃ বানূ তামীম; ইকাব (ঝাণ্ডা ধারণ) ঃ বানূ উমায়্যা;

কুব্বা ওয়া আ'ইন্না (قبة واعنة) [সেনা ছাউনি এবং সেনাবাহিনীর সৈনাপত্য]ঃ বানূ মাখযূম; সাফারাত (অপর গোত্রসমূহে সংবাদ প্রেরণ এবং পূর্তকার্য)ঃ বানূ 'আদী।

ইসলামের আবির্ভাব কালে আরবগণ নিজদের বংশসমূহকে মূলত নিম্নবর্ণিত তিনটি ভাগে সীমাবদ্ধ রাখিত ঃ রাবী'আ, মুদার, য়ামান।

আরব-গোত্রসমূহকে অন্য একভাবেও বিভক্ত করা হইত অর্থাৎ উত্তর আরবের অধিবাসী (বানূ 'আদনান), যাহারা হযরত ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর এবং দক্ষিণ আরবের অধিবাসী, যাহারা কাহ্তান ইব্ন 'আমির-এর বংশধর। উত্তরের অধিবাসিগণকে 'আদনানী (নাযারী এবং মা'আদী) [معدى] বলা হয় এবং দক্ষিণের (য়ামান) অধিবাসীদিগকে কাহ্তানী অথবা য়ামানী বলা হয়। উত্তর আরব এবং দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য করা হয় ঃ (১) দক্ষিণের অধিবাসিগণ সাধারণত শহর-বন্দরে বসবাস করিত এবং উত্তরের অধিবাসিগণ ছিল প্রধানত যাযাবর এবং অস্থিতিশীল। হিজায এবং য়ামান-এর ভাষা ও উচ্চারণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল।

(২) স্থায়ী বসবাস ও যাযাবরত্ব এবং ভাষার বিভিন্নতার দরুন দক্ষিণ এলাকাবাসী ও উত্তর এলাকাবাসীদের মধ্যে কৃষ্টি ও সভ্যতার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, দক্ষিণ এবং উত্তর আরবের মধ্যে কোন বিষয়েই সাদৃশ্য ছিল না এবং তাহারা একে অপরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইসলাম-পূর্ব যুগেই য়ামানী গোত্রসমূহ সময় সময় হিজাযের দিকে গমন করিতে থাকে এবং হিজাযের কিছু লোক (যদিও তুলনামূলক উহাদের সংখ্যা কম ছিল) য়ামানকে তাহাদের বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করে। য়ামানবাসীদের দেশত্যাগের মূল কারণ "সাদ্দি মাআরাব"-এর ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যাহার কারণে তাহারা জাযীরাতু'ল-'আরবের (আরব উপদ্বীপের) বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে য়ামানবাসীদের দেশত্যাগের একটি কারণ ইহাও ছিল যে, তৃতীয় ও চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রোমবাসিগণ লোহিত সাগরে তাহাদের বাণিজ্য বহরের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাইয়াছিল, যাহার ফলে য়ামানের বাণিজ্য প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উত্তরের অধিবাসীদের য়ামান অভিমুখে দেশত্যাগের প্রধান কারণ অধিক জনবসতি এবং স্থানের সংকীর্ণতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

যাহা হউক, কুলজি বিশেষজ্ঞদের মতে আরবের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতেই যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছিল। অতঃপর ইসলাম যখন শান্তির অমিয় বাণী লইয়া আগমন করিল তখন আরব গোত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মহাসুযোগ আসে। ফলে তাহারা দলে দলে কেবল আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলেই বিচরণে ব্যস্ত থাকে না বরং তাহাদের এক বিরাট সংখ্যা অনারব দেশসমূহে গিয়াও বসবাস করিতে থাকে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে একমাত্র কাবীলা-ই ছিল আরবদের সামগ্রিক জীবনের ভিত্তি। ইসলাম আরবদিগকে একমাত্র দীনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়ার উপর রচনা করে।

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)। বেদুঈনদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি গোত্রসমূহের রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল লোক সাধারণত তাঁবুতে বসবাস করিত। এক তাঁবুতে এক পরিবারের লোকেরা অবস্থান করিত। অনেক তাঁবুর সমষ্টি আল-হায়্যি (দল)-এর রূপ পরিগ্রহ করিত এবং অনেক দলের (আহয়া') সমষ্টির নাম ছিল কাবীলা। কাবীলা-এর লোকজনের জাতীয় বিষয়াবলী প্রায় একই হইত; অন্যথায় পানির ভাণ্ডারসমূহ, চারণভূমি এবং কৃষিভূমি কাবীলার যৌথ মালিকানায় পরিগণিত হইত।

অধিকাংশ বেদুঈন গোত্র সাধারণত সফর এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের অবস্থায় থাকিত। এক স্থানে স্থায়ীভাবে থাকিয়া বসবাস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহাদের জীবন ধারণ মওসুমের আনুকূল্য এবং পানির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাহাদের পানি এবং তৃণের প্রয়োজন হইত বলিয়া যখনই কোন স্থানে পানির ভাণ্ডার এবং চারণভূমি (আল হিমা)-এর স্বল্পতা দেখা দিত তখনই তাহারা নিজেদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মালসামগ্রী এবং উষ্ট্র, ঘোড়া ও বকরী পাল লইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য এমন স্থানে গিয়া তাঁবু স্থাপন করিত যেখানে প্রচুর পানি পাওয়া যাইত এবং ভূমি উর্বর হইত। তাহাদিগকে নানা প্রাকৃতিক উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হইত। আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ তাহাদের জীবন ধারণের জন্য খুবই মূল্যবান সম্পদ ছিল। বেদুঈন গোত্রের লোকেরা সাধারণত শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য পসন্দ করিত না। তাহাদের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল চতুষ্পদ জন্তু, বিশেষ করিয়া উষ্ট্র। উষ্ট্রের উপরই তাহাদের জীবন বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। এজন্যই আরব গোত্রসমূহ উহার প্রতিপালন ও যত্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিত। তাহারা উহার গোশত খাইত, দুগ্ধ পান করিত, উহার লোম হইতে কাপড় তৈরি করিত এবং উহার চামড়া দ্বারা তাঁবু নির্মাণ করিত এবং সফর অবস্থায় উহার পৃষ্ঠের উপর গৃহের সকল সামগ্রী উঠাইয়া দিত। মরু কাবীলাসমূহের জীবন ধারণের অন্য এক মাধ্যম ছিল লুণ্ঠনবৃত্তি, যাহা তাহাদের সমাজে একটি রীতিমত পেশার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বেদুঈন গোত্রসমূহের বিপরীত স্থায়ী বাসিন্দারা শহরসমূহে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করিত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং কৃষিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিত। এই সকল স্থায়ী বাসিন্দারা ইসলাম পূর্বকালে কোনও কোনও বৃহৎ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। তন্মধ্যে য়ামানের সাবা', হিময়ার এবং মু'ঈন, সিরিয়ার বানূ গাসসান এবং ইরাকের বানূ লায়ম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

গোত্রীয় সমাজে কোন নিয়মতান্ত্রিক এবং সুশৃঙ্খল জীবনের ধারণা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই বিশৃঙ্খল এবং অবিন্যস্ত সমাজে রক্তের সম্পর্কই প্রকৃত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হইত। জাহিলী যুগে আরবগণ কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে স্বীকার করিত না। কাবীলার সমষ্টিগত সিদ্ধান্তই তাহাদের নিকট আইনের মর্যাদা পাইত। উক্ত গোত্রীয় ব্যবস্থার রূপ এই ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য নিজকে প্রস্তুত রাখিত— সে অত্যাচারীই হউক কিম্বা অত্যাচারিতই হউক। আত্মীয়তার সম্পর্ক আরব গোত্রসমূহের নিকট সম্মিলিত মর্যাদার অধিকারী ছিল। কোন গোত্রের সংখ্যাধিক্য উহার শক্তি এবং উক্ত গোত্রীয় ব্যবস্থায় উহার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কারণ হইত। নিজ সংখ্যা শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরব গোত্রসমূহ বিদেশীদিগকে মাওয়ালী (একবচন ঃ মাওলা) হিসাবে গ্রহণ করিত। মাওয়ালী দুই প্রকারের ছিল ঃ (১) কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন কাবীলার তত্ত্বাবধানে আসিতে চাহিলে সেই

ব্যক্তি উক্ত কাবীলার মাওলা (মিত্র, বন্ধু) হইয়া যাইত। (২) মুক্তিপ্রাপ্ত দাসও অনেক সময় তাহার ভূতপূর্ব মনিবের পরিবারে জীবন ধারণ করিতে পসন্দ করিত এবং তাহাকেও মাওলা বলা হইত। মাওয়ালীকে কোন গোত্রের জন্য সম্পদ এবং উহার সাহায্য ও শক্তির উৎস বলিয়া মনে করা হইত। ক্রীতদাসীও নিজ মনিবের আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হইত।

বস্তুত সমাজের গোত্রীয় ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি নিজের জীবন, ধন-সম্পদ এবং মান-ইয্যতকে নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারিত না, যতক্ষণ না সে কোন কাবীলার সহিত কোন না কোন সূত্রে সম্পর্ক রাখিত। আবার কাবীলাসমূহে পারস্পরিক দ্বন্দ্বও অব্যাহত থাকিত। এই কারণে কখনও এক কাবীলা অন্য কাবীলার সহিত অথবা কোন কোন কাবীলা পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত, যেন তাহারা শত্রু কাবীলাসমূহের হামলার মুকাবিলায় সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে।

যদিও গোত্রীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের অস্তিত্ব ছিল না, তবু 'প্রতিটি কাবীলা বা গোত্র একটি স্বাধীন দলের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল' এবং এই মর্যাদা কাবীলার প্রত্যেক ব্যক্তিরই ছিল। ইহা ছাড়া প্রতিটি গোত্রের একজন নেতা (শায়খ) থাকিত। বংশগত মর্যাদা, ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি, উন্নত গুণাবলী এবং বয়সের জ্যেষ্ঠত্ব নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হইত। সকল আরব, বিশেষ করিয়া মরুবাসী গোত্রসমূহ গণতন্ত্রপ্রিয় ছিল এবং কোন ব্যক্তির সীমাহীন নেতৃত্ব মানিতে অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং শায়খ নিজ ক্ষমতায় খুব কমই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহাকে কাবীলার বিবেকবান লোকদের পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজ দায়িত্ব পালন করিতে হইত (কখনও শায়খকে কাবীলার সিদ্ধান্তের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হইত)। তাঁহার কোন অফিস কিম্বা ব্যক্তিগত গাড়ীবাড়ী থাকিত না, তিনি স্বাধীন বাদশাহ কিম্বা শাসকের মত ছিলেন না। গোত্রীয় আরবে বাদশাহ্-এর ধারণা ছিল না। যুদ্ধাবস্থায় আরবরা তাহাদের শায়খ-এর অধীনে জীবন বাজি রাখিয়া যুদ্ধ করিত। কিন্তু শান্তির অবস্থায় শায়খ-এর তেমন কোন দায়-দায়িত্ব থাকিত না, বরং সেই সময় (সামগ্রিকভাবে) কাবীলাই আসল ও মৌলিক বস্তু বলিয়া গণ্য হইত।

যদিও আরবগণ এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রতিটি গোত্রের জন্য এক নির্দিষ্ট ইলাহ (মাবূদ) থাকিত এবং প্রতিটি গোত্র সিজ্দার জন্য এক বা একাধিক মূর্তি (সানাম, ওয়াছন) রাখিত। আরবের অধিকাংশ লোক মূর্তি উপাসক ছিল। বলা হইয়া থাকে যে, প্রথম যে ব্যক্তি আরবদিগকে মূর্তি পূজার সহিত পরিচয় করাইয়াছিল সে ছিল 'আম্র ইব্ন লুহা। সে সিরিয়া হইতে মূর্তি সঙ্গে লইয়া আসে এবং উহা কা'বা-তে স্থাপন করে।

কুরায়শদের সর্ববৃহৎ মূর্তি ছিল হুবাল যাহা কা'বা-র মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল। ইহা রক্তিম বর্ণের 'আকীক পাথর কাটিয়া মানুষের আকৃতিতে তৈরি করা হইয়াছিল। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী কা'বা-তে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। মক্কা বিজয়কালে মহানবী (স) উক্ত মূর্তিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেন।

ইহা ছাড়া আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যে অসংখ্য মূর্তি ছিল তন্মধ্যে প্রাচীনতম মূর্তি ছিল মানাত, যাহা মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী সমুদ্র তীরের নিকটবর্তী স্থান 'কাদীদ'-এ স্থাপিত ছিল। ইযদ, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা উহার উপাসনা করিত। লাত তা'ইফ-এ ছিল এবং উহার প্রতিবেশী ছিল বানূ ছাকীফ। 'উয্যা মক্কা হইতে ইরাকের রাস্তায় অবস্থিত ছিল এবং বানূ গাতাফানের ইলাহ ছিল। ইহা 'লাত' এবং 'মানাত' হইতে আধুনিকতর ছিল। ওয়াদ্দ বানূ কাল্ব-এর মূর্তি যাহা দুমাতু'ল-জান্দাল নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। সুওয়া য়ান্বু'তে ছিল এবং বানূ কিনানা, হুযায়ল, মুযায়না ইত্যাদি কাবীলার লোকেরা উহার পূজা করিত। য়াগূছ বানূ মাযহিজ-এর মূর্তি। য়া'উক হইল বানূ হামদান এবং খাওলান-এর মূর্তি, ইহা সান'আ' হইতে দুই দিনের দূরত্বে আরহাব নামক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। নাস্র নাজরানের বানূ হিময়ার-এর মূর্তি। ইসাফ সাফা পর্বতে এবং না'ইলা মারওয়া পর্বতে স্থাপিত ছিল। এই দুইটিও কুরায়শদের প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ছিল। আরও কিছু প্রসিদ্ধ মূর্তির নাম ছিল ঃ জিহার, শাম্স আল-ফুল্স, আস-সা'ঈদা, যুল-লাবা, আল-মুহরাক, যির্‌রিহ, মারহাব, আল-মিনতিক, যু'ল-কাফ্ফায়ন, সা'দ, রি'আম, রুদী যু'ল-কা'বাত (বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. আল-কাল্বী, কিতাবু'ল-আসনাম)।

কোন কোন আরব কাবীলা-র (এবং বুতূন ও ফাসা'ইল) নাম জীবজন্তুর (অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর) নামানুসারে রাখা হইয়াছে। যেমন, বানূ আসাদ, বানূ ফাহ্দ, বানূ কাল্ব, বানূ ছাওর, বানূ বাক্র। কোন কোন আধুনিক পণ্ডিতের (বিশেষ করিয়া প্রাচ্যবিদদের) ধারণা ঃ এই জাতীয় কাবা'ইল এবং বুতূন-এর নাম কোন সম্প্রদায় কর্তৃক কুসংস্কারবশত কোন প্রাণী বা বস্তুকে সম্প্রদায়ের প্রতীক বলিয়া গণ্য করার মতবাদের স্বাক্ষর বহন করে কিন্তু সাধারণত উহাকে কেবল প্রবৃত্তি পূজার জ্ঞান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে (দ্র. সুলায়মান নাদাবী, আরদু'ল-কুরআন, ১খ)। এই জাতীয় মতবাদের অবকাশ ইরাক, হিন্দুস্তান, মিসর এবং গ্রীসের "ইল্মু'ল-আসনাম"-এ থাকিতে পারে, কিন্তু আরবদের নিকট উক্ত ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জাতীয় নাম আধুনিক য়ূরোপে পাওয়া যায়। যেমন, Mr Fox এবং Mr Bull, কিন্তু Tutemism মতবাদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রায় সকল কাবীলারই একজন কবি থাকিত, যে শৌর্যবীর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিত এবং নিজ গোত্রের শত্রুদের নিন্দা ও তিরস্কারে লিপ্ত থাকিত। যুদ্ধকালে যোদ্ধাদের তরবারি ও কবির ভাষা একই দায়িত্ব পালন করিত। তাহার কবিতা কাবীলার লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিত এবং নিজের শক্তিশালী কাব্যের মাধ্যমে যুদ্ধের গতি তীব্র করিতে পারিত। গোত্রের ঘটনাবলী, উহার মান ও মর্যাদা এবং পূর্বপুরুষের অবদানসমূহের প্রচার ও প্রসারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল গোত্রীয় কবির কাব্য। এই কারণেই গোত্রীয় কবিদের কাব্য আরবদের খুব দ্রুত মুখস্থ হইয়া যাইত এবং জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে উহার বিরাট ভূমিকা ছিল।

কবি কেবল নিজ গোত্রের প্রশংসা এবং শত্রুর নিন্দাই করিতেন না, বরং তিনি এক দিক দিয়া কাবীলার ঐতিহাসিক এবং সাংবাদিকও ছিলেন। তিনি জাতির পথ প্রদর্শক, বাগ্মী এবং মুখপাত্রের দায়িত্বও পালন করিতেন।

বৎসরের বিভিন্ন মাসে আরবের বিভিন্ন স্থানে মেলা (সূক ব. ব. আসওয়াক) বসিত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ মেলা হিজাযে নাখ্লা এবং তা'ইফ-এর মধ্যবর্তী স্থানে বসিত এবং উহার নাম সূক 'উকাজ (দ্র.)। এই মেলায় বিভিন্ন গোত্রের লোক একত্র হইয়া পারস্পরিক অহংকার ও প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিত। বড় বড় বাগ্মী এবং কবি নিজ নিজ গোত্রের ঐতিহাসিক

ঘটনাবলী ও অবদানসমূহ বর্ণনা করিতেন। এইভাবে কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে একে অপরের উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিত। আরবী সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবিতা সংকলন " আল-মু'আল্লাকাতু'স-সাব্'আ" সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, উহা এই মেলাতেই গঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে শিল্পগত নৈপুণ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দরুন উহা কা'বা শরীফের দরজায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

গোত্রের জীবনে কবির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এক দিকে সমাজে যেমন তাঁহাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত, অপর দিকে তাঁহার জ্বালাময়ী বর্ণনা এবং নিন্দার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করা হইত। কবি যদিও শত্রু গোত্রের নিন্দাকারী এবং নিজ গোত্রের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসাকারী ছিলেন, তথাপি সুযোগ পাইলে তিনি নিজ গোত্রের দুর্বলতাসমূহ উদ্ঘাটন করিতেও প্রস্তুত থাকিতেন এবং শত্রু গোত্রের বৈধ প্রশংসা করিতে দ্বিধা করিতেন না। জনৈক বীরত্ব গাথা রচয়িতা কবি বলেন ঃ

لو كنت من مازن لم تستبح ابلى

بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

(আমি যদি বানূ মাযিন গোত্রের লোক হইতাম, তবে বানু'ল-লাকীতা: গোত্রের যুহ্ল ইব্ন শায়বানা আমার উটগুলি অপহরণ করিয়া নিতে পারিত না)। কতিপয় গোত্রীয় কবির নাম নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ ইম্রুু'উল-কায়স (বানূ কিনদা), 'আম্র ইব্ন কুলছুম (বানূ তাগলিব), যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা (বানূ গাতফান), 'আলকামা ইব্ন 'আব্দ (বানূ তামীম), হাতিম (বানূ তায়্যি), 'উবায়দ ইবনু'ল-আবরাম (বানূ আসাদ), লাবীদ ইব্ন রাবী'আ (বানূ 'আমির), হাস্সান ইব্ন ছাবিত (মদীনার আনসার), তা'আব্বাতা শাররান (বানূ হুযায়ল), খানসা (বানূ সুলায়ম), আল-মুসাবির ইব্ন হিন্দ (বানূ 'আব্স), নাবিগা (বানূ যুবয়ান), 'আম্র ইব্ন মা'দীকারাব (মাযহিজ), যুহায়র ইব্ন জানাব (কাল্ব), আ'শা (বানূ সা'দ), নাবিগা জা'দী (বানূ কা'ব), মালিক ইবনু'র-রায়ব (বানূ মাযিন), 'আমর ইব্ন কুমায়'আ (বানূ সা'দ), আল-মুনাখ্খাল (বানূ য়াশকার), তারাফা ইবনু'ল-'আব্দ (বানূ বাক্র ইব্ন ওয়া'ইল), 'আনতারা শাদ্দাদ (বানূ 'আব্স)। ইসলামের আবির্ভাবের পরে আরব কাবীলাসমূহের দেশ-বিদেশে অবস্থানের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল (দ্র. সুবহু'ল-আ'শা, ১খ, ৩১৫ পৃ.) ।

বানূ কুদাআ (بنو قضاعة)-এর কয়েকটি পরিবার মিসরে গিয়া বসতি স্থাপন করে (তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল য়ামান)। উহাদের মধ্যে বালা (بلى), জুহায়না, 'উয্রা, বাহ্রা' (بهراء) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুদা'আ গোত্র হইতেই বানূ কাল্ব কনস্টান্টিনোপল সাগরের তীরবর্তী এলাকা হালাব প্রভৃতি স্থানে এবং বাহরা' গোত্র কুলযুম (লোহিত) সাগর অতিক্রম করিয়া হাবাশ (আবিসিনিয়া) দেশে এবং বানূ 'উযরা এবং বানূ-নাহ্দ-এর কিছু লোক সিরিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করে। (ইব্ন হায্ম-এর বর্ণনা মতে বালা গোত্রের কিছু লোক স্পেনে কর্ডোভার উত্তর অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করে। তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আরবী বলিত, ল্যাটিন ভাষায় তাহাদের দক্ষতা কম ছিল। তাহারা বড়ই অতিথিপরায়ণ ছিল বানূ 'উযরাও স্পেনের দালায়া, জায়্যান ও আছ-ছিগার-এ বসবাস করিত এবং তাহাদের একটি শাখা বান ফাওয়ারতিশের (=বানূ ফাওয়ারিস) অনেক লোক সারাকুসতা-তে অবস্থানরত ছিল (জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৪৪৩, ৪৫০)।

কাহ্তানী গোত্রসমূহ হইতে বানূ ইয্দ সিরিয়ার (বুসরা) শহরসমূহ-সহ বিভিন্ন স্থানে এবং এইভাবে বানূ জাফনাঃ (গাস্সান) গোত্রের অবশিষ্ট লোকেরা বালকা' ও হিমস রাজ্যে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আওস ও খাযরাজ (মদীনার আনসার) হইতে অনেক লোক পূর্বে ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়ে। ঐতিহাসিকগণ মানফালুত (সাঈদ-ই মিস্র)-এ হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) এবং সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর বংশধরগণের উল্লেখ করিয়াছেন।

বানূ তায়্যি সম্পর্কেও বলা হইয়া থাকে যে, উহার কয়েকটি শাখা ইসলামের বিজয়কালে বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। তন্মধ্যে বানূ যুবায়দ ফুরাতের নিকটবর্তী সানজার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং বানূ সুনবুস দিময়াতের সীমান্ত অঞ্চলে গমন করে। উহারই আর একটি শাখা বানূ য়ূসুফ পশ্চিমে সাখা নামক স্থানে বসবাস করিত। বানূ জারম গোত্র প্রথম দিকে গায্যাতে বসবাসরত ছিল। অতঃপর সুলতান সালাহু'দ-দীন মিসর ও সিরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিলে তাহাদের বিপুল সংখ্যক মিসরে চলিয়া যায়। এইভাবে বানূ ছা'লাবা-র অনেক লোকও মিসরে হিজরত করিয়া যায় এবং দেশের পূর্ব অংশে বসতি স্থাপন করে। বানূ তায়্যি গোত্রেরই গাযিয়্যা সম্প্রদায় ইরাকে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে।

বানূ কাহ্লান (بنو كهلان)-এর একটি শাখা 'হামাদান' ইসলামের আবির্ভাবের পর য়ামান হইতে বাহির হইয়া সিরিয়াতে বসতি স্থাপন করে। বানূ হামাদান সাহাবীদের বিরোধ কালে হযরত 'আলী (রা)-র অবলম্বন করিয়াছিল।

কাহ্লানের মধ্যে বানূ জুযামও ছিল। বর্ণিত আছে যে, তাহারা 'আম্র ইবনু'ল-'আস (রা)-এর মিসর বিজয়কালে তাঁহার সহিত আগমন করে এবং তাহারা মিসরে বসবাসকারী প্রথম কাবীলাসমূহের অন্যতম ছিল। তাহাদের বংশধরগণ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর বানূ জুযাম-এর অনেক লোক সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে। বানূ সাখ্র কারক-এ, বানূ মাহ্দী বালকা-তে, বানূ 'উকবা এবং বানূ যুহায়র শূবাক-এ এবং বানূ সা'ঈদ সারখাদ ও হাওরান-এ বসতি স্থাপন করে, অন্য এক গোষ্ঠী সুদানকে নিজেদের বাসভূমিতে পরিণত করে।

বানূ লাখাম কাহ্লান-এরই একটি শাখা ছিল, স্পেনের সেভিল (ইশবীলিয়্যা)-এর রাজন্যবর্গ (বানূ 'আব্বাদ) তাহাদেরই বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ মিসরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

বানূ কাহলান হইতে বানূ য়ারীম এবং বানূ বাশতাগীর স্পেনের সেভিলে বসতি স্থাপন করে (জামহারা, ৩৯২)। তাহাদেরই মধ্য হইতে বানূ'ল-আশ'আর স্পেনের রায়্যা শহরে বসবাসরত ছিল (জামহারা, ৩৯৮)। আরবের বিভিন্ন কাবীলা দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্পেনের বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

বানূ লাখাম-এর একটি শাখার নাম ছিল বানূ'দ-দার। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী তামীমু'দ-দারী (রা) ঐ বংশেরই লোক ছিলেন। এই বংশের লোকেরা ফিলিস্তীনের আল-খালীল শহরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত সেই ফরমানও ছিল, যাহাতে তিনি তামীম (রা) এবং তাঁহার ভাইদিগকে 'বায়ত হাবারূন' অঞ্চলে জমি প্রদান করিয়াছিলেন।

অনুরূপভাবে সিরিয়া রাজ্যের জিবাল-ই 'আমিলা-র উপর বানূ হারিছ (বানূ কাহ্লানের বংশধর) গোত্রের এক বিরাট দল বসতি স্থাপন করিয়াছিল। হযরত ইসমা'ঈল ('আ) ইব্ন ইবরাহীম ('আ)-এর বংশ হইতে বানূ 'আদনান ইব্ন উদাদ ('আরব মুসতা'রাবা)-এর অসংখ্য শাখা-উপশাখা হিজায হইতে বাহির হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করে।

হাওয়াযিন (هوازن) কাবীলা হইতে বানূ সা'দ ইসলামের যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। উহাদের মধ্য হইতে একদল পশ্চিম রাজ্যের বাজা অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বানূ জিলার ইব্ন রাবী'আ-ও মদীনা এলাকা ত্যাগ করিয়া সিরিয়ার দিকে গমন করে এবং হালাব ও সিরিয়ার অন্যান্য রাজ্য দখল করে। এই সমস্ত লোক পরবর্তীকালে তুর্কী ভাষায় কথা বলিত। বানূ হিলাল প্রথমে মিসর ও ইফরীকিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং পরে তথা হইতে পশ্চিম সীমান্তে গিয়া বসতি স্থাপন করে।

হাওয়াযিন বংশোদ্ভূত বানূ জুশাম বাহ্‌রায়ন পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া যায় এবং এইভাবে বানূ গাতাফান-এর একটি শাখা বানূ আশজা'-ও পশ্চিম সীমান্তকে বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করে।

বানূ রাওয়াহা (بنو رواحة), বানূ হায়ত (بنو حيت), বানূ ফাযান, বানূ বাদ্‌র, বানূ ম্যাযিন, বানূ ফারাস, বানূ লায়ছ, বানূ দামরা, বানূ জিনানা ইব্ন খুযায়মা, সুলায়ম এবং 'আদওয়ান ইফরীকিয়্যা এবং পশ্চিমে গিয়া বসতি স্থাপন করে। বানূ দাব্বা নাজ্‌দ হইতে কয়েকটি পরিবার সিরিয়া এলাকার রাজ্যসমূহের দিকে চলিয়া যায়। আল-কাল্‌কাশান্‌দী বলেন, "আমার সম্পর্ক বানূ বাদ্‌র-এর সহিত এবং কালকাশানদী-এর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক বানূ বাদ্‌র আর বাকী অর্ধেক বানূ মাযিন" (সুবহু'ল-আ'শা, ১খ, ৩৪৫)।

কুরায়শ-এর অনেক বংশ ইসলামের বিজয়ের পর হিজায পরিত্যাগ করে, যেমন বানূ সাহ্‌ম ['আমর ইবনু'ল-'আস (রা) ইবনু'ল-খাত্তাব-এর গোত্র] 'আ'মাল-ই গারবিয়্যা ও সিরিয়ার রাজ্যসমূহে, বানূ তায়ম [আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাবীলা] 'সা'ঈদ-ই মিসর, 'উশমূনায়ন, 'বাহনসা'ইবা ও 'তাহারতে, বানূ যুহ্‌রা ও বানূ মাখযূম উশমূনায়ন-এ, বানূ মাখযূম হইতে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের বংশধর হিম্‌স-এ এবং বানূ 'আবদি'দ-দার হামাত-এ বসতি স্থাপন করে।

স্পেনে গিয়া বসবাসকারী গোত্রসমূহের তালিকাও বেশ দীর্ঘ (ইফরীকিয়ার প্রসিদ্ধ কাবীলাসমূহের জন্য দ্র. ইব্ন হায্‌ম, জামহারাতু আনসাবিল-'আরাব, ৪৯৫-৫০৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হায্‌ম, জামহারাতু আন্‌সাবি'ল-'আরাব, কায়রো ১৩৮২ হি.; (২) শিহাবু'দ-দীন আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-'আরাব ফী ফুনূনি'ল-আদাব (আস-সাফরু'ছ-ছানী), কায়রো ১৩৪২ হি.; (৩) আল-মুস'আব ইব্ন 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়রী, নাসাবু কুরায়শ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (৪) ইবনু'স-সা'ইব আল-কালবী, কিতাবু'ল-আসনাম, কায়রো ১৩৪৩ হি.; (৫) আল-হামাদানী, আল-ইকলীল, কায়রো ১৩৮৩ হি.; (৬) ইব্ন সা'ইদ আল-আনদালুসী, তাবাকাতু'ল-উমাম, বৈরূত ১৯২২ খৃ.; (৭) ইব্ন কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩ হি.; (৮) আবু'ল-'আব্বাস আল-মুবার্‌রাদ, নাসাবু 'আদনান ওয়া কাহ্‌তান; (৯) আল-কালকাশানদী, সুবহু'ল-আ'শা, ১খ, কায়রো ১৩৮৩ হি. ; (১০) হাসান ইবরাহীম হাসান, ১খ, ১৮৪৬ খৃ. ; (১১) সামীর 'আবদু'র-রায্‌যাক আল-কুতুব, আনসাবু'ল-'আরাব, বৈরূত ১৩৮৮ হি. ; (১২) ইব্‌ন খালদূন, কিতাবু'ল-'ইবার, ১খ, ১২৮৪ হি. ; (১৩) 'উমার রিদা কাহ্‌হালা, আল-'আরাব কাবলা'ল-ইসলাম (আল-'আলামু'ল-ইসলামী, ১খ,), দামিশক ১৩৭৭ হি. ; (১৪) ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৬১ হি. ; (১৫) জুরজী যায়দান, আল-আরাব কাবলা'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯০৮ খৃ. ; (১৬) ঐ লেখক, তা'রীখু'ত-তামাদ্দুন আল-ইসলাম, কায়রো ১৯২২ খৃ.; (১৭) আহ্‌মাদ আমীন, ফাজরু'ল-ইসলাম, বৈরূত ১৯৬৯ খৃ. ; (১৮) জাওয়াদ 'আলী, المفصل فى تاريخ العرب ১খ, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ. (১৯) ইব্ন 'আব্‌দি রাব্বিহি, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ, ৩খ, কায়রো ১৩৭২ হি. ; (২০) ইব্ন সীদা, আল-মুখাস্‌সাস (আস্‌-সাফরু'ছ-ছালিছ), বৈরূত সং. ; (২১) আস-সুওয়ায়দী, سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب ১২৯৬ হি. ; (২২) ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব, ঐ শব্দের অধীনে ; (২৩) আয-যুবায়দী, তাজু'ল-'আরূস, ঐ শব্দের অধীনে ; (২৪) আল-ফীরূযআবাদী, আল-কামূসু'ল-মুহীত, ঐ শব্দের অধীন ; (২৫) সুলায়মান নাদাবী, তা'রীখু আরদি'ল-কুরআন, ২খ, আজমগড় ১৯৫৫ খৃ. ; (২৬) Philip K. Hitti, History of the Arabs, লন্ডন ১৯৫৬ খৃ. ; (২৭) History of the Islamic Peoples, লন্ডন ১৯৫০ খৃ. ; (২৮) আমীর 'আলী, A Short History of the Saracens ; (২৯) আল-জাওহারী, আস-সিহাহ ; (৩০) মাহমূদ শুকরী আল-আলূসী, কায়রো ১৩৪৩ হি. ; (৩১) আদী লুহ্‌দ, হাদারাতু'ল-'আরাব ; (৩২) আল-কাল্‌কাশানদী, نهاية الادب فى معرفة انساب العرب কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ; (৩৩) 'উমার রিদা কাহ্‌হালা, মু'জামু কাবা'ইলি'ল-'আরাব (৩ খণ্ড)।

আমীনুল্লাহ্ ওয়াছীর ও সম্পাদক মণ্ডলী (দা. মা. ই.)/
মুহম্মদ ইসলাম গনী

কাবা'ইলিয়্যা (قبائلية) ঃ (১) অর্থ, গোত্রবাদ (Tribalism)ঃ আরবী প্রতিশব্দ (العصبية) [আল-'আসাবিয়্যা], জন্মগতভাবে এক গোত্রের লোকদের উপর অন্য গোত্রের লোকদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, এইরূপ ধারণা ও মানসিকতার নাম গোত্রবাদ। জাহিলী যুগে আরব দেশের লোকদের মধ্যে গোত্রবাদ প্রবল ছিল। গোত্রবাদের প্রাবল্যে এক গোত্রের লোক নিজকে অন্য গোত্রের লোক অপেক্ষা জন্মগতভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গৌরব বোধ করিত। এক গোত্রের উপর অন্য গোত্রের আধিপত্যের প্রচেষ্টা এবং উহার ফলে গোত্রসমূহের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটন ছিল গোত্রবাদের প্রত্যক্ষ ফল।

ইসলাম গোত্রবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন জিহাদ ঘোষণা করিয়াছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মানব জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আর আমি তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ ঃ ১৩)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ সমগ্র মানব জাতির এক ও অবিচ্ছিন্ন হইবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানব জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র এবং বিভিন্ন জাতি বিদ্যমান থাকিবার বিষয়কে একটি সামাজিক বাস্তব সত্য ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানব জাতির সম্মুখে এই মহাসত্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, পারস্পরিক সামাজিক পরিচয়ের

সুবিধার্থে বিভিন্ন গোত্র এবং বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক হইলেও আল্লাহর নিকট মানুষের 'ইয্যত ও সম্মান প্রাপ্তির উপায় ও ভিত্তি উক্ত গোত্রত্ব বা জাতীয়তা কোনটিই নহে, বরং তাঁহার নিকট তাহাদের 'ইয্যত ও সম্মান প্রাপ্তির প্রকৃত ও একমাত্র উপায় ও ভিত্তি তাক্ওয়া বা পরহেযগারী। এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলী যুগের আরবদের এবং আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহের সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্য তথা যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণটিকে চিহ্নিত করত সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতির মৌলিক ও প্রধান নীতি-কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জাহিলী যুগের আরবের অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রধান কারণ ছিল যেমন প্রাচীন সংকীর্ণ গোত্রবাদ, আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহের অশান্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রধান কারণও তেমনি আধুনিক বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ।

কুরআন মাজীদের উক্ত শিক্ষা অনুসারে বর্ণ, বংশ, গোত্র, ভাষা বা ভৌগোলিক জাতীয়তা— ইহাদের কোনটি মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না, বরং তাহার প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির কারণ তাক্ওয়া।

জাহিলী যুগের গোত্রবাদ (Tribalism) ও আধুনিক যুগের বর্ণবাদ ও জাতিভেদ প্রথা (Racism, Racialism)-ই মানব জাতির মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধানতম অন্তরায়। কুরআন মাজীদের উল্লিখিত শিক্ষা এই গোত্রবাদ, বর্ণবাদ ও জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণ্য ও বর্জনীয় আখ্যায়িত করিয়া বিশ্ব-মানবতার ঐক্য ও সংহতির মূল ভিত্তি হিসাবে তাক্ওয়াকে নির্দেশ করিয়াছে। এইরূপে মহানবী (স) নূতন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদায় হাজ্জের ভাষণে যে মূলনীতিসমূহ ঘোষণা করিয়াছিলেন— গোত্রবাদ, বর্ণবাদ ও জাতিভেদ প্রথার নিন্দা ও বিলুপ্তি সাধন ছিল উহাদের প্রধান। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করিলেন ঃ (১) বিশ্ব-মানব একটি একক জাতি; (২) গোত্র, বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক জাতীয়তা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, বাস্তব সত্য হইলেও উহা মানুষের মূল্য-ভেদ ও মর্যাদা-ভেদের কারণ হইতে পারে না এবং (৩) আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদার ভিত্তি অন্তরের বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মসমূহ।

৬৩২ খৃ.-এর ফেব্রুয়ারী মাসে (হি. ১০ সনের ৯ যু'ল-হিজ্জা) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা (স) বিদায় হজ্জে 'আরাফাতের ময়দানে যে অবিস্মরণীয় ভাষণ দান করিয়াছিলেন, এই স্থলে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন হইবে। মহানবী (স) বলিলেন, "জানিয়া রাখ ! জাহিলী যুগের সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কার আজ আমার পদতলে দলিত। হে মানব জাতি ! তোমাদের সকলের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক এবং তোমাদের সকলের পিতা একই মানব। জানিয়া রাখ ! তাক্ওয়া ভিন্ন অন্য কোন কারণে কোন অনারবের উপর কোন আরবের, কোন আরবের উপর কোন অনারবের, কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের বা কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নাই। নিশ্চয় এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। আর সমগ্র মুসলিম জাতি একটি ভ্রাতৃসংঘ। দাসদাসীদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করিও। তোমরা নিজেরা যাহা খাইবে, তাহাদিগকে তাহাই খাইতে দিবে। তোমরা নিজেরা যাহা পরিধান করিবে, তাহাদিগকে তাহাই পরিধান করিতে দিবে। নারী জাতির প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিও। নিশ্চয় নারীদের নিকট তোমাদেরও অধিকার প্রাপ্য রহিয়াছে এবং তোমাদের নিকট তাহাদেরও অধিকার প্রাপ্য রহিয়াছে। এই মহাপবিত্র মাসে, এই মহাপবিত্র নগরীতে আজিকার দিনটি যেরূপ মহাসম্মানিত, তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল, কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের প্রত্যেকের নিকট সেইরূপ হুরমত ও সম্মানের যোগ্য" (শিব্‌লী নুমানী, সীরাতু'ন-নাবী, আজমগড় ১৩৬৯ হি., ২/১খ, ১৪৯, ১৫৪-৫৫)।

মহানবী (স)-এর উক্ত ভাষণে দেখা যায়, তিনি শুধু আরবের লোকদিগকে নহে, বরং পৃথিবীর মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ লেখক Goldziher স্বীয় গ্রন্থে Muhammadanische Studien (=Muslim Studies, সম্পা. S. M. Stern ও অনু. C. R. Barber and S. M. Stern, London 1967) "আরব গোত্রসমূহ ও ইসলাম" বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনায় তিনি বিশ্ব-মানবতার মহান উদ্গাতা মহানবী (স)-এর বিশ্বমানবতাবাদী শিক্ষা ও নীতির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু নিজ প্রকৃতি ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি-সংস্কৃতির কুপ্রভাবের ফলে Goldziher নবী-রসূলগণের ঐশী আহ্বানের খোদায়ী কল্যাণ ধারার প্রতি বিমুখ থাকিবার ফলে মহানবী (স)-এর গোত্রবাদ, বর্ণবাদ ও ভাষাবাদবিরোধী নীতি ও শিক্ষাকে মানব প্রেমমূলক নীতি ও শিক্ষা মনে না করিয়া উহাকে মহানবী (স)-এর নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি সাময়িক নীতি ও ব্যবস্থা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "মুহাম্মাদ (স) গোত্রবাদবিরোধী নীতি ও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন মদীনার আনসার গোত্রসমূহের সাহায্য লাভের উদ্দেশে, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং মক্কার কুরায়শ বংশীয় শত্রুদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিবার জন্য।" বস্তুত মহানবী (স)-এর গোত্রবাদ-বর্ণবাদ, ভাষাবাদবিরোধী নীতি ও শিক্ষা ছিল নিছক মানবতা-প্রেমউদ্ভূত নীতি ও শিক্ষা।

পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণের একটি দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহারা সত্যকে স্বীকার করিতে চাহেন না। কুরআন মাজীদের মৌল শিক্ষা— বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-মানবতার ঐক্য ও সংহতির দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মাজীদের কোন শিক্ষা ও নীতিতে সুবিধাবাদ বা সাময়িকতাবাদের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। ইহার সকল শিক্ষাই সর্বজনীন ও সমগ্র মানব জাতিকেন্দ্রিক। উহার কোথাও পারস্পরিক বিরোধিতা বা অপ্রাসঙ্গিকতা দৃষ্ট হয় না। কুরআন মাজীদের শিক্ষার সর্বজনীনতার উদাহরণ হিসাবে মানুষের প্রতি শিরক বর্জন ও তাওহীদ গ্রহণের আহ্বানসম্বলিত নিম্নোক্ত আয়াতকে উল্লেখ করা যায় ঃ "(হে রাসূল !) তুমি বল— হে কিতাবধারী জাতিসমূহ! যে কথা আমাদের ও তোমাদের সকলের নিকট সমানভাবে মান্য, উহার দিকে তোমরা আইস। উহা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও 'ইবাদত করিব না" (৩ ঃ ৬৪)।

প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মনগড়া ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, কুরআন মাজীদ মানুষকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব তথা বিশ্ব-মানবতার ঐক্য ও সংহতির শিক্ষা দেয়। ইহা সমগ্র মানব জাতির সামাজিক সুবিন্যাসের উদ্দেশে মানুষের অন্তরের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্য ও সংহতির পর্যায়ক্রমিক সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে ইহা অন্তরের বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলিম জাতিকে একটি সীমারেখার মধ্যে স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহা পূর্ববর্তী কোন রাসূলের উম্মাত হইবার দাবীদার তাওহীদপন্থী জাতিসমূহকে একটি সীমারেখার মধ্যে স্থাপন করিয়াছে।

তৃতীয় পর্যায়ে ইহা সেইসব লোককে একটি সীমারেখার মধ্যে স্থাপন করিয়াছে, যাহারা কোন নবী-রাসূলের ধর্মানুসারী না হইলেও তাওহীদে বিশ্বাসী এবং তাহারা কোন সৃষ্ট বস্তুকে মা'বুদ মনে করিয়া পূজা করে না। চতুর্থ পর্যায়ে ইহা সেই সকল লোককে একটি সীমারেখার মধ্যে স্থাপন করিয়াছে, যাহারা মানব সমাজে মানবতা প্রতিষ্ঠার সাধারণ উদ্দেশে পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর লোকদের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত থাকে। পঞ্চম পর্যায়ে ইহা সেই সকল লোককে একটি সীমারেখার মধ্যে স্থাপন করিয়াছে, যাহারা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পূর্বোল্লিখিত শিক্ষার বিরোধী এবং কুফ্‌র ও শির্‌কের উপর থাকিয়া মানুষের নিকট হইতে মৌলিক মানবীয় অধিকার কাড়িয়া লইতে সচেষ্ট থাকে। কুরআন মাজীদের শিক্ষা অনুসারে প্রথমোক্ত চার পর্যায়ের লোক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার অংশীদার হইতে পারে। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার বিরোধ ও সংঘাত রহিয়াছে শুধু শেষোক্ত পর্যায়ের লোকদের সহিত। তবে ইহাদের জন্যও সন্ধির পথ খোলা রহিয়াছে। ইহারা চাহিলে সংঘর্ষের পথ পরিত্যাগ করিয়া মানব সমাজে সাধারণ মানবতা প্রতিষ্ঠায় উক্ত চার পর্যায়ের লোকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে।

ইসলামের লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা। কুরআন মাজীদের উদ্ধৃত আয়াতে এবং বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণে তাই "হে মানব জাতি" এই সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। শুধু উদ্ধৃত আয়াতে নহে, বরং কুরআন মাজীদের যেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিশ্ব-মানবতার ঐক্য ও সংহতির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন, সেখানেই তিনি 'হে মানব জাতি !' এই সম্বোধন পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তবে যেহেতু কুরআন মাজীদের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের নীতি ও শিক্ষার প্রথম ও প্রত্যক্ষ আহ্বায়ক মুসলিম জাতি, তাই তাহাদের ঐক্যানুভূতিকে শক্তিশালী রাখিবার উদ্দেশে তাহাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব তথা মুসলিম-ভ্রাতৃত্বকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি করা হইয়াছে। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা সমগ্র মানব জাতির প্রতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রকৃত আহ্বায়ক ও উহার প্রকৃত আদর্শ হইতে পারিবে। বিদায় হাজ্জের সম্পূর্ণ ভাষণ পাঠ করিলে এই বিষয়টি বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ইসলাম গোত্রবাদের বিষাক্ত ফল অহংকার, মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্ববোধ, গোত্র-বৈষম্যবোধ ও মিথ্যা গৌরববোধকে বিলুপ্ত করত তদস্থলে ইসলামী বিশ্ব জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠিত করিবার যে মহান কার্যটি সাধন করিয়াছে, উহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে জাহিলী যুগে আরবদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্নমুখী গোত্রবাদ ও উহার বিষময় ফল সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

আরবের গোত্রবাদের ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক। এক গোত্রের অন্তর্গত লোকগণ পারস্পরিক রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজদিগকে অন্য গোত্রের লোকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিত। যদিও এক গোত্রের লোকের সম্মুখে অন্য গোত্রের সদস্য হইবার পথ রুদ্ধ ছিল না, তথাপি এইরূপ ঘটনা ঘটিবার ক্ষেত্রে সদস্যভুক্ত ভিন্ন গোত্রীয় লোককে সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকেরা উদারতা ও সৌহার্দ্যের খাতিরে নিজেদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র বা সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করিত।

কোন গোত্রের লোকদের অন্যান্য গোত্রের লোকদের উপর অহংকার ও গৌরববোধের ভিত্তি হইত তাহাদের পূর্বপুরুষগণের অতীত গৌরবময় কীর্তি ও ঐতিহ্য। বংশানুক্রম একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহা কোন গৌরবের বিষয় ছিল না, হইতে পারেও না। গৌরববোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের মূলে ছিল গোত্রের পূর্বপুরুষগণের গৌরবময় কীর্তিকলাপ। কোন গোত্র প্রাচীন হইলেও যদি উহার পূর্বপুরুষগণের গৌরবময় কীর্তিকলাপ অন্য গোত্রের পূর্বপুরুষগণের কীর্তিকলাপ অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইত, তবে শেষোক্ত গোত্রের উপর প্রথমোক্ত গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী দুর্বল হইয়া পড়িত।

গোত্রবাদের বহিঃপ্রকাশ প্রধানত তিন প্রকারে ঘটিত ঃ (১) ভিন্ন গোত্র বা গোত্রসমূহের উপর নিজ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় কবিতা রচনা (মুফাখারা), (২) যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ গোত্রের গৌরবসূচক স্লোগান উচ্চারণ (শি'আর) এবং (৩) এক গোত্রের সহিত অন্য গোত্রের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন (তাহালুফ)।

কবিতায় গৌরব-গাথা রচনা ঃ সাধারণত গোত্রের কবিগণ ও বীরগণ নিজ গোত্রের প্রশংসায় ও ভিন্ন গোত্র বা গোত্রসমূহের নিন্দায় কবিতা রচনা করিত। এই সব কবিতার মূল সুর ছিল নিজ গোত্রের প্রশংসা ও ভিন্ন গোত্রের নিন্দার মাধ্যমে আত্মগৌরব প্রকাশ। উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই শ্রেণীর কবিতা ও কবিতা রচনার কার্য মুনাফারাত (নিন্দাবাদের প্রতিযোগিতা) ও মুখায়ালা (আত্মগৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতা) নামেও আখ্যায়িত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে গোত্রের বীর পুরুষগণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধাগণের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া নিজ গোত্রের দানশীলতা, মেহমানদারী, বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, উদারতা, মহানুভবতা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্যক্তিগত বীরত্বের কথা বর্ণনা করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিত। বেদুঈন গোত্রের লোকদের নিকট উক্ত কবিতা আবৃত্তি ইন্‌তিখা নামে পরিচিত ছিল। আত্মগৌরব প্রকাশের উক্ত প্রথা আরবদের সমাজে এইরূপ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল যে, একদা বানূ তামীম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিতে পারি— তবে শর্ত এই যে, আপনি আমাদের সহিত নিজ গোত্রের গৌরব-গাথা আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন। মহানবী (স) তাহাদের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরা, ৯৩৪)।

গোত্রবাদের আলোচ্য ধারা অনেক সময়ে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিত। বিখ্যাত ফিজারের যুদ্ধ এইরূপ গৌরব-গাথা আবৃত্তি প্রতিযোগিতারই ফল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল হাওয়াযিন গোত্র ও কিনানা গোত্রের মধ্যে। একদা কিনানা গোত্রীয় বাদ্‌র ইব্‌ন মা'শার নামের একটি লোক আরবের বিখ্যাত মেলা 'উকাজ'-এর এক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে দাবী করিয়া বসিল যে, সে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং তাহার গোত্র আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র। ইহাতে হাওয়াযিন গোত্রের লোকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল (ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহি, আল-'ইকদুল-ফারীদ, তা.বি., ৩খ., ১০৮)। কখনও কখনও যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশেও গৌরব-গাথা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে চিহ্নিত করিবার জন্য বিচারক নিযুক্ত থাকিত। বিচারকের রায় মানিয়া লইবার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া উভয় পক্ষ যামানত প্রদান করিত। প্রতিযোগিতায় যে পক্ষ বিজয়ী হইত, উহাকেই শ্রেষ্ঠতর মানিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান হইত।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অনেক সময়ে এক গোত্রের কবিগণ ভিন্ন গোত্রের নিন্দাবাদে (মুহাজাত) কবিতা আবৃত্তি করিত। গোত্রবাদের প্রকাশ

কখনও কখনও ঘটিত মেহমানদারীর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। মেহমানদারীতে এক গোত্র অন্য গোত্রকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে সর্বোৎকৃষ্ট উটসমূহ বাছিয়া বাছিয়া মেহমান আপ্যায়নের জন্য যবেহ করিত। এই প্রতিযোগিতা তা'আকুর (উট যবেহ করিবার প্রতিযোগিতা) নামে পরিচিত ছিল। এই প্রথার শিকড় সমাজের এত গভীরে পৌঁছিয়াছিল যে, ইসলামের আগমনের পরও কোনও কোনও গোত্রের মধ্যে উক্ত 'উট নিধন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। অবশ্য মুসলিম আইনবিদগণ ও হাদীছশাস্ত্রবিদগণ সর্বদা উহাকে শারী'আত-বিগর্হিত কার্য বলিয়া আখ্যায়িত করত সমাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা গোত্রবাদের ভিত্তিতে যবেহকৃত উটকে মূর্তিপূজার বেদীতে বলি প্রদত্ত উটের ন্যায় হারাম বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরবসূচক স্লোগান উচ্চারণ ঃ গোত্রবাদের এই ধারায় যুদ্ধক্ষেত্রে গোত্রের লোকদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিজ গোত্রের গৌরবসূচক ধ্বনি ও স্লোগান উচ্চারণ করা হইত।

গোত্রবাদের উক্ত ধারার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা)-এর কঠোরতা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা)-কে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইবার কালে তাঁহাকে প্রদত্ত উপদেশমালায় বলিয়াছিলেন, "যদি কখনও একাধিক গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় এবং উহাতে কেহ কোনও গোত্রের দোহাই দিয়া লোকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানায় তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই যুদ্ধ শয়তানের প্ররোচনায় সংঘটিত হইতে যাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চার্য ধ্বনি বা স্লোগান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। গোত্রবাদভিত্তিক ধ্বনি ও স্লোগান পরিত্যক্ত হইয়া তদস্থলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসম্বলিত স্লোগান গৃহীত হয়। বদরের যুদ্ধের স্লোগান ছিল আহাদ আহাদ (এক আল্লাহ, এক আল্লাহ); উহুদের যুদ্ধের স্লোগান ছিল আমিত, আমিত (মৃত্যুর ঘরে পৌঁছাইয়া দাও, মৃত্যুর ঘরে পৌঁছাইয়া দাও); মক্কা বিজয়ের অভিযানে স্লোগান ছিল 'য়া বানী 'আবদি'র-রাহমান, য়া বানী 'আব্দিল্লাহ, য়া বানী 'উবায়দিল্লাহ (হে বানূ 'আব্দি'র-রাহমান গোত্রের লোকগণ, হে বানূ 'আবদিল্লাহ গোত্রের লোকগণ, হে বানূ 'উবায়দিল্লাহ গোত্রের লোকগণ) ইত্যাদি (ইব্ন হিশাম, সীরা, তা. বি., ৪৫)।

এক গোত্রের সহিত অন্য গোত্রের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন ঃ গোত্রবাদের আরেকটি ধারা ছিল এক গোত্রের সহিত অন্য গোত্রের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন। একাধিক কারণে এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত হইত। উহাদের একটি ছিল কোন গোত্রের দুর্বল ও ক্ষুদ্র হওয়া। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র গোত্র অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সবল ও বৃহৎ গোত্রের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইত। বলা বাহুল্য, ন্যায় ও ইনসাফকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে নহে, বরং গোত্রবাদের ভিত্তিতে গোত্রে গোত্রে বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ জোরদার করিবার উদ্দেশেই এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত হইত।

মহানবী (স) ঐরূপ চুক্তি সম্পাদন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ "ইসলামে (গোত্রবাদের ভিত্তিতে) কোনরূপ মৈত্রী চুক্তি (তাহালুফ) নাই।" তাঁহার নিষেধের কারণ এই যে, ইসলাম ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সমগ্র মুসলিম জাতিকে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছে। সেক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক উদ্দেশে একাধিক গোত্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়া অনুমোদিত হইতে পারে না। মহানবী (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল গোত্রবাদের ও উহার বিষময় ফল হইতে মুসলিম সমাজকে পবিত্র রাখিয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। মহানবী (স) অন্য হাদীছে গোত্রবাদের ভিত্তিতে একাধিক গোত্রের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি বা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন নিষিদ্ধ করিয়া জাহিলী যুগে সম্পাদিত যাবতীয় ন্যায়ভিত্তিক চুক্তিকে মান্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান সম্পর্কিত চুক্তির বিষয়ে মহানবী (স) অনুরূপ আদেশ দিয়াছেন।

গোত্রবাদ, বর্ণ-বৈষম্যবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম যে বিশ্বাস ও নীতিকে প্রচার করিয়াছে, ইসলামের ইতিহাসে উহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়িয়াছে। এইরূপ বলা অসঙ্গত হইবে না যে, মুসলিম উম্মা দুই-একটি ব্যতিক্রমমূলক দৃষ্টান্ত ছাড়া সর্বদা মূলত গোত্রবাদের বিরোধী রহিয়াছে। ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে মুসলিম উম্মা-র মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ গভীররূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এতদসহ উহার অনুভূতিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণাও ইসলামের অন্যতম নীতি হিসাবে পালিত হইয়া আসিতেছে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে যখন বর্ণ বৈষম্যবাদ, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মানবতাবিরোধী সংকীর্ণ মতবাদ ও মানসিকতা মানব সমাজে প্রবল রহিয়াছে, তখনও এই উম্মা উহার প্রভাব হইতে সামগ্রিকভাবে মুক্ত রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ভৌগোলিক ও রক্ত-সম্পর্কভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদ (Nationalism)-এর যে বিষবাষ্প পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিল, জামালু'দ-দীন আফগানী, মুফ্তী মুহাম্মাদ 'আবদুহ ও ড. মুহাম্মাদ ইকবাল উহার বিরুদ্ধে তুমুল জিহাদ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান মুসলিম জাহানে ঐক্য ও সংহতির যে আন্দোলন চলিতেছে, উহার মূলেও ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমৃদ্ধ ইসলামী আন্দোলন সক্রিয় রহিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী ঐক্যের অন্যতম উদ্গাতা 'আল্লামা ড. মুহাম্মাদ ইকবালের কবিতার বিপুল অংশে বর্ণবাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিন্দাবাদ উচ্চারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্তমান শতাব্দীর পাশ্চাত্য— তথাকথিত সভ্য ও উন্নত জাতিসমূহ বর্ণবাদ, রক্ত সম্পর্কভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নাগপাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। বর্ণবাদ, রক্তসম্পর্কভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অভিশাপ পাশ্চাত্যে গ্রীক সভ্যতার যুগেও জঘন্য আকারে বিদ্যমান ছিল। এরিস্টোটল এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, গ্রীস দেশ যেহেতু পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ— ইহাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তাই ইহার অধিবাসীদের মধ্যে পৃথিবীর সকল জাতির গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছে। তিনি মনে করিতেন, উত্তর য়ুরোপের অধিবাসিগণ সাহস ও বীরত্বের অধিকারী হইলেও মেধা ও প্রতিভায় ইহারা দুর্বল। এশিয়ার অধিবাসিগণ প্রতিভাবান ও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কর্মস্পৃহা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার গুণ হইতে ইহারা বঞ্চিত। এরিস্টোটল বলেন, একমাত্র গ্রীকগণই রাষ্ট্রনায়ক হইবার যোগ্যতার অধিকারী (Hernan Santa Cruz. Racial Discrimination, New York, United Nations, 1971, p. 1)।

শুধু গ্রীকগণ নহে, বরং রোমানগণও দাবী করিত, "আমরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার অধিকারী।" খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের যুগে পাশ্চাত্য দেশে বর্ণবাদ ও

জাতিভেদ প্রথা এত তীব্র ছিল যে, উহাকে বিলুপ্ত করিতে খৃষ্ট ধর্মকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। য়াহূদী জাতির সহিত খৃষ্টান জাতির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। উহার ফলে খৃষ্ট ধর্মের উন্নতি ও আধিপত্যের যুগে য়াহূদীগণ অধিকাংশ মৌলিক মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল (পূ. গ্র. পৃ. ৩-৪)। আধুনিক যুগে জার্মানীতে য়াহূদী জাতির প্রতি হিটলার যে লোমহর্ষক অত্যাচার চালাইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অজানা নহে। নামিবিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও বর্ণবাদের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা চলিতেছে (পূ. গ্র., পৃ. ২১৪, ২২৪ ও ৮৫৭)।

বর্ণ-বৈষম্যবাদের উক্ত বিভীষিকার মুকাবিলায় কুরআন মাজীদের শিক্ষা ও মহানবী (স)-এর নির্দেশাবলী গোত্রবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যবাদ হইতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বরং ইসলামের শিক্ষার গুণে মুসলিম সমাজে যে ঐক্য ও সাম্যের মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে, উহাই তাহাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রবল রহিয়াছে। Goldziher পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে এতদসম্পর্কিত সন্দেহ ও অভিযোগসমূহ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মুসলিম সমাজের ব্যতিক্রমমূলক দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অনভিপ্রেত— যাহা মানব প্রকৃতির পারস্পরিক মতভেদ এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে— মুসলিম সমাজের সাধারণ ও সামগ্রিক পরিচয় হিসাবে চিহ্নিত করিয়া স্বীয় কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে মুসলিম সমাজ জীবনের দুইটি ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট গোত্রবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দাবী করিয়াছেন, "মুসলিম সমাজ সামগ্রিকভাবে সংকীর্ণ গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।" তিনি বলিয়াছেন, "মুসলিম সমাজের সাহিত্য ক্ষেত্র ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র সংকীর্ণ গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল।" এই স্থলে আমরা সমালোচক Goldziher সাহেবের উক্ত সমালোচনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করিব।

সাহিত্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ঃ মুসলিম সমাজের কোন কোন অনারব সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় দুইটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন ঃ (১) কুরআন মাজীদের শিক্ষা আরবদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করিয়াছে। ইহা গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, ভাষাভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ববাদ ইত্যাদি যাবতীয় সংকীর্ণতাবাদের পথ মুসলিম উম্মাহর জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। (২) কোন কোন চরমপন্থী লেখক তাঁহাদের রচনায় আরব বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্য, অভিধান, বংশ-পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ক রচনায় উক্ত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় (পূ. গ্র.)।

লেখক-প্রবর Goldziher নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সাহিত্যে গোত্রবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি সংকীর্ণ মানসিক প্রকাশের পরিমাণ তেমন বেশী নহে (পূ. গ্র., পৃ. ৪৮)। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, অনারব মুসলিমদের মধ্যে আরবদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে যাহারা তৎপর থাকিত, তাহারা ছিল অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী। বাস্তব ঘটনা এই যে, ইরানের অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়, সিরিয়ার নাবাতীগণ (সিরিয়ার অধিবাসী খৃষ্টান সম্প্রদায়বিশেষ), য়াহূদী জাতি ও খৃষ্টান জাতির একটি অংশ— যাহাদের নিকট ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তৃতি অসহনীয় ছিল— নিজদিগকে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে শামিল করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যান্য ষড়যন্ত্রের সহিত আরব মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনারব মুসলিমদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইয়া বেড়াইত।

ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে মুসলিম সমাজের কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল। এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ Goldziher নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলিম সমাজে যে গোত্রবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ দেখা দিয়াছিল, উহা ছিল সাময়িক ও স্বল্প বিস্তৃত ব্যাপার, উহার স্থায়িত্ব কাল ও বিস্তৃতি ব্যাপক ছিল না। এতদ্ব্যতীত এই সংকীর্ণ মানসিকতা অনেকাংশে শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলিম সমাজের আরব ও অনারব ধর্মীয় নেতাগণ সর্বদা উক্ত সংকীর্ণ মানসিকতার নিন্দা করিয়াছেন এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উহা হইতে মুক্ত রহিয়াছে। 'আব্বাসী খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল না। খুব বেশী বলিলে উহাকে 'আব্বাসী শাসন অথবা আরবদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা যায়। উহা এইজন্যও তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নহে যে, 'আব্বাসী শাসনের বিরুদ্ধে স্বয়ং আরব গোত্র কুরায়শ বা হাশিমীগণও একাধিকবার বিদ্রোহ করিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটা সাধারণ ব্যাপার।

ইসলামের প্রথম প্রকাশ আরবে ঘটিলেও উহা শুধু আরবদের হাতে রাজ্য ও শাসনক্ষমতা দিতে আসে নাই ইসলাম পৃথিবীতে আসিয়াছে সর্বব্যাপক উচ্চতম পর্যায়ের মানবতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে। আরবদের মধ্যে যতদিন রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা ছিল, ততদিন তাহারা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল। কিন্তু যখন তাহারা উক্ত যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিল, তখন নেতৃত্বের আসন হইতে তাহারা স্বভাবতই বিতাড়িত হইল।

ইমাম আল-মাওয়ারদী (আল-আহকামু'স-সুলতানিয়্যা) এবং আরও অনেকে এই মত পোষণ করেন, 'নেতৃত্ব কুরায়শ গোত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে' (তাঁহারা "আল-আ'ইম্মাতু মিন কুরায়শিন" "কুরায়শ গোত্র হইতেই নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হইবে"), এই হাদীছের ব্যাখ্যায় উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, খিলাফাত অনারবদের হাতেও পৌঁছিয়াছে এবং সাধারণভাবে মুসলিম জনগণ কর্তৃক উহা স্বীকৃতিও পাইয়াছে। ইমামাত ও খিলাফাতের ব্যাপারে শী'আগণের বিশ্বাস ও নীতি অধিকতর কঠোর ও কেন্দ্রাভিমুখী। তাহাদের মতে ইমামাত ও খিলাফাত শুধু 'আহ্ল-ই বায়ত' অর্থাৎ মহানবী (স)-এর পরিবারের লোকগণের অধিকার। ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূন তাঁহার বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা'-য় খিলাফাত ও ইমামাত-এর মধ্যকার পার্থক্য সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বাস্তব ঘটনা এই যে, আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত-এর সাধারণ ভূমিকা খিলাফাতের অধিকারকে বিশেষ কোন গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার পক্ষে ছিল না।

সমালোচক Goldziher তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, "অনারব মুসলিমদের মধ্যে গোত্রবাদ প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল।" প্রশ্ন জাগে : যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে সমগ্র মুসলিম জাহানে একটি আরব গোত্রের শাসন শতাব্দীকাল স্থায়ী হইল কি করিয়া ? গাযনাবী ও অন্যান্য অনারব বংশ— যাহারা খুরাসান ও অন্যান্য প্রদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল— বাগদাদের আরব খলীফাগণের দরবার হইতে উপাধি লাভ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিল কেন ? তুগলাক বংশীয় অনারব কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেন কেন ?

এই স্থলে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, উহা এই যে, বাগদাদের আরব খিলাফাত কোন আরব বা অনারব মুসলিম গোত্রের আক্রমণে ধ্বংস হয় নাই, বরং উহা ধ্বংস হইয়াছে অমুসলিম চিংগীয খান ও হালাকু খানের আক্রমণে। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজে আরব অনারব গোত্রবাদ বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মানসিকতা প্রবল আকারে বিদ্যমান ছিল না। গোত্রবাদ বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কোথাও কোথাও কিয়ৎ পরিমাণে সক্রিয় থাকিলেও রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী সাম্যের আদর্শই বিজয়ী ছিল।

পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মধ্যে আরেকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, উহা এই যে, তাঁহারা মুসলিম লেখক, ধর্মীয় নেতা, আওলিয়া' প্রমুখ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণকেও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মানুষের শ্রদ্ধা লাভকারী বিবেচনা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিয়াছেন, অনারব মুসলিম মনীষিগণ আরব মুসলিমদের নিকট এবং আরব মুসলিম মনীষিগণ অনারব মুসলিমদের নিকট সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন বিবেচিত হইতেন না। উল্লিখিত পণ্ডিত প্রবরদের উক্ত ধারণা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপুল সংখ্যক মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ ও হাদীছশাস্ত্রবিদ ছিলেন অনারব। তাঁহারা বিশেষত মা ওয়ারা'উ'ন্-নাহ্র-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা অনারব হইয়াও আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'তাহারা অনারব' শুধু এই অভিযোগে ইঁহাদের গ্রন্থসমূহ কোথাও কখনও কম সমাদৃত হয় নাই। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইব্ন খালদূন বলেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ বাহক ছিলেন অনারব।" বলা অনাবশ্যক যে, মুসলিম সমাজের আরব-অনারব কোন অংশই এই সকল মনীষীর ফলকে তাঁহাদের অনারব হইবার অপরাধে (?) কখনও মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্য মনে করে নাই।

আরব লেখকগণ বংশ-পরিচয়শাস্ত্রের চর্চায় যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখাইয়াছেন, উহাতে যতটুকু আত্মগৌরববোধের প্ররোচনা ছিল, তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল হাদীছশাস্ত্রের সনদের বর্ণনাকারীদের জীবনেতিহাস জানিবার জন্য।

গোত্রবাদ ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলিম সমাজে প্রবল না হইবার আরেকটি কারণ ছিল— গোত্রবাদ ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সতর্ক ও কঠোর ব্যবস্থা। এতদসম্পর্কে হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশসমূহ ও তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী দ্বারা উক্ত সতর্কতা ও কঠোরতার বিষয় প্রমাণিত হয়। এই স্থলে উল্লেখ্য, Goldziher স্বীয় গ্রন্থে আবূ 'উবায়দা মা'মার ইবনু'ল-মুছান্না-এর অপরাধসমূহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, H. A. R. Gibb নামক লেখক উহা খণ্ডন করিয়াছেন (E. I.^{2}-এর আবূ 'উবায়দা ঃ প্রবন্ধ দ্র.)।

গোত্রবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের চরমপন্থী উদ্গাতাগণ ইহার পক্ষে নিজেদের রচনার মাধ্যমে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিতে তৎপর ছিল, উহা কোন কালেও মুসলিম সমাজে ঠাঁই পায় নাই। কারণ এই সব চরমপন্থী গুরু, এইরূপ কতিপয় অনারব ব্যক্তির শিক্ষা লোকদের মধ্যে সোৎসাহে প্রচার করিত, ইসলামী মূল্যবোধের নিকট যাহারা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফির'আওন, নামরূদ প্রভৃতি চিরঘৃণিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা যায়। বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যক্তিবর্গ মুসলিম সমাজের নিকট কোন কালে প্রিয় ছিল না এবং কোনক্রমে মুসলিম জাতির নিকট গৌরবের পাত্র বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে না।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কখনও কখনও আরব গোত্রসমূহের নিজেদের মধ্যে গোত্রবাদভিত্তিক বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যায়। আরব উপদ্বীপের উত্তরাংশের ও দক্ষিণাংশে য়ামানের আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অনেক সময় এইরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে এবং উহা মুসলিম জাতির অনেক ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তবে এক দিক দিয়া উম্মাহর সকল যুদ্ধ-বিগ্রহকে ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলিমগণ সর্বদা গোত্রবাদকে ঘৃণা করিয়াছেন এবং কুরআন মাজীদের ৪৯ ঃ ১৩ আয়াতের শিক্ষাকে মানিয়া চলিয়াছেন (উপরে দ্র.)।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম উহার অনুসারীদের সমাজ হইতে গোত্রবাদভিত্তিক আত্মগৌরব, প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক নিন্দাবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বিদূরিত করত তাহাদের মধ্যে তদস্থলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও দীনী মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আল্লাহ্র নি'মাত নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আর তোমরা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নি'মাতকে স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরসমূহকে পারস্পরিক স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। ফলে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হইয়া গেলে" (৩ ঃ ১০৩)।

সারকথা এই যে, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আরব গোত্রসমূহ উহাদের পুরাতন আত্মগৌরববোধ ও পরগোত্র নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করত ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সৎ কার্যাবলী ও সৎ চরিত্রকে ফযীলত (মর্যাদা) ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত ভিত্তি বলিয়া নির্দেশ করিতে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম উহার অনুসারীদের মধ্য হইতে গোত্রবাদভিত্তিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-কলহকে নির্বাসিত করত তাহাদের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ ও সাম্যবোধের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। আর মানুষের ইতিহাসে ইহাই সাম্য ও স্বাধীনতার পথে প্রথম সার্থক পদক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত আরও দ্র. কাওমিয়াত, আনসাব, কাবা'ইল প্রবন্ধসমূহ ঐ. (১) আহমাদ আমীন, দুহা'ল-ইসলাম, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৪৯-৭৮; (২) K. R. Minogue, Nationalism, প্রথম সং, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (৩) Lowis L. Snyder, The New Nationalism, ১ম সং, INC (New York) 1962 ; (৪) ঐ লেখক, The Idea of Racialism. (New York) 1963 ; (৫) Frederick Hartz, Nationality in History and Politics, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ. ; (৬) Barbara Ward, Nationalism and Ideology, ১ম সং. (New York 1966); (৭) Hernan Santa Cruz, Racial Discrimination, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত , নিউ ইয়র্ক ১৯৭১ খৃ. ; (৮) Goldziher, Muhammedanisch Studien, তা. বি, ১খ, ১৪৭-২১৬। এতদসহ ইং অনু. Muslim Studies, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ. ; (৯) Sami Zubaida, Race and Racialism, ১ম সং, লন্ডন ১৯৭০ খৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ মু. মাজহারুল হক

কাবা'ইলিয়া (قبائلية) ঃ (২) আলজিরীয় তেল্ল (تل=Tell) অঞ্চলে অবস্থিত একটি পার্বত্য এলাকা। কাবা'ইলিয়া শব্দটি ফরাসীদের

সৃষ্টি; ইহার অর্থ "কাবা'ইলদের দেশ", বিলাদু'ল-কাবা'ইল [আদিম অধিবাসী (গোত্র)-দের দেশ]। নামটি উদ্ভূত হইয়াছে অতি আধুনিক কালে। কেননা আরব ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিকগণের লেখায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত শব্দটি কথ্য ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বিদেশীদের অর্থাৎ য়ুরোপীয়দের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্ট। ১৬ শতকের পর হইতে য়ুরোপীয় লেখকগণই ভৌগোলিক পরিভাষাতে শব্দটি ব্যবহার করিতে থাকেন। 'কাবা'ইল' শব্দটির ব্যুৎপত্তি লইয়া সময়ে সময়ে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে; তবে ইহা আরবী কাবীলা: (قبيلة-গোত্র) শব্দের বহুবচনের রূপ 'কাবা'ইল (قبائل) হইতে উদ্ভূত মনে হয়। কোন কোন আরব লেখক শব্দটিকে বারবার-এর সমার্থকরূপেও ব্যবহার করিয়াছেন। রাওদু'ল-কিরতাস গ্রন্থের লেখক ইতোমধ্যেই শব্দটিকে এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে মারীনী সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নির্ণয় করিবার সময় (বিশেষ করিয়া আরবী পুস্তকটির পৃ. ২১৭ ও ২৩৩) অত্যন্ত সচেতনভাবে কাবা'ইল এবং আরবগণের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন।

ভূতত্ত্ব ও অর্থনীতি ঃ মিতিজা সমভূমির পূর্বদিকে একটি উচ্চভূমির বেড় একেবারে তিউনিসিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্বত্য অঞ্চলগুলি লইয়াই কাবা'ইলিয়া এলাকা গঠিত। ইহার সঙ্গবদ্ধতা যতটা প্রাকৃতিক ততটাই মানবিক। ভূমধ্যসাগরের সন্নিহিত এলাকাতে অতি প্রাচীন পাথরসমূহ গ্রানাইট ও মিকাসিয়াসের (Granite and micaceous) ভিত্তিভূমি যাহা খুব সম্ভব উত্তর আফ্রিকার ভূতাত্ত্বিক গঠন রচনা করিয়াছে, উচ্চে উঠিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় বলয় সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও কোথাও হঠাৎ মালভূমির রূপ নিয়াছে, যাহা ভূমিকম্প দ্বারা গভীরভাবে বিভাজিত হইয়া দীর্ঘ সমান্তরাল অভিযোগের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; যথা আরবাআনা-আথ-ঈরাতেন (সাবেক কোর্ট ন্যাশনাল) কল্লো এবং এই দুর্গের স্তূপ পর্বতসমূহ। স্ফটিক পাথরসমূহ অধিকতর আধুনিক কালের স্তর। সেগুলির মধ্যে দুইটির বিরাট ভৌগোলিক গুরুত্ব রহিয়াছে ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত চুন জাতীয় পাথর তীক্ষ্ণ চূড়াবিশিষ্ট দীর্ঘ ভয়ঙ্কর পর্বতমালাতে পরিণত হয়, সেগুলির মধ্যে একটি সর্বোচ্চ চূড়া জুরজুরা, ইহা লাল্লা খাজ্জা ২,৩০৮ মিটার উচ্চ, জাবাল বাবর ২,০০৪ মিটার উচ্চ। তৃতীয় পর্যায়ের বেলে পাথরের স্তর ক্রমেই অধিকতর উপরিভাগের স্তর হইয়া প্রসারিত হইয়াছে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে গিয়াছে এবং সেগুলি হইতে উদ্ভূত মাটির গুণে বনভূমি সৃষ্টি হয়। সাগরের নিকট বৃষ্টির পানি প্রবাহ কাবা'ইলিয়া বলয়ের উপর দিয়া বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। সেখানে প্রবাহ বস্তুত অগম্য খাড়া শিলার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলে। পালেসতো ও কেরাতা খাড়িমুখ এবং রুমেল খাড়িভূমির কিছুটা মুগ্ধকর সৌন্দর্য রহিয়াছে।

কাবা'ইলিয়ার উত্তর প্রার্শ্ববর্তী এলাকা আটলান্টিক মহাসাগর হইতে উত্থিত পানিকণাপূর্ণ বিরাট মণ্ডলের প্রভাবাধীন। ফলে সেখানে খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয়। আলজিরিয়াতে সর্বোচ্চ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৭৭৩ মিলিমিটার রেকর্ড করা হইয়াছিল। কল্লো পর্বতাঞ্চলে বেসোমবোর্গে উচ্চতার কারণে মধ্যশীত মওসুমে বৃষ্টি তুষারপাতে পরিণত হয়। উহা 'আয়নু'ল-হাম্মাম স্টেশনে (সাবেক Michelet) এক মিটার পর্যন্ত গভীর হয়। জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য এবং বালুকাপূর্ণ মাটির প্রাধান্য অরণ্যভূমি প্রসারের অনুকূল। এই অঞ্চলে বনভূমি বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী বর্তমান; প্রধানত ওক গাছ, মধ্যঢাল এলাকা একেবারে ছাইয়া রহিয়াছে। নুমিডীয় বেলে পাথরময় অঞ্চলে কর্ক গাছ (cork), যান (Chenes Zeens, quereus Mirbecku), আফারেস (afares) [quereus Castaneafolia] এবং বাল্লুত বা ওক বাদাম (hazelnutook) জাতীয় গাছ জন্মায়। ১০০০ মিটারের উপর উচ্চতায় জন্মায় দেবদারু গাছ; পূর্বে উহা জুরজুরার ঢালে প্রস্তরাদির স্তূপে জন্মাইত। কাবা'ইলিয়ার অধিবাসিগণের প্রাত্যহিক জীবনে বৃক্ষ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঃ বাড়ি-ঘরের নিকট তাহারা অ্যাশ গাছ (ash trees) লাগায়, সেগুলি দ্বারা আঙ্গুর বাগানে খুঁটি করে; গ্রীষ্মকালে এই গাছের পাতা গবাদি পশুকে খাওয়ায় এবং কাঠ দিয়া কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বাড়ী-ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করে। যায়তুন ও ডুমুর গাছ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে ৬০০ ও ১০০০ মিটার উচ্চতায় পর্যন্ত জন্মায়, এগুলো পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের খাদ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই সকল ভৌগোলিক উপকরণ, ভূমির গঠন, বাষ্পের প্রাধান্য, নিম্ন তাপমাত্রা এবং বনভূমি মিলিয়া কাবা'ইলিয়াকে পরিণত করিয়াছে এক উৎপাদনহীন পার্বত্য অঞ্চলে এবং বহিরাক্রমণের মুখে নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক জনসমষ্টির আশ্রয় স্থলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বারবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহারা অবিকৃত রাখিয়াছে। অত্যাবশ্যক যে বিশেষত্বসমূহ সেগুলিও অপরিবর্তিত রহিয়াছে, যেমন পুরাতন সামাজিক গঠন রূপ এবং রীতিনীতিসমূহ। ইসলাম গ্রহণ করিলেও একই সঙ্গে ইহারা বারবার ঐতিহ্যগত বিশ্বাসও সম্পূর্ণ পালন করিয়া থাকে। আরবী ভাষা বারবার আঞ্চলিক ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই, বৃহত্তর কাবা'ইলিয়া অঞ্চলের সর্বত্রই আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে।

কাবা'ইলিয়ার পর্বতসমূহ পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় পর্বতমালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, উভয়ের ভূদৃশ্যই এক অভিন্ন সভ্যতার চিহ্ন বহন করে। প্রথমত বসতবাটির ধরনের মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আরবাআনা-আথ-ঈরাতেন পার্বত্য অঞ্চলে গ্রামগুলির প্রাধান্য বেশী; খাড়ির রেখা ধরিয়া একটি প্রধান সড়ক, সেই সড়ক ধরিয়া লম্বালম্বি গ্রাম। পাথরের তৈরি ঘর, উপরে গোলাকার টালির ছাদ। এগুলিতে কয়েকটি পরিবারের একটি দল বাস করে, এরূপ দলকে বলা হয় খাররুবা। দলের সদস্যগণ একে অপরের ভাই বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রতি দম্পতি একটি ঘরে বাস করে, মাঝখানে একটা লম্বা বেঞ্চি দিয়া ঘরটি দুই ভাগে বিভক্ত ঃ একদিকে পরিবারের লোকেরা থাকে, আর একদিকে তাহারা গৃহপালিত পশু রাখে। একটি উঠানকে মাঝখানে রাখিয়া উহার চতুর্দিকে প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘর তৈরি করে। বাহিরের দিক মযবুত কাঠের দুই পাল্লার দরজা দ্বারা বন্ধ থাকে। যৌথ গ্রামের (ছাদাছ) বিপরীত হইল তুফিকা। সেগুলি বিচ্ছিন্ন কতগুলি কুঁড়ে ঘর নিয়া গঠিত। এই সমস্ত ঘরবাড়ি বেশ উঁচু করিয়া তৈরি করা হয় এবং আঁকাবাঁকা পথ দিয়া সেগুলিতে প্রবেশ করিতে হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে যে প্রতিবেশী বা অপরিচিত জনদের নিকট হইতে বিপদের বিরুদ্ধে আশ্রয় লাভের সাধারণ প্রবণতা বিদ্যমান। সেই চেতনাবোধ হইতেই এই ধরনের গৃহ নির্মাণের ঐতিহ্য আসিয়াছে। আর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে যে, সেই দেশের মাটি ব্যবহার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য, সেই জমিতে কাজ করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা মিটাইবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে। গ্রামে প্রবেশের মুখেই দেখা যায় ফসল মাড়াইয়ের শক্ত, সমতল বড় উঠান আর তেলের ঘানি। ঘরবাড়ির দেওয়ালের পাশে

মেয়েরা ছোট ছোট তরি-তরকারির বাগান করে। ঢাল অঞ্চলগুলি কচিৎ ধাপযুক্ত হইয়া থাকে, যায়তুন ও ডুমুর তরু-বীথি এবং যব চাষের উপযোগী। উপত্যকার তলদেশ দিয়া ওয়াদি প্রবাহিত হয়, দুই কিনারা খাড়া, সেগুলি খাটো খাটো গাছে আচ্ছাদিত; এই তলদেশ শীতল, অপ্রশস্ত, আর্দ্র এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। কাজেই সেই সব অঞ্চল জনবসতিহীন থাকিবার কারণ সহজেই বোধগম্য। অধিবাসিগণ উচ্চ এলাকায় বসবাস করে এবং খাড়ি হইতে খাড়িতে চলাচল করে। উপত্যকা যেখানে পলিময় সমতল বিস্তীর্ণ ভূভাগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেখানে অধিবাসিগণ উচ্চ স্থান ত্যাগ করিয়া যব ক্ষেতের মধ্যে তুফিকসমূহে ছড়াইয়া থাকে। ছোট কাবা'ইলিয়ার ন্যায় এখানেও লোকজন কখনও কখনও এরূপ ছড়াইয়া থাকে যে, পরিবারের কুঁড়েঘরগুলি ষাঁড় চরিবার চারণভূমির মধ্যে বিচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত দেখা যায়।

ভূগোলবিদগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এখানে স্তরে স্তরে জমি তৈরি করিয়া কৃষিকাজ করিবার রীতি অনুপস্থিত এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে নিয়া গিয়া পশু চারণের রীতিও নাই, অথচ অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ এই উভয় রীতি অনুসরণ করিয়া নিজেদের পরিবেশের সর্বোত্তম ব্যবহার করিয়াছে। ইহার পরিবর্তে কাবা'ইলিয়ার অধিবাসিগণ রূপা, তামা ও কাঠ দিয়া সাদামাটা ধরনের অলংকার, খোদাই করা টেবিল ও থালা-বাসন, বারকোশ ইত্যাদি তৈরি করে। আর মেয়েরা পশমী গালিচা ও মাটির তৈজসপত্র তৈরি করিয়া সেগুলিতে জ্যামিতিক নক্সার কারুকাজ করে। ফেরীওয়ালারা এক সময়ে ভূমধ্যসাগরের পরপারের দেশসমূহে নিয়া সেইসব দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। এই উদ্ভাবনী দক্ষতা এই ধরনের প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে যে এত ঘন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়; তিযি ঔযৌ-এর বড় কাবা'ইলিয়ার প্রধান অংশ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪০ জনেরও বেশী জনবসতি, আরবাআনা আথ-ঈ রাতেন জিলায় জনবসতির ঘনত্ব সর্বাধিক ২৫০ জন; বিজায়ার (সাবেক Bougie) ছোট কাবা'ইলিয়াতে জনসংখ্যার ৯৫ হইতে ১৪০ জন; কল্লোর ছোট কাবা'ইলিয়াতে এবং সীকদা (সাবেক Philippe ville) ও 'আন্নাবাতে (সাবেক Bone) জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭০ হইতে ৯৫ জন। এই অসাধারণ জনসংখ্যার ঘনত্ব একটি অত্যন্ত মযবুত গড়নের মানব পরিবেশের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। ইহা একটি জনবসতি যাহারা সর্বক্ষণ নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন বলিয়া ভয় করে, তাহাদের নিজেদেরকে টিকিয়া রাখিবার সহজাত মনোভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সে যাহাই হউক, কাবা'ইলীগণ যদি শুধু তাহাদের পার্বত্য জমির উৎপাদনের উপরে নির্ভর করিত তবে এত অধিক সংখ্যায় তাহারা সেখানে বাস করিতে পারিত না। নিজেদের সামান্য উৎপাদনের সঙ্গে তাহারা বাহির হইতে আনা বহুগুণ সম্পদ ভোগ করে। পার্বত্য অঞ্চলগুলি জনশক্তির বড় ভাণ্ডারস্বরূপ। সমভূমি অঞ্চলে, যেখানে জনবসতি আরও আগে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উন্নয়নশীল শহরগুলিতে যখনই শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই পার্বত্য অঞ্চল হইতে লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। দেশের রাজধানী আলজিয়ার্স অংশত একটি কাবা'ইলী শহরই; শহরতলী এলাকাসমূহ অপেক্ষমান মানুষের অঞ্চল, যাহারা শহরের অপরিচিত পরিবেশের সম্মুখীন হইতে তখনও সাহস করিয়া উঠিতে পারে নাই তাহারা সেখানে ভিড় করিয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে আঈন তায়া এলাকা, ১৯৫৪ খৃ. এখানকার অধিবাসী ছিল ২,৯১০ জন, ১৯৬৬ খৃ. সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২১,৯০৬ জন। পার্বত্যাঞ্চলের নগর কেন্দ্রগুলির জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে ঃ ১২ বৎসর সময়কালের মধ্যে তিযি ওযৌ-এর জনসংখ্যা ৬,০৫৬ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ২৫,৮৫২ জন; বিজায়ার জনসংখ্যা ২৯,৭৪৮ জন হইতে হইয়াছে ৫৯,৯৯১ জন; কন্সট্যানটাইনের জনসংখ্যা ১,১১,৩১৫ জন হইতে হইয়াছে ২,৪০,৬৭২ জন।

২০শ শতাব্দীর শুরু হইতে পূর্ব আলজিরিয়ার পার্বত্য এলাকার অধিবাসিগণ চাকুরীর সন্ধানে, এমনকি সাগর পাড়ি দিয়া ফ্রান্স এবং অন্যান্য সন্নিহিত দেশে যায়। ১৯৬৬ সনের আদমশুমারী হইতে দেখা যায় যে, আলজিরিয়ার মোট ২,৬৮,০০০ লোক বিদেশে কর্মরত রহিয়াছে। তাহারা পত্র দ্বারা ও টাকা পাঠাইয়া বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ফ্রান্সের ১৯৬৮ খৃ. আদম-শুমারীতে দেখা যায় যে, সেখানে আলজিরিয়ার সকল অঞ্চলের মোট ৬,১২,০০০ লোক কর্মরত রহিয়াছে। দুইটি কাবা'ইলী ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগ তিযি ওযৌ (বড় কাবা'ইলিয়া) ও সেতিফ (ছোট কাবা'ইলিয়া) হইতে আসিয়াছে ২০.৭৭% ও ২৫.৯২% অর্থাৎ সমগ্র আলজিরিয়ার বিদেশে কর্মরত লোকগণের ৪৬%-এরও বেশী এবং এই সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ১৬.৯% ও ১৪.৫%। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, বড় কাবা'ইলিয়াতে জন্মগ্রহণকারী প্রতি ৬ জনে ১জন বিদেশে অবস্থান করে। শ্রমজীবিগণ যে পরিমাণ অর্থ (সঞ্চয় ও ভাতা) তাহাদের পরিবারবর্গের নিকটে প্রেরণ করে তাহা বৎসরে ৯০০ মিলিয়ন আলজিরীয় দীনারে উন্নীত হইয়াছে। দেশ হইতে মদ বা কমলা জাতীয় ফল রফতানী দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ অর্জিত হয় তাহা হইতে এই অর্থের পরিমাণ বেশী। এই মোট পরিমাণ আয়ের প্রায় অর্ধেক প্রেরণ করিয়া থাকে কাবা'ইলিয়ার অধিবাসিগণ যাহাদের বর্তমানে মূল সম্পদ হইয়াছে তরুণদের শ্রমশক্তি।

বিদেশমুখী অভিবাসনের ফলাফল সবটা সুখের হয় নাই। ইহাতে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের আবাস এলাকার বৈশিষ্ট্য বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বড় ও ছোট কাবা'ইলিয়ার কয়েকটি অঞ্চল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জনসংখ্যার ২০-৫০% সাময়িকভাবে হারাইয়াছে। সর্বত্রই বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়; চাষাবাদ করিবার এবং বৃক্ষাদির চাষ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নাই। কৃষির ব্যাপ্তি কমিয়া যাইয়া গ্রামের আশেপাশে শাক-সব্জি ইত্যাদির চাষে আসিয়া সীমিত হইয়াছে এবং ক্রমেই অবনতির দিকে চলিয়াছে। প্রতি বৎসরই পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাগল ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা দিন দিনই কমিতেছে, বড় বড় পালের স্থলে স্বল্প সংখ্যক মাত্র গৃহপালিত পশু পালিত হয়। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়াছে, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার স্থলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। খাদ্য ও বস্ত্র স্থানীয় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতেই ক্রয় করা হয় বলিয়া দোকানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। যে ছিল আগে ফেরীওয়ালা সে এখন স্থায়ী বসবাসকারী ব্যবসায়ী। জীবনযাত্রার মান প্রায়ই বৃদ্ধি পাইতেছে; চিনি, চা, কফি এবং গমের রুটি এখন তাহাদের নিয়মিত খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। যাহারা বিদেশে চাকুরী করে তাহারা দেশে ফিরিবার সময়ে ক্যামেরা, ট্রানজিস্টার, রেডিও ইত্যাদি বিলাসসামগ্রী উপহারস্বরূপ লইয়া আসে। জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তীকালে তাহারা নূতন নূতন ধারণা, রুচিবোধ এবং কামনা-বাসনার প্রচলন করে। ফলে তাহাদের দেশবাসিগণের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। Renault

ফ্যাক্টরীতে কাজ করে এরূপ একজন তরুণ শ্রমিকের পক্ষে আধুনিক দুনিয়ার অভিজ্ঞতাহীন একজন বৃদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব মানিয়া লওয়া কঠিন। সে তখন গতানুগতিক জীবনধারা ত্যাগ করিয়া পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া নিজের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা নিয়া চিমনিযুক্ত আরও খোলামেলা বাড়িতে বাস করিতে চলিয়া যায়। নূতন দম্পতিরা এখন প্রায়ই খাররুবা পরিত্যাগ করে।

আলজিরীয় সরকারও এই স্থানান্তরে চাকুরীর সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সচেতন রহিয়াছে ঃ ফ্রান্স যদি এই সকল শ্রমিককে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে কাবা'ইলিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি অত্যন্ত খারাপ হইবে। এই নির্ভরশীল অবস্থার অবসান ঘটানোর উদ্দেশে নিজ দেশেই চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হইতেছে, যাহাতে বিদেশে কর্মরত লোকগণকে দেশের মাটিতে আকর্ষণ করা যায় এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে তাহাদিগকে জাতীয় অর্থনীতিতে পুনঃসংস্থাপিত করা যায়। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন করাই একমাত্র সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হইতে পারে। বিগত কয়েক বৎসর যাবতই নূতন সৃষ্ট চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আলজিরিয়ার সর্ববৃহৎ কাপড়ের কল বড় কাবা'ইলিয়্যার দারবেন খেদ্দাতে (সাবেক Mirabeau) স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে ২,২০০ শ্রমিকের কর্ম সংস্থান হইবে। ছোট কাবা'ইলিয়ার বিজায়া বর্তমানে তৈল বন্দর। ইহার বাৎসরিক তৈল রফতানী ক্ষমতা ১৪ মিলিয়ন টন। আরও পূর্বে অবস্থিত কাসানতীনা (قسنطينة)-তে একটি বস্ত্রকল রহিয়াছে। স্কীরুদাতে শীঘ্রই একটি মিথেন (methane) উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে। আন্নাবা অন্বষণের আল-হাজরে (সাবেক Quzerville) দেশের সর্ববৃহৎ ধাতব শিল্প কারখানা অবস্থিত; ইহা উন্নয়নের কেন্দ্রীয় স্থান হইয়া উঠিতেছে; ইহা বিশাল পার্বত্য পশ্চাৎভূমির কেন্দ্রস্থল। অবিসম্বাদিত ঐক্য ও সংহতি থাকা সত্ত্বেও কাবা'ইলী দুনিয়ার কয়েকটি আঞ্চলিক সত্তাতে বিভক্ত। বড় কাবা'ইলিয়া অবশ্যই সর্বাপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ; ইহার অন্তর্গত হইতেছে উত্তর হইতে দক্ষিণে মিয়রানার কিছুটা পার্বত্য খাড়ি যাহা ডেলিস হইতে তিগমার্ট পর্যন্ত যে একটানা ঢালু অঞ্চল রহিয়াছে তাহার পশ্চাতে অবস্থিত; সেবাউ-এর উর্বর উপত্যকা, প্রাচীন পর্বতময় এলাকা তিযি-ঔযৌ এবং জুরজুরার বিশাল চুনা পাথরের শৃঙ্গশ্রেণী যাহার দক্ষিণের ঢাল একেবারে সৌম্মাম উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বারবার গোত্রীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরাপুরি রক্ষিত হইয়াছে ঃ উচ্চ অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের নিজেদের ভাষা ও রীতিনীতি দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইসলাম ধর্ম এবং ফরাসী আধিপত্যবাদ কোনটিই তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য খুব একটা পরিবর্তন করিতে পারে নাই। অরণ্যাবৃত সীমান্ত রেখা ইয়াকৌরেনের পরবর্তী কাবা'ইলিয়া অংশে আরবী ভাষাভাষী বারবাররা বাস করে। বিজায়ার ছোট কাবা'ইলিয়া যাহার অন্তর্গত হইতেছে সৌম্মামের নিম্ন সমভূমি এবং বাবর পর্বতশ্রেণী, সেখানে স্বল্প সংখ্যক অধিবাসী বাস করে। তাহারা জমি চাষ করিয়া এবং গবাদি পশু পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কাবা'ইলী কল্লো পর্বত অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে বন্য প্রকৃতির লোক বাস করে। পূর্ব কাবা'ইলিয়া অঞ্চল বৃক্ষাদিপূর্ণ পর্বতশৃঙ্গময়, মাঝে মাঝে অববাহিকা, সেখানেই উন্নত কৃষি এবং যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধাহেতু শহরগুলির উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। স্কীক্দা, কাসানতীনা 'আন্নাবা, গুয়েলমা ও সূক আহরাস পার্বত্য অধিবাসিগণের আকর্ষণ কেন্দ্র।

জাতিতত্ত্ব ঃ কাবা'ইলিয়ার অধিবাসিগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বারবার ভাষাভাষী। উহারা, বিশেষ করিয়া জুরজুরা কাবা'ইলিয়া বা বড় কাবা'ইলিয়াতে বসবাস করে। ইহাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ছোট কাবা'ইলিয়া বা বাবর কাবা'ইলিয়ার অধিবাসিগণ মাত্র কতকাংশে বারবার ভাষাভাষী, তথাপি তাহাদের মধ্যে বারবার রীতিনীতি গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। যাহা হউক, কাবা'ইলীগণকে একটি বিশেষ নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার অধিকারী বলা যায় না। কারণ সকল প্রমাণই জাতিগতভাবে তাহাদের বিভিন্নতা প্রদর্শন করে, যদিও জাতি হিসাবে তাহাদের উৎপত্তির বিষয়টি অজ্ঞাত। ইহারা তুলনামূলকভাবে প্রাচীন, উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ-পূর্বকালের লোক। সম্ভবত বিভিন্ন দিক হইতে এই অঞ্চলে আসিয়াছিল, কিন্তু অন্তত কিছু লোক ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মাগরিবে একত্র বসবাস করিবার পরে ক্রমে তাহারা এক ভাষাবিশিষ্ট একটি সাধারণ সভ্যতা গড়িয়া তোলে। তাহাদের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখিয়া রাখা হয় নাই এবং অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য রাখিয়া নানা আঞ্চলিক কথ্য ভাষারূপে বিভক্ত হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উত্থান-পতন এবং অন্যান্য সভ্যতা কার্থেজীয়, রোমীয়, আরবীয়, তুর্কী ও ফরাসী সকলের মুকাবিলা করা সত্ত্বেও এই একান্তই গ্রামীণ সভ্যতাটি একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছে। মনে হয় কাবা'ইলীগণ নিজেদের সভ্যতাকে যতই বেশী গ্রামীণ ও হীন বলিয়া অনুভব করিয়াছে ততই বেশী মযবুতভাবে নিজেদের পূর্বপুরুষের জীবন যাত্রার পদ্ধতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। অন্তত বৃহত্তর বা পূর্ণাঙ্গ কোন সভ্যতা— যেমন আরব সভ্যতা— তাহার নিকট নিজেদের ক্ষুদ্র গ্রামীণ সভ্যতাকে পরিত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছাই তাহাদের ছিল না। আরবী সভ্যতাকে যে তাহারা অন্যগুলি অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কারণ ছিল দীর্ঘ সাহচর্য; ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে, বারবার সভ্যতায় বিভিন্ন প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য মিশিয়াছিল এবং অনেক পূর্বে একটা একত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাবা'ইলীগণের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রচুর বিষয় লেখা হইয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিনীতির পার্থক্য রহিয়াছে। তাহাদের যে সামাজিক আইন তাহা বর্তমান সময় পর্যন্ত বস্তুত লিখিতরূপে ছিল না, লোকের স্মৃতিতেই প্রচলিত ছিল। এই আইন কয়েকটি বিষয়ে মুসলিম আইন হইতে ভিন্নতর ছিল, যেমন মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার পায় না। ফরাসী শাসন আমলে ম্যাজিস্ট্রেটগণের সুবিধার জন্য ফরাসী ভাষায় কিছু সংখ্যক রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং ফরাসী আইন ক্রমে ক্রমে স্থানীয় রীতিনীতি এবং মুসলিম আইনকেও সংশোধিত করে।

কাবা'ইলীগণ যে বহুকাল যাবত ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাহা নিশ্চিত। খারিজীবাদ যখন সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করিয়াছিল (২য়/৮ম শতকের মধ্যভাগ হইতে), সম্ভবত তখনই তাহারা সেই মতবাদ গ্রহণ করে, কিন্তু এই বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য লাভ করা যায় না। ফরাসী শাসনামলে স্পষ্টতই বুঝা গিয়াছিল যে, কাবা'ইলী সমাজে ইসলামের যে তরীকা প্রচলিত তাহা ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা বেশী মানবিক এবং অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা ওলী-দরবেশ লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করিত। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব সমাজের সদস্যগণ এবং শুরফা'গণকে লোকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। এই সব ব্যক্তি অনেক সময়ে বিভিন্ন পরিবারের

মধ্যে বা উপজাতীয় গোত্রের মধ্যকার বিবাদ মিটাইতে পর্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব খাটাইতেন। তাঁহাদের, এমন কি খাজনা হইতে মওকুফ পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হইত। তাঁহারাই ছিলেন বস্তুত লিখিত অর্থাৎ আরবী সংস্কৃতির একমাত্র ধারক। সেই সংস্কৃতি শায়খ আল-ওয়ারছীলানীর (১২শ/১৮শ শতক) রচনার প্রমাণ অনুযায়ী ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। তবে তাহারা আরবীর মূল বিষয়সমূহ, ধর্মতত্ত্বের কিছু কিছু বিষয় এবং মুসলিম আইনেরও মৌখিক বিষয়সমূহ পড়াইতে সক্ষম ছিলেন। ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজসমূহও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সীদী মুহাম্মাদ 'আবদু'র-রাহমান আবূ কাবরাইন (বূকাবরীন) (১১২৬/১৭১৫-১২০৮/১৭৯৮) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃসমাজ। আল্লাহ্, রাসূল (স) এবং দরবেশগণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা সত্ত্বেও কাবা'ইলীগণ গভীরভাবে শুভ অশুভ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত এবং সেইগুলিকে তাহারা নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত বলিয়া মনে করিত।

পরিশেষে কাবা'ইলী ভাষার মৌখিক ঐতিহ্য বিষয়টি, যাহা আরবী ভাষাতে সীমিত লিপিবদ্ধ রচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই ভিন্ন তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। এই অতি সমৃদ্ধ ক্ষেত্রটি হইতে অগণিত নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। সেগুলি লিখিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রায়শ প্রাচ্যবিদগণ বা কাবা'ইলীগণ কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। ইহা পরিবার বা গ্রামের কাঠামোর মধ্যে পুরুষপরম্পরায় হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছে এবং সকল খাঁটি মৌখিক শ্রুতিবিষয় যেরূপ অনিশ্চিতে আচ্ছন্ন থাকে এগুলিও সেরূপই ছিল। পেশাদার পল্লীকবি এবং গায়কগণও এই ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা গ্রামে ঘুরিয়া আল্লাহ্‌র এবং আওলিয়া-দরবেশগণের প্রশংসা, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের পূর্ণ বর্ণনা এবং বীর যোদ্ধাগণের কৃতিত্ব কাহিনী গাহিয়া বেড়াইতেন। অন্যগণ আরও হাল্‌কা রসের মাধ্যমে, এমন কি অশ্লীল ঢঙে এগুলি আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেন। ছন্দ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা এগুলি গদ্য. অপেক্ষা অনেক সহজে মনে রাখা সম্ভব হইত এবং মহত্ত্বপূর্ণ, নৈতিক এবং হাস্যরসপূর্ণ কাহিনীগুলিই জনপ্রিয় ছিল। অধ্যাবধি অনাবিষ্কৃত এই সম্পদের বিপুল অংশ বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির বিপদের সম্মুখীন। কেননা নূতন যুগের তরুণগণ আর এগুলির প্রতি ততটা আগ্রহী নহে।

ইতিহাস ঃ ইহা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কার্থেজীয়গণ বা রোমীয়গণ, ইহাদের কেহই কাবা'ইলী অঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করে নাই। উপকূলবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবসতি ব্যতীত জুরজুরাতে বেশ কিছু রোমীয় ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। আরব সভ্যতা বাবরের কাবা'ইলিয়াতে পৌঁছায় ৩য়/৯ম শতকের শেষভাগে যাহার প্রমাণস্বরূপ কুতামাগণ কর্তৃক ফাতিমী ধর্ম প্রচারক আবূ 'আবদিল্লাহ আশ-শী'ঈকে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উল্লেখ করা যায়। কিন্তু আরব সভ্যতা জুরজুরায় কাবা'ইলিয়াতে পৌঁছায় একমাত্র ইসলামরূপে, যাহা সম্ভবত আরও পূর্বেই বাহ্যিক আকারে সেই দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া কাবা'ইলিয়া সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা যায়। ইহা আল-মুওয়াহহিদগণের অধীনস্থ ছিল; কিন্তু অতঃপর কী পরিস্থিতিতে ইহা হাফসীগণের বা তেলেমসেনের যায়ানীগণের অধীনে বা কখনও খুবই অল্প সময়ের জন্য, এমন কি ফেয (Fez)-এর মারীনীগণেরও অধীনে আসে তাহা জানা যায় না। কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা অপেক্ষা কাবা'ইলিয়া এই সকল বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় যে, দুই শতাধিক বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপী ইহা প্রধানত স্বায়ত্তশাসিতই ছিল।

১০ম/১৬শ শতকের পর হইতে কাবা'ইলীগণ সম্ভবত অযৌক্তিকভাবেই মাগরিবের ইতিহাসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে থাকে। বারবারোসা ভ্রাতৃদ্বয় 'আরূজ এবং অতঃপর খায়রু'দ-দীন (দ্র.) জিজেল্লি অঞ্চলকে তাহাদের প্রথম যুদ্ধ অভিযানের ভিত্তিভূমিরূপে ব্যবহার করে, তাহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল আলজিয়ার্স। কাবা'ইলী পর্বতশ্রেণী যেহেতু জিজেল্লি ও আলজিয়ার্সের মাঝখানে আবরণস্বরূপ ছিল, সেহেতু তুর্কীগণ বাধ্য হইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে। কেননা উহারা তাহাদের অগ্রসরের পথ কাটিয়া দিতে পারে। ফলে কাবা'ইলীগণকে যে মনোভাব গ্রহণ করিতে হয় তাহা অবশ্যই পরবর্তী ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করে। সেই সময়ে কাবা'ইলী জনগণ তিনটি শক্তিতে বিভক্ত ছিল। পশ্চাত্য লেখকগণ সেই তিন শক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন কূকো রাজ্য, লাব্বেস রাজ্য (বানূ 'আব্বাস) এবং বানূ জুবার রাজ্য। শেষোক্ত রাজ্যটি বিজায়ার পূর্বে অবস্থিত উপকূলীয় এলাকাতে বসবাসকারী গোত্রীয়গণের উপরে শাসন ক্ষমতার বিস্তার করিয়াছিল। লাব্বেস রাজ্য অবস্থিত ছিল ওয়াদি'স-সাহিল বা সুম্মামের পূর্ব দিকে এবং উহা অন্ততপক্ষে কাবা'ইলিয়ার অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কূকো রাজ্য জুরজুরা হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার বন্দর ছিল আযেফুন, অন্য কথায় জুরজুরার কাবা'ইলিয়ার অধিকাংশ এলাকা ইহার অন্তগর্ত ছিল। 'আরূন-এর আমলে কূকোর নেতার নাম ছিল আহমাদ ইবনু'ল-কাদী। 'আরূন তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন যাহার বলে তাঁহার স্বল্প সংখ্যক তুর্কী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি একটি পার্বত্য সেনাবাহিনী লাভ করেন। এই সময়ে বানূ জুবার ও বানূ 'আব্বাস সাধারণত বিজায়া হইতে আগত স্পেনীয়গণের পক্ষ অবলম্বন করিত। খায়রু'দ-দীনের শাসনাধীনে দৃশ্যের পরিবর্তন হয় ঃ তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ইবনু'ল-কাদী শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসেন এবং তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী আলজিয়ার্সের পতনে (১৫২০-২৫) যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। তুর্কীগণ অতঃপর বানূ 'আব্বাসের দিকে দৃষ্টি ফিরায় এবং তাহাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। তুর্কী শাসনের প্রায় অধিকাংশ কালব্যাপী নিশ্চয়ই অনুরূপ অবস্থাই বিরাজমান ছিল এবং বিভিন্ন কাবা'ইলী দল সময় সময় আলজিয়ার্সের শাসকগণের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। অতঃপর তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুকালের জন্য বিদ্রোহ করিয়াছে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের পার্বত্য এলাকায় অবরুদ্ধ হইয়াছে আর নিতান্ত শ্বাস ফেলিবার স্থানটুকু লাভের জন্য সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছে। কখনও কখনও সম্পর্কের মাধ্যমে কাবা'ইলীগণের সঙ্গে আলজিয়ার্সের সম্পর্ক শক্তিশালী হইত (যেমন ১৫৬০ খৃ. হাসান পাশার সঙ্গে কূকোর রাজকন্যার বিবাহ)। প্রায়ই কাবা'ইলী বাহিনী আসিয়া তুর্কী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিত (যেমন ১৯৭৪ খৃ. তুর্কী বাহিনী কর্তৃক মরক্কো অভিযানকালে)। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও কাবা'ইলীগণ কর্তৃক স্পেনের সঙ্গে সময়ে সময়ে সম্পর্ক স্থাপন করিবার বা আলজিয়ার্স হইতে পলায়ন করিয়া আসা খৃষ্টান বন্দিগণকে সাদরে গ্রহণ করিবার কোন বাধা ছিল না। এইভাবেই ১৫৫৯ খৃ. বানূ 'আব্বাস প্রধান "লৌহ শিরস্ত্রাণধারী একটি চমৎকার সৈন্যদল" গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (Haiedo, Histoire des Rois d'Alyer , পৃ. ১১৯) এবং কূকোগণের নেতা স্পেনের সম্রাট ৩য় ফিলিপের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্পর্ক এরূপ ছিল

যে, স্পেন সম্রাট এক পর্যায়ে কাবা'ইলীগণের সহায়তায় আলজিয়ার্স অধিকার করিবার বিষয়ও চিন্তা করিয়াছিলেন। (Carlos Rodriguez Jouliz Sainteyr, Felipe III Yel Rey de Cuco, মাদ্রিদ ১৯৫৪ খৃ.)। এই ধরনের বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরে আবার কখনও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনও দেখা দিত। যেমন কূকো রাজ্যের অবসান ঘটে এবং তদস্থলে যোওয়াওয়াগণের একটি ফেডারেশন গঠিত হয় বা গাসেম (কাসিম) নামক জনৈক শায়খ্-এর ইঙ্গিতে জুরজুরার পশ্চিম অংশে গেশতু'লা (ইগুশতাল) নামক একটি নূতন ফেডারেশনের জন্ম হয়।

একেবারে শেষ পর্যন্ত তুর্কী কর্তৃত্ব খুবই টলটলায়মান অবস্থায় ছিল। কাগজপত্রে অধীন গোত্রগুলি দুইটি কাইদাতে বিভক্ত হইয়া যায়, বোগনি আর সেবাউ, সেই সঙ্গে বিজায়া শহর। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং খাজনা আদায়ের জন্য কাইদদের হাতে কয়েক শত জানিসারী সৈন্য ছিল। তাহারা সংরক্ষিত ফাঁড়িতে অবস্থান করিত। ইহা ব্যতীত সহায়ক সৈন্যও ছিল। তাহাদের মধ্যে কিছু ছিল কৃষ্ণকায় ('আবিদ)। তাহারা স্থানীয় ব্যাপারে যত কম সম্ভব হস্তক্ষেপ করিত এবং সদাসর্বদা বাহিরের সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া দেশটি অধিকারে রাখিত। এই ভীতি কাটাইয়া উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা বাহির হইতে আনীত সংস্থান তাহাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তুর্কীগণ স্থানীয় বিবাদ-বিসম্বাদকে উস্কানি দিত এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের প্রতি সমর্থন প্রদান করিত। তাহারা কোন মসজিদ বা ধর্মীয় ভবন নির্মাণ করিতে চাহিলে তুর্কীগণ তাহাতে সাহায্য করিত। সামগ্রিকভাবে তুর্কী শাসন কাবা'ইলিয়াতে কোন তিক্ততা রাখিয়া আসে নাই। কেননা এই শাসন খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। "জনপ্রিয় গানে তুর্কীগণকে সাহসী, সম্মানীয়রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে তখন তাহাকে কোন তুর্কীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন" (Handeau, Paesie Populaire de la kabailie du Djurdjaura, পৃ. ৬৩-৪, নং৩)।

তুর্কী আমলে কাবা'ইলী অধিবাসিগণ তাহাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল। এইগুলি ছিল ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রের সমষ্টি যাহা একযোগে একটি ফেডারেশন গঠন করিয়াছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইউনিট ছিল গ্রাম (ছাদ্দরাছ); উহা আবার কয়েকটি এলাকাভিত্তিক ভাগে বিভক্ত ছিল। সেগুলিকে বলা হইত আদরূম, ছারিফছ, তাখেররুবাত ও খাররুবা। কয়েকটি গ্রামের অধিবাসী মিলিয়া পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকিয়া একটি গোত্র বা 'আরুশ গঠন করিত। ফরাসী বিজয়ের সময়ে ১৪,০০০ গ্রাম ১২০টি গোত্রের মধ্যে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গোত্রের সংযুক্ত হওয়াকে হাকবিলছ (আরবী কাবীলা) বলিত। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্মিলিত গোত্র সাময়িকভাবে একত্র হইয়া সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিত, কিন্তু স্বগোত্রের বাহিরের কাহারও সঙ্গে এইরূপ মৈত্রী খুবই অস্থায়ী হইত।

গ্রাম ছিল সম্ভবত পৌর প্রজাতন্ত্র ধরনের। উহা নাগরিকগণের সম্মিলিত মজলিসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল (ছাজমা'ইছ আরবী জামা'আ), যাহার ক্ষমতা ছিল সুদূরপ্রসারী। ইহা একজন সভাপতি নিয়োগ করিত (আমেকক্রান, আমগার, আমীন) যাহার উপর ইহার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিত এবং তাহার ডেপুটিস্বরূপ বা সম্ভবত তাহার অধীনস্থ তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ তেম্মান (একবচনে তামেন, আরবী দামিন) নিযুক্ত করিত। জামা'আ করের নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিত এবং কর বণ্টন করিত, যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের বিষয়াদি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত, সাহায্য তহবিল নিয়ন্ত্রণ করিত এবং প্রয়োজনের সময়ে স্থানীয় রীতিনীতি সংশোধন করিত। ইহা গঠিত হইত রোযা ফরয হইয়াছে এরূপ সকল বয়স্ক পুরুষ সদস্যগণের সমন্বয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন সমাজের অসংখ্য ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, যাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতেন। জামা'আ-এর কর্তৃত্ব, ব্যক্তির ও পরিবারের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা এবং প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা সীমিত থাকিত। গোত্রসমূহ এবং সম্মিলিত ফেডারেশন একই ধরনের সংস্থারূপে গঠিত ছিল। কিন্তু ফেডারেশনের সংঘবদ্ধতা যত বেশী এলাকা জুড়িয়া ব্যাপৃত হইত সদস্যদের মধ্যে সঙ্গবদ্ধতাও তত কম হইত। তদুপরি সকল দলের মধ্যে সোফ বা পার্টির অস্তিত্ব হেতু এই সংহতি সীমাবদ্ধ হইত, যাহার উদ্ভব বা কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বর্তমানে সামান্যই জানিতে পারা যায়। সংক্ষেপে কাবা'ইলিয়া গঠিত হইত খুবই ছোট ছোট দল সমবায়ে, যাহাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল স্থায়ীভাবে স্থিতিহীন এবং পর্যটক আল-ওয়ারছী-এর চাক্ষুষ সাক্ষ্য অনুযায়ী দেশটিতে সব সময়েই বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান থাকিত।

ফরাসীরা যখন ১৮৩০ খৃ আলজিয়ার্সে অবতরণ করে তখন কাবা'ইলিয়ার অবস্থা এই রকম ছিল। তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই কাবা'ইলীদের সংস্পর্শে আসে, কেননা শেষোক্তরা রাজধানীতে সংখ্যায় অগণিত ছিল, কিন্তু তখন দেশটি দখল করিবার চিন্তা তাহাদের মনে উদিত হয় নাই। কারণ কয়েক বৎসর পর্যন্ত, এমনকি তাহারা নিজেরাই নিশ্চিতভাবে জানিত না যে, তাহারা আলজিয়ার্সে থাকিবে কি না। তুর্কী সৈন্যবাহিনী চলিয়া যাইবার পরে কাবা'ইলিয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু তাহা দেশটির দৃঢ় সংহতি সৃষ্টিতে আদৌ অবদান রাখিতে পারে নাই। যাহা হউক, কাবা'ইলীগণ ও নূতন দখলকারিগণের মধ্যে একটি তাৎক্ষণিক সমঝোতা সৃষ্টি হয়। কেননা ১৮৯০ খৃ. আগস্ট হইতে Bourmont যোওয়াওয়াদের (Zouaves) সমবায়ে সামরিক বাহিনী গঠনের চিন্তা করিতে থাকেন; এই ইউনিটসমূহের ভাঙ্গাগড়াময় জীবন শুরু হয় ১ অক্টোবর ১৮৩০ খৃ.।

ফরাসীরা কাবা'ইলীদের বিষয়ে কোনরূপ প্রকৃত উৎসাহ প্রদর্শনের পূর্বেই আমীর' আবদু'ল-কাদির (দ্র.) কাবা'ইলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ তাফনার চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তাহাদিগকে নিজ প্রভাবিত এলাকাধীন বলিয়া জ্ঞান করেন এবং তিনি তাহাদিগকে ফরাসীদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন বলিয়াই জানিতেন। তিনি সেবাওয়ের একজন খলীফা নিযুক্ত করেন, কিন্তু কাবা'ইলীগণ তাঁহাকে সুলতান বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। বুযো (Bugeand) যখন গভর্নর জেনারেল ও ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন তখন তিনি আমীর 'আবদু'ল-কাদির-এর সঙ্গে যুদ্ধে এত বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকেন যে, কাবা'ইলীগণের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পর্যন্ত পান নাই। ১৮৪৪ খৃ. তিনি এদিকে মনোযোগ দেন এবং কিছুটা সময় পাইবামাত্র দেল্লিস দখল করিয়া লন। ১৮৪৭ খৃ. ফরাসী সরকারের ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় অভিযান শুরু করেন এবং এলাকার বহিঃসীমায় কিছু সাফল্য অর্জন করেন কিন্তু কাবা'ইলী পর্বত অঞ্চলের সমস্যা কমবেশী পূর্বানুরূপই থাকিয়া যায়। ফ্রান্সে প্রিন্স প্রেসিডেন্ট লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নির্বাচনের পরেই কেবল কাবা'ইলিয়া সমস্যাটি পুনরায় নূতন করিয়া উত্থাপিত হয়। ১৮৫১ খৃ. শরীফ বলিয়া পরিচিত আবু বাগলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হয়। উহার

পরেই বাবরের কাবা'ইলিয়্যার বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন জেনারেল de Saint Arnaud, যাহার ফলে জিজেল্লি নিশ্চিতভাবে অধিকৃত হয়। তবে জুরজুরার কাবা'ইলিয়্যা অবিজিতই থাকিয়া যায়। সেখানে প্রায়শ গোলযোগ চলিতে থাকে। গোলযোগের প্রেরণা যোগাইতে থাকে রাহমানিয়্যা ভ্রাতৃসমাজ। প্রতিবারেই ফরাসীরা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। অবশেষে তাহারা গভর্নর জেনারেল Marshal Randon-এর নেতৃত্বে কাবা'ইলিয়া পর্বতাঞ্চল সম্পূর্ণ দখল করিবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাহাতে নেতৃত্ব দেন। একটি যুদ্ধে কাবা'ইলীগণ নিজেদের পার্বত্য এলাকায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে এবং ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ খৃ. জুলাই মাসের প্রথম দিকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দান এবং যুদ্ধ কর প্রদান করার বিনিময়ে কাবা'ইল গোত্রীয়গণ তাহাদের পৌর শাসন ব্যবস্থা রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহাদের যে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় শাসন শক্তি শত দুর্যোগের মধ্যেও টিকিয়া ছিল, তাহা অতঃপর ক্রমে অপসৃয়মান হইয়া যায়।

দুই কাবা'ইল ১৮৭১ খৃ. স্বাধীনতার অভ্যুত্থানে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া ও গুরুতর জরিমানা আরোপ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হয়; পৌর সম্মেলনকে দাবাইয়া রাখা হয়, কিন্তু সমাজের আমীন পদগুলিকে রক্ষা করা হয়। জুরজুরাপে ফরাসী ম্যাজিস্ট্রেট পদের প্রচলন করা হয়, যাহাদিগকে কাবা'ইলী রীতিনীতি রক্ষা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ১৮৮০ খৃ. হইতে জুরজুরার কাবা'ইলীদের চারিটি "Communes mixtes" ও চারিটি বিচার বিভাগীয় জেলাতে বিভক্ত করা হয় এবং কয়েক বৎসর যাবত কিছুটা সাফল্যের সঙ্গেই তাহাদিগকে ফরাসী করার কাজ চলিতে থাকে। Jules Cambon তাঁহার উপদেষ্টাগণের সমর্থনক্রমে কাবা'ইলী রাজনীতি বন্ধ করিয়া দেন। কারণ তিনি উহাকে এক অলীক বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল গঠনের সময়ে (১৮৯৮ খৃ.) কাবা'ইলী ২১ জন স্থানীয় সদস্যের মধ্যে ৬ জন প্রতিনিধি (জুরজুরার কাবা'ইলিয়ার জন্য ৪ জন) প্রেরণ করে। এই অনুগ্রহের নিদর্শনটুকুর পরেই আবার কাবা'ইলিয়াকে ফরাসীকরণের নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, বিশেষ করিয়া স্কুলগুলির মাধ্যমে। স্কুলগুলি তুলনামূলকভাবে আলজিরিয়ার অন্য অংশ অপেক্ষা উন্নত ছিল। প্রায় একই সময়ে কাবা'ইলীগণের নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে গমন শুরু হয়। প্রথমদিকে গিয়াছিল সামান্য সংখ্যক লোক, কিন্তু ইহা প্রাচীন কাবা'ইলী ঐতিহ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া হেতু ১ম বিশ্বযুদ্ধকালে তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে তাহাদের দেশে যথেষ্ট অর্থ সমাগম হইতে থাকে। কেননা শ্রমিকগণ তাহাদের প্রায় সব উপার্জনই দেশে পরিবারের নিকট পাঠাইত।

অতএব ইহাতে আর বিস্ময়ের কিছু নাই যে, কাবা'ইলীগণ ১৯২৬ খৃ. ফরাসী কমুনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং প্রধানত কাবা'ইলীগণই দ্বারা গঠিত "নর্থ আফ্রিকান স্টার"-এর গঠনের জন্য সচেষ্ট হইবে। এই দলটি ১৯২৭ খৃ. হইতে যাহার নেতৃত্ব দান করিতে থাকেন মাসালী হাজ্জ। যখন অল্প দিন পর হইতেই আলজিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য দাবী উত্থাপন করিতে থাকে, তখন কিছু সংখ্যক কাবা'ইলী সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করিতে থাকেন, যদিও দেশের অভ্যন্তরে প্রাচীন ঐতিহ্য প্রবল থাকে। কাবা'ইলিয়্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বা বাবরের কাবা'ইলিয়্যাতে ১৯৪৫ খৃ. আলজিরীয় বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু ১৮৭১ খৃ. বিদ্রোহের ন্যায় এই উত্থানকেও ফরাসী সরকার কঠোরভাবে দমন করে। ১৯৪৭ খৃ. পর হইতে একদল কাবা'ইলীর একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ ইবনু'ল-কাসিম কারীম-এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক কারণে সমাজবহির্ভূতরূপে কাল কাটাইতে থাকে। এই দলটিই ১৯৫৪ খৃ. কাবা'ইলিয়্যাত বিদ্রোহের কেন্দ্রীয় শক্তি হয়।

কিছু সংখ্যক কাবা'ইলী ব্যক্তিগতভাবে আলজিরীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, যেমন কারীম, আঈত আহমদ বুদিয়াক, ঔয়ামরান প্রমুখ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনাস্থলে থাকিয়া কার্যাবলী পরিচালনা করিতেছিলেন, কেহ বা দেশের বাহিরে থাকিয়া এবং পরিভ্রমণ করিয়া আলজিরিয়ার দাবী জোরদার করিতে সচেষ্ট হন, এমন কি এইরূপ একটা সময়ও ছিল (১৯৫৫-৫৭ খৃ.) যখন আলজিরিয়াতে যে আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হইত তাহা পরিচালনা করিতেন কাবা'ইলী রমদান আবান। এই আমলের চূড়ান্ত মুহূর্ত আসে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে সৌম্মাম উপত্যকা কংগ্রেসে, যাহার অনুপ্রেরণা দান এবং বাস্তবরূপ দান করেন আবান ও কারীম। ১৯৫৯ সনে আবানের মৃত্যু ঘটনা সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। শেষোক্ত ব্যক্তি, কারীম Evian Agreement -এর অন্যতম মধ্যস্থতাকারী ছিলেন। সেই চুক্তি অনুযায়ীই ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আলজিরীয় যুদ্ধের অবসান ঘটে। কাবা'ইলীগণের মধ্যে কতিপয় প্রভাবশালী নেতার স্বাধীনতা সংগ্রামে আবির্ভাব হইলেও কাবা'ইলিয়্যার জনসাধারণ শুধু ইহাতেই তুষ্ট ছিল না, ইহাদের এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জনসাধারণ জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সদস্যগণের চলাচল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়া থাকে। যুদ্ধের অবসানে জুরজুরার কাবা'ইলিয়্যা সেক্টর (বিলায়া ৩) ছিল জনৈক কাবা'ইলী সেনাপতি কর্নেল মোহান্দুল হাজ্জের নেতৃত্বাধীনে। যুদ্ধের পরে ও গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আলজিরিয়াতে এক মারাত্মক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়, বিশেষ করিয়া বিদেশ হইতে আগত জাতীয় মুক্তিবাহিনীর (M. L. F.) সদস্যগণের এবং কয়েকটি প্রতিরোধ বাহিনীর মধ্যে (বিলায়া ৩ ও ৪)। শেষোক্ত দলের মধ্যে ছিল বিলায়া ৩-এর কাবা'ইলীগণ এবং তাহাদের সঙ্গে ছিলেন আবু'ল-কাসিম কারীম (Belkasem Krim)। কয়েকবারই (জুলাই এবং আগস্টের শেষ ভাগ) তাহারা পর্বতের মযবুত ঘাঁটিতে একত্র হয় এবং সেইখানে সকল বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, অন্তত বাহ্যত। কিন্তু অস্বস্তিকর অবস্থা চলিতেই থাকে, গণভোট ও ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে উহার প্রকাশ দেখা যায়, তখন জুরজুরার নির্বাচনী এলাকাসমূহের অনেকগুলিতে কোন প্রার্থীই অংশগ্রহণ করেন নাই।

খুব বেশী দিন পরে নহে, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ সালে জুরজুরার কাবা'ইলীদের এক অভ্যুত্থান ঘটে আইত আহমাদ ও কর্নেল মোহান্দুল হাজ্জ-এর নেতৃত্ব। আপাত অজুহাত ছিল সরকার কর্তৃক আহমাদ প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক শক্তি ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া। প্রকৃত বিবাদ তুচ্ছই ছিল এবং ১১ অক্টোবর আলজিরিয়া মরক্কো যুদ্ধ শুরু হইলে উহাকে এই বিপদ মিটাইয়া ফেলিবার একটা উপলক্ষরূপে প্রয়োগ করা হয়। ২০ অক্টোবর পরে সব কিছুই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে, যদিও আইত আহমাদ আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কাবা'ইলীদের এই সাধারণ প্রতিবাদের একটি

গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট কংগ্রেসের সভা যেখানে যুদ্ধের পরে সেই প্রথমবারের মত নূতন আলজিরিয়া রাষ্ট্রের জন্য একটি সাধারণ কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে মুখ খুলিয়া কথা বলা সম্ভব হয়। ইহা সত্ত্বেও ১৯৬৪ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে কাবা'ইলিয়ার কয়েকটি স্থানে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ২০ সেপ্টেম্বরের আইন সংসদ নির্বাচনে কাবা'ইলীদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। ভোট দানে অংশগ্রহণ করে ৫৭.৩৮% এবং বেশ যথেষ্ট সংখ্যক ব্যালটপত্র অব্যবহৃত থাকে।

অবশেষে আইত আহমাদকে গ্রেফতার করা হয় (১৭ অক্টোবর, ১৯৬৪)। প্রথমে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং পরে দণ্ড মওকুফ করিয়া দেওয়া হয় (১২ এপ্রিল, ১৯৬৫)। ৩০ এপ্রিল তিনি পলায়ন করিয়া আলজিরিয়ার বাহিরে অবস্থানরত বিরোধী দলের সঙ্গে যোগদান করেন। আবু'ল-কাসিম কারীম ১৫ অক্টোবর, ১৯৬৭ বিদেশে একটি বিরোধী দলীয় আন্দোলন গঠন করেন। তখন পর্যন্ত মনে হয় যেন এই সকল তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। দেশের ভিতরে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচনেও কাবা'ইলিয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু পরলোকগত কর্নেল বুমেদীন (আবূ মাদ্‌য়ান)-এর সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিলেন যে, কাবা'ইলিয়্যার অবস্থা শান্ত। সেই সরকার ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বৃহত্তর কাবা'ইলিয়্যার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকাশ করে, তাহাতে বহু মিলিয়ন আলজিরীয় দীনার ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) সাধারণ ঃ (১) G. H. Bousquet, Les Berberes. প্যারিস ১৯৬১ খৃ.; (২) A. H. Hanoteau ও A. Letourneux, La Kabylie et les coutumes Kabyles, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ. ৩খ.; (৩) C. Devaux, Les Kebailes du Djerdjera. Etudes sur les pays vulgairement appeles la Grande Kabylie, মার্সেইল্লে-প্যারিস ১৮৫৬ খৃ.; (৪) E. Carette, Etuedes sur la Kabylie proprement dite, প্যারিস ১৮৪৮ খৃ., ২খণ্ড; (৫) J. Liorel, Races berberes. Kabylie du Jurjura, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ.; (৬) J. Morizot, L' Algerie Kabylisee, প্যারিস ১৯৬২; (৭) Y. Courliere, La guerre d'Algerie, I. Les fils de la Toussaint ; (৮) II. Le temps des Leopards, প্যারিস ১৯৬৮, ১৯৬৯ খৃ. ; (৯) III, l'Heure des Colonels, ১৯৭০ খৃ.; (১০) Annuaire de l'Afrique du Nord, ১৯৬২ a ১৯৬৮, ৭খ, ১৯৬৩ খৃ. হইতে ১৯৬৯ খৃ. স্থা। (খ) ইতিহাস ঃ (১১) E. Daumas and Fasar, La Grande Kabylie, etudes historiques, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (১২) L. A. Berbrugger, Les epoques militaires de la Grande Kabylie, আলজিয়ার্স ১৮৫৭ খৃ.; (১৩) S. A. Boulifa, Le Djurdjura a travers l'histoire. Organisation et independance des Zouaoua, আলজিয়ার্স ১৯২৫ খৃ.; (১৪) এম. হাজ্জ-সাদোক, A travers la Berberie orientale du XVIII[e] siecle avec le voyageur Al-Warthilani, in R. Afr., সংখ্যা ৪২৮-৪২৯ (১৯৫১ খৃ.); (১৫) N. Robin. L'insurrection de la Grande Kabylie en 1871, প্যারিস ১৯০১ খৃ.; (১৬) L. Rinn. L'insurrection de 1871 en Algerie, আলজিয়ার্স ১৮৯১ খৃ.; (১৭) Ch. Ageron, La France, a-t-elle eu une politique Kabyle? in Revue historique, ১৯৬০ খৃ. পৃ. ৩১১-৫২; (১৮) ঐ লেখক, Les Algeriens musulmans et la France (1871-1919), ২খ, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৬৭-৯২, ৪৮১-৪, ৮৫৪-৬৮, ৮৭৩-৯০ এবং সর্বত্র; (১৯) F. Dessomes, Notes sur l'histoire de Kabylie ফোর্ট ন্যাশনাল ১৯৬৪ খৃ.; (গ) অর্থনৈতিক জীবন ঃ (২০) Caix de Saint Amour, Questions algeriennes. Arabes et Kabyles, প্যারিস ১৮৯১ খৃ.; (২১) R. Maunier, L'economie Kabyle in Melanges de Sociologie nord-africaine, প্যারিস ১৯৩০ খৃ. পৃ. ৮৮-১০৮; (২২) A. Russinger, Quelques problemes humains poses par le developpement agricole en Grande Kabylie Liens-এ, ১০. (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃ.), ১২৩-৪৩; (২৩) P. Schoen, Les travaux et les jours du paysan Kabyle Liens-এ ১২ (প্রথম ত্রৈমাসিক ১৯৬০ খৃ.), ১-৬৩; (২৪) R. Ancel, La Kabylie vivra-t-elle? L' Afrique et l'Asie -তে, ১৭ (১৯৫২ খৃ.) ৪৩-৫১.); (ঘ) কুটির শিল্প ঃ (২৫) J. L. Myres, Notes on the history of the Kabyle pottery, Journal of Anthropological Institute-এ, ১৯০২ খৃ., ২৪৮-৬২; (২৬) P.Ricard, Tissage berbere des Ait Aissi (Grande Kabylie). Hesperis-এ, ৫ (১৯২৫ খৃ.) ২১৯-২৫; (২৭) G. Chantreaux, Le tissage sur metier a haute lisse a Ait Hichen et dans le haut Sebaou, আলজিয়ার্স ১৯৪২ খৃ. ; (২৮) C. Lacoste, Sabres Kabyles, Journal de la societe des Africanistes-এ, ২৮ (১৯৫৮ খৃ.) ১১১-৯১; (২৯) L. Golvin, Les arts populaires en Algerie, ii Les tapis algeriens, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ.; (ঙ) বাসস্থান ঃ (৩০) A. Bernard. Enquete sur l'habitation rurale de l'Algerie, আলজিয়ার্স ১৯২১ খৃ.; (৩১) R. Maunier, La construction collective de la maison en Kabylie, Etude de cooperation economique chez les Berberes du Djurdjura, Travaux et memoires de l'Institut d' Ethnologie, ৩, ১৯২৬, খৃ.; (৩২) M. Earnaude, Le groupement de la population berbere dans la Kabylie de Djurdjura, Societe historique 1932, 269-93; (৩৩) J. Stamboul, Le probleme de l'habitat algerienne, rural en Kabylie et dans les territoires du Sud Liens-এ, ৬ (মে, ১৯৫৮ খৃ.) ১১-২০। (চ) জনসংখ্যা ঃ (৩৪) La repartition en altitude des populations de la Kabylie du Djurdjura (Algerie), Annales de Geography-তে, ৬০ (১৯৫১ খৃ.), ২৩৮-৯; (৩৫) P. Boyer, L'evolution demographique des populations musulmanes du departement d'Alger (১৮৩০-১৯৪৮), R. Afr. -তে, ৯৮ (১৯৫৪ খৃ.) ৩০৮-৫৩; (৩৬) L. Muracciole, L'emigration algerienne, Aspects

economiques, sociaux et juridiques, আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ.; (৩৭) R. Montagne, L' emigration des musulmans d' Algerie en France L'Afrique et 1' Asie-তে, ২১ (১৯৫১), ৫-১৯। (ছ) জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গঠন-পাঠন : (৩৮) E. Daumas Moeurs et coutumes de l'Algerie, Tell, Kabylie, Sahara, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ. ; (৩৯) Besson, Etudes comparatives sur la constitution de la famille chez les Kabyles. Bulletinde la sociете de legislation comparee-তে, ২৫ (১৯৯৪ খৃ.) ২৭৬-৯৬; (৪০) M. Gaudefroy-Demombynes, Les ceremonies de mariage chez les indigenes de l'Algerie, প্যারিস ১৯০১ খৃ.; (৪১) J. Lanfry. Mariage (retour de la femme au domicile de ses parents sans repudiation); Fichier de documentation berbere -তে, ১৯৬৯, খৃ. ১-৪৯; (৪২) R. Laurette, Aspect de la vie sociale en petite Kabylie, Cahiers Nord-Africains-এ, ১৭ (১৯৫১ খৃ.), ৩-৩৯; (৪৩) E. Masqueray, Formation des cites chez les populations sedentaires del' Algerie (Kabylie du Djurdjura, Chouia de l'Aures, Beni-Mezab), প্যারিস ১৮৮৬ খৃ.; (৪৪) J. Lanfry, Assemblee du village, Fichier de documentation berbere -তে, ১৯৪৬, ১৯৫৯ খৃ.; (৪৫) P. Bourdieu, Sociologie de l'Algerie, প্যারিস ১৯৫৮ খৃ. ; (৪৬) J. Servier , Les portes de l'annee, প্যারিস ১৯৬২ খৃ. ; (জ) আইন : (৪৭) G. Marcy, Le probleme du droit coutumier berbere, France Mediterraneenne el africane 1939, or in Revue de legislation et jurispru dence algerienne, tunisienne et marocaine -এ, ১৯৫৫ খৃ. ; (৪৮) G. Letellier Le probleme du droit coutumier berbere, Ibla-তে, ৩ (১৯৩৯ খৃ.) ৩৮১-৯৩ খৃ.); (৪৯) Campredon, Etude sur l'evolution des coutumiers Kabyles, আলজিয়ার্স ১৯২১ খৃ.; (৫০) R. Maunier, Le menage Kabyle (regime des beins entre epoux). Etuded de sociologie et d'ethnologie juridique, প্যারিস ১৯৩০-৩২ খৃ.; (৫১) R. Maunier, Famille Kabyle et famille romaine, Le menage Kabyle et les biens des epoux, Coutumes Algeriennes, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ. ; (৫২) F. Dulout, Lemariage de Kabyles et les actes d'Etat civil relatifs aux -dits mariages, in Revue algerienne, tunisienne et marocaine de legislation et de jurisprudence, ১ (১৯৩৪ খৃ.) ৮৬-৯১ ; (৫৩) M. Morand, Le statut de la femme Kabyla et la reforme des coutumes berberes, R. E.[1] -তে, ১খ, (১৯২৭ খৃ.), ৪৭-৯৪; (৫৪) L. Millot Une reforme du statut de la femme kabyle, Afrique Francaise et Renseignements Colonizux-এ, xlx, (১৯৩১ খৃ.), ৬৮১-৩; (৫৫) L. Bausquet-Lefevre, La femme Kabyle, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ. ; (৫৬) B. Luc, Le droit kabyle, Toulouse ১৯১১ খৃ. ; (৫৭) L. Milliot, Les nouveaux quanoun Kabyles, in Hesleris, ৫খ. (১৯২৬ খৃ.) ৩৬৫-৪১৮; (৫৮) M. Remond L'elargissement des droits politiques des indigenes. Les consequences en kabylie, in R. Afr. ৬৮খ. (১৯২৭ খৃ.) ২১৩-৫৩; (৫৯) J. Mazard, la loi du 2 mai 1930 sur les mariages kabyles, in Revue Algerinne, tunisienne, et marocaine de legislation et de jurisprudence ১খ. (১৯৩৩ খৃ.), ১৩৭-৪৮। (ঝ) সাহিত্য : (৬০) A. Hanoteau, Poesies populaires de la kabylie de Djurdjura. প্যারিস ১৮৬৯ খৃ. ; (৬১) Moulieras, Legendes et contes merveilleux de la grande Kabylie, ২ খণ্ড, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ. ; (৬২) H. Basset, Essai sur la litterature des Berberes, আলিজিয়ার্স ১৯২০ খৃ. ; (৬৩) F. Amrouche, Histoire de ma vie, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ. ; (৬৪) J. Amrouche, Chants berberes de kabyle, তিউনিস ১৯৩৯ খৃ. ; (৬৫) J. M. Dallet, Contes Kabyles inedits; (৬৬) E. Dermenghem. Contes kabyles, আলজিয়ার্স ১৯৪৫ খৃ. ; (৬৭) M. Mammeri, Evolution de la poesie kabyle, in R. Afr. ৯৪খ. (১৯৫০খৃ.) পৃ. ১২৫-৪৮; (৬৮) এম. ফেরাউন, Les poemes de si Mohand, প্যারিস ১৯৬০ খৃ.; (৬৯) M. Mammeri La Colline oublies, প্যারিস ১৯৫২ খৃ. ; (৭০) এম. ফেরাউন, Jours de Kabylie, আলজিয়ার্স ১৯৫৪ খৃ. ; (৭১) ঐ লেখক, Le fils du pauvre, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ. ; (৭২) ঐ লেখক, La terre et le sang, প্যারিস (তারিখবিহীন) ; (৭৩) ঐ লেখক, Les chemins qui montent, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ. ; (৭৪) ঐ লেখক, Journal (১৯৫৫-১৯৬২ খৃ.), প্যারিস ১৯৬২খৃ. ; (৭৫) C.Lacoste, Legendest et contes merveilleux da la Grande Kabylie, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ.। (ঞ) ভাষা : (৭৬) Boulifa, Methode de langue Kabyle, etude linguistique et sociologique sur la Kabylie de Djurdjura, আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ. ; (৭৭) J. M. Dallet, Le verbe kabyle : parler des Ait Mangellat, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ. ;(৭৮) A. Picard. De quelques faits linguistiques dans le parler berbere des Irjen (Kabyli-Algerie), আলজিয়ার্স ১৯৬০ খৃ. ; (৭৯) A. Picard, Textes berberes dans le parler des Irjen, ২ খণ্ড, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ. ; (৮০) A. Basset, Etudes de geographie linguistique en Kabylie, প্যারিস ১৯২৯ খৃ. ; (৮১) ঐ লেখক, La Langue berbere, in Handbook of African Languages. লন্ডন ১৯৫২ খৃ. ৬৫-৬; (৮২) Fichier de documentation berbere, ফোর্ট-ন্যাশনাল ; (৮৩) C. Lacoste, Bibl. ethn. de la Grande Kabylie, প্যারিস-দি হেগ ১৯৬২ খৃ.; (৮৪) দা. মা. ই., ১৬/১খ., ২৩০-৩১।

R. Le Tourneau (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

কা'বা শারীফ (كعبة شريف) : বিশ্বমুসলিমের কিবলা (দ্র.) ও পবিত্রতম স্থান। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম 'ইবাদতখানা আল্লাহ্‌র ঘর (بيت الله)। ইহা মক্কায় মাসজিদুল-হারামের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত।

গোটা বিশ্বের মুসলিমগণ ইহার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করেন এবং প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হাজ্জ ও 'উমরা ব্রত পালনের উদ্দেশে এইখানে আগমন করেন এবং যথারীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া থাকেন। ইসলামের প্রাথমিক নূতন মুসলিম সমাজ কা'বার আশেপাশেই দিনাতিপাত করিত।

(১) কা'বা, কা'বার নামকরণ ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ

ঐতিহাসিকগণ কা'বার কতিপয় নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ (ক) ঘরটি চতুষ্কোণ হওয়াতে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে কা'বা।

আভিধানিক অর্থে প্রতিটি উচ্চ ও চতুর্ভুজ 'ইমারতকেই কা'বা বলা হয় [দ্র. আল-ফাসী (الفاسي) শিফা'উ'ল-গিরাম (شفاء الغرام); কাদী-'আয়াদ রচিত আল-মাশারিক; আন্-নাওয়াবী, তাহ্যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত (تهذيب اسماء واللغات)]। (খ) ইহার অপর নাম বায়তু'ল-হারাম (بيت الحرام) সম্মানিত গৃহ। (গ) বাক্কা (بكة) শব্দের অর্থ হইল ভাঙ্গিয়া ফেলা, ছিঁড়িয়া ফেলা ইত্যাদি। কাবাকে বাক্কা এইজন্য বলা হয় যে, কা'বা বিদ্রোহীর দর্পকে খর্ব করে, তাই ইহা উক্ত নামে অভিহিত। পবিত্র মক্কাও বাক্কা নামে অভিহিত। (ঘ) বায়তু'ল-'আতীক (بيت العتيق ঃ মুক্ত, সুপ্রাচীন, মর্যাদাপ্রাপ্ত গৃহ), এই পবিত্র ঘরটি সকল বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীর অত্যাচার হইতে মুক্ত ছিল বলিয়া ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে। ইবনু'ল-আছীর, আন-নিহায়া, আল-আযরাকী, আখবার-ই মাক্কা গ্রন্থে কা'বার আরও কয়েকটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আল-ফাসী, শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ ১২৭)। কা'বা শব্দটি মূলত নামবাচক নয়। ইহা দ্বারা কা'বাগৃহের ঘনাকক বিশিষ্ট আকার বুঝায়। কিন্তু এই ইমারতটি আপাতদৃষ্টিতে ঘনাকক সদৃশ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা এমন একটি চতুর্ভুজ যাহার বিপরীত দুই বাহু পরস্পর সমান্তরাল। কা'বার উত্তর-পূর্ব সম্মুখ ভাগের প্রাচীর ঃ যেইখানে ইহার প্রবেশদ্বার রহিয়াছে এবং ইহার বিপরীত দিকের দেওয়ালটি (পশ্চাৎভাগ) ৪০ ফুট করিয়া লম্বা, অপর দেওয়াল দুইটি ৩৫ ফুট করিয়া লম্বা এবং ইহার উচ্চতা ৫০ ফুট। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিক কিঞ্চিৎ ঢালু ছাদবিশিষ্ট, যেখান দিয়া পানি গড়াইয়া পড়ে। ইহাকে মীযাব (ميزاب) বলা হয়। মক্কার চতুর্দিকস্থ পাহাড়ে প্রাপ্ত লালিমা মিশ্রিত কাল রংয়ের (ধূসর বর্ণ) প্রস্তর স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া কা'বা গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে মর্মর প্রস্তর দ্বারা, যাহার উচ্চতা দশ ইঞ্চি এবং চারিদিকে কয়েক ফুট জুড়িয়া দেওয়ালের ভিত্তি অবস্থিত। কা'বার কেন্দ্রস্থল হইতে চারিকোণের (রুক্ন ব. ব. আরকান) মধ্য দিয়া রেখা অংকন করিলে মোটামুটিভাবে চারিটি দিক নির্দেশ করে। চারি দেওয়ালের কেন্দ্র হইতে লম্বালম্বি রেখা টানিলে উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক নির্দেশ করে। উত্তর কোণকে আর-রুকুনু'ল-'ইরাকী, পশ্চিম কোণকে আর-রুকনু'শ-শামী, দক্ষিণ কোণকে আর-রুকনু'ল-য়ামানী এবং পূর্ব দিকের কোণকে (আল-হাজারু'ল-আসওয়াদ-এর নামানুসারে) আর-রুকনু'ল-আসওয়াদ বলে।

কা'বার চারিটি দেওয়াল একটি কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন (كسوة কিসওয়া) বা গিলাফ দ্বারা আবৃত থাকে। ইহা ভূমি পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে এবং ভিত্তির সহিত সংলগ্ন তাম্রের আংটা দ্বারা আটকানো থাকে। কা'বার গায়ে আচ্ছাদিত করার রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইসলামেও এই প্রথা চালু রহিয়াছে। এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে "তুব্বা' আস'আদু'ল-হিময়ারী"র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য (শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ১১৯)। ইসলাম-পূর্বকালে খালিদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন কিলাব কা'বা-কে রেশমী গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। মক্কার কুরায়শগণও নূতনভাবে কা'বার পুনর্নির্মাণ করিয়া অত্যন্ত সুদর্শন চাদরে আবৃত করেন। আল-আযরাকীর ভাষ্যে প্রকাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা) য়ামানী চাদর দ্বারা কা'বাকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা), হযরত 'উমার (রা) ও হযরত 'উছমান (রা) স্ব স্ব শাসন আমলে অতি চমৎকার মিসরীয় কাপড়ের গিলাফ পরাইতেন। হযরত 'উছমান (রা) উপরে ও নীচে দুইখানা গিলাফ পরাইতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) এবং আমীর মু'আবিয়া (রা)-ও রেশমী গিলাফ পরাইতেন। প্রতি বৎসর মুহাররামের দশ তারিখে কা'বার গায়ে গিলাফ পরান হইত। পরবর্তীকালে উমায়া শাসকবৃন্দের মধ্যে য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা), 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান ও 'আব্বাসী খলীফাগণের মধ্যে খলীফা মা'মূনু'র-রাশীদ ও মুতাওয়াক্কিলও এই রীতি চালু রাখেন। খলীফা মা'মূন তিনখানা গিলাফ পরাইতে শুরু করেন। (১) যু'ল-হিজ্জা মাসের ৮ তারিখে তারবিয়্যার দিন (يوم التروية) লাল রেশমী চাদর পরাইতেন; (২) কুবাতী (মিসরীয়) চাদর পরাইতেন রাজাব মাসের ১ তারিখে; (৩) সাদা রেশমী চাদর পরাইতেন ২৭ রামাদান। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আস-সুহায়লী (السهيل) আর-রাওদু'ল-উনুফ, কায়রো, ১খ, ১২৯-৩১; সীরাত ইব্ন হিশাম, কায়রো, ১খ, ১৯৯; আল-ফাসী, শিফা'উল-গিরাম, ১খ, ১১৯-১২৬)।

গিলাফে মাত্র দুইটি ফাঁক আছে ঃ (ক) একটি পানি নির্গত হওয়ার জন্য চুঙ্গির মুখে (মীযাব) ও (খ) অন্যটি দরজার মুখে। কিসওয়া এই যাবতকাল প্রতি বৎসর মিসরে তৈরি হইত, তারপর ভারত ও পাকিস্তানেও একবার তৈরি হয়। হাজ্জ-এর এক বিশেষ কাফিলা কর্তৃক ইহা মক্কায় আনীত হইত। বর্তমানে ইহা মক্কার দারুল-কিসওয়ায় (دار الكسوة) তৈরি হয়। পুরাতন গিলাফ যু'ল-কাদা মাসের ২৫ তারিখে (আল-বাতানূনীর মতে ২৮ তারিখে) অপসারণ করা হয় এবং সাময়িকভাবে একটি সাদা আবরণ ব্যবহার করা হয়, যাহা ভূমি হইতে ৬ ফুট উচ্চে থাকিত এবং বলা হয় কা'বা ইহরামের বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। ইব্ন জুবায়র তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ২৭ যু'ল-কা'দা কা'বার গিলাফটি চতুর্দিক হইতে আট-নয় ফুট উপরের দিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, ইহাকে কা'বার ইহরাম বলা হয়। ইব্ন জুবায়রের মতে বরাবর এই নিয়মই প্রচলিত রহিয়াছে। আল-ফাসী বলেন (শিফা'উল-গিরাম, ১খ, ১২৪), তাঁহার আমলে প্রতি বৎসর যু'ল-কা'দা মাসের ২৫ তারিখে গিলাফটি চারিদিক হইতে উপরের দিকে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। বর্তমানেও এইরূপ হইয়া থাকে। এই কাজ প্রথমত 'আসরের সালাতের পর এবং পরবর্তী কালে দিনের প্রারম্ভেই করা হইত। হজ্জের শেষে কা'বা নূতন গিলাফ দ্বারা আবৃত করা হয়। দরজায় একটি বিশেষ ধরনের পৃথক পর্দা থাকে। মিসরীয়গণ ইহাকে বুরকা' (البرقع) বলিয়া থাকেন। কিসওয়া বা গিলাফ কালো কিংখাবে প্রস্তুত। ইহাতে কালেমা শাহাদাত লিপিবদ্ধ থাকে। ইহার কিছু উপরেই স্বর্ণের কারুকার্য খচিত ফিতা বা বেল্ট থাকে, যাহাতে অত্যন্ত সুন্দর হরফে কুরআনের আয়াতসমূহ লিখিত হয়। কা'বার গিলাফ প্রতি বৎসর পরিবর্তন করা হয়। গিলাফের সামান্যতম অংশটুকুও পূত-পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। কা'বার দ্বাররক্ষক বানূ শায়বা পবিত্র বস্ত্র হিসাবে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা বিতরণ ও বিক্রয় করিত। কিন্তু সউদী সরকার বর্তমানে

কা'বার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গিলাফের টুকরা বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

কা'বার উত্তর-পূর্ব দিকের দেওয়ালে ভূমি হইতে প্রায় ৭ ফুট উচ্চে ইহার একটি মাত্র দরজা আছে। ইহার কিয়দংশ রৌপ্যমণ্ডিত। সউদী সরকার ইদানিং স্বর্ণ-নির্মিত দ্বার স্থাপন করিয়াছেন। Burckhardt ও 'আলী বে-র বর্ণনামতে প্রতি রাত্রে ইহার দহলীযে এক সারি মোমবাতি দ্বারা আলোচিত করা হইত। কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় উহার প্রয়োজন হয় না। কা'বার দ্বার খোলা হইলে চাকাবিশিষ্ট একটি কাঠের সিঁড়ি উহাতে (مدرج বা درج) লাগাইয়া দেওয়া হয়। অব্যবহৃত অবস্থায় এই সিঁড়ি যামযাম কূপ ও বাব (দরজা) বানূ শায়বার মধ্যবর্তী স্থানে রক্ষিত থাকে (দ্র. Snouck Hurgronje, Bilderattas Mecca, No, ii)। এই সিঁড়ির চিত্রের জন্য 'আলী-বে-র ভ্রমণ বৃত্তান্ত দ্বিতীয় খণ্ড (৮০ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

কা'বার অভ্যন্তরে তিনটি কাঠের খুঁটি আছে যেইগুলির উপর ছাদ নির্ভরশীল এবং ছাদে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি আছে। গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বহু সংখ্যক ঝুলানো ঝাড়বাতি ছাড়া আর কোন গৃহসজ্জা নাই। দেওয়ালের অভ্যন্তরে অনেক উৎকীর্ণ লিপি খচিত রহিয়াছে এবং মেঝে মার্বেল পাথরে আচ্ছাদিত। ভূমি হইতে প্রায় ৫ ফুট উপরে পূর্ব দিকের কোণে দরজার সন্নিকটে দেওয়ালের গায়ে কৃষ্ণ পাথর (আল-হাজারু'ল-আসওয়াদ) প্রোথিত আছে। উহা বর্তমানে তিনটি বড় এবং কতিপয় ক্ষুদ্র টুকরার সমাহার। এইগুলি একটি প্রস্তর বলয়বেষ্টিত অবস্থায় দেওয়ালে আটকানো আছে। এই প্রস্তর বলয় আবার একটি রৌপ্য বলয় দ্বারা আবদ্ধ। প্রস্তরটিকে কখনও লাভা (Lava), আবার কখনও আগ্নেয় শিলা (Basalt) বলা হয়। ইহার সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ বহুকাল যাবত তীর্থযাত্রিগণের ক্রমাগত স্পর্শ ও চুম্বনের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইহার বহির্ভাগ মসৃণ হইয়া গিয়াছে। 'আলী-বে (২খ, ৭৬) যেভাবে চিত্রায়িত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, উহার উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অসমতল হইয়া গিয়াছে। আল-বাতানূনীর (পৃ. ১০৫) ভাষ্য অনুযায়ী ইহার ব্যাস ১২ ইঞ্চি। রং লালিমা মিশ্রিত কাল (রক্তাভ কাল)। ইহাতে লাল ও হলুদ রংয়ের বিন্দুগুলি উজ্জ্বল। হাজারে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে আল-মুলতাযিম (الملتزم = সংলগ্ন হইয়া থাকিবার স্থান) বলা হয়। কারণ হাজ্জীগণ তাওয়াফের পর দু'আ' করিবার সময় এখানে তাঁহাদের বক্ষ সংলগ্ন করেন।

কা'বা গৃহের বাহিরের দিকে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি সোনালী পাইপ আছে (ميزاب) যাহা উত্তর-পশ্চিম দেওয়ালের ঠিক ছাদের নীচে অবস্থিত। ইহার একটি সংযোজনও আছে, উহাকে 'মীযাবে'র দাড়ি বলা হয়। এই পাইপ রহমতের মীযাব (ميزاب الرحمة) নামে খ্যাত (এই সম্বন্ধে দ্র. Beu Chirif, Auxvilles Suiutes de l' Islam, পৃ. ৭৫)। এই নালা দিয়া বৃষ্টির পানি নীচে মোযাইক করা বিচিত্র নক্শা সম্বলিত শানবাঁধান পাকা মেঝেতে গিয়া পতিত হয়। কা'বার চতুর্দিকের আঙ্গিনা মার্বেল পাথরের পাট (স্লাব) দ্বারা আবৃত। উত্তর-পশ্চিমের দেওয়ালের সম্মুখ দিকে গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি অর্ধ-বৃত্তাকার শ্বেত-মর্মর পাথরের দেওয়াল (الحطيم) আছে। ইহা তিন ফুট উচ্চ এবং প্রায় পাঁচ ফুট পুরু। কা'বায় উত্তর ও পূর্ব কোণ হইতে এই দেওয়ালের উভয় প্রান্ত প্রায় ৬ ফুট দূরে অবস্থিত। হাতীম ও কা'বার মধ্যবর্তী অর্ধ-বৃত্তাকার স্থানটি বিশেষভাবে সম্মানিত। কারণ এক সময় ইহা কা'বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইজন্য তাওয়াফের সময় উহার ভিতর দিয়া না গিয়া যথাসম্ভব উহার সন্নিকটস্থ বাহির দিয়া যাইতে হয়। এই স্থানটি আল-হিজর বা হিজর-ই ইস্মা'ঈল নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, হযরত ইসমা'ঈল ('আ) ও তাঁহার মাতা হাজিরা ('আ) [অন্য বর্ণনায় আছে হযরত ইসমা'ঈলের পিতা ও তাঁহার মাতা হাজিরা] এখানেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। যে স্থানে তাওয়াফ করা হয় তাহাকে মাতাফ (مطاف) বলে। দরজার ঠিক বিপরীত দিকে একটু নিম্ন স্থান আছে। উহাকে মি'জান (পশুদের জন্য রক্ষিত খাদ্য পানীয়ের আধার) বলে। কথিত আছে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কা'বা নির্মাণের সময় এখানে চুন-সুরকি ইত্যাদি মিশ্রিত করিতেন। মাতাফ এবং উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ সর্বযুগে একরূপ ছিল না। অবশ্য মাতাফের প্রবেশের অর্ধ গোলাকৃতি ফটকটি (বানূ শায়বা, কখনও ইহাকে বাবু'স-সালাম বলা হইত) যথারীতি স্থায়ী ছিল। ১৬৫৬ খৃ. সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধনকালে মাতাফের মেঝে নূতন করিয়া আবৃত করা হয়। কিছুকাল পূর্বেও মাতাফে ৩১ বা ৩২টি থাম ছিল এবং ২টি থামের মধ্যে ৭টি করিয়া ঝাড়বাতি ঝুলান ছিল। এইগুলি সন্ধ্যায় জ্বালান হইত। বর্তমানে সর্বত্র বিজলী বাতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

কা'বার উত্তর-পূর্ব দেওয়ালের বিপরীত দিকে মাতাফের প্রবেশদ্বারে একটি তোরণ (محراب) আছে। এই তোরণ ও কা'বার মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজবিশিষ্ট গৃহ আছে, যাহাকে মাকাম-ই ইবরাহীম বলে। ইহার অভ্যন্তরে একটি প্রস্তর রক্ষিত আছে। কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম ('আ) পবিত্র কা'বার নির্মাণের সময় ইহার উপর দাঁড়াইতেন। প্রাচ্যের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা একটি নরম (বেলে) পাথর। ইহাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়। 'আব্বাসী খলীফা মাহদী ইব্ন আল-মানসূরের শাসন আমলে (হি. ১৬৯) ইহাকে সংরক্ষিত রাখার জন্য একটি স্বর্ণমণ্ডিত বেষ্টনী তৈরি করা হয়। মাকাম-ই ইবরাহীম ব্যতীত উহার পার্শ্বেই কা'বার উত্তর-পূর্ব দেওয়ালের বিপরীত দিকে (থামের সারির মধ্যে) কিন্তু মাকাম-ই ইবরাহীম হইতে সামান্য উত্তরে একটি মিম্বর রহিয়াছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা শ্বেত-মর্মর পাথরে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়। সম্প্রতি ইহার পুনঃসংস্কারের সময় মাকামের আকৃতি সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহার ধ্বংসাবশেষ কাচ ও রড দ্বারা বহুভুজ ক্ষেত্রবিশিষ্ট করিয়া (বেষ্টন করিয়া) রাখা হইয়াছে। বানূ শায়বার দরজার নিকটে প্রবেশদ্বারের বামে হাজারে আসওয়াদ-এর ঠিক বিপরীত দিকে যে গম্বুজটি রহিয়াছে উহার অভ্যন্তরেই 'যামযাম'(زمزم) কূপটি অবস্থিত। কামরার ভিতরে ভূমির মেঝের উপর যে কূপটি অবস্থিত তাহার সব কিছুই শানবাঁধানো। বর্তমানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে উহা হইতে পানি উত্তোলনের ও বিভিন্ন স্থানে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালে মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও সম্প্রসারণকালে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সমগ্র রাস্তাই উত্তমরূপে পাকা ও উহার উপর ছাদ নির্মাণ করা হয়। পুরাতন নক্শা মাতাফের চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমা-নির্দেশক থামগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। হাজ্জের সময় হাজ্জীগণকে রাত্রিতে আলো প্রদান করার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বৈদুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'আলী-বে কর্তৃক অংকিত হারামের নকশায় পাকা রাস্তায় বহিঃস্থ প্রান্তে এবং যামযামের পূর্ব দিকে আরও দুইটি দালান দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহাদিগকে 'কুব্বাতায়ন' (القبتين) বা দুইটি গোলাকার গৃহ বলে। কিন্তু Snouck Hurgronje অংকিত নকশায় ইহা নাই। বহুদিন যাবত যামযাম কূপটি এই কুব্বার নীচে আবৃত ছিল। এই কূপের বর্ণনা ডাঃ সোলিমান-বে রচিত একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; উহা Raport quarantenaire of 1905 (পৃ. ১৩) মিসরে প্রকাশিত; পুস্তকটির একটি সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করিয়াছেন J. Jomier in Le Mahql et carauane des pilerus de la Mekke. Cairo 1953. 154-61 কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খোলা চত্বরে আর কোন অট্টালিকা না থাকায় হাজ্জীগণ অতিরিক্ত স্থানটুকু ব্যবহারের সুবিধা পান। দুই কামরাবিশিষ্ট গোপন কক্ষের দিকে একটি সিঁড়ি অবতরণ করিয়াছে। উহার একটি পুরুষদের জন্য এবং অপরটি মহিলাদের জন্য। সেখানে পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। মাতাফের বহির্ভাগে যে তিনটি ঘর (হানাফী, মালিকী ও হাম্বালী মাকামসমূহ) ছিল, তাহা অধুনা সম্প্রসারণ ও সংস্কারের সময় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

এই কামরাগুলি ছিল নামাযের সময় বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের দাঁড়াইবার স্থান। এইগুলিকে মুসাল্লা (مصلى) বলা হয়। কা'বার উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং হিজরের সম্মুখভাবে হানাফী মাযহাবের বৃহত্তম মুসাল্লা (مقام مصلى حنفي) অবস্থিত ছিল; দক্ষিণ-পূর্বে হাম্বালী মাযহাবের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মালিকী মাযহাবের মুসাল্লা; শাফি'ঈ মাযহাবের কোন স্বতন্ত্র মুসল্লা ছিল না; তবে তাঁহাদের ইমাম নামাযের সময় যামযাম কূপের ঘরটি ব্যবহার করিতেন। বর্তমানে এই সকল মুসাল্লার অস্তিত্ব নাই।

(২) কা'বার ইতিহাস ঃ কা'বার নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ আছে। আল-আযরাকী (আখবার-ই মাক্কা গ্রন্থে) বলেন, ফেরেশতাগণ সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণ করেন। হযরত আদম (আ)-এর জন্ম তখনও হয় নাই। এই উক্তির সপক্ষে তিনি হযরত যায়নু'ল-আবিদীন (রা) বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতের উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত 'আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে। আন্‌নাওয়াবী স্বীয় তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ফেরেশতাগণই সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তারপর হযরত আদাম ('আ) কা'বা নির্মাণ করেন। ইহার সমর্থনে আল-বায়হাকী "দালা'ইলু'ন (دلائل النبوة) গ্রন্থে একটি মারফূ' হাদীছ পেশ করিয়াছেন। রাসূল (স) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ পাক জিবরা'ঈলকে হযরত আদাম (আ) ও হাওয়া' (আ)-এর নিকট প্রেরণ করিয়া কা'বা নির্মাণ কারার আদেশ দেন। তাঁহারা আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থেই কাবা নির্মাণ করেন। নির্মাণ শেষে কা'বা তাওয়াফ করার নির্দেশও দিয়াছিলেন। অতঃপর বহুকাল অতিবাহিত হইবার পর হযরত নূহ ('আ) কা'বায় হাজ্জ পালন করেন।

আল-আযরাকী হযরত আদম ('আ) কর্তৃক কা'বা নির্মাণের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহার বক্তব্যের অনুকূলে দুইটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। বিখ্যাত হাদীছবেত্তা (محدث) 'আবদু'র-রাযযাক স্বীয় গ্রন্থ "আল-মুসান্নাফ"-এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, হযরত আদম ('আ) পাঁচটি পাহাড় দ্বারা কা'বা নির্মাণ করেন। পাহাড়গুলি হইল লুবনান, তূরে যীতা, তূরে সায়না', আল-জূদী এবং হিরা'।

আল-মুহিব্বু'ত-তাবারীর ভাষ্য মুতাবিক কা'বার ভিত্তি নির্মাণে হিরা' পর্বতের পাথর ব্যবহার করা হয়। হযরত আদম ('আ)-এর পর তদীয় পুত্র শীছ ('আ) দ্বিতীয়বার কা'বা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম ('আ) কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মাণের ঘটনা পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হইয়াছে। ইব্নু'ল-হাজ্জ আলমালিকী বর্ণনা করেন, হযরত ইবরাহীম ('আ) নির্মিত কা'বা পিছনের দিক হইতে গোলাকৃতির ছিল। রুকনে য়ামানী নামে উহার ২টি কোণ ছিল। কুরায়শগণ কা'বা পুনর্নির্মাণের সময় উহার চারিটি কোণ নির্মাণ করিয়াছিলেন (শিফা'উল-গিরাম, পৃ. ১খ, ৯২-৯৩)।

হযরত 'আলী (রা)-র উদ্ধৃতি দিয়া আল-ফাকিহী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম ('আ) নির্মিত কা'বা বিনষ্ট হইয়া গেলে জুরহুম গোত্রের লোকের উহা নির্মাণ করেন। কালের আবর্তনে উহা পুনঃধ্বংস হইয়া গেলে 'আমালিকা গোত্র উহা পুনর্নির্মাণ করেন। তৎপর কুরায়শগণ উহা পুনর্নির্মাণ করে। আল-মাস'উদী বর্ণনা করেন, জুরহুম গোত্রের যে লোকটি কা'বা নির্মাণ করিয়াছিল তাহার নাম আল-হারিছ ইব্ন মাদাদ আল-আসগার (الحارث بن مضاض الاصغر)।

মক্কা শারীফের কাদী আয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার "কিতাব নাসাব কুরায়শিন ওয়া আখ্যারিহা" গ্রন্থে কুসায়্যি ইব্ন কিলাব (قصى بن كلاب) কর্তৃক কা'বা পুনর্নির্মাণের উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মাওয়ারদী আহকামু'স-সুলতানিয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর পর কুরায়শগণের মধ্যে কুসায়্যি ইব্ন কিলাবই প্রথম নূতনভাবে কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন (শিফা'উ'ল-গিরাম, পৃ. ৯২-৯৫; আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, পৃ. ১২৭-১৩০)। হাদীছ গ্রন্থ ব্যতীত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদি কা'বার অন্য কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। টলেমী (Ptolemy) (Geography, vi 7) মক্কার স্থলে মাকোরাবা (Macoraba) শব্দ ব্যবহার করেন এবং Gloser (Skizze der Gesch. u. Geogr. Arabiens, Berlin 1890, ii, 255) মনে করেন যে, দক্ষিণ আরবীয় বা ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়া) মিকরাব (Mikrab)-এর মতই ইহা গুরুত্বপূর্ণ।

য়ামানের শাসনকর্তা আবরাহা (ابرهة)। যখন ৫৭০/৫৭১ সালে মক্কা ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালায়, তখন আল্লাহ্ পাক নিজেই পবিত্র ঘরকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আবরাহার সেনাবাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন (দ্র. আবরাহা এবং আসহাবু'ল-ফীল প্রবন্ধদ্বয়)। এই ঘটনা 'মুযদালিফা' ও 'মিনা'-র মধ্যবর্তী মুহাসসাব' 'উপত্যকার সন্নিকটে' মুহাসসির নামক স্থানে সংঘটিত হয়। মুসলিম ও 'আবূ দাউদে বর্ণিত আছে যে, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূল (স) যখন মুযদালিফা হইতে মিনা (মুনা) অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন মুহাস্‌সির উপত্যকা এলাকায় তিনি দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন। আন-নাওয়াবী তাঁহার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, আসহাবু'ল-ফীল-এর ঘটনা এইখানে সংঘটিত হইয়াছিল। তাই এখানে দ্রুত গতিতে পথ চলা সুন্নাত। এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বৎসরকে আরববাসিগণ 'আমু'ল-ফীল (عام الفيل = হাতীর বৎসর) বলিয়া অভিহিত করে। এই বৎসরই রাসূল (সা)-এর পৃথিবীতে শুভাগমন ঘটে। হাদীছবিশারদ ও ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি ঐকমত্য পোষণ করিয়া থাকেন যে, এই বৎসর মুহাররাম মাসেই আসহাবু'ল-ফীল-এর ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং রাসূল পাক (স)-এর জন্ম হইয়াছিল রাবী'উল-আওয়াল মাসে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আসহাবু'ল-ফীলের পঞ্চাশ দিন পর রাসূল (স)-এর জন্ম হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের

সূরা ফীল অবতীর্ণ হয় (দ্র. ইব্‌ন হিশাম, সীরা, ১খ, ৪৩-৫৭; আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, পৃ. ১খ, ৩৫-৪৮; আল-ফাসী শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ১৮৯-৯০; উর্দূ তাফসীরসমূহ, যেমন--মাওয়াহিবু'র রাহমান, তাফহীমু'ল-কুরআন প্রভৃতি)।

আবরাহার মক্কা অভিযানের ঘটনা হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কা'বার অস্তিত্ব ও উহাতে 'ইবাদতের বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'তুব্বা' (য়ামানের রাজাদের উপাধি) আস্'আদ আবূ কারীব আল-হিময়ারী মক্কা আসিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম কা'বার গিলাফ (কিসওয়া) এবং তালাযুক্ত দরজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কা'বার বিভিন্ন পদে কুসায়্যি (قصی)-এর পুত্রগণের নিযুক্তি এবং দায়িত্ব বিতরণ হইতে জানা যায় যে, কা'বার মূর্তি পূজার প্রথাটি মুহাম্মাদ (স)-এর বহু পূর্ব হইতে সযত্নে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। আধুনিক মুসলিমগণ কা'বার প্রথম নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত বর্ণনাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। আল-কুরআনের একটি মাদানী সূরায় উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও তদীয় পুত্র ইসমা'ঈল ('আ) কা'বা গৃহ নির্মাণে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আল-কুরআন, সূরা ঃ বাকারাঃ, ১২১-২৭, মাকাম-ই ইবরাহীমকে সালাত আদায়ের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে (বাকারা ঃ ১২৫)। আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) হাজ্জ যাত্রা করিয়াছিলেন (২২ ঃ ২৬-২৭)। পৃথিবীতে কা'বাই সর্বপ্রথম উপাসনালয় একটি প্রাচীনতম গৃহ। কুরআনে ইহা পবিত্র গৃহ (বায়তু'ল-হারাম) উল্লিখিত হইয়াছে (৫ ঃ ৯৭)। ইসলামপূর্বকালে কুসায়্যি কর্তৃক পূবর্তন কা'বা গৃহ ধ্বংস ও উহার পুনর্নির্মাণের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কেবল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময় হইতেই কা'বার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেই নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, যখন হযরত মুহাম্মাদ (স) বয়ঃপ্রাপ্ত হন, সেই সময় একজন মহিলা সুগন্ধি (লোবান) দগ্ধ করার সময় আকস্মিকভাবে কা'বায় আগুন লাগিয়া যায় এবং উহা ভস্মীভূত হয়। সেই সময় ঘটনাক্রমে রোমকদের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কতকগুলি কাঠের খণ্ড ভাসিতে ভাসিতে জিদ্দার উপকূলে চরায় আটকাইয়া যায়। মক্কাবাসিগণ ঐ কাঠ সংগ্রহ করিয়া নূতন ভবনের জন্য উহা ব্যবহার করে। এই প্রসঙ্গে বাকূম (باقوم) নামক জনৈক ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বর্ণনান্তরে তিনি জাহাজের কাপ্তান বা মিস্ত্রী ছিলেন (কা'বার পুনর্নির্মাণ কার্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়)। তিনি একজন কিবতী খৃষ্টান ছিলেন (দ্র. আস-সুহায়লী, আররাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ১৩০)। আস-সুহায়লীও তাঁহার নাম বাকূম উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, পুরাতন গৃহটি একজন মানুষের সমান উচ্চ ছিল এবং ইহার কোন ছাদ ছিল না। চৌকাঠ ছিল ভূমি সমতল; ফলে বৃষ্টির পানি সহজেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিত। তারপর পর্যায়ক্রমে প্রস্তর ও কাষ্ঠ স্তর দ্বারা কা'বা নির্মিত হয়; ইহার উচ্চতা দ্বিগুণ বর্ধিত করা হয় এবং ছাদ নির্মাণ করা হয়। দরজা এত উচ্চে স্থাপন করা হয় যে, উহাতে প্রবেশকারীর জন্য সিঁড়ির আবশ্যক হয়। কা'বার পুনর্নির্মাণের সময় যখন কৃষ্ণ প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করার সময় হয়, তখন মক্কাবাসীদের মধ্যে তুমুল বিবাদ শুরু হইল। বিষয় ছিল ঃ কোন্ গোত্র ইহা স্থাপন করার গৌরব অর্জন করিবে ? অবশেষে কুরায়শ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা প্রস্তাব করেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বায় আগমন করিবে তাহাকেই ইহা মীমাংসা করার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। হযরত মুহাম্মাদ (স) কা'বা নির্মাণের জন্য প্রস্তর বহন কার্যে সাহায্যও করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হযরত মুহাম্মদ (স)-ই প্রথমে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হন। ইহাতে সকলেই খুশীতে উল্লসিত হইল। মহানবী (স) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত একটি চাদর লইয়া প্রস্তরটি উহার উপর রাখিলেন এবং বিবদমান গোত্রগুলির প্রধানদিগকে চাদরের কোণা ধরিয়া পাথরটিকে যথাস্থানে লইয়া যাইতে বলিলেন। অতঃপর তিনি নিজে পাথরটি তুলিয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, মিসর, ১খ, ১৯৭; আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ১৩২; শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ৯৫ ও ৯৬)। ৮ম/৬২৯ সালে মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (স) কাবার কোন পরিবর্তন করেন নাই। অবশ্য অন্য হাদীছ সূত্রে জানা যায়, তিনি হযরত 'আইশা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, "হে 'আইশা! যদি তোমার কাওম নব-মুসলিম না হইত তবে আমি কা'বা গৃহের ২টি দরওয়াজা তৈরি করিতাম। একটি প্রবেশ ও অন্যটি বাহির হইবার জন্য (আস-সাহীহ আল-বুখারী; কিতাবু'ল-'ইলম, অধ্যায় ৪৮)। এই উক্তি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু ইহা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া তিনি বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই সদিচ্ছা ৬৪/৬৮৩ সালে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা হিসাবে তিনি হুসায়ন ইব্‌ন নুমায়র (দ্র.) কর্তৃক মক্কায় অবরুদ্ধ হন। মক্কার চতুর্দিকস্থ পাহাড়ে 'মানজানীক' (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ) স্থাপন করিয়া শহর ও হারাম শারীফ-এর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়। ফলে কা'বার ভীষণ ক্ষতি সাধিত হয় (এবং ইহাকে একজন শোকাতুরা অশ্রুসিক্ত মহিলার চেহারার ন্যায় করুণ দেখায়)। হযরত 'আবদুল্লাহ্ (রা) ও তাঁহার সঙ্গিগণ কা'বার নিকটে তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করেন। এই সময় হইতে তিনি নিজেকে 'আ'ইয বি'ল-বায়ত (কা'বায় আশ্রয় গ্রহণকারী) হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ইহার পর এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে উহা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা হইয়া যায়। ইব্‌ন যুবায়র (রা) এই টুকরাগুলি রৌপ্যের পাত দ্বারা বাঁধিয়া দেন (শিফা'উ'ল-গিরাম, পৃ. ৯৮)।

উমায়্যা সৈন্যদল চলিয়া গেলে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কা'বার পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করেন। যখন তিনি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং ধ্বংসস্তূপ অপসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন কেহই এই কাজে সাহসী হইল না। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-সহ অনেকেই আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) স্বহস্তে কুঠার লইয়া কাজে লিপ্ত হইলেন। তাঁহাকে অক্ষত অবস্থায় দেখিয়া সকলেই সাহস লাভ করিল এবং কাজে যোগদান করিল। কা'বা নির্মাণকালে কিবলা ও মাতাফের মধ্যবর্তী চিহ্ন নির্দেশ করার জন্য কা'বার অবস্থান স্থলে একটি আবৃত কাঠামো রাখা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, এই কাঠামোর বাহিরেই রাজমিস্ত্রীরা কাজ করিত। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) দারু'ন-নাদওয়ায় (دار الندوى) রক্ষিত কিংখাবে মোড়া কৃষ্ণ পাথরটি স্বয়ং পাহারা দিতেন। ইহার তিনটি খণ্ডকে যথাস্থানে রাখিয়া রৌপ্য বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এইবার কা'বা সম্পূর্ণরূপে মক্কার প্রস্তর ও য়ামানের চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত হয়। ইমারতটি ২৭ ঈল অর্থাৎ প্রায় ৩২ গজ (মতান্তরে ২৭ গজ) উচ্চ করা হইয়াছিল। একটি

হাদীছের বর্ণনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বা হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভূমির সমতলে ইহাতে ২টি দরজা লাগান হইয়াছিল। পূর্বদিকের দরজাটি প্রবেশ এবং পশ্চিম দিকের দরজাটি বাহির হইবার জন্য। তাওয়াফের সময় দেওয়ালের চারিকোণেই চুম্বন করা হইত। এই ধরনের পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী ছিল। ৭৪/৬৯৩ সালে হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ মক্কা জয় করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করেন। হাজ্জাজ খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের সহিত একমত হইয়া পুনরায় 'হিজর'-কে কা'বা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পশ্চিম দিকের দরজাটি বন্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-র নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ জ্ঞাত হইয়া খলীফা 'আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ান লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ কা'বাকে হযরত যুবায়র (রা) কর্তৃক নির্মিত আকৃতিতে অক্ষুণ্ন রাখাই শ্রেয় ছিল (শিফা'উ'ল-গিরাম, পৃ. ৯৬)। এইভাবে কা'বা পূর্বরূপ পরিগ্রহ করিল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যামানার আকৃতির ন্যায় এবং অদ্যাবধি ঐ আকৃতিই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। কা'বায় যে কোন ধরনের পরিবর্তন জনসাধারণের ভাবাবেগের পরিপন্থী ছিল। কখনও কখনও ইহার সংস্কারের প্রয়োজন হইত। জাহিলী যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বদাই এই ইমারতটি স্রোত প্রবাহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। ১৬১১ খৃ. যখন ইহা বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিল তখন রক্ষা-কবচ হিসাবে ইহার চতুষ্পার্শ্বে একটি তাম্রের বেষ্টনী দেওয়া হইল। কিন্তু একটি নূতন বৃষ্টিধারা এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অপ্রতুল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিল। সুতরাং ১৯৩০ খৃ. কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হইল এবং পুনর্নির্মাণে যথাসম্ভব পুরাতন প্রস্তরই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

৩১৭/৯২৯ সালে কারামতী সম্প্রদায়ের কা'বা আক্রমণ সত্ত্বেও উহা অক্ষত ছিল, অবশ্য আক্রমণকারিগণ "হাজারে আসওয়াদ" ছিনাইয়া লইয়াছিল। প্রায় ২০ বৎসর পর উহা মক্কায় প্রত্যাবর্তিত হয় (cf. de Goeje, Mcm. Sur les Carmathes[2], ১০৪-১১, ১৪৫-৮)।

গিলাফ দ্বারা কা'বা আচ্ছাদিত করা একটি অতি প্রাচীন প্রথা। কথিত আছে যে, য়ামানের 'তুব্বা' কর্তৃক ইহা প্রবর্তিত হয় (অন্য এক বর্ণনায় সিকান্দার 'আজামের কথা উল্লেখ আছে)। প্রতি বৎসর গিলাফ পরিবর্তন করা বর্তমানে একটি বিধিবদ্ধ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। 'আশূরার দিন গিলাফ পরিবর্তন করা পূর্বতন মুসলিম যুগের রীতি হিসাবেও উল্লেখ করা আছে। তবে রাজাব ও অন্যান্য মাসেও গিলাফ পরিবর্তন করা হইয়াছে। গিলাফ কখনও য়ামানী, কখনও মিসরীয় বা অন্য কোন প্রকার বস্ত্রেও তৈরি হয়। বিভিন্ন কাপড় ও রংয়ের গিলাফের বর্ণনা পাওয়া যায় (দেখুন শিফাউ'ল-গিরাম, ১১৯-১২৬)। ওয়াহ্হাবীগণ লাল রংয়ের গিলাফ দ্বারাও কা'বা আবৃত করিয়াছিলেন। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে বহু গিলাফের চাপে কা'বা ভূপাতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 'আব্বাসী যুগ হইতেই কা'বার চতুর্দিকস্থ মাকামগুলির কথা কথিত হইয়া আসিতেছে। কখনও কখনও 'মাকাম' কে 'জুল্লা' (ظلة—ছায়া) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। বর্তমান গৃহসমূহ ১০৭৫/১৬৬৩ হইতে কা'বার চারিদিকে বিদ্যমান। ঐ সময় হইতেই যামযাম কূপের উপরিস্থ গম্বুজের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান গম্বুজটি নির্মিত হইয়াছে ১০৭২/১৬৬১ সনে। ৯৩৩/১৫২৬ সালে যামযাম কূপের উপরিস্থ গৃহের সম্মুখে 'উছমানী সুলতান সুলায়মান-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে খচিত করিয়া দেন। ৯৪৮/১৫৪১ সালে যামযাম কূপের উপরিস্থ ঘরটি নূতনভাবে নির্মাণ করা হয় (শিফা'উ'ল-গিরাম, পৃ. ২৫১)। ১০২০/১৬১২ সালে সুলতান আহমাদ খানের নির্দেশক্রমে যামযাম কূপে লোহার জাল লাগান হয়। ১০৭২/১৬৬১ সালে যামযামের গম্বুজও পুনর্নির্মাণ করা হয় (শিফা'উ'ল-গিরাম, পৃ. ২৫১)। সুলতান 'আবদু'ল-'আযীয আল-সা'উদ যামযাম কূপের নিকট দুইটি পানির ট্যাপ (পাইপ) সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং পানি পানকারীদের জন্য শেড নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পৌত্তলিক ও মুসলিম উভয় যুগেই কা'বার জন্য ধন-সম্পদ উৎসর্গীকৃত হইয়া আসিতেছে। আল-আযরাকী এই সম্পর্কে একটি বিস্তারিত অধ্যায় রচনা করিয়াছেন (পৃ. ১৫৫-৬)। অনেক শাসকই এই সকল উৎসর্গীকৃত সম্পদকে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি তথ্যে বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) বলিয়াছেন, "আমি কাবার স্বর্ণ, রৌপ্য কিছুই রাখিব না; সবই বিতরণ করিয়া দিব।" কথিত আছে যে, হযরত 'আলী (রা) ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলে হযরত 'উমার (রা) তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

(৩) কা'বা ও ইসলাম ঃ নুবূওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে সালাত ফরয হইলে মহানবী (স) আল্লাহ্র আদেশে কা'বার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করিতে শুরু করেন (অবশ্য সালাত ফরয হইবার পূর্বেই এই কিবলামুখী সালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়)। হিজরতের পর মাদানী জিন্দেগীর প্রারম্ভেই তিনি বায়তু'ল-মাকদিসের দিকে মুখ করিয়া সালাত পড়ার আদেশ প্রাপ্ত হন। প্রায় বছর দেড়েক রাসূল (স) এই আদেশ পালনে রত ছিলেন। কিন্তু অন্তরে তিনি বায়তুল্লাহ (কা'বা) মুসলমানদের কিবলা হউক এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। পবিত্র কুরআনেও রাসূল (স)-এর এই আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ আছে। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ায় তাঁহার এই বাসনা পরিপূর্ণ হয় ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ – وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.

"আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পসন্দ কর। অতএব, তুমি মাসজিদু'ল-হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, উহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন" (২ ঃ ১৪৪)।

প্রথমে নির্মিত কা'বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম ('আ) উহা পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন জাদ্দু'ল-আম্বিয়া' (جد الانبياء) বা বহু নবীর পূর্বপুরুষ। য়াহূদী ও নাসারাগণও তাঁহার নুবূওয়াতের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিও তাঁহার অনুসরণ করার হুকুম ছিল। হযরত ইবরাহীম ('আ)-ও ইসলামের আহ্বায়ক ছিলেন। য়াহূদীগণ তাহাদের ধর্মের অনেক রদবদল করিয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমা'ঈল ('আ) কর্তৃক কা'বার পুনর্নির্মাণের কথা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় বর্ণিত হইয়াছে (সূরা বাকারা ঃ ১২৭)। মাকাম-ই ইবরাহীম সালাতের জন্য সর্বোত্তম স্থান হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। আল্লাহ্ তা'আলা জনসাধারণকে হাজ্জের প্রতি

আহ্বান করার জন্য হযরত ইবরাহীম ('আ)-কে আদেশ দেন (২২ ঃ ২৭)। কা'বা গৃহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত মসজিদ (বায়তু'ল-'আতীক) (২২ ঃ ২৭, ৩৩)। ৬/৬২৭ সালে হযরত মুহাম্মাদ (স) চৌদ্দশত সাহাবী সমভিব্যাহারে 'উমরা পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হন। এখানে সম্পাদিত সন্ধির প্রেক্ষিতেই তিনি সপ্তম হিজরীতে 'উমরাতু'ল-কাদা (عمرة القضاء) সম্পন্ন করেন। ৮ম হিজরীতে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয়। ইহাতে ইসলামের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। কা'বাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কুফরী আচার-অনুষ্ঠান পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা বিদূরিত করা হইল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, কা'বায় ৩৬০টি প্রতিমা রক্ষিত ছিল। যখন রাসূল (স) আপন হস্তের লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলিকে আঘাত করেন এবং এই আয়াত

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

["সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই" (কুরআন, ১৭ ঃ ৮১ ও হাদীছ সিহাহ সিত্তা)] পাঠ করেন, তখন উহা ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কা'বার অভ্যন্তরে হুবাল দেবের যে প্রতিমূর্তি 'আমর ইব্ন লুহায়্যি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা এবং নবীগণের প্রতিকৃতিগুলিও অপসারিত করা হইল (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ., ৮২; ইবনু'ল-কালবী, কিতাবু'ল-আসনাম)।

কাষ্ঠনির্মিত কবুতরের প্রতিমূর্তি কা'বায় রক্ষিত ছিল, তাহাও মহানবী (স)-এর আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় বলিয়া কথিত আছে। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (স) পূর্বপ্রচলিত যাবতীয় পার্থিব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সুব্যবস্থা করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, জাহিলিয়া যুগে কুসায়্যি বানূ খুযা'আর সহিত যুদ্ধ করিয়া কা'বার উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং ধর্মীয় ও পার্থিব সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি স্বয়ং অধিকার করিয়াছিলেন। এই পদগুলি ছিল দারুন-নাদওয়ার ব্যবস্থাপনা, পতাকা উত্তোলন ('ইকদুল-লিওয়া), তীর্থযাত্রিগণকে আহার্য প্রদান (رفادة = রিফাদা), পানীয় সরবরাহ (سقاية = সিকায়া), কা'বার তত্ত্বাবধান (سدانة وحجابة = সুদানা ওয়া হাজাবা) প্রভৃতি। কুসায়্যি-র মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ (পুত্র ও পৌত্রগণ) নিম্নবর্ণিত সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়। কুসায়্যির বংশধরগণের তালিকা নিম্নরূপ (ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, ১২৩-২৪)ঃ

'আব্দ মানাফ — হাশিম — 'আবদু'ল-মুত্তালিব — 'আব্বাস, 'আবূ তালিব

'আবদু'দ-দার — 'উছমান — 'আবদুল-'উযযা — আবূ তালহা, 'আবদুল্লাহ

'আবদ মানাফ ও তাঁহার বংশধরগণের উপর তীর্থযাত্রিগণকে খাদ্য ও পানি সরবরাহ (رفادة وسقاية) এবং 'আবদু'দ-দার ও তাঁহার বংশধরগণের উপর কা'বার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব (সুদানা ওয়া হিজাবা) বন্টন করা হয়।

মক্কা বিজয়ের পর নবী (স)-এর চাচা 'আব্বাস (দ্র), অন্য বর্ণনানুসারে 'আলী (রা) ঐ সমস্ত পদ লাভের বাসনায় আবেদন করিলেন। কিন্তু নবী কারীম (স) উত্তর করিলেন, "যামযামের পানি সরবরাহ ও কা'বার তত্ত্বাবধান ব্যতীত যাবতীয় প্রাচীন প্রথাই আপনার পদতলে পিষ্ট (পরিত্যক্ত); খাদ্য ও পানীয়ের দায়িত্ব হযরত 'আব্বাস (রা)-এর উপর এবং কা'বার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইল হযরত 'উসমান ইব্ন তালহা (রা)-র উপর। 'উছমান (রা) তাঁহার চাচাত ভাই শায়বা ইব্ন তালহাকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিলেন। এই শায়বার বংশধরগণই অদ্যাবধি কা'বার দ্বার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের যে দায়িত্ব আবূ তালিবের উপর ছিল, ৯ হিজরীতে আবূ বাক্র (রা)-কে তাহা প্রদান করা হয়। তাঁহার ইনতিকালের পর খলীফাগণই তীর্থযাত্রি (হাজ্জী)-গণের আহার্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করিতেন।

৯ম হিজরীতে মক্কা ও মক্কাবাসীদের উপর হযরত মুহাম্মাদ (স) তথা মুসলমানদের একচ্ছত্র শাসন পূর্ণত্ব লাভ করে। এই বৎসর মহানবী (স) নিজে হাজ্জে যান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে হযরত আবূ বাক্র (রা) হাজ্জীগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং এক নূতন ও সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিলেন। হযরত 'আলী (রা). সূরা তাওবার আয়াত পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলেন, "এই বৎসরের পর হইতে আর কোন বিধর্মীকে বায়তুল্লাহতে প্রবেশ অধিকার দেওয়া হইবে না।" সূরা তাওবা (براءة বারাআত) ; (৫ ঃ ১-২, ২৮, ৩৬-৭) ; রাসূল (স) এই ব্যবস্থাপনার আদেশ ওয়াহয়ি যোগে প্রাপ্ত হন। এই ঘোষণানুযায়ী বিধর্মিগণকে (পৌত্তলিক) কা'বা শারীফের যে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কারণ তাহারা অপবিত্র (نجس)। এতদ্ব্যতীত ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘাত ও চুক্তি ভঙ্গকারী পৌত্তলিকগণকে আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তাহাদিগকে চারি মাসের সময় দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা দেশের মধ্যে যথেচ্ছা গমন করিতে পারে। কিন্তু যেই সমস্ত পৌত্তলিক সন্ধিশর্ত সম্পূর্ণ পালন করিয়াছিল এবং যাহারা মুসলিমবিরোধী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ছিল না, তাহাদিগকে ছাড়া অন্য সব পৌত্তলিককে মক্কায় আগমন নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় (দ্র. সূরা বারা'আত = براءة)।

১০ম হিজরীতে (৬২৯ খৃ.) রাসূল (স) স্বয়ং হাজ্জের নেতৃত্ব দান করেন। ঐ বৎসর একজন পৌত্তলিকও উপস্থিত ছিল না। কা'বা সম্পূর্ণরূপে একটি মুসলিম পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমগণ প্রতিটি সালাতে কা'বার দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। হাজ্জের সময় কা'বা-কে কেন্দ্র করিয়া প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কা'বার দুইটি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয়। একটি দ্বার উদ্ঘাটন ও অন্যটি ধৌতকরণ। দ্বারোদ্ঘাটন একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় এবং (উপরে বর্ণিত) সিঁড়িটি যথারীতি লাগান হয়। তবে দ্বার উদ্ঘাটনের তারিখ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ইহা হাজ্জের মাসে ও ১০ মুহাররামে ('আশুরার দিনে) খোলা হইয়া থাকে। প্রথমে পুরুষ এবং পরে মহিলাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

[কা'বার অভ্যন্তরে সালাত ঃ সাধারণত কা'বাকে সম্মুখে রাখিয়াই সালাত আদায় করা হয় এবং ইহাই বিধান। কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সালাত আদায়ের ঘটনা বিরল। রাসূলুল্লাহ্ (স) কখনও কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সালাত আদায় করিয়াছেন কি-না সে সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (স) কা'বার নিকট গেলেন। অতঃপর লোক পাঠাইয়া

'উছমান ইব্ন তালহা (রা) নিকট হইতে চাবি আনাইলেন এবং দরজা খুলিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। উসামা, বিলাল এবং 'উছমান (রা)-ও তাঁহার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করেন, অতঃপর কা'বার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহারা সেইখানে অবস্থান করিবার পর দরজা খুলিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি দরজার নিকট গিয়ে বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) কি ভিতরে সালাত আদায় করিয়াছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, কোন্ স্থানে ? তিনি বলেন, সম্মুখের দুই স্তম্ভের মধ্যখানে। তিনি কয় রাক'আত আদায় করিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছি (সাহীহ আল-বুখারী, ১খ, ২১৭ : সাহীহ মুসলিম, ১খ, ৪২৮)। দারু কুতনীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়াছিলেন (দারু কুতনী, ২খ, ৫২)।

ইব্ন হিব্বান-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁহার ভাই আল-ফাদল (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) কা'বায় প্রবেশ করিয়া দুই স্তরের মধ্যখানে সিজ্দায় পড়িয়া যান। অতঃপর সিজ্দা হইতে মাথা তুলিয়া বসিয়া দু'আ করেন। কিন্তু সালাত আদায় করেন নাই।

অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কা'বায় প্রবেশ করেন। কা'বায় তখন ছয়টি স্তম্ভ ছিল। অতঃপর প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া তিনি দু'আ করেন কিন্তু সালাত আদায় করেন নাই (সাহীহ মুসলিম, ১খ, ৪২৯)।

এই ব্যাপারে দারু কুতনী যে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন তাহা দ্বারা উপরিউক্ত বর্ণনাগুলির সমন্বয় সাধিত হয়। রিওয়ায়াতটি এই ঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করত দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর বাহির হইয়া তিনি হাজারে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যখানে দাঁড়াইয়া দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়া বলিলেন ঃ ইহাই কিবলা। অতঃপর আর একবার তিনি কা'বায় প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া দু'আ' করিলেন। অতঃপর বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু সালাত আদায় করিলেন না (দারু কুতনী, ২খ, ৫২)।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) দুইবার কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একবার তিনি দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিয়াছিলেন আর একবার শুধু দু'আ' করিয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

কা'বার অভ্যন্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সালাত আদায় সম্পর্কিত রি'ওয়ায়াত দ্বিবিধ হওয়ার কারণে ফাকীহগণের মধ্যেও এই মাস'আলা সম্পর্কে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

হানাফীগণ ইব্ন 'উমার (রা)-এর হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, কা'বার অভ্যন্তরে ফরয বা নফল যে কোনও ধরনের সালাত আদায় করা জাইয। শাফি'ঈ মাযহাব মতেও ফরয এবং নফল উভয়ই জা'ইয, তবে সম্মুখের দরজা উন্মুক্ত থাকিলে সালাত সাহীহ হইবে না।

মালিকী মাযহাব মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরয সালাত আদায় করা মাকরূহ তাহরীমী। ওয়াক্তের মধ্যে পুনরায় তাহা আদায় করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে সুন্নাতে মু'আক্কাদাও মাকরূহ তাহরীমা। কিন্তু তাহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে না। আর সুন্নাতে গায়র মু'আক্কাদা বা নফল আদায় করা মুস্তাহাব।

হাম্বালী মতে কা'বার অভ্যন্তর ফরয সালাত আদায় করা জাইয নাই। নফল বা মান্নতের সালাত আদায় করা জা'ইয।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাহীহ আল-বুখারী, দেওবানদ (ইউ. পি.), তা. বি., ১খ, ২১৭ ; (২) সাহীহ মুসলিম, দেওবানদ (ইউ. পি.), তা. বি., ১খ, ৪২৮-২৯ ; (৩) তিরমিযী আস্-সুনান, দিল্লী তা. বি., ১খ, ১০৬-১০৭; (৪) দারু কুতনী আস-সুনান, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮২, ২খ ৫১-৫২; (৫) ইমাম মুহাম্মদ আল-মুওয়াত্তা', দেওবন্দ তা. বি., ২২৮; বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৮ খৃ., অনুচ্ছেদে ৪১, নং ৪৮০, পৃ. ২৮১-২; (৬) বুরহানু'দ-দীন আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, দেওবন্দ (ইউ. পি.), তা. বি., ১খ, ১৬৪-৬৫; (৭) 'আবদু'র-রাহমান আল-জাযীরী, কিতাবু'ল-ফিকহ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, মিসর তা. বি., ১খ, ২০৪।

ড. আবদুল জলীল

কা'বা ধৌত করার রীতি বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ধৌত করার তারিখ ও সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয়। বর্তমানে যু'ল-হিজ্জা মাসের ৬ কিংবা ৭ তারিখে কা'বা ধৌত করা হয়। সুলতান কিংবা মক্কার গভর্নর, মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশেষ বিশেষ কতিপয় হাজ্জী এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথমে সুলতান কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি কা'বায় প্রবেশ করেন। দুই রাকা'আত সালাত আদায় করার পর তিনি নিজেই যামযামের পানি দ্বারা কা'বা ধৌত করেন। এই পানি চৌকাঠের নিম্নস্থ একটি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। খেজুর পত্রে নির্মিত একটা ঝাড়ু দ্বারা দেওয়াল ধৌত করা হয়। অতঃপর মক্কা শারীফের শাসনকর্তা সব কিছুর উপর গোলাপ পানি ছিটাইয়া দেন। অবশেষে সারা ঘর নানা প্রকার সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করা হয় (দ্র. আল-কিবলা)।

আল-বাতানূনী বলেন (পৃ. ১০৯) যে, যামযামস্থ ও তাওয়াফরত ব্যক্তিগণ ন্যূনতম অর্থ রিয়ালের বিনিময়ে অনুরূপ ঝাড়ু হাজ্জীগণের নিকট বিক্রয় করিত। কা'বার সান্নিধ্যে আগমনকারী প্রত্যেক মুসলিমই এই পবিত্র গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। হাজারে আসওয়াদ, পানির নালা, মুলতাযাম— সর্বোপরি যামযামের পানি প্রভৃতি সবই মুসলমানের দৃষ্টিতে পবিত্র। সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত 'উমার (রা) একদা হাজারে আসওয়াদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি জানি তুমি একটি প্রস্তরমাত্র, তুমি সাহায্যও করিতে পার না, ক্ষতিও করিতে পার না। যদি রাসূল (স) তোমাকে চুম্বন না করিতেন, তাহা হইলে আমিও তোমাকে চুম্বন করিতাম না" (বুখারী)। অতঃপর 'উমার (রা) উহা চুম্বন করেন। পানির নলের (মীযাব) নীচে সালাত আদায় করা সবিশেষ ছাওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করা হয়। আল-আযরাকী (পৃ. ২২৪) বলেন, যে ব্যক্তি মীযাব-এর নীচে সালাত পড়িবে, সে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। অনেকের বিশ্বাস, যে কোন সৎ উদ্দেশ্যেই যামযামের পানি পান করা হউক না কেন, তাহা পূর্ণ হইবে। ماء زمزم لما شرب له (মা' যামযাম লিমা শুরিবা লাহু), কুতবু'দ-দীন, ৩৪; আল-হাকিম তাঁহার আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীছটি চয়ন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সনদের দিক হইতে হাদীছটি বিশুদ্ধ (শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ২৫৩)। পবিত্র কা'বা গৃহ দর্শনমাত্রই দর্শনকারীদের মনে যে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে মুসলিম ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে অজস্র

দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, কা'বায় সালাত আদায় সম্পর্কে আল-বাতানূনীর বর্ণনার (পৃ. ২৬) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, "সমবেত জনতা যেখানে প্রগাঢ় সম্মানের সহিত মহাপ্রতাপান্বিত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সমীপে দণ্ডায়মান হইল, তাঁহার সামনে মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ত তুচ্ছ ও অস্তিত্বহীনের মতই নগণ্যতম। যদি আমরা স্বচক্ষে সালাতের সময় এই জনসমষ্টির দেহ সঞ্চালন, তাকবীর ও মুনাজাতে তাহাদের হস্ত উত্তোলন প্রত্যক্ষ না করিতাম, যদি বিনয় ও নতি স্বীকারসূচক অনুচ্চ স্বরের আকুতি না দেখিতাম, আর আমরা যদি মহামহিমান্বিত সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান জনতার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ না শুনিতাম, তাহা হইলে সব কিছুই আমাদের অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সত্যই আমরা সেই সময় অন্য জগতে ছিলাম, আমরা আল্লাহ্‌র ঘরে এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলাম। আমাদের মস্তক ছিল অবনত, ভাষা ছিল বিনীত এবং প্রার্থনায় কাকুতি, অশ্রুবিগলিত নয়ন, ভীতিবিহ্বল অন্তর ও পরিত্রাণের পবিত্র চিন্তা" (তু. Macdonald, the Religious Attitude and Life in Islam, Chicago 1909, 216-7; Ben Cherif, Aux villes saintes de l'Islam, ii-iii, ৪৫-৬-৬৮)।

পবিত্র কা'বার এই সুউচ্চ স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বের সকল মাযহাবের মুসলিমগণ একমত। ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, পবিত্র মক্কা ভূমি ইসলামের দীপ্তির মহত্ত্বের এক জ্বলন্ত নিদর্শন এবং কা'বা তাহার গৌরবোজ্জ্বল মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কেন্দ্রস্থল। এই বিশাল পৃথিবীতে ইহাই একমাত্র স্থান যেখানে বিশ-পঁচিশ লক্ষ মানুষ পবিত্র হাজ্জব্রত পালনের জন্য সমবেত হয়। ভাষা, জাতি ও বর্ণনির্বিশেষে তাহারা সকলেই এক মহান আল্লাহ্‌র নিকট ঐকান্তিকভাবে একই কিবলার দিকে মুখ করিয়া, একই কাতারে দণ্ডায়মান হইয়া একই পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে বিনম্র প্রার্থনা জানায়। এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজেদের কামনা ও বাসনা পূরণের প্রত্যাশা করা যায় না। আধুনিক চিন্তাবিদগণের মতে মহান আল্লাহ্ তাঁহার প্রত্যাদেশ অবতীর্ণকরণকল্পে এই মক্কা ভূমিকে মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহারা পবিত্র কা'বাকে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছেন। সূফী মতবাদিগণও কা'বা সম্পর্কে এই বিশেষ ধারণা পোষণ করেন। কা'বা সম্পর্কে তাঁহাদের এই মনোভাব শারী'আত সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণার উপর নির্ভরশীল। গাযালীর ন্যায় শারী'আতপন্থী সূফীগণের মতে নিঃসন্দেহে কা'বা একটি পবিত্র গৃহ এবং হাজ্জের সময় উহার তাওয়াফ করা অত্যাবশ্যক। এই তাওয়াফ সার্থক ও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করে তখনই, যখন উহা মানুষকে উন্নততর আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হইবার প্রেরণা যোগায়। সূফীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কা'বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবূ য়াযীদ আল-বিসতামী বলেন, "আমার হাজ্জের প্রথমবার আমি শুধু কা'বা দেখিলাম, দ্বিতীয়বারে কা'বা ও প্রভু উভয়কেই দেখিলাম, আর তৃতীয়বারে আমি শুধু প্রভুকে দেখিলাম।" মোটকথা, আল্লাহ্‌র সহিত মিলনের আকুতির অভাবে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় আত্মার আশ্রয় মিলে না। যেখানে ধ্যান আছে সেখানেই আত্মার আশ্রয় আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র জগৎ মানুষের জন্য আল্লাহর সহিত মিলন স্থল হইয়া দাঁড়ায় যে, সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্-প্রেম তাঁহার নিকট অপরিচিত থাকে। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ যাহা তাহা কা'বা নয়, বরং আসল কথা হইল, ধ্যান ও পরম প্রিয়ের মধ্যে বিলীন বা ফানা (فنا) হইয়া যাওয়া। কা'বার যিয়ারাত উক্ত পরিণতিগুলির মধ্যে একটি কারণমাত্র (আল-হুজবীরী, অনু. Nicholson, পৃ. ৩২৭)।

(৪) পৌরাণিক কাহিনী (কিংবদন্তী) ও কুসংস্কারে কা'বা;

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বকালীন কা'বা সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী বর্ণিত আছে, এমনকি আধুনিক তাফসীরকার মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ পর্যন্ত ধর্ম বিশ্বাসীদের নানা কল্পনাপ্রসূত আধিক্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর ছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িককালে প্রচলিত নানা কিংবদন্তীর উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন (তাফসীর আল-মানার, ১খ, ৪৬৬-৭)। ইহাও সুবিদিত যে, সৌদীগণ কর্তৃক হিজায বিজয়ের পর বেশ সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাসভিত্তিক কিছু সংখ্যক পুণ্য স্থান বিলুপ্ত করা হয়। যথা ঃ জিদ্দাস্থ হযরত হাওয়া' ('আ)-এর কবর। কা'বা সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের কয়েকটির বিষয়বস্তু এইরূপ ঃ পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই কা'বা সৃষ্টির কাহিনী, হযরত নূহ ('আ)-এর প্লাবনের সময় কা'বার কি অবস্থা হইয়াছিল, ইবরাহীম ('আ) কিরূপে আরবে আগমনের জন্য নির্দেশিত হইয়াছিলেন, হযরত ইবরাহীম ('আ) কর্তৃক কা'বা নির্মাণের কাল, তাঁহার আচরণের বিস্তারিত বিবরণ, নূহ ('আ)-এর মহাপ্লাবনের সময় আবূ কুবায়স পাহাড়ে রক্ষিত কালো পাথরটি কিভাবে জিবরা'ঈল ('আ) কর্তৃক আনীত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে সাদা পাথরটি কিভাবে ইসলামপূর্ব যুগের মানুষের পাপ ও অন্যায়ের সংস্পর্শে তাহার বর্তমান রং ধারণ করিয়াছে প্রভৃতি।

যামযাম কূপ সম্পর্কেও অনেক কাহিনী রহিয়াছে। যেমন একদা 'আবদু'ল-মুত্তালিব কক্ষের ভেতর শায়িত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, জনৈক ব্যক্তি অতি সংগোপনে তাঁহাকে আদেশ দিল, "তুমি যামযাম কূপটিকে ঐ স্থানে খনন করিয়া বাহির কর যেখানে গোবর, রক্ত, পাহাড়ী কাকের বাসা এবং পিপীলিকার গর্ত রহিয়াছে।" কুরায়শগণ কূপ খননে তাঁহার অধিকার অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষ এখন বানূ সা'দ হুযায়ম-এর গণকের সহিত পরামর্শ করার নিমিত্ত যাত্রা করে, কিন্তু পথিমধ্যে তাহাদের পানি নিঃশেষ হইয়া যায়। 'আবদু'ল-মুত্তালিবের বাহনের খুরের চিহ্ন হইতে একটি ঝরণা প্রবাহিত হয়, যাহা ঐশী সত্যের প্রতীক। অতঃপর সকলেই সেখান হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। 'আবদুল-মুত্তালিব সেখানে খননকার্য চালাইয়া তরবারি, যুদ্ধের পোষাক, লৌহবর্ম ছাড়াও স্বর্ণ নির্মিত দুইটি হরিণ শাবকের প্রতিকৃতি উদ্ধার করিলেন, যাহা জুরহুম গোত্রের লোকেরা যামযাম কূপের গর্তে প্রোথিত করিয়াছিল। এই সব জিনিস কা'বায় সংরক্ষণ করা হইয়াছিল (ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ১খ, ১৪২-৪৭; আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ৯৭-১০০)। পবিত্র কুরআনে কা'বাকে উম্মু'ল-কুরা (ام القرى = শহরসমূহের মাতা, আদি শহর) নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ... الخ

"আমি এই কল্যাণময় কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি "উম্মুল-কুরা" (শহরসমূহের মাতা অর্থাৎ মক্কা) ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগকে সতর্ক কর। যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা উহাদিগের সালাতের হিফাজত করে" (৬ ঃ ৯২)।

'উম্মুল-কুরা' অর্থ শহরসমূহের 'মা' বা ভিত্তি। পবিত্র মক্কা ছিল সমগ্র আরবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক আশ্রয়স্থল। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা পৃথিবীর প্রাচীন কেন্দ্রবিন্দু। এইজন্যই মক্কাকে "উম্মুল-কুরা" বলে। حولها বা চতুষ্পার্শ্বস্থ শব্দ দ্বারা হয় আরব ভূমি কিংবা সারা দুনিয়াকেই বুঝানো হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا "যাহাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে" (২৫ ঃ ১) (সূরা আল-ফুরকান, ২৫)।

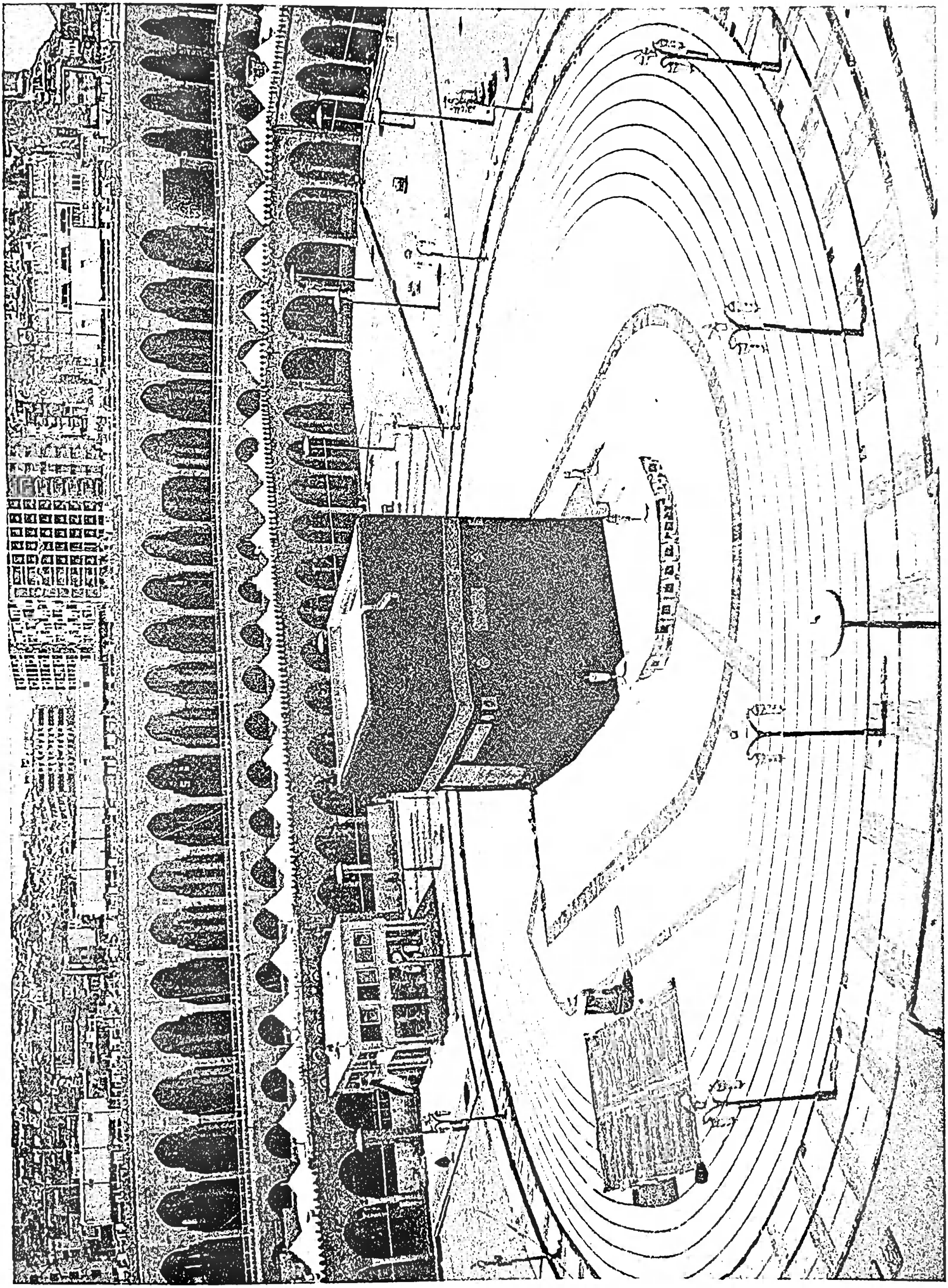
আরবে মূর্তি পূজার সূত্রপাত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন বানূ খুযা'আ গোত্রের লোকেরা বানূ জুরহুম গোত্রের লোকদিগকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, তখন মক্কাবাসিগণ আমর ইব্ন লুহায়্যি আল-'খুযা'ঈ'কে তাহাদের সর্দার নিযুক্ত করে। মক্কাবাসীরা সকল কার্যে তাহার অনুসরণ করিত। অত্যধিক ধনাঢ্য ছিল বলিয়া সে এই মর্যাদার অধিকারী হয়। সে হাজ্জীদিগকে আহার্য দিত, বস্ত্র দান করিত, কখনও বা দশ হাজার পশু যাব্হ করিয়া খাওয়াইত, দশ হাজার ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করিত। তৎকালে ছাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এক বৃহৎ পাথরের উপর ছাতু গোলাইয়া শরবত পান করাইত। ঐ পাথরটিকে সাখরাতু'ল-লাত (صخرة اللات) বলা হইত। এই লোকটি মারা গেলে 'আমর প্রচার করিয়াছিল যে, সে মরে নাই, বরং সে পাথরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর সে আরবদিগকে ঐ পাথরের পূজা করার পরামর্শ দিয়াছিল এবং ঐ পাথরের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া 'লাত' (لات = যে ছাতু গোলে) নামে নামকরণের কথা বলিয়াছিল। কথিত আছে যে, তিন শত বৎসর 'আমরের বংশধরগণ ইহার পূজা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উহা একটি দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে (আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ৬২ ; ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১খ, ৭৭)। বানূ ইসমা'ঈল গোত্রের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন সম্পর্কে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা দেয় তখন তাহাদের অনেকেই মক্কা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেশে গমন করিতে থাকে এবং যখনই মক্কা ত্যাগ করিত, তখন কা'বার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ হারাম শারীফ হইতে একটি করিয়া পাথর সঙ্গে লইয়া যাইত। তাহারা যেখানেই যাইত কা'বার ন্যায় এই প্রস্তর খণ্ডগুলিকে তাওয়াফ করিত। কালের বিবর্তনে তাহারা নিজেদের পসন্দমত প্রস্তর পূজা শুরু করে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে তাহারা হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রস্তর পূজারীতে রূপান্তরিত হইতে থাকে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মত পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উহাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় ধর্ম (দীনে ইবরাহীম)-এর উপর অটল ছিল, তাহারা কা'বার প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাওয়াফ করা, হাজ্জ ও 'উমরা পালন, 'আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান, কুরবানী করা ও হাজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের একটি দোষ ছিল এই যে, হাজ্জের তালবিয়া পাঠকালীন আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করিত। তাহারা বলিত ঃ لبيك اللهم لبيك لاشريك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك তাহারা এইভাবেই তাওহীদের কালেমার মধ্যে শিরক অন্তর্ভুক্ত করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে : وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ "তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার শরীক করে" (১২ ঃ ১০৬), (ইব্ন হিশাম, সীরা, ১খ, ৭৭; আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ৬২)। ইব্ন ইসহাক প্রমাণ দিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি 'আমর ইব্ন লুহায়্যিকে জাহান্নামের মধ্যে নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়াইতে দেখিয়াছি। তৎপর আমি তাহাকে আমার ও তাহার মধ্যবর্তী সময়ের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে" (আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ৬১)।

মক্কাকে পৃথিবীর নাভিমূল বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় (তু. ইসলাম-পূর্বকালের কা'বা নামক নিবন্ধে এই সমস্ত কাহিনী উল্লিখিত। মক্কা সমাধিস্থলও বটে। ইহা কেবল হযরত ইসমা'ঈল ('আ) ও তাঁহার মাতার সমাধিস্থলই নয়, বরং শতাধিক নবী ও রাসূলের সমাধিও কা'বার আশেপাশে রহিয়াছে।

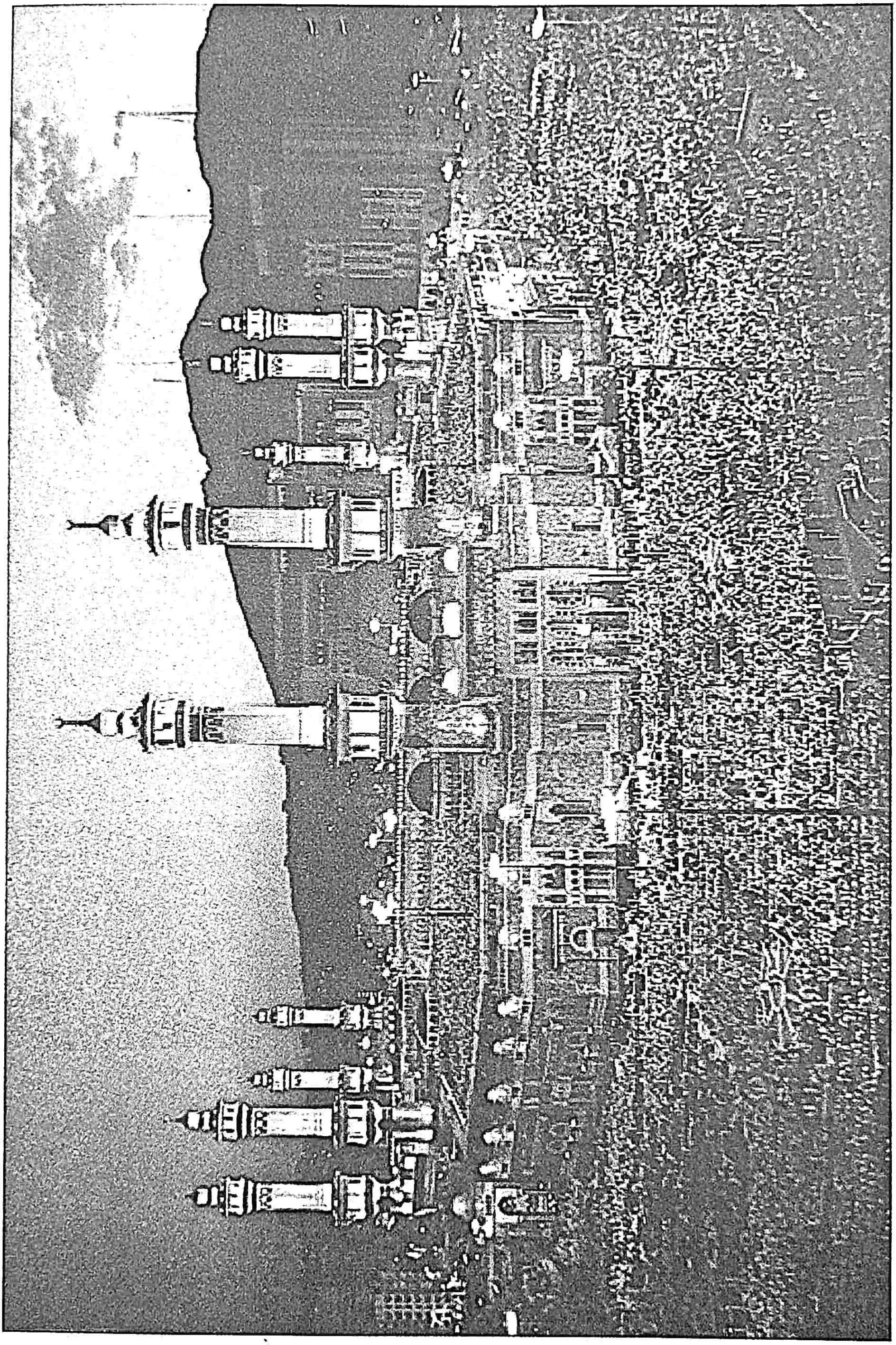
ইসলাম-পূর্ব ধর্মীয় ইতিহাস

টলেমী (Ptolemy) মক্কাকে "Macroba" (মাকরোবা) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (ic, Mikrab, স্মৃতিসৌধ)। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তৎকালে কা'বাকে এক বা একাধিক দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত তীর্থস্থান বলিয়া ধারণা করা হইত। Epiphanius-এর ভাষ্য মুতাবিক (Haereses, v, following the text Philolagies, 1860, 355) যু'শ-শারা পেট্রায় Khaabou সম্ভবত কা'বা শব্দটির সহিত অভিন্ন। কিন্তু ইপিফানিয়াস-এর এই ভাষ্যে পরিষ্কার বুঝা যায় না যে, ইহা দ্বারা Petra-এর মন্দির না কি যু'শ-শারার চতুষ্কোণবিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তরটির কথা বুঝানো হইয়াছে। আল-বাকুরী (মু'জাম, ed. Wustenfeld, 46) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বাক্‌র ইব্ন ওয়াইল (দ্র.) এবং 'ইয়াদ' গোত্রের কূফা অঞ্চলের সিনদাদ নামক স্থানে উপাসনা কেন্দ্র এবং তাহাদের পবিত্র মন্দিরকে (بيت) যাতু'ল-কা'বাত (ذات الكعبات) বলে (কিন্তু তু. আল-হামদানী, সিফাত জাযীরাতি'ল-'আরাব, ১৭১, ১, ১৪, ১৭, ২৩০, ১, ১২)। হাজারে আসওয়াদ কোন বিশেষ দেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কা'বায় হুবাল দেবতার মূর্তি ছিল, ইহাকে মক্কা এবং কা'বার দেবতা বলা হইত। কা'বা ও হু'বাল দেবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে Caetani বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। হু'বাল দেব ব্যতীত কা'বায় রক্ষিত অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে আল-লাত, আল-'উয্‌যা এবং আল-মানাতের পূজাও করা হইত যাহা পবিত্র কুরআনেও উল্লিখিত হইয়াছে ; এখানে হুবালের নামের কোন উল্লেখ নাই। প্রাক-ইসলামী যুগে এই সমস্ত দেবদেবীর তুলনায় আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কা'বায় রক্ষিত আরও অনেক দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা ছিল তিন শত ষাট।

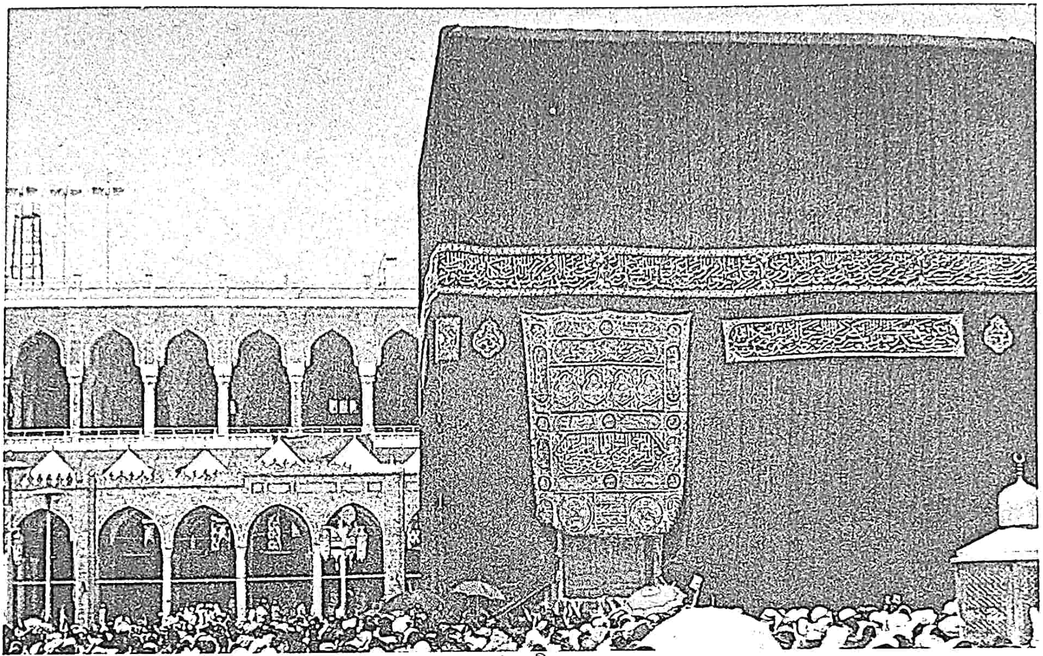
(৫) আল-হাজারু'ল-আসওয়াদ (الحجر الاسود বা কাল পাথর) ঃ আল-আযরাকী স্বীয় তা'রীখ মাক্কা গ্রন্থে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ "হযরত আদাম ('আ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় "হাজারে আসওয়াদ" ও মাকামে ইবরাহীমকেও প্রেরণ করা হইয়াছিল, যাহাতে হযরত আদাম ('আ) উহার সহিত পরিচিত থাকেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত নূহ ('আ)-এর তুফানের সময় আল্লাহ্ পাক হাজারে আসওয়াদকে আবূ কুবায়স পাহাড়ে সংরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর কা'বা নির্মাণ কালে জিবরা'ঈল ('আ) হাজারে আসওয়াদটিকে যথাস্থানে স্থাপন করেন (শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ১৯২)। হযরত 'আবদুল্লাহ, ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সাথে কা'বা নির্মাণে সক্রিয় অংশগ্রহণকারিগণের বরাত দিয়া আল-আযরাকী বলেন, কা'বায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তিন টুকরা হইয়া গিয়াছিল। ছোট

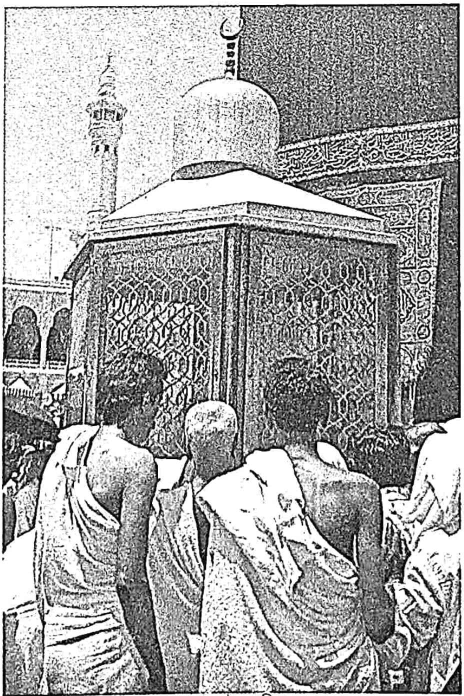


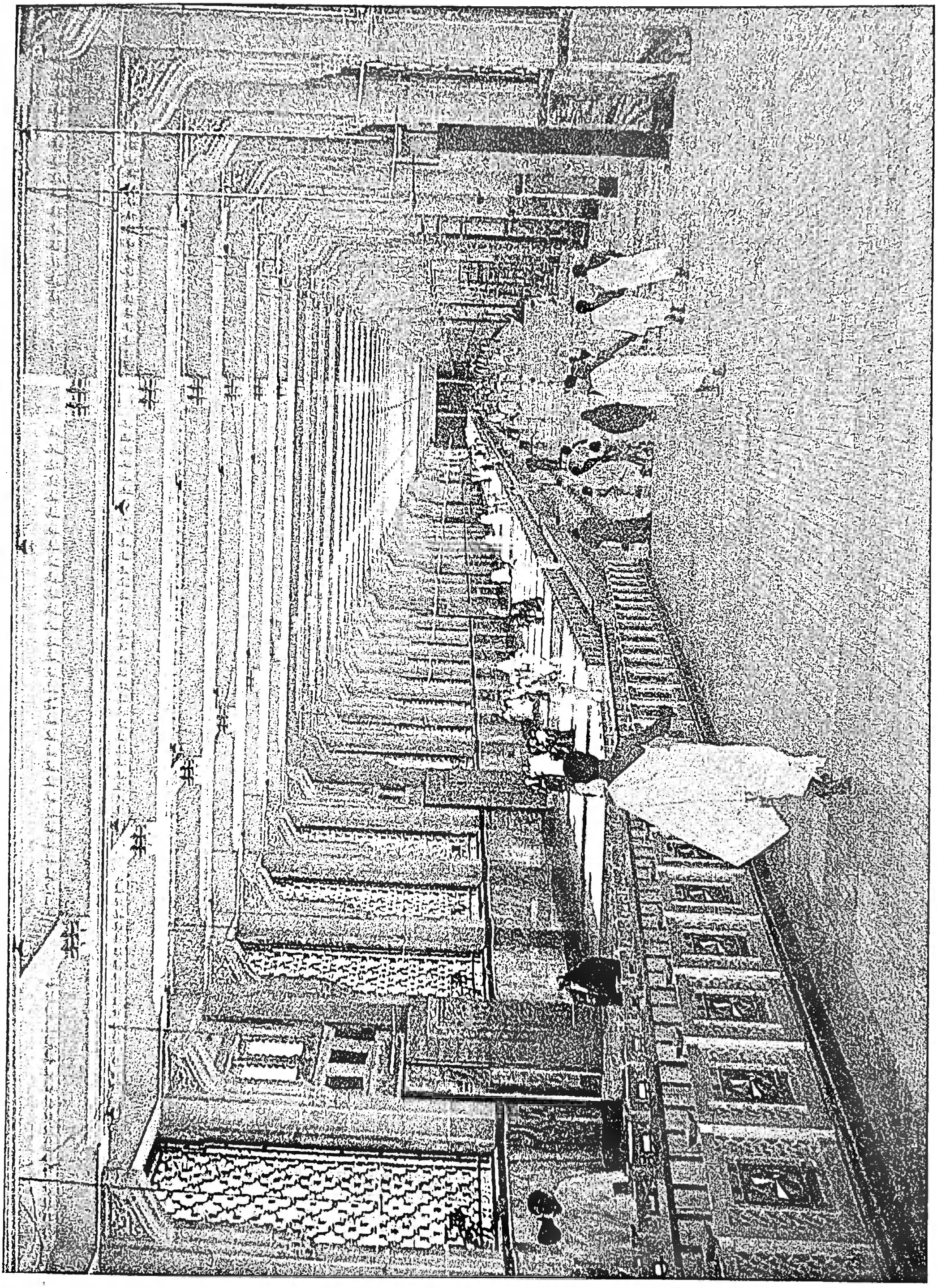
কা'বা শরীফের দৃশ্য



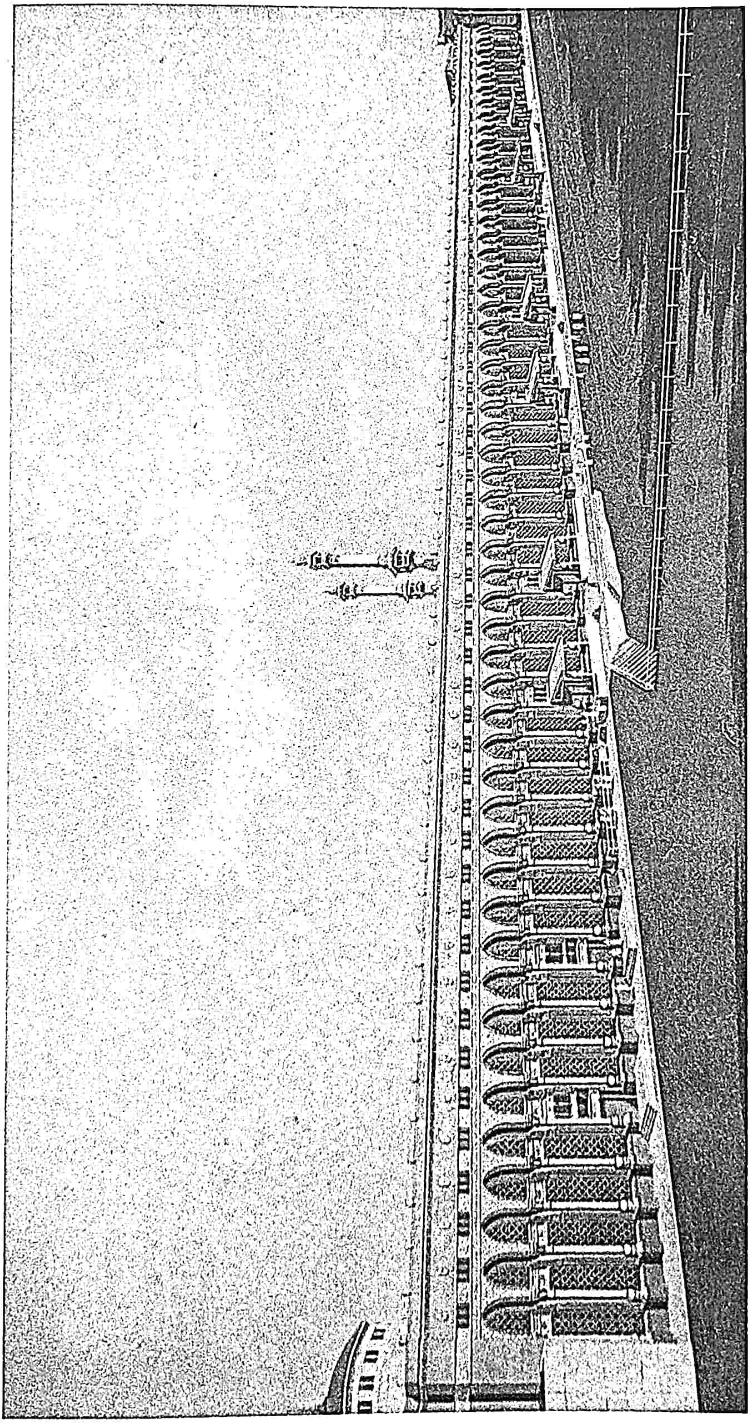
পরিবেষ্টিত মসজিদুল হারাম (বর্তমান নির্মাণ)


কা'বা শরীফ

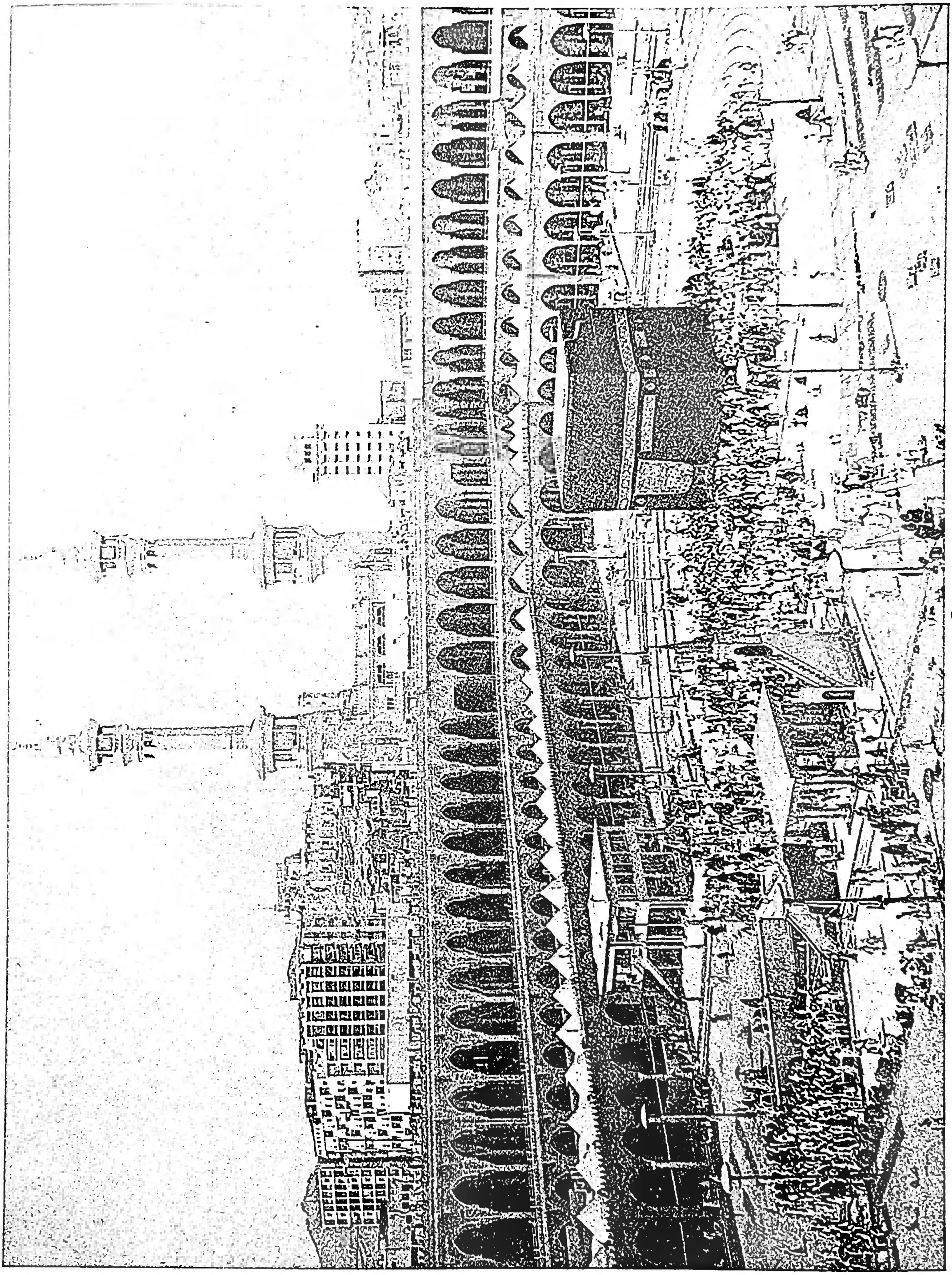

মাকামে ইবরাহীম



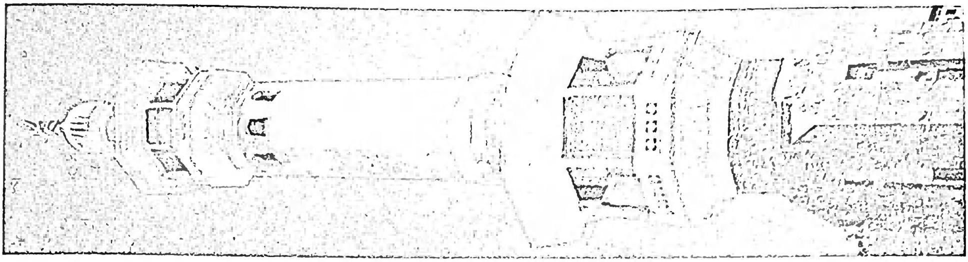
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ



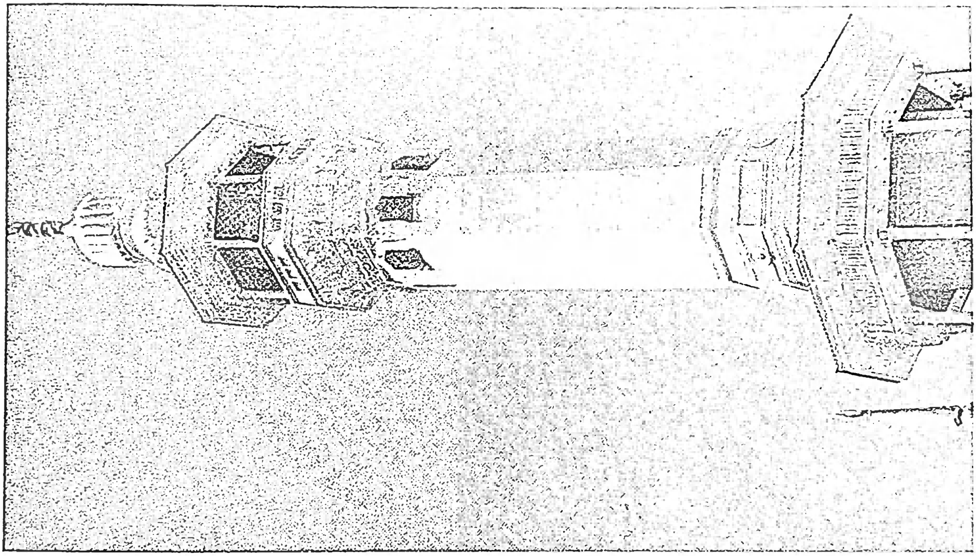
সাফা ও মারওয়া সাঈ ভবনের অভ্যন্তরে



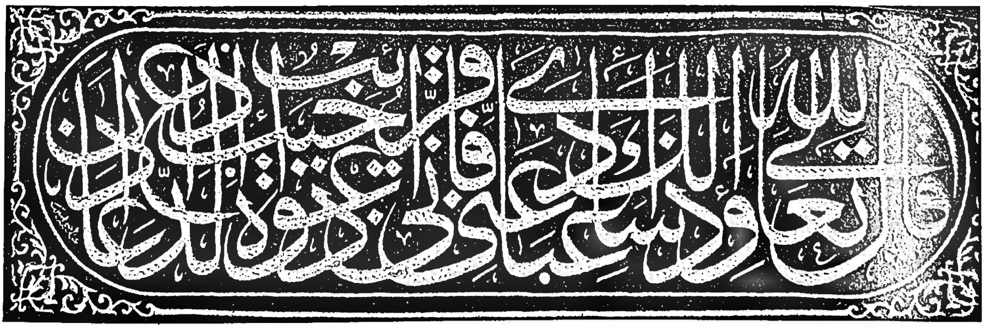
কা'বা শরীফ



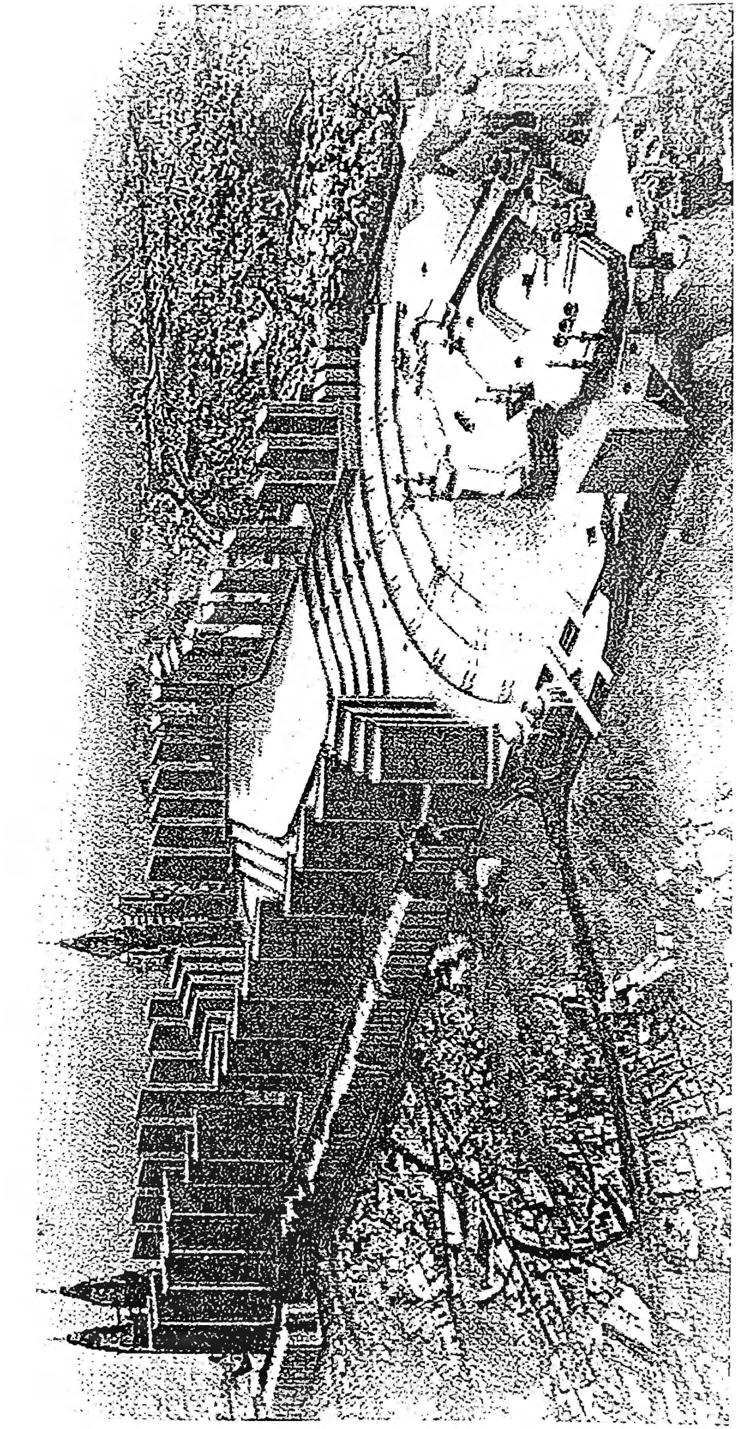
মসজিদুল হারামের মিনার



মসজিদুল হারামের মিনার



কা'বা শরীফের গেলাফে আল কুরআনের আয়াত (২ ঃ ১৮৬)



২০১০ সালে কা'বা শরীফ এলাকার (নির্মীয়মান) নমুনা

একটি টুকরা সংগোপনে বানূ শায়বার কোন এক ব্যক্তি লইয়া যায় এবং বহুদিন যাবত ঐ বংশেই উহা রক্ষিত ছিল। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) রৌপ্যের তার দ্বারা টুকরাগুলি বাঁধিয়া দেন। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ায় উহা ঢিলা ও নড়বড়ে হইয়া যায়। 'আব্বাসী খলীফা হারূনু'র-রাশীদ তাঁহার শাসনামলে পাথরটিকে আড়াআড়ি ছিদ্র করিয়া উহা রৌপ্য দ্বারা ভরাট করিয়া দেন (শিফা'উল-গিরাম, ১খ, ১৯২-১৯৩)।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুযায়ী আবূ তাহির কারমাতী (৮ যু'ল-হিজ্জা, ৩১৭/৯৩১) মক্কায় আগমন করিয়া জা'ফার ইবন ফালাহ্ নামক রাজমিস্ত্রিকে কৃষ্ণ পাথরটি কা'বা হইতে উঠাইয়া লইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিল। অতএব, তিনি ১৪ যু'ল-হিজ্জা সোমবার কৃষ্ণ পাথরটিকে উঠাইয়া হাজার (الحسا = আল-হিসা) শহরে লইয়া যান। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কা'বা গৃহ কৃষ্ণ প্রস্তরশূন্য অবস্থায় ছিল বলিয়া জনগণ সম্মানার্থে উক্ত স্থানে হাত স্থাপন করিত। পরিশেষে মঙ্গলবার, ৩৩৯/৯৫০ সালে কুরবানীর দিন (يوم النحر) কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। কথিত আছে যে, সানবার ইব্ন হাসান কারমাতী কর্তৃক দ্বিতীয়বার ইহা স্ব-স্থানে স্থাপিত হয়। তাহারা পাথর দর্শনমাত্র কৃতজ্ঞতাবশত সিজদায় মস্তক অবনত করিত এবং চুম্বন করিত। কুরবানীর দিন লোকজন কা'বা যিয়ারাত করিতে আসিবার পূর্বেই পাথরটিকে যথাস্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল (দ্র. শিফা'উল-গিরাম, ১খ, ১৯৩)। ইহার এক বৎসর পরই ৩৪০/৯৫১ কা'বার দ্বাররক্ষী ভীত হইয়া সানবার কারামাতী কর্তৃক স্থাপিত কৃষ্ণ পাথরটি উঠাইয়া কা'বার অভ্যন্তরে রাখিয়া দিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল পাথরের চতুর্দিকে একটি শক্ত গোলাকার রৌপ্যের বেষ্টনী তৈরি করা, যাহাতে উহা কেহ উঠাইয়া লইতে না পারে।

ইব্ন যুবায়র (রা)-ও কা'বা নির্মাণের সময় এইরূপ করিয়াছিলেন। তাই দুইজন দক্ষ কারিগর দ্বারা এই বেষ্টনী তৈরি করা হয়। কারামাতীগণ পাথরটি প্রত্যর্পণ করিবার পর অন্য কেহ ইহা উঠাইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে কোনও প্রমাণ নাই। আল-ফাসী বলেন, একজন মিসরীয় বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন, ৭৮১/১৩৭৯ সালে আমীর "সূদূন পাশা" কৃষ্ণ প্রস্তর উঠাইয়া উহা নূতনভাবে সজ্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মক্কার কতিপয় অধিবাসী মিসরীয় বিশেষজ্ঞের কথা স্বীকার করেন না। মিসরীয় বিশেষজ্ঞ জোর দিয়া বলিয়াছেন, "আমি স্বচক্ষে কৃষ্ণ পাথরটি উঠানো অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" আল-ফাসী বলেন, "মক্কার অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মিসরীয় বিশেষজ্ঞের নিকট শ্রবণ করিয়া উহা আমাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং নূরু'দ-দীন আল-মানূফী নামক মিসরীয় ফাকীহ যখন ৮১৪/১৪৩৭ সালে একদল মিসরীয় হাজ্জযাত্রীর নেতা হিসাবে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি স্বয়ং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উহা স্বীকার করিয়াছিলেন" (শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ১৯৩)।

হাজারে আসওয়াদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা ঃ (১) পৃথিবীতে স্থানান্তরের পর হাজারে আসওয়াদ মারাত্মক দুর্ঘটনায় [যেমন নূহ ('আ)-এর মহাপ্লাবন] পতিত হওয়া সত্ত্বেও উহা হুবহু সুসংরক্ষিত আছে।

(২) হাদীছবেত্তা ইব্ন জামা'আ বলেন, হাজারে আসওয়াদ কয়েকবার নিজ স্থান হইতে সরাইয়া ফেলিবার পরও (যেমন জুরহুম গোত্র, বানূ ইয়াদ এবং কারামিতা গোত্রের লোকজন কর্তৃক) উহা পুনরায় যথাস্থানে আনীত হইয়াছে।

(৩) কারামিতাগণ হাজারে আসওয়াদকে উপড়াইয়া লইয়া পালাক্রমে চল্লিশটি উটের পিঠে বোঝাই দিয়া লইয়া যাইবার সময় সবগুলি উটই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যখন কারামিতাগণ কর্তৃক প্রস্তরটি প্রত্যর্পণ করিয়া একটি শীর্ণকায় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হইয়াছিল, তখন উষ্ট্রটি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। হাদীছবিশারদ আয-যাহাবীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) অনুরূপভাবে এই পাথরটিকে হাজার শহরের দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন একের পর এক পাঁচ শত উটের পিঠে ঐ পাথরটি চাপান হইলে ইহাদের সবই মারা গিয়াছিল।

(৫) কৃষ্ণ পাথর পানিতে ভাসে, ডুবে না। ঐতিহাসিক "ইব্ন শাকির আল-কুতুবীর" ন্যায় ইব্ন আবি'দ-দামও আল-ফিরাকু'ল-ইসলামিয়া গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (শিফা'উ'ল-গিরাম, ১খ, ১৯৫)। কা'বা বিশ্বমুসলিমের কি'বলা এবং হজ্জের কেন্দ্রস্থল। এইজন্য ইহার চতুর্দিকস্থ এলাকাসমূহ পবিত্র বলিয়া গণ্য। শহরের চারিপার্শ্বে বৃত্তাকার একটি পবিত্র স্থান (حرم = হারাম) আছে যাহার চতুর্দিক প্রস্তর দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। হারামে প্রবেশকারী প্রত্যেকের কিছু বিশেষ বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি প্রতিপালন করিতে হয়। আল্লাহ্ পাক এই অঞ্চলকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করিয়াছেন। এই অঞ্চল শান্তি ও নিরাপত্তা, সন্ধি ও কল্যাণের প্রতীকরূপে স্বীকৃত। হারামের সীমার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। বিপজ্জনক না হইলে কোন জীবজন্তু এইখানে বধ করা অবৈধ। তদ্রূপ ইযখির ঘাস ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষলতাও কর্তন করা বৈধ নয়। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবগণ এখানে হাজ্জ করিতে আসিলে তাহাদের কলহ-বিবাদ স্থগিত থাকিত। অস্ত্রসহ এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশকারী সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে নিরাপদ। কথিত আছে যে, য়াহূদীগণ কা'বায় কুরবানী করিত। প্রাচীন আরবগণ পাথরের মূর্তির বদলে বেদীর গাত্রে কুরবানীর জন্তুর রক্ত লেপন করিত। ইসলামী বিধান মতে কুরবানী করা হয় মিনা (منى)-তে। কা'বা ঘর নির্মিত হওয়ার পর হইতেই হজ্জের সহিত সম্পৃক্ত ছিল (দ্র. ২ ঃ ১১৫ ও ২২ ঃ ২৬-২৯)। মক্কার বাহিরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি (বিশেষ করিয়া 'আরাফাতে অবস্থান) হাজ্জের অপরিহার্য অঙ্গ। সূরা ৩ ঃ ৯৬-৯৭-এর আদেশ অনুযায়ী বায়তুল্লাহ (بيت الله)-এর যিয়ারাত হাজ্জের জন্য অপরিহার্য। স্বভাবত প্রাক-ইসলামী যুগে য়াহূদীগণের মধ্যে দুই ধরনের উৎসব পালিত হইত। আরবগণ পাশাপাশি দুইটি পবিত্র স্থানে একই উৎসবানুষ্ঠান পালন করিত। ইহা অনস্বীকার্য যে, জাহিলী যুগেও কা'বা আরবদের আধ্যাত্মিক জগতের প্রতীক ছিল। তৎকালে তাহারা সোনালী সূর্য ও চন্দ্রের নামে মানত করিত (আল-আযরাকী, ১৫৫ প.)। আল-মাস'উদী বলেন (মুরূজ, ৪খ, ৪৭, এবং Tr. Pellat, ১৩৭৩), কেহ কেহ কা'বাকে সূর্য, চন্দ্র ও পঞ্চগ্রহের নামে নিবেদিত মন্দির বলিয়া ধারণা করিত। আবার কা'বার চতুর্দিকে রক্ষিত ৩৬০টি দেবদেবীর জন্য উৎসর্গীত বলিয়াও মনে করা হইত। তবে এইসব মতামত সঠিকভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। উল্লিখিত হইয়াছে যে, কা'বা গৃহের সর্বপ্রথম বস্ত্রাচ্ছাদনকারী ছিল তুব্বা'। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই বর্ণনার সত্যতা নির্ণয় করা হয় নাই। তবে রঙ্গীন কাপড় দ্বারা কা'বা গৃহ আচ্ছাদনের সময় বর্ণিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সামগ্রিকভাবে কা'বা সম্বন্ধে দ্র. (১) Wustenfeld, Die Chroniken der stadt Mekka, Leipzig ১৮৫৭-৬১ খৃ., ৪খ.। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে দ্র. (২) J. L. Burckhardt,

Travels in Arabia, London 1829, ২খ.; (৩) 'আলী বে, Travels, London ১৮১৬ খৃ., ২খ.; (৪) R. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Maccah, London 1857, 2 vols.; (৫) A. Muller, Der Islam im Morgen, und Abend land, Berlin 1885, 2 vols.; (৬) C. Snouck Hurgronje, Mekka, The Hague 1888-89, 2 vols, with Bilderatlas; (৭) ঐ লেখক, Bilder aus Mekka, Leiden 1889; (৮) Caid Ben Cherif, Aux villes saintes de l'Islam, Paris-1919; (৯) আল-বাতানূনী, আর-রিহলাতু'ল-হিজারিয়্যা, ২য় সং., কায়রো ১৩২৯ হি.; (১০) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, London ১৯২৮ খৃ., 2 Vols.; (১১) ইবরাহীম রিফ'আত, মির'আতু'ল-হারামায়ন, ১খ., (কায়রো ১৯২৫ খৃ.); (১২) M Gaudefroy-Demombynes, Le peleinage a la Mekka, Paris 1923 (১৩) আল-আযরাকী (তা'রীখ মাক্কা), ৮৬ প.; (১৪) আল-ফাকিহী, ১৮ প.; (১৫) আত-তাবারী, (সং, লাইডেন) ১খ, ৯০১ প., ৯৩৬ প.; ১১৩০ প. ; (১৬) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, সং. প্যারিস, ১খ, ১৩৩ ; ৪খ, ১২৫ প. ৫খ, ১৬৫-৭, ১৯৩ ; (১৭) BGA (আল-ইসতাখরী), ii, (ইব্ন হাওকাল), ২৩-৪ প., ৩খ., ২য় সং. (আল-মুকাদ্দাসী), ৭১ প.; ৫খ, (ইবনু'ল-ফাকীহ, ১৬-২২ ; Vii (ইব্ন রুস্তা), ২৪-৫৪; (১৮) য়াকূত, মু'জাম (ed. Wustenfeid), ৪খ, ২৭৮ পৃ.; (১৯) ইব্ন জুবায়র রিহালা (Gibb, Mem,. v), ৮১ প.; (২০) আল-বুখারী, সাহীহ, কিতাবুল-ইলম, বাব ৪৮; (২১) Gaudefroy-Demombynes, Notes sur la Mekke et Medine, Rev. de l'Hist. des Religions, xxvii, ৩১৬ প.।

৩য় অংশের জন্য দ্র. ঃ (২২) C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880 ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকগণ রচিত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন চরিত এবং উল্লিখিত আয়াতগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের তাফসীরসমূহ দ্র.।

৪র্থ অংশের জন্য দ্র. (২৩) আল-আযরাকী, ১প; (২৪) আত-তাবারী, ১খ, ১৩০ প. ২৭৪ প.; (২৫) আছ-ছালাবী, কিসাসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১২৯০ হি., ৬৯ প.; (২৬) আদ-দিয়ার বাকরী, তা'রীখু'ল-খামীস, কায়রো ১২৮৩ হি.; ২খ; (২৭) ইব্ন হিশাম, সীরা, সম্পা. Wustenfeld, Gottingen ১৮৫৮-৬০ খৃ., ২খ.; (২৮) Caussin de Perceval, Essai sur l'Hist. des Arabs, প্যারিস ১৮৪৭-৪৮ খৃ.; (২৯) A. J. Wensinck, The Navel of Earth, Verh, Kon. Akad. v. Wetensch., Dl. xvii, no. 1; (৩০) J. L. Palache. Het Heiligdom in de Voorstelling der Semitische Volken, Leiden 1920।

৫ম অংশের জন্য দ্র. (৩১) L. Caetani, Annali, dell' Islam, মুকাদ্দামা, শাখা (فصل) ৬২ প.; (৩২) J. Wellhausen, Reste Arab. Heidentums² বার্লিন ১৮৯৭ খৃ.; পৃ. ৭৩ প.; (৩৩) H. Grimme, মুহাম্মাদ, Munich 1904, ৪৫-৬।

A. J. Wensinck-(J. Jomier) (E.I.²)/
মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

কাবাকচী ওগলূ মুসতাফা (کبکجی اغلو مصطفى) ঃ 'উছমানী সুলতান ৩য় সালীমকে উৎখাতকারী বিদ্রোহের প্রধান নেতা। মূলত তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ার অন্তর্গত শহর কাসতামুনীর অধিবাসী। তিনি বসফোরাসের তীরবর্তী রুমেলি কাভাক দুর্গসমষ্টির য়ামাকগণ (অতিরিক্ত সুলতানী রক্ষীবাহিনী)-এর নেতা নির্বাচিত হন। ইহারা শায়খু'ল্-ইসলাম 'আতাউল্লাহ্ আফিনদী এবং প্রধান মন্ত্রীর কা'ইম মাকাম কোসা মূসা পাশা-র প্ররোচনায় ১২২২ সালের ১৭ রাবী'উ'ল-আওওয়াল/২৫ মে, ১৮০৭ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। বিদ্রোহের সংগঠন পর্বটি তিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন, নিজাম-ই জাদীদ (দ্র.)-এর প্রধান সংগঠকগণকে হত্যা করেন— যাহাতে ৪র্থ মুসতাফা (দ্র.)-এর সিংহাসন আরোহণ সহজ হয় (২১ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১৯ মে) এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির প্ররোচকগণের উদ্দেশ্য সফল হয়। বসফোরাসের রুমেল পক্ষীয় তীরে অবস্থিত সকল দুর্গের অধিনায়করূপে তাহাকে নির্বাচিত করা হয় এবং তুরনাজী বাশীর মর্যাদা প্রদান করা হয়। প্রথমত শায়খু'ল-ইসলাম-এরও পরবর্তীতে মাহ্মূদ তায়্যার পাশার সহায়তায় যিনি শা'বান/অক্টোবর মাসে কা'ইম মাকাম নিযুক্ত হন। আবার শায়খু'ল-ইসলামের সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি সরকারী কর্মতৎপরতায় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ১৯ জুমাদা-১, ১২২৩/১৩ জুলাই, ১৮০৮-এ তিনি ৩য় সালীম (দ্র.)-কে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইস্তাম্বুল অভিমুখে অগ্রসরমান 'উছমানী বাহিনীর সহিত আগমনকারী মুসতাফা পাশা বায়রাকদার (দ্র.) প্রেরিত একদল সৈন্যের অধিপতি পিনারহিসারের আয়ান 'আলী আগার হস্তে রুমেলি ফেনার-এ নিহত হন।

একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ পরিচালনায় তিনি আশ্চর্যজনক নেতৃত্ব প্রদর্শন করেন; তথাপি তাহার ক্ষতিকর কার্যকলাপের জন্য তাহার যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়। তাহার এই কার্যকলাপের দরুন তৃতীয় সালীমের আমলে গৃহীত সংস্কারধর্মী পরিকল্পনাসমূহ ব্যাহত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ৪খ, ৪৫৯ প.; (২) A. de Juchereau de Saint Denis Revolutions de Constantinople en ১৮০৭-১৮০৮, প্যারিস ১৮১৯ খৃ. ২খ, ১১৩-৭১; (৩) আসিম, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল তা. বি., ২খ, স্থা.; (৪) আহমাদ জাওদাত, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি., ৮খ, ১৫৭-২৯৭; (৫) মুসতাফা নূরী, নাতা'ইজু'ল-উকূ'আত, ইসতাম্বুল ১২৯৪-১৩২৭ হি., ৪খ., ৪৮-৫৫; (৬) আই. এইচ. উযুনকারসিলি, হমাসহুর রুমেলি আয়ানলারিনদান ... আলেমদার মুসতাফা পাশা, ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৭) ঐ লেখক, Kabakci Mustafa isyamna dair yazilmis bir tarihce, in Belleten, vi (১৯৪২ খৃ.), ২৫৩-৬৭; (৮) ঐ লেখক, Kabakci vak' asina dair bir mektup, in Belleten, ২৯খ, (১৯৬৫ খৃ.), ৫৯৯-৬০৪; (৯) Zinkeisen, ৭খ, ৪৬৩-৭১; ৫৫২-৫৭; (১০) N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha, ১৯১০ খৃ.; ৫খ, নির্ঘণ্ট; (১১) A. F. Miller, Mustafa Pasha Bay-raktar, Moscow-Leningrad ১৯৪৭ খৃ.; (১২) S. I. Shaw, Between old and new, the Ottoman Empire under Selim III, ১৭৮৯-১৮০৭, Cambridge Mass. ১৯৭১ খৃ.; (১৩) H. D. Andreasyan, (tr.), Georg Ogulukyan'in

ruznamesi ১৮০৬-১৮১০ isyanlari : III, Selim, IV Mustafa, II Mahmud ve Alemdar Mustafa Pasa, Istanbul ১৯৭২। আরও দ্র. (১৪) আহমাদ রাফীক, কাবাকজী মুসতাফা, ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি.।

E. Kuran (E.I.²)/আবদুল বাসেত

কাবাকবাযী (দ্র. লা'ব)

কাবাছ ইব্ন আশ্য়াম (قباث بن اشيم) ঃ (রা) সাহাবী, বানূ লায়ছ মতান্তরে বানূ তামীম গোত্রের লোক। ভিন্ন মতে কিনদা-এর অধিবাসী। ইব্ন সা'দ-এর মতে তিনি মক্কার মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবূ নু'আয়ম-এর মতে তিনি খন্দক যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলায়মান ইব্ন আবী সুলায়মান তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তাঁহার গোত্রের অথবা অন্য কোন আরব গোত্রের কতিপয় লোক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ নামক এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লোকদেরকে আমাদের বিপরীত ধর্মের দিকে আহ্বান জানাইতেছেন। এই কথা শুনিয়া কাবাছ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসেন এবং তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 'উছমান (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ্ (স) ? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার বড়। কিন্তু আমার বয়স তাঁহার অপেক্ষা বেশী। তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) 'আমু'ল-ফীল (আবরাহার হস্তীযুদ্ধের বৎসর) জন্মগ্রহণ করেন (তিরমিযী)। তিনি হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। য়ারমূক যুদ্ধে তিনি আবূ 'উবায়দা (রা) [দ্র.]-এর সঙ্গে সৈন্যব্যূহের সম্মুখভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন, পরে হিম্‌স-এ বসতি স্থাপন করেন।

কাবাছ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "একত্রে দুইজনের জামা'আতে নামায আল্লাহ্‌র নিকট একাকী আট জনের নামাযের অপেক্ষা উত্তম। একত্রে আটজনের জামা'আতে নামায আল্লাহ্‌র নিকট একাকী এক শত জনের নামাযের তুলনায় উত্তম (বুখারী)।"

তাঁহার নিকট হইতে আবূ সা'ঈদ আল-মাকবূরী, আবু'ল-হুওয়ায়রিছ, খালিদ ইব্ন দারীক এবং 'আমির ইব্ন যিয়াদ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩৮২ হি., ৩খ., ২২১-২, নং ৭০৫৬; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ., ১৮৯-৯০; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৬৮-৭০); (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা, জামি' তিরমিযী, আবওয়াবু'ল-মানাকিব, বাব মা জা'আ ফী মীলাদি'ন-নাবিয়্যি (স)।

মুহাম্মদ মূসা

কাবার্দ (كبرد) ঃ ককেসাস (قفقاز) অঞ্চলের একটি মুসলিম সম্প্রদায়। তাহাদিগকে রুশ ভাষায় কাবারদিনত্‌সী (Kabardintsi) এবং তুর্কী ভাষায় কাবারতায়লার (كبرتايلر) বলা হয়। কাসাক (Kasaq = قازق) নামেও তাহারা পরিচিত। কাবারদ্‌গণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বারবারো-এর Cheuer thei-এ। তিনি ১৪৩৬ সালে ককেসাস অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট।

কাবারদী ভাষা আদীগে (Adighe=Cerkes) ভাষা শ্রেণীর প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত এবং ইহা আদীগে বালান্দ (উচ্চ আদিগে) নামেও পরিচিত। ১৯২৬ সালের সোভিয়েত আদমশুমারী অনুযায়ী জাতিগতভাবে কাবারদগণের সংখ্যা ছিল ১৩৯,৯২৫ এবং ভাষা ভিত্তিকভাবে ১৩৮,৯২৫। ১৯৩৯ সালের গণনায় ১৬৪,০০০ কাবারদ-এর উল্লেখ করা হয়। কাবারদ সম্প্রদায় প্রধানত তেরেক (ترك) নদীর উচ্চ অববাহিকা এবং ইহার কতিপয় উপনদীর অঞ্চলে বসবাস করে এবং তাহারা দুইটি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ঃ বৃহৎ কাবারদ্ (كبردة عظيم) গোত্রভুক্ত উপদলটি তেরেক নদীর পশ্চিমে মালকা ও তেরেক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। অপর দলটি ক্ষুদ্র কাবারদ (كبردة صغير) নামে পরিচিত এবং ইহারা তেরেক নদীর পূর্বে তেরেক ও সুনজা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে।

কাবার্দ সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান বাসভূমিতে আগমন করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তাহাদের মূল আবাস ছিল আরও পশ্চিমে। মঙ্গোল আক্রমণের ফলে অ্যালানগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িলে এবং আলতন উরদ (Golden Horde)-এর পতন ঘটিলে তাহারা ককেসাসের ইতিহাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে কাবারদ্ রাজন্যগণ মস্কোর শাসকগণের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। চতুর্থ ইভানের দ্বিতীয় স্ত্রী মেরী ছিলেন কাবারদ্ রাজকুমারী তিমরূ-এর কন্যা। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাবার্দগণ কালমুকগণের বিরুদ্ধে ককেসাসের অধিবাসিগণের সম্মিলিত বিরোধিতায় নেতৃত্ব প্রদান করে। মধ্যককেসাসে তাহাদের কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দারয়াল গিরিপথের সন্নিকটে অবস্থিত তাহাদের অবস্থানের কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহারাই সর্বপ্রথম রুশ নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং এই নিয়ন্ত্রণ লাভে রুশগণ উল্লেখযোগ্য কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয় নাই। রুশ অধিকারের সময় কতিপয় কাবার্দ কুবান নদীর উজান ও মেলেনচুক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করে। ইহারা মুহাজির কাবারদ্ নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৬৪ সালের পর কিছু সংখ্যক কাবারদ্ প্রধানত মুহাজির উপদলভুক্তরা 'উছমানী সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপন করে।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিমীয় তাতারগণ খৃস্ট ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতামূলকভাবে হানাফী মাযহাবভুক্ত সুন্নী ইসলামের প্রসার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্বের মধ্যেই তাহারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে কাবারদ্ অর্থনীতি প্রধানত অশ্ব পালন, কৃষিকার্য, ফল ও সবজি উৎপাদন, মৌমাছি পালন এবং কুটিরশিল্পের উপর নির্ভরশীল। ঐতিহ্যগতভাবে কাবারদ্ সমাজ একটি জটিল কাঠামোতে বিন্যস্ত, যাহাতে এগারটি শ্রেণী দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল ঃ একটি অভিজাত শ্রেণী অথবা নিয়ন্ত্রণমুক্ত অংশ, দ্বিতীয়টি পশাত্‌লী (پشتلی) বা নিয়ন্ত্রিত দল। সমাজের শীর্ষে স্থান ছিল রাজন্যবর্গের (পাশা) এবং তাহাদের মধ্যে ওয়ালী ছিলেন কাবারদ্ জনগণের প্রধান নেতা। পরবর্তী স্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীর উরাক অথবা উরাখ (اوركى يا اورخ)। ইহারা শাসকদের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের ভিত্তিতে চারিটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণীর নিম্নে ছিল স্বাধীন কৃষকশ্রেণী তাফ্ খূতাল (تفو خوتل = Tafokhotl)। নিয়ন্ত্রিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল আযাত [Azat] (মুক্ত কৃষক যাহারা সাবেক প্রভুর সহিত কিছু কিছু দায়িত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল); ওগ (ভূমিদাস); লোগানাপুত (ভূমিদাস ও ক্রীতদাসের মধ্যবর্তী শ্রেণী), উনাউত (ক্রীতদাস)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে K. Atazukin একটি সাহিত্যিক ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস পান এবং ১৮৬৫ সালে তিনি সিরিলিক (Cyrillic) বর্ণমালার (রুশ) উপর ভিত্তি করিয়া একটি কাবারদ্ বর্ণমালার প্রবর্তন করেন;

তথাপি ১৯২৪ সালের পূর্বে কাবারদ্ ভাষা একটি লিখিত সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে নাই। বৃহৎ কাবারদ্‌গোষ্ঠীর ব্যবহৃত মৌখিক ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া এই লিখিত ভাষা গঠিত হয় এবং ইহাই কাবারদো-বালকাব স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং কারাচায়-চেরকেস স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। কাবারদ্ ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্রটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে; ইহার নাম ছিল কারাখালূক্ (قـــره خلق) Letopis' periodicskikh izdanij S. S. S. R-এর বর্ণনামতে ১৯৬০ সালের কাবারদ্ ভাষায় দুইটি সংবাদপত্র এবং দুইটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

কাবারদ্‌গণ সর্বপ্রথমে কাবারদ্ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অধীনে সংগঠিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে। ১৯২২ সালের ১৬ জানুয়ারী তাহারা বালকার জাতীয় এলাকার সহিত সংযুক্ত হয় এবং তাহা ৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ সালে কাবারদো-বালকার স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৪ সালে কাবারদ্‌কে স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং তাহা পুনরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী কাবারদো-বালকার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। প্রজাতন্ত্রের মোট আয়তন ১২,৪০০ বর্গ কি. মি.। ১৯৫৯ সালে এই প্রজাতন্ত্রের লোকসংখ্যা ছিল ৪২০,১১৫। ইহাদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ কাবারদ্, ৮.১ শতাংশ বালকার, ৩৮.৭ শতাংশ রুশ এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ককেসীয় গোত্রভুক্ত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B. Geiger, T. Halasi-Kun, A. Kuipers and K. Menges, Peoples and Languages of the Caucasus, দি হেগ ১৯৫৮ খৃ.; (২) Istoriya Kabardino-Balkarskoya A. S S. R. মস্কো ১৯৬৭ খৃ.; (৩) Kabardiskaya A. S. S. R., নালচিক ১৯৪৬ খৃ.; (৪) B. Kalmikov. Ocerki revolutsionnogo dvizeiya v Kabarde, নালচিক ১৯৪৬ খৃ.; (৫) A. Kuipers, Introduction to Morpheme and phoneme in Kabardian, দি হেগ ১৯৬০ খৃ.; (৬) Sh. B. Nogmov, Istoriya Adigeyskogo Naroda Sostavlennaya po Predaniyam Kabardintsev, ৫ম সং, নালচিক ১৯৫২ খৃ.; (৭) Sbornik Slatey po Istorii Kabady ১-২, নালচিক ১৯৫৭ খৃ.; আরও দ্রষ্টব্য (৮) BESKESEK-ABAZA CERKES এবং AL-KABK; (৯) দা.মা.ই., ১৭খ., ৮৭-৯।

Hulya Salihoglu (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাবালা (قـبـالة) ঃ ('আ) শাব্দিক অর্থ নিশ্চয়তা, যামিনদারী, গ্যারান্টি। প্রধানত লেনদেনের ব্যাপারে ব্যবহৃত একটি আইনগত পরিভাষা, এই লেনদেন কী ধরনের হইবে তাহা নির্ধারণ করা দুষ্কর।

দুইটি বিশেষ ক্ষেত্রের সহিত ইহার আলোচনা সম্পর্কিত। ভূমিকর বা খারাজ (দ্র.) এবং বিশেষ প্রকারের কর মুকূস (مكوس)। আরবদের বিজয়ের পূর্ব হইতেই বায়যানটাইন ও সাসানীয় উভয় রাজত্বকালে এই বিধান ছিল যে, রাজকোষ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবীকৃত ভূমি করের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সমষ্টিগতভাবে দায়ী করিত তথাপি; প্রায়শই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইত— যখন দেখা যাইত তাৎক্ষণিকভাবে বহু ব্যক্তি-বিশেষেরই প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ সংগ্রহের সমস্যা দেখা দিয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণও প্রশাসনের মধ্যে উপনীত মতৈক্যের ফলে কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির (প্রায়শই স্থানীয়, তবে বহিরাগতও হইতে পারে) নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ আগাম প্রদানের জন্য আবেদন করা হইত। আবেদনকারী তাহাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতেন যে, উক্ত অর্থ পরবর্তী সময়ে পরিশোধ করিয়া দিবে। সাধারণত এই ব্যবস্থাটি অগ্রিমভাবেই ঐকমত্যে স্থির হইত এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত স্থানের জনগণের প্রদেয় করের নিশ্চয়তা প্রদানকারী যামিনদাররূপে কার্য করিতেন। এই পদ্ধতিটি কাবালা চুক্তি (اجارة قبالة)-রূপে পরিচিত। প্রস্তাবটিকে বলা হয় তাকবীল (تقبيل) এবং ব্যক্তিকে বলা হয় মুতাকাব্বিল (متـقـبل)। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) কাবালার এই পদ্ধতিটিকে অনুমোদনীয় মনে করেন; কিন্তু ব্যবহারিক পর্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায়শই ঘটনা অন্যরূপ ধারণ করিত। বলা যায় যে, কেবল নিশ্চয়তা সম্পর্কিত শর্তাবলীই নহে, অধিকন্তু প্রদেয় অর্থের পরিমাণও পূর্বেই নির্ধারণ করা হইত। এই সকল ক্ষেত্রে আইনবিদ ও হাদীছবেত্তাগণ, যথাঃ ইমাম আবূ য়ূসুফ (কিতাবু'ল-খারাজ) এবং আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (কিতাবু'ল-আমওয়াল) ইহা সমর্থন করেন না। হাদীছবেত্তাগণের ইহা অপসন্দের কারণ হইতেছে এই যে, যেহেতু অগ্রিমভাবে ফসলের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে; সেহেতু শতাংশ হিসাবে ($\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$) করের পরিমাণ নির্ধারণ করাও সম্ভব নহে। ফাকীহ্‌গণের বিরোধিতার কারণ হইল সর্বমোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ নিশ্চিতভাবেই সঠিক পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ হইতে কম অথবা বেশী হইবে। ফলে ইহাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার অথবা করদাতার কোন এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বস্তুত সামরিক নেতৃবর্গ প্রত্যাশিত লাভের আশায় কাবালা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। প্রারম্ভে তাঁহারা সরকারী খাস জমিসমূহে (সাওয়াফী) নির্ধারিত করের বিনিময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (কাতা'ই', কাতী'আ-এর বহুবচন, দ্র. ইকতা') সুবিধা পাইতেন। এইরূপ ভূমি যেহেতু বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হইত সেহেতু কালক্রমে নূতন খাস জমি পাওয়া দুর্লভ হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খারাজ জমিসমূহের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তাহারা হয় এক-দশমাংশ পরিশোধ করিয়া খারাজ জমি ভোগ করিত কিংবা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে কাবালা করিয়া লইত যাহা ছিল অপরাধমূলক (দ্র. Arabica, ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ৩৫৮)। অবশ্য নূতন ধরনের ইকতা' (ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান)-এর উন্মেষের ফলে কাবালা প্রথা দ্রুত গতিতে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। যদিও আয-যামাখশারীর ন্যায় পরবর্তীকালীন অভিধানবেত্তাগণের রচনাবলীতে সময় সময় ইহার সংজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। সুস্পষ্টভাবেই ইহাতে কর আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারাদারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং মূল সূত্রসমূহে কাবালা ও দামানের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কাবালা সাধারণত কেবল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্তরে প্রয়োগ বুঝায়। অপর পক্ষে দামানের প্রয়োগ ক্ষেত্রে মুসলিম ইতিহাসে সর্বযুগে করের উৎস ও ইহার পরিমাণ নির্ধারণের বেলায় ব্যাপকতর সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে যাহাতে কমবেশী অগ্রিম দেয় নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তার বিনিময়ে (যাহা নির্ধারিত মূল করের তুলনায় মোটেও কম নহে) রাজস্ব

আদায়ে জন্য একটি প্রশাসনিক এলাকায় কয়েক বৎসরের মেয়াদে কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সময়ে সময়ে গ্রন্থসমূহে কাবালাও মুকাতা'আ-এর মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে। শেষোক্তটি ক্ষুদ্রতর ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তবে মেয়াদকালের পরিপ্রেক্ষিতে তারতম্য করা হয়। কিন্তু ইহাও আধা স্বায়ত্তশাসিত বিস্তীর্ণ এলাকা বা প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ইহাতে নির্ধারিত চুক্তিপত্রের বিনিময়ে রাষ্ট্র উক্ত এলাকার সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে সংশ্লিষ্ট নিশ্চয়তা দাতার হাতে ন্যস্ত করিত।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা সাধারণভাবে কিছু মাত্রায় মুসলিম এশিয়ার জন্য প্রযোজ্য। মাগরিব ও স্পেনে মুকূস (مكوس)-এর প্রেক্ষিতে কাবালার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা নিশ্চিত নহে যে, শব্দটি খারাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে কি-না। মাঝে মাঝে ইহা কোন ওয়াকফ-এর প্রশাসক দ্বারা পরিশোধ্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ নির্দেশ করে। কিন্তু মিসরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা নাযুক প্রশ্নাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই এই সকল প্রশ্ন কৃষি ও অর্থবিষয়ক সমস্যার সহিত জড়িত।

বস্তুতপক্ষে মিসরে আপাতদৃষ্টিতে কোন প্রকার কাতা'ই' (জায়গীরদারী প্রথা) প্রদান করা হইত না যদিও মুসলিম বিজয়ের পূর্ব হইতেই কিছু মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী সরকারী জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল যাহা পরবর্তীকালেও তাহাদের উক্ত অস্তিত্ব বজায় রাখে। কিন্তু নিঃসন্দেহে যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে মিসরের আরব জনসংখ্যা কেবল সামরিক শহরসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যেহেতু নীলনদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকা ছাড়িয়া গৃহীত সেচ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট কৃষিভিত্তিক সংগঠন একটি সমন্বিত প্রশাসনের উদ্ভব ঘটায়, যাহা তাহাদের প্রত্যেকের কার্যকর স্বাধীনতার কিছুটা লাঘব করে, সেহেতু আপাতদষ্টিতে মনে হয় মিসরে এই বিশেষ অর্থে কাতী'আ শব্দটিই অজ্ঞাত ছিল (যদিও বহুবচনে কাতা'ই' দ্বারা ইহা সামাররা-র উদাহরণে সৃষ্ট ফুসতাত-এর তুলনীয় এলাকা নির্দেশ করে)। কাবালাত এমন বহু ব্যক্তির হাতে রহিয়াছে যাহাদিগকে প্যাপিরাস লিপিতে মারয়ূত (ماروت) বলা হইত। ইহার পর ২য়/৮ম শতাব্দীতে আরব গোত্রসমূহ মিসরে বসতি স্থাপন করে এবং যেহেতু তাহাদের কাতা'ই' প্রদান করা সম্ভব ছিল না, তাহাদের জমি বরাদ্দ করা হয় এবং তাহারা কাবালা-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহার শর্তানুসারে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হয় এবং ইহা তাহাদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে লাভজনক প্রমাণিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা হইত নিলামের মাধ্যমে। ফুসতাতে এই নিলাম প্রতি চারি বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইত এবং মৌলিক কর জরীপ প্রতি ত্রিশ বৎসর পর পর পর্যালোচনা করা হইত। প্রয়োগকৃত পদ্ধতিসমূহে সাধিত সংস্কার সত্ত্বেও (বিশেষভাবে ফাতিমী রাজত্বের ২য় শতকে আল-আফদাল ও আল-মা'মূন আল-বাতা'ইহী-এর আমলে) মনে হয় এই ব্যবস্থাটি কতিপয় ক্ষেত্রে চালু রহিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত আয়্যূবী বিজয়ের মাধ্যমে মিসরে একটি নূতন পদ্ধতির সূচনা ঘটে যাহা কমবেশী প্রাচ্য ইকতা' দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় যে, নিকটপ্রাচ্যের অন্যান্য সদৃশ পদ্ধতির সঙ্গে পুরাতন পদ্ধতিটির তারতম্য হইল তাহার পদ্ধতি ও স্থায়িত্বকালের দিক হইতে এবং মিসরের এই তারতম্য দেখা যায় নাই, বিশেষভাবে কৃষি সংগঠনের অভিযোজনের মাধ্যমে।

অবশ্য ইহার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। প্যাপিরাস ও পরবর্তীতে ফাতিমী ও ইহার সময়কালের অর্থনৈতিক প্রবন্ধ ও দলীলসমূহ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কাবালাতে বহির্ভূত ভূমিসমূহ (যাহা স্থায়ীভাবে জরিপের [মিসাহা] অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যে সকল জমিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার কৃষি ও ব্যবস্থার নির্বাচন ও কী পরিমাণ অংশ প্লাবিত করা হইবে তাহা প্রতি বৎসর পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হইত) এবং কাবালাত অন্তর্ভুক্ত জমি (যাহা স্বয়ং বিলা মিসাহা ছিল এবং যাহার জন্য ভূমিভাগের পরিমাণ ও কৃষিশ্রেণীর বার্ষিক সত্যায়ন ব্যতিরেকেই চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব ছিল) এই দুই প্রকারের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বিরাজমান ছিল। আল-মাখযূমী, ইব্‌ন মাম্মাতী (ابن مماتى) এবং আন-নাবুলুসী রচিত অর্থবিষয়ক প্রবন্ধসমূহে প্রথম পদ্ধতিটিকে মুফাদানাহ (مفادنة) অর্থাৎ ফাদ্দান-এর মাধ্যমে আরোপ অথবা সরলভাবে যিরা'আ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিকে বলা হইয়াছে কাবালা, কিন্তু একই সঙ্গে অন্ততপক্ষে কতিপয় ক্ষেত্রে তাহা মুনাজাযা (مناجزة) বিবাদের পর মীমাংসা সময় সময় মুশাতারা (مشاطرة) অধিভাগী নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে [ইব্‌ন হাওকাল, ১খ, ১৩৩, মা'কূদ (معقود) ও মাহ্‌লূল (محلول)-এর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন]। অপর পক্ষে রীতির দিক হইতে ক্রমশ কাবালাকে আরদু'ল-কাবালার (কাবালা ভূমি) অর্থে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়, ইহাতে ভূমিকে কাবালার অন্তর্গত করা হয়। দুই একটি প্যাপিরাস দলীলে ক্ষুদ্র সম্পত্তিও কাবালার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে (যেমন এশীয় কাবালা যাহাতে রহিয়াছে) এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও অপরাপর দলীল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডও উহার অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী সময়ের রাজস্ব বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে দেখা যায় যে, মুফাদানা ও কাবালা এই উভয় শ্রেণীভুক্ত ভূমির উপর কর আদায়কারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাদের কয়েকজন উক্ত উভয় প্রকার (মুফাদানা ও কাবালা)-এর এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে স্থানান্তরের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইহা হইতে প্লাবনের পর ভূমির অবস্থার উপর নির্ভরশীল চাষাবাদের ধরনের প্রেক্ষিতে। ইহা হইতে আভাস পাওয়া যায় যে, এই পর্যায়ে আরব ও ধর্মান্তরিত স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দুই শ্রেণীর ভূমির মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য চাষাবাদের ব্যবহারের তারতম্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। কাবালা এখন কেবল সেই সকল ভূমির জন্য প্রযোজ্য হয় যাহাতে খাদ্যশস্য এবং ডাল জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা হয় এবং যে সকল জমিতে ফলের বাগান অথবা অর্থকরী ফসল (আতসী, ইক্ষু ইত্যাদি) জন্মে তাহা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয়। শুরু হইতে এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

পরিশেষে মামলূক যুগে এই বিবর্তনটি অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়। কতিপয় ভূমি অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহার জন্য অগ্রিমভাবেই তানাজুয-মুনাজাযা (مناجزة) একটি নির্দিষ্ট অঙ্কে ইজারা স্থির করে, কিন্তু এখন যাহাকে কাবালা বলা হইতেছে, তাহা সাধারণত মিসাহা সাপেক্ষ কৃষিভূমির পরিমাণের একক ব্যতীত অধিক কিছু নয় এবং ইহার মধ্যে কৃষিকার্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী ফাদ্দানের উপর অর্পিত বিভিন্ন প্রকার জমির মধ্যে পার্থক্যকরণ করা হয়। অন্য কথায় একটি সাধারণ পদ্ধতির সহিত সমন্বয় সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইয়াছে, কোন প্রকার ঘোষণা অথবা কর প্রয়োগ অথবা অপর কোন 'নিশ্চয়তা'র প্রয়োজন নাই, কেবল প্রদেয় পাওনা পরিশোধ করাই যথেষ্ট। ইহা একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। কারণ প্রায়শই

এই পাওনা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাইবে না, বরং ইহা পাওনা হইতে মুকতা'- প্রাক্তন মুতাকাব্বিল-এর আয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর। 'উছমানী আমলে, যদিও মুকাতাআত ও ইলতিযামাত (التزامات) [শব্দগতভাবে ইহার অর্থ দামানের সহিত সম্পর্কিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ইকতা'-এর সহিত সম্পর্কিত]-এর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমিকর সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দাবলী হইতে কাবালা শব্দটি অদৃশ্য হইয়াছে। মিসর বিজয়ের পর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিশেষজ্ঞগণকে মুনাজাযা (مناجزة) ভূমিকে কেবল অনুর্বর ভূমি বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

উল্লিখিত ভূমিসম্পর্কিত করব্যবস্থা প্রসঙ্গে উহার ব্যবহারের পাশাপাশি, কাবালা শব্দটি এবং সেই সঙ্গে দামান, অধিকতর স্থায়ীভাবে ইহা বিশেষ শ্রেণীর কর ইজারাদারী অর্থ প্রকাশ করে। প্রধানত মুকূস (مكوس) শ্রেণীর এই বিন্যাসে রহিয়াছে শহরাঞ্চলে লবণ বিক্রয় অথবা হাম্মাম পরিচালনা এমন কি স্থানীয় শুল্ককেন্দ্র ইত্যাদির উপর নির্ধারিত কর। যে সকল ক্ষেত্রে আমরা শাসনকর্তাগণ দ্বারা অপরাপর স্থানে মুকূসের ন্যায় কাবালার বিলোপ অথবা নিন্দিত হইতে দেখি প্রধানত সেইগুলিকে উক্ত অর্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই প্রকার কাবালাতের প্রেক্ষিতে য়ূরোপীয়গণ এই শব্দটির মর্মার্থ অনুধাবন করিয়া ইহাকে সেই অর্থে গ্রহণ করিয়াছে (স্পেনীয় "আল-কাবালা" ১১০১ সালে প্রত্যায়নকৃত, ইতালীয় 'গাবেল্লা' দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দরসমূহে এবং সিসিলির নর্মানগণের মধ্যে প্রচলিত এবং ইহা হইতে ফরাসী 'gabelle' চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে যাহার কোন উল্লেখ এখনও পাওয়া যায় নাই; Provencal, gabele)। [অবশ্য ইহা লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় যে, প্রাচ্যে পরিচালিত কাটালনীয় অভিযানের নেতা Roman Muntaner-এর বর্ণনায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে gabelle তুর্কী গোত্রসমূহকে নির্দেশ করিত। সুতরাং উহা কাবীলা হইতে উদ্ভূত, কাবালা হইতে নয়]। এই সকল করের জন্য দ্রষ্টব্য Dariba (দারীবা), যদিও ইহা আরোপের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা করা হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ব্যবহৃত উৎসসমূহ (যদিও তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া দাবী করা হয় নাই) ঃ (১) আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, সম্পা. কায়রো ১৩৫২ হি., পৃ. ১০৫, অনু. Fagnan, পৃ. ৪৯; (২) 'উবায়দ, আমওয়াল, ৭০-২; (৩) আত-তাবারী, ২খ, ১৭১৭, ৩খ, ১০৯, ১৭৯৯; (৪) বায়হাকী, সম্পা. Schwally, ১২৫; (৫) ইব্ন হাওকাল, ১খ, ১৩৬; (৬) মাখযূমী, in JESHO, ৫খ, (১৯৬২ খৃ.), ২৬৩; (৭) ইব্ন মাম্মাতী, সম্পা. Atiya, ২৫৯, ৩৩৬-৮; (৮) নাবুলুসী, ফায়্যুম, in Arabica, ৪খ. (১৯৫৭ খৃ.), ১৩ প.; (৯) নুওয়ায়রী, নিহায়া, ৮খ., ২৪৬-৫২; (১০) আল-মাকরীযী, খিতাত, বূলাক, ১খ., ৮৩-৬; (১১) কালকাশানদী, সুবহ, ৩খ, ৪৫৮; (১২) A. Grohmann, Papyrus Caire, ২খ, নং ৮৭, ৩খ, নং ১০৩, ৪খ, নং ২৭০ ও ২৭১ তৎসহ মন্তব্য; (১৩) Ch. Backer, Papyri Schott-Reinhardt, নং ৩; (১৪) J. David-Weill, Papyrus Louvre, in JESHO, ১৪খ. (১৯৭১ খৃ.), ১৩-১৫ (মাযূত)।

আধুনিক রচনাবলী ঃ এই সম্পর্কে এখনও গবেষণা সম্পূর্ণ হয় নাই। (১৫) Quatremere, Journal des Savants, ১৮৪৮ খৃ., ৪৯ (gabelle-এর শব্দতত্ত্বসহ); (১৬) De Goeje, Glossaries of Baladhuri এবং তাবারী (কিন্তু আহলু'ল-কিবালা=আহ্‌লু'য-যিম্মা প্রদর্শনের জন্য বালাযুরী হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কিছু স্থির করিতে অত্যন্ত সন্দেহজনক)। (১৭) Dozy, দ্র. কাবালা (De Goeje হইতে উদ্ধৃত অংশ সম্পর্কে একই পরিমার্জনা প্রযোজ্য) এবং মুনাজাযা; (১৮) Lokkegaard, Islamic taxation, ch. IV (তু. Arabica, ১খ., ১৯৫৪ খৃ., ৩৫০; (১৯) Cl. Cahen, Fiscalite, Proprietc, etc., in Arabica, ২খ. (১৯৫৫ খৃ.); (২০) ঐ লেখক, Impots Fayyum, ৪খ, (১৯৫৭ খৃ.); (২১) এ লেখক, Contributions, in JESHO, ৫খ. (১৯৬২ খৃ.); (২২) ঐ লেখক, L'administration de l'arruee fatimide, in JESHO, ১৪ খ. (in press); (২৩) দিয়া'উ'দ-দীন আর-রা'ঈস, আল-খারাজ ফি'দ-দাওলাতি'ল-ইসলামিয়্যা:, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., শেষ অধ্যায়, (২৪) Makoto Shinizu, Les finances Foubliques de la Etat abbaside, in Der Islam, ৪২ খ. (১৯৬৫ খৃ.) বিশেষত পৃ. ১২; (২৫) E. Levi-Provencal, Esp. Mus, ৩খ, ৩৯, ২৭০, ৩০১, ৪৩০; (২৬) M. Talbi, L'emirat aghlabide, ৩২০, ৬৬১; (২৭) H. R. Idris, Zirides, ২খ, ৬১৫; (২৮) Crescini, Vincenzo Gabella, in Romanica Fragmenta, Turin ১৯৩২ খৃ.; (২৯) Giovanni Battista Pellegrini, L'elements arabo nelle lingue nealatine, in L'occidente et l'Islam nell'alto mediocre; Settimane de studio del contro italiano di studisull'alto Medio-Evo, XII-2, Spoleto ১৯৬৫ খৃ., ৭০৬, ৭৬৯-৭০; (৩০) F. Nasser, Les emprunts lexicologiques du francais a l'arabe, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ২৭৩-৪ এবং নির্ঘণ্ট। আর ও দ্র. ইকতা'; (৩১) দা. মা. ই., ১৬/১খ, পৃ.-২০৫-৯।

Cl. Cahen (E. I.²)/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাবিদ (كبد) ঃ (অভিধানবেত্তাগণের মতে ইহাই একমাত্র শুদ্ধ রূপ) অথবা কাব্‌দ, কিব্‌দ অর্থ 'যকৃৎ' (Liver)।

(১) যকৃৎ অর্থে ব্যবহৃত নামসমূহ ও উহাদের শব্দার্থগত বিশ্লেষণঃ অপরাপর সকল জাতির ন্যায় মুসলিম জনগণও মানব শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যঙ্গসমূহ সম্বন্ধে অবহিত ছিল এবং প্রাণীদেহের অনুরূপ প্রত্যঙ্গের প্রেক্ষিতে সেইগুলিকে সনাক্ত করিত। একই সঙ্গে তাহারা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উক্ত অঙ্গসমূহের প্রতি এক বা একাধিক শারীরতাত্ত্বিক এবং মনো-দৈহিক কার্য (function)-এর আরোপও করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের মানসিক কাঠামো অনুযায়ী তাহাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মানসিক কাঠামো আমাদের নিকট আংশিক স্পষ্ট মাত্র।

প্রাচীন কাল হইতেই যে এই চিহ্নিতকরণ চলিয়া আসিয়াছে, ভাষাই ইহার সাক্ষ্য বহন করে। এ প্রসঙ্গে E. Bargheer বলেন, "এইগুলি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যাহা প্রায়শ কোন একটি বিশেষ অঙ্গকে জনগণের ধারণা (concept) জগতে বিশেষ উচ্চ স্থান দান করে। যথা ঃ হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে উহার স্পন্দন বা ছন্দোবদ্ধ গতি, ফুসফুসের ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং যকৃতের ক্ষেত্রে উহার কেন্দ্রীয় অবস্থান, অন্যান্য প্রত্যঙ্গের তুলনায়

উহার অসাধারণ আকার, পরিবর্তনশীল আকৃতি এবং ভোজ্যত্ব" (Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsgd. von E. Hoffman-Krayer, বার্লিন ১৯২৭-৪২ খৃ., ৫খ, কলাম ৯৭৬, দ্র. Leber)।

আরবীতে যকৃতের ক্লাসিক্যাল নাম কাবিদ, কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রায়শ ব্যবহৃত আঞ্চলিক রূপ কাব্দ এবং কিব্দ-এর সন্ধান পাওয়া যায় (তু. Worterbuch der Klassischen Arabischen Sprache, ১খ., Wiesbaden ১৯৭০ খৃ., ১৮)। অন্যান্য সামী (Semitic) ভাষার ন্যায় যকৃতের গুরুভার ওজনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যকৃতের বিশেষ্য রূপ যাহা মূল ক-ব-দ (ك-ب-د) অথবা ক-ব-ত (ك-ب-ت) হইতে উদ্ভূত তাহা সকল সামী ভাষাতেই দেখা যায়। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম সামী 'দ' (d) মনে হয় আক্কাদী ভাষায় 'ত' (t)-এর রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে ('ব')-এর উপস্থিতির দরুন উদ্ভূত হইয়াছে (কাবাত্তু পরবর্তীতে কাবিত্তু, কবিতায় কাবত়াতু) এবং মনে করা হয় ইহাই মৌলিক রূপ (Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Gramatik d. semit. Sprachen, বার্লিন ১৯০৮-১৩ খৃ., ১খ., ১৫২)। কিন্তু আক্কাদী ভাষাতে আমরা গাবীদু, কাবীদু-র সন্ধান পাই যাহা সম্ভবত সামী ভাষা হইতে গৃহীত। ইহা সুস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় যে, ইহা বিশেষণ পদ 'ভারী' হইতে রূপকভাবে উদ্ভূত (আক্কাদী কাবত্তু, স্ত্রী কাবাত্তু, কাবিতু; হিব্রু ঃ কাবেদ; উগার ঃ কব্দ ইত্যাদি) এবং ইহারই অনুরূপ (Corresponding) ক্রিয়া পদটি (তু. 'আরবী ঃ কাবাদা (كابد), "সহ্য করা" "বহন করা" অর্থবাচক (তু. H. Holma, Die Namen, der Korperteile im Assyrisch-Babylonischen, Leipzig ১৯১১ খৃ. পৃ ৭৮; P. Fronzaroli, Studi sul lessico comune semitico, Rend. Linc, series 8, vol. 19, fasc. 5-6, 1964, 32f. 47, 54) যকৃত বুঝাইবার জন্য এই রূপকটির ব্যবহার ("সর্বাপেক্ষা ভারী এবং সর্বাপেক্ষা পুরু পাত্র", Galen, De usu partium, vi, 17=iii, 495, ed. C. G. Kuhn, i, 360, 1. 19 f. ed. G. Helmreich) Semitic ভাষার একটি নূতন সৃষ্টি, Hamito-Semitic ভাষার সহিত তুলনীয় যাহাতে একই অর্থে কয়েকটি পৃথক পৃথক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। A. Cuny যেমন দৃঢ়তার সহিত বলেন, ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে এই শব্দের অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত নহে (Recherches sur le vocalisme.. en nostratique" Paris ১৯৪৩ খৃ., ৬৮ প.)। ইন্দো-য়ূরোপীয় ভাষাসমূহে সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টিগোচর হয় যে শব্দটি তাহা সম্ভবত পিণ্ড (lump) বা স্ফীত উপবৃদ্ধি (Swelling tumour)-এর ধারণার সহিত সংযুক্ত (J. Pokorny, Indo-Germanisches Etymologisches Worterbuch, i, Berne-Munich ১৯৪৮-৫৯ খৃ., ৫০৪)। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে ইহাকে প্রধানত ফারসী 'জিগার' (جگر) শব্দে নির্দেশ করা হয় (Latin iecur)। 'উছমানী তুর্কীগণ শব্দটিকে তাহাদের ভাষায় গ্রহণ করে এবং সার্বো-ক্রোটগণ শব্দটি গ্রহণ করে পশুদের যকৃৎ বুঝাইবার জন্য।

তুর্কী শব্দটির সর্বাধিক প্রচলিত রূপ বাগীর (baghir) [Yenisei-এর সুপ্রাচীন runiform উৎকীর্ণ লিপি ইহার সাক্ষ্য বহন করে, cf. V. G. Egorov. Etimologiceskiy slovar cuvasskogo yazika, Ceboksary ১৯৬৪ খৃ., ১৫৫; যিনি তুর্কী ভাষায় শব্দটির সকল প্রচলিত রূপসমূহও প্রদান করিয়াছেন], সম্ভবত একটি বন্ধন (tie), একটি বাণ্ডিল, একটি বস্তা (sack) অথবা একটি পকেটের ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট (তু. 'উছমানী তুর্কী বিশেষ্য পদ 'বাগ' ও ক্রিয়া পদ বাগলামাক। কিন্তু L. Bazin উল্লেখ করিয়াছেন যে, শব্দটির এই সম্পর্ক কতিপয় ধ্বনিতাত্ত্বিক অসুবিধার সৃষ্টি করে)।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত শব্দসমূহ সুপ্রাচীন কাল হইতেই একটি 'স্বাভাবিক' অথবা 'কেন্দ্রীয়' অর্থে অর্থাৎ 'যকৃৎ' অর্থে স্থায়িত্ব লাভ করে (L. Bloomfield, Language, লন্ডন ১৯৩৫ খৃ., ১৪৯) কিন্তু ভাষান্তর (transfers)-এর ফলে অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে (Semantic field) এই শব্দগুলি সেই রূপে সুপ্রাচীন কাল হইতে নিঃসন্দেহে 'প্রান্তিক' (marginal) অথবা 'রূপক' (metaphoric) মূল্যমান বা প্রকাশ ভঙ্গীর সহিত সম্পর্ক রাখে।

অর্থের নৈকট্য হেতু এই সকল ভাষান্তরের ফলে (তু. S. Ullmann, The principles of semantics, Glasgow ১৯৫১ খৃ., ২৩১ প.) আলোচ্য শব্দসমূহের কতিপয়কে যকৃৎ সন্নিহিত প্রত্যঙ্গ নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। এইভাবে প্রাচীন আরবীতে 'কাবিদ' মোটামুটি যকৃৎ সন্নিহিত প্রত্যঙ্গের উপরিভাগ এবং সেই সঙ্গে বক্ষ, এমন কি উদরও নির্দেশ করে। কোন মহিলাকে "কাবিদুন মালসা'উ" (كبد ملساء) অর্থাৎ মসৃণ ও চকচকে উদরবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (আ'শা, দীওয়ান, সম্পা. R. Geyer, London 1928, 77 : 15a=তারাফা, দীওয়ান in W. Ahlwardt, the divans of the six ancient Arabic poets, London 1870, II ঃ 6a) এবং এইরূপ আরও ব্যবহার (নির্দেশনার জন্য দ্র. Worterbuch der klassischen Arabischen Sparche, i, Wiesbaden ১৯৭০ খৃ., ১৮-২০)। একইভাবে Uyghur ভাষায় রহিয়াছে 'বেগির্গা বাস্মাক' অর্থাৎ বক্ষ বা হৃদয়ের সহিত জড়াইয়া ধরা, "বাগরী য়ুগান পালবান" অর্থাৎ শক্তিশালী বক্ষের অধিকারী বীর (বা ক্রীড়াবিদ) (E. N. Nadzip, Uygursko-russkiy slover', Moscow ১৯৬৮ খৃ., ২২৬)। একইভাবে Azeir ভাষায় "বাগরীনা বাসমাগ" অর্থ আলিঙ্গন করা, বাহুপাশে আবদ্ধ করা, বক্ষের সহিত জড়ান (H. A. Azizbekov, Azerbaydzanskoy-russkiy slovar, Baku ১৯৬৫ খৃ., ৪৭)।

ফারসীতে যুগ্ম শব্দ "জিগার-বান্দ" অর্থ যকৃতসমষ্টি (liver complex) [উদাহরণস্বরূপ সা'দী ও শাম্স-ই তাব্রীযী-তে এই ব্যবহারের সাক্ষ্য দৃষ্ট হয়] যাহা বক্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যঙ্গ ঃ ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎকে শ্রেণীগতভাবে নির্দেশ করে। ইতোমধ্যেই তুর্কী ভাষাগুলিতে যকৃৎ অর্থ প্রকাশের জন্য 'জিগার' শব্দটি ধার করা হয় যাহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় সারায়-এর সায়ফ (১৩১১ খৃ.) কর্তৃক মিসরে রচিত গুলিস্তান-এর তুর্কী অনুবাদে (তু. E. Fazylov, Starouzbekskiy yazik, Tashkent ১৯৬৬-৭১ খৃ.; ১খ., ৩৭০)। কিন্তু অভিন্ন কয়েকটি ভাষায় একই অর্থ প্রকাশের জন্য অপর একটি শব্দের (বাগীর ইত্যাদি) অস্তিত্ব থাকার কারণে এবং সম্ভবত উল্লিখিত অর্থে জিগার-বান্দ-এর ব্যবহারের দরুন ও জিগার শব্দটি সম্প্রসারিত

হইয়া বক্ষ-গহ্বরস্থ অপর একটি প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ ফুসফুসকে বুঝায় যদিও ফুসফুস অর্থে ব্যবহৃত একটি যথার্থ তুর্কী শব্দ বিদ্যমান (ok (k) a, opka, "ovka", "okpe", যাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সুপ্রাচীন রচনাবলীতে লিপিবদ্ধ রূপক অর্থাৎ "ক্রোধ, শোক, অসন্তোষ, দুর্দশা" অর্থ বহন করে (তু. Egorov, Etim, slovar..., ২৮০ প.); বর্তমানে ইহাই প্রচলিত 'উছমানী তুর্কী ভাষায় ofke শব্দটির একমাত্র অর্থ (Lat. orthog, ofke এবং তৎসহ আঞ্চলিক শব্দ oygan অর্থ ফুসফুস)। ফলে যকৃত ও ফুসফুসকে পৃথক করিবার জন্য একটি বিশেষণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যথা ঃ 'কৃষ্ণ' যকৃৎ (Azeri ভাষায় 'gara, djiyar', তুর্কী 'কারা জিগার', Lat. orthog. 'কারা সিগার') অর্থাৎ প্রকৃত যকৃৎ এবং 'শ্বেত' যকৃত (আয়েরি 'আগ জিয়ার, তুর্কী 'আক জিগার, Lat. orthog. 'আক সিগার') অর্থাৎ ফুস্ফুস্। 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন অন্যান্য ভাষা এই একই পার্থক্য রীতি গ্রহণ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, বুলগেরীয় ভাষা— ইহাতে ধার করা শব্দ জিগার (ফুসফুস্ ও যকৃৎ)-এর প্রতি পার্থক্য রীতি প্রয়োগ না করিয়া স্লাভ (slav) শব্দ drob-এর প্রয়োগ করা হইয়াছে (তু. Balgariski etimonologicen recnik, v. Sofia ১৯৬৬ খৃ., ৩৬২) এবং Serbo-Croat ভাষা (ইহাতে দুইটি শব্দ রূপ ঃ crna dzigerica, 'যকৃৎ', bijela dzigerica 'ফুসফুস', তু. 'Abdullah Skaljic, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo ১৯৬৫ খৃ., ২৪০ প.)। অপর পক্ষে ইন্দো-য়ূরোপীয় শব্দ 'jetra', বিশেষভাবে অংগ গঠনতান্ত্রিক (anatomical) অর্থে ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট। "শ্বেত যকৃত" (কুবুদ বীদ كبود بيض) রূপটি আরবী ভাষাতে সময়ে সময়ে হইলেও ব্যবহৃত হইয়াছে সম্ভবত ফুসফুস অর্থে (ইব্ন জায্লা, মিনহাজু'ল-বায়ান, শিরো. কাবিদ, পাণ্ডু. প্যারিস, Bib. Nat. Ar. ২৯৪৯, fol. ১৫৯ v ইত্যাদি)।

নৈকট্যের কারণে শব্দার্থের স্থানান্তর প্রক্রিয়া 'যকৃৎ' শব্দটির অর্থ প্রদান ক্ষেত্রকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করে যে, ইহা কেবল বক্ষ গহ্বরের প্রত্যঙ্গগুলিকেই নহে, বরং একই সঙ্গে প্রাণী দেহকাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ অপরাপর প্রত্যঙ্গকেও ইহার অর্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। উপরন্তু 'যকৃত' শব্দটির বহুবচন রূপ দ্বারা অস্পষ্টভাবে সীমিত ধরনে উক্ত প্রত্যঙ্গসমূহকে সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা হয়। এইভাবে আত-তাবারী (৪র্থ/১০ম শতক)-এর ফার্সী অনুবাদে বহুবচন "জিগারান" (جگران) নাড়ীভুঁড়ি অর্থে ব্যবহৃত হয় (G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, প্যারিস ১৯৬৩ খৃ., ১৯৫)। কিন্তু তুর্কী ভাষায় 'বাগীর' শব্দটি এককভাবে (অথবা অন্তে প্রত্যয় যোগে, যথা ঃ বাগীর্সাক এবং অন্যান্য রূপে) 'উদর' 'তলপেট' ও 'নাড়ীভুঁড়ি'কেও নির্দেশ করে (তু. Drevnetyurskiy slovar'-এ প্রদত্ত সূত্রাবলী, লেনিনগ্রাড ১৯৬৯ খৃ., ৭৭, ৭৮)। উদাহরণস্বরূপ, ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে "উইগুর বেগিরলিমাক" অর্থ আবক্ষ মাটিতে লুটান, পেটের উপর ভর করিয়া হেঁচড়াইয়া চলা, এমন কি ইথিওপিয়া-র আধুনিক ভাষাগুলিতেও (proto-Ethiopic) যকৃৎবাচক শব্দটি "উদর, হৃৎপিণ্ড, অভ্যন্তর, অন্ত্র, তলপেট" ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়াছে (Tigre kabd, Tigrina Kabdi) এবং Amharic ভাষায় ইহা hod-এর একমাত্র অর্থ দাঁড়াইয়াছে (কাবদ হইতে, তু. Brockelmann, Grundriss, ১খ., ২০৪) যাহার ফলে এই ভাষায় যকৃৎ নির্দেশ করিতে অপর একটি শব্দ (গুব্বাত) ব্যবহার করিতে হয়।

অর্থের এই প্রকার পরিবর্তনের মধ্যে সাধারণভাবে কোন বস্তুর "মধ্য, কেন্দ্র, অভ্যন্তর (আমরা বলিতে পারি হৃৎপিণ্ড)" এই সকল শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আরবীতে في كبد جبل - "কোন পর্বতের গহীন অভ্যন্তরে" على كبد بحر - "কোন সমুদ্রের গভীরে" ইত্যাদি বাকরীতি দৃষ্ট হয় (Worterbuck... ২০-তে প্রদত্ত সূত্রাবলী দ্র.)। আরবী 'কাবিদু'ল-কাওস' (كبد القوس F. W. Schwarzlose, Die Waffen der alten Araber, Leipzig ১৮৮৬ খৃ., ২৬০, ২৬৫ প.; A. Boudot Lamotte, Contribution a l'etude de l'archerie musulmane, দামিশক ১৯৬৮ খৃ., ১৬৪, দ্র. নির্ঘণ্ট, পৃ. ১৭৯ এবং চিত্র ৩)-এর ন্যায় প্রাচীন তুর্কী ভাষায় য়া' বাগ্রী "ধনুকের যকৃৎ" বলিতে উহার বক্রাংশের কেন্দ্র নির্দেশ করে (মাহ্মূদ কাশ্গারী, দীওয়ানু লুগাতিত-তুর্ক, ইস্তাম্বুল ১৩৩৩-৩৫ হি., ১খ., ৩০১; C. Brockelmann, mittelturkischer Wortschatz, Budapest ১৯২৮ খৃ., ২৮)। তাতার ভাষায় 'উরাল বাভীরী' (Ural baviri) অর্থ "উরাল পর্বতের যকৃৎ কেন্দ্র" (Tatar'sko-russkiy slovar', মস্কো ১৯৬৬ খৃ., ৫১)। উদাহরণস্বরূপ একইভাবে ফারসী ভাষায় দেখা যায় 'জিগার-ই গিল' "ধরণীর নাড়ীভুঁড়ি, সমাধি"। স্থান হইতে কালে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় ফী কাবিদি'ল-লায়ল' = রাত্রির বৃহৎ যকৃৎ অর্থাৎ "মধ্যভাগ হৃদয়, গভীরতা"-এর ন্যায় বাক্য (ইব্ন সা'দ, ৩/১খ, ২০৫)।

তুর্কী ভাষায় অর্থের এই সম্প্রসারণ প্রায়শ 'সম্মুখ', 'অগ্র' এবং 'পার্শ্ব'কেও অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণ ঃ উযবেক ভাষায় তোগ বাগরিদা (togh baghrida) অর্থ "পাহাড়ের পার্শ্বদেশে" [A. K. Borovkov (ed.), Uzbeksko-russkiy slovar', মস্কো ১৯৫৯ খৃ., ৫৮]। Altai অঞ্চলের আঞ্চলিক শোর (Shor) ভাষায় paghrinda-তে ইহা এমনকি একটি অব্যয় (preposition)-এর অর্থ "beside" (অধিকন্তু) গ্রহণ করে (W. Radloff, Versuch eines Worterbuch der Turk-Dialecte, St. Petersburg ১৮৯৩-১৯১১ খৃ., ৪খ., col. ১১৩৪)।

২। 'যকৃত-এর প্রাচীন ও প্রচলিত মনো-দৈহিক তত্ত্ব (psycho-physiology) ঃ দেহের অন্য প্রত্যঙ্গ, অংশ বা ধরিত্রীর কোন অংশ নির্দেশের জন্য যকৃতের অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি অপরাপর যাহা প্রান্তীয় (marginal) অর্থই গ্রহণ করুক না কেন, প্রাকতাত্ত্বিক (pretheoretic) পর্যায় হইতেই এই অঙ্গটির প্রতি একটি না একটি দেহতাত্ত্বিক এবং মনোদৈহিক কর্ম (function)-এর আরোপ করা হয়।

এইভাবে হৃৎপিণ্ডের মতই যকৃৎও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মনোজীবনের (psychic life) একমাত্র বা অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত, অন্য কথায় ইহা ছিল আত্মার (soul) বা কোন একটি আত্মার অবলম্বন (তু. W. Wundt, Volkerpsychologie[2], ৪খ, Liepzig ১৯২০ খৃ., ১০৫; A Merx, Le role du foie dans la letterature des peuples semitiques, in Florilegium ... Melchior de Vogue, Paris ১৯০৯ খৃ., ৪২৭-৪৪; M. Jastrow, The liver as the seat of the soul, in

Studies in the History of Religion presented to C. H. Toy, New York ১৯১২ খৃ., ১৪৩-৬৮; F. E. Clements, Primitive Concepts of Disease, University of California Publications in American Archeology and Ethnology, ৩২/২খ., (১৯৩২ খৃ.), ২৩৩ প.; Bargheer, Leber, ৯৭৭ প.; ঐ, Eingeweide, Lebensu. Seelenkrafte des Leibensinneren, Leipzig ১৯৩১ খৃ., ৯৩; W. D. Wallis, ERE, x, 373 ff.)। সম্ভবত ইন্দ্রজালের চাপা পরশ (undertones) মাখা নানা গুণের আধাররূপে যকৃতের প্রধান গুরুত্বের কারণেই ইহার বিশেষ্য পদের রূপটি সেমিটিক ভাষাসমূহে প্রায়শ স্ত্রী লিঙ্গের। সিরিয়াক ভাষায় ইহা স্ত্রী লিঙ্গের এবং প্রচলিত মতের বিপরীত প্রাচীন হিব্রু ভাষাতেও ইহা স্ত্রী লিঙ্গের (তু. G. R. Driver, JRAS, ১৯৪৮ খৃ., ১৭৫, n. ২)। আরবীতেও অধিকাংশ সময় ইহার বিশেষ্যরূপ স্ত্রী লিঙ্গের, যদিও আরবীতে ইহা পুংলিঙ্গেরও হইতে পারে এবং সাধারণভাবে ব্যাকরণবিদগণের বিবেচনায় উভয় লিঙ্গের রূপ শুদ্ধ [A. J. Wensinck, Some Aspects of Gender in the Semitic Languages, Amsterdam ১৯২৭ খৃ. (Verh, Ak. Amst., xxvi/3), ৩০, তু. ৩৬ প.; M. Feghali and A. Cuny, Du genre grammatical en semitique, প্যারিস ১৯২৪ খৃ., ৫৫)।

আরও বিশ্লেষণ রীতিতে সাধারণভাবে অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গসমূহকে অনুভূতি (feeling), আবেগ (emotion) এবং কামনা (passion)-র উদ্ভাবক বা কারণরূপে অভিহিত করা হয় (এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ নহে)। সুতরাং মেসোপটেমীয়গণের নিকট এবং সম্ভবত আংশিকভাবে হিব্রুগণের নিকট যকৃৎ ছিল 'আনন্দ'-এর উৎস (যখন ইহা স্বচ্ছন্দ অবস্থায় 'আলোকিত' হয়) এবং 'দুঃখ'-এর উৎস (যখন ইহা অসুস্থ বা ব্যথিত হয়), 'ক্রোধ'-এর উৎস (যখন ইহা প্রজ্বলিত হয়), 'প্রশান্তি'-র উৎস (যখন ইহা তুষ্ট হয়) এবং পরিশেষে হৃৎপিণ্ডের পাশাপাশি ইহা কামনারও উৎস (তু. E. Dhorme, L' emploi metaphorique des noms de parties du corps en hebreu et en akkadien, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., ১২৮ প.; Merx, Le role du foie, ৪৩৬ প., ৪৩৯ প.)। আরবগণ মনে করে যে, যকৃৎ আহত হয় সেই সকল দুঃখ দ্বারা যাহা আমরা হৃদয়ের প্রতি আরোপ করি অর্থাৎ প্রেমের ব্যথা। লাজুক প্রেমিক অথবা অনুরূপভাবে ব্যথিত ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয় তাহার যকৃৎ 'বিদীর্ণ' (মূল ص-د-ع، ف-ط-ر، ف-ل-ق) কিংবা ভগ্ন (কাবিদ মার্দূদা = كبد مرضوضة), হারীরী, মাকামাত, সম্পা. Silvestre de Sacy, ২য় সং. প্যারিস ১৯৪৭-৫৩ খৃ., ৫৭) অথবা তাহার যকৃৎ ক্ষয়িষ্ণু, তৃষ্ণার্ত, ভারাক্রান্ত, প্রজ্বলিত। বলা হয় অমুকের যকৃৎ "প্রেমের ব্যথায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে"। কৃষ এবং কোমল যকৃৎ কোমলমতি ও সংবেদনশীল হৃদয়ের লক্ষণ। ধার্মিক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ দেহে শুভ্র যকৃৎ (ইবন জুবায়র, ২৪০) অর্থাৎ নির্মল আত্মা একটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী রূপক যাহার ব্যবহার জাম্বিয়ার Ndembu-দের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত (তু. V. W. Turner, The Drums of Affliction, অক্সফোর্ড ১৯৬৮ খৃ., ৪৮, ২৮৩; আরও তু. Bargheer, Leber ৯৭৯; ঐ, Eingewide, ৯৫ প.)। 'যকৃৎ ভবন' অথবা 'যকৃতে আঘাত' সুগভীর দুঃখ প্রদানের অর্থবাহক। ফলে যকৃতকে দেহের একটি বিশেষ মূল্যবান অঙ্গরূপে বিবেচনা করা হয় এবং প্রিয় ব্যক্তিবর্গকে যকৃতে (কলিজায়) স্থান দান করা হয় অথবা তাহারা 'কলিজার টুকরা'-রূপে পরিণত হয়। শিশুরা যকৃতের "অন্তস্থলের রক্ত" (মাহ্জা)। কোন প্রিয় বন্ধু অথবা সম্মানিত ব্যক্তির স্থান বলা হয় "যকৃৎ ও ইহার আবরক পর্দার মধ্যস্থলে" (খিল্ব)। অধিকতর সাধারণভাবে প্রিয়জন "যকৃতের (কলিজার) টুক্রা (قطعة) বিশেষ" (দ্র. Worterbuch..., ১৯ প. এবং A. Merx, Le role du foie..., ৪২৯-৩৩-এ উল্লিখিত সূত্রাবলী)। শেষোক্ত বাকরীতিটি বর্তমানেও প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ, তিউনিসীয় গ্রাম তাক্রূনা-তে (W. Marcais, Textes arabes de Takrouna, ১খ, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ৮০-১, ২৭২, ২৯২, নং ৪২, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ যাহার মধ্যে রহিয়াছে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে খৃষ্টানগণের মধ্যে সম্পাদিত একটি মোযারাব দলীল)। এখানে 'যকৃৎ' শব্দটি দ্বারা কেবল কোন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষত শিশুকে বুঝান হয়, বলা হয় ঃ ياكبدى = হে আমার কলিজা-অমূল্য সম্পদ (W. Marcais, ibid, ২খ, bk. 7, প্যারিস ১৯৬০ খৃ., ৩৩৫৪-৬)। Constantine অঞ্চলে শিশুদের সম্বন্ধে বলা হয়, তাহার মাতাপিতার 'কবাদ' (যকৃৎ) (M. S. Belguedj, La medecine traditionelle dans le Constantinois, Strasburg ১৯৬৬ খৃ., ১২১)।

হুবহু একই প্রকার বাগ্‌ধারা ফারসী সাহিত্যেও দৃষ্টিগোচর হয় যাহা Merx-এর বিশ্বাস অনুযায়ী আরবী হইতে সরাসরি গৃহীত (উদাহরণস্বরূপ দ্র. Merx-এ প্রদত্ত বাকরীতিসমূহ, Le role du foie..., ৪৩৪-৫ এবং in Farhangi Zaboni todjike মস্কো ১৯৬৯ খৃ., 779b এবং বহু অভিধানে প্রদত্ত বাকরীতি)। মাত্র দুইটি উদাহরণ দেওয়া যায় ঃ পিতার নিকট তাহার পুত্র যেন নিজ যকৃতের রক্ত, খুন-ই জিগার, (কবি ফিরদাওসী ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, শাহ্নামাহ, ১খ, ২৫৬, সম্পা. Mohl) কিংবা জিগার-পারা = 'যকৃতের টুকরা" অথবা জিগার-গূশা = "যকৃতের অংশ"), অত্যন্ত প্রিয় সন্তানের সম্পর্কে এইরূপ বাক্য জনপ্রিয়।

তুর্কী ভাষাতেও একই ধরনের প্রকাশভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়; তবে এই ক্ষেত্রে ফারসী ও আরবী দ্বারা প্রকাশিত শব্দাবলী এবং মৌলিকভাবে তুর্কী শব্দাবলীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ সহজ নহে। নির্মম কোন ব্যক্তিকে বলা হয় "পাষাণ যকৃত"-এর অধিকারী অথবা "যকৃৎহীন" (বাগীরসিয) (দ্র. কুতাদগু বিলিগ, ৫ম/১১শ শতক, ref. in Drevnetyurskiy slovar, ৭৮)। সমকালীন Uyghur ভাষায় "আমার যকৃৎ" বলিতে "আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তমা" বুঝান হয় (E. N. Nadzip. Uygursko-russkiy slovar, ২২৬)। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর তুর্কীস্তানের তুর্কী সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশ স্থলে ব্যবহৃত বাকভঙ্গীর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায় যেইগুলি এইরূপ ঃ যকৃৎ দ্বি-খণ্ডিত হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া, ছিন্ন হওয়া, জ্বলিয়া যাওয়া, তীরবর্শী ইত্যাদির লক্ষ্যস্থলরূপে ব্যবহৃত হওয়া, শিকে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া গাঁথা (প্রায়শই ফারসী হইতে অনূদিত) ইত্যাকার বাকরীতির একটি চয়নিকা সংকলন করিয়াছেন E. Fazylov, in Starouzbekskiy yazik, i, Tashkent ১৯৬৬ খৃ., ২০১-২। অন্যান্য স্থানে সময় সময় যকৃতকে ক্রোধের উৎসরূপে বর্ণনা করা হয় (কতিপয় অপ্রত্যয়িত বরাতের জন্য দ্র. Radloff,

versuch, iv, col. 1431 f; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার অর্থ ফুসফুস; তু. উপরের আলোচনা)।

এই ধরনের প্রচলিত মনো-শারীরতত্ত্ব (Psycho-Physiology) আত্মা ও ইহার আবাস সম্পর্কে অধিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র অবলম্বনে দূরকল্পনার (Speculation) ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। প্লাটো কর্তৃক প্রণীত আত্মার কার্যাবলীর (functions) বিভাগকে দার্শনিকদের আলোচনা কমবেশী অগ্রসর করে। দার্শনিকগণের প্রবণতা ছিল বিবিধ কার্যাবলীকে এমন কতিপয় আত্মার অঙ্গীভূত করা (incorporate) যাহারা কতকটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। প্লাটো আত্মার যে অংশগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সে অংশগুলিকে দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থানের সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন। মেসোপটেমিয়ায় উদ্ভূত যকৃতবীক্ষণ (hepatoscopy) প্রভাবে তিনি কামনা-বাসনা উদ্দীপক আত্মা (appetitive soul = النفس الشهوانية)-কে (epithum tirhe psukhe) যকৃতের অব্যবহিত নৈকট্যে ও ইহার সহিত সম্পর্কিত রূপে স্থান দিয়াছেন (Timeos, 69-72, Known in the Islamic world through Hunayn b. Ishaq's translation of Galen's compendium, XVII c, ed. & tr. P. Kraus and R. Walzer, Galeni... Compendium=Plato Arabus, i, London 1951, Arab. p. 23, Lat. p. 74)। 'নিঃশ্বাস' (রূহ)-এর সহিত চিহ্নিত আত্মা যাহা একই সঙ্গে আবেগ এবং মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী (Functions) এবং দৈহিক কার্যাবলীরও প্রধান অবলম্বন, তদ্রূপ প্রচলিত ধারণাবলী অনুযায়ী মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট করা সংগত ছিল, প্রচলিত ঐ ধারণাবলীকে একটি বিশেষ পদ্ধতির যুক্তির সাহায্যে কতকটা সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। 'Pneumatic School' নামে পরিচিত চিকিৎসা মতবাদ (প্রথম শতাব্দীতে Attalia-এর Atheneos কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) এই ধারণাবলীর কেবল পুনর্বিন্যাস করিয়াছিল। Galen তাঁহার দেহনিঃসৃত রস, (রক্ত, পিত্ত ইত্যাদি) তত্ত্ব (Theory of humours)-এর সহিত উপরিউক্ত Preumatic মতবাদটি (যাহাতে যকৃৎকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়)-কে তাঁহার পদ্ধতিতে (system) প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার মাধ্যমে পরবর্তীকালের চিকিৎসকগণ বিশেষত আরবগণ ইহা গ্রহণ করেন।

Pneumatic মতবাদে, প্রাচীনকালেও আরবগণের মধ্যে, উভয় ক্ষেত্রে চিত্তবৃত্তির অবস্থানসমূহকে (sites) অধিকতর নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অথবা তৎকালে প্রচলিত ধারণাবলী, বিশেষত ভাষার মাধ্যমে পরিবাহিত ধারণাবলী অনুযায়ী সংশোধন করা হইয়াছিল (যকৃৎ-এর জন্য তু. H. Hagen, Die physiologische und psychologische Bedeutung der Leber in der Antike, thesis, Bonn 1961; তু. Merx, Le role du foie, ৪৩৭ প., সিরিয়াক ও হিব্রু গ্রন্থকারগণের জন্য)। এই কারণে রাসা'ইলু ইখওয়ানি'স সাফা'তে অবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের ধারণাবলীর সমালোচনা করা হইয়াছে, যাঁহারা আবেগ (affections) ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক শক্তি (faculties) বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, যথা ঃ কামনা (শাহ্ওয়া)-র স্থান নির্ধারণ করিয়াছেন যকৃতে (সম্পা. কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮, প্রথম পুস্তক, ২০০ প.)। হারূনু'র-রাশীদ-এর জন্য সংকলিত এবং জনৈক মাসীহ্ ইব্ন হাকাম কর্তৃক রচিত বলিয়া পরিচিত ও বিভিন্ন উপস্থাপনায় (versions) অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পরিচিত, জনপ্রিয় ঔষধাবলী সংক্রান্ত 'হারূনিয়্যা' নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে "যকৃৎ করুণার নির্ঝরধারা" (Vatican ms. cited by M. S. Belguedj, La medicine traditionelle dans le Constantinois, Strasburg ১৯৬৬ খৃ., ১২১)। এই মতের সমর্থনে গ্রীক ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়।

সন্তানের প্রতি ভালবাসার সহিত যকৃতের পূর্বোল্লিখিত সম্বন্ধ কনস্ট্যান্টাইন এলাকার জনগণের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতিতে দৃষ্ট হয়। যদি পিতামহ অথবা পিতা সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ (indulgent) হয়, তাহার কারণস্বরূপ বলা হয়, "তাহাদের যকৃৎ সন্তানকে শান্তি প্রদানে বাধা দান করে"; সন্তানের অনুপস্থিতিতে যকৃৎ "জ্বলিয়া পুড়িয়া" ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুতে যকৃৎ "বিদীর্ণ হয়" (Belguedj, পূ. স্থা., ১২১)।

কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, যথা ঃ কোন শিশুর নামকরণ উৎসবের সময় আচার অনুযায়ী কোন প্রাণীর যকৃৎ আহারের পশ্চাতে রহিয়াছে পূর্বোক্ত ধারণা। মরক্কোতে এই বিশেষ উপলক্ষে একটি মেষ যাবহ করা হয় এবং ইহার যকৃৎটি পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে বিতরণ করা হয় যাহাতে তাহাদের যকৃতে শিশুর প্রতি স্নেহ জন্মে (J. Jouin, Hesperis, ৪৪ (১৯৫৭ খৃ.), ৩০৮; Legey, Essai de folklore marocain, প্যারিস ১৯২৬ খৃ., ৯৫; E. Westermarck, Rilual and Belief in Morocco, লন্ডন ১৯২৬ খৃ., ২খ, ৩৯০)। আবার মরক্কোতে যকৃৎকে বৈবাহিক প্রেমের সহিত সম্পর্ক যুক্ত করা হয়; কোন কোন গোত্রে বর-বধূ তাহাদের সর্বপ্রথম যৌথ আহারকালে তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে যাবহ্ (যবাই) করা একটি মেষের যকৃৎ আহার করে (E. Westermarck, Marriage ceremonies in Morocco, লণ্ডন ১৯১৪ খৃ., ১০১; একই ধারণার য়ুরোপীয় উদাহরণের জন্য দ্র. Bargheer, Leber, পৃ. ৯৭৮, ঐ, Eingeweide, ২১৬)।

সাধারণ্যে প্রচলিত দেহতাত্ত্বিক ধারণা মতে দেহ যাহা পান এবং নিঃসরণ করে যকৃত সেই সকল তরল পদার্থের আধার। এই ধারণাটি যাহা Bingen-এর Hildegard (causae et curae, ৯৮, ১১০) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহা প্রায়শ জার্মান ভাষার বাকরীতিতে প্রচলিত (Bargheer, Leber, ৯৮৪; ঐ লেখক, Eingeweide, ৩৮৭), তাহার সাক্ষ্য বহন করে ইসলামী বিশ্বে রাসা'ইলু ইখ্ওয়ানি'স্-সাফা' (২খ., ১৬২)। এই গ্রন্থে উল্লিখিত যকৃৎ তরল খাদ্যের গৃহ (بيت الشراب)।

৩। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পণ্ডিতসুলভ তত্ত্বসমূহ ঃ মুসলিম গবেষকগণের পরিচালিত যকৃৎ সম্পর্কে যুক্তিসম্মত পর্যবেক্ষণ নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ প্রত্যঙ্গটির গঠনতান্ত্রিক (anatomical) বিবরণ; ইহার মনো-দৈহিক ভূমিকা যাহা দার্শনিক, চিকিৎসক, শরীরতান্ত্রিক (anatomist) সকলের নিকট আকর্ষণীয়, ইহার রোগ নিরূপক (Pathological) ও আরোগ্যকর (therapeutic) ভূমিকা এবং ঔষধ প্রস্তুতি প্রণালীতে (Pharmocology) জীবদেহের যকৃতের ব্যবহার।

মুসলিম বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক গৃহীত গ্যালেনীয় শরীরবিদ্যায় যকৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসাশাস্ত্রের সকল সাধারণ গ্রন্থে যকৃৎ সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। Ephesns-এর Rufus ও Philagrius প্রণীত গ্রীক , প্রবন্ধাবলীর ধাঁচে যকৃৎ ও ইহার রোগ নিরূপণবিদ্যা (Pathology) সম্পর্কে রচিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধাবলী সংকলন করেন কুস্তা ইব্ন লূকা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা' আর-রাযী (F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. iii, Leiden ১৯৭০ খৃ., ৬৮, ১৫৬, ২৭৩, ২৯২), যদিও এই প্রবন্ধাবলী সাধারণ গ্রন্থাদির অধ্যায় মাত্র হইতে পারিত।

শরীরে যকৃতের অবস্থান (anatomy) বিষয়ক গবেষণায় গ্রীকগণের ন্যায় মুসলিম গ্রন্থকারগণও Galen-প্রদত্ত বিবরণ অনুকরণ করিয়া কার্য সমাধা করিয়াছেন। কারণ শব-ব্যবচ্ছেদ (Dissection) উভয় সম্প্রদায়ের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। Galen স্বয়ং Chalcedon ও Herophilos (খৃ. পূ. ৩য় শতক)-এর অনুসরণ করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শব-ব্যবচ্ছেদ করিতেন এবং যকৃৎ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি স্বাভাবিক সুস্থ যকৃৎ সম্পর্কে তাঁহার পর্যবেক্ষণের সহিত মানব ও জীব দেহের অসুস্থ যকৃতের পর্যবেক্ষণ সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এই মর্মে Herophilos-এর উপর Galen-এর আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় বানর দেহ-ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে (তু. Ch. Daremberg, Oeuvres anatomiques, phgsi-ologiques et medicales de Galien, প্যারিস ১৮৫৪-৫৬, ১খ., ২৯৩, নং ১; Max Simon, Sieben Bucher Anatomie des Galen, লাইপযিগ ১৯০৬ খৃ., ২, ৩৪, ৩৭ প.)। মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ তাঁহার (Galen) অনুসরণে শিক্ষা দান করেন যে, মানবদেহের যকৃতে কোন কোন ক্ষেত্রে দুই অথবা তিনটি lobes (اطراف = ঝুলন্ত অংশ) অথবা সংযোজিত অংশ (زوائد) থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে চারি বা পাঁচটি থাকে পাকস্থলীয় চতুর্দিকে। যকৃৎ সম্পর্কে ও বিবিধ বিবরণের সন্ধান পাওয়া যায় মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা' আর-রাযীর 'মান্সূরী' গ্রন্থে 'আলী ইব্ন 'আব্বাস-এর 'মালাকী' গ্রন্থের একটি সংস্করণে যাহা p. de Koning কর্তৃক বিপরীতে ফরাসী অনুবাদসহ প্রকাশিত (Trois Traites d'anatomie arabe..., Leiden ১৯০৩ খৃ., ৬৮-৭১, ৩৭৪-৯); তদ্রূপ ইব্ন সীনা-র কানূন-এর তৃতীয় পুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের ফরাসী অনুবাদ, ফান্ন ১৪, অধ্যায় ১ (ঐ ৭০৬-১৫; Rome সং, ১৫৯৩ খৃ., ৪৫৫-৬; ল্যাট. অনু., ভেনিস ১৫৬৪ খৃ.; ৭৪০-২) তৎসহ গ্রীক গ্রন্থকারগণের অনুরূপ রচনাবলী।

যকৃতের মনো-দৈহিক ভূমিকা সম্পর্কে আরব চিকিৎসকগণের ধারণাবলী প্রথমত উদ্ভূত হয় পূর্বেকার প্রচলিত মতবাদ হইতে Galen কর্তৃক সংগৃহীত এবং বিধিবদ্ধ দেহনিঃসৃহ রসের (humours) দেহতাত্ত্বিক সংগঠন (system) হইতে। এই সংগঠন সাধারণভাবে আরবদের বিজিত দেশসমূহে এবং খৃস্টান পাশ্চাত্যে গৃহীত হইয়াছিল (তু. এই প্রসঙ্গে একটি অতি চমৎকার সাম্প্রতিক বিবরণ, Luis Garcia Ballester রচিত "Galeno" in P. Lain Entralgo, Historia Universal de la Medicina, ii, Barcelona 1972, 209-268; ঐ লেখক, Galeno en la Sociedad yen la ciencia de su tiempo, Madrid 1972; Simplified summary by G. Sarton, Galen of Pergamon. Lawrence, Kansas 1954; diagram of blood formation and distribution in Historia Universal, 244 and in A. C. Crombie, Angustine to Galileo, A. D. 400-1650. London 1952, i, 132)। এই দৈহিক গঠনতন্ত্রে যকৃৎ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয় "অন্য সকল প্রত্যঙ্গ ইহার (যকৃতের) কল্যাণে কাজ করে; কিন্তু ইহা কাজ করে স্বাধীনভাবে" [ইব্ন সীনা, উর্জূযা ফি'ত্-তিব্ব (ارجوزة في الطب), ৪১৭ সম্পা. ও অনু. H. Jahier এবং A. Noureddine, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ৪০]। যকৃতের মধ্যে রক্ত রূপ লাভ করে পাকস্থলীতে পূর্বাহ্নে ভুক্ত এবং পরিপক্ব (রন্ধনকৃত) খাদ্যদ্রব্যের পরিশোধন এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে যে খাদ্যদ্রব্য তখন Chyle (অন্নরস) অথবা Chyme (মণ্ড)-এর অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে (যথাক্রমে কীলূস অথবা কীমূস (সময় সময় কায়লূস বা কায়মূসরূপে উচ্চারিত)-এর রূপ গ্রহণ করে; শব্দদ্বয় পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল, (তু. খাওয়ারিয্মী, মাফাতীহু'ল-'উলূম, সম্পা. G. van Vloten, Leiden ১৮৯৫ খৃ., ১৮১; কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, ১০৭)। অপর একটি প্রাথমিক পরিপাক প্রক্রিয়া ("coction") মেসেনটেরিক শিরা (mesenteric veins) [মাসারায়কা অথবা মাসারায়্কা, ল্যাটিন mesaraicae]-তে অনুষ্ঠিত হইতে পারে যাহা যকৃতের ন্যায় অনুরূপ কার্য সাধনের মাধ্যমে আংশিকভাবে অন্নরস (chyle)-কে রক্তে পরিণত করিতে পারে (ইব্ন সীনা, কানূন, ৩, ফান্ন ১৪, মাকালা ১-এর প্রারম্ভ; এই প্রসঙ্গে Galen-এর সন্দেহ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Mani, ১খ, ৬৮, যাহা মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁ যুগে বিতর্কের সূত্রপাত করে)। তাপের উৎস যকৃতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবে পাকস্থলীস্থ এই 'coction' ইতোমধ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে; যকৃতের lobe-গুলি আঙুলের ন্যায় পাকস্থলীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া কল্পিত হইত।

ইতোমধ্যে কিছু মাত্রায় রূপান্তরিত অন্নরস যকৃতে উপস্থিত হয় vena porta-এর মাধ্যমে (vena porta "আল-'ইর্কু'ল-উসূতুওয়ানী" গ্রীক হইতে অনূদিত, Simon, Sieben, Bucher... ১খ, ৩৪৬ এবং তৎপর আল-বাব নামে অভিহিত। এই vena porta-এর মধ্যে মেসেনটেরিক শিরাসমূহ প্রবাহিত হয়)। সেইখানে ইহা যথার্থ অর্থাৎ দেহের পুষ্টি সাধনের উপযোগী রক্তে রূপান্তরিত হয় (sanguificatio est chyli in sanguine mutatio এই প্রবচনটি ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল একটি অন্ধবিশ্বাসজনিত মতবাদ; Mani ১খ, ৫৯)। এই রক্তের কিছুটা যকৃতের গঠন বস্তুতে পরিণত হয়, যাহাকে জমাট রক্তরূপে ধরা যাইতে পারে। (ইব্ন সীনা, কানূন ১. ফান্ন খ, তা'লীম ৩, ফাস্ল ২; ঐ, ৩খ, ফান্ন ১৪, মাকালা ঃ ১; এই সূত্রবদ্ধ ব্যাখ্যাটি এমনকি পশ্চাতে অন্তত Cappadocia-এর Aretaios-এর সময় পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় (২য় শতক ; Mani ১খ, ৫৮, তু. পৃ.৬৪)। প্রকৃত রক্ত সৃষ্টিকারী অংগ হিসাবে যকৃৎকে উৎপত্তিস্থানরূপে গণ্য করা যায় চারটি দেহ নিঃসৃত রসের "humours" =(منشأ الأخلاط) (ইব্ন সীনা, উর্জূয়া, শ্লোক নং ৪১৬; তু. কানূন ১, ফান্ন ১, তা'লীম ৪, ফাস্ল ২)। ইহাদের মধ্যে দুইটি রস তাৎক্ষণিকভাবে উৎপন্ন হয়, একটি ভারী গাদ (dregs) অর্থাৎ কৃষ্ণ পিত্ত (black gall) বা

atrabile (আল-মিররাতু'স-সাওদা', ল্যাট arat bilis), অপরটি পাতলা, হাল্‌কা অংশ, এক প্রকার ফেনা অর্থাৎ হলুদ পিত্ত (আল-মিররাতু'স-সাফরা' ল্যাট. cholera), উভয়ই প্রধানত দুইটি পাত্র (وعاء)-এর মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়। এই পাত্রদ্বয় দুইটি গলাসদৃশ (বি-মানুযিলাতি'ল-'উনুক, গ্যালেন) যাহা যকৃতকে যথাক্রমে প্লীহা ও পিত্ত থলির (gall bladder) সহিত সংযুক্ত করে (তু. রাযী, মানুসূরী, apud Konnig, Traites, 76f., 'আলী ইবনু'ল-আব্বাস, মালাকী, ঐ, ১৭৭, ৩৭৮ প., ইব্‌ন সীনা, কানূন, ঐ, ৭০৬, বিপরীত দিকে গ্রীক মূল পাঠসহ, প্রথমে Galen, De usu partium, ৪খ, ৪, ফলপ্রসূভাবে Daremberg কর্তৃক পর্যালোচিত, Oeuvres..de Galien, ১খ, ২৮২, নং ১)।

আরও কতিপয় উপাদানমিশ্রিত রক্ত যকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া শিরা সংগঠন (Venous System)-এর মাধ্যমে বিতরিত হয় [ইহা প্রকৃত সঞ্চালন নহে, বরং ধীর গতি পুনরাবৃত্তিসহ ভাটা (ebb) এবং জোয়ার (flow)-এর মতো]। সমস্ত শিরার উৎপত্তি ('আওরিদা:, আল'-উরূকু'স-সাওয়াকিন) যকৃৎ হইতে, অন্যপক্ষে ধমনী সমষ্টির উৎপত্তি স্থল হৃৎপিণ্ড। ধমনীগুলি (Veins) শাখাযুক্তভাবে বাহির হয় (vena porta) হইতে, যাহা যকৃৎ গহ্বর হইতে নির্গত হয় এবং vena cava ইহার উত্তল (Convex) পার্শ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় (আল-'ইরকু'ল-আজ্‌ওয়াক) (কানূন, ১খ, ফান্ন ১, তা'লীম ৫, জুম্‌লা ৫)।

বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টির সকল উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (theories), হলুদ পিত্তের স্থান নির্দেশ করে আগ্নেয় উপাদানের (igneous element) সহিত, যাহা তথায় প্রাধান্যপূর্ণ এবং মেযাজ ("Temparament" = مزاج মিযাজ)-এর সহিত যাহা তাহার প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে—যকৃতের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্কযুক্ত অবস্থানে। কিন্তু ভিন্ন একটি মতবাদ (Variant) এই অঙ্গটিকে বরং সম্পর্কযুক্ত করে রক্তের সহিত, যাহাতে বায়ু প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং স্বাভাবিকভাবে, (sanguine temparament) (উজ্জ্বল রক্তিম মেযাজ)-এর সহিত (দ্র. diagram in M. Ullmann, Die Medizin im Islam, Leiden-Cologne ১৯৭০ খৃ., ৯৯ এবং R. Herrlinger-এর রঙিন চিত্র (যাহাতে Hippocratic corpus-এর সময় হইতে সাধিত বিকাশ প্রদর্শিত) E. Schoner, Das Viererschema in der antiken Humoral-pathologie, Wiesbaden ১৯৬৪-এর শেষ ভাগ; প্রচলিত পুস্তিকা (manual)-সমূহ হইতে গৃহীত সাধারণ আধুনিক রূপসমূহ দৃষ্ট হয় in T. Canaan, Aberglaube und Volksmedizin im Lande der Bibel., Hamburg ১৯১৪ খৃ., ৩৩)।

মুসলিম চিকিৎসকগণ স্বাভাবিকভাবেই Galen-এর Pneumatic (বায়ু সংক্রান্ত) শিক্ষণের নীতিসমূহের সহিত দেহরসের সম্পর্কিত তত্ত্বের যোগ সাধনেরও অনুসরণ করেন। ইহার পশ্চাতে কি অনুপ্রেরণা ছিল তাহা আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ করিয়াছি। কতিপয় 'spirits' (জীবনী শক্তি=ارواح) তথা সূক্ষ্ম বাষ্প (Subtle vapours) দেহকে উজ্জীবিত করে এবং ধারণা করা হয়, ইহারা অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া (vital functions)-সমূহের সম্পাদন করে; মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে একটি রূহ তথা স্বাভাবিক বা দৈহিক (তাবী'ঈ অথবা তাবী'ইয়্যা)-এর আবাসস্থল যকৃৎ। এই মতবাদ ততটা Galen অনুসারী নহে (এই ক্ষেত্রে তিনি সন্দিহান ছিলেন এবং ইতস্তত করিয়াছেন) যতটা ছিল সিরিয়া ও আলেকজান্দ্রীয়গণের অনুসারী, যাঁহারা Galen -এর ধারণাবলীকে সরল ভাষায় সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই রূহকে সম পর্যায়ে স্থান দান করা হয়, অত্যাবশ্যকীয় অথবা প্রাণী-রূহ, (vital or animal spirit) এবং মনো-রূহ (psychic spirit)-দ্বয়ের সহিত যাহাদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র যথাক্রমে হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক (হুনায়ন ইব্‌ন ইস্‌হাক-এর অত্যুত্তম রচনা, আল-মাদ্‌খাল ফি'ত-তিব্ব; তু. O. Temkin, "On Galen's Pharmacology" Gesnerus (Aarau, viii ১৯৫১ খৃ.), ১৮০-১৮৯)। ইহা (Spirit-রূহ) রক্তের সহিত শিরার মাধ্যমে শরীরে বিতরিত হয়।

এই সকল spirit-এর প্রতিটি একটি প্রধান faculty (কর্মশক্তি) অথবা একটি কর্মশক্তি শ্রেণী (group of faculties=قوى, Lat vertutes)-র সহিত সংযুক্ত (Correspond) হয় (ইহাও আবার Galen-বাদেরই অনুসরণ) এবং দেহতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানা ব্যাপার (Phenomena)-কে ইহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি আরোপ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকগণ দাবী করেন যে, 'স্বাভাবিক' কর্মশক্তি বা কর্মশক্তিসমূহ দুইটি উপশ্রেণীতে (type) বিভক্ত যাহার প্রথমটির কার্য (فعل) সংরক্ষণ করা (conserve) ও ব্যক্তির গঠন (make up), যাহা দেহে পুষ্টির নিয়ন্ত্রক এবং যকৃতে অবস্থিত; দ্বিতীয়টির কাজ প্রজাতির সংরক্ষণ এবং ইহার অবস্থিতি যৌনাঙ্গসমূহে। অ্যারিস্টোটল হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া ইব্‌ন সীনা এবং অপরাপর বহু ব্যক্তি এই তত্ত্বের সহিত কিঞ্চিৎ মতানৈক্য প্রকাশ করেন এবং হৃৎপিণ্ডকে প্রথম উপ-বিভাগে (first Substratum) এবং যাবতীয় কর্মশক্তির মুখ্য উৎসরূপে নির্দেশ করেন (তু. (Mani), ২খ., ২১)। পুষ্টিমূলক কর্মক্ষমতা হৃৎপিণ্ড হইতে যকৃৎ অভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয় (ইব্‌ন সীনা, শিফা', তাবী'ইয়্যাত [طبيعيات] ফান্ন ৬, মাকালা ৫, ফাস্‌ল ৮, সম্পা. J. Bakos, psychologie d'Ibn Sina... ১খ, Prague ১৯৫৬ খৃ., ২৬৫; তু. কানূন, ১, ফান্ন ১, তা'লীম ৬)। অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে, ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর ন্যায় অবিমিশ্র অ্যারিস্টোটলপন্থিগণ গ্যালেনের মতবাদের বিরোধিতা করিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন যে, পুষ্টিকর্মের আবাস হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে নহে (কুল্লিয়্যাত, ২খ., ৯ম অধ্যায়; তু. J. C. Burgel, Averroes, "contra Galenum", NGW Gott, i, ১৯৬৭., নং ৯, ২৯২ প)। কর্ম ক্ষমতাসমূহের (faculties) বহু তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং ধারণা করা হয় যে, ইহারা অপরাপর অঙ্গসমূহের উপর একইরূপে সক্রিয়।

মুসলিম চিৎসাবিদগণের রোগ নির্ণায়ক (Pathology) ও রোগ প্রতিষেধক (Therapeutics) সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হইবে না। ইহাদের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সরল বর্ণনা পাওয়া যায় একটি প্রাচীন প্রবন্ধ 'আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল তাবারীকৃত ফির্‌দাওসু'ল-হিকমা-তে (সম্পা. M. Z. Siddiqi, বার্লিন ১৯২৮ খৃ., ৪০প. ২১৮প.) এবং এই প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, বর্তমানে ক্লাসিক রচনা হিসাবে স্বীকৃত ইব্‌ন সীনা-র কানূন, ৩য় পুস্তকের ১৪শ ফান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত (সং. রোম ১৫৯৩ খৃ., ৪৫৫-৭৯; সং. তেহরান ১২৯৫ হি., ১৭৯-২০৪; Lat. tr. ভেনিস ১৫৬৪ খৃ., ৭৪০-৮১); ইহার প্রথম মাকালা-তে

অঙ্গটির গঠন আলোচনা করা হইয়াছে (উপরের আলোচনা দ্র.)। অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীতে যকৃতের প্রদাহের ক্ষেত্রে Cauterisation (তপ্ত লৌহ দ্বারা দাহন বা সেঁকার আলোচনা রহিয়াছে (তু. চূড়ান্তভাবে, P. Huard ও M. D. Grmek, Le premier manuscrit chirurgical turc, প্যারিস ১৯৬০ খৃ., ১০৯, ১১৩, ১২১, চিত্র ২৭, ৩১; আধুনিক প্রয়োগ M. S. Belguedj. La medecine traditionelle...., 148)।

ইব্ন সীনার কানূনে যকৃৎ সম্পর্কে কতিপয় বিচ্ছিন্ন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা ১৫৬৪ সালে ভেনিসে প্রকাশিত ল্যাটিন সংস্করণের অত্যন্ত নিখুঁত নির্ঘণ্টের কল্যাণে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তথ্যবহুল ২য় খণ্ডে সহজ ঔষধাবলী সম্পর্কে (সং রোম, ১৫৯৩ খৃ., ১খ., ২৪৯-৩৪৭), ১৫৬৪ সালের ভেনিস সংস্করণে ল্যাটিন বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত (১খ., ১২৪-২৮০) এবং তদ্রূপ ৫ম খণ্ডে ঔষধ বিজ্ঞান অংশে, যকৃতের উপর কতকটা ক্রিয়াশীল বলিয়া পরিচিত লতাগুল্ম, খাদ্য-পথ্য ও সাধারণ এবং জটিল ঔষধাবলী সম্পর্কে টীকা সংযুক্ত হইয়াছে। এই সকল জটিল ঔষধাবলীর একটি তালিকা, ৫ম পুস্তকের প্রথম জুম্লা (সুম্মা)-এর ১২শ মাকালা-তে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে (abridged version) শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (সং রোম ১৫৯৩ খৃ., ১খ. ২৪৩; ল্যাট, অনু. ভেনিস ১৫৬৪ খৃ., ২খ. ৩০৫-৬) যে সকল রোগে ঔষধগুলি ব্যবহার্য সেই শিরোনামে।

ক্যানূনের ২য় খণ্ডে ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত (Pharmacological) একটি অধ্যায়ে পশুদেহের যকৃৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে (কানূন, ed. cit, ১খ., ১৯৬; tr. cit. ১খ., ২৯৯)। ইব্ন সীনার গবেষণালব্ধ তথ্য ঐ সকল তথ্যের অন্যতম যাহা গৃহীত এবং পথ্যবিধান (dietetic)-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত তথ্যসমূহ ইব্ন জাযিয়া-র ব্যাপকভাবে প্রচলিত পথ্য বিধান সংক্রান্ত প্রবন্ধ মিনহাজু'ল-বায়ান-এর অন্তর্ভুক্ত (পাণ্ডু. Bib. Nat. Paris, Ar. 2949, fol. 159 v., 2950, f. 279r, 2952, f. 231, r-v)। যকৃৎ খাওয়ার একটি সাধারণ অসুবিধা এই যে, পরিপাকের সময় ইহা এত ঘন রক্ত উৎপাদন করে যাহা রক্তবাহী কোষের (blood vessel) মধ্য দিয়া অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। Saumure (শুভ্র মদ) বা তৈল সহযোগ আহার করা ইহার প্রতিকারের উপায়। সাধারণভাবে চতুষ্পদ প্রাণীর যকৃৎ আহার না করাই শ্রেয়। মুরগীর বাচ্চা অথবা সুপুষ্ট হাঁসের যকৃত শ্রেষ্ঠ এবং মেদপূর্ণ হংসের যকৃৎও চমৎকার যদি তাহা বিশেষত দুধেল মণ্ডের (milky paste) সহিত আহার করা হয়। পাকস্থলীকে ভারক্রান্ত না করিবার জন্য ইহার সহিত লবণ ও তৈল যুক্ত করা উচিত। রোস্ট করা মেষের যকৃৎ উদরাময় রোগে উপকারী। ছাগলের যকৃৎ (বিশেষত নর ছাগলের) মৃগী রোগের জন্য একটি সার্থক পরীক্ষা, কারণ ইহাতে তড়কা সৃষ্টি হয়। চক্ষু চিকিৎসায় সেবনের ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে বা বাষ্পাকারে (fumigation) -এর জন্য ব্যবহৃত হইলে ইহা কনীনিকা (fris) দূষণের (infcetion) -ক্ষেত্রে উপকারী [তু. বর্তমান কালে হাদ্রামাওত অঞ্চলে প্রচলিত অনুরূপ প্রতিষেধক –R. B. Serjeant, BSOAS, xviii, (১৯৫৬ খৃ.), ৭]। তিত্তির পক্ষীর বিশুষ্ক এবং যকৃৎ ঔষধ মাত্রারূপে সেবন মৃগীরোগে ফলপ্রদ, যেমন ফলদায়ক হায় খালি পেটে গাধার ভাজা করা যকৃৎ আহার। যকৃতের নানা রোগে নেকড়ে বাঘের যকৃৎ ফলপ্রসূ। ওয়াযাগা (এক প্রকার বৃহৎ টিকটিকি)-এর যকৃৎ দন্তশূল উপশম করে। সর্বশেষ পাগলা কুকুরের যকৃৎ জলাতঙ্ক প্রতিরোধ করে, বিশেষত যদি দংশনকারী বিশেষ কুকুরটির যকৃৎ আহার করে দংশিত রোগী। বহুপূর্বে Pliny (xxix, 32) বর্ণিত এবং ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপে সুপ্রচলিত (তু. Bargheer, Eingeweide ২৮৩ পৃ.) দৃশ্যত এই চিকিৎসা ২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জেরুসালেমে পরিচিত ছিল, কারণ S. Y. Agnon-এর উপন্যাস Tmol shilshom-এ ইহার উল্লেখ আছে, (৪খ, ১৮; ফরাসী অনু. Le chien Balak, প্যারিস ১৯৭১ খৃ., ৫৬৫ প.)।

৪। যাদুবিদ্যায়, ধর্মে ও উপকথায় বিকাশ ঃ যকৃতের যেমন আছে একটি জনপ্রিয় মনো-দেহতাত্ত্বিক দিক যাহা ইহার বৈজ্ঞানিক প্রতিরূপ (counterpart)-এর বৈজ্ঞানিক রোগ নির্ণয় বিদ্যা, খাদ্য নির্ধারণ বিদ্যা এবং ঔষধ প্রস্তুতি বিদ্যার সংযোগে দেহের মধ্যে যকৃতের ভূমিকা বিবেচনা করে (এবং তাহা হইতে নিয়মমাফিক সংক্রমণের (infection) প্রতিষেধক নির্ণিত হয় এবং খাদ্য অথবা প্রতিষেধকরূপে প্রাণী যকৃতের মূল্যমান নির্ধারিত হয়) তদ্রূপ যকৃতের মূলত প্রতীকী এবং যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত কতিপয় প্রাথমিক মূলনীতি (rudiments)-ও রহিয়াছে, বাস্তবে যাহা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছিল। এই নীতিগুলি মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত হয় এবং মাঝে মাঝে সংযোজনরূপে তাহাতে দেখা যায়।

Galen-এর অনুসরণে ইব্ন সীনা কিঞ্চিৎ সংশয়পূর্ণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোনও প্রাণীর যকৃতের আকার হয় ইহার লোভ (greed) ও নিরীহতা (timidity)-র অনুপাতে (তু. P. de. Koning, op. cit ৭০৮, ৭১১)। সদৃশ বস্তুদ্বয় ("like to like") সংক্রান্ত যাদুনীতি অবলম্বনে এইরূপ ধারণা করা হইত যে, মেষের যকৃৎ ভক্ষণ করিলে মানুষের যকৃৎ শক্তিশালী হয় (দাঊদু'ল-আনতোকী, তায্‌কিরা, কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭, ১খ, ২০৭)।

জমাট রক্ত হইতে যকৃৎ গঠিত হয় (বলা যায়, বস্তুর আসল সত্তা ও প্রকৃতি বিবেচনায়=(Ontogenically) এই প্রকার বৈদগ্ধপূর্ণ ধারণাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয় অথবা প্রচলিত একটি ধারণার সহিত যুক্ত করা হয়। রক্ত সম্পর্কিত সাধারণ নিষেধ বাণী হইতে যকৃৎ ও প্লীহা বাদ পড়িয়াছে একটি হাদীছে... "দুই প্রকার রক্ত আমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে যকৃৎ ও প্লীহা, (ইব্ন মাজা, ২৯, ৩১; আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল, ২খ., ৯৭)।

যকৃতের ব্যাধিতে কবচাদি ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে কিতাবু যাখীরাতি'ল-ইস্‌কান্দার (যাহা মূলত গ্রীক উৎসজাত একটি সন্ন্যাসী চক্রের [Hermetic] সংকলন)-এ একটি কবচের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে যকৃৎ অবয়বের একটি লাল পাথর এবং তৎসহ একটি ibex (বন্য ছাগল) যাহার গায়ে আছে হেঁয়ালীপূর্ণ উৎকীর্ণ লিপি। এই কবচ যকৃত প্রদাহের একটি প্রচলিত প্রতিষেধক (J. Ruska, Tabula Smaragdina, Heidelberg ১৯২৬ খৃ., ৯৮ প.)। ব্যবহারিক চিকিৎসা পুস্তকসমূহে বহু ব্যবস্থাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাতে প্রতিফলিত হয় বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ঐন্দ্রজালিক সিদ্ধান্ত (তৈলের মধ্যে চূর্ণিকৃত নেকড়ে বাঘের যকৃতের ব্যবহার), নিছক হাতুড়ে ব্যবস্থা (উটের পেশাব) এবং ধৌত কবচের (কবচ ধৌত) পানির ব্যবহার ইত্যাদি [উদাহরণস্বরূপ, তু. ছদ্ম (Pseudo) জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতী (মুহাম্মাদ আস-সানাওবারী, মৃ. ৮১৫/১৪১২), আর-রাহ্‌মা ফি'ত-তিব্বওয়া'ল

হিক্‌মা, কায়রো ১৩৫৭ হি., ১০৬ পৃ. ১০২ অধ্যায়]। মরক্কোতে, মুরাবিত খানকাহ-এর দেওয়ালের বহির্ভাগে যকৃতের আকৃতিতে খোঁচা নাশপাতির টুকরা সাঁটিয়া দেওয়া হয় এই ধারণায় যে, উহা যেমন ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকিবে, রোগীও ক্রমশ আরোগ্য লাভ করিবে (E. Westermarck, Ritual and belief in Morocco, লন্ডন ১৯২৬ খৃ., ১খ, ২০২)। মরক্কোতে প্রচলিত অপর একটি রীতি এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জুতার তলীর আকৃতিতে কাটা এবং বারংবার ছুরিকাঘাত করা এক খণ্ড নাশপাতির সহিত একটি মেষের যকৃৎ ও কিডনীকে শিকে গাঁথিয়া গৃহ চত্বরে শুকাইতে দিতে হইবে (A...R. de Lens, Pratiques des harems marocains, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ১২)। যকৃতের পীড়ায় মধ্য আরবের বেদুঈনগণ প্রাতরাশ সম্পন্ন করে দারুচিনি যোগে, যাহা "কিরাফু'ল-কুবূদ" অর্থাৎ যকৃতের চর্ম নামে পরিচিত (J.-J. Hess, Von den Beduinen des Innern Arabiens, Zurich and Leipzig ১৯৩৮ খৃ., ১৪৮ প.)।

যকৃতের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কথন (hepatoscopy) প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও Etruria-তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা ছিল। কিন্তু ৩য় শতকেই আরব রাণী যেনোবিয়া (Zenobia) উহা পরিত্যাগ করেন (Zosimus, ১খ., ৫৯)। সুতরাং আরবগণের মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল না (তু. T. Fahd, La divination arabe, Leiden ১৯৬৬ খৃ., ৩৯৭, ৫২৭) যদিও ইব্‌ন খালদূন ভবিষ্যৎ কথন পদ্ধতিসমূহের একটি সামগ্রিক তালিকায় ঐ প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন (মুকাদ্দিমা, ১খ., ১৯১, ১৯৪, সম্পা. (Quatremere, ১খ., ৩৬৯, ৩৭১, সং. ওয়াফী) এবং জনৈক রাব্বী লেভী (Rabbi Levi) উহার উল্লেখ করিয়াছেন; এই (Rabbi-র সময়কাল অনিশ্চিত; তিনি বাবেল-এর রাজার যকৃৎ দর্শন চর্চার (Ezekiel, xxi, 26) সহিত "কতিপয় আরব যাহারা মেষ হত্যা করিয়া তাহার যকৃৎ পর্যবেক্ষণ করিত" তাহাদের তুলনা করিয়াছেন (Midrash Rabba to Eccles, xii, 7. etc. in Monumenta Talmudica, v, Geschichte, Vienna and Leipzig ১৯১৪ খৃ., ৪৮, শা. ৮৪)।

লোক কাহিনীতে যকৃতের ভূমিকাটি নগণ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরোগ্যদায়করূপে। তুর্কী লোকগাথাসমূহে দেখা যায়, পাগল শাহযাদীর একমাত্র ঔষধ কোনও শাহাযাদার যকৃৎ (W. Eberhard and P. N. Boratav, Typen turkischer Volksmarchen, Wiesbaden ১৯৫৩ খৃ. ৩০২), কোনও তরুণী চুম্বনের বিনিময়ে পশুর যকৃৎ বিক্রয় করে (ঐ, ২২৪) এবং জনৈক নরভূক (cannibal) প্রাণী মানব যকৃত ভক্ষণ করে, ইত্যাকার কাহিনী (ঐ ১৭২)। "ঐন্দ্রজালিক পাখীর হৃদয়" সংক্রান্ত সর্বজনবিদিত বিষয়বস্তুর (theme) একটি বিবরণে হৃৎপিণ্ডের স্থলে যকৃতের উল্লেখ দেখা যায় (A. Aarne and S. Thompson, The Types of the Folktale,[2] Helsinki ১৯৬৪ খৃ., ২০৮ type ৫৬৭। মাঝে মাঝে যকৃতের পরিবর্তে কিডনী, খাদ্যকোষ (crop) এবং পুনরায় হৃৎপিণ্ডের উল্লেখও দেখা যায় (Eberhard and Boratav. Typen... ১৯৬-৮)। Adakale হইতে প্রাপ্ত একটি কাহিনীতে দেখা যায়, জনৈক কৃপণ ব্যয় সংকোচের জন্য যকৃৎ আহার করে। ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কাহিনীটি সাম্প্রতিক (ibid, 88, নিম্নে দ্র.)

প্রাণীদেহের কোনও অঙ্গের ঐন্দ্রজালিক আরোগ্য মতার বর্ণনা (them) (তু. Bargheer, Eingeweide, ১৫৯ প., ২২৯ প.)-র সহিত সংযুক্ত অত্যাশ্চর্য প্রাণীসমূহের অসাধারণ ক্ষমতার বর্ণনা শাহ্‌নামা'র বিবরণের ভিত্তি, যাহাতে বিবৃত হইয়াছে কিরূপে মাযানদারানগণ আক্রমণের সময় শ্বেত 'দীও' (diw-দেও)-এর যাদু প্রক্রিয়ায় কায়-কাউস ও ইরানীগণ অন্ধে পরিণত হয় এবং কিভাবে তাহারা আরোগ্য লাভ করে (তু. s. v. DIW, ২খ., ৩২৩)। শ্বেত দীও-কে পরাস্ত করিয়া রুস্তম উহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন, উহার যকৃৎ টানিয়া বাহির করেন এবং উহা হইতে প্রাপ্ত রক্তের ব্যবহারে তাঁহারা পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন (সম্পা. J. Mohl, প্যারিস ১৮৩৮-৭৬ খৃ.; Kay-Kawus, শ্লোক ৬৫২ প.; সম্পা. E. E. Bertels, et al, ২খ., মস্কো ১৯৬২ খৃ. ১০৯, মাযানদারান, শ্লোক ৬১৩ পৃ., অনু. J. Mohl, ১খ, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., ৪২৮ প.)। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধত্বের প্রতিকারে যকৃতের কার্যকারিতার বিবরণ Tao (চীনা দার্শনিক)-পন্থী ঐন্দ্রজালিক প্রাণীবিদ্যার একটি নীতির কাছাকাছি (J. C. Coyajee, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, n. s. xxiv, ১৯২৮ খৃ., ১৮৭ প.)। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত বিবরণে যেমন দেখা যায়, চক্ষুরোগ সংক্রমণের চিকিৎসায় ছাগলের যকৃতের ব্যবহার ইব্‌ন সীনার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, Book of Tobit-এ উল্লেখ আছে যে, মাছের যকৃৎ ও পিত্ত ভূত বিতাড়ন সহায়ক (Tobit, vi, 5; viii, 2) এবং পিত্ত অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি দান করে (vi, 9; xi, 8)। নিঃসন্দেহে এই সকল সূত্র হইতে য়ুরোপীয়, সাধারণ্যে প্রচলিত চক্ষু চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রায়শ যকৃতের ব্যবহারের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (Bargheer, Eingeweide, ২৮৪ প.)।

শরীরাভ্যন্তরে যকৃতের অতিশয় গুরুত্ব নিঃসন্দেহে যাদুবিদ্যামূলক অনুসিদ্ধান্তের মাধ্যমে কতিপয় প্রচলিত প্রথা উদ্ভবের ব্যাখ্যা প্রদান করে। শত্রুর যকৃৎ চর্বণ করা অথবা অন্ততপক্ষে মৃদুভাবে দাঁতে কাটা সম্ভবত সংহার অথবা চরমতম অভিশাপের অর্থসূচক। উহুদ-এর যুদ্ধে আবূ সুফ্‌য়ান-এর স্ত্রী হিন্দ হামযা (রা)-এর যকৃৎ চর্বন (ইব্‌ন হিশাম, ৫৮১) হইতে মু'আবিয়া (রা)-র অপযশমূলক "ইব্‌নু আকিলাতি'ল-আক্‌বাদ" (ابن اكلة اكباد) 'যকৃৎ ভক্ষণকারিণীর পুত্র' উপনামের উৎপত্তি হয় [মাস্‌'উদী মুরূজ, ৪খ, ৪৩৯, ফরাসী অনু. Pellat, শা. ১৭৪২ ছদ্ম ? মাস্‌'উদী, কিতাবু ইছবাতি'ল-ওয়াসিয়্যা: লি'ল-ইমাম 'আলী (كتاب اثبات الوصية للامام علي),Ch. Pellat কর্তৃক তাঁহার Le shi`isme imamite গ্রন্থে উদ্ধৃত, প্যারিস ১৯৭০ খৃ., ৮৫]। সিনাই অঞ্চলের বেদুঈনগণের বিশ্বাস, দ্রুয (Druze=শী'আ)-পন্থিগণ মুসলিমদের যকৃৎ ভক্ষণ করে (W. P. Zenner, in Middle Eastern Studies, ৮খ., ৩, অক্টোবর ১৯৭২ খৃ., ৪১১)। See parallels in Bargheer, Leber, ৯৭৭, id., Eingeweide, ৯৩, ২১৬; W. D, Wallis, ERE, x, ৩৭৩ প.)।

১০ যু'ল-হিজ্জার কুরবানীর পশুর যকৃৎ সর্বপ্রথম আহার করিতে হয়—আল-মাগ্‌রিবের এই প্রথাটি মযবুত দলীল প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করাকে হয় এবং দাবী করা হয় যে, ইহার পশ্চাতে কতিপয় ফুকাহা'-এর সমর্থন ও রাসূল (সা)-এর ব্যক্তিগত উদাহরণ রহিয়াছে [E. Doutte, Magie et religion duans l' Afrique du Nord, আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ., ৪৭৩; J. Desparmet. Coutumes, institution

croyances des indigenes de l'Algerie, আলজিয়ার্স ১৯৩৯ খৃ., ১খ. ২৭৫; E. Westermarck, Ritual & Belif in Moroco, লন্ডন ১৯২৬ খৃ., ১খ. ২৩৪ প., ২খ, ১২০ প., J. Chelhod, Le sacrifice chez les arabes, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., ১১৩ প; J. Jouin Hesperis, xliv (১৯৫৭ খৃ.), ৩২০; A. M. Goichon La vie feminine au Mzab, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., ২৬৪]।

মরক্কোর কতিপয় উপজাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বর তাহার অবিবাহিত বন্ধুদিগকে একটি ষাঁড় উপহার প্রদান করে, যাহার বরকতবাহী সর্বপ্রথম ভক্ষ্য যকৃতটি উপস্থিত সকল পুরুষের মধ্যে (মহিলা নহে) বিতরণ করিতে হয় (E. Westermarck, marriage ceremonies in Morocco, লন্ডন ১৯১৪ খৃ., ১২৬)।

৫। খাদ্যরূপে জান্তব যকৃৎ ঃ বর্জিত নাড়িভুঁড়ির শ্রেণীভুক্ত বলিয়া যকৃতকে অবজ্ঞা করা এবং দুঃস্থদের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইত। দক্ষিণ লিবিয়াতে প্রচলিত একটি প্রবচন এইরূপ ঃ "দরিদ্রজন কোনও বস্তুকে বে-পরওয়া দখল করে যেমন "এক খণ্ড যকৃতের পশ্চাতে ধাওয়া করে যাযাবর বেদের দল"(F. J. Abela, Proverbs populaires, adages et locutions proverbiales du Liban-Sud) (in the press); তথাপি অপরাপর বহু স্থানে, যথা ঃ হাদ্‌রামাওতে যকৃৎ হৃৎপিণ্ডকে অতি প্রিয় খাদ্যরূপে বিবেচনা করা হয়। (F. Stark, The southern Gates of Arabia, Harmondsworth ১৯৪৫ খৃ., ৭৮)। বর্তমান কালে এডেনে সোমালিল্যাণ্ড হইতে নাড়িভুঁড়ি আমদানী করা হয় যাহা শেষোক্ত স্থানে ভক্ষণ করা হয় না (য়ূসুফ তালিব প্রদত্ত তথ্য)। স্থানে স্থানে, যথা ঃ লেবানন ও জর্দানে কাঁচা যকৃৎ অত্যন্ত সুখাদ্যরূপে বিবেচিত হয় (A. Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ৬৫)। সাহারা মরু অঞ্চলে শিকারে ধৃত জন্তুর নাড়িভুঁড়ি তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া উহার যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস জ্বলন্ত কাঠ কয়লায় ঝলসাইয়া উত্তপ্ত বালুকা দ্বারা আবৃত করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ অথবা পর দিন উহা ভক্ষণ করা হয় (M. Gast Alimentation des populations de l'Ahagger, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., ১৩৬)।

মধ্যযুগে আরব দেশের বাজারসমূহ সর্বদাই 'কুবূদী' অর্থাৎ যকৃৎ 'বিক্রেতা' নামে পরিচিত ফেরীওয়ালা ছিল, যাহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া আহার করে অথবা নিজেরা রন্ধন করে না–এমন লোকদের নিকট বিক্রয় করিত। পেঁয়াজ সহযোগে রন্ধন করা যকৃৎ অথবা শিকে গাঁথা ভাজা (roasted) যকৃৎ। হিস্‌বা সংক্রান্ত পুস্তিকাবলীতে মেষের যকৃতের সহিত ছাগ অথবা গবাদি পশুর যকৃৎ মিশ্রিত করা নিষিদ্ধ; ইহাতে কোন উপাদান কি পরিমাণে যোগ করিতে হইবে তাহার নিখুঁত এবং বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ("ইবনু'ল-উখুওয়া", The Ma'alim al-kurba...., সম্পা. R. Levy, লন্ডন ১৯৩৮ খৃ. আরবী ভাষ্যের ৯৫ প.)। এই প্রকার খাদ্য প্রায়শ ভেজাল মিশ্রিত হইত। কীমীয়'াতু'ত-তাবা'ইখ (كيمية الطبائخ) নামক যেই প্রবন্ধে যে সকল বাবুর্চী ভাজা যকৃৎ বলিয়া যেই ভোজ্য বিক্রয় করে, অথচ তাহাতে আদৌ যকৃৎ নাই তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছে, সেই প্রবন্ধটি ইতোমধ্যে দার্শনিক য়া'কূব আল-কিন্দী (৩য়/৯ম শতক)-র প্রতি আরোপিত হইয়াছে (শায়যারী, নিহায়াতু'র-রত্বোঃ, apud, ইব্‌নু'ল-উখুওয়াঃ, ঐ, ১০৭, নং ৮ এবং ইব্‌ন বাস্‌সাম, নিহায়াতু'র-রুতবা, in Mashrik, ১০, ১৯০৭, ১০৮১)। অন্যপক্ষে শুষ্ক অথবা বিচূর্ণিত ও ঝলসানো যকৃতের অংশবিশেষ নকল কস্তুরিরূপে ব্যবহৃত হইত (সাকাতী, Un manuel hispanique de hisba, ed. G. S. Colin and E. Levi-Provencal, ১খ., প্যারিস ১৯৩১, ৪৬; অনু. P. Chalmeta Gendron, El-"Kitab fi adab al-hisba", মাদ্রিদ ১৯৬৮ খৃ., ১১৬ আল-আনদালুস, ৩৩ ১৯৬৮, ১৯৩) এবং স্পেনীয় ও মরক্কোর বালাজা (গোশ্‌ত ও নাড়িভুঁড়ি হইতে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য বিশেষ)-র সহিত নষ্ট যকৃৎ, প্রচুর পরিমাণে রুটি, মসলা ইত্যাদি ভেজাল দেওয়া হইত (ঐ, মূল পাঠ, পৃ. ৩৯, ৫০ ঃ ১৩; উল্লিখিত অনু. পৃ. ১৮০)।

মধ্যযুগের রন্ধনবিদ্যা বিষয়ক পুস্তিকাবলীতে প্রদত্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রন্ধনে যকৃতের ব্যবহার নাই বলিলে চলে। এই শ্রেণীর বহু প্রাচ্যদেশীয় পুস্তিকার মধ্যে কেবল বুসলা-তে যকৃত ঘটিত খাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালীর নির্দেশ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটিতে সিদ্ধ যকৃৎ শিকে গাঁথা অবস্থায় ঝলসানো হয়, অপর একটিতে সিদ্ধ যকৃতে গোটা অথবা কর্তিত মসলা ঠাসিয়া দেওয়া (Stuff) হয় (বুস্‌লা, Ms. A, fol. 59, r.-v; তু. Rodinson, Recherches...১৩৫)। এতদ্ব্যতীত যকৃতের উল্লেখ পাওয়া যায় মেষের চর্বিযুক্ত লেজ (আলিয়া)-এর সহিত খণ্ডিত আকারে "কৃত্রিম মস্তিষ্কে" (বুস্‌লা; Rodinson, ঐ,; ১৫৮) এবং হাঁস বা মুরগির নাড়িভুঁড়ির আহারযোগ্য অংশ সহযোগে অথবা মেষ শাবকের গোশ্‌তের টুকরার সহিত সিসেম (sesame) তৈলে কড়া (কাল ভাজা এক প্রকার চাটনি প্রস্তুত করা হয় যাহা বিভিন্ন খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হয় (বুস্‌লা, তু. Rodinson, ibid., 133 n. 4, 156)। ৭ম/১৩শ শতকের শাম্‌সু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইবনু'ল হাসানা আল-বাগদাদী প্রণীত বাগদাদী রন্ধন সংক্রান্ত পুস্তকে অথবা একই যুগের A. Huici Miranda কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হিস্পানো-মাগ্‌রীবী রন্ধন সম্পর্কিত রচনাসমূহে যকৃৎ দ্বারা প্রস্তুত কোনও প্রকৃত পাকপ্রণালীর নির্দেশ নাই।

বর্তমান কালে লেবাননে শিকে বিদ্ধ অবস্থায় মেষ অথবা গো যকৃতের আহার্য দৃষ্ট হয় যাহার নাম মি'লাক' (معلاق) প্রকৃত অর্থ "Pluck, the viscera of the thorax" (অর্থাৎ যকৃত অর্থ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস) (M. K. Khayat and M. C. Keating. Food from the Arab World, বৈরূত ১৯৬১ প., ৩২ পৃ.; P. Bazantay, Enquete sur l'artisanat a Antioche, বৈরূত ১৯৩৬ খৃ., ৪৭; সিরকায় ভাজা যকৃতের একটি পাক-প্রাণালীর জন্য দ্র. Claudia Roden A book of Middle Eastern Food, লন্ডন ১৯৬৮ খৃ., ১৮০)। হাল্‌কা ভাজা এবং গরম অথবা শীতল অবস্থায় পরিবেশিত একটি বিরেচকের সহিত যকৃতের খণ্ড (mezze. hors d'oeuvres-রূপে ব্যবহৃত হয় (Roden, ৩৩)। 'মাগরিব' অঞ্চলে যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ডের শিক কাবাব, যদিও অতীতে দরিদ্র জনগণের খাদ্য ছিল, বর্তমানে তাহা ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু খণ্ডগুলি মিহি আবরণে (caul) মোড়ানো থাকে সুতরাং ইহাকে মালফুফ বলা হয় (M. Beausie, Dictionaire pratique arabe francais,[2] Algiers 1931, 904b; M. Gast, Alimentation des populations de l'Ahaggar প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., ১৩৪, নং ২)

এবং মরক্কোতে ইহাকে বলা হয় বুলফাফ (L. Brunot, Textes arabes de Rabat, ২খ, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., ৭৪৪; Z. Guinaudeau, Fes vu par sa cuisine Rabat ১৯৫৭ খৃ., ৩৯)। যকৃতের খণ্ডগুলি যদি মেষ চর্বির স্তর দ্বারা বিভক্ত থাকে তবে এই খাদ্যটিকে মরক্কোতে কাওয়াহ (জঞ্জাল, অন্তঃস্থ অংগসমূহ) নামে পরিচিত হয় (Z. Guinaudeau,) ঐ, ৪১; তু. H. Mercier, Dictionnaire arabe-francais, Rabat ১৯৫১ খৃ., ১০১। গ্রীলের বিশেষজ্ঞ বাবুর্চি কওয়ায়হী নামে পরিচিত (ঐ.)।

মিসরে কুক্কুটাদি পক্ষীর শরীরে প্রায়শ খণ্ডিত (chopped) যকৃত এবং পক্ষীর নাড়িভুঁড়ি, কাঁচা গম চূর্ণ অথবা গোশ্তের কিমার সংমিশ্রণে প্রস্তুত পুর ঠাসিয়া (Stuffed) ভক্ষণ করা হয় (C. Wissa Wassef, Pratiques rituelles et alimentaires des Coptes, কায়রো ১৯৭১ খৃ., ৩৮১)।

ইরানে মেষ ও মুরগির আহারযোগ্য নাড়িভুঁড়ি কয়েক প্রকার খাদ্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যকৃত কেবল একটি পূর্ণাঙ্গ রন্ধন প্রণালী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যাহা সম্ভবত শাহ্-এর পাচক কর্তৃক সংকলিত এবং ১৩০১/১৮৮৪ সনে সম্পাদিত এই গ্রন্থে; শিকে বিদ্ধ কাবাব অথবা এক প্রকার Stew (উত্তপ্ত খাদ্য) যাহাকে হাসরাতু'ল-মুলূক (রাজাদের কামনা অথবা আক্ষেপ) বলা হয়, উহার বর্ণনায় যকৃতের উল্লেখ আছে ['আলী আকবার ইব্ন মাহ্দী কাশানী, Sofre-ye at`eme, Ms. collection P. Ikowski, সম্পা. ও অনু. M. Ghavam-Nejad (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ) প্যারিস ১৯৬৭ খ., ২৬, ২৭; প্রথম পাক-ব্যবস্থা (recipe) সামান্য পরবর্তী তারিখের কয়েকটি গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথা ঃ Josephine richard (ওরফে নিশাতু'দ-দাওলা) প্রণীত ও তাববাখি-ই নিশাত, (তেহরান, তা. বি. ২২) এবং বাদরু'ল-মুলূক-ই বামদাদ, রাহনুমা-ই তাববাখী[6], তেহরান তা. বি., ৩৬]।

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তুরস্কে যকৃত খাওয়া হইত না এবং কসাইগণ তাহা কুকুর-বিড়ালের প্রতি নিক্ষেপ করিত। তবে ইদানিং যকৃৎ, ফুসফুস ('তাকিম' অর্থ পূর্ণ) এবং আহারযোগ্য নাড়িভুঁড়ি ভক্ষণ ক্রমশ চালু হইয়া উঠিতেছে; "নাড়িভুঁড়ি" বিক্রেতা নামে পরিচিত ভ্রাম্যমাণ আলবেনীয় ব্যবসায়ীদের ইহা প্রিয় খাদ্য (P. Boratav কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য; তু. W. Eberhard and P. N. Boratav, Typen turkischer Volksmarchen, Wiesbaden, ১৯৫৩ খৃ. ৮৮)। বর্তমানে প্রচলিত রন্ধন প্রণালী পুস্তকসমূহে যকৃৎসহ পোলাও (Pilau) রন্ধন প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। (Kulzulu pilav, I. Orga, Turkish Cooking, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ., ১২৫; ic pilav (হংস বা মুরগির যকৃৎসহ) C. Roden, op cit., ২৪৮, বুসরায় প্রাপ্ত তুর্কী নৃতাত্ত্বিক জরিপ (H. Z. Kosay and A. Ulkucan, Anadolu yeemkleri ve turk mutfagi, Ankara 1961, 101)-এর ফলে এই রন্ধন ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; তু. Orga, Cooking with yoghurt, পুস্তকে (লন্ডন ১৯৫৬ খৃ., ৪০) উল্লিখিত yoghutat-এ জড়ান যকৃতের brochettes।

উযবেকিস্তানেও যকৃৎ রান্না করা হয় শিক কাবাব (জিগার কাবাব)-রূপে; কখনও বা (যেমন সোভিয়েত আযারবায়জানে) যকৃতের স্তরের মধ্যে চর্বিযুক্ত মেষের লেজসহ (দুম্বা কাবাব) যকৃতকে ঝলসানোর পরও পুর ঠাসিয়া দেওয়া হয়(kovurilgan djigar) (K. Mahmudov, Uzbekskie bljuda, Tashkent ১৯৬২ খৃ., প. ৯৮, ১০২; N. K. Alhazov et. al, Azerbajdzanskaya kulinariya, Baku 1963, 433)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ উল্লিখিত; আরও দ্র. Nicolaus Mani, Die historischen Grundlagen der Leberforschung. ২খণ্ড, Basle ১৯৫৯-৬৭।

M. Rodinson (E. I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাবিস (قابس) ঃ বা গবেষক, তিউনিসিয়ার একটি শহর, এই একই নামীয় (অর্থাৎ কাবিস) উপসাগরের তীরে অবস্থিত (সুপ্রাচীন কালের ছোট সারতে=Little Syrte), রাজধানী তিউনিসের ৪০৪ কি. মি. দক্ষিণে এবং গাফ্সা হইতে (দ্র. কাফ্সা) ১৫০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। জনসংখ্যা ৪০,০০০, তন্মধ্যে ১,২০০ য়ুরোপীয়। ইহা ২,০৪,০০ অধিবাসী অধ্যুষিত (১৯৬৬ খৃ. আদমশুমারী) একটি গভর্নর শাসিত অঞ্চলের (আয়তন ১১,১৮০ বর্গমাইল) প্রধান শহর। শহরটি ১৯৫৭ খৃ. হইতে চারিটি জিলাতে বিভক্ত। তন্মধ্যে রহিয়াছে পুরাতন শহর মানযিল, ইহা ওয়াদী কাবিসের উজান এলাকাতে অবস্থিত এবং জারা, ইহা ভাটি এলাকাতে অবস্থিত। এই উভয় জনপদ চিরকাল পরস্পর মারাত্মক বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছে। একটি নূতন এলাকা নাম বাব ভার বা কাবিস (গাবেস) বন্দর আরও ভাটি এলাকায় অবস্থিত। ইহা ফরাসী আশ্রিত রাজ্য হিসাবে থাকা কালে স্থগিত হইয়াছিল এবং অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত অপর একটি গড়িয়া ওঠা এলাকার সহিত যুক্ত হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃ. এবং ১৯৬২ খৃ. মানযিল ও জারা ওয়াদী কাবিসের মারাত্মক বন্যায় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে অতিরিক্ত একটি খাল খনন করিয়া বন্যার পানি সরাসরি সাগরে লইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে এলাকা দুইটি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বস্তুত কাবিস একটি অববাহিকার ভাটিতে অবস্থিত, উত্তর দিকে ওয়াদী কাবিসের একটি ঘোরানো বাঁক দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে সিদি বুলবাবা পাহাড় দ্বারা আবদ্ধ। এই সিদি বুলবাবা এই শহরের কুতব। বলা হইয়া থাকে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। এখানে তাঁহার মাযার অবস্থিত এবং এখানেই মানারা-ও অবস্থিত। ইহা একটি অতি মনোরম দর্শনীয় বস্তু। মধ্যযুগে এখানে একটি বতিঘর ছিল এবং ১৯৬২ খৃ. হইতে এখানে শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের জন্যে একটি জিলা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালের বন্যায় যাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে তাহাদিগকেও এখানেই আবাসিত করা হইয়াছে। A Bechraovi এই বিষয়টি সম্বন্ধে অতি সাম্প্রতিক কালে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তদনুসারে কাবিস মরূদ্যানে ১৪,০০,০০০ বৃক্ষ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬,৫০,০০০ বা সমগ্র বৃক্ষের ৪৭% হইতেছে মাঝারি ধরনের খেজুর গাছ। গুরুত্বের দিক হইতে ইহার পরে হইতেছে বেদানা ও ডালিম গাছ, সংখ্যায় ১,০৭,০০০ এবং অতিউৎকৃষ্ট শ্রেণীর এই ফল তিউনিসিয়ার দ্বিতীয় প্রধান উৎপাদিত ফসল। অতঃপর পীচ, আঙ্গুর ও খোবানী গাছের স্থান। জলপাই গাছ শুধু কেত্তানা তেবলেবু উদরাফ মাতৌইয়া (Kettana Teboulbou Oudref Metouia) অঞ্চলেই ভালভাবে হয়। কলা গাছ আছে আর তাহাতে ফল ধরে ও পাকে। তবে এই গাছ অনেকটা বিরল। আবাদী জমিতে সামান্য পরিমাণে গম ও যব, খড় (বিশেষত lucerne), তামাক, মেহেদী বা হেনা এবং

বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী তরি-তরকারী চাষ করা হয়। সাম্প্রতিককালে asparagus (সব্জি বিশেষ)-এরও চাষ করা হইতেছে। গবাদি পশুর সংখ্যা কম; তবে পশুপালন বলিতে প্রধানত গৃহপালিত পশু রক্ষণ বোঝায় এবং উহাকে মূলত একটা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের উপায়রূপে গণ্য করা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের গভীরতা খুব বেশী নহে, প্রচুর মাছ রহিয়াছে। কিন্তু সেই মাছ ধরা হয় না বলিলেই চলে। পানিসেচ ব্যবস্থার সাহায্যে মরূদ্যান এলাকা যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ১৮৯০ খৃ. হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি গভীর কূপ খনন করা হইয়াছে, যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ভূনিম্নস্থ পানি বর্তমানে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে।

সাম্প্রতিককালে কাবিসকে দক্ষিণ তিউনিসিয়ার উন্নয়ন কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করা হইয়াছে। ৫০,০০০ টন বহনক্ষম জাহাজ ভিড়িবার উপযোগী বন্দর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হইয়াছে। নাইট্রেট সার উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ একটি কোম্পানী Industries Chimiques Maghrebines (I. C. M.) স্থাপন করা হইয়াছে এবং আল-বোরমা গ্যাসক্ষেত্র হইতে শহর পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন করা হইয়াছে। ফলে ইটের কারখানা এবং বিদ্যুৎ ষ্টেশনসমূহে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হইয়াছে। কারুশিল্প এবং পর্যটন দ্বারা অতিরিক্ত কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আরও উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইতিহাস ঃ সুপ্রাচীন কাল হইতে এই শহরটি তাকাপে (Tacape) তাকাপা বা বহুবচনরূপে তাকাপাই (Tacapae) নামে পরিচিত ছিল, উহারই আরবী রূপ কাবিস। সাধারণ সম্বন্ধ পদ নিষ্পন্নরূপ তাকাপাস হইতে আরবী রূপটি গৃহীত হইয়াছে, আর তখন লিবীয় বারবার উপসর্গ 'তা' পড়িয়া গিয়া নাম হইয়াছে কাবিস। এই কাবিস অঞ্চলে একেবারে নিশ্চিতভাবেই নব্য প্রস্তর যুগ হইতে জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে; উহার প্রমাণস্বরূপ অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও রহিয়াছে। পরবর্তীকালে সম্ভবত ফিনিশীয়গণই প্রথম এখানে একটি বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে এবং এখান হইতে নুমিডিয়ার সঙ্গেও সাহারার অপর প্রান্তবর্তী এলাকাসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে থাকে। এই বাণিজ্য ঘাঁটিটি একটি কার্থেজীয় বন্দরে পরিণত হয় এবং অতঃপর ইহা একটি রোমীয় কলোনীতে রূপান্তরিত হয়। ইহার পর হইতে শহরটি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য লাভ করা যায়।

টাইবেরিয়াসের রাজত্বকাল হইতে (১৪-৩৭ খৃ.) এই অঞ্চলটির পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু হয়, Comitia Centuriata-এ ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রধান উপকূলীয় সড়ক দ্বারা তাকাপাস কার্থেজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৪ খৃ. একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ খোলা হয়; ফলে ইহার সঙ্গে কাপসা (কাফসা) হইয়া থেকেপতে (Thekepte) ও আম্মায়েদারা (হাঈদরা)-র সংযোগ স্থাপিত হয়। শেষোক্ত স্থানে ৩য় রোমীয় বাহিনী [3rd Legion (Augusta)] মোতায়েন ছিল। পূর্ববর্তী যুগে কার্থেজীয়গণের প্রচেষ্টার ফলে এবং এই সড়ক সংযোগসমূহেরও ফলে বন্দরটির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, ওয়াদী কাবিসের পানি প্রবাহ প্রচুর ছিল, প্যাক্স রোমানার পানি সরবরাহও ছিল। ফলে শহরটির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। শহরের কেন্দ্রস্থল অবশ্যই ছিল, বর্তমানে ঠিক যেখানে বুলবাবার মাযার অবস্থিত, সেখানে। উন্নয়ন কি মাত্রায় হইয়াছিল সেই বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে; তবে খৃষ্টান আমলে এখানে একজন বিশপের ধর্মীয় দফতর ও গির্জা ছিল। যাহা হউক, তুলনামূলকভাবে আরও পরবর্তীকালে শহরটিকে সুরক্ষিত করা হয়। Ch. Diehl (L' Afrique byzantine, ১খ, ২২৯) লিখিয়াছেন, "অন্তত ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত কাবিস শহরের কোনও সুরক্ষিত প্রাচীর ছিল না।" শুধু বিজেতাদের প্রবেশ পথের মুখে একটি রক্ষাব্যবস্থা (Castellum) নির্মাণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ উপকূল এবং ছোট্ট আল-ফেজ্জাজের মধ্যবর্তী স্থানে যাহা দ্বারা বায়যাসেনা (Byzacena) ও লিবিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। এই স্থানেই ৫৪৭ খৃ. বায়যানটীয় বাহিনীর আসট্রিসিস (Astrices) গোত্রের নিকটে শোচনীয় -ভাবে পরাজিত হয়। সন্দেহ নাই যে, সেই পরাজয়ের পরেই তাকাপাসের চতুর্দিকে একটি প্রতিরক্ষা বেষ্টনী-প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। সেই প্রাচীর অন্তত খৃষ্টীয় ১৬ শতক পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। বর্তমানে কাবিসে প্রাচীন কালের কোনও ইমারত, সৌধ বা নির্মাণ কার্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। অবশ্য ওয়াদী কাবিসের উপরে রোমীয়গণ যে বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিল উহার চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কয়েকটি থাম ও থামের চূড়া (Capital) সিদি ইদরীস-এর মসজিদে বা সিদি বূলবাবার মাযার-সৌধে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু স্থাপত্য চিহ্ন পুরাতন শহরের বিভিন্ন দালান-কোঠাতে ব্যবহার করা হইয়াছে।

যেই পরিস্থিতিতে কাবিস ইসলামী শক্তির অধীনে আসে তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, পরর্তীকালে আলওয়ায়ীর অস-সাব্‌রাজ এই বিষয়ে জোর দিয়া দাবী করিলেও 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (দ্র.) ২৭/৬৪৭-৮ সালে তাঁহার বায়যাসেনা বিজয়কালে শহরটি অবরোধ করেন নাই (হুলাল, ১খ, ৩৪৪)। শহরটি অধিকৃত হয় আরও পরে—সম্ভবত মু'আবিয়া ইব্‌ন হুদায়জ বা তাঁহার উত্তরাধিকারী 'উকবা ইব্‌ন নাফি' কর্তৃক ৩৪/৬৫৪ এবং ৫০/৬৭০ সালের মধ্যে অভিযানসমূহ পরিচালনা করিবার কালে। আনুমানিক ৬৪/৬৬৮ সালে তাহূদাতে 'উকবা-এর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিলে শহরটি পরিত্যক্ত হয়। বিজয়ী কুসায়লা কায়রাওয়ানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'আবদু'ল-হাকাম-এর মতে (ফুতূহ, পৃ. ৭০-১), সেখান হইতে তিনি "কাবিসের প্রবেশদ্বার সমেত চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ শাসন করিতে থাকেন। এই প্রবেশ দ্বার দিয়াই আনুমানিক ৭৪/৬৯৩-৪ সালে আল-কাহিনা-এর সৈন্যগণ দেশটি পুনরাধিকার করিবার উদ্দেশ্যে আগত হাসান ইবনু'ন-নু'মান (দ্র.)-কে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তবে কয়েক বৎসর পরে এই একই প্রবেশদ্বার পথে তিনি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে কাবিস চিরতরে মুসলিম শক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইসলামের অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া ১২২/৭৪০ হইতে ১৫৫/৭৭২ সময়কাল সমগ্র ইফরীকিয়্যা যখন ভয়াবহ খারিজী আন্দোলন দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইতেছিল তখন এই কাবিসও রেহাই পায় নাই। সুফরী মতানুসারী যানাতী 'উকশা ইব্‌ন আয়্যুব আল-ফাযারী ১২৩/৭৪১ সনে এই শহরটি অধিকার করেন এবং কায়রাওয়ানের প্রতিও হুমকিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু পরে তিনি পরাজিত ও নিহত হন (১২৫/৭৪৩)। কয়েক বৎসর পরে 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন হাবীব-এর রাজত্বকালে ইহা পুনরায় খারিজীদের হস্তগত হয়। এইবারে ইবাদী মতাবলম্বীদের পুনরায় ইহা অধিকৃত হয় এবং বিদ্রোহী নেতা ইসমা'ঈল ইব্‌ন যিয়াদ আন-নাফূসী আনুমানিক ১৩১/৭৪৮-৯ সালে পরাজিত ও নিহত হন। ১৩৭/৭৫৫ সনে 'আবদু'র-রাহমান গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত

হইলে নূতন গোলযোগ সূচিত হয় এবং পুনরায় এক নূতন খারিজী উপদ্রব শুরু হয়। এই সময়ে বারবার পরস্পরবিরোধী দলগুলির মধ্যে শহরটির হাতবদল হয়। ইবাদী আবু'ল খাত্তাব ১৪১ শুরু/৭৬১ মাঝামাঝি সময়ে শহরটি হস্তগত করেন। ইবনু'ল-আশআছ ১৪৪/৭৬১ সনে শহরটি সাময়িকভাবে মুক্ত করেন, কিন্তু পুনরায় ইহা হাতছাড়া হইয়া যায়। অবশেষে মুহাল্লাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা য়াযীদ ইব্‌ন হাতিম আল-মুহাল্লাবী জুমাদা (১), ১৫৫/২৮ এপ্রিল, ৭৭২ তারিখে বিজয়ীর দেশে নগরে প্রবেশ করেন এবং কয়েক দশক যাবত এলাকাটিতে যে মারাত্মক রক্তপাত চলিতেছিল পরবর্তী সিকি শতাব্দীর জন্য তাহা বন্ধ করেন।

আগলাবী আমলে জিলার প্রধান শহর এবং গভর্নরের শাসন কেন্দ্র হয় কাবিস। আশ-শাম্মাখীর সাক্ষ্য হইতে (সিয়ার, পৃ. ২০৩) ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহহাব (১৬৮/৭৪৮-২০৮/৮২৩)-এর একজন 'আমিলের কথা জানা যায়। ধারণা করা যায় যে, শহরটি রুসতামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুত এই 'আমিল ছিলেন একজন সাধারণ কর সংগ্রাহক, যিনি কতকটা গোপন পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক এলাকার ইবাদীগণের নিকট হইতে তাহারত নগরীর সাদাকাত আদায় ব্যবস্থা সংগঠন করেন। কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, সমগ্র ৩য়/৯ম শতাব্দী ধরিয়া এই শহরটি সর্বদাই রাজনৈতিকভাবে কায়রাওয়ানের নির্ভরশীল ছিল। কাবিসের জন্য এই সময়টা ছিল শান্তির, ক্বচিত কখনও সেই শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছে। যেমন ২৮৩/৮৯৬ সালে নগর প্রাকারের নিকটই সংঘটিত যুদ্ধ যেখানে ২য় ইব্‌রাহীম অত্যন্ত বিপজ্জনক নাফূসা ইবাদীগণকে নির্মূল করিয়াছিলেন। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইহা ফাতিমীদের শাসনাধীনে চলিয়া যায়, তাঁহারা কুতামা বানূ লুকমানগণ দ্বারা শহরটি শাসন করেন। কবিগণ ইহাদের উদারতাকে কাব্যে অমরতা দান করিয়াছেন।

যীরীগণের শাসন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের শাসনের শুরুতেই খারিজীদের বিদ্রোহ দেখা দেয় (৩৬১/৯৭২); কাবিস শহরটি অবরুদ্ধ হয় এবং শহরতলী এলাকাসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। অতঃপর ফাতিমী খলীফা আল-হাকিম (৩৮৬/৯৯৬-৪১১/১০২১) কাবিস ও ত্রিপোলী শহর দুইটি যীরীগণের নিকট হইতে অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হন নাই। যীরীগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বনূ ' আমিরগণ শহরটি শাসন করেন। অতঃপর বাদীস (৩৮৬/৯৯৬-৪০৬/১০১৬)-এর এক ভাই ইব্‌রাহীম শাসক নিযুক্ত হন; তাঁহার পরে শাসক হন মানসূর ইব্‌ন মাওয়াস। আল-মু'ইয্য (৪০৭/১০১৬-৪৬৪/১০৬২) কর্তৃক মনোনীত ইহার শেষ গভর্নর ছিলেন ইব্‌ন ওয়ালমিয়্যা। অতঃপর শহরটি ইখতিয়ারের বাহিরে চলিয়া যায়।

বস্তুত এই একই অঞ্চলে হায়দারানে ৪৪৩/১০৫২ সনে যে বিপর্যয়টি ঘটে তাহার ফলে ইফরীকিয়্যা হিলালীগণের (দ্র. হিলাল) করতলগত হইয়া পড়ে। তবে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিলালীগণ দ্বারা শহরটির—সেই সময়ের মধ্যে চতুর্দিকে মজবুত প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে বা মরূদ্যানটির কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই, যদিও বা শহরটি তখন অরক্ষিতই ছিল। বিজয়িগণ ও শহরের গভর্নরের মধ্যে কোনও প্রকার সমঝোতা-স্বাভাবিকভাবেই নজরানা এবং খাজনা প্রদান বিষয়ে হইয়া থাকিবে—নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেননা ৪৪৩/১০৫৩-৪ সন হইতে রিয়াহী প্রধান মুনিস ইব্‌ন য়াহ্‌য়া-এর আশ্রয় প্রদানের ফলে যীরী বংশের কিছু সংখ্যক সদস্য, যাহারা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, খোলখুলিভাবেই শহরে আশ্রয়লাভ করে। মাহ্‌দিয়াগণের সঙ্গে কাবিসের সম্পর্ক তৎক্ষণাৎই ভঙ্গ হয় নাই। আনুমানিক ৪৫৪/১০৬২-৩ সনে গভর্নর আল-মু'ইয্য ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ালমিয়্যা, যীরী আমীর কর্তৃক তাঁহারা ভ্রাতা ইব্‌রাহীম এবং কাদীর প্রতি আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া, কাদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্র করেন এবং মু'নিস ইব্‌ন য়াহয়ার আশ্রয়পুষ্ট হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আততীজানী এই বিষয়ে মন্তব্য করেন, "এই ঘটনা হইতেই হিলালী আরবগণ কর্তৃক শহরটির অধিকার শুরু হয়" (রিহ্‌লা পৃ. ৯৬)। ইব্‌রাহীম তাঁহার ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর কাদী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন; কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কাবিসের অধিবাসিগণ তাঁহাকে হত্যা করে (৪৮৯/১০৯৫-৬)।

এই গুপ্ত হত্যার ফলে বানূ জামি ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তাঁহারা দাহমান-এর মধ্যস্থতায় রিয়াহ হিলালীগণের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হন। ইহা সত্য বলিয়া জানা যায় যে, ফাতিমী খলীফা আল-মুসতানসির (৪২৭/১০৩৬-৪৮৭/১০৯৪) যে সময়ে বানূ হিলালকে ইফরীকিয়্যা অভিযানের জন্য ছাড়িয়ে দেন, ঠিক সেই সময়েই যুগবা গোত্রীয়গণকে তাঁহাদের অংশস্বরূপ ত্রিপোলী এবং কাবিস অর্পণ করিয়াছিলেন। বস্তুত এই শেষোক্তগণ ত্রিপোলী লইয়া সন্তুষ্ট ছিল এবং জনৈক দাহমানো-রিয়াহী, যাঁহার নাম ছিল মাক্কী ইব্‌ন কামিল ইব্‌ন জামি' (আত-তীজানী, রিহ্‌লা, পৃ. ৭১, ৯৭) কাবিসে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাবিসের বিদ্রোহিগণ কর্তৃক ক্ষমতাতে প্রতিষ্ঠিত 'উমার ইব্‌নু'ল-মু'ইয্যকে যিনি ছিলেন আমীর তামীমা (৪৫৪/১০৬২—৫০১)-এর ভাই-অপসারিত করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মাক্কীর উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র রাফি', তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন প্রথমে রুশায়দ ইব্‌ন কামিল ইব্‌ন জামি' (আনু. ৫১৫-১১২১-৫৪১/১১৪৭)। অতঃপর য়ূসুফ নামক জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস স্বল্পকালীন সময়ের জন্য মতা দখলের পর ক্ষমতাসীন হন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুশায়দ এবং সর্বশেষে মুদাফি' ইব্‌ন রুশায়দ।

৫ম/১১শ শতকের মধ্যভাগ হইতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রিয়াহীগণের আশ্রয়ধীন স্বাধীন গভর্নরগণের শাসনামলে এবং বানূ জামি' বংশীয়গণের সরাসরি শাসনামলে কাবিসের ইতিহাস ছিল ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের। অভ্যন্তরে ছিল একের পর এক ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা দখলের নিষ্ফল প্রচেষ্টার সংগ্রাম। আর বাহিরে ছিল সিসিলীর নর্মান শাসকগণের রাজ্যবিস্তার নীতি। তাঁহারা ইফরীকিয়্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে ছিল সচেষ্ট। বহু অবরোধ সত্ত্বেও (৪৭৪/১০৮১-২, ৪৭৯/১০৮৬-৭, ৪৮৬/১০৯৩-৪ এবং আনুমানিক ৫১১/১১১৭-৮সনে) আক্রমণকারিগণের সব প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং শহরটি বিভিন্ন সময়ে সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য (৪৮৯/১০৯৫-৬ এবং ৫৪২/১১৪১ সনে) রক্ষা করেন আল-মু'ইয্য-এর উত্তরাধিকারিগণ। এই উত্তরাধিকারিগণের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্য শহরটি খোলাখুলিভাবে একটি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে; তাহারা শত্রুগণকে আমন্ত্রণ জানাইয়া নিজস্ব বাহিনী এককভাবে বা মিত্রবাহিনী সমভিব্যাহারে উহাদের রাজধানীসমূহ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে (৪৭৬/১০৮৩-৪, ৪৯৩/১০৯৯-১১০০ এবং আনুমানিক ৫১১/১১১৭-৮ সনে)। শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য তাহারা শুধু হিলালীগণের সঙ্গেই মিত্রতা করে নাই, ২য় রোজারের নর্মানদের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করে। তিনি আক্রমণকারীর নিজেরই অনুরোধে তাঁহাকে সুন্দর এবং সুষ্ঠু পদ্ধতিতে

একখানি অভিষেক সনদ প্রদান করেন, সেই সঙ্গে খৃস্টান সম্মানসূচক খিতাবসমূহও প্রদান করেন এবং অতপর মাহ্দিয়্যা (৫৪৩/১১৪৮) ও সমগ্র সাহেল (Sahel) অধিকৃত হইবার পরে একজন উত্তরাধিকারীও মনোনীত করিয়া দেন। ইনি ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্ন রুশায়দ। এই সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাতে শহরটি কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এখানে একটি অতি সুন্দর রাজপ্রাসাদও ছিল; ইহা ছিল আল-'আরুসায়ন-এর প্রাসাদ। ইহার নির্মাণ শুরু করেন সম্ভবত ইব্ন ওয়াল্‌মিয়্যা এবং সমাপ্ত করেন রাফি'; ইহার জন্য কৃতিত্ব লাভ করেন শেষোক্ত জন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রুশায়দ নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলিত করেন; ইহা হইতে তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় লাভ করা যায়।

আল-মুওয়াহ্হিদগণের আগমনের ফলে কাবিসের স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটে। ইতিপূর্বে নর্মানগণের আধিপত্যাধীনে যাওয়ার ফলে ৫৪১/১১৪৬-৪৭ সন হইতেই বস্তুত স্বাধীনতার অবসান হইয়াছিল (মোটামুটি সহনশীল পরাধীনতা বস্তুত কার্যকর পরাধীনতা)। যে শহর ৫৫৩/১১৫৮-৯ সনে নর্মানদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল উহা ৫৫৪/১১৬০ সনে 'আবদু'ল-মু'মিন ইব্ন 'আলী (দ্র.)-র পুত্র আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বিজিত হয়। অতঃপর শান্তি স্থায়ী হয় কয়েক দশককালমাত্র। শীঘ্রই কাবিস বস্তুত আল-মুওয়াহ্হিদ এবং অপর দুই শক্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সেই দুই শক্তি কখনও ছিল মিত্র, আবার কখনও একে অপরের শত্রু কারাকুশ, (দ্র.) যাহারা ইতোমধ্যেই ত্রিপোলীর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং বানূ গানিয়্যাগণ। আল-মানসূর (৫৮০/১১৮৪-৫৯৬/১১৯৯) ব্যক্তিগতভাবে ইফরীকিয়্যার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। কেননা সেখানে তাঁহার পরাজয়েরই আশংকা দেখা দিয়াছিল এবং আল-হাম্মার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া (৫৩৮/১১৭৮-৮) তিনি শহরটি পুনরাধিকার করিতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে কারাকুশ 'আলী ইব্ন গানিয়্যার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া শহরটিকে এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেন। কারাকুশ শীঘ্রই পুনরায় নিজেকে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর এককালের মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হইবার ফলে তিনি পুনরায় আল-মুওয়াহ্হিদগণের নিকটে শহরটি হারান এবং আল-মুওয়াহ্হিদগণ উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। য়াহ্য়া ইব্ন গানিয়্যা ইতোমধ্যে 'আলী-র স্থলাভিষিক্ত হন এবং কারাকুশকে পর্যুদস্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ত্রিপোলী কাড়িয়া লইয়া ৫৯১/১১৯৫ সালে তিনি কাবিস অবরোধ করেন। শহরটিকে আত্মসমর্পণ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি মরূদ্যান ধ্বংস করিয়া দেন। দাবী করা হয় যে, সেখানে চিহ্নস্বরূপ তিনি একটি খেজুর গাছ মাত্র রাখেন। জয়লাভের পরে তিনি কাবিসে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তিউনিস সমেত সমগ্র ইফরীকিয়্যাতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি তিউনিস জয় করেন ৬০০/১২০৩ সন। আন-নাসির (৫৯৬/১১৯৯-৬০৯/১২১৩)-কে এভাবে তাঁহার রাজ্যের সমগ্র পূর্বাংশ পুনর্বিজয় করিতে হয় রাবী'—১, ৬০২/অক্টোবর ১২০৫ সনে। তিনি কাবিসের নিকটে য়াহ্য়া ইব্ন গানিয়্যাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন এবং শহর পুনর্দখল করিয়া শেষবারের ন্যায় আল-মুওয়াহ্হিদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইফরীকিয়্যাতে আল-মুওয়াহ্হিদ শাসন তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। হাফসী বংশের প্রতিষ্ঠাতা যাকারিয়্যা য়াহ্য়া (৬২৫/১২২৮-৬৪৭/১২৪৯) কাবিসের শাসক থাকাকালীন খলীফা আল-মা'মূন (৬২৪/১২২৭-৬২৯/১২৩২) কর্তৃক সমগ্র ইফরীকিয়্যার গভর্নর নিযুক্ত হন। শহরের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভূম্যাধিকারী 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মাক্কীর সমর্থন লাভ করিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতার নিকট হইতে তিউনিস অধিকার করিয়া নেন, অতঃপর ভাইকে তিনি বরখাস্ত করেন। এই তারিখ হইতে বানূ মাক্কীগণের সৌভাগ্য সূচিত হয়। তাঁহারা ৬৮১/১২৮২ হইতে ৭৯৬/১৩৯৪ সন পর্যন্ত কাবিসে সত্যিকারের অর্থে একটি ক্ষুদ্র, স্থানীয় এবং প্রধানত স্বায়ত্ত শাসনকারী বংশ ছিলেন এবং বস্তুত স্বাধীনই ছিলেন। এই রাজবংশের দুইজন অত্যন্ত শক্তিশালী সদস্য 'আবদু'ল মালিক ইব্ন মাক্কী ও তাঁহার ভাই আহ্মাদ। শেষোক্ত জন ছিলেন, বিশেষ করিয়া জেরবার শাসক এবং সেখান হইতে কিছুকালের জন্য তিনি ত্রিপোলী পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই দুই ভাই ছিলেন লুওয়াতা বংশোদ্ভূত। তাঁহারা শিক্ষিত ও মার্জিত মানুষ ছিলেন; তাঁহারা ফকীহদের অনুকরণ করিয়া চলিতে পসন্দ করিতেন। তাঁহারা চতুরও ছিলেন এবং প্রায়শই হাফসী নীতিকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইতেন; সেইখানে তাঁহাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং সেই ভূমিকা তাঁহারা নিজেদের কাজে লাগাইতেন।

রাজাব ৬৮১/অক্টোবর ১২৮২ সনে 'আবদু'ল-মালিক আক্রমণকারী ইব্ন আবী 'উমারার নিকটে কাবিস-এর নগর তোরণ উন্মুক্ত করিয়া দেন (১২৮২-৪ খৃ.) তাঁহার সিংহাসনে আরোহণে সহায়তা করেন। বলা হইয়া থাকে যে, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি "প্রাসাদে সাবেক সুলতানের আমলের যত তরুণী বাঁদী ছিল তাহাদের সকলকে উপহারস্বরূপ 'আবদু'ল-মালিককে প্রদান করেন (R. Brunschvig, Hafsides, ২খ, ১০৬) এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষমতা দিয়া তাঁহাকে স্বীয় উযীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইব্ন আবী 'উমারার শাসন কাল খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং 'আবদু'ল-মালিক কাবিসের করদ শাসক হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। ১২৮৬ সনে শহরটি আমীর আবূ যাকারিয়্যা' কর্তৃক অবরুদ্ধ হয় এবং ইহার খেজুর বাগান ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়; তৎপরবর্তী গোলযোগের কালে 'আবদু'ল-মালিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকেন নাই। ১২৮৭-৮ সালে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইব্ন আবী দাব্বূস-এর প্রতি আবূ হাফস (৬৮৩/১২৮৪-৬৯২/১২৯৩)-এর বিরুদ্ধে সমর্থন দান করেন (এইবার অবশ্য তাঁহার সমর্থন ব্যর্থ হয়)।

অতঃপর ৬৯৩/১২৯৪ সালে তিনি তিউনিসের আধিপত্য অস্বীকার করেন এবং বোগী (Bouige) দাবী করেন, সেখানে ১২৮৬ খৃ.-এ কাবিস অবরোধকারী আবূ যাকারিয়্যা'র জনৈক পৌত্র তাঁহার পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ৭৩২/১৩৩২ সালে আর এক নূতন দাবীদার 'আবদু'ল-ওয়াহিদ আল-লিহ্য়ানীও আবূ বাক্র (৭১৮/১৩১৮-৭৪৭/১৩৪৬)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার সমর্থন লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতে বানূ মাক্কী বংশীয়গণের সর্বোচ্চ গৌরব সূচিত হয়। ৭৫১/১৩৫০ সালে শক্তিশালী ও কুশলী রাজ-সহচর ইব্ন তাফরাজীন-এর বিরোধিতা করিয়া তাঁহারা নিজদের রাজ্যসীমা বর্ধিত করিতে এবং আধিপত্য অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের সম্মান এমনই বৃদ্ধি পায় যে, আনুমানিক ১৩৫৫ খৃ. ভেনিস আলাদাভাবে তাঁহাদের সঙ্গে একটি সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করে। তিউনিসের সঙ্গে বরাবরের মতো বৈরিতা বজায় রাখিয়া তাঁহারা আবূ ঈনান (দ্র)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দ্বিতীয় মারীনীয় অভিযানের প্রতি সমর্থন দান করেন (৭৫২/১৩৫২-৭৫৭/১৩৫৭)।

কিন্তু কয়েক দশক পরে আবু'ল-আব্বাস-এর শাসন আমলে (৭৭২/১৩৭১-৭৯৬/১৩৭৪) দক্ষিণের সকল শহরের স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটে। তবে কাবিস পুনর্বিজয় করা সহজ ছিল না। যু'ল-কা'দা ৭৮১/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৩৮০ সালে শহরটি বিজিত হয় এবং সেখানে যুসুফ ইবনু'ল-আব্বার নামক একজন হাফসী গভর্নরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু পরের বৎসরই 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মাক্কীর জনৈক পৌত্র 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব নিজকে শহরের প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গভর্নরকে হত্যা করেন। আবু'ল-আব্বাস ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিয়া শহরটি অবরোধ করেন (৭৮৯/১৩৮৭) এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার জন্য সেখানকার সকল খেজুর গাছ কাটিয়া ফেলেন। ইব্‌ন খালদুন-এর মতে গাছগুলি কাটিয়া ফেলার ফলে সেখানকার আবহাওয়া কতকটা অধিক স্বাস্থ্যকর হয়। 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব তখন আত্মসমর্পণ করেন নিজের এক পুত্রকে হাফসী সুলতানের নিকটে প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করেন এবং যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। কিন্তু 'আবদুল-ওয়াহ্‌হাব (৭৯২/১৩৯০) তাঁহার চাচা য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক ইব্‌ন মাক্কীর হাতে নিহত হন, তিনি অতঃপর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৭৯৬/১৩৯৩-৪ সালে একটি সফল ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হইয়া হাফসী সুলতানের সম্মুখে নীত হন, সুলতান আবূ হাফ্‌স তাঁহাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বানূ মাক্কী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং কাবিসের স্বাধীনতারও সমাপ্তি ঘটে।

তখন হইতে শুরু করিয়া শহরটি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। দক্ষিণের বাদবাকি অংশের ন্যায় ইহা পুনরায় শেষ হাফসীগণের কর্তৃত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, হাফসীগণ তখন স্পেনীয়দের আশ্রিত ছিল; পরে সমগ্র তিউনিসিয়ার সঙ্গে তুর্কী শাসনাধীনে আসে; ১৫৭৪ খৃ. সেই সমগ্র অঞ্চলকে একটি পাশা শাসিত অঞ্চলরূপে সংগঠিত করা হয়। 'উছমান দায় (১৫৯০-১৬১০ খৃ.) দেশটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি জারাত-এ কূলুগলীগণের (কুল-ওগলু) অর্থাৎ তুর্কী পিতা ও স্থানীয় মায়ের মিশ্র সন্তানগণের জন্য একটি কলোনী গড়িয়া তোলেন। স্থায়ী জনসংখ্যার কারণে এবং সাহারার প্রান্তে অবস্থানহেতু কাবিস ফরাসী দখলের পূর্বকালীন অরাজকতার আমলে অন্যান্য শহর অপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শহরটি দ্বিমুখী চাপের সম্মুখীন হয়; তন্মধ্যে ছিল যাযাবরদের চাপ, যাহারা নিয়মিত সেনাবাহিনী দেখিলে তাহাদের মুকাবিলা না করিয়া মরুভূমিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত অথবা লিবীয় সীমান্তের ওপারে গিয়া আশ্রয় লইত। অভিযানসমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও কাবিস 'আলী ইব্‌ন গাযাহুম-এর অভ্যুত্থানের সময়ে (১৮৬৪ খৃ.) রক্ষা পায় নাই। ১৮৭০ খৃ. খাযনাদারগণ কর্তৃক শহরটি সত্য সত্যই লুণ্ঠিত হয়।

আশ্রিত (Protectorate) এলাকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কালে ইহার প্রতি কিরূপ শর্ত আরোপ করা উচিত তাহা লইয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়— জারা আশ্রিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, মানযিল প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছুক হয়। এই কারণে শেষোক্ত স্থানটি অধিকার করা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়। বিজয় শুরু হয় ২৪ জুলাই, ১৮৮১ সালে কিন্তু নভেম্বরের শেষভাগের পূর্বে সম্পন্ন হয় নাই। বিজয়ের জন্য রক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে কাবিসের দক্ষিণে অবস্থিত মারেথ-এ একটি রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই কারণে শহরটিতে মারাত্মকভাবে বোমাবর্ষণ করা হয় এবং ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়। তাহা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জার্মানরা শহরটি দখল করিয়া নেয় (১৯ নভেম্বর, ১৯৪২)। পরে ২৯ মার্চ, ১৯৪৩ সালে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী শহরটি পুনর্দখল করিতে সক্ষম হয়।

ঐতিহাসিক ভূগোল ঃ কাবিসকে যথার্থভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে, "সমুদ্রতীরবর্তী মরূদ্যান" বলিয়া। প্রতি যুগেই ইহার সমৃদ্ধি, কৃষিজ সম্পদের প্রাচুর্য এবং বন্দরের কর্মকাণ্ডের সমতালে উন্নীত হইয়াছে; এই বন্দর সাহারা অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক বহিঃপথ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। Strabo (আনু. খৃ., পূ. ৫৮-খৃ., ২৫) ইতিপূর্বেই ইহাকে "মস্তবড় বাণিজ্যিক স্থল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে সাহারা অঞ্চলের পণ্যদ্রব্যাদি নুমিডিয়াতে প্রেরিত দ্রব্যাদির সঙ্গে বিনিময় করা হইত। জ্যেষ্ঠ প্লিনী (Pliny) [২৩-৭৯ খৃ.] এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সেচের পানি বিতরণ ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন ব্যবস্থা অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। তিনি উৎপাদিত কৃষিজ সম্পদের সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন; সেইগুলির তিনটি শ্রেণী ছিল– খেজুর, অতঃপর জলপাই, ডুমুর, ডালিম-বেদনা ও আঙুর এবং সবশেষে খাদ্যশস্য ও শাকসবজি।

অতঃপর ৩য়/৯ম শতাব্দী পর্যন্ত, যে সময়ের মধ্যে কাবিস মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে পরিণত হয়, ইহার আর কোনও যথাযথ ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ইব্‌ন খুররাদাযবিহ (মৃ. ২৭২/৮৮৫-৬) ইহাকে অন্য কোনও মন্তব্য ব্যতীত শুধু "বিদেশী আফারিকাগণের শহর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মাদীনাতু'ল-আফারিকা আল-আ'আজিম) [দ্র. মাসালিক, পৃ. ৬-৭], এই সম্যক্ প্রকাশ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে আফারিকাগণ অর্থাৎ গ্রীসীয় রোমীয়দের এবং ল্যাটিনীকৃত বারবারদের বংশধরগণ, যাহাদের অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান, তখন পর্যন্ত শহরটির অধিবাসিগণের প্রধান অংশ ছিল। নিশ্চয়ই এই আফারিকাগণকেই আল-য়া'কূবীর (মৃ. আনু. ২৮২-৯২/৮৯৫-৯০৫) গ্রন্থে 'আজাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সেখানে তিনি আরও বলিয়াছেন, "মিশ্র জনসংখ্যা"র মধ্যে আরব এবং বারবার উভয়ই ছিল। আল-য়া'কূবী আরও বলিয়াছেন যে, কাবিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ শহর, যেখানে প্রচুর বৃক্ষ লতা এবং ফলমূল ছিল।

৪র্থ/১০ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইব্‌ন হাওকাল বলিয়াছেন যে, এখানে প্রধানত বারবারগণ বাস করিত এবং তিনিই সর্বপ্রথম কিছু সংখ্যক য়াহূদীর বসবাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই য়াহূদীগণকে একটি বিশেষ কর দিতে হইত। এখানকার অধিবাসিগণ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এই যে, "প্রকৃতিগতভাবে খুব একটা সুশ্রী বা পরিচ্ছন্ন নহে, বরং কতকটা সাদামাটা ধরনের" (সূরাতু'ল-আরদ, ৭২; অনু. Kramers-Wiet, পৃ. ৬৬)। তিনি আরও বলিয়াছেন, ইহার চতুর্দিকে দেওয়াল পরিখা ছিল এবং দেওয়ালের বাহিরে একটি শহরতলী এলাকা ছিল, সেখানে বাজার বসিত; এই বিষয়টি তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। এখানকার বিভিন্ন ধরনের ও সহজলভ্য প্রচুর উৎপাদন-সামগ্রীর মধ্যে তিনি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তৈল, পশম, অতি উৎকৃষ্ট মানের বিপুল পরিমাণ রেশম, খুব চমৎকার চামড়া—ধরিতে কোমল এবং সুগন্ধিযুক্ত, যাহা মাগরিবের সকল অঞ্চলে রফতানী হইত। কিন্তু হায়! বাণিজ্যিক এলাকার পশ্চাদভূমিতে বাস করিত তস্কর প্রকৃতির খারিজীরা, স্থানীয় সওদাগরগণের

এবং যিম্মীগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশত উহারা শহরতলী এলাকা লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছিল।

৪র্থ/১০ম শতকের শেষভাগে আল-মুকাদ্দাসী এই শহরটির বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা "ত্রিপোলী অপেক্ষা ছোট", "প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত", খেজুর গাছ, আঙ্গুর বাগিচা ও আপেল গাছে সমৃদ্ধ (আহসানু'ত-তাকাসিম, ১২-১৩)। ইহার "পশ্চাদভূমিতে বারবারগণ বাস করে" এবং ইহার নগর প্রাচীরের মধ্যে "তিনটি ফটক রহিয়াছে"।

আল-বাক্‌রী যে বিবরণ দিয়াছেন পরবর্তীকালের ভৌগোলিকগণ প্রায়ই তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। এই বিবরণ খুবই বিস্তারিত এবং উহা ৫ম/১১শ শতকের মধ্যভাগ সম্পর্কিত। সেই সময়ে এই শহরটির শাসক ছিলেন ইব্‌ন ওয়ালমিয়্যা, যিনি হিলালী প্রধান মু'নিস ইবন য়াহয়্যার আশ্রিত ছিলেন। তখনও শহরটি সুপ্রাচীন দেওয়ালবেষ্টিত ছিল, সেই দেওয়াল কাটা পাথর দ্বারা নির্মিত, দেওয়ালের বাহিরে পরিখা দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত ছিল, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে সেই পরিখা পানি দ্বারা ভাসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে ইব্‌ন হাওকাল-এর সময়ের পর হইতে শহরের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়, বিশেষ করিয়া শহরের দক্ষিণ এবং পূর্বদিক একটি নহে, কয়েকটি শহরতলী দ্বারা বেষ্টিত ছিল, বাজার ছিল, সরাইখানা (ফানাদিক) ছিল, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই জমজমাট ছিল। শহরের শোভাস্বরূপ একটি অতি সুদৃশ্য মসজিদ ছিল। তাহা ছাড়া অগণিত হাম্মামও ছিল।

উপরে বর্ণিত চিত্রে একমাত্র দুঃখের বিষয় ছিল এই যে, সেখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছিল—অথচ পূর্বে সেইরূপ ছিল না। ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, শহরে একটি গোপন মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ (talisman) ছিল, কোনও একটি গুপ্তধন অনুসন্ধানের কালে সেই রক্ষাকবচটি বিনষ্ট হয়। রক্ষাকবচের জনশ্রুতি দ্বারা নিশ্চয়ই উচ্চ স্থানে অবস্থিত সীদী বৌলবাবার মাযারের বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ পুরাতন দালানগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার বিষয়ই বুঝান হইয়া থাকে; সেখানে হাওয়া সব সময়েই অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। সেই কারণেই ৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে 'ওয়াদী' (oued) দ্বারা পরিবেষ্টিত অস্বাস্থ্যকর নিম্নভূমিতে শহরতলী অঞ্চল গড়িয়া উঠে। ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচীন দেওয়াল হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত শহরতলীতে, বর্তমান জারা আবাসিক এলাকা যেখানে সেই স্থানটি, সম্পূর্ণ নগর এলাকাতে পরিণত হয়, যাহার নিদর্শন বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই সীদী ইদরীস-এর মসজিদ, সীদী আল-হাজ্জ 'উমার মসজিদ এবং সীদী ইব্‌ন 'ঈসা-র মসজিদ, যেইটিকে G. Marcais বানূ জামি' কর্তৃক নির্মিত বলিয়া মনে করেন (Architecture, পৃ. ৭৭-৮)। উপরিউক্ত সবগুলি মসজিদ একই এলাকাতে অবস্থিত। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুপ্রাচীন দালানগুলির কিছু কিছু খণ্ডাংশ এই সকল এবং অন্যান্য দালান-কোঠাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচীন শহর পরিত্যক্ত হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহার স্থলে অস্বাস্থ্যকর শহরতলী অঞ্চল গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই শহরতলীগুলি সম্পর্কে আল-বাক্‌রী হইতে শুরু করিয়া সকল ভূগোলবিদই বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, অথচ পূর্বে এই ধরনের কোনও প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই।

আল-বাক্‌রীর মতে শহরের অধিবাসিগণের মধ্যে তখন পর্যন্তও আরব এবং আফারিকা—এই ভেদাভেদ ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতিগত মিশ্রণ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। জনসাধারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের ঠাট্টা-রসিকতা প্রচলিত ছিল—মাসালিক-এ সেইগুলি পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে—যেমন, শহরের ঘরবাড়িতে সংলগ্ন কোনও পায়খানা ছিল না, লোকের মল বাগিচাকে উর্বরা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এই রীতি অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে (দ্র. A. Bechraoui, La vie rurale dans les oasis de Gabes, পৃ. ৩১৭)। বারবারেরা কুঁড়ে ঘরে (আখসাস) বাস করিত এবং তাহারা প্রধানত পশ্চাদভূমি অঞ্চলে থাকিত। তাহারা মূলত লুওয়াতা, লামায়া, নাফূসা মাযাতা, যুওয়াগা, যুওয়ারা এবং অন্যান্য ছোট ছোট গোত্রে বিভক্ত ছিল। কাবিস-এর মরূদ্যানে বিপুল পরিমাণ কলা, ইক্ষু এবং সব রকমের ফল-মূল উৎপন্ন হইত। সেগুলি কায়রাওয়ানে সরবরাহ হইত। ইফরীকিয়্যার মধ্যে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই শহরে তুঁতগাছের এক বিরাট বনভূমি রহিয়াছে; ফলে এখানে বিপুল পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট মানের রেশম উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ্য যে, Geniza (দ্র) দলীলপত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, ৫ম/১১শ শতকের ইফরীকিয়্যা রেশমের বড় রফতানীকারক ছিল, কিন্তু তথাপি S.D.Goitein সেখানে কাবিসের কোনও সবিশেষ উল্লেখ খুঁজিয়া পান নাই। সবশেষে আল-বাক্‌রী উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই শহরের বন্দর এলাকায় একটি বাতিঘর ছিল; অত্যাশ্চর্য বস্তু হিসাবে উহা সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল–একটি মিনার যাহার কোনও চিহ্নই এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, শুধু সেই স্থানটি অদ্যাবধি আল-মানারা নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই বাতিঘর যুক্ত বন্দরে "পৃথিবীর সকল স্থান হইতে জাহাজ আসিয়া ভিড়িত" (আল-বাক্‌রী, মাসালিক)।

৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও আল-ইদরীসী আফারিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তবে সন্দেহ নাই যে, সেই সময়ে উহারা আর জনসংখ্যার কোনও বৈশিষ্ট্যযুক্ত বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন যে, আফারিকাদের "অঙ্গসৌষ্ঠব নাই, তবে তাহাদের পোশাক পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন" (নুযহা, পৃ. ৭৭)। তখনও পর্যন্ত শহরটি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। আল-ইদরীসী এখানকার 'রুতাব"-এর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন; এই "রুতাব" মধুর ন্যায় মিষ্ট এক প্রকারের খেজুর; এইগুলি বড় মটকীতে ভরিয়া রাখা হইত। শহরে তখনও যথেষ্ট তৈল উৎপাদিত হইত, সেই তৈল "প্রচুর পরিমাণে চতুর্দিকে রফতানী হইত"। যাহা হউক, নানা পরিবর্তন সাধিত হয়—যে পোতাশ্রয়কে আল-বাক্‌রী "অতি ব্যস্ত" বলিয়াছেন, উহার সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আল-ইদরীসী বলিয়াছেন যে, প্রতিকূল বায়ুর কারণে এবং চর পড়ার ফলে উহাতে অতি কষ্টে নৌ-চালনা করা যায় মাত্র; বাতিঘরের আর কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। রেশম শিল্প তখন অবনতির দিকে; উহা তখন 'ওয়াদী'-র উৎসের কাছাকাছি কাসর সাজ্জা নামক একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল; যে চামড়ার কারখানা সম্বন্ধে ইব্‌ন হাওকাল এত প্রশংসা করিয়াছিলেন, আল-বাক্‌রী উহার কোনও উল্লেখই করেন নাই। অবশ্য উহার আবার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং উহার উৎপন্নসমূহ বিপুল পরিমাণে রফতানী হয়।

য়াকূত ৭ম/১৩শ শতকে লিখিতে গিয়া নূতন কিছুই বলেন নাই, বস্তুত তিনি আল-বাক্‌রীর প্রায় প্রতিটি শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইব্‌নু'শ-শাববাত (৬১৮/১২২১-৬৮১/১২৮২) [আল ওয়াযীর আস-সাররাজ কর্তৃক উদ্ধৃত] উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাবিস "একটি বড় শহর" এবং অধিবাসিগণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিন শ্রেণীর অধিবাসিকে

তখনও আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়— আরব, বারবার ও 'আজম অর্থাৎ আফারিকা। সেই শেষবারের মতো আমরা অধিবাসিগণের তিনটি জাতিগত শ্রেণীর দেখিতে পাই। ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগে আল-'আবদারী হাজ্জের পথে শহরটি অতিক্রম করিবার কালে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। তিনি বলেন যে, ইহা একটি নোংরা, দুর্গন্ধভরা শহর, এখানকার লোকদের ভণ্ডামির তুলনা হয় শুধু তাহাদের অজ্ঞতা ও মমত্বহীনতার সহিত।

আত-তীজানী জুমাদা-১ ৭০৬/নভেম্বরের শেষভাগ ১৩০৬ সালে এই শহরে চার দিন অবস্থান করিয়াছিলেন; তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আবার ভিন্ন রকমের। বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "ইহা সাহারা অঞ্চলের একটি সুন্দর সামুদ্রিক শহর। দুনিয়াতে সত্য সত্যই যেন জান্নাতস্বরূপ, অল্প কথায় বলা যায় যে, ইহা একটি ক্ষুদ্র আকারের দামিশ্ক শহর।" যাহা হউক, ঐ সময়ের শহরটির একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর চলিতেছিল। প্রাচীন দেওয়ালগুলি তখনও দাণ্ডায়মান ছিল সত্য, কিন্তু বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র সরিয়া গিয়াছিল "শহরতলী এলাকায়; সেই এলাকা ছিল ব্যাপক এবং সেখানেই অধিকাংশ বাজার অবস্থিত ছিল" (রিহ্লা, পৃ. ৮৬-৭)। পুরাতন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিশাল জামি' মসজিদের মিনারটির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, উহা তখন বিপজ্জনকভাবে হেলিয়া পড়িয়াছিল, কাসাবা এবং বানূ জামি'গণের প্রাসাদ "কাসরু'ল-'আরূসায়ন, দুনিয়াতে অতুলনীয় বিস্ময়" তখন ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু নহে (রিহ্লা, পৃ. ৯৪-৫)। তখন সেখানকার আবহাওয়া যেইরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল সেইরূপ আর কখনও ছিল না, অধিবাসিগণের চেহারা পাংশুবর্ণের, এক ধরনের চিরসবুজ উদ্ভিদের (আল-জিফলা) কারণে প্রায়ই মহামারী দেখা দিত। আত-তীজানী উহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সেইগুলির কারণে 'আয়নু'ল-আমীর এবং 'আয়নু'স-সালাম নামক দুইটি ঝরনা থাকা সত্ত্বেও পানি দূষিত হইত।

অতএব, আমাদিগকে ১৬ শতকের শুরুর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, অর্থাৎ Leo Africanus-এর বিবরণীর জন্য। তিনি ১৫১৭ খৃ. তিউনিসিয়া সফর করেন (Description, ২খ, ৩৯৮)। তিনি কাবিসের উন্নয়নের আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। মনে হয় যে, তখন পর্যন্ত উহা "খুব বড় শহর ছিল" এবং পুরাতন শহর তখন পর্যন্ত "উচ্চ প্রাচীন দেওয়াল" দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু "আরবদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ফলে" শহরটির পতন শুরু হয়। অধিবাসিগণ সকলেই বিভিন্ন মরূদ্যানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। "উহাদের গায়ের চামড়া কালো। উহারা কৃষিকাজ করে অথবা মাছ ধরে, দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করে, সব সময়েই উহারা আরবদের এবং তিউনিসিয়ার রাজার সৃষ্ট চাপের মধ্যে কালাতিপাত করে (Description, ২খ, ৩৯৮)। সংক্ষেপে শহরটির ধ্বংসের আর কিছু বাকী ছিল না; ইহার ফল-মূলের প্রাচুর্যের, ইহার শিল্প-কারখানার, চতুর্দিকে ইহার রফতানী দ্রব্যাদির আর কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। ইহার বন্দরের কর্মব্যস্ততা সম্বন্ধে বা ইহার বাজারগুলি সম্বন্ধে আর একটি শব্দও জানা যায় না; নিরাপত্তাহীনতা ইহার ব্যবসা-বাণিজ্যকে শেষ করিয়া দিয়াছিল। আন্তঃসাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, উহার অবস্থাও একইরূপ হইয়াছিল। এই বাণিজ্যের ফলে নিঃসন্দেহে কৃষ্ণদেহী ক্রীতদাসদের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। ফলে কালক্রমে অধিবাসিগণের গাত্রবর্ণের পরিবর্তন ঘটে, দীর্ঘদিনের দারিদ্র্যের কারণে রঙের বিভিন্নতা শেষ পর্যন্ত একটি সাধারণ গাত্রবর্ণে পরিণত হয়।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে V. Guerin প্রাচীন প্রাচীরটির আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পান নাই; মানযিল এবং জারা-তে পুরাতন, জীর্ণ-ঘরবাড়ী ছাড়া আর কিছুই তখন বিদ্যমান ছিল না; F. Laffite এবং J. Servonnet-এর মতে সেইগুলি আর আদৌ গৃহ নামে পরিচিত হইবার মত ছিল না। মানযিল-এর জনসংখ্যা তখন ছিল ৩,৫০০ আর জারার জনসংখ্যা ৪,০০০ আর সমগ্র মরূদ্যানের জনসংখ্যা তখন ছিল ১০,০০০। ১৮৭৩ খৃ. Captain Roudaire একটি খাল খনন দ্বারা কাবিসকে কাবিস উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি অভ্যন্তরীণ কৃত্রিম উপসাগর সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা করেন, উহা দ্বারা শাত্ত (شط) অঞ্চলটি পানিতে তলাইয়া যাইত কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষার পরে তাঁহার পরিকল্পনাটি অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ভৌগোলিক তথ্যসমূহ (বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজানো) (১) ইব্ন খুর্রাদাযবিহ্, মাসালিক, এবং (২) ইব্নু'ল-ফাকীহ, বুলদান, হাজ-সাদোক কর্তৃক Description du Maghreb নামে সম্পাদিত এবং আংশিকভাবে অনূদিত, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., ৬-৭ এবং নোট ৫৭, পৃ. ৩০-১; (৩) য়া'কূবী, বুলদান, অনু. G. Wiet, Les pays, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ২০৮; (৪) ইব্ন হাওকাল, সূরাতু'ল-আরদ, বৈরূত, তা. বি. পৃ. ৭২-৭৩ (অনু. Kramers-Wiet, ৬৬-৭); (৫) মুকাদ্দাসী, আহসানু'ত-তাকাসীম, সম্পা. এবং আংশিক অনু. Ch. Pellat, অনূদিত সংস্করণের নাম Description de l'Occident...., আলজিয়ার্স ১৯৫০ খ., পৃ, ৪-৫, ১২-১৩, ৬৪-৫, ৬৬-৭; (৬) বাক্রী, মাসালিক, এবং অনু. De Slane, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., ৭/২২, ১৭-১৯/৪১-৪৪, ১৯/৪৫, ৪৭/১০২, ৮৫/১৭২; (৭) ইদরীসী, নুযহা, আংশিক সম্পা. H. Peres, আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৭৬-৭, ৮৯, ৯৪; (৮) য়াকূত, বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৪খ., ২৮৯-৯০; (৯) 'আবদারী, রিহ্লা, সম্পা. এ. ইব্ন জাদ্দূ, কন্সট্যানটাইন তা. বি., পৃ. ৬৮-৬৯; (১০) তীজানী, রিহ্লা:, তিউনিস ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৫৮, ৬৮, ৭১, ৮৬-১১৭, ১৩২; (১১) সাফিয়্যুদ-দীন আল-বাগদাদী মারাসি.দ, সম্পা, 'আলী মুহাম্মাদ আল-বিজাবী, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.,৩খ, ১০৫৪; (১২) Leo Africanus, Description de l' Afrique, অনু. A Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ৩৯৮, ৫৪৯; (১৩) আল-ওয়াযীর আস-সার্রাজ, হুলাল, সম্পা. এম. এইচ. আল-হীলা, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., ১খ, ৩৪২-৭৩, ৮৪৭-৮, ৯৬২; (১৪) V. Guerin. Voyage Archeologique dans la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৬২ খৃ., ১খ, ১৯০-৭; (১৫) Zaccone. Notes sur la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৭৫ খৃ., প. ১৫২-৬২; (১৬) Rebillet, Le Sud de la Tunisie, Sousse ১৮৮৬ খৃ., প. ১৫-১০১; (১৭) F. Laffite ও J. Servonnet , Le Golfe de Gabes en 1888, প্যারিস ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ২১৬-৪০. ৩১৫-৩২; (১৮) Maunoir, Journal de route, প্যারিস ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৬৭-৭১। গবেষণা (১৯) A. Bechraoui, La vie rurale dans les oasis de Gabes (পি. এইচ. ডি. থিসিস, ৩য় পর্যায়, ১৯৭০ খৃ.); (২০) R. Brunschvig, La Berberie Orientale

sous les Hafsides, প্যারিস ১৯৪০-৭ খৃ. নির্ঘন্ট; (২১) L. Carton, Essai sur les travaux hydrauliques des Romains dans le sud de la regence de Tunis, in Bull. Arch., তিউনিস ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ৪৩৮-৬৫; (২২) J. Despois, L'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫৮ খৃ. নির্ঘন্ট; (২৩) Ch. Diehl, L' Afrique byzantine. প্যারিস ১৮৯৬ খৃ., ১খ, ২২৮-৩৩, ২খ, ৪১৪, ৫৩৫; (২৪) L. Foucher, Hadrumetum, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩২১-২২; (২৫) J. Ganiage, Les origines du protectorat francais en Tunisie (1861-1881), প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৩৬, ১৩৮, ১৪৫-৬, ২১৯-৩৬, ৪৬৭; (২৬) S. D. Goitein, A mediterranean society, Los Angeles ১৯৬৭ খৃ., ১খ, ১০২, ২৭৮, ২৭৯, ৪৬৯; (২৭) S. Gsell, Histoire ancienne de l' Afrique du Nord, প্যারিস ১৯১৩-২৮ খৃ., ১খ. ৬৪-৬৬, ২০৩-৪, ২খ, ১২৫-৬, ৫খ, ২৪৭; (২৮) J. Hilaire, Compte-rendu des fouilles executees en 1898 sur l'emplacement de Tacapas, in Bull. Arch., তিউনিস ১৯০০ খৃ., ১১৫-২৫; (২৯) এইচ. আর. ইদ্‌রীস. La Berberie orientale sous les Zirides, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩০) Ch. A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ. ইংরেজী অনু. লন্ডন ১৯৭১ খৃ.,নির্ঘন্ট; (৩১) A. Laroui, L'histoire du Maghreb, প্যারিস ১৯৭০ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩২) G. Marcais, L' Architecture musulmane d'Occident, প্যারিস ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৭৭-৭৮; (৩৩) A. Martel, Les confins saharotripolitains de la Tunisie (1881-1911), প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩৪) মারযূকী, কাবিস জান্নাতু'ল-আব্‌দ', তিউনিস ১৯৬২ খৃ. পৃ. ৩১০ (৩৫) J. F. Monlezun, Les ruines de Tacapas in Bull. Arch. তিউনিস ১৮৮৫ পৃ., পৃ. ১২৬-৩১; (৩৬) P. Romanelli, Storia delle province romane dell` Africa, রোম ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩৭) Ch. Tissot, Geographie comparee de la province romaine d'Afrique, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ., ২খ, ৩১, ১৯৬; (৩৮) B. Torki La dessaharisation nucleaire=retablissement de la mer interieure au Maghreb Central, Technical Report no. 23 (1968) of Commissariat a l`Energieatomique, তিউনিস; (৩৯) এ. এস. যাগলুল, তা'রীখু'ল-মাগরিবি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., নির্ঘন্ট; (৪০) B. Orgels, L'oasis de in Gabes, Correspondance d'Orient ১৯৬৮ খৃ.। (৪১) M. Talbi, L'Emirat aghlabide, Paris 1966, নির্ঘন্ট।

M. Talbi (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

আল-কাবিসী (القابسي) ঃ অথবা ইবনু'ল-কাবিসী, আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালাফ আল-মা'আফিরী (৩২৪/৯৩৫-৪০৩/১০১২), কায়রাওয়ানে মালিকীপন্থিগণের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি, যিনি ইব্‌ন আবী যায়দ-এর (মৃ. ৩৮৬/৯৯৬) মৃত্যুর পর তাহাদের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা আল-মা'আফিরিয়্যীনের গাবেস (Gabes) অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং কায়রাওয়ানের এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, আল-কাবিসী, ইব্‌ন আবী যায়দ ও সীদী মাহ্‌রেয (মুহ্‌রিয ইব্‌ন খালাফ) পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। কারণ তাঁহাদের পিতারা তিন ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইফরীকিয়্যাতে তাঁহার প্রধান শিক্ষকগণ ছিলেন আবু'ল-আব্বাস আল-ইবয়ানী (যিনি শাফি'ঈ ভাবাপন্ন তিউনিসীয় ছিলেন), ইব্‌ন মাসরূর আদ-দাববাগ ও দাররাস আল-ফাসী, শেষোক্ত ব্যক্তি আশ'আরী মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি আস-সাবা'ঈ ও আল-জাবানয়ানী নামক কায়রাওয়ানের দুইজন একনিষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। (৩৫২/৯৬৩ সন হইতে ৩৫৭/৯৬৮ সন পর্যন্ত তিনি দেশভ্রমণ (রিহলা) করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন দাররাস আল-ফাসী ও স্পেনীয় আল-আসীলী। তিনি অন্ধ ছিলেন বিধায় তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার সচিবের কাজ চালাইতেন। নিজকে ফিকহশাস্ত্রে নিয়োজিত করিবার পূর্বে তিনি কুরআন 'পঠন' শিক্ষা দিতেন। আশ'আরী ভাবাপন্ন একজন 'উসূল-শাস্ত্রবিদ' হিসাবে ইবনু'ল-মাওওয়াযের রচনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তবে সর্বোপরি তিনি ছিলেন উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন একজন হাদীছবেত্তা এবং তিনি মাগরিবে আল-বুখারীর 'সাহীহ' প্রচার করেন। আল-কাবিসীর প্রতি আরোপিত ইহার একটি "রিওয়াত"-এর সহিত আমাদের পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে আমরা 'মুওয়াত্তা'র হাদীছসমূহের একটি সংকলনের উল্লেখ করিতে পারি যাহা বিশেষ করিয়া স্পেনে সমাদৃত হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের আচরণ বিধির উপর রচিত তাঁহার একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুপ্রেরণার মূলে ছিল মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহনূনের একটি রচনা। আরও রহিয়াছে একটি বৃহদাকার অথচ অসম্পূর্ণ হাদীছ সংকলন যাহাতে বিষয়গুলি 'ফিকহে'র শিরোনামের ক্রমানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; কুরআনের ব্যাখ্যা 'ইবাদাতের রীতিসমূহ, ঈমানের অঙ্গসমূহ, হাজ্জের রীতিনীতি, 'রিবাত', 'আদালা'ও সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে আপত্তি, আল্লাহ্‌ ভীতি, অনুশোচনা (ইসতিগফার) প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ পুস্তিকা; আল-'আশ'আরী সম্পর্কে এবং 'বাকরীয়'দের (Bakrites) যুক্তির বিরুদ্ধে লিখিত তাঁহার দুইটি রচনাও রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন আবী যায়দ ও ইব্‌ন শিবলূনের মৃত্যুর পর তিনি উচ্চ প্রাধিকারসম্পন্ন একজন বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাদীসের সেবিকার ভ্রাতুষ্পুত্রের (বা ভাগিনেয়ের) ঘটনায় কায়রাওয়ানের আইনজ্ঞগণের মুখপাত্র ও 'শায়খ' হিসাবে তাঁহার ভূমিকা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হয়। তাঁহার অসংখ্য শাগরিদ ছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াও তিনি প্রায় আশিজন কায়রাওয়ানী আন্দালূসীয় ও মাগরিবী ছাত্রকে শিক্ষা দানে নিয়োজিত ছিলেন। আবূ বাক্‌র ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান ও আবূ 'ইমরান আল-ফাসী তাঁহার প্রধান উত্তরসূরি, তাঁহারা ইফরীকিয়্যাতে মালিকী মাযহাবের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটি যীরিদের (Zirids) ও ফাতিমীদের (Fatimids) বিরোধের কারণে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'ইয়াদ, তারতীবু'ল-মাদারিক, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ. ৩খ, ৬১৬-২১; (২) ইব্‌ন নাজী, মা'আলিমু'ল-ঈমান, তিউনিস ১৩২০ হি., ৩খ, ১৬৮-৮০; (৩) আহওয়ানী, আত-তা'লীম ফী রা'য়ি'ল কাবিসী,

কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (৪) H. R. Idris, Deux juristes kairouanais de l'epoque ziride: Ibn Abi Zayd et al-Qabise, in AIEO, আলজিয়ার্স ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৭৩-৯৮; (৫) ঐ লেখক, Fetes chretiennes celebrees en Ifriqiya a l'epoque ziride, R. Afr., ১৯৫৪ খৃ., ২৬১-৭৬; (৬) ঐ লেখক, মানাকিব-এর সম্পাদনা, Publ. de la Fac. des Letters d'Alger, ৩১খ, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, La Berberie Orientale sous les Zirides, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., নির্ঘণ্ট।

H. R. Idris (E. I.[2])/আবূ মুহাম্মাদ আসাদ

আল-কা'বী আবুল-কাসিম (الكعبى ابو القاسم) ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহমূদ আল-কা'বী আল-বাল্খী একজন যুক্তিবাদী, 'ইলমু'ল-কালাম (ধর্মতত্ত্ব)-শাস্ত্রে বাগদাদের মু'তাযিলী দলের প্রখ্যাত নেতা এবং বহু গ্রন্থের লেখক। তিনি জন্মসূত্রে বানূ কা'ব (بنو كعب) নামক একটি গোত্রের সহিত সম্পর্কিত। এইজন্য তাঁহার বংশগত নিসবা আল-কা'বী এবং বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহর বালখে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহার জন্মভূমি নির্দেশক নিসবা আল-বালখী। তিনি আবু'ল-কাসিম আল-কা'বী, আল-মু'তাযিলী নামেই সমধিক পরিচিত। কাশফু'জ-জুনূন-এর গ্রন্থকার হাজ্জী খালীফা ভুলক্রমে আল-কা'বী-র প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ-এর পরিবর্তে আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আল-কা'বীর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। ইব্ন খাল্লিকান ও তাঁহার অনুসরণে ইব্ন কাছীর ও অন্যান্য লেখক আল-কা'বীর-এ মৃত্যু তারিখ শা'বান মাসের প্রারম্ভে ৩১৭/৯৩১ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সম্ভবত সঠিক সন ৩১৯/৯৩৩। স্বদেশে শিক্ষাকালের পর বাগদাদে দীর্ঘকালে অবস্থান করিয়া তিনি স্বীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ জীবনে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাল্খ শহরেই ইনতিকাল করেন।

ইসলামী বিষয়সমূহ, বিশেষ করিয়া কু'রআন, হাদীছ ও 'ইলমু'ল-কালামে আল-কা'বী গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 'ইলমু'ল-কালাম (ধর্মতত্ত্ব) ও উসূলু'ল-ফিক্হ (ইসলামী আইনতত্ত্ব)-এর কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্নে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ ছিল। তাঁহার মতবাদের অনুসারীরা কালামশাস্ত্রের ইতিহাসে আল-কা'বিয়ী নামে খ্যাত। আহলু'স-সুন্না ও মু'তাযিলীদের মধ্যে 'ইলমু'ল-কালামের যে কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে। আহলু'স-সুন্না-এর মতে আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁহার যাত বা সত্তা হইতে স্বতন্ত্র, মু'তাযিলীদের মতে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত অভিন্ন। আল-কা'বীও এই মত পোষণ করিতেন। অধিকন্তু তিনি আল্লাহর ইচ্ছা (ইরাদা), শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি গুণকে তাঁহার জ্ঞান ('ইল্ম) অর্থে ব্যাখ্যা করিতেন। আল্লাহ সব কিছুর দ্রষ্টা ও শ্রোতা—এর অর্থ তিনি সর্বজ্ঞ। আল-কা'বী বলিতেন, মানুষের কৃতকর্মের সহিত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা (ইরাদা) নিরূপণ ও নির্ধারণ (কাদা' ও কাদার) সম্পৃক্ত নহে। কেননা তাহা হইলে মানুষের কৃত পাপ কার্যের সহিত আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং কাদা' ও কাদার সম্পৃক্ত হয়। এমতাবস্থায় মানুষকে স্বীয় পাপ কার্যের জন্য দায়ী করা সঙ্গত হইতে পারে না। আল-কা'বী তাঁহার মতবাদের সমর্থনে বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ১২ খণ্ডের বৃহৎ তাফসীর ও আল-মাকালাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক কালে সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যে আহলু'স-সুন্না-র ধর্মীয় মতাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতুরীদী আস-সামারকান্দী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪)। তিনি তাঁহার কিতাবু'ত-তাওহীদ ও তা'বীলাতু আহলি'স-সুন্না নামক সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে আল-কা'বীর উপরিউক্ত মতবাদ এবং ইহার সমর্থনে প্রদত্ত প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আল-কা'বীর নিম্নোক্ত তিনখানা গ্রন্থের সমালোচনায় তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করেন ঃ (১) কিতাবু রাদ্দি আওয়া'ইলি'ল-আদিল্লা লি'ল-কা'বী (كتاب رد اوائل الادلة للكعبى); (২) কিতাবু রাদ্দি তাহযীবি'ল-জাদাল লি'ল-কা'বী (كتاب رد تهذيب الجدل للكعبى) এবং (৩) রাদ্দু কিতাবি ওয়া'ঈদি'ল-ফুসসাক লি'ল-কা'বী (رد كتاب وعيد الفساق للكعبى)। ইমাম আলমাতুরিদীর উপরিউক্ত গ্রন্থাদি হইতেই প্রত্যক্ষভাবে আল-কা'বীর রচনাদি ও মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বর্তমানে তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থেরই খোঁজ পাওয়া যায় না।

সিফাত সম্পর্কিত আল-কা'বীর মতবাদের খণ্ডনে ইমাম আল-মাতুরীদী যেই সব প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়াছেন উহাদের সংক্ষিপ্তসার হইল ঃ আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি সেই সকল গুণে গুণান্বিত এবং উহা তাঁহার সত্তা হইতে মূলত ভিন্নও নহে এবং অভিন্নও নহে, কেননা নির্গুণ সত্তার অস্তিত্বই অকল্পনীয়। আল-কুরআনে আল্লাহ্ সম্পর্কে বলা হইয়াছে তিনি সামী'উন (سميع=সর্বশ্রোতা), তিনি বাসীর (بصير =সর্বদ্রষ্টা) এবং তিনি 'আলীম (عليم সর্বজ্ঞ)। কাজেই শ্রবণ ও দর্শন দুইটি স্বতন্ত্র গুণ—এই দুইটি গুণকে জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করা অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে আল-কা'বী যে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট। কেননা তাঁহার উপরিউক্ত অভিমত কুরআন ও হাদীছের পরিপন্থী।

আল্লাহ্ তা'আলার কাদা' ও কাদার এবং ইরাদা (ইচ্ছা) সর্বব্যাপী হওয়া সম্পর্কে আল-কা'বী যে সন্দেহের অবতারণা করিয়াছেন ইমাম আল-মাতুরীদী কুরআন ও হাদীছ হইতে প্রমাণাদি দিয়া উহা নিরসন করিয়া বলেন ঃ আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের ভাল মন্দ কোনও কার্যই সংঘটিত হইতে পারে না। পাপ কার্যের সহিত আল্লাহ্র ইচ্ছা, জ্ঞান ইত্যাদি পাপ কার্য হিসাবেই সম্পৃক্ত হয়, ভাল কার্যের সহিত তাঁহার ইচ্ছা ভাল কার্য হিসাবেই সম্পৃক্ত হয়, এই কারণেই মানুষ স্বীয় কৃতকার্যের জন্য দায়ী, আল্লাহ্ দায়ী নহেন।

অন্য একটি বির্তকিত বিষয় হইল ঃ কাবীরা গুণাহ্ বা গুরুতর পাপের পরিণাম সম্পর্কে। খারিজীদের অভিমত ঃ কাবীরা গুনাহ্ করিলে মুসলিম কাফিরে পরিণত হয় এবং তাওবা না করিয়া মারা গেলে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে। মু'তাযিলাদের অভিমত ঃ এইরূপ ব্যক্তি মু'মিনও নহে এবং কাফিরও নহে, তবে সে চিরজাহান্নামী হইবে। মু'তাযিলাদের এই অভিমতের সমর্থনে আল-কা'বী আল-কুরআনের দুইটি আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন ঃ (১) "আর কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন, সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে" (৪ ঃ ১৪); (২) "কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হইবে ... ..." (৪ ঃ ৯৩)। ইমাম আল-মাতুরীদী

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আয়াতদ্বয়ে এবং অন্য যে সব আয়াতে স্থায়ী শাস্তির উল্লেখ আছে সেইগুলি কাফিরদের অথবা যাহারা পাপ কার্যকে বৈধ মনে করিয়া উহাতে লিপ্ত হয় তাহাদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা আল-কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনও মু'মিন জাহান্নামে চিরস্থায়ী হইবে না এবং সকল কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হইবে। এইজন্যই আহলু'স-সুন্না এই সম্পর্কে উপরিউক্ত ঐকমত্য পোষণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আল-মাতুরীদীর তীব্র সমালোচনার ফলে মুসলিম প্রাচ্যে মু'তাযিলী মতবাদ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী, আল-ফার্‌ক বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১খ, ৩৮৪; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ২৪৮; ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, কায়রো, ১১খ, ২৬৪; (৪) আল-মাকরীযী, খিতাত, কায়রো ১৩৪২ হি., ১খ, ১৬৮; (৫) হাজ্জী খালীফা কায়রো ১২৪৮ হি., ১খ. ১৯১; (৬) 'আবদুল্লাহ মুসতাফা আল-মারাগী, আল-ফাত্‌হু'ল-মুবীন, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১খ, ১৭০-৭১; (৭) ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী, আল-'আকীদাতু'ল-ইসলাম ওয়া'ল ইমাম আল-মাতুরীদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ২৫৪, ২৭৩, ২৮৭, ৪০৮, ৪৫৫।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

কাবীর (كبير) ঃ ১৫শ শতাব্দীর জনৈক ভারতীয় মরমী সাধক। হিন্দু, মুসলিম উভয়েই তাঁহাকে স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করিত। হিন্দী কবিতার এক বিরাট সংকলন তৎপ্রতি আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তথ্যের প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। তাঁহার জীবন কাহিনীও অনুরূপ অনিশ্চয়তা বিজড়িত। নানা উপাখ্যানের দরুন ইহা অস্পষ্ট। কথিত আছে, তিনি ছিলেন জনৈক মুসলিম তাঁতীর পুত্র বা পালিত পুত্র। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কারক রামানন্দের শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। রামানন্দ কাশীতে ব্রাহ্মণ ও সূফীদের সহিত যে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক যুক্তি-তর্ক করিতেন, কাবীর গুরুর পদপ্রান্তে বসিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন। বস্ত্র-বয়ন ছিল তাঁহার জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং তিনি বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনে সন্তানাদির জনক হন বলিয়া অনুমতি হয়। যোগীদের পেশাদারী সন্ন্যাসের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন অবজ্ঞাপূর্ণ; হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীর প্রতিও তেমনি ছিলেন উদাসীন। যে অসীম সাহসিকতার সহিত তিনি একেশ্বরবাদ সম্পর্ক তাঁহার মরমী ভাবধারা কীর্তন করিতেন, তাহার ফলে তাঁহাকে নানা নির্যাতনের সম্মুখীন হইতে হয়। তদ্দরুন তিনি ১৪৯৫ খৃ. প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে কাশী হইতে বিতাড়িত হন এবং ১৫১৮ খৃ. বাস্তী জিলার মাগ্‌হার-এ মৃত্যুবরণ করেন বলিয়া কথিত আছে। লোক-কাহিনী অনুযায়ী তাঁহার মৃতদেহ-সৎকার লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলিম শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাধে। প্রথমোক্ত দল তাঁহাকে দাহ করিতে ও শেষোক্ত দল কবর দিতে চাহে কিন্তু আবরণ তুলিয়া তাঁহার মৃতদেহের স্থলে তাঁহারা এক স্তূপ পুষ্পমাত্র দেখিতে পায়। হিন্দুরা এগুলির অর্ধেক কাশীতে লইয়া দাহ করে এবং মুসলিমগণ অবশিষ্টগুলি মাগ্‌হারে কবর দেয়; সেখানে তাঁহার সমাধির তত্ত্বাবধানের ভার অদ্যাপি মুসলিম কাবীরপন্থীদের হস্তে ন্যস্ত আছে। কাবীরের সমসাময়িকদের ন্যায় আধুনিক পণ্ডিতগণও তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মদ্বয়ের একটি বা অন্যটির লোক বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। H. H. Wilson (পূ. গ্র., ৬৯, ৭৪) ও আর. জি. ভান্ডারকরের (পূ. গ্র., ৬৯) মতে তিনি ছিলেন হিন্দু। পক্ষান্তরে G. H. Westcott-এর মতে তিনি ছিলেন মুসলিম। আবার G. A. Grierson-এর মতে (JRAS. 1907, p. 325. 429) তিনি তাঁহার মতগুলি খৃষ্টান সূত্র হইতে প্রাপ্ত হন, কিন্তু এই শেষোক্ত ধারণা ভিত্তিহীন এবং কাল্পনিক। তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি বলেন, "আত্মধ্যানকে আমার 'জিন' করিতে ও আল্লাহ্-প্রেমের রেকাবে আমার পা রাখিতে দাও। .... আর যাহারা নিজেদের বেদ বা কুরআন হইতে দূরে রাখে, তাহারাই নিপুণ অশ্বারোহী।" তিনি নিজস্ব কোনও ধর্মীয় বা দার্শনিক মত উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন নাই; বরং স্বীয় যুগের প্রচলিত বৈষ্ণব মতকে জনপ্রিয় করেন, কিন্তু ইহাকে কোনও নির্দিষ্ট অবতারের সহিত সংযুক্ত করেন নাই, তিনি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে উদাসীনভাবে রাম, হরি বা আল্লাহ্ শব্দের ব্যবহার করিতেন। তিনি উপবীত, জাতিভেদ, মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের বাহ্য আচরণ প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলিমদের প্রামাণিক গ্রন্থাবলী, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসমূহ (যথা ঃ কুরআন, খাৎনা, হাজ্জ, মোল্লা, কাদী ইত্যাদি) সম্পর্কে তিনি যে সকল উক্তি করেন, তাহাতে উহাদের বৈধতা অস্বীকৃত হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌কে সর্বব্যাপী সত্তারূপে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু মানুষের আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে প্রেমের মধ্যে দিয়াই আল্লাহ্‌র সহিত মানবাত্মার মিলন ঘটিতে পারে, জ্ঞান বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মারফতে নহে। দৈনন্দিন জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুন এবং তাঁহার সহজবোধ্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তাঁহার নীতিমালাকে এমন সুন্দররূপে প্রকাশ করিতেন যে, অশিক্ষিত লোকের নিকট তাহা সহজে গ্রহণীয় হইত। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার অনুসারীদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দাবিস্তানের মাযাহিব, কলিকাতা ১৮০৯ খৃ., পৃ. ২৪৬-২৪৮, Transl. Shea and Troyer (Paris 1843), ii. 186-191; (২) H. H. Wilson, Essays on the Religion of the Hindus (London 1862), i., 68 প.; (৩) Gli scritti de Padre Marco Della Tomb, racolti..... da A. di Gubernatis (Florence 1878). p. 191 পৃ., 205 প.; (৪) E. Trumpp, Gemerkungen uber den indischen Reformator Kabir, in Atti del iv. Congresso internat. degli Orientalisti (Florence 1880-81), ii 159 প.; (৫) Kabir-charitra, edited by Pandit Walji Bechar (Surat 1881); (৬) G. H. Westcott, Kabir and the Kabir Panth (কানপুর ১৯০৭ খৃ.); (৭) M. A. Macauliffe, The Sikh Religion (Oxford 1909), vi 122 প.; (৮) One Hundred Poems of Kabir, translated by Rabindranath Tagore assisted by Evelyn Underhill (London 1914); (৯) Ram Chandra Bose, Hindu Heterodoxy (Calcutta 1887), chap. x.; (১০) Sir R. G. Bhandarkar, Vaismavism, Saivism and minor religious systems (Encyclopaedia of Indo-Aryan Research,

vol. iii., Part 6). p. 67-73; (১১) The Bijak of kabir translated by the Rev. Ahmad Shah (Hamirpur 1917) (১২) G. N. Farquhar, An Outline of the Religious Literature of India. p. 331-5 (Oxford 1920) কাবীরের রচিত বলিয়া কথিত কোনও গ্রন্থই এ পর্যন্ত সমালোচনামূলে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তৎপ্রতি আরোপিত গ্রন্থগুলির তালিকার জন্য দ্র. Westcott. পূ., গ্র. p. 73-4, 169-172।

T. W. Arnold (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

কাবীরা বিন্ত আবী সুফ্য়ান (كبيرة بنت ابى سفيان) ঃ (রা) রাসূল (সা)-এর একজন সাহাবিয়্যা। বানূ খুযা'আ মতান্তরে বানূ ছাকীফা গোত্র সম্ভূত। পিতার নাম আবূ সুফ্য়ান মতান্তরে সুফ্য়ান। অনেকে কাবীরা (রা)-কে কাছীরা (كثيرة) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন মাকূলা (ابن ماكولا)-এর অনুসরণে আবূ মূসা তাঁহাকে কাবীরা নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইব্ন মানদা-এর অনুসরণে আবূ নু'আয়ম উল্লেখ করিয়াছেন কাছীরা নাম। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, ইব্ন ম্যাকূলার পূর্বে আল-খাতীবও তাঁহার নাম কাবীরা বলিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মতে কাবীরা বিনত আবী সুফ্য়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিকট হইতে সরাসরি হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। আল-খাতীব নিম্নলিখিত সনদে কাবীরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন সাম'উল য়াহ্য়া ইব্ন আবী ওয়ারাকা ইব্ন সা'ঈদ হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতা আবূ ওয়ারাকা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমার মনিব (مولا) কাবীরা বিন্ত আবী সুফ্য়ান আমার নিকট বর্ণনা করেন, উল্লেখ্য যে, তিনি (কাবীরা) জাহিলী যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করেন, তিনি বলেন, "আমি রাসূল কারীম (সা)-কে বলিলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জাহিলী যুগে আমার চার সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তুমি চারজন দাস মুক্ত করিয়া দাও। সুতরাং আমি আবূ সা'ঈদ, তৎপুত্র মায়সারা ও উম্মু মায়সারা (মায়সারার জননী)-কে মুক্ত করিয়া দেই।" আল-খাতীব বলেন, রাবী চতুর্থ জনের নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত রাবী অর্থাৎ আবূ ওয়ারাকা স্বয়ং চতুর্থ ব্যক্তি। কাবীরা (রা)-র মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি. ৫খ, ৫৩৮; (২) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৩০০; (৩) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯৬।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাবীল (দ্র. হাবীল)

কাবীলা (কাবা'ইল)

কাবীসা ইব্ন ওয়াক্কাস আস্-সুলামী (قبيصة بن وقاص السلمى) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তাঁহাকে আল-লায়ছী (الليثى) -ও বলা হয়। তিনি বসরায় (ভিন্নমতে মাদীনায়) বাস করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে তিনি মাত্র একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছটি আবূ হাশিম আল-মা'আফারানী-র উস্তাদ সালিহ ইব্ন 'উবায়দ ছাড়া আর কেহ রিওয়ায়াত করেন নাই এবং আল-মা'আফারানী [বা সাহিবু'ল-মা'আফারান-]-এর নিকট হইতে হাদীছটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন একমাত্র আবু'ল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী। হাদীছটি এই ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "এমন কিছু নেতার আবির্ভাব তোমাদের মধ্যে হইবে, যাহারা সালাত দেরী করিয়া পড়িবে!"

ইব্ন আবী হাতিম, আবূ দাউদ ও ইব্ন সা'দ প্রমুখ আবু'ল-ওয়ালীদ-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, কাবীসা সাহাবী ছিলেন। ইব্ন হাজার বলেন ঃ তাঁহাকে ইব্ন আবী খায়ছাম, আবূ 'আলী ইব্নু'স-সাকান ও আবূ যুর'আ আর-রামী' প্রমুখও সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রা) তাঁহার সাহাবী হওয়া সম্বন্ধে দৃঢ়মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহার বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে ইব্ন হাজার বলেন; তাঁহার লায়ছী হওয়াটাই অধিকতর সঠিক। আবু'ল-ফাত্‌হ আল-আয্‌দী এবং বাগাবীরও এই মত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২৩, নং ৭০৬৩, মিসর ১৩২৮ হি; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, ২খ, ১২৩, নং ৮০,. আল-মাদীনাতু'ল-মুনাওওয়ারা, তা. বি.; (৩) ঐ লেখক, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, ৮খ, ৩৫৯, নং ৬৩৪, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি; (৪) ইব্ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ২খ, ৫৪৭, নং ২২৮৬, হায়দরাবাদ ১৩১৯ হি.; (৫) আয্‌-যাহাবী, তাজ্‌রীদু-আস্‌মা'ইস-সাহাবা:, ২খ, ১১; বৈরূত তা. বি.।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজলী

কাবীসা ইব্ন ওয়ালিক (قبيصة بن والق) ঃ (রা) বানূ তাগলিব গোত্রের লোক। আবূ জা'ফার আত'-তাবারীর মতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। ইহার সমর্থনে তিনি ৭৭/৬৯৬ সনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। উমায়্যা খলীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ানের সময় খারিজীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাহাদের দমন করার জন্য হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, তাহাদের সঙ্গে কাবীসা ইব্ন ওয়ালিক (রা)-ও ছিলেন। যুদ্ধে তিনি খারিজীদের হাতে নিহত হইলে খারিজী নেতা শাবীব ইব্ন য়াযীদ তাহার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই ব্যক্তি (কাবীসা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল, অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।" অতঃপর সে তাঁহার লাশকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ 'তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি প্রথমে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তুমি সৌভাগ্যশীলই হইতে।'

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২৩, নং ৭০৬২।

মুহাম্মদ মূসা

কাবীসা ইব্ন জাবির (قبيصة بن جابر) ঃ আল-আসাদী আল-কূফী, কুনয়া আবু'ল 'আলা' (ابو العلاء)., প্রথম স্তরের একজন তাবি'ঈ, আসাদ গোত্রের লোক, কূফার অধিবাসী। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি বহু সম্প্রদায়ের লোক দেখিয়াছি কিন্তু 'উমার (রা) অপেক্ষা কুরআন মাজীদ ও আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি তালহা (রা)-র সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু তাঁহার তুলনায় অধিক দানশীল ব্যক্তি দেখি নাই। আমি মু'আবিয়া (রা)-এর সাহচর্যেও কাটাইয়াছি কিন্তু তাঁহার তুলনায় অধিক অধ্যবসায়ী আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি 'আম্‌র ইব্নু'ল-'আস (রা)-এর সাহচর্য

লাভ করিয়াছি কিন্তু তাঁহার তুলনায় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোক আর দেখি নাই। আবূ যুর্'আ আদ-দিমাশ্কী নিজস্ব সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করিয়াছেন, কাবীসা ইব্ন জাবির বলেন ঃ আমি মু'আবিয়া (রা)-র নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করিয়া দেন। তিনি আরও বলেন, "আমি ইহ্রাম অবস্থায় একটি হরিণ দেখিতে পাইয়া উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলাম। তীরের আঘাতে হরিণটি নিহত হইল। এই সম্পর্কে আমার মনে সংশয় সৃষ্টি হইলে আমি 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া সমাধান জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার পাশে 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-কেও উপস্থিত পাইলাম। তিনি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আমার মতে কাফ্ফারা হিসাবে একটি বক্রী যাব্হ করিলেই তাঁহার জন্য যথেষ্ট হইবে। 'উমার (রা) তাঁহার মত সমর্থন করিলেন এবং আমাকে একটি বক্রী যাব্হ করার নির্দেশ দিলেন।" কাবীসা (রা) হযরত 'আলী, তালহা, ইব্ন মাস'উদ, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে এবং আশ-শা'বী, 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'উমায়র, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন কারিব প্রমুখ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 'আলী ইবনু'ল-মাদীনী বলেন, কূফাবাসিগণ তাঁহাকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে 'উছমান (রা)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাবি'ঈ ছিলেন এবং ৬৯/৬৮৮ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৮; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, ২খ, ১২২; (৩) ইবনু'ল-আছীর উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৪খ, ১৯১।

মুহাম্মদ মূসা

কাবীসা ইব্ন বুরুমা আল-আসাদী (قبيصة بن برمة الاسدى)

ঃ (রা) বানূ আসাদ গোত্রের লোক। তিনি সাহাবী কি না ইহাতে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারীর মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। তাঁহার কোন কোন সন্তান তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ইবনু'স-সাকানের মতে তিনি সাহাবী বলিয়া কথিত। ইব্ন হিব্বানও অনুরূপ মত প্রকাশ করার পর তাঁহাকে তাবি'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আবূ হাতিম বলেন, তাঁহাকে যে সাহাবী বলা হইয়াছে তাহা সঠিক নহে। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ ও মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র য়াযীদ ইব্ন কাবীসা, পৌত্র 'উমার ইব্ন য়াযীদ, ভ্রাতুষ্পুত্র বুরমা ইব্ন লায়ছ ও সুলায়মান আল-বুনানী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কাবীসা (রা) বলেন, "আমি নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট একজন স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। আমার একটি সন্তানও বাঁচিয়া নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার কয়টি সন্তান মারা গিয়াছে ? সে বলিল, তিনটি পুত্র সন্তান। তিনি বলিলেন ঃ তুমি চূড়ান্তভাবে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিয়া গেলে।" তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "দুনিয়ায় সৎ এবং প্রভাবশালী লোকেরা আখিরাতেও প্রভাবশালী হইবে।" একদল বিশেষজ্ঞের মতে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ মুরসাল পর্যায়ের। কেননা তিনি ইব্ন মাস'উদ (রা) ও মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২২; (২) ইবনুল-আছীর, উস্দুল-গাবা, ৪খ, ১৯১।

মুহাম্মদ মূসা

কাবীসা ইব্ন যুআয়ব আল-খুযা'ঈ (قبيصة بن ذؤيب الخزاعى)

ঃ (রা) একজন উচ্চ স্তরের প্রবীণ তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ, মতান্তরে সাহাবী। উপনাম আবূ সা'ঈদ। তাঁহাকে আবূ ইসহাকও বলা হয়। তিনি বানূ খুযা'আ গোত্রীয় ছিলেন। বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ কাবীসা ইবন যুআয়ব ইব্ন হাল্হালা ইব্ন 'আম্র ইব্ন কুলায়ব ইব্ন আস্রাম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন কুমায়র ইব্ন হুব্শিয়্যা ইব্ন সালূল ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমর ইব্ন খুযা'আ বংশোদ্ভূত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় মদীনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জন্মতারিখ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র-এর মতে তিনি হিজরতের প্রথম বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে হুনায়ন যুদ্ধ দিবসকে তাঁহার জন্মদিন বলিয়াছেন। তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুসারে মক্কা বিজয়ের বৎসর তাঁহার জন্ম হয়। ইব্ন হাজার এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। জন্মলাভের পর তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আনয়ন করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জন্য বরকতের দু'আ করিয়াছিলেন। হিজরতের বৎসরকে তাঁহার জন্ম তারিখ ধরিয়া অনেকে তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইব্ন শাহীন ও আল-'আস্কারী তাঁহাকে সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইহা প্রমাণ করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সূত্রে তিনি যেইসব হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাদ্দিছগণ সেইগুলিকে মুরসাল সাব্যস্ত করিয়াছেন। তবে শৈশবে যে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে তিনি মদীনায় বসবাস করিয়াছেন, অতঃপর সিরিয়ার রাজধানী দামিশকে আবাস গ্রহণ করেন। তিনি খলীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ানের আস্থাভাজন ছিলেন। খলীফা তাঁহাকে অন্য সকলের উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি খলীফার চিঠিপত্র সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান ছিলেন। খলীফার নিকট প্রেরিত সকল চিঠিপত্র প্রথমে তিনি পাঠ করিতেন। অতঃপর খালীফাকে উহার বিষয়বস্তু জ্ঞাপন করিতেন। হাদীছ বিশারদদের মতে কাবীসা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক হাদীছের বর্ণনাকারী। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা), আবুদ-দারদা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট তিনি সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা), 'উমার (রা), 'আবদুর-রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা), 'উবাদা ইবনুস-সামিত (রা), জাবির (রা), 'আমর ইবনু'ল-'আস (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), তামীম আদ-দারী (রা), 'আইশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) হইতে তিনি যেই সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন সেইগুলি মুরসাল। মাকহূল, যুহ্রী, রাজা' ইব্ন হায়ওয়া, আবূ কিলাবা এবং পুত্র ইসহাকসহ বহুসংখ্যক তাবি'ঈ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বিচারক হিসাবে যেই সকল রায় দিয়াছেন সেইগুলি সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। ইমাম যুহ্রী বলেন, তাঁহার অপেক্ষা কোন বড় 'আলিম আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহার পিতা যু'আয়ব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্র রক্ষক ছিলেন। কাবীসা খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের শাসনামলে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহারা ৮৬ হি., ৮৭ হি., ৮৮ হি. ও ৮৯ হি. মোট এই চারটি মত উল্লেখ করিয়াছেন। তবে প্রথমটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ৮খ, ৩৪৬, ৩৪৭; (২) ঐ লেখক,

তাক্রীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত তা. বি., ২খ, ১২২; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৬২/১৩৮২ হি., ৪খ, ১ম ভাগ, ১৮৪, ১৮৫; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ., ১১; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮ হি., ৫খ, ১৭৬; (৬) আয-যাহাবী, তায্কিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৬/১৩৭৫, ১খ, ৬০; (৭) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, মিসর, তা. বি., ৩খ, ১২৭২, ১২৭৩; (৮) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৬; (৯) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্কী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ৯৭; (১০) মুহ্য়ি'দ-দীন ইব্ন শারাফ আন-নাওয়াবী, তাহ্যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর তা. বি., ২খ, ১ম ভাগ, ৫৬; (১১) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৯৭৬/১৩৯৬, পৃ. ১৯৭।

আ. ব. মু. সাইফুল ইসলাম

কাবীসা ইবনু'ল-আসওয়াদ (قبيصة بن الاسود) ঃ ইব্ন 'আমির আত্-তায়্যি (রা) সাহাবী, তায়্যি গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হন। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যায়দ আল্-খায়ল ইব্ন মুহালহাল (রা) [দ্র.]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২২; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ১৯০।

মুহাম্মদ মূসা

কাবীসা ইবনু'ল-বারাআ (قبيصة بن البراء) ঃ (রা) একজন সাহাবী। ইব্ন মান্দা বলেন, তিনি সাহাবী বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু তাহা প্রমাণিত নহে। ইমাম তাবারানী তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "যখন অমুক অমুক এলাকার জমি ধ্বসিয়া যাইবে তখন একদল লোকের আবির্ভাব হইবে, যাহারা কালো খেযাব ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না।" মুজাহিদ বলেন, আমি সেই সব এলাকা ধ্বসিয়া যাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এই হাদীছে নবী (স)-এর নাম উল্লেখ নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২২; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ১৯১।

মুহাম্মদ মূসা

কাবীসা ইবনু'ল-মুখারিক আল-হিলালী (قبيصة بن المخارق الهلالی) ঃ (রা) সাহাবী, বানূ হিলাল গোত্রের লোক, ডাকনাম আবূ বিশ্র (ابو بشر), বসরায় বাস করিতেন। ইব্ন খুযায়মা বলেন, তিনি সাহাবী কিনা তাহা আমার কাছে স্পষ্ট নহে। তিনি নিজ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কাবীসা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগিল। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ পরিধানের চাদর টানিতে টানিতে বাহির হইলেন। আমিও তখন মদীনায় তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি দীর্ঘ কিয়াম সহকারে দুই রাক'আত সালাত পড়িলেন।' অতঃপর সালাত শেষ করিলেন এবং সূর্য পরিষ্কার হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ ইহা হইতেছে মহান আল্লাহ্র নিদর্শন। তিনি ইহার মাধ্যমে বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব তোমরা এইরূপ ঘটিতে দেখিলে এই সালাতের ন্যায় সালাত পড়িও।" কুতন ইব্ন কাবীসা হইতে তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "ভবিষ্যতের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য পাখি উড়ানো, শকুন তত্ত্বের জন্য কিছু নিক্ষেপ করা এবং গণকের কথায় বিশ্বাস করা কুফরী রীতির অন্তর্ভুক্ত (ইসলামে ইহার কোন অনুমোদন নাই)।" তাঁহার নিকট হইতে আবূ কিলাবাও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২২-৩; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ, ৩০৯, ২খ, ৩৫; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ১৯২-৩; (৪) সুলায়মান ইব্নুল আশ'আছ, সুনান আবী দাঊদ, কিতাবু'ল-কুসূফ, কিতাবু'ল-কুহানা ওয়া'ত-তাতায়উর।

মুহাম্মদ মূসা

কাবীসা আল-মাখ্যূমী (قبيصة المخزومی) ঃ (রা) একজন সাহাবী। বানূ মাখ্যূম গোত্রে তাঁহার জন্ম। বলা হইয়া থাকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বার তৈয়ার করিয়াছিলেন। হাফিজ শামসু'দ-দীন আয্-যাহাবী তাজরীদ-এ বলেন, কোন কোন মাগ্রিববাসী (আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) পণ্ডিত ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন ফাত্হুন ও ইব্ন বাশ্কুওয়ালও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হান্তাব-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, কাবীসা (রা) মিম্বার তৈয়ার করিয়াছিলেন।

ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, যুবায়র ইব্ন বাক্কারও আখবারু'ল-মাদীনা গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভুলবশত তিনি নামে ب.-এর পূর্বে (ص) লিখিয়া দেখিয়াছেন قصيبه। ইবনু'ল-আছীর সংযোজিত আল-ইস্তী'আব-এর পরিশিষ্টেও এই রকম উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২৩, নং ৭০৬৪, মিসর ১৩২৮ হি.; (২) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, ২খ, ১১, নং ২১১, বৈরূত তা. বি.।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজলী

কাবীসা আস-সুলামী (قبيصة السلمی) ঃ (রা) একজন সাহাবী। বানু'দ-দারবান (بنو الضربان) বংশোদ্ভূত ছিলেন। 'উকায়ল ইব্ন তালহা (মতান্তরে 'উবায়দ ইব্ন তালহা) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আল-ওয়াকিদী কিতা'বুর-রিদ্দা-য় বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাবীসা একবার প্রতিনিধি হিসাবে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি ও তাঁহার কাওম মুরতাদ্দ হয় নাই। তখন আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে তদীয় গোত্র বানূ সুলায়ম-এ যাহারা মুরতাদ্দ হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দিলেন। কাবীসা প্রত্যাবর্তন করিয়া গোত্রের কিছু সংখ্যক অনুগতলোকের সহযোগিতায় মুরতাদ্দদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইলেন। এই যুদ্ধে হামীসা ইবনু'ল-হাকাম আস-সুলামী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে কাবীসা (রা)-র মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাওয়ার ফলে তিনি ইনতিকাল করেন।

এই কাবীসা ও কাবীসা ইব্ন ওয়াক্কাস আস-সুলামী স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি না অভিন্ন ব্যক্তি সেই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। আবু'ল-ফাত্হ আল-আযদী এই দুইজনের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, প্রথম ব্যক্তি লায়ছ গোত্রভুক্ত আর দ্বিতীয়জন সুলায়ম গোত্রের। আবু'ল-

কাসিম আল-বাগাবী ও ইব্ন কানি'-এরও এই মত। ইব্ন হাজার বলেন, "আমি জানি না ইনি কি এই কাবীসা (যাঁহার নিকট হইতে 'উবায়দ ইব্ন তালহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন), না অন্য কেহ অথবা পূর্বোক্ত ইব্ন ওয়াক্কাস?"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২২৪, নং ৭০৬৫, মিসর ১৩২৮ হি.; (২) ঐ লেখক, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৮খ, ৩৫১, নং ৬৩৪, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি.।

মুহাম্মদ মুহিববুর রহমান ফজ্‌লী

আল-কাবীসী (القبيصى) ঃ 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন 'উছমান ইব্ন 'আলী, আবু'স-সাকর, জ্যোতিষী। কাবীসা নামক দুইটি শহরের একটিতে তাঁহার জন্ম। একটি মাওসিলের দুই ফারসাখ (প্রায় ষোল কিলোমিটার) পূর্বে অবস্থিত কাবীসা (য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, ৪খ, ৩০৮, বৈরূত), অপরটি সামাররার নিকটে অবস্থিত। ইবনু'ন-নাদীম (সম্পা. Flugel, ২৬৫, ইবনু'ল-কিফতী কর্তৃক উদ্ধৃত, সম্পা. Lippert, ৬৪)-এর মতে তিনি মাওসিলের 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-'ইমরানী (মৃ. ৩৪৪/৯৫৫-৬)-এর অধীনে টলেমী (Ptolemy) রচিত আল-মাজিসত (Almagest) আমাদের সময়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়কে ইবনু'ল-কিফতী ৩৭০/৯৮০-১ সাল পর্যন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-কাবীসী প্রকৃতপক্ষে আল-'ইমরানী কর্তৃক তাঁহার In electionibus horarum-এ উল্লিখিত হইয়াছেন (J. M. Millas Vallicrosa, Las traducciones orientales, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৩৮৮)।

আল-কাবীসীর বিদ্যমান প্রধান ৫ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত আল-মাদখাল ইলা সিনা'আত আহকামিন নুজম (হাজ্জী খালীফা, ৫খ, ৪৭৩ ও ৪৭৬) আলেপ্পোর (হালাব) হামদানী শাসক সায়ফু'দ-দাওলা (৩৩৩/৯৪৪-৫ সন হইতে ৩৫৬/৯৫৬-৭ সন পর্যন্ত)-এর নামে উৎসর্গিত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কোন একটি উদাহরণে তিনি ৩১৭ য়াযদিজিরদ (৯৪৮-৯ খৃ.) বর্ষ উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থটির নাম হইতে মনে হয় যে, ইহা কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার মৌলিক নীতির প্রারম্ভিক প্রকাশমাত্র। ইহার বর্তমান গুরুত্ব মূলত আনদারযগার (Andarzghar) আল-কিনদী আল-হিন্দ, টলেমী; ডোরোথিউয়াস (Dorotheus) মাশা'আল্লাহ্ হারমেস (Hermes) এবং ভ্যালেন্‌স (Valens) হইতে উদ্ধৃতির জন্য। কিন্তু মধ্য যুগে ইহার অত্যধিক গুরুত্ব ছিল। অনেকগুলি আরবী পাণ্ডুলিপি (কিছু হিব্রু লিপিতে ইহার অন্তর্ভুক্ত) আছে, যদিও কোন ভাষ্য নাই। Ioannes Hispalensis ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে একখানা ল্যাটিন অনুবাদ ও ১৩৬২ খৃষ্টাব্দে Plerin de Pousse ফরাসী অনুবাদ (সম্ভবত ল্যাটিন হইতে) প্রকাশ করেন। আইওয়াননেসের ল্যাটিন অনুবাদ ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে এবং প্যারিসের Ioannes de Saxonia এবং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে V. Nabod ভাষ্য প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও সম্ভবত Fancesco degli Stabili (Cecco d'Ascoli) (১২৬৯-১৩২৭) গ্রন্থটির টীকা সংযোজন করেন।

আল-মাদখালের ভূমিকায় আল-কাবীসী তাঁহার কিতাব ফী ইছবাত সিনা'আত আহকামি'ন-নুজূম (এখন বিনষ্ট) গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। একইভাবে অপ্রাপ্ত রিসালাত 'ঈসা ইব্ন 'আলী ফী ইবতাল আহকামি'ন-নুজূম (আরও দ্র. আল বায়হাকী, তাতিম্মা)-এর কথাও জানা যায়। 'ঈসা ইব্ন 'আলী সম্ভবত সুপরিচিত হাররানী জ্যোতির্বিদ। তিনি বাগদাদ ও দামিশকে ২১৪/৮২৯-৩০ সাল এবং ২১৭/৮৩২-৩৩ সালে (নক্ষত্র) পর্যবেক্ষণ করেন। ইস্তাম্বুলের একটি পাণ্ডুলিপিতে (AS ৪৮৩২) আল-কাবীসীর তিনটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রহিয়াছে। এইগুলি (১) রিসালা ফী আনওয়া'ই'ল-আ'দাদ ওয়া তাওয়া'ইফ মিনা'ল-আ'মাল মিম্মা জামা'আহু মিন মুতাকাদ্দিমী আহ্লি'ল-'ইল্‌ম বি-হাযিহি'স-সিনা'আ (رسالة فى انواع الاعداد و طوائف من الاعمال مما جمعه من متقدمى اهل العلم بهذه الصناعة); (২) রিসালা ফি'ল আব-'আদ ওয়া'ল-আজরাম (رسالة فى الابعاد و الاجرام) এবং (৩) মা শাররাহাহু মিন কিতাবি'ল-ফুসূলি'ল-ফারগানী (ما شرحه من كتاب الفصول الفرغانى)। প্রথম দুইটি সায়ফু'দ-দাওলা-কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। রংধনু সম্বন্ধে একটি কবিতা দেখা যায়, যাহা ইব্ন খাল্লিকান (ওয়াফিয়াতু'ল-আ'য়ান, ৩খ, ৭৯, কায়রো সং.) বলেন যে, কেহ কেহ (আছ-ছা'আলিবী-র কিতাব য়াতীমাতি'দ-দাহ্‌র-এ অবস্থান নির্দেশ করা হয় নাই) সায়ফু'দ-দাওলার এবং অন্যরা কাবীসী-র প্রতি আরোপ করিয়াছেন। Ioannes Hispalensis কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত এবং Ioannes Sexonia কর্তৃক টীকা সংযোজিত আরও একটি গ্রন্থ De Planetarum coniunctionibus আলকাবিটিয়াস (Alchabitius)-এর প্রতি আরেপ করা হয়। Oronce Fine ১৫৫১ কর্তৃক ইহা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহা আল-মাদখালের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ নহে, যেমন Steihschneider বলিয়াছেন এবং সম্ভবত ইহা কখনই আল-কাবীসী কর্তৃক রচিত নহে। আল-বায়হাকী কিংবা হাজ্জী খালীফারও অজ্ঞাত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উল্লিখিত কতকগুলি আরবী উৎসে আল-কাবীসী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। (ক) আধুনিককালে (১) M. Steinschneider, Die hebraischen Ubersetungen, ৫৬১-২ ও Die europaischen Ubersetzungen, repr. Graz ১৯৫৬ খৃ., ৪৫-৬ গ্রন্থে; (২) Suter, ৬০-১; (৩) C. A. Nallino, আল-বাত্তানী, ১খ, ২৪৬, ৩০৯ ও Raccolta di scritti, ৫খ, ৩৩৮; (৪) Brockelmann, ১খ, ২৪৫ ও S I, ৩৯৯; তাহার Isagoge ও De Planetarum Coniunctionibus-এর ল্যাটিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ও সংস্করণ F. J. Carmody কর্তৃক অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং অনির্ভরযোগ্য আকারে তালিকাভুক্ত হইয়াছে; (৫) Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation, বার্কলে-লস এনজেলস ১৯৫৬ খৃ. ১৪৪-৫০ (বৃটিশ মিউজিয়াম, বিবলিওথেক ন্যাশনাল এবং হার্ভার্ড-১ সংস্করণের তালিকা বর্তমানে সেগুলি এখানে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে); (৬) Isagoge, সম্পা. Matheus Moretus de Brixia, Bologna ১৪৭৩ খৃ., Publ. E. Ratdolt, ভেনিস ১৪৮২ খৃ., সম্পা. Bartholomaeus de Alten de Nusia (Ioannes de Saxonia-এর ব্যাখ্যাসহ) E. Ratdolt, ভেনিস ১৪৮৫ খৃ.; (৭) I এবং G. de Forlivio, ভেনিস ১৪৯১ খৃ.। I. and G. de Gregoriis, ভেনিস ১৫০২ ও ১৫০৩ এবং M. Sessa, ভেনিস ১৫১২, সম্পা. Guilhelmus Huyon (Ioannes de Saxonia-র ভাষ্য ও Petrus Turrellus-এর টীকাসহ)। B. Trot. Leiden (১৫২০?) সম্পা. Antonius de Fantis Taruisinus (Ioannes de Saxonia-এর De

Planetarum coniunctionibus-এর ভাষ্যসহ), M. Sessa ও P. de Ravanis, ভেনিস ১৫২১ ও P. Liechtenstein, ভেনিস ১৫২১ ও প্রকাশিত (Ioannes de Saxonia-এর ভাষ্যসহ), প্যারিস ১৫২১। Enarratio elementorum astrologiac রূপে V. Nabod-এর ভাষ্য এবং প্রকাশিত হইয়াছিল, Cologne ১৫৬০; (৯) Cecco d'Ascoli-এর Commento all' Alcabizzo, P. G. Boffitto কর্তৃক সম্পাদিত, Firenze ১৯০২ (খ) De Planetarum coniunctionibus, সম্পা. Bartholomaeus de Altem (Ioannes de Saxonia-এর ভাষ্যসহ), E. Ratdolt, ভেনিস ১৪৮৫; (১০) I. and G. de Forlivio, ভেনিস ১৪৯১। ইহা ছাড়া Antonius de Fantis কর্তৃক Isagoge-এর সংস্করণ দ্রষ্টব্য। Oronce Fine কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ তাঁহার Les canons et documents tres amples touchant l'usage et parctique des communs almanachz, প্যারিস ১৫৫১ ও ১৫৫৭।

D. Pingree (E.I.[2]) / মুহঃ আবূ তাহের

কাবূল (کابل) ঃ কাবুল (১) আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি নদী, সিন্ধু নদীর উপনদী, ৭০০ কিলোমিটার লম্বা, উদ্ভব উনাই (Unai) গিরিপথের নিকট হইতে, অক্ষরেখা ৩৪°২৫ উত্তর, দ্রাঘিমা ৬৮°২০ পূর্ব। ইহার সুপ্রাচীন নাম কোফাস (Cophus)। কাবুল, জালালাবাদ ও নওশেহ্রা-র পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোহ্মান্দ পাহাড় শ্রেণী অতিক্রম করিয়াছে। অতঃপর পাকিস্তানের সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া ইহা আটক (Attock)-এর উত্তরে সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। উত্তর দিক হইতে পানজহির, আলিন্গার, কুনার ও সোয়াত এবং দক্ষিণ দিক লোগার, এই পাঁচটি উপনদীর স্রোতধারা ইহাতে প্রবাহিত হয়। হুদূদু'ল-'আলাম (৪/১০ শতকের শেষভাগ)-এ ইহাকে "লামগান-এর নদী"-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহা লাম্গান ও দুনগুর-এর সীমান্তে অবস্থিত পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া নানগাহার (অর্থাৎ জালালাবাদ জিলা) অতিক্রম করিয়া মুলতান পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া অতঃপর সাগরে পতিত হইয়াছে। আল-বীরূনী ইহাকে বলিয়াছেন, "গোরওয়ান্দ-এর নদী"। কারণ পানজহির নদীর একটি উপনদী গোরওয়ান্দ গিরিপথের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা হইতে এবং অন্যান্য ভৌগোলিকের বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে, সেই সময়ে কাবুল নদীকে সিন্ধু নদীর প্রধান ধারারূপে গণ্য করা হইত। খুব সম্ভব কাবুল নদী (ঋগ্বেদ— উক্ত সাতটি নদীর অন্যতম, সংস্কৃতে এই নদীর নাম কুভা = Kubha) হইতেই কাবুল অঞ্চলের এবং পরিণামে কাবুল শহরেরও নামকরণ হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার খৃ. পূ. ৩২৭ এই কাবুল নদী-উপত্যকা পথেই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই কাবুল নদীর পানি হইতে আফগানিস্তানের জালালাবাদ উপত্যকায় এবং পাকিস্তানের পেশাওয়ার জিলার কৃষি জমিতে ব্যাপকভাবে সেচ প্রদান করা হয়; নিম্নে দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Humlum et al., La geographie de l'Afghanistan, etude d'un pays aride, কোপেনহ্যাগেন ১৯৫৯ খৃ., ৪৬; (২) Pauly-Wissowa, Real Encyclopadie Reihe ১, ১১খ, ১৩৬১-৬২, দ্র. Kophen, Kophes; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ঢাকা, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ১৯৭২ খৃ., 'কাবুল'; (৪) দা. মা. ই., ১৭খ, ১।

২। কাবুল পূর্ব আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ ও একটি শহর, বর্তমানে আফগানিস্তানের রাজধানী এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। শহরটির অবস্থান ৩৪°৩০ উত্তর দ্রাঘিমাংশে ও ৬৯°১৩ পূর্ব অক্ষাংশে; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১,৭৫০ হইতে ১,৮০০ মিটার। কাবুল নদীর তীরে চতুর্দিকে পাহাড় ও পর্বতশ্রেণী বেষ্টিত একটি উর্বর, বৃষ্টিপাত ও জলপ্রবাহপূর্ণ সমতল ভূমি। যোগাযোগের অতি চমৎকার কেন্দ্র হওয়াতে প্রাচীনকাল হইতেই ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কাবুল নদী-উপত্যকার যোগাযোগ পথটির সঙ্গে হিন্দুকুশ পর্বতের আড়াআড়ি বিভিন্ন পথ এবং গায্না ও দক্ষিণ হইতে আগত পথসমূহ মিলিত হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব যুগে কাবুল অঞ্চল গ্রীক প্রভাবাধীন (Hellenized) ব্যাকট্রিয় রাষ্ট্রপুঞ্জের অংশ ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় যুগের প্রথমদিকেই ইহা উত্তর দিকের স্তেপভূমি হইতে আগত অভিযানকারিগণ, যথা ঃ কুশানগণ ও কিডারীগণ এবং পরে হেপহথালীয়গণ (দ্র. হায়াতিলা) কর্তৃক কাবুল বিধ্বস্ত হয়। এখানে ও সমগ্র গান্ধারা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। কাবুল উপত্যকার অদ্যাবধি বিরাজমান অসংখ্য স্তূপ (stupas) বৌদ্ধযুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তদ্রূপ চীনা বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙ, যিনি কাবুলকে কাও-ফু (Kao-fu) নামে জানিতেন, তাঁহার বিবরণেও এই তথ্য পাওয়া যায়। তথাপি উদাভাণ্ডারপুর বা ওয়াহিন্দ কেন্দ্রিক গান্ধারা হিন্দু রাজ্য হইতে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিকীর্ণ হয় তাহা কাবুলের হেপহথালীর শাসকগণকে ভারতীয়করণের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার করে এবং সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের স্থানে হিন্দু ধর্মীয় মতবাদসমূহ বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে কাবুল শুধু শহরের নাম নহে, বরং সমগ্র আপার কাবুল নদী উপত্যকারই নাম ছিল (দ্র. কাবুলিস্তান)। এই কারণেই য়া'কূবীর ন্যায় একজন মুসলিম ভূগোলবিদ (দ্র. বুল্দান, ২৯০-১, অনু. Wiet, ১০৬-৭) অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম রহস্যজনক (حروس) এবং কাবুল-শাহগণের রাজধানী হিসাবে جرريلس-এর উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সম্ভবত এই কাবুলের প্রধান দুর্গের সঙ্গে অভিন্ন (Wiet এই সকলগুলি নামই একটিমাত্র স্থানের তথা জারবীন-এর নাম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; তিনি Marquart রচিত Djurwin in Eransahr, 277-89)-এর অনুসরণ করিয়াছেন।

আরবদের নিকট ইসলাম-পূর্ব আমলেও কাবুল নামটি পরিচিত ছিল। জাহিলী ও মুখাদরাম (যাহারা প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী উভয় যুগে জীবিত ছিলেন = مخضرم) কবিগণ সুদূর অঞ্চল বা অজ্ঞাত স্থান অর্থে 'তুর্ক ওয়া-কাবুল' কথাটি ব্যবহার করিয়াছে (দ্র. T. Kowalski, Die altesten Erwahnungen der Turken in der arabischen Literatur, in KCSA, ii, ১৯২৬-৩২ খৃ., ৩৮-৪১)। যাহা হউক, পূর্ব আফগানিস্তান সম্বন্ধে কিছু সরাসরি জ্ঞান আমরা সর্বপ্রথম লাভ করি যখন সীস্তান অববাহিকা ও বাস্ত হইতে আরব অভিযানগুলি পূর্বাভিমুখে সম্প্রসারিত হয় যুনবীলদের রাজ্য যামীন্দাওয়ার ও যাবুলিস্তান (দ্র.)-এর দিকে; যুনবীলগণ ছিল হেপহথালীয়গণের দক্ষিণাঞ্চল শাখার বংশধর। অনুমিত হয়, স্থানীয় শাসকগণ দুই শতাব্দীরও অধিককাল আরবগণকে প্রতিহত এবং কাবুল উপত্যকাতে তাহাদের প্রবেশের পথ রোধ করে; কাবুল-শাহগণের সহিত এই যুনবীলদের আত্মীয়তা

আক্রমণকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সংহত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে সীস্তানের গভর্নরগণ, 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন সামুরা ও আর-রাবী' ইব্ন যিয়াদ এমনকি কাবুল পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন এবং তথাকার স্থানীয় শাসকগণও যাবুলিস্তানের শাসকগণকে কর দিতে বাধ্য করেন। এই সকল দুর্গম অঞ্চলে অভিযানের প্রধান লাভ ছিল অবশ্য ক্রীতদাস সংগ্রহ। 'আবদু'র-রাহমান কাবুলে বন্দী দাসগণকে বস্রাতে তাঁহার নিজ বাড়িতে আনয়ন করেন, সেখানে তাহারা তাঁহাকে কাবুলী স্থাপত্যরীতিতে একটি উপাসনাগার নির্মাণ করিয়া দেয় (বালাযুরী, ফুতূহ, ৩৯৭)।

বিখ্যাত সিরীয় মাওলা 'আলিম মাক্হুল আদ-দিমাশ্কী, আল-আওযাঈ (মৃ. ১১৮/৭৩৬)-এর শিক্ষক, মুসলিমগণের প্রথম কাবুল অভিযানকালে সেখানে বন্দী হন (দ্র. ইব্ন সা'দ, ৭/২খ, ১৬১; ইব্ন খাল্লিকান, অনু. ৩খ, ৪৩৭)। তথাপি সেই সকল ও পরবর্তীকালীন অভিযানসমূহের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সমভাবে সাময়িক এবং 'আবদু'ল-মালিকের খিলাফাতকালে 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী বাক্রা-র অধীনে প্রেরিত একটি মুসলিম সেনাবাহিনী কাবুল অঞ্চলে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে (৭৮/৬৯৭-৮)। তখন মুসলিম বাহিনীর অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য ইবনু'ল-আশ'আছ-এর অধীনে "ময়ূর বাহিনী" নামে খ্যাত এক প্রসিদ্ধ সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছিল। হারূনু'র-রাশীদের আমলে খুরাসানের গভর্নর আল-ফাদ্ল ইব্ন য়াহ্য়া আল-বারমাকী উত্তর ও পূর্ব আফগানিস্তানে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে সেই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৭৯/৭৯৫ সালে সেনাপতি ইবরাহীম ইব্ন জিব্রীল যাবুলিস্তান আক্রমণ করেন এবং অতঃপর কাবুল পর্যন্ত অগ্রসর হন, তখন কাবুল ছিল তুর্ক-শাহী রাজবংশের শাসনাধীন এবং আল-মা'মূন-এর আমলে পুনরায় কাবুল আক্রমণ করা হয়, যাহার পরিণামে কাবুলের শাসক বন্দী হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুকাল যাবত 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির খুরাসানের গভর্নর থাকাকালে (২১৩/৮২৮-২৩০/৮৪৫) কাবুল-শাহ মুসলিমগণকে বাৎসরিক ১৫,০০,০০০ দির্হাম এবং ২,০০০ জন ওগুয তুর্কী দাস খাজনাস্বরূপ প্রদান করিতেন (ইব্ন খুররাদাযবিহ, ৩৮)।

সীস্তান-এর সাফ্ফারী (দ্র.)-গণের আমলেই কেবল মুসলিমগণের প্রকৃত অগ্রগতি সূচিত হয়। য়া'কূব ইব্ন লায়ছ কর্তৃক ২৫৬/৮৭০ সালে বাল্খ-এর মধ্য দিয়া বামিয়ান, কাবুল এবং পান্জহির-এর রূপার খনি অঞ্চলে অভিযানের ফলে কাবুলে সর্বপ্রথম দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাফ্ফারীগণ কর্তৃক কাবুল উপত্যকা হইতে প্রেরিত উপঢৌকনস্বরূপ হস্তীযূথ এবং পৌত্তলিকদের মূর্তিসমূহ যখন বাগদাদে আসিয়া পৌছায় তখন কিরূপ উত্তেজনা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল আরব ঐতিহাসিকগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (তাবারী, ৩খ, ১৮৪১; তু. মাস্'উদী, মুরূজ, ৮খ, ১২৫-২৬)। কাবুল অঞ্চলের ইসলামীকরণের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হয় ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে গাযনার সুলতান আলপ্তিগিন ও তুর্কী দাস গভর্নরগণের আমলে; সম্ভবত গাযনাবী (দ্র.) সুলতানগণের আমলে সেনাবাহিনীর হস্তীযূথের আড্ডা ছিল কাবুল (দ্র. Bosworth, The Ghaznavids, 116-17)। এই সময় হইতে বামীয়ান-গোরবান্দ (Bamiyan-Ghorband) এলাকা অপেক্ষা কাবুল প্রশাসনিকভাবে গায্নার প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে (দ্র. মাকদিসী, ২৯৭)।

৩য়/৯ম এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর ভৌগোলিকগণ কাবুল অঞ্চল সম্বন্ধে কতকটা অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন বিশেষত এই কারণে যে, কাবুল ছিল তাঁহাদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতার প্রান্তিক পর্যায়ে। কাবুল অঞ্চলের ইসলামীকরণের বহু পূর্বেই মুসলিম সওদাগরগণ কাবুলে প্রধানত এই কারণে যাতায়াত করিত যে, ইহা ছিল ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর আমদানী কেন্দ্র। ইব্ন খুর্রাদাযবিহ-এর গণনায় ৩৮টি পণ্যসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নমানের aloes কাঠ, নারিকেল, জাফ্রান এবং সর্বোপরি myrobalanus, [ইহ্লীলাজ বা হালীলাজ] রক্তক্ষরণরোধক একটি সঙ্কোচক ঔষধ, যাহার একটি প্রসিদ্ধ কাবুলী (বা চেবুলী) প্রকারভেদ ছিল (দ্র. Yule and Burnell, Hobson-Jobson, a glossary of Anglo-Indian colloquial words and phrases, ৬০৭-১০, এবং Laufer, Sino-Iranica, ৩৭৮)। গায্নাবী বংশের শাসন আমলের গোড়ার দিকে কাবুল একটি শহর হিসাবে বৈশিষ্ট্য লাভ করে, তখন সেইখানে ছিল মুসলিম এবং ভারতীয়গণের মিশ্র জনশক্তি (ভারতীয়গণ কাবুলকে একটি তীর্থস্থানরূপে গণ্য করিত), আর ছিল একটি শক্তিশালী দুর্গ এবং একটি সমৃদ্ধ রাবাদ বা বাণিজ্যিক এলাকা (দ্র. মুকাদ্দাসী, ৩০৪; হুদূদু'ল-আলাম, ১১১)।

গাযনাবীদের রাজধানী গায্না এবং ঘূরী শাসকদের রাজধানী ফীরূযকোহ (দ্র.), এই দুইয়ের প্রাধান্য অনিবার্যভাবে কাবুলকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং কাবুল সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকগণের বেশী কিছু বলার ছিল না। 'আলা'উ'দ-দীন ঘূরী এবং তীমূর কর্তৃক সাধিত গায্নার ধ্বংসলীলা কাবুলের পুনরুত্থানের সহায়ক হয়, যদিও পর্যটক ইবন বাত্তূতা ৭৩৩/১৩৩৩ সালেও সেখানে একটি গ্রামমাত্র দেখিতে পান এবং সূফী শায়খ ইসমা'ঈল আল-আফগানীর একটি আস্তানা (زاوية) ব্যতীত তথায় তেমন উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখিতে পান নাই (রিহ্লা, ৩খ, ৮৯-৯০, ইং অনু. Gibb. ৩খ, ৫৯০-৯১)। পূর্ব আফগানিস্তান তীমূর সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় এবং তীমূরের মৃত্যুর পরে উহা তীমূরের শাহ্যাদাগণের ভরণ-পোষণের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তি (সয়ুরগাল)-তে পরিণত হয়। এইভাবেই আবূ সা'ঈদ-এর পুত্র উলুগ বেগ (ইনি সেই বিখ্যাত উলুগ বেগ ইব্ন শাহরুখ [দ্র.] মৃ. ৮৫৩/১৪৪৯ নহেন) কাবুল ও গায্নাতে ৮৬৫/১৪৬১ হইতে ৯০৭/১৫০১-২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কাবুল সাময়িকভাবে আরগূনী বংশের মুকীম-এর শাসনাধীন হয়; তিনি উক্ত উলুগ বেগ-এর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। অতঃপর যখন বাবুর ফার্গানা (Transoxania) হইতে আসিয়া কাবুল দখল (৯১০/১৫০৪) করেন, মুকীম তখন কান্দাহারে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। বাবুরের রাজত্বকালে কাবুলের সমৃদ্ধি ঘটে। সম্রাট তাঁহার আত্মজীবনীতে অঞ্চলটির আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিবিধ সুযোগ-সুবিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হিন্দুস্তান, চীন, মধ্য এশিয়া ও পারস্যের পণ্যসামগ্রী আনয়নকারী কাফিলাসমূহের মক্কা এই কাবুল। এই কাবুলেই বাবুর বহু বাগান রচনা করেন। কাবুলকে তিনি কান্দাহার ও উত্তর ভারত অভিযানের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মুগল সম্রাটগণ কাবুলকে দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখেন। মুগল শাসনামলেই কাবুল

সর্বপ্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তৈরীর জন্য টাকশাল কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সম্রাট ২য় 'আলামগীর ('আযীযু'দ-দীন 'আলামগীর)-এর আমল (১১৬৭/১৭৫৪—১১৭৩/১৭৫৯) পর্যন্ত এইখানেই মুগলদের মুদ্রা অঙ্কিত হইতে থাকে। বাবুরের অন্তিম বাসনা অনুযায়ী ৯৩৭/১৫৩০ সালে আগ্রাতে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার দেহাবশেষ তাঁহার প্রিয় কাবুলের কেন্দ্রে আনিয়া দাফন করা হয়; আধুনিক কাবুল শহরের পশ্চিম দিকে শীরি দারওয়াযা পর্বতের পাদদেশস্থ ঢালে অবস্থিত তাঁহার কবর এখন একটি মনোরম স্থান (দ্র. বাবুর নামা, অনু. Beveridge, ১১৮ প., ৭০৫-৬, ৭০৯-১১, lxxx-lxxi)। ২য় মুগল সম্রাট হুমায়ূন কাবুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাদির শাহ্ তাঁহার বিখ্যাত ভারত অভিযানের যাত্রা পথে ১১৫১/১৭৩৮ সালে কাবুলের প্রধান দুর্গ দখল করেন, কিন্তু ১১৬০/১৭৪৭ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর কাবুলের কিযিল্‌বাশ রক্ষীবাহিনী কান্দাহারের আহ্‌মাদ শাহ দুর্‌রানী (দ্র.)-র নিকট ইহা সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। আহমাদ শাহ্-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী তীমূর শাহ্-এর আমলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্‌রানী সাম্রাজ্য কান্দাহার হইতে সন্তোজনকভাবে শাসন করা সম্ভব নহে; কাজেই কাবুলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এইভাবে আফগানিস্তানের রাজধানীরূপে কাবুলের আধুনিক ভূমিকা শুরু হয়—যদিও ১৯শ শতাব্দীতে মাঝে মাঝে কাবুলের আমীরগণের কর্তৃত্ব ভৌগোলিকভাবে মোটামুটি চিহ্নিত করা ছিল (এই আমলের ইতিহাসের জন্য দ্র. প্রবন্ধ আফ্‌গানিস্তান, ৫)। প্রথম দুইটি বৃটিশ আফগান যুদ্ধের সময়ে এবং সাদো যাঈ ও মুহাম্মাদ যাঈ (বা বারাকযাঈ) এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের সদস্যগণের মধ্যে বে-সামরিক দ্বন্দ্ব চলাকালে শহরটির ক্ষতি সাধিত হয়। ১ম বৃটিশ-আফগান যুদ্ধকালে ১৮৪২ খৃ. শরৎকালে বৃটিশ বাহিনী যখন কাবুল পুনরাধিকার করে তখন, Macnaghten-এর হত্যা এবং কাবুল হইতে ব্রিটিশ সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের কালে তাহাদের দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধস্বরূপ তাহারা কাবুলের বিশাল বাজার পোড়াইয়া দেয়। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে যখন কাবুলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯,১৩,১৬০ (১৯৭৯ Statesman's Yearbook, 123rd edition) উন্নীত হইয়াছিল (১৯৬৫-তে সরকারী হিসাবে ছিল ৪,৩৫,০০০), তখন রাস্তাগুলি পাকা করা হইয়াছিল এবং কাবুল উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া শহরটি সম্প্রসারিত হইয়াছে উত্তর-পশ্চিমে শাহ্‌র-ই নাও শহরতলীতে ব্রিটিশ দূতাবাসের দিকে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্-এর সাবেক রাজপ্রসাদ দারু'ল-আমান-এর দিকে। শহরের শিল্প কারখানাগুলির মধ্যে রহিয়াছে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ শিল্প, কামান-বন্দুক নির্মাণ কারখানা ও কাপড়ের কল। বড় বাজার অবস্থিত নগরের পুরাতন অংশে, যাহা সরু আঁকাবাঁকা গলিবিশিষ্ট। আধুনিক প্রশাসনিক ভবনসমূহ এবং বাণিজ্যিক এলাকা কাবুল নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ১৯৩২ খৃ. কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, উহার অধীনে অনেক কলেজ রহিয়াছে। কাবুলের যাদুঘর অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পুরাতন দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নগর এলাকার বাহিরে অবস্থিত। কাবুল প্রদেশের আয়তন ১৭৭০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১৪,০৭,০০০। ইহা দেশের অন্যতম প্রধান ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাবুলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আধুনিক শহরের উন্নয়নের জন্য দ্র. (১) J. Humlum et al., La geographie de l' Afghaniston, etude d'un pays aride, ১৩০-৯; সামাজিক, জনসংখ্যাগত ও অর্থনৈতিক বিস্তারিত সমীক্ষার জন্য দ্র. (২) H. Hahn, Die Stadt Kabul (Afganistan) und ihr Umland. i. Gestaltwandel einer orientalischen stadt. ii, Sozialstruktur und wirtschaftliche Lage der Agrarbevolkerung in Stadtumland, Bonner geographische Abhandlungen, Hefte 34-5, Bonn, ১৯৬৪-৫ (অনেকগুলি মূল্যবান মানচিত্র-সম্বলিত)। মধ্যযুগের কাবুলের ইতিহাসের জন্য দ্র. (৩) R. Ghirshman, Les Chionites-Hephtalites, কায়রো ১৯৪৮ খৃ.; (৪) J. Marquart, Eransahr, বার্লিন ১৯০১ খৃ.; (৫) C. E. Bosworth, Sistan under the Arabs, from the Islamic conquest to the rise of the Saffarids, রোম ১৯৬৮ খৃ.; (৬) H. C. Roy, The Dynestic history of Northern India, ১খ, কলিকাতা ১৯৩১ খৃ.; (৭) M. Forstner, Ya'qub b. al-Lait und der Zunbil, in ZDMC, ১২০/১ (১৯৭০ খৃ.), ৬৯-৮৩। মুসলিম ভৌগোলিকগণের তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত; (৮) Le Strange, The lands of the Eastern Caliphate গ্রন্থে পৃ. ৩৪৮-৫০, সেই সঙ্গে দ্র. হুদূদু'ল-'আলাম, অনু. Minorsky, ১১খ, ৩৪৩-৭; (৯) বাবুর-নামা, অনু. A. S. Beveridge, লণ্ডন ১৯২১ খৃ., ইহাতে কাবুল অঞ্চলের ভূ-বিবরণ এবং উৎপাদিত সামগ্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। আধুনিক যুগের ইতিহাস ও তথ্যাবলীর জন্য 'আফগানিস্তান' প্রবন্ধের সহিত সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জীর (১খ. এবং ৫খ.) সূত্রসমূহ দ্র.; ১৯ এবং ২০ শতকের পর্যটকগণের বিবরণী এবং Mountstuart Elphinstone, Alexander Burnes, J. P. Ferrier, Sir Thomas Holdich প্রমুখ কর্মকর্তার বিবরণীও খুবই মূল্যবান; (১০) Encyclopaedia Britannica, ১৫শ সংস্করণ, প্রবন্ধ আফগানিস্তান; (১১) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা, ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স ১৯৭২ খৃ., প্রবন্ধ আফগানিস্তান; (১২) দা. মা. ই., 'কাবুল' প্রবন্ধ (১৭খ.; পৃ. ১-৪)।

C. E. Bosworth (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

কাবূল (قبول = কবূল) ঃ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা, মানিয়া লওয়া ও উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা; চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবার পক্ষে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা। দ্র. ঈজাব ও বায়' শব্দদ্বয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দা. মা. ই., ১৬/১খ, পৃ. ২৫৮।

(দা. মা. ই.)/ মোঃ মায্‌হারুল হক

কাবুলিস্তান (كابلستان) ঃ বা কাবুলিস্তান, কাবুল নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল (পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্র.)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই অঞ্চলটিকে পশ্চিমে বানিয়ান ও পূর্বে লাম্‌গান-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল বলিয়া অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইত। ভৌগোলিক মুকাদ্দাসী (আনু. ৩৭৫/৯৮৫) কাবুল অঞ্চল দ্বারা গায্‌না এবং যাবুলিস্তান-এর উত্তরে অবস্থিত সকল এলাকা অর্থাৎ লোগার উপত্যকাকে বুঝাইয়াছেন (তু. Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ৩৪৯) এবং সেই সময়েই 'কাবুল' কথাটি দ্বারা সমগ্র কাবুলিস্তান অঞ্চলকে না বুঝাইয়া শুধু কাবুল শহরকে বুঝানো হইতে থাকে বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগের

কাবুলিস্তানের কেন্দ্রীয় অঞ্চল বর্তমান আফগানিস্তানে, ১৯৬৪ খৃ. হইতে কাবুল বিলায়াত বা প্রদেশরূপে গঠিত হইয়াছে।

C. E. Bosworth (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

কাবূস ইব্ন ওয়াশ্মগীর (قابوس بن وشمگیر) ঃ শামসু'ল-মা'আলী আবু'ল-হাসান (রাজত্বকাল ৩৬৬-৭১/৯৭৭-৮১, ও ৩৮৮-৪০৩/৯৯৮-১০১৩-১৩), যিয়ারিয়া বংশের ৪র্থ শাসক। মারদাবীজ ইব্ন যিয়ার (দ্র.) এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা তাবারিস্তান ও গুরগান (বা জুরজান) রাজ্য শাসন করিতেন। পারস্য ইতিহাসের "দায়লামী বিরতিকালে" যে সকল পরিবার ক্ষমতা লাভ করেন, তাঁহাদেরই ন্যায় যিয়ারীগণও নিজদিগকে প্রাক ইসলামী ইরানের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে প্রয়াসী হন এবং কাবূস-এর পৌত্র কায় কা'উস কাবূস-এর পূর্বপুরুষকে কায় খুসরুর সময়কালে গিলানের শাসনকর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (কাবূসনামা, ভূমিকা)। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আমলে যেইরূপ ছিল, কাবূস-এর শাসন আমলেও তেমনি কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলভাগের আধিপত্য নিয়া খুরাসানের সামানীগণের সঙ্গে পশ্চিম পারস্যের বুওয়ায়হীগণের বিবাদ চলিতেছিল। মনে হয় যেন বুওয়ায়হী 'আদুদু'দ্-দাওলা (দ্র.)-র সমর্থনপুষ্ট হইয়াই কাবূস ৩৬৬/৯৭৭ সালে তাঁহার ভাই জাহীরু'দ-দাওলা বীসুতূন-এর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কেননা কাবূস-এর প্রথম মুদ্রায় এই মহান আমীরের আধিপত্য স্বীকার করা হইয়াছে। এই সময়েই তিনি খলীফা তা'ই'-এর নিকট হইতে সম্মানসূচক শামসু'ল-মা'আলী উপাধিও লাভ করেন।

যাহা হউক, ইহার অল্পকাল পরেই কাবূস তাঁহার জামাতা জিবাল অঞ্চলের কুর্দী এলাকার বুওয়ায়হী শাসনকর্তা ফাখরু'দ-দাওলা (দ্র.)-কে শেষোক্তজনের ভাই 'আদুদু'দ-দাওলা ও মু'আয়্যিদু'দ-দাওলার বিরুদ্ধে সমর্থন করেন। এই সিদ্ধান্ত কাবূস-এর জন্য মারাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হয়। ৩৬৯/৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে তিনি তাবারিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ হারান এবং ৩৭১/৯৮১-২ স্বয়ং মু'আয়্যিদু'দ-দাওলার নেতৃত্বে পরিচালিত বুওয়ায়হী বাহিনী তাঁহার রাজ্যের বাকী অংশ আক্রমণ করেন। আসতারাবাদে পরাজিত হইবার পরে কাবূস ও ফাখরু'দ-দাওলা উভয়েই নীশাপুরে সামানী সেনাপতি হুসামু'দ-দাওলা তাশ-এর নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সামানী সাহায্য সত্ত্বেও এই উভয় আশ্রয় গ্রহণকারী যতদিন পর্যন্ত 'আদুদু'দ্-দাওলা জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আর পুনর্দখলের চেষ্টা করিতে পারেন নাই। ৩৭৩/৯৮৪ মু'আয়্যিদু'দ-দাওলার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাস্পিয়ান অঞ্চল তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। অতঃপর ফাখরু'দ-দাওলা নীশাপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ-এর সাহায্যে রায় ও জিবালের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। বুওয়ায়হীগণের অকৃতজ্ঞতার কারণে কাবূস এই ভাগ্য পরিবর্তনে কোনরূপ অংশ লাভ করিতে পারেন নাই এবং ফাখরু'দ-দাওলার মৃত্যুর পরেই কেবল তিনি, সামানীদের মধ্যে ১৭ বৎসরকাল নির্বাসনে থাকিবার পরে, পুনরায় স্থানীয় লোকদের আহ্বানে স্বীয় পূর্বপুরুষের রাজ্যের অধিকার লাভ করেন (৩৮৮/৯৯৮)।

কাবূস-এর দ্বিতীয়বারের শাসনকাল বিষয়ে প্রামাণিক তথ্যাদি খুব কম; পরবর্তী কালের কোন মুদ্রাও পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকদের মতে কাবূস-এর অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু শাসনের ফলে— যাহার এক পর্যায়ে আসতারাবাদের গভর্নরকে মু'তাযিলী মতবাদে বিশ্বাসী অভিযোগে শিরোচ্ছেদ করা হয়— শেষ পর্যন্ত এক সামরিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কাবূস স্বীয় পুত্র মানূচিহর-এর পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু উহার অল্পকাল পরেই বিদ্রোহীগণ তাঁহাকে প্রচণ্ড শীতে অনাবৃত রাখার মাধ্যমে হত্যা করে (৪০৩/১০১২-১৩)। ৩৯৭/১০০৬-৭ তাঁহার নিজেরই নির্মিত সমাধি সৌধ অদ্যাবধি আধুনিক গুরগান শহরের বাহিরে বর্তমান রহিয়াছে (দ্র. গুনবায-ই কাবূস)। কাবূস-এর পরে যিয়ারী রাজ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে খুরাসানের সামানীগণের উত্তরাধিকারী গাযনাবীগণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নিষ্ঠুরতার কুখ্যাতি সত্ত্বেও কাবূস আরবী ও ফারসী ভাষায় একজন বিদ্বান ও কবি হিসাবে তৎকালে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সামানীগণের মধ্যে দীর্ঘ নির্বাসনকালে তিনি বুখারার কৃষ্টিসমৃদ্ধ দরবারের কতিপয় ব্যক্তিত্বের ফলপ্রসূ সাহচর্য লাভ করেন। য়াতীমাতু'দ-দাহ্র গ্রন্থে ছা'আলিবী তাঁহাকে "শাসকদের সীলমোহর, যুগের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সকল ন্যায় বিচার ও মহানুভবতার উৎস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অন্যদিকে ইব্ন শুহায়দ, ইব্ন বাস্সাম-এর যাখীরা গ্রন্থে ১/১খ, ২০২ (তু. Ch. Pellet, Ibn Shuhayd, Hayatuhu wa atharuhu, আম্মান ১৯৬৬ খৃ., ১৩২) তাঁহাকে বাদী'উ'য-যামান আল-হামযানীর সঙ্গে একত্র ছন্দময় গদ্য রচনার নূতন আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাবূস-এর বিদ্যমান আরবী গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে একখানি রাসা'ইল এবং সাহিত্য ও প্রবাদ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ; কিন্তু রিসালা ফি'ল-ইফ্তিখার ওয়া'ল-'ইতাব নামক বর্তমানে লুপ্ত গ্রন্থের জন্য 'আসকারী তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত করিয়াছেন (দ্র. Brockelmann, S I, ১৫৪)। কাবূস অতি নিপুণ লিপিকার ছিলেন এবং জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সেই যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহাদের রচনা তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় খ্যাতি তিনি লাভ করিয়াছিলেন ইব্ন সীনার (Avi-cenne) সাহচর্য হইতে। ইনি খাওয়ারিযম হইতে পলায়ন করিয়া কাবূস-এর দরবারে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং পরে রায় গমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আল-বীরূনীর সাহচর্যও লাভ করেন। আল-বিরূনী কাবূস-এর ২য় বার সিংহাসনে আরোহণের (৩৮৮/৯৯৮) স্বল্পকাল পরে গুরগানে আসেন এবং সেখানে আমীরকে তাঁহার আল-আছারু'ল-বাকিয়া গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। প্রাথমিক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ ঃ (১) 'উতবী-মানীনী, য়ামীনী, ১খ., ১০৫-৫১, ৩৯০ প., ২খ, ১-২৬, ১৭২-৯; (২) মিস্কাওয়ায়হ ও রূযরাওয়ারী, in Eclipse of the 'Abbasid Cliphate, ২খ., ৪১৫, ৩খ, ১৫-১৮, ২৪-২৬, ২৮, ৯৩, ৯৮-৯, ২৯৭-৮; (৩) গারদীযী, সম্পা. নাজিম, পৃ. ৪৬, ৫০; (৪) কাবূসনামা, সম্পা. Levy, পৃ. ৫৫, ১৩৫-৬, অনু. ৮৮-৯, ২৩১-৪; (৫) ইব্ন ইসফান্দিয়ার, সম্পা. ইকবাল, ২খ, ৪-১৩, অনু. Browne, ২২৫-৩৩; (৬) মুজমালু'ত-তাওয়ারীখ, ৩৯৪ প.; (৭) জুরবায়কানী, তারজুমা-ই য়ামীনী, তেহরান ১৩৩৪/১৯৫৫, ৫৪-৭৭, ১৬৩-৭০, ২২১-৩; (৮) য়াকূত, ইরশাদ, ৬খ, ১৪৩-৫২; (৯) ইবনু'ল-আছীর, ৮খ, ৫০৬, ৯খ, ৮-৯, ৯৮-১০০, ১৬৭-৯; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ৩খ, ২৪৩-৮, নং ৫১২, অনু. ২খ, ৫০৭-১০; (১১) মুসতাওফী, গুযীদা, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০, ৩৮৮, ৪১৪-১৫, ৪২০; (১২) মীর খাওয়ান্দ, ৪খ, ২৫-৭।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ের ঐতিহাসিক উৎসসমূহ ঃ (১৩) Cl. Huart, Les Ziyarides, in Mems. de L'Acad. des Inscrs. et Belles-Letters, ৪২খ, প্যারিস ১৯২২ খৃ., ৪০৩-১৫; (১৪) এম. নাজিম, Sultan Mahmud of Ghazna, কেম্ব্রিজ ১৯৩১ খৃ., ৭৭-৮; (১৫) Spuler, Iran, ১০২-৩, ১০৯; (১৬) এম. কবির, History of the Ziarids..., in Journal of the Asiatic Society of Pakistan, ৫খ, ১৯৬০ খৃ., ৮ প.; (১৭) J. C. Burgel, Die Hofkorrespondens 'Adud ad-Daulas, উইজবাডেন ১৯৬৫ খৃ., ১৪০-৭।

৩। মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ক ঃ (১৮) S. M. Stern, The coins of Amu, NC-তে, Ser, ৭ (১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২৫৫-৭, ২৬৬।

৪। সংস্কৃতি বিষয়ক ঃ (১৯) ছা'আলিবী, য়াতীমাতু'দ-দাহর, কায়রো ১৩৭৫-৭/১৯৫৬-৮, ৪খ, ৫৯-৬১; (২০) 'আওফী, লুবাবু'ল-আলবাব, সম্পা. নাফীসী, ৩০-১, ২৫৬-৭; (২১) দাওলাত শাহ, সম্পা. 'আব্বাসী, পৃ. ৫৬-৭; (২২) নিজামী 'আরূদী, চাহার মাকালা, সম্পা. Browne, ৭৮-৮০, সংশোধিত অনু. ৮৭-৯০; (২৩) Browne, ১খ, ৪৬৯-৭১; (২৪) যাকী মুবারাক, আন-নাছরু'ল-ফান্নী, ২খ, ২৭৭-৮৯।

C. E. Bosworth (E.I.²)/হুমায়ুন খান

কাবূস নামে (দ্র. কায়কাউস)

কাবৌ (كابى = কাবূ) ঃ (Kabou = كبوى) পশ্চিম আফ্রিকার তোগো (Togo = توغو) প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত একটি জনপদ (৯°২৫´ উত্তর, ০°৫৫´ পূর্ব) বাস্‌সারি হইতে ২৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার এই বাস্‌সারি ইহার উপনিবেশ-পূর্ব কালে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অংশত ইহার পণ্য বিনিময় ব্যবসায় যাহাতে ক্রীতদাসের বিনিময়ে লামা-কারার কাব্রে কর্মকারদিগকে অশোধিত লৌহ প্রদান করা হইত এবং অংশত ইহা কোলাকারাভান পথের উপর একটি বিশ্রাম স্থান হিসাবে। সুতরাং কাবূতে বহিরাগত মুসলমানদের (বিশেষত হাওসা এবং জেরমা) উপস্থিত অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাস্‌সারি হইতে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত কালাংগা'র একজন অধিবাসী জনৈক Oukpane সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশ সময়ে কাবৌ (কাবূ) গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অল্পদিন পরে বিরাইমা নামে সানসানে ম্যাংগোর একজন তায়োকোসি (A Tyokossi of Sansane Mango) আগমন করেন যিনি প্রকৃতপক্ষে সেখানে বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসলিম এবং তিনি স্বল্প পরিমাণে হইলেও নিঃসন্দেহে তায়োকোসি শাসকদের কর্তৃত্বের প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় Tyokossi শাসন ব্যাপুর এলাকার (কাবূ হইতে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং কাবূ সম্ভবত ছিল ইহার একটি আশ্রিত রাজ্য।

Oukpane-এর পরে প্রধান শাসক হন Outoune। তিনি ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শাসন করেন। সেই সময়ে কাবূর তৃতীয় ইমাম ছিলেন (বিরাইমা এবং সালিয়ার উত্তরসুরি) বাবা তোমা। Outoune-র রাজত্বকালে কালাংগা জনগোষ্ঠীর অবশিষ্ট লোকেরা কাবূ'র চারিদিকে বসতি স্থাপন করে। Outoune-এর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কারাকপো প্যারিস চুক্তি (২৩ জুলাই) স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে ১৮৯৫-এর এপ্রিলে ফরাসী অভিযাত্রী Baud এবং Vermeersch-কে এবং ১৮৯৬-এর জানুয়ারীতে দ্বিতীয়বারের জন্য Baud-কে স্বাগত জানান। এই চুক্তির ফলে কাবূ, টোগো Schutzgebiet-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। য়ূরোপীয়দের আগমনের সময়ে বেশ কয়েক ডজন জেরমা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীসহ এখানে একটি মুসলিম এলাকা বিদ্যমান ছিল।

বহু বৎসর যাবত সানসানে ম্যাংগোর তায়োকোসি যুদ্ধ নেতাদের (Tyokossi warlords of Sansane Mango) নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা এই পৌত্তলিক দেশটির নেতৃবৃন্দ ইয়েন্দির দাগোমবা প্রধানের (Dagomba chief of Yendi) মুসলিম যোদ্ধাদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছিল। ইসলামের মর্যাদা এত উচ্চ ছিল যে, বাসারি জাতির মধ্য হইতে সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত মামা বোনাফোহ-কে জার্মান প্রশাসন এই শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রধান হিসাবে মনোনীত করে। জার্মান প্রশাসনের মুসলিম ঘেষা নীতির সুফলে মুসলিম নেতার পরিচালনায় অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর সাধিত হয়। শহরে মুসলিম প্রাধান্য থাকিলেও (শহরের বিভিন্ন জেলা ৪০০০ হইতে ৫০০০ অধিবাসী লইয়া গঠিত) চারিপাশের গ্রাম এলাকাসমূহে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত লামা কারা অঞ্চলসমূহ হইতে আগত কারে এবং লোসো সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করিত। এই সকল বহিরাগত বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E.I.², ৪খ, ৩৫১-৫২।

R. Cornevin (E.I.²)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কামদাআ (قمداء) ঃ (রা) সাহাবী, বংশ পরিচয় অজ্ঞাত, উসদু'ল-গাবায় কামযা'আ (قمذاء)। সালিহ্ ইব্‌ন সামা'আ হইতে বর্ণিত আছে যে, কামদা'আ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জীবজন্তুর (الكبد الحراء = উষ্ণ কলিজার অধিকারী অর্থাৎ জীবন্ত পশু) পরিচর্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ "ইহাদের পরিচর্যায় তোমার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪১; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান তা. বি., ৩খ, ২০৮।

মুহাম্মদ মূসা

আল-কাম্মাদ (الكماد) ঃ উপনাম আল-কাম্মাদ। প্রকৃত নাম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ। তিনি কনস্টানটাইনের হাসানী বংশোদ্ভূত শারীফ। তিনি ফেয-এ চলিয়া যান এবং সেখানে হাদীছশাস্ত্র, তর্কবিদ্যাও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা দান করেন। কিন্তু তাঁহার কোন রচনাই বিদ্যমান নাই। তবে নাওয়াযিল (দৈববাণী) শ্রেণীর কতিপয় বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য reponsa (adjurba) হইতে জানা যায়, এই বিষয়ে তিনি সুযোগ্য ছিলেন। তিনি ১১১৬/১৭০৪-৫ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Chorfa, ২৪৪, and n. 2; (২) Kadiri, Nashr, ii, 184; (৩) ঐ লেখক, al-Nashr al-Kabir, ii, fol. 53r.; (৪) ঐ লেখক, Iltikat, fol.57r.; (৫) M. Lakhdar, La vie litteraire au Maroc, sous la dynasite, alawide index।

এম. লাখদার (E.I.²)/ মোঃ আবদুস সালাম

কাম্মূন (كمون) ঃ অর্থ জীরা, Cuminum Cyminum অর্থাৎ জীরা গাছ, যাহা পূর্ব ইরানে উৎপাদিত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কালেও ইহা নিকট প্রাচ্যে (সিরিয়া, ফিলিস্তীন এবং নীল নদের উপত্যকায়)

পাওয়া যাইত। অতঃপর ইহা ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে হিব্রু ভাষায় কাম্মূন, গ্রীক ভাষায় কুমিনন এবং ল্যাটিন ভাষায় কুমিনাম বলা হয়।

বন্য অথবা আবাদীকৃত এই সুগন্ধি শস্য বীজের চাহিদা ছিল ব্যাপক। চিকিৎসকগণ ইহার অনেক গুণাগুণ স্বীকার করিয়াছেন। যেমন পাকস্থলীর বায়ুনাশক ঔষধ, এমিনাগজিক, ঘর্ম-উৎপাদক ঔষধ ইত্যাদি। তরল বটিকারূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। পথ্যবিশারদগণ ইহাকে হজম শক্তির সহায়ক বলিয়া মনে করেন। ইহার আরো অনেক উপকার জানা গিয়াছে এবং সেগুলিকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হইয়াছে। কিরমান (দ্র.) নামক স্থানের জীরাকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করা হয়। ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ ইহাকে বাসিলিকুন বা রাজকীয় জীরারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর নাবাতী ও আবিসিনিয়দের আবাসভূমি সিরিয়া, মিসর এবং ফারেসের জীরা উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদবিশারদগণের মতে, 'কাম্মূন' শব্দটি একটি সাধারণ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত 'যাহা সুগন্ধময় অথবা ঔষধ সম্পর্কীয় বীজবিশিষ্ট অন্যান্য উদ্ভিদকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আরমেনীয় কাম্মূন এবং রোমীয় কাম্মূন (জীরা) ছিল মূলত শাজীরা (করুম কারভী)। ইহাকে কাম্মূন বারূরী বা বন্য জীরাও বলা হইত। যেমন ইহা ফ্রান্সের কোন কোন স্থানে 'কুমিন ডেসপ্রেস' বা 'মিডো কুমিন' হিসাবে পরিচিত ছিল। 'কাম্মূন হালূ' বা মিষ্টি জীরা ছিল মৌরী গাছের একটি নাম। পূর্ব আলজিরিয়ার 'বোগী' নামক স্থানে Meum athamanticum কাম্মূন-জাবাল বা পাহাড়ী জীরা নামে পরিচিত ছিল। কাম্মূন আসওয়াদ বা কাল জীরা ছিল শুলফা জাতীয় গাছ (Negella Sativa)। এক প্রকার Ranunculus যাহাকে যথার্থভাবে শূনীদে বলা হয়। ইহাকে হাব্বাতু'স-সাওদাও বলা হয় অর্থাৎ কাল জীরা এবং আধুনিক সিরিয়ায় ইহাকে হাব্বাতু'ল-বারাকা বলা হয়।

আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কাম্মূন শব্দটির পাশাপাশি আরো একটি দুর্লভ শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দটি হইল شنوت; ইহা বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয় ঃ সান্নুত, সুন্নুত এবং সিন্নুত। অভিধানেও ইহার বিভিন্ন অর্থ দৃষ্ট হয়; যথা ঃ জীরা, মৌরী মধু, ফলের নির্যাস (রুব), ' কেক' এবং আরো কয়েকটি মসলা। এই শব্দটি কয়েকটি হাদীছেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা য়ামানী শব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার ক্রিয়া পদ 'সান্নাসা'-এর অর্থ জীরা বীজ পাত্রে রাখা কিংবা নিক্ষেপ করা।

পাশ্চাত্য মুসলিম ঃ উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে জীরার চাষ করা হইত এবং ব্যাপকভাবে ঔষধ ও রন্ধন কার্যে ব্যবহার করা হইত। যাদু টোনার উপকারী হিসাবেও ইহা ব্যবহার করা হইত। স্পেনীয় মুসলমানগণ অন্য আরবী ভাষাভাষীদের বিপরীতে 'কাম্মূন' শব্দটির পাশাপাশি ইহার আঞ্চলিক উচ্চারণে কামূন ব্যবহার করিত। 'কামূন' শব্দ হইতে রূপান্তরিত অন্যান্য শব্দ হইল 'কাইমূন', 'কেইমূন'।

স্পেনীয় শব্দ 'আল-কামুনিয়াস' সুগন্ধ বীজ, জীরাশা-জীরা, মৌরী গাছ, শুলফা গাছ প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। ইহা আরবী হইতে ধার করা শব্দ এবং রোমানী ভাষায় বহুবচন। এই শব্দটি প্রাচীন ফরাসী ভেষজ গ্রন্থে বর্ণিত প্রধান চারিটি উষ্ণতাবর্ধক ঔষধির সমার্থবোধক। প্রাচীন স্পেনীয়গণের মতে কিউমিনের মূল ল্যাটিন নাম বহুবচনে কামিনোস।

মাগরিব অঞ্চলে মরক্কোতে স্পেনীয় রীতিতে 'কামুন' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে (তাঞ্জিয়ার্স ও তিতান অঞ্চলে) উহার রূপান্তরিত শব্দ কাইমুন প্রচলিত আছে।

ফেজের ভেষজবিশারদগণ তুয়াত হইতে আমদানীকৃত 'কামুন সোফি' অথবা 'কামুন বু সোফা' (কমল জীরা) নামে অভিহিত এই জাতীয় এক প্রকার বীজ বিক্রয় করিতেন। ইহা হইতে নির্মিত তরল ঔষধ পাকস্থলীর ব্যাথা আরোগ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাগরিবের অন্যান্য অঞ্চলে 'কাম্মুন/কেম্মুন' জীরার একমাত্র নাম বলিয়া মনে হয়।

তিউনিসিয়ায় 'কাম্মূন' শব্দটি পূর্ণ সৌন্দর্য ও মোহিনী মণ্ডির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, ইহা আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং ইহা অতি রতি বর্ধক ঔষধের অপরিহার্য উপাদান। ইহার বহুবচন 'কামামেন' শব্দটি সুগন্ধযুক্ত বীজের সমষ্টিকে বুঝায়। যেমন জীরা, ধনিয়া, মৌরী, শাহ্জীরা, শুলফা গাছ ইত্যাদি। ইহার প্রতিশব্দ বহুবচনে যারাই'র (زرارن) সুগন্ধ বীজ। ইহা Alcamonians এবং মরক্কীয় রাসূ'ল-হানুত-এর সমার্থবোধক, যাহার আভিধানিক অর্থ ঔষধ এবং আতরের দোকানের অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। মালটায় কিউমিনকে কাম্মূন বলা হয় এবং কাম্মূন হালুউ (كمون حلو) ব্যবহৃত হয় মৌরী গাছের জন্য (তু. above)।

আরবী ভাষাভাষী সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে সম্বন্ধবোধ বিশেষণ 'কাম্মুনী' সবুজ বর্ণের একটি বিশেষ শ্রেণীকে বুঝায় ঃ স্পেনে সবুজ বাদামী, মরক্কোতে সবুজ খাকী, আলজিরিয়ায় খাঁটি সবুজ। টাকরোনা, তিউনিসিয়ায় ইহা একটি নীল উদ্ভিদ। উল্লিখিত বিবরণ স্থানীয় বীজের রংয়ের সহিত সম্পৃক্ত।

স্ত্রীলিঙ্গে (কাম্মুনিয়্যা) ইহা জীরার সংমিশ্রণে তৈরী খাদ্যের বিভিন্ন প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনারব মুসলিম বিশ্বে কিউমিন-এর ফার্সী নাম হইল জীরা, জীরে। শা-জীরা ও জীরা-ই রুমী শব্দ দুইটি শাহ্জীরা-এর অর্থ প্রকাশ করে। জীরা সহকারে বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা গোশ্তের পাত্রকে বলা হয় জীরা বা (زيره با) জীরবা। প্রাচীন রূপ জীরা বাজ (জীরাবাগ) শব্দটি খাদ্যপাত্র অর্থে মুসলিম স্পেন ও প্রাচ্য অঞ্চলে রন্ধন সম্পর্কীয় আরবী শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাশাপাশি সর্বজনবিদিত কেম্মুন' তুর্কী শব্দটি কিমায়নরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিশেষণ পদ 'কিমিয়নী' সবুজ জলপাইয়ের অর্থ প্রদান করে। ফার্সীতে উল্লিখিত খাদ্যপাত্রকে 'জীরভা' বলা হয়। বর্তমানে রসুন ও চাউলসহ বাছুর ক্ষুরমিশ্রিত খাদ্যকে জীরভা বলা হয় এবং সাধারণত উহা জীরা ছাড়া হয়।

পরিশেষে জীরা সম্পর্কিত প্রবাদ বাক্যগুলি বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত আছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত "জীরাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, উহাকে আগামী কল্য ভালভাবে সিক্ত করা হইবে"। ইহা একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রতীক। দ্বিতীয়ত জীরা বলে ঃ "আমাকে তোমার হস্তদ্বয়ের মধ্যে ঘর্ষণ কর, আমি আমার সুগন্ধি বাহির করিব" "যাহা সেবার জন্য উচ্চস্বরে ধ্বনি করার" সমতুল্য অর্থ প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-বায়তার, Traite des simples, অনু. Leclerc, নং ১৯৬৭; (২) ইবনু'ল-হাশ্শা, Glossaire sur le Mansuri de Razes, সম্পা. Colin and Renaud, নং ৫২৬, ৬৯৩, ১১৮১; (৩) তুহফাতু'ল-আহবাব, অনু. Colin and Renaud, নং ২২৯; (৪) W. Marcais, Textes arabes de Takrouna, 1,405, iv, 1665; Vii, 3496; (৫) Westermarck, Wit and wisdom in Morocco, Nos.

1080, 1487; (৬) Huici, কিতাবু'ত-তাবীখ, মাদ্রিদ ১৯৬১-২ খৃ. ৩৮; (অনু. মাদ্রিদ ১৯৬৬ খৃ., ৩৬)।

G. S. Colin (E.I.[2])/ মোঃ আবদুস সালাম

আল-কাম্মূনী (الكمونى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আত-তামীমী ছিলেন যীরী আল-মু'ইয্য ইব্ন বাদীস (৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) বংশীয় একজন কায়রাওয়ানী স্তুতিমূলক কবিতা রচয়িতা। তাঁহার প্রশংসাধর্মী, বর্ণনামূলক ও শোকগাঁথা— এই তিন ধরনের কবিতার সংখ্যাধিক্য এবং মানগত উৎকর্ষের জন্য তিনি সমালোচকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হন। এতদ্ব্যতীত মূল বিষয় নির্বাচন ও উপমা, জোরালো ভাষা ও যথোপযুক্ত ছন্দের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার কবিতার জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাঁহার উদ্দীপনা, রসবোধ এবং প্রাণবন্ত কল্পনা যাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার বিশৃঙ্খল, বিচিত্র জীবনের উত্থান-পতেরন বর্ণনা দিয়াছেন এবং তাঁহার সমসাময়িক কতিপয় সম্ভ্রান্ত-নাগরিকের দোষ-ত্রুটি ও ব্যর্থতার চিত্র অংকন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কবিতার খুব কমই টিকিয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন রাশীক, উনমূযাজ, উহাতে কবিতার উদ্ধৃতি আছে ঃ কিফতী কর্তৃক কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; (২) আল-মুহাম্মাদূন মিনা'শ-শু'আরা', বৈরূত ১৯৭০ খৃ., ১১৪-৫; (৩) 'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, পাণ্ডু. ২৩২৭ প্যারিস, ১৭খ, ৮২r.-৮৩v; (৪) সাফাদী, ওয়াফী, ২খ, ৪; (৫) ইব্ন জাফির, বাদা'ই'উ'ল-বাদা'ইহ্, কায়রো ১২৭৮ হি., ৪০; (৬) ইব্ন মান্‌জূর, (ছদ্মনাম) নিছারু'ল-আযহার, ইস্তাম্বুল ১২৯৮ হি., ১খ, ২০; (৭) আরও দ্র. এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব, বিসাতু'ল-'আকীক' তিউনিস ১৩৩০ হি., পৃ. ২৩, ৫৩; (৮) মায়মানী, ইব্ন রাশীক..., কায়রো ১৩৪৩ হি., পৃ. ৩১, ৩২, ৮১; (৯) এইচ. আর. ইদরীস, La Berberie orientale sous les Zirides, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৭৮৫; (১০) 'আ.-আর. য়াগী, হায়াতু'ল-কায়রাওয়ান, বৈরূত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১৬১-৩; (১১) Ch. Bouyahia, La vie litteraire en Ifrikiya sous les Zirides, তিউনিস ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১২৮-৯, ২৭৯।

Ch. Bouyahia (E.I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ

কামরান মীর্যা (كامران ميرزا) ঃ বাবুর ও গুলরুখ বেগমের ২য় পুত্র এবং হুমায়ূন-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনি আনু. ৯১৫/১৫০৯ সনে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুমায়ূন অপেক্ষা চতুর ও কাব্যিক প্রতিভার অধিকারী হইলেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র এবং এক অবিশ্রান্ত চক্রান্তকারী। তিনি বারবার হুমায়ূন-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; অবশেষে হুমায়ূন তাঁহার কর্মকর্তাগণের চাপে বাধ্য হইয়া ৯৬০/১৫৫৩ সালে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেন। ৯৬১/১৫৫৪ সালে তিনি মক্কা গমন করেন এবং সেখানেই যু'ল-হিজ্জা ৯৬৪/অক্টোবর ১৫৫৭-এ ইনতিকাল করেন। তাঁহার সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে তাঁহার প্রতি তাঁহার পত্নী বেগম মাহ চীচাক আরগূনের সুগভীর অনুরাগ। কামরানের সুসময়ে ৯৫৪/১৫৪৬ সালে তাঁহার পিতা কামরান-এর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এই বলিয়া জিদ ধরেন যে, কামরানের দুর্দিনে তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না, তিনিও তাঁহার সহিত মক্কা যাইবেন। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনিও মক্কায় ইনতিকাল করেন। কামরান-এর পিতা তাঁহাকে কান্দাহার-এর দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং হুমায়ূন-এর রাজত্বকালের শুরুতে তিনি পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন। প্রথমবার রাজ্য হারাইয়া হুমায়ূন যখন পারস্যে অবস্থান করিতেছিলেন তখন কামরান ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'আসকারী আফগানিস্তান শাসন করেন।

তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া যান। পিতার কাব্যিক প্রতিভার উত্তরাধিকারী পুত্র আবু'ল-কাসিমকে আকবর ৯৬৪/১৫৫৭ সালে গোয়ালিয়রে বন্দী করেন; একজন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করিয়া কয়েক বছর পর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তিন কন্যাকেই তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করাইয়া গিয়াছিলেন। কন্যাদের মধ্যে একজন ছিলেন পুরুষোচিত উদ্যমের অধিকারিণী গুলরুখ। তিনি ইবরাহীম হুসায়ন সুলতানকে বিবাহ করেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই আকবরের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ ছিলেন (ফিরিশ্তা, Lith. সম্পা. ২২১ এবং মুহাম্মাদ হুসায়ন, দরবার-ই আকবারী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-ফাদ্‌ল, আকবারনামা, ১; (২) মুহাম্মাদ হায়দার, তা'রীখ-ই রাশীদী, এন. ইলয়াস এবং ই. ডেনিসন রস-এর ইংরাজী অনুবাদ; (৩) জাওহার আফতাবচী, Memoirs of the Emperor Humayun, অনু. Stewart (অক্সফোর্ড অনুবাদ তহবিল, ১৮৩২ খৃ.); (৪) তূযুক-ই বাবুরী, বাবুর-এর আত্মজীবনী, অনু. Erskine, Memoirs of Baber; (৫) গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা (History of Humayun, অক্সফোর্ড অনুবাদ তহবিল), লণ্ডন ১৯০২ খৃ.; (৬) বাদায়ূনী, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ১খ, ৪৫১ প.; (৭) Elliot-Dowson, ৪খ, ৪৯৮, খ.; (৮) বাঁকীপুরের Oriental Public Library-তে কামরান-এর দীওয়ান-এর একটি কপি আছে; বাঁকীপুর ক্যাটালগে, ২খ, ১৪৫, ২১৫; (৯) কামরানের জীবনী, সম্প্রতি দীওয়ানটি আজমগড় হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

H. Beveridge (E.I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ

কামরান শাহ দুর্‌রানী (كامران شاه درانى) ঃ আফগানিস্তানের সাদূযায়ী বংশের শেষ অধিপতি। তাঁহার পিতা মাহমূদ শাহ (মৃ. ১২৪৪/১৮২৮)-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে হারাত-এর শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি শক্তিশালী বারাকযায়ী পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ১২৩৫/১৮১৮-৩ সালে আফগানিস্তান-এ সাদূযায়ীদের শাসনাবসানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরবর্তীকালে হারাত-এর অধিকার লইয়া মাহমূদ এবং কামরান-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পশ্চিমে হারীরূদ হইতে পূর্বে হিলমান্দ নদী এবং দক্ষিণে সীস্তান হইতে উত্তরে মায়মানা পর্যন্ত সুবিস্তৃত এলাকা লইয়া হারাত গঠিত ছিল। তবে কেন্দ্র হইতে দূরবর্তী স্থানসমূহের কর্তৃত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাত লাগিয়াই থাকিত। রাজত্বের প্রথমদিকে কামরান শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকালের শেষ পাঁচ বৎসর তাঁহার যোগ্য মন্ত্রী য়ার মুহাম্মাদ খান 'আলী কোযায়ী (১২৬৭/১৮৫১)-র হাতে ক্ষমতা চলিয়া যায়। তিনি সামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ এবং ১২৫৫/১৮৩৯ সনে স্বাক্ষরিত বৃটিশ ও তুর্কী নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। মন্ত্রী ১২৫৮/১৮৪২ সনে কামরান-কে অপসারণ ও হত্যা করেন। কামরান এবং য়ার মুহাম্মাদ ইরানী সার্বভৌমত্বকে কখনও স্বীকার, কখনও অস্বীকার করিবার হারাতী ঐতিহ্য বজায় রাখেন এবং ১২৫৩-৪/১৮৩৭-৮ সনে

এক দীর্ঘ ইরানী অবরোধ প্রতিহত করেন। এই অবরোধ হারাত উপত্যকার ধ্বংস সাধন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. আফগানিস্তান প্রবন্ধ, ই. বি., ১খ, ৩৯৬; (২) Common-Wealth Relations office, লণ্ডন, Gazetteer of Afghanistan, ৩য় অধ্যায়, হিরাত, কলিকাতা ১৯১০ খৃ.; (৩) J. P. Ferrier, Caravan Journeys, ২য় সংস্করণ, লণ্ডন ১৮৫৭ খৃ., পরিশিষ্ট F; (৪) George W. Forrest সম্পা., Selections from the travels and journals Preserved in the Bombay secretariat, বোম্বে ১৯০৬ খৃ.; (৫) J. W. Kaye, Lives of Indian officers, ২ খণ্ড, লণ্ডন ১৮৬৭ (Pottinger ও Todd লিখিত প্রবন্ধদ্বয়); (৬) A. Conolly, Overland journey to India, ২খণ্ড, লণ্ডন ১৮৩১ খৃ.; (৭) H. L. O. Garrett ও C. Grey, European adventures of Northern India, ১৭৮৫-১৮৪৯, লাহোর ১৯২৯ খৃ., পরিশিষ্ট, ২৭-৪৮ (Court's Journal); (৮) দা. মা. ই., ১৭খ., ৫৭।

M. E. Yapp (E.I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ

কামরূপ (کامروپ) ঃ কামরূপ, পশ্চিম আসামের একটি অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বশেষ এই স্থানটি পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বিজয়ের পর কখনও কোন বড় আকারের মুসলিম বসতি এই অঞ্চলে স্থাপিত হয় নাই। কেবল সীমিত সময়ের জন্যই এই অঞ্চল তাহাদের অধিকারে ছিল। বর্তমানে এই জেলায় যে কিছুসংখ্যক মুসলমান আছে তাহাদের অধিকাংশই শহরে ব্যবসায়ী। এই জিলা কিভাবে ইসলামে প্রভাবিত করিয়াছিল সেই ইতিহাস জানার জন্য দেখুন আসাম প্র., মুসলমান ভৌগোলিকগণ (হুদূদু'ল-আলামা, মারওয়াযী) ইহাকে প্রায়ই ক'মরওয়ান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ

কামল (قمل) ঃ উকুন,(একক কোন উকুনকে বলা হয় قملة, কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, 'কাম্ল' শব্দটি শুধু স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পুংলিঙ্গের জন্য সু'আব (صئاب) বহুবচনে صئبان-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয় যদিও শেষোক্ত শব্দটি বরং উকুনের ডিম্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়)। এই hemipterous (= সম্মুখবর্তী ডানার মূল মোটা) পোকাটি যেই পরিবারের, তাহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বহু প্রজাতির কীট, কিন্তু আরবী ভাষায় উহাদের মধ্যে পার্থক্য, এমনকি দেহের উকুন এবং মাথার উকুনের মধ্যে পার্থক্যও করা হয় না।

যদিও ইহা জানা ছিল যে, উকুনের ডিম্ব চর্ম আঁকড়াইয়া থাকে, তবুও ধারণা করা হইত, মানুষের দেহের লোম অথবা বস্ত্রাচ্ছাদিত অংশের ময়লা ও ঘর্ম হইতে আপনাআপনি উকুন উৎপন্ন হয়। জন্মের সময় উকুনগুলি উৎপত্তি স্থলের লোমের বর্ণ ধারণ করে। কামিল (قمل)-রূপে আখ্যায়িত কিছুসংখ্যক ব্যক্তির শরীরে অন্যদের তুলনায় অধিক উকুন উৎপন্ন হয়; উকুনগুলি এই ক্ষেত্রে দীর্ঘকায় হয়। এইরূপ লোকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কোন ফল হয় না। এই ক্ষতিকর কীটের বংশবৃদ্ধি হইতে রক্ষার উত্তম পন্থা রেশমী বস্ত্র পরিধান, কারণ রেশমী বস্ত্র উহাদের অনুকূল নহে। এই কারণে 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা) ও আয্-যুবায়র ইবনু'ল-'আওয়াম (রা), যাঁহারা কামিল ছিলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র এক বিশেষ বিধানে কুষ্ঠরোগীরা এই কীট হইতে মুক্ত, কারণ তাহাদের পক্ষে চুলকান বিপজ্জনক। পক্ষান্তরে মুরগী ও কবুতর উকুনমুক্ত নহে, বানরও উকুনমুক্ত নহে, বরং বানরের শরীরে বিস্তর উকুন থাকে এবং নিজকে সুন্দর করিয়া তুলিবার সময় সে উকুন খায়। উকুন ও যে খাদ্য উকুনের সংস্পর্শে আসে তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ফাকীহ্‌গণ এই ক্ষতিকর কীট হইতে রক্ষার উপায়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় তাঁহারা carthamus তৈল, সমুদ্রের পানির সহিত মিশ্রিত ভিনেগার, পারদ কিম্বা তিলের (sesame) তৈল ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছেন। মসজিদের বাহিরে অবস্থাকালে ও ইহরাম মুক্ত অবস্থায় নিজকে উকুনমুক্ত করা অর্থাৎ মারা বৈধ। মসজিদে উকুন মারা নিষিদ্ধ, মসজিদের বাহিরে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত উকুনকে জামা কাপড়ে অবস্থান করিতে দিতে হইবে। ইহরাম কালে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কীটকে নরম হাতে সরাইয়া দেওয়া যায় কিন্তু মারিয়া ফেলিলে সাদাকা দিতে হয়। কোন ফলের আঁটি দ্বারা পিষিয়া উকুন মারা অবৈধ, কারণ ঐ আঁটি তখন পশু খাদ্যের উপযোগী থাকে না।

স্বপ্নে উকুন দেখার ব্যাখ্যা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং বহু রকম। সংস্কার বশে মনে করা হইত, গর্ভবতী জননীর স্তন দুগ্ধে উকুন ডুবাইয়া যদি দেখা যায় উকুনটি হামাগুড়ি দিয়া পার হইয়া গেল তবে গর্ভস্থ শিশু কন্যা হইবে, অন্যথায় পুত্র হইবে, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে দুগ্ধ ছিল ঘন। এই ক্ষতিকর কীটের সহিত আরও অনেক ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জড়িত রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি জীবন্ত উকুন দূরে নিক্ষেপ করে, সে তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগকে ভুলিয়া যায়।

কুরআনের অনুবাদকগণ সাধারণভাবে قمل (৭ ঃ ১৩৩) শব্দটি-র অনুবাদ 'উকুন' করিয়াছেন, কিন্তু তাফসীরকারগণ এই শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যদ্দারা ঝিঁ ঝিঁ পোকা অথবা এক প্রকার প্রতঙ্গ (কির্‌দান, হালাম ইত্যাদি) বুঝায়।

উকুনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কীট হইল ছারপোকা (bug) এবং পক্ষহীন-মাছি (flea)। সাইমেক্স (cimex) পরিবারের যে hemipter ও ছারপোকাগুলিকে পিষিয়া মারিলে যে কড়া দুর্গন্ধ এবং কটু বাদামের গন্ধ ছড়ায় তাহাতে এইগুলির পরিচয় পাওয়া এবং অন্য পতঙ্গ হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা যায়। ইহাদিগকে বাক্ক (بق) ও বানাতু'ল-হাসীর বলা হয়, শেষোক্ত নামটি এইজন্য যে, ইহারা বিছানায় মাদুর (حصير)-এ লুকাইয়া থাকে; তবে কখনও কখনও ইহাদিগকে মশা (بعوضة) প্রজাতিভুক্ত করা হয় [দ্র. LA]। কারণ শেষোক্তটিকে ছারপোকার রূপান্তর (metamorphosis) মনে করা হইত যেমন মনে করা হইত flea-কে; আরবগণ flea-কে মশার ভিন্ন একটি প্রজাতি মনে করিত। অন্যান্য ক্ষতিকর কীটের ন্যায় ছারপোকাও উপরিউক্ত অবস্থায় মারা যাইবে। তবে যেহেতু ছারপোকা প্রধানত রাত্রে ও বাসস্থানে বিচরণ করে, ফাকীহ্‌গণের জন্য ছারপোকা অন্যান্য কীটের তুলনায় বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে না।

শেষোক্তটি তথা pulex পরিবারভুক্ত dipfera-কে বুর্‌গূছ (برغوث)-ও বলা হয় এবং অনুরূপভাবে উহাকে কথ্য ভাষায় আবু তাফির, আবূ 'আদী আবু'ল-ওয়াছ্‌ছাব তামির ইব্ন তামির প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। উহারা পশ্চাৎ দিকে লাফ দেয়। এই কারণে এই সকল কথ্য নামের উৎপত্তি। শীতের শীষে এবং বসন্তের শুরুতে উহারা অন্ধকার

স্থানে মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করে, উহারাও মশকে রূপান্তরিত হয়। Antioch-এ প্রচলিত প্রথায় তাবীয (تعويذ) (তাবিজ) ব্যবহারে উহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় অথবা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। ছাগলের চাবি কিংবা গাধার দুধের প্রলেপযুক্ত নলখাগড়ার ব্যবহার দ্বারা, যাহার উপরে উহারা একত্র হইবে যেন এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে, হত্যা না করিয়া উহাদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে বিহিত ফর্মূলা উচ্চারণ সহকারে। প্রচলিত ধারণা ছিল, flea-তে ভরা লোমযুক্ত কোন খেকশিয়াল যদি উহার মুখে একগুচ্ছ রেশম ধারণ করে, তবে কীটগুলি উহার উপর একত্র হইবে, তখন যদি রেশমগুচ্ছটিকে পানিতে ফেলিয়া দেয় তবে কীটগুলি জলমগ্ন হইবে।

কিংবদন্তী অনুসারে flea কীটের ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধ, কারণ উহারা এক নবীকে ফাজ্র-এর সালাতের জন্য সময় মত জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, মসজিদে ইহরাম অবস্থা ব্যতীত উকুনের বেলায় যেমন উহাদিগকে মারিয়া ফেলার অনুমতি আছে, তবে নির্দেশ রহিয়াছে, উহাদিগকে যেন অগ্নিতে নিক্ষেপ করা না হয়। flea কীটের রক্ত অথবা বিষ্ঠা কাপড়ে অথবা শরীরে লাগিলে উহা ধুইয়া ফেলার আবশ্যকতা প্রথম যুগে আলোচিত হইয়াছে। অধিকাংশ ফাকীহের মতে বিষ্ঠার কয়েকটি মাত্র দাগ ওযূ (وضوء)-এর আঘাত ঘটায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহিজ, হায়াওয়ান, নির্ঘন্ট, শিরো. কাম্ল; (২) ঐ লেখক, বুখালা, সম্পা. হাজিরী, ১৯৯ (Arabica, 1955/ 3,327); (৩) Damiri. দ্র. শিরো; (৪) কায়রাওয়ানী, রিসালা, নির্ঘন্ট, দ্র. poux।

সম্পাদক (E.I.[2])/ মোঃ আবদুস সালাম

কাম্হ্ (كمح) ঃ গমের সিরিয়া ও মিসরে প্রচলিত নাম। ইরাকে গমকে হিন্তা ও আরবে যুর্র বলা হইত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী রচনায় গমবোধক এই বিভিন্ন শব্দের সবগুলিই প্রচলিত ছিল। মুসলিম শাসনামলের সূচনা হইতে (এবং বহু আগেও) গম ছিল নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির প্রধান খাদ্যশস্য। অথচ মধ্যযুগের য়ূরোপে, এমনকি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জন্যেও যব ও রাই হইতে রুটি প্রস্তুত করা হইত। মুসলিম অঞ্চলের খাদ্যশস্যগুলির মধ্যে গমের প্রাধান্য মুসলিম দেশগুলিকে দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতেও আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল বলিয়া একজন চৈনিক পরিব্রাজক মন্তব্য করিয়াছেন।

মুসলিম চিকিৎসকগণ অসুখ-জ্বর ইত্যাদি হইলে রোগীদিগকে গম ছাড়া অন্য কোনও শস্যের রুটি খাইতে নিষেধ করিতেন। লিখিত নানা বিবরণ হইতে প্রমাণ মিলে যে, খলীফাদের শাসনামলে কেবল দক্ষিণ ইরাকের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা চাউলের রুটি খাইত। অবশ্য খুযিস্তান ও কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী কয়েকটি প্রদেশে, যেমন মাযানদারানের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধানের আবাদ হইত এবং ঐ সকল অঞ্চলে খাদ্যশস্য হিসাবে চাউলের প্রাধান্যও ছিল। তবে মুসলিম দুনিয়ার মধ্যাঞ্চলের জনগণ কেবল আকাল-অভাবের সময়েই অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময়ে ও সাধারণ সমৃদ্ধির বিশেষ অবনতিকালে গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্যের রুটি খাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই রকম ঘটনা ঘটে ৯ম/১৫শ শতকের মিসরে। যবের রুটি ছিল তপস্বী ও মিতাহারী দরবেশগণের খাদ্য।

৩য়/৯ম শতকের ইরাকী অর্থ বিভাগের নানা উদ্ধৃত বিবরণ আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে ভৌগোলিক কুদামা ইব্ন জা'ফার ও ইব্ন খুর্রাদাযবিহের রচনাবলীর মাধ্যমে। তাঁহাদের রচনাবলীর ঐ সকল বিবরণে করের আকারে রাজকোষে প্রাপ্ত গম ও যবের পরিমাণ সংক্রান্ত কিছু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। উহাতে গম ও যব প্রাপ্তি যে সকল পরিমাণের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, যবের সরবরাহ বা উৎপাদন গমের অপেক্ষা কিছুটা বেশী হইত। কিন্তু এই যব পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইত। ইহা ছাড়া ঐ বিবরণে দেখা যায়, যে সকল অঞ্চল বা এলাকার মাটি গম চাষের জন্য কম উপযুক্ত সেখানকার জমিতেই প্রধানত যবের আবাদ করা হইত। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় এই যে, ইরাকে যব ও গমের উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারটি সুপ্রাচীন সুমেরীয় যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং আজিও ঐ বৈশিষ্ট্য ইরাকে বিদ্যমান। খলীফাদের শাসনামলে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় বিপুল পরিমাণে গমের উৎপাদন হইত ও ঐ ফসলের চালান যাইত দক্ষিণ ইরাকে। সিরিয়ার হামা, হিম্স ও বা'লাবাক্ক প্রদেশ, বিশেষত হাওরান প্রদেশ ছিল দেশের শস্যাগার। এই সকল প্রদেশ হইতে তখন চতুর্দিকের প্রদেশগুলিতে গমের চালান যাইত। ফিলিসতীনের উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চলে চমৎকার জাতের গমের ফলন হইত। আল-মুকাদ্দাসী রামলার গমের রুটির চমৎকার উৎকর্ষের প্রশংসা করিয়াছেন। আগে মিসর হইতে রোম ও কন্স্টান্টিনোপ্‌ল-এ গমের চালান দেওয়া হইত। খলীফাদের শাসনামলে ও তাঁহাদের পরবর্তী শাসকদের সময়ে মিসর হইতে হিজায ও অন্যান্য দেশে গম রফতানী করা হইত। মিসরে প্রধান গম আবাদের অঞ্চলটি ছিল দেশের দক্ষিণাংশে সা'ঈদ প্রদেশে। আরবীয় গ্রন্থকারগণ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মিসরে উৎপাদিত কোনও কোনও জাতের গম ছিল অতুলনীয় মানের। মিসরে মুসলিম বিজয় অভিযানের আগে হইতেই যবের আবাদ হ্রাস পাইতেছিল এবং উহা মুসলিম বিজয়ের পরেও সম্ভবত অব্যাহত ছিল। ৮ম/১৪শ শতকে মিসর সফরকারী য়ূরোপীয় পর্যটকগণ মিসরের গমের চমৎকার গুণমানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং উহা হইতে প্রস্তুত রুটির চমৎকারিত্বের কথা বলিয়াছেন। এইভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া খাদ্য হিসাবে গমের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকে। উত্তর আফ্রিকার গোটা উপকূল অঞ্চলে গমের আবাদ হইত এবং অন্ততপক্ষে শহরবাসীদের প্রধান খাদ্যও ছিল গম। বূনা প্রদেশের বিবরণ প্রসঙ্গে ভূগোলবিদ ইব্ন হাওকাল বলেন, এত বেশী গম ও যব ফলিত যে, উহার পরিমাণ নির্ণয় ছিল দুঃসাধ্য। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ব্যবসায়ী-সওদাগরগণ তৎকালে ঘানা ও তাকরূর নামে পরিচিত (বর্তমানকালের সেনেগাল ও মালির অংশবিশেষ) দেশগুলিতে গম রফতানী করিতেন।

মুসলিম দেশগুলিতে গমের প্রাধান্য ছিল সর্বজনীন ব্যাপার। কেবল কিরমান ও নুবিয়ার মত অত্যন্ত বিশুষ্ক অঞ্চলে সোরগাম বা যুরা ফসলের আবাদ হইত। অন্যত্র অবশ্য একই জাতের গমের চাষ হইত না। ভূগোলবিদ আল-বাক্রী বলেন, পশ্চিম মরক্কোর সিজিলমাসা প্রদেশে এক ধরনের ক্ষুদ্র দানার 'চীনা' গমের চাষ হইত। গমের ব্যাপারে এই যাবত যে সকল তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার সকলই মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগের। পরবর্তী সময় তথা মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের বহু স্থানেই গমের চাষ হ্রাস পায়। গম আবাদের জমি যেমন কমে তেমনই গম উৎপাদনের পরিমাণও কমিয়া যায়। গমের উৎকর্ষও নামিয়া যায়। মুসলিম অঞ্চলগুলিতে যাযাবর বেদুঈনদের দল ভারী হওয়াই ইহার কারণ। ভূর্জপত্র তথা প্যাপিরাস (এক জাতীয় নলখাগড়া)-এর লিপি, আরবী ঘটনাপঞ্জী ও বিভিন্ন আরব

গ্রন্থকারের রচনার বিবরণে গম ও যবের দাম সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রহিয়াছে। 'আব্বাসী আমলে নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতে গম ও যবের দামের অনুপাত ছিল ২ ঃ ১ এবং আরও পরে মধ্যযুগীয় আমলে ঐ অনুপাত ছিল ৩ ঃ ২। ইহা স্পষ্ট যে, উমায়্যা ও 'আব্বাসী খলীফাদের শাসনামলে ইরাক ও মিসর— উভয় দেশেই গমের দাম ৯০০ ভাগ, এমন কি উহার বেশী হারে বৃদ্ধি পায়। ৪র্থ/১০ম শতকের শেষ হইতে গমের দাম ইরাকে এবং ৫ম/১১শ শতকের শেষ ভাগ হইতে মিসরে পড়িতে থাকে। সম্ভবত জনবসতির বা সমাগমের ক্ষেত্রে প্রধান প্রবণতাগুলির কারণে ইহা ঘটে। খলীফাদের শাসনামলে জনসংখ্যা (অর্থাৎ ভোক্তা) বৃদ্ধি পায় এবং ক্রুসেডের যুদ্ধের আমলে ঐ জনসংখ্যা কমিয়া যায়।

প্রাচীন আমলে খাদ্যশস্যগুলির দাম যে ওজনে নির্ধারিত হইত তাহা হইল ইরাকে কুর্‌র (২৯২৫ কেজি), মধ্য সিরিয়ায় গিরারা (২০৮.৮ কেজি), আলেপ্পোয় মাক্‌কূক (প্রায় ৮২ কেজি), মিসরে প্রথমে তিল্লী (৬৭.৫ কেজি) ও পরে ইর্‌দাব (৬৯.৬ কেজি) এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মুদ্দ (পরিমাপ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Mez, Renaissance, 405, ইং. অনু. 430; (২) কুদামা ইব্‌ন জা'ফার, কিতাবু'ল-খারাজ, ২৩৭ ও তু. অনু. De Goeje, 180; (৩) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ, ৮ প.; (৪) আল-মাস'ঊদী, তান্‌বীহ, ২২; (৫) আল-মুকাদ্দাসী, ১৩৬, ১৪৫, ১৫১; (৬) D. Muller-Wodarg, Die Landwirtschaft Agyptens in der fruhen Abbasidenzeit, in Isl. xxxii (1957), 17 প.; (৭) ইব্‌ন হাওকাল, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১; (৮) আল-বাক্‌রী, Description de l'Afrique Septentrionale (সম্পা. de Slane), 151, 158; (৯) আল-ইসতাখরী, ৯১; (১০) Spuler, Iran, 387; (১১) E. Ashtor, Essai sur l'alimentation des diverses classes sociales dans l'Orient medieval, in Annales Ec., soc., civ., xxiii (1968), 1018 প.; (১২) ঐ লেখক, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient medieval, Paris 1969, 42 প., 77 প., 100 প., 124 প., 242 প., 282 প., 392 প., 451, 453 প.; (১৩) E. Ehrenkreutz, The kurr system in medieval Iraq, in JESHO, v (1962), 309; (১৪) X. de Planhol, Les fondations geographiques de l'histoire de l'Islam, Paris 1968, 90।

E. Ashtor (E.I.²)/আফতাব হোসেন

কামানচা ঃ (দ্র. মালাহী)।

কামানিচা (قمنيه، قمانچه) ঃ (Kamieniec, Kamenetz), ইউক্রেইন-এর একটি দুর্গ শহর; উত্তরাঞ্চলে Podolia নামে পরিচিত স্থানে অবস্থিত। তাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে এই দুর্গবিশিষ্ট অজেয় ঘাঁটি হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। লিথুয়ানিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা (১৪৩২ খৃ., সালের পর) ও পোল্যাণ্ড রক্ষায় এই দুর্গ ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণসাগর উপকূল Moldavia হইতে পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক সাগর তীর অবধি চলিয়া যাওয়া বাণিজ্য পথের ধারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এই কামানিচা। এক সুউচ্চ শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই দুর্গ ছিল অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী। স্থানটি Smotric ও Dnestr নদীর মিলন স্থলের (তু. Dupont, 29) কিছু আগে অবস্থিত। Dupont তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, le boulevard de la chretiente dans cette partie de l'Europe। ১০৪২/১৬৩৩ সনে উছমানী সেনাবাহিনী কামানিচায় উপস্থিত হয় (Fedhleke, ii, 160)। তবে ১০৮৩-৭/১৬৭২-৬ সনে পোল্যাণ্ড ও উছমানী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘাতের আগে অবধি এই দুর্গটি তুর্কীদের দখলে যায় নাই। অবশ্য যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই (১০৮৩/১৬৭২) ইহা তুর্কী প্রধান উযীর আহমাদ কোপরুলুর পদানত হয়। তবে এই দুর্গের উপর তুর্কী নিয়ন্ত্রণ ছিল স্বল্পস্থায়ী। Karlowitz-এ সম্পাদিত শান্তি চুক্তি অনুযায়ী দুর্গটি ১১১০/১৬৯৯ সনে পোল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং Sacra Liga যুদ্ধের অবসান ঘটে (১৬৮৪-৯৯ খৃ.)। ১৭০৩ খৃ. পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বিভক্তির সময় এই দুর্গ-শহরটি রাশিয়ার হাতে চলিয়া যায়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ খৃ. দুর্গটি আরও একবার পোল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া গেলেও ইহা ১৯৪৫ খৃ. হইতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাজ্জী খলীফা, Fedhleke, ইস্তাম্বুল ১২৮৬-৭ হি., ২খ, ১৬০; (২) রাশিদ, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., ১খ, ২৬৬ প.; (৩) সিলাহদার, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ১খ, ৫৮৬ প.; (৪) য়ূসুফ নাবী, তা'রীখ-ই কামানিচা, ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি.; (৫) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামে, ৫খ, ইস্তাম্বুল ১৩১৫ হি., ১২৮ প.; (৬) Acta Ioannis Sobieski, সম্পা. Fr. Kluczycki, ii/i, Cracow ১৮৮১ খৃ., ১০৬০ প.; (৭) S. Makowiecki, Relacya o upadku Kamienca r. 1672, in Przeglad Powszechny ix (Cracow 1886); (৮) G.Groski, Wojna Rzeczypospolitej z Turcja w latach 1672 i 1673, Warsaw 1890; (৯) J. Pajewski, Bunczuk i Koncerz. Z Dziejow Wojen Polsko Tureckich, Warsaw, 1960, 146 প.; (১০) J. Wolinski, Wojna Polsko-Turecka 1672-1676 w Swietle Relacji Rezydentow Austriackich w Turcje, in Studia i Materialy do Histori Wojsko-wosci [Wojskowy Instytut Historyczny Zaklad Historii Dawnego Wojska, Polskiego], vii/2 (Warsaw 1961), 322 প.; (১১) L. Finkel, Bibliografia Historyi Polskiej, Warsaw 1956, ii, 1335, 1953 (নির্ঘণ্ট); (১২) Cronicele Romaniei Seu Letopisetele Moldaviei si Valahiei, সম্পা. M. Kogalniceanu, iii, Bucharest 1874, 7 প.; (১৩) E. de Hurmuzaki, Documente la Istoria Romanilor, Supl. privitoare, ii/3, Bucharest 1900, 89 প. (Peace of Zurawna 1087/1676); (১৪) Memoires du Sieur de la Croix, Paris 1684, i, 325 প.; (১৫) Mons. de Jonsac, Histoire de Stanislas Jablonowski, Castellan de Cracovie, Grand General des Armees de Pologne, Liepzig 1774, iii, 182 (plans of Kamieniec); (১৬) P. Dupont,

Memoires pour servir a l'Histoire de la Vie et des Actions de Jean Sobieski III du nom, Roi de Pologne, সম্পা. J. Janicki, Warsaw 1885, 28 প. 226 প. 268 প. (নির্ঘন্ট); (১৭) E. Eickhoff, Venedig, Wien und die Osmanen, Munich 1970; (১৮) Hammer-Purgstall, Histoire, xi, 385 প., xii (Paris 1838), 158, 462; (১৯) Zinkeisen, v. 71, 138, 213; (২০) N. Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, iv, Gotha 1911, 144, 203 প., 272; (২১) Babinger, 179, 229, 238; (২২) Agah Sirri Levend, Gazavat-nameler..., Ankara 1956, 126 প.; (২৩) J. A. দ্র. Kamanice, (Aurel Decei)।

V. J. Parry (E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

আল-কামার (القمر) ঃ আ. চন্দ্র। (১) জ্যোতির্বিজ্ঞান ঃ আল কামার মহাকাশ তথা সৌরমণ্ডলের অন্যতম অঙ্গ। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগের মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাটি ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পূর্বপুরুষদের। এই একই ধারণায় ঐ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, এমন কি 'সাতটি গ্রহে'র সকলগুলিই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু আসলে নিজ কক্ষে চন্দ্রের আবর্তন অত্যন্ত জটিল ব্যাপার; কেননা উহা সূর্য ও পৃথিবীর মহাকর্ষের টানের সমন্বয়ে সাধিত হইয়া থাকে। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বড় লক্ষ্য ছিল চন্দ্র আবর্তন পর্যায়ের একটি চলচ্ছবি সদৃশ মডেল নির্মাণ যাহার দ্বারা চন্দ্রের প্রদক্ষিণ বা আবর্তনের সঠিক পূর্বাভাস দান করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। বিশেষত পরিক্রমা শেষে দুই জ্যোতিষ্কের একান্ত সান্নিধ্যের পর চান্দ্র মাসের সূচক হিসাবে নবচন্দ্রকলার উদয় নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিধায় এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাদের ঐ প্রয়াসে পুরাপরি সফল না হইলেও তাঁহারা যে মডেলের ধারণা গড়িয়া তোলেন তাহা মূলত পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী Copernicus-এর মডেলের অনুরূপ বলা যায়।

জাহিলী যুগের আরব ও পরবর্তীকালে মুসলমানদের নিকটও চান্দ্র মাস ছিল বর্ষপঞ্জীর গণনায় মৌলিক একক। এই চান্দ্রমাসের সূচনা হয় সূর্যের সহিত চন্দ্রের একই অবস্থানে আসিবার পর যে প্রথম শিশু চন্দ্রকলা পরিদৃষ্ট হয় সূর্যাস্তের পর — তখন হইতে। এই মাসের কাল পরিসরের ভিন্নতা হয় দুইটি চল্-এর ক্রিয়াকারণে; একটি চল্ হইতেছে সৌর গতি ও অন্যটি চান্দ্র গতি। তবে চান্দ্র মাস সাধারণত গড়ে সাড়ে ২৯ দিনের মত হইয়া থাকে। আর মাসের ঐ কাল পরিসরের ভগ্নাংশ বা অর্ধদিবসের সামঞ্জস্য বিধান বর্ষপঞ্জীতে করা হয় একটি মাস ২৯ দিন ও পরবর্তী মাস ৩০ দিন ধরিয়া। ৩০ দিনের চান্দ্র মাসকে পূর্ণ মাস বলা হয়। পক্ষান্তরে ২৯ দিনের মাসকে অপূর্ণ মাস বলা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের আগে কয়েক শতাব্দী যাবত আরবগণ প্রতি বৎসর একই মৌসুম বা ঋতু যাহাতে একই মাসে পড়ে— সেই জন্য প্রয়োজন হইলে চান্দ্রমাসগুলির মধ্যে রদবদল করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইত (দ্র. আল-বীরূনী, ঘটনাপঞ্জী, অধ্যায় ৫; আবূ মা'শার, in JA, ser. V, xi 1858, 168-78 ও Nallino, Raccolta, v, 156-8)। কিন্তু মুসলমানগণ সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র মাসগুলির ঐ ধরনের সামঞ্জস্য বিধান করেন না। ফলে সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে ১১ দিনের মতো পার্থক্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ নূতন চান্দ্র বৎসর ১১ দিন আগাইয়া আসে।

আল-বীরূনীর বর্ণনা অনুযায়ী সৌর বর্ষপঞ্জীর সহিত চান্দ্র বর্ষপঞ্জীর সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জাহিলী যুগের আরবগণ যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিত উহার অন্যতম ছিল, প্রথম নব চন্দ্রকলার উদয়কালে চন্দ্র কোন্ মানযিলে (Lunar mansion) অবস্থান করিতেছিল উহা পর্যবেক্ষণ করা। ধরা হয় যে, চন্দ্র তাহার মাসিক আবর্তন বা পরিক্রমায় ২৮টি পর্যায় অতিক্রম করে। ইহার এক একটি পর্যায়কে আরবীতে 'মানযিল' (দ্র.) বলা হয়। ২৮টি মানযিলের উদয়ের এই ব্যাপারটিকে আগেকার কালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইত (দ্র. ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল আন্ওয়া)। ঐ ২৮টি মানযিল বলিতে ভারতীয় কাল গণনাশাস্ত্রে ঐগুলি কার্যত আলাদা আলাদা নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলী বিশেষ। চন্দ্রের সহিত মানযিলগুলির সম্মিলনে ও উল্লিখিত ২৭ বা ২৮টি নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের মিলনের ভারতীয় ব্যাখ্যা-ব্যবহারের সহিত সাদৃশ্য পরে ক্রমান্বয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইয়া উঠে। চন্দ্র সাধারণত উহার নিজের সহ ঊর্ধ্বাকাশের সকল পরিমণ্ডলীয় প্রভাবের যে চারিটি উপাদান পৃথিবীকে প্রভাবিত করে সেগুলির বাহক হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের হিজরী সনের সূচনার তারিখ নির্ধারণ করিয়া থাকেন ৬২২ খৃষ্টাব্দের 14 বা ১৫ জুলাইয়ের দিবাবসান বা সূর্যাস্তের সময় হইতে। ইহার পরের সাধারণ বৎসগুলি হয় ৩৫৪ দিনে। কিন্তু চান্দ্র মাসের হিসাবে ঈষৎ অশুদ্ধতার কারণে (সাড়ে ২৯ দিন) উহা সঠিক করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে একটি রদবদল চক্র ঐ হিসাবে আরোপ করা হয়। এই চক্র নিয়ম বা সূত্রানুসারে, প্রতি ৩০ চান্দ্র বৎসরের ১১টি বৎসরের প্রতিটিতে ৩৫৫টি করিয়া দিন থাকে। এই ধরনের জ্ঞাত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চক্রটি 'মুজাররাদ' নামে পরিচিত। এই চক্রটি ২১০ (৩০×৭) বৎসরের জন্য। চক্রটি এইভাবে পরিকল্পনা করা হইয়াছে যাহাতে বর্ষ ও মাসের সূচক সপ্তাহের দিনও চক্রাকার লাভ করে। এই চক্রটির সন্ধান পাওয়া যায় সর্বপ্রথম আল-ফাযারীর রচনায় (fl. ১৪৫/৭৬২-আনু. ১৭৪/৭৯০) [D. Pingree, in JNES, xxix (1970), 110-11]। অবশ্য উহার পর হইতে চক্রের উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়।

চন্দ্রের আবর্তন সংক্রান্ত আদি মুসলিম তত্ত্বগুলি গ্রীক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত ইন্দো-সাসানীয় তত্ত্ব ও ধারণা বিকাশের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। আর এই তত্ত্বগুলির সাক্ষাত মিলে যীজু'ল-সিন্দহিন্দ ও যীজু'শ-শাহ-এ। এই সকল তত্ত্বের মাঝে কেবল একটি অসাম্য পরিলক্ষিত হয়, আর সেইটির ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হইয়াছে এই ধারণায় ঃ ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে একটি মন্দচক্র আছে। ঐ মন্দচক্রের পরিধির উপর চন্দ্র (অধিকতর প্রযোজ্য ঃ চন্দ্রের অপভূ) আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু এই আবর্তন শীঘ্র বৃত্তের (D. Pingree on Masha, 'llah's De elementis et orbibus coelestibus) পরিধির উপর উপচক্রের কেন্দ্রের আবর্তনের বিপরীত আবর্তন। এই বিষয়ে 'ভারতীয়' পদ্ধতিগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল। এইগুলি অনুসারে শিশু চন্দ্রকলার প্রথম দৃষ্টিমানতার যে পদ্ধতিতে

হিসাব করা হইয়া থাকে সেই পদ্ধতিগুলি গোড়ার দিকের মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুসৃত পদ্ধতিতে প্রায়শ পরিলক্ষিত হয় (দ্র. E. S. Kennedy on Ya'kub ibn Tarik in JNES, xxvii, 1968, পৃ. 126-32)। অক্ষাংশে চান্দ্র লম্বন হিসাব করার ভারতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, অর্থাৎ ঐ পদ্ধতিটিও প্রায় ক্ষেত্রেই মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুসরণ করিয়াছেন (দ্র. O. Neugebauer, The Astronomical Tables of Al-Khwarizmi, Copenhagen 1962, 71-2, 121-6; E. S. Kennedy in Isis, xlvii (1956) 33-53)। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মুসলিম চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি টলেমীয়।

হিজরী তৃতীয় শতকে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ ক্রমান্বয়ে গ্রহাবর্তনের প্রশ্নে টলেমীর মডেল গ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁহারা আগেকার এই সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী হইতেও কোনও কোনও বিষয় যেমন, প্রধানত কিছু কিছু নূতন পরামিতি গ্রহণ এবং জ্যা-র পরিবর্তে 'সাইন' (sine) ও তৎসম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। টলেমী চন্দ্রের ক্ষেত্রে এক শীঘ্রবৃত্ত-তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। এই শীঘ্রবৃত্তের কেন্দ্র পৃথিবীর চতর্দিকে একটি ক্ষুদ্রাকার বৃত্তের উপর ঘূর্ণমান (the crankmechanism) এবং ঐ আবর্তন ঘটে অন্যান্য খগোলীয় বস্তুর শৃঙ্খল-বিন্যস্ত ধারার বিপরীতে এবং সূর্য হইতে চান্দ্র দ্রাঘণের দ্বিগুণ হারে বা গতিতে। চান্দ্র মন্দবৃত্তের কেন্দ্রটি খগোলীয় বস্তু শৃঙ্খলাবর্তনের বিপরীতে শীঘ্রবৃত্তের পরিধির উপর চন্দ্রের মধ্য বা গড়গতির হারে আবর্তিত হয়। আর খোদ চন্দ্র খগোলীয় বস্তু শৃঙ্খলাবর্তনের বিপরীতে নিজ কৌণিক গতির হারে মন্দবৃত্তের পরিধির উপর আবর্তিত হয়। এই ক্রিয়াপদ্ধতির তলটি উপবৃত্তের তলের প্রতি নতি প্রবণতাসম্পন্ন এবং উক্ত দুই দলের প্রতিচ্ছেদের ব্যাসটি চন্দ্রের পাতবিন্দুর গতির হারে খগোলীয় বস্তুশৃঙ্খলার বিপরীতে আবর্তিত হয়। শুধু উহাই নহে, চান্দ্র মন্দবৃত্তের অপভূ যেখান বা যে স্থান হইতে চন্দ্রের কৌণিক গতি গণনা করা হইয়া থাকে, উহা সেই রেখার প্রতিচ্ছেদ স্থল নয়, যে রেখা পৃথিবী হইতে প্রলম্বিত হইয়া মন্দবৃত্তের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া উহার পরিধি অবধি চলিয়া গিয়াছে, বরং উহা হইতেছে সেই রেখার প্রতিচ্ছেদ যে রেখা শীঘ্রবৃত্তের কেন্দ্রের বিপরীতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ক্ষুদ্রাকার বৃত্তের উপরের বিন্দুটি হইতে মন্দবৃত্তের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া উহার পরিধি অবধি প্রসারিত (prosneusis)। এই মডেলে বিভিন্ন পরামিতির [যেমন, তিনটি বৃত্তের পারস্পরিক ব্যাসের অনুপাতসমূহ, চন্দ্র, সূর্য ও চান্দ্র কৌণিক গতির (গড়) হারসমূহ এবং চান্দ্র পাতবিন্দু ও চান্দ্র কক্ষের নতি-প্রবণতা ইত্যাদির] প্রয়োগের কারণে কোনও নির্ধারিত কালের জন্য বিভিন্ন অনুমানকৃত দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ পাওয়া যায় আর তাই মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত বা অন্যভাবে নির্ণীত 'সত্যকার' দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সহিত ঐ প্রাপ্ত দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের অধিকতর সুসামঞ্জস্য বিধানের জন্য সাধারণত উল্লিখিত পরামিতিগুলির রদবদল করিয়াই সমস্যার সহজ সমাধান করিতেন।

অবশ্য এই রায়ের বা নিয়মের দুইটি প্রধান ব্যতিক্রম রহিয়াছে। মারাগার জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষের দিকে টলেমীর গ্রহাদি সম্পর্কিত মডেলের পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল অধিকতর 'নির্ভুল' বিভিন্ন মডেল গড়িয়া তোলা যাহাতে বৃত্তের কেন্দ্রের চতুর্দিকে সকল আবর্তন বৃত্তাকার ও নিরবচ্ছিন্ন হয় এবং টলেমীর মডেলের মত পাদসাংস্থানিক অবস্থানে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের অবস্থান অতখানি যৎসামান্য না হয়। বস্তুত এই সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াসের চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছে দামিশ্কের আশ-শাতির (fl. ৭৫০/১৩৫০)-এর চমৎকার কাজে। তিনি যে চান্দ্র মডেলটি নির্মাণ করেন তাহা মূলত Copernicus-এর মডেলেরই একান্ত অনুরূপ। বলা যায়, পোলবিজ্ঞানী অনিবার্যভাবেই সম্ভবত আশ-শাতিরের মডেলের ভিত্তিতে তাঁহার মডেল তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ইহা কোনও না কোনভাবে সম্ভব হইয়াছিল। ইবনু'শ-শাতির টলেমীর মডেলের শীঘ্রবৃত্তের কেন্দ্রস্থলের উপরে পৃথিবীর চতুর্দিকের বৃত্তটির পরিবর্তে চন্দ্র ধারক দ্বিতীয় একটি মন্দবৃত্ত প্রতিস্থাপিত করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত ফল লাভে প্রয়াসী হন। টলেমীর তত্ত্বানুসারে পৃথিবীর উপরে অনুমিত ক্ষুদ্রাকার বৃত্তের ঠিক উপরে শীঘ্রবৃত্তটি আবর্তন করে। দ্বিতীয় প্রতিস্থাপিত মন্দবৃত্তটির কেন্দ্র প্রথম মন্দবৃত্তের উপর আবর্তিত হয় (দ্র. V. Roberts in Isis, xlviii (1957), 428-32; F. Abdud in Isis, liii (1962), 492-9 এবং E. S. Kennedy in Isis, lvii (1966), 365-78)। এই মডেলের দ্বিতীয় পরিমার্জন সাধিত হয় য়াহূদী জ্যোতির্বিদ Levi ben Gerson-এর (1288-1344) প্রচেষ্টায়। এই বিজ্ঞানীর নিবাস ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের Orange নামক স্থানে। তাঁহার চান্দ্র মডেলগুলি খুবই জটিল প্রকৃতির। এই বিষয়ে দ্র. B. R. Goldstein রচিত একখানি গ্রন্থের Proc. Israel Acad. Sci. Hum., iii (1969) 239-54 বিশদ বর্ণনা। আর আল-বিতরূজী এই ক্ষেত্রে যে 'অ্যারিস্টোটলীয় মডেল' নির্মাণ করিয়াছেন (B. R. Goldstein, Al-Bitruji, New Haven 1971, i, 36-9 ও 142-54) তাহা টলেমী'র মডেলের তুলনায় কোনও দিক হইতেই উন্নত নহে।

চন্দ্রের বিষয়ে আর একটি সমস্যা যাহার প্রতি মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতেছে চন্দ্রের আলোর প্রকৃতি। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে দাঁড়ায়, কিভাবে চন্দ্রের কিরণ সৌর কিরণের উপর নির্ভর করে সেই রহস্যটির প্রতি মুসলিম বিজ্ঞানীরা আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্যাটি বস্তুতপক্ষে ইবনু'ল-হায়ছামের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইয়া উঠে। তাঁহার রচিত 'ফী দাও'ই'ল-কামার (লেখকের মাজমূ'উর-রাসা'ই'ল, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৫৭/১৯৩৮; তু. M. Schramm, Ibn al-Haytham's Weg zur Physik, Wiesbaden 1963, 70-189) গ্রন্থে এই বিষয়ে মধ্যযুগের অত্যন্ত মৌলিক আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দেখুন নিম্নে উল্লিখিত ও প্রকাশিত যীজগুলি; এই ধরনের আরও প্রকাশনায়, যেইগুলিতে চান্দ্র তত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্য রহিয়াছে ঃ (১) Caussin de Perceval, Le Livre de la grande Table Hakemite, Notices et extraits, vii, Paris 1803, 16-240 (Ibn Yunis); (২) L. A. Sedillot, Prolegomenes des tables astronomiques d'Oloug-Beg, 2 vols., Paris 1847-53; (৩) Carra de Vaux, L. Almageste d' Abu'l Wefa al-Buzjani, in JA, ser. viii, xix (1802), 408-71; (৪) C. A. Nallino, Opus Astronomicum 3 Vols., Milan 1899-1907 (আল-বাত্তানী); (৫) F. Nau, Le livre de l'ascension

de l'Esprit, Paris 1900 (Bar Hebraeus); (৬) A. Bjornbo, R. Besthorn ও H. Suter, Die astronomischen Tafeln des... al-Khwarizmi, Copenhagen 1914; (৭) O. Neugebauer, The astronomical tables of al-Khwarizmi, Copenhagen 1962; (৮) আল-বীরূনী, কানুনু'ল-মাস'উদী, ৩খ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৫৪-৬ খৃ.; (৯) B. R. Goldstein, Ibn al-Muthanna's Commentary, New Haven 1967; (১০) G. J. Toomer, A survey of the Toledan tables, in Osiris. xv (1968), 5-174। এই নিবন্ধে প্রদত্ত সূত্র নির্দেশ ছাড়াও দ্র. (১১) D. Pingree in Dumbarton Oaks Papers, xviii (1964), 135-60; (১২) E. S. Kennedy in Oriens, xviii-xix (1967), 327-34; (১৩) H. Salam ও E. S. Kennedy in JAOS, lxxxvii (1967), 492-7; (১৪) O. Neugebauer, in Mem. Ac. Roy. Belg. Cl. Lettres, lix (1969), 5-45; (১৫) C. Jensen in Archive for History of Exact Sciences, viii/4 (1972), 321-8।

D. Pingree (E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

২। **লোকগাথা, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি ঃ** জাহিলী আরবে চন্দ্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চন্দ্র পূজা সেখানে এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবের অধিকারী হয়, যদিও বিষয়টির সম্ভবত অতিরঞ্জন বা অতিমূল্যায়ন করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, মেসোপটেমিয়ার চন্দ্র দেবতা সীন নিঃসন্দেহে হাদরামাওতের সর্বপ্রধান আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়। মধ্য আরবের বেদুঈনগণ দিনের প্রচণ্ড গরম এড়াইবার জন্য তাহাদের অনেক কাজকর্ম রাত্রিকালে সম্পাদন করিত। স্বভাবত তাঁহারা চন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করে। আর তাই তাহাদের মধ্যে চন্দ্রের বিভিন্ন দিক, বৈশিষ্ট্য ও কলা (বিকাশ পর্যায়), চান্দ্র চক্রের বিভিন্ন রাত্রি সম্পর্কে শ্লোক, কাহিনী, কবিতা ইত্যাদির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রহিয়াছে। তাহা ছাড়া চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত অনেক ছড়া, শ্লোক, হেঁয়ালী, ধাঁধা ইত্যাদি রহিয়াছে যেইগুলির মধ্য দিয়া চন্দ্রের প্রতি নানা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং চান্দ্রকলার বিষয়ে যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে চন্দ্র ক্রমাগতভাবে এক পর্দার (গিলাফ) ভিতর প্রবেশ করে বলিয়া দেখানো হয় এবং ঐ পর্দাকে আবার শিশ্ন আবরণী ত্বকের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে।

ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহের নিয়ামক হিসাবে চন্দ্রের এক প্রধান ভূমিকার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইসলামে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্বাদি এবং চন্দ্র ঐগুলির জবাব দিবে এমন কল্পনাও করা হইয়াছে। প্রাচীন আরবের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (দ্র. আনওয়া') চান্দ্র মানযিলের বর্ষপঞ্জীর মাঝে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম প্রক্রিয়া ইখ্‌তিয়ারাত (দ্র.) (clectiones)-এ নিহিত যাহা চন্দ্রের অন্যতম মানযিলে উহার অবস্থানের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রের এই বিশেষ মানযিলে অবস্থান কালেই কোনও এক নির্ধারিত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া ধরা হয়। একটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ধারণা অনুযায়ী এই রকম একটি সর্বব্যাপী ধারণা প্রচলিত যে, সর্বপ্রকারের প্রাকৃতিক ঘটনার উপর চন্দ্রের প্রভাব রহিয়াছে। বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কিত এক চক্র-তত্ত্বানুযায়ী মনে করা হয় মহানবী মুহাম্মাদ (স) যে আমলের সূচনা করেন তাহা এক চান্দ্র 'যুগ' বা আমল।

আরবীয় আলকেমি বিজ্ঞানে বলা হয়, রৌপ্য ধাতু চন্দ্রের প্রভাবাধীন। বহু যাদু এবং ঐশী বলিয়া কথিত পদ্ধতি চন্দ্রের সহিত সম্পর্কিত, যেমন নজীর হিসাবে এখানে ত্বক, করোটির অস্থি, সোমবার, স্ত্রী যৌনাঙ্গ ও আরবী 'জীম' হরফ ইত্যাদির সহিত চাঁদের সম্পর্কের কথা বলা হয়।

সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় কাব্য উপমারূপে বহু স্থলেই চন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মানুষের মুখমণ্ডল, বিশেষত সুন্দরী নারী বা রূপবান পুরুষের আননের সহিত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ শশীর (বাদ্‌র) উপমা দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্রচন্দ্র তথা শিশুচন্দ্রের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই ধরনের তুলনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসার দাবীদার। অবশ্য কোনও কোনও কবি দৃশ্যত বেদুঈনদের প্রচলিত প্রবাদ প্রয়োগে চাঁদের ঘাটতির দিকগুলির উপর এমনভাবে গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন যাহা সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিচারকদের নিকট অবমাননাকরও গণ্য হইতে পারে। মরমিগণ চন্দ্রকে ভালবাসার যোগ্যতাবর্জিত বাস্তবতা হিসাবে দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস, বিশেষত তুর্কী ও ফার্সী কবিতায় এক প্রতীকধর্মী বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

কোনও কোনও মুসলিম অঙ্কনচিত্রে চন্দ্র দেখা যায় বটে, তবে ইহা আরও পরবর্তীকালে য়ূরোপীয় প্রভাবে ভারতে বহুল প্রচলন লাভ করে। সর্বোপরি অবশ্য এই উল্লেখ আবশ্যক যে, চন্দ্রের বিষয়টি অলঙ্করণের একটি মূল ধারণা বিশেষ এবং ইহার উৎপত্তি বিধর্মী প্রতীকবাদ হইতে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলীতে চন্দ্রের বিশেষ ভূমিকা ও উল্লেখের উৎস ব্যাবিলনীয় মডেল বা দৃষ্টান্ত। ব্যাবিলনীয় চন্দ্র মডেলটি আবার উদ্ভূত হইয়াছে হেলেনীয় তথা গ্রীক প্রতীকের প্রাচীকরণের মাধ্যমে।

চন্দ্রের ব্যাপারে বহু ধরনের লোক প্রচলিত ঐতিহ্য-কাহিনী আদিকাল হইতে যুগান্তরিত হইয়াছে। চাষাবাদের সহিত চন্দ্রের যে যোগসূত্রটি নানা উপলক্ষে লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ রোগ-ব্যাধির সহিত চন্দ্রের যে যোগসূত্র দেখান হইয়া থাকে, সেইগুলি হইতে এই চন্দ্রের প্রভাব কতখানি তাহার একটি ধারণা মিলে। আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত পূর্বাভাস, শুভাশুভ লক্ষণ ও অন্যান্য চিহ্ন এই চন্দ্রের সূত্রে নির্ধারণ করা হয়। নানা লোকসাহিত্য, প্রবাদ ও ধাঁধাতেও চন্দ্রের উল্লেখ আছে। এই চন্দ্রই আবহাওয়ার নানা পূর্বাভাস, লক্ষণ ও চিহ্নের উৎস। লোকপ্রিয় সাহিত্যকর্ম, প্রবাদ ও ধাঁধায় প্রায়ই চন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। একইভাবে চন্দ্রের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়। বহু ক্ষেত্রেই চন্দ্র বাগাড়ম্বরের কৌশলমাত্র— এই কথা ঠিক। চন্দ্র লইয়া প্রচলিত বহু কাহিনী, শ্লোকগাথা, ছড়া ইত্যাদি মিলিয়া বলিতে গেলে একটি গোটা পরিসরের যে অব-অতিকথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অতি বিরল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট লোক-ধর্মীয় রীতি-আচারের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও দৃশ্যত মনে হয় এই খগোলীয় বস্তুটির নিজস্ব একটি শক্তি রহিয়াছে। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিকি ঘটনাটি মহানবী (স)-এর একটি বিশেষ মু'জিযা। পবিত্র কুরআনের ৫৪ নম্বর সূরায় ১ আয়াতে মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় মক্কার আকাশে চন্দ্র বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া চন্দ্রগ্রহণের বিষয়টি চন্দ্রকে লইয়া অতিকথামূলক জল্পনা-কল্পনার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। ইসলামে ইহা আল্লাহর কুদরাতের নিশানা ছাড়া আর কিছু নয়। আফ্রিকার মাগরিব

দেশগুলিতে চন্দ্রের বরাত দিয়া নানা রকম যাদুর কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

বিভিন্ন স্থানের চন্দ্র নাম হইতেও সেখানে যে এককালে চন্দ্র চর্চা বা ভক্তির প্রচলন ছিল তাহা বুঝা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির নামের সহিতও প্রায়ই চন্দ্র যুক্ত কথাটি লক্ষ করা যায়। শিশু চন্দ্রকলা প্রায় সর্বদাই অলঙ্করণমূলক নকশা হিসাবে ব্যবহার করার ফলে শেষাবধি য়ুরোপীয়দের নিকট ইসলামের পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীক চিহ্নে পরিণত হয়। 'উছমানী সাম্রাজ্যও ঊনবিংশ শতাব্দীতে চন্দ্রকে (বক্র চন্দ্র) ইসলামের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে।

জাহিলী যুগের চন্দ্র-তারকার প্রভাবে বিশ্বাসী বিধর্মী সমাজে বহুকাল ধরিয়া, বিশেষ করিয়া হাররান-এর সাবীর জনগোষ্ঠীতে চন্দ্র দেবতা হিসাবে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত পূজিত হইত। চন্দ্রের এই প্রভাবের চিহ্ন আজিও সিরিয়ার য়াযীদী ও নুসায়রী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। সিরিয়ার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 'আলী (রা) ও সালমান (রা)-কে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখা হয়। তাহা ছাড়া সেখানে খোদ কামারিয়্যা নামে একটি বিশেষ ধর্মীয় উপগোষ্ঠীরও অস্তিত্ব আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে যে সকল বরাতের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি ছাড়াও দ্র. (১) M. Rodinson, La Lune chez les Arabes et dans l'Islam, in La lune, mythes et rites, Paris 1962 (coll. Sources orientales, 6), 153-255, ইহাতে সংশ্লিষ্ট সূত্র নির্দেশের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

M. Rodinson (E.I.^{2})/আফতাব হোসেন

আল-কামার (القمر) ঃ আরবী ভাষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রের চন্দ্রকে হিলাল এবং চতুর্থ হইতে মাসের শেষ পর্যন্ত রাত্রের চন্দ্রকে কামার বলে (কামার-এর বহুবচন আকমার= أقمار)। উপরন্তু কামার পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নাম। ইহাকে সূরা ইকতারাবাতি'স্-সা'আ এবং সুরাতু'ল-মুবায়্যাদা-ও বলা হয়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই সূরা-কে তাওরাত-এ আল-মুবায়্যাদা বলা হইয়াছে। কেননা হাশরের দিবসে যখন কিছু সংখ্যক লোকের চেহারা কাল হইয়া যাইবে, তখন এই সূরা মুখস্থকারীর চেহারায় আল্লাহ্ তা'আলা ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি দান করিবেন (দ্র. রূহু'ল-মা'আনী, ২৭খ, ৭৩ ; আদ-দুররু'ল-মানছূর, ৬খ, ১৩২)। কুরআনের বিন্যাস পদ্ধতিতে এই সূরার ক্রমিক নম্বর ৫৪ এবং অবতরণের দিক দিয়া ৩৭। অধিকাংশ 'আলিমের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কায় নাযিল হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও মুকাতিল হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, উহার তিনটি আয়াত (৪৪-৪৬) মদীনায় নাযিল হইয়াছে, ভিন্নমতে শুধু ৪৫তম আয়াত মাদানী (রূহু'ল-মা'আনী, ২৭খ, ৭৩; আদ-দুররু'ল-মানছূর, ৬খ, ১৩২ ; ফাতহুল-বায়ান, ৯খ, ১৬১)। সর্বসম্মতিক্রমে এই সূরায় ৫৫টি আয়াত এবং ৩টি রুকূ' আছে। আল-খাযিন (লুবাবু'ত-তা'বীল, ৪খ, ২১৬)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরায় ৩৪২টি শব্দ ও ১৪২৩টি বর্ণ রহিয়াছে।

সূরা আল-কামার-এর শানে নুযূলের জন্য নায়সাবূরী-এর আস্বাবু'ন-নুযূল (পৃ. ২২৭ প.), পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সহিত ইহার যোগসূত্রের জন্য রূহু'ল-মা'আনী (২৭খ, ৭৩ প.), আল-বাহ্রু'ল-মুহীত (৮খ, ১৭১ প.) এবং তাফসীরু'ল-মারাগী (২৭খ, ৭৪), বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বের জন্য তাফসীর কাবীর (৭খ, ৭৪৮), তাসাওউফ এবং সূফীতত্ত্বের জন্য তাফসীর ইবনি'ল-'আরাবী (২খ, ১৩৯), নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরি'ল-কুরআনি'ল-কারীম (২৩খ, ২৪৬), অতুলনীয় আলংকারিক বিষয়ের রচনাশৈলীর জন্য ফী জিলালি'ল-কুরআন, ২৭খ, ৭৯), এই সূরার তাফসীরের সহিত সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও উক্তিসমূহের জন্য আদ-দুররু'ল-মানছূর, ৬খ, ১৩২ প.) এবং এই সূরার বিভিন্ন আয়াত হইতে শারী'আতের আইন ও বিধান বাহির করিবার জন্য আল-জাস্সাস-এর আহকামু'ল-কুরআন (৩খ, ১১৪) দ্রষ্টব্য।

সূরা আল-কামার-এর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সূরাটি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য এক ভীতিপ্রদ ধমকি এবং ঈমানদার ব্যক্তিগণের জন্য গভীর সান্ত্বনা ও আন্তরিক প্রশান্তিস্বরূপ (ফী জিলালি'ল কুরআন, ২৭খ, ৭৯)। কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার পূর্বাভাষ এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করিবার মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এই সূরা আরম্ভ হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ন্যায় আরবের কাফিরগণও নিদর্শনসমূহকে যাদু বলিয়া মুহাম্মাদ (স)-এর নবূওয়াতকে অস্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহাদের হইতে বিমুখ থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং এইভাবে সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, ঐ মিথ্যারোপকারী কাফিরগণের পরিণতিও পূর্বযুগের মিথ্যারোপকারিগণের মতই হইবে। অতঃপর হযরত নূহ ('আ), 'আদ্ ছামূদ ('আ) এবং ফির'আওনের কাওমের মিথ্যারোপকারীদের ঘটনা এবং দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উহার পর মুশ্রিক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণকে এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, ঐ দৃষ্টান্তসমূহ হইতে তাহারা কোন শিক্ষা লাভ করে না, অথচ উহাদিগকে আল্লাহ্র এই বাণী অস্বীকার ও তুচ্ছজ্ঞান করার প্রতিফল কিয়ামত দিবসে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরাত এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর তাঁহার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা ও নিয়মনীতির কার্যকারিতার বর্ণনা দিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের কর্মফলের হিসাবরক্ষণ এবং উহার পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন (তাফসীরু'ল-মারাগী, ২৭খ, ১০৩ ; ফী জিলালি'ল কুরআন, ২৭খ, ৮২ প.)। নবী কারীম (স) হইতে বর্ণিত আছে যে, যেই ব্যক্তি সপ্তাহে সূরা আল-কামার একবার পাঠ করিবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহাকে এমন অবস্থায় কবর হইতে উঠাইবেন যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে (আল-কাশ্শাফ, ৪খ, ৪৪২; তাফসীরুল-বায়দাবী, ২খ, ২৪০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাযিন, লুবাবু'ত-তা'বীল, কায়রো ১৩২৬ হি.; (২) আস্-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫১ খৃ. ; (৩) ঐ লেখক, আদ-দুররু'ল-মানছূর, কায়রো ১৩২৬ হি. ; (৪) সায়্যিদ কুতব, ফী জিলালি'ল্-কুরআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ. ; (৫) মুহ্য়ি'দ-দীন ইবনু'ল-'আরাবী, তাফসীর ইবনি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৩১৭ হি. ; (৬) আল-বায়দাবী, আন্ওয়ারুত-তান্যীল, কায়রো ১৯৫৫ খৃ. ; (৭) আয্-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ. ; (৮) আবু'ল-হাসান নায়সাবূরী, আস্বাবু'ন্-নুযূল, কায়রো ১৯৬৬ খৃ. ; (৯) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, কায়রো সংস্করণ ; (১০) আহমাদ মুস্তাফা আল-মারাগী, তাফসীরু'ল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.।

জাহুর আহমাদ আজহার (দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ সোলায়মান

কামারখন্দ (کمر خند) ঃ বা কামারতান্দা বা কামারকান্দি (দ্র. Bangladesh Population Census, 1981) বা কুমারকান্দি (দ্র. District Census Report, 1961), সিরাজগঞ্জ জিলার (সাবেক পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা) ক্ষুদ্রতম উপজিলা (বা থানা)। আয়তন ৩৬ ব. মা., জনসংখ্যা (১৯৭৪ খৃ.) ৫৫,০০০, (১৯৮১ খৃ.) ৮৫,৫৫৭, তন্মধ্যে ৯২.৭% মুসলিম, আর ৭.৩% হিন্দু। মাত্র ৪টি ইউনিয়ন, ভদ্রঘাট, ঝাইল, জামতোজ্জ ও রামদস্তপুর এবং ৫৫টি গ্রাম লইয়া গঠিত। উপজিলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত যমুনা নদীর পশ্চিম তীর হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত, উত্তর ও উত্তর পূর্বে সিরাজগঞ্জ উপজিলা, দক্ষিণে বেলকুচি ও উল্লাপাড়া উপজিলা, পশ্চিমে করতোয়া নদী। সমগ্র উপজিলা এলাকা সমতল, পুরাতন ও নূতন নদী বিধৌত বলিয়া স্থানে স্থানে গতি পরিবর্তিত নদীর মরা ও শুষ্ক খাত এবং বিল রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের কিছু এলাকা বরেন্দ্রভূমির অংশ, সেখানকার মাটি প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত, রঙ ধূসর-কাল, বিলের মাটি প্রায় ক্ষেত্রে কাল, পূর্বাংশের মাটি নূতন পলি এবং কাদাতে রূপান্তরিত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০´´, আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, শীতে গড় তাপমাত্রা ৭৯° ফা., গ্রীষ্মে ৯০° ফা.।

কামারখন্দ উপজিলার পূর্ব সীমান্ত দিয়া যমুনা নদীর একটি শাখা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত (তাহার কয়েক মাইল পূর্বেই বিশাল যমুনা নদী, বর্ষাকালে প্রস্থে প্রায় ১০ মাইল হয়), উত্তর সীমান্তে ইছামতী নামে একটি ছোট নদী, পশ্চিম সীমান্তে করতোয়া নদী, এইগুলি দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া একত্রে মিলিত হয় যাহা হুরাসাগর নামে অভিহিত। অতঃপর উহা যমুনাতে পতিত হয়।

মজা নদীর খাত ও বিল বেশী থাকাতে এলাকাটির সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা তত ভাল নহে। সিরাজগঞ্জ শহর হইতে একটি মোটামুটি ভাল পাকা সড়ক পাবনা শহর এবং নগরবাড়ী ফেরীঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথে বাস চলাচল করে। সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী ব্রডগেজ রেলপথ এই উপজেলার উপর দিয়া গিয়াছে। জামতৈল রেল স্টেশনটি এই উপজিলাতে পড়িয়াছে। এখান হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে সড়কপথে কামারখন্দ উপজিলা সদরে যাইতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রধান যোগাযোগ সিরাগঞ্জ ও পাবনা শহরের সঙ্গে।

সমগ্র এলাকাটি কৃষি প্রধান, প্রধান ফসল ধান, আমন ও আউশ এবং বিল জমিতে বোরো ধান প্রচুর উৎপাদিত হয়। সাম্প্রতিক কালে ইরি ধানের আবাদ যথেষ্ট হইতেছে। ইক্ষু যথেষ্ট হয়। অন্যান্য ফসল পাট, সরিষা, মসুর ডাল, গম ও গোলআলু। ফলের মধ্যে কলা, আম, লিচু, পেপে, আনারস ও তরমুজ প্রধান। কোন একক বড় বন না থাকিলেও বিচ্ছিন্ন জঙ্গল উপজিলার সর্বত্রই রহিয়াছে। সেইগুলিতে এবং গ্রামে আম, কাঁঠাল, মেহগনি, সিমুল, বাবুল, পিটিরাজ, বট, বেল, তেঁতুল ও বাঁশ জন্মে। এইগুলি কাঠের প্রয়োজন মিটায়। জলাজমিতে উলু খাগড়া জন্মে। সেইগুলি দিয়া ঝুড়ি, টুকরি ইত্যাদি তৈরি হয়। বর্ষাকালে সকল বিল জমি পানিতে তলাইয়া যায়, সেইগুলি মাছের উৎস। শীতকালে এই বিলগুলিতে নানা প্রকার যাযাবর পাখী আসিয়া ভিড় করে।

এই অঞ্চলটি অনেক আগে হইতেই তাঁতে তৈরী সূতী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। শাড়ী, লুঙ্গী, ধুতি, চাদর ইত্যাদি সুন্দর ও উন্নত মানের কাপড় স্থানীয় তাঁতিগণ সাধারণ তাঁতে তৈরি করে। এই কাপড় জিলার সর্বত্র এবং রাজধানী শহর ঢাকাতে যায়। এখানকার কয়েক শত তাঁতী পরিবার এই বয়নশিল্পের উপরে নির্ভরশীল এবং তাহাদের উৎপাদিত কাপড় গুণগত মানে উৎকৃষ্ট এবং পরিমাণেও দেশের বিরাট প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। কামারখন্দ উপজিলা সদরে বিভিন্ন উপজিলা অফিসসমূহ, থানা আদালত, স্কুল, হাসপাতাল ও ডাকঘর রহিয়াছে।

খৃ. ১৩শ শতকের শুরুতে (আনু. ১২০২ খৃ.) এলাকাটি মুসলিম শাসনাধীনে আসে। অতঃপর সূফী দরবেশগণ এখানে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে অধিবাসীগণ ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। এই এলাকার সর্বাধিক সফল ও বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন হযরত শাহ মাখদূম (র)। দক্ষিণের সাজাদপুর (শাহযাদপুর) উপজিলাতে তাঁহার সুন্দর মাযার ও মসজিদ রহিয়াছে। ১৫৭৬ খৃ. সম্রাট আকবার (Bangladesh District Gazetteer Pabna, Dhaka 1978, pp 59, 77)-এর সেনাপতি, বাংলার সুবাদার মুন্‘ইম খান পাঠান শাসক দাউদ খান কার্‌রানীকে পরাজিত করিয়া বাংলায় মুগল শাসন কায়েম করেন। কিন্তু শাসন ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মুগল শক্তিকে আরও বহু বৎসর যাবত খণ্ড খণ্ডভাবে যুদ্ধ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটি বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই অঞ্চলে। আকবার-এর শাসনের শেষদিকে বাংলাতে বারো ভূঁয়া নামে বিখ্যাত পাঠান-হিন্দু জমিদারগণ ক্ষমতাসীন ছিলেন। এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন মা‘সূম খান কাবুলী। আকবার-এর ধর্মীয় নীতির প্রতি অনুগত হইতে না পারিয়া তিনি আকবার-এর সৎ ভাই, কাবুল-এর সুবাদার মীর্যা হাকিম-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কাবুলী নাম ধারণ করেন। ১৫৮৩ খৃ. মা‘সূম খান কাবুলী এই অঞ্চলের কিছু দক্ষিণে মুগল সেনাপতি শাহবায খানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মা‘সূম খান পরাজিত হন। পরে তিনি ভাটির জমিদার ‘ঈসা খান-এর সঙ্গে মিলিত হন। ১৭৬৫ খৃ. পর্যন্ত এখানে মুসলিম শাসন ছিল। অতঃপর সেই বৎসর মুগল সম্রাট শাহ ‘আলাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলার দেওয়ানী প্রদান করিলে এখানে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হয়। বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্র. পাবনা, সিরাজগঞ্জ নিবন্ধয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Poulation Census of Bangladesh, District Census Report, Pabna 1979, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka 1979 ; (২) Bangladesh Population Census 1981, District Pabna ; (৩) Bangladesh District Gazetteers Pabna, Dhaka 1978, pp. 59, 77।

হুমায়ুন খান

কামারান (قمران) ঃ এক প্রবাল দ্বীপ (অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপসহ)। দ্বীপটির অবস্থান য়ামানী সামুদ্রিক সীমার মধ্যে, সালীফ উপদ্বীপ হইতে তিন মাইলেরও কম দূরে এবং পেরিম হইতে ২০০ মাইল উত্তরে। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ১৪ মাইল ও সর্বাধিক প্রস্থ ৬ মাইল ; আয়তন ২২ বর্গমাইল। দ্বীপের অধিবাসীরা গরীব সুন্নী ও মিশ্র জনগোষ্ঠীর লোক। জনসংখ্যা ১০০০ হইতে ৩০০০ (আদেনী, ইথিওপীয়, সোমালী ও ভারতীয়)। দ্বীপের অধিবাসীরা তুলা চাষ ও মুক্তার জন্য ঝিনুক চাষ করে।

৪র্থ/১০ম শতকের শেষের দিকে য়ামানের বাদশাহ কামরান দ্বীপটিকে বন্দী নিবাস হিসাবে ব্যবহার করিতেন। ১০ম/১৬শ শতকের প্রথমার্ধে

পর্তুগীজরা দ্বীপটি দখল করিয়া উহাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে তুরস্ক সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে বাবেল মান্দেব প্রণালী হইয়া আগত হজ্জযাত্রীদের জন্য একটি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র স্থাপন করে। কেননা উল্লিখিত হজ্জযাত্রীদের অনেকেই মক্কায় কথিত কামরান ব্যাধিতে আক্রান্ত হইত। ১৯১৫ খৃ. আদনে (এডেন) তুর্কী আক্রমণের সময় বৃটিশ বাহিনী কামারান দ্বীপ দখল করে। Lansanne চুক্তি অনুযায়ী (১৬ নং অনুচ্ছেদ) ১৯২৩ খৃ. নাগাদ লোহিত সাগরের সকল দ্বীপে তুর্কী সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে। হজ্জযাত্রীদের কামারান কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রটি বৃটিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। ১৯২৮ সনে হল্যাণ্ড ও ১৯৩৮ সনে ইতালী কামারান দ্বীপের ইখতিয়ারে বৃটিশ কর্তৃকপক্ষের অংশীদার হয়। ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির আওতায় স্থির হয় যে, গ্রেট বৃটেন ঐ দ্বীপে উহার সার্বভৌমত্ব কায়েম করিবে না, দ্বীপে কোনও রকম দুর্গ নির্মাণ করিবে না কিংবা কোনও প্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে না। চতুর্দিকের মূল ভূখণ্ড অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও উন্নতির সুবাদে ১৯৫২ খৃ. কামারান দ্বীপের কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহার পূর্ব অবধি বৎসরে ঐ দ্বীপে ১,০০,০০০ হজ্জযাত্রী নামানো হইত বলিয়া কথিত আছে।

কামারান দ্বীপের আন্তর্জাতিক মর্যাদাটি ব্যতিক্রমধর্মী। ১৯৪৮ খৃ. কামারান অর্ডার ইন কাউন্সিল এই মর্মে ঘোষণা করে যে, দ্বীপটির উপর যুক্তরাজ্যের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রহিয়াছে। অতঃপর এই ঘোষণা অনুযায়ী আদনের গভর্নরকে কামারান দ্বীপের গভর্নর নিয়োগ করা হয় এবং একই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা হয় যে, দ্বীপটি আদন বৃটিশ উপনিবেশের কোনও অঙ্গ নয় কিংবা উহা আদন আশ্রিত রাজ্যেরও কোন অঙ্গ নয়। এই দ্বীপে বৃটেনের বৈদেশিক ইখতিয়ার আইন প্রযোজ্য ও ঐ আইনানুসারে উহাকে বৃটেনের একটি উপনিবেশের বা দখলী অধিকারের মতই ধরিতে হইবে। কার্যত এই ব্যবস্থা এমন এক ফর্মূলা যাহাকে অছি চুক্তির বা ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ১৯২৮ খৃ. হইতে য়ামান ক্রমাগতভাবে কামারান দ্বীপের উপর স্বীয় সার্বভৌমত্ব দাবি করিয়া আসিতেছে এবং ঐ দ্বীপাঞ্চলে যুক্তরাজ্য কর্তৃক তৈল অনুসন্ধানের ইজারা দানের ব্যর্থ প্রতিবাদ জানায় (অনুরূপ একটি তৈল অনুসন্ধানের ইজারা দেওয়া হয় ১৯৫৫ খৃ. D' Arcy Exploration Co.-কে; কিন্তু ঐ কোম্পানী তৈল অনুসন্ধানে কোনও ফল দর্শে নাই)। ১৯৬৭ সনের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘের নিকট বৃটিশ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কুরিয়ামুরিয়া, পেরিম ও কামারান দ্বীপের জন্য দক্ষিণ য়ামান প্রজাতন্ত্র ১৯৬৭ সনের ডিসেম্বরে নিজস্ব গভর্নর নিয়োগের কথা ঘোষণা করিয়া এক ফরমান জারী করে। যুক্তরাজ্য ঐ ঘোষণায় বিশ্বসংস্থাকে জানাইয়া দেয় যে, কুরিয়ামুরিয়া দ্বীপগুলিকে মস্কটের সুলতানকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) য়াকূত, ৮০ ; (২) আল-মুকাদদাসী, ১০৩ ; (৩) C. Snouck Hurgronje, Mekka in the later part of the 19th century, Leiden ও London 1931, 218, note 1; (৪) ঐ লেখক, Verspreide Geschriften, Bonn ও Leipzig 1923, iii, 27, 32; (৫) OM (1938), 215, (1953), 29; (৬) L. Farago, the riddle of Arabia, London 1939, 284-7; (৭) E. Quadri, L'ile de Camaran, in Revue Egyptienne de Droit International, xiii (1957), 1-30 ; (৮) B. Reilly, Aden and the Yemen, London 1969, Colonial no. 63 ; (৯) R. B. Serjeant The Portuguese of the South Arabian Coast, Oxford 1963।

V. Vacca (E. I.²)/আফতাব হোসেন

কামাল, 'আলী (كمال ، على) ঃ তুর্কী উচ্চারণ কেমাল, 'আলী [১৮৬৭-১৯২২ খৃ.] তুর্কী লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। তাঁহার পিতা হাজ্জী আহমাদ এফেন্দী যুবক বয়সে মধ্য আনাতোলিয়ার চানকিরির নিকটবর্তী একটি গ্রাম হইতে রাজধানীতে আসেন। সেখানে তিনি মোম প্রস্তুতকারকের পেশাতে থাকিয়া অনেক ধনসম্পদের মালিক হন এবং নিজের সংস্থা বা গিল্ডের তত্ত্বাবধায়ক (warden) হন। 'আলী রিদা (ছাত্র জীবনের পূর্বে 'আলী কামাল এই নামে পরিচিত ছিলেন, নিম্নে দ্র.) ১৮৬৭ খৃ. ইস্তাম্বুলের সুলায়মানিয়্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন তাঁহার পিতার দ্বিতীয় (ককেশীয়) স্ত্রী। কামাল ঐতিহ্যগত গোঁড়াপন্থী পরিবারিক পরিবেশে বড় হইয়া উঠেন। স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করিবার পরে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্কুলে (মেকতেব-ই মুলকিয়ে) ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিশষ করিয়া মুরাদ বে-এর শিক্ষাদান আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন (এই মুরাদ বে পরিচিত ছিলেন মীযান জী মুরাদ নামে, ১৮৫৩-১৯১৪ খৃ., পরবর্তীকালে তিনি নির্বাসিত তরুণ তুর্কী [Young Turk] নেতা হন। শেষদিকে তিনি সুলতান ২য় 'আবদু'ল-হামীদ-এর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন, দ্র. B. Lewis, The emergence of modern Turkey, নির্ঘণ্ট)।

তাঁহার প্রিয় পত্রিকা ছিল তেরজুমান-ই হাকীকাত। সেই পত্রিকাতে তিনি মু'আল্লিম নাজী-র কবিতা ও প্রবন্ধের প্রশংসায় তাঁহার রচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। নাজী ছিলেন আধুনিকতাবাদিগণের, বিশেষ করিয়া 'আবদু'ল-হাকক হামিদ এবং রেজা'ই যাদে একরেম-এর বিরোধী লেখকগণের নেতা। তিনি গুলশেন নামক ছাত্রদের একটি পত্রিকাতেও 'আলী কেমাল এই নামে লেখা শুরু করেন, এই কলম-নামটি ধীরে ধীরে তাঁহার পূর্বেকার 'আলী রিদা নামটিকে অপসারিত করে। মুলকিয়্যের ছাত্র থাকাকালে তিনি ১৮৮৬ খৃ. য়ূরোপে যান। এক বৎসরেরও বেশী সময় তিনি প্যারিস এবং জেনেভাতে কাটান এবং ফরাসী ভাষার উপরে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৮৮ খৃ. পিতার মৃত্যু হইলে তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেন ও পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। য়ূরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি ছাত্র সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন (এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য দ্র. তাঁহার নিবন্ধ মেকাতিব-ই 'আলিয়ে মাখসূস জেম'ইয়্যেতলের, ইকদাম-এ প্রকাশিত, ২০ আগস্ট, ১৯০৮)। কর্তৃপক্ষ সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং একদিন কোনাক নামক যে স্থানটিতে তাঁহারা সভা করিতেন পুলিশ তাহাতে হানা দেয়। ছাত্রদিগকে আটক করা হয় এবং 'আলী কেমাল সমেত আরও চারিজনকে (তন্মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যত তরুণ তুর্কী লেখক 'আবদু'ল-হালীম মেমদূহ) জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁহারা কয়েক মাস ছিলেন। কালক্রমে 'আলী কেমাল এবং তাঁহার একজন কবি বন্ধুকে (কাসতামনুর ফাখ্রী) আলেপ্পোতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। পাঁচ বৎসর

তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন। সেখানে সরকারীভাবে ভালীর (ওয়ালী) দফতরের একটি নির্ধারিত বেতনে নিয়োজিত হন এবং স্থানীয় একটি হাই স্কুলে (মেকতেব-ই ই'দাদী) তাঁহাকে সাহিত্য এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা দানও করিতে দেওয়া হয়। আলেপ্পোতে থাকাকালীন তাঁহার জীবন ও সাহিত্যিক কার্যাবলীর চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাওয়া যায় তাঁহার আত্মজীবনীতে (নিম্নে দ্র.)।

১৮৯৪ খৃ. তিনি কৌশলে প্যারিসে পলাইয়া যান এবং সেখানে ইস্তাম্বুলের দৈনিক পত্রিকা ইকদাম-এর নিয়মিত সংবাদদাতা হন। সেই পত্রিকাতে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় চিঠিপত্র ও নিবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন (তাঁহার কোন কোন পত্রের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ রহিয়াছে সেই বিষয়ে দ্র. হুসায়ন জাহিদ, গাভেগালারীম, ইস্তাম্বুল ১৩২৬ রূমী সাল/১৯১০ খৃ., পৃ. ৩৭-৯২)। এইগুলি এমন সময়ে প্রকাশিত হইতে থাকে যখন কোন রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার নিজ নামে ইস্তাম্বুলে কোন কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহাকে এই যে বিশেষ সুযোগ দান করা হইয়াছিল উহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'আলী কেমাল রাজধানীতে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত ছিলেন না। য়ূরোপে থাকিবার কালে তিনি তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। কিন্তু নিজে কখনও তরুণ তুর্কী দলের সদস্য হন নাই। তাহাদের অধিকাংশ চিন্তা-ভাবনার সঙ্গেই তিনি দ্বিমত পোষণ করিতেন এবং তাঁহার সহানুভূতি ছিল বরং সুলতান 'আবদু'ল-হামীদ-এর প্রতি। পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরামর্শদাতা ও তথ্যদাতারূপে তিনি সুলতানের চাকুরীতেই নিযুক্ত ছিলেন [সুলতানকে এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণের নিকটে প্রেরিত তাঁহার প্রতিবেদনের (যুরনাল) এবং পত্রাবলীর কপি ; তন্মধ্যে কতগুলির মূলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ দ্র. আহমেদ বেদেভি কুরান, উসমানলি ইম্পারেটরলুগুনদা ইনকিলাপ হারেকেতলেরি ভে মিল্লি মুকাদেলে, ইস্তাম্বুল ১৯৫৯ খৃ., ৩০২-৯ এবং আসফ তুগায়, ইবরেত, 'আবদু'ল-হামীদ-য়ে ডেরিলেন জুরনাল্লের ভে জুরনালকিলের, ইস্তাম্বুল, তা. বি., ২০০-১৭]।

১৮৯৭ খৃ. তাঁহাকে ব্রাসেলস-এর দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব নিযুক্ত করা হয়। বলা হইয়া থাকে যে, মুরাদ বে-র বিদ্রোহের সময়ে তিনি যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন উহার পুরস্কারস্বরূপই সেই পদটি লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. য়াহ্য়া কামাল [বেয়াথ], সিয়াসি ভে এদেবি পোরট্রেলের, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ., ৭৮)। কিন্তু রাষ্ট্রদূত মুনীর পাশা তাঁহাকে পসন্দ করিতেন না বলিয়া কিছুতেই তাঁহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। তবে 'আলী কেমাল তাঁহার পদবী ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে বেতন গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় (দ্র. তানীন, ২০ জুলাই, ১৩২৪ রূমী/২ আগস্ট, ১৯০৮ এবং সুলায়মান নাযিফ-এর জীবনীমূলক লেখাসমূহ যেইগুলি ইবনুলেমিন এম.কে, ঈনাল ব্যবহার করিয়াছেন, গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। প্যারিস হইতে তিনি মিসরে গমন করেন এবং মিসরের দুইজন শাহযাদীর (আহমাদ জালালু'দ-দীন-এর সৎ মেয়ে এবং মাহমূদ মুখতার পাশার স্ত্রীর) জমিদারীর তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি স্থানীয় উঠ্তি তুর্কী পত্রিকাগুলিতে লিখিতেন এবং তুর্ক নামক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন (নাম তুর্ক থাকিলেও পত্রিকাটি ছিল 'উছমানিয়্যা সমর্থক)। স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা আন্দাজ করিয়া তিনি বিরাট অর্থের মালিক হইয়াছিলেন। কিন্তু একবার বাজার দর পড়িয়া গেলে তখন তিনি আবার সবই হারান। ১৯০৮ খৃ. তিনি যখন প্যারিসে ফিরিয়া যান তখন মেসিডোনিয়ার বিপ্লবী কর্মকর্তাগণ য়ূরোপের তরুণ তুর্কী সংগঠনের সঙ্গে মিলিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে তাহাদের আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। 'আলী কামাল রাজপ্রাসাদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং ২৩ জুলাই, ১৯০৮-এর বিপ্লবের কয়েক দিন আগে ইস্তাম্বুল আসিয়া পৌঁছান। রাজনৈতিক সংকটের বিষয় যখন আলোচিত হয় তখন তিনি সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন (দ্র. য়াহ্য়া কামাল, পূ. গ্র., ৭৯)। সুলতান 'আবদুল-হামীদ উপদেষ্টাসুলভ কাজের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ৪৫০ সোনার মোহরের থলি প্রদান করেন (দ্র. তানীন, ২৫ জুলাই, ১৩২৪ রূমী/৭ আগস্ট, ১৯০৮ ঃ 'আলী কামাল উহা স্বীকার করেন। তবে মোহরের পরিমাণ তিনি বলেন ২৬০, দ্র. ইকদাম, ২৭ জুলাই, ১৩২৪ রূমী/৯ আগস্ট, ১৯০৮)।

গোঁড়াপন্থী সাংবাদিক আহমেদ জেওদেত (১৮৬২-১৯৩৫ খৃ.) কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস (CUP) যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তাঁহাদের প্রতি আদৌ সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তিনি এই সময়ে 'আলী কামালকে তাঁহার ইকদাম পত্রিকার প্রধান লেখক হইবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁহার প্রথম নিবন্ধ মাদীদেন আতিয়ে ("অতীত হইতে ভবিষ্যতে") প্রকাশিত হয় ৩০ জুলাই, ১৯০৮ তারিখে, বিপ্লবের এক সপ্তাহ পরে। প্রতিদিনই রাজনীতি, ইতিহাস, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার লেখা বন্যার মত প্রকাশিত হইতে থাকে। বিশ বৎসর কাল দেশের বাহিরে থাকিবার পরে তিনি বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া লিখিতে থাকেন; তাঁহার লেখা ছিল যুক্তিনির্ভর কিন্তু চিত্তাকর্ষক। তাঁহার নিজস্ব এমন একটি রচনারীতি ছিল যাহার কারণে তিনি তৎকালীন সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংবাদিকের আসন লাভ করেন। একই সময়ে তিনি কলা অনুষদে ও মুলকিয়েতে কূটনৈতিক ইতিহাস পড়াইতেন।

CUP তিনি অপছন্দ করিতেন। সেই সংস্থা ইতোমধ্যে নূতন সরকারকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সকল রকম পদ্ধতি (রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা সমেত) প্রয়োগ করিতে শুরু করিয়াছিল। ফলে তাঁহার অপসন্দ ঘৃণাতে পরিণত হয়, প্রতিদিন পত্রিকাতে তিনি কমিটির নীতি ও পদ্ধতিকে আক্রমণ করিতে শুরু করেন। ১২ মার্চ, ১৯০৯ সালে 'আলী কামাল তাঁহার নির্ধারিত কলাম ডঃ রিদা নূরকে লিখিতে দেন। তিনি ছিলেন Sinop-এর ডেপুটি। তিনি তাঁহার সতর্কতা সংক্রান্ত বিখ্যাত নিবন্ধ প্রকাশ করেন। উহা বিরোধীগণের সকল অভিযোগের ব্যাখ্যাসম্বলিত ইশতাহার বলিয়া সাদরে গৃহীত হয় ঃ CUP-কে বিশৃঙ্খলার মনোভাবাপন্ন বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়। বলা হয় যে, উহারা কোমিতাজি কৌশলাবলম্বী, ঘুষ প্রদানকারী, স্বজনপ্রীতি দেখায়, বিরোধী মত সহ্য করে না ইত্যাদি। এপ্রিল ১৯০৯ সালে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে 'আলী কামাল 'উছমানিয়্যা লিবারেল পার্টি হইতে (উছমানলী আহরার ফীরকাসী) প্রার্থী হন; কিন্তু CUP দলীয় প্রার্থীর নিকটে পরাজিত হন। অতঃপর তিনি আরও মারাত্মকভাবে CUP-কে অভিযুক্ত করিতে থাকেন। ইউনিয়নিস্ট-এর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, যেমন হুসায়ন জাহিদ এবং বাহাউদ্-দীন শাকির একই রকম মারাত্মক ভাষায় CUP পত্রিকাগুলিতে, যেমন তানীন এবং শুরা-য়ি উম্মেত-এ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লিখিতে থাকেন এবং খলীফা 'আবদু'ল-হামীদ-এর সঙ্গে তাঁহার যে সম্পর্ক ছিল সেই সকল উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে থাকেন। বিরুদ্ধবাদী পত্রিকাগুলি, যথা ঃ ইকদাম, মীযান, সেরবেসতি,

'উছমানলী, বিশেষ করিয়া ভলকান-এ অবিশ্রান্তভাবে প্রকাশিত প্রচারণাসমূহের ফলে সৃষ্ট জটিল পরিবেশের কারণে ১৩ এপ্রিল এক সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়। উগ্রপন্থী এবং হতাশ শ্রেণীর লোকেরা সেই বিদ্রোহের উস্কানী যোগায় (এই বিদ্রোহের ভাল ব্যাখ্যা এবং পশ্চাদপট জানিবার জন্য দ্র. সিনা আকসিন ৩১ মার্চ ওলায়ি, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.)।

'আলী কামাল এক ইংরেজ বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং সেলোনিকার তরুণ তুর্কী সদর দফতর হইতে প্রেরিত সেনাবাহিনী (হারেকেত ওরদুস, আদিতে নাম ছিল হারেকাত আরদুসু-Operation Army) রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছাইলে অতঃপর তিনি য়ূরোপ পলায়ন করন। প্যারিসে তিনি ইউনিয়নিস্ট নেতৃবৃন্দের [যেমন ফেতহী (ওকয়ার) ও জাবীদ] সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া CUP-এর সঙ্গে সমঝোতায় আসিবার চেষ্টা করেন। উহা ব্যর্থ হইবার পর তিনি মেশরূতিয়েত পত্রিকাতে নিবন্ধ লিখিতে থাকেন। উহা ছিল বহির্বিশ্বে শেরীফ পাশার ইউনিয়নিস্টগণের বিরুদ্ধবাদী মুখপত্র। ইতোমধ্যেই তিনি নভেম্বর ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত লিবারেল ইউনিয়নের (হুররিয়েত ভেইতিলাক ফিরকাসি) সদস্য হইয়াছিলেন।

জুলাই ১৯১২ সালে "Saviour Officers" দল (খালাসকার দাবিতান গ্রুপু) ইউনিয়নিস্ট সরকারের পতন ঘটায় ; লিবারেলপন্থিগণ ক্ষমতায় আসেন। 'আলী কামাল ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন এবং ইকদাম পত্রিকাতে তাঁহার প্রধান নিবন্ধ লেখা শুরু করেন। কিন্তু ২৩ জানুয়ারী, ১৯২৩ সাল ইউনিয়নিস্টগণ এক মারাত্মক অভ্যুত্থান ঘটায় (বাব-ই 'আলী বাসকীনী) এবং 'আলী কামাল গ্রেফতার হন। জামাল বে (পরবর্তীকালে পাশা ও ইউনিয়নিস্টদের সমপদস্থ ব্যক্তি) ছিলেন ইস্তাম্বুলের সামরিক গভর্নর। তিনি জেলে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং উৎকোচ দিয়া দেশত্যাগ করাইতে রাজী করান; অতঃপর 'আলী কামাল সরকারী ভাতা লইয়া ভিয়েনা গমন করেন (দ্র. জামাল পাশা, Memoirs of a Turkish statesman, 1913-1916, London 1922, 16; সংশোধিত তুর্কী সংস্করণ, হাতিরালার, তাঁহার পুত্র বেহচেত কেমাল কর্তৃক সম্পাদিত, ইস্তাম্বুল ১৯৫৯ খৃ., ২২ ও ২৬ মে) ১৯১৩ সালে তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন। ১১ জুন, ১৯১৩ সালে উযীরে আ'জাম মাহমূদ শাওকাত পাশা গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হইলে তখন CUP বিরোধিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। 'আলী কামাল ইতোপূর্বে জামাল পাশার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবেন। তিনি অবশ্য নিরাপদেই ছিলেন। তাঁহার সমর্থনক্রমে সেই বৎসরই তিনি 'পায়াম' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বাহির করেন। সেই পত্রিকাতে কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় তরুণ লেখক নিয়মিত লিখিতে থাকেন (দ্র. রাফিক হালিত কারায়, মিনেলবাব ইলেল্‌মিহরাব, ইস্তাম্বুল ১৯৬৪ খৃ., ৬৩-৪)। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে তখন এই পত্রিকাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'আলী কামাল জনজীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া বুয়ুকাদা দ্বীপের স্বাস্থ্যনিবাসে এবং বস্‌ফরাস উপকূলবর্তী এলাকাতে কাটান। তিনি পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ করেন। মুদরোস (Mudros) চুক্তি স্বাক্ষরের পরে (৩০ অক্টোবর, ১৯২৮) 'উছমানিয়্যা শাসনের অবসান সূচিত হয়। সেই সময়ে দৈনিক সাবাহ পত্রিকার সম্পাদক মিহ্‌রান এফেন্দী প্রধান নিবন্ধ রচনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে 'আলী কামালকে আহবান জানান। তিনিও আগ্রহের সঙ্গে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে CUP-এর তিন নেতা—আনওয়ার, তাল'আত ও জামাল দেশ হইতে পলায়ন করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিয়নিস্টগণের বিরুদ্ধে মারাত্মক লেখা শুরু করেন। যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময়ে উহারা যে সকল ভুল ও অপকর্ম করিয়াছিল প্রতি দিন তিনি সেইগুলির খতিয়ান তুলিয়া ধরেন।

মিত্রশক্তির নৌ-বহর ১৩ নভেম্বর ইস্তাম্বুলে পৌঁছায়। সমগ্র নগরী মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় এবং শত শত ইউনিয়নিস্ট নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। মিত্রবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট গ্রীক সেনাবাহিনী ইয্‌মিরে অবতরণ করিয়া দেশের ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। 'আলী কামাল শিক্ষা মন্ত্রীরূপে দামাদ ফারীদ পাশার প্রথম মন্ত্রী সভায় যোগদান করেন (৪ মার্চ, ১৯১৯)। কিছুকাল পর্যন্ত তিনি মধ্যপন্থী থাকেন এবং লিবারেল ইউনিয়ন দলের পক্ষপাতী চাপ প্রতিরোধ করেন (দ্র. য়াহয়া কামাল, পূ. গ্র., পৃ. ৮৭-৮)।

ইতোমধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয় এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রস্তুতি গৃহীত হইতে থাকে। অতঃপর প্রথম গেরিলা বাহিনী ঈজীয় (Aegean) সাগরের উপকূলে গ্রীক বাহিনীকে বাধা দেয়। 'আলী কামাল ১৯ মে, ১৯১৯ গঠিত দামাদ ফারীদ পাশার দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন (ঠিক এই তারিখেই মুসতাফা কামাল সামসুনে আসিয়া অবতরণ করেন)। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদ, তাঁহার উযীর-ই আ'জাম এবং সহযোগীগণের নীতি ও কৌশলের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দান করেন। সেইগুলি ছিল : সন্ধির শর্তাবলী লঙ্ঘনকে উপেক্ষা করা; মিত্রবাহিনীর নির্দেশ মানিয়া চলা এবং শান্তিচুক্তির শর্ত কোমল হইবে আশায় অগ্রসরমান বিদেশী সৈন্যগণকে কোন রকম বাধা না দেওয়া, যদিও জাতীয়তাবাদিগণের দৃষ্টিতে তাহা ছিল শত্রুপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার শামিল। 'আলী কামাল-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আনাতোলিয়াতে মুসতাফা কামাল-এর যে আন্দোলন তাহা ইউনিয়নিস্টগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষারই পুনর্জাগরণ মাত্র। উহার সংগঠক ও সমর্থনকারী হইতেছে CUP (এই বিষয়ে বিশেষভাবে দ্র. তাঁহার নিবন্ধ ইত্তিহাদ বে-তেরাক্কী ওলুদ, য়াশাসীন ইত্তিহাদ বে-তেরাক্কী! "CUP মারা গিয়াছে, CUP দীর্ঘজীবী হউক!", পায়াম, ২০ ডিসেম্বর, ১৯১৯)।

আনাতোলিয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতকে গোড়াতেই ভুল দৃষ্টিতে দেখিবার কারণে তাঁহার বহু পাঠক-পাঠিকা বিভ্রান্ত হয় এবং পরিণামে তাঁহার নিজের ভাগ্যই নির্ধারিত হইয়া যায়। ১৮ জুন, ১৯১৯, 'আলী কামাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে সকল প্রদেশে আদেশ জারী করেন যে, কোথাও মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা যাইবে না, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি নেওয়া যাইবে না এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, যেই সকল কর্মকর্তা ও সরকারী কর্মচারী মুস্তাফা কামাল-এর নির্দেশ পালন করিবেন তাঁহাদিগকে কোর্ট মার্শাল করা হইবে (দ্র. জি. জায়েশচকে, তুর্ক কুরতুলুস সাভাসি ক্রোনোলোজিসি, আঙ্কারা ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৪৩-৪৫)।

২৩ জুন তারিখে তিনি বিখ্যাত গোপন আদেশ জারী করেন, তাহাতে ঘোষণা করেন, "মুসতাফা কামাল পাশা তাঁহার নূতন উদ্যোগে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন, ইংরেজ হাই কমিশনারের দাবি অনুযায়ী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে। তাঁহার (মুসতাফা কামাল) কোন আদেশ যেন কেহ পালন না করে" (দ্র. গাযী মুসতাফা কামাল, নুতুক, আঙ্কারা ১৯২৭ খৃ.,

পৃ. ২২, ইংরেজী অনু. A. Speech ..., ইস্তাম্বুল ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৬-৭)। মন্ত্রীসভার সহকর্মিগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থক। তাঁহাদের চাপের মুখে 'আলী কামাল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন (২৬ জুন) [যে পরিস্থিতিতে তিনি পদত্যাগ করেন সে বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) 'আলেমদার পত্রিকাতে প্রদত্ত তাঁহার বিবৃতি, ৩ জুলাই, ১৯১৯ ; (২) আর. এইচ. কারায়, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৮-১৪১ ; এবং (৩) জায়েসকে, তুর্ক কুরতুলুস সাভাসি ইলে ইলগিলি ... আঙ্কারা ১৯৭১ খৃ., পৃ. ১৩০-২]।

যেই সকল সহকর্মিগণের বিরুদ্ধে তিনি সুলতানের নিকটে নালিশ করিয়াছিলেন, উত্তরে সুলতান বলিয়াছিলেন, "আপনার আনুগত্য আমার জন্য বড় সান্ত্বনাস্বরূপ এবং আশার বিষয় ছিল। রাজপ্রাসাদের দরজা সকল সময়ে আপনার জন্য খোলা থাকিবে" (দ্র. গাযী মুসতাফা কামাল, পূ. গ্র., পৃ. ২২-২৫, ইংরেজী অনু., পৃ. ২৮)। ৩ আগস্ট, ১৯১৯ সালে 'আলী কামাল তাঁহার পায়াম পত্রিকা আবার প্রকাশ করেন এবং উহাতে প্রতিদিন আনাতোলিয়ার প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এবং ইস্তাম্বুলে তাঁহাদের সমর্থকগণের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকেন।

পরবর্তীকালে পায়ামকে মিহরান এফেন্দীর সাবাহ পত্রিকার সঙ্গে একীভূত করিয়া দেওয়া হয়, তখন হইতে পত্রিকাটির নাম হয় পেয়াম-ই সাবা (১ জানুয়ারী, ১৯২০)। 'আলী কামাল স্থায়ীভাবে উহার প্রধান লেখক হন। লিবারেল ইউনিয়ন পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছিল। 'আলী কামাল-এর কর্মকাণ্ড এবং লেখার ফলে উহাতে ঐক্য ফিরিয়া আসে এবং যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি এবং রাফি' জাওয়াদ (আলেমদার পত্রিকার) সুলতানের এবং দামাদ ফারীদ পাশার মিত্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার নীতির সবচেয়ে উদ্যোগী সমর্থক ছিলেন। সেই নীতিতে ছিল দখলদার বাহিনীর নির্দেশ পালন করা এবং প্রতিরোধ সংগ্রামকে দমন করিতে চেষ্টা করা। সেই নীতি অনুসরণ করিয়া 'আলী কামাল মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকতর সেনাশক্তি লইয়া ইস্তাম্বুল অধিকার করিয়া থাকাকে স্বাগত জানান (১৬ মার্চ, ১৯২০)।

সুলতান কর্তৃক জাতীয়তাবাদীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত 'শান্তিরক্ষা' বাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন। বিখ্যাত ফাতওয়া প্রকাশিত হইলে পরে (১১ এপ্রিল) তিনি এক আনন্দব্যঞ্জক নিবন্ধ লেখন। অতঃপর মুসতাফা কামাল ও তাঁহার সহযোগিগণকে অনুপস্থিতিতে বিচার করিয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদিগণের সাফল্যের সংবাদে মাঝে মাঝে তিনি দোদুল্যমান হইতেন। তিনি তুর্কী সৈন্যদের সাহসের তারিফ করিতেন। কিন্তু উহার পরেই আবার তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ তীব্র বিরোধিতাতে নামিতেন এবং তাঁহার লেখার মূল লক্ষ্য হইত "ভিত্তিহীন জাতীয়তাবাদ এবং বিশ্ব-মতামতকে উপেক্ষা করিবার বিপদ" ইত্যাদি।

তীব্র কষাঘাতের ন্যায় তাঁহার নিবন্ধসমূহ ১৯২২ সালের আগস্ট মাসের শেষ এবং সেপ্টেম্বর মাসের শুরু পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন জাতীয়তাবাদী সেনাদল চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিয়াছিল, আর পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ গ্রীক সৈন্যগণ পুনরায় ইযমির অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতেছিল। শুধুমাত্র শেষ তিনটি নিবন্ধে (৮, ৯, ১০ সেপ্টেম্বর), যখন জাতীয়তাবাদী সৈন্যগণ ঈজীয় (Aegean) উপকূলে যাইয়া পৌঁছায়, তখন তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং "তুর্কী বাহিনীর বিরাট বিজয়"-কে অভিনন্দন জানান এবং দাবি করেন, "লক্ষ্য সকল সময়ে অভিন্নই ছিল।" কিন্তু তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। জাতীয়তাবাদী সরকার ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে যাহারা সহযোগিতা করিয়াছে তাহাদের সকলকে আঙ্কারাতে লইয়া গিয়া বিচার করা হইবে। কিন্তু অধিকৃত ইস্তাম্বুলে তাহা করা সম্ভব ছিল না। পরীক্ষামূলকভাবে একজন লোককে নির্বাচিত করা হয় এবং সেই ব্যক্তিটি হন 'আলী কামাল। তাঁহাকেই শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতাকারিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ধরা হয় (দ্র. ডঃ রিদা নূর, হায়াতীম বে., খাতিরাতিম, বৃটিশ লাইব্রেরী, Or. 12591, 486b)।

আঙ্কারা হইতে প্রেরিত নির্দেশক্রমে কর্নেল আস'আদ (পরে পাশা, ১৮৭৫-১৯৩২ খৃ.) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইস্তাম্বুলের সামরিক গভর্নর এবং পুলিশের পরিচালক। তিনি জাতীয়তাবাদীগণের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। ১৮ নভেম্বর সাদা পোশাক পরা দুইজন পুলিশ 'আলী কামালকে বেয়োগলুর (পেরা) এক চুল কাটার দোকান হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। একটি মোটর বোটে করিয়া তাঁহাকে বিচারের জন্য আঙ্কারার উদ্দেশ্যে ইযমিদে লইয়া যাওয়া হয়। প্রথম বাহিনীর সেনাপতি নূরু'দ-দীন পাশা তাঁহার সদর দফতরে তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রশ্ন করেন। বাহিরে বিরাট জনতার ভিড় ছিল। 'আলী কামালকে সেখান হইতে লইয়া যাইবার সময়ে সামনের চৌরাস্তায় হত্যা করা হয়। কি পরিস্থিতিতে তাঁহার মৃত্যু হয় সেই বিষয়ে তথ্যগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন রকমের ভাষ্য পাওয়া যায়। একটি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ক্রুদ্ধ জনতার হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আবার কোন কোন মতে ব্যক্তিগত সম্মান অর্জনের জন্য নূরু'দ-দীন পাশার চক্রান্তে তাঁহার মৃত্যু হয় বা মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় [দ্র. (১) ফালিহ্ রিফকি আতায়, চানকায়া, ইস্তাম্বুল ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩৪১-২ ; (২) য়াহয়া কামাল, পূ. গ্র., পৃ. ৯১-৯৯ ; (৩) রিদা নূর, পূ. গ্র., পৃ. ৪৮৭ প. ; (৪) ইস্তাম্বুল আনসিক্লোপেদিসি, ইস্তাম্বুল ১৯৬১ খৃ.]। 'ইসমাত পাশা (ইনোনু) ছিলেন তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি লুসান (Lausanne) শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাইবার পথে তাঁহার দলের সদস্যগণকে লইয়া ইযমিদের ঘটনার দিনেই সেখানে পৌঁছান। তিনি প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় নূরু'দ-দীন পাশাকে দোষারোপ করেন যে, তিনি সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া বিচার নিজের হাতে তুলিয়া নিয়াছেন।

'আলী কামাল মূলত ছিলেন একজন সাংবাদিক। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে লিখিত তাঁহার প্রথম দিককার নিবন্ধগুলি—যেইগুলি তিনি প্যারিস হইতে "বিশেষ প্রতিনিধি"-রূপে প্রেরণ করিতেন—ছিল প্রধানত ফরাসী পত্র-পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করা। কখনও কখনও ব্যক্তিগত বা আত্মজীবনীমূলক কিছু লেখা থাকিত (নিম্নে দ্র.)। বিদেশের তরুণ তুর্কী পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁহার কিছু কিছু নিবন্ধে তিনি সমসাময়িক আদর্শগত বিভেদের উপরে আলোকপাত করেন (যেমন আকচুরাওগলু য়ূসুফ-এর বিখ্যাত রচনা সম্বন্ধে তাঁহার জবাব, উভয়টিই প্রকাশিত হয় তুর্কী পত্রিকাতে, সংখ্যা ২৪-৩৪, কায়রো ১৯০৪ খৃ. ; পরে সেই একই প্রবন্ধ সমেত পুনর্মুদ্রিত হয় আকচুরাওগলু য়ূসুফ-এর উচ তারয-ই সিয়াসেত-এ, ১৩২৭ রূমী/১৯১১ খৃ., পৃ. ৩৩-৪৫)।

ইকদামে এবং পরে তাঁহার নিজের পত্রিকা পায়ামে তিনি যে হাজার হাজার নিবন্ধ লিখিয়াছেন (সেইগুলি সংগৃহীত হয় নাই), সেইগুলির বিরাট প্রামাণিক মূল্য রহিয়াছে। সেইগুলি হইতে সেই সময়কার পরিবেশ সার্বিকভাবে জানা যায় এবং ১৯০৮-১৪ খৃষ্টাব্দের সময়কার রাজনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর বিষয় অনুধাবন করা যায় ; কিন্তু সেই সকল নিবন্ধ একযোগে পড়িতে হইবে— CUP-এর মুখপত্র তানীন-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী লেখক হুসায়ন জাহিদ (য়ালচিন)-এর লেখাগুলির সঙ্গে মিলাইয়া। শেষদিকে লেখা তাঁহার যে সকল নিবন্ধ নবরূপে প্রকাশিত পায়ামে (আগস্ট-ডিসেম্বর, ১৯১৯) এবং পায়াম-ই সাবাহতে বাহির হইয়াছিল (১৯২০-২২ খৃ.), সেইগুলি হইতে অধিকৃত ইস্তাম্বুলে সুলতানের সরকারের লোকদের মানসিক গঠন ও মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, সেই সময়ে আনাতোলিয়াতে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলিতেছিল। ফার্সী হইতে কৃত যে সকল অনুবাদ সিরিজ আকারে পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় সেইগুলি এবং আরও বিভিন্ন অপ্রধান প্রকাশনা ব্যতীত 'আলী কামাল নিম্নলিখিত বইগুলির লেখক ছিলেন ; (১) প্যারিস মুসাহাবেলেরি (ইকদাম পত্রিকাতে লিখিত নিবন্ধ ও পত্রাবলীর সঙ্কলন, ১৮৯০ খৃ.-এর দশকে লিখিত, ২খ., ইস্তাম্বুল ১৩২৯, ১৩৩১ রূমী/১৯১৩, ১৯১৫) ; (২) ফেতরেত (ফিতরাত) [ইংলণ্ডে ১৮৯৫ খৃ. লিখিত ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত ১৩২৯/১৯১৩]।

তিনি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা লইয়া লেখা শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু কতগুলি শিথিল সম্পর্কবিশিষ্ট নিবন্ধ নায়ক ফেতরেতকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। এই নায়ক মিশ্র বিবাহের সন্তান, বইটিতে লেখক আধুনিকতা, পাশ্চাত্যবাদ, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে তাহার বিরুদ্ধে দলীয় ছেরবেত-ই ফুনূন সাহিত্য সমিতির সদস্যগণের, বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রধান বৈরী হুসায়ন জাহিদ-এর সমালোচনা করেন ; (৩) ঈকি হেমশীরে, ইস্তাম্বুল ১৩১৫/১৮৯০, ইহা একটি দীর্ঘ ছোট গল্প। সেখানে লেখকের আলেপ্পোতে নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ের আত্মজীবনীমূলক উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে; (৪) চোলদেবির সেরগুযেশ্ত ইস্তাম্বুল ১৩১৬/১৯০০ ; ৩ ও ৪ নং গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ একত্রে বির সাফহা-ই শেবাহ নামে প্রকাশিত হয়, ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১৩; (৫) রিজাল-ই ইখ্তিলাল, ইস্তাম্বুল ১৩২০/১৯১৩, ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা, ফ্রান্স এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশের উপর বিপ্লবের কি প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা এবং প্রধানত Condorcet, Saint-Just, Danton এবং Robes-pierre-র বিস্তারিত জীবনী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে ; (৬) এদেবিয়্যাত-ই হাকিকিয়্যে দেরসলেরি, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১৪, ১২টি নিবন্ধের সঙ্কলন। প্রথমে ইকদাম পত্রিকাতে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালের দিকে ফ্রান্সের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাঠ "সাহিত্যে বাস্তবতা"-এর উপরে প্রদত্ত ; মাঝে মাঝে সমসাময়িক তুর্কী সাহিত্যের উপরে মন্তব্য রহিয়াছে ; (৭) রাশিদ মু'এররিখ মিশা'ইর মিঃ ইস্তাম্বুল ১৩৩৪/১৯১৮, ইহা খৃ. ১৮শ শতকের ঐতিহাসিক রাশিদ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা। আহমাদ রাফীক একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন সুলতান ৩য় আহমাদ এবং তাঁহার উযীর-ই আজাম ও জামাতা ইব্রাহীম পাশা সম্বন্ধে (সুলতান আহমাদ-ই ছালিছ বে দামাদী, য়েনী মেজমূ'আতে প্রকাশিত, নং ৩৪, ১৯১৮ খৃ.)। উহার জওয়াবে 'আলী কামাল এই নিবন্ধটি রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রাচ্য দেশীয় ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য ধরনের ইতিহাস রচনা পদ্ধিতির তুলনা করেন। নিবন্ধটিতে তিনি আহমাদ রাফীককে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেন। প্রাচ্যদেশীয় এবং বিশেষ করিয়া 'উছমানিয়া চিরায়ত কাব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ঐতিহাসিক হিসাবে রাশিদ মধ্যম মানের ছিলেন, কিন্তু নাবী ভাবধারার(Nabi School) একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। এই লেখাটি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক এই কারণে যে, এক অর্থে ইহাতে 'আলী কামাল-এর ভাবধারার একটি সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। তাঁহার সকল লেখাতেই ইহা বারবার দেখা গিয়াছে ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় লেখক ও পর্যবেক্ষকগণ তুর্কীদের সম্বন্ধে এবং 'উছমানিয়া সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল বিরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তিনি সেইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ফলে য়ুরোপ ও য়ুরোপীয়দের বিষয়ে তিনি গভীর হীনতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এখানে আমরা তাঁহার সার্বজনীনতা, জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা এবং পাশ্চাত্যের মুকাবিলাতে তাঁহার অসহায়ত্ববোধের মূল কারণ খুঁজিয়া পাই। বুঝিতে পারি যে, কেন তিনি মনে করিতেন যে, পাশ্চাত্যের বড় শক্তিগুলির (দুওয়েল-ই মু'আজ্জামা) মুকাবিলা করিতে যাওয়া অর্থহীন এবং কেন যে তিনি নরমপন্থী বৈদেশিক নীতি অনুসরণের জন্য সকল সময়ে পরামর্শ দিতেন এবং পাশ্চাত্যের সকল কিছুকেই কেন তিনি শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করিতেন (এই বিষয়ে ইকদাম পত্রিকাতে লিখিত তাঁহার ১২, ১৫, ১৭, ২১ ও ২৩ জানুয়ারী এবং ২৩ মার্চ, ১৯০৯ নিবন্ধগুলিও দ্র.) ; (৮) 'ওমরুম, 'আলী কামাল-এর বাল্য জীবন, স্কুল জীবন এবং আলেপ্পোতে নির্বাসিত জীবনের স্মৃতিকথা। ইহা প্রথমে পায়াম পত্রিকাতে ১৩২৯ রূমী/ডিসেম্বর ১৯১৩ সাল হইতে ২৯ সিরিজে প্রকাশিত হয়। একটি সংশোধিত সংস্করণ পায়াম পত্রিকাতেই ১৪ জুলাই, ১৩৩৫ রূমী/১৯১৯ হইতে ৩২ সিরিজে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সেইগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয় নাই, তবে বেরনা কায়াক ১৯৫৪ খৃ. রোমান হরফে একটি সঠিক সংস্করণ তৈরী করিয়াছিলেন (ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, নং ২৬২১)।

রাজনীতিতে জড়িত হইবার আগে বা বিরুদ্ধবাদিগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবাদে লিপ্ত হইবার আগে 'আলী কামাল দীওয়ান কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ, সমসাময়িক সাহিত্যের সমস্যা সম্বন্ধে নিবন্ধ এবং কখনও কখনও কবিতা রচনা করিতেন। সেইগুলি তিনি তাঁহার নিজেরই পত্রিকা পায়াম-এর সাহিত্য সংখ্যা পায়াম-ই আদাবীতে (পেয়াম-ই এদেবী) প্রকাশ করিতেন। সেই সাহিত্য-পত্রে অনেক সুবিখ্যাত লেখক (রিদা তাওফীক, আহমাদ রাফীক, য়াহয়া কামাল, য়া'কূব কাদরী প্রমুখ) লিখিতেন। কবিতা ও সাহিত্য সমালোচনাতে 'আলী কামাল ছিলেন মু'আল্লিম নাজী (১৮৫০-৯৩ খৃ.)-র শাগরিদ। তিনি ছিলেন একজন নব্য ক্লাসিক্যালপন্থী চিন্তাবিদ এবং আধুনিকতাবাদীদের ঘোর বিরোধী। তিনি দীওয়ান কবিতার প্রশংসা করিতেন, ক্লাসিক্যাল তুর্কী গদ্য সম্বন্ধে তেমন ভাল ধারণা পোষণ করিতেন না (উহা তাঁহারই ভুল ছিল, তুর্কী গদ্য সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক লেখকেরই ন্যায় তাঁহার জ্ঞান ছিল অতি সামান্য) এবং তিন পুরুষ কালব্যাপী গড়িয়া উঠা (তানজীমাত, ছেরবেত-ই ফুনূন এবং "জাতীয় সাহিত্য" বা মিল্লী এদেবিয়াত) সাহিত্যিক আধুনিকতাবাদিগণের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। তুর্কী সাহিত্য সম্বন্ধে এই মত তিনি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন একটি দীর্ঘ পত্রে, ১৯১৮ খৃ. রূশেন এশরেফ (রাওশান আশরাফ) (Unaydin)-কে তিনি সেই পত্রখানি লেখেন। রূশেন সেই সময়ে তৎকালীন প্রধান প্রধান লেখকের সাক্ষাতকার গ্রহণ করিতেছিলেন [দ্র. রূশেন এশরেফ, দিয়েরলার কি, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ., আধুনিক তুর্কী, সম্পা. শামসু'দ-দীন কুতনী (সেমসেত্তিন), ইস্তাম্বুল ১৯৭১ খৃ.]। তাঁহার রচনারীতির ব্যক্তিগত মুনশিয়ানা থাকা সত্ত্বেও (বিস্ময়ের বিষয় যে,

বিশুদ্ধবাদী কবি য়াহয়া কেমাল উহার খুব প্রশংসা করেন, দ্র. পূ. গ্র., পৃ. ৭১-২) ; 'আলী কামাল-এর এক কালে ব্যতিক্রমধর্মী লেখার পদ্ধতি ছিল। ক্লাসিক্যাল 'উছমানিয়া মুনশীগণের ধারা অনুসরণ করিয়া তিনি নিজের গদ্য রচনাতে আরবী, ফার্সী ও তুর্কী কবিতা হইতে যথেষ্ট উদ্ধৃতি ব্যবহার করিতেন। অল্প কয়েকজন 'প্রতিক্রিয়াশীল' সমসাময়িক লেখকের ন্যায় (যেমন জনাবু'দ-দীন, শিহাব সুলায়মান নাজীফ, 'আলী একরাম প্রমুখ) তিনি ১৯০৮ খৃ. পরবর্তী ভাষা সংস্কার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং লিখিত ভাষা তুর্কীকৃতকরণের সাধারণ ধারাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেন। ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহার চুলচেরা সতর্কতা রচনারীতির উৎকর্ষ সাধনে কোন একটি সহায়ক হয় নাই—কথাটি বলিয়াছেন সমসাময়িক বিখ্যাত ভাষারীতিকার (এবং তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী) রাফীক খালিদ (দ্র. পূ. গ্র., পৃ. ৬৩)।

'আলী কামাল খুবই শক্তিসম্পন্ন লেখক ছিলেন। প্রচুর লেখার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তাঁহার জ্ঞান ছিল বিশ্বকোষ ধরনের। কিন্তু তাঁহার ইতিহাসবোধ এবং বাস্তবতাবোধের অভাব ছিল। অজস্র অর্থহীন তর্কবিতর্কে যুক্ত হইয়া তিনি নিজের প্রতিভা নষ্ট করেন এবং নিজের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে, অন্ধ একগুঁয়েমি এবং শেষ পর্যন্ত মারাত্মক পক্ষপাত দোষের জন্য তাঁহার কর্মজীবনে অধঃপতন নামিয়া আসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত দ্র. (১) 'আলী চানকায়া, য়েনি মুলকিয়ে তারিহি ভে মুলকিয়েলিলের, ২খ, আঙ্কারা ১৯৬৮-৯ খৃ., পৃ. ৯৩৭-৪১ ; (২) য়ুসুফ হিকমাত বায়ুর, তুর্ক ইনকিলাবি তারিহি, ১, ২, ৩ খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪০-৫৩ খৃ. নির্ঘন্ট ; (৩) জালাল বায়ার, বেন. দে য়াযদিম, ৬, ৭খ, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮-৯ খৃ., নির্ঘন্ট; (৪) ফীরূয আহমাদ, The Young Turks, Oxford 1969, 28, 122, 173 ; (৫) মাহমূদ কামাল ইনাল, 'উছমানলি দেভরিনদে সোন সাদরিয়ামলার, ১৪ অংশে, ইস্তাম্বুল ১৯৪০-৫৩ খৃ., নির্ঘন্ট ; (৬) ঐ লেখক, আসির তুর্ক সাইরলেরি, ১২ অংশে, ইস্তাম্বুল ১৯৩০-৪২ খৃ., নির্ঘন্ট ; (৭) আসিম উস, হাতিরালার, ইস্তাম্বুল ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৪৬-৫৪ ; (৮) এম. ও জ, 'আলী কামাল, ইর্য়মিদে নাসিল সেওক ও লুনদু, রুমিলি গেজেটে প্রকাশিত, নং ৭০-৯, জানু.-মার্চ ১৩৪১/১৯২৫ ; (৯) বিলাল এন. সিমসির, ইংগিলিয বেলগে লেরিনদে আতাতুর্ক, ১খ., আঙ্কারা ১৯৭৩ খৃ., নির্ঘন্ট।

Fahir Iz (E.I.[2])/হুমায়ন খান

কামাল উদ্দিন (كمال الدين) ঃ এ এফ. এম. বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক, ভৌগোলিক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (জ. ৭/১১/১৯৩৭ খৃ., মৃ. ৬/১/১৯৮৮ খৃ.)। তিনি ফেনী জিলা ও উপজিলার চাড়িপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুমতাযুদ্দীন আহমাদ (মৃ. ১২/৭/১৯৪২ খৃ.) অত্র এলাকার পরম ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতা গুলবদন বেগম (মৃ. ১৮/২/১৯৮৮ খৃ.)-ও একজন ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন। শৈশবেই পিতৃহারা হইয়া কামাল উদ্দিন তাঁহার পড়াশুনার ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাঁহার মাতার অতি আগ্রহে এবং কিছু আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় তাঁহার পড়াশুনা চলিতে থাকে। তিনি ছিলেন অতি মেধাবী ছাত্র। অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ফেনী হাই স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি তাঁহার বড় ভগ্নীর নিকট রংপুরে চলিয়া যান। সেখানকার জেলা স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত স্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন এবং রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ হইতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ খৃ. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূগোল বিষয়ে অনার্সসহ বি. এ. এবং ১৯৬০ খৃ. এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষাশেষে ডঃ কামাল উদ্দিন ঢাকা কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন (১৯৬১ খৃ.)। উক্ত পদে থাকাকালীনই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য গমন করেন এবং এবার্ডিন (Aburdeen) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা-উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা সন্দর্ভের জন্য পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন (১৯৬৫-৬৭ খৃ.)। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রফেসার হিসাবে প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজ এবং পরে তীতুমীর কলেজ ও ঢাকা কলেজে কর্মরত ছিলেন (১৯৬৮-৭০ খৃ.)। ডিসেম্বর ১৯৭০ খৃ. জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ খৃ. পর্যন্ত উক্ত বিভাগের প্রধান হিসাবে বিভাগটিকে গড়িয়া তোলার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৭৪ খৃ. যুক্তরাজ্যের ইউনিভারসিটি অব হাল (Hull) হইতে ফেলোশিপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় আরও উচ্চ গবেষণা কর্মের জন্য গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন একমাত্র হলটির তিনি বেশ কিছুকাল প্রভোস্ট ছিলেন। ১৯৭৮ খৃ. তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হন এবং ১৯৭৯ খৃ. প্রফেসর পদ লাভ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাম উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (R. D. S.) নামে একটি সংস্থার তিনি উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন।

মে ১৯৮৪ খৃ. তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের শুরু হইতেই একজন নিষ্ঠাবান নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিয়া যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ক্ষেত্রেও তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৮৭ খৃ. তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসক তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ ব্যাহত হইতে পারে এই আশংকায় তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে শায়িত থাকাকালীনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র নিয়মিত দেখিতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন।

অন্যান্য কাজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি ইসলামী গবেষণা সংস্থা গঠন করার বিশেষ একটি পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ধরনের আরও অনেক পরিকল্পনা তাঁহার ছিল। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়েন। ১৯৮৮ খৃ. ২ জানুয়ারী তাঁহার শারীরিক অবস্থার বিশেষ অবনতি হইলে তাঁহাকে ডায়াবেটিস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি ৬ জানুয়ারী দিবাগত রাত্রে ইনতিকাল করেন। জাহাঙ্গীরনগর মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্তরিক আগ্রহে তাঁহার পরদিন বিকালে দাফন করা হয়।

ডঃ কামাল উদ্দিন বেশ কিছু গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি Samuel Rapport এবং Hallen Wright-এর The Crust of The Earth গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ভূত্বকের

কথা নামে বাংলা একাডেমী হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬৭ খৃ.)। Refugees ... A Third World Dilemma (সম্পা. Zohn R. Rogge Rowman ও Little field) গ্রন্থে তাঁহার গবেষণা প্রবন্ধ The Problem of non-Locals in Assam (পৃ. ২০৯ প.) প্রকাশিত হয় (১৯৮৭ খৃ.)। মুসলিম ভৌগোলিকদের সম্পর্কে তাঁহার একটি প্রবন্ধ সুধী মহলে আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্কুল মাধ্যমিক শ্রেণীর ভূগোল গ্রন্থটি তাঁহার রচনা (প্রথম সং ১৯৭৩ খৃ.)। তিনি অনেকগুলি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, যেমন— বাংলাদেশ জাতীয় ভূগোল এসোসিয়েশন-এর সভাপতি (১৯৮১-৮৩ খৃ.), বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের সদস্য, ESCAP-এর কন্‌সালটেন্ট ইত্যাদি। বিশ্বের বহু দেশে তিনি শিক্ষা সফরে গমন করিয়াছেন।

ডঃ কামাল উদ্দিন ছিলেন অতি বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সদালাপী, নিরহংকার, বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আকীদা ও আমলে একজন খাঁটি মুসলিম এবং একজন আদর্শ শিক্ষক।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নাম এ. এফ. এম. কামাল উদ্দীন হল রাখা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A.K.M. Shamsul Huda সংকলিত ও সম্পাদিত WHO'S WHO in Bangladesh 1984, The Time Publications, ঢাকা, ২য় সং. ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৭৩-৭৪ ; (২) The Third National Geographical Conference, (December 1981), Abstract of Papers, Bangladesh National Geographical Association, Dhaka, p. 59; (৩) The Bangladesh Observer, Dhaka 8 January, 1988; (৪) Principal M. N. Karim, In Memory, an educationist, Bangladesh Times, Dhaka 12 February, 1988।

এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন

কামাল খুজান্দী (كمال خجندى) ঃ পারস্য দেশীয় গীতি-কবি ও মরমী সাধক। জন্ম খুজান্দ (ট্রান্সঅক্সিয়ানা)-এ। পরে তিনি তাব্‌রীয নিবাসী হন। খাওয়ানদামীরের বর্ণনা অনুযায়ী তাবরীযেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়। তিনি ৮০৩/১৪০০-১ সনে ইনতিকাল করেন। কামালু'দ-দীন খুজান্দীর দীওয়ান বা কাব্য সঙ্কলন নাতিপরিসর। ইহাতে রহিয়াছে ক্ষুদ্রাকার অথচ অপূর্ব সুন্দর গযল। এইগুলির মূল উপজীব্য প্রেম, জীবনলিপ্সা ও হতাশা। গযলগুলি পাঁচ হইতে সাত শ্লোকে রচিত। তাঁহার এই সকল রচনায় গভীর মরমী ধারণার প্রগাঢ় উপস্থিতি লক্ষণীয়। আর তাই তাঁহার কাব্যকর্মের মধ্যে ইবনু'ল-'আরাবী ও জালালু'দ-দীন রূমীর মতবাদের প্রতিফলন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। মহান পারস্য দেশীয় সূফী-মরমী সাধকদের ঐতিহ্যানুগ থাকিয়া তিনি কখনও সার্বভৌম শাসককুল বা কর্তৃপক্ষের স্তুতিবাদমূলক কোন রচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। ইহা ছাড়া তিনি নিজে একজন শায়খু'ল ইসলাম হইলেও প্রায়ই 'আলিম সমাজের সমালোচনা করিতেন। শাসকরাও ইহা হইতে নিস্তার পাইতেন না। কবি হাফিজ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার কবিতা বিনিময়ও চলিত। জনসাধারণ কামাল খুজান্দীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে ভিড় করিতেন। শায়খ কামালের মাযার বহুকাল ধরিয়াই পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দীওয়ান, সম্পা. দাওলাতাবাদী দাওলাতশাহ, তাযকিরাতু'শ-শু'আরা', ৩২৫ ; (২) খাওয়ানাদামীর, হাবীবু'স-সিয়ার, ৩খ, ৯০ ; (৩) রিদা কুলী খান, মাজমা'উ'ল-ফুসাহা, ২খ, ২৯ ; (৪) H. Ethe, Gr, I Ph., ii, 304; (৫) সূদী, শারহ-ই হাফিজ, বূলাক সং., পৃ. ৩, ৮৪ ; (৬) Browen, iii, 320-30; (৭) J. Rypka, History of Iranian Literature, Dordrecht 1968, 262-3; (৮) I. S. Braginskiy Zum Studium des Schaffens Kamol Hudschandis, in Akten des XXI int. Or.-Kongr., (Munchen, 1957) Wisbaden 1959, 499-505 ; (৯) ঐ লেখক, Ocerki iz istorii tadzikskoy literature, in O tvorcestve Kamola Khodzandi 239-61 ; (১০) A Pagliaro A. Bausani, Storia d. letterature Persiana, 464, 469।

M. Shaki (E.I.²)/আফতাব হোসেন

কামাল পাশা যাদে (দ্র. কেমাল পাশা যাদে)

কামাল মাওলা মসজিদ (كمال مولى مسجد) ঃ মাণ্ডু (ভারত) হইতে ২৪ মা. উত্তরে ধর নামক স্থানে অবস্থিত, আনু. ১৪০০ খৃষ্টাব্দে কোনও গৌরী সুলতান কর্তৃক হিন্দু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ব্যবহারে নির্মিত। ১৩১´ X ১০২´ আয়তাকার প্রাঙ্গণ ; মসজিদটির আয়তন ঃ ১১৯´ X ৪০ $\frac{১}{২}$´ ; ১২ $\frac{১}{২}$´ উচ্চতাবিশিষ্ট ৬৪টি হিন্দু ভাস্কর্যযুক্ত স্তম্ভের উপর ছাদ নির্মিত ; ছাদে ৩টি হিন্দু ঢঙের গুম্বজ। মিহ্‌রাব ও অন্যান্য কিছু সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য না থাকিলে মসজিদ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ৭৬

কামাল মুহাম্মাদ নামীক (كمال محمد نامق) ঃ তুর্কী উচ্চারণ কেমাল মেহমেদ নামীক, খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের শেষার্ধের শ্রেষ্ঠ তুর্কী সাহিত্যিকগণের অন্যতম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়, তাঁহার দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক জীবন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১। জীবনী তথ্য ঃ কামাল-এর মাতার নাম ছিল ফাতিমা যাহ্‌রা। তিনি ছিলেন 'আবদু'ল-লাতীফ পাশা এবং মখদূম খানিম-এর কন্যা। কামাল-এর পিতা ছিলেন মুসতাফা 'আসিম বে। তিনি ইতিহাস, সূফীবাদ, বিশেষ করিয়া জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে অনেক কবি, পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে রহিয়াছেন মোরার (মোরিয়া বা পেলেপনেসে) শহীদ তোপাল 'উছমান পাশা, যিনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতকে ছিলেন সাদর-ই আজাম, বীরত্বের জন্য তিনি বিশেষ সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন। কামাল তাঁহার জন্য বিশেষ গৌরববোধ করিতেন। কামাল ২৬ শাওয়াল, ১২৫৬/২১ ডিসেম্বর, ১৮৪০ সালে তাকফূরদাগী (তাকিরদাগী)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার মাতামহের সঙ্গে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার মাতামহ ইস্তাম্বুলে মুহুরদার এবং কাসাদার পদে (এম. সালাহু'দ-দীন, বীর তুর্ক দিপ্লোমাতীনীন আওরাক-ই সিয়াসিয়েসি, ইস্তাম্বুলে ১৩০৬ হি., পৃ. ১১) এবং বিভিন্ন প্রদেশে মুতাসাল্লিম, মুহাসসিল ও মুতাসাররিফ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার মাতামহের সঙ্গে গেলিবোলু, তীরখালা (ত্রিকালা), আফয়োন কারাহিসারী (১৮৪৬ খৃ.), কুতাহিয়া

(১৮৪৮ খৃ.), কার্‌স (মার্চ ১৮৫৩ - জুলাই ১৮৫৪) এবং সোফিয়াতে (মে ১৮৫৫ - সেপ্টে. ১৮৫৬) কাটান। কামাল-এর বয়স যখন মাত্র ৮ বৎসর তখন আফ্‌য়োনে তাঁহার মাতা মারা যান (৩০-৩১ আগস্ট, ১৮৪৮)। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে সোফিয়াতে তিনি নীশের কাদীর কন্যা নাসীমা খানিমকে বিবাহ করেন। অল্পকাল পরেই মতামহের সঙ্গে তিনি ইস্তাম্বুলে চলিয়া আসেন ; সোফিয়ার কাইম মাকাম পদ হইতে তাঁহার মাতামহ পদচ্যুত হইয়াছিলেন। মাতামহ ও মাতামহীর মৃত্যুর পরে কামাল খুব্‌য়াতে তাঁহার সৎ মা দুররিয়্যা খানিম-এর বাড়িতে আসিয়া উঠেন। মাতামহ আবদু'ল-লাতীফ পাশার বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রি করিয়া দিতে হইয়াছিল।

এক স্থান হইতে আরেক স্থানে বদলীর মাঝখানে 'আবদু'ল-লাতীফ পাশা ইস্তাম্বুলে অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে পিতা মুসতাফা 'আসিম বালক কামাল-এর মানসিক গড়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। আরেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার দাদা। আফ্‌য়োনের কবিগণ তাঁহার গুণকীর্তন করেন। তিনি মাওলাবী তারীকার অনুসারী ছিলেন। সেই তারীকার একটি আস্তানা ছিল তাঁহাদের বাড়ীর নিকটেই। খুব সম্ভবত আফ্‌য়োনে থাকাকালে কামালকে সামা' এবং ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সকল উৎসই একটি বিষয়ে একমত বলিয়া মনে হয় যে, ইস্তাম্বুলে প্রায় দেড় বৎসরকাল তিনি দারু'ল-মা'আরিফে পড়াশুনা করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ১২-১৩ বৎসর [দ্র. (১) মাহমূদ ওজভাদ, মা'আরিফ-ই 'উমূমিয়্যা নাজারাতি তারিখচে-ই তাশ্‌কীলাত ভে ইজ্‌রা'আতী, ইস্তাম্বুল ১৩৩৮, পৃ. ৪০, ৯৭ ; (২) 'উমার ফারূক আকুন, নামীক কেমাল, IA-তে প্রকাশিত, ৯খ, ৫৫ খ]। কামাল-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস ছিল কবিতা, সঙ্গীত ও সূফীতত্ত্ব। তিনি যখন মুদাররিস কবি সায়্যিদ মুহাম্মাদ হামিদ (১৭৭৯ ?-১৮৫৪ খৃ.)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন তখন মুহয়ি'দ-দীন আল-'আরাবীর রচনাবলী তিনি ভালভাবে পাঠ করেন। সেই উস্তাদের তত্ত্বাবধানে তিনি কারস-এ থাকাকালে তুর্কী দীওয়ান কবিগণের (যথা ঃ নাবী) রচনা এবং মাছনাবীর কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন (বানি চিচাক কিরযিওগলু, নামীক কেমাল'ইন কারস্‌তাকি হোকাসি মুদেররিস বুয়ুক হামীদ এফেন্দী, তুর্কী কুলচুরুতে প্রকাশিত, নং ২/২২, আগস্ট ১৯৬৪ ; ইহার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল এম. এফ. কিরযিওগলু-র লেখা ১৯৫৫ কারস জাফেরি ও কারস তারিখি)। কার্‌সে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন ক্রীড়াতেও অংশগ্রহণ করিতেন, যেমন শিকার ও ঘোড়ায় চড়া।

কামাল ঠিক কোন্ তারিখে চাকুরী জীবন শুরু করেন তাহা জানা সম্ভব হয় নাই। জানা যায় যে, ১৮৫৯ খৃ. ইতোমধ্যেই তিনি বাব-ই 'আলীতে সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। লেসকোফচালী গালিব যখন শুল্ক বিভাগের প্রধান সচিব ছিলেন তখন কামাল তাঁহার সহকারী ছিলেন (এমলি'আ গুমরুক তাহরীরাত বাশকাতিবি ১৯ মার্চ, ১৮৬০) এবং প্রথমোক্ত জন যখন সেপ্টেম্বর ১৮৬১ সালে শুল্ক পরিচালক পদে (গুমরুক এমীনী) ত্রিপোলীতে বদলী হন, কামাল তখন 'উছমানিয়া সরকারের অনুবাদ বিভাগের সদস্য হন। সেই পদে তিনি ২০ মার্চ, ১৮৬৭ পর্যন্ত থাকেন। অতঃপর তাঁহাকে এরযুরুমে সহকারী গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে তিনি নিজেরই প্রতিষ্ঠিত জামি'ইয়্যাত-ই তাদরিসিয়্যা-ই ইসলামিয়্যাতে ব্যাকরণের বাক্য গঠন ও শুদ্ধ উচ্চারণ রীতি শিক্ষাদান করিতে থাকেন। প্যারিস রওয়ানা হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই শিক্ষা দান অব্যাহত রাখেন [দ্র. (১) এম. সেভাদ, পূ. গ্র., ৯৭ ; (২) 'উছমান এরগিল, তুর্কিয়ে মা'আরিফ তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ২খ, ৪০৬ ; (৩) তাসবীর-ই আফকার, নং ২০৮, ২৮৫, ১৩ ও ৩০ মার্চ, ১৮৬৫, নং ৩৬৫, ৪০০, ৪০২, ৪০৩, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২৮ জুন, ৬ ও ১০ জুলাই, ১৮৬৬]। কামাল ষোল বৎসর বয়সে সোফিয়া হইতে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সেই কৈশোরের কাল ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এই কারণে যে, সেই সময়ে তানজীমাত আমলের প্রচলন করা সংস্কারসমূহ বাস্তবায়িত হইতেছিল। সংস্কার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬-তে সুলতানের ফারমান বলে। ২২ অক্টোবর, ১৮৬০ সালে আগা আফেন্দী (বা এফেন্দী), শিনাসী-র সহযোগিতাক্রমে প্রথম বেসরকারী সংবাদপত্র তারজুমান-ই আহওয়াল প্রকাশ করিতে শুরু করেন এবং পরে, ২৮ জুন, ১৮৬২ সালে শিনাসী তাসবীর-ই আফকার পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। দেশাত্মবোধক ও জাতীয়তাবাদী যে চিন্তাধারা শিনাসীর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় (যেমন তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক নিবন্ধসমূহ এবং তাঁহার মঞ্চ-নাটক শা'ইর আভলানমাসি), সেইগুলি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য-পত্রিকা মাজমূ'আ-ই ফুনূন-এর (জুলাই ১৮৬২) ও মির'আত-এর প্রকাশনা (মার্চ ১৮৬৩)। এই সকল কিছুই কামাল-এর প্রজ্ঞাগত দিগন্তকে অনেক প্রসারিত করে। তিনি 'উছমানিয়া সরকারের অনুবাদ বিভাগের (তারজামা ওদাসী) খুলাফা' মানসূর আফেন্দীর নিকটে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি পুরাতন ও নূতন ধারার কবিগণের মিলনকেন্দ্র আনজুমান-ই শু'আরা (১৮৬১ খৃ.), তাসবীর-ই আফ্‌কার পত্রিকার প্রকাশনা ও মুদ্রণ অফিস এবং সারাফিম কিরাআতখানেসি (গণ-পাঠাগার)-এর মত সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক মহলে চলাফিরা করিতেন।

মিসরের শাসক কে হইবেন তাহা নির্ধারণের জন্য উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করা হইলে (মিসির ওয়ারাছেত কানূনু) [সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৮৬৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে] তখন বিধান হয় যে পিতার পরে খেদীব হইবেন পুত্র, পূর্বের ন্যায় খেদীব পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য নহেন। কিন্তু ইহার পূর্বে মুসতাফা ফাদিল পাশা এই আইন দ্বারা উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হওয়াতে 'উছমানিয়া সরকার তাঁহাকে কিছু কালের জন্য ইস্তাম্বুল ত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন এবং এপ্রিল ১৮৬৬ সালে তিনি য়ূরোপে চলিয়া যান। 'আবদু'ল-'আযীয-এর নিকটে লিখিত পত্রে, যাহা ফরাসী ভাষাতে এবং আলাদাভাবে তুর্কী ভাষাতে প্রকাশিত হয়, সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের জন্য উযীরগণকে বদলানো উচিত এবং Le Nord পত্রিকার ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭-এর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের জবাবে তিনি ঘোষণা করেন যে, নূতন ধারণা যাঁহাদের রহিয়াছে (আফকার-ই জাদীদে সাহিবলেরি) তাঁহারা সকলেই সেই মত পোষণ করেন। কামাল তুর্কীতে এই উত্তরের অনুবাদ করেন এবং উহা তাসবীর-ই আফ্‌কার পত্রিকায় ছাপা হয়। তাহা ছাড়াও কামাল মন্তব্য করেন যে, তুর্কিস্তান'ইন আর্‌বাব-ই শাবাবি (তুর্কিস্তানের তরুণগণ) যাহারা এম. ফাদিলকে সমর্থন করে তাহারা জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্থান দেয় এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহারা নিজদের আদর্শ বাস্তবায়িত করিতে প্রস্তুত, তখন য়ূরোপীয়রা, যাহারা 'উছমানিয়া তুরস্ককে পশ্চাদপদ বলিয়া অভিযোগ করে, তাহারা হতভম্ব হইয়া যাইবে (সংখ্যা ৪৬১, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭)। ইস্টার্ন কোশ্চেন বা প্রাচ্য সমস্যার প্রশ্নের বিষয়ে তাঁহার নিবন্ধে, তাঁহার লায়িহাতে, যেহেতু রাষ্ট্রের দুর্বলতা

প্রকাশ পাইয়াছিল সেই কারণে সরকার উহাকে দেশপ্রেম-বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। তাই তাঁহাকে তাসবীর-ই আফকার পত্রিকাতে লিখিতে নিষেধ করা হয় এবং তাঁহাকে এরযুরুমের সহকারী গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তাঁহাকে রুতবে-ই ছানিয়্যা সিনফ-ই আওওয়াল-ই মুত্তামায়িযি-র পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। [দ্র. (১) হুররিয়্যাতে, নং ২৩, ৩ নভেম্বর, ১৮৬৮ ; (২) তাসবীর-ই আফকার, সংখ্যা ৪৬৯, ২৪ মার্চ, ১৮৬৭]। এম. ফাদিল-এর সঙ্গে তাঁহার সমঝোতা হয়। তাঁহার আমন্ত্রণক্রমে তিনি এরযুরুমে যান নাই। সোসাইটি অব ইয়ং অব অটোম্যানস বা তরুণ 'উছমানিয়া সমিতির সদস্যগণের সঙ্গে (যথাঃ দিয়া', সু'আবী, আগা এবং অন্যগণ) তিনি প্যারিসে পলায়ন করেন। এই সকল যুবককে তাঁহাদের পরিবারসমেত প্রাত্যহিক দিনের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিতেন এম. ফাদিল এবং অংশত শাহযাদা মুরাদ। ৩০ মে তারিখে তাঁহারা সকলেই একত্রে মিলিত হন। তাঁহাদের লক্ষ ছিল জনগণের অধিকার আদায় করা এবং তাহাদিগকে নিজদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা, জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু করা এবং শাহযাদা মুরাদকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা। ৩০ জুন, ১৮৬৭ সালে সুলতান 'আবদু'ল-'আযীয যখন রাষ্ট্রীয় সফরে প্যারিসে যান তখন তিনি এম. ফাদিলকে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন, তবে সুলতানের সঙ্গে নহে, ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে। সেই সময়ে কামাল এবং তাঁহার সহযোগিগণ ৩১ আগস্ট হইতে মুখবির পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু মু'আবী কর্তৃক এম. ফাদিল-এর বিরুদ্ধে এবং 'আবদু'ল-'আযীয-এর পক্ষে লিখিবার কারণে তাঁহারা এপ্রিল বা মে, ১৮৬৮ সালে লিখিত একটি পত্রে ঘোষণা করেন যে, মুখবির পত্রিকা সোসাইটি অব ইয়ং 'উছমানিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী নহে। এইভাবেই সমিতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ২৮ জুন, ১৮৬৮ হইতে শুরু করিয়া কামাল এবং তাঁহার সহযোগিগণ মুখবির-এর মুকাবিলা করিবার জন্য হুররিয়্যাত (মুক্তি বা স্বাধীনতা) নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, যদি তাঁহারা 'আবদু'ল-'আযীয এবং 'আলী পাশার বিরুদ্ধে লিখিতে থাকেন তবে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমা প্রদর্শন ও ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান সম্ভব নাও হইতে পারে। ইহার পরে কামাল এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী ৭ জানুয়ারী, ১৮৭০ একটি পত্রে ঘোষণা করেন যে, হুররিয়্যাতে প্রকাশিত লেখার সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং সেই পত্রিকাতে প্রকাশিত বিষয়বস্তু হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় হইতে ১০ আগস্ট, ১৮৭০ প্রেরিত একটি পত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে ইস্তাম্বুলে ফিরিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। ২৫ অক্টোবর কামাল এবং তাঁহার বন্ধুগণ পুনরায় ইস্তাম্বুলে আসেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি দিয়োচেন (Diyochen) পত্রিকাতে যে সকল নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন (পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল ১২ নভেম্বর, ১৮৭২) সেইগুলি এবং 'ইবরাত সংবাদপত্রেও (ইহা ১৫ জুন, ১৮৭২ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে, ইহার তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন) প্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ সাধারণ রুচিবোধ বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। ফলে কামালকে প্রথমে গেলিবোলুর (গাল্লিপোলি) মুতাসার্‌রিফ নিযুক্ত করা হয় (১১ জুলাই, ১৮৭২ এবং উহার কয়েক দিন পরেই, ১৯ জুলাই, ১৮৭২, সংবাদপত্রটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়)। ৩১ জুলাই মিদহাত পাশা উযীর-ই আ'জাম নিযুক্ত হন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর কামাল গাল্লিপোলি রওয়ানা হইয়া যান। 'ইবরাত (তুর্কি 'ইবরেত) পত্রিকাটির উপর হইতে যখন নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়া হয় তখন কামাল একটি পত্র প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পত্রিকার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করা অন্যায় হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রদেশে পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবার ফলে তাঁহাদের উপরে যথেষ্ট চাপ পড়িয়াছিল। ৬ ডিসেম্বর সংবাদ আসে যে, 'আসিম পাশাকে গাল্লিপোলির মুতাসার্‌রিফ নিযুক্ত করা হইয়াছে (জারীদা-ই হাওয়াদিছ, নং ২০৫৬) আর কামালকে ১১ ডিসেম্বর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে (দ্র. এম. সি. কুনতায়, নামীক কেমাল, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ২৩৪ ; ২/১, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১২৬, ১৩৪)। ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিয়া তিনি (দ্র. হাদীকা, নং ২৮, ডিসেম্বর ২২, ১৮৭২) 'ইবরাত পত্রিকায় লেখাতে মনোনিবেশ করেন।

গেদিক পাশা থিয়েটারে ১ এপ্রিল, ১৮৭৩ তারিখে তাঁহার নাটক ওয়াতান য়াখুদ সিলিসত্রে মঞ্চায়িত হয় এবং উহার সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশকে সমর্থন জানাইবার কারণে 'ইবরাত-পত্রিকা ৬ এপ্রিল, ১৮৭৩ সনে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই দিনই কামাল ও তাঁহার বন্ধুগণকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১০ এপ্রিল তারিখের ফরমানবলে তাঁহাদিগকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। প্রথমে তাঁহাকে সাইপ্রাসের ফামাগুসতার মাগোসা ব্যারাকের একটি ক্ষুদ্র ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হয়। পরে সাইপ্রাসের মুতাসাররিফ-এর তত্ত্বাবধানে অধিকতর প্রশস্ত একটি ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তিনি দর্শনার্থিগণের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে পারিতেন এবং তাহাদের মাধ্যমে বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগও করিতে পারিতেন। বন্ধুগণের সাহায্যে, বিশেষ করিয়া শাহযাদা মুরাদ-এর সাহায্যক্রমে তিনি এবং ইস্তাম্বুলে তাঁহার পরিবার বেশ আরামপ্রদভাবেই কালাতিপাত করিতেন। সুলতান ৫ম মুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করিবার (৩১ মে, ১৮৭৬) পরেই তাঁহাকে অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। ১৪ জুন তিনি ইস্তাম্বুল রওয়ানা হন। ইযমিরে মেহমান হিসাবে থাকিবার সময়ে তাঁহারা চেরকেস হাসান-এর ঘটনাবলীর সংবাদ পান এবং ২০ জুন ইস্তাম্বুলে আসিয়া পৌছেন। ফামাগুসতাতে তিনি ৩৮ মাস নির্বাসনে ছিলেন। বস্তুত সেই সময়ে তিনি তাঁহার জীবনের সবচেয়ে অধিক সৃষ্টিশীল কাজ সম্পন্ন করেন।

সুলতান ৫ম মুরাদ অসুস্থ হইয়া পড়িলে ১১ সেপ্টেম্বর 'আবদু'ল-হামীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩১ আগস্ট তিনি শপথ গ্রহণ করেন। কামালকে প্রথমে ১৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের (শুরায়ি দাওলাত) সদস্য করা হয় এবং পরে ২ নভেম্বর সাধারণ পরিষদের (মাজলিস-ই 'উমূমী) সদস্য করা হয়, সেখানে তখন শাসনতন্ত্র (কানূন-ই এসাসী) রূপায়ণের কাজ চলিতেছিল। তেরজেমে জেম'ইয়েতি পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই (নভেম্বর) বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। সেইজন্য সেখানে সু'আবীকে গ্রহণ করা হয় নাই এবং 'আসাকির-ই মিল্লিয়ে জেম'ইয়েতিও বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। কারণ উহার অগণিত সদস্য সংখ্যা সরকারের দুশ্চিন্তার কারণস্বরূপ ছিল। শাসনতন্ত্রে পরবর্তী কালে সংযোজিত একটি ধারার তিনি বিরোধিতা করেন। উক্ত ধারাবলে পুলিশের অনুসন্ধান দ্বারা সন্দেহজনক প্রমাণিত যে কোন ব্যক্তিকে সুলতান নির্বাসনে পাঠাইতে পারিতেন। ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ সালে জারীকৃত ফরমানবলে শাসনতন্ত্র অনুমোদন লাভ করে। উহার অল্পদিন পরেই ১২ জানুয়ারী ১৮৭৭ তারিখে

জন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কামালকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার লেখা চিঠিপত্র হইতে বুঝা যায় যে, গ্রেফতারের প্রকৃত কারণ ছিল ভিন্ন ; তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। উহাতে সুলতান 'আবদু'ল-হামীদ-এর সিংহাসনচ্যুতির ইঙ্গিত ছিল। মিদ্‌হাত পাশাকে ইস্তাম্বুল হইতে নির্বাসিত করিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্যও প্রমাণ সন্ধান করা হইতেছিল এবং তাঁহার দ্বারা কোনও প্রকার গোলযোগ সৃষ্টির ভয় ছিল বা তিনি ডেপুটি নির্বাচিত হইবেন, সেইরূপ ভয়ও ছিল। তিনি অন্তরীণ থাকাকালেই ১৯ মার্চ, ১৯৭৭ তারিখে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। তাঁহার বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ ১০ জুলাই শেষ করা হয় এবং সেই মাসেরই ১৯ তারিখে তিনি মিদিল্লি (Mytiline) রওয়ানা হইয়া যান। তাঁহাকে সেখানেই যাইয়া থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৩ এপ্রিল তুর্কো-রুশ যুদ্ধ শুরু হইলে তিনি সতর্কতার সঙ্গে যুদ্ধের গতি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ; সান স্টেফানোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে (৩ মার্চ, ১৮৭৮) যুদ্ধ শেষ হয়, উহার ঘটনা, ২০ মে তারিখে সু'আবীর ঘটনা, বার্লিন কংগ্রেস (বার্লিন অধিবেশন, উহা শুরু হয় ১৩ জুলাই) এবং 'উছমানিয়্যা পার্লামেন্টে উত্থাপিত প্রশ্ন ও আলোচনাসমূহ তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৮ খৃ. পার্লামেন্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সংসদীয় সরকার গঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের নিকটে পত্র দ্বারা নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, সংসদে আলোচনাকালে তাঁহারা কোন্ কোন্ বিষয় উত্থাপন করিবেন। তাঁহারাও সেই অনুযায়ী বিল (লায়িহা) উত্থাপন করেন এবং আলোচনা করেন। মাইটিলেনে তিনি প্রায় আড়াই বৎসরকাল নির্বাসিত ছিলেন ; অতঃপর ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৭৯ সালে তাঁহাকে সেই দ্বীপের মুতাসাররিফ নিযুক্ত করা হয়। ইতালীয় জেলেদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। ইতালীয়রা স্থানীয় স্পঞ্জ আহরণকারী জেলেদের ক্রমাগতই নানা প্রকারের অনিষ্ট করিত। গ্রীকরা স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছিল। সামরিক চাকুরীতে যোগদান না করা হেতু তাহাদের উপরে যে কর আরোপ করা হইয়াছিল (বেদেল-ই আসকেরি) তাহা দিত না বলিয়া তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া তুর্কী কর্মকর্তাগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার বিরোধী ছিলেন—এই সকল কিছু মিলাইয়া যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহার ফলে তিনি সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন (ফেব্রুয়ারী-মে ১৮৮১)। পুনরায় তাঁহাকে সেই চাকুরীতে বহাল করা হইলে তিনি চারি বৎসরে ও অধিক কাল সেই দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর ১৭ অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় যে, রোড্‌স দ্বীপের মুতাসাররিফ আগা আফেন্দীর সঙ্গে তাঁহাকে পারস্পরিকভাবে বদলী করা হইয়াছে (তারিহ, নং ২০৩-২০৭, জারীদা-ই হাওয়াদিছ, নং ৬৮২২) এবং ২০ অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ করা হয় যে, তিনি রোড্‌স দ্বীপে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। ৫ নভেম্বর, ১৮৮৫ সালে 'আরিফ পাশা ঈজীয় (Aegean) দ্বীপপুঞ্জ প্রদেশের (জেযায়ির-ই বাহ্‌র-ই সেফীদ) গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁহার ক্রমাগত চেষ্টার ফলে প্রদেশটির প্রশাসনিক কেন্দ্র চিওস (Chios, তুর্কী সাকীয) হইতে রোড্‌সে স্থানান্তরিত হয় (মুহাম্মাদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ৩খ., ২৯৭)। সেই কারণেই কামালকে চিওস-এর মুতাসাররিফ করিয়া সেখানে বদলী করা হয়। তাঁহার একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, ৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ সনে তিনি সেখানকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত স্থানসমূহে মুতাসাররিফ পদে নিযুক্ত থাকিবার কালে দেশময় সাধারণ বিশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক অদক্ষতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও পরিশ্রম এবং তামাক ও স্পঞ্জ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গিয়া কামাল খুব বেশি শ্রান্ত হইয়া পড়েন। নিজ শাসন এলাকাতে খৃস্টানদের তুলনায় মুসলিম অধিবাসী কম ছিল। তিনি মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করেন। সুলতান 'আবদু'ল-হামীদ-এর নিকটে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নিকটে প্রেরিত স্মারকলিপি (লায়িহা), আবেদনপত্র ('আরিদা) ও চিঠিতে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলির অধিকার রক্ষা করিতে হইলে কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে সেই সম্পর্কে তাঁহার মতামত ও সুপারিশ পেশ করেন। তাঁহাকে ১৮৮১ খৃ. বালা রুত্‌বাসী এবং ১৮৮৩ ও ১৮৮৬ খৃ. 'উছমানলী নিশানী পদক দ্বারা সম্মানিত করা হয়। কামাল প্রথমে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হন, পরে আবার তাঁহার নিওমোনিয়া হয়। অতিরিক্ত সরকারী কাজের চাপেও তিনি দুর্বল হইয়া পড়েন, বিশেষ করিয়া তাঁহার রচিত 'উছমানিয়া ইতিহাসের ('উছমানলী তারীখী) ১ম খণ্ড বাজেয়াপ্ত করা হইলে উহাতে তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রঙ্কাইটিস, পাকস্থলীর ব্যথা এবং অন্ত্রের জটিল রোগে ২ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ সনে চিওসে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে সেখানে তিনি একাই বাস করিতেন। স্ত্রী এবং পুত্রকে তিনি ইস্তাম্বুলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া পৌঁছাইবার আগেই লাশ দাফন করা হইয়া যায়। আবুদ-দিয়া' তাওফীক-এর কাছে তিনি শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন বোলায়িরে দাফন করা হয়। তদনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আদেশক্রমে দাফনের পরদিনই লাশ তুলিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হয় ও পুনরায় দাফন করা হয়। খাযিনা-ই খাসসার পক্ষ হইতে মাযারের উপরে সৌধ নির্মাণ করা হয়। সৌধের পরিকল্পনা করেন তাওফীক ফিতরাত।

২। গ্রন্থাবলী ঃ তানজীমাত সাহিত্যের অন্যান্য অনেক ব্যক্তির ন্যায় কামালও নূতন চিন্তাধারার প্রচার এবং নূতন ধারার লেখা প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন।

(ক) কবিতা ঃ কামাল কবিতা লেখা দিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। একটি পত্র-কাব্যে তিনি ৮ হইতে ১০টি গযল লেখেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বৎসর। তাহা ছাড়া সোফিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অপর একটি পত্রিকার জন্যও কবিতা লিখিতে থাকেন। শেষোক্ত সাময়িকীতে তাঁহার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে রচিত কবিতা প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া ষোল বৎসর বয়সে তিনি একটি কিত্'আ রচনা করেন। উহাতে তিনি ব্যাংক নোটের বিষয়টিকে বিদ্রূপ করেন। দিয়া' পাশা তাঁহার খারাবাত-এ এই কিত্'আটি অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার যে ছয়খানি কাব্য সঙ্কলন হয় সেইগুলিতে এই সকল বাল্যরচনার অল্প কয়েকটি মাত্র গৃহীত হয়। কারণ তিনি নিজেই সেইগুলি আর খুব একটা পসন্দ করেন নাই। তাঁহার নাজীরাগুলিরও একটি সঙ্কলন রহিয়াছে। তাঁহাকে নামীক—এই কবিনামটি দিয়াছিলেন আশরাফ পাশা। তিনি তাঁহার মার্‌ছিয়াগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে কামাল ইকলিমিনিন সুলতানী বলিয়া বিশেষ প্রশংসনীয় সম্বোধন করিতেন (দ্র. দীওয়ান, ইস্তাম্বুল ১২৭৯, পৃ. ১০৯, ২০০)। বিশ বৎসর বয়সে তিনি যখন দিয়া' পাশার সঙ্গে পরিচিত হন তখন শেষোক্ত ব্যক্তি কবি হিসাবে তাঁহার সম্ভাবনা লক্ষ করেন ও

প্রশংসা করেন। তিনি সমসাময়িক ও প্রাচীন কবিগণের কবিতার নাজীরা বা অনুরূপ কবিতা রচনা করিতেন। অন্য কবিগণের সঙ্গে মিলিতভাবেও তিনি কবিতা লিখিতেন। নূতন সুলতান সিংহাসনে বসিলে তাঁহার প্রশংসাসূচক জুলূসিয়া (অভিষেক) কবিতা রচনা করিতেন ঃ মাদ্‌হিয়্যা (প্রশস্তি কবিতা), হিজ্‌বিয়্যা (ব্যঙ্গ কবিতা), ফাখ্‌রিয়্যা (আত্মপ্রশস্তিমূলক কবিতা) ও তারীখ কিত'আসিস (কোন ঘটনার স্মারক কবিতা) ; ফার্সী ভাষায় মুতাম্মাত গযল রচনা করেন (নুক্তাবিহীন হরফে) এবং নাদিম-এর অনুরূপ একখানি নাজীরা রচনা করেন, উহার নাম সাকীনামাহ্। কাব্যের প্রায় সকল ধারাতেই তিনি দীওয়ান কবিতার কিছু না কিছু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাসবীর-ই আফকার পত্রিকাতে লিখিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা রহিয়াছে। স্বরচিত দশটি কবিতাতে তিনি সিল্যাবলে সিল্যাবলে বিভক্ত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি তিনি রচনা করেন য়ূরোপে থাকিতে, কিছু কবিতা তিনি মুলাম্মা' ধরনে রচনা করেন। অর্থাৎ আধা-তুর্কী আধা-আরবী ভাষাতে ; কিছু কিছু পত্র লিখেন কবিতা ও শারকীতে মিলাইয়া ; তন্মধ্যে কোন কোনটিতে সুর সংযোজন করিয়া গানে রূপ দেওয়া হয় ; তাহা ছাড়া তিনি Edward Goen-এর একটি কবিতা এবং Marseillaise-এর অনুবাদ করেন। এই শেষোক্তটি সম্বন্ধে, যদি আমাদের ভুল না হয় তবে, বলা যায় যে, ইহাই ছিল তাঁহার রচিত নূতন রীতির ছন্দের কবিতা। এই ধরনের কবিতা তিনি রচনা করেন প্রধানত ওয়াবিলা ('হায়!') প্রকাশিত হইবার পরে, উহা তিনি রচনা করিয়াছিলেন হামীদ-এর সাহারা" ('দেশ') কাব্যের নাজীরা (অনুরূপ) হিসাবে। তাঁহার কাব্য গ্রন্থাবলী হইতে পরিচয় পাওয়া যায় যে, হৃদয়ানুভূতি তাঁহার বোধশক্তিকে এবং কল্পনাশক্তিকে খুব বেশি প্রভাবিত করিয়াছিলেন। অধিকাংশ দেশাত্মবোধক কবিতাই যেমন পিলেভনা শারকীসী, মুরাব্বা', বির মুহাজির কিযিনিন ইস্‌তিমৃদাদী তিনি লিখিয়াছিলেন মিদিল্লিতে থাকিতে, যখন তুর্কো-রুশ যুদ্ধ চলিতেছিল। এই কবিতাগুলির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এইগুলির মধ্যে একটি বিশেষ বিখ্যাত কবিতা হইতেছে ওয়াতান কাসীদাসি। ইহার কিছু কিছু শ্লোক (বায়ত) তিনি য়ূরোপে থাকিতে (১৮৬৯ খৃ.) এবং মাগোসাতে নির্বাসনে যাইবার আগে (১৮৭২ খৃ.) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(খ) প্রবন্ধাবলী ঃ কামাল সাংবাদিকতা দ্বারা কর্মজীবন শুরু করেন, পরে শিনাসীর প্রভাবে তিনি উহাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাসবীর-ই আফকার পত্রিকাতে লেখা শুরু করেন। য়ূরোপে থাকাকালে তিনি হুর্‌রিয়্যাত পত্রিকাতে নিয়মিত লিখিয়া যাইতে থাকেন এবং ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিবার পরে তিনি দিয়োঝেন, 'ইবরাত এবং হাদীকা পত্রিকাতে লিখিতে থাকেন। তাঁহার সাংবাদিকতা জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় কাল ছিল ফামাগুস্তাতে নির্বাসনে যাইবার আগেকার দশ-এগার বৎসর। তাঁহার অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ইবরাত (তুর্কী উচ্চারণ 'ইবরেত) পত্রিকাতে। তিনি নিজেই ছিলেন সেই পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক। ফামাগুস্তাতে ও মাইটিলিনে নির্বাসিত থাকিবার সময়ে তাঁহার প্রতি কোন লেখা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে, যেমন সা'য়, মুসাওভের মাদীনিয়্যাত, চানতা, মুহাররির, ইস্‌তিকবাল, সাদাকাত ও ইত্তিহাদ-এ তিনি কিছু কিছু নিবন্ধ ছাপান। এই সকল লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছাপা হয় নাই ; তারজামান-ই হাকীকাত ("সত্যের ব্যাখ্যা") পত্রিকাতে প্রকাশিত কবিতা যেমন তিনি খিতাম-ই 'আজিমী এবং আদ-দা'ঈ কামাল ছদ্মনামে লিখিতেন, এই ক্ষেত্রে সেইরূপ করেন নাই। চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটিত সেই সকল বিষয় নিয়াই তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন। সেইগুলির বিষয় বৈচিত্র্য ছিল অনেক। তবে রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিই হইত সবচেয়ে কার্যকর এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী। এই সকল লেখাতে য়েনি, 'উছমানিলার জাম'ইয়্যাতির নীতি-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকিয়া তিনি নানা ধারণা প্রকাশ করিতেন। সেইগুলিই শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া তিনি প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেরই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উল্লেখ করিয়া সেইগুলির সংশোধন ও উন্নয়নের কথা লিখিতেন। তাঁহার সবচেয়ে মারাত্মক সমালোচনা দেখা যায় তাসবীর-ই আফকার ও 'ইবরাত পত্রিকাতে। সেই সকল প্রবন্ধে যেইগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন য়ূরোপে পলায়ন করিবার চিন্তা যখন করিতেছিলেন তখন। সেই সময়ে কোন সরকারী চাকুরীর তাঁহার প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু সেই লেখাগুলির জন্যই তাঁহাকে ফামাগুস্তাতে নির্বাসিত করা হয়। তাঁহার রচিত অন্যান্য ধরনের লেখার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এইগুলির, বিশেষ করিয়া যেইগুলিতে তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রামশীলতার প্রতিফলন ঘটিয়াছে, সেইগুলির জন্যই তিনি অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

(গ) ঐতিহাসিক রচনা ঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার লেখাগুলি সকলই নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ ধরনের, আর সেইগুলির বিষয়বস্তু হইতেছে 'উছমানিয়া ইতিহাসের এবং ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্ব, তারীখ-ই 'আসকারী ও 'উছমানলী তারিখী।

(১) বারিকা-ই জাফার ("বিজয়ের তরবারি") গ্রন্থখানি দিগ্বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক ইস্তাম্বুল বিজয়ের ঘটনা লইয়া রচিত। প্রবন্ধটি তিনি একদিনে রচনা করিয়াছিলেন। এখানে তিনি অলংকৃত ও শিল্পসম্মত গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আর কেহ প্রবন্ধটির 'সমতুল্য' অপর একটি প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন না (ইস্তাম্বুল ১২৮৯ হি., রূমী ১৩০৫ সাল)।

(২) দাওলাত-ই 'আলিয়্যা'নিন দেভর-ই ইসতিলাসিনা দা'ইর বির মাকালাদির। এই গ্রন্থখানিতে তিনি প্রথম হইতে একেবারে সুলতান মহান সুলায়মান-এর শাসনামল পর্যন্ত 'উছমানিয়া সাম্রাজ্যের সকল বিজয়াভিযানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাসবীর-ই আফকার পত্রিকাতে অংশে অংশে প্রকাশিত হইবার অল্পকাল পরেই জানুয়ারী ১৮৬৭ হইতে ইহা বই আকারে প্রকাশিত হয় (ইস্তাম্বুল ১২৮৯, ১৩০১, ১৩০৪ সাল)।

(৩) সালাহু'দ-দীন আয়্যুবী ; এইখানি আয়্যুবিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম শাসক ও যোদ্ধা সুলতান সালাহু'দ-দীন (Salaudin)-এর জীবনী বিষয়ক সন্দর্ভ। ইহা দেভর-ই ইসতিলা'র সঙ্গে একত্রে এভ্রাক-ই পরিশান-এর প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয় (ইস্তাম্বুল ১২৮৯/১৮৭২, ১৯৬৪ খৃ.)।

(৪) সিলিসত্রে মুহাসারাসী ; তিনি আহমাদ নাফিয-এর নামে এইখানি প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তি স্বয়ং ১৮৫৩ খৃ. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় উপরিউক্ত ফামাগুস্তাতে অবস্থানকালে কামাল ইস্তাম্বুলের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে নির্ভর করিতেন (ইস্তাম্বুল ১২৯০ ; ১৯৪৬ খৃ.)। কানিঝে, এইখানি তিনি লিখিয়াছিলেন তুর্কী সৈন্যদের প্রশংসনীয় সকল বিজয়ের স্মরণে। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে সুলতান ৩য়

মুহাম্মাদ-এর আমলে সংঘটিত বিখ্যাত যুদ্ধে তুর্কী বাহিনী কর্তৃক কানিঝে বিজয় এবং সেই সঙ্গে তিরয়াকী হাসান পাশার বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা। এইখানি আহমাদ নাফিয-এর নামে প্রকাশিত হয় (ইস্তাম্বুল ১২৯০, ১৩০৩, ১৩১১, ১৩৩৫; ১৯৪১ খৃ.)।

(৬) তারজামা-ই হাল-ই আমীর নেভরূয ; আমীর নেভরূয-এর জীবন সংগ্রাম নিয়া রচিত। মঙ্গোল আক্রমণের সময়ে তিনি ইসলাম ও মানবতার কারণে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, বইখানি প্রথমে নূন-কাফ এই সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি ফামাগুস্তাতে নির্বাসনে ছিলেন (ইস্তাম্বুল ১২৯৩ রূমী ; আরাকেল ১৩০২ রূমী ; মাতবা'আ-ই আবু'য-যিয়া' ১৩০২, ১৩০৫)। উপরে উল্লিখিত বইগুলির মধ্যে দেভর-ই ইসতিলা', সালাহু'দ-দীন আয়্যুবী এবং সেই সঙ্গে দিগ্বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ ও সুলতান সালীম-এর জীবনী একত্রে যুক্ত করিয়া আওরাক-ই পারীশান (তুর্কী এভরাক-ই পেরীশান) নামে এক খণ্ডে প্রকাশ করা হয় [ইস্তাম্বুল, তা. বি. (ইস্তাম্বুল ১৩০১ রূমী সাল)]।

(৭) এই পর্যন্ত যে সকল বইয়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি ছাড়া তিনি ফামাগুস্তাতে থাকাকালে তাঁহার তারীখ-ই 'আসকারী রচনা করেন, হারবিয়্যা মাকতাবী বা সামরিক একাডেমীতে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইতিহাস পাঠ্যগ্রন্থরূপে তিনি সেখানে লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ডে সুলতান 'উছমান হইতে শুরু করিয়া সুলতান সুলায়মান-এর আমল পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হইয়াছে সুলতান ২য় সালীম-এর কাল হইতে এবং শেষ হইয়াছে ১৬৩৭ খৃ. বোযজা-আদা (Tenedos) ও লিমনি (Lemnos) বিজয়ের ঘটনাবলীতে ; এই গ্রন্থখানি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপি তুর্ক তারিহ কুরুমুতে রক্ষিত আছে।

(৮) ১৮৮৬ খৃ. রোড্‌সে তিনি 'উছমানলী তারীখী গ্রন্থখানি লিখিতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল তারীখ-ই 'আসকারী গ্রন্থেরই একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির করা। এই গ্রন্থখানির ভূমিকাতে ছিল রোমান ইতিহাস এবং ২২৭-৮ হিজরী সময় পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস। এই পর্যন্ত ছাপা হইলেই (ইস্তাম্বুল ১৩০৫ রূমী/১৮৮৭) কিছু কিছু মত ও মন্তব্যের কারণে প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কামালকে জানানো হয় যে, বইখানির মুদ্রণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং মুদ্রিত সকল বই বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বইখানির পাণ্ডুলিপিতে সুলতান ১ম সালীম-এর শাসনামল পর্যন্ত ঘটনাবলী লেখা হইয়াছে ; উহা তুর্ক তারিহ কুরুমুতে রক্ষিত আছে। এই 'উছমানলী তারীখী লিখিত হইয়াছিল তাঁহার সন্দর্ভগুলিরই ন্যায় বর্ণনামূলকভাবে। সমগ্র গ্রন্থখানির একটি অংশমাত্র—দিগ্বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদের আমল পর্যন্ত ঘটনাবলী কুল্লিয়াত-ই কামাল সিরিজে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (ইস্তাম্বুল ১৩২৬-৭ সাল)।

(ঘ) নাটক ঃ কামাল নাটককে নৈতিকতাবোধ শিক্ষা দিবার মাধ্যম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এইরূপ মত পোষণ করিতেন যে, তুর্কী ভাষা যেহেতু তখন পর্যন্ত সহজরূপ লাভ করে নাই, সেই কারণে ছন্দময় ভাষায় নাটক লেখা সম্ভব নহে ; এইজন্যই তাঁহার ছয়খানি নাটকই তিনি গদ্যে রচনা করেন।

(১) ওয়াতান য়াকুদ সিলিসত্রে ; নাটকের মূল ঘটনাবলী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ-এর আমলের শুমনুর যুদ্ধের বর্ণনা হইতে নেয়া। কিন্তু উহাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার জন্য নাটকটি ১৮৫৩ খৃ. সংঘটিত সিলিসত্রের ঘটনার পটভূমিতে সাজান হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃ. V. D. Smirnov এইখানি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন প্রথমে H. Hantt ও পরে L. Pekotsch এবং আরবীতে অনুবাদ করেন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল খায়্যাত। মুরাদ বে নাটকটির কঠোর সমালোচনা করিলেও এইখানির বিশেষ মূল্য রহিয়াছে এই কারণে যে, এই মঞ্চ নাটকটিতেই সর্বপ্রথম 'উছমানী জাতীয় বীর্যবত্তা ও গুণাবলীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়। ইহার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় সানাসতিবুলি রিফা'আত-এর য়া গাযী য়া শাহীদ নাটকে (চানুটা, ৩খ, ইস্তাম্বুল ১২৯১ রূমী সাল) এবং তাঁহার তুনা য়াখুদ জাফার নামক নাজীরাতে (ইস্তাম্বুল ১৩০১ রূমী সাল)। এই নাটকটি ১৮৭৩ হইতে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশবারের বেশী মুদ্রিত হয় এবং প্রথম মঞ্চায়নের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু বহুবার উপস্থাপিত হইয়াছে।

(২) দানিশ বে য়াখুদ ফাখিশা-ই না'ইবা-র বিষয়বস্তু তিনি ফামাগুস্তাতে নির্বাসনে যাইবার কালে জাহাজে থাকিতে ভাবনা করেন। সেইখানে গিয়া তিনি সেই চিন্তাকে নাটকে রূপ দেন এবং নাম দেন 'আকিফ বে (ইস্তাম্বুল ১৮৭৩, ১৮৭৬ এবং ১৯৬৬ খৃ.)। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শুরুতে সংঘটিত একটি যুদ্ধের বিষয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন। ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৩ সনে সিনোপ বন্দরে নোঙর করিয়া রাখা 'উছমানিয়া নৌবহরে রুশগণ আগুন ধরাইয়া দেয়, সেই পটভূমিতে নাটকটি পরিকল্পিত। এই বিয়োগান্ত নাটকটিতে এক নারীর প্রেমের দুঃসাহসিক অভিসার বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার স্বামী নিহত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বিবাহ করিবার পরিকল্পনা করেন এবং বীরত্বব্যঞ্জক ও দেশাত্মবোধক অনুভূতি প্রকাশ করেন।

(৩) তাঁহার সামাজিক ভাবালুতামূলক নাটক হইতেছে যাওয়ালতি চোজুক (ইস্তাম্বুল ১৮৭৩ খৃ. তিনবার ; ১৮৭৪, ১৯৪০, ১৯৪৭, ১৯৬০ খৃ.)। একটি পরিবার বিবাহের প্রশ্নে যে চাপের মুখে পড়ে সেই দুঃখজনক ঘটনা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় হামীদ-এর ইচ্‌লি কিয নাটকে এবং আর. একরাম-এর উসলাত নাটকে।

(৪) গুলনিহাল ; প্রথমে নাটকটির নাম রাখা হইয়াছিল রায-ই দিল ("হৃদয়ের রহস্য"), ওয়াতান নাটকটির মহড়া যখন চলিতেছিল সেই সময়ে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটি তিনি ফামাগুস্তাতে থাকাকালীন যাওয়াল্লী চোজুক এবং 'আকিফ বে-এর ন্যায় লেখকের নামবিহীনভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও নির্যাতনকে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কতগুলি প্রতীকী চরিত্র এই ধারণাগুলিকে রূপ দান করিয়াছে (ইস্তাম্বুল ১৮৭৩, ১৮৭৬, ১৮৬৯ খৃ.)।

(৫) কারা বেলা নাটকটিও তিনি ফামাগুস্তাতে থাকিতে রচনা করেন। ইহাতে জনৈক হারেম আগাসী জনৈক ভারতীয় রাজার কন্যার প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কামাল স্বয়ং এই নাটকটির প্রশংসা করিলেও ইহার তীব্র সমালোচনা হয় (প্রথম ১৯১১ খৃ. ; শাহ সুলায়মান, তেনকীদাত-ই আদাবিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯১১ খৃ.)।

(৬) তাঁহার শেষ নাটক জালালু'দ-দীন খাওয়ারাযম শাহ। ইহাতে ইসলামের ঐক্যের ধারণাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, বিষয়বস্তু মঙ্গোল অভিযানের কালের। ১৮৮১ খৃ. মাইটিলিনে নাটকটি লেখা শেষ হয়। প্রকাশের যে তারিখ, কায়রো ১২৯২/১৮৭৫ সাল, তাহা সত্য নহে। তাঁহার জীবনকালে ইহা আংশিকভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয়

(মাজমূ'আ-ই আবু'য-যিয়া, ৫খ, নং ৪৯, ৫০ ; ৩১ আগস্ট ও ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬)। নাটকটি তিনি পড়িবার জন্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইহা মঞ্চস্থ হয় (TOEM, xxxvii/1, এপ্রিল, ১৩৩২-৫০) ; সহজ ভাষায় পুনঃপ্রকাশিত হয়, ইস্তাম্বুল ১৯৬৯ খৃ.।

(ঙ) উপন্যাস ঃ কামাল-এর উপন্যাসগুলি তাঁহার নাটকের মত এত বিখ্যাত নহে এবং সাধারণভাবে তত বেশি সফলতাও লাভ করে নাই ; তবুও সেইগুলির গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ সেইগুলি ছিল এই ধারার প্রথম লেখা বই। একটি উপন্যাস তিনি লিখিয়াছিলেন ফামাগুস্তাতে থাকিতে। উহার বিষয়বস্তু হইতেছে এক তরুণ যুবক। সে কোন এক বেশ্যা নারীর সঙ্গে প্রেমাসক্ত হইয়া সাংসারিক ও নৈতিক সকল দিক হইতেই সর্বস্বান্ত হইয়া যায়।

বইখানি তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমা লাভের অল্পকাল পরে 'আলী বে'ইন সারগুযেশতিনি হাবীদির, এই নূতন নামে প্রকাশিত হয়। কারণ প্রথমে দেওয়া নাম সোন পিশমানলিক নামে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই (ইস্তাম্বুল ১৮৭৬, ১৯৬৯, ১৯৭১ খৃ.)। তাঁহার এই রোমান্টিক সামাজিক উপন্যাসটি ফরাসী ভাষাতে অনূদিত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস জায্মী (তুর্কী-জেয্মী)-এর বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয় খৃ. ১৬শ শতকের 'উছমানী, ক্রিমীয় ও ইরানী ইতিহাস হইতে। অংশ অংশ করিয়া ইহা মাইটিলিনে লেখা শুরু হয় এবং ১৮৮১ খৃ. লেখা শেষ হয়। ইহাতে রোমান্টিকতার প্রভাব রহিয়াছে। ইহার মূল ধারণা প্যান-ইসলামী চিন্তা (ইস্তাম্বুল ১২৯৭, ১২৯৯, ১৩০৪, ১৩৩৫ ; ১৯৬৯ খৃ.)।

(চ) সমালোচনা সাহিত্য ঃ তাঁহার প্রায় সকল সমালোচনাতেই সাধারণভাবে দীওয়ান সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়াছে, সেইগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় লিখিত। সকলই পত্রের আকারে লেখা। কারণ সেই সময়ে তিনি নির্বাসনে ছিলেন।

(১) বাহার-ই দানিশ গ্রন্থের ভূমিকাতে (মুকাদ্দিমা) তিনি লিখিয়াছেন যে, তানযীমাত আমলে লেখকগণ ফার্সী হইতে অনুবাদ করা হইতে বিরত ছিলেন। কারণ তখন পাশ্চাত্য প্রভাব খুব বেশি ছিল এবং তিনি শায়খ 'ইনায়াতুল্লাহ-র উর্দূতে রচিত একটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন (ইস্তাম্বুল ১২৯১, ১৩০৩, ১৩১১)।

(২) তাখরীব-ই খারাবাত হইতেছে দিয়া' পাশার সংকলন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (ইস্তাম্বুল হইতে প্রকাশিত, ১৮৭৪ খৃ.) সমালোচনা। উহাতে আরবী-ফার্সী কবিতার এবং তুর্কী দীওয়ান কবিতার বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে ইহা একটি প্রবন্ধ আকারে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয় (মাজমূ'আ-ই আবু'য-যি-য়া', নং ১১, ১৯, ২৪, ১৭ জানুয়ারী, ১৫ মে, ১৭ জুলাই, ১৮৮২)। পরে ইহা বই আকারে প্রকাশিত হয় (ইস্তাম্বুল ১৩০১, ১৩০৪ রূমী সাল)।

(৩) এই একই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের উপরে লিখিত তাঁহার সমালোচনা প্রথমে পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয় (দ্র. ঐ, নং ৩০-৩৬, ২৪ জানুয়ারী, ২৩ এপ্রিল, ১৮৮৩), পরে আলাদাভাবেও প্রকাশিত হয় (ইস্তাম্বুল ১৩০১, ১৩১২)।

(৪) 'ইরফান পাশা'য়া মেকতুব লিখিত হইয়াছিল যখন 'ইরফান পাশা তাঁহার মাজমূ'আ-ই ইরফান পাশা গ্রন্থের ভূমিকাতে (ইস্তাম্বুল ১২৮৭ রূমী সাল) তরুণ সমাজকে দোষারোপ করিয়াছিলেন যে, তাহারা দীওয়ান সাহিত্য পসন্দ করে না (দ্র. ঐ, নং ৭, ১৮ নভেম্বর ১৮৮০) ; উহা বই আকারে প্রকাশিত হয় ইস্তাম্বুল হইতে, ১৩০৯, ১৩২৭)।

(৫) মুতালা'আ-নামে, তিনি লিখিয়াছিলেন আর. একরাম-এর তা'লীম-ই আদাবিয়্যাত বইটি প্রসঙ্গে এবং ছাপা হইয়াছিল একটি ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ; কিন্তু উহা ধরা পড়ে পরবর্তী কালে (দ্র. এন. হালিল ওনাত, নামিক কামাল'ইন তা'লীম-ই আদাবিয়্যাত উযেরিনে বির রিসালেসি, আঙ্কারা ১৯৫০ খৃ.) ; তাঁহার চিঠিপত্র হইতে জানা যায় যে, এই বইখানি তিনি লিখিয়াছিলেন মাইটিলিনে থাকিতে ১৮৭৮ খৃ.।

(৬) মুকাদ্দিম-ই জালাল গ্রন্থখানি তিনি লেখা শেষ করেন ১৮৭৮ খৃ. মাইটিলিনে। ইহাতে তিনি সাহিত্যের নূতন রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই রূপগুলি তানজীমাতে পরে প্রচলিত হয় ; যথা ঃ রাজনৈতিক প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক। তাহা ছাড়া তাঁহার নাটক জালালু'দ-দীন খাওয়ারাযম শাহ-এর কয়েকটি বিষয়েও আলোকপাত করেন যে, নাটকটি কতটুকু ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর এবং ভাষার সহজবোধ্যতার কথাও তিনি বলেন (একটি প্রবন্ধরূপে উহা প্রথম প্রকাশিত হয় শারক পত্রিকাতে, নং ১ প., ১২৯৭ রূমী সাল ; মাজমূ'আ-ই আবু'য-যিয়া, নং ৩৮-৪৪, ৪ নভেম্বর, ১৮৮৪—১২, জানুয়ারী ১৮৮৫, ইস্তাম্বুল ১৩০৫, ১৩০৯)।

(৭) তাঁহার রেনান মুদাফা'আ-নামেসি লেখা শেষ হয় মাইটিলিনে, সেপ্টেম্বর ১৮৮৩-এ। উহা Ernest Renan সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ মে, ১৮৮৩ সালে যে L' Islamisme et la science শীর্ষক বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সমালোচনা (ইস্তাম্বুল ১৩২৬ রূমী ; সম্পা. ফুআদ কোপরুলু, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ.)।

(৮) আহমাদ মিদহাত উস-ই ইনকিলাব গ্রন্থে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া যে সকল তথ্য দিয়াছেন কামাল সেইগুলির সমালোচনা করেন (ইস্তাম্বুল ১২৯৫, পৃ. ১৯৭, ২২০)। এই সমালোচনা তিনি করেন পত্রাকারে, তারিখ ২৪ আগস্ট ও ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ (এদীব-ই আ'জাম নামীক কামাল বে'ইন গায়র-ই মাতবূ' আছারিনদান-আহমাদ মিদহাত আফেন্দি'য়ে য়াযদিগী ইকি মেকতুব, ইযমির ১৩২৪ রূমী সাল)।

(৯) উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া তাঁহার আরও কিছু সমালোচনামূলক রচনা আছে। সেইগুলি পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু বই আকারে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে আর. একরাম কর্তৃক Silvio Pellico-এর Le Mie Prigioni-এর তুর্কী অনুবাদ (১৮৭৪ খৃ.) সম্পর্কে লেখা মেস প্রিজন্স মু'আখাযেসি।

(১০) কে. পি. রিফা'আত-এর হুকূক-ই 'উমূমিয়্যা নামে অনুবাদ গ্রন্থটি (ইস্তাম্বুল ১২৯০ রূমী সাল) ছিল Pradie Fodere-এর Principes generaux de droit politique et de legislation (প্যারিস ১৮৬৯ খৃ.) গ্রন্থের অনুবাদ। কামাল সেই অনুবাদ গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন, নাম মুকাতেবাত-ই সিয়াসিয়্যে। (১১) ইনতিবাহ মুকাদ্দিমেসি।

(১২) তাঁহার লাতীফে (কাহিনী ও প্রবচন), পিলেভনে মু'আখাযেসি নামেও প্রচলিত। ইহা ডি. হিকমেত-এর পিলেভনে কাহরামানী 'উছমান পাশা শানিন্দাদির গ্রন্থখানি (ইস্তাম্বুল ১৮৭৮ খৃ.) বিষয়ে রচিত। (১৩) তিনি মাহমূদ জালালু'দ-দীন পাশার শারহ-ই শাফীক-নামা গ্রন্থের (ইস্তাম্বুলে ১২৯০) একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন—নাম শেফীক-নামে বা

রাওদাতু'ল-কামিলীন মু'আখাযেসি। এই শ্রেণীর সঙ্গে তাঁহার লায়িহাগুলি (স্মারকলিপি) ও তাকরীদগুলিকেও (বইয়ের প্রশংসা) অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে আন্তরিক এবং বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পাওয়া যায় ব্যক্তিগত পত্রগুলিতে। তন্মধ্যে কতগুলি প্রায় বইয়ের সমানই দীর্ঘ। সেইগুলিতে সমসাময়িক অনেকের বই সম্বন্ধেই তিনি খোলাখুলি মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই সময়কার নানা বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধেও তিনি সেইগুলিতে আলোচনা করিয়াছেন।

(ছ) অন্যান্য রচনা ঃ উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তিনি আরও কিছু রচনা রাখিয়া গিয়াছেন ঃ তান্‌যীরু'ল-খিনযীর (ইস্তাম্বুল ১৩০৭); সেরগুযেশী (ইস্তাম্বুল ১৩২৭ রূমী); রু'য়া, ইহাতে লেখকের নাম সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে নূন-কাফ (মিসর ১৯০৮ খৃ., ইস্তাম্বুল ১৩২৬, ১৯৩২ খৃ.); ইমতিয়াজ-ই আকওয়াম ওয়াফায়-ই 'আহ্‌দি (ইস্তাম্বুল ১৩২৭); হিকমেতু'ল-হুকূক, মিদিল্লি রিসালেসি এবং মাজমূ'আ-ই সিয়াসেত কখনও বই আকারে প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের তথ্যাবলী প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে গৃহীত ঃ (১) ফা'ইক রেশাদ, আদীব-ই আ'জাম কামাল ; (২) আবু'য-যিয়া', কামাল বে'ইন তেরজেমে-ই হালি (ইস্তাম্বুল ১৩২৬) ও (৩) য়েনি 'উছমানলিলার তারীখী, TE-তে প্রকাশিত ; (৪) এ. একরাম বোলায়ির, নামীক কেমাল, (ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ.)।

অন্যান্য তথ্য-উৎসের মধ্যে তাঁহার বাল্য জীবন ও কবিতা সম্বন্ধে ভাল আলোচনা রহিয়াছে ঃ (৫) এস. এন. আরগুন (নামীক কেমাল হায়াতি ভে সিইরলেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ. ; (৬) নামিক কেমাল'ইন সিইরলেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ. ; (৭) আই. আর. এম. কেমাল ইনাল তাঁহার যে জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেখানে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে কামাল-এর জীবন এবং তাঁহার কাব্যের আলোচনা রহিয়াছে (সোন আশির তুর্ক সাইরলারি, ৫খ., ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৮১৯ প.)। তাঁহার বাল্য জীবনের জন্য দ্র. (৮) ই. 'আলী বাকী, নামিক-কেমাল'ইন আন্নেসিনেরেদে য়াতার, জুম্হুরিয়েত-এ প্রকাশিত, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০ ; উলকু, নং ১০১, জুলাই ১৯৪১ ; (৯) নামিক কেমাল আফয়োন্দা, আঙ্কারা ১৯৪৯ খৃ.। তাঁহার কিছু কিছু প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে ; (১০) (আবু'য-যিয়া, মুন্তাখাবাত-ই তাসবীর-ই এফকার, ইস্তাম্বুল ১৩০৪, ১৩১১; (১১) এ. একরাম বোলায়ির, কুল্লিয়াত-ই কেমাল, ইস্তাম্বুল ১৩২৭ ; (১২) এম. নিহাদ ওযোন, নামিক-কেমাল ভে'ইব্‌রেত গাযেটেসি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ.)। আরও দ্র. (১৩) R. H. Davison, Reform in the Ottoman empire 1856-1876, Princeton 1963, নির্ঘণ্ট ; (১৪) A. Bombaci, Storia della letteratura tirca, Milan 1956, নির্ঘণ্ট ; (১৫) Enciclopedia Italiana, সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ দ্র.। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই তিনি নির্বাসনে থাকাকালে অন্যদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি নিজে সংশোধন করিতে পারেন নাই বলিয়া সেইগুলিতে কিছু ভুলত্রুটি রহিয়া গিয়াছে এবং কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছে। তুর্ক তারিহ কুরুমু তাঁহার পরিবারের নিকট হইতে যে সকল গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছে, তন্মধ্যে রহিয়াছে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি এবং কিছু কিছু মুদ্রিত রচনা, সেইগুলি তিনি সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত সংস্থা তাঁহার প্রায় ৭৪৪ খানি পত্র একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতগুলি পত্র তাঁহাকে লেখা। সংস্থাটি তাঁহার সরকারী লেখাসমূহ দুইখানি বইয়ে এবং তাঁহার কাব্যসংগ্রহ দুইখানি বইয়ে প্রকাশ করিয়াছে। কবিতাগুলি ছাড়া এই সকল বই হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই। তাঁহার প্রায় ১,০০০ পত্র, সেই সঙ্গে ইতোমধ্যে যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলি, সকলগুলিরই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা এবং প্রামাণিকতা সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে তুর্ক তারিহ কুরুমু ; (১৬) (নামিক-কেমাল'ইন মেকতুপলারি, ১খ, ইস্তাম্বুল, আভরুপা ভে মাঘোসা মাকতুপলারি ; ২খ ও ৩খ, মিদিল্লি মেকতুপলারি, আঙ্কারা ১৯৬৭ খৃ., ১৯৬৯ খৃ., ১৯৭৩ খৃ.)। এই সকল গ্রন্থই পাওয়া যায় বিধায় এখানে শুধুমাত্র মূল গ্রন্থপঞ্জীই দেওয়া হইল। অতিরিক্ত জানিবার জন্য উক্ত তিনটি খণ্ডের নির্ঘণ্ট দ্র.।

E. A. Tansel (E.I.^{2})/ হুমায়ুন খান

কামাল রাঈস كمال رئيس ঃ (মৃ. ৯১৭/১৫১১) ছিলেন সুলতান ২য় বায়াযীদ-এর আমলে (৮৮৬-৯১৮/১৪৮১-১৫১২) নৌবাহিনীর এ্যাডমিরাল এবং স্বনামখ্যাত 'পীরী রাঈস (দ্র.)-এর পিতৃব্য। মূলত কারামান-এর অধিবাসী Gallipoli-এ এক তুর্কী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মাহ্‌মূদ পাশার অধীনে ৮৭৪/১৪৭০ সনে Agriboz অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উক্ত দ্বীপেই বসতি স্থাপন করেন এবং 'azablar aghasi পদে উন্নীত হন। তিনি ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে শত্রুর যুদ্ধ জাহাজ বিতাড়ন তৎপরতার মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ফলে ৯০০/১৪৯৫ সনে ২য় বায়াযীদ তাঁহাকে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পীরী রাঈসকে প্রতিদিন ২০ akcas (তুর্কী মুদ্রা) বেতনে 'উছমানী সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। পরবর্তী বৎসর তিনি আদানা ও তারসুস প্রদেশদ্বয়ের ওয়াক্ফ সম্পত্তি হইতে আরবের পবিত্র স্থানসমূহের জন্য পর্যাপ্ত আয় আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছাইয়া দেন। প্রত্যাবর্তনকালে রোড্‌স (Rhodes) দ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে সেই দ্বীপের নাইট (Knight)-দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন (কামাল পাশা যাদা, তা'রীখ-ই আল-ই. 'উছমান, Ali Emiri viii, Defter নং ৩২, পত্রী ৭৬ ক)। ৯৪০/১৪৯৯ সালে তিনি Inebakhti (Aynabakhti) অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি ও বুরাক' রাঈস নব নির্মিত দুইখানি সুবৃৎ যুদ্ধজাহাজ (Kuke) পরিচালনা করেন। এই নৌ-সমরে উক্ত জাহাজদ্বয় নৌ-সেনাধ্যক্ষ Kucuk দাঊদ পাশার সর্বাধিনায়কত্বে তুর্কী নৌ-বহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নৌযুদ্ধে কামাল রাঈস-এর দায়িত্ব ছিল সমুদ্র পথে ভেনিসীয়গণ কর্তৃক সাহায্য প্রেরণের প্রতিরোধে করা এবং এই উপায়ে রুমেলীর 'beylerbeyi কোজা মুস্‌তাফা পাশাকে সহায়তা করা, যিনি স্থলপথে Inebakhti-র দুর্গ অবরোধে রত ছিলেন। Sapienza দ্বীপের সন্নিকটে ১৯ যু'ল-হিজ্জা, ৯০৪/২৮ জুলাই, ১৪৯৯ তারিখের সামুদ্রিক যুদ্ধকালে ভেনিসীয়গণ ভুলবশত কামাল রাঈ'সকে আক্রমণ করিতেছে মনে করিয়া বুরাক' রা'ঈস-এর জাহাজ আক্রমণ করে, যাহার অন্যতম আরোহী ছিলেন Yenishehir-এর Sanjakbeyi কামাল বে। বুরাক রা'ঈস naptha সহযোগে শত্রু জাহাজগুলিতে অগ্নিসংযোগে সক্ষম হন যদিও তিনি তাঁহার রণতরীসহ ধ্বংস হন। পরে Sapienza দ্বীপের পরিবর্তিত নাম হয় "বুরাক রা'ঈস" দ্বীপ। ইত্যবসরে কামাল রা'ঈস উপকূল ভাগে এমন অবস্থান গ্রহণ করেন যাহাতে ভেনিসীয় নৌ-বহর 'উছমানী বাহিনীর পশ্চাদভাগে সৈন্য নামাইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী মাসে আরও অনেকগুলি অভিযানে তিনি ভেনিসীয় বাহিনীর উপর জয়যুক্ত হন এবং 'উছমানী

বাহিনীর পক্ষে Inebakhti দখল এবং পরে Modon, Koron এবং Navarino অধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সকল যুদ্ধে তাঁহার কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে দ্র. সাফা'ঈ, ফাত্‌হনামা-ই ইনেবাখ্‌তিve Modon, Topkapi Sarayi, K-utuphanesi, Revan 127। তিনি ৯০৬-৭/১৫০১ সালের গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ও মধ্যভাগে শত্রু নৌবহরের তৎপরতা রোধ (Corsair)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং ঐ বৎসর হেমন্তকালে তিনি ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধলব্ধ মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন Catanzaro-এর ডিউক, যাহার মুক্তিপণ হিসাবে পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দাবী করা হয়, দ্র. (১) H. J. Kissling Sultan Bayezid II's Beziehungen zu Markgraf Francesco II, von Gonzaga. in Munchener Universitatsschriften Reihe der Phiosophischen Fakultat, Munich 1965, i; সংশোধিত ইতালীয় অনুবাদের জন্য দ্র. (২) Francesco II, Gonzago ed il Sultano Bayezid II, in Archivio Storico Italiano 1967, I, 34-68; (৩) Kissling, Betrachtungen uber die Flottenpolitik Sultan Bayezids II, 1481-1512 in Saeculum, xx/I, 35-43। সম্ভবত এই সাফল্যের পরেই তাঁহার দৈনিক ভাতা ৫০ akcas-এ বর্ধিত করা হয় (Kissling, Zur Tatigkeit des Kemal Reis im Westmittelmeer, in WZKM, lxii, 1969. 155)। ৯১৭/১৫১১ সনে এক অভিযানে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার জাহাজ বাত্যা-কবলিত হইয়া ডুবিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার দৈনিক ভাতা ছিল এক শত akcas (Topkapi Sarayi Muzesi Arsivi, E 4661)। উছমানী নৌবাহিনীতে দূরপাল্লার কামান প্রবর্তনের জন্য তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ব্যতীত দ্র. (১) Piri Re'is, Kitab-i Bahriyye, ভূমিকা ও সম্পা. Fevzi Kurdoglu Haydar Alpagot, Istanbul 1935, i-viii; (২) J. H. Mordtmann, Zur Lebensgeschichte von Kemal Re'is, in MSOS, Berlin 1929, 39-49; (৩) H. A. v. Burski, kemal Re'is, Ein Beitrag zur Geschichte des turkischen Flotte, Bonn 1928; (৪) H. J. Kissling Kemal Re'is und der Duca di Catanzaro, in Festschrift fur Werner Caskel, Leiden 1968, 202-11; (৫) Ismet Parmaksizoglu, Kemal Re'is, in IA।

Nejat Goyunc (E. I[2])/মুহাম্মদ শওকত আলী

কামাল হযরত শাহ (كمال حضرت شاه) ঃ বিখ্যাত ওলী, দরবেশ। ১৫০৩ খৃ. তিনি আরবদেশের য়ামান অঞ্চল হইতে সর্বপ্রথম পাক-ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর তৎকালীন বঙ্গদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উপস্থিত হইয়া আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে মশ্‌গুল হন। অল্পদিনের মধ্যেই একজন কামিল দরবেশরূপে চতুর্দিকে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার দু'আ'য় স্থানীয় হিন্দু জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণের পুত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্ধাঙ্গ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলে জমিদার কামালপুর, গেদরা প্রভৃতি এলাকা জায়গীরস্বরূপ তাঁহাকে দান করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া করাইবাড়ীর জমিদার তাঁহাকে আসামের গোয়ালপাড়া এলাকার বাকলাই গ্রামও প্রদান করেন। হযরত শাহ কামালের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে এখনও উক্ত স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রতি বৎসর এই স্থানে তাঁহার 'উর্‌স অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ৭৬

কামালু'দ-দীন ইব্‌ন য়ূনুস (كمال الدين بن يونس) ঃ ১১৫৬-১২৪২, জ. মাওসিল (ইরাক), মুসলিম গণিতজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিশ্বকোষবিদ। বাগ্‌দাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে তিনি মাওসিলের একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম কামালিয়া রাখা হয়। তিনি সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কুরআন ও ইব্‌ন সীনার রচনাবলীর উপর ভাষ্য লেখেন এবং ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পাটিগণিত, বীজগণিত, বর্গমূল, জ্যামিতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ৭৬

কামালু'দ-দীন ইব্‌নু'ল-'আদীম (দ্র. ইব্‌নু'ল-'আদীম)

কামালু'দ-দীন ইসমা'ঈল (كمال الدين اسماعيل) ঃ কামাল ইসমা'ঈল-ই ইসফাহানী নামেই বেশী পরিচিত। সালজূক খাওয়ারায্‌মশাহী আমলের একজন পারস্যদেশীয় (ফারসী) কবি। (কথিত) ইরাকী আদর্শের ফারসী কবিতার একজন বিশিষ্ট পারদর্শী কবি। তাঁহার পিতা জামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রায্‌যাকও একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে (আনু. ৫৮৮/১১৯২) পুত্র কামালের বয়স ছিল ২০ বৎসরের নীচে। কিন্তু কামাল ঐ বয়সেই এমন উৎকর্ষসম্পন্ন শোক-গাথা ও স্তুতিকবিতা রচনা করেন যাহাতে তাঁহার পিতার স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকের দরবারে তাঁহার স্থান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হইয়া যায়।

কোনও কোনও বিদ্বজ্জনের মতে কাব্য উৎকর্ষের দিক হইতে তাঁহার পিতার অবস্থান (দ্র. দাওলাত শাহ, সম্পা. F. G. Browne, ১৯০১ খৃ., ১৪১-২-এ বর্ণিত উলুগ বেগের রায়; তু. তা'রীখ-ই হাযীন, বোম্বাই ১৩২২ হি., ৩৬-৮) তাঁহার চেয়ে অনেক উপরে। তবে সে যাহাই হউক, স্তুতিকার হিসাবে তিনি তাঁহার পিতার খ্যাতিকে ম্লান করিয়াছেন।

তাঁহার জীবন সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তিনি তাঁহার নিজ শহর ইসফাহান ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছেন কৃচিৎ। বরং সেখানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার অন্যত্র ছড়াইয়া থাকা পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশে স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন। তবে এই কথাও সত্য যে, তিনি খাওয়ারায্‌ম, রায়্যি, নিশাপুর ও তাবারিস্তান সফর করেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, এই সফরে প্রায় তিন বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। তিনি তাঁহার দীওয়ান-এ তাঁহার প্রতি তাঁহার স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের বিরূপতা, পানিতে ডুবিয়া তাঁহার এক পুত্রের প্রাণহানি, তাঁহার এক ভাইয়ের মৃত্যু, শারীরিক দুর্ভোগ, বিশেষত শুষ্ক খোসপাঁচড়া (জারাব), চক্ষুরোগ ও দাঁতের বেদনা ইত্যাদি সংক্রান্ত খুঁটিনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। কামাল প্রধানত তাঁহার কাজকর্মের বেশীরভাগ সময় নিয়োগ করিয়াছেন ইসফাহানের দুই নেতৃস্থানীয় পরিবারের

নেতৃবৃন্দের প্রশংসায়। এই দুই পরিবারের একটির নেতার নাম ঃ শাফি'ঈ আল-ই খুজান্দ ও অন্যটির নেতার নাম ঃ হানাফী আল-ই সা'ঈদ। অন্যান্য যে পৃষ্ঠপোষকের তিনি স্তুতিবাদ করিয়াছেন তাঁহার কাব্যকর্মে তাঁহাদের মধ্যে আছেন ঃ 'আলা'উদ-দীন তেকিশ (৫৬৮/১১৭২-৫৯৬/১১৯৯) ও সুলতান জালালু'দ-দীন (দ্র.) (৬১৭/১২২০-৬২৮/১২৩০); ইঁহারা উভয়েই খাওয়ারাযমশাহী বংশের। আরও আছেন সালগুরীয় আতাবাক সা'দ ইব্ন যাঙ্গী (আনু. ৫৯৪/১১৯৮-৬২৩/১২২৬) ও তাঁহার পুত্র আবূ বাক্র (৬২৩/১২২৬-৬৫৮/১২৬০); তাবারিস্তানের ইসপাহবাদীয় হুসামু'দ-দাওলা আরদাশীর (মৃ. ৬০২/১২০৫) ও তাঁহার পুত্র শারাফু'ল-মুলূক হাসান (মৃ. ৬০২/১২০৫)। তিনি সুবিখ্যাত সাধক শিহাবু'দ-দীন'উমার-ই সুহ্রাওয়ার্দী (দ্র.)-র (মৃ. ৬৩২/১২৩৪) সম্মানে মরমী গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সুহ্রাওয়ার্দীর মুরীদ হিসাবেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দৃষ্টত তাঁহার সহিত শায়খ সুহ্রাওয়ার্দীর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। তবে সুনিশ্চিতভাবেই তাঁহার সহিত পত্রালাপ ছিল। কেননা শায়খ কর্তৃক তাঁহার নিকট প্রেরিত অন্তত একখানি এই ধরনের পত্রের নমুনা (দ্র. MDAT,14) আজও টিকিয়া আছে। দাওলাত শাহ-এর বিরবণ হইতে জানা যায় যে, কবি কামাল তাঁহার জীবনের শেষদিকে তপস্বী দরবেশের কৃচ্ছ্র জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়া ইসফাহান শহরের বাহিরে এক নিভৃত আলয়ে আশ্রয় নেন। এখানেই হানাদার মঙ্গোলগণ তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। দাওলাত শাহের বিবরণ অনুসারে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে ৬৩৫/১২৩৭-৩৮ সনে, অন্যান্য সূত্রে ঐ ঘটনার সময় ৬২৮/১২৩০-১ ও ৬৩৯/১২৪১-২ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা বাস্তবে সম্ভব নয়।

হাফিজের মত উঁচুদরের কবিও কামালের স্তুতিমূলক কাব্যকর্মের প্রশংসা করিয়াছেন ও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কামালের কবিতা মৌলিক ভাবধারার দিক হইতে অত্যন্ত পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ। কোনও কোনও তাযকিরায় তাঁহাকে 'খাল্লাকু'ল-মা'আনী' এই সম্মানসূচক খেতাবে অভিহিত করা হইয়াছে যাহার উল্লেখ অবশ্য জামী ও দাওলাত শাহের আগে পাওয়া যায় না। এই সম্মানসূচক উল্লেখ হইতে তাঁহার কাব্যকল্পনার উর্বর ঐশ্বর্য ও কবি হিসাবে তাঁহার বিশাল ভাবমূর্তির আভাস পাওয়া যায়। এমনকি আপোসহীন সমালোচক শাম্স-ই কায়স (আল-মু'জাম, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৬০) তাঁহার প্রসংশা করিয়াছেন। কামাল গাযাল, চতুষ্পদী কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা ও অশ্লীল কাব্যকর্ম ইত্যাদিও রচনা করেন। তাঁহার এই সকল কাব্যকর্মের মাঝে সমসাময়িককালের গোলযোগপূর্ণ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তাঁহার জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুর নিকট পত্রের আকারে ফারসীতে লিখিত একটি ক্ষুদ্রায়তন ব্যঙ্গমূলক মাছনাবী ও ধনুক সম্পর্কে লেখা একটি আরবী পুস্তিকাও (রিসালাতু'ল-কাওস) তাঁহার অন্যান্য রচনার অন্তর্গত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাযকিরা সাহিত্যসহ ইরানে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাঁহার সম্পর্কিত রচনাবলীর জন্য দ্র. ঃ (১) এ. খায়্যাম-পুর, ফারহাঙ্গ-ই ভারান-ই ঈরান, তাবরীয ১৩৪০ সৌর, ৪৮৭-৮; (২) কামালু'দ-দীন ইসাম'ঈলের কুল্লিয়াত গ্রন্থটি ১৩০৭ হিজরীতে বোম্বাইতে লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইয়াছে; (৩) দীওয়ান-ই খাল্লাকি'ল-মা'আনী আবু'ল-ফাদল কামালু'দ-দীন ইসমা'ঈল ইসফাহানীর এক নূতন সংস্করণ সম্প্রতি এইচ, বাহ'রু'ল-'উলূম, তেহরান (১৩৪৯ সৌর) প্রকাশ করিয়াছেন। আরও দ্র.: (৪) The Hundred love songs of Kamal Ad-Din of Isfahan, অনু. I Gray ও ইং. কাব্যানুবাদ ঃ Ethel W. Muinford, London 1930; (৫) রিসালাতু'ল-কাওস-এর পূর্ণ পাঠ 'আলা'উদ-দীন 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-বাহা'ঈ রচিত মাফালি' আল-বুদূর (১২৯৯ হি., ২খ, ১৬৭-৭২)-এ প্রদত্ত হইয়াছে; (৬) H. Ritter, in Philologika, vii, no. 20 in Isl., xxi-এ একটি মাছনাবীর উল্লেখ আছে যাহা কবি কামালের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রচনাটি মরমী প্রেম সম্পর্কিত। এই রচনাটির কোনও সন্ধান তাঁহার প্রকাশিত কোনও দীওয়ানে পাওয়া যায় না। আরও তথ্য নির্দেশের জন্য দ্র. ঃ (৭) C. Rieu, Cat of Pers. Ms. in the B. M., ii, 850-51; (৮) H. Ethe, Neupersische Litteratur, in Gr. I. Ph,. ii. 269; (৯) Browne, ii, 540-42; (১০) A. J. Araberry, Classical Persian Literature, 1958, 244-5; (১১) J. Rypka, History of Iranian Literature, Dordrecht 1968, 214,; (১২) ঐ লেখক, in the Cambridge History of Iran, v., 585-6।

A. H. Zarrinkoob (E. I.[2])/ আফতাব হোসেন

কামালু'দ-দীন আল ফারিসী (পারিসী) (كـمـال الدين الفارسى (پارسى)) ঃ আবু'ল হাসান মুহাম্মাদ আল-হাসান, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, দৃষ্টি ও আলোক সংক্রান্ত বিজ্ঞানে পারদর্শী। আলো, দৃষ্টি ও দর্শন শক্তি (نور و رؤيت) সংক্রান্ত প্রশ্ন এককালে দর্শনশাস্ত্রের একটি জরুরী বিষয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে দর্শনশাস্ত্র হইতে পৃথক হওয়ার দরুন ইহা পদার্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য হইতেছে। স্বীকার্য যে, আলো ও দর্শন এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে প্রতিটি যুগে চিন্তাবিদগণ বিশেষ করিয়া গ্রীক যুগ হইতে অদ্যাবধি গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। আলো, রং ও দর্শন শক্তি সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ ইব্ন সীনার গ্রন্থে ('ইলমু'ননাফ্স, তৃতীয় প্রবন্ধ) বর্ণিত হইয়াছে উহার উৎস হইল গ্রীক মতবাদ। মুসলিম মনিষিগণ ঐ সকল বিক্ষিপ্ত বিষয় নূতনভাবে বিন্যস্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যার রূপ দান করিয়াছেন।

ইবনু'ল-হায়ছাম স্বীয় প্রজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে উল্লিখিত বিষয় টলেমীর 'মানাজির' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাতে সেই সকল বিষয়ও সংযোজন করেন, যেই সকল আর্কিমিডিস স্বীয় পুস্তিকা "মহাদ্দাব 'আদসা:" (محدب عدسه)-তে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনু'ল-হায়ছাম স্বয়ং চক্ষু সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিষয়াবলীর সমষ্টি তাঁহার "কিতাবু'ল-মানাজির ওয়া'ল-মারায়া" (كتاب المناظر و المرايا) নামক গ্রন্থে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

উল্লেখ যে, ইবনু'ল-হায়ছামের কাজ কেবল উক্ত বিষয়াদির বিন্যাস সাধন, সংকলন ও একত্রীকরণই ছিল না, বরং তিনি উহাতে প্রতিটি বিষয় নূতন করিয়া অধ্যয়নকরত উহার সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উহার ই'তিবার (اعتبار) নামকরণ করেন। এইভাবে তিনি অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটি প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেন।

আল-বীরূনীর ন্যায় অভিজ্ঞ অঙ্কশাস্ত্রবিদও যিনি পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিতেন; রং, আলো ও দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে গবেষণা করিতেন, তিনি "আছারু'ল বাকিয়া" (آثار الباقية) [ফার্সী অনু. ৩০০] গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ আলো ও আলো বিকিরণ বিষয়দ্বয় সম্পর্কে আমার ও ইব্ন সীনার মধ্যে বেশ কয়েকবার বির্তক

হইয়াছে এবং আমি এই বিতর্কিত বিষয়টি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। নিঃসন্দেহে উক্ত গ্রন্থটি হইল "তাজরীদু'শ-শি'আত ওয়া'ল-আনওয়ার" (تجريد الشعات و الانوار); কিন্তু এই মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পর্কে সুধী সমাজ মোটেই অবহিত ছিলেন না। অথচ উহা সেই সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অন্যতম যাহা ইসলামী যুগে আলোর উপর রচিত হয়। আল-বীরূনী তাঁহার অন্য আর একটি গ্রন্থ "ইফরাদু'ল-মাকাল ফী আমরি'জ-জিলাল" (افراد المقال في امر الظلال) গ্রন্থেও আলো ও দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত আবু'ল-'আব্বাস ঈরানশাহরী (ابو العباس ايرانشهرى) বর্ণিত কয়েকটি অতি জটিল ও মূল্যবান তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন।

পারস্যের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হইলেন কামালু'দ-দীন আল-ফারিসী। তিনি স্বীয় স্বভাবজাত স্পৃহার দরুন যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার "তানকীহু'ল-মানাজির" (تنقيح المناظر) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রথম হইতেই আলো ও দর্শন শক্তি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল এবং তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তা করিতেন যে, পানি ও কাঁচের মধ্যে রক্ষিত বস্তু উহার প্রকৃত রূপ হইতে ভিন্নতর দৃশ্য হইয়া থাকে। তিনি আলোর কোনও প্রতিবিম্ব হইতে উদ্ভূত কোনও কোনও দিক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তবে তিনি জানিতেন না যে, উক্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত এবং উক্ত মতবাদের উৎসই বা কোথায়। অবশেষে তিনি কুতবু'দ-দীন শীরাযীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে ইব্নু'ল-হায়ছামের গ্রন্থ পড়িবার পরামর্শ দেন। কামালু'দ-দীন উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উহার একটি সংক্ষিপ্তসারও প্রস্তুত করিয়া ইব্নু'ল-হায়ছামের বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী স্পষ্ট ভাষায় এবং কোথাও কোথাও আরও প্রয়োজনীয় দলীল প্রমাণসহ বর্ণনা করেন (দ্র. কিতাবু তানকীহি'ল-মানাজির, প্রকাশনা, হায়দরাবাদ, ১খ, পৃ. ৪)।

ইব্ন সীনা আলোর (নূরের) উৎপত্তিকে অস্থায়ী (انى-আনী) মনে করিতেন এবং এই মত পোষণ করিতেন যে, যখনই কোনও বস্তু চোখের জ্যোতির সামনে আসে তখনই উহার অবস্থার মধ্যে এক পরিবর্তন সাধিত হয় যাহাকে উক্ত বস্তুর জ্যোতি ও আলো বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় (আশ-শিফা 'ইলমু'ন-নাফ্স, ৩ প্রবন্ধ, ২ অধ্যায়)। কিন্তু ইব্ন হায়ছাম আলোকে গতিশীল বলিয়া মনে করিতেন। উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানকালে আলোর গতিবেগ প্রমাণও করিয়াছেন। ইব্নু'ল হায়ছাম ধূলিময় এবং অন্ধকার কক্ষে গিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন যে, (সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহ কিংবা দরজাসমূহের ফাঁক দিয়া বাহির হইতে আগত) আলোকরশ্মি একেবারে সোজাভাবে চলে এবং উহার এই গতি সর্বদা একই দিকে ধাবিত হয়।

ইব্নু'ল-হায়ছাম আলো ছাড়া রংয়ের গতি আছে বলিয়া মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ মোটকথা রং সর্বদা আলোর সহিত সংমিশ্রিত ও গতিশীল থাকে এবং যেহেতু যাবতীয় রং সম্পর্কে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে উহা দ্বারা এই তত্ত্বই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণে ধারণা করা হইয়াছে যে, রংয়ের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ইহাই এবং আলোর সহিত যদি গতিশীল হালকা রং দৃশ্যমান না হয় তাহা হইলে উহার কারণ হইবে এই যে, দর্শন ইন্দ্রিয় উহা দেখিতে অক্ষম (দ্র. তানকীহু'ল মানাজির, ১খ, পৃ. ৫-৭)। ইহা ছাড়া আলোর গতি সম্পর্কে (দ্র. ঐ গ্র., ২খ, পৃ. ১৩০) সেখানে তিনি নূরের প্রতিবিম্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "জ্যোতি (অর্থাৎ নূর) দেহাভ্যন্তরে এত দ্রুতগতিতে প্রবেশ করে যে, ইন্দ্রিয় উহা অনুভব করিতে পারে না (অবশ্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা জুপিটার-এর [মুশতারী] নক্ষত্রসমূহের উদয় ও অস্ত দ্বারা উক্ত গতির বেগ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন)।

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দাবী করিয়াছেন যে, আলোই হইল রং এবং আলো ও রং দুইটি পৃথক বস্তু নহে। কিন্তু ইব্নু'ল-হায়ছাম স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, আলো ও রং দুইটি পৃথক বস্তু যাহা একত্র হয় এবং একই সঙ্গে আন্দোলিত হয়।

রং সম্পর্কে ইব্নু'ল-হায়ছাম ও কামালু'দ-দীন (নিজদের গ্রন্থে) যে আলোচনা করিয়াছেন এবং যে মতবাদ উপস্থাপন করিয়াছেন উহা দ্বারা এমন কতক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা চিত্রাংকন শিল্পে ফলপ্রসূ হইয়াছে, যেমন আবছা আলোতে গাঢ় রংও ফ্যাকাশে দেখায়, কিন্তু তীব্র আলোতে উহা চকচকে দেখা যায় (কারাদেভে, দ্র. মুতাফাককিরীন-ই ইসলামী)। অনুরূপভাবে উপরিউক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় গভীর কাঁচ (مقعر) ও স্ফীত কাঁচ (محدب) সম্পর্কে আলোচনা করিয়া নিজেদের যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, উহার ফলে দূর ও নিকটের বস্তু দেখিবার চশমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (দ্র. তানকীহু'ল-মানাজির গ্রন্থের 'মারায়া' অধ্যায়)।

বস্তুত কামালু'দ-দীনের জন্ম না হইলে ইব্নু'ল-হায়ছামের বৈজ্ঞানিক অবদান বিস্মৃত কাহিনী হইয়া থাকিত। এই মনীষীই 'তানকীহু'ল-মানাজির' সংকলন করিয়া স্বীয় ও বৈজ্ঞানিক ইব্নু'ল-হায়ছামের নাম অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

কামালু'দ-দীনের 'তানকীহু'ল-মানাজির', ইব্ন সীনা'র 'কানূন'; আল-বীরূনীর 'কানূন-ই মাস্'উদী' এবং রাযী'র 'আল-হাবী' এমন কয়েকটি গ্রন্থ যেইগুলি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে বিরাট ভূমিকা পালন করিয়াছে। চশমা, দূরবীন ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার এবং আলো ও রংয়ের প্রকৃতি বিষয়ক তথ্যাদি উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের চিন্তাধারার ফসল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহাদের মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। কামালু'দ-দীন ৭২০/১৩২০ সনে ইনতিকাল করেন (দ্র. কারাদেবু., মুতাফাক্কিরীন-ই ইসলামী)।

পাণ্ডুলিপি আকারে কামালু'দ-দীনের আরও কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যথা ঃ (১) তাযকিরাতু'ল-আহবাব, কোপরুলু লাইব্রেরী, তুর্কী, বাগদাদ লাইব্রেরীতে কপি, হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ৪৭১; (২) 'আবদু'ল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাদ্দাম রচিত গণিত বিষয়ক গ্রন্থ ঃ ফাওয়া'ইদু'ল-বাহা'ইয়্যা গ্রন্থের শারহ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ); (৩) কিতাবু'ল-বাসা'ইর ফী 'ইল্মি'ল-মানাজির, দর্শনশক্তি সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ (দ্র. M. Krause Stambuler Handschriften 509)। উপরিউক্ত গ্রন্থ কয়টি সম্পর্কে আর কোনও বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, 2 ঃ 273 and Suppl. II., 295; (২) এফ. এম. শুজা', Cause of Reflection according to Kamal Din Abi A. Hasan al Hasan al Farsi, in Proceedings of the third Session of Idara Ma'arifa, heldot Delhi (লাহোর ১৯৪২ খৃ.) পৃ. ৫৭-৬৮; (৩) E. I.², 4/515।

আকবার দানা সিরাশত (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

কামালু'দ-দীন শের'আলী (দ্র. বানানাঙ্গ)

কামিল (দ্র. 'আরূদ)

আল-কামিল (আল-মালিক) (الكامل الملك) ঃ দুইজন আয়্যূবী সুলতানের উপাধি।

(১) আল-মালিকু'ল-কামিল ঃ নাসিরু'দ-দীন আবু'ল-মা'আলী মুহাম্মাদ, আল-'আদিল (দ্র.) আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আয়্যূবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জন্ম ৫৭৩/১১৭৭ অথবা ৫৭৬/১১৮০ সনে। তিনি ৫৯৫/১১৯৯ সনে দামিশ্‌ক গিয়া আল-'আদিলকে আল-আফদাল ইব্‌ন সালাহু'দ-দীন-এর বিপক্ষে সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য জাযীরা ত্যাগ করেন। সেইখানে তিনি তাঁহার পিতার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন (৫৮৭/১১৯১সন হইতে) আরম্ভ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তির পরাজয়ের পরে পিতা পুত্র মিসর অভিমুখে যাত্রা করেন; ২২ রামাদান, ৫৯৬/৬ জুলাই, ১২০০ সনে কায়রো পৌঁছেন। আল-আদিলকে মিসর ও সিরিয়ার সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ৬০৪/১২০৭ সনে খলীফা কর্তৃক আনুষ্ঠানিক অভিষেকের পরে আল-'আদিল তাঁহার পুত্রদের মধ্যে (আল-'আদিল দ্র.) প্রদেশগুলি বণ্টন করিয়া দেন; আল-কামিলকে তাঁহার পিতার রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত মিসরের রাজ প্রতিনিধি হিসাবে থাকিতে হইয়াছিল। ৬০৪/১২০৭ সনে তিনি নবনির্মিত কাল'আতু'ল-জাবাল-এ তাঁহার বাসভবন স্থানান্তরিত করিলেন।

সফর ৬১৫/মে ১২১৮-তে ফরাসীরা দিময়াত (দ্র.)-এ অবতরণ করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে মিসর আক্রমণ করে [৫ম ক্রুসেডসমূহ)] বন্দরের প্রধান দুর্গ-বুর্জ-আস্-সালসালা (শৃঙ্খলা-কেল্লা) তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আল-কামিল ব্যর্থ হন। এই সংবাদ পাইবার অল্প পরেই আল-'আদিল দামিশক-এর নিকট তাঁহার তাঁবুতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। (শুক্রবার ৭ জুমাদা-২, ৬১৫/৩১ আগস্ট, ১২১৮) এবং আল-কামিল মিসরের সুলতান ও আয়্যূবী রাজ্যের সর্বপ্রধান হইলেন। ২৫ শা'বান, ৬১৫/৫ নভেম্বর, ১২১৯ সনে ফরাসীরা দিময়াত নগর সম্পূর্ণভাবে দখল করে। ১২২১ খৃ. আগস্ট মাসে আল-আশরাফ (দ্র.), আল-মু'আজজাম (দ্র.) এবং অন্যান্য আয়্যূবী শাহযাদা তাঁহাদের ভ্রাতা আল-কামিল-এর দাবী অনুসারে তাঁহাদের যৌথ সৈন্যদল লইয়া না পৌঁছান পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আল-কামিল দিময়্যাত-এর দক্ষিণে অবস্থিত মানসূরা নামক তাঁহার নূতন শিবির হইতে ফরাসীদিগকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফরাসীরা অপূরণীয় সময় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা কায়রোর দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করিতে (৭ রাজাব, ৬১৮/২৭ আগস্ট, ১২২১) এবং মিসর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে ৫ম ক্রুসেড যুদ্ধের এক লজ্জাকর পরিসমাপ্তি ঘটে।

আল-কামিলের রাজত্বকালের দ্বিতীয়াংশ আয়্যূবী ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে নেতৃত্ব লাভের সংগ্রামের জন্য উল্লেখযোগ্য আল-কামিল ছিলেন দামিশক-এর আল-মু'আজজাম-এর বিপক্ষে (১২২১-১২২৭) এবং শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-আশরাফ-এর বিপক্ষে ১২২৭-৩৭। ৬১৯/১২২২ সনের দিকে আল-আশরাফ কায়রোতে তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারা আল-মু'আজজামের বিপক্ষে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে একমত হইলেন। শেষ পর্যন্ত আল-মু'আজজাম দুইটি পৃথক বিতর্কিত ব্যাপারে [হামাত-এর উত্তরাধিকার লাভ, ৬১৯/১২২২; আখলাত দখল (দ্র.)] হাটিয়া যাইতে বাধ্য হন। আল-মু'আজজাম এবং খাওয়ারাযম- শাহ্ জালালু'দ-দীন (দ্র.)-এর মধ্যে ৬২২/১২২৫ সনে সম্পাদিত এক চুক্তি প্রতিযোগী শক্তিসমূহের শক্তি সাম্যের উপর আঘাত হানে এবং আল-আশরাফ তাঁহার ভ্রাতার সহিত আপোস করিতে বাধ্য হন। তিনি শাওয়াল ৬২৩/ সেপ্টেম্বর ১২২৬-এ আল-মু'আজজাম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে এবং হিম্‌স ও হামাত-এর উপর তাঁহার অধিকার দাবী ত্যাগ করিতে দামিশ্‌ক গমন করিলেন; জুমাদা-২, ৬২৪/ মে-জুন ১২২৭ পর্যন্ত তাঁহাকে সেখানে প্রকৃত বন্দীরূপে থাকিতে বাধ্য করা হয়। আয়্যূবী রাজত্ব দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবার উপক্রম হয়; এমন সময় আল-মু'আজজাম-এর মৃত্যু (শুক্রবার, ১ যু'ল-হিজ্জা, ৬২৪/১২ নভেম্বর, ১২২৭) পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। তাঁহার একুশ বৎসরের যুবক পুত্র আল-মালিকু'ন-নাসির দাউদ (দ্র.) তৎক্ষণাৎ আল-কামিল-এর নিকট তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মসমর্পণ করেন।

সেই বৎসরই ৬২৪/১২২৭ সনে একটি নূতন ক্রুসেডের গুজব কায়রোতে পৌঁছায়। খুব সম্ভব অবস্থা হতাশাজনক মনে করিয়া দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে সালাহু'দ-দীন কর্তৃক বিজিত স্থানসমূহ প্রত্যাবর্তন করিবার শর্তে আল-কামিল তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সম্মত হইয়া ১২২৮ সনের সেপ্টেম্বর Acre পৌঁছিলেন। অনেক দর কষাকষির পর ১২২৯ সনের ১১ ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত চুক্তি সম্পাদিত হয়। জেরুসালেম ফ্রাঙ্কদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়।

ভ্রাতুষ্পুত্র আন-নাসির-এর সহিত আল-কামিল-এর আন্তরিক সম্পর্ক স্থায়ী হয় নাই। তেল আল-'আজুল (গাজ্জার নিকট) -এ আল-আশরাফ-এর সহিত এক সাক্ষাৎকারে নাসির দামিশ্‌ক-এর কর্তৃত্ব আল-আশরাফকে ছাড়িয়া দিবেন। এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন; ৬২৫/১২২৮ সনের শেষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। দুই ভ্রাতা তখন সিরিয়ার রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। অল্পক্ষণ অবরোধের পরে নাসির আত্মসমর্পণ করেন। (২১ রাজাব, ৬২৮/ ১৫ জুন, ১২২৯); উহার পরিবর্তে তাঁহাকে আল-কারক ও আল-শাব্‌বাক-এর দুর্গ লইতে হইল। আল-আশরাফকে দামিশ্‌ক হস্তান্তরিত করা হইল; আল-কামিল রাজ্যের সর্বপ্রধান হিসাবে স্বীকৃত হইলেন। কামিল-এর পক্ষাবলম্বী শাহ্‌যাদাগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে অভিষিক্ত করা হইল এবং জাযীরাতে আল-আশরাফ-এর অধিকৃত স্থানসমূহ দখল করিয়া লওয়া হইল। এইরূপে আল-কামিল-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল।

জাযীরায় দীর্ঘ পরিদর্শনের পর আল-কামিল রাজাব ৬২৭/মে ১২৩০-এ মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু মাত্র দুই বৎসর পরেই পরিস্থিতির চাপে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। সমবেত আয়্যূবী যুবরাজবর্গকে এক প্রতীক্ষিত মঙ্গোল আক্রমণের বিপক্ষে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সালামিয়ায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু কোন আক্রমণ না হওয়ায় তিনি আমিদ-এর কুখ্যাত আরতুকীয় শাসনকর্তা আল-মাস'ঊদ রুকনু'দ-দীন মাওদূদ (যু'ল-হিজ্জা ৬২৯/অক্টোবর ১২৩২)-কে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আরতুকীদ শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া কায়রোতে পাঠানো হইল। ইহার পরেই আমিদ-এর আমীর হীসন কায়ফা নামক অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ শর্তাধীনে সমর্পণ করে এবং উহা কামিল-এর পুত্র নাজমু'দ-দীন আয়্যূবকে প্রদান করা হয়। তিনি ৬৩৪/১২৩৬ সনে আমিদও দখল করিয়া লইলেন। এমনকি জাযীরাতেও আল-কামিল

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সার্বভৌম নৃপতি হইলেন। সুতরাং অন্যান্য আয়্যূবী যুবরাজ তাঁহার আক্রমণ আশঙ্কা করিতে বাধ্য হইলেন।

আল-কামিল জুমাদা-১ ৬৩০/ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১২৩৩-এর দিকে কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু আবারও তাঁহার অবস্থান সংক্ষিপ্ত হইল। রূম-এর সুলতান কায়কোবাদ (দ্র.) কর্তৃক আখলাত অবরোধ (৬২৯/১২৩২-এর শেষে) তাঁহাকে এশিয়া মাইনরে সামগ্রিকভাবে সালজূকদের উপর আক্রমণ চালাইতে প্রবৃত্ত করিল। সম্ভবত তাঁহার পরিকল্পনা ছিল সালজূকদের বহিষ্কারের পরে আয়্যূবী যুবরাজদেরকে সিরিয়া হইতে এশিয়া মাইনরে স্থানান্তরিত করা এবং মিসরের ন্যায় সিরিয়াকে একক রাষ্ট্র হিসাবে শাসন করা। রামাদান ৬৩৪/জুন ১২৩৪-এ সালামিয়্যা অভিযান আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহা ব্যর্থ হইল। আয়্যূবী যুবরাজদের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা আল-কামিলকে তাঁহার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল; যু'ল-কা'দা ৬৩১/ আগস্ট ১২৩৪ সনে তিনি কায়রোয় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে ব্যস্ততার সহিত আল-আশরাফ-এর সহযোগিতায় কায়কোবাদ-এর পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল। আল-আশরাফ-এর সহিত দামিশ্ক-এ দীর্ঘ অবস্থানের পরে আল-কামিল মুহাররাম বা সফর ৬৩৪/ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১২৩৬ সনে কায়রোতে ফিরিয়া আসিলেন।

আলেপ্পোর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে আল-কামিল এবং আল-আশরাফ-এর মধ্যে একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইল। আল-কামিল-এর বিপক্ষে আল-আশরাফ-এর নেতৃত্বে অন্যান্য শক্তির একটি ঐক্যজোট গড়িয়া ওঠে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে। এমন সময় আল-আশরাফ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কয়েক মাস পরে তিনি ইনতিকাল করেন (৪ মুহাররাম, ৬৩৫/২৭ আগস্ট, ১২৩৭)। আল-কামিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রুর তিরোধানের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আন-নাসিরকে দামিশ্ক নগর প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত দামিশ্ক-এর বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দুই মাসের অবরোধের পর দামিশক আত্মসমর্পণ করে (১৯ জুমাদা-১, ৬৩৫/৫ জানুয়ারী, ১২৩৮)। আল-কামিল-এর বিপক্ষে মৈত্রীজোট ভাঙিয়া গেল। যাহা হউক আল-কামিল তাঁহার বিজয়ের ফল উপভোগ করিবার পূর্বে (আলেপ্পো দখল এবং আন-নাসিরকে দামিশক-এর সিংহাসনে অভিষিক্ত করা) হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি ২১ রাজাব, ৬৩৫/৬ মার্চ, ১২৩৮ বুধবারে ইনতিকাল করেন এবং দামিশক-এর দুর্গমধ্যে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. L. Gottschalk, Al-Malik al-Kamil von Egypten und seine Zeit, Wiesbaden ১৯৫৮ খৃ., উহাতে সমস্ত উৎস বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) আল-মালিক আল-কামিল ঃ নাসিরু'দ-দীন আবু'ল-মা'আলি মুহাম্মাদ ইব্ন আল-মুজাফফার শিহাবু'দ-দীন গাযী ইব্ন আল-'আদিল মুহাম্মাদ (দ্র.) ইব্ন আয়্যূব হইলেন মায়্যাফারিকীন (দ্র.)-এর পূর্ববর্তী সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র। ৬৪৫/১২৪৭ সনে তিনি তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হন এবং মঙ্গোলদের সাথে আপোসের বৃথা চেষ্টা করেন। মঙ্গোলরা ইতোপূর্বেই ৬৪২/১২৪৪ সনে মায়্যাফারিকীন অবরোধ করিয়াছিল এবং ৬৪৫/ ১২৪৭ সালে উহা পুনরায় আক্রমণ করিল। ইহার পর আল-কামিল মঙ্গোলদের বিপক্ষে মিলিতভাবে যুদ্ধ চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আলেপ্পো এবং দামিশক-এর আয়্যূবী সুলতান আল-মালিকু'ন-নাসির (দ্র.) সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। কারণ আন-নাসির আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দূত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'ইয্যু'দ-দীন ইব্ন শাদ্দাদ (দ্র.) [তু. H. F. Amedroz, Three Arabic Mss. on the history of Mayyafariqin, in JRAS (১৯০২খৃ.) ৭৮৫-৮১২]-কে প্রেরণ করিয়া তিনি মঙ্গোলদিগকে শান্ত করিতে পরিবেন। আল-কামিল ও স্থানীয় অধিবাসীদের সাহসিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও মঙ্গোলরা তাশ্মুত ইব্ন হুলাগূ-র নেতৃত্বে যু'ল-কা'দা ৬৫৬/অক্টোবর-নভেম্বর ১২৫৮ সনে মায়্যাফারিকীন-এ তৃতীয়বার অবরোধ আরম্ভ করিল এবং ৬৫৮/১২৬০ সনে শহরটি দখল করিয়া লইল। আল-কামিল ও তাঁহার ভ্রাতা আল-আশরাফকে হূলাগূ (দ্র.)-র সম্মুখে আনা হইল এবং সে নিজেই তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিল। কথিত আছে যে, আল-কামিল-এর মস্তক আল-জাযীরা ও সিরিয়ার কয়েকটি শহরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত দামিশ্ক-এর বাবু'ল-ফারাদীস-এর উপর ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। মুসলমানরা ঐ নগর জয় করিবার পরে মস্তকটি আল-হুসায়ন-এর মাশহাদ-এ দাফন করা হয়।

(৩) আল-কামিল [দ্র. শা'বান]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'ইয্যু'দ-দীন ইব্ন শাদ্দাদ, আল-আ'লাকু'ল-খাতীরা, ৩য় খণ্ড, Bodleian Lib., Ms. Marsh 333, fol. 111 ff., Ms. Berl. 9800, fol. 72 ff; (২) আল-য়ূনানী, হায়দরাবাদ, ১খ, ৩৫৯, ৪৩০; ২খ, ৭৫; (৩) আবূ শামা, যায়ল, কায়রো, ২০৫; (৪) আল-মাক্রীযী, সুলূক, কায়রো, ৪৪১; (৫) M. Van Berchem, Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekr, in Abh. G. W. Gott., Phil.-hist. Kl. N. F. IX, 3. 16-17. n. I; (৬) Spuler, Mongolen.

H. L. Gottschalk (E. I.[2])/ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

কামিল মুসতাফা (দ্র. মুসতাফা কামিল)

কামূনিয়া (দ্র. আল-কায়রাওয়ান)

কামূস (قاموس) (আ), অভিধান।

(১) আরবী অভিধান ঃ কামূস/কাওমাস শব্দটি "সমুদ্রতলা ও সমুদ্রের গভীরতম অংশ" অর্থে নবী (সা)-এর যুগের শেষের দিকে গ্রীক শব্দ Okheonos হইতে আরবী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। তবুও টলেমীকে অনুসরণ করিয়া আরব ভৌগোলিকগণ শব্দটিকে 'উকিয়ানূস'-রূপে পুনরায় ধার করেন এবং "ভূভাগকে বেষ্টনকারী বিশাল জলরাশি" অর্থে উহাকে ব্যবহার করেন। তাঁহারা আটলান্টিক মহাসাগরকে বিশেষভাবে "উকিয়ানূস'ল-মুহীত" এবং পরে সাধারণভাবে "আল-কামূসু'ল" নামে অভিহিত করেন। যেহেতু ফীরূযাবাদী শেষোক্ত পরিভাষাটিকে রূপক অর্থে তাঁহার বৃহৎ অভিধানের শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করেন, সেইহেতু পরবর্তীকালে 'কামূস' অভিধান অর্থবোধক নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয়, তবু এখনও উহা ব্যাপকতর কিছুটা অর্থ বহন করে, কিন্তু 'মুজাম' (অভিধান) অনুরূপ নহে। তবে এই পার্থক্য সর্বজনীন বা চূড়ান্ত নহে। সম্প্রতি 'মুজাম' ও 'কামূস' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন আরবীতে এমন কোনও নির্দিষ্ট শব্দে ছিল না যাহা এককভাবে অভিধানের পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে। অভিধান শ্রেণীর প্রতিটি গ্রন্থ স্বতন্ত্র শিরোনাম বহন করিত। এই শিরোনামগুলির অনেকগুলি 'ইলমু'ল লুগা বা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করিত

এবং অভিধানশাস্ত্রকে 'ইল্‌মু'ল-লুগা বা ভাষা-বিজ্ঞান বলা হইত। অনেক সময় 'ফিলোলজি' বা ভাষা বিজ্ঞানের সহিত উহার বিভ্রান্তি ঘটে। সম্প্রতি ভাষা বিজ্ঞানকে 'ফিক্‌হু'ল-লুগা বলা হয়। উহা এমন একটি শব্দ সমষ্টি যাহা মধ্যযুগে ইব্‌ন ফারিস কর্তৃক তাঁহার প্রখ্যাত সাহিবী' গ্রন্থের শিরোনামে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি নূতন শব্দ 'মু'জামিয়্যাত' প্রচলিত হইতে চলিয়াছে।

ফারসী ভাষায় অভিধানের সাধারণ পরিভাষা ছিল 'ফরহাঙ্গ'। তবে আরবী ও তুর্কী ভাষার মতো ফরসী ভাষাতেও শিরোনামে বহু শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয়।

বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসারে মধ্যযুগীয় অভিধানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। এমন অভিধান যাহাতে সর্বপ্রকার বিন্যাসসহ একই শিরোনামের অধীনে কতিপয় মূল শব্দকে এলোমেলোভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং দ্বিবর্ণাত্মক এবং ততোধিক বর্ণবিশিষ্ট শব্দগুলিকে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই ধরনের প্রায় সকল অভিধানেই কণ্ঠবর্ণ দ্বারা সূচিত ধ্বনি বিষয়ক নীতির ভিত্তিতে বর্ণ-বিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত বর্ণ-বিন্যাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম আল-খালীল (দ্র.) ব্যবহার করেন।

২। এমন অভিধান যাহাতে অন্ত্যমিল অনুযায়ী মূল শব্দ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ মূল শব্দগুলিকে প্রথমত শেষ বর্ণের অধীনে, পরে প্রথম বর্ণ এবং যে কোনও মধ্যবর্ণের অধীনে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই কাঠোমোর আওতায় সাধারণ বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। জাওহারীর সাহাহ এই নিয়মে রচিত সর্বপ্রথম বৃহৎ গ্রন্থ। এই পদ্ধতি সাধারণ অভিযানে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপীয়দের প্রভাবে কেহ উহার তীব্র সমালোচনা করেন নাই।

৩। এমন অভিধান যাহাতে মূল শব্দগুলি কমবেশী য়ুরোপীয় নিয়মে বিন্যস্ত। প্রাচীনতম উদাহরণ আবূ 'আম্‌র আশ-শায়বানীর 'কিতাবু'ল-জীম'। ইহাতে একই মূল অক্ষরে গঠিত সকল শব্দ এক অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু অধ্যায়ের ভিতরে শব্দ সাজাইবার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা হয় নাই। ইহাকে "কূফী পদ্ধতি" (Kufan Method) নামে অভিহিত করা হইয়াছে (J. A. Haywood, Arabic Lexicography)। আধুনিক বিন্যাস-পদ্ধতি অন্তত ইব্‌ন ফারিস হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, বিশিষ্ট অভিধানসমূহের ইহা বেশ সমাদর লাভ করে। যেমন কুরআন ও হাদীছ সম্বন্ধীয় অভিধান যামাখশারীর আসাসু'ল-বালাগা' এই পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

নিম্নলিখিত অভিধানগুলি মধ্যযুগীয় অভিধানসমূহের প্রধান: অভিধানগুলিকে মোটামুটি কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে (শিরোনামের পর বন্ধনীস্থ সংখ্যাটি নির্দেশ করে। উপরে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের কোন্‌টি অনুযায়ী বর্ণ বিন্যাস করা হইয়াছে)।

২য়/৮ম শতাব্দী ঃ আল-খালীল ইব্‌ন আহমাদের কিতাবু'ল-'আয়ন ফি'ল-লুগা (প্রা.১) অভিধানখানি অন্তত তিনটি পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান। Pere Anastase Marie de Saint Elie ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৪৪ পৃষ্ঠার পর এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখিতে অসমর্থ হন এবং প্রায় সমস্ত মুদ্রিত কপি বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'আবদুল্লাহ্‌ দারবীশ একটি নূতন সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত করেন এবং ইহা ১৩৮৬/১৯৬৭ সালে বাগদাদে প্রকাশিত হয় (বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রসহ)। আবূ 'আমর আশ-শায়বানীর কিতাবু'ল-জীম ফি'ল-লুগা ; (প্রা.৩) শুধু পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (মাদ্‌রীদ, এস্কোরিয়াল, নং ৫৭২)।

৩য়/৯ম শতাব্দী ঃ ইব্‌ন দুরায়দ-এর আল-জামহারা ফি'ল-লুগা (প্রা. ১) এই অভিধানে উচ্চারণভিত্তিক এবং বর্ণানুক্রমিক বর্ণ-বিন্যাসের সমন্বয় ঘটিয়াছে। হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) সংস্করণ (১৩৪৪ হি.)-এ আধুনিক কায়দায় বিষয়বস্তুর একটি প্রয়োজনীয় সূচিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

৪থ/১০ম শতাব্দী ঃ (ক) আস-সাহিব ইব্‌ন 'আব্বাদ-এর আল-মুহীত ফি'ল-লুগা ঃ (১), একমাত্র পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে (ইরাকের জাতীয় যাদুঘরে)। (খ) আবূ মানসূর আল-আযহারী, কিতাবু'ত-তাহযীব ফি'ল-লুগা (প্রা.১), কায়রো ১৯৬৪ খৃ.। (গ) আল-জাওহারীর আস-সাহাহ (বা সিহাহ) (প্রা. ২), কায়রো ১৯৫৬ খৃ. এবং বূলাক সন অজ্ঞাত। (ঘ) ইব্‌ন ফারিস-এর মাকায়িসু'ল-লুগা (প্রা. ৩) কায়রো ১৩৬৬-৭১ হি.। একই আল-মু'জাম লেখকের ফি'ল-লুগা (প্রা.৩), ১খ, (সকলই প্রকাশিত) কায়রো ১৯৫৮ খৃ.।

৫ম/১১শ শতাব্দী ঃ ইব্‌ন সীদা/সীদুহ-এর আল মুহকাম ওয়া'ল-মুহীতু'ল-আ'জাম ফি'ল-লুগা (প্রা. ১); কায়রো ১৯৫৮খৃ., এই গ্রন্থ স্পেনে সংকলিত হয়।

৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী ঃ আয-যামাখশারীর আসাসু'ল-বালাগা (প্রা.৩) কায়রো ১৯৫৩ খৃ.। ইহা বিশেষভাবে অলংকারযুক্ত ভাষা সম্বন্ধীয়।

৭ম/১৩শ শতাব্দী ঃ ইব্‌ন মুকাররাম অথবা ইব্‌ন মানজূর-এর লিসানু'ল-আরাব (প্রা. ২), বূলাক ১৩০০-৮ হি., বৈরূত ১৯৫৫-৬খৃ.। ইহা এখনও একটি সর্বাধিক পরিচিত বৃহৎ অভিধান।

৮ম/১৪শ শতাব্দী ঃ আল-ফীরূযাবাদীর আল-কামূসু'ল-মুহীত (প্রা. ২)। ইহা বহন করা যায় এমন একখানা প্রামাণিক অভিধান। ইহাতে অল্প পরিসরে সংক্ষেপে বহু শব্দ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং সমর্থক উদাহরণসমূহ বর্জন করা হইয়াছে। অভিধানখানি ৪ খণ্ডে বহুবার মুদ্রিত হয়। উহার অধিকাংশ মুদ্রণই কায়রোতে হয়।

১২শ/ ১৮শ শতাব্দী ঃ মুরতাদা আয-যাবীদী-র তাজু'ল-'আরূস মিন জাওয়াহিরি'ল-কামূস (প্রা. ২), বূলাক ১৩০৬-৭ হি., কুয়েত ১৯৬৫ খৃ.। ইহা পুরাপুরি মধ্যযুগীয় না হইলেও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা লিসানু'ল-'আরাব-এর ন্যায় কামূসের একটি বর্ধিত সংস্করণ।

সম্প্রতি আরবগণ কর্তৃক আধুনিক অভিধান বিন্যাস পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে। বুত্‌রুসু'ল-বুসতানী তাঁহার দুই খণ্ড-বিশিষ্ট অভিধান মুহীতু'ল-মুহীত, বৈরূত ১৮৬৭-৭০ খৃ., গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন। মূলত ইহা কামূসের পুনর্বিন্যাস মাত্র। তাজু'ল-'আরূস-এর পর হইতে আরব জাহানে বৃহদাকৃতির অভিধান আর প্রকাশিত হয় নাই। সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিধান হইল লুইস মা'লূফের 'আল-মুনজিদ' যাহা একই খণ্ডে সমাপ্ত। বৈরূত হইতে প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ খৃ. এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫ খৃ. প্রকাশিত।

বর্তমান শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আরব জাহানে দ্বিভাষিক অভিধান দুষ্প্রাপ্য ছিল। কাশগারীর 'দীওয়ানু'ল-লুগাতি'ত-তুরক' (৫ম/১১শ শতাব্দী) গ্রন্থে আরবী ভাষায় তুর্কী শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যামাখশারীর

মুকাদ্দিমাতু'ল-আদাব (Samachtnerii Lexicon Arabicum Persicum, সম্পা. J. G. Wetzstein, Leipzig 1843-50) গ্রন্থে ফার্সীতে আরবী শব্দের অর্থ দেখানো হইয়াছে। তবে উহার বিন্যাস পদ্ধতি সুবিধাজনক নহে। রেনেসাঁ যুগ হইতে প্রকাশিত দ্বিভাষিক আরবী অভিধানগুলির পূর্ণ তালিকা দিতে অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইবে। নিম্নবর্ণিত অভিধানগুলি শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার অভিধান। বহু ভাষায় লিখিত অভিধানগুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

আরবী সূত্রসহ য়া'কূব গোলিয়াস-এর Lexicon Arabico-Latinum একটি অপূর্ব অভিধান ছিল। একই শিরোনামে G. W. Freytag-এর বৃহৎ অভিধান (Halle ১৮৩০-৭ খৃ.) প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইহাতে ল্যাটিন আরবী সূচিপত্র ছিল। উভয় অভিধানই কামূস-এর উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক কায়দায় পুনর্বিন্যস্ত। A. de Biberstein Kazimirski-এর Dictionnaire arabe-francais, প্যারিস ১৮৬০ খৃ. অভিধানখানিতে আঞ্চলিক ভাষার প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা এখনও অত্যন্ত উপকারী অভিধান; কারণ ইহা Pere J. B. Belot-এর Vocabulaire arabe francais অপেক্ষা অধিক সম্পূর্ণ, যদিও শেষোক্তটি ১৮৮৩ খৃ. হইতে জনপ্রিয় অভিধান হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছিল। এডওয়ার্ড উইলিয়ামলন-এর Arabic-English Lexicon (লন্ডন ১৮৬৩-৮৭, খৃ. পুনঃমুদ্রণ ১৯৫৫-৭ খৃ.) অভিধান যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। প্রকাশনার ক্ষেত্রে দুইটি নতুন অভিধান সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর এই সমস্ত রচনাবলীকে অতিক্রম করিয়াছে— প্রথমটি হইল Worterbuch der klassischen arabischen Sprache। এই অভিধানখানি Deutsche Morgenlandische Gesellschaft কর্তৃক প্রণীত এবং Wiesbaden-এ ১৯৫৭ খৃ. নাগাদ প্রকাশিত হয় [বর্তমান সম্পাদক (১৯৭৪ খৃ.) হইলেন M. Ullmann], সংজ্ঞাগুলি জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় দেওয়া হয়। ইহার গুরুত্ব কাফ (ك) বর্ণে অথচ Lane-এর অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করা আশু প্রয়োজন বলিয়া Lane-এর অভিধানটি কেবল খসড়া হিসাবে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়টি হইল Blachere, Chouemi এবং Denizeau কর্তৃক সম্পাদিত Dictionaire Arabe-Francais-Anglais যাহা প্যারিসে ১৯৬১ খৃ. হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক– উভয় ভাষাই স্থান পাইয়াছে।

R. Dozy-এর দুই খণ্ডবিশিষ্ট Supplement aux dictionnaires arabes, 2 Vols. (Leiden 1881, Paris 1927) আরব, স্পেন ও মাগরিবে ব্যবহৃত শব্দসমূহ এবং বিলম্বিত প্রাচীন শব্দসমূহের জন্য একখানি অমূল্য গ্রন্থ। Hans Wehr-এর Arabisches Worterbuch fur die Schriftsprache der Gegenwart আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক আরবী বুঝিতে সহায়তা করে। অভিধান-খানি Leipzig-এ ১৯৫২ খৃ. এবং উহার পরিশিষ্ট ১৯৫৮ খৃ. Wiesbaden-এ প্রকাশিত হয়। উহার ইংরেজী সংস্করণ A. dictionary of modern written Arabic জে মিলটন কাওয়ান কর্তৃক ১৯৬১ খৃ. Wiesbaden হইতে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা য়ুরোপীয় ভাষাসমূহ হইতে আরবীতে অনূদিত অভিধানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ব্যাপক কোনও কাজ হয় নাই। Ellious Bochtor-এর Dictionaire francais-arabe, যাহা তৃতীয় সংস্করণে সংশোধিত এবং বর্ধিত আকারে Caussin de Perceval কর্তৃক ১৮৬৪ খৃ. প্যারিসে প্রকাশিত হইয়াছিল, কার্যত উহা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। Belot-এর Vocabulaire francais-arabe ১৮৮৯ খৃ. হইতে বহুবার সংশোধিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও উহা অসম্পূর্ণ। G. P. Badger-এর English-Arabic Dictionary (লন্ডন ১৯১৩ খৃ.) একখানি উল্লেখযোগ্য অভিধান। কিন্তু বিলম্বগত Elias. A. Elias-এর Modern Dictionary English-Arabic (কায়রো ১৯১৩ খৃ.) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুনীর বা'ল-বাক্কীর বহু বিজ্ঞান এবং হস্তশিল্প সংক্রান্ত শব্দসংবলিত অভিধান আল-মাওরিদ (বৈরূত ১৯৬৯ খৃ.) অপেক্ষাকৃত পূর্ণ এবং আধুনিক অভিধান। কিন্তু আরবী সংজ্ঞাগুলিতে কতিপয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; যেমন—ভগ্ন বহুবচন (جمع مكسر) যাহা য়ুরোপীয় আরবী ভাষাবিদগণের অতি প্রয়োজনীয়। Baranov-এর Russian-Arabic Dictionary (মস্কো ১৯৬৪ খৃ.)-ও একটি প্রয়োজনীয় অভিধান। অন্যদিকে Gotz Schregle-এর Deutsch-Arabisches Worterbuch (ওয়াইজবাডেন ১৯৬৩ খৃ. বর্তমানে প্রকাশনাধীন)-ও খুব উপকারী অভিধান। বৈরূতে দুইখানা ফরাসী-আরবী অভিধান প্রকাশিত হয়। প্রথমটি জাব্বূর 'আবদু'ন-নূর ও সুহায়ল ইদরীস রচিত আল-মানহাল (১৯৭০) ও দ্বিতীয়টি মুনজিদ (১৯৭২ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিম্নবর্ণিত সাধারণ গ্রন্থগুলিতে গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে ঃ (১) R. Dozy, Supplement, v-xxix; (২) আহমাদ 'আবদু'ল-গাফূর 'আত্তার, আস-সাহাহ ওয়া মাদারিসু'ল-মু'জামাতি'ল-'আরবিয়্যা, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.; (৩) এ. দারবীশ, আল-মা'আজিমু'ল-'আরবিয়্যা, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.; (৪) J. A. Haywood, Arabic lexicography—its history and its place in the general history of lexicography, Leiden 1959; (৫) সিদ্দীক হাসান খান, আল-বুলাগা ফী উসূলি'ল-লুগা, ইহাতে মধ্যযুগীয় প্রধান আরবী অভিধানগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে, ইস্তাম্বুল ১২৯৬ হি.; (৬) W. Marcais, Arabic lexicography (আরবীতে), Articles et Conferences, প্যারিস ১৯৬১ খৃ., ১৪৫-৭০; এতদ্ব্যতীত L. Kopf-এর অপ্রকাশিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য BSOAS, xvii (১৯৫৫খৃ.), ৬১৭-৮ দ্র.।

(২) ফার্সী অভিধান : অভিধানের জন সাধারণ ফার্সী শব্দ ফারহাঙ্গ যাহার মূল অর্থ জানা, শিক্ষাও বুঝায়। মধ্য পারসিক (পাহলাভী) ছাঁচে উহাকে এমন দুইটি সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাহা অপ্রচলিত হইলেও ইসলাম-পূর্ব যুগের তথ্যাবলী সরবরাহ করে। ফারহাঙ্গ-ই ওঈমেক (Frahang-i oimek)-এর নামকরণ করা হয়। ইহাতে লিখিত প্রথম শব্দটি অনুসারে; পাহলাবী ভাষার শব্দাবলীর সমার্থক আভেস্তীয় (Avestan) শব্দাবলীর তালিকা ইহাতে রহিয়াছে। প্রচলিত স্মৃতিসহায়ক ব্যাখ্যাসহ ফারহাঙ্গ-ই পাহলাবী' প্রধানত পাহলাবী ভাষায় ব্যবহৃত মূল আরামী বাগধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ফার্সী শব্দনিচয়ের ভাণ্ডার। তবে পাহলাবী পাণ্ডুলিপি দুর্বোধ্যতাহেতু অনেকগুলি ব্যাখ্যাই আজগুবি বলিয়া মনে হয়। যথা ঃ binmin (Aram, brh-এর উচ্চারণ bnmn) পুঁজ, 'পুত্র' অর্থে।

আধুনিক ফার্সী ভাষায় প্রাচীনতম অভিধান হইল আবূ হাফস-ই সুগদীর 'রিসালা; যাহা ১ম/৭ম শতাব্দী হইতে ৫ম/১১শ শতাব্দী পর্যন্ত কোনও এক সময়ে সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। এখন ইহা প্রচলিত না থাকিলেও মনে হয় ইহা ১১শ/১৭শ শতাব্দীর সংকলকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। কবি আবূ মানসূর 'আলী ইব্‌ন আহমাদ আসাদী তূসীর 'লুগাত-ই ফুর্‌স' প্রাচীনতম ফার্সী অভিধান, যাহা এখনও টিকিয়া আছে। ইহা ৪৫০/১০৫৮-৪৬০/১০৬৮ সালের দিকে সংকলিত। এই অভিধানখানির সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইরানের প্রাচীন কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রায় ১২০০ দুর্লভ ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যাখ্যা করা। ইহা বর্ণানুক্রমে ছন্দমালায় বিন্যস্ত। প্রতিটি বিষয়ের সহিত কবিতার উদ্ধৃতি রহিয়াছে। তাবরীযের কবি কাতরান রচিত 'তাফসীর ফী লুগাতি'ল-ফুর্‌স' ইহা অপেক্ষা সামান্য প্রাচীনতর অভিধান; ইহা অধুনাবিলুপ্ত। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর সূচনা অবধি অন্য কোনও ফার্সী অভিধানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালীন শব্দ বিজ্ঞানিগণ আরবী ও ফার্সী ভাষায় আরবীর বিশ্লেষণে, বিশেষ করিয়া কুরআনের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। ফার্সী টীকাসহ শব্দকোষের মধ্যে আমরা পাই হুসায়ন যাওযানী (মৃ. ৪৮৬/১০৯৩)-র কিতাবু'ল-মাসাদির ও তারজুমানু'ল-কুরআন। হুসায়ন নাতানযী (মৃ. ৪৯৯/১১০৬)-র দাসতূরু'ল লুগাতি'ল-আরাবিয়্যাও কিতাবু'ল মিরকাত, আবু'ল-ফাদল মায়দানী-র আস-সামী ফি'ল-আসামী (৪৯৭/১১০৪); আবু'ল-কাসিম মাহমূদ আয-যামাখাশারী-র প্রসিদ্ধ 'মুকাদ্দিমাতু'ল-আদাব' (৫২১/১১২৭-এর পূর্বে); জা'ফারাক বায়হাকী (মৃ. ৫৪৪/১১৫০)-এর তাজু'ল-মাসাদির; এই নামের একটি গ্রন্থকে খুব সম্ভব ভুলবশত কবি রুদাকী (মৃ. ৩২৯/৯৪০-১)-র প্রতি আরোপ করা হয়; আবু'ল-ফাদ্‌ল হুবায়শ তিফলিসীর কানূনু'ল-আদাব (৫৪৫/১১৫০-১); জাওহারীর আরবী অভিধান আস-সিহাহ্-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত জামাল আল-কুরাশীর আস-সুরাহ মিনা'স-সিহাহ্' (৬৮১/১২৮২-৩) প্রভৃতি।

আরবী অভিধান সিহাহ্-এর উপর ভিত্তি করিয়া আরও রচিত হয় মুহাম্মাদ হিন্দূ শাহ নাখ্‌জাওয়ানী শামস-ই মুন্‌শীর ফারসী অভিধান সিহাহু'ল-ফুরস্ (বা সিহাহু'ল-'আজাম) (৭২৮/১৩২৭-৮)। হাফিজ-এর বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক লেখক শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ফাখরী ইসফাহানী (শামস-ই ফাখ্‌রী)-র তৃতীয় প্রাচীনতম অভিধান 'মি'য়ার-ই জামালী' (যাহার একটি নিবন্ধের এক চতুর্থাংশ কাব্য সমালোচনায় ভরা) ৭৪৫/১৩৪৪ সালে রচিত হয়। ইহা আসাদীর গ্রন্থ অনুসরণে রচিত। তবে উহার ১৬০০-এর অধিক সংখ্যক শব্দের সমর্থনে উদ্ধৃত কবিতাগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকারের স্বরচিত এবং সেইজন্য উহা অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য।

এই সময়ের পর হইতে ভারতবর্ষ ফার্সী অভিধানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দুইখানি অভিধান গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে; ঐগুলি মুবারক শাহ গাযনাবী, ফখর-ই কাওওয়াস-এর 'ফারহাঙ্গনামা' (প্রায় ৭০০/১৩০০) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কিওয়াম আল-বালখীর বাহ্‌রু'ল-ফাদা'ইল (প্রায় ৭৯৮/ ১৩৯৩?), কাদী খান মুহাম্মাদ দিহলাবী যারওয়াল-এর আদাতু'ল-ফুদালা (৮২২/১৪১৯) গ্রন্থে অন্যান্য বিলুপ্ত সূত্রের উল্লেখ করা হয়। পরবর্তী দুই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আরও অনেকগুলি ফার্সী অভিধান সংকলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল নিম্নলিখিত অভিধানগুলির নাম উল্লেখ করা সম্ভব ঃ (১) কবিদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত ইব্‌রাহীম কিওয়ামু'দ-দীন ফারূকীর শারাফ নামা-ই আহমাদ মুনায়রী (৮৭৮/১৪৭৩-৪); (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শায়খ দিয়া'উদ-দীন মুহাম্মাদ-এর উদ্ধৃতিবিহীন অভিধান তুহফাতু'স-সা'আদা ৯১৬/১৫১০-১); (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন লাদ দিহলাবীর মু'আয়্যি'দু'ল-আফাদিল (৯২৫/১৫১৯); (৪) হুসায়ন ওয়াফাঈ-র ফারহাঙ্গা-ই ওয়াফাঈ (৯৩৩/১৫২৬-৭); (৫) 'আবদু'র-রাহীম ইব্‌ন আহ্‌মাদ সূর-এর কাশফু'ল-লুগাত (৯৫০/১৫৪৩?); (৬) ইলাহ-দাদ ফায়দী সিরহিন্দী-র মাদারু'ল-আফাদিল (১০০১/১৫৯৩)।

ঠিক এই সময় ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে আরও একটি স্রোতধারা দেখা যায়; তাহা ছিল ফারসী লেখকের রচনাবলী ব্যাখ্যার ব্যাপারে তুর্কীদের উদ্যোগ।

বেনামী ও অপ্রচলিত অভিধান 'আকনূম-ই 'আজাম'-এর পর এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ছিল লুতফুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী য়ুসুফ হালীমীর তিনটি গ্রন্থ বাহ্‌রু'ল-গারা'ইব, নিছারু'ল-মুলূক (৮৭২/১৪৬৭-৮) ও সংক্ষিপ্ত কা'ইমা (৯১৭/১৫১১-২)। হালীমী তাঁহার সূত্রসমূহের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অনুরূপ সমসাময়িক রচনাবলীর মধ্যে হাসান ইব্‌ন হুসায়ন কারাহিসারীর শামিলু'ল-লুগাত (৯০০/১৪৯৫). খাতীব রুস্‌তাম মাওলাবীর ওয়াসীলাতু'ল-মাকাসিদ (৯০৩/১৪৯৭-৮) এবং ইব্‌রাহীম ইব্‌ন খুদায়দেদে-র কাব্যে রচিত তুহ্‌ফা-ই শাহিদী (৯২০/১৫১৪-৫) উল্লোখযোগ্য। নি'মাতুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুবারাক আর-রূমী তাঁহার প্রসিদ্ধ অভিধান 'লুগাত-ই নি'মাতুল্লাহ্ (৯৪৭/১৫৪০-এর পূর্বে) রচনা করিতে শেষোক্তটি ব্যতীত উল্লিখিত সকল কয়টি গ্রন্থই ব্যবহার করেন।

১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে দুইটি প্রধান অভিধান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১০০৮-১৫৯৯-১৬০০ সালে শাহ 'আব্বাস সাফাবীর সৌজন্যে মুহাম্মাদ কাসিম কাশানী সুরূরী তাঁহার মাজমা'উল-ফুর্‌স' রচনা করেন। উক্ত অভিধানের উৎস হিসাবে তিনি ৩৮টি প্রাচীন অভিধানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রায় ৬,০০০ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঠিক এই সময়ে মুগল দরবারে জামালু'দ-দীন হুসায়ন ইন্‌জূ শীরাযী প্রণয়ন করিতেছিলেন. তাঁহার ফারহাঙ্গ-ই জাহাঙ্গীরী নামক অভিধানটি, যাহা ১০১৭/১৬০৮-৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৪০-এর অধিক উৎসের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, যদিও সকলগুলি সরাসরি নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার এবং সুরূরীর উৎস একই। কতকগুলি উৎস তদবধি বিলুপ্ত। ১০৩৮/১৬২৮-৯ সালের দিকে ইনজূর অভিধানখানি হস্তগত করিয়া সুরূরী তাঁহার অভিধানটি সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে এই অভিধানগুলির মানোন্নয়নের দুইটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০৬২/১৬৫২ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে মুহাম্মাদ হুসায়ন ইব্‌ন খালাফ তাবরীযী বুরহান তাঁহার প্রখ্যাত অভিধান বুরহান-ই কাতি' রচনা করেন। ইহার দুই বৎসর পর 'আবদু'র রাশীদ আল-হুসায়নী আত্‌-তাত্তাবী তাঁহার 'ফারহাঙ্গ-ই রাশীদী' রচনা করেন। অনেকগুলি উদ্ধৃত কবিতা পরিহার করিয়া রাশীদ তাঁহার অভিধানখানি সংক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করেন। বুরহানের পরিবর্তনগুলি ছিল ব্যাপকতর। পূর্বসুরীদের জটিলতার অংশত বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের পরিবর্তে ২০,০০০ শব্দের অভিধানটি সর্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে বর্ণমালা অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। সর্বপ্রথম প্রত্যয়ন ও উৎসের উল্লেখ বর্জন করা হইয়াছে।

ত্রুটিপূর্ণভাবে লিখিত ফারসী পাণ্ডুলিপিতে উৎসের দুর্বোধ্যতার সূচনা হইতেই ভুল থাকিয়া যায়। শামস-ই ফাখরী gavaz1-এর স্থলে gr'z

ও yakand-এর স্থলে p'knd ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এইভাবে সময়ের সহিত ভুলের মাত্রাও বাড়িয়া চলে। বুরহানে নূতন ধরনের দুইটি প্রধান ভুল পরিলক্ষিত হয়। একটি হইল যানৃদও পাযানৃদ-এ রহিয়াছে এই শিরোনামে ফারহাঙ্গ-ই পাহলাবীগণ হইতে ঐতিহ্যগত Ideogram পদ্ধতির গঠনের পাহলাবী ভাষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অন্যটি হইল বহু বিকৃত বা কল্পিত শব্দসংবলিত প্রাচীন পারস্যবাসীদের বেনামী এবং নকল 'পবিত্র গ্রন্থ' দাসাতীর-এর শব্দ তালিকার মৌন সমর্থন। শু'উরী হাসান এফেন্দীর বৃহৎ ফারসী-তুর্কী অভিধান ফারহাঙ্গ (১০৭৫/১৬৬৪-৫)-এ সম্ভবত যে কোনও অভিধানের তুলনায় অধিকতর মারাত্মক ভুল পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্বসূরির শব্দ তালিকা ছাড়াও শু'উরীর অভিধানে প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় কাল্পনিক কবিদের কবিতার দ্বারা সমর্থিত নব্য গঠিত শব্দ পাওয়া যায়। উহাদের মূল সম্ভবত কখনও জানা যাইবে না।

পূর্ববর্তী যে কোনও অভিধানের তুলনায় তুলনায় 'বুরহান-ই কাতি'-র সমালোচনা অথবা সমর্থনে অধিক সংখ্যক গ্রন্থের তালিকা রহিয়াছে। তন্মধ্যে কবি সিরাজু'দ-দীন 'আলী খান আরযূর সিরাজু'ল-লুগাত (১১৪৭/১৭৩৪-৫) সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার অল্প কিছুদিন পরে আরযূর ছাত্র রায় টেকচান্দ বাহার-এর বৃহৎ অভিধান বাহার-ই 'আজাম প্রকাশিত হয় (১১৬২/১৭৪৯)। এই সময় হইতে প্রাচীন লেখকদের শব্দসম্ভার ছাড়াও সমসাময়িক লেখকদের শব্দসম্ভার অভিধানসমূহে স্থান লাভ করে।

এই সময়ে য়ূরোপীয়গণ ইরান ও ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া অভিধান রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৬৬৯ সালে Edmund Castell মূল উৎস হিসাবে নি'মাতুল্লাহ্-এর লুগাত এবং Jacob Gollius (১৫৯৬-১৬৬৮ খৃ.)-এর পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়া প্রথম ফারসী অভিধান মুদ্রণ করেন। ইহা ছিল তাঁহার Lexicon heptaglotton-এর অংশ। স্পষ্টতই ইহাতে তিনি শু'উরীকেও অন্যতম উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন। হালীমী, নি'মাতুল্লাহ্ ও শু'উরীর অভিধানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ১৬৬০ খৃ. Franz von Mesgnien Meninski তাঁহার তুর্কী-আরবী-ফারসী অভিধান Thesaurus প্রকাশ করেন। Meninski-র অভিধান একটি বৃহৎ অভিধান যাহাকে অনুসরণ করিয়া জন রিচার্ডসন Dictionary Persian Arabic and English রচনা করেন (১৭৭৭-৮০ খৃ.)। পরবর্তীকালে উহা ফ্রান্সিস জনসন কর্তৃক পরিবর্ধিত হয় (১৮২৯ খৃ.)। J Vuller-এর Lexicon Persico-Latinum (১৮৫৫-৬৪ খৃ.) ও J. J. p. Desmaison-এর Dictionnaire Persanfrancais (১৯০৮ খৃ.) উল্লিখিত য়ূরোপীয় গ্রন্থগুলির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়; অধিকন্তু উহাদের রচনায় বুরহান, শু'উরী ও বাহার-ই 'আজাম-এরও সাহায্য গ্রহণ করা হয়। F. Steingass-এর Comprehensive Persian-English Dictionary (১৮৯২ খৃ.) উৎসসমূহের উদ্ধৃতি বর্জন করিয়া অবনতির পথে সর্বাধিক অগ্রসর হয়।

১৩শ/১৯শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রাচীন রীতিতে রচিত আরও অনেক অভিধান প্রকাশিত হয়। যথা ঃ Joseph Barretto-এর পরিচালনায় সংকলিত শামসু'ল-লুগাত (১২২০/১৮০৫-৬); কাবূল মুহাম্মাদ কর্তৃক রচিত কিন্তু অযোধ্যার সুলতানের দিকে আরোপিত 'হাফ্‌স কুলযুম', মুহাম্মাদ গিয়াছু'দ-দীন-এর 'গিয়াছু'ল-লুগাত' (১২৪২/১৮২৬-৭), মুহাম্মাদ পাদশাহ শাদ-এর ফারহাঙ্গ-ই আনন্দরাজ (১৩০৬/১৮৮৮-৯) প্রভৃতি। রিদা কুলী হিদায়াত-এর সংকলন 'ফারহাঙ্গ-ই আঞ্জুমান আরা-য়ি নাসিরী' (১২৮৬/১৮৬৯-৭) ছিল ইরানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিধান, যদিও উহা 'দাসাতীর'-কে পুরাপুরি গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

কথ্য ও লিখিত শব্দের সরাসরি রেকর্ডের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ১৮৭৪খৃ. ফারসী ভাষায় আধুনিক অভিধানের ভিত্তি স্থাপিত হয় J. L. Schlimmer-এর Terminologie medico Pharmaceutique et anthropologique Francaise-Persane-এর উপর। বর্তমানে ফারসী অভিধানের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে মাত্র দুইটি অসাধারণ ও অদৃশ অভিশাপ উল্লেখযোগ্য। য়ূরোপের Fritz wolff-এর Glossar zu Firdosis Schahname (১৯৩৫ খৃ.) উৎসের পূর্ণ বিবরণসহ এবং ইরানের বিশ্বকোষরূপী লুগাতনামাহ যাহার সংকলনের কাজ 'আলী আকবার দিহখুদা দ্বারা শুরু হয়। (১৮৭৯-১৯৫৬) এবং মুহাম্মাদ মু'ঈন ও অন্যদের পরিচালনায় চলিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. de Lagarde, Persische Studien, Gottingen 1884; (২) C. Salemann, Bericht uber die Aug'gabe des Mi'jar i Jamali, Beilage V. Chronologisches Verzeichnis der Farhange, in Melanges Asiatiques, ix, 4. (1888). 505-94; (৩) এ. এ. দিহখুদা et al. লুগাত-নামাহ, ৪০, মুকাদ্দিমা, তেহরান ১৯৫৯ খৃ., ১৭৮-৩৭৮; (৪) S. I. Baevskiy. Opisanie tadzikskikhi persidskikh rukopisey Institute Narodov Azii, vip, 4-5 মস্কো ১৯৬২-৮ খৃ.; (৫) F. Tauer, Persian learned literature, III Philology, in Rypka et al., History of Iranian Literature Dordrecht 1968, 429-37।

D. N. Mackenzie (E. I.[2])

তুর্কী অভিধান

(ক) প্রাচ্য অভিধানসমূহ ঃ তুর্কী অভিধান লেখকগণ আরবী ও ফারসী অভিধানরীতি অবলম্বন করেন।

সর্বপ্রথম তুর্কী অভিধান হইল মাহমূদ আল-কাশগারীর দীওয়ানু লুগাতি'ত-তুর্ক, যাহা ৪৬৬/১০৭৪ সালে বাগদাদে রচিত হয়। (সম্পা. কিলিস্লি রিফ'আত, ইস্তাম্বুল ১৩৩৩-৫/১৯১৫-৭; ইহার উপর ভিত্তি করিয়া C. Brockelman ও B. Atalay যথাক্রমে ১৯২৮ ও ১৯৪৩ খৃ. অভিধানসূমহ রচনা করেন)। ইহাতে অনেকগুলি আঞ্চলিক শব্দসহ কারখানী সাম্রাজের প্রামাণিক ভাষার আলোচনা রহিয়াছে। ইহাতে তুর্কী শব্দের অর্থ আরবীতে দেওয়া হয় এবং তুর্কী লোকগীতি হইতে উদ্ধৃতি দিয়া উদারহণ দেওয়া হয়।

কাশগারীর অভিধানখানি ৮ম/১৪শ শতাব্দী হইতে ৯ম/১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত মিসর ও সিরিয়ায় রচিত (Kipcak) তুর্কী অভিধানসমূহের আদর্শ হিসাবে কাজ করে (O. Pritsak in Ph TF, i. 75-6) ঃ আবূ হায়্যান, কিতাবু'ল-ইদরাক (৭১২/১৩১৩, সম্পা. A Caferoglu, ১৯৩১ খৃ.); বেনামী লেখক, তারজুমান তুর্কী (৭৪৩/১৩৪৩, ৬৪৩/১২৪৫ নয়, তু. B. Flenming, in Isl. xliv (১৯৬৮ খৃ.) ২২৬-৯, সম্পা. M. Th. Houtsma (১৮৯৪ খৃ.); জামালু'দ-দীন আত-তুর্কী, কিতাব

লুগাতি'ল-মুশতাক (৮ম/১৪শ শতাব্দী, সম্পা. A. Zajaczkowski ১৯৫৪ খৃ.), বেনামী লেখক, কিতাবু'ত-তুহফাতি'য-যাকিয়্যা: (৮ম/১৪শ শতাব্দী, সম্পা. টি. হালাসিকুম. ১৯৪২ খৃ., বি. আতালায় ১৯৪৫খৃ.) অজ্ঞাত লেখকের আল-কাওয়ানীনু'ল-কুল্লিয়্যা: (৯ম/১৫শ শতাব্দী, সম্পা ফুওয়াদ কোপরুলু, ১৯২৮ খৃ.) এবং সম্প্রতি উদ্ধারকৃত কিতাবু'দ-দুররাতি'ল-মুদী'আ (A Zajaczkowski কর্তৃক আংশিক সম্পাদিত, Ro, xxix, ১৯৬৫ খৃ.)।

খাওয়ারিযমে আয-যামাখশারীর 'মুকাদ্দিমাতু'ল-আদাব ছিল জনপ্রিয় গ্রন্থ। খাওয়ারিযমী-তুর্কী হাশিয়াসহ এই গ্রন্থের অন্য ১৫খানা পাণ্ডুলিপি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে (Z. V. Togan, in TM., xiv, 1964, 81-92)।

চাগাতাঈ অভিধানগুলি প্রধানত নাওয়া'ঈ (৮৪৪/১৪৪১-৯০৬/১৫০১)-এর রচনাবলী পাঠের সুবিধার জন্য সংকলিত হয়। ঐগুলির বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক এবং প্রতিটি বর্ণের অধীনে প্রারম্ভিক বর্ণের পরবর্তী স্বরবর্ণ অনুযায়ী বিষয়বস্তুসমূহ সন্নিবেশিত। কাব্যিক উদ্ধৃতি কোনও শব্দের অর্থ বুঝাইতে সাহায্য করে। এই অভিধানগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিরাতের তালি' ঈমানী-র বাদা'ই'উ'ল-লুগাত (চাগ-ফারসী, ৯১২/১৫০৬-এর পূর্বে, সম্পা. A. K. Borovko 1961); অজ্ঞাত লেখকের আবুশকা (চাগ-'উছমান, ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, সম্পা. A. Vambery 1862, V. Vel'yaminov-Zernov 1968) এবং মীরযা মাহদী খান, 'সাংলাখ (চাগ-ফারসী, আনু. ১১৭২/১৭৫৮, সম্পা. Sir G. Clauson 1960)।

তুর্কী ভাষায় ব্যাখ্যাকৃত প্রায় ২০০০ আরবী-ফারসী শব্দের ছন্দে গ্রথিত শব্দসম্ভার লইয়া 'উছমানী অভিধানের কাজ শুরু হয়। স্মৃতিপটে সংরক্ষণীয় এই শব্দসম্ভার কয়েকটি কিত'আ বা অধ্যায়ে বিভক্ত, যাহাতে একই আকারবিশিষ্ট বা সমুচ্চরিত শব্দসমূহ একত্র করা হয়। এই ধরনের প্রাচীন অভিধানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হুসামের তুহফে-ই হুসামী (ফারসী-তুর্কী, ৮০২/১৩৯৯) যাহার উল্লেখ তুহফে-ই শাহিদী-তে করা হয় (নীচে দ্র.)। এইগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধি ছিল ঃ ফিরিশতে-ওগলু'আবদু'ল-লাতীফ (মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪-এর পূর্বে), লুগাত-ই ফিরিশতে-ওগলু (আরবী-তুর্কী), অন্য একটি ছন্দে গ্রথিত আরবী-তুর্কী শব্দকোষ, 'সুবহা-ই সিব্‌য়ান'-এর হাশিয়ায় মুদ্রিত; শাহিদী ইব্‌রাহীম দেদে, তুহফে-ই শাহিদী (ফারসী-তুর্কী, ৯২০/১৫১৪, লিথু. ১২৭৫/১৮৫৩); সুনবু'ল যাদে (মেহমেদ) মুহাম্মাদ ভেহবী (মৃ. ১৮০৯ খৃ.) তুহ্‌ফে-ই ভেহ্‌বী (ফারসী-তুর্কী, ১ম সং, ১২১৩/১৭৯৮) ও 'নুখবে-ই ভেহ্‌বী (আরবী-তুর্কী, ১ম সং, ১২২০/১৮০৫); হাসান 'আয়নী, নাজমু'ল-জাওয়াহির (আরবী-ফারসী তুর্কী, মুদ্রিত ১২৫০/১৮৩৪-৫); আহমাদ 'আসিম (মৃ. ১২৩৫/১৮১৯), তুহফে-ই 'আসিম) মুদ্রিত, বূলাক ১২৫৪/১৮৩৮-৯)।

এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি বৃহৎ অভিধানও রচিত হয়। আরবী-তুর্কী অভিধানগুলিতে আরবী শব্দগুলিকে প্রথম অথবা শেষ অক্ষর অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়। আবার প্রতিটি 'বাব' বা অধ্যায়কে শব্দের দ্বিতীয় এবং পরবর্তী বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন ফাস্‌ল বা অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে সুপরিচিত ঃ মুস্‌তাফা ইব্‌ন শামসি'দ-দীন আল-কারহিসারী, আখতার-ই কাবীল অথবা লুগাত-ই আখতাবী (৯৫২/১৫৪৫), ১৮২৬ হইতে ১৯০৬ খৃ. পর্যন্ত কমপক্ষে ১৫টি সংস্করণে প্রকাশিত; আহমাদ 'আসিম, আল-ওকিয়ানূস আল-বাসীত (১ম সং, ১২৩০/১৮১৪-১২৩৩/১৮১৮), ফীরূযাবাদীর আল-কামূসু'ল-মুহীত'-এর অনুবাদ; মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুস্‌তাফা আল-ওয়ানী (ওয়ানকুলু), তারজামাতু সিহাহি'ল-জাওহারী (ইব্‌রাহীম মুতাফার্‌রিকা কর্তৃক মুদ্রিত, ১১৪১/১৭২৯), আল-জাওহারীর প্রসিদ্ধ আস-সিহাহ-এর অনুবাদ। ফারসী অভিধানে ফারসী শব্দগুলিকে ১ম বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন 'বাব' বা অধ্যায়ে এবং প্রতিটি 'বাব' বা অধ্যায়ের মধ্যে শব্দের ১ম বর্ণের পরবর্তী স্বরবর্ণ অনুযায়ী তিনটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়। এইগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল ঃ নি'মাতুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ, লুগাত-ই নিমাতুল্লাহ্ (৯৪৭/১৫৪০, অপ্রকাশিত), ইহাতে ক্রিয়া ও বিশেষ্য পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। হাসান শু'উরী, ফারহাঙ্গ-ই শু'উরী (১০৮০/১৬৬৯-১০৯২/১৬৮২). ইব্‌রাহীম মুতাফার্‌রিকা কৃর্তক মুদ্রিত, (১১৫৫/১৭৪২); আহমাদ 'আসিম, তিব্‌য়ান-ই নাফি,' (১ম সং., ১২১৪/১৭৯৯-১৮০০), তাব্‌রীযীর বুরহান-ই কাতি'-এর অনুবাদ, আধুনিক অভিধান-বিন্যাস-পদ্ধতির অনুকরণে বিন্যস্ত। সর্বাধিক পরিচিত তুর্কী-আরবী-ফারসী অভিধান আস'আদ মুহাম্মাদ এফেন্দীর লাহজাতু'ল-লুগাত (১১৪৫/১৭৩২-৩, মুদ্রিত ১২১৬/১৮০১-২)।

(খ) য়ুরোপীয় অভিধান ঃ কন্সটান্টিনোপল বিজয় 'উছমানীগণকে পাশ্চাত্যের নিবিড় সংস্পর্শে লইয়া আসে। বিভিন্ন স্বার্থে প্রথমে য়ুরোপীয়গণ এবং পরে তুর্কী অভিধান লেখকগণ বহু অভিধান রচনা করেন। প্রসিদ্ধ অভিধান ছিল ঃ Fr. Meninski, Thesaurus, ভিয়েনা ১৬৮০ খৃ., ১৭৮০ খৃ. ভিয়েনায় Lexicon turco-arabicopersicum শিরোনামে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত; J. D. Kieffer. T. X. Bianchi, Dictionnaire turc-francais, প্যারিস ১৮৩৫-৭ খৃ., J. Th. Zenker, Turkisch-arabisch-persisches Handworterbuch, লাইপযিগ ১৮৬৬-৭৬ খৃ., পুনঃমুদ্রিত ১৯৬৭ খৃ.; J. W. Redhouse A. Turkish and English lexicon, কন্সটান্টিনোপল ১৮৯০, ২য় সং ১৯২১ খৃ.; শামসু'দ-দীন সামী, Dictionnaire francais-turc, ইস্তাম্বুল ১২৯৯/১৮৮২ I. Khloros, Lezicon turco-ellenikon, Istanbul 1899-1900। এক ভাষাভিত্তিক: আহমাদ ওয়াফীক পাশা, লেহজে-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১২৯৩/১৮৭৬; শাহ সামী, কামূস-ই তুর্কী, ইস্তাম্বুল ১৩১৭-৮/১৮৯৯-১৯০০। পূর্ব তুর্কী বিষয়ক ঃ Pavet de Courteille, Dictionnaire turk-oriental, প্যারিস ১৮৭০খৃ.; শায়খ (শেখ) সুলায়মান এফেন্দী, লুগাত-ই চাগাতায় ওয়া তুর্কী-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১২৯৮/১৮৮১।

অনেকগুলি আধুনিক অভিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ Fritz Heuser, Heuser-Sevket Turkisch-deutsches Worterbuch, Wiesbaden 1967; H. C. Hony-Fahir I[7], A Turkish-English dictionary, অক্সফোর্ড ১৯৫৭ খৃ.; ঐ লেখক, An English-Turkish dictionary, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ., বিভিন্ন নূতন সংস্করণ, পুনঃমুদ্রিত ১৯৬৮ খৃ.; New Redhouse Thrkish-English dictionary, সম্পা. আমেরিকান বোর্ড, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ.। এক ভাষাভিত্তিক: Turkee sozluk, সম্পা. Turk Dil Kurumu, আনকারা ১৯৬০ খৃ.।

আরও অভিধানের নামের জন্য দেখুন ঃ A. Caferoglu, Yeni Cag Turk dili lugatleri, in Ist. Un. Ed. Fak. Turk Dili ve Edebiyati Dergisi, xiv (1966),9-52।

তুরস্কের অধিকাংশ ভাষা (অ-'উছমানী) সোভিয়েত ইউনিয়নে কথিত হয়। সোভিয়েত শাসনের পূর্বে এই ভাষাসমূহের অভিধানগুলি বিদ্যমান ছিল। তবে তাহাদের নিয়মতান্ত্রিক অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় কেবল ১ম মহাযুদ্ধের পর। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে অর্থাৎ আলতায়, আযারবায়জানী, বাশকির, চুভাশ, গ্যাগাউয, কারাচায়-বালকার, কারাইম, কারাকালপাক, কাযাখ, খাকাস, কিরগিয, বুমিক, নোগায়, শোরতাতার, তুরকোম্যান, তুভিনিয়ান, উযবেক, (নূতন) উইগু'র, য়াকুত ইত্যাদি স্থানে কথিত সকল তুর্কী ভাষায় অভিধানগুলি পাওয়া যায় (দেখুন Slovari, izdanniev SSSR, Bibliograficeskiy ukazatel', মস্কো ১৯৬৬ খৃ. ১২৯-১৬২)। তুর্কী ভাষাবিদগণ নিম্নলিখিত অভিধানগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন ঃ E. K. Pekarskiy, Slovar, yakutskogo yazika, i, পেটরোগ্রাড ১৯১৭ (তুর্কী ভাষায় অনূদিত); Yakut Sozlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ. ii-iii, লেনিনগ্রাড ১৯২৭-৩০ খৃ.; এন. আই. আশমারিন, Thesaurus linguae Tschuvaschorum, i-ii, কাযান, iii-xvii, Ceboksari 1928-50; K. K. Yudakhin, Kirgizsko-russkiy slovar, মস্কো ১৯৪০ খৃ. (অনু. তুর্কীতে Kirgiz Sozlugu, আনকারা ১৯৪৫-৮ খৃ.), ২য় সং., ১৯৬৫ খৃ.।

(গ) বিশেষ অভিধান ঃ ঐতিহাসিক ঃ K. Gronbech, Komanisches Worterbuch, কোপেন হেগেন ১৯৪২ খৃ.; Tarama Sozlugu, সংশোধিত সং., Turk Dil Kurumu, আনকারা ১৯৬৩ খৃ.; A. Caferoglu, Eski Uygur Turkcesi Sozlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ.; Drevnetyurkskiy slovar, লেনিনগ্রাড ১৯৬৯ খৃ.; E. Fazilov, Starouzbekskiy yazik, তাশকেন্ত ১৯৬৬-৭১খৃ.। তুলনামূলক ঃ L. Budagov, Sravnitel'niy slovar' turetsko-tatarskikh nareciy, দুই খণ্ডে, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৯-৭১ খৃ. পুনঃমুদ্রিত ১৯৬১ খৃ.; W. Radloff, Versuch eines Worterbuches der Turk-Dialecte, ৪ খণ্ডে, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯৩-১৯১১ খৃ., পুনঃমুদ্রিত, হেগ ১৯৬০ খৃ., মস্কো ১৯৬৩ খৃ.; এইচ. কাযিম কাদরী, তুরক লুগাতি, ৪ খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১৯২৭-৪৫ খৃ.। উপভাষা ঃ Turkiyede Halk Agzindan Soz Derleme Dergisi, সম্পা. Turk Dil Kurumu, ৩ খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯-৪৭ খৃ., সংশোধিত সং., আনকারা ১৯৬৩ খৃ.; G. Jarring, An Eastern Turki-English dialect dictionary, Lund 1964। শব্দতাত্ত্বিক ঃ M. Rasanen, Versuch eines etymologischen Worterbuchs der Turk-sprachen, Helsinki 1969; Sir Gerard Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish, অক্সফোর্ড ১৯৭২ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত (১) Rieu, Turk (পাণ্ডু) ১৩৪-১৪৯, ২৬৩-৯; (২) Blochet, পাণ্ডু. Turcs; (৩) F. E. Karatay. Istanbul Universitesi Kutuphanesi Turkce basmalar alfabe Katalogu, ২ খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১৯৫৬ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce yazmalar Katalogu, ii, 3-42, ইস্তাম্বুল ১৯৬১ খৃ.; (৫) Tarama Sozlugu, i, XXCI, আনকারা ১৯৬৩ খৃ.; (৬) J. Benzing, Einfurung in das Studium der altaischen Philologie und der Turkologie, Wiesbaden 1953; (৭) The bibliographies in Ph TF, i; (৮) G. Hazai, Sovietico-Turcica, বুদাপেস্ট ১৯৬০ খৃ., s. v. Worterbucher (p. 314)।

J. Eckmann (E. I.[2])/ মুহাম্মদ আবদুল আজীজ খান

কায (দ্র. কাব্‌ক)

কায্‌দুগলিয়্যা (قـاز دغلـيـه) ঃ 'উছমানী মিসরের বিখ্যাত নব্য-মামলূক পরিবারসমূহের মধ্যে ইহা তৃতীয়। যু'ল-ফাকারিয়্যা ও কাসিমিয়্যা ও (দ্র.) হইতে কাযদুগলিয়্যা এই কারণে পৃথক যে, ইহার অভ্যুদয়ের প্রথম দশকগুলিতে তুর্কী দুর্গরক্ষী সপ্তম সৈন্যবিভাগের অফিসারগণ ইহা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তুরস্কের আঞ্চলিক শাসকগণ নহেন। ইহা প্রভেদসূচক উপাধি হইল মুসতাফা আল-কাযদুগলী যাহা জাবারতী কর্তৃক মূলগত অর্থে রূমী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ছিলেন রূম উশাগি এবং সেইজন্য জন্ম হইতেই স্বাধীন কিন্তু আসলে তিনি মামলূক ছিলেন না [তু. Stanford J. Shaw, (সম্পা) Ottoman Egypt in the eighteenth century: The Nizamname-i Misir of Cezzar Ahmed Pasha, কেমব্রীজ Mass. ১৯৬২; ইংরাজী ভাষায় মূল পাঠ ২৩-২৬ পৃ., তুর্কী ভাষায় মূল পাঠ ৭-৮ পৃ.]। তিনি হাসান বালফিয়্যার একজন দেহরক্ষী (সারবাজ) হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেন (জাবারতী-র মুদ্রিত মূল পাঠে দৃষ্টত ইব্‌ন ইগীহ পাঠ নির্ভরযোগ্য নহে)। তিনি ১০৮৫/১৬৭৪-৫ সালে আযেবান সৈন্যবিভাগে এবং ১০৯৩/১৬৮২ সনে গোনুললুয়ান সৈন্যবিভাগে আগা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় জানিসারী বাহিনীর কাহ্‌য়া-এর পদে উন্নীত হন। এই পদে বহাল থাকা কালে ১০৮৭ /১৬৭৬ এবং ১১০৬/১৬৯৪ সনের মধ্যবর্তী সময়ে একটি জানিসারী বাহিনীর বাশোদাবাশি হিসাবে বিভাগটির উপর আধিপত্য বিস্তারকারী কুচুক মুহাম্মাদের সহিত বহাল থাকা অবস্থায় সংঘর্ষে পতিত হন। হিজাযে দুই বৎসর কাল নির্বাসিত থাকিবার পর তিনি মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কুচুক মুহাম্মাদকে হত্যার প্রচেষ্টা সফল করেন। অতঃপর ১১১৫/১৭০৩-৪ সনে তাঁহার স্বীয় মৃত্যু অবধি তিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। হাসান বালফিয়্যা যু'ল-ফাকারিয়্যার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন (এই উপদলের প্রধান ইসমা'ঈল বে আল-কাবী'রুল-ফাকারী তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন)। মুসতাফা আল-কাযদুগলী এবং তিনি যে পরিবারটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এই উভয়ের মাধ্যমে তাঁহার রাজনৈতিক সংযোগ অব্যাহত থাকে।

১২/১৮ শতাব্দীর প্রথমদিকে সংঘটিত উপদলীয় সংগ্রামের ফলে শেষ পর্যন্ত কাসিমিয়্যা (১১৪২/১৭৩০)-এর উপর যু'ল-ফাকারিয়্যা ও কাযদুগলিয়্যার বিজয় সূচিত হয়। বিজয়ের অর্থ এই ছিল না যে, ইহার পর হইতে একটি সম্মিলিত মামলূক দল মিসর নিয়ন্ত্রণ করিত। প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। উক্ত পরিবারসমূহের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল কাযদুগলিয়্যা যাহার প্রধান আমীর ছিলেন ইবরাহীম আল-কাযদুগলী। অতঃপর তিনি জানিসারী বাহিনীর ক্ষণকালীন কাহ্য়া (Kahya) নিযুক্ত হন। তাঁহাকে ১১৪৮/১৭৩৫-৬ সনে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁহার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল সরদার হিসাবে ১১৫১/১৭৩৯ সনে অনুষ্ঠিত হাজ্জের দায়িত্ব পালন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে কায়রোতে তাঁহার প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং তিনি 'উছমান বে যু'ল-কার, যিনি হাজ্জের প্রধান (আমীরু'ল-হাজ্জ) হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দল গঠন করিতে আরম্ভ করেন। অপরিহার্যরূপেই এই দুইজনের মধ্যে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল রিসায়ার (riasa=নেতৃত্ব) অধিকারকে কেন্দ্র করিয়া একটি লড়াই যাহার অর্থ মামলূক আমীরগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের লড়াই। জুলফিয়্যা পরিবারের নেতৃস্থানীয় আমীর রিদওয়ান, যিনি আযেবান সৈন্যবিভাগের কাহ্য়া (Kahya), তিনি উক্ত লড়াইটির মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ফলে তিনি ইবরাহীমের একজন সমর্থক হইয়া পড়েন।

ইবরাহীমের সমর্থকগণ 'উছমানকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। ইহাতে তিনি কেবল আহত হন, কিন্তু তাঁহাতে দলীয় সমর্থকদের বাড়ীঘর আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। 'উছমান মিসরের ভূমিতে পলায়ন করেন। কারণ সেইখানে তাঁহার পরিবারের একজন মামলূক জিরজা (Djirdja)-এর গর্ভনর ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান কার্যালয় আস্‌য়ূতে স্থাপন করেন এবং তথায় কাসিমিয়্যার অবশিষ্ট দলীয় ও অন্য সমর্থকগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে উপদ্বীপে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া 'উছমান ইস্তাম্বুলে চলিয়া যান। তথায় তাঁহাকে রাজসভায় সাদরে গ্রহণ করা হয় (আনু. ১১৫৭/১৭৪৪-৪৫-সাল) তিনি আর কখনও মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন নাই এবং ১১৯০/ ১৭৭৬ সনে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন। ইবরাহীম কাহ্য়া আল-কাযদুগলী ও রিদওয়ান কাহ্য়া আজ-জুলফী' মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ এই আমীরদ্বয়ের স্বীয় অনুসারীদিগকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বী মামলূক গোষ্ঠীসমূহের সহিত সংঘর্ষ বিরাজ করিতে থাকে। কিন্তু ১১৬১/১৭৪৮ সনে এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। রিদওয়ানের নামেমাত্র সহযোগিতায় ইবরাহীম এইভাবে রিয়াসা (কর্তৃত্ব) অধিকার করেন। কিন্তু রিদওয়ানের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আর কোনও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি নিজে জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল অট্টালিকাসমূহ অধিকার করিয়া বিলাসবহুল জীবন যাপন এবং কবিদিগকে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। ইবরাহীম এবং রিদওয়ান উভয়েই তাহাদের মামলুকদের মধ্য হইতে তিনজনকে প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন কাযদুগলিয়্যা প্রথম এইরূপ নিয়োগের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে ইহাদেরই একচেটিয়া অধিকার করিয়া লইবার কথা। ইবরাহীম মিসরের কর হস্তগত করিয়া বহু সংখ্যক মামলূক ক্রয় করেন এবং তাহাদের কতিপয়ের সঙ্গে সাবেক আমীরগণের বিধবা স্ত্রীদিগকে বিবাহ দিয়া মামলূকগণের ভাগ্য গড়ন ও প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ প্রদান করেন। প্রায় সাত বৎসর তিনি অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং উক্ত সময়কাল কায়রো ছিল নির্ঝঞ্ঝাট ও বিদ্রোহমুক্ত। প্রদেশগুলিতে তখন জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিরাজ করিত। তিনি সাফার ১১৬৮/নভে.-ডিসে. ১৭৫৪ সনে ইনতিকাল করেন। রিদওয়ান তাঁহার সহকর্মী অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিলেও শীঘ্রই তাঁহার ক্ষমতা খর্ব হইয়া যায়। উর্ধ্বতন কাযদুগলী আমীর 'আবদু'র-রাহমান কাহ্য়া ইবরাহীম-এর পরিবারকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। রিদওয়ান-এর স্বীয় মামলূকদের একজন কাযদুগলিয়্যার সহিত যোগসাজসে তাঁহাকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টা চালায়। রিদওয়ান তাঁহার শত্রুদের নিকট হইতে পলায়নকালে আহত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। ইব্‌রাহীম-এর ইনতিকালের প্রায় ছয়মাস পর উক্ত ঘটনাটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে জুলফিয়্যার অবসান ঘটে।

অতঃপর কাযদুগলিয়্যা কায়রো নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইবরাহীম-এর পরিবারের উর্ধ্বতন শাসনকর্তা 'উছমান আল-জিরজাবীকে রিয়াসায় নিয়োগ করে। এই সময় তাঁহাদের মধ্য হইতে অপর দুইজনকে প্রদেশের শাসনকর্তা হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় হইলে হুসায়ন আসসাবুনজী ও বুলুতকাপান 'আলী ['আলী বে আল-কাবীর (দ্র.) হিসাবে সাধারণ পরিচিত]। 'উছমান বে তাঁহার রূঢ় ব্যবহারের জন্য সহকর্মীদের বিরাগভাজন হন। দোষী সাব্যস্ত এবং ১১৭০/১৭৫৬-৬৭ সনে তাঁহাকে রিয়াসা হইতে অপসারণ করা হয় এবং আস-সাবূনজী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। নূতন শায়খু'ল বালাদ (অর্থাৎ রিয়াসার অধিকারী) এখন হইতে নিসফ হারামের অর্থাৎ জনসাধারণের ঐ অংশ যাহারা চিরাচরিতভাবে কাসিমিয়্যার সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ তাহাদের সমর্থন লইয়া পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিতে চাহেন। তিনি তাঁহার খুশদাশিয়্যাকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিবার কাজে নিয়োজিত হন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তিনি সাফার ১১৭১/অক্টোবর-নভেম্বর ১৭৫৭ সনে নিহত হন। অতঃপর ইব্‌রাহীম কাহ্য়া-এর সাবেক মামলুকগণের মধ্যে অপর একজনের উপর রিয়াসা অর্পণ করা হয় যাঁহার নাম 'আলী বে আল-গায্‌যাবী। তিনি কোনও কোনও সময় অভিহিত হন (কিছুটা বিভ্রান্তিমূলকভাবে) 'আলী বে আল-কাবীর নামে, ইহা হয় তাঁহার জ্যেষ্ঠতার কারণে অথবা শায়খু'ল-বালাদ-এর পরিবর্তে উহার সমর্থক কাবীরু'ল-বালাদ এবং কাবীরু'ল-কাওম ব্যবহৃত হইবার ফলে। আল-গাযযাবী ১১৭৩/১৭৬০ সনে আমীরু'ল-হাজ্জ হিসাবে হিজায গমন করেন। তিনি তথায় রওয়ানা হইবার পূর্বে 'আবদু'র-রাহমান কাহ্য়াকে স্থানচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কারণ তিনি তখনও কাযদুগলিয়্যার মধ্যে ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছিলেন। 'আবদু'র-রাহমান ইহা জ্ঞাত হইয়া বুলূত কাপান 'আলী বে-এর সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি অমাত্যবর্গের এক সভায় কাযদুগলিয়্যা পরিবারের প্রধান হিসাবে তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি 'আলী বে-কে শায়খু'ল-বালাদ মনোনীত করেন এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে তিনি স্বয়ং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আল-গায্‌যাবী এই সংবাদ পাইয়া হাজ্জযাত্রীর নেতৃত্ব হস্তান্তরপূর্বক গাযায় পলায়ন করেন। তিন মাস পর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইহার অল্পকাল পরেই তথায় তাঁহার ইনতিকাল হয়।

অতঃপর 'আলী বে তাঁহার নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসেন। 'আবদু'র-রাহমান কাহ্য়া তাঁহাকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে একটি যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই ভুল অচিরেই ভাঙিয়া যায়। তিনি যু'ল-কা'দা ১১৭৮/এপ্রিল ১৭৬৫ সনে হিজাযে বিতাড়িত হন এবং 'আলী বে-এর মৃত্যুর পর ১১৯০/১৭৭৬ সনে তিনি কেবল মুমূর্ষু অবস্থায় মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খু'ল-বালাদ-এর স্বৈরতান্ত্রিক উত্থান

এবং 'উছমানী সুলতান-এর প্রতি তাঁহার সন্দেহজনক আনুগত্য সম্পর্কে আশ-শাফি'ঈ-র যাদুঘরে রক্ষিত তাঁহার খোদিত তাম্রলিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি 'আযীয মিস্‌র (দ্র.)-এর সন্দেহজনক অথচ প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মিসর হইতে 'আলী তাঁহার স্বীয় মামলূক মুহাম্মাদ বে আবু'য-যাহাব কর্তৃক বহিষ্কৃত হন (মুহার্‌রাম ১১৮৬/এপ্রিল ১৭৭২)। এই শোষোক্ত ব্যক্তি শায়খু'লবালাদ-এর পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শায়খ জাহিরু'ল-'উমার-এর বিরুদ্ধে এক অভিযানকালে তিনি নিজেই ইনতিকাল করেন (রাবী'-২, ১১৮৯/জুন ১৭৭৫)।

অতঃপর কোনও একক কাযদুগলী আমীর শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন নাই, বরং তিনজন অমাত্য ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন 'আলী বে-এর খুশদাশ ইসমা'ঈল বে এবং আবু'য-যাহাব-এর মামলূকদের মধ্য হইতে দুইজন, ইব্‌রাহীম বে আল-কাবীর (দ্র.) ও মুরাদ বে। মিসরে ১২০০/১৭৮৬-৮৭ সনে জেযা'ইরলি গাযী হাসান পাশা (দ্র.)-র নেতৃত্বে এক 'উছমানী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি ইসমা'ঈল বে-এর অবস্থাকে ক্ষণিকের জন্য শক্তিশালী করিয়াছিল এবং ইহার ফলে তিনি শায়খু'ল-বালাদ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১২০৫/১৭৯১ সনে সংক্রামক মহামারীতে ইনতিকাল করিলে ইব্‌রাহীম এবং মুরাদ একটি অশান্তিময় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত শাসনামলের দুরবস্থা একটি নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে— 'উলামা সদস্যদের সমর্থনে এমনকি তাঁহাদের পরিচালনায় কায়রোর বেসামরিক জনগণ বিদ্রোহ করিয়া বসে। মিসরে ফরাসী আধিপত্য (১৭৯৮-১৮০১) হইবার ফলে কাযদুগলিয়্যার প্রতি, এমনকি গোটা নব্য-মামলূক শাসন ব্যবস্থায় একটি ভয়ানক আঘাত হানা হয়। মিসর অধিকৃত হইবার সময় মুরাদ বে ইনতিকাল করেন (৪ যু'ল-হিজ্জা,. ১২১৫/১৮ এপ্রিল, ১৮০১। অপরপক্ষে ১৭৯৮ সালে ইব্‌রাহীম বে সিরিয়ায় পলায়ন করিবার পর আর কখনও তিনি ক্ষমতা ফিরিয়া পাইতে সক্ষম হন নাই। ফরাসীরা বিতাড়িত হইবার অল্প কয়েক বৎসর পর মুরাদ-এর স্বীয় মামলূকদের মধ্য হইতে 'উছমান বে আল-বারদীসী ও মুহাম্মাদ বে আলফী (শেষোক্ত জন ছিল বৃটেনের আশ্রিত ব্যক্তি) –এই দুইজন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে নভেম্বর ১৮০৬ ও জানুয়ারী ১৮০৭ সনে যথাক্রমে ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাঁহাদের উপদলীয় মামলূক পরিবারগুলি মুহাম্মাদ 'আলী পাশার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। মামলূকদের মধ্য হইতে যে সকল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যাহারা ১৮১১ সনে ইব্‌রাহীম বে-এর সহিত দঙ্গোলায় পলায়ন করিয়াছিল তাহারাই হইল কাযদুগলিয়্যার সর্বশেষ সংগঠিত অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-জাবারতী, 'আজা'ইবু'ল-আছার (বূলাক সং), বিশেষভাবে মৃত্যু তালিকাসমূহ, উক্ত তালিকাসমূহের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধানত উল্লেখযোগ্য ঃ মুসতাফা আল-কাযদুগলী (১খ, ৯১-২); (২) ইব্‌রাহীম আল-কাযদুগলী (১খ, ১৯১-৯২); (৩) 'উছমান বে যু'লফাকার (১খ, ১৭৮-৮৫); (৪) রিদওয়ানু'জ-জুলফী (১খ, ১৯২-২০৪); (৫) 'আবদু'র-রাহমান আল-কাযদুগলী (২খ, ৫-৮); (৬) মুহাম্মাদ আবু'য যাহাব (১খ, ৪১৭-২০); (৭) ইসমা'ঈল বে (২খ, ২১৯-২০); (৮) মুরাদ বে (৩খ, ১৬৭-৭১); (৯) 'উছমান আল-বারদীসী (৪খ, ৪২-৪৪); (১০) মুহাম্মাদ আল-আলফী (৪খ, ২৬-৪৩), 'আলী বে আল-কাবীর ও ইব্‌রাহীম বে আল-কাবীর-এর জন্য প্রবন্ধসমূহ দ্র. (উপরিক্ত, ১, ৩৯১-২; ৩, ৯৯২)। আরও দ্র. ঃ (১১) P. M. Holt, The career of Kucuk Muhammad (1676-74) in Studies in the history of the Near East, London 1973, 231-51; (১২) W. Livingston[6], The rise of Shaykh al-balad 'Ali Bey al-Kabir: a study in the accuracy of the chronicle of al-Jabarti, in BSOAS, xxxiii (1970), 283-94।

P. M. Holt (E. I.[2])/ মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন

কায্‌ফ (قذف) ঃ ('আ) অবিবাহিত নর-নারী অথবা বিবাহিত ও অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের যৌনসঙ্গম [যিনা দ্র.]-এর অথবা অবৈধ জন্মের অপবাদপূর্ণ অভিযোগ। শেযোক্ত ক্ষেত্রে উহা কাহারও জননীকে অবৈধ যৌন মিলনের দায়ে অভিযুক্ত করার শামিল। দোষী পক্ষকে কুরআন (২৪ ঃ ৪) নির্দেশিত আশি কশাঘাত শাস্তি (হাদ্দ) দেওয়া হয়। কোনও ক্রীতদাস একই অপরাধে অপরাধী হইলে সে ফিক্‌হের সাধারণ নিয়ামানুযায়ী চল্লিশ কশাঘাত শাস্তি পাইয়া থাকে। অধিকাংশ ফাকীহ্-এর মতে কায্‌ফ কেবল তখনই ঘটে যখন অপবাদকারীর ব্যবহৃত বাক্যসমষ্টি সুস্পষ্টভাবে অপবাদকৃত ব্যক্তিকে অবৈধ যৌনসঙ্গম অথবা অবৈধ জন্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত করে। কেবল মালিকী মতাবলম্বীরাই পরোক্ষ অভিযোগ (তা'রীদ) অথবা অতীতে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার অপবাদকে কায্‌ফ গণ্য করেন। ফলে অপরাধের পরিসর অনেকটা সম্প্রসারিত।

এইখানে ইহা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, অধিকাংশ ফুকাহা কায্‌ফ-এর প্রমাণ সম্পর্কে কড়াকড়ি মনোভাব গ্রহণ করেন। ফলে কোনও অভিযোগ কুরআন মুতাবিক দণ্ড দানের উপযোগী না হইলে বিচারক এইরূপ মামলার ক্ষেত্রে তাঁহার বিবেচনা [তা'যীর দ্র.] মতে দোষী পক্ষকে কুরআনের নির্দেশিত (হাদ্দের) পরিবর্তে লঘুতর শাস্তি প্রদান করিতে পারেন (কিন্তু মালিকী ফাকীহদিগের মতে ইহা বেশিও হইতে পারে)। বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক যে কোনও ব্যক্তি সে ক্রীতদাস হউক অথবা স্বাধীন হউক, মুসলিম হউক অথবা অমুসলিম হউক, কায্‌ফ-এর অপরাধে শাস্তি পাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি চারিটি সাক্ষী পেশ করিয়া তাহাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে, তাহারা ব্যতীত ঐসব ব্যক্তি শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে যাহারা জনক (মালিকী অনুসারীরা ছাড়া, যাহারা ব্যতিক্রম স্বীকার করে না) এবং স্বামী, যদি সে তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ বিধিবদ্ধ করার পর লি'আন (দ্র.) পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু অন্য অবস্থায় পারিভাষিক অর্থে কায্‌ফ কেবল তখনই ঘটে যদি অপবাদকৃত ব্যক্তি মুহসান হয়। কায্‌ফ প্রসঙ্গে (অবৈধ যৌনসঙ্গমের মত নয়) এই শব্দসমষ্টি কেবল এমন ব্যক্তির উপরই প্রয়োগ করা হয় যে বালিগ হইয়াছে (মালিকী আইন ছাড়া যাহাতে এমনকি, সাবালকত্ব অর্জিত না হইলেও মানুষকে বেলায়ত সংরক্ষিত অবৈধ জন্মের অভিযোগ হইতে রক্ষা করা হয়, উদাহণস্বরূপ); এই ব্যক্তিকে ভাল মন্দ উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখিতে হইবে, উপরন্তু তাহাকে মুক্ত মুসলিম হইতে হইবে এবং পূর্বে অবৈধ যৌন মিলনের অপরাধে সে দণ্ডিত হইলে চলিবে না। যদি অপবাদকৃত ব্যক্তির মধ্যে উপরে বর্ণিত গুণাবলীর কোনও একটির অভাব থাকে তাহা হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে কেবল তা'যীর পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে— কুরআনের নির্দেশিত হাদ্দ অনুযায়ী নহে।

শাস্তি প্রদানের সময়ে অপবাদকৃত ব্যক্তিকে যে জীবিতই থাকিতে হইবে—উহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। অধিকাংশ ফাকীহ-এর মতে তাহার সকল ওয়ারিছ অথবা তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (সংখ্যালঘিষ্ঠদের মতানুসারে) কায্'ফ-এর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির জন্য আদালতের কার্যক্রম দাবী করিতে পারে এই শর্তে যে, অপবাদকৃত ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় এইরূপ কার্য করে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিক্হ-এর সকল গ্রন্থেই কায্ফ-এর উপর একটি অধ্যায় আছে। দেখুন উদাহরণস্বরূপ কাসানী, বাদা'ঈ' ওয়াস-সানা'ই', ১৩২৭ হি., ১৭ খ, ৪০-৬৫; (২) খালীল ইব্ন ইসহাক, মুখ্তাসার, অনু. Bousquet, আলিজিয়ার্স ১৯৬২ খৃ., ৪খ, ৫০-১; (৩) বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে তুলনা করার জন্য, আহমাদ ফাত্হী বাহ্নাসী, আল-জারা'ইম ফি'লফিক্হি'ল-ইসলামী, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ১২৩ প.; (৪) L. Bercher, Les Delits et les peines de droit commun prevus par le Coran, Tunis 1926, 119-28; (৫) J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford 1964, 179.; (৬) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ৩১৭।

Y. Linant de Bellefonds (E. I.[2])/মুহাম্মদ নওয়াব আলী

কায্ফ (قـذف) ঃ শাব্দিক অর্থ 'নিক্ষেপ করা' বা 'ছুঁড়িয়া মারা'। কুরআন মাজীদে মোট আট স্থানে বিভিন্ন ক্রিয়াপদে শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন اقْذِفِيْهِ "তাহাকে নিক্ষেপ কর (ভাসাইয়া দাও)" (২০ ঃ ৩৯); فَـقَـذَفْنٰـهَـا "আমরা উহা নিক্ষেপ করিলাম" (২ ঃ ৮৭); وَيُقْـذَفُـوْنَ مِنْ كُلِّ جَـانِبٍ "উহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে" (৩৭ ঃ ৮); وَقَـذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ "এবং তিনি তাহাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ (সঞ্চার) করিলেন" (৩৩ ঃ ২৬; দ্র. ৫৯ ঃ ২; আরও দ্র. ২১ ঃ ১৮, ৩৪ ঃ ৪৮, ৩৪ ঃ ৫৩)।

হাদীছ শরীফেও শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

يكون فى اخر امتى خسف ومسخ وقذف .

"আমার উম্মতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধ্বস, দেহাবয়ব বিকৃতি ও প্রস্তর-বৃষ্টি বর্ষিত হইবে" (ইব্ন মাজা, কিতাবুল ফিতান, বাব ২৯, নং ৪০৫৯-৪০৬২)।

ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر .

"পাথর নিক্ষেপের পরিমাণ দূরত্ব দিয়া অতিক্রম করিলে কোন ক্ষতি নাই" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস-সালাত, বাব ১০৯, নং ৭০৪; একই অর্থের জন্য দ্র. মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ১৭০, নং ২১৮২৭)।

আইনের পরিভাষায়, "কোন বালেগ ও বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপর বালেগ ও বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাহা চারিজন বালেগ ও বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলে উক্ত অভিযোগকে কায্ফ বলে"।

ইসলামী আইনে ইহা দণ্ডযোগ্য একটি গুরুতর অপরাধ। কুরআন মাজীদে এই অপরাধ 'কায্ফ' শব্দের পরিবর্তে 'রাম্য়ূন' (নিক্ষেপ)-এর ক্রিয়াবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

"যাহারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (যেনার) অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদেরকে আশিটি 'কোড়া' মার এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, তাহারা ফাসেক" (২৪ ঃ ৪)।

মহানবী (স) বলেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ .... وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধকর্ম হইতে বিরত থাক। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেইগুলি কি কি? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত শরীক স্থির করা ... সরলমনা সতী-সাধ্বী মু'মিন নারীগণের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করা" (বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাব ২৩, নং ২৭৬৬, আরও দ্র. নং ৫৭৬৪, ৬৮৫৭; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ৩৮, নং ২৬২/১৪৫; আবূ দাউদ, ওয়াসায়া, বাব ১০, নং ২৮৭৪; নাসাঈ, ওয়াসায়া, বাব ১২, নং ৩৭০১)।

وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّوْرِ وَاَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ .

"তিনি আমাদেরকে গর্হিত কর্মে লিপ্ত হইতে, মিথ্যা কথা বলিতে, ইয়াতীমের সম্পদ হরণ করিতে এবং সতি-সাধ্বী নারীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন" (মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ২০২, নং ১৭৪০, ৫খ, পৃ. ২৯১, নং ২২৮৬৫; উম্মু সালামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। নাজ্জাশীর দরবারে জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর দীর্ঘ ভাষণের অংশবিশেষ)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-র প্রতি অনুরূপ অপবাদ রটনার প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং তদনুযায়ী অভিযুক্তদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়। অপবাদ আরোপের ধরনের দিক হইতে উহা তিন পর্যায়ভুক্ত। (১) সারীহ (صريح) অর্থাৎ স্পষ্ট বাক্যে অপবাদ আরোপ, যাহার যেনা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ গ্রহণের সুযোগ নাই। (২) কিনায়া (كناية) অর্থাৎ ইশারা-ইঙ্গিতে যেনার অপবাদ আরোপ। যেমন অমুক নারী কোন পুরুষের স্পর্শই প্রত্যাখ্যান করে না। (৩) তা'রীদ (تعريض) অর্থাৎ কটাক্ষ করিয়া যেনার অপবাদ আরোপ। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষকে বলিল, আমার মাতা ব্যভিচারিণী নহে (امى ليست بزانية), ইহার দ্বারা সে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, বরং তোমার মাতা ব্যভিচারিণী (হাশিয়া ইব্ন আবিদীন আশ-শামী, ৩খ, পৃ. ১৯১)।

কেবল স্পষ্ট বাক্যে (صريح) যেনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রেই হদ্দ কার্যকর হইবে। যাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় সে মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমান, স্বাধীন ও ইতিপূর্বে যেনার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় নাই এই প্রকৃতির কোন নারী বা পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হইলে (আল-বাদাইওয়াস সানাই, ৭খ, পৃ. ৪০) এবং কোন বালেগ, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, গোলাম, মুসলিম বা অমুসলিম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাহার বিরুদ্ধে উক্তরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিলে তাহা হদ্দের আওতাভুক্ত কায্ফ গণ্য হইবে (আল-মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যা, শিরো. কায্ফ, পৃ. ১১)।

চারিজন মুসলিম পুরুষ লোকের চাক্ষুস সাক্ষ্যের দ্বারা আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অবস্থাভেদে (বিবাহিত/অবিবাহিত) যেনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তি ভোগ করিবে। অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে অভিযোগ উত্থাপনকারীগণ দণ্ডিত হইবে এবং প্রত্যেকে আশি বেত্রদণ্ড ভোগ করিবে" (দ্র. ২৪ ঃ ৪ ও ১৩)। সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-র প্রতি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তাহা প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগ উত্থাপনকারীগণ উপরোক্ত দণ্ড ভোগ করে (দ্র. ২৪ ঃ ১১-২০;

আরো দ্র. ইব্‌ন মাজা, হুদূদ, বাব হাদ্দিল-কায্‌ফ, নং ২৫৫৭; আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ফী হাদ্দিল-কায্‌ফ, নং ৪৪৭৪-৫১)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাত আমলেও অনুরূপ একটি মোকদ্দমা তাঁহার দরবারে দায়ের করা হয়। চারিজন সাক্ষীর দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি অবশিষ্ট তিনজন সাক্ষীকে বেত্রাঘাত করেন (বুখারী, শাহাদাত, বাব শাহাদাতিল কাযিফ...-এর অধীন ভাষ্য)।

কাহারও প্রতি যেনার অভিযোগ উত্থাপনের পর সে যদি স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে দোষ স্বীকার করে তাহাতেও অপরাধ প্রমাণিত হইবে এবং এক্ষেত্রে তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হইবে না" (ফাতহুল কাদীর, ৪খ, পৃ. ১৯৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, ২খ, পৃ. ১৩২; মুগনী আল-মুহতাজ, ৪খ, পৃ. ১৫৭)।

শাফিঈ ও হাম্বালী মতানুসারে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অপবাদ আরোপকারীদেরকে ক্ষমা করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে না। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর অভিমতও তাই। আদালতে মোকদ্দমা দায়েরের আগে বা পরে যে কোন সময় এই ক্ষমা ঘোষিত হইতে পারে। হানাফী মাযহাব মতে এই ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ক্ষমা কার্যকর হইবে না। মালিকী মাযহাবমতে মোকদ্দমা দায়েরের পর ক্ষমা করিলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে না (আল-বাদাই' ওয়াস-সানাই, ৭খ, পৃ. ৫৬; হাশিয়া ইব্‌ন আবিদীন, ৩খ, পৃ. ১৮২; রাওদাতুত-তালিবীন, ১০খ, পৃ. ১০৬-৭; আল-মুগনী, ৮খ, পৃ. ২১৭; তাবসিরাতুল হুক্কাম, ২খ, পৃ. ১৮২)।

ব্যভিচারজাত ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করা হইলে এবং তাহা প্রমাণিত না হইলে অপবাদ উত্থাপনকারী হদ্দ-এর আওতায় দণ্ডযোগ্য হইবে। কেননা ব্যভিচারজাত হওয়ার জন্য সে দোষী নয় এবং সে মুহসান (দ্র.) গণ্য হইবে (আল-মাবসূত, ৯খ, পৃ. ১২৭; কাশশাফুল কিনা, ৬খ, পৃ. ১০৬)।

একইভাবে লি'আনকারিণী বা তাহার (দ্র. লি'আন) সন্তানের প্রতি উক্ত অভিযোগ আরোপ করিলে এবং তাহা প্রমাণিত না হইলে অভিযোগ উত্থাপনকারী হদ্দ-এর আওতায় দণ্ডিত হইবে। ইহা ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র)-র অভিমত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, "মহানবী (স) লি'আনকারিণী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, লি'আনকারিণী ও তাহার সন্তানের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করা যাইবে না। কেহ তাহার প্রতি বা তাহার সন্তানের প্রতি উক্ত অপবাদ নিক্ষেপ করিলে সে হদ্দ-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে" (আবূ দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাব ফিল-লি'আন, নং ২২৫৬)।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র)-এর মতে সে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে। কারণ তাহাদের মতে লি'আনকারিণী মুহসান নহে (আল-মুগনী, ১০খ, ২২৫; ফাতহুল কাদীর, ৪খ, পৃ. ২০৩; আল-মুদাওয়ানাতুল-কুবরা, ৬খ, পৃ. ৩৪)।

মৃত ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ নিক্ষেপ করা হইলে, সে নারী বা পুরুষ যাহাই হউক, এবং তাহার ওয়ারিসগণ বিচার দাবি করিলে, অপবাদ আরোপকারী হদ্দ-এর আওতায় দণ্ডযোগ্য হইবে— যদি সে অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারে। ইহা জমহূরের অভিমত। হাম্বালী মাযহাবমতে মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলেই এবং তাহার পুত্রসন্তান থাকিলে তাহার দাবির ভিত্তিতেই কেবল অভিযোগকারী দণ্ডযোগ্য হইবে (আল-মাবসূত, ৯খ, পৃ. ১১২; আল-মুগনী, ৮খ, পৃ. ২৩৩-৪)। কেহ মহানবী (স), তাঁহার মাতা এবং অপর কোন নবীর প্রতি উক্তরূপ অপবাদ আরোপ করিলে সে ধর্মত্যাগী (দ্র. মুরতাদ) গণ্য হইবে এবং তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সে তাওবা করিলে অথবা (কাফিরের বেলায়) ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না (আল-মুগনী, ৮খ, পৃ. ২৩৩; আল-ইকনা', ৪খ, পৃ. ২৬৫; হাশিয়া ইব্‌ন আবিদীন, ৩খ, পৃ. ২৯০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, ২খ, পৃ. ২৮০)।

কিনায়া (ইশারা-ইঙ্গিতে) অথবা তা'রীদ (কটাক্ষ) করিয়া যেনার অপবাদ আরোপ করা হইলে ক্ষেত্রবিশেষে তাহা হদ্দ-এর আওতায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা'যীর (দ্র.)-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে।

মালিকী ও শাফি'ঈ ফকীহগণের মতে ইশারা-ইঙ্গিতে বা কটাক্ষ করিয়া কেহ অপর ব্যক্তির উপর যেনার অপবাদ আরোপের পর তাহা অস্বীকার করিলে শপথসহ তাহার অস্বীকৃতি বিশ্বাসযোগ্য হইবে। অধিকাংশ শাফি'ঈ ফকীহ-এর মতে সে তা'যীর-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে। আর মালিকী ফকীহগণের মতে শপথ করিতে অস্বীকার করিলেই সে শাস্তিযোগ্য হইবে। হানাফী ও হাম্বালী ফকীহগণের মতেও অপবাদ রটনাকারী তা'যীর-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে, কিন্তু তাহাকে শপথ করানোর প্রয়োজন নাই (আল-মুগনী আল-মুহতাজ, ৩খ, পৃ. ৩৬৯; আল-মাবসূত, ৯খ, পৃ. ১১৯; আল-মুগনী, ৮খ, পৃ. ২২১-২; কাশশাফুল কিনা, ৬খ, পৃ. ১১০)।

কোন ব্যক্তি পাগল, নাবালেগ, যে নারী খৃস্ট ধর্ম বা অন্য ধর্মের অনুসারী থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করিয়াছে, যে মুসলিম নারী বা পুরুষ বাস্তবেই যেনায় লিপ্ত, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের মাতা প্রমুখ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করিলে অপবাদ উত্থাপনকারী তা'যীর-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে (আল-মুগনী, ১০খ, পৃ. ২০২; আল-মাবসূত, ৯খ, পৃ. ১১৮; শারহু ফাতহিল কাদির, ৪খ, পৃ. ২০৩)। একইভাবে কাফের নারী-পুরুষকে যেনার অপবাদ দিলে অপবাদ আরোপকারী তা'যীর-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে (আল-হিদায়া, ২খ, পৃ. ৮৭; আল-মুগনী, ১০খ, পৃ. ২০২; আল-মাবসূত, ৯খ, পৃ. ১১৮)।

কায্‌ফ-এর দণ্ড ভোগকারীর সাক্ষ্য কখনও গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, আবূ য়ূসুফ, মুহাম্মাদ, যুফার (র) প্রমুখের অভিমত। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা করিয়া পরবর্তীকালে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয় তবে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহ্‌মাদ (র)-এর মতে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে (তাফসীর গ্রন্থাবলীতে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আন-নূর-এর সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং তাফসীর গ্রন্থাবলীতে উহার ব্যাখ্যা, বিশেষত তাফহীমুল কুরআনে উক্ত আয়াতের অধীন ৬ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা দ্র.; (২) ইব্‌ন মাজা (মাওসূআতুল হাদীছ আশ-শারীফ, ৩য় সং., রিয়াদ ১৪২১/২০০০); (৩) মুসনাদ আহ্‌মাদ, রিয়াদ সং. (৬ খণ্ড একত্রে), ১৪১৯/১৯৯৮; (৪) সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ, সুনান আন-নাসাঈ, রিয়াদ সং.; (৫) বিস্তারিত অবগতির জন্য ফিক্‌হ-এর গ্রন্থাবলীতে কিতাবুল হুদূদ-এ যিনা অনুচ্ছেদ-এর কায্‌ফ উপ-অনুচ্ছেদ দ্র.।

মুহাম্মদ মূসা

কাযবীন (قـزويـن) ঃ উত্তর ইরানের কেন্দ্রীয় প্রদেশের অন্তর্গত একটি জিলা ও শহর, তেহরানের উত্তর-পশ্চিমে ও গীলানের (জীলান) দক্ষিণে অবস্থিত। শহরটি ৩৬°১৫ উত্তর দ্রাঘিমাংশ ও ৫০° পূর্ব অক্ষাংশে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,১৬৫ ফুট উচ্চতায় তেহরান হইতে প্রায় ৯০ মাইল দূরে বিস্তীর্ণ পলিসঞ্চিত সমভূমির প্রান্তে অবস্থিত। ইহার প্রায় ৫ মাইল উত্তরে আলবুর্য পর্বতশ্রেণী। বর্তমান শহরটি ২য় শাপূর কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন শহরের উপরে নির্মিত। সেই প্রাচীন শহরটিও আবার জনশ্রুতি অনুসারে তৎপূর্বে শাপূর ইবন আরদাশীর কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন অপর একটি শহরের উপরে নির্মিত হইয়াছিল (হামদুল্লাহ মুসতাওফী, তা'রীখ-ই গুযীদা, সম্পা. E. G. Browne এবং R. A. Nicholson, ১৯১০-১৩ খৃ. পৃ. ৮৩০, ফরাসী অনু. Barbier de Meynard, Description historique de la ville de Kazvin, in JA., ১৮৫৭ খৃ.)। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৮১,০০০ এবং ১৯৮২ খৃ. ছিল ২,৪৪,২৬৫। কাযবীন জাতীয় মহাসড়ক, কয়েকটি বড় সড়ক ও রেলপথ দ্বারা দেশের রাজধানী তেহরানের সঙ্গে যুক্ত; এখানে একটি বিমান বন্দরও রহিয়াছে।

১। ভূগোল ও ইতিহাস ঃ কাযবীন উহার উত্তরে অবস্থিত তাবারিস্তান হইতে রাশতগামী গিরিপথসমূহ এবং কাস্পিয়ান সাগরের মুখামুখি স্থানে অবস্থিত। আবার রাশ্ত হইতে তেহরান ও তাবরীয হইতে তেহরানগামী সড়কেরও সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। কাযবীন হইতে হামাদান ও কুম্ম পর্যন্তও রাস্তা গিয়াছে। উনিশ শতকে কাযবীন হইতে তেহরান পর্যন্ত চারিটি রাস্তা ছিল, তিনটি রাস্তা খচ্চরে আরোহিগণ ব্যবহার করিত আর একটি ব্যবহার করিত চাপা-এর আরোহিগণ (সাফারনামাহ-ই মীর্যা হুসায়ন ফারাহানী, সম্পা. এইচ. ফারমা-ফারমাইন, ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৯-১০)। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৪°৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর শীতকালে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৫°৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৩৯.১ মিলিমিটার, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায়ই বরফ পড়ে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগে কাযবীন কখনই রায়, নীশাপুর বা ইসফাহানের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। উহার অন্যতম কারণ পানির অভাব, যাহা শহরটির অগ্রগতির ক্ষেত্রেও গুরুতর বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইসতাখরী বলেন যে, কাযবীনে শুধু পান করিবার জন্য যথেষ্ট পানি মওজুদ থাকিত। সেই পানি বৃষ্টিপাত হইতে ও একটি কানাত বা ঝর্ণা হইতে সরবরাহ হইত (মাসালিকু'ল-মামালিক, লাইডেন ১৯২৭ খৃ. পৃ. ২০১)। সাম্প্রতিক কালের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাযবীন সমভূমিতে পানি সিঞ্চন ও পানি প্রবাহের উৎস ছিল কানাতসমূহ ও চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী (আরও দ্র. মুহাম্মাদ) 'আলী গুলরীয, মীনূ দারয়া বাবু'ল-জান্নাতি কাযবীন, তেহরান ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৫৯ এবং সাফারনামাই-ই মীর্যা হুসায়ন ফারহানী)। হাম্দুল্লাহ্ মুসতাওফী বলেন যে, এই স্রোতস্বিনীগুলি প্রবাহিত হইত বসন্তকালে, ভাল মৌসুমে এই সকল নদীর পানি কাযবীনের বাগান সিঞ্চন করিত, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কদাচিৎ শহরে পানি পৌঁছাইতে পারিত। অধিকাংশ পানি উজানের কৃষিভূমিতে সেচের জন্য ব্যবহৃত হইত (নুযহা, ফার্সী মূল পাঠ, খৃ. ২২২)। ১৯৬৩ খৃ. এই অঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিকার্যের অগ্রগতি সাধনের জন্য কাযবীন উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হয়। (দ্র. A. K. S. Lambton, The Persian land reform 1962-1966, অক্সফোর্ড ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ২৮১।

কাযবীন ভূমিকম্প এলাকাতে অবস্থিত বলিয়া কয়েকবারই ভূমিকম্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই শহরে ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয় ২৪৯/৮৬৩-৪, ৩৬০/৯৭০-১, ৫১৩/১১১৯-২০ (গুলারীয্ পৃ. ৮৭২-৩), ৫১৪/১১২০ (N. N. Ambraseys, On the seismicity of south-west Asia, তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে খৃ. ১৫শ শতকের একখানি আরবী পাণ্ডুলিপি হইতে, Rev. pour l'etude des calamites-এ প্রকাশিত, সংখ্যা ৩৭, জেনেভা ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১০)। এবং ৫৬২/১১৬৯ সালে (Chardin, The travels of Sir John Chardin, লন্ডন ১৬৯১ খৃ., পৃ. ৩৮২)। James Morier এই শহরের উপর দিয়া ১৮০৯ খৃ. অতিক্রমকালে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লেখেন যে, বেশ সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত এক ভূমিকম্পের ফলে শহরটি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। (A journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople, লন্ডন ১৮১২ খৃ., পৃ. ২৫৪)। ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে তালিকান ৮৮৯/১৪৮৪-৫ সালে, রূদবার ৯৫৬/১৫৪৯-৫০ সালে (গুলরীয, পৃ. ৮৭৩) এবং কাযবীন সমভূমির দক্ষিণাংশ ১৯৬২ খৃ. [N. N. Ambraseys, The Buyin-zara (Iran) earthquake of September 1962, a field report, Bull. of the seismological society of America-তে প্রকাশিত, ৫৩/৪ (জুলাই ১৯৬৩), পৃ. ৭০৫-৪০]। বন্যার ফলে শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৯৫৬/১৫৫৭-৮ এবং ১২৬৭/১৮৫০-১ সনে (গুলরীয, পৃ. ৮৭৪)। সেখানে ১০৪৫/১৬৩৫-৬ সনে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কয়েকবারই কলেরা দেখা দেয় (গুলরীয, পৃ. ৮৭৬)।

হাম্দুল্লাহ্ মুসতাওফী বলেন যে, এই শহরের চতুর্দিকে ফল-ফুলের ও আঙুর বাগান ছিল প্রচুর। সেইগুলিতে অতি সুস্বাদু আঙ্গুর, বাদাম ও পেস্তা প্রচুর উৎপাদিত হইত। বিপুল পরিমাণ কিসমিস রফতানী হইত। একবার যমীনে বন্যা হইয়া গেলে খরবুজা ও তরমুজের চাষ করা হইত। পুনঃ পানিসেচ ব্যতীত তথায় চমৎকার ফল উৎপন্ন হইত। খাদ্যশস্যও যথেষ্ট উৎপাদিত হইত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে উত্তম চারণভূমি ছিল। তিনি বলেন যে, উষ্ট্রের খাদ্য হিসাবে তথাকার চারণভূমিতে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ভাল তৃণ জন্মাইত এবং কাযবীনে উষ্ট্রের মূল্য অন্যান্য স্থানের উষ্ট্র অপেক্ষা অধিক ছিল (নুযহা, পৃ. ৫৮, ২২২)। বর্তমান সময়ে কাযবীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শাল নামক একটি জনপদ এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতের ভেড়া পালিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এখানে নানারূপ বস্ত্র বয়ন করা হইয়া আসিতেছে, যদিও মানের দিক বিবেচনা করিলে এই বস্ত্র ঠিক ইসফাহান, কাশান কিংবা কিরামানের বস্ত্রের সমতুল্য নহে।

কাযবীনের সীমানা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইসলামী আমলে খলীফা হারূনু'র-রাশীদ সর্বপ্রথম ইহাকে একটি প্রাদেশিক শহরের মর্যাদা দেন এবং এতদসহ বাশারিয়্যাত ও দাশ্তবী জিলার অংশবিশেষ (যাহা পূর্বে হামাদানের অন্তর্ভুক্ত ছিল) আবহার্রূদ এবং কাকযানের একাংশ যুক্ত করিয়া দেন (তা'রীখ-ই গুযীদা, খৃ. ৮৩৩)। ২৮৪/৮৯৭-৮ সনে খারাকান কাযবীনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন উহার অন্তর্গত ছিল ৭৬৫টি গ্রাম (ইবনু'ল-ফাকীহ, কিতাবু'ল-বুলদান, লাইডেন ১৮৮৫ খৃ.;

ফরাসী অনু. H. Masse, Abrege du livre des pays, দামিশক ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ২৮৯) এবং খলীফা আল-মু'তাসিম-এর আমলে নাসা ও সালকানরূদ-ও হামাদান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় (ঐ, পৃ. ২৮০)। ৮ম/১৪শ শতকে কাযবীনের অন্তর্গত ছিল মাত্র ৩০০টি গ্রাম এবং ইহা ৮টি জিলা বা নাহিয়ায় বিভক্ত ছিল (নুযহা, পৃ. ৫৯)। Don Juan ১৬০২-৩ খৃ. লিখিয়াছেন যে, কাযবীন প্রদেশে ২০টি প্রাচীরবেষ্টিত শহর ও ১০০০ উন্মুক্ত গ্রাম ছিল (Don Juan of Persia, অনু. ও সম্পা. G. Le Strange, লন্ডন ১৯২৬ খৃ., ৪০)। ১৮৮৪ খৃ. ইহা ১১টি বুলুক লইয়া গঠিত ছিল, যথা খাররূদ (দূদান্গা), কূহপায়া (কূহপায়া), আব্হার্‌রূদ, বাশারিয়্যাত, ইকবাল, ফিশকিলদার্‌রা (পিশকিলদার্‌রা) দাশ্তাবী (দাশ্তবী), কাকাযান, রামান্দ ও আফ্‌শারিয়্যা। আর রূদবার (যেখানে আলামূত অবস্থিত) ছিল ইহার আশ্রিত অঞ্চলগুলির অন্যতম (সাফারনামাহ-ই মীর্যা হুসায়ন ফারাহানী, পৃ. ২৪-২৫)। আধুনিক কালে কাযবীন ৬টি জিলা (বাখ্শ) দ্বারা গঠিত একটি শাহরিস্তান; অর্থাৎ শহর এলাকা লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় জিলা, আব য়াক (উপজিলা বা ফিশকিলদার্‌রার, জিহিস্তান, কূহপায়া ও বাশারিয়্যাত লইয়া গঠিত), মু'আল্লিম কালায়া (উপজিলা রূদবার ও আলামূত); দিয়্যা 'আবাদ (উপজিলা কাকাযান ও দূদান্গা); আভিজ (উপ-জিলা পূর্ব ও পশ্চিমে খারাকান ও আফ্‌শারিয়্যা) এবং বুইন (উপজিলা যাহ্‌রা, দাশতাবী ও রামান্দ)।

বর্তমানে কাযবীনের অধিবাসীগণ প্রধানত তুর্কীভাষী। তাহার কারণ মঙ্গোল শাসনামলে বিপুল সংখ্যক তুর্কীবংশীয় জনগণ এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল (নিম্নে দেখুন)। যাহ্‌রা জিলাতে জনগণ তাতী ভাষায় কথা বলে (জালাল আল-আহমাদ, তাতানিশীনহা-য়ি বুলুক-ই যাহ্‌রা, তেহরান ১৯৫৯ খৃ.)। বিভিন্ন গোত্রীয় লোক যাহাদের মধ্যে অনেকই সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্ধ যাযাবর শ্রেণীর ছিল বিভিন্ন জিলাতে বসবাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে ইনানলূ ও বাগদাদী শাহ্‌সিভান গোত্রীয়গণ, যাহারা ১৮ শতকের শেষভাগে খারাকান ও সাভাতে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তখন আকা মুহাম্মাদ খান কাজার তাহাদিগকে বর্তমান স্থানসমূহে স্থানীয়ভাবে বসবাস করান। ঈনানলূগণের শীতকালীন বাসস্থান ছিল সাওজ বুলাগ, যারান্দ ও যাহ্‌রার মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে এবং গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান ছিল খারাকানে। বাগদাদী শাহসিভানগণ শীতকাল তেহরানের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে কাটাইত এবং কুম্ম সুলতানাবাদ (আরাক) সাভা ও তেহরানের মধ্যবর্তী জিলাতে। আর গ্রীষ্মকাল কাটাইত খারাকান ও খালাজিস্তানে (হামাদান) এবং খামসার সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত। কাযবীনের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে রহিয়াছে লাক, চিগিনী, গিয়াছভান্দ, কাকাভান্দ, জালীলাভান্দ, রাশভান্দ, মাফী বাহতূ'ঈ চুমুশগাযাক ও কালহূর। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের দিকে রিদা শাহ দেশান্তর গমন বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের পরে পুনরায় তাহা শুরু হয় (গুলরীয, পৃ. ৮৫৩ প., পারভায ভারজাবন্দ, সারযামীন-ই কাযবীন, তেহরান ১৯৭০ খৃ. পৃ. ৪৬০)। শাহ্‌সিভানগণের মধ্যে কিছু কিছু এখন রামান্দ, যাহরা, খারাকান ও আফশারিয়্যাতে বসতি স্থাপন করিয়াছে, সে সব স্থানে উহারা পশু পালন ও কৃষিকার্য করে (সারযামীন-ই কাযবীন, পৃ. ৪৬৩)।

সাসানীগণের শাসনকালে কাযবীন একটি সীমান্তবর্তী শহর ছিল। এখানকার ছাউনীর সৈন্যগণ দায়লামীগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নিয়োজিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে ইহা সম্ভবত কাযবীনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, যদি ও মুকাদ্দাসী বলিয়াছেন যে, এই স্থান ছিল ফিকহ ও হিকমাশাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্রস্বরূপ (আহসানু'ত-তাকাসীম, সম্পা de Goeje, লাইডেন ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৩৯২)।

হযরত 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাতকালে কাযবীন ইসলামী সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। ২৪/৬৪৪ সনে আলবারা' ইব্‌ন আযিব (রা) এবং যায়দ ইব্‌নু'ল-জাবাল আত-তা'ঈ ইহা অধিকার করেন। আল-বারা' যখন কাযবীন দুর্গ অবরোধ করেন জনগণ তখন শান্তি (সুলহ) চুক্তির আবেদন জানায়। আবহারের জনগণের সহিত যে শর্তে চুক্তি করা হইয়াছিল, কাযবীনবাসিগণকেও সেই শর্ত মানিয়া লইতে বলা হয়। জিয্‌য়া কর দিতে অনিচ্ছুক অধিবাসিগণ তখন ইসলাম কবূল করে। আল-বারা' (রা) তাঁহার সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই জিলাতে তুলায়হা আল-আসাদীকে ভাতা প্রদান করেন। তাহারা সংখ্যায় বহু গুণ বৃদ্ধি পায় এবং যে ভূ-সম্পদ লাভ করিয়াছিল তাহাদের উত্তরাধিকারগণের নিকট হস্তান্তর করিয়া যায়। ইব্‌নু'ল-ফাকীহ বলেন যে, সেই বংশধরগণ দুই শত বৎসর পরেও উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে এবং সেইজন্য সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহাদের সেই মালিকানা দলীলও ছিল। কাযবীন হইতে আল-বারা' দায়লাম ও গীলানে (জিলান) অভিযান পরিচালনা করেন এবং যানজানও দখল করেন। সা'দ ইব্‌নু'ল-আস যিনি আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উকবার উত্তরাধিকারীরূপে কূফার গভর্ণর হন—তিনিও দায়লামে অভিযান করেন এবং কাযবীনে একটি শহর নির্মাণ করেন। হাজ্জাজ উমায়্যা খিলাফাতকালে পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত হইলে স্বীয় পুত্র মুহাম্মাদকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের শাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে যাযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব, কুতায়বা" ইব্‌ন মুসলিম ও নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যারও কাযবীনের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কাযবীনে দ্বিতীয় আর একটি শহর নির্মাণ করেন মূসা আল-হাদী। সেই শহর তিনি সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-আস (রা) কর্তৃক নির্মিত শহরটির পার্শ্বেই স্থাপন করিয়া মদীনা মূসা নাম প্রদান করেন। তিনি নিকটবর্তী রুসতামাবাদ ক্রয় করিয়া এই শহরটির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করিয়া দেন। আল-হাদীর জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মুবারাক তুর্কীও ১৭৬/৭৮২-৩ সনে কাযবীনে অপর একটি শহর নির্মাণ করিয়া নিজ নামানুসারে উহার নামকরণ করেন।

খলীফা হারূনু'র-রাশীদ খুরাসানের পথে কাযবীন অতিক্রমকালে দায়লামীদের আক্রমণের কারণে এখানকার অধিবাসীগণের কঠোর দুর্দশা এবং উহার মুকাবিলায় তাহাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হন। মহানুভব খলীফা তখন তাহাদের খারাজ মাফ করিয়া উহার পরিবর্তে ১০,০০০ দিরহাম বাৎসরিক খাজনা নির্ধারণ করেন। তিনি মূসা ও মুবারাকাবাদের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দেন। সেই নগরপ্রাকার আল-মু'তায্য-এর খিলাফাতকালে সম্পূর্ণ হয়। নির্মাণকার্য মূসা ইব্‌ন বুগা ২৫৪/৮৬৮ সনে সমাধা করেন (দ্র. গুলরীয, পৃ. ১০৫ পৃ.; তিনি রাফি'ঈ রচিত কাযবীনের একখানি ইতিহাস কিতাবু'ত-তাদবীন ফী আখবার কাযবীন পাণ্ডু হইতে তথ্য উদ্ধৃত করেন। উক্ত লেখক ৬২৩/১২২৬ সনে ইনতিকাল করেন। কাযবীনের দেওয়াল সম্বন্ধে সেখানে অতিরিক্ত তথ্যাবলী রহিয়াছে)। খলীফা হারূনু'র-রাশীদ কাযবীনে একটি জামি' মসজিদ নির্মাণ করেন

এবং বিভিন্ন ধরনের সরাইখানা ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ করিয়া সেগুলি ওয়াকফকরত সেই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। আল-কাসিম ইবনু'র-রাশীদ যখন কাযবীন, জুরজান ও তাবারিস্তানের গভর্নর তখন সরকারী খাস জমিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কয়েকজন স্থানীয় জমিদার তালজী'আ চুক্তির মাধ্যমে তাঁহাদের সমুদয় জমি আল-কাসিম-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখেন। চুক্তি অনুযায়ী তাঁহারা সরকারী কোষাগারে 'উশর প্রদান করিতেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাকেও দ্বিতীয় 'উশর প্রদান করিতেন। এইভাবে তাঁহারা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করেন, যদিও জমির মালিকানা সরকারের নামেই থাকে (বালাযুরী, ফুতূহ', পৃ. ৩১০-১১; ইবনু'ল-ফাকীহ, পৃ. ২৮২-২৮৩; তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৮৩০; নুযহা, ৫৮)। জনৈক অজ্ঞাত লেখক রচিত মুজমালু'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, 'আলীপন্থী কাওকাবী এখানে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্রোহ আল-মু'তায্য-এর খিলাফাতকালে মূসা ইব্ন বুগা দমন করেন (সম্পা. মালিকু'শ-শু'আরা, তেহরান ১৯৪০-৪১ খৃ., পৃ.৩৬৩)।

এই সময়ে শহরে প্রধানত আরব অধিবাসিগণই বাস করিত বলিয়া মনে হয়। মূসা ইব্ন বুগা নগর-প্রাচীর সমাপ্ত করিবার পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেইখানে বিভিন্ন গোত্রীয় এবং পরিবারের লোকেরা বাস করিত। তাহাদের প্রায় সকলেই সর্বপ্রথম আরব বসতি-স্থাপনকারিগণের বংশধর বলিয়া দাবী করিত। ইহাদের মধ্যে ছিল সাদাত বংশীয়গণ, যাঁহাদের অধিকাংশই হামদুল্লাহ্ মুসতাওফীর মতে বিনয়, জ্ঞান সাধনা, মহানুভবতা ও ভদ্রতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি লেখেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, কোনরূপ সরকারী ভাতা চাহিতেন না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা পার্থিব ক্ষমতা বা ভোগ-বিলাস হইতে দূরে থাকিয়া নিজেদের স্বাধীন মনোভাব অক্ষুণ্ন রাখেন। আরও পরবর্তীকালে লিখিতে গিয়া খাওয়ান্দামীর বলেন যে, কাযবীনের লোকেরা তাঁহাদের বীরত্ব (মুরুওওয়াত) ও মানবতাবোধের (ইনসানিয়্যাত) জন্য খ্যাত ছিলেন (তা'রীখ-ই হাবীবু'সসিয়ার, তেহরান ১৯৫৪-৫ খৃ., ৪খ, ৬৫৪)।

কাস্পিয়ান প্রদেশসমূহে খিলাফাত ও 'আলী পন্থিগণের মধ্যে সংঘর্ষ চলার কালেও কাযবীন একটি সীমান্ত-শহর হিসাবে স্বীয় গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। আল-মু'তাসিম খলীফা হইলে তিনি দায়লামীগণকে স্বীয় আনুগত্যাধীনে আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি ফাখরুদ্-দাওলা আবূ মানসূর কূফীকে গভর্নররূপে কাযবীনে প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি স্বীয় পুত্রগণের সহায়তায় ২২৩/৮৩৮ সাল হইতে প্রায় বিশ বৎসর যাবত দায়লামীগণের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সংঘর্ষের মুকাবিলা করিয়া গভর্নররূপে সেখানে অবস্থান করেন। ফাখরু'দ্-দাওলা খলীফাগণের পক্ষে সর্বমোট প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল যাবত গভর্নরপদে আসীন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে দুই বৎসর আবার তিনি 'আলীপন্থী হাসান ইবনু'ল-বাকির-এর পক্ষেও গভর্নররূপে শাসন করেন। তিনি ২৫১/৮৬৫-৬ সালে কাযবীন অধিকার করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের জন্য কাযবীন সামানী শাসনাধীনে আসে, যখন ইলয়াস ইবন আহমাদ ২৯৩/৯০৫-৬ সালে উহার গভর্নর ছিলেন। তবে পরবর্তী বৎসরই হামদুল্লাহ মুসতাওফীর পূর্বপুরুষ ফাখরু'দ-দাওলা আবূ 'আলী খলীফার পক্ষে গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সাতাশ বৎসর যাবত শহরটি স্বীয় শাসনাধীনে রাখেন। যদিও ৩০১/৯১৩-১৪ সালে ইহাকে রায়, দীনাওয়ার, যানজান, আব্হার ও তারুম সমবায়ে 'আলী ইবন মুকতাদির-এর সার্বিক কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয় (The eclipse of the 'Abbasid caliphate, সম্পা. H. F. Amedroz ও D. S. Margoliouth, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ., ১খ, ৩৩)। ৩০৪/৯১৬-৭ সালে যূসুফ ইবন আবি'স-সাজ (দ্র. সাজী) কাযবীন অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন (ঐ, ১খ, ৪৫)। কিন্তু আসফার ইবন শীরূয়া (দ্র. আসফার ইবন শীরাওয়ায়হী) তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া নিজে কাযবীন এবং তৎসহ তাবারিস্তান ও গুরগান হইতে কুম্ম ও হামাদান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভ করেন। ৩১৫/৯২৭-৮ সনে আসফার কাযবীনের বহির্ভাগে খলীফা আল-মুকতাদির কর্তৃক প্রেরিত একটি বাহিনী পর্যুদস্ত করেন। সেই যুদ্ধকালে কাযবীনবাসী বহু লোকও খলীফার বাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিল। আসফার তখন নগর অবরোধ করিয়া অনেক অধিবাসীকে হত্যা করেন, নগরেরও বহু ক্ষতি সাধন করেন এবং শহরবাসিগণের উপরে বিরাট জরিমানা চাপাইয়া দেন। পরে মারদাবীজ তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিয়া হত্যা করেন [দ্র. (১) ঐ, ১খ, ১৬১-২ ; (২) মাস'ঊদী, মুরূজু'য-যাহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard, পুনর্মুদ্রণ, তেহরান ১৯৭০ খৃ., ৯খ, ৬, ৯ প.]। পরবর্তীকালে রুকনু'দ-দাওলার নিকট কাযবীনের পতন ঘটে এবং জিলাটি বুওয়ায়হীদের অধীনে এক শত বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত থাকে। ৩৫৮/৯৬৮-৯ সালে শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে রুকনু'দ-দাওলার উযীর আবু'ল-ফাত্হ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন উহা দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি শহরবাসিগণের উপরে ১২,০০,০০০ দিরহাম জরিমানা আরোপ করেন (তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৮৩৭)।

৪২১/১০৩০ সালে কাযবীন গাযনাবী শাসনাধীনে আসে। এই সময় পর্যন্ত হামদুল্লাহ মুসতাওফীর পূর্বপুরুষগণই শহরটির গভর্নর পদে বহাল ছিলেন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু সেই অধিকারের সময়ে এই পরিবার হইতে গভর্নর হইবার উপযোগী কাহাকেও পাওয়া যায় নাই বলিয়াই সম্ভবত গভর্নরের পরিবর্তে তাঁহারা প্রধান কর্মকর্তা (মুস্তাওফী) পদে নিয়োগ লাভ করেন। আনুমানিক ৪২৪/১০৩৩-৪ সনে আবূ 'আলী মুহাম্মাদ জা'ফারী গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ প্রায় ষাট বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকেন। এই বংশের শেষ শাসক ফাখরু'ল-মা'আলী আবূ 'আলী শারাফ শাহ ইবন জা'ফারী অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বহু সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। তিনি ৪৮৪/১০৯১-২ সনে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল (তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৮৩৭ প.)।

কাযবীনের সঙ্গে গুয্যগণের প্রথম যোগাযোগ ৪৩০/১০৩৮-৯ সনে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, যখন অধিবাসিগণ ৭,০০০ দীনারের বিনিময়ে গুয্যদিগকে ও দায়লামী ফানা খুসরাও-কে অধীনস্থ হওয়া হইতে রক্ষা করে। দায়লামীরা ৪২৮/১০৩৭ সালে বহু অধিবাসীকে হত্যা করিয়া রায় দখল করিয়াছিল (ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৯খ, ২৬৯-৭১)। নাসি'র-ই খুসরাও ৪৩৮/১০৪৬ সনে কাযবীন ভ্রমণ করিয়া এই বিবরণ প্রদান করেন। এখানে প্রাচীরবিহীন অনেক বাগান ছিল, তথায় সহজেই প্রবেশ করা যাইত। ইহা একটি সুন্দর নগরী। ইহার চতুর্দিকে মযবুত দেওয়াল ও রক্ষাব্যূহসমূহ ছিল। নগরে সুন্দর সুন্দর বাজার ছিল। তবে এখানে

একটি মাত্র ভূ-গর্ভস্থ খাল (কারীয) হইতে স্বল্প পরিমাণ পানি সরবরাহ হইত। নগরপতি (রা'ঈস) একজন 'আলীপন্থী ছিলেন। এখানকার নানা শ্রেণীর কারুশিল্পিগণের মধ্যে জুতার কারিগরেরাই (কাফশগার) সংখ্যায় বেশী ছিল (সাফারনামাহ, সম্পা. C. Schefer, প্যারিস ১৮৮১ খৃ., ফার্সী মূল পাঠ, পৃ. ৪)।

কাযবীন ইসমা'ঈলী দুর্গ আলামূত (দ্র.)-এর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সালজূকগণ ইহাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলিয়া গণ্য করেন নাই ; এখানে কোনও আমীর বা মালিক নিযুক্ত করা হইত না। ইসমা'ঈলীগণ আলামূতে প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্প পরেই আবু'ল-মাহাসিন রূয়ানী কাযবীনীগণকে প্ররোচিত করিয়া এক ফরমান জারী করান যে, আলামূত হইতে আগত যে কোনও ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হইবে, যেহেতু ইসমাঈলীগণের সঙ্গ লাভ করিলে কাযবীনবাসীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পরে (M.G. Hodgson, The Order of the Assassins, দি হেগ ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১২৩)। রূদবার পর্বতের বিভিন্ন স্থানে ইসমা'ঈলীগণের অনেক দুর্গ ছিল। তথা হইতে মাঝে মাঝে আসিয়া তাহারা কাযবীনের উপর অত্যাচার চালাইত। ৫২৩/১১২৯ সনে তাহারা জনৈক ইসমা'ঈলী রাষ্ট্রদূতকে আইনসম্মত বিচার না করিয়া নির্যাতন করিবার কারণে প্রায় ৪০০ কাযবীনীকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত দূত ইসফাহানে মাহমূদ ইবন মুহাম্মাদকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ১০২)। মুহাম্মাদ ইবন বুযুর্গ উমীদ যখন নগরপতি (৫৩২-৫৭/১১৩৮-৬২) তখন ইসমা'ঈলী দুর্গসমূহ হইতে কাযবীনে পুনঃ-পুনঃ আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ করা হইত (ঐ পৃ. ১৪৫)। আরও কিছুকাল পরে ৫৬০/১১৬৫ সালে রূদবারের ইসমা'ঈলীগণ কাযবীনের বহির্ভাগে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথা হইতে তাহারা নগরটিকে প্রায় অবরোধ করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ১৫৮)।

পরবর্তী সালজূক আমলে কাযবীনে বিভিন্ন শাসক ও আমীরগণের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ হয়, তন্মধ্যে ছিলেন তুগরিল ইবন মুহাম্মাদ যিনি সানজার-এর নিকট হইতে ইহার শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. বুনদারী, যুবদাতু'ন-নুসরা ওয়া নুখবাতু'ল-'উসরা, M. Th. Houtsma, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ১৩৪)। খাওয়ারিযম শাহদের আমলে ইসমা'ঈলীদের বিরুদ্ধে কাযবীন হইতে পুনরায় আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। জালালু'দ-দীন হাসান ৬০৭/১২১০ সনে ইসমা'ঈলীগণের নেতা হিসাবে স্বীয় পিতা মুহাম্মাদ-এর স্থলাভিষিক্ত হইলে তিনি ইসলাম কবূল করিয়া 'জালালু'দ-দীন ও সুলায়মান' নামে পরিচিত হন। কাযবীনের অধিবাসিগণ ইসমা'ঈলীদের কপটতা ও ছলচাতুরীর ব্যাপারে ভালভাবেই অবহিত ছিল বলিয়া তাহার দাবী মানিয়া লইতে নিস্পৃহতা প্রকাশ ও প্রমাণ দাবী করে। তিনি সেখানে গিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া তাহাদের মন জয় করিত চেষ্টা করেন এবং কাযবীনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আলামূতে প্রেরণ করিতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁহাদের সম্মুখেই ইসমা'ঈলী গ্রন্থসমূহ পোড়াইয়া ফেলেন (জুওয়ায়নী, তা'রীখ-ই জাহানগুশা, সম্পা. মীর্যা মুহাম্মাদ কাযবীনী, GMS, লণ্ডন ১৯১৬ খৃ., ৩খ, ২৪৩-৪)।

খাওয়ারিযম শাহদের ও মঙ্গোলদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালীন কাযবীন পুনঃপুনঃ হস্ত বদল হয়। অবশেষে খাওয়ারিযম শাহগণ পরাভূত হন। ৬১৭/১২২০ সনে মঙ্গোলগণ কাযবীনের অধিবাসীদিগকে নির্বিচারে হত্যা করে বলিয়া অভিযোগ করা হয় (হামদুল্লাহ মুসতাওফী, জাফারনামাহ, Browne কর্তৃক উদ্ধৃত, ৩খ, ৯৬-৮)। ৬৫১/১২৫৩-৪ সনে মানগূ কা'আন—ইফতিখারু'দ-দীন মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ইমামু'দ-দীন য়াহ্‌য়া ৬৭৭/১২৭৮-৯ সন পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন। ইফতিখারু'দ-দীন মঙ্গোলীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই ভাষায় বিখ্যাত কালীলা ওয়া দিমনা অনুবাদ করেন। গাযান খান-এর শাসনামল (৬৯৪-৭০৩/১২৯৫-১৩০৪)-এর পূর্বে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করা অবস্থায় ঈলখানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় কাযবীন ও ইলচিও অন্যদের অত্যাচারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসমুখী হয়। বহু লোক শহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এইরূপ হয় যে (হামদুল্লাহ মুসতাওফী), শুক্রবার জুমু'আর সালাত আদায় করিবার লোক পর্যন্ত জামা'আতে হইত না (তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৫৯২-৩)। মঙ্গোলরা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পর্যন্ত (পিশকিলদারূরা) কাড়িয়া লয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (নুযহা, পৃ. ৬৭)। উলজায়তূর রাজত্বের (৭০৩-১৬/১৩০৪-১৬) শেষ ভাগে কাযবীনের শাসনভার হুসামু'দ-দীন আমীর 'উমার শীরাযী ও হাজ্জী ফাখরু'দ-দীন আহমাদ মুসতাওফীর উপরে ন্যস্ত হয়। আবূ সা'ঈদ বাহাদুর (৭১৬-৩৬/১৩১৬-৩৫) তাঁহার রাজ্য শাসনের প্রথমভাগে তাঁহার মাতার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কাযবীন শহর নির্ধারণ করিয়া দেন (তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৮৪২)।

কাযবীন প্রদেশের জনসংখ্যা সালজূক আমল অপেক্ষা মঙ্গোল আমলেই বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল কিছু সংখ্যক তুর্কী গোত্রকে সেখানে গিয়া বসবাস করিতে দিবার কারণে, যদিও এই তুর্কীরা নিঃসন্দেহে সালজূক আমলেই সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মনে হয় যে, কাযবীনের বহু বিখ্যাত পরিবার (যে সময়ে হামদুল্লাহ মুসতাওফী তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন) আদিতে আরব ছিলেন বলিয়া দাবী করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশাল জমিদারীর মালিক ছিলেন। তিনি শীরযাদিয়ান নামক একটি পরিবারের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উঁহারা ছিলেন 'মধ্যবিত্ত' (আওসাতু'ন-নাস) এবং তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন মেষপালক। তবে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছিল এবং বেশ কিছু সংখ্যক তুর্কী পরিবার নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কারাভুলান নামক একটি পরিবার অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু হামদুল্লাহ মুসতাওফী যখন তাঁহার গ্রন্থ লিখিতেছিলেন সেই সময়কালের মধ্যে সেই পরিবার নিজেদের সামাজিক মর্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আর একটি পরিবার ছিল বূলাতমূরিয়ান। ইহাদের প্রথম ব্যক্তি আমীর তাকাশ ওগেদো-র আমলে কাযবীনে আসিয়াছিলেন (তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৮৪২)। এখানে শাফি'ঈ মাযহাব-এর প্রাধান্য ছিল। তবে কিছু সংখ্যক হানাফী এবং শী'আও ছিল (নুযহা, পৃ. ৫৭)।

ঈলখানী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটার পর সেই শহরটি দীর্ঘকাল পূর্বেই সীমান্ত শহর হিসাবে সকল বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে। সাফাবী আমল পর্যন্ত কাযবীন-এর ইতিহাস ঘটনাবিহীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। ইতোমধ্যেই ইসমা'ঈল সাফাবী (৯০৭-৩০/১৫০২-২৪)-এর পক্ষে 'উছমানী এবং উযবেক রাজ্য সীমান্ত রক্ষা করা সমস্যা হইয়াছিল। তাঁহার আমলে কাযবীন, আযারবায়জান ও খুরাসানের মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ার কারণে এক নূতন গুরুত্ব লাভ করে। তাহমাসপ-এর শাসনামলে [৯৩০-৮৪/১৫২৪-৭৬) তাবরীয সাময়িকভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধীন চলিয়া যায় ; তখন কাযবীন বহিরাক্রমণের

হাত হইতে একরূপ রক্ষা পায় এবং দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ, যথা আযারবায়জান ও খুরাসানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া ৯২৬/১৫৫৫ সনে পারস্যের রাজধানী হয়। সেই সময় হইতে এই শহরের উপাধি হয় দারু'স-সালতানা। শাহ 'আব্বাস (দ্র.) ইসফাহান-এ নূতন রাজধানী নির্মাণ না করা পর্যন্ত কাযবীনই দেশের রাজধানী ছিল। কাযবীন হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইলেও ইহা কোনও স্বাধীন প্রদেশ ঘোষিত হয় নাই, বরং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক ওয়াযীর, দারোগা, কালানতার ও মুসতাওফী দ্বারা শাসিত হইত। সুলতান হুসায়ন-এর রাজত্বের শেষ ভাগে ইহাকে একটি প্রদেশ করা হয়। একজন বেগলরবেগী ইহার শাসক নিযুক্ত হন এবং তাহ্মাসপ খান নামক জনৈক সামরিক গুলামকে ইহার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাঁহার বেতন (মুদাখিল) হিসাবে পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহ এবং রানকূহ-এর খাজনা (বুজূহাত)-এর উপরে একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। উহার পরিবর্তে তাঁহাকে ৩০০ সৈন্য রাখিতে হইত (দ্র. মীর্যা রাফী'আ, দাস্তূরু'ল-মুলূক, সম্পা. এম.টি. দানিশপাযহূহ, in Rev. de la fac. des letres et des sciences humains, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১৬/১-২, নভেম্বর, ১৯৬৮, পৃ. ৭৫)। সৈন্যদের এই সংখ্যাদৃষ্টে মনে হয় যে, কাযবীন দেশের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহের অন্যতম ছিল না।

অন্য বহু শহরের ন্যায় কাযবীনকেও সাফাবী আমলে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা হায়দারী ও নি'মাতী। Alessandri তাহ্মাসপ-এর আমলে কাযবীন সফর করেন। তিনি সেই দুইটি ভাগের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, এক ভাগে চারিটি জিলা ও অপর ভাগে পাঁচটি জিলা ছিল এবং সেই দুই অংশের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিককাল যাবত শত্রুতা ও রক্তপাত লাগিয়া ছিল (Narrative of the most Noble Vincento d' Alessandri, হাকলুইত, প্রথম সিরিজ, ৪৯, পৃ. ২২৪)। এই দুই অংশের অধিবাসিগণ যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত একযোগে মুহাররাম ও সাফার উৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করিত তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে (গুলরীয, পৃ. ৩৮৬-৭)। মঙ্গোল ও মঙ্গোল-উত্তর যুগে কাযবীন ধর্মীয় গোঁড়ামীর কেন্দ্রস্থল ছিল, যেহেতু ইহার অবস্থান দায়লাম ও পরে আলামূত-এর সন্নিকটে ছিল। যাহা হউক, সালজূক আমলে কাযবীনে একটি শী'আ মহল্লা ছিল (হুসায়ন কারীমান, তাবারসী ওয়া মাজমা'উ'ল-বায়ান, তেহরান ১৯৬২ খৃ., ১খ, ১৪৯) এবং উপরের উল্লেখ অনুযায়ী, হামদুল্লাহ মুসাতাওফীর গ্রন্থ রচনা কালে কাযবীনে কিছু সংখ্যক শী'আ অধিবাসী ছিল (নুযহা, পৃ. ৫৮, তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৮৪৩)। এখানে ব্যাপকভাবে শী'আ মতে দীক্ষিতকরণের কাজটি সম্ভবত সাফাবী আমলের পূর্বে করা হয় নাই। এমনকি তাহার পরেও স্থানীয় বিশিষ্ট পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সুন্নীগণকে দেখা যাইত। উদাহরণস্বরূপ মীর্যা মাখদূম শারীফীর কথা বলা যায়, যিনি ২য় ইসমা'ঈল-এর সুন্নীবাদে দীক্ষিত হইবার কালে সেখানে বসবাস করিতেন (ইসকান্দার মুন্‌শী, 'আলামারা-য়ি 'আব্বাসী, ইসফাহান ১৯৫৬ খৃ., ১খ, পৃ. ১৪৮, ২১৩ প.। আরও দ্র. E. Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safaviden in 16. Jahrhundert nach arabischen Handschriften, Freiburg 1970)। তাহ্মাসপ-এর রাজত্বকালে নুককাবী ধর্মান্ধতা কাযবনে ছড়াইয়া পড়ে। সেখানে উহার নেতা ছিলেন জনৈক দরবেশ খুসরাও। ইসকানদার মুনশীর মতে (জনৈক বিরুদ্ধ দলীয় সাক্ষী) তিনি ছিলেন দারব-ই কূশ্ক মহল্লার একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বর্শাধারী মুকান্নীস ছিলেন। তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া দরবেশ (কালান্দার) হন। কিছুকাল যাবত বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া নুক্কাবীগণের সঙ্গে মেলামেশার পর অবশেষে তিনি কাযবীনে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তাঁহার কিছু অনুসারী হয়। তাঁহার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখিয়া 'উলামা শ্রেণী সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠেন। তাঁহাকে কাফির বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে মসজিদে গিয়া তিনি আস্তানা গড়িয়াছিলেন সেখানে অবস্থান করিতে নিষেধ করা হয়। তিনি তাহমাসপ-এর মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁহার কার্যকলাপ শুরু করিলে পুনরায় তাঁহার অনুসারী জুটিতে থাকে। অবশেষে তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী কাফির বলিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (১০০২/১৫৯৩-৪) (১) 'আলামারা, ১খ, ৪৭৩-৬; (২) গুলরীয, পৃ. ৪৪৪ প.।

তাহমাস্‌প-এর মৃত্যুর পর কাযবীনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বিদ্রোহী তুর্কোমানগণ পরলোকগত শাহ-এর কনিষ্ঠ পুত্রদের অন্যতম তাহমাসপ মীর্যাকে পুতুলস্বরূপ সিংহাসনে বসাইয়া স্বল্পকালের জন্য শহর দখল করিয়া নেয়। ৯৯৪/১৫৯৬ সনের বসন্তকালে হামযা মীর্যা, যিনি 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত তাবরীয শহর অধিকার করিয়াছিলেন, কাযবীনে অভিযান করিয়া তুর্কোমানদের নির্মূল করত তাহমাসপ মীর্যাকে বন্দী করেন এবং এইভাবে বিদ্রোহ দমন করেন। শহরের ক্ষতি অল্পই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। Dan Juan ঘটনার অল্পকাল পরে কাযবীনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "চতুর্দিকের গ্রামাঞ্চল অত্যন্ত উর্বরা। এখানে প্রাচীর ঘেরা বিশাল ফল বাগানসমূহ এবং বৃহৎ বৃহৎ উদ্যান রহিয়াছে। এখানে এক লক্ষ পরিবার (সাড়ে চারি লক্ষের অধিক মানুষ) বাস করে। শহরটির বিশালত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণার জন্য এখানকার মসজিদগুলি বহুবার গণনা করিয়া প্রায় পাঁচশতের অধিক মসজিদ পাইয়াছি। রাজপ্রাসাদ ও রাজপরিবারের বাসস্থানসমূহ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আর এত বিস্তৃত যে, উহার বহির্ভাগ ধরিয়া সোজা প্রায় পোয়া লীগ পর্যন্ত পদব্রজে গমন করা যায়।" Don Juan of Persia, পৃ. ৪০)। Sir Antony Sherley-এর ভ্রমণ সঙ্গী জনৈক ব্যক্তি ১৫৯৮ খৃ. রাজধানী কাযবীনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বর্ণনা অবশ্য এতটা অনুকূল নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে, শুধু কিছু সংখ্যক ভাল মসজিদ ব্যতীত শহরে উল্লেখযোগ্য বলিয়া কিছুই নাই। রাজপ্রাসাদের সদর দরজা অত্যন্ত মযবুত। তাঁহার মতে শহরটি ছিল তদানীন্তন লণ্ডন অপেক্ষা সামান্য ছোট Sir Antony Sherley and his Persian adventure, সম্পা, E. D. Ross, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৫৩)। Antony Sherley-এর ভাই Robert-এর ১৬২৭ খৃ. কাযবীনে মৃত্যু হয়, Sir Dodmore Cotton-ও সেখানেই মারা যান।

পারস্যে Discalced Carmelite-গণের প্রথম সুপিরিয়র Father Paul Simon ১৬০৭ খৃ. লেখেন, "কাযবীন তখন আর রাজধানী নহে, কিন্তু ইহা ছিল ইসফাহানের মত বৃহৎ নগরী। সুন্দর অট্টালিকা, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং বিলাস-ব্যসনের প্রচুর সামগ্রী সেখানে ছিল এবং আমাদের (ইতালীয়) শহরসমূহে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় সেইগুলি সবই এখানে পাওয়া যায়" (A chronicle of the carmelites in Persia, লণ্ডন ১৯৩৯ খৃ., ১খ, ১১৯)। Pietro della Valle ১৬১৮ খৃ. কাযবীনে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজকীয়

আবাসরূপে পরিচয় পাওয়ার মতো কোনও প্রাসাদ এখানে একটিও ছিল না, তবে দুইটি মাত্র দর্শনীয় বস্তু রহিয়াছে। যথা ঃ রাজপ্রাসাদের সদর ফটক ও বিশাল ময়দান।" অপরপক্ষে Sir Thomas Herbert ১৬২৭ খৃ. কাযবীনের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "একমাত্র ইসফাহান ব্যতীত ইহা পারস্যের আর যে কোনও শহরের মতো ঐশ্বর্যময়।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই শহরের দেওয়াল চতুর্দিকে প্রায় সাত মাইল হইবে এবং জনসংখ্যা তিনি ২,০০,০০০ বলিয়া অনুমান করেন (দ্র. Curzon, ১খ, ৩৬)। প্রায় দশ বৎসর পরে Olearius শহরের জনসংখ্যা মাত্র ১,০০,০০০ বলিয়া লিখিয়াছেন (The Travels of Antony Jenkinson, in Early Voyages and Travels to Russia and Persia, Hakluyt, ১ম সিরিজ, ৭২, ১৮৮৬ খৃ., পুনর্মুদ্রণ নিউ ইয়র্ক তা. বি., ১খ, ১৩৪, নং ১)। আর Chardin, যিনি ১৬৭৪ খৃ. সেখানে ছিলেন, শহরের চতুর্দিকের দেওয়াল ভগ্নপ্রায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া শহর সম্বন্ধে বলেন, "একটি ঐশ্বর্যময় রাজসভার যে গৌরব ও মহিমা থাকা উচিত ছিল তাহা সবই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তাঁহার বিবরণ অনুসারে শহরে ১২,০০০ বাড়ী ছিল, জনসংখ্যা ছিল ১,০০,০০০। প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আমীর উমারা'-র প্রাসাদসমূহ, যেইগুলিতে পুরুষানুক্রমে পিতা হইতে পুত্র বাস করিয়া আসিতেছিলেন। Curzon, ১খ, ৩৫-৬)।

সাফাবী আমলে কাযবীন এক সময়ে রাজধানী ছিল। উপরন্তু এই সময়ে দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্য দিয়া য়ুরোপের সঙ্গে বাণিজ্য উন্নয়নেরও প্রচেষ্টাও চলে। ফলে এই আমলে কাযবীনের গুরুত্ব বাড়ে। Antony Jenkinson উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৫৬১ খৃ. কাযবীনে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ গমন করিতেন (The Travels of Antony Jenkinson, ১খ, ১৪৯)। Arthur Edwards, যিনি Muscovy Company-র পক্ষ হইতে কয়েকবার পারস্যে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৫৬৭ খৃ. লিখিয়াছেন যে, কাযবীনে মখমল ও অন্যান্য কারু শিল্প দ্রব্যাদি তৈরী হইত। তবে সেগুলির মান য়ুরোপীয় দ্রব্যাদির মানের সমতুল্য ছিল না। ১৫৬৯ খৃ. তিনি লিখিয়াছেন যে, কাযবীনে নানা রকমের মসলা পাওয়া যাইত। কিন্তু অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলন্ডে যে মানের মসলা পাওয়া যাইত তাহার তুলনায় সেগুলি তেমন কিছু নহে। আর দাম এত বেশী যে, উহা ক্রয় করিয়া বেশি কিছু লাভবান হওয়া যায় না" (Early Voyages and Travels to Russia and Persia, ২খ, ৪০৫)। Sir Antony Sherley-এর প্রতিনিধিদলের বিবরণে জানা যায় যে, কাযবীনে বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী ছিল। তাহাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক মাত্র ধনী ছিল ; বেশ কিছু সংখ্যক কারুশিল্পীও ছিল, যেমন স্বর্ণকার ও পাদুকা কারিগর। উহারা শাগরীন (Segrin) দ্বারা সবুজ, সাদা ও অন্যান্য রঙের যে সকল পাদুকা তৈরী করিত সেগুলি সমগ্র দেশে উন্নত মানের ছিল। কিছু সংখ্যক উস্তাদ কারুশিল্পীও ছিল যাহারা গিল্টি করা এবং রঙীন মিলসই তীর ও ধনুক তৈরী করিত, অন্যান্য কারিগর অত্যন্ত কারুকার্য গিল্টি করা অশ্বের জিন এবং গিল্টি করা রঙীন তীর রাখিবার তূনীর তৈরী করিত (Sir Antony Sherley and his Persian adventure, পৃ. ১৫৩)। পাদ্রী Paul Simon লিখিয়াছেন, "কাযবীনে ব্যবসায়িগণের আনাগোনা প্রায়শই হইত। কারণ সেখানে রেশম গালিচা ও জরির কাপড় প্রচুর পাওয়া যায়" (A chronicle of the carmelites in Persia, ১খ, ১১৯)।

সাফাবী আমলের শেষে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহার ফলে সাময়িকভাবে কাযবীনের সমৃদ্ধি স্থগিত থাকে এবং জনসংখ্যাও বেশ কিছু পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া মনে হয়, সম্ভবত ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটিবার কারণে। আফগান মাহমূদ ইসফাহান জয় করিবার পরে আমানুল্লাহ খান-এর অধীনে প্রায় ৬,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী কাযবীনের উদ্দেশে পাঠান। ১৭২২ খৃ. কাযবীন আত্মসমর্পণ করে। জানুয়ারী ১৭২৩ সালে শহরের গোত্রীয় প্রধানদের (কালানতার) নেতৃত্ব আফগানদের বিরুদ্ধে এক গণবিক্ষোভ (লূতীবাযার) হয়। চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তাহারা ইসফাহানে পশ্চাদপসরণ করে। সেই সংঘর্ষে তাহাদের প্রায় ২,০০০ সৈন্য নিহত হয় বলিয়া বর্ণিত আছে [(১) Sir John Malcolm, History of Persia, লন্ডন, ১৮২৯ খৃ., ১খ, ৪৪৩-৪ ; (২) J. Hanway, An historical account of the British trade Over the Caspian sea, লন্ডন ১৭৬২ খৃ., ২খ, ১৮৮)। ১৭২৬ খৃ. কাযবীন এই শর্তে 'উছমানী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে যে, এই শহরে যে গভর্নর প্রেরিত হইবেন তাঁহার সঙ্গে কোনও সেনাবাহিনী আসিবে না। সেই শর্ত রক্ষিত হয় নাই। 'আলী পাশার অধীনে ১২,০০০ সৈন্য পাঠানো হয় ; কিন্তু স্বল্পকাল পরেই সেই সেনাদলকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর কাযবীন আশরাফ-এর জন্য ঘোষণা করে [(১) Hanway, ২খ, ২৪৫ ; (২) Malcolm, ১খ, ৪৪৩-৪]। Hanway, ১৭৪৪ খৃ. লিখিতে গিয়া জনৈক ইরানী ব্যবসায়ীর উক্তি দিয়া বলেন যে, পূর্বে যেখানে কাযবীনে ১২,০০০ বাড়ী ছিল, তখন অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১,১০০টি বাড়ী (ঐ, ১খ, ১৫৬)।

উনবিংশ শতকের শুরুতে তখনও কাযবীনে মখমল বুটিদার রেশমী কাপড় ও সূতী কাপড় তৈরী হইত (J. Morier, A second Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the years 1810-1816, লন্ডন ১৮১৮ খৃ, পৃ. ২০৩)। এবং কাযবীন পুনরায় উহার অতীত গৌরব ফিরিয়া পাইতে সচেষ্ট হয়। রাজপরিবারের অন্যতম সদস্য, মুহাম্মাদ 'আলী মীর্যা, যিনি তখনও বালক ছিলেন, ফাতহ 'আলী শাহ কর্তৃক ১২১৩/১৭৯৮-৯ সনে গভর্নর নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১২২১/১৮০৬-৭ সন পর্যন্ত বহাল ছিলেন (বামদাদ, শারহ-ই হাল-ই রিজাল-ই ঈরান, তেহরান ১৯৬৬ খৃ., ৩খ, ৪৩০)। কাযবীনের অবস্থান, নূতন রাজধানী তেহরান হইতে আগত বড় সড়ক, রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর তাবরীযগামী সড়ক এবং কাম্পিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থিত এন্‌যেলীগামী সড়কের মিলনস্থল হওয়ার কারণে ইহার এক নূতন গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। সেই গুরুত্ব অবস্থানগত ও বাণিজ্যিক— উভয়ই। ফাতহ 'আলী শাহ প্রথম গুরুত্বটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া 'আব্বাস মীর্যা (দ্র.)-র আদেশক্রমে ১৮১৮ খৃ. এখানে গভর্নর প্রেরণ করেন, যাহাতে তাঁহার সিংহাসন আরোহণকালে প্রয়োজনবোধে আযারবায়জান হইতে তেহরানে অভিযান সহজ হয় (Great Britain, Public Records Office, F.O. 60/13, Willock to Castlereagh, নং ৯, তেহরান ৭ মে, ১৮১৮)। কাযবীনের পুনরুত্থানের প্রধান কারণ ছিল এখান হইতে ত্রেবিযন্দ হইয়া কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি।

Malcolm ১৮০১ খৃ. ইহার সমৃদ্ধির কথা এইভাবে লিখিয়াছেন, কাস্পিয়ানের "সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল" (দ্র. C. Issawi, The economic history of Iran, 1800-1914, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১ খৃ., পৃ. ২৬২)। Consul Abbott ১৮৪১ খৃ. পারস্যের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ব্যবসার ক্ষেত্রে কাযবীনের স্থান তেহরানের সমতুল্য এবং সম্ভবত দেশের অন্য যে কোনও শহরের সমান সংখ্যক ধনী ও সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িগণ এখানে রহিয়াছেন। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে ব্যবসায়ের জন্য আগমন করিয়া থাকেন" (Great Britain, Public Records Office, F.O. 60/92, Report on the trade for 1841, প্রামাণিক দলীল [কিছু অংশ গিয়াছে] Issawi-তে, উপরে উল্লিখিত, পৃ. ১১৮)। মীর্যা হুসায়ন ফারাহানী ১৮৮৪ খৃ. কাযবীনের উপর দিয়া অতিক্রম করেন। তিনি বলেন যে, সেই সময় তথায় ৬০০ দোকান, ৮টি সরাইখানা, ৪০টি মসজিদ, ৯টি মাদরাসা ও ১২টি বরফের দোকান (য়াখছাল) ছিল (দ্র. সাফরনামাহ, পৃ. ১৬)। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কাযবীনের যে গুরুত্ব ছিল তাহা উপলব্ধি করিয়া ১৮৯০ খৃ. ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব পারসিয়া এখানে একটি শাখা খুলিয়াছিল এবং New Oriental Banking Corporation-এর এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছিল। (Issawi, পৃ. ৪৪৬)। ইতোমধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তেহরানের সঙ্গে কাযবীনের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় (ঐ, পৃ. ১৫৩-৪)। ১৮৯৯ খৃ. কাযবীন হইতে তেহরান পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মিত হয় ; ১৯০৬ খৃ. কাযবীন হইতে হামাদান পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ সমাপ্ত হয় ; ১৮৯৩ খৃ. একটি রুশ কোম্পানীকে এই নির্মাণ কার্যের চুক্তি প্রদান করা হয়। ১৯১৩ খৃ. কাযবীন হইতে রাশ্ত পর্যন্ত এবং তেহরান হইতে হামাদান পর্যন্ত জনৈক রুশ নাগরিক ১৯১৯ খৃ. কাল পর্যন্ত মোটর সার্ভিস চালু করিবার চুক্তি লাভ করেন, তখন কিছু সংখ্যক মোটর গাড়ি গণ-পরিবহনের জন্য চালু করা হয় (ঐ, পৃ. ২০১)।

উনবিংশ শতকে কাযবীনের বাণিজ্যিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তথাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, যদিও বিভিন্ন সময়ের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা তুলনা করা কঠিন। কেননা হিসাব সব সময় নীতির উপর নির্ভরশীল নহে। Morier এই শতাব্দীর প্রথম দিকে লিখিতে গিয়া এখানকার জনসংখ্যা দেখাইয়াছেন ২৫,০০০ (A second journey, পৃ. ২০৩)। William Ouseley-ও এই একই সংখ্যা দেখাইয়াছেন (Travels in various countries of the East, particularly Persia, লণ্ডন ১৮১৯ খৃ., ৩খ, ৩৭৭ ; আরও তু. G. A. Olivier, Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et la Perse, প্যারিস, ১৮০১ খৃ., ৩খ, ৪৯)। আরও পরবর্তীকালের ১৮৬৮ খৃ. একটি বিবরণ হইতেও একই জনসংখ্যা পাওয়া যায় [United Kingdom, Parliament, Accounts and papers 1867-68, Thomson to Allison, Tehran, 20th April, 1868, "Report on Persia" Document (with omissons), Issawi-তে, পৃ. ২৮]। কিন্তু ১২৯৮/১৮৮০-১ এবং ১২৯৯/১৮৮১- সালের আদম শুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ৬৪,৩৬২ (গুলরীয, পৃ. ৩৯১ প.)। মীর্যা হুসায়ন ফারাহানী পুনঃ লিখিয়াছেন যে, এখানে ৭০০০ পরিবার বা আনু. ৩০,০০০ অধিবাসী ছিল। শহরটি সেই সময়ে ১৭টি মহল্লাতে বিভক্ত ছিল। চতুর্দিকের দেওয়াল তখন ধ্বংসপ্রায়, কিন্তু ১২টি তোরণ তখনও দণ্ডায়মান ছিল (সাফারনামাহ, পৃ. ১৪-১৫)। Curzon-এর মতে ১৮৮৯ খৃ. জনসংখ্যা ৪০,০০০ ছিল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত উহার তিন-চতুর্থাংশের বেশি ছিল না (Persia and the Persian question, লণ্ডন, ১খ, ৩৫)। সম্ভবত Curzon-এর পরে কিংবা শতাব্দীর প্রথমদিকে বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ [(১) Gazeteer of Persia, সিমলা ১৯০৫ খৃ. ২খ, ৩১৪, (২) Sobotsinski, Persiya: statistikoekonomiccskii ocerke, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৩ খৃ., Issawi কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৩৪]।

যে ঘটনাক্রমের পরিণতিতে শাসনতন্ত্র মঞ্জুরী প্রদান করা হয় তাহাতে কাযবীনের ভূমিকা ছিল নগণ্য। প্রথম National Consultative Assembly-তে কাযবীনের প্রতিনিধিত্ব করেন দুইজন ডেপুটি এবং তখন সেখানে একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল (আঞ্জুমান-ই বিলায়াতী) নির্বাচন করা হয়। জনপ্রিয় আঞ্জুমানসমূহ গঠিত হয় এবং সেইগুলির তেহরান আঞ্জুমানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯০৮ খৃ. মুহাম্মাদ 'আলী সংসদ ভবন আক্রমণ করিলে সেইগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। তাবরীয ও ইসফাহান মুহাম্মাদ 'আলী বিরোধী প্রতিরোধ সংগঠিত হইলে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গীলান পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে কাযবীনের শাসনতন্ত্রের সমর্থকগণ তুরস্কের শাহবান্দারীর অন্তর্গত বাস্ত দখল করিয়া সেখান হইতে গীলানের জাতীয়বাদিগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। শেষোক্তগণ য়াপরিম খান-এর নেতৃত্বে ১৯০৯ খৃ. কাযবীন দখল করে এবং সেখান হইতে তেহরান অভিমুখে রওনা হয় (গুলরীয, পৃ. ৮৬১ প.)। জুলাই মাসে জাতীয়তাবাদিগণের উপরে চাপ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া কাযবীনে সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯১১ খৃ. মার্চ মাসে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্যই প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে পুনরায় আরও বেশী রুশ সৈন্য প্রেরণ করা হয় (Gazetteer of Persia, সিমলা ১৯১৪ খৃ., ২খ, ৩১০)। ১৯১১ খৃ. পরিষদ ভাঙিয়া দিবার পরের গোলযোগপূর্ণ বৎসরগুলিতে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে কাযবীন প্রদেশসহ প্রায় সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাধারণভাবে অবনতি ঘটে। ১৯১৮ খৃ.-এর জুন মাসে Dunsterforce-এর সদর দফতর স্থাপন করা হয় কাযবীনে। এখান হইতে জাঙ্গালীগণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হইত। রিদা (রিযা) শাহ-এর শাসনমলে কাযবীনের দ্রুত অবনতি ঘটে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইলেও ইহা আর গুরুত্বপূর্ণ পণ্যাগার রহিল না। এখানকার বহু ব্যবসায়ী এবং জনসংখ্যারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই শহর ত্যাগ করিয়া তেহরান চলিয়া যায়।

সর্বশেষে কাযবীন ইরানের ইতিহাসে স্বীয় অবদান রাখে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে যখন 'আলী রিযা শাহ পাহলাবীর শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের কালে কাযবীনবাসীগণও একযোগে উহাতে সমর্থন দান করে। ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর সমর্থনে জনগণ সমগ্র শহরব্যাপী আন্দোলন করে। ফলে শেষ পর্যন্ত শাহ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন আর ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্বে ইরান একটি ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের মধ্যেই যথেষ্ট বরাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সঙ্গে যোগ করিতে হইবে জ (১) হুসায়ন 'আলী সুতূদা, তা'রীখচা-য়ি

কাযবীন, বাররাসিহা-য়ি তা'রীখী, ৪/৪ খ. (১৯৬৯ খৃ.), পৃ. ৯৭-১৩২, ৪/৫-৬খ, (১৯৬৯-৭০ খৃ.), ১৬৫-২১০; (২) R. Mottahedeh, Administration in Buyid Qazwin, in Islamic civilisation 950-1150, সম্পা. D.S. Richards, অক্সফোর্ড ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৩৩-৪৫ ; (৩) ইরান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র ; (৪) Europia year book : Midlle East 1986, লণ্ডন, ১৯৮৫ খৃ., প্রবন্ধ।

A. K. S. Lambton (E.I.²)/হুমায়ুন খান

২। স্মৃতি সৌধসমূহ ঃ কাযবীন-এর মধ্যযুগীয় মসজিদসমূহের অধিকাংশই এখন আর নাই। প্রাথমিক যুগের রাবী' ইব্ন খুছায়ম মসজিদ (সম্ভবত জামি'উ'ছ-ছাওর বা জামি'উ'ত-তূত মসজিদ, যাহা মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাজ্জাজী নির্মাণ করিয়াছিলেন উহার সঙ্গে অভিন্ন), খলীফা হারূনু'র রাশীদ কর্তৃক নির্মিত বিশাল জামি' মসজিদ এবং যাকারিয়্যা আল-কাযবীনী কর্তৃক উল্লিখিত অপর চারিটি মসজিদ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ৪র্থ/১০ম শতকে কাযবীন শহরের দুইভাগ ছিল, বহিঃশহর ও অভ্যন্তরীণ শহর এবং সেখানে দুইটি জামি' মসজিদ ছিল। খলীফা হারূনু'র-রাশীদ যে নগর প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন এবং নির্মাণ শুরু করাইয়াছিলেন, উহা সমাপ্ত হইবার পর উহাতে ২০৬টি মিনার ও ১২টি তোরণ ছিল। ৫৭২/১১৭৬ সালে উযীর সাদরু'দ-দীন আল-মারাগী উহা পুনঃনির্মাণ করেন ; আগাগোড়াই কাদামাটির ইট গাঁথিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। শুধু বিশাল তোরণগুলি ও সৈন্যদের যুদ্ধের অবস্থানের জন্য সচ্ছিদ্র প্রাচীরসমূহ চুন-সুরকি দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছিল। কাযবীনে ইসলামের প্রাচীনতম অস্তিত্বশীল যে ভবন এখনও চিহ্নিত করা যায় তাহা হইল মাসজিদ-ই জামি', যাহা সম্ভবত প্রাক-ইসলামী কোনও একটি নির্মাণ কাজের উপরে নূতন করিয়া তৈরী করা হইয়াছিল। ইহার দীর্ঘায়িত আওকাফ-খোদাই লিপি (ইহা ইরানী স্থাপত্যশিল্পের এক দুর্লভ লিপি) ৫০০/১১০৬ ও ৫০৮/১১১৪ সনের মধ্যবর্তী কোনও সময়ের। পৃষ্ঠপোষকের নাম লিখিত আছে আমীর আবূ মানসুর খুমারতাশ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-'ইমাদী। এই গম্বুজকক্ষ পূর্বেকার ৪র্থ/১০ম শতকে সাহিব ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদ কর্তৃক নির্মিত একটি মাদ্রাসাকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে। যাকারিয়্যা আল-কাযবীনীর মতানুসারে এই গম্বুজ এত বিশালাকারে ছিল যে, কোথাও উহার কোনও তুলনা ছিল না। তিনি চমকপ্রদভাবে বিবরণ দিয়াছেন যে, রাজমিস্ত্রিগণ একবার গম্বুজটি মেরামত করিবার কালে একটি বিরাট ফাটল কিভাবে ভরাট করা যায় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন সময় রাস্তা দিয়া একটি বালক যাইতেছিল। সে পরামর্শ দেয় যে, গম্বুজের ফাটল যেন প্রথমত খড় দিয়া বন্ধকরত পলেস্তারা করা হয়। গম্বুজ কক্ষের নিম্নের পরিকল্পনা, কিবলা ব্যতীত আর সকল দিক দুই দিকে খোলা, মধ্য ইরানের সালজূক মসজিদসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও উচ্চতায় আবার উহা অপেক্ষা পরিষ্কারভাবেই ভিন্নতর। সম্ভবত কোনও বিশাল আকারের অগ্নিপূজার মন্দিরের অনুকরণে উহা নির্মিত হইয়া থাকিবে। মধ্যবর্তী অভ্যন্তরীণ এলাকাতে ইরানের যে জটিল ধরনের তিন ঝুলবিশিষ্ট খিলান তাহা ব্যবহৃত হয় নাই, উহার পরিবর্তে প্রশস্ত সাদাসিদা খিলান ব্যবহৃত হইয়াছে। একটির উপরে আরেকটি একই আকারের ছয় ভুজবিশিষ্ট করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। প্রশস্ততার তুলনায় উচ্চতার যে পরিমাপের হার তাহা অন্যান্য সালজূক গম্বুজ কক্ষের অপেক্ষা কম। হামদুল্লাহ মুসতাওফী লিখিয়াছেন যে, মসজিদটিতে ৫৪৮/১১৫৩ সালে দুইটি কক্ষ গম্বুজ (ঈওয়ান) ছিল। উত্তরের গম্বুজ কক্ষটি যদি এই তারিখের হইয়া থাকে (ইহার অলঙ্করণ অবশ্যই সালজূক আমলের), তবে যে কেহ ধারণা করিবেন যে, দক্ষিণের গম্বুজ-কক্ষ গম্বুজের পূর্বেকার নির্মাণ। ইহা হইতে পারে যে, সালজূক মসজিদের এমনটি চারি গম্বুজ কক্ষ ছিল। বর্তমান মসজিদটি অস্বাভাবিক রকম বড় ; ইরানের ধর্মীয় ভবনসমূহের মধ্যে একমাত্র মাশহাদে অবস্থিত ইমাম রিদার মাযার এবং ইসফাহানর জামি' মসজিদই ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। ইহার অধিকাংশ নির্মাণ কর্ম সাফাবী ও কাজার আমলের। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণের যে কক্ষ তাহাতে ২য় শাহ 'আব্বাস-এর ১০৬৯/১৬৫৮-৯ সন উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

হায়দারিয়্যা মসজিদ বা মাদরাসার (আদিতে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না) খুমারতাশের গম্বুজের সঙ্গে রীতিগতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং হয়ত বা ইহা কয়েক বৎসর পরে নির্মিত হইয়া থাকিবে। ইহার চতুষ্কোণাকার গম্বুজ-কক্ষ একটি অংগনের দক্ষিণে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে কাজার 'ইমারতাদি দ্বারা বেষ্টিত। ক্ষতিগ্রস্ত খিলান এলাকা খুমারতাশের গম্বুজ হইতেই গঠন করিয়া তোলা হইয়াছে। কারণ ছয় ভাঁজবিশিষ্ট খিলানসমূহের ভিত্তি ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে যাহা অষ্ট কোণাকৃতি খিলানসমূহের মধ্যবর্তী বাঁকানো স্থানকে পূর্ণ করিয়াছে। ইহা দুই সমতার অত্যন্ত কল্পনাপ্রসূত সমন্বয়। প্রধানত ইট ও পলেস্তারায় করা অতি কারুকার্যময় অলঙ্করণ অতি সূক্ষ্ম লতাগুল্মাদি শোভিত কূফী লিপি এবং খুবই প্রাথমিক আমলের জেল্লাদার অলঙ্করণের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সালজূক আমলে কাযবীনে একটি অতি বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্য ও অলঙ্করণগত রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভবনসমূহের নির্মাণ রীতিকেও প্রভাবিত করে, যেমন কুরওয়ার মসজিদ ও শুজা'-র মসজিদ।

তথাকথিত হামদুল্লাহ মুসতাওফীর মাযার (যাহা সাম্প্রতিক কালে মেরামত করা হইয়াছে) মঙ্গোল আমলে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার ভিত্তি চতুষ্কোণাকার ; চতুষ্কোণাকার এলাকা ঢালু কোণাতে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং একটি অভ্যন্তরীণ গম্বুজ যাহার উপরে মোচাকার ছাদ। মাযানদারান-এ অনুরূপ মাযার চূড়া অনেক দেখা যায়। কাযবীনের একমাত্র সাফাবী সৌধ হইতেছে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত শাহ তাহমাসপ-এর প্রাসাদ, যাহা বর্তমানে যাদুঘররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। খুব বেশি মেরামত করা একটি পার্টিকো, একটি উদ্যানের শামিয়ানা সৌধ (Kiosk) ও কিছু দেওয়ালচিত্র (রঙ প্রায় মুছিয়া গিয়াছে) এখনও বর্তমান রহিয়াছে। শেষ দুই শতাব্দীর প্রতীকস্বরূপ সৌধ হইতেছে মসজিদ-ই শাহ, শাহযাদা হুসায়ন এবং অত্যন্ত কারুকার্যময় অভ্যন্তরীণ কক্ষ সংবলিত বাজার ও সরাইখানাসমূহের বিভিন্ন রকমের জালির কাজ ; সেইগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া তৈরী করা হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Godard আছার-ই ঈরান, ১খ, (১৯৩৬ খৃ.), পৃ. ১৯৩-২০১; (২) D. N. Wilber, A. Survey of Persian Art., সম্পা. A. U. Pope, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৯৯৬ ; (৩) P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, পুনর্মুদ্রণ হিলডেশীম ও নিউ ইয়র্ক ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৭০৫-২২।

R.M. Hillenbrand (E.I²)/হুমায়ুন খান

আল-কাযবীনী, আবূ হাতিম মাহমূদ ইবনু'ল-হাসান আত-তাবারী (ابو حاتم محمود بن الحسن الطبرى ، القزوينى) ঃ জনৈক শাফি'ঈ ফিক্হবিদ ও আশ-শীরাযীর শিক্ষক। ইনি তাবারিস্তানের অন্তর্গত আমুলের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানে লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি বাগদাদে আবূ হামিদ আল-ইস্ফারা'ইনী (মৃ. ৪০৬/১০১৫-১৬)-এর তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জন করেন, ইব্নু'ল-লাব্বান (মৃ. ৪০২/১০১১-১২)-এর নিকট উত্তরাধিকার আইন এবং ইবনু'ল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩/১০১২-১৩)-এর নিকট উসূল অধ্যয়ন করেন। তিনি ৪৪০/১০৪৮-৯ সনে বাগদাদ ও আমূলে শিক্ষাকতা করেন। আশ-শীরাযী তাঁহাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) কিতাব তাজ্রীদি'ত-তাজ্রীদ ; ইহা আল-মাহামিলী (মৃ. ৪১৫/১০২৪-২৫) রচিত আইন বিষয়ক তাজ্রীদ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ; (২) রাওনাক (رونق), ইহা আল-মাহামিলী প্রণীত লুবাবু'ল-ফিক্হ-এর সংক্ষিপ্তসার (হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফু'জ্-জুনূন, নং ৫৭০২) ; (৩) কিতাবু'ল-হিয়াল ফি'ল্-ফিক্হ (সম্পা. J. Schacht, Hanover 1924),ইহাই একমাত্র গ্রন্থ যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা শাফি'ঈ আইনশাস্ত্রের প্রয়োগ হইতে রেহাই পাইবার বিধিসম্মত কৌশল সম্পর্কে যে স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই বিষয়ের উপর একই নামে হানাফী মাযহাবের ভিত্তিতে আশ্-শায়বানী ও আল-খাস্সাফ প্রমুখ লেখকদের রচিত গ্রন্থাদি থাকায় আল-কায্বীনীর গ্রন্থটি শারী'আতের দৃষ্টিতে কার্যত খুব কমই ব্যবহৃত হইত। মূলত গ্রন্থটি ঐ সকল আইনগত কলা-কৌশল (হীলা حيلة) যাহা শারী'আতের দৃষ্টিকোণ হইতে অসমর্থিত তাহাই চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুকূলে লিখিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ-শীরাযী, তাবাকাতু'ল-ফুকাহা আন-নাওয়াবী রচিত তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগা-এর মধ্যে, সম্পা. Wustenfeld, no. 688 ; (২) আস-সুবকী, তাবাকতু'শ-শাফি'ইয়্যাতিল-কুব্রা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৪খ, ১২ ; (৩) Wustenfeld, Schafiten, no. 371 (=Abh. G. W. Gott., 1891, xxxvii, (৪) দা. মা. ই. ১৬/২খ, পৃ. ৬২৩।

W. Heffening (E.I.[2])/এ. কে. এম. আবদুল্লাহ

আল-কাযবীনী, খাতীব দিমাশ্ক (القزوينى خطيب دمشق) ঃ জালালু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দি'র-রাহমান ইব্ন 'উমার (৬৬৬-৭৩৯/১২৬৮-১৩৩৮) সিরিয়া ও মিসরের প্রধান বিচারপতি (কাদী) এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের দুইখানি সার-গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার প্রথম জীবন প্রায় অজ্ঞাত। অধিকাংশ জীবনীকারের মতে তাঁহার জন্ম মাওসিল (موصل)-এ এবং ৬৫৩/১২৫৫ মনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইমামু'দ-দীন 'উমার তাব্রীয-এ জন্মগ্রহণ করেন। যদি ইহা সত্য হয় যে, এই দুই ভ্রাতা 'আবদু'ল-কারীম আর-রাফি'ঈ (মৃ. ৬২৩/১২৬৬ ; দ্র. Brockelmann, I, 393 ; S I, 678)-এর সহিত আত্মীয়তায় সম্পৃক্ত ছিলেন [যেমন আবু'ল-ফিদা' বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. আল-মুখতাসার ফী আখ্বারি'ল-বাশার, কায়রো (১৩২৫ ?), ৪খ, ১২৯ ; (তু. সুব্কীকৃত তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪/১৯০৬, ৫খ, ১২৪)-তে কায্বীনী কর্তৃক আর-রাফি'ঈ হইতে একটি উদ্ধৃতি এবং তু. আল-আসনাবীতে বংশগত পদবী (نسبة 'আর্-রাফি'ঈ সম্পর্কে একটি টীকা, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, বাগদাদ ১৩৯০/১৯৭০, ১খ, ৫৭২]। তাহা হইলে তাঁহার বংশগত পদবী "আল-কায্বীনী" সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কায্বীনী স্বয়ং দাবী করিতেন যে, তিনি আবূ দুলাফ আল-'ইজ্লী (দ্র.)-র বংশোদ্ভূত [তু. সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল্-ওয়াফায়াত (সম্পা. Dedering, III, Damascus 1953, 243)। সম্ভবত সাফাদী কায্বীনীকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন, কেননা তিনি কায্বীনী প্রদত্ত 'ইজাযা' (অধ্যাপনা অথবা হাদীছ বর্ণনার অনুমতি) লাভ করিয়াছিলেন এবং সুব্কী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি কবিতায় তাঁহার প্রায়ই প্রশংসা করিয়াছেন (তাবাকাত, ৫খ, ২৩৯)]। তাঁহার উক্ত দাবী সকল জীবনচরিতে প্রকাশ্যভাবে অথবা কায্বীনীর বংশ তালিকার অংশ হিসাবে উল্লেখ দেখা যায় , তবে ইহা প্রমাণসাপেক্ষ (দ্র. মাত্লূব, ৯৯-১০১)। দুর্ভাগ্যবশত এই সকল জীবন চরিতে কোনও উল্লেখ নাই, কখন এবং কোন্ অবস্থায় কায্বীনী-পরিবার তাহাদের বসতি শহর পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল, কায্বীনীর প্রথম শিক্ষক কে ছিলেন বর্ণনা করে না [য়াফি'ঈ (মির'আতুয্-যামান, হায়দরাবাদ ১৩৩৭/১৯১৮-৯, ৪, ৩০১) দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেন যে, কায্বীনী-র পিতা ও পিতামহ উভয়েই প্রধান বিচারপতি (কাদী)-র পদে সমাসীন ছিলেন (আরও তু. ইব্ন তূলূন, কুদাতু দিমাশ্ক, সম্পা. এস. মুনাজ্জিদ, দামিশক, ১৯৫৬ খৃ., ৮২, ছত্র ৮-১০, ৮৭ ছত্র ১৪-১৬)] অথবা এইরূপ উল্লেখও নাই যে, তিনি হয়ত প্রথম জীবনেই অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যেহেতু 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী (মৃ. ৪৭১/১০৭৮) প্রণীত আস্রারু'ল-বালাগা এবং দালা'ইলু'ল-ই'জায, এমনকি মধ্যযুগের কতিপয় বিদ্বান পাঠকের নাগালের বাহিরে ছিল। সুতরাং কায্বীনী কোথায় এই দুইটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এই তথ্যের সন্ধান আকর্ষণীয়। অনুরূপভাবে আকর্ষণীয় এই অনুসন্ধান যে, তিনি কি সম্ভবত দামিশ্কে আসিবার পূর্বেই 'তাল্খীস'ও 'ঈদাহ' রচনা করিয়াছিলেন।

কোনও কোনও জীবনীকার দৃঢ় মত প্রকাশ করেন যে, কায্বীনী প্রায় বিশ বৎসর বয়সে আনাতোলিয়ার একটি জিলার কাদীর পদে অধিষ্ঠিত হন (এই কথাটি ইবন তাগ্রীবির্দী-কে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যে, কায্বীনী মূলত শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কি না, দ্র. মাত্লূব, ১০৭-৮) এবং যখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ৬৮৯/১২৯০ সনে বা তৎপূর্বে (ইবন কাছীর প্রদত্ত তারিখ '৬৯০-এর পর', দ্র. আল-বিদায়া, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ১৪খ, ১৮৫ সঠিক হইতে পারে না ; দ্র. মাত্লূব, ১০৮) দামিশ্কে আগমন করেন। তৎপূর্বেই তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকগণ [যাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'আলামু'দ-দীন আল-বিরযালী (দ্র.)] মনে হয়, ফিকহ, হাদীছ, যুক্তিবিদ্যা এবং 'ইলমু'ল-আওয়া'ইল-এর প্রতি বেশীর ভাগ অনুরক্ত ছিলেন। ইহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, অলংকার শাস্ত্রে আকর্ষণের জন্য কায্বীনী এই শিক্ষকদের মধ্যে কাহারও নিকট ঋণী ছিলেন (দ্র. মাত্লূব, ১১৪-১৬) কি না। এই বিষয়ে তাঁহার রচিত দুইটি গ্রন্থ ছাড়াও তাঁহার সাহিত্যিক মেধার আরও কিছু প্রমাণ রিহয়াছে। রিপোর্ট পাওয়া যায় যে, বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি আদাব (সাহিত্য) অধ্যয়নের উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং তিনি 'আর্রাজানী' (দ্র.)-র কবিতার একটি সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইবনু'ল-কাদী (দুর্রাতু'ল-হিজাল, কায়রো ১৩৯০/১৯৭০. ২খ., ১১৫) ইবনু'ল-ফারিদ প্রণীত 'তা'ইয়্যা' কবিতার উপর কায্বীনী-র একটি

সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কাল্‌কাশান্দী (সুবহু'ল-আ'শা, ১খ, ৪৬৯) সাবী (খৃ. ৭৪৯/১৩৪৮ ; দ্র. Brockelmann, S II,258) প্রণীত একটি নীতিমূলক ছন্দপ্রকারণ বিষয়ক কবিতার সমালোচনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। বাহা'উ'দ-দীন আস্‌-সুব্‌কী [দ্র.] তাল্‌খীসু'ল-মিফতাহ-এর সম্পর্কে কাযবীনী-র ইজাযা লাভ করিয়াছেন (দ্র. নু'আয়মী, আদ্‌-দারিস ফী তা'রীখি'ল মাদারিস, দিমাশক্‌ ১৩৬৭/১৯৪৮, ১খ, ৩৮-৯) এবং সুয়ূতী তাঁহার নিকট কায্‌বীনীর স্বহস্তে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল বলিয়া গর্ব করিতেন (সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য কায্‌বীনী বিখ্যাত ছিলেন) এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার 'উর্‌জূযা' (رجــز ছন্দে রচিত কাসীদা) রচনা করিয়াছিলেন ('উকূদু'ল-জুমান; দ্র. ১৩৫৮/১৯৩৯ সনে কায়রোতে প্রকাশিত সংস্করণে এবং সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, কায়রো ১৩২৬/১৯০৮-৯, ৬৬)। তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া যায় জামালু'দ-দীন ইবন নুবাতা (দ্র.)-র রচনার সমালোচনা (تقريض)-তে এবং জীবনীকার ও কবিগণ তাঁহার বাকপটুতার যে প্রশংসা করেন তাহাতে (দ্র. মাত্‌লূব, ১১৬-৮, ১৩৯-৫২), যদ্দরুন তিনি "খাতীব দিমাশ্‌ক" উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন (তাফ্‌তাযানী, আশ-শারহু'ল-মুতাওওয়াল, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১১-২, ৩ ; হাজ্জী খালীফা, ১খ, পৃ. ২১০ ; মেহ্‌রেন ৭। অত্র নিবন্ধকারের জ্ঞানমতে কোন জীবনীতেই এই উপাধি তাঁহার নামের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, যদিও বাস্তবিকপক্ষে তিনি খাতীবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন)। কেহ কেহ দাবী করেন যে, কায্‌বীনী আরবী ব্যতীত ফারসী ও তুর্কী ভাষাও জানিতেন। ইবনু'ল-'ইমাদ (শাযারাত, ৬খ, ১২৩)-এর মতে ফিক্‌হে তাঁহার পারদর্শিতা তৎরচিত একটি 'উসূল' বিষয়ক গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে।

কায্‌বীনীর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদির অপ্রতুলতা এবং তাঁহার সাহিত্যকর্মের নানা বর্ণনার বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে রহিয়াছে তাঁহার সরকার প্রদত্ত পদগুলির সূক্ষ্ম বিবরণের প্রাচুর্য। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত পদগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঃ শিক্ষক হিসাবে তিনি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা (যিনি ৬৯৬/১২৯৭ সনে কাদী নিযুক্ত হন)-র প্রতিনিধিত্ব করেন ; ৭০৫/১৩০৫ সনে নাজ্‌মু'দ-দীন ইব্‌ন সাস্‌রা (দ্র.)-র স্থলাভিষিক্ত হন ; ৭০৬/১৩০৭ সনে উমায়্যা মসজিদের খাতীব ও ইমাম নিযুক্ত হন ; কায়রো সফরকালে মাম্‌লূক সুলতান আন্‌-নাসির-এর নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগপত্র লাভ করিয়া ৭২৪/১৩২৪ সনে প্রধান কাদী ও সিরীয় সেনাবাহিনীর কাদী নিযুক্ত হন (৭১১/১৩১১ সনে সুলতান আন্‌-নাসিরের এক সহকারী কর্তৃক গুরুভার ট্যাক্স ধার্যের প্রতিরোধ করিয়া তিনি স্বীয় সাহসের পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিরোধ সুলতান আন্‌-নাসিরের মধ্যে দৃশ্যত কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নাই, বরং তিনি তাঁহার সহকারীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন ; দ্র. ইব্‌ন হাজার আদু-দুরারু'ল-কামিনা-হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৭৩/১৯৫৪, ৩খ, পৃ. ২৩৫-৬)। অল্পকাল পরেই ৭২৭/১৩২৭ সনে বাদ্‌রু'দ-দীন ইব্‌ন জামা'আ (দ্র.)-র স্থলে তাঁহাকে কায়রোর প্রধান কাদী নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগ ছিল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা। কায্‌বীনীর তুলনায় কোনও কাদীই কখনও একজন তুর্কী শাসনকর্তার উপর এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যবশত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তাঁহার পুত্রদের উশৃঙ্খলতার দরুন কায্‌বীনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। অবশেষে আন্‌-নাসির তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অসংখ্য অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই [মাক্‌রীযী, সুলূক, সম্পা. এম. যিয়াদা, কায়রো ১৯৪১,II/2, ৪৩৯-৪২; ইব্‌ন হাজারের মতানুসারে (আদ্‌-দুরার, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ৪খ, ১৩৫০/১৯৩১, ৪) তাঁহাকে বহু পূর্বে অর্থাৎ ৭২৪ সনের মধ্যে এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল] এবং তিনি বাধ্য হইয়া কায্‌বীনীকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহাকে দামিশ্‌কের পূর্বপদে নিযুক্ত করিলেন। অল্পকাল পরে ১৫ জুমাদা—১, ৭৩৯/৩০ নভেম্বর, ১৩৩৮ সনে এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন।

কায্‌বীনীর রচনাবলীর মধ্যে কেবল তাল্‌খীসু'ল্‌-মিফ্‌তাহ ও ঈদাহ ফী 'উলূমি'ল বালাগা বর্তমান আছে বলিয়া মনে হয়। সাক্‌কাকী (দ্র.) প্রণীত মিফ্‌তাহু'ল-'উলূম-এর ৩য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই তালখীস যাহা আবার 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী (দ্র. ইস্তি'আরা)কৃত আসরারু'ল-বালাগা ও দালা'ইলু'ল-ই'জায-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ঈদাহ তাল্‌খীসের একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ। নীরসতা এবং কূটতর্কমুক্ত না হইলেও উভয় গ্রন্থ বিপুল প্রচার লাভ করে ; আমাদের হস্তগত বহু পাণ্ডুলিপি ও সমালোচনা গ্রন্থ ইহা প্রমাণিত করে, বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণের অদ্যাবধি বিদ্যমানতাও গ্রন্থদ্বয়ের জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে (প্রাণ্ডুলিপিসমূহ, মুদ্রিত সংস্করণাদি এবং হস্তালিখিত বা মুদ্রিত সমালোচনামূলক পুস্তকাদির তালিকার জন্য দ্র. হাজ্জী খালীফা, প্র. ২১০-১১, ৪৭৩-৯ ; Brockelmann, ii, 22, S II, 15 ; Matlub, 169-82, 184-90)। এই দুইটি গ্রন্থ কেবল জুরজানীকৃত গ্রন্থদ্বয়ের নহে, বরং আস্‌-সাক্‌কাকীর গ্রন্থটির স্থানও সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে। যাহা হউক, একই সঙ্গে উক্ত গ্রন্থাকারদ্বয় কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়মনিষ্ঠ বর্ণনাধারা কায্‌বীনীর কল্যাণে সুধী সমাজে একটি সুদৃঢ় আসন লাভ করিয়াছিল এবং ইহা প্রভাবিত করিয়াছিল সেই পুরাতন অনিয়মিত সাহিত্যিক প্রতিপাদ্যের আলোচনা ধারাকে যাহা তদবধি অনুসৃত হইত। পুরাতন আলোচনা ধারা বাক্যালঙ্কার (بديع) শিরোনামে লিখিত কতগুলি অধ্যায়ের সমষ্টির ভিত্তিতে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কায্‌বীনী ও সাক্‌কাকীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ (ক) শ্রেণীবিন্যাস্‌ ক্ষেত্রে কায্‌বীনী মাজায 'আক্‌লী (مجاز عقلى)-কে 'ইলমু'ল-মা'আনী (علم المعانى)-র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (দ্র. Mehren, 30)।

অথচ সাককাকী এই শ্রেণীর বাক্যালঙ্কারকে 'ইলমু'ল-বায়ান (علم البيان)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; (খ) কায্‌বীনী البديع-র সহিত একটি অধ্যায় যোগ করেন যাহা জুরজানীকৃত 'দালা'ইল-এর ভিত্তিতে علم المعانى -এর অধ্যায়গুলি হইতে এবং জুরজানী-র আসরার-এর ভিত্তিতে علم البيان -এর অধ্যায়গুলি হইতে সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে সাক্‌কাকী এই সকল বাক্যালঙ্কারের আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু "সাহিত্যিক রচনার অলংকরণের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত বিশেষ বাকরীতির" কথাই বলেন। (গ) সারিকা, ইব্‌তিদা', 'তাখাল্লুস ও ইন্‌তিহা' (দ্র. দ্র.) শিরোনামে কায্‌বীনী চারিটি অধ্যায়ের সংযোজন করেন। কায্‌বীনী 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী প্রণীত দুইটি গ্রন্থ ও যামাখশারী সংকলিত কাশশাফও অধ্যয়ন এবং আলোচনা করেন এবং প্রায়ই ঋণ স্বীকার ব্যতীত তাঁহার পূর্ববর্তী অন্য কয়েকজন গ্রন্থকারের রচনা হইতে তথ্যাদি ধার করিয়াছেন (দ্র. মাত্‌লূব, ১৯১-২৪৩)। তাল্‌খীস-এর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে রচনার তারিখ '৭২৪' লিখিত রহিয়াছে (দ্র. মাত্‌লূব, ১৬৪)। তাল্‌খীস-এর পরিশিষ্ট হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত ঈদাহ অবশ্যই তালখীস-এর

পূর্বে লিখিত হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ের রচনার তারিখ অথবা প্রেক্ষিত সম্পর্কে অধিক কিছুই জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর সকল ধারাবিবরণী এবং জীবনী গ্রন্থে কায্‌বীনীর জীবন চরিত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। আরও দ্র. (১) তাশকোপরূযাদে, মিফ্‌তাহু'স-সা'আদা (কায়রো ১৯৬৮ খৃ., ১খ, পৃ. ২০৯-১০)-ও দ্রষ্টব্য। (২) A. F. Mehren, Die Rhetorik der Araber, Copenhagen-Vienna 1853, তালখীস-এর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলি দ্র.। শুরূহু'ত্‌-তাল্‌খীসে সমালোচনাসমূহ, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.। কায্‌বীনী ও তাঁহার সাহিত্যকর্মের বিস্তারিত পর্যালোচনামূলক একমাত্র গ্রন্থ ; (৪) এ. মাত্‌লূব, আল-কায্‌বীনী ওয়া শুরূহু'ত-তাল্‌খীস, বাগদাদ ১৩৮৭/১৯৬৭। আরও দ্র. (৫) The Introduction to H. Ritter's ed. of Djurdjani's Asrar al-balagha, Istanbul 1954. 6-7।

S. A. Bonebakker (E.I.[2])/এ. কে. এম. আবদুল্লাহ্

আল-কায্‌বীনী (القزويني) ঃ নাজমু'দ-দীন 'আবদু'ল-গাফ্‌ফার ইবন 'আবদি'ল-করীম কায্‌বীনের একজন শাফি'ঈ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ, লেখক ও সূফী, যিনি মুহাররাম ৬৬৫/অক্টোবর ১২৬৬ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সাহিত্যকর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি আল্‌-হাবী ফি'ল্‌-ফুরূ' (الحاوى فى الفروع) বা আল্‌-হাবী ফি'ল-ফাতাওয়া (الحاوى فى الفتاوى) কিংবা শুধু আল-হাবী (الحاوى) বলিয়া পরিচিত। ইহা শাফি'ঈ ফিকহের বহুল ব্যবহৃত একটি পাঠ্যপুস্তক এবং ইহার অসংখ্য সমালোচনা গ্রন্থ ও ব্যাখ্যা পুস্তক রহিয়াছে। হাজ্জী খালীফা কর্তৃক এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা সতের বলিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে (কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, সম্পা. Yaltkaya and Bilge, ১খ, cols, 625-7)। তাঁহার রচিত যায়ন'দ-দীন 'উমার ইবন মুজাফ্‌ফার আল-ওয়ারদী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮) প্রণীত আল-বাহ্‌জাতু'ল-ওয়ারদিয়্যার বিস্তারিত কাব্যানুবাদ বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত আল-কায্‌বীনী "আল-লুবাব ফি'ল-ফিকহ" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন যাহা আল-হাবী অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এবং তিনি নিজেই ইহার উপর আল-ঈজাব ফী শারহি'ল-লুবাব নামে একটি ব্যাখ্যা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি গণিতশাস্ত্রে অপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। একজন প্রখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ ছাড়াও তিনি আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন একজন খ্যাতনামা সূফী ছিলেন। হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা ভ্রমণ কালে একদা গভীর রাত্রে আল-হাবীর রচনায় লিপ্ত থাকাকালে কাগজে তাঁহার আঙুল হইতে অলৌকিক আলো বিচ্ছুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল। এই সফরে তিনি সুহ্‌রাওয়ারদী তারীকার প্রবর্তক শায়খ আবূ হাফ্‌স 'উমার শিহাবু'দ-দীন আস-সুহ্‌রাওয়ারদী (মৃ. ৬৩২/১২৩৪)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান এবং তিনি তাঁহাকে আল-হাবীর রচনার সমাপ্তি ত্বরান্বিত করিতে উৎসাহিত করেন। তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কায্‌বীন্‌ শহরে অতিবাহিত করেন, যেখানে তিনি তাঁহার দীপ্তিমান অঙ্গুলি ও অন্যান্য কারামাত বা আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ডের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S I, 679 ; (২) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, সম্পা. Yoltkaya and Bilge, ১খ, cols, 625-7, ২খ, col, 1043 , (৩) য়ূসুফ ইবন ইসমা'ঈল আন্‌-নাব্‌হানী, জামি'উ কারামাতি'ল-আওলিয়া, কায়রো ১৩৮১/১৯৬২, ২খ, ১৯৪ ; (৪) তাজু'দ-দীন আস্‌-সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪/১৯০৬, ৫খ, ১১৮ ; (৫) খায়রু'দ-দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ৪খ, ১৫৭ ; (৬) দা.মা.ই., ১৬/২খ, পৃ. ১৩৩-৪।

H. Algar (E.I.[2]) এ.কে.এম, আবদুল্লাহ

আল-কাযবীনী (القزويني) ঃ যাকারিয়্যা, ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ আবূ য়াহয়া (হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৮৮-৯, মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ আল-কূফী আল-কাযবীনী) একজন বিখ্যাত আরব বিশ্বতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদ। তাঁহার পূর্বপুরুষ আরব ছিলেন [শায়খ আবু'ল-কাসিম ইবন হিবাতিল্লাহ আল-কাযবীনী সম্ভবত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) (দ্র.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন] যিনি পারস্যের কাযবীন শহরে বসতি স্থাপন করিয়া পারস্য দেশীয় লোক বনিয়া গিয়াছিলেন। আল-কাযবীনীর বিভিন্ন রচনায় কিছু কিছু অশুদ্ধ শব্দ লক্ষ করা যায়। তাহাতে মনে হয়, আরবী তাঁহার মাতৃভাষা ছিল না। তাঁহার জন্ম কাযবীন-এর সম্ভবত ৬০০/১২০৩ সনের দিকে। আইন বিষয়ে এই শহরেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি তাঁহার জন্মভূমি ছাড়িয়া বাগদাদে যান। শুধু তাহাই নহে, তিনি এক সময় দামিশ্‌কেও বসবাস করেন। সম্ভবত এই নগরেই ৬৩০/১২০৩ সনের দিকে তাঁহার সহিত তৎকালের সুপরিচিত দার্শনিক ও মরমী ইবনু'ল-'আরাবী [মৃ. ৬৩৮/১২৪০ (দ্র.]-র সাক্ষাৎ ঘটে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ একই সময়ে তিনি আল-মাওসিল সফরে যান এবং সেইখানে দিয়া'উ'দ-দীন ইবনু'ল-আছীর (মৃ. ৬৩৭/১২৩৯) [দ্র. ইবনু'ল-আছীর]-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। সম্ভবত তিনি সিনজার শহরও সফর করেন। আল-কাযবীনী পারস্য সফরেও যান ও জান্নাবা শহর পরিদর্শন করেন। ইব্‌ন তাগ্‌রীবীরদীর বিবরণ অনুযায়ী আল-কায্‌বীনী বেশ এক দীর্ঘ সময় আল-ওয়াসিত ও আল-হিল্লা শহরে কাটান। ঐ সময় তিনি শেষ 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিম (৬৪০-৫৬/১২৪০-৫৮)-এর শাসনামলে ঐ শহর দুইটিতে কাযী পদের দায়িত্ব পালন করেন। আরব ভাষাবিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ ইবন সা'ঈদ আল-গারনাতী (দ্র.)-র সহিত তাঁহার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। গারনাতী ৬৪৮/১২৫০ সনে প্রাচ্য সফরে যান। আল-কাযবীনীর নামের নিস্‌বা হিসাবে তাঁহার নামের সঙ্গে আল-কূফীও যুক্ত দেখা যায়। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি কোনও না কোনও এক সময় কূফার বাঁসিন্দা ছিলেন। ৬৫৬/১২৫৮ সনে বাগদাদ মঙ্গোলদের পদানত হইলে তিনি একান্তভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কিত কর্মতৎপরতায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়েই খুব সম্ভব তিনি Maecenas-র ব্যক্তিত্বের সমতুল্য ইরানী ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৬৮২-১২৮৩, দ্র.)-র সংস্পর্শে আসেন। আল-জুওয়ায়নী হূলাগূ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আবাকার পক্ষে ৬৬১/১২৬২ সন হইতে বাগদাদের গভর্নর ছিলেন। সম্ভবত তিনি আল-জুওয়ায়নীর আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত রচনা আল-জুওয়ায়নীর নামেই উৎসর্গ করেন। ৬৮২/১২৮৩ সনে তাঁহার মৃত্যু (তাঁহার নাম ও জীবন সম্পর্কে দ্র. তাঁহার রচিত বিশ্বতত্ত্ব, ২খ, আছারু'ল-বিলাদ, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1848, ১২১, ২৩২, ২৬৩, ২৯৩, ৩১০, ৩৩৪, ৩৪৯, ৩৬৭-৮ এবং 'আজা'ইবু'ল-মাখলূকাত, আদ-দামীরীর হায়াতু'ল-

হায়াওয়ান-এর পার্শ্বে, কায়রো ১৩১৯-১৯০১-২, পৃ. ৩; S. De. Sacy, Chrestomathic arabe[2], iii, 447, 448 প.; F. Wustenfeld, in Gottinger Gelehrte Anzeigen, i (1848), 349 প.; M. Reinaud, Geographie d'Aboulfeda, অনু. i, Paris 1848, pp. cxliii-cl ; Brockelmann, GAL I, 481 ; M. Streck, al-Kazwini, in EI[1]; I. Yu. Krackovsky, Arabskaya geograficeskaya literatura, in idem, Izbrannye socineniya, iv, Moscow-Leningrad 1957, 359-60)।

আল-কাযবীনী দুইটি গ্রন্থের রচয়িতা। একটি বিশ্বতত্ত্বমূলক ও অন্যটি ভৌগোলিক বিবরণমূলক। প্রথম গ্রন্থটির সাধারণ নাম 'বিশ্বতত্ত্ব', আরবী নাম ঃ 'আজা'ইবু'ল-মাখলূকাত ওয়া গারা'ইবু'ল-মাওজূদাত" (সৃষ্ট নানা বিস্ময়কর বস্তু ও অস্তিত্বমান বস্তুসমূহের বিস্ময়কর দিকসমূহ)। এই রচনাটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে আছে অতিজাগতিক বিষয়বস্তুর আলোচনা এবং ২য় খণ্ডে পার্থিব বিষয়বস্তুর বিবরণ। ১ম খণ্ডে গ্রন্থকার খগোলীয় বিষয়বস্তু তথা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পরে তিনি উহাতে জান্নাত, ফিরিশতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ দিয়াছেন। এই খণ্ডের শেষের দিকে কাল নিরূপণ সংক্রান্ত সমস্যাদি এবং আরবী ও সিরীয় বর্ষপঞ্জীর ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই রচনার ২য় খণ্ডের শুরুতে চার মৌলিক উপাদান, ধূমকেতু ও বাতাস সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার পর পৃথিবী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পৃথিবীকে সাতটি জলবায়ুমণ্ডলে ভাগ করা হইয়াছে এবং জ্ঞাত সকল সমুদ্র ও নদ-নদী সম্পর্কেও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকম্প, পাহাড়-পর্বত ও জলাশয় সৃষ্টির কারণগুলির বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি প্রকৃতির তিন জগৎ ঃ খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের আলোচনা করিয়াছেন। প্রাণীজগৎ সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে তিনি মানুষ, তাহার বৈশিষ্ট্য, শারীরবৃত্ত এবং মানব উপজাতি বা গোত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জিন্ন ও 'গুল' সম্পর্কে আলোচনার পর অন্যান্য প্রাণীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আল-কাযবীনীর 'বিশ্বতত্ত্ব' বা 'মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা গঠনতত্ত্ব' নামধেয় গ্রন্থটি মুসলিম সাহিত্যে প্রথম বিজ্ঞান বা পদ্ধতিসম্মতভাবে বিশ্বতাত্ত্বিক বিষয়ের উপস্থাপনা। গ্রন্থখানি গোটা ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই রচনাটির আরবী পাঠের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব থাকায় ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ফারসী ও তুর্কী ভাষাতেও এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে ; ইহার একাধিক সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। J. Ruska (Kazwini-Studien, in Isl., iv, 1913, 14-66, 236-62) Wustenfeld-এর (পরে উল্লিখিত গ্রন্থের সংস্করণ ঃ 'আজা'ইব, Kosmographie i, Gottingen 1849, pp. vii-xii) বিপরীত বক্তব্যে জানান যে, 'Cosmography' গ্রন্থের চারটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ ছিল। এই চার সংস্করণের ২য়টির প্রতিনিধিত্বকারক ঃ Cod Monac. 464। ইহা এই যাবৎ কালের জ্ঞান সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি। আর অনেকের মতে উহাই দৃশ্যত সর্বোৎকৃষ্ট। Wustenfeld অবশ্য তাঁহার 'আজা'ইব' সংস্করণের জন্য অতি সাম্প্রতিক কালে প্রাপ্ত ৪নং পাণ্ডুলিপির ভাষাকে বাছিয়া লইয়াছেন যাহা আল-কাযবীনীর মূল রচনার ১৮ শতকীয় পুনঃসংশোধিত সং. মাত্র। পাণ্ডু. Gotha 1508-এই পুনঃবিন্যস্ত গ্রন্থের প্রতিনিধিত্বশীল। ইহা ছাড়া ৪নং ভাষ্যের কোনও কোনও অংশ প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং 'আজা'ইব'-এর অন্যান্য ভাষ্যের সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ ঐ সকল অংশের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তিনি তাঁহার নিজের সংস্করণটিকে অতিশয় জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। এইভাবে তিনি এই গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ নূতন অবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছেন যাহা সংশ্লিষ্ট রচনার অস্তিত্বমান ভাষ্যগুলির কোনটিরই প্রতিনিধিত্বশীল নয়। Wustenfeld-এর সংস্করণ ছাড়াও 'Cosmography' গ্রন্থের একটি কায়রো সংস্করণও (তা. বি., ৮, ৪১৬ পৃ. সংবলিত) আছে। এই সংস্করণটির ভিত্তি Cod Monac. ৪৬৪ পাণ্ডুলিপি। সংস্করণটি আদ-দামীরী রচিত 'হায়াতু'ল-হায়াওয়ান' গ্রন্থের (কায়রো ১৩১৯/১৯০১-২) মার্জিন বা হাশিয়ায় প্রকাশিত সংস্করণের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

'Cosmography' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রায় ক্ষেত্রেই ছবি ও ব্যাখ্যামূলক নকশা সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ উহাতে নানা জ্যামিতিক সারণী এবং উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও দানবসদৃশ অতিকায় জীবের ক্ষুদ্রাকৃতি ছবি রহিয়াছে। এই ছবিগুলির শিল্পকলাগত সৌকর্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান (গ্রন্থের আরবী ভাষ্যসমূহ, উহার ফারসী ও তুর্কী অনুবাদ এবং ঐসব ভাষ্যের পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. আল-কাযবীনী Kosmographie i, সম্পা. Wustenfeld, iii-xii ; Streeck, পূ. গ্র.; 'আব্বাস মাহমূদ, 'আক্কাদ, আল-ফুসূল, ১২৩-৭ ; Brockelmann, S I, 883 ; Krackovsky, পূ. গ্র., 362-5 ; M. Kowalska, Eine unbekannte Handschrift al-Kazwini's Kitab Aga'ib al-mahlukat, in Folia Orientalia, i/2, 1959, 326-32)। 'আজা'ইবু'ল-মাখলূকাত গ্রন্থের সূত্রসমূহ সম্পর্কে এই যাবৎ কোথাও কোনও গবেষণাসমীক্ষা (এই সমস্যা সম্পর্কে দ্র. Pertsch, Kat. d. arab. Handschr, xu Gotha, iii, 431) হয় নাই। Wustenfeld-এর সংস্করণ পাঠে দেখা যাইবে যে, আনুমানিক ২০ জনের মতো গ্রন্থকারের রচনা হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এইসব গ্রন্থকারের মধ্যে আল-জাহিজ, হইতে ইবনু'ল-ফাকীহসহ ইবনু'ল-আছীর অবধি গ্রন্থকারের রচনা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে যাঁহার রচনার সর্বাধিক উদ্ধৃতি লক্ষ করা যায় তাঁহার নাম জনৈক আবূ হামিদ আল-আনদালুসী, ইহা ছাড়া এক অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের রচনাও, তুহফাতু'ল-গারাইব (দ্র. M. Kowalska, Remarks on the unidentified Cosmography Tuhfat al-gara'ib, in Folia Orientalia, ix, 1967 II-8), আলোচ্য গ্রন্থকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তবে Cosmography গ্রন্থের সহিত য়াকূত রচিত 'মু'জামু'ল-বুলদান'-এর যোগসূত্র আজও নির্ণীত হয় নাই।

উপরের বর্ণনা হইতে ইহা পরিষ্কার যে, Cosmography গ্রন্থেরকোনও সমালোচনামূলক সংস্কারণের অস্তিত্ব নাই। Wustenfeld-এর সংস্করণের প্রেরণায় H. Ethe (Leipzig 1868) গ্রন্থের কেবল ১ম খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের সূচনায় A. L. de Chezy ঐ আরবী গ্রন্থটির খনিজ, উদ্ভিদ ও মানুষ শীর্ষক অধ্যায়গুলির (দ্র. S. de Sacy, পূ. গ্র., ৩খ, ৩৮৫-৫১৬) অনুবাদ করিয়াছেন। Uber die Urspring und die Bedeutung der Sternamen (Berlin 1809) শিরোনামে প্রকাশিত এক রচনায়

নক্ষত্র সম্পর্কিত অধ্যায়টির উপর L. Ideler টীকাভাষ্য সম্বলিত এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আজা'ইবু'ল-মাখ্‌লূকাত গ্রন্থের আংশিক নানা সংস্করণ, অনুবাদ ও সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন, J. Ruska, Das Steinbuch aus der Kosmographie des ... al-Kazwini, Heidelb. Prog. d, Oberrealschule, Kirchhain N.-L. 1896 ; Uber den falschen und den echten Kazwini, in Mitt. Gesch. Naturwiss., xiii (1914), 183-8; S. J. Anbacher, Die abschnitte uber die Geister u. die wunderbaren Geschopfe aus Qazwini's Kosmographi ..., Kirchhain N.-L. 1905 ; F. Taeschner, Die Psychologie Kazwini, thesis Kiel, Tubingen 1912 ; E. Wiedemann, Uber die Kriechtiere nach al-Qazwini, dans SB Phys.-med, Soc. Erlangen, xlviii-xlix (1916-7), 222-85) ; Ubersetzung und Besprechung des Abschinittes uber die Pflanzen von Qazwini, ঐ, 286-321 ; G. Jacob, Studien in arabischen Geographen, Berlin 1892, iii, 94-124 ; Ornithologisches zu Qazwini; G. Ferrand, La Tuhfat al-albab de Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati, dans JA (Oct.-Dec. 1925), 230-35 ; A. Seippel, Rerum normannicarum fontes arabici, Oslo 1896-1928, 102-3 ও 140-1 এবং Adnotationes criticae, pp. XLVI and LXVI-LXVII।

আল-কাযবীনীর ২য় রচনাটি সাধারণত ভূগোল নামে পরিচিত। দুইটি ভিন্ন ভাষ্যের কয়েকটি পাণ্ডুলিপির সূত্রে এই রচনাটি পরিচিত। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন ভাষ্যটি হইতেছে 'আজা'ইবু'ল-বুলদান' "বিভিন্ন দেশের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ" (দ্র. হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৮৬)। ইহার রচনাকাল ৬৬১/১২৬২-৩ (দ্র. Reinaud, পৃ. গ্র., cxliv)। পরিপূর্ণ পরিমার্জিত ভাষ্যটির রচনাকাল ৬৭৪-১২৭৫-৬। ইহার শিরোনাম আছারু'ল-বিলাদ ওয়া আখবারু'ল-'ইবাদ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সৌধ ও উহাদের অধিবাসীদের ইতিহাস (দ্র. হাজ্জী খালীফা. ১খ, ১৫৪)। ২য় ভাষ্যটির চারটি পাণ্ডুলিপি Wustenfeld-এর সংস্করণের (Geography Cosmography, ii, আছারু'ল-বিলাদ, Gottingen 1848) বুনিয়াদ এই গ্রন্থের আরও একটি সংস্করণ (বৈরূত ১৩৮০/১৯৬০-১) প্রকৃত প্রস্তাবে Wustenfeld-এর প্রকাশনারই পুনঃপ্রকাশনা।

আছারু'ল-বিলাদ গ্রন্থে পৃথিবীর বর্ণনায় টলেমীয় Oikoumene বিভাজন তথা সপ্ত জলবায়ু বিভাজন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহার এক একটি জলবায়ুর অন্তর্গত শহর-নগর, দেশ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদির বর্ণনা বর্ণমালানুক্রমিকভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি নগর বা দেশের বর্ণনায় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ঐসব নগর বা দেশের প্রতিটিতে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী তথ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এমনিভাবে দেখা যায়, য়াকূতের মু'জামু'ল-বুলদান-এর সহিত কাযবীনীর 'ভূগোল' গ্রন্থের সাদৃশ্য রহিয়াছে, বিশেষত সংশ্লিষ্ট উপদানের (একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, আল-কাযবীনীর রচনায় বিভিন্ন উপকরণ, জলবায়ুর বিভাজন অনুসারে বিভিন্ন সাতটি অভিধানে সন্নিবিষ্ট) বণ্টন সন্নিবেশ দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর মতো বিষয়ের উপর ভূগোল গ্রন্থের কোনও কোনও নিবন্ধের বিষয়গুলি 'বিশ্বতত্ত্ব' গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় এবং সেই তথ্যমূলক নিবন্ধগুলিও নিখুঁতভাবে অভিন্ন পদ্ধতিতে লিখিত।

আরবীতে দুইটি ভাষ্য ছাড়াও ফারসী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থের সংশোধিত ভাষ্য এবং তুর্কী ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকৃতির এই গ্রন্থের কথা জানা গিয়াছে। ৮০৮/১৪০৩ সনে আল-বাকুবী এই গ্রন্থের নূতন ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যটি উল্লিখিত দুই আরবী ভাষ্য হইতে স্বতন্ত্র ('ভূগোল' গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য ও অনুবাদ এবং আলোচ্য রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দ্র. Wustenfeld, Kosmographie, ii, pp. iii-x ; Streck, পৃ. গ্র. ; Brockelmann, SI, 882-3)

Cosmography বা বিশ্বতত্ত্ব গ্রন্থের সূত্রসমূহ সম্পর্কে গবেষণাসমীক্ষা এই যাবৎ না হইলেও 'ভূগোল' গ্রন্থের উৎসাদি সম্পর্কে কিছু সমীক্ষা হইয়াছে। F. Wustenfeld ইহার আগেই অবশ্য আল-কাযবীনী (Gott. Gelehrte Anzeigen, i, 1848, 351) ব্যবহৃত সূত্র বা উৎসগুলির এক তালিকা (যদিও উহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ) প্রণয়ন করেন। য়াকূতের মু'জামু'ল-বুলদান পুস্তকটির তাঁহার কৃত সংস্করণে (Leipzig 1866-70, v, 36-7) এই সমস্যাটির উপর আরও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আল-কাযবীনী উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে প্রচুর উপকরণ ব্যবহার করেন। তবে তিনি উহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। W. Jwaideh (The Introductory Chapters of Yaqut's Mu'jam al-Buldan, Leiden 1959, 44, n I) প্রমাণ করিয়াছেন যে, আল-কাযবীনী য়াকূত রচিত গ্রন্থে বর্ণিত সাত জলবায়ুর সবগুলিই হইতে প্রাথমিক বিবরণসমূহ ধার করিয়াছেন। ১৯৬৭ খৃ. M. Kowalska "Folia orientalia", viii (1966), 41-88-এ প্রকাশিত "The Sources of Al-Qazwini's Athar al-Bilad" শীর্ষক নিবন্ধে প্রথমবারের মতো কাযবীনীর 'ভূগোল' গ্রন্থের উৎস ও সূত্রসমূহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষায় তিনি ঐসব উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। উহা হইতে দেখা যায় যে, আল-কাযবীনীর ভৌগোলিক অভিধানে সন্নিবেশিত ৬০০টির মত নিবন্ধের প্রায় ৩৬০টি নিবন্ধে প্রদত্ত উপাত্তসমূহ মু'জামু'ল-বুলদান হইতে সংগৃহীত। আর এই ৩৬০টি নিবন্ধের একটা বেশ বড় অংশ (যেমন ১৫৭টি) য়াকূতের রচনার সরাসরি বরাত বৈ কিছুই নয়। এইভাবে দেখা যাইবে যে, মু'জামু'ল-বুলদান আছারু'ল-বিলাদ গ্রন্থের প্রধান উৎস। M. Kowalska-র সমীক্ষা হইতেও দেখা যায়, আল-য়া'কূবী, ইবনু'ল-ফাকীহ, ইবন ফাদলান, ইবন হাওকাল ও আল-মুকাদ্দাসীর রচনা এবং আবূ দুলাফের দুই রিসালা হইতে যেইসব উদ্ধৃতি আল-কাযবীনীর 'ভূগোল'-এ সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলি উল্লিখিত ভূগোলবিদগণের মূল রচনা হইতে সরাসরি নয়, বরং তাহা মু'জামু'ল-বুলদান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আল-কাযবীনী অন্যান্য আরবী সূত্র হইতে যেসব উপকরণ নানা খণ্ডাংশ আকারে গ্রহণ করিয়াছেন M. Kowalska তাহার প্রায় সম্পূর্ণ একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ তালিকা হইতে ইবরাহীম ইবন আহমাদ আত-তুরতূশীর গ্রন্থাবলীর বরাত এখানে দেওয়া

হইয়াছে (ইবরাহীম ইবন য়া'কূব আত-তুরতুশী ; দ্র. T. Kowalski, Relatio Ibrahim ibn Ja'kub de itinere slavico, Cracow 1946, 21-35)। ইহা ছাড়াও তালিকাতে রহিয়াছে, নিম্নবর্ণিত গ্রন্থকারদের রচনাবলী ঃ আল-বীরূনী, আল-'উযরী, আবু হামিদ আল-আনদালুসী ও তুহফাতু'ল-গারা'ইব নামে দ্বাদশ শতকের শেষে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত এক রচনা। ইহা ছাড়াও M. Kowalska কায্‌বীনী যেইসব তথ্য ও উপাত্ত মৌখিকভাবে তথ্য সরবরাহকারকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহাদেরও একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। আছারু'ল-বিলাদ-এর গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা উল্লিখিত ধরনের দুই মৌখিক তথ্য সরবরাহকারকদের নিকট হইতে পাইয়াছেন (দ্র. M. Kowalska, Zwei wenig bekannte muslimische Reisende in West-Sudan im 13. Jh., in Folia Orientalia, iii, 1961, 231-4)।

অপেক্ষাকৃত কম সমালোচনামূলক ও নির্ঘণ্টবিহীন Wustenfeld-এর আছারু'ল-বিলাদের সংস্করণটি এতদসত্ত্বেও এই গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ড সংস্করণ, অনুবাদ ও এই রচনার বিভিন্ন অধ্যায় সংক্রান্ত বিশেষ সমীক্ষার প্রারম্ভিক পাঠ হিসাবে কাজ করিয়াছেন। এই সমীক্ষাগুলি হইতেছে ঃ G. Jacob, Studien in arabischen Geographen, বার্লিন ১৮৯২ খৃ., ২খ, ৩৮-৯, ৬০-১ ; ঐ লেখক, Arabische Berichte von Gesandten an germanische Furstenhofe aus dem 9. und 10. Jarhhundert, বার্লিন-লাইপযিগ ১৯২৭ খৃ., পৃ. ২১-৩৩; A. Seippel, Rerum normannicarum fontes arabici, 24-5, 44 ও Adnot. crit., pp. XII-XXIII, XX; G. Ferrand, Le Tuhfat al-albab d'Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati, in JA (1925), 235-9 ; M. C. Lyons, Some Aspects of Al-Qazwini's Athar al-Bilad, in Glasgow Univ. Or. Soc, Trans., xx (1963-4), 63-76 ; M. Kowalska, Namensregister zu Kazwini's Athar al-Bilad, in RO, xxix/I (1965), 99-115, xxx/I (1966), 119-34; ঐ লেখক, Al-Qazwini's Athar al-Bilad and the quotations from Abu Dulaf's Narrative, in Atti del III Congresso di Studie Arabi e Islamici, Ravello 1966, Naples 1967, 427-35.

আল-কায্‌বীনী আরব বিশ্বতত্ত্ববিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভৌগোলিক, ভূতত্ত্ববিদ, খনিজবিশারদ, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও প্রাণীতত্ত্ববিদ। তিনি তাঁহার সকল পূর্বসূরীদের মতোই (৬ষ্ঠ/১২শ শতকের পূর্বসূরিগণ) কোনও নূতন তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন নাই। তিনি একজন উত্তম সংকলক মাত্র। তিনি কোনও নূতন তথ্যাদি সন্নিবেশ করেন নাই কিংবা কোনও নূতন তত্ত্বের উদগাতাও নহেন। তবে তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন এবং একই সময়ে তিনি উল্লিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্রগুলি সম্পর্কে তাঁহার সমসাময়িককালে জ্ঞাত সকল তথ্যকে সুসমঞ্জসভাবে একত্র করিতে সফল হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বতত্ত্ব নামক বিজ্ঞান বা বিষয়কে অত্যন্ত উঁচু স্তরের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বস্তুত ইহাই তাঁহার প্রধান উৎকর্ষ। তিনি বক্তব্যকে অতি সরলভাবে উপস্থাপন করিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য সোজাসুজি উপস্থাপিত করিতেন। তিনি জানিতেন, পাণ্ডিত্যের বিষয়টি একটি সীমিত চৌহদ্দি লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কেননা তাহাতে সাধারণ মানুষ নিরুৎসাহিত হয়, বক্তা বা লেখকের বক্তব্যে আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে। তাঁহার ভাষা পরিষ্কার, সরল ও বৈচিত্র্যময়। অবশ্য বিভিন্ন উৎস হইতে বরাত দেওয়ার সময় তিনি প্রায়ই ঐ উৎসের নীরস মৌখিক উদ্ধৃতি করিয়া দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। তবু একথাও ঠিক, ঐ উপস্থাপনার বিন্যাসও অত্যন্ত নৈপুণ্যময়। আধুনিক আরবী ভাষাবিশারদগণ তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া এমনকি তাঁহাকে Herodotus ও Pliny-র সহিত তুলনা করিয়াছেন (Reinaud, পৃ. গ্র., পৃ. cxliv; আরও দ্র. Streck, পৃ. গ্র., ও Krackovsky, পৃ. গ্র., 358-9)। কিন্তু অন্য কতক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার উৎকর্ষ ও মূল্য বিচারে অনেকখানি কঠোরতার পরিচয় দিয়াছেন। G. von Grunebaum (Medieval Islam, Chicago 1947, 301-2, 304) ৭ম/১৩শ শতকে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলির অবক্ষয় বুঝাইবার জন্য 'আজা'ইবু'ল-মাখলূকাত হইতে দুইটি অনুচ্ছেদের বরাত দিয়াছেন। আর G. Wiet (Introduction a la litterature arabe, Paris 1966, 210) আল-কাযবীনীর 'বিশ্বতত্ত্ব' গ্রন্থটিকে কোনও রকম সমালোচনামূলক মননশীলতা ও মৌলিকতাবর্জিত এক রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। M. Kowalska (The Sources, 87-8) উল্লিখিত মূল্যায়ন অনুযায়ী তাঁহাকে "একজন সখের ভূগোলবিদ বলিয়াছেন—যিনি প্রায়ই বলিতে গেলে আকস্মিকভাবে কোনও রকম বাছবিচার না করিয়াই তথ্য যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।" তাঁহার আরও বিশ্বাস, "তিনি আগেকার ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিকদের লেখা নকল করিয়াছেন।" বস্তুতপক্ষে এই রকম একটা ধারণা ফেলিয়া দেওয়া খুবই শক্ত যে, এই নকলের ব্যাপারে আল-কাযবীনী অন্য সকল আরবীয় বিশ্বতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদদের ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এই কঠিন সিদ্ধান্তটি তাঁহার ব্যাপারে লইতেই হয়। কেননা তিনি মু'জামু'ল-বুলদান হইতে এমনকি গ্রন্থকারের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ না করিয়াই উহা হইতে বিপুল তথ্য ধার করিয়াছেন। অথচ উহাই ছিল তাঁহার বিশ্বতত্ত্ব রচনার প্রধান সূত্র।

পরবর্তীকালের আরব বিশ্বতত্ত্ববিদ ও ভৌগোলিকদের উপর আল-কাযবীনীর প্রভাব বিপুল। তাঁহার দুই গ্রন্থের বুনিয়াদেই আবির্ভূত হইয়াছেন শামসু'দ-দীন আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭২৭/১৩২৭), আহমাদ ইবন হামদান আল-হার্‌রানী (রচনা আনু. ৭৩২/১৩৩২), হামদুল্লাহ কাযবীনী (মৃ. ৭৫০/১৩৪৯-এর দিকে), আদ-দামীরী (মৃ. ৮০৮/১৪০৫), ইবনু'ল-ওয়ারদী (মৃ. ৮৬১/১৪৫৭) এবং মাহমূদ ইবন সা'ঈদ আস-সাফাকুসী (মৃ. ১২৩৩/১৮১৮ সনের পরে) অবধি আরও কয়েকজন ভূগোল ও বিশ্বতত্ত্ববিশারদ লেখক। এই বিষয়ে অন্যান্যের সহিত দ্র. A. F. Mehren, Manuel de la cosmographie du moyen age, Paris-Copenhagen-Leipzig 1874, 165, 168, 179, 186-91, 198 ও স্থা. ; Krackovsky, পৃ. গ্র., 365, 385-6, 493, 598, 618 ও 748-9.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রদত্ত।

T. Lewicki (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

কাযবীনী হামদুল্লাহ (দ্র. হামদুল্লাহ মুসতাওফী)

আল-কায্‌যায (القزاز) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আত-তামীমী, জন্ম কায়রাওয়ান শহরে এবং সেখানেই তাঁহার প্রায় গোটা জীবন অতিবাহিত হয়। ফাতিমী খলীফাগণের সঙ্গে তাঁহার ভাল সম্পর্ক ছিল এবং তাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও প্রচুর উপহার সামগ্রীও তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি ফাতিমী খলীফাদের সঙ্গে মিসরে আসেন সম্ভবত খুবই অল্প সময়ের জন্য। তিনি আবার কায়রাওয়ানে ফিরিয়া যান। নিজ শহরে ফিরিয়া ৪১২/১০২১-২ সনে তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। আনুমানিক ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, আদর্শ জীবনযাত্রা ও মহৎ উদারতার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ—উভয় মহলেরই নিকট তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের প্রায় সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ছাত্রদের মধ্যে ইবন রাশীক, ইবন শারাফ ও ইবনু'ল-বার্‌র-এর নাম উল্লেখযোগ্য। স্পেনে ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তাঁহারা সবিশেষ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃত। আল-হাতিমী, যিনি কবি আল-মুতানাব্বীর সুবিখ্যাত বিরূপ সমালোচক, আল-কায্‌যাযের ছাত্র ছিলেন। সমালোচকদের মূল্যায়নে আল-কায্‌যায একজন চমৎকার বিদ্বান, অথচ স্বভাব কবি। ইবন রাশীক সাহিত্য সমালোচনার সমস্যাদির ক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁহার শরণ লইলেও (আরও সূত্র নির্দেশ নিম্নবর্ণিত গ্রন্থপঞ্জীর আল-'উবাদা দ্র.) তাঁহার প্রধান খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ব্যাকরণ ও অভিধানমূলক বহু বিশালায়তন রচনার জন্য। বস্তুত জীবদ্দশায় এই ধরনের রচনাগুলির জন্যই তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা বলিয়া এই গ্রন্থগুলি উল্লিখিত হয় ঃ

(১) কিতাবু'ল-হুরূফ ; রচনাটি আল-জামি' গ্রন্থের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থটি একটি সুবিশাল সঙ্কলন বিশেষ। ইহাতে প্রতিটি অব্যয় (حرف)-এর অর্থ, উহার ব্যবহার, মূল্য ও বাক্যে উহার প্রয়োগ ও ভূমিকা ইত্যাদির বিবরণের সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে ; (২) কিতাবু'ল-আশারাত (Sidon-এ প্রকাশ ১৩৪৪/১৯২৫-৬), দশ বা ততোধিক অর্থ প্রকাশক শব্দাবলীর এটি শব্দকোষমূলক রচনা ; (৩) কিতাবু'ল-হুলা ওয়া'শ-শিয়াত, Sidon ১৩৪৪/১৯২৫-৬ ; লেখক ও দাস ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য মানব দেহের অঙ্গ সংস্থান বা শারীরতত্ত্ব সংক্রান্ত রচনা ; (৪) কিতাবু'ল-মুছালাছ, ইহা ত্রয়ী স্বরচিহ্ন ব্যবহার বিষয়ক রচনা; (৫) কিতাবু'দ-দাদ ওয়া'জ-জা'; (৬) কিতাবু'ত-তা'রীদ ওয়া'ত-তাসরীহ ; (৭) কিতাব মা য়াজূয লি'শ-শা'ইর ফিদ-দারূরা, কাব্যধিকার বিষয়ক ; সম্পা. এম. কা'বী, তিউনিস ১৯৭১ খৃ. ; (৮) ই'রাবু'দ-দুরায়দিয়্যা, ইবন দুরায়দ রচিত আল-মাকসূরা শীর্ষক কবিতার ভাষ্য; (৯) শারহ রিসালাতি'ল-বালাগা, তর্কালঙ্কার শাস্ত্রীয় এক রচনা ; (১০) কিতাব আব্‌য়াতি;ল-মা'আনী, আল-মুতানাব্বীর হেঁয়ালিমূলক কাব্যকর্ম সংক্রান্ত রচনা ; (১১) কিতাব মা উখিযা 'আনি'ল-মুতানাব্বী মিনা'ল-লাহ্‌ন ওয়া'ল-গালাত; আল-মুতানব্বীর কবিতায় কোনও কোনও নির্দেশনা উক্ত সমালোচনা হইতে উদ্ভূত ; (১২) কিতাব আদাবি'স-সুলতান ওয়া'ত-তা'আদ্দুব লাহু, ১০ খণ্ডে ; সম্ভবত ইহা শাসকদের পালনীয় আচরণ নীতিমালা ও তাঁহাদের প্রতি আচরণীয় নীতিমালা সম্পর্কিত এক রচনা (পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann, নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীতে)। তাঁহার শিক্ষা ও রচনার প্রকৃতি ও মূল্যায়নগত উৎকর্ষের মধ্যে দিয়া আল-কায্‌যায যাঁরি শাসকদের আমলে দৃশ্যত "কায়রাওয়ানের বিদ্বৎগোষ্ঠী"তে ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য গড়িয়া ওঠে তাহা নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন রাশীক, আল-'উমদা, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ১খ, ৭২, ১০৭, ১৩১, ১৫৫, ১৭৪, ১৮৩, ২খ, ৭৮, ৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২৪৫, ; (২) ইবন খায়র, ফাহরাসা, বৈরূত ১৯৬৩, খৃ., পৃ. ৩৬২-৬৩ ; (৩) য়াকূত, উদাবা', কায়রো ১৯২২ খৃ., ৮খ, ৩, ১৮খ, ১০৫-৯ ; ১৯খ, ৩৭ ; (৪) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৮-খৃ., ৪খ, ৯-১১ ; (৫) আল-কিফতী, ইনবাহ, ১খ, ৩১৮, ৩খ, ৮৪-৭, ৩১৫; (৬) ঐ লেখক, আল-মুহাম্মাদুন মিনা'শ-শু'আরা', বৈরূত ১৯৭০ খৃ., ১৮৫-৬ ; (৭) ইবন দিহয়া, আল-মুতরিব, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৮৮ ; (৮) আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আব্‌সার, পাণ্ডু, ২৩২৭, Paris, f. 130 ; (৯) সাফাদী, আল-ওয়াফী, ২খ, ৩০৪-৫ ; (১০) ইবনু'ল-আব্বার, তাকমিলাঃ, কায়রো ১৯৫৫-৬ খৃ., ১খ, ১৩৩, নং ৩৪০; (১১) মাক্কারী, নাফহ, কায়রো ১৯৪৯ খৃ. ৩৭৪; (১২) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ২৯ ; (১৩) ঐ লেখক, মুযহির[3], কায়রো, ১খ, ৮৮ (ইহার পাদটীকায় যে ব্যক্তিকে ইবনু'ল-কায্‌যায বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ঐ ব্যক্তি আসলে আরেকজন লেখক), ৯৬ ; (১৪) এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহহাব, বিসাতুল-'আকীক, তিউনিস ১৩৩০ হি., পৃ. ৫৭; (১৫) ঐ লেখক, ওয়ারাকাত, তিউনিস ১৯৬৫ খৃ., ১খ, ১০৩-৩ ; (১৬) মায়মানী, ইবন রাশীক, কায়রো ১৩৪৩ হি., পৃ. ৩৭-৯; (১৭) Brockelmann, S I, 539; (১৮) R. Blachere, Un poete arabe du IV[e] siecle de l'Hegire, Paris 1935, 292; (১৯) H. R. Idris, La Berberie orientale sous les Zrides, Paris 1962, ৭৭৯-৮০ ও নির্ঘণ্ট; (২০) আ. র, য়াগী, হায়াতু'ল-কায়রাওয়ান, বৈরূত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৯৫, ১৩৭-৪০; (২১) Ch. Bouyahia, La vie litteraire en ifnikiya sous les Zirides, Tunis 1972, নির্ঘণ্ট।

Ch. Bouyahia (E. I.[2])/আফতাব হোসেন

কাযা (দ্র. কাদা)

কাযা'আ ইবন কা'ব (قزعة بن كعب) ঃ (রা) সাহাবী, তাঁহার সূত্রে কোনও হাদীছ বর্ণিত নাই। তাঁহার সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৩৫ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২০৪; (৩) শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আয-যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), তাজরীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, ২খ, ১৫।

মুহাম্মদ মূসা

কাযাক (قزاق/قازاق) ঃ তুর্কী ভাষায় শব্দটি অষ্টম/ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। "স্বাধীন ভবঘুরে" অর্থে, এই সব এবং এই জাতীয় অর্থ যেমন, মুক্ত ও স্বাধীনচেতা লোক, ভবঘুরে, দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী লোক ইত্যাদি অর্থে আধুনিক তুর্কী ভাষাসমূহেও পরিচিতি। তায়মূরীদের অরাজকতা ও অশান্তিপূর্ণ সময়ে শব্দটি দ্বারা প্রকৃত শাসকদের পরিবর্তে ঐ ভণ্ডদের এবং তাহাদের অনুসারী সমর্থকদের বুঝাইত, যাহারা তাহাদের নেতার নেতৃত্বে দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী অথবা দস্যুর মতো জীবন যাপন

করিত। একই সময়ে শব্দটি দ্বারা ঐ সমস্ত যাযাবর সম্প্রদায়গুলিকেও বুঝাইত যাহারা তাহাদের রাজ-পরিবার এবং জ্ঞাতিদের হইতে পৃথক হইয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। পরবর্তীকালে আর এক অর্থে ইহা মধ্য এশিয়ার অলস 'সার্ট' (Sart) জাতীয় লোকদের পরিবর্তে 'যাযাবর'দের বুঝাইত। কাযাকদের সামাজিক পদমর্যাদা যাযাবর তুর্কীদের একটি অতি প্রাচীন সামাজিক বিধানরূপেও বিবেচ্য হইত। শব্দটি একটি রাজনৈতিক দলের নামে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে উযবেক উপজাতীয় মিত্র সংঘভুক্ত ঐ দলগুলির জাতিগত নাম হিসাবে বুঝাইত, যাহারা উযবেক খান আবু'ল-খায়রকে পরিত্যাগ করে এবং তুর্কিস্তানের উত্তর-পূর্বে শুষ্ক প্রান্তরে বসতি স্থাপন করে। এই দলগুলিই বর্তমান কাযাকিস্তানের অধিবাসীদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরে এই নাম ধারণ করে। সম্ভবত আধুনিক কাযাকদের সহিত অন্যান্য তুর্কী ও মোঙ্গলেরও জন্মসূত্রে সম্পর্ক ছিল। একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্যালমাক জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে তিনটি কাযাক সম্প্রদায়কে রাশিয়ায় যাইতে এবং তাহাদের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে খুবই দুর্বল এবং নামমাত্র সম্পর্ক ছিল। পূর্বের রুশ প্রথা অনুসারে স্লাভিক কাযাক অথবা কোযাকস (কস্যাক্স) কোযাকদের হইতে তুর্কী কাযাকদের পৃথক করার জন্য মধ্য এশিয়ার কাযাকদের নির্ভুল ভাষায় কাযাক-কিরগিয নামে অভিহিত করা হইত। তুর্কী ভাষা হইতে উদ্ভূত কাযাক শব্দটি সর্বপ্রথম রুশ ভাষায় এক ব্যাপক অর্থসহ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যবহৃত হইত। পরবর্তীকালে ইহার সামরিক অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত সামরিক দলসমূহকে বুঝাইত যাহারা মধ্যযুগীয় রাশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করিয়াছিল। কাযাক (কস্যাক্) শব্দটি উকরাইন ও পোল্যাণ্ডের উচ্চারণের মতো পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে ব্যবহৃত হয়। কাযাক শব্দটির সঠিক শব্দতত্ত্ব এখনও জানা যায় নাই। তুর্কী শব্দতত্ত্ব অনুসারে kaz (কায)-এর অর্থ "পলায়ন করা, মুক্ত করা" এবং প্রত্যয় (nom act.) ak-এর অর্থ ভাষা সম্পর্কীয় তথ্যাবলীতে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং ইহা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত নয়। বর্তমান তুর্কী শব্দতত্ত্ব অনুসারে তুর্কী জাতির জাতিগত নাম kaz কায (>az) এবং ইরানের জাতিগত নাম Sak (সাক) অর্থাৎ Saka-এর সাম্প্রতিক শব্দতত্ত্ব একটি অস্পষ্ট অনুমান, যাহা ঐতিহাসিক তথ্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাসঙ্গিক ভাষা সম্পর্কীয় ও ঐতিহাসিক উপাত্তসমূহ (বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সমালোচনামূলক জরীপসহ) এক সাথে সন্নিবেশিত হইয়াছে (১) G. Doerfer, Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen, iii, Wiesbaden 1967, 462 ff. এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক জাতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে উপস্থাপন করিয়াছেন ঃ (২) L. Krader, Ethnonymy of Kazakh, in American Studies in Altaic Linguistics, Bloomington—The Hague 1962, 123 ff.। (৩) A. von Gabain তাঁহার প্রবন্ধে তুর্কী জাতি সম্প্রদায়ের ইতিহাসে কাযাকদের সামাজিক মর্যাদার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন ঃ Kasakentum, eine soziologischphilologische Studie, in Acta Orient, Hung. xi, 161 ff. রুশ ভাষা সম্পর্কীয় এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কসমূহ বর্ণিত হইয়াছে ঃ (৪) G. Stokl, Die Entstehung des Kosakentums, Munich 1953, and G. F. Blagova, Istoriceskie vzaimootnosheniya slov kazak i kazah (The mutual historic relations of the words kazak and kazah), in Etnonimi, Moscow 1970, 143 ff. (G. F. Blagova-এর উপরিউক্ত গ্রন্থে জাতিতাত্ত্বিকতার ভাষা সম্পর্কীয় এবং ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে); (৫) দা.মা.ই., ১৬/২খ, ১১৪-৫।

W. Barthold (G. Hazai) (E.I.^{2})/মুহাম্মদ আয়াজ

কাযাকিস্তান (قازقستان) ঃ (কাযাকিস্তান, কাযাকিস্তান, Kazakhstan), সোভিয়েত সামাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যাহা সোভিয়েত য়ূনিয়ন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (USSR) দ্বিতীয় বৃহৎ রাজ্য। উহার আয়তন ১০,৬৪,০৯২ বর্গমাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সীমান্ত হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্র প্রজাতন্ত্র (RSFSR) এবং দক্ষিণে উয্বেকিস্তান ও কারগীযিয়া অবস্থিত। কাযাকিস্তানের উত্তরাংশ উর্বর সবুজ প্রান্তরবিশিষ্ট, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আলতাই এবং তিয়ানশান পর্বত-শৃঙ্গসমূহ বরফে আচ্ছাদিত থাকে এবং উহার পাদদেশে সবুজ খেজুর বাগান বিদ্যামান, কিন্তু বিশেষ করিয়া মধ্য এবং পশ্চিম অংশ খুবই শুষ্ক, এমনকি কোনও কোনও অঞ্চলে সামান্য পানিও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রজাতান্ত্রিক বিরাট অংশ ঈলী ইউরাল, আরতাশ এবং শির দরিয়া প্রভৃতি নদী সিঞ্চন করিয়া থাকে। বর্তমানে উহার পানি দ্বারা ব্যাপকভাবে সেচকার্য করা হয়। এই কারণেই সোভিয়েত রাশিয়ার মোট কর্ষণযোগ্য জমির শতকরা ১৪ ভাগ কাযাকিস্তানে অবস্থিত এবং সোভিয়েত য়ুনিয়নের এক-চতুর্থ ভাগ শস্য এইখানেই উৎপন্ন হয় (১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এক কোটি সত্তর লাখ মণ শস্য)। এই অঞ্চল চতুষ্পদ জন্তু, বিশেষ করিয়া মেষের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ, যাহা হইতে উন্নতমানের পশম পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদের দিক দিয়াও এই রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কয়লা, টাংসটেন, (Tungsten), প্যাট্ট, তাম্র, সীসা, জিস্ত (جست), নিকেল এবং ক্রোমিয়াম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল খনিজ দ্রব্যের কারণে শিল্পে এই প্রজাতন্ত্র সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এইখানে ১৩,২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল লাইন এবং ১০৮,৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছিল। ১৯৬০ খৃ. এই রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সাড়ে দশ হাজার এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। এই প্রজাতন্ত্রে তেষট্টি হাজার লাইব্রেরী এবং বিশটি যাদুঘর রহিয়াছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আলমা আতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। রাশিয়াতে মহাশূন্য পরিভ্রমণের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে, উহার কেন্দ্র কাযাকিস্তানের কারাগান্দা অঞ্চলে অবস্থিত। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারী ১৯৬৯ খৃ. এই প্রজাতন্ত্রের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,২৮,৮০,০০০ যাহাতে শতাধিক জাতির লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, মুসলিম গেজেটিয়ার অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১,১২,৬৭,০০০ তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৭৬,৬১,৫৬০ অর্থাৎ ৬৮%)।

কাযাক একটি মিশ্র বংশের জাতি। অষ্টম শতাব্দীতে মা ওয়ারা-ই কাফকায-এ অনুপ্রবেশকারী তুর্কী গোত্র এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই স্থানে বসবাসকারী মুগোল গোত্রসমূহের পারস্পারিক সংমিশ্রণের ফলে

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহারা আত্মপ্রকাশ করে। গোলডেন হোর্ড (Golden Horde)-এর পতনের পর এই যাযাবর জাতি তিনটি বৃহৎ গোত্র [বৃহৎ গোত্র (উরদু-ই কাবীর), মধ্যম গোত্র (উরদু-ই মুতাওয়াস্‌সাত) এবং ক্ষুদ্র গোত্র (উরদু-ই সাগীর)]-এ বিভক্ত হইয়া পড়ে। কাযাকদের মধ্যে গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ; কোনও প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত তাহাদের অধিকাংশ বসতি উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং তাহাদের কিয়দংশ সীর দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিকার্য করিত। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহাদের স্বতন্ত্র জীবিকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উহারা উত্তর অঞ্চলে রুশ নব্য-বসতিসমূহের দক্ষিণে উয্‌বেকিস্তানের সীমান্তে বসতি স্থাপন করে।

কাযাকিস্তানে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সূত্রপাত সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন রুশিয়া সাইবেরিয়া জয় করে। পক্ষান্তরে চৈনিক মধ্য-এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলের ন্যায় পূর্ব কাযাকিস্তান মুগোল গোত্র ইউংগায (Jungae)-এর অধিকারে ছিল। ১৭২৬ খৃ. পশ্চিম কাযাকিস্তানের খান আবু'ল-খায়র বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য রুশের সাহায্য কামনা করেন। ১৭৩১ খৃ. রুশ সরকার তাতারী সদস্যদের সমন্বিত একটি প্রতিনিধি দল সেখানে প্রেরণ করেন, যাঁহারা উক্ত সনের অক্টোবর মাসে খান আবু'ল-খায়র-এর নিকট হইতে রুশিয়ার প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনারা ইউংগায গোত্রকে পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। রুশগণ আরতাশ নদীর তীরে তাহাদের দুর্গ নির্মাণ করিয়া ফেলে। কাযাক ও কালমাকদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ উভয়কে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। ফলে এই স্থানে রুশদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ ঘটে। এই সময়ে (১৭৮৩-১৭৯১ খৃ.) কাযাকদের ক্ষুদ্র গোত্র (উরদু-ই সাগীর) Srym Datov-এর নেতৃত্বে রুশদিগকে ও তাহাদের মিত্র অর্থাৎ আবু'ল-খায়র-এর পুত্র নূর 'আলী খানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু রুশদের বিজয় অব্যাহত থাকে। সুতরাং ১৮২২ খৃ. যখন তাহারা সাইবেরিয়াতে চীনের সহিত তাহাদের সামারিক সীমান্ত নির্ধারণ করায় তখন তাহারা বুখারা এবং যূকান্দ পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া ফেলে। ইহার পর কাযাকিস্তানে রুশদের অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩০ খৃ. রুশগণ আকমূনাসাক (বর্তমান সালীনুগ্রাড)-এ একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং উক্ত এলাকায় রুশ এবং যূক্রীনী কৃষকদিগকে পুনর্বাসিত করিতে শুরু করে। তাহাদের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে Kenesary Kasymov-এর পরিচালনায় উরদু-ই মুতাওয়াস্‌সাত-এর অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৩ খৃ. রুশগণ কাযাল আওয়ারদা এবং আলমা আতা'র দুর্গ নির্মাণ করে, এমনকি ১৮৬৪ খৃ. পর্যন্ত সমগ্র কাযাকিস্তান তাহাদের অধিকারে আসে। কাযাকিস্তানের ন্যায় বিরাট রাজ্য এত সহজে রুশদের অধিকারে আসা বাহ্যত আশ্চর্যজনক মনে হয়। তবে কাযাক বিপুল জনশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। তদুপরি তাহাদের শাসকবৃন্দ রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল এই কারণে যে, তাহারা মুগোল, চীন ও উযবুকগণের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রুশদের আশ্রয় গ্রহণ করাকে প্রাধান্য দিয়াছিল।

ইসলাম কাযাকিস্তানে খৃ. দশম শতাব্দীতে পৌঁছে, যখন বালখের কাযাক গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তাতার এবং উযবেকগণের ন্যায় তাহারা ইসলাম দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় নাই। উরদু-ই মুতাল্লা (Golden Horde)-এর খান সুলতান গিয়াছু'দ-দীন উযবিক খান (১৩১৩-১৩৩১ খৃ.) এই দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেন ; কিন্তু উহারও তেমন কোনও সন্তোষজনক ফল পরিলক্ষিত হয় নাই। কাযাক ছিল একটি যাযাবর জাতি। ফলে তাহাদের বাসভূমিতে যেমন মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব হইত না তেমনি মাদ্‌রাসাও পরিচালনা করা যাইত না। তাহারা স্বভাবত লেখাপড়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। ফলে অতি অল্প সংখ্যক লোকই ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করিত। রুশের সহিত সংযুক্তিকালে তাহারা শারী'আতের নির্দেশাবলী এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন সম্পর্কে অত্যন্ত অজ্ঞ ছিল ; তদুপরি তাহাদের আইন-কানুন প্রাচীন সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যারীনা দ্বিতীয় কেথরীন—এর ধারণা ছিল যে, ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন কাযাকদের জন্য খুবই উপযোগী এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের যাযাবর জীবনে বিপ্লব সাধন করা যাইতে পারে। সুতরাং রুশ সরকার কাযাকদের জন্য মসজিদ নির্মাণ এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। উফাতে একটি ইসলামী ধর্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, এমনকি ইসলাম প্রচার ও কুরআন মুদ্রণের ব্যয়ভারও বহন করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাযাকিস্তানের সরকারী ভাষা ছিল তাতারী এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তাতারী প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যাহার দরুন এই অঞ্চলে রুশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনও প্রভাব পড়ে নাই। ১৮১৪ খৃ. ভল্গা ও যূরাল ভূখণ্ডে প্রথম রুশী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ খৃ. পর্যন্ত অনুরূপ আরও আটটি স্কুল খোলা হয়, তন্মধ্যে অওরানবারগ ও আওমাসক-এর প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইখানে কাযাক প্রধানদের সন্তান-সন্ততি শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে রাজনৈতিক কারণে কিছু সংখ্যক লোককে রাশিয়া হইতে কাযাকিস্তানে নির্বাসিত করা হয়। ফলে কাযাকিস্তানের শিক্ষিত শ্রেণীর উপর গভীর প্রভাব পড়ে, বিশেষত তাহাদের স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাধারা দ্বারা যুবক শ্রেণী অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তাহারা মুক্ত চিন্তা, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ওয়ালী খান (১৮৩৫-১৮৬৫ খৃ.)-এর নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু করে। কেননা কাযাকদের উন্নতির পথে গোত্রীয় ব্যবস্থাই ছিল বড় অন্তরায়। সুতরাং তাতারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলামী প্রাণসত্তার পুনর্জীবনের মাধ্যমে জনগণের মানসিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা যায়। দক্ষিণ কাযাকিস্তানে ইসলামের প্রভাব যেহেতু অধিকতর ছিল এই কারণে কাযাকিস্তানের গোত্রসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি মুসলিম কাযাক নেতৃবৃন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রুশ সরকার কাযাকদের ধর্মীয় জীবনের উপর হইতে 'উফা' অঞ্চলের মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার লোপ করিয়া কাযাকিস্তানের সরকারী কাজকর্মে তাতারী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই আইনের মাধ্যমে মাদরাসাসমূহে রুশ ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সকল মাদরাসায় তাতারীর স্থলে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে, শিক্ষকগণকেও উক্ত ভাষী হইতে হইবে। স্বকীয় ভাষায় শিক্ষার প্রসারের দরুন কাযাকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয় এবং তাতারী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া এমন এক কাযাক জাতির ভিত্তি রচিত হয় যাহারা রুশ, তাতার কিংবা তুর্কী না হইয়া প্রত্যেকে স্বীয় সত্তা ও পৃথক

সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃঢ় ছিল। তাহাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেদের স্বাধীন ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং 'কাযাক' পত্রিকা ছিল তাহাদের সর্বোত্তম মুখপত্র। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে এই দেশে একটি জাতীয় আন্দোলন দানা বাঁধিয়া ওঠে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর প্রথম এবং দ্বিতীয় 'দূমা' (পার্লামেন্ট)-এর জন্য কাযাক প্রতিনিধিও নির্বাচিত হয়।

কাযাকিস্তানকে সংযুক্ত করিবার পর রুশ সরকার তথায় আধুনিক কৃষিকার্যের উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে। রুশদের এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশ য়ূরাল ও আরতাশ নদী তীরে এবং সামারচী-এর নিম্ন পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। ১৮৯১-১৮৯২ খৃ. দুর্ভিক্ষের পর রুশগণ কাযাকিস্তানে উপনিবেশিকদের সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পায় এবং সরকার যাযাবরদের অনেক পতিত জমি দখল করে। উক্ত উপনিবেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কাযাকিস্তানে অবস্থিত ছিল, তথাকার উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও আবহাওয়া কৃষিকার্যের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ ব্যবস্থা এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রুশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির দরুন কৃষি-উৎপাদকদের বিরাট বিরাট গোষ্ঠী এই স্থানে আগমন করে। সরকারের এই বিজ্ঞ পদক্ষেপের দরুন রুশ ও যূক্রীন অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় এবং কাযাকিস্তানের আবাদকারীদের সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রুশ ও যূক্রীনী জাতি এই দেশে পৌঁছে যাহার সংখ্যা চারি লক্ষেরও অধিক ছিল। তাহাদিগকে পুনর্বাসিত করিবার জন্য সরকার অতিরিক্ত সাড়ে আট কোটি একর জমি দখল করে। উহার প্রতিক্রিয়া কাযাকদের জীবনের এক অপরিহার্য ব্যাপার ছিল। কিছু সংখ্যক লোক কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অনভিজ্ঞতার দরুন তাহারা উহাতে সফলকাম হইতে পারে নাই। অধিকাংশ কাযাকবাসী নিজেদের উর্বর ভূমি ও সবুজ চারণভূমি নূতন আবাদকারীদের হাওয়ালা করিয়া মধ্য ও দক্ষিণ কাযাকিস্তানের দিকে হিজরত করে। ধীরে ধীরে তাহাদের চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্য হ্রাস পায় এবং তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাযাক নেতৃবৃন্দ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করিয়া দাবী করেন যেন রুশদের কৃষিকার্য সত্বর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যদিও রুশিয়ার সকল স্বাধীনচেতা নেতৃবৃন্দ উহা সমর্থন করেন তথাপি সরকার এই বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়া বসে। কেননা উক্ত নব বাসিন্দাদের মাধ্যমে রুশিয়া কেবল যে বিপুল পরিমাণে শস্য এবং বিভিন্ন সামগ্রী অর্জন করিতেছিল তাহা নহে, বরং তথায় বহু সংখ্যক রুশি কৃষকদের কর্ম সংস্থানও হইতেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে রুশিয়ার সেনাবাহিনীতে সংরক্ষিত সৈন্যদল ও শ্রমিকের স্বল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। মধ্য এশিয়া বিজয়কালে সরকার অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তথাকার মুসলমানদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তির জন্য ডাকা হইবে না এবং ১৮৮৬ খৃ. উক্ত অঙ্গীকার অনুমোদন করা হইয়াছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুসলমানদিগকে শ্রমিকদের কার্যে ভর্তি করিয়া রণাঙ্গণের পশ্চাতে পরিখা খনন এবং ব্যারাক ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণকার্যে নিয়োগ করা হউক। বাধ্যতামূলক ভর্তির এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'কাযাক' পত্রিকা দাবী করে যে, যদি এই ভর্তি অপরিহার্য হয় তাহা হইলে নূতন বসতি স্থাপন বন্ধ করিতে হইবে ; দূমা'তে (রুশিয়ার সংসদ) কাযাকদের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে শ্রমিকদের পরিবর্তে অশ্ব বাহিনীতে ভর্তি করিতে হইবে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে একটি কাযাক প্রতিনিধিদল সেন্ট পিটারসবুর্গ-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইত্যাকারে উযবেকিস্তান ও কারগীযিয়াতে ভর্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়; কয়েক স্থানে হাঙ্গামা হয় ; সরকারী অফিসের উপর আক্রমণ করা হয়, রেলওয়ে স্টেশন ধ্বংস করা হয় ; রেলওয়ে লাইন এবং তারের স্তম্ভ উৎপাটন করা হয়। রুশ সেনাবাহিনী এই গোলযোগ কঠোরভাবে দমন করে। ইহাতে কয়েক সহস্র মুসলমান নিহত হয় এবং তাহাদের এক বিরাট সংখ্যা চীনে হিজরত করে। কাযাকিস্তানেও এই গোলযোগ 'আবদু'ল-গাফফার ও আমান জালদী ঈমানূফ-এর নেতৃত্বে আরম্ভ হয়, কিন্তু ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কেননা অধিকাংশ কাযাক নেতৃবৃন্দ ধৈর্য সহকারে আইন অমান্য রোধের যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। মোটকথা কাযাকদিগকে যথেষ্ট জানমালের ক্ষতির শিকার হইতে হয়। অক্টোবর ১৯১৭ খৃ. বিপ্লবের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

নূতন রুশিয়া প্রজাতন্ত্রের গোড়াতে কাযাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের সমর্থকগণ ইসলামী ঐক্য আন্দোলনে সহযোগিতা করে নাই। ১৯১৭ খৃ. নভেম্বর মাসে 'আলী খান বূকা'ই কাযাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন এবং উক্ত বৎসরই একটি জাতীয় সরকার (Alish orda) গঠিত হয়। এই স্বাধীন ও জাতীয় সরকার বেশীদিন টিকিতে পারে নাই। ১৯১৯-২০ খৃ. লাল বাহিনী শ্বেতাঙ্গ রুশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া কাযাকিস্তান দখল করে। ২৬ আগস্ট, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে "কাযাক সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিক", যাহা Uralsk, Turgai, Akmlionsk ও Semipalatinsk প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্র সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (RSFSR) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার সামরিক অস্থায়ী রাজধানী উরানবার্গ-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাহা ১৯২৫ খৃ. কাযাল উরদাতে এবং ১৯২৯ খৃ.-র আলমাআতা-তে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৭ খৃ. পর রুশ সরকার যাযাবর কাযাক গোষ্ঠীকে স্থায়ী বসতিতে রূপান্তরিত করিবার এবং এই অঞ্চলে অধিক সংখ্যক রুশ ও যূক্রিনীদের পুনর্বাসিত করিবার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত করিতে আরম্ভ করে যাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাযাক সংখ্যালঘুতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহার প্রতিবাদের ফলে ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী Kalumbetov-কে অপর আঠার জন নেতার সহিত "কারিসী স্বার্থ"-এর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৩৬ খৃ. ৫ ডিসেম্বর আরও কিছু অঞ্চল কাযাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মান প্রদান করা হয়। বর্তমানে উহাতে নিম্নবর্ণিত প্রদেশসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। Aktyubinsk, আলমাআতা, চামকান্ত, Dzhambul, পূর্ব কাযাকিস্তান, Guryev, Karaganda, Kokchetan, Kustanai, Telinograd, kzyl-orda, উত্তর কাযাকিস্তান, Pavlodar, সীমীপ্লাত নামক, Taldi-Kurgan ও Uralsk। ১৯৩৭ খৃ. জুন মাসে কাযাক কমিউনিস্ট পার্টির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাযাকিস্তান সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং কিছু কাযাক সৈনা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া খেতাব (তামগা) লাভ করেন। যুদ্ধকালীন প্রথমবার একজন কাযাক Shaykh metov-কে কাযাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রতিনিধি

হিসাবে মনোনীত করা হয়। যেহেতু তিনি পরবর্তীকালে রুশ সরকারের নূতন বসতি সংক্রান্ত পলিসি বাস্তবায়িত করিতে অপরাগ হন এই কারণে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অপসারণ করিয়া তাঁহার স্থলে একজন রুশকে মনোনীত করা হয়। নূতন বসতি স্থাপনের অভিযান অব্যাহত থাকে এবং আরও রুশ ও যুকরীনীকে এখানে অধিক সংখ্যায় স্থানান্তরিত করা হয়।

সরকারের ক্ষমতা সুপ্রিম সোভিয়েতের হাতে থাকে। উহার সর্বোচ্চ পরিষদ (Presidium) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রতিনিধি ও ষোল জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৬০ খৃ. উহার অর্ধেক সদস্য ছিল কাযাক সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও কাযাকিস্তান বাহ্যত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, তথাপি উহার রাশিয়ার বাহিরে কোনও দেশের সহিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নাই [আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. সোভিয়েত রুশ]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. E. Hudson, Kazakh Social structure, লন্ডন ১৯৩৮ খৃ.; (২) I. Grauman, The Kazakhs under changing Russian Regimes ওয়াশিংটন ১৯৫১ খৃ.; (৩) G. Lias, Kazakh Exodus, লন্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (৪) P. Alempliev, Soviet Kazakhstan, মস্কো ১৯৫৮ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Where Economic Inequality is no more, মস্কো ১৯৫৯ খৃ.; (৬) Serge A. Zenkovsky, Pan-Turkism and Islam in Russian কেম্ব্রিজ (মিসাচুসেটস [আমেরিকা]) ১৯৬০ খৃ., দ্র. গ্রন্থপঞ্জীর বিস্তারিত সূচী; (৭) Muslim Gazetter, মু'তামার-ই 'আলাম-ই ইসলামী সংখ্যা, করাচী; (৮) G. Wheeler, Islam in the Soviet Union, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (৯) Encyclopaedia Britannica, ১৯৬৯ খৃ., ১৩খ, ২৫৮ প.; (১০) The Statesman's year Book, ১৯৭০-১৯৭১ খৃ., নির্ঘন্ট; (১১) চৌধুরী নাযীর আহমাদ খান, Commonwealth of Muslim States, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (১২) মুয্যাম্মিল য়াসীন, তা'রীখ-ই সালতানাত-ই মুসালমানান, করাচী ১৯৬৯ খৃ., যাহা অনেকাংশে উল্লিখিত গ্রন্থ Pan-Turkism and Islam in Russia-এর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ মুহম্মদ ইসলাম গণী

কাযাকিস্তান (قازقستان) ঃ যাহার বানান Kazakstan, সরকারী প্রজাতন্ত্রী কাযাক (Kazak Republic, Kazakh, Qazaq) কাযাক রিপাবলিকেসি (Kazakh Republikasy), মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম দেশ (Encyclopaedia Britannica, vol. 6, Tenth Edition, p. 775, USA 1902-1903)।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যাহা সাবেক সোভিয়েত য়ূনিয়ন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (USSR) দ্বিতীয় বৃহৎ রাজ্য। পূর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, দক্ষিণে কিরঘিযিস্তান, উজবেকিস্তান, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং তুর্কমেনিস্তানের কিয়দংশ, উত্তরে রাশিয়া। সোভিয়েত য়ূনিয়ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সনে কাযাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ২৫ অক্টোবর, ১৯৯০ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ঐ তারিখ কাযাকিস্তানকে সার্বভৌম ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ, ১৯৯২ কাযাকিস্তান জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ২৫ ডিসেম্বর কাযাকিস্তানের জাতীয় দিবস।

আয়তন ঃ ১,৬৮৭,৪৪৩ বর্গমাইল, ২,৭১৭,৩০০ বর্গ কি.মি.।

ভূমির আয়তন ঃ ১,৬৫৭,৯৪৫ বর্গমাইল, ২,৬৬৯,৮০০ বর্গ কি.মি.। তুলনামূলক আয়তন ঃ বিশ্বের নবমতম, পশ্চিম য়ূরোপের সমান। টেকসাসের চারি গুণ, ফ্রান্সের পাঁচ গুণ। কাযাকিস্তানের দীর্ঘতম সীমানা রাশিয়ার সঙ্গে ৪,২৫১ মাইল/৬,৮৪৬ কিলোমিটার, চীন ৯৫১ মাইল/১,৫৩৩ কি.মি., কাস্পিয়ান সাগরের সীমানায় ১,১৮৩ মাইল/ ১,৮৯৪ কি.মি.।

প্রসিদ্ধ শহর ঃ আসতানা (Astana) রাজধানী। বৃহত্তর শহর, আলমাআতি (Almaty) পূর্বে রাজধানী ছিল, ডিসেম্বর ১৯৯৮ সনে স্থানান্তর করা হয় আসতানায়। কারাগান্দা (Karaganda), সীমকেনট (Skymkent), আতিরাউ (Atyrau), আকতোবী (Aktobe) ও ওসকিমেন (Oskemen)। জনসংখ্যা ঃ ১ অক্টোবর, ২০০৬ সালে ১৫,৩৪৭ মিলিয়ন।

ইসলাম কাযাকিস্তানে খৃ. দশম শতাব্দীতে পৌঁছে। যখন বালখের কাযাক গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তাতার (Tatar) এবং উযবেকগণের ন্যায় তাহারা ইসলাম দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় নাই। উরদু-ই মুআল্লা (Golden Horde)-এর খান সুলতান গিয়াছুদ্দীন উযবেক খান (১৩১৩-১৩৩১ খৃ.) এই দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেন; কিন্তু উহারও তেমন কোন সন্তোষজনক ফল পরিলক্ষিত হয় নাই। কাযাক ছিল একটি যাযাবর জাতি। তাহারা স্বভাবত লেখাপড়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। ফলে অতি অল্প সংখ্যক লোকই ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করিত। রুশের সহিত সংযুক্তিকালে তাহারা শরী'আতের নির্দেশাবলী এবং ইসলামী-তাহ্যীব তমদ্দুন সম্পর্কে অত্যন্ত অজ্ঞ ছিল; তদুপরি তাহাদের আইন-কানূন প্রাচীন সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্তমান কাযাকিস্তানে সুন্নী ইসলামের হানাফী স্কুলের প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্যাথেরিন দি গ্রেট (Catherine the great)। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইসলামের আদর্শ কাযাকদের জন্য খুবই উপযোগী এবং ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের যাযাবর জীবনে বিপ্লব সাধন করা যাইতে পারে (The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Goln L. Esposito, editors chief, Volume-2, New York, p. 407, 1995)।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাযাকিস্তানের সরকারী ভাষা ছিল তাতারী এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তাতারী প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যাহার দরুন এই অঞ্চলে রুশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন প্রভাব পড়ে নাই। কাযাকদের মধ্যে গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; তাহাদের উন্নতির পথে এই ব্যবস্থাই ছিল অন্তরায়। কোন প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাতারীর স্থলে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বকীয় ভাষায় শিক্ষার প্রসারের কারণে কাযাকদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হয় এবং তাতারী প্রভাবমুক্ত এমন এক কাযাক জাতির ভিত্তি রচিত হয় যাহারা রুশ, তাতার কিংবা তুর্কী না হইয়া প্রত্যেকে স্বীয় সত্তা ও পৃথক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃঢ় ছিল। কাযাক ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি ছিল জনগণের প্রথম দাবি। ১৯৮৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাযাক সুপ্রিম সোভিয়েত (আইন সভা) কাযাক ভাষাকে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক

ছিল। ১৯৮৯ সনে প্রজাতন্ত্রে কাযাক ভাষায় শিক্ষাদান করিবার নির্দেশ জারি করা হয়। শ্রেণীকক্ষে উহা যথাযথ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাযাকিস্তানের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কাযাক আল-ফারাবী। ইহা ছাড়া কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, কারিগরি স্কুল রহিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে (Ency, পৃ. গ্র., পৃ. ৭৭৫)।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র ধর্মবিরোধী সমাজব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ইসলাম বর্জন করা সম্ভব না হইলেও ১৯৮৯ সালে কাযাকিস্তানের গ্রাম-গঞ্জে ইসলামের তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯৮৯ সালে রাশিয়া ধর্মচর্চার ব্যাপারে নমনীয় হয়। কার্যত সমস্ত কাযাক জাতিসত্তা হিসাবে নিজেদেরকে মুসলমানরূপে পরিচিতি হয় (Akiner, Shirin, Islamic Peoples of the Soviet Union p. 316, Rev. ed. London 1990)। তাহারা পারিবারিকভাবে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালন করিত, যেমন জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারে। স্বল্প সংখ্যক কাযাকদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ বা আরবী জ্ঞান ছিল, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা ধর্ম সম্পর্কে তেমন জ্ঞান ছিল না। কাযাকিস্তানে ইসলামী ভাবধারায় জীবন যাপন করা সম্ভব। ১৯৯১ সনের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণায় (Declared 16 December, 1991) ধর্মীয়-আচার অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেওয়া হয়। সউদী, তুর্কী ও মিসর সরকারের অর্থায়নে বহু মসজিদ, মাদরাসা ও দালানকোঠা নির্মিত হয়। স্থানীয় জনগণও আর্থিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৯০ সালে কাযাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভ (Nur Sultan Nazarbayev) এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার বুনিয়াদ হইবে ইসলাম। তখনও তিনি তাঁহার প্রজাতন্ত্র হইতে তাসকেন্ট ভিত্তিক (Taskent-based) সাডউম (Sadum) অপসারণ করিয়া আলাদা কাযাক মুফতিয়াত (Muftiate) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তখনও কাযাকিস্তান রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল (Then Still Part of The USSR)। স্বাধীন কাযাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সংবিধান জানুয়ারী ১৯৯৩ খৃ. প্রবর্তিত হয়। সেই সংবিধানে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকার স্বীকৃত হয়। সেই সাথে নব্য কাযাকদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তুরস্কে প্রেরণ করা হয়, যাহারা ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবে।

উপরোক্ত সমর্থন লাভ সত্ত্বেও আধুনিক কাযাকিস্তানে ইসলামের সম্ভাব্য প্রসার সম্পর্কে বর্তমান নেতৃত্ব রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল। কাযাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৪০% (১৭ মিলিয়নের মধ্যে) ভাগ জাতিগতভাবে রাশিয়ান। কাযাকিস্তান আরও ইসলাম প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র হইতে পারিত। কিন্তু সংবিধানে ধর্মীয় প্রভাব তো নাই-ই অপরদিকে রাজনৈতিক দলগুলি কোন মতবাদ বা ধর্মীয় প্রভাবাধীন রাষ্ট্র চায় নাই। প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিনিয়োগ ও সাহায্যের নিশ্চয়তা চাহিয়াছেন, তেমনিভাবে পশ্চিমা দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন। তিনি ইরান ও তুরস্ক সফর করেন। তিনি মুসলিম ও খৃষ্টান রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষায় সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করেন। তিনি একদিকে পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে পর্যবেক্ষকরূপে অনুমতি দেন, অপরদিকে পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন।

নাজারবায়েভ নিজে হজ্জ করেন নাই। রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানদের কোন পবিত্র দিনকে অনুমোদন করেন নাই। সরকার কাযাক ইসলামিক ন্যাশনালিষ্ট পার্টির রেজিস্ট্রেশন থাকা সত্ত্বেও তাহাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে দেয় নাই। কাযাকিস্তানের প্রথম সরকারী মুফতী রাথবেক হাজী নায়সানবেভ (Rathbek Hazi Nysanbaev)-কে অর্থ আত্মসাত, ধর্মের অপব্যাখ্যা, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক এবং কাযাক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একদল রাজনৈতিক কর্মী অভিযোগ উত্থাপন করিলে তাহাদেরকে দমন করা হয়। প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভ কাযাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন (The Oxford Ency, P. 408)।

৪ ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নূর সুলতান নাজারবায়েভ ৯০% ভোট পাইয়া সাত বৎসর মেয়াদী দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বিরোধী দল নির্বাচনে জালভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিবাদ জানায়। নাজারবায়েভ উক্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন অবাধ ও নিখুঁত হইয়াছে। জনতা মূল্যায়ন করিয়াছে। নাজারবায়েভ ১৯৪০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৯ সনে কাযাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ফাষ্ট-সেক্রেটারী হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। ঐ বৎসর তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সোভিয়েত য়ূনিয়ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর ১৯৯১ সনে পুনঃনির্বাচিত হন। তাঁহার সমর্থকরা বলিয়াছেন, তিনি সংস্কারের বৎসরগুলিতে দেশকে স্থিতিশীল রাখিতে সক্ষম হন। মি. নাজারবায়েভ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিজ হাতে রাখেন। তিনি বিরোধী ও বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি বলেন, He says he advocates democracy as a long - Term goal, he warns that stability could beat risk if change is too suift: "গণতন্ত্র সুদৃঢ় করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। কোন পরিবর্তন দ্রুত করিলে উহা স্থায়িত্ব লাভ করে না।"

১৯৯১ সন দেশটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৎসর ছিল। ঐ বৎসর মার্চ মাসে সোভিয়েত য়ূনিয়নের ভাগ্যের উপর গৃহীত গণভোটে কাযাকিস্তান কোনভাবে সাভিয়েত য়ূনিয়ন রাখিবার পক্ষে ভোট দেয় (৯৪.১%)। আগস্ট মাসে মস্কোতে কমিউনিস্টপন্থী অভ্যুত্থান ঘটে। প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভ কিছুদিন সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি অবলোকন করেন। পরে তিনি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সাথে সাথে তিনি সোভিয়েত য়ূনিয়ন পলিট ব্যুরো ও কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকার হইতে তাহাদের হাত গুটাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে কাযাক কমিউনিস্ট পার্টি মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কাযাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সনে কাযাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সোভিয়েত য়ূনিয়নের ১৫টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তাহারাই সর্বশেষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১ ডিসেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নাজারবায়েভ একমাত্র প্রার্থী হিসেবে ৯৮.৮% ভোট পাইয়া জয়ী হন।

১৯৯৩ সনের জানুয়ারী মাসে নূতন সংবিধান গৃহীত হয়। ইহার নাম জাতীয় ঐক্যের য়ূনিয়ন (জাঐই)। প্রেসিডেন্ট নাজারবায়েভকে উহার চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। উহা ছিল একটি ব্যাপক ভিত্তিক দল। কাযাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চল ও জাতিসত্তা হইতে উহার প্রতিনিধি নেওয়া

হয়। পরে ইহার নাম রাখা হয় পিপলস ইউনিটি পার্টি (পিইপি)। ডিসেম্বর মাসে কাযাক সংসদে (নূতন নাম সুপ্রিম কংগ্রেস) পরবর্তী সংসদ গঠনের জন্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সনের ৭ মার্চ প্রথমবারের মত কাযাক সংসদে বহুদলীয় নির্বাচন সম্বন্ধে বিরোধীরা নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ করে। রুশ সংখ্যালঘুদের অভিযোগ ছিল তাহাদের অনেক প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। নির্বাচিত সংসদে জাতিসত্তার অবস্থা ছিল কাযাক ৫৯%, রুশ ২৮% ও অন্যান্য জাতি ১৩%। সরকারী দল পিপলস ইউনিট পার্টি পায় মোট ১৭৭টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন। প্রেসিডেন্ট নাজারবায়েভ পৃথকভাবে যে প্রার্থীদের অনুমোদন দিয়াছিলেন সেই তালিকা হইতে ৪২ জন জয়ী হয়। ফলে সংসদে প্রেসিডেন্টের দল শক্তিশালী হয়। অন্যান্য পার্টির মধ্যে কাযাক ট্রেড য়ূনিয়নের কনফেডারেশন পায় ১১টি আসন, কাযাক পিপলস কংগ্রেস পার্টি ৯টি আসন, কাযাকিস্তান সোশালিস্ট পার্টি ৮টি আসন, কাযাক কৃষক ইউনিয়ন ৪টি, স্লাভিক আন্দোলন ৪টি। অন্যান্য ক্ষুদ্র ছয়টি দল প্রত্যেকে একটি করিয়া আসন পায়। মার্চ মাসেই কাযাক কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। মে মাসে তাহারা অন্যান্য বিরোধী দল (সমাজতন্ত্রী দল, পিপলস কংগ্রেস পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন)-এর সঙ্গে শক্তিশালী বিরোধী দলীয় জোট গঠন করে। মে মাসেই ৯৬ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনতির অভিযোগে অনাস্থার ডাক দেয়। প্রেসিডেন্ট নাজারবায়েভ দুর্নীতি দমন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ নেন। অক্টোবর মাসে সেরগেই টেরেশেংকোর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ১৯৯১ সন হইতে তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নাজারবায়েভ আকেঝান কাঝে গেলভিনকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন।

জুলাই মাসে আলমাআতি হইতে ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজধানী উত্তরের আকামোলায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আকমোলার (শোদা মাজার) নূতন নাম আসতানা (Astana) (রাজধানী)। ১০ জুন, ১৯৯৮ খৃ. রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। আলমাআতি (Almaty) ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত, গোলযোগপূর্ণ আফগানিস্তানের অতি নিকটে— এই সমস্ত কারণেই রাজধানী সরানো হইয়াছে।

১৯৯৫ সনের শুরুতেই সংসদের সঙ্গে সরকারের বাজেট সংক্রান্ত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। সংসদ সরকারের ব্যয় হ্রাসে সম্মত হয় নাই। কিন্তু সরকারের বক্তব্য ছিল, ব্যয় সংকোচন ছাড়া আইএমএফ-এর সাহায্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ পাওয়া সম্ভব নহে। ১৯৯৫ সনের মার্চ মাসে সংবিধান কোর্ট সংসদের নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করিলে সদস্যদের পদত্যাগ করিতে হয়। বিরোধীরা অভিযোগ করে যে, প্রেসিডেন্ট নাজারবায়েভ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার লোভে সংবিধান কোর্টের রায়ের ইন্ধন যোগাইয়াছেন। সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করে। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট অক্ষতভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ২৯ মার্চের এক গণভোটে ৯৫% ভোটার প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ২০০০ সন পর্যন্ত বৃদ্ধিতে ভোট দেয়। কিন্তু আবার ১৯৯৮ সনের অক্টোবর মাসে সংসদ প্রেসিডেন্টের মেয়াদ সাত বৎসর বাড়াইতে এবং ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১০ জানুয়ারির নির্বাচনে নাজারবায়েভ আবার নির্বাচিত হইলেন। ১৯৯৫ সনের ৩০ আগস্ট এক গণভোটে নূতন সংবিধান অনুমোদিত হয়। এক কক্ষ বিশিষ্ট কংগ্রেস বা সংসদ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিধান রাখা হয়। ৪৭ আসনের সিনেট এবং ৬৭ আসনের মজলিস। সিনেটে কাযাকিস্তানের ১৯টি অঞ্চল ও রাজধানীর প্রত্যেকে দুইটি করিয়া সিনেটর মোট ৪০ জন সিনেটর নির্বাচন করিতে পারিবে। বাকী ৭ জন সিনেটর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত। মজলিসের সদস্যরা সকলেই নির্বাচিত। ৫ ডিসেম্বর সিনেটর এবং ৯ ডিসেম্বর মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভও বাড়িয়াছিল। ১৯৯৬ সনের এপ্রিল মাসে বৈজ্ঞানিক, লেখক ও নেতৃস্থানীয় বিরোধীরা আজামত (নাগরিক) নামে একটি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন। পিটর স্বোইককে তাহার চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। তিনি মনোপলি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারী কমিটির সাবেক প্রধান।

১৯৯৬ সনের মে মাসে মজলিস সরকারী পেনশন বিধান প্রত্যাখ্যান করে। ইহাতে সরকারী কর্মকর্তাদের অবসর বয়স ৬০ হইতে ৬৩-তে উন্নীত করিবার প্রস্তাব ছিল। জুন মাসে প্রধান মন্ত্রী কাঝেগেলদিন কর্তৃক পাশ করা এক আস্থা ভোটে সরকার জয়লাভ করে। আস্থা ভোটে সংসদের পক্ষই অংশগ্রহণ করে। ঐ বৎসর জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের চেয়ারম্যান মিখাইল মালাখবের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ উঠে। ফলে সিনেট তাহাকে বরখাস্ত করে এবং তিনি দেশত্যাগ করেন।

কাযাকিস্তান গরীব দেশ। কিন্তু দেশটির বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে। ১৯৯৫ সনের প্রথম দিকের এস্টিমেট অনুযায়ী কাযাকিস্তানের মওজুদ পেট্রোলের পরিমাণ ৪৫০ কোটি ব্যারেল, গ্যাসের পরিমাণ ৫.৯ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার। কারাগানডা, তুরগাই ইকিবাসতুঝ এবং মাইকুবেন এইসব অঞ্চলে বিরাট কয়লাখনি রহিয়াছে।

কাযাকিস্তানের অব্যবহৃত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের জন্য ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৯৩ খৃ. একটি মার্কিন কোম্পানী টেংগিঝ তৈলক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য চুক্তি করে কিন্তু পাইপ লাইনের অভাবে তৈল রপ্তানী ব্যাহত হয়। দৈনিক ১২০,০০০ ব্যারেল উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে মাত্র দৈনিক ৬৫,০০০ ব্যারেল উৎপাদন সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে ১৯৯৬ খৃ. কাস্পিয়ান পাইপ লাইন কনসোর্টিয়াম একটি পাইপ লাইন নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহার ফলে টেংগিঝ তৈলক্ষেত্র ভূমধ্যসাগরীয় রুশ বন্দর নবোবোসিইকের সঙ্গে যুক্ত হইবে। ২০১০ সনে এই পাইপ লাইন নির্মাণ শেষ হইবে। অন্যান্য তৈলক্ষেত্র উন্নয়নের জন্যও আরও কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভ্যাসিলসংকোর স্বর্ণখনি পৃথিবীর চতুর্থতম স্বর্ণক্ষণি।

রাজনৈতিক সংগঠন

ইসলামী রেনেসাঁ পার্টি, আলমাতা, প্রতিষ্ঠা ১৯৯১। ইহারা সংযুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে। কাযাকিস্তান পপুলার কংগ্রেস, আলমাতা। প্রতিষ্ঠা ১৯৯১। প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দল। ইহাতে আছে ঃ নেভাডা-সেমিপলিটিনস্ক আন্দোলন, কাযাক ভাষা সমাজ; আজাত (স্বাধীনতা)— ইহারা কাযাকিস্তানের পুরা সার্বভৌমত্বের পক্ষপাতী। জেলতোক্সান (ডিসেম্বর)। ইহারা পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। ইডিনসটোতে (ঐক্য)—ইহার কাযাকিস্তানে রুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের দল। কাযাকিস্তানের সোশ্যালিস্ট দল, আলমাতা, প্রতিষ্ঠা ১৯৯১। প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টির নূতন সংস্কার। তুর্কিস্তান পার্টি আলমাতা, প্রতিষ্ঠা ১৯৯১। ইহারা মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে কাযাকিস্তান এবং অন্য ছয়টি সিআইসি সদস্য ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্যের অঙ্গীকারে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে কাযাকিস্তান পার্শ্ববর্তী উজবেকিস্তান ও কিরঘিস্তানের সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করে। ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে সহযোগিতা চুক্তি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি আন্তঃরাষ্ট্র পরিষদ গঠন করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য ১৯৯৬ খৃ. ইহাদের মধ্যে আরও কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (সোহরাব উদ্দীন আহমদ, মুসলিম জাহান, ইফাবা, পৃ. ২০১, ১৯৯৯ খৃ.)।

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাযাকিস্তান রাশিয়া এবং বেলারুশের সঙ্গে কাস্টম য়ুনিয়ন গঠন করে। ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কিরঘিস্তান এই য়ুনিয়নে যোগ দেয়। কাযাকিস্তান তাযিকিস্তানে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল। ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কাযাকিস্তান রাশিয়ার সঙ্গে ২৫ বৎসর মেয়াদী বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৫ সনে আরও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রুশ মাইনরিটিদের আন্দোলনের ফলে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৯৯৬ সনে কাযাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য স্লাভ (রুশ মাইনরিটি) গ্রুপ সাবেক সোভিয়েত য়ুনিয়ন পুনর্বহালের জন্য আন্দোলন শুরু করে। বিচার মন্ত্রণালয় এক ডিক্রিতে ইহাদের আন্দোলন ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরে কাযাক কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের গঠনতন্ত্র হইতে সোভিয়েত য়ুনিয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি বাদ দেয়। স্বাধীনতার সময় কাযাকিস্তানে বহু রুশ পারমানবিক অস্ত্র মোতায়েন ছিল। ইহা রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড মাথাব্যথার কারণ ছিল। কিন্তু কাযাকিস্তান সোভিয়েত য়ুনিয়নের উত্তরসুরি হিসাবে ১৯৯৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসেই দ্বিতীয় স্টার্ট (কৌশলগত সামরিক অস্ত্র হ্রাস আলোচনা) চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়। পারমানবিক অস্ত্র ফেরত দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কাযাকিস্তানকে সাহায্য ও ঋণ দেয়। ১৯৯৫ সনের এপ্রিল মাসের মধ্যে সমস্ত পারমানবিক অস্ত্র কাযাকিস্তান হইতে প্রত্যাহার করা হয়। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে চীনের সিনকিয়াং অঞ্চলে পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটাইলে কাযাকিস্তান আশংকা প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু চীন বিস্ফোরণ বন্ধ ঘোষণা করিলে কাযাকিস্তান চিন্তামুক্ত হয়। ১৯৯৫ সনের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট নাজারবায়েভ চীন সফর করেন এবং দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহারের চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

২০০৭ সালের ২৭ জুন নাজারবায়েভকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিয়া পার্লামেন্টে একটি বিল পাস হয়। জুলাই ২০০৬ প্রেসিডেন্ট তাঁহার ওয়াতান পার্টি (Otan Party) তাঁহার কন্যার দারিগাস (Darigas Party) পার্টির সঙ্গে একিভূত করিয়া দেন।

কাযাক এক মিশ্র বংশের জাতি। কাযাক ৫৮.৯%, রাশিয়ান (Russion) ২৫.৯%, য়ুকরীনীয়ান (Ukrainian) ২.৯%, উযবেক (Uzbek) ২.৪%, উইগুর (Uighur) তাতার এবং জার্মান (Tatar and German) ১.৫% এবং অন্যান্য গ্রুপ ৪%। কাযাকিস্তানে এক শত জাতের বেশী মানুষ বাস করে। কাযাকিস্তানে দুইটি বৃহৎ ধর্ম ঃ ইসলাম এবং খৃষ্ট ৫৭% ও ৪০%। কাযাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। খৃষ্টানরা রাশিয়ান চার্চের অনুসারী। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রহিয়াছে, যাহাদের প্রায় ৩০০০ ধর্মীয় সংগঠন রহিয়াছে। কাযাকিস্তানের জনগণ কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। তবে অধিকাংশ জনগণ গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসী নহে।

ভাষা ঃ কাযাক ভাষাভাষী ৫২%, উহা রাষ্ট্রভাষা। রাশিয়ান ভাষায় প্রায় সকলেই কথা বলিতে পারে। অন্যান্য ভাষাকেও সংবিধান সমান স্বীকৃতি দিয়াছে। দৈনিক পত্রিকা, টিভি, রেডিও প্রোগ্রাম ১১টি ভাষায় সম্প্রচার ও প্রকাশিত হয়। যেমন কাযাক, রাশিয়ান, উযবেক, জার্মান, কোরিয়ান ইত্যাদি। শিক্ষার হার ১০০%, ১৫ বৎসর ও তাহার উর্ধ্বে বয়সের সকলেই পড়িতে ও লিখিতে পারে। ১৯৯৭ সালে কাযাকিস্তান দীর্ঘ মেয়াদী ২০৩০ ঘোষণা করিয়াছে ঃ Kazakhtan 2030. Prosperity, Security and Improvement of Welfare of the Citizens of Kazakhstan : এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় জাতীয় সাতটি বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হইয়াছে। উহাকে রোডম্যাপ (road map) হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে যাহা কাযাকিস্তানের ভবিষ্যতে সমৃদ্ধির আয়নাস্বরূপ। জাতীয় অগ্রগতি অর্জনের সাতটি দিকনির্দেশনা যথা ঃ

১. জাতীয় নিরাপত্তা। কাযাকিস্তান উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান স্বাধীন সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার সুব্যবস্থা করা।

২. নিরাপত্তাবিধান এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় ঐক সুসংহত করা।

৩. মুক্ত বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করা। বিদেশীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় যাহাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

৪. কাযাকিস্তানের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

৬. ভৌত অবকাঠামো, বিশেষভাবে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। যাহাতে মুল চালিকা শক্তি জাতীয় নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

৭. দক্ষ সরকার। একটি দক্ষ প্রশাসন গড়িয়া তোলা যাহাতে সিভিল সার্ভেন্টরা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। তাহারা তাহাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জনগণের নিকট দিতে বাধ্য থাকিবে।

মুদ্রা ঃ টেনজ (Tenge) (KZT)। মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেট ঃ গড় ২০০৬ ঃ IUSD = 126.0 KZT। মূল দেশীয় উৎপাদন রেট (২০০৫) ৯.৪%; (২০০৬), ১০.৬%। শিল্পে উৎপাদন (২০০৫) ৪.৬%; (২০০৬) ৭%।

জিডিপি পারকেপিটা ২০০৫ ইউএসএস ৩,৫৫০, ২০০৬ ইউএসএস ৫,০৮৩। নোমিনাল জিপিপি ঃ (২০০৫) ইউএসএস ৪৮ আইএলএন ইউসএস ৭৭.৯ আইএলএন।

মুদ্রাস্ফীতি রেট ঃ (২০০৫) ৭.৬%; (২০০৬) ৮.৬%। বেকারত্ব রেট ঃ (২০০৫) ৮.২%; (২০০৬) ২.৮%।

প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার ঃ ইইউ (জারমানী, ইউকে, ইটালী ও নেদারল্যান্ড), রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, চীন, আমেরিকা, তুরস্ক, দক্ষিণ

কোরিয়া, উযবেকিস্তান, ইউক্রেন। রপ্তানী ঃ (২০০৬) মার্কিন ডলার ৩৮.৩ বিলিয়ন (গ্রোথ ৩৭,৩%)। আমদানী ঃ (২০০৬) মার্কিন ডলার ২৩.৭ বিলিয়ন (গ্রোথ ৩৬.৪%)। প্রধান রপ্তানী ঃ খনিজ দ্রব্যাদি (৭৩.৮%) অশোধিত দ্রব্য (১৫.৯%), কেমিকেলস (৩.৪%), খাদ্য (২.৪%), মেসিনারী (১.২%), অন্যান্য (৩.৩%)। প্রধান আমদানী ঃ মেসিনারী এবং খুচরা যন্ত্রাংশ (৪৩.৩%), খনিজ দ্রব্যাদি (১৪%) অপরিশোধিত (১৪;৭%) রাসায়নিক দ্রব্যাদি ১১.৬%, খাদ্য (৭.২%) অন্যান্য (৯.২%)। মূল বিনিয়োগ উৎপাদন (২০০৫) (২২.১%); (২০০৬) ১০.৬% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ (১৯৯৩-২০০৭) ঃ মার্কিন ডলার ৪৬.৯ বিলিয়ন, ইহার মধ্যে ২০০৪ সালে মার্কিন ডলার ৬.৫ বিলিয়ন। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগঃ মার্কিন ডলার ৮০ বিলিয়নেরও বেশী।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ (২০০৭) মার্কিন ডলার ৩৭.৪ বিলিয়ন, যাহার মধ্যে তেল ফান্ড ১৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৭% জিডিপি)। প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ কয়লা, টাংসটেন (Tungsten), প্যাট্র, তাম্র, সীসা, জিসত (جست), নিকেল এবং ক্রোমিয়াম, সিলভার, দস্তা, ম্যাঙ্গনীজ, স্বর্ণ, লোহা, তেল, গ্যাস, আকরিক ইত্যাদি। জিএনআই পারকেপিটা ঃ ইউএস ডলার ২,৯৩০ (বিশ্বব্যাংক, ২০০৬)।

কাযাকিস্তানের নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০০টি। হ্রদের সংখ্যা ৪৮০০০টি। কাযাকিস্তানের বিখ্যাত হ্রদ পায়সান, আলাকোস টেনগিজ হ্রদ (প্রফেসরস সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশ ও নতুন বিশ্ব, পৃ. ২২৯, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০০৭)।

গড় আয়ু ঃ ৫৮ বৎসর পুরুষ, ৬৯ বৎসর মহিলা (UN)। কাযাকিস্তানে রাশিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ১৮৬১ খৃ.। রাশিয়া কাযাকিস্তানে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে ১৯১৭ খৃ.।

কাযাকিস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, বিশেষ করিয়া তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদে, কিন্তু ভূ-বেষ্টিত দেশটির উন্নয়নে বহুবিধ সড়ক যোগাযোগ এবং আধুনিক ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি ঘটাইতে পারিলে প্রচুর খনিজ সম্পদ ও জ্বালানী দ্বারা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব।

কাযাকিস্তানের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভের দল নূর ওতান (Nur Otan) ৮৮ শতাংশ ভোট পাইয়া পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ মজলিসের সবগুলি আসনে জয়লাভ করিয়াছে। সরকারী ফলাফলে এই তথ্য জানানো হয়। কাযাক বিরোধী দলগুলি বলিয়াছে, ১৮-০৮-২০০৭ শনিবারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম করা হইয়াছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুসারে মজলিসে আসন লাভের জন্য প্রয়োজনের চাইতে ৭ শতাংশ ভোট বিরোধী দলগুলি কম পাইয়াছে। প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান ভোট গ্রহণের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এই নির্বাচন তেল সমৃদ্ধ সাবেক সোভিয়েত য়ুনিয়নের মধ্য এশীয় দেশটির গণতন্ত্রকে সুসংহত করিবে। নূর সুলতান তাহার দলের বিজয়ে দেশটির নূতন রাজধানী আস্তানায় এক ব্যয়বহুল কনসার্টের আয়োজন করেন। এইদিকে প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা উয়ালি খান কায়সারোভ বলিয়াছেন, নির্বাচনে চরম অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে।

তাহার দল সরকারি ঘোষণা অনুসারে ৪ দশমিক ৬২ শতাংশ ভোট পাইয়াছে। দলটি অভিযোগ করিয়াছে, ভোট গ্রহণের আগের দিন টেলিভিশনে তাহাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অন্য বিরোধী দল একে জোল পার্টির নেতা বুরিখান নূর মুখামেদোভ বলিয়াছেন, তাহার দল নির্বাচনের ঘোষিত ফল মানিবে না। সরকারি ঘোষণায় বলা হইয়াছে, একে জোল পার্টি ৩ দশমিক ২৫ শতাংশ ভোট পাইয়াছে। দলটি দাবি করিয়াছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ১২ শতাংশ ভোট পাইয়াছে (বিবিসি/ আল-জাজিরা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) John L. Esposito, Editor in Chief, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, volume 2, Oxford University Press, P. 407, 1995; (২) Muslim Gazetteer, মু'তামার আলাম আল-ইসলামী সংখ্যা, করাচী; (৩) মুয্যামমিল য়াসীন, তারীখ-ই সালতানাত-ই মুসলমানান, করাচী ১৯৬৯ খৃ.; (৪) চৌধুরী নাযীর আহমাদ খান, Commonwealth of Muslim States, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (৫) G. Wheeler, Islam in the Soviet Union, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (৬) Akiner Shirin, Islamic Peoples of the Soviet Union, Rev. ed. London 1990; (৭) Allworth Edward ed., Central Asia : A century of Russian Rule, New York 1967; (৮) Bennigsen, Alexandre and S. Enders Wissbush, Muslims of the Soviet Empire : A Guide, Bloomington 1986; (৯) Olcott, Martha Brill, The Kazakhs, Stamford, California 1987; (১০) Rywkin Michael, Moscows Muslim Challenge, Rev. ed. Armonk, New York 1990; (১১) The New Encyclopaedia Britannica, volume 6, Micropaedia Ready Reference, Founded 1768, tenth edition 1902-1903, U.S.A, Library of Congress Catalog Card Number 95-62057; (১২) The Statesman's year book, ১৯৭০ খৃ., নির্ঘন্ট; (১৩) G. Lias, Kazakh Exodus, লন্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (১৪) প্রফেসর'স প্রকাশন, বাংলাদেশ ও নতুন বিশ্ব, ঢাকা ২০০৭; (১৫) সোহরাব উদ্দীন আহমদ, মুসলিম জাহান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৯ খৃ.।

ডঃ আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন

কাযান (قازان =Kazan) ঃ মধ্য ভল্গা (Volga)-র একটি শহর। এখন ইহা সোভিয়েত রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত গণ-প্রজাতন্ত্রী তাতারাস্তানের (Tatarastan) রাজধানী। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও ইহা উক্ত নামেই খান (Khanate) বংশীয় শাসকদের রাজধানী ছিল।

কিংবদন্তীতে জানা যায় যে, শহরটি তুরস্কের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বাতু খান (Batu Khan) নামক এক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অঞ্চলটি মোঙ্গল আক্রমণের পূর্বে প্রাচীন বুলগার (Bulghar) সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল।

কাযানের খান বংশ (Khanate) পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিংগীয খানের বংশধর, জালালু'দ-দীনের পুত্র, তোকতামীশ (Toktamish)-এর পৌত্র উলূ মুহাম্মাদ (ولو محمد)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময় তাতার বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন ছিল। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই খান বংশীয় শাসকগণ রাশিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর ধ্বংসকারী

যুদ্ধগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ মস্কো অবরোধ করেন এবং কালমনা (Kolomna) ধ্বংস করেন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র মাহমূদাক (محمودك) মস্কোর যুবরাজ ২য় ভাসিলি (Vasili-II)-কে পরাজিত ও বন্দী করেন, অবশ্য অল্প সময় পরেই তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। সেই বৎসর মাহমূদাক কাযান শহর অবরোধ করেন। তখন 'আলী বেগ নামে এক শাহ্যাদা সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। পরবর্তী বৎসরে (১৪৪৬ খৃ.) উলূ মুহাম্মাদ মাহমূদাক কর্তৃক নিহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই পুত্র কাসিম ও য়া'কূব ইব্ন উলূ মুহাম্মাদ রাশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাসিম মস্কোর প্রধান যুবরাজের নিকট হইতে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত বৃত্তিস্বরূপ গোরোডক (Gorodok) শহর প্রাপ্ত হন। উহা তাঁহার সম্মানার্থে কাসিমভ (Kasimov) নামে অভিহিত হয় এবং মস্কোর সামন্তরাজ খানদের রাজধানী নির্ধারিত হয়। এই সমস্ত সামন্ত রাজ্যের শাসনকর্তারা প্রথা অনুযায়ী রাশিয়ার সাহায্যকারী হিসাবে থাকিত। মাহমূদাক ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় খালীল (১৪৬২-৭ খৃ.) ও ইব্রাহীম (১৪৬৭-৭৯ খৃ.) তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইব্রাহীম রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি প্রথমদিকে জয়লাভ করেন এবং ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে সাময়িকভাবে ভিয়েটকা (Viatka) দখল করেন। কিন্তু ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ানরা আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করত কাযান অবরোধ করে। তাহাদের আশ্রিত কাসিমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখার কোনও ব্যবস্থা না করিয়াই তাহারা ইব্রাহীমকে কাযানের সমস্ত রাশিয়ান বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য করে। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র 'আলী (কোনও কোনও মতে ইল্হাম) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত ব্যক্তির ভাই মুহাম্মদ আমীন রাশিয়াতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তৎপর কাযানে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর এক প্রধানের নিকট উপস্থিত হন। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর শহরটির পতন হয়।

'আলীকে ভলোগদা (Vologda)-তে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং মুহাম্মাদ আমীন খান হিসাবে অভিষেক প্রদান করা হয়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে শিবির (Sibir)-এর খান রাজ্য হইতে তাতারদের বহিরাক্রমণের ফলে তিনি সেই শহর হইতে বহিষ্কৃত হন। এই বহিরাক্রমণ তাতারদের খান মামুক ইব্ন আইবেক (Mamuk b. Ibek) কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি কাযানে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ানদের দ্বারা পরাজিত হওয়া পর্যন্ত মাত্র এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন। স্থানীয় জনগণের ইচ্ছার প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ আমীন-এর ছোট ভাই 'আবদু'ল-লাতীফকে সিংহাসন হস্তান্তর করা হয়।

১৫০২ খৃষ্টাব্দে 'আবদু'ল-লাতীফকে রাশিয়ায় তলব করা হয় এবং মুহাম্মাদ আমীনকে সিংহাসন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমত রাশিয়ান মৈত্রীতে বিশ্বস্ত ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মস্কোর প্রধান যুবরাজের অভিভাবকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাশিয়ান বণিক যাহারা কাযানের বার্ষিক মেলায় আগমন করিয়াছিল তাহাদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত এবং তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং জয়যুক্ত হন, এমনকি নিজনী নভাগ্রোদ (Nizniy Novgorod)-এর সন্নিকটে এক রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৫০৭ সালে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাহার মাধ্যমে দুই বিরোধী সামন্ত রাজ্যের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

মুহাম্মাদ আমীন ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উলূ মুহাম্মাদ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'আবদু'ল-লাতীফ আগের বৎসরই ইনতিকাল করেন। নোগাই যাযাবর বাহিনী ও ক্রিমিয়ার খান শাসকদের দ্বারা সমর্থিত জাতীয়তাবাদী দল (Nationalist) এবং রাশিয়ার সমর্থক দল— এই দুই প্রতিপক্ষের ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে খান রাজ্য এক্ষণে এক নৈরাজ্যের যুগে প্রবেশ করিল। ৩০ বৎসরেরও অধিককাল রাশিয়া কর্তৃক সমর্থিত বিভিন্ন রাজন্যবর্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; যথা ঃ কাসিমভ-এর খান শাহ্ 'আলী, তাঁহার ভ্রাতা জান আলী (আস্ত্রাখান = Astrakhan-এর আওলিয়ার খান-এর পুত্রগণ) এবং Giray-এর শাসক সাহিব ও সাফা, যাহারা ক্রিমিয়ার পিতৃব্যগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

কাযানের এই সংকটজনক পরিস্থিতির প্রথম সুযোগ রাশিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ৩য় ভাসিলী (Vasili) শাহ্ 'আলী (Shah Ali)-কে সিংহাসনে বসান (প্রথমত তিনি ১৫১৯ হইতে ১৫২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন)। তাঁহারা ক্রিমিয়ার শাসক খান মুহাম্মাদ গিরায়-কে তদীয় ভ্রাতা সাহিবকে কাযানের সিংহাসনে বসাইতে নির্দেশ দেন (শেষ খান মুহাম্মাদ আমীনের মাতার দিক হইতে ভাই)। একই বৎসর দুই তাতার শাসক রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন এবং রাশিয়ার রাজধানীর প্রাচীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। মস্কোর বিভিন্ন অঞ্চল নিযমী নভগোরদ (Nizmy Novgorod) ও রিয়াযান (Riazan) সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং কয়েক লক্ষকে বন্দী করিয়া ক্রিমিয়ার বাজারে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু তাতাররা যুদ্ধে প্রকাশ্যে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও মস্কো ও রিয়াযান আক্রমণে ব্যর্থ হয় এবং তাঁহাদের এই বিরাট যুদ্ধ অভিযান আংশিক সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়।

১৫২৪ খৃ. ভ্রাতা মুহাম্মাদের ইনতিকালের পর সাহিব গিরায় (Sahib Giray) তাঁহার ১৩ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র সাফা গিরায় (Safa Giray)-কে কাযানে (Kazan) ক্রিমিয়ার খান হিসাবে প্রত্যাবর্তন করান। এখন হইতে রুশীয়দের চাপ জটিল রূপ ধারণ করে। কিন্তু উহা কোন আকারগত বা প্রতিশোধমূলক আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে নয়, বরং ধীর ও পদ্ধতিগত অগ্রগতির মাধ্যমে। শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার মানসে মস্কোর প্রধান শাসক রাশিয়ান বণিক সম্প্রদায়কে তাতার রাজধানীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং St. Makarii-র মঠে বার্ষিক মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। উহা শীঘ্রই প্রতিপক্ষ কাযানের মেলার মতোই একটি স্থায়ী মেলায় পরিণত হয়। ১৫২৩ খৃ. ভল্গা ও সূরা (Sura) নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে Vasilsursk দুর্গ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ানরা মধ্য ভলগা অঞ্চলে দখল কার্য শুরু করে। রুশপন্থী দল ১৫৩০ খৃ. সাফা গীরায়-এর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং জান 'আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করে। কিন্তু তিনি গিরায় (Giray) সমর্থকদের অভ্যুত্থানের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। সাফা গীরায়কে পুনরায় কর্তৃত্ব লাভের জন্য আহ্বান করা হয় এবং তিনি রুশীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে অবজ্ঞা করিয়া ১৫৪৬ খৃ. পর্যন্ত নিজকে কাযানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। সেই বৎসরই তিনি আর একবার বিতাড়িত হন এবং স্বল্প সময়ের জন্য শাহ্ আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। শাহ্ 'আলীর সঙ্গে অবস্থানরত রুশীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই সাফা গিরায় কাযানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৫৪৯ খৃ. তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সিংহাসন রক্ষা করেন। তাঁহার

১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র ওতিমিশ (Otemesh) তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তাঁহাকে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানে তাঁহাকে আলেকজান্ডারের নাম প্রদান পূর্ব খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তিনি ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শাহ্ 'আলী তৃতীয়বার কাযানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী জনগণের দ্বারা তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। তাতার জনগণ আস্ত্রাখান-এর খান বংশীয় য়াদিগার মুহাম্মাদ (Yadiga Muhammad)-কে সিংহাসনে আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই জার ৪র্থ আইভানের রুশীয় সেনাবাহিনী কাযান রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং ১৫৫২ খৃষ্টাব্দের ২ অক্টোবর প্রবল আক্রমণের মুখে কাযান দখল করিয়া লয়। ইহার পর খান রাজ্য রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়।

এই বিজয়ের পর পরই ক্রমাগত দখলের মাধ্যমে গোটা দেশই রুশীয়রা জয় করিয়া নেয়। তাতারদিগকে কাযান হইতে বহিষ্কার করা হয়। নদী উপত্যকার ও শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ উৎকৃষ্ট জমিগুলি জবরদখল করিয়া রুশীয় অভিজাত ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং ধর্মীয় মঠের জন্য বিলি করা হয়। প্রায় সমস্ত উর্বর অঞ্চলে রুশীয় কৃষকদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। গণ অভ্যুত্থান ও ক্রিমিয়ার তাতারদের বহিরাক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সমগ্র দেশে রুশীয় দুর্গ গড়িয়া ওঠে। এই কারণেই সপ্তদশ শতক হইতে প্রাচীন খান রাজ্যের জনগণের সংমিশ্রণ সংঘটিত হইল এবং তাতার বংশীয় জনসংখ্যা সেখানে এখন শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র।

সেখানে খৃষ্ট ধর্মের প্রচারকার্য সক্রিয়ভাবে চলিতেছিল, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের পর কাযান রাজ্য বিশপের উর্ধ্বতন যাজকের এলাকা ছিল। পরে ইহা আর্চ বিশপের এলাকায় পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে দেশীয় ধর্মান্তরিত তাতারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী সেখানে ছিল। কিন্তু সর্বোপরি ফিনল্যান্ডবাসী Kryashens জনগণ (তাতারে Kryash বলা হয়) খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও তাতার ভাষা ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল।

রাশিয়ার বিজয় তাতার সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। প্রাচীন অভিজাতগণকে ভূমির অধিকারচ্যুত করা হয় এবং তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে বণিক শাসনের প্রবর্তন করা হয়। ইহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটে। ২য় ক্যাথেরিন-এর সময় হইতে এই শ্রেণীই তাতার জাতির নেতৃত্ব দান করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত রাশিয়ার সমস্ত তুর্কী ও মুসলিম জনগণের মধ্যে কাযানের তাতার জাতির মধ্য হইতে প্যান-তুর্কী (Pan Turkish) আন্দোলনের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে।

কাযানের আধুনিক শহরগুলিতে খান রাজত্বের প্রাচীন স্মৃতি খুব কমই রক্ষিত হইয়াছে। নগর দুর্গের একটি উচ্চ অট্টালিকা অদ্যাবধি সাফা গিরায়-এর স্ত্রী Suyumbigi-এর নামানুসারে পরিচিত (তিনি পূর্বে জান 'আলী এবং পরে শাহ 'আলী-র মহিষী ছিলেন)। কিন্তু কিভাবে ও কখন হইতে এই দুর্গের সঙ্গে তাঁহার নাম যুক্ত হয় তাহা জানা যায় নাই। ঠিক একইভাবে দুর্গটির গঠন কার্যের কোন্ অংশটি তাতারদের এবং কোন্ অংশটি রাশিয়ানদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহাও স্থির করা কষ্টকর।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে কাযানের কোনও সামরিক গুরুত্ব রহিল না। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পুগাসেভ (pugacev) কর্তৃক বিনা বাধায় কাযান বিজিত হয়। কেবল রাজধানী শহর ছাড়া সেই সময় সেই শহরে ২৮৬৭টি আবাসগৃহ ছিল। এমন কি এই সময় ইহা শাসন সংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া নিজনী নভগ্রোদ (Nizniy Novgorod) অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কাযান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহা প্রধানত প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা বিভাগের জন্য বিখ্যাত ছিল (প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে প্রাচ্য দেশীয় বিভাগ)। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয় বিভাগ খোলার ফলে কাযানে প্রাচ্যদেশীয় ভাষার শিক্ষা দান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার ও শিক্ষা দানের অন্যান্য উপকরণ সমস্তই রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পর কাযান বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দান শুরু হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারী অনুযায়ী ঐ শহরে ১,৩১,৫০৮ জন বাসিন্দা ছিল এবং ১৯১১ সালে বাসিন্দা ছিল ১,৮২,৪৭৭। তন্মধ্যে ৩০,৭৮১ জন তাতার।

কাযান বর্তমানে তাতারিস্তান সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। ১৯৭০ খৃ. এই প্রজাতন্ত্রের লোকসংখ্যা ছিল ৩১,৩১,২৩৮ জন। তন্মধ্যে ১৫,৩৬,৪৩১ জন তাতার, ১৩,২৮,৭৩৮ জন রুশীয়, ১,৫৩,৪৯৬ জন কুভাশ (Cuvash), ৩০,৯৬৩ জন মরদভিনস (Mordvins) ও ২৪,৫৩৩ জন udmurts। শহর অঞ্চলীয় অধিবাসিগণ অধিকাংশই রাশিয়ান ৯,৩৪,৩৮৭ জন রুশীয় ও ৫,৯৩,৬৬৫ জন তাতার।

কাযানের তাতারগণ এখন জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, ৫৯,৩০,৬৭০ জন জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ লোক তাহাদের জাতীয় সীমান্তের বাহিরে বসবাস করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. H. Howorth, History of the Mongols, ii, p. 363-429; (২) K. Tuks, Kratkaya istoriya goroda Kazani, Kazan 1817, repr. there 1899; (৩) V. Velyaminov-Zernov, Izsledovaniya o Kasimovskikh tsariakh i tzarevicakh, in Trudi Vost. Lta Arkh. Obshc., i (1863), part ix (Ger. tr. J. T. Zenker, Leipzig (1867); (৪) G. Kuntzevic, Istoriya o Kazanskom tzarstve i Kazanskiy letopisetz, St. Petersburg 1905, with a survey of the leterature.; (৫) Hadi Atlasov, Kazan khanlighi, Kazan 1914 (mainly from Russian sources; on p. 133, gives text of Sahib Giray's edict; review in Zap., xxiii, 421-22); (৬) P. Zarinskiy, Ocerki drevnei Kazani, Kazan 1877; (৭) M. Khudiakov, Ocerki po istorii Kazanskogo khanstva, Kazan 1923. On the University, see especially N. P. Zagoskin, Ist. Imp. Kazanskogo universiteta, Kazan 1902, and Barthhold, Materiali dlya istorii fakulteta vost. yazikov, iv, St. Petersburg 1909. R. R. Arat, I A art, Kazan রচিত গ্রন্থে কাযানের কানাত সম্পর্কে সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে।

W. Barthold [A. Bennigsen] (E.I.^{2})/
মোঃ মোমতাজ হোসেন

কাযান (قازان) ঃ অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কাযান সোভিয়েত রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী তাতারিস্তানের রাজধানী নির্বাচিত হয়। কাযান রোমের মত সপ্ত পাড়ার বেষ্টিত। অধিবাসীরা কাযান তাতার; দেশটির নাম তাতারিস্তান (দ্র.)। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইহা রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর পূর্বদিকে মাত্র আট শত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। উহা ভলগা (Volga) এবং উরাল (Ural) পাহারদ্বয়ের মাঝখানে বিদ্যমান।

তাতারগণ তাহাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সনাতনি প্রচলন এবং উৎসব ও বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল। তাহাদের এই ঐতিহ্য রাশিয়ার ইতিহাসে চমকপ্রদ অধ্যায় রচনা করিয়াছে। কাযান রাশিয়ার পশ্চিমাংশে ইহার পূর্ব তীর সামারা (Samara) জলাধারের ভলগা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত, যাহা কাযানকা (Kazanka) নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। শহরটি প্রায় ১৫ মাইল (২৫ কি.মি.) পাহাড় সমেত বিস্তৃত, যাহা উপত্যকা দ্বারা বেষ্টিত। ভলগা নদীর পূর্ব-দক্ষিণে কামা (Kama) নদী মিলিত হইয়াছে। কাযানের খান বংশ (Kazan Khanate) পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিংগীয খানের বংশধর, জালালুদ-দীনের পুত্র, তোকতামিশ (Toktamish)-এর পৌত্র, উলূ মুহাম্মাদ (ولو محمد)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic world, vol. 2, p. 408)। কাযান খান বংশ কাযান শহরমুখী ছিল। অঞ্চলটি মোঙ্গল আক্রমণের পূর্বে প্রাচীন ভলগা বুলগার (Bulgar) সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল (Ency., P. 408)। ইহা পূর্ব য়ুরোপের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র। ৯২২ খৃষ্টাব্দে ইবন ফাদলান-এর পর্যটনের সময় উহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলাম রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। কাযান খান মুসলিম-তুর্কী কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহার সমাজে ধরিয়া রাখেন (Ency. Britannica vol. 10, p. 776)।

কাযান শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কাযান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গণিত শাস্ত্রবিদ এন. আই. লোবাচিভেচকি (N.I. Lobachevsky) ইহার রেক্টর ছিলেন ১৮২৭-১৮৪৬ পর্যন্ত। লিয়ো টয়লেস্টয় (Leo Tolstoy) উহাতে অধ্যয়ন করেন। উহাতে একাডেমী অন সাইন্স, সঙ্গীত, নাট্যকলা ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার শাখাসমূহ ছিল। কাযান তাতারদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাহা তাতার মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

ড. আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন

কাযারূন বা কাযিরূন (کازرون) ঃ ২৯°৩৭ অক্ষাংশ উ. দ্রাঘিমা ৫১°৩৮ পূ.-এ অবস্থিত ইরানের ৭ম প্রদেশ (উস্তান = اوستان) ফারস-এর একটি জিলার প্রধান শহর। ইহার পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহ হইল বোহ্বাহান, শীরায (দ্র.), ফীরূযাবাদ (দ্র.) ও বূশাহ্র (দ্র.), ফাহ্লিয়ান নদীর উত্তরে ও যাগ্রস (Zagros)-এর প্রান্তে অবস্থিত কাযারূন জিলা (শাহরিস্তান = شهرستان)-টি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ও পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তিতার কারণে গ্রীষ্মকালে ইহার আবহাওয়া অধিক উষ্ণ এবং অন্যান্য মওসুমে শীতল। খাড়িময় শৈলশ্রেণীর মধ্যে বিশাল সমতল ভূমিতে অবস্থিত শহরটির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা প্রায় ৮০০ মিটার। ভীতিপ্রদ সুউচ্চ কয়েকটি বিখ্যাত গিরিপথ (কুতলি-ই পীর-যান, কুতাল-ই দুখ্তার, শীরায-এর দিকে প্রায় ১২০ কি. মি. পূর্বে; খিশ্ত ও কুমারিজ গিরিপথ, বূশাহ্র-এর দিকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১৮০ কি. মি.)-এর উপর ইহার অবস্থান। খেজুর ও কমলা লেবুর বাগান- সংবলিত কাযারূন-এর চাষাবাদের ভূমি (বাখ্শ) অত্যন্ত উর্বর ও শস্য-শ্যামল (কৃষিজ দ্রব্য খাদ্যশস্য, চাউল, শুষ্ক ফল, লেবু জাতীয় ফল, তামাক, আফিম, তিল, তূলা, শন ইত্যাদি); খাল বা কানাত (দ্র.) ঝর্ণা ও কূপ হইতে পানি সরবরাহ হয়। অঞ্চলটি অশ্ব প্রজননের জন্য বিখ্যাত। বসন্ত ঋতুতে ইহার শ্যামল চারণভূমি নার্গিস ফুল দ্বারা সুশোভিত হয়। এই অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাশ্কা'ঈ ও মাসাসানী গোত্রসমূহ বিচরণ করে।

কিংবদন্তী অনুসারে ইরানের পৌরাণিক সম্রাট তাহ্মুরাছ (طهمورث) কাযারূন শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। নূরূদ, দারীস্ত (দার্বাস্ত) ও রাহ্বান (রাহ্শান) নামক তিনটি গ্রামের এবং একই নামের খালসমূহের সমন্বয়ে ইহা গঠিত হয় এবং এই খালগুলিই শহরে পানি সরবরাহ করে (ইবনু'ল-বাল্খী, ফার্সনামাহ, হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুয্হা)। ১ম শাপূর (২৪১-৭২)-এর রাজত্বের শেষভাগে ইহা বিশাপূর (শিরো শাপূর)-এর অধিরাজ্য ছিল। ফীরূয (৪৫৯-৮৪) ইহাকে একটি শহরে উন্নীত করেন এবং কুবায/কাবাদ (৪৮৮-৫৩১) ইহাকে সম্প্রসারিত করেন (ফাসা'ঈ, ফার্স নামা-ই নাসিরী, পৃ. ২৪৮)। এই অঞ্চলে সাসানী আমলের বহু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; M. Siroux কর্তৃক আবিষ্কৃত চাহার তাক ইহাদের অন্যতম, যাহা কাযারূন হইতে আনীত বলিয়া কথিত আছে (দ্র. মুসতাওফী, ইকলীম-ই ফার্স, পৃ. ১১১ এবং নির্ঘন্ট; সার মাশ্হাদ-এর শিলালিপি সম্বন্ধে Ph. Gignoux JA-তে, ১৯৬৮, পৃ. ৩৮৭-৪১৮)। ৪র্থ/১০ম শতকের শেষদিকে শাপূর শহরটি বিধ্বস্ত হইলে কাযারূন তখন প্রাচীন শাপূর খুররাহ্-এর প্রধান শহরে পরিণত হয়। ক্ষৌমবস্ত্র (Linens) ও সূতীবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ এই শহরটিকে আল-মুকাদ্দাসী (পৃ. ৪৩৩) "পারস্যের দিময়াত (Damietta)" বলিয়া অভিহিত করেন। বুওয়ায়হী বংশীয় আমীর 'আদুদু'দ-দাওলা (দ্র.) শহরটিতে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইহার বাগান পরিবেষ্টিত গৃহগুলি জাঁক-জমকভাবে সুসজ্জিত ছিল, উচ্চভূমিতে নির্মিত মসজিদটি ছিল শহরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শাবানকারা-এর আমীর আবূ সা'ঈদ কর্তৃক বিধ্বস্ত শহরটি ফার্স-এর গভর্নর সালজূকী আতাবেক চাবলী ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের শুরুতে ইহার পুনর্নির্মাণ করেন (যারকূব-ই শীরাযী, শীরাযনামাহ, পৃ. ২৯-৩০)। এই সময় শহরতলীর সুরক্ষিত কারখানাগুলিই সমৃদ্ধ ছিল; তবে দালাল ও ফড়িয়াগণের প্রতারণা ও অসদাচরণমূলক হইয়া উঠিয়াছিল (ইব্নু'ল-বাল্খী, ফার্সনামাহ)। আমীন রাযীর মতে কাযারূন সর্বদাই পণ্ডিত ব্যক্তি ও ধর্মতত্ত্ববিদদের কেন্দ্র ছিল (শীরায্নামায় প্রদত্ত তালিকা, পৃ. ১৩১ প.; হাফ্ত ইক্লীম, ১খ, ২০৮ প.; ফার্স নামা-ই নাসিরী, পৃ. ২৪৯ প.)। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন ঃ শায়খ আবূ ইস্হাক কাযারূনী (দ্র.) একটি সূফী তারীকার প্রতিষ্ঠাতা (৪র্থ-৫ম/১০ম-১১শ শতক)। এই তারীকার পুনরুজ্জীবনকারী আমীনু'দ-দীন বাল্য়ানী (৭ম-৮ম/১৩শ-১৪শ শতক) ও জালালু'দ-দীন দাওয়ানী (দ্র.) (৯ম/১৫শ শতক)। কাযারূনী (অথবা ইসহাকী ও বহুল ব্যবহৃত মুরশীদী) তারীকার শাখা সুদূর চীন ও ভারতেও ছিল এবং 'উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যে ৯ম/১৫শ শতকে ও সাফাবী পূর্ব ইরানে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত মহাসাগরে নাবিক ও বণিকদের নিরাপত্তা বিধানে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারেও ইহার প্রভাব ছিল। সুন্নী মতের অনুসারী এই

তারীকাপন্থিগণ সাফাবী শাহ ইসমা'ঈল (দ্র.) কর্তৃক নির্যাতিত হন। যান্দ (Zand)-এর মিথ্যা অনুসারীদের মতবিরোধের কারণে ১২শ/১৮শ শতকের শেষভাগে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বূশাহ্‌র বন্দরটির উন্নতির ফলে শহরটি বিশেষভাবে লাভবান হয়। এই বন্দরটির মাধ্যমে ১৯ শতকে কাযারূনের পণ্য রফতানীর পথ উন্মুক্ত হয় (কার্জন, ফার্‌সনামা-ই নাসিরী, পৃ. ২৪৭)। Ousley-এর ধারণায় ১৮৬১ খৃ. ইহার জনসংখ্যা ছিল চারি হইতে পাঁচ হাজার। কার্জন-এর মতে এই সংখ্যা ছিল (১৮৯২ খৃ.) দুই হইতে আড়াই হাজার। পরবর্তী বর্ণনা ও আদম শুমারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় (১৯১৩ খৃ. ১৩০০০; আনু. ১৯৫০ খৃ. ২৫,৩২৮; ১৯৫৬ খৃ. ৩৬,৬৫৯; ১৯৬৬ খৃ. ৩৯,৯০২)। সাসানী আমলের ধ্বংসাবশেষ এবং কাযার যুগের উঁচু খোদাই করা নক্‌শাদি ছাড়াও এই অঞ্চল ও শহরের মধ্যে বহু মুসলিম সমাধি-সৌধ এবং সাল্‌মান ফারসী (রা)-র বংশধরদের মাযার দৃষ্টিগোচর হয় (ইকলীম-ই পার্‌স, পৃ. ১০৮, ১১০; ফার্‌সনামা-ই নাসিরী, পৃ. ২৪৯)। শহরের পূর্বাঞ্চলীয় সমতলভূমি, মৎস্যে পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ফামূর হ্রদ ও বাগ-ই নাজার-এর কমলা লেবুর বাগানসমূহ দ্বারা পরিশোভিত (ফারস্‌নামা-ই নাসিরী, ইকলীম-ই ফার্‌স, পৃ. ১১০)। সমাধি সৌধগুলি ছাড়া শহরে কোনও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন নাই। শহরটি চারিটি মহল্লায় (quarters) বিভক্তঃ বাযার, বালা, গুম্বাদ ও মুসাল্লা বা সুফ্‌লা। এই শহরে এখনও চর্ম ও ক্যানভাসের জুতা তৈরীর কারখানা বিদ্যমান। MacGregor ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ইহা ব্যবহারের সুপারিশ করেন (কার্জন)। ইহার বর্তমান অর্থনৈতিক পশ্চাদবর্তিতার কারণ হইল বূশাহ্‌র বন্দরের অবনতি, যদ্দরুন কাযারূন ইহার উৎপন্ন দ্রব্যের রফতানীর পথ হইতে বঞ্চিত হয় এবং শীরায-এর পথে প্রধান ব্যবসা কেন্দ্ররূপে ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) আরব ভৌগোলিকদের জন্য দ্র. (১) Schwarz, Iran, পুনর্মুদ্রণ, নিউইয়র্ক ১৯৬৯ খৃ., ১খ, ৩৩ ও নির্ঘণ্ট; (২) Le Strange, পৃ. ২৬৬ প. ও নির্ঘণ্ট; (৩) B. de Meynard, Dict. de la Perse, পৃ. ৪৭২ প.। (খ) ফারসী উৎসসমূহ ঃ (৪) যারকুব-ই শীরাযী, শীরাযনামাহ, সম্পা. ইসমা'ঈল জাওয়াদী, তেহ্‌রান ১৩৫০/১৯৭১, পৃ. ২৮ প. ও নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্‌নু'ল-বাল্‌খী, ফার্‌সনামাহ, সম্পা. Le Strange, ও Nicholson, পৃ. ১৪৫ প. ও নির্ঘণ্ট; (৬) হামদুল্লাহ মুস্‌তাওফী, নুয্‌হা, পৃ. ১৬৫ প., অনু. পৃ. ১২৫ প.; (৭) আমীন আহ্‌মাদ, হাফ্‌ত ইক্‌লীম, সং., কলিকাতা ১৯৩৯ খৃ., ১খ, ২০৭ প.; (৮) হাফিজ-ই আব্‌রূ, জুগরাফিয়া, man, Ch, Adle, পত্রক ২৯৮ (ইব্‌নু'ল-বাল্‌খীর পুনরুক্তি); (৯) হাজ্জী মীরযা হাসান ফাসা'ঈ, ফারসনামা-ই নাসিরী, তেহ্‌রান লিথু. ১৩১৩/১৮৯৫-৬, পৃ. ২৪৬ প.। (গ) পর্যটকবৃন্দ ঃ (১০) W. Francklin, Observations made on a tour from Bengal to Persia..., লন্ডন ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২৪৪ প., ৩৪১ প.; (১১) E. S. Waring, A Tour to Sheeraz, লন্ডন ১৮০৭ খৃ., পৃ. ২২; (১২) Morier, Second Journey, লন্ডন ১৮১৮ খৃ., পৃ. ৪৯; (১৩) Ouseley, Travels, লন্ডন ১৮১৯-২৩ খৃ., ১খ, ২৭১-৮; (১৪) G. N. Curzon, Persia and the Persian Question, লন্ডন ১৮৯২ খৃ., ২খ, ২০৫ প.। (ঘ) পঠন-পাঠন ঃ (১৫) Rapport du Ministere de l'Interieur sur le Fars. তেহরান ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১১৮ প.; (১৬) মাস্‌'ঊদ কায়হান, জুগ্‌রাফিয়া-ই মুফাস্‌সোল-ই ঈরান, তেহ্‌রান ১৩১০/১৯৩২, ১খ, ২২৭ প. ও নির্ঘণ্ট; (১৭) ফারহাঙ্গ-ই জুগ্‌রাফিয়া-ই ঈরান, তেহ্‌রান ১৩৩০/১৯৫১, ৭খ, ১৮০ প.; (১৮) ম. ত. মুস্‌তাওফী, ইক্‌লীম-ই পার্‌স, তেহ্‌রান ১৩৪৩/১৯৬৪, পৃ. ১০৮ প. ও নির্ঘণ্ট; (১৯) ম. জ. বেহ্‌রূযী, শাহ্‌র-ই সাব্‌য য়া... শাহরিস্তান-ই কাযিরূন, শীরায ১৩৪৬/১৯৬৭; (২০) F. Meier, Die Vita des Scheich Abu Ishaq al-Kazaruni, (ফিরদাওস্‌'ল-মুরশিদিয়া... সং), লাইফযিগ ১৯৪৮ খৃ.; (২১) A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia[2], লন্ডন ১৯৬৯ খৃ., নির্ঘণ্ট।

J. Calmard (E.I.[2])/ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

কাযারূনী (كازرونى) ঃ শায়খ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন শাহরিয়ার একটি সূফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা যাহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মুরশিদিয়াহ, ইসহাকিয়াহ, কাযারূনিয়াহ। পারস্যের ফার্‌স প্রদেশের শীরায নগরের নিকটবর্তী কাযারূন নামক স্থানে ৩৫২/৯৬৩ খৃ. তিনি জন্মগ্রহণ এবং সেইখানেই ৪২৬/১০৩৩ খৃ. ইনতিকাল করেন। হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন ও হাজ্জ সম্পাদন করিবার জন্য ৩৮৮/৯৯৮ সনে তিনি কেবল একবারই তাঁহার জন্মস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। শীরায নগরের ইব্‌ন খাফীফ (মৃ. ৩৭১/৯৮১) কিংবা তাঁহার অন্যতম শাগরিদ হুসায়ন আক্‌কার-এর নিকট তিনি সূফী মতবাদে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন ও কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলি কতিপয় ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে কাযারূন ও উহার পার্শ্বস্থ এলাকা বিধর্মীদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণ একটি। তিনি অন্যূন ২৪,০০০ জরথুস্ত্র ও য়াহূদী ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা প্রদানের সুনাম অর্জন করেন। এইরূপে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন ('আত্তার, তাযকিরাতু'ল-আওলিয়া, ২৪৪-৫৪; মাহমূদ ইব্‌ন 'উছমান, ফিরদাওস্‌'ল-মুরশিদিয়া ফী আস্‌রারি'স-সামাদিয়্যা, ৪১৬)। তাঁহার এই প্রচেষ্টার পথে তিনি বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং কাযারূনের জোরাস্টারী শাসনকর্তা খুরশীদের বিরোধিতাকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধনের কাজেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বায়যান্টাইন সীমান্তে জিহাদ করার জন্য প্রতি বৎসর গাযী পাঠানোর ব্যবস্থায় রত ছিলেন। এই কার্যের জন্য তিনি শায়খ-ই গাযী উপাধি অর্জন করেন। তিনি কাযারূনে যে খান্‌কাহ্‌ স্থাপন করিয়াছিলেন উহার মূল্যবান সামাজিক কার্যকারিতা ছিল। উহা নিয়মিতভাবে গরীব ও মুসাফিরদিগকে সাহায্য দান করিত। তাঁহার জীবিতাবস্থায় ফার্‌স-এর বিভিন্ন স্থানে কাযারূনী ভক্তবৃন্দের দ্বারা ৬৫টি ঐরূপ খানকাহ্‌ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এইগুলি তাঁহার মতবাদ সম্প্রসারণের প্রাণকেন্দ্ররূপে কার্য করিতে থাকে।

এই মতবাদের সবগুলি শাখা হইতে গরীবদের জন্য একই ধরনের সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছিল এবং ইহাই কাযারূনীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। বুরসায় অবস্থিত এক ইসহাকী খানকায় বিক্ষিপ্তভাবে আজও পর্যন্ত সাবান বিতরণ ব্যবস্থা চালু আছে (Mehmed Shems el-Din, Yadigar-i Shemsi, ২২০)। ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে এই মতবাদ পাশ্চাত্যের আনাতোলিয়া এবং প্রাচ্যের সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আনাতোলিয়ায় কাযারূনীর অনুসারীদিগকে ইসহাকী বলা হয়। এরযেরুম, আমাসিয়া, বুরসার কুনিয়া (স্থাপিত ৮২১/১৪১৮)-তে তাহাদের কেন্দ্র ছিল (Abdulbaki Golpinarli, Mevlana'dan sonra

Mevlevilik, Istanbul 1953, ii) এবং বুরসা-তে ৮৮৪/১৪৭৯ খৃ. প্রতিষ্ঠিত (H. Adnan Erzi, Bursa'da Ishaki dervislerine mahsus zaviyenin vakfiyesi, in Vakiflar Dergisi, ii 1942 423)। ধারণা করা যাইতে পারে যে, প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক আনাতোলিয়া বিজয় এবং সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আনাতোলিয়া হইতে ইসহাকিয়া মতবাদ রুমেলী ও আলেপ্পোর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এদির্নাতে একটি তাকিয়া ছিল (Ewliya Celebi, iii, 454 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য এবং W. Caskel, in Isl., xix, 284 f.)। পূর্বদিকে ভারত ও চীন পর্যন্ত তাঁহার মতবাদের যে বিস্তার তাহা সম্ভবত সমুদ্র পথে হইয়াছিল এবং কাযারূনীগণ baraka কর্তৃক সমুদ্র যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে জড়িত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধি মৃত্তিকা দ্বারা অলৌকিক কার্যাদি সমাধা করা হইত। নিরাপদ যাত্রার নিশ্চয়তার জন্য কাযারূনীর খানকায় মানত হিসাবে অর্থ প্রদান করা হইত এবং এই অর্থ বিদেশী বন্দরে নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক সংগৃহীত হইত।

ইব্ন বাত্তূতা (২খ, ৮৮-৯২; ৪খ, ১০-১৩) এই সকল বন্দরের মধ্যে ভারতের কালীকট, ক্যামে ও কোলাম এবং যায়তুন (ক্যান্টন)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রথা সম্ভবত 'উমার ইব্ন আবি'ল-ফারাজ আল-কাযারূনী (মৃ. ৭০৪/১৩০৪) কর্তৃক প্রচলিত হয়। কাযারূনীর সমাধি-মৃত্তিকা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, উহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ শান্ত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে উহা সর্বরোগ-হরা ঔষধ ও রক্ষাকরণের উৎকৃষ্ট উপকরণ। কাযারূনের কেন্দ্রীয় খানকাহ ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাফাবী শাসকগণ কর্তৃক প্রতিহত করা হইয়াছিল (Mirza Hasan Fasai, Farsnama-yi Nasiri, Tehran 1314/1896, 249) এবং এই ধর্মমতের আনাতোলিয়া শাখা পরবর্তী শতাব্দীতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, যদিও অনেক পরে ইহার কিছু কিছু নমুনা চালু হয়। কাযারূনী মতবাদের অবশিষ্টাংশের কিছু উল্লেখ করা যায়। যেমন— শীরায নগরের রূযবীহান বাকলী (Ruzbihan Bakli মৃ. ৬০৬/১২০৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Ruzbihaniyya। ইহা ফারস নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এক শতাব্দী কালের বেশী সময় স্থায়ী ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Farid al-Din Attar, Tadhkirat al-Awliya, ed. Mirza Muhammad Khan Kazwini, Tehran 1346, sh./1967, 244-54; (২) Mahmud b. Uthman, Firdaws al-Murshidiyya fi asrar al-Samadiyya, ed. F. Meier, Leipzig 1948; (৩) Ibn Battuta, ii, 64, 88-92, iii, 244-8, iv, 89, 103, 271; (৪) "Abd al-Rahman Djami, Nafahat al-Uns, ed. Mahdi Tawhidipur, Tehran 1336, sh/1957, 254-55; (৫) Mehmed Shems el-Din, Yadigar-i Shemsi, Bursa 1332/1914, 219-20; (৬) Kopruluzade Mehmed Fu'ad, Abu Ishaq Kaseruni und die Ishaqi-Derwische in Anatolien, in Isl., xix (1931), 18-26; (৭) H. Adnan Erzi, Bursa'da Ishaki dervislerline mahsus zaviyenin vakfiyesi, in Vakiflar Dergisi, ii (1942), 423-9; (৮) A. J. Arberry, The biography of Shaikh Abu Ishaq al-Kazaruni, in Oriens, iii (1950), 163-72; (৯) J. Spencer Trimingham, The Sufi orders in Islam, Oxford 1971, 15, 21,236; (১০) দা. মা. ই., ১৭খ., ১৪-১৫।

H. Algar (E.I.[2])/ মোঃ মোমতাজ হোসেন

কাযী (দ্র. কাদী)

কাযী খান (قاضى خان) : হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন আল্লামা ফাখরুদ্দীন কাযী খান হাসান ইব্ন মানসূর আওযাজানদী ফারগানী (মৃ. ৫৯৬ হি.)। ফারগানার নিকটবর্তী আওযাজান্দ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে আওযাজান্দীও বলা হয়।

তাঁহার রচিত বিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়া কাযী খান' আল-ফাতাওয়াল খানিয়্যা' নামে পরিচিত। গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে এই কিতাবখানি ব্যাপকভাবে পঠিত ও সমাদৃত। ফাতাওয়ার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য এই কিতাব অন্যতম উৎস। এই কিতাবে সচরাচর সংঘটিত হয় উম্মতের জীবনপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট এই জাতীয় বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বিন্যাস অপরাপর প্রসিদ্ধ ফিকহী কিতাবের ন্যায়। প্রতিটি মাস্আলার জন্যই মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল মাসআলায় উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মত রহিয়াছে, সেখানে একটি বা দুইটি উল্লেখ করা হইয়াছে। লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, এই কিতাবে অধিক স্পষ্ট মত আগে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভূমিকায় আরও বলা হইয়াছে, এই কিতাবে বর্ণিত মাসআলা বিভিন্ন প্রকারের। এক প্রকার, যাহা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার শাগরিদগণের বর্ণিত মাসআলা। অপর এক প্রকার, তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের হানাফী আলিমগণের বর্ণিত মাসআলা।

গ্রন্থকার ৫৭৮ হিজরী সনের ১০ মুহাররম যুহরের সময় এই কিতাব লিখার কাজ শুরু করেন। পরবর্তী কালে রূমের অধিবাসী মুহাম্মাদ ইব্ন মুসতাফা ইবনুল হাজ মুহাম্মাদ আফিন্দী আস-সূফী নামের একজন আলিম ইঁহার মাসআলা পুনর্বিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা শুরু করিয়াছেন নিম্নবর্ণিত শব্দে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ -

সম্পাদক লিখিয়াছেন, তাঁহার শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্ন শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ—যিনি বাচবী যাদাহ নামে খ্যাত— হিজরী ৯৯৫ সনে তাঁহাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করিতে হুকুম করিয়াছেন। অবশেষে তিনি এই কিতাব তরতীব (বিন্যাস) দিয়াছেন এবং ওহ্হাজে শরীআত (وَهَّاجِ شَرِيعَت) নামকরণ করিয়াছেন। এই নাম এই গ্রন্থের তরতীবের তারিখ।

আখী চালপী তাওকানী নামে খ্যাত আল্লামা য়ূসুফ ইব্ন জুনায়দ ফাতাওয়া কাযী খানকে একই খণ্ডে সংক্ষেপণ করিয়াছেন। এই সংক্ষেপিত গ্রন্থের প্রথম বাক্য : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْبَارِ الْقَوِىِّ الْمَتِيْنِ — তিনি তুর্কী সুলতান বায়াযীদ খানের নিকট ইহা হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেন (কাশফুয যুনূন, ২খ, ১২২৭, আল মাকতাবাতুল ফায়সালিয়্যা, মক্কা)।

ফাতাওয়া কাযী খান হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ইহা সেই সকল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলি ফাতওয়া প্রদানের কাজে বিশেষভাবে

সমাদৃত। যেসব মাসআলায় পূর্ববর্তীদের নানা বর্ণনা এবং পরবর্তীদের নানা মত রহিয়াছে, সেখানে তিনি প্রাধান্য দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনাবী (র) আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা গ্রন্থে এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ফুকাহায়ে কিরামের নিকট নির্ভরযোগ্য। আল্লামা কাসিম ইব্ন কুতলুবুগা (মৃ. ৮৭৯ হি.) আত-তাসহীহু ওয়াত-তারজীহু লিলকুদূরী কিতাবে লিখিয়াছেন, কাযী খানের শুদ্ধিকরণ অন্যদের শুদ্ধিকরণ হইতে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কিতাবের চারখানি অংশ রহিয়াছে। সর্বপ্রথম ১৮৩৫ খৃ. মুতাবিক ১২৫১ হি. সনে কলিকাতা হইতে ইহা চারি খণ্ডে ব্লকে মুদ্রিত হয়। অতঃপর মিসরের দারুত তাবাআহ (বূলাক) কর্তৃক হিজরী ১৩১০ সনে আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়ার টীকায় ইহা মুদ্রিত হয় (শারহুয যিয়াদাত-এর ভূমিকা)।

কাযী খান এই গ্রন্থের ভূমিকার পর মূল কিতাব শুরু করার পূর্বে فَصْلٌ فِى رسم المفتى (ফাতওয়া প্রদানকারীর জন্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা) শিরোনামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমাদের যুগের কোন ফাতওয়া প্রদানকারীকে যখন কোন মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সেই মাসআলা যদি ইমাম আ'যম ও তাঁহার শাগরিদদের পক্ষ হইতে কোন প্রকার মতবিরোধ ব্যতীত যাহিরী রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়া থাকে, তবে আমাদের মাযহাবের ফাতওয়া প্রদানকারীকে এই দিকেই ঝুঁকিতে হইবে, নিজের ইচ্ছামত এই মতের বিরোধিতা করা যাইবে না, এমন কি ফাতওয়া প্রদানকারী মুজতাহিদ ও জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও। কারণ এই ব্যক্তির ইজতিহাদ ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার শাগরিদগণের ইজতিহাদের সমপর্যায়ে পৌঁছিবে না।

আর যদি ঐ মাসআলাটি এমন হইয়া থাকে, যে বিষয়ে ইমাম আ'যম ও তাঁহার শাগরিদগণের মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছে, তবে যদি ইমাম আ'যম আবূ হানীফার সঙ্গে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দুই শাগরিদ ইমাম আবূ যূসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মধ্য হইতে কোন একজন থাকেন তখন এই দুইজনের কথাই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন ছাত্রই মতবিরোধ করিয়া থাকেন, যদি তাহাদের মতবিরোধ যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে হইয়া থাকে, তবে সাহিবায়ন অর্থাৎ ইমাম আবূ যূসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত গ্রহণ করা হইবে।

আর যদি ঐ মাসআলাটি যাহির রিওয়ায়াত ব্যতিরেকে নাদির (বিরল) রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়, তবে যদি তাহা হানাফী মাযহাবের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন তাহার উপর আমল করা হইবে। যদি কোন মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার শাগরিদগণের পক্ষ হইতে কোন কথাই বর্ণিত না থাকে, এই ক্ষেত্রে তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্তী হানাফী উলামায়ে কিরাম যদি কোন ফাতওয়ায় ঐকমত্য পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাই আমলের জন্য গৃহীত হইবে।

আর যদি ফাতওয়া প্রদানকারী সাধারণ পর্যায়ের আলিম হইয়া থাকেন— নাসিখ-মানসূখ, ফিকহের উসূল এবং মানুষের অভ্যাস ও পরিভাষায় তাহার গভীর জ্ঞান না থাকে, তবে তিনি তাহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ফকীহের মত অনুসারে ফাতওয়া প্রদান করিবেন এবং এই ফাতওয়া সেই বড় ফকীহের সংগেই সংযুক্ত করিবেন।

হিজরী ১৩১০ সনে মিসরের 'দারুত তাবাআহ' হইতে আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া বা আল-ফাতাওয়াল আলমাগীরিয়্যাহ ছয় খণ্ডে মুদ্রিত হয়। ইহার প্রথম তিন খণ্ডের পৃষ্ঠার পার্শ্বে ফাতাওয়াল খানিয়্যা মুদ্রিত হয়।

কাযী খান তাঁহার এই কিতাবখানি বহু অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছেন। আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়ার প্রথম খণ্ডের সঙ্গে আল-খানিয়ার তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, নিকাহ, তালাক ও ইতাক অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। আল-হিন্দিয়া বা আলমগীরিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে আল-খানিয়ার আল-বুয়ূ', আল্-ইজারাত, আদ-দা'ওয়া ওয়াল-বায়্যিনাত, আশ-শাহাদাত ইত্যাদি অধ্যায় রহিয়াছে। আল-হিন্দিয়ার তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠার পার্শ্বে খানিয়ার যে সকল অধ্যায় রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ আল-ওয়াকালাহ, আল-কিফালাহ ওয়াল-হাওয়ালা, আস্-সুল্হ, আল-ইকরার, আল-কিসমাহ, আল-মুদারাবা, আল-মুযারাআহ, আল- মু'আমালা, আশ-শুরব, আল-আশরিবা, আল-গাসব, আল-হিবা, আল-ওয়াক্ফ, আল-উদহিয়্যা, আস-সায়দ ওয়ায-যাবাইহ, আল-ওয়াদীআহ, আল-আরিয়াহ, আল- লুকতাহ, আল-লাকীত, আল-হাদার ওয়াল-ইবাহা, আল- জিনায়াত, আল-হুদূদ, আল-ইকরাহ, আল-ওয়াসায়া, আশ-শুফ্আহ্, আস-সিয়ার, আর-রাহন, আশ-শিরকাত, আল-মা'যূন ও আল-হিজরু। গ্রন্থখানির মূল পাঠসহ ইংরাজী তরজমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্লামা ফখরুদ্দীন কাযী খান হাসান ইব্ন মানসূর আওযাজানদীকৃত 'আল ফাতাওয়াল খানিয়্যা', মাকতাবা মাজিদিয়্যা, কোয়েটা, পাকিস্তান ১৯৮৩ খৃ./ ১৪০৩ হি.; (২) হাজ্জী খালীফা, 'কাশফুয্ যুনূন, ২খ., আল-মাকতাবাতুল ফায়সালিয়্যা, মক্কা তা. বি.; (৩) ডক্টর কাসিম আশরাফ নূর সম্পাদিত, কাযী খান লিখিত 'শারহুয যিয়াদাত', আল-মাজলিসুল ইলমী, করাচী, প্রকাশকাল ২০০০ খৃ./ ১৪২১ হি.; (৪) ইব্ন আবিদীন, 'রাদ্দুল মুহতার', মাকতাবা মাজিদিয়্যা, কোয়েটা, পাকিস্তান ১৩৯৯ হি.; (৫) আল-ফাতাওয়াল আলামগীরিয়্যা, মাকতাবা মাজীদিয়্যা, কোয়েটা, পাকিস্তান/ ১৯৮৩/১৪০৩; (৬) মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী, আপ ফাতওয়া কেয়সে দেঁ, দেওবন্দ ১৯৯৬/১৪১৬।

জুবাইর আহমদ আশরাফ

কাযেমউদ্দীন আহমদ সিদ্দীকী (كاظم الدين احمد صديقى) ঃ (জন্ম ১৯৭৬ খৃ.) ঢাকার বলিয়াদীর প্রখ্যাত জমিদার, সাহিত্যানুরাগী, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতার নাম রইসুদ্দীন আহমদ। দেশের রাজনীতিতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ১৯০৬ খৃ. অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হইলে তিনি পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (প্রতিষ্ঠা, ঢাকা ১৯০৮ খৃ.) সভাপতি ছিলেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী। তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করায় মূল ধারার রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া পড়েন।

কাজেমুদ্দীন সিদ্দীকী আরবী-ফারসীতে সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ধর্মের বিধান পুরাপুরি মানিয়া চলিতেন। তাঁহার একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার ছিল, যাহা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া যান। ইহাতে আরবী ও ফারসী ভাষার বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। তিনি বাংলা ভাষায়ও কাব্যচর্চা করিতেন। তাঁহার "কার দোষ" কবিতা তাঁহার জন্য সুখ্যাতি আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার "ফরিয়াদে আসী" (গুনাহগারের ফরিয়াদ)" শীর্ষক

ফার্সী কবিতাগ্রন্থ তাঁহার ভাই খান বাহাদুর ফরিদুদ্দীন আহমদ কলিকাতার রিদওয়ানী প্রেস হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯১২ খৃ.)। ইহার একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকীম হাবীবুর রহমান সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ইহাতে হাম্দ, না'ত ও মুসাদ্দাস রহিয়াছে। সীরাতুন্নবী (স) উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার চকবাজারস্থ বলিয়াদী হাউজে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেন এবং পুরস্কার প্রদান করিতেন। তিনি ইমাম গাযালীর মিনহাজুল 'আবিদীন ও সিরাজুস্-সালেকীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ইহার নামকরণ করেন "সাহিত্য সোপান"। ২২২ পৃষ্ঠার এই বইটি ঢাকার ইসলামিয়া লাইব্রেরী হইতে ১৩৬৬ বাংলায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৩, ২০৯, ২১১, ২১২-১৫; (২) বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ঢাকা ১৯৭৫ ; (৩) জয়তিশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, Natural Biography for India ; (৪) আবুয যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৫৫-৫৬ ; (৫) ফরিয়াদে আসী-কাজেমুদ্দীন সিদ্দিকী।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

কায়কা'উস (كيكاوس) ঃ রূম (এশিয়া মাইনর)-এর দুইজন সালজূকী সুলতানের নাম।

কায়কা'উস (১) যে যুদ্ধে তাহার পিতা ১ম কায়খুসরাও (দ্র.) ইনতিকাল করেন (৬০৮/১২১১) তাঁহার মৃত্যুতে তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। অবশ্য ইহার পূর্বে তাঁহাকে তাঁহার দুই ভ্রাতা কায়ফেরীদূন ও কায়কুবায-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহাকে অপর কোনও অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকাল Nicaea-এর গ্রীকগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ মনোভাবের সহিত দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে হস্তক্ষেপের নীতির সমন্বয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চলে (যেখানে কায়খুসরাও আনতালিয়া অধিকার করিয়াছিলেন) তিনি লাতিন যুবরাজ, অ্যান্টিওক-এর ৪র্থ বোহেমুণ্ড এবং তাঁহার মিত্র আলপ্পোর আজ-জাহির-এর সপক্ষে পরিচালিত, সিলিসিয়ার আরমেনীয়গণের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থাবলীর সহিত সাইপ্রিয়ট ও ভেনিসীয়গণের বাণিজ্যচুক্তির বিষয়টি সংযুক্ত করার প্রয়াস পান। উত্তর সীমান্তে, তাঁহার রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ সাফল্য ছিল সিনোপ অধিকার, ইহার মাধ্যমে তিনি একটি নূতন সমুদ্র বহির্গমন পথ লাভ করেন, এইবার কৃষ্ণ সাগরের জন্য। এই বন্দরটির একটি সুবিধা ছিল এই যে, ইহা সুস্পষ্টভাবে Nacaea অথবা ট্রেবিযোন্দ কাহারও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এইখানে তিনি একটি নৌবহর সংগঠিত করেন, যাহার লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে ক্রিমিয়া। কিন্তু কায়কা'উস ৬১৩/১২১৬ সালে আজ-জাহিরের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগত সমর্থক সামোসাতা-র নির্বাসিত আয়্যুব বংশীয় আল-আফদাল (দ্র.)-এর পক্ষে আলেপ্পো বিজয়ের চেষ্টা করিলে মেসোপটেমিয়ার আয়্যূবী আল-আশরাফ (দ্র.) তাঁহাকে পরাস্ত করেন। আল-মাওসিল-এর শাসক লু'লু' (দ্র.)-এর সহায়তাপুষ্ট হইয়া তিনি একটি আয়্যূবী বিরোধী মোর্চা গঠন করার মাধ্যমে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (৬১৮/১২২০-এর শেষ দিকে)। এশিয়া মাইনরে তাঁহার প্রতিবেশী এরযিনজান-এর বাহ্রামশাহ ও এরযুরুম-এর আল-মুগীছ-এর সহিত তিনি সুসম্পর্ক রক্ষা করিতেন। একই সঙ্গে খলীফা আন-নাসির (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল। খলীফার সংস্কারকৃত ফুতুওওয়া (দ্র.)-র প্রতি অনুগত থাকিয়া তিনি তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। সম্ভবত তিনি ফারসী ভাষায় লিখিত সাহিত্যের প্রসারের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার শাসনাধীন এলাকাসমূহে তখন কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। ইব্নু'ল-'আরাবী (দ্র.)-র প্রচারিত সূফীবাদের প্রতিও তিনি ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন। এই একই যুগে মোটের উপর নগর, স্থাপত্য, মসজিদ মাদ্রাসা, সরাইখানা ইত্যাদির প্রকৃত উন্নতি সূচিত হয়, তবে ইহাদের পূর্ণ তালিকা এই প্রসঙ্গে প্রদান করা সম্ভব নয়।

কায়কা'উস (২) 'ইয্যু'দ-দীন ২য় কায়খুসরাও যিনি মৃত্যুকালে তিনজন নাবালক পুত্র রাখিয়া যান— তাঁহার পুত্র ও অন্যতম উত্তরাধিকারী; এই পুত্রেরা হইতেছে ঃ জনৈক গ্রীক মহিলার গর্ভজাত পুত্র ও জ্যেষ্ঠ 'ইয্যু'দ-দীন; দ্বিতীয় জন একজন তুর্কী মহিলার গর্ভজাত সন্তান রুক্নু'দ-দীন কিলিজ আরসলান এবং কনিষ্ঠ জনৈক জর্জীয় মহিলার গর্ভজাত পুত্র ও রোগাক্রান্ত 'আলা'উ'দ-দীন। কয়েক বৎসর পর্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, বিশেষভাবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী মুক্তিপ্রাপ্ত (মাওলা) কারাতায় তিন ভ্রাতার মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য সম্মিলিত ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। মোঙ্গলগণের প্রতি এক সফরে প্রেরিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার রহস্যজনক মৃত্যুর পর অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে সহযোগিতা রক্ষার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। কিন্তু 'ইয্যু'দ-দীন ও রুক্নু'দ-দীন যখন সাবালকত্ব অর্জন করেন তখন এই নীতি অসম্ভব প্রমাণিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই দুই যুবরাজের মধ্যকার বিরোধিতা ছিল তাঁহাদের নিজ দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। রুক্নু'দ-দীন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন এশিয়া মাইনরের পূর্ব প্রান্তে। মোঙ্গলগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ও সংযোগ ছিল। তিনি তাহাদের উপর এবং তাঁহার নিজ দরবারে তাহাদের বিশ্বস্ত কর্মকর্তা পার্ওয়ানাহ্ মু'ঈনু'দ-দীন সুলায়মান (দ্র.)-এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। 'ইয্যু'দ-দীন এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার গ্রীক পরিবার ও সীমান্তে বসবাসকারী তুর্কোমান দলসমূহের সহিত মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি শেষোক্ত গোত্রের মোঙ্গল-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেন। এই জটিল ঘটনা প্রবাহের দ্বারা এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঃ কারাতায়-এর মৃত্যু ঘটিলে (৬৫২/১২৫৪) রুক্নু'দ-দীন কায়সেরি অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে বন্দী করা হয়। কিন্তু দুই বৎসর পর মোঙ্গলগণ বায়জু-র নেতৃত্বে পুনরায় আনাতোলিয়া আক্রমণ করে। এই আগ্রাসনটি একদিক হইতে ৬৪১/১২৪৩ সালের আক্রমণ হইতে অধিকতর বিপজ্জনক ছিল; কারণ ইহার মূল লক্ষ্য ছিল এশিয়া মাইনরে মোঙ্গল গোষ্ঠীর একাংশকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও ইহার মাধ্যমে তাহাদের শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করা। 'ইয্যু'দ-দীন পরাজিত হইয়া গ্রীক এলাকায় পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পক্ষে সেই সময়ে Nicaea-তে নির্বাসিত Michael Paleologus (নিম্নে দ্রষ্টব্য) অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে কায়সেরিতে রুক্নু'দ-দীনকে সুলতানরূপে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তিনি যখন সর্বোচ্চ খানের নিকট তাঁহার আনুগত্য প্রকাশের জন্য যাত্রা করেন, 'ইয্যু'দ-দীন পুনরায় কোন্য়া অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেন (৬৫৫/১২৫৭)। প্রধান খান মোংগকে খলীফার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইজনের যৌথ সহযোগিতা লাভ অথবা অন্ততপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি

পুনরায় উক্ত এলাকার বিভক্তি নিশ্চিত করিলে দুই ভ্রাতা ৬৫৮/১২৬০ সালে সিরিয়াতে পরিচালিত ইলখান হুলেগু-র সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি এই স্থান ত্যাগ করিলে তাঁহার পুনরায় তাঁহাদের পুরাতন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। মোঙ্গলদের আশংকায় শংকিত 'ইয্‌যু'দ-দীন পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই পলায়ন চিরকালের জন্য পলায়ন হইয়া দাঁড়ায়। লাতিনগণের নিকট হইতে তাঁহার পুরাতন বন্ধু Paleologus কর্তৃক পুনর্দখলকৃত কনস্ট্যানটিনোপলে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পলায়ন তাঁহার জন্য দুর্ভাগ্যজনকরূপে বিবেচিত হয়। নূতন সম্রাট লাতিন ও রাশিয়ার মোঙ্গল জাতির বিরুদ্ধে তাঁহার সর্বশক্তি সমাবেশে আগ্রহী হইয়া ইরান ও এশিয়া মাইনরের গোত্রসমূহের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। অপর দিকে শেষোক্ত দলও ঠিক তখনই রাশিয়ার মোঙ্গল গোত্রসমূহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল। 'ইয্‌যু'দ-দীনকে বায়যানটাইন রাজ্যের উত্তর সীমান্তে বন্দী করিয়া রাখা হয়; একটি মোঙ্গল আক্রমণের মাধ্যমে তাঁহাকে মুক্ত করা হইলেও তিনি কেবল ক্রিমিয়া অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করিতে সক্ষম হন এবং সেই স্থান হইতে নীরব দর্শকের ন্যায় এশিয়া মাইনরে ঘটমান ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কোন প্রচেষ্টা ব্যতীত তিনি উক্ত স্থানে ৬৭৮/১২৭৯-৮০ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার সঙ্গী কতিপয় তুর্কী জনতা দোবরুজা অঞ্চলে থাকিয়া যায় এবং অদ্যাবধি ইহারা এই অঞ্চলে তাঁহার নাম বহন করিতেছে। তাহারা বর্তমানে গাগযেস (দ্র. দোবরুজা)-রূপে পরিচিত হইয়াছে। এশিয়া মাইনরে তুর্কোমান গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার নামে সংগঠিত বিভিন্ন বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে তাঁহার পুত্রেরা যে সমর্থন লাভ করে তাহার মাধ্যমে। একই সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই ইহা আকস্মিক বা কাকতালীয় নয় যে, মহান, তুর্কোমান কালজয়ী গাঁথা দানিয়ামান্দ-নামাহ্ ইহার সর্বপ্রথম আকারে তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সালজূকী প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপটে কেবল ১২৪৩ খৃ. সালের পূর্ববর্তী ৭ম/১৩শ শতকের প্রাসঙ্গিক একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থতালিকা এবং সালজূকী-মোঙ্গল যৌথ-শাসনামলের গ্রন্থাবলী এখানে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বৃহদাকার ও অধিকতর বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. Cl. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, লন্ডন ১৯৬৮ খৃ., ৪২৭-৪০।

(ক) ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতকের সমাপ্তি কাল হইতে ১২৪৩ খৃ. পর্যন্ত ঃ মুসলিম আনাতোলীয় উৎসসমূহ কেবল দ্বিতীয় যুগেই লিখিতভাবে (ফারসী ভাষায়) সংরক্ষিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা প্রথম যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ঃ (১) ইব্‌ন বীবী, আল-আওয়ামিরু'ল-'আলা'ইয়্যা, অদ্বিতীয় এই পাণ্ডুলিপিটির অবিকল প্রতিরূপ সংস্করণ, আদনান এরযি, আনকারা ১৯৫৬ খৃ.; (২) একই ব্যক্তি ও নেকাতি লুগাল-এর শুরু করা সমালোচনামূলক সংস্করণ— একমাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত, ১৯৫৭ খৃ.; কিছু মাত্রায় সংক্ষেপিত (৩) একটি ভাষ্য ১৯০২ খৃ. M. Th. Houtsma কর্তৃক Recueil de textes relatifs a l'histoire des Saljukides, ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত; এই ভাষ্যের জার্মান অনুবাদ ও তৎসহ মূল ভাষ্য হইতে গৃহীত সংযোজনা H. Duda, Die Seltschuchengeschichte des Ibn Bibi, 1959। এই সময়ের জন্য আরও দ্র. (৪) অজ্ঞাত গ্রন্থকার, তারিহ্-ই আল-ই সেলচুক, তুর্কী অনুবাদসহ সংস্করণ, নাফিয উয্‌লুককৃত ১৯৫২ খৃ.। আরবীয় সূত্রসমূহ আয়্যূবী যুগের, দ্র. আয়্যূবী। আলোচ্য বিষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হইতেছে ঃ (৫) কামালু'দ-দীন ইব্‌নু'ল-'আদীম, যুব্‌দা, সম্পা. সামী দাহান, ৩খ, এবং (৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাজীফ আল-হামাবী, তা'রীখ মানসূরী, ক্ষুদ্র সংস্করণ, P. Gryaznevitch, মস্কো ১৯৬০ খৃ. (অপ্রকাশিত জার্মান অনুবাদ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত)।

আর্মেনীয়, সিরীয়, গ্রীক, জর্জীয় ও এমনকি কখনও কখনও লাতিন ভাষ্যে খৃস্টান সূত্রসমূহকেও এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। আর্মেনীয় সূত্রসমূহে মূল আর্মেনিয়া ও সিলসিয়া উভয় স্থানের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ের জন্য বস্তুতপক্ষে শেষোক্তটিই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার প্রধান উদাহরণ হইতেছে ঃ (৭) Historien Royal (সম্ভবত=Sempad the Constable, সং. Akelian ১৯৫৬ খৃ., আংশিক ইংরেজী অনু. S. Der Nersessian, সম্পূর্ণ ফরাসী অনুবাদ G. Dedeyan, গবেষণাসন্দর্ভ, সরবোন প্যারিস ১৯৭২ খৃ.। জর্জীয় উৎসসমূহে (৮) M. F. Brosset-কৃত Histoire de la georgie, ২ খণ্ডে, ১খ., ১৮৪৯-গ্রন্থে যথোপযুক্তভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। বায়যানটাইন উৎসসমূহের অবদানসমূহ (সর্বোপরি Nicetas, Akropolites, Pachymeros) সুবিধাজনকভাবে (৯) B. Lehmann, Die Nachrichten des ... uber die Seltschuken, ১৯৩৯ খৃ.-এ সংগৃহীত হইয়াছে। সিরীয় ভাষায় (১০) Bar Hebraeus (দ্র. ইব্‌নু'ল-'ইব্‌রী)-এর Chronography গুরুত্বপূর্ণ (ইহা আরবী ভাষ্যটির তুলনায় উত্তম), সম্পা. ও অনুবাদ E. W. Budge, ১৯৩২ খৃ.; (১১) J. B. Chabot, Corpus Scriptorum Orientalium নামক রচনায় একটি সিরীয় কালপঞ্জী প্রকাশ করিয়াছেন। অজ্ঞাত গ্রন্থকারের একটি সিরীয় কালপঞ্জী প্রকাশ করিয়াছেন। অজ্ঞাত গ্রন্থকারের এই কালপঞ্জীটিতে ১২৩৫ খৃ. পর্যন্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচিত অংশটির অনুবাদ এখন পর্যন্ত করা হয় নাই।

যুগ দুইটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী ক্রান্তিকালীন সময়ের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হইতেছে (১২) Vincent de Beauvais-এর Speculum Historiale-এ অন্তর্ভুক্ত লাতিন মিশনারী Simon de St. Quentin-এর ভাষা হইতে দীর্ঘ খণ্ডাংশসমূহ। (১৩) J. Richard সাম্প্রতিককালে ইহাদের Histoire des Tartares, 1966 শিরোনামে সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়াছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লিপিসমূহের অধিকাংশ একটি গ্রন্থপঞ্জী সহকারে (১৪) RCEA-তে সংগৃহীত করিয়া রাখা হইয়াছে, মুদ্রাসমূহের অনেক উদাহরণ (১৫) S. Lane-Poole-এর Catalogue of the oriental coins in the British Museum, viii; (১৬) আহমেদ তেভহিদ-এর Catalogue des anciennes monnaies islamiques du musee d'Istanbul, iv, 1904-এ বর্ণনা করা হইয়াছে। ৭ম/১৩শ শতকের বিভিন্ন সময়ে ওয়াকফ্ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১৭) Belleten (১৯৪৭-৮ খৃ.)-এ ওসমান তুরান-এর প্রবন্ধ। প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন নগরী সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ দ্রষ্টব্য।

আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাবলী ঃ (১৮) IA; Cl Cahen, উপরে দ্রষ্টব্য এবং (১৯) Le commerce anatolien au XIII^e siecle, in Melanges... Louis Haphen, 1951; (২০) ওসমান তুরান, Selcuklular Zamainda Turkiye, 1971.

(খ) ১২৪৩ হইতে ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত। ইব্‌ন বীবী (১২৮০ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত) ও অজ্ঞাত গ্রন্থাকারের তা'রীখ-এর সহিত এখন (২১) কারীমু'দ-দীন মাহ্‌মূদ আকসারায়, মুসামেরাতু'ল-আখবার, সম্পা. ওসমান তুরান, ১৯৪৭ খৃ. যোগ করা যাইতে পারে (জার্মান ভাষায় বিশ্লেষণ, ফিকরেত ঈসিলতান, ১৯৪৩ খৃ.)। প্রথম মামলূকগণের যুগের বহুসংখ্যক আরবীয় উৎসের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি প্রদান করা উচিত (২২) বায়বারস আল-মানসূরী (অপ্রকাশিত)-এর প্রতি (৭ম/১৩শ শতকের মধ্যভাগের জন্য) এবং (২৩) 'ইয্‌যু'দ-দীন ইব্‌ন শাদ্দাদ-এর Life of Baybars প্রতি, শেষোক্তটির দ্বিতীয় অংশ (এখন পর্যন্ত কেবল ইহারই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে) এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত; তবে শারাফু'দ্‌-দীন য়ালত্‌কায়া কর্তৃক ইহার একটি তুর্কী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে (Baypars Tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৪১খৃ.)। প্রথম খণ্ডটি বহু গ্রন্থকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য য়ূনীনী, সং. হায়দরাবাদ ১৯৫৪-৫ খৃ.। বৃহত্তর আরমেনিয়ার কতিপয় আর্মেনীয় গ্রন্থকার পূর্বাঞ্চলীয় এশিয়া মাইনরের মোঙ্গল জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল Hitorien Royal গ্রন্থেই মূল আনাতোলিয়া সম্পর্কে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে Pachymeros ও Nicephoros Gregoras-এর সাহায্য গ্রহণ অতি প্রয়োজনীয়; লাতিন অনুবাদসহ দ্রষ্টব্য Bonn Corpus।

সাম্প্রতিক কালের সাধারণ গ্রন্থপঞ্জীর সহিত বর্তমানে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ যোগ করা যায়। (২৪) Faruk Sumer, Anadoluda Mogollar, in Selcuklu arastirmalari dergisi, ১খ., (১৯৬৯-৭০ খৃ.), ১-১৪৭; (২৫) Necat Kaymaz, Pervane Mu'inu'din Suleyman, 1970; (২৬) S. Vryonis, The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization in the XIth-XVth century, বার্কলে ও লস-এঞ্জেলস্ ১৯৭১ খৃ.।

Cl. Cahen (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কায়কা'উস (كيكاوس) ঃ ইরানী কিংবদন্তীর জনৈক বাদশাহ্, কায়ানী বংশের সহিত সম্পৃক্ত। আবেস্‌তা-য় তাঁহাকে কাবা উচা (Kava uca) নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিরদাওসী তাঁহাকে কায়কোবাদ-এর পুত্র বলিয়াছেন। অন্যান্য সূত্রে তাঁহাকে কায়কোবাদ-এর পৌত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি একজন যুদ্ধবাজ বাদশাহ ছিলেন এবং সেনাবাহিনীসহ মাযিন্দারান-এ প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হয়। মাযিনদারান ছিল এক "শুভ্র দৈত্য" শাসিত দেও-দানবের দেশ। শুভ্র দৈত্য কায়কা'উসের বাহিনীর উপর আকাশ হইতে রাত্রিতে পাথর নিক্ষেপ করে এবং বাদশাহকে বন্দী করে। বন্দী বাদশাহকে উদ্ধার করার জন্য 'যাল'-এর পুত্র রুস্তাম (দ্র.) রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাঁহাকে সাত সাতটি যুদ্ধ (হাফ্‌ত খান) জয় করিতে হয়। ফারসী কাব্যে তাঁহার এই অভিযানগুলি বিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঘুমন্ত অবস্থায় শুভ্র দৈত্যকে হত্যা করা হয় এবং তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত ব্যবহারে বাদশাহ ও তাঁহার বাহিনী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায়। এই বাদশাহকে একটি যুদ্ধ করিতে ইরানের দক্ষিণে অবস্থিত হামা ওয়ারান যাইতে হয়। সম্ভবত স্থানটি ছিল য়ামান (حمير)। কেননা এখানে উপনীত হইবার জন্য বাদশাহ মাকরান হইতে সমুদ্র পথে জাহাজ যোগে রওয়ানা হইয়াছিলেন। খামখেয়ালীর বশে তিনি কোহ্-ই কাফ (দ্র.)-এ উপনীত হইলেন। এই পাহাড় সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইহা সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তিনি হামাওয়ারান শাহ্‌যাদী সূদাবা (سودابه) (আছ-ছা'আলিবী, সুদানা = سوداند আরবীতে সু'দা বিনৃত যু'ল-আয'আর)-কে বিবাহ করেন। একবার তিনি যখন তাঁহার শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন তখন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া সমুদ্র সৈকতে এক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাঁহাকে উদ্ধার করার জন্য এখানেও রুস্তামই আগমন করেন।

কায়কা'উস দেও-দানবের রাজা ছিলেন। তিনি উহাদের শক্তির ব্যবহার করিয়া আল-বুরূজ (البرج) পর্বতে দুর্গ নির্মাণ করান (আছ-ছা'আলাবী, ১৬৫; মীনার-ই-বাবিল; ও হাম্‌যাতু'ল ইস্‌ফাহানী, Gottwaldt সং., পৃ. ৩৫, মুজ্‌মালু'ত-তাওয়ারীখ, Journ. Asiatic, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১১, ১৮৪১ খৃ., ৩২৫)। বাধ্যতামূলক এই পরিশ্রমের প্রতিশোধ গ্রহণের ফন্দি হিসাবে দানবদের একজন বাদশাহকে বলিল যে, আকাশে আরোহণ সম্ভব। সুতরাং বাদশাহ এই উদ্দেশ্যে চারিটি শক্তিশালী শকুনকে তাঁহার আসনের চারি কোণে বাঁধিয়া আকাশে উড়িতে শুরু করেন। উড়িতে উড়িতে পরিশ্রান্ত হইয়া শকুনিগুলি নিম্ন দিকে নামিতে থাকে এবং আমুল (দ্র.)-এর নিকটবর্তী এক জঙ্গলের মধ্যে বাদশাহকে ভূতলে নিক্ষেপ করে। অনুসন্ধানরত আমীরগণ তথা হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

কায়কা'উসের এক পুত্র সিয়াওয়াখ্‌শ (সিয়াওশ, ছিয়াওয়ার শানা)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার বিমাতা সূদাবা এই মর্মে অভিযোগ করে যে, সে (সিয়াওয়াখ্‌শ) তাহার সতীত্ব হরণের চেষ্টা চালাইয়াছে। অথচ তিনি বিমাতার অবৈধ অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ অর্থাৎ দুই পার্শ্বে প্রজ্বলিত দুই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যবর্তী একটি সংকীর্ণ পথে অক্ষতাবস্থায় বাহির হইয়া তাঁহার নির্দোষিতা প্রমাণ করেন। অতঃপর যুবক শাহ্‌যাদা তুরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং বাল্‌খ (দ্র.)-এর নিকটবর্তী স্থানে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সিয়াওয়াখ্‌শ-এর মৃত্যু সংবাদ (যিনি আফ্‌রাসিয়াব-এর জামাতা হইয়াছিলেন) শুনিয়া রুস্তাম ইরান আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দুর্ধর্ষ বীর বাদশাহের চোখের সামনে রাণীকে হত্যা করেন এবং তারপর নিজ দেশের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণমানসে তূরান আক্রমণে অগ্রসর হন।

কায়কা'উস এক শত পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। জীবনের শেষ বৎসর তিনি নির্জন সাধনায় অতিবাহিত করেন এবং তাঁহার সিংহাসন স্বীয় পৌত্র কায়্‌খুসরাও (দ্র.)-কে অর্পণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিরদাওসী, শাহনামা Vullers সং, ১খ., ৩১৫; ২খ, ৭৬৪, প্রকাশনা ও অনুবাদ Mohl, ১খ, ৪৮৬ প., ২খ., ১-৫৫৭; (২) আত-তাবারী, তা'রীখ, ১খ, ৫৯৭ প.; (৩) আছ-ছা'আলাবী, গুরার ওয়া আখ্‌বারু মুলূকি'ল-ফুরূস, প্রকাশনা ও অনুবাদ Zotenberg, ১৫৩-২৩৪; (৪) Fr. Spiegel, Eranische Alterthumskunde, ১খ, ৫৮৪ প.; (৫) ঐ লেখক, Awesta und Shahname in Zeitsehr. d. Deutsch. Morg. Gesellsch, ৪৫ (১৮৯১

খৃ.), ১৯৫; (৬) Dubeux La perse (প্যারিস ১৮৪১ খৃ., ২৩৩ প.; (৭) J. Darmesteter, Etudes iraniennes (প্যারিস ১৮৮৩ খৃ.), ২খ, ২১১ প.; (৮) Grundr. d. iran. Philologie, ২খ., নির্ঘন্ট, দ্র. 'Kaui; (৯) Th. Noldeke, Das iramische Nationaelepos, দ্বিতীয় সং. (বার্লিন, লাইপযিগ, ১৯২০ খৃ.), ১খ, ৪৮, ৫২, ৫৫, ৬০।

Cl. Huart (E.I.[2])/ এ. কে. এম. নুরুল আলম

কায়কা'উস (کیکاوس) ঃ ইবন সিকান্দার ইবন কাবূস ইবন ওয়াশ্‌মগীর। উপাধি 'উনসুরু'ল-মা'আলী, জুরজান ও তাবারিস্তান-এর শাসনকর্তা। যিয়ার (দ্র. ইরানের সাসানী রাজবংশের একটি শাখা) বংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। পরাক্রমশালী দুই সাল্‌জূকী সুলতান তুগরিল বেগ ও আল্‌প আরসালান-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে ৪৪১-৪৬২ হি. (১০৪৯-১০৬৯ খৃ.) সন পর্যন্ত করদ প্রশাসক ছিলেন।

স্বরচিত কাবূসনামা (قابوس نامه) গ্রন্থ তাঁহাকে বিপুল সুখ্যাতির অধিকারী করে। উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে তিনি ঐ সময় তাঁহার বয়স তেষট্টি বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বীয় বর্ণনামতে তিনি ৪৭৫/১০৮২-৩ সনে উক্ত গ্রন্থের রচনাকার্য আরম্ভ করেন। সুতরাং বলা যায় তিনি ৪১০/১০১৯-২০ সনের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসনারোহণ কালে কায়কা'উসের বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর। মৃত্যুর বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই তিনি সম্ভবত সিংহাসন ত্যাগ করেন। কি কি কারণে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন তাহা অবশ্য জানা যায় না। যাহা হউক কায়কা'উস একদিকে যেমন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান শাসনকর্তা ছিলেন অন্যদিকে তেমনই তাঁহার চরিত্র ও স্বভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর ও রুক্ষ। তাঁহার রচনায় উহার প্রকাশ সুস্পষ্ট।

বাদশাহদের উদ্দেশে উপদেশবাণী হিসাবে রচিত যে সমস্ত ফারসী গ্রন্থ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে সেইগুলির মধ্যে কাবূসনামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কায়কা'উস উক্ত গ্রন্থ স্বীয় পুত্র গীলান শাহ-র জন্য রচনা করেন এবং স্বীয় পিতামহ কাবূস ইবন ওয়াশ্‌মগীর-এর নামানুসারে উহার নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁহার পিতামহ কাবূস, সুযোগ্য শাসনকর্তা ও গ্রন্থকার হিসাবে সমভাবে বিখ্যাত ছিলেন। কাবূসনামা রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল সম্পর্কিত নীতিমালার একটি সংক্ষিপ্তসার। উহাতে চুয়াল্লিশটি অধ্যায় রহিয়াছে। নীতিদর্শন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ জুড়িয়া আছে। এইগুলিতে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কিত আলোচনাও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজনীতি সম্পর্কে উহার শুধু শেষ কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

E. G. Browne রচিত A Literary History of Persia (১৯০০ খৃ. প্রকাশিত)-এর ২খ, ২৭৬-২৮৭-এর কাবূসনামা গ্রন্থের একটা সাধারণ বিবরণী পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণে জানা যায়, গ্রন্থকার বক্তব্য বিষয়সমূহের বিন্যাসে নিঃসন্দেহে আংশিকভাবে গ্রীক নীতিদর্শনকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং অনুরূপ মূল চিন্তাধারাসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এই কথাও সত্য যে, গ্রন্থবিন্যাস এবং উহাতে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ও উদাহরণসমূহের প্রায় সমুদয়ই মূলত ইরানী।

কাবূসনামা গ্রন্থের কোনও সমীক্ষিত ও সন্দেহাতীত পাঠ পাওয়া যায় না। ১২৭৫ ও ১২৮৫ হি. সনে তেহরান হইতে উহার যে দুইটি সংস্করণ লিথো প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থের হস্তলিখিত অনুলিপির সহিত তুলনা না করিয়া উহাদের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। তুর্কী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের তিনটি অনুবাদ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে দুইটি অনুবাদ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে, উহারা মূল গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ নহে। কারণ উহাদের মধ্যে কতগুলি পরিবর্তন ও প্রক্ষেপণ অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। উক্ত অনুবাদত্রয়ের প্রথম অনুবাদটি কবে কোন্ সনে হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এখন সম্ভব নহে। দ্বিতীয় অনুবাদটি ৮৩৫/১৪৩২ সনে সুলতান ২য় মুরাদ-এর জন্য মারজুমাক আহমাদ ইবন ইলয়াস কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ১৮৫৩ খৃ. Wickerhauser, "Wegweiser Zum Verstandniss der turkischen Sprache" শিরোনামে উহার পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়— যাহাতে কবিতা ও কাব্য রচনা শিল্প আলোচিত হইয়াছে— প্রকাশ করেন (পৃ. ২৬২-২৬৫ দ্র.)। তিনি তাঁহার গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ের অনুবাদও প্রকাশ করেন (পৃ. ২৮৭-২৯০ দ্র.)। গ্রন্থের তৃতীয় অনুবাদটি ১১১৭/১৭০৫-৬ সনে নাজমী যাদা মুরতাদা বাগদাদের তৎকালীন শাসনকর্তা হাসান পাশার জন্য সম্পন্ন করেন। H. F. V. Diez গ্রন্থটির তিনটি হস্তলিপির সাহায্যে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুর্কী অনুবাদ হইতে উহার জার্মান অনুবাদ প্রস্তুত করেন (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। ১৯০৬ খৃ. বোম্বাই হইতে মূল ফারসী কাবূসনামার প্রথম বাইশটি অধ্যায়ের একটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংস্করণটি ১২৮৫ হি. সনে তেহরান হইতে প্রকাশিত সংস্করণের উপর সম্পূর্ণরূপে ভিত্তি করিয়া প্রকাশিত (কাবূসনামা, 'উনসুরু'ল-মা'আলী রচিত; মুনশী খালীলু'র-রাহমান কর্তৃক সংযোজিত বিশদ টীকা ও শব্দার্থসহ দ্র.)। এতদ্ব্যতীত ১৮৮২ খৃ. Querry নামক ফরাসী পণ্ডিত মূল ফারসী সংস্করণ হইতে ফরাসী ভাষায় উহার একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) v. Zambaur, Manuel de Genealogie, পৃ. ২০১ মূল উৎসসহ (পৃ. ১২১); (২) অত্র নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ; (৩) Geiger Kuhn, G. I. Ph., ২খ, পৃ. ৩৪৭-৩৪৯; (৪) Heinr Friedr v. Diez, Buch des Kabus, Berlin 1811 A. D.; (৫) Plessner, Der des Neupythagorers, Bryson, 1928 A. D., P. 55-58, 260-262 (Criticism on the text)।

M. Plessner (দা. মা. ই.)/ মু. মাজহারুল হক

কায়কুবাদ (کیقباد-کیقوباد) ঃ রূম-এর তিনজন সালজূক সুলতানের নাম। 'আলা'উ'দ-দীন প্রথম কায়কুবাদ ছিলেন রূম-এর সালজূক সুলতানদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তী অনেক সার্বভৌম শাসক নিজদিগকে তাঁহার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার ভ্রাতা ও পূর্বসূরি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পুনরায় তিনি তাঁহার উত্তরসূরি হিসাবে ৬১৮/১২২০-এ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার বৈদেশিক নীতি তাঁহার রাজবংশকে ঐ সময়ের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি দক্ষিণ দিকে সিলিসীয় তাউরূস (Cilician Taurus)-এর এক বৃহৎ অংশ পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া সেখানে তুর্কী বসতি স্থাপন করেন। তিনি বিশেষত কালন ওরস (Kalon-Oros) বিজয় করিয়া তাঁহার সমুদ্রসীমা আরও সম্প্রসারিত করেন। Kalon Oros-কে 'আলায়া (علايا) এই নূতন নামকরণ করিয়া তিনি ইহাকে তাঁহার শীতকালীন বাসস্থান এবং ইহা তাঁহার ধন-

সম্পদের নিরাপদ ভাণ্ডারে পরিণত করেন। কৃষ্ণ সাগরে তিনি Trebizond-এর আধিপত্য অস্বীকার করেন এবং কাসতামোন-এর আমীর চুপান-এর অধিনায়কত্বে এক স্মরণীয় নৌ-অভিযান সুগদাক-এর ক্রিমীয় পোতাশ্রয়ে সালজূকী আধিপত্য নিশ্চিত করেন। আয়্যূবীগণের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাদের মধ্যকার আল-আশরাফ নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় পূর্ব দিকে মধ্য-ইউফ্রেতিস-এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আরতুকিদ অধিকৃত স্থানসমূহ দখল করেন। ইরযিনজান-এর মানগুজাকী দাঊদ শাহ শক্তি বৃদ্ধির অনুরোধ জানাইলে তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দাঊদ শাহ-এর এলাকাসমূহ দখল করেন এবং এই এলাকা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়খুসরাও (দ্র.)-এর অধীনে আনয়ন করেন। খাওয়ারীযমীয় আক্রমণ সংঘটিত না হইলে অধিকার লাভের অব্যবহিত পরেই ইরযরূম-এর সালজূকী স্থানসমূহের একই পরিণতি ঘটিত।

খাওয়ারাযমীগণ তাঁহাদের শাসক জালালু'দ-দীন মানগুবিরতি-র জন্য ইরান ও জর্জিয়া-তে একটি অখ্যাত সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিল (দ্র. জালালু'দ-দীন খাওয়ারিযম শাহ)। কিন্তু মোঙ্গলদের চাপের মুখে তাহারা আরও পশ্চিম দিকে একটি আশ্রয়ের সন্ধানে ছিল।

আল-আশরাফের নিকট হইতে তাঁহারা সবেমাত্র এশিয়া মাইনরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল আখলাত দখল করিয়া লইয়াছিল। এই সময় তাহারা সমগ্র অঞ্চল আক্রমণ করিতে উদ্যত ছিল। কায়কুবাদ তাঁহার প্রতিপক্ষকে দুর্বল হইতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার পূর্বতন শত্রু ও মিত্রদের আহবান জানাইলেন। বিভিন্ন সিরীয় সেনাদল সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ লইয়া আল-আশরাফ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইরযিনজান-এর পশ্চিমে য়্যাসি-চুমেন (yasi-cumen) নামক স্থানে খাওয়ারিযমীদের পর্যুদস্ত করা হয়। ইরযরূম-এর অঞ্চলসমূহ জাহান শাহ-এর হস্তচ্যুত হয়। জাহান শাহ জালালু'দ-দীন-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। জর্জিয়ান এলাকার ভিতর দিয়া মোঙ্গল আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছে— এই অজুহাতে কায়কুবাদ তাঁহাদের নিকট হইতে কতিপয় সীমান্ত দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (ইহার পর শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জর্জিয়ান উত্তরাধিকারিণীর সহিত কায়কুবাদ-এর বিবাহ সাধিত হয়, দ্র. কায়খুসরাও) এবং তিনি বিধ্বস্ত আখরাত দখল করেন। আখলাত-এর কর্তৃত্ব সম্পর্কে আল-আশরাফ আগ্রহ হারান। তুর্কী ভূখণ্ড এই সময় পশ্চিমদিকে ১১শ শতাব্দীর বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। অপরদিকে জালালু'দ-দীন-এর মৃত্যু এবং মোঙ্গলদের আক্রমণের মুখে তাঁহার সেনাদলের পলায়নের পর কায়কুবাদ মনে করেন যে, তিনি তাঁহার বর্ধিত ভূখণ্ডে খাওয়ারিযমীয় বসতি স্থাপন করিয়া ঐ অঞ্চলে একটি কার্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু আয়্যূবীগণ খাওয়ারিযমীদের পরাজয়ের সুযোগে মেসোপটেমিয়া-র উচ্চভূমিসমূহে তাঁহাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই সময় হইতে কোনও মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র না থাকাতে দুই উচ্চাভিলাষী শক্তি পরস্পরের মুখামুখি হয়। আয়্যূবী শাসক আল-কামিলকে সিরীয়গণ এই ধারণা দিয়াছিল যে, তিনি সহজেই বিজয় লাভ করিতে পারিবেন। সেইজন্য তিনি এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হন (৬৩১/১২৩৩)। কারণ সেনাবাহিনীর যে অংশটি এই অভিযানের বিরোধিতা করিয়াছিল তাঁহারা তাউরুস-এর পার্বত্য পথে তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে। কায়কুবাদ তখন তাইগ্রীস উচ্চভূমি অঞ্চলে প্রবেশের পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য যে, মোঙ্গলদের মুহুর্মুহুঃ আক্রমণের পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন (৬৩৪/১২৩৭)। তবে এই সমস্ত আক্রমণের তেমন কোন ফল হয় নাই। তাঁহার উত্তরসূরি যে সমস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা কায়কুবাদকে উত্তরপুরুষদের কাছে ঐ রাজবংশের সর্বশেষ প্রকৃত মহান সার্বভৌম শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। বাস্তবে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক।

তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে অদম্য ইচ্ছা দ্বারা ঐ সময়ের সমস্ত আমীরকে আনুগত্যাধীন রাখা অবশ্যই তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বহু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য তাঁহার শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নির্মাণ কার্যসমূহের মধ্যে রহিয়াছে দুর্গ প্রাচীর, মরু যাত্রীদলের অবস্থানের নিমিত্ত সরাইখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা। খননকার্যের ফলে ক্রমশ তাঁহার কুবাদাবাদ ও কায়কুবাদিয়া প্রাসাদসমূহের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় (দ্র. কায়কুবাদিয়া)। সুলতান নিজে নানা গুণে বিভূষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত দৈহিক ও মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কায়কা'উস প্রবন্ধ; (২) H. Gottschalk, আল-মালিকু'ল-কামিল, Wiesbaden ১৯৫০ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Der Bericht des Ibn Nazif Uber die Schlacht von Yasicimen, WZKM সাময়িকীতে, ৫খ, (১৯৬০ খৃ.), ৫৫-৬৭।

দ্বিতীয় কায়কুবাদ ছিলেন প্রথম কায়খুসরাও-এর পুত্রদের একজন (দ্র. ২য় কায়কা'উস)।

তৃতীয় কায়কুবাদ 'ইয্যু'দ-দীন ছিলেন ২য় কায়কা'উস-এর একজন পুত্র, যিনি ১২৮২ খৃ. ক্রিমিয়া হইতে এশিয়া মাইনরে তাঁহার পিতার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাঁহাকে সিলিসিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আবারও তিনি ১২৯৭ খৃ. আবির্ভূত হন এবং ২য় খান গাযান-এর সমর্থনে রূম-এর নামমাত্র সালতানাত অধিকার করেন। অবশেষে ৭০২/১৩০৩ সালে মোঙ্গল শাসক তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. কায়কা'উস।

কায়কুবাদ (کیقباد) ঃ মু'ইয্যু'দ-দীন দিল্লীর সুলতান (৬৮৬-৯/১২৮৭-৯০) ছিলেন। তিনি ছিলেন গিয়াছু'দ-দীন বলবান (দ্র.)-এর পৌত্র এবং তাঁহারই উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার পিতা বুগরা খান ছিলেন বলবান-এর কনিষ্ঠ পুত্র, যিনি পিতার মৃত্যুকালে বাংলায় উপস্থিত ছিলেন। কায়কুবাদ-এর মাতামহ ছিলেন সুলতান নাসিরু'দ-দীন মাহমূদ (৬৪৪-৬৫/১২৪৬-৬৭)। বলবান-এর তত্ত্বাবধানে কায়কুবাদকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে শিক্ষা দান করা হয়। কিন্তু ১৭ অথবা ১৮ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি এক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ন্যায় জীবন যাপন শুরু করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি দিল্লীর কোতওয়াল-এর ভাগিনা ও জামাতা আমীর-ই দাদ, মালিক নিজামু'দ-দীন-এর প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন।

৬৮৭/১২৮৮ সালে কায়কুবাদ তাঁহার পিতা নাসিরু'দ-দীন বুগরার মুকাবিলা করিবার জন্য দিল্লী হইতে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার পিতা বাংলায় নিজেকে সার্বভৌম শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন। গাগরা-র

তীরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠকটি সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়; আমীর খুসরাও দিহলাবীর মাছনাবী কিরানু'স-সা'দায়ন গ্রন্থ এই বৈঠককে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছে। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক বারানী এক সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। এই উপদেশসমূহ যুবক সুলতান-এর নৈতিকতার কোনও স্থায়ী উন্নতি বিধান করিতে না পারিলেও ইহা তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রী নিজামু'দ-দীনকে বিষ প্রয়োগে অপসারিত করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার দিল্লী প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর ইহা সংঘটিত হয়।

শাসনকার্যে সুলতানের অনীহার ফলে দরবারে আমীর ও মালিকদের মধ্যে গোত্রগত ভেদাভেদের ভিত্তিতে কলহের সূত্রপাত হয়। সম্ভবত তাঁহার শাসনের প্রথম দিকে একটি মোঙ্গল আক্রমণকালে নও-মুসলিম (ধর্মান্তরিত মোঙ্গল) আমীরদের বেপরোয়াভাবে হত্যা করা হয়। নিজামু'দ-দীন-এর মৃত্যুর পর পুরানো প্রতিষ্ঠিত তুর্কী মালিকগণ ও 'আরিদু'ল-মামালিক জালালু'দীন ফীরূয (সুলতান ৬৮৯-৯৫/১২৯০-৬)-এর নেতৃত্বাধীন খালজী উপদলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। মনে করা হয় যে, মাত্রাতিরিক্ততার কারণে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তুর্কী মালিকগণ তাঁহার নাবালক পুত্র শামসু'দ-দীন কায়ুমারছ-কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু জালালু'দ-দীন ফীরূয খালজী তরুণ সুলতান ও রাজধানীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পকাল পরেই তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা। ইতোমধ্যে তিন দিনের অনাহারক্লিষ্ট কায়কুবাদ এমন একজন তুর্কী মালিক-এর পুত্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন, যাঁহাকে কায়কুবাদ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মোটা আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া প্রহার করিবার পর যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমীর খুসরাও, কিরানু'স-সা'দায়ন, আলীগড় ১৯১৮ খৃ.; (২) বারানী, তা'রীখ-ই ফীরূয শাহী, ১৮৬২ খৃ., ১২৬-৮৩; (৩) 'ইসামী, ফুতূহু'স-সালাতীন, মাদ্রাজ ১৯৪৮ খৃ., ১৮৪-২০৮; (৪) সারহিন্দী, তা'রীখ-ই মুবারাক শাহী, ৫২-৯; (৫) বাদায়ূনী, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ১খ, ১৫৭-৬৬; (৬) ফিরিশতা, তা'রীখ, বোম্বে ১৮৩২ খৃ., ১৪৬-৫২। ইংরেজীতে অপ্রধান গ্রন্থসমূহ ঃ (১) Sir T. Wolseley Haig, in The Cambridge history of India, ৩খ, ৮২-৭ এবং E.I.[1]-এ (দ্র.); (২) কে. এ. নিযামি, এম. হাবিব ও কে. এ. নিযামির সংস্করণসমূহে, A Comprehensive history of India, দিল্লী ১৯৭০ খৃ., ৫খ, ৩০৩-১০; (৩) এম. ওয়াহিদ মির্যা, The life and works of Amir Khusrau, পুনর্মুদ্রণ, লাহোর ১৯৬২ খৃ., ৬৫-৭৭, ১৭৪-৬; (৪) কায়কুবাদ-এর মৃত্যুর ধরন সম্পর্কে দেখুন S. H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim history, ১খ, কলিকাতা ১৯৩৯ খৃ., ২৬৩-৪।

S. Digby (E.I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ

কায়কুবাদ (کیقباد) ঃ ইরানের জনৈক উপকথার বাদশাহ, যিনি কায়ান বংশীয় ছিলেন। আবেস্‌তা-য় তাঁহার নাম কাবী কাওয়াতাহ (Kavi kawata) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে অন্য কোনও বিষয়ের উল্লেখ নাই। বর্ণনাসমূহের মধ্য হইতে তাঁহার সম্পর্কে কেবল এই ঘটনা বিদ্যমান আছে যে, তিনি য়াযাতাস (Yazatas)-এর বড়ই কৃতজ্ঞ ছিলেন যেহেতু তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে বিরাট রূপ দান করিয়াছিলেন এবং ইরানের শাসন-ক্ষমতায় পুনরায় উহার যথার্থ বংশীয় রাজাদের অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "শাহ্‌নামা-ই ফিরদাওসী"-এ একমাত্র উৎস যাহার সাহায্য এই বিষয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইরানী ভূখণ্ডকে আফরাসিয়াব তুরানীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রুস্তামের পিতা যাল পাহ্‌লাওয়ান পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা এবং মুবায (জরথুস্ত্রীয়দের পুরোহিত)-এর পরামর্শের পর কায়কুবাদ-এর পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন, যিনি সেই সময়ে আল-বারাহ আল-বিরিয (Hareberezaiti) পর্বতমালায় অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং যাল তদীয় পুত্রকে তাঁহার সন্ধানে আল-বিরিয প্রেরণ করেন। সেইখানে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন যে, কায়কুবাদ তাঁহার সহাস্য বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এক ভোজসভায় বসিয়া আছেন। তিনি যথারীতি সম্মানে প্রদর্শন করিলেন। নব্য বাদশাহ ইতোপূর্বেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, দুইটি শুভ্র বাজপাখী তাঁহার মাথার উপর একটি স্বর্ণের পাগড়ী রাখিয়া দিয়াছে। এইভাবে তিনি যেন দূতের আগমন সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি মানুষের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য দূতকে আবারও তাঁহার দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইরানী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইবার পর রুস্তাম আফরাসিয়াবকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। আফরাসিয়াব অবশ্য বন্দী হইতেন। কিন্তু তাঁহার কোমরের বেল্ট যাহা ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনা হইতেছিল হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায় এবং তিনি পলায়ন করেন। এই বিজয়ের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, উভয় দেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং এই সুবাদে ইরান পুনরায় তাহার প্রাচীন সীমানা জায়হুন নদী (আমু দরিয়া) পর্যন্ত গোটা ভূখণ্ড লাভ করে। কায়কুবাদ তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা, উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিভ্রমণ, নূতন শহর নির্মাণ এবং সেই সকল বীরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কাজে ব্যয় করেন যাঁহারা পুনরায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল বীরদের মধ্যে রুস্তাম, কারিন প্রমুখ ছিলেন প্রসিদ্ধ। এক শত বৎসর কাল রাজ্য শাসনের পর তিনি ইনতিকাল করেন।

মুজমালু'ত-তাওয়ারীখ (Journ. Asiatic), তৃতীয় সিরিজ, ১১খ. (১৮৪১ খৃ.), ৩২১-এ লিখিত আছে যে, কায়কুবাদ আল-বিরিয হইতে নহে, বরং হামায়ান-এর আল-ওয়ান্দ পর্বত হইতে আগমন করিয়াছিলেন এবং হাম্‌যা ইসফাহানী (Gottwaldt সং, পৃ. ৩৫) কেবল তাঁহার শহর নির্মাণ, বিশেষ করিয়া জায়হুন নদীর তীরে বসতি স্থাপন এবং ইসফাহান শহর সম্প্রসারণের উল্লেখ করিয়াছেন। বুন্‌দিহিশ (Bundihish)-এ তাঁহার রাজ্য শাসন কাল এবং শত বৎসরের স্থলে পনের বৎসর লিখিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিরদাওসী, শাহনামাহ, সম্পা. Vullers, ১খ, ২৯০-৩১৫, সম্পা. ও অনু. Mohl, ১খ, ৪৫২-৪৮৪; (২) আছ-ছা'আলাবী, গুরার ওয়া আখ্‌বার মুলূকি'ল-ফুরূস, সম্পা. ও অনু. Zotenberg, পৃ. ১৩৭-১৪০, ১৪৪-১৫৪; (৩) আত-তাবারী, লাইডেন সং., ১খ, ৫৩৩ প.; (৪) Fr. Spiegel, Eranische Alterthumuskunde, ১খ, ৫৮১ প.; (৫) ঐ লেখক, Avesta und Shahname, Zeitschr, d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch-এ ৪৫খ. (১৮৯১ খৃ.), ১৯৫; (৬) Dubeux, La Perse (প্যারিস ১৮৪১ খৃ.), পৃ. ২৩৩; (৭) Gunder d iran, Philol, ২খ, ৯৫, ১৩৪, ১৬৯, ১৭৪, ৩৪৬, ৪১০; (৮) Noldeke, Das iran Nationalepos, দ্বিতীয় সং. (বার্লিন-লাইপযিগ ১৯২০

খৃ.), পৃ. ৫, ৫০, ৫৫।

Cl. Huart (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

কায়কুবাদিয়া (کیقبادية) ঃ রূম সালজূক শাসক ১ম 'আলা'উ'দ-দীন কায়কুবাদ (৬১৬-৩৪/১২১৯-৩৭) কর্তৃক ১২২৪-২৬ খৃ. কায়সেরী-র আনু. ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নির্মিত একটি প্রাসাদের নাম। স্থানটিকে বর্তমানে কিয়বাদ চিফ্‌তলিগি বলা হয়। ইহা কিয়বাদ দাগ-এর পাদমূলে অবস্থিত। পার্শ্বেই অবস্থিত মাশহাদ (মাশহাদিয়্যা)-এর সমতল ভূমি, যেখানে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হইত। Kayseri-Bogaz Kopvu নামক যে রাস্তার উপর এই প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল তাহা প্রাক-রোমান যুগ হইতে 'উছমানী আধিপত্যকাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। কোনয়ার উত্তর-পূর্ব রূম সালজূক ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কায়কুবাদিয়া ১ম 'আলা'উ'দ-দীন কায়কুবাদ-এর অন্যতম প্রিয় আবাস ছিল। তিনি প্রায়ই তথায় অবস্থান করিতেন। কায়কুবাদিয়াতে তিনি ৬২৫/১২২৮-এ ইর্‌যিন্‌জান প্রধান মালিকু'দ-দীন দাউদ শাহ-এর আনুগত্য লাভ করেন এবং ৬৩৪/১২৩৭-এ তিনি এই প্রাসাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াছু'দ-দীন কায়খুসরাও কায়কুবাদিয়াতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই প্রাসাদটি রূম সালজূকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ১ম 'আলা'উ'দ-দীন কায়কুবাদ দ্বারা কোন্‌য়া আলানয়া ('আলা'ইয়া), কুবাদাবাদ, সিভাস ও ইরযিন্‌জান-এ নির্মিত বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতিস্তম্ভের অন্যতম নিদর্শন। ১৯৬৪ খৃ. নির্ধারিত স্থানে খনন কার্য শুরু করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. W. Duda, Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, Copenhagen 1959, 131, 145, 197-200; (২) G. Bartsch, Das Gebiet des Erciyes Dagi und die Stadt Kayseri in Mittel-Anatolien, Deutsche Forschungsreisen গ্রন্থে, সম্পা. H. Spreitser, হ্যানোভার ১৯৩৫ খৃ., ৮৭-২০২ (তালিকা ২৫, কায়সেরী এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহের মানচিত্র); (৩) M. Zeki Oral, Kayseri'de Kubadiye Saraylari in TTK Belleten, ১৭খ., (১৯৫৩ খৃ.), ৫০১-১৭; (৪) O. Aslanapa, Kayseride Keykubadiye Koskleri Kazisi (১৯৬৪ খৃ.), Turk Arkeoloji Dergisi গ্রন্থে, ১২খ (১৯৬৪ খৃ.), ১৯-২২; (৫) IA, দ্র. Keykubad I; (৬) EI[1], দ্র. ১ম কায়কুবাদ; (৭) C. E. Bosworth, The Islamic dynasties, ১২৯-৩১।

H. Busse (E.I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ

কায়কোবাদ, মহাকবি (کیقباد) ঃ কায়কুবাদ, (১৮৫৭-১৯৫১ খৃ.) জন্ম ঢাকা জিলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার অন্তর্গত নওয়াবগঞ্জ থানার আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল-কুরায়শী। কায়কোবাদ তাঁহার কলমী নাম এবং এই নামে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত।

কায়কোবাদের পিতার নাম হাশমত উল্লাহ আল-কুরায়শী ওরফে এমদাদ আলী। ফরিদপুর জিলার গোড়াইল তাঁহার নিজ গ্রাম। তিনি ঢাকায় ওকালতী করিতেন এবং এইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কবির মাতার নাম জরীফুন্নিসা খাতুন। কবি ছিলেন মাতাপিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন আবদুল খালেক ও আবদুল বারী। আবদুল খালেক সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আবদুল বারী ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের হাউজ সার্জন হইয়াছিলেন। গ্রামে পিতার নিকট থাকিয়াই তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। পরে তিনি ঢাকা পগোজ স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁহার এগারো-বারো বৎসর বয়সের সময় পিতা ও মাতা উভয়েই ইনতিকাল করিলে তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। তিনি আগলা গ্রামে মাতুলালয়ে চলিয়া যান।

এক বৎসরকাল সেইখানে অতিবাহিত করিবার পর তিনি পুনরায় ঢাকায় আসেন এবং পিতার হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায় সরকারী ঢাকা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। মাদ্‌রাসায় তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রাজেন্দ্র চন্দ দত্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন স্যার হাসান সুহরাওয়ার্দীর পিতা মওলবী উবায়দুল্লাহ আল-'উবায়দী সুহরাওয়াদী। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর পিতা জাস্টিস জাহিদ সুহরাওয়ার্দী এই মাদ্‌রাসায় কায়কোবাদের সহপাঠী ছিলেন। ঢাকা মাদ্‌রাসায় কায়কোবাদ এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছাত্র জীবনেই তাঁহার দুইটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। বই দুইটির নাম 'কুসুম কানন' ও 'বিরহ বিলাপ'।

মাদ্‌রাসায় শিক্ষা জীবন শেষ হইলে কায়কোবাদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। তিনি ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ খৃ. চাকুরী জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কায়কোবাদের জীবদ্দশায় তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যগুলি প্রকাশিত হয় ঃ

১। 'অশ্রুমালা', খণ্ড কবিতার বই, ১৩০২ বঙ্গাব্দ। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবি খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সেই যুগের স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন 'অশ্রুমালা' পাঠ করিয়া ২ এপ্রিল, ১৮৯৬ ইং তারিখে আলীপুর হইতে কায়কোবাদকে অভিনন্দন জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

২। 'মহাশ্মশান', মহাকাব্য, বাংলা ১৩১১। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে যে সমস্ত বীর ও বীরাঙ্গনা আত্মবিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহাদের বীরত্বগাথা ও কতিপয় নায়ক-নায়িকার কল্পিত প্রেম-কাহিনী এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। এই কাব্যেই তিনি বাংলার মুসলমানকে জাগরণীর প্রথম বাণী শুনাইয়াছিলেন। যেমন ঃ

"পড়ে নাকি মনে সেই অতীত গৌরব ?
সুদূর আরব ভূমে যেই বীর জাতি
মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড প্রায় প্রচণ্ড বিক্রমে
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে।
আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
বিসর্জিয়া আত্মপ্রাণ কেমন বিক্রমে
স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য 'আল্লা' 'আল্লা' রবে
আজিও ধ্বনিত সেই নীলনদ তীরে।"

'মহাশ্মশান' মহাকাব্য কায়কোবাদকে মহাকবির মর্যাদা দান করিয়াছে। ১৩১১ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। 'শিব মন্দির-কাব্য', ১৩২৮ বাং। ভাওয়ালের জনৈক মুসলমান জমিদার-সন্তানকে তদীয় হিন্দু নায়েব কূপে ফেলিয়া হত্যা করে এবং তাহার উপর 'শিব মন্দির' নির্মাণ করে। ইহাই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। জমিদারী আত্মসাৎ করার জন্যই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। 'অমিয় ধারা', খণ্ড কাব্য, ১৩২৯ সালের ১ ফাল্গুন। এই কাব্যের 'আজান' কবিতা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

৫। 'মহরম শরীফ' বা আত্মবিসর্জন কাব্য, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, ৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

৬। 'শ্মশান-ভস্ম'-কাব্যোপন্যাস, ১৩৪৫ বাং, ৩০ জ্যেষ্ঠ। কবির মৃত্যুর পরে 'প্রেম পারিজাত', 'প্রেমের ফুল' 'প্রেমের বাণী' ও 'মন্দাকিনী ধারা' প্রভৃতি কাব্য ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৫ খৃ. ২ সেপ্টেম্বর 'নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ' কায়কোবাদকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'মাইকেল দি সেকেণ্ড'-ও বলা হয়। তিনি বাংলাদেশে মুসলিম জাগরণের কবিদের অন্যতম। ১৯৫১ খৃ. ২১ জুলাই (৪ শ্রাবণ) মহাকবি কায়কোবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনতিকাল করেন। আজিমপুর পুরাতন গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের উপকরণের অধিকাংশ কবির নিকট হইতে (তাঁহার জীবদ্দশায়) সংগৃহীত। ইহা ছাড়া দ্র. (১) দেওয়ান আবদুল হামিদ, ছোটদের কবি কায়কোবাদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; (২) ঐ লেখক, কায়কোবাদ স্মরণিকা; Bureau of National Reconstruction, Dhaka।

দেওয়ান আবদুল হামিদ

কায়-খুস্রাও (کیخسرو) ঃ ইরানের কায়ানী (দ্র.) বংশের তৃতীয় পৌরাণিক শাসনকর্তা, যিনি আভেস্তায় বর্ণিত ধর্মীয় ঐতিহ্যমতে কাভি হাওসরোভাহ (Kavi Haosrovah)-এর সহিত সাদৃশ্য রাখেন (দ্র. A Christeusen, Les Kayanides, কোপেনহ্যাগেন ১৯৩১ খৃ., ৯০-২ ও নির্ঘণ্ট)। ধারণা করা হয় যে, তিনি ছিলেন সিয়াওউশ/সিয়াওয়াখ্শ (দ্র.)-এর পুত্র এবং তাঁহার মাতার দিক হইতে আফরাসিয়াব (দ্র.)-এর দৌহিত্র। প্রচলিত জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে (Christeusen, ১১৪-১৭) তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মহিমান্বিত উৎস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া বাযিয়ান-এর নিকটে কালূ-এর পার্বত্য মেষ–পালকগণের মধ্যে প্রতিপালিত হন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহার আভিজাত্যের চিহ্ন প্রকাশ পায় ঃ মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি তীর-ধনুক ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং দশ বৎসর বয়সে তিনি কোনও ব্যাঘ্র অথবা সিংহকে ভয় করিতেন না। কর্মকার কাবী (দ্র.)-এর বংশোদ্ভূত একজন ইরানী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি গূদারয স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তূরান-এর অন্তর্গত এলাকায় বাস করিতেছেন এবং তিনি তাঁহার নিজ পুত্র গীও (বীও)-কে তাঁহার সন্ধানে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার সন্ধান লাভ করেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে ইরানে ফিরাইয়া আনেন। এই উদ্ধারপর্ব বহু বিপদ-আপদ অতিক্রম করিয়া সমাধা করিতে হয়।

ইহার পর তাঁহাকে তাঁহার পিতৃব্য বুরযফাররাহ/ ফারীবুর্য-এর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরদাওসী প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী, আরদাবীল (দ্র.)-এর সন্নিকটে অবস্থিত বাহমানদিয দুর্গ অধিকার করিয়া তাঁহার পিতামহ কায়কা'উস (দ্র.)-এর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এই স্থানে অতঃপর তিনি আযুর গুশাস্প-এর পবিত্র অগ্নির সম্মানে একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন (হামযা আল-ইসফাহানীর মতে কায়খুস্রাও, কুশীদ নামক একটি অজগর হত্যা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে গুশাস্প-এর জন্য একটি অগ্নিমন্দির নির্মাণ করেন)।

সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণের মাধ্যমে তূরানীগণের দ্বারা সৃষ্ট প্রচণ্ড ধ্বংসকাণ্ড তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার প্রতিশোধমূলক এক যুদ্ধ ঘোষণার শপথ গ্রহণ করেন। অভিজাত বংশীয় সকলের সাহায্যে সংগঠিত হইয়া তিনি কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম অভিযানসমূহ গূদারয-এর অসম সাহসিকতা ও বীরত্ব সত্ত্বেও বুরযফাররাহ/ ফারীবুর্য-এর কাপুরুষতার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য ইহার পরের অভিযানসমূহ সফলতার স্বর্ণদ্বার উন্মোচনে সক্ষম হয়। কায়খুস্রাও চারিটি সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করেন এবং ইহার প্রধানটির নেতৃত্ব প্রদান করা হয় গুদারযকে। তিনি তূরানের উপর এক চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন এবং একই সঙ্গে অপরাপর বাহিনীসমূহ শত্রুকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। আফরাসিয়াব স্বয়ং পলায়নে বাধ্য হন, পথিমধ্যে তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং কায়খুস্রাও তাঁহাকে হত্যা করেন এবং ইহার মাধ্যমে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

আফরাসিয়াব-এর মৃত্যুর পর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুকালের মধ্যেই কায়খুস্রাও ক্ষমতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লুহরাস্ব-এর নিকট রাজমুকুট হস্তান্তর করেন। তিনি এক মহাযাত্রায় বহির্গত হন এবং একটি ঝর্ণায় গোসল করার পর রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হন। অপরদিকে তাঁহার সহযাত্রীরা এক তুষার ঝড়ের কবলে পড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ, ৬০৪ প.; (২) দীনাওয়ারী, তিওয়াল, ১৯-২৩; (৩) ছা'আলিবী, Hist. des. rois de Perse, সম্পা. ও অনু. Zotenberg, ২১৮-৪৩; (৪) হাম্যা আল-ইসফাহানী, ৩৬; (৫) মাস'উদী, মুরূজ, ২খ, ১২০-১, ৫৪৩-৪; (৬) মাকদিসী, আল-বাদ্' ওয়াত-তা'রীখ, ৩খ, ১৪৯; (৭) ফিরদাওসী শাহনামা, সম্পা. Vullers, ২খ, ৬৭০-৯, ৭০১-৩, ৭১০, ৩খ, ১৪৪২, সম্পা. ও অনু. Mohl., ২খ, ৪১৬-৩০, ৪৬২-৫, ৫৭৬, ৪খ, ২৭৩; (৮) ইবনু'ল-বাল্খী, ফারস্নামা, ৪৪ প.।

Cl. Huart (E.I.[1])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কায়খুস্রাও (کیخسرو) ঃ রূম (এশিয়া মাইনর)-এর তিনজন সালজূকী সুলতানের নাম ঃ কায়খুস্রাও ১ম গিয়াছু'দ-দীন, ২য় কিলিজ আরসালান (দ্র.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীবৃন্দের অন্যতম। আনু. ৫৮৩/১১৮৭ সালে, কিলিজ আরসলান যখন প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে, তাঁহার সমস্ত রাজ্য তাহার দশ পুত্র, এক ভ্রাতা এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে মনস্থ করেন, তখন গিয়াছু'দ-দীন কায়খুস্রাও তাঁহার অংশরূপে বায়যানটানি এলাকার সীমান্ত সংলগ্ন সোযোপলিস বা উলুবুরলু এলাকা প্রাপ্ত হন। সম্ভবত ইহার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন একজন বায়যানটাইন মাতার পুত্র। এইভাবে তিনি একদিকে গ্রীক খৃষ্টানগণের সহিত এবং অপর দিকে এই দিকে ক্রমাগত অগ্রসরমান তুর্কোমান সীমান্ত যোদ্ধা (উজ) দলসমূহের সহিত যোগাযোগ লাভ করেন। ভ্রাতাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসার সৃষ্টি হইলে এবং তাঁহাদের একজন কুতবু'দ-দীন তাঁহাদের বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিলে শেষোক্ত জন কায়খুস্রাও-এর প্রতি সাহায্যের আবেদন জানান। কায়খুস্রাও তাঁহাকে পুনরায় কোনিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কিলিজ আরস্লান-এর

মৃত্যুর পর (৫৮৮/১১৯২) কায়খুসরাও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার ভ্রাতাদের দ্বারা স্বীকার করাইতে অসমর্থ হন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যদের উত্তরাধিকারের অংশ নিজ অধিকারে আনিবার প্রচেষ্টা করে। ৫৯৩/১১৯৭ সালে কুতবু'দ-দীনের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী রুকনু'দ-দীন পুনরায় কোনিয়া অধিকার করেন এবং তাঁহার নিজের সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে তাঁহার পৈতৃক উত্তরাধিকারের অখণ্ডতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কায়খুসরাও, বায়যানটাইন সামন্ত অধিপতি Maurozomos-এর নিকটে তাঁহার পুরাতন মূল ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করেন। অবশ্য রুকনু'দ-দীন যখন তাঁহার নীতি আনাতোলিয়ার পূর্বাংশ অধিকারের লক্ষ্যে পরিচালিত করেন, তখন কতিপয় তুর্কোমান এই ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

রুকনু'দ-দীন-এর মৃত্যুর পর ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কায়খুসরাও এইবার নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে একত্রীভূত রূম রাজ্যের পুরাটাই পুনর্দখল করেন (৬০১/১২০৫)। রুকনু'দ-দীন কেবল একজন নাবালক পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে বায়যানটাইন সাম্রাজ্যকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে অগ্রসরকারী বিভিন্ন অন্তর্কলহ কায়খুসরাও স্থানীয়ভাবে এবং বিভিন্ন দিকে হস্তক্ষেপ করেন। ১২০৪ সালে ল্যাটিনগণ কনস্টানটিনোপল দখল করিয়া নেয় এবং Theodore Lascaris-এর নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরে একটি গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার রাজধানী ছিল নিসিয়া (Nicaea)। লাসকারিস-এর সহিত মরোযোমাস-এর তিক্ত সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। কায়খুসরাও মরোযোমাসকে প্রথমে তাঁহার সঙ্গী হিসাবে কোনিয়ায় আনয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার জন্য পরবর্তীতে তিনি খুনাস এবং লাওডিসিয়া (পরবর্তীকালে দেনিযলি) শহরদ্বয় সংগ্রহ করেন। এই শহরদ্বয় এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎস ছিল। মারোযোমাস সম্ভবত সেই ব্যক্তি, যাঁহাকে ইব্ন বীবী "Comnenos amir" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং যিনি পঁচিশ বৎসর যাবৎ সালজূকী রাষ্ট্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে লাসকারিস ও কায়খুস্রাও উভয়েরই অভিন্ন স্বার্থ ছিল। কিন্তু তাহার পূর্ববর্তিগণের বিপরীতে কায়খুসরাও-এর মনোযোগ পশ্চিম এশিয়া মাইনরে সম্প্রসারণের জন্য সালজূকী রাষ্ট্রের যে আগ্রহ থাকিবে তাহার প্রতি কিছুমাত্র কম আকৃষ্ট হন নাই। বায়যানটানি সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের বিনিময়ে তিনি তাঁহার রাজ্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। এই সময়ে নিসিয়া ও ত্রেবিযোন্দ অথবা আরমেরো সিলিমিয়ার মধ্যে বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের কোন প্রতিরক্ষক অবশিষ্ট ছিল না। কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত সামসুন, যাহা সম্প্রতি সাময়িকভাবে তুর্কোমানগণের অধিকারে, সেইখানে তিনি পুনরায় নিজ অবস্থান অর্জন করিতে না পারিলেও তিনি অপরদিকে আনাতোলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে আনতালিয়া অধিকারের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। সালজূকী রাষ্ট্রের ইতিহাসে ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রথম প্রকৃত সামুদ্রিক বহির্গমন পথ। অল্পকাল পরেই অবশ্য কায়খুস্রাও ও লাসকারিস-এর মধ্যকার সম্পর্কে পুনরায় ফাটল দেখা দেয়। শেষোক্ত জনের লাতীন অথবা গ্রীক শত্রুবৃন্দ এবং সেই সঙ্গে তুর্কোমান সীমান্ত যোদ্ধাদের বিশৃঙ্খলা নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় ছিল। ৬০৮/১২১১ সালে এই দুই শাসক Meander-এর অ্যান্টিয়ক-এর নিকটে এক যুদ্ধে পরস্পর শত্রুরূপে আবির্ভূত হন। কায়খুস্রাও বিজয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অতঃপর আর কখনো কোন ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই।

কায়খুস্রাও তাঁহার পিতার নিকট হইতে ইরানী পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত একটি নাম লাভ করেন। তিনি নিজেও তাঁহার দুই পুত্রের অনুরূপ নামকরণ করেন— কায়কা'উস ও কায়কুবাদ। তাঁহার আমলে পারস্য সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং ইরানের সালজূকীগণ ক্রমশ অদৃশ্য হইলে, তাঁহাদের আনাতোলীয় আত্মীয়বৃন্দ প্রাচীন ইরানী ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে কাজ করেন। ইহার ফলে পারস্য গ্রন্থকার রাওয়ান্দী ইরানী সালজূকীগণের ইতিহাস প্রণয়ন করিলে তিনি তাঁহার রচনা কায়খুস্রাও-এর প্রতি উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. কায়কা'উস।

কায়খুস্রাও ২য়, কায়কুবাদ [দ্র.]-এর পুত্র উত্তরাধিকারী (৬৩৪/১২৩৭ সালে)। তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল সমস্যা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ইহার বেশ কিছু সংখ্যকের মূলে ছিল তাঁহার পিতার শাসনামলের শক্তিমত্তা। তাঁহার শাসনামলে সংঘটিত মোঙ্গল আক্রমণসমূহের সহযোগে ইহারা যে প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহা হইতে সালজূকী রাষ্ট্রব্যবস্থা আর কখনো পরিত্রাণ লাভ করে নাই।

তিনি কায়কুবাদ-এর নির্ধারিত উত্তরাকিারী ছিলেন না, যিনি রাজনৈতিক কারণে তাঁহার আয়্যূবী গোত্রভুক্ত স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্রের একজনকে এই উদ্দেশ্যে মনোনীত করেন। কিন্তু কায়খুস্রাও-২ ছিলেন পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র তিনিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার এই "বলপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণ" ক্রমাগত বহু হত্যা ও মৃত্যুদণ্ডের সৃষ্টি করে সেইগুলি কায়কুবাদের অভিজাত সম্প্রদায় বিরোধী নীতিকে সুস্পষ্টতর করিয়া তোলে। কেবল তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এবং তাঁহাদের মাতাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হয় নাই, বরং বহু সংখ্যক আমীর ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদেরকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং এশিয়া মাইনরে বসতি স্থাপনকারী খাওয়ারাযমীগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এমনকি এই সকল কার্যে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা সা'দু'দ-দীন কোপেকও শেষ পর্যন্ত একই পথের অনুসারী হন। এই নীতিকে গ্রহণযোগ্য করাইতে হইলে সাথে সাথে সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাঁহার পিতার রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ের ন্যায় কায়খুস্রাও-২ সর্বোপরি তাঁহার আয়্যূবী প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে তাঁহার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হন এবং সেই সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গলগণের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণের চেষ্টা করেন।

দুইজন প্রভাবশালী আয়্যূবী আল-কামিল ও আল-আশরাফ-এর মৃত্যু তাঁহার আনুকূল্যে আসে। আল-কামিলের পুত্র আস-সালিহ-এর বহুসংখ্যক শত্রুর সহিত তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন, ইহারা আস-সালিহকে মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়াতে আক্রমণ করিলে কায়খুস্রাও-২ তাইগ্রীস নদীর অববাহিকার উচ্চাংশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থান আমিদ অধিকার করিতে সক্ষম হন (৬৩৯/১২৪১)। তিনি জনৈকা জর্জীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং সামরিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আলেপ্পো-র আয়্যূবীগণ, সিলিসিয়ার আরমেনীয়গণ, ত্রেবিযোন্দ-এর 'সাম্রাজ্য' এবং এমন কি কিছু মাত্রায় নিসিয়ার উপরও (কনস্ট্যান্টিনোপল-এর লাতীনগণের সহিত একটি বিবাহ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলাকালে) তাঁহার সার্বভৌমত্ব কায়েম করিতে সক্ষম হন। এই সময়ে রূম-এ অবস্থানকারী এবং তথায়

সুলতান কর্তৃক সাদরে গৃহীত জনৈক খৃষ্টধর্ম প্রচারক সেন্ট কুয়েনটিন-এর ফ্রায়ার সিমন তাঁহার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করিতে কখনো ক্লান্তিবোধ করেন নাই। তথাপি অভিজাত দলসমূহের অবশিষ্টাংশ, এমনকি তুর্কোমানগণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার চিহ্ন ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে। অতি প্রারম্ভিক পর্ব হইতেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মকর্তাগণ যাহারা ইতোমধ্যে শহরে ইসলামী মনোভাবাপন্ন ও অর্ধ-ইরানীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত অর্ধ-যাযাবর তুর্কোমান গোত্রসমূহের মনোভঙ্গির পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছিল। এই গোত্রসমূহ একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনসমূহের তুলনায় তাহাদের পূর্বপুরুষগণের ঐতিহ্যের প্রতি অনেক বেশী নিবিড় সম্পর্কের অধিকারী ছিল। মোঙ্গল ও খাওয়ারাযমীগণের বিতাড়নের ফলে তাহাদের সংখ্যা ও সমস্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহারা প্রচারের জন্য প্রস্তুত ছিল— এই প্রচার সাধারণত ধর্মীয় রূপে প্রকাশ পাইত; বাবা'ঈ [দ্র.] আন্দোলনের ন্যায় এই প্রকার কার্যাবলী শ্রেষ্ঠ সালজূকী সেনাবাহিনীসমূহকে তিন বৎসর যাবৎ মধ্য এশিয়া মাইনরে ব্যস্ত রাখে। শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া ফ্রাংক বাহিনী ব্যবহারের মাধ্যমে তাহাদের দমন করা হয়। তথাপি এই সকল সমস্যার মূল হেতুসমূহ বহাল থাকিয়া যায়। ইহার স্বল্পকাল পরেই রূমের সীমান্তে প্রথমবারের মতো একটি প্রকৃত মোঙ্গল সেনাবাহিনী আবির্ভূত হয়। ইহার অধিনায়ক ছিলেন বায়জূ।

১২৪৩-৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে পূর্ব পরিকল্পিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্রের সাহায্যে মোঙ্গলগণ আরদরূম অধিকার করে এবং বসন্তকালে তাহারা মূল এশিয়া মাইনরে তাহাদের বিজয় অভিযান শুরু করে। অত্যন্ত জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ২য় কায়খুস্রাও তাঁহার মুসলিম ও খৃষ্টান প্রতিবেশীদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানান। অভিন্ন বিপদের মুখে ইহারা তখন একজোট হইয়াছিলেন। কিছু সংখ্যকের অধৈর্য এবং অন্যদের ভীতির কারণে কায়খুস্রাও এই সকল সাহায্যকারী বাহিনীর সবগুলি একত্র হইবার পূর্বেই মোঙ্গলগণের মুখামুখি হইতে বাধ্য হন। ইতোমধ্যেই তাঁহার বাহিনী বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এরযিনজান ও সিভাস-এর মধ্যে অবস্থিত কোস দাগ-এ তিনি মোঙ্গলগণের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হন (৬ মুহার্রাম, ৬৪১/২৬ জুন, ১২৪৩)। কয়েক দিন পরে তাহারা সিভাস ও কায়সেরি অধিকার করে। সুলতান দ্রুততার সহিত তাঁহার ধন-দৌলত একত্র করিয়া তৎক্ষণাৎ পশ্চিম আনাতোলিয়ার আনতালিয়ায় পলায়ন করেন। তিনি বিশেষভাবে কিছুকালের জন্য ক্ষমতাহীন হইয়াও স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখেন। তাঁহার উযীর মুহাযযাবু'দ-দীন মোঙ্গলগণের সহিত একটি নিরাপত্তা বিধায়ক চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে অবশ্য অঙ্গীকারকৃত বিশাল অংকের উপঢৌকন এবং সার্বভৌম শাসকের মর্যাদা হানি সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধ্বংসের পথ সুগম করিয়া দেয়। সীমান্ত অঞ্চলে তুর্কোমান বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ইহা পরিণামের দিক হইতে অতি নগণ্য ছিল। কায়খুস্রাও-২ একজন আরমেনীয় বিদ্রোহীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া সিলিসিয়ার রাজা Hethum-এর উপর কিছুমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা হেথুম রূম-এর রাণী-মাতাকে মোঙ্গলগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১২৪৫-৬ খৃ. শীতকালে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁহার পুত্রগণ সকলেই নাবালক ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. কায়কা'উস।

কায়খুস্রাও-৩ এশিয়া মাইনরের উপর কার্যত নামেমাত্র রাজত্বকারী সুলতানগণের অন্যতম। বাস্তব অবস্থায় ইঁহারা মোঙ্গলগণ অথবা তাঁহাদের সহচরবর্গের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিলেন।

তাঁহার পিতা রুকনু'দ-দীন কিলিজ আরস্লান-এর হত্যাকাণ্ডের পর পারওয়ানা মু'ঈনু'দ-দীন সুলায়মান [দ্র.] কর্তৃক তিনি দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন (৬৬৩/১২৬৫)। সব সময়েই তিনি ছিলেন একজন পুতুল শাসকমাত্র, প্রথমে মু'ঈনু'দ-দীন ও পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে (১২৭৭ খৃ.) উযীর ফাখরু'দ-দীন 'আলীর হস্তে তিনি ক্রীড়নকরূপে কাজ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর তিনি নিজকে মোঙ্গল ঈলখান আবাকা-এর নিরাপদ আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতাদের একজন মাস'উদ ('ইযযু'দ-দীন কায়কা'উস-এর পুত্র) ক্রিমিয়া হইতে এশিয়া মাইনরে আগমন করিলে আবাকা তত্ত্বগতভাবে হইলেও কায়খুস্রাওকে কারামানীয় অঞ্চলসমূহের উপর সার্বভৌমত্ব প্রদান করেন। আবাকা-এর মৃত্যুর পর কায়খুস্রাও-৩ নিজেকে নূতন ঈল-খান আহমাদ-এর বিরুদ্ধে কানগিরতায়-এর বিদ্রোহের সহিত জড়িত করিয়া ফেলেন। আহমাদের নীতি ছিল তাঁহার পূর্বসূরির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মাস'উদকে সালতানাত প্রদান করেন এবং কায়খুস্রাওকে ফাঁসিতে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন (১২৮৪ খৃ.)। ভাগ্যাহত এই সুলতানের বিধবা পত্নী ও তাঁহার নাবালক পুত্র অবশ্য শীঘ্রই আহমাদ-এর উত্তরাধিকারী আরগুন-এর নিকট হইতে পূর্বতন সালতানাতের পশ্চিমার্ধ লাভ করেন। কিন্তু ইহার একমাত্র ফলাফল এই হয় যে, মাস'উদ এইবার তাঁহাদের হত্যা করিতে আদেশ দান করেন (১২৮৫ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. কায়কা'উস।

Cl. Cahen (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কায়গীলী, উছমান জামাল (كيغيلى عثمان جمال) ঃ আধুনিক তুর্কীতে 'উছমান চেমাল (জামাল) কায়গীলী, তুর্কী ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক এবং রসাত্মক প্রবন্ধকার (১৮৯০-১৯৪৫)। নগর প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত ইস্তাম্বুলের একটি উপকণ্ঠে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন স্থানীয় মুদী ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি তাঁহার মাতাপিতাকে হারান এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপনের পর তিনি সেনা দফতরের একজন কেরানীরূপে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়া জেনারেল স্টাফের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী করেন (১৯০৬-১০)। ১৯১৩ সালের জুন মাসে প্রধান উযীর মাহমূদ শাওকাত পাশার হত্যাকাণ্ডের পর বিরোধী দলীয় অপর বহুসংখ্যক 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহাকেও গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত সিনোপ দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হয়। এখানেই তিনি তাঁহার দীর্ঘ ছোট গল্প চুবলজী শায়খিনিন খালিফে রচনা করেন (পরবর্তীকালে আলোয় পত্রিকায় প্রকাশিত, ৫ ফেব্রু. ১৯২০)। তাঁহার সহনির্বাসিতগণের মধ্যে কয়েকজন বিশেষভাবে রাফীক খালিদ করাই (দ্র.), যিনি ইতোমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে একজন পেশাজীবী লেখকে পরিণত হইতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিনোপ হইতে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন সামরিক ইউনিটে সেনা কেরানীরূপে চাকুরী করিতে থাকেন। গুরুতরভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি ১৯১৭ সালে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯১৮ সালে ২৮ বৎসর

বয়সে দৈহিক অসামর্থ্যহেতু তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সাহিত্যকর্মে উৎসর্গ করেন। এই সময়ে তিনি ছোটখাটো কাজ ও পরবর্তী কালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে ইস্তাম্বুলে তাঁহার ইনতিকাল হয়।

'উছমান জামাল কায়গীলী তাঁহার লেখক জীবন শুরু করেন একজন রসাত্মক লেখকরূপে এবং ১৯২০ সাল হইতে পরবর্তী সময়ে তিনি বহু সংখ্যক দৈনিক পত্রিকা (উদাহরণস্বরূপ সাবাহ, ইকদাম, আকশাম, ওয়াকিত, আচীকসোয ইত্যাদি) এবং সাময়িকীসমূহে, বিশেষত আশায়, আয়দিদি, আকবাবা এবং তাঁহার নিজস্ব স্বল্পকাল স্থায়ী আয়ীনি (আয়না ১৯২১-২৩)-তে তাঁহার রচনা প্রকাশ করেন। কতিপয় ছোট গল্প ও উপন্যাস এবং তাঁহার আত্মজীবনীসহ এই সকল রচনাবলীর অধিকাংশই পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় নাই।

কায়গীলী সেই সকল তুর্কী লেখক ও ঔপন্যাসিকের দলভুক্ত ছিলেন যাঁহারা ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশকসমূহ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐতিহ্যবাহী তুর্কী লোককাহিনী ও জনপ্রিয় গল্প কথকগণের বিন্যাস ও নৈপুণ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বিভিন্ন রচনাবলী সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদের রচনা ঐ একই যুগের তথাকথিত মর্যাদাশীল লেখকগণের তুলনায় অনেক বেশী পাঠকের নিকট পৌঁছিতে ও তাঁহাদের প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয়। কায়গীলী একদিকে যেমন আহমাদ মিদহাত-এর ঘরোয়া পদ্ধতি, সরল ও মুক্ত শৈলী এবং পরিচিত প্রসঙ্গান্তরকরণ এবং সেই সংগে তাঁহার সহজ সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার প্রতি উপলব্ধি ও সহানুভূতি গ্রহণ করিয়াছেন— তেমনি অপরদিকে হুসায়ন রাহমী গুরপিনার এবং অংশত আহমাদ রাসিম যে গভীর অভিনিবেশসহ ইস্তাম্বুলের নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারা পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেও এই জগতের অধিবাসী ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি তাঁহার পূর্বসূরি শিক্ষকগণের ন্যায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইস্তাম্বুলের লোককাহিনী ও বিশেষ বিশেষ কতিপয় শ্রেণীর পর্যবেক্ষণ (বিশেষত যাযাবর সম্প্রদায় বলকান হইতে আগত উদ্বাস্তু মুহাজির, গৃহহীন সড়কবাসী কিশোর, জনপ্রিয় গায়কদল ও যন্ত্র শিল্পীদল ইত্যাদি) তাঁহার রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য এবং ইহাতে অন্তর্ভুক্ত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় কালের ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠের জীবনযাত্রার প্রামাণিক তথ্যসমূহ অমূল্য বলিয়া বিবেচিত। কায়গীলীর প্রধান প্রকাশিত রচনাবলী হইতেছে (১) এশকিয়া গুযেলী, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ (ছোট গল্প সংগ্রহ); (২) সানদালিম গেলিয়র ভারদা (দুইটি দীর্ঘ ছোট গল্প), ইস্তাম্বুল ১৯৩৮; (৩) চিনগেনেলার (ইস্তাম্বুলের নগর প্রাচীরের বাহিরে যাযাবর সম্প্রদায়ের জীবন সম্পর্কিত উপন্যাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনারূপে (বিবেচিত), ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ ও ১৯৪৩; এবং (৪) আয়গির ফাত্মা (একটি আবেগপ্রবণ প্রেমের গল্প), ইস্তাম্বুল ১৯৪৪। তিনি কতিপয় নাটক রচনা করেন, যেইগুলিতে তিনি স্বয়ং অভিনয় করেন। পুতুল নাচ প্রযোজনা করেন এবং কারাগোয ও ওরতা ওয়ুনু থিয়েটারদ্বয় [উভয় দ্রষ্টব্য] পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত নাটক ঊফ্রূকচু ("নিঃশ্বাস দ্বারা চিকিৎসাকারী"), ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ.। ইস্তাম্বুলের লোক-কাহিনী সম্পর্কে তাঁহার গবেষণালব্ধ অবদান বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে অথবা ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন দৈনিকে ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্তাম্বুলের কথ্যবুলি সম্পর্কে তাঁহার গবেষণাসমূহ (Istambul Argosu lugati, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ.) এবং জনপ্রিয় কবি গায়কদের অনুষ্ঠান প্রযোজনাকারী বিভিন্ন কফি হাউস সম্পর্কে তাঁহার রচনা (Istanbul Semai Kahveleri ve Meydan, Sairleri, ইস্তাম্বুল ১৯৩৭ খৃ.) কেবল পুস্তাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Tahir Alangu, Cumhuriyetten sonra Hikaye ve Roman, ইস্তাম্বুল ১৯৫৯ খৃ., ৯৫-১২২ (with excerpts); (২) Cevdet Kudret, Turk Edebiyatinda Hikaye ve Roman, ii, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ., ২২০-৪০ (with excerpts); (৩) Behect Necatigil, Edebiyatimizda Isimler Sozlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., দ্র.; (৪) Halit Fahri Ozansoy, Edebiyatcilar Cevremde, আনকারা ১৯৭০ খৃ., ১০৪-১০।

F. Iz (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কায়গুসুয আবদাল (قيغوسز ابدال) ঃ (?-৮১৮/?-১৪১৫), ৮-৯/১৪-১৫ শতকের তুর্কী মরমী কবি ও গ্রন্থকার। তাঁহাকে বেক্তাশি দারবীশ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে সাধারণত গণ্য করা হয়। তাঁহার জীবনকাহিনী সম্পর্কে সামান্য যাহা জানা যায়, তাহার অর্ধেক কিংবদন্তীমূলক এবং এই তারীকার ঐতিহ্যগত রচনাভিত্তিক। তাঁহার জীবনীতে নির্দিষ্ট সন তারিখ উল্লেখকারী একমাত্র লেখক আহমাদ সিরূরী বাবা (আর্-রিসালাতু'ল-আহ্মাদিয়া ফী তা'রীখি'ত্-তারীকাতি'ল-বেকতাশিয়া, কায়রো ১৩৫২ হি., যে গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন A. Golpinarli, Turk Tasavvuf Siiri Antolojisi, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ১৭৪) তাঁহার তথ্যের উৎস উল্লেখ করেন নাই। কায়গুসুয আব্দাল সম্ভবত আব্দাল মূসার একজন মুরীদ ছিলেন (মূসার সমাধি আন্তালিয়া-র নিকটে এলমালি-তে অবস্থিত)। মূসা ছিলেন বেক্তাশিয়ার পৃষ্ঠপোষক খুরাসান-এর হাজ্জী বেক্তাশ (মৃ. ৬৬০/১২৭০)-এর অনুসারী, স্বয়ং তিনি ছিলেন বাবা ইস্হাক-এর শাগরিদ যিনি সালজূকীগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ৬৩৮/১২৪০ সালের বিখ্যাত ধর্মীয়-সামাজিক বাবা'ঈ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। ৯/১৫ শতকের প্রারম্ভে কায়গুসুয মিসরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সেখানে ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি বেক্তাশী যাবিয়া (زاوية) স্থাপন করেন, যাহা এই সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাবা'ঈ ও বেক্তাশী প্রভাবে তাঁহার আদর্শগত সত্তার উন্মেষ হইয়াছিল এবং তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব, বিশেষত ভাষা ও রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি ৭-৮/১৩-১৪ শতকের মহান মরমী কবি য়ুনুস ইম্র (Emre)-এর নিকট ঋণী। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী (heterodox) বাবা'ঈ আন্দোলন [দ্র.]-এর শিকার হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সূক্ষ্ম শ্লেষ, ব্যাঙ্গাত্মক কৌতুক ও জীবনের প্রতি এক শক্তিশালী আকর্ষণ কায়গুসুযের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার সাবলীল, পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী সুস্পষ্ট গদ্য রচনা জনপ্রিয় মরমী গ্রন্থাবলী সৃষ্টি করে (রিসালা-ই কায়্গুসুয, কিতাব-ই মাগ্লাতা, কিতাব-ই দিলগুশা অথবা বুদালা-নামা), যাহা প্রাথমিক যুগের উছমানী সাহিত্যের সেরা রচনারূপে পরিগণিত। কায়গুসুযের রচনাবলী এখনও সম্পাদিত হয় নাই। লিথোগ্রাফে মুদ্রিত সংস্করণ-সমূহ নির্ভরযোগ্য নহে। তাঁহার কাব্যসমূহকে প্রায়ই ভুলক্রমে

১০ম/১৬শ শতাব্দীর একজন জনপ্রিয় মালামাতিয়া মরমী কবি কায়গুসুয ভিযেলি 'আলা'উ'দ-দীনের কাব্য বলিয়া মনে করা হয়। কায়গুসুয আব্‌দালের অধিকতর নির্ভরযোগ্য পাঠের পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. মাজমূ'আ, Nuru Osmaniye, নং ৪৯০৪, Ankara General Library, পাণ্ডু. নং ১৬৯, ৮২৪ এবং ৮৬৭; Istanbul Belediye Library, Cevdet section, পাণ্ডু. নং ২১৬। রচনা চয়নের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Fuad Koprulu, Turk edebiyatinda ilk Mutasavviflar, ২য় সং., ইস্তাম্বুল ১৯৬৬ খৃ., স্থা. (দ্র. নির্ঘণ্ট); (২) Sadettin Nuzhet Ergun, Turk Sairleri, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬-৪৫, artiele Abdal Musa, ১৬৪-৭১; (৩) A. Golpinarli, Kaygusuz Abdal, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ.; (৪) Fahir iz, Eski turk edebiyatinda nesir, ইস্তাম্বুল ১৯৬৪ খৃ., ১০০-১৮; (৫) A. Golpinarli, Turk tasavvuf siiri antolijisi, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ১৭৪-৯৫।

F. Iz (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

কায়জী ইব্ন কায়স (قيظى بن قيس) : (রা) আনসার আওস গোত্রের লোক। ইব্ন সা'দ ও বাগাবী তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী বলিয়াছেন। ওয়াকিদী বলেন, তিনি ও তাঁহার তিন পুত্র 'উকবা, 'আবদুল্লাহ্ ও 'আবদু'র-রাহমান (রা) উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আজনাদায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং জাসার-এর যুদ্ধে (يوم الجسر) শহীদ হন। বাগাবী বলেন, তাঁহার সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৫; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৩০।

মুহাম্মদ মূসা

কায়তাক : (স্বকীয় নাম, কায়দাক্‌লান, বহুবচন কায়দাক, রুশীয় নাম, যথা : খায়দাকী, কায়তাগি, কায়তাকি, কারাকায়তাকী; নামের অন্যান্য রূপ, যথা : খায়তাক, কায়তাখ, কারাকায়তাখ) একটি ভাষা শ্রেণী (group)-র নাম অর্থাৎ ক্ষুদ্র দাগিস্তান (দ্র.) ভাষা শ্রেণী, যাহা কুবাচী (kubaci) (দ্র.) ও দারগিণ (Dargin দ্র.) ভাষাদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত এবং আইবেরো ককেশিয়ান (Ibero-Caucasian) ভাষাসমূহের দারগিন-ল্যাক (Dargin-Lak) গ্রুপের Dargin শ্রেণীর রূপ লাভ করে।

১৯২৬ সনের আদমশুমারীর নৃতাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী সেখানে ১৪,৪৩০ জন কায়তাক ছিল এবং ১৪,৪৬৯ জন কায়তাক ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করিত। কায়তাক উপজাতি বসবাস করিত কায়তাক জিলার দশটি 'আউল' (Aul)-এ দাখাদায়েভ (Dakhadev) জিলার পর্বতময় দক্ষিণাংশ, উলু-চাই (Ulu-chi) পর্বতের উপত্যকায় এবং দাগিস্তান A. S. S. R. কায়তাক অঞ্চল দাগিন ও তাবাসারান (Tabasaran) এলাকার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

কায়তাক-এর সর্বপ্রথম উল্লেখ ৪/১০ শতাব্দীর আরব গ্রন্থকারগণের রচনায় দৃষ্ট হয়। মুহাম্মাদ রাফী'-র মতে কায়তাকগণ লাক (দ্র.) দেশের কাযীকুমুখ-এর শাসখালকে রাজস্ব প্রদান করিত। ৮/১৪ শতাব্দীর শেষ ভাগে মঙ্গোলগণ কায়তাক ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে এবং কায়তাক জাতির উপর মঙ্গোলদের গভীর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। কায়তাক জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ তীমূর কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তাতার বাহিনী (Golden Horde)-র পতনের সময়ে উত্তর দাগিস্তানে কায়তাক-এর উত্‌সমিয়াত (utsmiyat)-এর সামন্ত রাজ্য একটি বড় শক্তি হিসাবে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। [উত্‌সমী (Utsmi) শব্দের শব্দতত্ত্ব অনিশ্চিত–উহা isim শব্দ হইতে উৎপন্ন ; উহার অর্থ প্রসিদ্ধ]। বর্তমান কায়তাক অধ্যুষিত এলাকা অপেক্ষা উক্ত সামন্ত রাজ্যের আয়তন বৃহত্তর ছিল কায়তাক জাতি ব্যতীত উহার জনসংখ্যা সংমিশ্রণ ছিল বহু উপজাতির, যথা : Laks Dargins ও দক্ষিণাঞ্চলীয় কুমাইকগণ (Kumyks)। কিংবদন্তী অনুসারে উত্‌সমীগণ কালা'কুরায়শা-এর আরব গভর্নরদের বংশধর ২/৮ শতাব্দীতে উক্ত অঞ্চলের ইসলামীকরণ সাধন করেন উক্ত গভর্নরগণ এবং কেন্দ্রীয় দাগিস্তানের যে সমস্ত অঞ্চল প্রথমদিকে ইসলামী ভাবধারায় গড়িয়া ওঠে, কায়তাক অঞ্চল ছিল উহাদের অন্যতম। কায়তাকগণ ছিল শাফি'ঈ মাযহাব-এর অনুসারী সুন্নী। ১০/১৬ শতাব্দীতে উত্‌সমী ছিলেন দাগিস্তানের অন্যতম শক্তিশালী শাসক এবং ১২/১৮ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি তুরস্ক ও পারস্যকে সমর্থন দেওয়ায় জটিল পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিতেন।

১৮০২ খৃ. উত্‌সমী শাসক 'আদিল খানের উপর রুশীয় Protectorate (আশ্রিত রাজ্য) ব্যবস্থা চালাইয়া দেওয়া হয়। লোয়ার (lower) কায়তাক-এর অগ্রবর্তী কাস্পিয়ান অঞ্চলে সরাসরি রুশ শাসন প্রবর্তিত হয় ১৮২০ সনে এবং পবর্তময় কারাকায়তাক অঞ্চলে ১৮৬২ সনে। ১৮৪৪ সনে utsmiyat শক্তি লোপ করা হয়।

কায়তাক উতস্‌মিয়াত-এর সমাজ কাঠামো ছিল আভার (দ্র.)-এর সমাজ কাঠামোর অনুরূপ একটি জটিল সামন্ততন্ত্র যাহার মধ্যে ছিল বহু বেগ (beg) চান্‌কা (Canka) উযদেন (স্বাধীন কৃষক) এবং পরাধীন শ্রেণীসমূহ, যাহা : চাগার (Cagar) [দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ কৃষক] রায়াত (ভূমিদাস) এবং কূল। উহারা মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি যৌথ পরিবার (তুখুম) প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিতভাবে সহ-অবস্থান করিত। তাহাদের মধ্যে স্বগোত্র বিবাহ প্রচলিত ছিল।

কায়তাকদের রীতিনীতি (عادات) রুস্তম খান উত্‌স্‌মী কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধভাবে সংগৃহীত হয় এবং মূল আরবী হইতে ইহা ১৮৬৮ সনে রুশ ভাষায় অনূদিত হয় (Sbornik Svedeniio Kavkazskikh Gortsakh, Tiflis 1868)।

ভাল কৃষি জমির অভাবে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় কৃষি একটি নগণ্য ভূমিকা পালন করিত। কিছু কিছু ঘোড়া ও গবাদি পশুসহ ছাগ ও মেষ পালনই ছিল তাহাদের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। হস্ত শিল্প, বিশেষ করিয়া রেশম ও পশমের বুনন শিল্প খুবই উন্নত ছিল। বারশামাই ও চাবাখনী-র কায়তাক মহিলার সূচীশিল্প পরিশোভন কর্মে বিখ্যাত ছিল। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় পার্বত্যাঞ্চলে মেষ পালন (স্থান পরিবর্তন ব্যবস্থাসহ), নিম্নতর পর্বতাদি ও পর্বতের পাদদেশে ঘোড়া ও গবাদি পশু পালনের উপর এখনও গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে।

মাগালিস-কায়তাক (উত্তরাঞ্চলে) ও কারা-কায়তাক (দক্ষিণাঞ্চলে)-এই দুইটি উপভাষা সমন্বয়ে কায়তাক ভাষা গঠিত। দারগিন প্রথমত সাহিত্যের ভাষা ও দ্বিতীয়ত (কখনও কখনও প্রথম) কথ্য ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রুশ ভাষা দ্বিতীয় লিখিত ভাষা। কায়তাক উপজাতি সংস্কৃতি ও ভাষাগত দিক হইতে দারগিন জাতিতে একীভূত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Bennigsen & H. Carrere d' Encausse, Une Republique Sovietique Musulmane ঃ le Daghestan, Apercu Demographique, in REI. xxiii (1955), 7-56; (২) Geiger, Halasi-Kun, Kuipers, Menges Peoples and Languages of tha Caucasus, 's-Gravenhage 1959; (৩) B. Grande, Spisok Narodnostey S.S.S.R., in Revolutsiya i Natsional'nosti, iv (1936), 74-85; (৪) E. N. Kusheva, Narodi Severnogo Kavkaza ikh Sviazi s Rossiei, Vtoraya polovina XVI-30 Godi XVII Veka, Moscow 1963; (৫) Narodi Dagestana, Moscow 1955; (৬) Narodi Mira, Moscow 1962; i (Narodi Kovkaza); (৭) A. S. Omarov and R. G. Marshaev, Postanovleniya Rustem Khana Kak Istocnik po Istorii Kaytaga XVII v. Ucenye Zapiski Instituta Yazka i Literaturo Dag. filiala A. N. SSSR, vii, Makhackala1960; (৮) S. A. Tokarev Etnografiya Narodov S. S. S. R. Moscow 1958.

R. Wixman (E. I[2])/মুহাম্মাদ শামসুল ইসলাম

কায়দু (قيدو-Qaydu) ঃ বিখ্যাত খান ওগেদেয়-এর পঞ্চম পুত্র কাশি-এর পুত্র; জামাল আল-কারশীর মতানুসারে তাঁহার জন্ম আনু. ৬৩৩/১২৩৫-৬ সালে। এখনও প্রচলিত একটি বক্তব্য এই যে, তিনি ৬৩৭-৮/১২৪০-১ সালে পূর্ব য়ূরোপে অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত ইহা তাঁহার ও পিতৃব্য কাদান-এর মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তির ফল। মহান খান মংগকে (Mongke)-এর সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহাকে কায়ালিক (দ্র.) অঞ্চলে বসবাস করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। খানাতে-এর নেতৃত্বে কুবিলায় (দ্র)-এর নির্বাচনে পর যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাহাতে তিনি শেষোক্ত ব্যক্তির ভ্রাতা অরিগ বোকি-এর দলে যোগদান করেন। আরিগ বোকি মহান খান-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পর কায়দু তাঁহার সংগ্রাম অবিচল থাকেন এবং জীবনের শেষ অবধি তিনি কুবিলায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারী তায়মূর ওলজেয়তু-এর প্রতি প্রকাশ্য অথবা গোপন শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। চাগাতায় খানাতে (দ্র.)-র জন্য তিনি কুবিলায়-এর মনোনীত প্রার্থী বুরাক (দ্র.)-এর বিরোধিতা করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহারা একটি মতৈক্যে উপনীত হইতে সক্ষম হন এবং পরবর্তী ত্রিশ বৎসরকাল কায়দু-এর নেতৃত্ব ওগেদেই ও চাগাতায় বংশদ্বয় শান্তির সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে। তাঁহার মৃত্যু সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ পরস্পর বিরোধী। মনে করা হয় যে, তিনি মহান খানের বাহিনীর সহিত এক সংঘর্ষে আহত হন এবং ইহার স্বল্পকাল পরেই ইনতিকাল করেন। কাশানীর মতে ৭০২ সালের রাজাব/ ফেব্রু-মার্চ ১৩০৩ সালে কারাকোরাম-এর সন্নিকটে "কুলানবাশী" নামক স্থানে তাঁহার ইনতিকাল হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশীদু'দ্-দীন, The successor of Genghis Khan, অনু, J. A. Boyle, নিউ ইয়র্ক-লন্ডন ১৯৭১ খৃ.; (২) Wassaf, Bombay edn; (৩) কাশানী, The History of Uljaytu, সম্পা. Mahin Hambly, তেহরান ১৯৬৯ খৃ.; (৪) V. V. Barthold, Four Studies on the history of Central Asia, ১খ, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ.; (৫) P. Pelliot, Notes on Marco Polo, ১খ, প্যারিস. দ্র. 'Caidu' প্রবন্ধ।

J. A. Boyle (E. I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুর বাসেত

কায়ন (قـيـن) ঃ শব্দটির উৎপত্তি আরবী মূল ق, ى, ن হইতে, যাহার মৌলিক অর্থ "সজ্জিতকরণ, শোভা বর্ধন," ব্যাপকার্থে ইহা কারিগর, লোহার কর্মকার (সাকিন/صانع)-কে বুঝায়, যদিও বর্তমান ব্যবহারে ইহা শুধু কর্মকারকেই বুঝায় [L. A. (দ্র.) কয়ন]। আল-কুরআন-এ শব্দটির উল্লেখ নাই। অন্যাদিকে কর্মকার অর্থে অনেক হাদীসের ইহার উল্লেখ আছে। শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কায়না (قينه)-এর 'গায়িকা। যাহা হউক, যেহেতু এই কাজে নিয়োজিত লোকদের অবস্থান সাধারণভাবে জনসাধারণের নিম্নস্তরে, সেইহেতু কায়ন ক্রীতদাসদের (ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দে পরিণত হয়। জারীর-এর ব্যঙ্গ কবিতাসমূহে তাহার বিপক্ষ আল-ফারাযদাক-কে ইবনু'ল-কায়ন বলা হইয়াছে (আগানী, বৈরূত ১৯৫৬, ১৯খ, ৩৭, ৪১, ৮৪) এবং মরুভূমি অঞ্চলে ইহা এক রকম এত অপমান বলিয়া পরিগণিত ছিল যে, সিমাকে আল-আসাদী-কে প্রশংসা করিবার ইচ্ছায় কবি আল-আখতাল অনিচ্ছাকৃতভাবে এই বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া উল্লেখ করেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন কর্মকার।

সানি' (صانع) সম্পর্কে এই বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী বেদুঈনদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে (H. Wahba, জাযীরাতু'ল'আরাব ফি'লকারনি'ল-'ইশরীন; আর আল-'উযায়যী, কামূসু'ল-'আদাত... ...আল-উর্দুনিয়্যা ঃ, 'আম্মান ১৯৭৩-৪, ২খ, ১৭৭)। একজন দক্ষকারিগর স্মরণাতীত কাল হইতে তাহাদের মধ্যে বাস করিলেও তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারকে তাহারা বহিরাগত বলিয়াই গণ্য করিত। তাঁহাকে কখনও গোত্রের মধ্যে একীভূত করা যাইত না এবং একজন নিম্নতম জাতির আরব যাযাবর ও তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিত না [R. Montagne, Vie sociale et Politique de l'Arabie du Nord REI সাময়িকীতে (১৯৩২ খৃ.),]।

হাদ্দাদীন (حدادين) (হাদ্দাদ=কর্মকার'-এর বহুবচন) মূলত মরূদ্যানের বাসিন্দা (Montagne, পৃ. গ্র.) এবং কখনও কখনও তাঁহারা ছিলেন নাওয়ার (A. Jaussen. Coutumes des Arabes au pays de Moab, 104 n. 2) অথবা সুলাবা-দের মতো সমাজচ্যুত গোত্রভুক্ত। তাহারা একটি পৃথক জাতি গঠন করেন [Doughty, 'Arabia deserta, নির্ঘণ্ট (দ্র.) Sany] এবং নিজদিগকে তাহারা অন্যদের সহিত সম্পর্ক রহিত, বানূ আম্ম বলিয়া মনে করিত (A. Musil, The manners and customs of the Rwala Bedouins. New York 1928, 281)। নিম্ন পদমর্যাদার জন্য তাহারা আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত এবং সেইজন্য এখানে তাহারা একরকম পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করিত।

তাহারা যে জাতির মধ্যে বসবাস করিবার জন্য সিদ্ধান্ত লইয়াছিল, তাহাদের উপর এক আক্রমণ কালে নিজদিগকে ও নিজদিগের দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার জন্য কোনও কিছু না করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিত। কারণ তাহারা নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করিত। তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী ভুলবশত লইয়া যাওয়া হইলেও উহা শীঘ্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে তাহারা নিশ্চিত ছিল। প্রতিটি জাতিতে বস্তুত একজন ভ্রাতা (আখ) ছিল। সে ছিল ঐ জাতির একজন কর্মকার যাহার কর্তব্য ছিল ভুলবশত অপহৃত দ্রব্যাদি পুনরায় ফেরত পাইবার ব্যবস্থা করা (মুসিল, পূ.গ্র. পৃ. ২৮১-২)।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সাবায়ী ভাষায় কায়ন শব্দটি উত্তর আরবের ন্যায় অবমাননাকর অর্থ বহন করে না। এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, এই ভাষায় ইহার অর্থ "সেই ব্যক্তি, যিনি কোনও কিছুর বন্দোবস্ত করেন," যাহা শব্দটির আরবী উৎপত্তিগত অর্থের সহিত সংগতিপূর্ণ। সুতরাং ইহা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক অথবা মন্ত্রী প্রমুখ যাহারা ধর্ম ও পবিত্র বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদিগকে বুঝায়। এই অতি প্রাকৃতিক দিকটি সম্পর্কে আল-কুরআনে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে, যখন ইহা বলে, "আমরা লৌহ পাঠাইয়াছি, যাহাতে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য উপকার রহিয়াছে" (৫৭ ঃ ২৫) এবং ইহাকে দাঊদ (আ)-এর বর্মাবৃত জামার আবিষ্কার ও প্রস্তুতিকাল বলিয়া বলা হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে উহা আবিষ্কার ও উৎপাদন করেন।

কয়েকটি হাদীছে লৌহের ঐশী উৎপত্তি বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইব্ন উমর (রা)-এর মতে "আল্লাহ্ পৃথিবীতে চারিটি উপাদান আনয়ন করেন ঃ লৌহ, আগুন, পানি ও লবণ" (আত-তাবারসী, মাজমা'উ'ল-বায়ান ফী তাফসীরি'ল-কুরআন, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ২৩খ, ১৫৭)। ইব্ন আব্বাস (রা) আরও পরিষ্কারভাবে বলেন,"হাতুড়ী, নেহাই, সাঁড়াশি আদাম (আ)-এর সহিত পৃথিবীতে আসিয়াছিল।" অন্য এক হাদীছে আছে যে, নেহাই, সাঁড়াশি, সুঁচ, হাতুড়ী ও ক্ষুর (আত-তাবারী, জামি'উ'ল-বায়ান, ২৭খ, ১২২; আলূসী, বুলূগু'ল-'আরাব, ৩খ, ৪০০)-এই পাঁচটি যন্ত্র হযরত আদাম (আ)-এর সহিত জান্নাত হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিল।" পরিশেষে মক্কার হারাম শারীফের গাছ কাটার সাধারণ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীছে বাড়ীঘর ও কবর সজ্জার কাজে এবং কর্মকারদের দ্বারা তাহাদের কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার সুগন্ধি গাছ ইযখীর-এর ব্যাপারে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে (আল-বুখারী, সাহীহ, ২খ, কিতাবু'ল-জানা'য, ৮০-১; LA. s.v.K. yn; Gaudefroy-Demombynes, Le pelerinage a La Mekke, ৮-৯)।

কায়ন-এর অবস্থা এইরকম দ্বিমুখী। ইহা একটি বিদ্রূপের বস্তু। আবার একই সঙ্গে পবিত্র ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু সুবিধাও ইহা ভোগ করিয়া থাকে। যেমন, তথাকথিত আদিম সমাজে মরুবাসী আরবদের মধ্যে কর্মকার ছিল পৃথক। রওয়ালাদের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ্ বেদুঈনদের সহিত একই সময়ে প্রথম কর্মকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন (Musil, পৃ., গ্র., পৃ. ২৮১)। তাহাদের সম্বন্ধে অশোভন ভাষা কেবল যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি ঘৃণার জন্যই নয়, অন্য একটি বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে ঃ এই কারিগর যাদুকরের অপবিত্রতা দ্বারা কলুষিত হইবার আশংকা এবং যে স্বর্গীয় বিশ্বাসের গোপন রহস্যে সে বিশ্বাসী সেই পরাক্রান্ত শক্তির সংস্পর্শে আসিবার কুসংস্কারপূর্ণ ভীতি এবং ইহাই সাবিয়ীন কায়নকে মানুষ পবিত্র বিষয়ের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পরিণত করিয়াছে।

লেখকগণের দাবী অনুসারে দক্ষিণ-আরবের অধিবাসী কর্তৃক উত্তর-আরবের অধিবাসিগণকে কর্মকারের কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল কি (আল-বালাযুরী, আনসাবু'ল-আশরাফ ১খ, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ৪৬৭) এই প্রশ্নটি বর্তমান য়ামান-এর কর্মকারদের কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। কর্মকারকে বিশেষ অমর্যাদাকর শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। সর্বাধিক ঘৃণ্য শ্রেণী হইল 'আনাদীল (নাপিত, কসাই, রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রভৃতি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র. (১) J. Chelhod, Le monde mythique arabe, in Jnal. de la Soc. des Africanistes, ২৪খ, (১৯৫৪ খৃ.), ৪ প.; (২) ঐ গ্রন্থকার, L'organisation sociale au Yemen, in L'Ethnographie, N. S. no 64 (1970), 75 ff. (৩) দা. মা. ই, ১৬/২খ, পৃ. ৫৮১-৮৫।

J. Chelhod (E. I[2]) মোঃ শহীদুল্লাহ্

আল-কায়ন (القين) (ইবনু জাস্র) ঃ সাধারণত বানু'ল-কায়ন অথবা উহার 'নূ' (نو) উহ্য রাখিয়া বা'ল-কায়ন বলা হয়, সম্বন্ধপদ 'কায়নী' এক বা একাধিক আরব গোত্রের নাম। আল-কায়ন বিখ্যাত কুদা'আ গোত্রীয়/গোষ্ঠীর পদবী। এখানে আল-কায়ন দ্বারা গোত্র প্রধান নু'মান ইব্ন জাস্রের উপনাম বুঝায়। অতএব এই গোত্র বানূ'ল-কায়ন ইব্ন জাস্র নামে পরিচিত [দ্র. Wustenfeld ঃ Geneal, Tabellen, বংশ তালিকা ২, পৃ. ২০; ইব্ন দুরায়দ, আল-ইশ্তিকাক্ (সম্পা. Wustenfeld) পৃ. ৩১৭; তাজু'ল-'আরূস কায়ন শিরোনামে; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান (সম্পা. de Slane) নিবন্ধ ওয়াহীমা ইব্ন মূসা (প্রায় মধ্যভাগে) ইত্যাদি]। ইহার ভিত্তিতে সম্ভবত শুদ্ধভাবেই ইহাকে পদবী বলা হইয়াছে। আল-কায়ন-এর শাব্দিক অর্থ কর্মকার, ধাতব দ্রব্যের কারিগর, তরবারি প্রস্তুতকারক (দ্র.) আরামী ভাষায় কায়নায়া (قينا - قينايا) [কায়না'আ'] শব্দের অর্থ কর্মকার। কিন্তু এই শব্দ সর্বপ্রকার হস্তশিল্পী ও কারিগর সম্পর্কেই বহুল প্রচলিত। আল-কায়ন-এর অর্থ আরবী অভিধান মতে ক্রীতদাস। আল-কায়ন পদবীর উৎস সম্ভবত এইরূপ যে, বানু'ল-কায়ন কোন এককালে প্রকৃতপক্ষেই ধাতব দ্রব্যের কারিগর ছিল অথবা খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, শোধন কিংবা উহার কারিগরী তাহাদের পেশা ছিল। এই কারণেই ফারান ইব্ন বালী, যিনি বিখ্যাত সুলায়ন কিংবা ফারান—খনিতে কাজ করিতেন—বানূ'ল-কায়ন বা কর্মকার পুত্র' অথবা আল-কুয়ূন (কর্মকার) নামে অভিহিত হইতেন, দ্র. য়্যাকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, পৃ. ৮৬৫ পৃ.; আল-বাক্রী, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld পৃ. ২০ = Wustenfeld ঃ Die Wohnsitze u. Wanderungen der Arab, Stamme, in Abh d. Gesellsch. d. Wiss zu Gottingen, ১৪খ, ২৮; Noldeke ভুলক্রমে d. Deutsch, Zeitschr d. Morgenl. Gesellsch (৪০খ, পৃ. ১৮১, টীকা ৬-এ আমাদের নিম্নে আলোচ্য বানু'ল-কায়ন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন; Sprenger, Die alte geographie Arabiens, অনুচ্ছেদ ৪১৯ পৃ. ২৮ ছত্র ১ এবং Wustenfeld, Register zu den Geneal. Tabellen, পৃ. ১৬২]।

যাহা হউক, প্রাচীন কবিতায় এই গোত্রের উল্লেখ থাকায় এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা সর্বতোভাবে একটি বেদুঈন গোত্র ছিল—বেদুঈন হিসাবে তাহারা তাহাদের কীর্তিকলাপে গর্ববোধ করিত, তু. de Slane অনূদিত ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, পৃ. ৪০। অতএব বানু'ল-কায়নের কর্মকার পেশায় অনুসন্ধান প্রাগৈতিহাসিক কালে করিতে হইবে (দ্র. Sprenger, পৃ. গ্র., পৃ. ৪২০)। বানু'ল-কায়নের নামকরণের আরেকটি কারণ অবাস্তব মনে হয় না। আরব বেদুঈনগণ সর্বপ্রকার হস্তশিল্পের কার্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। সেই কারণে আল-কায়ন ও বানু'ল-কায়নকে ঘৃণাব্যঞ্জক বিশেষণে বিশেষিত করিত [দ্র. নাকা'ইদু' জারীর ওয়া'ল-ফারায্দাক গ্রন্থে 'কায়ন' শিরোনামে (Bevan) প্রায় যাটটি সূত্র পেশ করিয়াছেন যাহার সকলগুলি নাকা'ঈদ

গ্রন্থ হইতে আহরিত]। এখানে স্বয়ং কবি আল-ফারায্দাক ইবনু'ল-কায়ন অথবা ইবনু'ল-কুয়্ন নামে আঠার বার এবং তাঁহার বংশকে বানু'ল-কায়ন-এর নামে তিনবার উপস্থাপিত করা হইয়াছে [আরও দ্র, কায়স ইব্নু'ল-খাতীম, দীওয়ান (সম্পা. Kowalski), সংখ্যা ১০, কবিতা নং ১১; হাস্সান ইব্ন ছাবিত, দীওয়ান (সম্পা, Hirschfeld) সংখ্যা ১২৯, কবিতা নং ৪; হামাসাতু'ল-বুহ্তুরী (সম্পা. L. Cheikho) সংখ্যা ১৩৩৩, কবিতা নং-১; তিরিম্মাহ্, দীওয়ান (সম্পা. Krenkow), সংখ্যা ১৯, কবিতা নং ২০৫]। এই মর্মে আলোচ্য আল-কায়ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই যে, অন্ততপক্ষে ইহা এক প্রকার হীনতা ও ঘৃণাব্যঞ্জক পদবী যাহা বানু'ল-কায়ন গোত্রের সহিত সম্পৃক্ত।

বানু'ল-কায়ন বিখ্যাত বানূ কুদা'আ নামক বিশাল গোত্রের একটি শাখা ছিল। কুদাআ প্রকৃতপক্ষে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে য়ামানের বাসিন্দা ছিল। ঐতিহাসিক যুগে তাহারা উত্তরাঞ্চলে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও ইরাকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বাহ্যত তাহাদের সকলেই অথবা অধিকাংশই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে [দ্র. Wustenfeld, Tabellen, আলোচিত স্থান; ইব্ন দুরায়দ; প্রা. গ্র.; ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মা'আরিফ (সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৫১; ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহ, আল-'ইক্দু'ল-ফারীদ, কায়রো ১৩০৫ হি., ২খ, পৃ. ৫৮ ইত্যাদি]।

বানু'ল-কায়ন গোত্রের আবাসস্থল পেট্রার প্রাচীন নগর 'আরাবিয়া পেট্রা (Arabia Petraea)-র সীমা অনুযায়ী সীনাই উপদ্বীপ হইতে সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল ও জর্দানের পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত ভূমিসহ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত [দ্র. Wustenfeld, Register zu geneal. Tabellen, পৃ. ৩৭১; Sprenger পূ. গ্র., পৃ. ৪২০প.; Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, ২খ, পৃ. ২৩২, ৩খ, পৃ. ৩৪৫ ও ৩৫২; Noldeke, Uber die Amalekiter u. einige andere Nachbarvol in Benfey ker der Israeliten-Orient u. Occident ঃ ২খ, পৃ. ৬৩৫; আল-হামদানী, জাযীরাতু'ল-'আরাব, সম্পা. Muller, ১খ, ১৩১ প.; Sprenger, পূ. গ্র., প্যারা ৩২; 'উরওয়া ইবনু'ল-ওয়ার্দ (সম্পা. Noldeke, পৃ. ৩২=আবূ তাম্মাম, আল-হামাসা, সং. Freytag, ১খ, পৃ. ২২; আল-আগানী, ১৪খ, পৃ. ১২৪; আল-য়া'কূবী, কিতাবু'ল-বুলদান, in Bibl. Geogr. Arab., সম্পা. de Goeje, ৭খ, ৩২৬; য়াকূত্, মু'জামু'ল-বুল্দান, ৩খ, পৃ. ৪৫৯, ৪খ, পৃ. ৪১৩; আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী (Wellhausen কৃত সংক্ষিপ্ত অনু., পৃ. ৩১৫; Sprenger, Das Leben u. die Lehre des Propheten Mohammad), ৩খ, ২৯৫; ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল ফি'ত্-তা'রীখ (সম্পা. Tornberg), ৬খ, পৃ. ৮৭ প., তৎসহ মানচিত্র in Blau, Arabien im Sechsten Fahrhundert), in Zeitscher. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch., ২৩খ, ৫৫৯ এবং in Caetani, Annali de l' Islam, ২খ, পৃ. ২]।

ইব্ন ইসহাক বানু'ল-কায়নকে তাহাদের প্রতিবেশী গোত্রদের সঙ্গে মুসতা'রাবা বলিয়াছেন (দ্র. আত-তাবারী, তা'রীখ, সম্পা. de Goeje, ১খ, পৃ. ১৬১১ ও ২৩৪৭)।

ইতিহাস ঃ যে সকল কবিতা ও কাহিনীতে আরবদের প্রাক-ইসলামী যুগের যুদ্ধের ইতিহাস এবং প্রাচীনকালের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে বানু'ল-কায়নকে বানু'ল-কাল্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেখিতে পাওয়া যায় [দ্র. আবূ তাম্মাম, হামাসা, পৃ. ৭৭; য়াকূত, পূ. গ্র., ৩খ, পৃ. ২৪১; ইবনু'ল-আছীর, পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ৩৭০; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, সম্পা. Sachau, ২/৩খ, ২৭ পৃ.; ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ২খ. পৃ. ২২৪, ইব্ন হাজার, ইসাবা ২খ, ৪৫; Sprenger, Das Leben u. die Lehre des Prophten Mohammad, ১খ, ৪০১; বাহরা (বালাযুরী ফুতূহ, সম্পা. De Goeje, পৃ. ২৮৩). গাতফান্ (আগানী, ২খ, পৃ. ১৯৪)]।

কায়নদিগের কোনও কোনও শাখাগোত্র মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিল। কাজেই ৮/৬২৯ সনে যাতু'স-সালাসিল যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহাদের সাহায্য আশা করিয়াছিলেন (দ্র. ওয়াকিদী, সম্পা. Marsden Jones, ২খ, পত্রক ৭৭০)। কিন্তু বানূ'ল-কায়ন গোত্রের একটি বাহিনী প্রায় সেই সময়েই মু'তার যুদ্ধে মসুলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। পববর্তীকালে তাহারা য়ারমূকের যুদ্ধেও বায়যান্টাইন পতাকাতলে বানূ কূদা'আ, বানূ লাখ্ম ও বানূ জুযামের সহিত মিলিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কারণ যে সকল আরব গোত্র সিরিয়া সীমান্তে বসবাস করিত ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল তাহারা অল্পাধিক বায়যান্টাইন প্রাধান্য মানিয়া চলিত [ইব্ন হিশাম, সীরা, সম্পা. Wustenfeld ৭২৯; তাবারী, ১খ, পৃ. ১৬১১ ও ২৩৪৭; আবূ ইসমা'ঈল আল-বাস্রী, ফুতূহু'শ্-শাম. Lees, ১খ, পৃ. ৯৭, ১১৪; Sprenger, Das Leben u. die Lehre, ৩খ, পৃ. ২৯২, পার্শ্বটীকা ২; Caetani, পূ. গ্র.,/ ১/২খ, ৮৩; ১/৩খ, পৃ. ২০৬]। আত-তাবারী, পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ১৮৭২-এ ঐতিহাসিক সায়ফ ইব্ন 'উমার বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর ধর্মত্যাগের যে ঝড় সমগ্র আরবে বহিয়াছিল তাহাতে বানু'ল-কায়নও প্রভাবান্বিত হইয়াছিল [দ্র. Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabs, ৩খ, পৃ. ৩৪৫, ৩৫২; Caetani, পূ. গ্র., ১/২খ, ৫৮৩-৫৮৫]।

সিরিয়া বিজয়ের পর বানু'ল-কায়ন গোত্রের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ১ম মারওয়ান ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধকালে সিরিয়া সীমান্তে বসবাসকারী হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই বানূ'ল-কায়ন গোত্রকে মারওয়ানের পক্ষাবলম্বন করিতে দেখা যায় [তাবারী, ২খ, পৃ. ৪৭৮; আল-মাস্'উদী, আত-তান্বীহ্ ওয়া'ল-আশরাফ, in Bibl. Geogr. Arab, ৮খ, ৩০৮]। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরেই 'কুরাকির' নামক স্থান লইয়া বানূ-কালবের সহিত তাহাদের কলহ বাধিলে খলীফা 'আবদু'ল-মালিক বানু'ল-কায়নের বিরুদ্ধে রায় দেন (য়াকূত, ৪খ, পৃ. ৪৯)।

১১৯/৭৩৭ সনে খারিজী বিদ্রোহী বাহ্লূল-এর অভ্যুত্থানের সময় পুনরায় বানূ'ল-কায়নকে উমায়্যাদের আনুগত্য করিতে দেখা যায়। বাহ্লূলের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করা হয় তাহাতে বানূ'ল-কায়নের ৬০০ সৈন্য যোগদান করে (তাবারী, ২খ, পৃ. ১২৩; ইবনু'ল-আছীর, ৫খ, পৃ. ১৫৬)। ১৭৬/৭৯২ সনে হারূনু'র-রাশীদের খিলাফাতকালে দামিশ্কের হাঙ্গামা দমনে তাহারা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন য়ামানী গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (দ্র. ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৬খ, পৃ. ৮৭ পৃ.)।

নাশ্ওয়ান রচিত শাম্সু'ল-'উলূম গ্রন্থের বর্ণনা মতে লুকমান আল-কায়ন ইব্ন জাস্র কুদা'ঈর ক্রীতদাস ছিলেন (দ্র. Die auf sudarabien bezuglichen Angaben Naswan's im Sams al-Ulum, সম্পা. 'আজীমু'দ-দীন, পৃ. ৯৫)।

এই গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন কবি আবু'ত্-তামাহান (হানজালা ইব্ন শারকী) আল-কায়নী (মৃ.৬৫০ খৃ.)। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর চাচা আয-যুবায়র ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্তালিব ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুদ'আনের বন্ধু ছিলেন [দ্র. ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', সম্পা. de Goeje, পৃ. ২২৯ পৃ.; ইব্ন খাল্লিকান, সম্পা. de Slane, ১খ, পৃ. ৪০; Caussin de Perceval, ১খ, পৃ. ১৩১, ২খ, পৃ. ২৩২; আবূ তাম্মাম, আল-হাম্মাসা, পৃ.৫৫৮; ইব্ন হাযম জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৪৫৩ ও ৪৫৪; আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-'আরাব, ২খ, পৃ. ৩৫১; আল-কালকাশান্দী, নিহায়াতু'ল-'আরাব, পৃ. ৭১]।

H. Ewald (দ্র. Gesch. d. Volkes Israel, ১খ, পৃ. ৩৩৭) সর্বপ্রকার সতর্কতাসহ Old Testament-এ উল্লিখিত কায়িন তথা কেনাইটদের সহিত এই গোত্রের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। Noldeke প্রথমত একটি সম্ভাব্য মত মানিয়া লইয়া পরবর্তীকালে অত্যধিক প্রত্যয়ের সহিত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন [দ্র. Uber die Amaklekiter, পৃ. গ্র., পৃ. ৬৩৪ প.]।

ফিলিস্তীনের দক্ষিণে প্রাচীন 'নাজব' নামক স্থানে (পরবর্তীকালে যাহা Idumaea নামে খ্যাত হইয়াছে) প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলেই আমরা বা'ল-কায়ন গোত্রের লোকদিগকে বসবাসরত দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত কেনাইটগণ (Kenites) প্রকৃতপক্ষে বা'ল-কায়নের মতো যাযাবর গোত্র [Stade, Zeitschr. fur d. Alttest Wiss, ১৪খ, ২৮৭ এবং Sayce, Early Israel and the Surrounding Nations, পৃ. ৯১ প.; ইহা ছাড়া Hastings, Dict. of the Bible গ্রন্থে 'Kenites' শিরোনামে এই 'কায়ন' নামের কারণে উপরিউল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাহাদিগকে কর্মকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে এমন কোনও প্রমাণ পেশ করিতে সক্ষম হন নাই যে, ঐতিহাসিক যুগে তাহারা কর্মকার ছিল। Stade, Wellhausen রচিত Die composition des Hexateuchs (পৃ. ৩০৫) অনুসরণ করত Cain Kenites-কে হাবীলের ভ্রাতা কাবীলের সমার্থবোধক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন (দ্র. পৃ. গ্র.) এবং Ed. Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstamme, পৃ. ৩৯৫ প.; Procksch, Die Volker Alt Palastinas, ১খ, ২য় ভাগ এবং Das Land der Bibel. (পৃ. ২৭) প্রভৃতি একই মতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষে এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লেখক Noldeke, Encyl. Bibl. পৃ. স্থা. গ্রন্থে উপরিউক্ত বিষয়ের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়া এই মতকে সংশয়পূর্ণ মনে করিয়াছেন।

উল্লিখিত বা'ল-কায়ন ও কায়ন এতদুভয়কে সমগোত্রীয় ধরা এইজন্য সিদ্ধ নহে যে, কায়নদের অভ্যুদয়ের পর রেখাবীদের (Rekhabites) ছাড়া কোনও গ্রন্থ তাহাদের কথা উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহাদের কায়ন-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। সম্ভবত তাহারা পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র গোত্রের লোক, যাহারা প্রাচীনকালে কোথাও স্বয়ম্ভরতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই, তাহাদের দেশ ত্যাগের পর এক হাজার বৎসর বিদ্যমান থাকা এমনকি তাহাদের পতনকালেও তাহারা অন্য গোত্রের সহিত মিলিত হইয়া হইলেও এত অধিক শৌর্যবীর্য ও প্রাচুর্য অর্জন করিতে পারে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুত কায়ন নামের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। [দ্র. Wustenfeld : Register zu den Geneal. Tabellen, পৃ. ৩৭১; Lidzbanski : Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, পৃ. ৩৬২; Likmann. Zur Entzifferung d. thamud. Inschriften, পৃ. ৪৫]।

গ্রন্থপঞ্জী : (নিবন্ধের মধ্যে উল্লিখিত ছাড়া) (১) আত-তাবারী, তা'রীখ (সম্পা. de Goeje); (২) আল-আগানী; (৩) য়াকূত, মু'জাম (সম্পা. Wustenfeld), নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্ন হাযম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৪৫৪; (৫) 'উমার রিদা কাহ্হালা, মু'জামু কবা'ইলি'ল-'আরাব; (৬) E. I.[2], ৪খ, পৃ. ৮১৯।

সম্পাদনা পরিষদ ও A. Fischer (দা.মা. ই.)/ মোঃ মাজেদুর রহমান

কায়না (قينة) : ব. ব. কায়নাত কিংবা কিয়ান "গায়িকা ক্রীতদাসী" (বাইজী)। আরব অভিধান রচয়িতাগণ শব্দটির আদি অর্থ সম্পর্কে একমত নন (LA, TA : ঐ শিরোনাম দ্র.)। তাঁহারা শব্দটির প্রকৃতি ও ব্যুৎপত্তিগত মূল অবহিত নন। তাঁহারা শব্দটিকে সচরাচর যে ক্রীতদাসীর উপর বিভিন্ন কর্মভার অর্পণ করা হয়, প্রথমত তাহার ক্ষেত্রে (আমা, জারিয়া) এবং দ্বিতীয়ত, যে গায়িকা ক্রীতদাসী সামাজিক মর্যাদায় হীনা, বিশেষত তাহার বেলায় ব্যবহার করিতে আগ্রহী (আমা, জারিয়া, মুগান্নিয়া)। কোনও কোনও অভিধান রচয়িতা কায়না শব্দটিকে উহার ৫ম রূপ তাকায়্যানা "নিজকে ভূষিত করা" শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করিতে আগ্রহী (আল-ওয়াশ্শা', মুওয়াশশা, ১৬৪, আল-ইমা' আল-মূতাকায়্যিনাত আল-মুতাজার্‌রিফাত, "সুন্দরী মার্জিতা ভদ্র মহিলা" এই শব্দ দুইটিকে সমার্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন)। অন্যরা কায়না শব্দটিকে কায়ন 'শ্রমিক', বিশেষত 'কর্মকার'-এর স্ত্রীবাচকরূপে ব্যবহৃত দেখিতে এবং উহাতে আদি "কর্মরতা মহিলা" কিংবা "কেশ বিন্যাসকারিণী" আরোপ করিতে ইচ্ছুক। নাসিরু'দ-দীন আল-আসাদ এই পদটি সম্পর্কে বিশদ গবেষণা পরিচালনা করিয়াছেন (আল-কিয়ান-ওয়া'ল-গিনা'ফিল-'আসরিল-জাহিলী, কায়রো ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৫-২৪)। দুই অক্ষরবিশিষ্ট قن-এর সঙ্গে قين ,قن, (কিন্ন) قنى প্রভৃতি মৌলিক শব্দাবলীর অর্থগত সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া তিনি বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় সমার্থবোধক শব্দনিচয়ের অস্তিত্ব লক্ষ করেন। তিনি Xpivw এবং cano-এর সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য লক্ষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সেমিটিক ভাষাসমূহের ঐ সকল শব্দ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল ভাষায় আরবী শব্দাবলী গ্রহণের সম্ভাবনার লক্ষ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত না দিয়া কিংবা P. Anastase (আল-ইকলীল, ৮খ, ১৬৫) যিনি قين-কে Cano-এর একটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং আরবী শব্দ গান্না 'গান গাওয়া'কে ক্রিয়া দুইটির যে কোন একটির মূল বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাকে অনুসরণ না করিয়া উল্লিখিত সম্পর্কে সত্যতা নিরূপণের মধ্যেই আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, খুব সম্ভব আসিরীয় 'কিনীতু' আরবী কায়ন-এ রূপান্তরিত হইয়াছে (গিনা' দ্র)। প্রাচীনকালেও গায়িকা বুঝাইতে অন্যান্য শব্দের সপক্ষে প্রমাণ মিলিয়াছে : কারীনা (ইব্ন খুর্‌রাদায বিহ,. কিতাবু'ল-লাহও ওয়া'ল-মালাহী, সম্পা. আই. এ. খালিফে, বৈরূত ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ২০), মুসমি'আ (যাহা সম্ভবত ইসলাম বিষয়ক, ঐ ১৭), দাজিনাঃ ও মুদ্জিনা (আসাদ, পৃ. গ্র., ২৭), সাদূহ ও সাদিহা (ঐ, ২৮) এবং পরিশেষে জারাদা 'পঙ্গপাল'।

একটি বিশ্বাসযোগ্য কিংবদন্তী অনুযায়ী আল-জারাদাতানী অথবা জারাদাতা 'আদ নামে পরিচিত দুইজন ক্রীতদাসীই আরব সমাজের প্রথমদিকের গায়িকা উল্লেখ করা হইয়াছে। এমন কি স্বতন্ত্রভাবে তাহাদিগকে যে নাম দেওয়া হয় সেইগুলির বানান (CCaC-এর বিভিন্ন রূপই বিন্যস্ত (আত-তাবারী, ১খ, ২৩৪-৬; আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, সম্পা. Pellat, নির্ঘণ্ট)। তাহারা যে ব্যক্তির অধীনে ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার নামও অজ্ঞাত নহে ঃ মু'আবিয়া ইব্ন বাক্র আল-'ইম্‌লাকী। যে 'আদ গোত্র ঐতিহাসিকভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে য়াছরিববাসীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিয়ান-এর ব্যবহার সম্পর্কিত সত্যতার সমর্থন লাভ করায় ঐতিহ্যটির টিকিয়া থাকা নিশ্চিত হইয়াছে (ইব্ন খুর্‌রাদাযবিহ্, পূ. গ্র., ২০)। প্রাপ্ত সূত্রে ইহাও সমর্থিত হইয়াছে যে, জাহিলী যুগের পরও মদীনায় ক্রীতদাসী গায়িকাদের অস্তিত্ব ছিল (যথাঃ আগানী, সং. বৈরূত, ১৫খ, ৩৪, উহায়হা ইব'নুল-জুলাহ সম্পর্কে)। যে মক্কা নগরী 'আদ গোত্রের প্রভাব বলয়ের বাহিরে ছিল বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও সঙ্গীত আর গান অজানা ছিল না। আল-হীরা রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল-হারিছ ইব্ন কালাদা ইহার প্রবর্তন করে (আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট, ঐ শিরোনামে; আসাদ, পূ. গ্র., ১১৫, ১১৬, ১১৮ ও ১৩১)। কায়নার উৎপত্তি সম্পর্কে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে সমর্থনে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী নাসরী গাস্‌সানীদের কিয়ান সম্পর্কে অনেক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন খুররা-দাযবিহ (পূ. গ্র. ৩৬)-এর মতে জাবালা ইব্‌নু'ল-আয়হাম আল-গাস্‌সানী (দ্র.) দশজন কায়নার মালিক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে বায়যান্টীয় বলিয়া মনে হয় এমন ৫ জন রূমিয়্যা (এশিয়া মাইনর) ভাষায় গান গাহিত।

কবিকুল প্রদত্ত বিবরণীতে আস্থা রাখিয়া বলা যায়, আরবের বড় বড় শহরের বাহিরে বেদুঈন সমাজে কতক কিয়ান বসবাস করিত। অবশ্য উহাদের রচনাবলী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে।

যতদূর জানা যায়, ক্রীতদাসী গায়িকারা হয়ত দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যে দলটি কোনও শহর কিংবা কোনও অভিজাত বেদুঈনের মালিকানাধীন ছিল; ইহার দায়িত্ব ছিল কেবল এককভাবে কিংবা সপরিষদ মালিকের চিত্তবিনোদন করা। অবশ্য তাহার সঙ্গে অন্য ধরনের সম্পর্ক থাকিলেও উহাকে আমল না দিয়া অনেকটা হীনতার মর্যাদার অপর দলটি পানশালার সহিত যুক্ত থাকিত কিংবা ভ্রাম্যমাণ মদ্য ব্যবসায়ীদের অনুগমন করিত। কবিকুল (যথা ঃ তারাফা, "মু'আল্লাকা-এর শ্লোক ৪৯-৫২; আল-আ'শা, রাওয়া'ই', নং ৩১, ২৬-৭; লাবীদ, মু'আল্লাকার শ্লোক ৬১) এই সকল স্ত্রীলোককে মদ্যপান উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের বর্ণনা এমন ভাষায় পেশ করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। সমাজে ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই দুইটি জাহিলী কিয়ানদল সম্পর্কে, বিশেষত এই ক্ষেত্রে আল-আ'শার প্রভাব সম্পর্কে নাসিরু'দ-দীন আল-আসাদ ব্যাপক গবেষণা করিয়াছেন (পূ. গ্র. ১৬৩-২৫৩)।

কয়েকজন কিয়ান— বিশেষত ক্রীতদাসদাসী-ব্যাবসায়ী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুদ'আন (দ্র.)-এর জারাদাতান 'পঙ্গপাল' দলীয় দুইজন নবীন কিয়ানের বিশদ জীবন তথ্য ইসলামের অব্যবহিত পূর্ব হইতেই আমরা অবগত হইয়াছি। ইহার স্বল্পকাল পরেই 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাতাল-এর মালিকানাধীন ফারতানা ও কারীবা/কুরায়বা নাম্নী দুইজন গায়িকা মদীনায় হিজরতকারী মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে মক্কায় প্রচারণার সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় (আল-জাহিজ, তারবী', নির্ঘণ্ট, ফারতানা শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.; সীরা ২খ, ৪১০; নাসাব কুরায়শ, ৪৪২-৩; আসাদ, পূ. গ্র., ৮৬-৭)। কথিত আছে, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক গীত গাহিয়া বেড়াইবার অপরাধে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) উহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (উক্ত দণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলিতে অবশ্য মতান্তর রহিয়াছে)। 'আমর ইব্ন আবী সায়ফী (নাসাব কুরায়শ, ৯০-১) -এর মালিকানাধীন সারা নাম্নী জনৈকা কায়না (আসাদ, পূ. গ্র., ৮৮)-কে হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ মহনবী (স)-এর মক্কা জয়ের অভিপ্রায় জানাইবার জন্য তাঁহার কুরায়শী আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়াছিল (সীরা, ২খ, ৩৯৮, ৪১০, ৪১১)। ৫ম/১১শ শতকের গ্রন্থকার ইবনু'ত-তাহহানকৃত হাবি'ল-ফুনুন ওয়া সালওয়াতু'ল-মাহ্যুন পুস্তকের ১৪শ অধ্যায়ে প্রাচীন কালের কিয়ান-এর একটি তালিকা পাওয়া যায় (পাণ্ডু দারু'ল-কুতুব, নং ৫৩৯, চারুকলা) যাহা আসাদ কর্তৃক প্রকাশিত, পূ. গ্র. ২৬৯-৭২।

ঐ সময় আরও কিছু বেনামী কিয়ান যথারীতি কর্মরত ছিল। সেই সকল ক্রীতদাসী নিশ্চয়ই আরব জাতিভুক্ত ছিল না। অতএব তাহাদের কেহ কেহ সম্ভবত শ্বেতাঙ্গিনী ক্রীতদাসী ছিল; কিন্তু অধিকাংশই ছিল কৃষ্ণাঙ্গী বা বর্ণসংকর। জাবালা ইবনু'ল-আয়হাম-এর ক্রীতদাসীদের মতো কেহ কেহ সম্ভবত তখনও বিদেশী ভাষায় গান গাহিত। তবে অন্যরা আরবের সামাজিক পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হওয়ায় তাহারা যে সকল কবির কবিতা আবৃত্তি করিত, তাহাদের ভাষায় তাহারা সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্তা ছিল। যাহা হউক, নির্ভরযোগ্য দলীলের অভাবে চূড়ান্ত মত দেওয়া যায় না। যখন ১ম/৭ম শতকে হিজাযের পবিত্র শহরগুলিতে গান ও সঙ্গীতের চর্চা হইতে দেখা যায়। মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য হইতে কিছু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেইগুলিও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত নহে। পক্ষান্তরে এই বৃত্তি দুইটির বৈধতা সম্পর্কে আইনগত বিতর্ক তীব্রভাবে শুরু হয়। ফলে উহাদের বিকাশ ব্যাহত করার একটি জোরদার প্রচেষ্টা ছিল মক্কায়, বিশেষত মদীনায়। কারণ মদীনাতে সনাতন আচারনিষ্ঠার মনোভাবই ছিল অধিক। সমস্যাটি প্রেমের কবিতা (গাযাল দ্র.) ও রস-সাহিত্যের সঙ্গেও (আল-জিদ্দ ওয়া'ল-হায্ল দ্র.) সংশ্লিষ্ট। ইসলামে এই ধরনের বৃত্তি বৈধ নয়, তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে গান অবৈধ নয় (দ্র. ফিকহ্-এর গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)।

মদ্যপান নিষেধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাটির নিম্নস্তরের গায়িকাদলের এক বিপুল অংশ অদৃশ্য হইয়া গেলেও যন্ত্র বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞগণকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে, যাহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা দান করিত। গায়িকাদলে মুক্ত ও মুক্তিপ্রাপ্তা নারীরা থাকিলেও উহার প্রধান অংশই ছিল এমন ক্রীতদাসী যাহাদের মনিবগণ ঐ ধরনের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিত যাহাতে তাহাদের ব্যবসায়িক মূল্য বৃদ্ধি পায়। নব নব বিজয় অর্জনের ফলে তরুণ ক্রীতদাসদাসীর সংখ্যা এই দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ইহার পরে কিয়ান-তালিকায় মনোনয়ন লাভেচ্ছুক নারীকে অবশ্যই সুন্দরী ও মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী হইতে হইত। পক্ষান্তরে হাট-বাজারে অধিক হারে বিক্রীত হওয়ার জন্য তাহাদের মেধা ও দক্ষতার অর্থাৎ সঙ্গীতে উচ্চতর শিক্ষা আর উন্নততর বোধশক্তির অধিকারিণী হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। ১ম/৭ম শতক হইতে অত্যুচ্চ মূল্যে (হাজার হাজার দীনার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) কিয়ান ক্রয়ের সুবিদিত কাহিনী প্রায়ই বেশ আলঙ্কারিক ভাষায় রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাল্লামা (দ্র.) ও হাবাবা (দ্র) উহাদের অন্তর্গত পক্ষান্তরে অন্য কয়েক

জনের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইসহাক' আল-মাওসিলী এক মিথ্যা বর্ণনায় বলেন যে (আগামী, ৫খ, ১৫৬), যে সকল গায়িকাকে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহারা আসলে কৃষ্ণকায়া (সূদ) কিংবা 'পীতবর্ণ' (সুফর) অর্থাৎ শ্বেতকায়া ছিল এবং তাহারা তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য মনোনীত হয় নাই বলিয়া তিনি আভাস দেন। কেননা তাঁহার মতে, তাঁহার পিতা ইবরাহীমই সর্বপ্রথম দৈহিক গুণাবলীকে কিয়ানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, যেহেতু উহার ভিত্তিতে অনুরাগী ব্যক্তিদের নিকট তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ১ম/৭ম শতক হইতে প্রচলিত ইতিহাসসমূহের দ্বারা এই তথ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

'আয্যা (দ্র.) আর জামীলা (দ্র.) মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মানে ঐকতান-সঙ্গীত পরিবেশন করিত। অধিকন্তু কিছু সংখ্যক কিয়ান সমভিব্যাহারে জামীলার ঐকতান গায়িকামণ্ডলী গঠিত হইত। আরবের এই দুই ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিল্পীর পরিচালনায় ১ম/৭ম শতকের প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক-গায়িকারা সংগঠিত হয় (গিনা' দ্র.)। উহাদের মধ্যে কেবল মা'বাদ (দ্র)-এর নাম উল্লেখের প্রয়োজন আছে। ইনি সঙ্গীত শিক্ষার্থিনী ও গায়িকা কিয়ানগণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাহাদের চাহিদা ছিল অত্যধিক। এই সম্পর্কে মদীনাস্থ শিক্ষাকেন্দ্রের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রিগণের জন্য ইরাকে, বিশেষত বসরায় ক্রেতার অভাব একেবারেই ছিল না। সেখানে মদীনার শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অবিলম্বে একটি নূতন শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইলে উহা বাগদাদের দরবারের কয়েকজন সর্বাধিক বিখ্যাত গায়িকা তৈয়ার করে। আল-হাদী ও আল-আমীন-এর কায়না বায্ল (আগানী, সং বৈরূত, ১৭খ, ৩২-৭), 'আরীব (আগানী, ২১খ, ৫৮-১০২) যাহার কর্মজীবন আল-মা'মূনের রাজত্বকাল হইতে আল-মুতাওয়াক্কিলের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মুতায়্যাম আল-হাশিমিয়্যা (আগানী), ৭খ, ২৮০-৯৩) এবং শারিয়া (আগানী, ১৫খ, ৩২০-৮) যাহাকে ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহদী পালিত কন্যারূপে গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থকার ইবনু'ল-মু'তায্য যাঁহার জীবনী রচনা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আল-জাহিজ বসরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কায়নাদের একটি বিস্তারিত তালিকা দিয়াছেন (রাসা'ইল, সম্পা. হারূন, ২খ, ২৮৮-৯০) যাহাদিগকে তিনি কূফার কিয়ান অপেক্ষা অধিক পসন্দ করেন। সেই সময় হইতে যে সকল ক্রীতদাসী খলীফাদের জন্মদাত্রী হইয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন (স্বাধীনা মাতার গর্ভজাত খলীফার সংখ্যা অত্যল্প) ও যাহারা মহিলা কবিরূপে সম্মান অর্জন করিয়াছিল ('ইনান দ্র., কিংবা ফাদ্ল-এর মত) এবং যে সকল প্রকৃত গায়িকা একাধারে খলীফার বা অত্যুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাহারও শয়ন কক্ষে কাল যাপন করিতে পারিত, স্বরচিত বা অন্য কবির রচিত গীত গাহিতে পারিত এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিত (যথা ঃ মাহবূবা), তাহাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা সর্বদা সহজ ছিল না। বস্তুত অনেক কায়না ছোট ছোট কবিতা লিখিতে পারিত এবং জরুরী অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া সংকেতের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে কবিতা রচনা করিতে পারিত। এই বিষয়ে তাহারা রাজ-দরবারের কবিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। সঙ্গীতের আঙ্গিক সম্বন্ধে উচ্চস্তরের দক্ষতার ক্ষেত্রে–বিশেষত অত্যুত্তম ইজাযা (দ্র.) সঙ্গীতানুষ্ঠানে তাহাদের দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। একটি অপ্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধে (Recherches sur la poesie des qiyan, Paris-Sorbonne 1970) A. Chirane শতাধিক কিয়ানের নামোল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা কবি বলিয়া গণ্য ছিলেন। যে কয়েক ডজন নাম না জানা মহিলা কবির সংরক্ষিত রচনা সমগ্র রচিত কাব্য সাহিত্য এবং পূর্ব প্রস্তুতি বিনা রচিত কবিতার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র, তাহাদিগকে ঐ হিসাবে ধরা হয় নাই। সচরাচর এই শ্রেণীর কবিতাকে আদর্শস্বরূপ গণ্য করা চলে না, তবে সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও অসামান্য তারুণ্যে-উদ্দীপক গুণাবলীসমৃদ্ধ। উহাতে প্রণয়লীলা ('ইশক) উদারভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ প্রণয়ঘটিত তিরস্কার ('ইতাব) ও বাধ্যতামূলক বিচ্ছেদ বিলাপের দৃষ্টান্তও আছে প্রচুর। পক্ষান্তরে উহাতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা, মুনীবের মৃত্যুতে শোকসঙ্গীতের রচিত কবিতা ও এমন এমন কবিতা রহিয়াছে যাহাতে মাতৃভূমি হইতে বহুদূরে বসবাসরত কিয়ান স্বদেশে ফিরিবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে মদ্যবিষয়ক ও বর্ণনামূলক কবিতাও রহিয়াছে, তবে ছোট ছোট বিদ্রূপাত্মক কবিতার সংখ্যাই বেশী যেইগুলি তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হইত। এই সকল স্ত্রীলোক ছিল উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্তা। তাহাদিগকে কর্মদক্ষতা, আরবী ভাষা ও কবিতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হইত। কথিত আছে, নিযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আর-রাশীদ তাহাদের একজনকে পরীক্ষার জন্য আল-আসমা'ঈকে আদেশ দিলে প্রার্থিনী এত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তর দেয় যে, মনে হইতেছিল যেন সে "কোনও পুস্তক হইতে উত্তরগুলি পড়িয়া শুনাইতেছে" (আল-আনবারী, নুযহা, সম্পা. 'আ. 'আমির, ৭২-৩)। সাহিত্য বিষয়ক পাণ্ডিত্যের জন্য অন্য এক কায়না—যে ছিল ব্যাকরণ-শিক্ষক আল্-মাযীনীর ছাত্রী—খলীফার দরবারে নিযুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করে (Pellat, Milieu, ২৫০ দ্র.)। মান অনুযায়ী এই সকল ক্রীতদাসী বহু কবিতা মুখস্থ রাখিত। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন অবশ্য তাহাদিগকে ধর্মকর্ম হইতে সরাইয়া রাখিলেও ঐতিহ্যগত শিক্ষাদীক্ষায় তাহারা ছিল পারদর্শী এবং ধারণা করা হয় যে, তাহারা আল-কুরআনও অধ্যয়ন করিত। আল-মাস'ঊদী বর্ণিত একটি কারিআর কাহিনীর ভিত্তিতে—যাহাতে তারাব (দ্র)-র একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে (৫খ, ৪২৮-৩১, শা. ২১৮৪-৮৫) ইহা জানা যায়। অধিকন্তু ইহা অজানা নয় যে, ঐ পবিত্র গ্রন্থখানি সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত আর মদীনায় গানের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত "কিরা'আঃ বি'ল-আলহানা"-কে সুনজরে দেখা হয় (ম. তাল্বি, Arabica, v/2 (১৯৫৮ খৃ.) ১৮৩-৯০); ফাকীহদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা মুসলিম জগতের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে (যথা ম. তালবি, Emirat aghlalisde, ৩০৭ দ্র.)।

ইবরাহীম আল-মাওসিলী (দ্র.) একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে এবং তৎপুত্র ইসহাক আতীকা নাম্নী জনৈকা কায়নাকে শিক্ষা দেয়। ৩য়/৯ম শতকের প্রারম্ভে বাগদাদ এই বিষয়ে বসরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে চাহিয়াছিল। বস্তুত কায়না সংগঠনে মদীনা শিক্ষা কেন্দ্রের যে একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল, বসরা তাহার অবসান ঘটাইতে ব্যর্থ হয়। ৩য়/৯ম শতকেও ২য় 'আবদু'র-রাহমান ফাদল, 'ইল্‌ম ও কালাম নাম্নী তথাকথিত "মদীনার রমণী"–ত্রয়কে কর্ডোভায় তলব করেন। তন্মধ্যে শেষোক্তটি নাভার-এর বাসিন্দা। তাহাকে তাহার শিক্ষা সমাপ্তির জন্য হিজাযে পাঠানো হয়। [(১) H. Peres, Poesie andaluse, ৪০-১; (২) E. Levi-Provencal, Hist, Esp. Mus., ১খ., ২৬৭-৮ দ্র.]। যে উমায়্যা আমীর তাহাদিগকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তিনি উহাদের জন্য তাঁহার প্রাসাদ এলাকায় একটি বিশেষ বৃহৎ আরামপ্রদ চত্বর নির্মাণ করান। সেখানে তাহারা খাঁটি যৌথ নৃত্যগীত পরিবেশন করিত। ৩য়/৯ম শতকের প্রারম্ভকালে আগলাবী আমীর যিয়াদাতুল্লাহ্ (২০১-২৩/৮১৭-৩৮) ৩০

হাজার দীনার পরিমাণ অর্থ দ্বারা কিয়ান ক্রয়ের জন্য একজন দূতকে বাগদাদে প্রেরণ করেন (ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, ৫খ, ৩৯৬; তু. হ. হ. 'আবদু'ল-ওয়াহহাব, ওয়ারাকাত, ২খ, ১৯৫)। ইতোপূর্বে বাগদাদ হইতে আল-মুহতাদী কর্তৃক জারীকৃত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও (আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৮খ, ২=শা. ৩১১১ দ্র.) ঐ শতকের শেষে সেভাইল 'রাজ' ইবরাহীম ইব্নু'ল-হাজ্জাজ (২৮৬-৮৯/৮৯৯-৯১১) কামার-কে ক্রয় করার আদেশ দেন। এই নারী ইরাকী কবিতা প্রচারের সহায়তা দান করে এবং এই বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত (H. Peres, পূ. গ্র., ৪১)। যাহারা তাহাদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, সে তাহাদের একজন।

খলীফাকে বহুবার এই শ্রেণীর এক বা কয়েকজন কিয়ান উপহার দেওয়া হইয়াছে (জনৈক মাহবূবা নাম্নীকে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির কর্তৃক খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে দানের মতই; আল-মাস'উদী, সম্পা Pellat, নির্ঘণ্ট)। কিন্তু এমনও ঘটিয়াছে যে, খলীফা নিজেই বাছাই করিয়া লইয়াছেন। কোনও বেসরকারী বৈঠকে কালামু'স-সালিহিয়্যা গান গাহিয়াছে শুনিতে পাইয়া খলীফা আল-ওয়াছিক তাহাকে ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহার মালিক ক্রয় ক্ষমতাবহির্ভূত উচ্চমূল্যসহ মিসর সরকারের অধীনে তাহাকে নিয়োগের সরকারী নিয়োগপত্র দাবী করে (আল-জাহিজ, তারবী', সম্পা. Pellat, ভূমিকা দ্র.)। অন্যদিকে কিয়ান সমাজের শোচনীয় প্রান্তে ইরাকে চিত্ত বিনোদনের বিবিধ ব্যবস্থাযুক্ত রেস্তোরাঁয় ক্যাবারে গায়িকা হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে (কৌতূহলের কথা এই যে, বাশশার, দীওয়ান, ১খ, ১৩৬ পৃষ্ঠায় মদ্যপানের দলে কায়নার গান গাওয়াকে 'রিক্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)। কিন্তু যে কবিতাবলীর উল্লেখ করিয়া কবিকুল সুখ্যাতি বা সমালোচনা করিয়াছেন-যেমন, আল-ওয়াশাহ্' দ্বারা (পূ. গ্র., ১১৯-২৮)—উহারা সেই দলের গায়িকা কি না অথবা সেই কবিগণ আরও সম্মানিত কায়নাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত কি না, যাহাদের অবস্থান নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া শক্ত। ইহা নিশ্চিত যে, প্রথমত বসরায় ও পরবর্তীকালে দূরবর্তী কর্ডোভাসহ অন্যান্য শহরে 'কায়্যান' অথবা মুকায়্যিন'-এর লাভজনক পেশার আবির্ভাব ঘটে। যেই সকল তরুণী বাঁদী কিয়ান হইবার যোগ্য, তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত সংগ্রহ করা হইত ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করিয়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের কাছে ভাড়া দেওয়া হইত। ইহা ছিল কায়্যান বা মুকায়্যিন বৃত্তি। কায়্যান এই প্রত্যাশায় সঙ্গীত-বৈঠকের অনুষ্ঠান করিত যে, তদ্দারা শ্রোতৃবর্গের মনে এমন কামেচ্ছার ভাব জাগ্রত হইবে যাহাতে তাহাদের কামনার লক্ষ্যবস্তু লাভের জন্য তাহারা অত্যধিক মূল্য দিতে দ্বিধা করিবে না। বিশেষ করিয়া উল্লেখ রহিয়াছে জনৈক 'উমার (বা আল- ফাদল্) ইব্ন 'আবিদি'ল-মালিক আল-বাসরী আবু'ন-নাদীর/আবু'ল-বাসীর (আস-সূলী, আওরাক, ১খ, ৮-১০; আগানী, ১১খ, ২৬৭-৭৪)-এর যিনি একজন অখ্যাত কবি, গায়ক ও মুকায়্যিন ছিলেন। আবান আল-লাহিকী তাহাকে যে সকল কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তদ্দারা তাঁহার স্মৃতিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখা হইয়াছে (আস-সূলী, পূ. গ্র., ১খ, ৯; আগানী, ২৩খ, ২৪; রিফা'ঈ, 'আসরু'ল-মা'মূন, ২খ, ৩১৭)। অন্যান্য নামও জানা গিয়াছে, কেননা সেগুলি আল-জাহিজ-এর কিতাবু'ল-কিয়ান-এর শুরুতেই রহিয়াছে (সম্পা. Finkel, Three Essays, পৃ. ৫৩-৭৫; সম্পা. হারূন, রাসা'ইল, ২খ, ১৩৯-৮২; অনু. Pellat, Arabica, x/2, ১৯৬৩ খৃ., ১২১-৪৭)। উল্লিখিত উৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার কায়না জাতীয় নারীদের বিবরণ দিয়াছেন। সেখানে তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাহারা বিত্তশালী দর্শকগণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে আর তাহাদের নৈতিক চিত্র তিনি বিশেষ সুরুচির সঙ্গে অংকন করিয়াছেন। তৎকালীন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিগণের মধ্যে কায়নারা কি ভূমিকা পালন করিত, তৎসম্পর্কে এইরূপে আমরা একটা ধারণা লাভ করি। তাহারা সুকৌশলে উহাদের (অন্তর) অনুরাগ জাগ্রত করিত অথচ তাহাদের পরদানশীন পত্নীরা সাধারণত অশিক্ষিতা–এই রূপ দুর্নিবার আবেদন সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। আরবী সাহিত্যে কিতাবুল'-কিয়ান এক অতুল্য সম্পদ। আল-ওয়াশশা' বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে উক্ত রচনা চুরি করিয়া প্রকাশ করেন, যাঁহার 'মুওয়াশশা' গ্রন্থে কিয়ানরা তাহাদের প্রেমমুগ্ধ (যুবকদের) হৃদয়গুলিকে কিভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছিল সেই সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্বাচিত কবিতাংশের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে (১১৯-২৮)। সংস্কৃতিবান ভদ্র সমাজের (জুরাফা') উপকারার্থে গ্রন্থখানি রচিত। উহাতে "ইমা' মুতাকায়্যিনাত"-দের পোশাক পরিচ্ছদের নিখুঁত বিবরণ রহিয়াছে (পূ., ১৬৪)। উহারা রঞ্জিত বস্ত্রে প্রস্তুত প্রগাঢ় রঙের টিলা পোশাকে সজ্জিত থাকিত। অথচ স্বাধীনা নারীরা শুধু সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিত। উহাতে তাহাদের রীতি প্রথা সম্পর্কে যথা ঃ পাদুকা, ললাট, করতল প্রভৃতিতে লিখিত বাগ বৈশিষ্ট্যাদির অনেক খুঁটিনাটি বিবরণও রহিয়াছে (পূ. গ্র., ২৩৬ প.)।

কায়নাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত যে সকল প্রবন্ধের কথা ইবনু'ন-নাদীম এবং য়াকূত দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, সাহিত্যিক মূল্য বিচারে ঐগুলি আল-জাহিজ ও আল-ওয়াশশার গ্রন্থাবলীর তুলনায় সম্ভবত অনেক নিম্নমানের। কেননা ঐগুলিতে কিতাবু'ল আগানীর কায়দায় কেবল ক্ষুদ্র কাহিনী ও কবিতার স্তবকাদি সংকলিত হইয়াছে। আল'আমরূসী কর্তৃক কার্যকরীভাবে একত্রে সেইগুলির সারসংক্ষেপ সংগৃহীত হইয়াছে (আল-জাওয়ারি'ল-মুগান্নিয়াত, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.)। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ (১) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-মাওসিলীকৃত কিতাবু কিয়ানি'ল-হিজায এবং (২) কিতাবু'ল-কিয়ান (ফিহরিস্ত, ২০২; উদাবা', ৬খ, ৫৬); (৩) য়ূনুস আল-মুগান্নীকৃত কিতাবু'ল-কিয়ান (ফিহ্‌রিস্ত, ২০৭); (৪) আল-মাদা'ইনীকৃত কিতাবু'ল-কায়নাত (উদাবা', ১৪খ, ১৩৩); (৫) আল-মুফাজজা'কৃত আশ'আরু'ল-জাওয়ারী (ফিহরিস্ত, ১২৩; উদাবা' ১৭খ, ১৯৪); (৬) সুলায়মান ইব্ন আয়ূনকৃত কিতাবু কিয়ানি'ল-হিজায এবং (৭) কিতাব কিয়ান মাক্কা, (ফিহরিস্ত, ২১২; উদাবা', ১১খ.); (৮) আবু'ল ফারাজ রচিত গ্রন্থ কিতাব আখবারি'ল-কিয়ান (উদাবা', ১৩খ, ৯৯; Brockelmann, S. I., ২২৬)। উল্লিখিত তালিকাভুক্ত গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। উহাদের সঙ্গে ইবনু'ত -তাহহান রচিত যে অধ্যায়টির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত নিম্নোক্ত কাব্য সঞ্চয়নগুলিও যোগ করিতে হইবে ঃ (১) ইবনু'ল-মু'তায্য রচিত তাবাকাত; (২) আল-মাস'উদীকৃত মুরূজ কিংবা (৩) আল-মাকক'রীকৃত নাফহু'ত-তীব। অধিকন্তু নিম্নোক্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থগুলির কিয়ান বিষয়ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ঃ

(১) ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ প্রণীত 'ইক্দ (৪খ, ১২৭-৩৮); (২) আল-ইবশীহীকৃত মুস্তাতরাফ (২খ, ২১১-৭); (৩) আন-নুওয়ায়রীকৃত নিহায়াতু'ল-আরব (৫খ, স্থা.) এবং নারী সম্পর্কিত গ্রন্থবলী (যথাঃ ইব্ন

কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আখবারু'ন-নিসা', সম্পা. ন. রিদা, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ., অথবা 'উ. র. কাহ্হালাকৃত গবেষণাধর্মী পুস্তক কিতাব আলামিন-নিসা,' দামিশক ১৯৭৯/১৯৫৯) কিংবা যেইগুলি মহিলা কবিদের সম্পর্কে লেখা কিন্তু খোয়া গিয়াছে। দরকারী তথ্যাদি শেষ পর্যন্ত এই সকল কিতাবে মিলিবে : (১) ইবনু'স-সা'ঈ রচিত (সম্পা. ম. জাওয়াদ, কায়রো তা. বি.) বলিয়া গণ্য নিসা'উ'ল-খুলাফা,' (২) সুয়ূতীকৃত (সম্পা. স. আল-মুনাজজিদ, বৈরূত ১৯৬৩ খৃ.) আল-মুসতাজরাফ মিন আখবারি'ল-জাওয়ারী।

৪র্থ/১০ম শতকের পর যদিও কোনও কোনও কায়নার নাম উল্লিখিত হইতে দেখা গিয়াছে, তবুও তাহা সর্বক্ষেত্রেই ছিল ছদ্মনাম। প্রাপ্ত সূত্রাদি মতে এই সম্পর্কিত বংশপরম্পরাগত কাহিনী মূলত হিজরী ১ম শতকে যে সকল কিয়ান স্থায়ী সুখ্যাতি অর্জন করে, তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া রচিত। এই বিষয়ে মদীনা ও বসরার পর বাগদাদই মুসলিম জগতের কেন্দ্র ছিল। আত-তাওহীদী (ইমতা', ২খ, ১৮৬) আল-কারখ (দ্র.) শহরের ৪৬০ জন ক্রীতদাসীর (ও ১২০ জন স্বাধীনার) একটি তালিকা দিয়াছেন যাহাদের মধ্যে ২০ জনের নামসহ তাহাদের প্রত্যেক যে সকল গান (কবিতাংশ) গাহিত, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল-আযদী যে সকল কায়নাকে বিখ্যাত করিয়াছেন (হিকায়াত আবি'ল-কাসিম, ৭০ প.) তাহারাও বাগদাদের বাসিন্দা। আত-তাওহীদীর মত (পূ. গ্র.) তিনি তারাব অর্থাৎ যে সকল আত্মসংযমী ব্যক্তিত্ব তাহাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন অথচ অনেক ক্ষেত্রে প্রবল উত্তেজনা ও উল্লাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহাদের তখনকার চিত্রানুগ বর্ণনা দিয়াছেন। এতদনুসারে যে সকল ক্রীতদাসী গায়িকার গুণাবলী সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাদের আদি বাসভূমি যেখানেই থাকুক, বাগদাদই তাহাদিগকে সরবরাহ করিয়াছে বিশেষত ফাতিমী বংশীয় তামীম আল-মু'ইয্য (মৃ. ৩৬৮/৯৭৮, in Mez, Renaissance, ইং অনু. ৪০১)। ইব্ন বুতলান (মৃ. ৪৫৪/১০৬২)-এর যে কবিতাংশ মেয-এ উদ্ধৃত হইয়াছে পূ. গ্র, অনু. ১৬১; রিসালা ফী শিরা'ই'র-রাকীক ওয়া তাক্লীবি'ল-'আবীদ, গ্রন্থে মূল পাঠ, সম্পা হারূন, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ৩৪৭; আস-সাকাতী কর্তৃক পুনর্বার গৃহীত, হিসবা, ৫০, যাহা Chalmeta কর্তৃক "আল-আন্দালুস" পুস্তকে ৩৩/২ খ. (১৯৬৮ খৃ.) ৩৭৫ ও ৮নং টীকায় স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত তাহা সম্ভবত কিয়ান-সম্পর্কিত। কেননা উহাতে বলা হইয়াছে যে, ওখানে আদর্শ ক্রীতদাসী ছিল বারবার সংস্কৃতিভুক্ত স্ত্রীলোক—যে জীবনের ৯ বৎসর বয়স হইতে প্রথম ৩ বৎসরকাল মদীনায়, তৎপরবর্তী ৩ বৎসরকাল মক্কায় এবং তাহার পর ৯ বৎসরকাল ইরাকে বসবাস করিত। শেষোক্ত স্থান (ইরাকে) সে আদাব শিক্ষা করিত।

ইহাও জানা গিয়াছে যে, মাগরিব (আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল) জয়ের অব্যবহিত পরেই কিয়ান দলকে অকুস্থলেই অর্থাৎ যেখানে দরকার ঠিক সেই স্থানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত, যদিও প্রাচ্যের দলের সঙ্গে তাহাদিগকে বিনিময় করাও হইয়াছে (M. Talbi, Emirat aghlabide, ৩৫)। ইহার অনেক পরেও ইফরীকিয়াতে ক্রীতদাসী গায়িকাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল (R. Brunschvig Hafsides, ২খ, ৪১২; তু. Leo Africanus, Description de l'Afrique ৩৮৮)। কিন্তু ইহা সম্ভবপর যে, কেহ কেহ হয়ত মধ্যপ্রাচ্য বা স্পেন হইতে আসিয়াছিল। যাহা হউক য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন খলীফা আল-মু'তামিদকে একটি বারবার স্ত্রীলোক উপঢৌকন দিলে একটি মারাত্মক ভুলের দরুন স্ত্রীলোকটি করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে (H. Peres, পূ. গ্র. ১৩)। সে নিশ্চয়ই মরক্কোয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু যাহার নিজের মালিকানায় একটি কিয়ান দল ছিল সেই যিরয়াব (দ্র.)-এর আগমনের সময় হইতে কর্ডোভা গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এইভাবে এই সময় হইতে অভিজাত কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাগদাদের দিকে তাকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। কেননা সেখান হইতে কিয়ান দল আমদানী তখন বিরল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় (E. Levi-Provencal, পূ. গ্র. ৩খ, ৩১৬)। খলীফা আল-মানসূর ও আল-মুজাফ্ফার কর্তৃক (আদ-দাব্বী, বুগয়াঃ, নং ৮১; Boustany. DM. ৩খ, ৪৭৭) ইবনু'ল-কাত্তানী (H. Peres. পূ. ৩৮৩-৫; ২য় সংশোধন করিয়া তিনি নামটি আল-কিনানী করেন; E. Levi-Provencal, পূ. গ্র., ৩খ, ৩১৭) নামক জনৈক চিকিৎসককে নিয়োগ করার পক্ষে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ক্রীতদাসগুলিকে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন জ্যামিতি, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র, সাহিত্য এবং সুন্দর হস্তাক্ষর শিক্ষা দিয়া অতি উচ্চ মূল্যে (একটি ক্ষেত্রে উহা ছিল ও হাজার দীনার) তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। আন্দালুসীর কায়নারা হাতের কৌশল ও অস্ত্রের খেলায় দক্ষতা প্রদর্শন করিত, বৃহৎ ঐকতান বাদকদল 'সিতারা' গঠন করিত। নামটি রঙ্গমঞ্চের ঐ যবনিকার নামানুসারে রাখা হয়, যাহা তত্ত্বীয়ভাবে প্রাচ্যে গায়ক-গায়িকা, সঙ্গীতবিদ সুরকারদের সংস্রব হইতে খলীফাকে আলাদা রাখিত (মেয, পূ, গ্র. ৪৭৯)। স্পেনে উমায়্যাদের পতন ঘটিলে ওদিকে মুলূকু'ত-তাওয়া'ইফ সর্বাধিক কর্মদক্ষ গায়িকাদের মালিকানা লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ করে। আল-মুরাবিত ও আল-মুওয়াহ্হিদগণের আগমনের ফলেও তাহারা ঐ কলহের অবসান ঘটায় নাই। বিষয়টি সম্পর্কে কর্ডোভা যে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিতেছিল, ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের পর হইতে Seville তাহাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করে। আত-তীফাশী (মৃ. ৬৫১/১২৫৩ কৃত গ্রন্থ "মুত'আতু'ল-আসমা' ফী 'ইলমি'স-সামা' যাহা হ. হ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব তাঁহার 'ওয়ারাকাত'-এর ২৩১-২ পৃষ্ঠায় আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে এই কথার একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। Sevill-বাসী যে সকল গায়িকাকে পরবর্তীকালে উত্তর-আফ্রিকায় বিক্রয় করিত, তাহাদিগকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত, আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিরবণ রহিয়াছে। স্পেনেও পরবর্তীকালে উত্তরাংশে কায়নারা মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে কিছুটা যোগসূত্রের কাজ করিত—উভয় দলই অনুগামী লোকজনরূপে তাহাদিগকে সঙ্গে রাখিত। তাহাদের কেহ কেহ তখনও আরবী ভাষায় গান গাহিত, ইব্ন বাস্সাম এই বিষয়ে মর্মস্পর্শী দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়াছেন (H. Peres. পূ. গ্র. ৩৮৬-৭)। সাংস্কৃতির ভিন্ন একটি পর্যায়ে মুওয়াশশাহাত (দ্র. মুওয়াশশাহ ও যাঁজাল)-এর 'খারজা'য় ছন্দিত বীরত্ব কাহিনী যোগ করার ক্ষেত্রে, এমনকি উহাদের সংস্থাপন প্রণালী রচনায় আন্দালুসীয় কানারা সম্ভবত অসংশ্লিষ্ট ছিল না।

ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের পর হইতে প্রকৃত কায়নাবৃত্তি আর কখনও চোখে পড়ে নাই। কিন্তু যাহারা মধ্যযুগে গায়িকার দল গঠন করিয়াছিল, তাহাদের স্থলে বর্তমানে স্বাধীনা নারীদের গায়িকাদলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মরক্কোতে যাহাদিগকে শীখাত বলা হইয়া থাকে (এ. ব. শীখা শীখ বা শায়খ-এর স্ত্রীলিঙ্গ) তাহারা সজ্ঘ গঠন করে এবং পারিবারিক বা ধর্মীয় খানাপিনার উৎসবাদিতে অংশ গ্রহণ করে। ফাস (ফেয) শহরে

তাহাদের অভিনেত্রীদলের বিভিন্ন বৈচিত্রমূলক নাটকের পটে আন্দলুসীয় গান, কথা ভাষায় কবিতা ও এমনকি আলজিরীয় গানও অন্তর্ভুক্ত ছিল (R. Le Tourneau, Fes avat le Prototorat, Casablanca 1949, 561)। হীনতর মর্যদার 'গিন্নায়াত' দল কখনও কখনও পারিবারিক ভোজ-উৎসবাদির জন্য সংরক্ষিপ্ত কবিতাদিও রচনা করিত (E. Aubin Le Maroc, Paris 1912. 345-51)।

অবশ্য ক্লাসিকাল যুগের যে সকল কায়না আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করিত তাহাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই অজ্ঞাত। মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস কায়নার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সম্পর্কে S. Jargy মন্তব্য করিয়াছেন (La musique arabe coll "Que sais-je?", no 1436, Paris 1971, 39-40), "প্রত্যেক প্রতিভাবান মুসলিম গায়কের কর্মজীবনের উন্নতির মূলে এমন একজন কায়নার অবদান ছিল যিনি তাঁহার ছাত্র।" কেবল তাহাই নহে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কায়নারা তথাকথিত 'আধুনিক' (মুহদাছ) কবিতার বিকাশের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণও করিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব রচনার দ্বারা—স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে যাহার প্রকৃত মূল্য বিভিন্ন প্রকারের ছিল—এবং কাবিকুলের প্রেরণাদাত্রী হিসাবে তাহারা সাহিত্য সেবা করে। 'আব্বাসী সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত, তখন তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের বৈঠকখানায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটাইত। তথাকার মেহমানগণ সঙ্গীত ও গান শুনিতে শুনিতে উদ্ভাবনী শক্তি প্রতিযোগিতা এবং উপস্থিত রচনা ও আবৃত্তিতে প্রতিযোগিতা করিত।

কায়নাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অসংখ্য কবি তাহাদের মোহিনী শক্তির তারিফ করিয়াছেন অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে নির্মমতার অভিযোগ করিয়াছেন। ইব্ন কুতায়বার মতামত যাহাই হউক না কেন, এই ব্যাপারে সকল শ্রেষ্ঠ মুহদাছ কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কায়নাদের প্রশংসায় বাজে কবিতা আবৃত্তি করাই যাহাদের অভ্যাস ছিল, প্রশাসনের সেই সকল সচিবদের বিরুদ্ধে ইব্ন কুতায়বা তাঁহার "আদাবু'ল-কাতিব"-এর ভূমিকায় জোরালো নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন (দ্র. G. Lecomte, in Melanges Massignon, iii, 51)। (কায়না সম্বন্ধে প্রবন্ধে প্রদত্ত বিবরণ মুসলিম সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলামী শারী'আতের প্রাণসত্তার সহিত উহার দূরতম সম্পর্কও নাই)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধ বক্ষে প্রধান প্রধান সূত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে নিম্নোক্তগুলি যোগ করা যাইতে পারে (১) জ. 'আবদু'ন-নূর আল-জাওয়ারী, কথ্য, ইকরা' সংখ্যা ৫৯, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.; (২) আ. ম. আল-হাওফী, আল-মার'আতু ফি'শ-শি'রিল-জাহিলী, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ৪৩৮-৬৫; (৩) গিনা শীর্ষক নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত আরবী সঙ্গীতের ঐতিহাসিকের নাম; (৪) G. H. Farmer, The sources of Arabian music, Leiden 1965; (৫) 'ঈসা সাবা, আল-মুগান্নিয়াত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৫৪ খৃ.; (৬) D. Boustany, Ibn ar-Rumi, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ৫৬-৬১ এবং গ্রন্থপঞ্জী; (৭) 'আবদু'ল-কারীম আল-'আল্লাফ, কিয়ান বাগদাদ ফি'ল-'আসরি'ল-আব্বাসী ওয়া'ল-'উছমানী ওয়া'ল-আখীর, বাগদাদ ১৯৬৯খৃ.; (৮) J.-C. Vadet., L'esprit courtois en Orient, Paris 1968, 241-6; (৯) J. E. Bencheikh, Les voies d'une treation, 214-6 (doctoral hesis, Sorbonne, 1972); (১০) S. D. Goitein, Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza records, in Arabica ১০/১খ, ১৯৬২ খৃ. ১-২০; (১১) Thousand and One Nights, ৩৩৪, ৩৮৩, ৪৩৬ ও ৮৯৬ তম রাত্রির কাহিনীতে কায়নাদের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে; (১২) ক্রীতদাসদের মর্যাদা সম্পর্কে 'আবদ দ্র.; (১৩) সমাজে তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে B. Lewis, Race and color in Islam, New York-London 1971 ও উহার গ্রন্থপঞ্জী।

Ch. Pellat (E. I.[2])/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

কায়নুকা' (قينقاع) ঃ বানূ কায়নুকা' য়াছরিব (يثرب) মদীনার পুরাতন নাম)-এর একটি য়াহূদী গোত্রের নাম। মহানবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে তথায় তিনটি য়াহূদী গোত্র—বানূ নাদীর, বানূ কুরায়জা ও বানূ কায়নুকা বাস করিত। কায়নুকা শব্দটি আরবী নাম হইতে কিছুটা ভিন্ন ধরনের, অথচ হিব্রু ভাষার সহিতও ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। ইব্ন খাল্দূন বলিয়াছে যে, তাহারা মদীনার একপ্রান্তে বসবাস করিত। ইহাদের য়াছরিব আগমনের সময় সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। সেখানে তাহাদের কৃষিভূমি ও ফলের বাগান কোনও কিছুই ছিল না। তাহারা পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী বা স্বর্ণকার ছিল (বুখারী, ফারদু'লখুমুস, ১, মাগাযী, ১২)। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)-ও এই গোত্রের লোক ছিলেন। ইহাদের যে সমস্ত ব্যক্তিবাচক নাম আমাদের জানা আছে তাহার অধিকাংশ আরবী। কিন্তু এইগুলির দ্বারা তাহাদের মূল বাইবেলীয় নাম কি ছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাহারা যে য়াহূদী ছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নাই। য়াছরিবে তাহারা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে মুসাল্লার কাছে ওয়াদী বুতহান-এর উপরস্থ সেতুর সন্নিকটে বাস করিত। সেখানে তাহারা য়াছরিবী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দুইটি সুরক্ষিত দুর্গের অধিকারী ছিল। য়াহূদীদের হাত হইতে য়াছরিব-এর কর্তৃক বানূ কায়লার হাতে চলিয়া গেলে বানূ কায়নুকায় খায্রাজ (দ্র.) গোত্রের সহিত বন্ধু সূত্রে মিলিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে ইমাম বুখারী (র) বানূ কায়নুকা'র একজন স্বর্ণকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পূ. গ্র.)। বানূ কায়নুকা' গোত্রে সাত শত যোদ্ধা ব্যক্তি ছিল, তন্মধ্যে তিন শত ছিল লৌহবর্মধারী সৈন্য।

মদীনায় হিজরত করিবার পর রাসূল করীম (স) মদীনায় য়াহূদীদের অর্থাৎ বানূ কায়নুকা', ও বানূ কুরায়জার সহিত এক লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, যাহার প্রেক্ষিতে বংশগোত্র ভেদে সমস্ত মুসলিমগণ এক উম্মা ও য়াহূদীগণ পৃথক আর এক (ভিন্ন) জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মুসলিম ও য়াহূদীদের জন্য পূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার আশ্বাসবাণী উহাতে ঘোষিত হয়। উভয় জাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিরোধ মীমাংসার জন্য মহানবী (স)-এর শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যদি কোনও শত্রুপক্ষ মদীনায় মুসলিমদের আক্রমণ করে, তবে উভয় গোত্রই সম্মিলিতভাবে তাহা প্রতিহত করিবে এবং মুসলিম ও য়াহূদীগণ স্ব স্ব ব্যয়ভার বহন করিবে। এই চুক্তিতে মদীনাকে হারাম (পবিত্র) বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হয় (দ্র. ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ, ১১৯-১২৩)।

রামাদান ২/মার্চ ৬২৪ বদরের যুদ্ধের পর মদীনার য়াহূদীদের সহিত রাসূল কারীম (স)-এর সম্পর্ক তিক্ত হইয়া ওঠে। কারণ বদ্র যুদ্ধে মুসলিমদের সফলতা ও বিজয় দর্শন করিয়া বানূ কায়নুকা' এবং অন্যান্য য়াহূদী গোত্রের জনগণের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যদিও মুসলিম ও য়াহূদীগণের মধ্যে পরস্পর সাহায্য সহানুভূতির

চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল এবং য়াহূদীগণ স্বীয় ধর্মকে ইসলামের মতোই প্রেরণার উৎস ও উদ্দীপনাব্যঞ্জক মনে করিত ও নিজেদেরকে আহ্‌লে কিতাবও ভাবিত, কিন্তু মাক্কার কুরায়শগণের পরাজয়ে তাহারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়। য়াহূদীগণ সম্মিলিতভাবে রাসূল (স)-এর সহিত অবন্ধুসুলভ আচরণ শুরু করে। তাহারা মুসলিমদের ক্রমবর্ধিষ্ণু শক্তি নিজেদের জন্য ভীতির কারণ মনে করিল। য়াহূদীগণ প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুতা করিতে লাগিল এবং ইসলামকে ধ্বংস করিয়া দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বদরের যুদ্ধে পরাজিত মক্কার কাফিরগণের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। য়াহূদী কবিগণ প্রকাশ্যে মুসলিমদের উদ্দেশে ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও গান রচনা করে। কা'ব ইব্‌ন আশরাফ (দ্র.) ছিল কায়নুকা'র কবি ও নেতা। সেও এই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ভূমিকা পালন করে। সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাদের ও রাসূল (স)-এর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে থাকে। কা'ব মক্কায় যাইয়া নিহত কাফিরদের সম্পর্কে শোকগাথা গাহিয়া কুরায়শদেরকে মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

রাসূল (স) বানূ কায়নুকার প্রতারণা, চুক্তিভঙ্গ ও বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাইয়া তাহাদের নেতৃস্থানীয় জনগণকে একত্র করিয়া সদুপদেশ প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাহাদের আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূল (স) সম্পর্কে যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দেন। রাসূল (স) ঘোষণা করেন, "তোমরা ভাল করিয়াই অবগত আছ যে, আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত নবী। ইসলামের আহ্বানে সাড়া না দিলে তোমাদের অবস্থা ঠিক তেমনই হইবে, যেমনটি বদ্‌রের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের হইয়াছিল।" কিন্তু বানূ কায়নুকা'-র লোকেরা উক্ত আহ্বানে সাড়া দিল না, বরং তাহারা বলিল, "যখন আপনি আমাদের সহিত কর্মক্ষেত্র অবতরণ করিবেন, তখন আপনিও উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আমরা কিরূপ লোক" (ইব্‌ন কাছীর, আস্-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, ৩খ, ৫; ইব্‌ন খালদূন, উর্দূ অনু. ১খ, ৩৩২-৩৩৩)।

ইতোমধ্যেই অন্য একটি দুঃখজনক, ঘটনা ঘটে। মাকবূল আল-বালাযূরী নামক একজন মুসলিম মহিলা বানূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক য়াহূদী স্বর্ণকারের দোকানে গহনা তৈরীর উদ্দেশ্যে গমন করেন (ইব্‌ন কাছীর বলেন, একজন আরবীয় মহিলা তথায় দুধ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গিয়াছিল, আস্-সীরাতু'ন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ৬)। তখন সেই স্বর্ণকারটি মুসলিম মহিলাটিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাঁহার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে। মহিলাটির ফরিয়াদ শুনিয়া জনৈক মুসলিম য়াহূদী স্বর্ণকারকে হত্যা করে। প্রতিশোধ গ্রহণের আবেগে য়াহূদীগণও উক্ত মুসলিমকে শহীদ করে। ফলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। রাসূল কারীম (সা) মদীনা মুনাওওয়ারায় আবূ লুবাবা বাশীর ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুনযির আনসারী (রা)-কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং বানূ কায়নুকা'কে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বয়ং রওয়ানা হইয়া যান। রাসূল (স) মুসলিম মুজাহিদগণকে সঙ্গে লইয়া বানূ কায়নুকা' গোত্রের য়াহূদীগণকে অবরোধ করেন। ১৪/১৫ দিন অবরোধ করিয়া রাখিবার পর অবস্থা বেগতিক দেখিয়া য়াহূদীগণ শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে। রাসূল (স) তাহাদিগকে বন্দী করেন। তাহাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে মুন্‌যির ইব্‌ন কুদামা আস্-সুলামীকে নিযুক্ত করা হয়। মুনাফিক্‌দের প্রধান নেতা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যি তাহাদের পক্ষ হইতে রাসূল (স)-এর নিকট তাহাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করে। রাসূল (স) বানূ কায়নুকা'কে সিরিয়ায় নির্বাসন প্রদানের নির্দেশ দেন। তাহারা প্রথমে মদীনায় উত্তরে ওয়াদি'ল-কুরার য়াহূদী বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখান হইতে সিরিয়ার আয্‌রি'আতে চলিয়া যায় (আল-বালাযুরী, আন্‌সাবু'ল-আশরাফ, ১খ, ৩০৮, ৩০৯)।

বানূ কায়নুকা' গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা মদীনাতেই থাকিয়া যায়। ইব্‌ন হিশাম/ইব্‌ন ইস্‌হাক রাসূল (স)-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে ৩০জন বানূ কায়নুকা'র তালিকা প্রদান করেন (৩৫৯ পৃ.)। হয়ত ইহা দ্বারা নির্বাসন-পূর্ব সময়কে বুঝানো হইয়াছে। তালিকার ৫/৬টি নাম ওয়াকিদীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। ৯/৬৩১ খৃ. ইব্‌ন উবায়্যি-এর দাফনের সময় বানূ কায়নুকা' এবং অন্য গোত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ভিড় ঠেলিয়া লাশের খাটিয়া পর্যন্ত গিয়াছিল (Wellhausen, ৪১৫)। কায়নুকা' গোত্রের আরেক ব্যক্তি ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (প্রকৃত নাম আল-হুসায়ন, দ্র.)। ইনি ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক প্রদত্ত তালিকার উপসংহারে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরই ইসলাম কবূল করেন। Horovitz বলেন যে, তিনি হিজরতের ৮ বৎসর পর এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইনতিকালের দুই বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, ২খ, কলিকাতা ১৮৯৩ খৃ., ৭৮০-২)। বানূ কায়নুকা'র যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সীরাত রচয়িতাগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল-বালাযুরী, ইব্‌ন খালদূন প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। কিন্তু ইব্‌ন কাছীর বলেন যে, ইহা হিজরী ৩য় সালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহা নিশ্চিত যে, এই যুদ্ধ বদ্‌রের যুদ্ধের পর ও উহুদের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। কোনও এক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 'আমার্‌রা'-র যুদ্ধ ৩য় হিজরীর মুহাররাম মাসে গাতাফান গোত্রের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার ফলে সংঘটিত হয়। রাসূল (স) 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা)-কে মদীনায় তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং স্বয়ং নাজদ্ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেইখানে সাফার মাস অতিবাহিত করেন এবং বিনা যুদ্ধেই প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপর হিজরী ৩ সালে রাবী'উল-আওওয়াল মাসে একদল সৈন্য লইয়া হিজাযস্থ বুহরান নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন। সেইখানে একটি খনি আছে। কিন্তু কুরায়শগণের সহিত যুদ্ধ করার সুযোগ হয় নাই। রাসূল (স) তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যেহেতু বানূ কায়নুকা'র যুদ্ধ ইহার পর সংঘটিত হয়, সেহেতু ইহার তারিখ ৩য় হিজরী-ই নির্ধারিত করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld. ৩৮৩, ৫৪৫-৭; (২) ওয়াকিদী, সম্পা. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ., ১৭৬-৮০ (সংক্ষিপ্ত জার্মান অনু. Wellhausen. ৯২-৪); (৩) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ২/১খ, ১৯ প. ; (৪) আল-বালাযুরী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ১খ, সম্পা. হামীদুল্লাহ্, কায়রো ১৯৫৯ খৃ., ২৮৫, ৩০৮ পৃ. (৫) ঐ লেখক, ফুতূহু'ল বুলদান, পৃ. ১৭; (৬) তাবারী, ১খ, ১৩৫৯-৬৪; (৭) দিয়ার বাকরী, তা'রীখু'ল খামীস, কায়রো ১২৮৩ হি. ৪০৮ প.; (৮) হালাবী, আস্-সীরা, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৪, ২খ, ৪৭৪-৮; (৯) L. Caetani, Annali dell' Islam, i, ৫২০-৪; (১০) A. J. Wensinck, Mchammed en de Joden te Medina, Leiden ১৯০৮ খৃ. ৩৯, ১৪৬-৫১; (১১) R. Leszynsky, Die Juden in Arabien বার্লিন ১৯১০ খৃ., ৬০-৩; (১২) Frants Buhl, Das Leben Muhammeds, Leipzig ১৯৩০ খৃ.,

২৪৮ প.; (১৩) H. Z. Hirschberg. Yisra`el ba'Arabh, Tel Aviv ১৯৪৬খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৪) W. M. Watt, Muhammad at Medina, অক্সফোর্ড ১৯৫৬ খৃ., ১৮১ পৃ. ১৯২-৮, ২০৮-১০, ২১৬ প. ২১৯ প., ২২৬-৮; (১৫) ইব্ন হায্ম, জাওয়ামি'উ'স-সীরা., পৃ.১৫৪; (১৬) ইব্ন সায়্যিদি'ন-নাস, 'উয়ূনু'ল-আছার, ১খ, ২৯৪; (১৭) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, ৩খ, ৫ ও ৬ (=আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৪খ, ৩ ও ৪); (১৮) আল-মাকরীযী, ইমতা'উল-আস্মা', ১খ, ১০৪; (১৯) মুহাম্মাদ জামালু'দ-দীন সুরূর, কিয়ামু'দ-দাওয়াতি'ল-'আরাবিয়্যাতি'ল-ইসলামিয়্যা ফী 'আহ্দি'ন-নুবুওয়া, কায়রো ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১১৪, ১১৬; (২০) আমীন দুওয়ায়দার, সুওয়ারু'ম-মিন হায়াতি'র-রাসূল (কায়রো ১৯৫৮ খৃ.), পৃ. ৩৩৪, ৩৩৭; (২১) শায়খ 'ইনায়াতুল্লাহ্, উর্দূ অনু. তা'রীখ ইব্ন খালদূন (লাহোর ১৯৬০ খৃ.) ১খ, ৩৩২-৩৩৩; (২২) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ১খ, ৪০৩-৪০৫; (২৩) ইবনু'ল-কায়্যিম, যাদু'ল-মা'আদ।

'আবদু'ল-কায়্যুম (দা. মা. ই.) A. J. Wensinck-R. Paret (E. I.[2]/ মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

কায়মাক (দ্র. কীমাক)

আল-কায়রাওয়ান (القيروان) ঃ মধ্য তিউনিসিয়ার একটি শহর তিউনিস হইতে ১৫৬ কিলোমিটার এবং সূস্ হইতে ৫৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এবং ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত একটি বিলায়েত (Governorate)-এর প্রধান শহর; আয়তন ৬ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর। খৃ. ১৯৫৬ সনে শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৩৪,০০০; খৃ. ১৯৬৬ সনের আদমশুমারীতে হয় ৪৭,০০০; ১৯৭২ খৃঁ. ৫৬,০০০; ১৯৮৪ খৃ. সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২,২৫৪। শহরের তাপমাত্রায় যথেষ্ট উত্থান-পতন ঘটে। শীতকালে শূন্যের কয়েক ডিগ্রী নীচে থাকে। গ্রীষ্মে ৪০° সেলসিয়াসের উপরে ওঠে। প্রতি বৎসর গড়ে ২১ দিনের মত গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তপ্ত বায়ুপ্রবাহ (Sirocco) হয়। শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বৃষ্টিপাতের গড় ২৫০ অথবা ৩০০ মিলিমিটার হইতে ৫০০ মিলিমিটার; বিলায়েত এর পশ্চিম অঞ্চলে আরও অধিক। বিভিন্ন বৎসরে বৃষ্টিপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়া থাকে। কখনও খরা হয়; আবার কখনও ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়; ১৯৬৯ খৃ.-এর বন্যা ছিল অতি সর্বনাশ। ওয়াদী যেরূদ (Zeroud) ও ওয়াদী মারগুইল্লীল (Marguellil)-এ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও সেচ কর্ম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হয়। তাহা বাস্তবায়িত হইলে বন্যা প্রতিরোধের সহিত কৃষিজমির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ১৪,০০০ হেক্টর; তন্মধ্যে মাত্র ৮,০০০ হেক্টর জমিতে প্রকৃত চাষাবাদ হইয়া থাকে।

আল-কায়রাওয়ান একান্তই কৃষিকর্ম নির্ভর এলাকা এবং গত দুই দশকের প্রচেষ্টার ফলে বৃক্ষ রোপণ প্রয়াসের যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে। ফলবান বৃক্ষ, যথা ঃ জলপাই (olive), কাগজী বাদাম (almond) ও তৃতীয় স্থানে খুবানী বৃক্ষ রোপণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত ভূমির পরিমাণ বিভিন্ন বৎসরে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় শরৎকালীন সম্ভাব্য বৃষ্টির প্রেক্ষিতে। ১৯৫৬ খৃ-এ এই জমির পরিমাণ ছিল ৭৫,০০০ হেক্টর, ১৯৫৯-এ ২,২৫,০০০, ১৯৬৮-তে ৫৮,০০০ ও ১৯৭২ খৃ. ২,০০,০০ হেক্টর। ১৯৭২ খৃ. গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ ২,৬০,০০০ ভেড়া, ১৪,০০০ গরু, ২০,০০০ ছাগল ও ১১,০০০০ উট। শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি এখনও পর্যন্ত বস্তুত ভ্রূণের পর্যায়ে রহিয়াছে। প্রায় দশটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (যথা ঃ রঞ্জন সূতা তৈরী, কাঠের কাজ, রুটি-বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ ও খাদ্য সংরক্ষণ)-এ নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১,০০০। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কম।

বিপরীতে কারুশিল্পিগণ শহরের কর্মকাণ্ডে প্রধান স্থানে রহিয়াছে। কাঠের কাজ, তামা-পিতলের কাজ, হালকা (Alfa) তৃণের দ্রব্যাদি প্রস্তুত, অলংকার তৈরী ও কারুকাজ, লণ্ঠন ও ঝাঁঝরি তৈরী এবং সেইসঙ্গে ঐতিহ্যগত বয়ন ও রঞ্জন শিল্প ১২০০ কারিগরের কর্ম সংস্থাপন করে। কিন্তু আল-কায়রাওয়ানের প্রকৃত সুখ্যাতির ভিত্তি হস্ত সম্পাদ্য "long wool" গালিচা বুনন। সাম্প্রতিককালে জাতীয় কারুশিল্প দফতর (National of Craft Industry) সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা কর্মিগণকে কারখানাতে কাজ করিবার অনুমতি প্রদান। ইহাতে ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছুটা আধুনিকতার বিকাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেইজন্য শিল্পকর্মে পরিবার ও একান্তভাবে নারী-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। ১৯৭২ সনে এখানে ৪,৫০০ গৃহ-কারুশিল্পী (সাদ্দায়া) গণনা করা হয়। প্রস্তুত গালিচার পরিমাণ ১৯৬২ খৃ. ৫৬,০০০ বর্গ মিটার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭২ খৃ., ১,৩০,০০০ বর্গ মিটার হয় এবং এই উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবুও এই কারখানাগুলি সকলের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারিতেছে না জন্মহারের আধিক্যের কারণে। কর্মক্ষম, পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হয় অসম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত, না হয় খণ্ডকালীন কর্মে নিযুক্ত।

প্রকৃত আল-ক'য়রাওয়ান শহরটি স্থানীয় অধিবাসিগণের এলাকা। তথাকার সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা ও বাজার (সূক) মোটামুটিভাবে ১৮ শতকের শহরটির যে অবয়ন ছিল তাহা রক্ষা করিতেছে। স্থানীয় অধিবাসিগণের এই এলাকার চতুর্দিক নিরেট ইটের তৈরী দুর্গ প্রাকার বেষ্টিত, যাহাতে বন্দুক চালনার খাঁজ রহিয়াছে। এই দুর্গ প্রাকারের বহির্ভাগে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গোলাকার ঠেক্না বা আলম্ব নির্মিত হইয়াছে যাহার পরিমাপ তিন কিলোমিটারের কিছু বেশী। পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে অবস্থিত Gueflia, Djeflia ও Zlass-এর শহরতলী এলাকা। দক্ষিণে বাবু'ল-জাল্লাদীন [Skinner's Gate, স্বাধীনতার পরে যাহার পুনঃনামকরণ করা হইয়াছে বাবু'শ-শুহাদা" (শহীদ তোরণ), যাহা স্থানীয় অধিবাসিগণের এলাকার প্রবেশদ্বার] এবং রেল-স্টেশনের মাঝখানে আধুনিক শহর অবস্থিত। এখানেই বিভিন্ন প্রশাসনিক দফ্তর, ব্যাংক, হোটেল ইত্যাদি অবস্থিত। পূর্বদিকে মেহনতী জনতার একটি জিলা (সাদী সাহ্নূন) নির্মাণ করা হইয়াছে; অন্যটি অধিকতর সমৃদ্ধ শ্রেণীর জন্য নির্মিত ৪০০ ভবনের (Villa) একটি এলাকা, যাহাকে বলা হয় আল-মান্সূরা। জামি' মসজিদ ব্যতীত আল-কায়রাওয়ানের অন্যতম প্রধান সৌধ জামি'উছালাছাতি বীবান বা তিন দরজা মসজিদ। উহার সম্মুখভাগ (facude) আগ্লাবী স্থাপত্য রীতির চমৎকার নিদর্শন। ইহা আন্দালুসী মুহাম্মাদ ইব্ন খায়রূন আল-মা'আফিরী কর্তৃক ২৫৮/৮৬৬ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু ৯/১৫ শতকে ইহার গঠন পরিবর্তিত হয়। শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সৌধ, যথা ঃ Tunis Gate (তিউনিস তোরণ)-এ আগলাবী আমলের একটি জলাধার (Cistern), ৮/১৪ শতকের সীদী 'আবীদ আল-গারিয়্যানী-র যাবিয়্যা, সীদী আস-সাহিব-এর যাবিয়্যা [যাহা প্রথমে

রাসূল (স)-এর সাহাবী আবূ যাম্'আ আল-বালাবী (রা)-র কবরের উপরে নির্মিত একটি সাধারণ, অতি পুরাতন সমাধি সৌধ ছিল। যাহার স্থলে মুরাদী বে হাম্মূদা বর্তমান সৌধটি নির্মাণ করেন ১১শ/১৭শ শতকে] এবং ১৯শ শতকে নির্মিত সীদী 'উমার 'আবাদা-র যাবিয়্যা।

১। নগরের পত্তন ঃ আরবদের সকল অভিযানই [যে সকল অভিযানের পরিণাম ছিল বায়যাসেনা (Byzacena) বিজয়] শুরুর দিকে সমুদ্র তীরবর্তী পত এড়াইয়া যাইবার বিষয়ে সর্তক ছিল। আক্রমণকারিগণ কাস্তীলিয়া (দ্র) অঞ্চল দিয়া দেশের অভ্যন্তারে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে হইতে তাহারা কেন্দ্র ও উত্তর অঞ্চলে উপনীত হইবার চেষ্টা করে। বিজয়ী বাহিনী পূর্বদিকের সমুদ্র তীরবর্তী নৌপথ এড়াইয়া যাইত। কারণ তাহারা সমুদ্রে নৌপরিচালনায় তখন পর্যন্ত যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল না বলিয়া বিপজ্জনক ছিল। পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চলও তাহারা এড়াইয়া চলিত। কারণ সেখানে শত্রুগণের আত্মগোপন (ambush) ও আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ বেশী ছিল। ফলে তাহাদের পক্ষে অভ্যন্তরভাগের সংযোগ পথ (Coridor) ধরিয়া অগ্রসর হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সেই পথ স্বাভাবিকভাবেই কামমূনিয়্যা অঞ্চলে অর্থাৎ আল-কায়রাওয়ানের সংযোগ পথে গিয়া শেষ হইয়াছিল। এই শহরটি মূলত ছিল একটি সামরিক ঘাঁটি; ভূপ্রকৃতি (উঁচু নীচু বৈষম্য = relief) যাহা আক্রমণকারী বাহিনীর রণকৌশল নির্ধারিত করিয়াছিল তাহাই কায়রাওয়ান শহরটি পত্তনের সূচনা করে। প্রচলিত বর্ণনায় ইহার পত্তন 'উকবা ইব্ন নাফি'-এর প্রতি আরোপিত হয় কিন্তু বস্তুত স্থাপিত হয় কয়েকটি সাবলীল পর্যায়ে এবং সেই প্রতিষ্ঠাকার্যে কয়েকজন সামরিক নেতার অবদান ছিল।

সুফেতুলা-র যুদ্ধ (২৭/৬৪৭-৮) কার্যত মুসলিম সেনাপতি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ-এর হস্তে বায়যাসেনা-র কর্তৃত্ব তুলিয়া দেয়; বায়যেন্টীয় বাহিনী বিতাড়িত হয় Proconsularium রক্ষাকারী তাহাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বিতীয় সারির পশ্চাতে। ঠিক সেই সময়েই যে বিজয়িগণ কায়রাওয়ান অঞ্চল পর্যন্ত তাহাদের অভিযান দুর্বার গতিতে পরিচালনা করিয়াছিল, সেই রূপ ধারণা করা আদৌ অবাস্তব বা অসম্ভব নহে; কারণ গুরু করভার আরোপের কারণে তাহারা অঞ্চলটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ইব্ন নাজী (মা'আলিম, তিউনিস ১৩২০/১৯০২, ১খ, ৩০) উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল-কায়রাওয়ানে অবস্থিত ইব্ন আবী সারহ্-এর নামে উৎসর্গিত একটি মসজিদ তাঁহার সমুদ্র ভ্রমণের স্মৃতি কিছুটা রক্ষা করে।

পরে যখন মু'আবিয়া ইব্ন হুদায়জ ৩৪/৬৫৪-৫, ৪১/৬৬১-২ ও ৪৫/৬৬৫ সালে ইফ্রীকিয়্যাতে পর পর তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন তখন পরিস্থিতি যথার্থ রূপ নিতে শুরু করে। তিনবারই তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সেনাপতির অনুসৃত একই পথে অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষে কামমূনিয়্যা বা আল-কায়রাওয়ানে উপনীত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করেন। ৩৪/ ৬৫৪-৫ সনে ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন হুদায়জ "কয়েকটি কিল্লা জয় করেন এবং যথেষ্ট ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। তিনি আল-কারন-এর নিকটে রক্ষীসেনা শিবির (কায়রাওয়ান) স্থাপন করেন" (ফুতূহ', আংশিক সম্পা. ও অনু. A. Gateau, আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খৃ., ৫৭)। ৪১/৬৬১-২ তিনি তখনও কারন-এ প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় পুনরায় আবির্ভূত হন (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, সম্পা. Colin and Levi-Provencal, Leiden, ১৯৪৮, ১খ, ৯৫)। ৪৫/৬৬৫ আরও একবার তিনি কারন-এ আবির্ভূত হন [(১) আল-মালিকী, রিয়াদ, সম্পা. H. Mu'nis, কায়রো ১৯৫১ খৃ, ১খ, ১৭-১৮; (২) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ১৬; (৩) ইব্ন নাজী, মা'আলিম, ১খ, ৩৯-৪০]। এই প্রসঙ্গে আল-মালিকী বলেন, 'উক্বা কর্তৃক আল-কায়রাওয়ান স্থাপিত (تأسيس) হইবার পূর্বেই ইব্ন হুদায়জ আল-কারন-এ একটি শহরের পত্তন করেন (اختط مدينة عند القرن) এবং ইফরীকিয়্যাতে অবস্থানকালে তিনি সেখানেই বাস করেন।" ইব্ন নাজী এই বিষয়ে বলেন যে, কামমূনিয়্যাতে প্রত্যাবর্তনের পর ইব্ন হুদায়জ আল-কারন এলাকাতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করান। তিনি উহার নামকরণ করেন কায়রাওয়ান যখন (প্রকৃত) কায়রাওয়ান-এ কোন জনবসতিও ছিল না বা উহা শহরের রূপও লাভ করে নাই (غير مسكون ولا معمور) মা'আলিম, ১খ, ৪১)। ইব্ন হুদায়জ কর্তৃক উল্লিখিত আল-কারন (পাহাড়, চূড়া) নাম লাভ করিয়াছে উহার ভূপ্রকৃতি (relief)-র কারণে। ১৭১ মিটার উঁচু যে পাহাড়টি বর্তমানে বাতনু'খ-কারন নামে পরিচিত, আল-কারন সেই পাহাড়টিকে সম্ভবত বুঝায় যাহা প্রকৃত আল-কায়রাওয়ান শহরের ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে জালূলাগামী সড়কের পার্শ্বে পর্যটন এলাকাতে অবস্থিত [দ্র. M. Solignac Reche, rches sur les installations hydrauliques in AIEO x, (১৯৫২ খৃ.), ১২, নং ১০]।

আল-কায়রাওয়ানের পত্তনের মূল কারণ ছিল স্থানটির উচ্চতা, যাহা আকস্মিক আক্রমণ ও বন্যা হইতে স্থানটিকে রক্ষা করিত। ইব্ন হুদায়জ প্রতিষ্ঠিত কায়রাওয়ান বরাবর ইফরীকিয়্যার রাজধানী থাকে নাই। কিন্তু ইহা কখনও ধ্বংস হয় নাই। যাহা হউক, রাজধানীর মর্যাদা হারাইবার পরে উহার নাম আর আল-কারন রহিল না। ১২৪/৭৪২ সালে খারিজী 'উকাশা সেখানেই ইফরীকিয়্যার গভর্নর হানজালা ইব্ন সাফওয়ান কর্তৃক পরাজিত হন। ২য় শতকের শেষে/৮ম শতকের শুরুতে পুনরায় আল-কারন-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (আবু'ল-'আরাব, তাবাকাত, সম্পা. Ben Cheneb, প্যারিস ১৯১৫ খৃ. ১৬৭; আল-মালিকী, রিয়াদ, ১খ, ১৮)। অতঃপর ইহার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। আল-বাক্রী বা আল-ইদ্রীসী কেহই ইহার উল্লেখ করেন নাই। (য়াকূত, বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৪খ, ৩৩৩) আল-কারনকে ইফরীকিয়্যার একটি পর্বতগাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উমায়্যা বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া (রা) মিসরের গভর্নর পদে ইব্ন হুদায়জকে ৫০/৬৭০ সনে বহাল রাখিলেন বটে, কিন্তু ইফরীকিয়্যাকে পৃথক করিয়া উহার শাসনভার 'উক্বা ইব্ন নাফি'-এর উপর ন্যস্ত করেন। স্বীয় পদে পুনরায় যোগদান করিয়া 'উকবা তাঁহার আমলের পূর্বে মু'আবিয়া ইব্ন হুদায়জ কর্তৃক স্থাপিত কায়রাওয়ান-এর ব্যাপারে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না (ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম ফুতূহ, ৬৫)। বিভিন্ন সূত্র [যেমন, (১) ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম, ফুতূহ, ৬৪-৬; (২) আল-মালিকী, রিয়াদ, ১খ, ৬-৭, ১৯; (৩) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ১৯-২০; (৪) ইব্ন নাজী, মা'আলিম, ১খ, ৭-৯] অত্যন্ত জোরালভাবে খুঁটিনাটি (আলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কাছাকাছি)-সহ বর্ণনা করে, কিভাবে 'উকবা ইব্ন নাফি' তাঁহার স্বনামধন্য অনুসারিগণ (অনেক সাহাবীও ছিলেন) সমেত একটি নূতন স্থান অনুসন্ধানে বাধ্য হন। সবুজ গাছপালা আবৃত সরীসৃপ ও বন্য জীবজন্তু আধ্যুষিত একটি সমতলের অংশবিশেষ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানেই নূতন কায়রাওয়ানের পত্তন হয়। স্থানটির আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য দুইটি প্রতিষ্ঠান তথা

একটি মসজিদ ও একটি সরকারী ভবন (দারু'ল-'ইমারা) ও 'উকবা তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন। ইহাদের একটি অপরটির বিপরীত দিকে নির্মিত হয়। প্রথমবারের গভর্নর পদের পাঁচ বৎসর কালে তিনি আর কোনও অভিযান না করিয়া এই শহর নির্মাণের তদারকে থাকেন।

তাঁহারা স্থলাভিষিক্ত আবু'ল-মুহাজিদ দীনার, 'উকবা ইব্‌ন নাফি' নির্মিত স্থানে বসবাস করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন (ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাকাম, ফুতূহ, ৬৮/৬৯)। জানা যায় যে (ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ২২; ইব্‌ন নাজী, মা'আলিম, ১খ, ৪২-৩), তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী শাসকের ইমারতসমূহে অগ্নিসংযোগ করেন এবং তিউনিসগামী সড়কের ধারে দুই মাইল দূরে বারবার (Berber) অধ্যুষিত এলাকাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নূতন রাজধানী সম্প্রতি যাহার ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হইয়াছে, তাহার নাম ছিল 'তাকিরওয়ান' (ইব্‌ন নাজী, মা'আলিম, ১খ, ৪৩)। এই বারবারসদৃশ নাম ও শহরের স্থান নির্বাচন উভয়ই হয় আবু'ল-মুহাজির কর্তৃক আরব্ধ সরকারী পরিকল্পনাধীনে। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নীতিতে উৎসাহ প্রদান। কিন্তু তাঁহার সেই নীতি খলীফার মনঃপুত হইল না। ৬২/৬৮২ 'উক্‌বা পুনরায় ইফ্‌রীকিয়্যার পথে অগ্রসর হন। তাঁহার প্রথম কাজই হয় ইতোপূর্বে তৎনির্বাচিত স্থানে রাজধানীর অপসারণ। অতঃপর আল-কায়রাওয়ানের অবস্থান আর কখনও পরিবর্তিত হয় নাই।

প্রমাণ পাওয়া যায়, এই স্থানটিতে পূর্বে রোমক বা বায়যান্টীয় একটি শহর ছিল, যাহা মুসলিম বিজয়ের কালে অন্য বহু স্থানের মতো ধ্বংস হয়। আরবগণ প্রথমদিকে যে সকল ভবন নির্মাণ করে সেগুলির পুনঃধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত প্রচুর মাল-মসলা অবশ্যই পুনঃব্যবহৃত হইয়াছিল। কম বা বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই সকল মাল-মসলা শুধু বড় বড় সৌধে নহে, বরং সাধারণ ঘরবাড়ীতে পর্যন্ত এখনও দেখা যায়। সাম্প্রতিক পুনরুদ্ধার কর্মের সময় (১৯৬৯-৭২ খৃ. আরও অনেক মাল-মসলা, এমন কি বিশাল জামি' মসজিদের ভিত্তি গাত্রেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আল-কায়রাওয়ানের অনতিদূরে উত্তর দিকে আল-আসনাম (الاصنام=মূর্তিসমূহ) নামক একটি স্থান (আত-তীজানী, রিহ্‌লা, তিউনিস ১৯৫৮ খৃ., ১১৮; ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ৫৮-৯) আছে যাহার আল-আসনাম নামের কারণ নিঃসন্দেহে সেই বহু সংখ্যক মূর্তি, বিজয়িগণ যাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তদুপরি আল-বাক্‌রী বলেন (মাসালিক, সম্পা. de Slane, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ২২/৫২-৩), টাকশালের স্থানটিতে (سوق الضرب) সুপ্রাচীনকালে একটি গির্জা ছিল। বিভিন্ন অন্য সূত্র হইতে পরিষ্কার জানা যায়, কূনিয়া বা কামূনিয়্যা নামক একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর আল-কায়রাওয়ান নির্মিত হইয়াছিল [(১) ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাকাম, ফুতূহ, ৫৮, ৭৪; (২) আল-মালিকী, রিয়াদ, ১খ, ১২, ১৮, ১৯,২১; (৩) আল-বাক্‌রী, মাসালিক, ৭৫; (৪) য়াকূত, বুল্‌দান, ৪খ, ৩৯৯, ৪১৫; (৫) ইব্‌ন নাজী, মা'আলিম, ১খ, ৩৯-৪১]। তাঁহাদের এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই; অন্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

বাকী থকিল স্থান নির্বাচনের প্রশ্নটি। কেহই বলেন না, এই স্থানটির নির্বাচন দুর্ভাগ্যজনক হইয়াছিল; তবে প্রতিকূল স্তেপভূমির এই স্থানটি কেন এই বিশাল রাজধানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত করা হইল ? আরবগণ নগর পরিকল্পনা বিষয়ে অদক্ষ ছিলেন, এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া ইব্‌ন খালদূন এক বিতর্কের সূচনা করেন। স্বীয় মতের সমর্থনে তিনি উদাহরণস্বরূপ বস্‌রা, কূফা ও আল-কায়রাওয়ান—এই তিনটি শহরের স্থান নির্বাচন নিকৃষ্ট গণ্য করেন (মুকাদ্দিমা, ৬৪৭)। আধুনিক লেখকগণও এই মত পোষণ করেন [J. Despois, Kairouan, Origine et evolution d'une ancienne capitale musulmane. in Annales de Geog., xxxix (1930), ১৬১; P. Sebag, Kairouan. Zurich ১৯৬৩ খৃ. ১৬]। বস্তুত আল-কায়রাওয়ান শহরের স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে যিনি যাহাই মনে করুন, তাহা তেমন নিকৃষ্ট ছিল না। মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে অতীতে একটি প্রাচীন শহর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল; কারণ পরবর্তীকালে যেমন হইয়াছিল, নগরটির পত্তনের কালে স্থানটি এতটা স্তেপ প্রকৃতির ছিল না। আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন না হইলেও বসতি স্থাপনকারিগণ যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন 'ইযারী (দ্র. বায়ান, ১খ, ২০) বলেন, 'উক্‌বা এই নগর নির্মাণের উদ্দেশ্যে অঞ্চলের বনভূমি পরিষ্কার করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন (ان يقطعوا الشجر)। ৪র্থ ১০ম শতকে আল-বাক্‌রী অন্যত্র বলেন (মাসালিক, ২৬/৬১), আল-কায়রাওয়ানের জলপাই বন এককভাবে কোনও ক্ষতি ব্যতীত শহরের কাঠের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট ছিল। J. Despois-এর মতে (পৃ. স্থা.) Merguellil এবং Zeroud নামক হ্রদদ্বয়ের উর্বরতা প্রদ পলি (Fertilising silt)-র আনুকূল্যে ভূমি ছিল নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ।

সুতরাং পানি সরবরাহ সমস্যার সমাধানই ছিল একমাত্র করণীয়। এই সমস্যার সমাধান একবার করিয়াছিল রোমকগণ এবং পরে আরেকবার আরবগণ। আল-কায়রাওয়ান শহরের জন্য নির্বাচিত স্থানের কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি পানি উত্তোলন ও সরবরাহের জন্য নির্মিত ব্যবস্থা (System) আরবগণ খুঁজিয়া পায়। উহার নাম তাহারা দিয়াছিল কাস্‌রু'ল-মা' (قصر الماء=পানির প্রাসাদ)। এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থাতে পানি আসিত একটি পানি প্রবাহ প্রণালির (aqueduct) মাধ্যমে, যাহা ৩৩ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত Mams-এর জলধারাসমূহে সঞ্চয় করিত। বর্তমানে Mams কে বলা হয় হান্‌শীর দবীমী [Hanshir Dwimis] (M. Solignac, op. cit., ১৯-২১, ১২৬-৬১)। 'উক্‌বা ৫৫/ ৬৭৫ সালে দামিশকে প্রত্যাবর্তনকালে এই স্থানে যাত্রা বিরতি করিয়াছিলেন (ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাকাম, ফতূহ, ৬৮/৬৯)। অতঃপর এই স্থানটি পূর্বগামী যাত্রী কাফিলাসমূহের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয় [(১) আবু'ল-আরাব, তাবাকাত, ২৫; (২) আল-মালিকী, বিয়াদ, ১খ, ৩০, ৬৯-৭০; (৩) ইব্‌ন নাজী, মা'আলিম, ১খ, ৫২, ১৪৭; (৪) ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ৩২, ৪৪, ২৫৯]। আরবগণ এই অঞ্চলটিকে ধ্বংসাবস্থা হইতে মুক্ত করে এবং পূর্ববর্তীদের সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন ও সম্প্রসারণক্রমে স্থানটির সমৃদ্ধি পুনরায়ন করে। প্রতিটি বাড়ী ও মসজিদে যে কূপ ও জলাধারগুলি স্থাপিত হইয়াছিল (প্রায় ব্যতিক্রম ব্যতীত) [ইব্‌ন নাজী, মা'আলিম, ১ম, ১৩, ২৫; আল-বাক্‌রী, মাসালিক, ২৩/৫৩] সেগুলি আগলাবী শাসকদের মহৎ কীর্তিগুলিতে যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছিল, যে কীর্তিগুলির জন্য আগলাবীগণ সঙ্গত কারণেই সুখ্যাত। এই কারণে ৫ম/১১শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সকল ভৌগোলিকই এই অঞ্চলটির উর্বরতা বিষয়ে গর্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মোটকথা, আল-কায়রাওয়ানের জন্য যে স্থানটি নির্বচিত করা হইয়াছিল, সামরিক গুরুত্বের কথা বাদ দিলেও উন্নয়নের জন্য এবং একটি বড় শহরের অর্থনৈতিক অবকাঠামো

গড়িবার পক্ষে স্থানটি অনুকূলে ছিল। শুধু মানুষের ভ্রান্তি স্থানটিকে শেষ পর্যন্ত তৃণভূমিতে পরিণত করে।

২। ইতিহাস ঃ আল-কায়রাওয়ান সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে আর ঠিক তখনই উহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। বিস্ক্রা (Biskra)-র দক্ষিণে অবস্থিত তাহূদা (Tahuda)-র সর্বনাশা ঘটনায় স্থাপয়িতা 'উক্বা ইব্ন নাফি' প্রাণ হারান এবং তাঁহার সাথী যোদ্ধৃগণ নিহত হন। ইহাতেই শুরু হয় শহর ত্যাগ ও পূর্বাভিমুখে দলবদ্ধ পলায়ন। বিজয়ী ছিলেন বার্বার্ নেতা কুসায়লা (দ্র.)। তিনি শহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। আরব-মুসলিম অধিবাসিগণ সকলেই অবশ্য শহর ত্যাগ করেন নাই। তিনি এইখানে তাঁহার স্বল্পস্থায়ী রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন (৬৪-৯/৬৮৪-৯)। যুহায়র ইব্ন কায়স আল-বালাবী, ও বিশেষত হাস্সান ইব্নু'ন-নু'মান আসিয়া পুনরায় শহর উদ্ধার করেন।

পরবর্তী চার দশককালের শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পর আল-মাগরিবের রাজধানী পুনরায় গুরুতরভাবে বিপদের সম্মুখীন হয় বার্বার্দের আক্রমণে। ১২৪/৭৪২ সালে ইহা খারিজী আন্দোলনের তরঙ্গে প্রায় নিমজ্জিত হইবার উপক্রম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল-কারন-এর এবং আল-আসনাম-এর অপ্রত্যাশিত দুইটি বিজয় ইহাকে রক্ষা করে। ১৪০/৭৫৭-৮ সালে শহরটি আবার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয় যখন সুফ্রী মতাদর্শপ্রবণ ওয়ারফাজূমা (Warfadjuma) খারিজীগণ কিছু সংখ্যক অধিবাসীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রক্রমে শহরটি অধিকার করে এবং বৎসরাধিক কাল উহাকে অধিকারে রাখে, অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষত আরব অভিজাত কুরাশীগণকে উহারা নির্বিচারে হত্যা করে। পরের বৎসর সাফার মাসে (জুন-জুলাই, ৭৫৮) ইবাদী আবু'ল-খাত্তাব ত্রিপোলী হইতে কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া খারিজীদে কবল হইতে শহরটি মুক্ত করেন। পরবর্তীকালে তাহার্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন রুস্তামকে তিনি গভর্নররূপে রাখিয়া যান। কিন্তু তাহাও ছিল স্বল্পস্থায়ী ব্যবস্থা। জুমাদা- ১, ১৪৪/ আগস্ট ৭৬১ মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-আশ'আছ পুনরায় শহরটি প্রাচ্যের কর্তৃত্বাধীন করেন এবং খলীফা আল-মান্সূর-এর নির্দেশে ইহার রক্ষা ব্যবস্থা মযবূত করিতে থাকেন। প্রথমবারের মতো তিনি শহরের চতুর্দিকে প্রাচীণ নির্মাণ করেন; নির্মাণ শুরু হয় যু'ল-কাদা ১৪৪/ফেব্রুয়ারী ৭৬২ এবং শেষ হয় রাজাব ১৪৬/সেপ্টেম্বর -অক্টোবর ৭৬৩।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরে গৃহীত এই সকল ব্যবস্থা আল-কায়রাওয়ানকে দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৫৪/৭৭১ সালে সুফ্রী ও ইবাদী বার্বার্গণের মিলিত বাহিনী কর্তৃক শহরটি অবরুদ্ধ হয়। প্রাণের দায়ে অধিবাসিগণ "তাহাদের ভারবাহী পশু, কুকুর ও বিড়াল" পর্যন্ত ভক্ষণ করিবার মত দুর্ভোগ পোহায় (দ্র. ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ৭৬)। শহর রক্ষার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়; আক্রমণকারীর নগর প্রাচীরের তোরণে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং দেওয়ালের এক স্থানে ভাঙন সৃষ্টি করিয়া ঝড়ের বেগে শহর আক্রমণ করে। খারিজীদের সৃষ্ট ইহাই ছিল শহরটির শেষ বিপর্যয়। প্রাচ্য হইতে যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত ও রসদসহ য়াযীদ ইব্ন হাতিম আল-মুহাল্লাবী (১৫৫-৭১/৭৭২-৮৮) প্রেরিত হইলেন, যাহাতে তিনি পুনরায় শহরটি দখল করিয়া কঠোর হস্তে ইফ্রীকিয়্যা হইতে খারিজী আলোড়ন নির্মূল করিতে পারেন।

আরেক বিপদ দেখা দেয় জুন্দ (সেনাবাহিনী)-এর কার্যকলাপে। আল-কায়রাওয়ান যেন বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের জুয়ার বাজিতে পরিণত হয়। বিদ্রোহী সৈন্যগণের সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে শহরটি শাস্তি দানের নিমিত্ত ১৯৪/৮১০ সালে ১ম ইবরাহীম (১৮৪-৯৬/৮০০-১২) নগর প্রাচীর ভাঙিয়া দেন এবং তোরণগুলি অপসারিত করেন। কিন্তু এই শহর পুনরায় একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়। ইতোমধ্যে নগর তোরণগুলি পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল এবং ২০৯/৮২৪ সালে অধিবাসিগণ তোরণগুলি মান্সূর আ'ত-তুন্বুযীর অনুকূলে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এইবার তাহাদের শাস্তি হয় অত্যন্ত কঠোর (draconian) এবং ১ম যিয়াদাতুল্লাহ্ (২০১-২৩/৮১০-৩৮)"দেওয়ালগুলি ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেন" (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ,১০০)। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই শাসন করিতে থাকেন যদ্দিন না ইফরীকিয়্যাতে শী'আ প্রচারণা সম্প্রসারিত হয়। সুন্নী মতবাদের এই দুর্গ উহার বিপদগ্রস্ত রাজন্যবর্গকে সমর্থন দান করে নাই, বরং তাঁহাদের প্রতি নিস্পৃহ, এমনকি শত্রুতার মনোভাব প্রদর্শন করে। আগ্লাবী বংশের শেষ শাসক এক রাত্রিতে গোপনে তাহার রাজধানী ত্যাগ করেন। আর তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণ অবিরাম প্রস্তর বৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

ফাতিমী খলীফাগণের শাসনামলে সীদী 'উকবার শহর এবং তখন হইতে ধর্মদ্রোহীদের দ্বারা অপ্রতিরোধ্যভাবে পরিচালিত শক্তি—এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়। ২০ শা'বান, ২৯৯/১১ এপ্রিল, ৯১২ সালে ঝড় শুরু হয়। এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা অত্যুগ্র স্বাভাব কুতামাকে ক্ষুদ্ধ বণিকগণের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেয়। ফলে কয়েক শত লোককে বন্দী করা হয় (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ১৬৬; ইব্নু'ল-আছীর, কামিল, বৈরূত সং, ১৯৬৬ খৃ. ৮খ, ৫৩)। 'উবায়দুল্লাহ্ জনগণকে শান্ত করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু তদ্দারা আল-কায়রাওয়ানের অধিবাসিগণকে খারিজী আবূ য়াযীদ আনন্নুক্কারীর অভ্যুত্থানের (৩৩২-৬/৯৪৩-৭) প্রতি সমর্থন দান হইতে বিরত রাখা সম্ভব হয় নাই। এই ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে প্রতারণা করে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহারা শাস্তির হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বিদ্রোহী পরাজিত ও নিহত হইলে তখন আল-মান্সূর তাহাদের একদলকে বন্দী করেন এবং চরম নির্যাতনের পর তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন।

শী'আ ধর্মদ্রোহিতা পরিত্যাগের পূর্বে যীরি শাসকদের শাসনও অধিকতর ত্বরায় সমর্থন লাভ করে নাই। আল-মুইয্য (৪০৭-৫৪/১০১৬-৬২) যখন আল-কায়রাওয়ানের তাঁহার প্রথম সরকারী সফরে আগমন করেন তখন তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা এবং এক মারাত্মক গণবিদ্রোহ (১৫ মুহাররাম, ৪০৭/২৪ জুন, ১০১৬) তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। আল-কায়রাওয়ানের জনগণ শী'আ সন্দেহে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। নিহত ব্যক্তির লাশ পোড়াইয়া ফেলা এবং যদৃচ্ছা বাসগৃহাদিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। এই গোলযোগ সুদূর আল-মান্সূরিয়্যা পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়ে এবং তাহাতে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলে। শান্তি-শৃঙ্খালা স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক মাস পরেই স্বয়ং আল-মু'ইয্য পরিচালিত 'ঈদু'ল-ফিতর (১ শাওওয়াল, ৪০৭/৩ মার্চ, ১০১৭) অনুষ্ঠানাদির দিনে এক নূতন সংঘর্ষ শুরু হয়। শহরে পুনরায় রক্ত বন্যা হয়। এইবার কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত পাশবিক। আল-মান্সূরিয়্যার সেনাবাহিনীর হাতে আল-কায়রাওয়ান শহরটি তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে শহরের প্রতিটি দোকান লুণ্ঠিত হয়। সৈন্যগণ ব্যবসায় এলাকার প্রধান বাজারগুলি (কিবাররু'ল-আস্ওয়াক)-তে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইহা ছিল বৃহত্তর দুঃখের অবতরণিকামাত্র। বানূ হিলাল যদিও ইফরীকিয়্যার প্রতিটি শহর ধ্বংস করে নাই, তবুও আল-কায়রাওয়ানের গৌরবের যাহা অবশিষ্ট

ছিল সবই ধুলিসাৎ করিয়া দেয়। ৪৪৬/১০৫৪ সাল হইতে শহরটি অবরুদ্ধ হয়। আল-মু'ইয্য শহরটিকে অবরোধকারীদের হাতে সোপর্দ করিয়া আল-মাহ্দিয়্যাতে পশ্চাদসরণ করেন (৪৪৯/১০৫৭)।

অতঃপর এই শহরের কথা খুব কদাচিৎ শোনা যায়। কাবীস, কাফ্সা, তূযির, আল-মাহ্দিয়্যা, সূসা বা সাফাকিস অঞ্চলগুলি যেমন হইয়াছিল আল-কায়রাওয়ান তেমন হাফ্সীগণের চিন্তার কারণ হয় নাই। তাঁহাদের শাসনাধীনে কোনও স্থানীয় বংশই সেখানকার ক্ষমতা দখল করে নাই। ইতোমধ্যে এই এলাকার যাযাবর আরবগণ রাজনৈতিক মঞ্চে কিছু ভূমিকা পালন করে। সামান্য বিলম্বে তাহারা আল-মুওয়াহ্হিদ (Almohad) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইতোমধ্যেই সমগ্র ইফরীকিয়্যায় কর্তৃত্ব স্থাপনকারী 'আবদু'ল-মু'মিন ইব্ন 'আলীর বিরোধিতা করিতে চেষ্টা করে। তাহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহাদের নেতা রিয়াহী বংশের মুহ্রিয ইব্ন যিয়াদ পরাজিত হন (৫৫৬/১১৬১) (ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৬খ, ৪৯৪)। ৫৮২/১১৮৬-৭ সনে আল-মুওয়াহ্হিদ বংশের আল-মান্সূর, যিনি বানূ গানিয়্যার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মরক্কো হইতে আসিয়াছিলেন-তিউনিস হইতে আল-কায়রাওয়ান অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে শিবির স্থাপন করিয়া তিনি আল-হাম্মা-র দিকে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই উপায়ে প্রথমে তাঁহার বাহিনীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ হয় (ইব্ন খাল্দুন, 'ইবার, ৬ষ্ঠ, ৫১০)। কয়েক বৎসর পর যখন য়াহ্য়া 'ইব্ন গানিয়্যা এই শহর এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ইফরীকিয়্যা দখল করেন। তাঁহার সাফল্য যেমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল তেমনই ছিল স্বল্পস্থায়ী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল-কায়রাওয়ান প্রথমে আল-মুওয়াহহিদ এবং পরে হাফসী বংশের শাসনাধীনে ফেরত আসেন। ৬৬৯/১২৭০ সালে সম্রাট ৯ম লুইস (Louis) কার্থেজ-এ অবতরণ করিলে সমগ্র দেশে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সীদী 'উক্বা কর্তৃক স্থাপিত পবিত্র শহর জিহাদের অনুপ্রেরণায় প্রাণচঞ্চল হইয়া ওঠে। তিউনিসকে অতি বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন মনে করিয়া আল-মুস্তান্সির এমনকি স্বীয় গভর্নমেন্ট সেখানে স্থানান্তর করিবার কথা চিন্তা করিতে থাকেন (ইব্ন খাল্দূন 'ইবার, ৬খ, ৬৭০)। কিন্তু এক মহামারী সংঘর্ষের অবসান ঘটাইয়া তাঁহাকে সেই গৌরব হইতে বঞ্চিত করে। কয়েক বৎসর পরে আল-কায়রাওয়ান 'প্রতারক' ইব্ন আবী 'উমারা-র শাসন ক্ষমতা লাভের ৬৮১-৩/ ১২৮৩-৪ আনুকূল্যে করার মাধ্যমে পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে। বলা হয় (ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, ৬খ, ৬৯১). এই প্রতারকের হস্তে বায়'আত গ্রহণের সময় আল-কায়রাওয়ান তাহাকে মূসা ও সাফাবীগণের আল-মাহদিয়্যা-র সমর্থনের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিল।

সুলতান আবূ য়াহ্য়া আবু বাক্র-এর বিরুদ্ধে আবূ দার্বা-র সংগ্রামের কালে (৭১৮-২৪/১৩১৮-২৪) আল-কায়রাওয়ান পুনরায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ৭৪৯ মুহাররাম/১৩৪৮ এপ্রিলে। আবু'ল-হাসান আল-মারীনী সবেমাত্র ইফরীকিয়্যা দখল করিয়াছেন, এমন সময়ে আল-কায়রাওয়ানের সন্নিকটে তিনি বেদুঈন আরবদের নিকট পরাজিত হন। পরে সেখানে তিনি অবরুদ্ধ হন (ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, ৬খ, ৫৬৪., ৮১৪-৬, ৮১৯)। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি সেখান হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম এবং পুনরায় তিউনিসে উপনীত হন। এই পরাজয় নিশ্চিতই তাঁহার পতনের সূচনা করে এবং দেশটিও পরিত্যক্ত হইবার কারণ হয়।

ইহার পরে, অযোগ্যতার মেঘচ্ছায়ায় হাফ্সীয়গণের শাসনামলের অবসান পর্যন্ত আল-কায়রাওয়ান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কাজেই খায়রু'দ-দীন বার্বারোসা – যিনি ইতোমধ্যেই আলজিয়ার্স-এর অধিপতি হইয়াছিলেন, প্রায় বিনা কষ্টে ঝটিকা আক্রমণে তিউনিস দখল করেন (১৮ আগস্ট, ১৫৩৪), হাফ্সী রাজবংশের পতন ঘোষণা করেন এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে আল-কায়রাওয়ানের একটি রক্ষীবাহিনী নিয়োজিত করেন। পরের বৎসর (১৪ জুলাই, ১৫৩৫) রাজা ৫ম চার্লস স্পেনীয় আশ্রয়াধীনে (Protectorate) মাওলায় আল-হাসান-কে তাঁহার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দেশের সমগ্র দক্ষিণ অংশ তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়। এই সময়ে আল-কায়রাওয়ান ছিল সীদী 'আরাফা নামক শাব্বিয়া গোত্রের জনৈক মুরাবিত কর্তৃক শাসিত ক্ষুদ্র একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। ১৫৪২ খৃ. মাওলায় আল-হাসান ইহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেনাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। কাজেই শাব্বিয়া সেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে যতদিন না রা'ঈস Dragut হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ত্রিপোলী হইতে অগ্রসর হইয়া এই স্থানে উপনীত হন এবং শাব্বিয়া-কে বিতাড়িত করিয়া শহর দখল করেন (৩ জানুয়ারী, ১৫৫৮) এবং হায়দার পাশাকে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া যান। সিনান পাশা-কে সমর্থন দানের জন্য হায়দার পাশা নিজ সেনাবাহিনীকে ত্রিপোলীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেন। সিনান পাশা এক সুবৃহৎ নৌবহর লইয়া আসিয়াছিলেন হাফসী রাজবংশের শাসন এবং স্পেনের প্রাধান্য চিরদিনের জন্য নির্মূল করিবার অভিপ্রায়ে (ইব্ন আবী দিয়াফ [ইত্হাফ, তিউনিস ১৯৬৩ খৃ., ২খ, ১৮-২১] এই ঘটনাবলীর কাল নির্দেশ করিয়াছেন ৯৮১/১৫৭৩)। অতঃপর তিউনিসিয়াকে একটি তুর্কী পাশা শাসিত প্রদেশ (Pashalik) রূপে সংগঠিত করা হয় এবং আল-কায়রাওয়ানের সাবেক গভর্নর হায়দার পাশাকে উহার প্রধান নিযুক্ত করা হয় (ইব্ন আবী দিয়াফ, ইত্হাফ, ২খ, ২৭)। মুরাদীগণের শাসনামলে আল-কায়রাওয়ানের পতন ত্বরান্বিত হয়। হাম্মূদা পাশা শহরটির বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৬৩১ খৃ. আওলাদ-সা'ঈদ-কে সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি আগমন করেন এবং সেখানে একটি রক্ষী সেনা (উজাক) স্থাপন করেন। কিন্তু শীঘ্রই সেখানে 'আলী বেও তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। আল-কায়রাওয়ান শেষোক্তজনের পক্ষ অবলম্বন করে এবং ১৬৭৮ খৃ.-এর মীমাংসার পর দেশটি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিভক্ত হইলে কায়রাওয়ান ইহার নিজস্ব সরকারের রাজধানী হয় (ইব্ন আবী দিয়াফ, ইত্হাফ, ২খ, ৫৫)। পরে ইহা মুরাদ বে আবূ বালা-র প্রতি প্রতিকূলতা প্রদর্শন করেন (১৬৯৯-১৭০২ খৃ.)। ফলে তিনি শহরটি অবরোধ করেন এবং উহার উপর যৌথ জরিমানার গুরু বোঝা চাপাইয়া দেন। পরে তিনি শহরটিকে ত্রিপোলীর বে (bey) লুঠেরা খালীল-এর হস্তে তুলিয়া দেন আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষ অবলম্বনের বিনিময়ে। পরের বৎসর [১৭০১ খৃ.] নগরবাসিগণকে স্বহস্তে নিজেদের শহর ধ্বংস করিবার আদেশ দেওয়া হয়, শুধু মসজিদ ও যাবিয়াগুলি বাদে (ইব্ন আবী দিয়াফ, ইত্হাফ, ২খ, ৭৬)। এই দুই প্রকার দালানই শুধু রক্ষা পায়। যাহা হউক এই অত্যাচারীকে হত্যা করা হয়, যাহার ফলে তাহার উত্তরাধিকারী ইব্রাহীম আশ-শারীফ বিধ্বস্ত শহরটিকে মেরামতের সুযোগ লাভ করেন। আল-কায়রাওয়ানের অধিবাসিগণকে [১৭০৩ খৃ.] নিজেদের শহরে প্রত্যাবর্তন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনগুলি পুনঃনির্মাণ করিবার অধিকার প্রদান করা হয় (ইব্ন আবী দিয়াফ, ইত্হাফ, ২খ, পৃ. ৮১)।

পরবর্তীকালে নগরবাসিগণ হুসায়নী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হুসায়ন ইব্ন 'আলীর (১৭০৫-৩৫) মহানুভবতায় উপকৃত হয়, যিনি মসজিদ পুনঃস্থাপনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। নগরবাসিগণ শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার অনুগত ছিল। এই আল-কায়রাওয়ান শহরেই হুসায়ন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র 'আলী পাশা কর্তৃক পাঁচ বৎসর অবরুদ্ধ থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ধৃত হন এবং ১৩ মে, ১৭৪০ খৃ. তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়। তৎসঙ্গে আল-কায়রাওয়ানের চল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিককেও ফাঁসি দেওয়া হয় এবং শহরের চতুর্দিকের প্রাচীর ধূলিসাৎ করা হয় (দ্র. ইব্ন আবী দিয়াফ, ইত্হাফ, ২খ, ১১২-৮)। পরে হুসায়ন ইব্ন আলীর পুত্র মুহাম্মাদ আর-রাশীদ (১৭৫৬-৯) আগমন করেন এবং সুফলপ্রদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার সন্তানগণের স্বীকৃতি লাভ করেন। আল-কায়রাওয়ানের নগর-প্রাচীর পুনরায় নির্মাণ করা হয়। শহরবাসিগণের খাজনা হ্রাস করা হয়। তখন নাগরিকগণের জীবনধারায় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

তবে ২য় হুসায়ন-এর শাসন অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগ্যজনকই ছিল। এই আমলে শহরের উপর গুরু অর্থদণ্ড চাপান হয়, যাহার ফলে অধিবাসিগণ সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। সেই জরিমানা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত সম্পদ এবং তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৬৪ খৃ. 'আলী ইব্ন গাযাহুম-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহের শহরটি সর্বাপেক্ষা সক্রিয় আখড়ায়ও পরিণত হয়। ইহার এলাকার মধ্যেই এই অঞ্চলের যূলা (Zla) গোত্র, আস-সুবৃ'ঈ ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সুবৃঈ-এর নেতৃত্বে বানূ যীদ, হামামা এবং ফ্রাশীশগণের সহিত এক সম্মেলন করেন। কিন্তু সেই সম্মেলনের ফলে কোন বাস্তব কর্মের উদ্ভব হয় নাই। পরে ১৮৮১ খৃ. যখন ফরাসী আশ্রিত তিউনিসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আল-কায়রাওয়ান পুনরায় সম্মানজনক মর্যাদা লাভ করে। ইহা প্রতিরোধ আন্দোলনের সর্বাধিক কার্যকর কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৫ হইতে ২০ জুন, ১৮৮১ নগরীর বড় জামি' মসজিদে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণ মিলিত হন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁহারা ত্রিপোলীয় পাশার পক্ষে যোগদান করিয়া প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করিবে। যখন প্রতিরোধ নিষ্ফল হয় এবং বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ অর্থহীন হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন শেষ পর্যন্ত ২৬ অক্টোবর ১৮৮১ সালে শহরটি বিনা বাধায় অধিকৃত হয়। শুধুমাত্র যূলাগণ কিছুকালের জন্য সীমিত অভিযান পরিচালনা করে।

৩। **ঐতিহাসিক ভূগোল ঃ** প্রতিষ্ঠাতার প্রতিজ্ঞা (Vow) অনুযায়ী আল-কায়রাওয়ান "কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের মহিমাকে চিরস্থায়ী করিবে" (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ১৯; আবু'ল-'আরাব, তাবাকাত, ৮)। এই শহর সেই প্রতিজ্ঞা কিয়দাংশে পূর্ণ করিয়াছে। তখন পর্যন্ত ইহা একটি পবিত্র এবং শ্রদ্ধেয় নগররূপে বিদ্যমান রহিল বটে, কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ইহা গৌরবময় রাজধানী শহরের ভূমিকা হারাইয়াছে। উপরের আলোচনায় দেখা যাইবে, এই শহর যেমন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে তেমনই আবার চরম দুরবস্থার গহ্বরে নিপতিত হইয়াছে।

'উক্বা বড় জামি' মসজিদ ও সরকারী ভবন [দারু'ল-ইমারা]-এর স্থান নির্বাচন করত তাঁহার কাজ শুরু করিয়াছিলেন। ১৩,৬০০ হাত, প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার পরিধির ভিতরের ও বাহিরের এলাকা (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ২১) নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন গোত্রীয়দের মধ্যে বণ্টিত হইয়াছিল, যেমন হইয়াছিল বসরা ও কূফার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থাতেই শহরদ্বয়ের পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে কিছু কিছু ইঙ্গিত ব্যতীত কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানিতে পারি (আল-বাক্রী মাসালিক, ২৩), হিশাম ইবন 'আবদি'ল-মালিক-এর আমলে (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩) প্রতিষ্ঠাতার স্বগোত্রীয় কুরাশীদের উপগোত্র ফিহ্র বড় মসজিদের উত্তরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অন্যপক্ষে ৩য়/৯ম শতকে এখানকার জিলাগুলি লক্ষণীয় গোত্রগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করিয়াছিল। হারাত য়াহ্সুর এই ইঙ্গিত দিয়াছেন ('ইয়াদ, মাদারিক, আংশিক সম্পাদনা, এম. তাল্বি, গ্রন্থের নাম Biographies Aghlabides...., তিউনিস ১৯৬৮ খৃ. ৭১) ; রাহ্বাতু'ল-কুরাশিয়্যীন ('ইয়াদ মাদারিক, ৩৬৯), দারবু'ল-ফিরশাশ ('ইয়াদ, মাদারিক, ৩৫৯) এবং একটি সূকু'ল-য়াহূদ ('ইয়াদ, মাদারিক, ৩৫৯)।

গোড়াতে সরেজমিনে প্রাপ্ত পুনঃব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর কল্যাণে আল-কায়রাওয়ান শহর পাথর দিয়া গড়া হইতে থাকে। ইহার আয়তন হইতে আন্দাজ করা যায় যে, একটি বড় শহররূপেই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছিল, যাহাতে ইফরীকিয়্যার সকল আরব অধিবাসিকে, প্রধানত যোদ্ধৃগণকে একত্রে রাখা যায় এবং যাহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পরিজন তাহাদের সহিত মিলিত হয়। শহরের প্রারম্ভিক জনসংখ্যা কদাচিৎ ৫০,০০০-এর নিম্নে ছিল।

বস্রা ও কূফার ন্যায়ই প্রথমে ইহার চতুর্দিকে কোন রক্ষাপ্রাচীর ছিল না এবং প্রায় এক শতাব্দী যাবত ইহা ছিল একটি উন্মুক্ত নগর। পূর্ববর্ণিত ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের কারণে শহরটিকে ১৪৪/৭৬২ সাল হইতে শুরু করিয়া দশ হাত পুরু দেওয়াল ঘিরিয়া ফেলিতে হয় (আল-বাক্রী, মাসালিক, ২৪)। য়াযীদ ইব্ন হাতিম আল-মুহাল্লাবী-র শাসনামল (১৫৫-৭১/৭২২-৮৮) শহরের জন্য বিশেষ সুফলপ্রদ হইয়াছিল। এই শাসকই শহরের সুক বা বাজারগুলির সংগঠন করেন এবং কোন্টিতে কি প্রকার ক্রিয়াকর্ম চলিবে তাহা নির্ধারণ করেন (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ৭৮)। তিনি ছিলেন কিছুটা খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব যাহাতে কতিপয় কবি ও বৈজ্ঞানিক তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। মুসলিম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগ্রহের পথে তখন আল-কায়রাওয়ানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

৩য়/৯ম শতকে এই শহর গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে যখন উহা একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। রাজপুরুষের জন্য আল-'আব্বাসিয়া (দ্র) নামক একটি সুরক্ষিত প্রধান বাসভবন নিকটেই নির্মিত (১৮৪/৮০০) হয়। পরে আরও বিলাসবহুল এবং আরও প্রশস্ত অপর একটি প্রাসাদ, রাক্কাদা নির্মাণ করা হয় (২৬৩/৮৭৭)। শহরটি তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্তৃপক্ষের দুর্ভাবনার কারণ হইয়া ওঠে। তখন আর শহরটি রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না, বরং ইহার বিপরীতে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়েজন হইয়া পড়ে। এই কারণেই পূর্ব বর্ণিত পরিস্থিতিতে উহাকে রক্ষাপ্রাচীর বর্জিত করিতে হয়।

শহরের আয়তন কত ছিল ? আল-বাক্রী (মাসালিক, ২৫-২৬) বলেন, শহরের প্রধান সড়কটি (আস-সিমাত), যাহা বড় মসজিদের পূর্ব দিক দিয়া অগ্রসর হয়, উহার দৈর্ঘ্য ছিল দক্ষিণে আবু'র-রাবী' হইতে উত্তরে তিউনিস তোরণ পর্যন্ত প্রায় সোয়া দুই মাইল, অর্থাৎ (আল-বাক্রীর বর্ণনায় মাইলের পরিমাণ ১,৬০০ মিটার ধরিয়া) চারি কিলোমিটারের সামান্য কম। ধরিয়া নেওয়া যায় যে, বিপরীত দিকেও শহটির সমপরিমাণ ব্যাপ্তি ছিল। এই আয়তন কয়েক লক্ষ লোকের অবস্থান নির্দেশ করে। অন্য প্রমাণ হইতেও এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। আল-বাক্রীর

বর্ণনা হইতে আরও জানা যায় যে, শহরটিতে হাম্মাম-এর সংখ্যা ছিল ৪৮, আর আল-'আশূরা-র উৎসবের সময়ে নগরবাসিগণের আহারের প্রয়োজনে একবারের গণনায় দেখা গেল ৯৫০টি ষাঁড় যবেহ্ করা হইয়াছিল। গোশতের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ২০০ টন। অতিরঞ্জন হইলেও অনুমিত হয় যে, জনসংখ্যা নগণ্য ছিল না। ৩য়/৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লেখক আল-য়া'কূবী লিখিয়াছেন যে, এই শহরে সকল শ্রেণীর, যথা ঃ কুরায়শ্ মুদার, রাবী'আ, কাহ্তান এবং অন্যান্য গোত্রীয় 'আরবগণ, খুরাসানের ইরানীগণ, রূম-এর বার্বারগণ এবং আরও কত জাতের লোকের সঙ্গে সংস্রব ঘটিত (Les Pays, অনু. G. Wiet, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ২১০)। মুসলিম সংখ্যাগুরু অধিবাসিগণের পাশাপাশি ছিল য়াহূদী-খৃষ্টান। আল-ফাদ্ল ইব্ন রাওহ (১৭৭-৮/৭৯৩-৪) শহরে খৃষ্টানদের একটি গির্জা নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন (ছদ্ম ইবনু'র-রাকীক, তা'রীখ,... সম্পা. এম. আল-কাবি, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., ১৮৫)। ৩য়/৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে আল-কায়রাওয়ানের খৃষ্টীয় গির্জার প্রধান ছিলেন কয়েকজন ('ইয়াদ, মাদারিক, ১৩২), এবং উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত তথাকার খৃষ্টানগণ সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ লিপিতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করিয়া চলিয়াছিল।

জনসংখ্যার তুলনায় হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর শাসনামলে (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩) হইতে নির্মিত ও সংগঠিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ক্রমেই অপ্রতুল হইয়া পড়িল (আল-বাক্রী, মাসালিক, ২৬)। আগলাবীদের আমলে ক্রমে জনসংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছিল, যে কারণে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন জলাধার নির্মাণ করা হইয়াছিল। আবূ ইব্রাহীম আহমাদ (২৪২-৯/৮৫৬-৬৫) কর্তৃক নির্মিত তিউনিস তোরণের পাশের বিশাল জলাধারটি অনুরূপ চৌদ্দটি জলাধার নির্মাণ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল বৃহত্তম; উহার ভগ্নাবশেষ এখনও প্রশংসার দাবীদার।

মুসলিম পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরববাহী সৌধ যে বিশাল মসজিদ, উহাও শহরের সম্প্রসারণের নমুনায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এক নূতন অবয়ব লাভ করিয়াছে। ৩য়/৯ম শতকেই এই মসজিদ বর্তমান আকার ও আয়তন লাভ করে; সামান্য ব্যতিক্রম শুধু কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে। হাস্সান ইব্নুন-নু'মান (দ্র.)-ই এই মসজিদকে নবরূপ দান করেন। পরবর্তী কালে উত্তর দিকে ইহা সম্প্রসারিত হয় এবং সম্ভবত হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর আমলে বর্তমান মিনারাটি নির্মিত হয়। য়াযীদ ইব্ন হাতিম (১৫৭/৭৭৪) ইহা পুনঃনির্মাণ করান। অবশেষে ১ম যিয়াদাতুল্লাহ ইহাকে ভাঙিয়া সম্ভবত মিনারাটি রাখিয়া পুনঃনির্মাণ করান (২২১/৮৩৬)। 'উক্বা ইব্ন নাফি' কিব্লা দেওয়ালের যে নকশা প্রণয়ন করেন (যদিও দেওয়ালটির অবস্থান নির্ণয়ে দক্ষিণ দিকে ৩০° পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল), যিয়াদাতুল্লাহ পুনঃনির্মাণ কর্মে সে নকশাটি বিবেচনাধীন রাখেন। আবূ ইব্রাহীম আহ্মাদ উহা সম্প্রসারিত করেন এবং পুনরায় ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন (২৪৮/৮৬২-৩)। এই সময়ের পর হইতে এই মসজিদের নবায়ন ও অলঙ্করণে ইহার সাধারণ আকৃতির আর কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। যীরি শাসক আল-মু'ইয্য ইব্ন বাদীস (৪০৭-৭৪/১০১৬-৬২) আগলাবী আমলের মাক্সূরার স্থলে বর্তমান মাকসূরাটি নির্মাণ করেন এবং সেখানে একটি কুতুবখানা (গ্রন্থাগার) স্থাপন করেন। অন্যান্য নবায়ন কাজ এবং অলঙ্করণ করা হয় হাফসীদের আমলে এবং খৃ. ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ শতকে। সর্বশেষ নবায়ন হয় ১৯৭০-৭২ সালে।

নগরীর উন্নয়ন ইহার জ্ঞান চর্চার সহায়ক হয়। ৩য়/৯ম শতাব্দীতে আল-কায়রাওয়ান ইসলামের প্রধান তামাদ্দুনিক কেন্দ্রগুলির অন্যতম ছিল। ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) "ইহাকে (কূফা ও আল-মাদীনার তুল্য) মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তিনটি প্রধান কেন্দ্রের অন্যতম" বলিয়া মনে করেন (দ্র. ইব্ন নাজী, মা'আলিম, ২খ, ৩৮)। আত-তাবারীরও অনেক পূর্বে য়াহ্য়া ইব্ন সাল্লাম আল-বাসূরী (১২৪-২০০/৭৪১-৮১৫) এই শহরে বসবাসরত অবস্থায় তাঁহার গ্রন্থসমূহ রচনা করেন এবং তাঁহার তাফ্সীর শিক্ষা দান করেন, যাহা আংশিকভাবে রক্ষিত (তিউনিসে দুইখানি পাণ্ডুলিপি, নং বিএন ৭৪৪৭ ও এইচ. এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে); ইহাই ছিল তাফসীর বিষয়ক প্রথম বিরাট স্মৃতিসৌধ। ইমাম মালিক (র), হানাফী মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হাসান (র) এবং প্রাচ্যের আরও অনেক বিখ্যাত 'আলিমগণের বক্তৃতা শুনিয়া আসাদ ইবনু'ল-ফুরাত (র) [আনু. ১৪২-২১৩/৭৫৯-৮২৮] তৎপ্রতিষ্ঠিত আসাদিয়্যা-তে তাঁহার অর্জিত বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেন এবং অনেক শাগরিদ লাভ করেন, যাঁহারা তাঁহার শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে একটি বিশেষ আল-কায়রাওয়ানী ফিক্হ-এর উদ্ভব হইতে পারিত যদি সাহ্নূন (আনু. ১৬০-২৪০/৭৭৭-৮৫৪)-এর ব্যক্তিত্ব তাঁহার খ্যাতিকে ম্লান না করিত। সাহনূন ছিলেন নিঃসন্দেহে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম। তাঁহার স্মৃতিসৌধ রূপ সুবিশাল গ্রন্থ আল-মুদাওওয়ানা, ইবনু'ল-কাসিম-এর মতে ইমাম মালিক (র)-এর প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে এবং ইহা আল-কায়রাওয়ানের মুসলিমদের নিত্য দিনের পাঠ্য (boeviary)-এর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ দলে দলে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিত। তন্মধ্যে কতিপয় ছাত্র ছিল মুসলিম স্পেন হইতে আগত। ৫৭ জন স্পেনীয় বিশিষ্ট ছাত্রকে তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি অনুমতি প্রদান করেন। ভাষাতত্ত্ব চর্চার প্রয়োজনে কোন বড় গ্রন্থ যদিও পাওয়া যায় না, তথাপি আবূ বাক্র আল-যুবায়্রীর বিবেচনায় ইহা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁহার রচিত বিখ্যাত 'তাবাকাতু'ন-নাহ্বিয়্যীন ওয়া'ল-লুগাবিয়্যীন (কায়রো ১৯৫৪ খৃ:, ২৫৪-৭২) [طبقات النحويين و اللغويين] ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি গ্রন্থে বিশিষ্ট অধ্যায় সংযোজন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন যিয়াদ ইব্ন খাল্ফূন, ইসহাক ইব্ন 'ইমরান ও ইসহাক ইব্ন সুলায়্মান (আল বাক্রী, মাসালিক, ২৪; ইব্ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আনবা', সম্পা. এবং অনু. A Noureddine এবং H. Jahier, আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ., ২-৯)। উল্লিখিত 'আলিমগণের গ্রন্থাবলী যেইগুলি Constantine the African কর্তৃক ৫ম/১১শ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়, সালের্নো (Salerno)-তে পাঠ্য পুস্তক ছিল।

শী'আ ফাতিমীগণের শাসন অবশ্য সুন্নী অধ্যুষিত এই শহরের জন্য অনুকূল ছিল না। তাঁহাদের প্রচেষ্টার পুরস্কার হিসাবে বিজয়ী কুতামা এই সমৃদ্ধ শহরটি লুণ্ঠন করিবার অধিকার দাবী করেন। প্রকৃতপক্ষে শহরটি সামান্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। নিকটে সাব্রা আল-মান্সূরিয়্যা নামক একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শহর (যেই দিকে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ স্থানান্তরের প্রবণতা দেখা যায়) নির্মাণ (৩৩৬-৯৪৭-৮) সত্ত্বেও এই শহর ইহার সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখে এবং সাফল্যের সঙ্গে মুকাবিলা করিতে সক্ষম হয় কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের, যথা ঃ ২৯৯/৯১১-২ সালের ভূমিকম্প, ১৩ যু'ল-হিজ্জা, ৩০৬/১৭ মে, ৯১৯ বাজারে অগ্নিকাণ্ড, ৩০৮/৯২০-১ সালে বন্যা এবং ৩১৭/৯২৯ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। দুইজন সমসাময়িক

ঐতিহাসিক ইব্ন হাওকাল (সূরাতু'ল-আরদ, বৈরূত, তা. বি., পৃ. ৯৪) এবং আল-মুকাদ্দাসী (আহ্সানু'ত-তাকাসীম, সম্পা. ও আংশিক অনু. Ch. Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ., ১৪-১৭) তাঁহাদের বর্ণনায় একমত যে, "এই শহরের পানি-সরবরাহ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা প্রকৃতপক্ষে অধিকতর নিশ্চিত ছিল। ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য বাস্তবিকই পানি সরবরাহের জন্য কতগুলি নহরের একটি সিস্টেম (System) নির্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহা পর্বতগাত্র হইতে প্রবাহিত হইত এবং সাব্‌রা-তে অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া জলাধারসমূহ পূর্ণ করিত" (ঐ, পৃ. ১৫)। ১৫টি প্রধান সড়ক (দারব্) তখন শহরটিকে ভেদ করিত। সেগুলির নাম আংশিক রক্ষিত হইয়াছে (ঐ, ১৭) এবং শহর এলাকা আরও বর্ধিত হইয়া আল-মুকাদ্দাসীর মতে "তিন মাইলের সামান্য কম চৌহদ্দী" রচনা করিয়াছিল (ঐ, ১৫) [অর্থাৎ ৫.৫ কিলোমিটার, আল-মুকাদ্দাসীর বর্ণিত ১ মাইল = ১৯০০ মিটার হিসাবে]। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, শহরটির জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহাই ছিল নগর সম্প্রসারণের সর্বোচ্চ শিখর।

সেই সময় হইতে ইফরীকিয়্যার অন্য সকল অঞ্চলের ন্যায় কায়রাওয়ানেরও স্থবিরতার যুগ আরম্ভ হয়। অতঃপর দেখা দেয় অপ্রতিরোধ্য অবনতি। পুনরুত্থান আন্দোলনের কয়েকটি ঝটিকা প্রবাহ সৃষ্টি হয় বটে, যাহার ফলে নিশ্চিত অবক্ষয়ের পথগামী এই শহরটি কোনক্রমে টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই আন্দোলনগুলি শহরটির পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। ৩৬১/৯৭২ সনে খিলাফাতের কেন্দ্র কায়রোতে স্থানান্তরিত হইলে উহা ইফরীকিয়্যার জন্য হয় মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। ধনরত্নের সমস্ত সঞ্চয় ফাতিমীদের সহিত মিসরে চলিয়া যায় এবং রাজধানী হিসাবে আল-কায়রাওয়ানের ভূমিকা চিরতরে লুপ্ত হয়। প্রথম দিককার যীরি শাসকগণ কদাচিৎ সেখানে বাস করিতেন, বরং মধ্যবর্তী ও অধিকতর দূরবর্তী মাগরিব অঞ্চলসমূহের দুর্নিবার যুদ্ধে তাঁহাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়। তাঁহাদের শাসনামলের প্রথম দিকে ইহা সমৃদ্ধশালী থাকিলেও মিসরের ফাতিমী প্রভুর দাবীর অত্যধিক চাপ ইহার উপর পড়ে। উপ-প্রতিনিধি 'আবদুল্লাহ আল-কাতিব ৩৩৬/৯৭৬-৭ সালে শহরের ৬০০ নেতৃস্থানীয় নাগরিকের নিকট হইতে কমপক্ষে ৪,০০,০০০ দীনার আদায় করিয়াছিলেন। কয়েকজনকে ১০,০০০ দীনার প্রদান করিতে হইয়াছিল (ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ২৩০)। ইহাতে অনেক লোক সর্বস্বান্ত হইয়া যায়।

কয়েক দশক পরে ৩৯৫/১০০৪-৫ সালে এই শহরে দুর্ভিক্ষ ও ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দেয়। এই সম্বন্ধে ইবনু'র-রাকীক ও অতঃপর ইব্ন 'ইযারী (বায়ান, ১খ, ২৫৬-৭) অতি নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন। গণকবরে প্রতিদিন শত শত লাশ দাফন করা হইত; ঘরবাড়ী শূন্য হইয়া পড়ে। সেবা প্রতিষ্ঠান, চুল্লি, হাম্মাম ইত্যাদি অচল হইয়া যায়। শহর জনশূন্য হইয়া যায়, শরণার্থীরা বিশৃঙ্খলভাবে তাড়াহুড়া করিয়া দূরবর্তী স্থানে গিয়া আশ্রয় নিতে থাকে, এমন কি সুদূর সিসিলী পর্যন্ত চলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে ৪০৫/১০১৪-৫ সওদাগরগণকে পুনরায় সাব্‌রা-তে তাহাদের ব্যবসা স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য করা হয়। সান্হাজাগণ (আল-মাগরিব-এর এক বার্বার গোত্র)-ও উহাতে জড়িত হয়। মনে হইত সকল কিছুই যেন ছিল এই সুন্নী রাজধানীকে শ্বাসরুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র। এতগুলি দুর্যোগের শিকার এই শহরটি প্রত্যক্ষ করে ইহার সমৃদ্ধির অবক্ষয় ও জনসংখ্যার অবলুপ্তি। নগর প্রাচীরের পরিমাপ ২২,০০০ হাত অথবা আনুমানিক ১০.৫ কিলোমিটারের বেশী ছিল না (একটি সংযোগ স্থাপক পথ নগর-প্রাচীরকে সাব্‌রার সঙ্গে সংযুক্ত করিত, আল-মু'ইয্য ৪৪৪/১০৫২-৩ সনে ভীষণ চাপের মধ্যে অতি দ্রুত রাজধানী সাব্‌রা নির্মাণ করিয়াছিলেন) [আল-বাক্‌রী, মাসালিক, পৃ. ২৫]। ফলে সর্বপ্রথম 'উক্‌বা ইব্ন নাফি' শহরের যে অঞ্চলটির পত্তন করিয়াছিলেন শেষ পর্যন্ত শহরের আয়তন সেই পরিমাণেই দাঁড়ায়।

আমাদের সূত্রগুলি হইতে সংগৃহীত তথ্যগুলি যদি সত্য হয় (ইহাই সম্ভাব্য), তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, চূড়ান্ত গৌরবের কালে শহরটির যে আয়তন ছিল, তাহা সংকুচিত হইয়া এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এই শহরটি তখন উহার পূর্ব সত্তার ছায়ামাত্র। তবে তথাকার সংস্কৃতি সর্বদাই কিঞ্চিৎ ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখিয়াছে। মালিকী ফাকীহ ইব্ন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী (মৃ. ৩৮৬/৯৯৬), আল-কাবিসী (মৃ. ৪০৩/১০২২), আশ্'আরী আল-কালানিসী (মৃ. ৩৫৯ বা ৩৬১/৯৬৯-৭১), চিকিৎসক ইব্নু'ল-জায্যার (মৃ. আনু. ৩৯৫/১০০৪, ঐতিহাসিক ইব্নু'র-রাকীক (মৃ. ৪১৮/১০২৮-এর পর), জ্যোতির্বিদ ইব্ন আবি'র-রিজাল (মৃ. আনু. ৪২৬/১০৩৪-৫) [যাঁহার কিতাবু'ল-বারি' ফী আহ্কামিন-নুজূম (كتاب البرع فى احكام النجوم) গ্রন্থখানি ক্যাস্টিলীয়, ল্যাটিন, হিব্রু ও প্রাচীন পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত হয়], ইব্ন শারাফ (মৃ. ৪৬০/১০৬৭) ও অন্যান্য 'আলিম অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁহাদের পূর্ববর্তিগণের কৃষ্টি সমুজ্জ্বল রাখেন। যেই শহরের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং যাহার বিরুদ্ধে শাণিত তরবারি উন্মোচিত হইয়াছিল, সেই শহরের ইঁহারাই সর্বশেষ আলোকবর্তিকা ছিলেন। শেষ আঘাতটি হানে বানূ হিলাল, যাহারা আল-মু'ইয্য-এর সাবরা ত্যাগের এবং আল-মাহাদিয়্যাতে আশ্রয় গ্রহণের দুইদিন পরে, ১ রামাদান, ৪৪৯/১ নভেম্বর, ১০৫৭, এই শহরটি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। ইব্ন রাশীক একটি অতি করুণ শোকগাঁথাতে (দীওয়ান, বৈরূত, তা. বি., ২০৪-১২) বিধ্বস্ত নগরটির প্রশংসা করিয়াছেন।

৫ম/১১শ শতকের মধ্যভাগ ছিল শুধু আল-কায়রাওয়ানেরই নহে, বরং সমগ্র ইফরীকিয়্যারই ইতিহাসের প্রধান যুগসন্ধিক্ষণ। উহা ছিল অতি সমৃদ্ধ, অত্যুজ্জ্বল; মোটামুটি গৌরবময় একটি যুগের অবসান এবং তদপেক্ষা অনেক অনুজ্জ্বল অপর এক যুগের শুরু। শহর ও নাগরিক জীবন সুস্পষ্টভাবেই অপসৃয়মাণ ছিল চারণ ও বেদুঈন জীবনের প্রভাবে এবং দেশটির উপরে বেদুঈনদের প্রভাব ১৯ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান এক অভিশাপস্বরূপ হইয়া থাকে। অবক্ষয়ের এই সর্বব্যাপী পরিবেশে আল-কায়রাওয়ান এক মর্যাদাপূর্ণ রাজধানী হইতে দারিদ্র্যপীড়িত স্তেপ (Steppe) শহরে পরিণত হয়। অবশিষ্ট অধিবাসিগণও শহর ত্যাগ করে এবং জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পায়। বানূ হিলাল-এর আঘাতের দশ বৎসর পরে শহরের বিখ্যাত মসজিদ এবং পশ্চিমাংশের অবশিষ্ট এলাকার চতুর্দিকে একটি অস্থায়ী ধরনের দেওয়াল বর্তমান ছিল। বর্তমান কালের দেওয়াল-রেখার প্রায় কাছাকাছি এই দেওয়াল ছিল ৩ কিলোমিটার হইতে কিঞ্চিত দীর্ঘতর। আল-ইদ্রীসী লিখিয়াছেন (দ্র. নুয্হা, আংশিক সম্পা. H. Peres, আলজিয়ার্স ১৯৫৭-৮০) যে, তাঁহার রচনাকালে (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে আল-মুওয়াহিদগণের বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে) আল-কায়রাওয়ান একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানমাত্র ছিল (الاطلال الدراسة و الاثار الطامسة)। অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও মাটির অসমাপ্ত প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। আর শহরটি ছিল আরব বেদুঈনদের দখলে, যাহারা হতভাগ্য দরিদ্র অধিবাসিগণের নিকট হইতে খাজনা আদায়

করিত। রাক্কাদা ও সাব্রা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহাই ছিল শহরটির ভাগ্যের সর্বনিম্ন বিন্দু।

আল-মুওয়াহহিদগণের, বিশেষত হাফসীগণের শাসনের ফলে এই শহরে কিঞ্চিত শান্তি ফিরিয়া আসে এবং ধ্বংসাবস্থা হইতে শহরটি কিছু উন্নতি লাভ করে। ৭ম/১৩শ শতকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নততর বহিঃপ্রাচীর নির্মিত হয়। মুরাবিত (مرابط = Marabout) আন্দোলনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শহরটি যাবিয়া-তে পরিপূর্ণ হইতে থাকে (ইব্ন নাজী, মা'আলিম, ৪খ, ২২৭)। কিন্তু জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল নগর জীবনে সদ্য অভ্যস্ত বেদুঈন শ্রেণীর লোক। তখন হইতে এই জনগোষ্ঠী অধিকতর অমার্জিত হইতে লাগিল। য়াকূত (মৃ. ৬২৬/১২২৮) লিখিয়াছেন ঃ "আজকাল যাহাদিগকে দেখা যায় তাহারা সকলেই অমার্জিত গেঁয়ো লোক (معلوك)" [বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৪খ, ৪২০]। আল-'আব্দারী ৬৮৮/১২৮৯ সনে যিয়ারাত উদ্দেশ্যে যাইয়া যেই ধারণা লাভ করেন তাহাও তেমন ভাল নহে (আর-রিহ্লাল-মাগরিবিয়্যা, সম্পা. এম. আল-ফাসী, রাবাত ১৯৬৮ খৃ., ৬৪, ৬৬, ৮২)।

বস্তুত আল-কায়রাওয়ানে অধিকতর নিম্ন পর্যায়ে এক নূতন জীবনধারা শুরু হয়। ক্রমাগত ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির পটভূমিতেও এই শহর অন্তত কিছুটা মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু অতীত গৌরবের তুলনায় তাহা ছিল নগণ্য। তথাপি রাজ্যের অন্যান্য শহরের তুলনায় ইহা অধিকতর সম্মানিত ছিল এবং নূতন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ বেদুঈনগণের বাজার-শহর এবং বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে নিজ ভূমিকার সমন্বয় সাধন করে। এখানকার পণ্য সামগ্রী পশ্চিমে চালান হইয়া যাইত বলিয়া বাজারগুলি সংকুচিত হইলেও অত্যাবশ্যক পণ্যাদি, যথা ঃ চামড়া, বস্ত্র ও ধাতব দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য মজুদ থাকিত। বিনিময়ে চারণ-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। লিও আফ্রিকানাস ১৫১৬ খৃ. অর্থাৎ হাফ্সী আমলের শেষভাগে এই শহর সফর করেন। তিনি বর্ণনা করেন, "বর্তমানে এখানে শুধু দরিদ্র কারিগর শ্রেণীর লোক দেখা যায়; অধিকাংশই ভেড়া ও বকরীর চামড়া পাকা করার কাজ করে। চামড়াজাত পরিধেয় তাহারা নুমিডিয়া-র বিভিন্ন শহরে, যেইখানে কোন য়ূরোপীয় বস্ত্রাদি পাওয়া যায় না" গিয়া বিক্রয় করে (দ্র. Description de l' Afrique, অনু. A. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ৩৯৮)। পরবর্তীকালে, বিশেষত হুসায়নী শাসনামলের শুরুতে আল-কায়রাওয়ানের উন্নতি হয় এবং দেশের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় শহরের স্থান লাভ করে। ১৮শ শতকের শুরুতে আল-ওয়াযীর আস-সার্রাজ (মৃ. ১১৪৯/১৭৩৬-৭) লিখেন, "বর্তমানে তিউনিসের পরে আল-কায়রাওয়ান অপেক্ষা বৃহত্তর কোন শহর সমগ্র ইফরীকিয়্যাতে নাই। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে রহিয়াছেন অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অত্যন্ত দক্ষ কারিগর এবং অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী" (হুলাল, সম্পা. এম. এইচ. আল-হীলা, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., ১খ, ২৪৪)। এই ধারণার সমর্থক J. A. Peysonnel লিখিয়াছেন, "আল-কায়রাওয়ান এই রাজ্যের সর্ববৃহৎ শহরগুলির অন্যতম। ইহা একটি লোনা সমভূমিতে অবস্থিত। ইহার পরিধি অর্থ লীগ (league - প্রায় ৩$\frac{১}{২}$ মাইল), জন সংখ্যা যথেষ্ট ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। কয়েকবারই শহরটি বিধ্বস্ত হয়; কিন্তু বে হাশেম ইবন 'আলীর শাসনাধীনে ইহার উত্তম সংস্কার করা হয়। ... এখানে প্রচুর পশমী কাপড় তৈরী হইত, যথা ঃ বুর্নুস (برنس = মস্তকাবরণ), Sufficielis ও অন্যান্য সামগ্রী, যেইগুলি ছিল এই দেশের বৈশিষ্ট্য" (Relation d'une voyage sur les cotes de Barbarie, fait par l'ordre du roi en 1724 and 1725, ed. M. Dureau de la Malle, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ১খ, ১১৩, আরও দ্র. ১খ, ১৬০)। L. R. Desfontaines ১৭৮৪ খৃ., জানুয়ারী মাসে আল-কায়রাওয়ান সফর করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই শহর "তিউনিসের পরে দেশের সর্বাপেক্ষা বড় শহর; তিউনিস অপেক্ষা প্রকৃষ্টভাবে নির্মিত এবং অধিকতর পরিচ্ছন্ন ...। আল-কায়রাওয়ানের প্রধান পণ্য পশু-চর্ম। অধিবাসীরা ইহার বিভিন্ন ব্যবহার জানে। স্থানীয় ফ্যাশন অনুযায়ী লাগাম, জিন ও জুতা তৈরী হয়। বারাকান নামে পরিচিত নানা পশমী কাপড়ও উহারা তৈরী করে। অন্যান্য স্থানের লোকদের তুলনায় এখানকার অধিবাসিগণ বেশী সুখী; বর্তমান বে-এর দাদাকে তাহারা যে সাহায্য ও সমর্থন দান করিয়াছিল তাহারই পুরস্কারস্বরূপ তিনি এই শহরবাসিগণের ট্যাক্স মওকুফ করিয়া দেন" (Fragments d'un voyage dans les regences de Tunis et d'Alger fait de 1783 a 1786, ed. M. Dureau de la Malle, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ২খ, ৬১)। V. Guerin ১৮৬১ খৃ. ১৮ হইতে ২০ আগস্ট, এই তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। তিনি মনে করেন, " কেবল ১২,০০০ লোকের এই শহর রিজেন্ট শাসিত শহরগুলির মধ্যে "তিউনিসের পরে সর্বাপেক্ষা জনবহুল (Voyage Archeologique dans la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৬২ খৃ., ২খ, ৩৩৪)। ইহার স্থান ছিল সাফাকিস (Sfax)-এর আগে। লোক সংখ্যা ১০,০০০-এর বেশী ছিল না, সূস, মুনাস্তির ও মাহ্দিয়া শহরত্রয়ের আগেও কোনটিরই জনসংখ্যা ৫,০০০ বা ৮,০০০-এর বেশী ছিল না। তবে ইহা অবস্থিত ছিল এক প্রায় নিষ্পাদপ প্রকৃত মরুভূমির মধ্যে, যাহাতে ঝোপঝাড় বলিতেও কিছু ছিল না" (V. Guerin, Voyage..., ২খ, ৩২৬)। মোটের উপর পশ্চাদ্ভূমি ধ্বংস হওয়া এবং নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকাকালীন পর্যন্ত দৃশ্যত অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি অপেক্ষা সীদী 'উক্বা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই শহরটি বেশী টেকসই বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

ইহার ধর্মীয় মর্যাদা অবশ্যই ইহার অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। "প্রায় ৫০টি যাবিয়া ও ২০টি মসজিদের এই শহর" (V. Guerin, Voyage, ২খ, পৃ. ৩২৮) ১৯ শতকের মধ্যভাগ নিঃসন্দেহে দেশের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল। সেই সময়ে এই শহরকে পবিত্র নগরী বলিয়া গণ্য করা হইত এবং নীতিগতভাবে ইহাতে অ-মুসলিমগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে উহার সেই পবিত্রতা নাই। পর্যটকগণ উহার পবিত্র স্থানসমূহে অবাধে যাতায়াত করে। জনসংখ্যার বিবেচনায় সীদী 'উক্বা প্রতিষ্ঠিত এই শহর দেশের মধ্যে ৫ম স্থানের অধিকারী। ইহাই আবার দেশের বিলায়েত (গভর্নর শাসিত এলাকা)-গুলির মধ্যে সর্বাধিক অনুন্নত স্থান। তবে এখনও ইহার পবিত্রতার কিঞ্চিৎ দীপ্তি বিদ্যমান, যে কারণে ইহা বহু স্বনামধন্য দর্শক আকর্ষণ করে। আল-মাগরিবের দেশগুলির একত্রীকরণের ও ফেডারেশন গঠনের প্রশ্ন যখনই উপস্থাপিত হয়, তখন কতিপয় লোক মত প্রকাশ করে, "এই ফেডারেশনের রাজধানী হওয়া উচিত আল-কায়রাওয়ান, যহা বহু শতাব্দী যাবত মুসলিমগণের আধ্যাত্মিক রাজধানী ছিল। আর সে কারণেই মুসলিম জাহানের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রতীক হইবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান" (দ্র. La. Presse, তিউনিসের একটি দৈনিক পত্রিকা, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩-এর সংখ্যা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই বিষয়ে এত অধিক তথ্য-সূত্র রহিয়াছে, যেইগুলি সাকুল্যে লিপিবদ্ধ করা দুরূহ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণগুলির নাম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত গবেষণা সন্দর্ভাদি ঃ (১) T. Bachrouch, Le gouvernement des beys muradites au XVII^e sicele, unpublished thesis, Aix-en-Provence ১৯৭৩ খৃ., ১৫, ১৯, ১১৫-৬, ১৩৭, ১৪২; (২) J. Berque, Du nouveau sur les Banu Hilal ? in SI, xxxvi (1972), ৯৯-১১৩; (৩) R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hafsides, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ৩৫৭-৭৬; (৪) Cl. Cahen, Quelques mots sur les Hilaliens et le nomadisme, in JESHO (মার্চ ১৯৬৮), ১৩০-৩২; (৫) A. Cayaci, La question tunisienne et la politique ottomane (1881-1913), Neuchatel ১৯৬৩ খৃ., নির্ঘণ্ট। আরবী অনু. A. Temimi, তিউনিস ১৯৭৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৬) Ennabli-Mahjoubi-Salomson, La necropole romaine de Raqqada, তিউনিস ১৯৭১-৭৩, দুই খণ্ড; (৭) P. Fagault, Tunis et Kairouan, প্যারিস ১৮৮৯ (১৮৮৭ সনের একটি ভ্রমণের বিবরণী), ২১৬-৮২; (৮) J. Ganiage, Les origines du protectorat francais en Tunisie (1861-81), প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৯) এইচ. আর ইদরীস, La berberie orientale sous le Zirides, X^e-XII^e siecles, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ২খ, ৪১১-২৮; (১০) ঐ লেখক, De la realite de la catasrophe hilalienne, in Annales, E. S. C., সংখ্যা ২৩, (১৯৬৮ খৃ.) ৩৯০-৪৬১; (১১) B. Roy and P. Poinssot, Inscriptions arabes de Kairouan, ২ fasc., প্যারিস ১৯৫০-৮; খৃ. (১২) H. Saladin, Tunis et Kairouan, প্যারিস ১৯০৮, ৯৮-১৪০; (১৩) M. Talbi L'Emiral Aghlabide, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ. নির্ঘণ্ট; (১৪) ঐ লেখক, Kairouan et le malikisme espagnole, in Etudes d'orientalisme... Levi-Provencal, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ১খ., ৩১৭-৩৭; (১৫) সা'দ যাগ্‌লূল, তা'রীখু'ল-মাগ্‌রিবি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৬) A. Zghal, Modernisation de l'agriculture et populations semi-nomades, The Hague ১৯৬৭ খৃ. ২৭-৩১, ৬৪-৭৮; (১৭) La situation de l'emploi dans le gouvernorat de Kairouan, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের Roneotyped প্রকাশনা, তিউনিস, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ খৃ.; (১৮) Encyclopaedia Britannica, ১৫শ সংস্করণ, ১৮খ, প্রবন্ধ Tunisia (গ্রন্থপঞ্জী সংক্ষেপিত)।

M. Talbi (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

আল-কায়রাওয়ানী (দ্র. ইব্ন আবী যায়দ আল-কায়রাওয়ানী)

কায়রো (দ্র. আল-কাহিরা)

কায়ল (দ্র. মাকায়ীল)

কায়লা আল-আনমারিয়্যা (قيلة الانمارية) ঃ (রা) আল-আনসারিয়্যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈকা সাহাবিয়্যা, আনসারদের শাখা বানূ আন্‌মার গোত্রভুক্ত। আত-তাবারী তাঁহাকে বানু'ল-'আকীল গোত্রীয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জীবনীকারদের মতে কায়লা আল-আন্‌মারিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্ন হিব্বান, আয-যাহাবী, ইবনু'ল-আছীর প্রমুখ তাঁহার নাম সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবী খায়ছামা ও ইব্ন মাজা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উছমান ইব্ন খায়ছামের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কায়লা আল-আন্‌মারিয়্যা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) মারওয়া-র নিকটে স্বীয় 'উমরার ইহরাম হইতে হালাল হইতেছিলেন; তখন আমি বলিলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এমন একজন নারী, যে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক সময় আমি পণ্যদ্রব্য যে দামে ক্রয় করি তাহার অধিক দর করি। অতঃপর তাহা কমাইয়া দেই।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "এমন করিও না।" ইব্ন সা'দ উক্ত হাদীছটি 'উছমান ইব্ন খায়ছামের সূত্রে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। আল-ফাকিহীর বর্ণনামতে মক্কায় কায়লা আল-আন্‌মারিয়্যা (রা)-এর একটি বাড়ী ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ৫৩৫; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯৩; (৩) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৩৪৯; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১২খ, ৪৭৪; (৫) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ৬১১; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২৯৯; (৭) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবা-র টীকায় সংযুক্ত, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯৩)।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়লা আল-খুযা'ইয়্যা (قيلة الخزاعية) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবিয়্যা। খুযা'আ গোত্রের সিবা' ইব্ন 'আবদি'ল-'উয্‌যা ইব্ন আম্‌র ইব্ন নাদলা ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন সুলায়মান ইব্ন খুযা'আ-এর জননী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নাম সাহাবিয়্যাদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র-এর মতে তাঁহার সাহাবিয়্যা হওয়া সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯৩; (২) ইব্নু'ল-আছীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ৫৩৫; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২৯৯; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবা-র টীকা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯৩)।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়লা বিন্‌ত মাখরামা আত-তামীমিয়্যা (قيلة بنت مخرمة التميمية) ঃ (রা) জনৈকা সাহাবিয়্যা। বানূ তামীমের শাখা বানু'ল-'আনবার গোত্রভুক্ত। অনেকে বানূ গানাবা ও কেহ বানু'ল-'আনায গোত্রের বলিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম সাফিয়্যা বিন্‌ত সায়ফী। তিনি আক্‌ছাম ইব্ন সায়ফীর ভগ্নি, কায়লা-র স্বামীর নাম হাবীব ইব্ন আয্‌হার। কায়লা-র গর্ভে তাঁহার কয়েকটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হাবীব ইব্ন আয্‌হার ইনতিকাল করিলে তাঁহার ভ্রাতা আছওয়াব্ ইব্ন আয্‌হার কায়লা-র নিকট হইতে কন্যাদের কাড়িয়া লয়। কায়লা এই অবসরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভের জন্য মদীনাভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার হিজরতের ঘটনা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আল-বুখারী, আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী প্রমুখ

মুহাদ্দিছ ধারাবাহিক সনদে ঘটনার অংশবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আত-তাবারানী ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। কায়লা স্বয়ং তাঁহার এই ঘটনার মূল বর্ণনাকারী। তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার ভাষা সাহিত্যালংকারে পূর্ণ। বিভিন্ন ভাষ্যকার ইহার বিরল ভাষ্য ও উন্নত মানের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ঘটনাটি কৌতূহলপূর্ণ বিধায় নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। কায়লা বলেন, "আমার স্বামীর ইনতিকালের পর তাঁহার ভাই যখন আমার কন্যাদের কাড়িয়া লইল তখন আমি মদীনার পথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভের আশায় রওয়ানা হইলাম। তখন আমার গোত্রে ইসলামের উদয়লগ্ন। আমার সর্ব কনিষ্ঠা কন্যার নাম জুওয়ায়রিয়া। আমাকে বিদায় লইতে দেখিয়া সে চিৎকার জুড়িয়া দিল। বাধ্য হইয়া তাহাকেও সঙ্গে লইলাম। সঙ্গে তাহার লালন-পালনের দায়িত্বে ন্যস্ত আল-হুদায়বা'ও চলিল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখি আছওয়াব নাঙ্গা তরবারি হস্তে আমাদের দিকে ধাবমান। নিকটে আসিয়া সে তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিল, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়া দাও। অনন্যোপায় হইয়া আমি জুওয়ায়রিয়া-কে তাহার হাতে অর্পণ করিলাম। সে তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। আমি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম যে, আছওয়াবই তো এই মেয়ের সর্বাধিক নিকট আত্মীয়।

অতঃপর আমি নিকটে আমার জনৈকা ভগিনীর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম, যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংসর্গে পৌঁছার একটি উপায় লাভ করিতে পারি। আমার ভগিনীর স্বামী একদা রাত্রে জনৈক মদীনার যাত্রীর সংবাদ নিয়া আসেন। তাঁহার নাম ছিল হুরায়ছ ইব্‌ন হাস্‌সান আশ-শায়বানী। বানূ বাক্‌র ইব্‌ন ওয়া'ইলের প্রতিনিধি হিসাবে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাইতেছিলাম। আমি আমার ভগ্নির অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যুষকালে তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। সত্যিই তিনি একজন সৎ সফরসঙ্গী ছিলেন। এইভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি সকলকে নিয়া ফজ্‌রের সালাত আদায় করিতেছিলেন। সবেমাত্র উষার আবির্ভাব হইয়াছে। অন্ধকারে কাহাকেও চেনা যাইতেছিল না। আমি একজন পুরুষের পার্শ্বে সালাতে সারিবদ্ধ হইলাম। তখন তো আমি জাহিলী যুগের অতি কাছাকাছি ছিলাম। শারী'আতের বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। পার্শ্বের লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ওহে ! তুমি কি পুরুষ না নারী ? বলিলাম, নারী। সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তুমি তো আমার সালাত নষ্ট করিয়া দিতেছ। পিছনে নারীদের সারি আছে, সেইখানে গিয়া দাঁড়াও। আমি তথায় গিয়া দেখি হুজ্‌রাসমূহের কাছাকাছি তাহাদের কাতার। প্রবেশকালে তাহাদেরকে লক্ষ করি নাই। আমি তাহাদের সঙ্গেই রহিলাম। সূর্যোদয়ের পর আমি সম্মুখে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম চাদর পরিহিত এক সৌম্য মূর্তি। মনে মনে ভাবিলাম, ইনিই আল্লাহ্‌র রাসূল হইবেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া সালাম দিল, السلام عليك يا رسول الله, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার উপর সালাম। তিনি তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। এই দিকে আমি তাঁহাকে চিনিবামাত্রই ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তি তখন বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এই নিঃসম্বলা কাঁপিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হে রিক্তা ! তুমি শান্ত হও।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমার ভয় বিদূরিত হইল। অতঃপর আমার সঙ্গী তাঁহার সমীপবর্তী হইল এবং নিজের ও গোত্রের পক্ষ হইতে ইসলামের বায়'আত করিল। অতঃপর নিবেদন করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমাদের ও বানূ তামীমের মাঝে আদ-দাহ্‌না' (একখণ্ড ভূমি) লিখিয়া দিন। কোনও মুসাফির ও পথিক ছাড়া অন্য কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। রাসূলুল্লাহ (স) একজনকে তাহা লিখিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। ইহা আমার অন্তরে অসহ্য বোধ হইল। কারণ ইহা ছিল আমারই সম্পত্তি। আমারই জন্মভূমি। তৎক্ষণাৎ আমি আপত্তি করিলাম। বলিলাম, 'য়া রাসূলাল্লাহ্! সে পথিকের জন্য পরিত্যক্ত জমির আবদার করে নাই। বরং ইহা উষ্ট্র ও বক্‌রীর চারণভূমি।' রাসূলুল্লাহ (স) তখন লিখিতে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাইসদৃশ। জমির ঘাস-পানিতে উভয়ে সমান অংশীদার। বিপদাপদে পরস্পরের সাহায্যে আগাইয়া যাইবে। তখন প্রার্থনাকারী বলিয়া উঠিল, হে অসহায়া ! তোমাকে সঙ্গে আনিয়া তো আমি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত হানিয়াছি। তখন আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম যে, ইনিই যাত্রাপথে আমার সফরসঙ্গী ও পথ প্রদর্শক ছিলেন। আমি তাঁহার সৎ চরিত্রের প্রশংসা করিলাম। অতঃপর জমি লইয়া কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে বিতর্ক হইল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) একটি লাল বর্ণের চামড়ায় আমার ও আমার কন্যাদের জন্য জমিটুকু লিখিয়া দিলেন। শর্ত করিলেন ঃ কাহারও অধিকার বিনষ্ট করা হইবে না। কোনও অন্যায় কর্মে কাহাকেও বাধ্য করা যাইবে না। সকল মু'মিন মুসলিম আমাদের সহায়তা করিবে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ৯১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ৫৩৫, ৫৩৬; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা-র টীকা দ্র., মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯২, ৩৯৩); (৪) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩৯৭/১৯৭৭ ৩খ, ৩৪৯; (৫) আল-খাতীব, আল-ইক্‌মাল (মিশকাতু'ল-মাসাবীহ-র শেষে যুক্ত), দিল্লী তা. বি., ৬১৪; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ, ২৯৯; (৭) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ, ৩১২; (৮) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১২খ, ৪৭৪; (৯) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ৬১১।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়লুহরাসব (দ্র. কায়ানীগণ)

কায়স (قيس) ঃ জাবাল, ফার্‌সী কবি 'কীশ' (كيش) নামেও পরিচিত, বাণিজ্যিক দিক হইতে পারস্যোপসাগর (بحر عمان)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপগুলির অন্যতম, বিশেষ করিয়া সীরাফের ধ্বংসের ফলে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। উপকূল হইতে হুযু বন্দরের বিপরীতে প্রায় চার ফারসাখ দূরে এবং পরিধিতেও চার ফারসাখ। দ্বীপটি ছিল ফুলের বাগান ও জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণ শিল্পের দ্বারা সুশোভিত। উক্ত দ্বীপে 'উমানের শাসকের বাসভবন অবস্থিত ছিল। তথায় কূপের সাহায্যে ও চৌবাচ্চায় সংগৃহীত বৃষ্টির পানি দ্বারা পানি সরবরাহ করা হইত। কায়স ও তৎসংলগ্ন অন্য দ্বীপগুলি মুক্তা উত্তোলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। য়াকূত-এর মতে নৌবহরের বিশালতার দরুন ইহার শাসককে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করা হইত এবং তিনি বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেন বলিয়া মনে করা হয়। এই দ্বীপে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী তৎপরতাও চোখে পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ২৫৭, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জীর উদ্ধৃতি দিয়া;

(২) য়াকূত, বুল্দান, সম্পা. Wustenfeld, ৪খ, ২১৫-৬।

J. Lassner (E.I.²)/ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

কায়স (قيس) ঃ (রা) শুনায়মের পিতা, বানূ মাযিন মতান্তরে বানূ আসাদ গোত্রের লোক, কূফার অধিবাসী। ইব্ন আবী হাতিম, আবূ 'উমার, বাগাবী, ইব্নু'স-সাকান ও ইমাম বুখারীর মতে তিনি নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। বুখারী ও বাগাবী শুনায়মের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি আমার পিতার নিকট কিছু উক্তি (কয়েক ছত্র কবিতা) শুনিয়াছি। নবী (স) ইনতিকাল করিলে তিনি তাহা রচনা করিয়াছিলেন ঃ

الا لی الویل علی محمد   قد کنت فی حیاته بمقعد

ابيت ليلى آمنا لى الغد

বাগাবীর মতে তিনি নবী (স)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনু'স-সাকান-এর মতেও তিনি নবী (স)-এর সাহাবী। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৪।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স (قيس) ঃ (রা) মুহাম্মাদ-এর পিতা, ইমাম তাবারানী তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী বলিয়াছেন এবং নিজস্ব সনদ পরম্পরায় তাঁহার একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স (রা) বলেন ঃ আমার পিতা (কায়স) আমার হাতে একটি চাবুক দেখিতে পাইলেন যাহাতে ঝুলাইয়া রাখিবার মতো কোনও দড়ি ছিল না। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ "তোমার চাবুক ঝুলাইয়া রাখার দড়িটি সুন্দর করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন।" আবূ নু'আয়ম ও আবূ মূসাও তাবরানীর সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৪।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স (قيس) ঃ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-আশ'আছ-এর দাদা, আল-মুসতাগফিরী নিজস্ব সনদ পরম্পরায় বলিয়াছেন যে, তিনি (কায়স) নবী (স)-এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করেন নাই। আবূ সা'ঈদ ইব্ন য়ূনুস বলেন, তাঁহার সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইবনু'ল-আছীরের ধারণামতে তিনি কায়স আল-কিন্দী।

ইব্ন হাজার বলেন, যদি তিনি কায়স আল কিন্দীই হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী নহেন এবং তাঁহার কোন হাদীছও বর্ণিত নাই। কেননা তিনি জাহিলী যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তবে তিনি আল-কিন্দীর নানা হইতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৪; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২২৫-৬।

মুহাম্মদ মূসা

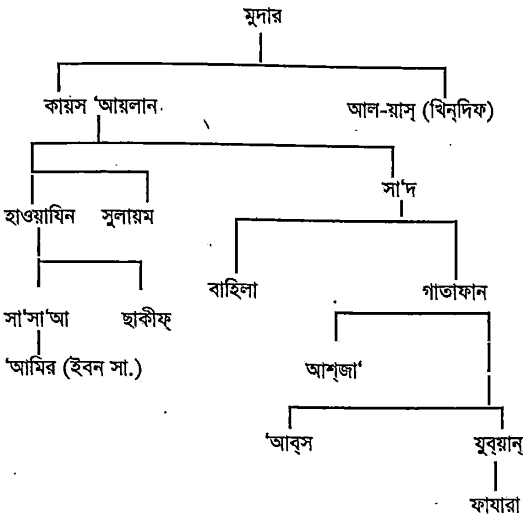
কায়স, আবূ ইসরা'ঈল (قيس إبو إسرائيل) ঃ (রা), সাহাবী, বানূ 'আমির (কুরায়শ) গোত্রের লোক। মতান্তরে আনসার সম্প্রদায়ের লোক। বলা হয় তাঁহার নাম য়ুসায়র (يعسير) মতান্তরে কুশায়র (قشير) বা কায়সার (قيسر)। 'আবু'ল-গানী বলেন, নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে আবূ ইস্রা'ঈল (দ্র.) উপনামের তিনি ছাড়া আর কোনও সাহাবী নাই। তাঁহার স্ত্রীর নাম বার্‌রা বিন্ত 'আমির ইবনি'ল-হারিছ (برة بنت عامر بن الحارث); তিনি মুহাজির মহিলা ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভেই ইসরা'ঈল জন্মগ্রহণ করেন। আবূ ইসরা'ঈল (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে প্রবেশ করিলেন, তখন কায়স (আবূ ইসরা'ঈল) সালাতরত অবস্থায় ছিলেন। নবী (স)-কে বলা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এই সে ব্যক্তি — যে বসিবে না, লোকদের সঙ্গে কথা বলিবে না, ছায়া গ্রহণ করিবে না এবং রোযা রাখিবে বলিয়া মানত মানিয়াছে। নবী (স) বলিলেন ঃ সে যেন বসে, লোকদের সঙ্গে কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং রোযা রাখে" (মুসনাদে আহমাদ)। বাগাবীর বর্ণনায় আছে, আবূ ইসরা'ঈল (রা) বলেন যে, নবী (স) তাঁহাকে রৌদ্রে দাঁড়ান অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহার কি হইয়াছে ? লোকেরা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এই সেই ব্যক্তি... এবং রোযা রাখে।

খাতবী বাগদাদীর বর্ণনায় আছে, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) জুমু'আর দিন লোকদের উদ্দেশে খুত্‌বা দিতেছিলেন। তিনি আবূ ইসরা'ঈল নামে কুরায়শ বংশের বানূ 'আমির গোত্রের এক ব্যক্তিকে রৌদ্রে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিলেন... পূর্ববৎ। ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তা' গ্রন্থে হাদীছটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাতে আবূ ইস্রা'ঈল (রা)-এর নাম উল্লেখ নাই। সাহীহ বুখারী এবং মুসলিম গ্রন্থদ্বয়েও এই হাদীছটির উল্লেখ আছে। বুখারীর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। একদা নবী (স) ভাষণ দিতেছিলেন। এমন সময় তিনি এক ব্যক্তিকে (রৌদ্রে) দাঁড়ান অবস্থায় দেখিলেন। তিনি তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা বলিল, সে আবূ ইসরা'ঈল। সে মানত করিয়াছে যে, সে দাঁড়াইয়া থাকিবে, বসিবে না, কথাবার্তা বলিবে না এবং রোযা রাখিবে। নবী (স) বলিলেন ঃ তাঁহাকে নির্দেশ দাও —সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা রাখে (কিতাবু'ল-আয়মান ওয়া'ন-নূযূর)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) এবং জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) তাঁহার হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৬-৭; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৪খ, ১২); (৩) উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ১৩৬।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স্ 'আয়লান (قيس عيلان) ঃ মুদার্ বংশের দুই উপ-বিভাগের একটি ইহা রাবী'আসহ 'আদনান-এর, তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় আরবগণের পুত্রসমূহের পরিচিতি বহন করে [দ্র. জাযীরাতু'ল-'আরাব]। মুদার বংশের অন্য উপ-বিভাগটি হইল খিন্দিফ বা আল-য়াস। 'আয়লান-কে কখনও কখনও কায়স-এর পিতা বলিয়া অভিহিত করা হয়, কিন্তু খুব সম্ভবত জোড়া নামের অর্থ হইল, "আয়লান (যথা, অশ্ব, কুকুর অথবা ক্রীতদাস)-এর কায়স (মালিক)"। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত বংশানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল ঃ



জাহিলী যুগে কায়স্ 'আয়লান একটি একক দল হিসাবে কাজ করিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, এবং আয়্যামু'ল-'আরাব (আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনগুলি)-এর বিবরণীতে কেবল বিশেষ গোত্রগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, উমায়্যা যুগে গোত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি রাজনৈতিক দলের অনুরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ বংশতালিকা সুবিধাজনক ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছিল। যখন বিভিন্ন গোত্র হইতে ছোট ছোট নির্বাচিত দলকে সাম্রাজ্যের শহরগুলিতে একত্রে বসবাস করান হইয়াছিল তখন হইতে এই প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছিল; বসরার জন্য তু. C. Pellat, Le milieu basrien, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ২৩ ও স্থা.। অবশেষে, সম্ভবত ৬০/৬৮০ সালে আমীর মু'আবিয়া (রা)-র মৃত্যুর পূর্বে নহে, দুইটি প্রধান দল গঠিত হইতে দেখা যায়। একটি কাল্ব বা য়ামান বা দক্ষিণাঞ্চলীয় আরব নামে পরিচিত। আর অন্যটি হইল কায়স 'আয়লান বা শুধু কায়স বা কখনও কখনও মুদার। যেহেতু মু'আবিয়া (রা) কাল্ব গোত্রের উপর নির্ভর করিতেন এবং তাঁহার পুত্র প্রথম য়াযীদ-এর মাতা ছিল কাল্ব গোত্রীয়, সেইহেতু কায়স গোত্রীয় অনেকেই 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যুবায়র (রা)-কে সমর্থন করিতেন। যদিও প্রথমত অন্যান্য দলের, যেমন রাবী'আর উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি উমায়্যা রাজনীতিতে ক্রমশ কায়স ও য়ামান গোত্রের আধিপত্য লাভের প্রবণতা দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে গোত্রীয় কলহের অবিচ্ছিন্ন ও প্রসারিত রূপ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন; এই মত ৬৮৪ খৃ. মার্জ রাহিত যুদ্ধে বহু জীবনের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দুই দলের মধ্যে সমঝোতা আনয়নের ব্যাপারে উমায়্যা শাসকগণের অক্ষমতা পরিশেষে তাঁহাদের পতন ঘটাইয়াছিল। সাম্প্রতিক কালে এম. এ. শাবান (Islamic History, A. D. 600-750/ A. H. 132, Cambridge 1971) জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 'আবদু'ল-মালিক ও আল-হাজ্জাজের অনুসৃত সম্প্রসারণবাদ নীতির সহিত কায়স একাত্মতা ঘোষণায় আগাইয়া আসিয়াছিলেন, অথচ য়ামানীগণ স্থিতিশীল সীমান্ত ও অনারবগণের আত্তীকরণের পক্ষে ছিলেন। তিনি সুলায়মান ও দ্বিতীয় 'উমার ইবন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর শাসনকালকে সম্প্রসারণবাদ নীতির বিপরীত প্রচেষ্টা হিসাবে দেখিয়াছেন এবং তৃতীয় য়াযীদ-এর শাসন কালকেও একইরূপে দেখিয়াছেন। এই শাসনকালগুলিতে কায়সীগণের স্থলে য়ামানীগণকে গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় 'উমার ও তৃতীয় য়াযীদ-এর উত্তরাধিকারিগণ কায়সীগণের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং উমায়্যা শাসনের অবক্ষয় শুরু হয়। শাবানের যুক্তির অনুকূলে একটি বিশেষ প্রমাণ হইল যে, 'আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠার পর কায়স ও য়ামানীগণের মধ্যে শত্রুতা সম্বন্ধে কমই শোনা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বংশতালিকা ইত্যাদির জন্য দেখুন ঃ (১) তাজু'ল-'আরূস, দ্র. কায়স 'য়ল; (২) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৩১, ৩৮-৪৪, সম্পা. 'উকাশা, পৃ. ৬৪, ৭৯-৯১, কায়সীগণের ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য দেখুন ঃ (৩) J. Wellhausen, The Arab Kingdom and its fall, অনু. M. G. Weir, কলিকাতা ১৯২৭ খৃ., নির্ঘণ্ট, দ্র. Qais, Qaisite, Kalb, Kalbite, Yemen, Yemenite; (৪) এবং Naji H. Hadi, The Role of the Arab Tribes in the East under the Umayyads (University of Edinburgh, Ph. D. thesis, 1973 (আরবীতে প্রকাশিতব্য)।

W. Montgomery Watt (E.I.[2])/ আ. র. মামুন

'উছমানী আমলে কায়স ও য়ামান ঃ কাল্ব ইব্ন ওয়াবারা প্রবন্ধে জাহিলী ও ইসলামী যুগে এবং বিশেষত স্পেনে, উত্তরাঞ্চলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় আরবগণের (যথাক্রমে কায়স ও কাল্ব গোত্রের প্রতিনিধিত্বে) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী গত হইবার পর এই শত্রুতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু 'উছমানী আমলে লেবানন ও ফিলিসতীনে রাজনৈতিক দলাদলির কোন্দলের সময় ইহা কিছুটা কৃত্রিমভাবে আবার দেখা দিয়াছিল।

প্রধান প্রধান বংশের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের সময় সম্মিলিত রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরগুলি রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশার্থে কায়স ও য়ামান নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই বিভাগ গোষ্ঠী সম্পর্কের তাৎপর্য রক্ষা করিয়াছিল এবং গোষ্ঠী-সম্পর্ক (প্রকৃত অথবা কল্পিত, আসল অথবা গৃহীত) ছিল আরব সমাজে বিচ্ছেদ ও যুদ্ধের রীতিসিদ্ধ কারণ। 'উছমানী আমলে লেবানন ও ফিলিসতীনে কায়স-য়ামান সংঘর্ষের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য দুইটি প্রামাণিক তথ্য হইতে উদ্ঘাটিত হয় ঃ (ক) এই দলগুলির প্রতিটিরই বহু সমর্থক (এবং এমনকি ইহাদের অনেক নেতৃস্থানীয় পরিবারবর্গ, যেমন ফিলিসতীনের আবূ গূশ পরিবার) মোটেই আরব ছিল না, বরং সার্কাসীয়, তুর্কী অথবা কুর্দী ছিল; আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত পরিবারগুলি প্রকৃত বংশধারার প্রতি অতি অল্প বিবেচনাসাপেক্ষে পক্ষ পরিবর্তন করিত, যেমন লেবাননের 'আলামু'দ্-দীন পরিবার (শিদ্য়াক, ১ম, ১২৯) অথবা একটি পরিবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রতিপক্ষ দলগুলিকে সমর্থন করিত। কেবলমাত্র শক্তিশালী গোত্রগুলি যাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া নিজেদের অবস্থান রক্ষা করিতে সক্ষম ছিল তাহারাই দলগত আনুগত্যে অবিচল ছিল।

মামূলক আমলে কায়স হিসাবে বিবেচিত শাসক গোষ্ঠী বুহ্তুরগণের প্রতিপক্ষ হিসাবে লেবাননে য়ামান দল 'আলামু'দ্-দীন পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হইত। মা'নগণ যখন ৯২২/১৫১৬ সালে বুহ্তুরগণের স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন শেষোক্ত দলটি উহাদিগকে সমর্থন করে।

৯৯৩/১৫৮৫ সালে মা'নী আমীর কোরকমায্-এর বিরুদ্ধে একটি য়ামানী ষড়যন্ত্র প্রায় সফলতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফাখ্রু'দ-দীন কায়স প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১০৪২/১৬৩৩ সালে দ্বিতীয় ফাখরু'দ-দীনের পতনের পর য়ামানদল 'আলামু'দ-দীন পরিবারের নেতৃত্বে স্বল্পকালের জন্য দ্বিতীয়বার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ১০৪৫/১৬৩৫ সাল হইতে শতাব্দীটির শেষ পর্যন্ত কায়স মা'ন দল প্রভাবশালী ছিল। মা'নগণের উত্তরাধিকারী য়ামান দল শিহাবগণের অধীনে 'উছমানী সমর্থনে ১১২১/১৭০৯ সালে অল্পকালের জন্য আরও একবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ১১২৩/১৭১১ সালে 'আয়ন দারা গ্রামে সংঘটিত ভয়াবহ যুদ্ধে য়ামান সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ 'আলামু'দ্-দীন পরিবারের সকল লোককে এক এক করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এইভাবে লেবাননে য়ামান শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত য়ামানী দ্রুযগণ জীবিত ছিল, তাহাদিগকে লেবানন হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল এবং তাহারা হাওরানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আর্সালানদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল এবং তাহাদিগকে নিম্ন গারব (যাহা তাহাদের আসল মুকাতা'আ-র একটি অংশ ছিল) অধিকারে রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। 'আয়ন দারা-র যুদ্ধের পর লেবাননে যে নূতন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহারা আর কায়স ও য়ামান নাম গ্রহণ করে নাই; তাহার পর হইতে রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের প্রধান পরিবারগুলির নামানুসারে পরিচিত হইতে থাকে।

ফিলিসতীনে কায়স ও য়ামান দলের বিভেদ বহু দিনের। আন-নিম্র (১খ, ৫৯)-এর বর্ণনামতে মামলূক সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালা'উন (১২৯৩-১৩৪০ খৃ.) জাবাল নাবুলুস-এর উত্তরাংশ য়ামান দলকে এবং দক্ষিণাংশ কায়স দলকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে ফিলিসতীনের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণ পুনরায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্ভব হইতে থাকে (U. Heyd, Ottoman documents on Palestine 1552-1615, Oxford 1960, 85-6)। ১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে প্রধানত নাবুলুস ও জেরুসালেম অঞ্চলে কায়স ও য়ামান পতাকাতলে দলীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। জাবাল নাবুলুস ১৭৯৪ ও ১৮২৩ খৃ.-এর মধ্যে তূকান ও নিম্র পরিবারসমূহের মধ্যে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধ এবং ১৮৪০ খৃ.-এর দশক ও ১৮৫০ খৃ.-এর দশকের মধ্যে 'আবদু'ল-হাদী দল ও তূকানগণের মধ্যে সংঘটিত অবিরাম সংঘর্ষ মাঝেমধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই সময় ব্যাপিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি, শহরবাসী, ফাল্লাহীন (কৃষিজীবী) ও বেদুঈন নিজদিগকে কায়স ও য়ামান দলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল এবং এমন কি যে সমস্ত পরিবারের বংশধারা অস্পষ্ট ছিল তাহারাও দল দুইটির যে কোন একটি সহিত সংযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। এইরূপে তূকানগণ তাহাদের শাসনকালের প্রারম্ভে য়ামানগণের সহিত তাহাদের সমাজভুক্তি (আ'লানূ য়ামানিয়্যাতাহুম) ঘোষণা করিয়াছিল যাহাতে তাহারা নাহিয়া-র শায়খগণের সমর্থন লাভ করিতে পারে (আন্-নিম্র, ২খ, ৪১৫-১৬)। একই সময়ে জুদী (Jadaean) পার্বত্য এলাকাও ফাল্লাহীন-এর সংঘর্ষস্থলে পরিণত হইয়াছিল ঃ সামহান পরিবার কর্তৃক পরিচালিত কায়স গোত্র ও আবূ গেশ কর্তৃক পরিচালিত লাহ্হাম, 'আম্র বারগুচ্ছী, গোত্রসমূহ ও য়ামান দল। খৃষ্টান বেথেলহেমের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল য়ামান, আর খৃষ্টান বায়ত জালা-র অধিবাসী ও হেবরন এলাকার মুসলিমগণ ছিল কায়স দলভুক্ত। বেদুঈনগণের এক দলে অথবা অন্যদলে সংযুক্তির ব্যাপারটি পার্শ্ববর্তী ফাল্লাহীন-এর দলভুক্তির অথবা বেদুঈনগণের নিজদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দলাদলির উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণীত হইত।

যাহা হউক, জাবাল নাবুলুস ও জুদী পার্বত্য এলাকার মধ্যে দলভুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোনও বন্ধন খুব কমই কার্যকর ছিল এবং মুখ্য সংঘর্ষগুলিতে এক এলাকার দল অন্য এলাকার প্রতিপক্ষ দলকে সাহায্য করিত না। একই দলের সদস্যগণের মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক বন্ধন প্রধানত দুই অঞ্চলের সীমান্তে দেখা যাইত এবং য়ামান দলের অপেক্ষা কায়স দলে বেশী দেখা যাইত। তদুপরি দুই অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য ছিল। নাবুলুসের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দলীয় যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন এবং ইহাতে অংশগ্রহণ করিতেন। সময়ে সময়ে এমন কি শহরেও সংঘর্ষ সংঘটিত হইত। শহরের এলাকাগুলিও দলীয় ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কোনও যুদ্ধ পরিচালনা করেন নাই বা ইহাতে কোনও সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেন নাই। তথাপি যখন কোনও দুর্বল পাশা শাসন করিতেন, তখন জেরুসালেমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজদের সুবিধার্থে দলীয় যুদ্ধের মোড় ঘুরাইতে সক্ষম হইতেন। শহরের 'মাজলিস'-এ উভয় দলের প্রধান প্রধান গ্রামীণ পরিবারের মিত্রদল থাকিত। সাধারণত যখন একজন শক্তিশালী পাশা একটি এলাকা শাসন করিতেন, তখনই কেবল দলীয় সংঘর্ষের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি বিরাজ করিত। যাহা হউক, ফিলিসতীন ও লেবানন উভয় স্থানেই 'উছমানীগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি দলকে (প্রায়ই দুর্বল দলটিকে) অপর দলের বিরুদ্ধে সমর্থন দান করিতেন। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'উছমানী শাসনের কেন্দ্রীয়করণ বর্ধিত হইলে ফিলিসতীনে দলীয় যুদ্ধ ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, যদিও কায়স অথবা য়ামান দলভুক্ত বলিয়া পরিচিতি দান এবং এই বিভেদজনিত কতকগুলি আচরণ শহরের বাসিন্দাগণের একাংশের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

দলকে সাধারণত সাফ্ফ বলিয়া উল্লেখ করা হইত। আবার 'ইসাবা, ফারীক, তা'ইফা অথবা হিযবও বলা হইত। একটি দলের সহিত সংযুক্ত হওয়াকে না'রা, 'আসাবিয়্যা, শাহ্ওয়া অথবা নিহ্লা নামেও অভিহিত করা হইত। একই দলের একজন সভ্যকে সাহিব এবং একজন শত্রুকে কাওমানী বলা হইত; একদিনব্যাপী যুদ্ধকে হারাবা বলা হইত এবং যুদ্ধ একদিনের বেশী স্থায়ী হইলে তাহাকে কাওন বলা হইত। দলের নেতা তাঁহার প্রতি অনুগত গ্রামগুলিতে (য়াকতা'উ'স-সুফূফ) একবার বার্ষিক পরিদর্শনে যাইতেন। এই সকল পরিদর্শন তাঁহাদের সময় নিরূপণে সময়-নির্ঘণ্ট হিসাবে কাজ করিত।

প্রতিটি দলের নিজস্ব রঙ ছিল— কায়সগণের লাল ও য়ামানগণের সাদা— যাহা দলের পতাকা ও দলের সদস্যগণের পোশাক, মহিলাগণের অবগুণ্ঠন ও বিশেষ করিয়া দুলহিনের অবগুণ্ঠনের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিত। একজন কায়স দুলহিনের জন্য লাল পোশাক পরিহিতা অবস্থায় য়ামান এলাকায় যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল ঃ তিনি সাদা পোশাক দ্বারা তাঁহার লাল পরিচ্ছদ গোপন করিতে অথবা সীমান্তে তাঁহার পরিচ্ছদ ও অবগুণ্ঠন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। দুই দলের মধ্যে আন্তঃবিবাহ অস্বাভাবিক ছিল না এবং এই প্রথাকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত যুদ্ধের বহু লোক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (পারিভাষিক শব্দ ও আচার-আচরণ সম্পর্কে দেখুন, বিশেষ করিয়া আন্-নিম্র, ২খ, ৪৩০-২, আর অন্যান্য অসংখ্য উৎস)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তান্নূস আশ-শিদ্‌য়াক, আখবারু'ল-আয়ান ফী জাবালি লুব্‌নান (১৮৫৯ খৃ.), বৈরূত ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ১২৬-৯, ২৮৮; ২খ, ১৮-২২; (২) কামাল সালিবি, The modern history of Lebanon, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৬-১১, (৩) J. Finn, Stirring times, i-ii, London 1878; (৪) R. A. S. Macalister ও E. W. G. Masterman, The wars of Yaman and Kais in the southern half of Palestine, in PEFQS (1906), 33-50; (৫) E. N. Haddad, Political parties in Syria and Palestine (Qaisi and Yemeni), in JPOS (1920-1), 209-14; (৬) 'উমার 'আস-সালিহ্ আল-বারগূছী, তা'রীখ ফালাস্‌তীন, জেরুসালেম ১৯২৩ খৃ.; (৭) ইহ্‌সান আন-নিমর, তা'রীখ জাবালি নাবুলুস্ ওয়া'ল-বাল্‌কা', ১খ, দামিশক ১৯৩৮ খৃ.; (৮) ২খ, নাবুলুস্ ১৯৬১ খৃ.; (৯) মুহাম্মাদ 'ইয্‌যাত দারওয়াযা, আল-'আরাবু ওয়া'ল-'উরূবা মিনা'ল্-কারনি'ছ-ছালিছ হাত্তা'ল-কারনি'র-রাবি' 'আশার আল-হিজরী, ২খ, দামিশক ১৯৬০ খৃ.; (১০)S. Shamir, Belligerency in a disintegrating society : factional warfare in Ottoman Syria on the eve of the period of modernization, in Abr-Nahrain, xii (1972), 75-84; (১১) M. Hoexter, the role of the Qays and Yaman factions in local political division in Asian and African Studies (Jerusalem), ix/3, 1973.

G. Baer and M. Hoexter (E.I.[2])/ আ. র. মামুন

কায়স ইব্ন 'আ'ইয আল-আহ্মাসী (قيس بن عائذ الاحمسى) ঃ (রা), মতান্তরে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক, উপনাম আবূ কাহিল। ইমাম বুখারী ও ইব্ন আবী হাতিমের মতে তিনি সাহাবী। তিনি নবী (স)-এর নিকট হইতে ও ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখিয়াছি। একটি হাবশী ক্রীতদাস ইহার লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিল।" ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র-এর মতে ইহার সনদ মুন্‌কার (অপসন্দনীয়)। ইমাম বাগাবীর মতে তাঁহার সূত্রে এই একটিমাত্র হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন এবং নিজ গোত্রের সরদার ছিলেন। তিনি আবূ 'উবায়দা ইবনু'ল-জার্‌রাহ (রা)-র পুত্র আল-মুখ্‌তারের সময়ে (৬৮৫-৮৭ খৃ.) ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৪, ৪খ, ১৬৪; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ২খ, ৩২৭, ৪খ, ১৬৪); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২২১; (৪) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১০২।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আদী (قيس بن عدى) ঃ (রা), সাহাবী, বানূ সাহ্‌ম গোত্রের লোক। নবী (স) হুনায়ন যুদ্ধের গানীমাত হইতে তাঁহাকে পঞ্চাশটি, ওয়াকিদীর মতে এক শত উট দান করেন। মতান্তরে তাঁহার নাম 'আদী ইব্ন কায়স। এই দুইজন একই ব্যক্তি কিংবা ভিন্ন দুই ব্যক্তি তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৫, ২খ, ৪৭১, ক্রমিক নং ৫৪৮৮।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আবদি'ল-'উয্‌যা (قيس بن عبد العزى) ঃ (রা) সাহাবী, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, "লোকেরা যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিতে থাকিবে, ততক্ষণ ইহা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষজনিত শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে। অতঃপর তাহারা নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য দীনের (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, "তোমরা মিথ্যাবাদী।" হাদীছটি ইব্ন মান্দা নিজ গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। ইহার সনদে হাজ্জাজ ইব্ন নাসীর রহিয়াছেন, তিনি দা'ঈফ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৫; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২২১-২

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আবদি'ল-মুন্‌যির (قيس بن عبد المنذر) ঃ (রা). আনসারী সাহাবী, রিফা'আ (রা)-র ভাই। তিনি বদর-এর যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। মুনাফিকরা তাঁহাকে ও অন্যান্য বদরী শহীদগণকে তাচ্ছিল্যভাবে মৃত বলিয়া অভিহিত করিলে শহীদদের মর্যাদা বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ - بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

"যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাহাদের 'মৃত' বলি না, বরং তাহারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পার না" (২ ঃ ১৫৪)। শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতও লক্ষণীয় ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

"যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদের 'মৃত' মনে করিও না, বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদের রিয্‌ক দেওয়া হইতেছে" (৩ ঃ ১৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৫; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২২২।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আবদিল্লাহ (قيس بن عبد الله) ঃ (রা) আল-আসাদী. সাহাবী, মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্ত্রী বারাকা বিন্‌তে য়াসার (بركة بنت يسار)-সহ দ্বিতীয় দলের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁহার কন্যা আমিনা (امنة)-কে নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) দুধ পান করান এবং কায়স উম্মু হাবীবা (রা)-র পূর্ব স্বামী 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্‌শের দুধ মাতার স্বামী ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পর খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কেহ কেহ তাহার নাম রুকায়শা (رقيشة) উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বারাকা বিনত য়াসার, আবূ সুফ্‌য়ান ইব্ন হারব (রা)-র আযাদকৃত দাসী ছিলেন। তাঁহার সূত্রে কোনও হাদীছ বর্ণিত নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৫; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২২১।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আবদিল্লাহ (قيس بن عبد الله) : (রা) আল-কিন্দী, ইবনু'ল-কালবীর মতে তিনি তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে নবী (স)-এর নিকট আসিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৫৪; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২২১।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আবদিল্লাহ (قيس بن عبد الله) : আল-হামদানী, ইমাম বুখারী (র)-এর মতে তিনি সাহাবী এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দেখিয়াছেন। হয়ত তিনি তখন কিশোর ছিলেন, যদিও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হইতে কোনও হাদীছ বর্ণনা করেন নাই (আত-তা'রীখ)। কিন্তু 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযীর মতে তিনি তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। তিনি আবূ ইদরীস খাওলানীর সূত্রে ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাবী'আ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৫; (২) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১০১।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আবায়া (قيس بن عبـاية) : (রা) আনসারী সাহাবী। আওস গোত্রের শাখা— বানূ হারিছের মিত্র (হালীফ)। ইবনু'স-সামী' তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'আবদু'ল-জাব্বার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মাহ্না-র মতে তিনি যুবক বয়সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে আবূ 'উবাদা ইবনু'ল-জাররাহ্ (রা)-র সঙ্গে সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। আবূ 'উবাদা (রা) তাঁহাকে তথ্য বিভাগের দায়িত্ব দেন। তিনি মু'আবিয়া (রা)-র খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। 'আল্লামা ইব্ন কাছীর ও ইব্ন সা'দ-এর নিজ নিজ গ্রন্থে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকায় কায়স (রা)-এর নামের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৪; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ৩খ, ৬২৯-৬৩৮; (৩) ইব্ন কাছীর, বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, ৩২৩।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন আবি'ল-'আস (قيس بن أبي العاص) : (রা) রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী। বানূ সাহ্ম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ তালিকা নিম্নরূপ : কায়স ইব্ন আবি'ল-'আস ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদী ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সাহ্ম। জন্ম তারিখ জানা যায় না। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতিথিপরায়ণ হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, মিসর বিজয়ের পর 'উমার (রা) 'আম্র ইবনু'ল-'আস (রা)-এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একটি অংশ হইল যে, বায়'আতু'র-রিদওয়ানে যে সকল সাহাবী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য একশত দীনার করিয়া ভাতা ধার্য করুন। আর আপনার স্ত্রীর জন্য আপনার নামে অনুরূপ ভাতা নির্দিষ্ট করুন। ইহা ছাড়া খারিজা ইব্ন হুযায়ফা-কে তাঁহার বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং কায়স ইব্ন আবি'ল-'আসকে তাঁহার অতিথিপরায়ণতার জন্য একশত দীনার করিয়া ভাতা প্রদান করুন। 'উমার (রা)-র নির্দেশক্রমে 'আম্র ইবনু'ল-'আস (রা) তাঁহাকে মিসরের কাদী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, মিসরের ইসলামী ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিচারপতি হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই বিচারক জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। হিজরী ২৩ সালে রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। মিসরে ইব্ন রুম্মানা-র বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁহার একটি বাড়ী ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৪; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১১৯; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ, ২১।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়স ইব্ন আবি'স-সাল্ত (قيس بن ابى الصلت) : (রা), সাহাবী, খন্দক যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন, বানূ গিফার গোত্রের লোক। হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) কাফির অবস্থায় বদর-এর যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া কায়স (রা)-এর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি নিজের উটে করিয়া তাঁহাকে মক্কায় পৌঁছাইয়া দেন। পরবর্তীকালে উভয়ে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই সময় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের হিদায়াতের পথ দেখাইয়াছেন, এইজন্য তাঁহারা আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। তাঁহারা আরও বলেন, "আমরা অন্যায়ভাবে বাতিলের উপর ছিলাম এবং ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলাম।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫১ নং ৭১৮৮।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন আবী ওয়াদী'আ (قيس بن أبى وديعة) : মতান্তরে কায়স ইব্ন ওয়াহ্রায (وهرج) আল-ফারিসী আল-আনবারী, আনসারদের মিত্র। তিনি আল-'আকিব ইব্ন নাজরান (العـاقب بن نجران)-এর সঙ্গে মদীনা আসেন। তাঁহাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। এই অবস্থায় 'আকিব নিজ এলাকায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু কায়স রোগাক্রান্ত হইয়া মদীনায় থাকিয়া যান। তিনি সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা)-র বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুনর্বার তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হইলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হাদ্রামাওত ফিরিয়া যান এবং মিথ্যা নুবূওয়াতের দাবিদার আসওয়াদ আল-'আনিসীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবী কারীম (স)-এর ইনতিকালের পর তিনি আবার মদীনায় ফিরিয়া আসেন। সায়ফ ইব্ন যী-য়াযান (سيف بن ذى يزن)-এর সঙ্গে তিনি আবিসিনিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আল-হাকাম ইব্ন 'আম্র আল-গিফারী (الحكم بن عمرو الغفارى)-র সঙ্গে খুরাসান আসেন এবং পুনরায় মদীনায় ফিরিয়া যান। অতঃপর আল-মুহাল্লাব (المهلب)-এর সঙ্গে পুনরায় খুরাসান আসেন। অতঃপর বাল্খ-এ বসতি স্থাপন করেন এবং এইখানে তাঁহার ওয়ারিছ রাখিয়া ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬২-৩।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন আবী গারাযা (قيس بن أبى غرزة) : (রা) ইব্ন 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন হাররানে ইব্ন হারিছা আল-গিফারী, একজন সাহাবী। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি গিফার গোত্রের লোক

ছিলেন। অবশ্য অনেকে তাঁহাকে জুহায়না মতান্তরে বাজীলা গোত্রের লোক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি কূফা নগরীতে বসবাস করিতেন এবং এখানেই ইনতিকাল করেন। ইবনু'ল-আছীরের বর্ণনামতে সাহাবীদের জীবনী সংকলকদের মধ্যে ইব্‌ন মানদা, ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থেও তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মহানবী (স) হইতে শুধু ব্যবসায় বিষয়ক একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তা-র মধ্যে আবূ দাউদ, নাসা'ঈ ও ইব্‌ন মাজা— এই তিন ইমামের গ্রন্থেই এই হাদীছটি স্থান লাভ করিয়াছে। আবূ ওয়া'ইল শাকীক ইব্‌ন সালামা তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি এই ঃ রাসূল (স) বলেন ঃ "হে ব্যবসায়িগণ, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অনর্থক কথা ও কসম বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহাকে সাদাকা-র মাধ্যমে দূরীভূত কর।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৬-২৫৭, ক্রমিক সংখ্যা ৭২১৭; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১২৯, ক্রমিক সংখ্যা ১৫৫; (৩) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা.বি., ৬খ, ৫৫; (৪) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন, আল-ইকমাল, দিল্লী ১৩৭৫ হি., পৃ. ৬১৩ (মিশকাত শারীফে সংযুক্ত), (৫) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২২২-২২৩।

লিয়াকত আলী

কায়স ইব্‌ন আবী সা'সা'আ (قيس بن أبى صعصعة) ঃ (রা) আল-আনসারী, একজন সাহাবী। মদীনার প্রখ্যাত খাযরাজ গোত্রের শাখা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতুল গোত্র আন-নাজ্জার-এ জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণিক সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তাঁহার পিতার নাম 'আম্‌র ইব্‌ন যায়দ যাঁহার উপনাম ছিল আবূ সা'সা'আ, মাতার নাম শায়বা বিনত 'আসিম ইব্‌ন 'আমর। হযরত কায়স (রা)-এর বংশ তালিকা হইল ঃ কায়স ইব্‌ন আবী সা'সা'আ 'আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মাযিন ইবনি'ন-নাজ্জার।

নুবূওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে (৬২২ খৃ.) হাজ্জ-এর মওসুমে হযরত মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা)-এর নেতৃত্বে আনসার দলের যে পঁচাত্তর ব্যক্তি 'আকাবায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন, হযরত কায়স (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে পদাতিক বাহিনীতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার আরও তিন ভাই ছিলেন সাহাবী, কিন্তু তাঁহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। ফাকিহ ও উম্মু'ল-হারিছ নামে তাঁহার দুই সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁহাদের মাতার নাম ছিল উমামা বিনত মু'আয ইব্‌ন 'আমর ইবনি'ল-জামূহ (রা)।

কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এক হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করিলেন, "হে রাসূলাল্লাহ! আমি কয়দিনে কুরআন কারীম খতম করিব?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "পনের দিন।" তিনি বলিলেন, "আমি আরও তাড়াতাড়ি খতম করিতে সক্ষম।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "তাহা হইলে প্রতি শুক্রবারে।" তিনি বলিলেন, "আমি আরও তাড়াতাড়ি করিতে সক্ষম।" অতঃপর তিনি এইভাবে বেশ কিছু দিন যাবত তিলাওয়াত করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার চোখে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় প্রতি পনর রাতে খতম করিতেন এবং বলিতেন, "হায়, আমি যদি পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেয়া অবকাশের উপর আমল করিতাম।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত তা.বি., ৩খ, ৫১৭; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫১, নং ৭১৮৭; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৮; (৪) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা.বি., ৩খ, ১২৯৪, নং ২১৩৭; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২১, নং ২২৫; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩২৩; (৭) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, মিসর তা. বি., ২খ, ২৬১; (৮) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, লাহোর তা. বি., ১খ, ৬১৬।

আবদুল জলীল

কায়স ইব্‌ন আবী হাযিম (قيس بن أبى حازم) ঃ (র) ইব্‌ন 'আবদি'ল-হারিছ ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন হুশায়শ ইব্‌ন হিলাল ইবনি'ল-হারিছ ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন কালব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন লু'আয়্যি ইব্‌ন রুহ্‌ম ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন আস্‌লাম ইব্‌ন আহমাস। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে তিনি একজন তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁহার উপনাম ছিল আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি বাজীলা গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন। মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (স) প্রেরিত যাকাত উসূলকারীর নিকট নিজ সম্পত্তির যাকাত প্রদান করেন। কিন্তু তিনি মহানবী (স)-এর দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বর্ণনামতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া অতঃপর মহানবী (স)-এর নিকট বায়'আত (দ্র.)-এর উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা হন। মদীনায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহানবী (স) ইতোমধ্যেই ইনতিকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) খলীফা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাগৈসলামিক যুগের অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল। সেইজন্য তাঁহাকে 'মুখাদরাম' (দ্র.) শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সাহাবী না হইলেও সাহাবীদের অব্যবহিত পরেই যেই সকল তাবি'ঈর স্থান, তাঁহাকে শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং এই কারণেই অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে তাবি'ঈ বলিয়া স্বীকার করিলেও সাহাবীদের অধ্যায়ে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার সাহাবী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ দুই একটি সূত্র উপস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল সূত্র গ্রহণযোগ্য নহে। সাহাবীদের জীবনী সংকলকদের মধ্যে ইব্‌ন মান্দা ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিয়াছেন। বুখারী, তাবারানীসহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে একাধিক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একদা এক গ্রাম্য বৃদ্ধ রাসূল (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমার এমন ভীষণ জ্বর যে, সে আমাকে কবরে লইয়া যাইবে।" রাসূল (স) বলিলেন, "অসুবিধা নাই, অসুস্থতা তোমার গুনাহ্-এর কাফফারা (দ্র.) হইয়া যাইবে।" এই ব্যক্তি পুনরায় আগের কথা বলিলে রাসূল (স) বলিলেন, "তুমি যদি আমার এই কথায় সন্তুষ্ট না হও তবে যেমন বলিতেছ তাহাই হউক।" আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইয়াই থাকে। উক্ত ব্যক্তি সেই দিনই ইনতিকাল করেন। বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহে এই ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয় নাই। যামাখ্‌শারী তাঁহার "রাবী'উ'ল-আবরার" নামক গ্রন্থে কায়স ইব্‌ন 'আবী হাযিম বলিতে এই ব্যক্তিকেই সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোথাও তাঁহার এই সনাক্তকরণের সমর্থন খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। এমন কি ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী তাঁহাকে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কায়স ইব্ন 'আবী হাযিম বহু সাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাবি'ঈদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'আশারা মুবাশ্শারা'-ভুক্ত নয়জন সাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা) হইতে তাঁহার বর্ণিত কোনও হাদীছের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্য যাঁহাদের নিকট হইতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্'ঊদ, খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ, হুযায়ফা, আবূ হুরায়রা, 'উক্বা ইব্ন 'আমির, জারীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ, 'আদী ইব্ন 'আমীরা, আস্মা' বিন্ত আবী বাক্র (রা) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিকট ইহাতে যাঁহারা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, আ'মাশ, বায়ান ইব্ন বিশর ও 'উমার ইব্ন আবী যা'ইদা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ সংকলিত হইয়াছে। য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈন, ইব্ন খিরাশ ও মুররাসহ অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ তাঁহাকে একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছ ও নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে মূল্যায়ন করিয়াছেন। তিনি খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ (রা)-এর সহিত প্রথম কাদিসিয়্যা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী (রা)-র সহিত নাহরাওয়ানে খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সুলায়মান ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর খিলাফাতের শেষভাগে হিজরী ৯৭ মতান্তরে ৯৮ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স এক শত বৎসরের অধিক হইয়াছিল। শেষ জীবনে তাঁহার স্মৃতিশক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল। তিনি চুলে হলুদ বর্ণের কলপ ব্যবহার করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৪; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১২৭; (৩) যাহাবী, তাজ্রীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ, ১৯, ক্রমিক সংখ্যা ১৯৭; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১১; (৫) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি. (উক্ত ইসাবা, ৩খ, ২৪৭ হাশিয়া); (৬) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আল-ইক্মাল ফী আসমা'ই'র-রিজাল, দিল্লী ১৩৭৫ হি., ৬১৪ (মিশকাত-এর সহিত সংযুক্ত); (৭) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত তা.বি., ৬খ, ৩৬, ৫৫, ৬৭, ৮খ, ৪৯৪; (৮) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৯৭৯/১৩৯৯, ১খ, ১১২; (৯) আন-নাওয়াবী, তাহ্যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর তা. বি., ২/১খ, ৬১।

লিয়াকত আলী

কায়স ইব্ন 'আম্র (قيس بن عمرو) ঃ আনসারী, মাযিন গোত্রের লোক। কিন্তু তাবারানীর মতে হাওয়াযিন গোত্রের লোক ও আনসারদের মিত্র। তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সংগে য়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খালিদ তাঁহাকে আল-কারাদীস (الكراديس)-এর কতিপয় এলাকার আমীর নিয়োগ করেন। ইব্ন হাজার-এর মতে তাঁহার নাম কায়স ইব্ন আবী সা'সা'আ (قيس بن أبي صعصعة) ও আবূ সা'সা-র নাম 'আম্র (عمرو)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৫, ২৮৩-৪, ক্রমিক নং ৭৩৫৫।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্ন 'আমর (قيس بن عمرو) ঃ (রা) ইব্ন কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন মালিক ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইবনি'ন-নাজ্জার, সাহাবী, মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার লোক ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল উম্মু হারাম বিন্ত মিল্হান (রা)। তিনি আনাস (রা)-এর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পিতা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উভয়েই ইহাতে শাহাদাত্ বরণ করেন। তিনি বদ্র-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আবূ মা'শার, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদের বর্ণনামতে তিনি বদ্র-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে মূসা ইব্ন 'উকবা ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বদ্র-এর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের যেই তালিকা পেশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম নাই। অবশ্য উহুদের যুদ্ধে তাঁহার অংশগ্রহণ ও শাহাদাত বরণের বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৬, ক্রমিক সংখ্যা ৭২১২; (২) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৪, ৪৯৫, ৭খ, ৪০২, ৮খ, ৪৫১; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, ইসতী'আব, মিসর ১৩২৮ হি. (উক্ত ইসাবা, ৩খ, ২৩৫, হাশিয়া)।

লিয়াকত আলী

কায়স ইব্ন 'আম্র ইব্ন লাবীদ (قيس بن عمرو بن لبيد) ঃ (রা) ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন সিনান, অন্যতম আনসারী সাহাবী। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ইবনু'ল-কাদাহ, আদাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে সংঘটিত সকল যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫৬, ক্রমিক সংখ্যা ৭২১৩; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২২৩।

লিয়াকত আলী

কায়স ইব্ন 'আম্র ইব্ন সাহ্ল (قيس بن عمرو بن سهل) ঃ (রা) সাহাবী, আনসার বানু'ন-নাজ্জার গোত্রের লোক, সুবিখ্যাত তাবি'ঈ য়াহ্'য়া ইব্ন সা'ঈদ-এর দাদা, মদীনার অধিবাসী। মতান্তরে তাঁহার নাম কায়স ইব্ন কাহ্দ (قيس بن قهد), ভিন্নমতে কায়স ইব্ন সাহ্ল (قيس بن سهل)। ওয়াকিদী তাঁহাকে মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইব্ন হাজার বলেন, "প্রথমদিকে হয়ত তিনি মুনাফিকদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী জীবন ইসলামে অতিবাহিত হইয়াছে।" তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে কায়স ইব্ন আবী হাযিম, মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আত-তায়মী, 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ ও পুত্র সা'ঈদ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কায়স বলেন, "নবী (স) বাহির হইয়া আসিলেন এবং সালাতের ইকামাত দেওয়া হইল। আমি তাঁহার সঙ্গে ফজরের সালাত পড়িলাম। অতঃপর তিনি সালাত শেষ করার পর পিছনে ফিরিয়া আমাকে নামাযরত দেখিলেন। তিনি বলিলেন ঃ হে কায়স, থামিয়া যাও। তুমি কি একত্রে দুই সালাত পড়িতেছ ? আমি বলিলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল । ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়িতে পারি নাই। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে কোনও দোষ নাই" (তিরমিযী, কিতাবু'স-সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ ফাজরের

সুন্নাত ছুটিয়া গেলে তাহা ফরয সালাতের পর পড়িয়া লইবে)। অপর বর্ণনায় আছে, কায়স ইব্‌ন 'আম্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে ফজরের সালাত পড়ার পর দুই রাক'আত সালাত পড়িতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন ঃ ফজরের সালাত দুই রাক'আত। লোকটি বলিল, আমি ফজরের পূর্বেকার দুই রাক'আত (সুন্নাত) সালাত পড়িতে পারি নাই। তাহা এখন পড়িলাম। (রাবী বলেন), অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নীরব থাকিলেন (সুনান আবী দাউদ, কিতাবু'স-সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সুন্নাত ছুটিয়া গেলে তাহা কখন পড়িবে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি.; ৩খ, ২৫৫-৬, ক্রমিক নং ৭২১১; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, ২খ, ১২৯; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইস্‌তী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৩৪-৫); (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২২২-৩; (৫) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ ওয়া'ত'ত-তা'দীল, ৭খ, ১০১; (৬) হাকিম নায়শাবূরী, আল-মুসতাদরাক 'আলা'স-সাহীহায়ন, দারু'ল-কিতাবি'ল-'আরাবী, বৈরূত, ১খ, ২৭৪-৫।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্‌ন আসলা' (قيس بن اسلع) ঃ (রা) সাহাবী। ইব্‌ন আবী হাতিম বলেন, তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীছ উল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার বংশতালিকাও দেন নাই। আবূ 'উমার-এর ধারণামতে তাঁহার নাম কায়স ইব্‌ন সালা' আল-আনী (قيس بن سلع الانى)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি.; ৩খ, ২৪২।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন উসায়দ (قيس بن عاصم بن أسيد) ঃ (রা), সাহাবী, নুমায়র গোত্রের লোক। তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে নবী কারীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন এবং বলেন ঃ " হে আল্লাহ্ ! তাঁহাকে ও তাহার সঙ্গীদেরকে বরকত ও প্রাচুর্য দান কর।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫২; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৮।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্‌ন 'আসিম (قيس بن عاصم) ঃ ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মিনকার ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন মুকাই'স আবূ 'আলী (অন্যান্য বর্ণনায় আবূ তালহা বা আবূ কাবীসা), বানূ মুকা'ইসের একজন মুখাদ্‌রাম অর্থাৎ (জাহিলী ও ইসলামী যুগের) প্রধান ও তাঁহার নিজ গোত্রের নেতা ছিলেন। গোত্রীয় কিংবদন্তীতে তাঁহার বদান্যতা, আশ্রিত লোকদিগের তত্ত্বাবধান, শিষ্টাচার ও মহানুভবতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আল-আহনাফ ইব্‌ন কায়স নিম্নোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সাহিত্যিক সংকলনসমূহে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কাহিনীটি এই যে, কি করিয়া কায়স ইব্‌ন 'আসিম তাঁহার পুত্র হত্যার খবর ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করেন এবং কি মহানুভবতার সহিত হত্যাকারীকে ক্ষমা করেন, যদিও তাঁহাকে শিকলে বন্দীকরত তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইয়াছিল। সুলায়মা গোত্রের একজন কবি, 'আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস তাঁহার প্রতিবেশীর প্রতি তাঁহার প্রদর্শিত মহৎ আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহাকে জাহিলিয়্যা যুগের মহৎ ও মহানুভব (হুলামা) ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁহারা মদ্য পান হইতে বিরত থাকেন। শিশু কন্যাদিগকে জীবন্ত সমাধিস্ত করিবার যেই রেওয়াজ তিনি পুনঃপ্রচলন করেন, তাহা তাঁহার পরিবারের একজন মহিলার কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত, যিনি তাঁহার গোত্রের উপর আকস্মিক আক্রমণে বন্দী হইয়া আক্রমণকারীর সহিত থাকিতে অধিকতর পসন্দ করেন এবং নিজ গোত্রে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃতি জানান। এইরূপ কলঙ্কের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহার প্রতিরোধকল্পে কায়স ইব্‌ন 'আসিম তাঁহার নিজ কন্যাদিগকে জীবন্ত কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ৮১ ঃ ৮-৯ আয়াত নাযিল হয় বলিয়া কথিত।

৭ম শতাব্দীর প্রথম দশকে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের কাহিনীতে গোত্র-নেতা হিসাবে কায়সের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আবরাক আল-কিবরীত ব্যতীত সকল যুদ্ধেই তিনি বিজয়ী হন। তবে উক্ত যুদ্ধে তাঁহার মাতা ও দুই ভগিনীর সহিত তিনি বন্দী হন। কথিত আছে যে, আস-সিতারের যুদ্ধে তিনি কাতাদা ইব্‌ন সালামা আল-হানাফীকে হত্যা করেন। যদি এই বর্ণনা সত্য হয়, তবে কাতাদা তখন অবশ্যই একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কারণ ইহার আগেই আবরাহা কর্তৃক পরিচালিত হাতীর অভিযানকালে তিনি গোত্রীয় নেতা ছিলেন এবং উক্ত অগ্রসরমান সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কবি তারাফা তাঁহাকে সতর্কও করিয়া দেন (দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব, আল-মুনাম্মাক, সম্পা. খুরশীদ আহ্‌মাদ ফারিক, হায়দরাবাদ ১৩৮৩/১৯৬৪, পৃ. ৬৯)। জুওয়াছায় 'আব্‌দ কায়সের উপর যেই আক্রমণে কায়স কৃতিত্ব অর্জন করেন উহা আল-আহ্‌তাম কর্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া মনে করা হয়। 'নিবাজ-ছায়তাল'-এ লাহাযিমের (দ্র. W. Caskel, গামহারাতু'ন-নাসাব, Leiden 1966, ii, 26-27) উপর যেই আক্রমণটি সংঘটিত হয় তাহা আজারিবের প্রধান সালামা ইব্‌ন জারিব ও মুকা'ইসের কর্তৃত্বাধীনে কায়স কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হয় (দ্র. Caskel, op. cit., 144)। তাঁহার কার্যকরী যুদ্ধকৌশল ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ তাহাদের বিজয় নিশ্চিত করে। ২য় আল-কুলাবের যুদ্ধে (আল-মুশাককারের হত্যার পর যেই স্থানে তামীমের গোত্রীয় দলসমূহ সমবেত হয়) কায়স সা'দের সৈন্যদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শক্তিশালী সৈন্য পরিচালনা ও সাহসিকতা যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করে; য়ামানী গোত্রীয় বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তামীম গোত্র বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কব্‌জা করে। ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে যেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় সেই যুদ্ধেই কায়স আল-আহ্‌তামের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই দুই নেতার মধ্যে শত্রুতা এবং কায়স ও আয-যিবরাকান ইব্‌ন বদ্‌র-এর মধ্যে বিদ্বেষ হিজা' (ব্যঙ্গ কবিতা)-র রেকর্ডকৃত পংক্তিতে ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট তামীমের প্রতিনিধি প্রেরণের কাহিনীতে প্রতিধ্বনিত হয়। মুকা'ইসের বিরুদ্ধে 'ইজল-এর একটি আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য যায়দ আল-খায়ল (যিনি কিছু সময়ের জন্য নিজস্ব গোত্র ছাড়িয়া কায়সের তাঁবুতে বসবাস করেন) যে ভূমিকা গ্রহণ করেন সেই সম্পর্কে একটি মাছাল কাহিনীর বিবরণে জানা যায়; কায়স যায়দের কৃতিত্বকে অস্বীকার করেন এবং ইহারই দরুন তিনি 'মিথ্যুক' বলিয়া অভিহিত হন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট প্রেরিত তামীমের প্রতিনিধত্বে কায়সের ভূমিকা সম্পর্কে তামীমী বর্ণনায় গুরুত্বারোপ করিয়া বলা হয় যে, নবী

করীম (স) তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'আরব যাযাবরদের নেতা" হিসাবে আখ্যায়িত করেন (সায়্যিদু আহ্‌লি'ল-ওয়াবার)। মুহাম্মাদ (স) ও কায়সের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনার বিবরণ একটি জাল হাদীছে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত বিবরণ অনুযায়ী কায়স মুহাম্মাদ (স)-কে বলেন যে, যিনি জাহিলী যুগে উট পরিচালনায় প্রথমে 'হুদা' বা হিদা' নামে পরিচিত 'রাজায' সুর প্রয়োগ করেন তিনি ছিলেন নবী (স)-এর পূর্বপুরুষ, মুদার এবং প্রথমে মুহাম্মাদ (স) নামে একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাবের খবর যিনি প্রাপ্ত হন তিনি ছিলেন সুফয়ান ইব্‌ন মুজাশি' আদ্-দারিমী এবং তিনি উক্ত নামানুসারে তাঁহার নবজাত পুত্রের নাম রাখেন মুহাম্মাদ। ইহা স্পষ্ট যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত মুদার ও তামীমের সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করাই উক্ত জাল হাদীছের উদ্দেশ্য।

বানূ হানীফা গোত্রভুক্ত কায়সের প্রিয়তমা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার একটি কাহিনী হইতে তাঁহার কথিত বিশ্বাসের প্রকৃত আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তাঁহার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। মুহাম্মাদ (স) কায়সকে তাঁহার মেষ পাল হইতে কিছুসংখ্যক মেষ দ্বারা গরীব ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য করিবার অনুরোধ জানান এবং ইসলামে গোত্রীয় মৈত্রী স্থাপন করিতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁহাকে মুকা'ইস ও বুতুন-এর কর আদায়কারী নিয়োগ করেন (দ্র. Caskel, op. cit., 230)।

নবী কারীম (স)-এর ইনতিকালের পর কায়সের মদীনার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে দোদুল্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হইয়া পড়েন এবং মদীনার জন্য সংগৃহীত কর তাঁহার নিজ গোত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। বাহ্যত তিনি এই ব্যাপারে আয-যিব্‌রিকানের সহিত এক প্রকার মতৈক্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে যখন আয-যিবরিকান তাঁহার গোত্রের উপর ধার্যকৃত কর লইয়া ত্বরিত আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট গমন করেন, তখন তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের জন্য তিনি নিজকে প্রতারিত মনে করেন ও আয্-যিবরিকানকে তজ্জন্য অভিযুক্ত করেন। রিদ্দা যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় নেতাই মদীনার প্রতি কোন বৈরীভাব প্রদর্শন করেন নাই; 'আমূর ইব্‌নু'ল-'আস (রা) যখন উমান হইতে মদীনায় আসিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে প্রহরাধীনে নিজদের এলাকায় লইয়া আসেন। গোত্রীয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মদীনা অবিচলিত থাকে কি না তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা মদীনার প্রতি নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কায়স ভণ্ড নবী সাজাহ্‌কে সাহায্যও করেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে কায়সের কোনও যুদ্ধক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। বানূ হানীফাদের বিদ্রোহ দমন করিবার পর কায়স যখন আল-বাহরায়নের পথে তখন তিনি আল-'আলা' আল-হাদরামীর সহিত যোগদান করেন, এমন কি তখনও তিনি তাঁহাকে কেবল সা'দের রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রহরাধীনে লইয়া আসেন; কিন্তু পরে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া আল-হুতাম ও আবজার ইব্‌ন বুজায়র-এর হত্যার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

কায়স বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কথিত আছে যে, তিনি ৩৩ পুত্র ও বহু কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তালাবা ইব্‌ন কায়স তাঁহার মহানুভবতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন; মুকাতিল ইব্‌ন তালাবা তামীমের মহৎ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং 'আমির ইব্‌ন সা'সা'আ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আরাবী কর্তৃক 'আবদু'ল-মালিকের নিকট প্রেরিত হন। মুকাতিল ইব্‌ন তালাবার কন্যা মায়্যা কবি যু'র-রুম্মা-র মানসপ্রিয়া ছিলেন।

ইব্‌ন কাছীরের মতে কায়স ৪৭/৬৬৭ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার কবরস্তান না জানাইবার জন্য তাঁহার পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া যান। কারণ বানূ বাক্‌র ইব্‌ন ওয়া'ইল-এর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হওয়ার ফলে তিনি কায়সকে ঘৃণা করিতেন এবং সেইজন্য কায়স তাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর শোক করা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। 'আব্‌দা ইব্‌নু'ত-তাবীব রচিত বিখ্যাত শোকগীতিতে তিনি প্রশংসিত হন, যাহাতে এই বলিয়া প্রশংসা করা হয়ঃ "কায়সের মৃত্যু মাত্র এক ব্যক্তির মৃত্যু নহে, বরং যেন একটি জাতির বিরাট সৌধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আগানী, নির্ঘণ্ট; (২) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৩) আল-বালাযুরী, আনসাবু'ল-আশরাফ, পাণ্ডু. 'আশির (Ef.) ৫৯৭/৮, পত্রক ১০১৯a-১০২০b; (৪) আল-বাক্‌রী, মু'জাম, সম্পা. মুস্তাফা আস-সাক্‌কা, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, নির্ঘণ্ট; (৫) আবূ যায়দ, আন-নাওয়াদির ফি'ল-লুগা, সম্পা. সা'ঈদু'শ-শার্‌তূনী, পুনর্মুদ্রিত, বৈরূত ১৩৮৭/১৯৬৭, পৃ. ৯২; (৬) আশ-শারীফ আল-মুরতাদা, আমালী, সম্পা. মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদ্‌ল ইবরাহীম, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, নির্ঘণ্ট; (৭) আল-মারযুবানী, নূরু'ল-কাবাস, সম্পা. R. Sellheim, Wiesbaden 1964, নির্ঘণ্ট; (৮) আল-মুফাদ্দালু'দ-দাব্বী, আল-মুফাদ্দালিয়্যাত, সম্পা. Ch. Lyall, Beirut 1920, 317, 741; (৯) আহমাদ ইবন আবী তাহির, বালাগাতু'ন-নিসা', আন-নাজাফ ১৩৬১ হি., ৫১, ৮৭-৮; (১০) ইবন হুবায়শ, আল-মাগাযী, পাণ্ডু. Leiden, Or. 343, pp. 13, 25, 72; (১১) ইবনু'ল-কালবী, জামহারাতু'ন-নাসাব, পাণ্ডু. Br. Mus., Add. 23297, f. 78b; (১২) আল-ওয়াকিদী, আর-রিদ্দা, পাণ্ডু. Bankipore, Cat. xv, ১০৪২, fols. 27b-29a; (১৩) ইবন আ'ছাম, আল-ফুতূহ, হায়দরাবাদ ১৩৮৮/১৯৬৮, ৫০-৫১, ৫৩; (১৭) আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়া'ত-তাব'ঈন, সম্পা. আস-সানদূবী, কায়রো

১৩৫১/১৯৩২, নির্ঘণ্ট ; (১৫) ঐ লেখক, আল-হায়াওয়ান, সম্পা. 'আবদু'স-সালাম হারূন, কায়রো ১৩৮৪-১৯৬৫, ৩খ, ৪৯০; (১৬) ইবন কুতায়বা, আল-মা'আনি'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ ১৩৬৮/১৯৪৯, ১খ, ৫০৭, ২খ, ৮২৫, ১০২৫ ; (১৭) ঐ লেখক, 'উয়ূনু'ল-আখবার, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, নির্ঘণ্ট ; (১৮) ঐ লেখক, আল-মা'আরিফ, সম্পা. আস-সাবী, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৫, ১৩১ (পুনর্মুদ্রিত, বৈরূত ১৩৯০/১৯৭০) ; (১৯) মুহাম্মাদ ইবন হাবীব, আল-মুহাব্বার, সম্পা. Ilse Lichtenstaedter, Hyderabad 1361/1942, 126, 237-8, 248 ; (২০) আছ-ছা'আলিবী, ছিমারু'ল-কুলূব, সম্পা. মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদল ইবরাহীম, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৫, ৩১৫, নং ৪৮৪ ; (২১) আল-'আব্বাস ইবন মিরদাআ'স-সুলামী, দীওয়ান, সম্পা. য়াহয়া আল-জুবূরী, বাগদাদ ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬১-২ ; (২২) সাদরু'দ-দীন আল-বাসরী, আল-হামাসা আল-বাসরিয়া, সম্পা. মুখতারু'দ-দীন আহমাদ, হায়দরাবাদ ১৩৮৩/১৯৬৪, ২খ, ৬০, নং ১৫৭, ২৩৮, নং ৪ ; (২৩) আল-বুহতুরী, আল-হামাসা, সম্পা. L. Cheikho (repr. Beirut 1387/1967), 245, no. 1321; (২৪) আবূ তাম্মাম, আল-হামাসা, শারহু'ত-তিবরীযী, সম্পা. মুহাম্মাদ মুহ্‌য়ি'দ-দীন 'আবদু'ল-হামীদ,

'আব্‌দু'র-রাহ্‌মান ও তদীয় পুত্র আল-হাকাম ছিলেন তাঁহার অসংখ্য ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

কাসিম ইব্‌ন আসবাগ ইব্‌ন কুতায়বা প্রণীত গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য সাহিত্য (আদাব) গ্রন্থ স্পেনে প্রচলিত করেন। এই গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল—মা'আরিফ, আদাবু'ল-কুত্তাব নামক উচ্চ প্রশংসিত ও সমধিক ব্যাখ্যাত গ্রন্থ এবং "গারীবু'ল-কুরআন" ও "মুশ্‌কিলু'ল-কুরআন" নামক গ্রন্থদ্বয়। তিনি নিজে আবূ দাউদের 'সুনান' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া এবং ইব্‌নু'ল-জারূদের আল-মুনতাকা ও উহার সারসংক্ষেপ আল-মুজতানা-র বিন্যাস পদ্ধতি (আব্‌ওয়াব) অনুসরণ করিয়া মুসাওওয়াফ নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং আল-হাকামের নামে উহা উৎসর্গ করেন। ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই সংকলনে ২,৪৯০টি হাদীছ স্থান পায়। তিনি উমায়্যা, কুরায়শ ও কিনানা গোত্রের সম্মানসূচক খিতাবীদের একটি উৎকৃষ্ট কুলজিগ্রন্থ, "কিতাব ফি'ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ" এবং মালিক ইব্‌ন আনাসের যেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য হাদীছ মুওয়াত্তা' গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত হাদীছের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোনটিই সংরক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের জন্য তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে Orosius-এর "Historiarum libri septem adversus Paganos-এর অনুবাদ যাহা তিনি জনৈক মোযারাব (মুরাদের আমলে সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণীর খৃস্টান স্পেনবাসীদের নাম)-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন করিয়াছেন। ইতিহাস ও ভূগোল—এই উভয় শাস্ত্রের তথ্যসম্বলিত এই অনুবাদ গ্রন্থটি আল-আন্দালুসের ভৌগোলিক সাহিত্য বিকাশের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কাসিম ইব্‌ন আস্‌বাগের ছাত্র আহ্‌মাদ আর-রাযী এই গ্রন্থটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাক্কারী, Analectes, i, 491-3 ও নির্ঘণ্ট; (২) ইব্‌নু'ল-ফারাদী, সংখ্যা ১০৬৮; (৩) দাব্বী, সংখ্যা ১২৯৮; (৪) য়াকূত, ইরশাদ, ৪খ, ১৫৪; (৫) ইব্‌ন বাশকুওয়াল, পৃ. ৯৬; (৬) Ben Cheneb, Etude... Idjaza (ইজাযা), পৃ. ২৮১; (৭) হুমায়দী, জায্‌ওয়া, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., সংখ্যা ৭৬৯; (৮) ইব্‌ন ফারহূন, দীবাজ, পৃ. ২২২; (৯) Pons Boigues, 59-61; (১০) H. Mu'nis, আল-জুগরাফিয়া ওয়া'ল-জুগরাফিয়্যূন ফি'ল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৩৮৬/১৯৬৭, পৃ. ৩০-১, ৫৫-৭, ৪১৮; (১১) H. Mones, St., Isl, xx (1964), 71; (১২) Ch Pellat, Ibn Hazm..., in al-And., xix (1954), 77-8, 86 (=অনু. মাককারী, ২খ, ১১৬, ১১৮-১৯; (১৩) G. Levi della Vida, La traduzione... di Orosio, in al-And. xix (1954), 257-93; (১৪) মুহাম্মাদ 'আলী মাক্কী, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espana musulmana, Madrid 1968, বিশেষত পৃ. ১৯৯-২০০, ২০৭-৮, ২৭২-৪।

J. Bosch-Vila (E.I.[2])/ আবদুশ শুকুর

আল-কাসিম ইব্‌ন 'ঈসা (القاسم بن عيسى) ঃ একজন বীর সেনাপতি, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং স্বগোত্রের নেতা। তিনি সাধারণত আবূ দুলাফ আল-'ইজলী নামে পরিচিত। ১৯৫/৮১১ সালে খলীফা আল-আমীন যখন 'ঈসা ইব্‌ন মাহান-এর নেতৃত্বে আল-মা'মুন-এর সেনাপতি তাহির ইব্‌নু'ল-হুসায়ন-এর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন তখন আবূ দুলাফ তাঁহার সঙ্গে যান। ইব্‌ন মাহান-এর মৃত্যুর পর আবূ দুলাফ হামাদান-এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আল-মা'মূন-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও তাহির তাঁহাকে আল-কারাজ-এ শান্তিতে থাকিতে দেন। আল-কারাজ এলাকাটি তিনি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১৪/৮২৯-৮৩০ খৃ. মা'মূন যখন রায়্যি-এ আগমন করেন তখন তিনি আবূ দুলাফকে তলব করেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া খলীফার খিদমতে হাযির হইলেন। খলীফা তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে স্বাগত জানান। আল-মুসতা'সিম-এর সময়ে আফশীন (দ্র.) যিনি আবূ দুলাফ-এর বীরত্বে ও বাগ্মিতার কারণে তাঁহাকে হিংসা করিতেন—তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। আল-আফশীন তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যা ও বিদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং মিথ্যা প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রধান বিচারপতি (قاضى القضاة) আহমাদ ইব্‌ন আবী দাঊদ (দ্র.)-এর হস্তক্ষেপে এই দণ্ড কার্যকর হয় নাই। বলা হইয়া থাকে যে, কাদী যখন জানিতে পারিলেন যে, আবূ দুলাফ-এর জীবন বিপন্ন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আল-আফশীন-এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন যে, খলীফা আবূ দুলাফকে মুক্তি দিতে আদেশ দিয়াছেন। আবূ দুলাফ ছাড়া পাইতেই আহমাদ খলীফার খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন যে, তিনি একটি নিরপরাধ অভিযুক্তের জীবন রক্ষার্থে এই কথা বলিয়াছিলেন। আল-মুসতা'সিম ইহা শুনিয়া তাঁহাকে মাফ করিয়া দিলেন এবং আবূ দুলাফকেও মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন। আবূ দুলাফ ২২৫/৮৩৯ অথবা ২২৬/৮৪০ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন এবং স্বরচিত গীতি কবিতা নিজেই গাইতেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'সিয়াসাতু'ল-মুলূক' ও আল-বুযাতু ওয়া'স-সায়দ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্পর্কে আবূ তাম্মাম (দ্র.)-সহ কতিপয় কবি, স্তুতি-কাসীদা রচনা করিয়াছেন। ইব্‌ন হায্‌ম-এর বর্ণনামতে আবূ দুলাফ আল-'ইজলীর পর তাঁহার বংশধর তেত্রিশ বৎসরাধিক পর্যন্ত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিতে থাকে। তাঁহার পরবর্তী বংশধরদিগের ইতিহাস ও জীবন চরিতের জন্য দ্র. ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, ৩খ, ৭৯৮, ৮০০, ১১৫৩; (২) আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য-যাহাব, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., ৭খ, ৪-৭, ১৩৯-১৪২; (৩) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল (সম্পা. Tornberg), ৬খ, ১৬৫, ২৯১প. ৩৩০, ৩৬৮; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৩১ এবং ৯৫৪ (অনু. De Slane, ১খ, ৬১প. এবং ২খ., ৫০২-৫০৭); (৫) ইব্‌ন খালদূন, আল-'ইবার, ৩খ, ২৫৫; (৬) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ২৬৮প., ৩৩২ প.; (৭) আল-আগানী, ৮খ, ২৪৮ (আদদার সং); (৮) সিমতু'ল-লা'আলী, সম্পা. 'আবদু'ল-'আযীয আল-মায়মানী, ৩৩১; (৯) তা'রীখ বাগদাদ, ১২খ, ৪১৬; (১০) য়ূসুফ আল-বাদী'ঈ, হিবাতু'ল-আয়্যাম, পৃ. ৯৩-১০৩, মিসর ১৯৩৪ খৃ.; (১১) ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৩১৩; (১২) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, শিরো.; (১৩) Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden 1978, 718.

K. V. Zeitersteen E.I.[2] ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা.ই.)/ ড. আবদুল জলীল

আল-কাসিম ইব্ন উমায়্যা (القاسم بن امية) ঃ ইব্ন আবি'স্-সালৃত আছ-ছাকাফী। কথিত আছে যে, তাঁহার পিতা প্রায় সময়ই নুবুওয়াত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের আলোচনা করিতেন। অথচ তাঁহার জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই; বরং সারা জীবন বিভিন্নভাবে ইসলামের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট ছিল। বদরের যুদ্ধে উদ্দীপনাময় কবিতা আবৃত্তি করিয়া সে কুরায়শ সৈন্যদের উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র কাসিমকে ঐতিহাসিক মারযুবানী মু'জামু'শ-শু'আরা' গ্রন্থে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে বিদায় হজ্জের সময় মক্কা ও তা'ইফে মুসলমান হয় নাই (কুরায়শ ও ছাকীফ গোত্রের) এমন কেহই বাকী ছিল না। সুতরাং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কাসিম শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, সংখ্যা ৭০৫০।

রুহুল আমীন সিরাজী

আল-কাসিম ইব্ন মা'আন (القاسم بن معن) ঃ (র) আল-মাস্'উদী, একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও তাব'উ তাবি'ঈন, উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)-র প্রপৌত্র। বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ আল-কাসিম ইব্ন মা'আন ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মাস'উদ। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন এবং তথাকার কাদী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আল-কাসিম স্বীয় পিতামহ 'আবদু'র-রাহমান ছাড়াও আল-আ'মাশ, 'আসিম আল-আহওয়াল, 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'উমায়র, মানসূর ইবনু'ল-মু'তামির, তালহা ইব্ন য়াহ্য়া ইব্ন তালহা, দাঊদ ইব্ন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আম্র ইব্ন 'আলকামা, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া ও য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রচুর সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অসংখ্য শাগরিদের মধ্যে ইব্ন মাহদী, আলী ইব্ন নাস্র আল-জাহ্দামী আল-কাবীর, 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-ওয়ালীদ আল-'আদানী, আবূ গাস্সান আন-নাহ্দী, আল-মু'আফী ইব্ন সুলায়মান আর-রাস্'আনী ও আবূ নু'আয়ম আল-ফাদ্ল ইব্ন দুকায়ন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একজন বিশ্বস্ত রাবী হিসাবে আল-কাসিম ইব্ন মা'আন সর্বস্বীকৃত ব্যক্তি। আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আবূ হাতিম, য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈন, ইব্ন হিব্বান, আবূ দাঊদ, ইব্ন সা'দ প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতার প্রত্যয়ন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় যুগের শা'বী (দ্র.) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কুতায়বা তাঁহার বিশ্বস্ততা স্বীকার করিয়া বলেন যে, তবে কোনও কোনও ব্যাপারে তিনি মুরজি'আ মতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

আল-কাসিম ইব্ন মা'আন (র) হাদীছশাস্ত্র ছাড়াও 'ইলমু'ন-নাহও, 'ইলমু'ল-ফিক্হ, কাব্য ও ইতিহাসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি রাখিতেন। আবূ হাতিম তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁহার তুলনা ছিল না।

আল-কাসিম ছিলেন একজন দানশীল ও নির্লোভ ব্যক্তিত্ব। কূফার বিচার বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও ইহার বিনিময় গ্রহণ করেন নাই। আমরণ তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। হিজরী ১৭৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী ও ইমাম আন-নাসা'ঈ তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে আল-কাসিম ইব্ন মা'আনের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ৩০৩, ৩০৪; (২) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১ ভাগ, ১৭০; (৩) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশকী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ২৮৬; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২০, ১২১; (৫) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৩৯, ২৪০।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাসিম ইব্ন মাখ্রামা (القاسم بن مخرمة) ঃ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন 'আবদি মানাফ ইব্ন কুসায়্যি আল-কুরাশী আল-মুত্তালিবী। কায়স ও সালত্-এর স্বগোত্রীয় বলিয়া জানা যায়। ইব্ন ইস্হাক উল্লেখ করিয়াছেন, কাসিম ঐ সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই সম্পদ বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, সংখ্যা ৭০৫২; (২) যাহাবী, তাজরীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৯, সংখ্যা ৯৯।

রুহুল আমীন সিরাজী

আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা (القاسم بن مخيمرة) ঃ আল-হামদানী (র) জনৈক তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ, উপনাম আবূ 'উরওয়া, বানু'ল-হামদান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল কূফায়। তিনি তথাকার মু'আল্লিম ছিলেন। অতঃপর সিরিয়ায় গমন করেন এবং দিমাশ্কে বসবাস শুরু করেন। একজন সৈনিক হিসাবে তিনি দিমাশ্কে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনি'ল-'আস (রা), আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) ও আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আদ-দাওরী য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈনের উদ্ধৃতিতে বলেন যে, আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা কোনও সাহাবীর নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। ইব্ন হিব্বানের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আ'ইশা (রা)-র নিকট মুহরিমের পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর-সংখ্যক তাবি'ঈ হইতেও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ মারয়াম আল-আয়দী, 'আলকামা ইব্ন কায়স আল-মুগীরা (রা)-র ব্যক্তিগত কাতিব ওয়াররাদ, আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা আল-আশ'আরী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়ম, শুরায়হ ইব্ন হানী', সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা, আবূ মায়সারা ও আবূ 'আম্মার আল-হাম্দানীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইব্ন হিব্বান ধারণা করেন যে, তিনি আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা আল-আশ'আরী-র নিকট হইতে কোনও হাদীছ শ্রবণ করেন নাই।

আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা-র সূত্রে মুহাদ্দিছগণের একটি বিরাট দল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ, সিমাক ইব্ন হারব, 'আল্কামা ইব্ন মারছাদ, 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন য়াযীদ ইব্ন জাবির, আল-হাকাম ইব্ন 'উতায়বা, সালামা ইব্ন কুহায়ল, হাসান ইব্ন হুর্র, হাস্সান ইব্ন 'আতিয়্যা, মূসা ইব্ন সুলায়মান, য়াযীদ ইব্ন আবী

মারয়াম আশ-শামী, হিলাল ইব্‌ন য়াসাফ, ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবী খালিদ, আল-আওযা'ঈ প্রমুখ তাঁহার উল্লেখযোগ্য শাগরিদ।

আল-কাসিম একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্লোভ ব্যক্তি ছিলেন। হাদীছ বর্ণনায় তাঁহার বিশ্বস্ততা সর্বজনস্বীকৃত। ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন মু'ঈন, আল-'আজালী, ইব্‌ন খিরাশ, আল-আওযা'ঈ, আবূ হাতিম, ইব্‌ন হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্‌ন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন কূফার একজন সৎ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবী খালিদ বলেন ঃ আমরা আল কাসিমের অনুলেখক ছিলাম। তিনি আমাদিগকে হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোনও বিনিময় গ্রহণ করিতেন না। আল-আওযা'ঈ বর্ণনা করেন যে, একদিন আল-কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারা খলীফা 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর নিকট আগমন করেন। খলীফা তাঁহার জন্য ভাতা নির্ধারণ করিলেন ও একটি ক্রীতদাস উপঢৌকনস্বরূপ দান করিলেন। কিন্তু তিনি এই বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন যে, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা দ্বারা আমাকে ভালভাবেই চালাইতেছেন, অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই। উল্লেখ্য যে, আল-কাসিম খলীফা উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-আযীয (র)-এর ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। লাভের অর্থ উভয়েই বণ্টন করিয়া লইতেন। উক্ত অর্থে যতদিন সংসার চলিত, ততদিন আল-কাসিম গৃহ হইতে বাহির হইতেন না। তিনি 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর শাসনামলে ইনতিকাল করেন। কাহারও মতে তিনি হিজরী ১০০ সালে এবং কাহারও মতে ১০১ সালে ইনতিকাল করেন। সিহাহ সিত্তায় তাঁহার বর্ণিত হাদীছ উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্‌যীবুত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ৩০২, ৩০৩; (২) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৯/১৯৭৯, ৫খ, ৩০৭; (৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১ম ভাগ, ১৬৭; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২০; (৫) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৬খ, ৩০৩; (৬) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১২২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (القاسم بن محمد) ঃ (র) ইব্‌ন আবী বাক্‌র আস-সিদ্দীক, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাবি'ঈ। হযরত আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-এর পৌত্র। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, মতান্তরে আবূ 'আবদি'র-রাহমান। পিতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। আল-বুখারী তাঁহার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁহার যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। আল-কাসিমের জননীর নাম সাওদা। তিনি উম্মু ওয়ালাদ ছিলেন। পিতা মুহাম্মাদ তাঁহার শৈশবেই ইনতিকাল করেন। ফলে তিনি য়াতীম হিসাবে ফুফু 'আ'ইশা সিদ্দীকা (রা)-র যত্নে লালিত-পালিত হন। এই সুবাদে তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীনের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিপুল অংশ আহরণে সক্ষম হন।

কাসিম মদীনায় বসবাস করিতেন। অসংখ্য সাহাবা হইতে তিনি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আ'ইশা সিদ্দীকা (রা), পিতা মুহাম্মাদ (রা), ইব্‌ন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্র ইবনি'ল-'আস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়র (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফার (রা), আবূ হুরায়রা (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন খাব্বাব, মু'আবিয়া (রা), রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা), সালিহ ইব্‌ন খাওওয়াত (রা), আসলাম মাওলা 'উমার (রা) ও ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর সূত্রে তিনি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার সূত্রে তাবি'ঈ ও তাবউ তাবি'ঈনের একটি বিরাট দল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম হইল ঃ আশ-শা'বী, সালিম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (ইঁহারা দুইজন তাঁহার সমসাময়িক), য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইব্‌ন আবী মুলায়কা, নাফি', আয-যুহ্‌রী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার, আয়্যুব আস-সুখতিয়ানী, ইব্‌ন 'আওন, রাবী'আ, আবু'য-যিনাদ, আফলাহ ইব্‌ন হুমায়দ, ছাবিত ইব্‌ন 'উবায়দ, হানজালা ইব্‌ন আবী সুফয়ান, রাবী'আ ইব্‌ন 'আতা', 'আব্বাদ ইব্‌ন মানসূর, 'ইকরামা ইব্‌ন 'আম্মার, মূসা ইব্‌ন সারজিস, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন হায্‌ম, মালিক ইব্‌ন দীনার, 'ঈসা ইব্‌ন মায়মূন আল-ওয়াসিতী ও আল-কাসিমের পুত্র 'আবদু'র-রাহমান।

হাদীছ শাস্ত্রে কাসিমের ব্যুৎপত্তি সর্বজনস্বীকৃত। তিনি অবিসংবাদিত বিশ্বস্ততার সাথে সাথে বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ইব্‌ন সা'দ, আবু'য-যিনাদ, ইব্‌ন মু'ঈন, মালিক ইব্‌ন আনাস, আল-বুখারী, ইব্‌ন সীরীন, খালিদ ইব্‌নু'ন-নিযার, ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন ইসহাক, য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনসারী প্রমুখ মুহাদ্দিছ, সমালোচক ও ঐতিহাসিক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, মহিমান্বিত, বিদগ্ধ, ইমাম, ফাকীহ, আল্লাহ্‌ভীরু ও হাদীছশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। ইব্‌ন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন তাবি'ঈ শ্রেষ্ঠ, 'ইলম, শিষ্টাচার ও ফিক্‌হশাস্ত্রে সমকালের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয যেইদিন আমীরু'ল-মু'মিনীন নিযুক্ত হন, সেইদিন মদীনাবাসী মন্তব্য করিয়াছিল, আজ লজ্জাবতী কুমারী (আল-কাসিম)-এর মুখ খুলিবে। 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয বলিতেন ঃ যদি সম্ভব হইত, আল-কাসিমের হাতেই খিলাফাতের দায়িত্বভার ছাড়িয়া দিতাম।

ফিক্‌হশাস্ত্রেও আল-কাসিম ছিলেন সকলের শীর্ষ। ইমাম মালিক বলিতেন, আল-কাসিম ছিলেন এই উম্মা-র এক ফাকীহ। তবে তিনি ফাত্‌ওয়া প্রদান করিতেন কমই। তিনি হাদীছও অল্প রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিতেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন—কেহ হাজ্জ করিলে তাহাকে বলিতেন ঃ আল-কাসিমের হাজ্জ দেখিয়া দেখিয়া 'আমল করিও। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ একদিন আমি দেখি যে, কাসিম সালাত আদায় করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি বড় 'আলিম, না কি সালিম ? তিনি বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ। কয়েকবার এইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর তিনি বলিলেন ঃ ওই তো সালিম আছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আসলে তিনি নিজেকে বড় বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে সালিমকে বড় বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। তাই প্রশ্নটি এড়াইয়া চলিয়াছেন। বস্তুত তিনিই বড় 'আলিম ছিলেন। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন

সা'ঈদ বলিতেন ঃ মদীনায় বর্তমানে এমন কেহ নাই, যাঁহাকে কাসিমের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। আয়্যুব আস-সুখ্তিয়ানী বলিতেন, কাসিমের চাইতে বড় কোনও ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নাই। গঠন প্রকৃতিতে কাসিম পিতামহ আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আয-যুবায়র বলেন ঃ এই যুবকের মত আবূ বাক্র (রা)-র আর কোনও সন্তান তাঁহার সহিত এত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযের ইনতিকালের পর কাসিম ইনতিকাল করেন। মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। রাজা' ইব্ন জামীলের মতে ১০১ বা ১০২ হি.; খলীফার মতে ১০৬ বা ১০৭ হিজরী; ইব্ন মু'ঈন ও ইবনু'ল-মাদীনীর মতে ১০৬ হি.। ইব্ন সা'দের বর্ণনামতে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ১১২ হি. সাল। ইহা ছাড়া আরও অনেক মতামত রহিয়াছে। ইব্ন মু'ঈন ও ইবনু'ল-মাদীনীর মতে ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৭০ বৎসর। সিহাহ সিত্তাহর সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ২৯৯, ৩০০, ৩০১; (২) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৯/১৯৭৯, ৫খ, ৩০২; (৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১ম ভাগ, ১৫৭; (৪) ইবনু'ল-জাওযী, সিফাতু'স-সাফওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৯/১৯৬৯, ২খ, ৪৯, ৫০; (৫) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশকী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ১৩৫; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২০; (৭) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত তা. বি., ৫খ, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩; (৮) আয-যাহাবী, তায্কিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরুত, তা. বি., ১খ, ৯৬, ৯৭।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাসিম ইব্ন য়ানখুসরুহ্ (القاسم بن ينخصره) ঃ (রা) য়ামান-এর অধিবাসী। আবূ আহমাদ আল-'আসকারীর মতে তিনি নবী (স)-এর যুগ পাইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) নিজস্ব সনদ-পরম্পরায় উল্লেখ করিয়াছেন, আল-কাসিম (রা) বলেন ঃ আমি 'উমার ফারূক (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে খোশ আমদেদ জানান এবং নিজের পাশে বসাইয়া নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ "আল্লাহ্ আরও এমন অনেক লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা হইবে আল্লাহ্র প্রিয় এবং আল্লাহ্ হইবেন তাহাদের নিকট প্রিয়। তাহারা মু'মিনদের প্রতি হইবে নম্র ও বিনয়ী আর কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর। তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করিবে না" (৫ ঃ ৫৪)। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে য়ামানের অধিবাসী ! এই আয়াত তোমাদের সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে বলিয়া আমি ধারণা করিতেছি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৭।

মুহাম্মদ মূসা

আল-কাসিম ইব্ন রাসূলিল্লাহ (স) (القاسم بن رسول الله ﷺ) ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম সন্তান। এইজন্য মহানবী (স)-এর কুন্য়া (উপনাম) ছিল আবু'ল-কাসিম। কাসিম জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে এবং বাল্যকালেই মক্কায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কাসিম বিচার বুদ্ধির বয়স হইবার পর মারা যান। যুবায়র ইব্ন বাক্কার নিজস্ব সনদসহ বর্ণনা করেন যে, খাদীজা (রা)-এর গর্ভে কাসিম জন্মগ্রহণ করেন এবং চলাফেরা করিতে পারেন এমন বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাতাদা-ও এই মত সমর্থন করেন। ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্'ইম-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাসিম মাত্র দুই বৎসর বয়সে মারা যান। আয্-যুহরীও অদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাসিম মাত্র সাত দিন জীবিত ছিলেন। আল-ফাদ্লু'ল-'আলা'ঈ বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নুবুওয়াত লাভের পর কাসিম সতের মাস জীবিত ছিলেন। য়ূনুস ইব্ন বুকায়র, যিয়াদাতু'ল-মাগাযী (زيادات المغازى)-তে নিজস্ব সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ননি'ল-হুসায়ন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়িয়া ভ্রমণ করিবার মত বয়সে কাসিম-এর মৃত্যু হইয়াছিল। কাসিম ইনতিকাল করিলে আল্-'আস ইব্ন ওয়া'ইল বলিল ঃ মুহাম্মাদ (স) নিঃসন্তান বা লেজকাটা হইয়া গেল। বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)-এর পুত্র কাসিম-এর মৃত্যুর পর আরব-এর বহু কাফির, মুশরিক ও কুরায়শ বংশের অনেকেই এই বলিয়া তিরস্কার করিল যে, মুহাম্মাদ-এর বংশ শেষ হইয়া যাইবে। ইব্ন আবী হাতিম সুদ্দী হইতে এবং বায়হাকী মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আরব দেশে কোন ব্যক্তির ছেলে সন্তান মারা গেলে 'আরববাসী তাঁহাকে আব্তার (লেজকাটা) বলিয়া নিন্দা করিত। এই সময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে সূরা আল-কাওছার নাযিল করিলেন, "আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার দান করিয়াছি। সুতরাং স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন; নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।"

কাহারও কাহারও মতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিতীয় পুত্র 'আব্দুল্লাহ (যাঁহার ডাকনাম ছিল তায়্যিব ও তাহির)-এর মৃত্যুর পর শত্রুরা এই কথা বলিলে এই সূরা নাযিল হয়। এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরেই কাসিম মারা যান। ইব্ন মাজা, আত-তায়ালিসী ও আল-হারাবী, ফাতিমা বিনতু'ল-হুসায়ন-এর সূত্রে এবং তিনি (ফাতিমা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাসিমের মৃত্যুর পর খাদীজা (রা) বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি দুগ্ধবতী জননী, কাসিমকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা দুগ্ধ পান শেষ করা পর্যন্ত জীবিত রাখিতেন তবে কতই না ভাল হইত ! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ জান্নাতেই তাহার দুগ্ধপান সম্পন্ন হইবে।" আবূ নু'আয়ম বলিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের কেহই কাসিমকে সাহাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। ইমাম বুখারী (র)-ও তা'রীখুল-আওসাত (تاريخ الاوسط) গ্রন্থে সুলায়মান ইব্ন বিলাল-এর সূত্রে হিশাম ইব্ন 'উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাসিম ইসলাম-পূর্ব যুগেই মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, পৃ. ২৬০ সংখ্যা ৭২৬৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১৮৮; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, ১খ, পৃ. ১৩৩; (৪) মুফ্তী শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, ৮খ, পৃ. ৮২৭; (৫) আবু'ল-বারাকাত 'আবদু'র-রা'উফ দানাপুরী, আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ১১।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

আল-কাসিম ইব্নু'র-রাবী' (القاسم بن الربيع) ঃ ইব্ন 'আবদি শামস্, ইহা আবু'ল-আস-এর প্রকৃত নাম বলিয়া অনেকের ধারণা। তিনি নিজের কুনয়া (উপনাম) আবু'ল-'আস-এ সর্বাধিক পরিচিত। অন্যান্য সূত্রে তাঁহার নাম লাকীত, মাহ্শাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, সংখ্যা ৭০৫১।

রুহুল আমীন সিরাজী

আল-কাসিম ইব্নু'ল-হুসায়ন (القاسم بن الحسين) ঃ ইব্ন আহমাদ আল-খুওয়ারিযমী, খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ, ব্যাকরণবেত্তা, গ্রন্থকার ও কবি। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, উপাধি মাজদু'দ-দীন, তিনি সাদরু'ল-আফাদিল নামেই বিশেষ পরিচিত। জন্ম ৯ শাওওয়াল, ৫৫৫/১১৬০, আরবী ভাষা ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন খাওয়ারিয্ম-এর তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ফাকীহ ও ভাষাবিদ শায়খ বুরহানু'দ-দীন নাসির ইব্ন 'আবদি'স-সায়্যিদ আল-মুতাররিযী (মৃ. ৬১৬/১২১৯)। শায়খ আল-কাসিম ফিক্হশাস্ত্রে হানাফী মাযহাবের এবং 'আকা'ইদে 'ইমাম আল-মাতুরীদীর অনুসারী ছিলেন।

তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানা বিশেষভাবে খ্যাত ঃ (১) 'আল্লামা যামাখশারীর আল-মুফাস্সাল গ্রন্থের ভাষ্য আত-তাদমীর; (২) আবু'ল-'আলা আল-মা'আররী-র সুবিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ সাক্তু'য-যানদ-এর ভাষ্য; (৩) আত-তাওদীহ, 'আল্লামা হারীরী-র আল-মাকামাত গ্রন্থের ভাষ্য; (৪) শারহু'ল-আনুমূযাজ; (৫) শারহু'ল-আব্নিয়া; (৬) আয-যাওয়ায়া ফি'ল-খাবায়া (الزوايا فى الخبايا) আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র; (৭) আল-মুহাসসাল ফি'ল-বায়ান, অলংকারশাস্ত্র।

'আল্লামা সুয়ূতী ও ঐতিহাসিক য়াকূত তাঁহার গভীর ভাষা জ্ঞান, কাব্য প্রতিভা, বাগ্মিতা, ধর্মনিষ্ঠা ও মহৎ চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ৬১৭/১২২০ সালে বাষট্টি বৎসর বয়সে এই মহান শায়খ তাতারীদের আক্রমণে শহীদ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জালালু'দ-দীন সুয়ূতী, বুগয়াতু'ল-উ'আত ফী তাবাকাতি'ল-লুগাবিয়্যীন ওয়া'ন-নুহাত (بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة), নির্ঘন্ট; (২) 'আল্লামা আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-হানাফিয়্যা, মিসর, ১ম সং., ১৩২১ হি., পৃ. ১৫৩-৪।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

কাসিম কাদী যাদাহ্ আর-রূমী (قاسم قاضى زاده الرومى) ঃ তুরস্কের ৯ম/১৫শ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও কাদী। পিতার নিকট তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। শারী'আত সম্পর্কিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ছিলেন। প্রথমে তিনি এশীয় তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কাসতামুনী শহরের কাদী নিয়োজিত হন এবং পরে সুলতান মুহাম্মাদ খান ইব্ন মুরাদ খান তাঁহাকে তুরস্কের একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে আবার কাদী পদে নিয়োগ করা হয়।

সুলতান বায়াযীদ খান ইব্ন মুহাম্মাদ খান (১৪৮১-১৫১২ খৃ.) তাঁহাকে বুরসা শহরের কাদী নিযুক্ত করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে সুনামের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৩ রামাদান, ৮৯৯/১৪৯৩ তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি লাখ্নাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-হানাফিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ১৫৪।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

কাসিম খান চিশ্তী (قاسم خان چشتى) ঃ (১৬১৩-১৭ খৃ.) বাংলার সুবাদার। ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঙ্গেরের শাসনকর্তা কাসিম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি সেপ্টেম্বর ১৬১৩ খৃ. সুবাদার নিযুক্ত হইলেও পরবর্তী বৎসর ১০২২ হি./ মে ১৬১৪ সালের পূর্বে কার্যভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরূপ যোগ্যতা, উদ্যম, সততা ও কর্মদক্ষতার অভাব ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন বদমেজাজী, ক্ষমতালোভী এবং দাম্ভিক। স্বজনপ্রীতির জন্যও তাঁহার শাসন আমল কলঙ্কিত ছিল, যেই কারণে তিনি অনেক অভিজ্ঞ কর্মচারীর সহযোগিতা, উপদেশ ও সহানুভূতি লাভ করেন নাই। ফলে তাঁহাকে নিজস্ব কতিপয় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে তাঁহার শাসনের তিন বৎসর কাল তিনি অভ্যন্তরীণ কলহ, বিদ্রোহ ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। নব অধিকৃত কামরূপের বিদ্রোহ দমনে তাঁহাকে বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়। আসাম ও আরাকানের বিরুদ্ধে অভিযানও চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

দীওয়ান মীরযা হুসায়ন বেগের সহিত কলহ তাঁহার শাসন আমলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীওয়ান ইতিপূর্বে সুবাদারের কিছু কাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং রাজধানী শহরের কোতওয়ালের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন। ইহাতে কাসিম খান কর্তৃক নিযুক্ত নূতন কোতওয়ালের সহিত দীওয়ানের বিবাদ অনিবার্য হইয়া উঠে। ফলে দুই জনের মধ্যে যেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতে সুবাদারের কয়েকজন লোক দীওয়ানের পুত্রগণ কর্তৃক হতাহত হইয়াছিল। কাসিম খান ব্যাপারটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আনিয়া দীওয়ান ও তাঁহার পুত্রদের কারারুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যস্থতায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেও দীওয়ানের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। এই ঘটনাটি তদন্ত করিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর সা'আদাত খান নামে তাঁহার এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তদন্তে কাসিম খান দোষী প্রমাণিত হওয়ায় দীওয়ানকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে এবং সুবাদারকে উপরন্তু এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।

কাসিম খান কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াও চরম অদূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই দুই রাজাকে ইসলাম খান যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া কাসিম খান তাঁহাদিগকে বন্দী করেন। ইহাতে উভয় রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ দমন করিতে বহু ক্ষতি সাধিত হয়। অতঃপর কাসিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন (নভেম্বর ১৬১৪)। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন মুগলদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কাসিম খান মুবারিয খানের অধীনে কাছাড়ে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন (১৬১৪ খৃ.)। মুবারিয খান প্রতাপগড় ও আশুবাতেকর দুর্গদ্বয় দখল করিয়া রাজা শত্রুদমনকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পর মুগল সেনাপতি মুবারিয খানের আকস্মিক ইনতিকালে তাঁহার কর্তব্যবিমূঢ় সহ-সেনাধ্যক্ষ মীরার

বাহাদুর সিলহটে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা সহজেই দুর্গ দুইটি পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। ইহাতে কাছাড়ে মুগল আধিপত্য বিনষ্ট হয়। শত্রুদমন বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর বীরভূম পাচেট, হিজলী ও চন্দ্রকোণার জমিদারগণ মুগলদের অধীনতা অস্বীকার করেন। কাসিম খান তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়াও বিশেষ কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পর আরাকানের মগ রাজা মেঙ্গবেঙ্গ-এর সন্দ্বীপের অধিপতি জলদস্যু সিবাস্টিয়ান গোওগ লেস ১৬১৪ খৃস্টাব্দে একযোগে ভুলুয়া অঞ্চল আক্রমণ করিলেন। তবে মগ রাজার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ফিরিঙ্গীরা দলত্যাগ করিলে এই আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। পরবর্তী বৎসর ১৬১৫ খৃ. আরাকানের রাজা পুনরায় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রাজা স্বয়ং জলাভূমিতে আটক পড়ায় মুগলদের হাতে বন্দী হন এবং সমস্ত লোকজন ও ধন-সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

কাসিম খান আসাম জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অসময়োচিত রণপ্রস্তুতি ও সেনাপতি আগা বারিক-এর অসতর্কতার জন্য এই অভিযান ব্যর্থ হয়। তাঁহার চট্টগ্রাম অভিযানও ব্যর্থ হয়। এইরূপে পরাজয়, অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফলে কাসিম খানের আমলে বাংলার মুগল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট তাঁহাকে ১৬১৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিলে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন এবং ইবরাহীম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জে. এন. সরকার (সম্পা.), History of Bengal, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), ২খ, ২৮৯-৯৮; (২) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ), পৃ. ১৪৫-৪৬; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১০৯-১০; (৪) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু'স-সালাতীন (আকবর উদ্দিন অনূদিত; বাংলার ইতিহাস), পৃ. ১৪৩ ও ৪৬০।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

কাসিম খান জুওয়ায়নী (قاسم خان جوینی) ঃ (১৬২৮-৩২ খৃ.), জুওয়ায়নের (বায়হাক বিলায়াতের অন্তর্গত) মীর মুরাদের পুত্র। মীর মুরাদ সেই স্থানের একজন নেতৃস্থানীয় সায়্যিদ ছিলেন। তিনি জুওয়ায়ন ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সাহসী ও দক্ষ তীরন্দায ছিলেন। বাদশাহ আকবর তাঁহাকে শাহযাদা খুররামের শিক্ষক নিয়োগ করেন। আকবরের রাজত্বের ৪৬তম বৎসরে তাঁহাকে লাহোরের বাখ্শী নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার পুত্র কাসিম খান ছিলেন একজন মার্জিত ব্যক্তি ও সাহিত্যসেবী। বাংলায় জাহাঙ্গীরের ভাইসরয় ইসলাম খান চিশ্তী ফারূকীর অধীনে কাসিম খান বাংলার প্রধান খাজাঞ্চী ছিলেন। তাঁহাকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য ইসলাম খান বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর কাসিম খান সৌভাগ্যক্রমে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভগ্নী মানীযাহ (منیزہ) বেগমকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে কাসিম খানের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দরবারিগণ অনেক সময় রসিকতা করিয়া তাঁহাকে কাসিম খান মানীযাহ বলিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে আগ্রার সুবাদার নিযুক্ত হন। শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রথম বৎসরে বাদশাহ তাঁহাকে পাঁচ হাযারী মান্সাবে উন্নীত করিয়া ফিদা'ঈ খানের স্থলে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করেন (৪ ফেব্রুয়ারী, ১৬২৮)। এইজন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কাসিম খান সম্রাটকে ৩৩টি হাতি, ২৭টি পার্বত্য ঘোড়া, ৪০ মণ মুসব্বর (Aloe)-সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার উপঢৌকন প্রেরণ করেন (১৬ জানুয়ারী, ১৬৩২)।

তাঁহার শাসনামলের প্রধান ঘটনা হুগলীতে অবস্থানরত পর্তুগীজদের দমন। য়ুরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম বাংলায় আসে। তাহার চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দরের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ভাগীরথী নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে যখন সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি ঘটে তখন হুগলী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে গড়িয়া উঠে। সেইখানে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৫৭৮ খৃ. সম্রাট আকবর হুগলীর পর্তুগীজদের প্রধান পেড্রো-টেভারিজের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সেইখানে বসতি ও গির্জা নির্মাণ ও ধর্ম প্রচার করিবার অনুমতি দেন। ফলে হুগলী বন্দরে পর্তুগীজদের একটি বড় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।

নানা কারণে বাংলার জনসাধারণ ও শাসকশ্রেণী পর্তুগীজদের প্রতি রুষ্ট হয় এবং সুবাদার কাসিম খানের সময় তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

প্রথমত, পর্তুগীজরা বাণিজ্যের নামে ব্যাপকভাবে জলদস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে এবং আরাকানের মগ দস্যুদের সহিত মিলিয়া বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়শই লুটতরাজ করিত। ইহাদের সহিত হুগলীর পর্তুগীজদের যোগাযোগ থাকায় তাহারা স্থানীয় জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজরা জোরপূর্বক এই দেশের লোকদের খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাহজাহান যখন বাংলায় ছিলেন, তখন তিনি হুগলীতে পর্তুগীজদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন। শাহজাহান জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হুগলী বন্দরের নিকটবর্তী পরগণাসমূহ অবৈধভাবে বন্দোবস্ত লইয়া পর্তুগীজরা সেইখানকার দরিদ্র প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচার করিত। ভয় ও লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত, এমনকি য়ুরোপেও পাঠাইয়া দিত। তৃতীয়ত, হুগলীতে পর্তুগীজদের সংখ্যা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদের উন্নত ধরনের গোলাবারুদ ও শক্তিশালী নৌবাহিনী থাকায় হুগলীতে পর্তুগীজদের অবস্থান রাজনৈতিকভাবে শংকার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পর্তুগীজরা দাস ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। আফ্রিকা মহাদেশ হইতে দাস আমদানী ছাড়াও এই দেশের নর-নারীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া বাজারে দাস হিসাবে বিক্রি করিত। তাহাদের এইরূপ গর্হিত আচরণ, জলদস্যুবৃত্তি ও জোরপূর্বক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টার ফলে পর্তুগীজদের সম্পর্কে এই দেশীয় জনসাধারণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

উপরন্তু শাহজাহান যখন বাংলায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন হুগলীর পর্তুগীজদের আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পর্তুগীজ নেতা ম্যানুয়েল টেভারিজ ও মিপোলেয় রত্তরিগিজ তাহাদের নৌবহর লইয়া শাহজাহানের সহিত এলাহাবাদে অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু পর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাঁহাকে অভিযান বন্ধ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পর্তুগীজরা ফিরিবার পথে পাটনা হইতে মুমতায মহল বেগমের দুইজন পরিচারিকাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। এই সমস্ত কারণে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সুবাদার কাসিম খানকে নির্দেশ দেন। কাসিম খান খুব দক্ষতার সহিত হুগলীর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা করেন। তিনি তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে অবরোধ করিবার ব্যবস্থা করেন।

বর্ধমান হইতে একটি মুগল সেনাবাহিনী হুগলী ও সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী হলদিপুরে অবস্থান নেয়। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ হইতে আরও একটি সেনাদল ইহাদের সহিত যোগ দেয়। শ্রীপুর হইতে মুগল সেনাবাহিনী নদীপথে কলিকাতার নিকটবর্তী সাংকরাইল নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইহার পর নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়া হলদিপুরের সেনাবাহিনী নদীপার হইয়া সাংকরাইল নৌ-বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। সুবাদার কাসিম খান তাঁহার পুত্র 'ইনায়াতুল্লাহ খানের সহিত আল্লাহ য়ার খান ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষকে হুগলী প্রেরণ করেন এবং পর্তুগীজরা যাহাতে নৌপথে পলায়ন করিতে না পারে সেইজন্য ঢাকায় অবস্থিত মুগল নৌ-বহরের একাংশ চট্টগ্রামে পাঠান। অবশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় যে, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল হিজলী। মুগল বাহিনী ১৬৩২ খৃস্টাব্দের ২০ জুন হুগলী আক্রমণ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই শহরের উপকণ্ঠ দখল করে। ইহার পর মুগল সৈন্যরা হুগলী শহর অবরোধ করিয়া রাখে এবং কামানের সাহায্যে শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে।

পর্তুগীজরা স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের দক্ষিণ ভারতের ঘাঁটি গোয়া ও অন্যান্য স্থানের পর্তুগীজদের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করিয়াছিল। কিন্তু কোন সাহায্য না আসায় তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। অবরুদ্ধ অবস্থায় হুগলীর অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। পর্তুগীজরা গোপনে নদীপথে পালাইতে চেষ্টা করিলে মুগলদের গোলাগুলীর আঘাতে ও নৌকাডুবিতে অনেকের মৃত্যু হয়। কিছুসংখ্যক নৌকা সাগরদ্বীপে পৌঁছাইতে সমর্থ হয় এবং সেখান হইতে পর্তুগীজরা জাহাজ যোগে গোয়ায় চলিয়া যায়। প্রায় তিনমাস কাল অবরোধের পর ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৬৩২ খৃ. মুগল সৈন্যরা হুগলী অধিকার করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক 'আবদু'ল-হামীদ লাহোরীর বিবরণ অনুসারে হুগলী যুদ্ধে দশ হাজার পর্তুগীজ নিহত হয় এবং ৪৪০০ জন বন্দী হয়। এক হাজার মুগল সৈন্য নিহত এবং পর্তুগীজদের হাতে বন্দী দশ হাজার ভারতীয়কে মুক্তি দেওয়া হয়।

হুগলী জয়ের কয়েক দিন পরই ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৬৩২ খৃ. (১০৪১ হি.) কাসিম কান রোগাক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন।

আগ্রায় আঙ্গাখানের বাজারে কাসিম খান একটি জামি' মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন (মা'আসিরু'ল-উমারা', ৩খ, ৭৮)। তিনি অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ-কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিরাট মুগল বাহিনী দ্বারা তাহাদিগকে প্রথম হইতেই কোণঠাসা করা, যাহাতে তাহারা বহিঃসমুদ্রে পালাইতে না পারে এবং বাহির হইতে নৌকাযোগে যাহাতে কোন সৈন্য সরবরাহ না আসিতে পারে তাহা নিশ্চিত করা। দেশীয় সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে য়ূরোপীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ তাঁহার যুদ্ধ কৌশল নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু'স-সালাতীন (আকবর উদ্দিন অনূদিত, বাংলার ইতিহাস), পৃ. ৪৮৫-৮৭; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১১০; (৩) জে. এন. সরকার (সম্পা.), History of Bengal (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), ২খ, ৩১৬-২৮।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

কাসিম নানূতূবী (দ্র. মুহাম্মাদ কাসিম নানূতূবী)

কাসিম পাশা (قاسم پاشا) ঃ আওলিয়া, ৯ম/১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উছমানী কর্মকর্তা। ধারণা করা হয় যে, তিনি প্রখ্যাত আলবেনীয় অভিজাত তোদোর মুযাক (Todor Muzak)-এর পুত্র ছিলেন ('আশিক পাশা যাদে, সম্পা. 'আলী, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., ১৯১; নেশরী, সম্পা. Taeschner, ১খ, ২৩০; H. Inalcik, Fatih devri uzere tetkikler ve vesikalar, আঙ্কারা ১৯৫৪ খৃ., ১৬২)। 'উছমানী সরকারী দফতরে নিয়োগের জন্য কবে তাঁহাকে দেওশিরমেতে কর্তৃক আনীত হয় তাহার সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তবে যেহেতু তিনি ২য় মুহাম্মাদ-এর রাজত্বকালে খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করেন, তাই মনে হয় ১ম মুহাম্মাদের রাজত্বকালের শেষের দিকে এই ঘটনা ঘটে। তিনি যে সমস্ত পদে কার্যরত ছিলেন তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল রূমেলির বেগলেরবেগী (بیگلر بیگی) পদ; তিনি এদিরনে (Edirne) শহরে তাঁহার জীবনের একাংশ কাটাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ৮৮৩/১৪৭৮ সালে তিনি তুনজা নদীর তীরে সেলখানে অঞ্চলের নিকটে একটি গম্বুজযুক্ত মসজিদ, একটি পান্থশালা ('ইমারেত) এবং একটি জোড়া হাম্মাম নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন [হিবরী, আনীসু'ল-মুসামিরীন, সম্পা. S. Ilgurel, অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. সন্দর্ভ, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ৩৩, ৪১, ৬৭; এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ১ শা'বান, ৮৮৩/২৮ অক্টোবর, ১৪৭৮ তারিখের ওয়াকফিয়্যার জন্য (দ্র.) Topkapi Sarayi Muzesi Arsivi, N. E. ৭৭৪৪/খ]। কাসিম পাশা ৮৯০/১৪৮৫ সালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার নির্মিত মসজিদের নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এদিরনেতে তিনি ইতোপূর্বে দারবীশগণের জন্য একটি বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এই ঘটনাটির সহিত তাঁহার 'আওলিয়া' উপাধিটি সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) Oral Onur, Edirne kitabeleri, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ১২৯; (২) Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ., ৬৬, ৬৭, ১৪৫; (৩) M. Tayyib Gokbilgin, XV-XVI asirlarda Edirne ve Pasa livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ৪৮ (নং ৫৮), ৪৩৪ (নং ৬৮৮), ৫২৪; (৪) Basbakanlik Arsiv Genel Mudurlugu, Topu-tahrir defteri, নং ৩৭০-পৃ. ৫৪৬।

C. Orhonlu (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম পাশা (قاسم پاشا) ঃ গুযেলজে মহান সুলতান সুলায়মানের রাজত্বকালে 'উছমানী উযীর; তাঁহার নামে ইস্তাম্বুলের একটি মহল্লার নামকরণ করা হয়। ঐতিহাসিক নথিপত্রে তাঁহার জীবনী সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য অত্যন্ত অপ্রতুল ও বিক্ষিপ্ত। তাঁহার সম্পর্কে প্রথম ঐতিহাসিক নির্দেশনা পাওয়া যায় মারজ দাবিক-এর বিজয়ের পর হামা অঞ্চলের সানজাক বেগরূপে তাঁহার নিযুক্তি প্রসঙ্গে। এই পদে নিযুক্ত থাকা কালে কাসিম পাশা জনৈক বিদ্রোহী আরব আমীর ইব্ন হাফ্‌শ-এর বিদ্রোহ দমন করেন। সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করিলে কাসিম পাশা আনাদোলু বেগলেরবেগী পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি রোডস-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে (৯২৮/১৫২২) অংশগ্রহণ করেন; ৯৩০/১৫২৪ সালে তিনি মিসরের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি অকৃতকার্য প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়, কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁহাকে প্রথমে কাপুদান-ই দারয়া (নৌ-বাহিনীর অধিকর্তা) ও পরে ৯৩২/১৫২৬ খৃ. হাঙ্গেরীয় অভিযানের সময় ইস্তাম্বুলের প্রশাসক (মুহাফিজ) নিযুক্ত করা

হয়। ইহার পরবর্তীকালে তিনি রুমেলী বেগলেরবেগী এবং ৯৩৫/১৫২৯ সালে তৃতীয় উযীর নিযুক্ত হন। এই পরিস্থিতিতে তিনি একই বৎসর ভিয়েনা অবরোধে এবং ৯৪১/১৫৩৫ সালে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার মর্যাদা অবশ্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত উচ্চ অবস্থানে স্থায়ী হয় নাই। অজ্ঞাত কারণে তাঁহাকে তৃতীয় উযীরের পদ হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং ৯৪৪/১৫৩৭ সালের পূর্বে তাঁহাকে তুলনামূলকভাবে কম মর্যাদাসম্পন্ন পদে, মোরিয়া অঞ্চলের সানজাক বেগরূপে নিযুক্তি প্রদান করা হয়। ৯৪৮/১৫৪১ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত কাসিম পাশা এই পদে বহাল থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। ইহাতে অনুমিত হয় যে, তখনও পর্যন্ত তিনি সুলতানের অসন্তুষ্টি হইতে মুক্তি পান নাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার মৃত্যুর সাল উল্লেখ করেন নাই, সম্ভবত তিনি ৯৫৯/১৫৫২ সালের পরে ইনতিকাল করেন। যদিও তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক গ্রন্থকারগণ দাবী করেন যে, তাঁহাকে গেলিবোলুতে (গ্যালিপোলি) দাফন করা হয়। তাঁহার সমাধির আজ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কাসিম পাশা মর্যাদার দিক দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিক ছিলেন না। সরকারী পদে তাঁহার উন্নতি ছিল অতি দ্রুত, কিন্তু তাঁহার পতন ছিল সমানভাবে আকস্মিক ও দ্রুত। অবশ্য নির্মাণ এবং সেবামূলক কার্য উভয়ের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। তৃতীয় উযীররূপে তাঁহার নিযুক্তি কালে ইস্তাম্বুলের যে অংশটি তাঁহার নাম বহন করে তিনি তাঁহার পুনঃনির্মাণ কার্য শুরু করেন। একই সময়ে তিনি স্থপতি সিনান-কে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা, একটি ধর্মীয় ইমারত, একটি স্নানাগার নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন তিনি বোযবুরুন অঞ্চলে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নাফীস খানুম নামে তাঁহার এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁহার পিতার নামানুসারে প্রদত্ত নগরীর অংশে একটি মসজিদ ও একটি বিদ্যালয় নির্মাণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত ঃ (১) সিজিল্ল 'উছমানী, ৪খ, ৪৬ প. (ভুলবহুল ও অসম্পূর্ণ); (২) Geofroy, L'Estat de la Court dn Grand Ture, Paris 1546, ১০ প.; (৩) Gniml Postel, La Tierce Partic des Orientales Histoires, Poitiers, 1560, ৬১ প.; (৪) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ৩৭-৮।

F. Sumer (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম পাশা (قاسم پاشا) ঃ জাযারী, ৯ম/১৫ শতাব্দীর 'উছমানী কবি ও কর্মকর্তা। তিনি যে পরিবারের সদস্য ছিলেন তাহা মিসর হইতে আগমন করে এবং 'উছমানীদের অধীনে কার্য গ্রহণ করে। তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ জাযারী রাজকীয় দীওয়ানে কর্মরত ছিলেন এবং ৮৬৯/১৪৬৪-৫ সালে নিশান্জী পদে অধিষ্ঠিত হন (কুল্লিয়াত-ই দীওয়ান-ই কাবুলী, সম্পা. ঈ. হিকমেত এরতায়লান, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০৪ প.)। তাঁহার পিতার ন্যায় কাসিম নিজেও দীওয়ান-ই হুমায়ূন-এ প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন দফ্তরে চাকুরী করেন। তিনি কালক্রমে দফতরদার-এর পদে উন্নীত হন। তিনি কিছু সময়ের জন্য ২য় বায়াযীদের (তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বে) সহিত আমাস্য়াতে অবস্থান করেন ও তাঁহার দাফতারদাররূপে কার্য সম্পাদন করেন। জাযারী কাসিম, ৮৮৬/১৪৮১ সালে নিশানজী পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং উযীরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই পদে তিনি তিন বৎসর বহাল ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কিছু কালের জন্য স্যালোনিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ৮৮৭/১৪৮৫ সালে ইনতিকাল করেন এবং বুরসায় আমীর সুলতানের কবরের নিকটে তাঁহার নিজের নির্মিত মাদ্রাসার পার্শ্বে তাহাকে দাফন করা হয়।

জাযারী কাসিম পাশা তাঁহার কালেই একজন যোগ্য কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 'সাফী' কবিনাম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতাবলী একটি দীওয়ান (সংকলন)-এ সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। উহার কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। অবশ্য তাঁহার পদ্যে বর্ণিত আলোচনাসমূহের একটি অসম্পূর্ণ ভাষ্য ইস্তাম্বুলের 'আলী আমিরী গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (মানবুম এসেরলের, নং ১০০০/১)। 'আশিক চেলেবি (দ্র.)-র বক্তব্য অনুসারে তিনি আহমাদ পাশা (দ্র.) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তিনি যথার্থ গাযাল রচনা করিয়াছিলেন (সম্পা. G. M. Meredith-Owens, লন্ডন ১৯৭১ খৃ., পৃ. ২১৪ ক)।

তিনি কতিপয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন, যেমন ঃ ইস্তাম্বুলের চাগালোগলু এলাকায় একটি মসজিদ (Istanbul vakiflari tahrir defteri, ৯৫৩/১৫৪৬ তারিহলি, সম্পা. O. L. Bar-kan এবং E. H. Ayverdi, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৫৩), বুরসা শহরে আমীর সুলতান অঞ্চলে একটি মাদরাসা ও একটি হাম্মাম (guldeste, ৬৬); কেফে এলাকায় একটি মসজিদ (Basbakanlik Arsiv Genel Mudurlugu, Kefe tahrir defteri, নং ৩৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গ্রন্থপঞ্জীমূলক রচনাবলীতে "কাসিম পাশা" নামধারী তিন ব্যক্তির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে ঃ জাযারী, আওলিয়া ও কোজা (শেষোক্ত জনের জন্য দ্র. 'আতাঈ', ১০৪); (২) দেখা যায় যে, মোহাম্মদ ছুরায়্যা, জাযারী কাসিমকে ৯৫০ হিজরী পর্যন্ত জীবিত দেখাইয়াছেন (So, ৪খ, ৪৭; তু. খাওয়ানসারী, হাদীকা, ১খ, ৭৯, ৮০, ২৮০)। সেহী-এর মতে (২৪), জাযারী কাসিম স্যালোনিকায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

নিম্নোক্ত রচনাবলীতে অতিরিক্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; (৩) 'আশিক পাশা-যাদে, সম্পা. 'আলী, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ খৃ., পৃ. ১৯২, ১৯৩, (৪) নেশরী, সম্পা. Taeschner, ১খ, ২৩১; (৫) সা'দু'দ-দীন, তাজু'ত-তাওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৭৯ হি. ১খ, ২১৬; (৬) কোজা হুসায়ন, বাদায়ী আল-ওয়াকায়ি সম্পা. I. S. Tveritinova, মস্কো ১৯৬১ খৃ., ২খ, পত্রক ৪১৪ক; (৭) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত-নামাহ, ১খ, ৩৩৫, ৩৪০, ২খ, ১৭; (৮) ম. তায়্যিব গোকবিলগিন, XV-XVI. asirlarda Edirne ve Pasa livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১৫৩, ৪৩৩, ৪৩৪; (৯) কোয়ুনলুওগলু মেমদুহ তুরগুত, Iznik ve Bursa Tarihi, বুরসা ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১৫৫, ১৬৪, ১৯৬।

C. Orhonlu (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম ফারিশতা (দ্র. ফিরিশ্তা)

কাসিমিয়্যা (قاسمية) ঃ ১১শ/১৭শ এবং ১২শ/১৮শ শতকের 'উছমানী মিসরের একটি নব্য-মামলূক পরিবার ও উপদল। যাঁহার নামানুসারে ইহা গঠিত সেই দাফ্তারদার কাসিম বে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত তিনি ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যদিও অপর একটি কিংবদন্তীতে আল-জাবারতী তাঁহাকে সুলতান ১ম সেলীমের শাসন আমলের ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) তাঁহার পুত্র সম্পর্কে আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা)-এর মন্তব্য শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ কে আমাকে আবূ কুহাফা-র পুত্র ও আল-খাত্তাব-তনয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবে? তাহারা আমার পুত্র দ্বারা আমার উপর কার্পণ্যের অপবাদ দেয়। কায়স (রা) দু'আ' করিতেন, "হে আল্লাহ! আমাকে ধনৈশ্বর্য দাও। কারণ ইহা ছাড়া কোনও বড় কাজ করা যায় না।" কায়স ইবন সা'দ (রা) শ্মশ্রু-গোঁফবিহীন ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে পশম বলিতেই ছিল না। আনসারগণ উপহাস করিয়া বলিতেন ঃ আমাদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে যদি কায়সের জন্য দাড়ি কিনিতে পারিতাম! শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি দশ বৎসর যাবৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমত করেন। তিনি বলেন ঃ উক্ত সময়ে একদা আমি সালাত সমাপ্ত করিয়াছি, এমনি মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ কায়স! আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি দরজার কথা বলিয়া দিব না? আমি বলিলাম ঃ অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন ঃ উহা এই দু'আ' ঃ

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ –

কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অনেকগুলি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)-র হাতে একদল যোদ্ধার পতাকা ছিল। কুরায়শদের অভিযোগ ক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত পতাকা তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লন এবং তাঁহার পুত্র কায়সের হাতে অর্পণ করেন। কাহারও মতে আয-যুবায়র ইবনু'ল-'আওওয়াম (রা)-এর হাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে কায়সের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইমাম আল-বুখারী আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কায়স ইব্ন সা'দের সম্পর্ক ছিল একজন রক্ষীর মতো। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পরও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে যোগদান করেন। তিনি মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি মিসরে একটি বাড়ী তৈয়ার করেন। হযরত 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর বিসম্বাদে তিনি 'আলী (রা)-র পক্ষে ছিলেন। 'আলী (রা)-র পক্ষ হইতে তিনি মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পর তিনি অব্যাহতি পান এবং তদস্থলে মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা)-কে নিযুক্ত করা হয়। সিফফীনের যুদ্ধে তিনি 'আলী (রা)-র পক্ষে অসি ধারণ করেন। এই সময় তাঁহার কণ্ঠে উচ্চকিত হইতেছিল ঃ

هذا اللواء الذى كنا نخف به
مع النبى وجبريل لنا مدد
ماضر من كانت الانصار عيبته
ان لايكون له من غيرهم احد
قوم اذا حاربوا طالت اكفهم
بالمشرفية حتى يفتح البلد

অর্থ ঃ এই ঝাণ্ডা লাইয়া আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে শত্রুর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করিতাম ; আর জিবরীল ছিলেন আমাদের সাহায্যে। আনসার সম্প্রদায় যাহার পক্ষ ধারণ করে, তাহার পক্ষে আর কেহ না থাকিলেও তাহার কোনও ক্ষতির আশংকা নাই। ইহারা তো এমন এক গোষ্ঠী, যখন তাহারা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে তখন তাহাদের বাহন ও তরবারি হইয়া ওঠে দীর্ঘ। এমনি করিয়া তাহারা নগর জয় করিয়া লয়।

হযরত 'আলী (রা)-র পরে তিনি হযরত হাসান (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। মু'আবিয়া (রা)-র সহিত হাসান (রা) সন্ধি স্থাপন করিলে তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তখন রাগের বশবর্তীতে তিনি হাসান (রা) সম্পর্কে কটূক্তিও করেন। এই সময় তিনি বলিতেন ঃ যদি ইসলামের অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে এমন কূটকৌশল চালিতাম যে, সমুদয় আরব মিলিয়াও তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিত না। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওওয়ারায় গিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করেন এবং আল্লাহ্র 'ইবাদাতে নিমগ্ন হন। মু'আবিয়া (রা)-র শাসনকালেই তিনি ৬০ হি. বা ৫৯ হি. সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু ইবন হিব্বান বলেন যে, হি. ৫৮ সালে তিনি মু'আবিয়া (রা)-র আয়ত্তাধীন হইতে পলায়ন করেন এবং আরমেনিয়ার তিফলীস (تفلس) নামক নগরে অন্তরীণ জীবন যাপন করেন। 'আবদু'ল-মালিকের শাসনামলে হি. ৮৫ সালে তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন। আল-খলীফার অনুসরণে ইবন হাজার আল-'আসকালানী প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৩৩৯ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান তা. বি., ৪খ, ২৫১, ২১৬ ; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২০ ; (৪) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৯ ; (৫) ইবন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (দ্র. টীকা আল-ইবাসা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২৪-২৩১) ; (৬) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১২২৫ হি. ৮খ, ৩৯৫, ৩৯৬ ; (৭) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২৮ ; (৮) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ৪খ, ১ ভাগ, ১৪১।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়স ইবন সায়ফী (قيس بن صيفى) ঃ (রা) সাহাবী, আনসার সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহার পিতা সায়ফী আবূ কায়স ইবনু'ল-আসলাত নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন আনসার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার সৎ মায়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেন। জাহিলী আরব সমাজে সৎ মাকে বিবাহ করার সাধারণ রীতি ছিল। সৎ মা তাঁহাকে বলিলেন ঃ আমি তোমাকে আমার সন্তান মনে করি। এই ব্যাপারে আমি প্রথমে নবী কারীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিব। অতএব তিনি নবী কারীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কায়সের পিতা ইনতিকাল করিয়াছে এবং কায়স আমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়াছে। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে" (৪ ঃ ২২)।

অপর ঘটনা অনুযায়ী এই ঘটনা হিসন ইবন আবী কায়স ইবনি'ল-আসলাত (حصن بن أبى قيس ابن الاصلت)-এর সহিত সম্পৃক্ত। মহিলার নাম কাবশা বিনত মা'ন (كبشة بنت معن)। 'ইকরামার সূত্রে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি আবূ কায়স ইবনু'স-সালত (ابو قيس بن الصلت)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট। আসলাত-এর স্ত্রী নাম দাম্‌রা উম্ম 'উবায়দিল্লাহ (ضمرة ام عبيد الله)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫১ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৮ ; (৩) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামি'ল-কুরআন, ৫খ, ১০৪।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবন সালা' (قيس بن سلع) ঃ (রা) একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। ইমাম বুখারী, ইবনু'স-সাকান, ইবন হিব্বান প্রমুখ মনীষী তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকের মতে তাঁহার পিতার নাম সালা'-এর স্থলে আসলা' হইবে। ইমাম বাগাবীর বর্ণনা মতে তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ইবনু'ল-আছীরের বর্ণনামতে ইবন 'আবদি'ল-বার্র, ইবন মান্দা ও আবূ নু'আয়ম-এর গ্রন্থে কায়স ইবন সালা' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইবন হিব্বানের বর্ণনামতে মহানবী (স) তাঁহার বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ' করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইহার পর আমি আমার পরিবারে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলাম। হাম্না-এর আযাদকৃত দাস নাফি' তাঁহার নিকট হইতে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাবারানী তাঁহার গ্রন্থে ইহা সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫০, ক্রমিক সংখ্যা ৭১৮২ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৬ ; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, ইসতী'আব (উক্ত ইসাবা, ৩খ, ২৩৬, হাশিয়া)।

লিয়াকত আলী

কায়স ইবন সালামা (قيس بن سلمة) ঃ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি জু'ফী গোত্রের লোক ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার এক দুধ ভাই সালামা ইব্ন য়াযীদসহ মহানবী (স)-এর নিকট তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। মারযুবানীর বর্ণনামতে তিনি একজন কবি ছিলেন। মারযুবানী তাঁহার 'মু'জামু'শ-শু'আরা' গ্রন্থে কায়স ইবন সালামা রচিত কতিপয় শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫০, ক্রমিক সংখ্যা ৭১৮৩ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৬-১৭ ; (৩) ইবন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩২৪-৩২৫।

লিয়াকত আলী

কায়স ইবন সালামা (قيس بن سلمة) ঃ (রা) তিনি ও পিতা সালামা ইব্ন য়াযীদ (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫১, নং ৭১৮৪ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৭।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবন সা'সা (قيس بن صعصعة) ঃ (রা) সাহাবী, আনসার-এর খাযরাজ গোত্রের শাখা বানু'ন-নাজ্জার-এর লোক, উহুদ-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। মালিক ইবন সা'সা' (রা) তাঁহার ভাই। সাহীহ বুখারী ও মুসলিম-এ তাঁহার সূত্রে মি'রাজ সম্পর্কে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫১ ; (২) ইবন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২২৩); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা; তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৮।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবন সুরমা (قيس بن صرمة) ঃ (রা) মতান্তরে সুর্মা ইব্ন কায়স, কায়স ইব্ন মালিক আবূ সুরমা অথবা কায়স ইব্ন আনাস আবূ সুর্মা (রা)। ইব্ন হিব্বান-এর মতে কায়স ইব্ন মালিক ও কায়স ইব্ন সুর্মা ভিন্ন দুই ব্যক্তি এবং তাঁহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী। আল-বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) বলেন, "নবী (স)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ইফতারের পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িলে তিনি আর সেই রাত্রে পানাহার করিতেন না এবং এইভাবে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিতেন। কায়স ইব্ন সুর্মা (রা) একদিন এই অবস্থায় নিজের ক্ষেতে কাজ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫১, নং ৭১৮৫ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৭, ২২৫।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবন হুযাফা (قيس بن حذافة) ঃ আল-কুরাশী (রা) সাহাবী, প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন, মা তামীমা বিন্ত হুরছান (تميمة بنت حرثان), কুরায়শ গোত্রের শাখা বানূ সাহম-এর লোক। তিনি ও তাঁহার ভাই 'আবদুল্লাহ (রা) সর্বশেষ আবিসিনিয়া হিজরত করেন এবং তথা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৪ ; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২২০) ; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৫ হি., ৪খ, ২১১ ; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ৪খ, ১৯১।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'ন-নু'মান (قيس بن النعمان) ঃ আল-'আব্দী (রা) সাহাবী, উপনাম আবু'ল-ওয়ালীদ। কাহারও কাহারও মতে কায়স ইবনু'ন-নু'মান আল-'আব্দী ও কায়স ইবনু'ন-নু'মান আস-সাকূনী একই ব্যক্তি এবং কাহারও কাহারও মতে ভিন্ন দুই ব্যক্তি। ইব্ন 'আব্দি'ল-বার্র, 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী ও ইব্ন হাজার (তাকরীব) নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁহাদের ভিন্ন দুই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্রায়নের 'আবদু'ল-কায়স গোত্রের যেই প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন তাঁহাদের মধ্যে কায়স ইবনু'ন-নু'মান আল-'আবদী (রা)-ও ছিলেন। এই বৃহৎ গোত্রের লোকেরা দুইবার তাঁহার দরবারে আসেন বলিয়া জানা যায়। প্রথম দফা ৫ম হিজরী বা ইহারও পূর্বে এবং দ্বিতীয় দফা ৯ম অথবা ১০ম হিজরীতে। প্রথম দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩, মতান্তরে ১৪ জন এবং দ্বিতীয় দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, "'আবদু'ল-কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী (স)-এর নিকট আসিয়া পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কোন কাওমের লোক?" তাঁহারা জবাব দিলেন, "আমরা রাবী'আ গোত্রের প্রতিনিধি দল।" তিনি বলিলেন, "তোমাদেরকে মুবারকবাদ! অনুতাপ ও অপমানে তোমাদিগকে

জর্জরিত হইতে হয় নাই।" তাঁহারা বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল। হারাম মাস (দ্র.) ব্যতীত অন্য কোনও মাসে আমরা আপনার নিকট আসিতে পারি না। কেননা আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থানে এই কাফির মুদার (مضر) গোত্র অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের এমন একটি বিস্তারিত নির্দেশ দিন যাহা আমরা আমাদের পিছনে থাকিয়া যাওয়া লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিব এবং ইহার উপর 'আমল করিয়া আমরা জান্নাত লাভ করিতে পারিব।" বর্ণনাকারী বলেন, তাঁহারা পানীয় (বা পান পাত্র) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের চারিটি কাজ করার নির্দেশ দেন এবং চারটি জিনিস হইতে বিরত থাকিতে বলেন। তিনি তাঁহাদের আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেন এবং বলেন, "তোমারা কি জান এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অর্থ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন।" তিনি বলিলেন, "এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রামাদান মাসে রোযা রাখা। উপরন্তু গানীমাতের সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ বায়তু'ল-মালে জমা দেওয়া।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের মদের চারিটি পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন ঃ হানতাম (حنتم), দুব্বা' (دباء), নাকীর (نقير) ও মুযাফ্ফাত (مزفت)। তিনি আরও বলিলেন ঃ "এই কথাগুলি সংরক্ষণ করিবে এবং তোমাদের পিছনে থাকিয়া যাওয়া লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাতের কিতাবু'ল-ঈমান, প্রথম অধ্যায় হইতে গৃহীত)। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু খেজুর উপঢৌকন দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

আবু'ল-কামূস যায়দ ইবন 'আলী বলেন, 'আবদু'ল-কায়স গোত্রের যেই প্রতিনিধি দল নবী কারীম (স)-এর নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের বলিলেন ঃ তোমরা নাকীর, মুযাফ্ফাত, দুব্বা' ও হান্তাম্ পানপাত্রে পান করিও না, বরং মুখ বন্ধকৃত চামড়ার মশকে পান কর। নাবীয (খেজুরের তৈরী এক প্রকার পানীয়) যদি কড়া হইয়া যায় তাহা হইলে ইহার সহিত আরও পানি মিশাইয়া কড়া ভাব দূর করো। যদি ইহাতেও কড়া ভাব না কমে তাহা হইলে ইহা ফেলিয়া দাও" (আবূ দাঊদ, কিতাবু'ল-আশরিবা, বাবুন ফি'ল-আও'ইয়া)। আবু'ল-কামূস যায়দ ইবন 'আলী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। বসরাবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার হাদীছ গৃহীত হইয়াছে। ইমাম বাগাবীর মতে তিনি বসরায় বসবাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬১-২ ; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, ২খ, ১৩০ ; (৩) ইবন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৩৯-৪১) ; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২২৮ ; (৫) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জার্হ ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১০৪ ; (৬) মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ২খ, ২৭০ ও ২৭২।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'র-রাবী' (قيس بن الربيع) ঃ (রা) একজন সাহাবী, যু'ল-আদ্গান গোত্রে জন্ম। 'আলী ইবন মূসা আর-রিদা (রা)-র পৈতৃক সূত্রে 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত একটি বিবরণে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনা নিম্নরূপ ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স) যু'ল-আদগান গোত্রের দরিদ্রদের জন্য কিছু সাহায্য প্রেরণ করেন। উক্ত গোত্রে কায়স ইবনু'র-রাবী' নামক এক বৃদ্ধ ছিলেন। তাহাকেও কিছু সাহায্য দেওয়া হইল, কিন্তু ইহা পরিমাণে স্বল্প ছিল। ইহাতে বৃদ্ধ চটিয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিন্দাবাদ করে। এই কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। বৃদ্ধ যখন শুনিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহার আচরণে ব্যথা পাইয়াছেন, তখন সে দ্রুত তাঁহার নিকট আসিয়া স্বীয় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই প্রসঙ্গে সে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করে ঃ

حى ذوى الاصغان تسب قلوبهم
تحيتك الحسنى و قذيرقع النغل
وان جنحوا للسلم فاجنح لمتلها
وان كتموا عنك الحديث فلاتسل
فان الذى يؤذيك منه سماعه
وان الذى قالوا ورائك لم نقل

অর্থ ঃ "যু'ল-আদ্গান গোত্রের লোকদিগকে অন্তর আপনার সৌজন্যের নিন্দা করে (?) ; বস্তুত কান ভাঙানোর মধ্যে অতিরঞ্জন থাকে। যদি তাহারা আনুগত্যের হস্ত প্রসারিত করে, তাহা হইলে আপনিও ক্ষমার হস্ত প্রসারণ করুন। আর যদি তাহারা আপনার নিকট কথা গোপন করে, তাহা হইলে আপনি প্রসন্ন হইবেন না। নিশ্চয়ই যাহার সম্পর্কিত সংবাদ আপনাকে আহত করিতেছে, তাহা লোকেরা পিছনে বসিয়া আপনাকে অবগত করিয়াছে বটে, মূলত লোকটি তাহা বলে নাই।"

তাহার ক্ষমা প্রার্থনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অত্যন্ত পসন্দ হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে কায়স, তুমি বলো নাই! হে কায়স, তুমি বলো নাই!" অতঃপর তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "যেই লোক দাড়িপাকা ব্যক্তির অজুহাত কবূল করে না—তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা, কিয়ামতের দিন সে হাওদ-ই কাওছারের নিকট উপনীত হইতে পারিবে না।"

উপরোল্লিখিত কবিতাটি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কেই পাওয়া যায়। জা'ফার ইবন শাযান তাঁহার কিতাবু'ল-জাদ্দ ওয়া'ল-হায্ল (كتاب الجد والهزل) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, দিরার ইবনু'ল-আযূর-এর ভাই 'আমির ইবনু'ল-আযূর যখন রাসূল (স)-এর সমীপে আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলে তিনি উক্ত চরণ কয়টি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বানূ আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের প্রতিনিধি দলের বিবরণে পাওয়া যায় যে, হাদরামী ইবন 'আমির রাসূল (স)-এর সমক্ষে ইহা পাঠ করিয়াছিলেন। আল-মারযুবানীর বর্ণনা মতে কবিতাটি আল-'আলা' ইবনু'ল-হাদরামী (রা)-এর। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে ইহা আবৃত্তি করিলে তিনি মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ কিছু ভাষণ চাক্ষুষ যাদু।

কায়স ইবনু'র-রাবী' (রা) সম্পর্কে উপরিউক্ত ঘটনা ছাড়া এমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা তাঁহার সাহাবী হওয়া প্রমাণিত হয়। ইবন হাজার আল-'আসকালানী তদীয় আল-ইসাবা গ্রন্থে প্রথমভাগে তাঁহার নাম (দ্র.) উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনু'ল-আছীরও তাঁহার নাম সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ এবং বংশ তালিকা জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৬ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২১৩।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়স ইবনু'ল-খাতীম (قيس بن الخطيم) ঃ ইবন 'আদী (রা) হাসসান ইবন ছাবিত (দ্র.)-সহ, য়াছরিব-এর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি। তিনি বানূ জাফার (ইবনু'ল-কালবী-Caskel, Tab. ১৮১) বংশের সদস্য, আওস গোত্রের লোক ছিলেন। খাযরাজ (দ্র.) গোত্রের সহিত সংঘর্ষের ব্যাপারে যুগপৎভাবে তরবারি ও কবিতার মাধ্যমে তিনি আওস গোত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন। বিলম্বে প্রকাশিত এবং সন্দেহপূর্ণ কিছু তথ্য ব্যতীত কায়স-এর জীবনী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তিনি তাঁহার পিতা ও দাদার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তথ্যটি পাওয়া যায় এবং এই মহৎ কর্মের জন্য পরবর্তীদের নিকট তিনি বিস্তর সুখ্যাতি লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তাঁহার কার্যাবলীর বর্ণনা সর্ব প্রকার কল্প-কাহিনী শোভিত হইয়াছিল, যাহা কখনও সাইরাস (Cyrus)-এর লোক-কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং Perzival-এর কাহিনীর সমান্তরাল চিত্রের আকার ধারণ করে (দ্র. Singer, Arab, und. europ poesie in Mittilalter, in Abh. Pr. Ak. Wiss., phil-hist. KI, xiii (1918) p. 7 of the reprint)। তিনি তাঁহার গোত্র আওস-এর রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতায় যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দীওয়ান (কাব্যগ্রন্থ)-এ এই সম্পর্কে আয়্যামু'ল-আওস (ايام الاوس)-এর গুচ্ছ গুচ্ছ অনেক বিবরণে পাওয়া যায়। পূর্বে প্রাপ্ত একটি জখমের ফলে তিনি বু'আছ (দ্র.)-এর চূড়ান্ত যুদ্ধে (পরবর্তীতে রচিত সংগীত যাহার প্রসিদ্ধি ব্যাপক) অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাসূল (স)-এর হিজরতের কিছুদিন পূর্বে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয় এবং বর্ণিত আছে যে, তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেই তাঁহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। কায়স তাঁহার সমকালীন সমস্ত খাযরাজ গোত্রীয় কবিদের, বিশেষত হাস্সান (রা) ইবন ছাবিত ও 'আবদুল্লাহ (রা) ইবন রাওয়াহা (দ্র.)-র সহিত বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। উভয়ই কায়সের মৃত্যুর পর উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইসলাম প্রচারের শুরুতে জীবিত থাকিলেও তাঁহার দীওয়ানে এই সম্পর্কে তাঁহার অবগতির কোনও ইংগিত পাওয়া যায় না। পরবর্তী সূত্রসমূহে মহানবী (স)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বর্ণনাটি মনে হয় প্রক্ষিপ্ত।

Top Kapu saray-তে রক্ষিত তাঁহার কাব্যগ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির তারিখ ৪১৯/১০২৮ ; ইহা হাস্সান (রা) ইব্‌ন ছাবিত-এর কাব্যগ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার কবিতাগুলির আদি পাঠ নির্ধারক ছিলেন ইবনু'স-সিক্কীত— কিন্তু মনে হয় চূড়ান্ত সম্পাদক ছিলেন আস্-সুক্কারী। অদ্যাবধি যাহা টিকিয়া রহিয়াছে তাহা আদি গ্রন্থের একটি খণ্ডাংশবিশেষ এবং তাহা কায়রোতে মিসরের জাতীয়, প্রাক্তন খাদিবীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত। ইহার প্রকাশনা করেন (১) T. Kowalski (Der Diwan des Kais b. al-Hatim, Lipzig ১৯২৪ খৃ.; (২) I. Sammara'i ও A. Matlub (বাগদাদ ১৩৮১/১৯৬২) এবং (৩) নাসিরু'দ-দীন আল-আসাদ (কায়রো ১৩৮১/১৯৬২)। কবি কায়স, আবূ যায়দ আল-কুরাশী কর্তৃক নির্বাচিত। আল-মুযাহ্হাবাত (المذهبات) বা সোনালী কবিতাসমূহ অর্থাৎ السبع المعلقات-এর অন্যতম কবিরূপে গণ্য ; আল-কুরাশী তাঁহার রচিত জামহারা' (১২৩ পৃ.)-তে কায়স ইব্‌ন খাতীম-কে ৪র্থ তাবাকা (স্তর)-এ স্থান দিয়াছেন ; যাঁহারা কায়সকে হাস্‌সান (রা) ইব্‌ন ছাবিত-এর উর্ধে স্থান দান করিবার পক্ষে ইব্‌ন সাল্লাম (طبقات الشعراء, ১৯০) তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। কায়স-এর গাযাল্ (غزل) তত্ত্ব (حكم)-মূলক কবিতায় যশগাথা (فخر) মূলক এবং জীবনের দুইটি দিক, তথা স্থায়ী বসতি ও যাযাবর জীবন উভয়ই প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহা ছিল তাঁহার সময়ে মরূদ্যানবাসী আরবদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার যুদ্ধ বিবরণ ও নারী অবয়বের চিত্র সুপ্রসিদ্ধ। বেদুঈন জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সাওয়ারী উষ্ট্রের বিবরণ, মরুভূমিতে উষ্ট্র চালনা ও শিকারের বর্ণনা তাঁহার কবিতায় অনুপস্থিত প্রায়। বলা যায় যে, পরবর্তী বংশধরদের বিবেচনায় কায়সের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকিলে তাহা তাঁহার কাব্য প্রতিভা তাঁহার বীরধর্ম (Chivalry)-এর জন্য। যাহা হউক, প্রাক-ইসলামী যুগে য়াছরিব-এর অবস্থা, কতগুলি বিশেষ প্রথা—বিশেষত শোনিত-পণ প্রথা সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য তাঁহার কবিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দীওয়ানের বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকায় বিভিন্ন উৎসের বর্ণনা রহিয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন ঃ (১) আবূ তাম্মাম, হামাসা, নির্ঘণ্ট ; (২) বুহ্তুরী, হামাসা, নির্ঘণ্ট; (৩) মারযুবানী, মু'জাম, ৩২১ ; হাস্সান, দীওয়ান, সম্পা. বার্কূকী, ১২১-৩ (তু. W. N. 'আরাফাত সংস্করণ, লণ্ডন ১৯৭১ খৃ., নির্ঘণ্ট); (৪) আগানী, বৈরূত সং., ৩খ., ৩-২৬ ; (৫) ইবন শুহায়দ, 'যাওয়াবী', সম্পা. K. বুস্তানী, ১২৮-৩১; (৬) ইসাবা, নং ৭৩৪৮ ; (৭) সামহূদী, ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা' বি-আখবারি'ল-মুসতাফা, কায়রো ১৩৭৪ হি. ; (৮) বাগদাদী, খিযানা, সম্পা. বূলাক, ৩খ., ১৬৮ ; (৯) আব্‌কারীউস, ২৫১-৩ ; (১০) Noldeke, in ZA xxiv, 205-16; (১১) Resher Abriss, i, 70-1; (১২) R. Blachire, Hist. de-la litt arabe, 310-11; (১৩) Brockelmann, S I. 56 ; (১৪) এফ. এফ. বুসতানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৩খ., ২০-২।

T. Kowalski (E. I.[2])/মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন খান

কায়স ইবনু'ল-খাশখাশ (قيس بن الخشخاش) ঃ (রা) সাহাবী। নিজ পিতা ও ভাই 'আবদুল্লাহ (মতান্তরে 'উবায়দুল্লাহ)-র সঙ্গে স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে নবী কারীম (স)-এর দরবারে আসেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের নিরাপত্তার লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজদের এলাকায় ফিরিয়া যান। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৪ ; (২) ইবন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ২৩৭) ; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহ্‌রান ১৩৭৫ হি., ৪খ, ২১২।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'ল-জারীর (قيس بن الجرير) ঃ আল-আনসারী (রা) আনসার সাহাবী, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং য়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি আবূ 'উবায়দ-এর ভাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৪।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইব্‌নু'ল-মাকশূহ (قيس بن المكشوح) ঃ আল-মুরাদী (রা) একজন সাহাবী। তাঁহার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার নাম হুবায়রা ইব্‌ন হিলাল (هبيرة بن هلال) আবার কাহারও মতে 'আবদ য়াগূছ ইব্‌ন হুবায়রা ইবন হিলাল (عبد يغوث بن هبيرة بن هلال)। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর তাঁহার সাহাবী হওয়া সম্পর্কে মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন ; তবে তাঁহার মতে কায়স ইবনু'ল-মাকশূহ সাহাবী ছিলেন ; এই কথাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছেন। তাঁহার কোন রিওয়ায়াত আছে বলিয়া জানা যায় না। যাঁহারা তাঁহার সাহাবী হওয়ার কথা স্বীকার করেন না তাঁহারা বলেন যে, তিনি (কায়স) আবূ বাকর (রা)-এর আমলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ বলেন, 'উমার (রা)-এর যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন [দ্র. আল-ইসতী'আব, হায়দরাবাদ, ১৩১৯ হি., ২খ, পৃ. ৫৪৪]।

"কায়স ইবনু'ল-মাক্‌শূহ য়ামান-এর ভণ্ড নবী আল-আসওয়াদ আল-'আনাসী-র হত্যাকারীদের একজন।" ইবন 'আবদি'ল-বার্‌র এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, "তিনি যে আসওয়াদ আল-'আনাসী-এর হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিলেন ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন" [দ্র. পূ. গ্র, পৃ. ৫৪৪]। কথিত আছে যে, আসওয়াদ আল-'আনাসীর হত্যার পর আল-'আনাসীর গোত্রের ভয়ে কায়স এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার সঙ্গী দাযাওয়াহ-এর উপরে চাপাইয়া দেন এবং আল-'আনাসীর গোত্রকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দাযাওয়াহকেও হত্যা করেন। আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিতে মুহাজির ইবন আবী উমায়্যা-কে প্রেরণ করেন। কায়স বন্দী হইয়া মদীনায় আসিলে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই হত্যার কথা অস্বীকার করেন। পরে আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। নু'মান ইবন মুকাররিন-এর সহিত তিনি (কায়স) 'নিহাওয়ান্দ' বিজয়ে শরীক হন। 'উমার (রা) ও 'উছমান (রা)-র খিলাফাত কালে 'কাদিসিয়া' বিজয়সহ বিভিন্ন অভিযানে তাঁহার সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে। অতঃপর হযরত 'আলী (রা)-র আমলে তিনি তাঁহার পক্ষ হইয়া সিফফীন-এ যুদ্ধ করেন।

আশ'আছ ইবন কায়স ইবন মা'দীকারাব-এর ভগ্নি কুতায়লা-কে কায়স বিবাহ করিয়াছিলেন। [দ্র. ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৮খ, পৃ., ১৪৭ বৈরূত, তা. বি.]। কায়স একজন সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা ও কবি ছিলেন; তিনি বিখ্যাত আমর ইবন মা'দীকারাব-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, পৃ. ২৬০ ; (২) ইবন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, হায়দরাবাদ ১৩১৯ হি., ২খ, পৃ. ৫৪৪, সংখ্যা ২২৭৩ ; (৩) ইবন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ৫খ, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫ ও ৮খ, পৃ. ১৪৭।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজলী

কায়স ইবনু'ল-মুনতাফিক (قيس بن المنتفق) ঃ (রা) একজন সাহাবী। ইবন হাজার আল-'আসকালানী তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'আল-ইসাবা কিতাবে তিনি হাসান ইবন সুফয়ান-এর একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কায়স ইবনু'ল-মুনতাফিক সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছে। আবূ মূসা তাঁহার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইবন হাজার আল'আসকালানী বলেন যে, তাঁহার অন্য কোনও নাম নাই। এই অভিমতই প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, পৃ. ২৬০ সংখ্যা ৭২৪১।

মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান ফজলী

কায়স ইবনু'ল-হায়ছাম (قيس بن الهيثم) ঃ (রা), 'আবদু'ল-কাহির ইবনু'স-সারী (কিতাবু'ল-জারহি, ৬খ, ৫৭ ; মীযানু'ল-ই'তিদাল, ২খ, ৬৪২)-এর পিতামহ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন কিনা ইহাতে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারী ও ইবন আবী হাতিম তাঁহাকে সাহাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন মান্দা বলেন, ইমাম বুখারী তাঁহাকে একটি হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই। আবূ আহমাদ আল-'আস্‌সাল (العسال) তাঁহাকে তাবি'ঈ হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা) ও তাঁহার পুত্র য়াযীদের কর্মচারী ছিলেন। য়াযীদ ইবন মু'আবিয়া ইনতিকাল করিলে অপর রাজকর্মচারী দাহ্‌হাক ইবন কায়স (রা) তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ধোঁয়ার টুকরার ন্যায় ফিতনা-ফাসাদ ঘটিতে থাকিবে। তখন মানুষের অন্তর মরিয়া যাইবে— যেমন তাহার দেহ মরিয়া যায়। প্রভাতে মু'মিন থাকিলে সন্ধ্যায় কাফির হইয়া যাইবে। আর সন্ধ্যায় মু'মিন থাকিলে প্রভাতে কাফির হইয়া যাইবে। লোকেরা তাহাদের চরিত্র ও দীনকে পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দিবে। এখন য়াযীদ ইনতিকাল করিয়াছে ; তোমরা আমাদের ভাই এবং আমাদের আপন ; অতএব আমরা নির্বাচিত করার পূর্বেই তোমরা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করিও না।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬২ ; (২) ইবন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, (ইসাবার হাশিয়া. ৩খ, ২৩৮) ; (৩) ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৭খ, ৪১০ ; (৪) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১০৫।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'ল-হারিছ (قيس بن الحارث) ঃ আল-আসাদী (রা) সাহাবী; ইমাম বুখারীর মতে তাঁহার নাম আল-হারিছ ইবন কায়স (রা)। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার আটজন স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইহাদের মধ্যে যে কোনও চারজনকে রাখিয়া অবশিষ্ট চারজনকে তালাক দিতে বলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৩ ; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, ২খ, ১২৭ ; (৩) ইবন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৩৮) ; (৪) ইবনুল-'আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৫ হি., ৪খ, ২১০ ; (৫) ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, ৬খ, ৬০।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'ল-হারিছ (قيس بن الحارث) ঃ ইবন 'আদী আল-আনসারী (রা), আনসার সাহাবী ও বারা' ইব্‌ন 'আমির (রা)-এর চাচা।

আবূ 'উমারের মতে তিনি য়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু ইব্ন শাহীন নিজস্ব সনদপরম্পরায় বলিয়াছেন যে, তিনি য়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন এইরূপ কথা আবূ 'উমার বলেন নাই। ওয়াকিদীর মতে তাঁহার নাম কায়স ইব্ন মুহরিছ (قيس بن محرث) এবং তিনিই উহুদ যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ হন। মুশরিকরা একদল আনসার সাহাবীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। কায়স ইব্ন মুহরিছ (রা) মুশরিক বাহিনীর উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের হত্যা করেন। তাহারা সুসংগঠিতভাবে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তরবারির আঘাতে তাঁহাকে শহীদ করে। তাঁহার দেহে চৌদ্দটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিলেন। আর কায়স ইবনু'ল-হারিছ (রা) য়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৩, ২৫৯ ; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২২২-৩); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৫ হি., ৪খ, ২১০।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'ল-হারিছ (قيس بن الحارث) ঃ ইব্ন য়াযীদ ইব্ন শিবল হায়্যান সাহাবী, বানূ তামীম গোত্রের লোক। হি. ৯ম সনে বানূ তামীম গোত্রের নেতৃপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (স)-র নিকট আগমন করেন। তিনি উক্ত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বসরা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। যাহাবী ও ইবনু'ল-আছীর-এর বর্ণনামতে সাহাবীদের জীবনী সংকলকদের মধ্যে এমমাত্র হাফিজ আবূ মূসা তাঁহার গ্রন্থে কায়স (রা)-এর জীবনচরিত অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক বানূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত তাঁহার কোনও হাদীছ-এর সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য ইমাম বাগাবী এই নামের বানূ তামীম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাহাবীদের দলভুক্ত করিয়াছেন এবং মহানবী (স) হইতে বর্ণিত তাঁহার একটি হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন হাজার আল-'আসকালানীর মতে তিনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনি সাহাবী নহেন, তাবি'ঈ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৩ ; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি. ১খ, ২৯৪, ২খ, ১৬১, ৭খ, ৬২ ; (৩) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি. ২খ, ১৮, ক্রমিক সংখ্যা ১৯৩ ; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা তেহরান ১৩৭৭ হি. ৪খ, ২১০ ; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ., ৫খ, ৪৫ ; (৬) ঐ লেখক, শামা'ইলু'র-রাসূল, বৈরূত তা. বি. ৪খ, ৭৯ ; (৭) 'আবদু'স-সালাম হারূন, তাহযীব সীরাতি ইবনি হিশাম, বৈরূত তা. বি. ৩৪২ ; (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৬ খৃ., ৩খ, ১৫৩ ; (৯) আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, বৈরুত ১২৭৬ হি., ২৬খ, ১৪১।

লিয়াকত আলী

কায়স ইবনু'ল-হারিছ (قيس بن الحارث) ঃ আল-গাদানী (রা) সাহাবী, জিহাদ সম্পর্কিত অধ্যায়ে তাঁহার সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছ আছে। তিনি বানূ তামীম গোত্রের কায়স ইবনু'ল-হারিছ ইবন য়াযীদ বলিয়াও অনুমিত। কেননা বানূ গাদানা বানূ তামীম-এর শাখা গোত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৩।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'ল-হুসায়ন (قيس بن الحصين) ঃ আল-মাযিনী (রা) সাহাবী, বানূ হারিছ গোত্রের লোক, বংশীয় উপাধি আল-মাযিনী (المازني)। হারিছ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিবার পর খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে এই গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসে। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ ছিলেন কায়স ইবনু'ল-হুসায়ন, য়াযীদ ইবন 'আবদি'ল-মাদান, শাদ্দাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন কারাদ, য়াযীদ ইবনু'ল-মুহাজ্জাল ও 'আমর ইবন 'আবদিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বানূ হারিছ গোত্রের আমীর নিয়োগ করেন এবং এই মর্মে একটি সনদপত্র লিখাইয়া দেন। অতঃপর তিনি নিজ গোত্রের লোকদের লইয়া নিজদের এলাকা য়ামানের নাজারানে ফিরিয়া যান। ইহার চার মাস পরেই রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা হুসায়ন ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁহারা চার ভাই ছিলেন এবং দক্ষ অশ্বারোহী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মতান্তরে তাঁহার নাম হুসায়ন ইবন য়াযীদ (حصين بن يزيد) বলিয়াও কথিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৪-৫ ; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৩৮-৯) ; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৫ হি., ৪খ, ২১১-২ ; (৪) ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা. বি. ৫খ. ৫২৮।।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স ইবনু'স-সা'ইব (قيس بن السائب) ঃ আল-কুরাশী আল-মাখযূমী (রা) জনৈক কুরায়শী সাহাবী। বানূ মাখযূম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ কায়স ইবনু'স-সা'ইব ইব্ন 'উয়ায়মির ইব্ন 'আ'ইয ইব্ন 'ইমরান ইবন মাখযূম। তাঁহার মাতার নাম (ইব্ন হিব্বানের বর্ণনা অনুসারে) রায়িতা (رايطة)। তিনি ওয়াহ্ব ইবন 'আম্র ইব্ন 'আ'ইয ইব্ন 'ইমরান আল-মাখযূমীর কন্যা। কিন্তু ইব্ন সা'দের মতে তাঁহার জননী বানূ খুযা'আ গোত্রীয়া ছিলেন। নাম হুস্সানা (حسانة)। কায়স ইবনু'স-সা'ইব (রা) মক্কায় বাস করিতেন। সুবিখ্যাত তাবিঈ মুজাহিদ ইবন জাব্র (মুফাস্সির, মুহাদ্দিছ ও ফকীহ) তাঁহার আযাদকৃত দাস। আল-মা'বাদ ইবনু'ন-নু'মান নামক জনৈক শী'ঈ লেখক বর্ণনা করেন যে, উম্মু হানি বিন্ত 'আবদি'ল-মুত্তালিব যেই দুইজন লোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন কায়স ইবনু'স-সা'ইব। জাহিলী যুগে কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশীদারী চুক্তিতে ব্যবসা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন একজন উত্তম অংশীদার। তিনি বিবাদ করিতেন না। ধোকা দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশীদার কে ছিলেন, তাহা বর্ণনায় মুজাহিদের শাগরিদবৃন্দের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল-বাগাবী, আল-হামান ইবন সুফয়ান প্রমুখ মুজাহিদের শাগরিদ ইবরাহীম ইবন মায়সারা-র সূত্রে কায়স ইবনু'স-সা'ইব (রা)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই সূত্রে আবূ বিশর আদ-দাওলাবী যেই রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন, তাহাতে কায়সের স্থলে আবূ কায়স ইবনু'স-সা'ইব নাম বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে কায়স ইবনু'স-সা'ইবই ছিলেন প্রকৃত অংশীদার।

মুজাহিদের আর এক শাগরিদ আল-আ'মাশ (الأعمش) 'আবদুল্লাহ ইবনু'স-সা'ইবের নাম উল্লেখ করেন। তাহার অপর দুই শাগরিদ ইবরাহীম ইবন মুহাজির ও সুলায়মান যথাক্রমে আস-সা'ইব ও আস-সা'ইব ইবন আবি'স-সা'ইবের নাম বর্ণনা করেন। ইবন আবী হাতিম তাঁহার কিতাবু'ল-'ইলালে উল্লিখিত ইখতিলাফ তাঁহার পিতা আবূ হাতিমের সূত্রে উল্লেখ করেন। তিনি পিতার নিকট ইহার সমাধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ আমার ধারণা কায়স ও 'আবদুল্লাহ দুই সহোদর। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় 'আবদুল্লাহ অল্পবয়স্ক ছিল। বস্তুত আস-সা'ইবের পুত্রই (কায়স) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। কায়স ইবনু'স-সা'ইব (রা) তাঁহার প্রাক-ইসলামী একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমার পিতামাতা একটি দুধেভরা পাত্র লইয়া তাহাদের উপাস্যদিগের (মূর্তি) নিকট যাইতে বলিতেন। আমি দেখিতাম যে, কুকুর আসিয়া সবটুকু দুধ ও মাখন উদরস্থ করিয়া লইত। অতঃপর উহাদিগের গায়ে মূত্রত্যাগ করিয়া বিদায় হইত।' সালাতের সময় সম্পর্কে কায়স ইবনু'স-সা'ইব (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। তাহা মুজাহিদ তাঁহার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ফজ্‌রের সালাত আদায় করিতেন যখন আকাশ আলোকোজ্জ্বল হইত এবং যখন সূর্য অস্তাচলগামী হইত তখন সালাতু'জ-জুহ্‌র আদায় করিতেন। উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী মুজাহিদের ছাত্র মুসলিম আল-আ'ওয়ার একজন দুর্বল রাবী। কায়স (রা) অতিশয় দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এক শত ষাট বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তিনি সাওম পালনে সক্ষম ছিলেন না। পরিবর্তে তিনি ফিদয়া ঃ (فدية) আদায় করিতেন। মুজাহিদ বলেন ঃ নিম্নের আয়াতটি আমার মাওলা (মনিব) কায়স ইবনু'স-সা'ইব সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –

"আর যাহারা সাওম পালনের ক্ষমতা রাখে না, তাহাদের প্রতিটি সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনের আহার পরিমাণ ফিদয়া আদায় করিতে হইবে।" মুজাহিদ বলেন ঃ আমি কায়স ইবনু'স-সা'ইবকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই রামাদান মাসে (সাওম পালনে অক্ষম) মানুষ ফিদয়া প্রদান করে। প্রতিদিন একজন মিসকীনকে আহার করায়। সুতরাং তোমরা আমার পক্ষ হইতে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে এক সা' (صاع) পরিমাণ খাদ্য দান কর।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪৮ ; (২) ইবন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৩৪১ ; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৫খ, ৪৪৬ ; (৪) ইবনু'ল-আছীর, আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি. ৪খ, ২১৪ ; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২০; (৬) ইবন 'আবদি'ল-বার্‌র আল-ইসতী'আব (দ্র. টীকা আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, ২২১)।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কায়স ইবনু'স-সাকান (قيس بن السكن) ঃ আল-আনসারী (রা) একজন সাহাবী। তাঁহার উপনাম ছিল আবূ যায়দ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের শাখা বানু'ন-নাজ্জার-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণিক সূত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় না। তাঁহার বংশ তালিকা হইল ঃ কায়স ইবনু'স-সাকান ইবন কায়স ইবন যা'উরা' ইবন হারাম ইবন জুনদুব ইবন 'আমির ইবন গানাম ইবন 'আদিয়্যি ইবনি'ন-নাজ্জার।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যে কয়জন সাহাবীর নিকট সম্পূর্ণ কুরআন সংরক্ষিত ছিল হযরত কায়স ইবনু'স-সাকান (রা) ছিলেন তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি বদর, উহুদ ও খনদকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে নভেম্বর, ৬৩৪ খৃ. আবূ 'উবায়দা (রা)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত জিস্‌র অর্থাৎ সেতুর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যায়দ ও ইস্‌হাক নামে তাঁহার দুই পুত্র এবং খাওলা নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের মাতার নাম ছিল উম্ম খাওলা বিনত সুফয়ান ইবন কায়স।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫১৩; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৫০ নং ৭১৮১ (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি. ৪খ, ২১৬ ; (৪) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ৩খ, ১২১৩, নং ২১৩৫ ; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২০ নং ২১৭ ; (৬) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩২৩; (৭) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, মিসর তা, বি., ২খ, ২৬১; (৮) ইদরীস কানধালাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, লাহোর তা. বি., ১খ, ৬১৬।

আবদুল জলীল

কায়স আল-খুযা'ঈ (قيس الخزاعى) ঃ বানূ খুযা'আ মতান্তরে বানূ আসলাম গোত্রের লোক। বুরায়দা ইবনু'ল-খাসীব আল-আসলামী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে কায়স নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন ঃ সে কোথাও যাইয়া স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারিবে না। আসলে সে কোথাও যাইয়া সেখানে স্থায়ীভাবে থাকিত না।" ইবন হাজার বলেন, এই বর্ণনার মাধ্যমে তিনি মুসলমান ছিলেন বলিয়া নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৩-৪।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স আল-জুযামী (قيس الجذامى) ঃ (রা), পিতার নাম 'আমির, মতান্তরে য়াযীদ, ভিন্নমতে যায়দ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী কিনা তাহাতে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারীর মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি নিজস্ব সনদপরম্পরায় কায়স-এর সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কায়স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্‌র নিকট শহীদ ব্যক্তির ছয়টি মর্যাদা রহিয়াছে। তাহার দেহের রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, জান্নাতে তাহার জন্য নির্দিষ্ট স্থান তাহাকে দেখানো হয়, কবরের 'আযাব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, কিয়ামতের কঠিন ভীতি হইতে নিরাপদে রাখা হইবে, ঈমানের পোশাক পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের হুরদের তাহার সঙ্গিনী করা হইবে।" আবদু'র-রাহমান আর-রাযীর মতে তিনি সাহাবী নহেন এবং তিনি 'উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) ও নু'আয়ম ইব্‌ন হাম্মার আল-গাতাফানীর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর দিকে কাছীর ইব্‌ন সুররা, আল-হাসান ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান ও 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন 'আ'ইয তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, তাঁহার হাদীছ মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমীর মু'আবিয়া (রা)ও তাঁহার পুত্র য়াযীদের রাজত্বের প্রসিদ্ধ আমীর নাতিল (نائل) তাঁহার পুত্র। ইমাম আহ্মাদ ও নাসা'ঈও নিজ নিজ সনদসূত্রে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ' সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৩; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, ২খ, ১৩০, ২৯৪; (৩) ইব্ন 'আব্দি'ল-বার্, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৩৬); (৪) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২১০; (৫) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারাহি ওয়াত-তা'দীল, ৭খ, ১০৫; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ৭খ, ৪২৬-৭।

মুহাম্মদ মূসা

কায়স আত-তামীমী (قيس التميمي) ঃ (রা), ইমাম বাগাবী তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিজস্ব সনদ- পরম্পরায় তাঁহার সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কায়স (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিধানে একটি হলুদ রংয়ের কাপড় দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে বাঁ হাতের ইশারায় সালাম দিতেও দেখিয়াছি।" অপর একটি বর্ণনায় আছে, কায়স (রা) বলেন, "জারীর আমাকে প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৩; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বাব্র, আল-ইস্তী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৪১-২); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২১০; (৪) 'আব্দু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১০৫।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান (كيسان) ঃ (রা) বানূ মাযিন ইব্নি'ন-নাজ্জার গোত্রের আযাদকৃত দাস। ইব্ন ইসহাকের মতে তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আবূ 'উমারের মতে কায়সান আল-আনসারী 'আদী ইবনু'ন-নাজ্জার গোত্রের আযাদকৃত দাস এবং উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁহারা একই নামের ভিন্ন ব্যক্তিও হইতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১ম সং, মিসর ১৩২৮হি. ৩খ, ৩১০; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্ব আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩০৮)।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান (كيسان) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস, মতান্তরে তাঁহার নাম যাক্ওয়ান (ذكوان), মিহরান (مهران), তাহ্মান (طهمان), হুরমুয (هرمز) ইত্যাদি এবং উপনাম আবূ কায়সান (ابو كيسان), 'আতা' ইবনু'স-সা'ইব বলেন ঃ আমার পিতা বানূ হাশিম-এর জন্য কিছু জিনিসের ওয়াসিয়াত করিলেন। আমি তাহা লইয়া আবূ জাফার-এর নিকট আসিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর কোন এক কন্যা সন্তানের (উম্ম কুলছূম) পরিচয় করাইয়া দিব না ? অতএব আমরা তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি বলিলেন ঃ যাক্ওয়ান অথবা তাহমান নামে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক আযাদকৃত দাস আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, "হে যাকওয়ান! সাদাকা (যাকাতের সম্পদ) আমার ও আমার পরিবারের লোকদের জন্য হালাল নহে। আর কোন কাওমের আযাদকৃত দাস তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত" (আবূ নু'আয়ম, আবূ মূসা, আবূ 'উমার)। ইবন হিব্বান তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৪৮৩, ৩খ, ৩০৯; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ১খ, ৪৮৩, ৩খ, ৩০৯); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ২খ, ১৩৭, ৩খ, ৬৮-৯, ৪খ, ২৫৭; (৪) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি' ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১৬৫।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান (كيسان) ঃ (রা) 'আত্তাব ইব্ন উসায়দ আল-উমাবীর আযাদকৃত দাস। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন 'আত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ নু'আয়ম বলেন, 'আত্তাব (রা)-এর মুক্ত দাস হওয়াটা তাঁহার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী হিসাবে গণ্য হওয়ার পক্ষে দলীল হইতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনেক সাহাবীর মুক্ত দাসগণ তাঁহারা সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা সাহাবী হিসাবে গণ্যও হন নাই। ইব্ন হাজার বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) 'আত্তাব (রা)-কে মক্কার প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং এই সময় তিনি একখানা পরিধেয় বস্ত্র লাভ করেন। ইহা তিনি তাঁহার মুক্ত দাস কায়সান (রা)-কে পরিতে দেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কায়সান (রা) তখন মক্কায় বর্তমান ছিলেন। ইহার পরে রাসূলুল্লাহ্ (স) হাজ্জ (বিদায় হাজ্জ) করেন এবং সকলে তাঁহার সঙ্গে হাজ্জ আদায় করেন। কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মুক্ত দাসগণও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দর্শন লাভ করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কায়সান (রা) নবী কারীম (স)-এর সাহাবী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৯, ২খ, ৪৫১; (২) ইবনু'ল আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৫৯।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান (كيسان) ঃ আবূ 'আম্রা, বাজীয়া গোত্রের বানূ 'উরায়নার একজন মাওলা (দ্র.)। তিনি আল-মুখ্তার ইব্ন 'উবায়দ আছ-ছাকাফী (দ্র.)-র বিদ্রোহের সময় কূফার বিখ্যাত মাওয়ালী সম্প্রদায়ের জনৈকা সদস্য ছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে অল্পই জানা যায়। তাঁহার জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হইল এই যে, আল-মুখ্তারের বিদ্রোহের পূর্বে তাঁহাকে শী'আদের প্রতি একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে। কায়সান শী'আদের প্রসিদ্ধ লোকদের অন্যতম এবং আল-মুখ্তারের অনুসারীদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁহাকে ইব্রাহীম ইব্নু'ল-আশ্তারের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল যেন আল-মুখ্তারের পক্ষে তাঁহার সমর্থন অর্জন করা যায়। যখন আল-মুখ্তার কূফা দখল করেন, তখন তিনি কায়সানকে তাঁহার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নেতা (على حرسه) নিযুক্ত করেন। ইহা এইজন্যই সম্ভব হইয়াছিল যে, তিনি অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাহাকে অত্যধিক বিশ্বাস করিতেন এবং কায়সান তাঁহার (আল-মুখ্তারের) মাওয়ালী সমর্থকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মাওয়ালী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার উচ্চপদে অবস্থান মূলত ইহা হইতে বোঝা যায় যে, যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, আল-মুখ্তার 'আশ্রাফ'-এর সহিত গোপনে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহারা তাহাদের নেতা কায়সানকে তাহাদের অসন্তোষের কথা অবহিত করিল।

মুখ্তারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে কায়সান ঐ সকল আশ্রাফ যাহারা ইমাম হুসায়ন (রা)-এর হত্যার জন্য দায়ী ছিল তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাহাদের মধ্যে 'উমার ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আবী ওয়াক্কাস ও শামির ইব্ন যি'ল-জাওশান অন্যতম। এই ব্যাপারে তাঁহার কার্যাবলী কূফা নগরীর জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ প্রবাদে পরিণত হয়। যেই লোক তাহার সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই ক্ষেত্রে প্রবাদটি প্রযোজ্য হয়। প্রবাদটি ছিল "আবূ 'আম্রা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে" (زاره أبو عمرة) অথবা "আবূ 'আম্রা তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে" (دخل أبو عمرة بيته)। তাহাকে "ইব্লীস অপেক্ষা বেশী দুষ্ট" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক ফল বলিয়া মনে হয়, যাহার কাছে আমরা তথ্যের জন্য ঋণী। এই ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল কূফায়, বিশেষ করিয়া আশ্রাফ-এর সামাজিক পরিবেশে, অতএব ইহা ছিল মাওয়ালীবিরোধী। ঐতিহাসিক ইব্ন হায্ম ও নাশ্ওয়ান আল-হিম্য়ারীর মতে কায়সানিয়া আল-মুখ্তারের ও আবূ 'আমরার অনুসারী ছিলেন। মাযার-এর যুদ্ধে (৬৭/৬৮৬ সালের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে) আল-মুখ্তারের সেনাবাহিনী কায়সান কর্তৃক পরিচালিত হয়। সম্ভবত তিনি এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১০৭; (২) কিতাবু'ল-ইমামা ওয়া'স-সিয়ামা (ইব্ন কুতায়বা প্রণীত বলিয়া কথিত), কায়রো ১৯২৫ খৃ., ২খ, ১৯, ২৪; (৩) বালাযুরী, আন্সাবু'ল-আশ্রাফ, জেরুসালেম ১৯৩৬ খৃ., ৫খ, ২২৮, ২২৯, ২৩৭, ২৩৮, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪; (৪) আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত-তিওয়াল, পৃ. ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮ ৩০০, ৩০৭, ৩০৮; (৫) তাবারী, ২খ, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৬১, ৬৬৩, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭৩, ৬৭৪, ৭২০, ৭২২, ৯৭১-৭৩; (৬) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, ৫খ, ১৮০, ২২৬; (৭) আত-তাওহীদী, আল-ইম্তা' ওয়া'ল-মু'আনাসা, ২খ, কায়রো ১৯৩৩-৪৫ খৃ. পৃ. ৫৩; (৮) আল-কাশ্শী, মা'রিফাত আখবারি'র-রিজাল, কার্বালা' ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১১৭; (৯) ইব্ন হাযম, আল-ফিসাল, ৪খ, কায়রো ১৯১৭-২০ খৃ., ৯৪; (১০) নাশ্ওয়ান আল-হিম্য়ারী রিসালাতু'ল-হূরি'ল-'ঈন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ১৮২; (১১) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৪খ, ১৮৬-৮৭, ১৯৯-২০০, ২২০-২১, ২২৭, ২৩৬, ২৪১; (১২) আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-আরাব, পাণ্ডু. আয়াসোফিয়া, নং ৩৫২২, ৯খ, পত্রক ১৭-২৪; (১৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৮খ, ২৬৮, ২৭০, ২৮৭-২৮৮; (১৪) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ১খ, ৭৫; (১৫) Friendlaender. The heterodoxies of the Shi'ites in the presentation of Ibn Hazm. JAOS-এ, ২৯খ. (১৯০৮ খৃ.), ৩৮; (১৬) A. A. Dixon, The Umayyad Caliphate 65-86/684-705. A Political Study. ১৯৭১ খৃ., নির্ঘণ্ট।

A. A. Dixon (E.I.[2])/ মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান

কায়সান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (كيسان بن عبد الله) ঃ (রা) ইব্ন তারিক, ইবনু'স-সাকানের মতে তা'ইফের অধিবাসী। ইব্ন মান্দার মতে কায়সান ইব্ন তারিখ ও কায়সান ইব্ন জারীর একই ব্যক্তি এবং 'আবদু'র-রাহমান ও নাফি'-র পিতা। আবূ নু'আয়মের মতে, 'আবদুর-রাহমানের পিতা কায়সান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (كيسان بن عبد الله) এবং নাফি'-র পিতা কায়সান ইব্ন জারীর (كيسان بن جرير) ভিন্ন দুই ব্যক্তি। আবূ 'উমার আল-হাকিমের মতে কায়সান আবূ 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্ন কায়সান (রা) খালিদ ইব্ন উসায়দ (রা)-এর মুক্ত দাস বলিয়া কথিত আছে। তিনি মক্কা ও মদীনায় বসবাস করিতেন এবং তাঁহার পুত্র 'আবদু'র-রাহমান তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এক কাপড়ে সালাত পড়া সম্পর্কিত হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে কায়সান ইব্ন 'আবদিলস্নাহ্ ইব্ন তারিক (রা) হইতেছেন নাফি'-র পিতা। পুত্র নাফি' তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) [তাঁহার আত-তা'রীখ গ্রন্থে], ইব্ন আবী হাতিম বাগাবীও তাঁহাদিগকে ভিন্ন দুই ব্যক্তি বলিয়াছেন। তাঁহাদের একজন মদীনায় এবং অপর জন দামিশকে বসবাস করিতেন।

নাফি' ইব্ন কায়সান (রা) বলেন "তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে মদের ব্যবসা করিতেন। তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে মশক ভর্তি মদ লইয়া মদীনায় আসিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উৎকৃষ্ট মদ লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ হে কায়সান! মদ এবং ইহার ব্যবসা ইতমধ্যেই হারাম করা হইয়াছে।" অতঃপর কায়সান (রা) মদভর্তি মশকগুলির নিকট গিয়া উহাদিগকে উপুড় করিয়া সবটুকু মদ ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন।

নাফি' ইব্ন কায়সান (রা) হইতে তাঁহার পিতার সূত্রে আরও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "ঈসা ইব্ন মারয়াম ('আ) দামিশকের পূর্ব অংশে সাদা মীনারের সন্নিকটে (আসমান হইতে) নামিয়া আসিবেন" (বুখারী, ইবনু'স-সাকান, তাবারানী, ইব্ন মান্দা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৯; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩০৮-৯); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৫৭-৯; (৪) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি ওয়াত-তা'দীল, ৭খ, ১৬৫, ক্রমিক নং ৯৩৩, ৯৩৫, ৯৩৬।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান ইব্ন জারীর (كيسان بن جرير) ঃ (রা), খালিদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন উসায়দ আল-উমাবীর আযাদকৃত দাস, মতান্তরে তাঁহার পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্, ভিন্নমতে বিশ্র, হিজাযের অধিবাসী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একটি মাত্র হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার দুই পত্র 'আবদু'র-রাহমান ও নাফি' তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ইব্ন মুতী'র কূপ (بئر ابن مطيع)-এর নিকট একটি মাত্র কাপড় পরিয়া জুহ্র অথবা 'আস্র-এর সালাত দুই রাক্'আত পড়িতে দেখিয়াছি" (ইব্ন মাজা, আহমাদ বাগাবী)। ইব্ন শাহীনের ধারণামতে তিনি বানূ মাযিন ইবনু'ন-নাজ্জার গোত্রের মুক্ত দাস। ইমাম বুখারী, বাগাবী, তাবারানী, আবূ নু'আয়ম, ইব্ন 'আসাকির প্রমুখের মতে কায়সান ইব্ন জারীর ও কায়সান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন তারিক (দ্র.) ভিন্ন দুই ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি. ৩খ, ৩০৮-৯; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত

তা. বি, ২খ, ১৩৭; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৫৭-৯।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান আল-কুরায়শী (كيسان القرشي) ঃ (রা), আবু'ল-হাসান ইব্ন সামী' ও আবদু'স-সামাদ ইব্ন সাঈ'দের মতে নবী কারীম (স)-এর যেসব সাহাবী হিম্‌স (حمص) গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ যুর'আ আদ-দিমাশকী তাবাকাতু'স-সাহাবা (طبقة الصحابة) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, কায়সান (রা) কুরায়শ বংশের লোক এবং সিরিয়ার রাবীদের নিকট তাঁহার বর্ণিত একটি হাদীছ পাওয়া যায়। ইব্ন 'আসাকির নাফি'-র পিতা কায়সান (রা)-এর পরিচিতিতে এই উক্তি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি ভিন্ন ব্যক্তি; কারণ ইব্নু'স-সাকানের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নাফি'-র পিতা কায়সান (রা) তা'ইফে বসবাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১ম সং, মিসর ১৩২৮ হি. ৩খ, ৩০৯-১০; (২) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি, ২খ, ৩৭।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সান আল-হুযালী (كيسان الهذلي) ঃ (রা), কুন্য়া আবূ তারীফ (ابو طريف) এবং এই নামেই সমধিক পরিচিত। ইব্ন কানি'-র মতে তাঁহার নাম কায়সান এবং আবূ 'উমারের মতে সিনান (سنان)। তাঁহার নাম সায়্যারা ইব্ন সালামা (سيار بن سلمة) মতান্তরে সায়্যার ইব্ন নুবায়শা আল-খায়র (سيار بن نبيشة) বলিয়াও কথিত আছে। আল-বাগাবী, মাতীন, ইব্ন হিব্বান, ইব্নু'স-সাকান প্রমুখের মতে তিনি নবী কারীম (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি (কায়সান) বলেন, "নবী কারীম (স) যখন তা'ইফ অবরোধ করেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাদের সহিত মাগরিবের সালাত পড়েন। তখনও এতটুকু আলো ছিল যে, কোনও ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিলে সে ইহা পতিত হওয়ার স্থান দেখিতে পাইত।" ইব্ন খুযায়মা এই হাদীছকে সাহীহ বলিয়াছেন। ইব্ন আবী হাতিম ও আবূ 'উমার নিজ নিজ গ্রন্থে ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১ম সং., মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩১০, ৪খ, ১১৩; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি. ৫খ, ২৩৩।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সানিয়া (كيسانية) ঃ কায়সান শব্দটি সর্বপ্রথম শী'আদের ঐ মাওয়ালীদিগের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাহাদের নেতা ছিলেন কায়সান আবূ 'আমরা (দ্র. কায়সান) এবং যাহাদের সহযোগিতা করিয়াছেন আল-মুখতার। পরবর্তীকালে 'কায়সান' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। আল-মুখতার-এর নেতৃত্বাধীন শী'আ দলের মধ্যে প্রচলিত চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ লোকদিগকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের প্রভাব পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কিছুদিন পর কায়সানের নাম বিস্মৃতির তলে পড়িয়া যায়। ঐ সময়ে 'কায়সান' শব্দটি মুখতার-এর উপাধি ছিল বলিয়া ব্যাখ্যা হইতে থাকে। ফলে কায়সানীদের প্রাচীন দলের নাম মুখতারিয়া হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। তখন হইতে কায়সানিয়ার নামকরণের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয় যে, উহা হযরত 'আলী (রা)-র আযাদকৃত দাস কায়সান-এর নামের সহিত যুক্ত। উক্ত দাস সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হন (আত-তাবারী, ১খ, ৩২৯৩)। বলা হইয়াছে যে, মুখতার তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলেন। কায়সানীদিগকে খাশাবিয়াও বলা হইয়া থাকে। কেননা তাহারা এক বিশেষ ধরনের কাঠের লাঠি অস্ত্র হিসাবে নিজেদের কাছে রাখিত।

মুখতার-এর সমসাময়িক কায়সানীগণ তাঁহাকে এক বিশেষ ধরনের গোপন বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এমনকি তাঁহাকে এক রকম নবী বলিয়াও মনে করিতেন। 'ইবাদাতের একটি বিশেষ পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে অবশ্য প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে য়ামানী গোত্রসমূহ ঐ রীতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সাবা'ঈ বলা হইত। ইহাদের 'ইবাদাত ছিল হযরত 'আলী (রা)-র বলিয়া কথিত একখানি কুর্সী অর্চনা করা এবং তাহারা উহা দ্বারা অদৃশ্য বিষয়সমূহের ভালমন্দ নির্ণয়ের কাজও সমাধা করিত। উক্ত কুর্সীটি-কে য়াহূদীদের পবিত্র সিন্দুক (তাবূতু'ল-'আবৃদ)-এর অনুরূপ বলিয়া মনে করা হইত। 'মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়া-কে তাহারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর স্থলাভিসিক্ত মনে করিত। মুখতার তাঁহাকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। আশ-শাহ্‌রাস্তানী বর্ণনা করেন যে, কায়সানী মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়াকে সকল জ্ঞানের অধিকারী মনে করিত এবং বিশ্বাস করিত যে, তিনি দুই মহান নেতার [হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)] নিকট হইতে অদৃশ্য, গোপন ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ জ্ঞানরাজি, অধিকন্তু নভোমণ্ডল ও মানবাত্মা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে একদল কায়সানী হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে বাদ দিয়া ইব্নু'ল হানাফিয়াকে হযরত 'আলী (রা)-র প্রত্যক্ষ স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। ইহার সপক্ষে তাহারা একটি বর্ণনাও পেশকরে যে, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন হযরত 'আলী (রা) স্বীয় পতাকা মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়্যার হস্তে অর্পণ করেন। সম্ভবত এই বিশ্বাস ইমামিয়্যা ও যায়দিয়াগণের বিশ্বাসের বিপরীতে সৃষ্টি হইয়াছে।

আনুমানিক ৮১/৭০০ সনে ইব্নু'ল-হানাফিয়া-র মৃত্যুর পর কায়সানীদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরে। একদল ইব্নু'ল হানাফিয়্যার পুত্র 'আলীকে নেতৃত্বের (ইমাম) আসনে অধিষ্ঠিত করে। অন্য একদল তাঁহার অন্য পুত্র আবূ হাশিমকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে। তাঁহারা তাঁহাকে স্বীয় পিতার গূঢ় তত্ত্বের উত্তরাধিকারী মনে করিত। এই দল হাশিমিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু আবূ হাশিম-এর মৃত্যুর পর (৯৫/৭১৬-৭১৭ সনে অথবা ৯৯/৭১৭-৭১৮ সনে) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপার লইয়া তাহারা আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ সময় 'আব্বাসীগণ এই চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করেন যে, আবূ হাশিম তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নেতৃত্ব (امامت)-এর সকল অধিকার মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস-এর নিকট হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

কায়সানীদের একটি দল মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়ার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা মনে করে যে, তিনি রাদওয়া পাহাড়ের গোপন গুহায় লুক্কায়িত আছেন। সেখান হইতে তিনি মাহদী নামে স্বীয় অনুসারীদের নেতা হইয়া বাহির হইবেন এবং পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও অধিকার পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করিবেন। কায়সানী কবি আল-কুছায়্যির (দ্র.) ও আসসায়্যিদ আল-হিম্য়ারী (দ্র.) তাঁহার গোপন স্থানে অবস্থান করাকে হযরত 'ঈসা (আ)-এর অবস্থানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। গায়বা (غيبة) ও রাজ'আ (رجعة)-র 'আকীদা আবূ কারিব (কুরায়ব) নামক জনৈক ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং তাহার অনুসারীদিগকে কুরায়বিয়া (দ্র.) বলা হইয়া থাকে।

আশ-শাহ্‌রাস্তানী বর্ণনা করেন যে, সকল কায়সানী এই মত পোষণ করে যে, শুধু এক ব্যক্তির আনুগত্য করার নামই ধর্ম। যে সমস্ত ব্যক্তি

সৎ পথ প্রদর্শনের উপযুক্ত একমাত্র তাহারাই ব্যাখ্যা ও গবেষণা করিয়া মাস'আলা ও ফাতওয়া প্রদানের অধিকার রাখেন। কায়সানীদের মধ্যে এই বিশ্বাসও জন্ম নেয় যে, নূতন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরেও পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে (দ্র. বাদা')। গোপন স্থানে লুক্কায়িত ইমামের প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাস ছাড়াও তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক পুনঃজন্মে বিশ্বাসী ছিল।

ইমামিয়া (দ্র.) ও যায়দিয়া (দ্র.)-গণের উপস্থিতির কারণে কায়সানীগণ অত্যল্পকাল সময়ের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। ইব্ন হায্ম তাঁহার যুগে কায়সানীগণকে একটি মৃত ফিরকা বলিয়া আখ্যায়িত করেন। গায়বা (غيبة) ও রাজ'আ (رجعة)-এর ধর্মীয় বিশ্বাস যায়দীগণের সমর্থিত 'আলাবীগণের আরোপ করা সম্ভবত কায়সানীগণের প্রভাবের ফলস্বরূপ। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র যাহাতে কারামাতী (قرامطي) 'আকীদা পাওয়া যায় (দ্র.) কারমাতী); সম্ভবত উহা কায়সানীদেরই নিকট হইতে আসিয়াছে। উহাতে আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নি'ল-হানাফিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে ইমাম মাহদী এবং নবী হইবার দাবীদার দেখিতে পাওয়া যায় [আত-তাবারী, ৩খ, ২১২৮ প; ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৭খ, ৩১১ প.; de Sacy, Expo:e de la religion des Druzes, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ১খ, ভূমিকা, ১৭৭ প.]। কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়ার সন্তানদের মধ্যে আহমাদ নামে কোন সন্তানই নাই (দ্র. ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ৫খ, ৬৫; আহমাদ ইব্ন 'আলী আদ-দাঊদী আল-হাসানী, 'উমদাতু'ত-তালিব ফী আনসাবি আবী তালিব, বোম্বাই ১৩১৮ হি., পৃ. ৩১৯ প.)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, সম্পা. De Goeje, ২খ, ৫৯৮ পৃ. বিশেষত পৃ. ৬৩৪, লাইন ৮ প., ৬৩৬, লাইন ১১ প., ৬৬২, লাইন ৮ প., ৬৭১, লাইন ১, ৬৭৩ লাইন ১০প., ৭০২ প., ৭২১, লাইন ৮প.; (২) আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত-তিওয়াল, Leiden ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ২৯৮, ৩০০, ৩০৫, ৩০৮ (৩) আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য-যাহাব (প্যারিস ১৮৬১ হইতে ১৮৭৭ খৃ.) ৫খ, ১৮০ প, ২২৬, ২২৭, ২৬৮, ৪৭৫ এবং ৬খ, ৮৫; ৭খ, ১১৭; (৪) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৩০০; (৫) ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহ, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ, কায়রো ১২৯৩ হি., ১খ, ২৬৭ প. ২৬৯, লাইন ৬ প.; (৬) আল-কাশ্শী, কিতাবু'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি.,. পৃ. ৮৫; (৭) আল-আগানী, ৭খ, ৩, লাইন ১৯, পৃ. ৪. লাইন ১৫ প., পৃ. ৫, লাইন ১৭, ২২, পৃ. ৯, লাইন ২৬ প.; ৮খ, ৩২, লাইন ৮ পৃ, পৃ. ৩৩; (৮) আল-খাওয়ারিযমী, মাফাতীহু'ল-'উলূম, Leiden ১৮৯৫ খৃ., ২৯ প.; (৯) 'আবদু'ল-কাদির আল-বাগদাদী, আল-ফারকু বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ১৬ প., ২৭-৩৮, ৫৩ লাইন ১৪ প.; (১০) ইব্ন হায্ম, আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহাল, কায়রো ১৩১৭-১৩২১ হি. ৪খ, ৯৪, লাইন ২ প., ১৭৯, লাইন ২০ প., ১৮০, লাইন ৭ প., ১৮২, লাইন ৭, ১৭ প. ১৮৪, লাইন ১০-১২; (১১) আবু'ল-মা'আলী, বায়ানু'ল-আদয়ান, Schefer, Chrest, Persane, ১খ, (Publ. de I'Ecole des Langues or, viv. ক্রমিক ২,৭), পৃ. ১৫৭ প.; (১২) আশ-শাহারাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, সম্পা. Cureton পৃ. ১০৯ প.; (১৩) আল-মাকরীযী, আল-খিতাত বূলাক ১২৭০ হি., ২খ, ৩৫১ প.; (১৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৫৭০ (পৃ. ৯১); (১৫) ইব্ন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা, কায়রো ১৩২৭ হি., পৃ. ২১৯ প.; (১৬) আল-জাওহারী, আস-সিহাহ, বূলাক ১২৮২ হি., ১খ, ৪৭৪, লাইন ২১ প.; (১৭) লিসানু'ল-'আরাব, ৭খ, ৮৬, লাইন ১৬ প.; (১৮) তাজু'ল-আরূস, ৪খ, ২৩৮, লাইন ১৪; (১৯) Barbier de meynard, Le Seid Hirmyarite, Journ As, ক্রমিক নং ৭ম, ৪ (১৮৪৭ খৃ.), ১৬২ প., ২৪০ প.; (২০) H. D. Van Gelder, Mohtar de valsche Prfoeet (Leiden ১৮৮৮ খৃ.) পৃ. ৮২ প.; (২১) G. Van Volten, Recherches sur la Domination arabe, (le Chiitisme Verhand de Kon, Akad, V. Wetensch, Afd) Letterkunde, Amsterdam ১৮৯৪ খৃ. ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৩), পৃ. ৪১ প.; (২২) J. Wellhausen, Die religios-Politischen Oppositions-partein im alten Islam (Abhandl. d. Kon. Gesellsch. d. Wissensch zu Gottingen, Phil. Hist. Kl. n. F., v. No. 2) পৃ. ৭৪ প.; (২৩) E. Blochet, Le Messianisme dans l' heterodoxie musulmane (প্যারিস ১৯০৩ খৃ.), পৃ. ৩২ প.; (২৪) Isr. Friedlaender, The Heterodoxies of the Shiites according to Ibn Hazm (Journ. of the American, Orient. Soc. ২৮ ও ২৯ খ., দ্র. Keisan; (২৫) H. Banning, মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়্যা (Muhammad ibn al-Hanafiya), Diss Erlangen ১৯০৯ খৃ., ৪৬-৫৩; (২৬) F. Buhl, Alidernes Stilling til de Shi'itiske Bevaegelser under Umajjaderne (oversight over det Kgl., Danske vidnskabernes Selskabs Forhandlinger, ১৯১০ খৃ., সংখ্যা ৫), পৃ. ৩৬৪ প.; (২৭) C. Van Arendonk, De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden ১৯১৯ খৃ.,., ১১-১৩।

C. Van Arendohk (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মদ সোলায়মান

কায়সাবা ইব্ন কুলছূম (قبيصة بن كلثوم) ঃ (রা), কিন্দার অধিবাসী, জাহিলী যুগের একজন সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে নবী কারীম (স)-এর নিকট আসেন এবং পরবর্তীকালে মিসর বিজয়েও অংশগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৪-৫; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৩০।

মুহাম্মদ মূসা

কায়সার (قيصر) ঃ (১) ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবী ভাষায় রোমক ও গ্রীক সম্রাটগণের প্রচলিত উপাধি। শব্দটি গ্রীক Kaisar শব্দের প্রতিরূপ এবং আরামী ভাষার মাধ্যমে ইহা আরবী ভাষায় আসিয়াছে (দ্র. Fraenkel, Die aramaischen Fremdworter im Arabischen, Leiden 1886, 278 f.)। এই ঋণ গ্রহণ অবশ্যই বেশ প্রাচীন কালেই ঘটিয়াছিল। কারণ শব্দটিকে পরবর্তীকালে সিরীয় ভাষায় প্রায় কেসাররূপে দেখা যায় (দ্র. Payne Smith, Thesaurus Syriacus)। মহানবী (স)-এর কয়েক শত বৎসর

পূর্ব হইতেই রোমকগণের সহিত আরবগণের সম্পর্ক ছিল এবং বায়যানটাইন সম্রাটগণের সহিত সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রাচীন Kaisar Periplous নামক একজন রোমানকে Eudaimon Arabia-র বিজেতা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে [সম্ভবত ক্যারাক্যালা (Caracalla), ১৯৮ খৃস্টাব্দ হইতে সেপ্‌টেমিউস সেভেরুস-এর রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন (দ্র. F. Altheim-R. Stiehl, Die Araber in der alten Welt, i, Berlin 1964, 44)]। ২৪৪ খৃস্টাব্দে হাওরান-এর একজন আরব দারিউস্ জুলিয়াস্ ফিলিপ্‌পাস্ নাম ধারণপূর্বক পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিরিয়াতে বানূ গাসসান গোত্র বায়ানটিয়ামের আরব মিত্র (summahoi) হিসাবে বানূ সালীহ গোত্রের স্থান দখল করিয়াছিল। প্রধান গাস্‌সানী দলপতিকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হইয়াছিল এবং patricius (বিত্‌রীক')-এর মতো উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। বায়যানটাইন সম্রাটের সামন্ত রাজা হিসাবে রাজমুকুট পরিতেও অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল (দ্র. গাস্‌সান)। গাস্‌সানীগণের ও উত্তর পশ্চিম আরবের সকল অধিবাসিগণের নিকট রোমক সম্রাট কায়সার অবশ্যই সর্বোচ্চ অধিপতি ছিলেন, যেমন পারস্য রাজা কিস্‌রা ছিলেন লাখ্‌মীগণের এবং উত্তর-পূর্ব আরবের সকল অধিবাসিগণের নিকট। প্রাচীন আরব কবিদের মধ্যে ইম্‌রু'উ'ল্-কায়স [দ্র.] একাধিকবার কায়সার-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে কবির জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কবিগণের জন্যও কিসরার পাশাপাশি কায়সার অদ্যাপি বীর্য ও সম্পদের প্রতীক।

কায়সার শব্দটি কুরআন মাজীদ-এ দেখা যায় না, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন চরিত, হাদীছ সংকলন, কুরআন-এর তাফসীর ও সাধারণ ঐতিহাসিক বিবরণীতে ইহার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। ইহা সব সময়েই বিনা বিশেষণে নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোনও সম্বন্ধ পদ সরাসরি ইহার পূর্বে বসিতে পারে না। ইহা হইতেই সুস্পষ্ট যে, শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং মুহাম্মাদ (স), আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) ও 'উমার ফারূক (রা)-এর সময়ের প্রসিদ্ধ সম্রাট হেরাক্লিয়াস্‌কে হিরাকল্ অথবা কায়সার 'আজীমু'র্ (অথবা মালিক)-রূম্ বলা হইত। যেমন অ্যামোরিয়াম অধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনে (৮৩৮ খৃস্টাব্দ, তাবারী, ৩খ, ১২৩৪ঃ তূফীল্ ইব্‌ন মীখা'ঈল, সাহিব/ মালিকু'র্-রূম) অগাস্টাস হইতে হেরাক্লিয়াস পর্যন্ত (তাবারী, ১খ, ১৭৪১-৪৪) "রোমক (বায়যানটাইন) রাজাগণের" (মুলূকু'র-রূম) তালিকায় এবং মালাযগেরূদ-এর যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে (১০৭১, ইব্‌নু'ল্-আছীর, ১০খ, ৪৪-৪৬ ঃ আরমানূস্ [রোমানুস্], মালিকু'ররূম) কায়সার শব্দটি প্রায়ই বর্জন করা হইয়াছিল। ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনামতে (১/১খ, ৪৩, ৪৫ প.) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রপিতামহ হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ সিরিয়া ভ্রমণকারী মক্কার ব্যবসায়িগণের যাতায়াতের নিরাপত্তার ব্যাপারে কায়সার-এর নিকটে হইতে একটি পত্র পাইয়াছিলেন [দ্র. M. J. Kister, in JESHO, viii (1965), 116f]। দিহ্‌য়া কালবী (রা) [দ্র.]-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (স) যে পত্র বস্‌রার গভর্নরের নিকট এবং তাঁহার মাধ্যমে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে সে সম্বন্ধে বহুসংখ্যক বিবরণী পাওয়া যায়। অনেকগুলি বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, সম্রাট আবূ সুফ্‌য়ান (রা)-কে নূতন নবী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন এবং (কিস্‌রা-র বিপরীত) ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন; কেবল তাঁহার প্রজাগণের ভয় তাঁহাকে প্রকাশ্যে নূতন ধর্ম গ্রহণে বিরত রাখিয়াছিল (সূত্রের জন্য নিম্নে দেখুন)। 'উমার (রা) মহানবী (স)-এর আড়ম্বরহীন সরল জীবন ধারণের সহিত কিস্‌রা ও কায়সার-এর বিলাস-বহুল জীবনযাত্রার বৈষম্য দেখাইয়াছেন (বুখারী, তাফ্‌সীর, ৬৬, ২; ইব্‌ন মাজা, যুহ্‌দ, ১১)। হু'দায়বিয়া ঘটনার সময় 'উর্‌ওয়া ইব্‌ন মাস্'উদ্ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত তাঁহার তাঁবুতে সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহার মাক্কী স্বদেশবাসিগণকে বলিয়াছিল যে, যদিও সে দূত হিসাবে রাজন্যবর্গ, কায়সার, কিস্‌রা ও আন্-নাজাশীর নিকট গিয়াছে, তথাপি সে কোনও রাজাকে অত সম্মানিত হইতে দেখে নাই, যত সম্মানিত ছিলেন মুহাম্মাদ (সা) তাঁহার সহচরবৃন্দের নিকট (বুখারী, শুরূত, ১৫; তু. ইব্‌ন হিশাম, ৭৪৫)। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নিম্নের উক্তিটি এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বর্ণনা করা হয়, "যদি কিস্‌রা ধ্বংস হয় (অন্য বর্ণনায় কিসরা মারা যায়) তাহা হইলে তাহার পরে আর কোনও কিস্‌রা থাকিবে না এবং যদি কায়সার ধ্বংস হয় তাহা হইলে তাহার পরে পরে আর কোন কায়সার থাকিবে না। যাঁহার হাতে আমার আত্মা ন্যস্ত তাঁহার শপথ! তোমরা তাঁহাদের সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিবে" (বুখারী, ফারদু'ল্-খুমুস, ৮, আয়মান ৩, জিহাদ ১৫৭; মুসলিম, ফিতান, ৭৫, ওয়াকিদী, ৪৬০)। তু. "মিত্র বাহিনী" দ্বারা মদীনা অবরোধকালে মু'আত্তিব ইব্‌ন কুশায়র-এর সমালোচনামূলক মন্তব্য, "মুহাম্মাদ (স) আমাদিগকে কিস্‌রা ও কায়সার-এর ধন-সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, অথচ আমাদের একজনের জন্য শৌচাগারে যাওয়াটাও নিরাপদ নহে" (ওয়াকিদী, ৪৫৯ প.; ইব্‌ন হিশাম, ৩৫৭)। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হইল, "আমার উম্মাতের যে প্রথম সৈন্যদল কায়সার-এর শহর (অর্থাৎ কনস্টান্‌টিনোপল) আক্রমণ করিবে তাহারা ক্ষমা পাইবে [তাহাদের পাপের]"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কায়সারের নিকট লিখিত মুহাম্মাদ (স)-এর চিঠি (ক) আবূ সুফ্‌য়ান-এর সহিত সংঘটিত কথোপকথন ব্যতীত ঃ (১) ওয়াকিদী, সম্পা. M. Jones, অক্সফোর্ড ১৯৬৬ খৃ., ৫৫৫ প.; (২) ইব্‌ন সা'দ, ২/১খ, ৬৩; (৩) তাবারী, ১খ, ১৫৫৯-৬১; (৪) ইব্‌ন সা'দ, ১/২খ, ১৫ প.; (৫) আবূ 'উবায়দ আল-ক'াসিম ইব্‌ন সাল্লাম, কিতাবু'ল-আমওয়াল, কায়রো ১৩৫৩ হি, ২৫৪-৬ (শা. ৬২৩-৫); (৬) য়া'কূবী, ২খ, ৮৩ প.; (৭) তাবারী, ১খ, ১৫৬৫-৬৭; (৮) ইব্‌নু'ল্-আছীর, ২খ, ১৬১ প.; (৯) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten. ৪র্থ Berlin 1889. 98; (১০) W. M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford 1956. 345-7; কায়সারের নিকট লিখিত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চিঠি (খ) আবূ সুফ্‌য়ান-এর সহিত সংঘটিত কথোপকথনসহ; (১১) বুখারী, জিহাদ, ১০২, তাফ্‌সীর, ৩, ৪, বাদ'উ'ল্-ওয়াহ্‌য়ি, ৬; (১২) মুসলিম, জিহাদ, ৭৪; (১৩) তাবারী, ১খ, ১৫৬১-৫; (১৪) ইব্‌নু'ল-আছীর, ২খ, ১৬৩; (১৫) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, ২খ, কলিকাতা ১৮৯৩ খৃ. ৫৫৭ প.; (১৬) আবু'ল-ফিদা', মুখ্‌তাসারু তা'রীখি'ল্-বাশার, সম্পা. ও অনু. Fleischer, as Abul-fedae Historia anteislamica, 132-4; (১৭) দা. মা. ই., ১৬/২খ., ৫৬৫-৬৭।

A Fischer-A. J. Wensinck-A. Schaade-R. Paret (E. I.[2])/ আ.র. মামুন

(২) ইসলামের ইতিহাসে ঃ মক্কী যুগে মুহাম্মাদ (স)-এর সহানুভূতি ছিল হেরোক্লিয়াসের প্রতি ও কিস্‌রা-র প্রতিকূলে এবং দুইজনের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি সূরাতু'র-রূম (কুরআন, ৩০)-এ বর্ণিত

হইয়াছে। কিন্তু মাদানী যুগে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, যাহার মূল ভিত্তি ছিল ধর্মভিত্তিক; যেহেতু ইসলাম "সরল পথে"র সত্য ধর্ম ও সার্বজনীনতার দাবী রাখে, তাই বায়যানটিয়াম এবং ইহার কায়সার, ইসলাম এবং ইসলামী রাষ্ট্র, যাহা অবশ্যই পরিশেষে জয়লাভ করিবে এবং নিজেই কনস্টান্টিনোপল অধিকার করিবে—তাহার শত্রু হিসাবে পরিণত হয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কায়সার সম্বন্ধে নূতন মুসলিম ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রাষ্ট্র দারু'ল-হার্ব (যুদ্ধের আবাসস্থল, শত্রু রাষ্ট্র)-এর অংশ, তিনি একজন অবিশ্বাসী এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইল জিহাদ (পবিত্র যুদ্ধ)। বায়যানটাইন রাজ্যগুলির উপর আরবগণের সামরিক জয় লাভের ফলে কায়সারের বিরুদ্ধে এই শত্রুতামূলক এবং অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব আরো জোরদার হইয়া ওঠে। এইরূপে যে ধর্মীয় ও সামরিক ভিত্তির উপর প্রাক-ইসলামী যুগে কায়সারের প্রতি আরবগণের সম্মান প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা ইসলামী যুগের প্রথম শতাব্দীতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল; এই নূতন মনোভাব কায়সারকে প্রদত্ত খিতাব, যেমন তাগিয়্যা, 'অত্যাচারী' কিংবা হারূনু'র-রশীদ কর্তৃক নিসেফোরাসকে সম্বোধনকালে কালবু'র-রূম, "রোমকগণের কুকুর," বলিয়া সম্বোধন করা হইতে প্রতিফলিত হয়।

১৫/৬৩৫ সালে আল-য়ারমূক যুদ্ধের পর প্রায় চার শতাব্দী ধরিয়া আরবগণের মাঝে কায়সারের ভাবমূর্তি স্বভাবতই খলীফা এবং কায়সার কর্তৃক শাসিত রাষ্ট্র দুইটির সামরিক জয় পরাজয়ের সহিত ওঠা-নামা করিয়াছিল। এই যুগের প্রথম অংশ, যাহাতে উমায়্যা ও 'আব্বাসী শাসনের প্রথম ভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বায়যানটাইনগণের বিরুদ্ধে আরবগণের সফলতার যুগ; কিন্তু ম্যাসিডোনীয় রাজবংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কাল-স্রোত আরবগণের প্রতিকূলে গিয়াছিল এবং হামদানীগণের আকর্ষণীয় সফলতা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

তুর্কীগণ ইসলাম ও বায়যানটাইগণের মধ্যে সম্পর্কের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে, যাহা ৪৬৩/১০৭১ সালে তাঁহাদের মান্‌যিকার্ত-এ জয় লাভের পর হইতে ৮৫৭/১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করা পর্যন্ত প্রায় চার শতাব্দী স্থায়ী ছিল। তুর্কী সামরিক বিজয়ের প্রভাবে বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের কায়সারের ভাবমূর্তি, ম্যাসিডোনীয় যুগের পূর্বে যাহা ছিল আবার তাহাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। মূল কারণ ছিল বায়যানটাইনগণের কেন্দ্রভূমি আনাতোলিয়া অধিকার ও ইহার তুর্কীকরণ এবং কায়সারগণের শাসন খর্বকরণ। সালজূক সুলতান আলপ্ আরস্‌লান ৪৬৩/১০৭১ সালে বায়যানটাইন সম্রাট রোমানাস ডাইয়োজিনিস-কে মান্‌যিকার্ত-এ পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন এবং দুই শতাব্দী ধরিয়া Comneni, Angeli ও Lascarids-র কায়সারগণের সহিত সম্পর্কের এবং তাঁহাদের প্রতি মনোভাবের ধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কায়সারের অবমাননার শেষ পর্যায়টি পরিচালনা করিয়াছিল 'উছমানীগণ। তাঁহার ও তাঁহার শাসিত রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব ছিল খাঁটি ইসলামী এবং বলকান অঞ্চলগুলিতে তাঁহাদের বিস্ময়কর বিজয় লাভ ইহা সুনিশ্চিত করিয়াছিল। মুসলিম-গ্রীক সংঘর্ষ-নাটকের শেষ অধ্যায়টি, যে সংঘর্ষ প্রায় আট শতাব্দী স্থায়ী হইয়াছিল, লিখিত হইয়াছিল যে, সিংহাসনাধিকারিগণের সর্বশেষ ব্যক্তি একাদশ কনস্টান্টাইনের উপর সুলতানের বিজয় দ্বারা বিজেতা মুহাম্মাদ কনস্টান্টিনোপল দখল করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গাযী ও খান উপাধির সহিত কায়সার উপাধিটিও সংযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি ইহা করিতে পারিয়াছিলেন। কারণ তিনি সুলতান ছিলেন, খলীফা ছিলেন না; য়ূরোপ ও এশিয়ায় কায়সারগণের হৃত বায়যানটাইন রাজ্যগুলি পুনর্বিজয়ের জন্য এই উপাধিটি তাঁহার রাজকীয় পরিকল্পনায় মূল্যবান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআন, ৩০; (২) ইব্‌ন হিশাম, The life of Muhammad, অনু. A Guillaume, Oxford 1967, 653-7; (৩) ইব্‌ন খুররাদায্‌বিহ, আল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. de Goeje, BGA, vi 16-17; (৪) 'ইরফান শাহীদ, On the patriciate of Imru' al-Qays, in The world of Islam, সম্পা, Kritzeck and Winder, লন্ডন ১৯৫৯ খৃ., ৭৪-৮২; (৫) ঐ লেখক, The Iranian factor in Byzantium during the reign of Heraclius, in Dumbarton Oaks Papers, xxvi (1972), 295-320; (৬) M. Canard, Les relations politiques et sociaels entre Byzance et les Arabes, in ibid, xviii (1964), 35-56; (৭) A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, Brussels 1935. 1950, 1968; i-ii, I; (৮) Cambridge mediaeval history. iv, The Byzantine Empire, part I, chs xvii-xiv; (৯) Cambridge history of Islam, i, chs. xvii-xix on the Turks; 231-373, 527-67.

Irfan Shahid (E. I. [2])/আ. র. মামুন

কায়সারিয়া (قيسارية) ঃ (Caesarea- قيصرية) রোমের ১ম সম্রাট Augustus অগাস্টাস, খৃ. পূ. ৬৩-১৪ খৃ.) ও ২য় সম্রাট Tiberius (টাইবেরিয়াস, খৃ. পূ. ৪২-৩৭)-এর আমলে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের ১৭টি শহর ও জনপদের নাম দেওয়া হইয়াছিল কায়সারিয়া। দ্র. Pauly Wissowa Realenzykl d. Klass Altertums-Wissench, ৩খ, ১২৮৮ প.। আরব লেখকগণ কায়সারিয়া' নামে দুইটি শহরকে জানিতেন ঃ (য়াকূত, বুলদান, ৫খ, কায়সারিয়া) এক ফিলিস্তীনে অবস্থিত কায়সারিয়া; সম্রাট হিরোদ হায়ফা ও য়াফা শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে খৃ. পূ. ১৩-১২ অথবা ১০-৯ সালে এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাহা সমুদ্রোপকূলে ৩৫ ডিগ্রি উত্তরে, হায়ফা শহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল (৪০ কি.মি) দক্ষিণে অবস্থিত রোমান সম্রাটদের আবাসস্থল ছিল। ৬৩৩ খৃ. আরবরা উহা জয় করেন। বর্তমানে উহার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। দ্র. Stark: Gaza und die philistaische Kuste ১৮৫২ খৃ. পূ., ৪৫০ প. (Neudauer, পূ. গ্র, পৃ. ১১-১৫), গ্রন্থে এই শহরের প্রাচীন নামের উল্লেখ পাওয়া গেলেও এই নামটি আবিষ্কারের ব্যাপারে দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা যায় না। একই নামের অন্যান্য শহর, বিশেষত উত্তর গালিলীর ফিলিপ্সের কায়সারিয়া (Paneas Caesarea philippi)-এর সাথে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ইহাকে স্পষ্টত Caesarae Stratonis, কিংবা Caesarea Patastinae কিংবা Caesarae Maritima নামে অভিহিত করা হইত। ইহাকে এশিয়া মাইনরের 'কায়সারিয়া' শহর হইতে পার্থক্য নিরূপণের জন্য আরবরা ইহাকে ফিলিস্তীন সংযোজন করিয়া 'কায়সারিয়া ফিলিস্তীন" বলিতেন (অর্থাৎ ফিলিসতীনস্থ কায়সারিয়া)।

কায়সারিয়া ফিলিপস সিরিয়ায় অবস্থিত, জর্ডান নদীর সন্নিকটে আশ-শায়খ (الشيخ) পাহাড়ের উপরে গ্রীক যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। সম্রাট হিরোদ সেখানে সিজার অগাস্টাসের (Caesar Augustus) একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করেন এবং তদীয় পুত্র ফিলিপ্স-এর আমলে শহরটি অত্যন্ত উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাই উহা "কায়সারিয়া ফিলিপ্স" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখানে খৃস্টান ধর্মযাজকের প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজিত এবং ঈসা ('আ) আকাশে আরোহণের সিঁড়ি অবস্থিত। ১১৩০ খৃ. ক্রুসেডাররা ইহা দখল করে এবং Paneas দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করে। ১১৩৪ খৃ. আরবরা পুনরায় উহা দখল করেন।

কায়সারিয়ার প্রাচীন ও আদি অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তবে ইহা সন্দেহাতীতে যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই শহরটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব ২২ সনে সম্রাট ১ম হিরোদ (Herod) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর এক জাঁকজমকপূর্ণ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন, যার নাম সীজার অগাস্টাস (কায়সার অগাস্টাস)-এর সম্মানে 'কায়সারিয়া' রাখা হয় (উহার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ঃ 'Otto' শিরো, Pauly-Wissowa, পূ. গ্র., পরিশিষ্টাংশ, ২খ, কলাম ৬৮ টীকা)। এই নূতন শহরের পরিকল্পনার একটি জাঁকজমকপূর্ণ বন্দর প্রতিষ্ঠা করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শহরটির প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই উহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কেননা উহার ফলেই য়াহূদীদের জন্য ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়। কায়সারিয়ার এত দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের ফলে উহা দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর শহরে পরিণত হয় এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত উহার অনুরূপ অবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। খৃস্টাবাদ প্রাথমিক যুগ হইতে সেখানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে শহরটির গুরুত্ব অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কেননা Chalcedon-এর শাসনামলে (৪৫১ খৃ.) পর্যন্তও কায়সারিয়া একটি সমৃদ্ধ দেশ ছিল। তিনি মুসলমানদের অগ্রাভিযানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এক দীর্ঘ অবরোধ কালে সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমানদের মুকাবিলায় দৃঢ়ভাবে অটল থাকে। পরিশেষে আমীর মু'আবিয়া (রা) অতর্কিত হামলা চালাইয়া শহরটি দখল করেন। প্রাচ্যের গ্রন্থাবলীতে শহরটির পতনের তারিখ ও অবরোধের মেয়াদকাল সম্পর্কে মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই অবরোধ ১৮/৬৩৯ সনে শুরু ও ১৯০/৬৪০ সনে শেষ হইয়াছিল। শাওয়াল ১৯/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৬৪০ সনে ইহা মুসলিম অধিকারে আসে। প্রতিরোধকারী ও অবরোধকারীদের সংখ্যা সম্বন্ধে যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, উহাতে বেশ মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। এই বর্ণনামতে অবরুদ্ধদের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৩০ হাজার এবং অবরোধকারীদের সংখ্যা ১৭ হাজার (বালাযুরী)। ইসলামী বিজয় সম্পর্কে দেখুন ঃ de Goeje, Men sur la Conquete de la Syrie, ২খ, পৃ. ১৬৬ প., Caetani: Analli dell' Islam, ৪খ, ৩১ প., পৃ. ১৫৬-১৬২।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ পর্যন্ত কায়সারিয়া শহরে মুসলমানদের আধিপত্য বিরাজমান ছিল। ঐ যুদ্ধের সময় আল-কুদস-এর সম্রাট ১ম Baldwin (১১০০-১১১৮ খৃ.) ৪৯৪/১১০১ সালের ৩১ মে তারিখে ঐ শহরটি দখল করেন (দ্র. Wilken, Gesch der Kreuzzuge, লাইপযিগ ১৮০৭-১৮৩২ খৃ., ২খ, ১০২-৪; R. Rohricht, Gesch. der kreuzzuge in Umriss Inns bruch, ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ৫৭)। ঐ সময়ে যেসব মূল্যবান গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) খৃষ্টানরা লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান ছিল ছয় বাহুবিশিষ্ট একটি সবুজ 'যমাররদ' পাথর, আর ছিল একটি কাঁচের পাত্র', যার সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল এই যে, উক্ত পাত্রটি হযরত ঈসা ('আ)-এর সর্বশেষ রাতের খাবার (Last Supper)-এর পেয়ালারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল (ইহা সুস্পষ্ট যে, এই বিশ্বাস বা ধারণা সর্বপ্রথম Holy Grail-এর বর্ণনার প্রভাবে সৃষ্টি হইয়াছে)। এই শহরটি দখল করার ব্যাপারে জেনেভা (Genova)-বাসীরা যে বিরাট অবদান রাখিয়াছিল, উহার স্বীকৃতিস্বরূপ শহরটির এক-তৃতীয়াংশ তাহাদিগকে উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত ঐ পাত্রটি Genova-এর বড় গির্জায় সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং Sacrocatino নামে প্রসিদ্ধ (দ্র. Wilken, পূ. গ্র., ২খ, ১০৩, ১০৮-১১১; Mislin পূ. গ্র., ২খ, ১১২ প.; Fr. Kampers, Das lichtland der Seelen und der hl. gral. Cologne 1916 A. D., পৃ. ৮৫ প.)।

হিত্তীনের যুদ্ধে (দ্র.) ৫৮৩/৫ জুলাই, ১১৮৭ সালে খৃষ্টানদের শোচনীয় পরাজয় বরণের পর সুলতান সালাহু'দ-দীন আয়্যুবী বিনা যুদ্ধে পুনরায় কায়সারিয়া অধিকার করেন (দ্র. Schultens, Saladini auct Bohadino I. Sjeddadi, লাইডেন ১৭৫৫ খৃ., পৃ. ৭১ ও ফারহাঙ্গ, অনুরূপ শিরোনামে, পৃ. ২৩)। কয়েক বৎসর পর ১১৯১ সনের ৩১ আগস্ট রিচার্ড যখন শহরটি দখল করেন, তখন উহাকে বিধ্বস্ত ও বরবাদ পাইলেন। ৬১৫/১২১৮ সনে ক্রুসেডাররা ঐ দুর্গটি নূতনভাবে তৈয়ার করেন। তাহাদের নির্যাতনমূলক আচরণের দরুন মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে ৬১৭/১২২০ সালে মিসরীয় বাদশাহ মালিক মু'আজ্জাম শহরটি দ্বিতীয়বার অধিকার করেন। ফরাসী সম্রাট ৯ম লুই (Louis) শহরটিকে পুনরায় দখল না করার পূর্বাবধি খৃস্টানরা কায়সারিয়া শহরটি পুনর্দখল করিতে সক্ষম হয় নাই। সম্রাট লুই এইখানে এক বৎসরকাল (১২৫১-৫২) অবস্থান করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক ব্যূহ (পরিবার) প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকেন যেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—শহরের চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর। এতসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ৬৬৩/১২৬৫ সালে কেবল এক সপ্তাহের হামলায় শহরবাসীরা সুলতান বায়বারস-এর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দখলের পর তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় (দ্র. Wilken, পূ. গ্র. ৩খ, ২৯৬; ৪খ, ৪০৮; ৬খ, ১৫৮, ৩০৩; ৭খ, ৪৭৪ প.; Kugler. Gesch. d. Kreuzzuge, বার্লিন ১৮৮০ খৃ. পৃ. ৩৮৭; Rohricht, পূ. গ্র.. ২৫৩)। ১২৯৩ খৃ. সুলতান আশরাফ উহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্তকরণের অবশিষ্ট কাজটুকু সমাধা করেন।

প্রাচীন আরব ভূগোলবিদগণ 'কায়সারিয়া' সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, উহা অতিশয় সুন্দর, মনোমুগ্ধকর ও সুদৃঢ় শহর ছিল। তাহারা সেখানকার ফলমূল, বন-জঙ্গল ও নদ-নদীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। প্রখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ য়াকূত আল-হামাবী (১১৭৯-১২২৯ খৃ.)-এর সময় পর্যন্ত কায়সারিয়া একটি গ্রামের ন্যায় ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আমীর আবু'ল-ফিদা ইসমা'ঈল (১২৭৩-১৩৩১/৭২১) (দ্র. আবু'ল-ফিদা) যখন স্বীয় গ্রন্থ "তাকবীমু'ল-বুলদান" লেখেন, তখন ১২৬৫ খৃ. ও ১২৯১ খৃ.-এর লুটতরাজের দরুন শহরটি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে মৎসজীবী ছাড়া অন্য কেহ বাস করিত না। ইহার পর কিছুকাল সেখানে নামমাত্রও জনবসতি ছিল না। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া অধিকৃত হইলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা

বোসনিয়ার আশ্রয়প্রার্থীদের সেখানে আবাদ করায়। বর্তমানে 'কায়সারিয়া' জর্ডানের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি বিধ্বস্ত জনপদ বোঝায়। শহরটির প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন নির্দশন অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। রোমন শাসনামলে এই শহরটি ৪০০ একর জমিতে বিস্তৃত ছিল। এর মুকাবিলায় মধ্যযুগে উহার প্রাচীরসমূহ, পরিখা, মিনার, গম্বুজসমূহসহ শহরটি এক চতুর্ভুজ আকৃতির ছিল, যাহা রোমান আমলের পরিধির প্রায় এক-দশমাংশে বিস্তৃত ছিল।

বন্দরটি বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বন্দরের দালান, ইমারতসমূহ যাহা এককালে সুবিশাল ছিল এবং সম্রাট হিরোদ-এর নির্মিত Drusus নামক বেলোয়ারী মিনারটি অদ্যাবধি নিজস্ব নিদর্শনসমূহ দ্বারা চেনা যায়। অনুরূপভাবে দক্ষিণাংশে সমুদ্রোপকূলে সম্রাট হিরোদ-এর নির্মিত গোলাকৃতিবিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের (amphitheatre) নিদর্শনও দৃষ্ট হয়, যেখানে ২০ সহস্রাধিক দর্শকের স্থান সংকুলান হইত। উহার অনতিদূরে উত্তরে ঘোড়া ও গাড়ীর দৌড়ের ময়দানের নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হয়। পাকা বাঁধাইকৃত নালা নর্দমাসমূহের কিয়দংশ এখনও সুরক্ষিত রহিয়াছে। মধ্যযুগের দীর্ঘ গম্বুজবিশিষ্ট চতুর্ভুজাকৃতির দুর্গটিকে তুর্কীরা একটা সরকারী অফিসরূপে ব্যবহার করিতেন। শহর প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ যাহা অদ্যাবধিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সম্রাট ৯ম লুই (Louis)-এর দুর্গ তৈরীর যুগের ছিল। ক্রুসেডারদের তিন দালানবিশিষ্ট বড় গির্জার কতিপয় ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রহিয়াছে। জনগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিধ্বস্ত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ উপাদান বিগত শতাব্দীসমূহ অত্র নির্মাণকার্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সেখান হইতে লইয়া গিয়াছে; উদাহরণস্বরূপ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আক্কা নগরীতে জায্যার পাশা (মৃ. ১২০৯/১৮০৪) স্বীয় প্রসিদ্ধ ইমারতসমূহ (বিশেষত নূতন বৃহৎ মসজিদ) তৈরী করিতে কায়সারিয়া ও 'আসকালান (দ্র. 'আসকালান ফিলিসতীনের দক্ষিণ উপকূলের একটি কান'আনী শহর)-এর বিধ্বস্ত অট্টালিকাসমূহের প্রস্তর ও প্রাসাদের ভগ্নাংশ (বিশেষত প্রাচীন আমলের স্তম্ভসমূহ) আনয়ন করান। যাফায় (ভূমধ্যসাগরস্থিত ফিলিসতীনের একটি সামুদ্রিক বন্দর) ফ্রান্সিসকান মঠ পুনরায় নির্মাণ করা হয় সেখানেও কায়সারিয়া পাথরের খনির কাজ দেয়। বিধ্বস্ত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ঃ R. Pococke (১৭৩৭ খৃ.); Descr. of the East (লন্ডন ১৭৪৩-১৭৪৫ খৃ.), ২খ, ৫৮ প., জার্মান অনু. (Erlangen ১৭৯১ খৃ.), ২খ, ৮৫-৮৭ (সচিত্র ঃ মূসা লাওহ, ৫ম-ব); A. V. Prokesch (১৮২৯ খৃ.), Reise ins heil. Land (ভিয়েনা ১৮৩১ খৃ.) পৃ. ২৮-৩৪; Wilson (১৮৪২ খৃ.), H. Barth (১৮৪৬ খৃ.), Ritter, পৃ. গ্র., ১৬ খ, ৫৯৯, ৬০৪-৬০৭; G. Hanel (১৮৪৭ খৃ.), Zeitschr, d. Ges. Morgenl. Deutsch, ৪খ, ৩৩৯ প., v. d. Velde : Reise durch Syrien und palastina, ১খ, (লাইপযিগ ১৮৫৫ খৃ.). পৃ. ২৫৩-২৫৬; V. Guerin : Descr. gegr...de la Palestine; ২খ, (Partie, ২খ, ২, প্যারিস ১৮৭৫ খৃ.) ৩২১-৩৩৯; Dalman : Palastinajahrbuch, ৫খ, ১৫, ৮খ, ১২৮ প.; H. Thiersch Zeitschr, d. Deutsch. Palastina vereins, ৩৭ (১৯১৪ খৃ.), ৬২ প.।

২। দ্বিতীয় কায়সারিয়া হইল-এশিয়া মাইনরের একটি শহর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Benzinger, Pauly-wissowa গ্রন্থে Realenz, der Klass, Altertumswiss, ৩খ, ১২৯১ প.; (২) Schurer, Gesch. des jud. Volkes, ৪ সং, ২; ৩৪ প. ১৩৪, ১৬২; (৩) W. Kubitschek, Zur Gesch. von Stadien romisch kaiserreiches, Sitz. Ber. der Wien Akad-এর মধ্যে, ১৯১৬ খৃ., পৃ. ৬৪ প., ৭১-৭৩; (৪) A. Neubauer, La geographie du Talmud (প্যারিস ১৮৬৮ খৃ.), পৃ. ৯১-৯৬; (৫) H. Graetz. Gesch. der Juden, ৪খ, ৪ (১৯০৮ খৃ.), ২৮৬ প.; (৬) S. Krauss, Zur Topographie von Caesarea, Jew. Quart. Rev. মধ্যে, ১৪ (১৯০২ খৃ.) ৭৪৫-৭৫১; (৭) P. Thomsen Loca Sancta, ১ (Halle ১৯০৭ খৃ.) ৭৪ প.; (৮) S. Krauss, Lehn-worter im Talmud. Griech-latein ইত্যাদি, ১ (বার্লিন ১৮৯৯ খৃ.) ৫৩৭; (৯) য়াকূত, মু'জাম (Wustenfeld সং), ৪খ, ২১৪; (১০) আবু'ল-ফিদা, তাক্বীমু'ল-বুলদান (تقويم البلدان), Reinaud ও de Slane সং. পৃ. ২৩৯ (Reinaud অনূদিত ২/২, ১৭); (১১) আবু'ল-ফিদা, তা'রীখ (কনস্টান্টিনোপল ১২৮৬ হি.) ১খ, ১৬৯, ৩খ, ৭৬, ৪খ, ২ (Reiske-Adler সং, ১খ, ২২৯, ৪খ, ৭৯, ৫খ, ১৫); (১২) হাজ্জী খালীফা, জাহাননুমা (جهان نما) (কুস্তুনতানিয়া ১১৪৫ হি.), পৃ. ৫৬৩; Norberg-কৃত ল্যাটিন অনুবাদ, (lund ১৮১৮ খৃ.), ২খ, ২৭৭; (১৩) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, (লন্ডন ১৮৯০ খৃ.), পৃ. ৪৭৪ পৃ.; (১৪) E. Robinson, Palastina und die umliegenden Lander (Halle ১৮৪১ খৃ.) ২খ, ২২১ প., ৩খ, ১১৬, ৯৭৯; (১৫) G. A. Smith, Historical Geography of the Holy land, ১৩৮ প., নির্ঘণ্ট, শিরো; (১৬) K. Ritter. Erdkunde, ১৬খ, ৫৫৪ প., ৪৯০, ৫৯৭, ৫৯৮-৬০৭; (১৭) N. J. Seetzen, Reisen durch Syrien. ইং ৪খ, (লাইপযিগ ১৮৫৯ খৃ.) ২৭৫ প. (Kommentar); (১৮) K. v. Raumer, Palastine, ৪খ, (লাইপযিগ ১৮৬০ খৃ.) পৃ. ১৫২ প.; (১৯) Mislin, Die heil orte, ২খ, (ভিয়েনা ১৮৬০ খৃ.) পৃ. ১০৫-১১৯, ১৫৬; (২০) Fr. Buhl, Geographie des alten palastina (টবেঙ্গন ১৮৯৬ খৃ.) পৃ. ১২৫, ২১২; (২১) B. Meistermann, Nouveau guide de Terre sainte (প্যারিস ১৯০৭ খৃ.), পৃ. ৪৯৬ প.) (সচিত্র); (২২) Baedeker, Palastine and Syria (লাইপযিগ ১৯১২ খৃ.), পৃ. ২৩৭-২৩৯ (সচিত্র); (২৩) Dowling Sketches of Caesarea, E. (Palestine), লন্ডন ১৯১২ খৃ.; (২৪) আল-মুনজিদ, দারু'ল-মাশরিক, বৈরূত, ২৫ সং।

M. Streck (দা.মা.ই)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

কায়সারিয়া (قيسارية) ঃ (কায়সারিয়া قيصارية) ব. ব. قياسير (কায়াসীর), গুচ্ছরূপে নির্মিত জন-ভবনসমূহের বৃহৎ সমাহার যাহাতে থাকে বিপণী, কর্মশালা, গুদাম এবং কখনও কখনও বসবাসের কক্ষ। de. Sacy-র মতে (Relation de l'Egypte par Abd al-latif, Paris 1810 A. D., পৃ. ৩০৩ প.) প্রথমে কায়সারিয়া ও সূক (বাজার)-র সম্ভবত একমাত্র পার্থক্য ছিল যে, কায়সারিয়া অধিকতর বিস্তৃত হইত এবং উহাতে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের চারিপাশে একাধিক ছাদযুক্ত গ্যালারী থাকিত। পক্ষান্তরে 'সূক'-এর কেবল একটি গ্যালারী থাকিত। বর্তমানে অর্থের দিক দিয়া কায়সারিয়া-কে ফারসী শব্দ "বারাওয়া

সারা" (যাহা নিকট প্রাচ্যে সর্বপ্রথম ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল) কিংবা আধুনিক অনুরূপ শব্দ "খ্যান, ওয়াকালাহ" (Okella), ফুন্দুক (দ্র), বুমিসান ইত্যাদির সমার্থক মনে করা হয়।

কায়সারিয়া শব্দটি নিঃসন্দেহে মূল গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহার অর্থ 'শাহী' কিংবা শাহী বাজার। H. Thiersch বলেন, ইহা বলা যায় যে, মসজিদের নকশায় দৃষ্ট প্রাচীন চতুর্ভুক্ত চত্বর (যাহার আশেপাশে কক্ষ থাকুক বা না থাকুক) কায়সারিয়ার অনুকরণ। যদিও R. Kasdorff (Haus und Hauswesen im alten Arabien, Halle ১৯৯৪ খৃ,. ৬৯)-এর কথায়' প্রাথমিক ইসলামী মসজিদ আসলে এক প্রাচীন আরব ইমারত, বরং কায়সারিয়াও তদ্রূপ, যাহার একদিকে মালগুদাম (পরবর্তীতে যাহা বাজারের রূপ ধারণ করে) থাকিত আর অন্যদিক সচরাচর বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। 'শাহী' অর্থজ্ঞাপক কায়সারিয়ার মূল গ্রীক শব্দটি এই কথাই প্রমাণ করে যে, এই শ্রেণীর প্রাচীনতর সাধারণ ইমারতগুলি সরকারীভাবে নির্মিত হইত। পক্ষান্তরে ইসলামী যুগের এই জাতীয় ভবনসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে হইত (ধনী ব্যবসায়ী, রাজ-পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)। Thiersch মনে করেন (পূ. গ্র., পৃ. ২৩৩) যে, অন্য অনেক বিষয়ের মতো এই সব ভবন নির্মাণের চিন্তা মুসলমানদের নূতন যুগে প্রধানত আলেকজান্দ্রিয়াকে দেখিয়া জাগ্রত হয়, যেই স্থানে বিশেষভাবে বহুছাদযুক্ত বাণিজ্যিক বাজার ও ভবন নির্মিত ছিল। কায়সারিয়ার নাম ও আকৃতির মূল রোমান সম্রাট কাইজারের (قيصر) কায়স'রিয়্যা উপাসনালয় (Caesarem)-কে, যাহার সহিত বাজার ও গুদাম সংযুক্ত থাকিত (Strabo, 17, 794), মনে করিতে হইবে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অবশ্য Vollers (Ztschr. d. Dtsch. Morg. Ges, 51, 302) অনুকূলে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কায়সারিয়া শব্দটি ফিলিস্তীনের কায়সারিয়া শহরের নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে–এই শব্দটির সহিত de Sacy (পূ. গ্র.) একমত হইলেও নির্ভরযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায় না। যাহা হউক, প্রাথমিকে এই শব্দটি কেবল সেই সব অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত যেইগুলি সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও উত্তর আফ্রিকার কোনও কোনও অংশের ন্যায় বায়যানটাইন সম্রাটের অধীন ছিল। এই ধারণা পরবর্তীতে স্পেন ও প্রাচ্যে প্রসার লাভ করে। স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের ভাষায় কায়সারিয়া একটি বহিরাগত শব্দ হিসাবে বিদ্যমান। স্পেনীয় alcaiceiria (Caecria; Cayceria); পর্তুগীজ alcacarias, দ্র. Fr. Canes, Dic Espanol Latino-Arabigo. (Madrid 1787). 1, 69; Dozy-Engelmann, Glossaire des mots espagnolos et portugais derives de i' arabe, 2nd (Leiden 1869), 73, 79; D. Leopoldo de Eguilao, Glos. etim. de las palabras espanolas. de Origen oriental (Granada 1886), 126.

মুসলিম বিশ্বে 'কায়সারিয়া' শব্দটি যেইভাবে ব্যববহৃত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত আলোচনা সহায়ক প্রমাণিত হইবে ঃ মিসরে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কায়রোতে শব্দটির ব্যবহার ছিল। আল-মাকরীযী (মৃ. ৮৪৫/১৪৪১) ঐ শহরের বিবরণ দানকালে বহুসংখ্যক কায়সারিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন, দ্র. আল-খিতাত (বূলাক ১২৭০), ২খ, ৮৬-৯১; E. Rei temeyer, Die Stadtegrundungen der Araber im Islam (১৯১২ খৃ.), ১১৭। পরবর্তীতে ক্রমশ উহার স্থলে ওয়াকালা (وكالة) (Okeler, Okella) শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। Niebuhr-এর যুগে (১৭৬১ খৃ.) কেবল একটি বাজার—যাহা বুলাকের শহরতলীতে অবস্থিত ছিল—কিসসারী (Kissarie) নামে বিখ্যাত ছিল। মরক্কোর কাস [দ্র. কাস] শহরে কায়সারিয়া বলিতে এমন কোন বাজার বোঝা যাইত যাহাকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া শহর হইতে একেবারে পৃথক করিয়া রাখা হইত (দ্র. Dozy, পূ. গ্র, ২খ, ৪৩২; T. Williams, Beitr. zur Assyriol, ৩খ, ৫৮৩; E. Reitemeyer, পূ. গ্র. ১৪৮)। স্পেনের গ্রানাডায় আল-কায়সারিয়া (Alcaiceria) বলা হয় শহরের কাঁচা রেশম বিক্রয়ের এলাকাগুলিকে (দ্র. Tollhausen, Spanisch-deutsch. Worterb, লাইপযিগ ১৮৮৮ খৃ. ১খ, ২৮b; F. v. Schack, পূ. গ্র., ২খ, ৩২৭)।

আমরা প্রমাণ পাই যে, কায়সারিয়া শব্দটি সিরিয়ায় পাইকারী পণ্য-বিক্রেতাদের দোকানের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বৈরূত [দ্র. Niebuhr, পূ. গ্র, ২খ, ৪৬৯ ও Muller, পূ. গ্র. ৭], দামিশকে [দ্র. ইব্ন জুবায়র, আর-রিহ্লা, ২খ, সম্পা. Wright ও de Goeje, পৃ. ২৮৮, ২১ (১১৪৮ হি.) ও Seetzen, Reisen durch Syrien (লাইপযিগ ১৮৫৪ খৃ., ১খ, ২৬৯)] এবং আলেপ্পোতে [দ্র. ইব্ন জুবায়র, পৃ. ২৫২; য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ৩০৭, ছত্র ২৩; ইব্ন বাত্তূতা (সং. প্যারিস), ১খ, ১৫১; A. Russal, The Natural History of Aleppo, London 1794, ১খ, ৩৬, জার্মান অনুবাদ, Gottingen 1797 A. D. p. 45 ও পূর্ব আরবে আল-হাসা (হুফূক দ্র.)-তে শহরের সকল অংশে দোকান-পাট ছিল উহাকে আল-কায়সারিয়া বলা হইত (দ্র. Der Islam, ৮খ, ৩২)। পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইলে মাওসিল (موصل)-এ একটি বাজার পাওয়া যায়, যাহা কায়সারিয়া নামে খ্যাত ছিল, দ্র. ইব্ন জুবায়র, পূ. গ্র., ২৩৫, ছত্র ১৬; মাওসিলের সন্নিকটে সালামিয়া-তে (য়াকূত, ৩খ, ১১৩, ছত্র ২১); ইরবিলে (য়াকূত, ১খ, ১৮৬, ছত্র ২২); বাগদাদে (Massignon. পূ. গ্র., ৯২; বর্তমান চকবাজার]; কারবালায় Massignon পূ. গ্র); ইসফাহানে [Ritter পূ. গ্র., ৯খ, ৪৯; Vullers, Lexic Persico-lat, ২খ, ৭৫৩, আরও দ্র. (ইস্ফাহান) Pietro della Valle, Viaggi (ব্রাইটন ১৮৪৩খৃ.), ২খ, ৮; জার্মান অনু. (Gent 1674), ৩খ, ৫, [Duprei] Voyage en Perse (প্যারিস ১৮১৯), ২খ, ১২৫ এবং W. Ouseley, Travels in Various Countries of the East, ৩খ, (১৮১৯ ১৬খৃ.); তাবরীযে (দ্র. Ritter, পূ. গ্র., ৯খ, ৮৫৬) ও খাওয়ারিযম [উরগানজ]-এর ইব্ন বাত্তূতা, ৩খ, ৪)।

অধিকন্তু এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, Niebuhr (পূ. গ্র.)-এর এক উদ্ধৃতি অনুযায়ী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে বারবারী রাজ্যসমূহে (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়) বড় বড় সরকারী ভবনকে কিস্সিরী (Casseries) বলা হইত। বর্তমানে আলজিরিয়ায় সৈন্যদের বসবাসের ঘরকে কায়সারিয়া বলা হইয়া থাকে (দ্র. Dozy, পূ. গ্র)। হাওরানে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলির সেই সকল মহল্লাকেও কায়সারিয়া বলা হয় যেখানে কোনও এককালে রোমান কিংবা বায়যানটাইন সম্রাটগণ থাকিতেন [দ্র. Wetzstein, Reisebericht uber Hauran etc (বার্লিন ১৮৬০ খৃ.) পৃ. ৫৫]। সাধারণত দেখা যায় যে, বর্তমান

যুগে অনেক ক্ষেত্রে বাজার ও ঐ জাতীয় অন্যান্য স্থানের জন্য কায়সারিয়ার স্থলে 'খান', ওয়াকালা, 'ফুন্দুক', বুযিস্তান ইত্যাদি নূতন নূতন শব্দ চালু হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Niebuhr, Reisbeschr. Von Arabien etc. ১খ. কোপেনহেগেন ১৭৭৪ কৃ.) ১১১, ১২১; (২) Quatremere, Not. et Extr. des Manuscrits ১২খ, ৪৬৮; (৩) Fleischer, Disscritica de glossis Habichtianis (লাইপযিগ ১৮৩৬ খৃ.). ৩৯; (৪) Zenker, Turk, arab. Pers. Hand worterb, পৃ. ৭২৮; (৫) Fr. V. Schack, Poesie und kunst der Araber in Spanien, ২য় সং., ২খ. (Suttgart ১৮৭৭ খৃ.). ৩২৭; (৬) Dozy, Suppl, aux dict. arab, ২খ. ৪৩২; (৭) G. Le., Strange The Lands of the Eastern Caliphate, কেম্ব্রিজ ১৯০৫ খৃ., ৮৯; (৮) H. Thiersch, Pharos, Antike, Islam und Occident (লাইপযিগ ১৯০৯ খৃ.) ২২৩-২৩৩, ২৩০, ছত্র ৫; (৯) Massignon, Mission eh Mesopotamie, ২খ, (কায়রো ১৯১২ খৃ.), ৯২; (১০) K. Muller, Die Karwanserai im vorderen Orient, বার্লিন ১৯২০ খৃ., ৭; (১১) E. Herzfeld, Etimologia d' al-Qaisariyyah, Orient Moderno, ১খ. ৬৯১ এবং উহার উপর সম্পাদকের টীকা।

M. Streck (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কায়সারিয়া (قيصرية) ঃ বা কায়সেরি, ভূসমতল হইতে ১,৩০০ ফুট উর্ধ্বে এরজিয়াসি দাগি-র উত্তর পাদদেশে মধ্য আনাতোলিয়ার একটি শহর। ইহা রোমক আমলের নাম Caesarea-র আরবী রূপ। 'উছমানী আমলে ইহা কায়সেরিয়ে নামে অভিহিত ছিল। আধুনিক তুর্কী ভাষায় ইহার নাম হইয়াছে কায়সেরি।

১. ইতিহাস ঃ হিত্তীয় সাম্রাজ্যের আমলেও ইহা একটি শ্রুত বর্ধনশীল বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এই শহরের কানেশ নামে একটি এলাকায় আসিরীয়দের একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। কায়সারিয়া এককালে Cappadocia রাজ্যের ও পরে রোমক Cappadocia প্রদেশের রাজধানী ছিল। এশিয়া মাইনরে খৃস্টীয় বিশদ পদমর্যাদার যাজকদের যেসব কেন্দ্র ছিল সেইগুলির মধ্যে মর্যাদার দিক হইতে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল Caesarea। ক্যাপ্পাডোসীয় খৃস্টীয় যাজকবর্গের (ফাদার) Basil, Nyssa-র Gregory ও Nazianzus-এর Gregory-এর অধিবাসস্থল ও কেন্দ্র হিসাবে কায়সারিয়া খৃস্টীয় ভাবধারা ও মঠের কেন্দ্র হইয়া ওঠে। সাসানীগণ এই শহরে আক্রমণ ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। ইহার পর ৬১১ খৃস্টাব্দে Heraclius শহরটি পুনরুদ্ধার করিলে ইহা আবার তাহারা শ্রী ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া পায়। ঐ সময় অর্থাৎ ২৬/৬৪৭ সনে মু'আবিয়া (রা)-র বাহিনী শহরটি আক্রমণ করিলে শহর কর্তৃপক্ষ নযরানা দিতে বাধ্য হয় (Michael the Syrian, অনু. Chabot, ii, 400, 441; আবু'ল-ফারাজ, অনু. Budge, i, 97)। হিশামের শাসনামলে (১০৫-২৫/৭২৪-৪৩) মাসলামা কায়সারিয়া শহরের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান চালান এবং সম্ভবত তিনি শহরটি সাময়িকভাবে দখলেও রাখিয়াছিলেন। হিশামের দুই পুত্রও এই শহরে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। ৫ম/১১শ শতকে বায়যান্টিয়ামের অনুসৃত নীতি ও তুর্কী আক্রমণের ফলে ঐ গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ অনুসারী খৃস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রেগরীর অনুসারে আর্মেনীয় খৃস্টানদের আগমন ঘটে (Michael the Syrian, iii, 133)। ৪৫৯/১০৬৭ সনে কায়সারিয়া তুর্কমেন অভিযানে বিধ্বস্ত হয় [দ্র. Cahen, Le premier penetration turque.. in Byzantion, xviii (1948) 25]। Manzikert-এর যুদ্ধের কিছু পরে সম্ভবত ধ্বংসাবশেষের আকারে কায়সারিয়া দানিশ্মান্দ রাজ্যের (Michael the Syrian, iii, 173; আবু'ল-ফারাজ, ১খ, ২২৯) অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম ক্রুসেডের ঘটনা পঞ্জীকারগণ যাঁহারা কায়সারিয়া শহরের মধ্য দিয়া যান তাঁহারা এই শহরের কোনও বিবরণ দেন নাই। এই শহরের বিজেতা গাযী দানিশ্মান্দের পুত্র মালিক মুহাম্মাদ পরিশেষে এই শহরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (Michael the Syrian, iii 237; আবু'ল-ফারাজ, ১খ, ২৫৮)। ৫৬৩/১১৬৮ সনে ২য় কীলীজ আর্সলান দানিশমান্দী শাসকদের নিকট হইতে শহরটি দখল করেন (আবু'ল-ফারাজ, ১খ, ২৯৩)। কায়সারিয়া বেশীরভাগ সময়ই সালজূক শাসকদের শাহী বাসস্থান হইয়া ওঠায় উহা আবার এক শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৬৪১/১২৪৩ সনে বায়গুর নেতৃত্বে মোঙ্গল সেনাবাহিনী শহরটি আক্রমণ করিয়া উহার হাজার হাজার লোককে হত্যা করে, তরুণ-তরুণীদের বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং রাজকোষ, সুরম্য ইমারত ও ভবনগুলি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে (আবু'ল-ফারাজ, ১খ, ৪০৭; ইব্ন বীবী, অনু. Duda, 230 প.)। ৬৭৫/১২৭৭ সনে বায়বারস বিনা বাধায় শহরটি দখল করেন। কিন্তু তাঁহার তথায় উপস্থিত হওয়ার পরেও মোঙ্গল শাসকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় তুর্কমেনগণের যে বিদ্রোহ প্রত্যাশিত ছিল তাহা না হওয়ায় তিনি Taurus পর্বতের দক্ষিণে অঞ্চলে সরিয়া যান। ইহার পর মোঙ্গলগণ ঐ শহরের অধিবাসীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে (আবু'ল-ফারাজ, ১খ, ৪৫৭)।

৭৪৪/১৩৪৩ হইতে ৭৮৩/১৩৮১ সন অবধি কায়সারিয়া Eretna শাসক বংশের অধীনে থাকে ও পরিশেষে এই শাসক বংশের রাজধানীতে পরিণত হয়। ইব্ন বাত্তূতা ইহাকে আনাতোলিয়ার অন্যতম বৃহৎ শহর আখ্যায়িত করিয়াছেন। কায়সারিয়াবাসী কাদী বুরহানু'দ-দীন Eretna শাসক বংশকে উৎখাত করেন এবং তিনি Sivas হইতে কায়সারিয়া শাসন করেন। 'উছমানী সুলতান বায়াযীদ ৮০০/১৩৯৮ সনে নগরটি দখল করেন, তবে তীমূরের নিকট তাঁহার পরাজয়ের পর কায়সারিয়া কারামান শাসক বংশের হাতে চলিয়া যায়। প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া অতঃপর এই নগরটির নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য কারামানের তুর্কোমান ও যু'ল-কাদরীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত চলিতে থাকে। মামলূকগণ ৮২৭/১৪১৯ সনে কারামানীদের নিকট হইতে নগরটি ছিনাইয়া লইতে যু'ল-কাদরীদের সাহায্য করে। পক্ষান্তরে 'উছমানীগণও ৮৩৯/১৪৩৬ সনে এই নগরটি পুনর্দখলের ব্যাপারে যু'ল-কাদরীদের সাহায্য করে। ৮৬৯/১৪৬৫ সনে কারামানীগণ কায়সারিয়া নগর আবার দখল করিয়া লইতেও ৮৭১/১৪৬৭ সনে ২য় মুহাম্মাদ নগরটি যু'ল-কাদরীদের নিকট ফিরাইয়া দেন। পরে 'উছমানীগণ ৮৭৯/১৪৭৪ সনে কারা হিসার দেভেলি দখলের পর কায়সারিয়াকে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনেন। ৮৯৫/১৪৯০ সনে মামলূক-যু'ল-কাদরী বাহিনী আবার আক্রমণ চালায়। ইহার পর নগরটি একাধিকবার মামলূক ও সাফাবী অভিযানের লক্ষ্যে পরিণত হয়। পরে ১ম সেলীম নগরীটিকে ঐ দুই শক্তির হুমকিমুক্ত করেন।

১১শ/১৭শ শতকে কায়সারিয়া অঞ্চলে জালালী নামে এক শ্রেণীর

বিদ্রোহীদের তৎপরতা দেখা দেয়। ১০০৮/১৬০০ সনে কায়সারিয়া সমভূমিতে ও উহার অল্পকাল পরেই কারা য়াযীজী 'উছমানী বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং জালালী দস্যুদল প্রাচীরবেষ্টিত নগরীটি দুইবার অবরোধ করিতে সাহসী হয়। শহরের অধিবাসীগণ এইসব হামলায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক গ্রামবাসী এই আক্রমণে নিহত হয় কিংবা আতঙ্কে অনেক চাষী তাহাদের জোতজমি ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ফলে সাময়িকভাবে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ১০২৭/১৬১৮ সনে পোল্যাণ্ডের Simeon এই শহরে আসিয়া গোটা শহরটিকে প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখিতে পান। কেননা শহরের অধিবাসীরা জালালীদের ভয়ে এতই আতঙ্কিত ছিল যে, তাহারা কোনও পুনর্নির্মাণমূলক কাজে হাত দিতে ভরসা বোধ করে নাই (Polonyali Simeon, অনু. H. Andreasyan. 158 প.)। ১০৩৪/১৬২৪ সনে উযীর চেরক্সেস মুহাম্মাদ আবাযা হাসানের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী সেনাদলকে কায়সারিয়ার নিকট ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। ১০৫৯/১৬৪৯ সনে আওলিয়া চেলেবি, শহরটিকে অনেকটা সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখেন, তবে উহা আর Sivas বা Maras শহরের মতো সমৃদ্ধ ছিল না। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল কায়সারিয়া Capanoghlu derebeys-এর শাসনাধীনে থাকার পর ১৮১৪ খৃ, উহা আবার প্রত্যক্ষ 'উছমানী শাসনাধীন হয়।

'উছমানী সাম্রাজ্যে ১৮৬৪ খৃ. অবধি কারামান ইয়ালেত-এর একটি লিওয়া বা সানজাক থাকার পর কায়সারিয়া আঙ্কারা বিলায়েতের আওতায় চলিয়া যায়। ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ শতকে একমাত্র কাদা' ছিল কারা হিসার দেভেলি। ইহার উপর Nigde-এর কাদী একাধিকবার দাবী উত্থাপন করেন। যাহা হউক, খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের শেষভাগে ঐ অঞ্চলে ইনসেসু (Incesu) ও দেভেলি (Develi) নামে দুইটি কাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের অধীনে কায়সারিয়া একটি বিলায়েত বা ইল-এর মর্যাদা লাভ করে।

২। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ঃ কায়সারিয়া নগরের অবস্থান উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী সুপরিচিত বাণিজ্যপথগুলির পাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হওয়ার কারণে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে উহার গুরুত্ব বরাবরই বজায় থাকে। এই নগরীটির গুরুত্ব আরও এই কারণে যে, ইহা উত্তরে কিযিলিরমাক নদী ও দক্ষিণে এরজিয়াসদাগি-র মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র, উর্বর ও সেচের সুবন্দোবস্তযুক্ত এলাকার কেন্দ্র। আর এই নগরের অধিবাসীদের চাহিদা মিটাইবার মতো প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত ফসল এই এলাকায় উৎপাদিত হয় (জনবসতির ঘনত্বের জন্য দ্র. Bartsch. 130. প.; Tanoglu et al., তুরকিয়ে এটলাসি, মানচিত্র সংখ্যা ৬৭)। গম ও যব কায়সারিয়ার দুইটি প্রধান কৃষিজ সম্পদ। এই দুই ফসল উৎপাদিত হয় কিযিলিরমাক নদী হইতে পেলাস-এর লবণহ্রদের মধ্যবর্তী (কায়সেরি ওভাসি) সমভূমি এলাকায়। ইহা ছাড়া এরজিয়াস (Erdjiyas) পর্বতশ্রেণী ও ইহার অনুচ্চ পাহাড়গুলি নিম্ন ঢালে সিঁড়িবৎ স্তরবিন্যাসে ও সেচের সাহায্যে নিপুণ কৌশলে ফল ও সজির আবাদ হয়। রূম সালজূক শাসকবংশের শাসনামলের সমৃদ্ধির সময়ে সিভাস, কোনিয়া ও কায়সারিয়া আনাতোলিয়ার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পরে ৮ম/১৪শ শতকে এই বাণিজ্য প্রধান শহর নগরগুলি 'উছমানী বুরসা (Bursa) নগরীর নিটক গুরুত্বের দিক হইতে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের কর রেজিস্টারসমূহে (দাফতার-ই খাকানী) বস্ত্র রঞ্জন কারখানা, চামড়া পাকাই কারখানা, কসাইখানা, মিল ও তিসি পেষাই কল এবং boza, মদ ও মোমবাতি উৎপাদন শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। শহরের চতুর্দিকের এলাকায় ছিল অসংখ্য দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ফলের বাগান ও অন্যান্য ধরনের উদ্যান এবং উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ এলাকায় গম ও যবের চাষ ছিল। নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন ধরনের ফল ও সজির, বিশেষত আঙুরের আবাদ হইত, কিশমিশ (শুষ্ক আঙুর) pekmez মদ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। তুলা চাষ ও মধু উৎপাদনও ছিল গুরুত্বপূর্ণ কৃষি তৎপরতা। ইহা ছাড়া আখরোট গাছের বাগান ও ধানের আবাদও করা হইত (দ্র. বারকান, কানুন-নামেলের, 'কায়সেরি' নির্ঘণ্টে; Beldiceanu, Karaman, 45 প. 70 পৃ. ও স্থা.)।

Poland-এর Simeon কায়সারিয়ার উদ্যান-বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলিকে এদির্নের (পৃ. ১৬০) বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আওলিয়া চেলেবি বলিয়াছেন যে, কায়সারিয়ার গম ও যব ছিল বিখ্যাত। তিনি এখানকার প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ও নানা জাতের ফল ও সজির প্রশংসা করিয়াছেন (৩খ, ১৮৪)। Kinneir কায়সারিয়ার "অসাধারণ রকমের সজির প্রাচুর্যের প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এখানকার ফল বিপুল উৎপাদন ও বৈচিত্র্যের কারণে গোটা অনাতোলিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার পশুচারণ ক্ষেত্রও বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ (পৃ. ১০৩ পৃ)। Barkley ইহার প্রচুর ফলন সমৃদ্ধ গম, যব, ধান ও তুলার আবাদযুক্ত সমভূমি এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কুল, আপেল ও quince (নাশপাতি জাতীয় ফল্য) ফলের উদ্যানপূর্ণ পাহাড়গুলির প্রশংসা করিয়াছেন। Hamilton উল্লেখ করিয়াছেন যে, এখানকার gallnut ও হলুদ বেরী ফল (buckthorn berries) ইযমিরে বিক্রয় হইত এবং tragacanth আঠার গাছ, madder (লতাবিশেষ) গাঢ় লাল রঞ্জক যাহার মূল হইতে প্রস্তুত হয়। মদের তলানিজাত নীল রঞ্জক ও সুলতানা কিশমিশ বা মনক্কাও কায়সারিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যগুলির অন্তর্ভুক্ত (২খ, ২৬৭, ২৫৫, ২৬৩; তু. Ainsworth, 307)। Mordtmann এইগুলির সঙ্গে কায়সারিয়ার উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে আলু, ও মৌরী এবং মদ, ব্রাণ্ডি ও বীয়ারের নাম ও (পৃ. ১৪২, ১৪৫) যোগ করিয়াছেন।

সালজূক শাসনামলের পর হইতে সূতী ও মোটা সূতীবস্ত্র ছিল কায়সারিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপণ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। Kinneir লক্ষ করেন যে, বস্ত্র ও কাঁচা তুলা ক্রয়ের জন্য সিরিয়া ও আনাতোলিয়ার সকল জায়গা হইতে বণিকেরা (পৃ. ১০০; তু. Lucas, 173) কায়সারিয়ায় সমবেত হন। কায়সারিয়ার অশ্ব ছিল বিখ্যাত। এখানে কাবাব তৈরী ও pastirma শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য ভেড়া, গরু ও মহিষ ইত্যাদি পশুপালন করা হইত। বস্তুত কায়সারিয়া কাবাব ও pastirma-র জন্য বিখ্যাত ছিল। আওলিয়া চেলেবির আমলে কায়সারিয়ার উল্লিখিত গবাদি পশুর গোশ্তের চাহিদা ইস্তাম্বুলে এত বেশী ছিল যে, খাদ কায়সারিয়াতেও অনেক সময় চাহিদা মুতাবিক গোশ্ত মিলিত না। এখানে উৎপাদিত গৃহপালিত পশুর চামড়া, বিশেষ করিয়া হলুদ 'মরক্কো লেদার (sari sahtiyan) তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে মূল্যবান বিবেচিত হইত এবং স্থানীয় পাদুকা শিল্পের জন্যও এই চামড়া ছিল সমান বিখ্যাত। আজও কায়সারিয়া বিপুল পরিমাণে অনন্য বৈশিষ্ট্যর কার্পেট (গালিচা) ও kelim উৎপাদন করে।

Simeon কায়সারিয়ায় বহু কাফেলা সরাই (কারওয়া সরাই), বেদেস্তান (বস্ত্র বিপণী শ্রেণী), দোকান পাট, বাজার, স্বর্ণশিল্পী ও মণিকারের (পৃ. ১৫৮) উল্লেখ করিয়াছেন। আওলিয়া চেলেবি উল্লেখ করিয়াছেন যে,

বুরসা ও এদ্‌রিনে শহরের মত এই শহরেও দুইটি বেদেসতান ছিল এবং বণিকেরা তাহাদের ব্যবসায়িক লেন-দেন হইতে প্রচুর লাভবান হইতেন (৩খ, ১৮০ প., ১৮৪)। Inciciyan জানাইয়াছেন যে, কায়সারিয়ার বাজারগুলিতে ইস্তাম্বুল ও ভারত হইতে আনীত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইত। Kinneir এই বাজারগুলিকে আনাতোলিয়া ও সিরিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (Simeon, ১৫৯ n; Kinneir, ১০০)। Kinneir বিশেষ করিয়া এই নগরের তুলার বাজারকে বিরাট বাজার (১খ, ১৭৩) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। Hamilton এই বাজারগুলিকে বিরাট ও সমৃদ্ধ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, এইসব বাজার আমদানীকৃত সস্তা পণ্যদ্রব্যে (২খ, ২৬৭)। পরিপূর্ণ। Von Schweinitz এইসব চমৎকার বাজার ও বিপণী কেন্দ্রের সুখ্যাতি করিতে গিয়া কায়সারিয়াকে অন্তত আনাতোলিয়ার (পৃ. ১১৬ প.) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর বলিয়া রায় দিয়াছেন। Mordtmann-এর ভাষায় কায়সারিয়া আনাতোলিয়ার (পৃ. ৪৯২) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির অন্যতম। তিনি বলেন যে, আনুমানিক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে এই শহরের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পূর্ণত স্থানীয় "ক্যাপ্পাডোসীয় খৃষ্টানদের হাতে ছিল"। অবশ্য ১১শ/১৭শ শতকে মুসলিমগণও তখনকার ব্যবসায়-বাণিজ্যে তৎপর হয়।

পেলাস-এর লবণহ্রদ ও হাজ্জী বেকতাশ হইতে শহরে প্রচুর লবণের যোগান আসিত, জিপসামও পাওয়া যাইত (Hamilton, ২খ, ২৪৬; Ainsworth, পৃ. ৩১১; Moltke, পৃ. ৩২৯; Mordtmann. পৃ. ১৪৭)। ১৯শ শতকে সারিওগলানেহ্রদের নিকটবর্তী এলাকায় এক বিরাট শোরা খনি অবস্থিত ছিল (Hamilton, ২খ, ২৫৯; Mordtmann, পৃ. ১৪৭)। আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত 'তুফা' (পাথর বিশেষ) নামক পদার্থ এই অঞ্চলের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া থাকায় উহা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের এক চমৎকার, সস্তা গৃহ-নির্মাণ ও অন্যান্য সামগ্রী হিসাবে কাজে লাগে।

১৯২৭ খৃ. আঙ্কারা হইতে কায়সারিয়া পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। ১৯৩০ খৃ. সামসুনের সহিত ও ১৯৩৩ খৃ. উলুকিসলার সহিত কায়সারিয়ার রেলযাগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কায়সারিয়া নগরী এক গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশনে পরিণত হয়। কিছুকাল আগে কায়সারিয়ার সহিত দেশের অন্যান্য স্থানের উত্তম সড়ক যোগাযোগও স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৩৫ খৃ. রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এক বিশাল কাপড়ের কল (বর্তমান কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২,৫০০) প্রধানত সোভিয়েট ঋণ সহায়তায় স্থাপিত হয়। কায়সারিয়ায় বিমান নির্মাণ (সংযোজন) কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃ. এই নগরীতে প্রতিটিতে ৫০ জনেরও বেশী কর্মীসহ ১৬টি কারখানা (পাঁচটি রাষ্ট্রীয় ও ১১টি বেসরকারী মালিকানাধীন) ছিল। ইহা ছাড়া প্রতিটিতে গড়ে ৫ জনের বেশী কর্মচারীসহ আরও এক শত এবং প্রতিটিতে এক হইতে পাঁচ জন কর্মচারী নিয়োজিত এমন ৫০০ কারখানা ছিল (কায়সেরিইল য়িল্লিজি, পৃ. ২০২)। যন্ত্রপাতি নির্মাণ, কাঠ ও ধাতব পণ্য নির্মাণ, রবার নির্মিত পণ্য, প্রেসার কুকার ও দুগ্ধ-পাস্তুরিতকরণ এই নগরীর প্রধান শিল্প।

ইহা ছাড়া শীর্ষস্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প পণ্য হিসাবে সূতী ও পশমী বস্ত্র, গালিচা ও কম্বল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, খাদ্যশস্য, পশম, গবাদিপশু, পশুখাদ্য ও pastirma-র উৎপাদন চলিতে থাকে। বস্তুত কায়সারিয়া ছিল অত্যন্ত শিল্পোন্নত নগরী ও এই নগরীর অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান অধিকাংশ তুর্কী নগর-শহরের জীবনমানের তুলনায় অধিকতর উন্নত ছিল।

৩। জনসংখ্যা পরিস্থিতি ঃ ১৫০০ হইতে ১৫৮৩, ১৮১৩ হইতে ১৯০৭ এবং ১৯২৭ হইতে ১৯৭০ খৃ. পর্যন্ত এই নগরীর জনসংখ্যা সংক্রান্ত দলীল-পত্রাদি পাওয়া যায়। চারটি 'উছমানী কর রেজিস্টারে (দাফতার-ই মাকানী) ১০খ/১৬শ শতকের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। ৯০৫/১৫০০ সনে শহরের করদাতা পুরুষ নাগরিকের সংখ্যা ছিল ২২৮৭। ইহাদের মধ্যে ৮৬% ছিল মুসলিম ১৪% যিম্মী (অমুসলিম) (১৯৬১/৩২৬)। সুলায়মানের শাসনামলের গোড়ার দিকে জনসংখ্যা (পুরুষ) ছিল ২৩৬৭। ইহাদের মধ্যে মুসলিমের হার ছিল ৮১% ও যিম্মীদের ১৯% (১৯০৭/৪৫৭)। সুলায়মানের শাসনামলের শেষের দিকে এই নগরীর মোট করদাতা পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৫০। ইহাদের মধ্যে মুসলিম ৮১% ও যিম্মী ১৯% (২৮৭০/৬৬০)। ৯৯১/১৫৮৩ সনে শহরে করদাতা পুরুষের সংখ্যা ছিল ৮২৫১। ইহার শতকরা ৭৮% ছিল মুসলিম ও ২২% যিম্মী (৬৪৩৫/১৮১৬)। এক শতকেরও কম সময়ের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা কার্যত চতুর্গুণ হয়। গ্রামীণ জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ৯ম/১৫শ শতকের বিরাজমান অরাজকতার কারণে জনসংখ্যা ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর এই নগর ও সন্নিহিত অঞ্চলের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায় (Basbakanlik arsivi tapu defter nos, 33, 387, এবং 976; তু. no. 38; Ankara tapu kadastro dairesi, no 136)। ৯৯১/১৫৮৩ সনে এই শহরে বসত বা 'খানা'র সংখ্যা ছিল ৬০১৫। প্রতিটি এই 'খানা' বা পরিবারে গড়ে ৫.৫ জন করিয়া মানুষ ছিল অর্থাৎ এই হিসাবে নগরীর জনসংখ্যা ছিল ৩৩,০৮২ (৪×৮২৫১=৩৩,০০৪, সম্ভবত করদাতা পুরুষ অধিবাসীদের এই জনসংখ্যাকে ৪ দিয়া গুণ করিলে শহরের একটা মোটামুটি মোট জনসংখ্যা পাওয়া যায়)। নগরে অমুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ১৫০০ খৃষ্টাব্দের ১৪% হইতে ৯০১/১৫৮৩ সনে ২২% বৃদ্ধি পায়। ৯০৫/১৫০০ সনে শহরে মোট অমুসলিমদের ৮২% ছিল আর্মেনীয়। ইহাদের এই অনুপাত গ্রীকদের তুলনায় অনেক দ্রুত হারে ৯৯১/১৫৮৩ সনে ৮৯%-এ বৃদ্ধি পায়। এইসব জরীপে কোনও য়াহূদী ধর্মাবলম্বীর উল্লেখ না থাকিলেও ১০৫৯/১৬৪৯ সনে আওলিয়া চেলেবী একটি য়াহূদী উপাসনালয়ের (সিনাগগ) (৩খ, ১৮৩) অস্তিত্বের কথা জানাইয়াছেন।

৯৯১/১৫৮৩ সন হইতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সরকারী পরিসংখ্যান আর পাওয়া যায় না। Poland-এর Simeon-এর হিসাব অনুযায়ী ১০২৬/১৬১৮ সনে শহরে ৫০০ আর্মেনীয় 'খানা' বা পরিবার ছিল। এক্ষেত্রে বলা যায়, হয় তিনি কম আন্দাজ করিয়াছিলেন অথবা জালালী বিদ্রোহের কারণে বিপর্যয়করভাবে ঐ শহরের জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল (পৃ. ১৫৮)। আওলিয়া চেলেবি নগরীর প্রাচীর বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ৬০০ 'খানা'র উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বেশীর ভাগ অধিবাসী ১০ম/১৬ম, শতকে নগরের প্রাচীর বেষ্টনীর বাহিরের এলাকায় বসবাস করিত (৩খ, ১৭৭)।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারীতে কায়সারিয়া নগরীর পুরুষ অধিবাসীর সংখ্যা ১৩,৪৬৬ জন (৭,০০৩ জন পূর্ণ বয়স্কপুরুষ, অনূর্ধ্ব ১২ বৎসর বয়সের পুরুষ শিশু ও বালক, ২১৫ জন সামরিক বাহিনীর লোক, ৩১ জন পঙ্গু) ও মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ২৬,৯৩২। আবার এই সম্পর্কিত অন্য এক বিবরণে ঐ শহরে 'খানা' বা পরিবারের সংখ্যা ৫,১৮৪ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (খানা প্রতি ৫ জন মানুষ হিসাবে মোট ২৫,৯২০) (কারাল, ইলক নুফুস সায়িমি, ১৮৩১ খৃ., ১১৩)। Kinneir ১৮১৩ খৃ.

এই নগরের জনসংখ্যা ১,৫০০ আর্মেনীয়, ৩০০ গ্রীক ও ১৫০ জন য়াহূদীসহ (পৃ. ১০০) মোট ২৫,০০০ বলিয়া যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহার সহিত ঐ হিসাব সঙ্গতিপূর্ণ। Texier-এর মতে ১৮৩৪ খৃ. শহরের সরকারী হিসাব মুতাবিক জনসংখ্যা ছিল ৬০,০০০ অর্থাৎ ১১,৯০০ খানা বা গৃহস্থালী (১০,০০০ তুর্কী, ১,৫০০ আর্মেনীয়, ৪০০ গ্রীক)। Hamilton-এর হিসাব অনুযায়ী ১৮৩৭ খৃ. শহরে ১০,০০০টি গৃহ ছিল। মনে হয় এইসব লেখক তাঁহাদের তথ্যের সূত্র হিসাবে একটি মাত্র অভিন্ন ও ভ্রান্ত উৎস ব্যবহার করিয়াছেন নতুবা তাঁহারা সম্ভবত কায়সারিয়া কাদা'র জন্য প্রযোজ্য পরিসংখ্যানগুলিকে কায়সারিয়া নগরের পরিসংখ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Texier, 544; Hamilton, ii, 267)। Poujoulat-ও ১৮৩৭ খৃ. এই শহরে ৯,০০০ তুর্কী ৬,০০০ আর্মেনীয় ও ৪,০০০ গ্রীক—মোট ১৯,০০০ অধিবাসীর উল্লেখ করিয়াছেন (খৃষ্টানদের হিসাবের অনুপাতটি একান্ত অতিরঞ্জিত, ১খ, ২১৩। Ainsworth স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বা আ'য়ান-এর (১৮৩৯ খৃ.) তথ্যের বরাত দিয়া বলিয়াছেন (পৃ. ৩০৮), শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮,৫২২ (১২,১৭৬ মুসলিম, ৫,২৩৭ আর্মেনীয় ও ১,১০৯ জন গ্রীক)। এই নগরের জনবসতি কোনওরকমে হ্রাস পাইয়া থাকিলে তাহার কারণ হিসাবে সম্ভবত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের তীব্র ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ ভূমিকম্প শহরের বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয় এবং ৬৬৫ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। Poujoulat এই ভূমিকম্পে ৪,০০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায় বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন তাহা সুনিশ্চিতভাবেই হয় অতিরঞ্জিত হিসাব নতুবা এই প্রাণহানির বিপুল সংখ্যা গোটা প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য। অবশ্য Mordtmann যুক্তিগ্রাহ্যভাবে দাবী করিয়াছেন যে, Ainsworth শহরের জনসংখ্যার যে পরিসংখ্যান দিয়াছেন তাহা শহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা নয়, বরং শহরের 'পুরুষদের' সংখ্যা অর্থাৎ ঐ শহরে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৭,০০০-এর মতো (Ainsworth, 310; Hamilton, 258, Poujoulat, i, 210 প.)।

১৮৪৮ কৃ. কলেরা মহামারীতে এই শহরের ৩,০০০ লোক প্রাণ হারায়। Mordtmann এর হিসাব অনুযায়ী শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৮,৪১৩ জন পুরুষ (১২,১৪৪ জন মুসলিম, ৫,০০০ আর্মেনীয় ও ১,০৬৭ জন গ্রীক)। এই ভিত্তিতে শহরের মোট জনসংখ্যা ৩৬,৮২৬-কে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান বলিয়া দৃশ্যত গ্রহণ করা চলে (পৃ. ১৪১, ১৪৩)। ১৮৫৮ খৃ. Barth-এর হিসাব অনুযায়ী শহরের (১০,০০০ গৃহের মধ্যে) ৮,০০০ গৃহে মানুষের বসবাস ছিল অর্থাৎ ঐ শহরে ৪০,০০০ লোকের বসবাস ছিল। এই হিসাব অনুসারে এক দশকে এই শহরে জনসংখ্যা বেশ বাড়িয়া যায় (পৃ. ৫৮)। ১৮৯২ খৃ. Cuinet হিসাব করেন যে, কায়সারিয়া কাদা-র লোকসংখ্যা ছিল ৭২,০০০ (৪৫,০০০ মুসলিম, ৯,০০০ আর্মেনীয় জর্জীয়, ১৪,৮০০ গ্রীক অর্থোডক্স খৃষ্টান, ৮০০ আর্মেনীয় ক্যাথলিক ও ১,২০০ প্রটেস্ট্যান্ট)। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কায়সারিয়া কাদা'র এলাকার আওতায় কায়সারিয়া নগরের চতুর্দিকের বহু গ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১খ, ৩০৭)। Townshend-এর হিসাব মতে ১৯০৪ খৃ. এই শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ (২০,০০০ খৃষ্টানসহ যাহাদের তিন-চতুর্থাংশই আর্মেনীয়, পৃ. ১১৯)। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আঙ্কারার বিলায়েত সালনামেতে ঐ শহরে অধিবাসীর সংখ্যা ৫৪,০১১ বলিয়া উল্লেখ আছে (১৭,৫৩৬ জন মুসলিম পুরুষ, ১৭,১৬৮ জন মুসলিম নারী, ৯,৫২১ জন অ-মুসলিম পুরুষ ও ৯,৭৮৬ জন অ-মুসলিম নারী পৃ. ২০৯)। দৃশ্যত ১৮১৩ হইতে ১৯০৭ খৃ. সনের মধ্যে ঐ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে।

১০ম/১৬শ শতকে কায়সারিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু যাযাবর, স্থায়ী নিবাসী ও স্থায়ী নির্বাসনের প্রকিয়াধীন য়ুরুক, তুর্কমেন ও কুর্দও অন্তর্ভুক্ত। য়ুমুন য়ায়লার সমৃদ্ধ পশুচারণ অঞ্চলে আফশার যাযাবর জাতির বহু লোকের বাস। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চেরকেস নামক এক গোত্রের বহু দেশত্যাগী লোক আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দেয়। কুর্দ ও আফশারগণ সংখ্যায় আজও বিপুল। আর য়ুযুন য়ায়লা তুরস্কে চেরকেস গোষ্ঠীর লোকদের অন্যতম প্রধান বসতিস্থল।

৯ম/১৫শ শতকের শেষভাগের একেবারে গোড়ার দিকের কর সংক্রান্ত নথিপত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী তখন হইতেই কায়সারিয়া নগর ও প্রদেশ—উভয়ের জনসমষ্টিতে মুসলিমগণই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিপুল সংখ্যক অর্থোডক্স ও জর্জীয় খৃষ্টান কায়সারিয়া নগর ও উহার নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে প্রায় ক্ষেত্রেই মুসলিমদের সহিত মিশিয়া বাস করিত। কায়সারিয়া নগরে জর্জীয় খৃষ্টানগণ অর্থোডক্স চার্চের অনুসারী খৃষ্টানদের অপেক্ষা তিন হইতে চারগুণ বেশী ছিল এবং ১০ম/১৬শ ও ১৯শ শতক—উভয় আমলেই এই আনুপাতিক পরিস্থিতি বহাল ছিল। মুষ্টিমেয় কিছু গ্রামে গ্রীক ও আর্মেনীয় ভাষায় কথা বলা হইত। ১৯শ শতকের বহিঃপ্রভাবে এইসব খৃষ্টানদের হেলেনীয় ও আর্মেনীয়করণ প্রয়াস সত্ত্বে প্রায় সকল খৃষ্টানই তুর্কী ভাষাভাষী রহিয়া যায়। (দ্র. R. M. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor; Inciciyan, Simeon-এর লেখায় উদ্ধৃত, নং ১৬১; Simeon, পৃ. ১৫৮; আওলিয়া, ৩খ, ১৮৩; 'Kurde' শব্দটি মনে হয় 'Ermenice' শব্দটির পরিবর্তে ভুলবশত বসিয়াছে। আরও দ্র. Mikrasiatika Kronika সাময়িকী)। ১৯২২ খৃ. কায়সারিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল আনাতোলিয়া অর্থোডক্স খৃষ্টান মহাসম্মেলন ঘোষণা করে যে, তাহারা তুর্কী জাতীয়তার আনাতোলীয় খৃষ্টান। একই ভিত্তিতে তাহারা 'গ্রীক' খৃষ্টীয় যাজক ব্যবস্থাকে অস্বীকার পূর্বক একটি তুর্কী খৃষ্টীয় চার্চ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তাহাদের ঐ প্রয়াস বাধ্যতামূলকভাবে গ্রীক-তুর্কী জনসমষ্টির বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় পড়িয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (Teoman Fregene, Istiklal harbinde turk ortodokslari, 18, প., ২৩-৪২)।

আর্মেনিয়ার পরাজয় ও গ্রীক অধিবাসী বিনিময়ের পর তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রথম আদম- শুমারীতে দেখা যায়, কায়সারিয়ার জনসংখ্যা ৩৯,৫৪৪-এর হ্রাস পাইয়াছে এবং মাত্র ১২৭৭ জন আর্মেনীয়, জর্জীয় ও ৬ জন গ্রীক অর্থোডক্স খৃষ্টান শহরে রহিয়াছে। শহরের জনসংখ্যা ১৯৩৫ খৃ. ৪৬,১৮১ (বৃদ্ধির হার ২৩%-এর উর্ধ্বে), ১৯৪০ খৃ, ৫২,৪৬৭ (২১%-এর উর্ধ্বে), ১৯৪৫ কৃ. ৫৭,৮৬৩ (১৫%-এর উর্ধ্বে), ১৯৫০ খৃ. ৬৫,৪৮৮ (৩৪%-এর উর্ধ্বে), ১৯৫৫ খৃ. ৮২,৪০৫ (২৬%-এর উর্ধ্বে), ১৯৬০ খৃ. ১,০২,৫৯৬ (২৫%-এর উর্ধ্বে), ১৯৬৫ খৃ. ১,২৬,৬৫৩ (২২%-এর উর্ধ্বে) এবং ১৯৭০ খৃ. ১,৬৭,৬৯৬ জনে (৩৩%) উন্নীত হয়। অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে এই শহরের জনসংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার ১০ম/১৬শ শতকের হারের তুলনায় দ্রুততর (কায়সেরি ইল য়িল্লিজী, ১২২ ১২৪-৭)।

৪। সংস্কৃতি ঃ রা'ঈসু'ল-কুত্তাব রাশিদ এফেন্দী ১২১০/১৭৯৬ সনে একটি গ্রন্থগার ওয়াকফ করিয়া দেন। কায়সারিয়ার এই গ্রন্থাগারে ৯৪৩টি

গ্রন্থ (৯২৬টি পাণ্ডুলিপি, ১৭টি মুদ্রিত গ্রন্থ) সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত নূতন কিছু গ্রন্থও গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সংযোজিত হইয়াছে (দ্র. Ahmed Okutan, Kayseri Umumi kutuphanesi Rasit Efendi kismi Usul-i hadis ve hadis ilmine ait arapca elyazma eserler katalogu, Istanbul 1964)। শহরে একটি II Halk Kutuphanesi ও একটি ক্ষুদ্র যাদুঘর আছে। যাদুঘরের বেশীর ভাগ সংগ্রহই প্রাক-ইসলামী যুগের নিদর্শন।

এই শহরের পুরাতন স্থানটি (এসকি শেহির) নগরের দক্ষিণ প্রান্তরে বাততাল গাযীর মাযারের নিকট অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি সমভূমি ও এরজিয়াস পর্বতশ্রেণীর অনুচ্চ পাহাড়গুলির মিলনস্থল। কায়সারিয়া স্থাপত্য সৌধাবলীর দিক হইতে সমৃদ্ধ। H. Edhem ও A. Gabriel এই সকল সৌধের এক সুপ্রণীত তালিকা দিয়াছেন। শহরের প্রাচীরের ভিতরের দুর্গপ্রাসাদ ও সাবেক প্রাচীরের একটি বড় অংশের অস্তিত্ব আজও বজায় আছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি মাদরাসা, মসজিদ, মাযার, 'খান' যেগুলি প্রাচীন সালজূক আমলের স্থাপত্যকীর্তি। এইসব সৌধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যগুলি হইতেছে ঃ Ulu Cami, চিফটে মাদরাসা, হুআন্দ হাতুন (Huand Hatun) মসজিদ-মাদরাসা-হাম্মাম ভবনরাজি, হাজ্জী কিলিচ মসজিদ, Doner Kumbet, কুরুশুনলু মসজিদ (সিনান-এর পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্মিত) ও উযীর 'খান'। এই স্থাপত্যকীর্তিগুলি সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের এক জোরদার কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে।

কিছুকাল আগে বাততাল গাযী মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করা হইয়াছে এবং ইহারই আঙিনার নীচে রহিয়াছে বাততাল গাযীর সুবিখ্যাত মাযার। স্থানীয় ভক্তরা তাঁহার মাযার যিয়ারত করিতে এখানে আসেন। জালালু'দ-দীন রূমীর শিক্ষক সায়্যিদ বুরহানু'দ-দীন-এর মাযারটিও উল্লেখযোগ্য। মুসলিম, খৃষ্টান ও মিশ্র পর্যায়ের অন্যান্য পবিত্র সৌধ বা স্থানগুলির জন্য দ্র. আওলিয়া, ৩খ, ১৮৬-৯ ও Carnoy-Nicolaides, স্থা.। সালজূক আমলে কায়সারিয়ায় সাতটি মাদরাসা ছিল অর্থাৎ মাদরাসার সংখ্যা কোনিয়া শহরের সমান ও আনাতোলিয়ার অন্য যে কোনও শহরের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল (দ্র. এ. কুরান, আনাদোলু মেদ্রেসেলেরি, ১)। সুলায়মানের আমলে এই নগরে তিনটি জামি' মসজিদ, ২০টি সাধারণ মসজিদ, ১০টি মাদরাসা, ১৭টি যাবিয়া, তিনটি হাম্মামও ১০৭টি বিপণী ছিল।

শহরে শীতকালের জীবনযাত্রা এবং এরজিয়াস পাহাড়ের দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলিতে গ্রীষ্মকালীন জীবনধারা এমনকি আজও কায়সারিয়ার আর্থ-সামাজিক জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কায়সারিয়ার উল্লিখিত নিসর্গশোভা ও জীবনধারা প্রায়ই স্থানীয় কাব্যকর্মের উপজীব্য বিষয় (দ্র. এ. সাতোগলু, কায়সেরি সায়রলারি ও এর্‌সিয়েস হালকেভি দের্‌জিসি)। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত (আওলিয়া, ৩খ, ১৮২; Mamilton, ii, 268; Mordtmann, 141; Kinneir, 104)। খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের কিছু পর্যটক কায়সারিয়া নগরকে নোংরা ও কসাইখানা, গোশত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং চামড়া পাকাই কারখানাময় শহর বলিয়াছেন। অবশ্য এইসব শিল্প ও ব্যবসায় তৎপরতা যে শহর-নগরে আছে সেগুলির দৃশ্য এমন না হইলে তাহাকে বিরল ব্যতিক্রমই বলিতে হয়। কোনও কোনও পর্যটক অবশ্য শহরের প্রস্তর নির্মিত আবাসগৃহগুলিকে সুরুচিপূর্ণ বলিয়াছেন। Moltke ও von Schweinitz এই শহরকে সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। বস্তুত এর্‌জিয়াস পর্বতমালা, ইহার গাত্রে জৌলু সময় সৌন্দর্যেভরা উদ্যানশ্রেণী, স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী যাহাদের অবলোকন করার সুযোগ হইয়াছে তাহাদের নিকট ইহার সৌন্দর্য ধরা পড়িতে বাধ্য।

কায়সারিয়াবাসীদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও তাহাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা ও নৈপুণ্য সুবিদিত। Hasluck বলিয়াছেন যে, এই শহরের অধিবাসীরা 'সনিষ্ঠ সুন্নী' ধারার ঐতিহ্যবাহী (৫১৩, ২৩ এন)। Carnoy-Nicolaides এক কাহিনীর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিতে চাহিয়াছেন যে, কোনও য়াহূদীর পক্ষেই কায়সারিয়াতে বসবাস করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ ইহার মধ্যে এই শহরের অধিবাসীদের ব্যবসায়ে পরম দক্ষতার ইঙ্গিত রহিয়াছে (২২৬-৬)। আওলিয়া চেলেবি এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের অত্যন্ত পরিশ্রমী হওয়ার কারণ এখানকার শীতল জলবায়ু (৩খ, ১৮২)। Poland-এর Simeon অবহিত ছিলেন যে, কায়সারিয়ার অধিবাসীদেরকে 'রাসভ রঞ্জক' বিবেচনা করা হয় (১৬০, Carnoy, 247 পৃ.)। ইহাও আজিকার তুরস্কে বহুল প্রচলিত বিশ্বাস যে, কায়সারিয়ার জনগণের ব্যবসায় করিবার জন্য বিশেষ প্রবণতা ও যোগ্যতা রহিয়াছে। তাহারা পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Bartsch, Das Gebiet des Erciyes Dagi und die Stadt Kayseri im Mittel-Anatolien, in Jahrbuch der Geographischen Gesellschsft zu Hannover fur 1934 und 1935, (1935), 87-202; (২) H. Edhem, Kayseriye sehri, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪ হি.; (৩) A. Gabriel, Monuments turcs d' Anatolie i, Kayseri-Nigde, প্যারিস ১৯৩১ খৃ.; (৪) E. Carnoy ও J. Nicolaides, Traditions populaires de l'Asie Mineure, প্যারিস ১৯৬৭ খৃ.; (৫) P. Stirling. Turkish village, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ.; (৬) R. Janin, Cesarec, ii, in Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques, xii, 199-203; (৭) Kayseri il yilligi, 1968, আঙ্কারা; (৮) K. Ozdogan, Kayseri tarihi, কায়সেরি ১৯৪৮ খৃ.; (৯) Koy Isleri Bakanligi, Koy envanter etudlerine gore Kayseri, 1965; (১০) Maden Tetkik ve Arama Enstitusu, Turkiye jeoloji haritasi (Kayseri), আঙ্কারা ১৯৬৩ খৃ.; (১১) B. Darkot, in IA; (১২) M. Streck, in EI1,; (১৩) M. T. Gokbilgin, XVI. Asir baslarinda Kayseri sehri ve livasi, in Zeki Velidi Togan'a armagan, ইস্তাম্বুল ১৯৫০-৫খৃ., পৃ. ৯৩-১০৮; (১৪) N. Beldiceanu-I. Beldiceanu-Steinherr, Recherches sur la province de Qaraman au XVI[e] Sieele, Leiden 1968; (১৫) O. Barkan, Kanunnameler. Michael the Syrian, Chronique. সম্পা. ও অনু. J.-B Chabot, ৩ খণ্ডে, Brussels, পুনঃ-মুদ্রণ, ১৯৬৩ খৃ.; (১৬) Gregory Abu'l Faraj (Bar Herbraeus), Chronography সম্পা. ও অনু., Wallis Budge, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৩২ খৃ.; (১৭) Teoman Ergene. Istiklal harbinde turk ortodokslari, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ.; (১৮) N. Kaymaz,

Pervane Mu'inu'd-din Suleyman. আঙ্কারা ১৯৭০ খৃ.; (১৯) Yasar Yucel, Kadi Burhaned-din Ahmed ve devletleri (1344-1398) আঙ্কারা ১৯৭০ খৃ.; (২০) I. U. H. Uzuncarsil Anadolu beylikleri..., আঙ্কারা ১৯৬৯ খৃ.; (২১) Polonyali Simeon, Seyahamesi 1608-1609, অনু. H. Andreasyan, ইস্তাম্বুল ১৯৬৪ খৃ.; (২২) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাতনামেসি; (২৩) Paul Lucas, Voyage, ২ খণ্ডে, প্যারিস ১৭১২ খৃ.; (২৪) J. M. Kinneir. Journey through Asia Minor Armenia and Koordistan in the years 1813 and 1814, লন্ডন ১৮১৮ খৃ.; (২৫) C. Texier Asie Mineure, প্যারিস ১৮৬২ খৃ.; (২৬) W. J. Hamilton, Researches in Asia Minor. Pontus and Armenia, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৪২ খৃ.; (২৭) W. Ainsworth Journey to Angora by Kaisariyah, Malatiyah, and Gergen Kalehsi, to Bir or Birehjik, in J. of the Royal Geographical Society, (1841). 275-340; (২৮) H. von Moltke, Briefe uber Zustande und Begebenheiten in der Turkei aus den Jahren 1835 bis 1839, in Gesammelte Schriften. viii বার্লিন ১৮৯৩ খৃ.; (২৯) A. D. Mordtmann, Anatolien Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien, সম্পা., F. Babinger, Hanover 1925; (৩০) H. Barkley, A. Ride througuh Asia Minor and Armenia, লন্ডন ১৮৯১ খৃ.; (৩১) H. Barth, Reise von Trapezunt durch die nordliche halfte Klein-Asiens nach Scutari im Herbst 1858, in A. Petermann. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt uber Wichtige Neue Erforschungen. Gotha 1860; (৩২) W. M. Ramsay, Impressions of Turkey during twelve years' wanderings, New York 1897; (৩৩) H. von Schweinitz, In Kleinasien ein Reitausflug, durch das Innere Kleinasiens im Jahre 1905, বার্লিন ১৯০৬ খৃ.; (৩৪) A. F. Townshend, A Military Consul in Turkey (1903-1906), লন্ডন ১৯১০ খৃ.; (৩৫) Arshak Alboyajian (Alpoyachian). History of the Armenian Caesarea, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৯৩৭ খৃ. (in Armenian); (৩৬) Everekli (Or Kayserili) Anastasios Levidis, Kappadokia, ৫ খণ্ডে, Athens 1885 (গ্রীক ভাষায়); (৩৭) Endurluklu Pavlos Karolidis, Kappadokia (গ্রীক ভাষায়); (৩৮) Johannes Joannides Kaysariyya, 1296/1897 (গ্রীক হরফে তুর্কী ভাষায়); (৩৯) আহমেত নাযিফ, মিরাতু'ল-কায়সারিয়ে (অপ্রকাশিত পাণ্ডু); (৪০) Erciyes Halkevi Dergisi (স্থানীয় পত্রিকা); (৪১) A. Satoglu, Kayseri sairleri, আঙ্কারা ১৯৭০ খৃ.; (৪২) M. Baydur. Kultepe (Kanes) ve Kayseri tarihi uzerine arastirmalar, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.; (৪৩) H. Kocer, Kayseri ulemasi, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ.; (৪৪) আলী রিযা ওনদার, কায়সেরি বাসিন তারিহি, আঙ্কারা ১৯৭২ খৃ.; (৪৫) R. Jennings, Loans and Credit in early 17th century Ottoman judicial records—the Sharia court of Anatolian Kayseri, in JESHO, xvi (1973), 168-210; (৪৬) ঐ লেখক, Urban population in Anatolia in the 16th century. in IJMES, vi (১৯৭৫)।

R. Jennings (E. I.[2])/ আফতাব হোসেন

কায়সারী (দ্র. কায়সারিয়া)

কায়ানী (کیانی) ঃ ইরানী রাজবংশ, বহুলাংশে পৌরাণিক নাম কাভী উপাধি হইতে উদ্ভূত (দ্র. Gr. I. Ph., ii, index s. v.)> 'পাহলাবীকায়' (ব. ব. কায়ান, আরবীতে আক্য়ান), পাঠের কিছু ব্যতিক্রমে কতিপয় ব্যক্তি ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্যের নামটি ধারণ করিয়াছে। A. Christensen রাজবংশটির একটি বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। (দ্র. les Kayanides, কোপেনহেগেন ১৯৩১ খৃ.)। প্রাচীন ইরান সম্বন্ধে উত্থাপিত সকল সমস্যার জন্য ইহার প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা উচিত।

রাজবংশটির বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক ও লেখকের জন্য প্রধান উৎস হইল "কিতাব সিয়ার 'মুলূকি'ল-'আজমত্", যাহা ইবনু'ল-মুকাফ্ফা (দ্র.) রচিত খুদায়নামা-এর আরবী অনুবাদ। কিন্তু প্রথম দিকের আরবী গ্রন্থকারগণ সাসানীয়দের পূর্ববর্তী অল্পবিস্তার পৌরাণিক শাসকদের উপর শুধু কতক পরিমাণে এলোমেলো তথ্য প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় যে, তাঁহারা অবশ্য অন্য উৎস ব্যবহার করিয়া থাকিবেন, বিশেষ করিয়া মৌখিক উৎস (দ্র. ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ৬৫২ প.)। আল-মাস'উদীর মুরূজ (২খ, ১৩৩-৪=৫৫৮)-এ উল্লিখিত ইবনু'ল-কালবী মনে করেন যে, কায়ানীরা পৃথিবীতে প্রথম রাজা ছিলেন। আল-মাস'উদী পীশদাদী (দ্র.)-দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদিগকে ভুলক্রমে খুদাহান নামে অভিহিত করিয়াছেন (২খ, ২৩৭, শা. ৬৫৯)। তিনি নিজে কায়ানীদের বস্তুত দ্বিতীয় রাজবংশ মনে করেন, তাঁহাদের পরে আসিয়াছে আরসাসী রাজবংশ আশকান [দ্র. মুলূকু'ত-তাওয়া'ইফ] এবং সর্বশেষে সাসানী রাজবংশ (দ্র.)। তাঁহার পূর্বে আত-তাবারী, এবং তারপরে পরবর্তী ঐতিহাসিক ও লেখকবৃন্দ আকিমিনীদের উল্লেখ না করিয়া একই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করেন। ফিরদাওসী তাঁহার দিক হইতে কায়ানীদের সম্পর্কে ২৭,০০০ বায়ত উৎসর্গ করিয়াছেন।

ধর্মীয় ঐতিহ্যে এক ডজন ব্যক্তি 'কায়' উপাধি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইসলামী গ্রন্থকারদের মতে প্রকৃত রাজবংশটিতে নিম্নোক্ত রাজন্যবর্গ অন্তর্ভুক্ত আছেন ঃ

কায়কুবাদ (Kavi kavata, کیقباد) প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু ধর্মীয় ঐতিহ্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কোনও তথ্য প্রদান করে না (Christensen, পূ. গ্র., ৭০-১)। তবে শেষ পর্যন্ত পিশদাদী রাজা উযাব' (আরবী যাব্ব/যাব) কর্তৃক পানিতে পরিত্যক্ত এক সদ্যপ্রসূত শিশুকে পোষ্য পুত্র হিসাবে গ্রহণ করার কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনাতে ইহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। জাতীয় ঐতিহ্য (Christensen, ১০৭-৮) এই গল্প সম্বন্ধে অবহিত এবং কায়কুবাদকে মানু চেহেরের বংশধর করিয়া এবং তাঁহার পিতার, যিনি স্বয়ং যাবের পুত্র, অনুমাননির্ভর নামের ভুল পঠনের মাধ্যমে একটি বংশ তালিকা সরবরাহ করাইয়াছে। এই শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর কায়কুবাদকে তালাশ করিয়া বাহির করার জন্য

রুসতামকে ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাকে আল-বুর্জ পর্বতমালায় এক রাজপ্রাসাদে পাওয়া যায়। তাহার শাসনকাল সৌভাগ্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু আংশিকভাবে ইহা তূরানীদের বিরুদ্ধে ইরানকে প্রতিরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল (দ্র. আত-তাবারী, ১খ, ৫৩৩-৩৫, ৫৯৭; বাল'আমী, জেতেনবার্গ Bal'ami-zatenberg, i. 807; আদদীনাওয়ারী, তিওয়্যাল, ১৪; আছ-ছা'আলিবী, Hist. des rois de perse, ১৫০-২; আল-বীরূনী, Chronology, ১০৪, ইব্নু'ল বাল্খী, ফারাস-নামা, ১৪; ফিরদাওসী, শাহ্নামা, সম্পা. ও অনু. Mohl, index)।

তাঁহার বংশধরগণ ছিল কায় কা'উস (দ্র.)। তাঁহাদের রাজত্বকালে সিয়াউশ ও আফরাসিয়াব (দ্র.)-এর মধ্যে মহাকাব্যিক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাহার পরে কায় খুস্রাও (দ্র.) তিনি আফরাসিয়াবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে আসে ঃ

(কায়) লুহ্রাস্ব্ (Lorasp) কায় কা'উসের এক ভাইয়ের বংশধর। তিনি বাল্খ্ (দ্র.) নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন বা আয়তনে বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং বলা হয় যে, তিনি ফিলিসতীনের বিরুদ্ধে নেবুচাদজারকে প্রেরণ করিয়াছিলেন (বুখ্ত-নাস্সার দ্র.) যিনি জেরুসালেম ধ্বংস করেন, য়াহূদীদেরকে চতুর্দিকে তাড়াইয়া দেন এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। কিন্তু ইব্ন কুতায়বা (মা'আরিফ, ৬৫২) এই সমস্ত ঘটনাকে হযরত মূসা ('আ)-এর সমসাময়িক বাহ্মানের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লুহ্রাস্ব্ তুর্কীগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া নিহত হন, (দ্র. Christensen, 117-18 এবং index; আত-তাবারী, ১খ, ৬২০; আল-মাস'ঊদী, ২খ, ১২১-২৩=∮∮ ৫৪৪-৬; আদ-দীনাওয়ারী, ২৬; আল-মাকদিসী, আল-বাদ্' ওয়া'ত-তা'রীখ, ৩খ, ১৪৯; আছছাআলিবী., ২৪৪; হাম্যা আল-ইসফাহানী, ৩৬; ফিরদাওসী, ৪খ, ২৭৯-৩৫৭)। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ঃ

বিশতাস্ব্ (Kavi Vishtaspa, Vishtasp, Bishtasf, Kushtasb, Hystaspes) তাঁহার পিতার সঙ্গে বিবাদ করিয়া রূমে (সিরিয়ায়) চলিয়া যান। সেখানে তিনি তথাকার নৃপতির কন্যাকে বিবাহ করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বহু বীরত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে রাজমুকুট হস্তান্তর করিয়া দেন। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে যরোস্টার (যারাদুস্ত দ্র.) তাঁহাকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহাকে তুর্কীদের একটি আক্রমণের মুকাবিলা করিতে হয়। তাহারা তাঁহার দুই কন্যাকে লইয়া যায়; কিন্তু তাঁহার পুত্র ইস্ফানদিয়ার (Spandyadh) তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। তাঁহার বীরত্বে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার পিতা রুসতামকে আক্রমণ করিবার ভার দিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেন। রুসতাম অতিমাত্রায় স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইত। যদিও পৌরাণিক কাহিনীতে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে, তবুও ক্রিস্টেনসেন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব (une figure entierement historique) বলিয়া বিবেচনা করেন (দ্র. Les Kayanides, ১১৯-২৪ এবং index; আত-তাবারী, ১খ, ৪১৬, ৬৪৫-৯, ৬৭৫-৮, ৬৯১, ৮১৩, ৮৬৯, ১০৫৩; আল-মাস'ঊদী, ২খ, ১২৩-৭ = ∮∮ ৫৪৭-৫০; হামযা আল-ইসফাহানী, ৩৬-৭; আছ-ছাআলিবী, ২৫৫-৩৭৭; ইবনু'ল-বাল্খী, ৪৮-৫২; আল-বীরূনী, পূ. গ্র. ১০৫; আল-মাকদিসী, পূ. গ্র., ৩খ, ১৪৯ প.; ফিরদাওসী, ৪খ, ৩৫৯-৭৫১)। তারপর সিংহাসন লাভ করে তাঁহার পৌত্র।

বাহমান ইসফানদিয়ারের পুত্র, পরবর্তীকালে তাঁহাকে আরদাশীর বা কায় আরদাশীরও বলা হইত, যাহাতে তাঁহাকে সাসানী রাজবংশের পূর্বপুরুষ বলিয়া ধরা যায়। তাঁহার শাসনের ইতিহাস বাহিরের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত। আল-মাস'ঊদী বলেন যে, তাঁহার শাসন কালে য়াহূদীদের জেরুসালেম প্রত্যাবর্তন ঘটে এবং দীনাওয়ারীর মতে তাঁহার একজন য়াহূদী স্ত্রী ছিল যে তাঁহাকে কিছুকালের জন্য য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করে। এতদসত্ত্বেও তিনি জরথুস্ত্র ধর্ম শক্তিশালী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। তিনি ছিলেন বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাতা এবং একজন যোদ্ধা রাজা যিনি রুসতামকে হত্যা করিয়া পিতার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন (দ্র. ক্রিস্টেনসেন, সূচীপত্র, আত-তাবারী, ১খ, ৬৪৯-৫৪; আল-মাস'ঊদী, ২খ, ১২৭-৯ = ∮∮ ৫৫৭-২; হাম্যা আল-ইসফাহানী, ৩৭; আল-বীরূনী, পূ. গ্র. ১০৫, ১১১; বাল্'আমী-যোতেনবার্গ, ১খ, ৫০০-১; ইবনু'ল-বাল্খী, ৫২ প.; আছ-ছা'আলিবী, ৩৭৯ প.; ফিরদাওসী, ৫খ, ৭-১৯)। বাহমানকে বর্ণনা করা হয় হুমায় (দ্র.)-এর পিতা এবং স্বামীরূপে যাহার গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র হয়। এই পুত্র হইলেন দারা/দারাব (দ্র.)। দারিউস ১ম, যাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন দারা/দারাব ২য়। বিশতাস্ব-এর শাসনকালকে আলেকজাণ্ডারের বিজয় হইতে যে ফাঁক বা শূন্যতা বিরাজ করিতেছে এইভাবে জাতীয় ঐতিহ্য তাঁহার সেতুবন্ধ রচনা করে এবং অন্য শাসকদের তালিকার সঙ্গে একিমেনীদের মিশ্রিত করিয়া ফেলে। হুমায়কে (যাহাকে শাহরযাদও বলা হয়) বিশতাস্বের এক কন্যার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং কোন এক হুমায়ের জন্যই "সহস্র রজনী"র কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু একত্র করা হইয়াছে ("আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লা" দ্রষ্টব্য)। ইহা এমন একটি বিষয় যাহা কঠিন সমস্যার অবতারণা করে। বাহ্মানের বংশধরেরা বেশ এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণের আকার ধারণ করিয়াছে; সামান নামে অন্য একজনকে তাঁহার পুত্র বলা হয়। তাঁহাকে উত্তরাধিকারিত্ব দেওয়া হয় নাই, কিন্তু একটি জাল বংশ তালিকা দ্বারা সাসানী রাজবংশকে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং উহা দ্বারা বংশ পরম্পরার বৈধতা সুনিশ্চিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল রচনায় প্রদত্ত।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ মু. আবদুল আজিজ

কায়ালীক (قيليق) ঃ দক্ষিণ কাযাকিস্তানের বর্তমান কোপাল (Kopal) অঞ্চলের একটি মধ্যযুগীয় শহর; তাল্দী কুর্গান-এর ১৮ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে পার্বত্য দুর্গ দুন্গিনারূপে A. N. Banshtam ইহার সনাক্ত করেন। ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কার্লুক সরদার আরসলান খানের প্রধান কর্মকেন্দ্র হিসাবে যিনি ৬০৭/১২১১ সনের বসন্ত কালে চিঙ্গীয খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। কায়ালীক মূলত চিঙ্গীয খান কর্তৃক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুসি (দ্র. Djuci)-কে বরাদ্দকৃত ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল; পরবর্তীকালে উহা নামেমাত্র চাগাতায় খানদের (Caghatay Khunate) শাসিত অঞ্চলের অংশ ছিল, যদিও উইঘুরিস্তান হইতে পশ্চিম দিকে খাওয়ারাযম পর্যন্ত সমস্ত কৃষি-প্রধান এলাকার ন্যায় উহা মাস্'উদ বেগ (দ্র.) কর্তৃক শাসিত হইত। কর্তৃত্ব লাভ করিয়া মহান খান মংকে (The Great Khan Monke) কায়দু (Kaydu দ্র.)-কে কায়ালীক অঞ্চলে বাস করিতে আদেশ দেন। Pelliot ওগিদী-র মতে এই আদেশ প্রমাণ করে যে, কায়ালীক ছিল Ogedi বংশের appanage (জ্যেষ্ঠ ব্যতীত রাজার অন্যান্য সন্তানের ভরণ-

পোষণের জন্য প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি বা বৃত্তি)-এর অন্তর্গত এবং বস্তুত ওয়াস্‌সাফ বলেন, কায়দূ ও চাগাতায় খান দু'আ কর্তৃক শাসিত দুই অঞ্চলের মধ্যে সীমারেখায় অবস্থিত ছিল কায়ালীক। ৬৫১ রামাদান-শাওওয়াল/১২৫৩ নভেম্বরে William of Rubruck কায়ালীক (তাঁহার বানানে Cailac)-এ ১২ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে একটি ব্যস্ত বিপণীকেন্দ্র এবং তিনটি বৌদ্ধ মঠসমেত একটি বড় শহর বলিয়া বর্ণনা করেন। ওয়াস্‌সাফের মতে কায়দূ ও মহান খানের সৈন্যদের মধ্যে শেষ যুদ্ধটি কায়ালীক হইতে কয়েক দিনের পথে এক স্থানে সংঘটিত হয়। ইহাই শহরটির সর্বশেষ উল্লেখ বলিয়া মনে হয়; তীমূরের অভিযানসমূহের বিবরণে শহরটির উল্লেখ নাই। অবশ্যই ধরিয়া লওয়া যায় যে, বালাসাগুন (দ্র.)-এর মত ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Djuwany-Boyle; (২) রাশীদু'দ-দীন, জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ, i/l, tr. O. I. Smirnova, Moscow-Leningrad 1952; (৩) ওয়াস্‌সাফ, বোম্বে সং.; (৪) The Jonrney of William of Rubruck to the Eastern Parts of the World, 1253-55, as narrated by himself, tr. and ed. W. W. Rockhill, London 1900; (৫) V. V. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia, i, Leiden 1956; (৬) P. Pelliot, Notes on Marco Polo, i, Paris 1959, দ্র. Caidu।

J. A. Boyle (E.I.²)/মু. আবদুল আজিজ

কায়িত বায় (قايتباى) : আল-মালিকু'ল-আশ্‌রাফ আবু'ন-নাস্‌র সায়ফু'দ-দীন আল-মাহমূদী আজ-জাহিরী মিসর ও সিরিয়ার সুলতান ছিলেন (৮৭২/১৪৬৮—৯০১/১৪৯৬)। তিনি বার্‌সবায় (দ্র.)-এর ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান জাকমাক তাঁহাকে মুক্ত করেন। তিনি তাঁহার দেহরক্ষী হন এবং পরে দাওয়াদার সাগীর অর্থাৎ প্রধান দাওয়াদারের (দ্র. দাওয়াদার) দফ্‌তরে সহকারী দাওয়াদার (মুহার্‌রির) নিযুক্ত হন; পরে ঈনাল (দ্র.)-এর অধীনে দশ জন মামলূকের আমীর হন। সুলতান খুশকাদামের অধীনে তাবলাখানার (অর্থাৎ সহচর পরিবৃত থাকিবার অধিকারসম্বলিত) আমীর এবং বিনোদী রেস্তোরাঁ (تفريخ خانه)-র পরিদর্শক নিযুক্ত হন। অল্পকাল পর হাজার সেনার অধিনায়ক হন (মুকাদ্দাম আলূফ)। ৮৭২/১৪৬৭-৮ সালে তিনি রা'সু নাওবাতি'ন-নুওওয়াব হন (অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যের বা দেহরক্ষী মামলূকদের অধিনায়ক নিযুক্ত হন)।

জুমাদা'ল-আওওয়াল ৮৭২/ডিসেম্বর ১৪৬৭ সালে তামিরবোগা সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি স্বীয় বন্ধু কায়িত বায়কে আতাবেক পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অধীনস্থ মামলূকদের মধ্যে তাঁহার সমর্থকদের সংখ্যাল্পতাহেতু সুলতানের কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। নূতন সমর্থক সৃষ্টি করিবার মতো অর্থবল তাঁহার ছিল না, বায়তু'ল-মাল শূন্য ছিল, উসতাদার খায়র বে কর্তৃক একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে একই বৎসরের রাজাব মাসে (ফেব্রুয়ারী, ১৪৬৮) কায়িত বায়ের নিকট সিংহাসন অর্পণ করা হইলে তিনি কিছু ইতস্তত করার পর তাহা গ্রহণ করেন। তামিরবোগা দামিয়েতায় অবসর জীবন যাপন শুরু করেন। সেখানে তিনি বন্দী হিসাবে নীত হন নাই, বরং কিছুসংখ্যক বন্ধু পরিবৃত অবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত তথায় ভ্রমণ করেন। অন্যান্য মামলূক সুলতান অপেক্ষা ভিন্নতর কায়িত বায় তাঁহার শাসন আমলে সিংহাসনচ্যুত সুলতান অথবা সাবেক সুলতানদের বংশধরদিগের প্রতি মহত্ত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রায়ই তাঁহাদিগকে কায়রোর পোলো টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানাইতেন, তাঁহাদিগকে মক্কায় হাজ্জ পালনের অনুমতি দিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতেও তাঁহাদিগকে অবাধে অথবা ষড়যন্ত্রের ভয়লেশহীন অবস্থায় রাজধানী পরিদর্শন করিবার অনুমতি দিতেন।

কায়িত বায়ের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা ছিল 'উছমানীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক। তাঁহাদের ও মিসরীদের শত্রুতা প্রকাশ পায় এশিয়া মাইনরে তাঁহাদের প্রজাদের যুদ্ধের মধ্যে। আলবিস্তান (দ্র.)-এর শাসনকর্তা শাহ সুওয়ার (দ্র. যু'ল-কাদ্‌র) মিসরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন (দ্র. খুশকাদাম) এবং তিনি গোপনে 'উছমানীদের সাহায্য লাভ করেন। অপরদিকে কায়িত বায় কারামানের আহ্‌মাদকে দ্বিতীয় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। শাহ সুওয়ার-এর বিরুদ্ধে প্রথম দুইটি অভিযান (৮৭২ ও ৮৭৩) মিসরী সেনাপতিদের খামখেয়ালী, বিশেষত তাহাদের সৈন্যদের শৃঙ্খলার অভাব এবং মিসরী ও সিরীয় সেনাবাহিনীর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারামানের আহ্‌মাদকে সাহায্য করা হইতে বিরত থাকিবার চুক্তি করিয়া কায়িত বায় পরবর্তীকালে শাহ সুওয়ারকে 'উছমানী সুলতানের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। শাহ সুওয়ার এইভাবে দুর্বল হইয়া ৮৭৬/১৪১৪ সালে আতাবেক এযবেক কর্তৃক সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত হন। শাহ সুওয়ার যামানতূ-তে পশ্চাদপসরণ করেন। সেইখানেও অবরুদ্ধ হইয়া তিনি এই শর্তে বশ্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি সুলতানের অধীনে করদাতা হিসাবে রাজ্যের অধিকারী হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিয়া কায়রোতে আনা হয় এবং যুদ্ধনীতি লংঘনকরত হত্যা করা হয়। দিয়ার বাক্‌র ও পারস্যের অংশবিশেষের শাসক আক-কোয়ুনলুর নৃপতি উযুন হাসান কায়িত বায়ের একজন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং একের পর এক বিজয় তাঁহার করতলগত হইতেছিল। ৮৭২/১৪৬৮ সালে তিনি কারা কোয়ুনলুর সুলতানকে এবং ৮৭৩ সালে সামারকান্দের সুলতানকে পরাজিত করেন। কিন্তু ৮৭৬/১৪৭১ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তিনি পরাজিত হন। ইহার পর কায়িত বায়ের জন্য তিনি আর ততটা মারাত্মক ছিলেন না। তিনি ৮৮০/১৪৭৫ সালে ইনতিকাল করেন এবং তৎপর য়া'কূব বে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। আর-রুহা (এডেসা)-তে য়া'কূবের গভর্নর বায়িন্দির ও সুলতানের সেনাপতি য়েশ্‌বেকের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ ছিল এই যে, হামা-র বেদুঈনদের বিদ্রোহী দলের প্রধান সাইফকে বায়িন্দির আশ্রয় দিয়াছিলেন। য়েশ্‌বেক আর-রুহার দিকে অগ্রসর হন এবং যদিও তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সন্তুষ্ট করা হইতেছিল, তথাপি তিনি শহর অবরোধ করিবার ব্যাপারে অটল থাকেন। কিন্তু অবরুদ্ধ সৈন্যের একটি অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহার কিছুসংখ্যক অধীনস্থ কর্মকর্তার সহিত তিনি নিহত হন। অন্যান্য গণ্যমান্য মিসরীদিগকে বন্দী করা হয়। কায়িত বায় এই পরাজয়ের বেদনা মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই এবং তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেননা নূতন 'উছমানী সুলতান বায়াযীদ (দ্র.) কর্তৃক যুদ্ধের ভয়ে তিনি ভীত হইয়াছিলেন। আল-বিস্তানের মালিকানা লইয়া দ্বন্দ্ব ব্যতীতও বায়াযীদ নিজে ভীত হইয়াছিলেন। কেননা কায়িত বায় তাঁহার ভ্রাতা ও সিংহাসনের মিথ্যা দাবীদার জেম-কে বন্ধুত্বপূর্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং এমনকি

বায়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। শান্তি রক্ষা করিবার জন্য বায়াযীদের নিকট প্রেরিত একটি দূতের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ৮৯১/১৪৮৫ সালে 'উছমানীগণ সিলসিয়া আক্রমণ করে এবং তারসূস ও আদানা দখল করে; অন্য 'উছমানী সৈন্যদল মালাতিয়া অবরোধ করে। কায়িত বায় যেমন আলবিস্তানের যুবরাজ 'আলা'উ'দ-দাওলার উপর জয়লাভ করেন তেমনভাবে মিসরী সৈন্যবাহিনী উভয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করে। ইস্কান্দারূন (দ্র.) উপসাগরে এক বৃহৎ সৈন্য দল নামানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৮৯৫/১৪৯০ সালে আতাবেক এযবেক এশিয়া মাইনরের কায়সারিয়্যাতে 'উছমানীদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে, যে যুদ্ধের ফলে কতিপয় সেনাপতি বন্দী হন। কায়িত বায় 'উছমানীদের প্রচুর সম্পদের কথা চিন্তা করিয়া সুকৌশলে মধ্যপন্থা অবলম্বনপূর্বক শান্তির সপক্ষে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং ৮৯৬/১৪৯১ সালে সন্ধি স্থাপিত হয়। কায়িত বায়ের অবশিষ্ট শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি হয় নাই। এই কথা সত্য যে, একমাত্র তিনিই নিজের ক্ষমতাবলে শত্রুভাবাপন্ন মামলূক দলসমূহের মধ্যকার হানাহানি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে তাহাদের বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই এবং কোন সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিতে পারেন নাই।

কায়িত বায়-এর রাজত্বকাল অন্যান্য সারকাশিয়ান মামলূকের রাজত্ব তুলনায় অসাধারণ শুধু ইহার স্থায়িত্বের দরুন নহে, বরং তাঁহার উদ্যোগ ও কার্যকারিতার জন্যও বটে। কায়িত বায় ব্যবসায়ী জাতিগুলির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। যেইখানে তাঁহার পূর্বসূরীদের অনেকে, বিশেষত বারস বায় ইতালীয় বণিকদের কর্মক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেন, কায়িত বায় সেইখানে তাহাদিগকে নূতন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং মসলা ব্যবসায়কে একচেটিয়াভাবে অধিকার করিতে প্রচেষ্টা চালান নাই। সম্ভবত তাঁহার আমলে সুলতানের দেশ ও খৃষ্টীয় য়ুরোপের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিপুল প্রসার লাভ করে। কিন্তু কায়িত বায় দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁহার দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার বহু উৎকীর্ণলিপিতে যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের উপর কিছুসংখ্যক করের বোঝা তিনি রহিত করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি নির্মাণ কার্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যথা ঃ কায়রোর দুর্গের মধ্যে নূতন ইমারতসমূহ, তাঁহার নিজের সমাধিসৌধ, কায়রোর নিকটস্থ মাযারে সূফীদের একটি খানকাহ্, মদীনার মসজিদের মেরামত এবং জেরুসালেমের মসজিদে পানি সরবরাহের জন্য পাকা প্রণালী।

সর্বোপরি তাঁহার সামরিক কর্মকাণ্ডই তাঁহার সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ গ্রাস করিয়া ফেলে। ইব্ন ইয়াসের মতে তাঁহার সকল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কায়িত বায় ৭ লক্ষ দীনার (আশরাফী)-এর অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে কায়রোতে ফেরত সৈন্যদের অবসরকালীন বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিতে হয় যাহা ছিল একটি বিরাট অংক। এই তথ্য অন্যান্য লেখকের দ্বারাও সমর্থিত। ইহার সহিত যোগ হইবে আলেকজান্দ্রিয়া, আলেপ্পো ও অন্যান্য শহরের দুর্গসমূহ মেরামত সংক্রান্ত ব্যয়। যেহেতু মামলূক সুলতানগণ কখনও নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সমর্থ হন নাই, সেইহেতু কায়িত বায় তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে মুসাদারা নামে একটি অনিয়মিত কর আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রয়োজনের সময় বায়তু'ল-মাল শূন্য থাকিলে তিনি নেতৃস্থানীয় নাগরিক, বণিক ও অমুসলিম (যিম্মী) সম্প্রদায়ের উপর কর আরোপ করিতেন এবং বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখা ও Mortmain সম্পত্তির উপর নূতন কর আরোপ করিতেন। এই সকল পদক্ষেপ মিসর ও সিরিয়ার শিল্প ও বাণিজ্যিক অগ্রগতিকে দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ করিয়া রাখিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও সুলতানের বিপুল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কায়িত বায়-এর অধীনে আপাতদৃষ্টিতে ধনী ও শক্তিশালী মামলূক রাজ্য ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সুলতান অবশ্য সকল প্রদেশ সফর করিয়াছিলেন (তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে নহে)। মৃত্যুর একদিন পূর্বে যখন তিনি পদত্যাগ করেন, মামলূক রাজ্য তখন এমন দরিদ্র ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, 'উছমানী তুরস্কের সহিত ইহার কোন তুলনাই হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন ইয়াস, বাদা'ই'উ'জ-জুহুর, সম্পা. Kahle (বূলাক ১৩১১-১২ হি., ২খ, ৯০-২৯১, ৩খ, ২-২৩৪); (২) ইবনু'ল-জী'আন, আল-কাওলু'ল-মুস্তাজরাফ ফী সাফারি মাওলানা'ল-মালিক আল-আশ্‌রাফ, সম্পা. R. V. Lanzone, তুরিন ১৮৭৮ খৃ.; (৩) R. L. Devonshire, Relation d'un voyage du sultan Qaitbay en Palestine et en syrie, in BIFAO, ২০খ. (১৯২২ খৃ.), ১-৪২; (৪) Weil, Gesch. der Chalifen, ৫খ, ৩২৬-৫৯; (৫) M.C. Sehabeddin Tekindag, II. Bayezid devrinde Cukur-Ova'da nufuz mucadelesi in Bell., ২১/১২৩ (১৯৬৭ খৃ.), ৩৪৫-৭৩; (৬) J. Wansbrough, A Mamluk letter of 877/1473, in BSOAS, xxiv(১৯৬১ খৃ.), ২০০-১৩; (৭) ঐ লেখক, A Mamluk commercial treaty concluded with the Republic of Florence 894/1489, in Documents from Islamic chanceries, ed. S. M. Stern, অক্সফোর্ড ১৯৬৫ খৃ., ৩৮-৭৯; (৮) G. Wiet, Decrets mamlouks d'Egypte, in Mayer Memorial Volume, জেরুসালেম ১৯৬৪ খৃ., ১৩৮-৪০; (৯) ঐ লেখক, Deux princes Ottomans a la Cour d' Egypte, in BIE, xx (১৯৩৮ খৃ.), ১৩৭-৫০; (১০) ইব্ন তাগরীবিরদী, হাওয়াদিছু'দ-দুহুর, পাণ্ডু. বার্লিন, নং ৯৪৬২, শেষের দিকে; (১১) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ২০২।

[Sobernheim-(E. Ashtor)] (E.I.[2])/ পারসা বেগম

কায়ী (قايى) ঃ ওগুয (গুয) উপজাতিসমূহের একটি গোত্র। কতিপয় তুর্কী ঐতিহাসিকের মতে 'উছমানী রাজবংশ এই উপজাতি হইতেই উদ্ভূত। কায়ী গোত্রকে ওগুয উপজাতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইত। ইঁহাদের উচ্চ সম্মান ভোগ করার পশ্চাতে সম্ভাব্য যে কারণ নিহিত, তাহা হইতেছে ৯ম ও ১১শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে সিরদারিয়ার (সায়হূন) উপকূলবর্তী বসবাসকারী ওগুয গোত্রভুক্ত জনগণের অধিকাংশ শাসক বা য়াবগুয এই গোত্রভুক্ত ছিলেন। এই সকল রাজন্যদের কয়েকজনের নাম ওগুয তুর্কগণের কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস পুস্তক জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ-এর অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক আনাতোলিয়া বিজয় ও সেখানে বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে কায়ী গোত্র একটি

প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার ফলে আনাতোলিয়ার অন্যান্য যে কোন গোত্রের তুলনায় ইহাদের নামানুসারে গৃহীত স্থানের নামের সংখ্যা অনেক বেশী। তবে যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, এই প্রকার স্থানীয় নামের আধিক্য ছাড়াও তুরস্কে বহুসংখ্যক কায়ী সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল, যাহারা দেনিযূলি, মেনতেশে ও কোন্য়া অঞ্চলে ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে উপজাতীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। ইহা ভিন্ন হামীদ (ঈসপারতা বুরদুর), আনকারা, সারুখান, কারা হিসার (আফয়োন) এবং সিস (কোযান) সানজাকসমূহে ১০ম/১৬শ শতকে পৃথক পৃথক কায়ী শাখার অস্তিত্ব ছিল।

কায়ীগণের যে ক্ষুদ্র শাখাটি পশ্চিমদিকে দেশান্তরিত হয় নাই, তাহারা ট্রান্সকাসপীয় তুর্কমানগণের মধ্যেই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই সকল জনগণ কতিপয় য়ুরোপীয় পর্যটককে বিস্মিত করিয়া জানায় যে, 'উছমানী বংশ তাহাদের গোত্র হইতে উদ্ভূত। সর্বপ্রথম যে ঐতিহাসিক দাবী করেন যে, 'উছমানী বংশ কায়ী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন য়াযিজি-ওগলু 'আলী, যিনি ২য় মুরাদ-এর রাজত্বকালে (৮২৪-৫৫/১৪২১-৫১) তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। এই দাবীটি প্রশ্নসাপেক্ষ হইলেও সম্পূর্ণ অসম্ভাব্য নয়। 'উছমানীগণের সরকারী প্রতীকরূপে কায়ী প্রতীক ব্যবহার শুরু হয় ২য় মুরাদের রাজত্বকালে। তাঁহার আমলে মুদ্রিত মুদ্রার কায়ী-প্রতীক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা ভিন্ন তাঁহার উত্তরসূরিগণের অস্ত্রশস্ত্রেও এই প্রতীক অংকিত ছিল। তোপকাপি মিউজিয়ামে রক্ষিত বহু অস্ত্রে এই প্রতীক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রতীক জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ-এ প্রদত্ত প্রতীকের সহিত খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। কায়ী গোত্রের ওগুয খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী গুন খান-এর সহিত তাহাদের সম্পর্কের সূত্রেই 'উছমানী বংশ অন্যান্য তুর্কমান বংশ এবং চিঙ্গীয খানের পুত্রদের তুলনায় নিজেদের সম্ভ্রান্তরূপে বিবেচনা করিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Sumer, Oguzlara ait destani mahiyette eserler, in Dil ve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi, ১৭খ, ৩৬২-৩, ৩৬৯-৭৪; (২) ঐ লেখক, Oguzlar (Turkmenlar), Tarihleri-Boy Teskilati-Destanlari, Dil ve tarih-Cografya Fakultesi rayinlayindan, Ankara 1967, নির্ঘন্ট; (৩) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ২০৫।

F. Sumer (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

আল-কায়্যাল (الكيال) ঃ ইবনু'ল-কায়্যাল বায়হাকের নিকট দাস্কারাত্ বায়তু'ন্-নারের অধিবাসী শী'আ মতবাদের প্রতি অনুরক্ত আহমাদ ইব্ন যাকারিয়া, ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রাক্কালে সক্রিয় ছিলেন। আশ্-শাহ্রাস্তানী-র মতে তিনি মূলত কিছুসংখ্যক ইসমা'ঈলী ইমামের একজন দা'ঈ (داعى = প্রচারক) ছিলেন। শী'আ মতবাদের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধিতার ফলে ইমাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি প্রথমত ইমামাতের দাবীদার হইলেন, তারপর ঘোষণা করিলেন যে, তিনিই কায়্যিম (দ্র.)। তিনি কিছুসংখ্যক সমর্থকও লাভ করিলেন এবং আরবী ও ফার্সী ভাষায় এমন কিছু লেখা রাখিয়া গেলেন, যাহা শাহ্রাস্তানী (মৃ. ৫৪৮/১১৫৩)-এর সময় পর্যন্তও বর্তমান ছিল। আবু'ল-মা'আলী সম্ভবত তাঁহার ট্রান্সঅক্সানিয়া (Transoxania) আগমনের উপর ভিত্তি করিয়া বর্ণনা করেন যে, আল-কায়্যাল ২৯৫/৯০৭-৮ সনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি (কায়্যাল) দাবী করেন যে, ইসলামী আইন রহিত করিতে এবং নূতন আইন প্রচার করিতে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ফার্সী ভাষায় একটি ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া উহাকে তাহার কুরআন বলিয়া দাবী করিতেন এবং শুধু একাই পাঠ করিতে পারেন এমন একটি গোপন বর্ণমালা তিনি আবিষ্কার করিলেন। বুখারার সামানী আদালতে তিনি উযীর মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আজ-জায়হানী (দ্র.)-র আনুকূল্য লাভ করেন। আল-কায়্যালের নামটি যদি সঠিকভাবে লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি ৩২৬/৯৩৮ সালের পরেও জীবিত ছিলেন, যখন আজ-জায়হানী উযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক, শেষোক্ত ব্যক্তির পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ আজ-জায়হানী যিনি ৩০২/৯১৪-৫ সাল হইতে ৩১০/৯২২-৩ সাল পর্যন্ত উযীর ছিলেন, তাঁহার সঙ্গ আজ-জায়হানীকে লইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। আজ-জায়হানী সর্বপ্রথম কিশ্শ (Kishsh)-এ তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে উৎসাহ দেন। সেইখানে তিনি অনুসারী যোগাইতে ব্যর্থ হইলে উযীর তাহাকে মারভের পল্লী অঞ্চলে যাইতে নির্দেশ দিলেন। সেখানে তিনি বহুসংখ্যক অনুসারী পাইয়াছিলেন। একজন কসাইকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আজ-জায়হানী যখন ইনতিকাল করেন (মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ৩৩০/৯৪১-এ মারা যায়), তখন এই আন্দোলন স্তিমিত হইয়া যায়। যাহা হউক, ইব্ন ফুন্দুক আল-বায়হাকী (মৃ. ৫৬৫/১১৬৯-৭০) বর্ণনা করেন যে, সামারকান্দে আল-কায়্যাল মতবাদের শিষ্যসামন্ত তাহার সময়েও বর্তমান ছিল এবং তাহার পুস্তকাদিও সেখানে পাওয়া যাইত।

শাহরাস্তানীর বর্ণনা অনুসারে আল-কায়্যালের শী'আ সংমিশ্রণবাদ হইতেছে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জগতের সাথে নিম্ন জড় জগতের যোগাযোগ এবং মানবদেহ ও নির্ভরযোগ্য অক্ষরসমূহের (হুরূফ) যোগাযোগ ও কুরআনের রূপক ব্যাখ্যা। ইহাতে ইসমা'ঈলী মতবাদের সহিত সুস্পষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়। যদিও ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসমা'ঈলীবাদে দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবর্তিত হইয়াছিল কি না তাহার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাহার চিন্তায় ভারতীয় ও ম্যানেকীয় প্রভাব বিদ্যমান বলিয়া বলা হইয়াছে। তাহার ইমামাত সম্পর্কীয় মতবাদ দার্শনিক মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়া আর-রাযী (মৃ. ৩১৩/৯২৫ অথবা ৩২০/৯৩২-৩ সাল) কর্তৃক ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

ইসমা'ঈলী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূন আল-কাদ্দাহ (দ্র.)-এর পুত্র আহ্মাদ এবং তিনি যে একই ব্যক্তি, কিছুসংখ্যক আধুনিক পণ্ডিতের এই ধারণা এখন আর সমর্থনযোগ্য নহে। ইসমা'ঈলী গ্রন্থকার মৃত ইদরীস ইব্ন আল-হাসান (মৃ. ৮৭৭/১৪৬৮ সাল)-এর বিবরণানুসারে আল-কায়্যাল ইসমা'ঈলী ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল-এর দা'ঈ (প্রচারক) ছিলেন। ইহা কাল্পনিক এবং শাহরাস্তানীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্রিস্ত, ৩০১; (২) রাসা'ইল ইখওয়ানি'স-সাফা', বোম্বাই ১৩০৬ হি., ৩খ, ২০; (৩) আবু'ল-মা'আলী, বায়ানু'ল-আদয়ান, সম্পা. হাশিম রাযী, তেহরান ১৯৬৪ খৃ., ৬৭-৯; (৪) শাহ্রাস্তানী, ১খ, ১৩৮-৪১; (৫) বায়হাকী, তা'রীখ-ই বায়হাক, সম্পা. আহমাদ বাহ্মানিয়ার, তেহরান ১৩১৭ হি., ২৫৩; (৬) মুরতাদা ইব্ন দা'ঈ রাযী, তাবসিরাতু'ল-'আওয়াম, সম্পা. 'আব্বাস ইকবাল, তেহরান, ১৩১৩ হি., ৭; (৭) ইদরীস 'ইমাদুদ-দীন, 'উয়ূনু'ল-আখবার, ৪খ, সম্পা. মুসতাফা গালিব,

বৈরূত ১৯৭৩ খৃ., ৩৫৭-৮; (৮) M. J. de Goeje, Memoire sur les Carmathes du Bahrain[2], Leide 1886, 20; (৯) L. Massignon, Esquisse d'une bibliographie, Qarmate, in A Volume of Oriental Studies presented to Edward G. Browne, ed. T. W. Arnold and R. A. Nicholson, Cambridge 1922, 331; (১০) H. H. Scheader, Die isamische Lehre vom vollkommenen Menschen, in ZDMG, lxxix (1925), 234; (১১) W. Ivanow, Ismailis and Qarmatians, in JBBRAS, xvi (1940), 64-5, 81, 83-4; (১২) W. Madelung, Fatimiden und Bahrainqarmaten, in Isl., xxxiv (1959), 44-5; (১৩) Mahdi Muhakkik, Faylasuf-i Rayy Muhammad b. Zakariyyayi Razi, Tehran 1352, 42-3।

W. Madelung (E.I.[2])/ মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম

কায়্যিম (قيم) ঃ শব্দটির মূল অর্থ সোজাভাবে দণ্ডায়মান ব্যক্তি, 'বি' 'আলা' 'লি' অথবা শুধু مضاف اليه [সম্বন্ধ পদ] ব্যবহারে ইহার অর্থ হয় 'দায়িত্ব গ্রহণকারী', 'কিছু বা কাহারও রক্ষণাবেক্ষণকারী' এবং ঐ কারণে 'কর্তৃত্বের অধিকারী'। প্রাক-ইসলামী কবি আল-কুতামীর কবিতায় (দীওয়ান, সম্পা. Barth, লাইডেন ১৯০২ খৃ., নং ২৬) দৃশ্যত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা তত্ত্বাবধায়ক অর্থে 'পানির কায়্যিম'-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বাইছ ইব্‌ন সুরায়ম-এর কবিতায় (আবূ তাম্মাম-এর হামাসা, সম্পা. Freytag, ২৬৯, শ্লোক ২) ভরণ-পোষণকারী বা স্বামী অর্থে এক 'মহিলার কায়্যিম'-এর উল্লেখ আছে। অতঃপর 'পরিদর্শক' অর্থে কায়্যিম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে। যথা ঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, স্নানাগারের বা মন্দিরের বা কোন দরবেশের সমাধির তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি। সাহীহু'ল-বুখারীর দা'ওয়াত শীর্ষক ১০ নং পরিচ্ছেদে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার রাত্রিকালীন প্রার্থনায় আল্লাহকে "কায়্যিমু'স্-সামাওয়াতি ওয়া'ল-আরদি" আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কায়্যিম (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী)-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এইরূপ প্রয়োগ কবি 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ (সম্পা. P. Schwarz, নং ৯১)-ও করিয়াছেন যেখানে কবি দীনু'ল-কায়্যিম-এর শপথ করেন। এখানে কবি (খুব সম্ভব ছন্দের খাতিরে) কুরআনে উল্লিখিত আদ-দীনু'ল-কায়্যিম-এর কায়্যিম শব্দটিকে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার না করিয়া সম্বন্ধ পদরূপে 'বায়তু'ল-মুকাদ্দাস'-এর নমুনায় ব্যবহার করিয়াছেন (তু. Wright, Grammar, ২খ, ৯৫-৬ এবং আল-কাসতাল্লানী, শারহ্ বুখারীর সাওম পরিচ্ছেদ, ৬৭)।

স্ত্রীলোকের ভরণ-পোষণকারী বা স্বামী অর্থে قيم শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কিয়ামত সম্পর্কিত হাদীছে যেখানে বলা হইয়াছে যে, শেষ দিন নিকটবর্তী হইলে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইবে যে, প্রতি ৫০ জন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন কায়্যিম (স্বামী বা ভরণ-পোষণকারী) থাকিবে। কায়্যিম শব্দটি কর্তৃত্বের অধিকারী (জ্ঞানের কোন শাখায়) এই বিশেষণাত্মক অর্থে ব্যবহার সম্ভবত শব্দটির পূর্বোল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রভু ইত্যাদি অর্থের ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। য়াকূত-এর রচনায় একজন পণ্ডিতের জীবনচরিত সম্পর্কীয় বরাতে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় (মু'জাম, ২খ, ২২৫)। কুরআনে "সঠিক বা সনাতন জীবন ব্যবস্থা" অর্থেও আদ-দীনু'ল-কায়্যিম-এর একাধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কায়্যিম প্রশাসক ঃ (১) বুখারী, সাহীহ, ওয়াসায়া, পরিচ্ছেদ ৩২ ও আল-কাস্‌তাল্লানী দ্র.; (২) য়াকূত, ৩খ, ৮৫৬; (৩) আল-মাক্‌কারী, ২খ, ৫৪৭; (৪) আত-তাবারী, ১খ, ৮১৪; (৫) আল-কাযবীনী, আছারু'ল-বিলাদ, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ১২৫। কায়্যিম = স্বামী ঃ (৬) বুখারী, পূ. গ্র., নিকাহ্ পরিচ্ছেদ ১১০ এবং স্থা.; (৭) 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ, পূ. গ্র., নং ২৬৯। কায়্যিম = সঠিক, সনাতন, ৯ ঃ ৩৬ এবং ৯৮ ঃ ৫, বুখারী, কিতাবু'ল ঈমান এবং স্থা., পরিচ্ছেদ ৩৪-এ উদ্ধৃতাংশের উপর কাসতাল্লানী-র মন্তব্য।

A. Schaader (E.I.[2])/ মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম

আল-কায়্যূম (القيوم) ঃ 'আ; আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম। ইহা ق-و-م (=কাফ-ওয়াও-মীম) ধাতু হইতে গঠিত ইস্‌ম-ই ফা'ইল মুবালাগা (اسم فاعل مبالغة = আতিশয্য-বাচক কর্তৃবাচ্যার্থক বিশেষ্য)। কায়্যূম, কায়্যাম (قيام) ও কায়্যিম (قيم)— এই তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৈয়াকরণ আল-ফার্‌রা-র মতানুসারে قيوم শব্দটি মূলত فيعول-এর ওযনে قيووم ছিল। উহার অন্তর্গত য়া (ى)-র সহিত ওয়াও (و) মুদ্‌গাম হওয়ায় ওয়াও য়াতে পরিণত এবং য়া তাশ্‌দীদযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ قيووم শব্দটি قيوم হইয়া গিয়াছে। আল-কায়্যূম শব্দটি কুরআন মাজীদের তিনটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

(১) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ- لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ-

"আল্লাহ্, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ইলাহ নাই ; তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্ববিধাতা ; তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না" (২ ঃ ২৫৫)।

(২) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ-

"আল্লাহ্, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ইলাহ নাই ; তিনি চিরঞ্জীব স্বাধিষ্ঠ বিশ্ববিধাতা" (৩ ঃ ২)।

(৩) وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ-

"চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্ববিধাতার নিকট সকলেই হইবে অধোবদন" (২০ ঃ ১১১)।

ভাষাবিদ ও তাফসীরকারগণ স্ব স্ব জ্ঞানমতে আল-কায়্যূম শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনাকরত উহার তাৎপর্য স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ 'আল্লামা যামাখ্‌শারী উহার অর্থ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ القيوم "শাশ্বত এবং সৃষ্টির পরিচালক ও সংরক্ষক সত্তা" (আল-কাশ্‌শাফ, পূর্বোক্ত প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যার অধীনে)। "আল্লামা যামাখ্‌শারী অতঃপর বলেন, কুরআন মাজীদের উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কায়্যূম শব্দের অর্থের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই উহার পর আল্লাহ্ তা'আলাকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ না করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ সৃষ্টিকে রক্ষা করিবার এবং উহার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য ইহা জরুরী যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা ও তন্দ্রা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিবেন। অলসতা ও ভ্রম আল্লাহ্ তা'আলার কায়্যূম হইবার গুণের সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিপন্থী। "নিদ্রা ও তন্দ্রা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্পর্শ করে না" এইরূপ কথা দ্বারা তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্ব প্রকারের অলসতা অবহেলা হইতে নিজেকে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইমাম রাগিবও তাঁহার 'মুফরাদাত' গ্রন্থে আল-কায়্যূম শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম ফাখরু'দ-দীন রাযী উহার অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নিজে নিজ ক্ষমতাবলে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে নিজ সত্তায় শাশ্বত।" ইমাম শাওকানী উহার অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনায় তাঁহার ফাত্হু'ল-কাদীর গ্রন্থে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নিজে শাশ্বত এবং অপরের (সৃষ্টির) রক্ষক।" আল্লামা মাজদু'দ-দীন ফীরোযাবাদী উহার অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নিজে শাশ্বত, প্রতিটি সৃষ্টির রক্ষক ও উহার কায়েম থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণ সৃষ্টিকারী" (বাসা'ইরু যাবি'ত-তাম্য়ীয, ৪খ, ৩০৮)। দাহ্হাক উহার অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা শাশ্বত ও চিরস্থায়ী, তাঁহার সত্তায় কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না।" লিসানু'ল-'আরাব অভিধান গ্রন্থে উহার অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনায় ق-و-م ধাতুর অধীনে অনেক ভাষাবিদের ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ যাজ্জাজ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিসমূহকে অস্তিত্ব ও রিযিক প্রদানের মাধ্যমে এবং তাহাদের অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিবার মাধ্যমে তাহাদিগকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন।" মুজাহিদের মতে "আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু ও বিষয়ের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক।" কাতাদা বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের জীবন, মৃত্যু, কার্যাবলী ও রিয্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাহাদিগকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন।" আবূ 'উবায়দা বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তু ও সকল বিষয়ের ধারক ও পরিচালক।" জাওহারী বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়নের মাধ্যমে, উহাকে রিয্ক প্রদানের মাধ্যমে এবং উহার অবস্থান স্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিবার মাধ্যমে উহাকে ধারণ, রক্ষা ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। তিনি অপরের সাহায্যে নহে, বরং নিজ শক্তির বলেই চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা। এতদসহ সকল বস্তু ও বিষয় তাঁহার সাহায্যে অস্তিত্বশীল হয় ও অস্তিত্বশীল থাকে।"

আল-কায়্যূম শব্দের উপরিউক্ত ব্যাখ্যাসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার একটি সিফাতী নাম। উহার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ক্ষমতা বলে চিরন্তন ও শাশ্বত; তিনি সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব, জীবন ও বিদ্যমানতার কারণ। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা, তিনি সকলের রক্ষক ও ধারক, তিনি সকলের প্রয়োজন পূরণকারী, সৃষ্টির টিকিয়া থাকা একমাত্র তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের অনুসারিগণ আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ও বাতিল সন্দেহ ও ধারণা লোকদের অন্তরে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে 'আল-কায়্যূম' নাম উহাদিগকে ভ্রান্ত ও বাতিল ঘোষণা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উহা আল্লাহ্ তা'আলার জনক বা জাতক হইবার ধারণাকেও মিথ্যা ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

আল-হায়্যু ও আল-কায়্যূম আল্লাহ্ তা'আলার এই দুইটি গুণবাচক নাম প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আল-হায়্যু শব্দের তাৎপর্য ও অর্থ হইতেছে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা জীবিত আছেন ও সর্বদা জীবিত থাকিবেন। পক্ষান্তরে আল-কায়্যূম শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য হইতেছে, তিনি সর্বদা কা'ইম আছেন ও কা'ইম থাকবেন; তিনি চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা, তাঁহার অবস্থায় কখনও কোনরূপ পরিবর্তন আসিবে না। তিনি সকল সৃষ্টির ধারক, রক্ষক ও পরিচালক তিনি সকলের প্রয়োজন পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি স্রষ্টা, রিয্কদাতা ও সর্ববিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। আল হায়্যু ও আল-কায়্যূম আল্লাহ্ তা'আলার এই দুইটি সিফাতী নাম একত্রে (অর্থাৎ الحي القيوم) ইস্ম-ই আ'জাম বা শ্রেষ্ঠ নাম।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূল (স) যখন কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখন এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ - بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-

"হে হায়্যু ও কায়্যূম ! আমি তোমার রাহ্মাত-এর আশ্রয় প্রার্থনা করি..." (তিরমিযী, আল-জামি')। একদা রাসূল (স) স্বীয় কন্যা ফাতিমা (রা)-কে নিম্নোক্ত দু'আটি শিখাইয়াছিলেন ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ - بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-

"হে হায়্যু ও কায়্যূম ! আমি তোমার রাহ্মাত-এর আশ্রয় প্রার্থনা করি; আর তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের অভিভাবকত্বে ছাড়িয়া দিও না।" (আবূ দাউদ, সুনান)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের স্থানে স্থানে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত দেখুন ঃ (১) কাদী মুহাম্মাদ সুলায়মান মান্সূরপুরী, মা'আরিফু'ল-আস্মা' (শারহু আসমা'ইল্লাহি'ল-হুস্না)।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ মু. মাজহারুল হক

কায়্যূম নাসিরী (قیوم ناصری) ঃ (১৮২৫-১৯০২) তাঁহার পূর্ণ নাম ঃ 'আবদু'ল-কায়্যূম নাসিরী। কাযান সরকারের সিভায়াযক (Sivazsk) প্রদেশের যুকারী শিরদানী (Yukari Shirdani) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভল্গা অঞ্চলের তাতারদের আধুনিকতাবাদী সংস্কারকগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ও সর্বোত্তম ছিলেন। কাযান মাদ্রাসায় আরবী, ফারসী ও রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করিবার পর তিনি নিজেই তথায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেখানে তিনি সর্বপ্রথম ইতিহাস, অংক, ভূগোল ও রাশিয়ান ভাষার মতো ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত বিষয়গুলি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। তৎকালে এইগুলি অভিনব ও নব প্রবর্তিত বিষয় ছিল যাহা প্রচরিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইত।

কায়্যূম নাসিরী তাতার, তুর্কী, আরবী ও ফারসী ভাষায় পঞ্চাশেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধ্যাপকরূপে তিনি তাঁহার প্রতিভায় ভাষাতত্ত্ব, ফোকলোর, ইতিহাস, ভূগোল ও নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা একাধারে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কাযানের চলতি ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া তাতার সাহিত্যিক ভাষা গঠন করাই ছিল তাঁহার সর্বোত্তম প্রতিভা। ইহা তাতার লেখকদের দ্বারা পূর্বে ব্যবহৃত চাগাতায় (Caghatay) কিংবা পূর্ব-তুর্কী ভাষার স্থান অধিকার করে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে তাতার সাহিত্যের অসাধারণ সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়তা করে।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি ছিল Fevakih ul-djulesa (فواكه الجلساء) (Kazan, 1884), The Enmuzedj (Kazan 1895, তাতার ভাষার পদবিন্যাসের রীতি বিষয়ক), The Lehce-i tatari (Kazan 1895-6, 2 Vols) এবং সর্বোপরি তাঁহার প্রসিদ্ধ Kazan Kalindari একটি বার্ষিক প্রকাশনা, ১৮৭০ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রকাশনা পরিলক্ষিত হয়। ইহা রুশ সাম্রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে জাদীদ (djadid) সংস্কারের মৌলিক ভিত্তি সম্বন্ধীয় সংবাদের সর্বোত্তম উৎস হিসাবে কার্য করিত।

রুশ ভাষায় তাঁহার দুইটি মৌলিক গ্রন্থ Obraztsi narodnoy literaturi Kazanskikh Tatar (কাযান প্রদেশের তাতারদের জনপ্রিয় সাহিত্যের দৃষ্টান্তসমূহ) N. F. Katanov-এর সহযোগিতায় Izvestiya Obshcestva Arkheologii, Istorii i Etnografii, Ixiii/5 (Kazan 1896), 374-427 এবং Pover'ya i Obryadi Kazanskikh Tatar obrazovavshicsya pomimo Vliyaniya na nikh sunitskogo Magometanstva (কাযানবাসী তাতারদের সুন্নী ইসলামের প্রভাববহির্ভূত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান), in Zapiski Imperatorskogo Russkogo Geograficeskogo Obshcestva, vi (Moscow 1880), 243-70।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাযান-তাতার, তুর্কী, রাশিয়ান ও ফরাসী ভাষায় কায়্যূম নাসিরী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। রুশ ভাষায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থটির নাম —Kayyum Nasiri (1825-1945), Materialy naucnoy sessii posvyashcennoy 120 letiyu so dnya rozdeniya (তাঁহার ১২০ তম জন্মবার্ষিকীতে বিজ্ঞান অধিবেশনের তথ্যাবলী), Acad, of Sciences, Kazan Division., Kazan 1948, pp. 136(তাতার ভাষাতেও প্রকাশিত হইয়াছে)। তুর্কী ভাষায় Saadet Cagatay-এর Abd-ul-Kayyum Nasiri সম্পর্কে AUDTCFD-এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রহিয়াছে, x/3-4 (Ankara 1952), 147-60। সর্বশেষে ফরাসী ভাষায় রহিয়াছে Ch. Lemercier-Quelquejay, Un reformateur Tatar du XIX siecle, 'Abdul Qayyum al-Nasyri, in Cahiers du Monde Russe et Sovietique, iv/1-2 (Paris 19), 117-42 (পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ)। Ch. Lemercier-Quelquejay (E.I.[2])/ মোঃ মোমতাজ হোসেন

কায়্যূমিয়্যা (قيومية) ঃ আ. শব্দটি (ق-و-م) ধাতু হইতে গঠিত। আল-কায়্যূম, আল-কায়্যাম (القيام) ও আল-কা'ইম (القائم) সেই সত্তা যিনি সৃষ্টির অস্তিত্বে আনয়ন, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনাদি ও অনন্ত কালব্যাপী বিরাজমান।

আল-কায়্যূম, আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম গুণবাচক নাম। অর্থ স্বয়ম্ভু, সর্বসত্তার ধারক, বিশ্বধাতা এবং সকল অস্তিত্বশালী বস্তুই তাঁহার ইচ্ছায় ও আদেশে বিদ্যমান (লিসানু'ল-'আরাব, ق-و-م ধাতুর অধীনে দ্র.)। সকল অবস্থায় সৃষ্টি জগতের যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্তা ও পরিচালক তিনি (ইমাম রাগিব, মুফরাদাত, ধাতুর অধীনে দ্র.)। কায়্যূম ও কায়্যাম উভয়ই অর্থে আতিশয্য আছে এমন কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য, অর্থ যে সত্তা নিজে স্বাধিষ্ঠ এবং সকল সৃষ্ট বস্তুর ধারক ও তত্ত্বাবধায়ক (মা'আরিফু'ল-কুরআন, তরজমানু'ল-কু'রআন ; তাফসীর-ই মাজিদী; ফী জিলালি'ল-কুরআন)। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত কায়্যূম; তবে রূপক অর্থে উহা বিশেষ এক আধ্যাত্মিক পদের অধিকারী মানুষের প্রতিও প্রযোজ্য। মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র)-কে এবং তাহার পর তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে পর্যায়ক্রমে তিনজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে তদ্রূপ বিশেষ পদের অধিকারী করিয়াছিলেন (রাওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা)।

কায়্যূমিয়্যা সম্পর্কিত সর্বাধিক বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. আবু'ল-ফায়দ কামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইহসান, রাওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা, রচনাকাল ১৩০১ হি., উর্দূ অনু. মালিক ফাদলু'দ-দীন, চানান দীন, লাহোর, প্রায় ১৩৩৫ হি.।

উক্ত গ্রন্থের বর্ণনানুসারে কায়্যূমিয়্যা-র সিলসিলা বা তারীকা শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র) হইতে আরম্ভ হয়। এই কারণেই তিনি কায়্যূম-ই আওওয়াল বা প্রথম কায়্যূম নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পরে তাঁহার খলীফাগণের মধ্য হইতে তিনজন বুযুর্গ পর্যায়ক্রমে কায়্যূম হইয়াছেন। মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র) তাঁহার একখানা পত্রে লিখিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার যে 'আরিফ বান্দা বস্তুসমূহের কায়্যূমিয়্যাত-এর পদ দ্বারা সম্মানিত হন, তিনি উযীরের মর্যাদাসম্পন্ন, সৃষ্টির সমস্যাগুলি তাঁহার নিকট পেশ করা হয়। সুলতানের তরফ হইতে প্রজা সাধারণের জন্য যত দানই আসে উযীরের মাধ্যমেই উহা তাহারা পায় (মাক্‌তূবাত, দাফতার-ই দুওয়াম, ৭৪সংখ্যক মাকতূব)। রাওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে ঃ কায়্যূম প্রকৃত সত্তাতুল্য, পক্ষান্তরে অন্য যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব কায়্যূমকে অবলম্বন করিয়া টিকিয়া আছে অর্থাৎ উহাদের আপতন (আরদ) মাত্র। উহাদের নিজস্ব অস্তিত্ব নাই। কায়্যূম, আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ না'ইব ও উযীর-ই আ'জাম সেই নিরাকার অতুলনীয় সত্তার নিকট হইতে একটি সত্তা তাহাকে দান করা হয় যাহা যাত-ই মাওহূব (ذات موهوب) নামে অভিহিত হয় (রাওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা, পৃ. ৯৫)।

গাওছ কুতুব, ফার্‌দ, আব্‌দাল, আওতাদ প্রভৃতি শ্রেণীর সকলেই কায়্যূম-এর না'ইব, অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকেন।

মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র)-র রচনায় একস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, "নুবূওয়াত মর্যাদার দিক দিয়া বিলায়াত (ولايت) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিলায়াত সুগরা (صغرى - নিম্নতর স্তর), কুব্‌রা (كبرى - উচ্চতর স্তর) ও 'উল্‌য়া (عليا - সর্বোচ্চ স্তর) যে কোন স্তরেরই হউক। বিলায়াতের সকল স্তরের যেখানে শেষ সেখান হইতেই নুবূওয়াতের আরম্ভ।"

কায়্যূমিয়াত-এর বিভিন্ন স্তরের বিশদ বিবরণ কাশফু'ল-হাকা'হিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। রাওদা'তুল-কায়্যূমিয়্যা (১ম রুক্‌ন, পৃ. ১০, ২য় রুক্‌ন, পৃ. ৮ এবং ৪র্থ রুক্‌ন, পৃ. ২৪০)। মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র)-এর শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ এই বর্ণিত হইয়াছে যে, তাসাওউফ-এর সকল তারীকা হযরত 'আলী (রা) পর্যন্ত পৌঁছিয়া সমাপ্ত হয়; কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র)-র তাসাওউফ-এর সিলসিলা হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) পর্যন্ত পৌছে। এতদ্ব্যতীত মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র) বংশগত দিক দিয়া হযরত 'উমার ফারূক (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত।

রাওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা গ্রন্থের বর্ণনানুসারে মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে "খাযীনাতু'র-রাহ্‌মাত" (রাহমাতের ভাণ্ডার) উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (পৃ. ১০০)। তিনি তাসাওউফের বিখ্যাত চারটি তারীকাতেই লোকদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিতেন; কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে কোন কোনটির সহিত তাঁহার নিজের তারীকার সামঞ্জস্য ছিল না, বিশেষত সিমা' (সঙ্গীত) ও ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওয়াজূদ (সর্বেশ্বরবাদ) সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাঁহার নিজের তারীকার নাম ছিল আহমাদিয়া। তিনি নিজেও তাঁহার বিভিন্ন পত্রে ও মাবদা' ওয়া মা'আদ গ্রন্থে (পাণ্ডু. সংখ্যা ২৯, P.C. iv, পত্র ৯খ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) কায়্যূমিয়্যাত-এর বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ১০৩২ হি. স্বীয় পুত্র 'উরওয়াতু'ল-উছকা মুহাম্মাদ মা'সূম (র)-কে কায়্যূমিয়্যাত-এর পদ দেন। ১০৩৪ হি. তিনি ইনতিকাল করেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম কায়্যূম ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং ; দ্বিতীয় কায়্যূম ছিলেন তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ মা'সূম, তৃতীয় কায়্যূম ছিলেন দ্বিতীয় কায়্যূম মুহাম্মাদ মাসুম-এর দ্বিতীয় পুত্র খাজা মুহাম্মাদ নাকশবান্দ এবং চতুর্থ কায়্যূম ছিলেন তৃতীয় কায়্যূম খাজা মুহাম্মাদ নাকশাবান্দ-এর পৌত্র খাজা মুহাম্মাদ যুবায়র। মুহাম্মাদ মাসূম তাঁহার একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "যিনি কায়্যূম হন তিনি একজন পূর্ণ সত্যাদর্শী হইয়া থাকেন; তিনি আল্লাহ-দর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, স্বীয় জ্ঞানের দর্পণে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর সৌন্দর্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে মোটামুটি ও সামগ্রিকরূপে প্রত্যক্ষ করেন। বিশ্বের সকল বস্তু বিশদরূপে তাঁহার মানসচক্ষুর গোচরে থাকে। কোনও বস্তুর সমগ্রটি যেইরূপে উহার অংশ-বিশেষকে বেষ্টন করিয়া রাখে তিনি সেইরূপে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। কোনও কোনও কায়্যূম নিজ গুণাবলীর সাহায্যে মহান সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সত্তা ও গুণাবলী উভয়ের প্রকাশস্থল হইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কায়্যূম অতি বিরল। যদি হাজার হাজার বৎসর পরেও এই শ্রেণীর একজন কায়্যূম-এর আবির্ভাব ঘটে, তথাপি উহা মনুষ্য জাতির জন্য এক মহাসৌভাগ্য বহিয়া আনে" (রাওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা, উর্দু, অনু., ২য় রুক্ন, পৃ. ৮)।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ যাওকী রচিত সির্র-ই দিলবারাঁ গ্রন্থ (২য় মুদ্রণ, করাচী ১৩৮৮ হি.)-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, মুজাদ্দিদিয়া তারীকায় কায়্যূমিয়্যাত-এর একটি বিশেষ ও অনন্য স্থান রহিয়াছে। উক্ত কায়্যূমিয়্যাতের তারীকা তাসাওউফের অন্য সকল তারীকা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। শাহ ইসমা'ঈল শাহীদ (র) তাঁহার 'আবকাত [যাহা এক দিক দিয়া শাহ্ ওয়ালিয়ুল্লাহ (র)-এর চিন্তাধারার ব্যাখ্যা] গ্রন্থে তিনি কায়্যূমিয়্যাতের চিন্তাধারার আরও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বস্তুর ধারণাগত উপাদান (ماهيت) ও বস্তু (مبدء تعين) এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ছুঁতার কর্তৃক নির্মিত একখানা চৌকির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। একটি কাঠখণ্ডের একখানা চৌকিতে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত উহাতে চারটি অবস্থা দৃষ্ট হয় ঃ (১) বস্তুটির স্বীয় অস্তিত্ব (অর্থাৎ কাঠখণ্ডটির মাহিয়্যাত); (২) সেই অস্তিত্বটি অর্থাৎ মাহিয়্যাতের সেই অংশটি যাহা মাব্দা-ই তা'আয়্যুন হইতে নির্গত (কাঠখণ্ডের উপর ছুতারের নিজ শিল্পবিদ্যা প্রয়োগে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা); (৩) কাঠখণ্ড (যাহা চৌকিতে রূপান্তরিত হইবার পূর্বে ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ছিল); (৪) مبدء تعن-এর সেই বিশেষ অবস্থা যদ্দরুন উহার (অর্থাৎ কাঠখণ্ডটির) উপাদান একখানা চৌকির আকৃতি পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের আলোকে প্রকৃত সত্তা (অস্তিত্ব) ভিন্ন অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে উহাদের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন দিকের পরিচয় নিম্নোক্ত চারটি পরিভাষার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যায় ঃ (১) হাকীকাত (বস্তুসমূহ যেমন, চৌকিটির সাধারণ মাহিয়াত); পরিভাষাগত উহাদিগকে আসমা-ই কাওনিয়া বলা যায়। উহাদেরই আরেক নাম হইতেছে আ'য়ান-ই ছাবিতা। (২) জিলাল (ظلال - ছায়া; যাহার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল), কাঠখণ্ডের স্থানে চৌকির যে বাহ্যিক আকৃতি তাহা জিল্ল; (৩) কায়্যূম যে কাঠখণ্ড চৌকিতে রূপান্তরিত হইল তাহাই অস্তিত্বশীল বস্তুর বাস্তব জগতে মাব্দা-ই তা'আয়্যুন; আর উহাই কায়্যূম নামে অভিহিত। উহা এই কারণে 'কায়্যূম নামে অভিহিত হইয়া থাকে যে, মাহিয়াতগুলি উহা দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং উহা দ্বারাই নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে; (৪) হুওয়ায়্যাত (هويت) কাঠখণ্ড ছুতারের কর্মফলে যে বিশেষ আকৃতি (চৌকি) ধারণ করিল উহা তাহারই ইচ্ছায় সাধিত হইয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মানাজির আহ্সান গীলানী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় অনূদিত 'আবাকাত গ্রন্থের পৃ. ২৯-৩৫)।

শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ (র) কায়্যূম ও মুকাওবিম— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। কারণ অধিবিদ্যার পরিভাষায় মাহিয়াত-এর বিভিন্ন অংশকে 'মুকাওবিম' বলে (যেমন প্রাণী ও বাকশক্তিসম্পন্ন [নাতিক] এই দুইটি মানুষের মুকাওবিম)। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক ব্যাপার এবং মাহিয়াতের জন্য কোন বস্তুর কায়্যূম হওয়া ভিন্ন ব্যাপার। মোট কথা এই যে প্রতিটি মাহিয়াতের ও প্রতিটি কায়্যূম একটি মাহিয়াত-এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে।

মাহিয়াত কোন বস্তুর বুদ্ধিগত ও ধারণাগত রূপ এবং কায়্যূম উহার বাস্তব রূপ হইয়া থাকে।

শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ তাঁহার গ্রন্থে অন্যদের এই অভিমতটি উদ্ধৃত করিয়াছেন "বিশ্বজগতই হইতেছে কায়্যূম; কিন্তু উহা সীমিত হইয়া যাইবার পর উহাকে 'আলাম নামে অভিহিত করা হয়।"

শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদের বর্ণনানুসারে বিশ্বজগতে আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন যাবতীয় বিষয় ও বস্তুর একটি মাত্র 'কায়্যূম' রহিয়াছে। অন্য কথায় বলা যায়, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা যে একজন— শুধু তাহাই নহে; বরং যে বস্তু যতদিন অস্তিত্বশীল ও বিদ্যমান থাকে, উহাকে ততদিন অস্তিত্বশীল ও বিদ্যমান রাখেনও একমাত্র একজন। মহাবিশ্বের অণু-পরমাণু হইতে বৃহত্তম নক্ষত্র প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি বিষয়ের ধারক ও রক্ষক (قيم) হইতেছেন একটি মাত্র শক্তি ও সত্তা। সারকথা এই যে, প্রতিটি বস্তুর ও প্রতিটি বিষয়ের পৃথক পৃথক ধারক ও রক্ষক নাই; বরং সকল সৃষ্টির ধারক ও রক্ষক সত্তা হইতেছেন মাত্র একজন ('আবাকাত, উর্দূ অনু, পৃ. ৩৫ ও ৩৭)।

শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদের বর্ণনানুসারে উপরিউক্ত 'কায়্যূম' বিভিন্ন নামেও অভিহিত হন ঃ 'জাহিরু'ল-ওয়াজূদ (শায়খ-ই আকবার মুহ্য়ি'দ-দীন ইব্নু'ল-'আরবী), ওয়াজূদু'ল-মুম্বাসিতি 'আলা হায়াকিলি'ল-মাওজূদাত (وجود المنبسط على هياكل الموجودات) (সৃষ্টির আকৃতির উপর যে অস্তিত্বটি ছড়াইয়া রহিয়াছে) [মুজাদ্দিদ আল্ফ-ই ছানী], নাফ্স-ই রাহ্মানী (রাহমানী আত্মা) [শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ, মাতা'আত) এবং নাফ্স-ই কুল্লিয়া (সকল সৃষ্টিতে বিরাজমান আত্মা), [শাহ্ ওয়ালিয়ুল্লাহ, লামা'আত]। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নাম খাতিম (সমাপক), আর-রাহমান (পরম করুণাময়) ও আল-মুরীদ (স্বেচ্ছাকারী) ('আবাকাত, উর্দূ অনু, পৃ. ২৮)।

শাহ ইসমা'ঈল শহীদ একক কায়্যূম-এর মধ্যে একাধিক কায়্যূম-এর প্রকাশ সম্বন্ধেও চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে জিলাল ও কায়্যূম-এর পারস্পরিক সম্পর্কেও প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, নিজ সৃষ্টির সহিত স্রষ্টা কায়্যূম-এর সম্পর্কের ধরন হইতেছে মা'ইয়াত (সাহচর্য)-এর ন্যায়। উক্ত সম্পর্ককে আমরা মা'ইয়্যাত-ই মুকাদ্দামা (পবিত্র সাহচর্য) নামে অভিহিত করিতে পারি। উক্ত 'মাইয়াত' প্রতিটি সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। উক্ত মা'ইয়্যাত সমগ্র সৃষ্টির কায়্যূম বটে। উহার কায়্যূমিয়্যাতকে স্রষ্টা কায়্যূম-এর কায়্যূমিয়্যাত হইতে

পৃথক করা যায় না (পূ. গ্র., পৃ. ৯৭)। মোটকথা এই যে, 'আবাকাত গ্রন্থে কায়্যুমিয়্যাত-এর বিশদ বিবরণ (যদিও উহা একটি অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য বিবরণ) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কায়্যুমিয়্যাত-এর ধারণা ও বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও তাঁহার সৃষ্টিরাজির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এবং সকল সৃষ্টির কায়েম থাকিবার রহস্য বিষয়ক একটি ধারণা। উক্ত ধারণা আবার অতি জটিল ও অতি দুর্বোধ্য ওয়াহ্দাতু'শ-শুহূদ-এর ন্যায় বিষয়াবলীর সহিত কিছুটা সম্পর্কিত।

কাদীর ছানা'উল্লাহ্ পানীপাতী তাঁহার এক পত্রে কায়্যুম-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিশেষ কৃপায় কোনও বান্দাকে একটি বিশেষ সত্তা দান করেন। অতঃপর সমগ্র সৃষ্টির কায়েম থাকিবার বিষয়টি সেই বান্দার সেই সত্তাটির উপর ন্যস্ত হয় এবং তাহার নিজ সত্তা (যাহা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার বিশেষ কৃপায় লাভ করিয়াছেন)-র ধারক ও রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হন। এইরূপ ব্যক্তি কায়্যুম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন" (আবু'ল-খায়র মুরাদআবাদী, কালিমাত-ই তায়্যিবাত, মাতবা মুজতাবা'ঈ, দিল্লী ১৩০৯ হি., পৃ. ১৪১-১৪৩)।

তাসাওউফের পরিভাষায় কায়্যুম শব্দের অর্থে কায়্যিম (قيم) শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্লাবী তাঁহার পত্রাবলীতে মীরযা মাজহার জান-ই জানান-কে তারীক-ই আহমাদিয়া-এর কায়্যিম নামে অভিহিত করিয়াছেন (কালিমাতে-ই তায়্যিবাত, মাকাতীব নামা-ই মাজ্হার জান-ই জানান)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ রাওদাতু'ল-কায়্যুমিয়্যা, (১ম রুক্ন, পৃ. ৭৬)-এ যে গ্রন্থপঞ্জী উল্লিখিত হইয়াছে উহা এই ঃ (১) মোল্লা বাদ্রু'দ-দীন, হাদারাতু'ল-কুদ্স ; (২) খাজা হাশিম কাশ্ফী, যুবদাতু'ল-মাকামাত; (৩) ঐ লেখক, বারাকাত-ই আহমাদিয়া; (৪) শায়খ মুহাম্মাদ হাদী, কাওয়াকিব-ই দুর্রিয়া; (৫) ঐ লেখক, হুজ্জাতু'ল-আহমাদিয়া, (৬) শায়খ মুহাম্মাদ শাফি'ল-হাল, তারীখ ; (৭) সাফার আহমাদ, তারীখ ; (৮) শায়খ মুহাম্মাদ হাদী, তাজদীদিয়্যা; (৯) ঐ লেখক, নাজমু'ল হুদা; (১০) ঐ লেখক, তারবীজিয়্যা; (১১) ঐ লেখক, মা'সূমিয়্যা; (১২) ঐ লেখক, তাবাকাত-ই মা'সূমী ; (১৩) ঐ লেখক, মাকামাত-ই মা'সূমী ; (১৪) মুহাম্মাদ 'উবায়দুল্লাহ্, হাদরাত মুরাব্বিজু'শ-শারী'আত, য়াকূত-ই আহমার; (১৫) শায়খ 'আবদু'ল-আহাদ, লাতা'ইফ-ই মাদীনা; (১৬) আবু'ল-'উলা, মাকামাত-ই নাকশ বান্দী ; (১৭) খাজা মুহাম্মাদ আমীন, মানাকিবু'ল-হাদারাত; (১৮) মুহাম্মাদ রিদা, মির'আতু'ল-'আলাম; (১৯) মুহাম্মাদ বাকা, মির'আত-ই জাহান্নুমা; (২০) দারা শুকোহ, কারামাতু'ল-আওলিয়া' ; (২১) ঐ লেখক, সাফীনাতু'ল-আওলিয়া'; (২২) ঐ লেখক, সাকীনাতু'ল-আওলিয়া'। অন্যান্য গ্রন্থের নাম নিবন্ধের স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ্ (দা. মা. ই.)/মুঃ মাজহারুল হক

কারওয়াঁ (کاروا ঃ কারাভান) (Karwan), স্পষ্টতই ইরানী ভাষার শব্দ; পরে ইহা আরবীতে আসে, সেখান হইতে ইংরাজী 'কারাভান' (Caravan), ফরাসী 'কারাভান', জার্মান 'কারাওয়ান' ইত্যাদি রূপ লাভ করে। ইহার আদিরূপ 'কার' বান (کاربان) "যে ব্যক্তি বাণিজ্যের তদারকী কাজ করে" সম্ভবত পাহলাবী যুগে উদ্ভূত। ইহার পাহলাবী রূপ কারপানদে হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইহা একটি বিশেষ্য পদ যাহা 'কার' অর্থাৎ 'সৈন্যদল' অথবা 'যুদ্ধ' এবং অনুসর্গ 'রান' অর্থাৎ একদল ভ্রাম্যমাণ বণিকের সমন্বয়ে গঠিত ঃ অর্থ— রসদ খাদ্যদ্রব্য ও জীবজন্তু সরবরাহের বহর বা 'কারাবান'। যাহা হউক, ইহা একটি অনিশ্চিত মূলের শব্দের জনপ্রিয় ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। ইহার অধিকতর বিস্তৃত অর্থ আদি ইসলামী যুগ হইতে ধরা হয় (এম. মু'ঈন. ফার্সী অভিধান, ৩খ, ২৮১৭), ৫ম/১১শতাব্দীর কবি ফিরদাওসী (দ্র.) ও ফাররুখী (দ্র)-র পুস্তকে কারাওয়াঁ বিবরণ পাওয়া যায়।

কারাওয়াঁ পথ বলিতে বাণিজ্য পথের বণ্টন ও দিকনির্দেশনা বুঝায়, যদিও ইহা কারওয়াঁ ব্যবস্থা বিকশিত হইবার পূর্বেও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার ভ্রমণ কারওয়াঁ-এর ন্যায় দলীয়ভাবে করা হইত। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবগণ বহুকাল পর্যন্ত 'ঈর' (عير) শব্দটি ও পরে অধিকতর প্রচলিত শব্দ 'কাফিলা" (كافلة) 'কারওয়াঁ-এর সমতুল্য হিসাবে ব্যবহার করিত। কাফিলা শব্দটি 'বণিকদের জমায়েত' অর্থে ৭ম শতাব্দীর শুরুতে প্রচলিত ছিল (দ্র. ইব্ন হিশাম, সীরা কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ২৫৩, ৩১২)। তুর্কী ভাষায় 'আরকীশ' অর্থাৎ 'কারওয়াঁ ৮ম শতাব্দী হইতে ব্যবহৃত (Clauson Etymological Dictionary, ২১৬-৭)।

ঘোড়া, গাধা খচ্চর, বিশেষ করিয়া উট বহর লইয়া কারওয়াঁ গঠিত হয়। উটের কারওয়াঁ সমতল ক্ষেত্রে ও মরুভূমিতে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় গাধা ও খচ্চর এবং কখনও কখনও ঘোড়া ব্যবহৃত হইত। কোন কোন এলাকায় কারওয়াঁ-এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ভারতে প্রচুর শস্য বহনের জন্য ১০০-২০০ গো-শকট সমন্বয়ে এক একটি কারওয়াঁ গঠিত হইত এবং প্রতিটি শকট ১০-১২টি গবাদি পশু টানিত (J. B. Tavernier, The six voyages.......London 1678, ২খ, ২৪ প.; Peter Mundy, Travels......, ২খ, pp. xxxvii, 45, 249, 250, 281, 283)।

ঐতিহাসিক জরিপ ঃ অধিকতর ভার বহনে সক্ষম হওয়ার কারণে উটের কারওয়াঁ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল (উটের গৃহপালন সম্পর্কে BADW দ্র.)। আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে উটের ভার বহন ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। উষ্ণ দেশগুলিতে যেমন ভারতে একটি উট ৬০০-৬৫০ পাউণ্ডের স্বল্প পরিমাণ ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু শীতপ্রধান আবহাওয়াতে অভ্যস্ত যে উট তাবরীয ও ইস্তাম্বুলের মধ্যে মাল বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি ১০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত ভার বহনে সক্ষম (Tavernier, i, 49-50)।

পশ্চিম এশিয়ায় কারওয়াঁ বাণিজ্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য হইল তথাকথিত 'রেশম পথ' (Silk Route)। চীন ও মধ্য এশিয়ার সংযোগকারী এই পথ ফারগানা পর্যন্ত এবং সেখানে হইতে দক্ষিণে ও পশ্চিমে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শত শত উটের বিরাট বিরাট কারওয়াঁ-এর মাধ্যমে দূর-দূর দেশের পণ্যসামগ্রী এই পথে বহন করা হইত। ইসলামী মধ্যযুগে বাগদাদ ছিল ইহার কেন্দ্র এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রাস্তাসমূহের সংযোগস্থল। ইহার প্রধান ভ্রমণ পথসমূহ হইল ঃ (১) বাগদাদ হইতে উত্তর দিকে তাইগ্রীস হইতে মাওসিল হইয়া হাতরা-হার্রান অথবা সিনজার-নিসিবিস-রাক্কা মানবিজ—আলেপ্পো— হামা-হিমস্— বা'লাবাক্ক-দামিশক্— রামলা কায়রো-আলোকজান্দ্রিয়া এবং সেখানে হইতে জাহাজযোগে উত্তর আফ্রিকা; (২) বাগদাদ হইতে ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীর বরাবর 'হীত'-এ এই নদী অতিক্রম করিয়া দামিশকগামী পথটি

মরুভূমির মধ্য দিয়া স্বল্পতম দূরত্বের পথ; (৩) পূর্বগামী পথটি বাগদাদ হইতে হামাদান এবং সেখান হইতে রায়-নিশাপুর-মারভ-বুখারা সামারকান্দ এমনিভাবে 'রেশম পথ' (Silk Route)-এর পশ্চিম প্রান্ত ফারগানা পর্যন্ত, যেখান হইতে চীনে যাওয়া যায়। একটি পথ খাওয়ারাযম-এর অন্তর্গত খীবা হইতে ভল্গা নদীর মুখ পর্যন্ত এবং সেখান হইতে ভগ্লার উজানে বাল্টিক দেশসমূহ পর্যন্ত গিয়াছে; অন্যটি কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর হইতে কৃষ্ণ সাগরের উত্তরাঞ্চলে গিয়াছে।

একটি কারওয়াঁ সংগঠন ও ভ্রমন ব্যবস্থা বর্ণনা করা যায়। প্রায় ৬০০ উট ও ৪০০ খচ্চরের সমন্বয়ে গঠিত একটি কারওয়াঁ বিবরণে, যাহা ১৮৩৮ খৃ. দিয়ারবাক্র হইতে মাওসিল পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিল, ১০/১২টি রজ্জুবদ্ধ উট একেকটি বহরে চলিত। ইহাদের মালিকগণ সম্মুখভাবে গাধা কিংবা ঘোড়ায় এবং দাসগণ হাঁটিয়া চলিত গাধা সম্মুখভাবে না চলিলে উটেরা নড়িত না। রাত্রি যাপনের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে কারওয়াঁ-র নেতা সম্মুখে অগ্রসর হইত এবং তাঁবু স্থাপনের স্থান দেখাইয়া দিত। উটগুলির বোঝা নামাইয়া বড় বড় গাঁইটকে আয়তাকারে সাজান হইতে, যেইগুলির মধ্যে প্রত্যেক যাত্রী রাত্রিতে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিত। উট ও খচ্চরগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া চরিবার জন্য তাড়াইয়া দেওয়া হইত কিন্তু ঘোড়াগুলিকে বাঁধিয়া রাখা হইত। অন্ধকার নামিলে উটগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া আঙ্গিনায় সারিবদ্ধভাবে খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হইত (Lettres du Marechal de Moltke sur O'lrient, Paris 1872, 229-30)।

আদি কাল হইতে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়িক ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। সেইহেতু নিয়মিত পথগুলির প্রান্তদেশে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর গড়িয়া উঠে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, মক্কার সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত কারওয়াঁ বাণিজ্যের উপর। বৎসরে একবার কারওয়াঁ বিশেষ দিকে যাত্রার জন্য সংগঠিত হইত। এই জাতীয় কারওয়াঁ ২৫০০ উট, ঘোড়া ও খচ্চর সম্বন্বয়ে গঠিত হইত। এই যুগে ১০০০ উটের কারওয়াঁকে মধ্যম আকারের মনে করা হইত; তেমনি বাগদাদ ও আলেপ্পোর মধ্যে চলাচলকারী ৪৫০টি উট ও ১০০টি খচ্চর ও গাধার কারওয়াঁকে ক্ষুদ্র আকারের কারওয়াঁ বলিয়া গণ্য করা হইত। কারওয়াঁর উটগুলিকে যাত্রীবাহীও করা যাইত; কিন্তু সাধারণত সেগুলি ভারবাহী ছিল। আবহাওয়া অনুসারে উটগুলি প্রতিদিন বিভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করিত। কারওয়াঁগুলি প্রতিদিন গড়ে ৬, ৮, ১০ অথবা ১২ ঘন্টা চলিত এবং প্রতিদিনের যাত্রা দুই ভাগে বিভক্ত হইত ঃ সকাল ৩টা অথবা ৪টা হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত এবং বিকাল ২টা অথবা ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত। যেহেতু একটি উট তিন, চার, এমনকি পাঁচটা ঘোড়ার সমান বোঝা বহন করিতে পারিত, সেইহেতু ইহা পণ্য পরিবহনের জন্য অপেক্ষাকৃত সস্তা বাহন ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কারওয়াঁ যাত্রাসমূহ নৌপরিবহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। শীতকালে নৌপরিবহন অসম্ভব হইত, তখন তিনটি কারওয়াঁ উত্তর সাহারার প্রান্তে সিজিলমাসা হইতে কায়রাওয়ান, ত্রিপোলি বার্কা হইয়া কায়রো পর্যন্ত চলাচল করিত। এই জাতীয় কারওয়াঁ দুই তিন মাসে তিউনিস ও কায়রোর মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রমকারী কারওয়াঁগুলিকে সাময়িক কারওয়াঁ এবং ভারতে মৌসুমী কারওয়াঁ বলা হইত (S. D. Goitein, Studies in Islamic history and institutions, Leiden, 1968, 303)। কারওয়াঁসমূহ গ্রীষ্মকালে আনাতোলিয়া, বলকান রাষ্ট্রসমূহ ও আযারবায়জানে চলাচল করিত। এমনিভাবে কারওয়াঁগুলি ইয্‌মিরেই পৌঁছিত ফ্রেব্রুয়ারী, জুন ও অক্টোবর মাসে (Tavernier, ১খ, ৪৬-৭); কিন্তু আনাতোলিয়া ও বলকান রাষ্ট্রসমূহ মরু অঞ্চলের বাহিরে অবস্থিত ছিল। তাই কারওয়াঁগুলি মিসর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য দেশে পৌঁছিত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, এমনকি এপ্রিল, মে ও জুন মাসে। গ্রীষ্মকালে বাগদাদ ও আলেপ্পোর মধ্যবর্তী মরুভূমি অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হরমুজকেন্দ্রিক কারওয়াঁগুলি ডিসেম্বর ও মার্চ মাসের মধ্যে চলমান থাকিত। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতে কারাওয়াঁগুলির নভেম্বরে দক্ষিণ ওরানে (আলজেরিয়া) আগমন এই শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল (F. Braudel, The Mediterranean...., Eng. tr., London 1972, i, 259--60)।

কারওয়াঁ পথ ও কারওয়াঁ বাণিজ্যের প্রসার ঃ কারওয়াঁ রাস্তার পাশে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান ছিল যেখানে রাত্রি যাপনের জন্য কারওয়াঁগুলি যাত্রাবিরতি করিত। মরুপথে ১৫ কিলোমিটার পর পর পানির চৌবাচ্চার ব্যবস্থা ছিল। এই যাত্রাবিরতির স্থানসমূহ রিবাত (দ্র.) বা অতিথি সদন (কারওয়াঁ সারায়-كاروان سراى) হিসাবে পরিগণিত হইত এবং সেগুলি প্রায় পরিচালনা করিতেন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। ওয়াক্‌ফ সংস্থা হিসাবে সেগুলিকে সাধারণত রিবাত (رباط) বলা হইত। এই রিবাতগুলির প্রতিষ্ঠাকালে ৪র্থ/১০ম শতাব্দী এবং মহান সালজূকদের সময় ইহা চরম বিকাশ লাভ করে। ৬ষ্ট/১২শ শতাব্দীর বিভিন্ন পুস্তকে রিবাত শব্দটি 'কারওয়াঁ সারায়' এর সমার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয় এবং মোঙ্গল আক্রমণের ফলে মধ্যে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কারওয়াঁ সারায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে সালজূক আনাতোলিয়াতে, বিশেষত ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের ফলে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিম পথসমূহের পার্শ্বে ৩০-৪০ কিলোমিটার অন্তর কারওয়াঁ সারায় বা খান নির্মিত হইত। এইগুলির শক্ত দেওয়াল ও গম্বুজসমূহ নিরাপত্তা বিধান করিত এবং সেগুলিতে ঘুমাইবার স্থান, রান্নাঘর, রসদ ঘর, গোসলখানা, মসজিদ, এমনকি রোগীদের জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল (O. Turan) Selcuk kervansaraylari, in Bell, x/39 (1946),477-95)। এই সময়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতি কারওয়াঁতে আমীর-ই কারওয়াঁসালার নামে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহার অধীনে রাহ্‌দার বা তুলকাবুল পরিচালিত একদল পাহারাদার থাকিত।

কারওয়াঁ-এর উদ্দেশ্য বাণিজ্য কিংবা হাজ্জ পালন যাহাই হউক না কেন, ইহার ভ্রমণের গতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হইত। ৩০-৪০,০০০ উটের হাজ্জ কারওয়াঁ পথে সামরিক পাহারার সাহায্যে কায়রো হইতে মক্কাতে ৪০ দিনে পৌঁছিলে পারিত। ৯ম/১৫শ শতাব্দী ও ১০শ/১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের অন্তরীপ হইয়া নৌপথে উন্নয়ন সত্ত্বেও সাহারাব্যাপী বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়, যদিও গতানুগতিক পথের কিছু সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল (Braudel op. cit, i, 181-2)। ১১শ/১৭শ শতাব্দী পারস্য ও ইজমীরের মধ্যবর্তী পথ খুব জনপ্রিয় ছিল, যদিও এই যাত্রায় ১০০ দিন সময় লাগিত। মাওসিল ও হামাদান হইয়া ইসফাহান যাইতে লাগিত ৫৮ দিন, আলেপ্পো হইতে বিরেজিক, দিয়ারবাক্‌র ও তাবরীয হইয়া পারস্যে যাইতে ৪২ দিন এবং ইসফাহান যাইতে ৬৬ দিন লাগিত। যাহা হউক, ইংরেজ ও ওলন্দাজগণের সমুদ্রপথে বাণিজ্য কোম্পানী গঠনের ফলে ১১শ/১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্য, ভারত ও

'উছমানী সাম্রাজ্যের কারওয়াঁ পথে বাণিজ্য হ্রাস পায়। স্থলপথে পরিবহনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল রেশম। মসলা দ্রব্যাদির বাণিজ্য চলিতে থাকে; কিন্তু পুরাতন মসলা পথ পরিত্যক্ত হয় (N. Steensgaard, Carracke, caravans and companies, Odense 1973, 174, 192)।

যাতায়াতের অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কারওয়াঁ-এর গঠন পরিবর্তিত হয় এবং পশুর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়। প্রতিটি কারওয়াঁতে ব্যবহৃত পশুর সংখ্যা কমিয়া গেলেও প্রতি বৎসর ব্যবহৃত কারওয়াঁ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারিত। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে বাগদাদ ও বসরার মধ্যে বৎসরে চারিবার বাণিজ্যিক কারওয়াঁ চলাচল করিত, সিরিয়া ও দক্ষিণ ইরাকের মধ্যে ছোট ছোট কারওয়াঁ নিয়মিত চলাচল করিত এবং দামিশক ও বাগদাদের মধ্যে বৎসরে তিনবার কারওয়াঁ চলিত। বাগদাদ কারওয়াঁ প্রতি বৎসর দামিশকে একবার এবং আলেপ্পোতে দুইবার যাইত। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। আনাতোলিয়াতে ক্ষুদ্রাকারে এই কারওয়াঁ-এর ব্যবস্থা ছিল। উত্তর ইরাকের মত এই পথে কোন কোন এলাকা ভগ্নপ্রান্তর হওয়ায় উটের পরিবর্তে খচ্চর ও গাধা ব্যবহার করিতে হইত।

সংগঠন ঃ নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল। সাধারণত কারওয়াঁতে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা থাকিত। কখনও কখনও পেশাদার সৈনিক এবং প্রতিটি যাত্রাবিরতিতে যাত্রীদের নূতন নূতন দল সংযোজিত হইত। রাত্রিকালে আক্রমণের ভয়ে সতর্ক প্রহরা দিতে হইত। যাত্রিগণ মাঝে মাঝে 'খবরদার' বলিয়া চিৎকার করিত এবং ঢাক বাজাইত (Mundy, Travels, ii, 41-2; The venot, Part 3, 19)। সম্পূর্ণ কারওয়াঁ সংগঠনের নেতাকে বলা হইতে 'কারওয়াঁ বাশী' (পারস্য ও ভারতে কারওয়াঁ-কেশ ও 'কারওয়াঁ-সালার') এবং তাহার একজন কিংবা দুইজন সহকারী থাকিত। ১৫-২০ উটের প্রতিটি দলের নিজস্ব দলপতি থাকিত এবং এইগুলি প্রধান দলপতির সাধারণ তত্ত্বাবধানে থাকিত। প্রধান দলপতি গতিপথ, যাত্রাবিরতি, কারওয়াঁ-এর অন্তর্ভুক্ত দলসমূহের শৃঙ্খলা বিধান করিত এবং সে নিরাপত্তা বিধানের প্রধান দায়িত্বে থাকিত। কারওয়াঁ-এর যাত্রা মন্থর গতি কিন্তু নিরাপদ ছিল। কারণ বিজন মরুপথে চলার জন্য সহকার বিশেষ ও অতিরিক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করিতেন। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কখনও কখনও বণিকগণ কারওয়াঁ-এর দলপতি নির্বাচন করিত। যদি কোন বণিকের ছয়টি উট থাকিত, তবে তাহার মধ্যে একটি তাহার অত্যাবশ্যকীয় সাজসজ্জা বহন করিত। কারণ কারওয়াঁ-এর প্রতিটি উট বা ঘোড়ার জন্য ইহার মালিককে, দলপতিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হইত। এইভাবে কারওয়াঁটি যদি বৃহদাকার হইত তবে দলপতির প্রচুর অর্থ লাভ হইত। ইহার কিয়দংশ সে প্রহরীদের দিত এবং কিয়দংশ পথ খরচ হিসাবে ব্যবহার করিত। যে সকল স্থানে আবগারী শুল্ক আদায় করা হইত, সেই সকল স্থানে প্রতিটি উষ্ট্রবাহী পণ্যের জন্য চারি কুরুশ ও ভারবাহী পণ্যের জন্য দুই কুরুশ আদায় করা হইত (Tavernier, part 1, 7, 8, 9, 10, 45, 46; Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa and Europe during the years 1799, 1800, 1801, 1802 and 1803, London 1814, i, 112-13)।

মরুভূমিতে যেখানে পানি দুষ্প্রাপ্য বা পাওয়া যাইত না সেখানে পানি খোঁজ করিবার জন্য 'তাকশীফ' নামে বেতনভুক বালকগণকে নিয়োগ করা হইত। চলার পথ ঘূর্ণীবায়ুতে অস্পষ্ট হইলে 'তাকশীফ'কে পথ খুঁজিবার জন্য অগ্রগামী হইতে হইত এবং কখনও কখনও তাহাকেই প্রথম মৃত্যুবরণ করিতে হইত (ইব্ন বাততূতা, ৪খ, ৩৮১-৩, তু. Leo Africanus, The history and description of Africa, London 1898, ১খ; পৃ. ১৭৩-৪)। কোথাও কোথাও, যেমন পশ্চিম সূদানে, অন্ধ বালকগণকে কাজে লাগান হইত। তাহারা ঘ্রাণ-শক্তির সাহায্যে পথের সন্ধান করিত। সাহারার কারওয়াঁ দলপতিদের বার্বার-গোত্রের সহিত সম্পর্ক ছিল। এখানে চারিটি প্রধান পথ উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার সংযোগ সাধন করিত ঃ (১) সিজিলমাসা ও ওয়ালাতা হইয়া সেনেগাল ও উত্তর নাইজারে যাওয়ার পথ; (২) গাদামেস-ঘাট হইতে হাউসাল্যাণ্ড ও আয়ার যাওয়ার পথ; (৩) ত্রিপলি-ফোযযান-কাওয়ার হইতে বোরনু ও লেক যাদ-এ যাওয়ার পথ এবং (৪) দূরতম পূর্বপথ, সাইরেনাইকা-কুফরা-ওয়াদাই পথ। প্রথম তিনটি পথ ছিল সম্পূর্ণভাবে বারবারদের আয়ত্তে। তাহারা পথিপার্শ্বে কূপ খনন করিত এবং চলন্ত কারওয়াঁসমূহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত। বড় বড় কারওয়াঁ বৎসরে মাত্র একবার এই দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করিত। এমনিভাবে ১৮০৫ সালে ২০০০ ব্যক্তি ও ১৮০০ উটের একটি কারওয়াঁ তাগাযা হইতে তিম্বুকত যাইতে তৃষ্ণায় ধ্বংস হইয়া যায়। (E. W. Bovill, The golden trade of the Moors[2], London 1958, 52, 235, 236)। এই শতাব্দীব্যাপী গতানুগতিক কারওয়াঁ আফ্রিকাতে প্রচলিত থাকে। এমনিভাবে ১৯০৮ সালে ২০,০০০ উটের একটি কারওয়াঁ আয়ার হইতে গাদামীস ও ঘাত হইয়া যাত্রা করে (Bovill, op. cit, 236, 238)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের দলীলপত্রে মরুভূমিতে কারওয়াঁ যাত্রার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ত্রিপোলিতে (উত্তর আফ্রিকা) কারওয়াঁ সংগঠনে ইচ্ছুক কয়েকজন বণিক প্রথমে নিজেরা সম্মত হয় এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভের পর উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত বলিয়া খ্যাত এক শায়খের মধ্যস্থতায় তাহারা যে সকল শায়খের গোত্রের জমির উপর দিয়া অতিক্রম করিবে তাহাদের সহিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। যদি শায়খ তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিত তবে সে প্রাদেশিক রাজধানীতে যাইত। তাহার সহিত থাকিত দলভ্রষ্ট লোকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দক্ষ রাককাসূন এবং পথ ও পানির উৎসস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত খাবীর। রাজধানীতে বসিয়াই মজুরীর পরিমাণ ইত্যাদি স্থিরীকৃত হইত; তাহা লিখিত থাকিত এবং প্রাদেশিক কর্মকর্তা দ্বারা নিশ্চিত করা হইত। এই সকল শর্ত লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি মানশূর বা আনুষ্ঠানিক দলীল শায়খকে দেওয়া হইত। সে কারওয়া-এর পরিচালক হিসাবে কাজ করিত, দলীয় সকলের জীবন ও মালপত্রের রক্ষায় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিত এবং উদ্ভূত সকল প্রকার আইন ও অপরাধমূলক প্রশ্নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত। কারওয়াঁ-এর উদ্যোক্তাগণ জনসমক্ষে ঘোষণার ব্যবস্থা করিতেন। সাড়া দানকারী সকলেই অপরিহার্যভাবে পেশাদার বণিক ছিল না; সহযোগী হিসাবে অব্যবসায়ী ব্যক্তিগণও অংশগ্রহণ করিতে পারিত এবং শায়খকে জানাইত যে, তাহার ছয়টি উটের প্রয়োজন (তিনটি লাভে বিক্রয়ের আশায় একটি মালামাল পরিবহনে, ও আরোহণের জন্য, একটি পানি ও অন্যটি খাদ্য বহনের জন্য)। এই খবরের ভিত্তিতে শায়খ কারওয়াঁ-এর বন্টন ব্যবস্থা করিত [Musevvid-zade Dervis Osmanli Imparatorluguna ait vesikalar, in Istanbul Dergisi, n. s. i./10-12

(Istanbul 1940), 393-4]। কারওয়াঁ-এর শায়খগণ ও সশস্ত্র প্রহরার দলপতিগণের প্রত্যেককে পদমর্যাদা অনুযায়ী শিরাচ্ছাদনসহ পোশাক দেওয়া হইত। মধ্য আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রীরা এই ধরনের কারাওয়াঁ-এর সঙ্গে বিনিময়ের জন্য মালপত্র বহন করিত। কারণ ঐ সকল স্থানে মুদ্রার প্রচলিত ছিল না।

৯ম/১৫শ শতাব্দী হইতে ১৯শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে কারওয়াঁ ব্যবসা ঃ 'উছমানী সাম্রাজ্যের বহুল বিস্তৃত কারওয়াঁ ব্যবস্থা পরিবহন ও যোগাযোগের সকল প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে মিটাইত। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষ দিকে আনাতোলিয়া হইয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারওয়াঁ পথ ছিল বুরসা হইতে তাবরীয, ইহার উত্তরমুখী ও দক্ষিণমুখী শাখা হইতে আরম্ভ করিয়া (কাস্তামনু বোলু, আংকারা-কোরাম), তাহার পর আমাসিয়া, তোকাত, ইরযিনজান, এরযুরূম এবং আরাস উপত্যকা অতিক্রম করিত। ইহা ছিল প্রধানত রেশম পথ [H. Inalcik. in Bell xxiv/93 (Ankara 1960), 45-96]। ১০১৯/১৬১০ সালের এক দলীল মারফত বাগদাদ হইতে আলেপ্পো চলাচলকারী কারওয়াঁ-এর গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার ১২০ জন বণিকের থাকিত ৯৪×২ ইউক পরিমাণ মাল ইউক পরিমাণ মাল (এক ইউক সমান একটি ভারবাহী পশুর দুই দিকে ঝুলানো দুইটি গাঁইট)। (Basbakanlik Arsiv Genel Mudurlugu, M M 7499)। বিভিন্ন নগরের মধ্যে যাতায়াত করিত এমন ছোট ছোট কারওয়াঁও ছিল। এইগুলিকে বলা হইত মাক্কারী (ভাড়ার জন্য) এবং এইগুলি ভাড়ার বিনিময়ে বণিক ও ভ্রমণকারীদিগকে বহন করিত। ইস্তাম্বুলে সুলতান ৪র্থ মুরাদের সময় ৩০০০ লোক এই ব্যবসায়ে রত ছিল (Ewliya Celebi, Seyahatname, i, 520; H. Ongan, Ankara'mn 1 numarali Ser'iye sicilli, Ankara 1958, 64; see, for the makkaris operating between Damascus and Baghdad, Mustafa Diya, Rehnuma-yi Baghdad, Damascus 1314, 4-5)। কারওয়াঁ-এর অধিকাংশ লোক ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত বণিক; কিন্তু পর্যটনকারিগণও কারওয়াঁ-এর নিরাপত্তা লাভের জন্য ইহার সহিত যোগাযোগ করিত।

১১শ/১৭শ শতকের শেষদিকে আরব গোত্র ও দস্যুদের হুমকির কারণে 'উছমানী সাম্রাজ্যের পর্যটকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অন্যভাবে চলাচল অসম্ভব ছিল (C. Le Bruyn, Travels, London 1718, ii, 329; Basbakanlik Arsivi, MD no. 115, pp.285, 306)। যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া আলবেনিয়া ও অন্যত্র বহু খান (সারায়) বিদ্যমান থাকার 'উছমানী সাম্রাজ্যের য়ূরোপীয় দেশসমূহেও কারওয়াঁ ব্যবসায় প্রচলিত ছিল (cf. Hamdija Kresevlijakovic, Hanovi i Karavansaraji u Bosni i Hercegovini Sarajevo 1957)। "বেলগ্রেড কারওয়াঁ" নামে পরিচিত ব্যবসা সংস্থার মাধ্যমে ইস্তাম্বুল ও বেলগ্রেডের মধ্যে নিয়মিত কারওয়াঁ গমনাগমন করিত। ১৯শ শতাব্দীতেও ইহা কার্যকারী ছিল (for a document of 1803, see Basbakanlik Arsivi, Cevdet tasnifi, iktisat no, 2029; see also S. Dimitriyevic Les caravans de Dubrovnik, dans la Serbie du sud au XVII^e siecle, Belgrade 1958)।

আনাতোলিয়ায় প্রচলিত খচ্চর কারওয়াঁ-এর নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্মুখ ভাগের পশুটি কিছুটা অগ্রবর্তী থাকিতে এবং অপেক্ষাকৃত কম ভার বহন করিত। ইহাকে বলা হইত পেশেক, তাহার পশ্চাদবর্তীটিকে বলা হইত জিন্দার এবং তাহার পরবর্তীটিকে বলা হইত পেশদার। সকল পশুর গণ্ডদেশে ছোট ঘন্টা বাঁধা থাকিত এবং ইহার আওয়াজ এক ঘন্টার দূর পথ হইতে শোনা যাইত। 'খান'সমূহে ইহাদের থামিতে হইত—হয় বাহিত মালপত্র সরবরাহ করিতে, না হয় অন্য পশুদিগকে বদলি দিতে। উটের ও খচ্চরের মালিকগণ জোটভুক্ত থাকিত [see. C. Cahit Guzelbey, Gaziantep'te kervancilick, in Gaziantep Kultur Dergisi, v/79 (Gaziantep 1962), 79, 80, 94]।

পারস্যে কারওয়াঁ চলাচল করিত রাত্রিকালে, কিন্তু দস্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'উছমানী সাম্রাজ্যে কারওয়াঁ চলাচল করিত দিবাভাগে। কারওয়াঁ-এর দলপতি নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া রাত্রিকালে সময় ঠিক করিতে পারিত। তাহার পশ্চাতে থাকিত একজন ব্যয়রাকদার (পতাকাবাহী)। একটি দণ্ডে জড়ানো বিপদের সম্মুখীন হইলে সে কারওয়াঁ-এর মুখোশধারী পাহারাদারদিগকে সর্তক করিবার জন্য এই পতাকা নাড়িতে থাকিত। বাগদাদ-আলেপ্পো কারওয়াঁতে কফি প্রস্তুতকারী থাকিত। একজন চাবুশ, যে দলপতির আদেশ জারী করিত, একজন মু'আযযিন এবং অন্যান্য পেশাদার লোক, যেমন চর্মকার, নাপিত, ঘোড়ার পায়ে না'ল লাগানো লোক ও কাঠমিস্ত্রী। পশ্চাৎবর্তী লোকজনকে বলা হইত হাম্লা [J. B. L. J. Rousseau, Voyage de Bagdad a Alep (1808), Paris 1899; cf. Tavernier, Voyages, 47, 60]।

Peter Mundy-এর মতে (২খ, পৃ. ৪৫) ১৬৩০ সালে ভারতের সুরাত হইতে আগ্রাগামী কারওয়াঁ-য় ২৫০-৩০০ শকট ও প্রায় ১৮০০ লোক থাকিত এবং অগ্রসর হইতে থাকিলে সংখ্যাও বাড়িতে থাকিত। কারণ দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় অনাহার হইতে রক্ষার জন্য লোকজন কারওয়াঁতে যোগ দিত। ভারতে কোন 'খান' ছিল না; কিন্তু পথিমধ্যে শহরগুলিতে সারায় নামে সরকারী ভবন ছিল। আবার Peter Mundy-এর মতে (২খ, পৃ. ৩৭) মৌসুমের সর্বশেষ কারওয়াঁ-য় ২৬৮টি উট ও ১০৯টি শকট থাকিত।

হাজ্জযাত্রী কারওয়াঁ ঃ পবিত্র শহরগামী হাজ্জযাত্রী কারওয়াঁসমূহ আমীরু'ল-হাজ্জ-এর তত্ত্বাবধানে থাকিত (Ewliya Celebi, x, 424-5, 435 etc)। যে সকল বেদুঈন দলপতির এলাকা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত সেই সকল দলপতিকে অর্থ প্রদান করার একটি নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল (Tavernier, 62-3)। 'উছমানী আমলে হাজ্জ কারওয়াঁতে খাদ্য সরবরাহ, পানি সরবরাহ ও প্রতিরক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল (কায়রোর কারওয়াঁতে ৪০,০০০ লোক ছিল)। কায়রো কারওয়াঁ ছিল দুইভাবে বিভক্ত ঃ উত্তর আফ্রিকা হইতে ১০,০০০ লোকের দ্বারা বহির্যাত্রায় পশ্চাৎভাগ ও ফিরতি যাত্রায় সম্মুখ ভাগ গঠিত হইত। হাজ্জ কারওয়াঁ-এর বর্ণনার জন্য দ্র. H. Maundrell, A journey from Aleppo to Jerusalem in 1697. Beirut 1963. 171-3; F. Hasselquist, Voyages and travels is the Levant in the years 1749, 1750, 1751, 1752, London 1776, 77-83; E. W. Lane, The manners and

customs chs. 24; 25; J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829. 247-8; and see MAHMAL।

পতন ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবহন প্রকৌশলের বিরাট পরিবর্তনের ফলে কারওয়াঁ ব্যবসায়ের পতন ঘটে। কোন কোন এলাকায় নৌযানের প্রবর্তনের ফলে কারওয়াঁ যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৬৯ খৃ. সুয়েজ খাল উদ্বোধনের ফলে ইহার দ্রুত পতন ঘটে; তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কারওয়াঁ প্রচলিত ছিল। আরও পরে মোটর যান উটের স্থলাভিষিক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর হইতে যদিও মরুপথ কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত, তবুও এই ব্যবসায়ের অবশিষ্টাংশের জন্য দামিশকই কেন্দ্র ছিল। তখন আর শত শত, হাজার হাজার উট নয়, স্থানীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য স্বল্প সংখ্যক উট ব্যবহৃত হইত (C. P. Grant. The Syrian Dese : tr caravans, trvel and exploration. London, 1937. 156-7)। কোন কোন এলাকায় রেলপথ স্থাপন কারওয়াঁ ব্যবসার উপর চরম আঘাত হানে, যেমন ১৮৫৯ সাল হইতে আনাতোলিয়াতে ১৯১৮ পর্যন্ত ও পবিত্র নগরগুলিতে পাঁচটি বিরাটকায় কারওয়াঁ চলিত বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে, সিরিয়া হইতে, পারস্য উপসাগরীয় এলাকা হইতে, আরব ভূখণ্ডের পরে 'উমান জিলা হইতে এবং মিসর হইতে। তিনটি বিষয় এই পতনকে দ্রুত করিয়াছে বলিয়া ধরা হয় ঃ (১) সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পশু রিকুইজিশন; (২) দস্যুদলের আক্রমণ; (৩) বর্ষাকালের রাস্তায় পুলের অভাব ও রাস্তার দুরবস্থা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (মূলপাঠে প্রদত্ত প্রসঙ্গের অতিরিক্ত); (১) মুহাম্মাদ ইবন হিন্দু-শাহ নাখচী-ওয়ানী, Dustur al-katib fi ta'yin al-maratib, ed. A. Ali-zade, Moscow 1964, i, 228-9, 552-3; (২) Piero Tafur, Travels and adventures, 1435-1439, London 1926, 83; (৩) O. Turan, Selcuklular ve Turk-Islam medeniyeti. Ankara 1964, 262; (৪) J. Jomier, Le Mahmal et la caravane egyptienne..... Cairo 1953; (৫) H. Sahillioglu, Bir tuccar kervani, in BTTD, ix (Istanbul 1968), 63-9; (৬) A. Cayci, Buyuk Sahra'da Turk-Fransiz rekabeti (1858-1911), Erzurum 1970; (৭) P. Tournefort, A voyage into the Levant, London 1718, ii, 180, 325; (৮) W. C. Brice, Caravan traffic across Asia, in Antiquity, xxviii (1954), 78-84; (৯) A. Sprenger, Die Post-und Reiserouten des Orients, Amsterdam 1962; (১০) F. Taeschner, Das anatolische Wegenetz ..... Leipzig 1924-6; (১১) J. Sauvaget, Les caravanserails syriens du Hadjdj de Constantinople. in Ars Islamica, iv (1937), 98-121; (১২) K. Muller, Die Karawanserai im Vorderen Orient, Berlin 1920; (১৩) S. F. Mouhtar, Travels and transportation in the Ottoman Empire during the XIXth century (unpublished thesis, Cornell 1928); (১৪) anon MS description of caravan routes from Istanbul into Arabia Ist. Un. T. Y. 93638; (১৫) J. P. Ferrier, Caravan journeys, London 1856, 53; (১৬) A. L. Salvator, Caravan routes between Egypt and Syria, 1881; (১৭) H. Schreiber, tr. S. Thomson, The history of roads, London 1961, 24-51; (১৮) F. Taeschner, Die Entwicklung des Wegenetzes ..... in Anadolu Arastirmalari, i/1 (Istanbul 1959), 169-93; (১৯) A. Mez, Die Renaissance des Islams, 461-72, Eng. tr, 492-505; (২০) M. I. Rostovtzev, The caravan cities, London 1932; (২১) R. Mauny, Tableau geographique de l'Ouest Africain au moyen age, Dakar 1961, 398-403; (২২) দা. মা. ই. ১৭ খ, ১১-১২।

Cengiz Orhonlu (E. I.[2])/মুহাম্মদ আবদুর কাদের

কারওয়াশা (Karwasha=قروشة): আদিতে যাদু ব্যবসায়ে অভ্যস্ত মাগরিবীদের মধ্যে প্রচলিত অপভাষা। বর্তমানে সুদানে উদ্ভূত দাকারনাদের (একবচনে দাকরুনী) ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা হয়। ইহারা দক্ষিণ মিসরের মাদামূদ-এর কাছাকাছি সুদানী গ্রামে এবং অন্যত্র বসবাস করে। ইহারা বাজারে বসিয়া রক্ষাকবচ লিখিত। চামড়ার তৈয়ারী চৌকোণা লাল রঙের থলিতে এইগুলি আবৃত করিয়া বগলের নীচে তাহারা বহন করিত। প্রচলিত ছিল যে, কুদৃষ্টি ও রোগব্যাধি হইতে রক্ষা পাইতে, দোকানে খরিদ্দার আকৃষ্ট করিতে, কোনও নারীর অনুগ্রহ লাভ করিতে, বিচারক, মেয়র বা অন্য কাহারও সম্মুখে নির্ভয়ে কথা বলিতে এই মাদুলি কার্যকর ছিল। দক্ষিণ মিসরের কথ্য আরবী রুতানা, যাহাকে রুতায়না বলে, সেই গোপন ভাষায় 'ডাকারনা'রা নিজদের মধ্যে ব্যবহার করিত। ইহাকে বলা হইত কারওয়াশা (ইহার ক্রিয়ারূপ কারওয়াশ অর্থাৎ 'কথা বলা' অথবা ক্রিয়ারূপ বালহাম হইতে বালহামা অর্থাৎ "অবোধ্য কায়দায় কথা বলা" এই শব্দগুলির অংশবিশেষ আল-মাগরিবে উদ্ভূত ঃ মিয়য়ান 'ভাল', বিয়্যাক 'অনেক', সিবসা 'সিগারেট'। এইগুলি কখনও কখনও মরোক্কীয় ধ্বনি যোগে ব্যবহৃত হয়; যিমযিমা জিমজিমা নয় 'মাথা'। লুক্সর অঞ্চলের কথ্য ভাষার ইহাই ব্যাকরণ রূপ। মানুষকে বলা হয় দিয়াবলু (বহুবচন দিয়াবলাত) [স্পেনীয় ভাষায় দিয়াবলু 'শয়তান']। বাদ-ই 'আমি চাই'। 'এশ বাদ অক' 'তুমি কি চাও ?'। দিয়াত (স্বরবর্ণ দিয়াত-এর পর) অধিকারণ কারক গঠনের প্রচলিত ব্যবহার এল-য়ু সুফা দিয়াত-উ, 'তাহার স্ত্রী' এল-কারবারী দিয়াত-হা, 'তাহার স্বামী', এস-সূত্রা দিয়াত এল-মুকসা, 'ঘরের দরজা'। বি-দিয়াত অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত; জায়্যিম এস্-সিবসা বি-দিয়াত এন-নূরা, 'দিয়াশলাই দিয়া সিগারেট ধারও'; নূদ, বি-দিয়াত-ই 'আমাকে ত্যাগ কর', জায়্যিম এল-মিমাত মিন এদ-দিয়াবলু ললি বি-দিয়াত অক', 'তোমার সাথী লোকটির নিকট হইতে টাকা লও'। উপসর্গ 'কা' বাদ দেওয়ার প্রথা দেখা যায়। লাম্বা কায়-কুন এল-ওয়াহীদ ফিল-লাম্মাম, 'বাজারে যদি কেউ থাকে'।

বহু পদই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। 'আলিফ' (ছাল, কলম) [আলীফ অক্ষরের দীর্ঘস্বরে উচ্চারণের স্মরণে], 'মীম' (ভাল করিয়া কালি দেওয়া) মীম

অক্ষরের মত 'জীম' চমৎকার (জায়্যিদ শব্দের সংক্ষেপকরণ), বহু সাম্য (Polyvalent) ক্রিয়া জায়্যিম সহিত অর্থাৎ কথা লওয়া, রান্না করা, তৈয়ার করা, মূল অর্থে ভাল করা। পানিকে রাবিয়া বলা হয় (অর্থাৎ যাহা সিক্ত করে) এই ভাষায় বাজার (লাম্মাম "লোকজনের জমায়েত"), নাওযাদা (স্ত্রীলিঙ্গ 'রাস্তা' অর্থাৎ 'পথচারী' (নাদ, য়িনূদ হইতে অর্থাৎ 'চলিয়া যাওয়া, হাঁট')। য়ূসফা (স্ত্রীলোক) বলিতে য়ূসুফ' বা সুন্দর যুবকের আদর্শকে বুঝায়। কুকুরকে বলা হয় নাববাহ', যাহা ঘেউ ঘেউ করে; পায়রাকে তায়য়া অর্থাৎ 'যাহা ওড়ে'। স্ত্রী গাধা জাররায়া 'যাহা দৌড়ায়' বুঝায়। কতকগুলি পদ হালাবের অপভ্রংশ হইতে আসিয়াছে। আদ-ওয়ান 'মাংস', বাসসামা 'চোখ' শাব্দিক অর্থে যাহা দেখে', তানা (য়িতিনি) একই সঙ্গে প্রবাহ করা ও বধ করা বুঝায়। কাববারী হালাব "শায়খ অথবা মেয়র"; এখানে স্বামীও বুঝায়। করওয়াশা দাকুনি শব্দসমূহ গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে ঃ জাগুর 'রাজা', মুর্তা 'ঘোড়া', লেত 'গাধা', ফাত্তাহ্ 'সাদা'। কতিপয় শব্দের আদিরূপ অনিশ্চিত ঃ আবরু ফেল্লাহ্ ও আববুওয়া 'ফেল্লাহা, যারবূন অথবা কীর 'কৃষ্ণকার মানব' তিদিক, "ক্ষুদ্র, উতিক 'বসা' ও ওয়াত্তাক 'আনয়ন করা'। বহুল ব্যবহৃত কয়েক ডজন শব্দের স্বল্পসংখ্যক শব্দপুঁজি প্রকৃতপক্ষে পেশাদার নিম্নবৃত্তের অপভাষা হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Vycichl, The slang of the Halab of the Sudan, in Kush, vii (Khartoum 1959), 223-8; (২) ঐ লেখক, Qarwasha in Actes du Congres d'etudes des cultures mediterraneenes d'inlluence araboberbere, Malta 1972।

W. Vycichl (E. I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

কারকাদ্দান (كركدن) ঃ কারকাদান্ন হইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারকান্দ (স্ত্রীলিঙ্গ কারকান্দা, মাগরিবী করকেদান) ফারসী কারগাদান শব্দের আরবীকৃত রূপ। ফারসী কারগাদান শব্দটিও আবার পাহ্লাবী 'কার্গ' শব্দ হইতে উদ্ভূত। এইগুলি প্রধানত ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাইনোসিরোটিডা (Rhinocerotidae) প্রজাতির প্রাণী বুঝায়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে (১) ভারতীয় এক খড়্গবিশিষ্ট গণ্ডার Rhinoceros unicornis), (যাহা মিরমীস, যিবা'রা'/যিব'আরা ও সিনাদ নামেও অভিহিত); (২) জাভার গণ্ডার Rhinoceros sondaicus)। আল-বীরূনী উহাকে উহার সংস্কৃত নাম কুন্দা নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং (৩) সুমাত্রার গণ্ডার (Didermoceros sumatrensis) যাহা পারস্যে 'নিশান' বলিয়া অভিহিত এবং নিস্য়ান ও নূশান-এ পরিণত হইয়াছে।

ইসলাম প্রচার ও মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের অনেক পূর্ব হইতেই আরবরা ইথিওপিয়ার মাধ্যমে আফ্রিকীয় গণ্ডারের প্রজাতির কথা জানিত। তাহারা গণ্ডারের স্থানীয় নামটি বহাল রাখিয়া সেটির শুধু আরবীয়করণ করে। ফলে কৃষ্ণ গণ্ডারের (Diceros bicornis) নাম হয় হারীশ, হারীস (আরওয়াহারীস, ওয়ার ওয়াহ্রীস হইতে যাহার অর্থ বৃহৎ শৃংগযুক্ত প্রাণী), খিরতীত ও খারতীত। Burchell-এর বিবৃত গণ্ডার বা শ্বেত গণ্ডার (Ceratotherium simum) পরিচিত হয় হির্মীস, আবূ কার্ন, উম্ম কার্স ও 'আনাযা নামে। এই স্থূলচর্মী জন্তুর কথা রোমকগণ জ্ঞাত ছিল। ৫৫ খৃ. পূর্বাব্দে প্রথমবারের মত সার্কাসে খেলা দেখাইবার জন্য পম্পেই নগরী একটি গণ্ডার সরবরাহ করে। পরে রোমক সম্রাট ডোমিটিয়ান-(Domitian) তাঁহার মুদ্রায় গণ্ডারের প্রতিমূর্তি ব্যবহার করেন। বিখ্যাত প্যালেস্ট্রিনা মোজাইক-এ গণ্ডারের একটি চমৎকার প্রতিমূর্তি অংকিত আছে। ইসলামের 'আব্বাসী বংশের শাসনের সূচনা পর্বে কারকাদ্দান কথাটি দৃশ্যত হারীশ কথাটির মধ্যে অভিন্নার্থক হইয়া উঠে বলিয়া মনে হয়। একই অঞ্চলে বসবাসকারী হাতি (ফীল দ্র.) সম্পর্কিত অধিকাংশ লেখায় গণ্ডারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই প্রাণীই তাহাদের বিপুল ওজন ও বিস্ময়কর শক্তিমত্তার জন্য পরিচিত। তবে পোষ মানানো হাতি বহুকাল ভারত, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পারস্যে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকায় প্রাণীটি সকলের নিকট পরিচিত হইয়া ওঠে। কিন্তু ভয়ংকর উগ্র মেযাজের এক শৃংগবিশিষ্ট গণ্ডার (ওয়াহীদু'ল-কার্ন) নিকট প্রাচ্যে বলিতে গেলে প্রায় অপরিচিত। বস্তুত গণ্ডার বেশ কতকগুলি চটকদার কিংবদন্তীর উৎস হইয়া ওঠে। আর এই সব কিংবদন্তীর পটভূমিকায় এক শিংওয়ালা জন্তু বা য়ুনিকর্ন (Unicorn) নামক এক আজব প্রাণীর অতিকথার সৃষ্টি হয়। এই অতিকথা কেবল মুসলিমদের মধ্যে নয়, খৃষ্টানদের মধ্যেও গড়িয়া ওঠে। জনমনের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা অচিরেই এই প্রাণীকে আজব প্রাণীকুলের কাতারভুক্ত করে। ইখ্ওয়ানু'স-সাফা' তাঁহাদের রাসা'ইল গ্রন্থে (বৈরূত ১৯৫৭ খৃ. ২খ, পৃ. ২৫৮-৬২) এই ধারণার এক রহস্যময় পরিবেশ বজায় রাখিয়া প্রাণীটি সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা এই অদ্ভুত জীবটিকে মানুষের বিরুদ্ধে এক আইনগত মামলা মোকাদ্দমায় ফিনিক্সর ('আনকা' মুগ্রিব) উযীর হিসাবে দেখিয়াছেন।

মনে রাখা আবশ্যক যে, চীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে এবং এশীয় এই প্রাণীটির বিষয়ে কম-বেশী অতিরঞ্জিত বিবরণ ভারত হইয়া বা বণিকদের মুখে মুখে দেশান্তরে প্রচার লাভ করে। পারস্যে প্রাণীটি পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল। গণ্ডারের শৃংগের বিশেষ গুণাবলীর জন্য উহা উচ্চ প্রশংসিত, যদিও "শৃংগ'টি প্রকৃতপক্ষে কোন শৃংগ নয়। এই শৃংগে কোন অস্থি নাই এবং ইহা সংগ্রথিত চুলের তৈয়ারী ত্বকের বর্ধিতাংশ মাত্র। এইজন্য অন্যতম প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত টেসিয়াস (Ctesias) সরল বিশ্বাসে এই শোনা উপকথাটি প্রচার করেন। তিনি আর্তাজারেক্সেসের (Artaxerxes) অধীনে চাকুরী করিতেন। আনুমানিক ৩৯৮ খৃ. পূর্বাব্দে Cnide-এ ফিরিয়া আসিবার পর তিনি 'পারসিকা' ও 'ইন্ডিকা') কন্স্ট্যান্টিনোপ্লের নগরপাল পোটিয়ুস (Photius) কর্তৃক ১৩০০ বৎসর পর সংকলিত গ্রন্থ দুইটিতে "শ্বেত গর্দভ" তথা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের য়ুনিকর্নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এরিস্টোটলও (Hist. Animal, I, 118) এই নামটি গ্রহণ করেন এবং আল-জাহিজ (হায়াওয়ান, ৭খ, ১২৩) উহার অনুবাদ করেন হিমার হিন্দী।

টেসিআসের (Ctesias) বর্ণনার কারণে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পরবর্তী সকল লেখক দুইটি প্রাণীকে অর্থাৎ এক শৃংগবিশিষ্ট গণ্ডার এবং খাড়া চক্রাকার শৃংগবিশিষ্ট হরিণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু পৌরাণিক এই প্রাণী বেশ সম্মানজনক স্থানের অধিকারী। হারীশ ও কারকাদ্দান শব্দগুলির ব্যবহার লইয়া বিশ্বতত্ত্ববিদ (Cosmographers), প্রকৃতি বিজ্ঞানী (naturalist) ও শব্দকোষবিশারদ (Lexicographer)-গণ আরবীতেও সেই বিভ্রান্তি বহাল রাখেন। অনেক লেখকের মতে এই শব্দগুলি দ্বারা কেবল গণ্ডার বুঝায় এবং অনেকে আবার শুধু শিঙেল হরিণ (Antilope) [যেমন, আল-কায্বীনী ও আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী, দ্র. আদ্-দামীরা, কায়রো

১৩৫৬/১৯৩৭, ১খ, ২৩৩-এর পার্শ্বটীকা] বুঝাইয়া থাকেন। পরিশেষে ৩য় একদল লেখকের লেখাতে এই দুই প্রাণী একাকার হইয়া এক বিখ্যাত চতুষ্পদ প্রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঠিক অনুরূপ প্রাণীর বর্ণনা দিয়াছেন লাতিন প্রাণীবিজ্ঞানী ইলিয়ান (Aelian, De natura animalium, XVI, 20)। তাঁহার বর্ণিত এই প্রাণীর হেলেনীয়-ভারতীয় নামটিতে ফারসী কারগাদান' শব্দটির আদল খুঁজিয়া পাওয়ার যায় এবং কোনও কোনও ভাষাতত্ত্ববিদ ইহাতে সংস্কৃত 'কার্‌তাজান' শব্দটির (বনভূমির প্রভু অর্থে) সন্ধান পান। প্রাণীতত্ত্ববিদ ইলিয়ান বিপরীতক্রমে নিজেই আবার তাঁহার রচনার অন্য এক অধ্যায়ে (১৭খ, ৪৪) শৃংগযুক্ত নাসিকাবিশিষ্ট প্রাণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হাতির প্রবল শত্রু এই প্রাণীটি হাতিকে তাহার শৃংগের সাহায্যে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া ফেলে। তবে ইলিয়ান ইহার আগে যে এক খড়্গবিশিষ্ট গণ্ডারের কথা উল্লেখ করিয়াছেনন তাহার সহিত তিনি এই প্রাণীর কোনও সাদৃশ্য বা অভিন্নতা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। পরে Pliny the Elder ও Julius Solinus (Polyhistoria, অনু. A. Golding 1587) এক শৃংগধারী (য়ুনিকর্ন) প্রাণীটির দেহকে একটি অশ্বের ধড়, পাগুলিকে হাতির পা, লেজটিকে শূকরের লেজ, মাথাকে হরিণের মাথা হিসাবে বর্ণনা করিয়া এবং কপালের ঠিক মধ্যভাগে লম্বা, তীক্ষ্ণ শৃংগ আছে এই বিবরণ দিয়া ইহাকে একটি ভয়ংকর চেহারার প্রাণীরা আকৃতি দান করেন।

ফলত এই প্রাণী মানুষের জন্য ত্রাস হইয়া ওঠে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতিটি প্রাণী উহা হইতে "এক শত পারাসাং" দূরে পলায়ন করে। বলা হয়, হাতি ও ঘোড়ার সংকর এই প্রাণীই একমাত্র এক খড়্গবিশিষ্ট জীব। ইহা দ্রুত গতির জন্য খ্যাত। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, এই প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় প্রাণী তিন হইতে সাত বৎসর গর্ভ ধারণের পর শাবক প্রসব করে এবং গর্ভধারণের এক বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ শাবকের দাঁত জন্মায়। শাবক ঐ দাঁত কাজে লাগাইয়া মাতৃজঠর ছেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় এবং আশপাশের ঘাসপাতা খাওয়া শুরু করে। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র শাবকটি মায়ের ভয়ংকর রকম ধারাল জিহ্বার লেহনের যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াইয়া পালায়। গণ্ডারের জিহ্বার এই কথিত ক্ষতবিক্ষতকারক প্রবল লেহনের পদ্ধতিকে চীনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষকে নিগৃহীত করার অন্যতম উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কারকাদ্দানের আয়ুষ্কাল ৭০০ বৎসর। তবে ৫০ বৎসর বয়স পূর্তির পূর্বে শাবক উৎপাদন করিতে পারে না। ইহার দুর্ভেদ্য শক্ত চামড়া চীনারা তাহাদের বর্মের বক্ষদেশের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করে। সঙ্গপিয়াসী দানবসদৃশ গণ্ডার প্রেমিকা গণ্ডারণীর মৃদু আহ্বানেই বিচলিত হইয়া পড়ে। তাই পুরুষ গণ্ডায় ধরিবার জন্য বনের মধ্যে নবীন কোনও গণ্ডারণীকে রাখিবার (ফাঁদ হিসাবে) ব্যবস্থা করিলেও পুরুষ গণ্ডার দ্রুত ঐ গণ্ডারণীর নিকট ছুটিয়া যায়। তারপর সে গণ্ডারণীয় দুগ্ধহীন স্তন্যদেশ লেহনচ্ছলে উন্মাদ অচৈতন্যের মত মাটিতে পড়িয়া থাকে; আর তখনই শিকারীরা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া হত্যা করেও উহার খড়্গ তথা শৃঙ্গটি কাটিয়া নেয়। শেষোক্ত এই উপাখ্যানে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্মীয় আখ্যানে বর্ণিত কাহিনী Lady of the Unicorn-এর ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তবে দুর্লভ এই প্রাণীর প্রধান আকর্ষণ ছিল উহার বিশেষ ও অনন্যসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন (খাওয়াসস) শৃঙ্গ বা খড়্গটি। আরবীতে কারকাদ্দান শব্দের আদিতম না হইলেও অন্যতম আদি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ভারত, চীন (আখবারু'স-সীন ওয়া'ল-হিন্দ, সম্পা. ও অনু. J. Sauvaget, Paris 1948, শা 28) সম্পর্কিত অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের বিবৃত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জীতে (দ্র. আস-সীরাফী ও সুলায়মান)। মুসলিম ভূগোলবিদ ও মানচিত্রকারগণ, বিশেষত আল-মাস'উদী উল্লিখিত 'আখবারু'স-সীন ওয়া'ল-হিন্দ' গ্রন্থ হইতে চীন ও ভারত সংক্রান্ত অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। Sauvaget-এর অনুবাদের নমুনা ঃ "ধর্ম অধ্যায় উল্লিখিত বিচান (vichan) গণ্ডার ছাড়া কিছুই নয়। এই প্রাণীর কপালে একটি শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গে আবার একটি চিহ্ন আছে, যাহা দেখিতে অনেকটা মনুষ্যাকৃতির, গোটা শৃঙ্গই কৃষ্ণ বর্ণ এবং শৃঙ্গের মধ্যভাগে সাদা অংশে ঐ মানুষের আদল সদৃশ চিহ্নটি বিরাজমান। এই গণ্ডার উচ্চতায় হাতি অপেক্ষা খাটো এবং বর্ণে প্রায় কালো, দেখিতে মহিষের মত। তবে কোন প্রাণীই ইহার মতো এত প্রচণ্ড শক্তিধর নয়। ইহার হাঁটুতে কোনও সন্ধিবন্ধী বা গুলফ নাই। পা হইতে পিঠের কুঁজ অবধি গোটা অবয়বখানি এক একক ও অবিভক্ত অঙ্গ বিশেষ। গণ্ডার দেখিলেই হাতি পালাইয়া যায়। গণ্ডার গরু ও উটের মত চর্বিত চর্বন তথা রোমন্থন করে। ইহার গোশ্‌ত ভক্ষণের জন্য অনুমোদিত, আমরা নিজেরা ইহার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিয়াছি। এই দেশের জঙ্গলে বহু গণ্ডার আছে। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাণীয় খড়্গ বা শৃঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর। এই শৃঙ্গে মানুষ, ময়ূর, মাছ বা যে কোনও কিছুর চর্বি থাকিতে পারে ঃ চীনারা এই শৃঙ্গ দিয়া বন্ধনী তৈরী করে। চীনে গণ্ডার-শৃঙ্গের দাম ক্ষেত্র বিশেষে শৃঙ্গের ছবির সৌন্দর্য অনুযায়ী ২০০০-৩০০০ কিংবা ততোধিক দীনার মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ঘটনাপঞ্জীতে আরও বলা হইয়াছে যে, চীন "গজদন্ত, সুগন্ধি তামার ধাতব পিণ্ড, সামুদ্রিক শংখ ও ঝিনুক এবং এই বিচান (Vichan) আমদানী করা হইত। বিচান (Vichan)-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই বিচানই হইতেছে গণ্ডার।"

চীনে গণ্ডারের শৃঙ্গ বা খড়্গ কার্‌গ কার্‌ক, খিরতীত খারতূত ও খুতু [ইবনু'ল-আকফানী, নুখাবু'য-যাখা'ইর, Machriqx, i (1908), 764f.] নামে পরিচিত। এই দেশে গণ্ডারের শৃঙ্গের খ্যাতির যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে উহাই ঐ খ্যাতির একমাত্র কারণ নয়। বস্তুত প্রাচীনকালে ইথিওপিয়া ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রসায়ন শাস্ত্রবিশারদ ও যাদুকরগণ এই মর্মে লক্ষ করেন যে, কোনও কোনও বিষাক্ত পদার্থ গণ্ডারের শৃঙ্গ চূর্ণের সন্নিকটে আনিলে ঐ জৈব পদার্থে এক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে উহাতে স্ফীতি দেখা দেয়। গণ্ডারের শৃঙ্গের এই গুণবৈশিষ্ট্য অনতিবিলম্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিরন্তর চক্রান্তের শিকার এমন ব্যক্তিরা বস্তুত তাহাদিগকে বিষমিশ্রিত পাণীয় কিংবা খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করার জন্য গণ্ডারের শৃঙ্গকে কষ্টি বা পরশ পাথর জ্ঞান করিতে থাকে। ইহার পর হইতে চীন ও আবিসিনিয়ার রাজন্যদের মধ্যে গণ্ডারের শৃঙ্গ দ্বারা পাত্র, পান পাত্র, এমনকি ছোরা, ছুরির বাঁট নির্মাণ রেওয়াজে পরিণত হয়। তাঁহাদের ধারণা জন্মায় যে, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পাইবেন। চিকিৎসাবিশারদদের মধ্যে এই ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, গণ্ডারের শৃঙ্গ বিষ যাচাই করার ক্ষমতা রাখে, এমনকি উহা বিশেষ বিষঘ্ন প্রতিষেধক উপাদানও বটে। আর এই সব ধারণা মূলেই তাঁহারা আস্ত বা চূর্ণ যাহাই হউক গণ্ডারের শৃঙ্গের অসাধারণ সব গুণ আছে বলিতে দ্বিধা

করেন নাই। ফলে সহজেই গণ্ডারের শৃঙ্গের বিষয়টি লইয়া অলীক জল্পনা-কল্পনার অবকাশ ঘটে। প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য অবধি সর্বত্র ইহাকে সর্বরোগহর ধন্বন্তরী হিসাবে প্রচার করা হয়। এইজন্য বিপুল বিত্তের বিনিময়ে হইলেও লোকজন ইহা সংগ্রহে আগ্রহী হইয়া ওঠে।

এই কথিত বিরাট ক্ষমতাসমপন্ন নিরাময়কারী মহৌষধ কাহারও আয়ত্তে থাকিলে তিনি সকল কুদৃষ্টি ও কুপ্রভাব হইতে সুরক্ষিত ; অশ্ব হইতে পতনসহ সকল দুর্ঘটনা হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন; কেবল এই শৃঙ্গের স্পর্শে শূল বেদনা তাৎক্ষণিকভাবে আরোগ্য হয় এবং প্রসব যাতনায় কাতর মহিলার শিশু মুহূর্তের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, চূর্ণ ও তরলাকারে গুলিয়া ইহা সেবন করাইলে রোগীর মৃগীরোগ জনিত অচেতন অবস্থা অচিরেই কাটিয়া যায় এবং উন্মাদের উন্মত্ত অবস্থার আশু উপশম ঘটে। এমনকি ইহা বিষের ক্রিয়াকেও নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারে। চূড়ান্তভাবে ও সর্বোপরি, এশীয় ঔষধ প্রস্তুতকারীদের মধ্যে ওবাত নামে পরিচিত গণ্ডারের শৃঙ্গ চূর্ণ যৌনক্ষমতাবর্ধক ঔষধ হিসাবে গণ্য ছিল এবং জরাজনিত পুরুষত্বহীনতা পর্যন্ত জয় করিতে সক্ষম। সংক্ষেপে ইহা এতখানি সাফল্য লাভ করে যে, ঔষধ প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা চিকিৎসক ও হাতুড়ে চিকিৎসকরা ইহার চাহিদা মিটাইতে হিমসিম খাইয়া ইহার নানা বিকল্প সরবরাহ করিতে থাকেন। আর ইহার ফলে Unicornum ilverum-এর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ-পত্রের বাজারে Unicornum falsum তথা নকল ঔষধ ছাড়া হয়। বলিতে গেলে প্রায় সব সময়ই এই দুই ঔষধই নারওলের (Monodon monoceros) হারীশু'ল-বাহরের লম্বা দাঁত, সিন্ধুঘোটকের দাঁত (ফীলু'ল-বাহ্‌র, ফায্‌য), এমনকি সাইবেরিয়া অঞ্চলে মাটির নীচ হইতে উত্তোলিত বিশালাকার ম্যামথ (mammoth) বা হাতির গজদন্ত ছাড়া কিছুই নয়। ফার-ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য পথ ধরিয়া প্রত্যন্ত উত্তরাঞ্চল হইতে এই সব হাতির দাঁত আসিত; বুলগার (দ্র.) ছিল এই পণ্যের অন্যতম প্রধান লেনদেন কেন্দ্র। আসাম রাজ্য (কামারীসা) হইতে কাফেলার মাধ্যমে কিংবা সমুদ্র পথে বাণিজ্যে নিয়োজিত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে আসল গণ্ডারের শৃঙ্গ চীনে যাইত। মুসলিম নৌ-সওদাগরের ইরাবতী বদ্বীপের বন্দরসমূহ, শ্যাম উপসাগর (কিরদানূজ), কম্বোডিয়া, চাম্পা (আনাম) মালয় (দ্র. বাহরু'ল-হিন্দ) হইতে সংগ্রহ করিয়া চীনে ও ইথিওপিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া লোহিত সাগর অঞ্চলে লইয়া আসিত। গণ্ডারের শৃঙ্গের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশী। এই বাস্তবতার নিরিখে এই ব্যবসায়ে নকল পণ্যের অনুপ্রবেশ না ঘটিলে বস্তুত পক্ষে তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম এই প্রাণীটি যে সব দেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া অস্তিত্বমান ছিল বলিয়া জানা যায় বোর্নিওর মতই সেই সব দেশ হইতে ইহা সুনিশ্চিতভাবেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের এক শুমারীতে দেখা যায়, গোটা মালয়ে তখন মাত্র ৭০টি গণ্ডারের অস্তিত্ব ছিল।

পাশ্চাত্যে ১২শ/১৮শ শতাব্দী অবধি এই এক শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী বা ইউনিকর্নের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছিল। গ্রীক অনুবাদকগণ য়াহূদী ধর্মীয় পুস্তক তথা হিব্রু ভাষায় লেখা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর অনুবাদে হিব্রু শব্দ re'em-এর যে অনুবাদ করেন তাহাতে এই বিভ্রান্তি আরও পাকাপোক্ত হয়। বাইবেলে "re'em" কথাটির মাত্র সাতবার উল্লেখ আছে, ডেভিডের প্রার্থনা সঙ্গীতেই ইহার উল্লেখ আছে তিনবার। 're'em' কথাটির অর্থ করা হইয়াছে ঃ ভয়ংকর ও বিপজ্জনক মরুবাসী প্রাণী। অনুবাকগণ অনেকটা অনিশ্চয়তার সঙ্গে re'em-এর গ্রীক অনুবাদ করিয়াছেন monokeros। এই শব্দটির কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও তাঁহারা দেন নাই। বাইবেলের লাতিন সংস্করণে শব্দটি Unicornus হইয়া যায় এবং পরিশেষে লাতিন বাইবেলে উহা Unicorn হিসাবেই চূড়ান্ত রূপ নেয়।

তবে কিছু স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী আরবীয় পণ্ডিত কারাকাদ্দান হারীশ সম্পর্কিত এই সব আজগুবি অলীক জল্পনা-কল্পনা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, উল্লিখিত শব্দের মধ্যে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই পুরু চর্মধারী জীবটিকে সনাক্ত করিতে পরিয়াছেন, এশীয় ও আফ্রিকীয়—উভয় প্রজাতিই। এই আরব পণ্ডিতদের মধ্যে আছেন ঃ ভৌগোলিক আল-য়া'কূবী (বুলদান, অনু. G. Wiet, Cairo 1937, 191)। অবশ্য আল-জাহিজ নিজে কখনও এই প্রাণীটি লইয়া অলীক গল্প ফাঁদিবার চেষ্টা করেন নাই। এই বিষয়ে (হায়াওয়ান, ৭খ, ১২৪) তাঁহার সমকালের পণ্ডিতগণ যে সব আজগুবি বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি বরং সেগুলির নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি এরিস্টোটলের হিমার হিন্‌দী ও কারকাদ্দান-হারীশের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইতে পারেন নাই। তিনি গণ্ডারের শৃঙ্গ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যপথ সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও একান্তই কল্পনাশ্রয়ী (পূ. গ্র. ৭খ, ১২০)। উহার বর্ণনা অনুযায়ী গণ্ডারের শৃঙ্গ কাফেলাযোগে বাগদাদে আসিত এবং উহা পুনরায় বসরা হইতে সমুদ্রপথে চীনে যাইত। তবে ঐ পণ্য কোথা হইতে আসিত আল-জাহিজ দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা উল্লেখ করেন নাই। ফলত তিনি ভারত বা আবিসিনিয়া হইতে প্রেরিত আসল গণ্ডারের শৃঙ্গ, না ল্যাপল্যাণ্ড হইতে আনীত নকল শৃঙ্গের কথা বলিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার নয়।

দুই শতাব্দী পর প্রকৃতি বিজ্ঞান ও খৃস্টান চিকিৎসক এবং নিজ পূর্বপুরুষদের মতোই বহু ভাষাবিদ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জিব্‌রীল ইব্‌ন বুখ্‌তীশূ' (দ্র. বুখতীশূ') এই বিষয়ে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটান। তিনি উল্লেখ করেন, "কারকান্দ হইতেছে সেই প্রাণী আরবরা যাহাকে হারীশ ও আর্মেনীয়রা রি'ম বা রীম বলে" (দ্র. ইকদু'ল-জুমান, পাণ্ডু, দারু'ল-কুতুব, কায়রো)। ইহা স্পষ্টত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাইবেলে উল্লিখিত রি'ম/রীমের সহিত শ্বেত যাবেলের (এক ধরনের পাহাড়ী ছাগল=Gazella leptoceros) কোনও সম্পর্ক নাই। পরবর্তীকালে আরবরা গাযেলের (দ্র. গাযাল) জন্য রি'ম/রীমেরও ব্যবহার করে। এই দূরদর্শী লেখক শ্রেণীতে এক শৃঙ্গবিশিষ্ট কাল্পনিক প্রাণীর গালগল্প উদ্‌ঘাটনকারীর আরও কয়েক জনকে শামিল করা যায়। কিছু পর্যটক আবিষ্কারক এশিয়ায় ভ্রমণকালে গণ্ডারের সাক্ষাৎ পান। এই শ্রেণীর প্রাণীর খৃস্টান পর্যটকদের মধ্যে মার্কোপোলো ১২৯১ খৃ. সুমাত্রায় গণ্ডার দেখিতে পান। তিনি এই শ্রেণীর নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন, যদিও আমাদিগকে সামান্য হতাশও করিয়াছেন (Description du Monde, French version by L. Hambis, Paris 1955, 243)। ইহার আনু. ৪০ বৎসর পর মুসলিমগণের হাতে মরক্কোবাসী ইব্‌ন বাত্তুতার (দ্র.) বিবরণ আসে। ৭৩৪/১৩৩৩ সনে পাঞ্জাবে (রিহলা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮, ২খ., ৪) ইব্‌ন বাত্তূতা তিন তিনবার গণ্ডার দেখার সুযোগ পান। তিনি গণ্ডারের মস্তক দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন এবং এই সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচলিত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, "কারকাদ্দানের মস্তকই সব।" তিনি

ঐ অঞ্চলের সুলতানের সহিত হাতির পিঠে চড়িয়া গণ্ডার শিকারেও গিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি গণ্ডার শিকার প্রত্যক্ষ করেন। পরে শিকার করা গণ্ডারটিকে উহার শৃঙ্গসহ সুলতানের শিকার শিবিরের আঙিনায় প্রদর্শন করা হয়। তবে তিনি ঐ প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি না তাহা উল্লেখ করেন নাই।

কারকাদ্দানকে ঘিরিয়া যে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল সেগুলি স্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবার পর গণ্ডারের গোশত খাওয়ার অনুমোদন-যোগ্যতার প্রশ্নে আর আপত্তি রহিল না। কেননা স্বীকৃত হইল যে, গণ্ডার উদ্ভিদভোজী প্রাণী। তবে মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদী সংস্কারের পরিবেশে কিছু রক্ষণবাদী আইন বিষয়ক লেখক এই প্রাণীর গোশত ভক্ষণের বিরুদ্ধে এই শর্ত আরোপে সক্ষম হন যে, অশ্ব ও হস্তীর সংকর হিসাবে এই প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে প্রমাণিত হইলে উহার গোশত ভক্ষণ বৈধ হইবে না। অবশ্য গণ্ডারের মতো স্থূল চর্মবিশিষ্ট প্রাণীকুল সম্পর্কে আরও নিখুঁত জ্ঞান লাভের পটভূমিকা এক সময় এই গোশত ভক্ষণযোগ্যতা সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটায়। বর্তমানকালে চিড়িয়াখানা ব্যতীত ইসলামী দুনিয়া কিংবা অন্য কোথাও এই প্রাণী আর কৌতূহলের বিষয়বস্তু নয়। কৃষ্ণকায় অধ্যুষিত আফ্রিকাতে আজও অতি অল্প সংখ্যক ও ক্ষুদ্র মুসলিম উপজাতির লোক গোশতের জন্য গণ্ডার শিকার করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে উল্লিখিত সূত্রগুলির অতিরিক্ত ঃ (১) আমীনু'ল-মা'লূফ, An Arabic Zoological Dictionary/ মু'জামু'ল-হায়াওয়ান, কায়রো ১৯৩২ খৃ., দ্র. Rhinoceros; (২) এড. গালিব, আল-মাওসূ'আ ফী 'উলূমি'ত-তাবী'আ, Dictionnaire des sciences de la nature, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ২খ., দ্র. কারকাদ্দান; (৩) Heuvelmans, Sur la piste des betes ignorees, Paris 1955, i, 140-7; (৪) ইব্ন সীদা, মুখাস্‌সাস, ৮খ, ৫৮; (৫) কালকাশান্দী, সুবহ, ২খ, ৩৭-৮; (৬) W. Ley. Exotic Zoology/Animaux Fabuleux, Paris 1964, 7-23; (৭) Loevenbruck, Les animaux sauvages dans l'histoire, Paris 1955, 75-84; (৮) M. Lombard, La chasse et les produits de la chasse dans le monde musulman, VIII-XI[e] siecles, in Annales E.S.C. 1959/3. 572-93; (৯) Dr. Odell Shepard La legende de la licorne, Boston 1930.

চিত্রাঙ্কন শিল্প ঃ ইসলামী চিত্রাঙ্কন শিল্পে, বিশেষত হাতির (দ্র. ফীল) মতো অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচিত প্রাণীর ন্যায় গণ্ডার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কারকাদ্দানের নাসিকার খড়্গ তথা শৃঙ্গজনিত যে কিংবদন্তী বা জল্পনা-কল্পনার অবকাশ ঘটিয়াছে উহা না থাকিলে গণ্ডার আরব দেশগুলির মুসলিম শিল্পীদের নিকট পুরাপুরিই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। বরং পারস্য দেশীয় মুগল ও ভারতীয় শিল্পীরাই দেখা যায় প্রচণ্ড শক্তিধর গণ্ডারের প্রায় নিখুঁত প্রতিচ্ছবি তাঁহাদের বিভিন্ন শিল্পকর্মে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দৃশ্যত মনে হয়, খৃষ্ট ধর্মীয় অংকন শিল্পে ইউনিকর্নের যেমন অস্পষ্ট চিত্র অংকিত হইয়াছে অনেকটা সেই রকমভাবেই আরব চিত্রকর্মে এই কিংবদন্তীবহুল এক শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে না ফুটাইয়া কাল্পনিক ধারণার গণ্ডিতে চিত্রায়ন সীমিত রাখা হইয়াছে। এই সব চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায়, শিঙ্গেল হরিণ, অশ্ব, বলদ, বিড়াল ও সর্বোপরি কুকুর জাতীয় নানা প্রাণীর বিভিন্ন বিচিত্র ছদ্মাবরণে এই গণ্ডারের প্রতিকৃতি হইয়াছে। কুকুর জাতীয় প্রাণীর উল্লেখ করা হইয়াছে খুব সম্ভবত পাহ্‌লাবী ভাষায় নেকড়ে বাঘের প্রতিশব্দ 'গুরগ' ও গণ্ডারের প্রতিশব্দ 'কারগ'-এর মধ্যে বানানের সাদৃশ্যজনিত বিভ্রান্তির কারণে। গুশতাস্‌প ও ইসফানদিয়ারের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে ইসকান্দার ও বাহরাম (দ্র.)-এর বিবরণে সাদৃশ্যজনিত শব্দ-বিভ্রান্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ঃ সুতুরর্গ ("বিরাট"), বুযুর্গ (=বড়), গুর্গ (=নেকড়ে), তার্গ (=শিরস্ত্রাণ), তাগার্গ (=শিলাবৃষ্টি), মার্গ (=মৃত্যু) ও কার্গ (=গণ্ডার)। এইগুলির বানান সাদৃশ্যের ব্যাপারটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জটিল। উল্লেখ্য, হারকিউলিসকে প্রদত্ত ১২টি দুঃসাহসিক কাজের (W. Ley, পূ. গ্র., পৃ. ১৯) একটি কাজ গণ্ডার (কার্গ, কারকাদ্দান) শিকারে সাফল্য লাভ করা মনে করা হয়। ৭ম/১৩শ ও ৮ম/ ১৪শ শতাব্দীর অত্যন্ত দুর্লভ ইরাকী পাণ্ডুলিপিতে অন্যান্য দানবাকার আজব প্রাণীর মধ্যে গণ্ডারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপিগুলি ব্যাখ্যা ও নকশা সহকারে বিশদ বিবরণ সংবলিত এবং এইগুলিতে নানা জীবজন্তুর বিবরণ দেওয়া আছে।

বস্তুত পাণ্ডুলিপিগুলি আল-কাযবীনী ('আজা'ইব, পাণ্ডু. B. N. Paris, no 2775, 682/1283; পাণ্ডু Bayer, Staatsbibl. Munich, C. Ar. 464, 678/1280; পাণ্ডু. Freer Gallery of Art, Washington on. 5451, ca. 782/1380; ইব্‌ন বুখতীশূ' (মানাফি'উল্-হায়াওয়ান, পাণ্ডু. Pierpont Morgan Libr., New York, no. 500. ca. 694/1295; অজ্ঞাতনামা লেখক, না'তু'ল-হায়াওয়ান, পাণ্ডু. Brit. Mus., no. OR. 2784); ইব্‌ন দুরায়হিম আল-মাওসিলী [মানাফি'উ'ল-হায়াওয়ান, পাণ্ডু. Escurial, Madrid, no Ar. 898, 755/1354; দ্র. E. de Lorey, Le Bestiaire de l'Escurial, in Gazette dex Beaux Arts. xiv (1935), 1-11]; আল-জাহিজ, আল হায়াওয়ান, পাণ্ডু. unic Bible. Ambros, Milan, no Ar. A. F. D. 140; দ্র. C. J. Lamm এবং O. Lofgren, Ambrosian fragments of an illuminated manuscript containing the Zoology of al-Gahiz, in Univ. Ars. Uppsala 1946 এবং ইব্‌ন গানিম আল-মাকদিসী (কাশফু'ল-আসরার, পাণ্ডু. unic. Suleymaniye, Istanbul, Kara Ismail 565) লিখিত বিশ্বতত্ত্বেরই অনুরূপ রচনা।

৭ম/১৩শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে অনারবীয় শৈলীর প্রবর্তনের সঙ্গে এবং ঐ সময় হইতে ১২শ/১৮শ শতাব্দী অবধি ইরানী রীতি পদ্ধতির চিত্র শিল্প প্রাণীকুলের চিত্রণে অনেকখানি বাস্তবতাভিত্তিক হইয়া ওঠে। হইাতে গণ্ডার পূর্বের ন্যায় এইরূপ বিরাটাকৃতির শিকারের প্রাণী হইয়া উঠে যে প্রাণী শিকার করিতে পারা প্রতিটি মৃগয়াবিলাসী রাজন্যের জন্য পরম কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। তাঁহারা হাতির পিঠে চড়িয়া সাসানীয় বাদশাহদের মতো গণ্ডারকুলকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া শিকার করিতেন। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে 'আবদু'র-রাহীম খানের [ms. Brit. Mus, no Or. 3714, fol. 352 (ফীল দ্র.) pl. xxiii, ও S. I. Tulajev, miniatures from a 16th century manuscript: Babur Namah, in Marg, xi (1958), 45-8], বাবুরনামার

ফারসী অনুবাদে এই প্রাণীটির অধিকতর সঠিক আকৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (দ্র. Eletr M. Riad, Birds and animals in Mughal Painting, in Bull. Coll. Arts, Baghdad Univ., i. 1959, 12-18)। যাহা হউক, গণ্ডারের মধ্যে বিস্ময়কর ঐন্দ্রিজালিক উপাদানটি কিন্তু জনসাধারণের ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার বিষয়বস্তু হিসাবে থাকিয়া যায় এবং ইহা অত্যন্ত পরিচিত প্রাণী হিসাবে গণ্য হয়। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর কোনও কোনও ক্ষুদ্র চিত্রে গণ্ডারের প্রতিকৃতি স্পষ্টত লক্ষ করা যাইবে। H. R. d'Allemagne পারস্যের উপর তাঁহার অনবদ্য গ্রন্থের (Du Khorassan au pays des Backhtiaris, Paris 1911)। প্রচ্ছদে এমনি এক ক্ষুদ্রাকার চিত্রের প্রতিচিত্র দিয়াছেন। একটি ফারসী পাণ্ডুলিপি হইতে (Collect. Verver) তিনি ঐ চিত্রখানি সংগ্রহ করেন। চিত্রে দেখানো হইয়াছে, একদল জীবজন্তু মানুষের হাতে তাহাদের অত্যাচার-নিগ্রহ সম্পর্কে অভিযোগ পেশের উদ্দেশ্যে মুল্লা জামী সকাশে চলিয়াছে। চিত্রে হাতির পার্শ্বে একটি গণ্ডারও আছে, যাহাকে অনেকটা ভল্লুকের মতো মনে হয়। তবে কৌতুহলের বিষয় এই যে, চিত্রকর গণ্ডারকে যে বিপুলভাবে অলংকৃত করিয়াছেন, তাহা তাহার বনেদী প্রতিবেশী হাতির সমতুল্য। ইহাতে বোঝা যায়, চিত্রকর দুইটি প্রাণীকেই সমমর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন এবং এই ধারণা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কারকাদ্দানও মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইত। শায়খ আহমাদ মিস্‌রী (কান্'নু'দ-দুন্‌য়া ওয়া 'আজা'ইবুহা, পাণ্ডু. Bibl. Musee Topkapi Sarayi, Istanbul, Revan 1638, 970/1563)-এর কপিতে অংকিত জীবজন্তুর ছবিগুলি উদ্ভাবনী প্রতিভায় উজ্জ্বল এবং আল-কাযবীনীর 'আজা'ইব গ্রন্থের (পাণ্ডু. Bayer Staatsbible., Munich, no. C. Ar. 463. of the 12th/18th century) চিত্রকর্মগুলির সংগে তুলনীয়। দুইটি গ্রন্থই অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল মিটাইবার জন্য পরিকল্পিত।

ক্ষুদ্রাকার চিত্র ছাড়াও ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে প্রস্তুত বিখ্যাত ভারতীয় পশমী গালিচা বা কার্পেটগুলিতে অংকিত জীবজন্তুর নকশায় গণ্ডারের প্রতিকৃতিও রহিয়াছে। এইগুলি দৃশ্যত মসজিদ ও বিখ্যাত মুগল রাজন্যদের প্রাসাদ সজ্জার জন্য প্রস্তুত করা হইত। গালিচা তৈয়ারীর কৌশল বা পদ্ধতি ইরানী হইলেও মোটিফ বা নকশাশৈলী একান্তভাবেই ভারতীয়। ইহার একটি নমুনা Musre du Louvre (Legs Jeuniette)-এ রক্ষিত আছে। G. Mignon (Manuel d' Art musulman, Paris 1927, ii, 383)-এর গ্রন্থে সন্নিবেশিত উহার একটি প্রতিচিত্রে ঐ চিত্রের গাঢ় আভার মাঝে এক বিস্ময়কর ও অদ্ভুত দেবমূর্তির আকৃতি লক্ষ করা যায়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের মাত্রায় হাতি ও গণ্ডারের দুইটি মস্তক অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্ময়কর রকম জীবন্ত আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিচিত্রটি খুব সম্ভব কোন কিংবদন্তী বা অতিকথাভিত্তিক। ইহাতে দেখা যায়, একটি খরগোশ গণ্ডারের মুখমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া উহার নাসিকা খড়গাগ্রে আরোহণ করিতেছে। এই ধরনের দৃশ্যে যে অতিকথার আভাস পাওয়া যায় তাহা মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর।

ক্ষুদ্র চিত্র ও নকশী পর্দা ব্যতীত শিল্পকলা প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যমে এবং তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত নেতিবাচক ফলাফলে নিশ্চিতভাবেই জানা যায় যে, কেবল ঐ ক্ষুদ্র চিত্র ও নকশী পর্দাতেই গণ্ডারের প্রতিকৃতির স্থান হইয়াছে ... ... সিংহ, চিতা, পাহাড়ী ছাগল ও হাতির প্রতিকৃতির বিপুল সমাবেশের তুলনায় যাহা নগণ্য বিবেচিত, আর পক্ষীকুলের বেলায় তো কথাই নাই। বস্তুত ইহাই মুসলিম বিশ্বের শিল্পসামগ্রী ও চিত্র শিল্পের সামগ্রিক কাঠামোর পরিস্থিতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে প্রদত্ত সূত্রগুলি ছাড়াও দ্র. (১) Collection Les Tresors de l'Asie, সম্পা. Skira, Geneva 1962, এবং সেই সঙ্গে (২) R. Ettinghausen, La Peinture arabe; (৩) B. Gray, La peinture persane; (৪) M. Bussagli, La Peinture de l'Asie centrale; (৫) D. Barrett ও B. Gray, La Peinture indienne.

F. Vire (E. I.[2])/ আফতাব হোসেন

কারকানা (قـرقنة) ঃ (কারকেন্নাহ; স্থানীয় উচ্চারণ কার্‌ক্‌না)। তিউনিসিয়া উপকূলের অদূরে এবং Sfax উপকূল হইতে (১১° ও ১১°২০ পূ. এবং ৩৪°৩৬ ও ৩৪°৫০ উ.) ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত এক দ্বীপপুঞ্জের নাম। দুইটি প্রধান দ্বীপ লইয়া মূলত এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত; উত্তর-পূর্বে অপেক্ষাকৃত বড় দ্বীপটির নাম Kerkena (প্রাচীন Cercina, ভৌগোলিকদের নিকট শারকী) এবং দক্ষিণে Mellita (Cercinitis)। দ্বীপটি বল্লমের ফলার আকারে উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অবধি ২৭ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রলম্বিত ও উহাদের বিস্তার গড়ে সাত কিলোমিটার। দ্বিতীয় দ্বীপটি ত্রিভুজাকার। এই ত্রিভুজের ভূমি-বাহুটির দৈর্ঘ্য ১৪ কিলোমিটার এবং উচ্চতা গড়ে ৭ কিলোমিটার। আগে এই দ্বীপটি রোমকদের (প্রস্তর) নির্মিত একটি সড়ক দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত ছিল। কিন্তু বহুকাল আগে একটি সংকীর্ণ প্রণালী (৮০০ মিটার প্রশস্ত) কাটিয়া এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। প্রণালীটির নাম আলকানতারা। এই প্রণালীর খাত দিয়া ভাটার সময়েও নৌ-পারাপার সম্ভব। প্রাচীন রোমক আমলের পাথরে বাঁধাই ঐ সংযোগ পথটির স্থলে একটি সড়ক নির্মাণ করিয়া দুইটি দ্বীপকে পুনঃসংযুক্ত করা হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে আরও সাতটি জনবসতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির চারটি উত্তর উপকূলে সীমা ঘেঁষিয়া অবস্থিত।

এই দ্বীপপুঞ্জের সাগরপৃষ্ঠ হইতে উঁচু জমির পরিমাণ ৬৯ বর্গমাইল। এই জমিগুলি কমবেশী আবাদযোগ্য। দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন রহিয়াছে অগভীর পানির নিম্নস্থিত এক মহাদেশীয় মহিসোপান যাহা উত্তরে Ras Kapoudia (La Chebba) হইতে দক্ষিণে Mahares অক্ষাংশ অবধি বিস্তৃত। ইহা " Channel of Kerkennah" হইতে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশটিতে পানির গভীরতা প্রায় ২০ মিটার। অন্যথায় ইহার বাহিরে কোথাও পানির গভীরতা ১০ মিটার পাইতে হইলে দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে ৪০ মাইল পর্যন্ত যাইতে হইবে। এইসব দ্বীপের চারিদিকের পানির গভীরতা শূন্য (০) হইতে পাঁচ মিটার পর্যন্ত; সেই সঙ্গে উপকূলের ভিতরের দিকের অংশে বহুদূর পর্যন্ত এক মিটার গভীরতাসম্পন্ন পানির প্রলম্বিত খাতের নিশানাও রহিয়াছে। আল-বাকরী (Descrip. de l'Afr Sept, 51) মন্তব্য করিয়াছেন, "Sfax-এর চতুর্দিকে সাগরে কারকিনা নামে একটি দ্বীপ আছে যাহা El-Casir-এর মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা Sfax হইতে ১০ মাইল দূরে এক সামুদ্রিক জলভাগের পারে অবস্থিত। ঐ জলভাগটি বাস্তবিকপক্ষে মজা ও অগভীর।

এখানে পানি কখনও তরঙ্গ উত্তাল থাকে না। El-Casir বলিতে এখানে প্রশস্ত বালুচরাসমূহকে বুঝানো হইয়াছে। আর বালুচরা অসংখ্য হওয়ার কারণে দ্বীপগুলির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কেবল উহার মধ্যবর্তী পুকুর জাতীয় জলাশয় (বাহীরা) ৩-৪ মিটার গভীরতাসম্পন্ন যাহার চতুর্দিকে কয়েক ফুট অবধি অগভীর পানি) এবং ওয়াদীসমূহ (মরুনদী কিংবা মরুনদীখাত) পার ইহা হইয়া যাওয়া যায়। এই ওয়াদীগুলি কার্যত এক ধরনের পানির তলায় অবস্থিত নদীখাত এবং বিশাল খাদসদৃশ নিম্নাঞ্চল যাহা বালুচরাগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া শুষ্ক, শূন্যগর্ভ খাত আকারে বাহির হইয়া গিয়াছে। এইগুলির গভীরতা ৫-১২ মিটার এবং সর্বাধিক ৩০০ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। ঐ ওয়াদীগুলিকে কখনও সঠিক অর্থে উপকূল এলাকায় দেখা যায় না, বরং ঐগুলির সব কয়টিই দ্বীপের দক্ষিণে কিংবা বালুচরের দক্ষিণ ঢালে দেখা যায়। স্ফীত পানির প্রবাহ হইতে ওয়াদীগুলির সৃষ্টি এবং জোয়ার ভাটার পানির মিশ্র খেলার মাঝেই এইগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে। অন্তপ্রবাহী ঢেউ যখন আসে ঐ ঢেউয়ের পানির অংশবিশেষ বালুচরের বালু শুষিয়া নেয় আর উহার পরেও কিছু পানি যখন গড়াইয়া ফিরিয়া যায় তখন চুলের ন্যায় সর্পিল আকারে বালুচরের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র নদীর মতো খাত কাটিয়া যায় এবং উহাই ক্রমে ক্রমে বড় ওয়াদীর আকার ধারণ করে। পরে ঐ ওয়াদী হইতে এক বা একাধিক শাখায় পানি গিয়া পড়ে বালুচরগুলির মধ্যবর্তী জলাশয় বা দীঘির মতো জলাধারে। আর ঐ জলাশয়েই স্রোতবাহিত সকল পলল গিয়া সঞ্চিত হয়।

দ্বীপগুলি খুব নীচু এবং এইগুলির সর্বাপেক্ষা উচ্চভূমিকেও সাগরতল হইতে উঁচু বলা কঠিন। দ্বীপগুলির উল্লিখিত সর্বোচ্চ স্থানগুলিও খুব কম ক্ষেত্রেই ১৩ মিটারের বেশী লম্বা। কারকানীয় অধিবাসীদের জমিগুলি কেবল দ্বীপপুঞ্জের মোট ৩৬ কিলোমিটার ভূমিতেই [যাহা সীদী য়ূসুফের মুরাবিত (Mellita) হইতে ইনুফা' আল-রাকীক বা Roumedia নামের ক্ষুদ্র দ্বীপ অবধি বিস্তৃত] সীমিত ছিল না, বরং দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে বহু জলমগ্ন চর অঞ্চলও তাহাদের 'জমি'র আওতাভুক্ত ছিল। ঐসব জমিতে তাহাদের মাছের চাষ ছিল। এইসব জলভাগ বা জলার (সমুদ্রের) জলজ প্রাণী প্রধানত পানির তলদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

এই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলভাগ সমতল এবং বলিতে গেলে প্রায় ঋজু, সরল। এই উপকূল বরাবর গ্রামের সংখ্যা অনেক। তবে উত্তর, উত্তর-পূর্ব উপকূল অত্যন্ত সর্পিল এবং এই উপকূলের বহু 'সেবখাস'-এ সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে। বড় আকারের দ্বীপগুলির আবাদযোগ্য দ্বীপসমূহের জমি কখনও কখনও ইহার আওতায় আসে, কখনও কখনও ইহার আওতার বাহিরেই থাকিয়া যায়। এই উপকূলের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মৃত্তিকায় পানি সেচের জন্য কোনও ওয়াদী যেমন নাই তেমনিই অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতজনিত ঘাটতি (বার্ষিক ২০০ মিলিমিটারেরও কম) পূরণের জন্য অন্য কোনও উৎস নাই। সামান্য কিছু কূপ আছে। এইগুলি গবাদিপশুর পানির চাহিদা ও জমিতে পানি দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। এইসব কূপের বেশীর ভাগ হইতে লোনা-মিঠা মিশ্র পানি মিলে। ১৯৫৩ খৃ. Artesian কূপ খননের পূর্বে পানীয় জলের জন্য কেরকেনীয়গণ জলাধার ব্যবহার করিত।

ইতিহাস ঃ গ্রীক লেখকগণের লেখায় Cercina (Herodo tus, Hist., IV. 195; Agathemerus, Hypotyposis, V. 21,22; Diodorus Siculus, Bibl. Hist., V. 12, 4; Plutarch, Parallel Lives, Dion, 25 Marius, 40; Strabo, Geogr. bk. II. ch. 5, 20 ও bk. XVII. ch. 3, 17)-র উল্লেখ খুবই বিরল। Polybius (Hist. Gen. III, 96,12) স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, ২য় পিউনিক যুদ্ধের সময় Consul Cn. Serv. Germanus_Menynx (জেরবা) আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করার পর Cercina-য় অবতরণ করেন এবং মাত্র ১০টি রৌপ্য (চাকতি) মুদ্রার নজরানার বিনিময়ে জনপদটিকে রেহাই দেন।

রোমাস লেখকদের লেখায় Karkena সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। ১৯৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমকদের হাত এড়াইবার জন্য Hannibal যখন Antioch হইতে সিরিয়ায় পলায়নের চেষ্টা করেন তখন তিনি কিছুদিনের জন্য Cercina-য় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বন্দরের নৌযানের মালিকেরা তাঁহার পিছু ধাওয়া করিতে পারে এই আশংকায় তিনি ও তাঁহার পরিচারকবর্গ পাল ও দাঁড়ের মতো নৌতরীসমূহের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দিয়া তাঁহাদের নিজেদের জন্য তাঁবু খাটাইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতাদের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেন ও তাহাদের পানাহারের হৈ-হুল্লোড়ের সুযোগে তিনি সেখানে হইতে সরিয়া পড়েন (T. Livy. Hist. Rom. bk. xxxiii, ch. 48)। ৮৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে Marius ও তাঁহার পুত্র একটি মাছধরা নৌকায় করিয়া এই দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন। Pompey ও Caesar-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় Sallust তাঁহার জাহাজবহরসহ Cercina দ্বীপে আশ্রয় লইবার জন্য আদিষ্ট হন। কারণ রোমের প্রজাতন্ত্রীরা ঐ দ্বীপে কিছু রসদপত্র সঞ্চিত রাখিয়াছিল (Bell. Afr, VIII, 2, 3 ও xxxiv, 1-3)। খৃষ্টীয় যুগের সূচনাপর্বে Augustus-এর কন্যার সহিত অবৈধ সংসর্গ ও সম্পর্কের জন্য শাস্তি হিসাবে C. Sempr Gracchus কে Cercina দ্বীপে ১৪ বৎসর মেয়াদের জন্য দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয় এবং ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাকে হত্যা করা হয় (Tacitus, Ann, I, 533 IV, 3)। Dioclete-এর আমলে এই দ্বীপপুঞ্জ বায়যান্টিয়ামের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে এই দ্বীপবাসীরা বায়যান্টাইন সম্রাটকে নজরানা প্রদান করিত এবং Hadrumete (Sousse) নিবাসী কর্মকর্তারা এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনকার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বীপপুঞ্জে দুইটি শহর ছিল। একটি Cercina অপেক্ষাকৃত বড় দ্বীপটিতে এবং অপরটি Cercinitis ক্ষুদ্র দ্বীপ Mellita-য়। এই পৌর জনপদগুলির ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু নিদর্শন আজও দ্বীপগুলির উত্তর উপকূলে দেখা যায়। ঐ সব দ্বীপে এক ধরনের খৃষ্টধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়াছিল বলিয়াও মনে হয়। কেননা ঐ দ্বীপে খৃষ্টীয় যাজকীয় কিছু মঠের (Notic episc Byz. 47) চিহ্ন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহার পর ৫ম/১১শ শতক অবধি এই দ্বীপপুঞ্জের আর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৪৯১/১০৯৮ সনে এই দ্বীপপুঞ্জ যীরী শাসনাধীন (অর্থাৎ বৃহত্তর দ্বীপ কারকানা যীরী শাসনাধীনে) যায়। আর ক্ষুদ্রতর দ্বীপ Mellita-য় মাফাকসীয়গণ চারণের জন্য তাহাদের গবাদি পশুগুলিকে সেখানে পাঠাইত (য়াকূত, ৬খ, ৬৬-৭)। পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এই কারকানা দ্বীপটি গোপন আশ্রয়স্থল কিংবা হামলা চালাইবার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কয়েকবারই এই দ্বীপপুঞ্জ আক্রান্ত হয় এবং দ্বীপবাসীদের হয় তাড়াইয়া দেওয়া হয় অথবা বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। হাম্মাদী

ও যীরীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে সিসিলীর ২য় Roger মাহদিয়্যার উপর নিজ সার্বভৌমত্ব আরোপ করেন এবং কারকানায় হানা দেন। "দ্বীপটি চমৎকার, এখানে বেশ জনবসতিও আছে যদিও সেখানে কোনও শহর নাই" (আল-ইদরীসী), Descr. de l' Afr., সম্পা. Dozy, 1866, মূলপাঠ, ১২৬-৭)। তিনি ৫৪৮/১১৫৩ সনে এই দ্বীপ দখল করেন। তবে ১১৫৮ খৃ. হইতে এই দ্বীপে তাঁহাকে এক বিপ্লবী আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হয়। আল-মুওয়াহ্হিদ শাসক 'আবদু'ল-মু'মিনের সহযোগীরা সিসিলীর নরম্যানদের নিকট হইতে কারকানা দ্বীপটি পুনরুদ্ধার করেন। এক শত বৎসর পর Aragon-এর Peter জেরবায় (১২৮৪ খৃ.) ও কারকানা দ্বীপে (১২৮৭খৃ.) আক্রমণ চালান। Lauria-র Roger এই দ্বীপগুলি দখল করিলে এই দ্বীপগুলি Holy See-র জায়গীর হিসাবে তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে এক বংশানুক্রমিক খেতাবও দেওয়া হয়। এইজন্য তাঁহার উপর বার্ষিক ১৫ আউন্স স্বর্ণের খাযনা ধার্য করা হয়। সিসিলীর Frederick ১৩১১ খৃ. হইতে ১৩১৫ খৃ. পর্যন্ত এই দ্বীপগুলি [Cronica (1265-1336), ch. 265] Ramon Muntaner-কে অর্পণ করেন এবং তাঁহাকে ঐ দ্বীপগুলির যাবতীয় অধিকার ও রাজস্বের অধিকার প্রদান করেন এবং তিন বৎসর যাবত এই দ্বীপগুলিকে লইয়া তাঁহার যাহা খুশি তাহা করিবার অধিকারও দেন। বিশ বৎসর পর দ্বীপবাসীরা খৃস্টান শাসক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজদেরকে স্বাধীন করিতে সমর্থ হয় (১৩৩৫ খৃ.)। আবূ ফারিসের শাসনামলে ১৪২৩ খৃ. সনের দিকে Aragon-এর লোকের নূতন করিয়া ঐ দ্বীপে হামলা চালায়। কারকানীয়রা সেই হামলা প্রতিহত করিতে পারে নাই। হামলাকারীরা ঐ দ্বীপবাসীদের মধ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাইয়া তাহাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে এবং বহু লোককে বন্দী করা হয়। ঐতিহাসিকদের কিছু কিছু খণ্ড বিবরণ হইতে উহাদের সংখ্যা ৩,৪৫০ বলিয়া জানা যায় [Fragment. Hist. Siculae, cols. 1095-6)। ১৫১০ খৃ. সনে এই দ্বীপপুঞ্জটির মালিকানা লইয়া তুর্কী ও স্পেনীয়দের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। Navarre-এর Peter ঐ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে এক দুর্ভাগ্যজনক অভিযান চালান। দেখা যায়, ঐ দ্বীপ প্রায় জনবসতিশূন্য; "মাত্র গুটিকয়েক দরিদ্র বারবার জাতির লোকের বসতবাড়ি সেখানে রহিয়াছে" (Marmol, l' Afrique, 536-8)। কিছুকালের জন্য এই দ্বীপ স্পেনের সামন্তরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখে। তবে ১৫৬০ খৃ. তুর্কীগণ দ্বীপপুঞ্জ আবার দখল করিয়া নেয়। ১৫৭৬ খৃ. দ্বীপে আবার স্পেনীয় আক্রমণ ঘটে এবং হামলাকারীরা ১০০০ কারকানীয়কে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই সঙ্গে দ্বীপের ১৫,০০০ মেষও উহারা লইয়া যায়। ১৫০৬ ও ১৬১১ খৃ. এই ধরনের আরও হামলা ঘটে।

Relacion anonima de los meritosy servicios de D. Alvaro Basan (1576)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দ্বীপের সাতটি গ্রামে জনবসতি ছিল। তাহারা পামগাছের চাষাবাদ ও মাছ শিকার, অসংখ্য মেষ পালন, পশমী বস্ত্র বয়ন, দ্রাক্ষা, ডুমুর ও জলপাই চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিত।

কারকানা দ্বীপপুঞ্জে আবার ক্রমান্বয়ে জনবসতি গড়িয়া ওঠে। খৃস্টীয় ১১শ শতকের প্রথম দিকের এক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপটিতে ১০টির মত গ্রাম ও ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে Mellita নামে একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল। কয়েক দফায় এইসব দ্বীপে অনেক লোকজন আসে। তাহারা বিভিন্ন ও বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর লোক। অনেকে আসে পূর্ব তিউনিসিয়া হইতে, কিছু সংখ্যক মুরাবিত' পরিবার নিশ্চয়ই আসিয়াছিলেন দক্ষিণ মুরক্কো হইতে আর অন্যান্য লোক আসে ক্ষুদ্র Syrte হইতে (জেরবা, যুওয়াগা)। তবে এইসব দ্বীপবাসীর বাড়িঘড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-রীতি ও ভাষা সব কিছুই বিশেষ করিয়া নিম্ন সাহেল অঞ্চলের প্রভাবের কথা মনে করাইয়া দেয়। Mellita-র ব্যাপারটি অবশ্যই এই ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কারণ এই দ্বীপটিতে জনবসতি ঘটিয়াছে অতি সাম্প্রতিক-কালেই। আর ঐ লোকগুলি আসিয়াছে বেলেদএল-আ'রাব, আধা যাযাবর সাহেল অঞ্চল অথবা সাফাকসীয় পশ্চাদভূমি অঞ্চল হইতে। বৃহত্তর কারকানা দ্বীপের লোকজন নগরবাসীর মত করিয়া তাহাদের ভাষা উচ্চারণ করিলেও Mellita দ্বীপের লোকজনের কথাবার্তায় বেদুঈনী ধাঁচ লক্ষ করা যায়।

এই দ্বীপপুঞ্জের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১৩,০০০-এর বেশী হওয়া কঠিন। তবে ২৫,০০০-এরও বেশী লোক মূল ভূখণ্ডে বাস করে। কারকান দ্বীপটি এখন গোটা দেশ হইতে আর বিচ্ছিন্ন না থাকায় সেখান হইতে জন সমষ্টির অভিভাষণ শুরু হইয়াছে। ব্যস্তবিকপক্ষে বিচ্ছিন্ন অবস্থানের কারণেই দ্বীপবাসীরা একটি সীমিত আকারের অর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিসরে স্বাবলম্বী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। আর তাহাদের সেই অর্থনীতি ছিল গ্রামভিত্তিক। উহার সামাজিক সংহতিও ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

কারকানীয় জীবনযাত্রা ঃ দ্বীপবাসী হিসাবে কারকানীয়দের জীবন রক্ষা ও জীবিকার প্রধান উৎস হইল সমুদ্র। দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে বেষ্টিত অগভীর জলরাশি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কার্যত এই সামুদ্রিক দ্বীপবাসীরা ঐ অগভীর জলরাশি হইতে পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণে উদ্যোগী হয়। তাঁহারা ঐ অগভীর পানিতে জাল টানাইয়া কিংবা পাটাতনের বাঁধ খাড়া করিয়া মাছ শিকারে নিয়োজিত হয় এবং মৎস্য চারণ ও শিকার ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে (শারফিয়্যা)। দ্বীপপুঞ্জে পাম গাছ প্রচুর। ইহার শাখাগুলি পুতিয়া অগভীর পানিতে মৎস্য শিকার ক্ষেত্রগুলির জলপথ চিহ্নিত করা হয় এবং এইগুলিকে মাছ ধরার জালের প্রতিবন্ধক হিসাবেও কাজে লাগানো হয়। তাহারা তাহাদের মাছ ধরার জালগুলি এই পাম গাছের প্রলম্বিত গুঁড়িতে টানাইয়া শুকায়। দ্বীপদেশের মৎস্য শিকারী হিসাবে কারকানীয়রা জানে উড়ুক্কু মুললেট (Mullet) মাছের মত মাছগুলির স্বভাব প্রকৃতির ফায়দা কী করিয়া উঠাইতে হয়। এই মাছ শিকার করিতে তাহারা কোনও একটি সাধারণ পানি প্রবাহকে (দাম্মাসাতু'ল-বারর) কাজে লাগায় যে পানি প্রবাহ সাগরে স্রোতের দিকে গিয়া আপতিত হয়। দ্বীপের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মৎসজীবীদেরকে ক্রমেই সমুদ্রের আরও গভীরে যাইয়া মাছ শিকার করিতে হয়। অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত কিংবা ভাড়ায় নিযুক্ত মৎস্য শিকারী প্রথমে মাছ ধারার জন্য অগভীর জলরাশির একটি এলাকা বিশেষকে চিহ্নিত করিয়া, বিশেষত কোনও বালুচরা এলাকার অত্যন্ত একটি ক্ষুদ্র অংশে চিহ্ন দিয়া নিজ দাবী আরোপ করে, যেখানে মৎস চারণ ক্ষেত্র তৈয়ার করা এবং অক্টোপাস শিকার করার জন্য টোপ বা 'চার' দেওয়া সম্ভব হইবে কিংবা স্পঞ্জ সংগ্রহ করা যাইবে।

অগভীর জলভাগ সমুদ্রের বেশ অনেকটা ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অগভীর জলরাশি তথা সাগরে চলাচলের জন্য কারকানীয়গণ লূদ নামে এক ধরনের নৌকা তৈয়ারী করে যাহা বেশ চ্যাপ্টা ধরনের এবং যাহাতে কোনও ক্রমসংকীর্ণ তলদেশও নাই। ফলে উহা অগভীর সাগর তলের

জন্য বেশ উপযোগী। তাঁহার এই ধরনের নৌযানে করিয়া উপকূলের বিভিন্ন স্থানে মাছের পণ্য বিক্রয় করিতে এমনকি গ্রীস অবধি অক্টোপাস শুটকি বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। কারকানীয়গণ নাবিক হিসাবে সুখ্যাতির অধিকারী। আর এই হিসাবে তাহারা উপকূলভাগ বরাবর এক বন্দর হইতে আরেক বন্দরে পণ্য পরিবহন ব্যবসায়ও চালাইয়া থাকে। তাহারা তাহাদের দুই পালের নৌকায় (Santel) করিয়া সাগর পাড়ি দিয়া প্রাচ্য দেশ অবধি যাইয়া থাকে। তাহারা ঐ ধরনের নৌযান চালনায় বিশেষ দক্ষ। উপকূলীয় বাণিজ্য ও মাঝে মাঝে স্থলভাগে যাত্রা বিরতির অবকাশে তাহারা অনেক নূতন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানিতে পারে এবং ঐ কৌশল দেশে লইয়া আসিয়া নানা রকম কাজ করে। ইহার জন্য তাহারা যেমন নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে তেমনই প্রয়োজনীয় রসদের সরবরাহও লইয়া আসে। এইভাবে তাহারা Esparto (এক ধরনের তৃণ) (হালফা মাহবূলা) সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে। ইহা সংগ্রহের জন্য তাহারা সাহেলের পশ্চাদভূমি অঞ্চলের দেশে কিংবা ছোট Syrte-এর উপসাগর অঞ্চলে গমন করে।

কারকানীয় সাগর কারকানীয়দের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করিতে পারে না। আর তাই এই দ্বীপবাসীরা দ্বীপপুঞ্জের সীমিত চাষাবাদে যথাসম্ভব নিয়োজিত হয় বা শিল্পী কারিগরের কাজ করে। তাহারা পাম গাছের প্রায় প্রতিটি জিনিসই কাজে লাগায় পাম গাছের গুঁড়ির তন্ত্র, আঁশ, শলা, ও ডাঁটা—সব কিছুই। উপকূলীয় অগভীর পানিতে Esparto ঘাস 'জাগ' দিয়া প্রক্রিয়া করার চমৎকার সুবিধা থাকায় তাহারা আলফা (এক ধরনের ঘাস বা খড়) পাকাইয়া দড়ি প্রস্তুত করে অথবা ঐ পাকানো দড়ি দিয়া ঝুড়ি তৈয়ার করে এবং উটের পিঠের আধার নির্মাণ করে।

এই দ্বীপপুঞ্জবাসীর সুদিন এখন আসিতেছে। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করিয়া বাঁচিয়া থাকার দিন শেষ প্রায়। উহাদের জীবনযাত্রা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছে। মূল ভূখণ্ড ও উপকূলের সহিত সংযোগ নিবিড় হইতেছে। এখন লেখাপড়া চর্চার ক্ষেত্রেও দ্বীপবাসীর সাফল্য বাড়িতেছে। কারকানাবাসীদের ছেলে-মেয়েরা এখন অনেক বেশী হারে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে যায়। আর ইহার সুবাদে ঐ দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া তাহাদের অন্যত্র আরও উন্নততর জীবনের সন্ধানে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ ঘটে। এমন সুযোগ আসিলে তাহারা দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া যায় বটে, তবে দ্বীপে স্বজন-পরিজন কিছু অবশ্যই রাখিয়া যায়। ইহারা মাছ ধরার কাজে কিংবা নাবিক হিসাবে জাহাজ কোম্পানীতে মৌসুমী কাজ করে, কেহ বা বড় বড় শহরে সরকারী ছোট আমলার চাকুরী করে। কেহ বা নিয়োজিত হয় শীর্ষ ব্যবস্থাপনামূলক পদে। এইভাবে দ্বীপপুঞ্জের বাহিরে Sfax, Sousse, La Goulette, Tunis-এ প্রায় ৩০ হাজার কারকানীয় বসবাস করে। যদিও উহারা অবশেষে তাঁহাদের পরম প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইতেই ভালবাসে বেশী। "য়া কারকানা" "য়া কারকারা" "হে কারকানা. তোমার সন্তানদের তুমি সর্বদাই নিজ বক্ষে ফিরাইয়া লও।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (১) A. Louis, Les Iles Kerkena (Tunisie) etude d'ethnographie tunisienne et de geographie humaine, Tunis 1961 3. ৩ খণ্ডে; আরও দ্র. (২) A. Louis, Documents ethnographiques et linguistiques sur les iles Karkena, Textes en arabe dialectal aveo trad, commentaire et glossaire Algiers 1961-2.

এই নিবন্ধে উল্লিখিত রচনাবলী ও সূত্র নির্দেশ ছাড়াও দ্র. (৩) A. d'Avezac, Iles de Qerqench in Iles d' Afrique, volume of l'Univers Pittoresque, প্যারিস ১৮৫৮ খৃ., পৃ., ৭৬-৮৫; (৪) De Mas-Latrie, Traites de paix et de commerce et Documents divers concernant les relations des Chretiens avecles Arabes de l'Afrique Septentrionale, au Moyen Agr, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ.; (৫)H. Von Maltzan Reise in den Regenschaften Tunia und Tripolis, Leipzig, iii, 76-93; (৬) J. Servonnet ও F. Lafitte, En Tunisie, le Golfe de Gabes en 1888. প্যারিস ১৮৮৯ খৃ. ৩৩২-৪০২ ও পৃ. pls I. IV-VII; (৭) A Allemand-Martin. Les Iles Kerkenna, Essai de colonisation agricole, in La Geographie, x (1904), 201-22; (৮) P. A. Hennique, Une Page d'archeologie navale, Caboteurs et pecheurs de la cote de Tunisie, Peche des Eponges, প্যারিস, ১৮৮৮ খৃ.; (৯) A. Guibert, Le periple des Iles, Tunis 1937, ch, ii: Les Iles Kerken ou le dernier paradis, 47-98; (১০) J. Despois. Les Iles Kerkena et leurs bancs in Revue Tunisienne, 1937, 247-301, মূল পাঠ হইতে ১০টি প্লেট ও তিনটি মানচিত্র; (১১) A. Bouyssonie, Dans les parages de la petite Syrte: des hauts fonds marins et certains problemes juridiques qui s'y rapportent, Sfax 1945; (১২) A. Cateau, Introduction d l'etude du vocabulaire maritime en Tunisie, technologie du lud in R. Afr. (1946). 140-83; (১৩) O. Kaak, জাযীরাত কারকনা ফি'ল-আদাব ওয়া'ত-তা'রীখ, সফ্যাকস ১৯৫৫ খৃ.।

A. Louis (E. I.²)/ আফতাব হোসেন

কারকারা (كركرة) ঃ মহানবী (সা)-এর একজন আযাদকৃত গোলাম। তাঁহার নাম লইয়া মতবিরোধ রহিয়াছেন। অনেকের মতে তাঁহার নাম কিরকিরা, আবার অনেকের (যেমন ইমাম নাওয়াবীর) মতে কারকিরা বা কিরকিরা। তিনি ছিলেন নুবিয়ার অধিবাসী। য়ামামা হইতে হাওদা ইব্ন 'আলী আল-হানাফী আল-য়ামানী মহানবী (স)-এর নিকটে তাঁহাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করিলে মহানবী (স) তাঁহাকে আযাদ করিয়া দেন। মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার বর্ণিত কোন হাদীছের সন্ধান পাওয়া যায় না। বুখারীসহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ইবনি'ল-'আস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক যুদ্ধে মহানবী (স)-এর জিনিসপত্র হেফাজতের জন্য কারকারা নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত ছিলেন। সেই যুদ্ধ হইতে ফেরার পথে ঐ ব্যক্তি ইনতিকাল করিলে মহানবী (স) বলিলেন যে, তাঁহাকে দোযখের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তিনি সংবিধান মত বন্টনের পূর্বেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে একটি জামা লইয়া গিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৯৩, ক্রমিক সংখ্যা ৭৪০০; (২) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত তা. বি. ১খ, ৪৯৮; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৩৮; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ., ৫খ, ৩১৯; (৫) ঐ লেখক, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৬ খৃ., ৪খ, ৬৩০।

লিয়াকত আলী

কারকীসিয়া (قرقيسيا) ঃ বা কারকীসিয়া (قرقيسية) আল-জাযীরার একটি শহর, ইউফ্রেটিস নদীর বাম তীরে অবস্থিত, খাবূর নদীর মিলন স্থানের নিকটে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশের সামান্য উপরে। কারকীসিয়া গ্রীক ও রোমান নামের আরবী অবিকল রূপ মাত্র। Circesium Syriac Kerwsion, Latin Castrum Circense the Castle with the Circus; তু. Noleke, পূ. গ্র. (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী), পৃ. ৩। য়াকূত-এর মু'জামু'ল-বুলদান অনুযায়ী হামযা আল-ইসফাহানী (৪খ, ৬৫, ছত্র ২১ প.) স্থান-নামের মূল ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে তখনও জ্ঞাত ছিলেন (কারকীসিয়া কিরকীসিয়া হইতে আরবীকৃত, যাহা কিরকীস হইতে=আ হাল্‌বা, মল্লভূমি)। যাহা হউক খাবূর নদীর মোহনায় অবস্থিত স্থানটিতে রোমান সাময়িক অবস্থান নির্মিত হইবার পর ইহা সর্বপ্রথম Ciresium নামে পরিচিতি লাভ করে। সম্ভবত Diocletian-এর পূর্বেই ইহার অস্তিত্ব ছিল। যাহা হউক, এই সম্রাটই দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সীমান্তে একটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপনের মাধ্যমে প্রথম এই স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। এই ঘটনা হইতে আরামী ভাষার শব্দ কারকা=শহর (দ্র. আল-কারখ) ল্যাটিন ভাষায় Circesium-এ রূপান্তরিত হইতে পারে—এই অনুমান সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব বলিয়া অনুভূত হয়, যেমন Moritz (Palmyrene, পৃ. ৩৭) ইহা মানে করিতেন; বিপরীত মতামতের জন্য দ্র. Streck, ZA-তে, ২৭ খৃ, ২৫৯।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট Jovian (৩৬৩ খৃ.) কর্তৃক সম্পাদিত অবমাননাকর চুক্তির সারকেসিয়াম পারস্যের হস্তগত হয়। পরে আরবগণ আল-জাযীরা বিজয়ের সময় ইহা অধিকার করে। প্রতীয়মান হয় যে, ইমাদ, ইব্ন গান্‌ম কর্তৃক প্রেরিত হাবীব ইব্ন মাসলামার নেতৃত্বে মুসলমানগণ কর্তৃক ইহা বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক উৎস অনুসারে ঘটনাটি ১৬/৬৩৭ সালে সংঘটিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৯/৬৪০ সালে ঘটিয়াছিল [তু. আল-বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ১৭৬, অধিকন্তু পৃ. ১১১, ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯; আত-তাবারী, ১খ, ২৪৭৮; ইবনু'ল-আছীর, ২খ, ৪০৯ প.; য়াকূত, মু'জাম, ৪খ, ৬৫ প.; Weil, Gesch der Chalifen. ১খ, ৮২ প.; Caetani, Annali dell' Islam, ২খ, ৪০২, ৩খ, ৭৩২, ৭৫৫ প., ৭৯৯]। কারকীসিয়া দিয়ার বাক্র প্রদেশের অন্তর্গত খাবূর জিলার সদরে পরিণত হয়। ইহার বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থানেরই ফলে আরব ভূগোলবিদগণ নদীর গতিপথ ও রাস্তাসমূহ সংক্রান্ত তাঁহাদের বর্ণনায় কারকীসিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। স্থানটি সম্ভবত ইসলামী যুগে তেমন কোনও বৃহৎ আকারও ধারণ করে নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তুদেলা নিবাসী Benjamin সেইখানে উচ্চ হারে য়াহূদীদের বসতি (৫০০ শত পরিবার) দেখিতে পাইয়াছিলেন [দ্র. তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সম্পা. ও অনু. Grunhut ও Adler (জেরুসালেম ১৯০৩ খৃ., ফ্রাঙ্কফুর্ট a/M. ১৯০৪), ১খ, ৪৯, ৫১প. ও ২খ, ৪৭]।

ইসলামের মধ্যযুগের যুদ্ধের ইতিহাসে কারকীসিয়া প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। 'আবদু'ল-মালিক যখন ইরাকের গভর্নর এবং বিরুদ্ধবাদী খলীফা 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু'য-যুবায়রের ভ্রাতা মুস'আবের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে রত ছিলেন, ঐ সময় তিনি ৭১/৬৯০ সালে কারকীসিয়ার প্রতি মনোযোগ দেন। সেইখানে তখন কায়সী যুফার ইবনু'ল-হারিছ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে ছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হিমসের গভর্নরের আক্রমণ তিনি সফলতার সহিত প্রতিহত করেন। স্বল্পস্থায়ী অবরোধের পর খলীফার সেনাবাহিনীর নিকট যুফারর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (তু. ইব্নু'ল-আছীর, ৪খ, ২৭৫ প.; Weil, Gesch. der Chalifen, ১খ, ৪৩১; J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, বার্লিন ১৯০২ খৃ., ১১৫-৬, ১১৯-২০, ১২৬; Canard, Hamdanides, পৃ. ১৩৮)। ৫ম/১০ম শতাব্দীতে হামদানী আমলে মেসোপটেমিয়ার ভূখণ্ডে সংঘটিত যুদ্ধগুলিতে কারকীসিয়াকে আর-রাহবাসহ একত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে দেখা যায়। আর-রাহবা কারকীসিয়া হইতে ইউফ্রেটিস নদী বরাবর ভাটিতে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত (তু. Canard, পূ. গ্র., পৃ. ৪৯২, ৫৪৫-৭)। মিসরের শাসকগণ কারকীসিয়া পর্যন্ত তাঁহাদের শাসন পুনঃপুনঃ সম্প্রসারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ তূলূনী বংশের আহমাদ, যাঁহার নিকট হইতে খলীফা আল-মু'তামিদের শৌর্যবান ভ্রাতা আল-মুওয়াফ্‌ফাক ২৬৮/৮৮১ সালে ইহা পুনঃঅধিকার করিতে সক্ষম হন (দ্র. Wustenfeld, Die Statthalter von Agypten zur Zeit der Chalifen, in Abh. GGW (১৮৭৬ খৃ.), ২১খ, ৩য় ভাগ, ২০]। কয়েক শতাব্দী পরে ৬৬৩/১২৬৪ সালে মিসরের সুলতান বায়বারস মঙ্গোলদের নিকট হইতে কারকীসিয়া অধিকার করত খাবূর নদী পর্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্য সীমা সম্প্রসারণ করেন (তু. Weil, Gesch. der Chalifen, ৪খ, ৯৬)।

৩০-৪০টি গাড়ী ও কাদা মাটির কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটীরের একটি দৈন্যদশাগ্রস্ত গ্রাম এবং সন্নিহিত একটি বিস্তৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা হিসাবে বর্তমানে কারকীসিয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এখন ইহা বুসায়রা (বেসেরা; কখনও কখনও বুসেয়রা লিখিত হয়) নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন পর্যটকগণ ইহাকে আবূ সেয়ার ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। বুসায়রা সম্ভবত আবূ সেরায়ের বিকৃত রূপ (যেমন, অন্যান্য লেখকের সহিত, Moritz. পূ. গ্র., ৩৭, ধারণা করেন), কম সম্ভাবনার সাথে মনে করা হইয়া থাকে যে, আধুনিককালের দায়র আয-যোর-এর প্রাচীন নাম (আবু'ল-ফিদা কর্তৃক ৭৩২/১৩৩১ সালের ঘটনাবলীর আওতাধীনে লিপিবদ্ধ), বাসীর (بسير) হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, যেমন Herzfeld মনে করেন। Herzfeld-এর মতে প্রাচীন নাম কারকীসিয়া অদ্যাবধি স্থানীয়ভাবে কারকীসা আকারে টিকিয়া আছে।

খাবূর ও ইউফ্রেটিসের মিলনস্থানে, খাবূর দ্বারা গঠিত বক্রাকার জিহ্বাকৃতির ভূখণ্ডে বুসায়রা অবস্থিত এবং মোহনা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় আধা ঘণ্টার পথ। একটি খাত দ্বারা দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ইহা একটি উপদ্বীপ হিসাবে সুচিহ্নিত। প্রাচীন দুর্গের পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত সহজেই চিনিতে পারা যায়। ইহা আয়তক্ষেত্র

আকারে গঠিত। ইহার বড় বাহুটি খাবূর বরাবর এবং ছোট বাহুটি ইউফ্রেটিস বরাবর অগ্রসরমান—যাহার বর্তমান দূরত্ব ইউফ্রেটিস হইতে প্রায় ১০০০ গজ। চারিটি কমবেশী সুরক্ষিত উচ্চ স্তম্ভ এবং একটি দুর্গাকৃতি ইমারত (Praetorium, সেরায়) অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা হইতে আধুনিক নাম আবূ সেরায় (বুসায়রা)-এর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া Moritz (পৃ. ঐ) ধারণা করেন। দুর্গটির উত্তর-পূর্বদিকে একটি সুবিদিত শহর অবস্থিত ছিল এবং এইখানে অসংখ্য মাটির দেওয়ালের চিহ্ন বর্তমান। Sachau Moritz ও Herzfeld, আধুনিক ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা ছাড়া Sachau ও Morzfeld ইহার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিয়াছেন।

সিরিয়া হইতে ব্যাবিলোনিয়া, মাওসিল হইতে সিরিয়া পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এইখানে মিলিত হওয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে একদা কারকীসিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। খাবূর-এর মোহনা হইতে উজানে কয়েক ঘণ্টা দূরত্ব ইউফ্রেটিস তীরে অবস্থিত আধুনিক কালের দায়রু'য-যোর (দ্র.) উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ফিরিয়া পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাক-ইসলামী যুগের শহর সংক্রান্ত বিষয়ে দ্র. (১) Pauly-Wissowa শিরো. ও শিরো. Chabora; (২) Ritter, Erdkunde, ১০খ, ১৫, ১৩৯, ২৩৬, ১১২৯, ১১খ, ২৬৬-৭৪, ৬৯৫; (৩) Layard, Niniveh and Babylon, লন্ডন ১৮৫৩ খৃ., ২৮৩.; (৪) Chesney, Narrative of the Euphrates Expedition, লন্ডন ১৮৬৮ খৃ., ২৫০; (৫) Noldeke, Nachr. GGW-এ, ১৮৭৬ খৃ., ১খ, ১প.; (৬) Sachau, Reise in Syrienu. Mesopot., লাইপযিগ ১৮৮৩খৃ., পৃ. ২৮৬-৪; (৭) Mortiz, Zar antiken Topographie der Palmyrene=Abh. Pr. Akad, ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ৩৭-৯; (৮) Chapot, La frontiere de l'Euphrate, প্যারিস ১৯০৭ খৃ., পৃ. ২৯৪-৭; (৯) Sarre-Herzfeld, Archaeol. Reise im Euphratund Tigrisgebiet, ১খ, বার্লিন ১৯১১ খৃ. পৃ. ১৭২-৪/আরবী উৎস–সমূহ ঃ (১০) BGA. স্থা.; (১১) ইব্ন সিরাপিওন, সম্পা. G. Le Strange. JRAS-এ (১৮৯৫ খৃ.) পৃ. ১০, ৫১; (১২) আত-তাবারী, নির্ঘণ্ট; (১৩) আল-বাকরী, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld. পৃ. ৫২৮, ৭৩৯; (১৪) ইদরীসী, নুযহাতু'ল-মুশ্তাক' অনু. Jaubert. ২খ, ১৩৮,১৪২, ১৪৫, ১৫০; (১৫) য়াকূত, মু'জাম, ৪খ, ৬৫; (১৬) ইবনু'ল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (১৭) আদ-দিমাশকী, নুখ্বাতু'দ-দাহ্র, সম্পা. Mehren. পৃ. ১৯১; (১৮) আবু'ল-ফিদা, Annales, সম্পা. Reiske-Adler, ১খ, ২৩৫, ৪খ, ৫১, ৫০৯, ৫খ, ১৭; (১৯) ঐ লেখক, তাকবীমু'ল-বুলদান, সম্পা. Reinaud ও de Slane. পৃ. ২৭৩, ২৮১ এবং অনু. ২খ, ৪৯,৫৭।

M. Streck (E. I.[2])/মুহাঃ আবূ তাহের

কারকূর (كركور) ঃ আরও সঠিক উচ্চারণ কুরকূর (Kerkur)। এই শব্দটি কেবল মাগরিবী কথ্য আরবীতে পাওয়া যায়, তু. বার্বার শব্দ akerkur। শব্দটির অর্থ "এক স্তূপ পবিত্র প্রস্তর"। প্রস্তর স্তূপের শ্রদ্ধা-ভক্তি খুবই আদিম প্রথা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই প্রস্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রথাটি সঠিক ও নিখুঁত অর্থে প্রস্তরপূজা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না বরং বলা যায়, অশুভ কোনও শক্তির বহিষ্কার বা স্থানান্তরের এক ধরনের রীতি হইতে ইহা আসিয়াছে। মনে করা হয়, কোনও ব্যক্তি যখন একটি প্রস্তরখণ্ড হাতে তুলিয়া নেয়, তখন উহাতে ঐ ব্যক্তি যে ধরনেরই অশুভ শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হউক — যেমন ক্লান্তি, শারীরিক বা নৈতিক কষ্ট, পাপ ইত্যাদির কারণ ঐ প্রস্তরে স্থানান্তরিত হয়। শুধু এইগুলিই নয়, অনেক বিপজ্জনক শক্তিও কোনও বিশেষ পবিত্র স্থানে মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে কিংবা উপরে যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইল সেইগুলির সব একত্রে মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। মানুষ ঐ তৎসমুদয় বিশেষণের জন্য উপযুক্ত কোনও স্থানে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া কিংবা প্রস্তরের সহিত ঐসব দোষ জমা করিয়া স্তূপীকৃত করার মাধ্যমে ঐসব অশুভ প্রভাব হইতে সে মুক্তি পাইতে পারে। এইসব অশুভ মোচনকারী প্রস্তরখণ্ডগুলি একত্রে মিলিয়া একটি পবিত্র স্তূপ রচিত হয়। আর এই ধরনের স্তূপগুলি দেখা যায় সড়কের পার্শ্বে, কঠিন গিরিসঙ্কটে এবং পবিত্র কোনও স্থানের প্রবেশপথের পাশে। ইহা ছাড়াও ইহার পাশাপাশি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ছোট পিরামিড আকৃতির প্রস্তরের স্তূপ গড়িয়া তোলাও কোনও ধর্মীয় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অন্যতম বাধ্যতামূলক রীতি অনুষ্ঠান হইয়া ওঠে। অনেক সময় এই ধরনের অনুষ্ঠান তাহার আদি বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে ও উহা সত্যিকার ধর্মীয় নিবেদনমূলক রীতি হইয়া ওঠে। কোনও একজন মানুষ যেখানে নিহত হয় কিংবা তাহাকে কবর দেওয়া হয় সেই ধরনের স্থানে প্রায়শই ঐ ধরনের প্রস্তর স্তূপ গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। এই ধরনের প্রস্তর স্তূপ নির্মাণের নেপথ্যে ব্যাখ্যা হইতেছে ইহাই যে, মানুষ একজন মৃত বা নিহতকে মাটির গভীরে আরও বেশী করিয়া গাড়িয়া দিতে চায়, যাহাতে ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মা বাহির হইয়া আসিতে উৎসাহিত না হয় কিংবা বাহির হইয়া আসিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ না করে অথবা এমন ধারণাও করা হয় যে, ঐ প্রস্তরের স্তূপ গড়িয়া তোলা হয় মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য; তবে এইভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি আসলে কিভাবে প্রদর্শিত হয় তাহা তেমন বোধগম্য নহে। তবে এই প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যাপারটির আরও এক ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, ইচ্ছা অশুভ শক্তি বিতাড়নের (একটি বিপজ্জনক স্থান, অহরহ মৃত্যু এবং বিপজ্জনক যাদুর প্রভাব ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য) এক রীতি বিশেষ)। এই কারণে মনে করা যায় যে, এই প্রাচীন আদিম উৎস রীতির সুবাদে শুচিশুদ্ধকরণের রীতির প্রচলন ঘটিয়াছে (এই বিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্য দ্র. J. G. Frazer, The golden bough3, part VI, The scapegoat, 8-30; এই বিষয়ে ইসলামী দুনিয়ায়ও কিছু সূত্র নির্দেশ রহিয়াছে; ফরাসী অনু. Le bouc emissaire, Paris 1925)।

প্রাক-ইসলামী আরবে এই প্রস্তর নিক্ষেপের রীতি ও পবিত্র প্রস্তর স্তূপ গড়িবার বিষয়ে জানা ছিল। হাজ্জ-এর রীতি অনুষ্ঠানের মাঝে ইহার সাক্ষ্য সংরক্ষিত রহিয়াছে। তবে এই প্রস্তর স্তূপ ও প্রস্তর নিক্ষেপ রীতি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে এই বিষয়ে অন্যান্য দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করা হইয়াছে (দ্র. T. Fahd, La divination arabe, 188-95)।

ইসলামের পতাকাতলে আসা সমুদয় দেশ ও ভূখণ্ডেই এই প্রস্তর স্তূপ ও এতদসংক্রান্ত আচার-রীতি লক্ষ করিয়াছে। ইসলামের রক্ষণবাদী মহল এই বিষয়টির ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করিলেও অন্যান্য বহু জনপ্রিয়

আচার-রীতির মত এই প্রস্তর স্তূপ গড়ার মত রীতিটিও কোনও কোনও স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে, যেগুলির বেশীর ভাগেরই আদি উৎস বহু প্রাচীন জড় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে নিহিত। বিশেষ কতক অঞ্চলে এই ধরনের প্রস্তরগুলি সংখ্যায় অনেক। তবে উত্তর আফ্রিকার মত আর কোথাও এই প্রস্তর স্তূপ সংশ্লিষ্ট রীতি-আচার এত বেশী মাত্রায় গড়িয়া ওঠে নাই। ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী পরিদৃষ্ট হয় মরক্কোর দক্ষিণাঞ্চলে। এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে সমীক্ষা করিয়াছেন E. Doutte [Marakech, Paris 1905, 58-108; Magie et religion dans l'Afrique du Nord, Algiers 1908, ch. x; E. Westermarck, The Moorish conception of holiness (Baraka) Helsingfors 1916, 26 প.]। এখানে বলিতে গেলে এমন একটি গিরিপথ, একটি নদীখাত বা নালা কিংবা পথের মোড় নাই যেখানে ছোট পিরামিডের আকৃতির প্রস্তরের স্তূপ নাই। এইগুলি মরক্কোতে পবিত্র (কারকূর) নামে পরিচিত। প্রত্যেক পথচারী প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ঐ প্রস্তরস্তূপে তাহার নিজ প্রস্তর যোগ করে। আর ঐ প্রস্তর স্তূপ কোনও রুক্ষ ধরনের পবিত্র স্থান না হইলেও সেখানে পবিত্র প্রস্তরের স্তূপ আলাদাভাবে থাকে।

অনেক সময় অন্য কিছু ক্ষেত্রের মতো খোদ কারকূর বলিতে একটি প্রস্রবণ, একটি গাছ বা একটি শিলাও হইতে পারে যাহার সূত্রে উহার নিকটেই গড়িয়া ওঠে পবিত্র ধর্মীয় স্থান যাহা মুরাবিত রীতিতে ইসলামায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, একজন সূফী দরবেশের অধীনে অতি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, উল্লিখিত ধরনের কতকগুলি রীতির সমন্বয়ে এক অদ্ভুত ধরনের ধর্মীয় পবিত্র স্থানের উদ্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে প্রদত্ত। (১) দা. মা. ই. ১৭খ, ২৩১-৩৩।

H. Basset (E. I. [2])/আফতাব হোসেন

আল-কারখ (الكرخ) ঃ সিরীয় 'কারকা' হইতে একটি ধার করা শব্দ যাহার অর্থ 'দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত নগরী' (Fraenkel, Fremdworter, ২০খ, Pauly-Wissown, ৪খ, ২১২২, ২১২৪; Supplement, ১খ, ২৭৫, ২৮৩)। ইসলামী যুগে শব্দটি বিভিন্ন শহরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। ইসলামের বিজয়ের পূর্বে আরামীয় কৃষিনির্ভর এলাকাগুলিতে এই ধরনের শহরগুলি তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থানের নাম যুক্ত করিয়া একটিকে অপরটি হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হইত। উদাহরণস্বরূপ ঃ কারখ বাগদাদ, কারখ সামাররা (তু. য়াকূত, মুশতারিক, ৩৬৮-৭০; মু'জাম, ৪খ, ২৫২-৭)।

বাগদাদে আল-কারখ বলিতে একটি নির্দিষ্ট এলাকা (বাবু'ল-কারখ) বুঝায় এবং অতি সাধারণভাবে ইসলামী বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা খলীফা আল-মানসূরের বৃত্তাকার নগরীর পশ্চিম পার্শ্বের নিম্নাংশকে বুঝায় (তু. ইসতাখরী পৃ. ৮৪; ইব্ন হাওকাল, ed. Kramers, পৃ. ২৪১-২)। য়া'কূবীর বর্ণনায় দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীর অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তাঁহার মতে দৈর্ঘ্যে আল-কারখের ব্যাপ্তি কাসূর ওয়াদ্দাহ (উত্তর) এবং 'মঙ্গলবার-বাজার" (দ ণ)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। চওড়ায় ইহার সীমা আর-রাবী' (পশ্চিম)-এর জায়গীর এবং টাইগ্রীসের মধ্যে সীমিত (বুলদান,) ২৪৬, Le Strange, বাগদাদ, মানচিত্র ৩, ৪ এবং ৭ দ্রষ্টব্য)।

আরামীয় নামানুসারে অনুধাবন করা যায় যে, আল-মানসূর (১৪৫/৭৬২) কর্তৃক বাগদাদের ভিত্তি স্থাপনের পূর্বেই আল-কারখ-এ লোকালয়ের অস্তিত্ব ছিল। কথিত আছে যে, সাসানী দ্বিতীয় শাপূর (৩০৯-৭৯ খৃ.) একটি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র শহর হিসাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং খলীফাদের ভবিষ্যৎ রাজধানীর জন্য নির্ধারিত স্থানের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রাথমিক উপনিবেশগুলি ন্যায় নিঃসন্দেহে আল-কারখ প্রধানত সিরীয় খৃষ্টানদের দ্বারাই অধ্যুষিত ছিল।

আল-মানসূর নগরী নির্মাণের পূর্বে, পশ্চিম পার্শ্বের (সূক বাগদাদ) প্রাচীন বাজারটি আল-কারখ-এ অবস্থিত ছিল এবং বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে যে, যখন বৃত্তাকার নগরীটি নির্মিত হয় তখন আল-কারখ-এর বাজারগুলি ঐ এলাকার বিশাল জন-সংখ্যার প্রয়োজন মিটাইত (তাবারী, ২খ, ৯১০, ৯১৪)। তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে ১৫৭/৭৭৪ সালে আল-মানসূর বৃত্তাকার নগরী দক্ষিণ পার্শ্বের বাণিজ্যিক এলাকাগুলি পুনর্উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখানে অবস্থিত কতগুলি বাজারের পুনর্বিন্যাস করেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগীকে আল-কারখ-এ তাঁহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য সরকারী তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। সরকার শহরতলীগামী এবং বহির্মুখী বিস্তৃত রাস্তাসমূহ আরও প্রশস্ত করেন (খাতীব আল-বাগদাদী, কায়রো, ১খ, ৭৯-৮২ প.; তাবারী Annales, ৩খ, ৩২৩-৪; য়া'কূবী; বুলদান, পৃ. ২৪১)।

ইরাকের ইউফ্রেটিসের সর্ব উত্তরের বৃহৎ খাল নাহ্র 'ঈসা (দ্র.) এবং সারাত ও কারখায়া নামক ইহার শাখাগুলি হইতে আল-কারখ-এ পানি সরবরাহ হইত। শেষোক্তটিকে "কারখী খাল" বলা হয়, যাহা আল-বারাছা (য়াকূত, ১খ, ৬৬৫ দ্রষ্টাব্য) গ্রামের নিকট আল-মুহাওওয়াল নামক ক্ষুদ্র শহরটির নিম্ন দেশে নাহ্র 'ঈসা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পশ্চিম বাগদাদের দক্ষিণ দিকের অর্ধাংশ অর্থাৎ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ইহার সন্নিহিত অঞ্চলে খালটি শাখা-প্রণালীসহ পানি সরবরাহ করিয়া স্থানে স্থানে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহার উপর অসংখ্য সেতু, যেইগুলি দিয়া ব্যস্ত যানবাহনগুলি পারাপার হয়। কারখায়া ও ইহার খালপ্রণালী বিষয়ে দেখুন ইব্ন-সেরাপিওন, সম্পা. Le Strange, in JRAS (১৮৯৫ খৃ.) পৃ. ১৭-২৬, ২৮৬-৮, ২৯২-৩; সুহরাব, 'আজা'ইব, সম্পা. Von Mzik, পৃ. ১২৩-৪; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, কায়রো, ১খ, ৭৯-৮২, য়াকূত, ২খ, ২৫২; Streck, Babylonien, পৃ. ৮৫-৯০; Le Strange, Baghdad, পৃ. ৫২-৫৬, ৬৩-৮০; Herzfeld, in Sarre-Herzfeld, Atchaologische Reise, ২খ, ১১০। আল-কারখ-এ এই অসংখ্য জালের মত বোনা খাল-প্রণালী ইহাকে বাণিজ্যিক দিক দিয়া লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। তন্মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল সারাত। বিশাল আকারের নৌযানগুলি চলাচলের জন্যে ইহা যথেষ্ট গভীর ছিল। ব্যাপকভাবে ইহা ইরাকের প্রধান নদী ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীসকে সংযুক্ত করিয়াছিল। শহরতলীতে ইহার নিজস্ব জামি' মসজিদ ছিল। সম্ভবত ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পৌরসভা হিসাবে বিবেচিত হইত। ইহা ছিল কতগুলি শহর এলাকার অন্যতম, যেইগুলিতে স্বাভাবিক রাজধানীর পরিবেশ বিদ্যমান ছিল (J. Lassner, in JESHO, ১০খ, ৫৩-৬৩)। আল-খাতীব আল-বাগদাদী ও য়া'কূবীর বিবরণীতে এবং ইব্নু'ল-ফাকীহ-এর অসম্পাদিত মাশহাদ পাণ্ডুলিপি কিতাবু'ল-বুলদান-এ আল-কারখ-এর বিভিন্ন অবস্থানের বিশদ বর্ণনা রহিয়াছেন। খাল নির্মাণ অনুসারে বিন্যস্ত সুহরাবের 'আজা'ইব (ইব্ন সেরাপিওন)-এর বর্ণনা সুবিন্যস্ত যাহা খাল নির্মাণ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।

আল-কার্‌খ অধিক পরিমাণে শী'আ অধ্যুষিত এবং ৪র্থ/ ১০ম শতাব্দীর শুরুতে শী'আ ও সুন্নীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিকটবর্তী বাবু'ল-বাসরা ও বাবু'ল-মুহাওওয়াল লোকালয়গুলিতে ঘন ঘন ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হইত। এলাকাটি বুওয়ায়হী এবং পরবর্তীকালে সালজূকদের পতনের সময় বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকার বাজারগুলি টিকাইয়া রাখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ অথবা তহবিল বরাদ্দ কোনটিই করেন নাই (M. Canard Baghdad au VI^e Siecle de l'hegire, in Arabica, ৯খ, ১৯৬৪ খ., ২৬৮-৮৭; G. Makdisi, The Topography of Eleventh Century Baghdad: Materials and Notes, in Arabica, ৬খ, ১৯৫৯ খৃ., ১৭৮-৯৭, ২৮১-৩০৯)। 'আলী বংশীয়দের সহানুভূতি প্রাপ্ত বুওয়ায়হীদের অধীনে শী'আ ও সুন্নীদের মধ্যে ঘন ঘন বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করে। দুইটি বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগসহ রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। আল-কার্‌খ স্বাভাবিকভাবে এই গৃহ বিবাদের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহার অধিবাসিগণ সন্নিহিত লোকালয়ের (বাবু'ল-বাসরা প্রভৃতি সুন্নীদের সহিত সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। জালাল'দ-দাওলা (৪১৬-৩৫/১০২৪-৪৪)-র অধীনে পরিস্থিতি অস্বাভাবিকভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। একবার ৪২২/১০৩১ সালে আল-কার্‌খ-এ তাঁহাকে সমধর্মী শী'আদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ৪৪৫/১০৫৩ সালে এই সমস্ত গোত্রীয় বিবাদের ফলে আল-কার্‌খ-এর বিরাট এলাকা ভস্মীভূত হয়। ইহার পূর্বে খলীফা আল-ওয়াছিক (২২৭/৮৪২–২৩২/৮৪৭)-এর শাসনাধীনে একটি বড় আকারের অগ্নিকাণ্ডে আল-কার্‌খ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই ধ্বংসের ক্ষতি পূরণ করা হয়। আল-খাতীব আল-বাগদাদীর বর্ণনা অনুসারে তাঁহার সময়ে (পঞ্চম/একাদশ শতাব্দী) খাল অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানে ইহার কোনও চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকালের এই বৃহৎ শহর এলাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে নদীর তীরস্থ ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হইয়াছে।

কালক্রমে আল-কার্‌খ এলাকায় অসংখ্য মসজিদ ও সমাধি গড়িয়া ওঠে, ব্যাপক অর্থে ইহা দ্বারা ক্রমশ টাইগ্রীসের পশ্চিমে সমগ্র দক্ষিণ বাগদাদের অধিকাংশ এলাকাকে বুঝাইত। স্থানীয় সাধক পুরুষ মা'রূফ ইবনু'ল-ফায়যুরান আল-কারখী (মৃ. ২০০/৮১৬)-র সুপ্রসিদ্ধ সমাধি মসজিদ এবং ইহার মাত্র ৩০০ গজ দক্ষিণে হারূনু'র-রাশীদের মহিষী যুবায়দার কথিত সমাধি—এইগুলির অন্যতম। এই উভয় জমকাল সমাধিস্তম্ভ আজও বর্তমান এবং প্রাচীন বাগদাদের স্থান-বিবরণ অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ আরম্ভস্থল হিসাবে এইগুলি বিবেচিত হয়। খলীফা আন-নাসির (৫৭৫/১১৮০-৬২২/১২২৫) কর্তৃক সংস্কারের পর এইগুলি বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে; তখন হইতে প্রায়ই এইগুলি মেরামত করা হইতে থাকে। তৃতীয়/নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আল-কারখীর মাযার ছিল বাগদাদের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পুণ্যভূমি এবং 'আব্বাসী যুগের প্রভাব বিস্তারকারী কবরগুলির মধ্যে ইহাই স্থান। [তু. Streck, পৃ. গ্র, পৃ. ১৫৯; Massigon, Mission পৃ. ৪৯, ১০৪; Herzfeld, পৃ. গ্র, ২খ. ১৭২-৩। যুবায়দা-র তথাকথিত সমাধি সম্পর্কে দ্র. Le Strange, পৃ. গ্র., ১০০, ১৬১ প., ৩৫০ প.ম্যাসিগনন, পৃ. গ্র, ৬৪ প., ৯৪ প]। আল-কার্‌খ শুধু বৃহত্তমই ছিল না, ইহা বাগদাদের পশ্চিমাংশের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী লোকালয় ছিল। যখন ইহার চতুর্দিকের লোকালয়গুলি ক্রমাগত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন ইহা বিচ্ছিন্নভাবে একটি পৃথক শহর হিসাবে য়াকূতের সময় পর্যন্ত টিকিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ (সপ্তম/ত্রয়োদশ শুরুতে) বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠার পরের প্রাথমিক যুগেও ইহা একটি পৃথক শহর হিসাবে পরিচিতি ছিল। তৎকালীন লোকালয় বাবু'ল-বাসরা (আল-মানসূরের প্রাচীন বৃত্তাকার নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) হইতে ইহার দূরত্ব ছিল এক মাইল। মধ্যযুগের শেষাংশে (তু. উদাহরণস্বরূপ অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীতে ইব্‌ন বাত্তূতা) বাবু'ল-বাসরা লোকালয়ের নামটি বর্তমানে পশ্চিম বাগদাদের লোকালয়গুলির ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমন কি আল-কার্‌খ ইহার অন্তর্গত ছিল (তু. Le Strange পৃ. গ্র., ৩৩৬; Herzfeld. পৃ. গ্র. ২খ, ১১৪ প.)। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আল-কার্‌খ ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থান বিবরণ সংক্রান্ত য়াকূতের বর্ণনার সঙ্গে অন্যান্য উৎসের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রতীয়মান হয় যে, ভৌগোলিক অভিধান প্রণেতার স্থানীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিল না, যেমন অনেকগুলি স্থানই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। অতি সামান্য মধ্যযুগীয় পরিবেশ সম্বলিত আল-কার্‌ক নামক এই স্থানটি আধুনিক সময়েও টিকিয়া আছে (তু. Le Strange পৃ. ৮৪, ১৫৯)।

অপর গুরুত্বপূর্ণ কার্‌খ-এর অবস্থান ছিল দ্বিতীয় রাজকীয় রাজধানী সামাররায়। ইহা ৮৩৬ খৃ. খলীফা আল-মু'তাসিম কর্তৃক বাগদাদ হইতে টাইগ্রীসের ৬০ মাইল উজানে নির্মিত হয়। ইহা কার্‌খ সামাররা ও কার্‌খ জুদ্দান হিসাবে পরিচিত ছিল (য়াকূত, মু'জাম, ৪খ, ২৫৫-৬)। নির্ধারিত স্থানটি সামাররা হইতে প্রাচীনতর ছিল; ইহার অবস্থান প্রারম্ভিকভাবে প্রাসাদ এলাকা হইতে কিছু দূরে ছিল। যাহা হউক, আল-মুতাওয়াক্কিলিয়্যার দিকে নগরী বর্ধিত হওয়ায় ইহা নদীর সীমান্ত বরাবর ২০ মাইল পর্যন্ত নগরায়নের অব্যাহত পদ্ধতির অংশে পরিণত হয়। কার্‌খ বাগদাদ ও সামার্‌রার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। বাগদাদের কার্‌খ ছিল সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ইহা ছিল বাগদাদের একমাত্র সামরিক আবাসবর্জিত। কিন্তু কার্‌খ সামাররা ছিল সেনাপতি আশনাস-এর নির্দেশাধীন খলীফার কয়েকজন তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনীর সেনানিবাস (য়া'কূবী, বুলদান, পৃ. ২৫৮-৯, য়াকূত, ৪খ, ২৫৬ প.) অধিকন্তু তুর্কী বাহিনীকে জনসাধারণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাদের জন্য নির্বাচিত মেয়েদেরই শুধু বিবাহ করিতে তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইত। শুধু খাদ্যদ্রব্যাদির বিতরণ কেন্দ্র ছাড়া অন্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র তথায় ছিল না। সামাররার পতনের সঙ্গে অনেক এলাকা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তবে আল-কার্‌খ-এ বসবাস অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) BGA, সূচীপত্র; (২) আত-তাবারী, সূচীপত্র; (৩) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ, কায়রো সং (G. L'Introduction topographique a l'histoire de Baghdad, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.); (৪) J. Lassnes-এর গ্রন্থে আরবী মূল পাঠ The Topographie of Baghdad in the Early Middle Ages, ডেট্রয়েট ১৯৭০ খৃ.; (৫) য়াকূত, মু'জাম; (৬) ইবনু'ল-আছীর, সূচীপত্র; (৭) M. Streck, Babylonien nach den Arab. Geographen, Leiden ১৯০০ খৃ. পৃ. ৯২-৭; (৮) Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, অক্সফোর্ড ১৯০০ খৃ., সূচীপত্র; (৯) ঐ লেখক, Lands

of the Eastern Caliphate, ক্যামব্রিজ ১৯০৫ খৃ., সূচীপত্র; (১০) L. Massignon, Mission en Mesopotamie, প্যারিস ১৯১২ খৃ., ১খ, ৪৯, ৯৯, ১০৮; (১১) F. Sarre and E. Herzfeld Archaologische Reise im Euphrat und Tigrisgebiet, ২খ, বার্লিন ১৯২০ খৃ., ১০৫ ১১০, ১১২, ১১৪ প.; (১২) E. Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra, বার্লিন ১৯৪৮ খৃ.।

M. Streck -[J. Lassner] (E. I.[2])/ মুহঃ আবু তাহের

কারখা (কেরখা) (كرخة) ঃ লুরিসতান ও খুযিসতানের একটি নদীর নাম। নিহাওয়ান্দ এলাকায় ইহার উৎপত্তিস্থান। ইহার আদ্য ও মধ্যগতি যাগ্রোস (Zagros) পর্বতমালার নদী ব্যবস্থার একটি উপনদী বিশেষ। পর্বতশ্রেণী যেদিকে অবস্থিত, নদী-নালাগুলি সেই দিকে প্রসারিত। পানিরধারা কখনও কখনও একটি হইতে অপরটির দিকে সঙ্কীর্ণ পথে তীর্যকভাবে প্রবাহিত হয়। নদীসমূহ বিভক্ত অঞ্চলগুলির উপর দিয়া প্রবাহের সময় নাম পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহার নামকরণ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

নিহাওয়ান্দ এলাকায় চাশ্‌ম-ই কাজিম, সূরা কুন্‌চ কারসারা, আব-ই কুলান, ও সীরওয়ান রুন্দে প্রভৃতি কিছু সংখ্যক জলধারার মিলনে কারখা নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। নদীটির প্রথম গতিপথের উত্তর-পশ্চিমমুখী অংশটি গামাসাব অথবা গামাসিয়াব (নামটির বিকৃত রূপ গামাসিয়াব) নাম ধারণ করিয়াছে। অতঃপর যাগ্রোসের (Zagros) পরপর কতগুলি পর্বতশ্রেণী অতিক্রমণের স্থান হইতে শুরু হইয়াছে ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখী স্বাভাবিক গতি। নদীটির এই গতিই কারখা নাম ধারণ করিয়াছে। বীসুতূনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাঙ্গারশাহের স্রোতধারা বহনকারী শাজূ মিলিত হওয়ায় ইহা স্ফীতকায় হইয়াছে। অতঃপর কিরমানশাহান হইতে কারা সু. এবং সর্বশেষে আব-ই কারূনিদ ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। ইহার পর কাবীর কূহ পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নদীটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে এবং আব-ই সায়মারা নাম ধারণপূর্বক সর্বপ্রথম ইহার বাম তীর হইতে আগত কাশগান উপনদীটিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। মায়দান, খোররামাবাদ ও কুলকূ প্রভৃতি স্রোতধারাগুলো ধারণ করিয়া নদীটি আরও স্ফীত হইয়াছে। দক্ষিণ তীরের লায়লুম ও আব-ই যাল ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

শেষোক্ত নদীটির সহিত মিলিত হইবার পর ইহা পুনরায় কারখা নামে ইহার দক্ষিণমুখী শেষ গতিপথ শুরু হইয়াছে। ইহার ও কারূনের বিশাল পলি টাইগ্রীসের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, এই সমস্ত এলাকায় কারখা, কারূন ও আব-ই দিয একটি স্থানে মিলিত হওয়ায় একটি স্বাভাবিক ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। প্যা-ই পুল এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই কারখা কতগুলি খালে পরিণত হইয়া আব-ই দিয এবং ইহার উপদীপসমূহ যেমন নাহ্‌র তাবাল খান ও নাহ্‌র দাগদারীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব দিকস্থ একটি শাখার তীরে সুসা-র ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, যাহা পরে শাওর নামে অভিহিত হয়। নাহ্‌র হাশিমের দক্ষিণভাগে কারখা সমাপ্ত হয়; এই এলাকায় ইহা শাত্তু'ল-জামূয-এর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অন্যতম শাখা কারূনের পলিতে ধাক্কা খাইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ করে; ইহা সূসানজিরদ এলাকা ও হোর আল-হাবীযা (আল-হুওয়ায়যা)-র জলাভূমি পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

টাইগ্রীসের বাম তীরের এই উপনদীটিকে প্রাচীনকালে চোয়াসপেস (Choaspes) বলা হইত, ইহার পানি এতই বিশুদ্ধ ছিল যে, পারস্যের রাজাদের টেবিলে পানীয় জল হিসাবে ইহাই শুধু ব্যবহৃত হইত। মাঝে মাঝে "সুসিয়ানার নদী" (নাহ্‌র আল-সূস) ব্যতীত আরব ভৌগোলিকগণ অন্য কোনও নির্দিষ্ট নাম ছাড়াই ইহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্ দীনাওয়ার অঞ্চলকে ইহার উৎপত্তি স্থান এবং দুজায়লের (কারূন) উপনদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল-য়া'কূবী সর্বশেষ উৎসটির কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া হামাযান অঞ্চলে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার নামকরণ করিয়াছেন হিন্দুওয়ান। ইব্‌ন রুসতা পাঁচটি মিল চালনাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসসম্বলিত একটি বৃহৎ নদীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা বিহিসতূন (বীসুতূন) পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিত। ইব্‌নু'ল-ফাকীহ-এর মতানুসারে নিহাওয়ান্দ এলাকায় নদীর দুই তীরে একটি উৎকৃষ্ট মানের কাল মোহর-মৃত্তিকা (Sealing clay) আহরিত হইত। আল-ইসতাখরী ইব্‌ন হাওকালের মানচিত্রে নাহ্‌র আস্-সূসকে সুসা শহরের পানি সরবরাহকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং নাহ্‌র তীরা নামক জলস্রোতের (অথবা খাল) নিকটে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। নদী গর্ভে অবস্থিত পয়গাম্বর দানিয়েল-এর কবর কিতাবীদের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোভাযাত্রার বিষয়বস্তু, বিশেষ করিয়া শুষ্ক মৌসুমে। আল-মুকাদ্দাসী কবরটির কথা উল্লেখ করিতে গিয়া টাইগ্রীস (দিজলা) নদীর নিকটে বাসিন্না শহরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং সন্দেহাতীতভাবে এই নদীটিই কারখা। আলোচিত নদীটি শহরের অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত এবং নৌকার উপর স্থাপিত সাতটি মিল চালনা করিত। হুদূদু'ল-আলামে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শূশ নদটি "কারখা বেষ্টনী ও আল-জিবাল পর্বতের একটি খাদ" হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। অতঃপর ইহা শূশতার (তুসতার) ও শূশ (সুসা) অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ঐ এলাকা সিঞ্চিত করে। যাহা হউক বাসুন্নায় (বাসিন্না) সীমান্তে পৌঁছিবার পূর্বেই এই সিঞ্চন ব্যবস্থা নদীটির পানি সম্পদ সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে।

সর্বশেষ উল্লেখ্য যে, আস-সায়মারা (সায়মেরে) ও আত-তারহানের (তু. য়াকূত, ৩খ, ৪৩৯, Schwarz., পূ. গ্র. ৪খ, ৪৭২) মধ্যে অবস্থিত এবং নির্মাণ কৌশলের চরম উৎকর্ষ হিসাবে বিবেচিত সেতুটি, কারখা নদীর উপর অবস্থিত পুল-ই খুসরাও-এর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ্, পৃ. ১৭৬; (২) য়া'কূবী-Wiet, পৃ. ৭২-৩, ২২৮; (৩) ইব্‌ন রুসতা Wiet, পৃ. ১৯৩; (৪) ইসতাখরী, সম্পা. এম. জি. 'আবদু'ল-'আল আল-হীনী-এম. শ. গারবাল, কায়রো ১৩৮১/১৯৬১ খৃ., পৃ. ৬৪ ও ৬২ পৃষ্ঠায় মানচিত্র; (৫) ইব্‌ন হাওকাল, পৃ. ২৫১, ২৫৫, অনু. Wiet, প্যারিস-বৈরূত ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২৪৮, ২৫২-৩; (৬) মুকাদ্দাসী, পৃ. ৪০৭-৮; (৭) হুদূদু'ল-'আলাম, পৃ. ৭৫, ২১৪ (শা'উর নামের অধীনে, শাভুর); (৮) ইদরীসী-Jaubert, ১খ, ৩৮২; (৯) য়াকূত, বৈরূত ১৩৭৪-৬/১৯৫৫, ১খ, ৪৪২ (বাসিন্না-র টাইগ্রীস, দিজলা B.), ৩খ, ২৮১; (১০) আবু'ল-ফিদা', তাকবীম, পৃ. ৩১৪-৫; (১১) Rawlinson, in JR Geog. S., ৯খ, ১৮৯; (১২) M. Besnier, Lexique de geographie ancienne, প্যারিস ১৯১৪ খৃ., ২০৮; (১৩) Barbier de Meynard Dictionnaire geographique, historique et litteraire de la Perse, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৩২৭; (১৪) P. Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen

Geographen, ৪খ, Leipzig ১৯২১ খৃ., ৩০৪-৫; ৩৬৪-৫, ৩৯৩, ৪৫৩, ৪৭২, ৪৮৮, ৫০১; (১৫) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, ক্যামব্রিজ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ২৩৩, ২৪০; (১৬) R. Blanchard, Asie occidentale, in Geographie Universelle, ৮খ, প্যারিস ১৯২৯ খৃ., ১৩০, ২২৪; (১৭) The Times Atlas of the World, লন্ডন ১৯৬৮ খৃ., pl. ৩২।

P. Schwarz-A. Miquel (E.I.[2])/ মুহঃ আবূ তাহের

আল-কারখী, 'উবায়দুল্লাহ্ ইবনু'ল-হাসান (الكرخى عبيد الله بن الحسن) ঃ ইব্ন দাল্লাল ইব্ন দাল্হাম; ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ফাকীহ (ইসলামী আইনবিদ), উসূলী (আইনতত্ত্ববিদ) ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি সাধারণত আবু'ল-হাসান আল-কারখী নামে সমধিক পরিচিত। ইব্নু'ন-নাদীম তাঁহার পিতার নাম আল-হাসান উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আস-সাম'আনী উল্লেখ করিয়াছেন আল-হুসায়নরূপে। য়াকূত তাঁহার নাম 'উবায়দুল্লাহ্-এর পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শায়খ আল-কারখী ২৬০/৮৭৩ সালে কার্খ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহার নিস্বা আল-কারখী। উল্লেখ্য যে, একাধিক স্থান কার্খ নামে পরিচিত, যথা ঃ বাগদাদের একটি শহরতলী কার্খ-বাগদাদ নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত কার্খ বাজদা (كرخ باجدا) ও কার্খ জুদ্দা (كرخ جدا) নামে আরও দুইটি স্থান আছে। শায়খ আবু'ল-হাসান-এর জন্মস্থান কার্খ-জুদ্দা। পরবর্তীকালে তিনি স্থায়ীভাবে বাগদাদে বসবাস করেন। তাঁহার প্রখ্যাত শি ক্ষকবৃন্দের মধ্যে কাদী ইসলা'ঈল ইব্ন ইসহাক, আহমাদ ইব্ন য়াহ্য়া আল-হুলওয়ানী ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান আল-মিস্রী উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষভাবে ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ইমাম আবূ হানীফা (র)-র পৌত্র ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ-এর শাগরিদ শায়খ কাদী আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইবনু'ল-হুসায়ন আল-বিরদা'ঈ-এর নিকট। তিনি বাগদাদে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁহার অসংখ্য শাগরিদের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সুখ্যাত তন্মধ্যে কয়েকজন হইলেন ঃ আহকামু'ল-কুরআন নামক সুপ্রসিদ্ধ তাফ্সীর গ্রন্থের লেখক আবূ বাক্র আর-রাযী আহমাদ ইব্ন 'আলী আল-জাসসাস (৩০৫-৩৭০/৯১৭-৯৮০), আবূ 'আলী আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আশ-শাশী (মৃ. ৩৪৪/৯৫৫), আবূ হামিদ আহমাদ আত-তাবারী, আবু'ল-কাসিম 'আলী আত-তানূখী, আবূ হাফস ইব্ন শাহীন, কাদী আবূ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-আকফানী, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আদ-দামিগানী, আবু'ল-হাসান আহমাদ আল-কুদূরী প্রমুখ।

ইমাম আল-কারখীর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য ঃ (১) কিতাবু'ল-মুখতাসার, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান (র) রচিত আল-জামি'উ'স-সাগীর ও আল-জামি'উ'ল-কাবীর গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাখ্যা; (২) শারহু'ল-জামি'ই'স-সাগীর ও (৩) শারহু'ল-জামি'ই'ল-কাবীর; (৪) মাস'আলাতুন ফি'ল-আশরিবাঃ (مسئلة فى الاشربة) ও (৫) তাহলীলু নাবীযিত-তাম্র (تحليل نبيذ التمر)। এই কয়খানাই ফিক্হ শাস্ত্র সম্পর্কে। 'উসূলু'ল-ফিক্হশাস্ত্র (ইসলামী আইনতত্ত্ব) বিষয়ে তাঁহার রচিত রিসালা (رسالة) পুস্তকখানা এই শাস্ত্রের একটি প্রামাণিক সূত্র। ইমাম নাজমু'দ-দীন আবূ হাফস 'উমার ইব্ন আহমাদ আন-নাসাফী পুস্তকটির একটি ব্যাখ্যা লিখিয়া উহাতে বর্ণিত উসূল বা নীতিমালা বিভিন্ন উদাহরণ ও নাজীর দ্বারা সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

ইব্নু'ন-নাদীম বলেন, আল-কারখী সমসাময়িক কালে বিদ্যাবত্তায় অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইব্ন কামাল পাশা তাঁহাকে একজন মুজতাহিদরূপে গণ্য করেন। ধর্মভীরুতা ও নৈতিকতার জন্য তাঁহার অশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি অধিক নফ্ল সালাত আদায় করিতেন ও নফ্ল রোযা রাখিতেন। তিনি অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী ছিলেন। স্বোপার্জিত আয়ের দ্বারা তিনি সাধারণভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অনটন হইলেও তিনি কাহারও নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।

শেষ জীবনে কঠিন বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে তিনি আর্থিক সংকটেও পতিত হন। সুচিকিৎসার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। শাগরিদমণ্ডলী এই ব্যাপারে পরামর্শ করিয়া আমীর সায়ফু'দ-দাওলা ইব্ন হামদান-এর নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য পত্র লিখিবার সিদ্ধান্ত করেন। আল-কার্খী ইহা শুনিয়া ক্রন্দনরত অবস্থায় এই দু'আ' করেন ঃ (اللهم لاتجعل رزقى الامن حيث عودتنى) = "হে আল্লাহ্, আপনি যেখান হইতে আমার জীবিকার ব্যবস্থা করিতেন তাহা ছাড়া অন্যত্র হইতে করিবেন না।" তাঁহার দু'আ' সত্যে পরিণত হইল। আমীরের দশ হাজার দির্হাম অনুদান পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। তখন ভক্তগণ এই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেন। সায়ফু'দ-দাওলা ভবিষ্যতে আরও সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

ইমাম আল-কার্খী ১৫ শা'বান, ৩৪০/৯৫১ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার শাগরিদ শায়খ আল-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হাশিমী আয-যায়নী তাঁহার জানাযার সালাত পড়ান এবং বাগদাদের আল-ওয়াসিতী নহরের তীরবর্তী দারব আবী যায়দ মহল্লার মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, কায়রো ১৩৪৯ হি., ১০খ, ৩৫৩; (২) য়াকূত আলহামাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, কায়রো ১৩২৪ হি., ৭খ, ২৩৪; (৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, কায়রো, ১১খ ২৪০; (৪) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্রিস্ত, কায়রো ১৩৪৮ হি., পৃ. ২৯৩; (৫) আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, শিরো আল-কার্খী; (৬) মুল্লা 'আলী আল-কারী, তাবাকাতু'ল হানাফিয়্যা, নির্ঘন্ট; (৭) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. (১০৮-৯); (৮) 'আবদুল্লাহ্ মুসতাফা আল-মারাগী, আল-ফাত্হুম-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূ- লিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ, ১খ, ১৮৬-৮৭।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

আল-কারখী (দ্র. আল-কারাজী)

কারছা' আদ-দাব্বী (قرثع الضبى) ঃ কূফার অধিবাসী। তিনি একজন মুখাদরাম (مخدرم) অর্থাৎ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ পাইয়াছেন এবং 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব, সালমান আল-ফারিসী, আবূ আয়্যুব আনসারী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। 'আলকামা ইব্ন কায়স তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথম পর্যায়ের কারী ছিলেন এবং 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে কোনও

এক যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ শামা'ইল ও তিনটি সুনান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৬৯, নং ৭২৮১; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, ২খ, ১২৪।

মুহাম্মদ মূসা

কার্‌ত (كرت) ঃ (সম্ভবত কুর্‌ত) ৬৪৩/১২৪৫—৭৯১/১৩৮৯ পর্যন্ত হেরাত শাসনকারী রাজবংশের নাম। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ১ম শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ কার্‌ত্ যিনি গূর রাজ্যের শান্‌সাবানী পরিবারের একজন অধস্তন বংশধর, যে পরিবারের সদস্য ছিলেন গিয়াছু'দ-দীন মুহাম্মাদ ও মু'ইয্‌যু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাম ভ্রাতৃদ্বয়। চিংগীয খানের ধ্বংসলীলা হইতে হেরাত পুনরুজ্জীবিত হইলে শাম্‌সু'দ-দীন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ৬৪৩/১২৪৫ সাল নাগাদ নিজকে রাজ্যের শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মালিক (রাজা) উপাধি গ্রহণ করেন যাহা তাঁহার বংশধরগণও ব্যবহার করেন। ৬৪৯/১২৫৯ সালে মহান খান মংকে (Mongke) যখন তাঁহার সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন তখন তিনি শামসু'দ-দীন কার্‌ত-কে হিরাত, বাল্‌খ্ এবং এই দুই প্রদেশ ও ভারত সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকার গভর্নর হিসাবে স্বীকৃতি দেন। শামসু'দ-দীনের রাজত্বকালের শেষাংশে তাঁহার পুত্র রুক্‌ন'দ-দীন তাঁহার সহযোগী (Coadjuster) হিসাবে কাজ করেন, কিন্তু পিতার পূর্বেই ৬৮২/১২৮৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।। শামসু'দ-দীন নিজে যখন ৬৮৪/১২৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন রুক্‌নু'দ-দীনের পুত্র ফাখ্‌রু'দ-দীন। পারস্যে যখন মোঙ্গল ঈল-খান (Il-Khan)-দের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে, তখন হিরাতের কার্‌ত্ মালিকদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহারা এই প্রথমবারের মত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন প্রায় সমপরিমাণ ভূখণ্ডের উপর যাহা বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত এবং যাহাকে তাহারা মোঙ্গলদের ধ্বংসকাণ্ড হইতে রক্ষা করেন। ফাখ্‌রু'দ-দীন ক্ষমতাশালী আমীর চোবান (Coban)- এর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, যিনি চতুর্দশ ঈল-খান আবূ সা'ঈদ-এর নাবালকত্বের সময়ে পারস্যের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। আবূ সা'ঈদ যখন আমীর চোবান পরিবারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন তখন চোবান আশ্রয় প্রার্থনা করেন গিয়াছু'দ-দীনের নিকট। তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং আশ্রয় দান করেন; কিন্তু ৭২৭/১৩২৭ সালে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র জালাও খানকে হত্যা করেন। গিয়াছু'দ-দীন নিজে ৭২৮/১৩২৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার দুই বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র, ২য় শামসু'দ-দীন ও হাফিজ পালাক্রমে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং যথাক্রমে ৭২৯/১৩২৯ সালে ও ৭৩১/১৩৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে একটির পর একটি মৃত্যুকে ঐতিহাসিক হাম্‌দুল্লাহ মুসতাওফী আমীর চোবানের প্রতি গিয়াছু'দ-দীনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার অন্য এক ভাই মু'ইয্‌যু'দ-দীন। কিরমান-এর মালিক কুত্‌বু'দ-দীন যখন তাঁহার রাজধানী হইতে আমীর মুবারিযু'দ-দীন কর্তৃক বিতাড়িত হন তখন মু'ইয্‌যু'দ-দীন তাঁহার সাহায্যার্থ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী পরাজিত হয়। কুত্‌বু'দ-দীনের সাহায্যের জন্য প্রেরিত দ্বিতীয় একটি বাহিনী কিরমানে আটকা পড়ে এবং ৭৪১/১৩৪০ সালের শেষে আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হয়। মু'ইয্‌যু'দ-দীন দুই পুত্র রাখিয়া ৭৭১/১৩৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন ঃ এক পুত্র মুহাম্মাদ, যিনি সারাখ্‌স-এর শাসনকর্তা ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তাহা বজায় রাখেন এবং অন্য পুত্র গিয়াছু'দ-দীন পীর 'আলী হিরাতে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ৭৮২/১৩৮০ সালে তীমূর হিরাতের শাসকের আনুগত্য ও তীমূরের আসন্ন সৈন্য সমাবেশ একটি সৈন্যদলসহ হিরাত শাসকের উপস্থিতি দাবী করিবার জন্যে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু গিয়াছু'দ-দীন পীর 'আলী বিভিন্ন অজুহাতে দূতকে আটক রাখেন। এই সময়ের মধ্যে নগরের খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর সংগ্রহ এবং ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। দূত সামারকান্দ প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার দৌত্যকার্যের ব্যর্থতার রিপোর্ট করেন। ৭৮৩/১৩৮১ সালের বসন্ত কালে তীমূর হিরাত অভিযান করেন ও কয়েক দিনের অবরোধের পর নগর দখল করিয়া ইহার শাসককে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পীর মুহাম্মাদকে বন্দী করেন। হিরাতের কতিপয় প্রধান নাগরিককে শাহ্‌র-ই সাব্‌য্-এ নির্বাসন দেওয়া হয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙিয়া ফেলা হয়। কিন্তু মালিক ও তাঁহার দুই পুত্রকে ক্ষমা করা হয়। ছোট পুত্র শক্তিশালী ইশকালচা (Ishkalca) দুর্গ সমর্পণ করিবার জন্য প্ররোচিত করা হয়। গিয়াছু'দ দীন পীর 'আলীকে তীমূরের সামন্ত হিসাবে হিরাতের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা হয় এবং ৭৯১/১৩৮৯ সালে এই রাজবংশের অবসান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার শাসন বজায় থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B. Spuler, Mongolen[3]. esp. 155-61 [বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখসহ, বিশেষত (ক) জুওয়ায়নী; (খ) হাম্‌দুল্লাহ্ মুসতাওফী, তা'রীখ; (গ) শারাফু'দ-দীন 'আলী য়ায্‌দী, জাফার নামা; (ঘ) ইব্‌ন 'আরাব শাহ্, 'আজা'ইব]; (২) A. Janata, Die Bevolkerung von Ghor, in Archiv fur Volkerkunde, xvii-xviii (1962-63), 123-9।

T. W. Haig-[B. Sputer] (E. I.[2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারতা (كرتا kaarta) ঃ মালি রাজ্যের একটি প্রদেশ। ইহার আয়তন ৫৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার। সীমা উত্তরে মরিতানিয়া হূয (هوز), দক্ষিণে বেলেদগু (بلدگو) ও ফুলাদগু (فلدگو), পশ্চিমে কুলুন্দীর পশ্চিম শাখা হইতে প্রবাহিত বৌলি জংশন পর্যন্ত বিস্তৃত সেনেগাল নদী। এই বিশাল শিলাযুক্ত মালভূমি অঞ্চলের নদীসমূহ দক্ষিণ-পূর্বে ঝুঁকিয়া সেনেগালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এইখানকার আবহাওয়া সাহারা অঞ্চলের আবহাওয়ার ন্যায় অল্পদিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবার পর দীর্ঘদিন যাবৎ শুষ্ক মওসুম বিরাজ করে। গাছপালা শুধু কাষ্ঠময় ঝোপঝাড়মাত্র। নদীর উপকূলবর্তী জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল উৎপন্ন হয়। প্রধান প্রধান ফসল হইল ঃ জোয়ার, বাজরা, ধান, চীনাবাদাম, তুলা ও নীল। গ্রামাঞ্চলের কূপের চারিধারে বাগান করা হয়। তুলনামূলকভাবে পশুপালন খামার পদ্ধতি বেশ উন্নত।

কারতা প্রদেশের জিলাসমূহ হইল ঃ ডিয়াফুনু (Diafunu), তামবারাকা (Tambaraka)ও ডিয়মবোকো (Diomboko), কোনিয়াকারী (Koniakari) ডিয়াকুনুর উত্তরে গুইডিয়ূনী (Guidioume) নাইগোমেরা (Niogomera); ফুলাডুগুর উত্তরে তমোরা (Tomora) দীদা (Dida) বাখে এবং কারতা বীনে (Baghe & Karta Bine); পূর্বে ডিয়াংঘাতে (Dianghate) এবং কিংগুই (Kingui) [নাইওরো Nioro]। প্রধান অধিবাসী বাম্‌বারাও সোনিনকী

(Bambara & Soninke) গোত্রের। কিন্তু খাসোন্‌কী (Khassonke), ফুলানী (Fulani) ও মুরিস (Maures)-গণ এই অঞ্চলে বাস করে। বাম্‌বারা মাসাসীগণের (Bambara Massassi) বৌরী নামে পরিচিত একটি গুপ্ত ধর্মীয় সংস্থা আছে। ইসলাম প্রচার কার্যাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ অভিযাত্রী হাউগটন (Houghton) ও মুংগু পার্ক (Mungo park) ১৭৯৫ খৃ. কারতা পরিদর্শন করেন। ডুরান্টন (Duranton) ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, রাফ্‌নেল (Ruffenel) ১৮৬৪ খৃ., মেজ ও কুইনটিন (Mage & Quintin) ১৮৩৩ খৃ. এবং লেঞ্জ (Lenz) ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থানটির বর্ণনা করিয়াছেন।

কারতা পূর্বে ঘানা সাম্রাজ্যের (দ্র.) এবং পরবর্তীকালে মালি রাজ্যের অঙ্গভুক্ত ছিল। মালির অভ্যুত্থানের পর কারতা অঞ্চল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের বাম্‌বারা (Bambara) প্রধান নাইয়াংগোলা (Niangolo) মুরদীয়া (Murdia)-র নিকটবর্তী সুনসানায় (Sunsana) বসতি স্থাপন করিয়া নাইজার নদীর বাম উপকূলে বামবারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র সুনসা (Sunsa) কাইতা (Keita) নাম্নী একজন বালিকাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র 'মাসা' (Massa) বামবারাকে নিজের নাম প্রদান করিয়া মাসাসী নামে অভিহিত করেন। ইনি ছিলেন বংশের আদিপুরুষ ও একজন বিশিষ্ট কৃষক। তাঁহারা এমন সুদর্শন সন্তান-সন্ততি ছিল যে, তাহাদের লাভজনক বিবাহ রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বেনেফালী (Benefali) দেশটির আরও বিস্তৃতি ঘটান, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা ফুলেকোরো (Fulekoro)-কে পরাজিত করিয়া "বিটন কুলুবালী" ১৭৫৪ খৃ. দুইটি রাজ্য একত্র করেন। ফুলেকোরোর উত্তরাধিকারী সি বামানা (Sey Bamana) ও ডেনিবা-বো (Deniba-Bo) আক্রমণ পরিচালনাকারী দুর্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী হানাদার বাহিনীর প্রধান অপেক্ষা উন্নততর ছিলেন। সিরাবো (Sira-Bo) ১৭৬০-৮০ খৃ. গুয়েমাও (Guemauo)-তে বাস শুরু করেন এবং তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করেন। দেস্‌সী কুলুবালী (Dessi-Kulubali) [১৭৮৮-৯৯] সেগু (Segu)-এর বামবারা বংশীয় রাজপুত্রগণের এবং ন'গোলোদাইয়ারা পুত্রগণের মধ্যকার বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি নামিয়াংকোরো (Namiankoro)-কে সমর্থন করিতেন। কিন্তু "দা ম্যানসন (Damanson) নামিয়াংকোরাকে পরাজিত করিয়া কারতা" আক্রমণ পূর্বক ১৭৯৬ খৃ. রাজধানী গুয়েমু দখল করেন। তাঁহার ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া 'মূসা কোরাবো' (Mussa Kurabo) (১৭৯৯-১৮০৮) ফুতা তোরো (Futa-Toro) অধিবাসী 'আবদু'ল কাদির আলমামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন।

"বোদিয়ান মরিবা" (Bodian Moriba) দিওয়ারা (Diawara) খাসোহ্‌কীর (Khassohke) সহিত (১৮১৫-৩২ খৃ.) দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হন। ন'টিন কোরো (Ntin Koro) [১৮০৮-১৮২১] ও সাখাবা (Sakhaba) [১৮১১-১৫] তাহার পূর্ববর্তী ছিলেন। গারানের (Garan) [১৮৩২-৪৩] পর মামাদী কাহদিয়ান (Mamady Kahdian) [১৮৪৩-৫৪] ইয়ালিমেনি ত্যাগ করিয়া প্রথমে কাদি (Kadie) ও পরে নাইওরোতে (১৮৪৭) বসতি স্থাপন করেন। ১৯৫৪ খৃ. আল-হাজ্জ 'উমার-এর সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত না হইতেই দিওয়ারা মরু অঞ্চলের দিকে বিতাড়িত হন।

শেষোক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ আল-হাজ্জ 'উমার) একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। 'আহমাদুর' ভ্রাতা 'মুতাগা' (Mutaga) ১৮৭৪ খৃ. এই পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু নাইওরোতে অবরুদ্ধ হইলে মুতাগা (Mutaga) তাঁহার প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া দেন। ইত্যবসরে ডিরিঙ্গার (Diringa) সেনাপতি মাসাসী (Massassi) আল-হাজ্জ 'উমার কর্তৃক পরাজিত হইয়া মরির (Mori) অন্তর্গত বাঙ্গাসীতে (Bangassi) [Fuladugu = ফুলাডুগু] আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭০ খৃ. ইনতিকাল করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে 'বুসেই' (Bussie) এবং 'মাসাসী' (Massassi) দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল গুয়েমুকুরাতে (Guemukura) [কারতাবীনি = kaarta-Bine] ও অন্যদল দাইয়ানীতে (Diani) [Gadiaga] বসতি স্থাপন করেন। নাইওরো দখলের পর কারতা অধিপতি আরচিনার্ড (Archinard) কর্তৃক বামবারা মাসাসী পুনরায় একত্র হয়। প্রাক্তন ফরাসী সূদানের অন্তর্গত নাইওরো কিতা এবং কেইস প্রদেশসমূহের মধ্যে কারতা পুনরায় ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৬০ খৃ. মালির স্বাধীনতার পর স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাঠামোগত তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. Diallo, La chasse (region du Fouladougou et du Kaarta), in Education africaine, xciii (1934) 93-110; (২) R. Furon, Le Kaarta, in Bull. Mus. Histoire Nat., xl (1930), 470-3, 2 maps; (৩) ঐ লেখক, Les gisements prehistoriques du Kaarta, in l'Anthropologie, 1930, 31-5; (৪) Godin de Lepinay, Note sur les chances de Possibilite d'une reunion du Niger et du Senegal par le Krarta, in Bull. Soc. Et. Coloniales et maritimes, xvi (1891), 287-9; (৫) Edt. de Lartigue, Notice historique sur la region de Sahel, in BCAF, 1898, 69-101; (৬) J. Lemoine, Mission hydrogeologique au Soudan, in BURGEAP, 1957; (৭) E. Mage, Voyage dans le Soudan Occidental (1863-1870), প্যারিস 1868; (৮) Ch. Monteil, Les Bambara de Sigou et du Kaarta, প্যারিস ১৯২৪ খৃ.; (৯) A. Raffenel, Nouveau Voyage au pays des negres, প্যারিস ১৮৫৬ খৃ.; (১০) P. Soleillet, Voyage a Segou, প্যারিস ১৮৮৭খৃ.; (১১) Lt. Sugols, La justice au Soudan Francais, in BCHSAOF, 1897, 113-29; (১২) L. Tauxier Histoire des Bambara, প্যারিস ১৯৪২ খৃ.;।

R. Cornevin (E.I.[2])/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

কারতাজান্না (قرطاجنة) ঃ নামে তিনটি স্থান পরিচিত, কার্থেজ (Carthage), কার্তেইয়া (Carteia) [কারতাজান্নতু'ল জাযীরা] ও কার্থাজেনা (Carthagena)। নামের এই অভিন্নতার কারণেই সম্ভবত প্রাচীন পিউনিক (Punic) অর্থাৎ প্রাচীন কার্থেজ-এর রাজধানী ও কারতাজান্নাতু'ল-খাল্‌ফা' (য়াকূত-এর বিবরণের আল-খুলদা' নহে)-এর মধ্যে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে গবেষণা

করিয়াছেন J. Vallve, Carthage et Carthagene au VIII[e] siecle একজন বিশপের কর্মকেন্দ্র এই শহরটির নাম অবশ্যই Cartago-Sparataria-এর ভাষান্তরিত রূপ—যাহা এই এলাকায় এসপার্টোর (esparto) ঘাসের প্রাচুর্যের ইঙ্গিত প্রদান করে।

আল-হিময়ারী-র অভিমত (রাওদু'ল-মি'তার, নং ১৩৯, যিনি আল-ইদ্রীসীকে হুবহু নকল করিয়াছেন), কার্থাজেনা মুর্সিয়া (Murcia)-র একটি বন্দর। ইহা সুদূর অতীতের একটি প্রাচীন শহর। এই শহরে একটি পোতাশ্রয় রহিয়াছে, যেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাহাজ নোঙর করিতে পারে। এই স্থানে খাদ্যদ্রব্য প্রচুর এবং তাহা বরাবরই সস্তায় বিক্রয় হয়। উপনিবেশসমূহের মধ্যে আল-ফুদূন (Fudun) নামে একটি অঞ্চল আছে ঃ এত উত্তম মানের মৃত্তিকা রহিয়াছে যে, এমন জায়গা খুবই বিরল এবং রিপোর্ট পাওয়া যায় যে, মাত্র এক পশলা বৃষ্টিই পরবর্তী মওসুমে ফসলের নিশ্চয়তা দানের জন্য যথেষ্ট। উৎপন্ন শস্যও অতি উত্তম। স্থলপথে কার্থাজেনা শহর হইতে মুর্সিয়ার দূরত্ব ৪০ মাইল। কার্থাজেনা শহরের নিকটেই 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন মূসা ইব্ন নুসায়র পরাজিত করেন তুদ্মীর ইব্ন 'আবদূসকে, যিনি তাঁহার নামানুসারে তুদ্মীর কুরা-র নামকরণ করিয়াছিলেন। 'আবদু'ল-'আযীম ও তুদ্মীরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটির পাঠই মুসলিম স্পেনের একমাত্র মূল পাঠ যাহা সাকুল্যে সংরক্ষিত হইয়াছে এবং যাহার অনেকটি পাঠ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই শহরটি শহর হওয়ার বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল বলিয়া মনে হয় না, যদিও আবু'ল-হাসান আল-কারতাজান্নী ১২-১৩শ শতকে ইহার গুরুত্বের একটি অতি উৎসাহী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন (তু. তাঁহার কাসীদা মাক্সূরা; একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন E. Garcia Gomez, observaciones sobre la Qasida......in al-And, 1933-1, 81-103) এবং এই বিষয়ে আরব সূত্রসমূহের যেমন ভৌগোলিক তেমনই ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ অসাধারণ সংক্ষিপ্ত। আবু'ল-খাত্তার (দ্র.)-এর মিসরীয় জুন্দ (সেনাবাহিনী)-এর একটি অংশকে স্থাপন করেন তুদ্মীর (দ্র.) জিলায় যাহার একটি চিত্র আমরা পাই Cronica del Moro Rasis-এর মধ্যে, যাহাতে ইহাকে গভর্নর 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন কাতান-এর শাসনাধীনরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। শার্লেমেন (Charlemagne)-এর সহিত ইবনু'ল-আরাবী (দ্র.)-র মৈত্রী বন্ধনকালে উমায়্যা শাসকগণকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত তাঁহার এক প্রচেষ্টায় "আবদু'র-রাহ্মান আস-সিক্লাবী ('আব্বাসী খলীফা আল-মাহ্দী-র নির্দেশক্রমে ১৪৩/৭৬৩-এ) এই অঞ্চলেই অবতরণ করেন। পরবর্তীকালে 'আবদু'র-রাহ্মানের বংশধরগণের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলে এই স্থান সুলায়মানের রাজ্যের এবং পরে 'আবদুল্লাহ্ আল-বালান্সীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুদার (مضر) ও য়ামানী গোত্রদ্বয়ের অবিরাম দ্বন্দ্ব যখন ২য় 'আবদু'র-রাহমান (দ্র-) কে ক্লান্ত করে তখন তিনি তাহাদের কল্যাণে ২১৬/৮৩১ সালে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র তথা মুর্সিয়া (Murcia)-র প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা এই অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্যের প্রকৃত সূচনাকাল চিহ্নিত করে।

খিলাফাতের পতনের পর কার্থাজেনা সর্বদা ইহার প্রশাসনিক রাজধানীর ভাগ্য অনুসরণ করে এবং পর্যায়ক্রমে ইহা দুইজন ক্রীতদাস খায়রান ও যুহায়র-এর দখলে এবং 'আবদু'ল-'আযীয ইবনু'ল-মানসূর ও দেনিয়ার মুজাহিদের কর্তৃত্বাধীন হয়। Memoires of the amir Abd Allah-এর বর্ণনা অনুযায়ী আলোদা (Aledo) (দ্র.) অবরোধের সময়ে দেখা গেল যে, মুর্সিয়া কার্থাজেনা অঞ্চলের দখল সংক্রান্ত বিরোধই বিবাদের মূল কারণ এবং ইহাই য়ূসুফ ইব্ন তাশুফীক (দ্র)-কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকে মতাচ্যুত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ইব্ন 'আ'ইশা (দ্র) এই প্রদেশটিকে পদানত করেন।

অতঃপর ইহা ইব্ন হামুশ্ক-এর ও ইব্ন মারদানীশ (দ্র.)-এর শাসনাধীন হয় এবং আল মুওয়াহ্হিদূন-এর নিকট আত্মসমর্পণের পর ইহা সার্বিক অবনতির ধারা অনুসরণ করে। Levant (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল)-এ সায়্যিদ আল-'আদিল-এর আবির্ভাবের পর ইহা তাঁহার রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। অতঃপর ইহা ইব্ন হূদ এর অধীনে এবং সর্বশেষে যায়্যান ইব্ন মার্দানীশ-এর দখলে চলিয়া যায়, যিনি ৬৩৫/১২৩৮ সালে ভ্যালেন্সিয়া হস্তচ্যুত হইবার পর মুর্সিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন; তথা হইতে বাহা'উদ-দাওলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। ১২৪৩ সালে সমগ্র মুর্সিয়া কার্থাজেনা এলাকা ভাবী বিজ্ঞ আলফনসো (Alphonso the Wise)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু ১২৪৬ সালে সেখানে এক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং দুর্দম সর্বশেষ বিদ্রোহিগণকে ১২৪৭ সালের পূর্বে নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই। অবস্থান অত্যন্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী এবং corsairs (শত্রু হননকারী) অসামরিক নৌ-সেনা) ও তুর্কীদের সহজ আক্রমণের পক্ষে উন্মুক্ত থাকিলেও কার্থাজেনায় Moriscos (দ্র.)-দের (স্পেন দেশীয় Moor সংখ্যা যৌক্তিকভাবে যেমন ধারণা করা যায় তেমন অধিক ছিল না। মুর্সিয়ার অবস্থা ইহার বিপরীত; তথায় ক্যাস্টিল (Castille)-এ নির্বাসিত গ্রানাডীয়দের অন্ততপক্ষে Cuenca অঞ্চল হইতে দেশত্যাগীদের আগমন অবশ্যই বিপুল সংখ্যায় ঘটিয়া থাকিবে। কার্থাজেনা বন্দর ছিল অন্যতম একটি স্থান, যে পথে ১৬১১ সালে স্পেনের মুসলমানগণের বহিষ্কার সম্পন্ন হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত তু. ভৌগোলিক সূত্রসমূহ এবং (১) 'উয্রী, মাসালিক, কাহিনীকারদের মধ্যে উল্লেখ্য (২) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান (সর্বোপরি A. Huici কর্তৃক প্রকাশিত খণ্ডটি M. A. Gaspar Remiro কর্তৃক রচিত পুরাতন monograph, Historia de Mnrcia musulmana, Saragossa 1905; (৩) J. Bosch Vila, Los Almoravides, Tetouan 1956; (৪) A. Huici Miranda, Historia politica del imperio almohade, Tetonan 1957; (৫) ঐ লেখক, Historia musulmana de Valencia y su region, Valencia 1969-70; (৬) E. Canabate Navarro, Historia de Cartagena desde su fondacion; (৭) J. Vallve, La division territorial en la Espana musulmana, ii, La cora de 'Tudmir' (Murcia), in And, xxxvii (1972), 161-66।

P. Chalmeta (E.I.[2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারদা ও বাযাব্দা (قردا و بازبدا) ঃ উত্তর মেসোপটেমিয়া (আল-জাযীরা)-এর দুইটি প্রাচীন এলাকা। ইহারা প্রায়শ একত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত স্থানটির নাম "বেথ, কারদূ"—কারদুসীদের দেশ হইতে উদ্ভূত, যাহার নাম পরবর্তীকালে বাকার্দা হইয়াছে। য়াকূত-এর

মতে (শিরো) এই শিরোনামে অনুমোদিত শব্দটি 'গ্রন্থাদি'তে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে 'কারদা' নামে অভিহিত করে। এলাকাটিতে প্রায় ২০০টি গ্রাম—তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আল-জূদী ও ছামানীন—এবং ফায়সাবূর এলাকা লইয়া গঠিত। ইহাতে প্রধানত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ভুট্টা ও যব উৎপন্ন হইত। আদিম কারদা গুরুত্ব হারাইলে বাসূরীন উহার স্থান অধিকার করে।

অপরদিকে তাইগ্রীস নদীর পশ্চিমে অবস্থিত জাযীরাত ইব্ন 'উমার (দ্র.) অঞ্চলের একটি এলাকার নাম বাযাব্দা—যাহা শেষোক্ত শহরটির মুখোমুখি অবস্থিত একটি গ্রামের নামও বটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন রুস্তা-wiet, পৃ. ১১৮; (২) ইব্ন খুর্রাদাযবিহ, পৃ. ৯৫, ২৪৫, ২৫১; (৩) বাক্রী, পৃ. ২২২; (৪) মাস'উদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, তানবীহ, পৃ. ৪৭; (৬) মাকদিসী, বাদ', ৩খ, ২৫; (৭) ইব্ন হাওকাল-Wiet, পৃ. ২১১, ২১২; (৮) বালাযূরী, ফুতূহ, পৃ. ১৭৬; (৯) Marquart, Eransahr, পৃ. ১৫৮; (১০) Le Strange, পৃ. ৯৩; (১১) সূলী-কানার্ড, ২খ, ১২৩; (১২) M. Canard, Hamda-nides, পৃ. ১১০-১২।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

কারদা ইব্ন নুফাছা (قردة بن نفاثة) ঃ আস-সালূলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী, বানু'স-সালূল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ কারদা ইব্ন নুফাছা ইব্ন 'আম্র ইব্ন ছাওয়াবা ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন তামীমা ইব্ন 'আম্র ইব্ন মুর্রা ইব্ন সা'সা'আ (صعصعة) ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন বাক্র ইব্ন হাওয়াযিন। মুর্রা ইব্ন সা'সা'আ-র সন্তান-সন্ততি তাঁহাদের জননী সালূল বিন্ত যাহ্ল ইব্ন শায়বানের পরিচয়ে নিজদের নামের সহিত আস-সালূলী নিসবা সংযুক্ত করেন। ইব্ন মান্দা কারদা ইব্ন নুফাছা-র স্থলে ফারওয়া (فروة) ইব্ন নুফাছা লিখিয়াছেন, কিন্তু ইবনু'স-সাকান, ইব্ন শাহীন, আবু'ল-ফাত্হ আল-'আবদী প্রমুখের উদ্ধৃতিতে কারদা নামকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কারদা (রা) একজন দীর্ঘজীবী সাহাবী ও কবি ছিলেন। তিনি এক শত চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন ঃ

اصبحت شيخا ارى الشخصين اربعة
و الشخص سخصين لما مسنى الكبر
لا اسمع الصوت حتى الستدير له
وحال بالسمع دونى المنظر العسر
و كنت امشى على الساقين معتدلا
قصرت امشى على ما ينبت الشجر
و اذا اقوم عجنت الارض متكنا
على البراجم حتى يذهب النفر

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার ফলে আমি একজনকে দেখি দুইজন আর দুইজনকে দেখি চারজন। কোনও শব্দ শুনিতে পাই না, যতক্ষণ না সেইদিকে ঘুরিয়া যাই। কঠিন পরিস্থিতি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এককালে আমি স্বীয় গোছাদ্বয়ে ভর করিয়া ঋজু হইয়া হাঁটিতাম। আর আজ আমাকে মাটির সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যখন দণ্ডায়মান হই, তখন হস্তাঙ্গুলের অগ্রভাগ মাটিতে চাপিয়া ভর করি। আর ততক্ষণে কাফেলা অনেক দূরে চলিয়া যায়।" সালূল গোত্রের কয়েক ব্যক্তির সহিত তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সময় কারদা (রা) নিম্নের চরণ কয়টি আবৃত্তি করেন ঃ

بان الشباب فلم احفل به بالا
و اقبل الشيب والاسلام ابالا
وقد اروى نديمى من مشعشعة
وقد اقلب اورا او اكفالا
فالحمد الله اذ لم ياتى احلى
حتى اكيست من اسلام سربالا

"আমার বার্ধক্য দেখা দিয়াছে, কিন্তু আমি ইহার বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। কেননা বার্ধক্য ও ইসলামের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যুগপৎভাবে। এক সময় আমি আমার সঙ্গীকে মদ্য পানে তৃপ্ত করিতাম। আহার করাইতাম উষ্ট্রের ডানা আর মাংসল উরু। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যেহেতু আমার মরণ আসে নাই, যতক্ষণ না গায়ে জড়াইয়াছি ইসলামের পোশাক।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র-ই সকল প্রশংসা হে কারদা! তিনিই তোমাকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করাইয়াছেন এবং তোমাকে মুসলিম হওয়ার সুযোগ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি কারদা (রা)-কে সালূলী নও মুসলিমদের আমীর হিসাবে মনোনীত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হিঁ., ৩খ, ২৩০-৩১, নং ৭০৯৩; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ১৪; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২০১; (৪) 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (দ্র. টীকা আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫)।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কারদাম ইব্ন আবি'স-সা'ইব (كردم بن أبى السائب) ঃ আল-আনসারী (রা), মতান্তরে আবু'স-সানাবিল (أبو السنابل), এবং বানূ ছাকীফ গোত্রের লোকও বটে। ইমাম বুখারী ও ইবনু'স-সাকানের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন ইব্ন হিব্বান ও আবূ 'উমার (ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র) বলেন, তিনি সাহাবী বলিয়া কথিত। তবে ইব্ন হিব্বানের অভিমত হইল যে, তিনি তাবি'ঈ এবং তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছ মুর্সাল রিওয়ায়াতের পর্যায়ভুক্ত। ইব্ন ফাতহূন আবূ 'উমার-এর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আবু'স-সানাবিল শব্দটি আবু'স-সা'ইব-এর ভুল পঠন এবং যেই সকল মনীষী সাহাবীগণের জীবনী রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ইব্ন আবি'স-সা'ইব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু আবূ 'উমার তাঁহাকে ছাকাফী বলিয়া যেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি ইহার কোনও সন্ধান পাই নাই। তিনি মদীনায় বসবাস করিতেন এবং কূফার বাসিন্দাদের নিকট হইতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বাগাবী, ইবনু'স-সাকান প্রমুখ তাঁহার হাদীছ সংকলন করিয়াছেন।

কারদাম (রা) বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে মদীনা রওয়ানা হইলাম। ইহা সেই সময়কার কথা যখন মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আবির্ভাবের ব্যাপারটি আলোচিত হইতেছিল। পথিমধ্যে আমরা এক মেষ পালের মালিকের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি। প্রায় দ্বিপ্রহর রাতে নেকড়ে বাঘ আসিয়া পালের একটি মেষ শাবক ধরিয়া লইয়া গেল। মেষ-পালক ইহার পিছু ধাওয়া করিল। সে বলিল, "হে উপত্যকা আবাদকারী (জিন্ন)!

আপনার প্রতিবেশীকে সাহায্য করুন।" তখন এক অদৃশ্য আহ্বানকারী আওয়াজে বলিল, "হে নেকড়ে বাঘ, ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" তৎক্ষণাৎ মেষটি দ্রুত দৌড়াইয়া পালের মধ্যে ঢুকিয়া গেল এবং ইহার দেহে কামড়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا –

"আরও যে, কতিপয় মানুষ কতক জিন্নের শরণ লইত, ফলে উহারা জিন্নদিগের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত" (৭২ ঃ ৬)। ইব্ন মারদাবিয়া তাঁহার তাফসীরে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৮৯, নং ৭৩৮৯; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩১৪); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৩৪।

মুহাম্মদ মূসা

কারদাম ইব্ন কায়স (كردم بن قيس) ঃ আল-খুশানী (রা)। আবূ 'আলী ইবনু'স-সাকান, আবূ হাতিম আর-রাযী ও 'তাবারানীর মতে কারদাম ইব্ন সুফয়ান (রা) ও কারদাম ইব্ন কায়স (রা) ভিন্ন দুই ব্যক্তি। আর ইব্ন মান্দা-র মতে তাঁহারা উভয়ে একই ব্যক্তি। কেননা তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে যে হাদীছ সম্পর্কিত করা হইয়াছে উহার শব্দ-বিন্যাস একই রূপ। কিন্তু ইবনু'ল-আছীর তাঁহার এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কারদাম ইব্ন কায়স (রা) বলেন, আমি ও আমার চাচাতো ভাই আবূ ছা'লাবা (ابو ثعلبة) এক গরমের দিনে বাহির হইলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল, তাহার পায়ে জুতা ছিল না। সে আমার নিকট জুতা চাহিলে আমি বলিলাম, না। তবে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হইলে তাহা দিতে পারি। সে বলিল, আচ্ছা, দাও। আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। আমরা ফিরিয়া আসিলে সে আমার জুতা ফেরত পাঠায় এবং বলে, মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দেব না। আমি ইহা নবী (স)-কে জানাইলে তিনি বলেন ঃ তাহাকে পরিত্যাগ কর, কেননা তাহার মধ্যে তোমার কোনও কল্যাণ নাই। অতঃপর আমি বলিলাম, আমি অমুক জায়গায় উট যবেহ করিবার মানত করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ইহা কি জাহিলী যুগের কোনও আস্তানায় অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অথবা এমন মালের মানত যাহার মালিক তুমি নহ ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমার মানত পূর্ণ করো। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য এবং মালিকানা-স্বত্ব নাই এমন মালে কোনও মানত বৈধ নহে।" এই হাদীছের সনদ দুর্বল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাব, মিসর ১৩২৮ হি. ৩খ., ২৯০, নং ৭৩৯১; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩১৪) ; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল গাবা, ৪খ, ২৩৪-৫।

মুহাম্মদ মূসা

কারদাম ইবন সুফয়ান (قردم بن سفيان) ঃ (রা), ছাকীফ গোত্রের লোক, তাইফের অধিবাসী। ইমাম বুখারী, ইব্নু'স-সাকান ও ইব্ন হিব্বান তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী বলিয়াছেন। তাঁহার কন্যা মায়মূনা (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। নিজ কন্যা ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্র ইবনি'ল-'আস (রা) তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। মায়মূনা (রা) বলেন, আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁহার একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। আমি তখন আমার পিতার সংগে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে শিক্ষকদের চাবুকের অনুরূপ একটি চাবুক ছিল। আমি বেদুঈন এবং অন্য লোকদের ইহাকে চাবুক (الطبطبية) বলিতে শুনিয়াছি। আমার পিতা নিকটে আসিয়া তাঁহার পা ধরিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) থামিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, 'উছরান বাহিনীতে (جيش عثران) আমি শরীক ছিলাম। তিনি সেই বাহিনীকে চিনিতে পারিলেন। মায়মূনা (রা) হইতে তাঁহার পিতার সূত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি (পিতা) জাহিলী যুগে যে মানত মানিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বুওয়ানা (بوانة) নামক স্থানে এক শত বকরী যবেহ করিবার মানত করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহা কি কোন মূর্তি অথবা আস্তানার জন্য ? তিনি বলিলেন, না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমার মানত পূর্ণ করো। মায়মূনা (রা) বলেন, অতঃপর আমার পিতা নির্দিষ্ট স্থানে বকরী একত্র করিয়া তাহা যবেহ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একটি বকরী ছুটিয়া পালাইল। আমার পিতা ইহার পিছু ধাওয়া করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্ ! আমার মানত পূর্ণ করিতে দাও। অবশেষে তিনি বকরীটিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং যবেহ করিলেন। ইমাম আহমাদ, বাগাবী ও ইব্ন আবী শায়বা নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৯০, ৪খ, ৪১৫ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৩৪, ৫খ, ৫৫৪-৫ ; (৩) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ৫খ, ৫১৪-৫, ৫৮৪, ৮খ, ৩০৩-৪ ; (৪) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১৭১।

মুহাম্মদ মূসা

কারদু হাসানা (قرض حسنة) ঃ করযে হাসানা, শাব্দিক অর্থ উত্তম ঋণ। করযে হাসানা হইল 'ইনফাক' (ব্যয়/খরচ)-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। নিজ সত্তা ও নিজ পরিবারের জন্য এবং সেই সঙ্গে দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে ইনফাক (انفاق) বলা হয়। আর করযে হাসানা হইল এক প্রকার ঋণ যাহা গ্রহীতার নিকট হইতে অবিকল আদায়যোগ্য। ইসলামী শরীআত করযে হাসানাকে ইনফাক-এর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছে। কারণ করযে হাসানা ইহার গ্রহীতার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ এবং আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা-তদবির ও উদ্যোগ সৃষ্টি করে। ইহা ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। করযে হাসানার এই ব্যবস্থা সাংসারিক, পারিবারিক, স্থানীয় ও জাতীয়ভিত্তিক তথা বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তার সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি উপাদান। যে কোন পরিবারের সদস্যগণের প্রাথমিক দায়িত্ব হইল উহার অভাবী সদস্যকে করযে হাসানা প্রদান করা। তাহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব না হইলে তাহাদের পাড়া-প্রতিবেশীর সামাজিক দায়িত্ব হইল এই ধরনের অভাবীদেরকে করযে হাসানা দান করা। তাহারাও অসমর্থ হইলে রাষ্ট্রকেই সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত সুবিধা প্রদানে অগ্রণী হইতে হইবে। যেভাবেই হউক, করযে হাসানাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দান করিতে হইবে, যাহাতে কোন ব্যক্তি করযে হাসানা না

পাওয়ার কারণে শোষণের শিকার না হয়। এই জাতীয় ঋণ প্রদান করিতে কুরআন মাজীদে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا .

"কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন" (২ ঃ ২৪৫; আরও দ্র. ৫৭ ঃ ১১)। এই আয়াতের শেষে বলা হইয়াছে— "করযে হাসানা দানকারীর জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার"।

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .

"তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দান কর, আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ মোচন করিব এবং তোমাদের প্রবেশ করাইব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত" (৫ ঃ ১২)।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا .

"আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য উত্তম যাহা কিছু অগ্রিম পাঠাইবে তাহা আল্লাহর নিকট পাইবে। তাহা উৎকৃষ্ট এবং পুরস্কার হিসাবে অতীব মহান" (৭৪ ঃ ২০)।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ .

"নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যাহারা আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দান করে তাহাদেরকে দেওয়া হইবে বহু গুণ বেশী এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার" (৫৭ ঃ ১৮)।

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ .

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করযে হাসানা) দান কর তবে তিনি তোমাদের জন্য তাহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল" (৬৪ ঃ ১৭)।

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رايت ليلة اسرى بى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشرة.

মহানবী (স) বলেন, "মি'রাজের রাত্রে আমি জান্নাতের ফটকে লিপিবদ্ধ দেখিলাম, দান-খয়রাতে দশ গুণ এবং করয দানে আঠার গুণ সওয়াব রহিয়াছে" (সুনান ইব্ন মাজা, কিতাবুস-সাদাকাত, বাব আল-কারয, নং ২৪৩১; আরও দ্র. তাবারানী ও বায়হাকী)।

عن ابن مسعود ان النبى ﷺ قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة .

"কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দুইবার করয দিলে সে যেন উক্ত পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করিল" (পূর্বোক্ত বরাত, নং ২৪৩০, হাদীছের শেষাংশ)।

করযে হাসানা তত্ত্বের সহিত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্য আচরণবিধি আরোপ করা হইয়াছে। যেমন : (এক) নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত করযে হাসানা প্রার্থনা করা যাইবে না। একটি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও অপব্যয়ের জন্য ঋণ চাহিবার বিষয়টি চিন্তা করা যায় না। যখন কেহ জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হইয়া পড়ে কেবল তখনই করযে হাসানা চাহিতে পারে।

(দুই) করযে হাসানা আদান-প্রদান সাক্ষিগণের উপস্থিতিতে লিখিতভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়, যদি না তাহা সংক্ষিপ্ত কালের জন্য হয় (দ্র. ২ ঃ ২৭৯)। (তিন) করযে হাসানা প্রদানকারী গ্রহীতার নিকট বন্ধক (দ্র. রাহ্ন) দাবি করিতে পারেন। (চার) ঋণ গ্রহীতাকে উহা যথাশীঘ্র সম্ভব পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ বিলম্বিত করা অপরিহার্য নয়। (পাঁচ) ঋণদাতাকে গ্রহীতার সহিত সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ঋণ আদায়ের জন্য কঠোর বা অসৌজন্যমূলক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঋণগ্রহীতার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা অনুচিত। (ছয়) ঋণগ্রহীতা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করিলে উদারতার সহিত তাহা অনুমোদন করা উচিত। (সাত) ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ ঋণ বা উহার অংশবিশেষ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে এবং ঋণদাতার পক্ষে সম্ভব হইলে তাহা মওকুফ করা উচিত। তাহার পক্ষে ঋণের দাবি ত্যাগ করা এবং ঋণগ্রহীতার পক্ষে উহা পরিশোধ করা সম্ভব না হইলে সরকার তাহার যাকাত তহবিল (দ্র. ৯ ঃ ৬০) হইতে তাহাকে সাহায্য করিবে। উপরোক্ত আচরণবিধি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহে বিধৃত হইয়াছে।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যদি তোমরা অনুধাবন করিতে" (২ ঃ ২৮০)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة, "যে লোক অসচ্ছল ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার সহিত সহজ ব্যবহার করিবেন" (ইবন মাজা, সাদাকাত, বাব ইনজারিল মু'সির, নং ২৪১৭)।

من انظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن انظره بعد حله كان له مثله فى كل يوم صدقة .

"যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় সে প্রতি দিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়াইয়া দেয় সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পায়" (ইব্ন মাজা, ঐ, নং ১৪১৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২৫১, নং ২৩৩৫৮)।

من احب ان يظله الله فى ظله فلينظر معسرا او ليضع له .

"যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে যে, আল্লাহ তাহাকে তাঁহার (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিন— সে যেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা তাহার ঋণের দাবি ত্যাগ করে" (ইব্ন মাজা, ঐ, নং ২৪১৯; আরও দ্র. তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ইনজারিল মু'সির, নং ১৩০৬; মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৩৫৯, নং ৮৬৯৬)।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (স) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়াছেন এবং অনেক লোককে ঋণ পরিশোধে সহায়তা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তিনি তাহার জানাযা পড়িতে অসম্মত হইয়াছেন এবং তাহার সাহাবীগণকে বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জানাযা পড়। মহানবী (স) বলেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে" (ইব্ন মাজা, সাদাকাত, বাব হুসনিল কাদা, নং ২৪২৩; সহীহ মুসলিম, মুসাকাত, বাব ২২, নং ৪১০৯/১১৯, ৪১১০/১২০)।

"যে ব্যক্তি পরিশোধের অভিপ্রায়সহ ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্ এই দুনিয়াতেই তাহার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দেন" (ইব্ন মাজা, সাদাকাত, বাব ১০, নং ২৪০৮)। "ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে থাকেন, যদি না সে তাঁহার অপছন্দনীয় উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে" (পূর্বোক্ত বরাত, নং ২৪০৯)।

"যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার অভিপ্রায়সহ ঋণ গ্রহণ করিল, সে (কিয়ামতের দিন) তস্কররূপে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হইবে" (পূর্বোক্ত বরাত, বাব ১১, নং ২৪১০)।

"মু'মিন ব্যক্তির রূহ তাহার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যে পর্যন্ত না তাহা পরিশোধ করা হয়" (পূর্বোক্ত বরাত, বাব ১২, নং ২৪১৩)।

"রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তাহার ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রাখিয়া গিয়াছে কি ? যদি বলা হইত, হাঁ, রাখিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহার জানাযা পড়িতেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদেরকে বলিতেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জানাযা পড়" (তিরমিযী, জানাইয, বাবুস সালাত আলাল-মাদয়ূন, নং ১০৭০; আরও দ্র. নং ১০৬৯; বুখারী, কাফালা, বাব ৩, নং ২২৯৫)।

কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে এবং তাহার ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পত্তি না থাকিলে সরকার উহা পরিশোধ করিবে। মহানবী (স) বলেন, মু'মিন ব্যক্তিগণের কেহ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তাহা পরিশোধের দায়িত্ব আমার" (তিরমিযী, ঐ, নং ১০৭০, শেষাংশ; বুখারী, নাফাকাত, বাব ১৫, নং ৫৩৭১; আরও দ্র. কাফালা, বাব ৫, নং ২২৯৮; মুসলিম, ফারাইয, বাব ৪, নং ৪১৫৭/১৪; ইব্ন মাজা, সাদাকাত, বাব ১৩, নং ২৪১৫; মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২৯০, নং ৭৮৮৬; পৃ. ৯৮৪৭)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইফাবা, আয়াতসমূহের তরজমার জন্য; (২) হাদীছ : সিহাহ আস-সিত্তা-র জন্য মাওসূ'আতুল হাদীছ আশ-শারীফ, আল-কুতুবুস সিত্তা (একই ভলিউমে ছয়টি গ্রন্থের সংকলন), দারুস সালাম, ৩য় সং., রিয়াদ ১৪২১/২০০০; (৩) Muhammad Akram Khan, Economic Teachings of prophet Muhammad (sm), International Institute of Islamic Economics, Islamabad 1989, ৯ নং অধ্যায়ের ভূমিকা, পৃ. ১৫১-২।

মুহাম্মদ মূসা

আল-কারদূদী (الكردودى) : আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-কাদির ইব্ন আহমাদ আল-গুলালী আল-হাসানী আল-ইদরীসী, মরক্কোর আইনবিশারদ ও গ্রন্থকার (১২১৬-৬৫/১৮০১-৪৯), যিনি কিছুকাল তাঞ্জিয়ার-এর কাদী ছিলেন। ইনি নিম্নোক্ত গ্রন্থাদির প্রণেতা ছিলেন : (১) একখানা 'ফাহ্রাসা', যাহাতে তাঁহার উস্তাদগণের নাম এবং তন্মধ্যে আল-কূহিন, আদ্-দাম্নাতী প্রমুখ কয়েকজনের প্রদত্ত ইজাযা (অনুমতি) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ; (২) ইস্তিলাহু'ল-কামূস নামক গ্রন্থের একখানি ভাষ্য; (৩) ইব্ন মালিক প্রণীত আলফিয়্যার খুত্বা (ভূমিকা)-এর একখানি ভাষ্য ; (৪) "আদ্-দুরুরু'ল-মুফাদ্দাদু'ল-ফাখির ফীমা লি-আবনা' মাওলানা 'আলী আশ্-শারীফ মিনা'ল-মাহাসিন ওয়া'ল-মাফাখির" নামক 'আলাবী বংশের একখানি ইতিহাস (অসমাপ্ত) এবং (৫) "কাশ্ফু'ল-গুম্মা ফী বায়ান আন্না হারবা'ন-নিজাম ওয়াজিব 'আলা হাদিছি'ল-উম্মা" নামক সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ (লিথু ফেয ১৩০৩/১৮৮৫)। ইনি ফেয নগরীতে ইনতিকাল করেন ও সেইখানে য়ূসুফ আল-ফাসীর কবরের নিকটে বাবু'ল-ফুতূহ এলাকার বহির্দেশে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : E. Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ২১৭ ও টীকা ১; (২) ম. আল-কাত্তানী, ফিহ্রিসু'ল-ফাহারিস, (৩) 'আ. ইব্ন সূদা, দালীল, ১খ, ১৪৯, ২খ, ২৮৮, ৩২৪, ৪৭১।

M. Lakhdar (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইলাহি বখশ

কারনাটক (كرناٹك) : কর্নাটক, সংস্কৃতিতে কারনাটকা, প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতের ক্যানারিজ (Kannada)-ভাষী জিলা। মনে হয় শব্দটি দ্রাবিড়ীয় মূল হইতে উদ্ভূত, ইহার অর্থ 'কৃষ্ণদেশ' অর্থাৎ তুলা চাষের কালো মৃত্তিকা অঞ্চল (Cotton belt of Madura, তুলা উৎপাদনের উপযোগী ভারতীয় কালো আর্দ্র মৃত্তিকা), যাহা দক্ষিণের দক্ষিণা পথ মালভূমিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। এই এলাকা দ্বারা মোটামুটিভাবে বর্তমান মহীশূর রাজ্যকে বুঝায়। কিন্তু ইতিপূর্বে মধ্যযুগে তেলেগুভাষী কিছু অঞ্চলকে ইহার সহিত যুক্ত করা ইহয়াছিল, যেমন বিজয়নগর (দ্র.) রাজ্যের সমসাময়িক কালে। ৯৭২/১৫৬৪-৫ সালে তালিকাটার যুদ্ধে সংযুক্ত দাক্ষিণাত্য রাষ্ট্র বিজয়নগর বাহিনীকে পরাজিত করিবার পর মুসলমানগণ বিজয়নগর-কারনাটক ভূমি দখলে আনেন। তাঁহারা শুধু মালভূমি অঞ্চলের প্রতিই এই নাম আরোপ করেন নাই, বরং ঘাটের (পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা) নিম্ন পূর্ব-উপকূলীয় ভূমিকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন। অষ্টাদশ শতকে য়ুরোপীয়রা দক্ষিণ ভারতের সহিত জড়িত হইবার পর ভুলক্রমে শুধু উপকূলীয় অঞ্চলের নামকরণ করা হয় 'কারনাটিক'। এই অর্থে ইহা কারনাটিকের নবাব উপাধি প্রযুক্ত হয়, অধিকতর শুদ্ধভাবে যাহাকে বলা হইত আরকাটের নবাব।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে আরকাট শহর (১২°৫৪ উ. ৭৯°২০ পূ.), সা'আদাতুল্লাহ্ খান-এর পরিবারের বংশানুক্রমিক দখলে আসে। তিনি একজন নাবা'ইত, দক্ষিণ ভারতের একটি মুসলিম গোত্র, বংশের দিক দিয়া হাশিমী বলিয়া বিখ্যাত। হাজ্জাজ কর্তৃক ইরাক হইতে ২য়/৮ম শতকে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, যিনি মহীশূরের বিরুদ্ধে আওরাঙ্গযীবের সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত 'আলী খান (১১৪৫-৫৩/১৭৩২-৪০) সাধারণত প্রথম নওয়াব হিসাবে স্বীকৃত। তিনি নামেমাত্র হায়দরাবাদের ১ম নিজামের অধীন ছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। হায়দরাবাদে ইংরাজ, ফরাসী এবং হায়দার 'আলীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই শহর ও পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহের বহুবার হাতবদল হয়। শেষ শক্তির অধিকারে থাকাকালেই বৃটিশের মিত্র মুহাম্মাদ 'আলী ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 'কারনাটিকের' রাজস্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবাব 'আজীমু'দ দাওলা আরাকট ও 'কারনাটিকে'-র পূর্ণ সার্বভৌমত্ব কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করেন। ১৮৫০-এর দশকে গভর্নর জেনারেল আর্ল অব ডালহৌসীর শাসনামলে নওয়াব পদবী বিলোপ করা হয়।

এই এলাকা মুসলিম স্থাপত্য কীর্তিতে তেমন সমৃদ্ধ নহে। নিম্নে উল্লিখিত নিদর্শনগুলি দ্বারা আরকাত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং নওয়াবের

প্রাসাদ, সা'আদাতুল্লাহ্ খানের সমাধিভবন (১১৪৫/১৭৩২-৩) এবং একই শহরের জামি' মসজিদ, ভেলূর (Vellore)-এ টিপু পরিবারের কবরসমূহ, আর তালিকোটায় পরাজয়ের পর বিজয়নগর রাজাদের স্থানান্তরিত চন্দ্রগিরির প্রাসাদ। এইগুলিতে বিজয়নগর স্থাপত্যরীতির মধ্যে মুসলিম প্রভাবের বেশ কিছু নিদর্শন লক্ষ করা যায় (দ্র. Hind, Architecture)।

ভারতীয় প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের পর বর্তমানে পূর্ববর্তী মহীশূর ও হায়দরাবাদ রাজ্য এবং মাদ্রাজ প্রদেশের কতিপয় জিলা কারনাটক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। মুসলিম অধিবাসী শতকরা আট ভাগ। প্রধান নগর বাঙ্গালোর। এখানে জাহাজ নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নির্মাণের কারখানা আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. আরকট প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী; (২) Pearson and Supplements, s. v. Nawabs of Arcot; (৩) দা.মা.ই., ১৭খ, ২৫৫-৬।

J. Burton Page (E.I.[2])/মোঃ ইমরুল কায়েস

কারনাল (کرنال) ঃ কর্ণাল ভারতবর্ষের পাঞ্জাব রাজ্যের একটি শহর ও জিলা ; বর্তমানে ইহা হরিয়ানা প্রদেশের আম্বালা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। শহরের আয়তন ২৬ বর্গমাইল এবং জিলার আয়তন ৩০৬২ বর্গমাইল। যমুনা নদী এই জিলার পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হয়। দক্ষিণে দিল্লী জিলা, উত্তরে আম্বালা জিলা, পশ্চিমে পাতিয়ালা এবং শিখদের সাবেক রাজ্য জীন্দ ও নাব্হাহ্। হিন্দুদের নিকট পবিত্র হিসাবে পরিগণিত সরস্বতী নদী কর্ণাল শহর হইতে বিশ মাইল উত্তর দিয়া প্রবাহিত হয়। ইতিহাস বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যেখানে মহাভারত উল্লিখিত কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এই জিলার উত্তরে অবস্থিত। যুদ্ধের কতিপয় নিদর্শন এখানে বিদ্যমান। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে জিলার লোকসংখ্যা ছিল ১৪,৯০,৪৩০। অধিবাসীগণ পশ্চিমী হিন্দীর আঞ্চলিক বুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে রাজ্যড় এবং চৌহান রাজপুত ব্যতীত জাটরাও বসবাস করে। কর্ণাল জিলার মুসলিম জনগণ প্রধানত চৌহান রাজপুত মান্ধার, গোরীওয়াহা এবং মূরিওয়ার গোত্রভুক্ত। ঐতিহাসিক এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়া ইহাকে পাঞ্জাবের তুলনায় হিন্দুস্তানের অংশ বলাই শ্রেয়। অধিবাসীদের পেশা মূলত কৃষি। ছোলা, বাজরা, চাউল, কার্পাস তুলা এবং গম উৎপন্ন হয়। পানিপত (ইতিহাসখ্যাত পানিপত প্রান্তর), কেথিল, শাহ আবাদ এই জিলার প্রসিদ্ধ শহর ও জনপদ।

কর্ণাল শহর আবাদ করিয়াছিলেন রাজা কর্ণ যিনি মহাভারত উল্লিখিত যুদ্ধে কুরুপক্ষের সেনাপতি ছিলেন। তাহার নাম হইতেই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে (কর্ণালিয়াহ্=কর্ণের বসবাস করিবার জায়গা বা আবাসস্থল)। প্রাচীন যুগে ইহা খুব প্রসিদ্ধ ছিল না। খৃ. ৬৩৫ সালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন শঙ কনৌজ নামক স্থানে বৌদ্ধরাজ হরিশ চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে কর্ণালের কোন উল্লেখ করেন নাই। মাহমূদ গাযনাবী এবং মুহাম্মাদ ঘূরীর বিজয় অভিযানসমূহের মধ্যেও ইহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১০১১ খৃষ্টাব্দে মাহমূদ গাযনাবী থানেশ্বর আক্রমণ করেন। কর্ণাল হইতে মাত্র বিশ মাইল দূরে থানেশ্বর অবস্থিত। ১০১৭ খৃ.-এ তিনি মথুরাও গিয়াছিলেন। ৫৮৮/১১৯২ সালে মুহাম্মাদ ঘূরী কর্ণালের অগ্রে দক্ষিণে অবস্থিত তিরাওড়ী নামক স্থানে রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করেন। তুগলাকের শাসন আমলে (১৩২০-১৪১৩ খৃ.) কর্ণাল ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করে। ৭২৫/১৩২৩ সালে পানিপতের খ্যাতনামা সূফী বূ'আলী কালান্দার ইনতিকাল করেন। 'আলা'উ'দ-দীন ঘূরীর পুত্র খুযী খান ও শাদী খান পানিপথে তাঁহার সামাধিসৌধ নির্মাণ করেন। কিন্তু গিয়াছু'দ-দীন তুগলাক কর্ণালেও তাঁহার সামাধিসৌধ নির্মাণ করেন। লোকমুখে প্রচলিত যে, কালান্দার শাহ (র) এইখানেই সমাহিত আছেন। ১৩৫৫ খৃ. ফীরোয শাহ তুগলাক যমুনার পশ্চিম তীর হইতে একটি খাল খনন করেন যাহা কর্ণালের চারি মাইল ভাটিতে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে এই এলাকার উৎপাদিত ফসল ও জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। ১৪৯৮ খৃ. যখন আমীর তায়মূর ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন কর্ণাল হইয়া অতিক্রম না করিলেও তিনি দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত পানিপথ গিয়াছিলেন এবং সেখানে গমের একটি ভাণ্ডার দখল করেন। ২১ এপ্রিল, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবুর যখন ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করেন তখন তিনি কর্ণাল হইয়াই সেইদিকে গিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খৃ. জালালু'দ-দীন আকবর হীমূ বাক্কালের বিরুদ্ধে স্বীয় ফৌজ কর্ণাল হইতে দশ মাইল উত্তরে সমাবেশ করেন এবং ৯৮০/১৫৭৩ সালে সম্রাট আকবর যখন গুজরাটে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইবরাহীম হুসায়ন মির্যা কর্ণাল, পানিপথ ও সোনীপতে লুটপাট চালায়। আইন-ই আকবারীতে একটি পরগণা হিসাবে কর্ণালের উল্লেখ রহিয়াছে। ১০১৩/১৬০৭ সালে জাহাঙ্গীর তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র খসরুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া কর্ণালে স্বল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কর্ণালে ফীরোয শাহ তুগলাক কর্তৃক খননকৃত খাল (নহর) আকবরের শাসনামলে দিল্লীর সুবেদার শিহাবু'দ-দীন আহমাদ খান পুনঃখনন করাইয়াছিলেন। শাহজাহান-এর রাজত্বকালে 'আলী মার্দান খান লাল কিল্লায় পানি সরবরাহের জন্য উক্ত খাল দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত করেন। মুগল শাসনামলে কর্ণালে একটি সরাইখানাও নির্মিত হইয়াছিল যাহার কোনও চিহ্ন আর এখন অবশিষ্ট নাই। আওরাঙ্গযীবের মৃত্যুর পর বান্দাহ বৈরাগী যমুনার পশ্চিম তীরস্থ এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকাইয়া বসে এবং কর্ণালের ফওজদারকে হত্যা করিয়া সেখানে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালায় ও শহর লুট করে। এই শহরের ইতিহাসের সর্বাধিক বিখ্যাত ঘটনা ১১৫২/১৭৩৫ সালে নাদির শাহের প্রতিরোধে মুহাম্মাদ শাহ-র পরাজয়। তিন মাস পর্যন্ত মুহাম্মাদ শাহ কর্ণালের জঙ্গলে ছাউনি ফেলিয়া কাটান। শহর-প্রাচীরের ঠিক বাহিরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আহমাদ শাহ আবদালী এখানে আসেন নাই বটে, কিন্তু ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাল জিলার অন্তর্গত বিখ্যাত শহর পানিপথে তিনি মারাঠাদিগকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। মারাঠা এবং আহমাদ শাহ আবদালীর কারণে দিল্লী সাম্রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল শিখেরা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। দিল্লীর নিকটবর্তী হইবার কারণে কর্ণালের ইতিহাস প্রথম হইতেই দিল্লীর অবস্থাদি দ্বারা প্রভাবিত হইত। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জীন্দ-এর রাজা গজপত সিং এই এলাকা নিজ নিয়ন্ত্রণে আনেন ; কিন্তু ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নাজাফ খান তাহা পুনর্বার জয় করিয়া লন। অতঃপর শাসনক্ষমতা লইয়া মারাঠা এবং শিখদের পারস্পরিক সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। পরিণতিতে ১৮০৫ সালে ইংরাজ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইবার পরই কেবল ইহার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। কিন্তু এই রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কর্ণাল পরগণার ২২১টি গ্রামের মধ্যে ১৭৮টি গ্রামই বিরান হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইলে কর্ণালের নওয়াব আহমাদ 'আলী খান ইংরাজদের সাহায্য করেন।

বৃটিশ সরকার কর্নালকে জিলা সদরে পরিণত করেন। এখানে সামরিক ছাউনি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে ইহার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল হিসাবে দেখা দেওয়ায় এই ছাউনি আম্বালায় স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব খননকৃত খাল নাদির শাহ্‌র আক্রমণের সময়ও বিদ্যমান ছিল। ইহা তখন পর্যন্ত চতুর্দিকে প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ করিত। কিন্তু অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলাকালীন ইহা ভগ্নদশায় পৌঁছে এবং ইহার দুই পার্শ্ব প্লাবিত হইতে থাকে। ফলে পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে হইবার কারণে মহামারী দেখা দিত। বৃটিশ সরকার নূতন খাল জুমন গারবী খনন করান ও স্যাঁতসেঁতে অবস্থা মাটি ভরাটের মাধ্যমে দূর করেন। শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল, হাসপাতাল, ডাকঘর প্রভৃতি নির্মাণ করেন এবং রাস্তাঘাট পাকা করান। দিল্লী-কাল্‌কা রেলপথ নির্মাণের ফলে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কর্নাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন শহরের আশেপাশে প্রাচীর রহিয়াছে যাহার সাথে সাথে রহিয়াছে সুদৃঢ় সড়ক পথ। শহরের দশটি দরজা রহিয়াছে। যে স্থানে পূর্বে সামরিক ছাউনি ছিল এখন সেখানে নূতন বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা সদর দরজা নামে পরিচিত। উত্তরে এক মাইল দূরে সিভিল লাইন ও সরকারী দফতরসমূহ রহিয়াছে। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের পর শহরের জনবসতি বাড়িয়া গিয়াছে, শহর উপকণ্ঠের অধিবাসীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। কালান্দার শাহ (র)-এর মাযারসৌধ শহরের ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শনের অন্যতম। সম্রাট আওরাঙ্গযীব 'আলামগীর এই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ ও একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। হিন্দুগণ রাজা কর্ণের কারণে কর্নালের পুষ্করিণীকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। কর্নালের দুর্গও বিখ্যাত। কাবুলের শাসনকর্তা আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ খান কলিকাতা যাইবার কালে এখানে ছয় মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ছাউনির স্থানে ইংরাজ কর্তৃক নির্মিত গির্জাঘর ভগ্নদশা এখনও টিকিয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-ফাদল, আঈন-ই আকবারী, কলিকাতা ১৮৭৯ খৃ., ২খ, পৃ. ৩৮ ; (২) জাহাঙ্গীর, তূযুক-ই জাহাঙ্গীরী, লাখনৌ সং., ১খ, পৃ. ২৮-২৯ ; (৩) শাম্‌স সিরাজ 'আফীফ, তা'রীখ-ই ফীরোযশাহী, কলিকাতা ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৩২৯-৩৩ ; (৪) Karnal District Gazetteer, লাহোর ১৮৯২ খৃ. ; (৫) E.I., লাইডেন, নূতন সং, ৪খ, ৬৬৫-৬৬, কর্নাল শিরো.; (৬) কানিংহাম, Ancient Geography of India, লন্ডন ১৮৭১ খৃ. ; (৭) দা. মা. ই., পৃ. ২৫৬-৫৮ ; (৮) Ibbetson, Settlement Report of Karnal and Panipat, Lahore 1883; (৯) ঐ লেখক, Outlines of Punjab Ethnography; (১০) Douie, Settlement Report, Karnal and Ambala, Lahore 1891 ; (১১) Massy, Chiefs and families of note in the Punjab, Allahabad 1890 ; (১২) Crooke, Popular Religion of Northern Inia, i, 219, Westminister, 1896; (১৩) Elliot and Dowson, History of India, iii, London 1871।

'আবদু'ল-গানী (দা. মা. ই.)/আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

কারবালা (كربلاء) ঃ কারাবালা-ই মু'আল্লা মাশ্‌হাদু'ল-হুসায়ন ইরাকের এক প্রসিদ্ধ শহর, যাহা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা), হযরত 'আব্বাস (রা), হুরর (রা) ইব্‌ন য়াযীদ আর-রিয়্যাহী এবং হাবীব (রা) ইব্‌ন মুজাহির-এর মাযারসমূহ এবং 'আশূরার ঘটনার দরুন যিয়ারাত স্থল এবং বিশেষভাবে শী'আ সম্প্রদায়ের সম্মানজনক কেন্দ্রে পরিণত।

প্রাচীন ইতিহাস ঃ প্রাচীন ইতিহাসে কারবালা'কে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন গাদিরিয়া, নীনাওয়া (সম্ভবত হা'ইর-এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি গ্রাম, যাহা বর্তমানে একটি মহল্লার রূপ লাভ করিয়াছে ; তারীখ-ই কারবালা' ওয়া হাইরুল-হুসায়ন, পৃ. ৯৮), 'আমূরা, শাতিউ'ল-ফুরাত, শাত্তু'ল-ফুরাত, তাফ্‌ফু'ল-ফুরাত, তাফ্‌ফু মারিয়া, নাওয়াবীস, সাফ্‌ফূরা, হা'ইর।

পুরাকীর্তি বিশেষজ্ঞগণ বিগত হাজার বৎসরের ইতিহাস এবং নাম ও নমুনার উপর আলোচনা করিতে গিয়া লিখেন ঃ (১) কারবালা' হইল কুরবাবিল অর্থাৎ বাবিল-এর একটি গ্রাম ; (২) কারবালা' হইল আশূরীয়দের প্রদত্ত নাম, 'কারব' 'ঈলা'-র সমন্বয়ে গঠিত এবং উহার অর্থ হইল 'হারুরামাল্লাহ' ; (৩) কারবালা' পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত ছোট পাহাড় শ্রেণীর নাম এবং এই সুবাদে এই জনপদকে কারবালা' বলা হয়।

অভিধান প্রণেতাগণ এবং জনসাধারণের বর্ণনা অনুযায়ী উহার নামকরণের কারণ হইল ঃ (১) কারবালা' শব্দের অর্থ নম্র পদচারণা, এই ভূমি যেহেতু নরম এবং প্রশস্ত ছিল, সেইজন্য ইহা কারবালা' নাম ধারণ করিয়াছে ; (২) কুরবিলাতি'ল-হিনতা, গম চালনি দ্বারা পরিষ্কৃত, যেহেতু এই ভূমি পাথরযুক্ত, এইজন্য ইহাকে কারবালা' বলা হয় ; (৩) কারবালা' জঙ্গলের এক তিক্ত ঘাসের নাম, যাহা এই ভূমিতেই জন্মাইত।

ইহা এক আশূরীয় নাম (কারব এবং ঈলা-র সমন্বয়ে গঠিত), এই ধারণার সমর্থন ইহা হইতে পাওয়া যায় যে, ইরাক এবং উহার জিলাসমূহের বিভিন্ন গ্রামের নামে 'কার' পাওয়া যায়, যেমন কারকূক এবং কারখ। তাওফীক ওয়াহ্‌বীর মতে আশূরীয় ভাষায় কার'-এর অর্থ হইল দুর্গ কিংবা চার দেওয়ালে পরিবেষ্টিত গ্রাম (প্রকৃত নাম কারকূক, মাজাল্লাতু'ল-'ইরফান, বৈরূত, রাজাব ১৩৯১ হি.)। কেহ কেহ ধারণা করেন, কারবালা' শব্দটি 'আব্বাসী 'কারবেলা', আবার কাহারও মতে আসীরীয় 'কারবাল্লাতুন' এক প্রকার শিরস্ত্রাণ হইতে উদ্ভূত।

ফুরাত নদীর তীরবর্তী এলাকার উর্বরতার দরুন শতাব্দী কাল হইতে এই অঞ্চল জনবসতি হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল। ইরাকের প্রাচীন ইতিহাসে কালদানী, তানূখী এবং মানাযিরা রাজ্যসমূহ প্রসিদ্ধ ছিল। সেই যুগে হীরা ছিল রাজ্যের প্রধান শহর এবং 'আয়নু'ত-তাম্‌র ছিল এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। কারবালা' এই দুইটি শহরের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। আরব বংশীয় গোত্রসমূহের মধ্যে বানূ ফারাম, ইয়াদ এবং অন্যান্য কয়েকটি আরব বংশ প্রাচীন যুগ হইতে অত্র অঞ্চলসমূহে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। বর্তমান 'কারবালা' শহরের দুই পার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি খৃস্টপূর্ব হাজার-দুই হাজার শতাব্দীর প্রাচীন বিধ্বস্ত শহরসমূহের স্বাক্ষর বহন করে। এই মালভূমির মাটির নীচে আশূরীয়, বাবিলীয়, সাসানী, উমাবী এবং গাযনাবী যুগের তাহযীব-তমদ্দুন চাপা পড়িয়া আছে। সায়্যিদ মুহাম্মাদ হাসান মুসতাফা কালীদার 'মাদীনাতু'ল-হুসায়ন' গ্রন্থে চুয়াল্লিশটি ছোট পাহাড়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'খায়ত' নীনাবী আল-কাজিমী, সিলসিলাতুল-নীনাওয়া আস-সাকিয়াতও রহিয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামসমূহের চিহ্নাবলী ও নামের খ্যাতির কারণে 'কারবালা' ঘটনার ইতিহাসের সূচনায় যখন ইমাম হুসায়ন (রা)-এর আগমন সম্পর্কিত

বর্ণনাসমূহ অধ্যয়ন করা হয় তখন আমরা বেশ কিছু নামের উল্লেখ পাই। সঠিক তথ্য সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি উক্ত নামসমূহের বর্ণনায় বৈপরীত্য লক্ষ করে।

ফুরাত নদীর তীরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও কারবালা'র ময়দান ফুরাত নদীর পানির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই কারণে প্রাচীন বাদশাহগণ খাল খনন করাইয়াছিলেন, 'সাবূর যু'ল-আকতাফ' (৩০৯-৩৭৯ খৃ.) বহু খাল খনন করিয়াছিলেন যাহাদের বিলুপ্ত চিহ্নাবলী এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। উহার পর আরও বহু খাল খনন করা হয়। উহার একটি খাল 'আলকামা নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত। এই সকল খাল ভূমির কোমলতা, মাটির সূক্ষ্মতা এবং নদীর পলিমাটির দরুন ভরাট হইয়া যাইত এবং ক্ষমতাসীনদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে শুষ্ক হইয়া মানুষের দুর্ভোগের কারণ হইয়া পড়িত। জনগণ কূপ খনন করিত কিন্তু উহাও তেমন ফলপ্রসূ ছিল না। এই ব্যাপারে কি ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত এবং খালসমূহের তলদেশ পরিষ্কার করিবার কাজ কখন বন্ধ হইয়া যায় তাহার ইতিহাস জানা যায় না। বলা হয় যে, গাযান খান ঈলখানী ফুরাত হইতে হিল্লা এবং কারবালা'র নদী খনন করাইয়াছিলেন এবং ৭০৩ হিজরীতে যখন তিনি হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত স্থল পরিদর্শন করিতে আসেন তখন কারবালাবাসিগণকে প্রচুর খাদ্যশস্য সাহায্য হিসাবে প্রদান করেন। প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ফুরাত সংলগ্ন কারবালা' অঞ্চল পানির দুষ্প্রাপ্যতার দরুন প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইতিহাসের কিছু ভয়াবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হইত।

ইসলামী যুগে কারবালা ঃ ৩৯ হিজরীতে হযরত 'আলী (রা) সিফফীন যুদ্ধকালে এই দিকে আগমন করিলে কারবালার নাম শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। লোকেরা এইরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "একদিন আমি মহানবী (স)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ জিবরীল ('আ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, হুসায়ন ফুরাত নদীর তীরে কারবালা' নামক স্থানে শহীদ হইবে। তিনি এক মুষ্টি কারবালার মাটি লইয়া আমাকে ঘ্রাণ লইতে দিয়াছিলেন। এই কারণে আমার ক্রন্দন আসিয়া যায়" (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ৩খ, ১৯৪, ১৯৫)।

৬১ হিজরীর ২ মুহাররাম ইমাম হুসায়ন (রা) কারবালাতে তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি এইখানে জমি ক্রয় করেন (আল-মুকাররাম, মাকতালু'ল-হুসায়ন, পৃ. ২৩৫) এবং ১০ মুহাররাম, ৬১ হি. তিনি উক্ত ভূমিতে নিজের স্থায়ী ঘর নির্মাণ করেন। তাঁহার কবর এক নীচুভূমিতে ছিল, যাহার চতুর্দিকে কিছু উঁচু টিলা ছিল। এইজন্য এই স্থানকে প্রথম দিকে "আল-হা'ইর" বলা হইত (মারাসিদু'ল-ইত্তিলা', ইরান ১৩১৫ হি., পৃ. ১২৬; বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. ডঃ 'আবদু'ল-জাওওয়াদ, তা'রীখ কারবালা' ওয়া হা'ইরু'ল-হুসায়ন, পৃ. ১৭ প.)।

সাফার ৬২/৬৮২ সনে হযরত জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আনসারী (রা) কারবালা' আগমন করিয়াছিলেন এবং আহল বায়ত-ও সিরিয়া হইতে মুক্তি লাভের পর এইখানে আসেন (আল-মুকাররাম, মাকতালু'ল-হুসায়ন, পৃ. ৪৬৭)। এই সাক্ষাতের কারণে শী'আ সম্প্রদায় কর্তৃক ২০ সাফার কারবালাতে বিশেষ দিন পালন করা হইয়া থাকে। শা'বান ৬৫/৬৮৫ সন পর্যন্ত কারবালা' সম্ভবত যিয়ারতকারীদের কারণে কিংবা গাদিরিয়া এবং নীনাওয়ার অধিবাসীদের কারণে জনবসতিতে পরিণত হয়। ৬৫ হিজরীতে আবূ ইসহাক মুখতার ইব্ন আবী 'উবায়দ আছ-ছাকাফী বানূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সেই যুগে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযারের উপর একটি ছোট সৌধ নির্মাণ করেন। ইহার একটি দরজা পূর্ব দিকে ছিল এবং আর একটি দরজা পশ্চিম দিকে। একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়। ইহার পূর্বে তথায় একটি কুলগাছ ছিল যাহা অক্ষত রাখা হয়। এই সৌধ এবং গাছটি হারূনু'র-রশীদ ধ্বংস করেন। আল-মা'মূন তাঁহার আমলে পুনরায় এই সৌধ নির্মাণ করেন, কিন্তু আল-মুতাওয়াক্কিল উহা ভাঙিয়া ফেলেন (আত-তাবারী, ১১খ, ৪৪ ; তা'রীখু'র-রাওদাতি'ল-হুসায়নিয়া, পৃ. ৯ ; বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. লেখকের প্রবন্ধ কারবালা', তা'রীখ ওয়া তা'মীর, রিদাকার-এ, লাহোর, মুহাররাম ১৩৯১ হি.)। ইহার পর সন-তারিখ অনুযায়ী সৌধ নির্মাণ ও সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ ঃ

আল-মুনতাসির-বিল্লাহ (২৪৭/৮৫৯) নূতনভাবে রাওদা নির্মাণ করেন এবং রাস্তায় পদচিহ্ন স্থাপন করেন। ২৭৩/৮৮৫ সনে এই সৌধ 'আরাফা'র দিনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (মুহাম্মাদ হাসান, তারীখে কারবালা', পৃ. ৮৯)।

২৮৩/৮৯৬ সনে তাবারিস্তানের শাসক মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ ইরান হইতে পাথর প্রেরণ করিয়া সুরম্য সৌধ নির্মাণ করান। ইব্ন হাওকালের বর্ণনামতে (ed. de Goeje, পৃ. ১৬৬) ৩৬১/৯৭১ সনে এই স্থানে একটি প্রশস্ত গম্বুজবিশিষ্ট সৌধ বিদ্যমান ছিল এবং যিয়ারতকারিগণ বিপুল সংখ্যায় আসিতেন। কিছুকাল পর দাব্বা ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আসাদী, যিনি 'আয়নু'ত-তাম্‌র-এর কয়েকটি গোত্রের সর্দার ছিলেন, মাশহাদু'ল-হা'ইর (কারবালা') এবং অন্যান্য সৌধ ধ্বংস করেন। সেইজন্য ৩৬৯/৯৭৯-৮০ সনে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সাহারা অভিমুখে পলায়ন করেন (ইব্ন মিসকাওয়ায়হ, তাজারিবু'ল-উমাম, সম্পা. Amedroz, in The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ২খ, ৩৩৮, ৪১৪)। এই বৎসরই 'আদুদু'দ-দাওলা বুওয়ায়হী নিজেই নাজাফ-এর মাশ্‌হাদ-ই 'আলী ও মাশহাদ-ই কারবালা'র দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (ইবনু'ল-আছীর, ৮খ, ৫১৮ ; হামদুল্লাহ মুসতাওফী) এবং 'ইমরান ইব্ন শাহীন মাযারের সংস্কার করেন।

৩৭০/৯৮০ সনে 'আদুদু'দ-দাওলা বুওয়ায়হী যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হন এবং দুইটি সুরম্য প্রশস্ত ভবন এবং মাযারের অট্টালিকার উপর বিরাট গম্বুজ নির্মাণ ছাড়াও ভবন অভ্যন্তরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি, কারুকার্য, আলোকসজ্জা ও বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ৪০২ হিজরীতে বাহা'উ'দ-দাওলার উযীর মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ৪০৭ অথবা ৪০৮ হিজরীতে উযীর হাসান ইব্ন ফাদ্‌ল অগ্নিসংযোগের পর নূতনভাবে মাযারের সৌন্দর্য পরিবর্ধন করেন।

৪৭৯/১০৮৬ সনে সুলতান মালিক শাহ সালজূকী মাযারটি যিয়ারত করেন। তিনিই নগর প্রাচীর নির্মাণ এবং সৌধ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেন। ৬২০/১২২৩ সনে নাসির লি-দীনিল্লাহ উহাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। ৭২৬/১৩২৬ সনে সুলতান আবূ সা'ঈদ বাহাদুর খান ইব্ন খুদাবান্দার আমলে ইব্ন বাত্তূতা পরিদর্শনে আসেন। তাঁহার বর্ণনা হইল—"এই ছোট্ট শহরটি খেজুরের বাগিচা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফুরাতের পানি জমি সিক্ত করে। শহরের মধ্যভাগে রহিয়াছে মাযার। এইখানে এক বিরাট মাদরাসা এবং মেহমানখানা (যাবিয়া) বিদ্যমান, যেখানে মেহমানগণকে আপ্যায়ন করা হয়। মাযারের দরজায় রক্ষী এবং দারোয়ান

মোতায়েন আছে যাহাদের অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। রওযা-র দরজা রৌপ্য নির্মিত (মাযারের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত ঝাড় বাতি ঝুলাইয়া রাখা আছে) এবং দরজাসমূহের উপর রেশমের পর্দা রহিয়াছে" (তুহফাতু'ন-নাজজার, কায়রো ১২৮৮ হি., ১খ, ১৩২)।

৭৪০ হইতে ৮২৭ হি. পর্যন্ত ঈলখানী শাসকবৃন্দের এবং জালা'ইর বংশের বাগদাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব থাকে, যাহারা রওযা-র রক্ষণাবেক্ষণ করে। হাসান আল-জালা'ইরী ৭৫৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহাকে নাজাফ আশরাফ-এ দাফন করা হয়। তাঁহার পুত্র উওয়ায়স-এর পক্ষ হইতে মারজান বাগদাদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ করিয়া কারবালা'তে আশ্রয় নেন এবং নিজের সকল সম্পদ রওযা-র জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন। তিনি আঙিনার উত্তর-পূর্বদিকে এক মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ভবনে (হারাম) মীনায় তৈরী করেন এবং উহার উপর স্বর্ণের কারুকার্য করেন (৭৬৭ হি.)। মারজান-এর মীনার এবং আরো কিছু নমুনা ১৩৫২ হিজরীতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হয় (তা'রীখ কারবালা, পৃ. ১১৪)। উহার পর দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে কারবালা' সাধারণ যিয়ারত কেন্দ্র এবং এক বসতিপূর্ণ সুন্দর শহরে পরিণত হয় (মাদীনাতু'ল-হুসায়ন পৃ. ১০৫ প.) দশম শতাব্দীর শুরুতে সাফাবীরা ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়। ৯১৬/১৫১০ পর্যন্ত শাহ ইসমাঈ'ল ইরাক এবং আরব উপত্যকা দখলে রাখেন এবং ইমাম হুসায়ন (রা)-এর রওযা যিয়ারত করেন। তিনি শাহী বদান্যতায় রওযার সংস্কার সাধন করেন এবং রৌপ্যনির্মিত তাযিয়া উপহার দেন। সুলতান সুলায়মান কানূনীর যুগে ইরাককে পুনরায় একবার 'উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ৯৪২/১৫৩৪ সনে সুলতান যিয়ারতের জন্য আগমন করেন এবং হুসায়নিয়া খালটি সংস্কার করা ছাড়া পতিত জমিসমূহে বাগান নির্মাণ করেন। ৯৮২/১৫৮৪ সনে মানারাতু'ল-'আরদ (ইতঃপূর্বে যাহা আংগাশত য়ার নামে পরিচিত ছিল) নির্মিত হয়। ৯৯১/১৫৮৩ সনে সুলতান তৃতীয় মুরাদ-এর নির্দেশে বাগদাদের গভর্নর 'আলী পাশা গম্বুজ এবং সৌধ পুনঃনির্মাণ করেন। ১০৩২ হিজরীতে ১ম শাহ 'আব্বাস কবরকে সাধারণ অবস্থায় দেখিয়া ইস্পাতের দ্বারা ইহা পুনঃনির্মাণ করেন এবং ভবন অভ্যন্তরে নানাবিধ কারুকার্য এবং মেঝের জন্য গালিচার ব্যবস্থা করেন। ১০৪৭ হিজরীতে সুলতান ৪র্থ মুরাদ গম্বুজের সংস্কার সাধন এবং শুভ্র পাত দ্বারা গোটা সৌধের উপর কারুকার্য করান। ১১৩৫ হিজরীতে নাদির শাহ আফশার-এর স্ত্রী ব্যাপক আকারে সকল ইমারত পুনঃনির্মাণ করান এবং বিরাট ওয়াকফ স্থাপন করেন। ১১৫৫ হিজরীতে নাদির শাহ স্বয়ং উপস্থিত হন এবং ভবন অভ্যন্তরে পুনরায় কারুকার্য, আয়না স্থাপন এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য করান, মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন এবং ইহাকে বিশেষভাবে চাকচিক্যময় করেন (বায়ান ওয়াকি, সং. লাহোর, পৃ. ১৩১)।

১২১১ হিজরীতে মুহাম্মাদ শাহ কাজার গম্বুজ এবং মীনারসমূহের উপর স্বর্ণের কারুকার্য করান। ১৮ যু'ল-হিজ্জা, ১২১৬/১৮০২ সনে মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব নাজদীর অনুসারীরা কারবালার উপর আক্রমণ চালায়। হত্যাকাণ্ড ছাড়াও তাহারা কারবালার সকল সরঞ্জাম লইয়া যায় (আ'য়ানু'শ-শী'আ, ৪/১খ, ৪০৪)। শাহ ফাত্‌হ 'আলী কাজার এই বিরাট ক্ষতি উত্তমভাবে পূরণ করেন। এইবার কারবালার ঐতিহাসিক পুনঃনির্মাণ সাধিত হয় এবং ইহাও কারুকার্যমণ্ডিত হয়। ১২২৭ হিজরীতে রওযা-টি পুনরায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। ১২৫০/১৮৩৫ সনে এই বাদশাহ-ই ইমাম হুসায়ন (রা) এবং হযরত 'আব্বাস (রা)-এর রওযাদ্বয়ের গম্বুজ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। ১২৭৬/১৮৫০ সনে শাহ নাসিরু'দ-দীন কাজার পুনরায় বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া ইহা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। ১২৮৭/১৮৭০ সনে তিনি স্বয়ং যিয়ারতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন এবং অনেক জায়গা ক্রয় করিয়া রওয়ার প্রসার সাধন করেন এবং ওয়াকফসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত কারবালা' এবং উহার মাযারসমূহ যথারীতি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সুরক্ষিত আছে। ভক্তগণ সাধ্যমত খিদমত করিয়া যাইতেছেন। ১৩৪১ হিজরীতে সায়্যিদ মুহাম্মাদ খাযীনা পূর্ব দরজার উপর একটি ঘড়ি স্থাপন করেন ; ১৩৫৮ হিজরীতে বুহরা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রচারক মুল্লা তাহির সায়ফু'দ-দীন কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া গংগা-জমুনী চাদর কবরের উপর স্থাপন করেন। ১৩৮৬ হিজরীতে জনৈক ইরানী ব্যবসায়ী, কাম্বর রাহীমী সবুজ রংয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ইরানী মর্মর পাথর প্রেরণ করেন যেন নূতন করিয়া মাযার ভবন নির্মাণ করা হয়। একই পদ্ধতিতে হযরত 'আব্বাস (রা)-এর রওযা-র এবং অন্যান্য মনীষীর কবরসমূহের নির্মাণকার্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত থাকে।

প্রবন্ধকার নিজে ১৩৮৯ হিজরীতে যিয়ারত করিতে গিয়া গোটা ঘর সবুজে ভরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) এবং হযরত 'আব্বাস (রা)-এর রওযাদ্বয়কে খুবই জাঁকজমক অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। ২০ সাফার বিভিন্ন দেশের যিয়ারতকারিগণ একত্র হন এবং দিনরাত বিলাপ (মাতম) চলিতে থাকে। এই দিবসকে আরবা'ঈন'-এর মাখসূসী বলা হয়, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ ৯ যু'ল-হিজ্জা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া রাজাব, শাবান ও মুহাররাম-এর দশ দিন কারবালা' অপরূপ দৃশ্য ধারণ করে।

উপমহাদেশের সুলতান, শাসক, ব্যবসায়ী এবং ভক্ত লোকেরা শতাব্দী ধরিয়া এই সকল রওযা যিয়ারত করিয়া আসিতেছেন। উপমহাদেশের সুলতানগণের মধ্য হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলাক (মৃ. ৭৫২ হি.) বুগদান নামক এক আমীরের হাতে এক কোটি তানকা (আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা) ইরাকের পবিত্র স্থানসমূহের জন্য প্রেরণ করেন (খালীক আহমাদ, সালাতীন-ই দেহলী কে মাযহাবী রুজহানাত, দিল্লী, পৃ. ৩৮০)। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণও উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সম্ভবত মুগল আমলেও মাযারের জন্য কিছু করা হইয়াছিল। টিপু সুলতানের তুর্কী প্রতিনিধির উল্লেখ প্রসঙ্গে আহমাদ জাওদাত পাশা (তা'রীখ-ই দাওলাত-ই 'আলিয়া, ইস্তাম্বুল ১২৯৮ হি. লিখেন, "সায়্যিদ গুলাম 'আলী শাহ, নূরুল্লাহ খান প্রমুখ ২১ রাবী'উ'ল-আখির, ১২০১ হিজরীতে রা'ঈসু'ল-কুত্তাব সুলায়মান ফায়দী আফিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত উল্লেখ করেন যে, টিপু সুলতান কামনা করেন যে, মক্কা মুকাররামা, মদীনা মুনাওওয়ারা, নাজাফ-আশরাফ, কারবালা-ই মু'আল্লা, মাশহাদ-ই ইমাম 'আলী আল-মুরতাদা (সম্ভবত 'আলী নাকী অর্থাৎ কাজিমায়ন) এবং 'আবদু'ল-কাদির জীলানীর খানকাহ্‌তে রৌপ্যনির্মিত দরজা স্থাপন করিবার এবং উল্লিখিত স্থানসমূহের সহিত একটি করিয়া মুসাফিরখানা এবং উহার উপর একটি করিয়া নাওবাতখানা নির্মাণ করিবার সরকারী অনুমতিপ্রদান করা হউক (শারীফু'ল-হাসান, উর্দু সাময়িকী, করাচী, জুন ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৫)। অনুরূপভাবে অযোধ্যার নওয়াব আসাফু'দ-দাওলা (মৃ. ১২১২ হি.) কারবালা' এবং নাজাফ-এ বেশ কিছু ভবন নির্মাণ করেন ; নাজাফ-এর নাহ্‌র-ই আসাফী আজ পর্যন্ত তাঁহার নামের সহিত সম্পর্কিত আছে

(নাজমু'ল-গিনা, ২খ, ২৪৫ ; মাদিয়্যু'ন-নাজাফ ওয়া হাদিরুহা, পৃ. ১৩১)। অযোধ্যার নাওয়াব বেগম সাহেবা তাঁহার ওয়াক্‌ফ-নামাতে কারবালা এবং নাজাফ-এর জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন (তুতারাম, তালাসসাম-ই হিন্দ, পৃ. ৩৭৫)। মুহাম্মাদ 'আলী শাহ্‌-এর স্ত্রী নাওয়াব মালিকা জাহান (মৃ. ৯ জুলাই, ১২৯৮/১৮৮১) যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসিয়া তাঁহার মরহূম স্বামীর মুকুট এবং স্বর্ণমণ্ডিত তরবারি হযরত 'আলী (রা)-র রওযার জন্য প্রদান করেন, কারবালা' এবং নাজাফবাসীর জন্য বহু লক্ষ টাকা খরচ করেন (হাকীম মুহাম্মাদ নাকী, মিনহাজু'য-যা'ইরীন, লাক্ষ্ণৌ ১৩৩১ হি., পৃ. ৫০)। তিনি বিরাট সম্পদ ওয়াক্‌ফ করেন। অযোধ্যার নওয়াবদের পর রামপুর, মাহমূদাবাদ এবং খায়রাবাদ-এর শাসকবৃন্দ এবং লাহোরের কাযালবাশ বংশও খুবই বদান্যতার সহিত কারবালা'র জন্য দান করেন। তাঁহাদের ওয়াক্‌ফসমূহ এবং কবর ও সৌধ এখন পর্যন্ত কারবালা-ই মু'আল্লাতে বিদ্যমান আছে।

কারবালা ইরাক প্রজাতন্ত্রের এই নামেরই একটি প্রদেশের প্রধান শহর। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে এই শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষের অধিক ছিল। শহরের অর্ধেক বাসিন্দা ইরানী বংশোদ্ভূত। উপমহাদেশের বহু পরিবারও এখানে বংশপরম্পরায় বসবাস করিতেছে। বাগদাদ হইতে কারবালা' পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের সুন্দর রাস্তা রহিয়াছে। কয়েক মাইল দূর হইতে শূন্যে চারটি উজ্জ্বল সোনালী মীনার এবং দুইটি স্বর্ণনির্মিত গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হয়। এই নবনির্মিত সুন্দর শহরে হযরত 'আব্বাস (রা) এবং হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযার কারুকার্য ও স্থাপত্য শিল্পের এক উত্তম নিদর্শন। এখানে দিবারাত্র হাজার হাজার দর্শককে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং দু'আয়রত থাকিতে দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ ছাড়া দ্র. (১) ড. 'আবদু'ল-জাওওয়াদ আল-কালীদার ; تاريخ كربلا وحائر الحسين عليه السلام বাগদাদ ১৩৬৮ হি. ; (২) সায়্যিদ মুহাম্মাদ হাসান মুসতাফা আল-ইকালীদার, মাদীনাতু'ল-হুসায়ন এবং মুখতাসার তা'রীখ-ই কারবালা', ইরান ১৩৬৮ হি. ; (৩) 'আবদু'ল-হামীদ আল-খায়্যাত, তা'রীখু'র-রাওদাতি'ল-হুসায়নিয়া, সচিত্র, বাগদাদ ১৩৭৬ হি. ; (৪) সায়্যিদ তায়্যিব আগা আল-জাযাই'রী, তা'রীখ-ই কারাবালা' ওয়া নাজাফ, লাহোর ১৯৬২ খৃ. ; (৫) মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল, তারীখ-ই কারবালা', তারীখ ওয়া তা'মীর, সাপ্তাহিক রিদাকার, লাহোর, মুহাররাম ১৩৯১ হি. ; (৬) ঐ লেখক, তারীখ-ই রাওদা-ই হযরত 'আব্বাস, সাপ্তাহিক শী'আ, লাহোর, মুহাররাম ১৩৯১ হি. ; (৭) E. I.^{2}, new ed, iv, 637-8; (৮) St. H. Longgigg, John Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925, নির্ঘণ্ট ; (৯) A. Musil, The Middle Euphrates, New York-1927 ; (১০) সায়্যিদ গুলাম 'আলী আহ্‌সান, রাহ্‌বান, যাইরান, আগ্রা ১৩৫৩ হি.। [ওয়া ইদারা]।

মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ ইসলাম গনী

কারবিয়া (كربية) ঃ অথবা কুরায়বিয়া (كريبية), শী'আ কায়সানিয়্যা (كيسانية) সম্প্রদায়ের একটি উপদল। আবূ কারিব (ابو كرب) অথবা আবূ কারীব (ابو كريب) কিংবা আবূ কুরায়ব (ابو كريب) নামক জনৈক শী'আ মতাবলম্বী এই উপদলের প্রতিষ্ঠাতা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. (১) দা.মা.ই., ১৭খ, ২৬০-৬১, كريبية প্রবন্ধ ; (২) ঐ, ৫০০-১, কায়সানিয়্যা (كيسانية) প্রবন্ধ ; (৩) E. I.^{2}, ৪খ, ৮৩৬-৮ (Kaysaniyya)।

সম্পাদনা পরিষদ

কারম (كرم) ঃ (আ), দ্রাক্ষালতা আঙ্গীর গাছ। মদ বা সুরার প্রতি ইসলামের আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যাঁহার জানা আছে তাঁহার নিকট মধ্যযুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে জোরদার দ্রাক্ষা চাষের বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন হেঁয়ালীর মত মনে হইতে পারে। তবুও বিষয়টি অবিসংবাদিত বাস্তবতা। কয়েকটি দেশে দ্রাক্ষা চাষ চিরাচরিত ঐতিহ্য হিসাবেও চলিতে থাকে। সেখানে বহুদিন যাবৎ দ্রাক্ষা চাষ প্রচলিত। ইহা ছাড়া দ্রাক্ষা চাষের আরও অনেক কারণ আছে। দ্রাক্ষার সুরা তৈয়ারী ছাড়াও ইহার বহুবিধ ব্যবহার (তাজা ফল, শুষ্ক কিশমিশ, সির্কা, ঔষধ হিসাবে ব্যবহার এবং সার হিসাবে খম্বিরায়িত দ্রাক্ষার তলানি ব্যবহার) আছে। তাহা ছাড়া মুসলিম দেশগুলিতে বহু অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কতক সংখ্যক বিভ্রান্ত মুসলিমও দ্রাক্ষার ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপিত বিধি-নিষেধগুলি মানিত না। ইসলামী দেশগুলিতে দ্রাক্ষা চাষের অবস্থার বিষয়টি সম্পর্কে প্রমাণ লিখিত বিবরণেই পাওয়া যায়। মুসলিম কৃষিবিদ্যা বিশারদগণ অন্যান্য জাতের ফসলের ও উদ্ভিদের তুলনায় দ্রাক্ষালতার চাষের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা মনোযোগ আকর্ষণের বিশেষ দাবী রাখে। এইসব বিশারদদের মধ্যে আছেন প্রাচ্যদেশীয় ইব্‌ন ওয়াহ্‌শিয়্যা হইতে শুরু করিয়া কিংবা কর্ডোভা (Cordova)-র বর্ষপঞ্জী হইতে শুরু করিয়া ৫ম/১১শ শতক ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের আনদালুসীয় কৃষিবিজ্ঞানিগণ যাহাদের নিকট আমরা দ্রাক্ষা চাষ সংক্রান্ত জ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি জানিয়াছি, তাঁহাদেরই এতদসংক্রান্ত জ্ঞান সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে। বহু আদি লেখক ও গ্রন্থকারের লেখা হইতে নানা তথ্য সমন্বয়ে ঐসব বিষয়ে জ্ঞানরাজি পুনরাবিষ্কার ও আত্মস্থ করিয়া (স্পেনে জুনিয়াস= Columella প্রাচ্যে এই সম্পর্কিত জ্ঞানের সহিত মূল্যবান যোজনা করিয়াছেন) এবং প্রাত্যহিক বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সংগৃহীত জ্ঞানের ঐকান্তিক নবায়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ঐ জ্ঞান আহরিত হইয়াছে।

ঐ জ্ঞানকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করা কঠিন কাজ ; কারণ চাষাবাদে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির একটির পদ্ধতির বর্ণনা কার্যত ঐ সব কৃষি পদ্ধতিগুলির যথার্থ অর্থে বলিতে গেলে অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠা সহকারে প্রয়োগ এবং অনুসৃত পদ্ধতিগুলির বহুত্বকে বুঝাইয়া থাকে। তবে সে যাহাই হউক, সাধারণভাবে ইহাই মনে হয় যে, বর্তমানকালে যেসব পদ্ধতিতে দ্রাক্ষালতার চাষাবাদ হইয়া থাকে তাহার তুলনায় তখন আরও অনেক বেশী পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং আরবগণ তাঁহাদের বিজিত দেশ ও ভূখণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি ঐ পদ্ধতিগুলির প্রসার ঘটায়, যদিও ঐ পদ্ধতিগুলি স্বাভাবিক কারণেই স্থিতি লাভ করে নাই। পদ্ধতিগুলি হইতে বাছাইয়ের জন্য বরং ঐসব পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। আবহাওয়ার সহিত খাপ খাওয়াইবার পরীক্ষা ও গবেষণা চলিয়াছে, যেমন উহা চলিয়াছে স্পেনে (দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পার্বত্য উচ্চভূমি ও নিম্নসমতল ভূমিতে দ্রাক্ষা চাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা)। এমনকি প্রাচ্য দেশেও এই ধরনের পরীক্ষা কার্য চলে। প্রাচ্যে ইবনু'ল-ফাকীহ্‌ (BGA, 125) ও মোঙ্গল আমলের কৃষিবিজ্ঞানী বিশেষ করিয়া আমাদের জন্য বিভিন্ন ধরন ও জাতের দ্রাক্ষালতা ও কুঞ্জের নাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সব নানা জাতের দ্রাক্ষালতার প্রতিটির ফলন চক্র ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কৃষিবিজ্ঞানীগণ ত্রুটি ও গুণের পরিপূরক দোষগুণের নিয়ম কাজে লাগাইয়া (যেমন, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা ফসলের জন্য সহনীয়করণ) দ্রাক্ষা চাষের

সম্ভাবনা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফলে তাঁহার প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও নিকট প্রাচ্যের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে দ্রাক্ষা চাষের বিষয়টি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইবার সুযোগ পান।

আনদালূসীয় (স্পেনীয়) কৃষি বিষয়ক রচনাবলিতে কোনও কোনও দ্রাক্ষা চাষের পদ্ধতি সার্বিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ঃ যেমন (ক) গর্তে বা পরিখা কাটা খাতে রোপণ করে (পদ্ধতিটির সুপারিশ থাকিলেও তেমন একটা প্রয়োগ করা হয় নাই) নীচু ধরনের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জ। এই পদ্ধতিতে ১.৪০ মিটার অন্তর অন্তর দ্রাক্ষালতা রোপণের সুপারিশ আছে। ঐ লতাগুলির জন্য ঠেস দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে নতুবা নীচু মাপের আঁকশি লাগানো থাকিতে হইবে। সূর্যের কিরণ হইতে দ্রাক্ষাঝোপকে রক্ষা করার জন্য ঐ দ্রাক্ষালতাগুলিকে খুব কম ক্ষেত্রেই পাতলা করিয়া দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি একান্তভাবে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে দ্রাক্ষা চাষের জন্য সংরক্ষিত; (খ) লতাইয়া উঠা দ্রাক্ষাকুঞ্জ যাহা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে চিরাচরিতভাবে দৃষ্ট হয়। এই ধরনের দ্রাক্ষা চাষের ক্ষেত্রে দ্রাক্ষালতা লতাইয়া উঠিবার সুবিধার জন্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কিছু লতানোর অবলম্বন হিসাবে কাজ করার উপযোগী অগভীর মূলসম্পন্ন কিছু গাছ লাগানো হয়। আঙুর লতা ঐ গাছগুলিকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া যায়। ঐ সহায়ক গাছগুলিকে তাই স্বভাবতই ছাঁটিয়া একটি মাপা উচ্চতায় স্থির রাখিতে হয়, যাহাতে ঐ গাছগুলি আবার দ্রাক্ষা কুঞ্জের জন্য ক্ষতিকারক না হইয়া পড়ে। আদি কালের আভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে গিয়া আনদালূসীয় কৃষিবিজ্ঞানীগণ অন্য ফসলের সহিত দ্রাক্ষার মিশ্র চাষ পদ্ধতির বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উহাতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাঁহারা, বিশেষত দ্রাক্ষা ও ডুমুর জাতীয় ভূমধ্যসাগরীয় ফলের মিশ্র চাষের ব্যাপারটি আদৌ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন না। দ্রাক্ষা চাষের জন্য সর্বোত্তম মাটি হইতেছে পলিযুক্ত, আর্দ্র অথচ ভিজা নয় এমন মৃত্তিকা। ইহা অবশ্য পশ্চিম দেশীয় কৃষিবিজ্ঞানীদের মতো। ইব্ন ওয়াহশিয়ার মতে, মাটি একই সঙ্গে বেলে হইতে হইবে। তবে যেসব জাতের দ্রাক্ষালতা সহজে মৃত্তিকা হইতে পুষ্টি আহরণে সক্ষম, সেই সব জাতের জন্য সমৃদ্ধ মৃত্তিকাও ফলদায়ক হইতে পারে। ফলত বাধ্যতামূলক কৃষির যে আধুনিক ধারণা রহিয়াছে উহার পরিবর্তে তখন পরস্পর পরিপূরকতার নীতিটি প্রযুক্ত হইত। দ্রাক্ষাকুঞ্জের চাহিদামাফিক উপযুক্ত পরিবেশযুক্ত জমি বাছাই করা হইত। নীচু কুঞ্জ জাতের দ্রাক্ষালতার জন্য ঢাল ও পাহাড়ের পার্শ্বদেশ এবং উর্ধ্বমুখী দ্রাক্ষাকুঞ্জের জন্য উপত্যকা ও সমতল ভূমি বাছাই করা হইত। আর দ্রাক্ষালতা বা গাছের উৎকর্ষ যাচাই করার জন্য পার্বত্য অঞ্চল বাছাই করা হইত দ্রাক্ষা চাষের জন্য। জলাভূমি এলাকায় দ্রাক্ষা চাষ নিষিদ্ধ ছিল। কেননা জলাভূমিতে দ্রাক্ষালতায় বেশী করিয়া রোগ-জীবাণু আক্রমণ করে। দ্রাক্ষা চাষের জমি তৈয়ারী করিতে হইলে কোদালের সাহায্যে গভীর করিয়া জমিতে চাষ দিতে হইবে। মাঝারি মানের মাটিতে লাঙলের চাষ দিতে সাধারণত যে ধরনের খাত লাঙ্গলের ফলায় সৃষ্টি হয় উহার চাইতে গভীর খাত বা পরিখা কিংবা গর্ত করিতে হইবে। ভাল জমিতে অন্তত দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত করিতে হইবে, যাহাতে দ্রাক্ষালতাগুলিকে রৌদ্রের হাত হইতে বাঁচানো যায়। প্রথম বৎসরের শেষের দিকে কিছু মাটির উপরের কাজ করিতে হইবে অর্থাৎ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফসলের মাঝের মাটি লতা ছাঁটাইয়ের ছুরির সাহায্যে দ্রাক্ষালতার শিকড় বাঁচাইয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে। আর যে শিকড়গুলি দেখা যাইবে মাটির উপরিভাগের একেবারে কাছাকাছি উঠিয়া আসিয়াছে সেগুলি কাটিয়া ফেলিয়া মাটির গভীরে প্রবিষ্ট শিকড়গুলি বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। দ্রাক্ষা চারা পরিচর্যাগারে দ্রাক্ষালতার কাটিং, স্তরীকরণ (তাকবীস), বীজ বপন ইত্যাদির আকার দ্রাক্ষালতা পুনরুৎপাদনের কাজ চলিত। আর এই ব্যাপারটা আধুনিক কালে অনুসৃত পদ্ধতির মত করিয়াই সম্পন্ন হইত। স্তরীকরণের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত পদ্ধতিসম্মত। দ্রাক্ষালতার শাখা, কুঁড়িযুক্ত শাখা, স্তরীকৃত শাখা ও কাটিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রায়শই ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে যে, এইগুলি একত্রে একই গর্তে রোপণ করা যাইবে না। আর এই বক্তব্য হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আসলে ইহাই করা হইত। বেশীরভাগ লেখকই এই মর্মে একমত হইয়া সুপারিশ করেন যে, দ্রাক্ষালতা বসন্তকালে রোপণ করাই শ্রেয়, যদিও আগাম জাতের জন্য শরৎকালে রোপণও চলিতে পারে (এই ব্যাপারে আজও ইতস্তত ভাব পরিলক্ষিত হয়)। মিসরের রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে উল্লেখ আছে যে, দ্রাক্ষালতা ফেব্রুয়ারী বা মার্চে রোপণ করা হয়। তিন বৎসর যাবৎ নিকৃষ্ট মাটিতে দ্রাক্ষালতার বীজ হিসাবে ব্যবহার্য অংশ বা কলমগুলি যাচাই করিবার পর সেইগুলি নির্বাচিত দ্রাক্ষাক্ষেত্রে রোপণ করা হয়।

দ্রাক্ষালতা রোপণ ও ছাঁটাইয়ের সময় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করিয়া মধ্য যুগে দ্রাক্ষাকুঞ্জে যখন আরও একটি সজির চাষ করিয়া তাহাতে অপর্যাপ্ত প্রাণীজ সার দেওয়া হইত ঐ সময়ে দ্রাক্ষালতাগুলির জন্য সারের আবশ্যকতা দেখা দিত। ঐ সজির গাছ বা লতাপাতাগুলিকে শুকাইয়া পাউডারের চূর্ণবৎ করা হইত এবং এরিস্টোটলীয় নিয়ম-সূত্র অনুযায়ী ঐ সজি বা উদ্ভিদের ডাঁটা বা কাণ্ডগুলিই অপেক্ষাকৃত এই শুষ্ক সার করার কাজে বেশী ব্যবহার করা হইত। এই শুষ্ক সারের ব্যবহারেকে আনদালূসীয় দ্রাক্ষা চায়ের বিশেষ আধুনিক দিক। আবহাওয়া, জলবায়ু, মৃত্তিকার ধরন ও নির্বাচিত জাতের দ্রাক্ষালতার উপর সেচ নির্ভর করিত। অনেক ক্ষেত্রেই দ্রাক্ষাচারায় পানির সরবরাহ উপযুক্ত পরিমাণে বেশি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রসালো ও নাতিপরিপূর্ণ দ্রাক্ষা ফল পাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই হাতে করিয়া পানি বহন করিয়া দ্রাক্ষা চারায় দেওয়া হইত।

দ্রাক্ষাকুঞ্জের ফলন বৃদ্ধির জন্য নিয়ম ও পদ্ধতি হিসাবে দ্রাক্ষালতা ছাঁটিয়া (যাব্র) দেওয়ার পদ্ধতি শীতকালে কাজে লাগানো হইত। আর এই কাজে লৌহনির্মিত ছাঁটাই কাঁচি (মিনজাল) ব্যবহার করা হইত। এই হাতিয়ারটির ব্যবহারের কথা Columella বর্ণনা করিয়াছেন। এই ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল দ্রাক্ষালতার শাখাগুলিকে (চারাগুলিকে) একটি চমৎকার কুঞ্জ হিসাবে গড়িয়া তোলা। কলম করার বিষয়টি প্রাচীন কৃষকদেরও জানা ছিল। আর মুসলিম কৃষিবিশারদগণই এই কলমের বিষয়টি লইয়া অশেষ ও বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ও সেইগুলির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এই ক্ষেত্রে দ্রাক্ষা ফলের আকৃতি ও রং, দ্রাক্ষারসের সিরাপ বৈশিষ্ট্য, আশু বা নাবী জাতের দ্রাক্ষালতা, সুরা-সারের অবস্থিতির মাত্রা সকল কিছুই বিবেচনা করা হইত। বিশেষ বিশেষ চাহিদা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে কোনও কোনও সময় অভিনব ও অভাবনীয় সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত (অর্থাৎ জলপাই গাছের ডালের সহিত দ্রাক্ষালতার 'কলম' করা হইত)। কারিগরি দিক হইতে এই কলম করার কাজটি ছিল ছিদ্র বা কাটিয়া ডাল জোড়া লাগানোর মাধ্যমে 'কলম' করা (তাতা'আমা, ইব্ন হাজ্জাজ-এর মতে যাহা আল-'আওওয়াম কর্তৃক উদ্ধৃত)।

আধুনিক কালের মতো মধ্যযুগের আলোচ্য সময়েও রোগ-বালাই ও প্রতিকূল আবহাওয়া হইতে দ্রাক্ষা ফসল রক্ষার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট চাষীদেরও মাথাব্যথার কারণ ছিল। এই ধরনের প্রতিকূলতার মুখে চাষীরা ছিল অসহায়। রোমকদের অপেক্ষাও আনদালুসীয়গণ সাগরকূলের নিকট আঙুর চাষের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকিত। আর তাহাদের এই শঙ্কার পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তিও ছিল। যেমন, সাগর উপকূল অঞ্চলে অসময়ে বৃষ্টিপাত হইত বেশী, যাহা দ্রাক্ষাকুঞ্জের জন্য ক্ষতিকর। ইব্‌ন ওয়াহশিয়া দ্রাক্ষালতার রোগ-ব্যাধির লক্ষণগুলির বিবরণ অত্যন্ত সঠিকভাবে দিয়াছেন। ঐ বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারণ করা যায় যে, ঐ কালে দ্রাক্ষালতা কীটাক্রান্ত হইত, দাগ পড়া ও পাণ্ডু রোগ দেখা দিত। এইসব রোগে নিরাময়মূলক চিকিৎসার বিধান দেওয়া হইত। এইজন্য তৈল, মদ ও পানি মিশ্রিত ঔষধ প্রয়োগ করা হইত দ্রাক্ষালতার আলগা কাণ্ডে। ইব্‌ন হাজ্জাজ দ্রাক্ষালতার কাণ্ড খড় দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ইহাতে দ্রাক্ষা ফসল কুয়াসা হইতেও রক্ষা পাইত।

স্পেন ও ইরাকের পদ্ধতির মতো সকল মুসলিম দেশের দ্রাক্ষা চাষ সম্পর্কিত বিবরণ একই রকমের নিখুঁত ও বিস্তারিত তথ্য আমরা না দিতে পারিলেও বিশেষ করিয়া ভূগোলবিদদের প্রদত্ত তথ্যাবলীর কল্যাণে বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সকল মুসলিম দেশেই অন্ততপক্ষে সেইসব অঞ্চলে মধ্যযুগে যাযাবর শ্রেণীর অভিযানের আগে অবধি আঙুর চাষের অস্তিত্ব ছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহার পরেও দ্রাক্ষালতার চাষ বজায় থাকে। এই দেশগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ আরব, মেসোপটেমিয়া, ইরান, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া ও মিসর। মুগল আমলে মুস্‌তাওফী, কায্‌বীনী তুর্কী এশিয়া-মাইনর অঞ্চলে আর্মেনীয় ও গ্রীকদের নিকট হইতে পাওয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অস্তিত্ব টিকিয়া রহিয়াছে বলিয়া দেখিতে পান। রাজদরবারগুলিতে মদ সরবরাহ কখনও তেমন সমস্যা ছিল না। আর কবিগণ যাঁহারা সুরার 'গুণকীর্তন' করেন তাঁহাদের ইহার সহিত কোনও না কোনওভাবে পরিচয় ঘটিয়া থাকিবে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ক্রুসেডারগণ সিরীয় উপকূলে দ্রাক্ষা চাষ গড়িয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মধ্যযুগের শেষ নাগাদ দ্রাক্ষা চাষে ভাটা পড়ে। ইহার কারণ এই ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ, ইসলামে ধর্মান্তর এবং সেই সঙ্গে এই ফসলের চাষে যাযাবর জনসমষ্টির বাধা। অন্যদিকে আবার উল্লেখ করিতেই হয় যে, য়ুরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন ও দেশের অভ্যন্তরে আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কতিপয় মুসলিম দেশে, বিশেষত উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে বলিতে গেলে কতকগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নূতন এলাকায় দ্রাক্ষাচাষ গড়িয়া ওঠে। এই দেশগুলির উল্লিখিত চাষাবাদ এমন একমুখী বৈশিষ্ট্য বা একফসলী কৃষি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যে, সাম্প্রতিক কালে ঐ চাষবাদে পরিবর্তন ও অভিযোজন আনায় বেশ কিছু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াহশিয়া, আল-ফিলাহ'ন-নাবাতিয়া (অসম্পাদিত, দ্র. ইবন ওয়াহশিয়া, মিসরীয় সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন) ; (২) Miller-Wodarg, in Islam (1953)। আনদালূসী কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে দ্র. (৩) ফিলাহা, ২খ., দ্রাক্ষাকুঞ্জ বিষয়ে লিখিয়াছেন ইব্‌ন ওয়াফিদ, স্পেনীয় অনু. ও সম্পা. Millas-Vallicrosa, in Al-Andalus, viii (1943), 281-332; (৪) ইবন বাসসাল, স্পেনীয়, অনু. ঐ লেখক, in al-Andalus, xiii (1948) 397-430-এ ; আবু'ল-খায়র আল-ইশবীলী, পাণ্ডু. Paris B. N. 4764, fols. 64 প. ; (৫) ইবনু'ল-'আওয়াম, সম্পা. Blanquieri (mediocre edn.) Madrid 1802 খৃ., ফরাসী অনু. Clement-Mullet, Paris 1864-7, অধ্যায়সমূহ ২য় (সার প্রয়োগ), ৭ম (জমি চাষ), ৯ম (ছাঁটাই), ১৪শ (রোগ-বালাই), ১৬শ (সংরক্ষণ), (দ্র. Lucie Bolens, Les methodes culturales au moyen Age d'apres les traites d'aglonomie andarous, Geneve 1974)। এবং ঔষধ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কিত সূত্র নির্দেশসমূহ ঃ যেমন (৬) Calendrier de Cordoue-এর নব সংস্করণ ও ফরাসী অনু. Ch. Pellat, Leiden 1961। আরও দ্র. ইবন যুবায়রের মতো আরব ভৌগোলিকদের প্রধান রচনাবলী, স্থানবিশেষে। আধুনিক কালের রচনাবলীর জন্য প্রধান প্রধান দেশের উপর, যেমন স্পেনের উপর রচিত ব্যাপক পরিচিতিসম্পন্ন রচনাগুলি দ্রষ্টব্য। যেমন, (৭) Levi-Provencal-এর গ্রন্থের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাগরিব দেশগুলির জন্য ঃ (৮) Brunschvig ও ইদরীস-এর রচনাবলী ; ইরানের জন্য ঃ (৯) Spuler-এর রচনা এবং Cambridge History of Iran, V-এ Petrushevsky-র অধ্যায়। স্পেনীয় মুসলিম কৃষি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দ্র. (১০) Cl. Cahen, in JESHO, 1971।

L. Bolens and Cl. Cahen (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

কারমাতী (قرمطى) ঃ ব. ব. কারামিতা (قرامطة) ; এই নামটি ইসমা'ঈলী মতাবলম্বী একটি শাখার অনুসারীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। আদিতে ইহা সাধারণত আল-কুফার সাওয়াদের অন্যতম ইসমা'ঈলী নেতা হামদান কারমাত (দ্র.)-এর অনুসারীদের বুঝাইত। হামদানের উপনাম কারমাত (কারমাতুয়া) কথাটির নানা অর্থ ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কারমাত ক্ষুদ্র পা কিংবা লাল চক্ষুর অধিকারীকে বুঝানো হইয়াছে। অবশ্য এখানে লক্ষণীয় যে, ইমামী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নীশাপুরের আল-ফাদল ইবন শাযান (মৃ. ২৬০-৮৭৩-৪) কারামিতা (আর-রাদ্দু 'আলা'ল-কারামিতা) মতবাদের খণ্ডনের একটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে রচনা করিয়াছিলেন।

এই কারণে হামদানের প্রচারমূলক তৎপরতা অবশ্যই ২৬১/৮৭৪-৫ কিংবা ২৬৪/৮৭৭-৮ সনের বহু পূর্বেই শুরু হইয়া থাকিবে (যাহা সূত্রগুলির মতে কারামিতা দলের সূচনাকাল) অথবা তাঁহার ঐ উপনামটি খোদ এই দলের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। হামদান যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাহা যে কোনওভাবেই হউক সমসাময়িক সাধারণ ইসমাঈলী আন্দোলনের একটি অংশমাত্র ছিল এবং ঐ আন্দোলনের নেতৃত্বকেও হামদান স্বীকার করিতেন। ২৮৬/৮৯৯ সনে ঐ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে হামদানের বিদ্রোহের পর এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে কারামিতা বলিতে সাধারণত ঐসব ইসমা'ঈলী গোষ্ঠীগুলিকে বুঝানো হইত যে গোষ্ঠীগুলি হামদানের বিদ্রোহে যোগ দেয় ও উহার ফলে উহারা ইমামাতে ফাতিমী খলীফাদের দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। কারমাতী কথটি অনেক ক্ষেত্রে অবমাননাকর অর্থেও ফাতিমী ইমামাতের সমর্থক ইসমাঈলীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত। অবশ্য বক্ষ্যমান নিবন্ধে কেবল পূর্বোক্ত ইসমা'ঈলী গোষ্ঠীসমূহের ইতিহাস এবং ফাতিমী ইসমা'ঈলী আন্দোলনের সঙ্গে উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক আলোচিত হইবে।

ইসমা'ঈলী আন্দোলনের বিভক্তির পর আনুমানিক ৩০০/৯১৩ সন অবধি ইতিহাস ঃ ২৮৬/৮৯৯ সনে ইসমা'ঈলী আন্দোলনের বিভক্তির ফলে যে সব ইসমা'ঈলী ফিরকা ইমামাতে 'উবায়দুল্লাহর (পরবর্তীকালে ফাতিমী খলীফা আল-মাহ্দী) দাবী অস্বীকার করে তাহারা সম্মিলিত নেতৃত্বহারা হয় এবং তাত্ত্বিক সঙ্কটে পড়ে। মেসোপটেমিয়া (ইরাক)-এ হামাদান ও তাঁহার প্রধান সহকারী 'আবদান (দ্র.) সকল প্রকার ধর্মীয় মতবাদ প্রচারমূলক তৎপরতা বন্ধ করিয়া দেন। পরিণামে আত-তালিকানের অধিবাসী ও 'উবায়দুল্লাহ্র এক আত্মীয়ের উসকানিতে আরেকজন দা'ঈ যিক্রাওয়ায়হ (দ্র.) কর্তৃক 'আবদান নিহত হন। 'আবদানের অনুসারিগণ বদলা লইবার হুমকি দিলে যিক্রাওয়ায়হ আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। ২৮৯/৯০২ সনে তিনি তাঁহার পুত্র আল-হুসায়ন (বা আল-হাসান, সাহিবু'শ-শামা নামে পরিচিত)-কে সিরিয়ার মরু অঞ্চলে বানূ কাল্বকে তাঁহার দলের মতবাদের অনুসারী করাইবার জন্য পাঠান। আল-হুসায়ন অবশ্য বানু'ল-উলায়স গোত্র ও বানু'ল-আসবাগ গোত্রের কিছু লোকের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। ইহারা অতঃপর আল-ফাতিমিয়্যিন ধর্মীয় নাম গ্রহণ করে। এখানে আল-হুসায়নের সঙ্গে সাহিবু'ন-নাকা যোগ দেন। আত-তাবারীর বর্ণনা অনুসারে, এই ব্যক্তি ছিলেন আল-হুসায়নের ভাই য়াহ্য়া। তবে শারীফ আবূ মুহসিনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন 'উবায়দুল্লাহর উল্লিখিত আত্মীয়। সাহিবু'ন-নাকা নিজেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলের একজন বংশধর দাবী করিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল দামিশক অবরোধের এক ব্যর্থ প্রয়াসের পর শাবান ২৯০/জুলাই ৯০৩ সালে নিহত হন।

ইহার পর সাহিবু'শ-শামা নেতা হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও নিজেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলের অন্যতম বংশধর দাবী করিয়া আমীরুল-মু'মিনীন ও আল-মাহদী খেতাব ধারণ করেন। আলেপ্পোয় ব্যর্থ অভিযানের পর তিনি হিম্স, হামাত, মা'আররাতু'ন-নু'মান, বালাবাক্ক এবং ইসমা'ঈলী আন্দোলনের নেতাদের সাবেক বাসস্থল সালামিয়া দখল করেন। এখানে তিনি সকল হাশিমী ও অন্যান্য অধিবাসীকে হত্যার আদেশ দেন। ফাতিমী ইসমা'ঈলী একটি সূত্র অনুসারে তিনি প্রথমে 'উবায়দুল্লাহ্কে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করেন যাহাতে তিনি ফিরিয়া আসিয়া নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তবে 'উবায়দুল্লাহ কারমাতীদের আগেই সালামিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইবার পর সাহিবু'শ-শামা সালামিয়াতে 'উবায়দুল্লাহ্র প্রাসাদ লুণ্ঠন করেন ও সেখানে হত্যাকাণ্ড চালান। 'উবায়দুল্লাহ্র পরিবার ও অন্যান্য সদস্য যাহারা থাকিয়া গিয়াছিল তাহাদের সকলকে হত্যা করা হয়। তবে এক প্রচণ্ড পরাজয়ের পর সাহিবু'শ-শামা তাঁহার অনুসারীদের ত্যাগ করিয়া মেসোপটেমিয়ায় পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। তবে তিনি ধরা পড়েন এবং রাবী'—(১), ৩৯১/জানু. ৯০৪ সনে বাগদাদে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ২৯৩/৯০৬ সনে যিক্রাওয়ায়হ আবূ গানিম নাস্র নামে আরেকজন দা'ঈকে বানূ কাল্ব গোত্রের মাঝে তাঁহার অনুসারীদের নিকট পাঠান। বানূ কালবের অনুসারীরা নাস্রের নেতৃত্বে বুসরা ও আযরি'আত পদানত ও লুণ্ঠন করার পর আবার দামিশককে আক্রমণ চালায় এবং তাবারিয়া ও হীত-এ নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চালায়। রামাদান ২৯৩/জুলাই ৯০৬ সনে নাসরের কিছু সমর্থক সরকারের নিকট হইতে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য অনুকম্পা লাভের আশায় নাস্রকে হত্যা করে। ইহার পর যিক্রাওয়ায়হ তাঁহার অবশিষ্ট সমর্থকদের নিকট এই বলিয়া আরও একজন বার্তাবাহক পাঠান যে, তাহাদের বিজয়ের দিন সমাগত আর তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে অচিরেই তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। সাওয়াদের নিকট যিক্রাওয়ায়হ-এর সমর্থকদের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা কুফায় এক আকস্মিক আক্রমণ চালায়। তবে আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা হয়। যু'ল-হিজ্জা ২৯৩/অক্টোবর, ৯০৬ সনে যিকরাওয়ায়হ তাঁহার গোপন আস্তানা আস-সাওওয়ান হইতে আল-কাদিসিয়ার নিকট বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার বাহিনী অতঃপর 'আব্বাসী খলীফার এক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিবার পর খুরাসানী কয়েকটি কাফেলা ও মক্কায় হাজ্জ হইতে প্রত্যাগত পশ্চিম পারস্যের কিছু হাজ্জীকে আক্রমণ করে। ঐ হামলায় বেশীরভাগ হাজ্জীই নিহত হন। রাবী' (১) ২৯৪/জানু. ৯০৭ সনে যিক্রাওয়ায়হ এক যুদ্ধে আহত হইয়া ধৃত হইবার কয়েকদিন পর মারা যান। তাঁহার বহু সমর্থককে ঘেরাও করিয়া আটক করা হয় ও তাহাদের হত্যা করা হয়। এইভাবে সিরিয়ায় কারমাতী বিদ্রোহের অবসান ঘটে। যিকরাওয়ায়হ-এর কিছু অনুসারী সাওয়াদে ছিল। তাহারা যিকরাওয়ায়হ-এর মৃত্যুর কথা অস্বীকার করে এবং এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে যে, তিনি ফিরিয়া আসিবেন। ২৯৫/৯০৭-৮ সনে সাওয়াদের কারামাতীদের মধ্যে আবূ হাতিম আয-যুত্তী নামে একজন দা'ঈ সক্রিয় হইয়া ওঠেন। তিনি কারামাতীদের কোনও কোনও সব্জি খাওয়া ও পশু যবেহ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। আর এই কারণে তাঁহার অনুসারিগণ বাকলিয়া (দ্র.) নামে পরিচিত হয়। পরে সাওয়াদের কারমাতীদের সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে এই বাকলিয়া নাম প্রযোজ্য হয়। কারমাতীদের প্রায় সকলেই এই বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকে যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল জীবিত আছেন এবং মাহ্দী হিসাবে তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন।

হামদান ও 'আবদান আবূ সা'ঈদ আল-জান্নাবীকে বাহরায়নে পাঠাইয়াছিলেন। ইসমা'ঈলী আন্দোলনে বিভক্তির বহুকাল আগেই এই ব্যক্তি ২৭৩/৮৮৬-৭ সনে তাঁহার কর্মতৎপরতা শুরু করেন। 'আবদানের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি 'উবায়দুল্লাহ বিরোধী বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং আবূ যাকারিয়া আজ-জামামী নামে একজন দা'ঈকে হত্যা করেন যাহার সহিত ইহার আগে তিনি সহযোগিতাও করিয়াছিলেন। আবূ যাকারিয়াকে তাঁহার আগে সম্ভবত য়ামানের দা'ঈ (আজ-জামামী এই নিসবাত বলিতে সম্ভবত জামাম নামে লা'আ-র একটি বাজার শহরকে বোঝানো হইয়াছে। এই শহরেই প্রথমে ইব্ন হাওশাব বসবাস করিতেন) ইব্ন হাওশাব পাঠাইয়াছিলেন। ইব্ন হাওশাবের মত যাকারিয়াও ফাতিমীদের অনুগত ছিলেন। কাদী 'আবদু'ল-জাব্বারের বর্ণনা অনুযায়ী আবূ সা'ঈদ আবূ যাকারিয়াকে হত্যার পর তিনি দাবী করেন, তিনিই মাহদী মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়ার প্রতিনিধি এবং মাহদী ৩০০/৯১২-৩ সন নাগাদ আবির্ভূত হইবেন।

য়ামানে দুইজন দা'ঈ নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের একজন ইব্ন হাওশাব (দ্র. মানসূর আল-য়ামান) ও অন্যজন 'আলী ইবনু'ল-ফাদ্ল। এই দুই দা'ঈ জাবাল মাসওয়ার ও বিলাদ য়াফি' নামে দুইটি পৃথক অঞ্চলে কাজ করিতেন। প্রথমদিকে তাঁহারা 'উবায়দুল্লাহ্র প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু ইবনু'ল-ফাদলের ঐ আনুগত্য সন্দেহাতীত ছিল না এবং প্রবীণ দা'ঈ ইব্ন হাওশাবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক মাঝে মাঝেই তিক্ত হইয়া ওঠে। দুই দা'ঈ-ই তাঁহাদের নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার সম্প্রসারণে তৎপর

থাকিলেও এই ক্ষেত্রে ইব্নু'ল-ফাদল অপেক্ষাকৃত বেশী সাফল্য লাভ করেন। রামাদান ২৯৯/মে ৯১২ সনে সান'আ' পুনর্দখলের পর তিনি ফাতিমী খলীফাদের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া শারী'আ বিলুপ্ত করেন এবং নিজেকে মাহদী বলিয়া দাবী করেন। এই ব্যাপারে ইব্ন হাওশাব তাঁহাকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করিলে ইব্নু'ল-ফাদল তাহা অগ্রাহ্য করেন এবং ইব্ন হাওশাবকে তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানাইয়া তাঁহাকে জাবাল মাসওয়ারে আট মাস অবরোধ করিয়া রাখেন। তবে ব্যর্থতার মধ্য দিয়া ঐ অবরোধের অবসান ঘটে যদিও ইব্ন হাওশাব তাঁহার এক পুত্রকে যিম্মী হিসাবে ইব্নু'ল-ফাদলের হাতে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইব্নু'ল-ফাদল ইহার পর সান'আ' য়া'ফুরী আস'আদ ইব্ন আবী য়া'ফুরের নিকট অর্পণ করেন। আস'আদ তাঁহার সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলে ইব্নু'ল-ফাদল তাঁহার মূল অধিবাস আল-মুযায়খিরায় প্রত্যাবর্তন করেন। রাবী' (২) ৩০৩/অক্টোবর ৯১৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আল-ফা'ফা' (?) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁহার নিজের অনেক সহযোগীকে হত্যা করেন। আস'আদ ইব্ন য়া'ফুর বিদ্রোহী হইয়া দীর্ঘকাল অবরোধের পর রাজাব ৩০৪/জানু. ৯১৭ সনে আল-মুযায়খিরা দখল করেন। চারমাস পর তিনি আল-ফা'ফা' ও অন্যান্য কারমাতী নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন এবং তাহাদের কর্তিত মস্তক বাগদাদে পাঠাইয়া দেন। এইভাবে ইব্নু'ল-ফাদলের আন্দোলনের অবসান ঘটে।

আর-রায় অঞ্চলে বসবাসকারী ইসমা'ঈলী দলের লোকেরা স্থানীয়ভাবে তাহাদের প্রথম দা'ঈ খালাফ আল-হাল্লাজের নামানুসারে খালাফিয়া নামে পরিচিত হয় ও তাহারা সেখানে গোটা ইসমা'ঈলী আন্দোলনের বিভক্তির আগে বেশ ভালভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবস্থাগত সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে মনে হয়, এই ইসমা'ঈলী দলটি 'উবায়দুল্লাহ্র ইমামাত স্বীকার করে নাই, বরং ঐ দল কা'ইম হিসাবে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় থাকে। সুন্নীদের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হইবার পর দা'ঈ গিয়াছ খুরাসানে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই পলায়নের ঘটনাটি ঘটে সম্ভবত ৩য় শতক/৯০৩-১৩-এর শেষ দশকে। খুরাসানে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, অমুক তারিখে মাহদী ফিরিয়া আসিবেন। তবে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ অনুযায়ী মাহদীর আবির্ভাব না ঘটায় আর-রায়-এ প্রত্যাগত দা'ঈ গিয়াছ তাঁহার অনুসারীদের সমর্থন হারান এবং অচিরেই তিনি সকলের মধ্য হইতে হারাইয়া যান।

খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সানিয়া-য় গোড়ার দিকের ইসমা'ঈলী আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যাদি অত্যন্ত খণ্ড-বিখণ্ড ও বিক্ষিপ্তাকারে পাওয়া যায়। ইসমা'ঈলী সূত্রগুলির তথ্যানুযায়ী ২৯৭/৯০৯ সনে মাগরিবে ক্ষমতায় আসার পর 'উবায়দুল্লাহ্ একের পর এক দুই দা'ঈকে ঐ অঞ্চলে পাঠান ও তাঁহারা নীশাপূরে তৎপর ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই প্রমাণও পাওয়া যায় যে, অনেক আগে হইতেই পূর্ব পারস্যে ইসমা'ঈলী তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইমামী আল-ফাদল ইব্ন শাদহান নীশাপূরে কারমাতী মতবাদের খণ্ডনে লেখনী ধরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া যাহা জানা যায়, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, ২৬০/৮৭৪ সনের আগে হইতেই সেখানে কারমাতীদের উপস্থিতি ছিল। ইসমা'ঈলী আন্দোলনের বিভক্তিকালে তালিকান ছিল ইসমা'ঈলী মতবাদ প্রচারের একটি কেন্দ্র এবং এখান হইতেই পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় দা'ঈ পাঠানো হয়। ইমামী লেখক সা'দ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-কুম্মী (আনুমানিক) ২৯০/৯০৩ সনে তাঁহার লেখা এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইমাম জা'ফার আস-সাদিকের পর ইমামাত ইসমা'ঈলের মধ্য দিয়া নয়, বরং তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্র মধ্য দিয়া উত্তরিত হইয়াছে বলিয়া 'উবায়দুল্লাহ্ তাঁহার মত প্রচার করেন। 'উবায়দুল্লাহ্র এই মতের অনেক সমর্থক ছিল খুরাসানে। অন্যদিকে আর-রায়-এর দা'ঈ গিয়াছ খুরাসানে অবস্থানকালে কারমাতী মতবাদের পক্ষে প্রচার অব্যাহত রাখিয়া খুরাসানের আমীর আল-হুসায়ন ইব্ন 'আলী আল-মারওয়াযীকে মারব আর-রূয-এ তাঁহার মতবাদে দীক্ষিত করেন। ফলে গোটা আত-তালিকান, মায়মানা, হারাত, গারজিস্তান ও আল-গূরে ইসমা'ঈলী মতবাদ বিস্তার লাভ করে। এইসব অঞ্চলে আমীর আল-হুসায়ন ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার ফলে বলা যাইতে পারে যে, এই আমলে ফাতিমী ও কারমাতী উভয় ইসমা'ঈলী মতবাদই পূর্ব পারস্যে বেশ জোরদার ছিল।

ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য-এর (৩৪১/৯৫৩) ক্ষমতায় আরোহণ অবধিকাল (আনু. ৩০০/৯১৩ সন হইতে) ঃ ৪র্থ শতক/৯১২-২৩-এর প্রথম দশকে দেখা যায়, কারমাতী আন্দোলন উহার আদর্শিক ঐক্য ফিরিয়া পাইয়াছে, যাহা পরপর্তী দশকে কারমাতী তৎপরতার ব্যাপক কার্যাবলীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। Transoxania-র দা'ঈ আন-নাসাফী (দ্র.) রচিত কিতাবু'ল-মাহসূল নামক গ্রন্থটি এই প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গ্রন্থ ইসমা'ঈলী মরমী তত্ত্বে নব্য প্ল্যাটোনিক বিশ্বতত্ত্বের বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। ঐ গ্রন্থে আরও বলা হয়, মুহাম্মদ ইসমা'ঈলের ইমামাতই সঠিক এবং তিনি মাহদী হিসাবে ফিরিয়া আসিবেন। কারমাতী মহলে অচিরেই গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। গিয়াছের এক শাগরিদ আবূ হাতিম আর-রাযী (দ্র.) ঐ শতকে আর-রায়-এ খালাফের বংশধরদিগকে সরাইয়া দিয়া দা'ওয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবূ হাতিম প্রচণ্ড উদ্যমের পরিচয় দিয়া তাবারিস্তান, ইসফাহান, আযারবায়জান ও জুরজানে দা'ঈ প্রেরণ করেন এবং বাহরায়নের কারমাতী নেতা আবূ তাহিরের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ রক্ষা করেন। দৃশ্যত মনে হয়, তিনি অনুপস্থিত ইমামের খলীফা হইবার দাবী করেন। আর এই ধরনের খলীফা হওয়ার অর্থ অন্যান্য দা'ঈর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। রায়-এর দা'ঈও পরে এই পদমর্যাদার অধিকারী হন। রায়-এর গভর্নর আহমাদ ইব্ন 'আলী (৩০৭-১১/৯১৯-২৪) দায়লামী নেতা আস্ফার ইব্ন শীরাওয়ায়হ এবং যিয়ারী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারদাবীজ প্রমুখ সাময়িকভাবে হইলেও তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দায়লামবাসীদের মধ্যে আবূ হাতিমের দা'ওয়ার সাফল্যের প্রমাণ আলামূতে দায়লামের জুস্তানী বাদশাহ সিয়াহচাশ্ম (নিহত আনু. ৩১৬/৯২৮)-এর কারমাতী মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ হইতে পাওয়া যায়।

বাহরায়নে ৩০০/৯১৩ সনে আবূ সা'ঈদের হত্যাকাণ্ডের পর সেখানকার কারমাতীগণ ৩১১/৯২৩ সন পর্যন্ত শান্ত থাকে। তবে ঐ বৎসরই তাহারা আবূ সা'ঈদের পুত্র আবূ তাহির আল-জান্নাবী (দ্র.)-র নেতৃত্বে দফায় দফায় দক্ষিণ ইরাকে বিপর্যয়কর হানাদারী অভিযান চালায় এবং ঐসব অভিযানকালে তাহারা বসরা ও কূফায় কয়েক দফা লুণ্ঠন ও ধ্বংস চালায় এবং হাজ্জযাত্রীদের কাফেলায় হামলা চালায়। আবূ হাতিমের মত আবূ তাহিরও এই সময় অচিরেই মাহদীর আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছিলেন। তাঁহার ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি ছিল ৩১৬/৯২৮ সনে শনি

ও বৃহস্পতি গ্রহের একই রেখায় সন্নিবেশ যাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় ইসলামী যুগের অবসান ও চূড়ান্ত ধর্মীয় যুগের সূচনা হিসাবে। ৩১৩/৯২৫ সনে আনুমানিক ৩০ জন ইসমা'ঈলী বাগদাদের বারাছা মসজিদে গ্রেফতার হয়। এই ইসমা'ঈলীদের দা'ঈ আবূ তাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছিলেন। ধৃত ইসমা'ঈলীদের নিকট "মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইমাম মাহদী, আল্লাহর বন্ধু" কথাগুলি উৎকীর্ণ মৃত্তিকার সীলমোহর পাওয়া যায়। ৩১৫-৬/৯২৭-৯ সন আবূ তাহির এক নূতন অভিযানে নেতৃত্ব দেন ও ইহার ফলে খোদ বাগদাদ হুমকির সম্মুখীন হয়। দৃশ্যত মনে হইতে থাকে, তিনি বাগদাদই দখল করিয়া লইবেন। তিনি তাঁহার বাহিনী লইয়া আর-রাহবা পর্যন্ত অগ্রসর হইলে কূফায় সাওয়াদের কারমাতীগণ তাঁহার ঐ বাহিনীর সহিত যোগ দেয়। শুধু তাহাই নহে, বানূ যুহল, রিফা'আ ও 'ইজ্ল নামের আরব গোত্রগুলিও উহাদের সহিত যোগ দেয়। এইসব গোত্রের লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ দা'ঈয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এই দা'ঈগণের অন্যতম ছিলেন 'আবদানের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র 'ঈসা ইব্ন মূসা। এই সম্মিলিত কারমাতী বাহিনী আল-ওয়াসিত এলাকা বিধ্বস্ত করে এবং শক্তির জোরে কূফায় প্রবেশ করে। তবে এক 'আব্বাসী সেনাবাহিনী অচিরেই তাহাদিগকে দমন করে। যাহারা 'আব্বাসী বাহিনীকে এড়াইতে সক্ষম হয় তাহারা আবূ তাহিরের দলে যোগ দিয়া বাহরায়নে ফিরিয়া যায়। তাহারা বাহরায়নেই থাকিয়া যায় এবং 'আজামিয়ুন নামে পরিচিতি লাভ করে। আবূ তাহির ৩১৭/৯৩০ সনে হাজ্জের সময় মক্কা আক্রমণ করেন ও তাহার বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছায়। কারমাতীগণ ঐ সময়ে অত্যন্ত ঘৃণ্য বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড চালায়। তাহারা মক্কায় আগত অনেক হাজ্জযাত্রী ও মক্কাবাসীদেরকে হত্যা করে এবং কাবার কৃষ্ণ প্রস্তর বা হাজারে আসওয়াদ লইয়া যায়। ইহা দ্বারা উহারা জানাইয়া দিতে চাহে যে, ইসলামী আমলের দৃশ্যত অবসান ঘটিয়াছে।

রামাদান ৩১৯/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৯৩১ সনে আবূ তাহির ইসফাহানে জনৈক তরুণ ব্যক্তির হাতে শাসনভার তুলিয়া দেন। আবূ তাহিরের অনুমান অনুযায়ী এই ব্যক্তিই ছিল তাঁহার মতে প্রত্যাশিত মাহদী। অবশ্য মাহদী প্রত্যাগমনের মুখে যেসব ঘটনা সাধারণত প্রত্যাশা করা হয় বাস্তবে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত সব ঘটনা ঘটিতে থাকে। মাহদীর প্রত্যাবর্তনের তারিখটি স্থির করা হইয়াছিল জরাথুস্ত্রের পর ১৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার বৎসরে (=আলেকজাণ্ডারের পারস্য অভিযানের ১২৪২ বৎসরের শেষে)। জরাথুস্ত্র ও জামাসৃপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মাজীয়গণ (Magians) আবার শাসন ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবে। আর এই কারণে উল্লিখিত তারিখ নির্ধারণের সহিত ইহাও সম্পর্কিত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এখন যে তরুণ পারসিককে আবূ তাহির মাহদী বিবেচনায় শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও ঘটনাক্রমে একজন মাজীয় ও একজন পারসিক বাদশাহের বংশধর বলিয়া কথিত। এই ব্যক্তির নিজ শহরের নাম ইসফাহান। বহুকাল আগে হইতেই জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই শহরে একটি পারসিক শাসক বংশের উদয় ঘটিবে যে শাসক বংশটি আরব খিলাফাত উৎখাত করিবে। এই আবূ তাহিরের সহিত যোগ-সাজশের কারণে খলীফা আর-রাদী কয়েক বৎসর পর মাজীয়দের পুরোহিত ইসফানদিয়ার ইব্ন আযারবাদকে হত্যা করেন। ইহার পর যে পারসিককে মাহদী ভাবিয়া শাসন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, দেখা গেল, ঐ ব্যক্তি সকল নবীকে অভিসম্পাৎ দেওয়ার ও অগ্নি পূজা করার নির্দেশ দিয়াছে। ঐ একই ব্যক্তি পরে নানা প্রকার যথেচ্ছাচারমূলক ঘৃণ্য কাজ করিতে থাকে ও কয়েকজন বিশিষ্ট কারমাতী নিতাকেও হত্যা করে। এই ধরনের কাজ-কারবার ৮০ দিন চলার পর আবূ তাহির তাহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হন এবং স্বীকার করেন যে, ঐ ব্যক্তি একজন প্রতারক ; সে তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। এই ঘটনাটি কারমাতী আন্দোলনকে ভয়ানকভাবে নিরুৎসাহিত করে। ইরাক হইতে আগত কারমাতিগণ বাহরায়ন ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজেদেরকে ভণ্ড নবী বলিয়া দাবী করে। ভণ্ড নবীত্বের দাবীদারদের অন্যতম হইতেছে ঃ 'ইজ্ল গোত্রের প্রধান আবু'ল-গায়ছ ইব্ন 'আবদা। তিনি কারমাতীদের দা'ওয়ার গোপন বিষয় ফাঁস করিয়া দেন। আরব গোত্রীয় কারমাতীরা ইহার পর সুন্নী শাসকদের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করে। 'আব্বাসী সেনাপতি মু'নিসের বাহিনীতে ৩২০/৯৩২ সনে প্রথমবারের মতো এই ধরনের ৭০ জন কারমাতী সৈন্যর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে কারমাতীগণ বিপুল সংখ্যায় 'আব্বাসী, বারীদীয়, হামদানী ও বুওয়ায়হী সেনাবাহিনীতে চাকুরী করিতে থাকে।

বাহরায়নের ঘটনায় নেতৃস্থানীয় দা'ঈগণ অত্যন্ত মর্মাহত হন। ইহাতে কারমাতী আন্দোলনের খ্যাতি নিদারুণ ক্ষুণ্ন হয়। ইহা ছাড়া কারমাতীদের মধ্যে ধর্মীয় যথেচ্ছাচার ও আরব বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারমাতীদের বিপর্যয়কর পরিণামের কারণেও কারমাতী মতবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবূ হাতিম তাঁহার কিতাবু'ল-ইসলাহ গ্রন্থে আন-নাসাফীর কিতাবু'ল-মাহসূল গ্রন্থের কোনও কোনও বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। ফলত আবূ হাতিমের রচনায় যেসব প্রবণতা লক্ষ করা যায় সেইগুলি এই ধারণাতেই সর্বোত্তম উপলব্ধি করা যায় যে, এই গ্রন্থটি লিখিত হইয়াছিল বাহরায়নের ঘটনাবলীর পরে এবং ঐসব ঘটনার প্রচ্ছন্ন সমালোচনা ও নিন্দাও ঐ গ্রন্থে করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থটি কিতাবু'ল-মাহসূলের একটি বিতর্কিত বিষয়ের সরাসরি বিরোধিতা করিয়া জোর দিয়া বলা হইয়াছে, ষষ্ঠ কাল পরিক্রমা অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মাদ (স) ও ইসলামের আমল ৭ম ইমাম মুহাম্মাদ ইসমা'ঈলের প্রথম আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় নাই অথচ কিতাবু'ল-মাহসূলের প্রচ্ছন্ন বক্তব্য—ঐ আমল শেষ হইয়া গিয়াছে। বরং কিতাবু'ল-ইসলাহ-এর বক্তব্য হইতেছে, কেবল ঐ ইমাম প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনিই ৭ম কাল পরিক্রমা বা অরাজকতার আমলের উন্মোচন করিবেন। আবূ হাতিম কিতাবু'ল-মাহসূলের যেসব সমালোচনা করিয়াছেন অন্যান্য দা'ঈ আবার সেইগুলির খণ্ডন করিয়াছে। এই দা'ঈগণের অন্যতম হইতেছেন ঃ আবূ য়া'কূব আস-সিজিসতানী (দ্র.)। তিনি তাঁহার কিতাবু'ন-নুসরাত গ্রন্থে আন-নাসাফীর অধিকাংশ অভিমতের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন, এমনকি তাঁহার কতিপয় বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াসের ক্ষেত্রেও বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্ত্বেও অবশ্য দাওয়াত অচিরেই আবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় যদিও অতঃপর বিপ্লবী তৎপরতা অপেক্ষা সাহিত্যমূলক তৎপরতাই প্রধান হইয়া ওঠে। ৩১৬/৯২৮ সনে সাওয়াদে কারমাতী বিদ্রোহ হয়। সরকারী বাহিনী ঐ বিদ্রোহ দমন করে এবং 'ঈসা ইব্ন মূসাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু 'ঈসা কারাগার হইতে পলাইয়া যান, বাগদাদে অবস্থান করিয়া দার্শনিক বিষয়ের ছোঁয়াচ সম্বলিত নানা বিষয়ে লিখিতে থাকেন এবং তিনি জানান, এইসব রচনার মূল প্রেরণা 'আবদান। মাওসিল-এ অবস্থানকারী দুই ভ্রাতা, আবূ মুসলিম ও আবূ বাক্র ইব্ন

হাম্মাদের মতো এবং প্রথমে রাক্কায় ও পরে মাওসিল-এ বসবাসকারী 'আলী ইব্ন ওয়াসফী-এর মতো ইরাকের এই সময়কার অন্যান্য দা'ঈও একই পন্থা অবলম্বন করেন। ইবনু'ন-নাদীমের বর্ণনা অনুসারে আল-মাওসিল-এ হাম্মাদের পুত্রগণ ও বাগদাদে ইব্ন নাফীস ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন দা'ঈ যাঁহারা রায় নিবাসী ইমামের খলীফা আবূ য়া'কূবের অধস্তন ছিলেন। এই আবূ য়াকূব ছিলেন আবূ হাতিমের (মৃ. ৩২২/৯৩৪) উত্তরাধিকারী যাঁহাকে ভালভাবেই আবূ য়া'কূব আস-সিজিসতানীর সহিত অভিন্ন পরিচয় ব্যক্তি হিসাবে দেখানো যাইতে পারে যিনি ঐ সময়ে ফাতিমী ইমামাত স্বীকার করিতেন না যাহা তাঁহার কিতাবু'ন-নুসরাগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সময়ে পারস্যের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাফল্যের সঙ্গে ইসমা'ঈলী মতবাদের সকল প্রচারকার্য চলিতে থাকে। আযারবায়জান-এর শাসক সাল্লারীয় আল-মারযুবান ইব্ন মুহাম্মাদ (৩৩০/৯৪১-৩৪৬/৯৫৭) ও তাঁহার ভ্রাতা আত-তারমের শাসন ওয়াহ্সূদান উভয়েই ইসমাঈলী মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আল-মারযুবান ক্ষমতায় আরোহণের পর 'আলী ইব্ন জা'ফার নামে একজন ইসমা'ঈলী দা'ঈকে নিজের উযীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে প্রকাশ্যে তাঁহার ইসমা'ঈলী মতবাদ প্রচারের অনুমতি দেন। ওয়াহ্সূদানের তৈয়ারী ৩৪৩/৯৫৪-৫ সনের মুদ্রায় কারমাতী ইসমা'ঈলী মতবাদে তাঁহার অনুসারী থাকার প্রমাণ রহিয়াছে। তবে এমন কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই যাহা হইতে বলা চলে যে, ঐ সময়ে ফাতিমী ইসমা'ঈলী দা'ওয়াত পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে মতাবলম্বী ফিরকাগুলির মধ্যে অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়। ইসমা'ঈলী মতবাদ-বিরোধী তার্কিক ইব্ন রিযাম তাঁহার এক কাহিনীতে জানাইয়াছেন যে, দা'ঈ'ন-নাসাফী ৩৩২/৯৪৩ সনে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইবার আগে ট্রান্সঅক্সানিয়ার সামানী দরবারে সক্রিয় ছিলেন। তিনি শাসক নাসর ইব্ন আহমাদকে জরিমানা করেন ও তাঁহাকে ফাতিমী খলীফা আল-কা'ইমের নিকট পাঠাইবার জন্য বলেন। এই শাসককে আন-নাসাফীই ইসমা'ঈলী মতবাদে দীক্ষিত করেন। ইব্ন রিযামের এই কাহিনীটিকে অবশ্যই সতর্কতার সহিত বিবেচনায় আনা দরকার।

বাহরায়নের কারমাতীগণ তাহাদের এই পুরাতন বিশ্বাসে ফিরিয়া আসে যে, তাহারা তাহাদের গুপ্ত মাহদীর আদেশক্রমেই কাজ করিতেছে। আবূ তাহির দক্ষিণ ইরাকে ক্ষুদ্র আকারের নানা অভিযান চালান। ফারস উপকূলেও তাঁহার হানাদারী চলিতে থাকে এবং তিনি জনসাধারণের হাজ্জযাত্রায় বাধা দিয়া চলিতে থাকেন। আগেকার দর-কষাকষিমূলক আলোচনাগুলিতে ব্যর্থতার পর তিনি ৩২৭/৯৩৯ সনে 'আব্বাসী সরকারের সহিত এক চুক্তিতে উপনীত হন। ঐ চুক্তির আওতায় স্থির হয়, বার্ষিক ভিত্তিতে এক নযরানা প্রদানের বিনিময়ে তিনি হাজ্জযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবেন ও হাজ্জযাত্রীরাও তাঁহাকে একটি নিরাপত্তা কর প্রদান করিবে। ইহার পর হইতে কারমাতী আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রশমিত হয়। ৩৩২/৯৪৪ সনে আবূ তাহিরের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবিত ভ্রাতাগণ সম্মিলিতভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে থাকে ও আবূ তাহিরের শান্তির নীতি অনুসরণ করিতে থাকে। ৩৩৯/৯৫১ সনে অবশেষে তাহারা 'আব্বাসী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিপুল অর্থের বিনিময়ে পবিত্র কা'বা গৃহের কৃষ্ণ প্রস্তর ফিরাইয়া দেয়। তাহারা ইতিপূর্বে কয়েকবারই ঐ কৃষ্ণ প্রস্তর প্রত্যর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যর্পণের এক প্রস্তাব স্বয়ং ফাতিমী খলীফা আল-মানসূরও করিয়াছিলেন।

ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য-এর ক্ষমতায় আরোহণের পর (৩৪১/৯৫৩) ঃ ৪র্থ ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য তাঁহার শাসনামলের প্রথম হইতেই ফাতিমী স্বার্থের প্রতি পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ইসমা'ঈলী দলগুলির সমর্থন পুনরায় আদায়ের জন্য দৃঢ় প্রয়াস চালাইতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফাতিমী ইসমা'ঈলী মতবাদের কিছুটা রদবদল করিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ইসমা'ঈলীদের কোনও কোনও বিশ্বাসের স্থান করিয়া দেন। এইভাবে তিনি কারমাতীদের এই মূল বিশ্বাসের পুনঃপ্রচলন করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল হইতেছেন কা'ইম, যাঁহার কার্যাবলী (তাঁহার মতে) তাঁহার খলীফাদের দ্বারা সাধিত হইতে হইবে আর ঐ খলীফারা হইবেন ফাতিমী ইমামগণ, যাঁহারা ইসমা'ঈলেরই বংশধর। এইসব প্রয়াস অনেকখানি সফল হইয়াছিল যদিও এইসব প্রয়াসের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করিয়া তেমন কিছু জানা যায় না। ঐ সময় ইসমা'ঈলী নব্য প্ল্যাটোবাদের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন আবূ য়া'কুব আস-সিজিসতানী। তিনি আল-মু'ইয্য-এর পক্ষে চলিয়া যান এবং আল-মু'ইয্য ক্ষমতায় আরোহণের পর য়া'কূব যেসব পুস্তক রচনা করেন সেইগুলিতে ফাতিমী ইমামাতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। আল-মু'ইয্য ফাতিমী ইসমা'ঈলী মতবাদে নব্য প্ল্যাটোনিক সৃষ্টিতত্ত্বের সমাবেশের অনুমতি দেন। এই বিষয়ে আন-নাসাফী ও আবূ হাতিম আর-রাযীর পূর্ববর্তী রচনাগুলিও ফাতিমী ইসমা'ঈলী মতবাদে সন্নিবেশিত হয়। অন্যান্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ইসমা'ঈলী অবশ্য এই প্রয়াসের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইব্ন হাওকাল আনু. ৩৬৭/৯৭৮ সনে লিখিত বিবরণে আযারবায়জানের ইসমা'ঈলী দলগুলিকে বাকলিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে তাহাদের মতে কারমাতী মতের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। ৩৭২/৯৮৩ সনের অল্পকাল পরেই শারীফ আবূ মুহসিন জানান, বাগদাদের 'ঈসা ইব্ন মূসার দল 'আবদানের তাত্ত্বিক ঐতিহ্য বজায় রাখে ও তাহার আমলেও উহা বজায় ছিল। অবশ্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় যাহা তাহা হইতেছে, আল-বাহরায়নের কারমাতীদের আনুগত্য অর্জনে আল-মু'ইয্য-এর ব্যর্থতা।

ইখওয়ানু'স-সাফা' (দ্র.)-র বিশ্বকোষটি একদল সচিব ও বিদ্বান ব্যক্তি কর্তৃক ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি আনু. খৃষ্টীয় ৯৬০ সনে বসরায় রচিত হয়। এই বিশ্বকোষটিকে ফাতিমীদের তাত্ত্বিক হামলা প্রতিহত করার এক অভিন্ন তাত্ত্বিক ভিত্তির বুনিয়াদে ফাতিমী ইসমাঈলীদের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার এক প্রয়াস বলা যাইতে পারে। এই বিশ্বকোষের লেখকগণ নব্য প্ল্যাটোনিক সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করিলেও যেসব বিষয় পূর্ববর্তী দা'ঈদের মধ্যে বিতর্কের ও মতভেদের কারণ হইয়াছে এমন সব বিষয় এড়াইয়া যান। তাঁহাদের মতে তাহাদের সকল ধর্মীয় শিক্ষার উৎস তাঁহাদের গুপ্ত সপ্তম ইমাম যিনি তাঁহাদের মতে ভবিষ্যতে গৌরবময়ভাবে পুনরাবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবে বলেন যে, ৭ম ইমামের বংশধরগণ তাঁহার মর্যাদা হইতে নীচে অবতরণ করিয়াছেন, এইভাবে তাঁহারা ইমামার ফাতিমী দাবী খণ্ডন করেন। ঐ সময়ে বসরা ছিল বিশেষভাবে বাহরায়নের কারমাতীদের প্রভাবিত এলাকা। এখানেই ঐ বিশ্বকোষটি রচিত হয়। ফলে ইহা নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ঐ বিশ্বকোষ কারমাতী (বাহরায়নী) মতবাদ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে উৎসাহিত বা প্রচলিত না হইয়া থাকিলেও ইহাতে ঐ মতবাদের পরোক্ষ অনুমোদন অন্তত ছিল।

৩৫৮/৯৬৯ সনে মিসরে ফাতিমী বিজয় অভিযানের পর বাহরায়নের কারমাতী ও ফাতিমীদের মধ্যকার প্রচ্ছন্ন বিরোধ প্রকাশ্য সংঘাতের আকার

ধারণ করে। কারমাতীগণ ইহার আগে হামদানী ও ইখশীদীয়দের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাহাদের আগ্রহের নিদর্শন রাখে। রাবী' (২), ৩৫৩/মে ৯৬৪ সনে তাহা তাবারিয়ায় লুণ্ঠন ও ধ্বংস অভিযান চালায়। ৩৫৭/৯৬৮ সনে আল-হাসান আল-আসাম (দ্র.) কারমাতী বাহিনী প্রধান হিসাবে সিরিয়া আক্রমণ করিয়া দামিশক দখল করে এবং ইখ্শীদীয় শাসক আল-হাসান ইবন 'উবায়দিল্লাহ্ ইবন তুগজকে পরাজিত করিয়া আর-রামলা লুণ্ঠন করে। এই অভিযান যে ফাতিমীদের পক্ষে পরিচালিত হয় নাই উহার প্রমাণ আর-রামলা হইতে আল-আসাম-এর বাহিনী প্রত্যাহারের আশু পরেই প্রস্তুত মুদ্রায় পাওয়া যায়। ঐ মুদ্রায় 'আব্বাসী খলীফার সার্বভৌমত্ব ও সেই সঙ্গে বাহরায়নের কারমাতী শাসকদের সার্বভৌম অধিকারেরও উল্লেখ রহিয়াছে। যু'ল-হিজ্জা ৩৫৮/ অকটো.-নভেম্বর ৯৬১ সনে মিসরে ফাতিমী বাহিনীর বিজয়ের তিন মাস পর আল-আসামের জ্ঞাতিভ্রাতা কিসরা ও সাখরের নেতৃত্বে এক কারমাতী বাহিনী আর-রামলায় আবার আল-হাসান ইবন 'উবায়দিল্লাহকে পরাজিত করে। তবে ঐ সময় এক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় যাহার আওতায় ইখশীদীয়গণ কারমাতীগণকে একটি নজরানা প্রদানের অঙ্গীকার করে। কারমাতী বাহিনীর প্রধান অংশটি চলিয়া যায় ও একটি ক্ষুদ্র কারমাতী বাহিনী থাকিয়া যায়। ৩৫৯/৯৭০ সনে একটি ফাতিমী বাহিনীর হাতে এই কারমাতী বাহিনী ও আল-হাসান ইবন 'উবায়দিল্লাহর বাহিনী পরাজিত হয় ও ফাতিমী বাহিনী আর্-রামলা জয় করে। ৩৬০/৯৭১ সনে বুওয়ায়হী শাসক 'ইয্যু'দদাওলা ও হামদানী শাসক আবূ তাগলিবের সহায়তায় আল-আ'সাম অস্ত্র সজ্জিত এক বিরাট বাহিনী লইয়া দামিশক ও আর্-রামলা পুনর্দখল করেন এবং সেখান হইতে ফাতিমী সেনাবাহিনীকে বহিষ্কৃত করেন। উহার পর সর্বত্র 'আব্বাসী সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়। ইহার পর আ'সাম কায়রো অবরোধ করেন। কিন্তু ছোটখাট কিছু বিপর্যয়ের পর তিনি রাবী' (১) ৩৬১/ডিসেম্বর ৯৭১ সনে কায়রো অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া সেনাবাহনী লইয়া আল-আহসায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার নিজ রাজধানীতে এই প্রত্যাবর্তনের কারণ সম্ভবত স্বদেশে তাঁহার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হইয়া উঠিয়াছিল। রামাদান ৩৬১/জুন ৯৭২ সন নাগাদ তিনি এক শক্তিশালী ফাতিমী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া আবার আর-রামলা দখল করিয়া নেন। কায়রোয় ফাতিমী খলীফা আল-মুইয্য-এর আগমনের পর (রামাদান ৩৬২/জুন ৯৭৩) তিনি সমুদ্র ও স্থলপথে মিসর আক্রমণে অগ্রসর হন এবং অন্যদিকে 'আলী পক্ষীয় এক মিত্র উত্তর মিসর আক্রমণ করে। রাজাব ৩৬৩/এপ্রিল ৯৭৪ সনে আল-আ'সাম কায়রোর নিকটে পরাজিত হইবার পর আল-আহসায় ফিরিয়া যান এবং তাঁহার ধৃত সচিব আবু'ল-মুনাজ্জা-র মুক্তির জন্য আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়া মিসরের ফাতিমী শাসকের সহিত এক সন্ধি করেন। সচিব আবু'ল-মুনাজ্জা দামিশকে ফাতিমী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। আল-মুইয্য-এর সহিত সম্পাদিত এই সন্ধির আওতায় আল-মু'ইয্য বাহরায়নের কারমাতীগণকে ঐ নজরানা প্রদানে সম্মত হন যাহা পূর্বে ইখ্শীদীয় শাসকগণ প্রদান করিত। রাবী' (২) ৩৬৫/ডিসেম্বর ৯৭৫ সনে আল-মু'ইয্য-এর মৃত্যুকাল অবধি ঐ নজরানা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু আল-'আযীয মিসরে ক্ষমতায় আসার পর পরই জা'ফার, কিসরা ও ইসহাক-এর নেতৃত্বে এক কারমাতী বাহিনী দামিশকে বিদ্রোহী আল্ফতাকীন (আলপতাগীন)-এর সহিত মিলিত হইয়া আর-রামলা দখল করে। তবে জাওহারের সৈনাপত্যে ফাতিমী বাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে উহারা দামিশকে সরিয়া যায়। ইতিমধ্যে আল-আ'সাম আসিয়া পড়িলে শক্তি বৃদ্ধি ঘটায় আল্ফতাকীন ও কারমাতীগণ জাওহারকে প্রথমে যায়তুন আর-রামলায় ও পরে 'আসকালানে ১৭ বার ধরিয়া অবরোধ করিয়া রাখে। অবশ্য পরে তাঁহাকে মিসরে চলিয়া যাইতে দেয়। কারমাতীগণ আল-'আযীযের নেতৃত্বে পরিচালিত এক বিশাল ফাতিমী সেনাবাহিনীর নিকট মুহাররাম ২৬৮/সেপ্টেম্বর ৯৭৮ সনে পরাজিত হয়। কারমাতীগণ রাজাব ৩৬৬/মার্চ ৯৭৭ সনে আল-আ'সামের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জা'ফারের নেতৃত্বে আল-আহসায় ফিরিয়া যায় ও ফাতিমীদের সহিত এক সন্ধিতে উপনীত হয়। ঐ চুক্তির শর্তানুসারে আল-'আযীয কারমাতীদের মোটা অঙ্কের বার্ষিক কর দিতে সম্মত হন।

বুওয়ায়হী শাসক 'আদু-দু'দ-দাওলার মৃত্যুর (৩৭২-৯৮৩) পর বাহরায়নের কারমাতীগণ দক্ষিণ ইরাকে আবার তাহাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ৩৭৩/৯৮৩-৪ সনে তাহারা বসরা আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে নজরানা প্রদানের শর্তে শান্তি স্থাপিত হয়। ৩৭৫/৯৮৫ সনে ইসহাক ও জা'ফারের সৈনাপত্যে এক কারমাতী বাহিনী কূফা দখল করে। সেখানকার বুওয়ায়হী শাসক তাহাদের সহিত শান্তিপূর্ণ একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা চালাইতেছিলেন, তখন আক্রমণকারীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ফসল বাজেয়াপ্ত ও অর্থ আদায় করিতে থাকে। এই অবস্থায় সরকার বাধ্য হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং কারমাতীগণ দুই দুইবার বিপর্যয়কর পরাজয় বরণ করে। আল-জামি'আয়নের রণক্ষেত্রে কারমাতীগণ পরাজিত হয়। কারমাতীগণ ইরাক হইতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং স্থায়ীভাবেই ইরাকে তাহাদের প্রভাবের অবসান ঘটে। ৩৭৮/৯৮৮ সনে 'উকায়লের বানু'ল-মুনতাফিক-এর গোত্র প্রধান আল-আসফার ভয়ানকভাবে কারমাতীদের পরাজিত করেন। তিনি তাহাদের রাজধানী আল-আহসা অবরোধ করেন ও আল-কাতীফে লুণ্ঠন চালাইয়া লুণ্ঠিত সামগ্রী বসরায় লইয়া যান। কারমাতীগণ হাজ্জযাত্রীদের নিরাপদে আগাইয়া দেওয়া ও তাহাদের নিকট হইতে কর আদায়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। তখন ঐ সুবিধা বা অধিকারের দাবীদার হন আল-আসফার ও অন্যান্য গোত্রপতি। ফলে কারমাতিগণ একান্তভাবেই একটি স্থানীয় ও স্বায়ত্তশাসিত শক্তি বিশেষে পরিণত হয়। ইহার পরের কারমাতী ইতিহাস সম্পর্কে আর তেমন কিছুই জানা যায় না। ৩৮২/৯৯২ সনে তাহারা ফাতিমী শাসক আল-'আযীযের প্রতি নূতন করিয়া নামমাত্র আনুগত্য স্বীকার করে, দৃশ্যত ফাতিমীগণ তাহাদিগকে আবার নজরানা প্রদান শুরু করিবে এই আশায়। আল-আসফারের জয়ের পর ঐ নাজরানা প্রদান বন্ধ হইয়া যায়। তবে এই সম্পর্কও বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। আল-হাকিমের শাসনামলে (৩৮৬/৯৯৬-৪১১/১০২১) ফাতিমীদের সহিত কারমাতীদের সম্পর্কে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে ফাতিমীদের সহিত ইহাদের সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না। ধর্মীয় তাত্ত্বিক মতবাদের দিক হইতে কারমাতীগণ ফাতিমী ইসমা'ঈলী দা'ওয়া হইতে চিরস্থায়ীভাবে পৃথক থাকিয়া যায়। বাহরায়নের বাহিরে কারমাতী দলগুলি কারমাতী রাজ্যটির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফাতিমী ইসমা'ঈলী মতবাদের সহিত হয় মিলিয়া-মিশিয়া যায় অথবা তাহাদের কিছু দল বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্তিত্ব হারায়। ৩৭৮/৯৮৮ সনের পর এই কারমাতী দলগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়

না। তবে আশ-শাব্বাস (মৃ. ৪৪৪/১০৫২-৩) নামে একজন ধনবান কারমাতী নেতা ও তাঁহার পরিবার সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। বসরার সাওয়াদে 'কারামিতা' ও বিক্ষিপ্ত নানা গোত্রের মধ্যে তাঁহাদের অনুসারী বর্তমান ছিল। ইহা হইতে ধরিয়া নেওয়া যায় যে, দক্ষিণ ইরাকে কোনও না কোনও আকারে কারমাতী ইসমা'ঈলী মতবাদের অস্তিত্ব ছিল।

আনু. ৪৫০/১০৬৭ সনে বাহরায়নের কারমাতীগণ উওয়াল দ্বীপের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারায়। ঐ দ্বীপের জনসাধারণ কারমাতীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দ্বীপে প্রেরিত কারমাতী নৌ-বহর পরাজিত হয়। ইহার অল্পকালের মধ্যেই একজন স্থানীয় বিদ্রোহী কারমাতীদের নিকট হইতে আল-কাতীফ দখল করিয়া নেন। ৪৬২/১০৬৯-৭০ সনে আল-আহসার প্রত্যন্ত উত্তরাঞ্চল নিবাসী 'আবদু'ল-কায়সের বানূ মুররা ইব্ন 'আমির-এর গোত্রপতি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আলী আল-'উয়ূনী কারমাতীদের নিকট হইতে আল-কাতীফ দখল করিয়া নেন। কারমাতীদের ও তাহাদের মিত্র গোত্রগুলির বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধ জয়ের পর তিনি আল-আহসা অবরোধ করেন। ঐ অবরোধ সাত বৎসর স্থায়ী হয়। ইরাক হইতে আগত ২০০ তুর্কোমান অশ্বারোহী সেনার সহায়তায় তিনি ৪৬৯/১০৬৭ সনে শহরটি পদানত করেন এবং ৪৭০/১০৭৭-৮ সনে কারমাতী ও বানূ 'আমির ইব্ন রাবী'আ-র বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার ফলে নিশ্চিতভাবে কারমাতী শাসনের অবসান ঘটে। সম্ভবত পশ্চাতে অবস্থানকারী তুর্কী মিত্রদের পাশাপাশি নিজ অবস্থা মযবুত করিবার জন্য তিনি ফাতিমী শাসক আল-মুস্তানসিরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। খলীফা আল-মুস্তানসির-এর মনিব ও রক্ষাকর্তা হিসাবে রাবী' (২) ৪৬৯/নভেম্বর ১০৭৬ সনে সুলায়হী 'আলী ইবন মুহাম্মাদ অধিষ্ঠিত হন।

বাহরায়নে কারমাতী রাজ্য ঃ কারমাতীরা প্রচার করে যে, মুসলিম সমাজে অবিচার ও নির্যাতনের পরিবর্তে তাহারা সুবিচার ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবে, কিন্তু এই ব্যাপারে তাহাদের কার্যক্রম বা পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। গোড়ার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পত্তির সমষ্টিগত মালিকানার কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিলেও উহা কোনও সুনির্দিষ্ট অবয়ব গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তবে নানা ঐতিহাসিক হেতু ও কারমাতী প্রজাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা— এই দুইয়ের মিলনের ফলে বাহরায়নে যে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বা রাজ্য গড়িয়া ওঠে ও ঐ রাজ্যে যে ধরনের শৃঙ্খলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ইব্ন হাওকাল, আল-মুকাদ্দাসী ও নাসির-ই খুসরাও-এর মতো অ-কারমাতী লেখকদেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আবূ সাঈদ আল-জান্নাবী, আল-'ইকদানিয়া নামে পরিচিত এক শাসন পরিষদের সহিত সলা-পরামর্শক্রমে প্রধান সিদ্ধান্তগুলি নির্ধারণ করিতেন। এই পরিষদ সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত হইত। এইসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে আবার নেতৃস্থানীয় ছিলেন ঃ আল-হাসান ইব্ন সান্‌বার (বা শান্‌বার), আল-কাতীফের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী পরিবার প্রধান যিনি আবূ সা'ঈদের প্রথমদিকের সমর্থক ও শ্বশুর। আবূ সা'ঈদের মৃত্যুর পর তাঁহার সাত পুত্র শাসক পরিষদে যোগদান করে। আবূ সা'ঈদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সা'ঈদ প্রথমে সরকারের নেতৃত্ব পান। পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবূ তাহির ৩১০/৯২২-৩ সনে পূর্ণবয়স্ক হইলে ঐ ক্ষমতায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। আবূ তাহির তাঁহাদের ভ্রাতাগণের ও সাত জন উযীরের এক পরিষদের সহায়তায় দেশ শাসন করেন। উযীর পরিষদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন আল-হাসান ইবন সান্‌বারের পুত্র সান্‌বার। আবূ তাহিরের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবিত ভ্রাতাগণ সম্মিলিতভাবে নেতৃত্ব পরিচালনা করেন এবং তাহাদের ঐ যৌথ নেতৃত্ব আস্-সাদা আর-রু'আসা' নামে পরিচিতি লাভ করে। আবূ তাহিরের পুত্রগণ যদিও অত্যন্ত মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকেন তাঁহাদিগকে শাসন ক্ষমতা হইতে দূরে রাখা হয়। ৩৫৮/৯৬৯ সনে আবূ তাহিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাবূর তাঁহার পিতার ক্ষমতার উত্তরাধিকার দাবী করিলে তাঁহার চাচাগণ তাঁহাকে গ্রেফতার করেন এবং সম্ভবত তিনি ঘাতকের হাতে নিহত হন। শাসক পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার এই কলহ বিবাদ উহার পর চলিতেই থাকে। ৩৬০/৯৭১ সনে খলীফা আল-মুতী' শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে চেষ্টা চালান বলিয়া জানা যায়। মুদ্রা ইত্যাদি হইতে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায়, অন্ততপক্ষে ৩৬১/৯৭২ সনে সা'ঈদ-এর মৃত্যুর পর আবূ সা'ঈদের পৌত্রগণ শাসক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হন। যদিও ঐ শাসক পরিষদে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান আসনটি দখল করিয়া থাকেন আবূ সা'ঈদের একমাত্র জীবিত পুত্র আবূ য়া'কূব য়ূসুফ। ৩৬৬/৯৭৭ সনে য়ূসুফের মৃত্যু হইলে আবূ সা'ঈদের ছয় পৌত্র ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁহারা সম্ভবত আবূ তাহিরের পুত্রগণ ব্যতীত আবূ সা'ঈদের ছয় পুত্রের বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আবূ তাহিরের পুত্রগণকে ক্ষমতা হইতে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই মনে হয়। নাসির-ই খুসরাও যখন আল-আহসা ৪৪৩/১০৫১ সনে সফর করেন, তখন ঐ দেশের শাসক পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আবূ সা'ঈদের ছয় বংশধর (সম্ভবত তাহাদিগকে পরবর্তীতে এই পরিষদে গ্রহণ করা হয়) আর ছয় জন উযীরও। প্রতীয়মান হয় যে, সকলেই ইব্ন সান্‌বারের (সানাবিরা) বংশধর। আবূ সা'ঈদের বংশধরেরা সাদা হিসাবে পরিচিত হয় এবং ৭ম/১৩শ শতকেও তাঁহাদের এই পরিচিতি আল-আহ্সায় বিদ্যমান ছিল।

ইব্ন হাওকালের আমলে বাহরায়নের ফলের বাগান ও ফসলের ক্ষেতের ফসল কারমাতী দলের (মু'মিনূন) লোকজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা সম্ভবত আবূ সা'ঈদের সময় হইতে প্রচলিত ছিল। পারস্য উপসাগর দিয়া যে সকল জাহাজ উওয়াল দ্বীপ হইয়া যাইত সেইগুলি হইতে প্রাপ্ত শুল্কের অর্থ আবূ সা'ঈদের পুরুষ ও নারী বংশধরদের মধ্যে (আনু. ৪০০ জন) বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত। অন্য সকল প্রকার কর ও ফী হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব যেমন, 'উমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত নজরানা, হাজ্জযাত্রীদের প্রদত্ত নিরাপত্তা কর, বিভিন্ন সরকার প্রদত্ত কর, সামরিক অভিযানে লব্ধ গানীমাতের মাল সব কিছুই আবূ সা'ঈদের শাসক পুত্র সানবারের সহিত পরামর্শক্রমে নিষ্পত্তি করা হইত। সরকারের জন্য আয় বা রাজস্বের যে অংশ প্রয়োজন হইত না তাহা বার্ষিক ভিত্তিতে ভাগ-বন্টন করা হইত। ইহার এক-পঞ্চমাংশ রাখা হইত মাহদীর কোষে, তিন-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত আনুপাতিক হার অনুযায়ী আবূ সা'ঈদের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে বিলি করা হইত এবং এক-পঞ্চমাংশ সানবারকে দেওয়া হইত তাঁহার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার জন্য (আনুমানিক ২০ জন)। বুওয়ায়হী আমলে বসরার প্রবেশদ্বারের নিকট বুওয়ায়হী সরকারের শুল্ক কার্যালয়ের পাশাপাশি একটি কারমাতী শুল্কঘরও ছিল। কারমাতীদের স্থায়ী শুল্ক প্রতিনিধি বা কর্মকর্তার নিবাস ছিল কূফায়

ও আল-জা'ফারিয়ায়। এই শেষোক্ত শহরটি অবস্থিত ছিল বসরার নিকটবর্তী মরুভূমির মধ্যে। কারমাতীগণ ছিল এই শহরের অধিবাসী। 'ইযযু'দ-দাওলা উহাদিগকে সাকী আল-ফুরাত অঞ্চলে বিপুল জমিজমা মঞ্জুর করেন। ইহা ছাড়া 'আদু-দু'দ-দাওলাও তাহাদিগকে আল-ওয়াসিত এলাকাতে ভূসম্পত্তি দান করেন। সামসামু'দ-দাওলার শাসনামলের সূচনায় কারমাতিগণের অন্যতম স্থায়ী প্রতিনিধি আবূ বাকর ইবন শাহূয়া বাগদাদে থাকিতেন এবং তিনি যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন।

আল-আহসা নিবাসী সক্ষম ও সুস্থ দেহধারী সকল কারমাতী সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁহারা ছিলেন কারমাতী সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড। ইহা ছাড়াও আরব গোত্রগুলি হইতে সহায়ক সেনাদল যাহারা নিয়মিতভাবে কারমাতী সামরিক অভিযানগুলিতে যোগ দিত। এই আরব সেনাদের বেশীর ভাগ আসিত বানূ কিলাব ও বানূ 'উকায়ল গোত্রদ্বয় হইতে। পূর্বোক্ত গোত্রের লোকজন স্পষ্টত ধীরে ধীরে পরিপূর্ণভাবে কারমাতীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যায়। বাহরায়নের কারমাতী রাষ্ট্রের শেষ পর্যায়ে রাজধানী আল-আহসার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল 'উকায়ল গোত্রপ্রধান 'আমির ইবন রাবী'আর উপর এবং এই কাজের জন্য কারমাতী খামারগুলিতে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ তাঁহাকে দেওয়া হইত।

নাসির-ই খুসরাও-এর আমলে ৩০ হাজার ক্রীতদাস পরিষদ খামারের কাজে নিয়োগ করে। আল-আহসার অধিবাসীদের কোনও প্রকার নজরানা বা কর দিতে হইত না। কেহ অভাবগ্রস্ত কিংবা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে ঋণ প্রদান করা হইত এবং নিজ অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত। ঋণের জন্য কোনও প্রকার সূদ গ্রহণ করা হইত না এবং সকল প্রকার স্থানীয় ক্রয়-বিক্রয় চলিত সীসার প্রতীকী মুদ্রার মাধ্যমে। যে কোনও শিল্পী কারিগর সদ্য আল-আহসায় আসিলে তাহাকে তাহার জীবিকায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হইত। জনপদের বাসগৃহের মেরামতের কাজ করিত শাসকের ক্রীতদাসগণ— বিনা খরচে। আল-আহসায় অনেক গম পেষাই কল ছিল। এই সব মিলে নিখরচায় অধিবাসীদের গম পেষাই করিয়া দেওয়া হইত। আবূ সা'ঈদের আমল হইতে সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। জনসাধারণ মদ্যপান কঠোরভাবে পরিহার করে। মিহি বস্ত্র বয়ন করিয়া বসরা ও অন্যত্র রফতানী করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সংশ্লিষ্ট আমলের সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী ছাড়া নিম্নবর্ণিত সূত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) আন-নাওয়বাখতী, ফিরাকু'শ-শী'আ, সম্পা. H. Ritter, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৬১-৪ ; (২) সা'দ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কুম্মী, আল-মাকালাত ওয়া'ল-ফিরাক, সম্পা. মুহাম্মাদ জাওয়াদ মাশকূর, তেহরান ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৮৩-৮ ; (৩) মাসউদী, তানবীহ, পৃ. ১০৪ প., ৩৮০-৭, ৩৮৯-৯৬ ; (৪) ইবন হাওকাল, পৃ. ২৫-৭, ২৯৫ প., ৩৪৯ ; (৫) ফিহরিসত, পৃ. ১৮৬-৯০; (৬) মুযাক্কিরাত ফী হারাকাতি'ল-মাহদী আল-ফাতিমী (ইসতিতারু'ল-ইমাম ওয়া সীরাত জা'ফার আল-হাজিব), সম্পা. W. Ivanow, in BFac. Ar., iv (1936), Ar. Sec., 89-133; ইসমা'ঈলী বিরোধী যুক্তিতর্কমূলক যে গ্রন্থটি শারীফ আবূ মুহসিন রচনা করেন (এবং যিনি ইরাকে কারমাতী আন্দোলন সম্পর্কে সুঅবহিত যদিও এই আন্দোলনের অন্যান্য শাখা সম্পর্কিত তথ্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনির্ভরযোগ্য) সেই রচনা (লুপ্ত)-র প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে নিম্নবর্ণিত গ্রন্থকারদের রচনাবলীতে ঃ (৭) ইবনু'দ-দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার, ৬খ., সম্পা. সালাহু'দ-দীন আল-মুনাজজিদ, কায়রো ১৩৮০-১৯৬১, পৃ. ৪৪-১৫৬ ; (৮) আল-মাকরীযী, ইত্তি'আজু'ল-হুনাফা' ১খ., সম্পা. জামালু'দ-দীন আশ-শায়াল, কায়রো ১৩৮৭/১৯৬৭, পৃ. ১৫১-২০২; (৯) ঐ লেখক, আল-খিতাত, বূলাক ১২৮০ হি., পৃ. ৩৯১-৭ ; (১০) আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-আরাব, আংশিক অনু. S. de Sacy, Expose de la Religion des Druzes, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ১খ, ৭৪-২৩৮; (১১) 'আবদু'ল-জাব্বার আল-হামাযানী, তাছবীত দালা'ইলি'ন-নুবূওয়াত, সম্পা. 'আবদু'ল-কারীম 'উছমান, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৩৮৬-৯৯, ৫৭৪-৬১৪ ; (১২) তা'রীখ আখবারি'ল-কারামিতা, সম্পা. সুহায়ল যাক্কীর, বৈরূত ১৩৯১/১৯৭১, এই রচনায় ; (১৩) ছাবিত ইব্ন সিনান (কৃত) ইতিহাস এবং (১৪) ইব্নু'ল-'আদীম (কৃত) বুগ্য়াতু'ত-তালাব এবং (১৫) আল-মাকরীযী (কৃত) আল-মুকাফ্ফা হইতে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ সন্নিবেশিত রহিয়াছে ; (১৬) আল-বীরূনী, আল-আছারু'ল-বাকিয়া, সম্পা. E. Sachau, লাইপযিক ১৮৭৮ খৃ. পৃ. ২১২-১৪; (১৭) নাসির-ই খুস্‌রাও, সাফার-নামাহ, সম্পা. মুহাম্মাদ দাবীর সিয়াকী, তেহরান ১৩৩৫ হি. পৃ. ১০৯-১২; (১৮) মুহাম্মাদ ইব্ন মালিক আল-হাম্মাদী, কাশফ আসরারি'ল-বাতি'নিয়া, সম্পা. 'ইয্‌যাত আল-'আত্তার, কায়রো ১৩৫৭ হি. ; (১৯) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, ১৯৫৮ খৃ., ৪খ, ১৮১-৯৫ ; এই গ্রন্থে বাহরায়নের কারমাতী শাসকদের ফাতিমীদের সামন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা দলীল-প্রমাণহীন ইতিহাস বিশেষ। আধুনিক পণ্ডিতগণ কারমাতী ও ফাতিমীদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে ব্যাপক তারতম্যসূচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষত দ্র. (২০) M. J. de Goeje, Memoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides[2], লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. ; (২১) B. Lewis, The Origins of Isma'ilism, Cambridge 1940; (২২) W. Ivanow, Isma'ilis and Qarmatians, in JBBRAS, xvi (1940), 43-85; (২৩) ঐ লেখক, Ismaili Tradition concerning the Rise of the Fatimids, লন্ডন ১৯৪২ খৃ. ; (২৪) হাসান ইবরাহীম হাসান ও তাহা আহ্‌মাদ শারাফ, 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.; (২৫) A. E. Bertels, Nasir-i Khosrov i Ismailism, মস্কো ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৮০ প.; (২৬) W. Madelung-Fatimiden und Bahrainqarmaten, in Isl., xxxiv (1959), 34-88; (২৭) ঐ লেখক, Das Imamat in der fruhen ismailitischen Lehre, in Isl., xxxvii (1961), 43-135; (২৮) S. M. Stern, The Early Ismaili Missionaries in North-West Persia and in Khurasan and Transoxania, in BSOAS, xxiii (1960), 56-90 ; (২৯) ঐ লেখক, Ismailis and Qarmatians, in L'elaboration de l'Islam, প্যারিস ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৯৯-১০৮ ; কারমাতী আমলের মুদ্রার জন্য দ্র. (৩০) G. T. Scanlon, Leadership in the Qarmatian Sect, in BIFAO, lix (1960), 29-48; (৩১) M. J. de Goeje, La Fin de l'Empire des Carmathes, in JA, ser. 9,

v (1895), 5-30; (৩২) দা. মা. ই. ১৬/২খ, ২১-৩৩।

W. Madelung (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

কারমিসীন (দ্র. কিরমান শাহ্)

কারমূনা (قرمونة) ঃ অধুনা Carmona) ঃ স্পেনের একটি শহর। ইশবীলিয়া, (সেভিল=Seville)-এর ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ২৪,৭৩৮। মূসা ইবন নুসায়র ৯৩/৭১২ সনে প্রাচীন রোমক কারমো (Carmo) শহরটি জয় করেন। তবে অন্য মতে শহরটি তারিক ইবন যিয়াদ দখল করিয়াছিলেন। ইশবীলিয়া ও কুরতুবা (কর্ডোভা) শহরের নিকটবর্তী এক মদীনা ও কূরার নাম দেওয়া হয় কারমূনা। কারমূনা শহরের বুনিয়াদ প্রাচীন। এই শহরে রহিয়াছে শক্ত প্রস্তরের প্রাচীর। আর ইহার দুর্গটি প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল। আল-কিময়ারীর (রাদু'ল-মি'তার, মূল পাঠ ১৫৮-৯, অনু. ১৯০) বর্ণনা অনুসারে এই শহরে একটি অস্ত্রাগার, গণশৌচাগার বা হাম্মামখানা এবং সাতটি মর্মর প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের খিলানযুক্ত বিশাল মসজিদ ছিল। শহরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশের চতুর্দিকে বিস্তৃত ও উর্বর ভেগা অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি অঞ্চলে প্রচুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। জনবহুল গ্রামও সেখানে অনেক। ভেগা কৃষি ভূমি অঞ্চলের কৃষি ক্ষেত্রগুলিতে গম ও যব উৎপন্ন হয়। এই ভূমি অঞ্চলে কিছু চুনা পাথর ও দামী মৃত্তিকার খনি ছিল। এখনও তাহার কিছু কিছু অস্তিত্ব আছে। ঐ অঞ্চলে গার্নেট নামে এক উজ্জ্বল রত্ন প্রস্তরের খনিও ছিল। "ঐ রত্নপ্রস্তরগুলি রাত্রে সেখানে প্রদীপের মত জ্বল জ্বল করিত" (Fagnan, Extraits, 62)। কারমূনা পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে বারবার জনসমষ্টির অধিবাস। এই অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে পুনঃপুনঃ বড় রকম বিদ্রোহের দরুন উহার প্রভাবে আনদালুসের দক্ষিণ অঞ্চল অবধি প্রভাবিত হয়, বিশেষত য়ামানী অধ্যুষিত অঞ্চল প্রভাবিত হয়। এই য়ামানীগণ 'আব্বাসী সমর্থক আল-'আলা' ইবন মুগীছকে সমর্থন জানায়। এই য়ামানীগণই ১৪৬/৭৬৩ সনে 'আবদু'র-রাহমানকে এই কারমূনা শহরে দুই মাস অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ২২৯/৮৪৪ সনে মাজূস (দ্র.) হইতে পলায়মান সেভিলবাসীদের জন্য ইহা আশ্রয়স্থল হইয়া ওঠে। ইহা ছাড়া আমীর 'আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে মুওয়াল্লাদ, বারবার ও সেভিলের আরবরা যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তখনও (৩য়/৯ম শতকের শেষভাগে) এই শহর তাহাদের আশ্রয়স্থলরূপে কাজ করে। বস্তুতপক্ষে এই শহরটি বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। পরে এই শহরটি ৩০০/৯১৩ ও ৩০১/৯১৪ সনে মুহাম্মাদ ইব্ন হাজ্জাজের পদানত হয় এবং ৩০৫/৯১৭ সনে হাজিব বাদ্র এই শহরটি দখল করার পূর্ব পর্যন্ত উহা মুহাম্মাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এমনকি খিলাফাতের পতনের আগেও এই জনপদ শাসন করেন বারবার গোত্রীয় বানূ বিরযাল। তাঁহারা এই জনপদটিকে ৪১৪/১০২৩-৪ সনে কার্যত একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করেন। আল-মু'তাদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সম্ভবত ৪৫৯/১০৬৬-৭ সনের কোনও এক সময়ের জন্য কারমূনা টলেডো (Toledo)-র আল-মা'মূনের দখলে চলিয়া যায়। তিনি ভুলক্রমে এই জনপদটিকে সেভিল (Seville) নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের হাতে তুলিয়া দেন। আল-মুরাবিতগণ রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৪৮৪/ মে ১০৯১ সনে শহরটি দখল করে এবং ৫৪২/১১৪৭ সনে ইহা মুওয়াহহিদূন শাসকদের পদানত হয়। কিছুকালের জন্য (৫৫৫-৬/১১৬০-১) এই জনপদে প্রভুত্ব করেন ইব্ন হামুশ্ক। রাজা ৮ম আল-ফনসো (Alphonso)-র আমলে খৃস্টানগণ কারমূনার ফসলের ক্ষেত-খামারগুলি ধ্বংস করার পর ৬৪৫/১২৪৭ সনে রাজা ৩য় ফারনান্দ (Fernand) ইহা জয় করেন ও সেখানে পুনঃজনবসতি গড়িয়া ওঠে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ছাড়াও দ্র. (১) ইব্ন গালিব, ফারহাতু'ল-আনফুস, আংশিক সম্পা. লুতফী 'আবদু'ল-বাদী', in RIMA, i (1955), 292। বিভিন্ন নির্দেশক ও অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্র. (২) Razi-Levi-Provencal, La 'Description de l'Espagne, in al-And., xviii (1953), 94, 95; (৩) আল-ইদরীসী, মুগরিব, মূল পাঠ ১৭৪, ২০৬, অনু. ২০৮, ২৫৩-৪ (অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সূত্রোল্লেখ); (৪) য়াকূত, ৪খ, ৬৯, ইনি ইহাকে কারমূনিয়্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন; (৫) Fagnan, Extraits, 105, 106; (৬) J. Alemany Bolufer, La geografia de la Peninsula Iberica en los autores arabes, in Rev, Centro Est. Hist. de Granada y su Reino ix (1919), 126, x (1920), 142; (৭) Cl. Sanchez Albornoz, Itinerario de la conquista de Espana por los musulmanes, in Cuadernos de Hist. de Espana, x (1948), 31, 50; (৮) E. Levi-Provencal and E. Garcia Gomez, Una cronica anonima de 'Abd al-Rahman III al-Nasir-Madeld-Granada 1950, নির্ঘন্ট; (৯) Levi-Provencal, Hist. Esp Mus, নির্ঘন্ট;(১০) ইবনু'শ-শাব্বাত, in RIEI, xiv (1967), 110; (১১) H. R. Idris, Les Birzalides de Carmona, in al-And, xxx (1965), 49-62; (১২) J. Bosch-Vila, Los almoravides, Tetouan 1956, নির্ঘন্ট; (১৩) A. Huici Miranda, Hist. politica des imperio almohade, Tetouan 1956, নির্ঘন্ট; (১৪) J. Gonzalez, Las conquistas de Fernando III en Anda-lucia, Madrid 1946, 104, 105; (১৫) ঐ লেখক, Repartimento de Sevilla, Madrid 1951, নির্ঘন্ট; (১৬) Simonet, Hist. de los mozarabes, নির্ঘন্ট; (১৭) Diccionario geografico de Espana, Madrid 1958, vii, প্রাগুক্ত গ্রন্থে অসংখ্য গ্রন্থপঞ্জীমূলক সূত্র নির্দেশনা সন্নিবেশিত; (১৮) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ৬২-৩।

J. Bosch-Vila (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

কারয়া (قرية) ঃ ব. ব. কুরা (قرى) ঃ, শহর, গ্রাম, বাসস্থান,লোকজনের মিলনস্থান, জনপদ ইত্যাদি অর্থে সেমিটিক ভাষাসমূহে ব্যবহৃত শব্দটির বিভিন্ন রূপের উদ্ভব হইয়াছে। আদি দুই-বর্ণ মূল ক-র (ر - ق) হইতে ফিনিসীয় Kart, যেমন Kart-hadast বনাম Carthage অন্তে স্ত্রীলিঙ্গসূচক উপসর্গ) এই মূলের পরিচয় বহন করে। একই কথা প্রযোজ্য হিব্রু Keret এবং Karta (জোরালো অবস্থায় আলিফসহ) সম্পর্কেও যাহার ব্যবহার তারগুমিক, সামারিটান ও খৃস্টীয়-ফিলিস্তীনী গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। সিরীয় ও খৃস্টীয় ফিলিস্তীনী Kere (স্ত্রীলিঙ্গ-অন্ত ছাড়াই)-এর মূলের সহিত একটি Y যোগ করা হয়। কিন্তু আরবী 'কারয়া', দক্ষিণ-আরবী 'কিরয়া এবং হিব্রু গঠনরূপে 'কিরয়াত'-এ দেখা যায়। k-r-y+t (ة - ى - ر - ق)। হিব্রু কিয়রাত আরবা'

(হেব্‌রন, খালীল দ্র.) কিরয়াত ইয়া'রীম, কির্‌য়াত Sefer (ব. ব. Kiryot)-এর মত স্থানের নামে এই গঠনরূপ প্রায়ই দেখা যায়। এই শব্দের সহিত 'সিরতা' (Cirta)-এর সংযোগ Noldeke এই যুক্তিতে বাতিল করিয়া দেন যে, ফিনিশিয়ার একটি স্থানের নাম Constantine Kustantina দ্র.)-এর মত স্থলাভ্যন্তরে এত দূরবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভবনা নাই।

কুরআনে একবচনে কার্‌য়া শব্দটি প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন শহরকে বুঝায়। যথা ঃ মক্কা (৪৭ঃ১৩), সাদুম (Sodom ঃ যথা ঃ ২১ ঃ ৭৪), নিনেভা (১০ ঃ ৯৮) এবং উপকূলীয় শহর (৭ ঃ ১৬৩ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ) ইত্যাদি। নবীগণের বার্তা প্রত্যাখ্যান এবং ফার্সাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টির পরিণামে আল্লাহ্ যে সকল জনপদ অতীতে ধ্বংস করিয়াছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন, সেই সকল জনপদ সম্বন্ধে একবচনে قرية বা বহুবচনে قرى শব্দের বহু ব্যবহার কুরআনে দৃষ্ট হয়। দ্বিবচনে আল-কারয়াতায়ন (৪৩ঃ৩১) মক্কা ও মদীনাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। উম্মু'ল-কুরা শহরসমূহের জননী (৬ ঃ ৯২; ৪২ ঃ ৭) বলিতে মক্কাকে বুঝায়। সম্ভবত ইসলামের পূর্বে মক্কাকে উম্মু'ল-কুরা বলা হইত, কারণ হিজাযের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে মক্কা ছিল নেতৃস্থানীয়। উম্মু'ল-কুরা সম্ভবত গ্রীক Metropolis-এর ভাষান্তরিত রূপ। আবূ মানসূর আল-আয্‌হারী (দ্র.) তাঁহার তাহ্‌যীব গ্রন্থে বলেন, প্রতিটি নগর উহার চতুষ্পার্শ্বের শহরগুলির জননী। ইব্‌ন 'আব্‌দি রাব্বিহ্ (দ্র) (আল-'ইক্‌দু'ল-ফারীদ, কায়রো সং. ১৩২১ হি, ৩খ, ৯৭) ইবনু'ল-কাল্‌বীর বরাতে ছয়টি উম্মুহাতু'ল-কুরা'ল-'আরাবিয়ার উল্লেখ করেন। যথা ঃ য়াছরিব, আত-তা'ইফ, খায়্‌বার, ওয়াদি'ল-কুরা, দূমাতু'ল-জানদাল এবং আল-য়ামামা। আরব ভাষাবিদগণ মনে করেন, قرية শব্দের মূল হইল قرى অথবা ق ر و অর্থাৎ সংগ্রহ, সঞ্চয় অথবা ইহার উদ্ভব قرى শব্দ হইতে অর্থাৎ মেহমানদারীর জন্য লোক সংগ্রহ, বাসস্থান পসন্দের জন্য কোন দেশ পরিদর্শন অথবা কোন স্থান অভিমুখে যাত্রা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Barth, Vergleichende Studien, in ZDMG, xli (1887) 605; (২) ঐ লেখক, Die Nominal bildung in den Semitischen Sprachen,2nd ed, Leipzig 1894, 2ob; (৩) H. Lewy, Die semitischen Fremdworter im Griechischen, Berlin 1895, 142; (৪) M. Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, Weimar 1898, 365; (৫) Le comte de Landberg. Etudes sur les dialectes de l'Arabe Meridionale, I, Hadramout, Leiden. 1901, 689; (৬) Th Noldeke, Zur Bildung des Plurals biem aramaischen Nomen, in Beitrage zur Semitischen Sprachwissenschaft, Strasbourg 1904, 61-62; (৭) ঐ লেখক, Zweiradikalige Substantive, in Neue Beitrage zur Semitischen Sprachwissenschaft, Strasburg 1910, 131; (৮) Gesenius Buhl, Hebraischs und Aramaisches Handworterbuch uber das Alte Testament, 16th ed., Leipzig 1915, দ্র. শিরো.; (৯) Koehler-Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden 1953, দ্র. শিরো.; (১০) Gesenius-Brown, A. Hebrew and English lexicon of the Old Testament, Oxford, repr. 1957 দ্র. শিরো.; (১১) Cyrus H. Gordon, Ugaritic textbook, Analecta Orientalia 38, Rome 1965, no . 2278; (১২) Ch-F. Jean and J. Hoftijzer, Dictionnaire des inscriptions semitiques de l'Ouest, Leiden 1965, 266.

A. N al-Wohaibi (E. I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

কার্‌য়াতু'ল-'উল্‌য়া (قرية العليا ঃ কার্‌য়া আল-'উল্‌য়া), উত্তর-পূর্ব আরবের একটি জনপদ। ২৭° ৩৫ উ. ৪৭° ৪২ পূ. সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৭০ মিটার উচ্চে অবস্থিত এবং ২,২০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত (১৯৬৩ সালের আদমশুমারী)। এই জনপদটি মুতায়র উপজাতির শাসকগোষ্ঠীর সদস্যগণ কর্তৃক ওয়াহ্‌হাবী ইখ্‌ওয়ানদের (দ্র.) একটি হিজরা বা উপনিবেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ১৯৩০ খৃ. হইতে ইহা বেদুঈনদের একটি ক্ষুদ্র বাজারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে প্রায়শই শুধু কার্‌য়া বলা হয়। পুরা নামটি পার্শ্ববর্তী কার্‌য়াতু'স-সুফ্‌লা (দ্র.) হইতে ইহার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুইটির কোন কোন সময় একসঙ্গে কারায়াত (আঞ্চলিক ভাষার একটি বহুবচন) হিসাবে উল্লিখিত হয়। ইব্‌ন সু'ঊদ নামে পরিচিতি 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন 'আব্‌দি'র-রাহমান আস্-সু'ঊদ এবং কুয়েতের শাসক পরিবারের মধ্যে ১৯১৯-২০ খৃ. সংঘটিত সীমান্ত-বিরোধের একটি বড় ঘটনা ছিল কার্‌য়া-র প্রতিষ্ঠা। ইহার ফলে ইখ্‌ওয়ান কুয়েত শহরের ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে আল-জাহ্‌রা' নামক স্থানে সালিম ইব্‌ন মুবারাক আস্-সাবাহ্-এর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করিলে সেখানে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় (মুহাররাম ১৩৩৯/অক্টোবর ১৯২০)।

মুতায়র উপজাতির মুওয়াহা শাখার দুশান বংশের তুরাইব ইব্‌ন বানদার ইব্‌ন শুকায়র ১৩৩৮/১৯১৯ সালে যখন ইব্‌ন সু'ঊদের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া কার্‌য়াতু'ল-'উল্‌য়াতে একটি হিজ্‌রা প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার অনেক পূর্ব হইতেই সেখানে উক্ত উপজাতির একটি সুপরিচিত পানি সংগ্রহ স্থল ছিল। কার্‌য়ার ১১০ কিলোমিটার পূর্বে উপসাগরের তীরে দাওহাত বিলবূল নামক স্থানে সালিমের একটি দুর্গ নির্মাণ পরিকল্পনার সংবাদে ইতোমধ্যেই ১৩৩৭/১৯১৯ সালে নাজ্‌দ এবং কুয়েতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছিল। সম্ভবত ইব্‌ন সু'ঊদের উৎসাহে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে কার্‌য়া-তে ইব্‌ন শুকায়র-এর নির্মাণ কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে কুয়েতের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ ওঠে এবং পরিণামে ৪০০ কুয়েতী সৈন্য প্রেরণ করা হয়, যাহা মুতায়র কর্তৃক কার্‌য়া-র উত্তর-পূর্বে হামাদ কূপের নিকটে শা'বান ১৩৩৮/মে ১৯২০ সালে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। ইব্‌ন সু'ঊদের ইখ্‌ওয়ান যেহেতু তাঁহার সংযত থাকার সনির্বন্ধ অনুরোধ-পত্র পৌঁছার পূর্বেই ফায়সাল ইব্‌ন সুলতান আদ্-দাবীশের নেতৃত্বে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছিলেন—তাই তিনি কুয়েতী উপজাতিদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দিতে রাযী হন। কিন্তু তিনি তাঁহার রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের দাবী পোষণ করিতে থাকেন। শাম্মার উপজাতীয়দের দ্বারা সাহায্যপুষ্ট কুয়েতী বাহিনীর কার্‌য়া অভিমুখে একটি ব্যর্থ অভিযান প্রেরণ এবং চুক্তির আলোচনা ও বৃটিশের মধ্যস্থতা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে ইখ্‌ওয়ান আল-জাহ্‌রা'য় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। উভয় কার্‌য়া ১৯২৮-২৯ সালে কুয়েত

এবং ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণে মুতায়রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। ইব্ন সু'ঊদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ইখ্ওয়ান বিদ্রোহের সময় কারয়াদ্বয় বিদ্রোহীদের কেন্দ্রও ছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইখ্ওয়ানের আক্রমণ তৎপরতা স্তিমিত হওয়ার পরে কারয়া বেদুঈনদের একটি বাজার এবং রিয়াদ ও কুয়েতের মধ্যে প্রধান মোটর পথে একটি শুল্ক ঘাঁটি হিসাবে বিদ্যমান ছিল। সেখানে সা'ঊদী আরব সরকার ১৩৫৫/১৯৩৬-৩৭ সালে একটি বিরাট মাটির দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দেও ভাল অবস্থায় ছিল। রাস্তাটি ক্রমে অব্যবহৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু গ্রামটি, কূপ, চারণভূমি এবং আস-সুমান গোত্রের (দ্র.) বাড়ীঘরগুলি যাতায়াতের জন্য অব্যাহতভাবে বেদুঈনদের উপকারে আসে। এলাকাটি একজন আমীর দ্বারা শাসিত হয়। তিনি সা'ঊদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আদ-দাম্মামের শাসনকর্তার নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আমীন আর-রীহানী, তা'রীখু নাজ্দি'ল-হাদীছ ওয়া মুলহাকাতিহ্, বৈরূত ১৯২৮ খৃ. ২৪৪-৪৬; (২) 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন নাসির, 'উনওয়ানু'স-সা'দ ওয়া'ল-মাজ্দ, Mss.; (৩) H. R. P. Dickson, Kuwait and her neighbours, London 1956, 54, 251-53, index; (৪) সু'ঊদ ইব্ন হুযলূল, তা'রীখু মুলূকি'স-সু'ঊদ, আর-রিয়াদ ১৩৮০/১৯৬১, ১২২-২৬; (৫) হুসায়ন খালাফ আশ-শায়খ খাজ্'আল, তা'রীখু'ল-কুয়েত আস-সিয়াসী, বৈরূত ১৯৬২-৬৫, pt, 4. 222-58।

J. Mandaville (E. I. [2])/ মুঃ আবদুল হালিম খান

কার্‌য়াতু'স-সুফলা (قرية السفلى) ঃ আরব দেশের উত্তর পূর্বে (২৭°২৯' উ. ৪৭°৫২' পূ.) সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৬৫ মিটার উচ্চে এবং প্রায় ৯৭০ জনসংখ্যা-অধ্যুষিত একটি জনপদ (১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী)। ইহার ১৯ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহত্তর জোড়-গ্রাম কার্‌য়া অথবা কারয়াতু'ল-'উল্য়া (দ্র.)-এর নামানুসারে ইহা সাধারণত কুরায়া নামে পরিচিত। ১৩৩৮/১৯১৯ সালে কারয়াতু'ল-'উল্য়া প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক অথবা ইহার কাছাকাছি সময়ে এলাকাটি ইখ্ওয়ান (দ্র.)-এর উপনিবেশ (হিজরা) হিসাবে আযাদ হয়। উপনিবেশিকরা ছিলেন মুতায়র গোত্রীয় লোক। তাঁহার উক্ত গোত্রের 'ইলওয়া শাখা গোত্রের যাও 'আওন শাখার প্রধান হায়িফ্ আল-ফুগ্ম-এর নেতৃত্বাধীন ছিলেন। উভয় জনপদের প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এবং একটি গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দেখুন কার্‌য়াতু'ল-'উল্য়া।

J. Mandaville (E. I.[2])/ মুঃ আবদুল হালিম খান

কাররামিয়া (كرامية) ঃ একটি সম্প্রদায়, ৩য়/৯ম শতকে মোঙ্গল আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রীয় এলাকায় ও পূর্বাংশে, বিশেষ করিয়া ইরানী অঞ্চলে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া ওঠে।

১. উৎপত্তি ঃ জীবনী গ্রন্থসমূহ যেমন আস-সাম'আনীর আনসাব, পত্রক 476^b-477^a; আয-যাহাবীর মীযানু'ল-ই'তিদাল, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ৩খ, ১২৭; একই লেখকের তা'রীখু'ল-ইসলাম, sub anno 255/869 (abridged version in Leiden Ms. 1721, fols. 73^b-75^a); আস-সুব্কীর আত-তাবাকাতু'শ শাফি'ইয়্যা আল-কুবরা, ২য়, ৫৩-৪ এবং আস-সাফাদীর ওয়াফী, ৪খ, ৩৭৫-৭ হইতে জানা যায় যে, আবূ 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন কাররাম ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। (كرامى) (=কাররামী) উচ্চরণটি সাম'আনীর, ইহার মতে كرامى-এর পিতা ছিলেন আঙ্গুর গাছের রক্ষণাবেক্ষণকারী (كرام)। আবার كرام (-কারাম) এবং كرام (কিরাম) উচ্চারণের পক্ষেও সমর্থন রহিয়াছে। মূলত এই সকলের প্রধান উৎস ছিল আল-হাকিম আল-বায়্যি'র তা'রীখ নায়শাবূর, যাহাতে উক্ত শহরের 'আলিমগণের জীবনচরিত রহিয়াছে।

কথিত আছে যে, আরব বংশোদ্ভূত ইব্ন কার্‌রাম আনুমানিক ১৯০/৮০৬ সালে সীস্তান-এর যারান্জ (زرنج)-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই সীস্তান হইতেই তাঁহার নিস্বা বা পদবী হইয়াছে আস-সিজিস্তানী। সেই স্থান হইতে তিনি জ্ঞান অন্বেষণে খুরাসানে যান। তথায় তিনি নীশাপুরের দরবেশ আহমাদ ইব্ন হার্‌ব (মৃ. ২৩৪/৮৪৮), বাল্খ-এর ইব্রাহীম ইব্ন য়ূসুফ আল-মাকিয়ানী (মৃ. ২৫৭/৮৭০) মার্‌ভ-এর 'আলী ইব্ন হুজ্র (মৃ. ২৪৪/৮৫৮) এবং হারাত-এর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন সুলায়মান-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি নিজেও আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-জুওয়ায়বারী (মৃ. ২৪৭/৮৬১) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন তামীম আল-ফির্‌য়ানানী-র সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। পরে তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহারা নির্ভরযোগ্য হাদীছ সংকলক ছিলেন না। এইরূপ সন্দেহযুক্ত হাদীছ সংকলকদের উপর নির্ভর করায় কাররামিয়াদের পরবর্তী বিরোধিগণ সজোরে দোষারোপ করেন যে, অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি সঞ্চার (তারহীব) এবং বেহেশ্‌ত লাভের আকাঙ্ক্ষা (তারগীব) সঞ্চারের জন্য এই সম্প্রদায় জাল হাদীছ তৈয়ার করার সুযোগ দান করিয়াছিল।

মক্কায় মুজাবির (মুসাফির) হিসাবে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করার পর ইব্ন কাররাম জেরুসালেম হইয়া নীশাপূর এবং তার পর সীস্তানে গমন করেন। সেখানে ফকীরীর উদ্দেশ্যে তিনি সকল সম্পদ বিক্রয় করেন এবং চামড়ার অমসৃণ আলখাল্লা পরিধান করিয়া স্বরচিত গ্রন্থ 'আযাবু'ল-কাব্‌র (عذاب القبر)-এ বর্ণিত মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার অপরাধে স্থানীয় গভর্নর তাঁহাকে সীসতান হইতে বহিষ্কার করেন। সুতরাং তিনি সীস্তান ত্যাগ করেন এবং গূর, গারচিসতান এবং খুরাসানের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজস্ব মত প্রচার করেন। এই প্রচারকালে তিনি সুন্নী এবং শী'আ উভয় দলকে দোষারোপ করেন। এই স্থান হইতে তিনি পুনরায় তাঁতী ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর অনুসারী লইয়া নীশাপূরে উপস্থিত হইলে খুরাসনের তাহিরী গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (২৪৮-৫৭/৮৬২-৭৩) ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁহার প্রতি সন্দিহান হন। কেননা পারস্যের অভ্যন্তরভাগ বহুদিন হইতে নানা প্রকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অন্দোলনকারী এবং সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কারণে গোলযোগপূর্ণ ছিল। তাই ইব্ন কাররাম (কোন কোন সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মুহাম্মাদের পূর্ববর্তী গভর্নর তাহির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ কর্তৃক তিনি প্রথম বারে নীশাপূরে থাকাকালীন স্বল্পকালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন) আট বৎসরের জন্য গভর্নর কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ২৫১/৮৬৫ সালে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি কারাগারে ছিলেন। মুক্তির পর তিনি নীশাপূর ত্যাগ করেন এবং জেরুসালেমে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করেন। এইখানে সাফার ২৫৫/জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ৮৬৯ তারিখে তিনি ইনতিকাল করেন। বাব আরীহা বা Jericho Gate-এর নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয় (দ্র. মুজীরু'দ-দীন আল-'উলায়মী, আল-উনসু'ল-জালীল, কায়রো ১২৮৬/১৮৬৬, ১খ, ২৬৩)।

২। মতবাদ ('আকা'ইদ) ঃ ইব্ন কাররামের ধর্মীয় চিন্তাধারা তাঁহার "আযাবু'ল-কাব্‌র" (কাবরের শাস্তি) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

ইহাতে কবরের মুর্দাকে প্রশ্নকারী ফেরেশতা মুনকার ও নাকীরের উল্লেখ আছে, জীবদ্দশায় প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত শুভাকাঙ্ক্ষী দুইজন ফেরেশতা (কিরামুন কাতিবীন)-এর সঙ্গে এই দুইজনের অভিন্নতা ইব্ন কাররাম শিক্ষা দিতেন (দ্র. 'আযাবু'ল-কাব্র)। প্রকাশের সমসাময়িক কালে গ্রন্থটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করে; বর্তমানে প্রধানত আল-বাগদাদীর আল-ফার্ক বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো, ১৩২৮/১৯১০, ২০২-১৪, অনু. A. S. Halkin Tel Aviv, 1935, 18-30; of also ইব্ন হায্ম-এর "আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, কায়রো ১৩৮১/১৯৬১, ১খ, ১০৮-১৩ শাহ্রাস্তানীর আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ed. Cureton, 79-85, tr. Haarbrucker, i, 119-27-এর কেবলমাত্র উদ্ধৃতি হইতে গ্রন্থটি সম্পর্কে জানা যায়। ৩৭০/৯৮০-১ সনে সামানী সেনাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সীমজূর-এর উপস্থিতিতে বাগদাদী ব্যক্তিগতভাবে কার্‌রামিয়া মতানুসারী ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির-এর সঙ্গে বির্তকে লিপ্ত হন এবং এইরূপ দাবী করেন যে, তিনি ইব্ন কাররামের মারাত্মক ভ্রান্তি উদ্‌ঘাটিত করেন। ইব্ন কাররামের অপর গ্রন্থ কিতাবু'স-সির্‌র সম্পর্কে কেবল পরবর্তী কালের গ্রন্থকার ইব্নু'দ-দা'ঈ-এর দুইটি উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়।

রক্ষণশীল বিরোধীদের মতে ইব্ন কাররামের মতবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার লেখায় আক্ষরিকতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি নরত্বারোপ, এই কারণে অনেক ধর্ম-বিশেষজ্ঞ তাঁহার সম্প্রদায়কে মুজাস্সিমা, (যাহারা স্রষ্টাকে নরসুলভ গুণসম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করে) অথবা মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী) দলভুক্ত করিয়াছেন। ইব্ন কাররাম বিশ্বাস করিতেন যে, আল্লাহ্ হইলেন মূল সত্তা (জাওহার -جوهر)। বাগদাদীর মতে এইভাবে তিনি খৃস্টীয় বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হন এবং তিনি মনে করেন যে, যখন পরমাত্মা আসলের সংস্পর্শে (Mumassa) আসেন তখন বিশেষভাবে সীমিত ক্ষেত্রে তিনি অবয়ব (জিসম=جسم) ধারণ করেন। এইভাবে কুরআনের বহুল আলোচিত আয়াত ২০ ঃ ৫ (الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى) (দয়াময় 'আর্‌শে সমাসীন)-এর তিনি ব্যাখ্যা দান করেন; তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী কালে মুমাস্সা শব্দের প্রতিকল্প হিসাবে অধিকতর অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ মুলাকাত (coutignity) ব্যবহার করেন। জগতের চিরন্তনতা ও আল-কুরআনের সৃষ্টি সম্বন্ধে ঘোষণা ইব্ন কাররামের চিন্তকে আলোড়িত করে; তিনি অতি সূক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে এই বিরোধ দূর করেন। বস্তুসত্তা ও অনিত্য সত্তার মধ্যে পার্থক্য অনুসারে পরমাত্মা কতিপয় অনিত্য সত্তার অধীন, যেমন ইচ্ছা, বাকশক্তি, উপলব্ধি, সংস্পর্শ ইত্যাদি এইগুলির উপরে তাঁহার কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু জগৎ এবং জগতের সৃষ্ট বস্তুর উপরে তাঁহার কোন কর্তৃক নাই, ঐ সমস্ত তাঁহার ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে না এবং আল্লাহ্‌র হুকুম كن (কুন) দ্বারা অনুরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বাগদাদী মনে করেন, সৃষ্ট বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, যাহা তাঁহার পরম সত্তা হইতে উদ্ভূত, তাঁহার সীমাবদ্ধতা ইব্ন কাররামের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন (বিদ'আত) এবং এই বিশেষ কারণে ইহা ঘৃণার সহিত পরিহার্য। ইব্ন কাররাম আরও ধারণা পোষণ করিতেন যে, আল্লাহ্ নিজস্ব বিধান অনুসারে তাঁহার প্রতি আরোপিত নামের শাশ্বত অধিকারী, যেমন তিনি একটি সহজাত, যদিও অনঅনুশীলিত সৃষ্টিশক্তি (খালিকিয়া) ও প্রতিপালন ক্ষমতার (রাযুযাকিয়া) জন্য মানব জাতির নিত্য স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আল্লাহ্‌র ন্যায়পরতা সম্পর্কে ইব্ন কাররাম মোটেই কোনও চরম মত পোষণ করিতেন না। তাঁহার মতে আল্লাহ্ শিশু বা বিধর্মীদের হত্যা অনুমোদন করেন না। কেননা তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর অথবা জীবনের পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। ইমামাত সম্পর্কেও তিনি মধ্যমপন্থী মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনুমোদন করেন যে, যদিও সুন্নাহ অনুসারে 'আলী (রা) একজন বৈধ ইমাম এবং মু'আবিয়া (রা) একজন অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী, তথাপি 'আলী ও মু'আবিয়া (রা) তাঁহাদের অনুসারীদের আনুগত্য সাপেক্ষে পাশাপাশি বিদ্যমান থাকিতে পারেন। তিনি মনে করিতেন যে, দুইটি কলেমা একবার উচ্চারণ করিয়া ঈমান আনয়ন করা যায় এবং তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে এবং কেবল ধর্মদ্রোহী হইলে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈমানের প্রকাশ দ্বারা মু'মিন থাকিতে পারে যদিও সে মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাত-এ অবিশ্বাসী অথবা সে একজন মুনাফিক হয়। এমনকি যদি কেহ প্রচলিত ধর্মমত, বিরোধী মনোভাব (আহলু'ল-আহওয়া) পোষণ করে তাহাকেও অনন্তকাল ধরিয়া দোযখের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না।

সর্বশেষ উল্লেখ্য যে, ইব্ন কাররাম কতিপয় আইন সংক্রান্ত বিষয়ে নিজস্ব মত পোষণ করিতেন এইগুলির অধিকাংশই ছিল অধিকতর নমনীয়তাপন্থী। তিনি শিক্ষা দিতেন যে, ময়লা পোশাকে এবং ময়লা শরীরে সালাত আদায় করা যায় এবং কোন অপবিত্র বস্তু (আনজাস)-এর সংস্পর্শে আসিলে তাহার সাধারণ উযূর প্রয়োজন হয় না। তিনি আরও মনে করিতেন যে, মুর্দাকে গোসল করানো বা জানাযা পড়ানো একটি সুন্নাহ (سنة) মাত্র এবং কাফন পরানো বা কবর দেওয়ার মত বাধ্যতামূলক (فرض) নহে।

ইব্ন কাররামের শিক্ষা পদ্ধতি ও সাধানার মধ্যে নিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতার ঝোঁক অতি তীব্রমাত্রায় ছিল এবং ইহা খুরাসানে অনুসারী সংগ্রহে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। বস্তুত কাররামিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাকাশ্শুফ (আত্মগ্লানি) এবং তাওয়াক্কুল (জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌র উপরে চরম নির্ভরতা) তিনি তাঁহার উস্তাদ, দরবেশ ও সাধক এবং কিতাবু'দ- দু'আর রচয়িতা আহমাদ ইব্ন হার্ব (১৭৬/৭৯২—২৩৪/৮৪৭)-এর নিকট শিক্ষা করেন। এই কারণে ইব্ন কাররাম আল-'আবিদ (ধর্মপ্রাণ) উপনামে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে শক্তিশালী কাররামী সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র জেরুসালেমের কুব্বাতু'স-সাখরার (Dome of the Rock) চত্বরে তাঁহার প্রচার বিপুল জনতা আকর্ষণ করিয়াছিল। মৃত্যুর পর জেরুসালেমে তাঁহার মাযার তাঁহার অনুসারীদের ধর্মচিন্তার নিভৃত কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ইহাই একটি বিশিষ্ট সূফীকেন্দ্র বা একটি বিশেষ দরগায় পরিণত হয়, ইরানী সূফী পরিভাষায় যাহাকে খানকাহ বলা হয় (দ্র. য়াকূত, বুলদান, ২খ, ৩৯৩, "আল-খানিকা" প্রবন্ধ)।

তাহাদের তত্ত্বের পরবর্তী বিকাশে কাররামিয়া সম্প্রদায় অন্যান্য ইসলামী সম্প্রদায়ের মতই কতকটা বিভক্ত হইয়া পড়িলেও এই সমস্ত উপদল ইব্ন কাররামের মৌল শিক্ষা হইতে লক্ষণীয়ভাবে অধিক দূরে সরিয়া যায় নাই। আল-বাগদাদী (২০২, tr.18) তিনটি উপদলের নামোল্লেখ করিয়াছেন ঃ হাকীকিয়া, তারা'ইফিয়া ও ইস্‌হাকিয়া। কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহারা পরস্পরকে ধর্ম বিরোধী বলিয়া মনে করিত না। শাহরাস্তানী (79-80, tr. i, 119) বলেন যে, তাহাদের বারোটি উপদল ছিল এবং তিনি ইহার মধ্যে ছয়টি দলের নামোল্লেখ করিয়াছেন,

যেমন পূর্বোল্লিখিত ইসহাকিয়া, তারপর 'আবিদিয়া, নূনিয়া, যারীবিয়া, ওয়াহিদিয়া এবং হায়ছামিয়া। ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযী তাঁহার ই'তিকাদাত ফিরাকি'ল-মুসলিমীন ওয়া'ল-মুশরিকীন গ্রন্থে (কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৬, ৬৭)। সাতটি উপদলের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত কোন কোন উপদলের প্রতিষ্ঠাতাগণ পরবর্তী কাররামিয়া সম্প্রদায়ের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। যেমন আহমাদ ইব্ন 'আবদূস আত-তারা'ইফী (মৃ. ৩৪৭/৯৫৮) এবং মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হায়ছাম (মৃ. ৪০৭ ?/১০১৬-১৭) যাহাকে শাহরাসৃতানী (৮০ প., অনু. ১খ, ১২০ প.) তাহার সম্প্রদায়কে মুতাকাল্লিম ধর্ম-তাত্ত্বিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই দলের ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং পারিভাষিক শব্দাবলীর একটি বিস্তৃত রূপ দান করেন। ইসহাকিয়া উপদল সম্ভবত আবূ য়া'কূব ইসহাক ইব্ন মাহমাশায-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল, যাঁহার পরিবার ছিল নীশাপূরে কাররামী আন্দোলনের প্রধান ভরসাস্থল।

ইসলামী ধর্মীয় চিন্তাধারা বিকাশে কাররামিয়াদের তাৎপর্যের সঠিক মূল্যায়ন সহজ নয়, তবে এই আন্দোলন স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহার সবই বিরোধীদের দৃষ্টির মাধ্যমে, কাররামীদের একটি নৈতিক ও মরমী বাণী সংকলনই (সম্ভবত বেনামী) একমাত্র প্রাপ্ত রচনা (British Museum Or. 8049)। Massignon ইহাকে (Essai sur les origines dù lexique technique de la mystique musulmane[2]. Paris 1954, 267-8) আনুমানিকভাবে নীশাপূরের কাররামী নেতা আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মাহমাশায'-এর প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাম্বালী ও জাহিরীসহ সকল সুন্নী ধর্মশাস্ত্রবিদ এই সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং শাফি'ঈ কাদী আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই সম্প্রদায়ের নেতা ফাদা'ইহ ইব্ন কাররামের বিভিন্ন ভ্রান্তি বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তবে ভূগোলবেত্তা আল-মাকদিসী সফরকালে একাধিকবার কাররামী দলের সংস্পর্শে আসেন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার যে বিশ্বাস জন্মে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই সম্প্রদায়কে দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠাবান বলিয়া গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাহাদিগকে ইমাম আবূ হানীফার দল (আহসানু'ত-তাকাসীম, ৩৬৫) হইতে উদ্ভূত একটি নৈষ্ঠিক ও আল্লাহ্‌ভীরু জনগোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করেন।

মনে হয়, কাররামিয়াদিগকে একদিকে মু'তাযিলা, অপর দিকে আহলু'ল-হাদীছ-এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় অবস্থান সংরক্ষণে নিয়োজিত সুন্নী দলভুক্ত বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত। আল-মাকরিযীর ন্যায় একজন পরবর্তী বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, তাহারা স্বভাবত মু'তাযিলীদের বিরোধী (খিতাত', ২খ, ৩৫৭) ছিল। Massignon (op. cit, 263-4) ইব্ন কাররামকে বর্ণনা করিয়াছেন মধ্যযুগের মুসলিম ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে একজন চিন্তাবিদ বলিয়া, যিনি মু'তাযিলা মতে উদ্ভূত ধর্মীয় প্রশ্নের নূতন এবং গভীরতাসম্পন্ন সমাধান দিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণ তত্ত্বভিত্তিক ছিল না, বরং মরমী ও নৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে রূপ লাভ করিয়াছিল। উল্লেখনীয় ছিল ইব্ন কাররাম কর্তৃক প্রবর্তিত একটি নূতন দার্শনিক ধর্মীয় পরিভাষা, যেমন কায়ফূফিয়া (আল্লাহ্‌র গুণ) এবং হায়ছুছিয়া (আল্লাহর সর্বব্যাপকতা)। অবশ্য বাগদাদী ইহাকে 'ইবারাত সাখীফা (হাস্যকর উক্তি) বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন; তথাপি এইগুলি ইব্ন কাররামের উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় বহন করে। ইহা নিশ্চিত যে, প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটিতে থাকে। Van Vloten এবং Riberay Tarrago-সহ প্রাচ্য বিশেষজ্ঞদের পুরাতন একটি দল এইরূপ ধারণা দিয়াছেন যে, কাররামিয়াদের খানকাহ্ ও মাদরাসাসমূহে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন ইসলামী বিশ্বের (দ্র.) বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, প্রচার এবং আচারনিষ্ঠ জীবনাচরণের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এইগুলি ৫ম/১১শ শতাব্দীতে আশ'আরী হানাফী এবং হাম্বালী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস ছিল; তবে এই যোগাযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না।

৩। **পরবর্তী ইতিহাস** ঃ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্যে কাররামিয়া সম্প্রদায় ইসলামী বিশ্বের এলাকা পূর্বাঞ্চলের বহু স্থান জুড়িয়া বিস্তৃতি লাভ করে। জেরুসালেমে তাহাদের নিজস্ব খানকায় যিক্র-এর একাধিক অধিবেশনসহ বহুসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং সুফতাত বা পুরাতন কায়রোতে তাহাদের নিজস্ব বিশেষ আবাস ছিল; কিন্তু মাগরিবে (মাকদিসী, ১৭৯, ১৮২, ২০২, ২৩৮) তাহাদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। খুরাসান, ট্রান্স অক্সিয়ানা এবং পূর্ব ইরানের প্রান্তিক এলাকাসমূহ এই সম্প্রদায়ের স্থায়ী সুরক্ষিত আশ্রয়ে পরিণত হয় এবং গৃযগান, খুত্তাল, ফারগানা, মার্ভ এবং সামারকান্দ (মাকদিসী, ৩৩২)-এ তাহাদের খানকাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। হারাতে এই সময় 'আসাবিয়া বা দলীয় বিবাদ ছিল কাররামিয়া এবং 'আমালিয়া সম্প্রদায় দুইটির মধ্যে (সম্ভবত এই বিবাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তিও ছিল।

নীশাপূরের কাররামিয়াদের সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি। সেখানে তাহারা বানূ মাহমাশায (দ্র)-এর নেতৃত্বে একটি কলহপ্রিয় ও শক্তিশালী দল ছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এইখানে তাহাদের নেতাদের জীবনের দৃষ্টান্তমূলক আচারনিষ্ঠা এবং তাহাদের প্রচার-পদ্ধতি ও শিক্ষা কার্যক্রমই জনসাধারণের উপর তাহাদের প্রভাবের মূল কারণ ছিল। আবূ য়াকূব ইসহাক ইব্ন মাহমাশায তাঁহার হৃদয়স্পর্শী প্রচারণার দ্বারা বহু-সংখ্যক যিম্মী ও জরথুস্ত্রবাদীকে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠপোষকতার আকারে গায্নাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুবুকতাগীন এবং তৎপর তাঁহার পুত্র সুলতান মাহমূদের সরকারের সমর্থনপুষ্ট হইয়া কাররামিয়া সম্প্রদায় নীশাপূরে তাহাদের বিরোধীদের উপরে সাময়িক প্রাধান্য লাভ করে; এই বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আশআরী শাফি'ঈ 'আলিমগণ। হযরত 'আলী (রা)-র অনুসারী এবং প্রসিদ্ধ শায়খ আবূ সা'ঈদ আল-মায়হানীর জীবন বৃত্তান্ত হইতে অনুমিত হয় যে, এক শ্রেণীর সূফীও এই দলের অন্তর্গত ছিলেন। যাহা হউক, ৪০২/১০১১-১২ সালের পর সুলতান মাহমূদ পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করিলে তাহাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়; তথাপি তাহারা নগরের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত ছিল। বায়হাক-এর স্থানীয় ঐতিহাসিক ইব্ন ফুনদুক এবং ইবনু'ল-আছীর ৪৮৮/১০৯৫ অথবা ৪৮৯/১০৯৬ সালে নীশাপূর ও বায়হাকে এক পক্ষে স্থানীয় কাররামিয়া এবং অপরপক্ষে হানাফী ও শাফি'ঈদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন এবং নীশাপূরে কাররামী প্রধান মাহমাশাযকে হত্যা এবং তাহাদের মাদরাসা ভূমিসাৎ করার ফলে এই বিরোধের সমাপ্তি ঘটে (এই সকল ঘটনার জন্য দ্র. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion[2], 289-90; C. E. Bosworth The rise of the Karramiyah in Khurasan in MW, ১৯৬০ খৃ, ৫-১৪; একই লেখকের The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and eastern Iran 994-1040, Edinburgh ১৯৬৩ খৃ, পৃ. ১৮৫-৯; R. W. Bulliet, The

Patricians of Nishapur, a study in medieval Islamic Social history, Cambridge Mass, ১৯৭২ খৃ, index)।

কাররামিয়াদের শেষ শক্তিশালী আশ্রয় ছিল মধ্য আফগানিস্তানের পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল গূর। সেখানকার জনসাধারণ সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। গূরীদের ঐতিহাসিক জূযজানীর মতে গূরী সুলতান গিয়াছু'দ-দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৫৯৯/১২০২-৩) এবং তাঁহার ভ্রাতা মু'ইযযু'দ-দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৬০২/১২০৫-৬) তাঁহাদের প্রজাসাধারণের ধর্মমতের সহিত একাত্মতার জন্য প্রথম হইতে কাররামিয়াদের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই আনুগত্য শাফি'ঈ মাযহাবের প্রতি স্থানান্তরিত করেন। গিয়াছু'দ-দীনের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিখ্যাত শাফি'ঈ শাস্ত্রজ্ঞ ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী (দ্র.) গূরের রাজধানী ফীরূযকুহ জনপ্রিয় কাররামী ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ইব্ন কুদওয়া-এর সহিত বিবাদে লিপ্ত হইলে সেখানে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে আর-রাযী হিরাত-এ প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কাররামিয়াদের সহিত আর-রাযীর ধর্মীয় মতবিরোধ এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত এবং ইহাতে কাররামী ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্ক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের পর আমরা আর এই সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু জানিতে পারি না। হয়ত খুরাসানের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে তাহারা দুর্দশায় পতিত হইয়াছিল। ইব্ন তায়মিয়া (র)-র মত পরবর্তী লেখকগণ যখন কাররামিয়াদের বিরুদ্ধে লিখিতেন, তখন তাঁহারা কেবল পুরাতন লেখকগণের তথ্যের উপর নির্ভর করিতেন (দ্র. Bosworth, The early Islamic History of Ghur, in Central Asiatic Journal, vi 1961, ১২৮-৩৩ এবং A. Maricq and G. Wiet, Le minaret de Djam, la decouverte de la capitale des sultans ghorides, Paris ১৯৫৯ খৃ, পৃ. ৪৯-৫০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ব্যাপকভাবে প্রবন্ধে উল্লিখিত, ইব্ন কাররামের চিন্তাধারার সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও সহানুভূতিপূর্ণ বর্ণনা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে আলোচিত হইয়াছে ঃ (১) Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane². 260-8, 318-9; see also (২) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932, নির্ঘণ্ট; (৩) H. Laoust, Essai sur les doctrines...... d' Ibn Taymiyya, Cairo 1939, 81, 159; (৪) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, নির্ঘণ্ট; (৫) W. M. Watt, Islamic philosophy and theology, Edinburgh 1962, 79, 184; (৬) A. M. A. el-Galli, The history and doctrines of the Karramiyya, sect, with Special reference to ar-Razi's criticism, Edinburgh M. Litt. thesis 1970, unpublished; (৭) F. E. Peters, Allah's commonwealth, a history of Islam in the Near East 600-1100 A. D. New York 1973, 426-7, 462-3; (৮) D. B. Macdonald The developement of the Muslim theology, jurisprudence and constitutional theory, New York 1903, 170-2, 195, 291-2 (এই পুস্তকে কাররামিয়াগণকে আল্লাহ্‌র মানবগুণবাদের প্রবক্তা বলিয়া প্রচারিত বাতিল মতটি পাওয়া যায়); (৯) দা. মা. ই. ১৭ খ, ২২৪-২৭।

C. E. Bosworth (E. I.²)/মোঃ ইমরুল কায়েস চৌধুরী

কাররী (দ্র. কেররী)

কারলী-ঈলী (کرلی ایلی) ঃ কারলো-ঈলি নামেও পরিচিত, "কার্লো-এর দেশ [দ্র. ঈল]". ১ম Carlo Tocco (১৩৮১-১৪৩০ খৃ.)-এর শাসনাধীন এলাকার সহিত প্রায় অভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম গ্রীসের (Acarnania এবং Aetolia-এর প্রায় সম্পূর্ণ অংশ) একটি জিলার 'উছমানীগণ কর্তৃক প্রদত্ত নাম।

কার্লো-এর পিতা লিওনার্দোকে ১৩৫৭ সালে সেফালোনিয়ার কাউন্ট পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি সেফালোনিয়া, যান্টি এবং ইথাকা সমন্বয়ে গঠিত তাঁহার মূল রাজ্য বিস্তৃত করিয়া লিউকাস দ্বীপ (Leucadia, Santa Maura; তুর্কী Aya Mavra) ও মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত ভোনিতযা (১৩৬২ খৃ.) উহার অন্তর্ভুক্ত করেন। Despotate of Epirus-এর প্রতি তাঁহার দাবী ঘোষণা করিবার মাধ্যমে কার্লো ১৪১৭ সালে নিজকে আরতা (এ্যাম্ব্রাসিয়া, লারতা; তুর্কী ঃ নারদা) এবং আইয়োন্নিনা (Ioannina) (তুর্কী ঃ য়ানয়া [দ্র.]) এলাকাসমূহের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাসমূহ দক্ষিণে পাত্রাস উপসাগর পর্যন্তবিস্তার লাভ করিয়াছিল (লেপান্তো, তুর্কী ঃ আয়নাবাখতী [দ্র.] অবশ্য ভেনেসীয় নিয়ন্ত্রণই অব্যাহত ছিল); ইহা ভিন্ন ক্লারেনজা (Clarentza)-এর বন্দর অধিকার করিবার মাধ্যমে তিনি মোরিয়া অঞ্চলেও একটি প্রবেশপথ অর্জন করিয়াছিলেন। ১৪৩০ সালে আয়োন্নিনায় যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, কোন বৈধ উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকায় তাঁহার পাঁচ অবৈধ পুত্রের একজন মেমনন, কার্লো-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ২য় কার্লো (১৪৩০-৪৮)-এর বিরুদ্ধে সুলতান ২য় মুরাদ-এর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। থেসালোনিকি (সেলানিক দ্র.) অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুরাদ, রুমেলি-এর বেগলারবেগী সিনান পাশাকে আইয়োন্নিনা-র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; উক্ত এলাকা আত্মসমর্পণ করে (অক্টোবর ১৪৩০)। বার্ষিক আনুগত্য-কর প্রদানে স্বীকৃত হইবার মাধ্যমে ২য় কার্লো তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্যের উপর কর্তৃত্বে বহাল থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর (সেপ্টেম্বর ১৪৪৮) পর তাঁহার নাবালক পুত্র লিওনার্দো-এর অভিভাবকগোষ্ঠী ভেনিসের নিকট নিরাপত্তার জন্য সাহায্যের আবেদন করেন। ইহার ফলে সুলতান আরতা (১৪৪৯) অধিকার করিয়া লইলেন এবং ১৪৬০ সালে এ্যাঞ্জেলোক্যাস্ট্রন হস্তচ্যুত হইবার পর মূল ভূখণ্ডে লিওনার্দো-এর নিয়ন্ত্রণে শুধু ভোনিটযা অবশিষ্ট থাকে। নেপলস্-এর রাজার প্রতি লিওনার্দো-র যোগাযোগ স্থাপন প্রচেষ্টায় বিরক্ত হইয়া ভেনিস ১৪৭৯ সালে সম্পাদিত ১৪৬৩-৭৯ সালের যুদ্ধ সমাপ্তিসূচক চুক্তিতে লিওনার্দো-কে অন্তর্ভুক্ত করে নাই। ইতিমধ্যে সুলতান ২য় মুহাম্মাদ দক্ষিণ ইতালীতে অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য পরিকল্পনারত ছিলেন এবং জনৈক 'উছমানী সানজাক বেগীকে (সম্ভবত Tocco পরিবারের কোন একজন সদস্য) অপমানিত করা হইয়াছে এই অভিযোগে লিওনার্দো-র দ্বীপ-রাজ্য আক্রমণ করিবার অজুহাত পান। এই সময়ে ভ্যালোনা (তুর্কী ঃ আওলোনয়া দ্র.)-এর সানাজক বেগী পদে অধিষ্ঠিত গেদিক আহমাদ পাশা (দ্র.)-এর অধিনায়কত্বে তুর্কী নৌ-বহর সান্নিকটে উপস্থিত হইলে লিওনার্দো পলায়ন করেন এবং আহমাদ পাশা ভোনিটযা, সান্তাম'রা, সেফালোনিয়া এবং যান্টি অধিকার করেন। ১৪৮১ সালে Tocchi পরিবার সেফালোনিয়া

এবং যান্টি উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ভেনিস তাহা দখল করিয়া নেয়; যান্টির উপর ভেনিসের অধিকার বহাল থাকে (১৭৯৭ সাল পর্যন্ত); কিন্তু ১৪৮৫ সালে ২য় বায়াযীদ-এর নিকট সেফালোনিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়; তবে ১৫০০ খৃ. উহা পুনরায় ভেনিসের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যাবর্তন করে।

'উছমানী উৎসসমূহে প্রাপ্ত 'কারলী-ঈলী' সংক্রান্ত প্রাচীনতম নির্দেশনসমূহ পরস্পর-বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর। ৭৮৭/১৩৮৫ সালে তিমুরতাশ পাশা কারলী-ঈলি পর্যন্ত দূরত্বে অভিযান পরিচালনা করেন এতদ্‌সংক্রান্ত 'আশিক পাশা-যাদে (৫৬) প্রদত্ত বক্তব্যটি গঠনের ভ্রান্তিরূপে পরিত্যাজ্য হইয়াছে ("Kraljevic-এর দেশ" অর্থাৎ প্রিলেপ-এর স্থলে উক্ত ভ্রান্তি হইয়াছে; দ্রষ্টব্য, সর্ব-সাম্প্রতিক প্রবন্ধ, Irene Beldiceanu-Steinherr, Recherches sur les actes...., মিউনিখ ১৯৬৭ খৃ. ১৯৭-৮), যদিও H. Inalcik মনে করেন, যে, উক্ত নির্দেশনা দ্বারা বস্তুতপক্ষে কার্লোথেপিয়া-এর দেশ (দ্র. আরনাওয়াউতলূক) চিহ্নিত করা হইয়াছে। 'আশিক পাশা যাদে পুনরায় একটি ভ্রমাত্মক বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যখন ৮৬৪/১৪৬০ সালে মোরিয়া অঞ্চলে পরিচালিত ২য় মুহাম্মাদ-এর অভিযান বর্ণনাকালে (শো. ১৩০) তিনি উক্ত অঞ্চলের কতিপয় দুর্গ সমষ্টিকে (মিস্ত্রা, লিওনদারি,? অ্যাস্ট্রোস) কারলী-এলি নামে অভিহিত করেন। তাঁহার এই বক্তব্য নেশরী, ইব্‌ন কামাল, সা'দু'দ-দীন প্রমুখ কর্তৃক পুনরুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, এই অভিযানের ঘটনাপ্রবাহে দক্ষিণ আতোলিয়া (Aetolia) স্পষ্টতই 'উছমান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল (দ্র. Hopf, Gesch. Griechenlands, ২খ, ১৩৬ এবং তু. Sphrantzes, সম্পা. Grecu, ১২৪) (১৪৬০-এর হেমন্তকালে এ্যাঞ্জেলোক্যাস্ট্রনে একজন সুবাশী)।

ঠিক কখন কারলী-ঈলী একটি সানজাক রূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে (ইহার প্রধান কেন্দ্র ছিল এ্যাঞ্জেলোক্যাস্ট্রন) তাহা সুস্পষ্ট নয়। Promontorio de Campis (আনু. ১৪৭৫ খৃ. সম্পা. Babinger) কর্তৃক তালিকাভুক্ত রূমেলি-র ১৭টি সানজাক-এর মধ্যে ইহার নাম অন্তর্ভুক্ত নাই। কিন্তু ৮৯৪/১৪৮৯ সালের জিযুয়া করের প্রতিবেদনে "লিওয়া-ই কারলো" (Belgeler, ১/১খ, ১৯৬৪ খৃ. ১০১)-এর উল্লেখ আছে এবং ৯০৯/১৫০৩ সালের জন্য একজন সানজাক বেগীর (মীর-ই লিওয়া-ই কারলো) নামোল্লেখ করা হইয়াছে (M. T. Gokbilgin, Edirne ve Pasha Livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ. ৪৮১)। রূমেলি-র অন্তর্গত সানজাকসমূহের তালিকায় ইহার স্বল্পকাল পরেই কারলী-ঈলী-এর আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে দ্র. IKt. Fak. Mecm, ১৫খ, (১৯৫৩-৫৪), ৩০৩; Bell, ২০খ. (১৯৫৬), ২৫৩, ২৬০, এবং নং ১৭০; তু. IA, প্রবন্ধ রূমেলী (H. Inalcik), ৭৭১-২। প্রায় একই সময়ে চূড়ান্তভাবে সংখ্যাগরিষ্ট খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মোট পরিবারের সংখ্যা প্রসঙ্গে দ্র. JESHO, ১খ. (১৯৫৭-৫৮), ৩২।

৯৪০/১৫৩৪ সালে খায়রু'দ-দীন (বারবারোসা দ্র.)-এর জন্য সৃষ্ট "সমুদ্র অঞ্চলের বেগলেরবেগিলিক" [দ্র. জাযা'ইর-ই বাহর-ই সাফীদ] প্রথমে পর্যায়ে , গেলিবোলু ব্যতীত শুধু রোডোস, এগরিবোয এবং মিদিল্লি (উভয় দ্র.) লইয়া গঠিত ছিল [দ্র. Ramberti, in A. H. Lybyer, The government of the Otoman Empire..., কেমব্রিজ পাণ্ডু. ১৯১৩ (পুনঃমুদ্রণ, নিউইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ.), ২৫৬, ২৫৯ এবং Ramberti-র নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গে তুলনীয়, ৩১৪]; কারলী-ঈলী পরবর্তী সময়ে ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়, সম্ভবত ৯৫৭/১৫৫০ সালে, 'উছমানী শক্তির পক্ষে যোগদান করিয়া, তুরগুদ রে'ঈস [দ্র.] যখন ইহার সানজাক-বেগী পদে নিযুক্ত হন (দ্র. Aziz Samih Ilter, Simali Afrika'da Turkler, ২খ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৭খৃ., ১৮৯ এবং ১৯৪, যাহাতে Pecevi [১খ, ৩৪৬-৭] আলোচিত হইয়াছে এবং হাজ্জী খালীফা, তুহফাতু'ল কিবার [ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি., ৬৭-৮] ; তবে ১১শ/১৭শ শতাব্দী হইতে এই এয়ালেত-এর অন্তর্গত সানজাকসমূহের মধ্যে ইহার নাম অভ্রান্তভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে; উদাহরণস্বরূপ ঃ 'আয়ন-ই 'আলী, আনু. ১০১৮/১৬০৯ [JA, সিরিজ ৬, ১৫খ, (১৮৭০ খৃ.), ২৬৬]; কোচী বেগ, আনু. ১০৫০/১৬৪০ (সম্পা. A. K. Aksut, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ., ১১০) ; এবং হাজ্জী খালীফা, আনু. ১০৫৬/১৬৫৬ (তুহফাতু'ল-কিবার, ১৪৭; জিহান্নুমা গ্রন্থে কারলী-ঈলীকে রূমেলি-র অন্তর্ভুক্ত করা তাহার একটি বৈসাদৃশময় কার্য ; সম্ভবত তিনি এই ক্ষেত্রে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর কোন তালিকা ব্যবহার করেন, দ্র. I.A. প্রবন্ধ রূমেলি, ৭৭২b)।

হাজ্জী খালীফা ঃ (J. von Hammer, Rumeli und Bosna, ভিয়েনা ১৮১২ খৃ., ১২৭-৯) সাতটি কাদার নাম উল্লেখ করেন ঃ প্রেভেজা (ভুল ?), আয়া মাভরা, ভোনিতসা, এ্যাঞ্জেলোক্যস্ট্রন, যেরোমেরন, ভালতোস এবং ভ্রাখোরিয়ন। ১০৮১/১৬৭০ সালে আওলিয়া চেলেবী এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অবশ্য সহজে বোধগম্য নয়। তিনি ছয়টি কাদা-র নাম উল্লেখ করেন (প্রেভেজা-র নাম বাদে, ৮খ, ৬২৬)। এই সানজাক-এর পূর্ব সীমান্ত ছিল যিলান-চায়ী ফিধারিস নদী/এভিনোস। অধিকন্তু তিনি যেবান' (যাপানদি), "ব. হুর" (বোখোরি, হাইপোখোরিয়ন), মেসোলনঘী, আনাতোলিকো (= এতোলিকন) এবং কালীভে' (কালিভিয়া) নামক ক্ষুদ্র শহরসমূহের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

আয়া মারভা এবং ভোনিতসা ১০৯৫/১৬৮৪ সালে Morosini-এর দ্বারা অধিকৃত হইবার পর Karlowitz-এর চুক্তি অনুযায়ী (কারলোফচা [দ্র.], ১১১০/১৬৯৯) তাহা ভেনিসের নিকট অর্পণ করা হয় (আইয়োনীয় দ্বীপসমূহের ইতিহাস প্রসঙ্গে অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য, য়েদি আদালার)। ১৮শ শতাব্দীর সমাপ্তিপর্বে কারলী-ঈলী 'আলী পাশা তেপেনদেলেনলী [দ্র.] এর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৮২১-৯ খৃ.) অতি প্রারম্ভিক সপ্তাহসমূহের মধ্যেই মেসোলনঘী এবং ভ্রাখোরি বিদ্রোহে যোগদান করে এবং এই এলাকাসমূহ বহু সংঘর্ষের ঘটনাস্থল হইয়া দাঁড়ায়। চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হইবার পর, নূতন সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তরেখা (১৮৩২ খৃ.) অনুযায়ী সম্পূর্ণ কারলী-ঈলী গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Miller, The Latins in the Levant, লন্ডন ১৯০৮ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৪ খৃ.), নির্ঘন্ট, দ্র. Tocco ; (২) Fr. Babinger, Beitrage zur Geschichte von Qarly-eli vornehmlich aus osmanischen Quellen, গ্রীক উৎস (?), ১খ, এথেন্স ১৯৩৩ খৃ., ১৪০-৯ (=Aufsatze und Abhandlungen..., ১খ, মিউনিক ১৯৬২ খৃ., ৩৭০-৭) ('উছমানী দায়িত্ব পালনে কর্তব্যরত Tocco পরিবারের সদস্যবর্গ প্রসঙ্গে); (৩) পীরী রে'ঈস, Kitabi Bahriye, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ., ৩১৭-২৪; (৪) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাতনামে, ৮খ, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ৬২০-৩৭;

(৫) I. G. Giannopoulou. বিভিন্ন গ্রীক পত্রিকা, গ্রন্থ ও উৎস; (৬) F.C.H. L. Pouqueville, Voyage de la Grece[2], প্যারিস ১৮২৬-৭ খৃ., ৩খ, ৪৩৮ প. ; (৭) J. C. Hobhouse, A journey through Albania..., লন্ডন ১৮১৩ খৃ., ১খ, ১৯৩-২১১; (৮) W. M. Leake, Travels in Northern Greece, লন্ডন ১৮৩৫ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৭ খৃ.), ১খ, ১০৬-৭৫, ৩খ, ৪৮৮-৫৭৮, ৪খ, ১-৪৩; (৯) D. Urquhart, The spirit of the East, লন্ডন ১৮৩৮ খৃ., ১খ, ৪৫ প.; (১০) Greece (Guides-Joanne, Hachette), প্যারিস ১৯১১ খৃ., ৩২১-৫।

V. L. Menage (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কারলুক (قرلق) ঃ কারলুগ (قرلغ) কারলুক (قارلق) প্রাচীন আরবী রূপ ঃ খারলুখ (خرلخ), 'ফারসী ভাষায় খাল্লুখ (خلخ), শেষোক্ত রূপান্তর হইতে বিভিন্ন সূত্রে খালাজ [দ্র.]-র সহিত প্রায়শ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, চীনা ভাষায় কো-লু-লু (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মধ্য চৈনিক, কার-লা-লুক), মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী একটি তুর্কী জাতিভূত উপ-জাতীয় সমষ্টি। মূলত ইহারা তিনটি গোত্র সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র ফেডারেশন ছিল, যাহা তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন ছিল (এই গঠনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হইতেই আনুমানিক ৭৬০ সালের উইগুর-সাইন-উসু লিপিসমূহে ইহাদের জন্য প্রদত্ত নাম উচ-কারলিক-এর উদ্ভব হইয়াছে; অন্যপক্ষে হুদূদু'ল-'আলম ৯৮, কারলুক গোষ্ঠীর অন্তর্গত রূপে সাতটি উপগোত্রের উল্লেখ করিয়াছে)। ইহাদের সর্বোচ্চ গোত্রপ্রধান কখনও কাগান (খাকান=(خاقان)) অথবা খান উপাধি বহন করেন নাই, কিন্তু ৭ম এবং ৮ম শতাব্দীতে তাহারা এলতেবার (সম্ভবত "ভূমি অথবা জনবলের অধিকারী" অর্থবোধক) উপাধির অধিকারী ছিল, যাহা তুলনামূলকভাবে একটি মধ্যম পর্যায়ের মর্যাদারূপে বিবেচিত ছিল (দ্র. A. Bombaci, On the ancient Turcic title Eltabar, in Proceeding of the IX-th meeting of the Permanent International Altaistic Conference, নেপলস্ ১৯৭০ খৃ. ২৪, ৫৭-৮) এবং কাশগারী প্রণীত তাঁহার দীওয়ান লুগাতি'ত-তুরক গ্রন্থের ভূমিকাপর্বে প্রদত্ত বিশটি তুর্কী উপগোত্রের তালিকায় ইহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই (অনু. Atalay, ১খ ২৮)। কাশগারী অবশ্য কতিপয় তুর্কী শব্দ এবং বাক্য প্রসঙ্গে কারলুক গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাদেরকে ওগুজ গোত্র হইতে সুস্পষ্টভাবেই পৃথক, তবে তাহাদের ন্যায় তুর্কোমেনরূপে বিবেচিত একটি যাযাবর শ্রেণীর উপগোত্ররূপে বর্ণনা করেন (অনু. ১খ, ৪৭৩; তু. Barthold, Four studies on the history of Central Asia, ৩খ, A history of the Turkman people, ৭৮)।

কারলুক গোত্র প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞাত প্রথম তথ্যসমূহ চৈনিক উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত; এই সকল সূত্রে ইহাদের আনুমানিক ৬৪০-৫০ সালে পশ্চিমাঞ্চলীয় Tu-chueh অথবা তুর্কগণ দ্বারা বিজিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সময়কালে তাহারা ইরতীশ নদীর উজান অঞ্চল এবং তিয়েনশান (T'ien Shen) পর্বতের উত্তর অঞ্চলে মেষপালক জনগোষ্ঠীরূপে বসবাস করিত। ৮ম শতাব্দীর প্রাথমিক বৎসরসমূহে ইহারা পূর্বাঞ্চলীয় T'u-chueh সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায় এবং ওরখন লিপিসমূহে ৭১১-১৪ সালে খাগান-এর বিরুদ্ধে কারলুক গোষ্ঠীর বিদ্রোহ সংগঠনের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. Sir Gerard Clauson এবং E, Tryjarski, The inscription at Ikhe Khushotu, in RO, ৩৪/১খ, ১৯৭১ খৃ., ২৭-৮, ২৯)। যে সার্বিক ও বহুল বিস্তৃত বিশৃঙ্খলা এবং উত্থান পূর্বাঞ্চলীয় T'u-chueh সাম্রাজের সম্পূর্ণ বিনাশ আনয়ন করে (৭৪৩-৫), তাহাতে কারলুক গোষ্ঠী বাসমীল এবং উইগুরগণের সহিত যোগদান করিয়াছিল, পরবর্তীতে তাহারাই আবার উইগুরদের নিকট পরাজিত হয় এবং ট্রান্স-অক্সানিয়া অভিমুখে পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। [এই সকল ঘটনা প্রসঙ্গে দ্র. E. Chavannes, Documents sur les Tou-xiue (Turcs) Occidentaux, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৯০০ খৃ.; Liu Mau-tasi, Die chinesische Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (T'u-kue), Wiesbaen ১৯৫৮ খৃ. L. N. Gumilev, Drevnie Tyurki, মস্কো ১৯৫৭ খৃ., J. R. Hamilton, Les Ouigours a l'epoque des Cinq Dynasties, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ.]।

এই পর্যায়ে ইহারা মুসলিম গ্রন্থকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইসতাখরীর মতে (পৃ. ২৯০) কারলুক এবং ওগুজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভক্তি সীমারেখা ছিল সির-দরিয়া-র মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত ইসফীজাব এলাকায়, অন্যদিকে হুদূদু'ল-'আলাম (৩৭২/৯৮২, ৯৭, তু. মানচিত্র ৫, ২৭৯) গ্রন্থে এই এলাকা ইসিককূল নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ সেমিরেচয়ে-এর দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর নির্দেশ করা হইয়াছে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন মুসলিম সূত্রে ইহাদের নেতৃবর্গ যাবগূ (يبغو) নামক উপাধি ভূষিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে [আরবী ভাষ্য জাবগূয়া (جبغوية) সম্ভবত ইহা শব্দটির কোনপ্রকার পশ্চিম তুর্কী উপভাষায় উচ্চারণ-রীতি প্রতিফলন করে], একই উপাধি ওগুয (দ্র. গুযয) গোত্রের প্রধানগণ কর্তৃক সমভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন অপর কিছু সংখ্যক কারলুক ছিল, যাহারা দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অক্ষু নদীর অববাহিকার উজান তুখারিসতানে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। আরব উৎসসমূহ এই অঞ্চলে Hephthalite-গণের epigoni-র বিরুদ্ধে পরিচালিত আরব অভিযানসমূহের প্রসঙ্গে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অঞ্চলের কারলুকগণের অধিপতি একইভাবে যাবগূ উপাধি ব্যবহার করিতেন।

ট্রান্স-অক্সানিয়ার উত্তরতম প্রান্তদেশে বসবাসকারী এই সকল কারলুক বহু কাল পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় আরব অগ্রাভিযানের অপ্রতিরোধ্য স্রোতের সম্মুখে পলায়মান বাস্তুত্যাগী এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভিন্ন-মতাবলম্বীগণের জন্য একটি আশ্রয়রূপে বিবেচিত ছিল। ইহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণভাবেই দেখা যায় যে, খলীফা হারূনু'র-রাশীদের বিরুদ্ধে সামারকান্দ-এর বিদ্রোহী আরব গভর্নর রাফি' ইব্ন লায়ছ-কে যাবগূ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় সাগদীয়ান ও তিব্বত-এর শাসক সমর্থন প্রদান করেন। এই প্রকার সংস্পর্শ, অবশ্য সম্ভবত কারলুক গোষ্ঠীকের ইসলামী বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতি অধিকতর আগ্রহী ও অনুরক্ত করিয়া তোলে, অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর পশ্চিমে অবস্থিত ওগুয গোত্র সুস্পষ্টভাবেই একটি নিম্নতর সাংস্কৃতিক স্তরে রহিয়া যায়। ২৮০/৮৯৩ সালে তালাস-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত সামানীয় আমীর ইসমা'ঈল ইব্ন আহমাদ [দ্র.]-এর সামরিক অভিযান তাহাদের ভূ-খণ্ডের হৃদ-কেন্দ্রে আঘাত হানে। ইহার ফলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর ভৌগোলিকবৃন্দ তালাস-এর পূর্ব দিকে অবস্থিত বেশ কয়েকটি শহরে মসজিদসমূহের অবস্থিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এই

সময়কালে কারলুক গোষ্ঠীর তুলনামূলকভাবে সাংস্কৃতিক অগ্রসরতার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। হুদূদু'ল-'আলাম-এ প্রদত্ত একটি বক্তব্যে, যাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহারা অত্যন্ত মধুর স্বভাবের লোক এবং জীবনযাত্রার মানের দিক হইতে ইহারা সভ্য সমাজের প্রায় সমতুল্য। একই সূত্রে সেমিরেচেয়ে-র দক্ষিণ অংশে তাহাদের বসতিসমূহের কতিপয় প্রসঙ্গে বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, তথায় কিছুসংখ্যক কারলুক কৃষিকার্য করিত এবং বণিকদের আগমন ঘটিত (৯৭-৮, ২৮৬ প.)।

যেই কারাখানী রাজবংশ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ট্রান্স-অক্সানিয়া অঞ্চলের সামানীয় আমীরশাহীর সমাপ্তি ঘটায় এবং গায্নাবী বংশের সহিত ইহাদের অধীনস্থ এলাকাসমূহ বণ্টিত করিয়া লয়, তাহারা কারলুক গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে (এই মতবাদটি O. Pritsak, Von den Karluk zu den Karachaniden, in ZDMG, ১০১, ১৯৫১ খৃ. ২৭০-৩০০, কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে) ; কিন্তু সমভাবে সম্ভাব্য অপরাপর প্রার্থীর মধ্যে রহিয়াছে চিগিল, য়াগমা, তুরগেশ ইত্যাদি গোত্র এবং ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, কাশগারী, যিনি কারাখানী সামাজিক পরিবেশ হইতে আগমন করেন তিনি এই রাজবংশের মূল উৎসরূপে কারলুক গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন নাই [দ্র. ইলেক খান]। কিছুসংখ্যক কারলুক গোত্রসদস্য নিশ্চিতভাবেই কারাখানী এলাকাসমূহের যাযাবর শ্রেণীর উপদলরূপে থাকিয়া গিয়াছিল। কারণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে আমরা এই সকল উপদল ও কারাখানী খানগণের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতের বিবরণ দেখিতে পাই। সামারকান্দ-এর চাগরী খান-এর সহিত বিরোধে লিপ্ত কারলুক গোষ্ঠীর জন্য সাহায্য প্রেরণ করিবার অজুহাত ব্যবহার করা মাধ্যমে ৫৫৩/১১৫৮ সালে খাওয়ারাযম শাহ দ্বিতীয় আরসলান ট্রান্স-অক্সানিয়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (দ্র. জুওয়ায়নী-Boyle, ১খ, ২৮৮-৯; Bosworth, in Cambridge History of Iran, ৫খ, ১৪৮-৯, ১৮৭-৮)।

৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভক্ষণে দেখা যায় যে, ইলি নদীর উত্তর পার্শ্বের অঞ্চলসমূহে এবং দক্ষিণ সেমিরেচয়েতে অবস্থিত তাহাদের পূর্বতন কেন্দ্র হইতে পূর্ব অভিমুখে অর্থাৎ আলমালিগ ও কায়ালিস এলাকার সর্বত্রই কারলুক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন। এইসকল অঞ্চলে এই সকল খান কারা খিতায় [দ্র.]-এর আনুগত্যের অধীন ছিল (আল-জুওয়ায়নী-Boyle, ১খ, ৭৪-৫ ; Barthold, For studies ....১খ, History of the Semirechye, ১০৩-৪)। ৬১৬/১২১৯ সালে কারলুক উপজাতীয় সেনাদল চিংগীয খান-এর বাহিনীতে যোগদান করে এবং ট্রান্স-অক্সানিয়া আক্রমণে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু মোঙ্গল যুগের পর হইতে মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কারলুক গোষ্ঠীর নাম ক্রমশ বিরল হইয়া পড়ে, যদিও তাহা কখনও সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, মীরযা মুহাম্মাদ হায়দার দুগলাত প্রণীত তা'রীখ-ই রাশীদী গ্রন্থে (আনু. Elias and Ross, ৩০৯) একজন কারলুক গোষ্ঠীভুক্ত সেনাধ্যক্ষ (সিরদার)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, যিনি ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ট্রান্স-অক্সানিয়া অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। বর্তমান সময়কালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আফগানিস্তান, বাদাখশান এবং কাত্তাগান অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী বিভিন্ন তুর্কী বংশোদ্ভূত উপদলসমূহ নিজেদের কালুক অথবা কারলুক নামে পরিচয় প্রদান করে [দ্র. G. Jarring, on the distribution of Turk tribes in Afghanistan, an attempt at a preliminary classification, in Lunds Universitets Arsskrift, N. F. ৩৫/৪খ, (লুনদ্-লাইপযিগ ১৯৩৯ খৃ.), ৭১-৩ ও নির্দেশিকা]।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত অতিরিক্ত তথ্য-উৎসরূপে দ্রষ্টব্য : (১) Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion[3], নির্ঘণ্ট ; (২) ঐ লেখক, Histoire des Turcs d'Asie Centrale, ৩-৫ অধ্যায় ; (৩) Bosworth, The turks in the Islamic lands up to the mid 11th century, in Phtf, ৩খ, Wiesbaden ১৯৭০ খৃ. ; (৪) I. A., প্রবন্ধ কারলুকলার (Rahmeti Arat)। (৫) ইসলামী ভৌগোলিকগণের প্রদত্ত তথ্যসমূহ Minorsky কর্তৃক হুদূদু'ল-'আলাম গ্রন্থের কারলুক অংশ প্রসঙ্গে তাঁহার সুচিন্তিত ব্যাখ্যা গ্রন্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, ৯৭-৮, ২৮৬-৯৭ ; (৬) দা. মা. ই., ১৬/১খ, পৃ. ২৪-২৫।

C. E. Bosworth (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

কারলোফ্চা (قرلوفچه) : আধুনিক তুর্কী ভাষায় কারলোফ্চা ; (প্রচলিত পাশ্চাত্য ব্যবহারে Carlowicz) ; বর্তমানে Sremski Karlovci নামে পরিচিত উত্তর যুগোস্লোভিয়ার একটি শহর। ইহা সিরমিউনে (Serbo-Croat Srem, 'উছমানী সিরেম) ফ্রুসকা গোরা-এর উত্তর ঢালে দানিউব নদীর সন্নিকটে অবস্থিত এবং বেল- গ্রেড হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে ৪৫$\frac{১}{২}$ মাইল ১৯৬১ খৃ. ইহার অনুমিত জনসংখ্যা ছিল ৬,৩৯০।

ইহার প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৩০৮ খৃ. এই সময় ইহার নাম ছিল কারোন। সপ্তদশ শতাব্দীর 'উছমানী পর্যটক আওলিয়া চেলেবীর বর্ণনায় ইহার দুর্গ (কাল'আ)-সমূহ হাঙ্গেরীয় রাজন্যগণের দ্বারা নির্মিত এবং মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে হাঙ্গেরীয় শাসনাধীনে থাকাকালীন অবস্থায় কা'রলোফ্চা শা'বান ৯২৭/জুলাই ১৫২১ সালে 'উছমানী শাসনাধীনে আসে। সে বিজয় অভিযানের ক্রান্তিকালে বেলগ্রেড তাহাদের করায়ত্ত হয়, তাহারই এক পর্যায়ে এই শহর 'উছমানীগণের নিয়ন্ত্রণে আসে। ইহার বিজয় অভিযানের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন য়াহ্য়া পাশা যাদে কূচূক বালী বেগ-এর নেতৃত্বে স্পেনীয় গাযীগণ [F. Tauer (সম্পা.), Histoire de la campagne du Sultan Suleyman IER contre Belgrade en 1521, Prague ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৪৭, নং ১৫২, তু. ফেরীদূন মুনশা'আত[2], ১খ, ৫০৮-১০]। উক্ত য়াহ্য়া পাশা পরবর্তীকালে বেলগ্রেড-এর বেগ্লের্ বেগি পদ লাভ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন 'উছমানী উৎসে ইহার নাম যে সকল রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে : ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের একটি দেফতের-ই মুফাস্সালে, কারালোভচী/কারলোচী (? = হাঙ্গেরীয় কার্লোক্যা) ১১শ/১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারলোফচা ; ১২শ/১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগের মধ্যে (রাশিদ), কারলোভীচে [শেষোক্ত এই রূপান্তরটি সম্ভবত এই সময়ে প্রচলন লাভকারী অস্ট্রীয় (অর্থাৎ জার্মান) প্রচলিত রূপ Karlowitz-এর প্রতিফলন করে]।

'উছমানী শাসনের অধীনে কারলোফ্চা প্রাথমিকভাবে বেলগ্রেডের বেগলের বেগি-র কর্তৃত্বের অধীনস্থ ছিল। পরবর্তী সময়ে বুদিন এলাকা বিজয় এবং উক্ত এয়ালেত স্থাপনের পর (৯৪৮/১৫৪৯) কারলোফচা উক্ত এলাকার অধীনস্থ হইয়া পড়ে এবং এই অবস্থা পরবর্তীকালে বহাল

থাকে। সিরেম সানজাক-এর অন্তর্গত হিসাবে ইহা ভারাদিন (Peterwardein)-এর কাদা'-এর একটি নিয়াবা গঠন করে। ২য় সেলীম-এর শাসনকালের একটি দেফতের-ই মুফাস্সাল অনুযায়ী ১০ম/১৬শ শতকের শেষভাগে কারলোফ্চা এই সানজাক-এর সর্ববৃহৎ খৃষ্টান অধিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ছিল [B. McGowan (সম্পা.), Defter-iliwa-i Sirem, অপ্রকাশিত Columbia পি. এইচ, ডি. থিসিস, ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২৪১-৯ (= মূল পাঠ, পত্রক ৬৫v-৬৮r)]। শহরের পাঁচটি মহল্লায় সর্বমোট ৪৮৭ গৃহ বেসামরিক অধিবাসী ছিল যাহাদের সকলেই ছিল খৃষ্টান। আওলিয়া চেলেবী যে সময়ে কারলোফ্চা পরিভ্রমণ করেন সেই সময় শহরের অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। খারাজ ও বাজই-ই বাযার করসমূহ সংগ্রহের সংগ্রহের ভার বুদিন হইতে আগত 'উছমানী কর্মকর্তাগণের উপর অর্পিত ছিল। শহরের কাল'আয় প্রায় ৫০ জন অফিসার ও সৈন্য অবস্থান করিত।

কারলোফ্চা পরবর্তীকালের নিয়তি এবং ইহার একমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবী উভয়ই ১০৯৪-১১১০/১৬৮৩-৯৯-এর 'উছমানী সাম্রাজ্য বনাম অস্ট্রিয়া ও উহার Sacra Liga-এর মিত্র দেশসমূহের—পোল্যান্ড, ভেনিস এবং বিলম্বে রাশিয়া—মধ্যেকার যুদ্ধের গতিধারা দ্বারা নির্ধারিত হয়। Mohacz (১৬৮৭ খৃ.)-এ 'উছমানী বাহিনীর পরাজয়ের পর কারলোফচা অস্ট্রীয় শাসনের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্য Congress of Carlowicz নামে সার্বিকভাবে পরিচিত একটি কূটনৈতিক সমাবেশ-এর (অক্টোবর ১৬৯৮-এ অনুষ্ঠিত) স্থানরূপে আকস্মিকভাবে ইহার নির্বাচন হইতে উদ্ভূত। সেখানে অক্টোবর ১৬৯৯-এর শেষ পর্যায়ে অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যাহার দ্বারা এই যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমান্তরেখা ও অন্যান্য বিষয়ের পুনর্বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই প্রবন্ধে Congress of Carlowicz-এর কোনপ্রকার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এই কংগ্রেস সংক্রান্ত সকল প্রকার দলীল ও কাগজপত্র বর্তমান না থাকায় এবং এই কংগ্রেসের অবশ্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক "পূর্ব-ইতিহাস"-সহ চুক্তির তুর্কি ও লাতিন অথবা ইতালীয় ভাষ্যসমূহের কোনপ্রকার সন্তোষজনক সংস্করণ ব্যতীত 'উছমানী পক্ষের এই কংগ্রেসের কার্যবিবরণী আরও নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর স্থাপন করার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা অবশ্যই একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিষয়রূপে বিবেচনা করিতে হইবে। তবে চুক্তির প্রেক্ষিতে সূচিত সমাধানের প্রসঙ্গে কিছু সার্বিক মন্তব্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

ত্রিশবর্ষীয় যুদ্ধের (১৬৪৮ খৃ.) সমাপ্তির পর এই ধরনের কংগ্রেসীয় কূটনীতি য়ূরোপে দ্রুত বিকাশ লাভ করিলেও এই প্রথম তাহা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যবহার করা হয়। ইহার মাধ্যমে একই সঙ্গে দারু'ল-ইসলাম ও দারু'ল-হারব সংক্রান্ত ইসলামী ধারণাসমূহের ক্রান্তিবিন্দু অর্জন ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের সূচনা হয়। লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বিরোধসমূহ, যথা 'উছমানী ও অস্ট্রীয় হ্যাপসবার্গগণের মধ্যে পূর্ববর্তী সংঘাতসমূহ নিষ্পত্তিতে ইহারাই প্রধানত নিয়ামকরূপে ভূমিকা পালন করে। প্রথমত ইংল্যান্ড-রাজের প্রতিনিধি (Lord Paget) ও যুক্ত প্রদেশ-এর প্রতিনিধি (Colyer)-এর কূটনৈতিক মধ্যস্থতা (তাওয়াসসুত) এবং দ্বিতীয়ত স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে নির্ধারিত সীমান্তরেখা সম্পর্কিত শর্তাবলীতে 'উছমানী পক্ষের অনিচ্ছুক সম্মতি প্রদানের ফলে এতকাল পর্যন্ত দারু'ল-হার্ব-এর দেশসমূহ এবং 'উছমানী রাষ্ট্রে মধ্যবর্তী সম্পর্ক নির্ধারক ধারণাসমূহ উহাদের বৈধতা ও সক্রিয়তা হারাইয়া ফেলে এবং প্রথমবারের মত সামরিক ও কূটনৈতিক ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুতরভাবে 'উছমানীগণের বিপক্ষে চলিয়া যায়।

কংগ্রেস শুরু হইবার বহু পূর্বেই Carlowicz-এ 'উছমানী পক্ষের আলোচনাকারিগণ—রা'ঈসু'ল-কুত্তাব রামী মেহমেদ এফেন্দি The Chief dragoman Alexander Mavrocordato এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবিহিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এবং ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভিক মাসসমূহে Mavrocordato Paget-এর মধ্যস্থতায় অস্ট্রীয় চ্যান্সেলর Kinsky 'উছমানী প্রধান উযীর 'আমুজাযাদে হুমায়ূন কোপরুলু-র মধ্যে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমেই 'উছমানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান পরিবর্তন সূচিত হয়। নিষ্পত্তি ভিত্তিরূপে যে মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইতেছে uti possidetis/'আলা হালিহি অর্থাৎ সংঘর্ষ সমাপ্তির মুহূর্তে যে পক্ষের অধিকারে যাহা ছিল তাহা সে পক্ষেরই অধিকারে থাকিবে। 'উছমানী কূটনৈতিক লক্ষ্য ছিল এই নীতির কঠোর বাস্তবায়নের বাহিরে কিছু সুবিধা লাভ করা এবং রামী মেহমেদ এফেন্দি ও Mavrocordato-এর দক্ষ কূটনীতি সত্ত্বেও কংগ্রেসে তাহা শুধু আংশিকভাবে অর্জিত হয়। ট্রানসিলভানিয়া হইতে অস্ট্রীয় বাহিনীর অপসারণ এবং ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই এলাকার মোটের উপর ঘোলাটে রাজনৈতিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে 'উছমানী পক্ষ ব্যর্থ হয়। তবে তাহারা মরেশ ও তিসা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিশিষ্ট সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তেমেশভার (তিমিসোআরা)-এর উপর তাহাদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়। ইহা ভিন্ন তাহারা সিরকিয়াম অঞ্চলে বেলগ্রেড-এর সন্নিহিত পশ্চাদভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং স্লাভোনিয়া ও ক্রোশিয়া অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়। অন্যপক্ষে পোল্যান্ডের নিকট 'উছমানীগণ কামানিচে-এর শক্তিশালী দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হয় যাহা ইতিপূর্বে কখনই বেদখল হয় নাই এবং ইহার ফলে তাহারা পদোলিয়া-র উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়; তবে ইহার বিনিময়ে পোল্যান্ড মোলদাভিয়ার উপর তাহার দাবী প্রত্যাহার করে। Carlowicz-এর চুক্তিতে রাশিয়ার সহিত কোনপ্রকার স্থায়ী নিষ্পত্তি সম্পাদিত হয় নাই। ১১১২/১৭০১ সালে ইস্তাম্বুলে ২ বৎসর মেয়াদী একটি যুদ্ধবিরতি নিয়ম স্থির করা হয়। কংগ্রেসের শেষ পর্যায়ে Sacra Liga শক্তিসমূহের মধ্যে দুর্বলতম সদস্য ভেনিসের উপর শর্তারোপ করা হয় এবং ভেনিস শেষ পর্যন্ত মোরিয়া অঞ্চলের উত্তরে তাহার অর্জিত বিজয়সমূহ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

এই মুহূর্তে Carlowicz সন্ধি প্রসঙ্গে কোন চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ সুচিন্তিত হইবে না। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা সম্ভবত 'উছমানী সাম্রাজের জন্য সাধারণভাবে প্রচলিত ও অনুভূত মাত্রার তুলনায় অনেক কম মাত্রায় পরাজয় ছিল এবং বস্তুতপক্ষে 'উছমানীগণ ইহার মাধ্যমে সসম্মানে তাহাদের জন্য শোচনীয় বিপর্যয়ে পর্যবসিত এই যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যদিও তাহাদের রাজ্যসীমা অপরিবর্তিত থাকে নাই, তথাপি সাম্রাজ্যের প্রশাসক চক্রের মধ্যে এই চুক্তি প্রচণ্ড বিরোধিতার সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে সামরিক বিভাগ ইহার বিপক্ষে ছিল এবং সম্ভবত এই সকল অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াসমূহের (যাহার ফলে ১১১৫/১৭০৩ সালের "এদিরনে-এর ঘটনা" ঘটে) গুরুত্ব ও বাস্তবে সাধিত সীমান্তরেখা পুনর্বিন্যাসের ন্যায় সমধিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাতনামাহ, ৭খ, (ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ.), ১৪৪-৫ ; (২) মেহমেদ রাশিদ, তারীখ, ২য় সং. (ইস্তাম্বুল

১২৮২ হি.), ২খ, ৪১৫-৭৪ (৪৪৯-৭৩ পৃষ্ঠায় চুক্তিসমূহের মূল পাঠসমূহ); (৩) কংগ্রেসের নিষ্পত্তির পর শীঘ্রই Flugschriften-এ পাশ্চাত্য ভাষার অনুবাদসমূহ প্রকাশিত হয়, ভিয়েনা, ভেনিস ও অন্যান্য স্থানে ; (৪) চুক্তিসমূহের প্রথম ইংরেজি সংস্করণের জন্য তু. R. Knolles, The Generall Histoire of the Turkes[6], ৩খ, লন্ডন ১৭০০ খৃ., ad finem। 'উছমানী গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর জন্য অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান, তু. I. Parmaksizoglu, দ্র. কারলোফচার IA.-এর প্রবন্ধে প্রদত্তবরাতসমূহ ! এইগুলির উপর আংশিকভাবে J. von Hommer, GOR, ৬খ, (Pest, ১৮২৮ খৃ. ৬৩০-৭৮), কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণটি প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত বিবরণ সম্পর্কে অদ্যাবধি তাহার কার্যকারিতা বিদ্যমান। Popovic (১৮৯৩ খৃ.) ও Munson (১৯৪০খৃ.) কর্তৃক The Congress of carlowicz সম্পর্কে গবেষণাসমূহ বর্তমানে বাতিল গণ্য করা হয়; (৫) R. A. Adou-El-Haj কর্তৃক আধুনিক গবেষণার ফলাফলসমূহ তাহার অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিসে পাওয়া যাইবে (Princeton ১৯৬৩ খৃ.) এবং JAOS-এর প্রবন্ধসমূহ, ৮৭/৪ (১৯৬৭খৃ.) ও ৮৯/৩ (১৯৬৩ খৃ.) ও ইসলাম, ৫১/১ (১৯৭৪ খৃ.)।

C. J. Heywood (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কারশী (قرشى) ঃ "দুর্গ প্রাসাদ" বুঝাইবার জন্য উয়গুর ভাষাতে ব্যবহৃত শব্দ ; সম্ভবত পূর্ব তুর্কিস্তানের কোন স্থানীয় ভাষা হইতে গৃহীত, তৎপর মুগলগণও গ্রহণ করে। Turfan, the kutadghu Bilig; সম্ভবত ইহা Tokharin B. শব্দ 'কারজিয়ে'-এর সহিত সম্পর্কিত। পরবর্তীকালে মোঙ্গলগণ কর্তৃক শব্দটি এই অর্থে গৃহীত হয়। শহর হইতে দুই পারাসাং দূরে চাগাতায় শাসক কেবেক খান (১৩১৮-২৬) কর্তৃক নির্মিত একটি দুর্গের নাম অনুসারে নাখ্‌শার অথবা নাসাফ (দ্র.) শহরটিকে কারশী নামে অভিহিত করা হয়। স্তেপ অর্থাৎ বৃক্ষহীন প্রান্তরসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত স্রোতটিকে বলা হইত কার্‌শি-দরিয়া। বাবুর (দ্র.)-এর আত্মকথায় এই শহরের উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহার নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে একটি জনপ্রিয় বর্ণনাও রহিয়াছে। পূর্বে এই শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র ছিল এবং এখানে সহস্রাধিক বাড়ী, ১৬টি মসজিদ, ৩টি সরাইখানা এবং ১২টি মাদরাসা ছিল। এখানে কার্পেট, অশ্বপৃষ্ঠের জিন, ব্রোঞ্জ দ্রব্যাদি এবং পরবর্তীকালে তামাক উৎপন্ন হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শারাফু'দ-দীন 'আলী য়াযদী, জাফারনামা (Zafarname), সম্পা. M. Iladad, i, Calcutta 1887-88, ১খ, ১১১ ; (২) G. Le Strange, The Lands of Eastern Caliphate, Cambridge 1905, 47 f.; (৩) R. Rahmeti Arat, in IA, দ্র. ; (৪) দা.মা.ই., ১৬/২খ. ৪৮।

B. Spuler (E. I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারশূনী (كرشونى) ঃ ইহা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার খৃষ্টানগণ কর্তৃক আরবী লিখিবার জন্য ব্যবহৃত সিরীয় (সুরয়ানী) হস্তাক্ষরের নাম। এই শব্দের উৎপত্তির উৎস অস্পষ্ট এবং ইহার প্রথম প্রচলনের স্থান কিংবা তারিখ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। ইহার উৎপত্তিগত উৎস সম্পর্কেও যে কয়েকটি অভিমত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের কোনটিই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে মনে হয় যে, এই শব্দের মূল সিরীয় (সুরয়ানী) রূপ ছিল গারশূনী এবং যেহেতু আরবী বর্ণমালায় সিরীয় বর্ণ 'গোমাল'-এর কোন প্রতিবর্ণ নাই, সেইহেতু শব্দের আদিতে কাফ বর্ণযোগে ইহা আরবীতে প্রতিলিখিত হয়। যেহেতু আরবী বর্ণমালায় ২৮টি ও সিরীয় বর্ণমালায় মাত্র ২২টি বর্ণ রহিয়াছে, সেইজন্য নিম্নবর্ণিত সিরীয় বর্ণসমূহের একেকটি দুইটি আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণ হিসাবে প্রতিলিখিত হয় ঃ তাও=তা' ও ছা ; গোমাল=জীম ও গায়ন ; কোফ=কাফ ও খা' ; দোলাছ=দাল ও যাল ; তেথ=তা' ও জা' এবং সোযে=সাদ ও দাদ। বিভ্রান্তি এড়াইবার উদ্দেশ্যে এই বর্ণসমূহের কয়েকটিকে ইহাদের উপরে ও নিম্নে বিন্দু স্থাপনপূর্বক লিখা হইত ; কিন্তু এইখানে উহার ব্যবহার সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে নাই। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, পশ্চিমাংশের হউক বা পূর্বাংশেরই হউক, সিরিয়ার সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়—ম্যারোনাইট, জ্যাকোবাইট কিংবা নেস্টোরিয়ান—এই লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছে, যদিও মেলকাইটগণ ইহা কখনও প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতে মালাবার খৃষ্টানদের স্বদেশীয় ভাষা মালায়ালম লিখিবার জন্য ব্যবহৃত সিরীয় বর্ণমালার জন্যও এই কারশূনী নাম ব্যবহার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Payne Smith, Thesaurus syriacus, Oxford 1868 i, 790; (২) R. Duval, Traite de grammaire syriaque, Paris 1881, II ; (৩) C. J. David, 149-55; (৪) A. Mingana, Garshuni or Karshuni ? in JRAS (1928), 891-93; (৫) M. Cohen, La grande invention de l'ecriture et son évolution, Paris 1958, 165, 177; (৬) দা.মা.ই, ১৭খ, ২২৯-৩০ ;

G. Troupeau (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

কার্‌স (كرس) ঃ পূর্ব তুরস্কের একটি সেনাশহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, ৪০°৩৭' উত্তর ও ৪৩°০৬' পূর্বে অবস্থিত এবং একই নামের ইল (প্রদেশ)-এর রাজধানী (chef-lieu) কার্‌স প্রদেশের চতুঃসীমানায় রহিয়াছে সোভিয়েত রাশিয়া ও তুরস্কের অন্য তিনটি ইল (প্রদেশ) আর্টভিন, এর্‌যুরুম ও আগরী এবং ইহার অন্তর্গত ইল্‌চ (জিলা)-সমূহের নাম ঃ পোসোফ, হানাক, চিলদির, আরদাহান, গল, সুসুয, আর্‌পাচায়, সেলিম, দিগর, সারিকামিশ, কাগিযমান, তুয্‌রুকা, আরালিক ও কার্‌সনামীয় ইল্‌চ। ১৯৬০ খৃ. কার্‌স প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫,৪৩,০০০ ; ১৯৬৫ খৃ. (খসড়া হিসাবে) তাহা হয় ৬,০৬,৫২১, যাহার মধ্যে ২০% ছিল শহরবাসী এবং ৮০% কৃষিজীবী অথবা পল্লীবাসী (Kars Il yilligi 1967, আঙ্কারা তা. বি.)।

কার্‌স শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস সম্পর্কে Barthold-এর অভিমত (EI[1]) যে, ইহা জর্জীয় এবং Kirzioglu-এর অভিমত (I A) যে, ইহা তুর্কী, এইগুলি সমর্থন করা যায় না ; মধ্যযুগের আরমেনীয় সূত্রসমূহে ইহার রূপ দেখা যায় কারুস (কারুত্‌স) [Karuc (Karuts)] অথবা কারুস বার্ড (Karuc berd) [A. K. Sanjian, Colophos of Armenian Manuscripts 1301-1480, Cambridge Mass. 1969, index ; N. Adontz, Armenia in the period of Justinian, Lisbon 1970, 206]। টলেমীর Chorsa-এর সহিত ষোড়শ শতাব্দীতে 'Chars'-এর অভিন্নকরণের বিষয়টি সম্ভবত প্রণিধানযোগ্য (G. T. Minadoi, Historia de bello inter Turcas et Persas, in P. Bizarus, Rerum persicarum historia, Frankfurt 1601, 516 ; তু., C. Muller (ed.), Claudii Ptolomaei geographia, Paris 1883-1901, i/l, 941 and n.)। এই শব্দের বায়যান্টীয়

ব্যবহারের রূপ (To Kaps) প্রদান করিয়াছেন Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, ch. xliv; মুসলিমদের ব্যবহৃত এই শব্দের রূপগুলি এইরূপ ঃ ইবনু'ল-আছীরের লেখায় কার্‌স (সম্পা. Tornberg, x 27 ; xii, 169, 295, 300, 306) য়াকূত-এর লেখায় কার্‌স অথবা কারস (সম্পা. Wustenfeld, iv 57), আল-ফারিকীর লেখায় গার্‌স (যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন V. Minorsky, Studies in Caucasian history, London 1953, 90-91) এবং এই গার্‌সরূপের উল্লেখ করিয়াছেন জুওয়ায়নী তারীখ-ই জাহান-গুশা (সম্পা. মীরযা মুহাম্মাদ), ২খ, ১৬১ 'উছমানীগণ ব্যবহারে কার্‌স রূপকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

উমায়্যাদের যুগ হইতে কার্‌স এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে উমায়্যা শক্তির পতনের ফলে বাগ্‌রাতী বংশের শাসনাধীন আরমেনিয়া অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকে এবং ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমদিকে আরমেনীয় রাজপুত্র সম্বাত (১৯০/৮০৬ হইতে ২১০/৮২৫ পর্যন্ত সামাররাতে যিম্মী হিসাবে আটক থাকেন এবং মুসলিমগণ তাঁহাকে আবু'ল-'আব্বাস আল-কারিসী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন) 'আব্বাসীদের সামন্ত হিসাবে কার্‌স শাসন করেন [J. Laurent, Armenie entre Byzance et Islam, Paris 1919, 290-91 and n. ; তু. the De administr. imperio, ii.(Commentary), সম্পা. R. H. J. Jenkins, London 1962, 158], ২২২/৮৩৭ সালে তিফ্‌লীসের আমীর ইসহাক মুসলিম আধিপত্য হইতে আরমেনিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বায়যানটীয় সম্রাট থিওফিলাস (Theophilus) কর্তৃক প্রেরিত এক সৈন্যবাহিনীকে কার্‌স-এর উপকণ্ঠে প্রতিহত করেন (Laurent, পৃ. গ্র., পৃ. ২১১-১২)।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে কার্‌স-এর গুরুত্ব লাভের একটি কারণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ আনী-কার্‌স-কালীকালা (=এরযুরুম)-ত্রেবিযোন্দ বাণিজ্য পথের উপরে ইহার অবস্থান (Minorsky, Studies 105) ঃ কালীকালা ও মালাত্‌য়ার সহিত কার্‌সও আরমেনিয়ার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিত এবং Lastivert-এর Aristakes-এর বর্ণনা অনুযায়ী (অনু. ও সম্পা. E. Prud'homme, Paris, 1864, 89) ইহার অধিবাসিগণ স্থলভাগ ও সমুদ্র পথ হইতে আহরিত সকল প্রকার দ্রব্যের প্রাচুর্যের মাঝে "শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিত।" ৮৯০ খৃ. মৃত্যুবরণকারী আশোত-এর শাসনাধীনে নয় (যেমন উল্লিখিত হইয়াছে, De adm. imp., i, ch. xliv) বরং আবাস-এর শাসনাধীনে (শাসনকাল ৯২৯-৫১ খৃ.), [De adm. imp. ii, 179] কার্‌স বাগরাতী রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ৯৬২ খৃ. হইতে ইহা আরমেনীয় রাজ্য ভানান্দ-এর রাজধানী হিসাবে কাজ করে, যাহা আনীর শাসক ৩য় আশোত তাঁহার ছোট ভাই মুশেগ এবং তাঁহার উত্তরসুরিদের জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন (তু. E.I[2], Ani)।

১০২২ খৃ.-এর দিকে ভানান্দ রাজ্য ইহার তিন দিক হইতেই বায়যানটিয়াম ভূখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল (Honigmann, Ostgrenze, 173)। ইহার শেষ শাসক গাগিক (Gagik) (১০২৮-৬৪ খৃ.), আনী রাজ্য বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ার (১০৪৪ খৃ.) পর পর্যন্তও তাঁহার ক্ষমতা বজায় রাখেন। সালজূক হুমকীর মুখে ৪৪৬/১০৫৪-৫৬ সালে তুগ্‌রিল বেগ গাগিকের শক্তি ধ্বংস করিয়া তিন দিনের জন্য কার্‌স অবরোধ করেন (Honigmann, পৃ. গ্র., পৃ. ১৮১)। সিসিলির তাওরাস (Taurus)-এ একটি শহর লাভের বিনিময়ে সম্রাট কন্‌স্টানটাইন ১০ম ডুকাসের অনুকূলে Gagik-কে তাঁহার সকল অধিকার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ছাড়িয়া দিতে হয়।

একটি মুসলিম শহর হিসাবে কার্‌স-এর প্রাথমিক ইতিহাস অস্পষ্ট। মনে হয় ৪৫৬/১০৬৪ সালে ইহার অধিবাসিরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলপ-আরস্‌লানের নিকট আত্মসমর্পণ করে (ইব্‌নু'ল-আছীর, ১০খ, ২৭)। যাহা হউক, ১০ বৎসর পরে ১০৭৪ খৃ. জর্জিয়ার রাজা ২য় জর্জী (Giorgi II) তাঁহার এক সামন্তের নিকট হইতে কারসের শাসনভার লইয়া লন। আনুমানিক ৪৭২-৩/১০৮৩ সালে আমীর আহমাদের নেতৃত্বে এক তুর্কী বাহিনী কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। আমীর আহমাদ "মাত্র অল্পদিন পূর্বে কার্‌স জয় করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর বেশীর ভাগ সময় কার্‌স নালতুকী আমীরাতের অধীনে থাকে (তু. Minorsky, Studies, 84, n. 1)। ৫৪৮/১১৫৩ সালে কীপচাক তুর্কীগণ কার্‌স দখল ও ধ্বংস করেন। কিন্তু সেই একই বৎসর সালতূকী মালিক 'ইয়্যু'দ-দীন তাহা পুনর্দখল করেন (তু. আরবী উৎকীর্ণ লিপি, ইহাতে সেই বৎসরে দুর্গের পুনর্নির্মাণের স্মৃতি ধরিয়া রাখা হইয়াছে এবং 'উছমানীগণ ৯৮৭/১৫৭৯ সালে যখন আবার ইহার পুনর্নির্মাণ করেন, তখন এই উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কার করেন। ইহার মূল পাঠের বিবরণ দিয়াছেন আওলিয়া চেলেবী (সিয়াহাতনামাহ, ২খ, ইস্তাম্বুল ১৩১৪ হি., ৩৩০)। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে কার্‌স একবার আনী রাজ্যের শাদ্দাদী বংশীয় আমীরদের প্রভাব বলয়ের অধীনেও আসে ঃ শা'বান ৫৫৬/আগস্ট ১১৬১ সালে "গার্‌স ও সুরমারি নেতা" (the lord of Ghars and Surmari) কর্তৃক প্রেরিত একটি সৈন্যদল শাদ্দাদবংশীয় আমীর ফাদ'লূন ইব্‌ন মিনুচিহ্‌র-কে জর্জীয় রাজা ৩য় জর্জী (Giorji III)-র নিকট হইতে তাঁহার রাজধানী পুনর্দখলের প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন (Minorsky, পৃ. গ্র., 88-91, আল-ফারিকী হইতে উদ্ধৃত)।

কার্‌স ৬০৩/১২০৬-৭ সাল পর্যন্ত মুসলিমদের হাতে থাকে। অতঃপর ইহা জর্জীয়দের অধিকারে আসে (ইবনু'ল-আছীর, ১২খ, ১৬৯)। খাওয়ারায্‌ম শাহ জালালু'দ-দীন ৬২৩/১২২৬ সালে বৃথাই ইহা অবরোধ করেন। ৬৩৬-৩৭/১২৩৯ সালে Noyon Cormaghun ইহা দখল করিয়া মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। ক্ষুদ্র আরমেনিয়ার রাজা Hethum, যিনি আনুমানিক ৬৪৯/১২৫১ সালে কার্‌স সফর করেন, সেখান মোঙ্গলদের শিবির দেখিতে পান। এই শিবির হইতেই বায়দু (Baydu) তাঁহার আয়ত্তাধীন ভূখণ্ড শাসন করিতেন। হামদুল্লাহ্ আল-কাযবীনীর বর্ণনা অনুসারে (নুয্‌হাতু'ল-কুলূব, সম্পা. Le Strange, 93) কিছুকাল পরে কারস এবং ইহার সহিত 'আনী' ঈলখানদের প্রদেশ জর্জিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় (গুরজিস্‌তান ওয়া আবখায) ঃ এই সময় ইহাকে জর্জিয়ার প্রধান শহরগুলির অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করা হইয়া থাকে (Le Strange, 181)।

কার্‌স ৭৫৯/১৩৫৭ সালে জালায়িরীদের হাতে এবং ৭৮২/১৩৮০ সালে কারা কোয়ুন্‌লুদের হাতে আসে। স্থানীয় শাসক পিরুযবাখ্‌তের অধীনে থাকার সময়ে ৭৮৮/১৩৮৬ সালে কার্‌স এলাকা তীমূরের অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বিজন মরুতে পরিণত হয় (তু. Sanjian, পৃ. গ্র., পৃ. ১৫২)। কথিত আছে যে, তখন কার্‌সকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় (তু. জাফার নামাহ, সম্পা. Tauer, নির্ঘণ্ট)। পরে আবার

৭৯৬/১৩৯৪, ৮০২/১৪০০ ও ৮০৫/১৪০৩ সালে তীমূর চিলদির-এর বিনগোল এলাকায় গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাত্রার পথে কার্‌স অতিক্রম করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তীমূরের আনী প্রদেশ, যাহার অধীনে কার্‌স অবস্থিত ছিল, কারা কোয়ুন্‌লুদের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া যায়। আরমেনীয় সূত্রসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী স্থানীয় শাসক পীর হুসায়ন ইব্‌ন সাহাত ৮১৫/১৪১২ সালে কার্‌স পুনর্নির্মাণ করিয়া ইহার পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনেন। পরবর্তীকালে ৮৭১-৭২/১৪৬৭ সালে কার্‌স আক-কোয়ুন্‌লু শাসক উযুন হাসানের অধীনে আসে।

সাফাবী শাসকদের ক্ষমতায় উত্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংঘাতের ফলে কার্‌সকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় ঃ উদাহরণস্বরূপ, ৮২০/১৫১৪ সালে যখন ‘উছমানী সুলতান ১ম সেলীম চাল্‌দিরান যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয় লাভ করিয়া ফিরিবার পথে কার্‌সের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করেন তখন এই শহর আরও একবার ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পতিত হয়।

৯৪০/১৫৩৪ সালের দিকে কার্‌স ‘উছমানীদের হাতে আসে এবং ৯৫৫/১৫৪৮ সালে সুলতান ১ম সুলায়মান দুর্গাদি নির্মাণ কাজের নির্দেশ দান করেন। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে ‘উছমানী-সাফাবী বিরোধ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরই কেবল কার্‌স ‘উছমানী সাম্রাজ্যের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হিসাবে ইহার পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়। একদিকে ইহা উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়ায় সাফাবীদের আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্গ-প্রাচীর হিসাবে এবং অন্যদিকে এরযুরুম প্রদেশের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে কাজ করিতে থাকে, যে ঘাঁটি হইতে তিফ্‌লীসগামী রাস্তা খুলিয়া রাখা এবং নূতন ককেসীয় বিজয় ধরিয়া রাখার মতো কঠিন কাজে সাহায্য করা যাইত।

ককেসাস লইয়া ‘উছমানী ও সাফাবীদের মধ্যে সংঘটিতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূত্রপাতে (জুমাদা'ল-উখরা ৯৮৬/আগস্ট ১৫৭৮) কার্‌স ছিল সাফাবী বাহিনী ও লালা মুসতাফা পাশার নেতৃত্বাধীন ‘উছমানী বাহিনীর প্রথম মুকাবিলার ক্ষেত্র—“una fiera scaramuzza”-(Cesare Campana, Compendio historico, delle guerre ..... tra Christiani and Turchi .... Venice 1597, f. 20)। ২ জুমাদা'ল-উখরা, ৯৮৭/২৭ জুলাই, ১৫৭৯ সালে লালা মুস্‌তাফা পাশার নেতৃত্বে একটি ‘উছমানী বাহিনী কার্‌স-এ শিবির স্থাপন করে। তিনি উপযুক্ত কর্মঠ লোকের প্রচণ্ড অভাব এবং ২ রাজাব/২৫ আগস্টের পরে আরম্ভ হওয়া ঘন কুয়াশা ও ভীষণ শীতজনিত সৃষ্ট চরম প্রতিকূলতার মুখেও (Minadoi, পৃ. গ্র., পৃ. ৫৫৭) শহরটিকে সুরক্ষিত করার কাজে দ্রুত অগ্রসর হন। তিফ্‌লীস উদ্ধারের কাজে ইহাকে একটি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করাই ছিল উদ্দেশ্য [Campana, পৃ. গ্র., f. 25 ; পেচেভি, তা'রীখ, ২খ, (ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি.), ৫৬ ; সেলানিকী, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮৩ হি., পৃ. ১৫৩-৫৪ ; য়ুরোপীয় Flugschriftenliteratur প্রসঙ্গের জন্য দেখুন C. Gollner, Turcica ii (Bucharest-Baden-Baden 1968), nos. 1706-1835, স্থা.]।

‘উছমানী শাসনের অধীনে কার্‌স ছয় অথবা সাতটি সানজাক লইয়া গঠিত একটি ইয়ালেতের (eyalet) প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে উন্নীত হয় (৯৮৮/১৫৮০)। ১০৫৭/১৬৪৭ সালে কার্‌স সফরকারী আওলিয়া চেলেবী সানজাকসমূহের এবং ইহাদের রাজস্ব আদায়ের তালিকা (উল্লিখিত গ্রন্থে, ১খ, ১৮৫, ১৯২ ; ২খ, ৩২৯) বিভিন্নভাবে প্রদান করিয়াছেন (১১শ/১৭শ শতাব্দীর মধ্যে ভাগ হইতে কার্‌স-এর অন্তর্ভুক্ত ইয়ালেত-এর বিভাগসমূহ এবং ইহাদের রাজস্ব আদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা প্রদানকারী অন্যান্য পরিসংখ্যানগত বিবরণীর জন্য দেখুন P. Rycaut, Present State of the Ottoman Empire[3], London 1670, 54 এবং J. von Hammer, Osm. Staatsverfassung, ii, 259)। এই শহর ও তৎকালীন ইহার প্রধান প্রধান কীর্তিস্তম্ভের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আওলিয়া চেলেবী, পূর্বোক্ত গ্রন্থে, ২খ, ৩২৯-৩৩, যাহার সম্পূরক হিসাবে আরও বর্ণনা প্রদান করিয়াছে J.-M. Thierry, A propos de quelques momuments chretiens du vilayet de Kars, in Revue des Etudes armeniennes, n. s. iii (1966), 73-90, এবং K. M. Fahrettin (=F. kirzioglu)-এর কতিপয় গ্রন্থেও ইহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। আওলিয়া চেলেবীর বর্ণনা অনুসারে কার্‌স-এ অবস্থিত ‘উছমানী সৈন্যবাহিনী এবং তাহাদের সহিত ভান ও আখিস্‌খা-এর সৈন্য বাহিনীও সীমান্তবাসী হিসাবে তাহাদের সাহস ও বীরত্বের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল (পূ. গ্র., ২খ, ৩৩১) এবং ১১শ/১৭শ শতাব্দীর ‘উছমানী ইতিহাস গ্রন্থসমূহে সেই সময়ে সাফাবীদের সহিত সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বর্ণনায় কার্‌স গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং ঘন ঘন ইহার উল্লেখ করা হয়।

১৯শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কার্‌স-এ য়ুরোপীয় পরিব্রাজকদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। G. F. Gemelli-Carreri, যিনি ১৬৯৪ সালের মে মাসে কার্‌স-এ ছিলেন, তিনি ইহাকে একটি “বৃহৎ, কিন্তু খুব ঘন বসতিপূর্ণ নয় এমন শহর” হিসাবে বর্ণনা করেন, যাহার মাটির নির্মিত দুইটি প্রাচীর এবং প্রতিরক্ষার জন্য একটি উত্তম সৈন্যবাহিনী ছিল, যেই বাহিনী সাফাবীদের ভূখণ্ড সন্নিহিত সীমান্ত টহল দেওয়ার জন্য প্রতি রাত্রিতে ৪০টি করিয়া অশ্বারোহী প্রেরণ করিত (A collection of voyages ...., iv, London 1704, 109)।

নাদির শাহের অভিযানের সময় কার্‌স কয়েকবার অবরুদ্ধ হয় [১৭৩৫-এ দুইবার ; ১৭৪৪-এ একবার ; L. Lockhart, Nadir Shah, London 1938, স্থা. ; ইহা ছাড়াও তু. Stanhope Aspinwall-এর সরকারী পত্রসমূহ, লন্ডন, Public Record Office, S. P. 97/32]। ১৮শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ কার্‌স-এর ইয়ালেত ‘উছমানী সাম্রাজ্যের দরিদ্রতম ইয়ালেতসমূহের একটিতে পরিণত হয় এবং এই সময় যে কয়েকটি প্রদেশ একজন উযীরের অর্থাৎ তিনটি তুগ-এর একজন পাশার ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ ছিল, কার্‌স ছিল তাহাদের অন্যতম [S. J. Shaw, Between old and new ...., Cambridge, Mass. 1971, 168-69; তু. M. d'Ohsson, Tableau generale[2], vii (Paris 1824), 306-7]।

তানজীমাত আমলের প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে কার্‌স ইয়ালেতকে এরযুরুম বিলায়েতের অধীনে একটি সান্‌জাকের মর্যাদায় নামাইয়া আনা হয় (তু. ১২৯২-এর সাল-নামাহ্)। কিন্তু কার্‌স দুর্গের সামরিক ও কৌশলগত গুরুত্ব আরও একবার স্বীকৃত হয় যখন ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাশিয়া ককেসাসের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে তাহার ভূখণ্ড সম্প্রসারণ করে। রুশ সৈন্য সাফল্যের সহিত তিনবার কার্‌স অবরোধ করে ঃ ১৮২৮, ১৮৫৫ ও ১৮৭৭ খৃ. (বিস্তারিত বর্ণনা গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. W. E. D. Allen and P. Muratoff, Caucasian Battle-fields, Cambridge 1953)। এই সময় কার্‌স একদিকে

বৃটিশ সরকারের কূটনীতি ও বৃটিশ জনমত এবং অন্যদিকে রাশিয়া উভয়ের জন্যই আপাতদৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বের অধিকারী হইয়া ওঠে। কারণ বৃটিশ সরকার ও জনগণ ইহাকে রাশিয়ার দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একটি চিরাচরিত বাধা হিসাবে মনে করিত (B. Sumner, Russia and the Balkans 1870-1880, Oxford 1937, 516) এবং রুশদের জন্য ইহা ছিল তাহাদের যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু (ঐ, ৬২৩-২৪)। নিষ্ফল সান স্টেফ্যানো চুক্তির (Treaty of San Stefano, ৩ মার্চ ১৮৭৮) শর্ত এবং বার্লিন চুক্তির (১৩ জুলাই, ১৮৭৮) ৫৬ নং ধারা অনুসারে কার্‌স ও আরদাহান সানজাকদ্বয় এবং বাতুম বন্দর রাশিয়ার নিকট সমর্পণ করা হয়।

১৯শ শতাব্দীর রুশ-তুর্কী যুদ্ধসমূহ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী কার্‌স শহর ও প্রদেশের জনসংখ্যা এবং গোষ্ঠীগত গঠনের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। রুশদের চলিয়া যাওয়ার পর ১৮২৮ খৃ.-এর দিকেই আদি আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের কার্‌স পরিত্যাগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যদিকে ১৮৭৭ খৃ.-এর পরবর্তী বৎসরগুলিতে কার্‌স হইতে 'উছমানী ভূ-খণ্ডের দিকে মুসলিমদের অব্যাহত বহির্গমন ঘটে। ফলে মূল কার্‌স-এ আর্মেনীয় ও রুশদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তথাকার পরিত্যক্ত জিলাসমূহে আর্মেনীয়-রুশদের ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপন সম্পূর্ণ হয় [Brokhaus-Yefron Entsik, Slovar (1895), দ্র. Kars, Karsskaya Oblast-এর পরিসংখ্যানসমূহ যাহা E.I.[1] গ্রন্থের এই নামীয় নিবন্ধের জন্য Barthold কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে]।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কার্‌স এক ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তির (treaty of Brest-Litovsk, ৩ মার্চ, ১৯১৮) শর্তানুসারে ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯১৮ সালের ২৫ এপ্রিল শহরে তুর্কী সৈন্যদের প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত ইহা আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতেই থাকে। মুদ্রোস যুদ্ধ বিরতি চুক্তির (৩০ অক্টোবর ১৯১৮) শর্তাধীনে তুর্কী বাহিনী ১৯১৪ খৃ. রুশ-তুর্কী সীমান্তের পশ্চিমে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

যাহা হউক, কার্‌স-এর তুর্কীগণ ফাখরু'দ-দীন পীরীওগলুর (ফাহ্‌রেত্তিন পিরিওগলু) নেতৃত্বে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন (৬ নভেম্বর, ১৯১৮), যাহা কার্‌স প্রদেশ এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত বাতুম ও গুমরু (আলেকসানদ্রোপোল) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তুর্কী ভাষাভাষী কিংবা মুসলিম অধ্যুষিত জিলাসমূহের উপর সার্বভৌমত্ব দাবী করে। আর্মেনীয়, জর্জীয় ও বৃটিশ সৈন্যদের সহিত কিছুকাল পর্যন্ত এক বিশৃঙ্খল যুদ্ধ করিবার পর কার্‌স-এর শাসক গোষ্ঠী বাতুম হইতে বৃটিশ বাহিনী পরিচালিত অভিযানের দ্বারা পরাজিত হয় (১৯ এপ্রিল, ১৯১৯) এবং ইহার কতিপয় নেতা মাল্টায় নির্বাসিত হন। ১৯১৯ সালের মে মাসে কার্‌স আবার আর্মেনীয় নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া আসে, অন্যদিকে যে স্থানীয় তুর্কী নেতৃবৃন্দ তখনও বাঁচিয়াছিলেন তাঁহারা আত্মগোপন করেন এবং কামালপন্থীদের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে থাকেন। ট্রান্সককেসিয়া হইতে বৃটিশদের প্রত্যাহার ও ১৯২০ খৃ. তুরস্ক-সোভিয়েত মৈত্রী পুনঃস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ট্রান্সককেসীয় প্রজাতন্ত্রসমূহের শীঘ্রই বিলুপ্তি ঘটে এবং আর্মেনীয়ার দ্রুত পতনের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী সেনাবাহিনীর ১৫তম বাহিনী কাযিম কারাবেকির পাশার নেতৃত্বে ১৯২০ সালের ৩০ অক্টোবর-এ কার্‌স পুনর্দখল করে। চিলদির ও পোসোফ (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১) এবং আরদাহান (৭ মার্চ, ১৯২১)-এর কাদাসমূহ যেগুলির সবই বর্তমানে কার্‌স-এর ইলের (প্রদেশের) অন্তর্গত তাহারা শীঘ্রই তুর্কী নিয়ন্ত্রণে আসে।

আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত সম্পাদিত গুমরু আলোকসানদ্রোপল) চুক্তি (২ ডিসেম্বর, ১৯২০) সোভিয়েত শাসক গোষ্ঠীর সহিত সম্পাদিত মস্কো চুক্তি (মার্চ ১৯২১) এবং সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া, জর্জীয়া ও আযারবায়জান প্রজাতন্ত্রসমূহের সহিত সম্পাদিত কার্‌স চুক্তি (১৩ অক্টোবর, ১৯২১) অনুযায়ী তুরস্ক ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বর্তমান সীমান্ত নির্ধারিত হইয়াছে। সাত বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দেশত্যাগ ঘটিবার পর এই সময় অমুসলিম জনগণ অদৃশ্য হইয়া যায় এবং কার্‌স প্রদেশ ও শহর ইহাদের বর্তমান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (মূল নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত), (১) না'ঈমা, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১১৪৭ হি., স্থা. ; (২) J. von Hammer, Geschichte[1] (পুনর্মুদ্রণ, Graz 1964), i, 269 ; ii, 420 ; iv, 75, 358, 477, 619 ; v, 82 ; viii, 57; সাম্প্রতিক তুর্কী গ্রন্থাবলী এবং স্থানীয় ইতিহাস রচনাসমূহের জন্য দেখুন ঃ (৩) K. M. Fahrettin, Kars Tarihi, i (ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ.) ও একই গ্রন্থকারের নিবন্ধ Kars (Tarih), IA ; (৪) W. E. D. Allen ও P. Muratoff তাঁহাদের গ্রন্থে ১৯শ শতাব্দীর কার্‌স-এর সামরিক ইতিহাস বিষয়ক অসংখ্য রুশ ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন ; ইহা ছাড়াও ১৯১৪-২১ খৃ. সময়ের ঘটনাবলীর জন্য উল্লেখ্য (৫) H. Bayur, Inkilab, Tarihi, আংকারা ১৯৪৩-৬৭ এবং (৬) K. Karabekir, Istiklal Harbimiz, ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ.।

W. Barthold-[C. J. Heywood] (E.I.[2])/
মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারসানা (দ্র. কুরসান)

কারা (قرا) ঃ এই তুর্কী শব্দটি দ্বারা প্রধানত 'কালো' বা "গাঢ় রং" বুঝানো হইয়া থাকে। ইহা সাধারণত এই অর্থে কোন ভৌগোলিক নামের আদ্য শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন ঃ কারা আসিদ (দুর্গটি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কালো পাথরের কারণে এই নাম), কারা দাগ (ঘন অরণ্যের অন্ধকারাচ্ছন্নতা বুঝাইবার জন্য) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কোন স্থানের ক্ষুদ্রতা বুঝাইবার জন্য উহার সাথে কারাজা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কোন ব্যক্তির নামের সাথে কারা যুক্ত হইলে কালো বা গাঢ় বাদামী রংয়ের কেশধারী অথবা গাঢ় বর্ণের লোককে বুঝাইতে পারে। আর একই সাথে শক্তিমান বা ক্ষমতাশালী লোককে বুঝাইতে পারে, যেমন, কারা 'উছমান বা কারা আরসলান অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কারা খান নাম হইতে সম্ভবত মধ্য এশিয়ার কারাখানী বংশ বা ইলেক খান (দ্র.)-এর উদ্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) von Hammer-Purgstall, G. O. R. i, 80 ; (২) কাশগারী দীওয়ান লুগাতি'ত-তুর্ক, ৩খ, ১৬৭, tr. Atalay, iii. ২২১-২ ; (৩) O. Pritsak, 'Qara', Studie zur turkischen Rechtssymbolik, in Zeki Velidi Togan'a armagan, Istanbul 1950-5, 239-63; (৪) Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish, 643-4, IA দ্র.।

বর্ণানুক্রমিক পারম্পর্যরক্ষা ও কারাযুক্ত শব্দসমূহ ক্রমানুসারে বিন্যাস করার পর সর্বশেষে এই শব্দগুলি অনেকটা স্বাধীনভাবে একত্র সন্নিবেশিত

হইয়াছে, যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ, কারা উপসর্গসহ সকল শব্দের পরেই কারাবা থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, শব্দটির প্রতিবর্ণায়নে সকল সময়ে কারা লেখা হইয়া থাকে। শব্দের শেষে দীর্ঘস্বর আরবী লিখন-রীতি অনুসারে একটি আলিফ দ্বারা লেখা হইয়া থাকে। অবশ্য তুর্কী লিখনরীতি অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি a (হ্রস্ব 'আ') সহযোগে লেখা হইয়া থাকে।

J. H. Kramers (E.I.[2])/নুরুল আমিন

কারা আমিদ (দ্র. দিয়ার বাক্র)

কারা আরসলান (দ্র. আরতুকিয়্যা)

কারা 'উছমান-ওগলূ (قرا عثمان او غلو) ঃ নাম ও পরিচিতি (দেরেহ বেগী= دره بیگی) ; ১১শ/১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যায় হইতে মানিসা এবং জেলাতে সক্রিয় একটি আয়ান (দ্র.) [সম্ভ্রান্ত পরিবার] পরিবারের নাম। কারা 'উছমান, যাঁহার নাম অনুসারে পরিবারটি পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে, তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ কাবূস-এর পুত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন প্রাসাদের একজন মুতাফাররিকা (متفرقة) এবং তিনি কারাবাতুশ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি মানিসার (منسا) নিকটে য়ায়া (Yaya) নামক গ্রামে ১০৫০/১৬৪০ সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং পরে তাঁহাকে উক্ত স্থানে দাফন করা হয় [TV, ৯ ঃ (১৯৪২ খৃ.), ১৯৮ ; দ্র. গ্রন্থপঞ্জী]। মুহাম্মাদ নিজে ছিলেন জনৈক হাসান আগা-র পুত্র ; তিনিও ছিলেন একজন মুতাফাররিকা।

য়ায়া-র স্থানীয় অধিবাসী কারা 'উছমান সিপাহীরূপে সেনাবাহিনী হইতে অবসর গ্রহণের পর মুতাসাল্লিম-এর কাতখুদা (كتخدا) এবং বায়তু'ল-মাল-ই 'আম্মী-র আমীন ও রাজকীয় ভূসম্পত্তিসমূহের (খাস্সা) মুকাতা'আরূপে দায়িত্ব পালন করেন। ১১০২-৩/১৬৯১ সালে যে সকল তিমার অধিকারী এবং যা'ঈমগণ ভিয়েনা অভিযানের সমর্থনে আগাইয়া আসিতে ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহাকে তাহাদের সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়কালে তিনি অগাধ ধন-সম্পত্তি অর্জন করেন। ১১১৮/১৭০৬ সালে য়ায়া গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয় (M. Cagatay Ulucay, Karaosmanoglu llarina ait dusunceler, III, Turk Tarih Kongresi, আঙ্কারা ১৯৪৮ খৃ., ২৪৫)। মুহাম্মাদ কাতুশ-এর মৃত্যু এবং ১১১৮/১৭০৬ সালে কারা 'উছমান-এর মৃত্যুকালের মধ্যে ৭২ বৎসরের তফাৎ দেখা যায়। একটি নব আবিষ্কৃত ওয়াকফিয়া হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'আবদু'র-রাহমান নামক জনৈক ব্যক্তিও কারা 'উছমানের পিতা হইতে পারেন (Munir Aktepe, Manisa ayanlarindan Kara Osman-oglu Mustafa Aga ve uc vakfiyesi hakkinda bir arastirma, in Vakiflar Dergisi, ৯খ., ১৯৭১ খৃ., ৩৬৯, ৩৭০)।

কারা 'উছমান-ওগ্লূ তাঁহার পরিবারের সদস্যবর্গের জন্য যে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তাঁহারা অতঃপর 'উছমান-যাদা বা কারা 'উছমান ওগ্লূ উপাধি ধারণে সমর্থ হন। কারা 'উছমানের মৃত্যুর পর পরিবারের নেতৃত্ব লাভ করেন তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে একজন, মুসতাফা। অপর তিন পুত্র ছিলেন ইবরাহীম, 'আবদুল্লাহ ও আহমাদ। তৃতীয় আহমাদ-এর শাসন কালে হাজ্জী মুসতাফা আগা সরকারের সহিত সরাসরি সংঘাত পরিহার করিয়া তাঁহার নিজস্ব প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে সচেষ্ট হন। পারস্যের সহিত বিরাজমান যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ উপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। একই সঙ্গে তাহা হাজ্জী মুসতাফা আগার ন্যায় প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গকে প্রদেশসমূহে তাঁহাদের অপেক্ষা কম ক্ষমতাশালী প্রতিপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত ও দমন করার মাধ্যমে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে উৎসাহিত করিতে থাকে। ১১৫২/১৭৩৯ সালে তিনি দেনিযলি, আয়দীন (ایدین) ও সারূওখান (صاروخان) অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত সারী বেয় ওগলূ মুসতাফা এবং অন্যান্য দস্যুচক্রকে নির্মূল করার লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানে সহায়তা করেন। পরবর্তীকালে সরকারী আদেশে তাঁহাকে অন্যান্য অনেক সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করিতে হয়। তাঁর সরকারকে সাহায্য করার জন্যে কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবার এই অঞ্চলে তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। ইতোমধ্যেই বায়তু'ল-মাল-ই 'আম্মী ও মানিসা অঞ্চলের রাজকীয় ভূ-সম্পত্তির মুকাতা'আ-র জন্য আমীন পদে অধিষ্ঠিত মুসতাফা আগা সরকারের পক্ষে তাঁহার সক্রিয় সহায়তার ফল লাভ করেন এবং ১১৫৬/১৭৪৩ সালে সারূখানের মুতাসাল্লিম নিযুক্ত হন। ১১৬৭/১৭৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁহার এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর স্থানীয় জনগণ মুতাসাল্লিমরূপে তাঁহার বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে। তিনি দোষী প্রমাণিত হন এবং ঐ বৎসরই তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় (ওয়াসীফ, তা'রীখ, বূলাক ১২৪৩ হি., ১খ, ৫৯।

মুসতাফা আগা-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটির প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আতা'উল্লাহ সারূখান-এর মুতাসাল্লিম পদ লাভে সমর্থ হন। কিন্তু ১১৭৪/১৭৬১ সালে অযোগ্যতা ও পদে বহাল থাকাকালীন অসদাচরণের দায়ে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁহাকে য়ায়া গ্রামে যাইয়া অবসর যাপনের উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্তে তাঁহার পিতার মৃত্যুর জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উহার ফলে সংঘটিত সংঘাতে তিনি পরাজিত হন এবং ১১৮১/১৭৬৭ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহার অল্পকাল পরেই পরিবারের নেতৃত্ব হাজ্জী মুসতাফা আগা-র অপর পুত্র আহমাদ আগার হাতে আসে। তিনি পরিবারের অপরাপর সদস্যকে তাঁহার পক্ষে সমবেত করিতে সমর্থ হন এবং ১১৮৩/১৭৬৯ সালে আকহিসার-এর ভয়ভোদা পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত পদ হইতে জোরপূর্বক বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি ১১৮৪/১৭৭০ সালে ইযমীর-এর ভয়ভোদা ও সানজাকবুরনী (সানচাকবুরনু)-এর মুহাফিজ পদ লাভ করেন। গভীর পারিবারিক সম্পর্ক এবং সুযোগসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবার উহাদের প্রভাবাধীন এলাকা বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয়। ১১৮৭/১৭৭৩ সালে আহমাদ আগা রাজপ্রাসাদে কাপিজি বাশী [দ্র.)-এর পদ লাভ করেন এবং ১১৯০/১৭৭৬ সালে সানজাক-এর মুলতাযিম হন। তাঁহার অপর ভ্রাতা মুহাম্মাদ আগা এই সময়ে সারূখান সানজাক-এর মুতাসাল্লিম ছিলেন অর্থাৎ বস্তুতপক্ষে এই সময়ে সমগ্র সানজাকটি কাবা 'উছমান-ওগলূ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১২০১-১৭৮৭-৯২ সালের রুশ যুদ্ধে 'উমার ও 'উছমান আগার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যকলাপ পরিবারটির জন্য আরো অধিক সুবিধা আনয়ন করে।

১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িলে মুতাসাল্লিম মুহাসসিল অথবা ভয়ভোদার ন্যায় দ্বিতীয় সারির কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁহাদের পুঞ্জীভূত ও কুক্ষিগত অতুল সম্পদের জোরে স্থানীয় প্রশাসনে ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবার এই বংশোদ্ভূতগণের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সময়ে

ইহারা সার্বিকভাবে আয়ান (দ্র.) উপাধির মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে থাকে। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে কারা 'উছমান পরিবার সারূ খানের সীমান্তের বাহিরেও ইহার বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। এই পরিবারের কতিপয় সদস্য যথাক্রমে আয়দিন-এর মুতাসাল্লিম এবং তুরগুতলূ, মেনেমেন ও বারগামা (برغمه)-এর ভয়ভোদা পদ লাভ করেন। হাজ্জী হুসায়ন আগা, ইযমীর-এর মুহাফিজ এবং বন্দর এলাকার মুবায়া 'আজী পদে অধিষ্ঠিত হন। 'উমার আগার সময়ে কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবার পশ্চিম আনাতোলিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পরিবারে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে তাহারা ইসপারটা-র মুতাসাল্লিম পদ এবং গেলেনবি-র ভয়ভোদা পদ অর্জন করে। কথিত আছে যে, উক্ত সময়কালের আ'য়ানগণের মধ্যে 'উমার আগা ছিলেন সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী। সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য সুলতান ৩য় সেলীম (দ্র.)-এর রাজত্বকালে আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার যে সমস্ত প্রভাবশালী আয়ান রাজকীয় আমন্ত্রণ লাভ করিতেন তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি চুক্তির দলীলে তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান করেন (I. H. Uzuncarsili, Meshur Rumeli ayanlarindan Tirsinikli Ismail, yilikoglu Suleyman Agalar ve Alemdar Mustafa Pasa, ইস্তাম্বুল S১৯৪২ খৃ., ১২৪, ১৪৩, ১৪৪)। ২য় মাহমূদ যখন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তখন তিনি প্রথম দিকে ক্ষমতাশালী কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অন্যান্য সকল পরিবারকে অপসারণ করিবার পরই কেবল তাঁহাদের উপর আঘাত আসে। অবশ্য মোরিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং রুশ অভিযানের সূত্রপাত মনে হয় কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবার পুনরায় তাঁহার পূর্ব-সম্মানের কিছু পরিমাণ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, যদিও এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী। ইহার পরবর্তীকালে ১২৪৪/১৮২৯ সালে পরিবারের দুইজন সদস্যের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের একজন ছিলেন বারগামার ভয়ভোদা 'উমার আগা এবং অপর জন মানিসার মুতাসাল্লিম হুসায়ন আগা। তাঁহাদের স্থানে পরিবারের অপর কোনও সদস্যকে নিয়োগ করা হয় নাই, তাহার পরিবর্তে পদসমূহ সরকারের নিকট প্রত্যার্পণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশসমূহে ইহার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে এবং আ'য়ানগণের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবার অতি দ্রুত এই নূতন পরিস্থিতির সহিত নিজেদের অভ্যস্ত করিয়া নেয়। পূলাদ মুহাম্মাদ-এর পুত্রদ্বয় তায়্যিব আগা য়া'কূব পাশা-এর কর্মজীবন ইহার সাক্ষ্য বহন করে (লুতফী, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩০৫ হি. ৫খ, ৯৬)। ১২৪৯/১৮৩৩ সালে তায়্যিব আগা মানিসা-র মুতাসাল্লিম-এ পরিণত হন এবং দুই বৎসর পর প্রধান অশ্বপাল পরিচালক (ইস্তাবল-ই 'আমিরি মূদূরলুগ)-এর পদ অর্জন করেন। তাঁহার ভ্রাতা য়া'কূব পাশা বহুবার আয়দীনের ওয়ালী ছিলেন (১২৪৯-৫২/১৮৩৩-৬, ১২৫৭/১৮৪১, ১২৬১-৩/১৮৪৫-৭) তায়্যিব আগা ১২৫৫/১৮৩৯ ও ১২৫৮/১৮৪২ সালের মধ্যে মানিসা-র মুহাস্‌সিল ছিলেন এবং আয়দীনের কা'ইম মাকাম থাকাকালীন ১২৬১/১৮৪৫ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র সাদিক বেগ বিভিন্ন সময়ে আয়দীন-এর কা'ইম মাকাম ছিলেন এবং তাঁহার পিতার ন্যায় রাজকীয় অশ্বপাল-পরিচালকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৭৭/১৮৬১ সালে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকায় ইতোমধ্যেই দুর্বল হইয়া পড়া কারা 'উছমান-ওগলূ পরিবারের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

যাহা হউক এই পরিবার হইতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য উত্তরসুরির আগমন অব্যাহত থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'উছমান বেগ ও খালিদ পাশা স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের পক্ষে কাজ করেন। গ্রীক বাহিনী মানিসা এলাকায় প্রবেশ করিলে খালিদ পাশা তাঁহার সংগঠিত গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হন, কিন্তু ২৩ জুন ১৯১৯ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২৩ ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই পরিবার মুহাম্মাদ রিদা সু'আদ কানী (সুয়াত কানী) ও না'ইম-এর ন্যায় ব্যক্তিত্বকে উপহার প্রদান করে। সাধারণতন্ত্রী যুগে এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত সদস্য হইতেছেন কাদরী বেগ-এর পুত্র য়া'কূব পাশা-এর পৌত্র লেখক ও রাজনীতিবিদ য়া'কূব কাদরী 'উছমান-ওগলূ (য়াকুপ কাদরী কারা উছমান-ওগলূ)।এই পরিবারের সদস্যবর্গ অদ্যাবধি মানিসা ও কিরক আগাচ (কির্কাগাচ) অঞ্চলে বসবাস করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (মূল পাঠে উদ্ধৃত রচনাবলীর অতিরিক্ত) ঃ (১) M. Cagatay Ulucay, Kara Osman ogullarina ait bazi vesikalar, in Tarih Vesikalari, ৯খ, (ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ.), ১৯৩-২০৭ ; ১০খ, (ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ.), ৩০০-৮ ; ১২খ, (ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.), ৪৩৪-৪০ ; ১৪খ, (ইস্তাম্বুল ১৯৪৪ খৃ.), ১১৭-২৬; (২) Munir Aktepe, Kara Osmanoglu Haci Osman Aga'ya ait iki vakfiye, in Vakiflar Dergisi, ৯খ. (আনকারা ১৯৭৩ খৃ.), ১৬১-৮; (৩) Osman Bayatli, Kara Osman-ogullarindan Haci Omer Oglu Mehmed Aga vakfi, ইযমির ১৯৫৭ খৃ. ; (৪) M. Cagatay Ulucay, Manisa Unluleri, মানিসা ১৯৬৪ খৃ., ৫৪-৬২ ; (৫) ঐ লেখক, 18. ve 19 yuzyillarda Saruhan'da eskiyalik ve halk hareketleri, ইস্তাম্বুল ১৯৫৫ খৃ., ১৭-২০, ১৫৩, ১৫৪, ২৮০-৬; (৬) Meliha Taktas, Karaosmanogullari ailesi, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ. (কলা অনুষদের স্নাতক থিসিস, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়); (৭) Ismail Hakki Uzunkarsili, Kitabeler, ইস্তাম্বুল ১৯২৯ খৃ., ২খ, ৯৬-১০১ ; (৮) Basri Edip Bayatli, Palamut nahiyesi, in Kurtulus gazetesi, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪১ খৃ., ৮ জানুয়ারী ১৯৪২ খৃ., নং ২৯৯-৩১৫ ; (৯) Asaf Goksel-Hikmet Solen, Aydin ili tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ., ১৯৯-২০২; (১০) জেওদেত পাশা, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি., ৫খ, ২২৭, ২৪০, ২৪২, ৬খ, ৩২, ১৪৬, ১৪৮, ২১৬, ২৯৭, ৩০৫, ৮খ, ৬৪, ১৯৭ ; ৯খ, ২, ৩, ১৪৩, ২৮৩ ; ১০খ, ৮৯ ; (১১) F. W. Hasluck, Christianitiy and Islam under the Sultans, অক্সফোর্ড ১৯২৯ খৃ., ২খ, ৫৯৭-৬০৩; (১২) Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grece, প্যারিস ১৮০৯ খৃ., ২খ, ৩৭-৮ ; (১৩) Macfarlane, Constantinople in 1828, লন্ডন ১৮২৯ খৃ., ১৬৩, ১৭৩, ১৭৭, ১৮৬, ১৯৩-৪; (১৪) M. Cagatay Ulucay এবং Ibrahim Gokcen, Manisa tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ., ৫৫-৫৮, ৬৩, ৬৫ ; (১৫) দা.মা.ই., ৯খ, ২৮৬-৯।

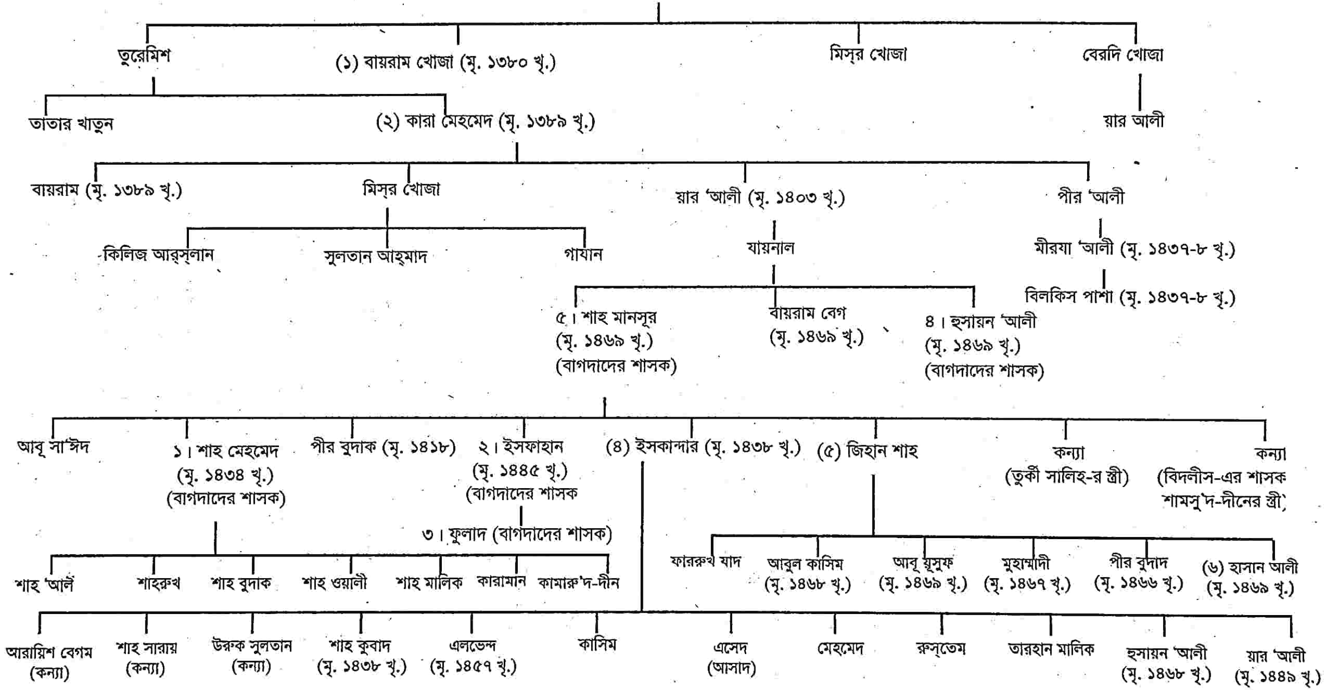
C. Orhonlu(E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কারা কোয়ুনলু (Kara Koyunlu)ঃ তুর্কী রাজবংশ, ইহারা পূর্ব আনাতোলিয়ার কতিপয় অংশ, ইরাক, আল-জাযীরা ও ইরানের অধিকাংশ ভূভাগ শাসন করেন, বারানী (বারানলু) বংশ নামেও পরিচিত, কিন্তু কেন এই নাম তাহা জানা যায় না। কারা কোয়ুনলু গোত্র নিঃসন্দেহে ওগুয (Oghuz) গোত্রের একটি উপগোত্র (oba) ছিল। Minorsky-র এই দাবি, এই উপগোত্র য়িওয়া (Yiwa) হইতে উদ্ভূত, সম্ভবত সত্য (The Clan of the Qara Qoyunlu rulers, in Koprulu Armagani, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ., ৩৯১-৫)। রাজনৈতিক সাফল্যের কারণে অন্যান্য বহু গোত্রের লোকেরা এই রাজবংশের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোত্রগুলি ছিল, সা'দলু (নাখ্চিবান অঞ্চল), দুখারলু (ইরযুরুম-বায়বুর্‌ত অঞ্চল), আলপাগুত ও এগাচ এরি (মার'আশ অঞ্চল), বাহারলু (হামাদান অঞ্চল জিহান শাহ্-এর শাসনামলে), কারামানলু (গান্‌জা ও বারদা'আ অঞ্চল), জাকিরলু (আর্‌দাবীল অঞ্চল) এবং আঈনলু গোত্র। এতদ্ব্যতীত কারা উলুস নামে পরিচিত এক বিরাট সম্প্রদায়ও কারা কয়ুনলুদের অধীন ছিল। পরবর্তী কালে এই সকল গোত্র আক কয়ুনলুদের এবং তৎপর সাফাবীদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। মোঙ্গল আমলে কারা কয়ুনলুদের শীতকালীন বাসস্থান ছিল মাওসিল (موصل) অঞ্চলে আর তাহাদের চারণভূমি ছিল ভান (সম্ভবত আরজিশ) অঞ্চলে এবং তাহারা ছিল উইরাত (Uyrat)-গণের অধীনে। সুতায়লীগণ (Sutayli) যখন ৭৩৭/১৩৩৭ উইরাতগণের মালিকানাধীন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে তখন কারা কয়ুনলুগণ তাহাদের সামন্ত হইয়া পড়ে। সুতায়লী গোত্রের পীর মুহাম্মাদ যখন ৭৫১/১৩৫০ সালে তায় বুগার পুত্র এবং তাঁহার অন্যতম আমীর হুসায়ন বেগ-এর হস্তে নিহত হন, এই আমীর তাঁহার স্থান দখল করেন। তবে অল্প দিনের মধ্যে তিনিও নিহত হন (৭৫২/১৩৫১) আমীর বায়রাম খোজার হস্তে। যিনি কারা কয়ুনলু গোত্রকে ইতিহাসের মঞ্চে স্থান দান করেন। হুসায়ন বেগ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ওরদু বুগা-র নিকট হইতে মাওসিল কাড়িয়া লইতে না পারিলেও বায়রাম খোজা অনায়াসেই দলীয় নেতৃত্ব লাভ করেন। তবে স্বল্পকালের মধ্যে বায়রাম অবশ্যই মাওসিল অধিকার করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা বেরদি খোজাকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। দিয়ার বাক্‌র-এর মোঙ্গল গভর্নরগণের ন্যায় বায়রাম শীতকালে মাওসিল অঞ্চলে বাস করিতেন এবং গ্রীষ্মকালে মুশ আখলাত অঞ্চলে বা কখনও ইরযুরুমে যাইতেন। উল্লিখিত অঞ্চলসমূহের অধিকাংশ স্থানীয় শাসক বংশকে হয় তাহার মিত্র না হয় সামন্তে পরিণত করা হইয়াছিল ; কিন্তু পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মারদীন-এর আরতুকী শাসক মালিক মানসূর কিছুতেই বায়রাম খোজার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেন না, বরং জালায়িরি শাসক সুলতান উওয়ায়স (Uways)-এর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই কারণে সুলতান উওয়ায়স ৭৬৭/১৩৬৬ সনের বসন্তকালে বাগদাদ ত্যাগ করেন, বেরাদি খোজাকে পরাজিত করিয়া মাওসিল অধিকার করেন এবং রমযান মাস মারদীনে অতিবাহিত করিয়া বায়রাম খোজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। খোজা তখন তাঁহার বাহিনীসহ মুশ্ প্রান্তরে অবস্থিত ছিলেন। সুলতান উওয়ায়স সেখানে কারা কয়ুনলু বংশীয় আমীর বায়রামকে পরাজিত করিয়া কারা কিলিস (আগরি) হইয়া তাবরীয-এ গমন করেন। এই পরাজয়ের পরে বায়রাম খোজা সম্ভবত উওয়ায়স-এর অন্যতম সামন্তে পরিণত হন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কারা কয়ুনলু বেগ তাঁহার কার্যক্রম চালাইয়া যাইতে থাকেন অর্থাৎ ৭৭৩/১৩৭১ সালে মাওসিল অবরোধ করেন (সম্ভবত মাওসিল তখন উওয়ায়স-এর অধিকারে ছিল এবং পর বৎসর সিনজার অধিকার করেন।

একই বৎসর (৭৭৪/১৩৭২) যখন জালায়ীরী শাসকের মৃত্যু হয়, তখন বায়রাম খোজা তাঁহার করদ সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সুযোগ বুঝিয়া তিনি সুরমেলি, আলা কিলিস, খোয়, নাখচিভান সমেত আরও কিছু ভূখণ্ড তাঁহার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। অন্যপক্ষে উওয়ায়স-এর উত্তরাধিকারী শায়খ হুসায়ন, বিশেষত প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী 'আদিল আকা বায়রামের এই কার্যকলাপে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ফলে বায়রাম সহজতর শর্তে পুনরায় সামন্তের অবস্থান স্বীকার করেন (৭৭৯/১৩৭৭)। ৭৮২/১৩৮০ সনে বায়রাম খোজার মৃত্যুর সময়ে মাওসিল হইতে ইরযুরুম পর্যন্ত ভূভাগ সরাসরি কারা কয়ুনলু রাজবংশের অধিকারে ছিল।

বায়রাম খোজার উত্তরাধিকারী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কারা মাহমূদ ছিলেন একজন পরিশ্রমী ও যোগ্য আমীর। ৭৮৪/১৩৮২ সনে জালায়ীরীগণের শাহ্‌যাদা শায়খ 'আলী ও পীর 'আলী বার বেগ-এর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত জালায়ীরী বাহিনীকে নাখ্চীবান-এর নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেন। জালায়ীরী শাহ্‌যাদা ও অপর সেনাপতি উভয়েই নিহত হন। এই বিজয়ের ফলে কারা মাহমূদ-এর মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং আহ্‌মাদ-এর জন্যও জালায়ীরী সিংহাসন নিশ্চিত হয়। তিনি সম্ভবত উক্ত ঘটনার পরে কারা মাহমূদ-এর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুলতান হুসায়ন-এর হত্যার পর জালায়ীরীগণের সঙ্গে তাঁহার যে করদ সম্পর্ক ছিল উহার অবসান ঘটে। তিনি একের পর এক বহু সাফল্য লাভ করেন, যথা মাওসিল-এ হজ্জযাত্রিগণের মালামাল লুণ্ঠনের অপরাধে জা'বার-এর শাসক ডোগার সালিম বেগ-কে মামলূক সুলতানের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, মারদীন অবরোধ করেন, আরতুকী শাসক মালিক 'ঈসাকে পরাজিত করেন এবং অতঃপর তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন ; আক কয়ুনলুকে, তাঁহার মিত্র আরযীনজানের শাসক মুতাহ্‌হার-এর সঙ্গে একযোগে পরাভূত করিয়া উভয়কে কাদী বুরহানু'দ-দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন এবং ৭৮৯/১৩৮৭ সনে তীমূর-এর আক্রমণের মুকাবিলায় কারা মাহ্‌মূদ বীরত্বের সহিত নিজ রাজ্য রক্ষা করেন। বস্তুত তীমূর-এর ট্রান্স-অক্সানিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগে তিনি পরের বৎসর তাবরীয অধিকার করেন। তাবরীযে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করিয়া তিনি যখন পূর্ব আনাতোলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহার অধীনে চাকুরীরত আমীর পীর হাসান বেগ-এর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। পীর হাসান বেগ ছিলেন হুসায়ন বেগ-এর পুত্র, যিনি বায়রাম খোজার হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। হাসান বেগ তীমূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহাতে উৎসাহিত ও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি কারা মাহমূদ-এর আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করেন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হয় এবং রাবী'উছ-ছানী ৭৯১/এপ্রিল ১৩৮৯ তারিখে সংঘটিত যুদ্ধে পীর হাসান বেগ-এর হস্তে কারা মাহমূদ নিহত হন এবং তাঁহার রাজ্য পীর হাসান-এর হস্তগত হয়। কোন কোন মামলূক ঐতিহাসিক (ইবনুল-ফুরাত এবং আল-'আয়নী) লিখিয়াছেন যে, পীর হাসান (তাঁহাদের লেখায় "কারা হাসান") ছিলেন কারা মাহমূদ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ; কিন্তু অন্যান্য সূত্র হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

কারা-কোয়ুনলু বংশ-তালিকা



পীর হাসান বেগ-এর শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কারা কয়ুনলু তুর্কোমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যা কারা মাহমূদ-এর অন্যতম পুত্র মিস্‌র খোজার সঙ্গে মিলিত হয় এবং সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণিত হয় যে, মিস্‌র খোজা একজন দুর্বল চরিত্রের মানুষ ; ফলে তাঁহার ভাই কারা য়ূসুফকে তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কারা য়ূসুফ ও পীর হাসান-এর মধ্যে তীব্র যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। অবশেষে ডোগার সালিম বেগের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়। পীর হাসান-এর মৃত্যু (৭৯৩/১৩৯১) কারা য়ূসুফকে তাঁর শত্রুমুক্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহাকে পুত্র হুসায়ন বেগ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যে তীমূর-এর অভিযানাদির সময়ে কারা য়ূসুফ-এর শাসনকাল পরিব্যাপ্ত ছিল। পিতার ন্যায় কারা য়ূসুফও তীমূরের আক্রমণের মুকাবিলা করিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তীমূর-এর প্রত্যাবর্তনের সুযোগে তিনি কয়েকবার তাব্‌রীয অধিকার করেন এবং তীমূর-এর অন্যতম সেনাপতি ও আওনিক-এর গভর্নর আলতামীশ-কে বন্দী করিয়া মিসরে প্রেরণ করেন (৭৯৭/১৩৯৫)। তবে তীমূর যখন আনাতোলিয়া আক্রমণ শুরু করেন তখন য়ূসুফ বেগ ১ম বায়াযীদ (দ্র.)-এর আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন (৮০২/১৪০০)। বস্তুত বায়াযীদ কারা কয়ুনলু বেগ (য়ূসুফ)-কে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন এই অজুহাতে তীমূর 'উছমানী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। তীমূর যখন 'উছমানী রাজ্যে প্রবেশ করেন, কারা য়ূসুফ তখন আনাতোলিয়া ত্যাগ (৮০৫/ ১৪০২) করিয়া ইরাকে গমন করেন। সেখানে তিনি ইরাকের সুলতান আহমাদকে তাঁহার পুত্রের বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেন। কিন্তু সুলতান আহমাদ স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলে য়ূসুফ বাগদাদ আক্রমণ করেন (৮০৫/১৪০৩)। তীমূর-এর পৌত্রগণের শ্রেষ্ঠতর বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া তিনি মরুপথে দামিশ্‌ক গমন করেন। মামলূক সুলতানের আদেশে কারা য়ূসুফ ও জালায়ীর আহ্‌মাদকে দামিশকে বন্দী করা হয়। সুলতান অল্পকাল পরেই তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু দামিশকের গভর্নর শায়খ সুলতানের সেই আদেশ উপেক্ষা করেন।

মামলূক সুলতান আশ্রয়প্রার্থীদ্বয়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন তীমূর-এর চাপের ফলে। চিরতরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তীমূর নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন, এই দুই ক্ষুদ্র শত্রু, বিশেষত কারা য়ূসুফ যেন ভবিষ্যতে তাঁহার সেনাপতিগণকে ও পৌত্রগণকে উত্যক্ত করিতে না পারে। বস্তুত শারাফু'দ-দীন 'আলীর কথা যদি সত্য হয়, তবে তীমূর তাঁহাকে বিদায় জানাইতে আগত আউনিক কিল্লার সেনাপতি আমীর দোলাদাই (Doladay)-কে বলিয়াছিলেন, "জালায়ীর সুলতান আহমাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিও না। কারণ তাজিকগণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছে। কিন্তু কারা য়ূসুফ-এর উপর কড়া নজর রাখিও, কারণ সে একজন তুর্কোমান।" দামিশকের গভর্নর শায়খ আশ্রিতদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ অমান্য করিলেন মামলূক রাজ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য নহে, বরং তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করিয়া বন্দিগণকে মুক্তি দেন (৮০৭/১৪০৫), যে সময়ের মধ্যে তীমূরও সামারকান্দে ফিরিয়া যান।

কারা য়ূসুফকে লইয়া শায়খ কায়রো অভিমুখে অগ্রসর হন। প্রথম যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। কারণ তিনি কারা কয়ুনলু বেগ (য়ূসুফ)-এর উপদেশ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে। কারণ অধিকাংশ আমীর তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং স্বল্প সংখ্যক, প্রধানত কারা য়ূসুফ-এর তুর্কোমান বাহিনীর সৈন্য লইয়া তিনি দামিশকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন (৮০৭/১৪০৫)। শায়খ-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরের বৎসরের গোড়ার দিকে কারা য়ূসুফ তাহার নিজ রাজ্য পূর্ব আনাতোলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্‌লীস-এর আমীর শামসুদ-দীন তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সামগ্রী প্রদান করেন। তীমূর-এর নাতীদ্বয় 'উমার মীর্যা ও আবূ বাক্‌র মীর্যা, যাহারা আযারবায়জান, আর্‌রান, 'ইরাক-ই 'আরাব ও পূর্ব আনাতোলিয়ার শাসক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ছিল অযোগ্য শাসক এবং একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী—এই পরিস্থিতি ছিল কারা য়ূসুফ-এর অনুকূল। ভান ও হাক্‌কারী-র আমীর 'ইয্‌যু'দ-দীন শীর-কে এবং আওনিক কিল্লার তীমূর কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতি দোলাদাই-কে পরাজিত করিয়া য়ূসুফ পূর্ব আনাতোলিয়াতে নিজ রাজ্য পুনরাধিকার করেন (৮০৯/১৪০৬)। আবূ বাক্‌র মীর্যাকে প্রথমবার নাখ্‌চিবান এলাকাতে (২ জুমাদা-১, ৮০৯/১৫ অক্টোবর, ১৪০৬) এবং দ্বিতীয়বার তাবরীয-এর নিকটস্থ সারূদ রূদ-এ (১৬ যু'ল-কা'দা/১৩ এপ্রিল, ১৪০৮) পরাজিত করিয়া তিনি আযারবায়জান অধিকার করেন। ইহার পরেই তিনি তৎকালে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুই বাণিজ্য কেন্দ্র সুলতানিয়্যা ও হামাদান জয় করেন। কারা য়ূসুফ-এর অপ্রত্যাশিত সাফল্যসমূহের ফলে জালায়ীর সুলতান আহ্‌মাদ এবং অন্য অনেক আমীরের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়, বিশেষত এই কারণে যে, সুলতান আহমাদ প্রধানত তাঁহার সাফল্যের কারণেই 'ইরাক-ই 'আরাব ও খূজিস্তানের শাসক হইয়াছিলেন। তদুপরি দামিশকে বন্দী থাকাকালে একমত হইয়াছিলেন যে, আযারবায়জান কারা কয়ুনলু-র এবং 'ইরাক-ই 'আরাব সুলতান আহমাদের ভাগে পড়িবে। বস্তুত জালায়িরি সুলতান আহমাদ ছিলেন কারা য়ূসুফ-এর দামিশকে জাত পুত্র পীর বুদাক-এর পালক পিতা। এই দুই সাবেক মিত্রের মধ্যে, তাবরীয-এর নিকটবর্তী আসাদ গ্রামে সংঘটিত যুদ্ধের (২৮ রাবী'-২, ৮১৩/৩০ আগস্ট, ১৪১০) পরিণামে সুলতান আহমাদ পরাজিত ও বন্দী হন ; পরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার রাজ্য 'ইরাক-ই 'আরাব কারা কয়ুনলুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উহার শাসনভার দেওয়া হয় কারা য়ূসুফ-এর পুত্র শাহ মুহাম্মাদ-এর উপর। তাঁহার অপর পুত্র পীর বুদাক-কে কারা কয়ুনলু রাজ্যের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হয় (৮১৪/১৪১১)। দলীলপত্রে দেখা যায়, তাঁহার উপাধি ছিল সুলতান পীর বুদাক খান য়ারলিগিদীন (Yarlighidin).... আবূ নাস্‌র য়ূসুফ বাহাদুর নোয়ান সোযুমুয (Noyan Sozumuz) এবং এই উপলক্ষের স্মারকরূপে তামা ও রূপার মুদ্রাঙ্কন করা হয়।

কারা য়ূসুফ-এর উপর্যুপরি সাফল্য ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্নতার সহিত অবলোকন করিতেছিলেন দুই শাসক চাগাতায় (তীমূরী) শাসক শাহ রুখ ও মিসরের শাসক শায়খ। তাঁহারা লক্ষ করিলেন, য়ূসুফ স্বল্প সময়ের মধ্যে এক লাফে সাধারণ একজন গোত্রপতির অবস্থান হইতে একটি বিশাল রাজ্যের অধিপতির মর্যাদায় উন্নত হইলেন। প্রায় এই সময় হইতেই, বিশেষত শাহ রুখ য়ূসুফের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকেন কয়েকজন শাসককে [যথা (১) আমিদ, উরফা ও কামাখের আক কয়ুনলু শাসক কারা য়ূসুফ 'উছমান, (২) শীরওয়ান শাহ শায়খ ইব্‌রাহীম এবং আরও কয়েকজনকে]। কারা কয়ুনলু শাসক য়ূসুফের বিরুদ্ধে একটি ত্রি-পক্ষীয়

জোট ছিল এই পরিস্থিতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। পক্ষত্রয় ছিল ঃ (১) শীরওয়ানী শাহ শায়খ ইব্রাহীম ; (২) শাকী-র শাসক আর্লাত সায়্যিদী আহমাদ এবং (৩) জর্জীয় রাজা কোস্টেনডিল (Constantine)। কিন্তু কুর নদীর তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে (রমযান ৮১৪/ডিসেম্বর ১৪১২) জোটের সদস্যগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শায়খ ইব্রাহীম বিপুল মুক্তিপণের বিনিময়ে রক্ষা পাইলেন, জর্জীয় রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল।

আনাতোলিয়াতে কারা কয়ুনলু রাজ্য উত্তরে ইরযিনজান এলাকা হইতে দক্ষিণে মারদীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারা য়ূসুফ ৮১৩/১৪১০ সনে মুতাহ্হার-এর নাতী শায়খ হাসান-এর নিকট হইতে ইরযিনজান দখল এবং ৮১২/১৪০৯ সনে আর্তুকী বংশের মালিক শাহ হইতে মারদীন অধিকার করেন। তবে সেই প্রান্তে কারা কয়ুনলু রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না। কারণ প্রবল বাধাস্বরূপ ছিলেন আক- কয়ুনলু বংশীয় কারা য়ুলুক 'উছমান বেগ। এই অনমনীয় শত্রুকে একাধিকবার পরাজিত করিলেও, এমনকি একবার তাঁহাকে মামলূকদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেও, কারা য়ূসুফ কখনও তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তদুপরি কারা য়ুলুককে বন্দী করিবার জন্য কারা য়ূসুফ মামলূক রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তথায় যে লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড চালাইয়াছিলেন তাহার ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। শায়খ ইব্রাহীম কারা য়ূসুফকে ব্যক্তিগতভাবে ভাল করিয়া জানিতেন। য়ূসুফের পক্ষ হইতে বিপদের আশংকায় ইব্রাহীম গোপনে আক কয়ুনলু বেগকে সমর্থন দানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। মামলূক রাজ্য হইতে মারদীনে ফিরিয়া আসিয়া (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৪১৩) কারা য়ূসুফ তাঁহার প্রিয় পুত্র পীর বুদাক-এর অকাল মৃত্যুরূপ অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হন এবং গভীরভাবে শোকাভিভূত হইয়া তাব্রীযে প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খ ইব্রাহীমের রাজ্যে কারা কয়ুনলু যে ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিলেন তাহা এবং কারা য়ূসুফ-এর নিকট হইতে তিনি যে ভয়সূচক পত্র পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া শায়খ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন—যদিও তখন তিনি বাতে পঙ্গু এবং তাঁহাকে পরিবহণ করা হইত। তিনি যখন খবর পাইলেন যে, শাহ রুখ কারা য়ূসুফ-এর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন তখন নিজের যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করিয়া দেন।

শাহ রুখ তাঁহার পিতা তীমূর কর্তৃক স্থাপিত বিশাল সাম্রাজ্যের অনেকাংশ নিজ কর্তৃত্বাধীন করিয়াছিলেন ; আযারবায়জান, বিশেষত 'ইরাক-ই আজাম কারা য়ূসুফ-এর দখলে থাকিবে তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। ইতোপূর্বেই ৮১২/১৪০৯ ও ৮১৭/১৪১৪ সনে কয়েকবার তিনি য়ূসুফকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক গোলযোগের কারণে সংকল্প পূর্ণ করিতে পারেন নাই। শান্তি প্রতিষ্ঠার আলাপ-আলোচনা ফলবতী হইল না। শাহ রুখ দাবি করেন যে, অবশ্যই সুলতানিয়্যা এবং কায্বীন শহরদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে এবং কারা য়ূসুফকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। কারা য়ূসুফ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজ রাজধানী তাব্রীয হইতে সসৈন্যে চাগাতায়ী শাসক শাহ রুখের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সংবাদে ২,০০,০০০ অশ্বারোহী চাগাতায়ী সৈন্যের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, যদিও কারা য়ূসুফ-এর সৈন্য সংখ্যা ৫০,০০০ অশ্বারোহীর বেশী ছিল না। ঐতিহাসিক হাফিজ-ই আব্রূ বলেন, চাগাতায়ী শাসক হইতে শুরু করিয়া সেনাবাহিনীর নিম্নতম স্তরের সৈনিকের মনেও বিজয় সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কিন্তু কারা কয়ুনলু য়ূসুফের মৃত্যু সংবাদ তাহাদের ত্রাসকে উল্লাসে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে তাবরীয হইতে রওয়ানা হইবার সময়েই কারা য়ূসুফ গুরুতরভাবে অসুস্থ ছিলেন ; তথাপি স্ট্রেচার পরিবহণের জন্য তিনি জিদ করেন। উজান হইতে দুই লীগ দূরে উপনীত হইলে তাঁহার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং স্বল্পকাল পরেই ৭ যু'ল-কা'দা, ৮২৩/১৩ নভেম্বর, ১৪২০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কারা য়ূসুফের যোগ্যতা কারা কয়ুনলু বংশের গৌরবে বিরাট রূপান্তর ঘটায়। ৮০৭/১৪০৫ সনে তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহার ও সহগামী সৈন্যগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের জন্য তিনি রাখিয়া যান বিশাল রাজ্য যাহা ইরযিনজান হইতে কাযবীন পর্যন্ত এবং শীরওয়ান হইতে বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহাকে আরজিশ-এ কবরস্থ করা হয় ; কিন্তু তাঁহার ব্যয়বহুল মাযার সৌধ ও যাবিয়ার স্থান চিহ্নিত করা যায় নাই।

য়ূসুফের মৃত্যু ও চাগাতায়ী বাহিনীর আগমন যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কারা কয়ুনলুদের অধিক সংখ্যক লোক কারা য়ূসুফ-এর এক পুত্র ইস্কান্দার-এর নেতৃত্বে সমবেত হয়, তিনি ছিলেন বীরত্বের জন্য খ্যাত। আক কয়ুনলু বংশীয় কারা য়ূসুফ রাবী'-২, ৮২৪/এপ্রিল ১৪২১ সনে মারদীন আক্রমণ করিলে ইসকান্দার তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই বিজয়ের ফলে শাহ রুখ-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় (উহারা তখন আরাস নদীর তীরে ছাউনীতে অবস্থান করিতেছিল)। পক্ষান্তরে কারা কয়ুনলুগণের মনোবল এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা শাহ রুখ-এর বিরুদ্ধে ইরযেরুম ও আগরী-র মধ্যবর্তী আলাশ্গির্দ (Alashgird)-এর সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করিবার জন্য ৩০-৪০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করে। চাগাতায়ী বাহিনীতে হাতী রহিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া তাহারা কাদামাটি দ্বারা নির্মিত হাতীর বিরুদ্ধে কৃত্রিম যুদ্ধের মাধ্যমে ঘোড়াগুলিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। শাহ রুখ ভান্হ্রদের তীরভূমি অতিক্রম না করিয়া আযারবায়জানে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কারা য়ূসুফ এবং কয়েকজন স্থানীয় আমীরের অনুরোধক্রমে তিনি কারা কয়ুনলু বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার সংকল্প করেন। আলাশগির্দ-এর ময়দানে তিন দিন ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে (২৯-৩০ রাজাব এবং ১ শাবান, ৮২৪/৩০-৩১ জুলাই এবং ১আগস্ট, ১৪২১) কেবল সৈন্য সংখ্যাধিক্যের কারণে শাহ রুখ বিজয়ী হন। কিন্তু আযারবায়জানের গভর্নর নিযুক্ত করিবার জন্য তিনি নিজ পুত্রগণের বা আমীরগণের মধ্যে উপযুক্ত কাহাকেও পাইলেন না (এইজন্য কোন কোন কবি শাহ রুখকে বিদ্রূপ করিয়াছেন)। ইসকান্দার-এর ভয়ে কেহই গভর্নর হইতে সম্মত হন নাই। অগত্যা ভূতপূর্ব মালিকগণেরই অধিকারে আযারবায়জান অর্পণ করিয়া চাগাতায়ী শাসক খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন। তাবরীয যদিও ইসকান্দার-এর ভাই ইসফাহান (যিনি আলাশগির্দের যুদ্ধে কারা কয়ুনলু বাহিনীর বাম ব্যূহের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন) কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল—তিনি ইসকান্দারের অভিযানের সংবাদ পাইয়া শহর ত্যাগ করিয়া পাসিন সমভূমিতে পশ্চাদপসরণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে 'ইরাক-ই 'আরাব গমন করেন।

৮২৫/১৪২২ ও ৮২৭/১৪২৪ এই দুই বৎসর ব্যাপী ইসকান্দার হাক্কারী ও বিদ্লীস-এর আমীরদ্বয়কে শায়েস্তা করেন। তাঁহারা ইসকান্দার-

এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শাহ রুখ-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া তিনি ভান, আখলাত ও মুশ নিজ রাজ্যের সহিত যুক্ত করেন। শাহ রুখ-এর অপর করদ শাসক শীরওয়ান শাহ খালীলুল্লাহ্র রাজ্য আক্রমণ (৮৩১/১৪২৮) করিয়া উহা লুণ্ঠন করেন এবং পর বৎসর শাহ রুখ-এর কর্তৃত্বাধীন সুলতানিয়্যা, যানজান, কাযবীন ও আভার জয় করেন। এই সকল বিজয় অভিযানের সংবাদে চাগাতায়ী শাসক এক বিশাল বাহিনী লইয়া আযারবায়জান অভিমুখে অগ্রসর হন। সালমাস-এর রণক্ষেত্রে দুই দিন ব্যাপী যুদ্ধে (১৭-১৮ যু'ল-হিজ্জা, ৮৩২/১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৪২৯) চাগাতায়ী বাহিনী জয়লাভ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শাহ রুখ উপলব্ধি করেন যে, কারা কয়ুনলু শক্তিকে তিনি কখনও নির্মূল করিতে পারিবেন না। অগত্যা তিনি কারা য়ূসুফ-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইসকান্দারের ভ্রাতা আবূ সা'ঈদকে আযারবায়জানের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ৮৩৩/১৪৩০ বসন্তকালে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অনতিকাল পরেই ইসকান্দার তাঁহার ভাইকে বন্দী করিয়া মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। অন্যান্য ভাইয়ের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক ছিল অবিশ্বাসপূর্ণ। ভাই শাহ মাহমূদ বাগদাদের শাসক হইবার পরে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইসকান্দার-এর অধীন হইতে অনিচ্ছুক ইসফাহান 'ইরাক-ই 'আরাবে গমন করেন এবং সেখানেই অনুপযুক্ত ও বোকা শাহ মাহমূদ-এর রাজ্য হইতে একের পর এক শহর দখল করেন। অবশেষে ৮৩৬/১৪৩৩ সনে বাগদাদ জয় করিয়া তিনি ভাইকে তাঁহার জমিজমা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন। জিহান-এর জায়গীর ছিল ভান হ্রদের চতুর্দিকে। তিনি তাঁহার প্রতি ভাইয়ের বিরূপ মনোভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ৮৩৭/১৪৩৩-৪ ভাইয়ের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে উদ্যোগী হইয়া তিনিও ইসফাহান-এর ন্যায় শাহ রুখ-এর সামন্তে পরিণত হন। এই দুই সামন্ত লাভ করিয়া শাহ রুখ প্রায় সকল আমীরের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া তৃতীয়বার আযারবায়জান অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আমীরগণ ছিলেন শীরওয়ান শাহ-এর তীব্র অভিযোগগুলির পক্ষে যাঁহার রাজ্যগুলি ৮৩৮/১৪৩৪ সনে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। জিহান শাহ-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইসকান্দার সম্ভবত কিছুই জানিতেন না।

শাহ রুখ ৮৩৮/১৪৩৪ সনে জিহান শাহকে রায় নামক স্থানে তাঁহার সমীপে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে কারা কয়ুনলুগণের প্রধান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইসকান্দার-এর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ইসকান্দার ইরযুরুম-এ পশ্চাদপসরণ করেন এবং আক-কয়ুনলু বংশীয় কারা য়ুলুক 'উছমান-এর বাহিনীর সম্মুখীন হন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইসকান্দার 'উছমানকে পরাস্ত করেন ; তীমূরী বাহিনী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি 'উছমানী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসকান্দার সম্ভবত ধারণা করিয়াছিলেন যে, আবূ সা'ঈদকে যত সহজে পরাজিত করিয়াছিলেন জিহান শাহকেও সহজে পরাস্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু তাবরীয-এর নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে (৮৪১/১৪৩৮) তিনি পরাজিত হন এবং আলীনজাক-এর দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিবার ও ধনরত্নসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। জিহান শাহ দুর্গ অবরোধ করিলে ইসকান্দার-এর একমাত্র ভরসা ছিল মিসরের সামরিক সাহায্য। কিন্তু ইরযিনজান-এ সুলতান বারসবায়-এর মৃত্যুসংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে মিসরীয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করে। ৮৪১/১৪৩৮ সনে এক রাত্রে ইসকান্দার তাঁহার পুত্র শাহ কোবাদ কর্তৃক নিহত হন। তিনি ছিলেন সেই আমলের একজন অত্যন্ত সাহসী শাসক। তাঁহার মুকাবিলা করিবার মত শক্তি প্রায় কাহারও ছিল না। প্রধানত সাহসের বলেই তিনি ১৮ বৎসর যাবৎ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব ছিল, আর সেই কারণেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হয়, প্রজাগণ কষ্টে নিপতিত হয় এবং তাঁহার রাজত্বের করুণ সমাপ্তি ঘটে।

জিহান শাহ-এর শাসনামলে (৮৪৩-৭২/১৪৩৯-৬৭) কারা কয়ুনলু রাজ্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং এই সময়টি ছিল রাজ্যের সর্বাধিক গৌরবময় পর্যায়। ৮৪৮/১৪৪৫ সনে ইসফাহান-এর মৃত্যু হইলে জিহান শাহ 'ইরাক-ই 'আরাব নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন (৮৪৯/১৪৪৬) এবং ৮৫০/১৪৪৭ সালে শাহ রুখ-এর মৃত্যুর সুযোগে তাঁহার সামন্ত জিহান শাহ সুলতানিয়্যা ও কাযবীন শহরদ্বয় আক্রমণ করেন। এই সকল বিজয়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি পরে রায় ও ইসফাহান শহর এবং ফারস ও কিরমান অঞ্চলসমূহ জয় করেন। প্রধানত তাঁহার পুত্র হাসান 'আলীর বিদ্রোহের (৮৬২/১৪৫৮) কারণে তাঁহার খুরাসান অভিযান ব্যর্থ হইলেও তিনি তীমূরী বংশের শাসক আবূ সা'ঈদ-এর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং তদ্দারা তীমূরীদের নিকট হইতে বিজিত এলাকাসমূহের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লন। জিহান শাহ তাঁহার কৃতিত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি খান, খাকান ও সুলতান উপাধির ধারক ছিলেন। তাঁহার শাসনামলে কারা কয়ুনলু রাজ্য অন্যতম প্রধান ইসলামী শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। শাসক তাঁহার সুখ্যাতির সহিত সমান্তরালভাবে তাঁহার রাজ্যের রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রশাসনিক সংগঠন উচ্চমানে উন্নীত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পের উৎসাহদাতা ও মার্জিত রুচির মানুষ ছিলেন এবং 'হাকীকী' ছদ্মনামে তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

আক কয়ুনলু বংশের উযুন হাসান বেগ-এর বিরুদ্ধে জিহান শাহের অভিযান তাঁহার সাবধানতার জন্য বিপর্যয়ে পরিণত হয়। যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ নিহত হন, অপর পুত্র য়ূসুফকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয় (৮৭২/১৪৬৭)। তাঁহার পুত্র পীর বুদাক ইতোপূর্বেই (৮৭০/১৪৬৬) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগত্যা তাঁহার অপর পুত্র হাসান 'আলীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া কারা কয়ুনলু রাজ্যের অধিপতির পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। হীন বুদ্ধি ও দুর্বল চরিত্রের হাসান 'আলীর পক্ষে উযুন হাসান বেগ-এর মুকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। মারান্দ-এর যুদ্ধে তিনি উযুন হাসান-এর নিকটে পরাজিত হন এবং তাঁহার সহায়ক আবূ সা'ঈদ-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন আবূ সা'ঈদও পরাজিত হন তখন হাসান 'আলী হামাদান-এর দিকে পলায়ন করেন। বন্দী হওয়া অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন (শাওওয়াল ৮৭৩/এপ্রিল ১৪৬৯)। জিহান শাহের ভাই য়ূসুফকে অন্ধ করা হইলে তাঁহাকে ফারস-এ লইয়া যাওয়া হয়, তথায় বাহারলু-র আমীরগণ তাঁহাকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু ৮৭৪/১৪৬৯ সনে উযুন হাসান বেগ-এর পুত্র উগুরলু মুহাম্মাদ কর্তৃক তিনি নিহত হন। সেই সনে সকল কারা কয়ুনলু রাজ্য আক কয়ুনলুগণের কর্তৃত্বে চলিয়া যায় এবং কারা কয়ুনলু শক্তির বিলুপ্তি ঘটে।

কারা কয়ুনলু রাজ্যের গঠন ছিল জালায়ীরী রাজ্যেরই অনুরূপ। এই বংশের সদস্যগণের এবং কোন কোন উপজাতীয় বেগগণের নাম, যথা য়ার 'আলী, পীর 'আলী, হাসান 'আলী, হুসায়ন 'আলী ও 'আলী শাকির

ইত্যাদি হইতে কারা কয়ুনলু বংশীয় শাসকগণের শী'ঈ প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদুপরি জানা যায় যে, ইসফাহান বার (১২) ইমাম-এর নামে মুদ্রাঙ্কনও করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে জিহান শাহ-এর আমলে অঙ্কিত মুদ্রাতে চারি খলীফার নাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিকের লেখায় এমন কোন প্রমাণ মিলে না যে, শী'আ মতবাদের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আকর্ষণ ছিল। মধ্য আনাতোলিয়া ও ইরানে ভেড়ার আকৃতিযুক্ত যে সকল সমাধি প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণত বীরত্বের খ্যাতি অর্জনকারীদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাহা নির্মিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি সমাধি প্রস্তর অবশ্যই কারা কয়ুনলু বংশীয়গণের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Sumer, Kara-Koyunlular (T.T.K.), ১খ, আঙ্কারা ১৯৬৭ খৃ. ; (২) দা. মা. ই. (উর্দু), লাহোর, ১৬/২ খ., ৮৭ প. ; (৩) মীর খান্দ্, রাওদাতু'স-সাফা, ৬খ, বিশেষত পৃ. ১১৩, ১৬৮, ১৮৮, ১৯৪, ২১০, ২৫১, ২৬০ ; (৪) খান্দমীর, হাবীবু'স-সিয়ার, ৩/৩খ, বিশেষত পৃ. ১০১, ১০৫, ১২০, ১২৪, ১৩৩ ; (৫) মুনাজ্জিম বাশী, ৩খ, ১৪৯ প. ; (৬) CI. Huart, Histoire le Baghdad, ২২-২৫।

F. Sumer (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

কারা কালপাক (দ্র. কারাকালপাক)

কারা কিরগিয (দ্র. কিরগিয)

কারা-কুম (দ্র. কারাকুম)

কারাকোল (قراقول) ঃ কারা কুল (قره قول) পুলিশ ষ্টেশন, থানা [সামরিক], পর্যবেক্ষণকেন্দ্র বুঝাইবার জন্য ইহা একটি আধুনিক তুর্কী পরিভাষা, ইহা একটি জনপ্রিয় শব্দপ্রকরণ (কালো [অর্থাৎ অশুভ] [কর্তৃপক্ষের] সেনাদল অথবা পর্যবেক্ষক দল) ; 'উছমানী তুর্কীদের নিকট কারাগুল (قراغول) কারাউল (قراول) শব্দগুলি মোঙ্গলদের নিকট হইতে ধার করা শব্দ (৮ম/১৪শ শতাব্দী হইতে প্রচলিত; দ্র. Tarama Sozlugu, আঙ্কারা ১৯৬৯ খৃ., ৪খ, ২২৮৩ প.)। উক্ত মোঙ্গল শব্দটি কারাভুল/কারা'উল হিসাবে ফারসী ভাষায়ও রূপান্তরিত হইয়াছিল। শব্দটির সম্প্রসারণের পূর্ণ তথ্য ও বিবরণের জন্য (as far as Swahili), দেখুন Doerfer, ১খ, ২৭৬ প.।

'উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যে ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন অঞ্চলের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত তুর্কী পদাতিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত ছিল (দ্র. Yeniceri) এবং যে বাহিনীগুলি (কোম্পানীসমূহ) শহর পাহারা দিত তাহাদেরকে কুল্লুক (Kulluk) বলা হইত। সামরিক অভিযানের সময় অগ্রবর্তী সৈন্যদল কার খোজা (كار خوجه) ছাড়াও তুর্কী সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠাইত যাহাদিগকে কারাউল মুফরেজেলেরী (Karavul mufrezeleri) বলা হইত। ঠিক একইভাবে তুর্কী নৌবাহিনী যখন সমুদ্রে অভিযান চালাইত, তখন নৌবহরের উপর কোন আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব দিয়া কারাউল সেফীনালেরী (Karavul sifineleri) হিসাবে দুইটি ডাক জাহাজ পাঠাইত। প্রায় দশটি জাহাজ তেরসানী কেতখুদাসী (tersane ketkhudesi = প্রধান নৌ-সেনাপতির দফতরের কর্মচারী)-এর নেতৃত্বে আরদ কারাউল (ard karavul) হিসাবে প্রয়োজনবোধে বিপদের সময় জাহাজগুলিকে সাহায্য করার জন্য পিছনে পিছনে চলিত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পদাতিক বাহিনী (জেনিসারী)-এর দমনের পর ইস্তাম্বুলের সাধারণ নিরাপত্তার দায়িত্ব সার 'আসকার (سر عسكر) (দ্র.)-এর উপর পতিত হইল ঃ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন, দাবতিয়্যে মুশীরিয়্যেতি (the Dabtiyye Mushiriyyeti; পুলিশের কার্যভার গ্রহণের জন্য ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সৃষ্টি করা হইয়াছিল) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটি নেযারেত (মন্ত্রণালয়)-এ রূপান্তরিত করা হইয়াছিল এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একটি দফতর হিসাবে সারা দেশের উপর ক্ষমতা প্রসারিত করিয়া উহাকে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের সহিত যুক্ত করা হয় (দ্র. দাবতিয়্যা)। এই সময় পুলিশ ষ্টেশনকে কারাকোল খানা এবং পরবর্তী কালে কারাকূল বলা হইত। কারাকোল শব্দটি তুর্কী সেনাবাহিনীর এবং নৌবাহিনীর ঐ দলটির জন্যও ব্যবহার করা হইত যাহা নিরাপত্তা বা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শ. শামী, কামূস-ই তুর্কী, ইস্তাম্বুল ১৩১৭ হি., দ্র. শিরো.; (২) কাতিব চেলেবী, তুহফাতু'ল-কিবার ফী আস্ফারি'ল-বিহার, ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি., ১৪৮; (৩) M. D'Ohsson, Tableau general de l'Empire othman, প্যারিস ১৮২৪ খৃ., ৭খ, ৩৮; (৪) I. Hakki Uzuncarsili, Osmanli devleti teskilatindan Kapikulu ocaklari, আঙ্কারা ১৯৪৩ খৃ., ১খ, পরিশিষ্ট; (৫) I. A., দ্র. R. Rahmeti Arat; (৬) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ৩৫ (কারাউল)।

E. Kurna (E.I.2)/ এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

কারা-কোল (قراكول) ঃ (তুর্কী "কৃষ্ণহ্রদ") কারাকুল, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন হ্রদের এবং রাশিয়ার উয্‌বেকের একটি আধুনিক শহরের নাম।

চারজূয় ও বুখারার মধ্যবর্তী সোঘদিয়ার (আধুনিক উয্‌বেকিস্তান) যারাফ্শান নদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হ্রদটি, সর্বাধিক পরিচিত (চারজূয় মধ্য যুগের আমুল-ইশাও, দ্র. আমুল, ২)। যে অববাহিকায় হ্রদটি অবস্থিত উহা সামজান অববাহিকা নামে পরিচিত (দ্র. ইসতাখরী, ৩১৫, এবং ইব্ন হাওকাল, সম্পা. Kramers, পৃ. ৪৮৫, অনু. Kramers and Wiet, পৃ. ৪৬৬)। Schefer সম্পাদিত ও Frye অনূদিত নারশাখারী তা'রীখ-ই বুখারা গ্রন্থে ১৯ পৃষ্ঠায়, এই হ্রদকে কারা-কোলের তুর্কী এবং বৃহৎ অববাহিকা "বারগীন-ফারাখ"-এর ইরানী এই উভয় নাম দেওয়া হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ২০ ফারসাখ ও প্রস্থ এক ফারসাখ বলিয়া কথিত আছে।

ইতিহাসে এই হ্রদটিকে কারা-কোল নামে সনাক্ত করা হইয়াছে, যেমন ৮ম শতকের প্রাচীন তুর্কী ওরখুন শিলালিপিসমূহ এবং কুলতিগিণ এন. ২-এ উল্লেখ আছে যেখানে এই হ্রদটিকে তিউকিউ অথবা কুলতিগিন রাজকুমারের অধীনস্থ প্রাচ্য তুর্কীস্তানের অধিবাসী এবং বিদ্রোহী আয়বাসিদের (সম্ভবত তূরগিশ) মাঝে অনুষ্ঠিত একটি যুদ্ধের পট হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে [cf. V. Thomsen, Altturkische Inschriften aus der Mongolei, in ZDMG, lxxvii (১৯২৪), পৃ. ১৫৪ এবং T. Teken, A grammar of Orkhon Turkic, ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৭০]। এই হ্রদটি ছিল শীতকাল কাটানোর একটি প্রসিদ্ধ জায়গা। কারণ শীতকালে স্থানটিতে ভ্রাম্যমাণ বন্য মোরগের বিরাট সমাগম ঘটিত এবং অনেক শিকারী ও জেলের সমাগম হইত। মোঙ্গল রাজন্যবর্গ চাঘাতে এবং ওগিদি (Caghatay & Ogedey) ৬১৯-২০/১২২২-৩ সনে (জুওয়ায়নী-Boyle, ১খ, ১৪০) সেইখানে শীতকাল যাপন করেন এবং তীমূরী

উলূগ-বেগ সেইখানে মাঝে মাঝে শিকার করিতেন (Barthold, Ulugh-Beg, in Four studies on the history of Central Asia গ্রন্থ, অনু. T. এবং V. Minorsky, ii, পৃ. ১৩৪)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাশিয়ার জারদের (Tsarist) দ্বারা বুখারার খান শাসিত অঞ্চল বিজয়ের পরে চারজূয়-বুখারা সড়ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কারাকুল দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে বর্তমানে একটি আধুনিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কারা-কোল অববাহিকার তৃণাবৃত প্রান্তর এবং চারণভূমিসমূহে কারাকুলের মেষ শাবকদের আদি বাসস্থান হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত। এই মেষ শাবকদল মসৃণ, আঁটসাঁট কোঁকড়ানো, মূল্যবান কালো পশম উৎপাদন করে, বাণিজ্যিকভাবে যাহা পারসিক মেষ শাবক নামে পরিচিত এবং এই পশমাবৃত চামড়া পোশাক তৈরীর কাজেও ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ বয়স্ক মেষ গালিচা তৈরীর জন্য কৃষ্ণ পশম সরবরাহ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার দেশগুলি আফগানিস্তান ও পারস্য বর্তমানে গুরুত্ব সহকারে মেষ প্রজনন ও লালন-পালন করিতেছে এবং ইহার পশম রফতানী করিতেছে।

পারস্য (রাশিয়ার তাদযিক) এবং ইসিক-কোলের নিকটে সিমিরিচাই প্রদেশের মধ্যবর্তী এলাকায় এই কারা-কোল নামের অন্যান্য হ্রদ অবস্থিত (তু. Barthold, in Four studies, ১খ, ৮৮, ৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত বরাত ছাড়াও দ্র. (১) Barthold, Tutkestan down to the Mongol invasion[3], পৃ. ১১৮, ৪৫৫ ; (২) Marquart, Wehrot und Arang, পৃ. ৮১, ৮৫; (৩) Hudud al-'alam, tr. Minorsky, পৃ. ৩০২।

C. E. Bosworth (E.I.[2])/রবিউল ইসলাম

কারা-খানিগণ (দ্র. ইলেক খানগণ)।

কারা খালীল (দ্র. জানদারলী)।

কারা খিতায় (قرا خطاى) ঃ কারা খিতায় (قره ختاى) ৬ষ্ঠ/১২ এবং ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মুসলিম সূত্রে কিতায় (Kitai) জনগণ সম্পর্কে কারা খিতায় নামটি প্রচলিত দেখা যায়। চীনা সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা চীন সাম্রাজ্যের উত্তর প্রান্তে ৪র্থ শতাব্দী হইতে বসবাস করিতেছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের একটি দল দেশ ত্যাগ করিয়া মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিতে চলিয়া আসে এবং সেখানে তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে যাহা প্রায় ৮০ বৎসরকাল স্থায়ী ছিল।

বহির মোঙ্গলিয়ার উরখুন (ارخون) লিপিতে তু'চু (T'uchueh or Turks, ca. 732 A.D.) অথবা তুর্কী রাজকীয় ঐতিহাসিক নথিপত্রে খিতায়গণকে তুর্কী জাতির শত্রু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তুরস্কের প্রাণকেন্দ্র উরখূন ও সেলেঙ্গা নদীর পূর্বদিকে তাহারা বসবাস করিত। নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিতে খিতায়গণ সম্ভবত টুন্‌গুয (تنكز = Tungus) না হইয়া বরং মোঙ্গল বংশোদ্ভূত ছিল। পূর্ববর্তী প্রাচ্য ভাষাবিদগণ অনুমান করেন যে, যদিও তাহারা তাহাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলিত তবুও সম্ভবত তাহারা উপরে উল্লিখিত জাতি দুইটির কোনটির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল না (Wittfogel and Feng রচিত History of Chinese Society : Liao 21-3 পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে আলোচনা এবং Sir Gerard Clauson রচিত Turk, Mongol, Tungus, in Asia Major, N. S. viii, 1970, 120-1, 123 দ্রষ্টব্য)। পূর্ব তুর্কীর কাগানদের অধীন থাকা অবস্থায় যুগুর তুর্কীগণের যথেষ্ট প্রভাবও তাহাদের উপর বিদ্যমান ছিল।

চীনাসূত্রে কিতায়গণকে প্রথমত Chitar (K'itan) এবং ৯৪৭ সনের পরে লিয়াও (Liao) বলা হইত। ৯০৭ সনে তাংগ (T'ang) রাজবংশের পতনের পর গোলযোগের সময় সম্প্রসারণবাদী খিতায়গণ উত্তর চীন সম্পূর্ণভাবে দখল করেন এবং সেখানে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় তাঁহারা যেমন স্তেপভূমির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন, তেমনি বাহ্যত চীনাদের মত চলিতে থাকেন। এই কারণে চীনা ঐতিহাসিক নথিপত্রে তাঁহাদিগকে জন্মগতভাবে স্থানীয় রাজবংশ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অপরপক্ষে দক্ষিণ চীন স্থানীয় সুঙ্গ (Sung) রাজবংশের অধীনেই রহিয়া যায় (৯৬০-১২৭৯)। লিয়াও সাম্রাজ্য পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আলতশায় পর্বতমালা এবং পশ্চিম দিকে উয়গুর (Uyghur) রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর চীনে তাহাদের আদি নাম কিতায় (Kitai) কখনও খিতা (Khita অথবা খাতা (Khata) নামে মুসলমানদের দ্বারা আখ্যায়িত হইত। তখন হইতেই সম্পূর্ণ চীনদেশে প্রাচীন ইংরেজগণ তাহাদিগেকে ক্যাথে (Cathey), রাশিয়ানগণ কিতায় (Kitay), গ্রীকগণ কিতাইয়া (Kitaia) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করিত (দ্র. Sir Henry Yule, Cathay and the way thither, London 1913-16, i. 146)। দক্ষিণ চীনের ব্যাপারে মুসলিমগণ চীন শব্দটি আরবী ভাষায় সীন (দ্র.)-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

উত্তর চীনের লিয়াওগণ ১১১৬ হইতে ১১২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরদিক হইতে আগত 'বারবার' হানাদারদের নূতন আক্রমণে পর্যুদস্ত হন। তাহারা ছিল 'আমূর' উস্‌সূরী অববাহিকা এবং উত্তর মাঞ্চুরিয়ার টুংগু বংশীয় যুরকীন (Gurehen), যাহারা মোঙ্গল আলতুন খান চীনে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কিতায়গণের একটি দল চীনদেশে চাং (Chun) নামক একটি অংশ লইয়া রহিয়া যায় এবং পরবর্তীতে চিংগীয খানের (Cingiz khan) সময়ে সফলভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মোঙ্গল সামন্ত রাজ্য হিসাবে কিতায় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। সেমিরেসির (Semirecyr) সন্নিকটে অবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র কিতায়গণ আক্রমণ করেন (দ্র. Ibn al-Athir, ix, 209-10, in cursion of the Khita'iyya in 408/1017-18)। কিন্তু এই আক্রমণগুলি সম্ভবত মোঙ্গল 'নায়ম্যান' (Nayman) দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। উত্তর চীনে কিতায়গণের বিস্তারের ফলে তাহারা পশ্চিম দিকে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল (দ্র. Barthold, Histoire des Turcs d'-Asia centrale, পৃ. ৯৫)। ইহা আনু. ৫১৯/১১২৫ সালের দেশান্তর। ইহার পরবর্তীতে কারা (কালো) খিতায় (Plano Carpini-র John-এর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দের (Latin ভাষায় Nigri Kitai) চীন শী' (Hsi-Western) লিয়াও দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল যাহারা প্রাচ্য ইসলামী জগতের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আর একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় দল পূর্ব তুর্কীস্তানের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কাশগারিয়ার শাসনকর্তা ঈলেক খানী কিংবা কারা খানীদের একটি শাখার প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিল। তাহারা কাশগার পৌঁছিবার পূর্বেই আরসলান খান আহমাদ ইব্‌ন হাসান তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নেতাকে বন্দী করিয়াছিলেন। ইব্‌নু'ল-আছীর (১১খ, পৃ. ৫৫) এই যুদ্ধকে ৫২২/১১২৮ সালের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সময়টিকে কিছু আগাইয়া আনা হইয়াছে।

কেননা খলীফার উযীরকে লিখিত পূর্ব পারস্যের সালজূক সুলতান সানজারের ৫২৭/১১৩৩ সালের একটি পত্রে এই বিজয়কে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বলিয়া জুওয়ায়নী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং Boyle অনূদিত গ্রন্থের ১খ, ৩৫৪ প. পৃষ্ঠায় খিতায়দের অন্যান্য দলের যুদ্ধ অভিযানগুলির বর্ণনা রহিয়াছে। এখন ধরা যাইতে পারে যে, জেনারেল কারা খিতায়-এর দক্ষিণ বাহিনীর একটি বড় অভিযান কৃতিত্বের সহিত সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল, অথচ বাম-বাহিনীর অভিযান কাশগারিয়া-তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। সকল অভিযানেই এই দ্বিতীয় দলটি উত্তরের রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম দিকে আসিয়াছিল। আপার ইনসি (upper Yenisei)-র কিরগীয ভূমির মধ্য দিয়া বালখাশ হ্রদের পূর্বে ইমিল জাতি (Emil) স্থায়ীভাবে বসবাস গড়িয়া তুলিতেছিল, যাহা সেমিরেসিতে কারাখানী রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার ভিত্তিভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইতোমধ্যে তাহাদের তাঁবুর সংখ্যা চল্লিশ হাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কারাখানী শাসনকর্তা খিতায়দেরকে বশে আনিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করিতেছিল যাহাতে তাঁহারা নিজের অবাধ্য কারলুক ও কাংখীল উপজাতিদিগকে বশে আনয়ন করা যায়। কিন্তু দেখা গেল ইহার পরিবর্তে তিনি নিজেই সিংহাসনচ্যুত হইলেন। চীনাসূত্রে প্রাপ্ত কারা খিতায় নেতা ইয়ে-লু তা-শিহ (Yew-lu Ta-shih, মৃ. ৫৩৭/১১৪৩) এক্ষণে কিছুটা আশান্বিত হইয়া একটি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত চীনদেশে লিয়াওদের বাসভূমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় কু' উপত্যকায় (Cu-valley) অবস্থিত বালাসাগুন শহরকে ঘাঁটি হিসাবে গ্রহণ করেন, যাহাতে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ তুর্কী উপজাতি ও তুর্কীরাজ শাসিত রাজ্যগুলির উপর, স্তেপভূমির কিরঘিয ও কাংখিলদের বিরুদ্ধে এবং খোতান (Khotan) ও কাশগারের কারাখানদের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ চালানো যায়। সেখানে ইব্রাহীম ইব্ন আরসলান খান আহ্মাদ সম্ভবত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। ৫৩৬/১১৩৭ সালে সামারকান্দের মাহমূদ খান ইব্ন আরসালান মুহাম্মাদ ফারগানা রাজ্যের খুজান্দে পরাজিত হন।

কারা খিতায়গণের চারি বৎসর বিরতির মধ্যে সামারকান্দ খানাতের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সমগ্র ট্রান্সঅক্সিয়ানা অভিযানের পথ তাহাদের জন্য খুলিয়া দেয়। যাযাবর কারলূক উপজাতি বিরোধের কারণে তাহাদের ভূস্বামী—মাহমূদ খানের বিরুদ্ধে কারা খিতায়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। মাহমূদকে তাঁহার নিজের ভূস্বামী সান্জারের (sandjar) নিকট আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সালজূক সুলতান তখন খুরাসান হইতে এক বিরাট বাহিনী লইয়া ট্রান্সঅক্সিয়ানা আক্রমণ করেন। সাফার ৫৩৬/সেপ্টেম্বর ১১৪১ সালে মধ্য শীর দরিয়ার দক্ষিণ অংশে উশরুসানা অঞ্চলের কাতওয়ান স্তেপভূমিতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সৈন্যসংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন এবং বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। সানজার ও মাহমূদ খান ট্রান্সঅক্সিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করত খুরাসানে গমন করেন। মামুলীভাবে সংগঠিত মুসলিম সৈন্য এবং কারা খিতায় যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে সংঘর্ষ, চিঙ্গীয জাতি এই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আসিলে যাহা ঘটা সম্ভব, ইহা উহারই পূর্ব পরীক্ষা। কারা খিতায়গণ এক্ষণে সামারকান্দ ও বুখারা জয় করিলে ইয়েলুতাশিহ খাওয়ারিযমের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন এবং খাওয়ারিযম শাহ 'আযীযকে বার্ষিক তিরিশ হাজার দীনার কর প্রদান করিতে বাধ্য করেন। কারা খিতায়দের অধীনস্থ রাজ্যের বিস্তৃতি দাঁড়াইল উত্তরে কিরঘিয রাজ্যের সীমা হইতে দক্ষিণে বাল্খ রাজ্য পর্যন্ত (৫৬০/১১৬৫ সালের দখলকৃত) এবং পশ্চিমে খাওয়ারিযম হইতে উইঘুর রাজ্যের পূর্ব তুর্কীস্তান পর্যন্ত (A Herrmann রচিত An historical atlas of China, Edinburgh 1966, P. 38-40 এবং Wittfogel and Feng, op. cit., 658 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কাতওয়ান স্তেপভূমিতে মুসলিম সৈন্যদলের উপর কারা খিতায়গণের বিজয়ের এই সংবাদ ক্রমশ লিভান্টের (Levant) ধর্মযোদ্ধাদের নিকট, অতঃপর য়ুরোপবাসী খৃষ্টানদের নিকট পৌঁছে। এই বিজয়ের খবর Prester John সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যানকে নূতন উদ্যম প্রদান করে। তিনি (Prester John) প্রতাপশালী খৃষ্টান নৃপতি ছিলেন। সম্ভবত মধ্য এশিয়াতে তাঁহার রাজত্ব ছিল এবং তিনি পশ্চাৎদিক হইতে মুসলিমদিগকে আক্রমণ করিতেছিলেন। (এই উপাখ্যানগুলি এই সময়ের পূর্বে প্রচলিত ছিল (C. F. Beckingham তাঁহার প্রবন্ধে The achievements of Prester John, Inaugural Lecture, University of London, 1966-তে এই ধারণা দিয়াছেন)।

ইসলামী উৎসগুলিতে কারা খিতায় নেতাদিগকে গুরখান (Gurkhan) উপাধিতে ভূষিত করা হইত এবং আনুক্রমিক শাসনকর্তাগণের নিজ নাম চীনা ভাষায় অভিহিত হইত (Djuwayni, tr. i, 354, and Djuzdjani, Tabakat-i Nasiri, ed. Habibi[2], ii, 96, tr. Raverty, ii, 911, পৃষ্ঠায় 'গুরখান' উপাধিতে শ্রেষ্ঠ খান, খান-ই খানান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। Barthold, Histoire des Turcs d'Asaie, centrale, 97, n. I, গ্রন্থ প্রথম অংশটি প্রাচীন তুর্কী শব্দ কূর কিংবা কূল (Kur, Kul) শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন যাহার অর্থ 'মহৎ' 'সাহসী'। ওরখন উৎকীর্ণ লিপির নাম ও উপাধিতে এই জাতীয় "বীর খান" (Heroic Khan)-এর কথা পাওয়া যায়।

Barthold সুনিশ্চিতভাবে উক্তি করিয়াছেন, "কারা খিতায়গণের রাজত্ব যাযাবরদের সাধারণ প্রকারের সাম্রাজ্য হইতে অনেক দিক দিয়া ভিন্ন ধরনের ছিল" (Four Studies or the history of Central Asia, i, 29)। কারা খিতায়গণের নিজেদের কিছু বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও ইউরেশিয়ান স্তেপ মৈত্রী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্তেপ সাম্রাজ্য হইতে নানাভাবে তাঁহাদের রাজত্ব ভিন্ন আদর্শের ছিল। সম্ভত অন্যান্য যাযাবর মৈত্রীর মত তাঁহারা নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়া সমজাতীয় ছিলেন না। প্রথম গূর-খানের বিজয় নিঃসন্দেহে বহু তুর্কী ও তুন্গুকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং এমন কি সম্ভবত তুন্গুরা খিতায়গণের অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া গর্ববোধ করিত। সামরিক দিক দিয়া অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবে তাঁহাদের আভিজাত্য ছিল। তাঁহারা তাহাদের অধীনস্থ রাজ্যে বিরলভাবে ছড়াইয়া থাকিত। কিন্তু বালাসাগুনের বাহিরে সেমিরেখিতে গূর-খান সৈন্য ছাউনী তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। লিয়াও শিহ রাজবংশের চীনা ইতিহাসে (যাহা ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে) উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গূর-খান য়ি লিহ (Yi-lich) ৫৪৬/১১৫১ সালে একটি আদমশুমারী করিয়াছিলেন। এই আদমশুমারীতে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ সহকারে ৮৪,৫০০টি গৃহ গণনা করা হইয়াছে। এই সংখ্যা সম্ভবত বালাসাগুন ও ইহার পশ্চাৎভূমির দেশীয় মুসলমান ও কারা খিতায় উপজাতি এবং এমনি প্রতি গৃহে দইজন করিয়া যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত করত গণনা করা হইয়াছে। কারা খিতায়গণের

সংখ্যা এত অধিক হওয়ার কথা নয় (Wittfogel and Feng, পৃ. 659-60 দ্র.)।

তাঁহাদের কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। তবুও অন্যান্য যাযাবর সাম্রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী আত্মীয় কিংবা উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিগণকে কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইত না। প্রথম গূর-খান সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে একশত জনের বেশী যোদ্ধা রাখায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বালাসাগুন ছাড়া উপরে উল্লিখিত অন্যান্য স্থানে স্থানীয় কারা খানী শাসকদিগকে স্থানচ্যুত করা হইয়াছিল (যদিও শহরের অধিক সংখ্যক অধিবাসী মুসলমান ছিল)। অন্যান্য স্থানে স্থানীয় রাজবংশ গূর-খানদের সামন্ত হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিল। কোন কোন স্থানে স্থানীয় শাসকদের পাশাপাশি গূর-খানদের নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ছিল (Chinese chien-kuo "state supervisor", Turkish baskak, Arabic-Persian shahna)। কারা খিতায়গণের কেবলমাত্র খাওয়ারাযম-এর মত প্রদেশগুলি কর আদায়কারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিত। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুখারা প্রদেশে বুরহান বংশীয় সাদার (Sader) অর্থাৎ ধর্মীয় নেতাগণ শহরের কর নিজেরাই আদায় করিয়া সামরিক ছাউনীতে লইয়া যাইতেন, যেমন তাতারদের স্বর্ণযুগে মাসকভির (Mascovy) যুবরাজ তাঁহার নিজের কর রাজধানী সারায়তে পৌঁছাইয়া দিতেন (O. pritsak, Al-i Burhan, in Isl., xxx, 1952, 81-96)।

কারা খিতায়গণের শাসন পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে ছিল করভিত্তিক। কর আদায় ব্যতীত প্রজা শাসন প্রায় সম্পূর্ণই তাঁহাদের স্থানীয় শাসকদের উপর অর্পিত ছিল। ইবনু'ল-আছীর (১১খ, ৫৬) বলেন, বিজিত অধিবাসীদের প্রতি গৃহের উপর বৎসরে এক দীনার হিসাবে কর আরোপিত ছিল। কিন্তু আমারা জানি যে, আর্থিক কর ছাড়াও অন্য ধরনের কর আদায় করা হইত। Barthold-এর মতে প্রতি পরিবারের উপর আরোপিত দীনার রাজস্ব বিশেষ করিয়া চীনা বৈশিষ্ট্যই বহন করে। ইহা অনুমান করা যায় যে, অনেক কয়েকটি রাজ্যে কেবল এক ধরনের পদ্ধতি চালু ছিল। এক চীনা সূত্রে জানা যায় যে, বালাসাগুন শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অধিবাসীরা তাহাদের শস্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে গূর-খানদিগকে প্রদান করিত। গূর-খানরা লিয়াও (Liao)-ও চীনা পদ্ধতি অনুসরণে নিজেরা তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। উহাতে চীনা রীতি অনুসারে রাজত্বকাল উৎকীর্ণ করা হইত। কিন্তু সামন্ত রাজ্যগুলি তাহাদের নিজস্ব ইসলামী ধরনের মুদ্রা চালু রাখিয়াছিল। এক্ষণে আমরা অবলোকন করিলাম যে, কারা খিতায়গণ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে দীনার পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন (Wittfogel and Feng, 661-2, 664, 672-3)।

Barthold তাঁহার EI[1]—এ কারা খিতায় শিরোনামের প্রবন্ধে নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছেন যে, চীনা ভাষাই সম্ভবত সেখানকার সরকারী ভাষা ছিল। কিন্তু সেই সময় মধ্য এশিয়ার ভাষা ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ছিল জটিল এবং সেখানে বিদ্যমান জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের উপর ইহার প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। কারা খিতায়গণ নিঃসন্দেহে শাসনকার্য ও তাঁহাদের অধীনস্থ রাজ্যের কৃষ্টির উপর চীনা প্রভাব ফেলিয়াছিল। মুসলিম লেখকগণ কিছু চীনা শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন ফু-মা (fu-ma=রাজা-জামাতা)। ইহা গূর-খানের জামাতা অর্থে ব্যবহৃত হইত (Djuwayni-Boyle, i, 290, 292)। পায়যা (Payza) চীনা ভাষায় পায়-যু (Pai-tzu) চাকতি অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তা পদমর্যাদার বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন (ibid, i, 158 ; Awfi, Lubab al-albab, ed. Browne, ii, 385)। গূর-খানগণ চীনা ভাষায় সরকারী উপাধি প্রদান করিতেন এবং পবিত্র রাজবিধানের জন্য চীনা হস্তলিপি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্য ছাউনিতে চীনা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের মুসলমান সামন্ত প্রজাদের সঙ্গে ফারসী ও আরবী ভাষায় পত্র বিনিময়ের জন্য মুসলমান পণ্ডিত ও কর্ম-সচিবদের আহ্বান করিতেন এবং সম্ভবত পূর্ব তুর্কিস্তানের সামন্ত প্রজাদের সঙ্গে তুর্কী উইঘূর ভাষায় পত্র বিনিময়ের জন্য উইঘূর কর্মচারীগিদকে আহ্বান করিতেন।

মুসলিম বিশ্বে মোঙ্গল খানরা যেমন শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল সেইরূপ কারা খিতায়গণ কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু স্তেপভূমিতে অবস্থিত সকল ধর্মবিশ্বাসের উপর তাহারা চিরাচরিত ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি যদিও ট্রান্সঅক্সিয়ানাতে কারা খানী ও সানজারের দ্বারা বাধা প্রদানের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছিল, তবুও তাহারা মুসলমানদিগকে নির্যাতন করেন নাই, যেমন তাহাদের ক্ষণকালে স্থলাভিষিক্ত কুচলুগ-গণ (kuclug) কাশগারিয়াতে করিয়াছিল। সমসাময়িক মুসলিম লেখক, যেমন নিজামী 'আরূদী সামারকানদী প্রথম গূর-খানের অসীম ন্যায়পরায়ণতা, বুখারার সুদূর (sudur)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং কারা খিতায় শাসন ব্যবস্থায় একজন অত্যাচারী প্রতিনিধির অপসারণ ব্যাপারে একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন (Cahar Makala, ed. Browne, 24, revised tr. 24-25)। ঘূরীদের ঐতিহাসিক জূযজানীও তাহাদের সম্পর্কে অসাধারণভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি প্রথম গূর-খানের ন্যায়বিচার ও মুসলমানদের জ্ঞান-গরিমার প্রতি তাঁহার সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রশংসা করিয়াছেন, এমনকি একটি গল্প সংযোজন করিয়াছেন যে, পরবর্তী গুর-খানদের একজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (তাবাকাত্-ই নাসিরী, ২খ, '৯৬, অনু. ৯১১-১২)। কারা খিতায় শাসন আমলে মুসলমানগণ উচ্চ পদমর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। জুওয়ায়নী, অনু. ১খ, ৩৫৭-৮ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধনী বণিক মাহমূদ তায় শেষ গূর-খানের উযীর ছিলেন।

কট্টরপন্থী মুসলিম কারা খানী আমল অপেক্ষা কারা খিতায়গণের সহনশীলতা ও সমদর্শিতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্যভাবে তুর্কিস্তানে অমুসলিমদিগকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। মধ্য এশিয়াতে নেস্তুরিয়ান খৃস্টান ধর্মযাজকদের জন্য তখন ধর্ম প্রচারের উন্মুক্ত সময় ছিল। প্রধান ধর্মযাজক ৩য় ইলিয়াস (১১৭৬-৯০) কাশগারে একটি প্রধান বিশপ এলাকা প্রতিষ্ঠিত করেন যাহার সীমা সেমিরেসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেমিরেসিতে কূ. উপত্যকায় (Cu-valley) অবস্থিত প্রাচীনতম সিরীয় ভাষায় উৎকীর্ণ করা খৃস্টান সমাধি ক্ষেত্রের গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই আরম্ভ হয় (দ্র. Barthold, Zur Geschichte des Christentums, in Mittel-Asien bis zur mongolischen Eroberung, Tubingen-Leipzig 1901. 57 ff; ঐ লেখক, Histoire des Turcs d'Asie centrale, 99-101 ; the earliest inscription Published by Chwolson dates from 1186)। সেই

সময়ে সামারকান্দ শহরে চীনা কারিগর কাজ করিত। পারস্যে তুদেলার বেনজামিন (Bengamin of Tudela) নামক এক য়াহূদী পরিব্রাজকের সাক্ষ্য অনুযায়ী খীবা, 'সামারকান্দ ইত্যাদি শহরে য়াহূদী সম্প্রদায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছিল [দ্র. W. J. Fischel, The Jews of central Asia (Khorasan) in mediaeval Hebrew and Islamic literature, in Historia Judaica, Vii (1945), 29-50]। গ্রুসেট (Grousset) কিছু বিচার-বিবেচনাপূর্বক মত প্রকাশ করিয়াছেন, "কারা খিতায় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনকে কারা-খানীদের দ্বারা ইসলামীকরণ কার্যাবলীর বিরুদ্ধে বলিয়া মনে করা যায়" (L'Empeir des steppes, Paris 1952, 221)।

কারা খিতায়গণের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস হইতে অতি অস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, ৫৫, প্রথম গূর-খানকে মানিকিয়ান (মানীর অনুসারী-Manichaean) বলিয়াছেন। মুসলিম লেখকগণ সাধারণত তাহাদিগকে নিছক পৌত্তলিক বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা অনুমান করিতে পারি যে, চীনে চী-তান (Chi-tan)-দের মূল ধর্ম shamanism-এর উপর বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এই ধর্মই তাহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমতাবস্থায় বলা যায় যে, কারা খিতায়গণের পরিবেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ধারণ ক্ষমতা এবং বিভিন্ন রাজবংশের শিথিল আইন-কানূনের ফলে ঐ সমস্ত ঐতিহ্যের উদ্দীপনাময় বিকাশ মানব সভ্যতার এক বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ দিক গঠন করিয়াছিল যাহার ফলে পরবর্তীতে মোঙ্গলিয়াতে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে অধিকতর সাফল্য আশা করা গিয়াছিল। এইভাবে চীনাদের সঙ্গে কারা খিতায়গণের সম্পর্ক সম্ভবত মোঙ্গলিয়া এবং সুদূর উত্তর চীন পর্যন্ত মুসলিম বণিকগণের ভ্রমণের সুযোগ দান করিয়াছিল। প্রজাসাধারণের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করা হইত না—একথা একেবারেই বলা যায় না এবং এইগুলি সম্ভবত তাহাদের শাসন আমলের শেষের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তবুও ঐ সময়ের গতি-প্রকৃতির টুকরা টুকরা তথ্যের ভিত্তিতে কারা খিতায়গণের সংস্কৃতির উপর Marquart-এর মতামত অনুমোদন করা যায় (Uber das Volkstum der Komanen 209)। এই রাজবংশের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর তুলনায় কঠোরতা নগণ্য ও উপেক্ষণীয়—Barthold-এর এই মতকে সম্মান প্রদর্শন করা যায় (Histoire des Turcs d'Asie centrale, 98-9)।

কারা খিতায় রাজবংশের সংখ্যাক্রম এবং ইসলামী সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন টুকরা টুকরা সংবাদ অনুযায়ী গূর-খানকে লিয়াও শিহ-এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। [অর্থাৎ ইবনু'ল-আছীর (১১খ, ৫৭) প্রথম গূর-খানের মৃত্যুকে রাজাব ৫৩৭/জানুয়ারী ১১৪৩ তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন]। Zambaur তাঁহার Manuel de genealogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam গ্রন্থে কারা খিতায়গণের সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু Marquart (op. cit, 237-8) তাঁহাদের শাসনকর্তাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদান করিয়াছেন। আদি গূর-খান ইয়ে-হ তা-শির মৃত্যুর (১১২৪-৪৩) পর তাঁহার বিধবা পত্নী তা-পু-ইয়েন (Ta-pu-yen) ১১৪৪ হইতে ১১৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। Djuwayni-Boyle, i, 356, তাঁহাকে কুয়ান (Kuyan), সম্মানজনক উপাধি Kan-tien, রাজকীয় উপাধি Hsien-ching বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উত্তরাধিকারী গূর-খান ইয়ে-লিহ (Yi-lieh) যাঁহার রাজকীয় উপাধি ছিল শাও পিং (Shao-hsing) ১১৫১ হইতে ১১৬৩ খৃস্টাব্দ এবং সর্বশেষ গূর-খান, ইয়ে-লিহ (Yi-lieh)-এর কনিষ্ঠতর পুত্র চিহ্-লু-কু (Chih-lu-ku) ১১৭৮ হইতে ১২১১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ১২১৩ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কারা খিতায়গণের রাজত্বের ৫টি শাসনকালের মধ্যে ২টি ছিল রাণী কর্তৃক শাসনকাল। ইহা গুরুত্ব সহকারে সাক্ষ্য দেয় যে, কারা খিতায় সমাজে মাতৃ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। খোদ চীনে লীয়াও বিধবা রাজপত্নী গতানুগতিকভাবে সাম্রাজ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন (Wittfogel and Feng, 620-1, 627 প. ; 672, এই সম্পর্কে ঘটনাপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় আরসলানের (৫৫১/১১৫৬-৫৬৭/১১৭২) শাসনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সময় খাওয়ারাযম শাহগণ কারা খিতায়গণের শৃঙ্খলমুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কর প্রদান বন্ধ করিলেই কারা খিতায়গণ আক্রমণ করিতেন। ফলে তাঁহাদের প্রভুত্ব পুনরায় দৃঢ় হয়। গূর-খান ইয়ে-লুর জামাতা ফুমা-র সাহায্যে শাহ তেকিশ (Shah Tekish) তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হন (৫৬৭/১১৭২-৫৯৬/১২০০)। কিন্তু পরে তিনি কারা খিতায় কর আদায়কারীদের অত্যাচারের অজুহাতে তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং কাফিরগণের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেন। ইবনু'ল-আছীর (১১খ, ২৪৮)-এর ভাষায় "তিনি তাঁহার সিংহাসন ও ঈমানের মর্যাদা রক্ষার্থে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন"। ইহার পরিণতিতে কারা খিতায়গণ তেকিশের ছোট ভাই ও ইতোপূর্বে সিংহাসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান শাহকে সমর্থন করে এবং উত্তর খুরাসানে কয়েকটি শহর দখলের ব্যাপারে সাহায্য করে (৫৭৬/১১৮১)। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষ দশকগুলি ও ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তেকিশ এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'আলা'উ'দ-দীন মুহাম্মাদকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আফগানিস্তানের ঘূরী বংশীয় নৃপতিগণের বিরুদ্ধে কারা খিতায়গণ সহায়তা দান করিয়াছিলেন। এইভাবে ৫৯৪/১১৯৮ সালে ঘূরীদের নিকট হইতে সামন্ত নগর বালখ পুনরুদ্ধারের জন্য আমু দরিয়ার (অক্সাস) অপর পারে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কারা খিতায়গণ পরাজিত হন। ইহাতে তাঁহাদের ও খাওয়ারাযম শাহদের মধ্যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ চলিতে থাকে।

ঘূরীদিগকে এইরূপে চূড়ান্তভাবে দমন করার পর 'আলাউদ-দীন মুহাম্মাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল যে, সম্পূর্ণ ট্রান্সঅক্সিয়ানার উপর খাওয়ারাযম প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন এবং সেখান হইতে ঐ প্রদেশের কারা খিতায় ভূস্বামীদের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে তিনি দ্বন্দ্বে জড়াইয়া পড়েন। পূর্ব তুর্কিস্তানের গূর-খান মুসলিম সামন্তদের মধ্যে একটি আকস্মিক সাধারণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। চিঙ্গীয খান-এর আগমনের পূর্বে এবং তাঁহার পশ্চিম দিকে পলায়নের পরে এই গোলযোগের সুযোগে Nayman Mongol Kuclug সেখানে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সামারকান্দের কারা খানীগণের শেষ শাসনকর্তা 'উছমান খান ইব্ন ইবরাহীম (৬০০/১২০৪-৬০৮/১২১২) কারা খিতায়ের আধিপত্য হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। গূর-খানের এক কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তিনি রাগান্বিত হইয়াছিলেন। কারা খিতায় সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি তাঁহার রাজধানী সাময়িকভাবে দখল করেন (সম্ভবত ৬০৬/১২০৯-১০) এবং পরবর্তীতে সত্যি সত্যিই সেই বিবাহ

সংঘটিত হইয়াছিল। ৬০৭/১২১০ সালে তালাস (Talas)-এর নিকটে কারা খিতায়গণকে পরাজিত করার ইচ্ছায় 'উছমান খান খাওয়ারাযম শাহর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হন। যদিও গুর-খান কুচলুগ (Kuclug)-কে পরাজিত করিয়াছিলেন তথাপি চিঙ্গীয খানের সেনাপতি Kubilay Noyan-এর অধীনে মোঙ্গল সেনাদলের উপস্থিতি তাঁহাকে কুচলুগের সঙ্গে শর্তাধীনে আসিতে এবং আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল (৬০৮/১২১১)। তিনি তখন নামেমাত্র শাসনকর্তা রহিলেন। ইহার ২ বৎসর পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে পশ্চিম হইতে চিঙ্গীযের আগমনের পূর্বে কিছু দিনের জন্য কারা খিতায়গণের রাজ্য কাশগারিয়া ও সেমিরেসির ঘোর মুসলিম বিরোধী কুচলুগ ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার খাওয়ারাযম শাহের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। কারা খিতায় বংশের অবশিষ্ট তাতারগণ মোঙ্গল সৈন্য দ্বারা ধৃত হইল। যাহা হউক, তাঁহাদের শাসন পরোক্ষভাবে ইসলামী জগতের পূর্ব প্রান্তের এক কোণে স্থায়িত্ব লাভ করে। ৬০৮/১২১১ সালে ধ্বংসপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই বুরাক হাজিব নামে এক কারা খিতায় সেনাপতি খাওয়ারাযম শাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং অবশেষে কিরমানে কুতলুগ খানী শাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন (দ্র. Burak Hadjib, Zambaur, Mannuel, 237, and Wittfogel and Feng, 626, 655-7)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রধান মুসলিম সূত্র ইবনু'ল-আছীর, আল-জুওয়ায়নী এবং প্রামাণিক সালজূক সূত্র যেমন রাওয়ানদী, বুনদারী ; (২) কিছু প্রাসঙ্গিক চীনা সূত্র, E. Bretschneider-এর Mediaeval researches from eastern Asiatic sources, London 1910, i, 208-35, গ্রন্থে অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু K. A. Wittfogel and Feng Chia-Sheng-এর History of Chinese society : Liao (907-1125), in Trans. American Philiosophical Society, N. S. xxxvi (Philadelphia 1949), 619-74 পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে চীনা সূত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্যান্য পরবর্তী সূত্রের জন্য (৩) W. Barthold রচিত Turkestan down to the Mongol invasion[3], 323 প.; (৪) ঐ লেখক, Histoire des Tures d'Asie centrale, 94-101; (৫) ঐ লেখক, Four studies on the history of Central Asia, i, A short history of Turkestan, 26-30, History of the Semirechye 100-8; (৬) J. Marquart, Ostturkische, Dialektstudien, 2. Uber das Volkstum der Komanen, in Abh. Gott. Gesell. der Wiss., Phil.-Hist. kl., N. S. xiii/I (1914); (৭) R. Grousset. L'empire des Steppes[4], 219-22; (৮) C. E. Bosworth, in Cambridge History of Iran, v, 147-50, 187 ff. ; (৯) দা.মা.ই., ১৬/২খ., পৃ. ৭৩-৭৮।

C. E. Bosworth (E. I2)/ মোহাম্মদ মোমতাজ হোসেন

কারা গোয (দ্র. কারাগোয)

কারা গূয্লূ (قرا گوزلو) ঃ ইরানের একটি তুর্কী গোত্র। ১০ম/১৬শ অথবা একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীর কোন উৎসে ইহার উল্লেখ নাই। আদিতে কারা গূযলু, সাফাবী যুগের বিখ্যাত শামলু গোত্রের সদস্য ছিল ; গোত্রটি 'কারা গূযলু' এই নামটি তাহাদের 'বে'-শাসকদের একজনের নাম হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। সম্ভবত ইহা শামলু গোত্রের বেদি লি উপগোত্র হইতে উৎপন্ন।

কারা গূয্লূ গোত্রের আবাসস্থল ছিল ইরানের হামাদান প্রদেশে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফারসে এই নামে একটি ক্ষুদ্র শাখা বিদ্যমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কারা গূয্লূ গোত্র যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করিয়া হামাদান প্রান্তরে একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী গ্রামে বাস করিতে শুরু করে। তথাপি যাহারা গোত্রীয় ঐক্য সংরক্ষণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইহারাই ছিল সর্বোত্তম। বর্তমানে তাহারা দুইটি শাখায় বিভক্ত—'আশিক্লূ ও হাজ্জিলূ। যে সকল যুরোপীয় পর্যটন এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাদিগকে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ডুপরে (১৮০৭-৯)-এর মতে তাহাদের সংখ্যা ১২,০০০ (Voyage en Perse, প্যারিস ১৮১৯ খৃ., ২খ, ৪৬০)। Macdonald Kinneir (১৮১০ খৃ.) বলিয়াছেন যে, তাহারা ৭,০০০ লোকের একটি সৈন্যবাহিনী সমবেত করিতে সক্ষম (A Geographical memoir of the Persian Empire, লণ্ডন ১৮১৩ খৃ., ১২৭) ; Lady Sheil (উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে) তাহাদের সংখ্যা দিয়াছিলেন ৪,০০০ (Glimpses of life and manners in Perisa, লণ্ডন ১৮৫৬ খৃ., ৩৯৮)। ১৯৩০ খৃ. কারা গূযলূ গোত্রের লোকসংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০। পর্যটকগণ তাহাদিগকে একটি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় গোত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ম্যাকডোনাল্ড কিন্নেয়ীর (op. cit., ৪৬) তাহাদিগকে ইরানের সর্বোত্তম অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। মুহাম্মাদ হাশিমের মতে (Rustam al-tawarikh, সম্পা. এম. মুশীরী, তেহরান ১৩৪৮ হি., ১০৫) কারা গূযলূ সা'ঈদ বেগ ছিলেন সর্বশেষ সাফাবী শাসক। সুলতান হুসায়নের রাজত্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট সাহসী আমীর কারা গূযলূ একটি দৃঢ় সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় হইলেও তাহারা অন্য শাসক রাজবংশের প্রজা হইয়া থাকিতে পসন্দ করিত। এইজন্যই তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হামাদান প্রান্তরে বসতি স্থাপন করিয়া অন্যান্য গোত্রের তুলনায় সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করিতে থাকে। ইহার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে, শামলু উপজাতির গোত্র হিসাবে তাহাদের ছিল দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা।

নাদির শাহ আফশারের মৃত্যুর পর কারা গূয্লূ গোত্র কারীম খান যান্দ-এর অধীনতা গ্রহণ করে। কিন্তু আকা মুহাম্মাদ খান কাজার ও কারীম খান, এই দুইজনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদে কারা গূযলূ অবিলম্বে কাজারদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং আকা মুহাম্মাদের ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজার বংশের প্রতি গোত্রটির আনুগত্য পরবর্তী বৎসরগুলিতেও বহাল ছিল। ফলে এই গোত্র হইতে অনেক লোক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন মুহাম্মাদ হুসায়ন খান (মৃ. ১২৪০/১৮২৪-৫)। তিনি আকা মুহাম্মাদকে তাঁহার রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একজন ন্যায়বান ও হিতৈষী শাসক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন (J. Morier, A Second Journey Through Persia ..., লণ্ডন ১৮১৮ খৃ., ২খ, ২৬৩)। উপরে বর্ণিত খানের পুত্র রুস্তাম খান এবং হাজ্জী মুহাম্মাদ খান, নাসরুল্লাহ খান, 'আলী খান, মাহমূদ খান, 'আবদুল্লাহ্ খান ছিলেন ফাত্হ 'আলী মুহাম্মাদ শাহ ও নাসিরুদ-দীন শাহের রাজত্বকালে কারা গূয্লূ গোত্রের সুপ্রসিদ্ধ

রাজনীতিবিদ এবং সমরবিদ (মীরযা মুহাম্মাদ তাকী, নাসিখু'ত-তাওয়ারীখ, সম্পা. জাহানগীর কা'ইম মাকামী, তেহরান ১৩৩৭ হি., ২খ, ৮৪ ; ৩খ, ১২৩ ; রিদাকুলী খান, রাওদাতু'স-সাফা-য়ি নাসিরী, তেহরান ১৩৩৯ হি., ৯খ, ৬৩৬, ৬৪৮, ৪৪-৫, ২১১, ২২৬-৭, ২৩৮-৪০, ৪৫৪ ৪৫৯, ৪৬৭, ৫২৯)। ইঁহাদের মধ্যে মাহমূদ খান ও 'আলী খান কাজার বংশের মেয়ে বিবাহ করেন (J. P. Ferrier, Voyage en Perse dans l'Afghanistan ..., প্যারিস ১৮৬০ খৃ., ১খ, ৭০-১)। কারা গৃযলূ গোত্রের প্রধানগণের মধ্যে রাজনীতিবিদগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন নাসরু'ল-মুলূক। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁহার ভাই আমীর তূমান ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কারা গৃযলূ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (১) F. Sumer, Kacarlar devrinde Turk oymaklari, in Selcuklu Arastirmalari Dergisi, ৫খ, আঙ্কারা ১৯৭৪ খৃ.; (২) দা.মা.ই., ১৬/২খ, পৃ. ৯২-৩।

F. Sumer (E.I.²)/মুঃ রবিউল ইসলাম

কারা চেলেবী যাদে (قره چلبی زاده) ঃ দশম/ষোড়শ ও একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে গুরুত্ব অর্জনকারী একটি 'উছমানী 'উলামা' পরিবারের নাম।

(১) মেহমেদ (মুহাম্মদ) মুহয়িদ-দীন ইব্ন হুসামিদ-দীন
|
(২) হুসায়ন হুসামুদ-দীন
|
(৩) মেহমেদ (মুহাম্মাদ) — (৪) 'আবদুল-'আযীয
|
(৫) মাহমূদ — সালিহা — রাবী'আ
|
(৬) 'উছমান (৭) আহমেদ নেদীম

এই পরিবারটির প্রতিষ্ঠাতা (১) মেহমেদ মুহ্য়িদ-দীন এফেনদিকে তাঁহার মাতামহ কারা য়া'কূব-এর নামানুসারে কারা চেলেবি-যাদে লাকাব প্রদান করা হয়। তিনি মুদাররিসরূপে কতিপয় পদে বহাল ছিলেন, ১ম সুলায়মান-এর পুত্র মুসতাফার শিক্ষক ছিলেন এবং এদিরনে ও ইসতাম্বুলের কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কবি হিসাবে তাঁহার ব্যবহৃত ছদ্মনাম ছিল হিজরী এবং কথিত আছে যে, তিনি একটি কবিতা সংগ্রহ বা দীওয়ান-এর প্রণেতা। তিনি ৯৬৫/১৫৫৭ সালে ইনতিকাল করেন।

(২) কারা চেলেবি যাদে হুসায়ন হুসামুদ-দীন এফেনদি ৯৪০/১৫৫৩ সালে কুতায়হা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনাদোলু ও রুমেলি-র কাদী 'আসকার [দ্র.] ছিলেন। ১০০৭/১৫০৮ সালে বুরসা শহরে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র (৩) মেহমেদ এফেনদি (৯৭০-১০৪২/১৫৬২-১৬৩২) কাদী ও মুদাররিসরূপে বেশ কয়েকটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১০২৩/১৬১৪ সালে আনাদোলু ও ১০২৯/১৬১৯ সালে রুমেলির কাদী 'আসকার পদে উন্নীত হন। তিনি যুহূরী ছদ্মনামে কাব্য সাহিত্য চর্চা করিতেন এবং বুরসা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (Basvekalet Arsivi, Kamil Kepeci Defter no. 257, পৃ. ২২)। (৪) কারা চেলেবী যাদে 'আবদু'ল-'আযীয এফেনদি ১০০০ সালের শেষভাগে (সেপ্টেম্বর ১৫৯২) ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেহমেদ এফেনদি (৩)-এর নিকটে লালিত-পালিত হন। তিনি শায়খুল-ইসলাম সুন'উল্লাহ এফেনদির নিকট ধর্মীয় আইনে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইস্তাম্বুল, এদিরনে ও বুরসা শহরের বিভিন্ন মাদরাসায় এবং ইস্তাম্বুলের সুলায়মানিয়্যে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত মাদরাসাসমূহের একটিতে মুদাররিসরূপে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি কাদী নিযুক্ত হন এবং য়েনিশেহির, মক্কা (১০৩৬/১৬২৬), এদিরনে (১০৪০/১৬৩০) এবং শেষে (১০৪৩/১৬৩৩ সালে) ইস্তাম্বুলের কাদী নিযুক্ত হন। শেষোক্ত পদে তিনি কেবলমাত্র সাত মাস বহাল ছিলেন এবং ইহার পর তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। প্রধান উজীর বায়রাম পাশার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অবশ্য তিনি অব্যাহতি লাভ করেন ও সাইপ্রাসে নির্বাসিত হন (১০৪৪/১৬৩৪)। আঠার মাস পরে তিনি ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রথমে আনাদোলু-এর কাদী 'আসকাররূপে নিযুক্ত হন। ১০৫৪ সালের ১৫ রাজব/১৭ সেপ্টেম্বর, ১৬৪৪ তিনি রুমেলি-এর কাদী আসকার নির্বাচিত হন (Basvekalet Arsivi, Kamil Kepeci Defter no. 258, পৃ. ৫৭)। কিন্তু বাস্তবে তিনি এই পদে যোগদান করেন ১৯ রাজাব, ১০৫৮/৯ আগস্ট, ১৬৪৮ সালে (সাদারেত-ই রুমেলি দেফতেরি, নং ৭৯ ; ইস্তাম্বুলের সেরিয়ে সিসিলেরি আরসিভিতে রক্ষিত এই দলীলটি এই সময় কালের ঘটনাবলীর সহিত সম্পর্কিত)। ৪র্থ মেহমেদ-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পশ্চাতে তাঁহার গৃহীত ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে শায়খু'ল-ইসলাম পদবীতে ভূষিত করা হয়। রমযান ১০৫৮/অক্টোবর ১৬৪৮ সালে প্রদত্ত এই পুরস্কার ছিল 'উছমানী রাজত্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই পদে যোগদান করেন ১১ জুমাদা-১, ১০৬১/২ মে, ১৬৫১ সনে। শায়খুল-ইসলাম পদে থাকাকালীন তিনি এই পদের সহিত সম্পর্কিত কতিপয় প্রাচীন প্রথা পুনঃপ্রচলন করেন, কাদী ও মুদাররিস পদসমূহের নিয়ুক্তিতে কিছুটা সূক্ষ্ম কৌশল প্রদর্শন করেন এবং ওয়াক্ফ সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী পুনর্গঠন করেন। ১৫ রমযান, ১০৬১/১ সেপ্টেম্বর, ১৬৫১ তিনি পুনরায় পদচ্যুত হন এবং এক সপ্তাহ পরে সাকীয (সিওস) দ্বীপে নির্বাসিত হন। ১০৬২ সালের জুমাদা-১ মাসে (এপ্রিল ১৬৫২) তাঁহাকে বুরসায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই ১০৬৮ সালের রাবী'-১/(অক্টোবর ১৬৫৭) মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

রাজকীয় আনুকূল্য হইতে 'আবদু'ল-'আযীয এফেনদীর পর্যাবৃত্ত পতন ছিল সেই যুগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাঁহার হস্তক্ষেপের ফল। 'আযীয ছদ্মনামে লিখিত তাঁহার কাব্যসমূহের যেগুলি টিকিয়া আছে তাহাদের মধ্যে আছে একটি দীওয়ান, গুলশান-ই নিয়ায নামক একটি মাছনাবী, যাহাতে ইস্তাম্বুলের কাদী এবং সাইপ্রাসে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁহার জীবন কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ফিক্হশাস্ত্রের উপর রচনাবলী (হাল্লু'ল-ইশতিবাহ 'আন 'আকদি'ল-আশবাহ ; কিতাবু'ল-ইলগায ফি'ল-ফিকহি'ল-হানাফিয়্যা ও কাফী)। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী (৪র্থ মুরাদকে উৎসর্গিত ও কিসাস-এর মাধ্যমে রচিত মির'আতু'স-সাফা' এবং হিল্য়াতুল-আম্বিয়া') এবং অনুবাদ কর্ম ; শেষোক্তটির একটি নীতিশাস্ত্র (মুহসিনী প্রণীত আখলাক) সম্পর্কিত এবং

এবং একটি সীরাত সম্পর্কে (কাযারূনী প্রণীত ফাওয়াইহুন-নাবাবিয়্যা)। তাঁহার খ্যাতির মূলে অবশ্য রহিয়াছে তাঁহার ঐতিহাসিক রচনাবলী। এইগুলির মধ্যে সুলতান ইবরাহীমকে উৎসর্গিত ১ম সুলায়মান-এর যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সুলায়মাননামা এবং ৪র্থ মেহমেদকে উৎসর্গিত রাওদাতু'ল-আবরার মুদ্রিত হইয়াছে (বূলাক ১২৪৮ হি.)। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে হযরত আদাম ('আ)-এর সময় হইতে সুলতান ইবরাহীমের যুগ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; মুদ্রিত সংস্করণটি একটি ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভরশীল (O. Koprulu এবং Parmaksizoglu, Seyhulislam Kara-Celebizade Abdulaziz Efendi, Istanbul Edebiyat Fakultesi, অপ্রকাশিত, ডক্টরেট ডিগ্রীর গবেষণাপত্র, ১৯৪৪-৫ খৃ., নং ৩৫৯, পৃ. ১৮ ; এই গ্রন্থটিতেই কারা চেলেবি যাদে ও তাঁহার পরিবার সম্পর্কে প্রাপ্তব্য পাঠসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ও তথ্যসমৃদ্ধ)। M. H. Yinanc-এর অভিমত অনুসারে (Turkiye tarihi, Selcuklular devri ইস্তাম্বুল ১৯৪৪ খৃ., ১৬) রাওদাতু'ল-আবরার গ্রন্থে অন্ততপক্ষে অংশত আলী ও জান্নাবী-এর পুনরাবৃত্তি থাকা উচিত। রাওদাতু'ল-আবরার-এর যায়ল অংশ প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিকথার আকারে রচিত এবং ইহাতে ১০৬৮/১৬৫৮ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার অপর একটি ঐতিহাসিক রচনাকর্মের নাম তা'রীখ-ই ফাত্হ-ই রেভান ওয়া বাগদাদ অথবা জাফারনামা এবং ইহাতে ১৬৩৫ সালে এরিভানের বিরুদ্ধে এবং ১৬৩৮ সালে বাগদাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ৪র্থ মুরাদের অভিযানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইস্তাম্বুল ও যূরোপের বহু গ্রন্থাগারে তাঁহার রচনাবলীর প্রচুর সংখ্যক পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় (দ্র. Istanbul kutuphaneleri tarih cografya yazmalar katalogu, Topkapi Sarayi Turkce yazmalar katalogu এবং Flugel, Pertsch, Rieu ও Tornberg-এর গ্রন্থ নির্দেশিকাসমূহ)।

যতদূর জানা যায়, 'আবদু'ল-'আযীয এফেনদি ছিলেন খর্বাকৃতি, স্থূলকায়, উচ্চ কণ্ঠ এবং কঠোর ও অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী। বুরসা শহরে তিনি পূর্তকার্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, মুফতু সুয়ু উলুদাগ হইতে পানি বহন করিয়া শহর পর্যন্ত প্রবাহিত করিত এবং তাহা শহরের চল্লিশটি বিভিন্ন গণ-ঝরনায় সরবরাহ করা হইত (O. F. Koprulu, Seyhulislam Kara-Celebizade Abdulaziz Efendi ve Muftu Suyu, in Belleten, ১১খ, ১৯৪৭, ১৩৭-৪৫)।

(৫) মেহমেদ এফেনদির পুত্র মাহমূদ এফেনদি (৯৯৭-১০৬৩/১৫৮৮-১৬৫৩), আবুল-ফাদ্‌ল উপনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কালক্রমে আনাদোলু ও রুমেলীর কাদী 'আসকার পদে উন্নীত হন। ইস্তাম্বুলের শেহযাদে বাশী অঞ্চলে তাঁহার একটি মাদরাসা ছিল (S. Eyice, Kaziasker Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi medresesi, in Tarih dergisi, ১০খ., (১৯৫৯ খৃ., ১৪৭-৬২) এবং বুসরা শহরে সেত-বাশী অঞ্চলে একটি মসজিদ, (Basvekalet Arsivi, Divan-i-Humayun ruus defterleri, no ২৮, পৃ. ৩১) এবং একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (মু'আল্লিম-খানে, ঐ, Defter no. 25, ১৮৩) উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল।

(৬) উপরে উল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র 'উছমান এফেনদি (১০৬২/১৬৫১) কাদীরূপে কতিপয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (৭) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি আহমেদ নেদীম [দ্র. নেদীম] তাঁহার মাতার দিক হইতে কারা-চেলেবি-যাদে পরিবারের সহিত সম্পর্কিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যায়লু'শ-শাকা'ইক, ৪১৯ ; (২) ইসমা'ঈল বেলীগ, গুলদিসতে-ই রিয়াদ-ই 'ইরফান, ৩১৭-২২ ; (৩) রিফ'আত দাওয়াহাত আল-মাশা'ইখ, ৫৮-৬২; (৪) 'ইলমিয়্যে সালনামেসি, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪ হি., ৪৬১-২; (৫) 'উছমানলি মু'এল্লিফলেরি, ৩খ, ১২০-১ ; (৬) E.I.-এর প্রবন্ধ 'আবদু'ল-'আযীয, কারা চেলেবি যাদে; (৭) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ৬৮-৭১।

Nejat Goyunc (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কারাতাকীন (দ্র. কারাতিগিন)

কারা দেনিয (قرادڭز) ঃ তুর্কী ভাষায় কৃষ্ণ সাগরের নাম।

১. নাম ঃ "কৃষ্ণ সাগর" শব্দটির সাক্ষাত পাওয়া যায় ৭ম/১৩শ শতাব্দী হইতে আরবী আল-বাহরু'ল-আস্ওয়াদরূপে (আবুল-ফিদা'র রচনাতে, অনু. Reynaud, ii/I, 38, 316) এবং গ্রীক ভাষায় Michael paleologus ও ভেনিসের মধ্যে ১২৬৫ খৃ. সম্পাদিত সন্ধিপত্রে (Fontes Rerum Austracarum, Section ii, xiv, 63, Vienna 1857) এবং ১৪শ শতাব্দীর শেষে (Schiltberger-এ) পাশ্চাত্য উৎসগুলির মধ্যে। কিন্তু অন্যান্য শব্দরূপও (রুশ সাগর, সিনোপ সাগর ইত্যাদি) অনেক দিন পর্যন্ত সমানভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বহুল ব্যবহৃত হইল "বৃহৎ সাগর" "Mare Maius" in Odoric of Pordenone, সম্পা. G. Strasman, Berlin 1968, 38 ; অনুরূপভাবে, in William of Rubruck, সম্পা. Michael ও Wright, Paris 1839, Recueil de voyageo et memoires, iv, 214 ; "Mare Magnum", in Plans Carpini, সম্পা. d' Avezac, ঐ, পৃ. ৭৪৩)। শব্দটি ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য উৎসগুলিতে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ইহা বিভিন্নরূপে Mare maggiore, mer majour, ইত্যাদি ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং এই সময় হইতে "কৃষ্ণ সাগর" শব্দ-রূপটি শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে গৃহীত হয় এবং অতি শীঘ্রই প্রাচ্য উৎসগুলিতে ইহার ব্যবহার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তুর্কী শব্দটির মূল এইরূপে একটি সমস্যার অবতারণা করে। চৈনিকগণ প্রধান যুক্তি হিসাবে বর্ণগুণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহাদের এই মত তুর্কীগণের নিকট পৌঁছিয়াছে। L. de Saussure (L'origine des noms de Mer Rouge, Mer Blanche et Mer Noire, in Le Globe, xliii, 23 ff.) উহার নিপুণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমর্থন করা যায় না। J. H. Mordtmann (দ্র. কারাদেনিয, in E.I.[1]) পাশ্চাত্য উৎসগুলির "বৃহৎ সাগর"-এর সহিত ইহার সমীকরণ করিয়া সমাধান দেখিতে পান এবং এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তুর্কী ভাষায় কারা গুণবাচক পদটি প্রায়ই "বৃহৎ, শক্তিশালী, ভয়ংকর" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষত নামবাচক ক্ষেত্রে। কারা দেনিয শব্দগুচ্ছের কারা শব্দের প্রাথমিক অর্থ ইহাই হইবে, মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য অনুবাদগুলিতে তাহা দেখান হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থ দুইটি বিকৃত হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সমপ্রকৃতিজ শব্দ কারা দেনিয আক দেনিয, (শ্বেত সাগর, ভূমধ্য সাগর)-এর অস্তিত্ব ইহার অনুকূলে সমর্থন যোগায় না।

তুর্কীগণের আগমনের পূর্বেই সমস্ত নামের উপরে কৃষ্ণসাগর নামটি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীতে কনস্টান্টাইন Porphyrogenetos (De adm. imp., সম্পা. Bonn, 132) "অন্ধকার সাগর" সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে Aurel Decei-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধটিকে গ্রহণ করিতে পারা যায় (Kara Deniz, in IA)। তিনি একটি প্রাচীন ইরানী নামের ahsaena ("অন্ধকারময়, বিষণ্ণময়") হইতে অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। ভুল ব্যুৎপত্তি অনুসরণে গ্রীক শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি ধারণা করা হইয়াছে। তারপর কুসংস্কারবশত এই শব্দের আরও রূপান্তর হয় ; ইহাই সম্ভবত ইহার মূল অর্থসহ পূর্ব-কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে টিকিয়া ছিল। সেইখানে তুর্কীগণ এই ভৌগোলিক ধারণার সহিত পরিচিত হইয়াছিল (আরও দেখুন বাহ্‌র বুন্‌তুস)।

২. তুর্কীগণ কর্তৃক বিজয় ঃ কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলগুলিতে তুর্কী অধিকারের অগ্রগতি তিন শতাব্দী কাল ধরিয়া সম্প্রসারণ লাভ করে। ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষে বিশৃঙ্খলার সময় হইতে বায়যানটীয় সাম্রাজ্য কৃষ্ণ সাগর উপকূলের সমস্ত দুর্গ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং আইকোনিয়াম (কোনিয়া)-এর সালজূক সাম্রাজ্য সমুদ্র হইতে কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষেই তুর্কীগণ সেখানে অধিকার লাভ করে। যখন ৫৮১/১১৮৫ সালে দ্বিতীয় কিলিজ আরসলান তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার রাজ্যগুলি বণ্টন করিয়া দেন, তখন তাঁহাদের একজন রুক্‌নু'দ-দীন, তোকাতকে কেন্দ্র করিয়া কৃষ্ণসাগর উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা লাভ করিয়াছিলেন। Nicetas-এর বর্ণনা অনুসারে তিনি সামসূন অধিকারে আনিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ৫৮৮/১১৯২ সালে কিলিজ আরসলান-এর মৃত্যুর পূর্বেই সামসূনে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়া গ্রীক শহর অ্যামিসোস-এর পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়িয়া সম্প্রসারিত হয় এবং অ্যামিসোস গ্রীক শহর হিসাবে ও পরে জেনোয়ী (Genoese) শহর হিসাবে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। ৬১১/১২১৪ সালে ১ম 'ইয্‌যু'দ-দীন কায়কা'উস কর্তৃক সানূব (সিনোপ) অধিকার আইকোনিয়ামের তুর্কীগণকে কৃষ্ণ সাগর উপকূলবর্তী এই মধ্যাঞ্চলীয় ভূভাগে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির নিশ্চয়তা দান করিয়াছিল এবং ইহাদের দিকে কিযিল ইরমাক ও য়েশিল ইরমাক-এর বিস্তীর্ণ উপত্যকা হইতে প্রাকৃতিক প্রবেশ পথটি তুর্কী অগ্রগতিকে পরিচালিত করিয়াছিল। অপরপক্ষে গ্রীকগণ পার্বত্য ও পূর্ব-কৃষ্ণ সাগরীয় পর্বতশ্রেণীর ও বনাঞ্চলের আড়ালে (এই প্রাকৃতিক বাধা ত্রেবিযোন্দ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল) উপকূলের পূর্বাংশে অধিকার বজায় রাখে এবং এইভাবে উপকূলের পশ্চিমাংশেও, যেখানে হেরাক্লিয়াম্স (এরেগ্‌লি) অঞ্চল নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র তুর্কীগণের নিকট ৭৬১/১৩৬০ সালে বিক্রয় করা হইয়াছিল (Heyd, ২খ, ৩৫৮) ; উপরন্তু সামাসত্রী (আমাস্‌রা) জেনোয়ী উপনিবেশ হিসাবে ৯ম/১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

উত্তর আনাতোলিয়ার উৎপন্ন দ্রব্য, যথা ঃ কোমল পশম, সূক্ষ্ম পশুলোম, চামড়া এবং খনিজ পদার্থ, আঞ্চলিক রফতানী বাণিজ্যের যাতায়াতের ব্যাপারে সিনোপ (সানূব) এবং সামসূনও উহাদের ভূমিকা পালন করিয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে সমুদ্রপথে কৃষ্ণ সাগরীয় বাণিজ্য তখন পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের দিকেই বিশেষভাবে পরিচালিত হইত এবং ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষিণাঞ্চলীয় বাণিজ্য দক্ষিণের তুর্কী বন্দরগুলি এবং উত্তরের গ্রীক শহরগুলির [উদাহরণস্বরূপ সোল্‌দাইয়া (সুদাক), যাহা তখনও পৌত্তলিকতার অনুসারী কিপ্‌চাক তুর্কীগণের অধিকারভুক্ত স্তেপ অঞ্চলের নির্গমন পথ ছিল] মধ্যে পরিচালিত হইত। ৬০২/১২০৫-৬ সাল হইতে আইকোনিয়াম, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী একত্রে দল বাঁধিয়া স্থলপথে সীভাস হইতে ত্রেবিযোন্দ এবং সেখান হইতে কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব ও উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলে যাতায়াত করিত (Heyd, ২খ, ৯৩)। দক্ষিণ উপকূলে তুর্কী ঘাঁটিগুলির আবির্ভাব সিনোপ ও সাম্‌সূনের দিকে এই বাণিজ্য যাতায়াতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করিয়াছিল। সূতী বস্ত্র, রেশম ও গরম মসলার বিনিময়ে উত্তরাঞ্চল হইতে আসিত সূক্ষ্ম লোম ও দাস (১২৫৩ খৃ. সোল্‌দাইয়া-তে রুব্‌রুকের উইলিয়ামের পর্যবেক্ষণগুলি)। মোঙ্গল বিজয় ও বাগদাদের পতন, মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য উত্তরের দিকে সরাইয়া দিয়া, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণ সাগরের অপর পারের অঞ্চলগুলির সহিত সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছিল। প্রথমত ক্রিমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে জেনোয়ীগণ কর্তৃক ১৩৬৫ খৃ. অধিকৃত সোলদাইয়াসহ কাফ্‌ফা (নিঃসন্দেহে ১২৬৬ খৃ. হইতে) এবং কেম্‌বালো (বালাকলাভা)-র মধ্যবর্তী অঞ্চলে জেনোয়ী পণ্যাগারের একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্যালিওলোগাস রাজবংশের সহিত জেনোয়ী আঁতাতের পর উক্ত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। আযোভ সমুদ্রের চতুষ্পার্শ্বে (ডন, কোপা-কোপিল ইত্যাদির মোহনায় তানা-আযোভ) এবং কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব উপকূল অঞ্চলে (মাপা-আনাপা সেবাস্‌টোপোলিস্‌-সুখুম, কাল'এ ইত্যাদি) আরও কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। দাস (তুর্কী ও সার্কাসীয়), মৎস্য ও এক প্রকার লবণাক্ত মৎস্য ডিম্ব, লবণ, খাদ্যশস্য ও সূক্ষ্ম পশুলোম ব্যবসা কনস্টান্টিনোপল ও য়ূরোপের দিকে পরিচালিত হইত, কিন্তু নিশ্চিতভাবে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এশিয়া মাইনরের দিকে, এমনকি সুদূর মিসর পর্যন্তও পরিচালিত হইত। ইহা ছাড়া খৃষ্টান ব্যবসায়িগণ ত্রেবিযোন্দ হইয়া পারস্যের সুলতানিয়্যা পর্যন্ত গমন করিয়াছিল। এই কৃষ্ণ সাগরীয় অপর পারের বাণিজ্যে মুসলিম ব্যবসায়িগণের অংশগ্রহণও গণ্য ছিল না, তবে তাহার মূল্যমান সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। একটি গ্রীক জাহাজে ১৩৩৩ খৃ. ইব্‌ন বাত্তূতা কেরচ হইতে সিনোপ গিয়াছিলেন (অনু. Defremery, ২খ, ৩৪৫ ; অনু. Gibb, ২খ, ৪৬৮)।

'উছমানীগণ কর্তৃক প্রণালীগুলিসহ কনস্টান্টিনোপল অধিকৃত হইলে এই সম্পর্কের বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। তাতারগণের খান—তখন সামসূন ও অন্যান্য বন্দরে যেসব পণ্যদ্রব্য ও দাস পাঠানো হইত—তাহা জেনোয়ী অঞ্চল বহির্ভূত উপকূলবর্তী কেন্দ্রগুলির [যথা ভোস্‌পোরো (কের্‌চ) ও কালামিটা (ইন্‌কেরমানের নিকট)] দিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন (Heyd, ২খ, ৩৮৭)। তথাপি কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে 'উছমানী সম্প্রসারণ নীতি শীঘ্র আরম্ভ হয় নাই। জেনোয়ার স্বত্বের উত্তরাধিকারী সেন্ট জর্জ-এর ব্যাংক কিছু দিন সম্পর্ক বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ৮৫৯/১৪৫৫ সালে ইহার জাহাজগুলি বসফোরাস পার হওয়ার এবং কাফফা ও সামাসত্রি যাওয়ার অধিকার অর্জন করিয়াছিল। ২য় মুহাম্মাদ এই শহরটিকে ৮৬৩/১৪৫৯ সালে অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাফ্‌ফার দিকে পরিচালিত বাণিজ্য, যাহা তখন সুলতানের করদ রাজ্য, পরবর্তী বৎসরগুলিতেও চলিতে থাকে। কাফ্‌ফার খাদ্যশস্য তখনও জেনোয়াতে যাইত। কেবলমাত্র ৮৮০/১৪৭৫ সালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর ইচ্ছায় ক্রিমিয়ার খান ও তাতারগণের মধ্যে গভর্নরের মনোনয়ন লইয়া কিছু মতানৈক্যের সৃষ্টি

হয়। এই গভর্নরের তাতারদের উপর শাসন কর্তৃত্ব ছিল সেই অজুহাতে ২য় মুহাম্মাদ শহরটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন এবং ত্বরিৎ গতিতে অন্যান্য জেনোয়ী শহরও দখল করিয়া লন।

৩. উছমানী সাগর ঃ যখন হইতে রূমীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ক্রিমীয় তাতার নোগায় এবং পশ্চিম ককেসীয়গণ কর্তৃক শাসিত রাজ্যগুলি সামন্তরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল সেই সময় হইতে কৃষ্ণ সাগর একটি 'উছমানী হ্রদ হিসাবে গণ্য হইতে থাকে এবং প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া মহান তুর্কী প্রশাসক বিদেশী জাহাজগুলিকে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত গিয়ারডিন ১৬৮৬ খৃ. ফরাসী জাহাজগুলিকে ব্যবসা উপলক্ষে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ, করিবার অনুমতির জন্য অনুরোধ জানাইলে উত্তর পাইয়াছিলেন "মহান অধিপতি শীঘ্রই তাঁহার হারেমের প্রবেশদ্বারগুলি বিদেশিগণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবেন" (P. Masson, Histoire du commerce francais dans le Levant au xviii[e] siecle, Paris 1911, 638)। একই ধরনের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ১৬৯৯ খৃ. রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত Ukraintzev-কে (B. Nicolsky, Le peuple russe : carriere historique 862-1945, Neuchatel 1945, 189)। দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চল ও কাস্পিয়ান সাগরের দিকে 'উছমানী দৃষ্টি ছিল। সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণ সাগরকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শেষ পর্যায়ে ডন-ভোল্গা খাল স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া ১৫৬৯ খৃ. আস্ত্রাখান অভিযান পরিচালিত হয়। যাহা হউক, এই একচেটিয়া প্রাধান্য ১৭শ শতাব্দীর কশাক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই এবং কশাকদের নৌকাগুলি সময়ে সময়ে আনাতোলিয়ার উপকূল অঞ্চল, উদাহরণস্বরূপ গিরেসুন-এ লুণ্ঠন করিতে আসিত (আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত নামেসি, সম্পা. যুহ্‌রি দানিশ্‌মান, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ., ৩খ, ৮১)।

'উছমানী রাজত্বকালে কৃষ্ণ সাগরীয় বাণিজ্য প্রথমত অপরিহার্যরূপে ইস্তাম্বুল সংলগ্ন ব্যাপকাকারে গড়িয়া উঠা শহরগুলির চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। কৃষ্ণ সাগর ব্যবসায়ী [আওলিয়া চেলেবির মতে [(ঐ, ২খ, ২৪৬) ২,০০০ দোকানে ৮০০০ জন] সংঘ শহরটির কার্যকলাপের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করিত, যেমনটি করিত কৃষ্ণ সাগরের নাবিকগণও [আরও একটি বর্ণনা অনুসারে (ঐ, ২খ, ২৪০) সংখ্যায় ৯,০০০ অথবা ২০০০]। উত্তর স্তেপ অঞ্চলের খাদ্যশস্য (গম, ওট, যব), মাছ, চর্বি (Eremya Celebi Komurucuyan, Istanbul tarihi : xvii asirda Istanbul, তুর্কী অনু. Hrand D. Andreasyan, Istanbul 1952, 15), আনাতোলিয়ার উপকূলের কাঠ, ককেসাসের দাস ও সূক্ষ্ম পশু-লোম ১৭শ শতাব্দীতে ব্যবসায়ের প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল। 'উছমানী প্রশাসন এই অভ্যন্তরীণ কৃষ্ণ সাগরীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে সচেষ্ট ছিল এবং বাণিজ্য রাস্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য বহরকে ইস্তাম্বুল হইয়া যাইতে বাধ্য করা হইত। এইরূপে ১০৯৫/১৬৮৪ সালে আংকারা হইতে পোল্যাণ্ডে প্রেরিত বাণিজ্য পণ্যদ্রব্যগুলিকে রাজধানী হইয়া লইয়া যাইবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছিল (R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitie du xvii[e] siecle, Paris 1962, 482), ত্রেবিযোন্দ উপকূলের 'কুলের মণ্ড' এবং একইভাবে আনাতোলিয়া উপকূলের কাষ্ঠ এবং আমাসিয়াতে প্রস্তুত কাষ্ঠদ্রব্যাদিও (কারুকাজ করা পাত্র, রেকাব)। প্রতিদানে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ক্রিমিয়ার খাদ্যশস্য প্রায়ই ত্রেবিযোন্দ ও রিযে পাঠান হইত। ত্রিপলির মদ আনাতোলিয়া উপকূল দিয়া এবং আক কির্‌মান ও মিসেভরিয়ার মদ বুলগেরিয়া ও বেসারাবিয়া উপকূল দিয়া ক্রিমিয়ায় পাঠান হইত এবং আরও পাঠান হইত আবখাজীগণের অথবা দক্ষিণ রাশিয়ার কশাকগণের নিকট যাহারা তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ পাইত ওক্‌জাকভ্‌-এতে। এই বাণিজ্যধারার সহিত দেশান্তর গতিধারা যুক্ত হইয়াছিল। আনাতোলিয়ার পূর্ব-কৃষ্ণ সাগরীয় পর্বতশ্রেণীর পার্বত্য অধিবাসিগণ ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যায় কনস্টান্টিনোপল ও কৃষ্ণ সাগরের সমগ্র ভূভাগের দিকে হিজরত করিয়াছিল। মোলদাভিয়াতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ লাজ ব্যবসায়ী উপনিবেশ ছিল (Peyssonel, ২খ, ২০৩-৪)।

৪. য়ুরোপীয়গণের অনুপ্রবেশ ঃ ১১০৭/১৬৯৬ সাল হইতে রুশগণ আজোভ অধিকার করিয়া আজোভ সাগরে রুশ নৌবহর প্রতিষ্ঠা করিলে 'উছমানী কৃষ্ণ সাগর ব্যবস্থা-পদ্ধতিতে ভাঙ্গন ধরে। ১১১১/১৬৯৯ সালে জারের রাজদূতের সহিত কিছু সংখ্যক রুশ জাহাজ ইস্তাম্বুলে গমন করিয়াছিল। ১৭১৩ খৃ. (Pruth-এর সন্ধি অনুসারে তুরস্ককে আজোভ ফেরত দেওয়া হইলেও ১৭৩৯ খৃ. বেলগ্রেডে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে আজো সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলের কিয়দংশসহ আজোভকে রাশিয়ার নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধির ৯ম অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, কৃষ্ণ সাগরে রুশীয় বাণিজ্য কেবলমাত্র তুর্কী জাহাজের মারফতে সম্পাদিত হইবে। অনুরূপভাবে পাসারোবিট্য সন্ধি দ্বারা দানিউব নদীতে অস্ট্রীয় জাহাজগুলির চলাচল নদীর মোহনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ১১৬৩/১৭৫০ সাল হইতে কাফফা-তে প্রথম ফরাসী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং এখানে ১৭৪৬ খৃ. হইতে ফরাসী দোভাষীরা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা 'উছমানী পতাকাবাহী জাহাজের মাধ্যমে করা হইত (P. Masson, পৃ. গ্র., ৬৪১-৩)। কুচুক কায়্‌নারকা-র সন্ধিই (১১৮৭/১৭৭৪) রুশ বাণিজ্য জাহাজগুলির জন্য কৃষ্ণ সাগর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, অপরদিকে কার্চ, য়েনিকাল-এ এবং ডিনিপের নদীর মোহনা দখল জার সাম্রাজ্যের সমুদ্র উপকূলের সীমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছিল। ১১৯৩/১৭৭৯ সালে অনুষ্ঠিত আয়নালি কাভাক সম্মেলন ঐ জাহাজগুলির জন্য বস্‌ফোরাস ও দারদানে-লেস-এর মধ্য দিয়া অবাধ চলাচলের সম্মতি প্রদান করিয়া ইহার সমাপ্তি ঘটাইয়াছিল। ১৭৭৮ খৃ. খেরসোন-এর ভিত্তি স্থাপন, ১৭৮৩ খৃ. ক্রিমিয়া দখল ও জর্জিয়া অধিকার, ১৭৮৮ খৃ. ওক্‌যাকভ অধিকার, ১৭৮৯ খৃ. হোজা উপসাগর (এখানে ১৭৯৫ খৃ. নূতন ওডেসা শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল) দখলের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অধ্যায় চিহ্নিত হইয়াছিল। রুশগণকে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দ্রুত গতিতে অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিকেও প্রদান করা হয়। ১৭৮৪ খৃ. অস্ট্রীয় জাহাজ, ১৭৯৯ খৃ. ইংরেজ জাহাজ, ও ১৮০২ খৃ. ফরাসী জাহাজ অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা লাভ করে।

য়ুরোপীয় অনুপ্রবেশ বাণিজ্য ধারায় বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৭৮১ খৃ. প্রথম রুশীয় জাহাজ খেরসোন হইতে মার্সাইলে গমন করিয়াছিল। ১৭৮৪ খৃ. খেরসোন-এ একটি ফরাসী কারখানা স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েক শত জাহাজ ইতোমধ্যেই দক্ষিণ

রাশিয়ার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে (বার্ষিক ৯০০ জাহাজ চলাচল করিয়াছিল, ইহার মধ্যে ৫৫২টি ওডেসা ও ২১০টি টাগানরোগ-এ গমন করিয়াছিল ; ৪২১ টি অস্ট্রীয় জাহাজ ও ৩২৯টি রুশীয় জাহাজ, Anthoine, পৃ. ২৬২ অনুসারে)। 'উছমানী বাণিজ্য ককেসাসের পশ্চিম উপকূলে (এই অঞ্চলের সহিত দাস ব্যবসা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চালু ছিল) এবং আনাতোলিয়ার উত্তর উপকূলের দিকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে। সিনোপ 'উছমানী নৌবহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং জাহাজ নির্মাণ কারখানার বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে রহিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ সাগরের অপর পারের রুশীয় বাণিজ্য আনাতোলিয়া উপকূলে সীমাবদ্ধতার মধ্যে টিকিয়া থাকে (আলেপ্পো হইতে বস্ত্রাদি এবং ত্রেবিযোন্দ হইতে সুপারী পাঠান হইত ঃ V. Fontanier, Voyages en Orient... de 1830 a 1833, deuxieme voyage en Anatolie, Paris 1834, 225)। একটি নূতন ঘটনা হিসাবে পারস্য হইতে ত্রেবিযোন্দ ও এরযুরুম-এর মধ্য দিয়া চালনাকৃত মালামালের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত যতদিন না পারস্য হইতে স্থলপথে রাশিয়ায় মালপত্রাদি বহনের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়, ততদিন এই পথে বাণিজ্য ঘটিতে থাকে এবং অতি সাম্প্রতিক কালে পারস্যের বাণিজ্যের গতি পারস্য উপসাগরের দিকে মোড় না লওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল কৃষ্ণ সাগর হইতে পারস্য পর্যন্ত ব্যাপক পণ্য চলাচলের স্বাভাবিক রাস্তা (C. Issawi, The Tabriz-Trabzon Trade 1830-1900 : Rise and Decline of a Route, in International Journal of Middle East Studies, i, 1970, 18-28)। এই সময় হইতে কৃষ্ণ সাগরীয় তুর্কী বাণিজ্য অপরিহার্যরূপে উপকূলীয় বাণিজ্যে পর্যবসিত হইয়াছিল। প্রধানত ইহা যাত্রী, কাঠ, যোঙ্গুল-দাক অববাহিকা হইতে ইস্তাম্বুলে কয়লা পাঠান ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, আর ইহার সহিত কিছু সুপারী ও তামাক যূরোপে সরাসরি রফতানী করা হইত।

৫. আধুনিক যুগে রাজনৈতিক ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত ইতিহাস ঃ যদিও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি হইতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতার ব্যাপারে কখনও প্রশ্ন উঠানো হয় নাই, কিন্তু কৃষ্ণ সাগরে নৌবহর সম্পর্কিত মর্যাদার ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। Hunkiar Skelesi-র সন্ধি (১২৪৯/১৮৩৩) অনুযায়ী তুর্কী প্রশাসক রাশিয়ার অনুরোধে প্রণালীগুলি বন্ধ রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত শক্তির (রাশিয়ার) উপর সমুদ্রে আধিপত্যের অধিকার বর্তাইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজের জন্য প্রণালীগুলি বন্ধ রাখার ব্যাপারে লণ্ডন সম্মেলন (১৮৪০ খৃ.) রাশিয়ার এই বিশেষ সুবিধামূলক অবস্থার অবসান ঘটাইলেও কৃষ্ণ সাগরে তাহার আধিপত্যের নিশ্চয়তা প্রদান কারয়াছিল। কিন্তু ১২৬৯/১৮৫৩ সালে সিনোপ-এ রাশিয়া কর্তৃক তুর্কী নৌশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফরাসী-ইংরেজ-তুর্কী মৈত্রীশক্তির জয়লাভ হইলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধি কৃষ্ণ সাগরকে নিরপেক্ষ রাখিবার শর্ত আরোপ করিয়াছিল (চিহ্নিত পানি সীমায় প্রতিটি শক্তির সর্বোচ্চ ৫০ মি. দৈর্ঘ্যের ছয়টি বাষ্পীয় পোত এবং চারটি করিয়া হালকা জাহাজ ও দানিউবের মোহনায় প্রতিটি শক্তির আরও দুইটি করিয়া জাহাজ ছাড়া)। ১৮৭১ সালের ফরাসী-জার্মান যুদ্ধ রাশিয়াকে লণ্ডন সম্মেলনের মাধ্যমে এই নিরপেক্ষকরণকে বাতিল ঘোষণা করিবার এবং তাহার ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু প্রণালীগুলিতে যুদ্ধ জাহাজ প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিয়া যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লুসান (Lausanne) সম্মেলন যে কোন জাতির যুদ্ধ জাহাজের অবাধ চলাচলের অনুমতি প্রদান করিয়া (এই শর্তে যে, কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নৌবহর অপেক্ষা ঐগুলি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিবে না) এবং প্রণালীগুলির অসামরিকীকরণ ঘটাইয়া কৃষ্ণ সাগরকে প্রকৃতপক্ষে অবাধ সমুদ্রে পরিণত করিয়া দিয়াছিল এবং যে কোন বহিঃশক্তির জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এই ব্যবস্থা মাত্র অল্পকালের জন্য স্থায়ী ছিল। Montreux সম্মেলনের (১৯৩৬ খৃ.) মাধ্যমে তুরস্ককে আরও একবার প্রণালীগুলিকে সুরক্ষিত করিবার অধিকার প্রদান করিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরের সীমান্তে অবস্থিত শক্তিগুলির নৌবহরের চলাচলের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া (কেবল হাল্কা জাহাজগুলি ব্যতীত) এবং তুরস্ককে যুদ্ধকালীন প্রণালীগুলিকে বন্ধ রাখিবার অধিকার (যদি সে নিরপেক্ষ থাকে) প্রদান করিয়া কৃষ্ণ সাগরকে আবারও অর্ধ-বন্ধ সাগরে পরিণত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও সাধারণ ঃ (১) A. Decei, art. Kara Deniz in IA.— নাম ঃ J. H. Mordtmann art. Kara Deniz E. I.[1]; প্রাক-'উছমানী যুগ ঃ (২) W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age, পুনঃমুদ্রণ, Leipzig 1923; (৩) G. I. Bratianu, Recherches sur le commerce genois dans la Mer Noire au xiii[e] siecle, Paris 1929, 'উছমানী যুগ ও যুরোপীয় অনুপ্রবেশের প্রারম্ভ আস্ত্রাখান-এর অভিযানের উপর (৪) A. Nimet Kurat, Turkiye ve Idil Boyu, Ankara 1966; বাণিজ্যের উপর (৫) de Peyssonel, Traite sur le commerce de la Mer Noire, Paris 1820; উপকূলবর্তী এলাকার উপর ঃ (৬) P. Minas Bijiskyan, Karadeniz kiyilari tarih ve cografyasi 1819-19. তুর্কী অনু. Hrand D. Andreasyan, Istanbul 1969; (৭) E. Taitbout de Marigny, Hy-drographie de la Mer Noire et de la Mer d' Azow, Trieste 1856; (৮) F. Brunn, Cernoe More, Odessa 1879-80, রাজনৈতিক ও নৌ-বিষয়ক ইতিহাস; (৯) A. Slade, Records of travels in Turkey, Greece etc. and of a cruise in the Black Sea with the Capitan Pasha in the years 1829, 1830 and 1831, London 1833; (১০) K. Rheindorf. Die Schwarzmeer (Pontus) Frage 1856-1871, Berlin 1925; (১১) P. H. Mischef, La Mer Noire et les detroits de Constantinople, Paris 1899.

X. de Planhol (E. I.[2])/আ. র. মামুন

কারা পাপাখ (দ্র. কারাপাপাখ)

কারা বাগ (قـره باغ)ঃতুর্কী ও ফার্সী ভাষায় শাব্দিক অর্থ "কৃষ্ণ উদ্যান" (সিয়াহ বাগ = سیاه باغ)। কথিত আছে যে, এই এলাকার উচ্চ উপত্যকার উর্বর শ্যামল ভূমির জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে কিন্তু খুব সম্ভব ইহা একটি লোকগাথা। মধ্যযুগের ইসলামী আররান-এর দক্ষিণাংশে

ট্রান্সককেসিয়ায় আরাক্সেস নদীর মধ্যে স্রোতপথের উত্তরে পর্বতময় ভূখণ্ডের বর্তমান নাম। কারা বাগের পর্বতমালা ১২,০০০ ফিটের বেশী উচ্চ এবং ইহার বর্তমান অধিবাসীরা কিছুসংখ্যক শী'আ আশারী তুর্কী ছাড়া অধিকাংশে আর্মেনীয়) এই গভীর উপত্যকায় বাস করে।

সুলতান আল্প আরসলান-এর নেতৃত্বে সালজূকদের ট্রান্সককেসাস অভিযানের সময় আরর্টযখ-এর সাবেক আর্মেনীয় রাজবংশিগণ অধিকারচ্যুত হন এবং তখন ক্রমান্বয়ে তুর্কীরা সেখানে বসবাস শুরু করে। মোঙ্গল যুগে এই অঞ্চলের নাম কারা বাগ-ই আররান হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে ইহা পারস্যরাজ ঈলখানদের অধীনে চলিয়া যায়। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কারা বাগ সাফাবী আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়ে এবং ৮৯৩/১৪৮৮ সালের মধ্যে জুনায়দ (দ্র.)-এর পুত্র শায়খ হায়দার এই অঞ্চলের অধিকাংশ দখল করিয়া লন। তুরস্ক-সাফাবী যুদ্ধে কারা বাগ ও গানজা অঞ্চল সুলতান ৩য় মুরাদ দখল করিয়া লন (৯৯৬/১৫৮৮) এবং ১ম শাহ 'আব্বাস কর্তৃক পুনর্দখল পর্যন্ত ইহা তাঁহার অধীনে থাকে। কারা বাগ এই সময়ে বংশানুক্রমে তুরস্কের জেওয়ানশীর বংশের অধীনে ছিল। তাঁহারা আদিম ওগুয আফশারী বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন। ১১৬৫/১৭৫২ সালে পানাহ 'আলী খান শূশা দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহার নাম রাখেন পানাহাবাদ। তাঁহার পুত্র ইবরাহীম খালীল খান কাজার নেতা আগা খান মুহাম্মাদ-এর নেতৃত্ব অস্বীকার করেন। আগা খান মুহাম্মাদ অবশেষে ১২১১/১৭৯৭ সালে শূশা দুর্গ জয় করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সেইখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

কারা বাগ বর্তমান কাজার— পারস্য এবং ক্রমাবর্ধমান রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে একটি স্বল্প পরিসর এলাকা। ইবরাহীম খালীল রুশো-জর্জিয়ার সেনাপতি রাজবংশীয় যিযিশউইলির নিকট ১৮০৫ খৃ. আত্মসমর্পণ করেন। জেওয়ানশীর বংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা মাহদী কুলী খান ১৮২২ সালে তাঁহার রাজ্য রাশিয়ার নিকট সমর্পণ করেন। কিন্তু ইতোপূর্বে ১৮১৩ সালে গুলিস্তান সন্ধির সময় কাজারগণ জর্জিয়া, দাগিস্তান, কারা বাগ ও তালিশ-এর উত্তরাংশের সকল অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জারের রাজত্বের শেষ সময়ে কারা বাগ ১৮৬৮ খৃ. পর্যন্ত বাকূর মুসলিম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং পরে নবগঠিত এলিযাবেটপোল বা গানজার শাসনাধীন ছিল। স্বল্পকাল স্থায়ী আযারবায়জান মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সময়ে কারা বাগ বিদেশী কবলমুক্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ইহা তখন আযার বায়জান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অধীন নাগোরনো-কারাবাখ নামে স্বশাসিত (Oblast)। ১৯৭০ সালে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০। ইহার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্টেপানাকার্টে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মধ্যযুগের মুসলিম ভূগোলবিদদের মধ্যে একমাত্র হামদুল্লাহ্ মুসতাওফী লিখিত নুযহাতু'ল-কুলূব, ১৮১-২, অনু. ১৭৩-৪, ব্যতীত অন্যদের নিকট কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না; (২) মীর্যা জামাল রচিত স্থানীয় ইতিহাস, the Karabagh nama— যাহা তুরস্কের ইতিহাসবিদ ফেরীদূন বেগ কর্তৃক ব্যবহৃত; (৩) IA art. Karabag-এ এই সম্পর্কে পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে; (৪) A. A. Al-izade. Sotsialno-ekonomiceskaya i politiceskaya istoriya Azerbaidzahana XIII-XIV vv., Baku 1956; (৫) K. M. Rohrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Juhrhundert Berlin 1966 and BSE^{2}, xx, 92; (৬) দা. মা. ই., ১৬/২খ, ৬৫-৬।

C. E. Bosworth (E.I.^{2})/ মকবুল আহমদ

কারা বোগদান (দ্র. বোগদান)

কারা মাহমূদ পাশা (قرا محمود پاشا), ইশকোদ্রালী, বুশাতলী (আনু. ১১৫৫-১২১১/১৭৪১-৯৬), উমর আলবানীয় বুশাতলী (তুর্কী ঃ বুজাতলী)-এর শক্তিশালী আ'য়ান পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যে পরিবার ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃহৎ মুকাতা'আ-সমূহের অধিকারীরূপে স্থানীয়ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। ১১৬৩/১৭৫০ এবং ১২৪৭/১৮৩১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই পরিবারটি উত্তরাধিকারভিত্তিক প্রায় স্বাধীন রাজ্যরূপে ইশকোদ্রা (ইসকেনদেরিয়া, স্কুটারী, স্কাদার, বর্তমানে স্কোদার) এবং সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বুশাতলীগণের বংশগত উৎপত্তি অদ্যাবধি বিতর্কিত রহিয়া গিয়াছে। প্রচলিত বিভিন্ন ঐতিহ্যমূলক দাবীর মধ্যে vladika জুরাগী (Gjuragj)-এর বিদ্রোহী ভ্রাতা স্ট্যানিশা, যিনি Ljeshkopolej-এর যুদ্ধের (৮৬৫/১৪৬১) ফলে বুশাত গ্রামে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহার হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে—এই দাবী গ্রহণযোগ্য। একইভাবে তাহা ভেনেসীয় উৎস সম্পর্কিত অপর একটি দাবীর (অসমর্থিত) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্যদিকে স্বয়ং কারা মাহমূদ তাঁহার কর্মজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে (১২০১/১৭৮৭) নিজকে ইস্কান্দার বেগ-এর উত্তরসুরিরূপে দাবী করেন। বাস্তব সত্য যাহাই হউক, ৯ম/১৫শ শতকের শেষ পর্যায় হইতে ১১শ/১৭শ শতকের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বুশাতলীগণকে ইশকোদরা-এর সানজাকবেয়িসরূপে ক্ষমতাসীন দেখা গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আনু. ১০১৫/১৬০৪ সালে জনৈক তাহির যে বুশতালীকে ক্লিমেনতি-র বিরুদ্ধে পাশা-র একজন সহযোগীরূপে কর্মরত দেখা গিয়াছে। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোলযোগপূর্ণ একটি সময়কালের পর ইশকোদরায় ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা এবং আ'য়ানরূপে তাহাদের সৌভাগ্যের আনয়নকারী গাযী মেহমেদ পাশা, আনু. ১১৬৩/১৭৫০ সাল হইতে তাঁহার শাসন ক্ষমতার বিরোধী সকল শক্তিকে নির্মূল করিতে সক্ষম হন। তাঁহার ইনতিকালের পর (১৫ জুমাদা'ল-আওওয়াল, ১১৮৯/১৪ জুলাই, ১৭৭৫ প্রচলিতভাবে প্রদত্ত ১১৮৪/১৭৭০ অথবা ১১৯৩/১৭৭৯ অথবা, E.I.^{2}, ৬৫৭-তে প্রদত্ত, ১২১১/১৭৯৬ সালে নয়) স্বল্পকালের জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসতাফা এবং অতঃপর (১১৯০/১৭৭৬) তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমূদ মতা লাভ করেন, যিনি দ্রুততার সহিত সার্বভৌম ক্ষমতা [Capriate, Venetian consul at Durazzo Durres, ১৭৮২ খৃ.] প্রয়োগ করেন।

সম্মানসূচক পদ মীরমীরান মর্যাদাসহ ইশকোদরা-র সানজাক বেয়িরূপে কারা মাহমূদ পাশা 'উছমানী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ এবং রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহিত ইহার অবিরাম যুদ্ধে জড়িত থাকিবার পরিস্থিতি হইতে স্বীয় সুবিধা অর্জনের সম্ভাবনা দেখিতে পান এবং উত্তর ও মধ্য আলবেনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলকে নিজ আনুগত্যে আনয়ন করা এবং পূর্বদিকে ওখ্রীলী আহমেদ পাশা ও দক্ষিণ অভিমুখে অধিকতর সুপরিচিত তেপেদেলেন্‌লি 'আলী পাশার সহিত সর্বক্ষণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিবার মাধ্যমে তিনি তাহা বাস্তবায়িত করেন। উত্তর অভিমুখে অবস্থিত বোস্‌নিয়া-র ওয়ালীগণের সহিত একইভাবে কারা

মাহমূদ পাশা সংঘর্ষে উপনীত হন এবং পোদগোরিজা (Podgorica) ও ইশপুযি (Spuz)-এর দুর্গসমূহের উপর তাঁহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি উচ্চ এলাকার মালিসোরগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন এবং ইশকোদরা হইয়া বাণিজ্য, বিশেষত ভেনিসীয় বাণিজ্য উন্নয়নের এক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজ শক্তি সংহত করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও এই বাণিজ্যিক কার্যক্রম হইতে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করেন।

ইস্তাম্বুলে ধারণা করা হইত— এবং সম্ভবত ইহার পশ্চাতে বৈধ যুক্তি ছিল— যে, কারা মাহমূদ পাশা-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে এলাকাসমূহের কাদীগণের সকল কর্তৃত্ব অপহৃত হইয়াছে এবং শারী'আ আইনসমূহ আর কার্যকর হইতেছে না। ইহার ফলে তুর্কী সুলতান তাঁহাকে একজন বিদ্রোহী ঘোষণা করেন এবং ১১৯৯/১৭৮৪-৫ সালে কাপুদান পাশা জেযা'ইরলী হাসান পাশা (দ্র.)-র অধীনে তাঁহার দমন করিবার জন্য এক বাহিনী প্রেরণ করেন, কারা মাহমূদ পাশা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাকে ক্ষমা করা হয় এবং পুনরায় ইশকোদরা-র সানজাকবেয়ি-এর পদে বহাল করা হয়। ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি মন্টেনিগ্রো অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং নিজকে স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকৃতি প্রদানের শর্তে সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সম্ভবত এই কারণেই তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার অভিযান প্রেরণ করা হয়। ১২০০-১/১৭৮৬-৭ সালে পরিচালিত এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন তেপেদেলেন্‌লি 'আলী পাশা এবং রুমেলি-র ওয়ালী আয়দোসলূ মেহমেদ পাশা। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার সামরিক সহায়তা প্রদানের শর্তে তাঁহাকে পুনরায় ক্ষমা করা হয় এবং শা'বান ১২০২/ মে ১৭৮৮ সালে Brugnard-এর নেতৃত্বাধীন অস্ট্রীয় বাহিনীকে নির্মূল করিয়া সুলতানের প্রতি তাঁহার আনুগত্য প্রকাশের পর কারা মাহমূদ পাশাকে আনাতোলিয়ার ওয়ালীলিক এই খেতাব প্রদান করা হয় এবং তিনি য়েনিপাযার-এ অবস্থিত 'উছমানী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন (১২০৪/১৭৮৯)। পরবর্তী বৎসর তিনি বিদিন সের 'আসকাররূপে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং অধিনায়কত্ব হইতে অপসারিত হন।

ইশকোদরায় প্রত্যাবর্তন করিবার পর কারা মাহমূদ পাশা নূতন সুলতান ৩য় সেলীমকে সফলভাবে প্রতিরোধ করেন— যিনি ১২০৮/১৭৯৩ সালে রুমেলী-র এবূ বেকির পাশাকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১২০৯/১৭৯৪ সালে তেপেদেলেন্‌লি 'আলী পাশা কর্তৃক তাঁহাকে অপসারণ করার অপর একটি প্রচেষ্টা একইভাবে ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে কারা মাহমূদ পাশা একই সঙ্গে মন্টেনিগ্রোর নজেগোস (njegos) ১ম পিটার পেট্রোভিচ-এর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন; মন্টেনিগ্রোকে তাঁহার করায়ত্তে আনয়নের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল ইহার হেতু। মন্টেনিগ্রোর বিরুদ্ধে পরিচালিত দুইটি অভিযানের দ্বিতীয়টিতে ১২১১-১২/১৭৯৬ সালে কারা মাহমূদ পাশার বাহিনী বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং তিনি নিহত হন (রাবী' ১,১২১১/ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)। এই ঘটনার সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি মন্টোনিগ্রীয় গীতিকাব্য Pjesen-এ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ছিন্ন মস্তক বহুকাল পর্যন্ত Cetinje-এর একটি গির্জায় সংরক্ষিত রাখা হয়; তাঁহার দেহ শেষ পর্যন্ত পোদ্‌গোরিকায় দাফন করা হয়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশনাই যে, খৃস্টীয় ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর বলকান অঞ্চলের আ'য়ানাতসমূহের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তেপেদেলেন্‌লি পাশা ইত্যাদির তুলনায় সার্বিকভাবে বুশাতলী পরিবার, বিশেষভাবে কারা মাহমূদ পাশা-র গুরুত্ব অনেকাংশে অবমূল্যায়ন করা হইয়াছে। তথাপি সাম্প্রতিককালে কারা মাহমূদ পাশার কর্মকাণ্ডে একটি আলবেনীয় জাতীয়তাবাদী তাৎপর্য সন্ধান করার যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তাহা যথাযথ সর্তকতার সহিত বিবেচনা করার প্রয়োজন থাকিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহমেদ জেওদেত, তা'রীখ[1] (প্রকাশনার স্থান ও তা. বি.), ৩-৪খ, ৬খ, স্থা. (জীবনী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬খ, ২০৬-১০); (২) Milorad Medakovic কর্তৃক মন্টেনিগ্রোর ইতিহাসসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনাসমূহ, Probjestnica Crnegore od naistarieg vremena do 1830, Zemun ১৮৫০ খৃ., পৃ. ৬৭ প.; (৩) A. Andric, Geschichte des Furstenthums Montenegro, ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ.; (৪) D. Milankovic, Istorija Crne Gore, Zadar 1856, 70-1; (৫) P. Coquelle, Histoire de Montenegro et de la Bosnie, প্যারিস ১৮৯৫ খৃ.; (৬) Dora d'Istria-তে অধিক বিস্তৃত আলোচনা বিদ্যমান, Gli Albanesi musulmani; (৭) Scutari e i Buchatli, in Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti, ৮খ. (১৮৬৮খৃ.) ২২১-৪২; (৮) S. Gopçevic, von Montenegro und Albanien, Gotha 1914, পৃ. ২২২-৫, ২৪৫-৮০; (৯) S. J. Shaw, Between old and new : the Ottoman Empire under Selim III, 1789-1807, Cambridge, Mass. 1971, পৃ. ২৩০-৪, তু. মেহমেদ ছুরায়্যা (Sureyya), সিজিল্ল-ই 'উছমানী ৪খ, ২৫৮, ৩২৮-৯; (১০) I. H. Uzuncarsili Osmanli Tarihi, ৪/১খ, আনকারা ১৯৫৬খৃ., ৬১৫-৭; (১১) Ettore Rossi, Saggio sul dominio turco e l'introduzione dell' Islam in Albania, in Rivista d'Albania, ৩/৪খ. (১৯৪২ খৃ.), ২০০ প.; (১২) S. Pollo, A. Buda ও অন্যান্য, Historia e Shqiperise, i, Tirane 1959, chs. ix-x, স্থা., কারা মাহমূদ পাশার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে; (১৩) N. P. Skerovie, 'Pjesen': Crnogorska pobjeda nad Skadarskim pasom Mahmutom Busatlion kao istoriski dokument-তে, Istoriski Casopis, ১/১-২খ. (১৯৪৮খৃ.), পৃ. ১৬৭-৮০; (১৪) T. Dukic, Izvestaji o bojevima Crno-goraca s Mahmud pasom Busatliom in Istoriski Zapisi, ৮খ, (১৯৫১ খৃ.), ৪৮০-৭; (১৫) B. Pavicevic, O prvom pohodu Mahmuta Busatlije na Crnu Goru 1796, in Istoriski Casopis, ৬ষ্ঠ (১৯৫৬ খৃ.), ১৫৩-৬৭; (১৬) V. Vinaver, Crna Gora, Skadar i Dubrovnik krajem xviii veka, in Istoriski Zapisi, ৯/১-২ খ. (১৯৫৬ খৃ.), ৪২-৭৭; (১৭) S. N. Naci, Le pachalik de Scutari considere dans son developpement socio-politique au xviii[e] sicele, in studia Albanica, ৩/১খ. (১৯৬৬ খৃ.), ১২৩-৪৪; (১৮) ঐ লেখকের সম্পূরক গ্রন্থ, আলবেনীয় ভাষায় Pashalleku i

Shkodres nen sundimin e Bushatllive....., Tirane 1964। আলবেনীয় ইতিহাস রচনা সম্পর্কে অধিকতর তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য (১৯) Naci. Pashalleku..., পৃ. ৩১৯-২১ এবং (২০) K. Bozhori ও V. Koka, Historiografia Shqiptare gjate 25 vjeteve te pushtetit popullor, in Studime Historike, ২৩ খ. (১৯৬৯ খৃ.), ৭২, নং ৬।

বুশাতলী পরিবারের সরকারী ও বেসরকারী চিঠিপত্র আলবেনীয় State Archives-এ সংরক্ষিত আছে (দ্র. Selami Pulaha, Materiaux documentaires en langue osmano-turque des archives albanaises...., in Studia Albanica, ৩/১খ, ১৯৬৬ খৃ., ১৮৭-৯৮)। উক্ত পরিবারের একদা অধিকারভুক্ত পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. J. Blaskovic, Arabische, Turkische und Persische Hss. der Universitats-bibliothek in Bratislava. নং ৫৬৯। ইহার সামান্য কিছু উল্লেখ নিঃসন্দেহে, উপরোল্লিখিত I. H, Uzuncarsili ও S. J. Shaw কর্তৃক তাঁহাদের রচনাবলীতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের রচনায় যে সকল উপাদান উল্লেখ করা হইয়াছে তদপেক্ষা Basvekalet Arsivi অধিক ব্যাপক। কারা মাহমূদ পাশা সম্পর্কে কিছুসংখ্যক তুর্কী দলীল (সিজিল্লস), ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, Sarajevo-তে সংরক্ষণ করেন M. Spaho, Skadarski mutesarif Mahmud Pasa Busatlija prema turskim dokumentima, in Istoriski Zapisi, ২০/৩খ. (১৯৬৩ খৃ.) ৬৬৯-৮১।

C. J. Heywood (E. I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কারা মুসতাফা পাশা (قرا مصطفى پاشا) ঃ মেরযিফোন্‌লু মাকতূল. 'উছমানী সালতানাত-এর প্রধান মন্ত্রী। 'উছমানী সরকারের বিবরণ অনুযায়ী কারা মুসতাফা পাশা তুর্কী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন (রাশিদ, তা'রীখ[২], ১খ, ৪৩০), ১০৪৪/১৬৩৪-৫ সালে তুরস্কের আনাতোলীয় সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম। উক্ত বিবরণ অনুসারে তাঁহার পিতার নাম উরুজ্ বেগ (কিন্তু S, O, ৪খ, ৪০২-তে তাঁহার নাম হাসান আগা), যিনি আ'য়ান-ই সিপাহীয়ান-এর দলভুক্ত ছিলেন এবং ১০৪৮/১৬৩৮ সালে ৪র্থ মুরাদ কর্তৃক বাগদাদ অবরোধের প্রাক্কালে যাহারা নিহত হইয়াছিল তাদের মধ্যে ছিলেন। কথিত আছে যে, কারা মুসতাফা পাশার পিতা ও কোপরুলু মুহাম্মাদ পাশার মধ্যে বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল। উক্ত বন্ধুত্বের ভিত্তিতেই শিশু কারা মুসতাফা পাশা এই কোপরুলু পরিবারে লালিত-পালিত হন, কোপরুলু মুহাম্মাদ পাশার পুত্র আহমাদের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করেন।

এইভাবে কোপরুলু পরিবার ও কারা মুসতাফা পাশার মধ্যে বাহ্যত স্থাপিত সম্পর্কটি কারা মুসতাফার পরবর্তী রাজনৈতিক গতিধারাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ১০৮৭/১৬৭৬ সালে প্রধান মন্ত্রী পদে তাঁহার মনোনয়নের পূর্ব পর্যন্ত তদীয় জন্ম ও শৈশবকালীন বৎসরগুলির ঘটনাবলীর যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় উহাতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিরোধিতা রহিয়াছে। ফরাসী রাষ্ট্রদূত de Nointel-এর জন্য মার্চ ১৬৭৫ ও অক্টোবর ১৬৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রস্তুত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী (Ch. Schefer-এর সম্পাদিত "Journal d' Antoine Galland pendant son sejour a Constantionple [১৬৭২-১৬৭৩], প্যারিস ১৮৮১ খৃ., ২খ, ১৮৬-২০৭) কারা মুসতাফা পাশা সম্ভবত ১০৩৬/১৬২৬-৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মেরযিফোন নামক স্থানের দারবীশ বেশদে নামক জনৈক সিপাহীর সন্তান ছিলেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে (? আনু. ১০৫৪/১৬৪৪-৫ সালে) তাঁহার পিতা তাঁহাকে মুহাম্মাদ কোপ্রুলুর অভিভাবকত্বে সমর্পণ করেন যিনি তাঁহাকে তাঁহার চাকুরীতে ইচ-ওগলান হিসাবে নিয়োগ করেন; শাম-এর ইয়ালেত (দামিশক)-এর মুসেল্লিম হিসাবে স্বীয় নিয়োগের পর তিনি কারা মুসতাফা-কে সিলাহদার পদে উন্নীত করেন। (তু. সিলাহদার, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ. ১খ, ২২৫) 'এবং পরবর্তী সময়ে তাঁহাকে স্বীয় মুহুরদার (সরকারী সীলরক্ষক) করেন। মুহাম্মাদ কোপ্রুলু পাশা তারাবলূস আশ-শাম ইয়ালেতের গভর্ণর পদে নিয়োগ লাভ করিবার পর কারা মুসতাফা পাশাকে স্বীয় আগাদের স্তরে উন্নীত করেন (প্রতিবেদন, apud Schefer, ১৮৬; ১০৬৫/১৬৫৪-৫ খৃ, তু. সিলাহদার, ১খ, ২২৬)। কিছুকাল পরে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার পর (১০৬৬/১৬৫৫-৬) মুহাম্মাদ কোপ্রুলু কারা মুসতাফা পাশাকে মেরযিফোন হইতে ডাকিয়া আনেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অসুস্থতার কারণেই কারা মুসতাফা মেরযিফোন গমন করিয়াছেন। মুহাম্মাদ কোপ্রুলু তাঁহাকে স্বীয় তেলখীসজি নিয়োগ করেন (তু. রাশিদ[২], ১খ, ৪৩০-১)।

ভেনিসীয় bailo Morosini di Alvise কর্তৃক আনু. ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে relazione-তে সংকলিত কারা মুসতাফা পাশার বংশ পরিচয় সংক্রান্ত তৃতীয় অপর একটি পরস্পরবিরোধী প্রাচীন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (N. Barozzi এবং G. Berchet Relazioni, সিরিজ ৫, Turchia, i/2 ভেনিস ১৮৭২ খৃ., পৃ. ২০৭ এবং তু. পৃ. ২৫৯) যাহা এমন কি ১৬৬০ খৃ. এক প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতিফলন বলিয়া প্রতীয়মান হয় (তু. Roger Norths, Life.... of Sir Dudley North, লণ্ডন ১৭৪৪ খৃ. ৭৩)। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ট্রাবযোন (Trabzon) (সম্ভবত কোনও দোভাষীর মেরযিফোন শব্দের ভুল পাঠ হইবে)-এর নিকটবর্তী এলাকার কোন এক নীচ বংশে কারা মুসতাফা পাশা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ কোপ্রুলু পাশার সর্বাপেক্ষা নিম্নপদস্থ পারিবারিক ভৃত্যদের একজন হিসাবে নিযুক্ত হন; কোপ্রুলু অবশ্য অল্প সময়ের জন্য ট্রাবযোন ইয়ালেত-এর শাসন পরিচালনা করেন, আনু. ১০৫৪-৫/১৬৪৪-৫ সালে (তু. সিলাহদার, ১খ, ২২৫) Schefer কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণনার ক্রমধারার প্রতি ইহাতে কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।

এই সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্যের ভিত্তিতে কোনও সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান দুঃসাধ্য। সরকারী বিবরণটি বাহ্যত দুর্বল এবং ইহা পরবর্তীকালের উদ্ভাবন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, শিলালিপির তথ্য আমাদিগকে ন্যূনপক্ষে এতটুকু নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, কারা মুসতাফা পাশা মেরযিফোনের অধিবাসী ছিলেন অথবা অধিকতর নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তিনি মারিনজা (Marindja) (বর্তমানে Bahcekent) নামক এক গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত স্থানে একটি মসজিদ, একটি ঝর্ণাধারা এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন (A. Gabriel, Monuments turcs d' Anatolie, ২খ, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৭১; Amasya Il yilligi, তা. বি. পৃ. ১৮৭-৮)। শুধু তাঁহার অভিভাবক মুহাম্মাদ কোপ্রুলু পাশা প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভ করার পর ১০৬৬/১৬৫৬ সালে কারা মুসতাফা একজন জননেতা

হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১০৬৮/১৬৫৮ সালে ট্রান্সিলভেনিয়া (Transylvania)-এর বিরুদ্ধে প্রধান উযীর পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন, য়ানোভাস্থ (Yanova=Jeno) গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসমূহ 'উছমানী দখলে আনার পর (৩ যু'ল্-হিজ্জা ১০৬৮) তাঁহাকে মুহাম্মাদ কোপরুলুর তেলখীসজি নিয়োগ করা হয়। এই সময় তিনি ৪র্থ মুহাম্মাদের নিকট বিভিন্ন বিজয়ের সংবাদ জ্ঞাপন করার দায়িত্ব পালন করেন (মুহাম্মাদ খালীফে, তা'রীখ-ই গিলমানী, সম্পা. এ. রেফীক, TOEM-এ, পরিশিষ্ট, ১৩৪০, পৃ. ৫৪) এবং পুরস্কার হিসাবে সুলতান তাঁহাকে বহির্বিভাগের কাজ দেন এবং তিনি কুচুক মীরাখোর পদে নিযুক্ত হন (সিলাহদার, ১খ, ১২৭, ১৪০)। ৩ জুমাদা (২), ১০৭০/১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৬৬০ সালে কারা মুসতাফা 'আগা' সিলিসত্রে-র বেগলেরবেগি নিযুক্ত হন। ২৬ শা'বান, ১০৭১/১৬ এপ্রিল, ১৬৬১ সালে এদিরনে (Edirne) হইতে ইস্তাম্বুলে ওয়ালিদে সুলতানের অপসারণের তদারকি করার জন্য তাঁহাকে বদলি করা হয়।

অতঃপর শীঘ্রই তিনি প্রধান উযীর পদে উন্নীত হন ও দিয়ার বাক্‌র প্রদেশের ওয়ালী নিযুক্ত হন (সিলাহদার ১খ, ১৮১-২, ২১৭; রাশিদ[২], ১খ, ৯৩; ২খ, ৪৩০)।

কোপরুলু পরিবারের ক্রমাগত উত্থানের উপর তাঁহার নির্ভরশীলতা শীঘ্রই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। মুহাম্মাদ কোপ্রুলুর মৃত্যুর পর এবং তাঁহার পুত্র ফাদিল আহমেদ কোপ্রুলু প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করার পর (৭-৮ রাবী'উল-আওওয়াল, ১০৭২/৩১ অক্টোবর-১ নভেম্বর, ১৬৬১) ঐ বৎসরের ১ জুমাদা'ল-উলা/২৩ ডিসেম্বর তারিখে স্বল্প সময়ের মধ্যে কারা মুসতাফা পাশা কাপুদান পাশা নিযুক্ত হন (সিলাহদার, ১খ, ২২১; রাশিদ[২], ১খ, ২৩)। ২৮ শা'বান, ১০৭৩/৭ এপ্রিল, ১৬৬৩ সালে সুলতান ৪র্থ মুহাম্মাদের উপস্থিতিতে এদিরনে (Edirne) নামক স্থানে অনুষ্ঠিতব্য সামরিক কুচকাওয়াজে শরীক হইবার জন্য কারা মুসতাফা পাশা জুমাদা (২), ১০৭৩/ জানুয়ারী ১৬৬৩ সালে ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাপুদান পাশা হিসাবে তিনি এজিয়ান সাগরে 'উছমানী নৌবহরের নেতৃত্ব দান করেন। এই ঘটনার সরকারী বিবরণ অনুসারে উক্ত মহড়ায় অংশ গ্রহণকারীদের তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ইহা ছিল তাঁহার নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক ভাগ্যোন্নয়নের অন্যতম নির্দশন।

আহমেদ কোপ্রুলু পরিচালিত হাঙ্গেরী অভিযানগুলিতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই। প্রধান উযীর ও সেনাবাহিনী এদিরনে (Edirne) ত্যাগ করিবার পর তিনি (৫ রামাদান, ১০৭৩/১৩ এপ্রিল, ১৬৬৩) কা'ইম মাকাম নিযুক্ত হন। আলোচ্য পদটি এমন এক মর্যাদা যাহা যুগপৎ সুলতান ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। একই সময়ে তিনি কাপুদানলিক-ই দেরয়া পদটিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া একজন সহকারী দ্বারা উহা পরিচালনা করিবার অনুমোদন লাভ করেন (সিলাহদার, ১খ, ২৪১; রাশিদ[২], ১খ, ২৬-৭)। এই সময়ে 'উছমানী নথিপত্রে সংরক্ষিত তাঁহার দায়িত্বাবলীর বিবরণ শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে সবিস্তারে প্রকাশ পায়। কিন্তু পশ্চিমা কূটনীতিকদের মধ্যে এই গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি প্রধান মন্ত্রী হইবার অভিলাসী ছিলেন এবং এইজন্য তিনি ফাদিল আহমেদ পাশার বিরুদ্ধে সুলতানের সহিত গোপনে চক্রান্ত করিতেছিলেন (সিলাহদার, ১খ, ২৩১ প., স্থা; Knolles, Generall Historie[6], ii, 163)।

কারা মুসতাফা দারদানেলিস (Dardanelles)-এর দুর্গ নির্মাণ তদারকীতে কাপুদান পাশা হিসাবে ৪র্থ মুহাম্মাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেন (সাফার-রাবী'উছ্-ছানী ১০৭৬/আগস্ট-অক্টোবর ১৬৬৫) এবং পরবর্তীকালে ক্রীট (Crete) চূড়ান্ত দখলের জন্য নৌবাহিনীর প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে য়ুরোপীয় নৌশক্তির পোতগুলি পরিবহন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাদের বন্দর প্রতিনিধিবর্গ তাঁহার প্রয়াসে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। য়ুরোপে তাঁহার কর্মকাণ্ডের যে বিবরণ রটে তাহাই তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত এতদসংশ্লিষ্ট বিবরণগুলির অতিরঞ্জনে প্রভূত অবদান রাখে।

শা'বান ১০৭৬/ ফেব্রুয়ারী ১৬৬৬ সালে ৪র্থ মুহাম্মাদের সহিত কারা মুসতাফা চাতালজা Cataldja নামক স্থানে এক শিকার অভিযানে গমন করত স্বল্প সময়ের জন্য কা'ইম মাকাম-এর পদে পুনর্বহাল হন। এই সময়ে তিনি কাপুদান পাশার পদ হারান (১-১৪ শা'বান/৬-১৯ ফেব্রুয়ারী)। কিন্তু ইহার ক্ষতিপূরণের স্বরূপ পদগুলির জটিল পুনর্বিন্যাসের একটি অংশ হিসাবে তিনি দ্বিতীয় উযীরের পদে উন্নীত হন (সিলাহদার, ১খ, ৩৯২-৩)। এই অবস্থায় ক্যাণ্ডিয়ে (Kandiye) অবরোধকালে প্রধান উযীরের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের কারণে কারা মুসতাফা পাশা পুনরায় কা'ইম মাকাম পদে অধিষ্ঠিত হন (৫ যু'ল-কাদা, ১০৭৬/৯ মে, ১৬৬৬)। ৮ সাফার, ১০৮১/২৭ জুন, ১৬৭০ সাল পর্যন্ত প্রধান উযীরের এদিরনে প্রত্যাবর্তন করা অবধি তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (সিলাহদার, ১খ, ৪০৯, ৫৫৮)।

উক্ত বৎসরগুলিতে কারা মুসতাফা পাশা ৪র্থ মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ছিলেন। কিন্তু সুলতানের ঘনিষ্ঠ সহচর মুস্তাফা আগা অকস্মাৎ প্রভাবশালী পদে উন্নীত হইলে কারা মুস্তাফা পাশার পদোন্নতি হুমকির সম্মুখীন হয় বলিয়া মনে হয়। ২৮ মুহাররাম, ১০৭৭/৩১ জুলাই, ১৬৬৬ সালে মুসতাফা আগা-কে দ্বিতীয় উযীরের পদমর্যাদা দান করা হয় এবং রাজসভায় তাঁহাকে কা'ইম মাকামের সমমর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করা হইত (এইভাবে কারা মুসতাফা পদাবনত হইয়া তৃতীয় উযীর পদে নামিয়া আসেন)।

শাওওয়াল ১০৭৮/মার্চ-এপ্রিল ১৬৬৮ সালে ক্যাণ্ডিয়ে (Kandiye) অবরোধের অগ্রগতি অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকনের উদ্দেশ্যে সুলতান ৪র্থ মুহাম্মাদের সঙ্গে কারা মুসতাফা পাশা য়েনিশেহির-ই ফেনার (Yenishehir-i Fenar) (Larissa) নামক স্থানে গমন করেন। এই স্থানে তিনি খুব ধুমধাম ও জাঁকজমকের সহিত অবস্থান করেন। তাঁহার তখনকার সময় কাটিত তাঁহার সামরিক ব্যাণ্ড পার্টির দূতদিগের অভ্যর্থনায় এবং থেসালী (Thessaly)-এর মধ্য দিয়া ৪র্থ মুহাম্মাদের সামরিক অভিযানসমূহের ফাঁকে সুলতানের সঙ্গে মৃগয়া যান। উক্ত অভিযানসমূহের একটি চলাকালে যখন লিভাডিয়াতে শিবির স্থাপিত ছিল, তখন জুমাদা'ল-উলা ১০৮০/ অক্টোবর ১৬৬৯ সালে কারা মুসতাফা পাশা সুলতানের নিকট ক্যাণ্ডিয়ে বিজয়ের সুসংবাদ লইয়া আসেন (সিলাহদার, ১খ, ৪৮৩ প., ৫০১ প., ৫৫৪-৫)।

ক্রীটে সামরিক অভিযানের সমাপ্তি ও পোল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ে তৃতীয় উযীর পদে আসীন থাকা অবস্থায় মুস্তাফা পাশা সুলতানের ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠেন (১৬৬৯-৭২ খৃ.; তু. সিলাহদার, ১খ, ৫৬২-৮)।

কারা মুস্তাফা অধীনস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ১০৮৩/১৬৭২ সালে অনুষ্ঠিত পোল্যাণ্ড অভিযানে এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। ১০৬৮/১৬৫৮ সালের পরে তাঁহাকে প্রথমবার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়। তিনি Khotin-এর অবরোধে শরীক ছিলেন এবং পরে Kamanice অবরোধের বাহিনীর শুরুতে দক্ষিণ পার্শ্বের নেতৃত্ব দান করেন। 'উছমানী বাহিনী বুচাশ (Buczacz) দখলের পর পোলিশদের সহিত দর কষাকষির জন্য মূল ব্যক্তি হিসাবে তিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং পোলিশদের শত্রুতা নিরসন করিয়া সন্ধি করেন। ইহার ফলে Podolia-কে 'উছমানী শাসনাধীনে সমর্পণ করা হয় ও পাশ্চাত্যের ইউক্রাইন (Ukraine) 'উছমানী সাম্রাজ্যের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে গণ্য হয় (সিলাহদার, ১খ, ৫৬৮ প. ৫৮২-৫, ৫৯২ প., ৬১০, ৬১১ প.)।

পোল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কারা মুসতাফা পাশা সুলতানের উপর পুনরায় স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি কর্মজীবনের প্রথমভাগে মুহাম্মাদ কোপরুলুর এক কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪ রাবী'উ'ছ-ছানী, ১০৮৬/২৬ মে, ১৬৭৫ সালে এদিরনেতে ৪র্থ মুহাম্মাদের পুত্রদের খাৎনা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হয়, এই উৎসবের অংশ হিসাবে সুলতান-কন্যা কুচুক সুলতানের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়।

ফাদিল আহমাদ পাশার অন্তিম পীড়ার সময়ে সুলতান, কারা মুসতাফা পাশাকে প্রধান উযীরের সরকারী দফ্তর পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ইস্তাম্বুলের Ok Meydani-তে অনুষ্ঠিত একটি দীওয়ানে তিনি ১৭ জুমাদা (?) ১০৮৭/২৮ জুলাই, ১৬৭৬ তারিখে সর্বপ্রথমে উক্ত দফ্তরের কার্য সম্পাদন করেন। একই সালের ২ শা'বান/১০ অক্টোবর তারিখে তিনি সুলতান ৪র্থ মুহাম্মাদের ইস্তাম্বুল হইতে এদিরনে ভ্রমণের য়োল কা'ইম মাকামি (yol Ka'immakami) নিযুক্ত হন। সুলতানের অনুগামী প্রধান উযীর, চোরলু ও কারিশতিরান-এর মধ্যস্থলে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ২৬-৭ শা'বান, ১০৮৭/৩ নভেম্বর ১৬৭৬ সালে সুলতানের সমীপে সরকারী সীলমোহর লইয়া আসা হয়। সুলতান কারা মুসতাফাকে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার অর্পণ করেন (রাশিদ, ১খ, ৩৩২-৪, সিলাহদার, ১খ, ৬৫১-২)।

সাত বৎসর কাল (শা'বান ১০৮৭/ নভেম্বর ১৬৭৬-৬ মুহার্‌রাম, ১০৯৫/২৫ ডিসেম্বর, ১৬৮৩) কারা মুসতাফা পাশা প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ ছিল রক্ষণশীল ও প্রায়শ হিংস্র, আর দুই-ই পরিকল্পিত ছিল যুদ্ধাবস্থার অর্থনীতির জরুরী প্রয়োজনে ও তাঁহার ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির লক্ষ্যে। তাঁহার সমসাময়িক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে অন্যায়কারী, অত্যাচারী ও লোভী আখ্যায়িত করিয়াছেন (Morosini di Alvise)। তাঁহার শাসনামলে মূলনীতির খাতিরে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোনও কোনও সময় অগ্রাহ্য করা হইত। এমনইভাবে যু'ল-কাদা ১০৯১/নভেম্বর ১৬৮০ সালে এক আদেশবলে তিনি মদের উপর ধার্যকৃত শুল্ক রহিত করেন এই যুক্তিতে যে, মদ বিক্রির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্জিত মুনাফা শারী'আ-বিরোধী। একই মনোভাব লইয়া তিনি প্রতি বুধবার প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকারিগণ কর্তৃক ইস্তাম্বুলের বাজার পরিদর্শনের প্রাচীন প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতদের দোভাষিগণ ছাড়া তাঁহার দরবারে অন্যদের প্রবেশাধিকার রহিত করেন এই যুক্তিতে যে, তাহাদের মর্যাদা রি'আয়া (প্রজা)-র মর্যাদা তুল্য (সিলাহদার, ১খ, ৭৩৫; R. Mantran Istanbul dans la seconde moitie du XVII^{e} siecle পারিস ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১২৬. n; Knolles, পৃ. গ্র., ২খ, ২৬৪)।

খৃষ্টান দেশসমূহের কূটনীতিকবর্গ এবং ইস্তাম্বুলসহ 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য বন্দর এলাকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আচরণে কারা মুসতাফা পাশা গভীর বৈরী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ বলিয়া মনে হয় (Mantran, পৃ. গ্র. পৃ. ৫২৭), ১০৭৪/১৬৬৩ সালেই যাহার উল্লেখ দেখা যায় [তু. প্রথাগত সম্বোধন বর্জন করিয়া সেই বৎসরে ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের নিকট লিখিত একটি কড়া চিঠি (Leicester, Country Record Office)]। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের পর তাঁহার এই মনোভাবটি আরও তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল (যেমন, Chios-এ ফরাসীদের বোমা বর্ষণের জন্য, ওলন্দজগণের সন্ধি-সমর্পণ নবায়নের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা এবং ১৬৭৬-৮৩ খৃ. পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন avanias-এর জন্য)। অপরপক্ষে এই সময়কার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ য়ূরোপের ব্যাপারে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও জ্ঞানের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত এই জ্ঞান তিনি Phanariot Alexander Mavrocordato-র নিকট হইতে ব্যাপকভাবে আহরণ করিয়াছিলেন [তু. ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপিসমূহ, কমিশন, Allan George Finch, Esq-এর পাণ্ডুলিপিসমূহের উপর রিপোর্ট, ২খ, (লন্ডন ১৯২২), ৬২. Berchet, পৃ. গ্র., ১৮৭, ২০৯; Schefer, পৃ. গ্র. ২খ, ২০৫]।

কারা মুসতাফা পাশা পররাষ্ট্র নীতিকে কম সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার দুইজন বিখ্যাত পূর্বসূরীর অনুসরণ করেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্ভবত সেই সময়কার ধারণামাফিক তাঁহার ব্যক্তিগত পক্ষপাত তাঁহাকে সাম্রাজের উত্তর সীমান্তবর্তী দেশ এবং উক্ত সীমান্ত দূরবর্তী খৃষ্টান অধ্যুষিত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া লইয়া সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য করে। এই সমস্ত দেশের সহিত তাঁহার সম্পর্কে ক্ষেত্রে তিনি খুব সামান্য সফলতার সহিত দুর্দান্ত 'উছমানী সামন্তদিগকে ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন— যেমন, কুজাক হেটম্যান ডোরাশেন্‌কো, হাঙ্গেরীর মহান Imre Thokoly এবং ক্রিমিয়ার তৎকালীন খান দ্বিতীয় সেলীম গিরায়। তাঁহার নীতি যুদ্ধের খাতিরে যুদ্ধ বলিয়া সাধারণভাবে বিবেচিত ছিল। কিন্তু নিদেনপক্ষে তাঁহার কোনও কোনও পদক্ষেপ ঐ সমস্ত বিতর্কিত অঞ্চলে 'উছমানীদের উপস্থিতি ও সংহতি সুস্পষ্টকরণের পদক্ষেপ বলিয়া মনে হয়। উক্ত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ইউক্রাইন এবং হাঙ্গেরী অত্যধিক উল্লেখযোগ্য। কেননা এই অঞ্চলদ্বয় 'উছমানী রাষ্ট্র ও দারু'ল-হারব বলিয়া স্বীকৃত দেশসমূহের মধ্যে বাফারমণ্ডল (দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ রোধার্থ তাহাদের মধ্যস্থলে স্থাপিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র) গঠন করিয়াছেন।

১০৮৭/১৬৭৬ হইতে ১০৯২/১৬৮১ পর্যন্ত বৎসরগুলি সম্পূর্ণভাবে নীপার (Dnieper) সীমান্ত সমস্যার সহিত নিয়োজিত ছিল। আহমাদ কোপরুলু মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে Izvandja (Zurawno) নামক স্থানে সম্পাদিত পোল্যাণ্ড এবং 'উছমানী সাম্রাজ্যের আপোস চুক্তি ইউক্রেনে রুশ ও 'উছমানী সাম্রাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরজা উন্মুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু ডোরোশেনকোর 'উছমানী শিবির ত্যাগের ঘটনাটি প্রথম রুশ অভিযানে কারা মুস্তাফা পাশাকে সরাসরি পরাজয়ের মুখে ঠেলিয়া দেয় (১০৮৮/১৬৭৭)। পরবর্তী বৎসরে সংঘটিত দ্বিতীয় একটি অভিযানে (রাজাব ১০৮৯/আগস্ট ১৬৮৭) চেহরিণ-এর Cossack দুর্গটি দখল

করিয়া লওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত দুর্গটি বিধ্বস্ত করা হয় (সিলাহদার, ১খ, ৬৭২-৭২২, ফাত্হ নামায় ঘটনাটির বিবরণ রহিয়াছে, ঐ ৭১৪)। জরুরী আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতির এই সকল অভিযান (১০৯০/১৬৭৯) নীপার ও বাগ্ নদী উপকূলবর্তী 'উছমানী দুর্গ নির্মাণ দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া আছে এবং ১০৯১/১৬৮০ সালে অনুষ্ঠিত অসমাপ্ত তৃতীয় একটি অভিযানের ফলে ২২ সাফার, ১০৯২/১৩ মার্চ, ১৬৮১ সালে একটি রুশ-'উছমানী সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এইভাবে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত 'উছমানীদের সম্পর্ক সুস্থির হইলে হাঙ্গেরীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগের জন্য কারা মুসতাফা পাশা অবসর পাইলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি হাঙ্গেরীর Thokoly-কে পুতুল শাসক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন (১০৯৩/১৬৮২)। অত্যধিক পীড়াদায়ক শর্ত ব্যতীত Vasvar-এর বিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধবিরতি চুক্তি যাহার মেয়াদ ১৬৮৪ খৃ. উত্তীর্ণ হইবার কথা তাহার নবায়ন করিতে তিনি অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং একই সময়ে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতিও নেয়া হয়। ১০৯৪ হিজরীর মুহার্‌রাম/১৬৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্তভাবে হাঙ্গেরীতে একটি বড় ধরনের অভিযান চালাইবার এবং ভিয়েনা দখলের জন্য (যাহা 'উছমানীদের দ্বিতীয় বারের পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য) ৪র্থ মুহাম্মাদ ও কারা মুসতাফার নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী এদিরনে হইতে রওয়ানা হয় (সিলাহদার, ২খ, ১ প.)।

কারা মুসতাফার জীবনের এই শেষ বিপর্যয়পূর্ণ পর্ব অভিযানের অগ্রগতি, নিষ্ফল ভিয়েনা অবরোধ, সাময়িক পরাজয়ের পরিণামে প্রধান উযীরের রাজনৈতিকভাবে টিকিয়া থাকার অক্ষমতা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। যে কোনভাবেই হউক, ইহা সমসাময়িক এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষকদের উল্লেখযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে (যদিও সচরাচর নির্বিচারে; দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। ভিয়েনার সম্মুখে কারা মুসতাফা পাশার বিপর্যয়কে সেই সময়ে এবং পরে যেইভাবে বিবেচনা করা হয়, সেইভাবে বিবেচনা করা হয়ত সঙ্গত হইবে না। 'উছমানী যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, একটি মাত্র অভিযানে অভাবনীয় বিপর্যয় ব্যতীত আর অতিরিক্ত কিছু ছিল না। ২০ রামাদান, ১০৯৪/১২ সেপ্টেম্বর, ১৬৮৩-তে অবরোধ উঠাইয়া নেওয়ার পর কারা মুস্তাফা পাশা য়ানিক (Raab, Gyor) নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন (২২-২৫ রামাদান) এবং তথা হইতে Buda নামক স্থানের দিকে পশ্চাদপসরণ করেন। তিনি ৩০ রামাদান/২২ সেপ্টেম্বর তারিখ তথায় উপস্থিত হন। এখানে তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করিবার এবং সীমান্তের পর্যুদস্ত ঘাঁটিগুলিকে পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পান ঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ উজভারকে শক্তিশালী করার জন্য বুদা গ্যারিসন হইতে তিনি ৬,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন (সিলাহদার, ২খ, ৮৫-৯৬, স্থা)। ইহার কোনও প্রমাণ নাই যে, বুদায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছিল অথবা ভিয়েনায় পরাজিত হইবার কারণে সুলতানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, কারা মুসতাফা স্বীয় সাধ্যানুযায়ী সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া এবং হাঙ্গেরীতে কারা মুহাম্মাদ পাশাকে 'সেরদার' হিসাবে রাখিয়া সসৈন্যে বেলগ্রেডের উদ্দেশে রওয়ানা হন ও তথায় তিনি ২৮ যু'ল-কা'দা", ১০৯৪/১৮ নভেম্বর, ১৬৮৩ সালে শীতকালীন আবাসে পৌঁছান (সিলাহদার, ২খ, ১০৭-১১৩)।

এই সময়ে তাঁহার রাজনৈতিক ভাগ্যে ভাটার শুরু হয়। ২৯ রামাদান/২১ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার 'তেলখীসজি' ইসমা'ঈল আগা বেলগ্রেডের সম্মুখে সুলতানের শিবিরে 'উছমানী বাহিনীর পরাজয় এবং য়ানিক নামক স্থানে উহার পশ্চাদপসরণের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হয়। প্রধান উযীর এই মর্মে সুলতানকে অবহিত করেন যে, তিনি রূয-ই কাসিম (২৬ অক্টোবর, পুরাতন পদ্ধতি অর্থাৎ ৫ নভেম্বর পর্যন্ত বুদায় অবস্থান করিবেন এবং পরে তিনি বেলগ্রেডের শীতকালীন নিবাসে গমন করিবেন। তথা হইতে পরবর্তী বসন্তকালে অনুমতিক্রমে এক বিশাল বিজয়ী সেনাবাহিনীসহ অতীত অভিযানের ক্ষতি পূরণের জন্য অগ্রসর হইবেন সিলাহদার, ২খ, ১১৭ প.)। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানের সঙ্গে উপস্থিত কর্মকর্তাদের অনেকগুলি পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়। রাজানুগ্রহের নিদর্শন খিল'আত ও একটি রত্নখচিত অসি, বুদাতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বেলগ্রেড হইতে ২১ শাওওয়াল/১৩ অক্টোবর, ৪র্থ মুহাম্মাদের স্বীয় প্রস্থান, বিশেষভাবে সুলতানের এদিরনে উপস্থিতির (১৬ যু'ল-হিজ্জা/৬ ডিসেম্বর) পর কারা মুসতাফার রাজনৈতিক শত্রুগণ সুলতানকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয়। ২৩ যু'ল-হিজ্জা/১৩ ডিসেম্বর কারা মুসতাফা পাশার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় এবং এদিরনে হইতে প্রেরিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ৬ মুহার্‌রাম, ১০৯৫/২৫ ডিসেম্বর ১৬৮৩ সালে এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয় (সিলাহদার, ২খ, ১১৯ পৃষ্ঠায় পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে প্রদত্ত বরাতসমূহ ব্যতীত কারা মুসতাফা পাশার মৃত্যু সম্পর্কে দ্র. (১) রাশিদা, ১খ, ৪৩০ প.; এবং তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা ও তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফাউণ্ডেশনসমূহ, ইস্তাম্বুল, গালাতা, এদিরনে, জিদ্দা ও মেরযিফোন-এ, এইগুলির জন্য দ্র. (২) ঐ, ৪৩১-২, তু. আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. (৩) IA-তে এম. মুনীর আকতেপে-এর প্রবন্ধ, মুসতাফা পাশা, মেরযিফোন্‌লু; (৪) SO-তে প্রদম বিবরণ সনের দিক দিয়া ভ্রমাত্মক; কারা মুসতাফা পাশার সময়ের সাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন (৫) Hammar-Purgstall, ৪খ, ৩৩৪ প.; (৬) J. W. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, Hamburg—Gotha, 1840-63, ৫খ, স্থা.; (৭) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, ৩খ., আঙ্কারা ১৯৫১-৪ খৃ. তু. আরও (৮) আহমেদ রেফীক ও Cevat Ustum (তুর্কী ভাষায়)-এর রচনাবলী Aktepe কর্তৃক তালিকাভুক্ত, পৃ. স্থা.।

কারা মুসতাফা পাশার সহিত সম্পৃক্ত শিলালিপি সংক্রান্ত উপকরণ পুরাপুরি সংগ্রহ করা হয় নাই, তু. (৯) A. Gabriel, পৃ. গ্র., ২খ., স্থা., অধিকন্তু (১০) ওরাল ওনুর, এদিরনে তুরক তারিহি ভেসিকালারিনদান কিতাবেলের, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ২৫, কারা মুসতাফা কর্তৃক ceshme 1077/1667 সালে নির্মিত 'চেশ্‌মে' (১০৭৭/১৬৬৭)-এর জন্য দ্র. (১১) ওসমান নূরী পেরেমেসি, এদির্‌নে তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ, প্লেট ৩০; এবং ওনুর, পৃ. গ্র., পৃ. ২৬ ঃ আর একটি চেশ্‌মে, যাহার তারিখ অজ্ঞাত। কারা মুসতাফা পাশা কর্তৃক তাঁহার মাতার জন্য মারিন্‌জা-তে নির্মিত মসজিদের প্রতিকৃতি; (১২) শেহাবে'দ-দীন উয়গুন রচিত মেরযিফোন ইলচেসি (১৯৩৮ খৃ.) পৃ. ৭-এ প্রকাশিত। এদিরনে-র শারিজা পাশা মসজিদের (উক্ত মসজিদের পার্শ্বে কারা মুসতাফার শির দাফন করা

হইয়াছে) পার্শ্বস্থ স্মৃতিফলকের বিবরণ। (১৩) H. T. Daglioglu-এর Edirne mezarlari, in Turk Tarihi, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, ৩খ. (১৯৩৬ খৃ.), পৃ. ১৬৭, ১৭৯-এ উল্লিখিত। নৌ-শক্তির সহিত তাঁহার সম্পর্ক জানার জন্য দেখুন ঃ (১৪) A. Vandal, Les voyages du marquis de Nointel (1670-1680), Paris 1900; এবং (১৫) F. Babinger কর্তৃক E.I.[1]-এ তালিকাভুক্ত য়ূরোপীয় পর্যটকগণের রিপোর্টসমূহ; তু. আরও (১৬) K. Heeringa, পূ. গ্র., স্থা. (১৬৭ প., avania কর ওলন্দাজ জাহাজ Keyser Octavianus-এর উপর আরোপিত, ২২৮ প. ওলন্দাজগণ কর্তৃক শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ নবায়নের সংগ্রাম); (১৭) Roger North, পূ. গ্র., পৃ. ৭১-১০২; "A Relation of diverse Turkish Avanias, since (i, e. in) the government of Cara Mustapha Basha Vizier Azem"; (১৮) Knolles, cont, Rycaut, ২খ, স্থা.; Hist. Mss. Comm, Report on Finch MSS (দেখুন উপরে), ১খ. (লন্ডন ১৯১৩ খৃ.) ২০১ প.; (১৯২২ খৃ.), ৬২-১৬৬, স্থা. (avanias on English as Kapudan Pasha, কা'ইম মাকাম ও প্রধান উযীর); (১৯) G. F. Abbot, Under the Turk in Constantinople, লন্ডন ১৯২০ খৃ. ১০৮৯/১৬৭৮ সালের চেহরিন অভিযানের উপর অপ্রকাশিত 'তুর্কী সূত্রের জন্যে দ্র. (২০) আগাসিরুরি লেভেন্ত, গাযাভাত না মেলের, আঙ্কারা ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১২৯-৩০ (একটি ছদ্মনামা relazione) এবং পৃ. ১৩০; (২১) 'আবদু'ল-কারীম, আহওয়াল-ই সেফের-ই চেহরিন; আরও (২২) J. Blaskovic, Die arabische, turkische und persische Hss. der Universitatsbibl, in Bratislava, 1961, 346-52; (২৩) 'আলী বেগ আল-উযিচেভি, গাযা নামে-ই চেহরিন-এর ব্যাপক উল্লেখ, লেখক গ্রন্থটি কারা মুসতাফা পাশার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভিয়েনার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত 'উছমানী দলীলসমূহ জরিপ ও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। (২৪) Richard F. Kreutel, Osmanische Berichte uber Kara Mustafas Feldzug gegen Wion প্রবন্ধে, WI, NS xxi/4 (1969). 196-227. অবরোধের বিভিন্ন বিবরণ পাশ্চাত্যভাষায় লিখিত গ্রন্থে বর্তমান ঃ অতি সাম্প্রতিককালের (২৫) John Stoye, The Siege of Vienna, লণ্ডন ১৯৬৪ খৃ. এবং (২৬) Thomas W. Barker, Double Eagle and Crescent, Albany, N. Y. 1967; আরও তু. (২৭) Camesina (1865); (২৮) Klopp (1882) এবং (২৯) von Renner ও Toifel (1883), পাশ্চাত্যের সমসাময়িক পুস্তিকা সাহিত্য, যাহার কিছুটা রোমঞ্চকর ও সম্পূর্ণ অনির্ভর, এইগুলি সংখ্যায় অনেক। ভিয়েনা অভিযানকালে কারা মুসতাফা পাশা কর্তৃক জারীকৃত বেয়ান-নামে বা (আত্মসমর্পণের আহ্বান) তথ্যের জন্য দেখুন ঃ (৩০) খালীল এদহেম, (এলদেম), কারা মুসতাফা পাশানিন শোপরোন আহালিসিনে বেয়ান নামেসি, TOEM-এ, সংখ্যা ১৬-১৭; (৩১) J. H. Mordtmann Die Kapitulation von Konstantinopel im J. 1453, BZ-এ, xxi (1912); (৩২) Knolles, cont. Rycaut, ২খ, ২৯০-তে বেয়ান নামে ভিয়েনাবাসীদের প্রতি সম্ভাষণ, ইংরেজী অনুবাদ।

C. J. Heywood (E. I.[2])/আ. ফ. ম. আমীনুল হক

কারা য়াযীজী (قرا يزيجى) ঃ (?৯৪৭-১০১১/? ১৫৪০-১৬০২). আসল নাম 'আবদু'ল-হালীম, তুরস্কের জালালী বিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা সুবিদিত নেতৃবৃন্দের অন্যতম। পূর্বে ধারণা করা হইয়াছিল যে, তিনিই এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তথ্যানুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হন যখন এই বিদ্রোহ তীব্র হইয়া ওঠে। তাঁহার জীবন-কথা সম্পর্কে অতি সামান্যই জানা যায়। হুসায়ন হুসামু'দ-দীন (আমাস্য়া তারীখি, ৩খ, ৩৪৮) বলেন, তাঁহার পিতা ছিলেন এডেসাবাসী 'আলী জনৈক তুর্কমান। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর আর্মেনীয় লেখক আরাকেল (Arakel দ্র. Brosset, Collection d'historiens armeniens ঃ Arakel de Tauriz, 359) তাঁহাকে চোরুম-এর জনৈক তুর্কীর পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ইতিহাস অনুসারে সঠিক।

কারা য়াযীজী'র বেসামরিক কার্যকলাপ কি ছিল তাহা অস্পষ্ট; একজন বিশিষ্ট বিদ্রোহী নেতা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার কথা বড় একটা শোনা যায় নাই। সমসাময়িক বহু তুর্কী যুবকের ন্যায় তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া সেক্বান (সৈনিক) হিসাবে কোনও সান্জাকবেগ (জিলা গভর্নর)-এর অনুগামীদলে যোগ দেন। ৯৭২/১৫৬৫ সালে সর্বপ্রথম তাঁহার নাম দিভ্রিক-এর সানজাকবেগ কাসিম বেগ-এর অন্যতম সুবাশী (পুলিশ অধীক্ষক)-রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। 'উছমানী সুলতান ৩য় মুরাদের রাজত্বকালে কারা য়াযীজী তাঁহার স্কোয়াড্রেনের সহিত দামিশক-এর দুর্গে কর্মরত ছিলেন (তিনি ইতিপূর্বে কাপুকুলী বাহিনীর একটি অশ্বারোহী বোলুক্ বা স্কোয়াড্রনে ভর্তি হন)। অল্পদিন পরে তিনি আনাতোলিয়ায় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাকে মালাতিয়া-র সান্জাক-এর একটি স্কোয়াড্রনের সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। ১০০৩/১৫৯৫ সালে মালাতিয়ার গভর্নরকে সুলতান ৩য় মুহাম্মাদের এগ্রি অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য ডাকিয়া আনিলে কারা য়াযীজী গভর্নরের প্রতিনিধিরূপে মালাতিয়ায় থাকিয়া যান। এগ্রি অভিযানের প্রস্তুতি চলাকালে জালালী বিদ্রোহ অকস্মাৎ শক্তি সঞ্চয় করত চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। সরকার এই পরিস্থিতিতে এগ্রি অভিযানে যোগ দেন নাই এমন সকল তীমার (=সামন্তসেনা) ও তাহাদের অধীনস্থদিগকে (প্রতিটি গ্রামের যুবকবৃন্দ) লইয়া কতিপয় স্বেচ্ছাসেবী স্কোয়াড্রন গঠন করিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন। কারা য়াযীজী ও তাঁহার সান্জাক-এর স্বেচ্ছাসেবী স্কোয়াড্রনগুলিও জালালী বিদ্রোহীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ পাইলেন। ১০০৩/১৫৯৫ সালে কারা য়াযীজীকে তার্সূস্ ও সিলিফ্কে'র মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে সমবেত বিদ্রোহী মাদরাসা ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের সহিত যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হইল। ইতোমধ্যে মালাতিয়া জিলার দায়িত্বভার অপর একজন সান্জাক-বেগকে দেওয়া হইয়াছিল। ফলে কারা য়াযীজী ও মালাতিয়ার প্রাক্তন সানজাক বেগ তাঁহাদের চাকুরীচ্যুতির সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহারা নবনিযুক্ত সন্জাক বেগ-এর পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণে আগত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করিলেন। এইরূপ আচরণের মাধ্যমে সরকারী আদেশের বিরোধিতা করিয়া (১৫৯৮ খৃ.) কারা য়াযীজী জালালী বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিলেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনানিবাসগুলি সম্প্রসারিত করিলেন

এবং অল্পকালের মধ্যেই একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী নেতার মর্যাদা লাভ করিলেন। অন্যান্য যাঁহারা জালালী বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়াছিলেন [ইঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন কাপু-কুলী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ যুভারি ইস্তাম্বুলে সরকারী জানিসারী বাহিনীর সঙ্গে আর অধিকাল একত্রে থাকিতে না পারিয়া আনাতোলিয়ায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সান্‌জাক-বেগ ও বেগ্‌লার-বেগ পদ মর্যাদার প্রশাসকদের কাপু-আগা অর্থাৎ সেক্‌বান বা সাধারণ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের পদে নিযুক্ত ছিলেন] তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারী নির্যাতনের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কারা য়াযীজী'র দলে যোগ দিতে শুরু করিলেন। এই সময় সরকার কর্তৃক জালালী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানিতে পারিয়া কারা য়াযীজী মার'আশ-এডেসা অঞ্চলে সরিয়া গেলেন। এই অঞ্চলটিতে ছিল বহুকাল যাবৎ অরাজক জীবন যাপনকারী দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলীয় তুর্কমান গোষ্ঠীর লোকদের ঘনবসতি। ঐ সময় কারমান অঞ্চলে বসবাসকরত বিদ্রোহী প্রাক্তন বেগ্‌লারবেগ হুসায়ন পাশাও এখানে তাঁহার দলে যোগ দেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কারা য়াযীজী'র নেতৃত্বাধীনে মোট ২০,০০০ সেক্‌বান ছিল। মার'আশ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সান্‌জাক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সরকারী সেনাদলকে পরাজিত করিয়া কারা য়াযীজী এই সময় বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহিনীর লোকজনদের জন্য বলপূর্বক খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ শুরু করা বহু সম্পদশালী ব্যক্তি ইস্তাম্বুলে পলায়ন করেন এবং সেখানে এক সরকারী বিরোধী বিক্ষোভের আয়োজন করেন। তুর্কী সরকার তখন উযীর সিনান পাশা যাদে মুহাম্মাদ পাশাকে একটি বেশ বড় আকারের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই পরিস্থিতিতে কারা য়াযীজী এডেসা দুর্গ দখল করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিলে সরকারী বাহিনী তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। কিন্তু কোনও পক্ষই বিজয় লাভ করিতে সমর্থ না হওয়ায় তুর্কী সরকার বিদ্রোহী নেতার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া প্রাক্তন বেগ্‌লার-বেগ বিদ্রোহী হুসায়ন পাশাকে সরকারের হস্তে অর্পণের পরিবর্তে কারা য়াযীজীকে 'আয়ন্‌তাব-এর সান্‌জাক-বেগ-এর পদ প্রদান করিলেন। অল্পকাল পরে মুহাম্মাদ পাশা পুনরায় কারা য়াযীজীকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিপুল ক্ষতি হইল এবং বিদ্রোহী নেতা সিভাস্-এর দিকে সরিয়া গেলেন। পুনরায় সরকার তাঁহার সহিত আপোস করিলেন এবং তাঁহাকে আমাসিয়া-এর সান্‌জাক-বেয়ি-র অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হইল। ১০০৯/১৬০১ সালে সিনান পাশা যাদে মুহাম্মাদ পাশাকে এই কারণে পদচ্যুত করা হইল যে, তাঁহার সৈন্যরাও যে জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে এবং জালালী বিদ্রোহীদের অপেক্ষাও তাহারা বেশী অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে এই কথা তিনি সরকারকে জানান নাই। আমাসিয়া-র জনসাধারণ ক্রমবর্ধমান হারে কারা য়াযীজী'র বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ উত্থাপন করিতে লাগিলে তাঁহাকেও চোরুম-এর সানজাক বেগিরূপে বদলী করা হইল এবং তারসুস ও সিলিফ্‌কে-র মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছাত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য সংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে যোগদানের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু পুনরায় তিনি বিদ্রোহ করিলেন। যে বিপুল সংখ্যক সেক্‌বান তিনি একত্র করিয়াছিলেন তাহাদের রসদ সরবরাহের প্রয়োজনে তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে পূর্বের ন্যায় খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যে সমস্ত শহর ঘেরাও করিতে পারিলেন সেগুলি হইতে মুক্তিপণ দাবী করিতে লাগিলেন—যেরূপ ১০০৯/১৬০১ সালের বসন্তকালে সিভাস-এর বেলায় করা হইয়াছিল। কারা য়াযীজী কাস্‌তামন দুর্গ দখল করিয়া সেখানে নিজের সৈন্যদের রাখিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এই সময় তুর্কী সরকার তাঁহার কার্যকলাপ একেবারে খতম করিয়া ফেলার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং বাগদাদের ওয়ালী সোকোল্লি যাদে হাসান পাশা (দ্র.)-কে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই সেনাপতির বাহিনীর মূল অংশে ছিল প্রচণ্ড গোত্রীয় মনোভাবাপন্ন দক্ষিণাঞ্চলের কুর্দী ও আরব সৈন্যরা। ইহা ছাড়া ইস্তাম্বুল হইতে কাপুকুলী সৈন্যদের একটি বৃহৎ দলকেও পাঠান হইল আলেপ্পোর প্রাক্তন ওয়ালী হাজ্জী ইব্‌রাহীম পাশার নেতৃত্বে। কিন্তু কায়সারিয়া'র নিকটে হাজ্জী ইবরাহীম পাশা প্রধান সরকারী বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই কারা য়াযীজী তাঁহার বিরুদ্ধে এক অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া সরকারী বাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধন করিলেন। ইহার ফলে হাজ্জী পাশা পশ্চাদপসরণ করিয়া কায়সারিয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। হাসান পাশা দিয়ার বাক্‌র-এ তাঁহার আরব ও কুর্দী সৈন্যদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখিতেই হিমশিম খাইতেছিলেন। হাজ্জী ইব্‌রাহীম পাশার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিতে তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব হইল। বিদ্রোহী নেতা কারা য়াযীজী কায়সারিয়া দুর্গের সৈন্যদিগকে আর হয়রান না করিয়া মার'আশগোক্‌সূন এলাকায় চলিয়া গেলেন। এইখানে হাসান পাশার বাহিনীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে জালালী সেক্‌বান সৈন্যরা ভীষণভাবে পরাজিত হইল। অতঃপর কারা য়াযীজী তাঁহার বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে লইয়া পলায়ন করিলেন এবং জানীক (সামসুন)-এর নিকটবর্তী পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৩ খৃ. শুরুতে সেইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা দেলি হাসান তাঁহার স্থলে জালালী বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

কারা য়াযীজী আনাতোলিয়ার একটি বৃহৎ অংশ তিন বৎসর কাল সাফল্যজনকভাবে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে পারায় ইস্তাম্বুলে তাঁহার শত্রুরা সন্দেহ করিতে লাগিল তিনি হয়ত একটি নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। আনাতোলিয়া হইতে যে সমস্ত ধনবান ব্যক্তি ইস্তাম্বুলে পলায়ন করেন তাঁহারা সরকারকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই গুজব রটাইয়া দিলেন। কারা য়াযীজী কোনও ফরমান জারী করেন নাই, সরকারের জানিসারি বাহিনীর ন্যায় কোনও বিশেষ সেনাদলও গঠন করেন নাই, নিজের কোন প্রধান মন্ত্রীও নিয়োগ করেন নাই। কারা য়াযীজী'র পরাজয়ের পর সেক্‌বান ও অন্যান্য যে সমস্ত জালালী নেতা তাঁহাকে যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ধরা পড়িয়া বিচারের সম্মুখীন হইলেন তাঁহাদের দেওয়া বিবৃতি এবং কারা য়াযীজী সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সীলমোহর করা ও স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কারা য়াযীজী'র স্বাধীন ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়ের কথাবার্তা সমস্তই কল্পনাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) না'ঈমা, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮০ হি., ২খ; (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ এদিরনেবী, নুখ্‌বাতু'ত-তাওয়ারীখ ওয়া'ল-আখবার, ইস্তাম্বুল ১২৭৬ হি.; (৩) মুনাজ্জিম বাশী; (৪) মুস্‌তাফা নূরী, নাতা'ইজু'ল-উকূ'আত, ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি.; (৫) 'আলী' কুন্‌হু'ল-আখ্‌বার (নূর ওসমানিয়্যা লাইব্রেরী, ৩৪০৯); (৬) 'আত'ঈ,যায়ল-ই শাকা'ইক

(নূর ওসমানিয়্যা লাইব্রেরী, ৩৩১৪); (৭) হাসান বে-যাদে, তেলখীস'-ই তাজু'ত-তাওয়ারীখ (নূর ওসমানিয়্যা লাইব্রেরী, ৩১৩৪); (৮) Basbakanlik Arisvi, Divan kayit defterleri no. 133, fol 104; (৯) Kamil Kepeci tasnifi, Ahkam defteri no. 70, fol. 440, 494, 499, 639; (১০) Bursa ser'iyye sicilleri no. B 136/351. fol 108; (১১) A. Tveritinova, Vosstaniye Kara Yazidzi-Deli Hasan v Turtsii, মস্কো ১৯৪৬ খৃ.; (১২) M. Akdag, Celali isyanlari, আঙ্কারা ১৯৬৩ খৃ.; (১৩) Hammer Purgstall, GOR. iv, 304-5.

Mustafa Akdag (E.I.^{2})/শায়খ ফজলুর রহমান

কারা-সূ (দ্র. আল-ফুরাত)

কারাসূ-বাযার (দ্র. কারাসূ-বাযার)

আল-কারাক (الكرك) ঃ মরু সাগরের পূর্ব দিকে প্রায় ৩,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত প্রাচীন মোয়াব (Moab) অঞ্চলের একটি দুর্গ। এই নামটি আরামী শব্দ 'কারখা' হইতে গৃহীত যাহার অর্থ 'শহর' এবং টলেমীর লেখায় (v, 16, 4), মাদাবা'র মোজাইক মানচিত্রে এবং বায়যানটিয়ামের Stephen-এর লেখায় ইহার Karakhmsba রূপে উল্লেখ দেখা যায়। মূল পর্বত হইতে একটি সংকীর্ণ ও কৃত্রিমভাবে গভীরকৃত দুর্গপরিখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন শৈল শ্রেণীর মধ্যে উদ্গত, খাড়া পাত্রবিশিষ্ট এক পর্বতপৃষ্ঠে ইহার অবস্থান ইহাকে অসাধারণ শক্তিশালী একটি স্থানে পরিণত করিয়াছে। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, জর্দানের পূর্ব দিকের এলাকাসমূহে কিংবা তাহার পরবর্তী শতাব্দীসমূহেও ইহার সম্পর্কে আমরা কিছু শুনিতে পাই না। কেবল ক্রুসেডসমূহের যুগে যখন ১১৪২ সনে রাজা ফুল্ক (King Fulk)-এর প্রাক্তন পান পরিবেশক পায়েন (Payen) ইহাকে সুরক্ষিত করেন, তখন ইহা বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখন ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ের ফ্রাঙ্কগণ (Franks = জার্মান জাতির শাখা বিশেষ) ভূগোল সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তাহারা সেখানে প্রাচীন পেট্রা-র অবস্থান নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন এবং ইহাকে পেত্রা ডেজার্টি (Petra deserti) নামে অভিহিত করেন। এই দুর্গ যেহেতু দামিশক হইতে মক্কাগামী হাজ্জের পথ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী বাণিজ্যিক কাফেলার পথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, কাজেই ইহা মুসলমানগণের জন্য অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। ১১৭৬ হইতে ১১৮৭ সালে যখন ইহা শাটিল্লোন-এর রেনাউড (Reynaud of Chatillon)-এর অধীনে ছিল, তখন মুসলিম দেশগুলির জন্য ইহা বিশেষ ভীতির ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল এই সময়েই রেনাউড্ দক্ষিণ দিকে আরব অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করেন এবং যদিও ইহা ব্যর্থ হয়, তবুও মুসলমানগণের মধ্যে ইহা খুবই উদ্বেগের সৃষ্টি করে। কারণ মুসলমানগণ ইহাকে পবিত্র নগরীসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া মনে করিত, কিন্তু বাস্তবে ইহা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি অভিযান ছিল।

৫৬৫/১১৭০ সাল হইতে নূরু'দ-দীন ও সালাহু'দ-দীন এই দুর্গের অবরোধ আরম্ভ করেন; আল-কারাক-এ মুসলমানগণের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের এই অবরোধ প্রথম দিকে সফল হয় নাই, অবশেষে খাদ্যাভাব ঘটায় ৫৮৪/১১৮৮ সালে দুর্গের সৈন্যদল সালাহু'দ-দীনের ভাই আল-মালিকু'ল-'আদিলের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সালাহু'দ-দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় ইহা আবার তাঁহার ভাই আল-মালিকু'ল-'আদিলের অংশে পড়ে। অতঃপর ইহা দীর্ঘদিন আয়্যূবী বংশের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁহাদের শাসনের অবসান ঘটিবার পরও আমীর আল-মুগীছ 'উমার আল-কারাক-এ অবস্থান করিতে থাকেন, কিন্তু অবশেষে ৬৬১/১২৬৩ সাল সুলতান বায়বারস (Baybars) বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন ও তাঁহার শিরশ্ছেদ করান।

মামলূক সুলতান আন-নাসির ৭০৮/১৩০৯ সালে যখন কায়রো হইতে পলায়ন করেন, তখন তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য এই দুর্গের শক্তিশালী প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বিভিন্ন মাম্লাকাতে (রাজ্যে) বিভক্ত ছিল এবং আল-কারাক সেই সময় এইরূপ এক রাজ্যের প্রধান নগর (Chef-lieu) ছিল। আরব গ্রন্থকারগণের প্রদত্ত বর্ণনা হইতে সেই সময়ে এই দুর্গ যে কত শক্তিশালী ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি; স্থানীয় অধিবাসীগণ তখনও আংশিকভাবে খৃষ্টান ছিল। 'উছমানী শাসক আমলে আল-কারাক তাহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। ১৮৪০ খৃ. ইবরাহীম পাশা উহা দখল করেন এবং উহার প্রাচীরের অংশবিশেষ ধ্বংস করিয়া দেন; ইহার পর 'উছমানীগণ পুনরায় ইহা দখল করেন এবং ১৮৯৩-এর পর তাঁহারা সেখানে বিভিন্ন সরকারী ভবন নির্মাণ করেন। একটি প্রশাসনিক জিলার কেন্দ্র হিসাবে ১৯৭৩ সালে আল-কারাকের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। শহরের মধ্যে ও সন্নিহিত দুর্গে ক্রুসেডারদের এবং পরবর্তী সময়ের ইসলামী ভবনসমূহের নিদর্শনাদি পার্থক্য করা মাঝে মাঝে কঠিন হইয়া ওঠে। কারণ উভয়ই প্রাচীন অবকাঠামোর উপর নির্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা নিঃসন্দেহ যে, দুর্গের মধ্যস্থিত কারাগার ও নিম্নের আদালত প্রাঙ্গণ পরিবেষ্টনকারী বহিঃপ্রাচীন মূলত মুসলমানগণ দ্বারা নির্মিত এবং ইহাদের নির্মাণের তারিখ বায়বারসের সময়কার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Due de Luynes, Voyage d'exploration a la Mer Morte, Paris 1871-6, i, 99 প., ii,106 প., (২) A. Musil, Arabia Petraea, Vienna 1907-8, i, 45-62; (৩) F. M. Abel, Geographie de la Palestine, Paris 1938, ii, 418-19; (৪) Blue Guide, the Middle East, Paris 1966, 555-6; (৫) p. Deschamps, Les chateaux des Croises en Terre-Sainte, ii, La defense du royaume de Jerusalem, Paris 1939, 35-98; (৬) W. Muller-Wiener, Burgen der Kreuzritter im heiligen Land Munich-Berlin 1966, 49-50; (৭) K. M. Setton (ed). A history of the Crusades, i, philadelphia 1955, index; (৮) A. S. Ehrenkreutz, Saladin Albany 1972, index; (৯) N. Eliseeff, Nur ad-Din, Beirut 1967, index; (১০) H. L. Gottschalk, Al-Malik al-Kamil von Egypten und seine Zeit, Wiesbaden 1958, index; (১১) RCEA, nos. 3801, 3965, 4733, 4734.

আরবী উৎসসমূহ ঃ (১২) A. S. Marmadji, Textes geographiques arabes sur la Palestine, Palestine, Paris 1951, দ্র.; (১৩) য়াকূ'ত, ৪খ, ৬২২; (১৪) ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্‌লা নির্ঘণ্ট; (১৫) ইবনু'ল-আছীর, নির্ঘণ্ট; (১৬) ইব্‌ন ওয়াসীল, মুফার্‌রিজু'ল-কুরূব, কায়রো ১৯৫৩-৬০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৭) 'ইমাদু'দ-দীন আল-ইসফাহানী, Conquete de la Syrie et de la Palestine par Saladin, অনু. H. Masse, Paris 1972, index; (১৮) দিমাশ্‌কী, সম্পা. মেহ্‌রেন, ২১৩; (১৯) ইব্‌ন বাত্তূতা, ১খ, ২৫৫; (২০) Gaudefroy Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks, Paris 1923, index; (২১) খালীল আল-জাহিরী, যুবদাতু কাশফি'ল-মামালিক, সম্পা. Ravaisse, Paris 1894; (২২) R. Hartmann, Die geographischen Nachrichten uber Palastina und Syrien in Halil al-Zahiris Zubdat kasf al-mamalik, Tubingen 1907, 44-5; (২৩) J. Gaulmier, La Zubda Kachf al-Mamalik de Khalil al-Zahiri, Beirut 1950, index.

D. Sourdel (E. I.^{2})/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারাক নূহ্ (كرك نوح) ঃ লেবাননের বিকা'-এর অন্তর্গত একটি গ্রাম, যাহা লেবানন পর্বতের পাদদেশে এবং বা'লাবাক্কগামী সড়কের উপর 'যাহ্‌লে' নামক স্থান হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। আয়্যূবী শাসনামলের গ্রন্থকারগণ ইহাকে 'আল-কারাক' নামে অভিহিত করিতেন, কিন্তু পরে মামলূক শাসনামলে ইহার নাম হয় 'কারাক নূহ্।' প্রকৃতপক্ষে ইহাকে নূহ্ (আ)-এর কবর এলাকা হিসাবে বিবেচনা করা হইত, যাহা এখনও সেই হিসাবে দেখানো হইয়া থাকে এবং যাহা স্পষ্টত ইতিপূর্বে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ভূগোলবিদ আল-মুকাদ্দাসী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। নূহ্ (আ)-এর স্মৃতিস্তম্ভের প্রস্তর ধারণকারী বলিয়া বিবেচিত অস্বাভাবিক লম্বা সৌধটি একটি প্রার্থনা গৃহকে তিনটি নিভৃত কক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, যাহার দেওয়াল ও স্তম্ভসমূহের গায়ে ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষের দিকে সেই সৌধটির নির্মাণ বিষয়ে এবং বিভিন্ন করের বিলোপ সাধন সংক্রান্ত ডিক্রীসমূহের বর্ণনা প্রদান করিয়া মামলূক শাসনামলের বিভিন্ন লিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। এইগুলির বিদ্যমানতা হইতে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, কারাক নূহ মামলূক শাসনামলে দুই বিকা'-এর প্রধান শহর (chef-lieu) ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Sourdel-Thomine, Inscriptions arabes de karak Nuh, in BEO, xiii (1949-50), 71-84 (ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের সূত্রের উল্লেখসহ)।

D. Sourdel (E. I. 2)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারকায় (দ্র. কারাকোল)

কারা কাল্‌পাক (قره قلپاق) ঃ (তুর্কী, কাল টুপি পরিহিত), মধ্যে এশিয়ার তুর্কী সম্প্রদায়ের একটি গোত্র। রুশীয় ইতিবৃত্তিতে দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতেই এই নামের (Cerniye Klobutsi) একজন লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু এই "কাল টুপি"গুলি [Black hats] ও আধুনিক কারাকালপাক একই কি না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দী শেষ না হওয়া পর্যন্ত মধ্যে এশিয়ায় কারাকালপাকদের বিবরণ পাওয়া যায় না। স্কিবিন ও ট্রোশিন [Skibin and Troshin] দূতাবাস রিপোর্ট অনুসারে তাঁহারা তখন তুর্কিস্তান শহর হইতে নিম্ন দিকে দশ দিনের পথ সীর দরিয়ার তীরে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহারা আবার ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে খীবার খানদের রাষ্ট্রের প্রতিবেশী হিসাবে উল্লিখিত; আনু. ১৭২২ খৃ. রাষ্ট্রদূত ভারশিনিন (Vershinin) কর্তৃক মহান পিটার (Peter the great) ও কারাকাল পাকের খান আবু'ল-মুজাফ্‌ফার সা'আদাত 'ইনায়াত মুহাম্মাদ বাহাদুরের মধ্যে একটি সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল (Polnoye Sobroniye Zakonov, ১৭২২, নং ৪১০১। ঐ সময় কারাকালপাকগণ শুধু পশুপালন ও লুটতরাজের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেন না, বরং কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের জমিতে পানি সেচের মাধ্যমে কৃষিকাজ করিয়া এবং আরাল সাগরে মৎস্য শিকার করিয়াও জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাও বলা হয় যে, তাহারা ভল্গা (volga) অঞ্চল হইতে মধ্য এশিয়ায় অভিপ্রয়াণ করে। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় কারাকালপাকের শীত প্রধান অঞ্চলের একটি দল সীর দারিয়ার মধ্যবর্তী খাওয়াস এলাকায় (Ura Tube-এর উমর) অবস্থান করিতেছিলেন। এই কারাকালপাকদের শাসক (Tura) ১১৬৮/ ১৭৫৫ সনে বুখারার আতালীক মুহাম্মাদ রাহীমের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ৩,০০০ কারাকালপাক পরিবার সামারকান্দে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে কারাকালপাকগণ সীর দরিয়ার নিম্নভূমি হইতে কাযাকীদের দ্বারা বিতাড়িত হন; কুঙ্গরাতের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (১২২২-৬/১৮০৭-১১) খীবার খান মুহাম্মাদ রাহীমের সামরিক অভিযান সম্বন্ধীয় সূত্রে য়েনী দরিয়ার একটু দক্ষিণে উনিশ শতকেও তাহাদের (কারাকালপাক) উল্লেখ পাওয়া যায়। কারাকালপাকগণ তখন কুঙ্গরাতের খানের প্রজা ছিলেন। খীবার সহিত কুঙ্গরাত একত্র হওয়ার পর (১২২৬/১৮১১) কারাকালপাকদিগকেও খীবার খানের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এই অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমনকি তাঁহারা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কুঙ্গরাত শহরটি সাময়িকভাবে অধিকারও করিয়াছিলেন। এই অভ্যুত্থান দমিত হইয়া যাইবার পর, তাঁহাদের একদল লোক দেশত্যাগ করিয়া ফারগানায় গিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী কারাকালপবীকদের নেতা ইর-নাজারা, যেখানে কাযাক নদী আরাল সাগরে পতিত হইয়াছে, তাহার নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া 'খান' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার খীবা বিজয়ের পরে খানকে আমূ দরিয়ার প্রধান শাখার পূর্বাংশের প্রায় সবটুকু এবং ইহার ব-দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকসহ সমগ্র ভূভাগের অধিকার রাশিয়ার কাছে ছাড়িয়া দিলে কারাকালপাকের সমগ্র ভূভাগও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ অঞ্চলটি তখন খীবা হইতে পৃথক হইয়া যায়। উহা প্রথমে একটি পৃথক বিভাগ (Otdyel) হিসাবে শাসিত হয় এবং পরে সীর দরিয়ার 'সরকারে'র একটি অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১১ মে তারিখে কারাকালপাক স্বায়ত্তশাসিত কাযাক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রের (A.S.S.R) অংশ হিসাবে গঠিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২০ মার্চ ইহার মর্যাদা পরিবর্তিত হয়। স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক (A.S.S.R.) হিসাবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর এই স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক (A.S.S.R.) উযবেক সোভিয়েত

সোসালিস্ট রিপাবলিক (Uzbek S. S. R.)-এ রূপান্তরিত হয়। কারাকালপাক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (A.S.S.R.)-এর রাজধানী হইল নুকুস। বিপ্লবের সময় যে কারাকালপাক কাযাকীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে (এবং উযবেকদের দ্বারা স্বল্প পরিমাণে) একত্র হইতে চলিয়াছিল সোভিয়েত জান্তা কর্তৃক তাহারা একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল। ভাষার দিক দিয়া কারাকালপাক ভাষা শুধু কাযাকীদের একটি কথ্য ভাষা; তাঁহাদের গোত্রীয় বিভাগও কাযাকীদের অনুরূপ। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া কারাকালপাক ভাষা লিখিত (অর্থাৎ সাহিত্যানুশীলদের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়) হয়; ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ল্যাটিন বর্ণমালায় পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা সিরিলিক (Cyrillic) বর্ণমালায় লিখিত হইতেছে। ১৯৭০ সনের সোভিয়েত আদম শুমারীতে ২,৩৬,০০৯ জন কারাকালপাককে ইউ. এস. আর. (U.S.S.R.)-এর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ২,৩০,২৫৮ (৯৭-৬%) জন উযবেক সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিকে (Ujbek S. S. R) বাস করিতেছেন এবং এই শেষোক্তদের ২১৭,৫০৫ (মোট সোভিয়েত কারাকালপাক জনসংখ্যার ৯২.২%) কারাকালপাক, স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত রিপাবলিকে (A.S.S.R.) বাস করিতেছেন ৮,৬৬৮ জন বুখারা অবলাস্টে [Oblast], ১৪২৮ জন তাশকন্দে এবং ৭৩২ জন ফারগানা অঞ্চলে বাস করিতেছেন (ফারগানা কারাকালপাকগণ দ্রুত উযবেকদের অঙ্গীভূত হইতেছে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Vambery, Das Turkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Bezichungen Leipzig ১৮৮৫ খৃ. ৩৭৩; (২) S. A. Tokarev, Etnografiva Narodov S. S. S. R. মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮ খৃ.; (৩) Narodi Sredney Aziii Kazakistana, বিজ্ঞান একাডেমী, মস্কো ১৯৬২ খৃ., ১খ, তাহাদের ভাষার জন্য; (৪) K. H. Menges in PhTF, i. 434-88 (bibl. at p. 438). und cf. ii, 761.; (৫) E. I.^{2}, 4/610; (৬) দা. মা. ই., ১৬/২খ, ৮৫-৬।

(W. Barthold-[R. Wixman]) (E. I.^{2})/
এ. বি. এম আবদুল মান্নান মিয়া

আল-কারাকী (الكركى)ঃ নূরু'দ-দীন 'আলী ইব্নু'ল-হুসায়ন ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আলী আল-'আমিলী, আল-কারাকী, শা'আ ইমামী সম্প্রদায়ের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি সম্ভবত ৮৭০/১৪৬৬ সালে কিংবা ইহার পূর্বে এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিস্বা আল-কারাকী আল-বিকা'-এর অন্তর্গত কারাক নূহ্ হইতে উদ্ভূত যেখানে তিনি প্রধানত 'আলী ইব্ন হিলাল আল-জাযা'ইরীর অধীনে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মিসরও সফর করেন এবং সেখানে কিছু সুন্নী 'আলিমের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। ৯০৯/১৫০৪ সালের দিকে তিনি আননাজাফ-এ বসতি আরম্ভ করেন এবং ৯১০/১৫০৪-৫ সালের শীতকালে তিনি ইস্ফাহানে সাফাবী শাহ্ ইস্মা'ঈলের দরবারে সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন। নাজাফের অন্যান্য ইমামী পণ্ডিতগণের সহিত ৯১৬-১৭/১৫১০-১১ সালে তিনি হারাত এবং মাশ্হাদ গমনের জন্য শাহ ইসমা'ঈলের একটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পারস্যের নব-বিজিত পূর্ব প্রদেশসমূহে ইমামিয়া মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণের জন্য শাহ ইস্মা'ঈল তাঁহাদিগকে এই আমন্ত্রণ জানান। কথিত আছে যে, পরবর্তী কালে শাহ্ ইস্মা'ঈল শিক্ষা দান কার্যে ব্যয় নির্বাহ এবং ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য নাজাফে আল-কারাকীর নিকট বার্ষিক ৭০,০০০ দীনার প্রেরণ করিতেন। ৯৩০/১৫২৪ সালে শাহ ইসমা'ঈলের স্থলাভিষিক্ত শাহ তাহ্মাস্পের শাসনামলে তিনি (আল-কারাকী) অন্তত আরও দুইবার সাফারী রাজদরবারে গমন করেন। শাহ্ তাহ্মাস্প সরকারীভাবে তাঁহাকে মুজতাহিদদের সীলমোহর (খাতামু'ল-মুজতাহিদীন) ও ইমামের প্রতিনিধি (না'ইবু'ল-ইমাম) হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন এবং তাঁহাকে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আল কারাকী ভূমি কর নির্ধারণের বিষয়ে গর্ভনরগণকে নির্দেশিকা প্রদান করেন, সালাত পরিচালনায় জনসাধারণকে শিক্ষা দানের সর্বক্ষেত্রে সুন্নী 'আলিমগণকে অপসারণ করিবার এবং শী'আ ইমাম নিয়োগের আদেশ দেন। ভূপৃষ্ঠের মাপ সম্পর্কে তাঁহার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তিনি পারস্যের কতিপয় শহরের কিব্লার সংশোধন করেন। তিনি সাদ্র গিয়াছু'দ-দীন আদ-দাশতাকী-র সহিত এক বিতর্কে এই পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন। শাহ্ তাহ্মাস্প আল-কারাকীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া ৯৩৮/১৫৩১-২ সালে গিয়াছু'দ-দীনকে বরখাস্ত করেন এবং আল-কারাকীর সুপারিশক্রমে তাঁহারই এক ছাত্র মু'ইয্যু'দ-দীন আল-ইসফাহানীকে গিয়াছু'দ-দীনের স্থানে সাদ্র নিয়োগ করেন। শাহী দরবারে মু'ইয্যু'দ-দীনের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য আল-কারাকী নিজেই 'সাদ্র' হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিবৃন্দ ও অধস্তনদের চাকুরীতে নিয়োগ করিতেন। বিভিন্ন সূত্র কর্তৃক উদ্ধৃত ৯৩৯/১৫৩২-৩ সালের একটি ফরমানে সম্ভবত এই অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। এই ফরমানে শাহ্ তাহ্মাসপ তাঁহাকে সাফাবী রাজ্যের ধর্মীয় কর্মকর্তাবৃন্দের নিয়োগ ও বরখাস্তের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং নাজাফ এলাকায় এক বিরাট ভূ-সম্পত্তি বংশগত ওয়াক্ফ্ হিসাবে তাঁহাকে দান করেন। ইহার বাৎসরিক আয় ছিল ৭০০ তুমান। আল-কারাকী যু'ল-হিজ্জা ৯৪০/জুলাই ১৫৩৪ নাজাফে ইনতিকাল করেন।

আল-মুহাক্কিক আল-হিল্লী রচিত শারা'ইউ'ল-ইসলাম-এর মতো প্রবর্তন আইন বিষয়ক গ্রন্থসমূহের উপর আল-কারাকী রচিত ভাষ্যসমূহের কোন কোনটি জনপ্রিয় শিক্ষামূলক পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের নিয়ম-বিধি সম্পর্কে লিখিত তাহার রিসালাতু'ল-জা'ফারিয়া গ্রন্থের উপর তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক ভাষ্য লিখিত হয় এবং তাহার সময়েই উক্ত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিতও হয়। তাঁহার অন্যান্য রচনা বিতর্কের সৃষ্টি করে। তাঁহার রিসালাত কাতি'আতু'ল-লাজাজ ফী তাহ্কীক হিল্লি'ল-খারাজ গ্রন্থে তিনি সরকার কর্তৃক খারাজ ভূমি মঞ্জুরী প্রদানের আইনগত বৈধতা সমর্থন করেন এবং ইহার দ্বারা তিনি এইরূপ মঞ্জুরী গ্রহণের জন্য তাঁহার সম্পর্কে যে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহার বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করেন। তাঁহার এই নিবন্ধ খণ্ডন করেন নাজাফের তীক্ষ্ণভাষী তাঁহার বিপক্ষ আল-ইবরাহীম আল-কাতাফী। আল-কাতাফী তাঁহার (আল-কারাকীর) অন্যান্য আরও কয়েকটি নিবন্ধের বক্তব্য খণ্ডন করেন; ঐগুলির মধ্যে একটি হইল 'রিসালা ফী সালাতি'ল-জুমু'আ, যাহাতে আল-কারাকী এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, শুক্রবারের জুমু'আ-র সালাত পড়া ইমামের অনুপস্থিতিতেও (গায়বা) বাধ্যতামূলক, যদি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ফাকীহ 'আলিম উপস্থিত থাকেন। তাঁহার

রিসালাতু নাফাহাতু'ল-লাহূত ফী লা'নি'ল-জিব্‌ত ওয়াত্-তাগূত গ্রন্থে তিনি হযরত আবূ বাক্‌র ও হযরত 'উমার (রা)-কে অভিশাপ দেওয়ার বৈধতা দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন এবং ইহার দ্বারা তিনি প্রাথমিক সাফাবীগণের অনুসৃত নীতির সমর্থন করেন যদিও অন্যান্য ইমামী বিদ্বানগণ ইহাকে তাকিয়া নীতির লংঘন বলিয়া ইহার অনুসরণে আপত্তি করেন। পরবর্তী কালের 'ইমামী অভিমত এই শেষোক্ত বিষয়ের ব্যক্তিক্রম ছাড়া, তাঁহার সমালোচকগণের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন এবং তাঁহাকে আল-মুহাক্কিক আছ-ছানী এই সম্মানজনক উপাধি প্রদান করেন।

সাফাবী বিরোধী সুন্নী প্রতিবাদকারিগণ ইমামী পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহাকেই তাঁহাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেন এবং তাঁহাকে দ্রুজ মতাবলম্বী হওয়া, অন্যান্য ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রচলিত ধর্মবিরোধী মতসমূহ হইতে একটি নূতন ধর্ম উদ্ভাবন করা, শাহ ইসমা'ঈলকে তাঁহার নিজের "মিথ্যা ধর্মে" দীক্ষিত করা এবং পারস্যের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক সালাত বিলুপ্ত করা প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাসান-ই রূমলূ, আহসানু'ত-তাওয়ারীখ, সম্পা. C. N. Seddon, i. Baroda 1931 190, 253-6, 304, 313, 398; (২) আত-তাফ্‌রিশী, নাক্‌দু'র-রিজাল, তেহরান ১৩১৮ হি., ২৩৮; (৩) নূরুল্লাহ্ শুশ্‌তারী, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, তেহরান ১২৯৯ হি., ৩৪, ২৪১, ৩৪০ প.; (৪) আল-হুররু'ল-'আমিলী, 'আমালু'ল-'আমিল, সম্পা. আহমাদ আল-হুসায়নী, বাগদাদ ১৩৮৫ হি., ১খ, ১২১ প.; (৫) আল-বাহ্‌রানী, লু'লু'আতু'ল-বাহ্‌রায়ন, সম্পা. মুহাম্মাদ সাদিক বাহ্‌রু'ল-'উলূম, নাজাফ ১৩৮৬/১৯৬৬, ১৫১-৪; (৬) আল-খানসারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, তেহরান ১৩৬৭ হি., ৩৯০-৪; (৭) মুহসিনু'ল-আমীন, আ'য়ানু'শ্-শী'আ, ৪১খ, বৈরূত তা. বি., ১৭৪-৮৭; (৮) আগা বুযুর্গ আত-তিহ্‌রান আয-যারী'আ" ইলা তাসানীফি'শ-শী'আ, ৫খ, তেহরান ১৩৬৩ হি.,৭২ প.; (৯) তাঁহার ইজাযাসমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রকাশিত হইয়াছে, আল-মাজলিসী, বিহারু'ল-আনওয়ার, ১০৮খ, ১৩৯১ হি., ৪০-৮৪; (১০) J. Matuz, L'accession au pouvoir des Safavides in Iranica, iv (1966), 33 প.; (১১) E. Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen Handschriften, Freiburg i. Br. 1970, নির্ঘণ্ট দ্র., 'Abd al-'Ali; (১২) E. Glassen, Schah Isma'il I. und die Theologen seine Zeit, in Isl. xlviii (1972), 262-8।

W. Madelung (E. I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারাকুম (قره قوم) ঃ (কারাকূম) তুর্কী "কাল বালু", রুশীয় তুর্কিস্তানে একটি মরুভূমি; আমূ দরিয়া (জায়হূন) উস্ত (ست), উরত (ارت) এবং কাস্পিয়ানের পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে, কিজিল কুম (লালবালু)-এর সঙ্গে তুলনীয়, কিজিল-কুমসীর দরিয়া (খায়হূন) এবং আমূ দরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে একটি মরুভূমি। কারাকুম (আয়তন প্রায় ৩০০,০০০ বর্গকিলোমিটার) কিজিল-কূম (قزل قوم)-এর চেয়ে অনেক বেশী নিরানন্দ একটি মরুভূমি এবং ইহা অপেক্ষাও উর্বর ভূমি এখানে অতি অল্পই আছে। সীর দরিয়ার উমরে চালকার (چلكر) হ্রদ পর্যন্ত বালুকাময় বিস্তৃত এলাকাকে বলা হয় "ছোট্ট কারাকুম" (قره قوم كوچك; তু. F. Machatschek, Landeskunde von Russisch-Turkestan) স্টুটগার্ট ১৯২১ খৃ., ১৫ পৃ., ২৮৫ ও সূচিপত্র। কারাকুমের অনেক অংশ এখনও তুর্কোমান যাযাবর কর্তৃক তাহাদের ভেড়া ও উটের চারণভূমি হিসাবে ব্যবৃত হয়। দক্ষিণে কিযিল সুব (রুশ ক্রাসনোভোদস্ক) হইতে চাহার জুয় (রুশ চারজোট) পর্যন্ত রেল লাইনটি আড়াআড়ি কারাকুম অতিক্রম করিয়াছে (১৮৮৩-৬ হইতে)। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ কারাকুম খাল আমু দরিয়ার তীরে বোযাগা হইতে মার্ব (মারি) হইয়া, তেজেনের বদ্বীপ হইয়া আশ্‌কাবাদ পর্যন্ত কোপেত দাগের উত্তরের ঢালুতে আর্কমান পর্যন্ত গিয়াছে (১৯৬২ খৃ. হইতে)। তারীখ-ই জাহান গুশায় জুওয়ায়নী কর্তৃক যে কারাকুমের উল্লেখ করা হইয়াছে যেখানে কানকূলিয়া বাস করে (কাংগুলি দ্র.) তাহা এবং ছোট কারাকুম সম্পাদকের মতে সম্ভবত অভিন্ন (পাণ্ডুলিপির গঠন সুনিশ্চিত নহে, তু. মির্যা মুহাম্মাদ কাযবীনীর সংস্করণ, G. M. S. xvi/I, পৃ. ৬৯ প., ২খ, ১০১ প., এবং হুদূদু'ল-'আলাম, পৃ. ৩০৯ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Leimbach, Die Sowyetunion, Stuttgart 1950, নির্ঘণ্ট; (২) The Shadad, Geography of the VSSR, New York 1951, নির্ঘণ্ট; (৩) W. Barthold, Turkestan[3], ৪১৫ প.; (৪) দা.মা.ই, ১৬/২খ, পৃ. ৮৬।

W. Barthold-B. Spuler (E. I.[2])মু. আবদুল আজিজ

কারাকূশ (قره قوش) ঃ শারাফু'দ-দীন আল-আরমানী আল-মুজাফ্‌ফারী আন-নাসিরী (এবং আত-তাকাবী ও আল-গুয্‌যীও) সালাহ্'দ-দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র আল-মালিকু'ল-মুজাফ্‌ফার তাকিয়্যুদ-দীনের আর্মেনীয় ক্রীতদাস; ইনি ত্রিপোলি ও দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য ত্রিপোলি, Gabes এবং অন্যান্য শহর দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাকিয়্যুদ-দীনের ইফ্রীকিয়া জয়ের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কারণ সেখানে আল-মুওয়াহহিদূনের কর্তৃত্ব তখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তবে তাঁহার মামলূক [মুক্ত গোলাম]-ই ৫৬৮/১১৭২ সন হইতে এই দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন (খুব সম্ভব সালাহ্'দ-দীনের পৃষ্ঠপোষকতায়)। তিনি প্রথমে বারকা, ত্রিপোলি এবং আওজিলা-র উপর কতকগুলি আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন (তু. আবূ শামা, রাওদাতায়ন, কায়রো ১৯৫৬-৬২ খৃ., ১/২খ, ৫৪৮) অতঃপর কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন, যেখানে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবার কর্মতৎপরতা শুরু করেন (৫৭২/১১৭৬-৭)। গুয্‌য (দ্র.)-এর একটি সেনাদলের প্রধান হিসাবে তিনি আবার একবার ত্রিপোলিতানিয়া (তু. আবূ শামা, পূ. গ্র. ১/২খ, ৬৯২) অভিমুখে আসিয়া দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের সুদূর ফায্‌যান পর্যন্ত দখল করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পর বানূ হিলাল ও বানূ সুলায়মের বেদুঈনদের সহায়তায় ত্রিপোলি অবরোধ করিয়াছিলেন।

মনে হয়; এখানেই তাকিয়্যুদ-দীনের সিলাহ্‌দার তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হন। এই সিলাহদার এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার ভূমিকা এমনকি ব্যক্তিগত নাম পর্যন্ত অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে (Gaudefroy Demombynes, Une lettre de Saladin au calife almohade, Melanges Rene Basset, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ২খ, ২৯০-১ এই ধারণা পেশ করিয়াছেন যে, নাসিরু'দ-দীন ইবরাহীম,

ইবরাহীম ইব্ন কারাতাকীন আবূ যাবা এবং অন্যান্য ভিন্নরূপে [=য়াযাবা=জোসেফ] একই ব্যক্তির তিনটি নাম ছিল)।

'আলী ইব্ন ইসহাক ইব্ন গানিয়া (দ্র. গানিয়া) যিনি 'আব্বাসী খলীফার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করত দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় আল-মুওয়াহহিদূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন, কারাকূশ তাঁহার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর জাবাল নাফূসা ও Gabes পর্যন্ত তাঁহার এলাকা সম্প্রসারিত করেন, অবশ্য তিউনিসে না পৌঁছাইয়াই। বানূ গানিয়াগণ গাফসা শহরের নিকটে আল-মুওয়াহ্হিদ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কারাকূশ গাফসায় উপনীত হন [১৫ রাবী' (২), ৫৮৩/২৪ জুন, ১১৮৭]। যে সকল মুওয়াহ্হিদ বাঁচিয়া যাইবার পর তাঁহার হিফাজতে নিজদিগকে সোপর্দ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে হত্যা করেন। কিন্তু আল-মুওয়াহ্হিদ আবূ য়ূসুফ য়া'কূব আল-মানসূর (দ্র.) তৎক্ষণাৎ অভিযানের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন এবং ১০ শা'বান, ৫৮৩/১৫ অক্টোবর, ১১৮৭ আল-হাম্মা জয় করেন। এইভাবে Gabes হইতে কারাকূশকে বহিষ্কার করেন। (কারাকূশ) যখন 'আলী ইব্ন গানিয়াসহ মরুভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করেন, তখন তাহার অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহ ও ফৌজকে আল-মানসূরের কাছে অর্পণ করা হয়, যিনি তাহার গুযয, ফৌজকে মার্‌রাশ-এ পাঠাইয়াছিলেন (দ্র. গুয্য, এবং ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, ৩৪৩-৪); তাহার অল্প পরেই (যু'ল-কা'দা ৫৮৩/জানুয়ারী ১১৮৮), গাফ্সারও পতন ঘটে এবং উক্ত শহরের অভ্যন্তরের গুযযরাও একই ভাগ্য বরণ করে। ইহাও সম্ভব যে, গাফ্সা অধিকারের আগেই কারাকূশ আল-মুওয়াহ্হিদূনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ত্রিপোলিতে সিলাহদারও অনুরূপ কাজ করিয়া থাকিবেন (Levi-Provencal, Trente sept lettres almohades, 198 and Recueil, 62)। সমভাবে ইহাও সম্ভব যে, এই কূট অভিযান কিছুকাল পরে ঘটিয়াছিল। ঘটনা যাহাই হউক, সালাহু'দ-দীন কারাকূশের সফলতায় আনন্দিত হইয়াছিলেন (দ্র. আবূ শামা, ১/২খ, ৫৪৭) এবং এই সময় ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে আল-মুওয়াহ্হিদ-বহরের সমর্থনের মুখাপেক্ষী ছিলেন; তাঁহার নামে আল-কাদী আল-ফাদিল (দ্র.) কর্তৃক লিখিত একখানা পত্রের মূল পাঠ পাওয়া গিয়াছে যাহার তারিখ ৫৮৫/১১৮৯, যাহা আল-মানসূরের ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহার হস্তক্ষেপ কামনায় (apud al-Kalkashandi, Subh, vi 526 ff., tr. and comm. in Gaudefroy Demombynes, op cit., 279-304)। তাহার পর কারাকূশকে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ভান করিতে হইয়াছিল, সম্ভবত সালাহু'দ-দীনের নির্দেশে, যিনি পরবর্তী বৎসর (২৮ শা'বান, ৫৮৬/৩০ সেপ্টেম্বর, ১১৯০) একটি পত্রসহ আল-মানসূরের কাছে দূত পাঠাইয়াছিলেন, (apud আবূ শামা, রাওদাতায়ন, in R.HC. Histori, ৪খ, ৪৯৭-৫০৫) যাহাতে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে সিলাহদার ও মাম্‌লূকের [ক্রীতদাসের] নিন্দানীয় কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অস্বীকার করেন (আবূ শামা অনুযায়ী, ঐ, ২খ, ৫০৮, কারাকূশ পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে তিউনিসে হস্তান্তর করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়, ইসতিব্‌সার, ১১১-এর মতে এই ব্যক্তি যিনি এখানে আবূ যাবা আল-ফারিসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহাকে ত্রিপোলী বহিষ্কার করা হয় এবং মার্‌রাকেশে পাঠানো হয়)। তিউনিসের গভর্নরের সহিত কিছুকাল অবস্থান করিয়া কারাকূশ সেখান হইতে পলায়ন করেন এবং কতিপয় দুর্ধর্ষ উপজাতির সহায়তায় সফলতার সহিত Gabes ও ত্রিপোলি পুনরুদ্ধার করেন (৫৮৬/১১৯০)।

যাহা হউক, 'আলী ইব্ন গানিয়ার মৃত্যুর পর (৫৮৪/১১৮৮) তাঁহার ভাই ও উত্তরাধিকারী য়াহ্‌য়ার সহিত কারাকূশের কূশের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। ৫৯১/১১৯৫ সনে জারীদ-এর অধিকারী য়াহ্‌য়া, Gabes ও ত্রিপোলি অবরোধ করেন। এই শেষোক্ত স্থানটিতে কারাকূশ তাঁহার লেফটেন্যান্ট [প্রতিনিধি] য়াকূতকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাপত্তার জন্য ওয়াদ্দানের দিকে পলায়ন করিয়া ছিলেন। এদিকে ইফ্‌রীকিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া যাহ্‌য়াও ওয়াদ্‌দানে পলায়ন করেন (৬০৬/১২০৯) এবং বানূ গানিয়ার পূর্ববর্তী মিত্রকে ঘেরাও করেন, যিনি তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হন; য়াহ্‌য়া তাঁহাকে তাঁহার এক পুত্রকে ৬০৯/১২১২ সনে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। এইভাবে এমন এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, যিনি ৪০ বৎসরকাল যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন সালাহু'দ-দীন এবং তাঁহার নিজের স্বার্থে। ওয়াদ্দানে আবার তাঁহার অন্য আর এক পুত্রের উপস্থিতির উল্লেখ আছে যিনি হাফসী আল-মুস্‌তানসিরের বিশ্বাসঘাতকতার পরে সেখানে পলায়ন করিয়াছিলেন (৬৪৭-৭৫/১২৪৯-৭৭); পরিণামে কানেম নৃপতি কর্তৃক তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্র ও বর্ণনাসমূহ ব্যতীত (বিশেষ করিয়া আবূ শামা ও Gaudefroy Demombynes যাহা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন), আরও দ্র. ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, ৩খ, Tetouan 1963., স্থা.; (২) মার্‌রাকুশী, মু'জিব, নির্ঘণ্ট; (৩) তিজানী, রিহ্‌লা, সম্পা. H. H. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব, তিউনিস ১৩৩৭/১৯৫৮, ১০৩ প., ১১১ প. ও নির্ঘণ্ট [tr. Rousseau in JA. ১৮৫২ খৃ.]; (৪) আল-ওয়াযীর আস-সার্‌রাজ প্রদত্ত মূল পাঠ আল-হু'লালু'স-সুনদুসিয়্যা", সম্পা. M. H. al-Hila, ১খ, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., ৩৫৮ প.; (৫) ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, নির্ঘণ্ট; (৬) কিতাবু'ল-ইসতিবসার, সম্পা. সা'দ যাগলূল 'আবদু'ল-হামীদ, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৮ খৃ., ১১০-১১; (৭) E. Levi-Provencal, Trente-sept lettres officielles almohades, রাবাত ১৯৪১ খৃ., স্থা.; (৮) ঐ লেখক, Un recueil de letters officielles. almohades, in Hesperis, ১৯৪১ খৃ. (প্যারিস ১৯৪২ খৃ.); (৯) ইব্ন খালদূন, Histoire des Berberes, ১খ, ১৩৮. ১৬১, ২৮১, ২খ, ৯১, ৯৫ ২১০, ২১১, ২২০, ৪খ, ২৬০, (১০) A. Bel, Les Banou Ghaniya, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১১) H. Derenbourg. Ousama ben Mounkidh, i, প্যারিস ১৮৮৯-৯৩, ৪৪৪-৬৪; (১২) R. Brunschvig, Hafsides, নির্ঘণ্ট; (১৩) S. Z. 'আবদু'ল-হামীদ, in Bull Fac. of Arts, আলেকজান্দ্রিয়া, ৬-৭ (১৯৫২-৩ খৃ.), ৮৪ প.; (১৪) A. S. Ehrenkreutz, Saladin, Albany ১৯৭২ খৃ., নির্ঘণ্ট দ্র. শারাফু'দ-দীন।

Ch. Pellat (E. I.[2])/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

কারাকূশ (قراقوش) ঃ বাহাউ'দ-দীন ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (অর্থাৎ এক অজ্ঞাত পিতার পুত্র) আল-আসাদী (আসাদু'দ-দীন শীরকূহ-এর মামলূক বা ক্রীতদাস) আর-রূমী (এশিয়া মাইনর-এ জন্ম) আল-মালিকী আন-নাসিরী, মালিক আন-নাসির য়ূসুফ (অর্থাৎ সালাহু'দ-দীন)-এর কর্মকর্তা, জনৈক খোজা। শীরকূহ তাঁহাকে যুক্ত করিয়াছিলেন এবং পরে

তিনি আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শরীকূহ-এর মৃত্যু (৫৬৪/১১৬৯)-র পূর্বে হইতেই তিনি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছিলেন; ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহার ও কাদী 'ঈসা আল-হাক্কারীর বদৌলতেই খলীফা আল'আদিদের সালাহু'দ-দীনকে উযীর নিয়োগ করিয়াছিলেন। আল-'আদিদের মৃত্যুর পর তাঁহার 'বিশিষ্ট বাজার সরকার (chamberlain) খোজা মু'তামান আল-খিলাফা কর্তৃক প্ররোচিত বিদ্রোহ দমনের পর কারাকূশ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ক্ষমতাবলে তিনি মৃত খলীফার পরিবারের কড়া খবরদারী করার কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে, কঠোরতার সহিত তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। খলীফার পরিবার বৃদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি পুরুষ ও মহিলাকে পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সালাহু'দ-দীন তাঁহাকে কায়রোর দুর্গ নির্মাণ এবং কায়রো ও ফুসতাত-কে একই প্রাচীরের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শহরের প্রাচীর বৃদ্ধির দায়িত্ব দিয়াছিলেন; পরবর্তীকালে তাঁহাকে 'আক্কা সুরক্ষিত করা ও উহার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ১৮ মাস যুদ্ধের পরে ৫৮৭/১১৯১ সনে যখন শহরটির পতন ঘটে, তখন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। কয়েক মাস পরে সালাহু'দ-দীন ২০,০০০ দীনারের উচ্চ অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্তি দেন। ৫৮৯/১১৯৩ সনে সালাহু'দ-দীনের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পুত্র আল-মালিক আল-'আযীয 'উছমানের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং যখন আল-মালিকু'ল-'আযীয মিসরের বাহিরে গিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সুলতানের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুলতান যখন তাঁহার অন্তিম সময় সন্নিকটে মনে করিলেন (৫৯৫/১১৯৯) তখন তিনি তাঁহার ছেলে মালিক আল-মানসূরকে তাঁহার উমরাধিকারী এবং কারাকূশকে তাঁহার অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিনিধি ঘোষণা করিলেন। এই ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে নবীন শাসক তাঁহাকে আতাবেগ (atabeg) নিযুক্ত করেন, যদিও কারাকূশ তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব অল্প দিনের জন্য উক্ত পদে বহাল ছিলেন। কারণ, অধিকাংশ আমীর ও মন্ত্রী দফতরের প্রধান ইব্ন মাম্মাতী কারাকূশকে তাঁহার বার্ধক্যের জন্য শাসন পরিচালনার অযোগ্য ঘোষণা করেন।

তাঁহার সমর্থকগণ যাঁহারা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি মনে করিতেন, তাঁহারা সালাহু'দ-দীনের উপদেষ্টা আল-কাদী' আল-ফাদিল [দ্র.]-এর সহিত যোগাযোগ করিলেন কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্বেই রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করায় এই ঝঞ্ঝাটে যুক্ত হইতে চাহিলেন না। অবশেষে আমীরগণ আল-মানসূরের চাচা আল-মালিক আল-আফদালকে রাজ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। ইহার পরে মাত্র একবার কারাকূশের উল্লেখ পাওয়া যায় যখন সুলতান আল-'আদিল ৫৯৬/১২০০ সনে বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন তখন তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে কারাকূশের ঘরে বন্দী করিয়াছিলেন। তাহার এক বৎসর পর তিনি ইনতিকাল করেন। 'ইমাদু'দ-দীন আল-কাতিব আল-ইসফাহানীর মত সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, যেমন প্রশংসা করিয়াছেন আল-মাকরীযী ও ইব্ন তাগরীবিরদীর মতো পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ। তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার সময়ের সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা অট্টালিকা নির্মাণে তাঁহাকে বিশেষ অবদানের প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত ইমারতগুলি ছাড়াও তাঁহার গৃহ, তাঁহার মল্ল প্রতিযোগিতা বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং Gizch-এর সেতু, যেগুলি তিনি Memphis-এ অবস্থিত পিরামিড হইতে পাথর অনিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐগুলিরও উল্লেখ আছে।

এই কৃতকর্ম কারাকূশের একই সময় আর এক কারাকূশ নির্বুদ্ধিতার জন্য জন প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। "কিতাবু'ল-ফাশূশ ফী আহকামি'ল-কারাকূশ" শিরোনামের একখানা গ্রন্থে অনেকগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। হাজ্জী খালীফার মতে উপরোল্লিখিত ইব্ন মাম্মাতী ছিলেন এই গ্রন্থের প্রণেতা। Casanova (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) কারাকূশের উপর তাঁহার বিস্তারিত বিশ্লেষণে তিনটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেন; (১) একটি কায়রো পাণ্ডুলিপি কিতাবু'ল ফাশূশ-এর অংশবিশেষ ইহার অন্তর্ভুক্ত সেইখানে ইব্ন মাম্মাতীকে রচয়িতা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; (২) একটি প্যারিস পাণ্ডুলিপি যাহার প্রণেতা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে আস-সুয়ূতীকে, নিশ্চয়ই ভুলবশত, যেহেতু গ্রন্থে কারা কূশ-এর ভুল নাম দেওয়া হইয়াছে, যাহা সুয়ূতীর জন্য কৃতিত্বের বিষয় হইতে পারে না; (৩) একটি কায়রো পাণ্ডুলিপি যাহা পরবর্তীকালে 'আবদু'স-সালাম কর্তৃক, যিনি ১২০০/১৭৮৬ সালে জীবিত ছিলেন। উহাতে কারাকূশকে একজন সুলতান বলা হইয়াছে এবং তাঁহার "বিচারের রায়সমূহে"র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই "বিচার কার্যগুলি" রাষ্ট্র শাসন কার্য সংক্রান্ত নহে, বরং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত; সেইগুলি কিছু দৃষ্টান্তস্বরূপ সুপরিচিত ক্ষুদ্র কাহিনী, যাহা অন্যান্য জাতির মধ্যেও চালু আছে। সমস্যাটি সম্বন্ধে এখনও কোনও বিশেষ অনুসন্ধান চালান হয় নাই। Casanova দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রচনাটি কারাকূশের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা, উহাতে ইব্ন মাম্মাতী তাঁহাকে একজন অত্যধিক পরিমাণে কঠোর লোক হিসাবে ঘৃণা করিয়াছেন। ইব্ন মাম্মাতী কারাকূশের জীবদ্দশায় এই কাহিনীগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় নাই। ইব্ন খাল্লিকান ঠিকই ধরিয়াছেন যে, কাহিনীসমূহে যে স্বভাব ও চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে ঐরূপ স্বভাব ও চরিত্রের এক ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের উচ্চ পদসমূহে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। ইব্ন মাম্মাতী ও কারাকূশের মধ্যে যে দীর্ঘ দিনের বিশেষ দ্বন্দ্ব ছিল তাহাও জানা যায় না, শুধু এইটুকুর উল্লেখ আছে যে, ৫৯৫/১১৯৯ সনে অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে কারাকূশের নিয়োগের বিরুদ্ধে বার্ধক্যের জন্যই শুধু আপত্তি বা বিরোধিতা করিয়াছিলেন ইব্ন মাম্মাতী। ফ্রাঙ্ক জাতীয় ধারা বিরবরণীর লেখকগণ, এমনকি ৫৮৫/১১৮৯ সনে 'আক্কা অবরোধের সময়ই কারাকূশকে অনেক বয়োবৃদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এমনকি তিনি Godfrey de Bouillon এর সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইব্ন খাল্লিকানের পর্যবেক্ষণ হইতে একটি বিষয় পরিষ্কার জানা যায় যে, ইব্ন মাম্মাতী কর্তৃক সরবরাহকৃত কাহিনীগুলি (আলোচ্য) কারাকূশের প্রতি আরোপিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ শামা, কিতাবু'র-রাওদাতায়ন ফী আখবারি'দ-দাওলাতায়ন, কায়রো ১২৮৭-৮৮ হি., ২খ, ২৪৪, 'ইমাদু'দ-দীন আল-কাতিব আল-ইসফাহানীর কারাকূশ সংক্রান্ত একটি প্রশংসাসংবলিত; (২) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, 'সম্পা. Wustenfeld, নং ৫৪৪, সম্পা ইহসান 'আব্বাস, ৪খ, ৯১-২ (অনু. de Slane, ২খ, ৫২০); (৩) 'আবদু'ল-লাতীফ আল-বাগদাদী, আল-ইফাদা" ওয়া'ল-ই'তিবার, কায়রো ১২৮৬ হি., ২৩ (ফরাসী অনু. de Sacy, as Relation de l'Egypte), প্যারিস ১৮১০ খৃ., ১৭১-২, ২০৬-১৩, স্থা.; (৪) P. Casanova, Karakouch, sa legende et

son histoire, communication faite a l'institut egyptien, কায়রো ১৮৯২ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Karakouch in the MMAF, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ., ৫খ, ৪৪৭ প., তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্র. (৬) H. Derenbourg. Ousama ibn Mounkidh, ৪৩২, টীকা ৪, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ.; (৭) A. S. Ehrenkreutz, Saladin, Albany ১৯৭২ খৃ., নির্ঘণ্ট।

M. Sobernheim (E. I.[2])/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

কারাকোরাম (قره قوروم) ঃ এশিয়ার কেন্দ্রে একটি পর্বত-শ্রেণী, যাহা হিমালয় পর্বতমালার প্রায় সমান্তরালে উত্তরে অবস্থিত। ইহার আওতা পশ্চিমে ৭৩° দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ; ইহা পূর্বে কতদূর পর্যন্ত গিয়াছে তাহা এখন পর্যন্তও সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় নাই। এক সময় ইহার পূর্বসীমা মনে করা হইত কারাকোরামের গিরিপথ, ডেপসঙ (Depsong)-এর মালভূমি ও শায়োক (Shayok)-এর উপরের অংশকে। কিন্তু বিখ্যাত ভূগোলবিদের মতে উহা তিব্বতের ভিতরে আরও অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, Tang-la (upper Saluen-এর উত্তরে অবস্থিত)-কেও কারাকোরামের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত। ১৮৩৬ খৃ. এই ধারণা Klaproth কর্তৃক পেশ করা হইয়াছিল এবং Burrard, Sven Hedin এবং অন্যরাও এই মত পোষণ করিতেন, যাঁহারা পরে ট্রান্স-হিমালয়কেও কারাকোরাম পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই মত যদি সঠিক হয়, তাহা হইলে সমগ্র কারাকোরাম পর্বতমালার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার।

কারাকোরাম গিরিপথের পশ্চিমাংশেই সর্বোচ্চ স্থানগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ৮,০০০ মিটার উচ্চ অনেকগুলি শৃঙ্গ এবং ৭,০০০ মিটারের উর্ধ্বে অসংখ্য চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চূড়াটি সম্ভবত পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, যাহার নাম K 2; উহা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরিয়া Chogo-ri নামে পরিচিত। এই বিশালকায় শৃঙ্গটি ৮,৬১১ মিটার উচ্চ।

কারাকোরামের এই পশ্চিমাংশ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত মনোরম নৈসর্গিক-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী। ইহার একটি বিরাট অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্থান জুড়িয়া চিরস্থায়ী বরফে আচ্ছাদিত। এই হিমরেখা ৪,৭৭০ মিটার উত্তর হইতে ৫,২০৩ মিটার দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এই এলাকার অধিবাসীরা বালতিস (Baltis) তিব্বতী ভাষা মিশ্রিত লোক, লাদাখিগণ, যাহারা তিব্বতী ও হুন্যাগণ (Hunzas)।

মেরু অঞ্চল বাদ দিলে কারাকোরামের এই অংশে পৃথিবীর বৃহত্তম হিমপ্রবাহসমূহ (Glaciers) দেখিতে পাওয়া যাইবে। Siachen তুষার প্রবাহ ৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় ২,৫০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। বালতোরো, হিসপারা ও বিয়াফো (Baltoro, Hispara and Biafo) হিম প্রবাহ শুধু Siachen-এর অপেক্ষা একটু কম। যে মালভূমি হইতে কারাকোরাম পর্বতমালা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার গড় উচ্চতা ৩,০৭০ মিটার, সমগ্র এলাকাটি চরম শুষ্ক। কারণ বৃষ্টি (বরফ, শিলা বৃষ্টি) প্রায়ই অতিমাত্রায় পতিত হয় উচ্চ পর্বতগুলিতে। উপত্যকাগুলিতে বনাঞ্চল ও উদ্ভিদাঞ্চল খুবই নগণ্য এবং এইগুলি প্রবল স্রোতস্বিনী ও ঝর্ণার নিকটে অবস্থিত। হিমবাহের শেষ প্রান্তে একটু সমভূমির উপর প্রায়ই অত্যন্ত মনোরম পার্বত্য উদ্ভিদকুল (alpine flora) দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্য এশিয়ায় জলধারার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎসই কারাকোরাম, যাহা বিভিন্ন নদ-নদীতে বিভক্ত হইয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত। সেইগুলির পানি বিশ্বের এই অঞ্চলের মরুভূমিতে নিঃশেষিত এবং যেগুলি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে সেগুলি ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

প্রধান গিরিপথের নাম কারাকোরাম গিরিপথ Col (৫,৫৭৪ মি.) যাহার মধ্য দিয়া গুরুত্বপূর্ণ চীন-তুর্কিস্তান ও কাশ্মীর বাণিজ্য পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুর্গম, কষ্টকর ও বিপজ্জনক। এই পথে অসংখ্য ভারবাহী পশু তাহাদের দীর্ঘ যাত্রায় নিদারুণ শ্রান্তি অথবা হিমবাহের কারণে ধ্বংস হইয়া যায়। এই গিরিপথের নামানুসারেই এই পর্বতমালার নামকরণ করা হইয়াছে। যেহেতু Karakorum অর্থ "কাল ধ্বংসাবশেষ" [black debris], সুতরাং উক্ত নামকরণটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয় নাই। Elphinstone কর্তৃক ১৮১৫ খৃ. প্রকাশিত একটি মানচিত্রে ইহা সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এই মানচিত্রে আলোচ্য পর্বতশ্রেণীকে Moor Taugh নামে দেখান হইয়াছে (Mur Tagh, "বরফাচ্ছাদিত পর্বত"-এর পরিবর্তে) বা Karra-Koorrum Mountains।

বর্তমানে কথিত কারাকোরাম পর্বতমালা সর্বপ্রথম পর্যটক যাহার লিখিত প্রমাণ আছে, তিনি ছিলেন মীর্যা হায়দার দুগলাত। তিনি ৯৬০/১৫৫৩ সালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে Yarkand হইতে লাদাখের রাজধানী Leh পর্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৮০৮ খৃ. Elphinstone যখন এই সকল অঞ্চল পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন মাত্র তখন হইতেই কারাকোরাম পর্বতমালা সম্বন্ধে যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হইয়াছিল। এই সু-উচ্চ পর্বতমালা সম্বন্ধে আরও সুসম্বদ্ধ এবং বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হইয়াছিল শুধু ১৮৯২ খৃ. Sir Martin Conway-র অভিযান দ্বারা যাহার পরে আরও অনেক অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল (১৯২২-১৯৩৫ খৃ.-এর মধ্যে Ph. C. ও J. Visser-এর পাঁচটি অভিযান)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Elphinstone, An Account of the Kingdom of Caubul, লন্ডন ১৮১৫ খৃ.; (২) H. von Schlagintweit, Reisen in Indien und Hochasien; Jena ১৮৭১ খৃ.; (৩) F. von Richthofen, China, বার্লিন ১৮৭৭ খৃ.; (৪) Georg Wegener, Versuch eincr Orographie des Kwen-lun, Marburg 1891; (৫) F. Grenard, Mission scientifique dans la Haute Asie, প্যারিস ১৮৯০-৯৫, ১৮৯৮ খৃ.; (৬) Martin Conway, Climbing and Exploration in the Karakoram-Himalayas, লন্ডন ১৮৯৪ খৃ. ; (৭) J. L. Dutreuil de Rhins, Mission Scientifique dans la Haute Asie, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ. ; (৮) S. G. Burrard and H. H. Haydin, A sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet, লন্ডন ১৯০৭ খৃ. ; (৯) F. B. and W. H. Workman, Icebound Heights of Mustagh, লণ্ডন ১৯০৮ খৃ., (১০) ঐ লেখক, Two Summers in the Iee-wilds of Eastern Karakorum, লন্ডন ১৯১৭ খৃ.; (১১) F. Frech, Aus der Vorzeit der Erde, Leipzig, ১৯১১ খৃ., (১২) Filippo de Fillippi, Karakoram and Western Himalaya 1904, লন্ডন ১৯১২ খৃ. (১৩) A. Neve,

Thirty Years in Kashmir, লন্ডন ১৯১৩ খৃ.; (১৪) Jacot Guillarmod, Six mois dans l'Himalaya le Karakorum et l'Hindu-Kush ; (১৫) Ph. C. Visser, Naar Himalaya en Kara-korum, Rotterdam ১৯২৩ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, Zwischen Kabul und Hindukusch, Leipzig ১৯২৮ খৃ. ; (১৭) ঐ লেখক, Wissenschaftl. Ergebnisse des Niederland. Expeditionen in den Karakorum, Leipzig ১৯৩৫-৮ খৃ. ; (১৮) E. Trinkler and H. de Terra, Wiss. Ergebnisse der Trinklerschen Zentralasien-Expedition. ২ খণ্ডে, বার্লিন ১৯৩২ খৃ. ; (১৯) K. Mason, Above the snow--a History of Himalayan exploration and mountaineering, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ.; (২০) G. O. Duhrenfurth, Himalaya-Chronik, 1953-68; (২১) H. J. Scheider, Die deutsche Kara-korum-Expedition 1959, in Berge der Welt, 1960-61; (২২) A. Gansser, Geology of the Himalayas, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ.; (২৩) The Himalayan Journal (বার্ষিক ১৯২৯ খৃ. হইতে)।

Ph. C-Visser-B. Spuler (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

কারাকোরূম (قره قوروم) ঃ মধ্য মঙ্গোলিয়াতে ওভোর খানগায়-র আয়মাক-এ অবস্থিত, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি শহর; ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে স্বল্পকালের জন্য ইহা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। য়ূরোপীয় পর্যটক উইলিয়াম অব রুবরাকে এবং পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিক জুওয়ায়নী (দ্র.) কর্তৃক শহরটির পরিপূর্ণ বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ প্রথমে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে N. M. Yadrentsev-এ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়; রাদ্‌লফ কর্তৃক পরিচালিত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের রুশীয় অভিযানের সদস্যবৃন্দ ঐগুলি পরিদর্শন এবং বর্ণনা করেন। ১৯৪৮-৪৯ সনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়ান পিপল্‌স রিপাবলিক কর্তৃক যুক্তভাবে সংগঠিত একটি অভিযান বিখ্যাত খান ওগেডেয়র রাজপ্রাসাদ, কারাকোএমের প্রধান প্রধান উন্মুক্ত রাস্তার সংযোগস্থলে হস্তশিল্পের কারখানাসমূহ এবং শহরটির দক্ষিণের ফটকের নিকটে কতকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করে। যদিও মাত্র ১২৩৫-এ ওগেডেয় কর্তৃক শহরটি প্রাচীরবেষ্টিত হয়, তবু কারাকোরাম ১২২০-তেই চিঙ্গীয খান কর্তৃক তাঁহার রাজধানীরূপে নির্বাচিত হয়। নামটি তুর্কী ভাষায় যাহার অর্থ কাল পাথর; জুওয়ায়নী স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শব্দটি প্রথমত উরখোনের উৎসস্থলের চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্বত্য অঞ্চলের প্রতি আরোপিত হয়। উইলিয়াম অব রুবরাকের মতে ওগিদির প্রাসাদ বাদে কারাকোরুম শহরটি Saint Denis গ্রামের মতো বড় ছিল না, অথচ সেন্ট ডেনিসের সন্যাসাশ্রমটি "রাজপ্রাসাদটির চেয়ে দশগুণ বেশী বড় ছিল"। যাহা হউক, কারাকোরূমের শান-শওকতের সংক্ষিপ্ত সময়কালে সেখানে অনেক প্রাসাদ ছিল। উইলিয়াম অবরুব্রাক ও জুওয়ায়নী নগরীতে ও উহার চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত রাজকীয় প্রাসাদমালার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ইহাদের কতক চীনা এবং অন্যগুলি মুসলিম স্থপতি কর্তৃক নির্মিত। য়ূরোপীয় পর্যটকের মতে রুশীয় এবং পশ্চিম য়ূরোপীয় কারিগরগণও এই সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করে। কারাকোরূমের পূর্বদিকে ১২৩৮ সালে নির্মিত তুযগু-বালিক নামক একটি গ্রামে (তুর্কী 'তুযগু" হইতে গৃহীত, অর্থ "পথিককে খাদ্য প্রদান" এবং বালিক' শহর') একটি প্রাসাদ ছিল যাহার চীনা নাম ইং চিয়া শিয়েন (Welcome Carriage Hall)।

মঙ্গোল সম্রাটগণ তাঁহাদের বাসস্থান চীনে স্থানান্তর করার পরে কারাকোরূম শুধুমাত্র মঙ্গোলিয়ার গভর্নরের আবাস ছিল। কায়দুর সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের সময় অস্থায়ীভাবে ইহার হাত বদল হয়, কিন্তু সাধারণভাবে ইহা সম্রাটের দখলে থাকে। মঙ্গোল রাজবংশ চীন হইতে বহিষ্কৃত হইলে (১৩৬৮) সম্রাটেরা কারাকোরূমে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ১৫শ শতাব্দীতে রাজবংশটির বিলোপের পর শহরটি সমস্ত গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। বর্তমানকালের এরদেনি-জু-এর বৌদ্ধ আশ্রমটি ঐ স্থানের সন্নিহিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Journey of William of Rubruck of the Eastern Part of the World, 1253-55, অনু W. W. Rockhill, London 1900; (২) জুওয়ায়নী-Boyle রাশীদু'দ-দীন, The Successors of Cenghis Khan অনু. J. A. Boyle, New York and London 1971; (৩) S. V. Kiselev, L. A. Evtyukhova L. R. Kizlasov, N. Ya Merpert and V. p. Levashova. Drevnemongol'skie goroda, Moscow 1965; (৪) F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian Inscriptions of 1346. in Harvard Journal of Asiatic Studies. in xv/1-2 (1952); (৫) P. Pelliot, Notes on Marco Polo, i, Paris, 1959, দ্র. CARACORUM; (৬) J. R. Boyle, The Seasonal Residences of the Great Khan Ogedei, in Central Asiatic Journal, xvi (1972); (৭) দা. মা. ই. ১৬/২, পৃ. ৮৫।

W. Barthold-J. A. Boyle (E. I.²)/মু. আবদুল আজিজ

কারাকোল জামে'ঈয়্যেতী (Karakol Djem`iyyet ; قره قل جمعيت) ঃ ইহা একটি গুপ্ত সংঘ, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রাক্তন ঐক্য ও প্রগতি সংঘের (Union and Progress Committee = ইত্তেহাদ ও তারাক্কী জেম্'ইয়্যাতি দ্র.) সদস্যদের একটি দল কর্তৃক ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে গেরিলা প্রতিরোধকে জোরদার ও সংগঠিত করা, যাহারা ১৯১৮ সনের ৩০ অক্টোবর মুদরোস-এর যুদ্ধ বিরতির পর তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিয়া রাখিয়াছিল। মুসতাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে আনাতোলিয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করার পর, কারাকোলা সোসাইটি উক্ত আন্দোলনকে সংবাদ, অফিসার ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিত। এই সোসাইটি আনাতোলিয়ার জাতীয়তাবাদীদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবার চেষ্টা করে এবং এই সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কারা ওয়াসিফ ইস্তাম্বুলে তাঁহাদের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মুসতাফা কামাল কারাকোল সোসাইটির কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিতে কৃতকার্য হন এবং ১৯২০ খৃ. বসন্তকালে ইহা ভাঙিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কারণ দর্শান যে, জাতীয়তাবাদীদের সম্মতি ছাড়াই এই সোসাইটির একজন প্রতিনিধি ১৯২০ সনের ১০ জানুয়ারী বলশেভিকদের

সহিত সামরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও তুর্কী স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কারাকোল সোসাইটি তাঁহাদের গোপন তৎপরতা চালাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কামাল আতাতুর্ক, নূতুক, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ. ১খ, পরিশিষ্ট ; (২) Ali Fuad Cebesoy, Milli Mucadele hatiralari, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ., ৩৪৭ প. ; (৩) কাযিম কারাবেকির, ইস্তিকালাল হার্বিমিয, ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ., ৫০৯, ৬২৮ প. ; (৪) Tarik 2. Tunaya, Turkiyede siyasi partiler, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ৫২০ প. ; (৫) Muharrem Giray, Istanbul'un isgalinde gizli bir teskilat, Karakol Cemiyeti, in Yakin Tarihimiz, ইস্তাম্বুল ১৯৬২ খৃ., ১খ., ৩৪৫ প, ; (৬) জর্জ এস, হাররিস, The origins of communism in Turkey, স্টানফোর্ড-ক্যাল, ১৯৬৭ খৃ. পরিশিষ্ট ; (৭) A. A. Cruickshank, The Young Turk Challenge in postwar Turkey, in MEJ, xxii (১৯৬৮ খৃ.,), ১৮ প.।

E. Kuran (E.I.[2])/এ. বি. এম. আবদুল মান্নাফ মিয়া

কারাচায় (قرچي) ঃ উত্তর ককেসাসের একটি তুর্কী গোত্র। তাহারা নিজদিগকে কারাচায়লী নামে অভিহিত করিত। তুর্কী ভাষায় তাহারা কারাচায়লার নামে এবং রুশ ভাষায় কারাচায়ত্সী অথবা কারাচায়েভ্ত্সী নামে পরিচিত। কারাচায় ভাষা তুর্কী ভাষার কিপচাক শাখার অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারী অনুসারে জাতিগতভাবে কারাচায়দের সংখ্যা ছিল ৫৫,১২৩ এবং ভাষাগতভাবে ছিল ৫৫,৩৪৯ জন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায় উক্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮১,৪০৩ ও ৭৮,৮১৭। ককেসাসের উত্তর ঢালুতে কুবান, তাবের্দা, যেলেনচুক, লাবা ও পোদ্কুমোক নদীর উজান অঞ্চলের পার্বত্য উপত্যকাসমূহ জুড়িয়া কারাচায় গোত্র বাস করে।

তাহাদের ইতিহাস খুবই কম জানা যায়। তাহাদের পূর্বপুরুষ পিছনে হুন্নো-বুলগেরীয় সংমিশ্রণ কাল হইতে উদ্ভূত যাহারা খাযার (দ্র.) রাজ্যের পতনের সময়েও ইহার পরবর্তীকালে তথাকথিত "কৃষ্ণ বুলগেরীয়া'য় কুবান নদীর তীর বরাবর বাস করিত। তাহারা তুর্কী গোত্র পাচেনেগ্স ও কুমানস (Pecenegs and Kumans)-এর হাতে তুর্কী জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গোত্রদ্বয়ই ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে খাযার রাজ্য দখল করে। সমগ্র মধ্যযুগে তাহারা বালকার (দ্র.)-দের সহিত মিলিতভাবে একদল হইয়া এবং স্থানীয় আইবেরো ককেশীয় জাতিসমূহের সহিত মিশিয়া ককেসাস পর্বতশ্রেণীর প্রান্ত বরাবর বসবাস করিত। পরবর্তীকালে তাহারা Golden Horde-এর কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ৭ম/১৩শ শতাব্দী হইতে ৯ম/১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে কাবার্দগণ (দ্র. কাবার্দ) তাহাদিগকে ধীরে ধীরে পর্বতশ্রেণীর উঁচু এলাকার দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে।

কাবার্দদের চাপের ফলে এই সময়ে এই কারাচায়-বালকার জনগোষ্ঠী দুইটি দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বালকার গোষ্ঠী দিহ্-তাউ ও কোশ্তান তাউ এলাকায় চলিয়া যায়। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে কারাচায় গোত্র কাবার্দদের অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয় এবং ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে পরবর্তী সময়ে তাহারা ক্রিমিয়ার খান শাসকদের প্রভাবাধীনেও আসে। তাহাদের মধ্যে এই সময়ে ক্রিমীয় তাতারদের দ্বারা ধীরে ধীরে এবং কিছু পরে ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে ও ১২শ/১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'উছমানীগণ কর্তৃক হানাফী মাযহাবের সুন্নী ইসলাম প্রবর্তিত হয়। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ রুশ দখলের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, তাহাতে কারাচায় ও বালকারগণ কোনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে নাই।

কারাচায়দের সমাজ কাঠামো কাবার্দদের সমাজ কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, কিন্তু সামন্ত প্রথা অনুন্নত ছিল। গোত্রের প্রধান ছিলেন বিই (বেই) [biy (bey)] অথবা তাভ্-বিইস (tab-biys); তাঁহার অনুসারীরা ছিল সমাজের স্বাধীন মানুষ উযদেন (Ozden) অথবা কারাউযদেন (Karaozden) গোত্র যাহারা ঐ শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা বিরাট অংশ ছিল। সর্বনিম্নে ছিল 'কুল' নামে অভিহিত দাস শ্রেণী। 'উছমানী শাসনের অধীনে ইসলামের প্রভাবে 'কুল' শ্রেণী মুক্তি লাভ করে এবং আযাত্লী'তে পরিণত হয়। কারাচায়-এর ঐতিহ্যগত আর্থিক অবস্থা ছিল পশু পালন, কৃষি এবং হস্তশিল্পের উপর নির্ভরশীল। তাহাদের মাটির নীচে গুরুত্বপূর্ণ কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ মওজুদ রহিয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কারাচায় সাহিত্যের ভাষা হয় নাই। ঐ সময়ে বালকারদের সহিত যৌথভাবে একটি কারাচায়-বালকার সাহিত্য-ভাষা গড়িয়া ওঠে এবং ইহা ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করে। ১৯৩৮-৩৯ খৃ. ইহা ল্যাটিনের পরিবর্তে সিরিল্লিক হরফ গ্রহণ করে। Letopis' Periodiceskikh izdanij S. S. S. R. এবং Pecat' S. S. R. v 1960 godu অনুসারে ১৯৩৫ খৃ. কারাচায়-বালকার ভাষায় ছয়টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; ১৯৬০ খৃ. এই সংখ্যা মাত্র একটিতে নামিয়া আসে।

প্রশাসনিক অবস্থা ঃ ১৯২০-এর ২০ জানুয়ারীতে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে কারাচায় পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (Gorskaya A. S. S. R) অংশে পরিণত হয়। কারাচায় ছাড়া এই প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ চার্কস্ (the Cerkes), বালকারস্ (the Balkars), ওসেটিয়ানস্ (the Ossetians), চেযেনস্ (the Cecns) ও ইনগুশ (the Engushes) এবং ইহার রাজধানী ছিল ভলাদিকাভ্কায়। ১২ জানুয়ারী, ১৯২২ সালে তাহাদের চার্কসের (the Cerkes) সহিত যুক্ত করিয়া স্বায়ত্তশাসিত Oblast কারাচায়-চার্কেস গঠন করা হয়। ১৯২৬-এর ২৬ এপ্রিল এই অখণ্ড প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভক্ত করিয়া একটি চার্কদের জাতীয় ওকরুগ (Cerkes National Okrug) এবং মিকোয়ন শাহারকে রাজধানী করিয়া একটি কারাচায় স্বায়ত্তশাসিত—Oblast গঠন করা হয়। ১৯৪৪ খৃ. কারাচায়দেরকে মধ্য এশিয়ায় নির্বাসিত করা হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের সহিত তাহাদের কথিত সহযোগিতার অভিযোগে তাহাদের জাতীয় ভূখণ্ড বেদখল করা হয়। ৯ জানুয়ারী, ১৯৫৭ সালে তাহাদিগকে পুনর্বাসিত করা হয় এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে তাহাদিগকে তাহাদের মূল ভূখণ্ডে ফিরাইয়া আনা হয় এবং তাহাদের নির্বাসনকে স্ট্যালিনের "ব্যক্তিত্ব পূজা" (Personalitycult)-এর ফল বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। তাহারা ৯ জানুয়ারী, ১৯৫৭ সালে পুনর্গঠিত স্বায়ত্তশাসিত Oblast কারাচায়-চার্কস-এ তাহাদের পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়া পায়। ১৪,২০০ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড জুরিয়া তাহাদের অঞ্চলের বিস্তৃতি। ১৯৫৯ খৃ. এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৩৩.১% ছিল কারাচায় ও চার্কস গোত্রের লোক এবং ৫১% ছিল রুশ।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের রুশ আদমশুমারী অনুযায়ী তাহাদের নিজ এলাকায় কারাচায়দের ৯৯.৯% জনের মাতৃভাষা ছিল কারাচায রুশ ভাষা তাহাদের কাহারও প্রথম কথ্য ভাষা ছিল না। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তাহাদের স্থানীয় ভাষা ছিল কারাচায়দের ৯৯% জনের মাতৃভাষা, অন্যদিকে যাহারা রুশ ভাষা ব্যবহার ফরিত তাহাদের সংখ্যা শূন্য হইতে ০.৫%-এ উন্নীত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) U. Aliev, Karacaevskaya Autonomnaya Oblast' (Istoriko-etnologiceskie i Kul'turnoekonomiceskie ocerki), Rostov on the Don, 1927; (২) M. Aminoff, Le groupe musulman de Karachai, in RMM (May 1910); (৩) B. Geiger, A. Kuipers, T. Halasi-Kun and K. Menges, Peoples and Languages of the Caucasus, The Hague 1958; (৪) A. Inan, La Litterature des Peuples Turcs du Caucase du Nord in Philologiae Turcicae Fundamenta, ii, Wiesbaden 1964; (৫) E. N. Kusheva, Narodi Severnogo Kavkaza i ikh sfafazi s Rossiey, vtoroya polovina XVI-30-e Gody XVII veka, Moscow 1963; (৬) Kh. O. Laypanov, Kistorii Karaevtsev i Balkartsev, Cerkesk 1957; (৭) K. Menges, Turkic Languages and Peoples, Ural-Altaische Bibliothek, xv (1947); (৮) ঐ লেখক, Turkic Peoples of the Caucasus, in Jean Deny Armagani, Ankara 1958; (৯) মির্যা বালা, কারাচায়লার, in IA; (১০) Narodi Karacaevo-Cerkesii, Stavropol 1967, Z. vols.; (১১) E. N. Studevetskaya, K voprosu o rabstve i feodalizme v Karacae, in Sovetskaya Etnografiya (Moscow 1937) no. z.; (১২) S. A. Tokarev, Etnografya Narodov S. S. R., Moscow 1958; (১৩) S. Wurm, Turkic Peoples of the U. S. S. R. London 1954।

Hulya Salihoglu (E.I.[2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারাজা (দ্র. কারা)।

কারাজা ইব্‌ন কা'ব (قرظة بن كعب) ঃ (রা) আনসারী সাহাবী; কুন্‌য়া আবূ 'আম্‌র; মতান্তরে পিতার নাম 'আম্‌র, মাতার নাম খালীদা বিন্‌ত ছাবিত, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উনায়স (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই, খাযরাজ গোত্রের লোক এবং আওস গোত্রের উপগোত্র বানূ 'আবদি'ল-আশহাল-এর মিত্র। লোকদের দীনী শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত 'উমার (রা) 'আম্মার ইব্‌ন য়াসার-এর সহিত যে দশজন আনসারকে কূফা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি উহুদ ও তৎপরবর্তী জিহাদসমূহে অংশগ্রহণ করেন। 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে ২৩ হিজরীতে তিনি রায় (الري) জয় করেন। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) কূফার শাসনকর্তা থাকাকালীন তিনি মুসায়লামার সাথী ইব্‌নু'ন-নাওয়াহা (ابن النواحة)-কে হত্যা করেন। 'আলী (রা) তাঁহাকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি সিফফীন যুদ্ধে 'আলী (রা)-এর সহিত ছিলেন।

'আমির ইব্‌ন সা'দ, শা'বী ও ইব্‌ন ইবরাহীম তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম তাঁহার হাদীছ মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে হাদীছ শুনিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম তাঁহার সকল রাবীকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

"কারাজা ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ আমরা ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করিলে 'উমার (রা) আমাদের সহিত সিরার (صرار) পর্যন্ত যান। অতঃপর তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি তোমাদের সহিত আসিয়াছি তোমরা কি তাহা জান ? তাহারা বলিলেন ঃ হাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী, তাই আপনি আমাদের সহিত আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা এমন এক জনপদে যাইতেছ, যাহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় গুন গুন শব্দ করিয়া কুরআন তিলাওয়াত করে। তোমরা প্রথমেই হাদীছের মধ্যে তাহাদিগকে মনোযোগ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ করিয়া দিও না; হাদীছ কম বর্ণনা করিবে এবং কুরআনকে অন্য জিনিস হইতে পৃথক রাখিবে। আর আমি তোমাদের সহিত আছি।" কারাজা (রা) সেখানে পৌছিলে তাহারা তাঁহাকে হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিল। তিনি বলিলেন ঃ 'উমার (রা) হাদীছে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হানাশ ইব্‌ন মু'তামির (রা) বলেন, "সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) ইনতিকাল করিলে তাঁহার লাশ 'আলী (রা)-র নিকট লইয়া যাওয়া হয়। 'আলী (রা) ছয় তাকবীরের সহিত তাঁহার জানাযা পড়াইলেন। কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলে বলা হইল যে, তিনি বদরী সাহাবী। লাশ কবরস্তানে আনা হইলে আমরা কারাজা ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর নিকট জড় হইলাম। তিনি বলিলেন আমীরু'ল-মু'মিনীন ! আমরা জানাযায় হাযির হইতে পারি নাই। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা জানাযা পড়িয়া লও। তাঁহারা জানাযা পড়িলেন। কারাজা তাঁহাদের ইমামতি করিলেন।"

তিনি 'আলী (রা)-র খিলাফাতকালে কূফায় ইনতিকাল করেন। 'আলী (রা) তাঁহার জানাযা পড়ান। মতান্তরে তিনি মু'আবিয়া (রা)-র রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন। 'আলী ইব্‌ন রাবী'আ বলেন, কূফায় সর্বপ্রথম যাঁহার উপর বিলাপ করা হইয়াছিল, তিনি হইলে কারাজা ইব্‌ন কা'ব (রা)। মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যাহার মৃত্যুতে বিলাপ করা হয়, কিয়ামতের দিন বিলাপ করার কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-র রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন। 'মুগীরা (রা) তখন কূফার গভর্নর ছিলেন। 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-র মধ্যে সংঘাত চলাকালে মুগীরা (রা) তা'ইফ ছিলেন। 'আলী (রা)-র শাহাদাতের পর মুআবিয়া (রা) ৪১ হিজরীতে তাঁহাকে কূফায় গভর্নর নিযুক্ত করেন। মু'আবিয়া (রা)-র রাজত্বকালে তিনি কূফায় গভর্নর থাকাকালীন ৫০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন সা'দ বলেন, মুগীরা (রা)-র শাসনকালে কারাজা (রা) কূফায় ইনতিকাল করেন। ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে কারাজা (রা)-র ইনতিকালের সময় মুগীরা (রা) কূফার গভর্নর ছিলেন। মুসনাদ আহমাদে, 'আলী ইব্‌ন রাবী'আ আল-আসাদী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কারাজা ইব্‌ন কা'ব নামক আনসারী ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাঁহার উপর বিলাপ করা হয়। তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন ঃ কি ব্যাপার ইসলামে আবার বিলাপ...। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৫০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৩১-২; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, ২খ, ১২৪; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ২৬৫-৮); (৪) 'আবদু'র-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহি ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১৪৪, ৬খ, ১৭; (৫) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহাবা, ২খ, ১৪; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ৩খ, ৪৭২, ৬খ, ৭; (৭) য়ূসুফ কান্দহলাবী, হায়াতু'স-সাহাবা, ৩খ, ২২৭-৮; (৮) হাকিম নীশাপূরী, আল-মুসতাদরাক, ১খ, ১০২; (৯) 'আবু'ল-হাসান মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ, সাহীহ মুসলিম, জানাযা, অনুচ্ছেদ মৃতের জন্য রোদন; (১০) আহমাদ 'আবদু'র-রহমান আল-বান্না, ফাতহু'র-রাব্বানী, ৭খ, ১২৪-২৫; (১১) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২০২।

মোঃ আবদুল মান্নান

কারাজা ওগ্লান (كـرج وغلن) ঃ তুর্কী লোক-কবি, 'আশিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধি। বিভিন্নভাবে 'আশিকগণ 'উছমানী যুগে তুর্কী গীতি কবি (ওযান)-গণের জাহিলী ও প্রাথমিক ইসলামী যুগের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখে। তাঁহারা প্রায়শই তাঁহাদের কাব্যকে সুর সংযোগের মাধ্যমে ও যন্ত্র সংগীত (বিশেষত কোপুয)-এর সহযোগে উপস্থিত মতে গান হিসাবে ব্যবহার করিতেন। মূলত বিভিন্ন দরবেশগোষ্ঠীর জনপ্রিয় মরমী কবিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও 'আশিক শব্দটি পরবর্তীকালে ভ্রাম্যমাণ চারণ কবিদের (সায শা'ইরলেরি) দ্বারা ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হইতে থাকে; ইঁহারা তুলনামূলকভাবে প্রাচীনতর ও ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দ ওযান-এর ব্যবহার পরিহার করেন। 'আশিকগণের উপর সূফীবাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং উহা তাঁহাদের বাস্তববাদিতাকে বড় আকারে পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই। অন্যদিকে মাদরাসা ও প্রাসাদ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত দরবারী কবিদের প্রভাব ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী; ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে ক্রমাগত তাঁহাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহারা বহু ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যরূপ, বিশেষত গাযাল ও মুরাব্বা' গ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহারা 'আরূদ'-এর বহু নূতন নমুনা প্রবর্তন করেন যেগুলি বেশীর ভাগ এক স্বরবিশিষ্ট ছন্দের (হেজে) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বহু সাধারণ বিষয়, সাধারণ উপাদান ও মামুলি ধারণাবলেই লোকগীতিতে স্থান পায়, রাজদরবারে প্রচলিত কাব্যের গতানুগতিক ধারা ও ধারণার সার্বক্ষণিক প্রভাব শেষ পর্যন্ত লোকগীতিকে দরবারী কাব্যের বন্ধ্যাত্বে পরিণত করে। ইহার ফলে বহু 'আশিক ক্ল্যাসিক্যাল কবিদের অদক্ষ অনুকরণকারীতে পরিণত হন।

এই প্রকারের সার্বিক চিত্রে কারাজা ওগলান ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অন্যান্য অনেকের মতো তিনি নগর পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেন নাই; তিনি যাযাবর গোষ্ঠী ও গ্রামীণ এলাকা হইতে আগত একটি ক্ষুদ্র চারণ কবি সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। জনপ্রিয় মরমী মহাকবি য়ূনুস ইম্‌রের ন্যায় তাঁহার জীবন কাহিনীও কিংবদন্তীর আবরণে আবৃত। তুর্কী লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রে যিয়া গোকল্প যে নব প্রেরণার সূচনা করেন তাঁহার ফলে বহু গবেষক (বিশেষত M. F. Koprulu, A. R. Yalgin, S. N. Ergun, I. R. Isitman, A. K. Tecer, P. N. Boratav এবং C. Oztelli) কারাজা ওগলান সম্পর্কিত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন (১৯৪০ খৃ., পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. F. A. Tansel, Karacaoglan hakkinda tenkidi bir bibliyografya, in Ulku, ১৫খ., নং ৮৫, ১৯৪০ খৃ.)। এই প্রকার প্রগাঢ় গবেষণা সত্ত্বেও স্বয়ং কবির পরিচয়, তাঁহার জীবন ও সময়কাল এবং তাঁহার বহু কবিতা প্রসঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা অদ্যাবধি বিতর্কিত রহিয়া গিয়াছে। একটি সাম্প্রতিক প্রকাশনায় (Cahit Oztelli, Karaca Oglan, Butur Siirleri, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.) এই সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান অর্জিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইলেও তাহা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে। কারাজা ওগলান-এর কবিতায় আলেপ্পো ও বাগদাদ-এর দখল বা পুনর্দখল প্রসঙ্গে এবং "আহমাদ পাশা" কর্তৃক পরিচালিত অস্ট্রীয় অভিযান সম্পর্কে যে অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ এই উভয় শতাব্দীর বিভিন্ন সূত্রে এই কবির নাম উল্লেখ থাকায় এইরূপ একটি তত্ত্ব সৃষ্টি হয় যে, একই নামধারী দুই জন ভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন দুই শতাব্দীতে সক্রিয় ছিলেন (এই বিতর্ক প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্র. Cahit Oztelli, পূ. গ্র., ভূমিকা এবং Cemil Yener, Karaçaoglan uzerine, in Turk Dili, ২৫খ., নং ২৪৪, আঙ্কারা ১৯৭২ খৃ., ২৯১-৪)।

গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত যাহা বলা যায় তাহা এই যে, কারাজা ওগলান-এর প্রকৃত নাম হাসান এবং তাঁহার পরিবার সায়িল ওগলু নামে পরিচিত উচ্ ওক তুর্কোমান উপজাতির ভারসাক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাউরুস (Taurus) পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে এই গোষ্ঠীর শীতকালীন বাসস্থান ছিল এবং বসন্তের আগমনে তাহারা উচ্চতর গ্রীষ্মকালীন চারণভূমিতে বাসস্থান পরিবর্তন করিত। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, তিনি দক্ষিণ আনাতোলিয়ায় ব্যাপক ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত 'উছমানী সাম্রাজ্যের অপরাপর স্থানেও তিনি পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ তথ্যে সন্ধান পাওয়া যায় যে, তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও ইস্তাম্বুলে গমন করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, যদিও তাঁহার রচিত তূরকূসসমূহের দুইটি সুলতান ইবরাহীমের আমলে 'উছমানী রাজসভার জন্য সংকলিত লোকগীতির একটি সঙ্গীত সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল (দ্র. C. Oztelli, Ali Ufki, Karaca Oglan ve Istanbul, in Turk Folklor Arastirmalari, নং ২৩৯)। মুসলিম সংস্কৃতিতে অতি সাধারণ ও অতি অল্পসংখ্যক ভাব ও বিষয় ব্যতীত কারাজা ওগলান সম্পূর্ণভাবে সভাকবি এবং দরবেশ গোষ্ঠীর জনপ্রিয় মরমী কাব্য এই উভয় ধারার কাব্যরীতি বর্জন করেন। তাঁহার রচিত সকল কবিতা (সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শত) তিনি ঐতিহ্যবাহী তুর্কী একপদী ছন্দে (বেশীর ভাগ ৬-৫ ও ৪-৪ বিন্যাসে) এবং তাঁহার যুগের গ্রাম্য কথ্য তুর্কীতে রচনা করেন। ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল সাময়িকভাবে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দাবলী ও বাক্য বিন্যাস। তাঁহার কাব্যের মৌলিক উপজীব্য বিষয় ছিল যাযাবর জীবনযাত্রা ও তাউরুস পার্বত্য এলাকার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রেম ও প্রাণোচ্ছলতায় উচ্ছ্বসিত যে আবেগ কবি অনুভব করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার অতুলনীয় 'কোসমাস', সেমাইস', 'তূরকূস' ও দেস্‌তান-এর মাধ্যমে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্রের পরবর্তীকালে "জাতীয় সাহিত্য" (মিল্লী এদেবিয়াত) আন্দোলনে এবং পুনরায় প্রাথমিক প্রজাতন্ত্রী যুগে খৃষ্টীয়

১৯৩০ দশকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত কারাজা ওগলান সর্বাধিক জনপ্রিয় লোক-কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্য বহু সংখ্যক নূতন তরুণ কবিকে তুর্কী কবিতায় বিষয়বস্তু ও রূপের নবায়নে ও উহাকে অধিকতর স্থানীয় লোকজ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধতর করার পথে তাঁহাদের প্রচেষ্টায় উৎসাহ প্রদান করে। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ঈচেল (মেরসিন) প্রদেশের অন্তর্গত মূত-এর নিকট চুকুর গ্রামে একটি পাহাড়ের উপর কারাজা ওগলানকে দাফন করা হয় এবং কালক্রমে তাঁহার কবর এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ জনপ্রিয় যিয়ারাতগাহে পরিণত হয়। ১৯৫৮ খৃ. ঔপন্যাসিক য়াসার কামাল (জ. ১৯২২ খৃ.)-এর রচিত চিত্রনাট্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার জীবনের একটি কিংবদন্তীমূলক ভাষ্যে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। য়াসার কামাল পরবর্তীকালে একই বিষয়ের উপর একটি ছোট গল্প রচনা করেন (in Uc Anadolu Efsanesi, ইস্তাম্বুল ১৯৬৭ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Kopruluzade Mehmed Fu'ad, Bir Varsaghi, in yeni Medjmu`a নং ৩১; ১৯১৮ খৃ. ; (২) সা'দু'দ-দীন নুযহেত (এরগুন), কারাজা ওগলান (একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ), কোনিয়া ১৯২৭ খৃ. ; (৩) Sadettin Nuzhet Ergun, Karacaoglan, Hayati ve Siirleri, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ., বহু সংখ্যক পরিবর্ধনসহ ১৮শ সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৬৩ খৃ. ; (৪) ম. ফুআদ কোপরুলু, তুর্ক সায শাইরলেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ২য় সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৬২ খৃ., ৩১৭-৭৭ ; (৫) 'আলী রেযা (য়ালমান পরবর্তীতে য়ালগিন), সেনুপ্তা তুর্কমেন ওয়মাকলারি, ৫খ, আনকারা ১৯৩৩ খৃ., স্থা., (৬) ইসহাক রেফেত (ইশিতমান) কারাচা ওগলান, আনকারা ১৯৩৩ খৃ. ; (৭) P. N. Boratav, Halk Edebiyati Dersleri, আনকারা ১৯৪২ খৃ., স্থা. ; (৮) A. K. Tecer, Karacaoglan'a yeni bir bakis, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ. ; (৯) Cahit Oztelli (সম্পা.), Karaca Oglan, Butun Siirleri (একটি ভূমিকাসহ তাঁহার পূর্বতন গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার ; ইহার অন্তর্ভুক্ত কারাজা ওগলানের সকল জ্ঞাত কবিতা এবং তাঁহার নামে কথিত সকল কবিতা), ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.।

Fahir Iz (E. I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কারাজা হিসার (قرجه حصار) ঃ কারা হিসার (قره حصار) ও কারাজা শেহর (قرجه شهر) নামেও পরিচিত ; সম্ভবত বায়যানটাইন মেলানগিয়া (Melangeia)-এর সহিত অভিন্ন এবং এসকিশেহির অঞ্চলে আগমনের পর 'উছমানীগণের দ্বারা বসতি স্থাপনের স্থানসমূহের অন্যতম প্রথম। কারাজা হিসার-এর চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহ সুলতান 'আলা'উ'দ-দীন কায়কুবাদ শীতকালীন বাসস্থানরূপে এরতোগরুল-এর অনুসারীদিগকে প্রদান করেন। প্রচলিত লোকগাথা অনুসারে ৬৮৭/১২৮৮ সালে 'উছমান গাযী শহরটি অধিকার করেন ('আশিক পাশা যাদে, সম্পা. 'আলী, ১৮ ; নেশরী সম্পা. Taeschner, ১খ., ২৬, ৮৭)। শহরটির সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য 'উছমান এখানে আগমন ও বসতি স্থাপন করিতে আগ্রহী এমন সকলকে আমন্ত্রণ জানান। ইহার ফলে তিনি গারমিয়ান ও অন্যান্য এলাকা হইতে আগত জনসাধারণকে শহরের মধ্যে বসতি প্রদান করেন, শহরের গির্জাসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং একটি জামি' মসজিদও নির্মাণ করা হয়। কারাজা হিসার-এর প্রশাসনিক দায়িত্বে 'উছমান তাঁহার পুত্র ওরখান বে-কে নিযুক্ত করেন।

৯ম/১৫শ এবং ১০ম/১৬শ শতাব্দীর বিভিন্ন সূত্রে শহরটিকে সাধারণত কারাজা শেহীর নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শহরটি সুলতানওনূ সানজাক-এর অন্তর্গত ছিল। ১০/১৬শ শতাব্দীর তথ্যে "এসকিশেহিরসহ কারাজা শেহির" নামক নাহিয়ে-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন পর্যন্ত ইহা সুলতানওনূ সানজাক-এর অন্তর্গত ছিল (Basbakanlik Arsiv Genel Mudurlugu Maliyeden Mudevver defterler, নং ২৭, পৃ. ২) কারাজা শেহির লইয়া গঠিত নাহিয়ে (১১টি গ্রাম সমন্বয়ে বার্ষিক ৫৮,৭৩৯ আকচে রাজস্ব আয়সহ) তখন সানজাক বেগী সুলতানওনূ-এর খাসস-এর অংশ ছিল (Sultanonu Sancagi tahrir defteri, নং ৫১৫, পৃ. ১৩)। এসকিশেহির এই সময়ে কারাজাশেহির-এর অন্তর্গত ছিল ; অবশ্য ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে কারাজাশেহির এসকিশেহির-এর একটি নাহিয়েতে পরিণত হয় (Topkapi Sarayi Muzesi Arsivi, N. D. ১৬৬, পৃ. ১২৪-৬)। ১৮৩০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কারাজাশেহির-এর জনসংখ্যার মধ্যে ছিল ৩,৭২৫ জন মুসলিম ও ৫৭৫ জন অমুসলিম অধিবাসী (E. Z. Karal, Osmanli imperatorlugunda ilk unfus sayimi ১৮৩১, আনকারা ১৯৪৩ খৃ., ১১০)।

বর্তমানে কারাচাশেহির নামধারী পূর্বতন কারাজা হিসার, এসকিশেহির বিলায়েত-এর মধ্য কাযা-এর অন্তর্গত একটি গ্রাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত উৎসসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) ইব্ন কামাল, তাওয়ারীখ-ই আল-ই 'উছমান, সম্পা. Serafettin Turan, আনকারা ১৯৭০ খৃ., ৯৭-৯, ১১১-৩; (২) I. Beldiceanu-Steinherr, Recherches sur les actes des regnes des sultans Osman, Orkhan et Murad I, মিউনিখ ১৯৬৭ খৃ., ৬৫, ৭৫-৭; (৩) Hammer-Purgstall, Histoire, ১খ, ৭৪-৬, ৮২; (৪) কাতিব চেলেবী, জিহান্নুমা, ইস্তাম্বুল ১১৪৫ হি., ৫৪৩; (৫) আহমাদ রাফীক, ফাতিহ দেভরিনদে সুলতানওনূ, in TTEM, ৩/৮০ (ইস্তাম্বুল ১৩৪০ হি.), ১৩০-২; (৬) Eskisehir II Yiligi, ১৯৬৭ খৃ., আনকারা; (৭) দা.মা.ই., ১৬/২ খ, পৃ. ৭১ (কারা হিসার)।

C. Orhonlu (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আল-কারাজী (الكرجى) ঃ আল-কারখী (الكرخى) আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান (মতান্তরে আল-হুসায়ন), আরব গণিতবিদ ও প্রকৌশলী। G. Levi Della Vida-এর মতে (in RSO, ১৪খ, ১৯৩৩ খৃ., ২৫০) তিনি ছিলেন ইরানের জিবাল অঞ্চলের আল-কারাজ-এর অধিবাসী। ইহার পূর্বে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মনে করা হইত যে, তিনি বাগদাদ-এর আল-কারখ এলাকার অধিবাসী ছিলেন। এইজন্য তিনি আল-কারখী উপনামেও পরিচিত। তরুণ বয়সেই তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং তথায় প্রশাসনিক দফতরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। বাগদাদে অবস্থানকালে ৪০২/১০১১-২ সালের সমসাময়িক সময়ে তিনি গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ আল-ফাখ্রী, আল-কাফী ও আল-বাদী' রচনা করেন। এই সকল রচনাবলীতে তিনি বীজগণিতকে জ্যামিতির আধিপত্য হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে ৪১০/১০১৯ সালের পর ইনতিকাল করেন। তারিখটি তাঁহার "ইনবাতু'ল-মিয়াহি'ল খালিয়া" গ্রন্থের সম্ভাব্য রচনাকাল। 'আদিল আনবূবা তাহার প্রকাশিত সংস্করণের (বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.) বাদী'-এর

ভূমিকায় এই গ্রন্থকারের রচিত ১২টি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলির বেশীর ভাগ বর্তমানে অবলুপ্ত। ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত গ্রন্থগুলি হইল; (১) আল-ফাখ্‌রী ফি'ল-জাব্‌র ওয়া'ল-মুকাবালা, F. Woepeke (Extraits du Fakhri traite d'algebre, প্যারিস ১৮৫৩)। এই গ্রন্থটি ও Diophantes রচিত Arithmetica-এর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কুসতা ইব্‌ন লূকা (মৃ. ২৯৬/৯১২)-কৃত Diophantes-এর আংশিক অনুবাদের (প্রথম তিনটি গ্রন্থও চতুর্থটির অংশমাত্র) মাধ্যম শেষোক্ত রচনাটি নিঃসন্দেহে আল-কারাজীর পরিচিত ছিল। তাঁহার প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে Diophantes-এর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এক-তৃতীয়াংশের অধিক সমস্যা, দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম সমস্যা হইতে শুরু করিয়া অপরাপর সবগুলি এবং তৃতীয় খণ্ডের প্রায় সকল সমস্যা আল-কারখী তাঁহার সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (পৃ. ২১)। বক্তব্যের ভিত্তিতে সম্ভবত ইহা প্রমাণিত হয় যে, Diophantes-এর ২য় পুস্তকের ১ হইতে ৭নং সমস্যাসমূহ সম্ভবত ভ্রান্তিপূর্ণ অথবা মৌলিক নয় এবং আরবী ভাষ্যে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না (তু. E. Vereecke, Diophante d'Alexandrie, পুনর্মুদ্রণ প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., ২৫)। আল-কারাজীর সমসাময়িকদের নিকট ডাওফেন্টাস-এর রচনাবলী নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইবনু'ল-হায়ছাম ও আবু'ল ওয়াফা' ইহাদের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা অথবা টীকা লিখিয়াছেন। আল-কারাজী তাঁহার আল-ফাখ্‌রী গ্রন্থে দ্বি-ঘাত রাশির পরস্পর উর্ধ্বঘাতসমূহের পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা আরো বিস্তৃতি লাভ করে বাদী' গ্রন্থে। এই প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে $(a-b)^n$-এর সহগসমূহ বিস্তারের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। সমাধানের জন্য ব্যবহৃত ত্রিভুজটি বর্তমানে Pascal অথবা Tartaglia-এর পরিচিত। এই চূড়ান্ত সমাধান তাঁহার যে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা আল-সামাওয়া' আল-ইব্‌ন ইযাহিয়া আল-মাগরিবী (মৃ. আনু. ৫৭০/১১৭৪)-এর রচিত 'বাহির' গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। (২) আল-বাদী' ফি'ল-হিসাব (البديع فى الحساب) এই গ্রন্থে ইউকিলিদ ও নিকোমাচুস (Euclid ও Nicomachus)-এর দ্বারা প্রবর্তিত স্থির বিন্দুসমূহকে উন্নয়ন করা হইয়াছে এবং ইহাতে বীজগাণিতিক ক্রিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রথমবারের মতো একটি অজ্ঞত রাশিসহ কোনও কোনও বাহু-ঘাত রাশির বর্গমূল নির্ণয়ের একটি তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছে। Liber Quadratorum গ্রন্থে Leonardo of Pisa যে x^2+5 ও x^2-5 পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করিয়াছেন এবং ডাওফেন্টাস, ii 20-তে উদ্ধৃত x^2+y ও y^2+x-এর ন্যায় সমস্যাসমূহ তিনি সমাধান করেন। এই সকল সমাধান ধীরে ধীরে Euler ও অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। এই সকল সমস্যার সামাধানকল্পে তিনি প্রায়ই সাবলীলতা অর্জনের লক্ষ্যে বিষম রাশি পরিবর্তন, সহযোগী বিষম রাশি ব্যবহার অথবা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পদ্ধতি পরিবর্তনের মত প্রায়োগিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (৩) আল-কাফী ফি'ল-হিসাব (الكافى فى الحساب) গ্রন্থে function-সমূহের ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখিত এবং বস্তুতপক্ষে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও মানসিক ক্যালকুলাসের পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত তালিকার সারসংক্ষেপ [ইবনু'স-সামহ্, মৃ. ৪২৬/১০৩৪ কর্তৃক হাওয়া'ঈ (বায়বীয়) নামে নির্দেশিত এই ক্যালকুলাস ভারতীয় ক্যালকুলাস হইতে ভিন্ন]; গ্রন্থটি A. Hocheim কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে (১-৩, হাল্লে ১৮৭৭-৮০)। (৪) ইনবাতু'ল-মিয়াহ আল-খাফিয়্যা (انباط مياه الخفية) ১৩৫৯/১৯৪৫ সালে হায়দরাবাদে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তরল পদার্থের চাপনির্ভর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক গ্রন্থ। ইহাতে কতিপয় আত্মজীবনীমূলক টীকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভূ-গোলকের ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি নূতন ধারণা সম্পর্কে একটি আলোচনামূলক রচনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। তিনি কতিপয় জরিপ যন্ত্রের (দ্র. মীযান) বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে এই সকল যন্ত্রের জ্যামিতিক ভিত্তিসমূহ সুচারুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি শুষ্ক অঞ্চলে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গ বা কানাত [দ্র.] নির্মাণ ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও প্রায়োগিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (তিনি এই প্রসঙ্গে ইসফাহান-এর সুড়ঙ্গসমূহের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ৩১)। একইভাবে তিনি কূপ খনন ও পানিবাহী সুড়ঙ্গ নির্মাণের বৈধতা শারী'আভিত্তিক আলোচনা করিয়াছেন এবং কোনও কোনও পরিস্থিতিতে এইগুলি জনগণের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হইতে পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে ব্যবহৃত নির্দেশনাসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) Sarton, Introduction, ১খ, ৭১৮; (২) Brockelmann, I, ২১৯; S I, ৩৮৯; (৩) J. Vernet এবং A. Catala, Un ingeniero arabe de siglo XI ঃ al-Karayi, in Al Andalus; (৪) H. Suter, Mathematiker, 84; (৬) দা.মা.ই., ১৭খ, ১৬১-৬২।

J. Vernet (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

সংযোজন

মূল নিবন্ধকার J. Vernet-এর মতে বৈজ্ঞানিক আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ছিলেন ইরানের জিবাল প্রদেশের অন্তর্গত আল-কারাজের অধিবাসী, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বর্তমান ইরাকের আল-কারজ-এর নহে। এই প্রবন্ধে তিনি G. Levi Della Vida যে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহার মতে তাহাই সঠিক এবং G. Sarton প্রমুখ পণ্ডিতও তাঁহাকে আল-কারখের অধিবাসী ধরিয়া লইয়া ভুল করিয়াছেন। বস্তুত এই বৈজ্ঞানিকের সমস্ত কার্য বাগদাদে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এই সময়ে তিনি বাগদাদের শহরতলী কারখে বাস করিতেন সেই হিসাবেই শেষোক্ত পণ্ডিতেরা কারখই তাঁহার জন্মস্থান বা বাসস্থান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

সেকালের জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা নিজেদের জীবনকথা প্রকাশ করিতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। অনেকেই একেবারে নীরব রহিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণও ধনে-মানে অগ্রগণ্য অভিজাত ব্যক্তিদের জীবনকথা লিখিতেই আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাই তাঁহাদের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা যায় না। তাই আল-কারাজ বা আল-কারখের বিষয়ের মতদ্বৈধতার প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— তাহা হইল আল-কারখ নামে ইরাকে আরও কয়েকটি স্থান রহিয়াছে। তাই বাগদাদের শহরতলী আল-কারখের অধিবাসী না হইলেও অন্য কোনও আল-কারখের অধিবাসী হওয়াও বিচিত্র নহে। এমতাবস্থায় প্রচলিত ধারণাকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা সমীচীন হইবে না।

এই পর্যন্ত তাঁহার যে ৪ খানি গ্রন্থের কথা জানা গিয়াছে সেগুলির মধ্যে বীজগণিত গ্রন্থ আল-ফাখরী ফি'ল-জাবর ওয়া'ল-মুকাবালাকে

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মূল নিবন্ধকার যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধেও মতদ্বৈধতা দেখা যায়। অনেকের মতে তাঁহার গণিত সম্বন্ধে গ্রন্থ আল-কাফী ফি'ল-হিসাবই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। যাহা হউক, আল-খাওয়ারাযমী-এর বীজগণিত গ্রন্থ আল-জাব্র ওয়া'ল-মুকাবালা গ্রন্থের পরে বীজগণিতে আল-কারাজীর আল-ফাখরী ফি'ল-জাব্র ওয়া'ল-মুকাবালা-এর ন্যায় অন্য কোনও গ্রন্থের এমন প্রভাব দেখা যায় না। অনেকের মতে বীজগণিতের বর্তমান নাম 'Algebra' হওয়া অনেকটা কাল ও স্থানের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিতেছিল। যূরোপীয় অনুবাদকগণ সর্বাগ্রে পরিচিত হন আল-খাওয়ারায্মীর আল-জাব্র ওয়া'ল মুকাবালা গ্রন্থখানির সঙ্গে এবং ইহা ল্যাটিন ভাষায় প্রথম অনূদিত হয়। তদানীন্তন যূরোপের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেই তাঁহারা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ওঠেন। আল-ফাখরী অনেক দিনই যূরোপে অজ্ঞাত থাকেন। ফলে বীজগণিতের Algebra নামই প্রচলিত হইয়া পড়ে। বস্তুত আল-ফাখরী যদি কোনওক্রমে আল-জাব্র ওয়া'ল-মুকাবালা-এর পূর্বেই বা সমসময়েই অনূদিত হইত তাহা হইলে যূরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বীজগণিতকে আল-ফাখরী নামেই অভিহিত করিতেন।

'আল-ফাখরী' প্রণয়নে তৎকালীন সুলতান বাহা'উ'দ্-দাওলা-এর মন্ত্রী আবূ গালিব মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ ফাখরু'ল-মূলক বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মন্ত্রীর প্রচলিত নাম ফাখ্রু'ল-মূল্ক-এর প্রথম অংশ গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহার করেন।

দ্বিমাত্রিক সমীকরণ (quadratic equation) যে নূতন আকারেও ব্যবহার করা যাইতে পারে সেই হিসাবে $x^4+5x^4=156$ প্রভৃতি অনুশীলনের সমাবেশে আল-কারাজীর অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের মতো তৃতীয় মাত্রায় সমীকরণ প্রভৃতির সমাধানেও আল-কারাজীর বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। তিনি বীজগাণিতিক সমস্যার শুধু জ্যামিতিক সমাধান দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শুদ্ধ গণিতের সাহায্যেও যে সেগুলির সমাধান হইতে পারে, তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। বর্তমানে প্রচলিত চিহ্নগুলি ব্যবহার করিলে আল-ফাখরী-এর quadratic equation-এর সমাধানের রূপ দাঁড়াইবে $ax^2+bx=c$

$$x=[\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2+ac}-b/2]\div a$$

বীজগণিতের অঙ্কের সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলির শক্তি (Powers of the unknown quantity) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের সমাধানও জটিল হইয়া ওঠে। তাহা ছাড়া যেইখানে দুই তিনটি অনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে এবং তাঁহাদের শক্তির বহরও বেশী সেইখানে সমাধান হইয়া পড়ে জটিলতর। আল-কারাজী এই জটিলতর সমস্যাগুলির বেশ সহজ সুন্দর সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়া বীজগণিতকে উন্নত স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। বস্তুত আল-ফাখরীতে যে সমস্ত বীজগাণিতিক সমস্যার উদ্ভাবন ও সমাধান করা হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই প্রামাণিক এবং আধুনিক বীজগণিতেও প্রচলিত। আল-কারাজী যে সমস্ত সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার কতকগুলি বর্তমানে প্রচলিত চিহ্ন সংযোগে উদ্ধৃত করা হইল।

যেমন : $x^3+y^3 = z^2$

$x^2-y^2 = z^3$

$x^2y^3 = z^2$

এই শ্রেণীর সমীকরণগুলির পূর্ণ সংখ্যায় x, y, z-এর মান বাহির করা।

এবং $x^3-y^3 = z^3$

$x^3+y^2 = z^2$

শ্রেণীর সমীকরণগুলির ভগ্নাংশে x, y, z,-এর মান বাহির করা সাধারণভাবে বলিতে গেলে $x^{2n}+ax^n=b$ শ্রেণীর সমীকরণগুলির n-এর বহু উর্ধ্বতন মূল্যবিশিষ্ট অনেক সমীকরণেরই তিনি সমাধান পদ্ধতি বাহির করিয়াছেন। তিনি প্রতিটি দ্বিমাত্রিক সমীকরণের দুইটি করিয়া সমাধানও বাহির করিয়াছেন, তবে negative ফলের দিকে মনোযোগ দেন নাই। ডাওফেন্টের নামে যে সমীকরণটি প্রচলিত আছে আল-কারাজী সেইটিরও সমাধান করেন।

আল-খাওয়ারাযমী প্রথমে root-এর প্রতিশব্দ 'জিদর' ও বর্গের (square) প্রতিশব্দে 'মাল' শব্দ ব্যবহার করেন। সাধারণত জিদর অক্ষরে লেখা হইত। আল-ফাখরীতে ত্রিমাত্রিক শক্তির (cube) প্রতিশব্দ হিসাবে কা'ব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খুব সম্ভব ইংরেজী Cube আরবী কা'ব হইতে উদ্ভূত।

বীজগাণিতিক পূরণে সংখ্যাগুলির শক্তিমাত্রার যোগ হওয়া (in multiplications powers are added) সূচক তত্ত্বের সর্বপ্রথম সংজ্ঞা পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির সমষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। আল-কারখী এই প্রচলিত মতবাদ উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্বভাবেই 'শক্তি'র যোগ হওয়াকেই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আল-ফাখরীতে 'মাল' x^2-এর প্রতিশব্দ হিসাবে এবং 'কা'ব' x^3-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই হিসাবে মাল মাল $(x^2\times x^2)=x^4$; অবশ্য 'মালে মালে' শক্তির যোগ বা পূরণে কোনও পার্থক্য হয় না। কিন্তু এই পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া ওঠে 'মাল কা'ব'-এ। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের মতে 'মাল কা'বা' $(x^2\times x^3)$ হয় x^6। কিন্তু বর্তমান মতে ইহা হইবে x^5। আল-কারখী 'মালকা'ব'-কে x^5 হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তেমনি 'কাব কাব' $(x^3\times x^3)$ $(x^3\times x^3)$ = x^6 এবং "মাল মাল কা'ব" $(x^2\times x^2\times x^3)=x^7$ হিসাবেই তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, x^9 এবং x^{12} হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

'আল-কাফী ফি'ল-হিসাব' গ্রন্থে অন্য সাধারণ গণিত গ্রন্থের মতই প্রাথমিক বিষয়গুলির অবতারণা করিয়া ক্রমশ জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এই ক্রমজটিলতার মধ্যে অঙ্কের সঙ্গে বীজগণিত সংযোগ করিবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল 'গুণন'। ছোট ছোট 'গুণনে' ঐগুলি বিশেষ উপযোগী হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন : ২২×৪৪ = (২২×৪+৮) ১০+২×৪= ৯৬৮; বীজগণিতের চিহ্ন অনুবর্তনে-এর ফরমূলা দাঁড়াইবে :

$(10a+a)\ (10b+b) =[(10a+a)b+ab]\ 10+ab$

'আল-কাফী ফি'ল-হিসাবে' অঙ্কশাস্ত্রের নানা নিয়মাবলী যেইগুলির ব্যবহার প্রণালী ও নূতন নিয়মের উদ্ভাবন প্রভৃতির সমাবেশ/ গ্রন্থকর্তার এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। Quarter Square, বর্গমূল নির্ণয় প্রণালী, সমতলভূমির পরিমাপ, বিশেষত যেইগুলিতে Surd number ব্যবহার করাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে সেই সবও আল-কারাজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। এই সমস্তই বৈজ্ঞানিকের

প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তাশীলতার জলন্ত উদাহরণ। তাঁহার ব্যবহৃত নিয়মাবলী এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

Summation of power series বা একই শক্তির ক্রমিক সংখ্যা রাশির যোগফল নির্ণয় ব্যাপারে আল-কারাজীই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নির্ণীত ফল এখনও সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক সংখ্যা লিখন অনুসারে নিম্নভাবে লিখিত হইবে ঃ

$$১^৩+২^৩+৩^৩ \ldots\ldots = (১+২+৩\ldots)^২$$

$$১^২+২^২+৩^২+n^২\ldots = (১+২+৩\ldots)\frac{2n}{3}+1$$

সংখ্যার উন্নত ধারায় (higher series)-ও আল-কারাজীর হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রবর্তিত Higher Series-এর নিয়মাবলী বর্তমানে প্রচলিত আঙ্কিক চিহ্ন অনুসারে নিম্নরূপে লিখিত হইবে ঃ

$$\sum n^2 = 10\times(10+1)\times\left(\frac{10}{3}+\frac{1}{6}\right)=385$$

$$\sum n^3 = [\sum n]^2$$

ইহা ছাড়া তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অন্যতম জটিল বিষয় Indeterminate analysis এবং Indeterminate equation সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। $mx^2+nx+p=y^2$ ধরনের Indeterminate equation-এর সমাধানে তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। এইরূপে সমীকরণে অমূলক সংখ্যা ব্যবহার না করিলেও Surd-এর যোগ-বিয়োগ আল-কারাজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি যোগ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, $\sqrt{8}+\sqrt{18}=\sqrt{50}$।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তাঁহার বীজগণিত গ্রন্থ কিতাবু'ল-ফাখ্‌রী ফি'ল-জাবার ওয়া'ল-মুকাবালা-এর পাণ্ডুলিপির এক কপি হায়দরাবাদের 'উছমানিয়া ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে [Q'A 510/FK—K (Acq 1060; 71ff.; Nq 166)]। পাণ্ডুলিপিখানি দুই অংশে বিভক্ত। ১ম অংশ ১৫ পরিচ্ছেদে (বাব) এবং ২য় অংশ ৫ অধ্যায় (কিস্‌ম) সমাপ্ত। ইহাতে ২৫০টি সমস্যার সমাধান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, মালিক লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৯-২০; (২) A. Rahman and Others, Science and Technology in Medieval India, Indian National Science Academy, New Delhi, 1982, p. 384; (৩) Smith D. E., A History of Mathematics, vol. II, pp. 382; (৪) G. Sarton, Introduction to the History of Science, vol. I., p. 719; (৫) Gayori, F., A History of Mathematical Notations, p. 379; (৬) Fink, Carl, A brief History of Mathematics, p. 84; (৭) Ed. Arnold T. & Guillaume, A, The Legacy of Islam, Oxford University Press. 1965, p. 394।

এম. আকবর আলী

কারাতা (قـــرتـة) ঃ [স্বপরিচিত irtle ব. ব. Kirtlei; রুশ Karatai, Karatin (tsi), Kirdli; আভার ঃ Kalalal; অন্যান্য ঃ Kirdi Kalal] আন্‌দি (দ্র.) আখওয়াখ, বাগুলাল, বতলিখ, চামালাল, গোদোবেরি এবং তিন্‌দি রূপসমূহ সহকারে আইবেরো-ককেসীয় ভাষাসমূহের আভার-আন্‌দি-দিদো উপ-বিভাগের আন্‌দি শাখা; কারাতাভাষী জনগোষ্ঠী।

১৮৮৬ খৃ. একটি জরিপ অনুযায়ী (Dagestanskaya Oblast) এই সময়ে কারাতা ভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৭২১৭; ১৯২৬ খৃ. এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩০৫ ও ১৯৩৩ খৃ. (Grande প্রদত্ত অনুমান) ৭০০০। কারাতা জাতির আবাসস্থল আখভাখ এলাকার উত্তর অংশ; এই এলাকার উপত্যকা অঞ্চলে ও আন্‌দি কয়সু-এর দক্ষিণ তীরে এবং আনদালালী ও ভেদেনো জিলার অন্তর্গত দুইটি প্রত্যন্ত এলাকায় দাগিস্তান স্বশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পশ্চিম অংশে একটি উচ্চ দুর্গম পর্বতময় বিচ্ছিন্ন এলাকায় সাতটি আউলে বিভক্ত হইয়া ইহারা বসবাস করে। আউলসমূহ হইতেছে কারাতা, আরচো, আনচিখ, তোকিতা, মাশতাদা, রাচাবালডা ও চাবাকোরা।

সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষভাগে আভার অঞ্চলের সর্বত্র ইসলামের প্রসার লাভ ঘটে। কারাতা গোষ্ঠী মাযহাবভুক্ত সুন্নী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। Nutsal Gruler of Avaristan, আনদুনিক-এর অন্তিম বক্তব্য অনুযায়ী (Khasaev, Obshcestvenniy Stroy Dagestana v xix Veke, ১৩৫), ৮৯০/১৪৮৫ সালে কারাতা অঞ্চলটি আভারিস্তান-এর শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত সাতটি অঞ্চলের একটি ছিল। এই সময়ে তাহা কার্যত অর্ধ-স্বাধীন মর্যাদা উপভোগ করিত। পরবর্তী সময়ে ইহা আভার খানেত দ্বারা নিজ রাজ্যে অঙ্গীভূত হইয়া যায় এবং শামীল কর্তৃক খানেত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা খানেত-এর অংশ রহিয়া যায়। প্রায় সকল আন্‌দি জাতিসমূহের ন্যায় কারাতা জাতি শামীল আন্দোলনে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে আঞ্চলিক ভূমি অধিকার এবং পশুচারণ ভূমি কেন্দ্র করিয়া কারাতা ও আখভাখ এবং কারাতা ও আভার গোষ্ঠীর মধ্যে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে দেখা যায়। আখভাখ সমিতি "রাতলুব-আখভাখ"-এর বিরুদ্ধে কারাতা ও গিদাতল গোষ্ঠীকে কোনও কোনও সময় মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। আভার খানেত-এর অংশ হওয়া সত্ত্বেও কারাতা গোষ্ঠী তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র সামাজিক কাঠামো অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়, যাহা সামন্ত-শ্রেণীর আভার সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল। আন্‌দি গোষ্ঠীর অন্তর্গত অপরাপর সকল শ্রেণীর ন্যায় কারাতাদের মধ্যেও কোনও প্রকার সামন্ত-চরিত্রের ক্ষমতা-স্তর ছিল না; তাহাদের পিতৃভিত্তিক-গোষ্ঠী শ্রেণীর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 'আদাত-এর নীতি দ্বারা পরিচালিত হইত (দ্র. Pamyatniki Obicnogo Prava Dagestana xvii-xiv vv, মস্কো একাডেমী অব সায়েন্সেস ১৯৬৫ খৃ., ১৪৩-৫২, কারাতা নাইবাত-এর 'আদাত-এর ভাষ্য)। সামাজিক কাঠামোর মৌলিক ভিত্তি ছিল যুগ্ম-সম্প্রসারিত পরিবার (তুখুম)।

ইহাদের প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল Transhumance পদ্ধতিতে পরিচালিত পশু পালন (মেষ ও ছাগল), কৃষিকার্য এবং গৃহভিত্তিক শিল্প। কারাতা নারী সম্প্রদায় পশমী বস্ত্র বয়নের ক্ষেত্রে তাহাদের দক্ষতার জন্য সুপরিচিত।

কারাতা ভাষার তিনটি উপভাষা রহিয়াছে ঃ প্রকৃত কারাতা, আনচিখ ও তোকিতা। উৎপত্তিগত দিক হইতে আভার ভাষা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কারাতা ভাষার সহিত সম্পর্কযুক্ত, শেষোক্ত ভাষা সম্পূর্ণভাবেই একটি কথ্য ভাষা। কারাতাগণ তাহাদের প্রথম সাহিত্যিক ভাষা এবং দ্বিতীয় (কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথম) কথ্য ভাষা হিসাবে আভার ভাষা ব্যবহার

করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক বৎসর যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাহা হইতেছে আভার। রুশ ভাষা লিখিত হিসাবে দ্বিতীয় এবং কথ্য হিসাবে তৃতীয় ভাষারূপে পরিগণিত। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত দিক হইতে কারাতাগণ ধীরে ধীরে আভারগণের মধ্যে অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছে। "তোমার জাতীয়তা কি ?" এই প্রশ্নের জওয়াবে একজন কারাতা যে উত্তর প্রদান করিবে তাহা হইতেছে ঃ যদি কোনও বিদেশী আমাদের প্রশ্ন করে আমাদের জাতীয়তা কি, আমরা জওয়াব দেই যে, আমরা আভার। যদি তাহারা প্রশ্ন করে ঃ কোন্ এলাকার ? আমরা বলি ঃ কারাতা। আমাদের নিজস্ব এলাকায় আমরা একে অপরের নিকট নিজ নিজ আউল দ্বারা পরিচিত (Narodi Dagestana, ৬৭; অতিরিক্ত দ্র. আন্দি আভার, দাগিস্তান, আল-কাবক, শামীল প্রবন্ধসমূহ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Benningsen, and H.C.d' Encausse, Une Republique sovietique Maslumane : le Daghistan, Apercu Demographique, in REI, ২৩খ (১৯৫৫ খৃ.), ৭-৫৬; (২) Dagestanskaya Oblast, Svod Statisticeskikh Dannikh Izvlecennikh iz Posemeynikh Spiskov Naseleniya Zakavkaz'ya, তিফলিস ১৮৯০ খৃ., ৭-১৪; (৩) Geiger, Halasikun, Kuipers and Menges, Peoples and Languages of the Caucasus'-s, Gravenhage ১৯৫৯ খৃ.; (৪) B. Grande, Spisok, Narodnostey S. S. R, in Revolutsiya i Natseonal nost, নং ৪ (১৯৩৬ খৃ.), ৭৪-৮৫; (৫) Kh. M. Khasaev, Odscistvenniy Story Dagestana v xix Veke, Academi of Sciences, মস্কো ১৯৬১ খৃ.; (৬) Narodi Dagestana, Academy of Sciences, মস্কো ১৯৫৫ খৃ.; (৭) S. A. Tokarev, Etnografiya Narodov S. S. S. R., মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খৃ.।

R. Wixman (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কারাতিগিন (قرتكن) ঃ আরব ভৌগলিকগণ কর্তৃক রাশত নামে অভিহিত আমূদরিয়ার অন্যতম উপনদী ওয়াখ্শ বা সুরখাব (তুর্কী কিযিলসূ)-এর মধ্য প্রবাহের উভয় তীরবর্তী একটি জিলা (ইব্ন খুর্রাদাযবিহ, ৩৪, ২১১ প.; ইব্ন রুস্তা, ৯২ প., ২৯০; য়া'কূবী, বুলদান, ২৬০)। অবস্থান অনুসারে রাশত-এর প্রধান স্থান (অথবা 'দুর্গ', আল-কাল'আ, আল-ইসতাখরী, ৩৪০) কারাতিগিন-এর একমাত্র শহর আধুনিক গার্ম (Garm) বা ঘার্ম-এর সম্পূর্ণ অনুরূপ। তখন রাশ্ত ছিল ইসলামের অন্যতম সীমান্তবর্তী দেশ এবং ফাদ্ল ইব্ন বারমাক [দ্র.] নির্মিত (তু. ইবনু'ল-ফাকীহ, ৩২৪ প.) একটি প্রাচীর দ্বারা পূর্ব দিকের তুর্কী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিত। প্রাচীনকালে টলেমি বর্ণিত সড়কটি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব এশিয়া অভিমুখে প্রসারিত ছিল। "কোমেদ-গোত্রের মালভূমি" [দ্র. কুমীজীস]-র সহিত সম্পৃক্ত কারাতিগিন-এর বহু উল্লেখ রহিয়াছে (উদা. সম্প্রতি E. Chavannes, Documents sur les Turcs Occidentaux, 164, Sewertsow-এর সূত্রে in the Bull. de la Soc. de Geogr., ৩খ, ১৮৯০ খৃ., ৪২০-৩১)। মধ্যযুগে (আরবী কুমীয বা কুমায, চীনা, কিউমিত'ও Kumit'o) নামটি রাশতের নিম্নাঞ্চলে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগে ও পরবর্তীকালে ওয়াখ্শ উপত্যকাটির বিশেষ কোনও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। আজ পর্যন্ত যাহা নিরূপণ করা গিয়াছে— শাহ্রুখ কর্তৃক চীনে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত (৮২২-৫১/১৪১৯-২২) প্রত্যাবর্তনের পথে টলেমি বর্ণিত ফারগানা ও বাল্খ-এর মধ্যবর্তী সড়ক ব্যবহার করেন। আমূ দরিয়ার উজানে সকল মালভূমির ন্যায় কারাতিগিণও আধুনিক কাল পর্যন্ত নিজস্ব আমীরের শাসনাধীন ছিল; প্রাক-মোঙ্গল যুগে রাশত-এর মাত্র একজন আমীর জা'ফার ইব্ন শামানীক্ (গারদীসী, সম্পা. ম. নাজিম, ৩৬) উল্লিখিত। তীমূর ও পরবর্তী সময়ে দেশের কায়ির তিগিন (বা তীগীন) নাম পরিদৃষ্ট হয় (মাওলাবী ম. ইলাহাদাদ প্রণীত ও শারফু'দ-দীন 'আলী য়াযদী সম্পাদিত জাফার-নামা-তে, ১খ, কলিকাতা ১৮৮৫ খৃ., ১৮৯, ভ্রমবশত তীর তেগীন)। নামটির বর্তমান রূপ কখন কিভাবে গৃহীত হয় তাহা অবিদিত। বাবুরনামা-র পাণ্ডুলিপিতে (সম্পা. Beveridge, প. ৩৩[b] ও ৬৩[b] কারাতীগীন, প. ৬৯[b], ও প. ৮১, কায়্যিরতীগীন, Kayyirtigin) এবং তা'রীখ-ই রাশীদী-তে (অনু. Ross, বিশেষত ২৪১) উভয়রূপ পরিদৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণ কন্টক"-এর প্রচলিত তুর্কী তরজমা কারাতিগিন (তু. W. Radloff, Worterbuch, St. Petersburg, ২খ, ১৩৫, 'উছমানী কাৱা দিকেন Karadiken) অথবা প্রথম দুইজন কিরগিয কৃষকের নাম (I. Minayew, Swyedeniya o stranakh po verkhovyam Amu Daryi, St. Petersburg, 241, following Arendarenko)। মাহ্মূদ ইবন ওয়ালী-র বাহ্রু'ল-আসরার (India Office Ms. Ethe, Cat. no. 575, f. 277[a], রাজাব ১০৪৫ (ডিসে. ১৬৩৫-জানু. ১৬৩৬)-এর বর্ণনানুসারে তখনও পৌত্তলিক কিরগিয-এর ১২,০০০ পরিবার কারাতিগিন-এর মধ্য দিয়া হিসার-এ গমন করে। বর্তমানে তাজীক, কিরগিয (কারা কিরগিয) এবং কিছু সংখ্যক উযবেগ কারাতিগিন অধিবাসীদের অংশ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাদাখশান [দ্র.] নৃতিদিগের ন্যায় কারাতিগিন-এর নৃপতিগণ মহান আলেকজাণ্ডারের উত্তরসুরি বলিয়া দাবি করিতেন। কারাতগিন তখন খোকান্দ-এর খানদের অধীনস্থ ছিল; ১২৫০/১৮৩৪ সালে (V. P. Nalivkin, Kratkaya istoria Kok, Khanstva, Kazan 1886, 134f.) মুহাম্মাদ 'আলী খান (১২৩৮-৫৮/১৮২২-৪২)-এর অধীনে তাহাদের পরাধীনতা কার্যকর হয়। আমরা দেখিতে পাই ইতিমধ্যে 'আলিম খান-এর অধীনে (উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) এই খান প্রতিষ্ঠিত সামরিক বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কারাতিগিন অধিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় (তা'রীখ-ই শাহ্রুখ, সম্পা, N. N. Pantusov, Kazan 1885, 42 f.)। ১২৭৫/১৮৫৮ সালে মাল্লা খান (১৮৫৮-৬২)-এর নেতৃত্বে খোকান্দ হইতে কারাতিগিন-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযানের উল্লেখ করা হইয়াছে (Nalivkin, পূ. গ্র., ১৯০)। তখন মুজাফ্ফার খান (পরবর্তীতে মুজাফ্ফার শাহ নামেও অভিহিত হইত) ছিলেন কারাতিগিন-এর শাসনকর্তা। ১৮৬৯ খৃ. বুখারা-এর আমীরের সৈন্যদল কর্তৃক কারাতিগিন অধিকৃত হয় এবং মুজাফ্ফার খান বন্দী অবস্থায় বুখারায় নীত হন। কেবল রুশ বড়লাটের সিদ্ধান্তের ফলেই এই সংঘর্ষের মীমাংসা হয় (K. P. von kauffmann) এবং মুজাফ্ফার খান-কে তাঁহার রাজ্য পুনর্বার প্রত্যর্পণ করা হয়। তাঁহার ইনতিকালের

পর ১০,৭৯২ বঃ কিঃ মিঃ আয়তন এবং (১৮৯০ খৃ.-র দিকে) ৬০,০০০ অধিবাসীসহ (অধিকাংশ তাজীক, অন্যান্য কিরগিয) কারাতিগিন একটি জিলা হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে বুখারা-র অন্তর্ভুক্ত হয়। রুশ কর্তৃক (১৮৭৪-৭৬ খৃ.) রাজ্যটি চূড়ান্তভাবে কুক্ষিগত হইবার পূর্বে ফারগানার সর্বশেষ যুদ্ধে কারাতিগিনও লিপ্ত হয়। ১৮৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর (নূতন রীতি) M. D. Skobelew এবং বেগ-এর অন্য ভ্রাতা সূফী খান-এর মধ্যে সম্পন্ন চুক্তি অনুসারে ফারগানা ও কারাতিগিন-এর মধ্যবর্তী সীমা নির্ধারিত হয়।

১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রথমবারের মতো কোনও য়ুরোপীয় কারাতিগিন ভ্রমণ করে নাই (V. Oshanin)। পরবর্তী দশকে ওয়াখশ-এর দক্ষিণ তীরে কারাতিগিন-এর মধ্য দিয়া মধ্য এশিয়ার অন্যতম সর্বোত্তম পার্বত্য সড়ক নির্মিত হয়, যাহা কারাতিগিন-এর যোগাযোগ অধিকতর সুগম করে। ওশানিন ও পরবর্তী পর্যটকগণ (বিশেষত A. Regel ১৮৮১-৩) কারাতিগিন-কে বহু গ্রাম ও ফলোদ্যানের উর্বর দেশ এবং বুখারা-র আমীরের রাজ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী প্রদেশ হিসাবে বর্ণনা করেন। কথিত আছে যে, ব্যতিক্রমহীনভাবে কারাতিগিন-এর সকল অধিবাসীই কৃষিজীবী (উদ্যান রচনাসহ) ছিল এবং সেখানে কোনও ভূমিহীন শ্রমিক ছিল না। তিন বৎসর অনাবাদী রাখিলে যে কেহ ভূমির স্বত্বাধিকার হারাইত। পক্ষান্তরে Rickmers (পৃ. ৩৪০) বলেন, অনেক কৃষক কারাতিগিন হইতে ফারগানায় গিয়া দিনমজুর ও পরিচারক হিসাবে কাজ করিয়া তাহাদের সঞ্চয় বাড়ী নিয়া আসিত। একমাত্র শহর গার্ম; অধিবাসীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে অনুমান পরস্পর-বিরোধী; ওশানিন-এর মতে ২,৩০০ গৃহ, (Masal'skiy-এর মতে ৪,০০০ অধিবাসী, Logofet-এর মতে ১৫,০০০। প্রশাসন, কর ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পরিবেশন করেন (A. Semenow ১৮৯৮ সালের ভ্রমণ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ১৮৭৮ পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞ Abramow in the Izv. Russkago Geograf. Obshc., ৬খ, ১০৮ প. এবংArendarenko in the Voyenniy Sbornik, মে ১৯৭৮, ১১৬ প.; (২) তৎপর Minayew in the Svedeniya o stranakh ইত্যাদি, ১৯৬ প., ২৩৩ প.; (৩) Notes from Gshani's journal in the Izv. R. Geogr. Obshc., 1880-81; (৪) Kostenko, Turkestankiy Kray, ii, 197 f.; (৫) also Proc. R. Geogr. Soc. (1880), 575, quoted by W. Geiger, Ostiranische, Kultur, 22; (৬) পরবর্তী পুর্যটকগণ ঃ A. Seminow, Etnograf. ozerki Zarafshanskikh gor, Karategina i Darwaca, Moscow 1903; (৭) D. Logofet, V. gorakh i na ravinakh Buchari, St. Petersburg 1913, 322 f.; (৮) W. R. Rickmers, The Duab of Turkestan, Cambridge 1913, 325 f. (journey of 1906); (৯) তু. W. Masal'skiy , Turk. Kray, 735 f.; (১০) Barthold, Turkestan[3], 70 f., 201, 203 (s. v. Rasht); (১১) Enciklopediceskij Slovar' Brokhaus-Efron, xiv/27, 460।

W. Barthold-B. Spuler (E.I.[2])/
আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

কারাদাগ (قره داغ) ঃ কার্না গোরা [Crna Gora (মন্‌টিনিগ্রো)] অঞ্চলের তুর্কী নাম। বর্তমানে ইহা যুগোস্লাভিয়া সোশালিস্ট ফেডারেল রিপাবলিকের ছয়টি প্রজাতন্ত্র অঞ্চলের একটি এবং ঐ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইহা যুগোস্লাভিয়ার ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র, আয়তনে ১৩,৯৬৭ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৫৩০,৩৬১ (১৯৭১, ৩১ মার্চের আদম শুমারী)। অঞ্চলটি সাধারণত পার্বত্য এলাকা, দেশের অভ্যন্তরীণ এলাকা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার দিক দিয়া উপকূল এলাকা হইতে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। রাজধানী টিটোগ্রাদ [পূর্বে পোড্‌গোরিকা (Podgorica) নামে পরিচিত ছিল]। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত মন্‌টিনিগ্রো সামন্ত রাজ্যের (এবং ১৯১০ খৃ. হইতে রাজ্য) রাজধানী ছিল সেটিনজে (Cetinge) শহর।

বর্তমান মন্‌টিনিগ্রোর জনসংখ্যার কাঠামো নিম্নরূপ (টিটোগ্রাদের পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের হিসাব মতে) ঃ ৬৬.৫৫% মন্‌টিনিগ্রীয়, ১.৮১% ক্রোটীয়, ৭.৫১% সার্বীয় এবং ১৩.৪৩% মুসলমান। জনসংখ্যার এই অংশটি সার্বো-ক্রোট ভাষায় কথা বলে এবং নিজদিগকে জাতীয় অথবা ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে (জনসংখ্যার ০.১৪% কোন জাতীয় অথবা ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করে নাই)। অল্প সংখ্যক অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়া অধিবাসিগণের ৬.৫৫% আলবেনীয়, যাহাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান আর কিছু ক্যাথলিক।

মন্‌টিনিগ্রোর সোশ্যালিস্ট প্রজাতন্ত্রের মুসলিম ধর্মীয় সংস্থা যুগোস্লাভিয়া সোশালিস্ট ফেডারেল রিপাবলিকের ইসলামিক ইউনিয়ন (Islamska Zajednica)-এর একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ইহার এইরূপ চারিটি অঞ্চল রহিয়াছে এবং সারাজেভো, প্রিস্টিনা, স্কোপ্‌জে ও টিটোগ্রাদ-এ এগুলির কেন্দ্র অবস্থিত। অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মতো মন্‌টিনিগ্রোর ইসলাম ধর্মীয় সংস্থার প্রধান সংস্থাপন হইল একটি নির্বাহী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত ইসলামিক ইউনিয়ন কাউন্সিল (Sabor Islamske Zajednice)। মন্‌টিনিগ্রীয় ইসলামিক ইউনিয়ন কাউন্সিলের ১৬ জন সদস্য আছেন এবং যুগোস্লাভিয়া সোশ্যালিস্ট ফেডারেল রিপাবলিকের ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট সুপ্রিম কাউন্সিল অফ্ দি ইসলামিক ইউনিয়নে ৩ জন প্রতিনিধি পাঠায়। মন্‌টিনিগ্রোতে ৭০টি মসজিদ এবং ইসলামিক ইউনিয়নের ৯টি বোর্ড রহিয়াছে। এইগুলি মন্‌টিনিগ্রোর ধর্মীয় সংস্থার মৌলিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে (১৯৬৯ খৃ. তথ্য অনুযায়ী)।

কৃষ্ণ পর্বত (Crna Gora = Black Mountain) নামে পরিচিত অঞ্চল হইতে মন্‌টিনিগ্রো নামকরণ হইয়াছে। মূলত অঞ্চলটি মধ্যযুগীয় সার্বিয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজ্যটি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল (Crnojevic বংশের অধীনে একটি পৃথক মন্‌টিনিগ্রোয়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮৮৬/১৪৮১ সাল হইতে ইহা একটি 'উছমানী সামন্ত রাজ্য ছিল এবং ৯০১/১৪৯৬ সাল হইতে উহা 'উছমানী শাসনাধীনে আসে। বর্তমান মন্‌টিনিগ্রোর অন্য অংশগুলি ইতোপূর্বে 'উছমানী শাসনাধীনে আসিয়াছিল, আর অধিকাংশ উপকূল এলাকা ভেনিসীয় শাসনাধীনে ছিল।

যখন ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় তখন সরকারীভাবে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল কারাদাগ। দেশটির অভ্যন্তরে অধিকাংশ অংশে এবং কোনও কোনও বিশেষ সীমান্ত অঞ্চলে একটি গোত্রীয় প্রথার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। ইহা দেশটির অভ্যন্তরীণ গণজীবনে এক ধরনের

সামরিক গণতন্ত্র উদ্ভবের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ৯১৯/১৫১৩ সাল হইতে ইসকান্দার বেগ (দ্র.) কারাদাগ-এর সানজাক বেগ ছিলেন। Crnojevic বংশের ইসলাম অনুসারী বংশধর। ওই সময় দেশটিকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল। জনগণকে আর জিয়্য়া প্রদান করিতে হইত না অথবা 'উশ্‌র এবং অন্যান্য করও দিতে হইত না, কিন্তু শুধু প্রতিটি বাড়ি ও জমির জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা (ফিলুরি) কর হিসাবে প্রদান করিতে হইত। ইসকান্দার্ বেগের মৃত্যুর পর কারাদাগ অঞ্চল আর স্বতন্ত্র সান্‌জাক, বিশেষ করিয়া ইসকান্দারিয়্যার সানজাক (স্কুটারি) রহিল না, কিন্তু তথাপি প্রজাগণ কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে থাকে। দশম/ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মন্‌টিনিগ্রোয়ী বিশপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীতে 'উছমানী শাসনাধীনে কারাদাগ-এর স্বায়ত্তশাসন একজন স্থানীয় সিপাহীর (সার্ব, স্পাহিয়া) অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা হউক, বিশপ ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকেন এবং একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জনগণের এবং 'উছমানী শাসকমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ওঠেন। একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কারাদাগ-এর অধিবাসিগণ ভেনিসীয়গণের অধিকতর সান্নিধ্যে আসে এবং তাহাদের প্রভাবে 'উছমানী শাসনের বিরুদ্ধে কারাদাগ-এর অধিবাসিগণের একটি বিদ্রোহের আশু সমাপ্তি ঘটে। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীতে এন্‌যেগুস (Njegus) পল্লীর Petrovic বংশোদ্ভূত বিশপগণের পরিচালনায় জনগণ 'উছমানী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং অনেকগুলি যুদ্ধে তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে পেট্রোভিচ বিশপগণের অধীনে এবং তারপর ঐ একই বংশের সাধারণ শাসকগণের অধীনে দেশটি একটি রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৭৮ সালের বার্লিন কংগ্রেসে ইহাকে একটি স্বাধীন সামন্ত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৯১০ সালে রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

অঞ্চলটিতে গোত্রীয় সংগঠন প্রাধান্য লাভ করায় এবং 'উছমানী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে মন্‌টিনিগ্রো একটি যোদ্ধৃ জাতির অধিকারী হইয়া ওঠে এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্‌টিনিগ্রোতে একটি জনশ্রুতি গড়িয়া ওঠে— যাহাতে প্রচারিত হয় যে, মন্‌টিনিগ্রো কখনো তুর্কী শাসনাধীনে ছিল না। এই জনশ্রুতির কিছুটা এখনো প্রচলিত আছে এবং বেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতিহাস লিখনেও ইহা স্থান লাভ করিয়াছে।

মনটিনিগ্রো বলকান যুদ্ধে (১৯১২-১৩) 'উছমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) সার্বিয়ার মিত্র হিসাবে আঁতাতের (Entente) পক্ষে অংশগ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহা অক্ষশক্তির অধীনে আসে এবং ১৯১৮ সালে সার্বিয়ার সহিত একত্রীভূত হইয়া সার্ব, ক্রোট এবং স্লোভেনগণের রাজ্যের (পরবর্তীতে যুগোস্লাভিয়া নামে রূপান্তরিত) অংশরূপে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মনটিনিগ্রো ইটালির দখলে ছিল এবং জনগণ একযোগে যুগোস্লাভিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Enciklopedija Jugoslavije, ii, Zagreb 1956, 398-488 (article Crna Gora); (২) B. Durdev, Turska vlast u Crnoj Gori u XVI i XVII veku ("The Turkish rule in Monetenegro in the 16th and 17th centuries"), Sarajevo 1953; (৩) Istorija Crne Gore ("History of Monenegro") ii 2, Tito-grad 1970 (volume iii, covering the period of Turkish rule, is in preparation); (৪) Ustav Islamske zajednice u Socijalistickoj Federativnoj Jogoslaviji ("The Constitution of The Islamic Union in the S. F. R. of Yogoslavia"), in Glasnik Vrhovnog islamskog starjesinstva u SFRJ, xxxiii, 1-2 (Sarajevo 1970), 105-12।

B. Durdev (E.I.[2])/ আ. র. মামুন

কারানফুল (قرنفل), লবঙ্গ। বিভিন্ন আরবী অভিধান হইতে দেখা যায় যে, এই উদ্ভিদটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যাহার মধ্যে কারানফুল ও কারানফুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে প্রচলিত জনপ্রিয় উচ্চারণ রীতিসমূহের মধ্যে কুরানফুল ও কুরানফিল অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগীয় সময়কালের অন্তিম পর্বের পূর্ব পর্যন্ত লবঙ্গ মলাক্কা Moluccas অঞ্চলের সীমানার বাহিরে প্রসার লাভ করে নাই এবং যেহেতু চীন অভিমুখে নৌ-পথে গমনকারী মুসলিম নাবিকগণ তাহাদের যাত্রা পথের ডানপার্শ্বে অবস্থিত এই দ্বীপমালা স্পর্শ করিতেন না। তাই প্রাচীন কালের আরব দেশীয় গ্রন্থকারগণ লবঙ্গের উৎপত্তিস্থল সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ইব্‌ন খুররাদায বিহ মনে করিতেন যে, ইহার উৎপত্তি স্থান 'সালাহিত', কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ওয়াকওয়াক [দ্র.] দ্বীপের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সালাহিত দ্বারা তিনি সম্ভবত মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যদিকে দেখা যায় যে, আল-মাস'উদী-র বর্ণনা অনুযায়ী ইহা আন্নাস সাগরস্থ (সানফ) দ্বীপসমূহের অন্তর্গত এবং যাবাজ নামক এক মহারাজার রাজ্য হইতে আনয়ন করা হইত। ইহা প্রায় নিশ্চিতভাবে শ্রী বিজয়ের রাজ্য নির্দেশ করে, যাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রায় অবস্থিত পালেম্বাং। আল-ইদরীসী ও আল-কাযবীনীর ন্যায় পরবর্তী সময়ের আরব ভৌগোলিকগণ শুধু এই সকল তথ্য ও বক্তব্যের পুনরুক্তি করিয়াছেন। অবশ্য আল-কাযবীনী ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সুমাত্রা, সিংহল ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপে লবঙ্গ জন্মায়। ইব্‌ন বাত্তুতা দাবী করিয়াছেন যে, সুমাত্রা ও যাভা দ্বীপে তিনি এই উদ্ভিদ দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি এই প্রসঙ্গে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, তিনি অপর কোনও উদ্ভিদের সহিত ইহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় আরবী সাহিত্যসমূহে "dumb barter" পদ্ধতিতে লবঙ্গ সংগ্রহ করা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনী হইতে অধিকন্তু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই মসলাটির উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা ছিল না।

লবঙ্গ মসলা অর্থাৎ এই উদ্ভিদের বায়ু শুষ্ক পুষ্প-কলি মসলারূপে রন্ধনকার্যে ব্যবহার করা হইলেও ইহার প্রধান ব্যবহার ছিল ভেষজরূপে। মরক্কো অঞ্চলে ইহা দুগ্ধ সুরভিত করার কার্যেও ব্যবহার করা হইত। ইসহাক ইব্‌ন হুনায়ন ও ইব্‌ন সীনা-এর ন্যায় আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানিগণ ইহাকে দৃষ্টি ক্ষমতা তীক্ষ্ণতর ও সূক্ষ্ম করার ক্ষেত্রে কার্যকর ঔষধরূপে বিবেচনা করিতেন। ইব্‌ন সীনা ও তাঁহার পূর্বে ইসহাক আল-ইসরা'ঈলী (Isaac Israeli) অধিকন্তু ইহাকে হজমের জন্য সহায়করূপে বিবেচনা

করিতেন। কারণ ইহা পাকস্থলী ও যকৃত শক্তিশালী করে। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইসহাক ইব্ন ইমরান প্রজনন ক্ষমতার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন। অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রীয় কর্তৃপক্ষগণের ন্যায় তিনি উল্লেখ করেন যে, ইহার ব্যবহার দ্বারা যৌন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী ইহা দৈহিক স্থূলতা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করে। বহুমূত্র এবং অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও একটি নিয়ামকরূপে আরব চিকিৎসাবিদগণ ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতেন। ইহার ব্যবহার প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিকিৎসাবিদ প্রদত্ত নির্দেশনাবলী স্পেনীয় উদ্ভিদ বিদ্যাবিশারদ ও ভেষজবিদ ইবনু'ল-বায়তার কর্তৃক তাঁহার প্রণীত আল-জামি' লি-মুফরাদাতি'ল-আদবিয়্যা ওয়া'ল-আগযিয়া গ্রন্থের 'in extenso' অংশে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার চমৎকার সৌরভের জন্য, ইহা মুখের নির্মলতা আনয়নে চর্বণের জন্য এবং বিভিন্ন সুরভি প্রস্তুতিতে উপাদানরূপে ব্যবহার করা হইত। মরক্কো অঞ্চলে বেদুঈন সম্প্রদায় এবং তাহাদের মহিলাগণ ইহাকে কণ্ঠহারের অংশ রূপে ব্যবহার করে।

এই সকল কারণ ও ব্যবহারিক চাহিদার জন্য লবঙ্গ মসলা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যরূপে বিবেচিত ছিল। খিলাফাত সময় কাল হইতে পরবর্তীকালে ইহা লোহিত সাগর পথে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে আমদানী করা হইত এবং তথা হইতে ইহা কায়রো ও দামিশ্ক অভিমুখে প্রেরণ করা হইত। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে এই সকল আনীত পণ্যের একাংশ আলেকজান্দ্রিয়া ও বৈরূতে ইতালীয় বণিকগণের নিকট পুনঃবিক্রয় করা হইত। এতদ্সত্ত্বেও ভেনিসীয়, জেনোয়া ও ফলোরেন্স-এর পোতসমূহে বাহিত মালামাল প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লবঙ্গের ভূমিকা মরিচ বা আদার ন্যায় গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। উপরন্তু লবঙ্গ অত্যন্ত মহার্ঘ্য মসলারূপে বিবেচিত ছিল এবং ইহা মরিচের তুলনায় দুই হইতে তিন গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে সাধারণভাবে ১০০ মান্ন পরিমাণ লবঙ্গ ৭০-৮০ ডুকাট মূল্যে বিক্রয় হইত, যদিও ইহার বোঁটা অংশ তুলনামূলকভাবে সস্তা ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. A. ও T. A., শিরো. দ্র.; (২) ইব্ন খুররাদাযবিহ, ৬৬, ৭০; (৩) মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ৩৪১, ৩খ, ৫৬ (অনু. Pellat, ১খ, ১৩৯, ৩খ., ৩৩৮); (৪) কাযবীনী, Kosmographie, ১খ, ২৬২, ২খ, ১৮, ৫৩, ৫৫; (৫) ইব্ন বাত্তুতা, ৪খ, ২২৮, ২৪০, ২৪৩; (৬) তুহফাতু'ল-আহবাব, সম্পা. Renaud ও Colin, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., ১৫৩; (৭) ইবনু'ল-বায়তার, বূলাক ১২৯১ হি., ৪খ, ৭প. (অনু. von Sontheimer, স্টুটগার্ট ১৮৪০-২ খৃ., ২খ, ২৮১ প.); (৮) E. Wiedemann, Aufsatze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, Hildesheim ১৯৭০ খৃ., ২খ., ২৫৪ প. (নুওয়ায়রী-এর সঠিক ভাষ্য); (৯) E. Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient medieval, প্যারিস ১৯৬৯ খৃ., ৩৩৪, ৪১৭ প.; (১০) W. Heyd, Histoire du Commerce du Levant, ২খ, ৬০৩ প.।

E. Ashtor (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কারাপাপাখ (قره پاپاخ) ঃ (তুর্কী, অর্থ কাল টুপী), একটি তুর্কী বংশোদ্ভূত গোত্র। উহাদের ভাষা পশ্চিম ওগুয শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং আযেরী ভাষা ও তুরস্কের তুর্কী ভাষা হইতে সামান্য ভিন্নতর। জর্জিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এই ভাষাকে প্রায়শ আযেরী ভাষা বলিয়া ভুল করা হয় এবং খোদ তুরস্কেই এখন আর কারাপাপাখ ভাষায় কেহ কথা বলে না (ইহার পরিবর্তে তুর্কী ভাষা বলে)। ১৮২৮ খৃ. কারাপাপাখরা পূর্ব জর্জিয়ার দেবেদা বা বোরচালা নদী তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়িয়া একাংশ কারস অঞ্চলে (সেইখানে উহারা মোট জনসংখ্যার ১৫% ছিল) এবং অপরাংশ পারস্যের রিদা'ইয়্যা (উরমিয়্যা) হ্রদের দক্ষিণে সুল্দুয অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করে। ১৮৮৩ খৃ. ইহাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২১,৬৫২, তন্মধ্যে ১১,৭২১ জন ছিল সুন্নী, আর ৯,৯৩১ জন ছিল শী'আ (K. Sadovskiy, Krathaya zametka o Karskoy oblasti, in Sbornik Materialov... Kavkaza, ৩খ, ৩১৫-৫০)। ১৮৯৭ খৃ. রাশিয়ার আদমশুমারী অনুযায়ী ইহাদের জনসংখ্যা ছিল ২৯,৮৭৯ (রুশ সাম্রাজ্যের ভিতরে); ১৯১০ খৃ. ইহাদের জনসংখ্যা ছিল বলিয়া বলা হয় ৩৯,০০০ ('Kavkazskiy Kalenda', ১৯১০ খৃ., পৃ. ৫৪৬)। কারস অঞ্চলের ৯৯টি গ্রামে ইহারা বাস করিত, তন্মধ্যে ৬৩টি গ্রাম ছিল কার্স জিলাতে, ২৯টি আরদাহানে এবং ৭টি কাগীযমানে। ১৯২৬ খৃ. সোভিয়েত আদমশুমারীতে মাত্র ৬,৩১৬ জন কারাপাপাখ অধিবাসী গণনা করা হয়, জনসংখ্যার এই হঠাৎ হ্রাস পাইবার কারণ, ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়ার কারস অঞ্চল তুরস্কের অধিকারে চলিয়া যায়। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কারাপাপাখদের বসবাসের স্থান হিসাবে দেখানো হয় যে, ৩০% সোভিয়েত রাশিয়াতে আর ৭০% পারস্যে (আর তুরস্কে যাহারা বাস করিতেছিল তাহাদিগকে সম্ভবত তুর্কী বলিয়াই ধরা হইয়াছিল)। সোভিয়েত রাশিয়াতে বসবাসকারী কারাপাপাখদিগকে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে আযেরীগণ তাহাদের সঙ্গে একীভূত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা চালাইতেছে এবং ১৯৫৯ ও ১৯৭০ খৃ. সোভিয়েত আদমশুমারীতে ইহাদিগকে আযেরীরূপেই ধরা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে কারাপাপাখদের অর্থনীতি ভেড়া পালন ও কিছু কিছু চাষাবাদ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

W. Barthold [R. Wixman] (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

আল-কারাফা (দ্র. আল-কাহিরা)

কারাফেরয়ে (Karaferye) ঃ (প্রাথমিক সূত্রসমূহের বর্ণনায় কারাভেরয়ে) মেসিডোনিয়ার একটি ক্ষুদ্র শহর, বের্‌রহোইআ (Berrhoia) বা বেরোইয়ার 'উছমানী নাম (আধুনিক গ্রীক ভাষায় ভের্‌রিআ, ভেরিআ; স্লাভ ভাষায় বের); শহরটি স্যালোনিকা হইতে পশ্চিম দক্ষিণে ৬০ কিলোমিটার এবং আলিয়াকমোন (Vistritza; তুর্কী, ইনজে কারাসু)-এর বাম তীর হইতে ৮ কিলোমিটার দূরে, ওলিম্পেন পর্বতশ্রেণীর (তুর্কী আগুসতোস দাগী) পূর্ব ঢালুর পাদদেশের নিকটে অবস্থিত, যাহার সম্মুখে বিস্তীর্ণ ও উর্বর এক সমতলভূমি বিস্তৃত; "ইহা রুমেলীর সর্বাপেক্ষা মনোরম শহরগুলির অন্যতম (Leake)। সম্ভবত উত্তর থ্রেস (তুর্কী [Eski] যাগরা) (তু. জোরগা, GOR, ১খ, ১১৩)]-এর অন্তর্গত বের্‌রহোইয়া শহর হইতে এই শহরের স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার জন্য ইহার নামের পূর্বে তুর্কী শব্দ কারা (দ্র.) যোগ করা হইয়াছে। বায়যানটীয় সূত্রসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের দিকেই কারাসী (দ্র.) হইতে আগত তুর্কীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় (Hammer-Purgstall, ১খ, ১২৭)। এই জিলাটি কিছুকালের জন্য স্টেফ্যান ডুসান

(Stefan Dusan)-এর সার্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (Ostrogorsky, History, 524) এবং তাঁহার মৃত্যুর (১৩৫৫ খৃ.) পর ইহা এক নৃপতি শাসিত সার্বীয় রাজ্য হলাপেনের (Hlapen) অন্তর্ভুক্ত হয় (Jirecek, Gesch. d. Serben, ২খ, ১০৫, ১০৭)।

'উছমানী ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে ৭৮৭/১৩৮৫ সনে এই শহরটি (লালা শাহীন কর্তৃক ?) অধিকৃত হয় (Giese, Anon. 26, 13, যাহা হইতে প্রাপ্ত 'আশিক পাশা যাদে [শা ৫৫], নেশরী ইত্যাদি; তু. সা'দু'দ-দীন, ১খ, ৯১-৯২, তাঁহার উল্লিখিত সাল ৭৭৬/১৩৭৪-৭৫)। গ্রীক ক্ষুদ্র ঘটনাপঞ্জী অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট তারিখ হইতে ৮ মে, ১৩৮৭ [P. Wittek কর্তৃক উল্লিখিত, BSOAS, xiv (1952), 661, n. 3]; কিন্তু চূড়ান্ত দখল সম্পন্ন হয় সম্ভবত ১ম বায়াযীদের অধীনে, যিনি সেখান হইতে Peloponnese-এর অভ্যন্তরে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করেন (Giese, Anon., 28-29; Hammer-Purgstall, ১খ, ২৪৯)।

য়াযীজী ওগলু 'আলী [দ্র.] কর্তৃক সংরক্ষিত একটি বর্ণনা অনুযায়ী রূমের সাল্জুক সুলতান ২য় কায়-কা'উস [দ্র.] বায়যান্টীয় সম্রাট ৮ম মাইকেলের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর তাঁহার অল্পবয়স্ক দুই পুত্রকে বেরোইয়ার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়; একজন রাজকুমারের পৌত্রগণ খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই একজন বংশধর জনৈক লিযিকোস (Lyzikos) 'উছমানী সুলতান (১ম বায়াযীদ)-এর নিকট বেরোইয়া সমর্পণ করেন। অতঃপর তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারকে যিখনায় স্থানান্তর করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে কারাফেরয়ে (এবং যিখ্না) সেই সব জিলার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলিতে গাগাউয্ (তুর্কীগণ অর্থাৎ "কায়-কা'উসের অনুসারিগণ" বসবাস করিত [P. Wittek, Les Gagaouzes = Les gens de Kaykaus, in RO, xvii (1951-52), 12-24; ঐ লেখক, Yazijioghlu 'Ali on the Cristian Turks of the Dobruja, in BSOAS, xiv (1952), 639-68; E. A. Zakhariadou, vi (Salonika 1964), 62-74]।

৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে শহরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মাঠগুলিতে রাষ্ট্র পরিচালিত বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতসমূহ বিদ্যমান ছিল (M. T. Gokbilgin, Edirne ve Pasa Livasi, Istanbul 1952, 135-37; তু. ফিলাহা পৃ. ৯০৭)। ১১শ/১৭শ শতকে (এবং অনুমান করা যায় যে, ইহার পূর্বেও) কারাফেয়ে, সেলানিক [দ্র.] সানজাকের একটি কাদা হিসাবে পরিচালিত হইত। আওলিয়া চেলেবি ইহাকে প্রাচীরবিহীন ও রক্ষী সৈন্যদলবিহীন হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন; তবে এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ থাকার কথাও বলিয়াছেন। এখানে ১৬টি মুসলিম, ১৫টি খৃস্টান মহল্লা ও দইটি য়াহূদী জেমা'আত লইয়া 8,০০০ বাড়ী ছিল। ১৮৮৫ খৃ. আগাস্তোস-এর নাহিয়ে (Naoussa)-সহ এই কাদা ৪৬টি গ্রাম ও খামার লইয়া গঠিত ছিল (IA, art. Selanik, p. 347 a)।

১ম বলকান যুদ্ধে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯২২), ২৫ অক্টোবর গ্রীকদের হাতে কারাফেরয়ের পতন ঘটে এবং এথেন্স চুক্তির (১৪ নভেম্বর ১৯১৩) পর হইতে ইহা গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Pauly-Wissowa, দ্র. Beroia (i) [এবং তাহাতে প্রদত্ত সূত্রসমূহ]; (২) Belgeler, i/I (1964), 91 ৮৯৪/১৪৮৯ সনের কারাভেরয়ে, সারফিসে [সার্ভিয়া] এবং ভোদানা (এডেসা)-র জিযয়া-র জন্য; (৩) হাজ্জী খালীফা, অনু. J. von Hammer, Rumeli und Bosna, vienna 1812, 86; (৪) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত নামে, ৮খ, ১৮১-৬; (৫) F. C. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grec, Paris 1826-7, iii, 94; (৬) W. M. Leake, Travels in northern Greece, London 1835 (পুনঃমুদ্রণ ১৯৬৭ খৃ.), iii, 290 প.; (৭) M. F. Thielen, Die europaische Turkey, Vienna 1828, 130-31; (৮) 'আলী জেওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়ানূন তা'রীখ্ ভে জুগরাফয়া লুগাতী, ইস্তাম্বুল ১৩১৩-১৭ হি., ৬০৫; (৯) সামী, কামূসু'ল-আ'লাম, ১৩১৪/১৮৯২, ৫খ, ৩৬৩৯-৪০; (১০) Semavi Eyice, in TM, xii (1955), 206-7; (১১) I. K. Vasdravelli.

V. L. Menage (E.I.²)/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারাবা (قـرابة) : আরবী শব্দ, নিকট আত্মীয়তা, জ্ঞাতি সম্পর্ক, মূল উৎস ق-ر-ب, অর্থ নিকটে অবস্থিত, নৈকট্য ইত্যাদি। সম্ভবত হিজরত পরবর্তীকালে 'কারাবা' পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি মুসলিম ভাষ্যকারদের রচনায় ব্যবহৃত হইলেও আল-কুরআনে কিন্তু ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। পবিত্র কুরআনের মনোনীত শব্দটি হইল 'কুরবা'। অবশ্য ইসলাম-পূর্ব কালের আরবী কাব্যেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন তারাফা, মু'আল্লাকা)। বস্তুত এই সমস্ত ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনাদি অপেক্ষা জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রশ্নটি গৌণ, বিশেষ করিয়া ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ক্ষেত্রে, যেমন— যু. (ذو), যাবী (ذوى), উলি'ল্-কুর্বা (اولى القربى), কুরআন, ২ : ৮৩, ১৭৭, ৪ : ৮, ৩৬, ৫ : ১০৬, ৬ : ১৫২; ৭ : ৪১; ৯ : ১১৩, ১৬ : ৯০, ১৭ : ২৬, ২৪ : ২২, ৩০ : ৩৮, ৩৫ : ১৮, ৪২ : ২৩, ৫৯ : ৭)। অতি নিকট সম্পর্ক বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় আল্-আক্রাবুন (الاقـربون), শব্দটি যাহার অর্থ অতি নিকট বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যাহারা কাহারও উত্তরাধিকার বা ওয়ারিছী স্বত্বের দাবিদার (২ : ১৮০, ২১৫, ৪ : ৭, ৩৩, ১৩৫)। সম্বন্ধ বা সম্পর্কের সঠিক সংজ্ঞা কোথাও বিবৃত হয় নাই। কারণ তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলীয় আরবগণ মূলত যাযাবরোচিত জীবন যাপন করিত এবং প্রথাগতভাবে পিতৃগোত্রের ধারণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইত (অর্থাৎ তাহারা পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক নীতিকে প্রাধান্য দিত)। তাই তারা গোত্রের সকল সদস্যকেই স্বীয় পরিবারভুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি দিত এবং (তাহারা) বিশ্বাস করিত যে, প্রত্যেকের ধমনীতে একই রক্ত প্রবহমান। স্বগোত্রের ধারণার এই ব্যপ্তি সত্ত্বেও কেবল অপেক্ষাকৃত সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই ঐক্য বিরাজিত ছিল— যেমন 'আশীরা (عـشـيـرة) গোত্র [দ্র.]; এই গোত্রভুক্ত সদস্যরা পরস্পরের নিকট হইতে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করিত না। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ (স) তাঁহার স্ববংশীয় ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে সর্বপ্রথম ইসলামের দা'ওয়াত জানান (কুরআন ২৬ : ২১৪)। এখনও বেদুঈনগণের মধ্যে অনুরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত প্রকৃত আত্মীয়-স্বজনকে (دمـوية — দামাবিয়া) রক্তের মূল্য প্রদান করিতে বিনীত অনুরোধ জানাইয়া থাকে।

জ্ঞাতি-সম্পর্ক সম্বন্ধে আল-কুরআনের ধারণাটি কী ? নিশ্চয়ই উহাতে বহুল পরিমাণে সেই যুগের ধারণা পিতৃ গোত্রেরই পারিবারিক সম্পর্ক, স্ত্রী জাতির উপর পুরুষ জাতির প্রাধান্য, স্ব-গোত্রীয় ঐক্য এবং যৌথ দায়িত্ব

ইত্যাদি প্রতিফলিত হইয়াছে। তথাপি দেখা যায়, মহানবী মুহাম্মাদ (স) বৈপিত্রেয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কিঞ্চিত নমনীয় মনোভাব পোষণ করিতেন। যেহেতু প্রকৃত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে শেষোক্ত (বৈপিত্রেয় সন্তানাদি) এই সব ব্যক্তি পরিবারভুক্ত নয় তাই তাহাদের কোন ওয়ারিছ বা স্বত্বাধিকারও নাই। ইসলামী শারী'আতে উত্তরাধিকার বা ওয়ারিছী স্বত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্বন্ধ অনুসরণ করা হইলেও উল্লেখ্য যে, মূল বংশোদ্ভূত কোনও উত্তরাধিকারী না থাকিলে কোনও মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের একাংশ তাহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃগণই পায় (আল-বুখারী, সাহীহ, কিতাবু'ল-ফারা'ইদ, ১৪ (الصحيح البخارى، كتاب الفرائض), ইব্‌ন রুশ্‌দ (ابن رشد) বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ (بداية المجتهد), কায়রো ১৩৩৫ হি., ২খ, ২০৭)। অধিকন্তু একটি হাদীছের ভাষ্যানুসারে "যাহার অন্য কেহ থাকে না মামা তাহার উত্তরাধিকারী হয়" (ইব্‌ন রুশ্‌দ, পূ. গ্র., ২৩)। উপরন্তু অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, "বোনের পুত্র বা ভাগিনাও গোষ্ঠীর অঙ্গভুক্ত।" পরিশেষে উল্লেখ্য যে, পিতৃকুলের (বংশের) দিক হইতে যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বৈধ নয়, অনুরূপভাবে মাতৃকুলের দিক হইতেও সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত বিবাহ-শাদী নিষিদ্ধ (কুরআন, ৪ ঃ ২৩) এবং রক্তের সম্পর্কযুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তির সহিত পরস্পর বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ, ঠিক তেমনি ধাত্রী মাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (আল-বুখারী, কিতাবু'ন-নিকাহ; ২১) পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ সমগোত্রীয় এবং অসম-গোত্রীয় চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বন্ধন অনুমোদিত, এমনকি সুপারিশকৃত। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতৃ গোত্রজ সম্বন্ধ (Kinship) দ্বিপাক্ষিক। অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করা হয়। বাস্তবে কেবল স্বগোত্রীয়দিগকেই প্রকৃত জ্ঞাতিরূপে গণ্য করা হয়। রক্তের প্রতিশোধ ও রক্তের মূল্য প্রদানের সম্পর্ক কেবল ইহাদেরই সহিত। এই কারণে স্ত্রীর জন্য প্রাপ্য দিয়্যাত (دية) পরিশোধের দায়িত্ব অংশীদারগণের উপর (عصابة) ন্যস্ত, যদিও তাহার ওয়ারিছ বা স্বত্ব তাহার সন্তান-সন্ততি ও স্বামীর উপর বর্তায় (আল-বুখারী, ফারা'ইদ, ১০, দিয়াত, ২৫)।

জাহিলী যুগে বংশগত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বৈপিত্রেয় সন্তান-সন্ততিগণ কখনও কখনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব বহন করিত। স্ত্রী ও মামাত-ফুফাত ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয়ের জন্য উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেদুঈন রীতিনীতিও একই চিন্তা-চেতনার অনুসারী (J. Chelhod, le droit dans le societe bedouine, Paris ১৯৭১ খৃ.)। সগোত্রীয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ধারণার সম্প্রসারণ কি ইসলামপূর্ব কালের রীতিনীতির পরিপন্থী এবং ইহা কি তাহাদের পক্ষ হইতে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইয়াছিল ? W. Robertson কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বে যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে (Kinship, and marriage in early Arabia) তাহাতে সংক্ষিপ্তাকারে বিপরীত মতবাদ পেশ করা হইয়াছে। তাঁহার ভাষ্যানুযায়ী পিতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা এশিয়ায় পরবর্তী ঘটনা। বস্তুত ইহা হিজরতের সমকালীন ঘটনা; কিন্তু ইহার পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক প্রথার প্রচলন ছিল। Morgan ও MacLennen-এর গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান ও পদ্ধতি অনুসরণে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। তথাপি এই মতবাদের প্রতি কিছু সংখ্যক লোকের সমর্থন রহিয়াছে (M. Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, ৬১৬; W. M. Watt, Muhammad at Medina, ৩৭৮ f.; Lecerf in 'A'ila) (عائلة) এবং সে কারণে সংক্ষিপ্তভাবে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। কুলজিবিদগণ গোত্রকে পিতৃগোত্রজ পরিবার বলিয়া যে ধারণা পোষণ করেন, Smith কর্তৃক যথার্থই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তিনি কুলজিবিদদের সুদক্ষ ও নববিন্যস্ত বংশ কাঠামোর কৃত্রিম প্রকৃতির সমালোচনাও করিয়াছেন। গোত্রগত ভিন্নধর্মিতা তাঁহারা লক্ষ করেন নাই। এই জন্য তাঁহারা দোষী; এই ভিন্নতা কাবীলার (قبيلة) [দ্র.] গঠনে লক্ষণীয়। তথাপি ইহা সত্য যে, রক্তের ঐক্য সামাজিক পিরামিডের উচ্চতর স্তরগুলিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, ফাখীয ও 'আশীরা ইহার উদাহরণ। এদ্ব্যতীত প্রাচীন গোত্র প্রথা সম্পর্কে Robertson Smith-এর ধারণা মূলত ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনাপ্রসূত। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা এই সমস্ত সমস্যার উপর সঠিক আলোকপাত করিতে সক্ষম হইব না। বরং মাতৃতান্ত্রিক প্রথার সহিত ইহা কতটুকু তুলনীয় তাহা দেখিবার পূর্বেই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর উপর সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এইরূপ ধারণা হয় যে, যোদ্ধা যাযাবরদের মধ্যে পিতৃগোত্রজ লোকদের অন্তর্বিবাহের প্রবণতা রহিয়াছে এবং স্থায়ী বসতকার কৃষিজীবী জনগণ অসবর্ণ বা ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিবাহ বন্ধন উৎসাহিত করে। অনুরূপভাবে হিজরত পূর্বকালে পশ্চিমাঞ্চলীয় আরবগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'স্মীথ'-এর ধ্যান-ধারণার বিপরীত প্রথা পোষণ করিত। আমরা যদি ইসলাম-পূর্বকালীন মাতৃতান্ত্রিক আরবীয় প্রথার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের প্রায় সকলেই দক্ষিণ আরবের সহিত সংশ্লিষ্ট (মদীনা, হিময়ার ও সাবা' হইতে) অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী যাহারা দীর্ঘদিন যাবৎ তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল যদিও, কতিপয় গোষ্ঠী স্বল্পকালের জন্য যাযাবর জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে য়ামানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রসূত আরও প্রমাণাদি সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত এই সমস্ত গোত্র সম্পর্কে যে কোনও প্রকার মন্তব্য সাময়িক হইলেও তাহা দূর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে উত্তর আরবীয়গণ গভীরভাবে মরুভূমির ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত এবং তাহাদের সামাজিক রীতিনীতিতে পিতৃতান্ত্রিকতার নিদর্শন বিরাজমান। পবিত্র মক্কা নগরীতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কুরআনিক সংস্কারের উদ্দীপনা এই পটভূমি হইতেই প্রধানত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কারাবা-র ধারণার সম্প্রসারণের জন্য মদীনার কোনও কোনও রীতিনীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। মুখ্যত এই শব্দটি স্বগোত্রীয়তায় সহিত সম্পর্কিত, কিন্তু তথাপি ইহা প্রায়শ মাতার দিক হইতে সগোত্রীয়তা পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। বৈপিত্রেয় সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক সূত্রে সংযুক্ত হইবার দুর্বল প্রস্তাবাবলী কারাবার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আকার গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম পূর্বকালীন বিশ্বাস অনুযায়ী অতীন্দ্রিয় বা গূঢ় সম্বন্ধ (পোষ্য পুত্র গ্রহণ, রক্তের সম্পর্ক, স্ববংশীয় সম্পর্ক) এমন সব সম্পর্ক স্থাপন করে, যাহা প্রকৃত জ্ঞাতি সম্পর্কের সমান। মহানবী মুহাম্মদ (স) স্বয়ং মুহাজির ও আনসারগণকে একে অপরের ভাই এবং পরস্পরের উত্তরাধিকারী (ওয়ারিছী স্বত্বাধিকারী) ঘোষণা করিয়া এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন (কুরআন, ৮ ঃ ৩, ৭২)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি কারাবাকে রক্তের সম্পর্কের সহিত সম্পৃক্ত বা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন (৬৮ ঃ ২, ৩৩ ঃ ৩, ৪০, ৮ ঃ ৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই বিষয়ের উপর গবেষণাপ্রসূত অনেক আলোচনা আছে। তাহা ছাড়া এই সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. J. Chelhod, রচিত Le marriage avec la cousine Parallele dans le systeme Arabe, in l'Homme, v (1965), ১১৩-৭৩।

J. Chelhod (E.I.[2])/ মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

কারাবাগ (দ্র. কারা বাগ)

কারাবাযীন (দ্র. আকরাবাযীন)

আল-কারাবিয়্যীন (القرويين) ঃ মসজিদ, মরক্কোর ফাস নগরীতে অবস্থিত একটি সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

১। পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা ঃ ফাস (দ্র.) প্রবন্ধের অন্তর্গত এবং "স্মারক ভবনসমূহ" শিরোনামের অধীনে এই বিখ্যাত মসজিদটির স্থাপত্য ইতিহাস ইতোমধ্যেই প্রয়াত H. Terrasse কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা যথাযথভাবে সুপরিচিত। উপরিউক্ত বর্ণনা ও ইতিহাস একই গ্রন্থকার কর্তৃক অপর একটি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ঃ La Mosquee al-Qarawiyyin a Fes, avec une etude de G. Deverdun, sur les inscriptions historique de la Mosquee (প্যারিস ১৯৬৮ খৃ.)-তে পরিমার্জিত করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে ইহার তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করা যায়।

(ক) মসজিদটির প্রথম অট্টালিকা নির্মিত হয় ২৪৫/৮৫৯ সালে; ওয়াদী ফাস-এর বাম তীরে নির্মিত এই ভবন ছিল ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ আল-ফিহ্রী নামক একজন ধার্মিক মহিলার অবদান। তিনি তাঁহার পরিবারসহ কায়রাওয়ান হইতে ফাস নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি ২য় ইদরীস-এর পৌত্র আমীর য়াহ্ইয়া ইব্ন ইদ্রীস-এর নিকট হইতে এই ভবন নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। প্রথম খুতবা কক্ষটির (কেন্দ্রীয় অংশ) অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ছিল পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ৪৬.৬০ মিটার ও উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ১৭.২০ মিটার এবং ইহার মধ্যে একটি সালাত কক্ষ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহার কিবলা-প্রাচীরে চারিটি সমান্তরাল স্তম্ভ সারির অলিন্দ (bay) বর্তমান ছিল। ইহার মিহরাব-এর অবস্থান ছিল বর্তমানের বিশাল ঝাড়-বাতির স্থানে, যে স্থানে ইহার মিনার অবস্থিত ছিল তাহা বর্তমানে 'আনাযা-এর স্থান; পরবর্তীকালে মিনারটি মসজিদের কেন্দ্রস্থলে স্থানান্তরিত হয়। ইদ্রীসী আমলের সারিবদ্ধ স্তম্ভের অলিন্দসমূহ পরবর্তীকালের সম্প্রসারণসমূহের তুলনায় বৃহত্তর ছিল (৩.৭০ মিটারের তুলনায় ৪.১০ মিটার) এবং ইহাতে ১২টি খিলান পথ ছিল যাহার ৫টি ছিল মূল ভবনের অক্ষীয় অবস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে এবং ৬টি ছিল পূর্ব পার্শ্বে। এই অস্বাভাবিক বিন্যাসের পশ্চাতে কি হেতু ছিল তাহা সন্ধান প্রচেষ্টায় অদ্যাবধি কোন সাফল্য লাভ করা যায় নাই। সম্ভবত ২৬৩/৮৭৭ সালের একটি শিলালিপিতে প্রদত্ত পরিবর্তন সংক্রান্ত ইঙ্গিতের সহিত ইহাকে যুক্ত করা যাইতে পারে (G. Deverdun, Une nouvelle inscription idrisite, in Melanges d'histoire et d'archeologie de l'Occident musulman, ২খ, Hommage a G. Marcais, আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ.); এই লিপির প্রণেতা ছিলেন ১ম ইদরীস-এর জনৈক পৌত্র আমীর দাঊদ। প্রাথমিক পর্যায়ের খুতবা কক্ষটির পূর্ব ও পশ্চিম সীমারেখা বর্তমান অট্টালিকার ক্রুশাকৃতি এক সারি স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে এবং এই রেখা দ্বারা মূল ভবনটি ইহার ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর পরিবর্ধন হইতে বিভক্ত। মসজিদের আঙিনাটি (সাহন) সালাত কক্ষের সম্মুখে বিস্তৃত। মূলত ইহার ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ইহার সার্বিক নির্মাণ পরিকল্পনা এবং ইহার বহির্দেশীয় বিন্যাস হইতে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, প্রাথমিক পর্যায়ের মসজিদটি ৩য়/১১শ শতাব্দীতে মাগরিবু'ল-আকসাতে নির্মিত বহুসংখ্যক উপাসনালয়ের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। আল-বাকরী এই প্রসঙ্গে বহু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন।

(খ) ফাস-এর জনসংখ্যা বহুলভাবে বৃদ্ধি হইবার কারণে ৩৪৫/৯৫৬ সালে অর্থাৎ ইহা স্থাপিত হইবার এক শতাব্দী পর কারাবিয়্যিন মসজিদ বর্ধিত করা হয়। ইতোমধ্যে ৩০৭/৯১৯ সালে ইহা কাযরাওয়ানী মহল্লার জামি' মসজিদে পরিণত হয় এবং এই মহল্লার নাম বহন করিতে থাকে। এই সম্প্রসারণ কার্য সম্পাদন করেন যানাতা আমীর আহমাদ ইব্ন আবি'স-সা'ঈদ; তিনি কর্ডোভা-র উমায়্যা খলীফা 'আবদু'র-রাহমান আন-নাসির-এর সামন্তরূপে এই এলাকার কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। খলীফা এই প্রকল্পের জন্য কর হিসাবে আদায়কৃত অর্থ হইতে বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করেন এবং ইহার ফলে মূল ইদরীসী ভবনকে কেন্দ্র করিয়া মসজিদের সম্প্রসারণ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। পূর্বতন চারটি স্তম্ভ অলিন্দ পশ্চিম দিকে চারটি তোরণ শ্রেণীতে বর্ধিত করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই পূর্বদিকে তাহা ৫টি সারিতে বর্ধিত হয়। প্রথম সাহ্ন ও আদিম মিনারটির স্থানে অপর তিনটি তোরণ-শ্রেণী স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে মূল কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকেই প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয় এবং এই সময় হইতে তাহা ৭টি স্তম্ভ সারি (bay) ও ২১টি কাতার (nave) সমন্বয়ে গঠিত থাকে। ভবনের ছাদ মূল bay-সমূহের অভিমুখে অর্থাৎ কিবলা প্রাচীরের সহিত সমান্তরাল বিন্যাসে অপরিবর্তিত থাকে। বর্তমান কাল পর্যন্ত ইহার যে মিনারটি দেখিতে পাওয়া যায় (ফাস প্রবন্ধের প্লেট নং ১৫), তাহা কাটা পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছিল। পরে তাহা যত্ন সহকারে পালিসকৃত চুন দ্বারা একটি প্রতিরোধক আবরণে আবৃত করা হয়। এই মিনারটি বর্গাকার এবং ৪.৯৫ মিটার প্রশস্ত ও সর্বমোট ২৬.৭৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট। প্রাচীরগুলি ০.৯৫ মি. পুরু, ০.৮৫ মিটার প্রশস্ত। ইহার সিঁড়ি ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুষ্পার্শ্বে উন্মুক্ত ও সরল সারিতে ক্রমশ উঠিয়া গিয়াছে। কর্ডোভার মিনারসমূহের ন্যায় ইহা সমতল টিবিতুল্য ধনুকাকৃতি ছাদ (rampart vaults) দ্বারা আবৃত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের দুইটি স্তম্ভ-অলিন্দ দ্বারা (উত্তর ও দক্ষিণ দিকে) ইহাকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিনার স্তম্ভের শীর্ষদেশে 'আযান' দেওয়ার জন্য একটি সমতল চাতাল রহিয়াছে। ইহার ছাদের কিনারা বরাবর নীচু পাচিল কারুশিল্পযুক্ত একটি সরল বন্ধনীর ন্যায় দেখায় এবং সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটির শীর্ষদেশে, লণ্ঠন স্থাপনের জন্য নির্ধারিত গবাক্ষ স্থাপন না করিয়া, ইফরীকিয়া-এর স্টাইলে একটি অর্ধগোলাকৃতি চাঁদোয়া স্থাপন করা হইয়াছে। মিনারের স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর অদ্যাবধি সমাধান হয় নাই, একইভাবে সাহ্ন-এর আকার, যাহা ক্রমশ সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার পরিবর্ধন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী উত্তরের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

৩৮৮/৯৯৮ সালে কর্ডোভার বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী, আল-মানসূর-এর পুত্র, আল-মুজাফফার ফাস পর্যন্ত প্রসারিত তাঁহার সামরিক অভিযান পরিচালনা কালে, কারাবিয়্যীন-এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার প্রয়াস পান।

বক্তৃতা কক্ষের কেন্দ্রীয় অংশের প্রবেশ পথে একটি চমৎকার সৌষ্ঠবময় চাঁদোয়া নির্মাণ করা হয়। একটি মিম্বার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং একইভাবে একটি পানির আধার নির্মাণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহাদের কোনটিরই পরবর্তীকালে পুনঃসন্ধান লাভ সম্ভব হয় নাই।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে মসজিদটি একটি অতি উচ্চমানের সৌষ্ঠবপূর্ণ অট্টালিকায় পরিণত হয়। বিভিন্ন ভাষ্যে ইহার অলংকরণ সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, তবে মাগরিব অঞ্চলে কারাবিয়্যীন মসজিদ অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিরাজিত ছিল।

(গ) আল-মুরাবিত [দ্র. আল-মুরাবিতূন] যুগে ফাস মাগরিব অঞ্চলের সর্বাধিক জনবহুল নগরীতে পরিণত হয় এবং কারাবিয়্যীন মসজিদ মুসাল্লীদের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কাদী ইব্ন মু'ঈশা আল-কিনানী অতঃপর এই বংশের প্রখ্যাত স্থপতি আমীর 'আলী ইব্ন য়ূসুফ-এর নিকট হইতে বিখ্যাত এই মসজিদটি পুনরায় বর্ধিত করিবার অনুমতি লাভ করেন। এই প্রকল্পের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং এই লক্ষ্যে কতিপয় প্রশাসক কর্তৃক ইতোপূর্বে জালিয়াতির দ্বারা অন্যত্র স্থানান্তরিত মসজিদের নিজস্ব আয় সঠিকভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়; অধিকন্তু নিশ্চিতভাবেই সরকারী কোষাগার হইতে এই কার্যে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। ৫২৮/১১৩৪ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রকৃত কার্য শুরু করা হয়। ৫৩১/১১৩৬ সালের মধ্যে দুইটি নূতন চাঁদোয়া নির্মাণের কাজ চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত হয়; তবে ৫৩৭/১১৪৩ সালের পূর্বে সম্পূর্ণ নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয় নাই। নূতন মিম্বারটি সমাপ্ত হয় ৫৩৮/১১৪৪ সালে অর্থাৎ বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রসারণ কার্য প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ চলে। কার্য সমাপ্ত হইলে মসজিদটি কিবলা অভিমুখে তিনটি অতিরিক্ত স্তম্ভ-অলিন্দ যুক্ত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে; এই সকল স্তম্ভ সারিতে অট্টালিকার অপরাপর অংশের ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত বক্রতায় গঠিত খিলান শ্রেণীর ব্যবহার অব্যাহত রাখা হয়, যাহার সহিত একটি নূতন ও চমৎকার মিহরাব সংযুক্ত হয়। একুশটি মূল কক্ষের জন্য সম্প্রসারিত অংশের তোরণ শ্রেণী, পুনরায় আর একবার, ইদ্রীসী আমলের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করে, যেমন যানাতা শাহযাদা কর্তৃক ইহা তৎকালে রূপান্তরিত হইয়াছিল। পশ্চিম অঞ্চলের মসজিদসমূহে মিহরাব অভিমুখে প্রসারিত মূল কক্ষটির অসাধারণত্ব চিহ্নিত করা একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথারূপে পরিজ্ঞাত ছিল। আল-মুরাবিত নির্মাতাগণ ইহাকে বহিরাংশেও একইভাবে চিহ্নিত করিতে মনঃস্থ করেন এবং এই লক্ষ্যে তাঁহারা একটি উত্তোলিত প্রধান কক্ষ নির্মাণ করেন যাহা একটি দ্বি-ঢালবিশিষ্ট টালির ছাদসহ স্তম্ভ-অলিন্দসমূহের ছাদের তুলনায় প্রাধান্য অর্জন করে। অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে অলংকৃত এই উচ্চ কক্ষটির বিন্যাসের মাধ্যমে পাঁচটি চাঁদোয়ার সমন্বয়ে রচিত একটি সৌষ্ঠবময় নির্মাণশৈলী বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়। ইহাদের প্রথমটি বর্গকার সমতল ভূমিতে মিহরাব-এর সম্মুখে অবস্থিত; ইহার পর একটি বিশাল গম্বুজ বর্ধিত অংশের জন্য নির্মিত অপর দুইটি স্তম্ভ-অলিন্দ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কিছুসংখ্যক অত্যন্ত সুন্দর কূফী লিপি অনুযায়ী এই নির্মাণকার্য আমীর 'আলী ইবন য়ূসুফ-এর রাজত্বকালে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। "অক্ষীয় কক্ষের প্রাচীন সাতটি স্তম্ভ অলিন্দ পুনঃনির্মিত এবং অলংকৃত করা হয়; অদ্যাবধি ইহাতে পাঁচটি চাঁদোয়া দেখিতে পাওয়া যায়; আল-মুরাবিত সম্প্রসারণ কার্যের পূর্ববর্তী তিনটি স্তম্ভ-অলিন্দ দুইটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত যাহা ঝুলন্ত দণ্ডসমূহসহ প্রান্তস্থিত একটি চাঁদোয়া সৃষ্টি করিয়াছে; আল-মুজাফ্ফার নির্মিত চাঁদোয়াটির স্থান অধিকার করিয়াছে ঝুলন্ত দণ্ড সজ্জিত অপর একটি গম্বুজ; অবশিষ্ট তিনটি স্তম্ভ-অলিন্দের উপর দুইটি দ্বৈত-ঢালসম্পন্ন ছাদের মধ্যে একটি প্রান্তবিশিষ্ট 'আলাবীত চাঁদোয়া অবস্থিত" (H. Terrasse)। পরিশেষে এই একই সময়ে মিহরাব-এর পশ্চাতে একটি মৃত ব্যক্তিদের মসজিদ (জামি'উ'ল-জানা'ইয) অর্থাৎ জানাযার সালাত আদায়ের জন্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে মরক্কোতে নির্মিত এই শ্রেণীর ভবনের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এই সংযুক্ত ভবনটি প্রার্থনা কক্ষের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত স্তম্ভ-অলিন্দসমূহের ন্যায় ঝুলন্ত দণ্ড-সজ্জিত সৌষ্ঠবময় একটি চাঁদোয়াসম্পন্ন। আন্দালুসীয় পদ্ধতি অনুসরণে ইহা একটি প্যাভিলিয়নে ছাদের নীচে স্থাপিত। একই সঙ্গে মূল মসজিদ ভবনে মৃত ব্যক্তির দেহের উপস্থিতিতে তাহার জন্য প্রার্থনা করিবার ধার্মিক অভিলাষ এবং মৃতদেহের উপস্থিতি দ্বারা মসজিদের বক্তৃতা কক্ষ নাপাক না করিবার ইচ্ছা— এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য, মৃত-ব্যক্তিগণের মসজিদ অর্থাৎ উক্ত জানাযার মসজিদ তিনটি দরজা দ্বারা অন্যান্য সালাত আদায়ের মসজিদের সহিত সংযুক্ত, প্রতিটি দরজা একটি দ্বৈত খিলান বহন করে। আল-মুরাবিতগণের সম্পাদিত নির্মাণকার্য যদিও ভবনের প্রাচীন অংশসমূহের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া পরিকল্পিত হয়, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ইহার মাধ্যমে কারাবিয়্যিন মসজিদকে তাহাদের সাম্রাজ্যের বিখ্যাত মসজিদসমূহের, বিশেষত তেলেমসেন (তিলিমসান) ও মাররাকুশ-এর মসজিদের ন্যায় সুরম্য ও অনন্যসাধারণ অলংকরণে সুশোভিত করার একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা বর্তমান ছিল। কেন্দ্রীয় কক্ষের ক্ষেত্রে তাঁহারা যে সমৃদ্ধ অলংকরণ বিন্যস্ত করিতে সমর্থ হন তাহা এই কালের শিল্পীগণের দক্ষতা এবং ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর হিস্পানো-মূর শিল্পকলার বিপুল সমৃদ্ধি প্রমাণ করে। কিন্তু ১১৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে বিজয়ী আল-মুওয়াহ্হিদগণ ইহাদের বিনাশ সাধন করিবে— এই ভয়ে এই সকল অলংকরণ পুনরায় পলস্তরা (Plaster) দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। তেলেমসেন ও মাররাকুশ-এর ক্ষেত্রে ঠিক এই আশংকাই বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছিল। কারণ এই দুইটি স্থানে মুওয়াহ্হিদগণের কঠোরতার বিরুদ্ধে সময় থাকিতে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই।

আল মুরাবিত অলংকরণ, ব্রোঞ্জে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ, মিম্বার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করিতে হইলে গবেষককে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত Terrasse প্রণীত গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিতে হইবে; বর্তমান প্রবন্ধের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও উক্ত গ্রন্থ ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

পরবর্তীকালে আল-মুওয়াহ্হিদ বংশীয় শাসকগণ মসজিদে কতিপয় ব্যবহারিক বিন্যাস আনয়ন করে; সর্বোপরি তাহারা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় এক প্রশংসনীয় পুনঃনির্মাণ কার্য সম্পাদন করে।

মারীনী [দ্র.] বংশীয় শাসকগণ অতীত কালের কীর্তিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহারা অদ্যাবধি বর্তমান আনাযাটি নির্মাণ করেন, মসজিদ সংক্রান্ত আসবাবপত্র সমৃদ্ধ করেন এবং কিছুসংখ্যক পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেষত একটি দৃষ্টান্তমূলক কৃতিত্বরূপে তাহারা ইহার গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। সা'দী [দ্র.]-গণ দুইটি ঝর্ণা প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করেন, যাহা আজও সাহ্ন-এর আঙিনায় টিকিয়া আছে; এই ঝর্ণা গ্রানাডা নগরীর বিখ্যাত আলহামরা প্রাসাদের সিংহ

আঙিনায় আজ পর্যন্ত সচল ঝর্ণা শ্রেণীর অনুকরণে নির্মিত। ব্যবহারিক কোন প্রয়োজনের জন্য ইহাদের নির্মাণ করা হইয়াছিল— এইরূপ কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না (প্রবন্ধ ফাস-এর ১৫নং প্লেট)।

একইভাবে এই সম্মানিত মসজিদের জন্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন সাধনের ক্ষেত্রে 'আলাবীগণ উদারহস্ত ছিলেন। তাঁহাদের শাসনামলেই H. Terrasse-এর অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে ইহার পুনরাবিষ্কার সম্ভব হয়; আল মুরাবিত শিল্প ও অলংকরণের যে সমৃদ্ধি এতকাল পর্যন্ত চিরতরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হইত এবং যাহা সুদীর্ঘ আট শতাব্দী পর্যন্ত আস্তরণের নীচে চাপা পড়িয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, তাহা ইহাদের মৌলিক সৌকর্য এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বর্ণ লইয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

আল-কারাবিয়্যীন তাই শুধুমাত্র ফাস নগরীর একটি বিখ্যাত মসজিদ নহে, একই সঙ্গে তাহা হিস্পানো-মূর স্থাপত্য-শিল্প এবং অলংকরণ শিল্পকলার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে সকল সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রবন্ধ ফাস-এর অন্তর্গত গ্রন্থপঞ্জীর অতিরিক্তরূপে, অপর যে দুইটি গ্রন্থ এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য তাহা হইতেছে, মধ্যযুগের মসজিদসমূহের ইতিহাস প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় আরবী ভাষ্য (১) ইব্ন আবী যার' প্রণীত রাওয়াদু'ল-কিরতাস এবং (২) আল-জাযনা'ঈ প্রণীত যাহ্রাতু'ল-আস। মসজিদ ও ইহার সংলগ্ন ভবনসমূহের নির্মাণ পরিকল্পনার নক্শা এবং প্রকাশনা করেন, E. Pauty, Le plan de l' Universite Qarwiyyin a Fes, Hesperis, ৩/৪ (১৯২৩ খৃ.), প্লেট-১। মৃত ব্যক্তিদের মসজিদ প্রসঙ্গে পর্যালোচনার জন্য দ্র. (৩) B. Moslow, Les Mosquees de Fes et du Nord marocain, P. I. H. E. M. T., ১৯খ., প্যারিস ১৯৩৮ খৃ. অন্যদিকে (৪) G. Marcais, L' arehitecture musulmane d' Occident, প্যারিস ১৯৫৪ খৃ., ৩৮৭-৮-তে মূলত সাহন-এর সা'দী আমলে নির্মিত অংশ প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে।

আরবী উৎকীর্ণ লিপিসমূহের জন্য RCEA, ৪খ., নং ১৪৭৮; ৬খ., নং ২০৯৯; ৮খ., নং ৩০৩১ এবং ৩০৬১; ৯খ., নং ৩৫৪৫। ১৫খ., নং ৫৬২৬; ১৬খ., নং ৬০৮০ এবং ৬০৮১। ইহা ভিন্ন 'আবদু'ল-হাদী আত-তাযী প্রণীত পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ তা'রীখ বিনা'ই'ল-কারাবিয়্যীন, in জামি'আতু'ল-কারাবিয়্যীন, আল-কিতাবু'য-যাহাবী, মুহাম্মাদিয়া ১৩৭৯/১৯৫৯, দ্রষ্টব্য।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ ঠিক কখন হইতে কারাবিয়্যীনে উচ্চ শিক্ষা প্রদান শুরু হয় ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করা বাস্তবে অত্যন্ত দুরূহ। মুহাম্মাদ আল-মানূনী, তা'রীখু'ল-কারাবিয়িন, জামি'আতু'ল-কারাবিয়ান, আল-কিতাবু'য-যাহাবী, মুহাম্মাদিয়া ১৩৭৯/১৯৫৯, মনে করেন যে, আল-মুরাবিত বংশের শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকৃতপক্ষে মসজিদের সহিত সংযুক্ত করা হয়; তবে মসজিদে একই সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের নজীররূপে কারাবিয়্যীন নিশ্চিতভাবেই অনন্যতার দাবী করিতে পারে না।

৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে বর্তমান কালের উন্মেষ পর্যন্ত সময়ে কারাবিয়্যীন-এর গৌরব ও প্রসিদ্ধি ছিল ইহার বিদ্বান ('উলামা') ও বিজ্ঞ শিক্ষাকমণ্ডলী। সমগ্র মরক্কোর সকল অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, আন্দালুসিয়া এমনকি সাহারা অঞ্চল হইতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এখানে আগমন করিত এবং মরক্কোর শাসক বংশসমূহ ও ফাস নগরীর জনগণ তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিত, যাহাতে তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। বিশেষভাবে মারীনীগণ চমৎকার শৈলীসম্পন্ন মাদরাসাসমূহ নির্মাণ করে যাহা আজ পর্যন্ত ভ্রমণার্থী ও পর্যটকগণের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইহার গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করিতে থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহার শিক্ষকবৃন্দ, প্রচলিত রীতিসমূহের চাহিদা এবং ধর্মীয় আইনের বাধ্য-বাধকতাসমূহের মধ্যে একটি আপোস-রফায় উপনীত হইবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়ায় ইহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষণ-পদ্ধতির মানে অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে; উপরন্তু, স্পেনের সহিত এই অঞ্চলের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এবং ফলে য়ুরোপের সহিত সম্পর্কের অবসান এই পরিস্থিতিকে ত্বরান্বিত করে। সা'দী বংশের শাসনকালে মাররাকাশ নগরীর বিপরীতে ফাস নগরী ইহার সাবেক রাজধানী নগরীর মর্যাদাচ্যুত হইলে আল-কারাবিয়্যীন ইহার নিজ সত্তায় অন্তর্মুখী হইয়া গড়ে এবং ইহার নিজস্ব ঐতিহ্যে শিক্ষা প্রদান অব্যাহত রাখে। কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া এবং কোনও প্রকার ক্রম অগ্রগতি সাধন না করিয়া, বিস্মৃত হইয়া যাইবার পূর্বে বহু শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া থাকা ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তার দ্বারা, ইহা ইহার অস্তিত্বে বিরাজমান থাকে। Leo Africanus এবং একইভাবে Marmol-এর রচনাসমূহ অধ্যয়নকালে বহুসংখ্যক নির্দেশনার সন্ধান পাওয়া যায় যাহাতে আগ্রহ অথবা তীব্র বেদনাবোধ কোনটিরই অভাব পরিলক্ষিত হয় না। শেষ অবধি 'আলাবী বংশের শাসনামলে ইহার ক্ষেত্রে কতিপয় সংস্কারমূলক পরিবর্তন আরোপ করা হয়। ১২০৩/১৭৮৮ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইহার শিক্ষক সংখ্যা, কার্যক্রম এবং শিক্ষা মেয়াদ সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মৌলিক দিকসমূহ ইব্ন যায়দান প্রণীত আদ-দুরারু'ল-ফাখিরা বি-মা'আছিরি'ল-মুলূকি'ল-'আলাবিয়্যীন বি-ফাসিয্-যাহিরা (রাবাত ১৩৫৬/১৯৩৭, ৬০-১) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু যদি 'আলী বে-র আল-'আব্বাসী নাম ধারণ করিয়া এই শহরে আগমনকারী জনৈক স্পেনীয়-এর প্রদত্ত বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে ইহার পনেরো বৎসর পরেও পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় মোটেই উন্নতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, এই মর্মে বক্তব্য পাওয়া যায় যে, সুলতান মাওলায় সুলায়মান (১২০৭-৩৮/১৭৯৩–১২৩৮/১৮২২) প্রায়শই ইহার শ্রেণীকক্ষসমূহ পরিদর্শন করিতেন, ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্ন করিতেন এবং শ্রেষ্ঠ উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করিতেন। উপরিউক্ত সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলায় 'আবদু'র-রাহমান নূতন সংস্কার সাধনে নিজেকে উৎসর্গিত করেন এবং মুহাররাম ১২৬১/জানুয়ারী ১৮৪৫ তারিখে প্রকাশিত একটি জাহীর-এর মাধ্যমে কারবিয়্যীন-এর শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃসংগঠিত করেন (দ্র. ইব্ন যায়দান, পৃ. গ্র., ৭৯-৮২)। এই প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞাত তথ্যাবলীর সাহায্যে একটি স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষা কার্যক্রমের এই নূতন নিয়ন্ত্রণ বিধিসমূহ দ্বারা কি ফল লাভ হইয়াছিল তাহার মূল্যায়ন সম্ভব নহে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সংগঠন প্রসঙ্গে R. Le Tourneau, Fas avant le Protectorat. (কাসাব্লাংকা ১৯৪৯

খৃ., ৬খ.) গ্রন্থে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ইহার লক্ষ্য ছিল বিশ্ববাসিগণকে বিশ্বাসের সত্যসমূহ প্রসঙ্গে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতায় জ্ঞান দান করা এবং এই সকল সত্যের প্রেক্ষিতে অনুসরণীয় আচার-ব্যবহার ও কার্যবিধি প্রসঙ্গে নির্দেশনা প্রদান। শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মমত ও সঙ্গতিবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহা আর পূর্বের ন্যায় মানব-জ্ঞানের সর্বজনীনতার ভাবধারাকে আলিঙ্গন করিত না; বস্তুতপক্ষে ইহা শুধু কঠোরভাবে ধর্মীয় আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। জ্ঞান-চর্চার ঘোষিত শাখাসমূহের মধ্যে কতিপয় ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া যায়; এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় যে বিষয়সমূহের পাঠ দান বন্ধ হইয়া যায় তাহাদের মধ্যে ছিল কুরআন-এর ভাষ্য (তাফসীর), যাহা শিক্ষা দান নিশ্চিতভাবেই সুলতান মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ-এর রাজত্বকালে বন্ধ হইয়া যায়, জ্যোতির্বিদ্যা (তানজীম), যুক্তিবিদ্যা (কালাম), মরমীশাস্ত্র (তাসাওউফ), যাহা সকলই ১৯০৬ খৃ. অপসৃত হয়, তদ্রূপ অভিধানবিদ্যা (লুগাত), ভাষা বিজ্ঞান (তাসরীফ), ভূগোল (জুগরাফিয়া), চিকিৎসাবিদ্যা (তিব্ব), ভবিষ্যতকথন (জাদওয়াল)।

বিশ্ববিদ্যালয়টি য়ূরোপীয় বা এমনকি কায়রো বা তিউনিস-এর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যায় পদ্ধতিতে সংগঠন করা হয় নাই। ইহা ফাস-এর প্রধান কাদী-র নিয়ন্ত্রণে প্রদান করা হইয়াছিল; ব্যবস্থাটি এক ধরনের রেকটর-এর ন্যায় হইলেও ইহার সহিত কোনও প্রকার যথাযথ, বিশেষত শ্রেণীর প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষাবর্ষ সম্পর্কিত কোনও ধারণা এখানে প্রচলিত ছিল না। কোনও প্রকার নিবন্ধীকরণ এখানে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত না, শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বিনা মূল্যে; শিক্ষা গ্রহণের সময়কাল নির্ধারিত ছিল না, কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অন্ততপক্ষে পাঁচ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত। গৃহীত শিক্ষা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কোনও প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, প্রত্যেক ছাত্র যাহারা প্রায়োগিক প্রমাণ ও দক্ষতার ইঙ্গিত প্রদর্শনে সক্ষম হইত তাহাদের সকলকেই অধ্যাপক একটি সাধারণ সনদপত্র (ইজাযা) প্রদান করিতেন। প্রধান মুসলিম উৎসবসমূহের সময় তিন সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করা হইত এবং বসন্ত উৎসবের সময় এই ছুটির পরিমাণ হইত এক মাস; শেষোক্ত এই উৎসবের সময় তালবা (তালিব-এর ব. ব., ছাত্র)-এর সুলতান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছাত্র, নির্বাচন করা হইত (দ্র. E. Doutte, La Khutba burlesque de la fete des Tolba au Maroc, Recueil de memoires et de testes publies en l'honneur du XIV^e congres des Orientalistes আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ.)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহার ছাত্রসংখ্যা কত ছিল তাহা নির্ধারণ করা বর্তমানে অসম্ভব—সম্ভবত ইহা ছিল প্রায় এক হাজার; তবে নিশ্চিতভাবেই পরবর্তী শতাব্দীর সূচনালগ্নে এই সংখ্যা ইহা হইতে স্বল্পতর ছিল। ইহারা দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ফাস নগরীর স্থানীয় ছাত্র এবং ফাস নগরীতে আগন্তুক (আফাকিয়ূন)। শেষোক্ত শ্রেণী, বিশেষভাবে দরিদ্র সদস্যবৃন্দ মাদরাসাসমূহে বসবাস করিত। দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক মেলামেশা প্রায় ছিল না।

অধ্যাপক (মুদার্‌রিস) পদে মনোনয়ন প্রদান সুলতানের হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং মনোনয়ন প্রদানে অনুসৃত প্রচলিত পদ্ধতিটি সব সময়েই সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপকগণের প্রাপ্ত বেতন অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু প্রতি বৎসর সরকার বিভিন্ন দ্রব্যাদি মারফত কিছু উপহার বিতরণ করিতেন। এই বিষয়ে সকলেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতেন যে, ইহার বিনিময়ে তাঁহাকে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হইবে। অধ্যাপকগণ সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন, যদিও প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁহাদের দৈনিক অন্তত একটি শ্রেণীতে পাঠ প্রদান করিতে হইত। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকগণ অত্যন্ত উচ্চ সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের "শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী" (আল-'উলামা'উ'ল-কিবার) নামে অভিহিত করা হইত। ১৯০৮ খৃ. ইঁহাদের সংখ্যা ছিল ১৭। কারাবিয়্যীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকমণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে কোনও গোষ্ঠী বা সমিতিবদ্ধ ছিলেন—এইরূপ বলা যাইবে না। তবে কোনও নূতন সুলতানের সিংহাসনে আসীন হইবার অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহিত অথবা মাঝে মধ্যে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত সুলতানের প্রশ্নাবলী বা তাঁহাকে উপদেশনামা প্রদানের ক্ষেত্রে ইঁহারা একযোগে কার্য করিতেন। ফাস নগরী ইহার 'আলিম সন্তানগণকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনা করিত, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তাঁহাদের খ্যাতিমান পূর্বসূরিগণের তুলনায় তাঁহারা সম্মানসম্পন্ন ছিলেন না। তথাপি তাঁহাদের সামাজিক পরিবেশে তাঁহাদের প্রভাব পূর্বের ন্যায় শক্তিশালী ও বিস্তৃত থাকিয়া যায়।

১৯১২ খৃ. ফরাসী আশ্রিত এলাকা (Protectorate) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ২৩ জুমাদা'ল-উলা, ১৩৩২/১৯ মে, ১৯১৪ তারিখে সুলতান মাওলায় য়ূসুফ একটি জাহীর স্বাক্ষর করেন, যাহার দ্বারা একটি পরিষদ সৃষ্টি করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইহার প্রশাসন ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন করিবার জন্য উপায়-উপকরণ সন্ধান করা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকশ্রেণীর অবস্থা পর্যালোচনা করা। ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৯১৮ খৃ.) বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি নির্দেশনা পরিষদের দায়িত্বে অর্পণ করিয়া ইহাকে পুনরায় বিচার মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ১৩৭৬/১৯২৭ সালে ইহার অধ্যাপকবৃন্দ প্রগতির সহিত সংযুক্ত হন এবং তাঁহারা নির্ধারিত পদমর্যাদা অনুসারে স্ব স্ব মর্যাদার জন্য স্থিরীকৃত হারে নির্ধারিত বেতন পাইতে থাকেন (এই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. ইব্ন যায়দান, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৩-৮)।

মরক্কো ও প্রধানত ফাস-এর রক্ষণশীল সমাজ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া এবং বহু পরিকল্পনার পর ভবিষ্যতের সুলতান ৫ম মুহাম্মাদ-এর দুইটি জাহীর দ্বারা কারাবিয়্যীন-এর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। ইহাদের প্রথমটি ১২ যু'ল-কাদা, ১৩৪৯/১ এপ্রিল, ১৯৩১ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৫ মুহার্‌রাম, ১৩৫২/১০ মে, ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয় ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর বা চূড়ান্ত। শেষোক্ত স্তরটি দুই শাখায় বিভক্ত ছিল ঃ প্রথমটি ধর্মীয় আইন, ইহার উৎসসমূহ, হাদীছ ও তাফসীর; দ্বিতীয় শাখাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে আধুনিক এবং তাহা সাহিত্য, আরবী ভাষা, ইতিহাস ও ভূগোলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপক ও ছাত্র নির্বিশেষে শিক্ষা-সময় নির্দিষ্টভাবে আরোপ করা হয়, কিছুসংখ্যক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং ছুটিসমূহ নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করা হয়। শিক্ষকবৃন্দ পেশাগত স্বীকৃতি লাভ করেন, সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান শক্তিশালী করা হয়, শৃঙ্খলা-বিধি কার্যকর করা হয় ইত্যাদি (দ্র. ইব্ন যায়দান, পূ. গ্র., ১৪৬-৬৬)। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় এইভাবে নব জীবন লাভ করে এবং

১৯৪৭ খৃ. একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ১২ রামাদান, ১৩৮২/৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩-এর ১৬২২৪৯ নং রাজকীয় ফরমানের দ্বারা আল-কারাবিয়্যীন সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করা হয়। বেসামরিক সংস্থার প্রকৃতিসম্পন্ন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হয়। ইহা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে "(১) ইসলামী বিষয়সমূহ ও আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে শিক্ষা দান নিশ্চিত করা এবং (২) শারী'আ ও আরবী ভাষার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা উৎসাহিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।" ইহার অনুষদসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) শারী'আ অনুষদ (মুসলিম আইন, যাহা অক্টোবর ১৯৬০ সালে ফাসে উদ্বোধন করা হয়।); (২) মার্‌রাকুশে অবস্থিত আরবী ভাষা গবেষণা অনুষদ (৩) তেতুয়ানে স্থাপিত ধর্মতত্ত্ব অনুষদ (উসূলু'দ-দীন) এবং (৪) ইহার সহিত সংযুক্ত কতিপয় প্রতিষ্ঠান, যাহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে রাবাতে অবস্থিত দারু'ল-হাদীছ যাহা ইসলামী বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করে। প্রতিটি অনুষদ একজন ডীন-এর পরিচালনায় অর্পিত এবং এই দায়িত্ব পালনে একজন সহযোগী তাঁহাকে সহায়তা দান করেন। উভয় পদেই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উচ্চতর শিক্ষাদফতর হইতে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বর্তমানে (১৯৭২ খৃ.) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক হাজার এবং প্রতি বৎসর ইহা ক্রমবর্ধমান হারে (১৯৭০ খৃ. ১১০ জন) সনদ প্রদান করিতেছে।

একই সঙ্গে প্রতি শিক্ষা বর্ষে এক প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণ যুবকের সৃষ্টি হইতেছে যাহারা আধুনিক মরক্কোর সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি কর্মস্থল সন্ধান লাভে ক্রমবর্ধমানভাবে কঠোরতার সম্মুখীন হইতেছে। মরক্কো সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে অসচেতন নন। কিন্তু ইহার জন্য কোনও সহজ ও সন্তোষজনক সমাধান নাই।

আজিকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়টি আর পূর্বের ন্যায় প্রাচীন মসজিদের স্তম্ভসারির পাদদেশে সমাবিষ্ট হয় না। ইহা বর্তমানে একটি পুরাতন ফরাসী সেনা ছাউনীতে স্থানান্তর করা হইয়াছে এবং তথায় ইহার ছাত্রবৃন্দ আর অতীত কালের ন্যায় মধ্যযুগীয় জীবন-যাত্রা পদ্ধতি অনুসরণ করে না। ইহার মাঝে অধ্যাপকবৃন্দ, এমনকি যাঁহারা অপেক্ষাকৃত তরুণ, প্রাচীনপন্থী ভাবধারায় শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে তাঁহারা যে তরুণ সমাজ সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহাদের সহযোগী তরুণ সমাজের সহিত একই পরিবেশে বিচরণ করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে প্রদত্ত উৎসসমূহ ও প্রবন্ধ ফাস-এর অন্তর্গত গ্রন্থপঞ্জীতে প্রদত্ত বরাতসমূহের অতিরিক্তরূপে অধিকতর বিস্তৃত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১) Marmol (খৃ. ১৬শ শতাব্দী), De I' Afrique, অনু. d' Ablancourt, ২খ, প্যারিস ১৬৬৭ খৃ.; (২) Badia y Leblich (ʿAli Bey), Voyages d' Ali Bey et Abbasi en Afrique et I' Asie, ৩ খণ্ডে, প্যারিস ১৮১৪ খৃ. (ফাস প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ১খ, ৮ম অধ্যায়) (৩) G. Delphin, Fas, son unil'ersite et venseignement Supeieur musulman, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ. (৪) A. Peretite, Les madrasa de Fes, im AM. ১৮খ. (১৯১২ খৃ.); (৫) P. Marty, Le Maroc de demain, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ১ম অধ্যায়; (৬) L. Brunot, Le personnage de Barabbas dans la fete du sultan des Tolba a Fes, Melanges Gaudefroy-Demombynes, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ.; (৭) Leon I' Africain (খৃ. ১৬শ শতাব্দী), Description de I' Afrique, অনু. A. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ১খ; (৮) জামি'আতু'ল-কারাবিয়্যীন, আল-কিতাবু'য-যাহাবী ফী যিকরাহা আল-মি'আ বা'দা'ল-আলফ্ (২৪৫-১৩৭৯/৮৫৯-১৯৬০), মুহাম্মাদিয়া ১৯৫৯ খৃ.; অত্যন্ত অসম দলীলী মূল্যসম্পন্ন কতিপয় প্রবন্ধ এবং কিছুসংখ্যক য়ুরোপীয় প্রকাশনার (প্রধানত ফরাসী ভাষায়) একটি গ্রন্থপঞ্জী পৃ. ২৩২-৪; (৯) R. Le Tourmeau, Evolution politique de I'Afrique du Nord Musulmane, 1920-1961. প্যারিস ১৯৬২ খৃ.; (১০) J. J. Waardenburg, Les Universites dans le monde arabe actuel, দি হেগ ১৯৬৬ খৃ.; (১১) 'আবদু'ল-হাদী তাযী, আল-কারাবিয়ীন, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ. (ফরাসী ভাষায় সারসংক্ষেপসহ আরবী ভাষায়)।

৩। **গ্রন্থাগার** ঃ আল-কারাবিয়্যীন-এর গ্রন্থাগারটি মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত নয়, ইহা একটি সংলগ্ন ভবনে স্থান পাইয়াছে। ইহার ভবনের গাত্রে উৎকীর্ণ টিকিয়া থাকা লিপিসমূহ এবং প্রকাশিত (RCEA. ১৬খ., নং ৬০৮১-২) লিপিসমূহ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ৭৫০/১৩৪৯ সালে মারীনী সুলতান আবূ 'ইনান ফারিস [দ্র.] কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সা'দী সুলতান আহমাদ আল-মানসূর [দ্র.] ইহার সম্প্রসারণ করেন।

এক সময়ে ইহার সমৃদ্ধির খ্যাতি বিস্তৃত ছিল এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে প্রাচীন রচনাবলীর সন্ধানে ফাস নগরীতে আকৃষ্ট করিয়া আনিত। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে ইহা পরিত্যক্ত, অবহেলিত ও জরাজীর্ণ হইয়া লুণ্ঠিত অবস্থায় নিপতিত হয়। নীতিগতভাবে গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার্মিক সংস্থার নাকীব [দ্র.]-এর উপর ন্যস্ত ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার উপর অর্পিত এই দায়িত্ব কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে একজন ছাত্রের উপর স্থানান্তর করেন। মার্‌রাকুশ-এর ইব্‌ন য়ুসুফ-এর মসজিদের গ্রন্থাগারের ন্যায় ইহার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার গ্রন্থ তালিকা বা বিতরণ করা পুস্তকসমূহের কোনও নথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বহু সংখ্যক পুস্তকগ্রহীতা নিশ্চিতভাবেই তাহাদের গৃহীত গ্রন্থাবলী প্রত্যর্পণে অবহেলা করেন এবং এই অবস্থা এত শোচনীয় রূপ লাভ করে যে, খৃষ্টীয় ২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মাত্র ১৬০০ পাণ্ডুলিপি ও ৪০০ মুদ্রিত পুস্তকে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক অত্যন্ত মূল্যবান অথবা অত্যন্ত দুর্লভ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইব্‌ন খালদূন প্রনীত কিতাবু'ল-'ইবার-এর ৫ম খণ্ড, যাহাতে এই প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের নিজ হস্তে লিখিত একটি উৎসর্গ লিপি রহিয়াছে। একই সংগ্রহে অপরাধের কিছুসংখ্যক গ্রন্থ রহিয়াছে যাহাতে কোনও কোনও মরক্কো রাজবংশীয় সদস্যের উপহার প্রদান নির্দেশক লিপি রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ এক হাজার বৎসরের পুরাতন এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ সা'দী সুলতান আহমাদ আল-মানসূর কর্তৃক হাবুস রূপে প্রদত্ত উপহার হিসাবে প্রাপ্ত। 'আলাবী সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ-এর গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত পুস্তকসমূহ যখন মরক্কোর বিভিন্ন শহরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বণ্টিত হইয়া যায়, কারাবিয়্যীন-এর গ্রন্থাগার তখন ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অধিকারী হয়।

১৯১৮ খৃ. ইহার গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করা হয় এবং তাহা সকলের মনে হতাশা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন তালিকাবহির্ভূত নথি হইতে বেশ কিছু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করা হয়। ৫ম মুহাম্মাদের শাসনকালে গ্রন্থাগারটি সম্প্রসারিত ও আধুনিকায়ন করা হয়। ইহার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করার মাধ্যমে তত্ত্বাবধান জোরালো করা হয় এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগে নূতন সমৃদ্ধি আনয়ন করা হয়। বর্তমানে ইহার সংগ্রহে অসংখ্য মুদ্রিত পুস্তক ব্যতিরেকে ৪০০০-এর অধিক পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে এবং ইহা পুনরায় ইহার কর্মতৎপরতা ও সার্বজনীন ভূমিকা চালু করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইতিমধ্যে উল্লিখিত Peretie, Marty, Le Tourneau ও ইব্ন যায়দান-এর গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য ঃ (১) A. Bel, Catalogue des livres arabes de la Bibliotheque de la Mosquee d'El-Qarouiyine a Fes, ফাস ১৯১৮ খৃ. ; (২) E. Levy-Provencal, Note sur l' exemplaire du Kitab al-'ibar offert par Ibn Haldun a la Bibliotheque d' al-Qarawiyin a Fes, in Hesperis (১৯২৩ খৃ.) ; (৩) H. P. J. Renaud, Un pretendu catalogue de la Bibliotheque de la Grande Mosquee de Fes date de 1268/1851, in Hesperis (১৯৩৪ খৃ.) ; (৪) G. Deverdun. Un registre d'inventaire et de prets de la Bibliotheque de la Mosquee Ali b. Youssef a Marrakech, date de 1111/1700, in Hesperis (১৯৪৪ খৃ.) ; (৫) J. Luccioni, Les bibliotheques habous au Maroc, in Bull. econ. et soc. du Maroc ১৯/৬৬ (১৯৫৫ খৃ.) ; (৬) 'আবিদ আল-ফাসী, খিযানাতু'ল-কারাবিয়্যীন ওয়া নাওয়াদিরুহা, in RIMA, ১খ. (১৯৫৯ খৃ.), ৮-১৬।

G. Devrdun (E.I.²)/মুহাম্মদ ইযাদুদ্দীন

আল-কারাবীসী (الكرابيسى) ঃ (কাপড় বিক্রেতা) নামটি কিছু সংখ্যক লোককে দেওয়া হইয়াছে যাহাদের মধ্যে নিম্নোক্তগণ উল্লেখযোগ্যঃ (১) আহ্মাদ ইব্ন 'উমার (احمد بن عمر) যিনি একজন গণিতশাস্ত্রবিশারদ। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। তাঁহার বিলুপ্ত প্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল ইউক্লিডের অনুবাদের একটি ভাষ্য। তাঁহার যে পুস্তকটি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইল কিতাব মিসাহাতু'ল-হালাক এবং এই রচনাটি অক্সফোর্ডে (Bodleian Lib. Mss. Or. i, no. 913) ও কায়রোতে (ফিহ্রিস্ত আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা ফী দারি'ল-কুতুব, ২০৪) সংরক্ষিত আছে। দ্র. ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২৬৫, পংক্তি ২৫, পৃ. ২৮২, পংক্তি ৩ ; ইবনু'ল-কিফতী, তারীখ আল-হুকামা', কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ৫৭. পংক্তি ৫ দ্র.।

(২) আবূ 'আলী আল-হুসায়ন (ابو على الحسين) ইব্ন 'আলী ইব্ন য়াযীদ আল-মুহাল্লাবী, তিনি একজন হাদীসবেত্তা ও আইনবিশারদ ছিলেন। প্রথমে তিনি আহ্লু'র-রায়-এর একজন সদস্য ছিলেন, কিন্তু ইমাম আশ-শাফি'ঈর বাগদাদ আগমনের পরে তিনি তাহার দলে যোগদান করেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি অদৃষ্টবাদের (জাবর) একজন অকপট সমর্থক ছিলেন। তাঁহার হাদীছবেত্তাদের জীবনী অথবা আইন বিষয়ক রচনাবলীর কোনও কিছুই আজ বিদ্যমান নাই। তিনি ২৪৫/৮৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহ্রিস্ত, ইব্ন নাদীম (সম্পা. Flugel), পৃ. ১৮১, পংক্তি ৪; (২) সাম'আনী, আনসাব (facsimile ed. Margolisouth), fol. 496b; (৩) ইব্ন খাল্লিকান (সম্পা. Wustenfeld), no 180 (সং. কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, পৃ. ১৮১); (৪) শাহরাস্তানী, মিলাল (সম্পা. Cureton), পৃ. ৯৬ ; (৫) নাওয়াবী, তাহযীব (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ৭৭৪ ; (৬) সুবকী, তাবাকাত, কায়রো ১৩২৪ হি., ১খ, পৃ. ২৫১-৬ ; (৭) ইবনু'ল আছীর, কামিল, কায়রো ১৩০৩ হি., ৭খ, পৃ. ২৯ ; (৮) আবু'ল-ফিদা, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮৭ হি., ২খ, পৃ. ৪৩৯ (সম্পা. Reiske-Adler, ২খ, পৃ. ২০৮) ; (৯) ইব্ন তাগরীবিরদী (সম্পা. Juynboll), ১খ, পৃ. ৭৫৩, ৭৬৩।

(৩) আস'আদ ইব্ন মুহাম্মাদ (اسعد بن محمد) হানাফী ফাকীহ্, তিনি ৫৭০/১১৭০ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-ফুরূক ফি'ল-ফুরূ (كتاب الفروق فى الفروع) গ্রন্থখানি হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন (সম্পা. Flugel), (৪খ, পৃ. ৪১৯, ৯০৪১) আল-মাহবূবীর তালকীহু'ল-'উকূল গ্রন্থের সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন (Brokelmann, G.A.L., ১খ, পৃ. ৪৭৩, সংখ্যা ৩৪), এখনও কায়রোতে বিদ্যমান। দ্র. ফিহ্রিস্ত আল-কুতুবি'ল-'আরাবিয়া ফী দারি'ল-কুতুব, খাদীবিয়া, ৩খ, পৃ. ৯৬ দ্র.।

C. Brockelmann (E. I.²)মুঃ রবিউল ইসলাম

আল-কারাম, বানূ (দ্র. যুরায়'ঈগণ)

কারাময়ূসুফ (দ্র. য়ূসুফ কারাম)

কারামত (كرامة) ঃ শব্দটি কারুমা (كرم) শব্দের ক্রিয়ামূল (مصدر) বলিয়া ধারণা করা হয়, যাহার অর্থ উদার হওয়া, দয়ালু হওয়া, সম্মানিত হওয়া (ইহা আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯টি সুন্দর নামের একটি, দ., আল-আস্মা'উ'ল-হুসনা)। শব্দটি আল-কুরআনে একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে আল-কারীম অর্থাৎ উদার বা দয়ালু হিসাবে আখ্যায়িত হইয়াছেন। তবে প্রকৃত রূপ 'কারামাত' অবশ্য সেখানে পাওয়া যায় না। ধর্মীয় পরিভাষায় কারামাত (বহুবচনে কারামাত=كرامات) শব্দের অর্থ আল্লাহ্র দেয়া দান, সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবারিত অনুগ্রহ (ইহসান, ইন'আম) এই অর্থ বহন করে। তবে অধিকতর যথাযথ ব্যাখ্যাটি হইল, কারামাত শব্দটি গঠিত হইয়াছে আল্লাহ্র বন্ধুদের (আওলিয়া; একবচনে ওয়ালী) অলৌকিক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করিবার জন্য, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ইহা সম্পাদন করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনা সাধারণত বস্তু জগতে সংগঠিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত নতুবা ইহার ভবিষ্যতের কোনও পূর্ব সংকেতস্বরূপ নতুবা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোনও ব্যাখ্যাস্বরূপ।

কারামাত শব্দের ভাবার্থ মু'জিযা (معجزة) হইতে ভিন্ন। তবে প্রতিটিই বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের (খারিকুল-'আদা) সহিত জড়িত অর্থাৎ ইহা একটি বিস্ময়কর ঘটনা, যাহা ঐশী নিয়ম-কানূনের (সুন্নাতুল্লাহ) স্বাভাবিক ধারাকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু মু'জিযা হইল পার্থিব ঘটনাসংবলিত যাহা কোনও দাবী বা চ্যালেঞ্জের (তাহাদ্দী-تحدى) মুকাবিলায় নবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যাহা দ্বারা নবীগণ তাঁহাদের শ্রোতাদের অক্ষমতাকে অখণ্ডনীভাবে সুনিশ্চিত করিয়া থাকেন। কারামাত হইল সাধারণ, ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, ইহাকে গোপন রাখা উচিত এবং কোনক্রমেই

ইহা নবীর মিশনের নিদর্শন নয়। কোনও ধার্মিক ব্যক্তির বিস্ময়কর ঘটনাবলীকে মু'জিযা বলা বিভ্রান্তিকর হইবে। গতানুগতিক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী নবী কর্তৃক সম্পাদিত বিস্ময়কর ঘটনাবলীকেই মু'জিযা বলা হয় এবং ওলী-দরবেশ কর্তৃক সাধিত বিস্ময়কর ব্যাপারকে কারামাত বলা হয়।

ওয়ালীগণের প্রতি প্রায়ই আরোপিত 'কারামাত-কে কি সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় ? যদি না হয় তাহা হইলে কেন তাহা করা যায় না এবং যদি হয় তাহা হইলে কোন যুক্তিতে ? এই প্রশ্নগুলি মুসলিম মননে অনেক পূর্ব হইতেই আত্মপ্রকাশ করে এবং মতপার্থক্য এমনকি পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও উন্মেষ ঘটায়।

এখানে বিশেষ চারি প্রকারের উত্তর লইয়া আলোচনা করা হইবে।

১। মু'তাযিলী মতবাদ ঃ 'ইতিযাল'-এর সমর্থক অধিকাংশ ইরানী মু'তাযিলী কারামাতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ যুক্তি হইল, যাহা আয-যামাখশারী কর্তৃক আল-কুরআনের (৭২ ঃ ২৬-২৭) ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে ঃ "তিনিই (আল্লাহ) অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত...।" আল-কুরআনের এই উদ্ধৃতি হইতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাঁহার প্রেরিত নবীগণের মিশনের সত্যতা সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাঁহাদের হাত দিয়া প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন রকম অলৌকিক ব্যাপার ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু অন্য সকল অতিপ্রাকৃত ঘটনা তিনি দৃষ্টির অগোচরে ঘটাইয়া থাকেন। আল-জুব্বা'ঈ বলেন, যদি ওয়ালীগণ এই ক্ষমতার অধিকারী হন তাহা হইলে তাহাদিগকে কিভাবে নবীগণ হইতে পৃথক করা যাইবে ?

নবীগণের এই সব অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে মুতাযিলী ব্যাখ্যার একটি বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাইবে মু'জিযা প্রবন্ধে। সংক্ষেপে বিরুদ্ধবাদী লেখকগণকে (আল-ইসফারাইনী, আল-বাগদাদী, আশ-শাহরাসতানী প্রমুখ) বিশ্বাস করা হইলে, উদাহরণস্বরূপ, আন-নাজ্জাম ও আল-মুরদার প্রথাগতভাবে নবীর প্রতি আরোপিত প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং আল-কুরআনের অননুকরণীয়তাতে কোনওরূপ আলৌকিক প্রকৃতি আরোপ করেন নাই (তু. Nader, Le Systeme Philosophique des Mu'tazila, Beirut 1956, 318 and refs.)। কিন্তু এই বিবরণকে কঠোর শর্তাধীনে বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল-খায়্যাত তাঁহার 'কিতাবু'ল-ইনতিসার (সম্পা. Nyberg, ২৮-৯, অনু. Nader, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ২৫-৬) গ্রন্থে বলেন যে, নাজ্জাম-এর নিকট আল-কুরআন নবীর মিশনের সপক্ষে অবশ্যই একটি দলীল। অধিকন্তু ইব্ন মাত্তাওয়াহ বলেন যে, মু'জিযাত শুধু বিচারবুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষাকেই (দ্র. The Karanic revelation) অনুমোদন করে এবং ইহা প্রথমত একটি ব্যাপার যাহা দ্বারা ঐগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়। মু'জিযাসমূহ নবী-রাসূলগণের প্রচার কার্যের সহিত সম্পৃক্ত, যাঁহারা অপরাপর মানুষের মতোই তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী। তথাপি মু'তাযিলী সম্প্রদায় কারামাতের যথার্থতাকে অস্বীকার করিবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিয়া থাকেন এবং ইহাকে 'প্রতারকের চালাকি' হিসাবে নিন্দা করেন। এই প্রসঙ্গে আল-হাল্লাজের বিরুদ্ধে 'আবদু'ল-জাব্বার মুতাযিলী-র সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। 'আবদু'ল-জাব্বারের গ্রন্থ 'মুগনীতে (১৫খ., ২৯০ পৃ.) হাল্লাজের অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আল-জুব্বা'ঈর অনুসরণে সেগুলিকে তিনি ঐন্দ্রজালিক কৌশল হিসাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, সহচরদের সাহায্যে এবং প্রতারণামূলক গৃহে ও কক্ষে বন্দী করিয়া। মুগনীর মনোভাব খুবই বিতর্কমূলক এবং তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হইয়া আল-হাল্লাজের নৈতিকতাকে পর্যন্ত সমালোচনা করিয়াছেন। তবে সিদ্ধান্তটি সুস্পষ্ট ঃ (ঐ, ২৭৫) সকল কারামাতই প্রতারণা এবং পরবর্তী কালের যে সমস্ত বিবরণ এইগুলি বারবার উল্লেখ করে তাহা জনপ্রিয় কুসংস্কারেরই বিবৃতিমাত্র।

২. ফাল্সাফা ঃ (দর্শন) ঃ (ইবন সীনা) ফালসাফার অবস্থান ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা ইব্ন সীনা হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। তিনি এই প্রশ্নটিকে কয়েকবারই বিচার করিয়াছেন। ইব্ন সীনার সৃষ্টিতত্ত্ব "অপরিহার্য এবং আত্মসচেতন ইচ্ছাসম্পন্ন" উদ্ভবের অস্তিত্বমূলক অদৃষ্টবাদের মাঝে মু'জিযাত ও কারামাত-কে স্থান দিয়াছেন। নবীগণ তাঁহাদের মানবীয় প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও বাহ্যিক বস্তুনিচয়ের উপর প্রকৃতিগত আত্মিক শক্তির কারণেই তাঁহাদের আগমনকে মু'জিযা দ্বারা নিশ্চিত করিয়া থাকেন। (একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইব্ন রুশ্দ তাঁহার "তাহাফুতু'ত-তাহাফুত" (সম্পা. Bouyges, 515) গ্রন্থে একটি পার্থক্য উল্লেখ করিয়াছেন ঃ শুধু সেইগুলিই অলৌকিক ঘটনা, যাহাতে গুণগত পরিবর্তন নিহিত। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইলেও তাহা সম্ভব। মু'জিযাতের এই সমর্থন, কম হউক আর বেশী হউক কারামাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁহার রিসালা ফী আকসামিল-'উলূম গ্রন্থে (তিস'উ রাসাইলের অন্তর্ভুক্ত, কায়রো ১৩২৬/১৯০৪, ১৪) ইব্ন সীনা বলেন, যে, কারামাত প্রকৃতিগতভাবে মু'জিযার 'সমার্থক' এবং তাঁহার ইশারাত গ্রন্থে (সম্পা. Forget, Leiden ১৮৯২ খৃ., ১২০) তিনি এই কথা সমর্থন করেন যে, অধ্যাত্মিক গভীরতার কল্যাণে যাঁহার আত্মা জাগতিক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল এবং যিনি এই ক্ষমতা কল্যাণকর ও নীতিসিদ্ধ পন্থায় ব্যবহার করেন, তিনি মু'জিযাত আল্লাহ্র দান হিসাবে লাভ করেন অথবা তিনি যদি ওলী হন তাহা হইলে কারামাতের গৌরব লাভ করেন। নবীগণ নুবুওয়াত প্রাপ্ত হন আল্লাহপ্রদত্ত তাঁহাদের প্রকৃতিগত সহজাত প্রবৃত্তি, প্রজ্ঞার ত্রিবিধ পরিপূর্ণতা, চিন্তা শক্তি ও কঠোর সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু সিদ্দীক (ওলী) বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ('আরিফ) এই পরিপূর্ণতা অর্জন করেন সঠিকভাবে সাধনা বা মুজাহাদার পথ অনুসরণের মাধ্যমে, যদিও সে সাধনা বা মুজাহাদা নিম্ন মানের হয় অন্তত তাঁহার চিন্তাশক্তির দিক হইতে।

ইব্ন সীনা আরও কিছু সম্মোহনী প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য নিয়মকানুনের কথা উল্লেখ করেন, যেই সব প্রক্রিয়া তুর্কীদের নিকট হইতে আগত (অতি দ্রুত আবর্তন, উজ্জ্বল বা কাল বস্তুতে দৃষ্টি স্থিরীকরণ ইত্যাদি) এবং এইগুলি স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলির বোধশক্তির লোপ ঘটাইতে বা দৈব শক্তির আগমন ঘটাইতে সক্ষম। তিনি এইগুলির প্রতি আস্থাশীল নন এবং এইগুলি হইতে দুর্বল বিশ্বাসের লোকদের জন্য যে বিপদ আনিতে পারে সেই কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি এইগুলির বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নাই।

মু'জিযাত বা কারামাত যাহাই হউক না কেন, দর্শনের (ফালসাফা) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সন্দেহাতীতভাবে তাঁহার বিশেষ করুণা দান করিয়া থাকেন। এই শক্তিসমূহ হইল সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতার

চূড়ান্ত ফল। মানবাত্মা তাহার নিজ প্রকৃতির যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে এই পরিপূর্ণতা অর্জন করিতে সক্ষম। এই অস্তিত্বনির্ভর অদৃষ্টবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নবী ও অলৌকিক ঘটনাবলীর সম্ভাব্যতার একটি স্বীকৃতি যুক্তিযুক্তভাবেই আমাদিগকে কারামাতের সম্ভাব্যতার দিকে পরিচালিত করে। প্রদত্ত ব্যাখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। পার্থক্য অবশ্যই কর্মে নয়, বরং শ্রেষ্ঠত্বে, যে শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণকে সাধক অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়াছে।

৩। আল-আশ'আরী সম্প্রদায়ের জওয়াব ঃ মনে হয় কিছু আশ'আরী, যেমন আল্-ইসফারাইনী ও আল-হালীমী কারামাত প্রসঙ্গে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের তীক্ষ্ণ মতামত বা বিচার-বিবেচনাকে সমর্থন করিতেন। আশ'আরী সম্প্রদায়ের সাধারণ মতবাদের যথার্থতা নিম্নে বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে স্বীকৃত ঃ

(ক) বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাব্যতা ঃ কোনও নবীর নৈতিক পরিপূর্ণতার নিদর্শন কোনও অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা কিংবা ইহা আদি হেতুও নহে, বরং উহা আল্লাহ্‌র যদৃচ্ছা কার্যকর ইচ্ছা। তিনি তাঁহার এই ইচ্ছাকে একজন নবীর মাধ্যমে সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই 'প্রকাশ্য অলৌকিক কার্যটি, সম্পদিত হয় কোনও ঘোষণা বা চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র জন্য কোনও সাধকের মধ্যস্থতায় কোনও ঘোষণা বা চ্যালেঞ্জ ছাড়াই অতিপ্রাকৃতিক কোনও ঘটনা ঘটানো বৈধ বা জাইয। (খ) ঘটনার অস্তিত্ব সর্বোপরি সেই সব ঘটনা, অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যাহা আল-কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহার ধারকগণ কোনওক্রমেই নুবূওয়াত প্রাপ্তির দাবী করেন নাই। এমনি ৩য় সূরার ৩৭ নম্বর আয়াত একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করে, যাহা ঘটিয়াছিল হযরত 'ঈসা ('আ)-র মাতা মারয়ামের ক্ষেত্রে এবং সূরা ১৮ ঃ ৯ আয়াতে সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তির বিস্ময়কর কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই সব ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘটনা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অলৌকিক নিদর্শন। পরিশেষে সূরা ২৭ ঃ ৪০ এইরূপ সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা হযরত সুলায়মান ('আ)-এর অনুরোধে ঘটিয়াছিল, হয় কোনও একজন জিন ('ইফরীত)-র মাধ্যমে অথবা কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে। (গ) সুতরাং কারামাত সম্ভব, কিন্তু উহাকে মু'জিযাতের সহিত সংযুক্ত করা সঙ্গত হইবে না।

আল্লাহ তা'আলা ওলীগণকে সম্মানিত করিবার জন্য এবং তাহাদের ধর্মনিষ্ঠা ও তাকওয়া সংরক্ষণ করিবার জন্য কারামাত প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি মু'জিযাত প্রকাশ করেন নবীগণের দ্বারা তাঁহাদের মিশনের প্রমাণস্বরূপ। প্রথমটি গোপন রাখা উচিত, কিন্তু দ্বিতীয়টি সকল মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত। যে কোনও ক্ষেত্রে দুইটির মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পার্থক্য বজায় থাকা উচিত, শুধু ধোঁকাবাজি (হিয়াল) হইতে ইহা ভিন্ন নহে, বরং সমস্ত যাদুবিদ্যা হইতেও ভিন্ন, যাহা ইন্দ্রজাল (সিহ্‌র) ও মায়াবিদ্যার মাধ্যমে সৃষ্ট। আল-বাকিল্লানী তাঁহার কিতাবুলবায়ান (সম্পা. R. Mc Carthy, বাগদাদ-বৈরূত ১৯৫৮ খৃ.) গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনকে সংজ্ঞায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উহাদিগের কিছু কিছু প্রকৃত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কিছু কিছু প্রতারণামূলক ও বিভ্রমাত্মক। এই পুস্তকে আত্মাসমূহের দর্শন লাভের নীতিমালারও বর্ণনা আছে। ইব্‌ন খালদূন তাঁহার মুকাদ্দিমায় (সং. কায়রো তা. বি. ৬৭, ৩৩২, অনু. de Slane, ১খ, ১৯১-৪, ৩খ, ১১১-১২, অনু. Rosenthal, ১খ, ১৮৮-৯১, ৩খ, ১৬৭-৮) যাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন তাহা মূলত আশ'আরী মতবাদ।

(ঘ) সূফী মনস্তত্ত্ব ঃ ওলীগণের কারামাত (কারামাতু'ল-আওলিয়া') স্বীকৃত। সুন্নী সূফীবিদ্যায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা সাধারণভাবে আশ'আরী মতের খুব কাছাকাছি। এই মতবাদের কারামাত ও মু'জিযাতের পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কোন ওলী-দরবেশ বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পাদন করিলে তিনি সেইজন্য নবী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেন না এবং তিনি রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় আইনের অধীনে বাধ্য থাকেন। তবে আশ'আরী সম্প্রদায় যেখানে দুই ধরনের নিদর্শনের বস্তুগত পার্থক্যের উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন, সেইখানে সূফী লেখনীতে আধ্যাত্মিক মনোভাবের পার্থক্য আলোচিত হয়।

সমস্যাটি প্রায় সকল সূফীগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, যেমন আবূ নাস্‌র আস-সার্‌রাজের কিতাবু'ল-লুমা' (সম্পা. Nicholson, GMS, ১৯১৪ খৃ., chs, ১১৩-১৮); কালাবাযীর কিতাবুত-তাআর্‌রুফ, সং, Arberry, কায়রো ১৩৫১/১৯৩৩, ch. ২৬); আর-রিসালাতু'ল-কুশায়রিয়্যা (সং, কায়রো তা. বি., ১৫৮ পৃ.); আল-হুজবীরী-এর কাশফু'ল-মাহজূব (অনু. Nicholson, GMS, ১৯১১ খৃ., ২১৮-৩৯) ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ওলীগণের নিদর্শনাবলী (আয়াতে) বাহ্যিকভাবে নবীগণের নিদর্শনসমূহের অনুরূপ, কিন্তু নবীগণ যেখানে জনসমক্ষে চ্যালেঞ্জের সহিত ঐ নিদর্শনগুলি প্রকাশ করেন সেখানে ওলীগণ ঐগুলিকে গোপন রাখিবার ব্যাপারে সচেষ্ট। আল-হাল্লাজের বিরুদ্ধে আনীত অন্যতম অভিযোগই ছিল এই অলৌকিকত্ব ব্যক্ত করিয়া দেওয়া (ইফশা'উ'ল-কারামাত) যাহার মাধ্যমে তিনি তাঁহার সমসাময়িক অনেকের দৃষ্টিতে বাহ্যত নবীর ভূমিকা দাবী করিতে পারেন।

মূলগতভাবে মুজিযাত হইল নবী-রাসূলগণকে প্রদত্ত একটি সাহায্য, যেন এইগুলির দ্বারা তাঁহাদের মিশনারী কার্যাবলী সমর্থিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে কারামাত ওলীর জন্য একটি অস্বস্তিকর বিষয় হইতে পারে—যিনি অলীক প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা করিতে পারেন। আল-কালাবাযী (পৃ. গ্র., ৪৪) আবূ বাক্‌র আল-ওয়াররাক'-এর মত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অলৌকিকত্ব সম্পাদনের ক্ষমতা কোনও ব্যক্তিকে নবী বানায় না, বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত কোনও মিশন পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির জন্যই তিনি নবী হন। অবশ্য আল-কালাবাযীর মতে, বিস্ময়কর কার্যাবলী ঘটানোর ক্ষমতা লাভ করিলে ওলীগণ অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়, আনুগত্য, তাকওয়া ও আত্মধিক্কারমূলক মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের প্রতি অধিকতর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সাধকদের পক্ষ হইতে এই বিনয় এবং নম্রতা তাঁহাদের কারামাতের যথার্থতার একটি নিদর্শন। পক্ষান্তরে বাহ্যত অনুরূপ কার্যাবলী সম্পন্ন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন "আল্লাহ্‌র শত্রুরা" গর্ব বোধ করিয়া থাকে এবং নিজেরাই উহার কৃতিত্ব দাবী করে (পূ. স্থা.)। এই দিক দিয়া তাঁহারা আল্লাহ্‌র কোপানলে পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ব্যর্থ করিবার জন্য, তাহাদিগকে ঐ সমস্ত ছলনায় প্রতারিত হইবার উত্তম সুযোগ দান করিয়াছেন। আমরা এই শিক্ষা পাই আল-হুজবীরী-র নিকট, যিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত নবীগণের নিষ্কলুষতা (ইসমাত) ওয়ালীগণের ভ্রমপ্রবণতা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরিয়া মুসলমানদের দ্বারা সম্পন্ন কারামাতসমূহ স্পষ্টত ইসলামের রাসূল (সা)-এরই মু'জিযা

বিশেষ। আল-কুরআনের বিধান নিশ্চিতভাবেই চিরন্তন হওয়ায় উহার নির্ভুলতার প্রমাণও চিরন্তন (কাশফু'ল-মাহজূব, অনু. ২২২)। গ্রন্থটির অবশিষ্টাংশ কারামাতের উপর একটি পর্যায়ক্রমিক দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে কিছু হইল কুরআনিক অথবা কুরআনের সমসাময়িক, আর কিছু হইল কুরআনোত্তর যুগের, অন্যদের মধ্যে আবূ সা'ঈদ আল-খার্‌রায, যু'ন-নূন মিসরী, প্রমুখের কারামাতসমূহ।

একদিকে সূফীগণ প্রায়শ এই শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, সাধকগণ অবশ্যই অলৌকিক কার্যকলাপ প্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের জন্য কোনও রকম তদবীর বা প্রচেষ্টা করেন না, বরং কখনও কখনও ইহাকে অবিশ্বাসও করিতেন এবং ইহার প্রতি আসক্ত হইলে আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হওয়ার পথে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হইবে। অন্যদিকে নেতৃস্থানীয় সূফীদের জীবনী, বিস্ময়কর কার্যকলাপ ও অতি প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক ঘটনাবলীতে ভরপুর। উদাহরণস্বরূপ এই দ্বৈত ব্যাখ্যা 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ-শারানী রচিত এবং Asin Palacios অধীত গ্রন্থ লাতাইফু'ল-মিনান ওয়াল-আখলাক (কায়রো তা.বি.)-এর সর্বত্র বিদ্যমান।

পরিশেষে ইহাই উল্লেখ করা যায় যে, সাধারণভাবে শী'আ মতবাদও কারামাত স্বীকার করে এবং সেগুলিকে মুজিযাত হইতে পৃথক করিয়াছে। মহান ইমামগণ, নিষ্কলুষতা ও পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার দরুন এখনও বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঘটাইতে পারেন। কঠোর ইমামী চিন্তাধারা এই শক্তিকে শুধু ইমামদের জন্যই দাবী করিয়া থাকে অথবা বড়জোর কারামাতের সম্ভাব্যতাকে ইমামদেরই প্রভাবাধীনে অথবা মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয় বলিয়া স্বীকার করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) E. I.², ৪খ, ৬১৫-২৬; (৩) দা, মা, ই., ১৭খ, ১৩৮-৪০।

L. Gardet (E.I.²)/মুঃ রবিউল ইসলাম

কারামত 'আলী (كرامت على) ঃ কারামাত 'আলী জৌনপুরী, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ নাম। জন্ম বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর শহরের মোল্লাটোন মহল্লায় ১৮ মুহার্‌রাম, ১২১৫/১১ জুন, ১৮০০ সালে ('আবদু'ল-বাতিন, সীরাত-ই মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী, পৃ. ৯; গুলাম রাসূল মিহর, জামা'আত-ই মুজাহিদীন, ২খ. ২৯৩)। 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হুসায়নী, 'আবদুল্লাহ য়ূসুফ 'আলী কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করিলেও মাওলানার ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা, একান্ত ভক্ত ও সুযোগ্য খলীফা 'আবদু'ল-কাদির ও দৌহিত্র 'আবদু'ল-বাতিনের মতে উপরিউক্ত তারিখ সত্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাঁহার আসল নাম ছিল 'আলী। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন তিনি কারামাত 'আলী নামে পরিচিত হন। তাঁহার রচিত মুকাশিফাত-ই রাহমাত (مكاشفات رحمت) কলিকাতা ১২৮৬ হি.), নূরু'ল-হুদা (نور الهدى), রিসালা-ই ফায়দে 'আম (رسالة فيض عام), তাযকিয়াতু'ল-'আকাইদ (تزكية العقائد), বায়'আত-ই তাওবা (بيعت توبة), হুজ্জাত-ই কাতি'আ (حجت قاطعة), মুকামি'উ'ল-মুব্‌তাদি'ঈন (مقامع المبتدعين) ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি নিজের নাম "কারামাত 'আলী জৌনপুরী বলিয়া পরিচিত—খাকসার 'আলী জৌনপুরী" এইভাবে লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার সীল মোহরেও 'আলী জৌনপুরী লেখা আছে। কোনও কোনও সময় তিনি নিজের নাম 'আলী জৌনপুরী আস-সিদ্দীকী আল-হানাফী লিখিতেন। বংশের দিক দিয়া তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর ৩৫তম উত্তরপুরুষ। তাঁহার পিতা আবূ ইবরাহীম ইমাম বাখ্‌শ জৌনপুর কালেকটরীতে সিরিশতাদার হিসাবে চাকুরী করিতেন। মুসলিম আমলে তাঁহাদের পরিবার খাতীবী করিতেন। বাল্যকাল হইতেই মাওলানা কারামাত 'আলী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আমপারার সবক দিলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কুরআন মাজীদের এই পারা তিনি মুখস্থ করিয়া ফেলেন।

তৎকালীন শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ নগরী ছিল জৌনপুর। কারামাত 'আলী এই সুযোগ ভালভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুরের কয়েকজন সেরা পণ্ডিত কুদরাতুল্লাহ রুদলূবী আহমাদ 'আলী চেরিয়াকুটী, আহমাদুল্লাহ আন্নামী-র কাছে কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, তথা দীনী 'ইল্‌ম-এর মৌলিক শিক্ষা লাভ করেন। তবে তিনি ছাত্র জীবনে 'ইলমু'ত-তাজবীদ ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পান নাই; মূলত তাঁহার পিতার কাছেই কুরআন পাঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে মক্কায় গিয়া 'ইলমু'ত-তাজবীদ-এর সুপণ্ডিত সায়্যিদ মুহাম্মদ ইস্‌কান্দারানীর কাছে দীর্ঘ দুই বৎসরকাল 'ইলমু'ত-তাজবীদ উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন এবং এই বিষয় কয়েকখানি উন্নত মানের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের লেখাও ছিল খুবই সুন্দর। নাসতা'লীক (نستعليق), নাস্‌খ (نسخ) ও তুগরা (التغرى)— এই তিন পদ্ধতিতেই তিনি লিখিতে পারিতেন। এত সুন্দর ও এত সূক্ষ্ম লিখিতেন যে, একটি চাউলের দানার উপর বিস্‌মিল্লাহি'র-রাহমানির-রাহীমসহ সূরা ইখলাস (اخلاص) এবং শেষে নিজের নামও লিখিতে পারিতেন। একটি চাউলের দানা যত বড়ই হউক তাহার উপর এতগুলি শব্দ লেখা অসম্ভব এবং অবাস্তব বলিয়া মনে হইলেও বিভিন্ন উৎস হইতে এই কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় (সীরাত, পৃ. ১৫-১৬ ; নূরু'দ-দীন যায়দী, তাজাল্লী-ই নূর, ২খ, ১২৪)। তাঁহার নিজ হাতে লেখা কুরআন মাজীদ-এর কপি বিক্রয় করিয়া তিনি ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের খরচ যোগাইতেন।

শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিহারী নামক একজন কুশতীগীর ও স্বর্ণকারের কাছে কুশতীগীরীর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরবর্তীকালে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার কার্যে বিভিন্ন স্থানে সফরকালে বিপদাপদের মধ্যে এই শিক্ষা জীবন রক্ষার্থে বড় কাজে লাগিয়াছিল।

১২৩৪/১৮১৯ সালে সায়্যিদ আহমাদ (১২০১/১৭৮৬-১২৪৬/১৮১৩) দিল্লী হইতে রায়বেরীলীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ই কারামাত 'আলী রায়বেরীলীতে তাঁহার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার হাতে বায়'আত (بيعت) গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের রচিত 'নূরুন 'আলা নূর (نور على نور) ও যাদু'ত-তাকওয়া (زاد التقوى) গ্রন্থে কারামাত 'আলী লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার মুরশিদ সায়্যিদ আহমাদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়া মুরশিদ-এর হুকুমে রায়বেরীলীতে ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং এই সময়ই বেরীলীর মসজিদে মুরশিদ-এর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেন। তাঁহার মুরশিদ এই ১৮ দিন যাবৎ তাঁহাকে 'ইলমু'ল-মা'রিফা ওয়া'ত-তারীকা (علم المعرفة والطريقة) শিক্ষা দিয়া যেসব রহস্য উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন তাহা পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছে (নূরুন 'আলা নূর, পৃ. ৭৩-৭৪ ; যাদু'ত-তাকওয়া পৃ. ১১৩)। ১২৩৬/১৮২১ সালে সায়্যিদ আহমাদের মক্কা যাওয়ার পথে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহার মুরশিদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কলিকাতা পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এখান হইতে কারামাত 'আলী আবার জৌনপুরে ফিরিয়া যান এবং পরের বৎসরই দীন ইসলামের দা'ওয়াত লইয়া বাংলাদেশে চলিয়া আসেন। ১২৩৯/১৮২৩ সালে যখন সায়্যিদ আহমাদ মক্কা হইতে কলিকাতা হইয়া রায়বেরীলীর দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন কারামাত 'আলী আবার তাঁহার মুরশিদ-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং মির্যাপুর পর্যন্ত মুরশিদ-এর সঙ্গে থাকেন। এই তৃতীয়বারের সাক্ষাতে সায়্যিদ আহমাদ (র) তাঁহাকে ১২৩৯ হিজরীর ২ শা'বান/১৮২৪ খৃস্টাব্দের ৩ এপ্রিল খিলাফাতনামা দান করেন। এই খিলাফাতনামা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের কাছে আজও সংরক্ষিত আছে।

সায়্যিদ আহমাদ বেরেলাবীর সঙ্গে কারামাত 'আলীর সাক্ষাৎ এবং তাঁহার কাছে বায়'আত লওয়া সম্পর্কে কিছু মতের পার্থক্য আছে। যেমন James Wise, J. C. Jack ও 'আল্লামা য়ূসুফ 'আলীর মতে মাওলানা কারামাত 'আলী কলিকাতায় সায়্যিদ আহমাদের সঙ্গে ছিলেন (James Wise, Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, পৃ. ২৯ ; J. C. Jack, Bengal District Gazetteer, Bakarganj, পৃ. ৩৪ ; য়ূসুফ 'আলী, Encyclopaedia of Islam, vol. II, পৃ. ৭৫২ ; নূরু'দ-দীন যায়দী, পূ. গ্রন্থ; পৃ. ১২৩ ; 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হুসায়নী (নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, পৃ. ১৯৪)। নূরু'দ-দীন যায়দী বলেন যে, মাওলানা কারামত 'আলী সায়্যিদ্য আহমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'আবদু'ল-কাদির কুমিল্লা হইতে মাওলানা কারামাত 'আলীর পুত্র 'আবদু'ল-আওওয়ালকে এক দীর্ঘ পত্রে লেখেন যে, মাওলানা কারামাত 'আলী ২৩ বৎসর বয়সে বানারসে সায়্যিদ আহমাদের হাতে বায়'আত হন। সুতরাং দীক্ষা লওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য থাকিলেও তিনি যে সায়্যিদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এই ব্যাপারে কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি অল্প বয়সেই তাঁহার মুরশিদ সায়্যিদ আহমাদের নিকট বায়'আত হইয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও বিভিন্ন বর্ণনা হইতে বোঝা যায়। ইহার পর মাওলানা কারামাত 'আলী মক্কায় যান ও হাজ্জ পালন করেন। তবে কোন্ সময়ে তিনি হাজ্জ পালন করেন তাঁহার কোনও পুস্তকে তাহা উল্লেখ নাই। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক মিফতাহু'ল-জান্নাত (مفتاح الجنت)-এর শেষের দিকে তিনি বলিয়াছেন, তিনি হাজ্জ সমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া ১২৪৩ হি. এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। James Wise-এর মতে কারামাত 'আলী সায়্যিদ আহমাদ বেরেলাবীর সঙ্গে হাজ্জ পালন করেন। কিন্তু এই তথ্য অন্য কোনও ইতিহাসে বা জীবনীগ্রন্থে বা মাওলানার লিখিত কোনও কিতাবেই পাওয়া যায় না। J. C. Jack-এর মতে মাওলানা কারামাত 'আলী সায়্যিদ আহমাদের সঙ্গে মক্কা যান নাই। দ্বিতীয়বারও মাওলানা তাঁহার কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মক্কায় কারীদের কাছে দুই বৎসর কাল ধরিয়া 'ইলম-ই কিরাআত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন অথচ সায়্যিদ আহমাদ বেরেলাবী মক্কায় ১৪ মাস অবস্থান করিয়াছেন।

বিভিন্ন দিক হইতে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহা যাচাই বাছাই করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে তিনি মক্কা গিয়াছিলেন এবং হাজ্জও সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মুরশিদ সায়্যিদ আহমাদের সঙ্গে হাজ্জ সম্পন্ন করিতে যান নাই। তিনি সম্ভবত ১২৪০ হি. সালে হাজ্জ পালন করেন এবং দুই বৎসর পর ১২৪২ হি. সালে ফিরিয়া আসেন।

মাওলানা কারামাত 'আলী হাদীছ ও ফিক্হশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাদীছের শিক্ষক ছিলেন আহমাদুল্লাহ, যাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি তাকলীদের সমর্থনে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিতেন। মুহাম্মাদ ইসহাক দেহ্লাবী লিখিত এবং এবং আহমাদুল্লাহ্ আন্নামী সম্পাদিত— মিয়াতু মাসা'ইল ফী তাহ্সীলি'ল-ফাদা'ইল (مسائل فى تحصيل الفضائل) গ্রন্থে তাকলীদ সম্বন্ধে যে মনোভাব ও মতবাদ ব্যক্ত হইয়াছে মাওলানা কারামাত 'আলী ঠিক সেই মতোই পোষণ করিতেন। এইজন্যই তিনি ফিক্হ শিক্ষার উপর বেশী তাকীদ দিতেন এবং যাহারা ফিক্হ-এর বিধান মানিত না তাহাদের নিন্দা করিতেন, আর তাহাদিগকে লা মাযহাবী (لا مذهبى) বা ওয়াহ্হাবী (وهابى) বলিতেন। অতএব যাহারা তাঁহাকে ওয়াহ্হাবী বলিয়াছেন তাহাদের ধারণা যে সত্য নয়, তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। মাওলানা কারামাত 'আলী তাঁহার কিতাব মুকাশিফাত-ই রাহমাত (مكاشفات رحمت) ও কাওলু'ছ-ছাবিত (قول الثابت) গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

সায়্যিদ কারামাত 'আলী জৌনপুরী (১৭৯৬-১৮৭৬ খৃ.) ও মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী দুই ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সুস্পষ্ট। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন শী'আ 'আলিম, যিনি পরবর্তীকালে ১৮৩৭ খৃ. হুগলী ইমামবাড়ার মুতাওয়াল্লী বা সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৮৭৬ খৃ. মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদেই সমাসীন ছিলেন। অপর পক্ষে মাওলানা কারামাত 'আলী ছিলেন হানাফী মাযহাবের নিষ্ঠাবান অনুসারী। মাওলানা কারামাত 'আলী একজন উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিছও ছিলেন যিনি হাদীছের দুইখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মিশকাতু'ল-মাসাবীহ ও শামা'ইলু'ত-তিরমিযীর অনুবাদ করেন। তিনি শুধু আরবী হইতে উর্দূতে ভাষান্তর করিয়াই শেষ করেন নাই ; ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যাও দিয়াছেন।

তিনি ফিক্হশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার রচিত তিনখানি পুস্তক— মিফ্তাহু'ল-জান্নাত (مفتاح الجنت), যীনাতু'ল-মুসাল্লী (زينة المصلى) ও তায্কিয়াতু'ন-নিসা' (تزكية النساء) মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া তাঁহার জীবনের প্রথম পুস্তক মিফ্তাহু'ল-জান্নাত বহুবার উর্দূ ও বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে যাহা আজও দেশের ঘরে ঘরে পাওয়া যায়।

তিনি একজন উচ্চস্থানীয় কারী ছিলেন। 'ইলমু'ত-তাজবীদে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন কারী সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইসকান্দারানী ও মুহাম্মাদ ইবরাহীম মাদানী। তবে তাঁহার প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে কোন কারী শিক্ষকের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইলমু'ত-তাজবীদ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ তিনি পান নাই। মক্কায় গিয়া তিনি এই বিদ্যা অর্জন করার সুযোগ পান এবং সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করিয়া এই বিষয়ের উপর চারিখানা পুস্তক যথা ঃ শারহি জাযারী হিন্দী (شرح جزرى هندى ; কলিকাতা ১২৬৪ হি.) কাওকাব দুররী (كوكب درى, কলিকাতা ১২৬৩ হি.), যীনাতু'ল-কারী (زينة القارى ; কলিকাতা ১২৬৪ হি.) ও মাখারিজু'ল-হুরূফ (مخارج الحروف) রচনা করেন। তাঁহার লেখা এই পুস্তকগুলি এই দেশে এত

সমাদৃত হইয়াছে যে, এই দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইগুলি পাঠ্য পুস্তক। কবি হিসাবে পরিচিত না হইলেও তিনি সুন্দর ও সাবলীল কবিতা রচনা করিতেন যাহা তাঁহার গ্রন্থে কোনও কোনও স্থানে দেখা যায়। তিনি একজন সফল তর্কবিদ ছিলেন। যখন তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে বিভিন্ন স্থানে যাইতেন তখন বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে বিরোধীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে হইত। এই সব বিতর্কে বিপক্ষকে হারাইয়া তিনি জয় লাভ করিতেন।

সেই সময়ে বাংলাদেশে যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। নদীবহুল এই দেশে চলাফেরা খুবই কষ্টকর ছিল। ভ্রমণকালে তিনি দেশের বিভিন্নস্থানে মাহ্ফিলে ওয়াজ করিতেন। লোকদের মাস্'আলা-মাসা'ইল শিখাইতেন এবং তা'লীম-তরবিয়াত দিতেন। এই ভ্রমণকালে তিনি তৎকালীন নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর পৌঁছেন। যেখানে আ'জাম শাহ নামে একজন কামিল পীর (দায়রা বাড়ীর শাহ সাহেব নামে পরিচিত)-এর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। শাহ সাহেব তাঁহার সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তিনি এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে এই দেশে কাজ করিতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। ভ্রমণকালে তাঁহার পরিবার-পরিজন ও বহু শাগরিদ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

তাঁহার জীবনে তিনি সর্বদাই সমাজের কুসংস্কার এবং ইসলামবিরোধী ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তদুপরি বাংলাদেশের ফারা'ইদী (ফারায়েজী) ও লা-মাযহাবী (আহ্‌লে হাদীছ)-দের সঙ্গেও তাঁহার মতবিরোধ থাকায় প্রায়ই তাহাদের সঙ্গে তাঁহার তর্কবিতর্ক হইত। এই দেশে ৫১ বৎসর যাবৎ ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকার পর ৩ রাবী'উল-আখির, ১২৯০/৩১ মে, ১৮৭৩ সালে তিনি রংপুরে ইনতিকাল করেন এবং সেখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি দুই স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, নয় কন্যা এবং বহুসংখ্যক মুরীদ ও খলীফা রাখিয়া যান।

মাওলানা কারামাত 'আলী (র) যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন সেইগুলির মধ্যে কতগুলি তো তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্ত ও শাগরিদগণ তাঁহার অপ্রকাশিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন। বিভিন্ন তথ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ছোট বড় উনপঞ্চাশখানা পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সবগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাহমান 'আলী (তাযকিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১৭১) মাওলানার পুস্তকসমূহের (বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪৬ খানা) একটি তালিকা দিয়াছেন।

এই সমস্ত কিতাবের কোনও কোনটিতে মাওলানা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক বেশীর ভাগই উর্দূতে, তবে অল্প কয়খানা ফারসী বা আরবীতেও লেখা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১। সাধারণভাবে দীন ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা, যেমন— মিফতাহু'ল-জান্নাত (مفتاح الجنت), (কলিকাতা ১২৪৩ হি.), 'আকা'ইদ-ই হাককা (عقائد حقة), যীনাতু'ল-মুসাল্লী (زينة المصلى) (কলিকাতা ১২৫৯ হি.)।

২। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সংস্কারমূলক লেখা, যথা— কাওলু'ছ-ছাবিত (قول الثابت), তাযকিয়াতু'ন-নিসওয়ান (تزكية النسوان), ফায়দ-ই 'আম্মা (فيض عامة) (কলিকাতা ১২৮২ হি.)।

৩। বিভিন্ন মতবাদ, যেমন ফারা'ইদী (فرائضى), ওয়াহহাবী (وهابى) বা আহলু'ল-হাদীছ সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনা, এই জাতীয় লেখা, যেমন হুজ্জাত-ই কাতি'আ (حجت قاطعة) (কলিকাতা ১২৮২ হি.), নাসীমু'ল-হারামায়ন (نسيم الحرمين), মুকাশিফাত-ই রাহমাত (مكاشفات رحمة) ইত্যাদি।

৪। পীর মুরীদী বা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে লেখা, যেমন— বায়'আত-ই তাওবা (بيعت توبة) (কলিকাতা ১২৫৪ হি.), নূরুন 'আলা নূর (نور على نور), নূরু'ল-হুদা (نور الهدى) (কলিকাতা ১২৮২ হি.) যাদু'ত-তাকওয়া (زاد التقوى) (কলিকাতা ১২৮৭ হি.)।

৫। অনুবাদ জাতীয় লেখা, যেমন— তারজামা-ই মিশকাত (ترجمة مشكوة), তারজামা-ই শামা'ইল-ই তিরমিযী (ترجمة شمائل ترمذى)। তাঁহার রচনায় তিনি অনেক লেখকের নির্ভরযোগ্য রচনাবলীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ রাদ্দু'ল-মুহতার (رد المحتار), মাদারিজু'ন-নবুওয়া (مدارج النبوه), জামি' সাগীর (جمع صغير), হিসন-ই হাসীন (حصن حصين), ফাতওয়া 'আলামগীরী (فتوى عالمگرى), শারহ বিকায়া (شرح وقية), হিদায়া (هداية), জামি'উ'র-রামূয (جامع الرموز), কানযু'দ-দাকা'ইক (كنز الدقائق), তাফসীর-ই মাদারিক (تفسير مدارك), তাফসীর রূহু'ল-বায়ান (تفسير روح البيان), আখবারু'ল-আখয়ার (اخبار الاخيار), বুখারী (بخارى), মুসলিম (مسلم), ইব্ন মাজা (ابن ماجة), তিরমিযী (ترمذى), আল-কাওলু'ল-জামীল (القول الجميل), 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ (عوارف المارف), সিরাত-ই মুসতাকীম (صراط مستقيم), তাকবিয়াতু'ল-ঈমান (تقوية الايمان), আল-আশবাহ ওয়া'ন-নাজা'ইর (الاشباه النظائر), মীযানু'শ-শা'রানী (ميزان الشعرانى) ইত্যাদি। তিনি নিজ পাণ্ডিত্যবলে অনেক কিতাব-পুস্তকের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাহা করিতে যাইয়া তাঁহাকে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালা (বরাত) দিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারাই বোঝা যায় যে, তিনি বহু লেখকের রচনা পড়িয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিতর্কিত কোনও বিষয়ের উপর তাঁহাকে অনেক পড়াশুনা করতে হইয়াছে। বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করিতে তাঁহাকে বিরোধী দলের বহু-পুস্তকও পড়িতে হইয়াছে। যেহেতু তিনি বাংলা ভাষা পড়িতে পারিতেন না, তাই বাংলা ভাষার কোনও বইয়ে কি আছে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বাংলাভাষী মুরীদদের কাছে বসিয়া ঐ পুস্তকের বিষয়বস্তুও পড়াইয়া শুনিতেন। তিনি সর্বদাই সমসাময়িক অবস্থা তুলিয়া ধরিতেন এবং উহার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেন। এই ক্ষেত্রেও তাঁহাকে সালাফ-ই সালিহীন (سلف صالحين)-এর রচনাবলী খুব নিবিড়ভাবে পাঠ করিতে হইয়াছে। কোনও সমস্যার সমাধান দিতে যাইয়া তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফিক্হ ও 'আকা'ইদ-এর নির্ভরযোগ্য কিতাব পুস্তকের হাওয়ালা দিতেন। অনেক সময় তিনি নিজের মতের অনুকূলে হাদীছের উদ্ধৃতি দিতেন যদ্দারা তাঁহার মতের যথার্থতা প্রমাণিত হইত। তিনি কথা ও লেখনী দ্বারা তাঁহার বিরোধী দলের মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইতেন। যাহাদের সঙ্গে তাঁহার মতের মিল না হইত, যেমন ফারা'ইদী, তাহাদিগকে তিনি বাংলাদেশের খারিজী বলিয়া অভিহিত করিতেন। আহলু'ল-হাদীছ যাহাদিগকে তিনি লা মাযহাবী (لامذهبى) বলিতেন এবং চট্টগ্রামের মুখলিসু'র-রাহমান ও তাঁহার মুরীদান— তাহাদিগকে তিনি উজ্‌দিয়া বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাহাদের সম্পর্কে তিনি কোনও কোনও সময় বিরূপ মন্তব্যও করিতেন। তাঁহার রচনাবলীর নর্বত্রই তিনি তাঁহার মুরশিদ

সায়্যিদ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমা'ঈল শহীদের মতামত সমর্থন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেন।

তিনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ মানুষ ছিলেন— যিনি ইসলামের আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রচার করার মানসে বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি লেখার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তিনি মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও অনৈসলামী কার্যকলাপের সংস্কার সাধন করিতে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার তেজদৃপ্ত বক্তৃতা ও শক্তিমান কলম দ্বারা তিনি এই ভূমিকা পালন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গভীর দার্শনিক চর্চায় মনোনিবেশ করেন নাই, ফলে তিনি তেমন কোনও উচ্চমানের মৌলিক রচনা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত কোনও কোনও পুস্তক অন্য ভাষায়, যেমন বাংলাতে অনূদিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার এবং মুসলিম জীবনে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণের ব্যাপারে কারামাত 'আলী জৌনপুরী (র)-র মহৎ অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই নদীবহুল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইয়া তিনি যেইভাবে মুসলমানদিগকে ইসলামী আদর্শের দিকে দীক্ষিত করিয়াছেন তাহার নজীর আর পাওয়া যায় না।

কারামাত 'আলী (র) তাঁহার মুরশিদ সায়্যিদ আহমাদ বেরেলাবীর সঙ্গে জিহাদ আন্দোলনে শরীক হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সায়্যিদ আহমাদ তাঁহার এই বুদ্ধিমান কর্মঠ যুবক অনুসারীকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য বেশী যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে তাঁহাকে জিহাদে যোগদান করিতে অনুমতি না দিয়া বাংলাদেশে আসিয়া ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাইতে নির্দেশ দেন। মুরশিদ-এর নির্দেশ মুতাবিক প্রথমদিকে তিনি তাঁহার নিজের শহর জৌনপুরেই কাজ আরম্ভ করেন। ঐ সময় জৌনপুরের জামি' মসজিদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সময়ে সময়ে মসজিদে না ঠিকমত আযান দেওয়া হইত, না ঠিকমত সালাত আদায় করা হইত। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি যাহা জৌপুরের শেষ শারকী সুলতান হুসায়ন শাহ কর্তৃক ১৪৭০ খৃ. নির্মিত হইয়াছিল, তাহার সংস্কার সাধনে সর্বাত্মকভাবে কাজ আরম্ভ করেন। এই কাজ সমাপ্ত হইলে তিনি পার্শ্ববর্তী শহরগুলি, যেমন আ'জামগড়, গাজীপুর, ফয়েযাবাদ ও সুলতানপুর যাইয়া সেখানকার মুসলিম সমাজকে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধান মানিয়া চলার আহ্বান জানান। তিনি জৌনপুরে একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মাওলানা কারামাত 'আলী ১৮২১ খৃ. সায়্যিদ আহমাদ-এর সাহচর্যে প্রথমবারের মতো কলিকাতা আসেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি এই দেশে বেশী দিন অবস্থান করেন নাই। জে. সি. জ্যাক-এর মতে সায়্যিদ আহমাদ শাহীদ-এর মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার পর মাওলানা কারামাত 'আলী ইসলামের 'আকীদা ও বিশ্বাস এই দেশের লোকদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য ১৮২২ খৃ. বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি একাই আসিয়াছেন।

১২৫০ বঙ্গাব্দ/১৮৩৫ খৃ. তিনি পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলিয়া আসেন। এই ভ্রমণের সময়ই কলিকাতায় তাঁহার পুত্র হাফিজ আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ইসলামের খিদমতে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, পূর্ণিয়া, খুলনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা এই সমস্ত জিলার বিভিন্ন স্থানে তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত সফর করেন।

মাওলানা কারামাত 'আলী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান যাহারা ভণ্ড পীর ও দরবেশদের খপ্পরে পড়িয়া এবং বহুকাল যাবৎ হিন্দু ধর্মের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করিয়া ইসলামী অনুশাসনের বিপরীত পথে জীবন যাপন করিতেছিল তাহাদের নিকট ইসলামের সত্য মত ও পথ তুলিয়া ধরেন। পীরপূজা, কবর পূজা, পীর-দরবেশদের নামে উরস করা— এসব কাজ হইতে মুসলমানদিগকে তিনি বিরত রাখার চেষ্টা করিতেন।

রাসমী ফাতিহা, লায়লাতু'ল-বারাআত, লায়লাতু'ল-কাদ্‌রে যে সব শির্‌ক বিদ'আত কাজ চলিয়া আসিতেছিল তিনি মুসলমানদিগকে সেই সমস্ত শির্‌ক ও বিদ'আতের কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন। সমবেত জনতার মধ্যে বক্তব্য রাখিতেন বা লিখিয়া এসব কাজের অসারতা প্রমাণ করিতেন।

তিনি বিশেষ ধরনের বোটে (নৌকা) পরিবার-পরিজনসহ সফর করিতেন এবং ঐ বোটেই সাধারণত বসবাস করিতেন। ঐ বোটগুলিকে স্থানীয় ভাষায় বজরা বলা হইত (মুরাদু'ল-মুরীদীন, পৃ. ৭৭)। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই মাদরাসা স্থাপন করার চেষ্টা করিতেন। এই কারণেই দেখা যায় যে, আজও কোনও কোনও মাদরাসা তাঁহার নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। যেমন নোয়াখালীতে কারামাতিয়া মাদ্‌রাসা, রংপুর শহরতলীতে কারামাতিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, যশোহর জিলার মনোহরপুরে মাদ্‌রাসা-ই কারামাতিয়া ইত্যাদি।

তিনি মুজতাহিদীন-ই শারী'আতের তাকলীদ ওয়াজীব মনে করিতেন। যেই ব্যক্তি নিজে মুজতাহিদ নহেন তাঁহার পক্ষে কোনও মাধ্যম না ধরিয়া কুরআন-হাদীছ হইতে জীবনের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া এবং সেই মুতাবিক জীবন যাপন করাকে তিনি হারাম বা অবৈধ মনে করিতেন। তাঁহার মতে কোনও মাযহাবের লোক বিশেষ কোনও সুবিধার জন্য অন্য মাযহাবের অনুসরণ করিতে পারিবে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুসরণ করিবে। তবে কেহ যদি পুরাপুরিভাবে মাযহাব পরিবর্তন করিয়া অন্য ইমামের অনুসরণ করিতে চাহে তাহা করিতে পারিবে (নাসীমুল-হারামায়ন, পৃ. ৫১)। মোট কথা, তিনি তাকলীদ-ই শাখসী অর্থাৎ বিশেষ কোনও এক মুজতাহিদের তাকলীদ (অনুকরণ) জরুরী মনে করিতেন।

আহ্‌লু'ল-হাদীছের ব্যাপারে মাওলানা কারামাত 'আলী ভাল ধারণা পোষণ করিতেন না (দ্র. তাঁহার রচিত গ্রন্থ ঃ মুলাখ্‌খাস, কাওলু'ল-হাকক, মিরআতু'ল-হাকক, আল-বারাহীনু'ল-কাতি'আ)। শেখপুরার ফারা'ইদী নেতা 'আবদু'ল-জাব্বার-এর সঙ্গে তাকলীদ-এর ব্যাপারে তাঁহার মতবিরোধ হয়। 'আবদু'ল-জাব্বার জাওয়াব-ই কৃতু'ল-ঈমান নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন, যাহাতে তিনি তাকলীদ-ই শাখসীর নিন্দা করেন এবং চার মাযহাব-এর মিশ্রণের (تخليط مذاهب اربعة) পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে মাওলানা কারামত 'আলীর মুরশিদ সায়্যিদ আহমাদও এই রকম চার মাযহাব বা তারীকার মিশ্রণে পঞ্চম তারীকা-ই মুহাম্মাদী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, হানাফী মাযহাবের আবূ হানাফী (র), আবূ য়ূসুফ (র), মুহাম্মাদ (র), য়ুফার (র) ইঁহারা সকলে কোনও কোনও বিষয়ে একমত পোষণ না করিলেও তাঁহাদের সকলের মতামত হানাফী মাযহাবের মধ্যে গণ্য। সুতরাং এই রীতিতে চার মাযহাবের

মিশ্রণে পঞ্চম মাযহাব মুহাম্মাদী মাযহাব উদ্ভাবণ জা'ইয। মাওলানা কারামাত 'আলী "আবদু'ল-জাব্বারের এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তারীকা-ই মুহাম্মাদিয়ার ব্যাপারে 'আবদু'ল-জাব্বার যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কেননা তাঁহার মতে তারীকা-ই মুহাম্মাদিয়া চার তারীকার সংমিশ্রণ নয় এবং সায়্যিদ আহমাদ শুধু তারীকা-ই মুহাম্মাদিয়াতেই বায়'আত গ্রহণ করিতেন, তাহাও সঠিক কথা নয়। আর ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমামের মধ্যে যে মতের পার্থক্য দেখা যায় এই প্রশ্নের জওয়াবে তিনি মুজতাহিদ ফি'শ-শার' (مجتهد فى الشرع) ও মুজতাহিদ ফি'ল-মাযহাব (مجتهد فى المذهب) এই দুই প্রকার মুজতাহিদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথমোক্ত মুজতাহিদ কোনও ভিন্ন স্বাধীন সত্তা নহে অথচ শেষোক্ত মুজতাহিদ সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মুজতাহিদ ও সাত স্তরের ফাকীহদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

সায়্যিদ আহমাদ (দ্র.) বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন নাই, বরং অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন—এই ধারণা যাঁহারা পোষণ করিয়াছেন মাওলানা কারামাত আলী তাঁহাদের এই মত খণ্ডন করেন। তিনি সায়্যিদ আহমাদের প্রতি অত্যন্ত বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইতেন এবং তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতেন। কোনও সময়ে তাঁহার মুরশিদের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন উঠিলে তিনি তাঁহার কড়া জওয়াব দিতেন। তারীক-ই মুহাম্মাদিয়ার সমালোচকদের জওয়াবে তিনি মুকামি'উ'ল-মুবতাদি'ঈন (مقامع المبتدعين) রচনা করেন। তিনি সায়্যিদ আহমাদ শহীদকে উনবিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলিতেন। তিনি সায়্যিদ আহমাদ-এর দুইজন শীর্ষস্থানীয় খলীফা শাহ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল ও মাওলানা 'আবদু'ল-হায়্যি-র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। অবশ্য তিনি বলিতেন যে, দুইজনই হানাফী মাযহাবের অনুসারী (পূ. গ্র., পৃ. ২২১)। তাঁহার এই দাবী 'আবদু'ল-হায়্যি-র বেলায় সত্য হইলেও শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈলের বেলায় সত্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা শাহ সাহেব কোনও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মাওলানা কারামাত 'আলী ওয়াহদাতু'ল-উজূদ (وحدة الوجود)-এর বিরোধী ছিলেন। ওয়াহদাতু'ল-উজূদ-এর প্রবক্তা চট্টগ্রামের মাওলাবী মুখলিসু'র-রাহমান-এর তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। মুকামি'উ'ল-মুবতাদি'ঈন (পৃ. ২২৩-২২৪) গ্রন্থে তিনি শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল (দ্র. তাকবিয়াতু'ল-ঈমান)-এর সহিত একমত পোষণ করেন। রাফ'উ'ল-য়াদায়ন (رفع اليدين) অর্থাৎ সালাতে হস্ত উত্তোলনের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করিলেও শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল-এর প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা কখনই হ্রাস পায় নাই। তিনি মীলাদু'ন-নাবী সমর্থন করিতেন। কিন্তু প্রচলিত মীলাদু'ন-নাবী অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীর বা আত্মা অলৌকিকভাবে উপস্থিত হয় বলিয়া যাঁহারা ধারণা পোষণ করেন তিনি তাঁহাদের এই ধারণার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম (দাঁড়ান) মুসতাহাব মনে করিতেন।

বাংলাদেশে ফারা'ইদীদের সঙ্গে মাওলানার মতবিরোধী ছিল, বিশেষত এই দুই বিষয়ে ঃ বেনামাযীর জানাযা ও বৃটিশ অধীনস্থ ভারতে জুমু'আ ও 'ঈদের সালাত জা'ইয হইবে কি না। তাঁহার মতে একজন ঈমানদার লোক অলসতা বা উদাসীনতার কারণে সালাত আদায় না করিলেও সে কাফির হইয়া যাইবে না। সুতরাং এই রকম একজনের মৃত্যুতে তাহার জানাযা আদায় করিতে হইবে। মাওলানা যেহেতু বৃটিশ অধীনস্থ ভারতকে দারু'ল-ইসলাম মনে করিতেন, তাই ঐ অবস্থায় জুমু'আ ও 'ঈদ-এর জামা'আত জা'ইয ও জরুরী মনে করিতেন। তাঁহার গ্রন্থ হুজ্জাত-ই কাতি'আ-য় এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। এই জুমু'আ ও 'ঈদের জামা'আত দুরস্ত হইবে কি হইবে না এই প্রশ্নটির উদ্ভব হইয়াছিল দিল্লীর সুলতান মুহাম্মাদ ইব্ন তুগলাক-এর আমলেও (৭২৬/১৩২৫—৭৫২/১৩৫১)। ৭৪১/১৩৪০ সালে এই প্রশ্নের উপর বিতর্ক হইয়াছিল এই বলিয়া যে, এই দেশ যাহা একজন সুলতান দ্বারা শাসিত যিনি মুসলিম খলীফার অনুমোদন লাভ করেন নাই, সুতরাং এই দেশে ইসলামী বিধান মুতাবিক জুমু'আ ও 'ঈদের জামা'আত বৈধ নয়। প্রশ্নটির গুরুত্ব সুলতান নিজেও অনুধাবন করেন। ফলে ৭৪৫/১৩৪৪ সালে তিনি মিসরের 'আব্বাসী খলীফার অনুমোদন লাভ করিলে পর 'ঈদ ও জুমু'আর সালাতের জামা'আত পুনরায় কায়েম হয়।

মাওলানা কারামাত 'আলী বৃটিশ অধীনস্ত ভারতকে দারু'ল-ইসলাম কেন মনে করিতেন সেই সম্পর্কে তাঁহার রচিত নাসীমু'ল-হারামায়ন (পৃ. ১৭৬-১৮৫)-এ বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ২৩ নভেম্বর ১৮৭০ সালে নাওয়াব 'আবদু'ল-লাতীফের বাড়ীতে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির ষান্মাসিক সভায় তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, বৃটিশ অধীনস্ত ভারতে দীন ইসলামের হুকুম-আহকাম আদায় করিতে কোনও বাধা-নিষেধ নাই। সুতরাং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শারী'আত সম্মত হইবে না। ইহার পর তিনি নাওয়াব 'আবদু'ল-লতীফ ও স্যার সায়্যিদ আহমাদ খানের সঙ্গে একমত পোষণ করিয়া বৃটিশদের সাথে সহযোগিতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল যে, বৃটিশ শাসনকর্তাদিগকে বয়কট করিয়া দেশ মুক্ত করিতে পারা যাইবে না। অতএব তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া মুসলমানদের অবস্থা ভাল করার চেষ্টা করা উচিত। বৃটিশ অধীনস্থ ভারত সম্বন্ধে তাঁহার মুরশিদের ভিন্নমত ছিল। মাওলানা বলিতেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তিত হইয়া যায়।

মুহাম্মাদ সা'ঈদ সম্পাদিত যাখীরাতু'ল-কারামাত নামক সংকলন (১খ ও ২খ, কানপুর ১৩৪৪ হি.)-এ মাওলানার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ ১ম খণ্ডে ৮টি (১) মুকাশিফাত রাহমাত ; (২) রিসালা-ই ফায়দা-ই' আম্মা ; (৩) তায্‌কিরাতু'ল-'আকাইদ ; (৪) হুজ্জাত-ই কাতি'আ ; (৫) নূরু'ল-হুদা ; (৬) কিতাব-ই ইসতিকামাত ; (৭) যীনাতু'ল-মুসাল্লী ; (৮) 'আকা'ইদ-ই হাককা। ২য় খণ্ডে ৬টি ; (১) কাওলু'ছ-ছাবিত ; (২) দাওয়াত-ই মাসনূনা ; (৩) মুকামি'উ'ল-মুবতাদি'ঈন ; (৪) হাককু'ল-য়াকীন ; (৫) বায়'আত-ই তাওবা ; (৬) কাওলু'ল-আমীন। ঐ একই নামের একটি সংকলন (৩খ.) 'আবদু'র-রাহীম কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঢাকা হইতে ১৯৬৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। উহাতে মাওলানার ৫টি গ্রন্থ মুদ্রিত হয় ঃ (১) মুরাদু'ল-মুরীদীন; (২) কাওলু'ল-হাক্ক ; (৩) মিরআতু'ল-হাক্ক; (৪) ইতমীনানু'ল-কুলূব ; (৫) মুলাখ্‌খাস।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-আওওয়াল, ইয়ানু'ল-ওয়ারা লি-সিহ্‌হাতি'ল-জুমু'আ ফি'ল-সুদান ওয়া'ল-কুরা, লখনৌ ১৯২৭ খৃ. ; (২) ঐ লেখক, মুফীদু'ল-মুফ্‌তী, লখনৌ ১৩২৬ হি. ; (৩) ঐ লেখক, শাজারাত-ই তায়্যিবাত, জৌনপুর ১৩২৬ হি. ; (৪) 'আবদু'ল-'আযীয, রাদ্দু'ল-মুফসিদীন, কলিকাতা ১২৮৩ বঙ্গাব্দ ; (৫) 'আবদু'ল-বাতিন, সীরাত-ই

মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী, এলাহাবাদ ১৩৬৮ হি. ; (৬) শাহ 'আবদু'ল-হাকক, আশি'আতু'ল-লুম'আত শারহি মিশকাত, লখনৌ ১৩৮৩ হি. ; (৭) আবু'ল-বাশার, সীরাত-ই মাওলানা 'আবদু'ল-আওওয়াল জৌনপুরী, ১৩৭০ হি. ; (৮) কারামাত 'আলী, মিফতাহু'ল-জান্নাত, জৌনপুর ১৩৪৫ হি. ; (৯) ঐ লেখক, মাখারিজু'ল-হুরুফ, কানপুর তা. বি. ; (১০) ঐ লেখক, মুলাখ্খাস, জৌনপুর ১২৮৭ হি. ; (১১) এ লেখক, নাসীমু'ল-হারামায়ন, জৌনপুর তা. বি. ; (১২) ঐ লেখক, রাফীকু'স-সালিকীন, জৌনপুর ১৩৪৬ হি. ; (১৩) ঐ লেখক, কুওওয়াতু'ল-ঈমান, কলিকাতা ১২৫০ হি. ; (১৪) ঐ লেখক, শারহ-ই জাযারী হিন্দী কানপুর তা. বি.; (১৫) ঐ লেখক, তায্কিয়াতু'ন-নিসওয়ান, কলিকাতা ১২৯২ হি. ; (১৬) ঐ লেখক, যাদু'ত-তাকওয়া, কানপুর ১৩৪০ হি. ; (১৭) ঐ লেখক, যীনাতু'ল-কারী, কানপুর তা. বি. ; (১৮) ঐ লেখক, যাখীরা-ই কারামাত (ذخيرة كرامت), ১খ, সম্পা. মুহাম্মাদ সা'ঈদ, কানপুর ১৩৪৪ হি. ; (১৯) যাখীরা-ই কারামাত, ২খ, সম্পা. মুহাম্মাদ সা'ঈদ, কানপুর ১৩৩৪ হি. ; (২০) যাখীরা-ই কারামাত, ৩খ, সম্পা. 'আবদু'র-রাহীম, ঢাকা ১৯৬৩ খৃ. ; (২১) মির্যা হায়াত, হায়াত-ই তায়্যিবা, লাহোর ১৯৫৮ খৃ. ; (২২) T. P. Hughes, Dictionary of Islam, London 1985; (২৩) W. W. Hunter, The Indian Musulmans.4th ed., Calcutta 1945; (২৪) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হুসায়নী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ১৩১৮ হি., ৭খ.; (২৫) শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল, সিরাত-ই মুসতাকীম, লাহোর ১২৩৩ হি.; (২৬) নিযার জৌনপুরী, তাযকিরা-ই মাশাহির-ই জৌনপুর, জৌনপুর ১৯০০ খৃ.; (২৭). গুলাম রাসূল মিহ্র, জামা'আত-ই মুজাহিদীন, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (২৮) ঐ লেখক, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ, লাহোর ১৯৫২ খৃ; (২৯) জাফার থানিসসারী, সাওয়ানিহ-ই আহমাদী, লাহোর তা. বি.; (৩০) নূরু'দ-দীন যায়দী, তাজাল্লী-ই নূর, ২খ, জৌনপুর ১৯০০ খৃ.; (৩১) J. C. Jack, Bengal District Gazetteer, Bakerganj, Calcutta 1918; (৩২) M. A. Khan. History of the Faraidi Movement, Karachi 1965; (৩৩) James Wise, Notes on the Raus, Castes and Trades of Eastern Bengal, London 1883; (৩৪) সাদু'দ-দীন তাফতাযানী, 'আকাইদু'ন-নাসাফী, দিল্লী ১৩৫০ হি.; (৩৫) কারামাত 'আলী, পীরতত্ত্ব, নোয়াখালী ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

ড. এম. এস. এ. ইবরাহিমী

কারামা (দ্র. কারামত)

কারামা ইব্ন ছাবিত (كرامة بن ثابت) ঃ (রা) আল-আনসারী, ইবনু'ল-কালবীর মতে সিফ্ফীন-এর যুদ্ধে 'আলী (রা)-র পক্ষে যেইসব সাহাবী অংশগ্রহণ করেন—কারামা ইব্ন ছাবিত (রা) তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবূ 'উমার (ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র)-ও তাঁহার গ্রন্থে অনুরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইবনু'ল-আছীরের মতে তাঁহার সাহাবী হওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৮৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৩৪।

মুহাম্মদ মূসা

কারামান (قرامان) ঃ একজন তুর্কোমান নেতার নাম, আনাতোলীয় রাজবংশ কারামানী বা কারামান ওগুল্লারী-র প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে কোন্য়া (Konya)-কে প্রশাসনিক কেন্দ্র করিয়া এই রাজ্যের যেই সমস্ত ভূ-ভাগ লইয়া একটি 'উছমানী প্রদেশ গঠিত হয়, তাহারও এই নামকরণ করা হয় (দ্র. নীচে)। পরবর্তীকালে 'উছমানীদের দেওয়া লারান্দা (দ্র.) শহরের নামও ছিল কারামান। কারামানলী/কারামানলূ পদটি কারামান অঞ্চলের তুর্কীভাষী গ্রীক নিষ্ঠাবান (Orthodox) খৃষ্টানগণকে বোঝাইতে ব্যবহৃত হইত এবং কারামান লিজা (গ্রীক কারামান লিজিকা) দ্বারা তাহাদের তুর্কী আঞ্চলিক ও সাহিত্যিক ভাষা (গ্রীক বর্ণমালা লিখিত) বোঝাইত। এই জাতীয় ধর্মীয় প্রবাসিগণকে [যাহারা গ্রীক নয়, সম্ভবত অতীতের Lycaonians-দের অধস্তন পুরুষ] 'উছমানী বিজয়ের পর ইস্তাম্বুলে আনা হয় এবং তাহাদের নামানুসারে Yedikule (দ্র. ইস্তাম্বুল, ১, ৭)-এর নিকটবর্তী একটি এলাকার নামকরণ করা হয়। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে কারামানলী সম্প্রদায় ইস্তাম্বুলে তাহাদের নিজের সংবাদপত্র Nea Anatoli প্রকাশ করে। দেখুন A. M. Scheider, Die Bevolkerung Konstantinopels in xv. Jahrhundert, in Nachr. der Akad. der Wiss, in Gottingen (1949), পৃ. ২৩৮ প. (তুর্কী অনু. Bell-এ, ২১খ. ১৯৫২ খৃ., ৩৫ প.); S. Salaville ও E. Daleggion ১খ. ১৫৮৪-১৮৫০ খৃ., ২খ, ১৮৫০-৬৫ খৃ., এথেন্স ১৯৫৮-৬৬ খৃ.; S. Vryonis Jr., The decline of medieval Hellenism in Asia Minor, বার্কলে ও লস এঞ্জেলস ১৯৭১ খৃ., নির্ঘণ্ট এবং Turks ভাষাসমূহ বিষয়ক অধ্যায়। কারামান এলাকা হইতে দেশান্তরিতদের নামানুসারে তুরস্কের অন্যান্য উনিশটি জায়গার নামকরণ হইতে দেখা যায়, দ্র. Son teskilat-i mulkiye de Koylerimizin adlari, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., এবং Turkiye'de meskun yerler Kilavuzu, আঙ্কারা ১৯৪৬-৫০ খৃ.।

অতঃপর যাহা বর্ণনা করা হইতেছে তাহা শুধু কারামানী বংশের চূড়ান্ত অন্তর্ধানের পর 'উছমানীদের অধীন কারামান প্রদেশের প্রশাসন সম্পর্কিত।

৮৮৮/১৪৮৩ খৃ. কারামানী অঞ্চলসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত একটি বেগলার-বেগিলিক (Begler-begilik)-এ পরিণত হয় ঃ প্রথম ভাগ উপকূল সন্নিকটস্থ এলাকার পূর্বভাগ লইয়া গঠিত (Anadolu-র মানচিত্র দ্রষ্টব্য) ঈচ-ইল্ (দ্র.) সানজাক এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল মুট (Mut) ও শাসন কেন্দ্র কোন্য়া (Konya)। দ্বিতীয় ভাগ গঠিত ছিল খারিজ নামক অভ্যন্তর এলাকাসমূহ লইয়া। ১০ম/১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈচ-ইল সানজাককে ইহা হইতে পৃথক করা হয়। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে কারামান প্রদেশটি (ইয়ালাত (ايالت)) আকসারায়, (Aksaray), আকশিহির (Akshehir), বেয়শেহির (Beyshehir), কায়সেরি (Kayseri), কীরশেহির (Kirshehir), কোন্য়া ও নিগদে (Nigde) (দ্র. সবগুলি) সানজাকসমূহ লইয়া গঠিত হয়। ১২৮১/১৮৬৪ খৃ.-এর প্রশাসনিক সংস্কার অনুসারে পূর্বেকার ইয়ালাতটি কোন্য়া বিলায়াত (ولايت)-এ পরিণত হয়। দেখুন হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৬১৪-১৫; Von Hammer, Staatsverfassung, ১খ, ২৫৪ প., ২খ, ২৫৬-৭; Barkan, Kanunlar, পৃ. ৩৯ প.; N and I. Beldiceanu, Le

Province de Qaraman au XVI^{e} siecle, JESHO-তে, ১১খ, (১৯৬৮ খৃ.), বিশেষত ৩৯; Tekindag in TD. ১৩খ, স্থা, ১৪খ, ৭৪; I. H. Konyali, Adideleri ve kitabeleri ile Karaman tarihi..., ইস্তাম্বুল ১৯৬৭ খৃ., স্থা.; Kramers, E.I.[1]-এ, শিরো.।

H.A. Reed (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবুল কাসেম

কারামান উগলূ (قرامان اوغلو) ঃ [অথবা কারামান, দ্র. "আল-কামূসুল-আলাম'] ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে সালজূকী সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার পর তুর্কোমান উপজাতির যে সকল বংশ এশিয়া মাইনরে রাজত্ব করিয়াছিল তন্মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজবংশ। এই বংশের শাসকবৃন্দ কিছুকাল ধরিয়া 'উছমানী বংশের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। প্রথম দিকে এই নামের সম্পর্ক তুর্কী জাতি প্রধান কারামান (দ্র.)-এর সহিত ছিল; ইনি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুগলদের যুদ্ধ-বিগ্রহকালে আংশিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং সুলতান রুকনু'দ-দীন তাঁহাকে Cilicia (সিলিসিয়া) অঞ্চল প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি স্বয়ং তথাকার অধিবাসী ছিলেন। সেই যুগে 'আলা'উ'দ-দীন কায়কুবাদ (১ম) এবং আরমীনিয়া মাইনরের মধ্যে যুদ্ধ (৬২৫/১২২৮; ইব্ন বীবী, in Houtsma, Recueil, ৩খ, পৃ. ৩২৯) সংঘটিত হওয়ার পর আমীর কামারুদ-দীন বিজিত আরমানী দুর্গসমূহের প্রধান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমীর কামারুদ-দীন-এর নামানুসারে তাঁহার জন্মভূমি কামারুদ-দীন ঈলী (বর্তমান ঈচ ঈলী) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মুনাজ্জাম বাশী (৩খ, ২৪) ইব্ন বীবীর এই বর্ণনার ভিত্তিতে কারামান নামটি কামরুদ্দ-দীন হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। নামের উৎপত্তির এই ব্যাখ্যা এক সাধারণ ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ববহ নয়; তথাপি ইহাকে কোনও ভৌগোলিক কিংবা বংশীয় নাম হইতে উদ্ভূত বলিয়া গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসম্মত বলিয়া মনে হয়। কেননা এই জাতীয় উদ্ভবের কাহিনী এশিয়া মাইনরের অন্যান্য বংশে ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের শাসক বংশের নামসমূহেও পরিদৃষ্ট হয় (দ্র. আয়মীর উগলূ, গারমিয়ান উগলূ)। সম্ভবত কারামানী বংশ প্রকৃতপক্ষে তুর্কোমান গোত্র সালূর [দ্র.]-এর একটি শাখা হইতে উদ্ভূত যাহা কারাহমান (قره مان) নামে খ্যাত ছিল, তবে লারান্দ শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরবর্তীকালে কারামান [দ্র.] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, এমনকি আনাতোলীর উত্তর তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চলকেও কারামানিয়া (Caramania) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত শাসক বংশের নামানুসারেই এই নাম হয়। প্রাচীন 'উছমানী ইতিবৃত্তে এই বংশের প্রত্যেক শাসক 'বেগ'-এর জন্য প্রায় সর্বদা কারামান উগলূ নাম ব্যবহৃত হইত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর য়ূরোপীয় লেখকদের নিকটও "কারামান আজাম" (Grand Karaman)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়যান্টীয় লেখকদের চিন্তা জগতে কারামান উগলূর উৎস সম্পর্কে কখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা দৃষ্ট হয় নাই।

কারামানী বংশের প্রাচীন ইতিহাসের উৎস দুইটি। তন্মধ্যে একটি উৎস উহাদের বিরোধী; ইহা সালজূকী ঐতিহাসিকদের দল যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব ইব্ন বীবী এবং পরবর্তী 'উছমানী ইতিবৃত্তকারগণ করেন। অন্য উৎসটির প্রতিনিধি কেবল শিকারী যাঁহার লিখিত "তারীখে কারামান" গ্রন্থটি শাহনামা গ্রন্থের পদ্ধতিতে লিখিত একটি ফারসী কবিতার তুর্কী গদ্যানুবাদ। শিকারী এই গ্রন্থে কারামানিয়ার প্রচুর গুণ-প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাবলীর প্রকৃত বর্ণনা করেন নাই (শিকারীর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দ্র. খালীল আদহাম, in TOEM. সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৯৭; মুনাজ্জিম বাশীও শিকারী হইতে উপকৃত হইয়াছেন) আল-জান্নাবী উল্লিখিত মতবাদদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছেন। কারামানী লেখাসমূহ খালীল আদহাম প্রকাশ করিয়াছেন; ঐগুলি দ্বারা আমাদের প্রভূত জ্ঞান বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

কারামান উগলূ'র পিতৃভূমি এবং পরবর্তীকালে তাঁহার বাসস্থান এমন দুর্গম পাহাড়ী এলাকা ছিল যাহা উত্তর-পশ্চিম তাওরুস (Taurus)-এ সিলিসিয়া (Cilicia) ও কূনিয়ার (Lycaonia) মধ্যবর্তী সীমানায় অবস্থিত; সেইখানেই এরমেনাক [দ্র.] শহর অর্থাৎ প্রাচীন জারমানী কোপোলিস (Germani copolis) অবস্থিত ছিল। ইব্ন বীবীর বর্ণনা মতে (Houtsma, Recueil, ৪খ, ৩২১) কারামান কয়লা বিক্রেতা ছিলেন; তিনি কাঠের কয়লা তৈয়ার করিয়া লারিন্দাতে বিক্রি করিতেন, কিন্তু এই বর্ণনা পক্ষপাতদুষ্ট। আল-জান্নাবী (পৃ. ২১৩) ও শিকারী কারামানের পিতার নাম লিখিয়াছেন নূরা সূফী (ইব্ন সাদু'দ-দীন, শিকারী)। তিনি একজন সূফী শায়খ ছিলেন এবং ইহার প্রতি কূনিয়ার সুলতান খুবই সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আল-জান্নাবী উল্লিখিত নূরা সূফীকে আরমান (ارمن) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তবে তাঁহার এই ধারণা সম্ভবত এরমেনাক নামের কারণে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া এরমেনাক-এর কোনও সম্পর্ক আরমেনিয়ার সহিত হওয়া যুক্তিহীন। কেননা ইহা কখনও আরমেনিয়া মাইনরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (Rec. Hist. des Crois, Doe., Arm. ১খ., xxiii)। উক্ত নাম যে Germanicopolis হইতে উদ্ভূত তাহা স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই। কারামানের পিতার নাম নূরা-ই ছিল; ইহার সত্যতা একটি লেখা হইতে প্রমাণিত হয়; লেখাটি খালীল আদহাম কারামান (কারীমু'দ-দীন কারামান ইব্ন নূরা)-এর মাযার হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মাযারটি, সানজাক আরমানাক-এর অন্তর্গত 'বিলকামূন'-এ অবস্থিত। এইরূপ বলা হয় যে, নূরা সূফীর কবর (তুরবা) মূতের কাদা'র অন্তর্গত দীর-ই মেনলিকে অবস্থিত (ইবরাহীম বেগ [দ্র.]-এর এক পুত্রের নামও নূরা সূফী ছিল)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারামান উগলূর উদ্ভব সূফীকূলে যেমন বর্তমান 'উছমানী বংশ (Giese, Ztschr. F. Semetistik, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ২৪৬ প.) এবং সাফাবী বংশ (Babinger, in ZDMG, ১৯২২ খৃ., পৃ., ১৩২) সম্পর্কে মনে করা হয়। আল-জান্নাবীর এই বর্ণনায় জানা যায় যে, নূরা সূফী ছিলেন বাবা ইলয়াস-এর অনুসারী। তবে সত্যের খাতিরে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাবা ইল্য়াস আমাসিয়ার 'বাবা'ঈ' হাঙ্গামার পতাকাবাহী ছিলেন না (এই দায়িত্ব বাবা ইসহাকের উপর বর্তায়), বরং তিনি একজন খুরাসানী সূফী ছিলেন। ইনি এশিয়া মাইনরের ধর্মীয় জাগরণকে খুবই প্রভাবিত করেন (দ্র. কগরূলূ যাদে, ফু'আদা ঈলকে মুতাসাববিফলার, পৃ. ২৩২, ২৩৩)। যাহা হউক ইহা অর্থবহ যে, ইব্ন বীবী কারামানীদিগকে খারিজী বলিয়াছেন এই নাম আবার বাবা'ঈদিগকেও প্রদান করা হইয়াছিল (দ্র. খায়রুল্লাহ, ইতিহাস, কনস্টান্টিনোপল ১২৯২ হি., ২খ, ৫৮)। খায়রুল্লাহ্র পুস্তকটিতে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, নূরু'দ-দীন সূফী (এইভাবে) ঈচ ঈলে বাবা ইলয়াসের প্রতিনিধি ছিলেন।

কথিত আছে (আল-জান্নাবীর বর্ণনামতে) যে, নূরা সূফী সেলফেকত দুর্গ প্রতারণা পূর্বক দখল করিয়াছিলেন এবং সুলতান এই দুর্গ স্বীয় পুত্র কারীমুদ-দীন কারামানকে জাগীর হিসাবে প্রদান করেন। অন্য সূত্র অনুযায়ী

তিনি এরমেনেকের বেগলাক লাভ করিয়াছিলেন (মুনাজ্জিম বাশী)। কেননা সুলতান রুক্‌নু'দ-দীনের বিশ্বাস ছিল যে, এইভাবে তিনি তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা অর্থাৎ সুলতানের মীর আখূর আবিংগ সূযের বিশ্বস্ততা পুনরায় লাভ করিবেন। তাঁহার এই ভ্রাতা এলাকাটিতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। কারামানের মৃত্যুর (৬৬০/১২৬১, মুনাজ্জিম বাশী, শিকারী বলেন যে, সুলতান তাঁহাকে বিষ পান করাইয়াছিলেন) পর তাঁহার ভাই ও পুত্রদিগকে কাওয়ালা দুর্গে বন্দী করা হয় (ইব্‌ন বীবী, in Recueil, ৯খ, ৩২২); সুলতানের মৃত্যুর (৬৬৬/১২৬৭) পর তাঁহার মন্ত্রী মু'ঈনুদ-দীন পারওয়ানা তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

কিছুকাল পরে কারামানের পুত্র মুহাম্মাদ স্বীয় তৎপরতা শুরু করেন। ঐ সময়ে তিনি সিরিয়ার শাসকবৃন্দের সহিত যাঁহারা সালজূকীদের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল আপোস ফায়সালা করেন। ফলে পারওয়ানার পক্ষে পাহাড়ী এলাকায় তাঁহাদিগকে পরাভূত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যখন সালজূকীগণ এবং তাঁহাদের মুগল শাসক প্রধান ইরাকে মামলুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন তখন তুর্কী আরমান জাতি কূনিয়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিতে থাকে। মুহাম্মাদ বেগ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দাবীদার 'জামরী'-কে স্বীয় কার্য সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করেন। ইহার দাবী ছিল যে, তিনি ক্রিমিয়ায় [কারীম] পলায়নকারী সালজূকীর পুত্র ছিলেন এবং কূনিয়ার দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থার সুযোগে তিনি পিতার নামে উহা দখল করেন। জাম্‌রী সুলতান হিসাবে শহরটির দুর্গে প্রবেশ করেন (৭ জুন, ১২৭৫/১০ যু'ল-হিজ্জা, ৬৭৩, এই তারিখটি সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় এই শর্তে যে, আমরা ইব্‌ন বীবীর ৬৭৩ হিজরীর স্থলে ৬৭৪ হি., পড়িবে)।

এই তালিকার ভিত্তি আদহাম বে কর্তৃক প্রদত্ত বংশতালিকা (TOEM, সংখ্যা ১৪, পৃ. ৮৮০); তবে উহা হইতে সামান্য পৃথক। V. Hammer (১খ, পৃ. ৬৮২)-এর তালিকা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। রেখাটানা নাম কেবল শিকারীতে এবং অবশিষ্ট নামসমূহ শিলালিপি ও মুদ্রাসমূহে পাওয়া যায়, সংখ্যা ৪ উহাকে ইব্‌ন বীবী (Recueil, ৪খ, পৃ. ৩২২) 'বূন সূয' লিখেন, সংখ্যা ৭ ঃ ইব্‌ন বাত্তূতা ও শিকারীর নিকট বর্ণিত বাদরু'দ-দীনকে ইবরাহীম-ই বলা হইয়াছে, যাঁহার নাম ১ নম্বর এবং ১১ নম্বর-এর মাযারের শিলালিপিতে তাঁহার পিতা হিসাবে দৃষ্ট হয়। সংখ্যা ৮ ঃ ইনি খালীল

কারামানী উগলূর বংশ-তালিকা

১। সা'দু'দ-দীন

২। নূরা সূফী (নূরু'দ-দীন)

যায়ন আল-হাজ্জ — কন্যা ইভলিয়া (মৃ. ১২৮২ খৃ.) — ৩। কারামান কারীমু'দ-দীন (মৃ. ৬৬০/১২৬১) — ৪। আওংগ সূয (বুন সুয)

৫। (শামসু'দ-দীন) মুহাম্মাদ ১ম (মৃ. ৬৭৫/১২৭৬) — ৬। মাহমুদ বাদরু'দ-দীন (৮ম শতকের শুরুতে রাজত্ব করেন) — 'আলী — তানু (মৃ. ১২৭৮ খৃ.) — যাকারিয়্যা (মৃ. ১২৭৮ খৃ.) — গুনেরী (মৃ. ১৩০০ খৃ.)

য়াখশী বেগ (খান) — ৭। বাদরু'দ-দীন ইবরাহীম (মৃ. ১৩৪০ খৃ.-এর পর) — সুলায়মান — ৮। খালীল (=য়াখশী বেগ) — ৯। পাশা মূসা (মৃ. ১৩৪৫ খৃ.)

১০। ফাখরু'দ-দীন আহমাদ (মৃ. ৭৫০/১৩৪৯) — ১১। শামসু'দ-দীন (মৃ. ৭৫৩/১৩৫২) — ১২। কারামান — ১৩। দুররী খান্দ খাতূন (মৃ. ১৪১০ খৃ.)

১৪। 'আলা'উ'দ-দীন 'আলী (মৃ. ৭৯৩/১৩৯০) — ১৫। সুলায়মান সায়ফু'দ-দীন (মৃ. ৭৭২/১৩৭০) — ১৬। দা'উদ — ১৭। খিদর — ১৮। ইসহাক

১৯। মুহাম্মাদ বেগ ২য় (মৃ. ৮২৬-২৭/১৪২২-২৩) — ২০। 'আলী 'আলা'উ'দ-দীন — ২১। আউগুয — ২২। পীর আহমাদ — ২৩। কাসিম

২৪। ইবরাহীম তাজু'দ-দীন (মৃ. ৮৬৮/১৪৬) — ২৫। 'আলী — ২৬। মুসতাফা (মৃ. ৮২২/১৪১৯) — ২৭। ইসহাক — ২৮। খালীল — ২৯। কারামান (মৃ. ৮৭৬/১৪৭১)

৩০। ইসহাক (মৃ ১৪৬৫ খৃ.) — ৩১। পীর আহমাদ — ৩২। কাসিম — ৩৩। কারামান — ৩৪। নূরেসূফী — ৩৫। 'আলা'উ'দ-দীন (মৃ. ১৪৬৫-৬৬) — ৩৬। সুলায়মান

মুনাজ্জিম বাশীর য়াখশী বেগ হইবে। শিকারীর বর্ণনা মতে তিনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন; সংখ্যা ৯ ঃ আরমানাক-এর ৭৪০ হিজরীর শিলালিপি। সংখ্যা ১৩ ঃ আরমেনাক-এর ৮১৩ হিজরীর মাযার শিলালিপি; সংখ্যা ১৪ শিলালিপি অনুযায়ী আবু'ল-ফাত্হ 'আলা'উ'দ-দীন খালীল (দ্র. মূল পাঠ)। তাঁহাকে ও শিকারীর বর্ণিত 'আলা'উ'দ-দীন ইব্ন খালীল ও নাফীসার স্বামী 'আলীকে একই ব্যক্তি মনে করা হয়। সংখ্যা ১৫ ঃ ৭৭২ হিজরীর শিলালিপি অনুযায়ী লারিন্দার খাতূনিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে তিনি সমাধিস্থ হন। শিকারীর বর্ণনামতে তাঁহার ভ্রাতা (সংখ্যা ১৪) তাঁহাকে লারিন্দার ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইরতিনা উগলূর তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। সংখ্যা ১৯ এবং ২১ ঃ শিকারীর বর্ণনামতে জনৈক 'উছমানী শাহযাদীর পুত্র; সংখ্যা ২৪ ঃ রুকনু'দ-দীন-এর মুদ্রায়; শিকারীর বর্ণনামতে তিনি এক সালজূক শাহযাদীর পুত্র ছিলেন; সংখ্যা ২৬ ঃ মামলুকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত কায়সারিয়া যুদ্ধে নিহত হন (৮২২ হি.)। সংখ্যা ২৯ ঃ ইদিরনা-এর শিলালিপি ৮৭৬ হি.; সংখ্যা ৩০ ঃ ৮৮০ হিজরীর মুদ্রা সংখ্যা ৩২ ঃ ৮৮৮ হিজরীতে লিখিত লারিন্দা-এর মাযার

শিলালিপি জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের মতে [সং Giese, পৃ., ১১৭] তিনি মুহাররাম ৮৮৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। সংখ্যা ৩১-৩৬ ঃ 'উছমানী কাহিনীকারদের মতে সুলতান ২য় মুরাদ-এর ভগ্নির পুত্র, যেই ভগ্নির বিবাহ ইবরাহীমের সহিত হইয়াছিল। শিকারীর বর্ণনায় অন্য আরও কিছু নাম পাওয়া যায়। সংখ্যা ৩৭ ঃ লারিন্দার ৯২৪ হিজরীর মাযার শিলালিপি।

মুহাম্মাদ কারামান উগলূ ওয়াযীর হিসাবে তাঁহার পক্ষ হইতে বিজিত অঞ্চলসমূহের শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সুলতান রুকনু'দ-দীনের কন্যার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাঁহার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই যে, তিনিই প্রথম ফারসীর স্থলে তুর্কীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং মিশ্র হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি চালু করেন, যাহা 'উছমানী তুর্কীদের জন্যও এক নমুনায় পরিণত হয় (এই ব্যাপারে দ্র. Gesch. d. OSM. Reiches, v. Hamer, ১খ, 35)। প্রথম দিকে মুহাম্মাদ ও জাম্রী (যিনি সিয়াউশ নাম ধারণ করিয়াছিলেন) সালজূকী সৈন্যদের মুকাবিলায় সাফল্যের সহিত টিকিয়া থাকেন এবং নিজ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। অবশেষে মুগল শাসক আবাকা খান (দ্র.) নিজ পুত্র উগুযকে প্রেরণ করেন কূনিয়া আক্রমণ করিবার জন্য। এই সংবাদ শুনিয়াই মুহাম্মাদ ও জাম্রী কূ'নিয়া ত্যাগ করেন; সঙ্গে লইয়া যান সেই সমস্ত গানীমাতের মাল-সামগ্রী যাহা উক্ত শহর বিজয়ের ফলে তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল। মুগল সৈন্য প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় উক্ত শহর পর্যন্ত পৌঁছাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তথাকার অধিবাসিগণ কাদী মাহমূদ-আল-উরমূবীর নেতৃত্বাধীনে তাঁহাদিগকে শহরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। সুতরাং তুর্কীরা তাহাদের পাহাড়ী এলাকার দিকে ফিরিয়া যায় এবং পথিমধ্যে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ন্যায় ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। অল্প কিছুদিন পর মুহাম্মাদ ও তাঁহার দুই ভাই মুগল ও সালজূক সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন এবং জাম্রী উত্তর-পশ্চিম দিকে পলায়ন করেন। ইহার পর তাঁহার এবং সুলতানের সৈন্যদের মধ্যে সাকারিয়ার সন্নিকটে সংঘর্ষ হয়; ফলে তিনি বন্দী হন এবং পরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইব্ন বীবীর বর্ণনা অনুযায়ী এই সর্বশেষ যুদ্ধ মুহাররাম ৬৭৬/জুন ১২৭৭ তারিখে সংঘটিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদের মৃত্যু ৬৭৫/১২৭৬ সনে হয়; উহার সমর্থন মাযারসমূহের শিলালিপি হইতেও পাওয়া যায়; ঐগুলি কূনিয়া-তে হস্তগত হয় (TOEM.পৃ. ৭০২)। শিকারীর বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় (দ্র. von Hammer Gesch, d. Ilchane, পৃ. ২৯৭, যেখানে মুহাম্মাদের উপাধি শামসুদ-দীন উল্লিখিত আছে)। মুহাম্মাদ-এর শিলালিপি এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে স্বাধীন বাদশাহ ছিলেন না, বরং তিনি মিসরের সুলতান বায়বারসকে তাঁহার প্রধান শাসনকর্তারূপে মান্য করিতেন।

কয়েক বৎসর পর মাহমূদ বেগের আমলে কারামানী পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। মাহমূদ বেগের উপাধি (খায়রুল্লাহ্র বর্ণনা মতে) ছিল বাদরু'দ-দীন। শিকারীর বর্ণনানুসারে এবং ৮০২/১৩৯৯-১৪০০ সালে লিখিত তাঁহার মাযার ফলকে তিনি কারামানের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শিকারী ইহাও বলেন যে, মাহমূদ ইতিপূর্বে তাঁহার ভ্রাতার অনেক অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার এ বিষয়ে মুনাজ্জিম বাশীর বর্ণনা এই যে, তিনি মুহাম্মাদের পুত্র ছিলেন। ইহা ভুল মনে করিতে হইবে। মাহমূদের বিশেষ অবস্থান স্থল সম্ভবত আরমানাক ছিল। এইখানে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করাইয়াছিলেন (৭০২/১৩০২)। মুনাজ্জিম বাশীর মতে তিনি পুনরায় কূনিয়া দখল করেন এবং ৭০৮/১৩০৮ সালে সম্পূর্ণ স্বাধীন নৃপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ৭১৯/১৩১৯ সালে ইরানের মুগল সুলতানের সেনাপতি আমীর চূবান তাঁহাকে কূনিয়া হইতে বহিষ্কার করেন। তিনি পুনরায় আরমানাক উপস্থিত হন, কিন্তু ইব্ন ফাদলিল্লাহ্র বর্ণনামতে (মাসালিকু'ল-আবসার, in NE, ১৩খ, ৩৪২ প.) এই যুগের প্রথম দিকে কারামানীগণ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে নাই। তাহারা নিজদিগকে আমীর বলিত এবং অনেক সময় নিজদিগকে মিসরের সুলতানদের আন্দোলনের কারণে শাসনাধীন রাখিতেন। এতদ্ব্যতীত তাহারা এই প্রচেষ্টাও করিত যেন মুগলদের সহিত তাহাদের সুসম্পর্ক থাকে। সেই যুগে তাহারা আরমানদের ঘোর শত্রু ছিল এবং মিসরের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন তাহাদের মুকাবিলায় নিজদিগকে অধিক শক্তিশালী মনে করিত।

মাহমূদের পর যে সকল শাহযাদা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন, তাঁহাদের নাম ও সিংহাসন লাভ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের পরস্পরবিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এই বিষয়ে মাযারের শিলালিপি হইতে কোন বাস্তব সাহায্য পাওয়া যায় না। শিকারীর বর্ণনামতে মাহমূদের তিন পুত্র ছিল ঃ বাদরু'দ-দীন, খালীল মূসা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বাদরুদ-দীন রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর খালীল তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার পর বাদরু'দ-দীন পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করেন। বাদরু'দ-দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ফাখরু'দ-দীন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং কায়সারিয়া-এর বেগ আরতানার ষড়যন্ত্রের শিকার হইয়া নিহত হন। শামসুদ-দীনের দ্বিতীয় পুত্র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার নামও ছিল শামসু'দ-দীন। তিনি মাত্র ১৪ মাস রাজত্ব করিবার পর তাঁহার ভ্রাতা কারামান বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করেন। তাঁহার পর উপরোল্লেখিত মূসা ইব্ন মাহমূদ ক্ষমতা লাভ করেন এবং বাদরু'দ-দীনের তৃতীয় পুত্র কারামানের সংক্ষিপ্ত শাসন উপেক্ষা করিয়া চারি বৎসর পর তাঁহার স্থলে 'আলা'উ'দ-দীন ইব্ন খালীল শাসনভার লাভ করেন। শিকারীর মতে 'আলা'উ'দ-দীন ছিলেন কারামানী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম; তিনি তাঁহাকে আবু'ল-ফাত্হ নাম দেন। ইব্ন বাত্তূতার বর্ণনা শিকারীর বর্ণনার অনুরূপ (২খ,

পৃ. ১৮২, ২৮৪)। প্রথমোল্লেখিত ব্যক্তি ৭৩৩/১৩৩২ সালে লারিন্দাতে সুলতান বাদরু'দ-দীনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; ইঁহার সাম্রাজ্যে কূনিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তিনি অবগত হন যে, তাঁহার ভ্রাতা মূসা তাঁহার পূর্বে লারিন্দাতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং উক্ত শহর মামলূকদের নিকট হস্তান্তর করিয়াছিলেন। বাদরু'দ-দীন তাঁহাদের নিকট হইতে পুনরায় উহা উদ্ধার করেন। ইব্ন ফাদলিল্লাহ (মাসালিকু'ল-আবসার in NE, ১৩খ, ৩৪৭) এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেন যে, মিসরের সহিত মূসার প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। এই কারণে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দুই ভাই একই সময়ে কারামানের বিভিন্ন অংশে শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন। লারিন্দার আমীর মূসা মাদরাসাতেই দুইটি মাযারফলক আছে সেইগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাখরু'দ-দীন আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাহমূদ ৭৫০/১৩৪৯-১৩৫০ সনে ও শামসু'দ-দীন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাহমূদ ৭৫৩/১৩৫২ সনে মৃত্যুবরণ করেন। নিঃসন্দেহে এই দুই জনই বাদরু'দ-দীনের পুত্র ছিলেন (এবং এই ক্ষেত্রে ইবরাহীম সম্ভবত তাঁহারই উপাধি ছিল) শিকারী যাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

'আলা'উ'দ-দীনের সঠিক পরিচয় লাভ করা আরও বেশী কঠিন। ৭৭২/১৩৭০-৭১ সনের একটি ফলক লারিন্দার একটি মাযারের দরজায় সংযুক্ত আছে। সেখানে জালালু'দ-দীন রূমীর মাতা কবরস্থ আছেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ঐ ফলক হইতে জানা যায় যে, উক্ত মাযারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান আবু'ল-ফাত্হ 'আলা'উ'দ-দীন খালীল ইব্ন মাহমূদ ইব্ন কারামান এবং ইহাও জানা যায় যে, সায়ফু'দ-দীন সুলায়মান ইব্ন খালীল (যিনি শিকারীর বর্ণনামতে 'আলা'উ'দ-দীনের ভ্রাতা ছিলেন) তথায় কবরস্থ আছেন। মুনাজ্জিম বাশীর (৩খ, পৃ. ২৬) বর্ণনায়ও এক 'আলা'উ'দ-দীনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন য়াখ্শা বেগ ইব্ন মাহমূদের পুত্র। এই য়াখ্শা বেগের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিন্তু কোনও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, ইনি সেই ব্যক্তি শিকারী যাঁহার নাম ইব্রাহীম লিখিয়াছেন (খালীল আদহাম বে, TOEM-এ একই ধারণা প্রকাশ করা হইয়াছে ; য়াখ্শা সম্ভবত এইখানে কোনও নামই নহে ; দ্র. ইব্ন বাত্তূতা, ২খ, ৩১৬)। শিকারীর বর্ণনা অনুয়ায়ী উক্ত 'আলা'উ'দ-দীনই 'উছমানী সুলতান ২য় মুরাদ-এর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে মুনাজ্জিম বাশীর মত এই যে, 'আলা'উ'দ-দীনের পুত্র 'আলী বেগ এই বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, সুলতান ২য় মুরাদ-এর কন্যা নাফীসা ও কারামান উগলূ 'আলী বেগের বিবাহ চুক্তি ফারীদুন-এর সংকলিত মুনশাআত (১খ, ১০৫ প.) গ্রন্থে এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে। মুদ্রিত গ্রন্থটির ১০৭ পৃষ্ঠায় উহার সন ৭৮৮/১৩৮৬ উল্লেখ আছে। কিন্তু খালীল আদহাম বলেন যে, সম্ভবত ৭৮৩/১৩৮১-১৩৮২ সন অধিকতর সঠিক হইবে। লারিন্দার মহিলা মাদরাসায় এই তুর্কী শাহ্যাদীর একটি ফলক আছে যাহা ৭৮৩ হিজরীতে লেখা হইয়াছিল। উহাতে সেই যুগের শাসকের নাম আমীর 'আলা'উ'দ-দীন খালীল ইব্ন মাহমূদ লিখিত আছে। ইহা সেই নাম যাহা ৭৭২ হিজরীর উল্লিখিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে, যদিও উহাতে সুলতানের উপাধি অনুপস্থিতি। এখন প্রশ্ন এই যে, ফলকসমূহে উল্লিখিত এই 'আলা'উ'দ-দীন খালীল কি তিনিই যাঁহার নাম শিকারী 'আলা'উ'দীন ইব্ন খালীল লিখিয়াছেন এবং ইনি কি সেই আলী যিনি শাহযাদী নাফীসার স্বামী ছিলেন ? এই সাদৃশ্যের সমর্থন 'আলা'উ'দ-দীনের দৌহিত্র ইবরাহীমের একটি ওয়াক্ফনামা হইতে পাওয়া যায়, যাহা ৮৫৯/১৪৫৪-১৪৫৫ সনে লেখা হইয়াছিল (খালীল আদহাম উহা TOEM সংখ্যা ১৩, পৃ. ৮৩১-তে উল্লেখ করিয়াছেন)। উহাতে উল্লিখিত ইবরাহীমকে ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা'উ'দ-দীন ইব্ন খালীল ইব্ন মাহমূদ ইব্ন কারামান [অথবা কারামান, দ্র. কামূসু'ল-আ'লাম] লেখা হইয়াছে (এই বিষয়ে খালীল আদহাম বে ছাড়া দ্র. Van Berchem, Inschrzten, etc., পৃ. ১১৮-১২৫)। সম্ভবত এই সকল যুগে বিভিন্ন কারামাতী শাসক বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন (যেমন লারিন্দা, কূনিয়া, আরমানাক, আক-শাহর, আক-সারাঈ। ইব্ন বাত্তূতা (২খ, পৃ. ২৫৮) জনৈক য়ূসুফ ইব্ন কারামানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে 'আলাইয়ার শাসক বলিয়াছেন। সেই যুগে তাঁহার রাজ্য সীমানায় যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে। যদিও স্থায়ী রাজধানী সম্ভবত লারিন্দাই ছিল, কিন্তু কূনিয়ার উপর তাঁহার শাসন সর্বদা কায়েম ছিল না। য়াখ্শা বেগ (মুনাজ্জিম বাশী) কূনিয়া জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কায়সারিয়া-র ইর্তিনা উগলূর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই ইরতিনা উগলূ ছিলেন মুগলদের অধীনস্ত এবং শিকারীর বর্ণনা অনুযায়ী একবার কূনিয়া এবং লারিন্দা দখলও করিয়াছিলেন। এইভাবে সিরিয়ার মামলূক, আরমানী, সাইপ্রাসের ফিরিঙ্গী এবং এশিয়া মাইনরের অন্যান্য তুর্কী শাসকের সহিতও তাঁহার যুদ্ধ হইতে থাকে। ইঁহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন এলাকা দখল করিয়া নিজ রাজ্যের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত করেন, এমন কি তিনি বুরসা [বুওয়ারসা] পর্যন্ত অগ্রসর হন। অবশেষে ৭৮৮/১৩৮৬ সনে সুলতান ১ম মুরাদ-এর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় (কূনিয়ার যুদ্ধ) ; অতঃপর ৭৯৩/১৩৯০ সনে গ্রীষ্মকালে ১ম অথবা ২য় বায়াযীদ-এর সহিত তাঁহার আকচাই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে 'আলা'উ'দ-দীন (বা 'আলী) বন্দী হইয়া তায়মূরতাশ পাশার হাতে নিহত হন। তাঁহার রাজ্য দখল করা হয় এবং তাঁহার দুই পুত্রকে বন্দী করিয়া বুরসাতে আনয়ন করা হয় (অধিকাংশ 'উছমানী ঐতিহাসিকের বর্ণনায় উক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় শিকারীর বর্ণনা উহা হইতে ভিন্নতর)। তায়মূর যখন 'উছমানীদের পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করেন তখন কারামান উগলূ আর একবার ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ পান। এইখান হইতে তাঁহার প্রচেষ্টার তৃতীয় পর্যায় শুরুহয়; ইহার সমাপ্তির পর তিনি চিরদিনের জন্য রাজ্যহারা হইয়া পড়েন। তায়মূরের দৌহিত্র মীরাযা মুহাম্মাদ বুরসার জেল হইতে 'আলা'উ'দ-দীন পুত্র মুহাম্মাদকে মুক্ত করিয়া দেন (এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি স্বয়ং তায়মূরের নিকট পালাইয়া আসিয়াছিলেন) এবং তায়মূর তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের এক অংশ ফিরাইয়া দেন (সম্ভবত ৮০৫/১৪০৩ সনে)। তাঁহার প্রচলনকৃত কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলির উপর তায়মূরের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। কথিত আছে যে, ৮১৬/১৪১৩-১৪১৪ সনে পুনরায় কূনিয়া তাঁহার দখলে আসে (মুনাজ্জিম বাশী), তিনি 'উছমানী শাসনের দাবীদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং কয়েকবার আযমীর 'উগলূ জুনায়দের সাহায্য করেন। 'উছমানী সুলতান ১ম মুহাম্মাদ-এর সহিত তাঁহার শেষ বিজয়ের পূর্বে তিনি সন্ধি চুক্তি করিয়াছিলেন। বলা হয় যে, ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার অর্ধেক রাজ্য সুলতানকে প্রদান করিয়াছিলেন (তাজু'ত-তাওয়ারীখ, ইহা ছাড়া Chalcocondylas)। তবে উল্লেখ্য যে, এই বৎসরই মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা'উ'দ-দীন নিজ পিতার মৃত্যু প্রতিশোধের অজুহাতে বুরুসা আক্রমণ করিয়া বসেন। চৌত্রিশ দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধের পর শহর ধ্বংস করিয়া

তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় গারমিয়ান উগলূর রাজ্য আড়াই বৎসর কাল তাঁহার দখলে থাকে (কূতাহিয়ার ফলকসমূহ; দ্র. TOEM সংখ্যা ২, পৃ. ১১০ প.)। ৮১৭/১৪১৪ এবং ৮১৮/১৪১৫ সনে তিনি 'উছমানী তুর্কীদের উপর নূতন করিয়া হামলা করেন। এক সুযোগে মুহাম্মাদকে বায়াযীদ পাশা গ্রেফতার করিয়া ফেলেন; তবে পরবর্তীকালে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

তুর্কী ইতিবৃত্তে ৮১৮/১৪১৫ হইতে ৮২৪/১৪২১ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তথাপি মিসরীয় ঐতিহাসিকগণের (আল'-আয়নী, আল-মাকরীযী, আবু'ল-মাহাসিন) মাধ্যমে এই শূন্যতা পূর্ণ হইয়া যায়। মুহাম্মাদ তুর্কীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে মিসরের সুলতানের নিকট সাহায্য কামনা করেন এবং তাঁহাকে নিজের কর্তাস্থানীয় শাসক বলিয়া স্বীকারও করিয়া নেন (ইহার প্রমাণ তাঁহার মুদ্রাসমূহ হইতেও পাওয়া যায়)। ইহার পর বিরোধিতার অগ্নি জ্বলিয়া ওঠে যাহার শিকার রামাদান উগলূও হন। এই সময়েই মুহাম্মাদের ভ্রাতা 'আলী মিসরে পালাইয়া যান। ফলে ৮২২/১৪১৯ সনে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে মিসর সৈন্য প্রেরণ করিয়া কায়সারিয়া ও কূনিয়া দখল করেন এবং 'আলীকে কূনিয়ায় তাঁহার ভ্রাতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মাদ প্রথমে পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নেন, তবে পরবর্তীকালে কায়সারিয়ার অদূরে এক খণ্ডযুদ্ধ কালে বন্দী হন এবং তাঁহাকে মিসরে প্রেরণ করা হয়।

৮২৪/১৪১২ সনে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তিনি পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার 'উছমানী দুর্গ আনতালিয়ার অবরোধ কালীন (বিস্তারিত বিবরণ ইতিবৃত্তকারগণ প্রদান করিয়াছেন) তিনি মৃত্যুবরণ করেন সম্ভবত ৮২৬ অথবা ৮২৭ হি.। তাঁহার পুত্র 'আলী 'উছমানীদের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহারা তাঁহাকে সোফিয়া [বুলগেরিয়াতে] সানজাক উপহার দেন। তবে মুহাম্মাদের দ্বিতীয় পুত্র এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ইবরাহীম নিজ পিতার মৃতদেহ লইয়া পৈতৃক পাহাড়ী এলাকার দিকে ফিরিয়া যান। ২য় মুহাম্মাদ-এর অনেক ফলক কূনিয়াতে বিদ্যমান আছে। অনুরূপ তাঁহার ভ্রাতা 'আলীরও ফলকসমূহ নীক্‌দা-তে দৃষ্ট হয়, যেখানে তিনি মিসরীয় শাসনের পূর্বে এবং পরে স্বীয় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। স্বীয় ভ্রাতার (মুহাম্মাদ-২) মৃত্যুর পর তিনি আর একবার স্বায়ত্তশাসনের প্রচেষ্টা করেন, যেহেতু সুলতান ৫ম মুরাদ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইবরাহীমকে সাহায্য করিতেছিলেন, এই কারণে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই সময় কারামান উগলূ যথেষ্ট শক্তির অধিকারী ছিলেন। সানূদূ (Sanudo) তাঁহার সৈন্যসংখ্যা যুদ্ধবস্থায় ত্রিশ হাজার এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ষাট হাজার বলিয়া অনুমান করেন (Murat, Inschr. Ital., ২২খ, কলাম ৯৬২)।

তাজু'দ-দীন ইবরাহীম বেগ ইব্‌ন মুহাম্মাদ প্রায় ৮২৭/১৪২৪ সন হইতে ৮৬৮/১৪৬৩ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন (৮২৭ হি. এবং তৎপরবর্তী মুদ্রা পাওয়া যায়)। তিনি এই বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। ঐ সময়ে গারমিয়ান উগলূর পতনের পর 'উছমানী সুলতানাদের ইনিই একমাত্র ভয়ংকর শত্রু অবশিষ্ট ছিলেন। ইবরাহীমের বিবাহ সুলতান ২য় মুরাদ-এর ভগ্নীর সহিত হইয়াছিল এবং 'উছমানী তুর্কীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এমন ছিল যে, কখনও সন্ধি আবার কখনও যুদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে তিনি কেবল সুলতানের ভগ্নীপতি হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পান। তিনি বাদশাহ Sigismund-এর সহিতও এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন 'উছমানী ঐতিহাসিকগণ খুবই অপ্রীতিকরভাবে তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন যে, তিনি কাফিরদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বার বার লংঘন করেন (লেখক অজ্ঞাত, সং. Gises, পৃ. ৬৩, ৬৪, ৬৮)। সুলতান ২য় মুরাদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কারামানদিগকে সমূলে উৎখাত করিবেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কোমান গোত্র যু'ল-কাদ্‌র-এর সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করেন। যু'ল-কাদরগণ ৮৪০/১৪৩৪-১৪৩৭ সনের কাছাকাছি সময়ে কারামানদের নিকট হইতে কায়সারিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা অধিকার করেন এবং ইবরাহীমের অন্যান্য অধিকারভুক্ত স্থান ছাড়াও আকশাহর ও বাকশাহারীও দ্বিতীয় মুরাদ-এর দখলে চলিয়া যায়। তিনি দ্বিতীয় মুরাদ-এর মৃত্যুর (৮৫৫/১৪৫১) পর বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। কথিত আছে যে, সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ এই যুদ্ধের সময় খৃষ্টানদের বন্ধু ও রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন (Ducas, পৃ. ২৩৩) দক্ষিণ দিকে ইবরাহীম আরও অধিক সফলতা লাভ করেন। তিনি সিলিসিয়াতে সিপ্রিয়টদের (Cypriot) নিকট হইতে Gorigos দুর্গ অধিকার করেন (Rec. Hist. des Crois. Doc. Arm., ১খ, পৃ. ৬৩৮)। মৃত্যুর পূর্বে ইবরাহীম নিজ পুত্র ইসহাকের পক্ষে সিংহাসন পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু ইসহাক দাসীর গর্ভজাত ছিলেন; এই কারণে তাঁহার অপর ছয় পুত্র ইবরাহীম ও ইসহাককে কূনিয়াতে অবরোধ করে; ইঁহাদের মাতা ছিলেন সুলতান মুরাদের ভগ্নি। অবশেষে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়কে পলায়ন করিতে হয়; ইবরাহীম কাওয়ালা দুর্গে (গুওয়ালা) মৃত্যুবরণ করেন (৮৬৮/১৪৬৩)।

পুত্র পীর আহমাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন; ইনি দ্বিতীয় মুহাম্মাদ-এর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইসহাক তখন আক কয়ুনলু-এর শাসক উযুন হাসানের নিকট পলায়ন করেন। সিংহাসন দখলের এই দ্বন্দ্বের ফলে দেশে যে নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করে, উহা এই বংশের পতন ডাকিয়া আনে। পীর আহ্‌মাদ তুর্কীদের সাহায্যে নিজ ভ্রাতাকে আরমানাক-এর যুদ্ধে (৮৬৯/১৪৬৫) পরাজিত করেন এবং তাঁহার পর তিনি নিজেকে সুলতান মুহাম্মাদ ২-এর অধীন বলিয়া গণ্য করেন (কায়সারিয়ায় প্রাপ্ত ফলক ৮৭০/১৪৬৬)। কিন্তু অল্প দিনে মধ্যেই তাঁহার এবং প্রধান শাসকের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়া যায়। কেননা তিনি ভেনিসবাসীর সহিত কোনও এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৮৭২/১৪৬৭ সনে তুর্কীরা স্থায়ীভাবে কূনিয়া " দখল করিয়া লয় এবং 'উছমানী যুবরাজ মুসতাফা তথাকার শাসক নিযুক্ত হন। কারামানদের কিছু সংখ্যক লোক ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করা হয়। পীর আহমাদ লারিন্দা ও নিকদাতে পশ্চাদপসরণ করেন এবং এইখানে তিনি একের পর এক 'উছমানী তুর্কী ও নিজ ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। তিনি কিছুদিনের জন্য নিজ ভ্রাতা কাসিম-এর গঠিত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন (উভয়ের ফলক, ৮৭৪/১৪৬৯-১৪৭০, নিকদা-তে), কিন্তু তিনি গেদিক আহমাদ পাশার মুকাবিলা করিতে সক্ষম হন নাই। এইভাবে লারিন্দা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। যখন আরমানাক ও মেনান 'উছমানীদের দখলে আসিয়া যায় এবং সেখানকার পীর আহমাদে বংশ ও সম্পদও তাহাদের হস্তগত হয়, তখন পীর আহ্মাদ এক পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিচে লাফাইয়া পড়েন। ইহাতে তাহার মৃত্যু না হওয়ায় তিনি সেখান হইতে তারসূস চলিয়া যান, যেখানে তিনি (তাজু'ত-তাওয়ারীখ অনুযায়ী)

৮৭৯/১৪৭৪ সনের কাছাকাছি ইনতিকাল করেন। ইসহাক সালফাকাতে ফিরিয়া আসেন, যেখানে তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তাঁহার স্ত্রী সরকার প্রধান থাকেন।

তাঁহার পর কাসিম ইব্‌ন ইবরাহীম মৃত্যু পর্যন্ত (অজ্ঞাত লেখক, সং Gises, পৃ. ১১৭, মুহাররাম ৮৮৭/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৪৮২; লারিন্দায় তাঁহার মাযার ফলকে ৮৮৮ হি. লিখিত আছে) নিজ অবস্থান ঠিক রাখেন। তিনি উযুন হাসানের নিকট সাহায্য কামনা করেন, তথাপি তিনি লারিন্দা দখল করিতে সক্ষম হন নাই। অতঃপর তিনি ৮৮৭/১৪৮২ সনে রাজ্যের দাবীদার [সুলতান বায়াযীদ ২-এর ভ্রাতা] সুলতান জাম [দ্র.]-এর সহিত মিলিত হন, যিনি কোনও এককালে নিজ ভ্রাতা মুসতাফার পরে কূনিয়ার শাসক ছিলেন এবং কয়েকবার কারামান সৈন্যরা তাঁহার সাহায্যও করিয়াছিলেন। ইহাতে দ্বিতীয় বায়াযীদ কাসিমের ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেন, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে কারামান উগলূর শাসনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা পূর্ব হইতেই 'উছমানী তুর্কীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কাসিমের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনা অধিনায়কগণ তূরগূত [তূরগূদ]-উগলূ মুহাম্মাদকে, যিনি কারামানের উচ্চ শ্রেণীর সহিত সুসম্পর্ক রাখিতেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁহাকেও তুর্কীদের সহিত মুকাবিলা করিতে হয় এবং অবশেষে ৮৯২/১৪৮৭ সনে হালাব-এর দিকে পলায়ন করেন।

কারামানগণ তাহাদের উত্থান ও ক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহাদের অবস্থানস্থল ও ভৌগোলিক অবস্থার দরুন। তাহাদের পার্বত্য এলাকা তাহাদের জন্য এমন আশ্রয়স্থল বানাইয়া দিয়াছিল যাহা দখল করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাহারা এই স্থান হইতে কূনিয়া ও সিলিসিয়ার সমতল ভূমিতে সফলতার সহিত বার বার অভিযান করিতে পারিত। সিলিসিয়ার বিভিন্ন পার্বত্য ঘাঁটি এবং তূরূসের উপর দিয়া যে সকল রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেগুলি দখলে থাকিবার দরুন শুল্ক বাবদ প্রচুর আমদানী হইত। এই কর তাহারা জেনেভা ও সাইপ্রাসের ব্যবসায়ীদের উপর ধার্য করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা উক্ত রাস্তাসমূহ দিয়া এশিয়া মাইনরে লাভজনক ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। অনুরূপভাবে তাঁহাদের দখলকৃত সমুদ্র তীরবর্তী শহর হইতে আদায়কৃত শুল্ক হইতেও (Anemur, Manavgat, ceandelor, সালফাকা, লামূস) নিঃসন্দেহে তাহাদের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ধন-সম্পদ তাহাদের রাজত্বকে আরও শক্তিশালী করিয়া দিয়াছিল। লারিন্দা, কূনিয়া ও নিকদা-তে তাঁহাদের নির্মিত যে সমস্ত প্রাসাদ বিদ্যমান আছে উহা তাঁহাদের ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য বহন করে—বিশেষ করিয়া খাতূনিয়া মাদরাসার ভগ্নাংবশেষ যাহা লারিন্দা অথবা কারামানে দৃষ্টিগোচর হয়। কারামানদের স্থাপত্য কৌশল সালজূকদের স্থাপত্য শিল্পের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা 'উছমানী তুর্কীদের নির্মাণ কৌশল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। কেননা ইহা ছিল বায়যান্টীয় স্থাপত্য শিল্পীর নকল (Woermann, Gesch. d. Kunst. লাইপযিগ-ভিয়েনা ১৯১৫ খৃ., ২খ. পৃ. ৪৪৫)। সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহাদের এই অবদান খুবই গুরুত্বের দাবীদার। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা ফারসীর স্থলে তুর্কী ভাষার প্রচলন ও প্রসার ঘটান; এতদসত্ত্বেও কারামান ও 'উছমানীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা বাহ্যিকভাবে প্রকট ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কারামান উগলূদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ রচনা খালীলা আদহাম বে-এর যাহা কারামান উগলূর ফলকসমূহ সম্পর্কে লিখিত ঃ حقنده (قره مان اغللری وثائق مقوقه كذا كحققه؛), সংখ্যা ১১ হইতে ১৪-তে (ডিসেম্বর ১৯১১-জুন ১৯১২ খৃ.) Revue Historique Publice par l'Institut. d' Histoire Ottomane, (তা'রীখ-ই 'উছমানী আনজুমানী মাজমূ'আসী, TOEM); ইনিই একমাত্র লেখক যিনি শিকারী হইতে ও প্রাচীন ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। (২) ইব্‌ন বীবী (Houtsma, Recueil de Textes relatifs a l'Histoire des Seldjoucides, খণ্ড ৪, লাইডেন ১৯০২ খৃ.; (৩) 'আশিক' পাশা যাদে, কনস্টান্টিনোপল ১৩২২ হি.; (৪) F. Giese, Die Alt-Osmanischen Chroniken, বারসালূ ১৯২২ খৃ.; (৫) সা'দু'দ-দীন, তাজু'ত-তাওয়ারীখ, কনস্টান্টিনোপল ১২৯৭ হি.; (৬) মুনাজ্জিম বাশী, সাহা'ইফু'ল-আখ্‌বার, কনস্টান্টিনোপল ১২৮৫ হি.; (৭) হাজ্জী খালীফা", তাকবীমু'ত-তাওয়ারীখ; (৮) আল-জান্নাবী, তা'রীখ; (৯) মিসরীয় ঐতিহাসিকগণ যাঁহাদের উল্লেখ প্রবন্ধে করা হইয়াছে; আরও দ্র. (১০) ইব্‌ন বাত্তূতা", তুহফাতু'ন-নুজ্জার, সং. Defremery ও Sanguinetti, প্যারিস ১৮৫৩-১৮৫৯ খৃ., ২খ, (১১) ফারীদুন বে, মুনশা'আতু সালাতীন, ১খ, কনস্টান্টিনোপল ১২৭৪ হি.; (১২) Chalcocondylas, সং Becker, বন ১৮৪৩ খৃ.; (১৩) Ducas, সং Becker, বন ১৮৩৪ খৃ.। নিম্নোক্ত সূত্রের উল্লেখও প্রয়োজন; (১৪) আহমাদ তাওহীদ, মাসকূকাত-ই কাদীমা-ই ইসলামিয়া; (১৫) ইসমা'ঈল গালিব, মাসকূকাত-ই ইসলামিয়্যা তাকবীমী, ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি.; (১৬) Cl. Huart, Epigraphie de l' Asie Mineure, in Revue Semtique, ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৩৪৬ প., ৩৫৫ প., ৩৭১ প.; (১৭) আরবী ফলকসমূহ, সং Maxvan Berchem, in Insichriften aus Syrien. Mesopotamien und Kleinasien, বিন্যাসে Maxvon Oppenheim, লাইপযিগ ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১১৯-২৫; (১৮) J. H. Loytved, Inschriften der Seldjukis chen Bauten, Konia, বার্লিন ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৭৯-৮৪; (১৯) J. v. Hammer Geschichte des Osmanichen Reiches Pest 1827 A. D. Vol I & II; (২০) Recueil des Historiens des Ileroisades, Documents Armeniens, প্যারিস ১৮৬৯ খৃ., ১খ.; (২১) J. von Hammer-Purgstall, Geschichte der chane, Darmstadt 1842 A. D. I খ, 297; (২২) H. A. Reed, Karaman, in E. I.^{2}., Vol. IV, pp. 619-25।

J. H. Kramers (দা. মা. ই)/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

কারামানলী (قرامانلى) ঃ একটি তুর্কী বংশীয় পরিবার যাহার একাধিক সদস্য ১১২৩/১৭১১ হইতে ১২৫১/১৮৩৫ সন পর্যন্ত ত্রিপোলিতানিয়া শাসন করেন এবং নিজদিগকে একটি প্রকৃত রাজবংশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কারামানলী আহ্‌মাদ বে, যাঁহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একমাত্র এতটুকু জানা যায় যে, তিনি অথবা তাঁহার পিতা অথবা কোনও পূর্বপুরুষ জানাতোলিয়ার সম্ভবত কারামান শহর কিংবা এলাকা হইতে ত্রিপোলীর ওজাক-এ

সৈনিকরূপে কাজ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কোনও কোনও লেখক মনে করেন যে, তাঁহার কোনও পূর্বপুরুষ সম্ভবত কোনও জলদস্যু তুরগূত (Dragut)-এর সহিত ত্রিপোলিতানিয়া আসিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইব্ন গালবূন, যিনি আহমাদ বে'র সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহাকে আহমাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুস্তাফা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১১২২/১৭১০ সন ও তৎপূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে 'উছমানী সাম্রাজ্যের ত্রিপোলিতানিয়া প্রদেশটি দেহরক্ষীবাহিনী (Janissaries) কুলুগলী ও আরব প্রধানগণের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে গোলযোগপূর্ণ অবস্থান নিমজ্জিত ছিল। এই সময় মান্‌শিয়া ও সাহিল এলাকার তৎকালীন 'আমিল বা গভর্নর আহ্‌মাদ কারামান্‌লী ১১২২/১৭১০ সনের শেষ দিকে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করত স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেন। আহমাদ সেখানে অরাজকতা নির্মূলের সংকল্প করিয়া এবং কুলুগলীদের বিরুদ্ধে আরবদের প্রতি সমর্থন জানাইয়া ত্রিপোলী অধিকার করেন, বে (Bey সেনাবাহিনী প্রধান) উপাধি গ্রহণ করেন এবং প্রদেশটির উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন (১৩ জুমাদা'ছ-ছানী, ১১২৩/২৯ জুলাই, ১৭১১)। অল্প কিছুকাল পরেই তিনি সুলতান প্রেরিত গভর্নর খালীল পাশা ও বহুসংখ্যক তুর্কী অফিসার ও কর্মকর্তাদের প্রাণ নাশ করিতে সক্ষম হন এবং একই সময় নিজ কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সুলতান ৩য় আহমাদের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। অবশেষে সুলতান তাঁহাকে বেলার্‌বে (গভর্নর) উপাধিতে ভূষিত এবং প্রদেশ প্রধানরূপে স্বীকৃতি দান করেন। আরও পরে ১১৩৪/১৭২২ সনে সুলতান তাঁহাকে নিজ প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া পাশা উপাধি প্রদান করেন।

জানিসারীদের প্রতি আস্থার অভাবে আহ্‌মাদ বে একটি স্বদেশী আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেন এবং জলদস্যুদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। ১১২৫/১৭১৩ হইতে ১১৩৫/১৭২৩ সন পর্যন্ত তাঁহাকে ত্রিপোলিতানিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব, সাইরেনাইকা (cyrenaica) ও ফায্‌যানে কয়েকটি স্থানীয় বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে হয়। এই সকল বিদ্রোহের পর তিনি সমগ্র প্রদেশটিকে তাঁহার সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করেন এবং প্রয়োজনে সন্ত্রাসের রাজত্বও কায়েম করেন। অনেক সম্মানী ও খ্যাতিমান ব্যক্তিসহ তিনি বহু সংখ্যক লোক হত্যা করেন। এমনকি এক মানহানিকর লেখার অভিযোগে ঐতিহাসিক ইব্ন গালবূনকে পর্যন্ত তাঁহার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, যিনি তাঁহার গৌরবেও পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। জলদস্যুতার প্রশ্রয় দিলেও আহমাদ কারামানলী বৃহৎ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরোধিতা এড়াইয়া চলিয়াছেন, বিশেষত তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত শান্তি ও বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন কিংবা নবায়ন করেন। তিনি ত্রিপোলীকে পুনরায় সুরক্ষিত করেন এবং শহরে তাঁহার নামে মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। ২৬ বা ২৭ রামাদান, ১১৫৭/৩ বা ৪ নভেম্বর, ১৭৪৫ সালে রাত্রে তিনি ইনতিকাল (সম্ভবত আত্মহত্যা) করেন। তাঁহার বয়স তখন আনুমানিক ৬০ বৎসর ছিল।

তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ (১১৫৮-৬৭/১৭৪৫-৫৪) গভর্নর ঘোষিত হন এবং বিনা বাধায় সুলতানের স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি দেশে শান্তি বজায় রাখেন এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত চুক্তি নবায়ন করেন। অবশ্য তখন জলদস্যুতার যথেষ্ট প্রসার ঘটে, যাহার ফলে ভেনিস ও নেপল্‌সের সহিত কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। শাওওয়াল ১১৬৭/জুলাই ১৭৫৪ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপর তাঁহার পুত্র 'আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (১১৬৭-১২০৭/১৭৫৪-৯৩) এবং সুলতানের সম্মতি লাভ করেন। ১১৭১/১৭৫৮ সন পর্যন্ত তাঁহাকে একাধিক বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে হয়। তন্মধ্যে মান্‌শিয়া ও সাহিলের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সকল বিদ্রোহ রক্তপাতের মাধ্যমে দমন করা হয়। ইহার পর বেশ দীর্ঘ কাল ১২০৪/১৭৯০ সন পর্যন্ত, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকে।

আহ্‌মাদ কারামানলীর শাসনামলের মধ্যবর্তী হইতে ত্রিপোলিতানিয়ার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় এবং অচিরেই উহা ভূমধ্যসাগরের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দরে পরিণত হয়। কিন্তু ১১৮১/১৭৬৭ সালের ভয়াবহ মহামারী এবং তারপর আবার ১১৯৮-১২০০/১৭৮৪-৬ সালের প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের ত্রিপোলী ও উহার বাণিজ্যে কিছু ভাটা পড়ে। এই সময়ে কারামানলীগণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রাখে (বে, জানিস্‌সারিদের আগা, কাহ্‌য়া, রা'ঈসু'ল-বাহ্‌র, খায্‌নাদার, শায়খু'ল-বালাদ, দীওয়ান) এবং প্রদেশগুলিতেও যেখানে কা'ইদ তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিত, তাহাদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। সামরিক বাহিনীতে ছিল প্রায় ৪০০ জানিসারী, ২০০ হইতে ৩০০ দলত্যাগী, ৫০০ আলবেনিয়ান ও ৬০০ আরব। নৌবাহিনী আল-বেনিয়ান ও আরবদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

'আলী পাশা বার্ধক্যে উপনীত হইলে অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৭৯০ খৃ. তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান বে আততায়ীর হাতে নিহত হন, তখন দ্বিতীয় পুত্র আহ্‌মাদ—বে (Bey) নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার অপর ভ্রাতা আরবদের সমর্থনপুষ্ট য়ূসুফের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপোলীর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও কিছু সংখ্যক সামরিক নেতা হস্তক্ষেপ করেন এবং সুলতানের নিকট অন্য কাহাকেও গভর্নর নিয়োগের জন্য আবেদন জানান। ইহার জওয়াবে য়ূসুফ, নুওয়ায়রীদিগের সমর্থনক্রমে নিজেকে গভর্নররূপে ঘোষণা করেন (১২০৭/১৭৯২-৩) এবং তারপর ত্রিপোলী অবরোধ করেন (জুন ১৭৯৩)। অল্পকাল পরে সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে আলজিয়ার্স হইতে বহিষ্কৃত এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আলী বুলগূরের আগমন ঘটে এবং তিনি নিজেকে সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর বলিয়া দাবী করেন। ত্রিপোলীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কর্ম-কর্তাদের জামা'আত হইতে তিনি উপকৃত হন এবং শহরে প্রবেশ করেন (জুলাই ১৭৯৩)। এই সময় য়ূসুফ ও 'আলী পাশা তিউনিসিয়া চলিয়া যান। 'আলী বুলগূর যখন জারবা দ্বীপ দখল করিলেন। তিউনিস-এর বে হামূদার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে কারামানলীর কার্যক্রমকে সমর্থন জানায়। অবশেষে পরাজিত 'আলী বুলগূর মিসরে পলায়ন করে (ফেব্রুয়ারী ১৭৯৫)। আর তখন তিউনিসবাসী 'আলী পাশা তাঁহার পুত্র আহ্‌মাদের অনুকূলে গভর্নরের পদত্যাগ করেন। শা'বান ১২১০/নভেম্বর ১৭৯৬ সালে আহ্‌মাদের তাজূরা যাত্রার সুযোগে য়ূসুফ ত্রিপোলী প্রবেশ করেন এবং সেখানে নিজেকে গভর্নর বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হয়। আহ্‌মাদ নিজের দাবীতে অটল না থাকিয়া মাল্টা চলিয়া যান। পরের বৎসর য়ূসুফ সুলতানের নিকট হইতে অভিষেক ফরমান সংগ্রহ করেন। তৎপর তিনি বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, দুর্গসমূহ সুরক্ষিত করেন এবং শত্রু জাহাজ ধ্বংসের জন্য নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিসর অভিযান কালে য়ূসুফ পাশা ফ্রান্সের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে অস্বীকৃত হন। ইংরেজদের হুমকির মুখে তিনি

বাধ্য হইয়া ত্বরিত ১৭৯৯ খৃ. ফ্রান্সের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৮০০ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যে জন্য প্রথমে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং পরে উহা শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। আমেরিকানগণ আহ্মাদ বে-কে সাইরেনাইকাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গভর্নররূপে ঘোষণা দিতে যাইতেছিল। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যস্থতায় উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর আমেরিকানদের সহিত একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আহ্মাদ বে মিসর চলিয়া যান (জুন ১৮০৫)।

১৮০৬ হইতে ১৮৩০ খৃ. পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং অল্পাধিক সাফল্যের সহিত দমন করা হয়। ১৮১০ খৃ. গাদামিস (Ghadames) অঞ্চল আরেকবার ত্রিপোলীর সহিত যুক্ত হয়। ১৮১৯ খৃ. একটি ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর ত্রিপোলী আগমন করে এবং হুমকির মুখে দাস ও খৃস্টান বন্দীদের মুক্ত করে। ১৮২৩ হইতে ১৮২৬ খৃ. পর্যন্ত সুলতানের অনুরোধে য়ূসুফ পাশা মোরিয়া উপকূলে 'উছমানী নৌবাহিনীর অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য একটি ত্রিপোলিতানীয় নৌবহর প্রেরণ করেন এবং উহা একই পথে ফিরিয়া আসে। কিন্তু ইহাতে সারদিনিয়া ও নেপ্ল্‌স রাজ্য দুইটিতে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় (১৮২৫-৬ খৃ.)। ইংরেজ কনসাল Warrington-এর জামাতা Major Laing-এর হত্যাকাণ্ডের জন্য ফরাসী কনসাল Rousseau-কে দায়ী করা হয়। ইহাতে য়ূসুফ পাশা একটু নাযুক অবস্থায় পড়েন। তাঁহাকে অবশেষে ফ্রান্সের সহিত একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হয় (আগস্ট ১৮৩০)। ১৮৩২ খৃ. ঋণ পরিশোধের জন্য মানশিয়া ও সাহিল-এর অধিবাসীদের উপর কর আরোপিত হইলে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা য়ূসুফের এক পৌত্র মুহাম্মাদ বে-কে গভর্নররূপে ঘোষণা করে এবং ত্রিপোলী অবরোধ করে। ১৮৩২ খৃ. ৫ আগস্ট য়ূসুফ তাঁহার পুত্র 'আলীর অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। 'আলী সাইরেনাইকার সমর্থন ও ফরাসীদের শুভেচ্ছার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন।

অপরদিকে মুহাম্মাদ বে ইংরেজদের আনুকূল্য ভোগ করিত। সুলতানের একজন দূত মুহাম্মাদ শাকির আফেন্দি পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা করেন। তিনি ১৮৩৪ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে 'আলী বে-র অভিষেক ফরমান লইয়া ফিরিয়া আসিলে বিদ্রোহিগণ ও ইংল্যাণ্ড তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। এই সময় কারামানলীদের উপর ফরাসী চাপ এবং আলজিরিয়ার ফরাসী উপস্থিতিতে সৃষ্ট মারাত্মক হুমকির কারণে 'উছমানী সরকার ত্রিপোলিতানিয়ার উপর সুলতানের সার্বভৌমত্ব আরও কার্যকরভাবে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে। ১৮৩৫ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে 'উছমানীগণ ত্রিপোলীতে মুসতাফা নাজীব পাশার নেতৃত্বে একটি নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই নৌবহর ত্রিপোলীতে ২৬ মে পৌঁছে এবং ২৭ মে সৈন্যরা অবতরণ করে। পরের দিন 'আলী পাশা এবং কিছু সংখ্যক ত্রিপোলীতানীয় পদস্থ ব্যক্তি গ্রেফতার হন। মুস্তাফা নাজীব পাশা নিজেকে প্রদেশের গভর্নর নিযুক্তির এবং 'আলী পাশার অপসারণের রাজকীয় ফরমান পাঠ করেন। মুহাম্মাদ বে আত্মহত্যা করেন, তাঁহার ভ্রাতা আহ্মাদ মাল্টায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কারামানলী পরিবারের একমাত্র য়ূসুফ পাশা ব্যতীত অন্য সকল সদস্য ইস্তাম্বুল প্রেরিত হন। বার্ধক্যের কারণে য়ূসুফ পাশাকে ত্রিপোলী বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দের ৪ আগস্ট সেখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

এইভাবে কারামানলী শাসক বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। তুর্কী ও কুলুগ্লীদের বিরুদ্ধে ত্রিপোলিতানিয়ার আরবদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বংশের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু তাঁহারা 'উছমানী সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেন নাই। পরবর্তীকালে কারামানালী দ্বন্দ্ব-কলহ ও অভ্যন্তরীন ঝগড়া-বিবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই, যাহার ফলে বংশের প্রথম সদস্যদের প্রচেষ্টা নস্যাৎ হইয়া যায় এবং আরেকবার প্রদেশটি 'উছমানী নিয়ন্ত্রণাধীন হইবার পথ সুগম হয়; 'প্রাচ্য প্রশ্ন' বিষয়টিকে আরও সহজ করিয়া তোলে। তিউনিসিয়ার হুসায়নী বংশের ন্যায়, তবে ভৌগোলিক বৈশাদৃশ্যের কারণে কিছুটা স্বল্প পরিমাণে, কারামানলীগণ ক্ষণকালের জন্য একটি স্থানীয় শাসক বংশরূপে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু জাতীয় বংশরূপে নহে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন গালবূন, আত-তাযকার ফী মান মালাকা তারাবুলুস ওয়া মান কানা ফিহা মিনা'ল-আখ্য়ার (التذكار فى من ملك طرابلس و من كان فيها من الاخيار) (পাণ্ডু. প্যারিস, বি. এন. নং ১৮৮৯), ত্রিপোলী আওকাফ গ্রন্থাগার; ইস্তাম্বুল, উম্মী কূতুফানেসী নং ৩৪২৩; সারসংক্ষেপ, মুহাম্মাদ নাহিজু'দ্-দীন, তা'রীখ-ই ইব্ন গালবূন দার বায়ান-ই তারাবুলুস-ই গারব্ ইস্তাম্বুল ১২৮৪/১৮৬৮; আংশিক অনু. E. Rossi, La cronaca arabatripolitana di Ibn Ghalbun (অধ্যায় ১৮), Bolagna ১৯৩৬ খৃ.; (২) আহ্মাদ বেগ আন-না'ইবু'ল আন্সারী, আল-মান্হালু'ল-'আয্ব্ ফী তা'রীখ তারাবুলুসি'ল-গার্ব্ (المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب) ইস্তাম্বুল ১৩১৭/১৯০১; (৩) হাসান সাফী তারাবুলুস গার্ব্ তা'রীখী, ইস্তাম্বুল ১৩২৮/১৯১২, ৫৩-৮৪; (৪) মেহ্মেদ নূরী ও মাহ্মূদ নাজী, তারাবুলুস গার্ব্, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১৪; (৫) A. S. Ilter, Simale Afrika'da Turkler, ইস্তাম্বুল ১৩৩৩ খৃ., ২খ, ২২৯-৪৪; (৬) D. Badia y Leblich. Voyages d' Aly Bey, প্যারিস ১৮১৪ খৃ., ২খ; (৭) Lady Mary Wortley Montague, Narrative of a ten years residence at Tripoli, লন্ডন ১৮১৬ খৃ.; (৮) G. F. Lyon, A Narrative of Travels in Northern Africa in the years 1818, 1819, 1820, লন্ডন ১৮২১ খৃ.; (৯) E. Pellissier de Reynaud, La Regence de Tripoli, in Revue de Deux Mondes, 12 (১৮৫৫ খৃ.), ৫-৪৮; (১০) D. D. Porter, Memoirs of Commodore David Porter of the United States Navy, নিউইয়র্ক ১৮৭৫ খৃ. অধ্যায় ২, ৩, ৪; (১১) N. Slousch, La Tripolitaine sous la domination des Karamanli. in RMM, ৬খ. (১৯০৮ খৃ.) ৫৮-৮৪, ২১১-৩২, ৪৩৩-৫৩; (১২) G. Medina, Les Karamanli de la Tripolitaine et l'occupation temporaire de Tripoli par Ali Boulgour, in RT, নং ৬১ (জানুয়ারী ১৯০৭), ২১-৩২; (১৩) E. Dupuy. Americains et Barbaresques, প্যারিস ১৯১০ খৃ., ১৩২ প.; (১৪) G. Ferrari, La spedizione della marina sarda a Tripoli nel ১৮২৫, রোম ১৯১২ খৃ.; (১৫) F. Nani-Mocenigo, Tripoli e Veneziani (১৭১৪-৬৬), Citta di Castello ১৯১৪ খৃ.; (১৬) R.Vadala, Essai sur l'histoire des karamanli,

pachas de Tripolitaine de 1714 a 1835 , in Revue de l'histoire des colonies francaises, ৭খ. (১৯১৯ খৃ.), ১৭৭-২৮৮; (১৭) J. Serres, La politique turque en Afrique du Nord sous la Monarchie de Juillet, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (১৮) C. Bergna, Tripoli dal 1510 al 1850, ত্রিপোলী ১৯২৫ খৃ.; (১৯) C. Ferraud, Annales tripolitaines, ed. A. Bernard, তিউনিস-প্যারিস ১৯২৭ খৃ.; (২০) E. de Agostini, Una spedizione americana in Cirenaica nel 1805, in Rivista della Calonie Italiana, ২খ., (১৯২৮ খৃ.) ৭২১-৩২, ৩খ. (১৯২৯ খৃ.) ৪১-৫৬; (২১) Ismail Kemali, Documenti inediti sulla caduta dei Caramanli, in Riv delle Col. Ital. ৪খ, (১৯৩০ খৃ.) ১-২৪, ১৭৮-২১৬; (১৬) R. Micacchi, I rapporti Tra il rgno di Francia e la Reggenza di Tripoli di Barberia nelle prima meta del sec xviii, in Riv. delle Col. Ital., ৮খ. (১৯৩৪ খৃ.), ৬৫-৮১, ১৫৯-৮২, ২৪৭-৭৬; (২৩) G. Cappovin Tripoli e Venezia nel secolo xviii, Verbania ১৯৪২খৃ.; (২৪) C. Bergna I Caramanli, in Libia, ৩১খ. (১৯৫৩ খৃ.), ৫-৫৯; (২৫) S. Bono, I corsari barbareschi, Torino ১৯৬৪খৃ., ৫২-৬৬, ১৫৮-৭৯; (২৬) R. Mantran, Le statut de l' Algerie, de la Tunisie et de la Tripolitaine dans l'Empirte ottoman, in Atti del I, congresso internazionale di studi nordafricani, Cagliari ১৯৬৫ খৃ., ২০৫-১৬; (২৭) E. Rossi, Storia di Tripolie della Tripolitania della conqesta araba al 1911, রোম ১৯৬৮ খৃ., ২২১-৯৪ (অনেক গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ); (২৮) IA, art. Karamanli (M. Fuad Ezgu)।

R. Mantran (E. I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

কারামানী মেহমেদ পাশা (দ্র. মেহমেদ পাশা কারামানী)

কারামিতা (দ্র. কারমাতী)

কারামীদ (দ্র. খাযাফ)

কারায়, রাফীক খালিদ (كرى ، رفيق، خالد) ঃ (আধুনিক তুর্কী পরিভাষায় রেফিক হালিত কারায়), তুর্কী প্রবন্ধকার, রম্যরচনা লেখক ও ঔপন্যাসিক (মৃ. ১৮৮৮/১৯৬৫)। তিনি ইস্তাম্বুলের অন্তর্গত বস্‌ফোরাস এলাকার বেয়লারবেয়ি (Beylerbeyi) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কারাকায়িশ উগুল্লারী বংশোদ্ভূত মুহাম্মাদ খালিদ (পরে রাফীক খালিদ ইহা 'কারায়'-তে সংক্ষেপ করেন) অর্থ-মন্ত্রণালয়ের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গালাতাসারায় লায়সী-তে (১৯০০-৬ খৃ.) প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কিন্তু স্নাতক ডিগ্রী লাভের পূর্বেই ইহা ত্যাগ করেন। অতৎপর তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারণিকের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং একই সঙ্গে ১৯০৮ খৃ. সংবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আইন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতেন। তারপর তিনি চাকুরী ও অধ্যয়ন উভয় পরিত্যাগ করিয়া সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত হন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখার পরে ১৯০৯ খৃ. তিনি নিজেই সোন হাওয়াদিছ নামক একটি স্বল্পকাল স্থায়ী সাময়িকী প্রকাশ করেন এবং এই বৎসরই তিনি সমকালীন যুবক কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা অল্পকালের জন্য গঠিত ফিজর-ই আতী (Dawn of the Future) নামক সাহিত্য সংঘে যোগদান করেন, তবে ইহা ঘটেছ র়্বেত-ই ফুনূন আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে।

১৯১০ খৃ. যখন তিনি 'কিরপি' (শজারু) এই ছদ্মনামে কালেম ও জেম নামক হাস্যরসের সাময়িকীতে লেখা আরম্ভ করেন—লেখক হিসাবে তখন তাঁহার আসল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং তিনি অল্পকালের মধ্যে সাময়িকী দুইটির প্রধান লেখক হিসাবে পরিচিত হন। নিপুণ ভাবধারায় লিখিত ও অতি সূক্ষ্ম হাস্যরস মিশ্রিত তাঁহার কঠোর বিদ্রূপাত্মক রচনাবলী ক্ষমতাসীন দল তথা ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত এবং ইহা তাঁহার জন্য দ্রুত অপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯১৩ সনের জুন মাসে প্রধান উযীর মাহমূদ শাওকাত পাশার হত্যার পরে রাফীক খালিদ, যদিও তিনি কোন দল করিতেন না অথবা কোনও দলের বিরোধিতাও করিতেন না, তথাপি সরকার বিরোধী "সন্দেহভাজন ব্যক্তি" হিসাবে চিহ্নিত কয়েক শত লোকের সহিত বন্দী হইয়া কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত সিনোপ (Sinop) দ্বীপে নির্বাসিত হন। স্বয়ং তাল্‌'আত পাশা, যিনি তাঁহার একটি কঠোর বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধের লক্ষ্যবস্তু হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নামটি শাস্তিযোগ্য লোকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন (R. H. Karay, Minelbab ilelmihrab, ইস্তাম্বুল ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩৬)। তিনি পরবর্তী পাঁচ বৎসর সিহনাপ, কোরাম (Corum), আঙ্কারা ও বাইলেসিক (Bilecik)-এ অতিবাহিত করেন এবং এই সময় তিনি মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ ও ছোট গল্প রচনা ছাড়া নীরব ছিলেন। প্রবন্ধ ও গল্পগুলি ইস্তাম্বুল দৈনিক পেয়াম (Payam)-এ আয়দেদে (Aydede) ছদ্মনামে এবং পরবর্তীকালে গোকাল্‌প (Gokalp)-এর বিখ্যাত য়েনি মাজ্‌মূ'আ (Yeni Medjmua) পত্রিকায় তাঁহার স্বীয় নামে প্রকাশিত হয়।

১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে নির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যামান ও সাবাহ পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন (পরবর্তীকালে তিনি এই দুই পত্রিকার একজন প্রধান লেখক হিসাবে পরিগণিত হন)। ১৯১৮ খৃ. যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে নেতৃবর্গ দেশ হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের ও কমিটির বিরুদ্ধে রাফীক খালিদের বিদ্রূপাত্মক রচনা অধিকতর তীব্র-তিক্ততাপূর্ণ হয়। অতঃপর তিনি লিবারেল ইউনিয়ন পার্টিতে যোগদান করেন এবং ১৯১৯-২২ খৃ. ইস্তাম্বুল সরকারের জাতীয়তাবিরোধী রাজনীতি ও কার্যকলাপের সহিত জড়াইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার অনেক প্রবন্ধ ও বিদ্রূপাত্মক রচনার মাধ্যমে আনাতোলিয়ায় মুসতাফা কামাল পাশা পরিচালিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে ইউনিয়নিস্ট আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়কে পুনর্জীবিত করার প্রয়াসরূপে চিত্রিত করিয়া ইহার মর্যাদা হানির চেষ্টা করেন এবং দামাদ ফারীদ পাশার কোয়ালিশন সরকারের আমলে তিনি যখন ডাক ও তার বিভাগের মহাপরিচালক ছিলেন তখন জাতীয়তাবাদিগণের (Nationalist) তারবার্তা যোগাযোগ ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই কার্যকলাপের দরুন তিনি আঙ্কারা সরকারের নিকট "অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে" পরিগণিত হন। ১৯১৯ সনের অক্টোবর মাসে সুলতানের সরকারের সহিত যে কোনও মীমাংসার জন্য তাঁহার গ্রেফতার ও বিচার ছিল জাতীয়তাবাদিগণের দ্বারা আরোপিত অন্যতম শর্ত (এস. সেলেক, আনাদোলু ইহতিলালি, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ.; পৃ. ৩০৪)।

১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আনাতোলিয়ায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির বিজয়ের পরে এবং তাহাদের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ইস্তাম্বুল রে'ফেত পাশার (Bele) আগমনের পরপরই, লেখক ও সাংবাদিক 'আলী কালাম, যিনি রাফীক খালিদ-এর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী এবং ন্যাশনালিস্টগণের প্রধান প্রতিপক্ষ ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাকে আঙ্কারায় বিচারের উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়ার পথে ইয্‌মিদে হরণ ও হত্যা করা হয় (এফ. আর. আতায়, চান্‌কায়া, ইস্তাম্বুল ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩৪১-৪২)। ইহা শুনিয়া রাফীক খালিদ লিবারেল ইউনিয়ন পার্টির একটি নেতৃস্থানীয় সদস্য দলে যোগ দেন। এই দলের অধিকাংশই ইস্তাম্বুল দখলকারী সেনাবাহিনীর সহিত একযোগে কার্য করিয়াছিল এবং বৃটিশ দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পরে তাঁহাকে অন্য শরণার্থীদের সঙ্গে তাশ্‌কিশ্‌লা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়, কিন্তু তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া ১৯২২ সনের ৯ নভেম্বর একটি ফরাসী জাহাজে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। [পরে তিনি ১৯২৩ সনে লুযানে (Lausanne) চুক্তির ভিত্তিতে সাধারণ ক্ষমাবহির্ভূত ১৫০ জন অবাঞ্ছিত লোকের তালিকাভুক্ত হন]। অতঃপর তিনি লেবাননের জুনিয়্যা গমন করেন এবং তাঁহার রাজনৈতিক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন। ১৯২৪ খৃ. ইস্তাম্বুলের দৈনিক আকশাম-এ ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ জনমনে চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা সৃষ্টি করিলে ইহা মুলতবী করা হয়। ঐ বৎসরই তিনি জুনিয়্যা" হইতে আলেপ্পো গমন করেন। সেখানে তুর্কী সংবাদপত্র Doghru Yol-এর সম্পাদক তাঁহাকে তাঁহার পত্রিকায় লেখা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি এই পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী তথা ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং ১৯৩৮ খৃ. সাধারণ মা ঘোষণার পর তুরস্কে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আলেপ্পোতে অবস্থান পূর্বক স্বীয় পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ২৭ বৎসর ইস্তাম্বুলে অতিবাহিত করেন এবং সাবধানতার সঙ্গে রাজনীতি এড়াইয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে লেখা প্রকাশ করেন এবং অনেক রচনা, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জনপ্রিয় উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ১৯৬৫ সনের ১৩ জুলাই তিনি ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তুর্কী P. E. N. ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

কোনও একটি বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে তাঁহার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জানা যায় যে (Rushen Eshref, Diyorlar ki, Istanbul 1334/1918, 247-59), রাফীক খালিদ প্রাচীন তুর্কী সাহিত্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আধুনিক ভাবধারাপূর্ণ সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলেন (তানজীমাত স্কুল)। তিনি তাঁহার অব্যবহিত অগ্রবতিগণের রচিত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে প্রকাশিত ছির্‌বেত ই-ফুনূন বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। তিনি তাঁহাদের পদ্ধতির প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁহাদের ফরাসী প্রভাবান্বিত প্রসঙ্গসমূহ, চরিত্র এবং তাঁহাদের কপট ও বিলাসবহুল ভাবধারাকে প্রত্যাখ্যান করেন (তবে খালিদ দিয়া', মুহাম্মাদ রা'উফ ও হুসায়ন যাহিদ-এর কিছু সাহিত্যকর্ম ব্যতিক্রম)। এইভাবে তিনি সহায়-সম্বলহীন অবস্থা হইতে তাঁহার কালজয়ী কর্মধারার সূচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের তাঁহার দুই একজন অগ্রবর্তী লেখককে বাদ দিলে তিনিই উপন্যাস ও ছোট গল্পে বাস্তববাদের সূচনা করেন এবং শোষণ পীড়িত রাজধানী (ইস্তাম্বুল) হইতে তাঁহার আনাতোলিয়ার গ্রাম এলাকার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি অমার্জিত ও অশালীন ভাষা ছাড়াই অতি সূক্ষ্ম সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শুরু হইতেই 'উমার (ওমর) সায়ফু'দ-দীন ও তাঁহার সঙ্গিগণ য়ানী লিসান (New Language)-এর আন্দোলন যাহা তুর্কী লিখিত ভাষা সহজীকরণের জন্য পরিচালিত হয়, তাহা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তিনি কথ্য তুর্কী ভাষাকে সাহিত্যমাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের জন্য যুক্তি ও প্রচেষ্টা চালান। রাফীক খালীদের প্রকাশিত ২৭ খানি পুস্তক নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা করা যাইতে পারে ঃ

(১) রসাত্মক, রসজ্ঞাপক ও ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধসমূহ ঃ (১) দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী, বর্তমান প্রসঙ্গ অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এইগুলি তাঁহার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। এই সমস্ত রচনা নিম্নলিখিত গ্রন্থাকারে বিন্যাস করা হইয়াছে ঃ Kirpinin dedikleri ("শজারু কি বলিয়াছিল"), ১৯০৯-১৯ সনের মধ্যবর্তী সময়ের রচনাবলী লইয়া রচিত দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৩৩৬ হি. (১৯২০ খৃ.) রোমান পাণ্ডুলিপি ১৯৪০ খৃ.,Tanidiklarim ("আমার পরিচিতগণ") ইস্তাম্বুল ১৩৩৫/১৯১৯, রোমান হরফে ১৯৪১ খৃ.; Sakin aldanma, inanma, kanma ("প্রতারিত হইও না, বিশ্বাস করিও না. হতাশ হইও না") ইস্তাম্বুল ১৩৩৫/১৯১৯, রোমান হরফে ১৯৪১ খৃ., Agho pashanin khatiralari (Memoirs of Agho Pashathe parrot ("আগো পাশা তোতা পাখীর স্মৃতিকথা"), ইস্তাম্বুল ১৩৩৮/১৯২২ রোমান হরফে ১৯৩৯ খৃ., Ay peshinde ("চন্দ্রের অনুসরণে"), ইস্তাম্বুল ১৩৩৯/১৯২৩, Ghughuklu sa'-at (কোকি ঘড়ি), ইস্তাম্বুল ১৩৪১/১৯২৫, রোমান হরফে ১৯৪০; Biravuc sacma (অল্প পরিমাণ তুচ্ছ বস্তু) আলেপ্পো ১৯৩২ খৃ.।

(২) ছোট গল্প" রাফীক খালিদের ছোট গল্পসমূহ Memleket Hikayeleri-তে ("Stories from the Country") সংগ্রহ করা হইয়াছে, ইস্তাম্বুলে ১৩৩৫/১৯১৯, রোমান হরফে ১৯৩৯ খৃ. (ফরাসী অনু. Belkis tavad, Contes turcs, ইস্তাম্বুল তা. বি.) এককালে ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে বিবেচিত হইত। তাঁহার প্রাথমিক জীবনের (১৯০৯-১২ খৃ.) কয়েকটি গল্প ব্যতীত বাকী গল্পগুলি তিনি আনাতোলিয়ায় নির্বাসনকালে লিখিয়া ছিলেন এবং এই সময় তিনি গ্রামবাসী ও প্রাদেশিক নগরবাসিগণের রীতিনীতি ও চালচলন সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করার সুযোগ পান। ইহা ১ম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব সেন্ট্রাল আনাতোলিয়ার দৈনন্দিন জীবনের একটি অমূল্য প্রামাণ্য চিত্র এবং এই গল্পগুলি আধুনিক তুর্কী সাহিত্যে নজীরবিহীন স্বাভাবিক ধারার দুর্লভ উৎকর্ষের নিদর্শন। তিনি সর্বদা তাহার চরিত্রের আত্মাকে অনুধাবনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া স্থূলভাগের চিত্র, প্রাদেশিক শহর, স্থানীয় কৃষক, দোকানদার, খ্যাতিমান ব্যক্তি, শিক্ষক, খোজা এবং পদস্থ কর্মচারীদিগকে কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করেন। তাঁহার Gurbet Hikayeleri (নির্বাসনকালের কাহিনী) ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ.; প্রধানত তাঁহার আত্মজীবনের অধিকাংশ বিবরণ লইয়া রচিত যাহা তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩. উপন্যাস ঃ রাফীক খালিদ ১৯০৯ এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র একখানি উপন্যাস Istanbul'un Ic Yuzu (ইস্তাম্বুলের অভ্যন্তরীণ কাহিনী), ইস্তাম্বুল ১৩৩৬/১৯২০, রোমান লিপিতে Istanbul'un Bir Yuzu ("ইস্তাম্বুলের একটি চেহারা") নামে ইস্তাম্বুলে ১৯৩৯ খৃ., সম্ভবত ইহা তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহা জনৈকা

স্বভাবজাত ভদ্র মহিলার ডায়রী আকারে লিখিত, যিনি হামীদিআন পাশার প্রাসাদে (Konak) লালিত-পালিত হন। এই উপন্যাসটি ১৯০০ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী ইস্তাম্বুল সমাজের একটি নিপুণ ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, যাহাতে প্রাচীন শাসন প্রণালীর শেষ নিদর্শন, সকল শক্তিশালী ইউনিয়ন ও প্রোগ্রেস কমিটির প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ এবং যুদ্ধ চলাকালীন হীন ভূঁইফোড় ধনীদিগকে চমৎকার ও কঠোর ব্যঙ্গোক্তির সাথে চিত্রিত করা হইয়াছে। তাঁহার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রধানত জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর, বিশেষত ১৯৩৮ খৃ. নির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে অনেক মাঝারি মানের জনপ্রিয় উপন্যাস (যেগুলির ১৯ খানা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কয়েকখানা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন (Mustafa Baydar, Edebiyatcilarimiz ne Diyorlarr' ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১০৮)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কয়েকটির উপন্যাস, বিশেষ করিয়া Surgunc নির্বাসন) ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ., Anahtar (চাবিটি), ইস্তাম্বুল ১৯৪৭ খৃ. এবং Bu Bizim Hayatimiz (ইহাই আমাদের জীবন), ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ. এইগুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনীমূলক তথ্য এবং কালের বর্ণনার জন্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অরাজনৈতিক ও ব্যঙ্গবর্জিত রচনাবলীর মধ্যে Uc Nesil Uc Hayat (তিনটি প্রজন্ম জীবনের তিনটি পথ), ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., খণ্ডটিতে, ১৮৬০ খৃ. হইতে পরবর্তী কালসমূহে ইস্তাম্বুলের দৈনন্দিন জীবনের জীবন্ত বিবরণ চিত্রায়িত হইয়াছে। তাঁহার বেশ কয়েকটি রচনা ও প্রবন্ধ তাঁহার অত্যধিক জনপ্রিয় হাস্যোদ্দীপক সাময়িকী Aydede-তে প্রকাশিত হয় (১৯২২ সনের জানুয়ারী হইতে ৯০টি সংখ্যায় এবং পুনরায় ১৯৪৮-৪৯ খৃ. ১২৫টি সংখ্যায়) কিন্তু ইহা পুস্তকাকারে সংকলিত হয় নাই।

(৪) নাটক ঃ রাফীক খালিদ দুইটি নাটক রচনা করেন ঃ তিরয়াকি হাসান পাশা (Tiryaki Hasan Pasha)। ইহা ১৬০১ খৃ. হাংগেরীর কানিয্সা (Kanizsa) দুর্গের প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্তা সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। নাটকটি ঐ সময় (১৯০৯ খৃ.) বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। ইহা প্রকাশিত হয় নাই। সিরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি একাঙ্কবিশিষ্ট তাঁহার দ্বিতীয় মিলনান্তক নাটকটি রচনা করেন Deli ('উম্মাদ'), আলেপ্পো ১৯৩১ খৃ., রোমান লিপিতে, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ., ইহা একটি মানসিক রোগীর গল্প যে একবার সুস্থ হইয়াছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রধান সামাজিক সংস্কারসমূহের প্রভাব দৃষ্টে পুনরায় আরোগ্য অসাধ্য এমন পাগলে পরিণত হয়। নাটকটি পাঠ করিয়া কামাল আতাতুর্ক বর্ণনা করেন, "ইহা সংস্কারকে ব্যঙ্গ করে নাই, বরং ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাঁহার পরামর্শে রাফীক খালিদ (১৫০ জন অবাঞ্ছিতগণের অবশিষ্ট জীবিতগণের সঙ্গে) ১৯৩৮ খৃ. প্রজাতন্ত্রের পঞ্চদশ বর্ষোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ক্ষমতাভুক্তগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন (Y. K. Karaosmanoglu, Genclik ve Edebiyat Hatiralari, আঙ্কারা ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৮৭-৯০)।

রাফীক খালিদ আধুনিক তুর্কীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গদ্য লেখক হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছেন (কখনও কখনও ব্যক্তিগত পক্ষপাতপূর্ণ প্রবণতায় ভিন্নমত প্রবর্তনের তৎপরতা দেখা যায়। যেমন Yahya Kemal Beyatli, Siyasi ve Edebil, Porlreler, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৫০-৫৩)। কথিত আছে যে, অন্য কোনও লেখক কথ্য ভাষাকে ভিমি করিয়া অধিকতর স্বাভাবিক ও সরল প্রকৃতির কোনও তুর্কী রচনা সম্পাদন করে নাই। এই মতবাদটি এখনও অনেক সমালোচকের নিকট এমনকি সমসাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্য বলিয়া মনে হয়। ১৯০৮-২৮ খৃষ্টাব্দের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে সত্য ; কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী যুগে ভাষার যে বিরাট রূপান্তর ঘটে এবং ভাষায় স্টাইল ও সাহিত্যিক রুচিত পরিবর্তন হয় তাহা তাঁহার ভাষার ও পদ্ধতির যুগ কিনা ইহা সঠিকভাবে লক্ষ করা হয় নাই; সংস্কারপূর্ব সময় তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইসমা'ঈল হাবীব তুর্ক তেজেদ্দুদ এদেবিয়্যাতি তা'রিখি, ইস্তাম্বুল ১৩৪০/১৯২৪ পৃ. ৬৩৪-৭; (২) Edmond Saussey, Prosateurs turcs contemporains, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২১৫-২৭; (৩) Munci Enci, Kendi Yazilari ile Refik Halit, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (৪) Cevdet Kudret, Turk Edibiyatinda Hikaye ve Roman, আঙ্কারা ১৯৭০ খৃ., ২খ, ১৫৯-৮৬; (৫)Behcet Necatigil, Edebiyatimizda Isimler Sozlugu, সংশোধিত ৭ম সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., দ্র. শিরো।

Faher Iz (E. I.[2])/এ. বি. এম. আব্দুর রব

কারায়ী (قرائي=Karaites) ঃ একটি য়াহূদী ধর্ম সম্প্রদায় যাহারা বাইবেল পরবর্তী যুগে তালমুদে সংযোজিত রীতিনীতি এবং রাব্বীগণ কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থাদির নির্ভরযোগ্যতায় বিশ্বাস করে না। ইহারাই একমাত্র য়াহূদী ধর্ম সম্প্রদায় যাহারা ১২০০ বৎসরেরও বেশী সময় ধরিয়া— এমনকি এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে (সামারিতানদিগকে বাদ দিলে)। বিভিন্নরূপে এই নামটির (হিব্রু ভাষায় কারা'ঈম, বেনে [বা বা'আলে] মিক্রা' আরবীতে কারাইয়্যূন, কোনও কোনও সময় আসহাব 'আনান ওয়া-বিনয়ামীন) অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যেমন ঃ "ধর্মগ্রন্থ (মিকরা')-র পাঠক (কারা')" এবং "আহ্বানকারী (সত্যপথে)", কারা' ভিন্ন অর্থে, "ডাকা, আহ্বান করা", (তু. শী'ঈ "আহ্বানকারী, দু'আত, এ. ব. দা'ঈ)।

১. ইতিহাস ঃ যদিও আমরা জানি— এবং কারায়ীগণ নিজেরাও জানিতেন— যে মুসলিম সাম্রাজ্যে বসবাসকারী য়াহূদীদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে কারায়ী মতবাদের আবির্ভাব, তথাপি ইহার প্রাথমিক উন্মেষকালে কতিপয় ঐতিহাসিক উপাদান এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। বিষয়টির মূল উপাদান সম্ভবত য়াহূদীদিগের কয়েকটি উপদল কর্তৃক প্রাচীন কাল হইতে গড়িয়া ওঠা তাহাদের মৌলিক ইতিবৃত্ত (অলিখিত আইন,) ইহার প্রচারক ও ব্যাখ্যাকারগণের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতা। ইহার ফলে তালমুদের সমকালীন এবং তৎপূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় (সাদ্দুকী, এ্যাসসেনেস, কুমরান ইত্যাদি উপদল) সকলেই বাইবেলকে আসমানী আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া মনে করিতে থাকে। সম্ভাব্য সহায়ক কারণগুলি হইতেছে ঃ (১) চোখের সামনে পারস্য ও বায়য্যান্টীয় সাম্রাজ্যের পত ঘটা এবং ১ম/৭ম শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে ত্রাণকর্তা হিসাবে মাসীহ-এর আগমনের আশা তিরোহিত হইয়া যাওয়া, য়াহূদী জাতির মুক্তি ও নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি হওয়া হাতের কাছে নয়, এইরূপ দুঃখজনক

উপলব্ধি; (২) অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ য়াহূদী স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ইরাকে (ব্যাবিলোনিয়া) ক্রমবর্ধমান সামাজিক অস্থিরতা, যেখানে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণীর জনগণ, প্রজাস্বত্বের চাষী ; নগরবাসী কারিগর ও শ্রমিক শ্রেণী মনে করিত যে, তাহারা জিওনিম (Geonim এ. ব. gaon; ইরাকী তালমুদী একাডেমীসমূহের সভাপতিবর্গ) ও এক্সিলার্ক (exilarch) [রা'সু জালূত, খলীফার দরবারে ইরাকী য়াহূদীদের সরকারী প্রতিনিধি] বা নির্বাসিত য়াহূদী যাজকতন্ত্রের আমলাগণ কর্তৃক চরমভাবে নিগৃহীত হইতেছে; (৩) সুবিশাল শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠার ফলে এই বিক্ষুব্ধ য়াহূদী ও অ-য়াহূদী জনগণ দেশত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলীয় জনবিরল ও পর্বতসংকুল এলাকা এবং উত্তর ইরাকে বসতি স্থাপন শুরু করে।

এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই সকল বিক্ষুব্ধ লোকই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত কারায়ী মতবাদের কেন্দ্রস্থলে ছিল। ইসফাহানের আবূ 'ঈসা ওবাদিয়াহ ('আবদুল্লাহ্) আল-ইসফাহানী (দ্র.) নামক ইরানের একজন ধর্মীয় নেতা খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের (৬৫-৮৬/৬৮৫-৭০৫) শাসনের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু অচিরেই তিনি পরাজিত ও নিহত হন। যদিও তাঁহার কতিপয় অনুসারী দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, তিনি মারা যান নাই, বরং আত্মগোপনকারী শী'ঈ ইমামের মতো এখন আত্মগোপন করিয়া আছেন, যথাসময়ে পুনরাবির্ভূত হইবেন। তাঁহার উত্তরসুরি য়ুদগান সম্বন্ধেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করা হইয়া থাকে যে, চূড়ান্ত পুনরার্বিভাব পর্যন্ত তাঁহার আত্মগোপন অব্যাহত থাকিবে (দ্র. 'ঈসাবিয়্যা)।

২য়/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইরাকে বিশেষ করিয়া নবনির্মিত রাজধানী বাগদাদে সাম্প্রদায়িক মতভেদ পুনঃপ্রবেশ করে এবং 'আনান ইব্‌ন দাউদ নামক রাব্বী অভিজাততন্ত্রের একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সদস্য ইহাতে জড়াইয়া পড়েন। ঐতিহ্যগত রাব্বী ইতিবৃত্তে তাঁহাকে (৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর কারায়ীপন্থী লেখক এলিজাহ ইব্‌ন আব্রাহাম কর্তৃক উদ্ধৃত) কারায়ী মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অভিহিত করিয়া অভিযোগ করেন যে, এক্সিলার্ক (exilarch) পদে নির্বাচিত হইতে না পারার দুঃখ ও অপমানবোধ হইতে তিনি একটি পৃথক মতবাদ সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই অতি সরলীকৃত বর্ণনার শুধু এইটুকু গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, 'আনানের সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে ক্রমপ্রসারমান এই দলটি যথেষ্ট আভিজাত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে, এই সম্প্রদায়ের প্রথম সংহিতা (সেফের-হা-মিসওত) তাঁহারই রচিত। ইহা কারায়ীদের প্রাচীনতম লিখিত দলীল হিসাবে এখনও বিদ্যমান। তাঁহার অনুসারিগণকে বলা হয় আনানিয়্যা ('আনানিয়্যিম, 'আনানিয়্যি)। তাঁহারা পৃথক এক্সিলার্ক প্রতিষ্ঠা করে, তাঁহার বংশীয় উত্তরাধিকারীকে কারায়ী প্রিন্স উপাধি প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য কতিপয় উত্তরাধিকারী নেতা বা পণ্ডিতরূপে চিহ্নিত হইতেন।

৩য়/৯ম শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা 'আনানের মতবাদের স্পষ্ট সমালোচনা করেন, ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন ঃ ইসামা'ঈল মীশাওয়াহ্ আল-'উকবারী (ইরাকের উকবারা এলাকার বাসিন্দা), ইরানের বেনজামিন আননিহাওয়ান্দি (যিনি কারায়ী শব্দটি সমষ্টিগত অর্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন) এবং মালিক আর-রামলী (ফিলিসতীনের রামলা এলাকার বাসিন্দা)। মূসা আয-যা'ফারানী (বাগদাদের যা'ফারান জিলার অধিবাসী) তাঁহার অনুসারিগণকে লইয়া দেশত্যাগ করেন এবং আর্মেনিয়ার তিফলীস-এ বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি আবূ 'ইমরান আত্-তিফলীসী নামে পরিচিত হন। দানিয়েল আল-কূমিসী (ইরানী প্রদেশ কূমিসের দামগানের অধিবাসী)-এর মাধ্যমে কারায়ী মতবাদ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে উপনীত হয়।

উপরিউল্লিখিত পদবীযুক্ত নাম দ্বারা প্রাথমিক যুগে কারায়ী মতবাদ ভৌগোলিকভাবে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই বোঝা যায়। দানিয়েল আল-কূমিসী ছিলেন জেরুসালেমে বসতি স্থাপনকারী প্রথম বিখ্যাত কারায়ী পণ্ডিত। অন্যান্য কারায়ীপন্থী গোষ্ঠীগুলি দামিশক ও কায়রোসহ কতিপয় ছোটখাটো শহরে বসবাস করিত। রাব্বীপন্থীদের ধর্মমত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে উৎসাহী কারায়ীপন্থী ধর্মপ্রচারকগণ ক্রমাগত মিশনারী সফর করিতে থাকেন। কিন্তু বস্তুত তাঁহারা খুব কমই সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। কেননা একমাত্র 'আনান ছাড়া আর এমন কোনও কারায়ীপন্থী পণ্ডিত দেখা যায় না যিনি রাব্বী মতবাদ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। প্রাথমিক যুগের কারায়ী পন্থী রচনাসমূহ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের হীনতা ও দীনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, দীর্ঘকাল যাবৎ এই সম্প্রদায় ও মূল রাব্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক সমঝোতামূলক সহ-অবস্থান বজায় ছিল; কিন্তু ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটে। সূরায় অবস্থিত (ইরাকে) রাব্বিনীক একাডেমীর সাদিয়াহ আল-ফায়্যূমী (৮৮২-৯৪২ খৃ.) নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী সভাপতি তাঁহার একটি ধারাবাহিক ও বিতর্কিত প্রবন্ধে কারায়ীপন্থীদের ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দা করেন এবং রাব্বী য়াহূদীবাদ হইতে কারায়ীদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। কারায়ীদের উপর এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আঘাতের ফল ছিল সর্বধ্বংসী মহাপ্লাবনের মতো। ইহাতে তাহাদের যে একটি মাত্র মিশনারী কর্মক্ষেত্র ছিল তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং রাব্বীপন্থী ভ্রাতৃবৃন্দকে একদিন 'সত্য পথ' তথা কারায়ী মতবাদে ফিরাইয়া আনার লালিত আশা চিরতরে বিনষ্ট হয়। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, তাহাদের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই তিক্ত এবং কারায়ী সাহিত্যে সাদিয়ার বিরুদ্ধে এই বিতণ্ডার সংক্রমণ তখন হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিতে থাকে।

অপরদিকে সাদিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার মুকাবিলা করিতে গিয়া তাহারা যে শুধু কারায়ীপন্থী চিন্তাধারার স্বর্ণযুগ (৪র্থ-৫ম/ ১০ম-১১শ শতাব্দী) রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নহে, বিভিন্ন উপদলকে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়েও রূপ দান করিয়াছিলেন। একই সঙ্গে কিছু পরিমিত অথচ অতীব প্রয়োজনীয় সংস্কারের ফলে কঠোর কারায়ী অনুশীলন-পদ্ধতি কিছুটা নমনীয় রূপও পরিগ্রহ করে। এই সময়ে ইরান ও ইরাক কারায়ী কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশ তাহাদের প্রাধান্য হারাইতে থাকে এবং জেরুসালেম ও কায়রো তাহার স্থান দখল করে। বলকান দেশসমূহে (৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বায়যান্টাইন শাসনাধীন) সাইপ্রাসে (৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে), স্পেনে (সেখানে ৫ম/১১শ শতাব্দীতে ইব্‌নু'ত-তারাসের নেতৃত্বে কারায়ী মতবাদ কিছুকাল চলিতে থাকিলেও পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়), ক্রিমিয়ায় (৭ম/১৩শ শতাব্দীতে) এবং লিথুয়ানিয়ায় (৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষ দিকে) নূতন নূতন কারায়ী বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ক্রুসেড (১০৯৯ খৃ.) সিরিয়ার বেশীর ভাগ এবং প্যালেস্টাইনে সকল প্রকার য়াহূদী তৎপরতার সমাপ্তি ঘটায়; জেরুসালেমের কারায়ী একাডেমীতে

বিভিন্ন দেশ হইতে আগত কারায়ী পণ্ডিতগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত, তাহারও বিলুপ্তি ঘটে। কিছু কারায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা কায়রোতে স্থানান্তরিত হইলেও ইহার অধিকাংশ কনস্টান্টিনোপলে কেন্দ্রীভূত হয়। সেখানে গ্রীকভাষী কারায়ী অনুবাদকগণ কিছু কারায়ী ধর্মগ্রন্থ আরবী ভাষা হইতে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এইভাবে আরবী ভাষা না জানা পাশ্চাত্য কারায়ী বংশধরদের নিকট তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলেন। ১৪৫৩ খৃ. তুর্কী 'উছমানীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল দখল ও বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কারায়ী চিন্তাধারা নূতন দিকে মোড় নেয়। এই সময় গ্রীক ও তুর্কীভাষী 'ইস্তাম্বুল সম্প্রদায়" ক্রিমিয়া ও লিথুয়ানিয়াবাসীদের প্রতি নৈতিক সমর্থন দিতে থাকে। ক্রিমিয়া ও লিথুয়ানিয়ার ভাষা ছিল একটি তাতার উপভাষা, যাহা এখনও চালু আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'উছমানী সাম্রাজের পতনের ফলে শেষোক্ত বসতিসমূহ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে এবং এইগুলি পরে রুশ শাসনাধীনে চলিয়া যায়। অল্পকাল পরেই রুশ কারায়ীগণ জার সরকারের নিকট হইতে পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করার ফলে তাহাদের রাব্বাই ভ্রাতাদের উপর আরোপিত কঠোর দমননীতি হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান দখলকার কর্তৃপক্ষ ক্রিমিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোলাণ্ডে বসবাসকারী কারায়ীগণকে কোনরূপ ক্ষতিসাধণ ছাড়া এই কারণে ছাড়িয়া দেয় যে, তাহারা জাতিগতভাবে য়াহূদী নহে। যুদ্ধের পরে অবশ্য প্রাচীন হীত (Hit) অঞ্চলের (ইউফ্রেটিসের তীরে) সকল য়াহূদী সম্প্রদায়সহ মিসর ও ইরাকের কারায়ীগণ দেশ ত্যাগ করিয়া ইসরাঈলে যাইতে রাযী হয়। সেখানে তাহারা কতিপয় ঘনবসতির উপনিবেশে (রামলা, আশদোদ ইত্যাদি) বসবাস করিতে থাকে। সমগ্র বিশ্বে কারায়ী জনসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না; ইহাদের আনুমানিক সংখ্যা ১২,০০০ হইতে ১৩,০০০।

২. সাহিত্য ঃ 'আনানী সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী যুগের কোনও লেখা সংরক্ষিত হয় নাই। যদিও আবূ 'ঈসা আল-ইসফাহানী নামক অন্তত একজন অক্ষরজ্ঞানহীন ধর্মীয় নেতা [তু. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মী উপাধী] সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, তিনি অলৌকিকভাবে বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আরামীয় ভাষায় (তালমুদের ভাষা) 'আনান লিখিত সংহিতা গ্রন্থই প্রাচীনতম কারায়ী দলীল, যাহার অংশবিশেষ এখনও পাওয়া যায়।

বেনজামিন আন-নাহাওয়ানদী হিব্রু ভাষায় বাইবেলের কতিপয় পুস্তকের ব্যাখ্যাসহ একটি সংহিতা গ্রন্থের সংকলন করিয়াছিলেন, যাহার অংশবিশেষ মাত্র এখনও পাওয়া যায়। দানিয়েল আল-কূমিসী হিব্রুতে একটি সংহিতা গ্রন্থ এবং বাইবেলের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও কয়েকটি অংশ মাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। ইহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম দেশে (তুরস্ক বাদে) বসবাসকারী কারায়ী লেখকদের বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম ক্রুসেডের পর বলকান দেশীয় কারায়ী অনুবাদকগণ ব্যাপকভাবে আরবী ও গ্রীক শব্দমিশ্রিত এক ধরনের জটিল হিব্রু ভাষা ব্যবহার করেন। ইহার পর হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তুরস্ক, ক্রিমিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের অধিবাসী কারায়ী লেখকগণ হিব্রু ভাষায় বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ সহযোগে এবং কখনও কারায়ী তাতারদের হিব্রু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথ্য ভাষায় ধর্ম গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

আবূ য়ূসুফ য়া'কূব আল-কিরকিসানী বা আল-কারকা-সানী ফুরাতের তীরে কিরকীসিয়া (কিরকেসিয়াম) বা বাগদাদের নিকটবর্তী কারকাসান নামক একজন বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি দ্বারা কারায়ী সাহিত্য চর্চার স্বর্ণযুগ শুরু হয় যিনি কিতাবু'ল-আনওয়ার ওয়া'ল-মারাকিব (আইন গ্রন্থ) এবং কিতাবু'র-রিয়াদ ওয়া'ল-হাদা'ইক (পেন্টাটিউকের আইনবহির্ভূত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা) নামে দুইখানি বিপুলায়তন গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও নেতাদের মধ্যে যাঁহারা পরবর্তীকালে ঐক্যবদ্ধ কারায়ী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি রহিয়াছে। সম্ভবত এই গ্রন্থটি পরে য়াহূদী ও মুসলিমগণ কর্তৃক রচিত এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের প্রধান উৎসরূপে কাজ করিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, সেগুলি ছিল জেনেসিস, জব ও একলেসিয়াস্টেস (Genesis, Job and Ecelesiastes) ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নুবূওয়াতের দাবী খণ্ডন (!) সংক্রান্ত পুস্তক (কিতাব ফী ইফসাদ নুবূওয়াত মুহাম্মাদ), প্রবন্ধ (কাওল) মূল ধর্মগ্রন্থসমূহের ভাষ্য ('আলা'ত্-তাফসীর ওয়া-শারহি'ল-মা'আনী) অনুবাদ রীতি ('আলা'ত-তারজামা) ইত্যাদি। সালামান ইব্ন জেরোহাম (সুলায়ম বা সুলায়মান ইব্ন রুহায়ম) নামক তাঁহার একজন বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন লেখক সাদিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষায় (শুধু 'মিলহামত হা-শেম' হিব্রু সংকলনটি সংরক্ষিত আছে) গ্রন্থাদি এবং আরবী ভাষায় বাইবেলের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে জাপেথ ইব্ন এলি (আবূ 'আলী হাসান ইব্ন 'আলী আল-বাসরী) নামক একজন মুখ্য বাইবেল ব্যাখ্যাতা, যিনি ৩৯৫/১০০৪-৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, আরবী ভাষায় সমগ্র বাইবেলের ব্যাখ্যা রচনা করেন। কিন্তু প্রতিটি হিব্রু বাক্যের ব্যাখ্যা তিনি নিছক শাব্দিক অর্থে ও ব্যাকরণগত দিক হইতে খুবই ত্রুটিপূর্ণ আরবী ভাষায় সম্পাদন করেন। বাইবেলকে জানা ও প্রচারের প্রয়োজনে কারায়ীগণ কর্তৃক হিব্রু ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার ফলে দাঊদ ইব্ন আব্রাহাম আল-ফাসী (মরক্কোর ফেযে) একটি অনন্য হিব্রু আরবী অভিযান (জামি'উ'ল-আলফাজ) রচনা করেন। আবু'স-সুররী সাহ্ল ইব্ন মাসলীআহ নামে একজন উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মিশনারী তাঁহার রাব্বী প্রতিপক্ষের জওয়াবে হিব্রু ভাষায় (একই পুস্তকে তিনি ইহা আরবী ভাষায় রচনা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন) দীর্ঘ পত্র-সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবত কায়রোতে তাঁহার এই প্রতিপক্ষের সহিত এই বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। জাপেথ ইব্ন 'আলীর পুত্র আবূ সা'ঈদ লেবী ইব্ন জাপেথ তাঁহার খ্যাতিমান পিতার অনুসরণে বাইবেলের টীকাটিপ্পনী (নুকাত)-সমূহের ধারাবাহিক অভিধান, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় বিধিসমূহের (৩৯৭/১০০৬-৭ সালে সংকলিত) সংকলন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি কেবল সেফের হা-মিস'উত নামে হিব্রু ভাষায় পাওয়া যায়।

৫ম/১১শ শতাব্দীতে জোসেফ নূহের সভাপতিত্বে জেরু- সালেমের কারায়ী একাডেমী পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে এবং যথেষ্ট সংখ্যক (প্রখ্যাত ৭০ জন) প্রখ্যাত পণ্ডিত তৈরী করিতে সক্ষম হয়। জোসেফ ইব্ন নূহ নিজেই পেন্টাটিউকের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও হিব্রু ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁহার ছাত্র 'আরন ইব্ন জোশুয়াহ (আবু'ল-ফারাজ হারূন ইব্নু'ল-ফারাজ), আল-মুশতামিল নামে একটি ব্যাকরণ অভিধান এবং আল-কাফী নামে অন্য একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়াও তিনি পেন্টাটিউকের

ভাষ্য রচনা করেন। জোসেফ ইব্‌ন নূহের অন্য একজন ছাত্র জোসেফ হা-রু'য়েহ (আবূ য়া'কূব য়ূসুফ আল-বাসীর); 'দেখা', ধ্বনি পদ্ধতি অনুসারে অন্ধদের জন্য লিখিত) ছিলেন ৫ম/১১শ শতাব্দীর একজন প্রধান দার্শনিক। তিনি মু'তাযিলী কালামের সংযোজন হিসাবে আল-মুহতাবী নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন (লেখক কর্তৃক কিতাবু'ত-তাময়ীয বা আল-কিতাবু'ল-মানসূরী নামে সংক্ষেপিত) কিতাবু'ল-ইস্‌তিব্‌সার তাঁহার রচিত অন্যতম সংহিতা গ্রন্থ। জোসেফ হা-রু'য়েহ কর্তৃক মূল কারায়ী সংহিতায় ব্যভিচারের জন্য আত্মহননের কঠোর শাস্তি শিথিল করার সুপারিশ তাঁহার ছাত্র জেশুয়াহ ইব্‌ন জুদাহ (আবু'ল-ফারাজ ফুরকান ইব্‌ন আসাদ) কর্তৃক আরও সংশোধিত হয়। 'সেফের হা-'আরাউত নামে ইহার শুধু হিব্রু অনুবাদ গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তিনি ইহা ছাড়া আরও কতিপয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রথম ক্রুসেডের পর কারায়ী সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রে বলকান দেশসমূহে স্থানান্তরিত হয়; সেখানে হিব্রু ছিল তাহাদের ভাষাগত বাহন। মিসরে প্রতিষ্ঠিত ইহার দ্বিতীয় কেন্দ্রে আরবী ভাষা কারায়ী সাহিত্যের মাধ্যমরূপ অব্যাহত থাকে। তোবিয়াহ ইব্‌ন মোসেস ও জেকব ইব্‌ন সিমেওন নামে দুইজন প্রখ্যাত বায়যান্টীয় অনুবাদক কিছু আরবী ভাষায় কারায়ী সাহিত্য হিব্রুতে ভাষান্তর করেন। জুদাহ হাদাস্‌সী (এডেস্‌সা আধুনিক তুরস্কের উরফা, সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী) "এশকোল হা-কোফের" নামে প্রাচীন কারায়ী জ্ঞানের একটি বৃহৎ বিশ্বকোষ (১১৪৮ খৃ. হইতে শুরু) রচনা করেন। প্রধানত আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া জেকব ইব্‌ন রেউবেন বাইবেলের ব্যাখ্যা রচনা করেন; তাঁহার এই গ্রন্থে নাম সেফের হা'উশের'। মিসরে হিব্রু ভাষায় কবিতা চর্চার কারায়ী প্রচেষ্টার ফলে (৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্তী সময়ে) মোসেস দার'ঈ (মরক্কোর দার্'আ এলাকার, যদিও জন্ম মিসরের আলেক্‌জান্দ্রিয়ায়) প্রাথমিক যুগের একজন প্রখ্যাত হিব্রু কবিরূপে পরিচিত হন। তিনি স্পেনে রাব্বী মতানুসারী মহান কবিগণকে অনুকরণ করিলেও বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই; তবে ধর্মীয় ও লোকায়ত–উভয়বিধ বিষয় লইয়া রচিত কবিতার একটি দীওয়ান রাখিয়া যান। জাপেথ (হাসান ইব্‌ন আবি'ল-হাসান) আল-বারকামানী-আরবী ভাষায় একটি চিকিৎসা গ্রন্থ (আল-সাকালাতু'ল-মুহসিনিয়া ফী হিফ্‌জি'স-সিহ্‌হা'ল-বাদানিয়া) এবং বিতর্কমূলক প্রবন্ধাদি রচনা করেন। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ইসরায়েল হা-মা'আরাবী (আল-মাগরিবী) নামে কায়রোর (৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিচারক আরবী ভাষায় কিছু সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। সামুয়েল ইব্‌ন মোসেস আল-মাগরিবী ৮৩৭/১৪৩৪ সালে 'আল-মুরশিদ' (আরবী ভাষায় সর্বশেষ কারায়ী সংহিতা গ্রন্থ) নামে একটি সংক্ষিপ্ত সংহিতা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক গ্রন্থকার দাঊদ ইবনু'ল্-হীতী (ফুরাতের তীরস্থ হীতের বাসিন্দা) আরবী ভাষায় 'আনান হইতে তাঁহার সময়কাল পর্যন্ত কারায়ী বুদ্ধিজীবিগণের একটি ঘটনাপঞ্জী রচনা করেন। ইহার প্রায় আশি বৎসর পূর্বে ফিলিসতীনের সাফাদ অঞ্চলের মোসেস ইব্‌ন স্যামুয়েল নামক একজন অখ্যাত কবি হিব্রু ভাষায় একটি দীওয়ান রচনা করেন। উক্ত দীওয়ানের দীর্ঘ মহাকাব্যধর্মী কবিতায়, সেখানে তিনি দামিশকের আমীরের ব্যক্তিগত এস্টেটের কেরানীর (কাতিব) দায়িত্ব পালনকালে তাঁহাকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর (৭৫৫/১৩৫৪) ও মক্কায় হাজ্জ পালনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি তথা হইতে মিসরে পলায়ন করেন এবং সম্ভবত তাঁহার সাবেক ধর্ম বিশ্বাসে ফিরিয়া যান।

৭ম-৮ম/১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে বায়যান্টীয় কারায়ী মতাবলম্বী সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ পুনরুত্থান ঘটে। আরন ইব্‌ন জোসেফ (জ্যেষ্ঠ আরোন) কর্তৃক লিখিত (৬৯১/১২৯২) পেন্টাটিউকের (সেফের হা-মিব্‌হার) দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তিনি কারায়ীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উপাসনারীতি সংস্কারের জন্যও সবিশেষ পরিচিত। উক্ত গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি পদ্য স্তোত্র সংযোজন করেন যেগুলির অধিকাংশই স্বরচিত্র। অন্য একজন আরোন (কনিষ্ঠ আরোন, নিকোমেডিয়া অঞ্চলের, এশিয়া মাইনরের বর্তমান ইযমীদ বা ইযমিত এলাকা, মৃ. ৭৭০/১৩৬৯) কারায়ী ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিন খণ্ডে সমাপ্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সুম্মা (Summa) রচনা করেন ঃ (১) দর্শন বিষয়ক (এসহায়্যিম, মূলত কারায়ী প্রতিপক্ষ মাইমোনীদের 'দালালাতু'ল-হা'রীন-এর মুকাবিলায় রচিত), (২) আইন বিষয়ক (গান'ঈডেন) এবং (৩) অভিধান বিষয়ক (কেতের তোরাহ)। ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে এলিজাহ বাশয়াচী নামে ইস্তাম্বুলের কারায়ী রচনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ৮৯৫/১৪৯০ সালে মারা যান। "আদ্দেরেত এলিয়্যাহূ" নামক এই গ্রন্থটির সংকলন কাজ তাঁহার মহাজ্ঞানী শ্যালক চালেব আফেনডোপলো (মৃ. ১৫২২ খৃ. পরে) অব্যাহত রাখেন; তিনিও ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শাস্ত্রনীতি ও বিধিবিধানের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে অধিকাংশ কারায়ী ইহাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন।

'উছমানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কারায়ী সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রভূমি আরও একবার স্থানান্তরিত হইয়া ক্রিমিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডে আসে। এই সময় ট্রোকি শহর (লিথুয়ানিয়ার উইলনা-এর নিকটবর্তী) হইতে কারায়ীদের বিখ্যাত সন্তানগণের আবির্ভাব হয়। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (মৃ. ১৫৯৪ খৃ. (১৫৮৬ ?) খৃষ্টীয় মতবাদকে আক্রমণ করিয়া হিয়্যুক এমূনাহ গ্রন্থটি রচনা করেন এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও যোগ্যতার জন্য ভল্টেয়ার-এর প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হন। ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্ববিদগণ (জোহান রিট্টান্‌জেল গুস্তাভ পেরিনজার, জোহান পুফেনডর্ফ, লেউইন ওয়ার্নার, জেকব ট্রিগল্যাণ্ড ও অন্যান্য) প্রধান কারায়ী মতবাদের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকেন; ফলে কারায়ী সহযোগীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তাঁহাদের প্রধান সিনাগগ (য়াহূদী উপসানালয়) হইতে পৃথক হওয়ার ইতিহাস কারায়ী ধর্মবিশ্বাসের উপাদানসমূহ এবং কারায়ী সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রচনা করেন; যেমন ট্রোকি (Troki) শহরের সোলোমোন ইব্‌ন আরোন কর্তৃক রচিত (মৃ. ১৭৪৫ খৃ.) 'আপ্‌পিরিয়োন (Appiryon) ও কুকিযৌ এলাকার (পোল্যাণ্ডের গালিসিয়ার অর্ন্তগত লভোভ-এর নিকটবর্তী) মোরদেকাই ইব্‌ন নিসান কর্তৃক রচিত "দোদ মোরদোকায়" ও "লেবূশ মালকূত"। ভলহায়নিয়া (Volhynia)-র অন্তগর্ত লুট্‌স্ক কারায়ী সম্প্রদায়ের সিমহাহ্ ইসহাক ইব্‌ন মোসেস (মৃ. ১৭৬৬ খৃ.) প্রথম কারায়ী গ্রন্থপঞ্জী উপহার দেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে কারায়ী লেখক ও গ্রন্থের তালিকা সংযোজন করেন। ইহা ছাড়া তিনি কনিষ্ঠ আরোন কর্তৃক রচিত দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'ঈসহায়্যিম'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কারায়ী লেখক ছিলেন আব্রাহাম ফিরকোভিচ (১৭৮৫-১৮৭৪ খৃ.) রুশ সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করিয়া

তিনি কারায়ী ইতিহাসের মূল উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্রিমিয়া, ককেসাস, সিরিয়া ফিলিসতীন, মিসর ইত্যাদি দেশ ব্যাপকভাবে সফর করেন। যীশুর আবির্ভাবের পূর্বেই কারায়ীগণ ফিলিসতীন ত্যাগ করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করাতে কারায়ীদের হাত ছিল না— ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে নিজ খেয়াল-খুশী মতো বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও স্মৃতিস্তম্ভের তারিখ পরিবর্তন করেন এবং এইভাবে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত সুনামের উপর তিনি নিজেই কলংক লেপন করেন। তাঁহার সংগৃহীত (কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলিতে গেলে যথেচ্ছভাবে) বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে লেনিনগ্রাদ পাবলিক লাইব্রেরীর হস্তগত হয় এবং এইভাবে পৃথিবীতে কারায়ী পাণ্ডুলিপিসমূহের অন্যতম বৃহৎ সংগ্রহশালা গড়িয়া ওঠে। আব্রাহাম ফিরকোভিচ-এর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক লেখক মরদেকাই সুলতানস্কি (মৃ. ১৮৬২ খৃ.) বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে বহুল পরিচিত "যেকের সাদ্দীকীম" গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং কারায়ী সম্প্রদায়ের স্বীকৃত বর্তমান ইতিহাস রাব্বী মূল সিনাগগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাসমৃদ্ধ আদর্শ গ্রন্থ।

৩. শাস্ত্র ও অনুশীলন ঃ বাইবেল-উত্তর যুগের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা ছাড়া কারায়ী ও রাব্বী ধর্মমতের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। এলিজাহ বাশয়াচী (৯ম/১৫শ শতাব্দীতে) কারায়ী ধর্মশাস্ত্রের নিম্নলিখিত দশটি ধারার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা, তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বের অন্য সকল কিছুর স্রষ্টা, বাইবেলে বর্ণিত নবীগণের ওহী প্রত্যাদেশ, তোরাহ্‌কে স্বীকার করা ও ইহা অধ্যয়নের আবশ্যকতা, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের নিশ্চয়তা, প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী থাকা এবং এক সময়ে মাসীহ-এর আবির্ভাব হওয়া। ইহার কিছুকাল আগে ইসরায়েল হা-মা আরাবী (৮ম/১৪শ শতাব্দীর) আরবী ভাষায় মাত্র ৬টি ধারাবিশিষ্ট কারায়ী ধর্মবিশ্বাসের ('আকাইদ) সংকলন করেন। মিসরীয় কারায়ীগণ ইহা তখনও মানিয়া চলে। কিন্তু ইহাতে মাসীহের আগমন সংক্রান্ত ধারাটি খুবই অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকরভাবে কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছাড়াই বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই ধারাগুলির কোনটিই রাব্বী ধর্মবিশ্বাসের সহিত বিরোধপূর্ণ নহে।

বস্তুত 'আনানের সময়েই বাইবেলে পরবর্তী যুগের ঐতিহ্যকে বাতিল করিয়া "বাইবেলের দিকে ফিরিয়া আসার" আহ্বান অবাস্তব প্রমাণিত হয় এবং সাদৃশ্যমূলক পদ্ধতির (হিব্রু-হেক্কেশ, আরবী কিয়াস) অনুসরণে তিনি বাইবেল হইতে নববিধান রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলা হইয়া থাকে যে, কারাগারে বন্দী অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-র সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং মনে করা হয় যে, কিয়াস পদ্ধতি তাঁহার নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রায় সহস্র বৎসর বা তাহারও অধিককাল পূর্বে ফিলিসতীনে রচিত সংহিতা অনুযায়ী জীবন যাপন করা বাস্তবিক অসম্ভব ছিল। 'আনান-এর দ্বিতীয় উত্তরসূরি পাতের সিনাগগ বেনজামিন আন্-নাহাওয়ান্দী তালমূদের বিধিবিধানসমূহ হইতে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করেন। এইভাবে কারায়ীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় বিধানে তিনটি প্রধান উৎসের আলোকে বাইবেল ক্রমশ একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে ঃ সেগুলি হইতেছে আসমানী গ্রন্থ (হিব্রু কাতূব, আরবী নাস্‌স), উহার ভিত্তি করিয়া সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত এবং সমসাময়িক পণ্ডিতগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত হিব্রু কিব্বুস, এদাহ (আরবী 'আদ অনুকরণে ?) পরে সীবেল হা-য়ীরূশাহ, "উত্তরাধিকারিত্বের দায়", আরবী ইজমা')। শেষোক্ত পরিভাষা সম্পর্কে বাইবেলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু বলা না থাকিলেও যে সকল বিষয়ে বাইবেলের যুক্তি ও বক্তব্যের সহিত বিরোধ নাই সেইগুলি ব্যাপক গবেষণা ও যাচাই বাছাইয়ের (নাজার, বাহ্‌ছ) পর পণ্ডিতগণ কর্তৃক সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে। 'তোরাহ্-তে গভীরভাবে অন্বেষণ করো, আমার মতামতের উপর নির্ভর করিও না" আনানের এই নীতিবাক্য কেন্দ্র বিমুখতার একটি শক্তিশালী প্রবণতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া শাস্ত্রের অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রত্যেককে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তদনুযায়ী আমল করিবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু সময় ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে ইহারও সংশোধন হইয়াছে। অন্তত কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশের মাধ্যমে যে প্রথা চালু হয় তাহা হইল বিশেষভাবে স্বীকৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামতের প্রতি সর্বসাধারণের কম-বেশী আনুগত্য। ধর্মীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের কারায়ী পণ্ডিতগণ মু'তাযিলী কালামকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ এবং পরবর্তী কালের দার্শনিকগণ যথাসম্ভব স্বল্প কিছু বিচ্যুতি ব্যতিরেকে তাহাদের পূর্বসূরিগণকে অটলরূপে অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য মনে করিলেন। ফলে রব্বী দর্শনের মত কারায়ী মতবাদ কখনই নব্য প্লেটোবাদ এবং আরিস্টোটলবাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে মসীহী-জাতীয়তাভিত্তিক চরমপন্থী প্রবণতার ফলে 'আবূ 'ঈসা কর্তৃক (১ম/৭ম শতাব্দী) সশস্ত্র বিদ্রোহ পরবর্তীকালে প্রশমিত হইলেও ইহার ব্যাপকতা কমে নাই, বরং য়াহূদীদের গৌরবময় অতীতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নির্বাসন হইতে মুক্তি লাভের জন্য দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা আরও বৃদ্ধি পায়। ইহার একটি ফল হইয়াছিল এই যে, স্বল্প সংখ্যক হইলেও জেরুসালেমে কারায়ী সম্প্রদায়ের অন্তত কিছু সংখ্যক ধার্মিক ব্যক্তি উপাসনা, উপবাস ও অন্যান্য নিষ্ঠাপূর্ণ তৎপরতার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছান ত্বরান্বিত করার জন্য বিরামহীন অথচ কার্যকর প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকেন। এই সকল কারায়ী ধার্মিকগণের কতিপয় লোক "য়াহূদী জাতির জন্য শোককারী" সন্ন্যাসীরূপে (হিব্রু ভাষায় আবীলী সিয়্যন) পরিচিতি লাভ করেন। ইহাদের সহিত কতিপয় রাব্বীপন্থী য়াহূদী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই শক্তিশালী মাসীহী অনুভূতির আরও একটি উল্লেখযোগ্য ফল হিসাবে কারায়ীদের জীবন যাপন অত্যন্ত বিষণ্ন ও আনন্দহীন হইয়া দাঁড়ায়। ইসরা'ঈলীদের দুঃখজনক নির্বাসন গমনের স্মৃতির সহিত সংগতিহীন বিধায় 'সাব্বাথ' ও 'পাসওভার' (Passover) উৎসবের মতো ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আমোদ-আহ্লাদ সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়। অপরদিকে মাসীহবাদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও তান্ত্রিকতাবাদ, যাহা রাব্বী বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট বিকশিত হইয়াছিল, কারায়ী বুদ্ধিজীবিগণ ইহাকে অধর্ম ও পাপাচার বলিয়া স্পষ্টরূপে নিন্দা করে।

ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে রাব্বীপন্থী ও কারায়ীপন্থীদের রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য এইখানেই স্পষ্ট যে, জনমত ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে রাব্বীগণ বাইবেলের নিয়ম কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিথিল বা সংযোজন করে। কিন্তু কারায়ী মতবাদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সেইগুলিকে পরিহার করে। উদাহরণস্বরূপ "হত্যার বদলে হত্যা" নিয়মের পরিবর্তন

করিয়া আর্থিক জরিমানা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা, কোনও প্রাণীর গোশত তাহার মাতার দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা পথ্য প্রণালীর ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা, চন্দ্র-কলা পর্যবেক্ষণের নির্ধারিত গাণিতিক পঞ্জিকার বিকল্প পদ্ধতি প্রণয়ন করা ইত্যাদি। ফলে কারায়ী মতবাদের কোনও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধিত হইতে পারে নাই। জেশুয়াহ্ ইব্ন জুডাহ কর্তৃক (৫ম/১১শ শতাব্দীতে) আত্মহননের বিধান বা তথাকথিত ব্যভিচারতত্ত্বের (হিব্রু রিককূব, আরবী তারকীব)। কিছুটা শিথিলীকরণ এই ধরনের মৌলিক সংস্কারের একমাত্র ব্যতিক্রম। কারণ বাইবেলে বর্ণিত নিষিদ্ধ আত্মীয়বর্গের তালিকা অনুযায়ী সীমাহীনভাবে একের পর এক সাদৃশ্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে গিয়া কারায়ীগণের পক্ষে বিবাহের জন্য আইনসঙ্গত সঙ্গী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য ছোটখাটো সংস্কার প্রচেষ্টা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তবে জীবনের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে শুধু স্থানীয়ভাবে কিছু সংস্কার প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়। যেমন ঃ সাব্বাথের সময় বাইবেলে বর্ণিত সকল প্রকার আগুনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আইন শিথিল করা, সাব্বাথের পূর্বে সিনাগগকে আলোক সজ্জিত করার অনুমতি প্রদান; সাব্বাথ চলাকালে ঘর গরম রাখিবার জন্য চুল্লী প্রজ্বলিত (সাব্বাথের পূর্বেই প্রজ্বলিত) রাখা এবং সাব্বাথের দিনে খাদ্যদ্রব্য গরম রাখা, রাশিয়া ও পোলাণ্ডে প্রচণ্ড শীতের সময় জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ব্যবহারের অনুমতি এবং উত্তরাঞ্চলীয় দেশের যেখানে নূতন চাঁদ দেখা প্রায়শ অসম্ভব, সেই সকল অঞ্চলে পবিত্র দিবসসমূহের যতদূর সম্ভব ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে চাক্ষুষভাবে চন্দ্রদর্শনভিমিক পঞ্জিকার পরিবর্তে গাণিতিক পঞ্জিকার প্রবর্তন করা।

এই সকল গৌণ সংস্কার সত্ত্বেও বিবাহ (নিঃসন্তান বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বাধ্যতামূলকভাবে বিবাহের সাবেক আইন নিষিদ্ধ করা), উত্তরাধিকার (মৃত স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর কোন অধিকার না থাকা), খাদ্য গ্রহণ, সাব্বাথের বিশ্রাম, শাস্ত্রীয় পরিচ্ছন্নতা, পবিত্র দিবসের তারিখ (য়াহূদী ধর্মশাস্ত্রের একটি অতি প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী পেনটিকেস্ট পর্বের তারিখ সুস্পষ্টরূপে রবিবারে নির্ধারিত) ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাব্বাইদের তুলনায় কারায়ীদের শাস্ত্রীয় বিধি এখনও অনেক নিয়ন্ত্রিত। ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, ৪র্থ-৫ম/১০-১১শ শতাব্দীতে সিরিয়া ও মিসরে এমনকি সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যেও কারায়ী ও রাব্বায়ীদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক মিশ্র বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। তবে ঐ সকল বিবাহ চুক্তিনামায় উভয় পক্ষ নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথা অনুসরণ করার অধিকার শর্ত হিসাবে সংযোজিত হইত। পরে অবশ্য মিশ্র বিবাহ লোপ পাইতে থাকে এবং কদাচিৎ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। বহুবিবাহ কারায়ী বিধানে কখনই নিষিদ্ধ ছিল না (পাশ্চাত্যের রাব্বায়ীগণ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছিল)। তবে এমনকি মুসলিম দেশে বসবাসকারী কারায়ীগণ কদাচিৎ বহুবিবাহ প্রথা অনুসরণ করিত এবং পাশ্চাত্য স্থানীয় আইন অনুসারে বহুবিবাহ ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার (কারায়ী ও রাব্বাই উভয় সম্প্রদায়ে স্থানীয় আইন মানিয়া চলার রীতি স্বীকৃত ছিল)।

জ্যেষ্ঠ আরান (৭ম/১৩শ শতাব্দী) কর্তৃক কারায়ী উপাসনা রীতি বিধিবদ্ধ করার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শুরুতে কারায়ীদের গোঁড়ামী শুধু বাইবেলে বর্ণিত ধর্ম সঙ্গীত ব্যবহারের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উপাসনা করার উপর অত্যধিক জোর দিয়াছিল। তাঁহারা বাইবেলের সম্পূরক হিসাবে পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক রচিত গদ্য ও পদ্যে প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে রাব্বী উপাসনা পদ্ধতির সমালোচনা করেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তন এবং বিস্তৃত ও কাব্যসমৃদ্ধ রাব্বী উপাসনা পুস্তকের প্রভাব লক্ষ করিয়া আরানের প্রদর্শিত উপাসনা রীতির সহিত পরবর্তীকালে গদ্য ও পদ্য স্তবগান ইত্যাদির সংযোজনের ফলে কারায়ী উপাসনা পুস্তক অদ্যকার এই বৃহদাকার রূপ লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন য়াহূদী সম্প্রদায়, বিশেষত একদিকে সাদুকী ও মরু সাগর অঞ্চলের সম্প্রদায়, অপরদিকে ইসলাম, বিশেষত শী'আদের সহিত কারায়ী সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তখনও খুবই ঘোলাটে ছিল এবং পক্ষে বিপক্ষে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কারায়ী মতবাদ মুসলিম সামাজিক পরিবেশে সৃষ্ট হওয়ার কারণেই সম্ভবত য়াহূদীদের প্রাচীন বিরোধী ধারার সহিত তাহাদের একটা সংযোগ লক্ষ করা যায়। কিন্তু য়াহূদী ধর্ম-সম্প্রদায়ের পূর্বসূরীদের সহিত তাহাদের সরাসরি কোনও ধারাবাহিক সংযোগ নিশ্চিতভাবেই অনুপস্থিত। আবার ইসলামের সহিত সেইরূপ কোনও সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। আমাদের কাছে সংরক্ষিত বর্তমান তথ্য অনুসারে যে কোনও দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কারায়ী মতবাদ য়াহূদীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চিন্তাজগতের একটি মৌলিক সৃষ্টি।

৪. মুদ্রণ ঃ রাব্বী য়াহূদীগণ Gutenberg-এর উদ্ভাবনকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কাজে লাগায় এবং ১৪৭০ সাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের বন্যা বহাইয়া দেয়। কিন্তু কারায়ীগণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছাপাখানার ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। ১৫২৮-৯ খৃ. ভেনিসে অবস্থিত ডেনিয়েল বোমবার্গের খৃষ্টান ছাপাখানার একজন রাব্বী মুদ্রাক্ষরিকের সহায়তায় উপাসনা রীতি সম্বন্ধীয় কারায়ী পুস্তকের একটি সংস্করণ প্রথমবারের মতো ছাপা হয়। কারায়ীদের দ্বিতীয় মুদ্রিত পুস্তকটি ছিল বাশয়াচী রচিত "আদ্দেরেত এলিয়্যাহু"-এর সংস্করণ। বিখ্যাত রাব্বী মুদ্রাকর পরিবারের সদস্য গার্‌শম কর্তৃক ইস্তাম্বুলের সন্‌সিনোস ছাপাখানায় ১৫৩০-১ খৃষ্টাব্দে ইহা ছাপা হয়। ১৫৮১-২ খৃ. আরও দুইটি ক্ষুদ্র কারায়ী পুস্তক বেনামীতে সম্ভবত রাব্বী ছাপাখানা ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৬৪৩ খৃ. মানাস্‌সেহ ইব্‌ন ইসরায়েল (Oliver Cromwell-এর সংবাদাতা)-এর আমস্টারডামস্থ ছাপাখানায় একটিমাত্র কারায়ী পুস্তক ছাপা হয়।

আফদাহ (আফিদাহ) ও সাব্বেথাই য়েরাকা ভ্রাতৃদ্বয় হইলেন প্রথম কারায়ী মুদ্রক যাঁহারা ১৭৩৩ খৃ. ইস্তাম্বুলে অল্প কিছু উপাসনা-রীতি সম্বন্ধীয় নমুনা মুদ্রণ করেন। কিন্তু ইহার পরপরই তাঁহারা ক্রিমিয়ার 'চুফুত-কালে' গমন করেন এবং সেখানে ১৭৩৪-৪১ খৃ. কিছুসংখ্যক পুস্তক মুদ্রণ করিবার পর এই কাজ পরিত্যাগ করেন। ১৮০৪ খৃ. একটি নূতন কারায়ী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ ছাপাখানা হইতে ১৮০৪-৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও চারিখানা পুস্তক ছাপা হয়। ১৮৩৩ খৃ. ক্রিমিয়ার ইউপেটোরিয়ায় (গোযলো) প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানটি প্রথমবারের মতো কমবেশী সফলতা অর্জন করে এবং ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ করে।

ছাপাখানার ব্যাপারে কারায়ীদের এই উদাসীনতার কারণ সম্পর্কে শুধু আন্দাজ অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবত ঐতিহ্যগতভাবে নূতন কিছুকে গ্রহণ করার প্রতি অনাগ্রহ তাহা— যতই প্রয়োজনীয় হউক এবং

সম্ভাব্য পুস্তক ক্রেতার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় ইহা লাভজনক ব্যবসার পরিবর্তে নেহায়েত পরহিতৈষীর কাজরূপে গণ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কারায়ী মতবাদ সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না, (১) J. Furst (Geschichte des karaerthums, Leipzig 1862-9) এবং; (২) W. H. Rule (History of the Karaite Jews, London 1870), প্রাচীন গ্রন্থাদি যথেষ্ট সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে; (৩) Z. Cahn, The Rise of the Karaite sect, New York 1937, গ্রন্থটিতে গুরুত্বহীন সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়; (৪) S. Poznanski রচিত বিবরণ, Encyclopaedia of Religion and Ethics, vii 662-72; এবং (৫) I. Markon, Encyclopaedia Judaica, ix, 923-45 গ্রন্থে, পরে ইচ্ছা যথাক্রমে ঃ (৬) L. Nemoy-এর Encyclopaedia Judaica (ইংরেজীতে), x, 761-85; (৭) S. Pinsker's Likkute Kadmoniyyot, Vienna 1860-এ সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হইলেও প্রথমবারের মতো প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; (৮) J. Mann রচিত Texts and studies, ii ঃ Karaitica, Philadelphia 1935, একটি বহুমুখী তথ্য ও গবেষণায় পরিপূর্ণ জ্ঞানকোষ হইলেও ইহার অধিকাংশ ১৫০০ খৃ.-এর পরে আধুনিক কালের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত; (৯) R. Mahler রচিত Karaimer, New York 1947, গ্রন্থটি কারায়ী মতবাদের একটি রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক আন্দোলন হিসাবে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা। ধর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া কারায়ী মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত পূর্বতন গ্রন্থাদির পাশাপাশি ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ইহার ফলে সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আরবী ভাষায় কারায়ী সাহিত্য চর্চার ইতিহাস ঃ (১০) M. Steinschneider-এর Die arabische Literatur der Juden, Frankfurt-on Main 1902, (Addenda by poznanski in OLZ, vii, 1904), এই গ্রন্থটিতে স্পষ্টত ইহার প্রকাশের পরের কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশিত গ্রন্থের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; (১১) কারায়ীদের সাদিয়াহ বিরোধী বিতণ্ডার চিত্র S. Poznanski, The karaite Literary opponents of saadiau Gaon. London 1908, গ্রন্থে পাওয়া যায় ; (১২) B. Revel, The karaite halakah, i (all published), Philadelphia 1913, গ্রন্থটি কিছুটা সেকেলে ধরনের; (১৩) L. Nemoy, Karaite Anthology, New Haven 1952, ইহা ১৫০০ খৃ.-এর পূর্বেকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ ও টীকা টিপ্পনীযুক্ত ইংরাজী অনুবাদ; (১৪) I. Husik, A history of medieval Jewish philosophy, New York 1916 গ্রন্থে প্রধান কারায়ী দর্শন বিষয়ক লেখকগণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে; (১৫) P. S. Goldberg. Karaite liturgy and its relation to synagogue worship, Manchester 1957 গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক গবেষণা পুস্তক হইলেও ইহা শুধু হিব্রু ভাষায় কারায়ী পুস্তকসমূহের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে। আরবী ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহ ছাড়া বিশেষত আল-কিরকি সানীর উপাসনা-রীতির ধারানুক্রম; (১৬) L. Nemoy. The liturgy of al-Cirqisani, in Studies in honour of I. Edward Kiev, New York 1971, ইহা সম্পূর্ণ বিবেচনা-বহির্ভূত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেখুন ঃ (১৭) S. W. Baron, A social and religious history of the Jews, New York 1957. v. 209-85, 388-416 (কারায় মতবাদ সম্পর্কে আরো জানিবার জন্য দেখুন নির্ঘন্ট, ১ম খণ্ড হইতে ৮ম খণ্ড, নিউইর্য়ক ১৯৬০); (১৮) Z. ankori, Karaites in Byzantium, New York 1959; (১৯) N. Wieder, The Judean scrolls and karaism, London 1962; (২০) A. Paul, Ecrits de Qumran et sectes Juives aux premiers siecles de l' Islam : recherches sur l' origine du Qaraisme, Paris 1969 (কারায়ী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 'আনান-এর ভূমিকা, কুমরান ও কারায়ী মতবাদের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত); (২১) S. Poznanski, Karaische Drucke und Druckereien (অসম্পূর্ণ), in Zeitschrift fur hebraische Bibliographie, xxi-xxii (1918-20), কারায়ী মতবাদ সম্বন্ধে আরব লেখকগণের (আল-বীরূনী, আশ-শাহারাস্তানী, আল-মাকরীযী ও অন্যান্য) রচিত পুস্তকাদি কারায়ী তথ্য মাধ্যমও সমূহের কোনও যাচাই-বাছাইহীন তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত এবং প্রায়শ ভ্রান্ত ও বিকৃত সুতরাং এইগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্তই কম।

L. Nemoy (E.I.^{2})/ নূরুল আমিন

৫. পূর্ব য়ূরোপীয় কারায়ী সম্প্রদায় ঃ বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কারায়ী বসতি ছাড়াও ৯ম শতাব্দীতে কারায়ী মতবাদ খাযার কাগানেটের পশ্চিমাঞ্চলের ছড়াইয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও স্লাভ জাতিভুক্ত কুবান কোসজাক গোষ্ঠীর সদস্যগণ নিজেদেরকে কারায়ী বলিয়া স্বীকার করিত। যাহা হউক, এই সকল এলাকায় কারায়ী জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের নামের সহিত একই সাথে তাহাদের জাতির নামও সম্পৃক্ত হইয়া যায় (কারায়, ব. ব. কারায়লার; কারয়িম, কারাইমি; পোলিশ ও রুশ ভাষায় কারামী; ভাষার নাম কারায় তিলি, কারায়চা, কারাইমচা)। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ ি ণ ক্রিমিয়ার বসবাসকারী বেশীর ভাগ কারায়ী ছিল কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর। কিন্তু ক্রিমীয় খানেটের বসবাসকারী কারায়ীগণ ছিল আইনগত ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী। ম্যানগাপ ও কির্কয়ের অঞ্চলে বসবাসকারী তাহাদের সম্প্রদায় সম্বন্ধে ১৬৬৬ খৃ. বিখ্যাত তুর্কী ভ্রমণকারী আওলিয়া চেলেবি (দ্র.) বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে লিথুয়্যানিয়ার গ্রাণ্ড ডিউক ভিটোল্ড তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে কিছুসংখ্যক ক্রিমীয় কারায়ীকে তাঁহার দেশে বসবাস করিতে দেন। রাজধানী ট্রোকিতে তাঁহার নিরাপত্তা রক্ষী হিসাবে এবং সীমান্তের শক্তিশালী দুর্গসমূহে তাহারা চাকুরী পায়। এইখানে তাহারা নিজস্ব জমি ও স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠী সংগঠনের সুযোগ-সুবিধাদি পায়। ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে যে, লিথুয়ানিয়া হইতে তাহাদের বসতি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে লাক, লভোভ ও হালিচে বিস্তৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পোলিশ ও লিথুয়ানীয় এলাকায় তাহারা সর্বমোট ৩২টি সম্প্রদায় লইয়া গঠিত ছিল। ক্রিমিয়া ও

ইস্তাম্বুলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া ও এই স্থানের (প্রধানত লভোভ ও হালিচ) কারায়ীরা মুসলমানদের নিকট হইতে যুদ্ধবন্দী উদ্ধার ও পূর্বাঞ্চলের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে রত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুদ্ধ ও মহামারী তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতিকে আরও সংকুচিত করিয়া দেয়। তবে আজিকার দিনেও লাক, হালিচ, পানেভেযয়ক, ট্রোকি ও ভিলনায় (উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত) কারায়ী সম্প্রদায়ের ঘন ঘন বসতির অস্তিত্ব রহিয়াছে।

১৭৩১ খৃ. যেখানে প্রথম কারায়ী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল সেই কির্কয়ের বহুকাল পর্যন্ত কারায়ীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কারায়ী খানেট-এর পতনের পর লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত ক্রিমীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে ক্রিমিয়ার কারায়ীগণের ক্রমান্বয়ে য়ুরোপীয়করণ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল গোযলেভে (ইউপেটরিয়া), সেখানে ১৮৩৭ খৃ. তাউরিদিয়ান কারায়ী ধর্ম পরিষদ এবং পরে একটি কারায়ী ধর্মীয় কলেজ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। লিথুয়ানিয়ার ভূ-সীমায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কাল পর্যন্ত ক্রিমিয়ার সহিত যুক্ত ছিল) ১৮৫৭ খৃ. ট্রোকিতে একটি পৃথক ধর্ম পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর পোল্যাণ্ড ইহার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। এই সময় ট্রোকি লিথুয়ানিয়ার পানেভেযয়স সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং পূর্ব হইতে অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হালিচ সম্প্রদায়ের (অস্ট্রীয় শাসনাধীন) উপর তাহাদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রিমীয় ও ট্রোকীয় কারায়ী সম্প্রদায় নিয়মিত যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে এই সময় ১৯৪৫ খৃ. পোলাণ্ডে (ওয়ারশ) একটি পৃথক কারায়ী ধর্ম পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রিমিয়ার কারায়ীগণ দলে দলে য়ুরোপের অন্যান্য অংশে (প্রধানত প্যারিসে) বসবাস করিতে গমন করিয়াছিল। S. Szapszal (১৮৭৩-১৯৬১ খৃ.) নামে একজন প্রতিভাবান নেতা ট্রোকিতে (১৯২৭ খৃ.) ধর্ম পরিষদের প্রধান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কারায়ীদের গোষ্ঠী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ায় কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় (প্রধানত সি. গিনি কর্তৃক ১৯৩৬ খৃ.) প্রমাণিত হইয়াছে যে, কারায়ীদের সহিত Tchuvash-দের সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং পূর্ব য়ুরোপীয় কারায়ীরা মূলত তুর্কী বংশোদ্ভূত হওয়া এবং পরে কারায়ী মতবাদ গ্রহণ করার সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে। তাহাদের ভাষা তুর্কী ভাষা পরিবারের কীপচাক উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ক্রিমিয়ার কারায়ীগণ পশ্চিমা কারাইম হইতে কিছুটা পৃথক, তাহাদের ভাষা প্রকরণ পৃথক, যেমন উমরাঞ্চলীয় (ট্রোকি, পানেভেযয়স ও ভিলনা) এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় (লাক ও হালিচ)। তাহাদের উভয়ের শব্দ ভাণ্ডার ও বাক্য গঠন রীতিতে অসংখ্য আরবী, ফারসী, হিব্রু, স্লাভ ও লিথুয়ানীয় ভাষার ধার-করা শব্দাবলী দেখা যায়। কারায়ী লোকগীতিতে খাযারদের (দ্র.) [হাযার ওগলু ও হাযার বিয় (১ম) ক্রিমিয়ার সঙ্গীতে] সহিত তাহাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া খাঁটি তুর্কী উপাদান বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। যেমন ঘুম পাড়ানী গানের প্রাথমিক সূত্র 'বির বার এদি' (bir bar edi)-এবং বহু ধাঁধা ও উপকথা। তাহাদের সাধারণ সংস্কৃতিতেও খাযারী অতীতের অনুরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় (তালকী ময়দা পেষার প্রাচীন কৌশল, হাযার হেলভাসি বা হাযার কায়মাগী "খাযার ছেলভা' থালাসমূহ, কাতলামা শোক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সপ্ত স্তরবিশিষ্ট পনিরের কেক ইত্যাদি। শত শত বৎসর ধরিয়া কারায়ীদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্পৃহাই ছিল তাহাদের ধর্ম। হিব্রু ভাষা ছাড়াও তাহাদের বুদ্ধিজীবিগণ কারাইম ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন, যাহা ইশ্বরের উপর নরত্বারোপমূলক গুণাবলীর সংজ্ঞাসমূহ বাদ দেওয়ার ফলে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মৌলিকত্বের দাবীদার। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে খৃষ্ট জগত (পোল্যাণ্ডে) ও মুসলিমগণের (ক্রিমিয়ার) প্রভাব দৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়াদির উপর গ্রন্থ রচনা হয়। কারাইম ভাষায় বিখ্যাত কারায়ী লেখকগণ ছিলেন I. Erak (ক্রিমিয়া,উনবিংশ শতাব্দী), Z. Abrahamowicz (হালিচ, ১৮৭৮-১৯০৩ খৃ.), S. Kobecki (ট্রোকি, ১৮৬৫-১৯৩৩ খৃ.), A. Mardkowicz (লোক ১৮৭৫-১৯৪৪ খৃ.) J. Lobanos (ভিলনা ১৯১৮-১৯৪৭ খৃ.), ও S. Firkovic (ট্রোকি, b ১৯৯৭)। রুশ ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক কারায়ী সাময়িকী প্রকাশিত হইত (Karaimskaya Zhizn; Karaimskoe Slovo), পোলিশ ভাষায় (Mysl Karaimska ও কারাইম ভাষায় (Sahyszymyz, "আমাদের চিন্তা" ভিলনা ১৯২৭ খৃ., Karaj Awazy, "কারাইম কণ্ঠস্বর" লাক ১৯৩২-৩৮ খৃ., Onarmach, 'উন্নয়ন' Panevezys, 1937-39)। পূর্ব য়ুরোপীয় বহু সংখ্যক কারায়ী বিভিন্ন তুর্কী গবেষণায় মনোনিবেশ করেন (S. Szapszal, A. Zajaczkowski ও অন্যান্য)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাতানামে, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ৭খ, ৫৮৪-৫, ৫৮৮-৯; (২) Z. A. Firkovic (সম্পা), Sbornik Starinnikh gramot uzakoneniy Rossiyskoy Imperii Rasatel no prav i sostoyaniya russko-poddannikh karaimov, St-petersberg 1890; (৩) C. Cini, I Caraimi d Polonia e Lituania in Genus ii/1-2, Rome 1936, 1-56; (৪) J. Grzegorzewski, Ein turk-tatarischer Dialekt in Galizien, in SB Ak. Wien cxlxvi (1903). 1-80; (৫) T. Kowalski, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Cracow 1929; (৬) A. Mardkowicz, Karaj Sez-bitigi-Karaimisches Worterbuch, Luck 1835; (৭) K. M. Musayev, Grammatika Karaimskogo yazika, Moscow 1964; (৮) O. Pritsck, Das Karaimische, in PTF i, 318-40; (৯) W. Radloff, Proben der Volkliteratur der turkischen Stamme, vii, St.-Petersburg 1896; (১০) D. Sidersky, Le Caraisme et ses doctrines in RHR cxiv (1936), 197-221; (১১) S. Sapsal, Kirim Karai Turkleri, in Turk Yili, Istanbul 1928; (১২) A. Zajac zkowski, Karaims in Poland, Warsaw The Hague-Paris 1961; (১৩) ঐ লেখক, Die karaimische Literatur, in PTF, ii, 793-801; (১৪) ঐ লেখক, Krotki wyklad gramatyki jezyka zachodnio-karaimskiego (narzecze luck-ohalickie), Luck 1931.

W. Zajaczkowski (E. I.[2])/নূরুল আমিন

কারার (দ্র. মূসীক)

আল-কারাস্তূন (القـــرسطون) ঃ শব্দটির উৎপমি সম্ভবত আরমেনীয়-ফারসী, উৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে ইহা দ্বারা দীর্ঘ দণ্ডযুক্ত যন্ত্র বোঝায়, উহার এক প্রান্তে পাথরের একটি ভার দেওয়া থাকিত। ইহা অবশ্যই গ্রীক হইতে উদ্ভূত শব্দ নহে এবং কোনও কোনও লেখক যে মনে করিয়াছেন যন্ত্রটির উদ্ভাবকের নাম হইতেই এই নামটি হইয়াছে-জনৈক গ্রীকের নাম হইতে — তাহা আরও অসম্ভাব্য বিষয়। শব্দটি আরমেনীয় ফারসী মূল হইতে গৃহীত হইয়াছে, এই ধারণা যদি সত্য হয় তবে কারাস্তূন অবশ্যই ছিল এক ধরনের লিভার (Lever) বা তুলাদণ্ড, ইহা শাদূফ-এর অনুরূপ ছিল যাহা দ্বারা কৌশলে পানি তোলা হইত এবং প্রাচ্যের কোনও কোনও দেশে এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রীক ও আরবী পাঠে এই শব্দটি পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় ইহার প্রথম ব্যবহার দেখা যায় Simplicius কৃত এরিস্টোটল-এর Physics-এর ভাষ্য গ্রন্থে। দ্বিতীয় ও শেষ ব্যবহার পাওয়া যায় খৃ. ১২শ শতকের বায়যানটীয় বৈয়াকরণ Tzetzes-এর কবিতাতে। তিনি Marcellus-এর সেনাবাহিনী কর্তৃক সাইরেকিউস অবরোধকালে আর্কিমিডিস কর্তৃক যে যান্ত্রিক পদ্ধতি আনীত হইয়াছিল উহার প্রশংসায় কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। উল্লিখিত উভয় পাঠের মধ্যে প্রথমটিতে উক্ত শব্দটি দ্বারা মানদণ্ড বোঝানো হইয়াছে এবং সাধারণভাবে ধারণা করা হইয়া থাকে যে, উহা ছিল তথাকথিত রোমক মানদণ্ড। দ্বিতীয় পাঠে ব্যবহৃত শব্দটি দ্বারা সম্ভবত বোঝানো হইয়াছে একটি ঋজু লিভার।

মুসলিম পণ্ডিতগণের লেখা হইতেও লিভারেরই ধারণা পাওয়া যায়; তবে কেহ কেহ ইহাকে কাব্বান-এর সমার্থক শব্দরূপেও ব্যবহার করিয়াছেন, উহা দ্বারা বিশেষভাবে রোমক মানদণ্ড বুঝায়। যাহা হউক, প্রথমোক্ত অর্থ অর্থাৎ লিভার, এই অর্থেই যন্ত্রটির বিষয়ে লিখিত একমাত্র টিকিয়া থাকা গ্রন্থ, ছাবিত ইব্ন কুররা-র কিতাবু'ল কারাস্তূনে আলোচনা করা হইয়াছে। তদুপরি ইসলামী সাহিত্যেও শব্দটির এই মূল অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং রোমক মানদণ্ড বুঝাইতে ইহার যে ব্যবহার –যাহা একটি ঋজু লিভারমাত্র ছিল–উহা অবশ্যই ছিল গৃহীত অর্থে।

ইব্নু'ন-নাদীম ও ইব্নু'ল কিফ্‌তীর মতে মুসলিম পণ্ডিতগণ কারাস্তূন সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন, বানূ মূসা, কুস্‌তা ইব্ন লূকা এবং ছাবিত ইব্ন-কুররার রচিত বই। ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত শেষোক্ত বইটির তিনখানি পাণ্ডুলিপি বর্তমান ছিল, বার্লিনের Stadtbibliothek-এ বৈরূতের Library of the Jesuit Fathers-এ এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে; বর্তমানে শুধু শেষোক্ত পাণ্ডুলিপিখানিই টিকিয়া আছে (Arabic No. 767, vii, fols. 198-208)।

এই বইটিতে ছাবিত ইব্ন কুররা কারাস্তূন নির্মাণ কৌশল ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন অর্থাৎ সংক্ষেপে সমজাতীয় পদার্থের একটি লম্বা দণ্ডের সমতা সাধন, দণ্ডটি সমতা কেন্দ্র হইতে দূরে ঝোলানো, উহার অর্থাৎ দণ্ডটির বিভিন্ন স্থানে ওজন বা ভার দেওয়া। বইখানি দুইটি কারণে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। স্থিতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই বইখানিই সর্বপ্রথম প্রকৃতপক্ষে যাহা পরবর্তীকালে displacement operation-এর মূলনীতি বলিয়া পরিচিত হয় তাহার পথ উন্মোচন করে; ছাবিত ইব্ন কুররা বস্তুত এখানে লিভার-এর সমতার শর্তাবলী নির্ধারণ করেন এবং তাহা করেন তিনি এরিস্টোটল-এর Physics and Mechanical problems নামে যে গ্রন্থখানি ভুলক্রমে তাঁহার নিজের রচিত বলিয়া কথিত হয় সেই দুইখানির ভিত্তিতে বলবিদ্যার নিয়ম অনুসরণ করিয়া। গণিতের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইব্‌ন-কুর্‌রা-এর বইয়ের ৪নং প্রতিজ্ঞার যে প্রমাণ তাহা অখণ্ড গণনাপ্রণালীর (Integral calculus) ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমবারের মতো আর্কিমিডিস কর্তৃক ক্ষেত্র হিসাব বা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত কতগুলি পদ্ধতি আধুনিক কালে সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হইল একটি সমপ্রকৃতির দণ্ডের স্থিতীয় বা গতিশীল ভরবেগ হিসাব করিবার জন্য।

অথচ ইব্‌ন-কুর্‌রার বইখানির গুরুত্ব সত্ত্বেও ইহা পাশ্চাত্যের স্থিতিবিদ্যা বিজ্ঞানকে সরাসরি প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয় ও রেনেসাঁর সময়কার সিদ্ধান্তকারিগণ পুনরাবিষ্কার করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা হয়ত ছিল সংশোধিতরূপে এবং আর্কিমিডিসের স্থিতিবিদ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী ইব্‌ন কুর্‌রা মূলত সেগুলি হইতে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেন।

তাঁহার বই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। সম্ভবত তাহা করিয়াছিলেন Gerard of Cremona, অনূদিত সংস্করণের নাম ছিল Liber Karastonis। এর অনুবাদ বর্তমানে যে পাণ্ডুলিপি টিকিয়া আছে উহা হইতে কোনও কোনও বিষয়ে ভিন্নতর, বিশেষ করিয়া ৪নং প্রতিজ্ঞার অর্থ (Liber Karastonis-এর proposition 6) অনুবাদক আদৌ দেন নাই। ইব্‌ন কুর্‌রার বইখানি জার্মান ভাষাতেও অনুবাদ করিয়াছেন E. Wiedemann ১৯১১ খৃ.; এই অনুবাদখানি ভাল হইয়াছে যদিও প্রতিজ্ঞাগুলির ক্রম পরিষ্কারভাবে দেখান হয় নাই এবং জার্মান প্রাচ্যবিদ বইখানিতে কতগুলি প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে সে বিষয়েও ভুল করিয়াছেন। উল্লিখিত দুইখানি হইতেই ভিন্নতর একখানি ফরাসী অনুবাদ করিয়াছেন K. Jaouiche।

ইব্‌ন কুর্‌রা তাঁহার অধিকতর জনপ্রিয় বই ফী সিফাতি ইস্‌তিওয়া'ল-ওয়ায্‌ন ওয়া'খ-তিলাফিহি (ওজনের সমতা ও অসমতার বিষয়)-তেও কারাস্তূন বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বইখানি, যাঁহারা যন্ত্রটি লইয়া কাজ করিবেন অথচ অঙ্কের জ্ঞান যথেষ্ট নাই, তাঁহাদের জন্য এবং এখানে তিনি ঠিক লিভার যন্ত্র সম্বন্ধে যতটা আলোচনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বেশী দুইটি চাটু (pan)-র সমমাত্রা বিষয়ে লিখিয়াছেন। এই বইখানি আমরা পাইয়াছি আলখাযিন (দ্র.)-এর মাধ্যমে। তিনি তাঁহার কিতাব মীযাননি'ল-হিকমা-তে ইহা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, হায়দরাবাদ সং, ১৩৫৯/১৯৪০ পৃ. ৩৩৮।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Buchner. Die Schrift uber den Qarastun von Thabit b. Qurra, in SBPMS Erl., liiliii (1920-1), 141-88; (২) M. Clagett, The science of mechanics in the Middle Ages, Madison 1959; (৩) ঐ লেখক ও E. Moody, The mediaeval science of weights, Madison 1952 (Liber karastonis-এর ল্যাটিন পাঠের জন্য); (৪) H.Diels, Uber das Wort Qarastun, in Wiedemann Aufsatze, ii, 577-8; (৫) P. Duhem, Les origines de la statique, প্যারিস ১৯০৫ খৃ.; (৬) K. Jaouiche, Le Kitab al-Qarastun de Tabit ibn Qurra, আরবী পাঠ, ফরাসী অনু. ও টীকা (প্যারিসে পি. এইচ. ডি.

সন্দর্ভ, ১৯৭২ খৃ.); (৭) মাযহারী, Les origines chinoises de la balance romaine, in Annales ESC, xv (1960), 833-51; (৮) M. Steinschneider, Interno al Liber karastonis, in Annali di Matematica pura de applicata, v (1863), 54-9; (৯) E. Wiedemann, Zur Mechanik und Technik bei den Arabern, in Aufsatze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, Hildesheim 1970, i, 181-2. 236; (১০) ঐ লৈখক, Die Schrift uber den Qarastun, in Bibliotheca Mathematica, xii (1911-12), 21-39; তাহা ছাড়া দ্র. নিবন্ধ মীযান।

K. Jaouiche (E. I.[2])/হুমায়ূন খান

কারাসী (قرهسى) ঃ (১) এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের ৭ম/১৩শ শতকের একজন তুর্কী প্রধানের নাম এবং এই প্রধান হইতে উদ্ভূত বংশের নাম। তাঁহার অঞ্চল (প্রাচীন মিজিয়া) ও দার্দানেলিস প্রণালীর এশিয়া উপকূলের পশ্চাদ্‌ভূমি) অদ্যাবধি সেই একই নাম বহন করিয়া আসিতেছে। এ যাবৎ এই নামের অর্থগত ভাবব্যঞ্জনা ও শব্দ প্রকরণের প্রশ্নে কেবল ভিত্তিহীন মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত এই বংশের সমগ্র ইতিহাস, বিশেষ করিয়া 'উছমানী বিজেতারা এই শাসক বংশের কাহাকে প্রথমে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহা এখনও কুয়াশাবৃত।

বায়যান্টানীয় ঐতিহাসিক ডুকাস (Ducus) আলোচ্য ঘটনা প্রবাহের দেড়শত বৎসর পর কারাসী বংশ সম্পর্কে লেখেন। তিনি পশ্চিম আনাতোলিয়ায় সম্রাট ২য় অ্যান্ড্রোনিকস (Andronicus 11 Palaogos)-এর শাসনামলে (১২৮২-১৩২৮) ঐ অঞ্চলে যেইসব বংশ নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল কারাসী বংশকে সেইগুলিরই অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা কোনও সুস্পষ্ট কালপঞ্জী সরবরাহ করে না, বরং ক্যাটালনীয় অভিযানের (১৩০৪-৬) যে বিবরণ ঐতিহাসিক Muntaner লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহাতে এবং Pachymeres (মৃ. ১৩১৩) প্রদত্ত তালিকায় আলোচ্য নাম অনুপস্থিত থাকায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, আরও দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে যেইসব অনুরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রত্যাশিতভাবেই সেইগুলির কিছুকাল পর কারাসী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুনটেনার ও প্যাকিমিরিস স্বয়ং এবং অর্ধ শতাব্দী কাল পরে অত্যন্ত সুপরিচিত ঐতিহাসিক Nicephorus Gregoras সুনিশ্চিতভাবেই ঐ অঞ্চলে তুর্কীদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দিয়াছেন। ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই তুর্কীরা ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু কেবল দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ গ্রোগোরাস, যিনি বিভিন্ন সন-তারিখ উল্লেখপূর্বক তথ্যাদির বিরবরণ দিয়াছেন, কারাসী শাসককুলের নামটির সহিত সুপরিচিত ছিলেন। (প্যাকিমিরিসের Lamisai-র সহিত গ্রেগোরাসের কারাসীর পিতা Kalamis-এর যে সমীকরণ Mordtmann প্রদান করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্যাকিমিরিসের তালিকায় যে ভৌগোলিক বিন্যাস অনুসৃত হইয়াছে সেই অনুসারে লামিসাঈ-এর রাজ্যের অবস্থান দক্ষিণে কিংবা আনাতোলিয়ার মধ্যাঞ্চলে পড়ে। এই তালিকায় সারূখান বংশের কথাও বাদ পড়িয়াছে)। এই বিতর্কের সমাধান যাহাই হউক, আমাসিয়া (Mysia/মিসিয়া) প্রদেশে যেই সব তুর্কী বসতি স্থাপন করে তাহাদের মূল পরিচয় নিরূপণ করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের গ্রন্থকারগণ এই বংশটিকে আনাতোলিয়ার তুর্কোমানী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম বলিয়াছেন। তবে এই ঢালাও আখ্যায়নে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন কয়েকটি বংশ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে কাগাসী নামক এক ব্যক্তি দানিশমান্দী বংশের লোক বলিয়া দাবী করিয়াছে। এই সমাধি লিপির ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর বিখ্যাত দানিশমান্দী রাজবংশের সঙ্গে ৮ম/১৪শ শতাব্দীর এই ক্ষুদ্র শাসক বংশের একটা যোগসূত্র প্রদর্শনের প্রয়াস লওয়া হইয়াছে। তবে সমাধিলিপিটি পাওয়া যায় কারাসী রাজ্যে নয়, বরং সাবেক দানিশমান্দী রাজ্যের আঞ্চলিক এলাকায় তোকাট নামক স্থানে। এখানে যে নামের মিল তাহাতে কিন্তু ঐ দুইটি যে অভিন্ন তাহা বুঝাইতেছে না। ইহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট পক্ষে দানিশমান্দী রাজবংশের সঙ্গে এই বংশের যে সম্পর্ক দাবী করা হইয়াছে তাহা আরও বেশী করিয়া দানিশমান্দী রাজবংশের সন্দেহাতীত খ্যাতির ইঙ্গিতবাহক। ইহা সত্য যে, আনাতোলিয়ার পশ্চিম প্রান্ত এলাকায় ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে দানিশমান্দী বংশের কথা জানা যায়। তবে কিছু প্রাচীন বংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রথমদিকে যেইসব নূতন তুর্কোমান শাসককুলের উদ্ভব ঘটিতেছিল সেইগুলির সঙ্গে আরও কোনও সম্পর্ক ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। ইহা ছাড়া দৃশ্যত কারাসী তুর্কীরা যদি পূর্বদিকে হইতে প্রবেশ করিয়া থাকে (যেমনটি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল) তাহা হইলে ইহাও স্পষ্ট যে, ঐ তুর্কীদের সহিত সম্পূর্ণত ভিন্ন এক জাতির লোকও তাহাদের সঙ্গে আসে। এইভাবে আমরা জানিতে পারি যে, আনাতোলিয়ার যখন মোঙ্গলদের হাতে স্বাধীন সালজূক শাসনের পতন ঘটে তখন কিছুসংখ্যক তুর্কী ও তুর্কোমান সুলতান 'ইয্যু'দ-দীন কায়কাউসের সহিত বায়যান্টিনীয় অঞ্চলে পালাইয়া যায় এবং পরিশেষে দব্রুজায় নিজেদের বসতি স্থাপন করে।

এখানে তাঁহারা দক্ষিণ রাশিয়া হইতে আগত লোকদের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং কমবেশী অনেকেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। ৮ম/১৪ শতাব্দীর প্রারম্ভের গোলযোগপূর্ণ সময়ে ইহাদের কিছু লোক বিবদমান পক্ষগুলির ডাকেই হউক কিংবা নিজেদের উদ্যোগে হউক, খালীল নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয় ও পরিশেষে দার্দানেলিস প্রণালীর অপর পারের সঙ্গে এক ধরনের সেতু নির্মাণ করিয়া থ্রেস ও মিজিয়ায় ফিরিয়া আসে।

ইব্‌ন বাত্তূতা ও আল-'উমারী আনু ১৩৩০ অব্দ আলোচ্য অঞ্চলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে ঐ আমলের তথ্যাদির ব্যাপারে আমরা একটি শক্ত বুনিয়াদ পাইয়াছি। ঐ সময়ে নিশ্চয়ই দুই ভাই দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন (আল-উমারীর গ্রন্থের প্রাচীন সংস্করণগুলিতে তথ্যের অসমাপ্তির কারণে উল্লিখিত দুই ভাইয়ের প্রশ্নে এই আলোচনার অবতারণা)। একজনের নাম দিমির খান (دمر خان), যিনি বালকাস্‌রী (بلكسرى) রাজ্যের (আল-'উমারীর বর্ণনা অনুসারে প্রাচীন নাম আকিরাস) এবং অপর ভাইয়ের নাম য়াখ্‌শী (বাখ্‌শী) খান (يخشى خان); ইনি বারগামা (برگمه)-র শাসক ছিলেন। আল-উমারী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও ঐ দুই ভাইয়ের পিতার নামও কারাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 'কালামিস' (কালাম শাহ্‌ বা আলাম শাহ্‌) নয় যাহা কখনও কারাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম নহে। ইব্‌ন বাত্তূতার বর্ণনা অনুসারে দিমির খানের পিতাকে বারগামা রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (এই নামকরণ তিনি করেন নাই)। পর্যটক ইব্‌ন বাত্তূতা যখন বারগামা সফর

করেন তখন প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনও মসজিদ ছিল না। Cantacuzenos নাম দুইটির অস্তিত্ব সুনিশ্চয়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যদিকে উছমানী সূত্রগুলির সবগুলিই কমবেশী কারাসী বংশকে আশিক পাশা যাদে (عاشق پاشا زاده)-র সহিত সম্পর্কযুক্ত দেখাইয়াছেন এবং 'উছমানী বিজেতারা কারাসী রাজ্যে পদার্পণ করার আগে অবধি উহাদের কেহই কারাসী শাসক বংশের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। উছমানী সূত্রগুলি আনু. ৭৩৫/১৩৩৫ সনে ইনতিকালকারী শাসকের নাম 'আজলান বেগ (عجلان بیک) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে যাঁহার পিতার নাম কারাসী। 'আজলান বেগের দুই পুত্র ছিল বলিয়া কথিত আছে, যাঁহারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত ছিল। এই পুত্রের একজন তুরসূন (طرسون) ও তাঁহার উযীর হাজিজী-ইলবেগী ভ্রাতার বিরুদ্ধে ওরখান (اورخان)-এর সাহায্য কামনা করেন এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অংশবিশেষ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ইহার পর তুরসূন ভ্রাতার হস্তে নিহত হইলে ওরখান গোটা রাজ্যটি দখল করেন।

'উছমানী সূত্রগুলিতে এই আমলের ঘটনাপঞ্জী অস্পষ্ট এবং সেইগুলিকে সহজতর করিবার প্রবণতা দেখা যায়। ইহা হইতে কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতে পারে যে, যেই পুত্রের নাম পাওয়া যায় না তাহার জন্য কারাসীর উপাধি ছিল 'আজলান। তিনি দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই ব্যক্তি ও ইব্ন বাত্তূতা উল্লিখিত দিমির খান খুব সম্ভব (সূত্রসমূহের পক্ষপাত নির্বিশেষে) একই ব্যক্তি। কারণ ইব্ন বাত্তূতাও তাঁহার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, য়াখ্শী খানও (এটিও একটি খিতাব বিশেষ, যাহার অর্থ উত্তম খান) তুরসূন হইতে পারেন। তাহা ছাড়া ইহাও নিশ্চিত যে, বিভিন্ন সূত্রে যতটা আগে কারাসী রাজ্য 'উছমানী সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, কার্যত তত শীঘ্র উহা নাও হইতে পারে। কারণ সুলায়মান নামে পরবর্তীতে আরও একজন কারাসী শাহযাদার দখলে তখনও কয়েকটি রাজ্য রহিয়াছিল। সম্ভবত তিনি সামন্ত শাসক হিসাবে ওরখানের মৃত্যু কালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বহাল ছিলেন এবং এই সময়ে তুর্কী ও বায়যান্টিনীয়দের মধ্যে যে সব সশস্ত্র সংঘাত ঘটে তিনি উহাতে যোগ দেন। অবশ্য ইহার পর কারাসী রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং অনেকটা পরে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মত এই রাজ্যটি 'উছমানী রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। অবশ্য ইহা আর তীমূরের হাতে পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। তদ্সত্ত্বেও, এই কারাসী রাজ্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যথেষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছে যাহার ফলে কারাসী নামটি ঐ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া বজায় ছিল।

'উছমানী প্রদেশ হিসাবে কারাসী কমবেশী উহার সাবেক রাজ্যের সীমার মধ্যেই বহাল থাকায় ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে মুনাজ্জিম বাশী যেমন, তেমনি আজ আমরাও এই রাজ্যের সীমারেখা অনেকটা নিখুঁতভাবে নিরূপণ করিতে সমর্থ। কয়েকটি বায়যান্টাইন শহর যেগুলি অরক্ষিত মুক্ত পল্লী এলাকাগুলি অপেক্ষা অনেক দিন অপরাজেয় ছিল সেইগুলি দখল হইবার পর ইহা একটি আয়তাকার ভূভাগ সৃষ্টি করে। ইহার উত্তরে মর্মর সাগরের পশ্চিম অর্ধাংশ ও দার্দানেলিস প্রণালী, পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণে বেকিরকে (Bekircay) উপত্যকা এবং পূর্বে সীমাবসু ও সুসুরলু। বারগামা প্রদেশের বিপরীতে অবস্থিত ছিল মিতিলিনি বা লেসবোস দ্বীপ (মিদিলী)। এই দ্বীপ চিরকাল বায়যান্টিনীয় সম্রাট কিংবা তাঁহাদের সামন্ত শাসকগণের শাসনাধীন ছিল। অদ্যাবধি একমাত্র ভুলক্রমে ছাড়া কারাসী শাসকদের কোনও মুদ্রা, উৎকীর্ণ লিপি বা ওয়াক্ফ-এর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই, যদিও আল-'উমারী উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল 'জেনোয়ার' জনৈক সওদাগরের তথ্যের ভিত্তিতে কারাসীদের বিভিন্ন মুদ্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমনও হইতে পারে যে, এখানে সেখানে প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র মূল্যমানের মুদ্রার মধ্যে কিছু কারাসী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল, তবুও অদ্যাবধি এই ধারণা নিছক কল্পনা বৈ কিছু নহে।

'উছমানী ঐতিহাসিকেরা কারাসী রাজ্যটির বিবরণ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোলাটে করিয়াছেন। অথচ এই রাজ্যটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে, ইহা দার্দানেলিস প্রণালী পার হইবার পথ প্রশস্ত করিয়াছিল, যেই কাজের কৃতিত্ব 'উছমানী ঐতিহাসিকেরা একান্তভাবে মুরাদকে দিয়া থাকেন। কারাসী শাসকদের নৌ-অভিযানসমূহের কথা আল-'উমারী আগেই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত কারাসী নাবিক তথা নৌ-সেনারা এই ক্ষেত্রে 'উছমানীগণের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কয়েকজন কারাসী শাসক 'উছমানীদের পক্ষাবলম্বন করেন ও 'উছমানী শাসকদের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। এই সব শাসকদের মধ্যে সম্ভবত আছেন বিপুল খ্যাতির অধিকারী Evrenos [এভ্রেনোস দ্র] যাঁহার নামের উৎপত্তি সম্ভবত সাময়িকভাবে গ্রীককৃত ভানা/এভরেন হইতে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১-মুখ্য সূত্রসমূহ ঃ (১) Pachymere, ii, 316, 389; (২) Nicephorus Gregoras, ১খ, ২১৪, ৭৬১; (৩) Ramon Muntaner, Cronica, catalana; (৪) Ducas, সং. বন. ১৩-১৪ সং, Vasile Grecu, বুখারেস্ট ১৯৫৮ খৃ., ৩৪; (৫) Cantacuzenos, ১খ, ৩৩৯, ২য়, ২৭৬, ৫০৭; (৬) আল-'উমারী, সম্পা. Taeschner, ৪৩-৪; (৭) ইব্ন বাত্তূতা, ২খ, ২৮১, ৩১৬, অনু Gibb, ৪৪৯; (৮) ইনশা, প্যারিস পাণ্ডুলিপি ৪৪৩৭ (যাহাতে দিমির খানকে শুজাউ'দদীন এই লাকাব বা সম্মানসূচক খিতাব দেওয়া হইয়াছে); (৯) ইসমাঈল হাক্কী, কিতাবেলার ইস্তাম্বুল, ১৯৭২ খৃ. ৪৩; (১০) নাশরী সম্পা. Unatkoymen, ১৬৪-৭০; (১১) 'আশিক পাশা যাদে, সম্পা. ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., ৪৩-৫; (১২) মুনাজ্জিম বাশী, ৩খ. ৩৬। ২—গৌণ সূত্রসমূহ ঃ (১৩) আহমাদ তেভহীদ বালিকাস্রিদি কারাসী, ও গুল্লারী, TOEM-এ ২খ, নং ৯, ৬৫৪; (১৪) J. H. Mordtmanu Uber das Turkische Furstengeschlecht der Karasi in Mysien, in SB Pr. Akad, (1911). 1-7; (১৫) J. H. Kramers, in EI[1] দ্র,; (১৬) J. H. Uguncarsili, Anadolu beylikleri, আঙ্কারা ১৯৩৭ খৃ., ৩৩-৫; (১৭) প্রাগুক্ত, IA দ্র. : (১৮) P. Wittek, ইয়াজিযিওগ্লু 'আলী on the Christian Turks of the Dobruja, BSOAS-এ, ১৪খ, (১৯৫২ খৃ.), ৬৩৯-৬৮; (১৯) P. Lemerle L'Emirat d'Aydin, Byzance et l'Occident প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., ২০৪., নং ১; (২০) I. Beldicenu-Steinherr Les actes des Premiers Ottomans, ১০১-৩ ও সূচী।

Cl. Cahen (E. I.[2])/আফতাব হোসেন

একটি প্রশাসনিক প্রদেশ ঃ [কারাসী শাসক বংশের (উপরে দ্র.)] শাসনাবসান ও এই রাজ্য 'উছমানীদের পদানত হইবার পাঁচ শতাধিক বছর পরেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কারাসী নামে পরিচিত ছিল। কারাসী অঞ্চলের

সানজাক এলাকাটি অবশ্য কারাসী ওগুল্লারী শাসনাধীন প্রাচীন এলাকায় ঠিক পড়ে না। কানাক কাল'আ ও দার্দানেলিস অঞ্চলটি একটি পৃথক জিলা হিসাবে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়।

'উছমানীগণ দার্দানেলিস প্রণালীর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে কতটা আগ্রহী ছিল ইহাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কারাসী অঞ্চলের সানজাকে এলাকাটি বালিকাসির সমভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। সেইজন্য ঐ অঞ্চলের কেবল ইদরেমিদ ও আয়ওয়ালিক (ایوالق) এই একদিকে খোলা ছিল। ইরদেক-এর কাদা'র সঙ্গে ইহা ১৮৪৬ খৃ. যুক্ত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলটির আরও একটি দিক সাগরে সংযুক্ত হয়। এই সাগরের নাম মর্মর সাগর। এই অঞ্চল ক্রমান্বয়ে বুরসা প্রদেশের উপর দিয়া সম্প্রসারিত হয়। ১৯২৬ খৃ. হইতে কারাসীর বিলায়েতকে বালকাসিরের বিলায়েত হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং আয়ওয়ালিক বুরহানিয়া ইদরেমিদ, হাওরাল, ইবরিনদি, সাওয়াস টিপি, বালিয়া, গনেন ইরদেক, বানদিরমা, মানিয়াস, সুসুরলুক, বালিকাসির, বিজাদিক, সিন্দিরজি, কেপসূত ও দুরসূনবে স্থানগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. H. Uzuncarrsili, Karasi vilayeti tahricesi, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ খৃ. ; (২) ঐ লেখক, Anadolu beylikleri, আঙ্কারা ১৯৬৯ খৃ., ১০২-৩ খৃ., (৩) R. Stewig, Bati Anadolunu bolgesinin kulturel gelismesini gosteren kartografik bilgiler, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ., pls. XXVI, XXVII, খণ্ডে সমসাময়িক কালের প্রশাসনিক জিলার বিভিন্ন রদবদল ও পরিবর্তন প্রদর্শক মানচিত্রাবলী; (৪) Bedriye Tolun-Denker-এর Balikesir ovasinda yerlesme ve iktisadi faaliyetler, ইস্তাম্বুল ১৯৭০-এ প্রদত্ত সাম্প্রতিক বিবরণ ও ভৌগোলিক বিশ্লেষণ; (৫) X. de Planhol, Notes sur la rigion du coude du Simav, in Revue Geographique de l'Est, ৪খ, (১৯৬৪ খৃ.), ৩৯৯-৪১৩।

X. de Planhol (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

কারাসূ-বাযার (قرصو بازار) ঃ ক্রিমিয়ার একটি ছোট শহর। ইহা সীমফিইর'পল (Simferopol)-এর পূর্ব দিকে ৪৫°১ó উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩৪°৩ó পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৭৩৬ খৃ. রুশগণ বাগ্চা সারায় (দ্র.) বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ায় কিছুকালের জন্য কারাসূ-বাযার খান-এ আবাসস্থল ছিল, কিন্তু পরবর্তী বৎসর (১৭৩৭ খৃ.) রুশগণ জেনারেল ডগ্লাস (Douglas)-এর নেতৃত্বে এই শহরটিও অধিকার করিয়া লয়। অদ্যাবধি এইখানে প্রাচ্যের সভ্যতার নিদর্শন বিদ্যমান। অনেক পণ্যাগার ও কফিখানাসহ সেইখানে বহুসংখ্যক পান্থশালা (خان) ছিল। বিশাল তাশখানটি, যাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি দুর্গ হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছ, তাহা অদ্যাবধি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডন্ নদীর জলদস্যুরা এই শহরটি কয়েকবার লুণ্ঠন করে। তু. Veliaminof Zernof, Materiaux pour servir a l'histoire du Khamat de Crimee, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৪ খৃ., নির্ঘণ্ট।

W. Barthold (E I.[1])/মোঃ সাইয়েদুর ইসলাম

আল-কারি'আ (القارعة) ঃ [আ . আল-কার - القرع শব্দমূল হইতে নির্গত, যাহার আভিধানিক অর্থ আঘাত করা, একটি বস্তু অন্য বস্তুর উপর নিক্ষেপ করা, তীব্র ধ্বনি, ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবং কঠিন বিপদ]। আল কারি'আ কিয়ামতের অন্যতম নাম। ইসরাফীল ('আ)-এর সিঙ্গার তীব্র ও ভীতিপ্রদ ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিয়ামতের জন্য উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে [দ্র. মুফরাদাতু'ল-কুরআন, লিসানু'ল 'আরাব, কার'উন (قرع) শব্দমূল প্রসঙ্গে; আল-কাশশাফ, ৪খ, ৭৮৯; ফাতহু'ল-বায়ান, ১০খ, ৪৩]।

কুরআন শারীফের একটি সূরার নাম যাহা উহার প্রথম আয়াত হইতে গৃহীত। উহা আল-কুরআনের ১০১সংখ্যক সূরা এবং সূরাতু'ল-আদিয়াত-এর পর ও সূরাতু'ত তাকাছুর-এর পূর্বে সন্নিবেশিত। উক্ত সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররামায় অবতীর্ণ হয় (আল-কাশ্‌শাফ, ৪খ, ৭৮৯; লুবাবু'ত-তাবীল ফী মা'আনি'ত-তানযীল, ১খ. ৮ ; আল-ইতকান, ১খ, ১০)। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই সূরাটি সর্বস্বীকৃতরূপে মাক্কী [(মক্কায় অবতীর্ণ) রুহু'ল মা'আনী, ৩খ, ২২০ ; ফাতহু'ল-বায়ান, ১০খ, ৪৩০ ; আল-বাহরু'ল-মুহীত, ৮খ, ৫০৬]। এই সূরাটির মধ্যে একটি রুকূ' ও এগারোটি আয়াত আছে (রুহু'ল-মা'আনী, ৩০খ, ২২০)।

পূর্বের সহিত এই সূরার সংযোগ ও সম্পর্কের জন্য দ্র. আল-বাহরু'ল-মুহীত (৮খ, ৫০৬), রূহু'ল-মা'আনী (৩০ খ, ২২০) ও তাফসীরু'ল-মারাগী (৩০খ, ২২৪)। আলংকারিক রচনাশৈলী ও অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গির জন্য "ফী জিলালি'ল-কুরআন" (৩০খ, ২৩০), বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের জন্য "আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরি'ল-কুরআনি'ল-কারীম" ২৫খ, ২৫২) এবং তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য 'তাফসীর ইবনিল-'আরাবী" পঠনীয়।

আল্লাহর কুদরাত ও মহিমার বিকাশসমূহের মধ্য হইতে একটি বিকাশ সেই কিয়ামত। এই সূরায় সেই কিয়ামতের বর্ণনা ভীতিপ্রদভঙ্গিতে ও জোরালো ভাষার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হইয়াছে। সর্বাগ্রে কিয়ামতের বিভীষিকাময় চিত্র পেশ করা হইয়াছে। অতঃপর ঐ সমস্ত সুফল ও কুফলের বর্ণনা রহিয়াছে, যাহা মানুষ ঐ দিন তাহার আমলের বিনিময়ে লাভ করিবে (ফী জিলালি'ল -কুরআন, ৩০খ, ২৩১ ; তাফসীরু'ল মারাগী, ৩০খ, ২২৫)। রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বর্ণিত আছে যে, যেই ব্যক্তি সূরা আল-কারি'আ তিলাওয়াত করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাহার সৎ কার্যসমূহ ভারী করিয়া দিবেন (আল-কাশ্‌শাফ, ৪খ, ৭৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন মানজূর, লিসানু'ল 'আরাব, আল-কার'উ (القرع) শব্দমূল প্রসঙ্গে; (২) আর-রাগিব, মুফরাদাতু'ল-কুরআন, কায়রো ১৩০৫ হি.; (৩) সিদ্দীক হাসান খান, ফাতহু'ল বায়ান, কায়রো তা. বি ; (৪) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ, কায়রো ১৯৪২ খৃ.; (৫) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, কায়রো তা. বি.; (৬) আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫২ খৃ. ; (৭) আল-মারাগী, তাফসীরু'ল মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ. ; (৮) সায়্যিদ কুতব, ফী জিলালি'ল-কুরআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (৯) ইব্‌নু'ল-'আরাবী, তাফসীরু ইবনি'ল-'আরাবী, কায়রো ১১১৭ হি. ; (১০) তানতাবী জাওহারী, আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরি'ল-কুরআনিল-কারীম, কায়রো ১১০৬ হি.; (১১) আবূ হায়্যান আল-গারনাতী, আল-বাহরু'ল-মুহীত, রিয়াদ তা. বি.।

জাহুর আহমাদ আজহার (দা. মা. ই.)/মুঃ মাহমুদুল হাসান

কারিজ (قارظ) ঃ ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন খালিদ, বানূ যুহ্‌রা গোত্রের হালীফ (মিত্র) ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা) কারিজ-এর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই নির্ভরযোগ্য সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা বিদায় হাজ্জের সময় কুরাশী ও ছাকাফী গোত্রের মুসলমান হয় নাই এমন কেহই বাকী ছিল না। ইহাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অভিমত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, নং ৭০৪৯ ; (২) যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস-সাহাবা বৈরূত তা. বি., ২খ, ৯।

রুহুল আমীন সিরাজী

কারিব (قارب) ঃ (রা) পূর্ণ নাম কারিব ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন মাস্‌'উদ ইব্‌ন মু'আত্তাব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন ছাকীফ আছ-ছাকাফী। তিনি 'উর্‌ওয়া ইব্‌ন মাস'উদ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। অনেকেই তাঁহার নাম 'মারিব' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ অনেক সময় তাঁহাকে 'মারিব' নামে ডাকা হইত। কোনও কোনও রাবী "কারিব অথবা মারিব" উভয় নাম বর্ণনাভুক্ত করিয়াছেন। তিনি কারিব নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন। কারিব-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাকাফী গোত্রের লোক 'উরওয়া ইব্‌ন মাস্‌উদ-কে হত্যা করিবার পর আবূ মুলায়্‌হ ইব্‌ন 'উর্‌ওয়া ইব্‌ন মাস্‌উদ ও কারিব ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ উভয়েই গোত্র ত্যাগ করিয়া ইসলামগ্রহণ মানসে রাসূল (স)-এর নিকট উপস্থিত হন। কাহাকেও মাওলা হিসাবে গ্রহণ করিতে রাসূল (স) উভয়কে আদেশ করিলে তাঁহারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের মাওলা। অতঃপর তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ছাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূল (স) তাহাদের প্রতিমা ধ্বংস করার জন্য আবূ সুফ্‌য়ান ও মুগীরা (রা)-কে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন আবূ মুলায়্‌হ (রা) তাঁহার পিতা 'উর্‌ওয়া ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা)-এর কর্জ পরিশোধ করার জন্য রাসূল (স)-এর নিকট আবেদন জানাইলে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হয়। কারিব তাঁহার পিতা আসওয়াদ-এর ঋণ পরিশোধ করার আবেদন জানাইলে রাসূল (স) বলেন ঃ আস্‌ওয়াদ তো মুশ্‌রিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। প্রত্যুত্তরে কারিব বলিলেন ঃ আমার পিতা মুশ্‌রিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন বটে, তবে আপনি একজন মুসলিমের নিকটাত্মীয়ের সাহায্য হিসাবে এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন। অবশেষে রাসূল (স) ছাকীফ গোত্রের গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হইতে উক্ত দুই পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে আবূ সুফ্‌য়ানকে আদেশ করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে কারিব (রা) রায়াতু'ল-আহ্‌লাফ (راية الاحلاف) অভিযানে শরীক ছিলেন। ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাসূল (স)-এর অভিযানকে রায়াতু'ল-আহ্‌লাফ বলা হয়। মতান্তরে আহ্‌লাফ ছাকীফ গোত্রের একটি উপদল। ছাকীফ গোত্র মূলত দুই উপগোত্রে বিভক্ত ছিল— একটি বানূ মালিক, অপরটি ছিল আহ্‌লাফ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবূ 'উমার রায়াতুল-আহ্‌লাফ-এ কারিবের উপস্থিতি সম্পর্কে বলেন, রাসূল (স) তাইফ অভিযান শেষে ছাকীফ গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, আর তখনই তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু'ল-হাসান মাদাইনী এই ঘটনা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, কারিব মুশ্‌রিকদের পরাজয় অবধারিত বুঝিতে পারিয়া তাহাদের পতাকা গাছের উঁচু ডালে বাঁধিয়া দিতে পরামর্শ দেন, যাহাতে দূর হইতে পতাকা দৃশ্যমান থাকিলে কেহ এই ধারণা করিবে না যে, তাহারা ময়দান ছাড়িয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছে। আর সেই অবসরে তাহাদিগকে ঘোড়াসহ পালাইতে বলেন। মুশ্‌রিকগণ তাঁহার পরামর্শ অনুসারে নিরাপদে পলায়ন করে, অথচ বানূ মালিক গোত্র পতাকা সমুন্নত দেখিয়া দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালায়। ফলে তাহাদের ৭২জনের মত লোক নিহত হয়। কেহ কেহ উল্লেখ করেন, আবূ সুফ্‌য়ান-এর সহিত ছাকীফদের মন্দির ধ্বংসের অভিযানেও কারিব উপস্থিত ছিলেন, তবে ইহা তেমন নির্ভরযোগ্য উক্তি নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২১৯, সংখ্যা ৭০৪৮ : (২) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১৮৬ ; (৩) ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তীআব, ৩খ, ২৭১ (ইসাবার হাশিয়া) ; (৪) যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মাই'স্‌-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৯, সংখ্যা ৯৩।

রুহুল আমীন সিরাজী

কারিনী বংশ (قارنى) ঃ তাবারিসতান-এর একটি আঞ্চলিক রাজবংশ যাঁহারা ১ম খুসরো (Chosroes)-র শাসনকাল ৫৩১-৭৯ খৃ. হইতে ২২৫/৮৪০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য এলাকাগুলির একটি অংশে রাজত্ব করিতেন।

আদিম ইতিহাস ঃ কারিনীরা নিজদিগকে সুখরার পুত্র কারিন-এর বংশধর বলিয়া দাবী করেন— উপকথা-খ্যাত কর্মকার কায়রাহ [দ্র.]-ই যাহাদের পিতৃপুরুষ। আরবী ও ফার্সী উপাখ্যান মতে ১ম কাওয়ায-এর আমলে (৪৮৮-৫৩১ খৃ.) সাসানী সাম্রাজ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সুখরা-ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তৎকৃত Le Regne de kawadh I et le communisme mazdakite গ্রন্থের ৯৪-৫ পৃষ্ঠায় A Christensen উৎস গ্রন্থ সম্পর্কিত যে দ্বন্দ্বে নিজেকে বিজড়িত করিয়াছেন তাহার ফলে সুখরা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যারমিহর প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন ব্যক্তি কি না; তিনি নিজেই সে প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। কারিনীরা ১ম খুসরোর শাসনকালকেই তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধির প্রারম্ভিক কাল বলিয়া মনে করেন। কার্যত আছে, কোনও এক তুর্কী অভিযান (ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ৯৩-৫ ; জাহীরু'দ-দীন) প্রতিহত করিবার লড়াইয়ে যে সাহায্য পান, তজ্জন্য তিনি সুখরার পুত্র কারিন ও যারমিহরকে পুরস্কার দান করেন। বস্তুত ইহা কারিনের গৌরব বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত একটি লোককাহিনী বলিয়া মনে হয়। অভিন্ন নাম হওয়াতে বিশিষ্ট অভিজাত কারিন পরিবারপ্রধানের নামের সঙ্গে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে Christensen L' Iran sous les Sasanides,[2] 98-9)। উত্তরাধিকার সূত্রে সুখরার পুত্র কারিন পর্বতসংকুল ওয়ানদা উম্মীদকূহ [কূহ পর্বতশ্রেণী] (আমুল-এর দক্ষিণে; Rabino di Borgomale, Mazandaran and Astarabad, 2) Amul, Lafur এবং তৎকালে বাবুল নদীর পূর্ব উৎসে ও যাহা পরে মামতীর নদীর পাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে (দ্র. Minorsky in E.I[1]. art ঃ Mazyar) এবং ফিররীম—যাহাকে কূহ-ই কারিন বলা হয়—লাভ করেন। তাবারিস্‌তান রাজ্যটি কারিন ও তামীশায় প্রতিষ্ঠিত সর্দার শাসকদের মধ্যেও বিভক্ত হয়। অতঃপর কারিন ইসপাহবাদ উপাধি লাভ করেন (ইব্‌ন ইসফানদিয়ার,

৯৫ ; জাহীরু'দ-দীন, ৩১-৫; বালআমী, ২খ, ২৯৭-৮)। কথিত আছে, সম্রাট চতুর্থ হুরমিজদ্ (৫৭৯-৯০ খৃ.) কারিনকে তাঁহার পদে পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি দান করেন।

তাবারিসতানের স্থানীয় ইতিবৃত্তকারদের মতে কারিন ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর তৎপুত্র আলান্দা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ৫২ বৎসর দেশ শাসন করেন (জাহীরু'দ্-দীন, ১৬৭, ৩২১)। কিন্তু এই সকল কালক্রমিক উপাত্ত কেবল কল্পনাপ্রসূত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের বয়সের সঙ্গে সমন্বিত মনে হয় না (তু. নিম্নে)। ক্ষুদ্র কারিনী রাজ্যটির প্রকৃত রাজধানী সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে উহা ছিল ফিররীম নামক স্থানে (তু. Ibn Hawkal, 377, tr. 367 ; Casanova, Les Ispehbeds de Firrim, in A. Volume of Oriental Studies presented to E. G. Browne, 117-22,), অন্যদের মতে অন্যত্র (Minorsky in E.I.[1] art, cit)। সে যাহা হউক, আরব বিজয়ের সময়ে কারিনীগণ আমূলের শাসনকর্তা ছিলেন না। উহা তখন দাবূয়িদিগের (দ্র.) ও বাদুসপানদিগের (দ্র.) পূর্বপুরুষ সুলতান ফার্রু খান জীলান শাহের রাজধানী ছিল এবং উহারা তাঁহার সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন (বাল'আমী, ৩খ, ৪৯৩) তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধের (২১/৬৪৯) পর আরবদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে রায়-এর শাসনকর্তাকে সাহায্য করিতে কারিনিগণ কিছু সৈন্যসামন্ত পাঠান, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয় [(১) বাল'আমী, ৩খ, ৪৮৯-৯১ ; (২) আত-তাবারী, ১খ, ২৬৫৩-৪)]। বশ্যতা কর প্রদানের শর্তে দুনবাওয়ান্দ, কূমিস ও গুরগান-এর স্থানীয় সর্দারগণ [আরবদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলে তাবারিস্তানের ইসপাহবাদ ও মারযুবানগণ সকলেই পালাক্রমে তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ভূমির প্রতিকূল প্রকৃতির কারণে [আরব সেনাপতি] সুওয়ায়দ ইব্ন মুকাররিন তাহাদের আত্মসমর্পণের যে সকল শর্ত মানিয়া নেন তাহা এই ঃ ৫ লক্ষ দিরহাম [বশ্যতা-কর] পরিশোধ করিয়া যুদ্ধকালে সৈন্যসামন্ত পাঠাইবার দায়িত্ব ব্যতীত আরব সাম্রাজ্যের করদ-নৃপতিরূপে রাজত্ব করিতে হইবে। অবশ্য এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আরবরা কোনও হস্তক্ষেপ করিবে না [(১) বাল'আমী, ৩খ, ৪৯২-৩ ; (২) আত-তাবারী, ১খ, ২৬৫৯-৬০)]। এই সকল এলাকায় খলীফার কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য বহুবার সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং তজ্জন্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় নৃপতিবৃন্দকে ক্রমাগত বর্ধিত হারে যে যোদ্ধাবাহিনী প্রতিপালন করিতে হইয়াছে সেইকথা বিবেচনা করিলে এই ধরনের সামান্য করাদিও (সাসানিদিগকে প্রদত্ত করভারের তুলনায় : ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১১৮) নিয়মিতভাবে কিংবা পুরোপুরি পরিশোধ করা হইত না।

১৬৫/৭৮১ সনে সংঘটিত ওয়ানদাদ-হুরমুয্দ বিদ্রোহের পূর্বে কারিনী সুলতান বংশের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে পূর্বে কিছুই না জানার দরুন কোনও কোনও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমাদিগকে তাবারিস্তানের ও অন্যান্য স্থানীয় নৃপতিদের ইতিহাস অধ্যয়ন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। স্থানীয় ঐতিহাসিকদের মতে (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ৯৮) ফিররীমকে রাজধানী করিয়া (হুদূদু'ল-'আলাম, ১৩৫-৬) তাবারিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত শারবীন পার্বত্য এলাকায় (ইব্নু'ল ফাকীহ, ৩০৫) আনু ৪৫/৬৬৫ সনে এক নূতন রাজবংশের পত্তন হয়। কোনও কোনও পর্বত লইয়া এনবুর্য-এর পূর্বগামী পর্বতশ্রেণী শাখা গঠিত ছিল ; এই সকল নানা ধরনের নামের মধ্যে সেইগুলিকে সনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা তাহাদের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে অথবা একই পর্বতের কয়েকটি নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেও যে কেহ তাহাদের বিভিন্ন নামে বিভ্রান্ত হইবে (Rabino di Borgomale, Mazandaran and Astarabad, 2)। স্থানীয় ঐতিহাসিকদের মতে [(১) ইসফানদিয়ার, ৯৮-৯, ২৩৭ : (২) জাহীরু'দ-দীন ২০৬-৭, ৩২৩-৪], বেদখলকারী আযুর ওয়ালাশ (যারমিহরিদ ?)-এর নিকট হইতে বাও (Baw)-এর পুত্র সূরখাবকে তাঁহার সিংহাসন পুনরুদ্ধারে কূহ্-ই কারিনের বাসিন্দারা সর্বদাই সাহায্য করিয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আনু. ৫৯-৬০/৬৭৯-৮০ সনে তাঁহার পিতাকে গোপনে হত্যা করিয়া ৮ বৎসর যাবৎ সিংহাসনটি স্বীয় দখলে রাখেন। ফিররীমে সূরখারের রাজ্যাভিষেক হয়। ইহাতে কারিনি বংশের [রাজ্য শাসনের] উত্তরাধিকার পুনঃ-প্রবর্তিত হইল বলিয়া ধারণা জন্মিতে পারে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা ফাররুখান জীলান শাহের পুত্র জীল গাওবারার হস্তেই ন্যস্ত ছিল— যিনি গিরিপর্বতাদির সুলতান উপাধি ধারণ করেন (ফারশওয়াদগাররশাহ ; ইব্ন ইসফানদিয়ার, ৯৭ ; জাহীরু'দ-দীন, ৪২)।

গুরগান যুদ্ধের সাফল্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া য়াযীদ ইব্নু'ল মুহাল্লাব শেষ পর্যন্ত ৯৭/৭১৬ সনে তাবারিস্তানকেও উমায়্যা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পান। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণার্থে গোপন অবস্থানস্থল হইতে তাঁহাকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয় (৫৪/৬৭৪ সনে মাসকালা ইব্ন হুবায়রা এবং ৫৫/৬৭৫ সনে মুহাম্মাদ ইবনুল-আশআছ-এর মতই) আর কেবল বশ্যতা কর ধার্য করিয়াই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়, যাহার পর্যাপ্ত পরিমাণ জুরজান-এর বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে-যাহারা তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহ করিয়াছিল [(১) আত্-তাবারী, ২খ, ১৩২০-১, ১৩২৭-৯ : (২) আল-বালাযুরী, ৩৩৬-৮ ইত্যাদি]। এতদ্‌সত্ত্বেও তাবারিস্তানেও জনসাধারণ আবার প্রথমে হিশাম [(১০৫-২৫/৭২৪-৪৩); আল-য়াকূবী, তারীখ, ২খ, ৩৮১] এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় মারওয়ানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয় [(১) আল-বালাযুরী, ৩৩৮ ; (২) ইব্নু'ল ফাকীহ, ৩০৮]। ইতিমধ্যে তাহাদের বিদ্রোহের পরিসমাপ্তির পূর্বেই আব্বাসিগণকে স্বীকৃতি দান করা হয় [(১) আত্-তাবারী, ২খ, ২০১৬ ; (২) ইব্নু'ল-ফাকীহ ২৭৫-৭] এবং তাহারা সাসানীদিগকে যে বশ্যতাকর প্রদান করিতেন ১৩৭/৭৫৫ সনে মুনবায-এর বিদ্রোহে তাহাদিগের সহযোগিতার পর আল-মানসূর নিজেই স্থানীয় সর্দারদিগের উপরে তদ্রূপ কর ধার্য করিতে সক্ষম হন (ইবন ইসফানদিয়ার, ১১৮)। ১৪২-৩/৭৫৯-৬০ সনে তাবারিস্তান বিজয় সম্পূর্ণ হইলে উহা 'আব্বাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ফলে পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে বিশেষত ফিররীম ও খুররামাবাদে সেনা সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হয় (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৩২-৩)। বাওয়ানদিগণ "পাদিশওয়াদার-হারশাহ" খিতাব ধারণ করাতে (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১২৬) দাবূয়িদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে তাহা প্রথমোক্তদের পক্ষে সুবিধাজনক প্রমাণিত হয় — তদ্দ্বারা কূহিস্তানে তাহাদের বিশেষ মর্যাদা সূচিত হয়। স্থানীয় নৃপতিবৃন্দ 'আব্বাসী অভিভাবকত্বের সঙ্গে নিজদিগকে ভালভাবে মানাইয়া লইতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। তাই তাবারিস্তানের শাসনকর্তা যখন করভার বৃদ্ধির প্রয়াস চালান, যাহা ফাকীহ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল এই যুক্তিতে অনুমোদন করেন যে, তাবারিস্তানকে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা আত্মসমর্পণ করাইতে হইয়াছে (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১২৫) তখন

১৬৫/৭৮১ সনে নৃপতিরা বিদ্রোহ করেন। উম্মীদবার-কূহ (আমূল-এর দক্ষিণে)-এর অধিবাসিগণ কারিনী বংশীয় নৃপতি ওয়ানদাদ-হুরমুযদ, যিনি দুনবাওয়ান্দ-এর সন্নিকটে বসবাস করিতেছিলেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯)-কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তিনি বিদ্রোহ করিলে তাহারা সাহায্য করিবে (ইবন ইসফানদিয়ার ১২৬)।

ওয়ানদাদ-হুরমুযদের বিদ্রোহ ঃ ওয়ানদাদ-হুরমুযদ অন্যান্য স্থানীয় নৃপতির মৈত্রী (শারবীন পার্বত্য এলাকার বাওয়ানদী নৃপতি শারবীন, বাদুসপান পার্বত্য এলাকার বাদুসপানী নৃপতি শাহরিয়ার, সারিয়ার নিকটস্থ মিয়ান্দুরূদ-এর নৃপতি মাসমুগান ওয়ালাশ (যারমিহ্‌রী গোষ্ঠীভুক্ত ?), তাবারিস্তানের পশ্চিমে ওয়ানদাদ সাফান পার্বত্য এলাকার কারিনী বংশীয় নৃপতি ওয়ানদাদ সাফান সম্পর্কে আশ্বস্ত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুসলিম হত্যার মাধ্যমে বিদ্রোহের প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে (ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১২২-৩)। অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ওয়ানদাদ হুরমুযদ কয়েক বৎসর যাবত পার্বত্য এলাকাগুলি দখলে রাখেন (১৬৫-৮/৭৮১-৫) ও খলীফা যোদ্ধৃবাহিনীকে বহুবার পরাস্ত করেন। খলীফা আল-মাহ্‌দীকে চারিবারের প্রতিবারই অধিকতর খ্যাতিমান সেনাপতির নেতৃত্বে পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অভিযান প্রেরণ করিতে হইয়াছে (১৬৭/৭৮৩ সনে সালিমু'ল-ফারগানী=, আমীর ফিরাশা 'উমার ইবনু'ল-'আলা তায়ম ইব্‌ন সিনান)। কিন্তু প্রতিবারই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ওয়ানদাদ-হুরমুযদের আত্মসমর্পণ লাভের লক্ষ্যে সেনাপতি য়াযীদ ইব্‌ন মাযয়াদ-এর সঙ্গে তাঁহাকে অভিযানে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আল-হাদীকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠাইতে হয় [(১) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ৪৪-৫, ১২৬-৩১; (২) জাহীরু'দ-দীন, ১৫৫-৯ ; (৩) আত-তাবারী, ৩খ, ৫১৭-৮, ৫৫১, ৭০৫ ; (৪) ইবনু'ল-ফাকীহ, ৩০৪]। হুরমুযদকে বাগদাদে কারারুদ্ধ করা হয় (আল-য়া'কূবী, তা'রীখ , ২খ, ৪৮৭) এবং বাহ্‌রাম ইব্‌ন ফীরূয নামক খলীফার এক সদ্যদীক্ষিত মুসলিম অনুচরকে হত্যার মাধ্যমে তাহার ভাই ওয়ানদাদ-সাফান আপন সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। ইতিমধ্যে ওয়ানদাদ হুরমুযদ তাঁহার ভাইকে খলীফার হস্তে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু নিজের পার্বত্য রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর সেই সম্পর্কে তিনি কিছুই করেন নাই [(১) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১৩১-২ : (২) জাহীরু'দ-দীন, ১৬০]। ইসলামের প্রতি তাহার শত্রুতা পূর্বের ন্যায়ই বজায় ছিল (ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১৪০) এবং তিনি সারিয়ার চতুষ্পার্শ্বে বিক্রয়ার্থে পেশকৃত এক হাজার 'জারীব' পরিমাণ খাস জমি সংগ্রহকরত লাভবান হন [(১) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১৩২ ; (২) ইব্‌ন রুস্তা, ১৫০, অনু. ১৭৩]। ১৮৭/৮০৩ সনে কর নির্ধারণের জন্য ভূমি পুনর্জরিপের উদ্দেশ্যে খলীফা প্রেরিত জাফার ইব্‌ন হারূনকে হত্যা করিয়া ওয়ানদাদ-সাফান 'আব্বাসী অনুপ্রবেশের প্রতি বিরোধিতা বজায় রাখেন। এই ধরনের বহু অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডে বাধ্য হইয়া ১৮৯/৮০৫ সনে খলীফা হারূনু'র-রাশীদ রায় অভিযানে গমনকালে খলীফার সার্বভৌম রাষ্ট্রক্ষমতাকে পুনর্বার আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন ও তাঁহার বশ্যতার প্রতিভূ আদায় করিবার জন্য ওয়ানদাদ-হুরমুযদকে তলব করেন। তখন ওয়ানদাদ হুরমুযদকে বশ্যতা-কর প্রদান ও যুদ্ধকালে সৈন্যদল প্রেরণের শর্তে খলীফার দলে যোগ দিতে হইল। তদুপরি তিনি তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ (মা'মূনী মহল) খলীফাকে 'উপঢৌকন' দিতে এবং তৎপুত্র কারিনকে প্রতিভূরূপে তাঁহার দরবারে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। বিনিময়ে পুনরায় তাঁহাকে "খুরাসানের ইস্পাহবাদ" উপাধিতে ভূষিত করা হইল [(১) ইবনুল-ফাকীহ, ৩০৪ ; (২) আত-তাবারী, ৩খ, ৭০৫ ; (৩) আল-য়াকূবী, তারীখ, ২খ, ৫৪১ ; (৪) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ৪৪, ১৪২-৩]। তাঁহার পৌত্র মাযয়ার-এর বিদ্রোহের খ্যাতি সত্ত্বেও ইতিবৃত্তকারদের পক্ষে ওয়ানদাদ-হুরমুযদের ব্যক্তিত্ব ও অভিযানসমূহ অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য। কেননা তিনি এমন একটি রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক সম্মিলন ঘটান যাহা কেবল হাসান ইব্‌ন যায়দ ২৫০/৮৬৪ সনে আর একবার ঘটাইতে সক্ষম হন এবং তাঁহার বিদ্রোহ দমন-প্রচেষ্টা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। পক্ষান্তরে ২২৫/৮৪০ সনে বিনা যুদ্ধেই মাযয়ার পর্যুদস্ত হইয়া পড়েন।

১৯২/৮০৮ সনে কারিনকে তাঁহার পিতার নিকট ফেরত পাঠানো হয় [(১) আল-য়াকূবী, ২খ, ৫২০ ; (২) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১৪৩]। আল-আমীন ও আল-মামূনের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে ১৯৫/৮১১ সনে 'আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহান দায়লাম, তাবারিস্তানের পার্বত্য এলাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির স্থানীয় নৃপতিগণকে কিছু উপঢৌকন দিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, খুরাসান হইতে বাগদাদে যাতায়াতের প্রধান পথ বন্ধ করিয়া দিয়া (উহার প্রধান অংশ তাবারিস্তানের পার্বত্য এলাকাভুক্ত) তিনি আল-মামূনের সেনাপতি তাহির ইবনুল-হুসায়নকে নূতন সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য প্রেরণ বাধা দিবেন। ইহাতে স্থানীয় নৃপতিরা সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হন (আত্-তাবারী, ৩খ, ৮২০)। কিন্তু আর-রায়-এর সন্নিকটে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহান নিহত হন।

স্থানীয় ঐতিহাসিকদের মতে ৫০ বৎসর রাজত্বের পর আল-মামূনের আমলে (১৯৮-২১৮/৮১৩-৩৩) ওয়ানদাদ-হুরমুযদের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র কারিন তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন [(১) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১৪৪-৫ ; (২) জাহীরুদ-দীন, ৩২১]। কিন্তু এই তথ্য নিশ্চিতই মিথ্যা ; কেননা ঐ দুইটি সূত্রের বরাতে মাযয়ারের ৩০ বৎসরের রাজত্বকালকে যদি কেহ উহার সঙ্গে যোগ করে তবে এই দুইজন নৃপতি কিভাবে ৩০+৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না, যেক্ষেত্রে আল-মামূনের রাজ্য লাভের সময় (১৯৮/৮১৩) হইতে মাযয়ার-এর হত্যা (২২৫/৮৪০) পর্যন্ত কালের ব্যবধান মাত্র ২৭ বৎসর।

তদুপরি খলীফা আল-মামূন বায়যানটীয় খৃষ্টান-শক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করেন (সর্বপ্রথম ২১৫/৮৩০) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার (পৃ. ১৪৫-৭) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। অথচ এই অভিযানে মাযয়ার তাঁহার শত্রুদলকে পরিহার করিতে সক্ষম হইয়া উপকৃত হন—পরবর্তীতে এই স্ববিরোধী কথাও তিনি লিখিয়াছেন।

একথা সত্য যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শাহরিয়ার দ্বারা একটু একটু করিয়া কুক্ষিগত করার ফলে কারিন ধীরে ধীরে তাঁহার রাজ্য হারান। অতঃপর যখন মাযয়ার তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন তখন তিনি নিজেকে একটা হ্রস্বীকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যের নেতৃত্বে আসীন দেখিতে পান (ইব্‌ন ইসফানদিয়ার ১৪৬)। এমনকি শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি তাঁহার অধিকারভুক্ত রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশই হারান— যাহা শাহরিয়ার অধিকার করিয়া লন। মাযয়ার তাঁহার চাচা ওয়ানদাদ-সাফান-এর পুত্র ওয়ানদাদ-উম্মীদ-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে বাওয়ানদিগণের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন (ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, ১৪৬-৭), যদিও ইসফানদিয়ারের মতে মাযয়ার কারাগার হইতে পালাইয়া বাগদাদে খলীফা আল-মামূনের নিকট হাযির হন (ঐ) [আত্-তাবারী,

৩খ, ১০১৫]। তাবারিস্তানের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইব্ন খুর্যাযবাহ-ই বাওয়ান্দী উপজাতিভুক্ত শাহরিয়ারকে যুদ্ধে পরাস্ত এবং ২০১/৮১৬-৭ সনে মাযয়ারকে আল-মামূনের দরবারে [তখন তিনি মার্‌বে ছিলেন; কেননা ২০৪/৮১৯ সনের পূর্বে খলীফা বাগদাদে ফিরেন নাই ; তু (১) ইবনুল-আছীর, ৬খ, ২৫৩ ; (২) বাল'আমী, ৪খ, ৫১৮] প্রেরণ করেন বলিয়া ইব্ন ইসফানদিয়ার মনে করেন। সে যাহাই হউক, মাযয়ারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল। তিনি আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর মাওলা উপাধি এবং আবুল-হাসান মুহাম্মদ ইব্ন কারিন নাম প্রাপ্ত হন (আল-য়াকূবী, তারীখ, ২খ, ৫৮২ ; আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৮ ; ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৪৭)। পরবর্তীকালে ২০৭/৮২২-৩ সনে তাঁহাকে মূসা ইব্ন হাফস-এর সঙ্গে একত্রে তাবারিস্তান, রূয়ান ও দুনাবাওয়ান্দ শাসনকর্তাপদে নিয়োগ করিয়া—বিশেষত যে সকল পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে তাঁহার সর্বাধিক জ্ঞান ছিল, সেই সকল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করা হয়। [(১) আত্-তাবারী, ৩খ, ১০৬৬, ১০৯৬ : (২) ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৪৮]। তাবারিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর মাযয়ার সম্ভবত প্রথমেই অন্যান্য স্থানীয় নৃপতিকে ও তাঁহার নিজের আত্মীয়দ্বয়কে—বিশেষত তাঁহার ভ্রাতা কূহ্য়ার (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৫ ; আল-বালাযুরী ৩৩৯) এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শাহরিয়ারের পুত্র কারিন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৮৩) ও বাওয়ান্দী গোষ্ঠীভুক্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরিহাস করিতে শুরু করেন। আনু. ২১০-৮২৫-৬ সনে তিনি শারবীন্ পুত্র শাপূরকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার নিজেরই মত ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমীরুল-মুমিনীনের 'মাওলা' উপাধি গ্রহণ করিবেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন [(১) আত্-তাবারী, ৩খ, ১০৯৩ ; (২) ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৪৮]। তিনি পার্বত্য এলাকা শারবীন অধিকার করিয়া তাঁহার পূর্বতন আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি জীল-জীলান, খুরাসানের ইস্পাহবাদ, পাদিশ খাওয়ার গারশাহ (আল-য়াকূবী, বুলদান, ২৭৬, অনু. ৮১)-র সঙ্গে 'মালিকুল-জিবাল' উপাধিও গ্রহণ করেন, যাহা ছিল আরব বিজয়ের সময় ফাররুখান জীলান শাহের উপাধি হইতে অভিন্ন (তু. বালআমী, ৩খ, ৪৯৩)। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতের প্রতিবাদে বলা যায় যে, এই সকল উপাধি খুরাসানের উপরে তাঁহার কোনও দাবী নির্দেশ করে না [(১) আযীযী, ১৮৬ ; (২) মিনোভি, ২৪; (৩) Minorsky, in EI[1], art. Mazyar] ; উহা করিলে খলীফা আল-মামূন মাযয়ারের কাছে লিখিত পত্রাদিতে ঐ সকল উপাধি ব্যবহার করিতেন না। (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৮ পৃষ্ঠায় উপাধিটির দুই ভিন্নরূপ-ইস্পাহবাদ/ইস্পাহবাযান —দেখাইয়াছেন)।

সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের এই নীতিই তাঁহার বিরুদ্ধে ২২৫/৮৪০ সনে স্বীয় জাতিদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার আদি কারণ যাঁহারা নৃপতিরূপে পুনরধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উহাকেই একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৮৩, ১২৯১, ১২৯৫)।

২১১/৮২৬-৭ সনে মূসা ইব্ন হাফস ইনতিকাল করিলে তৎপুত্র মুহাম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। (ইবনুল-আছীর, ৬খ, ২৮৬)। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে মাযয়ারের অনুকূল মনোভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৪৮)। তিনি পূর্বেই স্থানীয় যরাথুস্ত্রীয় ভূস্বামিগণের শত্রুতা পূর্বেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; তৎপর তাবারিস্তানের সমগ্র সমতল ভূমিতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করিবার জন্য পাশবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যাহা শহরবাসী মুসলিমগণকে তাঁহার প্রতি বৈরী করিয়া তোলে (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৪৮-৯)। এই সময়ে খলীফার নিকট অভিযোগ পত্রাদি প্রেরণ করা হয়, কিন্তু পদচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তিনি এতদুপলক্ষে বাগদাদে যাইতে অস্বীকার করেন। খলীফা আল-মামূন এই ব্যাপারে জিদ ধরিলে তিনি আমুল ওরূয়ান-এর কাদী দুইজনকে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ খলীফাকে জনাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। সেখানে আমুলের কাদী দাবী করেন যে, মাযয়ার হলফ করিয়া ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে ; কিন্তু খলীফা এই অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই (তু আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৭০-১)। তাঁহার ক্রমবর্ধমান স্বৈরী মনোভাব সত্ত্বেও (তিনি নিজেকে আর খলীফার 'অনুচর' না বলিয়া 'মিত্র' বলিয়া প্রচার করিতেন (তু আল-য়াকূবী, তারীখ, ২খ, ৫৮২)। পরবর্তী কালে আল-মামূন তাঁহাকে তাবারিস্তানের একচ্ছত্র শাসনকর্তা উপাধিতে ভূষিত করেন (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৫০-১) এবং আল-মুতাসিম ২১৮/৮৩৩ সনে উক্ত পদে তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করেন। তদুপরি কেন্দ্রীয় শক্তির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসক হিসাবে বিপুল ব্যক্তিগত ক্ষমতার অধিকারী একজন প্রকৃত ক্ষুদ্র নৃপতি হওয়ায় (তু. আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯২) শাসনব্যবস্থা সূত্রে খুরাসানের তাহিরিদিগের অধীন থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদিগকে 'খারাজ' পাঠাইতে অস্বীকৃতি জানাইয়া অবাধ্যতায় আরও একধাপ অগ্রসর হন। খলীফা তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হন (সম্ভবত 'আবদুল্লাহ' ইব্ন তাহিরের পরামর্শের বিরুদ্ধে) ও তাঁহার অনুমোদিত প্রতিনিধিরা হামাযান-এ মাযয়ার-এর নিকট হইতে 'খারাজ' গ্রহণকরত তাহিরিদিগের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাইয়া দিলেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৬৮)।

আত্-তাবারীর এ বর্ণনা অনুযায়ী (৩খ, ১২৬৯) "বাবাক-এর সঙ্গেও মাযয়ার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে (বিদ্রোহ করিতে) উৎসাহিত করেন ও সাহায্য দানের প্রস্তাব দেন।" কিন্তু কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করা সম্পর্কিত বাক্যটির (ঐ, ১২৬৯) ন্যায় এই বাক্যটির অগ্রভাগও সম্ভবত ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে—যাহা সঠিকভাবে পুনর্গঠিত হইলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বুঝায়। ইহা লক্ষণীয় যে, অন্য কোথাও বাবাক-এর সঙ্গে মাযয়ার-এর কোনও প্রকার দুষ্কর্মে সহযোগিতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই—যদিও আল-আফশীন-এর বিরুদ্ধে বহু গুজব ও অভিযোগ আরোপিত হয়। ২২৩-এর গোঁড়ার/৮৩৭-এর শেষের দিকে মাযয়ার-এর বিরুদ্ধে আল-আফশীন-এর এক অভিযান পরিচালনা পরিকল্পনা গৃহীত হয়— কেবলমাত্র তাঁহার অত্যাচার ও অবাধ্যতার জন্য [(১) আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৬৯-৭১ ; (২) আল-বালাযুরী, ৩৩৯ ; (৩) ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৫২ ; (৪) জাহীরুদ্দ-দীন, ১৬৭]। বাবাক, আল-আফশীন, মাযয়ার ও বায়যান্টীয় সম্রাট থিওফিলাম-এর প্ররোচনায় যে বিরাট আরববিরোধী ষড়যন্ত্রের 'তত্ত্ব' এ সময় রচিত হয়, তাহা ঐতিহাসিকদের মিথ্যা উদ্ভাবন ভিন্ন আর কিছু নহে [(১) এম. মিনোভি, ২৬ ; (২) এম. 'আযীযী, ২১২, ৩৬৪ ইত্যাদি]।

আতঙ্কিত হইয়া মাযয়ার পুনরায় কর নির্ধারণার্থ ভূমি জরিপের তীর/আগস্ট ৮৩৮ মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই 'খারাজ' ধার্য করার আদেশ দেন; আর যে জরিপে তিনটি অধিবেশনে মোট এক বৎসর সময় লাগিত তাঁহার প্রতিনিধিরা মাত্র দুই মাসে উহা সমাপ্ত করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৭০-২)। তদুপরি 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির যতই খলীফাকে "প্রজাপীড়ক অবাধ্য নৃপতি-শাসক" মাযয়ারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া সফল হইতে

থাকে, ততই মায়য়ার এবং তাহিরী গোষ্ঠীর মধ্যেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মায়য়ারকে খলীফার বিরোধিতা এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে 'খারাজ' পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাইতে, তাবারিস্তানের পার্বত্য এলাকা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলাদিতে আধিপত্য বজায় রাখিতে এই 'আবদুল্লাহ-ই প্রণোদিত করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৬৯)। কোনও কোনও সূত্রে এমন দাবিও করা হইয়াছে যে, আল-আফশীন-ই মায়য়ারের এই অবাধ্যতাকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন (আত্-তাবারী, ১২৬৯, ১৩০৫, অন্যান্য)। যে তাহিরী গোষ্ঠী ২২২/৮৩৭ সনে বাবাক যুদ্ধে এবং ২২৩/৮৩৮ সনে Theophilus-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে যে দোষারোপের কথা শুনা যায়, তাহাকে অস্বীকার করা না গেলেও তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নহে। কেননা আল-য়াকূবী স্মরণ করাইয়া দেন (তারীখ, ২খ, ৫৮৩) যে, আল-আফশীন যখন মায়য়ারকে এইরূপ ভাষায় উপদেশ দেন, "সৃষ্টিকর্তার দোহাই ! তোমার মিথ্যাচার তোমাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমার জীবন ধ্বংস করিতে মিথ্যাচরণ করিও না, তখন মায়য়ার পুনরায় আত্মসংবরণ করিয়া প্রতিবাদে বলিলেন ঃ বিধাতার দোহাই ! খলীফা আমাকে কোনও পত্র দেন নাই কিংবা আমার সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র বিনিময় হয় নাই।" নিম্নোক্ত সূত্রে আল-আফশীনের সুস্পষ্ট মনোভাবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : যে দ্বন্দ্বসংঘাত মায়য়ারকে তাহিরী গোষ্ঠীর বিরোধিতা করিতে প্ররোচিত করে, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, ঐ সংঘাত-ই পরিণামে 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহিরকে খুরাসানের সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবে" (আত্ তাবারী, ৩খ, ১২৬৯)। কেননা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিদ্রোহ করিলে মায়য়ার বহুদিন যাবত 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহিরকে ঠেকাইয়া রাখিবে। খলীফা আল-মুতাসিম ইহাতে আল-আফশীন ও অন্যান্যকে মায়য়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইবেন ও তাহাকে দমনের জন্য তাহিরের স্থলে আল-আফশীনকে নিয়োগ করিবেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১৩০৫)। এই সকল ঘটনায় "আরব বিরোধী" বিদ্রোহের ফলে ইরানীদের শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কল্পিত কাহিনীগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়—যাহা কতিপয় ঐতিহাসিক বিনাওজরে মানিয়া লইয়াছেন (এম. মিনাভি এবং এম. 'আযীযী তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যদিও ১৯৩৮ সনে Gh. H. Sodighi এই বক্তব্য খণ্ডন করিয়াছেন)।

মায়য়ারের বিদ্রোহ ঃ খলীফা আল-মু'তাসিমের রাজত্ব কাল ছয় বৎসর পূর্তির কয়েক মাস পর অর্থাৎ ২২৪/৮৩৯ সনের শেষের দিকে মায়য়ার প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (আল-বালাযুরী, ৩৩৯)। কোনও কোনও সূত্রে (আল-বালাযুরী ও ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৫২) এই প্রসঙ্গে 'কাফারা' শব্দ ব্যবহারের ভিত্তিতে কতিপয় ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করেন যে, তিনি ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন (মিনোভি, ২৪ ; 'আযীযী. ১৮৭)। এই ধরনের ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক, কেননা আর সকল ঐতিহাসিক "বিদ্রোহ করা" ক্রিয়াপদ কিংবা উহার কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন আর আল-বালাযুরী নিজেই 'কাফারা' শব্দটিকে "বিদ্রোহ করা"র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

তিনি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দকে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, আর তাঁহাদের সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত হইবার জন্য তিনি তাহাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাহাদিগকে প্রতিভূ প্রেরণ করিতে বাধ্য করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৬৯, ১২৭৩)। অধিকন্তু সারিয়া, আমুল, রূয়ান ও পশ্চিম তাবারিস্তানের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৭৩-৪, ১২৭৮, ১২৮৩) যাঁহারা গোপনে তাঁহাকে অত্যন্ত অপসন্দ করে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের সকলকে তিনি কারারুদ্ধ করেন [(১) কিতাবু'ল-উয়ূন, ৩খ, ৩৯৯ ; (২) মিসকাওয়ায়হ, ৬খ, ৫০৪]। তিনি আমূল, সারিয়া ও তামীশা এলাকায় আত্মরক্ষার্থে নির্মিত গড় কেল্লাগুলি ভাঙিয়া ফেলেন, যাহা 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহিরকে সতর্ক ও তৎপর করিয়া তোলে [(১) ইব্ন ইসফানদিয়ার ১৫০-২; (২) আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৭৪-৫]। যাহা হউক, আমূলের বাসিন্দারা এই ব্যাপারে আল মু'তাসিমকে হস্তক্ষেপ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি অবশেষে এই বিদ্রোহী নৃপতি শাসককে মৃত্যুদণ্ড দিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (ইব্ন ইসফানদিয়ার, ১৫৩-৪)।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং আল-মু'তাসিম কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি দলে বিভক্ত সেনাবাহিনী তাবারিস্তানকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখে। মায়য়ার নিজেকে নিরাপদ ভাবিলেন। কেননা তাঁহার ভাই কূহয়ার— যাঁহার উপর তিনি কারিন পর্বতমালা রক্ষার ভার অর্পণ করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৫) এবং শারবীনসহ জুরজান পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্বদিকের পর্বতশ্রেণী রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কারিন ইব্ন শাহরিয়ারকে তিনি ডাকিয়া ফিরাইয়া আনেন। তাবারিস্তানের অন্যান্য প্রবেশপথে— জুরজান ও আর-রায় এলাকায়— শত্রুসৈন্য প্রবেশে বাধা দানের দায়িত্ব যথাক্রমে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সারখাসতান ও আদ্-দুররীর উপরেই ন্যস্ত ছিল (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৫-৬)।

নিজেকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া মাযায়ার ভূম্যাধিকারীদিগের নেতাদিগকে (আল-আকরাল মুখতারীন মিন-বায়নি'দ-দাহাকীন) উত্তেজিত করিয়া দিয়া কয়েদীদিগের দায় হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু তাঁহার অপ-কৌশল ব্যর্থ হইল [আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৭৮-৮০ (কিন্তু ১২৬৯ নহে) যাহা সামাজিক, ভূমিবণ্টন ও মাযদাকী (Mazdakite) আন্দোলনরূপে একাধিক ভাষ্য রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছে]। অতঃপর মায়য়ারের পতন ত্বরান্বিত হয়। সারখাস্তান-এর কিছুসংখ্যক সৈন্য আল-হাসান ইবনুল-হুসায়নের (তামীশার নহে) যে কতিপয় সৈন্যের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে অতর্কিতে আটক করা হইল (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৭৮-৮০)। নৃপতিপদে পুনরধিষ্ঠিত হইবার আশ্বাস লাভ করিয়া কারিন ইব্ন শাহ্রিয়ার তাঁহার অধিকারভুক্ত সমতল এলাকা ও শারবীন পার্বত্য এলাকা হায়্যান ইব্ন জাবালার হস্তে সমর্পণ করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৮২-৩)। মুহাম্মাদ ও জাফার ইব্ন রুস্তাম নামক ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের সেনাপতি আদ্-দুররীর ভ্রাতা যিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীমের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে রূয়ান, কালান ও শালূস-এর কতিপয় দুর্গের সৈন্যবাহিনীকে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৯)। এই সকল সাফল্যে এবং পলায়নপর সারখাসতান ও আদ্-দুররীর প্রাণ বধের সংবাদ শুনিয়া সারিয়া ও মার্রাওর অধিবাসিগণ ঐ দিনই ১৩ শাবান, ২২৫/১৮ জুন ৮৪০ বিদ্রোহী হয় (আত্-তাবারী ৩খ, ১২৯৯)। মায়য়ারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানে তাঁহার ভ্রাতা কূহয়ার। তাঁহার নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিনিময়ে মায়য়ারকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে শত্রুপক্ষীয় সকল সেনাপতি কূহয়ারকে অনুরোধ

করেন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৮৬-৮, ১২৯১, ১২৯৬)। পরিশেষে কূহ্য়ার তাঁহাকে আল-হাসান ইবনুল-হুসায়নের নিকটে সমর্পণ করেন শাবান বা রামদান ২২৫/জুন-জুলাই ৮৪০ মাসে (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৯)। মায্‌য়ারকে সামার্‌রায় লইয়া যাওয়া হয়। শাওওয়াল/আগস্ট মাসে তিনি সেখানে উপনীত হন (আত্-তাবারী, ৩খ, ১৩০৩)। ৪ যুল-কাদা/৫ সেপ্টেম্বরের পূর্বে আল-আফশীনকে বন্দী করা হয় নাই : মায়্‌য়ার কর্তৃক দোষারোপের পরে নয়, বরং আযারবায়জানের মানকজূর-এর বিদ্রোহের প্ররোচনার অজুহাতে উহা হইয়াছে (আত্-তাবারী, ৩খ, ১৩০৫)। পরের দিনই তাঁহার বিচার অনুষ্ঠিত হয় (আত্-তাবারী, ৩খ, ১৩০৩) ও মায়্‌য়ারকে অভিযোগকারীর সাক্ষীরূপে তলব করা হয়। লক্ষণীয় যে, হলফ করিয়া ইসলাম ধর্ম ত্যাগের জন্য নহে, বরং বিদ্রোহ করার কারণে মায়্‌য়ারকে জেরা করার সময় কেবল তীব্র ভর্ৎসনা করা হয়। আল-আফশীন এই বিদ্রোহের প্ররোচক বলিয়া মায়্‌য়ার অভিযোগ করেন। কিন্তু তাঁহার বিবৃতিগুলি স্ববিরোধী বলিয়া বোধ হয়, আর অধিকাংশ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্বেপ্রদত্ত উক্তি অস্বীকার করেন [আল-য়াকূবী, তারীখ, ২খ, ৫৮৩ ; (২) আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৮ : (৩) ইবনুল-আছীর, ৬খ, ৩৬৩]। মায়্‌য়ারকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় ও কয়েক শত বেত্রাঘাতের ফলে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে (আত্-তাবারী, ৩খ, ১৩০৩)। ফলে রাজবংশরূপে কারিনিগণের অস্তিত্বের অবসান ঘটে, বিশেষত মায়্‌য়ারের দায়লামী রক্ষীদলের দ্বারা 'দেশদ্রোহিতার অপরাধে কূহ্য়ার নিহত হওয়ায় (আত্-তাবারী, ৩খ, ১২৯৩-৪)। ইহার পরে তাহিরীগণই তাবারিস্তান শাসন করিতে থাকে (ইব্‌ন হাওকাল, ২খ, ৩৮১, অনু. ৩৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সূত্রসমূহ ঃ (১) য়াকূবী ; (২) বালাযুরী ও (৩) তাবারীর ধারাবিবরণী ছাড়াও তন্মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি; (৪) কিতাবুল-'উয়ূন ঃ Historia Chalifatus al-Motacim, লাইডেন ১৮৪৯ খৃ. ; (৫) মিসকাওয়ায়্‌হ ; (৬) বাল'আমী ; (৭) ইবনু'ল-আছীর প্রভৃতিতে গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে। সর্বোপরি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ (৮) ইব্‌ন ইসফানদিয়ার, An abridged translation of the History of Tabaristan, Leiden 1905 (ফরাসী পাঠ, তেহরান ১৯৩৩ খৃ., আগাগোড়া সম্পাদিত) ; (৯) জাহীরু'দ-দীন, Geschichte von Tabaristan Ruyan und Mazandaran (ফারসী মূল পাঠ), সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৫০ খৃ.। এতদ্ব্যতীত Studis; (১০) H. L., Rabino di Borgomale, Mazandaran and Astarabad, London 1928; (১১) ঐ লেখক, Les dynasties du Mazandaran in JA. 1938; (১২) এম. মিনোভি, মায়্‌য়ার, তেহরান ১৯৩৩ খৃ. (২য় সং., ১৯৫৪ খৃ.); (১৩) Gh. H. Sadighi, Les mouvements religieux iranums au II^{e} et au III^{e} siecl^{e}s de l'Hegire. Paris 1938; (১৪) এম. 'আমীযী, La domination arabe et l'epanouissement du sentiment national. Paris 1938; (১৫) J. M. Unvala, Numismatique du Tabaristan, iranien, Paris 1938; (১৬) M. Rekaya. La place des provinces sud-caspiennes dans l'histoire de l'Iran de la conquete arabe a l'avenement Zaydites (16-250 H./637-864 J. C.) ঃ particularisme rigional ou role 'national' ? in R. S. O. xlvii (1974), 117-52; (১৭) ঐ লেখক, Mazyar, resistance ou integration d'une province iranienne au monde musulmanau milieu IX^{e} siecle ap. J. C., in Studia Iranica, ii/2, (1973), 143-92 দ্র.।

M. Rekaya (E. I.^{2})/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

কারিমী (كارمى) ঃ আয়্যূবী ও মামলূক সাম্রাজ্যের একদল মুসলিম ব্যবসায়ী—বিশেষ করিয়া মসলা ব্যবসায়ী এই নামে অভিহিত। কারিমী অথবা কারিম শব্দের সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ফরাসী লেখক Quatremere লেখক আল কাল্‌কাশান্‌দীর বক্তব্য অনুসরণ করেন এবং মনে করেন যে, নামটি কানিম শব্দ হইতে গৃহীত। ইহা পশ্চিম সূদানের একটি ভূখণ্ডকে বুঝায়, যাহা কারিমে পরিবর্তিত হইয়াছে। আল-কাল্‌কাশান্‌দী মন্তব্য করেন যে, এইভাবে শব্দটি দীওয়ানে ব্যবহৃত হয় এবং আরবীতে ইহার কোনও অর্থ নাই। ইব্‌ন মাজিদ (দ্র.) আবার উল্লেখ করেন যে, ইহা দ্বারা বিলাদু'ল-কানিম (পশ্চিম সূদান) হইতে মরিচ রফ্‌তানীর প্রাচীন (কাদীমান) পথকে বুঝায়। লিট্‌মান (Litttmann)-এর মতে ইহার মূল আম্‌হারিক (Amharic) ভাষায় প্রাপ্ত এবং শব্দটি কুআরারীমা হইতে গৃহীত যাহা এক প্রকার মসলা। উহা ইথিওপিয়া হইতে কারিমিগণ আমদানী করিত।

ইহা নিশ্চিত যে, কারিমীরা ছিল প্রধানত ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের ব্যবসায়ী, যাহা হইতে Littmann এই ধারণা পোষণ করেন যে, কারিমী শব্দটি কোনও বিশেষ পণ্যদ্রব্য সম্পর্কীয় বলিয়া বুঝায়। আল-মাকরীযীর কায়রেনে (Cairene) বাজারের বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে, অম্বর (কারিম বা কাহ্‌রামান)-এর বাজার খুব চালু ছিল। হলুদ বর্ণের অম্বর এখনও মিসরে কারিম নামে অভিহিত হয় এবং এইভাবে কারিমী শব্দের উৎপত্তি বর্ণনা করা যাইতে পারে। Blochet-ও এই ব্যুৎপত্তি সমর্থন করেন। G. Wiet মন্তব্য করেন যে, হলুদ অম্বরের উৎপত্তি বাল্টিক এলাকায় খুঁজিতে হইবে, ইহা ভারত মহাসগরের পণ্যদ্রব্য নয়। Wiedemann কারিমীদের বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত নহেন; তিনি নুওয়ায়রী-র উল্লেখ করেন, যাঁহার মতে বায়যানটীয় সাম্রাজ্য হইতে বায়যানটাইন বাজারের মাধ্যমে অম্বর আমদানী করা হয়। অপরপক্ষে Fischel. Goitein. Ashtor, Naura. R. de Miglio, Darrag , Sublet ও Cahen এই শব্দের ব্যুৎপত্তি অপেক্ষা কারিমী সংস্থার ক্রমবিকাশের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াছেন।

আরবী দলীলপত্রে দেখা যায় যে, কারিম শব্দটিকে নৌবহর, বিশেষত বাণিজ্যিক নৌবহর বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। য়াহূদী উপাসনালয়সমূহের প্রাচীন বস্তুনিচয় সংরক্ষণাগার (Geniza)-এর দলীলপত্রেও শব্দটির একই অর্থ লক্ষণীয়।

যাহা হউক, আল-কাল্‌কাশান্‌দীর গ্রন্থে প্রথম কারিম শব্দটি পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, ফাতিমিগণ একটি বিশেষ নৌবহর (প্রথম পাঁচটি, পরে তিনটি জাহাজের সমন্বয়ে) গঠন করেন, যেগুলির কাজ ছিল নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের জলদস্যু, বিশেষ করিয়া Dahlak গোষ্ঠীর কবল হইতে আয়যাব ও সাওয়াকিন-এর মধ্যে চলাচলকারী কারিমী জাহাজসমূহকে রক্ষা করা। কূস (দ্র.)-এর ওয়ালীকে আবার কখনও কায়রো সরকারের সহিত সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত আমীরকে এই নৌবহর

পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইত। গাযী সালাহু'দ-দীন এই কারিমী ব্যবসায়কে জোর সমর্থন করিতেন ; কারণ তাহাদের প্রতি ধার্যকৃত কর হইতে বহু রাজস্ব পাওয়া যাইত। আল-মাকরীযী বলেন যে, ৫৭৭/১১৮১ সালে এডেন হইতে আগত কারিমী বণিকগণ (তুজ্জারু'ল-কারিম)-এর নিকট হইতে সালাহু'দ-দীন অগ্রিম চার বৎসরের কর দাবী করেন। উল্লেখ্য যে আল-মাকরীযীর বক্তব্যে 'বণিকদের' শব্দ রহিয়াছে। ইহাতে নৌবহর অর্থে শুধু কারিমদের নৌবহর বুঝায় না।

এক বৎসর পরে (৫৭৮/১১৮২) ক্রুসেডারগণ লোহিত সাগরে তাহাদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিলে কারিমিগণ সর্বাপেক্ষা দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়। ইহাতে ইসলামের জন্য বিশেষ বিপদ সৃষ্টি হয় : কারণ এইভাবে ক্রুসেডারগণ পবিত্র ভূমি হিজাযের জন্য হুমকি হইয়া উঠিত : কিন্তু সালাহু'দ-দীনের সর্বাধিক উদ্বেগ ছিল লোহিত সাগরে চলাচলকারী মিসরীয় নৌযানের একাধিপত্যের জন্য বিপত্তি সৃষ্টিতে। যাহা হউক সালাহু'দ-দীনের Renaud de Chatillon-এর বিরুদ্ধে বিজয় পাশ্চাত্য ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যবর্তী সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বণিজ্যিপ্পথ হইতে ফরাসী শক্তি ও বণিকগণকে দূরে রাখিতে সমর্থ হয় এবং কারিমী বণিকগণের প্রসার বৃদ্ধি করে।

৫৭৯/১১৮৩ সালে সালাহু'দ-দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মিসরের প্রতিনিধি তাকিয়্যদ-দীন 'উমার কায়রোর বন্দর জেলা আল-ফুসতাত'-এ প্রসিদ্ধ ফুনদুকু'ল-কারিম নির্মাণ করেন। এই সময়ে য়াহুদী ও কিবতী উভয় জাতীয় বণিকগণকে লোহিত সাগরের প্রধান প্রধান অভিযাত্রা কমবেশী ত্যাগ করিতে হয়। তাহাদের স্থান মুসলিম বণিকদের প্রধানত কারিমীদের দ্বারা পূর্ণ হয়।

সালাহু'দ-দীনের মৃত্যুর পর আয়্যূবী আমলে উপযুক্ত দলীল-পত্রের অভাবে কারিমীদের ইতিহাস রচনা বেশ কঠিন। কিন্তু মামলূক সুলতানগণ তাহাদের পূর্ববর্তিগণের বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করেন এবং এইরূপে কারিমী অভিযাত্রার প্রসার ঘটে।

মিসরে আয়্যূবী সরকার হইতে মামলূক সরকার অবস্থান্তর সময়কাল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যায় পূর্ণ ছিল ঃ একদিকে সেন্ট লুই (Saint Louis)-এর ক্রুসেড ও মঙ্গোলদের অগ্রাভিযান ও অন্যদিকে মিসরে আরব গোত্রসমূহের বিদ্রোহ। কারিমী ও অন্যান্য পাইকারী বণিক এই সংকটপূর্ণ সময়ে মিসরে আমদানী হ্রাস করা বিজ্ঞোচিত মনে করেন, বিশেষ করিয়া যখন আল-মালিক আল-মুজাফ্ফার কুতুয (দ্র.) নিজ অভিযানের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিসরের বণিকগণের উপর এমন কর ধার্য করেন যে, তাহারা তাহাদের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হারাইয়া ফেলে। ১ম বায়বারস্ (দ্র.) এই সকল ব্যবস্থা রহিত করেন এবং কূস ও 'আয়যাবে নিজ ওয়ালীকে বণিকগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ দেন যাহাতে জাহাজগুলি য়ামান বন্দর হইতে আয়যাব পর্যন্ত বিনা কালক্ষেপে চলাচল করিতে পারে। ইব্ন ওয়াসিল (দ্র.) বলেন যে, কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাদের সম্পদ কোনভাবেই কোনও ক্ষতির সম্মুখীন হয় নাই।

মিসরীয় রাজধানী ও বাণিজ্যিক অর্থ সরবরাহ উন্নয়নের ইতিহাসে কারিমীদের কার্যাবলী এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। কারিমীদের পূর্বে মিসরে একজন মুসলিম কিংবা যিম্মী পাইকারী বণিকের মূলধন ১০,০০০ হইতে ৩০,০০০ দীনার বলিয়া হিসাব করা হইলে একজন কারিমী বণিকের ক্ষেত্রে তাহা দশ লক্ষ দীনার বা তাহার বেশী গণ্য করা হইত। আর্থিক সামর্থ্যের জন্য নাসরু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাল্লাম আল-বালিসী (মৃ. ৭৭৬/১৩৭৫) কারিমীর খ্যাতি মিসরের বণিক মহলের শীর্ষে ছিল। তাঁহার অর্থ সম্পদ ছিল এক কোটি দীনার। যে সকল ভারতীয় মুসলিম বণিক মিসর, মক্কা এবং এডেনের সঙ্গে বাণিজ্য করিতেন তাঁহারা নিশ্চিতভাবে বলেন যে, একজন ভারতীয় অমুসলিমের নাসরু'দ-দীনের সহিত যোগাযোগ ছিল। সে ছাড়া অন্য কোন ভারতবাসীর এত বিশাল সম্পদ ছিল না। আদ-দামামিনী নামে পরিচিত তাজু'দ-দীন আল-কারিমী (মৃ. ৭৩১/১৩৩১) এক লক্ষ দীনার রাখিয়া যান। ইহা আল-বালিসী সম্পর্কে উল্লিখিত সম্পদ অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য। দৌলতাবাদের ভারতীয় অমুসলিম বণিক সাহার প্রচুর অর্থের বর্ণনা করিয়া ইব্ন বাত্তূতা মন্তব্য করেন (৪খ, ৪৯), "তাহারা মিসরের কারিমী বণিকদের সমতুল্য।" অন্যত্র (৪খ, ২৫৯) তিনি চীনের সাতি (Sati)-এর সহিত কারিমীদের তুলনা করেন।

মুসলিম আইনে ক্রয়মূল্যের এক-তৃতীয়াশ মুনাফা বৈধ। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কারিমিগণ মুনাফা করিত। পণ্য বিনিময় ছাড়াও তাহারা নগদ ও চেকে মূল্য পরিশোধ করিত। বাজার ও কাজ কারবারের যোগসূত্রের মাধ্যমে কারিমিগণ বাস্তবিক এক ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনা করিত এবং ইহার প্রধান গ্রাহক ছিলেন সুলতান ও আমীরগণ, যাঁহাদের তাহারা শুধু ধার দিয়াই নয়, সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ করিয়াও সহায়তা করিত। শাসকদের মধ্যে একমাত্র মামলূক সুলতানই কারিমীদের নিকট হইতে অর্থ ঋণ করিতেন না, য়ামানের রাজাও অর্থ সংকটে অর্থ ধার করিতেন। এমনকি মালির রাজা মানসা মূসা যাঁহার পশ্চিম সূদানে সোনার খনি ছিল, তিনিও দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মক্কা ত্যাগের পূর্বে কারিমী বণিকগণের নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়াছিলেন।

কারিমীদের বাণিজ্যালয়সমূহ মূলত পারিবারিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিটি জেনারেশন পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা, সম্পদ ও খরিদ্দার উত্তারাধিকার সূত্রে পাইত এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রশিক্ষণের জন্য তাহাদিগকে বড় বড় লেনদেনের ব্যাপারে দূরে পাঠানো হইত। স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাসগণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিত্ব, বাজার যাচাই, খরিদ্দার সংগ্রহ এবং পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী করিত। কথিত আছে যে, জনৈক কারিমী তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে কতিপয় ক্রীতদাসকে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিম সূদানের বাজারে তাঁহার নামে বাণিজ্য ও লেনদেন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কারিমীদের মধ্যে নাসরু'দ-দীন মুহাম্মদ ইব্ন মূসাল্লামের পিতা, পিতামহ ও চাচাও বণিক ছিলেন, তাঁহার কোনও ক্রীতদাসই তাঁহার পক্ষ হইতে ভারত, য়ামান, ইথিওপিয়া, মালি ও বিলাদু'ত-তাকরূর-এ বাণিজ্য করিতে যাইয়া মারা যায় নাই বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেই কারণে তাঁহার কার্যে কোনও ক্ষতি হয় নাই।

সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউন (দ্র.)-এর শাসনামলে কারিমী বণিকদের সংখ্যা ছিল দুই শত এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ভ্রমণের জন্যে তাঁহাদের অন্ততপক্ষে এক শত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিল।

আল-আসাদী (ইব্ন কাদী শুহ্বা দ্র.) বলেন যে, কারিমী বণিকগণের কার্যকলাপ মাগরিব হইতে চীন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, এই কথা অতিরঞ্জিত নয়। নিজদের সশস্ত্র কাফেলা, প্রহরী, কমিশনার, অংশীদার এবং দাসদাসীসহ তাহাদের কেহ কেহ রাজাদের মত ক্ষমতাবান ও ধনাঢ্য

ছিল। তাহাদের প্রাসাদের ফটকে (কূসাত) ঘণ্টাধ্বনি হইত। উহা সাধারণত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের বিশেষ অধিকার।

প্রাচ্য হইতে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের বেশকিছু অংশ কারিমী ও অন্যান্য বণিক কর্তৃক য়ামান হইতে হিজায ও সিরিয়া এবং অধিকতরভাবে কায়রোতে রফতানী হইত। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী মিসরের দুইটি প্রধান বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া ও দামিয়েত্তাতেও রফতানী হইত, সেখানে ফরাসী, বিশেষত ভেনেসিয়রা বাণিজ্যোপলক্ষে আসিত। মিসরীয় বণিকগণ এই সকল ইতালীয়কে বণিক ও পুঁজিপতি হিসাবে তাহাদের প্রতিপক্ষ মনে করিত। ইহা সত্য যে, ভেনিসীয়গণ তাহাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ য়ূরোপ ও বায়যানটীয় সাম্রাজ্যে বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত এবং এশিয়া ও আফ্রিকাকে কারিমীদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। যাহা হউক, মঙ্গোল সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রায় শতাব্দীকাল (মোটামুটি ১২৫০-১৩৫০ খৃ.) ইতালীয়দিগকে এশিয়ার অভ্যন্তরে সুদূর চীন পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ দান করে। কিন্তু এই সকল এলাকায় এমন স্থানও ছিল যেখানে কারিমিগণ ও ইতালীয়গণ একত্র হইত। ইহা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, মঙ্গোলীয় প্রাধান্য (Pax Mongolica) আমলে নৌ ও স্থলপথে কারাভান বাণিজ্য ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরে ইহার গুরুত্ব হারায় নাই।

ফরাসী বণিক ও কারিমী উভয়কেই জলদস্যু সমস্যার সমাধান করিতে হইত ; প্রথমোক্তগণ ভূমধ্যসাগরে এবং শেষোক্তগণ লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে : তাহাদিগকে এশিয়া ও আফ্রিকার মরুপথে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত। উভয় গোষ্ঠীই নগরভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য করিত ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। মধ্যযুগে খৃষ্টান অধ্যুষিত পশ্চিমের শহরগুলি সামন্ত প্রভুদের কাল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। অন্যদিকে একই সময়ে প্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত শহরগুলি কেন্দ্রীয় শাসক ও তাহাদের গভর্নরদের অধীনে ছিল। কাজেই কারিমী বণিকগণের রাজনৈতিক কার্যাবলী কদাচিৎ তাহাদের বিপক্ষীয়দের সহিত তুলনা করা যায়। কারিমিগণ শুধু গৌণভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, কারণ কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের কার্যকলাপ রাজধানীতে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং ব্যবসায়ের স্বাধীনতা দেন।

তথাপি সরকারের স্থিতিশীলতা, মিসরের সুলতানের সহিত ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের সুসম্পর্ক কারিমীদের কার্যাবলী সম্প্রসারণের সুযোগ দেয়। মিসর ও এই সকল দেশ, এমনকি তাহার বাহিরে পশ্চিম সূদান হইতে চীন পর্যন্ত সকল দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে তাহাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

ক্রুসেডের সময়ে কারিমিগণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পাইকারী ব্যবসায়ী ছিল। অর্থ, রাজনীতি ও ধর্ম-বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দলপতি বা প্রধান (কাবীর, রাঈস) খেতাব দেওয়া হইত। মিসরের শাসনাধীন সকল স্থানে, এমনকি রাজপ্রাসাদে তাহাদের সহিত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করা হইত। যদিও এখন পর্যন্ত সমসাময়িক দলীলপত্রে একজন রা'ঈস বা কাবীর কিভাবে নির্বাচিত হইত বা কিভাবে সে ক্ষমতা ব্যবহার করিত তাহার বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তবুও ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (দ্র.)কথিত এক গল্পের সূত্র ধরিয়া এই সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করা যায়। তিনি তাঁহার ইতিবৃত্তে বর্ণনা করেন যে, কারিমী বণিক যাকিয়্যু'দ্-দীন আল-খারূরূবী ৭৮৬/১৩৮৪ সালে হিজায হইতে মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর সুলতান বারকূক এবং প্রধান প্রধান আমীরগণকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। মিসরে বসবাসকারী একজন প্রসিদ্ধ বণিক শিহাবু'দ-দীন ফারিকী তাহাকে আক্রমণ করে (ঐ ব্যক্তি সম্ভবত য়ামানী কারিমীদের নেতা এবং সমসাময়িক য়ামানী মন্ত্রী আল-আশরাফের ভ্রাতা)। আল-খারূরূবী তখন তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত য়ামানী রাজার একটি পত্র প্রকাশ করেন, যাহাতে আল-ফারিকী লিখিত একটি পত্রের উল্লেখ আছে, পত্রটির মধ্যে সে অভিযোগ করিয়াছে যে, উপযুক্ত শাসনের অভাবে মিসরে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলিতেছে যে, তাহার আর কর দেওয়া উচিত নয়। কারণ মিসরের তদানীন্তন সুলতান মামলূকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ইতর ও ঘৃণ্য ব্যক্তি। বারকূক আল-ফারিকীকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন এবং তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ দেন। অন্যদিকে আল-খারূরূবীকে একটি মূল্যবান সম্মানজনক পোশাক ও কাবীরু'ত-তুজ্জার উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ঘটনা হইতে উপাধি লাভের প্রয়োজনীয় শর্ত সম্পর্কে জানা যায়। আনুগত্য, নির্ভেজাল ধার্মিকতা, রাজনৈতিক আচরণ ও সম্পদের সাহায্যে অর্জিত এই উপাধি বণিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লাভজনক মর্যাদার প্রতীক। সরকারী নীতি ছিল কারিমী বণিকদের আনুকূল্য প্রদান করা। নাজিরু'ল-বাহার ওয়াল-কারিম, মসলা ও কারিম-পণ্যের পরিদর্শক লোহিত সাগর ও মিসরে কারিমীদের স্বার্থ দেখাশুনা করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে শুল্ক ও কর আদায় করিত। এই কার্য এত সম্মানজনক ছিল যে, ইহার দায়িত্ব কোনও মন্ত্রী বা নাজিরু'ল-খাস্স-এর উপর ন্যস্ত করা হইত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুলতানই গ্রহণ করিতেন। কারণ কারিমী পণ্যের উপর আরোপিত কর তাঁহার খাজাঞ্চিখানায় জমা হইত। আল-মুআয়্যাদ শায়খ-এর অধীনে নিযুক্তির সনদের মাধ্যমে এই কার্যের গুরুত্ব দেখান যায় : এইরূপ সনদের বিষয়বস্তুর বর্ণনা ইব্ন হিজজা আল-হামাবী (দ্র.) প্রদান করিয়াছেন। এইভাবে একটি পদ দেওয়া হয় শাফিঈ ফাকীহ কামালুদ-দীন আল-বারিযীকে। যেহেতু মিসরের দক্ষিণাঞ্চল দীর্ঘকাল যাবত প্রাচ্যের আমদানীর সাধারণ বাণিজ্য পথ ছিল, তাই অন্য একটি নিয়োগপত্রে জোর দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ মিসরের প্রধান ওয়ালী, ওয়ালী উলাতু'স-সাঈদের বাণিজ্যিক কার্যাদির দিকেও বিশেষ নজর রাখা উচিত। কারণ ইহা "য়ামান-হিজায-এর প্রবেশদ্বার" ছিল। তৃতীয় নিয়োগপত্রে উত্তর মিসরে কারিমী কার্যকলাপের প্রভূত গুরুত্বের কথা উল্লিখিত আছে। প্রধান ওয়ালীর কর্তব্য ছিল তাহাদের সহিত সদ্ভাব রাখা এবং তাহাদের স্বার্থের আনকূল্য করা।

৮৩২/১৪২৯ সালে বারস্বায় (Barsbay) মরিচ ব্যবসায় তাঁহার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাজারের কড়া তত্ত্বাবধান শুরু করেন। তিনি নিজে জুদ্দা (জিদ্দা) হইতে মরিচ ক্রয় করিতেন এবং নিজ ব্যবসা শেষ হইবার পূর্ব পর্যন্ত অন্য বণিকদের ঐ পণ্যের ব্যবসা করিতে নিষেধ করিতেন। মূল্য নির্ধারণ অন্তে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে ফরাসিগণের সহিত মরিচ ও মসলা ব্যবসায় সংকুচিত করিতেন। ইহাতে ফরাসীদের স্বার্থে আঘাত লাগে ; কারণ বাজারদর অপেক্ষা পঞ্চাশ দীনার অধিক মূল্যে তাহাদিগকে মরিচ কিনিতে হইত। বাধ্য হইয়া তাহারা ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং মাঝে মাঝে কোনও পণ্যদ্রব্য ক্রয় না

করিয়াই দেশে ফিরিয়া যাইত। মিসরীয় ব্যবসায়ীগণের ক্ষতি হইতে থাকে। যখন কারিমী বণিকগণ গোপনে ফরাসীগণের সহিত ব্যবসায়ের চেষ্টা করিত, তখন ৮৩৩/১৪৩০ সালে বার্সবায় তাহাদিগকে বাণিজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদের ভয় দেখাইতেন। দুই বৎসর পরে তিনি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ব্যবসা না করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। ৮৩৮/১৪৩৫ সালে তিনি জুদ্দার সহিত মসলা বাণিজ্য সংকুচিত করেন এবং পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। মিসর ও পাশ্চাত্যের বণিকগণের আসন্ন অসুবিধাসমূহ কাটালান (Catalan) এবং তুর্কী জলদস্যুদের জন্য তীব্রতর হয়। চাকমাক (৮৪১/১৪৩৮-৭৫৬/১৪৫৩) ফরাসী বণিকদের মিসরের বন্দরসমূহের অবস্থান সময়সীমা অনধিক ছয় মাসে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। ৯ম/ ১৫শ শতাব্দীতে কারিমী বণিকগণের অবনতিশীল অবস্থার কারণ শুধু মামলুক সুলতানদের নীতি নয়, এই সঙ্গে ছিল মিসরে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট এবং য়ামানী রাজা আন-নাসির আহমাদের নীতিমালা ; হিজাযে তাঁহার ক্ষমতা সম্প্রসারণ করিতে এবং সেখানে মিসরীয়দের সুবিধাজনক অবস্থান হইতে বহিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু খোদ য়ামানে তিনি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। কারিমিগণ 'আদন (এডেন)-এ তাহাদের সম্পদের অংশবিশেষ ত্যাগ করিয়া ভারত অথবা জুদ্দাতে পলায়ন করে। চীনের বণিক ও তাহাদের জাহাজগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনা সম্রাট ৮২৩/১৪২১ সালে উপঢৌকন প্রেরণের সময় রাসূলী সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ জানান। ইতোমধ্যে মিসর সরকার বণিক ও ক্যাপটেনগণকে 'আদন ও জুদ্দা হইতে আনয়নের জন্য শুধু প্রলোভনই দেন নাই, উপরন্তু রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার স্থাপনেরও চেষ্টা করেন।

৯ম/১৫শ শতাব্দীতে মামলূক সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে রাজনৈতিক আস্থা সংকটাপন্ন ছিল ; তথায় অবিরাম মিসরীয় অভিযান প্রয়োজন হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহাতে রাজকোষের উপর চাপ পড়ে। একচেটিয়া অধিকারাধীন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করায় কায়েতবে (Ka'itbay) ষোলটি সৈন্যাভিযানের ব্যয়ভার বহন করেন ; ইহাতে সৈন্যদের বেতন ছাড়াই আশি লক্ষ দীনার ব্যয় হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি এই ব্যয়ভার বহনে সক্ষম ছিল না ; তাই বাণিজ্য কর দ্বারা ইহা বহন করা হয় ; কিন্তু ইহা কারিমী বণিকগণের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া ওঠে। তখন হইতে তাহাদের লাভজনক ব্যবসায়ের ক্ষতি শুরু হয়। অনেকে সুলতানের চাকুরী গ্রহণ করে এবং মিসরের উৎকৃষ্ট পাইকারী ব্যবসায়ী হইয়া পড়ে। অন্যেরা ভারতে, বিশেষ করিয়া কালিকট (দ্র.) ও কামবায়াতে চলিয়া যায় এবং অনেকে অর্থলগ্নি করিতে শুরু করে। এই লগ্নি কারবার তাহাদের জন্য কম লাভজনক হইলেও রাষ্ট্রের জন্য বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাঁহারা এত অধিক পরিমাণে তাম্রমুদ্রা রফ্‌তানী করে যে, ৮৩২/১৪২৯ সালে জুদ্দাতে তাহাদের বাণিজ্য সুলতান কঠোরভাবে নিষেধ করেন। এই নিষেধাজ্ঞা পুনরায় ৮৩৯/১৪৩৭ সালে জারী করিতে হয়। বারসবায়-এর শাসনামলে বণিকদের অবস্থা কত অসুবিধাজনক ছিল তাহা একটি সমসাময়িক লেখা হইতে পরিষ্কার জানা যায়। একজন বণিকের দশ হাজার দীনার মূল্যের পণ্যদ্রব্য গুদামজাত থাকা সত্ত্বেও তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাকে কর্জ করিতে হইত।

লোহিত সাগরের বণিকগণ তাহাদের কায়রোর সহকারীদের বিপরীতে সুলতানের সহিত নিজেদের অধিকার স্থাপনের জন্য খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে চেষ্টা চালায়। এমনকি তীমূরীয় শাসক শাহরুখ এই কলহে জড়াইয়া পড়েন। শারী'আর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল প্রকার কর জুদ্দা হইতে আদায়ের প্রকাশ্য নিন্দা করেন এবং কায়রোর ফুকাহা ও ফাত্ওয়া বিশেষজ্ঞগণকে নিজদের প্রভুর খামখেয়ালীর ভার বহনকারী পশু বলিয়া অভিহিত করেন। শাহরুখ মামালূক ও প্রাচ্যের বণিকগণের বিরোধ জটিলতর করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সুলতানকে তাঁহার একচেটিয়া নীতি পরিত্যাগ করাইতে এবং একমাত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী কর আদায় করাইতে সক্ষম হন নাই।

৯ম/১৫শ শতকের প্রথম দশকগুলিতে চীনা নৌবহরের উত্তর আফ্রিকার উপকূল ও 'আদন উপসাগরে ক্ষণস্থায়ী অনুপ্রবেশ কারিমীদের বিপক্ষে সুলতানের খামখেয়ালী আচরণ সংশোধন করিতে কিংবা ইথিওপিয়া ও য়ূরোপের মধ্যে এই সময়ে স্থাপিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন মিসরের সুলতানকে কারিমীদের প্রতি তাহার নীতি পরিবর্তন করাইতে সমর্থ হয় নাই। ইরানী বংশোদ্ভূত এক কারিমী মুসলিমের পুত্র নূরু'দ-দীন 'আলী আত-তাওরীযী অস্ত্র ও য়ূরোপীয় বস্ত্র ইথিওপিয়ায় বিক্রয় করিত ; তাহাকে চরম রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, সে নাজাশী (Negus)-র আদেশে আরাগণের আলফোনসো (Alphonso of Aragon)-কে মুসলিমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য মাগরিব হইয়া য়ূরোপে যায়। তাহাকে ৮৩২/১৪২৯ সালে কায়রোতে ফাঁসী দেওয়া হয়। ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী এবং তাঁহার ছাত্র আস-সাখাবী এই রায়ের ন্যায়-নিষ্ঠতার প্রশ্ন ওঠান এবং এই মত পোষণ করেন যে, আত্-তাওরীযী ইথিওপিয়াতে ইসলামের প্রসার ঘটান এবং সেখানে তিনি তাঁহার কার্যকলাপের জন্য উচ্চ সম্মান লাভ করেন। নাজাশী ইয়েস্হাক (Negus Yeshak) ৫ম আলফোনসোর দরবারে পৌছান [C. de la Ronciere, La decouverte de l'Afrique au moyen age, ii, 116 ; F. Cerone, La politica orientale di Alfonso di Aragona, in Apchivio Storico per le Province Napoletane, xxvii (1902) 39-43, 65-66] এবং ইথিওপিয়ার মিত্রতা গ্রহণ করেন। বাণিজ্যে জুদ্দার অবস্থান খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে নাজাশী সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে সাওয়াকিনদের সহিত লোহিত সাগরে বাণিজ্য শুরু করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের একচেটিয়া অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টায় বারস্‌বায় সকল জাহাজকে 'আয়যাব (দ্র.) বন্দরে ভিড়িতে নিষেধ করেন। স্থানীয় গোত্রসমূহ জলদস্যুতে পরিণত হইয়াছিল ; তাঁহাদের বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং ৮২৯/১৪২৬ সালে শহরটিকে ধ্বংস করা হয়। লিও আফ্রিকানাস (Leo Africanus)-এর মতে ৪,০০০ অধিবাসীকে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্ট লোকজন ইথিওপিয়ার বন্দর দঙ্গোলা বা সাওয়াকিনে চলিয়া যায়। মামালূক সুলতানগণ মাস্‌সাওয়া (Massawa) এবং সাওয়াকিব পর্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা প্রসারিত করেন। শেষোক্ত স্থানের শাহযাদা সুলতানের সামন্তে পরিণত হন এবং কায়রো প্রশাসনের নিকট হইতে সনদ গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন তাগরীবিরদীর মতে ৮৫৯/১৪৫৫ সালে কারিমিগণ মিসরের বাজারে উপস্থিত হয় নাই এবং ৮৮৯/১৪৮৪ সালের পরে সমসাময়িক সূত্রে তাহাদের আর কোন উল্লেখ নাই। যতদূর জানা যায়, মিসরের শেষ দুইজন কারিমী, 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ কাল্‌য়ূবী এবং 'আলী

ইব্‌ন বাদরু'দ-দীন হাসান ইব্‌ন উলায়বা ৮৯৭/১৪৯১-৯২ সালে ইনতিকাল করেন।

শুধু কারিমিগণই নয়, বণিকশ্রেণী তাহাদের মর্যদাপূর্ণ বাণিজ্য পরিচালনার অবস্থান হারায়। 'উছমানীদের মিসর দখলের অল্পকাল পূর্বে মাত্র দুইজন কসাই বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। মিসরের পাইকারী ব্যবসায়ী তাহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক হারায় এবং ১৯ শতকের শেষাবধি এই অবস্থা ফিরিয়া পায় নাই। পর্তুগীজ ও উছমানী এই দুই শক্তিশালী বিদেশী শক্তির সহিত সংগ্রামকালে কারিমিগণ এবং অন্যান্য মিসরীয় বণিক পশ্চিমে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ভেনিসীয়দের পক্ষে যোগদান করে নাই অথবা মামলূকদের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চেষ্টা করে নাই। সামরিক বাহিনীই রাষ্ট্রের কর্ণধার, এই দৃঢ় বদ্ধমূল ধারণাতে স্থির থাকিয়া তাহারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের কথা চিন্তা করে নাই। ইহা সত্য যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দী হইতে বহু মামলূক তাঁহাদের ইকতা (দ্র.)-গুলি বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং এইরূপে বহু বণিককে ভূমি লাভে সমর্থ করে, সরকারের বা ফুকাহা'-এর আপত্তি সত্ত্বেও এইরূপ কারিমী বণিক নাসিরু'দ-দীন ইব্‌ন মুসাল্লাম (মৃ. ৭৭৫/১৩৭৩) ৩,৪৩৮ জাদ্দান (jaddan) জমি লাভ করে বলিয়া কথিত আছে। ইহার ভূমিকর ১০,০০০ দীনার বকেয়া ছিল। এই ব্যবস্থা মিসরের ইকতা' প্রথাকে প্রভাবিত করে ও অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা ইকতা লাভ করে তাহারা কখনও মামলূকদের নিকট হইতে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় সফল হয় নাই। তাহারা তাঁহাদের নিকট নতি স্বীকার করে, যদিও ইহাতেই তাহাদের পতন ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Ashtor, The Karimi Merchants, in JRAS 1956; (২) A. S. Atiya, The Crusade in the later Middle Ages. London 1938; (৩) E. Blochet Histoire d'Egypte de Makrizi, in ROL, VIII (1900/1901), 540, (৪) Cl. Cahen x R. B. Serjeant. A fiscal Survey of the Medieval Yemen, in Arabica, iv (1957) (৫) A. Darrag., L' Egypt sous le regne de Barsbai, Damascus 1961; (৬) R. R. di Miglio, II commercio Arabo con la Cina dal X secolo all'avvento dei Mongoli; (৭) Il commercio Arabo con la Cina dall' Avvento dei Mongoli al XV secolo, AIUON , N. S. xv (1965), xvi (1966); (৮) W. Fischel, Uber die Cruppe der Karimi Kaufleute Ein Beitrag zur Geschichte des Orienthandels unter den Mamluken. in Studia Arabica 1 (Rome 1939); (৯) ঐ লেখক The Spice Trade in Mamluk Egypt, JESHO, i (1958) ; (১০) S. D. Goitein, New light on the Beginnings of the Karim Merchatns, JESHO, i (1958); (১১) ঐ, লেখক Mediterranean Society; (১২) The Jewish Community in the Arab World ২য় খণ্ডে, University of California Press 1967-71; (১৩) W. Heyd, Histoire du Commerce du levant au Moyeu Age, zvols, Leipzig 1885-6; (১৪) S. Labxb এস. লাবীব, আত-তুজ্জারু'ল কারিয়্যা ঃ inBulleteia of The Egyptian Society for Historical studies, Cairo,iv (1952); (১৫) ঐ লেখক, Geld und Kedit, JESHO, ii (1959); (১৬) ঐ লেখক, al Asadi (=ibn Kadi Shuhba) und sein Bericht uber Verwaltung und Geldreform in 15 jhdt., JESHO, viii (1965); (১৭) ঐ লেখক, Les Marchands Karimis en Orient et dans I'Ocean Indien , in colloque International d'Histoire Maritime, presente par M. Mollat, Paris 1970; (১৮) ঐ লেখক, Handelsgeschichte Agyptens im Spatmittelalter, Wiesbaden 1965; (১৯) Fr. C. Lane, The Mediterranean Spice Trader, in The American Historical Review (1940); (২০) E. Littmann, Bespreechung des Beitrages von W. Fsrchel uber die Gruppe der Karimi-Kaueflute in Orientalia. viii (1939)) 174-6; (২১) R. Nausa, Les Karimis aux Archives de Venise, in JESHO, i (1958); (২২) J. Sublet, Abd al-Latif al-Takriti et la famille des Banu Kuwayk, Maohands Krimi Arabica. xi (1962); (২৩) M. Weber, Wirtschaftsgeschichte ; Abriss der universalen Sozial und Wirtschaftsgeschichte 3rd ed., Berlin 1958; (২৪) G. Wiet, Les marchands d'epices sous les sultans mamlouks, Cairo, 955.

Subhi Y. Labib (E. I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

কারীন (قرين) ঃ (আরবী মূল ق-ر-ن) [ব. ব. قرناء], ইহার অর্থ (ভালো বা মন্দ) সাথী (দ্র. সিহাহ্ ; লিসান ; এই দুই অভিধানে ইহার অর্থ মুসাহিব অর্থাৎ সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার কারণে আবূ বাক্র (রা) ও তালহা (রা)-কে এবং আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-কে আল-কারীনান (قرينان) বা সঙ্গীদ্বয় বলা হইত।

قرين শব্দটি কুরআন কারীম-এ একবচনে সাতটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, একটি স্থানে (৪১ ঃ ২৫) বহুবচনে (قرناء) ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যে সকল ফেরেশতা অথবা যে সকল শয়তান মানুষের সহিত থাকে তাহাদের বুঝাইতেও কুরআন কারীম-এ এই শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে। ৫০ ঃ ২৩ আয়াতে শব্দটি দ্বারা كراما كاتبين (সম্মানিত লিপিকারগণ বুঝানো হইয়াছে। ফেরেশতা সঙ্গিগণ মানুষকে সৎ কাজের, পক্ষান্তরে শয়তান সঙ্গিগণ মন্দ কাজের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করে। বহু হাদীছেও এই সম্পর্কে আলোচনা আছে (দ্র. গ্রন্থপঞ্জি)। কোন কোন আয়াতে শব্দটি মানুষ সঙ্গী বা মানুষ বন্ধু অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে (৩৭ ঃ ৫১) আল-বায়দাবীর মতে ইহার অর্থ দুনিয়ার সঙ্গী (جليس فى الدنيا)।

প্রাচীন্ আরবে قرين শব্দটি দ্বারা বিশেষ প্রকার জিন্‌ন-কে বুঝানো হইত, যাহারা কবিদের সঙ্গে থাকিয়া কবিতার প্রেরণা যোগাইত বলিয়া ধারণা করা হইত।

ফারসীতেও এই শব্দটি সঙ্গী অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ

زینهار از قرین بر زنهار

"অসৎ সঙ্গ হইতে সতর্ক থাক।"

ইহা অন্য একটি শব্দ যোগে 'নৈকট্য'-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যথাঃ কারীন-ই কিয়াস অর্থাৎ ধারণার নিকটবর্তী, কারীন-ই মাস্‌লাহাত অর্থাৎ কল্যাণের কাছাকাছি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মধ্যে প্রদত্ত। এতদ্ব্যতীত হাদীছ গ্রন্থ ঃ (১) আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল মুস্‌নাদ, ১খ, ৩৮৫, ৩৯৭ প., ৪০২, ৪৬০ ; ২খ, ৩২৩ ; (২) আদ্-দারিমী, মুস্‌নাদ, রিকাক বাব ২৫; (৩) মুসলিম সাহীহ, সিফাতু'ল-মুনাফিকীন, হাদীছ ৬৯ (শার্‌হসহ, আন-নাওয়াবী, সং. কায়রো ১২৮৩ হি., ৫খ, ৩৬২, কন্সটান্টিনোপল ১৩৩৪ হি., ৮খ, ১৩৮)।

B. D. Macdonald ও সম্পদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলিল

কারীনা (قرينة) ঃ আ. (১) আভিধানিক অর্থ নাফ্‌স (দ্র.) এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়—এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর মিলন, সংযুক্তকরণ, একীভূতকরণ, দুইটি বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক, দুই বস্তুর বাহ্যিক সম্পর্ক,—ভঙ্গিমা, পদ্ধতি, বিন্যাস, পারিপাট্য, সুশৃঙ্খলা, সমতা, জোড়া, সঙ্গী, সমবয়সী, সমমর্যাদা, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, ব্যাপকতা, অন্তরঙ্গতা, সাদৃশ্য, অনুরূপ, স্ত্রী, স্বামী, (স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজন), ব. ব. কারীনাত قرينات ও কারাইন قرائن (দ্র. ফারহাঙ্গ-ই আনান্দরাজ ; ফারহাঙ্গ আসাফিয়া ও Hans Wehr A. Dictionary of Modern-Written Arabic, —১৯৬৬ খৃ., শিরো.)। (২) 'ইল্‌মুল-বায়ান (অলংকারশাস্ত্র)-এর পরিভাষায় ইহার অর্থ হইল ঃ (ক) কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি মূল অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অপর অর্থে ব্যবহৃত হইলে ইহাকে কারীনা বলা হয় ; ইহা দুই প্রকার—কারীনা হালিয়া অপর নাম কারীনা মা'নাবিয়া এবং কারীনা মাকালিয়া গাকরীনা লাফজিয়া। আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ ছন্দোবদ্ধ গদ্যে অন্ত্যমিলবিশিষ্ট শব্দের শেষাংশকেও কারীনা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন (দ্র. থানাবী, কাশশাফ ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন বৈরূত সং., পৃ. ১২২৮. শিরো.; (খ) কোন কোন ছন্দে কবিতায় একটি শ্লোকের দুইটি পঙক্তিতে অন্ত্যমিলবিশিষ্ট দুইটি শব্দ থাকিলে পরিভাষায় ইহাকেও কারীনা বলা হয় (দ্র. ফারহাঙ্গ আনান্দরাজ)। (৩) যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় যখন বাক্য (proposition, قضيه) সমর্থক (affirmatisec, موجبه) হউক বা নঞর্থক (nagative, سالبه) তখন অপ্রধানহেতু বাক্য minor premise, (صغرى)-কে প্রধানহেতু বাক্য (major premise, كبرى)-এর সহিত সংযুক্ত করাকে কারীনা বলা হয়। ইহা ছাড়া নিরপেক্ষ সহানুমান (categoorical syllogism, قياس خملى)-এর ক্ষেত্রে সার্বিক univseal, (كلية) বাক্যকে বিশেষ (particular جزئيه) (جزئية) বাক্যের সহিত সংযোজনকে কারীনা বলা হয়। ইহার অপর নাম দার্‌ব (ضرب) (দ্র. থানাবী কাশ্‌শাফ ইসতিলাহাতিল-ফুনূন, পৃ. ৯৭২ শিরো 'দার্‌ব' এবং পৃ. ১২২৮, শিরো. 'কারীনা'।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/এ. কে. এম. নূরুল আলম

কারীব (قريب) ঃ এক আধুনিক ছন্দের নাম। তুর্কী ও ইরানী কবিগণ এই ছন্দে কবিতা লিখিয়া থাকেন। ইহাতে রচিত কবিতার প্রতিটি চরণে নিম্নোক্ত স্তম্ভ (ركن ব. ব. اركان) বর্তমান থাকে ঃ مفاعيلن، مفاعيلن، فاعلاتن

অন্যান্য প্রকারের ছন্দের اركان এর পরিমাণ (وزن)-এর ন্যায় আলোচ্য প্রকার ছন্দের স্তম্ভসমূহের পরিমাপ কখনও কখনও পরিবর্তন (زحاف) ঘটিয়া থাকে। ইত্যাকার পরিবর্তনের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) কাব্‌দ (قبض) এই শ্রেণীর পরিবর্তন আলোচ্য প্রকারের ছন্দের (مفاعيلن) স্তম্ভে ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে কবিতায় (مفاعيلن) স্তম্ভটির পরিমাপ مفاعلن -এ পরিবর্তিত হইয়া যায়। (২) কাফ্‌ফ (كف), এই শ্রেণীর পরিবর্তন আলোচ্য প্রকারের ছন্দের مفاعيلن স্তম্ভে ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে مفاعيلن পরিবর্তিত হইয়া مفاعيل হইয়া থাকে। (৩) খাব্‌ন (خبن), এই শ্রেণীর পরিবর্তন আলোচ্য প্রকারের ছন্দের (فاعلاتن) পদে ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে কবিতায় فاعلاتن স্তম্ভটির পরিমাপ فاعلاتن পরিবর্তিত হইয়া যায়। (৪) কাসর (قصر), আলোচ্য ছন্দের فاعلاتن স্তম্ভটির পরিমাপটি فاعلان = فاعلات -এ পরিবর্তিত হয়।

(৫) হায্‌ফ (حذف)। এই পরিবর্তন আলোচ্য ছন্দের فاعلاتن কে فاعلن = فاعلا এ রূপান্তরিত করে।

(উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের পরিবর্তনের পরিচয়ের জন্য দ্র. কাব্‌দ ইত্যাদি পাঁচটি শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধ)।

উল্লেখযোগ্য যে, ফারসী কবিতার ছন্দে مفاعيلن স্তম্ভটির পরিমাপ, خرم-নামীয় নিয়মে مفعولن=فاعيلن-এ পরিবর্তিত হইতে পারে।

কবিতার চরণের কোন স্তম্ভ (ركن)-এর প্রথম দিকের একাধিক বর্ণের বিলোপকে খার্‌ম (خرم) বলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. আরূয-প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী।

মুহাম্মদ বিন শানাব (দা. মা. ই.)/ মোঃ মাযহারুল হক

কারীবা বিন্‌ত আবী উমায়া (قريبة بنت ابى امية) ঃ (রা) আল-কুরাশিয়া আল-মাখ্‌যুমিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবিয়া। উম্মু সালামা (রা) (উম্মুল-মু'মিনীন)-র সহোদরা। আনুল-মাখযূম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ কারীবা বিন্‌ত আবী উমায়া ইবনি'ল-মুগীরা ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখ্‌যূম। অনেকে তাঁহার নাম কুরায়বা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম আতিকা বিন্‌ত উতবা জীবনীকারদের মতে কারীবা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ আমার (প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত) কন্যা যায়নাব ভূমিষ্ঠ হইলে একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আগমন করেন এবং বিবাহের প্রস্তাব দান করেন। আমি সানন্দে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করি। যায়নাবের লালন-পালনের দায়-দায়িত্বও স্বীয় স্কন্ধে রাখি। একবার রাসূল (স) আমার নিকট আগমন করিয়া দেখেন যায়নাব নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যায়নাব কোথায় ? তখন কারীবা ও আমার দাস বলিল যে, তাহাকে 'আম্মার ইব্‌ন য়াসার কোলে নিয়াছে (সংক্ষেপিত)। কারীবা (রা)-র সৌন্দর্যের খুবই খ্যাতি ছিল। আম্‌র ইব্‌ন শিব্‌হ তৎপ্রণীত 'কিতাবু ফাত্‌হ' মক্কা গ্রন্থে ধারাবাহিক সনদে প্রণিধান করেন যে, মক্কা বিজিত হইলে সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা (রা) কুরায়শ রমণীদের রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তুমি কি আবী উমায়া ইবনুল-মুগীরা-র কন্যাদের দেখিয়াছ / দেখিয়াছ তুমি কারীবা-

কে? আল-বালাযুরীর বর্ণনা মতে কারীবা (রা) পূর্ণবয়স্কা হইলে মুআবিয়া (রা)-র সহিত (তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনানুসারে আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র 'আব্দু'র-রাহ্মান তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। ইব্ন সা'দ একটি বিশুদ্ধ সনদে ইব্ন আবী মুলায়কা হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন আবী বাক্র (রা) উম্মু সালামা (রা)-র সহোদরা কারীবা-কে বিবাহ করেন। 'আব্দু'র-রাহ্মানের স্বভাবে কিছুটা রুক্ষতা ছিল। ফলে একদিন কারীবা তাঁহাকে বলিলেন ঃ ওগো। তোমাকে আমার ভয় হয়। 'আবদু'র-রাহমান বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমার হস্তে (বিবাহ রাখা না রাখার) ক্ষমতা অর্পণ করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ সিদ্দীক-তনয়ের উপর আমি কাহাকেও প্রাধান্য দিতে পারিব না। অতএব তিনি তাঁহারই নিকট থাকিয়া গেলেন। তাঁহার গর্ভে 'আব্দু'র -রাহমানের ঔরসজাত 'আব্দুল্লাহ নামের এক পুত্র এবং উম্মু হাকীম ও হাফ্সা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কারীবা (রা)-র জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। তাঁহার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনও হাদীছ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মাইস-সাহাবা বৈরূত তা. বি., ২খ, ২৯৮; (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা মিসর ১৩২৮ হি. ৪খ, ৩৯০ ; (৩) ইবনুল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ৫৩৪ ; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ, ২৬২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কারীবা বিন্ত আবী কুহাফা (قريبة بنت ابى قحافة) ঃ (রা) একজন সাহাবিয়া। হযরত আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর ভগ্নি। মাতার নাম হিন্দ বিন্ত নুকায়দ ইব্ন বুজায়র। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা আস-সাঈদী (রা)-র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁহার গর্ভে কায়স ইব্ন সা'দ (রা)-র কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। ইব্ন সা'দ আয-যাহাবী, ইব্ন হিব্বান প্রমুখ তাঁহার নাম সাহাবিয়াদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে কোনও হাদীছ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত , হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৫০ ; (২) ইব্ন সা'দ আত-তাবাকাতুল-কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ, ২৪৯; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২৯৮ ; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯০, ৩৯১।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কারীবা বিন্ত আবী সুফয়ান (قريبة بنت ابى سفيان) ঃ (রা) একজন সাহাবিয়া উমায়্যা বংশীয় মুআবিয়া (রা)-র সহোদরা। তাহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। কথিত আছে যে, চৌদ্দজন বদ্রী সাহাবী তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তিনি আবূ-তালিবের পুত্র 'আকীলের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কারীবা (রা)-র সূত্রে রাসূল (স)-এর কোনও হাদীছ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা , মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯০।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কারীবা বিন্ত যায়দ আল-আনসারিয়া (قريبة بنت زيد الانصارية) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবিয়া। আনসারদের বানূ জুশাম গোত্রভুক্ত। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ (রা)-র ভগিনী—যিনি স্বপ্নযোগে সর্বপ্রথম আযান শুনিতে পাইয়াছিলেন। জীবনীকারদের মতে কারীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বায়'আতকারী মহিলাদের একজন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কি না জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নুল-আছীর আল-জাযারী, উস্দু'ল-গাবা তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ৫৩৪ ; (২) ইব্ন সা'দ আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৮খ, ৩৬৫ ; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মাইস-সাহাবা বৈরূত, তা. বি., ২খ, ২৯৮; (৪) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯০, তেহরান সং, ৪খ, পৃ. ৫৩৪।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কারীম ইবনু'ল-হারিছ ইব্ন 'আম্র (كريم بن الحرث بن عمرو) ঃ (রা) একজন সাহাবী। তিনি বানূ সাহ্ম গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার আবাসস্থল ছিল বসরা নগরী। ইমাম বুখারী (র) তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত কোন হাদীছ সাহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ইমাম বাগাবী ও ইব্ন কানি তাঁহার সূত্রে বর্ণিত বলিয়া যে-ই হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন ইব্ন হাজার আসকালানীর অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত যুক্তি-প্রমাণাদি অনুযায়ী উহার প্রকৃত বর্ণনাকারী তাঁহার পিতা হারিছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইমাম বুখারীর বক্তব্য সর্বদা বস্তুনিষ্ঠ হয় বলিয়া এ ক্ষেত্রেও তাঁহারই মতকে ভিত্তি করিয়া ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সাহাবীদের জীবনী সংকলকদের মধ্যে আবূ নু'আয়ম ও ইব্ন মান্দা তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আসকালানী, ইসাবা মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৯৩-৪, ক্রমিক নং ৭৪০৩ ; (২) ইবনুল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৩৯।

লিয়াকত আলী

কারীম খান যান্দ (كريم خان زند) ঃ (মুহাম্মদ কারীম), (আনু. ১১৬৪-৯৩/আনু. ১৭৫১-৭৯), যান্দ্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যত পারস্যের অধিকাংশ এলাকার শাসক। 'শাহ উপাধি ধারণের আইনগত অধিকার না থাকায় তদস্থলে ইনি 'ওয়াকীল' অর্থাৎ অন্তর্বর্তী শাসক বা শাসকের প্রতিনিধি উপাধি গ্রহণ করেন। নাদির শাহ আফশার কর্তৃক আরোপিত যান্দ্ উপজাতির নির্বাসিত গোষ্ঠীজীবনের পরিমণ্ডলে তিনি লালিত-পালিত হন ও শাহের মৃত্যুর পর উত্তর খুরাসানের নির্বাসন এলাকা হইতে যান্দ্ দলটিকে 'মালাইর'-এর ৩০ কি. মি. দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত 'পিরিয়া"—বর্তমান পারী-র গ্রামে লইয়া যাইতে নেতৃত্ব দেন। উক্ত গ্রামেই উপজাতিটি, যাহা মূলত লাক্ [দ্র.] জাতির একটি পরবর্তী শাখা মাত্র—নির্বাসনের পূর্বে প্রথম বসতি স্থাপন করে। পার্শ্ববর্তী সর্দারগণের সঙ্গে সংঘর্ষকালে ইনি সবিশেষ সময় দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। বাখতীয়ারী "আলী মারদান খান [দ্র.]-এর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে

আবদ্ধ হইয়া তিনি ইসফাহান অধিকার করেন। সেখানে ১১৬৪/১৭৫১ সনে তাঁহারা সাফাবী বংশের ৮ বৎসর বয়স্ক এক বালককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার নাম দেন ৩য় ইসমা'ঈল। কর্মক্ষেত্রে কারীম খান প্রধান সেনাপতির ও 'আলী মারদান নাবালক নৃপতির অভিভাবক বা ওয়াকীলের দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। 'আলী মারদান খানের আচরণে প্রতারণার আশংকা করিয়া কারীম খান ইসফাহান অধিকার করেন। তিনি ৩য় 'ইসমা'ঈলকে নিজের তত্ত্বাবধানে আনিয়া 'ওয়াকীল' উপাধি ধারণ করেন ও 'আলী মারদানকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন। এক নূতন সাফাবী ক্রীড়নক নৃপতির প্রতি 'আলী মারদানের সমর্থন সংগ্রহ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে জনৈক যান্দ্ সেনাপতি সেই বাখ্তীয়ারী গোষ্ঠীপ্রধানকে গোপনে হত্যা করে। কারীম খান সে অবস্থায় কাজার মুহাম্মাদ হাসান খান, আফশার ফাত্হ 'আলী, আফগান আযাদ খান ও অন্যান্য দাবীদারের হাত হইতে ইসফাহান ও শীরায নগরী দুইটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধিত বোধ করেন। শূন্য সিংহাসন দখলের ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে ১১৭২/১৭৫৯ সনে মুহাম্মাদ হাসান তাঁহার আপন উপজাতীয়ের হস্তে নিহত হইলে ১১৭৬/১৭৬৩ এবং ১১৭৯/১৭৬৫ সনে ফাত্হ 'আলী ও আযাদ খানের পক্ষে সেনাবাহিনীগুলিকে একত্রীকরণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এক সময়ে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় হওয়ায় কারীম খান কেবল খুরাসান ব্যতীত সমগ্র ইরানের অবিসম্বাদী শাসকরূপে জনস্বীকৃতি অর্জন করেন।

তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে খুরাসান প্রদেশ নাদির শাহর উত্তরাধিকারীদের হস্তে রাখিয়া দেন। যদিও পরবর্তীকালে তাঁহাকে বারংবার স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছে, যেমন– খূযিস্তানে কা'ব উপজাতিগিদকে, কূহ-ই গীলূয়াতে লীরাভী যাযাবর দলকে, কিরমান অঞ্চলে তাকী দুর্রানীকে, ফারস এলাকায় নাসীর লাবীকে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মীর মুহান্নাকে এবং আসতারাবাদ ও মাযানদারান এলাকায় হুসায়ন কুলী কাজারকে—তথাপি তাঁহার শাসন ইরানে অতীব প্রয়োজনীয় শান্তি আনয়ন করে। যে ৩য় ইসমা'ঈল ১১৬৫/১৭৫২ সনে কারীম খানের পক্ষ ত্যাগ করিয়া পালাইয়া গিয়াছিল, সে আবার ১১৭২/১৭৫৯ সনে ফিরিয়া আসিলে অযোগ্যতার কারণ দর্শাইয়া তিনি তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অবশ্য তাহাকে আবাদা [দ্র.] নামক স্থানে বিপুল অঙ্কের অবসর ভাতাসহ সসম্মানে নজরবন্দী রাখেন। কারীম খান তাঁহার 'ওয়াকীল' উপাধি পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি ইহাকে ওয়াকীলু'দ-দাওলার বদলে ওয়াকীলু'র-রা'আয়া (রাজপদে অধিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধি) অর্থে ব্যবহার করিতেন। তিনি শীরাযে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন ও অনেক চমৎকার ইমারত নির্মাণ করিয়া ইহার সমৃদ্ধি সাধন করেন, যেগুলির কোন কোনটি অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

তিনি বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য, কারুশিল্প ও কৃষিকার্যের উন্নয়ন সাধন করেন, বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দেন ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের য়ূরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছু কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা মঞ্জুর করেন। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কার্যকর করার লক্ষ্যে তাহাদের প্রভাবকে কাজে লাগাইবার জন্যই প্রধানত তিনি ইহা করিয়াছিলেন। একবার মাত্র ইরান-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিনি ১১৯০/১৭৭৬ সনে বসরা অধিকার করেন। উহাকে ইরাকে তুর্কী শাসন বিলোপের প্রচেষ্টা না ধরিয়া তুর্কী বন্দরটির বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব মানিতে তাঁহার আপত্তি বলা যায়। তাঁহার একটি শিশু পুত্র ও জনৈকা অতি প্রিয় পত্নীর মৃত্যুশোক এবং ক্রমাগত রোগভোগ (পেটের শূল বেদনা, যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি) শেষ জীবনের দিনগুলিতে তাঁহাকে হতাশাগ্রস্ত করে।

তিনি ১৩ সাফার, ১১৯৩/২ মার্চ, ১৭৭৯ তারিখে ইনতিকাল করেন। শীরায নগরীতে তাঁহাকে দাফন করা হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষীয় কাজাররা তথা হইতে তাঁহার দেহাবশেষ উত্তোলন করিয়া উহা প্রথমে তেহরান নগরীতে ও পরবর্তীকালে নাজাফ-এ দাফন করে। কারীম খানের শাসন ছিল লাক্জ ও লূর যাযাবর উপজাতিদ্বয়ের সাধারণ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং পিতার দিক দিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি রাজতন্ত্র। তাঁহার শারীরিক শক্তি, অস্ত্র চালনায় দক্ষতা, রসিকতাবোধ, প্রজাদের কল্যাণের জন্য উদ্বেগ, শীরায নগরীর বাসিন্দাদের সমৃদ্ধির জন্য দুশ্চিন্তা প্রভৃতি বহু লোককাহিনীর উপাদান যোগাইয়াছে। তাজ্‌রিবাতুল-আহরার, ফারস-নামায়ি নাসিরী, রাওদাতুস-সাফায়ি নাসিরী নামক পুস্তকাদিতে উহাদের নমুনা দেখা যায়। অধিকন্তু তু. J. Malcolm History of Persia।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ (১) সাদিক-ই নামী, তারীখ-ই-গীতিগুশা, সম্পা. সাঈদ নাফীসী, তেহরান ১৩১৭ হি., নিঘন্ট; (২) আবুল-হাসান গাফফারী, গুলশান-ই মুরাদ, অপ্রকাশিত, দ্র. Storey, Persian literature, ২খ, ৩৩১ ; (৩) লুতফ 'আলী বেগ আযার, আতাশকাদা, কালিকট ১২৪৯ হি. পৃ. ৪৮১-৮ ; (৪) এ. গুলিসতানা, মুজমালুত-তাওয়ারীখ নাদিরী, তেহরান ১৩২০ হি., নির্ঘন্ট ; (৫) রূয নামা-য়ি মীরযা মুহাম্মাদ-ই কালান্তার, তেহরান ১৩২৫ হি., পৃ. ৪১-৬৮ ; (৬) মুহাম্মদ খালীল-ই মার'আশী মাজমাউত-তাওয়ারীখ, ভূমিকা ; (৭) রুস্তামুল-হুকামা, রুস্তামু'ত-তাওয়ারীখ, তেহরান ১৯৬৯ খৃ., নির্ঘন্ট (এই গ্রন্থকার-প্রদত্ত বিবরণীর অধিকাংশ ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়) ; (৮) রিদা কুলী হিদায়াত রাওদাতুস-সাফা-য়ি নাসিরী, লিথো-মুদ্রণ, তেহরান ১২৭০ হি., ৯খ, ৬-৫০; (৯) হাজ্জী মীর্যা হাসান-ই ফাসাঈ, ফারস-নামা-য়ি, নাসিরী তেহরান ১৩১৩ হি., ১খ, ২০৫-১২ ; (১০) আবদুর-রায্‌যাক-ই দুনবুলী, তাজরিবাতুল-আহরার, তাবরীয ১৯৭১ খৃ., ২খ, নির্ঘন্ট ; (১১) মুহাম্মাদ হাসান সানী'উ'দ-দাওলা মুনতাজাম-ই নাসিরী, তেহরান ১২৯৯ হি., পৃ. ২৯৮-৩১৭ ; (১২) এ. এ. ওয়াযীরী, তারীখ-ই কিরমান, তেহরান ১৩৪০ হি., পৃ. ৩২১-৯ ; (১৩) এ. কাসরাবী তারীখ-ই পানসাদ সালা-য়ি খূযিস্তান, তেহরান ১৩১২ হি., নির্ঘন্ট ; (১৪) এ. নাভাঈ, কারীম খান-ই যান্দ, তেহরান ১৩৪৫ হি., ; (১৫) Ch. Picault, Histoire des revolutions de Perse, ২খ, ৩২৮-৬৮ ; (১৬) A. J. Wilson, the Persian Gulf, পুনঃমুদ্রণ লন্ডন ১৯৫৪ খৃ., নির্ঘন্ট; (১৭) P. M. Sykes, A history of Persia, ২খ, পুনঃমুদ্রণ ১৯৫১ খৃ., নির্ঘন্ট (কয়েকটি ভুল রহিয়াছে); (১৮) J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf, 1795-1880, অক্সফোর্ড ১৯৬৮ খৃ., নির্ঘন্ট; (১৯) J. R. Perry, Karim Khan Zand ঃ a Critical history based on contemporary sources, কেম্ব্রিজ পি. এইচ. ডি. থিসিস, ১৯৭০ খৃ., অপ্রকাশিত, বাণিজ্যদূত ও পর্যটকগণের প্রতিবেদনসমেত অন্যান্য সূত্রের জন্য দ্র. ইংরাজি বিশ্বকোষ (E.I.[1]) (উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও) এবং Mehdi

Roschanzamir -কৃত Die Zand-Dynaste, হামবুর্গ ১৯৭০ খৃ., নির্ঘণ্ট।

A. H. Zarrinkoob (E.I.²)/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

কারীয (দ্র. কানাত)

কারূখ্ (كروخ) ঃ আধুনিক আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বাদ্গীস [দ্র.] অঞ্চলের একটি শহর। ইব্ন হাওকাল (৪র্থ/১০ম শতাব্দীর)-এর বর্ণনা অনুসারে ইহা রাজধানী হারাত-এর পরে সেই অঞ্চলের বৃহত্তম শহর। এখানে একটি জামি মসজিদ ছিল। বিভিন্ন ফল, বিশেষত খোবানী ও কিশমিশের জন্য এই শহর প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে ইহার খ্যাতি লাভের বিশেষ কারণ এই ছিল যে, ইহা পূর্ব ইরানী সীমান্তে খারিজীদের একটি দীর্ঘস্থায়ী কেন্দ্র ছিল। ২৫৯/৮৭৩ সালে সাফফারী বংশীয় আমীর য়া'কূব ইবনুল-লায়ছ-কে কারূখ-এ কেন্দ্রীভূত পূর্ব সীমান্তের খারিজীদের একটি প্রচণ্ড বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে হয়। বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন খারিজীদের "আমীরুল-মু'মিনীন" 'আবদুর-রাহীম আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ। মুকাদ্দীসী-র বর্ণনা অনুসারে ইহার এক শতাব্দীর বেশী সময় পরেও কারূখকারিজীদের একটি কেন্দ্র ছিল। কারূখ অঞ্চলে এই নামের একটি আধুনিক গ্রাম টিকিয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হুদূদুল -আলাম, অনু Minorsky, ১০৫; (২) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 410; (৩) C. E. Bosworth, The armies of the Saffarids, in BSOAS, xxxi (1968), 343-44।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

কারূন (قارون) ঃ বাইবেল উল্লিখিত কোরাহ (Num. xvi), আল-কুরআনে তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে (২৮ ঃ ৭৬-৮২ ; ২৯ ঃ ৩৯ এবং ৪০ ঃ ২৪)। শেষোক্ত দুইটি আয়াত হইতে প্রতীত হয় যে, সে ছিল হামানের ফিরআওনের জনৈক মন্ত্রী এবং তাহারা তিনজনই মূসা (আ)-কে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অপবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করিত। প্রথম অংশটি (২৮ ঃ ৭৬-৮২) অনুসারে কারূন ছিল মূসা (আ)-এর স্বজাতি এবং অপরিমেয় ধনের মালিক হওয়ায় সে ঐ জাতির সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিত। সে মনে করিত যে, তাঁহার জ্ঞানের জন্যই এই ধনরাশি তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে (اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ) (২৮ ঃ ৭৮)। সে জনসমক্ষে তাহার সম্পদ বিরাট জাঁকজমকের সহিত প্রদর্শন করিত। অবশেষে আল্লাহ্ কারূনকে তাহার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলেন (فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ) (২৮ ঃ ৮১)। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদিগকে প্রদত্ত পরকালে আল্লাহর প্রতিদান অপেক্ষা ইহজগতের ক্ষণস্থায়ী সম্পদকে যাহারা বেশী পসন্দ করে, কারূনের পরিণতি তাহাদের জন্য উদাহরণ।

এই কাহিনীতে পরোক্ষভাবে কারূন বা কোরাহ-এর বিদ্রোহ এবং সুস্পষ্টভাবে তাহার শাস্তির (Num. xvi, 31-3, xxvi, 10) উল্লেখ রহিয়াছে। কিসাস'ল-আম্বিয়া-র টীকাকার ও লেখকগণ একটি দীর্ঘ কিংবদন্তী ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। য়ূরোপীয় কোনও কোনও লেখকের মতে ইহার অংশ বিশেষ য়াহূদী ধর্মীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত (দ্র. Jewish Encylopaedia, vii 556 প. ; সেল-এর আল-কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের টীকাসমূহ এবং আছ'-ছা'লাবীর কিসাস, কায়রো ১৩১৪ হি., ১২০ প.)। হামান ও কারূনকে তাহাদের ঐশ্বর্য ও ধন-লিপ্সার জন্য উক্ত কিংবদন্তীতে একই সাথে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি কেন ফিরআওনের মন্ত্রী হইয়াছিল তাহাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ইসলামে কারূনের কাহিনীর দুইটি ভিন্নমুখী ভাষ্য বর্ণিত হইয়াছে। (১) তাহার কুখ্যাত সম্পদের উৎস ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এবং তাহার বিশেষ জ্ঞানের জন্য সে আলকেমী শাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিল (দ্র. আল-জাহিজ, বুখালা, ৪১, tr. Pellat, ৬৭; আল-মাস্'উদী, মুরূজু'য-যাহাব পুস্তকের একটি প্রসঙ্গ, viii, 177=ed. Pellat, শা. 3312। ইবনু'ন-নাদীম (ফিহ্রিস্ত, ৩৫২, tr. in M. Berthelot, La chimie au moyen age, Paris 1893, iii, 27) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর কাছে প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করেন [যথা ঃ তাওরাতের কাঠের বাক্সটি স্বর্ণমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে (আল-কিসা'ঈ, কিসাস, ২২৯] ও কারূনই সেই ব্যক্তি যে তাঁহাদের পক্ষে কাজটি সম্পন্ন করে। সে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহার সাম্প্রতিক অর্জিত ঐশ্বর্য তাহাকে যে অসদাচরণ, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের দিকে পরিচালিত করে উহার জন্য মূসা (আ)-এর অনুরোধে আল্লাহ্ কর্তৃক সে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। আত-তাবারীর মতে (Zotenberg, i, 382-4) সে ছিল মূলত একজন স্বর্ণকার এবং আল্-কিসাঈ-এর মতে (পূ. গ্র., ২২৯) মূসা (আ)-এর ভগিনী ছিলেন কারূনের স্ত্রী এবং তিনিই তাঁহার ভগিনীর স্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলকেমী শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন [টীকাকারদের মতে সে ছিল মূসা (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র]।

(২) মিসরে তাহার নাম বিভিন্ন হ্রদের সহিত সম্পর্কিত আছে। এইভাবে ফায়্যুম নামক স্থানে মোরিস (Moris) হ্রদের অবশিষ্টাংশ তাহার নাম বহন করে বিরকাতু কারূন (بركة قارون; দ্র. Guides Bleus, Egypte, 1956, 241-2, যেখানে একটি জনপ্রিয় শব্দ ভুলবশত ব্যবহার করা হইয়াছে) এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাম্প্রতিক কালে একটি মাদীনাতু'ল-কারূন (কারূনের শহর) প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। অধিকন্তু কায়রোর দক্ষিণে বিরকাতু'ল-ফীল (بركة الفيل) হ্রদের পার্শ্বে ইব্ন তূলূনের মসজিদের সন্নিকটে প্রাচীনকালে একটি কারূনের হ্রদ (بركة قارون) ছিল, যাহার সহিত স্পষ্টই অলৌকিক কিংবদন্তী জড়িত। আল-মাক্রীযী ইহা বর্ণনা করেন (খিতাত, বূলাক ১৩২৫ হি. ৩খ, ২৬১-২) এবং বলেন যে, ইখ্শীদী শাসক কাফূর (দ্র.) উহার পার্শ্বে একটি ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জিন দ্বারা উহা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, xxviii (Zotenberg-কৃত; cf. Not. et. Extr., i, 167 ff.)। আল্ফ-লায়লা (আরব্য রজনী) মিসরীয় সংস্করণে ধীবর জুদার (جدر)-এর গল্পে (রজনী ৬০৬-২৪) ইহাকে এমন একটি স্থান হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে যেখানে ভূত-প্রেত যাদুকরদের ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। Von Hammer ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, কারূনকে এখানে মিসরীয় শারণ (Charon)-এর সহিত অভিন্ন করিয়া তালগোল পাকাইয়াছে (Der Tausend und Eincn Nacht noch nicht ubersetzte Marchen, tr. Zinserling, ii, 32; tr. Trebutien, i, 291)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, তাফ্সীর, xx, 62 ff. ; (২) ঐ লেখক, তারীখ, নির্ঘণ্ট, (৩) আর-রাযী, তাফসীর, ed. Cairo 1308,

vi, 421 ff.; (৪) ইবনুল-আছীর, সূচীপত্র; (৫) ইব্‌ন নুবাতা, শারহুল-'উয়ূন Cairo 1964, 51-4; (৬) শিবলী, আকামু'ল-মারজান, ২১৮; (৭) A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Jadenthume aufgenommen, Leipzig 1902, 153; (৮) D. Sidersky, Les originis des legendes musulmanes..., Paris 1933, 95-7; (৯) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ২৭-২৮।

D. B. Macdonald/মুঃ আবদুল হালিম খান

[সংযোজন]

(কারূন) ঃ কারূন মূসা (আ)-এর গোত্রভুক্ত ও মিসরের ধনভাণ্ডারের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিল। মিসরের শিলালিপিতে কারু ভূমি (ارض فارو)-এর স্বর্ণ উৎপাদন এবং স্বর্ণ খনির উল্লেখ বারবার হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ফির্‌আওন ও হামানের ন্যায় কারূন একটি আপাধি। মিসরীয় ভাষা অনুযায়ী শব্দটি কারাউন (فارو + اون)-এর সমন্বয়ে গঠিত, যাহার অর্থ "কারু ভূমির জ্যোতি"। কারূন খনিজবিদ্যায় একজন বড় অভিজ্ঞ ছিল। কারূন বানূ ইসরা'ঈল ও অপর দাস গোত্রসমূহকে স্বর্ণখনিসমূহের কার্যে নিয়োগ করিয়া বিনা বেতনে খাটাইত। গ্রীক ঐতিহাসিক মানীছূ বলেন ঃ খনিজ অঞ্চলে আশি হাজার দাস কয়েদী হিসাবে বসবাস করিত। দ্বিতীয় রামাসীস-এর একটি শিলালিপিতে আছেঃ সম্রাটের দাপট-ভীতি কারু-ভূমিতে পৌঁছিয়াছে। তাহার বিজয়সমূহের দরুন তথায় তাহার নাম ধ্বনিত হইতে থাকে এবং তাহার নামে পাহাড়সমূহ অভ্যন্তরীণ স্বর্ণ উপরিভাগে নিক্ষেপ করিয়াছে (Bragsch, Egypt under the Pharaohs, 1902 পৃ. ২০১)। কারু ভূমির স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলনকারীর নাম কারূন ছিল। একজন প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন, মিসরীয় সামী বংশের (সেমেটিক বংশীয়) সকলেই নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের বিরকাতুল-কারূন (بركة القرون = শৃঙ্গের হ্রদ) অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন, দ্বিতীয় রামাসীস-এর পুত্রের বিবাহ একজন সিরীয় নৌ-কাপ্তানের কন্যা "বীন আনাথ"-এর সহিত হইয়াছিল।

আবার এমন কিছু লোক ছিল যাহারা রাজদরবারে তাহাদের স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির দরুন গুরুত্বপূর্ণ পদ, এমনকি ভাণ্ডার রক্ষকের দায়িত্ব লাভ করে। স্বয়ং মেন ফাতাহ-এর রাজকীয় দূত ছিল সামী নেতা "বীন আওয়ান" (Legacy of Egypt, পৃ. ২৫৯)। কারূনও উহাদের অন্তর্গত ছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-কাসাস-এ বর্ণিত আছে ঃ (১) "কারূন মূসার গোত্রভুক্ত ছিল, কিন্তু সে তাহাদিগের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করিয়াছিলাম যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল" (২৮ ঃ ৭৬)। (২) "সে বলিল ঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি" (২৮ ঃ ৭৮)। কারূনের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "অতঃপর আমি কারূনকে এবং তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম" (২৮ ঃ ৮১)। এই জাতীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত প্রাচীন মিসরে ইহার পূর্বেও পাওয়া যায়। একটি শিলালিপিতে পাওয়া যায় ঃ কাস মহিয়সীর বাসবভন ধ্বসিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া যায়; ভূমি তাহার মনোরম প্রাসাদ গলধকরণ করিয়া ফেলে, এখন উহার উপর শিশুগণ খেলাধূলা করে (Velikousky, Ages in chars, পৃ. ৫২)। কোন ভূমিকম্পনের দরুন যে ইহা ঘটে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মূসা (আ)-এর যুগেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রাচীন মিদরাশ কাহিনীতে আছে ঃ গাতূম ও রামাসীসের প্রাসাদের দেয়াল ধ্বসিয়া পড়ে এবং উহার একাংশ ভূমিগর্ভে চলিয়া যায়। এইরূপ ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত (দ্র. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৫২)। আর ইহাও বাস্তব যে, কারূন ও তাহার প্রাসাদ ভূমি গ্রাস করিয়া ফেলে। তাওরাতে ফিরআওনকে ফিরয়াওয় ও কারূনকে কূরাহ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাওরাতের পঞ্চম অধ্যায় আত্-তাদুনিয়া (১১ ঃ ৬)-তে উল্লেখ আছে ঃ বানূ ইসরাঈল যখন মিসর হইতে বাহির হইয়া মরুভূমিতে উপস্থিত হয়, তখন হযরত মূসা (আ)-এর বিরোধী দল দাছান ও আবারামেকে ভূমি গ্রাস করিয়া লয়। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে (১৬ ঃ ৩১, ৩২) উল্লেখ আছে ঃ দাছান, আবীরাম ও কূরাহ (কারূন)-কে ভূমি গিলিয়া ফেলে। যাবূর (গীতসংহিত ১৬ ঃ ১৭)-এ এই ঘটনার উল্লেখ আছে; তবে কূরাহ-এর উল্লেখ অনুপস্থিতঃ "ভূমি ফাটিয়া গেল এবং দাছানকে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং আবীরামের গোত্রকে ঢাকিয়া ফেলিল।" তাওরাতের পঞ্চম অধ্যায় ও যাবূরের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, মিসর হইতে বাহির হওয়ার পর কেবল দাছান ও আবীরাম ভূ-গর্ভস্থ হওয়ার শাস্তি ভোগ করে; কূরাহ্-এর দুর্ঘটনা ইহার পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। তাওরাতে কোনও সন্দেহের উপর ভিত্তি করিয়া কূরাহ্'-এর উল্লেখ মিসর হইতে ইসরাঈলীদের প্রস্থানের পর করা হইয়াছে। কুরআন মাজীদ আহ্‌ল কিতাবের এই মতপার্থক্যের প্রথম কাহিনীকে সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে যে, বানূ ইসরাঈলের মিসরে অবস্থানকালে কারূন ও তাহার প্রাসাদ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহার সমর্থন মাদরাশ-এর একটি প্রাচীন বর্ণনা হইতেও পাওয়া যায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রামাসীস ও পাতূম-এ এক বিরাট ভূমিধ্বস হয় যাহা মিসরের বড় শহর ছিল। এই দুর্ঘটনায় বানূ ইসরাঈলও ধ্বংস হইয়া যায়। কারূন যে মূসা (আ)-এর গোত্রভুক্ত ছিল এবং তাহার প্রাসাদ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, আহলি কিতাবের মতবিরোধে কুরআন মাজীদের ফায়সালা এবং ইতিহাস ও ধ্বংসাবশেষ উহার সমর্থক। বাইবেলের বিশেষজ্ঞগণ এখন স্বীকার করেন যে, কারূন সম্পর্কে দুইটি পৃথক কাহিনীকে কোনও পরবর্তী সমন্বয়কারী একত্র করিয়া দিয়াছেন। বানূ ইসরাঈলের ইতিহাসে এই জাতীয় দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। কালের বিবর্তনে কূরাহ (কারূন)-এর কাহিনী, দাছান এবং আবীরাম-এর ঘটনার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় (Peake, Commentary on the Bible, 1952 AD, পৃ. ২২১)।

'আবদুল-কাদির (দা. মা. ই.)/ মুহম্মদ ইসলাম গণী

কারূন (كـارون) ঃ দক্ষিণ ইরানের দীর্ঘতম নদীর নাম। ইহার উৎপত্তি-স্থান যার্‌দা কোহ্ (زرده كوه)। ১৫শ খৃ. শতকের লেখক হাম্‌দুল্লাহ আল-মুস্‌তাওফীর রচনায় কোহ্-ই যারদ্-এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 'আরাবিস্তান (عـربـستـان) জিলা যাহার পূর্ব নাম খূযিস্তান (خـوزسـتـان)-এর উত্তর-পূর্ব অংশে ৩২° উত্তর অক্ষাংশের সামান্য উত্তরে অবস্থিত। ইহা কোহ্-ই বাখ্‌তিয়ারী (كوه بـخـتـيـارى) নামক পর্বতশ্রেণীর অংশ।

অধিকতর সঠিকভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, কারূন নদী কোহ্-ই রাঙ্গ (كــوه رنگ) নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পর্বতটি

দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের উচ্চতম পর্বত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহার উচ্চতা আনুমানিক ১৩ হাজার ফুট।

সাইর (Sawyer)-এর বর্ণনা অনুসারে কারূন নদীর প্রকৃত উৎপত্তি-স্থান কেরাং (کرنگ= কিরণের উৎস) নামক জলাশয় হইতে ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। যা'ইন্দা (زانده) অথবা যীন্দা রূদ (زينده رود) নদীটিও (যাহার আরেক নাম ইসফাহান রূদ (اصفهان رود) হলদে পাহাড় (كـوه زرد) হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব দিকে ইসফাহান প্রদেশ অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. গ্রন্থপঞ্জীসহ মূল প্রবন্ধ E.I.², vol. 4, 673-76; (১) B. G. A., একাধিক স্থানে, বিশেষত (نهر دجيل ও نهرمسرقان -এর অধীনে ; (২) ইব্‌ন সীরীন-এর গ্রন্থের ইং অনু. JRAS-এ প্রকাশিত, ১৮৯৫ খৃ., de Goeje, পৃ. ৩০, ১৩২ ও ৩০৭-৩১৩ ; (৩) য়াকূত, মু'জাম, তা. বি., Wustenfeld, ২খ, পৃ. ৩০ ও ৫৫৫; ৪খ, পৃ. ১১ ও ৫২৭ ; (৪) হামদুল্লাহ্ আল-মুস্তাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, তা. বি. Le Strange, পৃ. ১৯৫ ও ২১৫ ; (৫) ইব্‌ন-বাত্তুতা, তা. বি., Sanguinetti ও Defremery, ২খ, পৃ. ২৩-২৪ ; (৬) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, ১৯০৫ খৃ., ক্যাম্ব্রিজ, পৃ. ২০৭ ও ২৩২-২৪৭ ; (৭) P. Schwarz, Iran, in Mittelalter nach den arab Geograph, Leipzig ১৯২১ খৃ., পৃ. ২৯৫-৩০৮, ৩১০-৩১১; (৮) J. M. Kinneir, A. geographical Memoir of the Persian Empire, লন্ডন ১৮১৩ খৃ., পৃ. ৮৭-৯০, ৯৬-৯৯ ও ১০২-১০৫ ; (৯) H. C. Rawlinson, JRGS, লন্ডন ১৮৩৯ খৃ., ৯খ, পৃ. ৬৪ প., ৭৩-৭৮, ৮১ ও ৮৮ প. ; (১০) Selbey, in JRGS, ১৮৪৪ খৃ., ১৪খ, পৃ. ২১৯-২৪৬ ; (১১) Layard, ঐ, ১৮৪৬ খৃ., ১৬খ, পৃ. ২৭-২৮, ৪৪ ও ৫০-৬৫ ; (১২) Ritter, Erdkunde, তা. বি., ৯খ, পৃ. ৪৬, ১৬২-২০৪, ২১৯-২২০ ও ২২৫-২২৭, ১০খ, পৃ. ২৬, ২৮ ও ৩১, ১১খ, পৃ. ১০২১-১০২৫ ও ১০২৮-১০৩০ ; (১৩) C. A. von Bode, Travels in Luristan and Arabistan, লন্ডন ১৮৪৫ খৃ., ২খ, অনেক স্থানে, বিশেষত পৃ. ১৬২ প., ১৯৩ ও ২৭৩ প. ; (১৪) W. K. Loftus, Travels and research in Chaldaea and Susiana, লন্ডন ১৮৫৭ খৃ., পৃ.২৮৯-২৯৩, ২৯৮-৩০০, ৩২৯, ৩৪৩, ৩৪৬ ও ৪২৩-৪৩১ ; (১৫) Fr. Spiegel, Eranische Alter tumskunde, Leipzig ১৮৭১ খৃ., পৃ. ১০৮-১১১।

M. Streck (দা. মা. ই.)/মোঃ মাযহারুল হক

কাল'আ (দ্র. আগাদির বুরজ, হিসার, হিসন, কাসাবা)

আল-কাল্'আ (القلعة) ঃ অর্থ দুর্গ (Castle, fortress)। এই শব্দটি ইহার সরল Alcala-রূপে এবং যৌগিক শব্দ Cala অথবা Calat-রূপে স্পেনীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। স্পেনীয় উপদ্বীপের সর্বত্র স্থানের নামে এইরূপ প্রচলিত; উদাহরণ ঃ Alcala de Henares, Alcala la Real (ইহা ইব্‌ন যায়্দ-এর নামেও পরিচিত), Alcala de Guadaira অথবা Calahorra (হুর্‌রা-এর দুর্গ), Calatrava (কাল'আত রাবাহ, দ্র. ='আলী ইব্‌ন রাবাহ ?), Calatayud (কাল্‌আতু আয়্যুব, (দ্র.), Calatorao (তুরাব অর্থ মাটি, যথা ঃ Valencia-র নাম মাদীনাতু'ত্-তুরাব, Calatnazor (কাল্'আতু'ন-নুসূর, কথিত আল-মানসূর-এর পরাজয়ের স্থান)। ক্ষুদ্রত্ববাচক Alcolea (আরবী আল-কুলায়'আ হইতে) শব্দটি কম গুরুত্ববহ স্থানের নামরূপে ব্যবহৃত, যথা ঃ কর্ডোভার নিকটবর্তী Alcolea, Alcolea del Cinca ইত্যাদি। প্রাচীন Castile ও Alava অঞ্চলদ্বয়ের উত্তরভাগ মুসলিমগণের নিকট আল-কিলাআ (দুর্গসমষ্টি) নামে পরিচিত ছিল ; ইহা Castilla ও Cataluna (= দুর্গসমষ্টির অঞ্চল) নামদ্বয়ের সহিত তুলনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাককারী, Analectes, ১খ, ৬৮১ ; (২) E. Levi-Provencal, HEM, স্থা. ; (৩) Madoz, Diceinario geografico, ১খ, ৩৫৬-৯৬।

A. Huici-Miranda (E.I.²)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আল-কাল'আ (দ্র. কাল'আত বানী হাম্মাদ)

কাল'আ-ই সাফীদ (قلعة سفيد) ঃ শ্বেত কেল্লা একটি দুর্গ, যাহা পারস্যে ৩০°১৫ অক্ষাংশ এবং ৫১°৩৫ দ্রাঘিমাংশ পূর্বে অবস্থিত। ইহা ওয়াদী কোহরা (Kohra-كره)-এর পূর্বাংশে একটি পর্বত শিখরে নির্মিত। এই পর্বতশৃঙ্গটি প্রশস্ত ও সমতল এবং ইহার পার্শ্বদেশ সকল দিক হইতেই সোজা ঢালু হইয়া ভূমি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইহার উপর পাহাড়ী ঢালু অংশে গিরিপথের সাহায্যে পৌঁছিতে হয়। সেখানে তৃণাচ্ছাদিত একটি প্রশস্ত মালভূমি দৃষ্ট হয়। বেশ কিছু ঝরনার দ্বারা এখানকার সেচকার্য সমাধা হইয়া থাকে। ফার্‌সনামাহ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ইহার সংরক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী সেনাদলের প্রয়োজন হয়। কয়েকজন লেখক এই দুর্গ ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন ইবনু'ল-বাল্খী তাঁহার ফারসনামাহ গ্রন্থে [উল্লিখিত দুর্গটির বিবরণ মুসতাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব গ্রন্থে এবং 'আলী য়াযদী ও মীর খাওয়ানদ (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী) উদ্ধৃত করিয়াছেন]। ১৯ শতকের য়ূরোপীয় পরিব্রাজকগণ ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে Stalze-এর বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি Andreas-এর সহিত একত্রে মিলিয়া পর্বত এবং দুর্গের প্রতিটি অংশ খুবই মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করেন। Stalze-এর মতে ১৮১০ খৃ. দুর্গটি পরিদর্শনকারী Kinnier-এর বিবরণ গ্রহণযোগ্য নহে। ফরাসী ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিকগণ এই দুর্গের নাম কাল'আ-ই সাফীদ (قلعة اسفيد) (সেফীদ, সেপীদ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাল'আ ইসপীদোয (قلعة اسفيدوز) নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে কেবল কাল'আ-ই সাফীদ নামটিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার আরবী তরজমা করিয়া ইবনু'ল-আছীর (Tornberg সং., ১১খ. ৪৬) এই দুর্গটির নাম আল-কাল'আতু'ল-বায়দা' (القلعة البيضاء) লিখিয়াছেন। সাফীদ কাল'আ নামক দুর্গ অন্যান্য অঞ্চলেও রহিয়াছে যেখানে আরবী ও ফারসী বলা হয় (যথা ঃ আল-হীরা, আল-মাদা'ইন, হাওরান-এর পূর্বদিকে অবস্থিত নাখলিসতান-ই রাহবা এবং আফগানিস্তান-এর কায়রাওয়ান অঞ্চল প্রভৃতি কিন্তু সেখানে এই নাম সম্ভবত এই কারণে দেওয়া হইয়াছে যে, উহা নির্মাণে খুবই উজ্জ্বল শুভ্র (সাফীদ) পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, আল-বুনদারী তা'রীখ দাওলাতি'স-সালজূক (সম্পা. Houtsma, ২খ, ১৮৮, লাইন ১৩) গ্রন্থে কাল'আ-ই সাফীদকে কাল'আ-ই গুল ওয়া গুলাব নাম দিয়াছেন।

বাহ্‌বাহান হইতে শীরায যাওয়ার গিরিপথের উপর কাল'আ-ই সাফীদ একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। এই পথটিই খূযিসতান ও ফারিস-এর মধ্যে

যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই বহু প্রাচীনকালে দুর্গ নির্মাণ করা হইয়াছিল। সিকান্দার আজাম (আলেকজাণ্ডার) যে সকল "ইরানী গিরিপথ"-এর মধ্য দিয়া হাখামানী (Achaemenids)-দের পূর্বপুরুষের দেশে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ফারস (Persia)-এর সুবেদার Arioparzanes তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ যে অঞ্চল রক্ষা করিয়াছিলেন, কতক লেখক, যথা ঃ Vincent, Mutzel, Droysen, Forbier তাহা কাল'আ-ই সাফীদ-এর উপত্যকায় চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Ritter (Erdkunde ৯খ, ১৩৮) ইহার সহিত দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি কাল'আ-ই সাফীদকে Uxrans-এর গড় বলিয়া বর্ণনা করেন এবং "ইরানের গিরিপথ"-কে ইহার বহু সম্মুখে ও বহু পূর্বে বলিয়া চিহ্নিত করেন। Ritter-এর অভিমত সম্পর্কে Mutzel তাঁহার Curtius গ্রন্থে (বার্লিন ১৮৪১ খৃ. পৃ. ৪১৪ প.) এবং Stalze (ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৬২ প.) বিশেষভাবে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। Stalze উল্লিখিত গ্রন্থে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাল'আ-ই সাফীদ-এর অঞ্চলের মধ্যে এবং আলেকজাণ্ডারের সঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ ইরানের যে গিরিপথের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহার অবস্থান স্থলের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই। এই গিরিপথসমূহের অবস্থানস্থল অন্য কোথাও অনুসন্ধান করা উচিত।

মধ্যযুগের আরব ভূগোলবিদগণ কাল'আ-ই সাফীদ-এর উল্লেখ করেন নাই। ইহার সহিত সংযুক্ত শহর নাওবানজান (নওবনদ জান)-এর ন্যায় ইহাকেও হয়তো খিলাফাত আমলে সাবুর-এর ইরানী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়া থাকিবে। ১০ শতক হইতে প্রাচ্যের তথ্যসমূহে আকস্মিকভাবে শূল নামক একটি যাযাবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদেরই নামানুসারে শীরায-এর পশ্চিম হইতে শুরু করিয়া ফারিস ও খূযিসতান-এর সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, যেখানে ইহারা বাস করিত, শূলিস্তান (شولستان) নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে যে, কাল'আ-ই সাফীদ শূলিসতান-এর অন্তর্গত ছিল। শূল ও শূলিসতান-এর অঞ্চল সম্পর্কে দ্র. Quatremere-এর বরাত, পূর্ব গ্রন্থ, পৃ. ৩৮০ প., আরও দ্র. আল-মুস্তাওফী, তা'রীখ-ই গুযীদাহ, সম্পা. Browne, গিব স্মরণিকা, সংখ্যা ১৪, পৃ. ৫৩৮, ৬৫৮ , ৬৬০, ৬৯৬, ৭২৬।

ফারসী কবি ও ঐতিহাসিকদিগের লেখনীতে বিভিন্ন স্থানে কাল'আ-ই সাফীদ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. E.I.[1], লাইডেন, শিরো.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-বাল্খী (Le Strange ও Nicholson সম্পা., গিব স্মরণিকা সংখ্যা নূতন, ১খ, লন্ডন ১৯২১ খৃ.), পৃ. ১৫৮। ইহা ছাড়াও অনু. Le Strange, in JRAS, ১৯১২ খৃ., পৃ. ৮৭৮; (২) হামদুল্লাহ আল-মুসতাওফী, নুয্হাতু'ল-কুলূব (Le Strange সম্পা., লাইডেন ১৯১৫ খৃ., গিব স্মরণিকা, ২৩), পৃ. ১২৯, লাইন ১৬; ১৩১, লাইন ১৯; ১৩২, লাইন ৮; (৩) রাশীদু'দ-দীন, জামি'উ'ত-তওয়ারীখ, আংশিক সম্পা. Quatremere, শিরো. Hist. des Mongols de La Perse, ১খ, (প্যারিস ১৮৩৬ খৃ.), ৩৮২ প. ; শেষোক্ত গ্রন্থে Quatremere 'আবদুল্লাহ ইব্ন ফাদলিল্লাহ (তা'রীখ ওয়াসসাফ) এবং মীর খাওয়ানদ-এর ফারসী ইতিহাস হইতে সংশ্লিষ্ট বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন; (৪) হাজ্জী মীরযা হাসান তাবীব শীরাযী, ফারস নামাহ-ই নাসিরী (লিথো মুদ্রণ, তেহরান ১৩১৩ হি.), পৃ. ৩৩৪; (৫) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate (কেমব্রিজ ১৯০৫ খৃ.), পৃ. ২৬৪ প. ; (৬) J. M. Kinnier, A. Geogr. Memoir of the Pers Empire (লন্ডন১৮১৩ খৃ.), পৃ. ৭৩ ; (৭) Malcolm, History of Persia (সংশোধিত সং, লন্ডন ১৮২৯ খৃ.), ১খ, ১৯ টীকা, ২৯৫ ; (৮) Ritter, Erdkunde, ৯খ, ১৩৭-১৪৪ ; (৯) Stolze, Verhandl, der gesellsch. f. Erdkunde, in Berlin, ১০খ, (১৮৮৩ খৃ.), পৃ. ২৬২-২৬৫ ; (১০) G. N. Curzon, Persia and the Persian Question (লন্ডন ১৮৯২ খৃ.), পৃ. ৩১৮ প. ; (১১) E. Herzfeld, in Petermann's Geogr., ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৮৪ প.।

M. Streek (দা.মা.ই.)/আবদুল জলীল

কাল'আত আয়্যুব (قلعة ايوب) ঃ বর্তমানে কালাতায়ূদ নামে পরিচিত। প্রাচীন বিলবিলিস-এর (য়াকূত-এর অন্তর্গত লাবলা) অবস্থানের নিকটে নির্মিত এবং সারাগোসা-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উচ্চাঞ্চলীয় মার্চ (আছ-ছাগরু'ল-আলা) অঞ্চলের একটি দুর্গ শহর। ইহার নামকরণ করা হয় তাবী আয়্যুব ইব্ন হাবীব আল-লাখমীর নাম হইতে। ইনি ছিলেন আবদুল-'আযীয ইব্ন মূসা ইব্ন নুসায়র-এর উত্তরসূরি একজন ওয়ালী। তুদেলা হইতে ২৫ মাইল এবং যেদিনাচেলী ও সারাগোসা হইতে ৫০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত এই শহরটি উর্বর, সেচযুক্ত ভূমির অধিকারী ছিল। ইহার ডুমুর বাগান ও অসংখ্য অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ বিচিত্র প্রকারের ফল উৎপাদন করিত এবং তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত। আল-বাকরী অনুসারে স্থানীয় পাহাড়সমূহে অত্যুৎকৃষ্ট মানের আঠালো রজন (murr) উৎপাদিত হইত। এই শহরে সোনালী জেল্লাদার এক প্রকার চিনামাটির সামগ্রী প্রস্তুত হইত এবং তাহা রফতানী করা হইত। আল-ইদরীসী দারোকা হুয়েসকা, সারাগোসা ও ভুদেলা-এর সাথে কাল'আত আয়্যুব-এর বালাদকে আরনেদো (আরনীত)-এর ইকলীম-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আল-বাকরীর মতে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে এই এলাকাটি নিশ্চিতভাবেই তুদেলা-র নিয়ন্ত্রণে ছিল। আল-মাককারী-র মতে ইহার মাদীনা ছিল মোলীনা। দুইটি শক্তিশালী পরিবারের আচরণ হইতে উদ্ভূত ঘটনাবলীর কারণে কাল'আত আয়্যুব-এর এলাকাধীন অঞ্চল পীড়িত হয় বানূ কাসী (যুওয়াল্লাদ) ও বানূল-মুহাজির অথবা তুজীবী (আরব) নামক এই পরিবার দুইটি সব সময়ই কর্ডোভার অধীনস্থ বা বাধ্য থাকিত না। আল-'উযরীর মতে আমীর মুহাম্মাদ ২৪৮/৮৬২ সালে কালা'আত আয়্যুব পুনঃনির্মাণ করেন। তুজীবীগণের প্রাধান্যের অধীনে খিলাফতের আমলে ইহাকে কয়েকবার কর্ডোভার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ৫ম/১১শ শতাব্দীতে শহরটি শাসন করিতেন সুলায়মান ইব্ন হূদ। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে শহরটি তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদের জন্য রাখিয়া যান। কিন্তু শেষোক্ত জন শীঘ্রই তাহা তাঁহার ভ্রাতা সারগোসার অধিকর্তা আহমাদকে হস্তান্তর করেন। ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে, কাল'আত আয়্যুব অন্ততপক্ষে ৫০৩/১১০৯ সাল হইতে আল-মুরাবিতগণের অধীন ছিল এবং ইহা ২৫ রাবী'-১, ৫১৪/২৪ জুন, ১১২০ সাল পর্যন্ত তাঁহাদের আয়ত্তে থাকার পর আরাগণ-এর ১ম আলফনসো ইহা অধিকার করেন। খৃষ্টানদের বিজয়ের পরও যে সকল মুসলিম কালাতায়ূদ-এ থাকিয়া যায় তাহারা খৃষ্টান ও য়াহূদীগণের পাশাপশি বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়

গঠন করে। সংখ্যায় তাহারা নিঃসন্দেহে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কালাতায়ূদ যেখানে অবস্থিত সেই জালোন উপত্যকা ছিল আরাগণ-এর সেই সকল অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম, যেখানে ছিল মোরিকোদের শক্তিশালী ঘন বসতি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, La "Description de l'Espagne" d' Ahmad al-Razi, in al-Andalus, ১৮ খ. (১৯৫৩ খৃ.), ৭৭, ৭৮ ; (২) ইদরীসী-মুগরিব, ১৭৬, ১৮৯, ১৯০ (মূলভাষ্যে), ২১১, ২৩০ (অনুবাদ); (৩) 'উযরী, আল-মাসালিক ইলা জামী'ই'ল-মামালিক, সম্পা. 'আবদু'ল-'আযীয আল-আহওয়ানী, মাদ্রিদ ১৯৬৫ খৃ., নির্ঘণ্ট ; (৪) বাকরী, আল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. আবদু'র-রাহমান 'আলী আল-হাজ্জী, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৯১, ১২৭; (৫) য়াকূত, ৪খ, ১৬৩ ; (৬) মারাসিদ, ১১খ, ১৪১ ; (৭) হিময়ারী, আর-রাওদু'ল-মি'তার সম্পা. Levi Provencal, লাইডেন ১৯৩৮ খৃ., ১৬৩ (ভাষ্য), ১৯৫-৬ (অনুবাদ) ; (৮) মাককারী, Analectes, ১খ, ৯০, ১০৩ ; (৯) ইব্‌ন ইযারী, ৩খ, ২২২, ৪খ, সম্পা. ইহসান 'আব্বাস, বৈরূত, ১৯৬৭ খৃ. ৪৪, ৫৫, ১৪৪ ; (১০) ইবনু'ল-খাতীব, আমাল, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., ১৭১ ; (১১) ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারা, ৪০৪, ৪৬৫ ; (১২) F. Codera, La stochibies en Espana Noticias de esta familia tomadas de Abenhazam, Nuevas noticias acerca delos tochibies and Noticias acerca de los Benihud, reyes de Zaragoza Lerida, Calatayud y Tudela, in Estudios criticos de historia arabe espanola, সারাগোসা ১৯০৩ খৃ., ৩২৩-৭২; (১৩) J. M. Lacarra, La reconquista y repoblacion del valle del Ebro, in La reconquista espanola y la repoblacion del pais, সারাগোসা ১৯৫১ খৃ., ৩৯-৮৩ ; (১৪) H. La peyre, Geographie de l'Espagne morisque, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ.।

J. Bosch-Vila (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

কাল'আত জাবার (দ্র. জাবার)

কাল্'আত নাজ্‌ম (قلعة نجم) ঃ উত্তর সিরিয়াতে অবস্থিত একটি দুর্গ ; ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই দুর্গটি মধ্যযুগের মানবীজ (منبج) হইয়া হালাব হইতে উত্তরাঞ্চলীয় মেসোপটামিয়াতে, হাররানগামী সড়কপথ নিয়ন্ত্রণ করিত। দুর্গটি এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে ফোরাত নদী পার হওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপের অস্তিত্বের কারণে ঐ অংশে ভাসমান সেতু নির্মাণ করা সহজসাধ্য ছিল। এইরূপ মনে করিবার সুযোগ আছে যে, দুর্গটি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানে অবস্থিত, কিন্তু ইহার সনাক্তকরণে কতিপয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবনা হইতেছে ইহাকে রোমান বিবরণীর Caeciliana-এর সহিত সনাক্তকরণ।

প্রাচীন আরবী গ্রন্থসমূহে এই অঞ্চলটিকে জিস্‌র মানবীজ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই বিবরণগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূর্বকালে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর উপরে যে সেতুটি ছিল তাহা খলীফা 'উছমান (রা)-এর আদেশে নির্মাণ করা হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর পূর্বে কাল'আত নাজ্‌ম-এর উল্লেখ কদাচিত পাওয়া যায়। এই নামটির উৎপত্তি সম্ভবত জনৈক গুলাম নাজ্‌ম-এর নাম হইতে, যিনি ৩০০/৯১২ সালে এই শহরটি পুনঃস্থাপন করেন। কতিপয় মানচিত্র এবং এমনকি কতিপয় গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ভ্রান্তভাবে নামটিকে কাল'আতু'ন-নাজ্‌ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। অবশ্য এইরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থকার ইচ্ছাকৃতভাবেই এই নামটি ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ দুর্গটিকে "নক্ষত্ররাজির দুর্গ" (কাল'আতু'ন-নাজ্‌ম) 'এই নামে অভিহিত করার মধ্যে অধিকতর কাব্যিক মাধুর্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কাল'আত নাজ্‌ম-এর সেতু ইসলামের পারম্ভিক যুগ হইতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে থাকে। এই এলাকাটি ১৮/৬৩৯ সালে অধিকার করা হয় এবং হযরত 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-র মধ্যে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষের বর্ণনায় এই সেতুটির উল্লেখ আছে।

এই পথ ধরিয়াই উমায়্যা সেনাবাহিনী মেসোপটামিয়া দখল করে। পরবর্তীকালে কাল'আত নাজ্‌ম হামদানী (দ্র.) রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল, ইহার পর উহা ছিল ক্রমান্বয়ে মিরদাসী (দ্র.) ও বানূ নুমায়র (দ্র.)-এর অধীনে। ইহার পর ইহা ক্রমান্বয়ে যানকীগণের হস্তে, নূরু'দ-দীন (দ্র.)-এর হস্তে এবং আয়্যূবীগণের (দ্র.) হস্তে পতিত হয়। নূরু'দ-দীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করেন (যাহাকে বিশ বৎসর পর ইব্‌ন জুবায়র "একটা নূতন দুর্গ"-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন) এবং তথায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনী মোতায়েন করেন।

পরবর্তীকালে সম্ভবত ৬৫৮/১২৬০ সালে ইউফ্রেটিস নদীর পাড়ি নিয়ন্ত্রণকারী এই দুর্গের অধিকার লাভের জন্য হূলাগূ (হালাকু খাঁ)-কে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়। এই সময়ে আলেপ্পো-র বিশপ Barhebraeus বিজয়ী নেতার নিকট গমন করেন খৃষ্টানদের জন্য করুণা ভিক্ষা করার জন্য এবং কাল্'আত নাজ্‌ম-এ বন্দী হন।

কাল্'আত নাজ্‌ম নামক দুর্গটি ১৯শ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু পর্যটকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে ; প্রায় ৫০ মিটার উচ্চতায় দুর্গটি একটি উচ্চ টীলায় একাকী দণ্ডায়মান, খোদ দুর্গ ভবনটি দুইটি তলার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী জনৈক আরব বিদ্রোহীর কারণে ১৮২০ খৃ. যখন 'উছমানীগণ ইহা অধিকার করিয়া নেয় তখন ইহার কতিপয় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনটি আরবী শিলালিপিতে ৬০৫/১২০৮ এবং ৬১২/১২১৫ সালের মধ্যে, সালাহু'দ-দীন-এর পুত্র আয়্যূবী সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির-এর আদেশে সম্পাদিত নির্মাণ কার্যের উল্লেখ রহিয়াছে। আরব ভৌগোলিকগণের বর্ণনামতে, নদীর উপকূল বরাবর এবং দুর্গের পাদদেশে যে ক্ষুদ্র শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিচয়জ্ঞাপক কোনও চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নাই। প্রাচীন সেই সেতুটিও অদৃশ্য হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Pauly-Wissowa, Suppl., ১খ, ২৬৬ ; (২) তাবারী, ১খ, ৩২৫৯ ; (৩) বালাযুরী, ফুতূহ, ১৫০ ; (৪) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্, ৯৮ ; (৫) কুদামা, in BGA, ৬খ, ২৩৩; (৬) ইব্‌ন হাওকাল, ১২০, ১২৫, ১৩৮, ১৫৪ ; (৭) আল-মাস'উদী, তান্‌বীহ, ৪৪ ; (৮) ঐ লেখক, মুরূজ, ১খ, ২১৫=শা. ২২৮ ; (৯) য়াকূত, ১খ, ৪৭৮, ৩খ, ৪৬০ ; (১০) ইদ্রীসী-Jaubert, ২খ, ১৩৯ ; (১১) আবু'ল-ফিদা', তাকবীম, ২৩৩ ; (১২) ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্‌লা, ২৪৮ ; (১৩) আল-কাযবীনী,

'আজা'ইবু'ল-মাখ্লূকাত, ২খ, ১৬১০ ; (১৪) ইবনু'শ-শিহ্না, আদ-দুর্রু'ল-মুন্তাখাব, ২৩০ ; (১৫) Barhebraeus, Chronicon syriacum, ৫০৯, ৫১০, ৫৯৯ ; (১৬) তা'রীখ মুখতাসারি'দ-দুওয়াল, ৩৯৩ ; (১৭) Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, লিপযিগ ১৮৮৩ খৃ., ১৫৩-৪ ; (১৮) Ainsworth, A personal narrative of the Euphrates expedition, লন্ডন ১৮৮৮ খৃ., ১খ, ২২৩-৩৪ ; (১৯) G. L. Bell, Amurath to Amurath, লন্ডন ১৯১১ খৃ., ২৩-৪, ৩৪-৫; (২০) Le Strnge, ১০৭-৮ ; (২১) M. Canard, H'amdanides, ৮৭, ৮৮, ৯২, ১৩৬, ২২৭, ২৩৪ [তু. Arabica, ১৮ (১৯৭২ খৃ.), ৩০৭] ; (২২) Cl. Cahen. La Syrie du nord, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., ১১৪, ১৫৬ ; (২৩) N. Eliseeff, Nura-din, দামিশ্ক ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘন্ট ; (২৪) RCEA, নং ৩৭৭৬, ৩৭৭৭, ৩৭৭৮ ; (২৫) দা.মা.ই., ১৬/২খ, ৩৭৬-৭৭।

D. Sourdel (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাল'আত বানী 'আব্বাস (قلعة بنى عباس) ঃ আলজিরিয়ার একটি শহর ; বুরূজ বূ 'আররাবিজ (برج بو عرايج)-এর প্রায় ৩৫ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে বীবান পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত। প্রায় ১০৫০ মিটার উচ্চে অবস্থিত এই শহরটির অবস্থান সামরিক দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৫০০-৬০০ মিটার ও ততোধিক গভীরতার অতি খাড়াই পার্বত্য খাত তিন দিক হইতে শহরটির মালভূমি অবস্থান ঘিরিয়া রহিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসমূহের সহিত ইহার একমাত্র সংযোগ হইতেছে অতল খাদের সীমানাযুক্ত সংকীর্ণ এক খণ্ড ভূমি। শহরটি চারিটি ভাগে বিভক্ত এবং অতীতে প্রায়ই এই চারি অংশের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাত লাগিয়া থাকিত। ইহাদের একটি অংশ বর্তমানে প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। ইহা বানূ 'আব্বাস গোত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল ; এই গোত্রের এলাকা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় নাই ; তবে তাহা ওয়াদী সাহেল হইতে মেজানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এক সময়ে ইহার অধিবাসিগণ পশমের তৈরী বার্নূস প্রস্তুতিতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং তাহারা ইহা আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ার সর্বত্র বিক্রয় করিত ; টেল শহরসমূহে অপর একটি জীবিকা ছিল বানূর্সে নক্শা তোলা। বর্তমানে ইহার অধিবাসিগণের অনেকেই তাহাদের গৃহ পরিত্যাগ করিতেছে ; প্রধানত ইহারা ফ্রান্সে চলিয়া যাইতেছে।

কাল'আ প্রতিষ্ঠিত হয় ৯ম/১৫শ শতাব্দীর ২য় অর্ধে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুরাবিতী সীদী আবদু'র-রাহমান। কথিত আছে যে, তিনি কাল'আ-র পর্বতে একটি যাবিয়া (খানকাহ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাওয়াদের বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্রোহ বানূ আব্বাসগণের অধিনায়করূপে নিজকে উপস্থাপন করেন ; এতদিন পর্যন্ত তাহারা ইহাদের অনুগত গোত্র ছিল। তাঁহার পুত্র আহমাদ একটি কাসবা নির্মাণ করেন এবং নিজেকে সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। হোদনা ও সমুদ্রের (মারমোল, লাবেস-এর জন্য) মধ্যবর্তী সকল অঞ্চলে তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী 'আবদু'ল আযীয তুর্কীদের সহায়তায় তাঁহার ক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি তুর্কীদের কুকূ-এর কাবিলেসদের বিরুদ্ধে সমর্থন প্রদান করেন এবং মরক্কো, তুগ্গূরত ও ওয়ারগলা-এর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তুর্কী অভিযানসমূহে সহায়তা প্রদান করেন। এই মৈত্রীর মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিলে (১৫৫২ খৃ.) তুর্কী ও বানূ 'আব্বাস-এর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয় এবং তাহা ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়কালে বেশ কয়েকবারের জন্য কালআ অবরুদ্ধ হইলেও শহরটিকে কখনও অধিকার করা যায় নাই। তাঁহার রাজধানীর প্রতিরক্ষায় যুদ্ধরত অবস্থায় 'আবদু'ল-'আযীয-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আমোককরান তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। শেষোক্ত ব্যক্তি সুদূর সাহারা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য সফলতার সহিত রক্ষা করেন, তুর্কিগণের কতিপয় আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় ইনতিকাল করেন (১৬০০ খৃ.) তাঁহার পুত্র সীদী নাসির ছিলেন যোদ্ধার তুলনায় যাবিয়া-এর অধিকতর অনুসারী ; তিনি বানূ 'আব্বাসগণের অপসন্দের সম্মুখীন হন এবং তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে। ইহার ফলে কাল'আ রাজ্য অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে এবং শহরটি কেবল সীদী নাসির-এর পারিবারিক দুর্গ নগরীতে পরিণত হয়। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মধ্যে শহরটি দ্রুত সমৃদ্ধি হারাইতে থাকে ঃ আল-ওয়ারছীলানী লিখিয়াছেন, "দেশ বর্তমানে শাসকহীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে, জনগণ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে, তাঁহার রাসূল (স) এবং তাঁহার আইনসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে।" ইহার দুর্ভেদ্য অবস্থানের প্রতিরক্ষায় ইহা ফরাসীদের হাতে বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বিদ্যমান থাকে। তুর্কীদের বিরুদ্ধাচরণকারিগণের জন্য ইহা একটি আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং বিখ্যাত মুসলিম পরিবারসমূহের সদস্যবর্গ যুদ্ধের সময় তাঁহাদের শস্য ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে রক্ষার জন্য এখানে আনয়ন করিতেন ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন। এই সকল আমানত গ্রহণকারিগণের বিশ্বস্ততা ছিল প্রবাদের ন্যায়। এইভাবে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মাঝে, যাহা সমগ্র দেশটিকে বিরাণ ও নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছিল, কাল'আ প্রকৃত নিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ সুযোগ উপভোগ করিতেছিল। ১৮ শতাব্দীতে 'আবদু'র-রাহমান-এর পুত্র ও উলাদ মুকরান-এর পূর্বপুরুষ সীদী আহমাদ-এর কবর ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থানরূপে পরিগণিত ছিল। ১৮৭১ খৃ. অনুষ্ঠিত বিদ্রোহের নেতা মুকরানীও এই কাল'আ শহরেই সমাহিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়ারছীলানী, নুযহাতু'ল-আনযার, আরবী ভাষ্য, সম্পা. M. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., ৪, ৮, ১১, ২৮, ৩৬ ; (২) Carette, Etudes sur la Kabylie, প্যারিস ১৮৪৮ খৃ., ২ ; (৩) Daumas & Fabar, La Grande Kabylie, আলজিয়ার্স-প্যারিস ১৮৪৭ খৃ., অধ্যায় ১৩ ; (৪) Berbrugger, Les Epoques militaires de la Grande, Kabylie, আলজিয়ার্স ১৮৫৭ খৃ., ৭৯-৮৬, ৯১-১০৪ ; (৫) Ch. Feraud, Les Moqrani seigneurs de la Medjana, in Notices et memoires de la Soc. archeol, de Constantine ১৮৭১ খৃ. এবং Histoire des Villes de la Province de Constantine (Setif, Bordj bou Arreridj, Mesila Bou Saada) কনস্টান্টাইন ১৮৭২ খৃ., ; (৬) L. Rinn, L'insurrection de 1871 en Algerie, আলজিয়ার্স ১৮৯১ খৃ., অবতরণিকা ; (৭) S. A. Boulifa, Le Djurdjura a travers l'histoire, আলজিয়ার্স ১৯২৫ খৃ. ; (৮) M. Hadj-Sadok, A travers la Berberie orientale du XVII[e] siecle avec le voyageur al-Warthilani,

in R. Afr., xcv (১৯৫১ খৃ.), ৩২৬, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৯ ; (৯) দা. মা. ই., ১৬/২খ, ৩৬৪।

L. Golvin (E.I.²)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাল'আত বানী হাম্মাদ (قلعة بنى حماد) : মধ্য মাগ্‌রিব অঞ্চলের একটি মধ্যযুগীয় শহর, মাআদিদ পর্বতে অবস্থিত এই শহরটি বানূ হাম্মাদ বংশের (দ্র. Hammadids) রাজধানী ছিল। ইহা কাল্‌'আতু আবী তাবীল নামেও পরিচিত ছিল (আল-বাক্‌রী, ইস্‌তিব্‌সার ইত্যাদি)। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই শহরটি বিরাট একটি প্রাকৃতিক amphitheatre (গ্যালারী সম্বলিত উন্মুক্ত ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির স্থান)-এর আকৃতিতে হোদ্‌না সমভূমির সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হয়। ৫৫০ মিটার উচ্চ হোদ্‌না শহরটির উপর কর্তৃত্বময় অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে পুরাতন শহরটির উচ্চতার গড় প্রায় ৯৯০ মিটার। এই শহরের উত্তর সীমানায় দণ্ডায়মান তাকারবুস্‌ত (১৪১৮ মি.) নামক বিশাল কর্তিত শীর্ষ (truncated) মোচাকৃতি (cone) নিষ্পাদপ পর্বত যাহার কুণ্ডলীবৎ ঢালসমূহ সম্মুখ দিকে প্রসারিত নালের (projected spur) আকৃতিবিশিষ্ট এবং তথায় শিলাস্তরগুলি বিপরীতমুখী। পশ্চিম সীমানায় রহিয়াছে Gorein পর্বতমালা, ম্‌সিলা (Msila)-র দিকে গমনের জন্য যাহাকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করা সম্ভব একটি মাত্র গিরিপথের সাহায্যে, যাহা ১১৯০ মিটার উচ্চ পর্বত শিখরের পাদদেশে অবস্থিত। দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত জাবাল রাহ্‌মা নামক পর্বতটি দৃষ্টিপথ অনেকাংশে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ব্যতিক্রম কেবল ইহার পূর্ব পার্শ্ব, যাহাকে বিভক্ত করে দক্ষিণে প্রলম্বিত Oued Fradj নামক সংকীর্ণ উপত্যকা। এই ফাঁকটি দীপ্তিমান Chott-Hodna-সহ দূরবর্তী সমভূমিকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে। পর্বত হইতে নির্গত একই খরস্রোত খাড়া পার্শ্বযুক্ত সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্য দিয়া শহরটির পূর্বাংশের পার্শ্ব ছাড়াইয়া প্রবাহিত হয়। গভীর বাঁধবেষ্টিত এই স্রোতধারার অপর দিকে ১০০০-১৪০০ মিটার উচ্চ বিভিন্ন উন্নতশীর্ষ পর্বতমালা দণ্ডায়মান।

সমভূমির দিক হইতে, যাহার উপর নজর রাখা সহজ, সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সুষ্ঠু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসম্পন্ন, সাধারণত ব্যবহৃত পূর্ব-পশ্চিম সড়কগুলি হইতে স্বল্পমাত্র দূরত্বে অবস্থিত এই স্থানটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অধিকৃত ছিল। কতিপয় স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষসহ যেই ধ্বংসস্তূপগুলি সুপ্রাচীন অতীতের সহিত সম্পৃক্ত, যাহা অদ্যাবধি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষিত হয় নাই, তাহা রোমান অধিকারের স্বাক্ষর বহন করে, যদিও ইহার বিস্তার অথবা প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব। ৩৩৫/৯৪৭-৮ সালে স্থানটি হয়ত "গর্দভ পৃষ্ঠারোহী" আবূ য়াযীদ (দ্র.)-এর নিষ্করুণ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কারণ এখনও 'আজীসা-র পর্বতরূপে পরিচিত, 'মাউন্ট কিয়ানা' মনে হয় আধুনিক তাকারবুস্‌ত (যাহার শীর্ষে কতিপয় ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়)-এর সহিত গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ। সানহাজাগণ স্থানটির সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবস্থিত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বুলুগ্‌গীন ইব্‌ন যীরী কর্তৃক প্রাচীন রাজধানী 'আশীর' আংশিকভাবে পরিত্যাগ করার কারণগুলি ইহাতে সুস্পষ্ট হয়। কালআ-র অবস্থান পছন্দ করিয়া তিনি এমন একটি দ্বিতীয় ঘাঁটি লাভ করেন যাহা ছিল শক্তিশালী, বিশেষত সমতল ভূমিবাসী 'যানাতা'-র উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধের পক্ষে সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত, অধিকন্তু এবং সর্বোপরি উক্ত অঞ্চলে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি নির্মাণের মাধ্যমে তিনি কায়্‌রাওয়ান-এর যীরী বংশীয় 'বাদীস'-এর কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা সুস্পষ্ট করিয়া দেন। কাল্‌'আ যেন প্রাচ্যমুখী এক বল্লমাগ্র (অগ্রগামী বাহিনী)-এর রূপ পরিগ্রহ করে। কয়েক বৎসর পর (৪০৫/১০১৫) হাম্মাদ "বিদ্রোহের পতাকা" উত্তোলন করেন ও "আব্বাসী খলীফাগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন"। একটি নূতন বংশের জন্ম হয় এবং কাল্‌'আ একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়।

ইব্‌ন খাল্‌দূন-এর মত সঠিক হইলে জোরপর্বক স্থানান্তরিত ম্‌সিলা (Msila) ও সূক্ হাম্‌যা (Bouira)-এর অধিবাসিগণ কর্তৃক নির্মিত এই শহরে বসতি স্থাপন করে জনগোষ্ঠীর অন্যান্য অংশ, বিশেষভাবে জারাওয়া গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সেখানে বসত করে। হাম্মাদের প্রথম প্রচেষ্টা হইল একটি শক্তিশালী গড় কেল্লা, একটি প্রাসাদ, "কয়েকটি মসজিদ কতিপয় সরাইখানা এবং অন্যান্য সরকারী ভবন" নির্মাণ। যাহা হউক, বিশ্বাস করা দুষ্কর যে, ৪০১/১০১০ সালের মত এত অগ্রবর্তী সময়ে কাল্‌'আ "অতি উচ্চ মানের সমৃদ্ধি অর্জন করে" এবং "কারিগর শ্রেণী ও ছাত্রগণ সাম্রাজ্যের দূরতম অঞ্চল এবং সুদূর স্থানসমূহ হইতে দলে দলে তথায় আগমন করিতে থাকে"। বস্তুত হাম্মাদ তখনও আশীর-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় এবং কাল্‌'আ তাঁহার মতে ছিল মাত্র একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের শহর। বাদীস তাঁহার পিতৃব্যের তৎপরতার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ৪০৬/১০১৫ সালে কাল্‌'আ আক্রমণ করেন। মনে হয়, শহরটি তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই ; এমন অবস্থায় এই যীরী শাসক অকস্মাৎ ইনতিকাল করেন।

শহরটি স্থায়ী সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল আলান্-নাস-এর পুত্র আন-নাসির (৪৫৪/১০৬২-৪৮১/১০৮৯)-এর রাজত্বকালে এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-মানসূরের আমলে (৪৮১/১০৮৯-৪৯৮/১১০৫)। কাল্‌'আ-র আকস্মিক সমৃদ্ধির কারণ ছিল আরবদের আক্রমণের ফলে ইফ্‌রীকিয়্যা-র দুর্দশা। অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের শহরসমূহ, বিশেষত কায়রাওয়ান জনহীন হইয়া পড়ে। অপর দিকে আল-বাক্‌রীর মতে কায়রাওয়ান-এর ধ্বংসের পর কাল'আ প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। "ইফ্‌রীকয়্যার অধিবাসিগণ বসতি স্থাপনের জন্য দলে দলে তথায় আসিতে থাকে ; ... একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে ইরাক, হিজায, মিসর, সিরিয়া ও মাগ্‌রিব-এর সকল অংশ হইতে শহরটি কাফেলা আকর্ষণ করিতে থাকে।" যাহা হউক, রাজত্বের প্রথম কাল হইতেই আন-নাসির সাগর অভিমুখে একটি জরুরী নির্গমন পথ (outlet) সৃষ্টির বাসনা করিতে থাকেন। তিনি ক্ষুদ্র বন্দর Bougie-র সংস্কার সাধন করেন এবং সেখানে তাঁহার পুত্র নির্মাণ করেন আল-মানসূরিয়্যা, যেখানে পরবর্তীকালে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমগ্র 'হোদ্‌না' সমভূমি এবং তৎসঙ্গে Iron Gates-এর সমতল 'সেতিফ' সমভূমি পর্যন্ত ছিল হিলালী (দ্র. HILIAL)-গণের অধিকারভুক্ত। একটি চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আছবাজ (Athbadj)-গণ যথার্থ একটি অবরোধ সৃষ্টি করিয়া শহরটির অস্তিত্বকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে Bougie-র অনুকূলে কাল্‌'আ-র শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৫৪৩/১১৪৮-৯ সালে আল-'আযীয-এর পুত্র য়াহ্‌য়া মূল্যবান সকল সামগ্রী স্থানান্তর করিয়া Bougie-তে লইয়া যান। ৫৪৭/১১৫২ সালের স্বল্পকাল পরেই আল-মুওয়াহ্‌হিদগণ ঝটিকা আক্রমণে কাল'আ অধিকার

করিয়া ইহাকে "সমূলে ধ্বংস করে"। যাহা হউক, 'আব্দু'ল-মু'মিন-এর সেনাবাহিনী সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি রক্ষী সেনাছাউনি গড়িয়া উঠে। তাহারা কতিপয় ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার পুনর্নির্মাণ ও বিশাল মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপর একটি ক্ষুদ্র খুত্‌বা মঞ্চ নির্মাণ করে। বানূ গানিয়্যা শহরটিকে কিছুকালের জন্য দখল করে। কিন্তু আল-মুওয়াহ্‌হিদগণ তিন মাস ব্যাপী এক অবরোধের (১১৮৫ খৃ.) পর তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করে। এই তারিখের পর হইতে হাম্মাদীগণের পূর্বতন এই রাজধানী সম্পর্কে কিছু শোনা যায় নাই।

কাল্'আ-র অধিবাসিগণ ছিল কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথমত সান্‌হাজা, যাহারা ছিল হাম্মাদ-এর জ্ঞাতি এবং সম্ভবত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী; দ্বিতীয়ত মসিলা (Msila) ও সূক্ হাম্‌যা-র নাগরিকবৃন্দ, বহু গোত্রের সংমিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি এবং তৃতীয়ত জারাওয়া, শহরের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত উহাদের আবাসিক এলাকাটি মনে হয় অন্যদের এলাকা হইতে প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। এইখানে অবস্থিত ছিল কাস্‌রু'ল-মানার এবং ইহার দুর্গ যাহার শীর্ষ শহরের সর্বাংশ ও সন্নিহিত এলাকার উপর দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম ছিল। ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষ দিকে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে কায়রাওয়ান হইতে নবাগত লোকেরা; বহু জাতিসত্তার এই সকল বিশ্রণের মধ্যে কতিপয় য়াহূদীও অন্তর্ভুক্ত ছিল [বস্তুত এক রেকর্ডে কাল্'আ-তে য়াহূদী পণ্ডিত ইসহাক আল-ফাসী (Isaac Alfasi)-র উপস্থিতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যিনি ১১শ শতাব্দীর শেষ দিকে দৃশ্যত স্পেনের উদ্দেশে যাত্রা করেন]।

শহরটির স্থান-বিবরণ (topography)-এ দৃষ্ট হয় একটি দক্ষিণমুখী প্রায় আয়তাকার প্রাঙ্গণ (প্রায় ৯৫০/৫০০ মিটার) যাহা তিন পার্শ্বে শহরটি ঘিরিয়া আছে। শহরটি তাকার্বুসত-এর শেষ শৃঙ্গসমূহের উপর নির্মিত; এই বিশাল পর্বতসমষ্টির অতি খাড়াই পার্শ্বদেশের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সত্ত্বেও শহরটির উত্তর পার্শ্বে দুর্গ প্রাচীর পর্বতের অতি উচ্চস্তরে আরোহণ করে, শীর্ষ অতিক্রম করিয়া পূর্ব পার্শ্বে নিম্নগামী হইয়া জারাওয়া এলাকার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে। একইভাবে পশ্চিম পার্শ্বে ইহার গোরিন (Gorein)-এর শৈলশ্রেণী অনুসরণ করিয়া ইহার শীর্ষ পর্যন্ত উঠিয়া খাড়াভাবে উয়েদ (oued)-এর অববাহিকা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহার অপরদিকে বাবু'ল-জানান নামক ম্‌সিলা অভিমুখী তোরণ একটি প্রায় সরলরেখ অক্ষ এই তোরণটিকে বাবু'ল-আকওওয়াস-এর সহিত যুক্ত করিয়াছে যাহা জারাওয়া এলাকার প্রান্ত সীমায় শহরের উত্তর-পূর্ব অংশে 'বুর্‌জ রেদির' (Burdj Redir) অভিমুখে পথ প্রদর্শন করে। তৃতীয় একটি তোরণ, বাবু'ল জারাওয়া-র দক্ষিণ-পূর্বে হোদ্‌না উপত্যকা অভিমুখে উন্মুক্ত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বর্তমানে প্রধান মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, যাহার মিনারটি উচ্চতায় কুড়ি মিটারের অধিক, এখনও দণ্ডায়মান। একই অক্ষের উত্তর পার্শ্বে, পশ্চিম দিকে একে অপর হইতে বেশ বিচ্ছিন্ন পর্বত শৃঙ্গগুলির উপর দৃষ্টিগোচর হয় কাস্‌রু'স-সালাম এবং তাহার পর আরও পূর্বদিকে কাস্‌রু'ল-কাওকাব ও কাস্‌রু'ল- মুলূক-এর ধ্বংসাবশেষ। শেষোক্তটি কাস্‌রু'ল-বাহ্‌র নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। কারণ ইহার দক্ষিণে একটি বিস্তৃত জলভাগ অবস্থিত যাহাতে সম্ভবত নৌ-মহড়া (ইস্‌তিব্‌সার) অনুষ্ঠিত হইত। সর্বশেষে পূর্বদিকে জারাওয়া এলাকায় দৃষ্টিগোচর হয় মানার দুর্গ এবং একই নামে অভিহিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

১৮৮৬ সালে Mequesse কর্তৃক চিহ্নিত হইবার পর পরবর্তী বৎসরসমূহে P. Blanchet ও A. Robert এই প্রাচীন হাম্মাদী শহরটিতে অনুসন্ধান চালান। জেনারেল de Beylie বৃহদাকারের খননকার্য শুরু করেন ; তাঁহাদের খনন-তৎপরতা মানার দুর্গ, কাস্‌রু'ল-বাহ্‌র এবং মসজিদ-এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯৫১ হইতে ১৯৬২ পর্যন্ত Golvin এখানে নূতন খননকার্য সম্পাদন করেন, বিশেষত কাস্‌রু'ল-মানার ও কাস্‌রু'স-সালামকে কেন্দ্র করিয়া শেষোক্ত অট্টালিকা গ্রুপের মধ্যে অনেকগুলি শস্য গুদাম আবিষ্কৃত হয় যাহা মনে হয় আল-ইদরীসীর এই বর্ণনা সমর্থন করে ঃ "তথায় ছিল এমন সুন্দর অনেক ভাণ্ডার যাহাতে বিন্দুমাত্র অবগতির আশংকা ব্যতীত এক এমনকি দুই বৎসর কাল পর্যন্ত শস্য সঞ্চিত রাখা যাইত।" আরও সাম্প্রতিক কালে সম্পাদিত খননকার্য, যাহা বর্তমানে R. Bourouiba-এর পরিচালনাধীন তাহা কাস্‌রু'ল-মানার-কে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহার ফলে Beylie প্রদত্ত নক্‌শা অপেক্ষা মসজিদটির আরও অধিক নিশ্চয়তাদায়ক নক্‌শা অংকন সম্ভব হইয়াছে।

কাল্'আর স্থাপত্য রীতিতে কিছু মৌলিকতা দৃষ্ট হয়, বিশেষত মানার-এর সম্মুখ (facade) ভাগে গভীরভাবে খোদাই করা লম্বমান কুলুঙ্গীসমূহে এবং সর্বোপরি বর্গাকার ব্যবস্থায় উপরে স্থাপিত (superimposed) কক্ষসমূহের বিন্যাসে যাহাতে সৃষ্টি হইয়াছে একটি চক্রকেন্দ্র (hub) এবং যাহার চতুষ্পার্শ্বে স্থাপিত ছিল সিঁড়ির ন্যায় সংযোগস্থাপক ঢালুস্তর (ramp), যাহার উপর নির্মিত হইয়াছিল ধনুকাকৃতি দোলনাবৎ (cradle vaulting) ছাদ;—মিনারের এই মৌলিকত্ব ছিল ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আল-মুওয়াহ্‌হিদ বংশের সৃষ্ট বিখ্যাত মিনারসমূহের পূর্বাভাস (কুতুবিয়্যা, the Hassan Tower, the giralda)। মসজিদের চতুর্ভুজ মিনার ইফ্‌রীকিয়্যার মিনারের তুলনায় মুসলিম স্পেনের মিনারের আকৃতির সহিত নিকটতর সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। ইহার দক্ষিণের মুখ অলংকৃত করা হইয়াছে বহু বর্ণ টালিসজ্জিত গভীরভাবে কর্তিত কুলুঙ্গীসমূহের মূল্যবান সজ্জা দ্বারা; ইহার পূর্ব ইতিহাস অথবা পরবর্তী ধারা অতি সামান্যই উপলব্ধি করা গিয়াছে; অথচ লতিযুক্ত (lobed) ও পরস্পর জড়ানো খিলানসমূহ (যাহা কখনও কখনও শংখাকৃতি অর্ধ গম্বুজসমূহের সদৃশ) ফাতিমী মিসরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঝুলন্ত মৌচাকসদৃশ খিলান (মুকার্‌নাস) নির্মাণ রীতির কৃতিত্ব মিসরের প্রাপ্য এবং সম্ভবত মুসলিম পাশ্চাত্যে ইহা ছিল সর্বপ্রথম। অন্যত্র খোদাই করা আস্তরের অলংকরণ 'সামার্‌রা'-এর অনুরূপ কার্যের সহিত তুলনীয়। কিন্তু এখানেও মিসরীয় কারিগরির স্মারক বিদ্যমান এবং অতি মনোরম খোদাই করা মার্বেল পাথরের তৈরী পানিপ্রবাহ পথ (water channel) [শাদিরওয়ান] ফুস্‌তাত-এর চ্যানেলগুলিকে স্মরণ করায়। অনেকগুলি দেওয়াল-অংকন, অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ কারিগরিসম্পন্ন বহু মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, উৎকীর্ণ অথবা রঞ্জিত অলংকরণসহ মৃৎপাত্র, বহুবর্ণ টালি, ধাতব চাকচিক্যযুক্ত টালি, ছাপযুক্ত টালি, "cuerda secca" নামে পরিচিত টালি, নক্‌শা করা ব্রোঞ্জ, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত অলংকার, রঞ্জিত কাঁচের সামগ্রী, কর্তিত স্ফটিক, মার্বেল পাথরের বহু ভাস্কর্য, পাথর ও প্লাস্টারের ভাস্কর্য—এই সকলই একটি বহু বৈচিত্র্যময় ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিল্পকলার সাক্ষ্য বহন করে, যাহাতে প্রাচ্য ও স্পেন এতদুভয়ের প্রভাব প্রকাশ পায়।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের দ্বারা গর্বপূর্ণভাবে কীর্তিময় ঐ শহরের ঐশ্বর্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে শিল্পকলার পুষ্পিত বিকাশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যদিও কাল'আ-র বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে অতি নগণ্য তথ্য জানা যায়। ইহার পণ্ডিতদের একজনের নাম সুপরিচিত; ইতি ছিলেন আন-নাহ্বী-র পুত্র সাধক আবূ ফাদ্ল। বাবু'ল-জানান-এর নিকটে অবস্থিত তাঁহার নামবাহী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার সমাধিসৌধ অবস্থিত। অপরাপর ব্যক্তিত্ব, যাঁহারা Bougei-র মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাঁহারা কাল্'আতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিঃসন্দেহে সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এই ক্ষেত্রেও কায়রাওয়ান-এর ঐতিহ্যের বিশেষ প্রভাব প্রশ্নাতীত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বাক্রী, Description de l'Afrique septentrionale, মূল পাঠ, ৪৯, অনু. de Slane, ১০৫ ; (২) আল-ইদ্রীসী, সম্পা. এবং অনু. R. Dozy and M. J. de Goeje, Discripton de l'Afrique et de l'Espagne, মূল পাঠ ৮৬, ৯১, অনু. ৯৯, ১০৬ ; (৩) ইসতিবসার, সম্পা. Von Kremer, ভিয়েনা ১৮৫৮, ১৯, ২০, ৫৫, ৫৬, ৫৮, সম্পা. Fagnan, l'Afrique septentrionale au XII[e] siecle de notre ere, কনস্ট্যানটাইন ১৯০০ খৃ., ৩২-৫, ৯৯, ১০১, ১০৫ ; (৪) ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, অনু. de Slane, Hist. des Berberes, ২খ, ৪৩, ৫২ ; (৫) Peter the Deacon, Chronique du Mont Cassin (১১১৪ সাল), হানোভার ১৮৪৬ খৃ. ; (৬) Mas-Latrie, Traite de Paix et de Commerce..., প্যারিস ১৮৬৮ খৃ. ; (৭) Mequesse, Notices sur la Kalaa des Bani-Hammad, in R. Afr., জুলাই ১৮৮৬ ; (৮) P. Blanchet, La Kalaa des Beni Hammad, in Revue de la Soc. Arch. de la Province de Constantine ১৮৯৮ খৃ., ৯৭ ; (৯) P. Blanchet and H. Saladin, Description des monuments de la Kalaa des Beni-Hammad, in Nouvelles Notices des Missions scientifiques xvii (১৯০৪-৫ খৃ.), ১-২১; (১০) A. Robert, La Kalaa et Tihamanine, in Revue de la socr. Arch. de la Province de Constantine, ১৯০৩ খৃ., ২১৭ প. ; (১১) ঐ লেখক, Kalaa des Beni Hammad, in R. Afr., vi (১৯০৭ খৃ.), ২৯১ প. ; (১২) E. Michaux-Bellaire, La Kalaa des eni-Hammad, in RMM, v (১৯০৮ খৃ.), ৫০০-২; (১৩) de Beylie, La Kalaa des Beni-Hammad, Paris 1907 ; (১৪) G. Marcais, La Kalaa des Beni-Hammad, Revue des Notices et Memoires de la Soc. Arch. du Departement de Constantine, ১৯০৮ খৃ. ; (১৫) ঐ লেখক, Les poteries et Faiences de la Qal'a des Beni Hammad, কনস্ট্যানটাইন ১৯১৩ খৃ. ; (১৬) ঐ লেখক, Album de pierre platre et bois sculptes, Algiers ১৯১৬ খৃ. ; (১৭) ঐ লেখক, Manuel d'Art Musulman, প্যারিস ১৯২৬ খৃ., ১খ, অধ্যায় ২, ৯৫, ২০২; (১৭) ঐ লেখক, l'Architecture Musulmane d' Occident, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., ৬৩, ১২৭ ; (১৮) L. Golvin, Note sur quelques fragments de platres trouves a la Qal'a des B. Hammad, in Melanges G. Marcais, ২খ., ১৯৫৮ খৃ., ৭৫-৯৪; (১৯) ঐ লেখক, Le Magrib central a l'epoque des Zirides, প্যারিস ১৯৫৭ ; (২০) ঐ লেখক, Recherches archeologiques a la Qal'a des Banu Hammad, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ. ; (২১) R. Bourouiba, Rapport preliminaire sur la campagne de fouilles de Septembre 1964, a la Qal'a des Bani Hammad, in Bulletin d'Arch. আলজিয়ার্স, ১খ. (১৯৬২-৫), ২৪৩, ২৬১।

L. Golvin (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাল্'আত রাবাহ্ (قلعــة رباح) ঃ স্পেনীয় কালাতরাভা (Calatrava); স্পেনের একটি শহর। সুদাদ রিয়াল (Ciudad Real)-এর প্রায় পনর কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে Guadiana (গুয়াদিয়ানা/ وادى انه) নদীর বাম তীরে Calatrava la Vieja-তে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। রাওদু'ল-মিতার-এর বর্ণনা অনুযায়ী উমায়্যাদের আমলে শহরটির গোড়াপত্তন করা হয় এবং প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণের বিলীয়মান উরীত (Oreto)-এর বাসিন্দাদিগকে এখানে পুনর্বাসিত করা হয়। কোন্ রাবাহ্-এর নামানুযায়ী এই স্থানের নামকরণ করা হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তাবি 'আলী (অথবা 'উলায়র) ইব্ন রাবাহ্-এর নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস মূলত একটি ভিত্তিহীন অনুমান। ইহা বিভিন্ন জুয্' (অংশ)-এ বিভক্ত এক ব্যাপক অঞ্চলের রাজধানী ছিল। য়াকূত-এর মতে এই জুয্' শব্দটির আন্দালুসিয়ার পরিভাষায় ইক্লীম-এর সমার্থক। প্রাচীন নথিপত্রে বাক্র, লাখ্ম ও জুযাম নামক জুয্'গুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। কাল্'আত রাবাহ্-এর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত জলাভূমি অঞ্চলটি ভৌগোলিক-বৃত্তান্ত-লেখকদের কাছে সুপরিচিত ছিল। তাঁহারা জানিতেন যে, এই স্থানে গুয়াদিয়ানা (Guadiana) নদীটি কাল্'আত রাবাহ্র নিকটে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ লাভের পূর্বে একাধিকবার ভূগর্ভে বিলীন হইয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। স্থান-বৃত্তান্ত-লেখকগণ Giguela, Riansares ইত্যাদি কতিপয় নদীকে এই গুয়াদিয়ানা নামের সহিত ভুলক্রমে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন [দ্র. ওয়াদীয়ানা]। আদ-দিমাশকী বলেন যে, লাল সেঁকো বিষ (arsenic) বা realgar (রাহ্জু'ল-গার) সেখানে পাওয়া যায়।

খৃষ্টান এলাকার অদূরবর্তী কর্দোভ (Cordova/قرطبه) ও টলেডো Toledo/طليطلة -এর টলেডীয় অঞ্চলে অবস্থিত কাল্'আত রাবাহ্-এর একটি ঘটনাবহুল ইতিহাস ছিল এবং এই ইতিহাস বিস্তারিতভাবে না হইলেও সাহিত্যে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ৪৭৮/১০৮৫ সালে প্রথমবারের মতো খৃষ্টানদের দখলে আসে। এই সময়ে ৬ষ্ঠ আলফনসো (Alfonso VI) টলেডো অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ৪৭৯/১০৮৬ সালে আল-মুরাবিতদের (المرابطون) আগমনের ফলে এই দখলের অবসান ঘটে (দ্র. যাল্লাকা যুদ্ধ, ৪৭৯/১০৮৬)। যদিও কখনও খোদ টলেডোকে আর পুনর্দখল করা কিংবা মুসলিম শাসনের অধীনে আনা সম্ভব হয় নাই। আল্-মুরাবিতদের ক্ষমতা বিলোপের পর কাল'আত রাবাহ্ ৫৪১/জানুয়ারী ১১৪৭ সালে আর একবার খৃষ্টান শাসনাধীনে চলিয়া যায় এবং ৫৯২/১১৯৬ সালে আল-মুওয়াহ্-হিদ (الموحدون) মুসলিমগণ কয়েক বৎসরের জন্য

তাঁহাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত এই শাসন স্থায়ী থাকে। পূর্ববর্তী বৎসরের বিখ্যাত আল-মুওয়াহ্হিদ বিজয়ের ক্ষেত্র আলারকোসে (Alarcos) ভাটি অঞ্চল কাল্'আত রাবাহ্-এর অনতিদূরে অবস্থিত। সর্বশেষ ৬০৯/১২১২ সালে Las Navas de Tolosa যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইহা ৮ম আলফন্সো (Alfonso VIII) কর্তৃক বিজিত হয় [দ্র. আল-'ইকাব]। ইহার পর ইহা উল্লেখযোগ্য কোনও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই এবং ১২৫২ খৃ. বিজ্ঞ আলফন্সো কর্তৃক সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভিলা রিয়েল (Villa Real) নগরী এই অঞ্চলের রাজধানী হয়। ১৪২৭ সালে সুদাদ রিয়েল (Ciudad Real) নামে ইহার নূতন নামকরণ করা হয়।

কাল্'আত রাবাহ্-এর খৃস্টান ধর্মযোদ্ধা 'নাইট'-দিগকে সম্মানসূচক ধর্মীয় মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা হয় ১১৫৮ খৃ. দ্বিতীয়বার খৃস্টানগণ কর্তৃক উহা দখলের পর। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আরব মূরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভূপ্রকৃতির (toponyms) বৈশিষ্ট্যের একটির নিদর্শনরূপে কাল্'আত রাবাহ্ নামটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আবদি'ল-মুন্'ইম আল-হিময়ারী, আর-রাওদু'ল-মি'তার দ্র. ; (২) য়াকূত, দ্র. রাবাহ্ ; (৩) দিমাশ্কী, নুখ্বাতু'দ্-দাহ্র, পৃ. ২৪২ ; (৪) দা.মা.ই, ১৬/২ খ, পৃ. ৩৬৫-৬৬।

J.F.P. Hopkins (E.I.[2])/মুহাম্মাদ শোয়াইব

কাল'আত আর-রূম (দ্র. রূম কাল'ইশী)

কাল্'আত হুওয়ারা (قلعة هوارة) ঃ ওয়াদী কাল্'আ-তে অবস্থিত, মাসকারা (مسكرة)-এর ৩০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে, ইগিল ইযানে-এর একটি দাইরা-মোসতাগানেমের বিলায়াত-এর অন্তর্ভুক্ত একটি আলজিরীয় শহর। জনসংখ্যা ১২,৩৩২ (১৯৬৬-এর আদমশুমারী)। এই কাল'আটি প্রতিষ্ঠা করেন ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে হুওয়ারাদের জনৈক দলপতি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক। প্রায় এক শতাব্দী পরে জাবাল 'আমূর হইতে আগত অপর একটি গোত্র বানূ রাশিদ, হাওয়ারা-গণের স্থান দখলে করে, শহরটি বানূ 'আবদি'ল-ওয়াদ (عبد الواد)-এর শাসনাধীনে আসে এবং ইহাদের পরে মারীনীগণের অধীনে এবং তাহার পর তুর্কীদের অধীনে আসে। এই সময়ে Leo Africanus এই শহরটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, শহরটি একটি দুর্গবেষ্টিত বসতি, যাহাতে প্রায় চল্লিশ ঘর বণিক ও কারুশিল্পী বসবাস করে।

অল্প অল্প করিয়া এখানে ক্রমশ কুলুগনীগণের বসতি স্থাপিত হইতে থাকে এবং এমনকি তুর্কী জাতির লোকও আশ্রয় লাভের জন্য এখানে আসিতে থাকে। ইহার অধিবাসীদের পেশা ছিল কৃষিকাজ, সাবান তৈরী ও কার্পেট বয়ন। ১৮৩০ খৃ.-এর পর শহরটি আমীর 'আবদু'ল-কাদির আল-জাযারী-র কর্তৃত্ব স্বীকার করে। তিনি কুল ওগলূগণকে (قل اوغلى) শহর হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পর ১৮৪৫ খৃ. ইহা ফরাসী কর্তৃত্বের অধীনে আসে।

বর্তমানকালে ইহা কতিপয় শিল্পের কেন্দ্র। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে কার্পেট বয়ন (মহিলাদের দ্বারা প্রস্তুত), চামড়া পাকা করা, ফিতা, ঘোড়ার জিন তৈরী, ধাতুর কাজ ও ঝালাই। কাল'আ-এর কার্পেট, যাহাতে বারবার (জাবাল 'আমূর), স্পেনীয় ও প্রাচ্য প্রভাব একত্র হইয়াছে, কিছুটা পরিমাণে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়।

১১শ/১৭শ শতকে ইহা ছিল প্রখ্যাত মুরাবিত সীদী আহমাদ ইব্ন য়ূসুফ-এর জন্মস্থান। তিনি বিদ্রূপাত্মক প্রবাদের গ্রন্থকার হিসাবে আলজিরিয়াতে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী (তু. R. Basset, Les dictons populaires attribues a Sidi Ahmed ben Yusuf, প্যারিস ১৮৯০ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খালদূন, Histoire des Berberes, সম্পা. de Slane, ১খ, ১৮১-২, ২খ, ২২৪-৫, অনু. ১খ, ২৮১-২, এবং ৪খ, ২, ৩ ; (২) Leo Africanus, Descr. de l'Afrique, অনু. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ৩৩৮ ; (৩) Marmol, Afrique, অনু. Perrot d'Ablancourt, ২খ, ৩৫৬ ; (৪) E. Graulle, Notice historique sur la Kala'a des Beni Rached, in RMM, ১৯১৩ খৃ. ; (৫) Rene Leclerc, Monographie geographique et historique de la commune mixte de la Mina, in Bull. soc. Geog, Oran ১৯০২ খৃ. ; (৬) R. Basset, Notes de voyage, in Melanges, Africains et orientaux, প্যারিস ১৯১৫ খৃ., ৯৬-১০৩ ; (৭) L. Bonnet, L'industrie du tapis a la Kala'a des Bani Rached, আলজিয়ার্স ১৯২৯ খৃ.; (৮) L. Golvin, Aspects de l'artisant en Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., স্থা. ; (৯) ঐ লেখক, Test apis et tissages principaux de l'Algerie, in Cahiers des arts et technique de l'Afrique du Nord, ২খ, ১৯৫৩ খৃ. ; (১০) ঐ লেখক, Les arts populaires en Algerie, ii, Les tapis algeriens, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ৫২১-৮০ ; (১১) দা. মা. ই. ১৬/২খ, ৩৭৭-৭৮।

R. Le Tourneau (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাল্'আতু'শ-শাকীফ (القلعة الشقيف) ঃ (প্রস্তর দুর্গ=Beaufort), আরনূল-এ অবস্থিত খৃস্টান ধর্মযোদ্ধা (Crusader)-দের একটি দুর্গ। ইহা শাকীফ আরনূন নামেও পরিচিত ছিল। য়াকূতসহ কতিপয় আরব লেখকদের বর্ণনানুসারে দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বাস করা হইত যে, আরনূন নামটি Arnould নামের আরবী রূপ ; Arnould ছিলেন জনৈক Frank (আধুনিক ফ্রান্স দখলকারী জার্মান জাতের লোক), যিনি এই অঞ্চলের শাসক (Lord) ছিলেন বলিয়া কথিত। জর্দান নদীর পশ্চিমে ইহার অবস্থান বর্তমান আরনূন গ্রামের সহিত ইহার সাদৃশ্যের ইঙ্গিত প্রদান করে। এই আরনূন অতীতে Moab-দের দেশের সীমান্ত নির্দেশ করিত। সুপ্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেস হইতে এই ধারণা করা যায় Leuctrum-এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঐ স্থানটিতে রোমান আমলে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল।

অজেয় বলিয়া বিবেচিত এই দুর্গটি অবস্থিত ছিল লেবাননের গিরিশ্রেণীর সর্বশেষ দক্ষিণ প্রান্তে, ৬৭০ মিটার উচ্চে একটি প্রস্তরময় শীর্ষে। পূর্বদিকে ৩০০ মিটার অধোগামী স্তরে দাঁড়াইয়া ইহা নাহ্রু'ল-লীতানী-র সুগভীর এবং সংকীর্ণ উপত্যকার উপর কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যপক্ষে পশ্চিমদিকে পর্বতটি বেশ খাড়া ঢালে নিম্নগামী হইয়া যেই সমতল ভূমির সহিত মিশিয়াছে, তথায় আরনূন গ্রামটি অবস্থিত, দুর্গটির নিম্নভাগ দিয়া প্রবাহিত নাহ্রুল-লীতানী অকস্মাৎ পশ্চিম দিকে ইহার গতি পরিবর্তন করে এবং নাহ্রু'ল-কাসিমিয়্যা নাম ধারণ করিয়া গ্যালিলী-র মালভূমি এবং লেবাননের পবর্তমালার সীমারেখা নির্দেশ করে।

কৌশলগত বিবেচনায় কাল'আতু'শ-শাকীফ দুর্গটির অবস্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ ইহা লীতানী নদীর দুই খিলানবিশিষ্ট যিসরু'ল-খারদালির উপর যেমন যথার্থ কর্তৃত্ব করে, অদ্রূপ নিয়ন্ত্রণ করে উপত্যকাটির তলদেশে বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলকে, এই রাস্তাগুলির মধ্যে রহিয়াছে বানয়াস হইতে সায়্দা' ভায়া (via) নাবাতিয়্যা, বানয়াস হইতে বৈরূত ভায়া জায্যীন ও দায়রু'ল-কামার এবং সূর (Tyre) হইতে দামিশক পর্যন্ত রাস্তা। দুর্গটি ফিলিসতীনে প্রবেশ পথের নিয়ন্ত্রণ করে, বিক্আ' হইতে আগত দক্ষিণ দিকের পথ, দক্ষিণ দিক হইতে সিরিয়ার প্রবেশপথ, উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে সূর ও সায়্দা'-এর প্রবেশপথও নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুর্গটি আরও কতিপয় দুর্গের সহিত সংযুক্ত, যেমন দক্ষিণ পূর্বে সুবায়বা, দক্ষিণে হূনীন, দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে তিবনীন, দক্ষিণ পশ্চিমে কাল্'আত মারূন এবং উত্তর-পশ্চিমে সায়্দা' দুর্গ।

দুইটি স্তরে নির্মিত দালানসমষ্টি ভূমির আকৃতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং ইহা প্রায় ১৪০ মিটার লম্বা এমন একটি দীর্ঘায়িত ত্রিভুজের রূপ ধারণ করিয়াছে, যাহার তলদেশ (fase) দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ৩৮ মিটার দীর্ঘ। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বের পাহাড় কাটিয়া খোদাই করা ১৫ হইতে ৩৬ মিটার প্রশস্ত একটি পরিখা, মালভূমি এবং পূর্ব দিক হইতে অগম্য দুর্গটির অবস্থানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবেশপথের বিপরীত দিকে ৪.৩০ মিটারের ব্যবধানে দুইটি স্তম্ভের উপর নির্মিত একটি সেতুর (আক্রান্ত হইলে সেতুটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া যাইত) মাধ্যমে পরিখা পার হওয়া এবং পর্বত চূড়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি কৃত্রিম সমতলে উপনীত হওয়া সম্ভব। বর্তমানে কাল্'আতু'শ-শাকীফ দুর্গটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ইহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, অংশগুলি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের সারি দ্বারা নির্মিত দুইটি পাঁচিলে (enceintes) পরিবেষ্টিত। পূর্বদিকে গিরিসংকটের উপরিভাগে রহিয়াছে শ্রেণীবদ্ধ কতিপয় দালানকোঠা নিম্নতর আঙিনায়, যাহা গোলাকার ছোট চারটি দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত ; দুর্গগুলি আরবী পাঁচিল দ্বারা সংযুক্ত। পশ্চিমদিকে রহিয়াছে উপরের অংশ, যাহাতে একটি বহিঃপ্রাচীর অভ্যন্তরীণ ramp (ঢালু সিঁড়ি)-এর সাহায্যে সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। খোদ দুর্গটির এই অবস্থা, বিভিন্ন আমলে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্মিত হইয়াছে। মধ্যযুগের পাঁচটি পৃথক পৃথক নির্মাণ এবং পরিবর্তনমূলক কর্মসূচী চিহ্নিত করা যায়, যথা ঃ খৃ. ১১৩৯ হইতে ১১৯০ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের কর্মসূচী, খৃ. ১১৯০ হইতে ১২৪০ পর্যন্ত আয়্যূবীদের, খৃ. ১২৪০ হইতে ১২৬০ পর্যন্ত সায়দা-র ফরাসী (Frank)-দের, খৃ. ১২৬০ হইতে ১২৬৮ পর্যন্ত Templar-দের, ১২৬৮ হইতে পরবর্তী পর্যায়ে মাম্‌লূক শাসকবৃন্দের কর্মসূচী। ক্রুসেডারদের আগমনের সময়ে কাল্'আতু'শ-শাকীফ দামিশক প্রদেশের একটি অংশ ছিল। ৫৩৩/১১৩৯ সালে আতাবেগ শিহাবু'দ-দীন দুর্গটিকে জেরুসালেমের রাজা Fulk-এর নিকট হস্তান্তর করেন। দুর্গটি তাঁহার রাজ্যের প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণ করিত বলিয়া Fulk ইহাকে সায়দা-র শাসনকর্তা Reynald-এর কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেন। পশ্চিম ফ্রন্টের মধ্যভাগে অবস্থিত অসমআকৃতি দুর্গটি (keep) ক্রুসেডারদের প্রাথমিক যুগের নির্মাণ কর্মের প্রতীক এবং সেই আমলে নির্মিত। দুর্গটি দ্বিতল ও বারান্দাবিশিষ্ট। অমসৃণ পাথরের গাঁথুনি এবং প্রাচীর গাত্রে তীর নিক্ষেপের সংকীর্ণ ছিদ্রপথ হইল এই যুগের দুর্গ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। হিত্তীন-এর যুদ্ধের পরেও ফ্রাংক দুর্গগুলিতে সৈন্য মোতায়েন ছিল। কিন্তু জনশক্তির অভাবে তাহারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনও অতিরিক্ত বা সাহায্যকারী সৈন্যদল লাভ করিতে পারে নাই ; ফলে দুর্গগুলি একের পর এক মুসলিমদের অধিকারে চলিয়া যাইতে থাকে। সালাহ্'দ-দীন ৫৮৫ হি. ১৭ রাবী'-/১৫মে, ১১৮৯ তারিখে কাল্'আতু'শ-শাকীফ অবরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। Sagette-এর Reynald তিন মাসের যুদ্ধ-বিরতির অবকাশ লাভ করেন এবং এই সুযোগে দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নীত করেন। প্রাচীরগুলিকে শক্তিশালী এবং দুর্গ প্রাঙ্গণে বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছিল। অধিক মসৃণ পাথরের গাঁথুনি এবং রেকাবাকৃতির তীর নিক্ষেপের ছিদ্র পথগুলি এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। রাজাব/আগস্ট মাসে পুনর্বার অবরোধ আরম্ভ হয়। অবশেষে খাদ্যাভাব ঘটাইয়া ১৫ রাবী'-১, ৫৮৬/১২ এপ্রিল, ১১৯০ তারিখে দুর্গটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। অতঃপর ইহা অর্ধ শতাব্দী যাবত মুসলিম দখলে থাকে (৫৮৬-৬৩৭/১১৯০-১২৪০)। আয়্যূবী আল-মালিকু'ল-'আদিল-এর বিভিন্ন নির্মাণ কার্যের মধ্যে ছিল দক্ষিণ দিকের প্রথম পাঁচিলের কিছুটা রদবদল, পূর্বদিকে নূতন নূতন দেওয়ালের একটি শ্রেণী যাহার পার্শ্বদেশে নির্মিত হইয়াছিল বিপুলায়তন বেলুনাকার (Cylindrical) ক্ষুদ্র রক্ষী দুর্গসমূহ। রক্ষীদুর্গসমূহের মধ্যে পূর্বগামী একটি প্রবেশপথ ; একটি আয়তাকার অস্ত্রাগারের মধ্য দিয়া এই প্রবেশপথে দুর্গের কামান-ব্যাটারী (battry) স্থাপনের স্থানে (terreplein) উপনীত হইয়া যাইত।

৬৩৭/১২৪০ দামিশকের শাসক আস-সালিহ ইসমাঈলের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিসরের শাসনকর্তা আস-সালিহ্ আয়্যূবের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফ্রাংক ও টেমপ্লারদের সমর্থনের বিনিময়ে সালিহ্ ইস্‌মাঈল তাহাদের হস্তে সায়দা, কাল্'আতু'শ-শাকীফ Tiberias ও সাফাদ অঞ্চলের কর্তৃত্ব প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব দেন, কিন্তু কাল'আতু'শ-শাকীফের রক্ষীবাহিনী দুর্গটি সমর্পণ করিতে অস্বীকার করে এবং ইসমাঈল দুর্গটিকে দখলে আনিয়া (Sagette-র Balian-এর) Reynald-এর পুত্র এবং Ibelin পরিবারের সদস্যের নিকট হস্তান্তর করিবার উদ্দেশ্যে দুর্গটিকে অবরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। Balian ইহার প্রায় পরপরই মারা যান ; তাঁহার পুত্র Julian উত্তরাধিকারসূত্রে দুর্গটির মালিক হইলেন এবং ১২৭০ খৃ. পর্যন্ত দুর্গটি তাঁহার দখলে থাকে। ঋণের বোঝায় জর্জরিত হইয়া এবং সুলতান বায়বারস (দ্র.)-এর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দুর্গটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিতে অসমর্থ হওয়ায় Julian দুর্গটিকে টেমপ্লারদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং নিজে তাহাদের বাহিনীতে যোগদান করিলেন। টেমপ্লারগণ দুর্গটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন, পূর্ব দিকে দুর্গের (keep) বিপরীতে তাঁহারা একটি বড় হল (hall) নির্মাণ করে—ধনুকাকৃতি ছাদবিশিষ্ট দুইটি খিলান পথসহ ; প্রায় ২৪৫ মিটার দক্ষিণ দিকে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন যাহা আট বৎসর পর বিধ্বস্ত হয়।

১৯ রাজাব, ৬৬৬/৪ এপ্রিল, ১২৬৮-তে সুলতান বায়্‌বার্‌স আশ-শাকীফ-এর সামনে উপনীত হন এবং ১০ দিন যাবত ২৬টি অবরোধ যন্ত্রের সাহায্যে দুর্গটির উপর বোমা বর্ষণ করেন। টেমপ্লারদের রক্ষীদল আত্মসমর্পণ করে এবং নারী ও শিশুদিগকে সূর-এ প্রেরণ করা হয়। ২২ জন নাইটসহ ৪৮০ জন রক্ষীসেনা বন্দী হয়। আমীর সারিমু'দ-দীন কায়মায কাফুরী-কে গভর্নর হিসাবে এবং আমীর সায়ফু'দ-দীন বালবান যায়নী-কে পূর্তকর্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োজিত করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করিয়া উহার দেওয়ালগুলির উপর বায়্‌বারস-এর

বীর-ধর্মসূচক প্রতীক চিহ্ন অর্থাৎ এক বিড়াল জাতীয় প্রাণী (feline passant)-এর প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। মামলূক যুগে সাফাদ প্রদেশের ১১টি জিলার মধ্যে একটি জিলার কেন্দ্র ছিল এই কাল'আতু'ল-শাকীফ।

১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন আমীর ফাখ্রু'দ-দীন মা'ন 'উছমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন তখন তিনি উছমানী দুর্গ রক্ষী বাহিনীকে বিতাড়িত করেন এবং ১০২২/১৬১৩ সনে দামিশ্‌ক হইতে হাফিজ আহমাদ পাশা কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করিবার জন্য দুর্গটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। দামিশ্‌কের সেনাবাহিনী ৮৪ দিনের অবরোধের পর পশ্চাদপসরণ করে। দামিশ্‌ক হইতে সুড়ঙ্গ খননকারী (Sapper) দল প্রেরণ করা হইলে তাহারা ৪০ দিনের মধ্যে আশ-শাকীফ ও বানিয়াস দুর্গদ্বয়ের ভূ-গর্ভ খনন করিয়া উহাকে ভূমিস্যাৎ করে।

১৮শ শতাব্দীর প্রথমদিকে আশ-শাকীফ, জাবাল 'আমিলা-র ৩টি জেলার মধ্যে একটির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। জাবাল 'আমিলা ছিল মুতাওয়ালী গোত্রের নিবাস। এই গোত্রের তখনকার সরদারগণ ছিলেন বানূ সাব গোত্রের শী'আ উপগোত্রের য়ামানী গোষ্ঠীর সহিত সম্পৃক্ত। ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে দুর্গটি দ্রুয (Druzes) অধিকৃত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সায়দা-র পাশালিক-এর অধীনস্থ থাকে। Volney-র বর্ণনায় তখন দুর্গটির চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় সিরিয়ার উৎকৃষ্ট মানের তামাক উৎপাদিত হইত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আশ-শাকীফ দুর্গটি মারজ 'উয়ূন এবং সূর জিলার সীমান্তে অবস্থিত সায়দা জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭০ খৃ. দুর্গটি নাবাতিয়া-র কাদা'-এর শাসনাধীন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, ৩খ, ৩৫৬ ; (২) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, 56, 76, 534 ; (৩) R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie, 43, 52; (৪) M. Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks, 119, 121, 123, 235 ; (৫) M. Chebli, Fakhreddin II Maan, 55-64 ; (৬) Volny, Voyage, 291 ; (৭) G. Rey, Architecture militaire des Croises, 126-39, p. xiii ; (৮) P. Deschamps, La defense du royaume de Jerusalem, 177-208, pl. liii-ixxv, 6 plans, 1 in section ; (৯) K. M. Setton, A History of the Crusades, i. 572, 612, 619, 627, ii, 479, 577, 707, 788 ; (১০) E. de Vaumas, Le Liban, pl. lxxiii; lxxiv, lxxvi.

N. Elisseeff (E.I.[2])/মু. রবিউল ইসলাম

কাল'ই-ই সেফীদ (দ্র. কাল'আ-ই সাফীদ)

কাল্'ঈ (قلعى) ঃ কালা'ঈ, টিন, রাঙ, বিশেষ করিয়া ভালো জাতের টিন-এর জন্য আরবদের ব্যবহৃত নাম, যাহাকে কখনও কখনও আর-রাসাসু'ল-কাল্'ঈ (الرصاص القلعى) ও আর-রাসাসু'ল-আব্‌য়াদ (الرصاص الابيض) অর্থাৎ 'কাল্'ঈ সীসা" অথবা "শ্বেত সীসা" বলা হয় (দ্র. লিসানু'ল-'আরাব, ১খ., ১৬৭ ; Dozy, Supplement, s. v.; Vullers, Lex. Pers-lat., ii, ৭৩৫ ; Quatremere, in Journal des, Savants, ১৮৪৬ খৃ., ৭৩১)। আরবীতে কালা'ঈ-এর অন্যান্য নামের (কায়সার) জন্য আরও দ্রষ্টব্য ঃ উদাহরণস্বরূপ আদ-দিমাশকী, নুখবাতু'দ-দাহ্‌র (Cosmographie), সম্পা. মেহ্‌রেন, ৫৪। আধুনিক ফারসী শব্দ কালহা (کلها)-কে মূল শব্দ হিসাবে বিবেচনাপূর্বক আজ জাওয়ালীকী মনে করেন (আল-মু'আররাব, সম্পা. Sachau, ১২৫) যে, এই শব্দটি সম্ভবত দূরপ্রাচ্য হইতে আগত। সেখান হইতে আরবরা ফারসী ভাষার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে (যদিও ইহা সম্ভব) সরাসরি উহা ধার করিয়া আনিয়া থাকিবে। কালহা শব্দের শুদ্ধ রূপ কালাহী (کلهی) এই অভিমত সম্বন্ধে G. Ferrand-এর Relations de voyage-এর উদ্ধৃতি অনুসারে ইব্‌ন সা'ঈদ-এর উপর ভিত্তি করিয়া উত্থাপিত। G. Ferrand-ও এই সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (Relation de Voyages..., প্যারিস ১৯১৩-৪ খৃ., ৩৪৩)। মাযান্দারান-এর আধুনিক আঞ্চলিক ফারসী ভাষার এই শব্দটির রূপ হইতেছে ঃ কালী (قلی) জীলানীতে কালিব (قلب ; দ্র. Melgunof, in ZDMG, XXII, ১৯৮) এবং ইহা অবশ্যই আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত। পরে আরবী হইতে ইহা তুর্কীতে কালায় (قلاى) রূপ গ্রহণ করে এবং উহা হইতে কালা'ঈ শব্দটি আধুনিক গ্রীক ভাষায় প্রবেশ করে। ধার করা শব্দ হিসাবে কালা'ঈ আরও দূরে পর্তুগীজ ভাষাতেও স্থান দখল করিয়াছে (calaim, calin=ভারতবর্ষে টিনের জন্য ব্যবহৃত ; দ্রষ্টব্য Dozy ও Engelmann, Gloss, des mots espagnols et portugais derives de l'arabe[2], Leiden, ১৮৬৯ খৃ., ২৪৫ ; Y-ule and Burnell, Hobson-Jobson[2], ১৪৩)। মনে করা হয় যে, টিন খনির জন্য প্রসিদ্ধ মালাক্কা উপদ্বীপের কালাহ (كله) (দ্র.) অঞ্চল হইতে এই শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। আরব ভৌগোলিক ও অভিধানবিদগণ কাল'ঈ শব্দটি আল-কাল'আ (القلعة) হইতে উদ্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (=কালাহ্; উদাহরণস্বরূপ, য়াকূত; দ্র. আল-ফীরূযাবাদী, কামূস, দ্র.; তু. হামদুল্লাহ্ মুস্তাওফী, নুয্‌হা, সম্পা. Le Strange, ২০৩)। এই ধারণা নিশ্চিতভাবেই ভ্রমাত্মক যে, শব্দটি সিংহল (য়াকূত, ১খ, ২১, ৪খ, ১৬২), স্পেন (য়াকূত, ৪খ, ১৬২ ; হাম্‌দুল্লাহ মুস্তাওফী, ২০৩) অথবা য়ামান (আল-ফীরূযাবাদী, পূ. গ্র.)-এর আল্-কালা'আ নামক টিনের খনির সহিত সংশ্লিষ্ট।

বর্তমান কালের মালয়ে টিনের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দটি হইতেছে তিমাহ্ (تمه), এই অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও শব্দ হইতেছে কালিং (كلينك) ও কালেং (كلنك)। অবশ্য Langles, Quatremere, Dozy-Engelmann, Yule-Burnell এবং অন্যান্য লেখক, যেমন কেলাং (كلنگ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ঠিক নয়—কেননা অভিধান অনুসারে ইহার অর্থ হইতেছে প্রধানত টিন-প্লেট অথবা টিনের মীনা করা লোহার পাত (যদিও 'টিন' অর্থটি প্রাচীনতর); তু. Wilkinson, A Malay-Eng. Dict., সিংগাপুর ১৯০১ খৃ., ৪৯৭; ঐ. An abridged Malay-English Dictionary ; সিংগাপুর ১৯১৯ খৃ. ও Klinkert, Nieuw Maleisch-Nederl. Woordenboek, লাইডেন ১৯১৬ খৃ.। ইহা স্পষ্ট যে, আরবী কাল'ঈ শব্দটি কাল্'আ (=কালাহ) হইতে উদ্ভূত নয়, বরং ইহা মালয়ের কোনও শব্দ হইতে উদ্ভূত। Quatremere দৃঢ়ভাবে এই উৎপত্তি সমর্থন করেন, কিন্তু Dozy, Engelmann ও Yule-Burnell সুস্পষ্ট অভিমত পেশ করেন না। মালয় শব্দ কেলিং আরবী কাল্'ঈ-র অপভ্রংশ

ইহা স্বীকার করা কঠিন। মালয় শব্দ কেলিং হইতে উদ্ভূত কালাহ্ নামক জিলার অর্থ "টিনের দেশ", এই সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হইয়াছে; Grammaire de la langue arabe-তে (প্যারিস ১৮১৩ খৃ, ৪৯৯-offprint, প্যারিস ১৮১৪ খৃ., ৬৩)। Y-ule ও Burnell সদৃশ অনুমান হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সেলাঙ্গুর (Selangor) [মালাক্কা নগরীর উত্তরে অবস্থিত] পূর্বে "নাগরী কালাং" অর্থাৎ "টিনের দেশ" বলিয়া পরিচিত ছিল; অধিকন্তু Wilkinson-এর মালায়-ইংরেজী অভিধান, ৫২৬ b, অনুসারে কেলাং, ক্লাং হইল সেলাঙ্গুরের একটি জিলা ও সেই জিলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর এবং প্রায়ই গোটা সেলাঙ্গুর রাষ্ট্র এই নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সম্ভবত কাল'ঈ শব্দের উৎপত্তি স্থল এই কেলাং।

(২) কাল'ঈ, কালা'ঈ শব্দদ্বয় অবশ্য এক ধরনের তরবারির জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার কথা বিশেষভাবে প্রাথমিক আরবী কবিতায় প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে [তু. উদাহরণস্বরূপ আওস ইব্‌ন হাজার, সম্পা. Geyer, ৩৩; রু'বা ইবনু'ল-'আজ্জাজ, সম্পা. Ahlwardt, ৪৯, ছত্র 43 ; scholia to Tarafa, মু'আল্লাকা (apud Arnold, Septem Moallakat লাইপযিগ ১৮৫০ খৃ., ৬১), আছ-ছা'আলিবী, লাতা'ইফ, ১০২, ১৩০ (Dozy কর্তৃক উদ্ধৃত, Supplement, ২খ, ৩৯৬b), দ্র. Fleischer in Sitz.-Ber. d. Sachs. Gesellsch. d. Wiss (১৮৮৬), ৮৬; তু. ইব্‌ন সাদ, তাবাকাত, ১খ, ৫০]। এই ধরনের তরবারিকে সাধারণত ভারতীয় বলিয়া বিবেচনা করা হইত (তু. উদাহরণস্বরূপ, আল-ফীরূযাবাদী, আল-কামূস দ্র.) এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তরবারি প্রাচীনকাল হইতেই আরবদের মধ্যে বিখ্যাত এবং আরব কবিগণ ইহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন (তু. Schwarzlose, Die Waffen der alten Araber, লাইপযিগ ১৮৮৬ খৃ., ১২৭-৮ এবং A. Siddiqi, Studies uber die persischen Fremdworter im Klassischen Arabisch, Gottingen ১৯১৯ খৃ., ৮৮-৯)। উৎপত্তিস্থল হিসাবে অধিকতর নির্দিষ্ট স্থানের নাম আরব ভৌগোলিক ও অভিধান রচনাকারীদের মতে হইতেছে কাল'আ, যে স্থান হইতে একই নামের টিন পাওয়া যাইত (উদাহরণস্বরূপ, য়াকূত, দ্র.)। কখনও কখনও সিরীয় আরব মরুভূমি (বাদিয়া,) অথবা ইরাকের হুলওয়ান জিলাকে (তু. লিসান, এবং কামূস, দ্র.) ইহার উৎপত্তি স্থল হিসাবে ধরা হয়। ভারতের পর উৎকর্ষের দিক দিয়া য়ামান তরবারি নির্মাণে খ্যাত ; কখনও কখনও য়ামানকেও সায়ফ কাল্'ঈ-র উৎপত্তিস্থল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন উপরে উদ্ধৃত তারাফা-এর মু'আল্লাকার ভাষ্য। Jacob, Alt-arab. Beduinen-leben (বার্লিন ১৮৯৭ খৃ., ১৪৯) য়ামানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, বিশেষভাবে এডেনের দুর্গকে (কাল'আ)। এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে 'আলকামা (সম্পা. Socin) রচিত ৩ নম্বর কবিতাখানি, যেখানে "কাল্'আ-র মুক্তার" কথা বলা হইয়াছে (কালা'ঈ)। তথাপি আল-কালা'আ নামক পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের একটি স্থানের নাম আল-কাল'আ হইতেই এই আরবী শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে, এই সম্ভাবনাই অধিকতর=মালাক্কার কালাহ (দ্র.)। কাল'ঈ ও কালা'ঈ (তু. Freytag, lex. Arab. Lat. দ্র. কাল'আ ও কালা'আ) এই দুই ধরনের তরবারির মধ্যে পার্থক্যকরণ যে কোনও রকমেই অগ্রাহ্য (contra Schwarzlose, পৃ. গ্র., ১৩০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দ্র. (১) E.I.[2], 4vol. iv, 502 ; (২) দা.মা.ই., ১৬/২খ, পৃ. ৩৭৮-৮০।

M. Streck (E.I.[2])/পারসা বেগম

কালওয়াযা (کلواذا) ঃ পূর্ব বাগদাদ-এর অদূরে দক্ষিণে দাজ্‌লা (তাইগ্রীস) নদীর বাম তীরে অবস্থিত একটি লোকালয়; একই নামের একটি জিলার (যাসূজ) প্রধান নগর। নাহ্‌রে বিন্ এখানেই তাইগ্রীস নদীতে পড়িয়াছে। নাহ্‌রাওয়ান-এর শাখাগুলির একটি শাখা, নাহ্‌রে বিন্ পূর্ব বাগদাদে প্রবাহিত। একটি বিরাট মসজিদে সজ্জিত কাল্‌ওয়াযা একটি বড় শহর। বাগদাদের সন্নিকটে হওয়ায় বহু বাগদাদবাসী এখানে প্রায়ই আসেন। [ইব্‌ন রুস্তা; (Wiet ২১৪)-এর মতে তিন পারাসাঙ, কিন্তু য়াকূত (দ্র.) ইহাকে এক পারাসাঙ দূরে বলিয়াছেন এবং ঐ স্থান তাঁহার সময়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন]। ২য়/৮ম শতাব্দীর কবিতায় এই শহরের নাম ও ইহার আরাম-আয়াশের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাহ্‌মূরাছ-এর পুত্র কালওয়াযা কর্তৃক এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদগণ ইহার নামকে কিলওয়ায-এর সহিত সংযুক্ত করেন। মনে করা হয় যে, বাইবেলে বর্ণিত নূহ ('আ)-এর জাহাজ এখানে ভূগর্ভস্থ হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাওকাল-Wiet, ২৩৪; (২) Salmon, Introduction, ১৫১, নং ১; (৩) Le Strange, নির্ঘন্ট; (৪) ঐ লেখক, Bagdad, 195-6।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

আল-কালওয়াযানী (Al-Kalwadhani) ঃ আবু'ল-খাত্তাব মাহ্‌ফূজ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-বাগদাদী, হাম্বালী মতাবলম্বী একজন বিখ্যাত ফাকীহ ও সেই সকল স্থপতিদের একজন যাঁহাকে আল-মাকদিসী বলিতেন ঃ "একাদশ শতাব্দীতে ঐতিহ্যবাহী ইসলামের পুনরুত্থানকারী"। ইব্‌ন 'আকীলের সমসাময়িক আবূ য়া'লা-র শাগরিদ আল-কালওয়াযানী ২ শাওয়াল, ৪৩২/৬ জুন ১০৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হাম্বালী ফিকহ্‌শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ উস্তাদের নিকট হাদীছ ও ফিক্‌হ্ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার উস্তাদদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ আল-ওয়ান্নী (মৃ. ৪৫০/১০৫৮)-এর অধীনে তিনি 'ইলমু'ল-ফারা'ইদ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার অন্যান্য শিক্ষক কম খ্যাতিমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ও ইব্‌ন 'আকীল নিজামিয়্যাতে আল-গাযালীর পাঠ দানের সময় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু খুরাসান হইতে আগত যুবকটির সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য অজ্ঞাত (দ্র. ৪৮৪/১০৯১, ইব্‌ন রাজাব, যায়ল, ১খ, ১৭৭)। সংখ্যাগরিষ্ঠ হাম্বালীদের মত আবু'ল-খাত্তাবও আল-গাযালীর ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁহার বিশেষত্ব ছিল ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রে এবং এই ক্ষেত্রে তিনি মুজতাহিদ-এর সমকক্ষতা লাভ করেন, যাঁহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধিজাত সমাধান দিবার প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন রাজাব (দ্র. ১৪৭-৫৪) এইরূপ সমাধানের বহু উদাহরণ দিয়াছেন। এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আবু'ল-খাত্তাব ফাকীহদের ঐকমত্যের (ইজমা')-এর বিরোধিতা করেন। তাঁহার মতে অমুসলিম কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীর একজন যুদ্ধবন্দী হইলে বিবাহ বন্ধন আপনাআপনি ছিন্ন হয় না। তাঁহার মতের সমর্থনে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইমাম মুসলিম-এর সাহীহ'-তে লিপিবদ্ধ আবূ সা'ঈদ এর একটি হাদীছ নির্ভুল নহে। এই হাদীছে বলা হয় যে, বিধর্মীর দেশে—দারু'ল-হারবে স্ত্রী বন্দী হইলে

বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। এইরূপ স্বাধীনচেতা হওয়া সত্ত্বেও আল-কালওয়াযীনী তাঁহার বহু পুস্তককে অতিরিক্ত নিয়মতান্ত্রিক এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ ইব্ন 'আকীল অপেক্ষা কম মৌলিক ছিলেন। ইব্ন রাজাব-এর মতে তাঁহার পুস্তকসমূহের মধ্যে আল-হিদায়া ফি'ল-ফিক্হি'ল-খিলাফ আল-কাবীর (আল-ইনতিসার নামেও খ্যাত) এবং আল-খিলাফু'স-সাগীর (যাহা রু'উসুল-মাসা'ইল নামেও খ্যাত) বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। উসূলু'ল-ফিক্হ শাস্ত্র (আইনতত্ব) সম্পর্কে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক আত-তামহীদ ফী উসূলি'ল-ফিক্হ (দ্র. ব্রকেলম্যান, SI, ৬৮৭)-এর সহিত তাঁহার প্রথম দুইটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দামিশকে এখনও পাওয়া যায়।

সম্ভবত সারা জীবন বাগদাদে কাটাইয়া আল-কালওয়াযানী সেইখানেই বুধবার ২৩ জুমাদা-২, ৫১০/৩ নভেম্বর, ১১১৬ ইনতিকাল করেন। অন্য একজন সমসাময়িক বিখ্যাত হাম্বালী আবূ মুহাম্মাদ আত-তামীমী-র পার্শ্বে এবং ইমাম ইব্ন হাম্বাল-এর পদপ্রান্তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ছিলেন 'আবদু'ল-কাদির আল-জীলানী, যিনি একই সময়ে তাঁহার ও ইব্ন 'আকীলের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন রাজাব, কিতাবু'য-যায়ল 'আলা তাবাকাতি'ল-হানাবিলা, সম্পা. H. Laoust and S. Dahan, Damascus 1951, 143-54; (২) G. Makdisi, Ibn 'Aqil et la resurgence de l'Islam traditionaliste au XI[e] siecle, Damascus 1963, 259-63।

P. Nwiya (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

আল-কাল্কাশান্দী (القلقشندى) ঃ মামলূক ও প্রাথমিক 'উছমানী আমলের মিসরীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের নিস্‌বা বা স্থাননির্দেশক উপাধি সমধিক পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ঃ

(১) শিহাবু'দ-দীন আবু'ল-'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-ফাযারী আশ্-শাফি'ঈ। ইনি ছিলেন আইনজ্ঞ পণ্ডিত, মামলূকদের সর্বোচ্চ সচিব এবং বেশ কতগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার জীবন কাহিনীর প্রধান প্রধান উৎস হইতেছে ঃ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে মামলূক আমলের আল-'আয়নী, আল-মাকরীযী, ইব্ন তাগরীবিরদী, আস-সাখাবী ইবনু'ল-'ইমাদ কর্তৃক রচিত জীবনীমূলক প্রশ্নাবলী। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাঁহার কিছু কিছু রচনা হাজ্জী খালীফা কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী হইতে আমরা সর্বাধিক তথ্য পাই। আল-কালকাশান্দী সম্পর্কে তাঁহার সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক লোকজন যে কতোটা উদাসীন, তাহা উল্লেখযোগ্য। আস্-সাখাবী (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) তাঁহার আদ্-দাও'উ'ল-লামি' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আল-কাল্কাশান্দীর 'সুবহু'ল-আ'শা' মাত্র চারিটি খণ্ডসম্বলিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল সপ্ত খণ্ডবিশিষ্ট; স্পষ্টতই তিনি ইহার কোন আসল অনুলিপি দেখেন নাই। তিনি আল-কালকাশান্দীর নিহায়াতু'ল-'আরাব-এর কোন পাণ্ডুলিপিও দেখেন নাই; কেননা ইতিহাস পাঠের সপক্ষে রচিত তাঁহার গ্রন্থ আল-ই'লান বি'ত্-তাওবীখ লি-মান যাম্মা আহ্‌লা'ত্-তাওয়ারীখ (যাহা F. Rosenthal কর্তৃক A History of Muslim Historiography[2] নামে অনূদিত হইয়াছে, লাইডেন ১৯৬৮ খৃ., ৪৩৪)-এর তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহা উস্তাদার জামালু'দ-দীনের প্রতি উৎসর্গ করা হইয়াছে। অথচ নিহায়া যাঁহার প্রতি উৎসর্গিত হইয়াছে তিনি হইতেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি (নিম্নে দ্র.)। এই কারণে আমরা আল-কালকাশান্দীর আইনগত ও পেশাগত জীবন সম্পর্কে বেশী কিছু জানি না। তাঁহার প্রাথমিক জীবন, শিক্ষা জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন তথ্যাদি পাওয়া তো দূরের কথা, সরকারী চাকুরী জীবনের প্রধান প্রধান দিক ও তারিখ ব্যতিরেকে আমরা আর কিছুই জানি না। তিনি ৭৫৬/১৩৫৫ সালে কালকাশান্দীর এক পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (য়াকূতের বুলদানে 'কারকাশান্দা' রূপটি হয় ভুল উচ্চারণ নতুবা আঞ্চলিক উচ্চারণের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে)। কালকাশান্দী তূখ্-এর দক্ষিণে এবং কায়রোর উত্তরে আধুনিক প্রশাসনিক বিভাগ (মুদীরিয়্যা)-এর কাল্য়ূব (দ্র.)-এর অন্তর্গত। তাঁহার নাসাব বা বংশ তালিকায় আল-কালকাশান্দী নিজকে গাতাফানের ফাযারা নামক উত্তর আরবীয় উপজাতির বানূ বাদ্‌র গোত্রের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া উল্লেখ করেন [দ্র. সুব্হ, ১খ, ৩৪৫]। এই গোত্রটি মুসলিম বিজয়ের পর নিম্ন মিসরের কাল্য়ূব (قليوب)-এর নিকটবর্তী কালকাশান্দী অংশ বসতি স্থাপন করে। এই স্থানে আল-কালকাশান্দী ৭৫৬/১৩৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের সময় তিনি সাহিত্য, হাদীছ ও আইন বিষয়ে মনোযোগী হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শাফি'ঈ আইনের কাদী হওয়া। তাঁহার প্রাথমিক রচনাসমূহ এই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত ছিল (নিম্নে দ্র.)। ৭৭৮/১৩৭৬-৭ সালে তিনি বিচার বিষয়ক রায় দেওয়ার এবং শাফি'ঈ আইন ও সুপরিচিত হাদীছ সংগ্রহাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের ইজাযা বা অনুমতিপত্র লাভ করেন। মশহূর 'আলিম শায়খ সিরাজু'দ-দীন আবূ হাফস'উমার ইব্ন 'আলী (মৃ. ৮০৪/১৪০১)-এর নিকট হইতে তিনি ইজাযা লাভ করেন।

যাহা হউক, কিছুকাল শিক্ষকতা করিবার পর ৭৯১/১৩৮৯ সালে আল-কাল্কাশান্দী কায়রোতে মামলূক প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ দীওয়ানুল-ইন্‌শা'র সচিব হন। তাঁহার এই পদের নাম ছিল কাতিবু'দ্-দাস্ত অর্থাৎ সচিবদের মধ্যে একজন, যিনি প্রধান সচিবের (কাতিবু'স-সির্র) সহকারী হইতেন, যখন শেষোক্ত জন বিচারকার্যের সময় সুলতানের সহিত বসিতেন (দ্র. দীওয়ান, ২খ, মিসর)। বিখ্যাত সচিব পরিবার বানূ ফাদ্‌লুল্লাহ্ (দ্র.)-র সদস্য কাতিবু'স্-সিরর বাদ্‌রু'দ্-দীন মুহাম্মাদ 'আলা'উ'দ-দীন 'আলী ইব্ন ফাদলুল্লাহ্ আল-'উমারীর অধীনে তাঁহার নিযুক্তির পটভূমি সচিবের কর্মের কলা-কৌশল তাঁহার মনিবের প্রশংসাসম্বলিত মাকামায় বর্ণিত আছে যাহা আল-কালকাশান্দী সুব্হ (১৪ খ, ১১২-২৮)-তে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন [এই বিষয়ে দ্র. Bosworth, in BSOAS xxvii (১৯৬৪ খৃ.), ২৯১-৮]।

তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে ১০ জুমাদা-২, ৮২১/১৬ জুলাই, ১৪১৮ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি দীওয়ানে নিযুক্ত ছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। তাঁহার পুত্র নাজমু'দ-দীন মুহাম্মাদ [যাঁহাকে ইব্ন আবী গুদ্দা (৭৯৭/১৩৯৫-৮৭৬/১৪৭১) বলা হইত]-ও আইন বিষয়ক পণ্ডিত, হাদীছবেত্তা ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন (আস-সাখাবী, আদ-দাও'উ'ল-লামি', সং. কায়রো ১৩৫৩-৬/১৯৩৪-৬, ৩খ, ৮২১ ; তু. Brockelmann, II, ১৬৭, সংযোজন II, ১৬৫।

আল-কালকাশান্দীর রচনাবলী তিন শ্রেণীর ঃ (ক) আইন, (খ) আদাব বা সাহিত্য, (গ) কিতাবা বা কর্ম সচিবের কার্যের কলা-কৌশল ;

এতদসঙ্গে ঐতিহ্য পরিচয়গত ও ঐতিহাসিক আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী। আইনের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী দুইজন পণ্ডিতের রচনাবলী সম্পর্কে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমত শাফি'ঈ ফাকীহ কামালু'দ-দীন আহমাদ ইব্ন 'উমার আন-নাসা'ঈ আল-মাদলিজীর (৬৯১/১২৯২-৭৫৭/১৩৫৫) জামি'উ'ল-মুখতাসারাত ফী ফুরূ'ই'শ-শাফি'ঈ সম্বন্ধে দ্র. Brockelmann, II, ২৫৪, S II, ২৭১ ; (Gaudefroy-Demombynes, lla Syrie a l'epoque des Momelouks, ১৩, উৎসের নাম উল্লেখ না করিয়া এই ভাষ্যের নাম দিয়াছেন আল-গুয়ূছু'ল-হাওয়ামী') এবং দ্বিতীয়ত সূফী শায়খ নাজ্মু'দ-দীন 'আবদু'ল-গাফফার আল-কাযবীনী (মৃ. ৬৬৫/১২৬৬, দ্র. Brockelmann, II,৪৯৪-৫, S I, ৬৭৯)-এর আল-হাবী আস-সাগীর ফি'ল-ফুরূ' নামক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। এই দুইটি গ্রন্থের কথা হাজ্জী খালীফা ও সাখাবী কর্তৃক যথাক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে এইগুলির অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্য (আদাব) বিষয়ে আল-কালকাশান্দী, হিল্য়াতু'ল-ফাদল ওয়া যীনাতু'ল-কারাম ফি'ল-মুফাখারা বায়না'স-সায়ফ ওয়া'ল-কালাম নামক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তিনি সুলতান আজ-জাহির বারকূক কর্তৃক ৭৯৪/১৩৯২ সালে দাওয়াদার (দ্র.) বা রাজকীয় মসীধারক নামক উচ্চপদে নিযুক্ত যায়নু'দ-দীন আবু'ল-জাহিরীর উপর লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের মূল লিপি এখনও ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে এবং তাহা সুবৃহ-তে, ১৪খ, ২৩-১৪০ (দ্র. Bagdatli Ismail Pasa, ঈদাহ্ আল-মাকনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫-৭ খৃ., ১খ, ৪২১) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি রাসূল কারীম (সা)-এর প্রশংসার্থে কা'ব ইব্ন যুহায়র রচিত বানাত সু'আদ নামক কবিতার একটি ভাষ্য লিখেন, আবয়ারী সম্পাদিত, নিহায়াতু'ল-'আরাব, ৪২০ পৃষ্ঠায়। তিনি ইহাকে কুনুহু'ল-মুরাদ ফী শারহ্ বানাত সু'আদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি আরও বলেন যে, অন্য কোন ভাষ্যে তিনি এত সুন্দর অর্থ ও প্রকাশভঙ্গী খুঁজিয়া পান নাই। এই রচনাটি পাণ্ডুলিপিতে এখনও সংরক্ষিত আছে। আলেকজান্দ্রিয়ায় ১২৮৮/১৮৭১ সালে মুদ্রিত, ব্রকেলম্যানের দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠায় আল-কালকাশান্দীর প্রতি আরোপিত রাসূল কারীম (স)-এর প্রশংসামূলক কবিতার সহিত বানাত সু'আদের উপর এই ভাষ্যের কি সম্পর্ক রহিয়াছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনও ধারণা পাওয়া যায় না। আল-কালকাশান্দীর প্রতি এই রচনার আরোপ যে কোনও অবস্থাতেই সন্দেহজনক, দ্র. সারকিস, ২খ, ১৫২২।

যাহা হউক, আল-কালকাশান্দীর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিপক্বতার ছাপ রহিয়াছে তাঁহার জীবনের শেষের দিকে কর্ম সচিবের কাজ এবং এই বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে বিস্ময়কর সুবৃহু'ল-আ'শা ফী সিনা'আতি'ল-ইন্শা', (صبح الاعشى فى صناعة الانشاء) যাহা মামলূক আমলের কর্মসচিবের কাজ সম্পর্কিত পুস্তক ও বিশ্বকোষের চূড়ান্ত রূপ, এমনকি গোটা আরবী আদাবু'ল-কাতিব বা সচিব বিজ্ঞান সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (সম্পা. মুহাম্মাদ 'আবদু'র-রাসূল ইব্রাহীম, দারু'ল-কুতুব, কায়রো ১৩৩১-৮/১৯১৩-২০, ১৪খ)। সুবৃহ শেস হয় ৮১৪/১৪১২ সালে ; সাত খণ্ডসম্বলিত এই পুস্তকে রহিয়াছে একটি ভূমিকা, দশটি আলোচনা অধ্যায় (মাকালাত) ও একটি উপসংহার। ইহার মধ্যে আল-কালকাশান্দী সরকারী চিঠিপত্র সম্পর্কিত কাজকর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট সচিবের প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। W. Bjorkman-এর অপরিহার্য নির্দেশিকা পুস্তকে ইহার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ আছে [তাঁহার Beitrage zur Geschichte der Staatskanlei im islamischen Agypten (হামবুর্গ ১৯২৮ খৃ.)]। সূচীপত্র সম্বলিত একটি খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৭২ খৃ.)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ফাতিমী আমল হইতে বিশেষভাবে মূল্যবান মিসর ও ইহার বহির্দেশীয় সম্পর্ক সম্বলিত বিপুল সংখ্যক মূল দলীল যাহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের তথ্যও বহন করে, আল-কালকাশান্দী সেইগুলির উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুবৃহ যখন পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল তখনও Amari, Lammens প্রমুখ য়ূরোপীয় প্রাচ্যবিদের দৃষ্টি এই সকল প্রবন্ধ ও সরকারী দলীলাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আল-কালকাশান্দীর উৎস ছিল প্রকৃতপক্ষে কিতাবা বিষয় সম্পর্কিত আরবীয় লেখকদের গোটা রচনাবলী এবং এতদসম্পর্কীয় বিজ্ঞান, যেমন ইতিহাস ও ভূগোল। কিন্তু তাঁহার রচনার প্রত্যক্ষ উৎস ছিল ৮ম/১৪শ শতকের দুইজন গ্রন্থকারের রচনাবলী। এই গ্রন্থসমূহ হইতেছে ঃ শিহাবু'দ-দীন আহমাদ ইব্ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী রচিত গ্রন্থ (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৯), তাঁহার আত্-তা'রীফ বি'ল-মুসতালাহ আম-শারীফ, ইহার ক্রোড়পত্র, 'উরফু'ত-তা'রীফ ও তাঁহার ভূগোল, মাসালিকু'ল-আবসার এবং ইব্ন নাজিরি'ল-জায়শ নামে অভিহিত কাদী তাকিয়্যু'দ্-দীন 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন মুহিব্বি'দ-দীন রচিত তাছকীফু'ত-তা'রীফ (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪)। সুবৃহ গ্রন্থের উৎসসমূহ সম্পর্কে Bjorkman-এর বিশদ আলোচনা রহিয়াছে, পূ. গ্র., ৭৫ প., এবং তাছকীফ (অদ্যাবধি অসম্পাদিত এবং ব্রকেলম্যানে অনুল্লেখিত) ; ইহার রচয়িতাকে R. Vesely পরীক্ষা করিয়াছেন, Zu den Quellen al-Qalqasandi's Subh al-Asa, in Acta Universitatis Carolinae Pragensis, Philologica ২ (১৯৬৯ খৃ.), ১৩-২৪।

সুবৃহ গ্রন্থে আল-কালকাশান্দী বিশ্বকোষের ন্যায় বিশদ বর্ণনা ও খুঁটিনাটি আলোচনার দিকে নজর দিয়াছেন। পরবর্তীকালে আবার তিনি ইহার একটি সংশোধিত খণ্ড রচনা করেন। ইহার নাম ঃ দাও'উ'স-সুবৃহি'ল-মুসফির ওয়া জানি'দ-দাওহি'ল-মুছমির (ضوء الصبح المسفر وجن الدوح المثمر) ; ইহা কামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন বারিযীর নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। তিনি পরবর্তীকালে কাতিবু'স-সির্র হইয়াছিলেন (ইহার কেবল প্রথম খণ্ড কায়রোতে মুদ্রিত হইয়াছে ১৩২৪/১৯০৬)। দাও'-তে অল্প সংখ্যক তথ্য রহিয়াছে যাহা সুবৃহ-তে নাই।

সরকারী দলীল-পত্রাদি গ্রহীতাদিগকে সঠিকভাবে সম্বোধন ও চিহ্নিত করিবার জন্য কর্মসচিবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বংশতালিকা সম্পর্কিত গবেষণা সুবহ-তে রহিয়াছে, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৬-৭১। কিন্তু আল-কালকাশান্দী দুইটি গ্রন্থে, বিশেষভাবে কুলজি বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। প্রধান গ্রন্থটি হইতেছে সুবৃহ-এর পর ও দাও'-এর পূর্বে রচিত নিহায়াতু'ল-আরাব ফী মা'রিফাতি আনসাবি'ল-'আরাব (نهاية الارب فى معرفة انساب العرب)। ইহা আমীর আবু'ল-মাহাসিন য়ূসুফ আল-উমাবী আল-কুরাশীর প্রতি উৎসর্গিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ ভাবে কুলজি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি প্রাথমিক যুগের আরবীয় ইতিহাসের আলোচনা রহিয়াছে, আয়্যামু'ল-'আরাব ইত্যাদি ; কিন্তু বইটির মূল বিষয় আরব গোত্রীয়

বর্ণানুক্রমিক অভিধান গ্রন্থখানি ১৩৩২/১৯১৪ সালে একটি অনুল্লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে এবং (একটি ভাল জীবনীমূলক ভূমিকা সহ, যাহা G. C. Anawati কর্তৃক MIDEO, vi-তে, ১৯৫৯-৬১ খৃ., পৃ. ২৭৪-৬, সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া গিয়াছে) ইব্‌রাহীম আল-আবয়ারী (কায়রো ১৯৫৯ খৃ.) কর্তৃত্ব সঠিকভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। আবয়ারী কর্তৃক আলোচিত একটি প্রশ্ন হইতেছে হাজ্জী খালীফা কর্তৃক (চতুর্থ খণ্ড, নং ৯৫৫৬, তু. vi, নং ১৪০৭০) নিহায়াতু'ল-আরাব নামক একটি গ্রন্থের রচনা আল-কালকাশান্‌দীর পুত্র মুহাম্মাদের (উপরে দ্র.) প্রতি আরোপ। এই গ্রন্থখানি "পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের বেদুঈনদের আমীর" যায়নু'দ-দীন আবু'ল-জূদ বাকার ইব্‌ন রাশিদ-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন নিম্ন মিসরের আমীর। ব্রকেলম্যান (২খ, ১৬৭, S II, ১৬৫) এই গ্রন্থের রচনা আল-কালকাশান্‌দীর পুত্র মুহাম্মাদের প্রতি আরোপ করিয়াছেন এবং আবু'ল-জূদের প্রতি ইহার উৎসর্গ সম্পর্কে পুনরুক্তি করিয়াছেন। অপরদিকে আবয়ারী মনে করেন, পিতা ও পুত্র উভয়েই একই বিষয়বস্তুর উপর একই নামে গ্রন্থ রচনা করার সম্ভাব্যতা নাই। তিনি বিশ্বাসযোগ্য রূপে এই পরামর্শই দেন যে, মুহাম্মাদ ৮৭৪/১৪৪৩-৪ সালে তাঁহার পিতার প্রণীত নিহায়ার মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈয়ার করিয়া আবু'ল-জূদকে (নিহায়া, সং. কায়রো, ভূমিকা, শীন-ছা') উপহার দেন। নিহায়ার পরিশিষ্ট হিসাবে বর্ণিত (ইস্‌তিদরাক) আল-কালকাশান্‌দীর বংশ তালিকা সম্পর্কিত আর একটি গ্রন্থ হইতেছে কালা'ইদু'জ-জুমান ফি'ত-তা'রীফ বি-কাবা'ইল 'আরাবি'য-যামান (قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان)। ইহা আবু'ল-মাহাসিন মুহাম্মাদ আল-জুহানী আল-মু'আয়্যাদীর প্রতি উৎসর্গ করা হয় এবং ৮১৯/১৪১৬ সালে রচনা শেষ হয়। ইহা আল-কালকাশান্‌দীর শেষ গ্রন্থও হইতে পারে; ইহা আব্‌য়ারী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৬৪ খৃ.)। সবশেষে রহিয়াছে আল-কালকাশান্‌দীর অবশিষ্ট গ্রন্থ মা'আছিরু'ল-ইনাফা ফী মা'আলিমি'ল-খিলাফা। ইহা খিলাফাতের সাংবিধানিক অবস্থানের উপর একটি প্রবন্ধ। ইহাতে আরও রহিয়াছে উক্ত পদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী, খলীফাদের কর্তব্য, তাঁহাদের জারীকৃত দলীল (যাহার অনেকগুলিই উদ্ধৃত হইয়া থাকে), খলীফা ও পরবর্তীকালের সুলতানদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা। গোটা গ্রন্থটিই কায়রোর এক 'আব্বাসী খলীফার প্রতি উৎসর্গিত হইয়াছে। তাঁহার নাম আল-মু'তাদি'দ ইবনু'ল-মুতাওয়াক্কিল (৮১৬/১৪১৪-৮৪৫/১৪৪১)। এই উৎসর্গ হইতে বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থটি সুবহ-এর পর এবং আল-কালকাশান্‌দীর জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে রচিত হইয়াছে। মা'আছির-এর অনৈতিহাসিক অংশটুকু সুস্পষ্টরূপে সুবহ-এর উপর নির্ভরশীল। তুরস্কে মারহুম মুকরিমিম হালিল ইনানচ ও ইব্‌রাহীম কাফেসগলু কর্তৃক দুইটি পাণ্ডুলিপি অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিতকরণের ফলে এই গ্রন্থটি সম্প্রতি পরিচিতি লাভ করিয়াছে। সুবহ-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থটির একটি বিশদ বিশ্লেষণ দিয়াছেন কাফেসগলু তাঁহার Kalkasandi nin bilinmeyen bir esseri, Measiru l'-Inafe, in Tarih Dergisi, ৮ম খণ্ড, নং ১১-১২ (ইস্তাম্বুল ১৯৫৬ খৃ.), ৯৯-১০৪। নিবন্ধে একটি অপরিচিত পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া মুদ্রিত মা'আছির-এর একটি সংস্করণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন 'আবদু'স-সাত্তার আহমাদ ফাররাজ (কুয়েত ১৯৬৪ খৃ., ৩ খণ্ড)। এই সংস্করণে তুর্কী পণ্ডিতদের অবদানের কোনও স্বীকৃতি প্রদান করা হয় নাই।

(২) শাফি'ঈ পণ্ডিতদের একটি বিখ্যাত পরিবার যাহা মূলত কালকাশান্‌দার বাসিন্দা কিন্তু জেরুসালেমে অভিবাসিত। পরিবারটি "আল-কালকাশান্‌দী" উপাধি বজায় রাখেন; তাকিয়্যু'দ-দীন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-মাকদিসী (৭৮৩/১৩৮২-৮৬৭/১৪৬৩) ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কারীমু'দ-দীন 'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-মাক্‌দিসী (৮০৮/১৪০৫-৮৫৫/১৪৫২) ইঁহাদের উভয়েই শিক্ষক, গ্রন্থকার ও মুফ্‌তী হিসাবে কায়রো ও ফিলিসতীনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন; দ্র. সাখাবী, দাও', ৪খ, ৩১১-১২, ১১খ, ৬৯-৭১ এবং ই'লান, অনুবাদ Rosenthal, A history of Muslim historiography², ৪৩৯-৪০। সম্ভবত জেরুসালেমের এই পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন বুরহানু'দ-দীন আবু'ল-ফাত্‌হ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আলী আল-মাকদিসী, মৃ. ৯২২/১৫১৬, কায়রো। তিনি হাদীছ সংগ্রহকারী এবং তাছবীতু'ল-মুলূক বি-তাফসীর কাওলিহি তা'আলা কুলিল্লাহুম্মা মালিকা'ল-মুলক নামক প্রবন্ধের রচয়িতা; এইগুলির কোনটিই প্রকাশিত হয় নাই; দ্র. ব্রকেলম্যান, ২খ, ৯৪, সংযোজন ২, ৮৫।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে নিজের রচনাবলী ব্যতীত আল-কালকাশান্‌দীর জীবনীর প্রাথমিক উৎসগুলি সামান্য। দ্র. সাখাবী, আদ-দাও'উ'ল-লামি', ২খ, ৮; (১) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৭খ, ১৪৯; (২) আল-মাকরীযী, কিতাবু'স-সুলূক, ৩খ, ৮২১; (৩) ইব্‌ন তাগরীবির্‌দী, আল-মান্‌হালু'স-সাফী, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৬, ১খ, ৩৩০-১; (৪) তাশকপরূযাদে, মিফতাহু'স্‌-সা'আদা, ১খ, ১৮২; অতিরিক্ত উৎসের জন্য দ্র. সুবহ্-এর ১৪শ খণ্ডের সহিত সংযুক্ত জীবনী; (৫) সারকিস, ২খ, ১৫২১-৩; (৬) কাহ্‌হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ১খ, ৩১৭; (৭) যিরিকলী, আল-আ'লাম, ১খ, ১৭২; (৮) M. Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks d'apres le auteurs arabes, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., ৫-১৫; (৯) ব্রকেলম্যান, ২খ, ১৬৬-৭, সংযোজন-২, ১৬৪-৫; (১০) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, I. Kafesoglu প্রণীত আল-কালকাশান্‌দী বিষয়ক প্রবন্ধ। সুবহ্-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থে রহিয়াছে (ব্রকেলম্যানের E.I.¹ নিবন্ধে উল্লিখিতগুলি ব্যতীত) : (১১) M. Amari, De' titoli che usava la cancellaria de' Sultani di Egitto nel XIV secolo scrivendo ai reggitori di alcuni Stati italiani in Atti Reale Accad. Lincei, Serie terza, xii (১৮৮৩-৪), ৫০৭-৩৮; (১২) H. Lammens, Relations officielles entre la cour romaine et les Sultans Mamlouks d'Egypte, in ROC, viii (১৯০৩), ১০১-১০; (১৩) B. Michel, L'organisation financiere de l'Egypte sous les sultans mamelouks d' apres Qalqachandi, in Bull. de l' Inst. egyptienne, vii (১৯২৫ খৃ.), ১২৭-৪৭; (১৪) M. Canard, Le traite de 1281 entre Michel Paleologue et le Sultan Qala'un Qalqasandi, Subh al-a'sa, XIV, 72 দ্র.; in Byzantion' x (১৯৩৫ খৃ), ৬৬৯-৮০; (১৫) ঐ লেখক, Un traite entre Byzance et l' Egypte au XIIIe siecle et les relation diplomatiqus de Michel VIII

Paleologue avec les Sultan Mamluks Baibar et Qalaun, in Melanges Gaudefroy-Demombynes, প্যারিস ১৯৩৫-৪৫, ১৯৭-২২৪ ; (১৬) ঐ লেখক, Les institutions des Fatimides en Egypte (=Arabic text of Subh, iii, ৪৬২-৫৩২), আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ. ; (১৭) O. Spies, An Arab account of India in the 14th century, being a translation of the chapters on India from al-Qalqashandi's Subh al-a'sha, দিল্লী, ১৯৩৫ খৃ. ও Stuttgart ১৯৩৬ খৃ. ; (১৮) G. Wiet, Les classiques du scribe egyptien au XV^e siecle, in Stud Isl., xviii (১৯৬৩ খৃ.), ৪১-৮০ ; (১৯) C. E. Bosworth, The Section on codes and their decipherment in Qalqashandi's সুব্‌হু'ল-আ'শা, in JSS, viii (১৯৬৩ খৃ.), ১৭-৩৩ ; (২০) ঐ লেখক, Some historical gleanings from the section on symbolic actions in Qalqasandi's সুব্‌হু'ল-আশা, in Arabica, x (১৯৬৩ খৃ.), ১৪৮-৫৩ ; (২১) ঐ লেখক, A maqama on secretaryship: al-Qalqasandi's আল-কাওয়াকিবু'দ্‌-দুররিয়্যা ফি'ল-মানাকিবি'ল-বাদ্‌রিয়্যা, in BSOAS, xxvii (১৯৬৪ খৃ.), ২৯১-৮ ; (২২) ঐ লেখক, Christian and Jewish religious digntaries in Mamluk Egypt and Syria : Qalqashndi's information on their hieraschy, titulature and appointment, in I JMES, iii (১৯৭২ খৃ.), ৫৯-৭৪, ১৯৯-২১৬ ; (২৩) ঐ লেখক, A Mamluk text on the orthographic distinction of দাদ ও যা', in Parole d'Orient, iii (কাসলিক, লেবানন, ১৯৭২ খৃ.) ১৫৩-৬৯; (২৪) দা.মা.ই. ১৬/২খ, পৃ. ৩৮১-২।

C.E. Bosworth (E.I.[2])/পারসা বেগম

কাল্‌কিনি (كلكنى) : বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার এবং বর্তমান মাদারীপুর জিলার সর্বদক্ষিণের উপজিলা, আয়তন ১১০ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৪ বর্গমাইল নদী এলাকা, ১৫টি ইউনিয়ন ও ১৮৪টি গ্রাম নিয়া গঠিত ; ১৯৮১ খৃ. জনসংখ্যা ২,৩০,২১০ জন, প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১৩৬৩ জন লোক বাস করে। মানচিত্রে মাদারীপুর জিলার দক্ষিণের যে বর্ধিত অংশ বরিশাল জিলার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে দেখা যায় উহাই কাল্‌কিনি উপজিলা। এলাকাটি পূর্বে বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) জিলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৩ খৃ. বৃটিশ সরকার ইহাকে তৎকালীন ফরিদপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত করে। উত্তরে মাদারীপুর উপজিলা, উত্তর-পূর্বে পালং উপজিলা, পূর্বে ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজিলা, পশ্চিমে কোটালিপাড়া উপজিলা, দক্ষিণে বরিশাল জিলার গৌরনদী ও মুলাদী উপজিলা। উপজিলার পূর্বদিক দিয়া আড়িয়ল খাঁ নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়া পদ্মাতে পড়িয়াছে, মাঝামাঝি এলাকা দিয়া আড়িয়ল খাঁ নদীরই একটি শাখানদী টরকী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ সীমান্ত দিয়া পূর্বমুখী হইয়া ঘুরিয়া গিয়া আবার আড়িয়ল খাঁ নদীতেই পড়িয়াছে। এই আড়িয়ল খাঁ নদীই হইতেছে পদ্মার পুরাতন খাত, পরে পদ্মা গতি পরিবর্তন করিয়া পূর্বদিকে সরিয়া যায়, তখন এই খাত ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়। আর পূর্বদিকে ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার কয়েকটি থানা এলাকা (বর্তমান নাম উপজিলা) ফরিদপুরের মধ্যে চলিয়া আসে। কাল্‌কিনি উপজিলার চলাচলের প্রধান প্রধান নৌপথ, পূর্বে স্টীমার চলিত, বর্তমানে ছোট-বড় লঞ্চ চলাচল করে। সমগ্র অঞ্চলটি একটানা নীচু ও সমতল, পদ্মা ও উহার শাখা নদীর পলি দ্বারা গঠিত, মাটি পলি-কাদা ও বালুপ্রধান। বর্ষকালে বিরাট এলাকা প্লাবিত হইয়া যায়। নদী ও বিল অঞ্চল হইতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার যে তিনটি বিখ্যাত চর অঞ্চল রহিয়াছে উহাদের একটি হইতেছে এই কালকিনি এলাকা। এখানকার অধিকাংশ গ্রামের নাম 'চর' শব্দ দ্বারা গঠিত।

এখানকার আহাওয়া মৃদু, সুষম, সাধারণভাবে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৬৮.৫৫" ইঞ্চি। এলাকাটি কালবৈশাখী কবলিত অঞ্চলের অন্তর্গত। প্রায় প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুরুতে এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকের প্রাণহানি হয় এবং ঘরবাড়ী ও ফল-ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ১৯১২, ১৯১৯ ও ১৯৬১ খৃ. কালবৈশাখী অতি ভয়াবহ ছিল; তাহাতে বহু প্রাণহানি হয়। ১৯৪৩ খৃ. দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরেও বহু লোক মারা যায়। ১৯৮৮ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে যখন ব্রহ্মপুত্র নদীর আকস্মিক বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ স্থলভাগই পানিতে তলাইয়া যায়, সেই সময়ে কাল্‌কিনির এই নিম্নাঞ্চলও ডুবিয়া যায় এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উর্বর জমিতে ধান, পাট, সরিষা, ইক্ষু, গম ও অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়। বর্তমান শতকের ষাটের দশকের পর হইতে ব্যাপকভাবে ইরি ধানের চাষ হইতেছে। গবাদি পশুর মধ্যে মহিষ পালন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদের মধ্যে সুপারি, খেজুর, নারিকেল, তাল, আম, কাঁঠাল, কলা ও বাঁশ প্রধান। কিছু কিছু বন্য পশুপাখী রহিয়াছে। চিতাবাঘ এবং কখনও কখনও বন্য শূকর দেখা যায়। শীতকালে হিমালয় ও সুদূর সাইবেরিয়া হইতে অসংখ্য বন্য পাখী নদীর চরাঞ্চলে ও এখানকার অগণিত বিলে আসিয়া থাকে এবং প্রায় ছয়-সাত মাসকাল থাকে।

বর্তমান জনসংখ্যার ৮২.৯% মুসলমান, হিন্দু ১৬.৮ (তন্মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বর্ণহিন্দু), খৃষ্টান ০.৩%, ২০ জন বৌদ্ধ) এবং অন্যান্য মোট ৩৮ জন। শিক্ষিতের হার শতকরা ১৩.৭৫ জন। অধিকাংশ অধিবাসীর জীবিকার উৎস কৃষিকাজ, প্রায় ৮৮% কৃষক। অন্যদের মধ্যে রহিয়াছে চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, ডাক্তার, জেলে, তাঁতী, নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি। এখানে কোন বড় বা মাঝারি আকারের শিল্পকারখানা নাই, কুটির শিল্প রহিয়াছে। তাঁতিগণ শাড়ী, ধুতি, লুঙ্গী, গামছা, চাদর ইত্যাদি বয়ন করে, কুমারগণ মৃৎশিল্পে নিয়োজিত রহিয়াছে, নমশূদ্র শ্রেণীর কারিগরগণ নৌকা তৈরী করে। এই অঞ্চলের গাছিগণ খেজুরের রস হইতে বিখ্যাত খেজুরের গুড় উৎপাদন করিয়া থাকে। এখানকার সংস্কৃতিতে ইসলামী ভাবধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কবিগানে ও পুঁথিসাহিত্যে বিশেষ করিয়া পুঁথি সাহিত্যের কিংবদন্তী মিশ্রিত ইসলামী নানা কাহিনী সমগ্র এলাকার গ্রামে গ্রামে বর্ণিত হয়।

কাল্‌কিনি উপজিলার দশর ইউনিয়নের দশর গ্রামে সায়্যিদ 'উছমান নামক জনৈক দরবেশের মাযার রহিয়াছে। তাঁহার নামে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসিবার প্রথম দিকেই এই দরবেশ আরব দেশ হইতে এখানে ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বর্তমানে বহু লোক তাঁহার মাযার যিয়ারত করিয়া থাকে।

খৃ. ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। শশাঙ্কের পিতা সমাচার দেব এই এলাকা শাসন করেন। খৃ. ৭ম শতকের শেষভাগে অঞ্চলটি হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। খৃ. ১২শ শতকে এখানে সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩০ খৃ. দিল্লীর সুলতান মুহাম্মাদ তুগলাক-এর সৈন্যগণ এই অঞ্চল জয় করেন, ১৩৩৮ খৃ. ফাখরু'দ-দীন মুবারাক শাহ এই অঞ্চল সমেত সমগ্র পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ইলয়াস শাহী বংশীয় সুলতানগণ এবং তাঁহাদের পরে হুসায়ন শাহ ও তাঁহার বংশধরগণ শাসন করেন। ১৫৭৪ খৃ. আকবর-এর জনৈক সেনাপতি মুরাদ খান এই অঞ্চল জয় করেন এবং সম্রাট কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল এলাকাটি শাসন করেন। বাংলার বারো ভূঁঞাগণের উত্থান ঘটিলে যখন মুগল-পাঠান সংঘর্ষের ফলে বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায় এখানকার জমিদার হন। কিন্তু কেদার রায় কাল্‌কিনি উপজেলারই নিকটবর্তী এলাকাতে সংঘটিত যুদ্ধে মানসিংহ (দ্র.)-এর নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে প্রাণত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীর-এর শাসনামলে এখানকার পাঠান জমিদার ছিলেন মাজলিশ কুতুব (দ্র.)। ১৬০৯ খৃ. মাজলিস কুতুব তাঁহার নৌবহর নিয়া মূসা খান (দ্র.)-এর নেতৃত্বে সম্মিলিত পাঠান বাহিনীতে যোগদান করিয়া বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহরের কয়েক মাইল ভাটিতে চর কোদালিয়াতে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নওয়াব ইসলাম খান (দ্র.)-এর মুগল বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন।

অতঃপর এখানে স্থায়ীভাবে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃ. ১৮শত শতকের গোড়ার দিকে মুগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত মাহমূদাবাদের হিন্দু জমিদার রাজা সীতারাম রায় (দ্র.) বিখ্যাত ভূষণা কিল্লা (দ্র.) দখল করিয়া নেন এবং মুগল দরবারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খুব সম্ভবত এই কাল্‌কিনি অঞ্চলও তাঁহার স্বল্পস্থায়ী শাসন এলাকাভুক্ত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুগল সেনাবাহিনীর নিকটে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। ১৭১২ খৃ. মুর্শিদাবাদের নিকটে সীতারাম রায়কে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে পুনরায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ খৃ. ক্লাইভ দিল্লীর দুর্বল মুগল বাদশাহ ২য় শাহ আলাম-এর নিকট হইতে বাংলার দীওয়ানী লাভ করিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই এলাকাটিকে ঢাকা নিয়াবাতের অন্তর্ভুক্ত করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে এই কাল্‌কিনি ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহকে ঢাকা—জালালপুরের অংশ করা হয়, জালালপুর পরগণা কালক্রমে পদ্মার স্রোতে বিলীন হইয়া যায়। পরবর্তীতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাকে ঢাকা হইতে কাটিয়া আলাদা জেলা করা হয়। বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্র. নিবন্ধসমূহ—মাদারীপুর ; ফরিদপুর, ঢাকা।

কাল্‌কিনি উপজেলা সদর একটি ছোট শহর, ২৩°-০৪' উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৯০°-১৫' পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত ; মাদারীপুর জেলা সদরের সঙ্গে মোটামুটি রকম একটি সড়ক দ্বারা যুক্ত। এখানে থানা, উপজেলা অফিসসমূহ, হাসপাতাল, ডাকবাংলা, স্কুল, কয়েকটি মাদ্‌রাসা, ডাকঘর, টেলিফোন অফিস এবং লঞ্চঘাট রহিয়াছে। ইহা একটি রাজস্ব সার্কেল, এখানে একজন কানূনগো থাকেন। তাহা ছাড়া সাব-রেজিস্টারী অফিস এবং কাযী অফিস আছে। সমগ্র উপজেলা এলাকাতে ৪টি পোস্ট-টেলিগ্রাফ অফিস রহিয়াছে। লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে ঐতিহাসিক নিদর্শন রহিয়াছে। সাহেবরামপুর একটি উন্নত গ্রাম, সেখানে স্কুল, মাদ্‌রাসা, সাধারণ পাঠাগার, ডাক্তারখানা, পশু-চিকিৎসালয়, সমবায় অফিস, ডাকঘর, বড় হাট ও লঞ্চঘাট রহিয়াছে। ঢাকা-টরকী-বরিশাল সড়ক এখান দিয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteer, Faridpur, Establishment Division, Cabinet Secretariate. Govt. of the People's Republic of Bangladesh, 1977 ; (২) Population Census of Pakistan 1961, District Census Report, Faridpur 1961, Ministry of Home and Kashmir Affairs, Govt. of Pakistan, Dacca ; (৩) Bangladesh Population Censaus; 1981; District Faridpur, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka 1989 ; (৪) মুহাম্মদ আবুল হাশেম মিয়া, নিবন্ধ ঃ ঐতিহাসিক দুর্গ ভূষণা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা 'ইতিহাস'-এ প্রকাশিত, দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৯৫ বাং, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৯৫।

হুমায়ুন খান

কালগায় (قلغى), কালগা, কাগালগা এই উপাধিটি ক্রিমিয়ার খানের (দ্র. কিরিম) এবং খানদের 'সহকারী' অথবা "আইন সংগত উত্তরাধিকারী" নির্দেশ করিতেই সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে ব্যবহৃত। এই শব্দটি নানাভাবে ভাষাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাগুলি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক হইতে এই উপাধিটিকে হালীম গিরায় প্রদত্ত একটি কাহিনীর ভিত্তিতে (গুলবুন-ই খানান, ইস্তাম্বুল ১২৮৭ হি. ১১ প.) তাতার শব্দ 'কালগায়', সে থাকিবে অথবা "তাহাকে থাকিতে দাও"-এর সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। জনপ্রিয় এই শব্দ প্রকরণটি Hammer (Geschichte der Chane der Krim, ... ভিয়েনা ১৮৫৬ খৃ., ৩৯), Howorth (২/১, ৬১০) এবং আহমাদ জাওদাত (তা'রীখ, ১খ, ৭৩) অনুসরণ করিলেও গ্রহণযোগ্য নহে। শব্দটির মঙ্গোলীয় উৎস (Pelliot, Inalcik) অসম্ভাব্য, কারণ ১৪৭৫ খৃ. পূর্বে শব্দটির পাত্তা পাওয়া যায় না। এই সমস্যাটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র. Doerfer, ৩খ. পৃ. ৪৯৯ ও J. Matuz, Qalga, in Turcica, ২খ, (১৯৭০ খৃ.), ১০১-২৯।

সমাজতাত্ত্বিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে, কালগায় পদটির বহু নজীর রহিয়াছে। গোল্ডেন হোর্ডের (Golden Horde) খান শাসন, ইহার উত্তরসুরি রাষ্ট্র ক্রিমীয় খান শাসন, অপরাপর যে কোন স্থিতিশীল সরকারের ন্যায় খান-এর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুভব করিত। সহকারী ও সাক্ষাত উত্তরাধিকারীরূপে কালগায় সর্বদাই হইতেন খান-এর পুত্র অথবা ভ্রাতা (M. de Peyssonel, Traite sur le commerce de la Mer noire, ২খ, প্যারিস ১৭৮৭ খৃ., ২৫২)। চেঙ্গীয খান (দ্র.)-এর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি হিসাবে গোল্ডেন হোর্ডের এবং ক্রিমিয়ার খানবৃন্দ, বহু মঙ্গোলীয় ও এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ঐতিহ্য নিখুঁতভাবে অনুসরণ করিত। বস্তুতপক্ষে কালগায়-এর পদটি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে 'ওটচিগি-আজান' নামে পরিচিত মঙ্গোল

যুবরাজের পদের সমমানের ছিল। এই উপাধিটির অর্থ হইতেছে "এই পারিবারিক য়ুর্ত (Yurt) [মঙ্গোল তাঁবু] অথবা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকর্তা" (তু. B. Vladimirtsov, Le Regime social des Mongols, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., ৬৭ এবং ১২৬)। মঙ্গোলগণের অনুসৃত ঐতিহ্য অনুসারে পারিবারিক য়ুর্তটি খান-এর কনিষ্ঠতম পুত্রের হিফাজতে প্রদত্ত হইত। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয় যে, ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ কালগায় নির্বাচিত হইত খান-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্য হইতে।

ইহার পর হইতে ক্রিমিয়ায় ইসলামী 'উছমানী প্রথাসমূহ অধিকতর প্রভাবশালী হইয়া ওঠে (দ্র. গিরায় এবং তৎসংলগ্ন বংশতালিকা)। ইনালচিক উল্লেখ করিয়াছেন (পূ. স্থা.) যে, খানদের অর্ধেকের সামান্য অধিক পূর্বে কালগায়রূপে কাজ করিতেন এবং প্রমাণ করে যে, ইহা সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীর তুলনায় সহকারীর ভূমিকাই অধিকতর প্রবল। সুস্পষ্টভাবেই 'উছমানী সুলতান (৮৮৩/১৪৭৮ সালের পরে) এবং উপজাতীয় অভিজাত বংশ সর্বদাই তাঁহাদের ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারিতেন; প্রায়শই, কোন সুশৃঙ্খল উত্তরাধিকার পর্যায়কে বিঘ্নিত করিতে এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। কুরিলতাঈ (দ্র.) নামে পরিচিত উপজাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সম্মেলন, এইরূপ অপর একটি আন্তঃএশীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রতর রূপ ; মূল কুরিলতাঈ, সম্ভবত, কেবল শাসক বংশের পরিবারের সদস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গোল্ডেন হোর্ডের মত, ক্রিমীয় খান শাসনেও এই সম্মানটি উপজাতীয় মীরযা (দ্র.)-গণের জন্যও প্রসারিত হইয়াছিল এবং এইভাবে শাসক পরবারের কর্তৃত্ব হ্রাস করা হয় (তু. B. Grekov and A. Iakoubovski, La Horde d'Or, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ., ১২১-৩)।

শাহাযাদা ও উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারিগণকে ঈনজূ (indju) অথবা জায়গীর প্রদানের একান্ত এশীয় প্রথার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কালগায়, আকমেসজিদ (Akmesdjid)-এ তাঁহার ক্ষমতার পাদপীঠ বহাল রাখিতেন এবং সেখান হইতে কাফা (কাফ্ফা)-এর 'উছমানী ছিটমহল পর্যন্ত সমগ্র আন্তক্রিমীয় অঞ্চলের উপর তাঁহার সর্বাত্মক প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন। তিনি প্রত্যহ তাঁহার নিজস্ব দরবার [দীওয়ান দ্র.]-এর অধিবেশন বসাইতেন এবং তাহাতে বাগচেসারায় অনুষ্ঠিত খান-এর দীওয়ানে উপস্থিত পদস্থ রাজকর্মচারীদের সমপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত থাকিতেন। ক্রিমীয় তাতারগণের মধ্যে ইসলামী রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যাইত কেবল দরবারী নির্বাচনে কাদীগণকে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যাপারে। কালগায়-এর দীওয়ান কালগায়-এর সীমানার মধ্যে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিত, কিন্তু এই শাস্তি খান তাঁহার মুফ্তী এবং কাদী 'আসকার (দ্র.)-এর দ্বারা পর্যালোচনার পর কার্যকর হইত। ৯৯২/১৫৮৪ সালের পরবর্তীতে খান-এর একজন দ্বিতীয় সহকারী ও নির্ধারিত উত্তরাধিকারীরূপে নূরু'দ্-দীন (দ্র.)-এর নিয়োগ সম্ভবত 'উছমানী প্রভাব নির্দেশ করে। ইহার পর হইতে কালগায়-এর পদে খান-এর কোনও জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়োগ করার প্রবণতা দেখা যায়; অপরদিকে নূরু'দ-দীন-এর পদটি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের জন্য সংরক্ষিত হইত। এইভাবে পরবর্তীকালের 'উছমানী সুলতানগণের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির ন্যায় বিশেষ একটি গিরায় পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে বংশীয় জ্যেষ্ঠতার প্রতি কিছু মাত্রায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

১২শ/১৮শ শতাব্দীতে কালগায়-এর রাজস্বের মধ্যে ছিল কারাসুবাযার (দ্র.) হইতে প্রাপ্ত শুল্ক বাবদ ১০ হাজার পিয়াস্তার, কার্চ-এর লবণ কারখানা হইতে প্রাপ্ত ৫ হাজার পিয়াস্তার, কাফ্ফা (দ্র.)-র শুল্ক বাবদ ৩ হাজার পিয়াস্তার এবং মোলদাভিয়ার মধুকর হইতে নজরানা হিসাবে ২,৫০০ পিয়াস্তার ও একই খাতে ওয়াল্লাচিয়া হইতে প্রাপ্ত ১০০০ পিয়াস্তার। ইহা ভিন্ন তিনি কতিপয় খৃস্টান গ্রাম হইতে অব্যাহতি কর [জিযয়া দ্র.] প্রাপ্ত হইতেন। এই রাজস্ব আয়টি তিনি সাধারণত তাঁহার সভার রাজকর্মচারীদেরকে প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার জিলায় যে সকল মীরযা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন তিনি তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন (Peyssonel, ২খ, ২৫৪)।

কালগায়গণকে যুদ্ধের সময় তাহার বাহিনীসমূহের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য খানরা আহবান করিতে পারিতেন (সাধারণত ইহা সংগঠিত হইত 'উছমানী বহিনীকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং তখন বিশেষ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইত) অথবা পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া, মুসকোভী অথবা সারকাসিয়া অঞ্চলে তাতার আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাহাদের আহবান করা হইত এবং এই ক্ষেত্রে কালগায়-এর পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকিত এবং মঙ্গোল রীতি অনুসারে তিনি সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদের এক-দশমাংশ পাইতেন। যখন স্বয়ং খান কোনও বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন, তখন কসাক ও অন্যান্য আক্রমণ হইতে ক্রিমিয়া রক্ষা করিতে প্রায় ক্ষেত্রেই কালগায় পশ্চাতে থাকিয়া যাইতেন। যদি তিনি খানের সঙ্গী হইতেন, তবে তাঁহাকে সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বের নেতৃত্ব দেওয়া হইত (আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাতনামা, ১০ খ, ৪৭-৪৮)। সুলতান অথবা অন্য মীরযাগণের অনুপ্রবেশের চেষ্টার মুখে বংশের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কালগায়-এর সমর্থন লাভ ছিল মোটের উপর প্রত্যাশিত ঘটনা।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খান-এর প্রেরিত দূতদের সঙ্গে সঙ্গে কালগায় তাঁহার নিজস্ব দূত প্রেরণ করিতে পারিতেন এবং কতিপয় বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মুসকোভি হইতে প্রাপ্ত সকল খাজনা (তীশ)-এর একটি আনুপাতিক অংশ সুনির্দিষ্টভাবে কালগায়কে দিতে হইত (ক্রিমিয়ায় প্রেরিত দ্রব্য সামগ্রীর তালিকার জন্য দ্র. H. Feyizhan and V. Velyaminov-Zernov, Mateirali poistorii Krimskago Khanstva, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৬৪ খৃ., স্থা.)।

সালগির নদীর বাম তীরে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত আকমেসজিদে কালগায়-এর প্রাসাদটি ১৭৮৩ খৃ. রুশ বিজয়ের পর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। পুরাতন শহরের অনতিদূরে রুশগণ সিমফেরপোলের নূতন বসতি গড়িয়া তোলে, যাহা ক্রমশ ক্রিমিয়ার রুশ প্রশাসকের ক্ষমতার কেন্দ্র হইয়া উঠে। কালগায়-এর পদটি এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ও ইসলামী প্রথার সংমিশ্রণ সূচিত করে; এই বিশেষত্বটি পশ্চিম এশিয়ার তুর্কী-তাতার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচরাচর দৃশ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এই প্রবন্ধের পাঠে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র. (১) IA গিরায় (হালিল ইনালচিক) প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী; (২) H. Howorth, History of the Mongols, লণ্ডন ১৮৭৬-১৯২৯ খৃ., বিশেষত খণ্ড ২/২; (৩) V. D. Smirnov, Krimskoye Khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Portido Nacala xviii, vv., সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৮৭ খৃ.; (৪) C. M.

Kortepeter, Ottoman Imperialism during the Reformation : Europe and the Caucasus, নিউইয়র্ক ১৯৭২ খৃ.।

C. M. Kortepeter (E. I.²)/মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

কালদা ইব্ন হিস্‌ল (كلدة بن حسل) ঃ (রা) মতান্তরে কালদা ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইবনি'ল-হিসল, তাকরীব ও আল-ইসতি'আব ('ইসাবার হাশিয়া)-এ হিস্‌ল ও আল-হিসল-এর পরিবর্তে হানবাল (حنبل) ও আল-হান্‌বাল (الحنبل)-এর উল্লেখ আছে। কোনও কোনও বর্ণনায় পিতামহের নাম মালিল (مليل) উল্লেখ আছে। তিনি সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই এবং 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইবনু'ল-হান্‌বালের সহোদর ভাই। তাঁহাদের মায়ের নাম সাফিয়্যা বিন্‌ত মা'মার মতান্তরে উনায়সা বিন্‌ত মা'মার ইব্ন হাবীব। তিনি বানূ আসলাম মতান্তরে বানূ গাস্‌সান ভিন্নমতে অন্য কোনও গোত্রের লোক এবং বানূ জুমহ-এর মিত্র (حليف) ছিলেন। মতান্তরে তিনি সাফওয়ান (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র। মুস'আব প্রমুখের মতে তিনি য়ামান হইতে মক্কা আসিয়া এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং এখানেই ইনতিকাল করেন। তিনি সাফওয়ান (রা)-এর খাদিম ছিলেন এবং সফরে অথবা বাড়িতে সব সময় তাঁহার সঙ্গেই থাকিতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কালদা (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজয়ের মুখোমুখী হইলে তিনি বলিলেন ঃ আজ ইব্ন আবী কাবশা-এর যাদুগিরি ব্যর্থ হইল। ইহাতে সাফওয়ান (রা) তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিন। হাওয়াযিন গোত্রের কোনও ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাইতে কুরায়শ বংশের কোনও লোকের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আমার নিকট অধিক প্রিয়। আবূ 'উমার বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন সাফওয়ান (রা) কিছু উপঢৌকন লইয়া তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পাঠান। নবী (স) তখন মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। কালদা (রা) বলেন ঃ আমি সালাম না দিয়া এবং অনুমতি না লইয়াই ঢুকিয়া পড়িয়াম। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ তুমি পুনরায় বাহিরে যাও এবং "আস্‌সালামু 'আলাইকুম" বলিয়া প্রবেশ কর। ইহা সাফওয়ান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। 'আমর ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান তাঁহার সূত্র হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৫-৬; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত্-তাহ্‌যীব, ২খ, ১৩৬; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩২১); (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান, বৈরূত, ৪খ, ২৫২-৩; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ৫খ, ৪৫৭-৮।

মুহাম্মদ মূসা

কালপাক (দ্র. লিবাস)

কালপী (كلپى) ঃ উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশে ২৬°৮' উত্তর ও ৭৯°৪৫' পূর্বে অবস্থিত এককালের একটি সমৃদ্ধশালী শহর। যমুনা নদীর অদূরে মাটির স্তূপের উপরে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন শহর ও দুর্গ। পুরাতন শহরের দক্ষিণ-পূর্বে ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ একটি নূতন শহর আছে এবং সেখানে এখনও উৎকৃষ্ট মানের কাগজ তৈরি হয়। চিরাচরিতভাবে কনৌজের রাজা চতুর্থ শতাব্দীতে এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৫৯৩/১১৯৬ সালের প্রথম অভিযানেই মুসলিমদের করতলগত হয়। তিন দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ও চতুর্থ পাশ নদী ও পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত এই দুর্গ দিল্লীর সুলতানদের যমুনা নদী পথে গমনাগমনের জন্য ছিল একটি গুরত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তায়মূর কর্তৃক দিল্লী পর্যুদস্ত হইবার পর ইহা কিছুকাল সাবেক গভর্নর মালিকযাদা ফীরূয-এর পুত্র মুহাম্মাদ খান-এর অধীনে স্বাধীন ছিল। ৮৩৭/১৪৩৩-৪ সালে জৌনপুরের শাসনকর্তা ইবরাহীম শাহ কর্তৃক ইহা শার্কী সালতানাতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এক পাল্টা আক্রমণে দিল্লীর মুবারাক শাহ সায়্যিদ কালপী পুনর্দখল করেন। কিন্তু পরের বৎসর দিল্লী-জৌনপুর যুদ্ধের সময় ইহা মালওয়া (মালব)-এর হুশাং শাহ গূরী কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরবর্তী দশ বৎসর মালওয়া-এর দখলে থাকে। আনুমানিক ৮৪৭/১৪৪৩ সালে ইহা জৌনপুরের মাহমূদ কর্তৃক পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু বাহলূল লোদীর নিকট শার্কী সালতানাতের চূড়ান্ত পতনের পর কালপী পুনরায় দিল্লীর অধীনে চলিয়া যায় এবং বাহলূল তখন কুত্‌ব খান লোদীকে ইহার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইহা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র ঘটনায় ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে কালপীর শাসনভার দিল্লী, জৌনপুর ও মালওয়া-এর মধ্যে হাত বদল হয়। ৯৩৩/১৫২৭ সালে ইহা মুগলদের হস্তগত হয় এবং আকবরের সময়ে কালপী একটি সরকারের প্রধান কর্মস্থল ও তাম্র মুদ্রার টাকশালে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মারাঠা যুদ্ধের পর কালপী এক মারাঠা গভর্নরের বাসস্থানে পরিণত হয়।

পুরাতন শহরের পশ্চিমে অনেক পুরাতন মুসলিম সমাধির মধ্যে চৌরাসী গম্বুয নামে (৮৪ গম্বুজ; এই অস্পষ্ট নামে) একটি সমাধি উল্লেখযোগ্য। ইহা প্রাচীরবেষ্টিত আঙ্গিনার অভ্যন্তরে নয় গম্বুযবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র ইহার কেন্দ্রীয় গম্বুযের নীচে দুইটি মাযার রহিয়াছে। ইহা এক লোদী সুলতানের সমাধি বলিয়া জনগণ বিশ্বাস করে। তবে ইহা কোনও এক লোদী গভর্নরের সমাধি হইতে পারে। কারণ ইহার তোরণ ও খিলানসমূহ ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষাংশ বা ১০ম/১৬শ শতাব্দীর স্থাপত্য ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধারণাকে ইহার কতিপয় জৌনপুরী শিল্প সৌকর্য নস্যাৎ করিতে পারে না। কারণ যমুনার পথে পাথরের রাজমিস্ত্রিদের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের কোনও অসুবিধা ছিল না। হইতে পারে ইহার নামের '৮৪' শব্দটি কোন তারিখ নির্দেশ করে এবং যদি তাহাই হয় তাহা হইলে খুব সম্ভব ইহা ১৫৮৪ (v. s.) প্রায় ৯৩৪/১৫২৭-৮ সালের হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Cunningham, in ASI, xxi (১৮৮৫ খৃ.), ১৩১-৩; (২) J. F. Blakiston, উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বাদায়ূনের জামি' মসজিদ ও অন্যান্য প্রাসাদ [= MASI, xix], কলিকাতা ১৯২৬ খৃ., ৬-৭ ও ১৬-২১ প্লেটসমূহ; (৩) দিল্লী, জৌনপুর, মালবা শার্কী গ্রন্থসমূহের গ্রন্থপঞ্জীও দ্রষ্টব্য; (৪) লোদী কায়দার প্রাসাদের জন্য দেখুন Hind, Architecture।

J. Burton-Page (E. I.²)/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

কাল্‌ব (كلب) ঃ (স্ত্রী লিঙ্গে ঃ কালবা, ব. ব. কিলাব, কালীব, আকলুব, বহু বচনের বহুবচনে ঃ কিলাবাত, আকালিব), প্রজাতিগতভাবে পার্থক্যকরণ না করিয়া গৃহপালিত কুকুরের (Canis familiaris) প্রচলিত নাম। মৌলিকভাবে একটি নাপাক (نجس) প্রাণী হিসাবে ইসলামী আইনে কুকুর খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধরূপে গণ্য এবং ইসলামী জগতের সর্বত্রই কুকুরকে সার্বিকভাবে ঘৃণা করা না হইলেও অন্ততপক্ষে এড়াইয়া

চলা হয়। নগর অঞ্চলে ইহা বিশেষভাবে সত্য। যাহা হউক, কুকুর আদিষ্ট হইয়া তাহার প্রভুকে বৈধ কার্য সম্পাদনা সহায়তা করে না। প্রায় অন্য সকল ভাষার ন্যায় আরবী ভাষাতেও 'কুকুর' শব্দটি হইতেছে অতি তীব্র ও তীক্ষ্ণ অপমানজনক এবং অসংখ্য প্রবাদ বাক্যে ইহার ঘৃণাত্মক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এশিয়া ও নিকট প্রাচ্যের সর্বত্র, বিশেষভাবে নগরসমূহে, দ্রুত বর্ধিষ্ণু কুকুরের দলসমূহের উৎপাতের ফলে এই প্রাণীটির বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব আরও শক্তিশালী হয়। এই সকল কুকুরকে কতিপয় কুকুর-বিশেষজ্ঞ 'maroon' রূপে (স্পেনীয় cimarron হইতে, অর্থাৎ বন্য অবস্থায় প্রত্যাগত) এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞ 'pariah' (অস্পৃশ্য)-রূপে গণ্য করেন। তথাপি শকুনের পালের ন্যায়, সর্বক্ষণ ক্ষুধার্ত এই সমাজচ্যুত প্রাণীটিকে উপস্থিত শহরের আবর্জনা ভক্ষক হিসাবে অপরিহার্য সেবার জন্য কিছুটা সহ্য করা হইত। শহরের সর্বত্র বিচরণশীল অসংখ্য 'pariah' কুকুর পালের জন্য ইস্তাম্বুল শহরটি কুখ্যাত ছিল। তথাপি মধ্য উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত Xavier Marmier-এর ভাষায় "এই প্রাণীগুলি যতই অপসন্দনীয় হউক না কেন, বাস্তবিকপক্ষে কনস্টানটিনোপল রাজ্যে ইহারা ছিল একটি মন্দ অথচ অপরিহার্য প্রাণী। শহর-পুলিশের দূরদৃষ্টির অভাবজনিত সমস্যার সমাধান করিয়া ইহারা শহরের রাস্তাসমূহ হইতে বিপুল পরিমাণে আবর্জনা পরিষ্কার করিত, যাহা অন্যথায় পঁচিয়া গলিয়া আবহাওয়াকে মহামারী সৃষ্টিকারী রোগজীবাণুতে পরিপূর্ণ করিত। কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। কুকুরের সংখ্যা এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, তাহা উক্ত শহরের অধিবাসিদের জন্য বিপর্যয় আনয়ন করে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে মিসরের ভাইসরয় মুহাম্মাদ 'আলীর (১৭৬৯-১৮৪৯) নির্দেশে প্রচুর সংখ্যক কুকুর ধরিয়া জাহাজ পূর্ণ করা হয় এবং ইহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারা হয়। মাগরিবও এই আক্রমণের শিকার হইয়াছিল এবং সেইখানে "douar (বেদে) কুকুর" অথবা "Kabyl কুকুর" নামে একটি অত্যন্ত হিংস্র প্রজাতির কুকুরের আধিক্য ছিল। জলাতঙ্ক (কালাব=(كلب) রোগের ভাইরাস বহনকারী কুকুরের এই প্রকার দ্রুত বৃদ্ধিতে সহজেই সকল সময়ে ও সকল ইসলামী দেশে জলাতঙ্ক রোগের আঞ্চলিক বিস্তৃতির ব্যাখ্যা মিলে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সহজে বোধগম্য যে, কেন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার যুগে মদীনা শহরে ইতস্তত বিচরণকারী বেওয়ারিশ কুকুরের সমস্যার সম্মুখীন হইয়া প্রথমে "সকল কুকুর" ধ্বংস করার অনমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (বিভিন্ন হাদীছ-এর অনুসরণ) এবং তাহার পর তাঁহার প্রদত্ত আদেশের কঠোরতা হ্রাস করেন। কারণ কুকুর জাতি আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবসমূহের একটি জাতি (انها أمة من الامم) এবং মানুষ কতিপয় জাতের কুকুরের সাহায্য গ্রহণ করে। পরিবর্তিত আদেশে, কালগাত্র বর্ণের সকল বেওয়ারিশ কুকুর, বিশেষত যেগুলির উভয় ভ্রূর উপর হালকা রঙ্গের দাগ (زيبتان) রহিয়াছে, সেইগুলি হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়, আরবগণ উক্ত চিহ্নকে সন্দেহাতীতভাবে শয়তানের চিহ্নরূপে গণ্য করিত। ইহা লক্ষণীয় যে, উক্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যটি বহু পাশ্চাত্য প্রজাতির কাল পশু বা মেষ পাহারাদার কুকুরের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং কুকুর বিশেষজ্ঞগণের নিকট ইহা প্রাচ্য দেশীয় Pariah কুকুরের অন্যতম নির্দেশক চিহ্নরূপেগণ্য হইতে পারে। মনিবের আদেশ পালনকারী সকল প্রকার উপকারী ও সাহায্যকারী কুকুর রাসূল (স)-এর প্রদত্ত আদেশের আওতা বহির্ভূত। ইহাদের মধ্যে ছিল ঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর (كلب الصيد , دارى বহুবচনে ঃ درارى) এবং পাহারাদার কুকুরসমূহ "যেমন গৃহের (كلب الدور), গলি অথবা রাস্তার (كلب الدرب), পশুপালের (كلب الراعى كلب الغنم , كلب الغضاع), শস্য ক্ষেত অথবা দ্রাক্ষা বাগানের (كلب الزرع) পাহারায় নিযুক্ত কুকুরসমূহ।" ইসলামী মাযহাবসমূহের ইমামগণ ও ফাকীহগণের সার্বিক মতে এই প্রকার সকল কুকুর পালন করা, রক্ষা করা ক্রয়-বিক্রয় এবং দান করা বিধিসম্মত, এমনকি এই অনুমতি কাল বর্ণের কুকুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যদি ইহাদের উপযোগিতা প্রমাণ করা যায়। ইহা ভিন্ন যদি কোন ব্যক্তি এইরূপে কোনও কুকুর হত্যা করে তবে তাহাকে উক্ত কুকুরের মালিককে একটি শিকারী কুকুরের জন্য চল্লিশ দিরহাম, একটি মেষ পাহারাদার কুকুরের জন্য একটি ভেড়া, একটি শস্য পাহারাদার কুকুরের জন্য এক ফারাক (=১৬ রাত্ল) গম এবং গৃহ পাহারাদার কুকুরের জন্য এক ফারাক ভাল মাটি, এই হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত।

সামাজিকভাবে উপকারী কুকুরসমূহকে গ্রহণ করা হইলেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে প্রাণীটি নাপাক থাকিয়া যায়। একটি কুকুর যাহা কিছুই স্পর্শ করে বা লেহন করে তাহা অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয় এবং একবার রাসূলুল্লাহ (স) যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার অনুসরণে কুকুর যেই স্থানে শয়ন করে তাহা পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পবিত্র করিয়া লইতে হয় এবং ইহার উপস্থিতি কোনও গৃহে ফেরেশতাগণের আগমনে বাধাস্বরূপ। শেষত কোনও ব্যক্তি যদি হিংস্র (عقور) এবং প্রয়োজনীয় কুকুর পালন করে তবে তাহার চূড়ান্ত পুরস্কার প্রতিদিন এক (অথবা দুই) কীরাত (দ্র.) পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে। কুকুর সম্পর্কে এই প্রতিকূল নীতিবাক্যসমূহ প্রচলিত হাদীছ সংকলনসমূহ হইতে সংগৃহীত এবং ইহাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা চারিটি সুন্নী মাযহাবের প্রধান প্রধান গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন ইমাম মালিক (র) প্রণীত মুওয়াত্তা', ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (র) কর্তৃক পরিশোধিত মুওয়াত্তা' এবং কিতাবু'ল-আস্ল, সাহনূন-এর মুদাওওয়ানা; শাফি'ঈ (র) প্রণীত কিতাবু'ল-উম্ম; আস-সারাখ্সী প্রণীত মাব্সূত, আল-মুযানী প্রণীত মুখ্তাসার, ইব্ন কুদামা প্রণীত মুগ্নী ইত্যাদি (বিভিন্ন গ্রন্থকারভেদে আসসায়দ, আয-যাবাইহ, আয-যাকাত, আদ-দাহায়া, আল-আত্'ইমা এবং আল-বুয়ু' সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহে)। একইভাবে এই সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন ফাকীহগণের মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত (ইখতিলাফুল-ফুকাহা') গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, যথা ঃ ইব্ন রুশ্দ-এর বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ। মুসলিম আইনে আনুষ্ঠানিক যাব্হ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ গবেষণায় Erwin Graf অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই সকল সূত্র হইতে প্রাপ্ত কুকুর সম্বন্ধীয় সকল তথ্যের বিশ্লেষণ ও ইহাদের শ্রেণীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করিয়াছেন (Jagdbeute und Schlachttier im islamischen Recht, বন ১৯৫৯ খৃ.)।

প্রাক-ইসলামী যুগে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কতিপয় আরব গোত্র কুকুরের মাংস আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বানূ আসাদ (দ্র.) এবং অন্যদের মধ্যে তাহাদের একটি শাখা গোত্র বানূ ফাক্'আস সম্পর্কে ইহা সত্য ছিল। ইসলামী যুগের প্রারম্ভের দিকে লিখিত কতিপয় ব্যঙ্গাত্মক কবিতাকে যদি আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি (দ্র. আল-জাহিজ, আল-বুখালা', লাইডেন ১৯০০ খৃ., ১খ, ২৫৯; ঐ লেখক, হায়াওয়ান, ১খ, ২৬৭), তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, এই সকল ব্যক্তিই ঐরূপ খাদ্যের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আল-মুকাদ্দাসী (সম্পা. ও অনু. Pellat,

আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৬১ এবং উদ্ধৃত গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ৮৭) মন্তব্য করিয়াছেন যে, মাগরিব অঞ্চলে কাসতীলিয়া ও নাফ্‌তার অধিবাসীরা ছিল কুকুরভুক এবং ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে আত-তীজানী ইফ্‌রীকিয়্যার জারীদে অবস্থিত Tozeur-এর অধিবাসিগণকে এই একই নিন্দনীয় প্রথার জন্য দোষী করিয়াছেন (রিহ্‌লা, তিউনিস ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১১৫)। অবশ্য ভোজন রসিকদের মতে হৃষ্টপুষ্ট কুকুর শাবকের মাংস (جرو বহুবচনে اجراء جراء) অত্যন্ত সরস ও সুস্বাদু এবং তাহা কবুতরের মাংসের অনুরূপ (দ্র. হায়াওয়ান, ২খ, ১৬৯, ৪খ, ৪২)। শেষত এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে, প্রাক-ইসলামী আরবগণের জন্য কুকুরের মাংস ভক্ষণ প্রাচীন টোটেমীয় প্রথাসমূহের পুরা নির্দশন হইতে পারে, কারণ প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাসমূহে কুকুর ছিল 'নিষিদ্ধ' প্রাণী।

কুকুর প্রসঙ্গে যাযাবর ও গ্রাম্য মুসলিমগণের মনোভাব ছিল সহনীয়। মানুষের প্রথম সহচর এই প্রাণীটির উচ্চ মানের গুণাবলী সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল না, বিশেষত ইহার উপযোগিতা ও আনুগত্য ছিল সুপরিচিত। প্রাক-ইসলামী যুগের মত আদিকাল হইতেই কুকুর ছিল একমাত্র গৃহপালিত প্রাণী যাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এতটা সুনির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা হইত এবং ইহাকে সা'দ, মাস'উদ, আনীস, মুরজান অথবা সাম্‌হা নামে নামকরণ করা হইত, যাহার সহিত ইহার বাহ্যিক চেহারার কোনও প্রকার সংযোগ ছিল না। বিভিন্ন ইতিবৃত্তে কুকুরের প্রতি দয়া প্রদর্শনের চিত্র বর্ণনা করিয়া বহু গল্প ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) একজন বৃদ্ধা মহিলাকে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরের প্রতি প্রদর্শিত তাহার সেবামূলক আচরণের জন্য আল্লাহর পুরস্কারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। S. H. Leeder (Veiled Mysteries of Egypt গ্রন্থে, ১৯১২ খৃ.) দুইবার কুকুরের পক্ষে প্রদত্ত উইল অথবা ওয়াকফ্‌-এর উল্লেখ করিয়াছেন (তু. G. H. Bousquet, Des Animaux et de luer, traitement selon le Judaisme, le Christianisme et l'Islam, St. Isl.-এ, ৯খ, ১৯৫৮ খৃ., ৩১-৪৮)।

ইহা ব্যতীত মুসলিমগণ "নিদ্রিত সাতজন"-এর পালিত কুকুর কিত্‌মীর সম্পর্কে প্রচলিত প্রশংসামূলক ও মর্মস্পর্শী গল্পসমূহ বিস্মৃত হয় নাই (কুরআন ১৮ ঃ ১৭)। আনুগত্যের প্রতীকস্বরূপ (দ্র. আসহাবু'ল-কাহ্‌ফ) এই কুকুরটিই হইবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতিপ্রাপ্ত একমাত্র কুকুর। আল-বায়দাবীর অভিমত অনুসারে (আনওয়ারু'ত-তান্‌যীল, লাইপযিগ ১৮৪৮ খৃ., ১খ, ৫৫৭) আল্লাহ্ এই কুকুরটিকে কথা বলিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। অপরদিকে আত-তাবারী বলেন (তাফসীর, ১৫খ, ১৪১), কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে, ইহা ছিল একটি মানুষ, তাহাদের পাচক, যে তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। এই ধারণাটি ইসমা'ঈলী বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, যাহাতে বলা হয় যে, কিত্‌মীর-এর কুকুর সদৃশ বাহ্যিক চেহারার আড়ালে লুক্কায়িত রহিয়াছে শিকারী (মুকাল্লিব=مكلب) সাল্‌মান (দ্র.আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ২খ, ১৮৯, ৩খ, ৪৪; আদ-দামীরী, শিরো. কাল্‌ব, ২খ, ২৭৮-৩১২; Massignon, Les Sept Dormants d'Ephese en Islame et en Chretiente, REI-এ, ২২-৩০ খ., ১৯৫৪-৬২ খৃ.)।

মুসলিম সমাজে কুকুরকে তাহার যথোপযুক্ত স্থানে পুনঃস্থাপন করেন আল-জাহিজ, তাঁহার বৈশিষ্টপূর্ণ "প্রাণী সমন্বয়" প্রবন্ধের (হায়াওয়ান, ১ ও ২খ), মাধ্যমে। কুকুরের পক্ষ সমর্থক (صاحب الكلب) এবং মোরগের পক্ষ সমর্থকগণের (صاحب الديك) মধ্যে সংঘটিত এক বিবাদে তিনি বিচারের সমর্থনে কুকুরের পক্ষে সমর্থনে অবতীর্ণ হন এবং এরিস্টোটলের পাশাপাশি গ্রীক বৈজ্ঞানিক তথ্য (প্রয়োজনবোধে তিনি এরিস্টোটলের যুক্তি খণ্ডনও করিতে পারেন), গদ্যে ও পদ্যে আরবী প্রবাদ, পর্যটকগণের কাহিনী এবং সমসাময়িক তথ্য একত্রে গ্রহণ করেন এবং ইহার সহিত তিনি কুকুরের বাস্তু সংস্থান ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণও সংযুক্ত করেন। এই সকলই তিনি একটি যুক্তির আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ক্ষেত্রে মু'তাযিলীগণের যুক্তিসিদ্ধ প্রবণতার প্রতি তাঁহার আসক্তির তুলনায় পদ্ধতির প্রতি তাঁহার সহজাত অনুভূতিই অধিকতর দায়ী।

যাহাই হউক না কেন, আমরা আল-জাহিজ-এর প্রতি এইজন্য কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি যে, তিনি শুধু এক শ্রেণীর অভিজাত শিকারী ('ইতাক عتاق)-রূপে খ্যাত তীক্ষ্ম ঘ্রাণ শক্তিসম্পন্ন 'সালকী' (দ্র.) সালুকী) শিকারী কুকুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুক্তি প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যেমন আল-জাহিজ-এর পূর্ব ও পরবর্তী শিকার সম্বন্ধে লেখক ও কবিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ, আমরা ইহাদের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে না পারিলেও তাঁহার আমলের সর্বাপেক্ষা সাধারণ কুকুরসমূহের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারি। সালুকী কুকুর ব্যতীত ছিল কুর্দী মেষ পাহাদার কুকুর (কুরদী)। এই বৃহৎ আকারের কুকুরটি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে কুর্দগণ তুরস্কে প্রথম আনয়ন করে। ইহা সম্ভবত হাঙ্গেরীয় পশু প্রহরী কুকুর কুওয়াটিজ (Kuwatz)-এর পূর্বসূরী ছিল। ইহার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া কুর্দী মেষ পাহারাদার কুকুর শিকার অনুসরণ ও অনুসন্ধানেও ব্যবহৃত হইত এবং সালুকী জাতের সহিত প্রজননের মাধ্যমে এমন একটি মিশ্রিত জাত (খিলাসী) সৃষ্টি করিল যাহার মধ্যে পিতা ও মাতা উভয়েরই গুণাগুণ বিদ্যমান ছিল। ইহা ছিল দৃষ্টিশক্তির সাহায্য না লইয়া ঘ্রাণের দ্বারা শিকার করিতে সক্ষম প্রথম শিকারী কুকুর (hound)। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (দ্র. আগানী, ১০খ, ২৩৯)-এর প্রিয় কবি 'আলী ইবনু'ল-জাহ্‌ম আস-সামী (মৃ. ২৪৯/৮৬৩) অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। অর্ধ শতাব্দী পরে ইবনু'ল-মু'তায্য তাঁহার দুইটি তারদিয়্যা (দ্র.)-গুলির কবিতায় এই কাব্যচিত্রের সারসংক্ষেপ করিয়াছেন (দ্র. দীওয়ান, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ২৬, নং ৩০; দামিশক ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৯৭; বৈরূত ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৮২-৩)। ইহাতে এই বিখ্যাত শিকারী কুকুরকে বর্ণনা করা হইয়াছে নায়রাজ (نيرج) নাওরাজ (نورج) "শ্রান্তিহীন অনুসরণকারী"রূপে। এই জাতের বহু মিশ্র প্রজনন হইতে উদ্ভব ঘটে এক শ্রেণীর প্রহরাকার্যে দক্ষ হৃষ্টপুষ্ট কুকুর "মাস্টিফ হাউণ্ড" বা বর্ণ সঙ্কর জাত (খারিজী = خرجى) ও মাগিরব অঞ্চলে বালহূত (بلهوت) বারহূশ (برهوش)। বাজ পাখির সাহায্যে যাহারা শিকার করে তাহারা ইহাকে "পক্ষী কুকুর"-রূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদের শিকারী পক্ষীর জন্য ছোট লোম অথবা পালকবিশিষ্ট প্রাণী অথবা পাখী তাড়ানোর কাজে ইহাদিগকে নিয়োজিত করিত। ইহার প্রাচীন হাই-জার্মান নাম Zeigari 'নির্দেশক' হইতে যাগারী/যুগারী (زغارى) (বহুবচনে যুগারিয়্যা = زغارية) নামে পরিচিত নির্দেশক কুকুরের আবির্ভাব ঘটে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে, ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে।

পাখি শিকারী কুকুররূপে ব্যবহারের জন্য ইহা বহু ব্যয় সাপেক্ষে ইসলামী দেশসমূহে আমদানী করা হইত। খিলাসী-র তুলনায় নিশ্চুপ এই

জাতের কুকুরকে কালবু'ল-বান্‌জ (كلب البنج) বা "ঝোপ-কুকুর" নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার উৎস ও ইহার পরিষ্কার হালকা রং-এর গাত্র বর্ণের জন্য যাগারী পয়েন্টার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্তমান কালের ইতালীর পয়েন্টার ও হাংগেরীয় vizsla-র সদৃশ এবং এইগুলিকে অন্যান্য সকল জাতের পয়েন্টার কুকুরের পূর্বপুরুষরূপে মনে করা হয়। ইহার হালকা বাদামী বর্ণ হইতে যাগারী পয়েন্টার কুকুর যাবীবা (শুষ্ক আংগুর রং) নামে পরিচিত হয়। এই নামেই ইহা ফাতিমী খলীফা আল-মুসতানসির বিল্লাহকে ৪৪৪/১০৫২ সালে বায়যানটাইন সম্রাট Michael VI Stratiotikos কর্তৃক প্রেরিত উপহার সামগ্রীর তালিকাভুক্ত হইয়াছে [দ্র. M. Hamidullah, L'Europe et l'Orient musulman. Srabica-তে, ৭খ. (১৯৬০ খৃ.), পৃ. ২৮৯]।

ক্ষুদ্রাকার জাতসমূহের মধ্যে আল-জাহিজ একটি দূত (basset) মেষ পাহারাদার কুকুরের উল্লেখ করিয়াছেন; যি'নী/যীনী (زينى/زئنى) নামে পরিচিত এই জাতটি হাংগেরীয় Puli ও Pumi-র সদৃশ। ইহা ব্যতীত তিনি উল্লেখ করিয়াছেন কালাতী (قلطى) জাতের "খর্ব বলিষ্ঠ কুকুরে"র যাহা সম্ভবত Pomeranian-এর সমগোত্রীয় এবং সীনী (صينى) 'চীনা' জাতের কুকুরের যাহা pug অথবা Pekinese জাতের সমকক্ষ। এই কুকুরকে সহজেই মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কসরৎ দেখাইতে শিক্ষা দেওয়া হইত। যেমন অনড়ভাবে মুখে প্রদীপ ধরিয়া রাখা অথবা গলায় ঝুড়ি ঝোলানো অবস্থায় বাজারে টুকিটাকি কাজের জন্য ছোটাছুটি করা (হায়াওয়ান, ২খ. ১৭৯)। ভ্রাম্যমাণ বাজিকর ও পথিপার্শ্বস্থ যাদুকরগণ এই দক্ষ কুকুরের (মুতালাক্কীন متلقين) ব্যাপক ব্যবহার করিয়া ইহাকে উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে বাঁদরের সহিত খেলা দেখানোর কার্যে ব্যবহার করিত।

গ্রীকগণের অনুসরণ করিয়া মুসলিমগণ কোন প্রজাতির বন্য কুকুরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, চিত্রিত হায়েনা অথবা cynhyena (سمع)-এবং aardwolf (عسبار) জাতীয় জানোয়ার গৃহপালিত কুকুর এবং নেকড়ে অথবা হায়েনার মিশ্রণ হইতে উদভূত সংকর শ্রেণীর জীবমাত্র। আল-জাহিজ-ই প্রথম এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেন (হায়াওয়ান, ১খ, ১৮৩-৫)।

অতি প্রাথমিক যুগ হইতেই আরব দেশসমূহে রোগের ভাইরাস বহনকারী ভবঘুরে কুকুরদলের প্রাচুর্যের কারণে জলাতংক রোগ (داء الكلب) অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বহুদিন পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তিকে (مكلوب , كلب) জুনূন দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া গণ্য করা হইত এবং স্বভাবতই এমনভাবে চিকিৎসা করা হইত যাহা পদ্ধতিগতভাবে আরোগ্যের তুলনায় ভূত ঝাড়ার সহিত তুলনীয় ছিল। রাজার রক্ত পান করাকে এই রোগের চরম প্রতিকাররূপে গণ্য করা হইত এবং কোনও কোনও পরিবারে গোপনীয়তার সহিত সংরক্ষিত চিকিৎসার ব্যবহারিক প্রণালীসমূহ পিতার নিকট হইতে পুত্রের নিকট হস্তান্তরিত হইত। ক্রমবর্ধমান এই বিপজ্জনক রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জরুরী প্রয়োজনে তাড়িত হইয়া বসরা-র প্রশাসক (৪৫/৬৬৫-৬) যিয়াদ ইবন আবী সুফ্য়ান জনসমক্ষে একটি চিকিৎসা প্রণালী প্রচার করেন। তাহার দ্বারা পুনঃনির্মিত প্রধান মসজিদের দেওয়ালে এই ব্যবস্থাপত্র ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায় না, যদিও এই চিকিৎসা শুভ ফল প্রদান করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় (হায়াওয়ান, ২খ, ১০-২)। এই রোগের নিদানিক উপসর্গ, বিশেষত পানি সম্পর্কে আতঙ্ক, সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞাত ছিল; আল-জাহিজ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার পরে কুশাজিম (মাসায়িদ, বাগদাদ ১৯৫৪-৯ খৃ.) আল-কায্‌বীনী ও আদ-দামীরী (শিরো. কাল্ব) তাহা পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন।

আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে আরও কতিপয় প্রাণীকে কাল্ব নামে অভিহিত করে। এইভাবে কালবু'ল-মা' (كلب الماء) = মিষ্ট-পানির কুকুর) হইতেছে উদ-বিড়ালের জন্য প্রদত্ত নাম এবং প্রাচ্য ইসলামী দেশসমূহে বীবর (Beaver) নামক প্রাণীর নাম। লোভের উপমা হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল কালবু'ল-বাহ্‌র (كلب البحر=সাগরের কুকুর) নামটির। এই নামটি দেওয়া হইয়াছে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি হাঙ্গরকে, যাহা ইংরেজীতেও ডগফিশ (dog fish) নামে পরিচিত। আরব প্রকৃতি বিজ্ঞানীগণ ইহাকে কাওসাজ (كوسج) অথবা লাখ্‌ম (لخم) নামেও অভিহিত করেন। এই "ক্ষুদ্র হাঙ্গর"(قريش)-এর নাম হইতেই সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর গোত্র ইহার নাম গ্রহণ করে; দৃশ্যত ইহার পশ্চাতে ছিল টোটেমবাদ। শেষত অমেরুদণ্ডী প্রাণী জগতে (حشرات) আমরা সন্ধান পাই কালবু'ল-মায়্যি (كلب المى) বা mole-cricket (gryllotalpa vulgaris)-এর যাহাকে উদ্যান পালকগণ হালূশ (حالوش) ও হাররাছা (حرائة) নামেও উল্লেখ করেন। অন্যদিকে বৃক্ষ-পালকগণ সকল শ্রেণীর কাষ্ঠখাদক পোকাকে কাল্ব নামে অভিহিত করেন। এই একই প্রকার উপমা দানের পদ্ধতি অনুসরণে, কাল্ব শব্দটিও ইহার অন্যান্য রূপ বহু প্রকার বস্তু, যন্ত্র বা হাতিয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার বহির্দেশ অথবা ক্রিয়াকলাপ কম বেশী এই প্রাণীটির সদৃশ (দ্র. Dozy, supplement, শিরো.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উদ্ধৃত বরাতসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) কাযবীনী, 'আজা'ইবু'ল মাখ্‌লূকাত, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪০৩-৪; (২) আমীন আল-মা'লূফ, মু'জামু'ল-হায়াওয়ান, কায়রো ১৯৩২ খৃ. (শিরো. canis ও dog); (৩) এডগালিব, আল-মাওসূ'আ ফী 'উলূমি'ত-তাবী'আ, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., শিরো.; (৪) E. Blaze, Histoire du chien. প্যারিস ১৮৪৩ খৃ.; (৫) H. D. Richardson, Dogs, their origins and varieties, নিউইর্ক ১৯৫৭ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Forty years with dogs, লণ্ডন তা. বি.; (৭) C. M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, কেমব্রিজ ১৮৮৮ খৃ.; (৮) De Schaeck, Des chiens d'afrique, Revue des Sciences naturelles appliquees-এ, প্যারিস ১৮৯৪-৫ খৃ.; (৯) von Oppenheim, Vom mittelmeer zum persischen Golf, বার্লিন ১৮৯৯-১৯০০ খৃ., ৬৯-৭১; (১০) A. Musil, Arabia Petraea, ৩খ, ভিয়েনা ১৯০৮; (১১) J. Euting, Tagebuch einer Reise in Innerarabien, ২খ, ৫৩; (১২) H. R. d' Allemagne, Du Khorassan au pays des Backhtiaris, প্যারিস ১৯১১ খৃ., ৪খ, ২৩০ প.; (১৩) W. Marcais ও A. Guiga. Textes arabes de Takrouna, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ২৮৫-৭, টীকা ৩১; (১৪) O. F. Gandert, Forschungen zur Geschichte des Haushundes, লাইপযিগ ১৯৩০ খৃ., ৪৬খ; (১৫) A. Childe, Etude philologique sur les noms du chien....., Arquivos do Museu nacional-এ, ৩৯ খ., Riode Janeiro ১৯৪০ খৃ.; (১৬) J. Oberthur, Le Chien, প্যারিস

১৯৪৯ খৃ., ১-২খ; (১৭) K. Lindner, La chasse prehistorique, প্যারিস ১৯৫০ খৃ., ৩৬৩, ৩৮৬, ৪৪১ প.; (১৮) F. M'ery, Les chiens de chasse, প্যারিস ১৯৫১ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, Le Chien, Enc Larousse-এ, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ.; (২০) E. Dechambre, Les chiens, প্যারিস ১৯৫২ খৃ.; (২১) M. Barat, Les chiens et les hommes, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ.।

জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রে কুকুর ঃ প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ বেশ কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডল ও তারকাকে কুকুর বা সারমেয় (XUWV, canis) নামেও অভিহিত করিয়াছেন। কারণ তাহারা বিশ্বাস করিতেন, আকাশমণ্ডলে এই সকল জ্যোতিষ্কের অবস্থান ও বিন্যাস রূপকভাবে এই প্রাণীটির ধারণা জন্মাইয়া থাকে। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পরে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণও এই একই নীতি অনুসরণ করেন এবং গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দসমূহকে অনুবাদ করিয়া নিম্নলিখিত তারকাসমূহকে কালবুন নাম প্রদান করেন ঃ (ক) আল-কলুব'ল-আকবার (الكلب الاكبر) বৃহৎ কুকুর ইহা কালবু'ল-জাব্বার, (كلب الجبار) "মহাকায় ব্যক্তি (অর্থাৎ Orion, কালপুরুষ)-এর কুকুর নামেও পরিচিত। রাশিচক্র বহির্ভূত এই নক্ষত্রমণ্ডলটি শশকমণ্ডলের পূর্বে কালপুরুষমণ্ডলের নিম্নে ও বাম পার্শ্বে এবং ছায়াপথের কিনারায় অবস্থিত। য়ুরোপীয় মধ্যযুগে ইহাকে quelb alagbar ও quelb elgeber নামে ডাকা হইত। এই নক্ষত্রমণ্ডলে সাতটি তারকা রহিয়াছে এবং ইহাদের একটি লুব্ধক (Sirius) বা কুকুর (a Canis majonis উজ্জ্বলতা ১.৫৮) অথবা আশ-শি'রা আল-য়ামানিয়্যা (الشعرى اليمنية) =Elschere ahemini) গ্রীষ্মায়নের স্বল্প কাল পরেই উদিত হয়। (খ) আল-কালবু'ল-আসগার (الكلب الاصغر) ক্ষুদ্র কুকুর-ইহা মুকাদ্দামু'ল-কালব বা "অগ্রবর্তী কুকুর" নামেও পরিচিত। রাশিচক্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এই নক্ষত্রমণ্ডলটি মিথুন (Gemini)-এর নীচে এবং কালপুরুষ হৃদ-সর্প (Hydra) মণ্ডলদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। Quelb alazgar দুইটি নক্ষত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে ঃ প্রভাস (Procyon. Cauis minoris, উজ্জ্বলতা-০.৪৮) অথবা আল-গুমায়সা' (الغميصاء) আল-গুমা'সা (=অশ্রুসজল চক্ষুবিশিষ্ট, আল-জুমায়যা (الجميزى) (sycamore, ডুমুর গাছ)-এর অপভ্রংশ), যাহা "আশ-শি'রা'শ-শামিয়্যা" (الشعرى الشامية) সিরিয়ার বিলুব্ধক নামেও পরিচিত এবং আশ-শি'রা'ল-'আবূর (شعرى العبور) =আল্‌হাবোর "যেই লুব্ধক (ছায়াপথ) অতিক্রম করিয়াছে"। ইহারা মধ্য জুলাইতে উদিত হয়। (গ) আল-কালবান (الكلبان) "দুই কুকুর" (আলদিবারান-এর) রাশিচক্রের বৃষ (Taurus) নক্ষত্রমণ্ডলের দুইটি তারকা, রোহিনী (Hyades) ও সাত ভাই (Pleiades)-এর মধ্যে অবস্থিত U. Tauri, উজ্জ্বলতা ৪.৬ তারকাদ্বয়। (ঘ) কালবু'র-রা'ঈ (كلب الراعى) সেলবালরাই, "মেষপালকের কুকুর" কিতফু'র-রাঈ (كتف الراعى) "মেষ পালকের স্কন্ধ" (Ariteus)-এর অপভ্রংশ এবং এই তারকাটি হইতেছে B Ophiuchi, উজ্জ্বলতা ২.৯ সর্পমণ্ডলে অবস্থিত। (ঙ) কিলাবু'শ-শিতা' (كلاب الشتاء) "শীতকালের কুকুরসমূহ" যেই চারিটি মনযিল নির্দেশ করে সেইগুলি হইতেছে আয-যিরা (الذراع) (= castor ও Pollus B Geminorum, বিষ্ণুতারা ও সোমতারা), আন-নাছরা (النثرة) (Cancri) আত-তারফ (الطرف) (cancri ও Leonis) এবং আজ-জাব্হা (الجبهة) (Leonis)। ইহাদের heliacal উদয় শুরু হয় যথাক্রমে জুনের শেষ হইতে মধ্য-আগস্ট পর্যন্ত এবং acronychal অস্ত জানুয়ারী প্রারম্ভ হইতে মধ্য-ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। লুব্ধক (canis majoris) ও আয'-যিরা একই সময়ে উদিত হয়। এই দীর্ঘ সময় কালের মধ্যে রহিয়াছে কুকুরের সময়কাল (الكلب) বা "কুকুরের দিনসমূহ" (তু. ফারাসী Jours caniculaires জার্মান Hundstage), যাহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ (وغرات) এবং সাইমুম ঝড় (سمائم ও) তাহার সহিত "কৃষ্ণ রাত্রি" (الليالى السود)-সহ তুহিনময় সময় কাল (كلب الشتاء، كلبة)। প্রাচীন যুগে এই সম্পূর্ণ সময় কালটিকে দুর্লক্ষণযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং এই কারণে তাহা ভীতিপ্রদ বলিয়া গণ্য হইত। লুব্ধক তারকার উদিত হওয়ার সময়ে রোমানগণ তাহার তুষ্টি সাধনের জন্য একটি লাল কুকুর উৎসর্গ করিত। এই চারটি মনযিল-এর আন্ওয়া' (أنواء দ্র.) সম্পর্কে যাযাবর আরবগণের প্রবচনসমূহ তাহাদের আশঙ্কা নির্দেশ করে। এই আশঙ্কা ছিল অত্যুষ্ণ গ্রীষ্মকালে পানি ও চারণভূমির স্বল্পতা এবং অপ্রতুল খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহের মুখে তীব্র শীতকালের ভয়। আয-যিরা 'বাহু' (castor তারকার আয-যিরা'উ'ল-মাব্সতা, "প্রসারিত বাহু") তারকাটি সপ্তম চান্দ্র মনযিল গঠন করে এবং অক্টোবর মাসে ইহা দূরতম অবস্থানে থাকে। আননাছরা 'হাঁটি' (সিংহ রাশির) তারকাটি অষ্টম চান্দ্র মনযিল গঠন করে এবং ইহার দূরতম অবস্থান ঘটে মধ্য অক্টোবর মাসে। নবম চান্দ্র মনযিল, আত-তারফ' শেষ প্রান্ত (কর্কটমণ্ডলের দক্ষিণ পশ্চাৎ নখর)-এর ক্ষেত্রে ইহা ঘটে নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, অপর দিকে দশম চান্দ্র মনযিল আল-জাব্হা 'কপা'ল (সিংহের)-এর জন্য ইহা হইতেছে মধ্য-নভেম্বর মাসে। সুতরাং এই চারটি মনযিলের জন্য "শীতকালের কুকুরসমূহ" নামটি সম্পূর্ণভাবে যুক্তি যুক্ত। ইহাতে বেদূঈনগণের প্রাচীন সৌর জ্যোতিষ-পঞ্জিকার চিহ্ন দেখা যায়। ইহা সুপরিচিত তারকাসমূহের heliacal উদয় ও acronychal অস্তগমন-এর সহিত সংশ্লিষ্ট আবহাওয়ার পরিবর্তন ও বায়ুমণ্ডলের অধক্ষেপ সৃষ্টি সম্পর্কিত তাহাদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানু'ল-'আরাব, শিরো. কাল্ব; (২) A. Benhamouda, Les noms arabes des etoiles, AIEO Alger-এ, ৯খ, (১৯৫১ খৃ.), ৭৬-২১০; (৩) M. Barat, Les Chiens et les Hommes, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৮৯ প.; (৪) Ch. pellat, Dictons rimes, anwa' et mansions lunaires chez les Arabes, Arabica- তে, ২খ. (১৯৫৫), ১৭-৪১; (৫) ঐ লেখক, Le Calendrier de Cordoue, নূতন সং, লাইডেন ১৯৬১ খৃ.।

F. Vire (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাল্ব (قلب), ব. ব. কুলূব (আ.), অর্থ 'হৃদয়', কলব।

১. সূফীতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদ ঃ সূফী ভাষাতে কাল্ব বা আত্মার ভূমিকা অনেক বেশী। কেননা ইহাকেই মানুষের ভাল ও মন্দ প্রেরণার উৎস বলিয়া এবং শিক্ষা বা ধর্মীয় বোধের ধারণ স্থল ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনেরও স্থান বলিয়া ধারণা করা হয়। 'ইলমু'ল-কুলূব ওয়া'ল-খাওয়াতির, "হৃদয়ের বিজ্ঞান ও আত্মার সচলতা" বিষয়টির আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আল-হাসান আল-বাসরী। তিনি ছিলেন তাসাওউফ-এর আদি লেখকগণের

অন্যতম (দ্র. L. Massignon, La passion d'al-Halladj, Paris 1922, 468)।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বোধশক্তির ব্যাপারে আত্মা বা হৃদয়ের যে ভূমিকা দেখা যায় তাহা কড়াকড়িভাবে সেমিটিক ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল এবং সূফী ভাবের যে 'ইল্‌মু'ল-কাল্‌ব বা "আত্মার বিজ্ঞান" তাহা কুরআনের মর্মমূল হইতে উৎসারিত। আল-কুরআনে 'আকল (বুদ্ধি) শব্দের ব্যবহার নাই, কিন্তু কাল্‌ব শব্দটি প্রায়শ ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে 'আকল হইতে গঠিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে। মানুষ তাহার হৃদয় দ্বারা "বোধ করে", যেমন চক্ষু দ্বারা দেখে এবং কর্ণ দ্বারা শোনে (৭ ঃ ১৭৯, ২২ঃ ৪৬)।

যাহারা (আল্লাহ্‌র কথা) বুঝেও না বা শোনেও না তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তাহাদের চক্ষু যে অন্ধ তাহা নহে, বরং তাহাদের বুকের মধ্যে যে হৃদয় আছে তাহা (অন্ধ)" (২২ ঃ ৪৬)। হৃদয়ের এইরূপ অন্ধত্ব এক আত্ম-অস্বীকৃতি এবং তাহা হইতে অজ্ঞতার জন্ম হয়। "যাহারা অজ্ঞ" আল্লাহ্ "তাহাদের হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন" এবং তাহাদিগকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না (৭ ঃ ১০১ ; ১০ ঃ ৭৪; ৩০ ঃ ৫৯ ইত্যাদি)। আল্লাহ্ "প্রত্যেক উদ্ধত জালিমের হৃদয়কে মোহর মারিয়া দেন" (৪০ ঃ ৩৫)। তাফসীরে ও 'ইল্‌মু'ল-কালামে "হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেওয়া" কথাটি পাইয়া মানুষের কাজ করিবার স্বাধীনতা কতটুকু সে প্রশ্নে বড় মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে (যেমন, ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতীহু'ল গায়ব, কুরআন বিষয়ে আলোচনা, ১৮খ, ২৩)।

কাজেই মানুষের হৃদয় হইতে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সচেতনতা বা অজ্ঞতার জন্ম হয়। কিন্তু ইহা নিতান্তই একটি প্রজ্ঞাগত বোধ তো নহেই, বরং ইহা মানুষের সারা জীবনের সাধনা ও জ্ঞানের বিষয়। হৃদয় যথার্থই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের স্থানস্বরূপ হইতে পারে, সুতরাং অবশ্যই "আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়" (১৩ ঃ ২৮); হৃদয় পাক-পবিত্র হইতে হইবে (২৬ ঃ ৮৯; ৩৭ ঃ ৮৪) এবং বিনীত হইতে হইবে (৫৪ ঃ ৩৩); হৃদয় তাকওয়া দ্বারা পূর্ণ হইতে হইবে, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইতে হইবে (২২ ঃ ৩২)। মানুষের হৃদয়ই ধর্মীয় জ্ঞানের আধার, এখান হইতে করুণা ও ক্ষমা উৎসারিত হয়, "ঈমানের উপরে যে ঈমান" হৃদয় উহার আধার, এখানেই আল্লাহ্‌র আসন। স্বয়ং আল্লাহ্ "নিজ সত্তাকে (সীকানা) ঈমানদারগণের হৃদয়ে অবতরণ করান যাহাতে তাহাদের ঈমানের সঙ্গে আরও ঈমান হয়" (৪৮ ঃ ৪)। যাহাদের হৃদয়ে পাপ রহিয়াছে (১৫ ঃ ১২; ২৬ ঃ ২০০) সে সকল হৃদয়কে "চিহ্নিত করা হইয়াছে মারাত্মক শাস্তি ভোগের জন্য" এবং "যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না" (৩৯ ঃ ৪৫) তাহাদের হৃদয় "কাঁপিয়া উঠে" (দ্র. ঐ), কাফিরগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইবে (কুফ্‌ফার, ৩ ঃ ১৫১; ৮ ঃ ১২)।

L. Massignon যে মন্তব্য করিয়াছেন (পূ. গ্র., ৪৮৯) তাহা এই সকল পাঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত "সংক্ষেপে কুরআনে মানুষের হৃদয়কে জ্ঞান ও বিবেকের উৎসস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা মানুষ কোনও উপায়েই নিজের সম্পদের অবধারিত ও অপ্রতিষেধক 'অবক্ষয়কে ধরিয়া রাখিতে' পারে না (চলাচলে ও অনুভূতিতে), মানুষ নিজের অস্তিত্ব শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই অনুভব করিতে পারে, তাহার পরিবর্তনশীল জীবনে, তাহার হৃদয়ে। শারীরিক কামনা-বাসনার যে বীজ তাহার মধ্যে সুপ্ত আছে উহার বিরোধিতার করিয়া সে উহা করে, আর এই বীজের অবস্থান সকল মুসলিম লেখকই নির্ধারণ করিয়াছেন যকৃত ও পাচকরসের মধ্যে" (দ্র. পূ. গ্র., টীকা ৭)।

ফলে ঈমানের গভীর অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের অন্বেষণ যে দুইটি হইতেছে তাসাওউফের প্রথম ও সার্বক্ষণিক লক্ষ্য, তাহা 'ইল্‌মু'ল-কুলূব বা "হৃদয়কে জানিবার জ্ঞান"-এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়, হাসান আল-বাসরী বিষয়টিকে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ভাবন করা হয়। চিন্তা ও আত্মসচেতনতার বোধ মস্তিষ্কে নহে, বরং হৃদয়ে একটি দৈহিক অঙ্গ (জিস্‌মী) এক টুকরা গোশত (মুদগা, মাদিগা) বুকের ভিতরে ফাঁকা স্থানে অবস্থিত, উহা স্পন্দনে থাকে এবং উহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণ রহিয়াছে। সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে "বোধশক্তির গোপন ও গুপ্ত (সির্‌র) আবাসস্থান, উহার গুপ্ত বিষয়গুলি (নাজওয়া) শেষ বিচারের দিনে প্রকাশ করা হইবে।" (দ্র. Massignon, পূ. গ্র., ৪৭৮)। মুরীদকে শিক্ষা দানের বিষয়ে পীর (শায়খ) যে ভূমিকা পালন করেন তাহা হইল, পীর মুরীদকে কামনা-বাসনা, চিন্তা-ভাবনা ও অভ্যন্তরীণ প্রেরণা আবেগের পরিচয় দান করেন, নাফ্‌স বা "দৈহিক আত্মা" হইতে উদ্ভূত এই সকল আকাঙ্ক্ষাকে চিনিতে ও দমন করিতে শিক্ষা দেন এবং রূহ বা "আসমানী আধ্যাত্মিক নিঃশ্বাস" হইতে আগত প্রেরণাকে গ্রহণ করিতে ও রক্ষা করিতে তা'লীম দেন। সেই রূহের মাধ্যমেই আল্লাহ্ নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। মানুষ যাহা কিছু দিয়া কামভাব ও রিপুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, যাহা কিছু তাহার ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ (ইসলাম) করিতে অনুপ্রাণিত করে, তাহা সকলই হৃদয় বা "কাল্‌ব জ্ঞানে"র অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই আবূ তালিব আল-মাক্কী (৪র্থ/১০ম শতক) যে বিখ্যাত সূফী গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন (উহাতে বাহ্যিক সূফী তারীকা এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হইবার স্তরসমূহ বর্ণিত হইয়াছে) উহার নাম দিয়াছেন কূতু'ল-কুলূব, অর্থাৎ হৃদয়ের খোরাক। উহার অগণিত সংস্করণ হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া ১৩৫১/১৯৩২ সালের কায়রো সংস্করণটি বিখ্যাত। অনুরূপ অর্থে বাহ্য়া ইব্‌ন পাকূদা নামক জনৈক আন্দালূসীয় য়াহূদী, তিনি ৫ম/১১শ শতকে আরবীতে লিখিতেন এবং সূফী ভাবধারা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্দর্ভের নাম দিয়াছিলেন হিদায়া ইলা ফারা'ইদি'ল-কুলূব অর্থাৎ হৃদয়ের প্রতি কর্তব্যসমূহের উপক্রমণিকা।

কাল্‌ব বা হৃদয় হইতেছে বোধ-বিবেকের 'অঙ্গ' ধর্মীয় জ্ঞানের আশ্রয়স্থল, আল্লাহ্‌র সামনে জীবনের আশ্রয়, ইহা কোনভাবেই ধর্মীয় মূল্যবোধের ভাবাবেগ নহে। ইহা অভিজ্ঞতাভিত্তিক মানবতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, এখানে বোধ ও ইচ্ছা একত্র হইয়াছে এক অস্তিত্ববাদী স্বভাবে যাহা মানুষকে এবং তাহার জীবনের পরিণতিকে একত্রে বন্ধন করে। ইহা কুরআনের শিক্ষার এক অতি প্রধান ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে কালব সূফীতাত্ত্বিক ধারণা তথা মা'রিফাতের কাছাকাছি আসে, যাহা 'আরিফ (উদ্যোগী)-এর সরাসরি সচেতনতা।

তাসাওউফ সম্বন্ধে লিখিত বহু বইয়ে "হৃদয়ের জ্ঞান" এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আমরা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন আবূ হামিদ আল-গাযালী (র), বিশেষ করিয়া তাঁহার ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন গ্রন্থে। ইহা আবূ তালিব

আল-মাক্কীর ধারাতেই লিখিত হইয়াছে এবং বস্তুত কূতু'ল-কুলূব হইতে গোটা অনুচ্ছেদই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রীক দর্শনের প্রভাবের ফলে আল-গাযালী কাল্‌ব বা হৃদয়ের সমস্যাকে পরিষ্কারভাবেই মানুষের জীবনের অন্যতম ভিত্তি বলিয়া দেখাইয়াছেন। হৃদয় বিষয়ক জ্ঞানের নৈতিক পরিণতির উপরে গুরুত্ব আরোপ করাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ধরা গেলেও, যেরূপ করিয়াছেন আল-গাযালী (র), উদাহরণস্বরূপ বিদায়াতু'ল-হিদায়া গ্রন্থে দ্র. W. Montgomery Watt, The Faith and Practice of al-Ghazali, London 1953), জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেখানে যে নৈতিক জীবনের স্বীকৃতি রহিয়াছে, তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। ঐগুলি হইতেছে পূর্ব অনুমিত বিষয়সমূহ।

ইহ্‌য়া' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় হইতেছে শারহ 'আজা'ইবি'ল-কাল্‌ব, "হৃদয়ের বিস্ময়সমূহ সম্বন্ধে টীকাভাষ্য"। প্রাথমিক সংজ্ঞাসমূহ যেখানে আল-গাযালী (র) চারিটি ধারণাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যথা কাল্‌ব, রূহ, নাফ্‌স ও 'আক্‌ল, সেগুলি অতি সুপরিচিত। প্রতিটি ধারণার জন্য আল-গাযালী একটি বিশেষ বাহ্যিক এবং একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দিষ্ট করিয়াছেন: প্রথম অর্থে কাল্‌ব হইতেছে দেহের একটি অঙ্গ; রূহ রক্তের মধ্যে স্থিত 'অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণশক্তি" (তু. শারীরতত্ত্ব বিষয়ক সমসাময়িক ধারণাসমূহ); নাফ্‌স হইতেছে মানুষের কামনা-বাসনার সারবস্তু, ইহাই মানুষের দূষণীয় বস্তুগুলির মূল; আর 'আক্‌ল হইতেছে জ্ঞান লাভের শক্তি, ইহার অবস্থান হইতেছে কাল্‌বে। দ্বিতীয় অর্থে কাল্‌ব হইতেছে অতি সূক্ষ্ম, খোদাঈ এবং আধ্যাত্মিক মূল সত্য। ইহাই হইতেছে "মানুষের বাস্তবতা" (হাকীকাতু'ল-ইনসান); রূহ হইতেছে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা, ইহাই কাজ করে, ইহা দ্বারাই মানুষ বুঝে ও উপলব্ধি করে। নাফ্‌স হইতেছে মানুষের বাস্তব সত্তা, কিন্তু নানা গুণাবলী দ্বারা ইহাকে যোগ্যতর করিয়া তোলা যায়, সেই গুণাবলী হইল যাহা দ্বারা তাহার কামনা-বাসনাকে দমন করে (আম্মারা, ১২ ঃ ৫৩) বা বাসনাগুলির জন্য তিরস্কার করিয়া নিজেকে সংশোধিত করিতে চেষ্টা চালায় (লাওওয়ামা; ৭৫ ঃ ২) বা "প্রশান্তিতে থাকে" (মুতমা'ইন্না, ৭৯ ঃ ২৭) বা আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহ্‌র জন্য রাযী এমন অবস্থা হয়; সেই ক্ষেত্রে নাফ্‌স বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার সমার্থক হইয়া যায়, দার্শনিকগণ যাহাকে বলিয়াছেন নাফ্‌স নাতিকা। সর্বশেষ 'আকল দ্বিতীয় অর্থে হয় "যাহা জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে পারে" সংক্ষেপে "খোদ হৃদয়"। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতে এই চারিটি কথা দ্বারা মানুষের "বাস্তবতাকে" বুঝানো হইয়া থাকে, কিন্তু চারিটি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে।

গাযালী (র)-র রিসালা লাদুনিয়্যাতে (জাওয়াহিরু'ল-গাওয়ালী, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, ২৩-৭) শব্দগুলির সমার্থকতার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে ঃ "বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা আমি সেই বস্তুকে বুঝাইয়াছি যাহাকে সকল চিন্তাধারাতেই একটি বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে। দার্শনিকগণ ইহাকে বলেন "বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা', কুরআনে ইহাকে বলা হইয়াছে 'প্রশান্ত আত্মা' এবং আল্লাহ্‌র বাণী হইতে উৎসারিত আত্মা' (তু. ১৭ ঃ ৮৭); সূফীগণ ইহাকে বলেন, কাল্‌ব বা হৃদয়। এইগুলি নামের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যাই একটি মাত্র ধারণাকে প্রকাশ করে (মা'না ওয়াহিদ), ইহাতে ধারণাগত কোনও পার্থক্য নাই। হৃদয়, আত্মা ও প্রশান্ত আত্মা–এইগুলি সবই বুদ্ধিগত আত্মারই নাম, তাহা একটি বস্তু যাহার জীবন, কাজ ও বোধশক্তি রহিয়াছে। সেখানেই আমরা বিশুদ্ধ অর্থে 'আত্মা' বা 'হৃদয়' সম্বন্ধে কথা বলি, যখন ইহা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া থাকি।

এইজন্যই গাযালী (র) যে হৃদয়ের উপরে জোর দিয়াছেন, উহাকে পাশ্চাত্যের অর্থে তাঁহার "আধ্যাত্মিকতার" ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে (তু. J. Oberman, Der Philosophische und religiose Subjektivismus Ghazalis, Vienna 1921)। A. J. Wensinck যেরূপ দেখিয়াছেন (La Peusee de Ghazzali, Paris 1940, 64) যদি সেইরূপ হয় যে, "হৃদয় হইল যুক্তি ও ইচ্ছার সমন্বয়", তবে বুদ্ধিবৃত্তিগত মূল্যবোধের ভাবাবেগ রূপকে উপলব্ধি করা অপেক্ষা (উপরে দ্র.) আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে একটি সামগ্রিক বোধের বিষয়ে যে অস্তিত্ববাদী মনোবিজ্ঞান যাহা বাইবেল ও কুরআন-এর ঐতিহ্য সমভাবে মানে, সে অনুযায়ী মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ঃ "Pascalian অর্থে তাহা হইতেছে হৃদয়" বাস্তবিক, কিন্তু তাহা শুধুমাত্র এই পর্যন্ত যে, Pascal-এর মতামতগুলি বাইবেল দ্বারা অনুপ্রাণিত। আল-গাযালী (র) তাঁহার ইহ্‌য়া গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হৃদয়ের দুইটি দরজা রহিয়াছে (তু. Wensinck, পূ. গ্র. পৃ. ৬৬-৭)। একটি খোলা বাহিরের দিকে, ইন্দ্রিয়সমূহ কামনাবাসনা ইত্যাদির দিকে, অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির দিকে, আর অপরটি অন্তরের রাজ্যে।" এই দ্বিতীয় দরজাই হইতেছে "অনুপ্রেরণার, আল্লাহ্‌কে ভয় করিবার এবং ওয়াহ্‌য়ি-র"। নাম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহা St. Augustine-এর লেখাতে এবং মধ্য যুগীয় ল্যাটিন লেখকগণের লেখাতেও যে পাওয়া যায় "আত্মার দুই দিক" (two facs of the soul) উহার খুবই কাছাকাছি হয়।

যিক্‌র (দ্র.)-এর অভিজ্ঞতাতে পাক নাম ক্রমেই অধিকতর উত্তেজনার সঙ্গে বারবার উচ্চারিত হইতে হইতে জিহ্বা হইতে হৃদয়ে প্রবেশ করে (তু. ইহ্‌য়া', ৩খ, ১৭) ঃ বীজবাক্যটি উচ্চারিত হয়, এবং এইভাবে মূল উদ্দেশ্য মনে জাগিয়া উঠে। প্রথমে তাহার প্রভাব পড়ে হৃদয়ের অঙ্গের (এবং রক্তপ্রবাহ পদ্ধতির) উপরে। অতঃপর এই উপায়ে আধ্যাত্মিক হৃদয় প্রভাবিত হয় এবং অতঃপর ইহা একেবারে সত্তার গভীরে প্রবেশ করে (বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হৃদয়ের ঠিক অনুরূপ ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে সূফী যিক্‌রে এবং Mount Athos-এর গ্রীক শান্তিবাদী খৃষ্টানদের মন্ত্র উচ্চারণে বা Account by a Russian Pilgrim গ্রন্থে)। আল-গাযালী (র) মাত্র দুইটি স্তরের কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, "জিহ্বার যিক্‌র" এবং "হৃদয়ের যিক্‌র", অন্যগণ তৃতীয় একটি স্তরের কথাও বলিয়া থাকেন, "হৃদয়ের যে হৃদয় (সির্‌র) উহার যিক্‌র", ইহা 'ইবাদতের সময়ে মানুষের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে [তু. ইব্‌ন 'আতা'ইল্লাহ্‌ (আলেকজান্দ্রিয়া), মিফতাহু'ল-ফালাহ ওয়া'ল-মিসবাহ, কায়রো তা. বি., ৪-৬]।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল-গাযালী (র)-র ধারণা সামগ্রিকভাবে সূফী ঐতিহ্য অনুযায়ী, হৃদয়ের যে দৈহিক অঙ্গ (এবং মস্তিষ্কের নহে) সেখানেই 'আকল-এর অবস্থান, তাহাই জ্ঞানের শক্তি। জ্ঞানের-বোধশক্তি অর্থে 'আকলই হইতেছে "সংক্ষেপে প্রকৃত হৃদয়" এবং হৃদয়ই হইতেছে মা'রিফাত-এর স্থল, হৃদয়ই উহার উৎস। এখন "আধ্যাত্মিক হৃদয়" হইতেছে নীতিবাদীর রাজ্য (মানুষ ও পশুর ক্ষেত্রে "দেহের হৃৎপিণ্ড" চিকিৎসার বস্তু)। দেখা যাইতেছে যে, 'আকলকে কাল্‌বের সঙ্গে এক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়, কিন্তু বিপরীতটি আবার বলা যায় না। কাল্‌ব

শুধুমাত্র জ্ঞানের শক্তিই নহে, ইহা সকল নৈতিক বোধের আবাসস্থল, অসৎ কামনা ও স্বভাবের, আবার সেগুলি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সংগ্রামের এবং আল্লাহ্র যে শিক্ষা তাহার প্রতি মনোযোগী হইবারও আবাসস্থল (তু. ইহ্য়া'-এর পাঠের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন H. Laoust in La Politique de Ghazali, Paris 1970, 218-21)। মুক্তি আসে একমাত্র হৃদয়ের যে বিশুদ্ধ জ্ঞান তাহার দ্বৈত ও অভিন্ন বিষয়সমূহ হইতে, অনুমানভিত্তিক এবং প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই হইতেছে 'হৃদয়ের' পরিপূর্ণ শিক্ষা যাহা পীর-মুরশিদগণ অবশ্যই ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে বিকাশ ঘটাইয়া আত্মোন্নতি সাধন করিবেন এবং তাহাদের বা মুরীদগণের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন।

সূফীতত্ত্বে সর্বোচ্চ মহৎ গুণ সিদ্ক (দ্র.) ['সততা'] বা 'সত্যবাদিতা'-এর বিশ্লেষণ সম্পূর্ণভাবে "হৃদয়ের জ্ঞানে'র উপরে নির্ভরশীল; এই বিষয়ে দ্র. আল-খার্রায-এর কিতাবু'স-সিদ্ক (সম্পা. ও অনু. A. J. Arberry, Oxford 1937)। শেষ বিচারের দিনে সু'আলু'স্-সিদ্ক বা সততার প্রশ্নের উত্তর নবীগণ, যাঁহারা নিশ্চিতভাবে ওয়ালীও, কর্তৃক দুইভাবে উদ্ঘাটিত হইবে ঃ ইহা জিহ্বাতে ছাপ মারিয়া দেওয়া হইবে, শ্রোতাগণ তাহা দেখিতে পাইবে এবং আল্লাহ্র প্রেরণার উৎস আত্মাতেও ছাপ মারিয়া দেওয়া হইবে।

আল-হাল্লাজ, আত-তিরমিযী ও ইব্নু'ল-'আরাবী হযরত 'ঈসা (আ) কর্তৃক সু'আলু'স-সিদকের জবাব প্রদান বিষয়ে এইভাবে মন্তব্য করিয়াছেন (তু. L. Massignon, পূ. গ্র., পৃ. ৬৮৬ ও বরাত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

L. Gardet (E. I.²)/হুমায়ুন খান

২. কাব্য সাহিত্য ঃ কাসীদা (দ্র.)-র নাসীবে প্রথম হইতেই প্রণয়মূলক বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইলেও 'হৃদয়' শব্দটির উপরে প্রাচীন আরবী সাহিত্যে কদাচিৎ মাত্র জোর দেওয়া হইয়াছে। এই পরিস্থিতিটি পরবর্তী সকল সাহিত্যের শব্দটির বিকাশ ও বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। ভাবের ক্রমবিকাশমানতার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যগত আরবী কবিতাতে শব্দটি ক্রমেই যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন ইহার অর্থও নূতনভাবে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার নবতর মূল্যায়নও হয়। এইরূপ মনে হইতে পারে যে, ইহার দ্বারা একটি স্বেচ্ছাকৃত ভুলের সংশোধন করা হয়, যাহার সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই।

বস্তুত প্রাচীন আরবী নাসীবে হৃদয় যে ভাবের উৎস ইহার তেমন কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না-অন্তত যে কাব্য-সংগ্রহকে সবচেয়ে বেশী বেদুঈন বলিয়া ধরা হয় উহাতে (উদাহরণস্বরূপ যুহায়র-এর কবিতাতে একটি মাত্র উল্লেখ, মুফাদ্দালিয়্যাতে দুইটি উল্লেখ, জারীর উল্লেখ করিয়াছেন ১৩ বার। তিনি শহরের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন)। এইরূপ সম্ভবত ধারণা করা যায় যে, আরবী গীতি কবিতার প্রতিষ্ঠাতাগণের কবিতাতে যে 'হৃদয়' শব্দটি দুর্লভ উহার সঙ্গে তাঁহাদের নাসীবে তাঁহারা প্রেমকে যেভাবে দেখাইয়াছেন তাহার সম্পর্ক রহিয়াছে। যদিও একথা সত্য যে, তাঁহাদের কবিতাতে এমন অল্প কয়েকটি উদাহরণও পাওয়া যায় যেখানে তাঁহারা শব্দটির যথার্থ অর্থকে অবহেলা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের কাছে "হৃদয়ের ব্যাপার" একটি সামাজিক, এমনকি সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব বহন করিত। বস্তুত নাসীব-এ "Rites de passage"-এর অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় (দ্র. Van Gennep, Paris 1909)। কবি একজন আশ্রয়দাতাকে, একজন শক্তিশালী বা প্রবীণ প্রতিবেশীকে খুঁজিয়া বেড়ান, যাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে একটি নূতনতর গোত্রীয় সুসম্পর্ক, নাসীব সৃষ্টি হইবে (তু. আল-বুহতুরী, আল-মাওলা'স্-সারীহু নাসীবু)। হিমা বা "সংরক্ষিত এলাকা" হইত সেই স্থান যেখানে সেই বন্ধনের আনুষ্ঠানিকতা হইত এবং উহাকে সম্ভবত বলা হইত 'আকীকা (দ্র. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia, 152)। কবি হন নূতন একটি গোত্রের বন্ধনকারী, সেই নারীর গোত্র যিনি তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন (সাবী)। তিনি সেই নারীর গোত্রের রাহন বা জিম্মীস্বরূপ হন (ফুতূহ'ল-বুলদান, পৃ. ৪০২, যে অর্থে বন্দী কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে এখানেও সেই অর্থে; তু. আস্‌সার্রাজ, মাসারি', ১৭৭, হিলাল ইবনু'ল-'আলা'-র কবিতা)। তিনি সেই নারীর গোত্রের বন্দী (আসীর) হন যেমন সুপ্রাচীন কালের ধর্মীয় 'ইবাদতখানাতে ধর্মভীরু লোক নিজেকে আবদ্ধ রাখিতেন। তদুপরি লিসানের মতে প্রতিজন শিশুকে ডাকা হয় রাহীনা বলিয়া, অর্থাৎ সে 'আকীকা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পণস্বরূপ বা বন্দীস্বরূপ হইয়াছে। এই একই মূল শব্দ দ্বারা কিদাহের ধারণাকেও বুঝায়। কিদাহ্ হইতেছে তীরের একটি পবিত্র খেলা। উহাকে তুলনা করা হইয়াছে "প্রেমিকা নারীর তীর"-এর সঙ্গে। কবির উটনী সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। আমরা জানি যে, আরবী লোককাহিনীতে রহিয়াছে যে (যেমন আস-সার্রাজ-এ, মাসারি'-তে, পৃ. ১০১) প্রেমিক একটি পাল ছাড়িয়া ছুটিয়া যাওয়া উটনীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন (নিশদান), সম্ভবত ইহা তালাবু'ল-হাজাত অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বস্তুর সন্ধান, সেই সময়ে প্রেমিকা নারীর আগমনকে একটি চিহ্ন বলিয়া ধরা হয় যে, কবির সন্ধান সাফল্য দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছে।

'আকীকার মত নিশদানও একটি প্রাচীন যুগের অনুষ্ঠান (তু. মক্কার হারামে – যাহা ছিল পূর্বেকার হিমা, সেখানে ফেলিয়া যাওয়া দ্রব্যাদি কুড়াইয়া না লওয়ার বিষয়ে হাদীছ)। মুনশিদ অর্থাৎ হিমাতে আগত পুণ্যার্থী এবং 'আগমনকারী'-র সহকারী, 'চিহ্নে'র সন্ধান করিতেছেন, মূল শব্দের অর্থ হইতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই চিহ্নগুলি যাজ্‌র (শুভাশুভ নির্ণয়) হইতে পাওয়া যায়; সুপ্রাচীন নাসীবে এইগুলি অতি সুপরিচিত। কখনও কখনও মুনশিদ-এর সন্ধানের সমাপ্তি হয় 'আযা' (ধৈর্য ধারণ, বিলাপ) দ্বারা; এই শব্দটির পরিষ্কার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রেমিকার কাছে গমন বা হিমাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে জমায়েত হওয়াটা (ই'তিমার) ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়, তাহা ছিল বসন্ত বা রাজাব মাস। ইহা প্রথম সাক্ষাতের জন্য ('উমরা বা ই'তিমার-এর জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট মাস) পবিত্র কা'বাতে প্রথম একবার আগমন করিবার পরে ইহা করিতে হইত। খুব সম্ভবত ওয়া'দ ও ইখ্‌লাফ আরব প্রেমিকের এই অনুসন্ধানের বিপদ-আপদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তী কালের সাহিত্যে হয়ত তাহাই হয় 'হৃদয়ে'র সন্ধান।

এই সকল দ্রুতগামী কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত ইঙ্গিত হইতে আমরা কিছুটা সম্ভাবনার সঙ্গে ধারণা করিতে পারি যে, "আরব প্রেম"-এর সঙ্গে "আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে"-এর মিল ছিল অন্তত শব্দগত গঠনের দিক হইতে; উহার সঙ্গে ভিন্ন গোত্রের একজন নারীর উপস্থিতির সম্পর্ক ছিল, সেই নারী রহস্যজনকভাবে প্রেমিককে আবদ্ধ করিয়াছিল। উহা কত কালের জন্য এবং উহার সঠিক প্রকৃতি কি ছিল তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে, তাহা সেই একই tabu (পবিত্র বা অপবিত্র বলিয়া পরিগণিতা)-এর

কারণে যাহা "হৃদয়ের বিষয়"-কে প্রভাবিত করিত। যে সকল ক্ষেত্রে প্রেমের কবিতাতে বেদুঈন গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলা হয় এবং যেক্ষেত্রে উহা শহরের কবিতা, সঙ্গীত ও ধর্মীয় শব্দাবলীর মিলিত প্রভাবের নিকটে টিকিতে পারে নাই সেখানে tabu আর কার্যকর হয় নাই। গোত্রীয় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, যে সকল কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকানো অপেক্ষা অতীতের দিকে তাকানো পছন্দ করিতেন উহার ব্যতিক্রমী কবি ছিলেন 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ—তাঁহারা বেদুঈন প্রেমের প্রধান উৎস হৃদয়ের দিকেই ভাব পরিবর্তিত করেন, কিন্তু উহাকে নিতান্ত উপমা-উৎপ্রেক্ষাতে দুর্বল করিয়া দেন। নিম্নলিখিত ধারণাগুলি রহিয়া গিয়াছে ঃ (১) এখন কবির হৃদয়ই, যাহা সব সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বা দেশান্তরে থাকে, প্রেমিকাকে "খুঁজিয়া বেড়ায়"। (২) আবেগ-উচ্ছ্বাসের অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির ও গোপনীয়তার ক্ষেত্র হওয়া হেতু হৃদয় হইয়াছে রাজদরবারের ভাষায় অবিচ্ছেদ্য অংশ, একই সঙ্গে আবার আত্মবিশ্বাসী ও কার্যের সংগঠনকারী। স্বাভাবিকভাবেই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইবে যখন আমরা হিজাযের কবিতার পরে ইরাকের কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

হৃদয় এক অনিঃশেষ অনুসন্ধান পথে ধাবমান, তাহার প্রেমিকা যে কাফেলাতে সফর করিতেছে সে উহারই পিছনে চলিয়াছে [দ্র. (১) আল-মারযূকী, হামাসা, ১খ, ৫১; (২) আস্-সার্‌রাজ, মাসারি', কালবু মান তায়্যামু, ১৪১; (৩) জামীলা, দীওয়ান, সম্পা. নাসসার, ১১৮; (৪) আল-'আব্বাস, ২৩২]। এই হৃদয়কে বলা হয় মুর্‌তাহিন (দ্র. 'উমার, ১৭৯ ও ২৯৫), কারণ এখন আর পরিষ্কারভাবে জানা যায় না যে, ইহা কোথায় বিচরণ করে এবং সেই অনিশ্চয়তার কারণে হতভাগা কবি চিরকাল স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। কবির দেহ হইতে এবং তাঁহার দলের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় (ইনসাদাআ) অথবা ইহা শূন্য দিয়া উড়িয়া যায়, এমন এক প্রবল ভাবাবেগের মধ্যে গিয়া পড়ে যে, ইহা তখন আর ইহার নিজের প্রকৃত দেশ চিনিতে পারে না (দ্র. মারু', পৃ. ১৮৫)। এই প্রতীকটি পরবর্তী কালে ব্যবহার করেন সূফী কবি জুনায়দ (দ্র. আদ্-দায়লামী, 'আতফ, পৃ. ৩২)।

এইরূপ স্থায়িত্বহীনতা, যাহার উদ্ভব হইয়াছে বাসস্থানের অনিশ্চয়তা হইতে এবং ইহার প্রকৃত অবস্থান যে কোথায় তাহার অনিশ্চয়তা হইতে, তাহা হৃদয়কে যাযাবর করিয়া দেয়। তাহার কোন পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত চারণভূমি নাই এবং তখন সে ঋতুর খামখেয়ালির অনুসরণ করিতে বাধ্য হয় (মিতবা'উ'ল্-ওয়াতান, 'উমার, ২৭৯)। কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে এই পরিস্থিতিটি হইল তাতায়্যুম বা দেশান্তরী গোলামী [দ্র. (১) 'উমার, পৃ. ১৯২; তু. আদ-দায়লামী, পৃ. ২৩, হুসাম-এর সমার্থবোধক ব্যাখ্যার জন্য]। ইহা সিবা বা আবেগের আহ্বান (মুনশিদকে যে চিহ্ন বা নিদর্শন দেওয়া হয় উহার পরেই ইহা), ইহা বিদ্যুতের ঝলকানি, পাখীদের ভাষা, এইগুলি হৃদয়কে সঠিক পথে রাখে। ভবঘুরে ও যাযাবর হৃদয় আবার একই সঙ্গে প্রেমের জালে আবদ্ধ, যাহার কারণে ইহা ক্রমাগত ওয়াস্‌ল বা সিসাল-এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে (ইহার অর্থ নারীর অনুগ্রহ বা ভালবাসা, আদিতে অর্থ ছিল নারীদের দলের মধ্যে মিশিয়া যাওয়া; দ্র. (১) 'উমার, পৃ. ২৯৫, ইহার একটি সমার্থক শব্দ মাওয়াদ্দা, ব্যবহার করিয়াছেন; (২) আবূ নুওয়াস, পৃ. ৭০৪; তু. (৩) 'উমার, পৃ. ২২২ ও ৩২৬। এই তালাব বা খুঁজিয়া বেড়াইবার সময়ে (পবিত্র এলাকায় আটক এক হরিণ) প্রেমিকা নারী তাঁহাকে শিকারের জন্য খুঁজিয়া বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তাহার নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হইয়া তিনি ধরাশায়ী হন—সম্ভবত সেই সকল প্রাণীর ন্যায় যেগুলিকে আর হিমা-এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় নাই (দ্র. 'উমার, পৃ. ৩১৯, মুসায়্যাদ-এর সঙ্গে মুতায়্যাম, দ্র. ঐ. পৃ. ৩৬০। প্রেমিকা নারী নিজেই হরিণীসম হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়কে শিকার করিয়া থাকে)।

যে হৃদয়কে এত কঠোর আঘাতের (মুসাব) জন্য বাধ্য করা হইয়াছে তাহা প্রেমকাতর এবং নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন মু'আল্লাক ও মুওয়াক্কাল, পৃ. ৩৬২)। এই প্রতীকগুলি প্রেমিক অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি হৃদয় এবং প্রেমিকা নারীর মধ্যে পরস্পর পরিবর্তনশীল; আহত পরাভূত জন তাহার আঘাতদানকারী বা কারিণীর স্বভাব ও গুণাবলী লাভ করে এবং অপরজন ও তাহাই পায়। এই কারণেই কবি ঘোষণা করিতে পারেন যে, প্রেমিকা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন (ঐ, পৃ. ৩৫৫), খোদ হৃদয়ই তখন পবিত্র খাঁচা হইয়া যায়, উহার ভিতর প্রেমিকা খেয়াল-খুশীমত বিচরণ করে। প্রেমিকা নারী কবির হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান বা "সর্বোচ্চ স্থান" অধিকার করিয়া থাকে ('উমার, পৃ. ১৯০; মুহতাল্লান, রাফীআন)। সেখানে প্রেমিকা ঠিক যাহা খুশী তাহাই করিতে পারে। সে তখন জানে যে, সে বিজিত দেশে রহিয়াছে (আবাহাত উম্ম হাযরা মিন ফু'আদী শি'আবু'ল-হুব্ব, জারীর, পৃ. ৬৫; তু. আল-'আব্বাস, পৃ. ৩৯, ১৯১; আবূ নুওয়াস, পৃ. ৪৯৭)। প্রেমের 'সন্ধান'-এর শেষে নারী বিভিন্ন উপায়ে হৃদয় অধিকার করিতে পারে (যাদুবিদ্যা, শিকার বন্দী করা, বন্দীদশা শৃঙ্খলিত, দায়ে বাঁধা, দড়ি দিয়া বাঁধা, জালে আটকানো, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা, ঋণে বাঁধা, সকল প্রকার দায়-দায়িত্বে আটকানো; এইগুলি হইল অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যাইবার পরিণাম, উহা হইল 'সন্ধান' যাহা প্রেম সম্বন্ধে আরব ধারণাতে অন্তর্নিহিত থাকে)।

তথাপি আরও গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক উপায় দ্বারা যাহা হৃদয়কে অনেক 'পর্দা' প্রদান করিয়াছে [দ্র. (১) আল-হামদানী, আল-আলফায়ু'ল-কিতাবিয়্যা, বাব সামীমি'ল-কালব; (২) দায়লামী, 'আত্ফ, পৃ. ১৬; (১৬) আশ্-শারীফ আল-মুরতাদা, ১খ., ৮৬], এইরূপ ধারণা করা যায় যে, হৃদয় প্রেমিকাকে বা তাহার ছায়াকে (এখানে তাঁবুর একটু চিহ্ন পাওয়া যায়) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধারণ করে।

ফলে প্রেমাপ্লুত হইয়াছে—যাহা অধিকতর অন্তরের বিষয়, অধিকতর সম্ভ্রমযুক্ত বা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন—ইরাকের শহর হইতে আগত কবিগণকে (যেমন আল্'-আব্বাস ইবনু'ল-আহনাফ; খাযরাজী সংস্করণে পঞ্চাশটি উদাহরণ; রোমান্টিক নায়কগণের দীওয়ান ধরনের কাব্যসমূহ) নিজেই হৃদয়ের প্রতি তাকাইবার কালে অবশ্যই সমঝোতা করিয়া নিতে হইবে।

হৃদয় হইল প্রেমের স্মৃতির আসন (দ্র. আল-'আব্বাস, পৃ. ১৮২)। স্মৃতি আর প্রেম সমার্থক (২৮১ "আমি বিস্মিত হই যে, কোন্ হৃদয় তোমাকে ভালবাসিতে পারে")। প্রেমিককে প্রেমিকা নারীর সঙ্গে তুলনা করিবার অর্থ এই যে, ইহা তাহাদের উভয়ের হৃদয়ের অবস্থার তুলনা (ঐ, পৃ. ৫৩, "আমার হৃদয় যদি তোমার হৃদয়ের মত হইত")। হৃদয়েই কামনার আগুনে (নীরান) পুড়িবার অভিজ্ঞতা হয় (কাদ আহ্‌রাকাত নীরানুহ্ কালবী)। প্রেমিকা নারী সর্বেসর্বা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় প্রেমিকের হৃদয় শাসন করিয়া থাকে (ঐ, পৃ. ১৬)। স্মৃতি ও প্রেমিকার চেহারার মধ্যে সামান্যই তফাত জ্ঞান করা হইয়া থাকে, প্রেমিকার রূপ যে হৃদয়ে থাকিবে সেখানে

আর কোন বস্তুর স্থান হইবে না (ঐ, পৃ. ১৯)। অপরপক্ষে হৃদয় ভাঙ্গিবার বা তাহাতে ফাটল ধরাইবার চেষ্টা (সূদ্', ফুতূর) হয় কমই। উহা হইল প্রেমিকের অশান্ত জীবনের এবং স্বীয় গোত্র হইতে তাহার বিচ্ছিন্ন হইবার প্রতীক।

এই সময় হইতে আরবী কবিতাতে হৃদয়কে এমন এক গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাহার বৈশিষ্ট্য হয় মার্জিত মানসিকতা। কিন্তু হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও সমস্যাও ছিল, সেইগুলি ভাবতাত্ত্বিক ও কবি উভয়কে ভাবাইয়া তোলে। প্রথম, হৃদয় যেহেতু প্রেমের মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন প্রশ্ন উঠে যে, ইহার সঙ্গে চক্ষুরও কোন অংশ রহিয়াছে কিনা, চোখের চাহনির ভঙ্গী কবিকে আহত করিয়াছিল। এই প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তাহা হইল ভালবাসার পাত্রের "চাহনির (বা কটাক্ষের) কামুকতা", যাহা মার্জিত নীতিবোধের প্রধান উদ্দেশ্য। কটাক্ষের অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া অর্থ কঠোর নৈতিকতাকে অত্যাবশ্যক বলিয়া তুলিয়া ধরা। সে অনুযায়ী প্রেমিক এবং সম্ভবত রাজসিক প্রেমকেও সামাজিক বিধানের নামে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হয়। হৃদয়ের নির্ধারণকারী না হইলেও প্রধান ভূমিকার কথা বলিতে যাওয়ার (হৃদয় চক্ষুর সাহায্য ছাড়াই গভীর-সাহিত্যানুরাগের সহায়তায় চেহারা গঠন করিয়া নিতে পারে) অর্থ আবেগের শক্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং অবাস্তব কিছু দ্বারা ইহাকে যুক্তিসঙ্গত করা, আর উহাই ছিল ইব্‌ন দাউদ কর্তৃক প্রচারিত জাহিরী কলঙ্কের মূল বিষয়। এই বিতর্কের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করা কঠিন; ইহার প্রভাব ইতোমধ্যেই ৩য়/৯ম শতকের ইরাকী 'ধাঁধা' ও কিস্সা-কাহিনীতে পড়িয়াছিল।

এইরূপ হইতে পারে যে, বীরত্ব ও প্রেমকাহিনীর নায়কদের বিষয়ে রচিত কিছু সংখ্যক কাহিনী কাব্য হইতে এই মূল বিতর্কের পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর একটি বিষয় যোগ করা যায় যে, সূফীবাদ ও ধর্মতত্ত্ব উভয় ক্ষেত্রেই হৃদয়ের দৃষ্টির ধারণাকে প্রধান করিয়া ধরা হয় (আদ-দায়লামী, পৃ. ৮৫)। সর্বশেষ হৃদয়ের উপরে অঙ্কিত প্রেমিকার স্মৃতি–সন্দেহ নাই যে, ইহা একটি ঐতিহ্যগত রূপকথা। কিন্তু ইহা গভীরভাবে অনুভূত হইত— এই আবির্ভাবমূলক ধারণাকে আল্লাহ্‌র ধারণার সঙ্গে একীভূত করিয়া লইত এবং প্রবল কামনা যাহা ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক এই উভয় ধরনের ইসলামী চিন্তাতে অনুসন্ধান করা হইত (এখানে রু'য়া-এর প্রাধান্য রহিয়াছে ঃ আল-কুশায়রীর রিসালার শেষ অধ্যায়ে রহিয়াছে যে, রু'য়া হাসানা 'হৃদয়ে' অধিষ্ঠিত, উহাকে সূফীতাত্ত্বিক সালিমিয়্যা মতে মনে করা হয় ফেরেশতাগণের "আবাস স্থল", আবূ তালিব আল-মাক্কী, ১খ., ১৩১)। হৃদয়ের দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি যেইগুলি হৃদয় সম্বন্ধে একটি নূতন ধারণার আলোকে বা অন্তত একটি উদারতর ধারণার আলোকে পরস্পর যুক্ত বা সম্পর্কিত, তাহা প্রাচ্যদেশের শিষ্ট ও মার্জিত প্রেমের উপরে ছায়াময় অস্পষ্টতা এবং স্বপ্নময় ব্যাপ্তি প্রদান করিতে সাহায্য করে, পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষককে তাহা আকর্ষণ করে।

কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে, কাল্‌ব বা হৃদয়ের প্রসঙ্গ শুরু হয় বেদুঈন প্রেম দ্বারা, তবে সেই বিষয়ে সামান্যই জানিতে পারা যায়। আরও জানা যায় যে, ইহা মর্যাদা পরিবর্তনের প্রশ্ন ছিল, সেখানে পবিত্র বিষয়াদি ইতোমধ্যেই গোত্রীয় রীতিনীতিতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। শহরের কবিতাতে হৃদয় কালক্রমে মনে হয় যেন কাব্যিক প্রকাশভঙ্গীর মুখ্য বিষয়; পরবর্তীকালে অন্যান্য এবং আরও বেশী জটিল প্রভাবে হৃদয় হয় প্রেমের স্মৃতির নির্ধারিত আসন এবং প্রেমিকার দৃষ্টি। এই "হৃদয়ের দৃষ্টি", যাহা একটি অতি উন্নত ও বিকশিত সভ্যতার ফসল ছিল, তাহা প্রাগৈতিহাসিক আরব সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণার প্রতি কতটুকু বিশ্বস্ত ছিল, আরবী ভাষাতে উদ্ভূত পরিষ্কার মার্জিত রুচিবোধ লইয়া রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা নির্ধারণ করা কোন ছোট সমস্যা নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাল্‌ব শব্দটি ব্যবহারের উদাহরণ ঃ (১) মুফাদ্দালিয়্যাত, সম্পা. আহমাদ শাকির, পৃ. ৯৩, ৩০১; (২) যুহায়র, সম্পা. Ahlwardt, পৃ. ৯১; (৩) জারীর, সম্পা. আস্-সাকী, পৃ. ৬৫, ৯১, ১০০, ১৪৭. ১৫৯, ১৮১, ২১০, ২২৭, ২৪০, ২৫৭, ৩০০, ৩০১, (৪) 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ, সম্পা. 'আবদু'ল-হামীদ, পৃ. ৬৭. ৮৪, ১০৫, ১৬০, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৫, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ২০১, ২০৩, ২১৭, ২১৯, ২২২, ২২৫, ২২৭, ২২৯, ২৭৯, ২৯৫, ৩১৯, ৩২৩, ৩২৬, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬২। কবির অবস্থা ও হৃদয়ের 'বন্দীত্ব'-এর মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্কে বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (৫) J. C. Vadet, L'esprit courtois en Orient dans les cinq premiers siecles de l' Hegire, Paris 1968, 61। 'শিষ্টতা' বা মার্জিত আচরণের ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভূমিকার বিষয় জানিবার জন্য দ্র. (৬) Vadet, পৃ. গ্র. এবং (৭) ইব্‌ন দাউদ, ই'তিলালু'ল-কুলূব, পাণ্ডু বুরসা ১৫৩৫ খৃ., বিশেষ করিয়া (৮) ইবনু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, রাওদাতু'ল-মুহিব্বীন, সম্পা. 'উবায়দ, পৃ. ১০৪ (হৃদয় ও চক্ষুর মধ্যে মুনাজারা)। মুন্‌শিদ ও ইন্‌শাদ-এর মূল অর্থ কি ছিল তাহা জানিবার জন্য দ্র. (৯) আগানী গ্রন্থে 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আ-এর প্রণয়োপাখ্যান, ১খ., ১৯৯; (১০) দায়লামী, 'আতফ, ৮৮, ইহা য়ামীন ও মুনাশাদা-র মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে স্বীকৃত নিবন্ধ।

J. C. Vadet (E. I.[2])/ হুমায়ুন খান

কাল্‌ব ইব্‌ন ওয়াবারা (كلب بن وبرة) ঃ কুদা'আঃ (দ্র.)-গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল, বানূ কাল্‌ব-এর পূর্বপুরুষ। তাহার মাতা উম্মু'ল-আসবু' (পশু-মাতা)-এর এই প্রকার নামকরণ হইয়াছিল, কারণ তাহার পুত্রদের সকলেরই নাম ছিল বন্য জন্তুর নামের অনুকরণে (T. Noldeke Neue Beitrage, ৭৫ প.)। বংশক্রমিক পদ্ধতি অনুযায়ী (ইবনু'ল-কাল্‌বী, জামহারাতু'ন-নাসাব ইত্যাদি) কাল্‌বগণ ছিল য়ামানী বংশোদ্ভূত কিন্তু সময় সময় তাহারা রাজনৈতিক কারণে নিজেদের উত্তর আরবীয় বা এমনকি কুরায়শ বংশীয় বলিয়াও দাবি করে।

১. প্রাক-ইসলামী যুগ ঃ ইহাদের শ্রেষ্ঠতম দলপতি ছিলেন যুহায়র ইব্‌ন জানাব এবং উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রসমূহের মধ্যে তাঁহার প্রচণ্ড কর্তৃত্ব ও প্রভাব বর্তমান ছিল। এই কারণে আব্‌রাহা (দ্র.) তাঁহাকে বাক্‌র ও তাগলিবগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রেরণ করে (আগানী, সম্পা. Brunnow, ৯৫; ইব্‌ন কুতায়বা, সম্পা. de Goeje, ২৩৩)। হযরত মুহাম্মাদ (স) যে সালে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সালের আবরাহা ইনি হইতে পারেন না; সম্ভবত ইনি ছিলেন য়ামান-এর একজন পূর্বতর প্রশাসক। যুহায়র-এর উত্তরসুরিগণের তালিকা আগানীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সম্পা. Brunnow, ১০২ প., ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন য়াযীদ ইবনু'ল-মুহাল্লাব (মৃ. ১০২/৭২০)-এর সমসাময়িক। পরবর্তীতে যুহায়রকে "দীর্ঘ জীবন লাভকারী" (মু'আম্মার)-গণের একজনরূপে উপস্থাপন করা হয় এবং তিনি তাঁহার কাব্যে তাঁহার হারানো তারুণ্য সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন (আবূ হাতিম, In Goldziher, Abhandlungen,

২খ, ২৪; আস-সায়্যিদ আল-মুরতাদা, আমালী, ২খ, ১৭২-৬)। সামাওয়াত কাল্‌ব (য়াকূত, ৩খ, ১৩১ ইত্যাদি) নামে পরিচিত, কাল্‌বগণের (তাহারা ছিল বিখ্যাত উষ্ট্র পালক, উদা. দ্র. আগানী, ৭খ, ১০৯, ১, ৪) পশুচারণ ভূমি ছিল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্তেপ ভূমিতে অবস্থিত। এখানে জাওয়াফ (দ্র.) ও ওয়াদী সিরহান (দ্র.)-এর দ্বারা গঠিত নিম্ন উচ্চতার অববাহিকায় (আল-খাব্‌ত) অবস্থিত মরূদ্যানসমূহ ছিল তাহাদের কেন্দ্র। ফলে মুসলিমগণ সিরিয়া বিজয়ের বহু পূর্বেই সিরিয়ার পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায় (হামাসায় উদ্ধৃত কবিতাবলী দ্রষ্টব্য, Freytag, পৃ. ৬৫৯ ও Wellhausen, Das arab., Reich., ৮৩, নং ২)।

এইভাবে, তাহারা সালামিয়্যা, পালমিরা, দামিশক [বিশেষত গূতা (Ghuta) ও আল-মিযযা অঞ্চল], জাওলান, আস-সুওয়ায়দা' এবং হাররান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাহারা হিম্‌স, আলেপ্পো, হামাত ও মানবিজ অঞ্চলেও স্বল্প সংখ্যায় বসবাস করিত। ইহা ছাড়া তাহারা ফাদাক, দূমাতু'ল-জানদাল, তায়মা' ও আল-হীরা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং আল-কালকাশান্দী (কালা'ইদু'ল-জুমান, ৪৭) ও ইব্‌ন খালদূন ('ইবার, ২খ, ৫২১)-এর মতে "কনস্টানটিনোপল উপসাগর" (আল-খালীজু'ল-কুসতানতীনী, তৎসহ পারস্যে শীরায ও মিসরের মানফালূতেও তাহারা বহু সংখ্যায় বর্তমান ছিল। সিরিয়াতে, বায়যান্টায়নীগণ তাহাদেরকে তাহাদের গোত্র প্রধান (Phylarchs) গাসসানী (দ্র.)-গণের অধীনে ন্যস্ত করে এবং তাহাদের দায়িত্ব ছিল সাসানী ও আল-হীরার আক্রমণের বিরুদ্ধে সিরীয় Limes-কে প্রতিরক্ষা প্রদান করা। এইভাবে কাল্‌বগণ সামরিক শৃঙ্খলা, আইন ও শাসনে ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া উঠে। গাসসানীগণের ন্যায় তাহারাও মনোফিসাইট খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

কাল্‌বগণের সহিত মুসলিমগণের প্রথম সংঘর্ষ সংঘটিত হয় আনুমানিক ৬/৬২৭ সালে, মুহাম্মাদ (স) দূমাতু'ল-জানদাল (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করিলে ইহার সূত্রপাত হয় এবং পরিণতিতে আল-আসবাগ ইব্‌ন 'আমর-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (ইব্‌ন সা'দ, ১/২খ, ৩৬; দ্র. J. Sperber, in MSOS As, ১৯ খ, ১৯১৬ খৃ.)। পূর্ব হইতেই, মক্কাতে কতিপয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাল্‌ব বাস করিতেছিল, যথা মুহাম্মাদ (স)-এর পালক পুত্র যায়দ ইব্‌ন হারিছা (দ্র.) ও দিহ্‌য়া আল-কালবী (দ্র.)। ৮/৬৩৯ সালে কাল্‌বগণ মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া তাহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে। তথাপি এইরূপ ধারণা করা হয় যে, ইহাদের অধিকাংশই সিরিয়া বিজয়ের অভিযানে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধের মূল ভাষ্যে দ্রষ্টব্য; অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে নিম্নোক্ত সূত্রসমূহের নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য ঃ তাবারী য়া'কূবী, মাস'উদী, ইবনু'ল-আছীর, ইব্‌ন দুরায়দ, আল-ইশতিকাক, আগানী (তালিকা), ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ (ম. শাফী'কৃত নির্ঘণ্ট), হামদানী, সম্পা. D. H. Muller (BGA, 8), আল-বাক্‌রী, য়াকূত-এর The Naka'id of Djarir and al-Farazdak, সম্পা. Bevan; আল-মুবাররাদ, কামিল, সম্পা. Wright; Wustenfeld, Register ২৬৪-৬; W. Caskel, Gamharat an-nasab, Das genealogische WerK des Hisam b. Muhammad al-Kalbi, ২খ, ৩৬৯। তাহাদের কথ্য ভাষার জন্য দ্রষ্টব্য Reste altarabischer Dialekte, in WZKM, ৪৭-৪৯ (১৯৪০-৪২ খৃ.) (অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য; আল-জাবিয়া, বানু'ল-মুহাল্লাব)।

J. W. Fuck(E. I.[2]) মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

২. ইসলামী যুগ ঃ উমায়্যাগণ ও কাল্‌বগণের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের অতীত ইতিহাস খলীফা 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) (উপরে দ্রষ্টব্য)-এর সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মু'আবিয়া (রা) কাল্‌ব অভিজাত বংশীয় উনায়ফ (দ্র.)-এর কন্যা মায়সূন (দ্র.)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সিরিয়াতে কাল্‌বগণ প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হওয়ায় স্বদেশে তাঁহার নিজস্ব অবস্থান সুরক্ষিত করিতে এবং 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর সহিত যুদ্ধে নিজেকে প্রস্তুত করিতে তাহাদের উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইরূপ সার্বিকভাবে য়ামানীগণ, বিশেষভাবে কাল্‌বগণ সিরিয়াতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রে পরিণত হয়। মু'আবিয়া (রা) ও তাঁহার পুত্র য়াযীদ, যিনি তাহার পিতার ন্যায় কাল্‌ব গোত্রীয় জনৈক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার ও ২য় মু'আবিয়া (দ্র.)-র রাজত্বকালে ইহারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রে পরিণত হয়।

স্বার্থের সংঘাতের ফলে কাল্‌ব ও কায়্‌সগণ (দ্র.) রাজনৈতিক দলসমূহকে সমর্থন দান করিতে শুরু করে। ১ম য়াযীদ-এর মৃত্যুর পরবর্তী সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত হয়, সেই সময় কাল্‌বগণ উমায়্যাগণকে সমর্থন প্রদান করে। এই সমর্থন প্রদানের হেতু ছিল তাহাদের আমলে কাল্‌বগণের ভোগকৃত সুবিধাজনক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। অপর পক্ষে কায়সগণ ইবনু'য-যুবায়র (দ্র.)-কে তাহাদের সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করে; তাহারা উদ্দেশ্যের প্রতি তাহাদের অনুরুক্তির তুলনায় উহাদের সমর্থন প্রদানকারী কাল্‌ব ও উমায়্যাগণের প্রতি তাহাদের ঘৃণাই ছিল প্রধান কারণ। মাস'উদী উল্লেখ করিয়াছেন (মুরূজ, ৫খ, ২০০) যে, মারওয়ান (দ্র.)-কে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করিবার পূর্বে কাল্‌বী হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বাহ্‌দাল-এর নেতৃত্বে আল-য়ামান শর্ত আরোপ করেন যে, ১ম মু'আবিয়া, ১ম য়াযীদ ও ২য় মু'আবিয়া-র অধীনে তাহারা যে সকল বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত তাহা তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে ছিল, প্রতি বৎসর তাহাদের মধ্যে ২ হাজার জনকে তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য দুই হাজার দিরহাম প্রদান করিতে হইবে এবং যদি কোন গ্রহীতার মৃত্যু হয় তবে তাহার পুত্র অথবা সম্পর্কিত ভ্রাতা এই অর্থ লাভ করিবে। কাল্‌বগণ রাষ্ট্রীয় সভায় অগ্রাধিকার লাভ করিবে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহাদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। এই সকল শর্তের প্রতিটিতেই মারওয়ান তাহার সম্মতি প্রদান করেন। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই মার্‌জ রাহিত (দ্র.)-এর যুদ্ধে (৬৪/৬৮৩) কায়সগণ ইবনু'য-যুবায়রকে তাহাদের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে, অপরদিকে কাল্‌ব ও অপরাপর য়ামানীগণ মারওয়ান-এর পক্ষ গ্রহণ করে। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কায়্‌সগণের জন্য এক শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়; কায়্‌সগণ এই পরাজয় কখনই বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহা তাহাদের ও কাল্‌বগণের মধ্যে বিরাজমান সংঘাতকে আরও অধিক গভীর করিয়া তুলে। 'আবদু'ল মালিক (দ্র.)-এর রাজত্বকালে তাহাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদসমূহের ইহা ছিল একটি কারণ; তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সময়কালে কায়্‌সগণ রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে তাহাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পাইয়াছিল।

এইরূপ একটি সুযোগ আসে খাযির-এ অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সময় (৬৭/৬৮৬)। এই সময় সিরীয় বাহিনীতে কার্যরত কায়সগণের সহিত এক সঙ্গে অবস্থানরত 'উমায়র ইবনু'ল-হুবাব আস-সুলামী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। ফলে এই যুদ্ধে ইরাকীগণের জন্য বিজয় অর্জিত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যের পর 'উমায়র কায়সগণের নেতা যুফার ইবনু'ল-হারিছ আল-কিলাবী-র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেষোক্তজন মারজ-রাহিত-এর যুদ্ধের পর হইতে কারকীসিয়া'-তে উমায়্যাগণের বিরুদ্ধে নিজ অবস্থান রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার পর হইতে কাল্ব ও কায়সগণের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের সূত্রপাত হয়, যাহা আয়্যাম (দিন) নামক স্বল্পকাল স্থায়ী ঝটিকা আক্রমণের রূপগ্রহণ করে এবং যাহা সাধারণত যেই এলাকায় ইহা সংঘটিত হইত সেই নামে পরিচিত হইত।

যুফার ও 'উমায়র উভয়েই সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে অবস্থিত সামাওয়া মরুভূমিতে বসবাসরত কাল্বগণের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতে শুরু করেন এবং কাল্বগণ হুমায়দ ইব্ন হুরায়ছ ইব্ন বাহদাল-এর নেতৃত্বে এই সকল আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করিতে থাকে। যাহা হউক সার্বক্ষণিক এই কায়সী আক্রমণের ফলে শেষ পর্যন্ত কাল্বগণকে এই এলাকা পরিত্যাগ করিয়া ফিলিস্তীন-এর আল-গাওর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য করে। এইভাবে কায়সগণ এই এলাকায় অপ্রতিহত প্রাধান্য অর্জন করে।

ইহার পরও কাল্ব-কায়স সংঘাত একটি নূতন এলাকায় সংঘটিত হইতে থাকে। জাযীরা অঞ্চলে কায়সগণের উপর হুমায়দ ইব্ন হুরায়ছ-এর পরিচালিত আক্রমণসমূহ ইরাকে বানূ ফাযারা (দ্র. ফাযারা)-গণকে উত্তেজিত করিয়া তোলে এবং তাহারা খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের নিকট অভিযোগ পেশ করে। ইহার ফলে নূতন কয়েকটি আক্রমণের সূত্রপাত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাতটি ঘটে বানাত কায়নে এবং ইহাতে কায়সীগণ বিজয়ী হয়। 'আবদু'ল-মালিকের গৃহীত প্রাজ্ঞ ও সুচিন্তিত ব্যবস্থাসমূহের ফলস্বরূপ এই প্রকারের আক্রমণ বন্ধ হইয়া যায় এবং বানাত কায়ন-এর দিনটিই ছিল কাল্ব ও কায়সীগণের দিনগুলির মধ্যে শেষ বিখ্যাত 'দিন'।

উমায়্যা ও 'আব্বাসীগণের মধ্যে সাময়িক সংগ্রামের সময় (১৩২/৭৫০) বসরার উমায়্যা গভর্নর সাল্ম কুতায়বাকে সাহায্য প্রদান করিতে প্রেরিত ২ হাজার কাল্বী দলত্যাগ করে এবং 'আব্বাসীগণের পক্ষ অবলম্বন করে। ইহা সম্ভবত এই কারণে সম্ভব হয় যে, মারওয়ান প্রায় সম্পূর্ণভাবে কায়সিগণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন অথবা কাল্বগণ এই সময়ে উপলব্ধি করিতে পারে যে, উমায়্যাগণকে সমর্থন করা আর লাভজনক নয় এবং সেইজন্য তাহারা নূতন শাসকগণের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। তাহা সত্ত্বেও এই একই বৎসরে কাল্বগণ অন্যান্য য়ামানীর সহিত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী (দ্র.)-র নেতৃত্বাধীন 'আব্বাসী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবু'ল-ওয়ারদ-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। ইহা ছিল সম্ভবত নূতন শাসকচক্রের প্রতি তাহাদের হতাশার ফল।

হারূনু'র-রাশীদ (দ্র.)-এর রাজত্বকালে দামিশক য়ামান ও মুদার-এর দুইটি বিবদমান অংশের মধ্যে উপজাতীয় দ্বন্দ্বের অকুস্থল হইয়া পড়ে। স্বল্পকাল স্থায়ী বিরতিসহ ইহা ১৭৪/৭৯০ হইতে ১৮০/৭৯৬ সাল পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান হেতু ছিল উমায়্যাগণের প্রতি সিরীয় আরব উপজাতিটির সহানুভূতি এবং 'আব্বাসী প্রশাসকের গৃহীত নীতিসমূহ তাহাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। 'আব্বাসী প্রশাসকগণ এক পক্ষের বিরুদ্ধে অপর পক্ষকে সমর্থন দান করিতে থাকে। আল-মা'মূন (দ্র.)-এর রাজত্বকালে মিসরে অবস্থিত য়ামানীগণের ব্যাপার লইয়া (২১৩/৮২৮) এই দ্বন্দ্ব পুনরায় শুরু হয়।

ইহার পরে 'আব্বাসী যুগে কাল্বগণের ইতিহাসের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে এবং তখন তাহা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত বেদুঈন (আ'রাব) আক্রমণের রূপ গ্রহণ করে। প্রধান প্রধান ঘটনা হইতেছে ঃ 'উতায়ফ ইব্ন নি'মা-এর অধীনে কাল্বগণ গভর্নর আল-ফাদল ইব্ন কারিন-এর বিরুদ্ধে হিম্স-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং ২৫০/৮৮৪ সালে তাহাকে হত্যা করে। কিন্তু আল-মুসতা'ঈন-এর সেনাপতি মূসা ইব্ন বুগা আল-কাবীর বিদ্রোহীদের পরাজিত করিতে সমর্থ হন এবং হিম্স অধিকার করেন। ২৯৪/৯০৬ সালে কালবগণের আ'রাব আন-নিম্র ইব্ন কাসিত (দ্র.) ও আসাদ -এর সমভিব্যাহারে মাওসিল-এর গভর্নর আল-হুসায়ন ইব্ন হামদান-কে পরাজিত করে এবং আলেপ্পো শহরের ফটক পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। এই একই বৎসর আল-হুসায়ন ইব্ন হামদান কাল্বগণের আ'রাব এবং তায়্' (দ্র.)-গণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বন্দী হন। আল-মুসতারশিদ-এর অধীনে কাল্বগণ দামিশ্ক-এর শাসক ও আলেপ্পো-র শাসক দুবায়স ইব্ন সাদাকা-এর মধ্যে সংঘটিত বিবাদে অংশগ্রহণ করে (দ্র. মাযয়াদীগণ) এবং প্রথমজনের পক্ষে তাহাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী শেষোক্ত জনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ইহা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে, কাল্বগণের কতিপয় শাখার মধ্যে, বিশেষত বানু'ল-'উলায়স ইব্ন দামদাম ও তাহাদের মওয়ালীগণ, যাহারা সামাওয়া মরুভূমিতে বসবাস করিত তাহাদের মধ্যে কারমাতী প্রচারণা সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয়। ২৮৯/৯০১ সালে তাহারা কারমাতী প্রচারণাকারী য়াহ্য়া ইব্ন যাকরাওয়ায়াহ্-এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে শায়খরূপে অভিহিত করে। কাল্বগণের অপর একটি শাখা বানু'ল-আসবাগও ইব্ন যিকরাওয়ায়হের সহিত যোগদান করে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা এই উদ্দেশ্যের প্রতি এত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের "ফাতিমী"-রূপে অভিহিত করিতে থাকে। তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী আল-মু'তাদিদ-এর বাহিনীকে তাহারা অতর্কিত আক্রমণ করিয়া উহার নেতা সাবুক আদ-দায়লামীকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর তাহারা দামিশক পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আর-রুসাফা-এর মসজিদটি ভস্মীভূত করে এবং অতিক্রমকালে প্রতিটি গ্রামকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। ইব্ন যিকরাওয়ায়হ্ এবং তাহার অনুসারীবৃন্দ দামিশ্ক-এর শাসক তুগজ ইব্ন জুফ্ফ (দ্র.)-কে হয়রানী করে এবং তাঁহাকে তাঁহার শহরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখে। মিসরীয়গণ ইব্ন তূলূন-এর ক্রীতদাস বাদরু'ল-কাবীর-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার পূর্ব পর্যন্ত কারমাতীগণকে পরাস্ত করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাহাদের নেতা ইব্ন যিকরাওয়ায়হ নিহত হন। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাহার মৃত্যুর জন্য সম্ভাব্য যে সকল কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার একটি হইতেছে, তাহার মাওয়ালী অনুসারিগণের জন্য গৃহীত তাহার সাম্যমূলক নীতি।

য়াহয়া-র মৃত্যুর পর বানু'ল-উলায়স ও বানু'ল-আসবাগ তাহার ভ্রাতা আল-হুসায়ন ইব্ন যিকরাওয়ায়হকে নেতারূপে গ্রহণ করে। তিনি

মিসরীয় বাহিনী ও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হিমস ও অন্যান্য মিসরীয় প্রদেশের বাহিনীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব এমনভাবে অনুভব করাইতে সক্ষম হন যে, ২৮৯/৯০১-২ সালে তাঁহাকে সিরিয়ার সর্বত্র শুক্রবারের খুতবাতে আমীরু'ল-মু'মিনীনরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য খলীফা আল-মুকতাফী তাঁহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হন এবং ২৯১/৯০৩ সালে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

আল-হুসায়ন ইব্‌ন যিকরাওয়ায়হ-এর মৃত্যুর পর বানুল-'উলায়স' বানু'ল-আস্‌বাগ ও বানূ যিয়াদ (ইহারা সকলেই কাল্‌ব গোত্রভুক্ত ছিল) অপর একজন কারমাতীয় দা'ঈ আবূ গানিম নাসর-এর সহিত যোগদান করে। তাহারা বসরা, আযরি'আত, দামিশ্‌ক ও তাবারিয়্যা-র উপর কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করে। তাবারিয়্যাতে দামিশ্‌কের বাহিনীর কিছু সংখ্যক সৈন্য তাহাদের সহিত যোগদান করে এবং তাহারা জর্দান-এর ডেপুটি গভর্নর ইব্‌রাহীম ইব্‌ন বুগামারদীকে পরাজিত ও হত্যা করে। ইহার ফলে খলীফা আল-মুক্‌তাফী আল-হুসায়ন ইব্‌ন হামদান-এর অধীনে তাহাদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। ইহারা অতঃপর সামাওয়া ও হীত অভিমুখে যাত্রা করে এবং উভয় স্থানকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন কুন্‌দাজীক-এর অধীনে অপর একটি সেনাবাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই যৌথ বাহিনীকে মুকাবিলা করিতে নিজেদের অসামর্থ্যতা উপলব্ধি করিয়া কাল্‌বগণ তাহাদের কারমাতী নেতা নাসরকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করে। তাহাদের আনুগত্যের নির্দশনস্বরূপ তাহার ছিন্ন মস্তক খলীফার নিকট বহন করিয়া তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

কাল্‌বগণ সকল সুফয়ানী (দ্র.) বিদ্রোহীদেরও সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সমর্থক ছিল। আবু'ল-ওয়ারদ (১৩২/৭৫০) ও 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (১৯৫/৮১০)-এর বিদ্রোহসমূহ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুফয়ানীগণের শেষতম অনুসারী হইবে কাল্‌বগণ—এই প্রবাদের মাধ্যমে এই সমর্থন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ তাম্মাম, নাকা'ইদ জারীর ওয়া'ল-আখতাল, ১খ, ১৬, ১৭ ২৬; (২) আল-হামাসা ঃ (সম্পা. G. H. Freytag), ১খ, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ৩১৭-৩১৯, ৪৩৫; (৩) খালীফা ইব্‌ন খায়্যাত, তা'রীখ, ১খ, ২১৯, ২৫৫, ২৫৬; (৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, ৩০৫-৬, ৩৭৩; (৫) বালাযুরী, আনসাব, ৪খ, ৬০, ৬১, ৬৫, ৫খ, ৯৯, ১০৬, ১২৭-৮, ১৩২, ১৩৮, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ৩০১, ৩০৮, ৩০৯ ৩১০, ৩১১, ৩১৩-১৪; (৬) ঐ লেখক, ফুতূহ, ১১০, ২৪৬, ২৮৬; (৭) য়া'কূবী, ২খ, ২৮৩, ৩০১, ৩০৩-৩০৪; (৮) ঐ লেখক, বুলদান, ৩২৬-৭; (৯) তাবারী, ১খ, ৬৮৬, ৭৪৯, ১৮৯৮, ২০৬৫-৬, ২০৮২, ৩০৫৬, ২খ, ২৯, ২০৪, ২০৫, ৪৭৪-৫, ৪৭৮, ৪৮০, ৪৮৩, ৩খ, ৫২-৪, ৮৩০, ৮৪৩-৫, ১৩১৯-২২, ১৫১৪, ১৫৩৩-৪, ২২১৭-২২, ২২৫৬-৯, ২২৭৭, ২২৭৮; (১০) তা'রীখু'ল-খুলাফা' (অজ্ঞাত), পত্র ৭০খ, ৯৫ক, ৯৬ খ; (১১) ইব্‌ন দুরায়দ, আল-ইশ্‌তিকাক, ৩১৮-১৯; (১২) জাহশিয়ারী, আল-উযারা' ওয়া'ল-কুত্তাব, ২৪, ২৬, ৩১; (১৩) হামদানী, ১৩৯-৩২, ২০৫-৬; (১৪) মাস'উদী, মুরূয, ৫খ, ২০০, ২০২, ৭খ, ২৪০; (১৫) ঐ লেখক, তানবীহ, ৩৭১-৬, ৩৭৭; (১৬) আগানী, ১৬খ, ৮৮, ১৭খ, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২১-৩, ৩১১, ২০ খ., ১২১-৩; (১৭) ইব্‌ন হাওকাল ৪১; (১৮) মারযুবানী, মু'জামু'শ-শু'আরা', ২৪১; (১৯) ইব্‌ন হায্‌ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, ২৬৪; (২০) বাক্‌রী মু'জাম মা ইসতা'জাম, ১খ, ২৭৯-৮০, ৪খ, ১৬০; (২১) ইব্‌ন 'আসাকির, তাহ্‌যীব, ৪খ. ১৪৫, ৪৬০, ৫খ, ৮৬, ৩৩৭, ৬খ, ১১৮; (২২) হিময়ারী, শামসু'ল' উলূম, ৪২; (২৩) য়াকূত, ১খ, ১৩১, ৩৬৯, ৪০৫, ৫৩৬, ৫৯৯, ৭০১, ৭৩৮-৯, ২খ, ৮৪-৫, ২১৭, ২৪৮, ২৬১, ৩৭৮, ৩৯১, ৪২১, ৭৪৪, ৩খ, ৩০৪, ৪১৯, ৫৭৫, ৫৮৭. ৫৯৬, ৬২৮, ৬৯০, ৬৯৪, ৭৮৩, ৮২৭. ৪খ. ৫২২, ১০২৪; (২৪) ইবনু'ল-আছীর, ২খ, ৩৯৫-৬, ৪০২, ৩খ, ৩৮০, ৪খ, ২৫৪, ৫খ. ৪০৬ ৬খ, ১২৯-৩০, ২৪৯, ৭খ, ১৩৪-৫, ৫১৪-৩, ১০খ, ৬৬৮-৯; (২৫) যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, ২খ, ৬৯, ৩খ, ১৬; (২৬) ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার, ২খ, ৯৯, ৪৯৬, ৫০৪, ৫২১, ৫৩৯, ৫৪০, ৩খ, ৪৯৯, ৫০১, ৮১০, ৫খ, ৯৩৬; (২৭) কালকাশান্দী, কালা'ইদু'ল-জুমান, ৪৬-৯; (২৮) ইব্‌ন হাজার, আল-ইসবা, ৩খ, ৩৩৭ ; (২৯) Wustenfeld, Register, Gottingen ১৮৫২-৩ খৃ., ২৬৪-৭ ; (৩০) R. W. Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, লণ্ডন ১৯০৩ খৃ., ২০০-১; (৩১) H. Lammens, Etudes sur le regne du Calife Omaiyade Mawia I, বৈরূত ১৯০৮ খৃ., ৫০-১, ২৮৬-৯৩, ৩০৯-১২ ৩২৪-৬, ৪১৮; (৩২) উ. র. কাহ্‌হালা, মু'জাম কাবা'ইল আল-'আরাব, ৩খ, দামিশক ১৯৪৯ খৃ., ৯৯১-২; (৩৩) ড. যাওয়াদ 'আলী, তা'রীখু'ল-'আরাব কাবলা'ল-ইসলাম, বাগদাদ ১৯৫০-৬০ খৃ., ৬খ, ১৫০, ১৬৮-৯, ৫খ, ৩১-৩; (৩৪) J. Welhausen, The Arab Kingdom and its Fall, কলিকাতা ১৯২৭ খৃ., ৭০-১, ১৩২-৩, ১৭৮, ১৮২, ২০১-৬; (৩৫) W. Caskel, Gamharat an-nasab: das Genealogische WerK des Hisam b. Muhammad al-Kalbi, লাইডেন ১৯৬৬ খৃ., ২৭৯, ২৮৮, ৩৬৯; (৬) A. A. Dixon, The Umayyad Caliphate, লণ্ডন ১৯৭০ খৃ., ৮৩-১২০।

A. A. Dixon (E. I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

৩. মুসলিম স্পেনে ঃ মূসা ইব্‌ন নুসায়র (দ্র.)-এর সেনাবাহিনীতে কাল্‌বী ও কায়সী উভয় গোত্রই অন্তভুর্ক্ত ছিল; তাহাদের মধ্যে মারজ রাহিত-এর স্মৃতি এক পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের জন্ম দেয় এবং তাহা ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রায় সম্পূর্ণ কালব্যাপী উভয় আফ্রিকা, বিশেষত স্পেনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মায়সারা (দ্র.) যে বারবার বিদ্রোহ শুরু করেন, তাহা দমন করিতে হিশাম ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিকের প্রেরিত সেনাবাহিনী ছিল সিরীয়গণের সমন্বয়ে গঠিত। তাহাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক বালজ (দ্র.) ছিলেন কায়সী অভিজাত শ্রেণীর সদস্য, তিনি সিউটাতে অশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্পেনের গভর্নর 'আবদু'ল মালিক ইব্‌ন কাতান, যিনি ছিলেন মাদীনী ও সিরীয় বিরোধীর নিকটে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। যথেষ্ট সময় পর্যন্ত সাহায্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার পর শেষ পর্যন্ত 'আবদুল-মালিক, বালজকে স্পেনে প্রবেশের অনুমতি দান করেন। এখানেও বারবারগণ বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল। শীঘ্রই কাল্‌ব ও কায়সগণের মধ্যে অসম্প্রীতি দেখা দেয়। বালজ 'আবদু'ল-মালিক-কে অপসারণ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার উপর অত্যাচার

চালান। বালজ-এর কায়সপন্থী নীতিসমূহ অশান্তি উদ্রেক করে। তাঁহারা উত্তরসুরি অধিবাসিগণের অপরাপর গোষ্ঠীর বিতৃষ্ণা ও ক্রোধের শিকার হন এবং তখন দামিশক-এর উমায়্যা খলীফা কাল্‌বী আবু'ল খাত্তাব আল-হুসাম ইব্‌ন দিরার (দ্র.)-কে কর্ডোভা প্রেরণ করেন। তিনি যে নীতি অনুসরণ করেন তাহা তাঁহার সহযোত্রীয়গণের অনুকূলে ছিল। তাঁহার এই পক্ষপাতমূলক আচরণের ফলে তিনি জনৈক কায়সী দলনেতা আস-সুমায়ল ইব্‌ন হাতিম (দ্র.)-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। তিনি যথেষ্ট সক্রিয়তার পরিচয় দান করেন এবং প্রশাসকের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ আরম্ভ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি কাল্‌বগণের এমনকি কতিপয় য়ামানীর (লাখ্‌ম ও জুযাম) সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১২৭/৭৪৫ সালের বিদ্রোহ সফলতা অর্জন করে, আবু'ল-খাত্তাব পরাজিত ও বন্দী হন এবং ছাবাবা ইব্‌ন সালামা আল-জুযামী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১২৯/৭৪৬ সালে ইন্‌তিকাল করেন। ইহার পর স্পেনের গভর্নর হিসাবে য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান আল-ফিহ্‌রী (দ্র.)-কে মনোনীত করা হয়। আবু'ল-খাত্তাব-এর অবশিষ্ট সমর্থকগণ পলায়ন করে এবং তাহারা ১৩০/৭৪৭ সালে সেকুনদা (শাকুনদা) নামক স্থানে একটি কায়সী দলের হাতে পরাজিত হয়। কালক্রমে তাহাদের রোষ শীতল হইয়া আসে, বিশেষত ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের মুখে তাহারা পারস্পরিক শত্রুতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বারবারগণের সহযোগিতায় য়ামানীগণ সারাগোসার প্রশাসক আস-সুমায়লকে আক্রমণ করিতে তৎপর হয়। কিন্তু কায়সীগণ তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় (১৩৭/৭৫৫)। এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করেন ভবিষ্যতের ১ম 'আবদু'র-রাহমান (দ্র.)। আপোষ আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেলে কাল্‌ব ও অন্যান্য য়ামানী উমায়্যা দাবিদারকে স্পেনে আসিতে ও তথায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে।

ইহার পরবর্তী সময়ে কায়স ও কাল্‌বগণের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা হ্রাস পায়; ক্রমশ তাহাদের মধ্যে আনদালুসীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিতে থাকে। কিন্তু তাহার পর ৩য়/৯ম শতাব্দীতেও উন্মত্ততার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে থাকে (উদা. মুরসিয়া অঞ্চলে ২০৭/৮২২ সালে যে যুদ্ধ শুরু হয় ও সাত বৎসরকাল স্থায়ী হয় তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল অত্যন্ত নগণ্য একটি অজুহাতে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., নির্ঘণ্ট।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আল-কাল্‌বী (الكلبي) ঃ কূফার একটি বিশিষ্ট বিদ্বান পরিবারের নাম। বিশর আল-কাল্‌বী ও তাঁহার পুত্রগণ আস্‌-সা'ইব, 'উবায়দ ও 'আবদু'র-রাহমান হযরত 'আলী (রা)-র পক্ষে উষ্ট্রের (আল্‌-জামাল দ্র.) যুদ্ধে (৩৬/৬৫৬) অংশগ্রহণ করেন। আস্‌-সাই'ব ইব্‌ন বিশ্‌র-মুস'আব ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং কূফাবাসীদের অনেকের দলত্যাগ সত্ত্বেও ৭১/৬৯০ সালে দায়রু'ল-জাছালীক (দ্র.) নামক স্থানে ওয়ারকা' আন-নাখা'ঈ কর্তৃক তাঁহার [মুস'আব (রা)-এর] পাশে থাকিয়াই তিনি নিহত হন। [মনে হয় আত-তাবারী, সম্পা. এম. ইবরাহীম, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ৬খ, ১০৩, তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৬৭/৬৮৬ সালে স্থাপন করেন এবং ইহা মুস'আব ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) ও আল-মুখ্‌তার-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে নির্দিষ্ট করেন। ঘটনা যাহাই হউক না কেন, আস-সা'ইব ৩৬/৬৫৭ সালে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হন নাই, যেমন ইব্‌ন হায্‌ম বর্ণনা করিয়াছেন (জামহারা, সম্পা. হারূন, কায়রো ১৯৬২ খৃ., ৪৫৯)]। মুহাম্মাদ ইব্‌নু'স-সা'ইব (ফিহ্‌রিস্‌তে বর্ণিত ইব্‌ন মালিক নহেন, সম্পা. G. Flugel, ৯৫), 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নি'ল-আশ'আছ (ইব্‌নু'ল-আশআছ দ্র.)-এর বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পক্ষে দায়র আল-জামাজিম (দ্র.) (৮২/৭০১)-এর যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি এই যুদ্ধের একটি আংশিক বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটি অস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়াও একদিনের মধ্যে কূফায় স্বীয় পরিবারের নিকট যশ এবং বিজয়দীপ্ত প্রত্যাগমনের চিত্র পাওয়া যায় (আত-তাবারী, ৬খ, ৩৪৯-৫০, ৩৬৪)।

অসি চালনা ছাড়াও পরিবারটির সঙ্গে পাণ্ডিত্যের খ্যাতির দাবি সংযুক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কোনও প্রাচীন আরবী গ্রন্থ অনুশীলনকালে একজন আল-কাল্‌বী-র উল্লেখ না পাওয়া বিরল ঘটনা। সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত এই তথ্যগুলি তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সংক্রান্ত, যাঁহাদিগকে পূর্বে চিহ্নিতকরণ দুরূহ ছিল।

(১) মুহাম্মাদ ইব্‌নু'স-সা'ইব আল-কাল্‌বী (আবু'ন-নাদর) ১৪৬/৭৬৩ সালে কূফাতে অন্যূন ৮০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি জ্ঞানচর্চার সমসাময়িক সকল শাখায় অনুরাগী ছিলেন ঃ সার্বজনীন ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস প্রাক-ইসলামী (আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী, মিলাল, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১২২০-৬৪), য়াহূদী (ইব্‌ন 'আব্দ রাব্বিহ, 'ইক্‌দ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১৫৭), 'ঈসায়ী ধর্মের ইতিহাস, কবিতা (ইব্‌ন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ৩খ, ৪৩৬), সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান, বংশবৃত্তান্ত, হাদীছ ও প্রাচীন উপাখ্যান প্রভৃতি। কুরআন-এর একটি দীর্ঘতম তাফসীর প্রণয়ন প্রচেষ্টায় তিনি তাঁহার অগাধ জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছেন (আয্‌-যাহাবী, 'ইবার, কুওয়ায়ত ১৯৬০ খৃ., ১খ, ১০৬)। এই ক্ষেত্রে তাঁহার খ্যাতি এত বিশাল ছিল যে, সুলায়মান ইব্‌ন 'আলী সম্ভবত বসরার গভর্নর থাকাকালে (১৩৩৯-৯) ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীকে বসরা নগরীতে কুরআন-এর তাফসীর শিক্ষা দেওয়ার জন্য আনয়ন করেন। তাঁহার শ্রোতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ আল-কাল্‌বী, সুলায়মান ইব্‌ন 'আলীর সমর্থনক্রমে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুরআন-এর এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, যাহা ছিল প্রচলিত মতের বিপরীত। সম্ভবত উহাতে তিনি 'আলী বংশীয়দের (শী'ঈ) সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনাভিত্তিক বক্তৃতাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল (ফিহ্‌রিস্‌ত, ৯৫)। কিন্তু তাঁহার তাফসীর বর্তমানে বিলুপ্ত; শুধুমাত্র কতিপয় অসম্পূর্ণ অংশ বিভিন্ন রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যাখ্যা এই যে, হাদীছ-এর উৎস ও বর্ণনাকারিগণের ধারাবাহিকতা জ্ঞাপক যে লিখিত ইসনাদ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হাদীছ সমালোচনার জন্য নির্ধারিত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সর্বোপরি শী'ঈ হিসাবে তিনি সুন্নী ধর্মবিশ্বাসের, বিশেষ করিয়া হাদীছ ও কুরআন-এর ব্যাখ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপরীত অভিমত পেশ করেন (আত-তাবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩৭৪ হি., ১খ, ৭৬ ৯১, ২১৬-৭ ইত্যাদি)। তাঁহাকে কখনও কখনও প্রচলিত ধর্মমতের অবিশ্বাসী, রিফদ, সাবা'ই মতবাদী, ইরজা' ইত্যাদি এবং কখনও কখনও জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও আল-আযহার-এর 'উলামার মধ্যে (আহমাদ শাকির সম্পাদিত উসামা ইব্‌ন মুনকিয-এর লুবাবু'ল-আদাব-এর সংস্করণে, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., ১২৬-৪, নং ৫) তাঁহার আবেগান্বিত বিরুদ্ধবাদিগণকে দেখিতে পাওয়া

যায়। তবুও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ 'আলিম হিসাবে এখনও স্বীকৃত, এমনকি তাঁহার কুৎসা রটনাকারিগণও তাঁহাকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করেন। (২) হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনি'স-সাই'ব আল-কাল্‌বী, আবু'ল-মুনযির, সাধারণত ইবনু'ল-কাল্‌বী নামেই পরিচিত। সম্ভবত তিনি ১২০/৭৩৭ সালের দিকে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ শহরেই শিক্ষা লাভ করেন। আল-মা'মূনের খিলাফাতকালে সেখানেই তিনি ২০৪/৮১৯ সালে অথবা ২০৬/৮২১ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুতে খলীফা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন (আল-খাতীবু'ল বাগদাদী, কায়রো ১৯৩১ খৃ., ১৪খ, ৪৫-৬); কিন্তু কি কারণে তাহা সুস্পষ্ট নহে। যাহা হউক জানা যায় যে, স্পেনে উমায়্যাগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে 'আব্বাসী খলীফা আল-মাহ্‌দী (মৃ. ১৬৯/৭৮৫) ইবনু'ল-কাল্‌বীর জ্ঞান কাজে লাগাইয়াছিলেন (আত-তাবারী, ৮খ, ১৭২-৩)। সম্ভবত এই খলীফার শাসন আমলেই ইবনু'ল-কাল্‌বী বাগদাদে অবস্থান করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও সমসাময়িক জ্ঞানের সকল শাখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। ফিহ্‌রিস্ত-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহার সংখ্যা ১৫০-এর অধিক। তাঁহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাগরিদ, যেমন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব, ইব্‌ন দুরায়দ, আত-তাবারী, আবু'ল ফারাজ আল-ইসফাহানী এবং অন্যদের বহু গ্রন্থে এই বিশাল রচনা বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছিল।

শাগরিদগণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া এবং অনেক সময় অতি অস্পষ্ট ইশারাসহ উস্তাদের রচনা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। ইবনু'ল-কাল্‌বী-র খ্যাতির ফলেই এই সব বেনামী গ্রন্থস্তূপ হইতে কয়েকখানা গ্রন্থ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। (১) জামহারাতু'ন-নাসাব, W. Caskel ও G. Strenzic দুইটি প্রকাণ্ড ভ্যলিউম প্রকাশ করেন। একটিতে আরব বংশ বৃত্তান্ত, বিশেষ করিয়া ইব্‌নুল-কাল্‌বী রচিত বংশ বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সমস্ত কিছুর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এবং অপরটিতে ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীর রচনা হইতে চয়নকৃত বংশ তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে (Gamharat an-Nasab des Ibn al-Kalbi, লাইডেন ১৯৬৬ খৃ.)। ইব্‌নু'ল-কাল্‌বী ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুলজিবিশারদ এবং ইব্‌ন হাযম তাঁহার জামহারায় বহুলাংশে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়াই তাঁহার প্রখ্যাত পূর্ববর্তী রচয়িতার রচনার প্রচলন ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় ইব্‌নু'ল্-কাল্‌বী ছিলেন উৎস, ছালিছ এবং কখনও কখনও অভিজাত শ্রেণীর জন্য নন্দিত খিতাব বিতরণকারী (২) আল-আসনাম গ্রন্থটি আহমাদ যাকী কর্তৃক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কায়রোতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং জার্মান ভাষায় (Rosa K. Rosenberger, Leipzig ১৯৪১ খৃ.), ইংরেজী ভাষায় (N. A. Faris কর্তৃক, প্রিন্সটন ১৯৫২ খৃ.) এবং ফরাসী ভাষায় (M. S. Marmardji কর্তৃক, in Revue Biblique, ৩৫খ., ১৯২৬ খৃ., ৩৯৭-৪২০ খণ্ড অংশে) অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, (সম্প্রতি W. Atallah গ্রন্থটির মূল পাঠের একটি নূতন সংস্করণ সটীকা ফরাসী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন, প্যারিস ১৯৬৯ খৃ.)। কুলজির ন্যায় ইব্‌নু'ল কালবী আরব পৌত্তলিকতার ইতিহাসেও নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়া আসিয়াছেন। ইব্‌ন দুরায়দ, আন-নাজীরামী, য়াকূত, 'আবদু'ল-কাদির আল-বাগদাদী এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহার গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছেন এবং সর্বদা তাঁহাকে উৎস হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৩) আনসাবু'ল-খায়ল-অশ্বের বংশ তালিকা। ইতিহাসের বিখ্যাত আক্রমণকারী যুদ্ধাশ্বের কীর্তিসম্বলিত খণ্ড কবিতাংশসহ বিশদভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন (সম্পা. Levi Della Vida, Leiden ১৯২৮ খৃ.; আহমাদ যাকী কর্তৃক পর্যাপ্ত টীকাযুক্ত সংস্করণ, রচয়িতার মৃত্যুর পরে ১৯৪৬ খৃ. কায়রোতে প্রকাশিত হয়)। (৪) বিলুপ্ত গ্রন্থের চিহ্ন হিসাবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কতিপয় খণ্ডাংশ সংরক্ষিত আছে; যেমন- কিতাবু'ল-কুলাব, কিতাবু'ল-লুবাব, শি'র হাতিম আত-তা'ঈ ইত্যাদি।

ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীর রচনা আংশিকভাবে তাঁহার পিতার রচনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। উদারহরণ স্বরূপ দায়রু'ল-জামাজিম-এর যুদ্ধের বর্ণনায় তিনি স্বাভাবিকভাবে তাঁহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তিনি উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্য সাক্ষ্যও উল্লেখ করেন (আত-তাবারী, ৬খ, ৩৪২-৫০)। যথার্থতা অনুসরণে তিনি এতই সতর্ক ছিলেন যে, অন্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে নিজের পিতাকে উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঐ, ২খ, ২৭২, ৬খ, ৩৬০)। মৌখিক উৎসসমূহ ছাড়াও ইব্‌নু'ল-কাল্‌বী এমন বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, বাইবেল সংক্রান্ত এবং পালমেরীয় (Palmyran) উৎসসমূহ যাঁহাদের আয়ত্তাধীন ছিল (ঐ, ২খ, ২৭৩)। তাঁহাকে য়ামানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা হয় (ইব্‌ন দুরায়দ, ইশতিকাক, সম্পা. হারূন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ৫২৪)। মনে হয় যে, জাবালা, নামক তাঁহার একজন সচিব ছিলেন যিনি তাঁহাকে পাহ্‌লাভী হইতে অনুবাদ সরবরাহ করিতেন (ফিহ্‌রিস্ত, ২৪৪) এবং তথ্যের জন্য তিনি নিজেই আল-হীরার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক নথিপত্র ও ফলকসমূহ পর্যালোচনা করিতেন (আত-তাবারী, ৯খ, ৬২৮)। আধুনিক পদ্ধতিগত তৌলদণ্ডে সজ্জিত হইয়া ইবনু'ল-কাল্‌বীর জ্ঞানের ফাঁক খোঁজা এবং ভাষার ইতিহাসের উপর তাঁহার অভিমত অথবা ঐতিহাসিক বর্ণনার পরিবর্তে উপাখ্যানমূলক বর্ণনার সমালোচনা করা সহজ। তাঁহার সার্বজনীন ইতিহাসে তিনি অনেক ক্ষেত্রে কেবল মৌলিক উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এইগুলি লিখিয়া রাখার জন্য তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। সর্বোপরি তাঁহার গ্রন্থ অন্যান্য প্রাচ্য অথবা সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিকগণের রচনার তুলনায় নিকৃষ্ট নহে। কিছু আর লেখক তাঁহার প্রখর সমালোচক ছিলেন; এই ধরনের সমালোচনা কখনও কখনও পাণ্ডিত্যসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিম্বা তাহা প্রায়ই ছিল গোত্রগত ঈর্ষা অথবা ধর্মীয় উৎসাহে অনুপ্রাণিত। কেননা পিতার ন্যায় ইব্‌নু'ল কাল্‌বীও নিষ্ঠাবান সুন্নীগণের বিরাগভাজন হন। পক্ষান্তরে তাঁহারঅনেক অত্যুৎসাহী সমর্থকও ছিল (য়াকূত, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ১৮৭-৮, ২১৯, ৫০৪)। কুৎসা ও প্রশংসাকারীরা তাঁহারই রচনার উপর সমভাবে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে পরিচালিত আদি সমালোচনার শাব্দিক অনুসরণে আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে Goldziher (Muh. Stud., ১খ, ১৮৫-৭) তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। ইহার ভিত্তি ছিল ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীর বর্ণিত কপট, স্বপ্রশংসাপূর্ণ বংশ তালিকাভিত্তিক হাস্যরসাত্মক রচনা এবং তাঁহার 'আব্বাসী পক্ষপাতিত্ব (আত-তাবারী, ৮খ, ১৭২-৩)। এইগুলি ব্যবহারের ফলে ইবনু'ল-কাল্‌বীর বিজ্ঞানসম্মত যোগ্যতার উপর সন্দেহ আরোপিত হইয়াছে। Th. Noldeke ভারসাম্য পুনঃস্থাপন করেন (Gesch. der Araber und Perser, লাইডেন ১৮৭৯ খৃ., ২৭ ও নির্ঘণ্ট) এবং তখন হইতে আল-কাল্‌বীর-র সমালোচনা সঠিক নিরিখে প্রবাহিত হয়। এতদসত্ত্বেও

প্রাচীন বা আধুনিকগণের কেহই তাঁহার যোগত্যার সঠিক মূল্যায়ন করিতে পারেন নাই। বর্তমান গবেষণা আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে ইব্‌নু'ল-কালবীর বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করিতেছে।

(৩) 'আব্বাস ইব্‌ন হিশাম, হিশামের পুত্র, তাঁহার ভ্রাতা নহেন, যেমন আল-কূফী বর্ণনা করিয়াছেন (ফিহ্‌রিস্‌ত, ৯৫)। আল-খাতীব আল-বাগদাদী (১৬খ, ৪৬) জনৈক ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি অবশ্যই মুহাম্মাদ আল-কাল্‌বী-র পৌত্র। আল-'আব্বাস তাঁহার পিতা হিশাম সম্পর্কিত স্মৃতিকথাগুলি অপরের কাছে হস্তান্তরিত করেন। তাঁহার জ্ঞানের কিছু অংশ ভাষাতত্ত্ববিদ ইব্‌ন দুরায়দ (ইশ্‌তিকাক, স্থা), ঐতিহাসিক আল-বালাযুরী ও আত-তাবারী প্রমুখ জ্ঞানিগণকে প্রদান করেন। তাঁহার সম্পর্কে ইহার অধিক জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল বর্ণনা ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৬খ, ৩৫৮-৯; (২) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, সম্পা 'উকাশা কায়রো ১৯৬৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) ইব্‌নু'ন-নাদীম, ফিহ্‌রিস্‌ত ; (৪) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, কায়রো ১৯৩১ খৃ., ১৪খ, নং ৭৩৮৬; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ৩খ, ৪৩৬-৮, ৫খ, ১৩১-৩ ; (৬) য়াকূত, উবাবা', কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ১৯ খ, ১১২; (৭) যাহাবী, মীযান, কায়রো ১৯৬৩., ৪খ, ৩০৪-৫, ৫৫৬-৯। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীর সম্পাদকগণ সাধারণ প্রচুর গ্রন্থপঞ্জী সরবরাহ করিয়াছেন। দ্র. জামহারা (Caskel-Strenzick) ও আসনাম-এর ভূমিকা, Brockelmann, Blachere, Litt. এবং কাহ্‌হালা-ও দ্রষ্টব্য।

W. Atallah (E. I.[2])/ মুহঃ আবু তাহের

কাল্‌বী বংশ (بنو كلب) ঃ একটি পরিবার। মূল বংশধারা কালব ইব্‌ন ওয়াবারা (كلب بن وبرة) (দ্র.) হইতে উদ্ভূত। মাগরিব সম্পর্কিত আরব সূত্রগুলি ইহাকে বানূ আবি'ল-হুসায়ন (অথবা আল-হাসান) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। মাগরিবী ইতিবৃত্তসমূহে, গভর্নর ও ইফরীকিয়ায় উমায়্যা প্রশাসনে নিয়োজিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কাল্‌বী বংশজাত এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বি কায়্‌স বংশের অন্তর্গত বলিয়া প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছেন। দামিশকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন খলীফাগণ মাঝে মাঝে এই দুইটি প্রতিপক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেন, অপরদিকে মাগরিব, স্পেন ও সিসিলিতে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ ব্যক্তিগত অনুরাগ অথবা বিশেষ সময়ের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই এক পক্ষের স্থলে অপর পক্ষের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন। বংশপরম্পরাগত শত্রুতার দ্বারা প্ররোচিত কলহ-বিবাদ এবং রক্তাক্ত যুদ্ধ দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তীব্রতর করিত। এমতাবস্থায় একজন কাল্‌বী ওয়ালী (গভর্নর)-কে একজন কায়্‌সী ওয়ালীর স্থলে প্রায়ই নিযুক্ত করিতেন বিপরীতভাবেও একইরূপ ঘটিত।

মুদারী কর্তৃত্বের উপর বেশী পরিমাণে আস্থা সহকারে নির্ভরশীল আগলাবীদের সময়ে কাল্‌বীগণের পতন শুরু হয়, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন ফাতিমীগণের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতির প্রধান অবলম্বন। ফলে তাঁহারা দ্রুত ইফরীকিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; যেখানে তাঁহাদের উত্থানের পথে একটি অনুকূল সামাজিক পরিবেশ ছিল। সুতরাং চতুর্থ/দশম শতাব্দীতে মুসলিম সিসিলিতে তাঁহারা শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হন। এই সময় কাল্‌বীগণ সম্ভবত কুতামা বারবারদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিশেষ করিয়া ইফরীকিয়ার প্রথম ফাতিমী ইমামদের সাহায্য করার জন্য মাহদী ও তাঁহার বংশধরগণ কাল্‌বীগণকে অবিলম্বে পুরস্কৃত করেন। আল-কা'ইম-এর শাসনকালে 'আলী ইব্‌ন আবি'ল-হুসায়ন আল-কাল্‌বী (এই পরিবারের প্রথম শাসক ও ৩০৫-৩২৫/৯১৭-৯৩৬ পর্যন্ত সিসিলির ফাতিমী গভর্নর সালিম ইব্‌ন আবী রাশিদ-এর জামাতা) বাগদাদের খিলাফাতের অতি অনুগতদের বিরুদ্ধে সিসিলিতে বসবাসকারী ফাতিমী সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামে Agrigento অবরোধের সময় (৩২৬/৯৩৮) ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র আল-হাসান ইব্‌ন 'আলী ইফরীকিয়ায় খারিজী আবূ য়াযীদ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে আল-কা'ইম ও আল-মানসূর কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন (তু. কিতাব আ'মালু'ল-আ'লাম, গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। তিনি সিসিলীয় কাল্‌বী গভর্নরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন। ইহা ছিল এক প্রকার বংশানুক্রমিক আমীরাত যাহা ৫ম/১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

Palermo ও Agrigento-তে ফাতিমী প্রতিনিধিদের বিদ্রোহে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া খলীফা আল-মানসূর সিসিলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত ও বিচক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন যাহাদের বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং যাহারা বিদ্রোহী ও ইফরীকি'য়ার ইমামগণের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ অবস্থা বজায় রাখিতে পারিবেন। সিসিলিতে আগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পরেই আল-হাসান Calabria ও Apulia বায়যানটাইন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দুইটি যুদ্ধে বিজয়ী হন। এই সুযোগে তিনি Reggio-তে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে মসজিদটি (খৃষ্টান কর্তৃক) ধ্বংস করা হয়। আল-মানসূরের মৃত্যুর (যু'লকা'দা ৩৪১/মার্চ ৯৫৩) পরে আল-হাসান দ্বীপটির শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার পুত্র আহমাদ-এর হস্তে ন্যস্ত করিয়া ইফরীকিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। সিসিলি ও ক্যালব্রিয়ার (Calabria) সামরিক অধিনায়কদের পদটি সুনির্দিষ্টভাবে তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীকালে বায়যানটাইনদের প্রবল চাপের মুখে তাঁহার ভ্রাতা 'আম্মার তাঁহাকে ঐ এলাকায় ডাকিয়া পাঠান। সিসিলির দ্বিতীয় কাল্‌বী ওয়ালী আহমাদ (৩৪২-৫৮/৯৫৪-৯৬৯) কতকগুলি চূড়ান্ত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। তন্মধ্যে টাওরমিনা (Taormina) অধিকার (৩৫১/৯৬২) ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া ইমাম আল-মু'ইয্য-এর সম্মানে মু'ইয্যিয়া রাখা হয়। রামেত্তা (Rametta)-র পতন এবং যুগপৎ ওয়াক 'আতু'ল-মাজায (প্রণালীর যুদ্ধ) নৌযুদ্ধে বিজয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি ইব্‌ন হানী কর্তৃক রচিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ কাসীদায় বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে (দীওয়ান, সম্পা. যাহিদ 'আলী, ১৩৫২/১৯৩৪, নং ৪০, পৃ. ৫৪০-৫৯)।

পরবর্তী সময়ে কাল্‌বী গভর্নরগণ বায়যানটাইনগণের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হন; কিন্তু তাঁহাদের সামরিক আক্রমণগুলি কদাচিৎ বিরাট আকারের ছিল। বায়যানটাইনগণ ফাতিমীগণের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ইতালীর প্রতি সম্রাট ১ম অটো (Otto I)-এর উচ্চাভিলাষ সুস্পষ্ট হওয়ার পর। এই উচ্চাভিলাষ তাঁহার পুত্র ২য় অটোকেও (Otto II) অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু ক্যালাব্রিয়াতে (Calabria) অভিযান কালে তাঁহাকে মুসলিম ও বায়যানটাইনদের সম্মিলিত বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। বায়যানটাইনগণ প্রয়োজনের খাতিরে কালবী সেনাদলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়ান এবং মুসলমানগণ দুইটি খৃষ্টান সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে দৈব সাহায্য প্রাপ্ত হন। ২য় অটো (Otto II) এবং সিসিলির প্রথম কাল্‌বী

গভর্নরের পুত্র কাল্বী ওয়ালী 'আলী ইব্নু'ল-হাসান-এর মধ্যে মুহাররাম ৩৭২/জুলাই ৯৮২ ক্যালাব্রিয়ার (Calabria) ক্যাপো কট্রোনে (Capo Cotrone) সংঘর্ষ হয়। প্রথমে মুসলমানগণ অসহায় বোধ করিলেও পরিস্থিতি দ্রুত মুসলমানদের পক্ষে মোড় নেয়। সম্ভবত ইহাই ছিল সিসিলিতে খৃষ্টানগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শেষ বিখ্যাত বিজয়। অতঃপর সেখানে কতিপয় কম গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ যেমন, ৩৭৬/৯৮৬ সালে ক্যালাব্রিয়ার (Calabria) আকস্মিক হানা, কয়েক বৎসর পরে কসেন্দো (Cosenza) অবরোধ, ৩৮১/৯৯১ ট্যারান্টোতে নূতন আক্রমণ, ৩৮৪/৯৯৪ সালে মেটারায় প্রচণ্ড আক্রমণ, ৩৯২/১০০২ সালে বেনেভেন্টোতে (Benevento) অতর্কিত আক্রমণ এবং সর্বশেষে কাপুরায় (Capura) সংক্ষিপ্ত অবরোধ সংঘটিত হয়।

মিসরেও ফাতিমীগণ কাল্বী পরিবারের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োগ করেন। ইহাদের কেহ কেহ কায়রোর ইমামগণ কর্তৃক সিসিলিতে গভর্নর হিসাবে প্রেরিত হন। উদাহরণস্বরূপ মিসরের আল-'আযীয বিল্লাহ (৩৬৪/৯৭৫ আল-মু'ইয্য-এর উত্তরাধিকারী)-এর উপদেষ্টা জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ দ্বীপটি দুই বৎসরের জন্য (৩৭২/৯৮৩) শাসন করেন। এই যুগে মিসরে কাল্বীগণের মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে দৃষ্ট হয়। আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ (দ্র.)-কে খলীফা ঘোষণা করা হইলে কুতামা বারবারগণ, ফাতিমী সমর্থকগণ দাবী উত্থাপন করে যে, আল-হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবি'ল-হুসায়নের ভাতিজা ও বিজেতা আল-হাসান ইব্ন 'আম্মার-এর উপর শাসন কার্যের দায়িত্ব অর্পিত হউক। সিসিলিতে কাল্বী আবু'ল-ফুতূহ য়ূসুফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (৩৭৯/৯৮৯-৩৮৮/৯৯৮)। দ্বীপটি আট বৎসরের জন্য অতীব বিচক্ষণতার সহিত শাসন করেন। আল-হাসান ইব্ন 'আম্মারকে আমীদু'দ-দাওলা ও আবু'ল-ফুতূহ য়ূসুফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্কে ছিকাতু'দ্-দাওলা খেতাব প্রদান করা হয়।

বানূ আবি'ল-হুসায়ন পরিবারের সৌভাগ্য এই শীর্ষ হইতে অতি শীঘ্রই পতন হয়। মিসরে আল-হাসানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং য়ুসুফের পুত্র জা'ফারের অধীনে (৩৮৮-৪১০/৯৯৮-১০১৯) সিসিলি বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হয়। যদিও মিসরে ফাতিমী শাসনের প্রারম্ভ হইতেই সিসিল ক্রমবর্ধমান হারে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত এবং সমকালীন পালের্মোতে আমীরদের দরবার অত্যধিক জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই সমস্ত এই সময়কার রাজনৈতিক বাস্তবতার পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাল্বী শাসকগণের প্রশাসনিক বিচক্ষণতা ও উদ্দীপনা প্রদর্শন করা উচিত ছিল। এই সময়ে বেশী পরিমাণে সামরিক অভিযান অথবা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাঁহারা পালের্মোর রাজপ্রাসাদসমূহে চিত্তবিনোদনে মত্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কুড়ি বৎসরের জন্য দ্বীপটিতে আমীরের দায়িত্ব পালনকারী জা'ফারকে পালের্মো ক্যাসিলো দ্য মারেডোলসি (Castello di Maredolci)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। সকল ক্ষেত্রেই এই পতনের ফলাফল দৃষ্টিগোচর হয়। সামরিক পর্যায়ে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। মুসলমানগণ ৩৯৪/১০০৪ সালে বায়যানটাইন ও ভেনেসীয়গণের হাতে প্রথম পরাজয় বরণ করেন এবং পরের বৎসর তাঁহারা Reggio-তে পিসাবাসীদের দ্বারা প্রতিহত হন।

ইতিমধ্যেই জা'ফার-এর ভাই কাল্বী আমীর আহমাদ ইব্ন য়ূসুফ আল-আকহাল (৪১০-২৭/১০১৯-১০৩৬)-এর অধীনে এই সংকটজনক অবস্থার অধিকতর অবনতি হয়। তাঁহার ক্যালাব্রিয়া (Calabria) ও আপুলিয়ায় (Apulia) অভিযান সম্পর্কে আরব কাহিনীকারগণ উল্লেখ করার মত তেমন কিছু পান নাই। অপরদিকে ইহা নিশ্চিত যে, ১৫ বৎসর ব্যাপী এই শাসন আমলে যীরী নামক একটি নূতন গোষ্ঠী সিসিলির রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনে পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে আল-আকহাল-এর বিরুদ্ধে অবিচার ও দুর্নীতির অভিযোগ আনয়নকারী বিরুদ্ধবাদিগণের প্ররোচনায় আল-মু'ইয্য ইব্ন বাদীস স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ্-এর নেতৃত্বে ঐ দ্বীপে একটি বিশাল সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। আল-আকহাল বায়যানটাইনগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাদের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই আপোস মীমাংসায় উপনীত হন। বায়যানটাইনগণ যীরী বাহিনীকে পরাস্ত করে। কিন্তু তারপর ক্যালাব্রিয়ায় (Calabria) প্রস্থান করে। 'আবদুল্লাহ্ সহজেই তাঁহার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে অবরোধ করিয়া হত্যা করেন।

য়ূসুফের পুত্রগণের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, তাহাদের অবিরাম চক্রান্ত এবং সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আস-সামসাম বলিয়া পরিচিত সিসিলের শেষ আমীর আল-হাসান-এর শাসনকালের (৪৩১-৪৫/১০৪০-১০৫৩) বৈশিষ্ট্য (শেষোক্ত তারিখটি সম্বন্ধে বিভিন্ন আরব বিবরণীতে বিভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে)। কতিপয় স্থানীয় কা'ইদ (ইবনু'ল-হাওয়াস ও ইব্নু'ছ-ছুমনা দ্র.) ইতিমধ্যেই দ্বীপটির উপর ক্ষমতার দাবী উত্থাপন করে এবং তাহাদের প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম সিসিলিতে নরম্যান হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত করে।

সিসিলিতে মুসলিম শাসন কালের মধ্যে কাল্বী যুগটি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাহাদের শাসনের শুরুতে রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক সামরিক তৎপরতাসমূহ নিঃশেষিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বানূ 'আবি'ল-হুসায়ন পরিবারের কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক স্বায়ত্তশাসনের সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়া পশ্চিম সিসিলিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। পৌর কর্মতৎপরতা, জনহিতকর কার্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে নব উৎসাহ প্রদানের ফলে পালের্মো (Palermo) এবং অন্যান্য কয়েকটি শহরের কেন্দ্রস্থল বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করে। রাজনীতিতে প্রচলিত বিষয়গুলি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা পূর্ববর্তী যুগেই সূচিত হইয়াছিল। কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ কাল্বী আমীর কাব্যের অনন্য অগ্রগতিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁহারা নিজেরাও অনেকে উৎসাহী কাব্য রচয়িতা ছিলেন। ইব্নু'ল-কাত্তা' আস-সিকিল্লীর রচিত লুপ্তপ্রায় কবিতা সংকলন হইতে অদ্যাপি বর্তমান উদ্ধৃতিসমূহ ইহার প্রমাণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাহিত্য বিষয়ক মূল গ্রন্থের সহিত সিসিলির কাল্বী সংক্রান্ত বিষয় আমারী কর্তৃক Bib liotheca arabo-sicula-তে সংগৃহীত হইয়াছে, Leipzig ১৮৫৭ খৃ., পরিশিষ্ট, ১৮৭৫ খৃ. (ইতালীয় অনু., ১খ, Turin- রোম ১৮৮০, ২খ, ১৮৮১, পরিশিষ্ট ১৮৮৯)। (২) এই পরিবারের উপর ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ এই একই ঐতিহাসিক কর্তৃক Storia dei Musulmani di Sicilia[2]-তে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, সম্পা. C. A. Nallino, Catania ১৯৩৩-৩৯ খৃ.; (৩) আবূ 'আলী মানসূর আল-'আযীযী আল-জাওযারী -এর সীরাতু'ল-উসতায জাওযার গ্রন্থে ইফরীকিয়ার কাল্বী ও ফাতিমী ইমামদের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; সম্পা. মুহা. কামিল হুসায়ন ও মুহা. 'আবদু'ল-হাদী শা'ঈরা, কায়রো ১৯৫৪ খৃ. (ফরাসী অনু, M. Canard, আলজিয়ার্স

১৯৫৮ খৃ.)। (৪) এই সংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ U. Rizzitano কর্তৃক ইতালী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, RSO ৩২ (১৯৫৭ খৃ.), ৫৪৬-৫৫। তু. ইহা ছাড়াও U. Rizzitano, Gli Arabi in Italia, in L'Occidente el' Islam nell' Alto Medioevo, Spoleto ১৯৬৫ খৃ., ১খ, ৯৩-১১৪; (৫) ঐ লেখক, Un compendio dell' Antologia di poeti arabo-sicilliani intitolata 'ad-Durrah al-hatirah min su'ara' al-Gazirah" di Ibn al-Qatta' "il Siciliano", in Atti del Acc. Naz. Lincei, অষ্টম সিরিজ, খণ্ড ৮ ঃ রোম ১৯৫৮ খৃ., ৩৩৫-৭৮; (৬) লিসানুদ্-দীন ইবনু'ল-খাতীব-এর কিতাব আ'মালু'ল-আ'লাম-এর একটি অধ্যায় বানূ আবি'ল-হুসায়ন-এর পরিবারের উপর নিয়োজিত; তু. আহ্মাদ মুখতার আল-'আব্বাদী ও মুহা. ইবরাহীম আল-খিত্তানী কর্তৃক সম্পা. কাসাব্লাংকা ১৯৬৪ খৃ., ১২২-৩৬ (R. Castrillo Marquez কর্তৃক স্পেন ভাষায় অনূদিত, মাদ্রিদ ১৯৫৮ খৃ.)।

U. Rizzitano (E. I.[2])/মুহাম্মদ আবূ তাহের

কালমাক (قلماق , قلمق) ঃ একটি মঙ্গোলীয় গোত্রের তুর্কী নাম, চিঙ্গীয় খানের সময়ের বৈকাল হ্রদের পশ্চিম পাশের জঙ্গলে বসবাসকারী ঐরাতদের (Oirat/اورات) ঃ নাম। নামটি সম্ভবত জনপ্রিয় ধাতুরূপ 'কালমাক' অর্থাৎ 'থাকা' হইতে উদ্ভূত এবং নামটি ঐরাতদের (যাহারা বিধর্মী 'থাকিয়া যায়') সঙ্গে ডাঙ্গান (চীনা ভাষাভাষী মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। ডাঙ্গানরা প্রসিদ্ধ মুসলিম আদর্শানুযায়ী ইসলামে 'প্রত্যাবর্তন' (ক্রিয়ারূপে 'ডনমেকে') করে। একদল ঐরাত হুলাগুর (হালাকু) সঙ্গে পশ্চিমে যায় এবং ঈলখানী পারস্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চীনে মঙ্গোল বংশের পতনের পর তাহারা নিজেদের জাতীয় সত্তা পুনরায় লাভ করে। চিঙ্গীযদের নিকট হইতে তাহারা মঙ্গোলিয়ার বিশাল অংশ কাড়িয়া লয় এবং কালমাক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ওয়ায়েস খানের (ویس خان) সময় হইতে (১৪১৮-২৮ ঈলী (দ্র.)-তে অবস্থিত মঙ্গোলদিগকে বিধর্মী কালমাকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের বিবরণ 'তা'রীখ-ই রাশীদী'-তে পাওয়া যায়। ওয়ায়েস খান কালমাক কর্তৃক দুইবার বন্দী হয় এবং তাঁহার ভগ্নীকে কালমাক সর্দার ইসেন তাইসী-র সঙ্গে বিবাহ দানে বাধ্য হন। তাইসী-এর পিতা তোগোন তখন চীন সীমান্তে মঙ্গোলিয়া শাসন করিতেন এবং ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে ইসেন তাইসী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়। ইসেন তাইসী-এর মৃত্যুর পর (১৪৫৫ খৃ.) ঐরাতদের বিশাল যাযাবর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। মুসলিম দেশসমূহের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পরবর্তী সময়ে কোনও কোনও রাজপুত্রের নাম শাসক হিসাবে উল্লিখিত আছে। ৮৬৪-এর শেষে/১৪৫৯-এর প্রথমে হারাতে কালমাক রাজদূত উপস্থিত হন। মুসলিম উৎস হইতে জানা যায়, খারা খুলার (মৃ. ১৬৩৪ খৃ.) অধীনে ঐরাত রাজত্বের পুনরুত্থান হয়। সমসাময়িককালে তুর্কীস্তানেও কালমাকদিগকে ইসলামের শক্তিশালী শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হইত। কামাখ খান তাওয়াক্কুল (রুশ ভাষায় তফকেল)-কে তাহাদের আক্রমণের পূর্বেই তাশকান্দে পালাইতে হয় এবং সেখানে উযবেক শাসক নওরোয আহমাদ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার জবাবে নওরোয জানান যে, তাঁহাদের মত দশজন রাজপুত্রও কালমাকদের মুকাবিলা করিতে পারিবেন না। যাহা হউক পরবর্তীকালে জারফিয়োডরের কাছে তাঁহার রাজদূত থাকাকালীন রুশ দলীলে তাওয়াক্কুলকে কাযাখ ও কালমাকদের রাজা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, খুব সম্ভব এই বিবেচনায় যে, একদল কালমাকও তাঁহার সঙ্গে ছিল। ১৬০৩-৪ খৃ. শীতকালে কালমাকগণ প্রথম অভিযান চালায় খাওয়ারিমযে। অল্প পরে আর ভাসিলি শুইস্কি (১৬০৬-১০)-এর অধীনে কালমাকরা রুশ সরকারের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করে, যদিও তাহারা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তল্গা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করেন নাই। কালমাকদের এই দলটি খো-অর লোক (Kho-or Lok)-এর নেতৃত্বাধীনে ১৬১৮ খৃ. দিকে তাহাদের স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাদের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ না হইলেও ভল্গা কালমাক অঞ্চলটি খারা খুলা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ভল্গা কালমাকদের প্রতিনিধিবৃন্দ তবুও ১৬৪০ খৃ.-এর কুরিলটে (দ্র.)-তে উপস্থিত হন। খারা খুলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাতুর নিজ কন্যার বিবাহ দেন খো-অরলুক-এর পৌত্রের সঙ্গে। একই কুরিলটেতে বৌদ্ধ ধর্ম কালমাকদের সকল শাখায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা'রীখ-ই রাশীদী-তে ইসলামের অগ্রগতির (৯১ পৃষ্ঠা) যে বর্ণনা আছে তাহাতে উক্ত বিবাহের উল্লেখ নাই।

তুর্কিস্তানের প্রায় সব মুসলিম রাজ্য মধ্য এশিয়ার সর্বশেষ বিশাল যাযাবর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ঈলীর বৌদ্ধ কালমাক শাসকের অধীন ছিল। ১৭৫৮ খৃ. চীন কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা টিকিয়াছিল। অবশেষে ১৭৪৯ খৃ. বুখারার রাজপ্রতিনিধি (আতালীক) ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কালমাক শাসকের রাজদূতের কাছে নিজেদের এক গোলমাল মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। কাযাখদের গোচারণভূমির বিরাট অংশ কালমাকদের অধিকারে চলিয়া যায় এবং সেমিরে চিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ইসলাম প্রায় সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। কতিপয় বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভকে (তিব্বতী লিখাসহ) এই যুগের কীর্তি মনে করা হয়। কালমাক সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলিম কাযাখগণ এই অঞ্চল পুনর্দখল করেন। ভল্গা কালমাক ও ক্রিমিয়ার তাতারদের মধ্যের যুদ্ধসমূহও তাহাদের খাওয়ারিযমে আক্রমণ ইসলামের উপর তেমন ফলবতী হয় নাই। ১৭২৪ খৃ. হইতে ভল্গার নিম্নাঞ্চলের কালমাক প্রধানদের রুশ জারের শুধু প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হইত। ঈলীর শাসকদের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভাইসরয় উবাসী ও তাহার অনুগত বিশাল সংখ্যক লোকজনের (প্রায় তিন লক্ষ) রাশিয়া ত্যাগ করা ও চীনা ভূমিতে বসবাসের সিদ্ধান্ত ভল্গা কালমাকদের বিপর্যয় ঘটায়। স্থান ত্যাগের সময়ে (১৭৭১ খৃ.) মধ্য এশিয়ায়, বিশেষত কাযাখদের দ্বারা, তাহাদের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। তদবধি রাশিয়া কিংবা চীনে কালমাকদের কোনও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। ঈলী উপত্যকায় মুসলিম উত্থানের সময় কুলজের নিকটস্থ কালমাকদের বিরাট বৌদ্ধমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Cambridge History of Iran, V. ch. 4, Cambridge 1968; (২) N. Elias and Denison Ross, A History of the Moghuls of Central Asia, being the Tarikh-i Rashidi of Mirza Muhammad Dughlat, London 1898; (৩) V. V. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia, tr. V. and I. Minorsky, i, Leiden 1956; (৪) W. Radloff, Aus Siberien, ii, Leipzig 1884; (৫) P. Pelliot, Notes

Critiques d'histoire kalmouke, Paris 1960; (৬) E. I.[2], vol. 4, 512; (৭) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ৩৮৬।

J. A. Boyle (E. I.[2])/আবদুল কাদের

আধুনিক যুগ ঃ ১৭৭১ খৃ.-র পর প্রায় ৫০,০০০ কালমাক ভল্গার পশ্চিম পার্শ্বে বসবাস করিতেছিল। তাহাদের অধস্তন পুরুষের লোকেরা বলশেভিক বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব লীগে যোগদান করে। কিন্তু ১৯২০ খৃ. ইহা বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাহারা 'স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ' গঠন করে এবং ১৯৩৩ খৃ. 'স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে' উন্নীত হয়। ১৯৩৯ খৃ. এই প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ, যাহার মধ্যে কালমাক ছিল এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার। ১৯৪২ খৃ. জার্মানরা ইহা আংশিকভাবে দখল করে। শত্রুর সহিত সহযোগিতার অভিযোগে রাশিয়া ১৯৪৩ খৃ. সমস্ত কালমাককে মধ্য এশিয়ায় বিতাড়িত করে। ১৯৫৭ খৃ. এক সোভিয়েত ফরমানে কালমাকদের ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা থাকে এবং ১৯৫৮ খৃ. ইহাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। ভোলগোগ্রাডের ১৫০ মাইল দক্ষিণে ইলিস্টা (Elista) (পূর্ব নাম স্টেপনয় Istepnoy) ইহার রাজধানী। ১৯৭০ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী ইহার জনসংখ্যা ছিল ২,৬৮,০০০ যাহার মধ্যে কালমাক ছিল ১১০,০০০। ইহা হইতে জানা যায়, যে শতকরা ৮০ জন কালমাক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে বাস করে। ঐরাত (Oyrats) নামে পরিচিত অল্প সংখ্যক কালমাক এখনও চীনের সিন্‌কিয়াং-উইগোর প্রজাতন্ত্রে বাস করে। ন্যূনাধিক ২০০০ কালমাক ইসলাম গ্রহণের সময় হইতে সেমিরেচিয়াতে (Semirec'ye) বাস করে এবং অন্যরা সত্যিকার অর্থে অথবা নামমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Great Soviet Encyclopaedia; (২) R. Conquest, The Soviet deportation of Nationalities, London 1960, 36-41, 134-43; (৩) E. I.[2], vol. 4, 312।

G. E. Wheeler (E. I.[2])/আবদুল কাদের

কাল্য়ানী (كليانى) ঃ বীদার হইতে ৩৭ মাইল পশ্চিমে ১৭°-৫৩' উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৬°-৫৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত দাক্ষিণাত্যের একটি শহরের নাম (দ্র. দেকান)। ৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীতে ইহা ছিল অবলুপ্ত পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজাদের রাজধানী শহর। পরে ইহা দেবগিরীর (দাওলাতাবাদ) যাদব শাসকদের অধিকারভুক্ত হয়। দেবগিরীতে বাহ্‌মানী বংশ প্রতিষ্ঠার পর তাঁহাদের রাজ্যের উত্তর সীমান্তে একটি দুর্গ হিসাবে কাল্য়ানী সংযোজিত হয়। উলুগ খান (পরে মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলাক নাম গ্রহণ করেন) কর্তৃক ৭২৩/১৩২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জামি' মসজিদের একটি সংরক্ষিত প্রাপ্ত শিলালিপির সূত্রে শহরটির মুসলমান কর্তৃক বিজয় বাহ্‌মানী বংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনুমান করা যায়। ৭৩৪/১৩৩৩ সালে এর অপর একটি তুগলাক বংশীয় শিলালিপির কথা জানা যায়।

বারুদের প্রচলনের পর ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে বাহ্‌মানীদের দ্বারা দুর্গটি পুনর্নির্মিত হয়। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে দুর্গ প্রাকারের সংলগ্ন স্তম্ভে উৎকীর্ণ একাধিক শিলালিপি হইতে দুর্গটির উত্তম সংস্কার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই সব শিলালিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বীদার ৯৮১/১৫৭৩ সাল পর্যন্ত বাহ্‌মানীদের উত্তরসূরি বারীদ শাহীগণের অধীনে ছিল। ইহার পর উহা বীজাপুরের 'আদিল শাহীদের অধিকারভুক্ত হয়। সম্রাট আওরাঙ্গযীব কর্তৃক দীর্ঘ দিন অবরোধের পর দুর্গটি ১০৬৭/১৬৫৭ সালে মুগল সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে এবং বীদারের মুগল সূবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হায়দরাবাদের ১ম নিজামের অধীনে দাক্ষিণাত্য যখন মুগল সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হয় তখন কাল্য়ানী উহার একটি অধিকারভুক্ত অংশে পরিণত হয়। ১১৭৮/১৭৬৪ সাল হইতে উহা কাল্য়ানীর নাওয়াবদের একটি বংশ দ্বারা শাসিত হইত। উহার প্রথম নাওয়াব ছিলেন হায়দরাবাদের আসাফ জাহ্-এর জামাতা মীর মুহাম্মাদ ইবরাহীম খান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Yazdani, Inscriptions from Kalyani, in EIM, 1935-36 (1939); (২) ঐ লেখক, Kalyani fort, in ARADHyd. 1344 F., 17-23 and pl. I।

J. Burton-Page (E. I.[2])/ড. এ. কে এম. ইয়াকুব আলী

কাল্য়ূন (দ্র. বাহরিয়্যা ও সাফীনা)

কাল্য়ূব (قليوب) ঃ কায়রো-আলেকজান্দ্রিয়া রেলপথের কায়রোর কেন্দ্রীয় স্টেশন হইতে দশ মাইল উত্তরে মিসরের নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত একটি রেল স্টেশন এবং মধ্যম আয়তনের একটি শহর। স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে এবং নীলনদের দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় তিন মাইলের ব্যবধানে তুর'আত আস্-সার্দূসিয়ার দিকে মূল শহরটি অবস্থিত। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাল্য়ূব মুদীরিয়া আল-কাল্য়ূবিয়ার রাজধানী ছিল। কিন্তু ১৮৭১ খৃস্টাব্দে খেদিব ইসমা'ঈলের অধীনে মুদীরিয়ার দীওয়ান বা সচিবালয় কাল্য়ূব হইতে বেন্‌হা-য় স্থানান্তরিত করা হয়। উক্ত সময় হইতে কালয়ূবকে একটি মার্‌কায্ বা জিলা সদর হিসাবে গণ্য করা হয়। শাখা লাইনসমূহ যাকাযীক ও নীল নদের উপর বাঁধ (Barrage du Nil) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলিম। 'আলী পাশা মুবারাকের মতে কাল্য়ূব-এ একটি শারী'আ বিচারালয় (মাহকামা শারী'আ) এবং একটি হাসপাতাল আছে। তু. (১) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতু'ল-জাদীদা, ১৫খ, ১১৪ প.; (২) Baedeker, Egypt (1914), পৃ. ৩৮; (৩) সামী বে, কামূসু'ল-আ'লাম, ইস্তাম্বুল ১৩১৪/১৮৯০, ৫খ, ৩৬৯৩b। ১৯৬০ খৃ. কাল্য়ূব মুদীরিয়্যার জনসংখ্যা ছিল ৯,৮৮,০০০।

ঐতিহাসিক ঃ নিকিয়াসের জন (John of Nikius) তাঁহার Chronicle-এর ১১৩ অধ্যায়ে (সং Zotenberg, 321, 509)। কাল্য়ূবের উল্লেখ করিয়াছেন। 'আম্‌র ইবনু'ল-'আস (রা) মিসর প্রদেশের অন্যান্য শহর জয়ের উদ্দেশ্যে এই শহরের খালের উপর একটি সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন (আনু. ২০/৬১৪)। ৫৪৯/১১৫৪-৫ সালে খলীফা আজ-জাহির তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র নাস্‌র ইব্‌ন 'আব্বাসকে কাল্য়ূবের জায়গীর দান করেন। উসামা ইব্‌ন মুনকিয এই উপহার সম্পর্কে নাসর ও তাঁহার পিতার নিকট এমন নিন্দনীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, উহা পরিশেষে নাসর ও 'আব্বাস কর্তৃক খলীফার হত্যার অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়ায় (ইব্‌নু'ল-আছীর, অধ্যায় ১১, পৃ. ১২৬; উসামা ইব্‌ন মুনকিয, সম্পা. Derenburg i, 245; ইব্‌ন মুয়াস্‌সার, সম্পা. Masse, 93)। ১ম সেলীম ও তুমান বে-এর মধ্যে যুদ্ধের সময় কাল্য়ূব আরবদের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই (ইব্‌ন ইয়াস, তা'রীখ মিস্‌র,

সাফার ৯২৫/মার্চ ১০, ১৫১৭ সালে)। দূতাবাস ইত্যাদির জন্য কায়রোর পূর্বে কাল্য়ূব একটি অবস্থান স্থল হিসাবে বিবেচিত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৯২৫/মার্চ ১৫১৯ সালে খা'ঈর বে সুলতানের দূতকে কাল্য়ূব-এ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাদী বারাকাত ইব্ন মূসা কর্তৃক সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন (ইব্ন ইয়াস, পূ. গ্র., ৩খ, ১০৯)। ১২১৯-২০/১৮০৪-৫ সালে সেনাবাহিনী ও মামলূকদের লুটতরাজের জন্য শহরটির পুনরায় অতিমাত্রায় ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল (তু. জাবার্তী, 'আজা'ইবু'ল-আছার, উপ-অধ্যায়)। কায়রোর প্রবেশ পথের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে রাজধানীতে অন্য সময়ে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব হইতে কাল্য়ূব মুক্তি পায় নাই। ইব্ন দুক্মাক (৮০৯/১৪০৬) এবং আজ-জাহির (৮৩৯/১৪৩৪-৩৫)-এর বর্ণনা মতে তাঁহাদের সময়ে কাল্য়ূবের একটি বিরাট অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক ঃ প্রায় সকল উৎসই কাল্য়ূবের সম্পদ হিসাবে বাগানসমূহ ও বৃক্ষরাজি, বিশেষ করিয়া বাবলা জাতীয় (সান্ত) বৃক্ষের প্রশংসা করিয়াছেন। আল-মালিকু'ল-কামিলের সীমিত অধ্যাদেশ সত্ত্বেও কাল্য়ূবের ভূমি নিকৃষ্টভাবে কর্ষণ করা হইয়াছিল, যাহার ফলে উহার উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় [তু. 'উছমান ইব্ন ইব্রাহীম আন-নাব্লুসী (Brockelmann, GAL, i, 409), ৬৩৭-৪৮/১২৪০-৪৯ সালে তাঁহার লিখিত লুমা'উ'ল-কাওয়ানীন আল-মুদী'আ ফী দাওয়াবীনি'দ-দিয়ারি'ল-মিসরিয়্যা গ্রন্থে কাল্য়ূবের উপর একটি দীর্ঘ অধ্যায় যোগ করিয়াছেন ; 'আলী পাশা মুবারাক, পূ. গ্র., পৃ. ১১৪-এ উদ্ধৃত]। ১২৪০/১৮২৪-৫ সালে মুহাম্মাদ 'আলী কাল্য়ূব-এ একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী কালে ঐ স্থানে একটি সেনানিবাস ও পরিবহন দফতর স্থাপিত হইয়াছিল। কাল্য়ূব-এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশ্-শাওয়ারিবী বংশের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তাঁহারা মসজিদসহ একটি সরাইখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কাল্য়ূব-এ ছয়টি মসজিদ আছে, ইহাদের মধ্যে একটিতে শুক্রবারে জুমু'আর সালাত আদায় করা হয়। এইগুলির মধ্যে বিরাট মিনারা সংবলিত প্রধান মসজিদটি যাহা ইতিপূর্বে জামি'উ'য-যায়নাবী নামে পরিচিত ছিল, ইব্ন জুবায়র (মিসরে ৫৭৮/১১৮২-৩ সালে)-এর মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল (দ্র. Brockelmann, i, 629; 'আলী মুবারাক, পূ. গ্র., পৃ. ১১৪)। এই মসজিদের মিম্বারে ও প্রবেশ পথের উপর উৎকীর্ণ শিলালিপির সূত্রে বলা যায় যে, কাল্য়ূব-এর শায়খু'ল-'আরাব আহমাদ আশ্-শাওয়ারিবী ১১৪৮/১৭৩৫-৩৬ সালে উহা পুনঃসংস্কার করেন। সেখানে সূফী সাধকদেতর কিছু মাযার রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে সীদী 'আওওয়াদের মাযার গুরুত্বপূর্ণ।

শহরের বিখ্যাত বংশ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া 'আলী পাশা মুবারাক উল্লিখিত আশ-শাওয়ারিবী পরিবারের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বারস তাহাদের উপর বাহ্রু আবি'ল-মানাজ্জা-র উপর নূতন সেতু নির্মাণের দায়িত্ব দেন (তু. আল-কাল্কাশানদী, অনু. Wustenfeld, পৃ. ২৮) এবং তাঁহাদের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি ও জায়গীর এবং বাৎসরিক অবসর ভাতা মঞ্জুর করেন (যাহা ১২৭৫/১৮৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল)। মুসতাফা পাশা আল-কাল্য়ূবিয়ার সমগ্র প্রদেশের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করেন। কাল্য়ূবের শায়খু'ল-'আরাবের পদ ছাড়াও এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ করিয়াছিলেন। মনে হয় শায়খু'ল-'আরাব পদটি তাঁহাদের জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পদ হিসাবে গণ্য হইত। সুলায়মান আশ-শাওয়ারিবীকে দেশপ্রেমের জন্য জীবন দান করিতে হইয়াছিল। রাজাব ১২১৩/ ডিসেম্বর ১৭৯৮ সালে একটি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ফরাসীগণ তাঁহার শিরশ্ছেদ করে (দ্র. আল-জাবারতী, ৪খ, ৫ প.)।

ইব্ন জী'আনের মতে (তু. 'আবদু'ল-লাতীফ, আল-ইফাদা ওয়া'ল-ই'তিবার, ফরাসী অনু. de Sacy, শিরোনাম Relation de l'Egypte etc., পৃ. ৫৯৫) আল-কাল্য়ূবিয়া প্রদেশ তাঁহার সময়ে (৭৭৭/১৩৭৫-৬) ৫৯ টি শহর এলাকা লইয়া গঠিত ছিল এবং ৪,১৯,০৪৪ দীনার রাজস্ব প্রদান করিত। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় ৬১টি শহর এলাকার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন দুক্মাক ৬০টি শহর এলাকা এবং সর্বমোট ৩,৮৩,১৪০ দীনার রাজস্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাসী অভিযানের সময় উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন তালুকের রাজস্বের পরিমাণ (Descr de. l' Egypte, ১খ, ৩০৬ প.) দাঁড়াইয়াছিল (১) মীরীর জন্য ৩৩,৯০,৭৪২ দীনার; (২) কুশূফিয়ার জন্য ১৭,১০,৪৬২ দীনার এবং (৩) ফা'ইযের জন্য ১,৫১,১৯,১৯৯ দীনার।

বাহ্রু'দ-দারদূস ঃ কিংবদন্তী অনুসারে ফির'আওন কর্তৃক নির্মিত এবং তাঁহার মন্ত্রী হামান কর্তৃক সম্প্রসারিত (ইব্ন দুকমাক, আল-কালকাশানদী) বাহ্যত সব সময় পানি ভর্তি একটি দীর্ঘ খাল। এই খালের সম্পর্ক ইব্ন দুক্মাক (আল-কাল্কাশান্দী তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন) মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। শাওয়ারিবী পরিবারের ৮৯১/১৪৮৬ এবং ১০৬১/১৬৫০-১ সালের দুইটি দলীলে ('আলী পাশা কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে) ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। আল-কাল্কাশানদী বলিয়াছেন যে, খালটি তাঁহার সময়ে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং আবু'ল-মানাজ্জা খাল উহার স্থান অধিকার করিয়াছিল (Wustenfeld, পূ. গ্র., পৃ. ২৫ প.)। 'আলী পাশা মুবারাকের মতে তাঁহার সময়ে তুর'আত আস্-সার্দূসিয়া নামে একটি ছোট খাল ছিল। ইব্ন খাল্লিকান, বুত্রুস আল-বুসতানী ও 'আলী পাশা মুবারাক আল-কাল্য়ূবী উপাধিধারী অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শিহাবু'দ-দীন আল-কালয়ূবী তাঁহার মধ্যে অধিক পরিচিত ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলি প্রধান ঃ (১) ইব্ন মুয়াস্সার, আখবার মিস্র, সম্পা. H. Masse, কায়রো ১৯১৯ খৃ., পৃ. ২৩, ৬০, ৯৩; (২) আবূ শামা, কিতাবু'র রাওদাতায়ন, in the Hist. des Crois, iv, 147; (৩) আদ-দিমাশ্কী, নুখবাতু'দ-দাহ্র ফী 'আজা'ইবি'ল-বার্র ওয়া'ল-বাহ্র, সম্পা. Mehren, কোপেনহ্যাগেন ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ২৩১ ; (৪) আল-মাক্রীযী, আল-খিতাত, সম্পা. Wiet, ১খ, ৩১৩, অধ্যায় ২৫, ২খ, ৮৫, টীকা ১; (৫) ইব্ন দুকমাক, কিতাবু'ল-ইন্তিসার, সম্পা. Vollers, এই শিরোনামে Descr. de l'Egypte, বূলাক ১৩০৯ হি., ৫খ, ৪৩, ৪৭; (৬) আল-কাল্কাশানদী, সুবহু'ল-আ'শা, Wustenfeld, Calcschandi's Geographie u. verwaltung von Agypten (Abh. d. kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Gottingen. xxv, 1879), পৃ. ২৫ প., ২৮, ১০৯; (৭) আজ-জাহিরী, in De Sacy, Chrestomathie arabe, প্যারিস ১৮২৬ খৃ., ২খ, ৫; (৮) ইব্ন

ইয়াস, তা'রীখ মিস্‌র, বূলাক ১৩১১ হি. ২খ, ৫৪, ১০৯, ১৫৭, ১৯৭, ২০৪; ৩খ, ১০৯, ১১০, ১৭০, ১৯২, ২০৬, ২৮৬, ৩০৩, ৩১৮; (৯) d'Anville, Memoires sur l'Egypte, ... প্যারিস ১৭৬৬ খৃ., পৃ. ৩৯; (১০) আল-জাবারতী 'আজা'ইবু'ল-আছার ফি'ত-তারাজিম ওয়া'ল-আখবার, কায়রো ১৩২২ হি; (১১) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতু'ল জাদীদা..., বূলাক ১৩০৫ হি., ১৪খ, ১১৪-৯; (১২) মুহাম্মাদ রাম্‌যী, আল-কামূসু'ল-জুগারাফিয়্যা লি'ল-বিলাদি'ল-মিসরিয়্যা, কায়রো ১৯৫৩-৬৮ খৃ, ২/১খ, ১৯, ৫৭-৮।

A. Richter (E. I.[2])/ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

আল-কাল্‌য়ূবী (القليوبى) ঃ আবু'ল-'আব্বাস শিহাবু'দ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালামা, একজন আরব লেখক, যিনি শাফি'ঈ মাযহাব-এর খ্যাতনামা ফাকীহ শামসু'দ-দীন (আশ-শামস আর-রামলী (মৃ. ১০০৪/১৫৯৬)-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক সকল ফাকীহ-ই তাঁহাকে একজন নির্ভরযোগ্য 'আলিম বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি শাওওয়াল ১০৬৯/জুলাই ১৬৫৯ সালের শেষ দিকে ইনতিকাল করেন। ফিক্‌হ (মুসলিম আইনশাস্ত্র), ভূগোল চিকিৎসাশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। উহাদের মধ্যে মাত্র একুশখানা গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। Brockelmann যেই ১৮খানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন সেইগুলির সহিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও যোগ করিতে হইবে ঃ (১) কিতাবু'ল-মুজাররাবাত (كتاب المجربات) Gottingen- এ (দ্র. Verzeichn. der Hss. im Preuss. Staate, Gottingen, Hannover, ৩খ, বার্লিন ১৮৯৪ খৃ., সংখ্যা ১০০); (২) মি'রাজু'ন-নাবী, (معراج النبى), দামিশকের জাহিরিয়্যা 'উমূমিয়া-তে (দ্র. হাবীব আয-যায়্যাত, খাযা'ইনু'ল-কুতুব ফী দিমাশ্‌ক ওয়া দাওয়াহীহা, কায়রো ১৯০২ খৃ., পৃ. ৭৪, সংখ্যা ৪০; Houtsma, Cat. d'une coll. de Mss. arabes et turcs...ইত্যাদি, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ., সংখ্যা, ২৪১); (৩) রিসালা ফী মা'রিফাত আসমা'ইল-বিলাদ ওয়া 'উরূদিহা ওয়া আতওয়ালিহা (رسالة فى معرفة أسماء البلاد و عروضها واطوالها) Princeton-এ (দ্র. Littmann, A list of Arabic Mss. in Princeton Univ. Library, প্রিন্সটন-লাইপযিল ১৯০৪ খৃ. ৯, সংখ্যা ৪০); (৪) কিতাব হিকায়াত (كتاب حكايات) সৎ লোক ও আল্লাহ্‌ভীরুদের জীবনী; ইহা কিতাবু'ন-নাওয়াদির (كتاب النوادر) Brit. Mus. হইতে ভিন্ন একখানা গ্রন্থ (দ্র. Edwards ও Ellis, A Deser. List of the Arabic Mss. acquired .... since 1894, লন্ডন ১৯১২ খৃ., পৃ. ৬২. Or. ৭০১৮); (৫) মানাসিকু'ল-হাজ্জ ওয়া'ল-'উমরা (مناسك الحج والعمرة); (৬) আল-বুদূরু'ল-মুনাওওয়ারা ফী মা'রিফাত রুতাবি'ল-আহাদীছি'ল-মুশতাহিরা (البدور المنورة فى معرفة رتب الاحاديث المشتهرة)।

আল-কাল্‌য়ূবীর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ (১) আন-নাওয়াবী রচিত মিন্‌হাজু'ত-তালিবীন (منهاج الطالبين)-এর মাহাল্লী (মৃ. ৮৬৪/১৪০০)-কৃত ভাষ্য শিহাবু'দ-দীন আল-বুরুল্লুসী-র টীকাসহ, কায়রো ১৩০৬–১৩১৮ হি., ৪ খণ্ডে; (২) কিতাবু'স-সালাওয়াত (كتاب الصلوات) বূলাক ১৩০০ হি.; (৩) আত-তাযকিরা ফি'ত-তিব্‌ব, আস-সুওয়ায়দীকৃত তাযকিরা-এর পার্শ্বস্থলে, কায়রো ১৩০২ হি. এবং পৃথকভাবে, কায়রো ১৩০৫ হি.; (৪) হিকায়াত গারীবা ওয়া 'আজীবা বা হিকায়াত ওয়া গারা'ইব ওয়া 'আজা'ইব ওয়া লাতা'ইফ ওয়া নাওয়াদির ওয়া ফাওয়া'ইদ নাফা'ইস (حكايات وغرائب وعجائب ولطائف ونوادر وفوائد ونفائس) যাহাকে সাধারণত সংক্ষেপে নাওয়াদিরু'ল-কাল্‌য়ূবী বলা হয়। ইহা তাঁহার ইনতিকালের পর প্রকাশিত হয়। দ্র. نوادر لقليوبى The Book of Ancedotes, Wonders, Marvels, Pleasantries, Rarities and Useful and Precious Extracts, সম্পা. W. Nassau Lees ও মাওলাবী কাবীরু'দ-দীন, কলিকাতা ১৮৫৬ খৃ., ২য় সং., ১৮৬৪ খৃ., ইহা ছাড়া ও ১২৭৪ হি. হইতে কায়রোতে কয়েকবার প্রকাশিত হইয়াছে। শেষবার প্রকাশিত হয় ১৩২৩ হি., ১৩২৮ হি., যাহার প্রকাশনার বর্ণনা কলিকাতার প্রকাশনার বর্ণনা হইতে ভিন্নতর; (৫) তুহ্‌ফাতু'র-রাগিব (تحفة الراغب), কায়রো ১৩০৭ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল-আছার মিন আ'য়ানি'ল-কারনি'ল-হাদী 'আশার, ১খ, ১৭৫ পৃ.; (২) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতু'ল-জাদীদা, ১৪খ, ১১৮; (৩) Sanguinetti, in Journ. Asiat., ১৮৬৫ খৃ., ২খ, ৩৫১; (৪) Leclerc, Hist. de la Medecine arabe (প্যারিস ১৮৭৬ খৃ.) ২খ, ৩০৩; (৫) Brockelmann. GAL ১খ, ৩৬৪. পরি. ২খ, ৪৯২ প.; (৬) আয-যিরিক্‌লী আল-'আলাম., শিরো আহমাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সালামা; (৭) 'উমার রিদা কাহ্‌হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন (দামিশক ১৯৫৭ খৃ.), ১খ, ১৪৮ ; (৮) সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবূ'আত, শিরো.।

C. Brockelmann (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলিল

কাল্লালা (Kallala/قللة) ঃ গুয়েল্লালা (Guellala), জারবা দ্বীপের [দ্র.] দক্ষিণে অবস্থিত মৃৎশিল্প কারখানার জন্য বিখ্যাত বার্বারভাষী একটি গ্রাম। সেখানে বহু বিচিত্র রকমের ছাঁচে (ন্যূনপক্ষে ১২০ প্রকার) মৃৎপাত্রাদি নির্মিত হয় ও সমগ্র তিউনিসিয়ায় বিক্রয় হয়। পূর্বে এই সকল পাত্র আলজিরিয়া, সিসিলি ও ত্রিপোলিতানিয়ায় রফতানী করা হইত। কিন্তু সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে স্বল্প মূল্যের য়ূরোপীয় তৈজসপত্রাদি যাহাদের কতক প্লাস্টিক হইতেও তৈরী, আমদানীর ফলে এই মৃৎশিল্প কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাল্লালায় নির্মিত মৃৎপাত্রাদি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। বৃহদাকারের "যেফফায়া" (Zaeffaya) বিপুল চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন করিয়া নির্মাণ করা হয়। এইজন্য বিপুল দক্ষতার প্রয়োজন। পাত্রগুলি ১.৫০ মিটার পর্যন্ত বড় হইয়া থাকে। ভরকেন্দ্র নীচু হওয়ায় কুম্ভকার একই সময়ে লেদযন্ত্র চালনা করিতে ও পাত্রের উপরিভাগ নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়িয়া লইতে পারে। কখনও এই সব পাত্র বিভিন্ন অংশে তৈরী করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সেফরি (Safri) [বার্বার আমীরী], যাহা তৈল বা পানির বিরাট পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় (২০০ হইতে ২৫০ লিটার ধারণক্ষম) একটির উপর অপর একটি। এইরূপে স্থাপিত চারিটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হাররাশা (harrasha) হইতেছে আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং বিভিন্ন প্রকার আধার (পানি, ময়দা, তৈল, সুস্বাদু দ্রব্যাদি, মসলাপত্র ইত্যাদির জন্য), রান্নার পাত্র, ঢাকনা, নল, প্রদীপ, সুগন্ধি ধারক ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়। কালাইকৃত ও সুশোভিত পাত্রাদিও এইখানে নির্মিত হইয়া থাকে। কোনও বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশী মৃৎশিল্পীরা নবদম্পতিকে সাজসজ্জার জিনিসপত্রাদি, কম্বল ও শীত বস্ত্রাদি) রাখিবার জন্য একটি বৃহৎ চকচকে মৃৎপাত্র উপহার দিয়া থাকেন।

কাল্লালায় [আরবী গাল্লালা (Gallala), বার্বার ইকাল্লায়েন (Ikallaen) 'কুম্ভকারগণ'] প্রচলিত বার্বার ভাষাটি বেশ কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। ইহাতে গতিশীল শ্বাসাঘাতের একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক মূল্য রহিয়াছে। তাহাদের মতে আফরুখ আমাশকুন (afrukh-amashkun) দ্বারা "ছোট বালকটি" ও তাফরুখত-তামাশকুনত (tafrukht-tamashkun) দ্বারা "ছোট বালিকাটি" বোঝায়। কিন্তু আফরুখদ আমাসকুন (Afrukhd amaskun) দ্বারা একটি "ছোট বালক" ও তাফরুখত্ তামাশকুনত্ (tafrukut tamashkunt) দ্বারা "একটি ছোট বালিকা" বোঝায়। স্ত্রীবাচক রূপটি নির্দিষ্ট কি অনির্দিষ্ট তাহা শুধুমাত্র শ্বাসাঘাতের (Strees) অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া নির্ণীত হয়।

স্বরবর্ণের দৈর্ঘ্যও একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। আগরুন (aghrun) হইতেছে 'রুটি', কিন্তু আগরুন ইস (aghrun-is) (দীর্ঘ u বিশিষ্ট) হইতেছে "তাহার রুটি", আগরুন ইনসেন aghrun-Insen (হ্রস্ব u বিশিষ্ট) হইতেছে "তাহাদের রুটি", রাহ্‌হাগ আল, বাউ-ইস (rahhagh-al-bau-is) অর্থাৎ "আমি তাহার পিতার গৃহে গিয়াছি" (গতি, bau-is) এবং yella al bau-is অর্থাৎ "সে তাহার পিতার গৃহে আছে" (স্থিতি, bau-is) বাক্য দুইটির মধ্যে একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য রহিয়াছে। কোনও কোনও সময় সম্বন্ধ পদের পরে ব্যবহৃত বিশেষ্যটি হ্রস্ব করা হয়। যেমন imi, 'মুখ' বা 'তোরা' (দীর্ঘ i বিশিষ্ট), কিন্তু imi-lhush, "গৃহের সম্মুখের আঙিনা" (হ্রস্ব i বিশিষ্ট)। বিশেষ্যসমূহের সহিত ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ ও পদান্বয়ী অব্যয় ও ইহাদের উচ্চারণকে প্রভাবিত করিতে পারে। berkukes অর্থাৎ 'কুসকুস' (উত্তর আফ্রিকায় বহুল প্রচলিত একটি জনপ্রিয় খাবার বিশেষ)।

কিন্তু edh berkukes, "কুসকুসের সহিত" (হ্রস্ব u বিশিষ্ট)। alhush-এর অর্থ 'বাড়ী,' কিন্তু "আমি বাড়ী হইতে আসিয়াছি" বুঝাইতে তাহারা বলে usigh-d s-alhush (দীর্ঘ u বিশিষ্ট)। বেশ কিছু বিশেষ্যের সর্বনামীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ alghum 'উট,' alaghm-is "তাহার উট", allabghal 'খচ্চর', albaghl-is "তাহার খচ্চর", alkahwath "কফি" এবং alkahhawt-is "তাহার কফি"। শেষোক্ত উদাহরণটিতে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। অঘোষ দন্ত্যবর্ণটি স্বরবর্ণের পরে th (মহাপ্রাণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের t অল্পপ্রাণ বা অন্তর্ধারক) উচ্চারিত হয় এবং সংস্কৃত অক্ষরটি একটি নূতন আক্ষরিক গঠনের সহিত যুগ্মভাবে ইহার সংবৃতাবস্থা বজায় রাখে। t ও th-এর উচ্চারণবিধি হিব্রু ও সুরিয়ানী begadkefat ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের সমতুল্য। কাল্লালার ভাষার বিপরীত উচ্চারণসমূহ হইতেছে b ঃ v, d ঃ dh, g ঃ y, k ঃ x (=পশ্চাত-তালব্য অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি, যাহাতে একটি উষ্ম প্রবণতা রহিয়াছে) এবং d ঃ d (প্রায়শ d রূপে উচ্চারিত)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরবী ভাষার সহিত সাদৃশ্য ও আরবী শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ইহার উচ্চারণতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত করিলেও সামগ্রিকভাবে ইহার মধ্যে মরক্কোর গুমারা (Ghumara) ও সেনেগালের যেনাগা (Zenaga) ভাষার মতো একই প্রকারের অন্বয়সমূহ (correlations) দেখিতে পাওয়া যায়। Sedwikesh, Almay ও Adjim-এর মতো কাল্লালা এই দ্বীপে বার্বার ভাষার সর্বশেষ দুর্গগুলির অন্যতম। একটি মৌখিক সাহিত্য (সঙ্গীত, গল্প ও ধাঁধাসমূহ) এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিলেও স্কুল, কলেজ, বেতার ও টেলিভিশনের প্রসার এবং আরবীভাষী জনগণের সহিত সংস্পর্শের ফলে ভাষাটির পুনর্বিন্যাস হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. L. Combes and A. Louis, Les poteries de Djerba, Ṭunis 1967; (২) W. Luadi, Topferei und Topferdorfer in Tunesien, in Kosmos, ii (Stuttgart 1961); 478-88; (৩) S. Tlatli, Djerba, l'ile des Lotophages, Tunis 1967; (৪) W. Vycichl, Begadkephat (Djerba, Gellala), in Proceedings of the Hamito - Semitic Colloquium, London 1970।

W. Vycichl (E. I. [2])/আবূ মুহাম্মদ আসাদ

কাল্‌হাত্ (قلهات) ঃ (২২°৪২ উত্তর অক্ষাংশ, ৪৯°১৭ পূর্ব দ্রাঘিমা), দক্ষিণ পূর্ব 'উমান-এর বানূ সালীমা ও মালিক ইব্‌ন ফাহাম্ (আয্‌দ) সম্প্রদায়ের একটি প্রধান উপকূলীয় উপনিবেশ, সম্ভবত ইসলাম-পূর্ব সময় হইতে বিদ্যমান ছিল। Marco Polo ইহাকে Calatu ও পর্তুগীজ লেখকগণ Calaiate নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাল্‌হাত্ এককালে বিষুবরেখার (رأس الحد) উত্তর-পশ্চিমে 'উমান-এর একটি মনোরম বন্দর নগরী ছিল। ইব্‌ন বাতূতা এই শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অলিগলি এবং সুন্দর ও সুউচ্চ জামি' মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই মসজিদ হইতে উপকূলীয় বন্দর এবং সমুদ্রের দূরবর্তী দৃশ্যসমূহ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইত। মুতাদায়্যিন বীবী (শরীফ বংশীয়) মারয়াম ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই শহরের অধিবাসিগণ ইবাদিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিল। কিন্তু তাহাদের সুন্নী শাসকগণ অর্থাৎ হুরমুয [দ্র.] (ইব্‌নু'ল-আছীর, আল্-কামিল, সম্পা. Tornberg, ১২খ, ১৯৮)-এর অধিপতিদের নিকট হইতে নিজেদের 'আকীদা-বিশ্বাস গোপন রাখিত। তাহারা ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া জীবন ধারণ করিত এবং বিকৃত আরবী ভাষা ব্যবহার করিত। য়াকূত কাল্‌হাত্-কে 'উমান-এর সুন্দরতম এলাকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, খৃ. ১২ শতাব্দীতে ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই শহরের ইবাদিয়া খারিজী সম্প্রদায় তাহাদের 'আকীদা-বিশ্বাস জনসমক্ষে স্পষ্ট প্রকাশও করিত। খৃ. ১৬শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজগণ হুরমুয্-এর রাজাগণের কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়। কামূ সালীমা ও মালিক ইব্‌ন ফাহাম—এই দুই উপগোত্র (clans) হুরমুয্ প্রণালী পারসিক অংশেও বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং জুলান্দা (Djulanda ibn)-Karkar-এর নেতৃত্বে Dikdan ও Huzw নামক তাঁহাদের ক্ষুদ্র দুর্গদ্বয় হইতে উপসাগরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এলাকাটি আংশিক নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিল। 'আদুদু'দ-দাওলা কর্তৃক বহিষ্কারের সময় পর্যন্ত তাহাদের এই নিয়ন্ত্রণ চলিতেছিল। বুওয়ায়হী শাসনের পতন, তদস্থলে সাল্‌জূক্‌দের শাসন প্রতিষ্ঠা, 'উমান ও হাদারামাওত-এ ইবাদী ইমামাত-এর মৃত্যু এবং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য লোহিত সাগরে স্থানান্তর— এই ঘটনাগুলির দরুন পারস্য উপসাগরের প্রবেশদ্বারে রাজনৈতিক জোট কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের ফলে সীরাফ ও সুহার-এর প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্রদ্বয়ের চূড়ান্ত পতন ঘটে। সীরাফ-এর বণিকগণ বুওয়ায়হী আমলে ইতিমধ্যেই কায়স-এর দ্বীপটির উন্নতি সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বুওয়ায়হীর শাসকগণই ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শুরুতে উপসাগরের প্রবেশদ্বারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল,

যাহাতে ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের কিছু অংশ ক্রমে ক্রমে উপসাগরীয় এলাকায় প্রত্যাবর্তিত হয়।

একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব 'উমান (যাহাদের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইবাদী) এবং হুরমুয (তখন কিরমানের স্থানীয় বন্দর)-এর অধিবাসিগণের মধ্যকার ঐতিহ্যগত সম্পর্ককে সক্রিয় করা হয়। কাল্হাত্কে সুরক্ষিত করা হয় এবং উহা মৌসুমী বাণিজ্যের আমদানী রফতানী কেন্দ্রে পরিণত হয়, যে ভূমিকা ইতিপূর্বে ছিল সুহার-এর। কায়স দ্বীপের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়াসে ফ্যাক্স-এর সালগুরীদের সহিত একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছিল। এই চুক্তির ফলে ৬১১/১২১৪-১৫ ও ৬১৭/১২২০-২১-এর মধ্যবর্তী কোনও সময়ে খাওয়ারিয্মীগণ কালহাত্ দখল করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর কাল্হাত্-এর মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ আল-কাওসতী (Kwsti, ভিন্ন রূপ Kwshe, Kashi) কায়স-কে পদানত করেন এবং জু'ফার পর্যন্ত সমগ্র উপকূলবর্তী এলাকার কর্তৃত্ব লাভ করেন। 'উমান-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে মাহমূদ কর্তৃক প্রেরিত সেনাদল ৬৬০/১২৬১-৬২ সনে দক্ষিণ মরুভূমি অঞ্চলে ধ্বংস হইয়া যায়।

মাহ্মূদ যদিও হুরমুযে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু কাল্হাতের সহিত সম্পর্ক কখনও ছিন্ন করেন নাই। অবশেষে সেখানেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে পারস্য ঐতিহ্যের অনুসারী হন, দ্বিতীয় রাজধানীর সংখ্যাগুরু শত্রু আরব জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান এবং রাজবংশীয় কর্তৃত্বের শত্রু ইবাদীদের সম্পর্কে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের কিছু পূর্বে একটি ভূমিকম্পের ফলে কালহাত্ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মৌসুমী বাণিজ্যকেন্দ্র 'উমান-এর উপকূলে মাস্কাত-এ স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কাল্হাত পরাভব স্বীকার করে। ১৫০৮ খৃ. Alboquerque কর্তৃক লুণ্ঠিত এই উপকূলীয় শহরটি পর্তুগীজ কর্তৃক কখনও পুনর্নির্মিত হয় নাই। তাহারা (পর্তুগীজ) সর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলীয় তাহাদের সুরক্ষিত উপনিবেশ হিসাবে কুরায়াত-কে গড়িয়া তুলিয়াছিল। খৃ. ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও পর্তুগীজ আড়তদারদের সহিত কাল্হাত-এর বাণিজ্যের পরিমাণ মাস্কাত্-এর বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ছিল। কিন্তু ১৭ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্তুগীজদের শেষ সময়ে কাল্হাতের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। অনুমিত হয়, এমনকি স্থানীয় বন্দর হিসাবেও সুর ইহার মর্যাদা দখল করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকৃত, মুজোম, ৪খ, ১৬৮; (২) ইব্ন বাতূতা (সং. Defremery and Sanguinetti), ২খ, ২২০, ২২৪-২২৬; (৩) ইব্ন সা'ঈদ, Relations de Voyages et textes Geogr. Arabes...... rel a l' Extreme Orient, G. Ferrand অনূদিত (প্যারিস ১৯১৩-১৯১৪ খৃ.). ৩৩৬; (৪) সালীল ইব্ন রাযীক, History of the Imams and Seyyids of 'Oman, G. P. Badger অনূদিত (লন্ডন ১৮৭১ খৃ.), ৩৭ প., ৩৯; (৫) The Book of ser Marco Polo, Yule অনূদিত, সং ৩. সম্পা. H. Cordier (লন্ডন ১৯০৩ খৃ.) ১খ., ১২০ টীকা, ২খ., ৪৪৯-৪৫৯; (৬) S. B. Miles. The Countries and tribes of the Persian Gulf, লন্ডন ১৯১৯ খৃ. ৪৩৭-৪৭৫, ৫২৮ প., নিবন্ধ Kilhat; (৭) Ritter, Erdkunde, ১২খ, ৩০৫, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৭. ৩৭৮; (৮) Geogr. d' Edrisi (আল-ইদ্রীসী, নুযহাতু'ল-মুশ্তাক, A. Jaubert-এর ফরাসী অনুবাদ), ১খ, ১৫১; (৯) J. R. Wellsted. Travels in Arabia, লন্ডন ১৮৩৮ খৃ. ১খ, ৪৪; (১০) আল-বাক্‌রী মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld ১৮৭৬-৭৭ খৃ., ৭৪২; (১১) Alboquerque, The commentaries of the great Alfonso Dalboquerque, Hakluyt Society ১৮৭৫-৮৪ খৃ., নির্ঘণ্ট, s. v. Calayate; (১২) J. Aubin. Les Princes d'Ormuz du xiii[e] au xv[e] Siecle, in JA. ccxli (১৯৫৩ খৃ.); (১৩) 'আওতাবী আস-সুহারী (সালামা ইব্ন মুসলিম), কিতাবু আন্সাবি'ল-'আরাব, two Mss. including Bib. Nat. Paris Mss. arabes 5019, section Azd; (১৪) de Barros, Asia, ৬ষ্ঠ সং., Lisbon ১৯৪৫ খৃ. প., ii, 2, i, 44; (১৫) দিমাশ্কী, নুখ্বাতু'দ-দাহ্র ....., ed Mehren ১৮৬৬ খৃ., ১৬৬; (১৬) S. D. Goitein Two evewitness reports on an expedition of the King of Kish (Qais) against Aden, in BSOAS, ১৬খ, (১৯৫৪ খৃ.); (১৭) হাম্দুল্লাহ্ মুস্তাওফী, নুয্হা, ১১৬; (১৮) ইব্নু'ল-আছীর, ১০খ., ২৩৩-২৩৪. ১২খ., ১৯৮; (১৯) ইব্নু'ল-মুজাবির, তা'রীখু'ল-মুস্তাব্সির, সম্পা. Lofgren, ১৯৫১, ১৯৫৪ খৃ. ২খ., ২৭২-৭৪, ২৮৭-৯১; (২০) F. M. Da Luz (সম্পা.), Livro das Cidades e Fortelezas da India, in Boletin Da Biblioteca Da Universidade De Coimbra, ২১খ, (১৯৫৩ খৃ.) ৫৫-৫৬; (২১) মুকাদ্দাসী, ৪২৬-৪২৭, ৪৩২; (২২) আস্-সালিমী ('আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুমায়দ), তুহ্ফাতু'ল-আ'য়ান বি-সীরাত আহ্লি 'উমান, কায়রো ১৯৬১ খৃ., ১খ., ২৫৩; ২খ, ৫; (২৩) সিরহান ইব্ন সা'ঈদ আল-আম্বু 'আলী, কাশ্ফু'ল-গুম্মা....., দামিশ্ক পাণ্ডু. তা'রীখ ৩৪৭, ৪৮৩, E. C. Ross কর্তৃক Annals of 'Oman শীরো. অনূদিত, JAs. Soc. Bengal, ১৮৭৪ খৃ., ১৪০; (২৪) P. Texeira, The travels of Pedro Teixeira, Hakluyt Society ১৯০২ খৃ., Appendix A (.... origin of the Kingdom of Harmuz...), Appendix D (....Chronicle of the Kings of Ormeuz); (২৫) P. Della Valle (Letter ix), Les Fameux Voyages de Pietro della Valle, প্যারিস ১৬৬৩-৬৪ খৃ., ৪খ, ৪০৭-৪০৮; (২৬) J. R. Wellsted, Travels in Arabia, লন্ডন ১৮৩৮ খৃ., ১খ, ৪১-৪২; (২৭) দা. মা. ই., ১৬/২খ., ৩৯২।

J. C. Wilkinson (E. I.[2])/এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

আল-কালা'ঈ (الكلاعي) ঃ আবু'র-রাবী 'সুলায়মান ইব্ন মূসা ইব্ন সালিম আল-হিময়ারী আল-বালানসী। প্রায়শই ইনি ইব্ন সালিম আল-কালা'ঈ নামে পরিচিত; আনদালুস (স্পেন) হইতে আগত একজন মালিকী মাযহাবের 'আলিম, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও কবি। তাঁহার দাবী অনুযায়ী বংশসূত্রের দিক দিয়া তিনি যু'ল-কালা'-এর হিময়ারী খানদানের সহিত যুক্ত। তাঁহার জন্ম মুরসিয়া-এর নিকটবর্তী স্থানে রামাদান ৫৬৫/মে-জুন ১১৭০ সালে। যখন তাঁহার পরিবার ভ্যালেনসিয়ায় স্থান পরিবর্তন করে তখনও তিনি শিশু। সেখানেই তিনি তাঁহার শিক্ষা জীবন আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য স্পেনীয় শহরে, বিশেষত কর্দোভায়

তাহা অব্যাহত রাখেন। ইব্ন মাদা' [দ্র.] ইব্ন হুবায়শ, ইব্ন যারকূন এবং অপরাপর কতিপয় প্রখ্যাত শিক্ষকের মুরীদ। আল-কালা'ঈ ভ্যালেনসিয়ার প্রধান মসজিদের খাতীব-এর পদে এবং সম্ভবত একই সঙ্গে কাদীর পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির পশ্চাতে অবশ্য ছিল তাঁহার কতিপয় গ্রন্থ এবং তাঁহার মুরীদের দ্বারা তাঁহার প্রতি উৎসর্গিত প্রশংসামূলক রচনাসমূহ ঃ ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইবনু'ল-আব্বার [দ্র.] যিনি তাঁহার নিকটে ইব্ন বাশকুওয়াল (দ্র.)-এর সিলা-এর অনুবর্তী অংশ (তাকমিলা) রচনায় সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মুরীদের অপর একজন ছিলেন আর্-রু'আয়নী (দ্র.); তিনি তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন পত্রালাপ রক্ষা করিতেন এবং তাঁহার বারনামাজ গ্রন্থে আল-কালা'ঈ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ উল্লেখ নিবেদন করেন। ৫৮৭/১১৯১ সালে তিনি ভ্যালেনসিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে আল-কালা'ঈ তাঁহার এই প্রস্থান সম্পর্কে শোকসঙ্গীত রচনা করেন যাহা এই শিল্পে তাঁহারা পারদর্শিতার নমুনা বহন করে। তাঁহার রচিত দীওয়ান-এর যে সকল অংশ এখনও টিকিয়া আছে, সেগুলি একজন কবি হিসাবে তাঁহার মেধার পরিচয় বহন করে। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি ভ্যালেনসিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁহার বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি 'আনীশা (El Puig de Cebolla)-এর যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আরাগণের প্রথম জেমস্-এর হস্তে এই শহরের পতন ঘটিবার (১৬ সাফার, ৬৩৬/২৮ সেপ্টেম্বর, ১২৩৮) পূর্বে সংঘটিত এই যুদ্ধেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে (২০ যু'ল-হিজ্জা, ৬৩৪/১৫ আগস্ট, ১২৩৭)। ইবনু'ল-আব্বার প্রায় এক শত পংক্তির একটি মারছিয়াতে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছেন (দ্র. H. Masse, intro. to the Iktifa, ১৬-২৩, ৪০)।

আল-কালা'ঈ কুড়িটির অধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। উহাদের মধ্যে একটিমাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে কিতাবু'ল ইকতিফা' ফী মাগাযি'ল-মুসতাফা ওয়া'ছ-ছালাছা'ল-খুলাফা' [প্রথম খণ্ড (প্রকাশিত), সম্পা H. Masse, আলজিয়ার্স-প্যারিস ১৯৩১ খৃ., Bibliotheca-arabica, ৬]। এই সীরাত কালা'ইয়্যাটি হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কেবল প্রথম তিন খলীফার সামরিক অভিযান সংক্রান্ত ইতিহাস এবং এইরূপ কিছু উৎসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, যে গুলির অনেকাংশ বর্তমানে লুপ্ত। H. Masse কর্তৃক প্রকাশিত খণ্ডটিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মিশন, হামযা ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্তালিব-এর কথোপকথন এবং আবিসিনিয়ার দেশত্যাগের ঘটনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে। আল-ইক্তিফা' হইতে উদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি আদ্-দিয়ারবাকরী-র তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩, ১৩০২)-এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; খুরশীদ আহমাদ ফারিক দিল্লীতে একটি রচনা প্রকাশ করিয়াছেন (Indian Institute of Islamic Studies, ১৯৭০ খৃ.) যাহাতে দারু'ল-কুতুব (কায়রো)-এ সংরক্ষিত এবং তা'রীখু'র-রিদ্দা বলিয়া কথিত একটি পাণ্ডুলিপি হইতে আল-ইকতিফা' (দ্র) সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ ব্যবহার করা হইয়াছে।

আল-কালা'ঈ-র জীবনীকারগণের অধিকাংশের মধ্যেই তাঁহার রচনাবলীর তালিকা সম্পর্কে ঐকমত্য বর্তমান। ইহা হইতে জানা যায় যে, বাগ্মিতা ও চমৎকার হস্তলেখনীর জন্য সুপরিচিত এই মুহাদ্দিছ বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবাগণ সম্পর্কে (উল্লেখ্য কিতাব মায়দানু'স-সাবিকীন, ইত্যাদি; আল-মু'জাম ফী যিক্র মান ওয়াফাকাত কুনয়াতুহ কুনয়াতে যাওজিহি মিন সাহাবাতি'ল-মুসতাফা) এবং হাদীছসমূহের প্রচারে (বিশেষত রুওয়াতু'ল-বুখারী ওয়া আখবারুহ, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত; আরবা'উন, ইত্যাদি) উৎসাহিত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকদের মু'জাম-এর উপর নির্ভর না করিয়া তিনি তাঁহার রচিত কবিতাসমূহ একটি দীওয়ান-এ সংকলিত করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার পত্রালাপও খুতবাসমূহ (প্রায় ৮০টি) সংকলিতও হইয়াছে। শেষত আল-মা'আররী-এর দুইটি অনুকরণ ও কতিপয় প্রবাদের একটি সংগ্রহ আমাদের লক্ষ করা বাঞ্ছনীয়, যদিও কেবল গ্রন্থসমূহের শিরোনাম হইতে তাহাদের সম্পর্কে রায় প্রদান করা কঠিন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই শিরোনামসমূহ যথাযথ নয়, তথাপি মনে হয়, তাঁহার বহু সংখ্যক সাহিত্য কর্মের মধ্যে কেবল ইকতিফা'-কে সংরক্ষণ করিয়া আল-কালা'ঈ-র উত্তরসূরিগণ তাঁহার প্রতি কোন প্রকার আবিষ্কার করেন নাই; শেষোক্ত গ্রন্থটি কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার দাবী রাখে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ H. Masse, ইকতিফা' প্রসঙ্গে তাঁহার প্রদত্ত সূচনায় নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থপঞ্জীর বিবরণ পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন ঃ (১) ইবনু'ল-খাতীব-এর ইহাতা; (২) আল-বাশতাকী-এর ইহাতা-র সংক্ষিপ্তসার (পাণ্ডুলিপি); (৩) ইবনু'শ-আব্বার-এর তাকমিলা (৭০৮, নং ১৯৯১ ও পরিশিষ্ট, ৫৪০); (৪) যাহাবী, তাযকিরা (হায়দরাবাদ, ৪ নং ১৪); (৫) আস-সুয়ূতী, তাবাকাতু'-হুফ্ফাজ (Gottingen ১৮৩৩ খৃ. ৩খ, ৫৬); (৬) ইব্ন ফারহূন, দীবাজ (ফেয ১৩১৬ হি., ১২৫); (৭) আল-মাককারী, Analectes (২খ, ৫০২, ৬৫৫, ৭৬৮); (৮) নাসিরী, কিতাব যাহরি'ল-আফনান (ফেয ১৩১৪ হি., ১খ, ৩০৭); (৯) আল-'আরাবী আল-মাশরাফী, ফাতহু'ল-মান্নান। এই তালিকার সহিত অপরাপর যে সকল উৎস যুক্ত করা উচিত ঃ (১০) রু'আয়নী, বারনামাজ, সম্পা. আই. শাব্বূহ, দামিশক ১৩৮১/১৯৬২, ৬৬-৭২,; (১১) M. Ben Cheneb, in Actes du XIV[e] Congres des Orient, প্যারিস ১৯০৭ খৃ., ৪খ, নং ৩৩৮; (১২) ইবনু'ল-ইমাদ; শাযারাত, ৫খ, ১৬৪; (১৩) Pons Boygues, ২৮৩-৪, নং ২৩৯, অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য (১৪) ইবনু'ল-আব্বার, হুল্লা, সম্পা. এইচ. মু'নিস, ২খ, ১০২, ২১৫, ২৬৭; (১৫) হিময়ারী, রাওদ মি'তার, ৩২ ; (১৬) নুবাহী, মারকাবা, ১১৯ ; (১৭) হাজ্জী খালীফা, ১খ, ৩৮৮, ৫খ, ৫৭৯; (১৮) R. Basset, in Bull. Corr. Afr. ১৮৮৪ খৃ., ৩৭৫; (১৯) F. C. Seybold, in Homenaje a D. Fr. Codera, সারাগোসা ১৯০৪ খৃ., ১১৫ প.; (২০) Brockelmann. I, ৩৭১, S. I. ৩৩৮; (২১) F. Rosenthal, Muslim Historiography, নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E. I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কালাউন (قلاوون) ঃ আল-মালিকু'ল-মানসূর সায়ফু'দ-দীন, আবু'ল-মা'আলী আল-আলফী আস-সালিহী আন্-নাজমী আল-'আলা'ঈ, পঞ্চম মামলূক সুলতান, ৬৭৮/১২৭৯-৬৮৯/১২৯০ সন অবধি মিসর ও সিরিয়ার নৃপতি। ইনি বাহ্রী [দ্র.] বংশোদ্ভূত শীর্ষস্থানীয় মামলূক (=ক্রীতদাস) সুলতানদিগের অন্যতম। ইনি সুলতান ১ম বায়বার্স [দ্র.]-এর নীতির, বিশেষত মঙ্গোল ও খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধাভিযান-নীতির অনুসারী ছিলেন।

কালাউন কৃষ্ণ সাগরের উত্তর তীরস্থিত কিপচাক্ তুর্কীদের আবাস-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-তারিখ সম্ভবত ৬২০/১২২৩। প্রাপ্ত

সূত্রে তাঁহার শৈশবকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। পরবর্তীকালে কোনও এক দাস-ব্যবসায়ী তাঁহাকে মিসরে আনয়ন করে ও এক হাজার দীনার মূল্যে আয়ূবী সুলতান আল-'আদিল (দ্র.)-এর এক ক্রীতদাস আমীর 'আলা'উদ-দীন আক-সুনকুর-এর কাছে বিক্রয় করে। এই কারণে তাঁহার উপনাম ছিল "আল-আলফী" (=হাজারী)। ৬৪৭/১২৪৯ সনে 'আলা'উ'দ-দীন আকসুনকুর ইনতিকাল করিলে কালাউন ও অন্যান্য মামলুক তখন আয়্যূবী সুলতান আস-সালিহ্ নাজমু'দ-দীন আয়্যূব (৬৩৭/১২৪০-৬৪৭/১২৪৯)-এর অধিকারভুক্ত হইয়া পড়েন। তিনি কালাউন ও সদ্য সংগৃহীত অন্যান্য ক্রীতদাসকে নীলনদ মধ্যবর্তী 'আর রাওদা' নামক দ্বীপে তৎপ্রতিষ্ঠিত সামরিক দফতরে সামরিক প্রশিক্ষণ (ফুরূসিয়্যা দ্র.) গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন সৈনিক প্রতিপন্ন হইলে কালাউন-কে ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া 'আমীর' খিতাব দান করা হয়। তাঁহার মনিব ৬৪৭/১২৪৯ সালে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী বৎসর তৎপুত্র সুলতান তূরান শাহ্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। সর্বশেষ আয়্যূবী সুলতান তূরান শাহের মৃত্যুতে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির যুগ শুরু হয় এবং ইহারই পরিণামে মামলূক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম মামলূক সুলতান আয়বাক-এর রাজত্বকালে কালাউন উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হইয়া নেতৃস্থানীয় মামলূকদের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে সুলতান আয়বাক-এর প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা এড়াইবার জন্য ৬৫২/১২৫৪ সালে তিনি অন্যান্য মামলূক নেতা বায়বার্স, সুনকুর ও বায়সারাকে সঙ্গে লইয়া সিরিয়ায় পলায়ন করেন। কেননা তাঁহারা ইতিপূর্বে সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আল-মালিকু'ন্-নাসির ২য় সালাহু'দ-দীন যূসুফ (৬৪৮/১২৫০-৬৫৮/১২৬০)-এর অধীনে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি প্রায় তিন বৎসরকাল সিরিয়ায় অতিবাহিত করেন। কালাউন ও তাঁহার সঙ্গী বাহ্রী গোষ্ঠীভূত মামলূকগণ ৬৫৫/১২৫৭ সনে আন্-নাসির যূসুফ-এর বিপক্ষ দলে যোগদান করায় তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর তাঁহারা কারাক-এর আল-মালিকু'ল-মুগীছ ফাখরু'দ-দীন 'উমার-এর চাকুরীতে যোগদান করেন। কারাকের পথে পলায়মান বাহ্রী মামলূক দলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মামলূক সুলতান নূরু'দ-দীন 'আলী ইব্ন আয়বাক-এর প্রতিনিধি আমীর কুতুয একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মামলূকগণ পরাজিত হইলে কালাউন বন্দীদশায় মিসরে নীত হন। তিনি বেশীদিন কায়রোতে অবস্থান করেন নাই; ঐ বৎসরেই (৬৫৫/১২৫৭) পলায়ন করিয়া কারাক-এ পৌঁছেন।

৬৫৭/১২৫৯ সন অবধি প্রায় দুই বৎসর কারাকে থাকার পর অন্যান্য নির্বাসিত মামলূক নেতা সমভিব্যাহারে কালাউন মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানকার নূতন সুলতান কুতুয তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সময় তিনি হানাদার মঙ্গোল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। ৬৫৮/১২৬০ সনে নাবুলুস-এর নিকটবর্তী স্থানে হানাদারগণ পরাজিত হয়। ঐ বৎসরই সুলতান কুতুযকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার প্রচেষ্টায় ১ম বায়বার্সকে যে সকল মামলূক সাহায্য করেন, কালাউন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বায়বার্স-এর আস্থাভাজন ছিলেন। বায়বার্স তাঁহাকে এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি (=আমীর আল্ফ) পদে পদোন্নতি দান করেন। ৬৭১/১২৭২ সনে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযানে কালাউন সুলতান বায়বার্স-এর সহগামী হন। ফোরাত নদী অতিক্রমকালীন প্রথম আমীররূপে তিনি সম্মান অর্জন করেন। এইভাবে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

বায়বার্স-এর রাজত্বকালে তিনি তাঁহার সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন এবং ৬৭৫/১২৭৬ সনে তিনি বায়বার্স-এর পুত্র আল-মালিকু'স্-সা'ঈদ বারাকা খানের সহিত আপন কন্যার বিবাহ সম্পাদন করেন। বিশেষ জাঁকজমকের মাধ্যমে বায়বার্স অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করেন।

বায়বার্স ৬৭৬/১২৭৭ সনে ইনতিকাল করিলে তাঁহার পুত্র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। আমীরদিগের মধ্যে কালাউন সুলতানের শ্বশুররূপে সর্বাধিক বিশিষ্ট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হন। সুলতান বারাকা খান ৬৭৬/১২৭৭ সনে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযানে কালাউনকে প্রেরণ করেন। বারাকা খানের প্রায় দুই বৎসরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে যে সকল প্রবীণ আমীর তাঁহার পিতার অধীনে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অবজ্ঞা করিতে থাকেন। ফলে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হন ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে কায়রো নগর দুর্গে অবরোধ করেন ও রাজ্যভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এই অবস্থায় মামলূকগণ কালা'উনকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে প্রস্তাব দিলে ভবিষ্যতে বাধা বিপত্তির আশংকা বুঝিতে পারিয়া তিনি উহাতে অসম্মত হন। ফলে বায়বার্স-এর সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র আল-মালিকু'ল 'আদিল সালামিশ (سلامش) -কে ৬৭৮/১২৭৯ সনে সুলতান মনোনীত করা হয় এবং মামলূক দলীয় আমীরগণ কালাউনকে তাঁহার 'আতাবেক' [দ্র.] (=তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করেন। সুলতান সালামিশ মাত্র তিন মাস কাল রাজত্ব করেন। তখন তাঁহার আতাবেক ক'লাউনই ছিলেন প্রকৃত শাসনকর্তা। শুক্রবার জুমু'আর সালাতের খুতবায় কালাউন-এর নাম উল্লিখিত হইতে থাকে এবং মুদ্রাপৃষ্ঠে সালামিশ-এর নামের সঙ্গে কালাউন-এর নামও মুদ্রিত হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সালামিশ সিংহাসনচ্যুত হন ও কালাউন "আল-মালিকু'ল-মানসূর" উপাধি ধারণপূর্বক সুলতানরূপে অভিবাদন গ্রহণ করেন। সুলতানরূপে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কালাউন একদল জাহিরী আমীরকে অর্থাৎ মরহূম সুলতান আজ-জাহির বায়বার্স এবং দলভুক্ত আমীরগণকে কারারুদ্ধ করেন। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই কালাউন যুদ্ধকর ধরনের কয়েকটি করের (সুলতান কর্তৃক যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণকালে যাহা আদায় করা হইত) বিলোপ সাধন করেন। কালাউন তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে বায়বার্স-এর কতিপয় আমীরের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। শাসনভার গ্রহণ সম্পর্কে উহাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমীর সুনকু'রু'ল-আশকার "আল-মালিকু'ল-কামিল" নাম ধারণপূর্বক সিরিয়ায় নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। বায়বার্স-এর পক্ষভুক্ত সকল মামলূক সিরিয়ায় সকল উপজাতি এবং হামা শহরের আয়্যূবী আমীরের সমর্থন সুনকুর লাভ করেন। কালাউন আমীর বাদরু'দ-দীন বাকতাশ আল-ফাখরীর নেতৃত্বে তাঁহার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সেনাদল প্রেরণ করেন। ৬৭৯/১২৮০ সনে দামিশকের সন্নিকটে আল-জাসূরা নামক স্থানে উভয় সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে সুনকুর পরাজিত হইলে বেদুঈন আরবদের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন ও মঙ্গোলদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পর বৎসর উভয় পক্ষ মঙ্গোলদের আবির্ভাবের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে সুনকুর কালাউনের সঙ্গে আপোস করেন।

১ম বায়বার্স-এর ন্যায় কালাউন মঙ্গোলদের সিরিয়া অভিযান প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন। উহারা তখন সুনকুরের বিদ্রোহে-সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। ঈলখান আবাকার ভ্রাতা মানগূতীমূর-এর পরিচালনায় এবং জর্জীয়, ফ্রাংক ও আর্মেনীয় মিত্রদলগুলির সঙ্গে একযোগে মঙ্গোল অভিযাত্রিগণ ফোরাত নদী অতিক্রম করিয়া সিরিয়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। কালাউন তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া সিরিয়ায় আগমন করেন। ইহা ব্যতীত সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকা হইতে সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা বাহিনীটি সম্প্রসারিত হয়। ৬৮০/১২৮১ সনে হিম্স নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে মঙ্গোলগণ পর্যুদস্ত হয় ও সিরিয়া অভিযান প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। ঐ বৎসরই মানগূতীমূর ও আবাকার মৃত্যু হয়। আবাকার উত্তরাধিকারী আহ্মাদ তেগূদের (তাকূদার) ইসলামে দীক্ষিত নও মুসলিম ছিলেন। তিনি দূত ও পত্রাদি বিনিময় দ্বারা কালাউনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। ৬৮৩/১২৮৪ সনে আহ্মাদ তেগূ নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা আরগূন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। আরগূন বারবার সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় একান্তই মুসলিম-বিরোধী ছিলেন। ইনি মামলূকদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ফরাসী রাজা ও পোপকে প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।

ক্রুসেডারদের প্রশ্নে কা'লাউন সিরিয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ১ম বায়বার্সীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। সুনকুর ও মঙ্গোলদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালে কালাউন ক্রুসেডারদের সঙ্গে সামরিক যুদ্ধবিরতি-চুক্তি সম্পাদন করিলে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তির পর তিনি যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করিয়া খৃস্টান ক্রুসেডারকবলিত অঞ্চলে বারংবার হানা দেন। ৬৮৪/১২৮৫ সনে তিনি মারকাবস্থ নাইট্স হাসপিটালারস (Knights Hospitallers) নামধেয় ক্রুসেডারদের দুর্গ আক্রমণ করেন ও ৩৮ দিন অবরোধের পর উহা দখল করেন। তাঁহারা মারকাব অবরোধকালে ঐতিহাসিক আবু'ল-ফিদা (মৃ. ৭৩২/১৩৩১) সেখানে হাযির ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল ১২ বৎসর। তিনি ঐ অভিযানে তাঁহার পিতার সহযাত্রী হন। তখন "Knights Hospitallers" বাহিনী তথা হইতে হটিয়া ত্রিপোলীতে যায়। ত্রিপোলীর শাসক ৭ম বহেমুণ্ড (Bohemund VII) কালাউনকে শান্ত করিবার আগ্রহে সমুদ্র তীরবর্তী মারাকিয়া দুর্গটি তাঁহার অধিকারে ছাড়িয়া দেন। ঐ বৎসরই (৬৮৪/১২৮৫) টায়ার (Tyre) নগরীর মার্গারেট কালাউনের সঙ্গে হীন শর্তে দশ বৎসরের শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। বিশেষ সংরক্ষিত বন্দর নগরী ও বৃহত্তম যে শহর কালাউন দখল করেন তাহার নাম ত্রিপোলী। বহেমুণ্ড (Bohemund)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার সিংহাসনের দাবীদারদের কলহের সুযোগে তিনি ৬৮৮/১২৮৯ সনে শহরটি অবরোধ করেন। ত্রিপোলী কর্তৃপক্ষ সাইপ্রাস হইতে সাহায্য লাভ করিলেও কালাউন তাঁহার শক্তিশালী মান্জানীক [কামান ব্যবহারের পূর্বে ইহা পাথর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত হইত] যন্ত্রের সাহায্যে শহর প্রাচীর ও দুর্গ-প্রাকার ধ্বংস করেন ও যুদ্ধ করিয়া নগরীটি অধিকার করেন। আবু'ল-ফিদা-তখন ১৬ বৎসরের কিশোর, তাঁহার পিতা ও মামাত ভাইয়ের সঙ্গে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, ত্রিপোলী অধিকৃত হওয়ার পর তিনি বন্দর-নগরীর সীমানা বহির্ভূত একটি দ্বীপে গমন করিলে তথাকার পচনশীল মৃতদেহের দুর্গন্ধে পীড়িত হন। পরবর্তী বৎসর (৬৮৯/১২৯০) কতিপয় মুসলিম বণিকের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আক্রা (Acre)-র নাগরিকগণ যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে। ইহাতে কালাউন জিহাদ ঘোষণা করেন, কিন্তু তিনি আকরা (Acre) নগরী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় কায়রো নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত তাঁবুর মধ্যে ইনতিকাল করেন। কাজেই সেই কাজের ভার তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-মালিকু'ল-আশরাফ আল-খালীলের উপরে বর্তায়, যিনি ৬৯০/১২৯১ সনে নগরীটি অধিকার করেন।

কালাউন খৃস্ট. ধর্মবালম্বী আর্মেনিয়ানদিগকেও আক্রমণ করেন। ৩৮২/১২৮৩ সনে তিনি লিটন আর্মেনিয়া রাজ্যে হানা দেন। ইহার দুই বৎসর পর আর্মেনীয়রা একটি দশসালা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা সমস্ত মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিতে ও বশ্যতা-কররূপে বাৎসরিক প্রচুর আর্মেনীয় মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়।

মামলূক রাজ্য-এলাকা আরও দক্ষিণে বিস্তারের জন্য কালাউন ৬৮৬/১২৮৮ এবং ৬৮৮/১২৮৯ সনে নুবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি নুবিয়ার শামামূনকে শায়েস্তা করিবার জন্য কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্য আমীরের পরিচালনায় দুইবার যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। শামামূন মামলূক সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক রকম লুকোচুরি খেলিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি কিছু উপঢৌকন ও নিয়মমাফিক বশ্যতা-কর বাক্ত [দ্র.]-সহ একটি প্রতিনিধি দল মিসরে প্রেরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উপঢৌকনগুলি গ্রহণ করিয়া প্রতিনিধি দলটির সঙ্গে সদয় আচরণ করা হয়। নুবিয়া মামলূক সুলতানের করদ রাজ্য থাকিয়া যায়।

১ম বায়বার্স বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত যে উত্তম কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, কালাউন তাহা সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করেন। তিনি গোলডেন হোর্ড (Golden Horde) নামক সেনাবাহিনীর মঙ্গোলগণ বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের প্রধান (Palaeologus) ২য় এন্ড্রোনিকাস, ক্যাসটিল-রাজ আলফনসো, সিসিলী-রাজ জেমস এবং হ্যাবসবুর্গ-অধিপতি ১ম রুডলফ-এর সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ইহা ব্যতীত তিনি জেনোয়া প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেও একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করেন। মিসরের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎসাহ দানের মতলবে কালাউন চীন, ভারত, য়ামান ও অন্যান্য দেশের বিদেশী বণিকদিগকে প্রলুব্ধ করার জন্য নিরাপত্তামূলক আচরণ-বিষয়ে যে ফরমানটি (আমান দ্র.) জারী করেন উহা কালকাশান্দী (দ্র.)-কৃত সুবৃহ'ল-আ'শা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে তিনি "যাকাতু'দ-দাওলাবা" নামক এক শ্রেণীর যাকাত কর রহিত করিয়া দেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, করটি বণিকগণকে দরিদ্র করিয়া ফেলিবে, মুসলিম দোকানদারগণকে তাহাদের মালপত্রের মূল্যের ভিত্তিতে উহা প্রদান করিতে হইত।

মামলূক যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধগুলি কালাউন পরবর্তীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আলেপ্পো, বা'লাবেক্ক দামিশক নগরদুর্গগুলিকে মেরামত করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনেন। তিনি কায়রোতে একটি হাসপাতাল (আল-বীমারিস্তান আল-মানসূরী) প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত উহাই মামলূক যুগের সর্বাধিক লক্ষণীয় সৌধ। উহাতে বিভিন্ন রোগের জন্য অনেকগুলি ওয়ার্ড বা বিভাগ, একটি বক্তৃতাকক্ষ, পরীক্ষাগারসমূহ, একটি অনাবাসিক রোগীদের চিকিৎসা বিভাগ, গোসলখানাসমূহ, রন্ধনশালাসমূহ ও গুদাম ঘর বিদ্যমান ছিল। সকল দেশ ও প্রদেশ হইতে আগত স্থায়ী ও অস্থায়ী নাগরিক, ধনী-নির্ধন, পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষে কোনও প্রকার কৌলিন্য বা মর্যাদা বিচার না করিয়া

সকলের জন্য হাসপাতালটি উন্মুক্ত ছিল। প্রত্যেক রোগী হাসপাতাল ত্যাগের সময় কিছু আর্থিক অনুদান ও বিনা মূল্যে পোশাক-পরিচ্ছদ পাইত। একটি বিদ্যালয়-মসজিদ ও একটি জাঁকাল সমাধির সঙ্গে হাসপাতালটি সংযুক্ত ছিল। সমাধিটিতে আরবীয় নকশা অনুযায়ী স্রোতের ন্যায় চিত্রিত সুদৃশ্য মর্মর প্রস্তরের আস্তরণ ছিল। প্রায় ৬০ জন য়াতীম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দানের পরিকল্পনা লইয়া বিদ্যালয়-মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। উহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রগত, ধর্মীয় এবং আইন-কানূন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ-সমৃদ্ধ একটি পাঠাগারও ছিল। নুওয়ায়রী, যিনি কালাউনের হাসপাতাল ও তজ্জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তির নাজির [তত্ত্বাবধায়ক] ছিলেন, তিনি তাঁহার 'নিহায়াতু'ল-আরাব' গ্রন্থে কালাউন তাঁহার সমাধি, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সকল সম্পত্তি, বিপণীকেন্দ্র, গণশৌচাগার ও কৃষিক্ষেত্রে ওয়াক্ফ করিয়া যান, সেই সম্পর্কে মূল্যবান উপাত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কালাউন ৭ যু'ল-কা'দা, ৬৮৯/১১ নভে., ১২৯০ শনিবার ইনতিকাল করেন। তিনি নিশ্চিতই সাহসী, ধৈর্যশীল, বদান্য, ন্যায়বান ও ধীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, তিনি অতি কষ্টে কেবল আরবী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনিই একমাত্র মামলূক সুলতান যিনি এমন এক রাজবংশের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হন, যেই বংশ কয়েক পুরুষ ধরিয়া শাসন ক্ষমতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। ৬৮৯/১২৯০ হইতে ৭৮৪/১৩৮২ সন পর্যন্ত যে সকল মামলূক সুলতান রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার মামলূক [=ক্রীতদাস] ছিলেন কিতবুগা, লাজীন ও ২য় বায়বারস আল-জাশনিকীর—তাঁহারা ভিন্ন আর সকলেই তাঁহারই বংশধর ছিলেন। কালাউন মামলূক-গোষ্ঠীর স্থায়ী সেনাদল 'বুরজী' [বুরজিয়্যা দ্র.] প্রতিষ্ঠা করেন। উহাদের প্রায় সকলেই সারকাশিয়া অঞ্চলের [কৃষ্ণ সাগর, কুব্যান নদী আর বৃহত্তর ককেসাসের মধ্যবর্তী য়ুরোপীয় রাশিয়ান ফেডারেশন (আর. এস. এফ. এস. আর)-এর দক্ষিণ-পূর্বাংশ (বাংলা বিশ্বকোষ)] ক্রীতদাস, যাহাদিগকে তিনি ক্রয় করিয়া কায়রো নগর-দুর্গের (আরবী, একবচন 'বুরজ') মধ্যে বন্দী করিয়া রাখেন। উক্ত বুরজী বা সারকাশীয় মামলূকগণ ছিলেন মামলূকদের দ্বিতীয় সারির সুলতান। ৭৮৪/১৩৮২ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯২২/১৫১৭ সনে মামলূক রাজত্বের অবসান কাল পর্যন্ত তাঁহারা মিসর ও সিরিয়া শাসন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ্য়ি'দ-দীন ইব্ন 'আবদি'জ-জাহির (মৃ.৬৯২/১২৯২)-কৃত "তাশরীফু'ল-আয়্যাম ওয়া'ল-'উসূর ফী সীরাতি'ল-মালিকি'ল-মানসূর", সম্পা. মুরাদ কামিল, কায়রো ১৯৬১ খৃ., নামক জীবনীগ্রন্থই কালাউনের জীবনী ও কর্মধারা সম্পর্কিত তথ্যাদির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সূত্র; (২) আল-কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ২খ, ২৬৯-৭০ দ্র., (৩) ইব্ন তাগরীবিরদী (আবু'ল-মাহাসিন দ্র.), আল-মানহালু'স,-সাফী, পাণ্ডু. দারু'ল-কুতুব, কায়রো তা. বি. নং ১২০৯; তারীখ তায়মূর, ৪খ, পত্রক ৪৩৫-৪৩; (৪) তু. আবু'ল-ফিদা, আল-মুখ্তাসার ফী আখবারি'ল-বাশার, ইস্তাম্বুল ১২৮৬/১৮৭০, ৪খ, পৃ. ২২. ২৪; (৫) ইব্ন আয়বাক আদ-দাওয়াদারী, কানযু'দ-দুরার ওয়া জামি'উ'ল-গুরারকৃত, ৮ম খণ্ড, শিরো. আদ-দুররা'য-যাকিয়া ফী আখবারি'দ-দাওলাতি'ত তুর্কিয়া, সম্পা. U. Haarmann, কায়রো ১৯৭১ খৃ. পৃ. ১৮৭, ১৯৭. ২২৫, ২৩১-৩০৩; (৬) আল-মাকরীযী, খিতাত, কায়রো ১২৭০/১৮৫৩-৪, ২খ, পৃ. ২৩৮, ৩৭৯-৮০, ৪০৬-৮; (৭) ঐ লেখক, সুলূক, সম্পা. এম. এম. যিয়াদা, কায়রো ১৯৩৬-৯ খৃ., ১খ, ৩৯০, ৩৯২, ৪০৬, ৪২০, ৪৩৬, ৬৫০, ৬৫৬, ৬৬৩; (৮) আন্-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-আরব ফী ফুনূনি'ল-আদাব, পাণ্ডু. দারু'ল-কুতুব, কায়রো নং ৫৪৯, মা'আরিফ 'আম্মা, ২৯খ, পত্রক ২৮-৩১; (৯) আল-কালকাশান্দী, সুবহু'ল-আ'শা, ১৩খ, কায়রো ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৩৪০-২; তু. এস. 'আশূর, আল-'আসরু'ল-মামালিকী ফী মিসর ওয়া'শ-শাম, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৪৭-৮, ৬৭-৭০, ৮২-৯০; (১০) D. Ayalon, The Circassians in the Mamluk Kingdom, in JAOS, lxix (১৯৪৯ খৃ.) পৃ. ১৩৭ এবং টীকা ২১ দ্র.; (১১) T. Ferdinan, সুকূতু'ল-মারকাব ফী য়াদি'স্-সুলতান কালাউন, আল-মাশরিক'-এ ৪খ. (১৯৩৫ খৃ.) পৃ. ৫৪৩-৬; (১২) ওয়াই. এফ. হাসান, The Arabs and The Sudan, এডিনবার্গ ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১১২-৭; (১৩) S. Lane-Poole, A History of Egypt in The Middle Ages, লন্ডন ১৯০১ খৃ., পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৭৭-৮৪; (১৪) হাসানায়ন রাবী, The financial system of Egypt A. H. 564-741/A. D. 1169-1314, লন্ডন ১৯৭২ খৃ., পৃ. ৯৯, ১১৪, ১১৮; (১৫) ঐ লেখক, Som efinancial aspects of the wakf system in medieval Egypt, in আল-মাজাল্লা আত-তারীখিয়া'ল-মিস্রিয়া, ১৮ খ (১৯৭১ খৃ.), পৃ. ২০ দ্র.; (১৬) দা. মা. ই. ১৬/২খ, ৩৫৭ প.।

Hassanein Rabie (E. I.^{2})/মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

কালাওযিয়্যা (قلاوذية) ঃ Claudias, একটি আদিম বসতি এলাকা (Pliny, Claudiopolis, তু. Pauly-Wissowa, শিরোনাম দ্র.), উহার সঠিক অবস্থান নির্ণীত হয় নাই, তবে মালাতিয়া (Melitene)-এর দক্ষিণদিকস্থ Taurus-এর পূর্বাংশ এবং খানযিত (দ্র.)-এর মধ্যবর্তী স্থানে ফোরাত নদীর প্রবেশ পথের মুখেই যে এলাকাটির অবস্থান ছিল তাহা প্রায় সন্দেহাতীত। সীমান্তের সুরক্ষিত এলাকাগুলির মধ্যে ইহা ছিল অন্যতম। এইগুলি আরব ও বায়যানটীয় শাসকবৃন্দ কর্তৃক বারংবার অধিকৃত ও পুনরাধিকৃত হইয়াছিল। খলীফা আল-মানসূর পুনরায় উহা অধিকার করেন। কিন্তু ৪র্থ/১০ম শতকের মাঝামাঝি Melitene প্রবেশ সমেত আবার উহা বায়যান্টীয় শাসকদের হস্তগত হয়। বস্তুত Taurus (হাদাছা প্রভৃতি)-এর দক্ষিণ দিকস্থ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির একই সারিতে অবস্থিত অন্যান্য দুর্গের ন্যায় বাস্তবক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হওয়ায় ইহার দ্রুত পতন ঘাটিতে থাকে। এদিকে নিকটবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা সিরীয় ইতিহাসবিদ মাইকেল কেবল "Claudias" অঞ্চল নামটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কখনও উহার অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ৫ম/১১শ শতকের শেষাংশ হইতে এলাকাটি তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত থাকে, কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থকারগণের মধ্যে যাঁহারা মুসতাওফী ও কাযবীনী হইতে Otter পর্যন্ত লেখকদের গ্রন্থাদি হইতে কালাওযিয়া ঃ (Claudias)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল প্রাচীন সাহিত্য পুস্তকাদির সূত্রেই উহা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ১৮৬-৭; (২) য়াকূত, ৪খ, ১৬৭ (ইনি মনে করিতেন যে, Ptolemy এখানকার অধিবাসী ছিলেন); (৩) Leo the Deacon, বন সং., পৃ. ২৫০; (৪) Michael the Syrian, সম্পা. Chabot, ২খ, ৫১৮; ৩খ, ৩০৯; (৫)

Honigmann, Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches, পৃ. ৮৮-৯; (৬) E. I.[1] গ্রন্থে J. H. Mordtmann কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ।

Cl. Cahen (E. I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

কালাওরিয়া (দ্র. কিল্লাওরিয়া)

কালাত (দ্র. বালূচিস্তান)

কালাতা, গালাতা (দ্র. ইসতাম্বুল)

কালান্তার (کلانتر) ঃ, (ফারসী, কালান=বৃহৎ, বিরোট)/৮ম/১৪শ ও ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে কালান্তার শব্দটি 'নেতা' অর্থে ব্যবহৃত হইত (তু. হাফিজ আবরূ, Cinq opuscules de Hafiz-i Abru concernant l'histoire de l'Iran au temps de Tamerlan, সম্পা. F. Tauer, Prague ১৯৫৯ খৃ., ৭; মু'ঈনু'দ-দীন নাতানূজী মুন্‌তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ-ই মু'ঈনী, সম্পা. J. Aubin, তেহরান ১৯৫৭ খৃ., ২৫৭, ২৫৮, ২৬১) এবং বিশেষত উপজাতীয় ও সামরিক 'নেতা'-র সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত। প্রশাসনিক দলীলপত্রেও কালান্তার আখ্যাটি গোত্রীয় নেতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কালান্তার বলিতে বুঝাইত ঃ (১) শহর, জিলা অথবা শহরের কোনও ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসামরিক আমলা শ্রেণীর (hierarchy) একজন কর্মকর্তা; (২) কোনও বণিক সংঘ (Guild)-এর প্রধান এবং (৩) কোনও গোত্রে বা উপ-গোত্রের প্রধান। অধুনা অপ্রচলিত প্রথমোক্ত অর্থে কালান্তার শব্দটি কখনও কখনও রা'ঈস (رئيس) দারুগা ও কাদ্‌খুদা শব্দগুলির সমার্থক অথবা আংশিকভাবে সমার্থক (Overlapping) হইয়া গিয়াছে। বণিক সংঘের প্রধান অর্থে কালান্তার শব্দটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপজাতীয় নেতা অর্থে কালান্তার শব্দের ব্যবহার এখনও প্রচলিত এবং ফার্স, কুহ্‌গীলুয়া ও বাখ্‌তিয়ারী গোত্রগুলির মধ্যে অধিকতর প্রচলিত।

শহর অথবা জিলার প্রধান হিসাবে কালান্তার সালজূক আমলের রা'ঈস (رئيس)-এর মত সম্মানিত অবস্থানের দাবীদার। অবশ্য এই ধারণা করা ঠিক হইবে না যে, সকল ক্ষেত্রে কালান্তার অবশ্যই একই রূপ দায়িত্ব পালন করিতেন অথবা তাঁহার পদমর্যাদাও সর্বত্র একই রূপ ছিল। পূর্ববর্তী 'রা'ঈস-এর মত কালান্তার ছিলেন সরকার ও করদাতাদের মধ্যে যোগসূত্র এবং তাঁহার প্রধান দায়িত্ব ছিল উভয় পক্ষের স্বার্থের সময় সাধন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি শাসকের নিকট হইতে সরাসরি নিয়োগপত্র লাভ করিতেন। [তু. J. Aubin-এর Un Santon Quhistani de l'epoque Timouride, in REI (১৯৬৭ খৃ.) ২১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তীমূর কর্তৃক গ্রাম-কালান্তার-এর নিয়োগ]। কালান্তার ও রা'ঈস-এর পদদ্বয়ের সাদৃশ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হইবে না। সাফাবীদের আমলে কালান্তার পদটি সালজূক আমলের রা'ঈস পদ অপেক্ষা প্রশাসক শ্রেণী তালিকা (hierarchy)-র মধ্যে পূর্ণতরভাবে সমন্বিত ছিল। ইস্‌ফাহান ও কয়েকটি প্রধান শহরে, কালান্তার খোদ শাহের নিকট হইতে নিয়োগপত্র লাভ করিতেন। ১০১৫/১৬০৬-৭ সালে তাব্‌রীয-এর কালান্তার পদে জনৈক আদাম বেগ-এর নিয়োগ প্রসঙ্গে ইসকান্দার বেগ মন্তব্য করেন, এই পদটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম (از معزمات امور) (দ্র. আলামারা-ই 'আব্বাসী, ইস্‌ফাহান ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ৭২৫)।

সাফাবী আমলে ইস্‌ফাহানের কালান্তার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সম্মানিত এবং মান্য ব্যক্তিদের (اشراف واعيان) মধ্যে গণ্য হইতেন। ইস্‌ফাহানের উযীরের সহিত যৌথভাবে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন দুই ব্যাপারে ঃ জিলাসমূহের অধিকর্তা মনোনয়ন (অবশ্য সংশ্লিষ্ট জনগণের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসাপেক্ষে) এবং বণিক সংঘগুলির প্রধান নিয়োগের ব্যাপারে। (মীরযা রাফী'আ, দাস্তূরু'ল-মুলূক, সম্পা. মুহাম্মাদ তাকী দানিশ-পাযহূহ, in Rev. de la facutle des letters et sciences humaines, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬খ, ৪, ৪২-১-২)। কালান্তরের কর্ম ছিল প্রধানত কর নির্ধারণ ও কর আদায় করা। বৎসরের প্রথম তিন মাসে তিনি একজন কর আদায়কারী (محصل) নিয়োগ করিতেন। বণিক সংঘের প্রধানগণ ও শহরের অধিকর্তাদিগকে সমবেত করিয়া নাকীবু'ল-আশরাফ-এর নিকট প্রেরণ করিতেন যিনি তাহাদিগকে কর বরাদ্দের একটি বিবরণী প্রদান করিতেন। কাদখুদা-র অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন বণিক সংঘের এবং বিভিন্ন জিলার প্রধানগণ যথাক্রমে তাঁহাদের সদস্য ও জিলার অধিবাসীদের মধ্যে এই করের অংশ বণ্টন করিয়া দেওয়ার পর এবং এই সংক্রান্ত দলীলপত্র নাকীব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে তাহা কালান্তারের নিকট তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য আনয়ন করা হইত এবং মুহাস্‌সিস-ই মামলাকাত (محصص مملكت) কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হইত যিনি সংঘ ও জিলার প্রত্যেক করদাতার মধ্যকার বিভাজন সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার রক্ষা করিতেন। মুহাস্‌সিস প্রকৃতপক্ষে কালান্তারের কারণিক ছিলেন এবং তাঁহার অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত হইতেন। সংঘ অথবা জিলার কর তহবিল হইতে ড্রাফট পরিশোধের আদেশনামায় কালান্তারের সীলমোহর আবশ্যিক ছিল।

বণিক সংঘসমূহ অথবা জিলার অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা অন্যান্য কার্যকলাপকে কেন্দ্র করিয়া কোনও বিবাদ ঘটিলে উহার তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করাও ছিল কালান্তারের দায়িত্ব। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য দীওয়ানের অধীনস্থ কিছু সংখ্যক পরিচালককে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে দেওয়া হইত (দাস্তূরু'ল-মুলূক, ১৬/৪খ, ৪২১-২, ৪২৭, ১৬/৫-৬খ, ৫৪৯)।

বৈদেশিক দূতদের সংবর্ধনার ব্যাপারে ইসফাহানের কালান্তারের কিছু দায়িত্ব ছিল এবং মেহ্‌মান্দার বাশী ও উযীর বিদেশী মেহমানদের বাসস্থান নির্দেশের বিষয়ে কালান্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন (দাস্তূরু'ল মুলূক, ১৬/৪খ, ৪২৭; তু. শাহ সুলতান হুসায়নের নিকট হইতে ১১৩০/১৭১৭ সালের একটি দলীল, যাহাতে দীওয়ানবেগী, উযীর, কালান্তার এবং ইসফাহানের কর্মকর্তাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল একজন ফরাসীকে তাঁহার বাসস্থান হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার জন্য, H. Busse, Unterscuchungen zum islamischen Kanzleiwesen, কায়রো ১৯৫৯ খৃ. ২২৯)। তাহ্‌মাস্‌প-এর শাসনামলে যখন মুগল সম্রাট হুমায়ূন কাযবীন-এ আগমন করেন, তিনি কালান্তার খাজা 'আবদু'ল-গানী জালাদাতী-র সহিত বাস করেন (ইস্কান্দার বেগ, 'আলামারা-ই 'আব্বাসী, ৯৮)। খৃ. ১৬৬৪ সালে যখন Tavernier ইস্‌ফাহানে আসেন তখন আর্মেনীয়দের কালান্তার তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি যে উপহার সামগ্রী আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা বহন করিয়া দরবারে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে লোক সরবরাহ করিবার জন্য

কালান্তারের প্রতি নির্দেশ ছিল (Voyages en perse, জেনেভা ১৯৭০ খৃ., ১১৬)।

সরকারের পক্ষে কালান্তার যে দায়িত্ব পালন করিতেন উহা ছিল তাঁহার কর্তব্যের একটি দিক মাত্র। দাস্তারু'ল-মুলূকের ভাষায় তিনি ছিলেন জনগণের প্রতিনিধি (উকীল-ই রা'আয়া = رعايا)। সেই সূত্রে শাহ এবং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রজাদের ব্যাপারসমূহ উপস্থাপন করা, অত্যাচার ও নির্যাতন রোধ করা, সংঘগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত শৃঙ্খলা ও নিয়মাবলী যেন পালিত হয় তাহা নিশ্চিত করাও তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের আলোচনাকালে তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে হইত। উদাহরণস্বরূপ রায়্যা' (জরীপকারী) যখন কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর কর হ্রাসের দাবী পরীক্ষা অথবা যখন যায়ান্দারূদ-এর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত বিতর্কিত ব্যাপারে তদন্ত করা হইত (দাস্তূরু'ল মুলূক, ১৬/৫-৬ খ, ৫৫২)।

কালান্তার নিয়োগের ব্যাপারে রাজধানীর তুলনায় প্রদেশসমূহের জনগণের প্রভাব অধিকতর ছিল। গীলান-ই বিয়া (বাশ্ত ও ইহার অঙ্গরাজ্যসমূহ)-এর কালান্তার খাজা মুহাম্মাদ তাকী-র অপসারণ এবং তাঁহার স্থলে খাজা মুহাম্মাদ সা'ঈদ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত একটি দলীল (রাবী'-১, ১১০৭/১৬৯৫)-এ দেখা যায়, পদস্থ কর্মকর্তাদের তদন্তের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের সমর্থনের ভিত্তিতে ভূতপূর্ব কালান্তারকে স্বপদে পুনর্বহাল করা হইয়াছিল। দীওয়ানের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিস্তারিত বিরবণ অনুসারে রাজস্ব তহবিলের ব্যয় নির্ধারণ করা, বৎসরের শেষে এই ব্যয়, প্রাপ্য ও প্রাপ্ত কর, করদাতাদের করের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদির বিবরণ, যথাযথভাবে সীলমোহরকৃত প্রাসঙ্গিক দলীল ও রশীদসমূহ দীওয়ানের নিকট প্রেরণ করাও ছিল তাঁহার দায়িত্ব। শাহ সুলতান হুসায়ন কর্তৃক প্রদত্ত একটি তারিখবিহীন ফরমানে দেখা যায় যে, সীস্তানের কতিপয় প্রদেশ (বিলায়াত)-এর উত্তরাধিকারমূলক কালান্তার পদের দাবীদার আমীর মুহাম্মাদ যামান ইব্ন আমীর মুহাম্মাদ হুসায়নের পক্ষে, তাঁহার দাবীর যথার্থতা স্বীকার করিয়া, সুলতান তাঁহাকে কালান্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এই শর্তে যে, তাঁহার নিয়োগ করদাতা। জনগণ ও অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। কারীম খান যান্দ কর্তৃক খৃ. ১৭৬৪ এবং ১৭৭৩ সনে জারীকৃত দুইটি সনদে দৃষ্ট হয় যে, কালান্তার নিয়োগের ব্যাপারে জনগণের মত বিবেচিত হইত, অন্তত নীতিগত (theory)-ভাবে (নাদির মীর্যা, তা'রীখ ওয়া জুগ্রাফিয়া-ই দারু'স-সাল্তানাত-ই তাব্রীয, তেহরান লিথো., ১৯০৫ খৃ., ২৯১ প.)।

ক্ষুদ্রতর শহরগুলিতে কালান্তার ছিলেন জনগণের মুখপাত্র। এবং কখনও কখনও তিনি তাঁহার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হইতেন যখন সাভানর কালান্তার এবং ঐ প্রদেশের জনগণ ৯৯৯/১৫৯০-১ সালে শাহ 'আব্বাসের নিকট তুর্কমান শাসনকর্তা শাহ কুলী সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁহার অত্যাচার ও যবরদস্তী অর্থ আদায়ের অভিযোগ করেন তখন তাঁহার স্থলে গাঞ্জ আলী খানকে নিযুক্ত করা হয় (কাদী আহ্মাদ কুম্মী, খুলাসাতু'ত্-তাওয়ারীখ., সম্পা. H. Muller. Wiesbaden ১৯৬৪ খৃ., ফারসী মূল পাঠ, ৯০)। সপ্তদশ শতাব্দীতে কতিপয় য়ুরোপীয় পর্যবেক্ষক বলিয়াছেন যে, কালান্তারের কাজ ছিল সরকারী অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে রক্ষা করা (তু. Du Mans, Estat de la Perse en 1660, Paris ১৮৯০ খৃ., ৩৬; Tavernier, Voyages en Perse, ২৬০; Corneille le Brun, Voyages de Corneille le Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales, Amsterdam ১৭১৮ খৃ., ১খ, ২০৯)।

ইসফাহানের বাহিরে New Djulfa-এর আর্মেনীয়দের কালান্তার সাফাবী আমলে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি সাধারণত আর্মেনিয়ার অধিবাসী হইতেন। তাঁহার দায়িত্ব কর্তব্য সাধারণত অন্যান্য শহর অথবা জিলা শহরের কালান্তারের অনুরূপ ছিল (আরও দ্র. H. Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen, ১৩৮ প., J. Carswell, New Julfa, অক্সফোর্ড ১৯৬৮ খৃ., ৭৮)। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্জিয়াতে কালান্তার নামক কর্মকর্তা সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সাধারণভাবে পারস্যের শহরগুলির কালান্তারের অনুরূপ ছিল। (তু. Joseph, Karst, Le Code de Vakhtang VI, Commentaire historique-comparatif in Corpus Juris Ibero-Caucasici, Strasbourg ১৯৩৭ খৃ., ৩খ, ৫৬৪)।

সাধারণত কালান্তার ছিলেন স্থানীয় লোক এবং অন্যান্য অনেক স্থানীয় কর্মকর্তার মতো তাঁহার পদটিতে প্রবল উত্তরাধিকার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কদাচিৎ এক নগরের কালান্তারকে অন্য নগরে বদলী করা হইত। কখনও কালান্তার অন্য কোনও পদের দায়িত্বও পালন করিতেন। [তু. মুহাম্মাদ সালিহ বেগ নামক একজন তাবরীযবাসী (মৃ. ১০৩১/১৬২১-২) ছিলেন শীরওয়ানের এক সময়কার উযীর এবং পরবর্তীকালে যুগপৎভাবে কুম-এর উযীর ও কালান্তার; ইস্কান্দার বেগ, 'আলামারা-য়ি 'আব্বাসী, ২খ, ৯৯১]।

যুগপৎভাবে জনসাধারণের মুখপাত্র হওয়ার এবং সরকারী প্রশাসনিক আমলাদের (hierarchy) শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে যখনই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অপসারিত হইত তখন কালান্তারের পক্ষে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে তাঁহার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তার করা সহজ হইত। অষ্টাদশ শতকে শহর ও নগরের কালান্তার ও কাদ্খুদাগণ প্রায়ই সংকটকালে স্থানীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হইতেন। এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন হাজ্জী ইবরাহীম, যাঁহার পিতা হাজ্জী হাশিম যিনি নাদির শাহের অধীনে শীরাযের হায়দারী এলাকার কাদখুদাবাশী ছিলেন। ফাত্হ 'আলী শাহের প্রথম মন্ত্রীদের অন্যতম আমীনু'দ-দাওলাও তাঁহার জীবনের শুরুতে ইসফাহানের একটি জিলার কাদ্খুদা ছিলেন এবং পরতীকালে নগরের কালান্তার পদে নিযুক্ত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে Sir John Malcolm উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালান্তার অথবা নগরের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট এবং কাদখুদা অথবা বিভিন্ন ওয়ার্ডের ম্যাজিস্ট্রেটগণ যদিও নৃপতি কর্তৃক মনোনীত হইতেন, তথাপি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত অধিবাসীদের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে মনোনীত করা হইত.... যদিও এই কর্মকর্তাগণ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হইতেন না, 'তথাপি' জনমত সর্বদাই তাঁহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিত; নাগরিকদের মতের বিরুদ্ধে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার কার্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না। কারণ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা তাঁহার পদাধিকারের সহায়ক হইতে হইত (History of Persia,

লন্ডন ১৮২৯ খৃ., ২খ, ৩২৪-৫)। প্রায় একই সময় James Morier বলেন, "প্রকৃত গভর্নর ব্যতীত Kelounter প্রতি নগর, শহর ও গ্রামে বাস করিতেন এবং কর আদায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।" তাঁহার বিবরণে দেখা যায়, কালান্তার-এর দফতরের কর্মপদ্ধতিতে একটি অব্যাহত রীতি ছিল। তিনি বলেন, "যেখানেই তিনি প্রধান হিসাবে কাজ করুন তিনি ছিলেন শক্তিধর।" রাজকীয় কর্মকর্তার মর্যাদায় বৎসরে একবার তাঁহাকে নৃপতির সমীপস্থ হইতে হইত; Ket-Khoda এই সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। তিনি রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কাদখুদা তাহা পাইতেন না। Kelounter ছিলেন সেই মাধ্যম যাঁহার মারফত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নৃপতিকে জানানো হইত (A Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinaple in the years 1808 and 1809, লন্ডন ১৮১২ খৃ., ২৩৫-৬)।

উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ হইতে যখন কেন্দ্রীয় সরকার ইহার কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে, কালান্তার পদটি ইহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। ইহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অনেকাংশই অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত হয়। গভর্নরের অধীনে কালান্তারের পদটি অবশ্য বহাল থাকে এবং ইহার দায়িত্ব সীমিত হয় স্থানীয় ব্যাপার, বণিক সংঘাদি ও কিছু পরিমাণে জনগণের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গণ্ডিতে। কিন্তু স্থানভেদে তাঁহার কর্তব্য ও প্রভাব বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিত (তু. E. Aubin, la Perse, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ৩৭, ৩৮, ৫১)। ১৯০৬ খৃ. সংবিধান মঞ্জুর এবং গভর্নমেন্টের আধুনিক রূপ গৃহীত হওয়ার পর কালান্তার পদটি লুপ্ত হইয়া যায় এবং ইহার যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য টিকিয়া রহিয়াছিল তাহা পৌরসভা ও পুলিশের উপর ন্যস্ত হয়। রিদা শাহের শাসনামলে কালান্তার শব্দটি 'থানা'র সরকারী নামে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আরও দ্র. A. K. S. Lambton. The office of kalantar under the Safawids and Afshars, in Melahges Masse, সম্পা, 'আলী আকবার সিয়াসি, তেহরান ১৯৬৩ খৃ., ২০৬-১৮; (২) W. M. Floor, The office of kalantar in Qajar Persia, in JESHO, xiv, iii (১৯৭১ খৃ.) ২৫৩-৬৮; (৩) মীর্যা মুহাম্মাদ কালান্তার-ই ফার্স, রূযনামা, সম্পা 'আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৯৪৬ খৃ.। কারীম খান [৫৪] মীর্যা মুহাম্মাদ ফারদ-এর কালান্তার নিযুক্ত করেন, রূযনামাতে দক্ষিণ পারস্যের কালান্তারদের ১১৪২/১৭২৯-৩০ ও ১১৯৯/১৭৮৪-৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের বহু প্রসঙ্গে রহিয়াছে।

A. K. S. LKambton (E. I.[2])/পারসা বেগম

কালান্দার (قلندر) ঃ ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে, পূর্ব তুর্কিস্তান-এর আলমালিক হইতে পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিচরণকারী এক শ্রেণীর দরবেশ সম্প্রদায়ের সদস্যদের নাম। নগণ্য কিছু পার্থক্য ব্যতীত তাহারা বর্তমানকালের 'হিপ্পি' (Hippies)-দের সহিত তুলনীয়, অন্য মুসলিমদের সহিত সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তাহারা মালামাতিয়্যা (দ্র.) মতবাদ গ্রহণ করে। তাহাদের অপ্রচলিত বেশভূষা, ব্যবহার এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী ছিল লক্ষণীয়। শব্দটির উৎপত্তিগত মূল অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় বাবা তাহির 'উরয়ানী-র একটি রুবা'ঈতে (JA, ৯ম সিরিজ, ১৮৫৫ খৃ., ৬খ. ৫১৬) এবং প্রখ্যাত সূফী 'আবদুল্লাহ্-ই আনসারী (মৃ. ৪৮১/১০৮৮-৯) প্রণীত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা কালান্দারনামায় (সম্পা. সুলতান হুসায়ন-ই তাবান্দা-ই গুনাবাদী, তেহরান ১৩১৯ হি., পৃ. ৮৭-৯৫)।

আরবী ভাষায় ইহা কারান্দাল (দ্র. সাফাদী, আল-ওয়াফী বি'ল-ওয়াফায়াত, বার্লিন, Westdeutsche Bibliothek, Ms. Orient, পত্রক ৩১৪৫, পৃ. ৩a প.; Dozy, Suppl., ২খ, ৩৪০) এবং কালান্দার (আন্-নু'আয়মী, তান্বীহু'ত-তালিব ওয়া ইরশাদু'দ-দারিস, আত্-তানজী-র, Ms., পত্রক ৩৬৮b প.) এই দুইরূপে প্রচলিত হয়। শব্দটি ফারসী কালান্দার ("কুৎসিত ও বিসদৃশ ব্যক্তি"; "দরজার পশ্চাতে স্থাপিত ও তাহা খুলিতে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত চোখা কাঠের টুকরা", বুরহান-ই কাতি', সম্পা. এম. মু'ঈন, তেহরান ১৩৪২ হি., ২খ, ১৬৮০a) ফারসী কালান্তার (কালান, "বৃহৎ, প্রকাণ্ড" হইতে (ঐ) অথবা গ্রীক Kaletor, Kaleo শব্দমূল হইতে (Ivanov, Truth-Workers, পৃ. ৬০ টীকা ১) উদ্ভূত বলিয়া যে সকল সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয় তাহা এখন পর্যন্ত ধারণামাত্র (তু. বুরহান-ই কাতি, ৩খ, ১৫৪০, সম্পাদকের টীকা ৩)। তুর্কীতে ইহার অর্থ হইল "এমন একজন দরবেশ যিনি এই পৃথিবীর ব্যাপারে নিস্পৃহ এবং যিনি ভবঘুরের ন্যায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ান; যিনি সকল পার্থিব বস্তু প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং যিনি সত্য দর্শন করিয়াছেন, একজন 'দার্শনিক' (দ্র. সামী, কামূস-ই তুর্কী, ইস্তাম্বুল ১৩১৮ হি., ২খ, ১০৮১; তু. J. W. Redhouse, Turkish-English dictionary, ইস্তাম্বুল ১৯২১ খৃ., ১৪৭১)।

বিশেষত তুর্কী রচনাবলীতে কালান্দার-এর বাহ্যিক চেহারার প্রাণবন্ত ও বিস্তৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ ১০ম/১৬শ শতাব্দীর তুর্কী গ্রন্থকার ওয়াহিদী প্রণীত খাজা-ই জাহান ওয়া নাতীজা-ই জান-এর নিকট অধ্যায়ে তাহাদের সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন (ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার Ms. Ty ৯৫০৪ প., ৩১ খ) ঃ পরিষ্কারভাবে কামানো মুখমণ্ডল, কামানো ভ্রূ ও মস্তক, মস্তকাবরণ হিসাবে পশমের বয়ন করা তিনকোণা টুপি, গায়ে হলুদ বা কাল রংয়ের শাল এবং হাতে একটি ঢোল ও একটি পতাকা ('আলাম); ইহার সহিত যুক্ত করিতে হইবে আবদালান-ই রূম ও শামসী গোত্রভুক্ত দরবেশগণের সহিত সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি (তু.ওয়াহিদী, ঐ. পৃ. ২০a-২১b)।

Nicolas de Nicolay's Les navigations.....(Lyons ১৫৬৭) গ্রন্থের ব্যবহৃত ও Blaise de Vigenere's-এর কৃত Chalcocondyles-এর অনুবাদে (প্যারিস ১৬১২) পুনঃপ্রকাশিত একটি চিত্রে দেখানো হইয়াছে, কালান্দার-এর গায়ে ঘোড়ার লোমের তৈরী মোটা কাপড় যাহা লম্বায় তাহার নিতম্ব পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহার মাথা ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণভাবে কামানো, মাথায় কেল্ট ক্যাপের টুপি, যাহাতে আছে ঘোড়ার লোমের তৈয়ারী এক হাত দীর্ঘ ঝালর। কান, গলা, কব্জি ও পুরুষাঙ্গে আংটি পরিধান করিত।

কালান্দার ও হায়দারী, জামী ও বেকতাশী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদের বাহ্যিক চেহারা ও পরিধেয় বস্ত্রে কিছু পরিমাণ পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি একই ছিল (ওয়াহিদী, পৃ. ৪৩ a, ৫৭bপৃ., ৬০a প.; তু. Turk halk edebiyati ansiklopedisi, নং ১, পৃ. ৫২b; ফাকীরী, তা'রীফাত, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, Ms. Ty ৩০৫১ প., ১৩b)। প্রাচীন 'উছমানী ভাষাসমূহে ইশীক ও তোরলাক শব্দদ্বয় কালান্দার-এর সমার্থকরূপে ব্যবহৃত

হয় (Turk halk edebiyati ansiklopedisi, পৃ. ৩৪a)।

পাঞ্জাবে কালানদার শব্দটি সাধারণত "শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঁদরের প্রশিক্ষক"-কে বোঝায় (দ্র. Rose, Glossary of the tribes of Panjab and N. W. Frontier, ৩খ, ২৫৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। (১) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ৩৮৬-৭।

Tahsin Yazici (E. I.²)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কালান্দার ওগলি মেহমেদ (দ্র. কালেন্দের ওগলী)

কালান্দারিয়া (قلندرية) ঃ কালান্দারী (قلندرى) সম্পদে ও বিষয় ভোগে আসক্ত একটি মুসলিম দলের নাম এবং এই সব ভাবধারাসংবলিত (পূর্বকালে খুব সুচারুরূপে সংগঠিত নহে এমন) একটি আন্দোলনের নাম যাহা সম্ভবত মালামাতিয়া (দ্র.)-র আবির্ভাবের পর শুরু হয় (৩য়/৯ম শতাব্দী) এবং যাহার অনুসরণকারিগণ সাধারণভাবে মালামী মত অবলম্বন করিয়া এই মতবাদগুলির একটি ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিত। ৭ম/১৩শ শতকে আন্দোলনের রূপ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাস ভাবধারা কর্তৃক প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত [দ্র. এম. হাবীব. Chishti mystics...in Med Ind Qtly., i/2 (১৯৫০ খৃ.) নং ১]। ৫ম/১১শতকে খুরাসানে এই আন্দোলনটির অস্তিত্ব একটি প্রমাণিত সত্য, তখন ইহার অনুসারীরা সম্ভবত মুসলিম জীবনপদ্ধতির ছদ্মাবরণে বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিল, বিকল্পে (পূর্ববর্তী) মালামীগণ এইরকম বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কালান্দারগণ এই ভারতীয় সন্ন্যাসীদের জীবনপদ্ধতিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিতেন (দ্র. খাতীব-ই ফারিসী, মানাকিব-ই কামালু'দ-দীন সাবী, সম্পা. টি. ইয়াযিসি, আঙ্কারা ১৯৭২ খৃ., ১২) বলিয়া দ্বিতীয় বিকল্পটিই অধিকতর সম্ভাব্য। আন্দোলনটি প্রথমে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ও পূর্বাঞ্চলীয় ইসলামী জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল (খুরাসান, তুর্কিস্তান ইত্যাদি)। ৭ম/১৩শ শতকের প্রথমভাগে পশ্চিমাঞ্চলে ইহার বিস্তৃতি ঘটে জামালু'দ-দীন আস্-সাবী (الساوى)-র কর্মকাণ্ডের ফলে (মৃ. আনু. ৬৩০/১২২৩-৩)। তাঁহার আমলের পূর্ব পর্যন্ত মালামাতিয়ার ন্যায় এই আন্দোলনটিও কেবল সাধারণ মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ধ্যানধারণার সমষ্টিগত রূপ ব্যতীত ইহার আর কোনও অবয়ব ছিল না। আস্-সাবী ইহাকে সুবিন্যস্ত ও সংযোজিত করিয়া বাস্তবে একটি নূতন আন্দোলনের জন্মদান করেন। ইহার রূপ এমন অভিনব ছিল যে, কোনও কোনও দলীলে (উদাহরণস্বরূপ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাতীব, ফুস্তাতু'ল-'আদালা; সম্পা. O. Turan, in Fuad Koprulu Armagani, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৫৫৫ প.) তাঁহাকে কালান্দারিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা না বলিয়া ইহার জাওলাকিয়া শাখার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সুতরাং আন্দোলনের ইতিহাসকে দুই ধাপে বিচার করা উচিত, আস্-সাবী-র পূর্ববর্তী এবং তাঁহার পরবর্তী সময়ের।

প্রথম ধাপে আন্দোলনের মৌলিক নীতিগুলিতে এক ধরনের অস্তিত্ববাদী ধারণা ছিল। মালামাতীগণ কোনও প্রকার দাম্ভিকতা বা আড়ম্বর ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সকল বিধান নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। অপরপক্ষে কালান্দারীগণ সকল প্রথা ও ঐতিহ্য নির্মূল করিতে এবং নিজেদের কাজকর্ম লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করিত (জামী, নাফাহাতু'ল-উন্স, লামি'ঈ কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনুবাদ, ইস্তাম্বুল ১২৮৯ হি. ২০; তু. আস-সুহ্রাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফ, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯; ৫৬-৭, J. S. Trimingham-এর আংশিক ইংরাজী অনুবাদ The Sufi Order in Islam, অক্সফোর্ড ১৯৭১ খৃ., ২৬৭)। আস-সুহ্রাওয়ার্দীর বর্ণনা 'আবদুল্লাহ্ আনসারীর কালান্দারনামায় (সম্পা. সুলতান হুসায়ন তাবান্দা-ই গুনাবাদী, তেহ্রান ১৩১৯ হি., পৃ. ৮৭)-এর বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত কালান্দারনামায় ইহাদের যে ধ্যানধারণা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি হইল ঃ আত্মিক সন্তুষ্টি বিদ্যার গুরুত্বহীনতা, সকল প্রকার বাহ্যিক প্রদর্শন পরিহারকরণ এবং এই অস্থায়ী জগতের প্রতি ও ইহার সব কিছুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা (পৃ. গ্র., পৃ. ৮৮ প.)।

বাস্তবক্ষেত্রে যে কোনও সমাজে স্বাভাবিকভাবেই কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই রকম ধারণা পোষণ করিবেন; কিন্তু তাহাদের প্রণালীবদ্ধ ব্যবহারের কারণ সম্ভবত ভারতীয় সন্ন্যাসীদের প্রভাব। ৩য়/৯ম শতাব্দীতে মেসোপটেমিয়া ও ইহার সংলগ্ন অঞ্চলসমূহে অমুসলিম ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের দেখা যাইত। তাহারা দারিদ্র্যের অনুশীলন করিত, ন্যায়, সত্য (সিদ্ক), শুদ্ধি ও পবিত্রতা অনুসন্ধান করিত, জোড়ায় জোড়ায় সফর করিত এবং একই স্থানে পর পর দুই রাত্রি যাপন করিত না (আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ৪খ, ১৪৭; তু. I. Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam, প্যারিস ১৯২০ খৃ., পৃ. ১৩৩)। খুব সম্ভব এই মুসলমান তাপসগণ এই সাধু ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কুরআন ও হাদীছের মধ্যে তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার অনুমোদন খুঁজিয়া পায়।

আনসারীর কালান্দারনামা ব্যতীত ৭ম/১৩শ শতকের পূর্বে এই আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এমন কোনও গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। ৭ম/১৩শ শতকেই ইহা সমগ্র মুসলিম জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিঃসন্দেহে এই আকর্ষণের কারণ ছিল জামালু'দ-দীন আস-সাবী (الساوى)-এর আবির্ভাব, তাঁহার অসাধারণ পোশাক ও প্রবল আকর্ষণ ক্ষমতা। তিনি ও তাঁহার অনুসরণকারীরা শ্মশ্রু, গোঁফ, চোখের ভ্রূ এবং মাথার চুল কামাইতেন; তাঁহারা পশমের জামা পরিধান করিতেন এবং যে কোনও কাজকেই বৈধ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার-আচরণ কাহারও কাহারও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত, কিছু কিছু লোককে আকৃষ্ট করিত এবং ইহার ফলে তাঁহারা সাহিত্যের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইতেন। আস-সাবী সম্ভবত ৬৩০/১২৩২ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ ৫৮২/১১৯২-৩ বলিয়া তাঁহার মানাকিবে উল্লিখিত আছে (সম্পা. টি. য়াযিসি, আংকারা ১৯৭২ খৃ., ভূমিকা, পৃ. ৫, মূল গ্রন্থ, পৃ. ৫; তু. M. F. Kopruluzade, Andolu, da islamiyet, offprint from EFM, পৃ. ৫২)] এই তারিখটি পরিহারযোগ্য। জাওলাকিয়া নামটি সম্ভবত ইহার প্রতিষ্ঠাতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পোশাক হইতে উদ্ভূত (ফারসী ঃ জাওলাখ, অর্থ "চটের কাপড়") জাওলাকিয়া (ঐ নামেই) ৭ম/১৩শ শতকের প্রথমার্ধে আনাতোলিয়ায় অনুপ্রবেশ করে (দ্র. O. Turan, পৃ. স্থা. উপরে; তু. জালালু'দ-দীন রূমী, মাছনাবী, সম্পা. নিকলসন, ১খ, ১৮)। এই আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল আনাতোলিয়া ও মিসর, কিন্তু আন্দোলনটি মাগরিব ও ভারত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল (দ্র. ফারখরু'দ-দীন ইরাকী, 'উশ্শাক-নামা, সম্পা. ও অনুবাদ A. J. Arberry, অক্সফোর্ড ১৯৩৯ খৃ., ২-২৬; তু. দাওলাত শাহ, পৃ. ২১৫; জামী, নাফাহাত, তুর্কী অনু., পৃ. ৬৭১)। ৭ম/১৩শ ও ৮ম/১৪শ শতকে সিরিয়া ও মিসরে বিপুল সংখ্যক কালান্দার ছিল এবং তাহাদের প্রচলিত রীতিনীতি-বিরুদ্ধ আচরণ

কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায়ই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত। যেমন ৭৬১/১৩৬০ সালে মামলূক সুলতান আল-মালিকু'ন্-নাসির তাহাদিগকে প্রচলিত পোশাক পরিধান করিতে বাধ্য করেন। ৭ম/১৩শ শতকের প্রথমার্ধে তাহাদিগকে আনাতোলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় (তু. আফলাকী, মানাকিবুল-'আরিফীন, সম্পা. টি. য়াযিসি, ৫৯৬; ফরাসী অনু. Huart, ১০০; তু. O. Turan, পূ. স্থান., পৃ. ৫৬১) এবং 'উছমানী আমলে তাহাদিগকে অন্য নামেও অভিহিত করা হয় (তাঁহারা ১২শ/১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন ঃ যেমন আবদালান-ই রূম, শামসিয়ান ইত্যাদি)। ৮ম/১৪ শতক হইতে আবদালদের ইতিহাস লিখিতভাবে পাওয়া যায় (দ্র. উদাহরণস্বরূপ, হাজ্জী বেকতাশের বিলায়েতনামা, ed. A. Golpinarli, ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ., ৪৬)। ১০ম/১৬শ শতকে এই শ্রেণীর দরবেশদের উপর আক্রমণ শুরু হয়; কোনও এক ওয়াহিদী এই রকম দশটি তারীকার অনুসারীদের নিন্দা করিয়া তাঁহার খাজা-ই জাহান ওয়া নাতীজা-ই জান গ্রন্থ লিখিয়াছেন (টি. য়াযিসি)। পরবর্তী শতাব্দীতে যখন পর্যন্ত তাহারা সক্রিয় ছিল, কারাকাশ-যাদে 'উমার Ef. ওয়াহিদীর গ্রন্থের একটি আধুনিক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন (নুরু'ল-হুদা লিমান ইহ্তাদা, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি.)। পরবর্তীকালের লেখকবৃন্দ (যেমন হারীরী যাদে কামালু'দ-দীন, ওয়াসা'ইলু'ল-হাকা'ইক ফী বায়ান সালাসি'ত্-তারা'ইক, পাণ্ডুলিপি ফাতিহ্ ৪৩২ প. ৭৪ v. প.) ঘোষণা করেন যে, কালান্দারিয়্যা মাওলাবিয়াদের হইতে উদ্ভূত, তাঁহারা মাওলাবিয়্যাদের একটি শাখা শামসিয়াদের পোশাকের সহিত কালান্দারদের পোশাকের সামঞ্জস্য দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আনাতোলিয়ায় কালান্দারদিগকে ইশিক ও তারলাকও বলা হইত।

ইরানে সাধারণ নাম ছিল কালান্দার (Turk halk edebiyati ansiklopedisi, পৃ. ৩৪)। সাফাবী আমলে তাহাদের সংখ্যা ছিল অনেক, বিশেষ করিয়া আরদাবীলের চতুর্দিকে (A. Olearius, Vermehrte... Reisebeschreibung, n. p. ১৬৫৬, পৃ. ৬৮৫)।

ভারতে এই আন্দোলন ইলতুতমিশ-এর শাসনামল হইতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল [(৬০৭/১২১০— ৬৩৩/১২৩৬), দ্র. এম. হাবীব, in Med. Ind. Qtly., i/২ (১৯৫০), ৩]। ৭ম/১৩শ শতকে কালান্দার শ্রেণীর দরবেশগণ দিল্লীতে আগমন করে এবং তাহাদের অদ্ভুত আচার-আচরণের জন্য কৌতূহল সৃষ্টি করে (দিয়া'উ'দ-দীন বারানী, তা'রীখ-ই ফীরূয শাহী, কলিকাতা ১৮৬০-২, ২০২), বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তাহারা ফাখরু'দ-দীন 'ইরাকী (মৃ. ৬৮৬/১২৮৭-৮), আমীর হুসায়নী (মৃ. ৭১৮/১৩১৮-৯) ও শাহবায কালান্দারের ('উছমান-ই মারানদী, মৃ. ৭২৪/১৩২৪) মতো ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত করে। দিল্লীর নিকটস্থ অঞ্চলে তাহাদের খানকাহ্ ছিল। তাহারা বিশেষভাবে ৭ম/১৩শ ও ৮ম/১৪শ শতকগুলিতে সমৃদ্ধি লাভ করে (বারানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০), কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যায় (C. A. Storey, Persian literature, i/2, ১০৩৬)।

মতবাদসমূহ ঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য (বিশেষ করিয়া মহায়ানা ও সংঘ) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া কালান্দারিয়্যা সম্প্রদায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় হইতে ভিন্নতর ছিল ঃ (১) মুখের সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করিবার জন্য মাথা, চোখের ভ্রূ ও মুখে ক্ষৌরকার্যকরণ (বিশেষ করিয়া আস্-সাবীর আমলের পর), (২) খিরকা পরিধান; ভারতে সাধারণ পোশাক ছিল সমস্ত শরীরের উপর একখানে কম্বল এবং কটিদেশের চারিদিকে একটি কম্বল অথবা সূতী কাপড়ের টুকরা (খায়রু'ল-মাজালিস, নং ৩৮; সিয়ারু'ল-'আরিফীন, পৃ. ১১৯; মানাকিব-ই খাজা-ই জাহান; মানাকিব-ই কামালু'দ-দীন আস-সাবীতে উল্লিখিত, সূচী, পৃ. ১১); (৩) গলায় ও হাতে হায়দারিয়া নামক লোহার বলয় পরিধান করা (ফাওয়া'ইদু'ল-ফুওয়াদ, ৭০৮); (৪) কৃচ্ছ্রতা ও নির্জনতাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হইত না এবং তাহারা ইসলামের ফরয কাজগুলি পালন করিবার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করিত; তাহারা সাধারণত সালাত পড়া হইতে বিরত থাকিত (সিয়ারু'ল-'আরিফীন, পৃ. ৯৭); (৫) তাহারা সাধারণত লোকের দানে জীবিকা নির্বাহ করিত। সামান্য কিছু ব্যক্তিগত জিনিস ব্যতীত তাহাদের কোনও সম্পত্তি ছিল না এবং তাহারা বিবাহ করিত না। তাহারা তাহাদের রূঢ় আচরণের জন্য কুখ্যাত ছিল (মাকরীযী, প্রাগুক্ত)। এই মতাবলম্বী ব্যক্তির কর্তব্য হইতে যে কোনও খারাপ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে অবিচলিত থাকা এবং তজ্জন্য কখনও কোনও দুঃখ বা কষ্ট বোধ না করা; তাহাকে এক গ্রাস খাবার ও একটি জামায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইত; তাহাকে কপটতা (রিয়া) সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইত; সকল মূল্যবান বস্তু তাহাদের কাছে ছিল ঘৃণিত। তাহাদের কাজ ছিল সব সময় জনসমাগম হইতে দূরে থাকা এবং সর্বদাই সফরে থাকা এবং সুন্দর চেহারার প্রতি তাঁহাদের সার্বক্ষণিক অনুরাগ থাকা (মানাকিব-ই কামালু'দ-দীন আস-সাবী, সূচী, পৃ. xii প.)। সফরে থাকা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক কালান্দার মিসর ও সিরিয়ায় খানকাহ্তে (উদাহরণস্বরূপ ৭ম/১৩শ শতকে) এবং কুনিয়াতে (আফলাকী, পূ. গ্র.) বসতি স্থাপন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধের আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য ঃ (১) আল-মাকরীযী, খিতাত, বূলাক ১৮৭০ খৃ., ২খ, পৃ. ৩৩২; (২) ইব্ন বাত্তুতা, ১খ, ৬১-৪; (৩) ফিরিশ্তা তা'রীখ-ই হিন্দ বোম্বাই ১৮৩১ খৃ., ২খ, ৭৭৪; (৪) বুরহান-ই কাতি', সম্পা. এম. 'মুঈন, তেহরান ১৩৪২ সৌর, ৩খ, ১৫৪০, ১৬৭০; (৫) A. Olearius, Persianischer Rosenthal, Schleswig ১৬৫৪, Book ৮, শাখা ৬৭; (৬) de Sacy, Chrest. Arabe[2], ১খ, ২৬৩ প; (৭) Notes et Extr., ১২খ, ৩৪১; (৮) d'Ohsson, Tableau[2], ৪খ, ৬৬৪; (৯) J. P. Brown, The Darvishes, সম্পা. H. A. Rose, লন্ডন ১৯২৭ খৃ.; (১০) A. le Chatelier, Les confreries musulmanes du Hedjaz, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২৫৩ প.; (১১) R. du Mans, Estat de la Perse en 1660, সম্পা. Schefer, প্যারিস ১৮৯০ খৃ., ২১৬; (১২) F. Babinger, in Isl. ১১খ., (১৯২১ খৃ.), ৯৪ n.; (১৩) J. S. Trimingham, The Sufi Orders in Islam, অক্সফোর্ড ১৯৭১ খৃ., ২৬৪-৯; (১৪) দা. মা. ই., ১৭খ, ৩৮৬-৮।

Tahsin Yazici (E.I.[2])/ পারসা বেগম

কালানসুওয়া (দ্র. লিবাস)

কালা পাহাড় (کالا پہار) ঃ কালা পাহাড়, প্রকৃত নাম কালা চাঁদ, ডাক নাম রাজু। পিতা নয়ন চাঁদ রায়, রাজশাহী জিলার মান্দা থানার বীর জাওন গ্রামের অধিবাসী ও ভূঁইয়া ছিলেন এবং গৌড়ের সুলতানের অধীনে ফৌজদারী বিভাগে চাকুরী করিতেন। তিনি "একটাকিয়া ভাদুরী" নামে

পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধর। কালা চাঁদের শৈশবেই পিতা নয়ন চাঁদের মৃত্যু হইলে মাতামহ কর্তৃক কালা চাঁদ লালিত-পালিত হন। মাতামহের তত্ত্বাবধানে কালা চাঁদ বাঙলা ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। বঙ্গের স্বাধীন আফগান সুলতান সুলায়মান কাররানী (كرانى) (৯৭২-৯৮০/১৫৬৪-৭২)-এর দরবারে চাকুরী প্রার্থী হইলে সুলতান কালা চাঁদকে গৌড়ের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। কালা চাঁদ চাকুরী গ্রহণের পূর্বে কি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তবে মনে হয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামের সাম্যবাদ ও একত্ববাদে মুগ্ধ হইয়া উক্ত চাকুরী লাভের অব্যবহিত পরেই কালা চাঁদ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী হইয়া ওঠেন। উড়িষ্যা, কামরূপ, কোচবিহার ও অন্যান্য স্থানে বহু বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস করিয়া কালা চাঁদ হিন্দু জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে, দিল্লীর সুলতান বাহলুর লোদীর ভাগিনেয় মিয়াঁ মুহাম্মাদ ফারমুলীও বহু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া কালা পাহাড় নামে খ্যাত হন। কালাচাঁদও তদ্রূপ হিন্দু জনগণের নিকট অভিহিত হইতে থাকেন এবং ইতিহাসে কালা পাহাড় নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই উভয় কালা পাহাড়ের কার্যাবলী ও কার্যকালের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া কোনও কোনও লেখক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাঙ্গালার বীর গ্রন্থের লেখক শ্রী কালী প্রসন্ন দাস, গৌড়ের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক রজনী কান্ত চক্রবর্তী ও অন্যান্য কতিপয় লেখক কালা পাহাড়ের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়া, বিশেষত সুলায়মান কাররানীর কন্যার প্রণয়াসক্তির ভিত্তিহীন উপাখ্যান রচনা করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কালা পাহাড়ের পূর্বে ও পরে বাঙ্গালার বহু উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর পৌত্তলিকতা ও মূর্তি পূজাকে মহাপাপ মনে করিতেন এবং মূর্তি ধ্বংস করাকে তাঁহারা পরম পুণ্যের কাজ বলিয়া আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ "অমৃত কুণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত ভোজর ব্রাহ্মণ (Bhojar Brahmon) নামক বেদান্ত-পণ্ডিত ও কামরূপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আম্বাভনাথ (Ambhevanath)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং বাংলার ইতিহাসে খ্যাত রাজা গণেশের পুত্র যদু এবং 'ঈসা খান মসনদে আলার পিতা কালিদাশ গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধিতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং কালা পাহাড় প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিংবা প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেন বলিয়া যেইসব উপাখ্যান রচনা করা হইয়াছে উহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

সুলায়মান কাররানীর উড়িষ্যা আক্রমণের কারণ সম্পর্কে সমসাময়িক সকল ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উড়িষ্যার রাজ সুলায়মানের প্রতিদ্বন্দ্বী ইবরাহীম সুরকে আশ্রয় দিয়া সাহায্য করিতেছিলেন। তদুপরি মুগল সম্রাটের জনৈক দূতকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়া প্রয়োজনে বাঙ্গালা আক্রমণে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সুলায়মান কাররানী এই সকল ষড়যন্ত্রের খবর পাইয়া স্বীয় পুত্র বায়াযীদ এবং বীর সেনানী সিকান্দার উযবেক-এর নেতৃত্বে ১৫৬৭ খৃ. এক বিশাল বাহিনী উড়িষ্যা অভিযানে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে আফগান বাহিনী জয়ী হয় এবং উড়িষ্যা সুলায়মানের অধিকারে আসে। তখন উত্তর উড়িষ্যার রাজধানী ভাজনগর হইতে একটি শক্তিশালী বাহিনী কালা পাহাড়ের নেতৃত্বে পুরীর জগন্নাথ মন্দির দখলের জন্য প্রেরিত হয়। কালা পাহাড় পুরী দখল করিয়া জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মন্দিরও তিনি ধ্বংস করেন (History of Bengal, সম্পা. J. N. Sarkar, ২খ, ১৮৩-৪)।

কোচবিহার অভিযান সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসের বর্ণনামতে কোচবিহারের রাজা বাঙ্গালার কয়েকটি এলাকা দখল করিলে তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা জয়ের পর সুলায়মান ১৫৬৮ খৃ. কোচবিহার আক্রমণ করেন এবং মুসলিম বাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া তেজপুর পর্যন্ত দখল করেন। অন্যান্য সূত্রানুযায়ী সুলায়মান স্বীয় সেনাপতি কালা পাহাড়ের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী কোচবিহারে প্রেরণ করেন এবং এই বাহিনী কামাখ্যা, হাজো ও অন্যান্য স্থানের মন্দির ধ্বংস করিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-৫)।

সুলায়মান কাররানীর মৃত্যুর (১১ অক্টো., ১৫৭২) পর নানা বিপর্যয় অতিক্রম করিয়া প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াযী খান (৯৮০/১৫৭২) এবং পরে কনিষ্ঠ পুত্র দাঊদ খান (৯৮০-৮৪/১৫৭২-৭৬) বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় মুগল সম্রাট আকবর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আফগান কর্তৃত্বের অবসানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। আফগানদের এই সংকটময় সময় কালা পাহাড় অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত আফগান বাহিনীর পক্ষে থাকিয়া বিভিন্ন যুদ্ধে মুগল বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং বাঙ্গালার স্বাধীনতা রক্ষায় সক্রিয় থাকেন। তিনি জৌনপুর ও ঘোড়াঘাটে মুগল বাহিনীকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু রাজমহলের যুদ্ধে (জুলাই ১৫৭৬ খৃ.) দাঊদ খান পরাজিত, বন্দী ও নিহত হন এবং কালা পাহাড় যুদ্ধে আহত হইয়া পলায়ন করেন (প্রাগুক্ত, ১৯৪-৫)।

কোনও কোনও লেখকের মতে এই যুদ্ধে কালা পাহাড় আহত হইয়া মারা যান। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাঊদ খানের মৃত্যুর পর কালা পাহাড় মা'সূম কাবুলীর বাহিনীতে যোগদান করেন এবং মুগল শক্তির বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধে সক্রিয় থাকেন। ২৭ মার্চ, ১৫৮৩, মা'সুম কাবুলী রাজমহলের সন্নিকটে কাটিগাঙ্গে এক বিরাট বাহিনী মুগলদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সমবেত করেন। এই আফগান নৌবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সম্ভবত কালা পাহাড়। খান-ই আজাম-এর নেতৃত্বাধীন মুগল বাহিনী এবং আফগান বাহিনী প্রায় এক মাস যাবত পরস্পরের সহিত খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অবশেষে ২৪ এপ্রিলের যুদ্ধে মুগল বাহিনী বিজয় লাভ করে। কালা পাহাড় যুদ্ধে আহত হইয়া ইনতিকাল করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২)।

কালা পাহাড়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সমসাময়িক সূত্রে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার বীরত্ব, রণকৌশল, স্বদেশ প্রেম ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী কার্যাবলীর বিপুল খ্যাতি আছে। প্রতিমা ভঙ্গকারী (বুতশিকান, Conoclast) হিসাবে সমকালীন হিন্দু সমাজে নিন্দিত হইলেও পরবর্তীকালে বাঙ্গালী হিন্দু লেখকগণ কালা পাহাড়ের অসম সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও শেষ জীবনে স্বধর্মত্যাগের জন্য অনুশোচনা ও গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জনের বহু কল্পকাহিনী রচনা করিয়া তাঁহাকে নন্দিত করেন। সমসাময়িক সূত্রসমূহ হইতে ইহা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু বংশোদ্ভূত ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী বাঙ্গালার কালা পাহাড় এবং আফগান বংশোদ্ভূত জন্ম-মুসলিম কালা পাহাড় দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি। কাজেই

আলোচ্য কালা পাহাড়কে আফগান কালা পাহাড় মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু'স-সালাতীন, কলিকাতা ১৮৯৮ খৃ., Bib. Indica sens; ইংরেজী অনু. 'আবদু'স-সালাম, বাংলা অনু. বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নির্ঘন্ট; (২) গুলাম হুসায়ন তাবাতাবাঈ, সিয়ারু'ল-মুতাআখ্খিরীন, কলিকাতা ১৮৩৩ খৃ., ইংরেজি অনু. Raymond (Mustapha), পুনঃমুদ্রণ, কলিকাতা ১৯০২ খৃ., বাংলা অনু. বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নির্ঘন্ট; (৩) মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশতাহ, তারীখ-ই ফিরিশ্তাহ, উর্দু অনু. নওল কিশোর, লক্ষ্ণৌ ১৯৩৩ খৃ., ২খ, ৪৮৩-৮৫; (৪) যদুনাথ সরকার, সম্পা. The History of Bengal, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সং., ১৯৭৬ খৃ., ২খ, ১৮১-২০৩; (৫) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সম্পা. বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলিকাতা ১৯৮৭ খৃ., ২খ, ১১৭-৮; (৬) রজনী কান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, মালদাহ, ১ম সং., ১৯০৯ খৃ., ১৬৮-৮৮; (৭) কালী প্রসন্ন দাশ, বাঙ্গালার বীর, ভারত বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৩৩৭ বাংলা, ২খ, ২৮-৪৬ (কিংবদন্তী অবলম্বনে কল্পকাহিনী); (৮) রাখাল দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২খ, কলিকাতা ১৯১৭ খৃ., নির্ঘন্ট; (৯) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ৯৯; (১০) দুর্গাচরণ সান্যাল, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, এই গ্রন্থ সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মুজমদার বলেন ঃ দুর্গাচরণে সান্যাল বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে কালা পাহাড় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, সত্যের বিন্দুমাত্রও তাহার মধ্যে নাই (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২খ, ১১৮, টীকা)। মজুমদারের মতে কালা পাহাড় জন্ম-মুসলিম আফগান (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭)।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

আল-কালাবাযী (الكلاباذى) ঃ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-কালাবাযী আল-বুখারী, প্রাথমিক যুগের সূফীবাদ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্যতম প্রণেতা। তাঁহার রচনাটির খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়াছেন। তিনি সম্ভবত ৩৮০/৯৯০ অথবা ৩৮৪/৯৯৪ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার নিসবা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি বুখারা-র একটি জিলা কালাবায-এ বসবাস করিতেন। য়াকূত (দ্র.)-এর বর্ণনা এবং পাণ্ডুলিপি উৎসসমূহে দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, (দ্র. Arberry, India Office Catalogue, নং ১২১৮), তিনি বুখারায় ইনতিকাল করিয়াছিলেন এবং "তথায় তাঁহার মাযার যিয়ারাত করা হয় ও সম্মানিতরূপে বিবেচিত হয়"। আল-কালাবাযী প্রণীত পাঁচ বা ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে দুইটি বর্তমান লভ্য। ইহাদের একটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এবং উল্লেখযোগ্য কোনও প্রকার বৈশিষ্ট্যহীন। একটি গ্রন্থ হইতেছে ঃ বাহরু'ল-ফাওয়া'ইদ ফী মা'আনি'ল-আখবার (এই গ্রন্থটির অন্যান্য শিরোনামের জন্য দ্র. Sezgin, GAS, ১খ, ৬৬৯), রাসূলুল্লাহ (স)-এর ২২২টি নির্বাচিত হাদীছ সম্পর্কে তাসাওউফের দৃষ্টিতে এক প্রকার সংক্ষিপ্ত নীতিমূলক ব্যাখ্যা। অপর গ্রন্থটি হইতেছে কিতাবু'ত-তা'আররুফ লি-মাযহাব আহলি'ত-তাসাওউফ; ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম তিন শতাব্দীতে সূফীবাদের উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক গ্রন্থ (অনু. A. J. Arberry, The doctrine of the Sufis, কেম্ব্রিজ ১৯৩৫ খৃ.)। গ্রন্থটি তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি ঐতিহাসিক, এই অংশে সূফী শব্দটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সূফীবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসমূহের একটি জরিপ প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটি কৈফিয়তমূলক, এই গ্রন্থে সূফীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও নীতি বর্ণিত হইয়াছে এবং সূফী ও আশ'আরীবাদের ধর্মমতের মধ্যে বিদ্যমান মতৈক্যসমূহ প্রদর্শন করা হইয়াছে (দ্র. Arberry, Sufism, ৬৯)। সূফীগণের বক্তব্য হইতে উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে এবং ইহাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তৃতীয় অংশটি তাসাওউফের প্রধান প্রধান স্তর নির্ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থকার প্রায়ই আল-হাল্লাজকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি যে পরিবেশে অবস্থান করিতেছিলেন তাহা মরমীবাদের প্রতি অনুকূল ছিল, কিন্তু তাহাতে ইতোমধ্যেই সূফীবাদ অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, গ্রন্থটির সূচনা অনুসারে উহার রচনার লক্ষ্য ছিল এই অবক্ষয়ের প্রতিরোধ এবং প্রকৃত সূফীবাদ নির্ধারণ করার অভিপ্রায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত; (২) দা. মা. ই., ১৭খ, ৩৩৯-৪০।

P. Nwyia (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কালাম (দ্র. কলম)

কালাম (كلام) ঃ কালামুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র বাণী, এই অর্থে শব্দটিকে নিম্নোক্ত ক্ষেত্র হইতে পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হইবে ঃ (১) কালাম যখন 'ইলমু'ল-কালাম (দ্র.) বোঝায় আল্লাহ্ সম্পর্কে "ব্যাখ্যা প্রদানকারী বিজ্ঞান; এবং (২) কালিমা (দ্র.) যাহা কালিমাতুল্লাহ এই পদ-বিন্যাসে একটি একক দৈব বাণী বোঝায়। কুরআন-এ অন্তত তিনটি স্থানে কালামুল্লাহ্ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় (২ ঃ ৭৫, ৯ ঃ ৬, ৪৮ ঃ ১৫)। "রাসূলগণের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছেন যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন" (২ ঃ ২৫৩); "আল্লাহ্ 'সুস্পষ্ট'ভাবে মূসা-র সহিত কথা বলিয়াছেন" (৪ ঃ ১৬৪, ৭ ঃ ১৪৩) যিনি তাহার বাণী ও রিসালাত বহনের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন (৭ ঃ ১৪৪)। "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন প্রত্যাদেশের মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরালে" (৪ ঃ ৫১)। "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না" (২ ঃ ১৭৪, ৩ ঃ ৭৭) এবং মূসা-র কওমের সোনার তৈরী গো-মূর্তি কথা বলিতে অক্ষম (৭ ঃ ১৪৮)।

"সুন্দরতম আসমানী নামসমূহের" তালিকায় (তু. আল-আসমা'উ'ল-হুসনা), 'কালাম' অথবা 'মুতাকাল্লিম' কোনটিই পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ কথা বলেন, কিন্তু কুরআনে "বক্তব্যরূপে তাঁহার উল্লেখ নাই। কালীমুল্লাহ হইতেছে হযরত মূসা ('আ)-র উপাধি; তথাপি "আল্লাহ্ তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে আল্লাহকে মুতাকাল্লিম (বক্তব্যদাতা)-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ তিনি (আল্লাহ্) কালাম-এর অধিকারী।

এখানে দুই শ্রেণীর প্রশ্নের উদ্ভব হয় ঃ (১) কুরআনের পাঠ অনুসারে 'কালাম' উল্লিখিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র একটি গুণরূপে এবং ধর্মতাত্ত্বিকগণ একটি দৈব গুণ (সিফাত)-রূপে কালাম শব্দটিকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং (২) আল্লাহ্ যেহেতু তাঁহার বাণীসমূহ তাঁহার রাসূলগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন (২ ঃ ২৫৩, এইজন্য বিশেষণরূপে কালামুল্লাহ দ্বারা কুরআন নির্দেশ করা হয়, যাহার ফলে উদ্ভূত হয় কুরআন ও দৈব গুণাবলী রূপে 'বাক্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কজনিত সমস্যা। বহু শতাব্দী যাবৎ এই বিষয়টি সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়সমূহের একটিরূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

১। কালাম একটি দৈব গুণ ঃ এই প্রশ্নটি সরাসরিভাবে কুরআন-এর প্রকৃতি (সৃষ্ট অথবা অ-সৃষ্ট) সম্পর্কে বিরাজমান বিতর্ক ও তজ্জনিত

প্রভাবের সহিত সংযুক্ত। এই সকল বিশ্লেষণের পশ্চাতে কারণ কি ছিল? তাহা কি প্রায়শই উল্লিখিত (উদাহরণ স্বরূপ C. H. Becker দ্বারা) দামিশ্ক-এর খৃষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকগণের প্রতি জবাব প্রদানের অভিলাষ হইতে উদ্ভূত, যাঁহারা দাবী করিতেন 'জ্ঞান' (Logos) বা দৈব বক্তব্য একই সঙ্গে অ-সৃষ্ট এবং সৃষ্ট? এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমস্যাটি যেইভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু প্রশ্নটি সম্পর্কে কুরআনীয় উৎসসমূহের সাক্ষ্যও ইহার তুলনায় কম লক্ষণীয় নয়।

আল্লাহ্র বাণী যদি কালাম থাকিয়াই থাকে, তবে নিশ্চিতভাবেই উক্ত বাণীর একটি দৈব গুণ থাকিবে। শাস্ত্রসম্মত 'সিদ্ধান্তে'র অধিকাংশ সাধারণ পদ্ধতিই (তাওকীক) ইহা নির্দেশ করে। কিন্তু এই ব্যক্ত গুণটি ঠিক কি প্রকারের এবং ইহার সহিত দৈব সত্তার সম্পর্কই বা কি?

(ক) মুতাযিলী ও জাহমিয়্যাগণ আল্লাহ্র সত্তার সহিত অস্তিত্বমান কোন অ-সৃষ্ট বাণী স্বীকার করেন না; কারণ "ইহা প্রমাণ করা যায় না যে, আত্মার মধ্যে এমন কিছু বিরাজ করে, যাহাকে 'শব্দ' (কালাম) বলিয়া গণ্য করা যায়", ইহা কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার-এর অভিমত (মুগনী, ৭খ, খালকু'ল-কুরআন, কায়রো ১৩৮০/১৯৬১, ১৭৯) "আল্লাহ্র কালাম পদটি যাহা বজায় রাখিতে হইবে, বস্তুত ইহাই নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ সম্ভাব্য সত্তাসমূহের মধ্যে বাগধারা ও শব্দসমূহ সৃষ্টি করেন, যেগুলির দ্বারা আল্লাহ্ মানব জাতির নিকট তাঁহার আইনসমূহ ব্যক্ত করিতে পারেন।" (খ) ফালাসিফা ও এ সম্পর্কিত অপরাপর কতিপয় দল ইহাকে উপলব্ধি করে একটি দৈব, শাশ্বত ধারণারূপে এমন একটি অনিবার্য প্রবাহের (ফারদ) উৎসারণরূপে, যাহা পরম সত্তা হইতে নির্গত হইতে বাধ্য, যাহা পৃথক পৃথক বোধ দ্বারা গৃহীত, যাহা একটি মাত্র সক্রিয় বোধের উদ্ভাষণের মাধ্যমে মানবকুলের নিকট প্রচারিত এবং যাহা মানব জাতির নিষ্ক্রিয় (বি'ল-কুওওয়া) গঠনের কারণে পৃথক পৃথক শব্দে সরলীকৃত। (গ) কাররামিয়াগণের মতে কঠোরভাবে বিবেচনা করিলে আল্লাহ্র বাণী অবিনশ্বর ও চিরন্তন নয়। তাঁহার নিজ সত্তার মধ্যে কার্য ও শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে (ইহদাছ ফি'য-যাত) আল্লাহ্ স্বয়ং মাধ্যম ও বক্তায় পরিণত হন। তাই ইহাকে "পরম সার-সত্তার একটি গুণ" বলা সঙ্গত; কিন্তু এমন একটি গুণ যাহার শুরু আছে। (ঘ) "ধার্মিক পূর্বপুরুষ" এবং হাম্বালী ঐতিহ্যমতে বিশ্বাস এই যে, কালাম চিরন্তন, তাহা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিরাজমান ও তাঁহাকে উন্মোচিত করে, এবং আল্লাহ দ্বারা তাঁহার চিরন্তন রহস্যময়তায় তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ব্যক্ত হয়। (ঙ) শেষত, আল-আশ'আরী ও আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের সহিত কুল্লাবিয়াগণ এই সহ-চিরন্তনতায় বিশ্বাস করে, কালামুল্লাহ হইতেছে কাদীম, অসৃষ্ট এবং অনাদি। কিন্তু তাহারা দৈব সত্তায় বিরাজমান 'শব্দ' যাহা ব্যক্ত (কাওল)-এর, এবং শব্দ ও সংকেতের মাধ্যমে ইহার অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন (তু. ২ নং, নিম্নে)। খোদ কালাম শব্দটি সৃষ্টি অথবা আদেশের ন্যায় একটি 'কর্মগুণ' (সিফাতু'ল-আফ'আল) নয়; ইহা হইতেছে ইচ্ছা, জ্ঞান, জীবনের ন্যায় একটি বৈশিষ্ট্য যাহা মা'আনী, "যাহা সারসত্তায় একটি ধারণা অর্পণ করে" কিন্তু যাহা নিজে উক্ত সত্তার অন্তর্গত হিসাবে আল্লাহ্র অস্তিত্বের মাধ্যমে বিরাজমান। এই মতের অনুসরণে ইমাম আল-জুওয়ায়নী মু'তাযিলাপন্থিগণের সহিত দীর্ঘ তর্কের উপর শিক্ষা দান করেন যে, "কালাম হইতেছে চিরন্তন", ইহা হইতেছে "পরম সত্তার একটি বৈশিষ্ট্য" এবং সকল সময়েই ইহার প্রকৃতি আদেশমূলক, নিষেধাজ্ঞামূলক অথবা তথ্য প্রদায়ী। সুতরাং ইহা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাহা কালের ব্যপ্তিতে উদ্ভূত, কিন্তু কালের সহিত যাহা শুরু হয় নাই (তু. ইরশাদ, ভাষ্য ও ফরাসী অনু. J. D. Luciani, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., ৭৩/১২০)। এই বক্তব্যটির ক্ষেত্রে হানাফী-মাতুরীদী মতবাদ নগণ্য ক্ষেত্রেই আশ'আরী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সামান্য ভিন্ন।

নিঃসন্দেহে মানব-ভাষার সহিত আল্লাহ্র বাণীর বিলা কায়ফ-এর তুলনাত্মক রূপটি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পরবর্তীকালের থিসিসসমূহে নিম্নোক্ত পার্থক্য সাধন করা হইয়াছে: খোদায়ী গুণাবলীর ঐক্য ইহার মতে 'আকলিয়্যাত (দ্র.)-এর উপর নির্ভরশীল যাহার অর্থ চিরন্তন আইন দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হইয়া মানবিক বোধ শক্তি যাহা অনুধাবন করিবার উপযোগিতা অর্জন করে, আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ, দৃষ্টি ও দৃশ্য তথা সাম'ইয়াত-এর উপর নির্ভরশীল যে জ্ঞান, মানব জাতি কেবল ex auditu-রূপে লাভ করিতে পারে রাসূলগণের প্রদত্ত শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে, এই চারিটি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বই যুক্তিবোধের সীমানার বাহিরে অবস্থিত।

২। কুরআন আল্লাহ্র কালাম (বাণী): যদিও সকলেই কুরআন-কালামুল্লাহ্ সম্পর্কে একমত, তবু বিভিন্ন মতবাদী গোষ্ঠী ইহার উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যুক্তিগতভাবে তাই দেখা যাইতেছে কুরআন (আল্লাহ্ কর্তৃক) সৃষ্ট অথবা অ-সৃষ্ট, চিরন্তন— এ সংক্রান্ত তর্ক সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে মতবাদী শিক্ষার প্রয়োগ, কিন্তু আসলে কুরআন-এর বিষয়ে গৃহীত অবস্থান এখানে অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে এবং কালাম-এর গুণ সম্পর্কিত সকল মতামতের বিকাশকে প্রভাবিত করিয়াছে।

(ক) মু'তাযিলাগণের "আল্লাহ্র সৃষ্ট কুরআন" তত্ত্বটি বাণীর ভাষাগত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে পূর্বশর্ত হিসাবে উচ্চারণ ও গতি রহিয়াছে, কিন্তু এ সকলই অবিমিশ্র দৈব অপরিবর্তনীয়তার ধারণার সহিত সামঞ্জস্যহীন। কুরআন-এর বাণীকে "আল্লাহর কালাম" বলা যাইতে পারে এই অর্থে যে, আল্লাহ্ ইহা দ্বারা মানব জাতিকে যাহা জানাইতে চাহেন, তাহা ব্যক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই সকল বাণী রাসূলবৃন্দ অথবা আবৃত্তিকারগণের ওষ্ঠে অথবা যে কিতাবে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার পাতায় সৃষ্ট হয়। একইভাবে আল্লাহ্ যখন হযরত মূসা ('আ)-র সহিত "প্রজ্বলিত ঝোপ"-এর মধ্যে কথা বলেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ঝোপটিই কথা বলিয়াছিল এবং ইহা হইয়াছিল স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক সরাসরি ইহার অভ্যন্তরে সৃষ্ট শব্দ ও আওয়াজের মাধ্যমে।

(খ) "ধার্মিক পূর্বপুরুষগণ" (সালাফ সালিহীন), বিশেষত ইমাম ইব্ন হাম্বাল-এর চিন্তিত ধারণাবলীকে তাহাদের চরম পরিণাম পর্যন্ত সুউচ্চারিত করা সহজ নয়। কুরআন আল্লাহ্র চিরন্তন বাণী; এ সম্পর্কে তাহাদের মতবাদী সমর্থন চরম ও অস্পষ্টতাহীন।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর চূড়ান্ত ধারণা এই যে, কুরআন কেবল সৃষ্ট বিশ্বের ('আলাম-ই খালক) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, একই সঙ্গে তাহা নির্দেশের বিশ্ব ('আলাম-ই আমর)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখন আমর-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনও কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে না। "কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে উৎসারিত হইয়াছে এবং তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে" ('আকীদা, ৫খ, ৩১৩; H. Laoust, La profession de foi d'Ibn Batta, দামিশক ১৯৫৮ খৃ., ৮৪,

নং-৩ দ্বারা উদ্ধৃত)। ইব্ন বাত্তা মনে করেন যে, এই বক্তব্য কুরআন-এর প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি অক্ষরের জন্য প্রযোজ্য (ঐ, ৫১/৮৬) এবং কোনও ব্যক্তি যদি এই মর্মে এই মত প্রকাশ করে যে, কুরআন সৃষ্ট অথবা এই বিষয়ে কোনও প্রকার সংশয় পোষণ করে অথবা সহজ সরলভাবে ঘোষণা করিতে অস্বীকার করে (ওয়াকুফ), তবে সে অবিশ্বাসী (কাফির)। একই ফলভোগ করিবে সেই ব্যক্তি, যে এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে অবিশ্বাসীরূপে নিন্দা করিতে (তাকফীর) অসমর্থ হইবে। ইব্ন তায়মিয়া (র) বলেন, (ফাতাওয়া, ৫খ, তিস'ঈনিয়া, কায়রো ১৩২৯ হি., ২৬৫), আল্লাহ্ যখন তাঁহার বাণী কোনও দেহে ব্যক্ত করেন, তখন তিনি উক্ত দেহে নূতন কিছু সৃষ্টি করেন না; তিনি স্বয়ং সেখানে প্রকাশমান হন, যেমন তিনি ঝোপের মাধ্যমে মূসা ('আ)-র নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'আমিই আল্লাহ্ এবং আমি ভিন্ন অপর কোনও ইলাহ নাই" (কুরআন, ২০ ঃ ১৪)।

ইব্ন তায়মিয়া (র)-র চিন্তাধারা প্রসঙ্গে বস্তুতপক্ষে যাহা এই বিশেষ ক্ষেত্রে হাম্বালী ঐতিহ্যেরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ। H. Laoust একটি চমৎকার সারমর্ম প্রস্তুত করিয়াছেন Essai sur les doctrines sociale et politiques de Taki-d-in Ahmad B. Taimiya, কায়রো ১৯৩৯, ১৭১ এবং নির্দেশনা)।

কালাম এক্ষেত্রে ইচ্ছা (ইরাদা)-র অধীন। আল্লাহ্ কথা বলেন অথবা (সালামিয়া মতবাদের বিরোধিতায়) কথা বলা বন্ধ করেন যখন অথবা যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁহার বাণী একই সময়ে "একটি ধারণা, শব্দ ও বর্ণ যাহা একটি লক্ষ্যে বিন্যাস (মাকসূদ)" (H. Laoust, ঐ)। ইহা কোনও তথ্য বহন করিতে পারে (ইখবার) অথবা আদেশ (ইনশা')-মূলক হইতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইহা, হয় কোনও সৃষ্টি আনয়ন করিবে (তাকবীন, উদা. কুরআনীয় পাঁচটি কুন) অথবা নূতন একটি বিধি প্রণয়ন করিবে (তাশ্রী')। কালাম বা বাণী তাই ইহার প্রণয়নের দিক হইতে বহুবিধ। ইহা একই সঙ্গে উঁচু-নীচু ধাপে সজ্জিত ঃ সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফাতিহা, ইহার পরবর্তী স্থানে রহিয়াছে সূরাতু'ল-ইখ্লাস। কুরআন, তাওরাত ও ইনজীল— সকল কয়টি আল্লাহ্র প্রেরীত বাণী, কিন্তু কুরআন মর্যাদায় তাওরাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাওরাত আবার তুলনায় ইনজীল হইতে শ্রেষ্ঠ।

বিশ্বাসিগণ কর্তৃক কুরআন-এর পঠন (তিলাওয়াত) এবং উচ্চারণও (লাফজ) কি তাহা হইলে অ-সৃষ্ট ? ইব্ন হাম্বাল-এর ঘোষিত মতবাদ অনুসারে তখন ইহার উচ্চারণ ও পঠনকে সৃষ্ট বলিয়া দাবী করা যখন গ্রন্থটি কালামুল্লাহ, নিন্দিত ও অভিশপ্ত জাহ্মিয়া সম্প্রদায়ের চিহ্ন বিশেষ ('আকীদা, ১খ, ২১, ৩২)। আল-বারবাহারীও একই দাবী করিয়া বলেন যে, ওয়াকুফ-এর পক্ষে রায় দেওয়া, যাহা এই বিশেষ নির্দিষ্ট বিষয়ে বিচারের রায় প্রদানে স্থগিতাবস্থায় আনয়ন করা, জাহমীরূপে বিবেচ্য।

কিন্তু একটি হাম্বালী ঐতিহ্য ইব্ন হাম্বাল (র)-এর গৃহীত অবস্থানকে শর্তসাপেক্ষ অথবা অন্ততপক্ষে অধিকতর সুনির্দিষ্ট করার প্রবণতা প্রকাশ করে। কথিত আছে যে, তাহারা উচ্চারণ ও পঠনকে সৃষ্ট বলিয়া দৃঢ় মতো ব্যক্ত করে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও নিশ্চিতভাবে ইহা যোগ করেন নাই যে, এইগুলি নিশ্চিতভাবেই অ-সৃষ্ট। ইব্ন তায়মিয়া (র) অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঃ যাহারা মনে করে যে, কুরআন-এর উচ্চারণ ও পঠন অ-সৃষ্ট (?), তাহারা বস্তুত জাহ্মিয়াগণের অনুরূপ এবং তাই তাহারা নিন্দনীয়; আবার ইব্ন হাম্বালেরই মতে যাহারা ইহার বিরোধী মতো সমর্থন করে তাহারা "নব-প্রবর্তনের" (বিদ'আ) দোষে দোষী। H. Laoust মন্তব্য করিয়াছেন (Essai .... ১৭২, নং ২) যে, আবূ তালিব আল-মাক্কী ছিলেন সেই ব্যক্তি, "যিনি ইব্ন হাম্বাল-এর প্রতি এই ধর্মমত নির্দেশ করেন যে, কুরআন-এর আবৃত্তি অ-সৃষ্ট"। প্রকৃতপক্ষে ইহা কি ইব্ন হাম্বাল-এর গৃহীত রক্ষণশীল (তাওয়াককুফ) অবস্থান ছিল ? ইহা তিনি এই ভয়ে গ্রহণ করেন যে, এই প্রকার অ-সৃষ্ট আবৃত্তি হুলূল-এর স্বীকার করিলে উহা আবৃত্তিকারের মধ্যে ঐক্য সত্তার 'অন্ত প্রবাহ' সৃষ্টি করিবে। ইব্ন তায়মিয়া (র) লাফজকে অ-সৃষ্ট বলা হইতে বিরত থাকেন এবং কেবল এই মর্মে দৃঢ় মতো ব্যক্ত করেন যে, "বাণী (কালাম) আল্লাহ্র প্রেরিত শব্দাবলী এবং কণ্ঠ (সাওত) আবৃত্তিকারীর কণ্ঠ।" (ঐ, ১৭২)। এবং পুনরায় "যখন কোনও মানুষ কুরআন আবৃত্তি করে, অথবা যখন সে তাহা কাগজে লিপিবদ্ধ করে কুরআন তখন বাস্তব অবস্থায় (হাকীকাত) আল্লাহ্র বাণীরূপেই বিরাজ করে।"

কোন বাণী বস্তুত কেবল একজনেরই জন্য নির্দিষ্ট করা যায়, যে প্রথম উহা বিন্যাস করে এবং কোনও অবস্থায়ই তাহা উক্ত বাণীর বাহক অথবা প্রচারকের বলিয়া গণ্য করা যায় না" (অনু. H. Laoust, Ibn Batta, ৮৫, ওয়াসিতিয়া, ২২ প্রসঙ্গে নোট)।

(গ) আশ'আরী ও হানাফী মাতুরীদিগণ এই বিচক্ষণ তাওয়াক্কুফ-এর একটি আপোসমূলক অবস্থা শ্রেয় বলিয়া গণ্য করেন। প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহাদের গৃহীত সমাধানটিকে মু'তাযিলী পথ ও তাঁহাদের ভাষায় হাশবিয়া বলিয়া কথিত মতবাদিগণের পথের মধ্যবর্তী পথরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। শেষোক্ত দলের মতে কুরআন অ-সৃষ্ট, কেবল বিশ্বাসিগণের ওষ্ঠ ও হৃদয়ের মাঝেই নয়, বরঞ্চ একই সঙ্গে যখন উহা কাগজে পুনঃপ্রকাশিত হয়, তখনও হযরত 'আ'ইশা (রা)-র বলিয়া কথিত একটি 'খবর' অনুসারে মহাগ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহার সকলই আল্লাহ্র বাণী (এবং তাই এই সকলই অ-সৃষ্ট)।

কুরআন আল্লাহ্র প্রেরিত বাণী, যাহা চিরন্তন ও অ-সৃষ্ট, এই প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে ঘোষিত হইয়াছে আল-আশ'আরী-র ঘোষিত ধর্ম-বিশ্বাসে (ইবানা, সং, কায়রো ১৩৪৮ হি., ১০; মাকালাতু'ল ইসলামিয়্যীন, সং. কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ১খ, ৩২১)। ইহা ছাড়াও ইহা ঘোষিত হইয়াছে ওয়াসিয়াত আবী হানীফা (৯নং অনুচ্ছেদ) এবং আল-ফিকহু'ল-আকবার ২খ, (৩ নং অনুচ্ছেদ) এবং ৩খ, (১৬ নং অনুচ্ছেদ)-তে। আল-আশ'আরী কর্তৃপক্ষীয় মতো হিসাবে ইব্ন হাম্বালের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। বহু শতাব্দী যাবত বিভিন্ন মতবাদী গোষ্ঠী এই সর্বাত্মক সমর্থনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

কিন্তু কালামুল্লাহ-এর কোন অংশটি রাসূল (স)-এর মাধ্যমে প্রেরিত এবং বিশ্বাসিগণ দ্বারা পঠিত অথবা আবৃত্তিকৃত, আল-আশ'আরী মতবাদ এই প্রসঙ্গে নিশ্চুপ। কিন্তু অপরদিকে এই সমস্যাটি মৌলিক হানাফী-মাতুরীদী ভাষ্যসমূহে উপস্থাপন করা হইয়াছে। ওয়াসিয়াত আবী হানীফা অনুসারে (অনুচ্ছেদ ৯) কুরআন যাহা আল্লাহ্র প্রেরিত অ-সৃষ্ট বাণী এবং তাঁহার দ্বারা উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত, 'তাহা' "স্বয়ং তিনি নন অথবা তিনি ব্যতীত অপর কেহ নয়, বরং তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য; নকলের মধ্যে তাহা লিখিত, জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত, বক্ষের মধ্যে লালনকৃত, অথচ তথায় আবদ্ধ নয়। কালি, কাগজ অথবা লেখা সৃষ্ট, কারণ এই সকলই মানুষের কর্ম। অপরদিকে আল্লাহ্র বাণী অ-সৃষ্ট, কারণ লেখাসমূহ, বর্ণসমূহ,

শব্দ-সম্ভার এবং পংক্তিমালা সকলই হইতেছে মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে সম্পাদিত কুরআন-এর অভিব্যক্তি (দালালা) মাত্র। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র বাণী, তাহার পরম সত্তার মাঝে স্ব-অস্তিত্বে বিরাজমান এবং ইহার অর্থ অনুধাবন করা হয় এই সকল সামগ্রীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি এরূপ উল্লেখ করে যে, আল্লাহ্‌র বাণী সৃষ্ট, সে আল্লাহ্‌র প্রসঙ্গে একজন অবিশ্বাসী (কাফির), তাঁহার বাণী আবৃত্তি করা যায় অথবা লিপিবদ্ধ করা যায়, এমনকি হৃদয়ের মধ্যে সংরক্ষণ করা চলে, তথাপি তাহা কখনও তাহার নিকট হইতে বিযুক্ত হয় না" (অনু. Wensinck, The Muslim Creed, ১২৭)। আল-ফিকহু'ল-আকবার, ২খ, (অনুচ্ছেদ ৩)-এ এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ "কুরআন সম্পর্কে আমাদের উচ্চারণ লিখন এবং আবৃত্তি সকলই সৃষ্ট, অপরদিকে কুরআন স্বয়ং অ-সৃষ্ট।"

আল্লাহ্‌র বাণীর প্রকৃতির সহিত কি কুরআন-এর পঠন, লিখন বা আবৃত্তির সঠিকভাবে কোনও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা যায় ? একটি হাদীছ অনুসারে "সংরক্ষিত ফলকে" [লাওহ মাহফূজ দ্র.] চিরকালের জন্য লিখিত আল-কুরআন এবং নশ্বর ও সৃষ্ট সকল পুস্তকাবলীর মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। এই সকল লিপিবদ্ধ কুরআন-এর একটিকে আগুনে প্রজ্বলিত করিলে আল্লাহ্‌র বাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। কতিপয় আধুনিক গ্রন্থকার যথা ঃ আল-ফুদালী মনে করেন যে, রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত বাণীসমূহ সত্যই আল্লাহ্‌র নিজস্ব বাণীসমূহ (লাওহু মাহফুজ-এ রক্ষিত বাণীসমূহ) অথবা তাহা ফেরেশতাগণের ব্যবহৃত শব্দাবলী।

আশ'আরী ব্যাখ্যাসমূহ সাধারণত অধিকতর দীর্ঘ ও প্রাঞ্জল। ইব্ন হায্ম দ্বারা পুনঃব্যবহৃত একটি বিশ্লেষণে আল-বাকিল্লানী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কুরআন আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী এবং তাহা এই অর্থে যে, ইহা একটি 'অভিব্যক্তি' ['ইবারা মাত্র (দ্র. A. J. Wensinck, The Muslim creed, কেম্ব্রিজ ১৯৩২ খৃ., ১৫১ ও E.I.[1], D. B.Macdonald, দ্র. কালাম এবং নির্দেশনাসমূহ)। তিনি আরও বলেন, "কালাম সত্তার মধ্যে বিরাজমান (কা'ইম বি'ন-নাফস্) একটি অর্থ (মা'না) যাহা মাঝে মাঝে নিজকে শ্রবণযোগ্য শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে (তামহীদ, সম্পা. R. J. McCarthy, বাগদাদ-বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ২৫১)।

এই পার্থক্যকরণ হইতে উদ্ভব ঘটে কালামু'ন-নাফস্ অথবা কালাম নাফসী-র প্রখ্যাত তত্ত্ব। অভ্যন্তরীণ বাণীর এই তত্ত্ব যাহা আমরা ইতোমধ্যে দেখিয়াছি, মু'তাযিলীপন্থিগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আল-জুওয়ায়নী এই প্রসঙ্গটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন (ইরশাদ, ৫৮-৭৮/৯৮-১৩১; অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য, তাঁহার লুমা')। এই প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট বর্ণনার সন্ধান লাভ করা যায় আল-গাযালী (র) প্রণীত আল-ইকতিসাদ গ্রন্থে (সং. কায়রো, তা. বি., ৮০)। ইহা সত্য নয় যে, বর্ণ অথবা শব্দ ব্যতিরেকে কোনও ভাষা হইতে পারে না। অন্তঃস্থ ভাষা, "আত্মার মধ্যে কথোপকথন"-কালামু'ন-নাফস, একটি বাস্তব ব্যাপার। বাণীর নির্দেশনা, যাহা সত্তায় বিরাজমান, প্রথমত ও প্রধানত এই অন্তঃস্থ বাণী, যাহা চিরন্তন ও অ-সৃষ্ট, ভবিষ্যৎ বা অতীতবিহীন, কোন প্রকার বিভাজন বা গুণন-এর উর্ধ্বে। ইহা কোনও অবস্থাতেই অসম্ভব নহে যে, আল্লাহ্ তাহা adextra সৃষ্ট শব্দ ও বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারেন। বস্তুত এই বিশেষ প্রেক্ষিতের মধ্যেই রাসূলগণের প্রত্যাদেশ ও উপলব্ধি বিরাজমান। মু'তাযিলীগণের বিশ্বাসের বিপরীতে ইহা কোনও নির্দিষ্ট বস্তুতে সৃষ্ট শব্দপূর্ণ বাণীর ব্যাপার নয়। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ স্বয়ং বাণী প্রদান করেন; কিন্তু তাহা সম্পাদিত হয় শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমে, যাহা সৃষ্ট বিশ্বের অন্তর্গত এবং যাহা তাঁহার একক ও অপরিবর্তনীয় বাণী প্রকাশও বর্ণনা করে। পরবর্তীকালের আশ'আরী ও মাতুরীদী ব্যবহারিক গ্রন্থসমূহে পুনরায় এই সকল প্রসঙ্গ তুলনামূলক বেশী বা কম প্রকাশ সৌষ্ঠবের সহিত বিবেচিত হইয়াছে (উদা. আল-বাজূরী, হাশিয়া ... 'আলা জাওহারিত'ত-তাওহীদ, সং., কায়রো ১৩৫২/১৯৩৪, ৪৩)।

অবশেষে ইহা লক্ষ করিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী একক গুণসম্পন্ন, বহু গুণসম্পন্ন নয় (আল বাজূরী, ঐ), তবে মৌখিক শব্দসমূহের মাধ্যমে ইহার প্রকাশনা একটি পার্থক্যকরণে আমাদের অনুমতি প্রদান করে। এই পার্থক্যকরণটি হইতেছে কুরআন-এর মধ্যে তথ্য ও আদেশমূলক বিভাগ, যাহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ অনমনীয়ভাবে দাবী করিতেন (তু. উপরিউক্ত হাম্বালী মত)। আবার আদেশসমূহকে ভাগ করিয়া নিষেধ, অঙ্গীকার ও সাবধান বাণীতে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু এই সকল পার্থক্যবোধ বা বুদ্ধি দ্বারা কৃত পার্থক্য (আকসাম ই'তিবারিয়া, ঐ)।

(ঘ) অতি আধুনিক যুগে মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ আশ'আরী পার্থক্যকরণটির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং এমন একটি ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হন, যাহা আপাতদৃষ্টিতে আশ'আরীবাদ ও মু'তাযিলীবাদ-এর মধ্যে একটি সংযোজনের প্রচেষ্টা বলিয়া মনে হয় (দ্র. রিসালাতু'ত-তাওহীদ, কায়রো ১৩৫৩ হি., ৪৪ প.)। কালাম হইতেছে সত্তার চিরন্তন একটি গুণ; কুরআন হইতেছে কোনও মধ্যস্থতাহীন আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী, কিন্তু যে সকল শব্দের মাধ্যমে ইহা প্রকাশ করা হয়, যাহা উচ্চারিত হয় অথবা লিখিত হয়, আবৃত্তি অথবা পাঠ করা হয়, তাহার বিচারে তাহা সৃষ্ট বিশ্বের অন্তর্গত। এই অর্থে বলা যায় যে, আল্লাহ্ কুরআন সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কোন সৃষ্ট দ্বারা হস্তক্ষেপ ব্যতীত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বর্ণিত সকল নির্দেশনাসহ, উসূলু'দ-দীন ও 'ইলমু'ল-কালাম সংক্রান্ত সকল ব্যবহারিক গ্রন্থে এবং এই সকল বিষয় সম্পর্কে লিখিত য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের সকল রচনায় আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অন্যতম হিসাবে কালাম সম্পর্কে একটি অধ্যায় অথবা কতিপয় অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত আছে। আরও দ্র. দা. মা. ই., ১৭খ, পৃ. ৩৪১ প.।

L. Gardet/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আল-কালাম (القلم) ঃ (ব. ব. ঃ আক্‌লাম اقلام), কুরআন মাজীদের একটি সূরা-র নাম যাহাকে সূরা নূন ও সূরাতু'ল-কালামও বলা হয়। শেষোক্ত নাম দুইটি উহাকে সূরাতু'ল-'আলাক হইতে পৃথক করিবার জন্য; কেননা সূরাতু'ল-'আলাক-ও সূরাতু'ল-কালাম নামে পরিচিত।

তিলাওয়াতের দিক হইতে ইহা কুরআন মাজীদের আটষট্টিতম সূরা (দ্র.) যাহা সূরাতু'ল-মুল্‌ক-এর পরে এবং সূরাতু'ল-হাক্কার পূর্বে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু অবতরণের দিক হইতে ইহা দ্বিতীয় সূরা যাহা সূরাতু'ল-'আলাকের (দ্র.) পরে এবং সূরাতু'ল-মুয্‌যাম্মিল (দ্র.)-এর পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে (লুবাবু'ত-তা'বীল ফী মা'আনি'ত্-তানযীল, ১খ, ৮; আল-ইত্‌কান, ১খ, ১০; আল-কাশ্‌শাফ, ৪খ, ৫৮৪; তাফ্‌সীরু'ল-মারাগী, ২৯খ, ২৬; রূহু'ল-মা'আনী, ২৯খ, ২২)। আল-আলূসী-র বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরার আয়াত ১৭-৩৩ ও আয়াত ৪৮-৫০ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার অবশিষ্টাংশ প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির অন্তর্ভুক্ত (রূহু'ল-

মা'আনী, ২৯খ, ২২)। ইমাম খাযিনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরায় ৫২টি আয়াত, তিনশত শব্দ এবং ১২৫৬টি বর্ণ রহিয়াছে (লুবাতু'ত্-তা'বীল, ৪খ, ৩১৪)।

পূর্বের সঙ্গে এই সূরার যোগসূত্র ও সামঞ্জস্যের জন্য দ্র. আল-বাহ্রু'ল-মুহীত (৮খ, ৩০৭), রূহু'ল-মা'আনী (২৯খ, ২২), তাফ্সীরু'ল-মারাগী (২৯খ, ২৬) এবং লুবাতু'ত্-তাবীল (৪খ, ৩১৪)। আয়াতের পারস্পরিক যোগসূত্রের জন্য দ্র. 'আলী আল-মাহা'ইমী, তাবসীরু'র-রাহ্মান। উহার শান-ই নুযূলের জন্য দ্র. আবু'ল-হাসান আন-নীশাপুরী-র আস্‌বাবুন'ন্-নুযূল (পৃ. ২৪৯) ও আস্-সুয়ূতীর লুবানু'ন-নুকূল ফী আস্‌বাবু'ন-নুযূল। আভিধানিক, ব্যাকরণগত ও দার্শনিক মতবাদের জন্য দ্র. তাফ্সীরু'ল-বায়দাবী (২খ, ২৭৩), বর্ণনা পদ্ধতিতে ভাষাগত অলঙ্কার, ই'জায ও আধুনিক সামাজিক মতবাদের জন্য দ্র. ফী জিলালি'ল্-কুরআন (২৯খ, ৩৮), আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক ইঙ্গিতের জন্য দ্র. আল-জাওয়াহির ফী তাফ্সীরি'ল-কুরআন (২৪খ, ২৩৬), তাসাওউফ ও সুলূক-এর আলোচনার জন্য দ্র. তাফ্সীরু ইব্নি'ল-'আরাবী (২খ, ১৬৮), আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কীয় হাদীছের জন্য দ্র. তাফসীরু আবিল-ফিদা' (৪খ, ৪০০) ও ফাতহু'ল-বায়ান (১০খ, ২১প.)। উহার আয়াত হইতে শারী'আতের বিভিন্ন হুকুম ও ফিক্হ সংক্রান্ত মাসা'ইল-এর জন্য দ্র. আত্-তাফ্সীরু'ল-মাজ্হারী (১০খ, ৫৮), আহ্কামু'ল-কুরআন লি-ইবনি'ল-'আরাবী (পৃ. ১৮৪৩) এবং আহকামু'ল-কুরআন আল-জাস্‌সাস (৩খ, ৪২৭)।

কলম ও মানুষ যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার শপথের সহিত সূরাটি শুরু হইয়াছে। আল্লাহ্ এই শপথ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রের অসীম মাধুর্যের কথা, যাহা তিনি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার পর কাফিরদিগের দুশ্চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্র সান্নিধ্য হইতে দূরত্বের ফলে তাহাদিগের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। অতঃপর আস্হাবু'ল-জান্না, অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের ঘটনা উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করিয়া কাফিরদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে মিথ্যাবাদী ও মুশ্‌রিকদেরকে অশুভ পরিণামের ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবার তাকীদ দেওয়া হইয়াছে (তাফ্সীরু'ল-মারাগী, ২৯খ, ৪৮; ফী জিলালি'ল-কুরআন, ২৯খ, ৩৮ প.)। রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কালাম তিলাওয়াত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মহান চরিত্রসম্পন্নদিগের প্রাপ্য ছাওয়াবের সমান প্রদান করিবেন (আল-কাশ্শাফ, ৪খ, ৫৯৭; তাফসীরু'ল-বায়দাবী, ২খ, ২৭৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত।

জাহুর আহ্মাদ আজহার (দা. মা. ই.)/ আ. ফ. সাইয়েদ মাসূউদ হোসেন

কালাম (قلم) ঃ 'উছমানী ব্যবহারে কালাম শব্দটি কালেমরূপে উচ্চারণ করিয়া রূপক অর্থে কোনও সরকারী বিভাগ বা সংস্থার সচিবালয়কে নির্দেশ করিত এবং পরে তাহা প্রশাসনিক দফতরের জন্য সাধারণ শব্দে পরিণত হয়। এই ব্যবহারটি আধুনিক তুর্কীতেও টিকিয়া আছে এবং একই সঙ্গে আরবীতেও প্রচলিত।

সম্পাদক (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

কালাম (দ্র. 'ইলমু'ল-কালাম)

কালামকারী (قلمكارى) ঃ 'আরবী ক. ল. ম. 'লেখনী ও ফার্সী কার, 'কর্ম' 'শিল্প' হইতে, হস্ত অংকিত ও পাকা রঙে রঞ্জিত ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র, পশ্চিম ভারতীয় স্থানীয় শব্দ চিতডা (চিত্রিত শাড়ী) হইতে ইহা সিনজ্ নামেও পরিচিত। প্রকৃত কালামকারী কার্যে ছাপার জন্য কোন ব্লক ব্যবহার করা হয় না। সময় সময় নক্‌শাসমূহ মুক্ত হস্তে অংকিত হয়, তবে সাধারণত এই কার্যে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহাতে সচ্ছিদ্র একটি কাগজের ছক কাটা ফর্মার মধ্যে চূর্ণ কাঠকয়লা ঘর্ষণ করা হয়। ইহার পর লাগানো হয় স্থায়ী করিবার জন্য পরিষ্কার পদার্থ, কয়েকটি রং লাল ও নীল রঙে কাপড় রাঙানোর প্রক্রিয়ার সময় কাপড়ের বিভিন্ন অংশ রক্ষা করার জন্য প্রয়োগ করা হয়— মোমের প্রলেপ, হাতের সাহায্যে। এই কার্যে নলখাগড়া বা বাঁশের কলম ব্যবহৃত হয়। কলমের মধ্যে একটি তুলার পিণ্ড অথবা পশমের বল থাকে যাহা রং বা মোম দ্বারা সিক্ত। ভারতে এই প্রকারের বস্ত্র রঞ্জন প্রক্রিয়া অন্ততপক্ষে ২০০০ বৎসর যাবৎ প্রচলিত থাকিলেও (এইরূপ কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, আনুমানিক ২০০০ খৃ. পূ. হরপ্পা সভ্যতায় এই প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল) ১৬০০ খৃ.-এর পূর্বের ইহার কোনও নমুনা বর্তমানে টিকিয়া নাই। এই যুগের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কালামকারী বস্ত্র তৈরি হইত মাসুলিপাতাম (গোলকুণ্ডা)-এর অভ্যন্তরভাগে। কারিগর সম্প্রদায় ছিল হিন্দু এবং তাহারা প্রধানত মুসলিম অথবা য়ুরোপীয়দের আনুকূল্যে কাজ করিত। যদিও কিছু পরিমাণ বস্ত্র মন্দিরসমূহের পর্দারূপে প্রস্তুত করা হইত। গোটা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দী ধরিয়া ইহা বিপুল পরিমাণে য়ুরোপে রফতানী হইত। ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী প্রাচ্য কোম্পানীসমূহ দ্বারা রফতানী করা এই বস্ত্র পাশ্চাত্যের অলংকরণ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। নিজ নিজ দেশের স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ইহার আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু প্রায়ই এই আদেশ লংঘন করা হইত। ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই আইন শিথিল করা হয়। কিন্তু ততদিনে য়ুরোপীয় প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বস্ত্র রঞ্জনে তাম্রপাত পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহার পর হইতে ভারতে এই শিল্পের মানের অবনতি ঘটিতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Irwin and Katharine B. Brett, Origins of chinz, লন্ডন ১৯৭০ খৃ.; (২) Census of India, ১৯৬১ খৃ., ২খ, ৭-ক (১) ঃ Selected crafts of Andhara Pradesh.

J. Irwin (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

আল-কালামমাস (القلمس) ঃ বানূ মালিক ইব্ন কিনানা-র হুযায়ফা ইব্ন 'আব্দ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদী, যিনি ঐতিহ্য অনুসারে আরবগণের প্রথম নাসী [দ্র.] ছিলেন; আল কালামমাস তাঁহার প্রতি প্রদত্ত উপাধি। আল মারযুবানী (মু'জাম, পৃ. ২৫০) অবশ্য অপর একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, যে অনুসারে আল্-কালামমাস আল্-আকবার ছিলেন 'আদী, হুযায়ফা-র প্রপিতামহ ও আত্-তাবারী (তাফসীর, বূলাক ১৩২৭/১৯০৯, ১০,২)-এর মতে তিন ব্যক্তি প্রথম নাসীরূপে অভিহিত হইতেন, তবে তিনি হুযায়ফাকে নাম ধরিয়া উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন Annales, (১খ, ১১৩৪) গ্রন্থে। আল-মাস'উদীর মতে (মুরূজ, ৩খ, ১১৬, শা. ৯৬৫) আবু'ল-

কালামমাস শেষোক্ত জনের কুন্‌য়া ছিল। অপর দিকে এই পরিবারের একজন মাওলা (দ্র. Melieu, পৃ. ৫১ এবং গ্রন্থপঞ্জী) আল-জাহিজ [দ্র.]-এর জীবনীকারগণ এই কুন্‌য়া প্রদান করিয়াছেন জনৈক নাসীকে যাঁহার নাম 'আম্‌র ইব্‌ন কাল'। এই নামটি বর্তমানে প্রচলিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নাই। (বহুকাল পরে ইহা 'উছমান ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উমার-এর প্রতি আরোপিত হয়, দ্র. আত-তাবারী, নির্ঘণ্ট; আবু'ল-ফারাজ, মাকাতিলু'ত-তালিবিয়্যীন, পৃ. ২৯৬)। ইহা সম্ভব যে, আল-মাস'উদী-র আবু'ল-কালামমাস সম্ভবত শেষতম নাসা'আ, আবূ ছুমামা-র কুন্‌য়া-র সহিত বিভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত। শেষোক্ত জন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমসাময়িক ছিলেন নাসী-র কার্যভার পিতার নিকট হইতে পুত্রের নিকট হস্তান্তরিত হইত এবং কয়েক যুগ যাবৎ তাহা উক্ত আবূ ছুমামা পর্যন্ত চালু ছিল (Caussin, Essai, ১খ, ২৪৪; এই প্রথাটি ৪১২ খৃ. হইতে চালু ছিল)। শেষোক্ত জনের বংশ তালিকা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থকারের মতানৈক্য রহিয়াছে। ইবনু'ল-কালবী-কাসকেল (Tab. ৪৭) তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন জুনাদা ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন কাল' 'ইব্‌ন হুযায়ফা-রূপে এবং সীরা (১খ, ৪৪) গ্রন্থে তাঁহাকে বলা হইয়াছে জুনাদা ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন কাল'/কালা' ইব্‌ন 'আব্বাদ ইব্‌ন হুযায়ফা-রূপে; ইব্‌ন হাবীব (মুহাব্বার, পৃ. ১৫৭) ও আল-বীরূনী (Chronology, 12) 'আব্বাদ ও হুযায়ফার মধ্যে আর একটি কাল'/কালা যোগ করেন। অপরদিকে আবার ইব্‌ন নুবাতা (শারহ্, পৃ. ৪০৬)-র মতে আল-কালাম্‌মাস ছিলেন হিন্দ বিনত আল্‌ খুসস্‌ (দ্র.)-এর সমসাময়িক, যিনি কতিপয় গৃহপালিত পশু সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের জন্য দায়ী বলিয়া মনে করা হয়।

হুযায়ফা-র প্রত্যক্ষ উত্তরসূরিদের সমষ্টিগতভাবে আল-কালামিস নামে অভিহিত করা হয়। ইহা কালাম্‌মাস-এর বহুবচন যদিও ইহার অর্থ স্পষ্ট নয়; আরবী অভিধানসমূহে শব্দটির অর্থরূপে "সমুদ্র, গভীর কূপ" (তু. কালাম্‌মাস, লিসানু'ল-'আরাব, দ্র. শিরো. এবং ইহার সম্প্রসারণরূপে "একজন মহান দক্ষ মানুষ" ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়; A. Moberg-এর প্রস্তাবনামতে ইহা কামূস (okeanos) এবং সম্ভবত calendas-এর সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে (An-Nasi' in der islam. Tradition, Lund Leipzeig 1931 পৃ. ৪৪, ৫৩-৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

Ch. Pellat (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

আল-কালাসাদী (القلصادى) ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-কুরাশী আল-বাস্‌তী, মুসলিম গণিতবিদ, আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি; ৯ম/১৫শ শতকের প্রারম্ভে স্পেনের অন্তর্গত বাযা (বাস্‌তা)-এ তাঁহার জন্ম। তাঁহার জন্ম শহরে। তিনি 'আলী ইব্‌ন মূসার পাঠ অনুসরণে আইনশাস্ত্র, তাফসীর, রম্য রচনা ও ফারা'ইদ (দ্র.) (সম্পত্তি বণ্টন আইন) অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রানাডায় বসবাস করেন। সেখানে আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন ফুতূহ ও ইমাম 'আবদুল্লাহ আস্‌-সারাকুসতী তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। প্রথমোক্ত জনের নিকট তাঁহার বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ঃ দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয় এবং শেষোক্ত জনের নিকট তিনি মুসলিম আইন সম্পর্কে আরও বিশদভাবে পড়াশুনা করিয়াছিলেন। গ্রানাডা হইতে তিনি হাজ্জ পালনের জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন; পথে তিনি মাগরিব ও মিসরের প্রধান শহরগুলিতে যাত্রা বিরতি করেন এবং তথায় তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সুবিদিত লেখকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার রচিত রিহ্‌লা নামক গ্রন্থে তাহার কিছু উদ্ধৃতি আহমাদ বাবা (দ্র.)-র নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ নামক গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। তিনি এই সকল পণ্ডিতের চিত্তাকর্ষক জীবনীমূলক ও গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত তথ্যসহ একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এইভাবে তেলেম্‌সেন-এ তিনি আল-কাসিম ইব্‌ন সা'ঈদ আল-উকবানী (মৃ. ৮৫৪/১৪৫০) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন যাগ্‌ (মৃ. ৮৪৯/১৪৪৫)-র সহিত সাক্ষাত করেন যাঁহাদের উভয়েই তাঁহার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ফারা'ইদের সমস্যার ব্যাপারে গণিতের প্রয়োগ ও গাণিতিক পদ্ধতি সংবলিত বিষয়ের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়াছিলেন। মিসরে তিনি ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (৮৫২/১৪৪৮ সালে)-র বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। হাজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আল-কালাসাদী গ্রানাডায় বসবাস করেন এবং শিক্ষকতায় ও তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্‌ আল-মাল্লালী, আবূ 'আবদিল্লাহ আস-সানূসী ও আহমাদ ইব্‌ন 'আলী আল-বালাকীর নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির অবশ্য অবনতি হইতেছিল ঃ আরাগন ও ক্যাস্টিলের ঐক্যবদ্ধ পরিবার স্পেনে মুসলিমদের শেষ শক্তিকেন্দ্রের উপর আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আল-কালাসাদী সাহসিকতার সহিত প্রতিরোধ সংগঠিত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অচিরেই তিনি মাগরিবে ছড়াইয়া পড়া আন্দালূসীয় শরণার্থী দলের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হন। তিনি ১৫ যু'ল-হিজ্জা, ৮৯১/১০ ডিসেম্বর ১৪৮৬ সালে ইফরীকিয়ার বেজাতে ইনতিকাল করেন।

আল-কালাসাদী বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক গ্রন্থ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন সংকলক ছিলেন, কিন্তু রচনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ও বহুবিধ ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। তাঁহার গণিত বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে সমীকরণ উপস্থাপনা ও লিখনের জন্য প্রথমবারের মতো ব্যাপক হারে প্রতীকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; উদাহরণস্বরূপ শীন (ش) বর্ণটির ব্যবহার। অজানা 'x' কে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শায়' (বস্তু)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, মীম (م) বর্ণের ব্যবহার (মাল-এর জন্য) $= x^2$, (কা'ব-এর) 'কাফ' (ك)-এর জন্য $= x^3$. তা'দীল-এর 'লাম' (ل)-এর জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন বুঝাইতে =-এর ব্যবহার, জাযর-এর (ج)-এর জন্য ব্যবহৃত $\sqrt{\ }$। ইব্‌নু'ল-বান্না' আল-মার্‌রাকুশী (দ্র.)-র তালখীস সম্পর্কে আল-কালাসাদীর টীকা সম্ভাব্য বর্গমূল বাহির করিবার একটি উন্নত সূত্র প্রদান করে। সর্বশেষে, ভগ্নাংশের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিযুক্ত আলোচনা ও গাণিতিক পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি ব্যাপক গবেষণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। নিম্নে তাঁহার রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইলঃ

পাটিগণিত ও বীজগণিত ঃ (১) গুন্‌য়াত যাবিল-আলবাব ফী শারহ কাশ্‌ফি'ল-জিল্‌বাব, পাণ্ডু. তিউনিস ১৪৫৫৪; (২) ইন্‌কিশাফু'ল-জিল্‌বাব 'আন ফুনূনি'ল-হিসাব, পাণ্ডু. আলেক্স হিসাব, ৪; Br. M. ৪১৮, ৯০৩, (দ্র. M. Ben Cheneb ও E. Levi Provencal. in R. Afr. 1922); (৩) কানূনু'ল-হিসাব ওয়া গুন্‌য়াত যাবি'ল-আলবাব, পাণ্ডু. বার্লিন ৫৯৯৫, lx, ৮৫৩৪; (৪) কাশফুল-আস্‌রার (আসতার) 'আন্

ইলমি (হুরূফ) আল-গুবার, পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৭৩, ৫৩৫০; তিউনিস ১৬৮ R. ৪০২ R. ৩২৯৩. ২৯৩৪, ৪৭৭৫; আলজিয়ার্স ৩৯৯, ১৭, ১৪৪৮, ৯; রাবাত ৪৫৫, ৪৫৬; Brill ২৯৫, ৫৩২; বৈরূত ২৩৯; প্রবন্ধকারের সংগ্রহে বেশ কিছু পাণ্ডু. মূল গ্রন্থখানি কায়রো (১৩০৯/১৮৯১) ও ফেযে (১৩১৫/১৮৯৭) প্রকাশিত হইয়াছে; (৫) কাশফু'ল-জিলাব 'আন-'ইলমি'ল-হিসাব, পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৬৩, ১৩; কায়রো ১খ, ১৭৮; Esc. ২৮৫৩, 8; Br. M. ৪১৮, ৯০৩; Woepcke, in J A. I ১৮৫৪ খৃ.; তিউনিস ২০৫৪; Tetonan ২২৭; (৬) রিসালা ফী মা'আনি'ল-কাস্‌র ওয়া'ল-বাস্‌ত, পাণ্ডু. তিউনিস ২০৩৯; (৭) রিসালা ফী মা'রিফাত ইস্‌তিখ্‌রাজি'ল-মুরাককাব ওয়া'ল-বাসীত, পাণ্ডু. তিউনিস ২০৪৩; (৮) শারহু'ল উর্‌জূযা আল-য়াসমীনীনিয়্যা, পাণ্ডু. Br. M. ৬২১; প্রবন্ধকারের সংগ্রহে আরেকটি পাণ্ডু.; (৯) শারহ্ যাওয়াতি'ল-আসমা', পাণ্ডু. রাবাত ৪৫৬; প্রবন্ধকারের সংগ্রহে বেশ কিছু পাণ্ডু.; (১০) শারহ তাল্‌খীস ইবনি'ল-বান্না', পাণ্ডু. S. ৩৩১; প্যারিস ২৪৬৪; (১১) তাবসিরাতু'ল-মুবতাদী বি'ল-কালামি'ল-হিন্দী, পাণ্ডু. রামপুর, I. ৪০৯, ৩; তিউনিস ২০৪৩ (অনুলিপি, তা. ১০২০); (১২) আত-তাব্‌সিরাতু'ল-ওয়াদিহা ফী মাসা'ইল আ'দাফি'ল-লা'ইহা, পাণ্ডু. তিউনিস ২০৪৯।

নির্দিষ্ট অংশ (১) বুগয়তু'ল-মুহ্‌তাদী ওয়া গুন্‌য়া'তুল-মুন্‌তাহী, Mard. ৩৪০, ফেয-এ প্রকাশিত। প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যে অনুলিপি আছে তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পাঠ করিতে হইবে আল-মুবতাদী; (২) আদ্‌-দাররী ফী 'ইলমি'ল-মাওয়ারিছ, আল-আ'লামে উদ্ধৃত, ৫খ, ১৬৩; (৩) আল-কুল্লিয়্যাত, ফি'ল-ফারা'ইদ'; টীকাসহ পাণ্ডু., তিউনিস ৪১৮; (৪) লুবাব তাক্‌রীবি'ল-মাওয়ারিছ ওয়া মুন্‌তাহা'ল-উকূলি'ল (কাওল)-বাওয়াহিছ, প্রবন্ধকারের সংগ্রহে পাণ্ডু.; (৫) আল-মুসতাওফী লি-মাসা'ইলি'ল-হাওফী, নায়ল, ২০৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত; (৬) ইব্‌ন হাজিবের শারহু'ল-ফারা'ইদ, তালকীন-এর আল-'আত্তাবিয়া-র খালীলের মুখ্‌তাসারের ফারা'ইদ সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ, নায়ল, ২০৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত; (৭) তিলিমসানিয়ার দুইটি শারহ, সংযোজন ১ ঃ ৬৬৬; (৮) বুগয়াতু'ল-মুবতাদীর ভূমিকায় উদ্ধৃত তাকরীবু'ল-মাওয়ারিছ ওয়া-তানবীহু'ল-বাওয়া'ইছ।

মালিকী-ফিকহ, হাদীছ, মহানবী (স) সম্পর্কে কৈফিয়তমূলক বর্ণনা ঃ নায়লু'ল-ইবতিহাজে তাঁহার এই ধরনের রচনার দীর্ঘ একটি তালিকা রহিয়াছে, ইহার বৃহদাংশ এখনও পাওয়া যায় নাই; (১) আশরাফু'ল-মাসালিক ইলা মাযহাবি মালিক, আল-আ'লামে উদ্ধৃত; (২) হিদায়াতু'ল-আনাম ফী শারহ কাওয়া'ইদি'ল-ইসলাম; (৩) শারহু'ল-বুরদা, (৪) শারহ হিকাম ইব্‌ন 'আতা'ইল্লাহ; (৫) শারহু'ল-আনওয়ারি'স-সানিয়া ফি'ল-হাদীছ; (৬) শারহ্ লুববি'ল-আয্‌হার, পাণ্ডু. Br. II, ৩৭৮; (৭) শারহ মুখ্‌তাসার খালীল; (৮) শারহ রাজায ইব্‌ন বার্‌রী ; (৯) শারহ রাজায আবী 'আমর ইব্‌ন মান্‌জূর ফী আসমা'ইর-রাসূল ; (১০) শারহ রাজাযি'ল-কুরতুবী ; (১১) শারহু'র-রিসালা।

ব্যাকরণ, ছন্দ প্রকরণ ইত্যাদি ঃ (১) গু'নায়াতু'ন-নুহাত-ভাষ্যসহ; (২) শারহু'জ-জাররূমিয়া; (৩) শারহু'ল-জুমাল (যাজ্‌জাজী-র); (৪) শারহ মুলহাতি'ল-ই'রাব (৫) মুখ্‌তাসার ফি'ল-'আরূদ; (৬) শারহু'ল-খাযরাজিয়া; (৭) Eisagoge-এর ভাষ্য; (৮) নক্ষত্রপুঞ্জের উপর ইব্‌ন ফুতূহ-এর উরজূযার শারহ; (৯) রিহলা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S II, 378; (২) ইব্‌ন মারয়াম, বুসতান পৃ. ১৪১-৩ ; (৩) ইবনু'ল-কাদী, দুররাতু'ল-হজাল, ২খ, ৪৪৫ ; (৪) মাক্কারী, নাফহু'ত-তীব, ২খ, ৬৮৪ ; (৫) সাখাবী, আদ্‌-দাও'উ'ল-লামি', ৫, ১৪ ; (৬) সারকীস, মু'জামু'ল-মাত্‌বূ'আত, ১৫১৯ ; (৭) সুয়ূতী, নাজমু'ল-'ইকয়ান, পৃ. ১৩১ ; (৮) আহমাদ বাবা, নায়লু'ল-ইবৃতিহাজ, পৃ. ২০৮ ; (৯) যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৫খ, ১৬৩; (১০) S. Enestrom, Sur une Formule d'approximation des racines carrees donnel par Alkalasadi, in Bibl. Math. (১৮৮৬ খৃ.), পৃ. ২৩৬-৯; (১১) Colin, in JA. cexxii; (১২) F. Hoefer Histoire des mathematiques depuis leurs origines jusqu'au commencement du XIX[e] siecle, প্যারিস ১৮৭৪ খৃ. পৃ. ৩০২; (১৩) J. A. Sanchez Perez, La aritmetica en Roma, en India y en Arabia মাদ্রিদ-গ্রানাডা, ১৯৪৯ খৃ. পৃ. ১০৫ ; (১৪) ঐ লেখক, Biografias de matematicos arabes que florecieron en Espana, মাদ্রিদ ১৯১৭ খৃ. ; (১৫) Woepcke, Traduction du traite d' arithmetique d' Alkalacadi, in Ac. Lincei, xii (১৮৫৯ খৃ.)।

M. Souissi (E.I.²)/পারসা বেগম

কালাহ (كله) ঃ [কালাহ (كلاه), কালা (كلا), কিলা, (كلا) কিল্লাহ (كلة)] একটি দ্বীপ (জাযীরা) অথবা উপদ্বীপের জন্য মধ্যযুগের আরব ভৌগোলিকগণের ব্যবহৃত নাম ; এই উপদ্বীপ অথবা দ্বীপটি আরব, ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী বাণিজ্যিক ও নৌযোগাযোগের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করিত। এই স্থানটি ইহার টিন খনিসমূহের জন্য বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিল এবং এই ধাতুর সমার্থক আরবীয় শব্দটি কাল'ঈ/কালা'ঈ (দ্র.)-কালাহ হইতে উদ্ভূত। এই অঞ্চলটি ইহা ব্যতীত কর্পূর, বাঁশ, হস্তী-দন্ত, ঘৃত-কুমারী ইত্যাদির বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার রাজধানী শহরটির নামও ছিল কালাহ (তু. উদা. আদ্‌-দীমাশ্‌কী, Cosmographie, ১৫২ ১৭০)। ইহার উপকূল বিধৌতকারী সমুদ্র এবং যাহা নৌ-চলাচলের জন্য অত্যন্ত দুর্গম ছিল, তাহাও বাহ্‌র কালাহ (بحر كله) অথবা বাহীরা কালাহ (بحيرة كله) নামে পরিচিত ছিল (উদা. আদ-দীমাশকী, পূ. গ্র. ১৫২-১৬৯)।

ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাসে কোনভাবেই গুরুত্বে নগণ্য নয় এই কালাহ-এর স্থান নির্ধারণের কার্য যাহা এক বিশাল গ্রন্থ তালিকার সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন সূত্র হইতে, বিশেষত টিন ধাতুর উৎপাদনের উল্লেখ— ধারণা করা হয় যে, স্থানটি মালাক্কা উপদ্বীপ। Walckemaer (Nouvelles Annales des Voyages, প্যারিস ১৮৫২ খৃ. ১৯) প্রথমবারের মতো কালাহকে এমন একটি শহরের সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করেন, যাহার নাম পর্তুগীজ সূত্রসমূহে কোয়েদারূপে লিখিত হইলেও তাহা কেদাহরূপে উচ্চারণ করা হয়। এই শহরটি মালাক্কা উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে অবস্থিত (৬° উত্তর অক্ষাংশ)। কালাং নদীবিধৌত কেদাহ প্রদেশ (দ্র. Ritter, Erdkunde, ৫খ, ২০-১) এখনও টিন ব্যবসায়ে ইহার জোরালো অবস্থানের কারণে মালাক্কা অঞ্চলে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান; অবশ্য মূল শহরটি এক সময় একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর থাকিলেও বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষয়িষ্ণু।

Walckemaer-এর সনাক্তকরণের সহিত L. A. von aer Lith (কিতাবু 'আজা'ইবি'ল-হিন্দ-এর সম্পাদক, নির্ঘন্ট) De Goeje (in De Gids, আমস্টারডাম ১৮৮৯ খৃ. ৩খ, ২৯৭), Tomaschek (Die topogr, des indischen Seespiegels Mohit, ভিয়েনা ১৮৯৭ খৃ., ৮৬) এবং G. Le Strange (হামদুল্লাহ্ আল-মুস্‌তাওফী-র্ নুযহাতু'ল-কুলূব-এর অনুবাদক, ১৯৪) একমত পোষণ করেন। Quatremere (in Journal des Savants, ১৮৪৬ খৃ., ৭৩৪), Yule ও Burnell (Hobson-Jobson, ১৪৫) ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করেন। শেষোক্ত জন বিশ্বাস করেন যে, কালান Ptolemy-র উল্লিখিত Kwz-এর সহিতও সনাক্ত করা উচিত; কিন্তু মনে হয় এই শহরটি অন্যত্র কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। (তু. Pauly-Wissowa, art, Koli, ১১খৃ. ১০৭৩)। J. Sauvaget (Relation de la Chine et de l' Inde, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., ৪৩) এই সনাক্তকরণটি সমর্থন করেন, কিন্তু একই সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, কেদাহ, কেরাহ, কেরাহ (ক্রা যোজক) অথবা এমনকি মাল্লাক্কা শহরের উত্তরে অবস্থিত কেলাং এই সমস্তই সম্ভব্য স্থান। যদিও মালয় ভাষায় 'দ' এমনভাবে উচ্চারণ করা হয় যে কোনও আরবীয় ভাষা-ভাষী 'ল'-এর উচ্চারণ শুনিতে পারে, চীনাগণ নামটিকে কো-লোরূপে অনুলিখিত করিয়াছে এবং ক্‌-লাহ-এর প্রথম শব্দাংশের উচ্চারণরূপ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত (P. Pelliot, Deux itineraires de Chine en Inde a la fin du VIII^{e} siecle, in Bull. de l'Ecole fr. d'Extreme Orient, ৪খ, ১৯০৪ খৃ., ৩৫১, নং ৬)।

উপরন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, G. Ferrand [in J. A. ২য় সিরিজ, ১৪ খ (১৯১৯ খৃ.) ২১৪-৩৩] শেষ পর্যন্ত কেদাহ ও কালাহকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিবার সম্ভাবনাকে নাকচ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ ভৌগোলিক দিক হইতে কারা=ক্রা, আনুমানিক ১০° উত্তর অক্ষাংশ এবং কেদাহ-এর নিকটবর্তী কারা-এর মধ্যে, আমি প্রথমোক্ত বন্দরটিকেই এবং আরবীয় ভাষ্যসমূহে ইহার অপরাপর ভাষাগত রূপসমূহকে কালাহ-এর অবস্থানরূপে গণ্য করিতে আগ্রহী। তাঁহার অগ্রাধিকার প্রদানের পশ্চাতে Ferrand-এর পর্যবেক্ষণকৃত কারণসমূহ প্রকাশিত হয় নাই এবং কেদাহ ও কেলাহ (ক্রা)-এর দাবীসমূহকে কোনও অবস্থায়ই নিষ্পত্তিকৃত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। কালাহ-এর স্থান সংক্রান্ত অপরাপর যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ শ্রীলংকায় (ঘালী বন্দর, গ্যালে, গ্যালে অন্তরীপ; উদা. Reinaud, Relations des voyages...., প্যারিস ১৮৪৫ খৃ., ১খ, পৃ. ৬১-৬২ এবং আবু'ল-ফিদা,' Geographie, ১খ, ৪১৪, ৪১৮-৪১৯; Dulaurier, in JA, ৪র্থ সিরিজ, ৮খ, ২০৯), মালাবার (Renaudot, তু. Ouseley, Travels...., ১খ, লন্ডন ১৮১৯ খৃ., নং ৫৩) এবং করমান্ডেল (Gildemeister, Script. Arab de rebus Indicis loci, বন ১৮৩৮ খৃ., ৫৭-৮)।

কালাহ-এর সঙ্গে সঙ্গে আরব ভৌগোলিকগণ যুগ্ম-শব্দ কালাহবারও ব্যবহার করেন (উদা. Rel. de l' Inde et de la Chine, শা. ১৫; আল-মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ৩৩০, ৩৪০=অনু. Pellat, শা, ৩৬১, ৩৭৪); এইখানে বার শব্দটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সংস্কৃত ভাতা হইতে উদ্ভূতরূপে, যাহা হইতে উদ্ভূত অপরাপর শব্দ হইতেছে ভাদ ও ভার; 'জেলা'। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় এবং এমনকি তামিল ভাষাতেও পারাম (যুগ্ম শব্দে বারাম) শব্দটি "বিপরীত উপকূল" বুঝায় এবং অপরাপর দেশ হইতে আগত নাবিকগণ তাহাদের নিয়মিত যাত্রায় প্রায়শ ভ্রমণ করে, সেই উপকূলকে এই নামে অভিহিত করে। Relation (শা. ১৫)-এ দুইটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে ('রাজ্য' এবং 'উপকূল'), যেহেতু দ্বিতীয়টি সঠিক, তাই আল-মাস'উদীর (১খ, ৩৪০-৩৭৪) বার অর্থ সমুদ্র নিশ্চিয়তভাবেই ভ্রান্ত ধারণা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবীহ্, ৬৬; (২) জাওয়ালীকী, মু'আররাব, সম্পা. Sachau, ৫৬-৭, ১২৫; (৩) S. Maqbul Ahmed, India and the neighbouring territories in the Kitab Nuzhat al-Mushtaq... of al-Sharif al-Idrisi, লাইডেন ১৯৬০ খৃ., ১১৬-৭; (৪) য়াকূত, নির্ঘন্ট; (৫) কাযবীনী, আছার, ২খ, ৩৮; (৬) আবু'ল-ফিদা,' তাকবীম, ৩৭৫; (৭) বাকুবী, তালখীসু'ল-আছার, অনু. de Guignes, in Notices et Extraits, ২খ, ৪০৫; (৮) ইবনু'ল-ওয়ারদী, খারীদাতু'ল-'আজা'ইব, কায়রো ১৩২৪ হি., ৮৬; (৯) G. Ferrand, Relations des voyages..., প্যারিস ১৯১৩-১৪ খৃ, নির্ঘন্ট; (১০) ঐ লেখক, in J A. ২য় সিরিজ, ১২খ. (১৯১৮ খৃ.), ৮৯, ১০৯, ১৩খ. (১৯১৯ খৃ.), ৩১২, ৪৩৮, নং ২, ৪৩৯-৪০, ১৪খ. (১৯১৯ খৃ.), ২১৪-৩৩, ২১খ. (১৯২৩ খৃ.) ৩১; (১১) হুদূদু'ল-আলাম, ১৮৭; (১২) দা. মা. ই, ১৭খ, ৩৫৮-৬০।

M. Streck (E. I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

কালীগঞ্জ (کلی گنج) ঃ বা কালিগঞ্জ, সাবেক ঢাকা সদর উত্তর মহকুমার এবং নবগঠিত গাজীপুর (মহকুমা গঠন ১৯৭৮ খৃ., জিলাতে রূপান্তর ১৯৮৪ খৃ.) দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী উপজিলা, মুগল আমলের বিখ্যাত ভাওয়াল পরগণার শাসনকেন্দ্র (নিম্নে দ্র.) এবং বর্তমানে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প অঞ্চল, শীতলক্ষা নদী বিধৌত। (বৃহত্তর কালীগঞ্জ হইতে ১৯৭৮ খৃ., নদীর পূর্ব তীরবর্তী ৪টি থানা বা উপজিলা নিয়া পলাশ উপজিলা গঠন করা হইয়াছে এবং সেই অংশকে নরসিংদী জিলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে)। বর্তমান নিবন্ধে বৃহত্তর কালীগঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। উপজিলার অবস্থান ২৩°৫৪ ও ২৪°০২ উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৯০°২৬ ও ৯০°৩৯ পূর্ব অক্ষাংশে, আয়তন (সাবেক কালীগঞ্জ থানা) ১১০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা (১৯৭৪ গণনা) ২,২১,২০২ জন, (বর্তমান অংশ) ৭৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা (১৯৮১ গণনা) ১,৬৮,৫৮৬ জন, প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২,০১১ জন লোক বাস করে। কর্তিত কালীগঞ্জ হইতেও আবার ১৯৮৮ খৃ. বাড়িয়া ইউনিয়ন কাটিয়া নিয়া গাজীপুর সদর বা জয়দেবপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে, সেই অংশও এখানে আলোচিত হইয়াছে। উত্তরে কাপসিয়া ও আংশিকভাবে শ্রীপুর উপজিলা, পূর্বে বর্তমানে শীতলক্ষ্যা নদী; বৃহত্তর কালীগঞ্জের পূর্বে ছিল নরসিংদী উপজিলা, দক্ষিণে শীতলক্ষা নদী ও পরপারে রূপগঞ্জ উপজিলা পশ্চিমে জয়দেবপুর উপজিলা। কালীগঞ্জ নামটির উৎপত্তি হইয়াছে স্থানীয় একটি কালীবাড়ী হইতে (দ্র. District Census Report, Dacca, 1924)।

কালীগঞ্জ এলাকাটি মূল ভাওয়ালের অন্তর্গত (নিম্নে দ্র.), এখানকার ভূমি গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে লাল মাটির ছোট ছোট পাহাড়—সেগুলিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ট্যাক বা টিলা এবং পলি সঞ্চিত দো

আঁশ শ্রেণীর সাদা বা কালো নীচু দোআঁশ মাটি, এগুলিকে বলা হয় বাইদ যমীন। এইগুলি অত্যন্ত উর্বর। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই অঞ্চলের নাম দিয়াছেন কোহিস্তান ঢাকা (=পার্বত্য ঢাকা)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এখানকার যমীনে লোহা মওজুদ রহিয়াছে। নীচু বাইদ ও বিলগুলি বর্ষার পানিতে পাঁচ হইতে দশ হাত তলাইয়া যায়, সে সময়ে প্রচুর পলি সঞ্চিত হইয়া যমীন উর্বরা হয়, এই যমীনেই আউশ, আমেন, বোরো ও ইরি ধান, শন, পাট, ইক্ষু, তামাক ও সরিয়া জন্মে।

ট্যাক বা টিলাপ্রধান বনাঞ্চলে এবং সর্বত্রই উচ্চভূমিতে গজারী— প্রধানত খুঁটি বা পুল নির্মাণে এবং গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়— কড়ুই, কাঁঠাল, তাল, জাম ও অন্যান্য নানাবিধ কাঠের গাছ জন্মিয়া থাকে, বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁশ সর্বত্র জন্মে। এই এলাকার ভূদৃশ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যই ছোট ছোট পাহাড় এবং আম-কাঁঠাল-তাল-শিমুল গাছের প্রাচুর্য। সুস্বাদু তরি-তরকারী ও ফলমূল প্রচুর জন্মে। ফলের মধ্যে কাঁঠাল দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল— আম, জাম, পেয়ারা, তাল, আনারস, পেঁপে, বেল— দক্ষিণ ভাগ গ্রামের বড় আকারের বেল সমগ্র দেশে সর্বোৎকৃষ্ট— ও আতা প্রধান। এইগুলির অধিকাংশ জামালপুর, ঘোড়াশাল ও পুবাইল বাজারের মাধ্যমে ঢাকা শহরে যায়। বন্য প্রাণী কিছুকাল পূর্বেও যথেষ্ট ছিল। বর্তমানে ব্যাপক আবাদীর ফলে বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী অনেক কমিয়া গিয়াছে। হাতী, বন্য শূকর, বাঘ ও চিত্রল হরিণ এখন আর নাই। এখন ছোট মেছো বাঘ, চিতাবাঘ, ছোট ভল্লুক, বনবিড়াল, শিয়াল, বানর, হনুমান, সজারু, অজগর, গোক্ষুর, কেউটে ও অন্যান্য কয়েক জাতের বিষধর সাপ ও গুঁইসাপ দেখা যায়। নানা জাতের পাখীও রহিয়াছে বনে ও বিলগুলিতে, বিশেষ করিয়া বেলাই বিলে যথেষ্ট শীতকালীন যাযাবর পাখী দেখা যায়। এই অঞ্চলের ঘর-বাড়িগুলির অধিকাংশ মাটির তৈরী কোঠাঘর, শক্ত, বহু বৎসর টিকে। কিন্তু পানি উঠিলে সহজে গলিয়া যায়। গত ১৯৮৮ খৃ. মহাপ্লাবনে কয়েক হাজার কোঠাঘর গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম শীতলক্ষা নদী। কৃষিজাত ও বনজ উৎপাদনের অধিকাংশ এই নদী এবং আংশিকভাবে বালু নদীপথে বহন করা হয়। শিল্পাঞ্চলের (নিম্নে দ্র.) কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রী নৌকা, মোটর বোট, বার্জ ইত্যাদি যোগে নদীপথে পরিবহন করা হয়, কিছু রেলপথে ও সড়কপথে পরিবাহিত হয়। পূর্বে লক্ষা নদীতে নিয়মিত স্টীমার চলিত। বর্তমানে লঞ্চ চলে। সাম্প্রতিক কালে যান্ত্রিক নৌকার প্রচলন হইয়াছে। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চল যখন প্লাবিত হইয়া যায় লোকজন তখন নৌকা দ্বারা চলাচল করে। কৃষকেরা তালগাছের গোড়ার অংশ খোদাই করা কোন্দা (ফার্সী শব্দ, অর্থ খোদাই করা) দিয়া চলাচল করে।

সাবেক আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে, বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়ে, উপজিলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ অধিবাসিগণের চলাচলের অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কালীগঞ্জ এলাকাতে চারিটি রেলস্টেশন রহিয়াছে। উপজিলা শহরের রেল স্টেশনের নাম আড়িখোলা, অতঃপর ঘোড়াশাল ফ্লেগ্যাগ— প্রথম দিকে যাত্রী থাকিলে স্টেশন মাস্টার ফ্ল্যোগ বা নিশান দেখাইলে তবেই গাড়ি থামিত বলিয়া এই নাম— ঘোড়াশাল ও জিনারদী। এই রেলপথ ১৯০৭-১০ সালের মধ্যে নির্মিত হয়, লক্ষা নদীর উপরে বড় ও সুদৃশ্য পুলটি ইংরেজ কারিগরগণের নির্দেশনায় চীনা এবং বাঙালী রাজমিস্ত্রিগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সড়ক যোগাযোগ খুব ভাল নহে; ঢাকা হইতে টঙ্গী এবং পুবাইল হইয়া কালীগঞ্জ পর্যন্ত পাকা সড়কটি ধরিয়া নিয়মিত বাস চলাচল করে। ঢাকা হইতে কাঁচপুর পুল পার হইয়া নরসিংদীর পথে ঘোড়াশাল পর্যন্ত (অর্থাৎ নদীর পরপারে, বর্তমান পলাশ উপজিলা) নিয়মিত বাস চলে। মুগল আমলে কাটানো কয়েকটি খাল শীতলক্ষা নদী হইতে ভিতরে অনেকদূর গিয়াছে। সেগুলি হইতে পানি সেচ হয়, বর্ষাকালে নৌকা চলে।

এই এলাকা এক সময় মসলিন কাপড় বোনার জন্য বিখ্যাত ছিল ঃ শীতলক্ষা নদীর তীরেই মিহি আঁশের কার্পাস তুলা জন্মাইত এবং উভয় তীরের কারিগরগণ বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈরী করিত (সেই কারণেই কালীগঞ্জে স্থাপিত সূতার মিলটির নাম দেওয়া হয় মসলিন কটন মিলস, নিম্নে দ্র.), উপজিলার জামালপুর বাজার সেই সময়ে মসলিন সংগ্রহের একটি কেন্দ্র ছিল। পূর্বের সেই ধারা বহন করিয়া এই উপজিলার হিন্দু যোগী বা নাথ (ইহারা এক সময়ে বৌদ্ধ ছিল, পরে হিন্দু শাসকদের চাপে পড়িয়া প্রচ্ছন্ন হিন্দু হয়, বর্তমানে স্বতন্ত্র ধরনের হিন্দু) এবং মুসলমান তাঁতিগণ উৎকৃষ্ট মানের তোয়ালে, শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, চাঁদর ইত্যাদি তৈরী করে। এই সকল কাপড় সরাসরি ঢাকা শহর ও দেশের সর্বত্র যায়। সূফী ভাবধারাপুষ্ট বেশ কিছু সংখ্যক বৈষ্ণব ও বৈরাগী এই উপজিলাতে বাস করে। তাহাদের প্রধান কেন্দ্র নরসিংদীতে। কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ী ছিল সাবেক কালীগঞ্জ উপজিলা সীমানার সংলগ্ন নরসিংদী উপজিলার পাঁচদোনা গ্রামে (স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে মৌলভী গিরিশচন্দ্র বলিত, বসতবাড়ী এখনও রহিয়াছে)।

ইতিহাস ঃ কালীগঞ্জের ইতিহাস ভাওয়াল পরগণার ইতিহাসের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। ভাওয়াল ছিল সাবেক সমগ্র ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা অর্থাৎ বর্তমান গাজীপুর জিলা এবং সাভার ও ধামরাই উপজিলা সমবায়ে গঠিত। সেই সমগ্র এলাকাটি প্রায় ৫০০ বৎসর কাল ধরিয়া শাসিত হয় কালীগঞ্জের সংলগ্ন উত্তরের গ্রাম চৌড়া হইতে। প্রাক-মুসলিম যুগের এই এলাকার কোনও পরিষ্কার ইতিহাস পাওয়া যায় না। মুসলিম অধিকারে আসার পর হইতে মোটামুটি ধারাবাহিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ কাহিনী জানা যায়; পূর্ব বাংলার অধিকার নিয়া মুগল-পাঠান সংঘর্ষের কালে কালীগঞ্জ বা ভাওয়াল গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শীতলক্ষা নদী তখনই সবচেয়ে মহিমময় হয়।

৫৪৪ খৃ. পর্যন্ত এই অঞ্চল ও সমগ্র বৃহত্তর ঢাকা জিলা প্রথমে মৌর্য এবং পরে গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল। অতঃপর বৌদ্ধ পাল ও চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক পর্যায়ে বৈষ্ণব বর্মণ ও শৈব সেনগণ পর্যায়ক্রমে শাসন করেন অথবা সম্ভবত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ বা নদিয়াতে মুহাম্মাদ বখতিয়ার খালজীর নিকট পরাজিত হইয়া পূর্ববঙ্গে আসিয়া বিক্রমপুর হইতে এই অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর হইতেই উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ হইতে তুর্কীরা বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ববঙ্গে অভিযান করিত; কিন্তু কোনও অঞ্চল স্থায়ীভাবে জয় করে নাই। পূর্ববাংলাতে সেন রাজত্ব খুব সম্ভবত ১২৪২ খৃ. শেষ হইয়া যায় এবং অতঃপর বৃহত্তর ঢাকা জিলার বিভিন্ন স্থানে— তন্মধ্যে ভাওয়াল ও কালীগঞ্জ এলাকা— কয়েকটি হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। মুসলিম শাসনাধীনে আসিবার আগে ভাওয়াল অঞ্চলে যশোপাল, শিশুপাল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া স্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে

চণ্ডাল রাজা বলিত। বৌদ্ধ রাজাগণের পরেই সম্ভবত মুসলিম গাযীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গাযীরা পাঠান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ঠিক কোন সালে তাঁহারা এই এলাকা জয় করিয়া গাযী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, এই গাযীরাই ছিলেন ভাওয়ালের প্রথম মুসলিম বিজেতা ও শাসক। সুলতান গিয়াছুদ-দীন বলবন কর্তৃক ৬৬৭ হি. নিযুক্ত লক্ষ্মণাবতীর উপ-শাসক তুগরিল খান ঢাকা জিলা এলাকাতে কয়েকটি যুদ্ধ করিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতাসীন হিন্দু রাজা দনুজ রায়কে পরাস্ত করিলে রাজা চন্দ্রদ্বীপে (বরিশাল) গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন (১২৭৫ খৃ.)। তুগরিল সোনার গাঁওয়ের নিকটবর্তী লরিকেলে কিল্লা' নির্মাণ করিয়া ঢাকা জিলা এলাকাকে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনাধীনে আনেন (বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দ্র. নিবন্ধ ঢাকা)। গাযীরা কালীগঞ্জের সংলগ্ন উত্তরের গ্রাম চৌড়া-তে তাঁহাদের জমিদারীর শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং পুরুষানুক্রমে কখনও বাংলার সুলতান বা সুবাদারগণের অনুগত জমিদাররূপে, আবার কখনও স্বাধীনভাবে ১৭৩৮ খৃ. পর্যন্ত ভাওয়াল পরগণা শাসন করেন। কালীগঞ্জের চৌড়া গ্রামকেন্দ্রিক যে ঐতিহাসিক ভাওয়াল পরগণা, সেই নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না; তবে ভাওয়ালপুর বা বাহওয়ালপুর, এইরূপ নাম উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানেও রহিয়াছে। এই বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্ভবত কায়্যুম খান গাযী। কোনও উৎস-গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া মোঃ নুরুল ইসলাম "ভাওয়াল হইতে গাজীপুর" নিবন্ধে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) লিখিয়াছেন যে, দিল্লীর বাদশাহ মুহাম্মাদ তুগলাক কোনও কৃতিত্বপূর্ণ কাজে সন্তুষ্ট হইয়া কায়্যুম গাযীকে চেদী রাজ্যের জমিদারী প্রদান করেন। শেরশাহ-এর আমলে এই বংশের জমিদার ছিলেন ভাওয়াল (বাহওয়াল-بهاول) গাযী। তাঁহারই নামানুসারে শেরশাহ চেদী রাজ্যের নূতন নামকরণ করেন ভাওয়াল। কিন্তু ভাওয়ালের জমিদার বলিয়াও তাঁহাকে সেই নামে ডাকা হইতে পারে। তাঁহার পরে জমিদার হন এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ফাদ্‌ল গাযী। তিনি ছিলেন বাংলার বারো ভূঁঞার অন্যতম ভূঁঞা এবং একজন সুযোগ্য শাসক। মাসনাদ-ই 'আলা 'ঈসা খান ছিলেন তাঁহার মিত্র। ফাদ্‌ল গাযী ভাওয়ালের মাটিতে সম্রাট আকবরের প্রেরিত বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। ভাওয়াল অঞ্চলে তাঁহার নাম অদ্যাবধি কীর্তিত হয় এবং চৌড়া গ্রামে অদ্যাবধি বসবাসরত গাযী পরিবার ফাদ্‌ল গাযীর বংশ নামেই পরিচিত। প্রথমে তাঁহাদের জমিদারী ঢাকা— উত্তরের সমগ্র এলাকা ছাড়াও ময়মনসিংহের দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া ছিল। খুব সম্ভবত এগারসিন্ধুর কিল্লার নিকটে 'ঈসা খান ও মহারাজা মানসিংহের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে (দ্র. নিবন্ধ কাপাসিয়া ও এগারসিন্ধুর) মানসিংহ যখন 'ঈসা খানকে আগ্রাতে সম্রাটের নিকট নিয়া যান (কিশোরগঞ্জ শহরে হয়বতনগরে দেওয়ান বাড়িতে সম্রাটের দরবারে 'ঈসা খান-এর উপস্থিতির একটি চিত্র রক্ষিত আছে, কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীতে উহার একখানি প্রতিলিপি রহিয়াছে), তখন সম্রাট ভাওয়াল পরগণাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; রণক্ষেত্রসমেত ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর তীরস্থ অংশের নাম হয় রণভাওয়াল, আর নদীর দক্ষিণ তীরস্থ অংশের নাম হয় মূল ভাওয়াল; বনভাওয়াল সমেত বাইশ পরগণা সম্রাট 'ঈসা খানকে প্রদান করেন। ফাদল গাযী মূল ভাওয়ালের জমিদার থাকেন। তিনি বস্তুত স্বাধীন ছিলেন। ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে ফাদল গাযীর নামাঙ্কিত দুইটি কামান রহিয়াছে। সেগুলির গায়ে নির্মাণের তারিখ লেখা ৯৪৯/১৫৪২ সাল। ফাদল গাযীর পরে (মৃ. ১৬০২ খৃ.) বাংলাদেশ মুগল-পাঠান ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, সেই সময়ে চৌড়ার জমিদার ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বাহাদুর গাযী। তিনি 'ঈসা খান-এর পুত্র মসনদ-ই 'আলা মূসা খান-এর মিত্ররূপে তাঁহার নেতৃত্বে অশেষ বীরত্বের সঙ্গে মুগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুগল সেনাপতি মীর্যা নাথন তাঁহার বাহারিস্তান-ই গায়বী গ্রন্থে এই বাহাদুর গাযীর বীরত্বের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। শেষ পর্যায়েও রণক্লান্ত বারো ভূঁঞাগণ তাঁহাদের সীমিত সম্পদ নিয়া প্রাণপণে অশেষ বীরত্বের সঙ্গে বিশাল মুগল বাহিনীর বিরোধিতা করেন। মুগল সুবাদার ইসলাম খান চিশ্‌তী যখন বারো ভূঁঞাগণকে দমন করিতেছিলেন তখন শেষবারের মতো সম্মিলিত পাঠান শক্তি মূসা খানের নেতৃত্বে শীতলক্ষা নদীর মোহনার কাছে মুগল নৌবহরের সম্মুখীন হয়। বাহাদুর গাযী কালীগঞ্জ হইতে ২০০ রণতরী (কোষা) নিয়া গিয়া এই অতি বিখ্যাত যুদ্ধে যোগদান করেন। গাযীগণের প্রাসাদ এবং অন্যান্য শাসন প্রতিষ্ঠান ছিল চৌড়া ও বালিগাঁও এই দুই গ্রামজোড়া। ১০২০/১৬১১ সালের এপ্রিল মাসে সম্মিলিত পাঠান শক্তি কোদালিয়া নামক স্থানে মুগল নৌবহর আক্রমণ করে। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাঠান শক্তির পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) মজলিস কুতুবও আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান তাঁহাদের সকলের নৌবহর ও সামরিক শক্তি হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগকে নামেমাত্র জমিদার করিয়া রাখেন। ১৬১২ খৃ. বর্তমান মৌলভী বাজার শহরের সংলগ্ন দৌলতপুর গ্রামে সংঘটিত সংশেষ যুদ্ধে 'উছমান পরাজিত ও নিহত হইলে পাঠানদের উপদ্রব বন্ধ হইয়া যায়। কালীগঞ্জের সংলগ্ন উত্তরের বিখ্যাত চৌড়া গ্রামে গাযীগণের বংশধরেরা থাকিলেও সাবেক প্রাসাদ বা নির্মাণ কাজের তেমন কোন চিহ্ন এখন নাই। একটু দক্ষিণে রহিয়াছে বিখ্যাত বড় দীঘি বা কারা শাহ-এর দীঘি। দীঘির উত্তর পাড়ে পাহলওয়ান গাযীর মাযার ও দীঘি বা তালাবটির খননকারী বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ কারফারমা (র)-এর মাযার। সংলগ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি সম্প্রতি গাযী পরিবারের সদস্যগণ নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। বিশাল ও মনোরম দীঘিটিই বর্তমানে অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে। এই সূফী দরবেশ হযরত শাহ কারফারমা (র) সম্ভবত গাযী পরিবারের প্রতিষ্ঠার সময়ে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। নিকটবর্তী অঞ্চলে তাঁহার নাম কিংবদন্তীর মতো শোনা যায়। তিনিই এই এলাকাতে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী দরবেশ ছিলেন। চৌড়া গ্রামেই আরও একজন সূফী দরবেশের মাযার রহিয়াছে। তাঁহার নাম হযরত বায়েযীদ (র)। তিনিও ভাওয়ালের অন্যতম ইসলাম প্রচারক ছিলেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে সৌদী আরব হইতে রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত হইয়া আর একজন বিশিষ্ট 'আলিম হযরত সুলায়মান কুর্দী কালীগঞ্জে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল কালীগঞ্জ বাজার ও স্কুল সংলগ্ন বাদশাহী আমলে নির্মিত জামি' মসজিদের ইমাম পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র কালীগঞ্জ উপজিলা এলাকাতে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গেলে সৌদী সরকারের অনুমতিক্রমে তিনি মদীনা শরীফে চলিয়া যান এবং পরে সেখানেই ইনতিকাল করেন।

ইংরাজ শাসন শুরু হইতেই উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকির মজনু শাহ (দ্র.) বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বৃহত্তর ভাওয়াল পরগণা। এই অঞ্চলের গড় বা জঙ্গলে তাঁহার দলীয় ফকিরদের আস্তানা ছিল। ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধটিই তিনি করিয়াছিলেন ভাওয়ালে। ১৮২০ খৃ. বাহাদুরপুরের পীর হাজী শরীয়তুল্লাহ (দ্র.) কালীগঞ্জ সমেত সমগ্র ঢাকা জিলাকে দারু'ল-হার্ব (শত্রু অধিকৃত এলাকা) বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও জুমু'আর সালাত ও 'ঈদের সালাত সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়'। কালীগঞ্জ ছিল এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নীল চাষের এলাকা। অবিভক্ত কালীগঞ্জ উপজিলার পলাশ গ্রামে (বর্তমানে পলাশ উপজিলা) এখনও একটি নীলকুঠির চিহ্ন রহিয়াছে। ইংরাজ কুঠিয়ালদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে যখন বাংলাদেশব্যাপী ছোটখাট বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয় তখন কালিগঞ্জের নীলচাষিগণ প্রতিবাদ মুখর হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে জৌনপুরের মাওলানা কারামাত 'আলী (র) তাঁহার ধর্মীয় সংস্কার উপলক্ষে কালীগঞ্জ এলাকাতে একাধিকবার আগমন করেন। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ নিয়মিত কালীগঞ্জ অঞ্চলে আগমন করিতেন। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে এই এলাকায় অসংখ্য তরুণ যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

কালীগঞ্জ উপজিলা এলাকার শতকরা ৮০ জন অধিবাসী সুন্নী হানাফী মুসলমান, অল্প কয়েক ঘর রহিয়াছে আহ্‌ল-ই হাদীছ। শতকরা প্রায় ১৮ জন অধিবাসী হিন্দু। তাহাদের মধ্যে নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বল্প সংখ্যক রহিয়াছে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান। তাহারা কালীগঞ্জের সংলগ্ন কিন্তু রূপগঞ্জ উপজিলার অধীন তুমুলিয়া গির্জার নিয়ন্ত্রণাধীন। কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর অনুমতিক্রমে পর্তুগীজ পাদ্রিগণ এই গির্জাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালীগঞ্জের উত্তরাঞ্চলে কয়েক ঘর কোচ ও রাজবংশী উপজাতীয় লোক বাস করে। বাংলা ১১৭৪ সালে কুচবিহার ও কামাখ্যা অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তখন বহু লোক আসিয়া ভাওয়ালে আশ্রয় নিয়াছিল। তাহারা পরে এখানেই থাকিয়া যায়। কৃষিকাজ ও শিকার করা তাহাদের পেশা।

প্রধানত যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার দরুন আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এলাকাটি পশ্চাদপদ ছিল। ১৮৮৯ খৃ. কালীগঞ্জ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হইলে এই অঞ্চলের ছেলেরা আধুনিক লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করে। বর্তমানে এখানে দুইটি কলেজ, ১৭টি ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখিতেছে আড়িখোলা রেল স্টেশনের সংলগ্ন উত্তরে বিখ্যাত দুরবাটি সিনিয়র মাদ্রাসা। ইহা ছাড়াও উপজিলা এলাকাতে আরও ৭টি নিম্ন মাদ্রাসা রহিয়াছে।

শিল্পকারখানা ঃ যে অঞ্চলটিকে ঘোড়াশাল শিল্প এলাকা বা পলাশ শিল্প এলাকা বলা হয় তাহা সম্পূর্ণই সাবেক কালীগঞ্জ উপজিলাতে পড়িয়াছে। বিভক্তির পরে অধিকাংশ পড়িয়াছে নবগঠিত পলাশ উপজিলাতে। সবগুলি কারখানাই শীতলক্ষা নদীর তীরে মোট ৬ মাইল এলাকাতে অবস্থিত। এখানে চরসিন্দুর গ্রামে প্রথম দেশবন্ধু সুগার মিলস স্থাপিত হয় ১৯৩৪ খৃ., উহা ছিল দুই বাংলার মধ্যে দ্বিতীয় চিনির কল। এটি উদ্বোধন করিবার কালে দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন যে, এমন একদিন আসিবে যখন শীতলক্ষা নদীর উভয় তীর শিল্পকারখানাতে প্লাবিত হইয়া যাইবে। ঘোড়াশাল, কাঞ্চন ও নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চল মিলিয়া এখন দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডস্বরূপ তিনটি শিল্পকারখানা কালীগঞ্জেই অবস্থিত ঃ (১) মসলিন কটন মিল্‌স, ১৯৫৪ খৃ. জাপানী কারিগরি সহায়তায় স্থাপিত হয়; (২) ঘোড়াশাল সার কারখানা পলাশ গ্রামে অবস্থিত; ইহা জাপানী কারিগরি সহায়তায় নির্মিত। এই কারখানা হইতে সমগ্র দেশের প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের অধিকাংশ উৎপাদন করা সম্ভব এবং ইতিমধ্যেই ইহা দেশের কৃষি উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখিতে শুরু করিয়াছে; (৩) ঘোড়াশাল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র পলাশ গ্রামে সার কারখানার পার্শ্বেই অবস্থিত, রাশিয়ার কারিগরি সহায়তায় নির্মিত। এখানকার উৎপাদিত বিদ্যুৎ টঙ্গী শিল্প এলাকা সমেত অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করা হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থানে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। ইতিমধ্যে শুধু কালীগঞ্জ উপজিলারই ৪৫টি গ্রামে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর অধীনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে। কর্মসূচী ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে। এইগুলি ছাড়া বর্তমান কালীগঞ্জ উপজিলাতে ২টি চটকল, ন্যাশনাল জুট মিল্‌স ও আর কে. জুট মিল্‌স এবং পূর্ব পাড়ের পলাশ উপজিলা অংশে আরও ৪টি চটকল রহিয়াছে। এইগুলি দেশের শিল্পোৎপাদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতেছে। কাঁচামাল-সমৃদ্ধ পশ্চাৎভূমি, নৌপথে পরিবহণের সুবিধা, স্বাস্থ্যকর এলাকা ইত্যাদি সুবিধাজনক কারণেই এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক্রমবর্ধমান। উপজিলার প্রায় ৩% অধিবাসী বহিরাগত। তাহারা অস্থায়ীভাবে শিল্পাঞ্চলে বাস করে।

কালীগঞ্জ শহর ঢাকা হইতে ২৮ মাইল (৪৫ কি. মি.) উত্তর-পূর্বে, উপজিলার সর্বদক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত। বিখ্যাত মসলিন কটন মিলস শহর এলাকাতে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় ১০,০০০। ইংরাজ আমলে এই স্থানটি আগাগোড়া অবহেলিত পড়িয়া ছিল, দেশ বিভাগের পরে উন্নয়ন শুরু হয়। এখানে একটি কলেজ, উচ্চ মাদ্রাসা, সাব পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সাব-রেজিস্টার অফিস, উপজিলা অফিসসমূহ, থানা, ডাকবাংলা ও রেস্ট হাউজ রহিয়াছে। কালীগঞ্জ একটি বড় বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র। রেল স্টেশন ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আড়িখোলাতে, পাকা সড়ক দ্বারা যুক্ত। ঐতিহাসিক চৌড়া গ্রাম ও হযরত শাহ কারফারমা (র)-এর দীঘি দেড় মাইল উত্তরে। রিক্সাযোগে যাতায়াত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ James Rennel, Map of Bengal, D. U. Library; (২) East Pakistan District Gazetteers, Dacca, art. History written by Muhammad Ishaq, Services and General Administration Deptt, Govt. of East Pakistan, Dacca 1969; (৩) S. M. Taifoor, Glimpses of old Dhaka, Pub. by Lulu Bilqis Banoo and others, Dhaka, n. d.; (৪) মুক্তিদূত খান বাহাদুর মওলবী মুহাম্মদ আজহার, সেখানে উদ্ধৃত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীর নিকটে লিখিত আশুগঞ্জ-টঙ্গী পর্যন্ত রেল লইন সম্প্রসারণ বিষয়ে লিখিত তাঁহার বিশেষ প্রতিবেদন। সম্পাদনা— মুহম্মদ ইলাহি বখশ, ঢাকা ১৯৮৮ খৃ.; (৫) জিলার নাম গাজীপুর, নবগঠিত গাজীপুর জিলা প্রশাসন কর্তৃক বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত, ১৯৮৪ খৃ., সেখানে বিশেষ করিয়া মোঃ নুরুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ ভাওয়াল থেকে গাজীপুর এবং অন্যান্য নিবন্ধ ও মানচিত্র; (৬) কালীগঞ্জ প্রবাহ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৮৫ খৃ. সেখানে প্রকাশিত ঃ (ক) দারা শামসুদ্দীন, কালীগঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার পরিবর্তন এবং (খ) হুমায়ূন খান,

কালীগঞ্জ পরিচিতি; (৭) District Census Report, Dacca 1974, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning 1979; (৮) Bangladesh Population Census 1981, All Thanas of Dhaka, Part-1, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 1985।

হুমায়ুন খান

কালীগঞ্জ (کلیگنج، کلیغنج) ঃ ঝিনাইদহ জিলার (সাবেক যশোর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার) একটি উপজিলা, যশোর-ঝিনাইদহ সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। আয়তন ১১৯.৮ বর্গমাইল (৩১০.২ বর্গ কি. মি.)। ভৌগোলিকভাব অবস্থান ২৩°১৬ ও ২৩°২৮ উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৯°০২ ও ৮৯°১৬ পূর্ব অক্ষাংশে। নামকরণ সঠিকভাবে জানা যায় না। সম্ভবত স্থানীয় কালী মন্দির হইতে কালীগঞ্জ নামটি আসিয়াছে। ১৪টি ইউনিয়ন ও ২২৪টি গ্রাম নিয়া গঠিত। জনসংখ্যা (১৯৮১) ১,৭৮,৫০৮, শিক্ষিতের হার ২০%; প্রতি বর্গমাইলে ১,৪৯০ জন (প্রতি বর্গ কি. মি.-তে ৫৭৫ জন) লোক বাস করে। অধিবাসিগণের মধ্যে ৭২% মুসলমান, বাদবাকি বর্ণহিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, ১০ ঘর আছে বুনা উপজাতীয় লোক। উহাদের পূর্বপুরুষ সাঁওতাল ছিল। নীলচাষের যুগে শ্রমিক হিসাবে উহাদের এই অঞ্চলে আনা হইয়াছিল। বর্তমানেও উহারা দিনমজুরের কাজ করে এবং পুরাতন নীলকুঠির নিকটে বাস করে (নিম্নে দ্র.)। কালীগঞ্জ উপজিলার উত্তরে ঝিনাইদহ উপজিলা, পূর্বে যশোর জিলার বাঘারপাড়া ও মাগুরা জিলার সালিখা উপজিলা, দক্ষিণে যশোর কোতোয়ালী উপজিলা, পশ্চিমে কোট-চাঁদপুর ও চৌগাছা উপজিলা। এই উপজিলার পশ্চিম এলাকা দিয়া ভৈরব নদী প্রথমে উত্তর-দক্ষিণে ও পরে পশ্চিম-পূর্বে প্রবাহিত হইয়াছে। শুষ্ক, মরা নদীর স্রোত কয়েকটিই রহিয়াছে, সেগুলি সবই ইছামতী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; সেইগুলির তীরে তীরে যে এক সময়ে জনবহুল শহর ও গ্রাম ছিল সেইগুলির চিহ্ন বর্তমানেও রহিয়াছে। এখানকার ভূমি উঁচু ও শুষ্ক, বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৬২°৫৭´, কিন্তু নদীগুলি অতি শীর্ণ ও মজিয়া যাইবার কারণে শুষ্কতা বেশী; মাটিতে বালুর পরিমাণও বেশী। গ্রীষ্মে গরম বেশী পড়ে। সর্বোচ্চ ৯০—৯৭° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠে, শীতেও বেশী শীত পড়ে, তাপমাত্রা ৪৯° হইতে একেবারে ৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত নামে। বায়ুতে আর্দ্রতা গড়ে ৭৮%। এই সকল কিছু মিলাইয়া সমগ্র অঞ্চলটিতে কতকটা মরুভূমির আভাস বিরাজিত থাকে আর সেই কারণেই সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে এই উপজিলাতে অধিক খেজুর গাছ জন্মে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বেকার অনেক শুষ্ক এলাকাতে বর্তমানে ফসলের আবাদ হইতেছে। ধান ও কিছু পাট উৎপাদিত হয়। ইহা ছাড়া মুগ ও মসুর ডাল, ইক্ষু, রাই-সরিষা এবং তামাক জন্মে। ফলের মধ্যে কলা, আম, লিচু, তরমুজ, পেঁপে, কাঁঠাল ও আনারস উল্লেখযোগ্য। খেজুরের গুড় উৎপাদনে এই উপজিলার স্থান সর্বাগ্রে। মানের দিক হইতেও এই গুড় অতি উৎকৃষ্ট। এখানে অনেকে পরিকল্পিতভাবে জমিতে খেজুর বাগান করিয়া থাকে। একটি গাছ হইতে ২০-২৫ বৎসর পর্যন্ত রস পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ গাছিগণ এই রস জ্বাল দিয়া তিন প্রকারের গুড় তৈরি করে, যথা ঃ পাটালী (পাটার আকৃতির করা হয় বলিয়া), মাগনা ও চিটা। এখানে তালের গুড়ও হয়।

উদ্ভিদের মধ্যে বাবুল বা বাবলা (ইহার কাঠ দিয়াই গরু-মহিষের গাড়ীর চাকা হয়), তেঁতুল, পাকুড় ও দেবদারু বেশী দেখা যায়। ফলের গাছের মধ্যে আম, কাঁঠাল, জাম, তাল, সুপারী ও নারিকেল উল্লেখযোগ্য। এখানকার আম স্বাদের জন্য সুখ্যাত। বন-জঙ্গল বিচ্ছিন্নভাবে বেশ যথেষ্টই রহিয়াছে। এক সময়ে এখানে বন্য মহিষ ছিল, বর্তমানে নাই। এখন মাঝে মাঝে চিতাবাঘ দেখা যায়, বন্য শূকর অনেক রহিয়াছে। শীতকালে জলা অঞ্চলে শীতের পাখী আসে।

এখানে অভ্যন্তরীণ চলাচলের প্রধান মাধ্যম গরুর গাড়ী। কালীগঞ্জ—জীবন নগর সড়ক ২২ মাইল পাকা, কালীগঞ্জ—খাড়াগোদা সড়ক ১৫ মাইল কাঁচা। তাহা ছাড়া যশোর কালীগঞ্জ—ঝিনাইদহ পাকা সড়ক এবং উহার কিছু কিছু শাখা-সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কালীগঞ্জ একটি রেল-জংশন। মূল রেল-সড়ক হইতে একটি শাখা কোটচাঁদপুর হইয়া কুষ্টিয়ার জীবননগর পর্যন্ত গিয়াছে। উপজিলা এলাকাতে তিনটি রেল স্টেশন রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে পল্লী-বিদ্যুৎ কর্মসূচীর অধীনে ১১টি গ্রাম (১৯৮১ পর্যন্ত) বিদ্যুতায়িত হইয়াছে।

মোট পাকা সড়ক ৬৪ কি. মি., কাঁচা সড়ক ৩৯৪ কি. মি.। উপজিলাতে মোট রেল সড়ক রহিয়াছে ২৬ কি. মি.।

উপজিলা এলাকাতে ১টি কলেজ, ১৮টি উচ্চ ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুল, ৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদরাসা রহিয়াছে। মসজিদ রহিয়াছে ২০০টি, হিন্দু মন্দির ৩৫টি আর খৃষ্টান গির্জা ৪টি। সাম্প্রতিককালে এই উপজিলার কাষ্ঠভাঙা ইউনিয়নের সাতগাছিয়া গ্রামে অতি পুরাতন একটি সুদৃশ্য মসজিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পরে মসজিদটির বিস্তারিত ইতিহাস জানা যাইবে।

এখানে কিছু কিছু কুটির শিল্প রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক ধরনের শোলার টুপি এক সময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ আবহাওয়াগত কারণেই কিছুটা অলস প্রকৃতির। অধিকাংশই কৃষিকাজ করে। শীতকালে তাহারা খেজুরের গুড় তৈরী করে। কিন্তু বৃহত্তর যশোর জিলার পূর্বাঞ্চলীয় কৃষকদের মতো ইহারা পরিশ্রমী নহে। সাংস্কৃতিক দিক হইতে এই অঞ্চল বিখ্যাত। ইহা কবি গান, পীরের গান, জারী গান, পুঁথিপাঠ, বাউল— মুর্শিদী গানের জন্য বিখ্যাত অঞ্চল। বিখ্যাত লোককবি পাগলা কানাই ও লালন ফকির (উভয় দ্র.) এই অঞ্চলেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ, হিন্দু সাধু ও বৈষ্ণবদেরও প্রাধান্য ছিল এক সময়ে। এখান হইতে নিকটেই বড় বাজার নামক একটি স্থান এক সময়ে বড় বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। মুসলিম বিজয়ের পরে পাঠান আমলে উহাই আবার ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুগল শাসনের শেষদিকে এই অঞ্চল বিখ্যাত হাজ্জী মুহাম্মাদ মুহসীন-এর জমিদারী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমগ্র অঞ্চলের গ্রামীণ সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামেরই প্রচার প্রভাব বিদ্যমান। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মও ইসলামী সূফীবাদের প্রভাবেরই ফল। কালীগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দু-বৈষ্ণব এবং মুসলিম বাউল ফকিরগণকে দেখা যায় একতারা, দোতারা ও বাঁশী বাজাইয়া গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। জনসাধারণের কাছে তাহারা বিশেষ আদরণীয়।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ কালীগঞ্জ সমেত সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম বৃহত্তর যশোর জিলা অঞ্চলটি প্রাচীন। মহাভারতের যুগে (খৃ. পূ. ৫ম-৩য় শতক) এখানে জনবসতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু সেই আদি অধিবাসিগণের বংশধরগণ বর্তমানে সম্ভবত এই অঞ্চলে আর নাই। এক সময় ইহা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খৃ. ১১শ শতকে এখানে পাল রাজ্য ছিল এবং

অঞ্চলটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল। খৃ. ১২শ শতকে ইহা হিন্দু সেন রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২০১ খৃ. মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খিলজী সমগ্র উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়া মুসলিম শাসন কায়েম করেন, তখন হইতেই এই অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। খৃ. ১৫শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিখ্যাত দরবেশ-সেনাপতি খান জাহান 'আলী (দ্র.) সমগ্র বৃহত্তর যশোর খুলনা অঞ্চল জয় করিয়া এখানে ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন না। এ অঞ্চল ছিল তাঁহার সৃষ্ট দুইটি বড় পরগণার অন্যত, মাহমূদাবাদের অংশ। নিজের দুই বিখ্যাত শাগরিদ গরীব শাহ ও বাহ্‌রাম শাহকে এখানকার শাসন ও ধর্মপ্রচার কার্যের দায়িত্বে রাখিয়া তিনি নিজে দক্ষিণে বাগেরহাটে গমন করেন। অতঃপর ইহা হুসায়ন শাহী বংশের (দ্র.) শাসনাধীনে ছিল। কিছু কালের জন্য শের শাহ (দ্র.)ও তাঁহার বংশধরগণ অঞ্চলটি শাসন করেন। অতঃপর সুলায়মান কাররানী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী দাঊদ খান কাররানী (উভয় দ্র.) এলাকাটিকে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত করেন। ১৫৭৬ খৃ. সম্রাট আকবর (দ্র.)-এর বাহিনী স্থায়ীভাবে ইহাকে মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মুগল ফৌজদারের অধীনে বিক্রমাদিত্য এখানকার জমিদার হন। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণে সুন্দরবনের দুর্গমতায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আধুনিক বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জুড়িয়া স্বাধীন যশোহর রাজ্য গঠন করেন, বাংলার বিখ্যাত বারো ভুঁঞার অন্যতম। ১৬০৯ খৃ. ইসলাম খান-এর বাহিনীর নিকট প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হইয়া ঢাকাতে নীত হন এবং আত্মহত্যা করেন। মুগল শাসনাধীনে কালীগঞ্জেরই নিকটবর্তী এলাকাতে ফৌজদারগণের শাসনকেন্দ্র ছিল, ধ্বংসাবশেষ এখনও রহিয়াছে। মুরশিদ কুলী খান-এর আমলে মুহাম্মদপুরের জমিদার সীতারাম রায় মুগল শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সমগ্র বৃহত্তর যশোহর জিলাই সীতারাম রায়ের স্বল্পকালীন রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৭১২ খৃ. মুগল বাহিনীর নিকটে সীতারাম রায় পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বাংলাতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে অতঃপর এই অঞ্চলটিতে শুরু হয় নীল কুঠিয়ালগণের নিপীড়ন অত্যাচার। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মানের নীল হইত বলিয়া অত্যাচার এই অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। কালীগঞ্জ উপজিলা এলাকাতে এখন পর্যন্ত কয়েটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। সমগ্র খৃ. ১৯শ শতক ব্যাপিয়াই বস্তুতপক্ষে কম আর বেশী নীলকর সাহেবগণের এবং তাহাদের দালালগণের জুলুম চলিতেছিল। একই সময়ে এখানে আরেক ধর্মীয় জুলুম শরু হয়। খৃষ্টান পাদ্রিগণ শাসক শক্তির ছত্রছায়ায় এই অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানগণকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। সেই অবস্থায় আবির্ভূত হন বিখ্যাত মুসলিম সংগঠক ও সংস্কারক মুন্সী মেহেরুল্লাহ (দ্র.)। তাঁহার বিরাট সাংগঠনিক শক্তির কাছে খৃষ্টান পাদ্রিগণের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ-এর জন্মস্থান ও কর্মকেন্দ্রের পূর্ব নাম ছিল চূড়ামনকাঠি। বর্তমানে নাম হইয়াছে মেহেরুল্লাহ নগর। উহা কালীগঞ্জ উপজিলা সীমান্তের সামান্য দক্ষিণে যশোর শহরের ৬ মা. পশ্চিমে অবস্থিত।

এই উপজিলা এলাকার অধীনে দুইটি বিখ্যাত গ্রাম হইতেছে রোকনপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর এবং বড় বাজার ইউনিয়নের অন্তর্গত মিঠা পুকুরিয়া। উভয় স্থানেই স্কুল, ডাকঘর, রেল স্টেশন, ডাকবাংলা ইত্যাদি রহিয়াছে (দ্র. যশোর, ঝিনাইদহ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Population Census of Pakistan, 1961, District Census Report; Jessore, pts. i-v, Min. of Home & Kashmir Affairs, Govt. of Pakistan, Karachi; (২) Population Census of Bangladesh, 1974. District Census Report, Jessore, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, 1979; (৩) Bangladesh Population Census, 1981, All Thanas of Jessore District, Complementary, Nov. 1985, Min. of Planning, Dhaka 1985, etc. etc.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ১০২।

হুমায়ুন খান

কালীগঞ্জ (کلیگنج = کلیغنج) ঃ সাতক্ষীরা জিলার (সাবেক খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার) পশ্চিম সীমান্তবর্তী উপজিলা, পূর্বে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খৃ. দেশভাগের সময়ে ইহাকে এবং সাতক্ষীরা জিলার অধিকাংশ এলাকাকে বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের) সঙ্গে দেওয়া হয়। আয়তন ১২৭.৭ বর্গ মাইল (৩৩০.৭ বর্গ কি. মি.)। তন্মধ্যে ৯.৮ বর্গ কিলোমিটার নদী ও জলাভূমি আর ২২.২ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল। জনসংখ্যা (১৯৮১ খৃ.) ২,০২,৩১৬। নদী সমেত প্রতি বর্গ মাইলে ১,৫৮৫ জন লোক বাস করে (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬১২ জন)। তন্মধ্যে মুসলিম ৭৫.৩%, হিন্দু ২৪%, বৌদ্ধ ১২ জন, খৃষ্টান ০.১% এবং অন্যান্য ৫৬ জন। শিক্ষিতের হার ২২.৫%।

উত্তরে দেবহাটা উপজিলা, পূর্বে আশাশুনি উপজিলা, দক্ষিণে শ্যামনগর ও সুন্দরবন, পশ্চিমে বিখ্যাত রায়মঙ্গল নদী বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রচনা করিয়াছে। পরপারে ২৪ পরগণা, উপজিলার পূর্ব সীমান্ত দিয়া আড়পাঙাশিয়া নদীর একটি শাখা প্রবাহিত। ১২টি ইউনিয়ন ও ২৪৭টি গ্রাম (২২৬টি মৌজা) লইয়া এই উপজিলা গঠিত। সমগ্র এলাকাটি সমতল, গঙ্গা বা পদ্মা নদীর শাখা নদীসমূহের বাহিত পলি ও বালু দ্বারা গঠিত। স্থানে স্থানে ছোট বড় বদ্বীপ এখনও গড়িয়া উঠিতেছে। জলাভূমি অনেক রহিয়াছে, কোনটি পলি জমিয়া ভরাট হইতেছে। বালুমিশ্রিত মাটিতে চুনাপাথর অনেক। উদ্ভিদ পচিয়া যাইবার কারণে কোথাও মাটি কালো বর্ণের দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে ভারত গঙ্গা নদীর উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাইবার কারণে মাটিতে লোনা ভাবও বেশী হইয়াছে। সেই কারণে ফসল কম হয়। বাধ দিয়া লবণাক্ততা রোধ করা হইতেছে। জনবসতি তুলনামূলকভাবে হালকা। প্রায় অধিকাংশ যমীনই এক ফসলা, ফসলের প্রকারও কম। প্রধান ফসল ধান, আউশ, আমন ও বোরো ধান হয়। আউশ হয় উঁচু যমিনে। তাহা ছাড়া ডাল ও সরিষা হয়। মাটিতে লবণাক্ততা থাকিবার কারণে আবার সুপারী ও নারিকেল প্রচুর জন্মে। আবহাওয়া দক্ষিণের সুন্দরবন দ্বারা প্রভাবিত। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষা থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭.২° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪.৯° সেলসিয়াসে নামে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩৫.৯° সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন হয় ২৪.৯° সেলসিয়াস। হাওয়া সকল সময়েই লোনা, বায়ুতে জলকণা বেশী থাকে। সুন্দরবনের রক্ষাপ্রাচীর থাকা সত্ত্বেও এলাকাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত নহে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে এই অঞ্চল এবং সন্নিহিত অঞ্চলের প্রায় ৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে যথা ঃ ১৬৮৮ (মৃত্যুর সংখ্যা ৬০,০০০), ১৭০৭, ১৭৫৭,

১৮৩২, ১৯০৭, ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৭০ এবং ১৯৮৮ খৃ. সালে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় হয় এবং মানুষ, পশুপাখী ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এখানকার ৭৭% ঘরবাড়ী বাঁশ ও খড়ের তৈরী, সুন্দরবনের বিখ্যাত গোলপাতায় ছাওয়া। মাটির দেওয়ালও কিছু রহিয়াছে। প্রায় ৭০% লোক কৃষিকাজ করে। অনেকে সুন্দরবনে গিয়া বাওয়ালী ও মৌয়ালীর কাজ করে। অর্থাৎ কাঠ কাটে, লাকড়ি কাটে, গোলপাতা কাটে এবং মধু আহরণ করে। তাহাদের মধ্যে পাঁচ-দশজন মানুষখেকো বাঘের মুখে যায়। মাছধরা ও পশুপালন অনেকের পেশা। বাদবাকীরা কুটির শিল্পে ও ব্যবসাতে নিয়োজিত। সাম্প্রতিকালে চিংড়ি মাছের পোনা ধরিয়া লীজ, পুকুরে বিক্রী করা এবং পুকুরে গল্দা ও বাগদা চিংড়ির চাষ করা একটি অতি লাভজনক ব্যবসায় হইয়াছে। উপজিলা এলাকাতে ২৫,৪৬৫টি নলকূপ রহিয়াছে, কিন্তু সেই পানিও কিছুটা লোনা। লোকেরা নলকূপ ছাড়াও পুকুর, নদী ও খালের পানি পান করে। নদীগুলিতে অতি দৃশ্যমানভাবে জোয়ার ভাটা হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার বড় জোয়ারের সময়ে মাছ প্রচুর ধরা পড়ে। নদী ও খালে কুমীর ও হাঙরের উপদ্রব বেশী। স্থলে বন্যপ্রাণীর মধ্যে শিয়াল, বনবিড়াল, গাছবিড়াল, সজারু ও সাপ এবং গুঁইসাপ প্রধান।

শীতকালে বহুদূর হইতে আগত যাযাবর শীতের পাখী দেখা যায়। বিল ও নদীর চরাঞ্চলে নানা জাতীয় স্থানীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। তন্মধ্যে সুন্দরবনের উদ্ভিদও রহিয়াছে। ফলের গাছের মধ্যে কিছু কিছু আম-কাঁঠাল গাছ রহিয়াছে; তবে প্রধান ফল অবশ্যই নারিকেল ও সুপারী। এখানে কুটির শিল্পের কাজ হয়। তন্মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজই প্রধান, সুন্দরবনের গেওয়া ইত্যাদি কাঠ দিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও কুটির শিল্প তৈরী হয়, যেমন হুঁকার নচিয়া, লাঠি, বাঁধানো হরিণের শিঙ ইত্যাদি। স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে রহিয়াছে বাউল গান, জারী গান, কবিগান, ধূয়া, গাযীর গীত ও পুঁথি পাঠ। এইগুলিতে ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাসের নানা ঘটনা ও কিংবদন্তীর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এবং স্থানীয় ইতিহাস ও পরিবেশের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পরিবেশিত হয়। উল্লিখিত সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই কম আর বেশী ইসলামী ভাবধারার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। উপজিলা এলাকাতে ৪১ মাইল (৬৬ কিলো. মি.) পাকা সড়ক এবং ২১৭ কি. মি. কাঁচা সড়ক রহিয়াছে। পাকা সড়কটি দক্ষিণের সুন্দরবনের প্রান্ত হইতে শ্যামনগর হইয়া কালীগঞ্জ উপজিলার মধ্য দিয়া সাতক্ষীরা ও খুলনার সঙ্গে এবং যশোহর ও ঢাকার সঙ্গে যুক্ত। এই পথে বর্তমানে নিয়মিত বাস চলাচল করে। কালীগঞ্জ উপজিলা সদরের সঙ্গে রাজধানী শহর ঢাকা পর্যন্ত প্রাত্যহিক বাস সার্ভিস রহিয়াছে। অভ্যন্তরীণ চলাচল ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম এই অঞ্চলের ছোট বড় অগণিত নৌকা। বর্তমানে যন্ত্রচালিত ট্রলারের ব্যবহার বাড়িয়াছে।

সুন্দরবনের প্রায় সকল সম্পদই এই অঞ্চলের লোকেরা নৌকাযোগে আনয়ন করিয়া থাকে। বনের শ্রমিক শক্তিছাড়াও পরিবহন শ্রমিক অনেকে কালীগঞ্জ এলাকার।

উপজিলা এলাকাতে ১টি কলেজ, ২৭ টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ৮৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২২টি মাদ্রাসা রহিয়াছে। ডাকঘর আছে ২২টি, হিন্দু মন্দির ৫টি, মসজিদের সংখ্যা মোট ১৭২ টি। এখান হইতে অল্প দক্ষিণে শ্যামনগর উপজিলা এলাকাতে ঈশ্বরীপুর গ্রামে রহিয়াছে বিখ্যাত টেঙ্গা মসজিদ (Bangladesh District Gazetteers; Khulna, 1978. p. 386)। খৃ. ১৭শ শতকের শুরুতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসিয়া নিহত ১২ জন মুগল সেনাপতির মাযার রহিয়াছে সেই মসজিদের সামনে (নিম্ন দ্র.)।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ বিখ্যাত এলাহাবাদ লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালেই এই অঞ্চলটি বঙ্গ রাজ্যের অংশ ছিল। খৃ. ৪র্থ শতকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই অঞ্চল জয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হইতে আরও তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়, যথা ঃ গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব তাঁহারা রাজত্ব করেন ৫৭৫ খৃ. পর্যন্ত। ৭ম শতকের শুরুতে এই অঞ্চল মহারাজ শশাঙ্কের অধীনে ছিল। অতঃপর সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খৃ. ৭ম শতকের শেষে বৌদ্ধ খড়ক বংশীয় রাজাগণের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজবংশ, যথা ঃ চন্দ্রবংশ, পালবংশ ও বর্মনবংশ রাজত্ব করেন। খৃ. ১২শ শতকের শেষভাগে ইহা রাজা লক্ষণ সেনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাখ্তিয়ার খিলজী (দ্র.) যখন ১২০১ খৃ. নদীয়া জয় করেন তখন খুব সম্ভবত এই অঞ্চলটি নদীয়ারই অংশ ছিল। তাহার পর হইতে এইখানে একটানা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃ. ১৫ শতকের মাঝামাঝি সময়ে খান জাহান 'আলী (দ্র.) এই অঞ্চল জয় করিয়া ব্যাপকভাবে বনভূমি আবাদ করেন এবং একই সঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর ইলিয়াস শাহী বংশ (দ্র.), হুসায়ন শাহী বংশ (দ্র.), ১৫৩৯ খৃ. শের শাহ (দ্র.), স্বল্প সময়ের জন্য সম্রাট হুমায়ূন (দ্র.), পুনরায় শের শাহ-এর বংশধরগণ, কিছুকালের জন্য লক্ষণাবতীর স্বাধীন গভর্নরগণ, ১৫৬৪ খৃ. আফগান তাজ খান কাররানী, অতঃপর সুলায়মান কাররানী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী দাউদ খান কাররানী স্বাধীনভাবে এই অঞ্চল শাসন করেন। ১৫৭৬ খৃ. সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে বাংলা জয় করেন এবং পরবর্তী ১৫০ বৎসর পর্যন্ত এখানে মুগল শাসন স্থায়ী হয়। খৃ. ১৬শ শতকের শেষ দিকে বাংলার বিখ্যাত বারো ভুঁঞার অন্যতম মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার গঠিত যশোহর রাজ্যের রাজধানী ছিল কালিগঞ্জের অল্প দক্ষিণে বর্তমান শ্যামনগর উপজিলার অধীন সুন্দরবনের প্রান্তে। ১৬০৩ খৃ. আকবরের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ প্রতাপকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু প্রতাপ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষাণা করেন। অবশেষে ১৬০৯ খৃ. সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার সুবাদার নাওয়াব ইসলাম খান-এর বাহিনীর নিকটে প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হইয়া ঢাকাতে নীত হন এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সেখানে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রতাপের রাজধানী সংলগ্ন ঈশ্বরীপুরের কালী মন্দিরের নিকটে সেই সময়েই মুগলগণ বিখ্যাত টেঙ্গা মসজিদটি নির্মাণ করেন। অতঃপর ১৮শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এখানে মুগল শাসন কায়েম থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পরে মীর জা'ফর (দ্র.) বস্তুত সমগ্র ২৪ পরগণা জিলার প্রকৃত শাসনভার ইংরাজদিগকে প্রদান করেন। ১৭৬৫ খৃ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর দুর্বল মুগল সম্রাট ২য় শাহ 'আলাম-এর নিকট হইতে সমগ্র বাংলারই দীওয়ানী বা রাজত্ব প্রশাসনের সম্পদ লাভ করিয়া শাসন ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। ইংরাজগণ ১৭৮১ খৃ. হইতে বস্তুত প্রত্যক্ষভাবেই বাংলা শাসন করিতে থাকে। এই সময়ে ইংরাজগণের জুলুম এবং তাহাদের প্রশ্রয়াধীনে নূতন হিন্দু জমিদারগণ কর্তৃক প্রজাগণের উপরে বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষ সমেত নানা প্রকার অত্যাচার চলিতে থাকে। তখন এই অঞ্চল হইতে প্রথম জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলিয়া জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ান

তীতুমীর (দ্র)। ইংরাজগণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ভারতবর্ষের সেই প্রথম স্বাধীনতার উত্থানকে দমন করে। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম সমগ্র উপমহাদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

আধুনিক কালীগঞ্জ উপজিলা সদর ইছামতী নামক ছোট কিন্তু বেগবতী নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। গোলপাতায় ছাওয়া অগণিত ঘর দেখিতে সুন্দর। ইহা একটি বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র। ধান-চাউল, মাছ, ফলমূল এবং সুন্দরবনের কাঠ প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। এখানে একটি কলেজ, হাইস্কুল, মাদ্রাসা, উপজিলা অফিসসমূহ, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন অফিস, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস, থানা, ডাকবাংলা ইত্যাদি রহিয়াছে। এখান হইতে ঢাকা, যশোহর, খুলনা ও সাতক্ষীরার সঙ্গে নিয়মিত বাস চলাচল করে। উপজিলা এলাকার দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। ফতেহপুর মৌতলা, নালতা, কাশীশ্বরপুর ও বাজারগ্রাম রহীমপুর উন্নত গ্রাম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Population Census of Pakistan 1961 ; District Census Report, Khulna, pts, i-v, Min of Home & Kashmir Affairs, Govt. of Pakistan. Karachi ; (২) Pop. Census of Bangladesh 1974 : District Census Report, Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, Min of Planning, Dacca 1979; (৩) Bangladesh Population Census 1981, District Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka 1984 etc ; (৪) Bangladesh District Gazetteers, Khulna, ঢাকা ১৯৭৮ খৃ., স্থা.।

হুমায়ুন খান

কালীগঞ্জ (كليگنج / كليغنج) ঃ নবগঠিত লালমনিরহাট জিলার (সাবেক রংপুর জিলার সদর মহকুমার) একটি উপজিলা। বিভিন্ন সময়ে পুনর্গঠনের কারণে ইহার এলাকার হেরফের হইয়াছে। বর্তমান আয়তন ৯০.৭ বর্গমাইল (২৩৪.৯ বর্গ কিলোমিটার.); তন্মধ্যে ৯.৬ বর্গ কিলো মি. নদী অংশ ; ১৫টি ইউনিয়ন এবং ১২২টি গ্রাম লইয়া গঠিত। উপজিলার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়া তিস্তা নদী প্রবাহিত। জনসংখ্যা (১৯৮১ খৃ. গণনা) ১,৫৭,০৬৭, প্রতি বর্গমাইল ১,৭৩২ জন (প্রতি বর্গকিলো মি. ৬৬৯ জন) লোক বাস করে। শিক্ষিতের হার ১৮.২%। উল্লিখিত জনসংখ্যার মধ্যে ১,১৮,৯৫৭ জন মুসলমান, ৩৬,৭৬১ জন হিন্দু, ২১ জন বৌদ্ধ ও ৯২ জন খৃষ্টান। তাহা ছাড়া অন্যান্য উপজাতীয় অধিবাসী ১৩৫ জন। আধুনিক কালে প্রথম এই থানাটি সৃষ্টি করা হয়। ১৯১৩ খৃ. এবং কাকিনার জমিদার কালীমোহন রায়ের নামে ইহার নামকরণ করা হয়। বর্তমান উপজিলা এলাকার অবস্থান ২৫°৫৪ ও ২৬°০৪ উত্তর দ্রাঘিমাংশের এবং ৮৯°০৭ ও ৮৯°২২ পূর্ব অক্ষাংশে। উত্তরে হাতীবান্ধা উপজিলা, পূর্বে অদিতমারী উপজিলা, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ ও গঙ্গাছড়া উপজিলা এবং পশ্চিমে হাতীবান্ধা ও জলঢাকা উপজিলা। সীমান্তে সামান্য উত্তর ও পূর্বেই কোচবিহার। উপজিলার পশ্চিমাঞ্চলের মাটি তিস্তাবাহিত নূতন ধূসর বর্ণের বালুময় পলি দ্বারা গঠিত। অন্যান্য অংশ তিস্তার পুরাতন স্রোতসমূহের বন্যাবিধৌত। সেখানে মাটি বাদামী বর্ণের জমাট বালুমিশ্রিত পলি দ্বারা গঠিত; তিস্তার সেই সকল পুরাতন স্রোতকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় মরা তিস্তা, বুড়ী তিস্তা বা ছোট তিস্তা। বর্তমান চল তিস্তা অত্যন্ত খরস্রোতা। উপজিলার স্থানে স্থানে বিল ও জলা অঞ্চল রহিয়াছে। পূর্বে শুধু তিস্তা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই প্রধান ফসল ধান উৎপাদিত হইত; অন্যান্য এলাকা বর্ষার পরে শুষ্ক পড়িয়া থাকিত। বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়িত করিবার পরে ৪নং খালকে এই উপজিলা এলাকা দিয়া প্রবাহিত করা হইয়াছে। ফলে বর্তমানে বিস্তীর্ণ এলাকাতে পানিসেচ দিয়া চাষাবাদ করা সম্ভব হইয়াছে। সামগ্রিক আবহাওয়া হিমালয় পর্বতের অবস্থান দ্বারা এবং মৌসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়। বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পও প্রচুর থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮৬´´ হইতে ৯২´´, মৃদুমন্দ জলবায়ু, গ্রীষ্মে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৯২°৪, ফা. হইতে সর্বনিম্ন ৭০°৮, ফা. পর্যন্ত হয়। শীতকালে ৮০° ফা. হইতে ৫২.৯০° ফা. পর্যন্ত নামে। কোনও কোনও সময়ে প্রচণ্ড শীত পড়ে এবং শীতের প্রকোপেও মানুষ মারা যায়।

একটানা সমভূমি অঞ্চল, কোনও বড় বন নাই। বিচ্ছিন্নভাবে বন জঙ্গল রহিয়াছে। উদ্ভিদের মধ্যে বাবুল (Acacea Arabica, বালুপ্রধান অঞ্চলেই বেশী হয়), জারুল, আম, কাঁঠাল, সুপারী, খেজুর ও বাঁশ প্রধান (বাঁশ তিন প্রকারের হয়, বড়, তল্লা ও বেরু)। স্থানে স্থানে উলু ঘাস জন্মায়, সেগুলি দিয়া ঘর ছাওয়া হয়। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগেও এই অঞ্চলে বন্য হাতী ও বাঘ ছিল। বর্তমানে দেখা যায় না। চিতাবাঘ, শিয়াল, বনবিড়াল ও খরগোশ দেখা যায়। অজগর গোক্ষুর ও কেউটা সাপ রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থানীয় পাখী ছাড়া নদীর চরে ও খালে-বিলে শীতকালে হিমালয় অঞ্চল এবং উত্তরের সাইবেরিয়া হইতে যথেষ্ট শীতের পাখী আসে। মাছের উৎস তিস্তা নদী, মজা নদীস্রোত এবং খাল-বিল ও পুকুর। প্রধান ফসল ধান, পাট ও সরিষা। তাহা ছাড়া উঁচু ভূমিতে ইক্ষু, গোলআলু ও তামাক জন্মে। ধান প্রধানত হয় তিস্তা দক্ষিণাঞ্চলে ও বাঁধ হইতে সেচ দেওয়া এলাকাতে।

কালীগঞ্জ উপজিলা এলাকার মধ্যে ১০ কিলো মি. পাকা সড়ক, ১,০৫৪ কিলো মি. কাঁচা সড়ক এবং ৩৯ কিলো মি. মিটার/গজ রেলপথ রহিয়াছে। নদীপথে নৌকা চলাচল করে। কাঁচা-পাকা পথে কিছু কিছু বাস এবং রিক্সা চলাচল করিলেও জনসাধারণের পারিবারিক ও ব্যবসায়িক চলাচলের প্রধান মাধ্যমে হইতেছে গরুর গাড়ী। বাবুল কাঠ দিয়া গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী হয়। ছৈওয়ালা গাড়ীতে করিয়াই লোকেরা সপরিবারে কাছে বা দূরের পথে চলাচল করে, বিশেষ করিয়া শুকনা মওসুমেই গরুর গাড়ীর চল বেশী থাকে। একদিকে ভাটি নদীপথের স্রোতের টানে মাঝিদের পরিশ্রমের সাশ্রয় এবং অপরদিকে বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়া যথেষ্ট অবসরসহ গরুর ও মহিষের গাড়ীর মন্থর গতি হইতেই এই অঞ্চলের বিখ্যাত ভাটিয়ালী এবং ভাওয়াইয়া গানের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। মিটার-গজ রেল লাইন দ্বারা এই উপজিলা লালমনিরহাট ও রংপুরের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-কাকিনা-বুড়িমারী শাখার তিনটি ষ্টেশন এই উপজিলা এলাকাতে অবস্থিত। তন্মধ্যে কাকিনা বড় ষ্টেশন। লালমনিরহাট হইতে একটি শাখা বিভাগপূর্ব যুগে আসামের ধুবড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপজিলা এলাকাতে ১১টি ডাকঘর এবং ১টি টেলিগ্রাফ অফিস রহিয়াছে। শিক্ষার দিক হইতে অঞ্চলটি যথেষ্ট অগ্রসর নহে। সমগ্র উপজিলাতে ১টি কলেজ, ১৫টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল,

৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাত্র ১টি মাদ্রাসা রহিয়াছে। মসজিদ আছে ২৬০টি, মন্দির ৯০টি এবং গির্জা ২টি। হাসপাতাল ১টি ও ডাক্তারখানা ৩টি। উপজিলাসমেত ৫টি গ্রাম ১৯৮১ খৃ. পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত হইয়াছে। বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে।

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ঘরবাড়ী বাঁশ বা কাদার দেওয়াল দিয়া উহার উপরে কাদা লেপিয়া তৈরী, উপরে শন বা উলু ঘাসের ছাওয়া। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ভিটি পাকা ঢেউটিনের ঘরে থাকেন। পাকা বাড়ীর সংখ্যা খুবই কম। সমগ্র বৃহত্তর রংপুর জিলারই অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু কিছু রহিয়াছেন বহিরাগত আফগান ও মুগল। বাদকারীরা মিশ্র, স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত, কোচ উপজাতীয়দের মিশ্রণও ঘটিয়াছে। রাজবংশী বা পালিয়াগণ সকলেই কোচ জাতির— ইহারা দ্রাবিড়। এই উত্তরাঞ্চলের অধিবাসিগণের ভাষার বিশেষ টান সুবিদিত। ভাষাতে অহমিয়া ও কোচবিহারী ভাষায় মিশ্রণ রহিয়াছে। সামগ্রিকভাবে সকল মানুষই সহজ, সরল শান্ত ও সামান্যে পরিতৃপ্ত ধরনের। চতুর প্রকৃতির লোকেরা এবং যথেষ্ট ভূমির মালিকগণ খুব সহজেই তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারে। ইহারা দরিদ্র হইলেও অতিথিবৎসল। অধিবাসিগণের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। ভূমিহীনরা অন্যের যমীন চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। কিছু কিছু লোক কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তাহারা প্রধানত বাঁশ ও বেতের কাজ করে। বাদবাকীরা ব্যবসায় ও চাকুরী করেন। গরু-মহিষ চরান এবং গরুর গাড়ী চালানো গ্রাম অঞ্চলের অতি সুপরিচিত দৃশ্য।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ বর্তমান বৃহত্তর রংপুর জিলার উত্তরপূর্বাংশে আগে উত্তর রংপুর নামে পরিচিত একটি জিলা ছিল। বিগত শতাব্দীতে ইংরাজগণ সেই অংশের সঙ্গে আরও কিছু অংশ যোগ করিয়া গোয়ালপাড়া নামে নূতন একটি জিলার সৃষ্টি করে এবং উহাকে আসামের ধুবড়ী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয়। সেই উভয় রংপুর, আসাম, মনিপুর, জৈন্তিয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও সিলেটের অংশ ব্যাপিয়া খৃ. ১২শ শতকে ছিল শক্তিশালী কামরূপ রাজ্য। বাখতিয়ার খিলজী (দ্র.) ১২০১ খৃ. উত্তর পশ্চিম বঙ্গ জয় করিবার পরে (১২০৩ সালে?) এই কামরূপ রাজ্যে অভিযান করেন। প্রধানত দুর্গমতার কারণে বিখ্যাত সেনাপতির জীবনের শেষ সেই অভিযান মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয় এবং তিনি মাত্র স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া দেবকোটে (পশ্চিম-দিনাজপুর) ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। তাঁহার পরে আফগান সেনাপতিগণ আরও কয়েকবারই কামরূপ জয় করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। অবশেষে সম্রাট রুকনু'দ-দীন বারবক শাহ-এর আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খৃ.) সেনাপতি শাহ ইসমা'ঈল গাযী কামরূপ-রাজ কামেশ্বরকে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করান। পরে সেখানকার কোচ উপজাতীগণের মধ্য হইতে জনৈক বিশু শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং আফগান হুসায়ন শাহকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া কোচ রাজ্য গঠন করেন। বিশুর পুত্র নর নারায়ণ "গৌড়ের পাশা"-র নিকটে পরাজিত হন এবং মুগল সম্রাটকে কর দিতে স্বীকৃত হন। নর নারায়ণ ১৫৮৪ খৃ. মারা যান। ১৬৮৭ খৃ. সম্রাট আওরাঙ্গযীব-এর আমলে ঘোড়াঘাট হইতে মুগল বাহিনী গিয়া কোচ আক্রমণ করে এবং কোচ রাজ্যের মোট ৬টি চাকলার মধ্যে তিনটি দখল করিয়া নেয়। রাজা রূপ নারায়ণ-এর চাচাতো ভাই শান্ত নারায়ণ বাকী তিনটি চাকলারও নামেমাত্র অধিকার রক্ষা করিয়া সন্ধি করেন। অধিকৃত ৩টি চাকলার খাজনা পূর্বে যাঁহারা আদায় করিতেন মুগলগণ সেই হিন্দু পরিবারটিকেই খাজনা আদায়ের দায়িত্বে রাখেন। তাঁহারাই হইলেই এই কালীগঞ্জ উপজিলার বিখ্যাত কাকিনার রায় চৌধুরী রাজবংশ (নিম্নে দ্র.)

১৭৬৫ খৃ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার রাজস্ব প্রশাসনের সনদ লাভ করে। ১৭৭০ খৃ. সমগ্র বাংলাতে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ (বাংলা ১১৭৬ সালে হইয়াছিল বলিয়া উহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত) দেখা দিলে উহার পরে পরে বিখ্যাত ফাকীর মাজনু শাহ (দ্র.)-এর নেতৃত্বে এবং ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর সহযোগিতায় প্রধানত ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর জিলাতে ফাকীর ও সান্ন্যাসী বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই কালীগঞ্জ এলাকাও তাঁহাদের সংগঠনের ক্ষেত্র ছিল। ইংরাজগণ বহু ক্ষয়ক্ষতি দিয়া অবশেষে সেই স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহ দমন করে।

মুসলিম শাসনের পরে ইংরাজ আমলে কাকিনার রায় চৌধুরীগণ জমিদারী রক্ষা করিতে সক্ষম হন। এই বংশের মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করেন। কালীগঞ্জ উপজিলা সদরের নিকটবর্তী কাকিনার রাজবাড়ীটি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নির্মিত অতি সুন্দর প্রাসাদ। এখানকার রাজপরিবার দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের একটি মূল্যবান লাইব্রেরী ছিল। উহার অধিকাংশ সংগ্রহ বর্তমানে রংপুর কারমাইকেল কলেজে রক্ষিত আছে। তাঁহারা একটি স্কুল এবং ডাক্তারখানাও চালাইতেন। সেখানে বড় রেল স্টেশন, ডাকঘর ও ডাক বাংলা রহিয়াছে। এই কাকিনাতেই জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম লেখক শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬ খৃ.) ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শবান প্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। মুসলিম ইতিহাস, উপাখ্যান ও জীবনী বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবাসীর উপকার করিয়া গিয়াছেন। কাকিনা হইতে তিনি সাময়িক পত্রও সম্পাদনা করিতেন।

আধুনিক কালীগঞ্জ উপজিলা সদর বস্তুত দুইটি গ্রাম সমবায়ে, গঠিত—কাশীরাম ও তুষভাণ্ডার। উপজিলা সদর কাশীরাম গ্রামে, আর রেল স্টেশন তুষভাণ্ডার গ্রামে। এখানে কলেজ, হাইস্কুল, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, উপজিলা অফিসসমূহ ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস, তাহসীল অফিস, সাব-রেজিস্ট্রারী অফিস, থানা, থানা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাকবাংলো ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। রেল ও সড়কপথে লালমনিরহাটের সঙ্গে এবং সেখান হইতে রংপুর ও অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ., নিবন্ধ কাকিনা ও কালীগঞ্জ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (২) ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৭৬ কৃ., নিবন্ধ শেখ ফজলুল করীম; (৩) Bangladesh District Gazetteers, Rangpur, Establishment Division Cabinet Secretariate, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka 1977; (৪) Population Census of Pakistan : 1961, District Census Report, Rangpur, Min of Home Kashmir Affairs, Govt of Pakistan Karachi; (৫) Bangladesh Population Census Report, 1974, National Volume, Bangladesh Bureau of Statistics, Min.

of Planning Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka 1977; (৬) Bangladesh Population Census 1981, All Thanas of Rangpur District, pt. ii, Bangladesh Bureau of Statistics, Min. of Plannig. Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, ১৯৮৬।

হুমায়ূন খান

কালিফ (كالف) : কায়লিফ বলিয়াও পরিচিত তিরমিয-এর পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আমু-দরিয়ার তীরে (আল মাস্‘ঊদী, ৮খ, ৬৪; শেষোক্তটিকে "কালিফ নদী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন) অবস্থিত একটি শহর। শহরটির প্রধান অংশ রিবাত যি'ল-কারনায়ন দুর্গটিসহ নদীটির দক্ষিণে অবস্থিত; নিকটে একটি প্রাসাদ রহিয়াছে। উত্তর তীরের বহির্দেশে দাঁড়াইয়া আছে রিবাত যি'ল-কিফল দুর্গ (দ্র. যু'ল-কিফল)। ১২২০ খৃ. খাওয়ারিযম শাহ ২য় মুহাম্মাদ মঙ্গোলদিগকে আমু দরিয়া অতিক্রম করিতে বাধা দেওয়ার জন্য শহরটিতে সসৈন্যে প্রবেশ করেন। মুস্তাওফীর (নুযহাতু'ল-কুলূব, পৃ. ১৫৬; অনু. পৃ. ১৫৩) মতানুসারে কালিফ ৮ম/১৪শ শতকে ইহার ফলের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং সোগ্দ-এর নাখশাব (নাসাফ) (দ্র.) হইতে বালখ পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তায় বাণিজ্য ঘাঁটি হিসাবে গুরুত্ব বহন করিত। শহরটি এখনও বিদ্যমান (রুশ কেলিফ); কিন্তু এখন ইহা নদীটিকে কেবল উত্তর তীরে অবস্থিত। আমু দরিয়ার খাদটি এখনও আফগানিস্তানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুকাদ্দাসী, ২৯১, ৩৪৩; (২) য়াকূত, সম্পা. Wustenfeld, ৪খ, ২২৯=বৈরূত সং, ৪খ, ৪৩২=Barbier de Meynard, Dict., 474; (৩) Le Strange, Eastern Caliphate, 442; (৪) Barthold, Turk. নির্ঘণ্ট; (৫) Enciklopediceskoj Slovar Brockhaus-Efron, xxviii (১৮৯৫), 902।

B. Spuler (ই. I.²)/পারসা বেগম

কালিমা (كلمة) : (আ) উচ্চারিত শব্দ, উক্তি, আলোচনা ও 'কবিতা' হিসাবেও অর্থ করা যাইতে পারে। ফালাসিফা (দার্শনিকগণ) তাঁহাদের আলোচনা, ব্যাকরণ ও যুক্তি-বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নাজাত (কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, ২য় খণ্ড)-এর ভূমিকায় ইব্ন সীনা কালিমার সংজ্ঞা বলিয়াছেন "একটি মাত্র শব্দ (লাফ্জ), যাহা কোনও ধারণা ও সীমা ব্যক্ত করে এবং এই ধারণা যে কোনও অনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আরোপিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যেমন আমরা বলিয়া থাকি, সে হাঁটিয়াছিল।" তু. মানতিকু'ল-মাশরিকিয়্যীন, কায়রো ১৩২৮/১৯১০, ৫৭-৮ ও ৬৬; যেখানে কালিমাকে ব্যাকরণবিদদের 'ফি'ল' (فعل) সমার্থক শব্দ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইশারাত (সম্পা. Forget, লাইডেন ১৮৯২ খৃ., ২খ) অনুসারে যুক্তিবিদ্যা বিশেষজ্ঞগণ কালিমাকে যে কোনও বর্ণনামূলক শব্দ, বিশেষ্য অথবা ক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও অনির্দিষ্ট সত্তাকে নির্দেশ করে (তু. A. M. Goichon, Lexique de lal angue philosophique d'Ibn Sina, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ. এবং ইশারাতের ফরাসী তরজমা, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., ৮৪, n. 1.)।

কালিমা শব্দটি এবং ইহার বহুবচন কালিমাতে প্রায়ই কুরআনে উদ্ধৃত হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহা "উচ্চারিত শব্দ" ভাব (কুরআন, ১৪ : ২৪; ৪৮ : ২৬) অথবা মন্দ (৯ : ৭৪, ১৪ : ২৬, ১৮ : ৫, ২৩ : ১০০) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তথাপি ইহা ঘন ঘন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট বাণীকেই বুঝায়।

কুরআনের ১০ : ৬৪ আয়াতে আছে : "আল্লাহ্র বাণী (كلمات) পরিবর্তিত হইবার নহে।" ফলত কালিমা অর্থ আম্র, সিদ্ধান্ত, আদেশ অথবা প্রকৃতপক্ষে রায় শব্দের অর্থের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। R. Blachere অহরহ কালিমা শব্দের ফরাসী তরজমা করিয়াছেন "ārret" (রায়)। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ রহিয়াছে (উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের ৬ : ১১৫, ৭ : ১৩৭, ১০ : ৩৩, ৯৬, ১১ : ১১৯ প্রভৃতি ; বহুবচনে ৬ : ৩৪, ১১৫, ১৮ : ১০৯, ৩১ : ২৭ প্রভৃতি)। কুরআনের ৪৩ : ২৮ আয়াতে ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : "এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য, যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে (আল্লাহ্র প্রদর্শিত সৎপথে)" [এখানে কালিমাতান বাকিয়াতান (كلمة باقية) অর্থ স্থায়ী বাণী]। ভাষ্যকারগণ (দ্র. আল-বায়দাবী, সম্পা. Fleischer, ২খ, ২৩৭, ২৫) সাধারণভাবে জোর দিয়াছেন যে, এখানে আল্লাহ্র একত্বের প্রসঙ্গ বুঝানো হইয়াছে যাহা "প্রথম শাহাদাতে"র সমপর্যায়ভুক্ত, যেমন ৪৩ : ২৬-৭ আয়াতে বলা হইয়াছে। কুরআনের ৩ : ৩৯ ও ৪৫ আয়াতে, যেখানে ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহ্র তরফ হইতে নাযিলকৃত 'বাণী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, উহা সর্বাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারগণ "কালিমাতুল্লাহ্"-কে [যিনি হইতেছেন ঈশা (আ)] সৃষ্টিমূলক ওয়াহ্য়ি 'কুন' (হইও ; তু. ৩ : ৪৭)-এর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে ঈশা (আ)-র সৃষ্টিকরণের সহিত আদম (আ)-এর সৃষ্টিকরণকে সম্পর্কিত করিয়াছেন : হ্যাঁ, আদাম-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যেমন করিয়াছেন, 'ঈসা-র ক্ষেত্রে ও আল্লাহ্ তা'আলা তেমনি করিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর বলিয়াছেন 'কুন' (হও!) এবং সে [আদম] হইয়া গেল (কুরআন, ৩ : ৫৯)।

কালিমা বস্তুত শব্দের (দ্র. কালাম) গুণ নহে, বরং ইহার প্রকাশ, যাহার মাধ্যমে ঐশী সিদ্ধান্তসমূহ প্রেরিত ও ব্যক্ত হয়। কুরআনের ভাষ্যসমূহে এই ব্যাপারে ঈসা (আ) সম্পর্কিত আয়াতসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা রহিয়াছে এবং আকীদা (আকা'ইদ) সংক্রান্ত আলোচনায়ও এই প্রসঙ্গ আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, La Profession de foi d' Ibn Batta, সম্পাদনা ও ফরাসী তরজমা H. Laoust, দামিশ্ক ১৯৫৮ খৃ./১০৭-৮-এর কথা।

'ইলমু'ল-কালামে কালিমাতুল্লাহ্ সম্পর্কিত সমস্যাকে কালামুল্লাহ্র গুণ সম্পর্কিত সমস্যার সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে : মু'তাযিলা মত অনুসারে ইহা সৃষ্ট। পরবর্তী মতবাদসমূহ অনুসারে ইহা অনাদি। আশ'আরী পণ্ডিতগণ কর্তৃক মু'তাযিলী মতবাদের দীর্ঘ যৌক্তিক খণ্ডনের পরিপ্রেক্ষিতে কালিমা ও কালামের অর্থ আবার তালগোল পাকাইয়া যায়। এইভাবে আল-বাকিল্লানীর তাম্হীদ (সম্পা. Mc Carthy, দামিশ্ক-বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.) ২৫৩ গ্রন্থে খৃষ্টান ও মু'তাযিলীগণকে "আল্লাহ্র বাণী সৃষ্ট" (কালিমাতুল্লাহ্ মাখ্লূকা) এই ধারণা পোষণকারী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আল-জুওয়ায়নীও খৃষ্টানদের সম্পর্কে একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন

(ইরশাদ, সম্পা. Luciani, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., ৭৫/১২৩)। কালামুল্লাহ্‌র মতবাদ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐশী বাণীর সংখ্যা অগণিত। সকল সম্ভাব্য অস্তিত্ব (আল-মুমকিনাত) কালিমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ পুনরাবৃত্ত আদেশ (কুন, 'হও')-সমূহ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সত্যের (আল-হাক্ক) প্রকাশ হইতেছে সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহের পরিচয় অথবা সম্ভাব্য অস্তিত্ব সমূহই, নাফ্স আ'য়ান আল-মুমকিনাত (দ্র. Dict. of Technical ১২৭১ প. এবং আল-জুরজানী, তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৪৫ খৃ., ১৯৪-৫)।

শী'আ ঃ ও সূফী শব্দ ভাণ্ডারসমূহে (অন্ততপক্ষে ওয়াহ্‌দাতু'ল-উজূদ সম্পর্কিত সূফী মতবাদের ক্ষেত্রে) কালিমাতে রহস্যবাদের সুর সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি বিবেচ্য ঃ

(ক) ইসমা'ঈলী অভিধান হইতে ঃ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আবূ য়া'কূব আস-সিজিস্তানী তাঁহার কিতাবু'ল-য়ানাবী'-তে বলিয়াছেন, "বোধের দিগন্ত আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর সংলগ্ন (কালিমাতুল্লাহ্) যাহা আদি বুদ্ধির বা জ্ঞানের আওতায় সৃষ্ট সকল অস্তিত্বের পূর্ণতার বাহিরে অবস্থান করিতেছে" (সম্পা. ও ফরাসী অনু. H. Corbin, Trilogie ismaelienne, তেহরান-প্যারিস ১৯৬১ খৃ., ১০ খ., ২৩)। Corbin বলেন (২৯, নং ৪৪ ঐ) "আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে তাঁহার হুকুম হিসাবে গণ্য করিতে হইবে (আমরুল্লাহ্), যাহার ইচ্ছার ফলে আদি বুদ্ধি অস্তিত্বে আসে। আস্-সিজিস্তানীতে আরও বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে (৭০/৯২) যে, "জান্নাত হইতেছে কালিমাতুল্লাহ্ যাহার মাধ্যমে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) জান্নাতের বস্তুসমূহ প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্বশেষে পুস্তকটির শেষপূর্ব অধ্যায়টিতে আদি কারণের বাণীর (কালিমা) অর্থ (মা-'না') সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে (৯০-৪/১১৮-২১)। সেখানে 'কালিমাকে বর্ণ-বর্ণ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে (ك-ل-م-ة); ইহা ইসমা'ঈলী ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে উল্লেখপূর্বক জা'ফার (দ্র.)-এর নীতি অনুসারে করা হইয়াছে। আদি-বুদ্ধিকে যে পর্যন্ত কালামুল্লাহ্‌র সহিত একীভূত করা হইয়াছে (৯১/১১৯), সে স্তর পর্যন্ত কালিমাতুল্লাহ্ "প্রথম বোধ বা একত্বে"র সমার্থক (৯০/১১৮)।

(খ) ইমামী অভিধান হইতে ঃ মোল্লা সাদ্‌রা শীরাযী (১০ম/১৬শ-১১শ/১৭শ শতকে) তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-মাশা'ইর গ্রন্থে আল্লাহ্‌র বাণী ও কুরআনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। তিনি কালামুল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আলোচনায় তিনি বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন যে, বাণীর (কালাম) বৈশিষ্ট্য হইতেছে "পূর্ণ বাণী"র জন্ম দেওয়া (কালিমাতু'ত্-তাম্মাত)। ইহার প্রধান নির্দশন বিবি মারয়াম ('আ)-এর গর্ভে হযরত 'ঈসা ('আ)-র জন্ম (পূ. গ্র., ৫৭/১৯৩)।

(গ) একটি সূফী অভিধান হইতে ঃ কালিমাতুল্লাহ্‌র প্রধান ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন ইবনু'ল-'আরবী, যিনি ইহাকে তাঁহার ফুসূসু'ল-হিকাম-এর মূল বিষয় (সম্পা. 'আফীফী, কায়রো ১৩৬৫/১৯৪৬) হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক রাসূলের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইবনু'ল-'আরাবীর চিন্তা ভাবনাকে বলা হয় হযরত আদাম ('আ), শীছ (আ), ইবরাহীম ('আ), ইসহাক ('আ) প্রমুখের "বাণীর মত ব্যক্ত ঐশী জ্ঞান।" হযরত 'ঈসা ('আ) সম্পর্কিত অধ্যায়ে তিনি ইহার উপর জোর দিয়াছেন (১খ, ১৩৯); অপর দিকে মূসা ('আ)-র অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহে (১খ, ১৯৭ প.) তিনি কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, সূরা ১০ ঃ ৬৪ ("আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ পরিবর্তিত হইবার নহে") এবং যোগ করেন (২খ, ২১১) "আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ (কালিমাতুল্লাহ্) প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বমান সকল বস্তুর নির্যাস (আ'য়ান); অপরিবর্তনশীলতা গুণের এইগুলি চিরন্তন (কিদাম); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব এবং বর্ধনশীলতার দরুন (অস্তিত্বের মধ্যে) এইগুলি সম্ভাব্য।

কালিমা কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিশীলতার মূল কারণ, তাঁহার অমৃত বচন, "প্রেরণাদায়ক বাণী" (H. Corbin), সকল অস্তিত্বের আদি ও অকৃত্রিম উৎস, যেখান হইতে সব কিছুর সৃষ্টি ও সব কিছুর নির্যাস আগত, এই সম্পর্কে আরও বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মধ্যে রহিয়াছে। উপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের ভাষ্য প্রধান তাফসীরসমূহেরও দ্রষ্টব্য। (১) দা. মা. ই, ১৭ খ, ৩৫৪-৬।

D. B. Macdonald-L. Gardet (E. I.[2])/পারসা বেগম

কালিয়া (كاليا) ঃ নড়াইল জিলার (সাবেক যশোর জিলার নড়াইল মহকুমা) একটি উপজিলা। আয়তন ৩১১ ব. কি. মি. (১২০ ব. মা.) তন্মধ্যে ১১.৩ ব. কি. মি. নদী ও বিল অঞ্চল, ১২টি ইউনিয়ন, ১৮৯ টি গ্রাম (১০২ টি মৌজা) নিয়া গঠিত, (১৯৮১ খৃ.) জনসংখ্যা ১,৯১,৬৬৪ জন, প্রতি বর্গমাইলে ১,৫৯৬ জন (প্রতি ব. কি. মি. ৬১৬ জন) লোক বাস করে। শিক্ষিতের হার ২২.৭%। উপজিলা এলাকা ২২°৫৭ উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৮৯°৩০ ও ৮৯°৪৮ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। ইহা জিলার সর্বদক্ষিণ পূর্ববর্তী উপজিলা, উত্তরে লোহাগড়া ও নড়াইল উপজিলা, পূর্বে মধুমতী নদী, পরপারে গোপালগঞ্জ জিলার কাসিয়ানী ও গোপালগঞ্জ উপজিলা, পশ্চিমে নড়াইল উপজিলা এবং যশোর জিলার অভয় নগর উপজিলা, দক্ষিণে খুলনা জিলার ফুলতলা ও তেরখাদা উপজিলা। সমগ্র উপজিলা অঞ্চলটি এক সময়ে কালীগঙ্গা নদীর প্লাবন-বিধৌত ছিল বলিয়া ১৮৬৬ খৃ. গঠনকালে ইহার নাম হয় কালিয়া। অনেক নদ-নদী ও বিল প্রধান নীচু এলাকা ; পূর্ব সীমান্ত দিয়া গড়াই বা মধুমতী নদী। এই নদী দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নবগঙ্গা নদী উপজিলার উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত, আর পশ্চিম প্রান্ত দিয়া চিত্রা নদী প্রবাহিত। গঙ্গা বা পদ্মা নদীর পলি ও বালু দ্বারা সমগ্র অঞ্চলটি গঠিত। বালুর পরিমাণ অনুযায়ী এখানকার যমিন তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়; যথা ঃ বেশী বালুযুক্ত মাটিকে বলা হয় বালিয়া, বেশী পলি ও কাদা মিশ্রিত মাটিতে বলা হয় মাটিয়াল আর মাটি ও বালু প্রায় সমভাবে থাকিলে বলা হয় দোআঁশ। বিলে কোথাও কোথাও কালো মাটি দেখা যায়। বর্ষায় প্রায় সমগ্র এলাকাই প্লাবিত হইয়া যায়। শীতকালে বহু নীচু জায়গাতে পানি জমিয়া থাকে। সব রকম বিলকেই স্থানীয় লোকেরা বলে বাওড়। এই বিল অঞ্চলই বেশী। মাঝে মাঝে যেখানে উঁচু জায়গা সেখানে মানুষের ঘরবাড়ী। বর্ষাকালে এইরূপ অধিকাংশ গ্রামকে দ্বীপের মত দেখায়। অগভীর বিলগুলিতে ক্রমে পলি জমিয়া ভরাট হইয়া উঠিলে সেগুলিতে ধানের চাষ করা হয়। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা ও লঞ্চ, বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে নৌকাই হয় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান বাহন। মধুমতী ও নবগঙ্গা নদী সারা বৎসর নাব্য থাকে। সেগুলি দিয়া আগে স্টীমার চলিত। বর্তমানে লঞ্চ চলাচল করে। কালিয়া উপজিলা এলাকাতেই অনেকগুলি লঞ্চ-স্টেশন রহিয়াছে, যেমন পেরুলি, পেরুলিস্তান, খড়ারিয়া, যোগানিয়া, রাগুডাঙ্গা ইত্যাদি। উল্লিখিত

গ্রামগুলি উপজিলার প্রসিদ্ধ স্থান ও সেগুলিতে পুলিশ ফাঁড়ি, স্কুল, মাদ্রাসা, ডাকঘর ও ডাক্তারখানা রহিয়াছে। এখানকার আবহাওয়া মোটামুটিভাবে মানশীল। কখনও বেশী গরম পড়ে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ৯৩.৩ ডিগ্রী ফা. হা. আর শীতে সর্বনিম্ন ৫৪.৩ ডিগ্রী ফা. হা.। জলা অঞ্চল এবং দক্ষিণে সুন্দরবন থাকিবার কারণে বায়ুতে আর্দ্রতা বেশী থাকে, সারা বৎসরে গড়ে ৭৮% বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬২.৫৭ ইঞ্চি। স্বাভাবিক বর্ষার বন্যা ছাড়া বড় বন্যা খুব একটা হয় না। অতীতে এখানে বড় বন্যা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৯৮৮ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানত ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) এবং তাহা ছাড়া গঙ্গা বা পদ্মা নদীর প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সমগ্র উপজিলা অঞ্চলই প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে। বর্তমানে সমগ্র উপজিলা এলাকাতে প্রায় ৪০ মাইল (৬৪ কি. মি.) পাকা সড়ক রহিয়াছে। কাঁচা সড়ক রহিয়াছে প্রায় ৩০৬ কি. মি.। সাম্প্রতিক কালে থানা এলাকার কতগুলি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হইয়াছে। অধিবাসিগণ নলকূপ এবং নদী-পুকুর ও বিলের পানি পান করে।

এই এলাকার উদ্ভিদের মধ্যে বাবুল, তেঁতুল, পাকুড় ও কড়ই প্রধান; কিছু কিছু আম, কাঁঠাল, তাল-সুপারী, খেজুর ও নারিকেল গাছ জন্মে। প্রধান ফসল ধান, আঁউশ, আমন ও বোরো তিন জাতের ধানই জন্মে; আমন প্রধান ফসল। বিলগুলিতে বোরো ধান হয়। রাই, সরিষা ও ডাল, বিশেষ করিয়া খেসারী ডাল যথেষ্ট হয়, কিছু কিছু পান, পাট, তামাক এবং ইক্ষু হয়। ফলমূলের মধ্যে কলা, আম, লিচু, পেঁপে, কিছু কিছু তরমুজ, খেজুর ও নারিকেল জন্মে। বন্য প্রাণীর মধ্যে চিতা বাঘ মাঝে মাঝে দেখা যায়। বন্য শুকরও দেখা যায়। শীতকালে নদীর চরে ও বিলগুলিতে হাঁস, স্নাইপ বা কাদাখোঁচা এবং অন্যান্য যাযাবার পাখী অনেক আসে। বিল প্রধান এলাকা বলিয়া কৈ, শিং ও মাগুর মাছ এখানে প্রচুর জন্মে। সেগুলি দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হয়। বিভাগ পূর্বকালে কলিকাতা শহর অনেকাংশে এই অঞ্চলের কৈ মাছের উপরে নির্ভরশীল ছিল। কালিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান (মোট ১,৩৫,১৪৩ জন), অন্যগণ বর্ণহিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু (মোট ৫২,৭৬৬ জন), বর্ণহিন্দুগণের মধ্যে রহিয়াছে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য (মিশ্র ক্ষত্রিয়) ও কায়স্থগণ, বিভাগ পূর্বকালে বর্ণহিন্দুগণ উচ্চশিক্ষিত চাকুরীজীবী ছিলেন। ১৯৪৭ খৃ. পরে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া যান। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে রহিয়াছে প্রধান দুই শ্রেণী, কৈবর্ত ও নমশূদ্র। কৈবর্তগণ প্রধানত মাছ শিকার পেশাতে নিয়োজিত, আর নমশূদ্রগণ কৃষিকাজ করে। উপজিলাতে ৪৮ জন বৌদ্ধ, ৬ জন খৃষ্টান ও ১১ জন উপজাতীয় রহিয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু সকল অধিবাসীরই প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এই অঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে কবিগান, পুঁথিপাঠ, গাযীর গীত, মানিক পীরের গীত ও জারীগান বিখ্যাত। এগুলিতে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিফলন রহিয়াছে। সমগ্র বৃহত্তর যশোহর জিলার মধ্যে বিশেষ করিয়া এই এলাকাতে কিছু কিছু দীর্ঘদেহী মানুষ দেখা যায়।

ইতিহাস ঃ এই অঞ্চলটির ইতিহাস ঘটনাবহুল ও চিত্তাকর্ষক। ইহা সুপ্রাচীন এক দ্বীপ এলাকার অংশ ছিল। হিন্দু যুগে অঞ্চলটির নাম ছিল বাগরি। বৌদ্ধ ও জৈন যুগে ইহা সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃ. ১১শ শতকে ইহা বৌদ্ধ পাল রাজাগণের রাজ্যভুক্ত ছিল; খৃ. ১২শ শতকে হিন্দু সেন রাজাগণ যখন বঙ্গ ও রাঢ়—এই উভয় বাঙলার শাসক হন তখন এই এলাকা তাঁহাদের শাসনাধীনে ছিল। ১২০১ খৃ. ইখতিয়ারু'দ-দীন ইবন বাখতিয়ার খালজী (দ্র.) যখন নদীয়া (মুসলিম ইতিহাসে নওদিয়া নামে উল্লিখিত) অধিকার করেন তখন এই অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে।

কালিয়া সমেত সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হইতেছেন দরবেশ-সেনাপতি খান জাহান 'আলী (দ্র.)। দিল্লীর সম্রাট নাসিরু'দ-দীন মাহমূদ শাহ-এর শাসনামলে (১৪৪২-৫২ খৃ.) এই দরবেশ ও সেনাপতি তাঁহার শাগরিদ ও সেনাবাহিনী নিয়া বস্তুত সমগ্র বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জিলা অঞ্চল জয় করেন এবং এখানে ইসলাম প্রচার করেন। একদিকে তিনি ধর্ম প্রচার করিতেন, অপর দিকে আবার সুন্দরবন অঞ্চল সাফ করিয়া আবাদ ও জনবসতি স্থাপন করিতে থাকেন। 'আইন-ই আকবারী'-তে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, সমগ্র যশোর খুলনা এলাকাকে তিনি দুইটি বড় পরগণাতে বিভক্ত করেন। উত্তরাংশের (কালিয়া সমেত) নাম রাখেন সম্রাটের নামে মাহমূদাবাদ এবং দক্ষিণাংশের নাম রাখেন সম্রাটের খলীফারূপে নিজ নামে খলীফাতাবাদ। উত্তরাংশে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি নিজের দুই বিখ্যাত শাগরিদ গারীব শাহ ও বাহরাম শাহকে রাখিয়া নিজে দক্ষিণে আধুনিক বাগেরহাটে (দ্র.) গিয়া অবস্থান করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন। উল্লিখিত দুই শাগরিদের মাযার বর্তমান যশোর (দ্র.) শহরের বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৪৯৩ খৃ. সুলতান 'আলাউ'দ-দীন হুসায়ন শাহ এই অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। পরে তাঁহার বংশধরগণ এবং অতঃপর শের শাহ এখানকার শাসক হন। মাঝখানে অল্প সময়ের জন্য সম্রাট হুমায়ূন শাসক ছিলেন। শের শাহ-এর বংশধরগণের পরে বাংলার বিখ্যাত আফগান শাসন সুলায়মান কাররানী (১৫৬৩-৭২) এবং তারপর তাঁহার পুত্র দাউদ খান কররানী স্বাধীনভাবে এই এলাকা শাসন করেন। ১৫৭৬ খৃ. সম্রাট আকবর-এর সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে বাংলা জয় করেন। ইহারপর প্রায় ১৫০ বৎসর এই অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলা মুগল শাসনাধীনে থাকে। খৃ. ১৬ শ শতকের শেষভাগে এখানে বাংলার বারো ভূঁঞার (দ্র.) অন্যতম বিখ্যাত ভূঁঞা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্যকে সম্রাট আকবর জমিদারী সনদ প্রদান করিয়াছিলেন (প্রতাপদিত্যের বাল্যকাল কাটিয়াছিল আগ্রাতে)। তিনি ধর্মঘাটে (বর্তমান সাতক্ষীরা জিলার শ্যামনগর উপজিলার অন্তর্ভুক্ত) রাজধানী স্থাপন করিয়া বিখ্যাত যশোহর রাজ্য গঠন করেন। স্বীয় রাজধানীকে শক্তিশালী করিয়া তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার সুবাদার মহারাজা মানসিংহ দক্ষিণ বঙ্গে অভিযান করিয়া ১৬০৩ খৃ. প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন। সন্ধি স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতাপাদিত্য সুযোগ পাইয়া পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর নিযুক্ত সুবাদার নওয়াব ইসলাম খান-এর প্রেরিত সেনাবাহিনীর নিকটে প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হইয়া জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) আনীত হন এবং পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। কালিয়া সমেত বৃহত্তর যশোহর রাজ্য অতঃপর মুগল ফৌজদারগণ শাসন করিতে থাকেন। নবাব মুরশিদ কুলী খান-এর শাসনামলে দিল্লী হইতে সনদপ্রাপ্ত মাহমূদাবাদের জমিদার সীতারাম রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নাটোর হইতে বাগেরহাট পর্যন্ত অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। সীতারাম নিজ জমিদারীর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে লুণ্ঠন করিতে থাকেন এবং ভূষণার মুগল ফৌজদার তোরাব 'আলী খানকে হত্যা করিয়া ভূষণা কিল্লা' (ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান) দখল করেন। নবাব তখন দয়ারাম নামক সেনাপতির

অধীনে এক শক্তিশালী মুগল বাহিনী পাঠান। যুদ্ধে সীতারাম রায় পরাজিত ও বন্দী হন। ১৭১২ খৃ. মুর্শিদাবাদের নিকটে তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অতঃপর মুগল ফৌজদারগণের অধীনে হিন্দু জমিদারগণ এলাকাটি শাসন করিতে থাকেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরে (১৭৫৭ খৃ.) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃ. বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন। তখনও পর্যন্ত হিন্দু জমিদারগণই খাজনা আদায় করিতে থাকেন। এই সময়ে জমিদারদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের দুর্ভোগ অন্তহীন হইয়া পড়ে। অবস্থা মুকাবিলা জন্য ইংরাজগণ বৃহত্তর যশোহর অঞ্চলের জন্য ১৭৮১ খৃ. এক আলাদা কালেক্টরেট স্থাপন করেন। কিন্তু এই সময় হইতে এই সমগ্র অঞ্চলটি ব্যাপিয়া নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। চাষিগণকে অগ্রিম দাদনের টাকা নিতে বাধ্য করিয়া নিষ্ঠুর নীলকররা তাহাদিগকে নীল চাষ করিতে বাধ্য করিত এবং স্বল্প মূল্যে সেই নীল কিনিয়া, নীল তৈরী করিয়া, বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করিত। এই অবস্থায় তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন শুরু হয়। বস্তুত সেই সকল নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিরূপেই তীতুমীর (দ্র.) ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা জিলার নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করিয়া তিনি যে ইংরাজ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম করেন তাহা উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করে। কলিকাতা হইতে বড় লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কামানসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া সেই বাঁশের কিল্লা ধ্বংস করিয়া দেন এবং তীতুমীরকে ফাঁশি দেন (১৮৩১ খৃ.)।

আধুনিক কালিয়া উপজিলা এলাকাতে ২টি কলেজ, ১২টি মাদরাসা, ১৮টি হাই স্কুল ও জুনিয়ার হাই স্কুল রহিয়াছে। মোট মসজিদের সংখ্যা ২৮৫ টি। কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন না থাকিলেও এই এলাকার মসজিদগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, এগুলি হয় ১ গম্বুজ-ওয়ালা অথবা গম্বুজওয়ালা।

কালিয়া উপজিলা সদর মধুমতীর শাখা নবগঙ্গা নদীর তীরে বড় কালিয়া গ্রামে অবস্থিত। ইহা একটি পৌরসভা শাসিত এবং ৩টি ওয়ার্ড ও ১৬টি মহল্লা নিয়া উহা গঠিত সড়কপথে ইহা নড়াইল এবং সেখানে হইতে যশোর শহরের সঙ্গে যুক্ত, নৌপথে খুলনার সঙ্গে যুক্ত। কালিয়াতে লঞ্চ ষ্টেশন (পুরাতন ষ্টীমার ষ্টেশন) রহিয়াছে। এখানে থানা, উপজিলা অফিসসমূহ, আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, ডাকঘর, ডাকবাংলা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, হাসপাতাল (৩০ শয্যা) ও একটি মাতৃসদন রহিয়াছে। কালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি অনেক পুরাতন, ১৮০২ খৃ. স্থাপিত। এই অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুলটির অনেক অবদান রহিয়াছে। এখানে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ও রহিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পরে ১৯৭৭ খৃ. একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. নিবন্ধসমূহ ঃ যশোর, নড়াইল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Population Census of Pakistan, 1961, District Census Report : Jessore, pt. I-Iv, Ministry of Home Affairs, Govt. of Pakistan, Karachi; (২) Population Census of Bangladesh, 1974, District Census Report : Jessore, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dacca 1974; (৩) Bangladesh Pop. Census, 1981, All Thanas of Jessore District, Supplement, Nov. 1985, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning. Dhaka 1985, etc. etc.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ১০২।

হুমায়ুন খান

কালিয়াকৈর (کالیاکیر) ঃ বর্তমানে উপজেলা। পটভূমি ঃ বংশী ও গোয়ালিয়া নদীর অববাহিকায় ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াল গড়ের পশ্চিমাঞ্চলে রক্তাভ পলি মিশ্রিত ও বনভূমি সমন্বয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কালিয়াকৈর উপজেলা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের রাজধানী ছিল। যাহার স্মৃতিচিহ্ন আজিও বহন করে টোল সমুদ্রের ঐতিহাসিক দীর্ঘি ও লুপ্তপ্রায় রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া সুবেদার ইসলাম খানের শাসন আমলে তিনি রাজস্ব পুনর্গঠনের প্রয়োজনে গাযী তালিব খানকে শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁহার নামানুসারেই এই এলাকার নামকরণ করা হয় তালিবাবাদ পরগণা। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে এই উপজেলা সাভার থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গাযী বংশের উত্তরসুরি রহীম নওয়ায খান চৌধুরীর একান্ত প্রচেষ্টায় এই এলাকাকে পৃথক থানার মর্যাদা দিয়া কালিয়াকৈর নামকরণ করা হয়।

কালীয়াকৈর উপজেলা গাজীপুর জেলার একটি উন্নয়নশীল উপজেলা। ইহা ২৪°-৪ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°-১৪ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এই উপজেলার পাশ দিয়া বংশী নদী প্রবাহিত। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্বে জয়দেবপুর এবং দক্ষিণে সাভার উপজেলা অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন ৩২১ বর্গ মাইল। ৭৭,৭২৪ একর যমীন ইহাতে আছে, যাহার ভিতর ১৯,৬৯৭ একর বনাঞ্চল। এই উপজেলায় মোট ৯টি ইউনিয়ন, ১৮১টি মৌজা এবং ২৮৯ টি গ্রাম আছে। এইখানে ১৫ কি. মি. পাকা রাস্তা ১৯৭ কি. মি. কাঁচা রাস্তা আছে। এখানে কোন রেললাইন নাই। ইহা ঢাকার সহিত স্থলপথে রাস্তা এবং বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে জলপথে সংযুক্ত। এখানে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস আছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ পাকা রাস্তাটি এই উপজেলা হইয়া গিয়াছে। ঢাকা হইতে কালিয়াকৈরে বাস চলাচল করে।

এই উপজেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা ২৬,৫৭৫ এবং মোট জনসংখ্যা ১,৬৫,৭৬৬ জন। শতকরা ২১ ভাগ শিক্ষিত। পুরুষের ভিতর শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯.৪ ভাগ। মহিলাদের ভিতর শিক্ষিতের হার শতকরা ১৯.৯ ভাগ।

১৯৮১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী কালিয়াকৈর উপজেলায় ২,০১,২৬৫ জন মুসলমান, ১৯,৫৯৫ জন হিন্দু এবং প্রায় ১,০০০ জন অন্যান্য ধর্মবলম্বী লোক বাস করে।

কালিয়াকৈরে কুটির শিল্পের মোট সংখ্যা ১,৪৫৯। উহার ভিতর তাঁত ৪৯ টি, কামারশালা ৭৯ টি, মৃৎপাত্র তৈয়ারী কারখানা ১৬৮ টি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের কারখানা ৪৭টি, কাঠের আসবাবপত্রের কারখানা ২২৪টি, পিতলের হাঁড়ি পাতিলের কারখানা ৮টি, পাট ও সুতার দ্রব্যাদি তৈয়ারীর কারখানা ৩২৯ টি, ঘানি ব্যাগের কারখানা ৪৩৭টি।

শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ঃ এই উপজেলায় একটি কলেজ, উনিশটি হাই স্কুল, তিরাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি মাদ্রাসা,

পঁচাত্তরটি ফোরকানিয়া মকতব ও একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল আছে। ইহা ছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিন শত পনরটি মসজিদ, পঁয়ত্রিশটি মন্দির ও একটি গির্জা আছে।

অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ যুব কল্যাণ কেন্দ্র ৩৬টি, ভূমিহীন পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্র ৩০টি, ভি. ডি. পি. ক্লাব ১৮টি, পেশাভিত্তিক সমিতি ৫৪টি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ২টি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ ১টি, মাতৃকেন্দ্র ৪৫টি, শিশুকেন্দ্র ৩০টি, কৃষি সমবায় সমিতি ২৪৮টি, মহিলা কুটির শিল্প ১টি, কারিগরী প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র ১টি, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ১১টি। এখানে পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অধীনে ১২১ টি গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উপজেলায় কৃষি ব্যাংকের ২টি, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫টি এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ১টি শাখা আছে।

প্রাকৃতিক বিবরণ ঃ এলাকার প্রায় $\frac{১}{—}$ অংশ জুড়িয়া গজারী বন অবস্থিত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা আছে। মাটির প্রকৃতি পলি মিশ্রিত দো-আঁশলা এবং লালচে রংয়ের। প্রধান ফসল ধান, পাট, গম ও চিনা বাদাম। এখানে প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল গাছ জন্মায়।

সামাজিক অবস্থা ঃ এলাকার অধিকাংশ লোক মুসলমান। ইহা ছাড়া কিছু সংখ্যক হিন্দু ও খৃস্ট ধর্মাবলম্বী লোক বসবাস করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কিছু সংখ্যক কোচ ও বংশী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজের অধিকাংশ লোকই রক্ষণশীল মনোভাবাপূর্ণ, যদিও সামাজিক বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে একই গ্রামে একাধিক সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এলাকার জনসাধারণ মোটামুটি ধর্মভীরু। শিক্ষিতা মহিলা এবং দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের মধ্যে পর্দা প্রথা নাই বলিলেই চলে। সচরাচর দু'একজন মহিলা বোরখা পরিধান করেন। নৈতিক অবক্ষয় দিন দিন বাড়িতেছে। সমাজের সচ্ছল ও ঐতিহ্যগতভাবে বংশীয় পরিবার সমাজে মর্যাদাশীল বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া ধর্মীয় নেতা এবং দানশীল সমাজসেবিগণও বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। মূলত উল্লিখিত শ্রেণীর দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিবাহ প্রথা ঃ ধর্মীয় প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এখানে বিবাহ প্রথা চালু আছে। অশিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারে একাধিক বিবাহ প্রচলিত আছে। হিন্দু ও অন্যান্য সমাজের চেয়ে মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ এবং বিবাহের প্রচলন বেশী। সমাজে যৌতুক প্রথা বিদ্যমান। তবে মুসলমান সমাজে এই প্রথা তত প্রকট নয়। হিন্দু পরিবারের মেয়েরা পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির মালিক না হওয়ার কারণেই সম্ভবত যৌতুক প্রথা তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। এই সমাজে ইদানিং কিছু অসবর্ণ বিবাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ এলাকাবাসী মোটামুটিভাবে চলতি বাংলা ভাষায় কথা বলে। তবে কিছুটা আঞ্চলিকতার মিশ্রণ আছে। ফলে ভাষার কিঞ্চিৎ বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এলাকাবাসী অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ। সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৮২ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কোনও সুসংগঠিত সংগঠন ছিল না। সম্প্রতি গঠিত কালিয়াকৈর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং হিন্দু সংস্কার সমিতি উল্লিখিত ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে। ইদানিং ভাটিয়ালী, মুর্শিদী ও পল্লীগীতির পাশাপাশি পপ গানের চর্চাও এখানে পরিলক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিক স্থান ঃ এলাকার ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে ঢোল সমুদ্রের দীঘি অন্যতম। জানা যায় খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এখানে পাল বংশের রাজধানী ছিল। বেশ কিছু প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দীঘির আশেপাশে দেখা যায়। এই উপজেলার কৃতি সন্তান বিশ্বনন্দিত প্রয়াত বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাথ সাহা কালিয়াকৈরের পরিচয় বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়াছেন।

ড. সাহা ১৮৯৩ খৃ. ঢাকার কালিয়াকৈর উপজেলার শেওড়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইত ফলিত গণিত বিষয়ে এম. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি ১৯১৬ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট গণিত বিভাগে যোগদান করেন। বিজ্ঞানের বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯২৭ খৃ. লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সম্মানিত ফেলো নির্বাচিত হন। ইহা ছাড়া ফরাসীর অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি ও বোস্টন একাডেমী অব সায়েন্স তাঁহাকে ফেলো মনোনীত করে এবং আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন তাঁহাকে সদস্য পদে বরণ করে। ইতালী সরকারের আমন্ত্রণে ড. সাহা ভারতের প্রতিনিধিরূপে আলেকজান্দ্রা ভোল্টার শত বার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য ইতালীর কোমোতে গমন করেন। ১৯৩১ খৃ. তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশে একাডেমী অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ খৃ. তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ড. সাহার একান্ত প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৩৮ খৃ.)। ১৯৩৫ সালে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় সায়েন্স আন্ডার কালচার নামে মাসিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানে অবদান ছাড়াও ড. সাহার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তিনি ১৯৪৯ খৃ. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন (সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সম্পা. শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রী অঞ্জলি বসু. কলিকাতা ১৯৭৬ খৃ. পৃ. ৪১৮-১৯)।

বলিয়াদী জমিদার ঃ বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাসী বলিয়াদী জমিদার পরিবার সর্বত্র বলিয়াদী সিদ্দিকী পরিবার হিসাবে পরিচিত। মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় হইতে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮০ বৎসর কাল যাবত এই পরিবার তাঁহাদের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া তালিবাবাদ পরগণায় ও দেশের অন্যান্য এলাকায় এবং বিদেশে বসবাস করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ উৎপাদিত দ্রব্য ঃ এখানে "ধনীর চিড়া" নামে প্রসিদ্ধ চিড়া তৈরী হয়। উল্লেখ্য যে, ধনী নামের এই হিন্দু মহিলা প্রথম এই চিড়া তৈরী করে। কথিত আছে যে, এই চিড়া ১৮৮৬ খৃ. ইংলন্ডের রাণীর জন্ম দিনে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে অন্যতম উপঢৌকন হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এখানে সমাজকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে পাট হস্তশিল্প-জাত বিভিন্ন দ্রব্য তৈরী হয় যাহা রফতানী করিয়া এলাকার দুঃস্থ মহিলাগণ কিছুটা লাভবান হইতেছে।

কালিয়াকৈর উপজেলায় সর্বপ্রথম যে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উহার নাম ভৃঙ্গরাজ তালেবাদ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। বিহারীলাল তালুকদার ১৯২৮ সনের ২ জানুয়ারী কালিয়াকৈর থানায় প্রথম হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশ জেলা গেজিটিয়ার, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ. পৃ. ৪২০; (২) উপজেলা পরিসংখ্যান, বাংলাদেশ, ১৯৭৮ খৃ.; (৩) বাৎসরিক পরিকল্পনা, কালিয়াকৈর ১৯৮২-৮৩; (৪) সংসদ বাঙলা চরিতাভিধান, সম্পা. শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত ও শ্রী অঞ্জলি বসু, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৪১৮-১৯; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক

প্রোগ্রাম, সম্পা খান বাহাদুর খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, ঢাকা ১৯৭৫, ২খ, ১০২।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

কালিয়াঝুড়ি (کلیاجهوڑی) ঃ নেত্রকোনা জেলার একটি অগ্রসরমান উপজেলা। এই উপজেলাটি ২৪°৪১ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°০৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

মুগল আমলে এই পরগণার সবটাই জলকর মহল হিসাবে বিবেচিত হইত। আদিতে এই এলাকা কামরূপের অধীন ছিল। নবাব মুরশিদ কুলী খান হেম চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির নিকট এই পরগণার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কালক্রমে তাহার বংশধরগণ ডাকাতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করিত। হেম চৌধুরীর দুই সন্তান ছিল। একজনের নাম ছিল লাম্বোদর (Lambodar) যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপর ভ্রাতা দামোদর (Damodar) যিনি পুরাতন ধর্মমতই অনুসরণ করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জিতরা নামক এক সন্ন্যাসী এই অঞ্চল কামরূপের রাজাদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। হেম চৌধুরীর বংশধরগণ এখনও এলাকায় বসবাস করে। শীতকালে এই অঞ্চলে পানির উচ্চতা ৩ হইতে ৪ ফুট নীচে নামিয়া যায়। এই সময়ে এক বিশাল এলাকা ঘন ও খাটো গুল্মের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি বিল আছে এবং এই সকল বিলে মাছের চাষ হয়। এখানকার জনগণের আয়ের সিংহ ভাগ এবং সরকারী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মাছ হইতেই আসে। জেলেরা মাছ শুকাইয়া শুঁটকি করিয়া বিক্রয় করে। জেলেদের কুঁড়ে ঘরগুলিকে খোলা বলা হয়। বিলের ধারে খালের পাড়ে এই খোলাগুলি গাঁদাগাঁদিভাবে নির্মাণ করা হয়। বিলের যে সমস্ত এলাকায় পানি কম সেখানে বোরো ধানের চাষ হয়। কৃষকগণ তাহাদের খামার হইতে বেশ দূরে বসবাস করে, যেহেতু বিলের ভিতর গৃহ নির্মাণ সম্ভব নহে।

প্রায় ৭২ হাজার একর জমি লইয়া এই উপজেলা গঠিত। ৬টি ইউনিয়ন, ৬৭টি মৌজা এবং ৮৪ টি গ্রাম এই উপজেলায় রহিয়াছে। এখানে ৫০০ কি. মি. কাঁচা রাস্তা আছে। কিন্তু কোন পাকা রাস্তা নাই এবং পুল ও কালভার্টের সংখ্যা ২২টি।

১৯৮১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে কালিয়াঝুড়ির জনসংখ্যা প্রায় ৬৯ হাজার এবং আবাসিক গৃহ ১০ হাজার ৫শতটি। উহার ভিতর ৩৩টি পাকা বাড়ী। বাকী সব কুঁড়ে ঘর, কাঁচা অথবা আধা পাকা। এখানকার ভাসমান জনসংখ্যা প্রায় চার হাজার।

এই উপজেলার শতকরা ৩৩ জন কৃষকের নিজস্ব চাষের জমি আছে, ২৪ জনের নৌকা এবং ১৭ জনের গরুর গাড়ী আছে। এখানে ১৯৮১ খৃ. ১৮,৩০০ জন কৃষি শ্রমিক, ৩০ জন শিল্প শ্রমিক, ৭৭৫ জন ব্যবসায়ী এবং ৪৩৩১ জন অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১০ বৎসর হইতে ২৯ বৎসর বয়সের প্রায় ৩ হাজার লোক বেকার অবস্থায় আছে এবং ইহার ভিতর প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষিত বেকার।

এই উপজেলায় ৩৮ হাজার মুসলমান এবং ২৭ হাজার হিন্দু বাস করে এবং অন্যান্য ধর্মের লোকের সংখ্যা খুবই কম।

এখানে প্রায় ৪,৫০০ টি কৃষি পরিবার আছে। নীট আবাদী এলাকার পরিমাণ ৩৩ হাজার একর এবং ২৪ হাজার একর জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা আছে। এই উপজেলার ৭ শত একর জমি বাসগৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে ৯২ একর জমিতে আউশ, ৪৩৮ একরে আমন এবং ৩০,০৬২ একর জমিতে বোরো ধানের চাষ হইয়া থাকে।

এই উপজেলায় ৫৫ ঘর তাঁতী, ১০ জন কুমার, ৯৯ জন বাঁশজাত দ্রব্যাদির কারিগর, ২৬ জন কাঠ মিস্ত্রী, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী ১০ জন এবং অন্যান্য কুটির শিল্পীর সংখ্যা ৭০ টি।

কালিয়াঝুড়ি উপজেলায় ১৯৮৭-৮৮ খৃ. পর্যন্ত ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি কলেজ, ৯টি মাদরাসা ও ৫৯৫ টি মসজিদ আছে। এখানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৪টি, কৃষি ব্যাংকের একটি শাখা অফিস আছে এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত একটি এতীমখানা আছে।

এই উপজেলায় ৬৮টি ওয়াকফ সম্পত্তি আছে, যাহার মোট জমির পরিমাণ ১০৭.১১ একর। এই সকল সম্পদ হইতে বাৎসরিক গড় ২৬৮৭ টাকা আয় হইয়া থাকে। এই আয় দ্বারা মসজিদ, ঈদগাহ, গোরস্তান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি পরিচালিত হইয়া থাকে।

সামাজিক অবস্থা ঃ মুসলমানগণ এই উপজেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। বেশ কিছু হিন্দু এবং কিছু সংখ্যক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও বাস করে। সমাজের অধিকাংশ লোকই রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতা হিন্দু সমাজের ভিতর বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এই এলাকায় একই গ্রামে একাধিক সমাজের অস্তিত্ব বর্তমান। জনগণ মোটামুটি ধর্মভীরু। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে সামাজিক অবক্ষয় দিন দিনই বাড়িতেছে। সমাজের সচ্ছল, ধার্মিক দানশীল ও সমাজসেবীদের মর্যাদা বেশী। এই জাতীয় জনগণই সমাজের কর্ণধার।

বিবাহ প্রথা ঃ মুসলমান, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণ নিজ নিজ ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বহু বিবাহ প্রথা মুসলমানগণের ভিতর পরিলক্ষিত হয়। সমাজে যৌতুক প্রথা বিদ্যমান আছে। তবে হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রথা খুবই প্রকট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩৬৫; (২) উপজেলা পরিসংখ্যান, বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খৃ.।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

কালিহাতী (کالی هاتی) ঃ টাঙ্গাইল জেলার একটি থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম বর্তমানে উপজেলা (১৯৮০ খৃ.)। কালিহাতী থানা ১৯০৮ হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নামকরণ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। বর্তমান উপজেলা সদরে ঐ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় কালিপূজা উৎসব মহাধুমধামে উদ্‌যাপন করিত। দূর-দূরান্ত হইতে বিত্তশালী লোকজন হাতীতে আরোহণ করিয়া এই উপলক্ষে এই স্থানে আগমন করিত। পরবর্তী সময়ে এই স্থান কালি ও হাতী এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে কালিহাতী নামে অভিহিত হয় এবং থানাটি প্রতিষ্ঠার সময় এই নামটি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার নামকরণ ব্যাপারে আরও একটি ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীব 'আলামগীরের আমলে হামীদপুরে সাফাই ফটিকজানি নদীর উভয় তীরে ছিল কাল্‌আ-ই হাতী বা হাতী রাখিবার কিল্লা, যেমন ঢাকা শহরের পীলখানা। আতীয়ার জঙ্গনশাহী পাহাড় হইতে ধৃত যে সকল হাতী খাজনা স্বরূপ প্রেরণ করা হইত তাহা এই কিল্লায় রাখা হইত। ঐ সময় হইতেই এই স্থানের নাম কাল্‌'আ-ই হাতী হয়–যাহা এখন বিকৃত হইয়া কালিহাতী হইয়াছে।

কালীহাতী থানা ১৯৮৩ সালের ২ জুলাই উপজেলায় উন্নীত হইয়াছে।

অবস্থান ঃ ইহা টাঙ্গাইল জেলার একটি উপজেলা। জেলাসদর হইতে ২১ কি. মি. (১৩ মাইল) উত্তর দিকে টাঙ্গাইল মোমেনশাহী সড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত। ইহা ২৪°১৭ ও ২৪°২৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৫ ও ৯০°১১ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

সীমানা ও আয়তন ঃ ইহার উত্তরে ঘাটাইল ও ভূয়াপুর উপজেলা, দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলাসদর ও বাসাইল উপজেলা, পূর্বে সখীপুর উপজেলা ও পশ্চিমে যমুনা নদী ও পাবনা, জেলা আয়তন ১৯.৫ বর্গ কি., নদীসহ মোট ৩০৯.১ বর্গ কি. (১১৯.৩ বর্গ মা.)।

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ এই উপজেলায় মোট ১২টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে ঃ যথা ঃ (১) কালীহাতী, (২) সহদেবপুর, (৩) বাংড়া, (৪) পাইকরা; (৫) বল্লা, (৬) কোকডহ্‌রা, (৭) বীর বাসিন্দা, (৮) নাগবাড়ী (৯) দুর্গাপুর, (১০) সল্লা, (১১) নারান্দিয়া ও (১২) এলেঙ্গা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ উপজেলার দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলা সদর এবং উত্তরে মোমেনশাহীর সঙ্গে দীর্ঘ পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। এই উপজেলার প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা বাস ও রিক্সা। উপজেলা সদরের সহিত অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ কাঁচা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। বর্ষাকালে একমাত্র চলাচল ব্যবস্থা হইতেছে নৌ-ব্যবস্থা। এই উপজেলায় ১৮ কি. মি. পাকা রাস্তা, ২৯০ কি. মি. কাঁচা রাস্তা এবং ২১ টি পোস্ট অফিস ও ১টি টেলিগ্রাফ অফিস রহিয়াছে।

জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ঃ ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৮৬,১৯২ জন। তন্মধ্যে ১,৪৬,৮৮৮ জন পুরুষ এবং ১,৩৯,৩০৪ জন মহিলা। এই উপজেলায় গড়ে যেখানে ১০৫ জন পুরুষ সেখানে ১০০ জন মহিলা আছে। কিন্তু জেলায় এই পুরুষের হার ১০ জন। জেলার শতকরা ৯.১ ভাগ এলাকাবিশিষ্ট এই উপজেলায় জেলার জনসংখ্যার শতকরা ১৯.৭ ভাগ লোক বাস করে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯২৬ জন, যাহার হার জেলায় ৭১৮ এবং সমগ্র দেশে ৬০৫ জন। মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৪৬.৫ ভাগ ১৫ বৎসর বয়সের কম। পক্ষান্তরের মোট জনসংখ্যার ৪৭.৫ ভাগ ভোটার বা ১৭ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে। এই উপজেলা সদরে চাকুরীজীবীর হার ১৬ হইতে ৬৪ বৎসর বয়সের প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ১০ জন। তালিকা CO3 হইতে দেখা যায় যে, এই উপজেলায় ১৫ হইতে ৪৪ বৎসর বয়সের ৪৮,৩০৪ জন বিবাহিত মহিলা আছে।

পৌর এলাকা ঃ এই উপজেলার পৌর এলাকা ৩.২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত যাহার বাসিন্দা ৮১৩৩ জন। ১৯৮১ সালের গণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ২.৮ শতাংশ লোক পৌর এলাকার বসবাস করে এবং ১.০ শতাংশ উপজেলা সদরে বাস করে। এই জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গকিলোমিটারে ২,৫৪২ জন। এই উপজেলায় পৌর এলাকার জনসংখ্যা, জেলা পৌর এলাকার জনসংখ্যার শতকরা ৪.৪ ভাগ মাত্র।

গ্রামসমূহের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য ও সদস্যসংখ্যা ঃ এই উপজেলায় মোট ৩০৮ টি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ১২৯টি (প্রায় শতকরা ৪১.৯ ভাগ) ছোট গ্রাম, যেগুলির প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ১০০টি পরিবার আছে। ১৬৯ টি (প্রায় শতকরা ৫৪.৯ ভাগ) মাঝারি গ্রাম, যেখানে পরিবারের সংখ্যা ১০০ হইতে ৫০১-এর মধ্যে এবং ১০টি বড় (প্রায় শতকরা ৩.২ ভাগ) গ্রাম আছে যেখানে প্রতি গ্রামে ৫০০ হইতে ততোধিক পরিবার বসবাস করে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই উপজেলায় ৪৯,০৭৪টি বাড়ী আছে, যেগুলির ৪৮,৬৪৯টি (শতকরা ৯৯.১ ভাগ) বাসগৃহ এবং বাকীগুলি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসার প্রতিষ্ঠান ও শ্রমশিল্প সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। বাসগৃহসমূহে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৫.৪ জন, যাহাদের হার জেলায় ৫.৯ জন এবং সমগ্র দেশে ৫.৭ জন। এই উপজেলায় মোট ২৬টি উপজাতীয় পরিবার আছে। বাসগৃহসমূহের কাঠামোগত নমুনায় দেখা যায় যে, উপজেলার মোট বাসগৃহের শতকরা ৩৭.০ ভাগ কাঁচা, ৬২.৭ ভাগ অর্ধপাকা এবং ০.৩ ভাগ পাকা। মোট বাসগৃহের প্রায় শতকরা ৩৫.১ ভাগ পরিবার নলকূপের পানি এবং ১.৮ ভাগ পরিবার নদী ও পুকুরের পানি ব্যবহার করে। শতকরা ৯৫.৫ ভাগ লোক নিজস্ব বাসগৃহে বসবাস করে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ এই উপজেলায় ৩টি কলেজ, ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ২২টি মাধ্যমিক স্কুল, ৩টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৯টি দাখিল মাদরাসা, ১টি ফাযিল মাদ্‌রাসা, ১০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোট ১৬৩ টি বিদ্যালয় আছে। ৫ বৎসর ও তাহার উর্ধ্ব বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর শিক্ষিতের হার শতকরা ১৮.৮ ভাগ, পুরুষ ২৬.০ ও মহিলা ১১.২ ভাগ, যাহা জেলাতে পুরুষ ও নারী উভয়ের হার শতকরা ২০.২ ভাগ, ২৬.৮ ভাগ পুরুষ ও ১৩.৫ ভাগ মহিলা। ১৯৬১, ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিক্ষিতের হার যথাক্রমে শতকরা ১৪.৫, ১৪.০ এবং ১৫.৮ ভাগ। এখানে ১৯,৪৪০ টি এমন পরিবার আছে (প্রায় শতকরা ৩৯.৬ ভাগ) যেগুলির প্রতিটি পরিবার কমপক্ষে একজন করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি আছে এবং ৮,৫১০টি এমন পরিবার আছে (প্রায় শতকরা ১৭.৩ ভাগ) যেগুলির প্রতিটিতে অন্তত একজন করিয়া শিক্ষিত মহিলা আছে। ৫ হইতে ২৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার সংখ্যা শতকরা ৯৭.৮ ভাগ। উভয়ের শতকরা উপস্থিতির হার যথাক্রমে ২২.৯ ও ১২.৫ ভাগ।

চিকিৎসা ও গণস্বাস্থ্য ঃ এই উপজেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল, ৩টি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৩টি সরকারী চিকিৎসালয়, ৫টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ১টি পশু হাসপাতালও ১টি কৃত্রিম পশু প্রজনন কেন্দ্র রহিয়াছে।

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য ঃ এই উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৬৯,৩০৭ একর এবং পতিত জমি ৫,২৬১ একর। প্রধান ফসল ইরি, বোরো, আউশ ও আমন ধান এবং পাট। ইহা ছাড়া ডাল, সরিষা, আলু, গম ও শাক-সব্জি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

হাট/বাজার ঃ এই উপজেলায় মোট ৩৪টি হাট/বাজার আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই উপজেলার প্রতি ৮,৪১৭ জন লোকের জন্য একটি হাট/বাজারে কোনটিতে সপ্তাহে একদিন, কোনটিতে দুইদিন এবং কোনটিতে প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল হাট/বাজারে প্রধানত কৃষিজ ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

বিদ্যুতায়ন ঃ বর্তমানে এই উপজেলায় বৈদ্যুতিক সুযোগ-সুবিধা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এই উপজেলার ৩০৮ টি গ্রামের মধ্যে ৩৮ টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহার ১২.৩ শতাংশ গ্রামে বৈদ্যুতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ ঐতিহ্যগতভাবে রহিয়াছে এই উপজেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প ও বরোজ শিল্পের সমাবেশ। এই উপজেলা তাঁত

শিল্পের জন্য বিখ্যাত। উত্তম শ্রেণীর শাড়ী, লুঙ্গী, বিছানার চাদর ও গামছা এখানে তৈয়ার হয়।

প্রধান পেশা ঃ এই উপজেলার প্রধান পেশার শ্রেণী বিভাগ হইতেছে ১০ বৎসর হইতে ততোধিক বয়সের লোকের শতকরা ২৫.৯ ভাগ কৃষিজীবী, ৫.৩ ভাগ ব্যবসায়ী ও ৪.৫ ভাগ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে।

ব্যাংক ব্যবস্থা ঃ এই উপজেলায় সোনালী ব্যাংকের ২টি শাখা, রূপালী ব্যাংকের ২টি শাখা এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ৫টি শাখা রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteers, Tangail, 1983, 160, 176, 180, 215, 220, 294; (২) Bangladesh Population Census-1981, July-1885, Tangail District, Thana Series, 55-61; (৩) Bangladesh Bureau of Educational Information and Statisties, গধু-১৯৮৬; (৪) খন্দকার আব্দুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৮৬ খৃ. ১খ, পৃ. ১৭৬, ২৮১, ২৮২, ২৮৬, ২৯৮; (৫) এফ, আর. খান, টাঙ্গাইল জেলার ভূগোল, টাঙ্গাইল ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ২৭, ২৮, ২৯; (৬) দৈনিক ইনকিলাব, ১ বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা, ১৯ অক্টোবর, ১৯৮৬ খৃ.; (৭) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগামস্, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ১খ, পৃ. ১৬৩।

আ. ফ. সাইয়েদ মাসুউদ্ হোসেন

কালী (দ্র. বিসাত)

আল-কালী (القالى) ঃ আবূ 'আলী ইসমা'ঈল ইব্নু'ল কাসিম ইব্ন 'আয়যু'ন ইব্ন হারূন ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান/সালমান ('আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান অথবা তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ-এর ক্রীতদাস), একজন বিখ্যাত আরব ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন (২৮৮-৩৫৬/৯০১-৯৬৭)।

তাঁহার ছাত্র আয়-যুবায়রী (পৃ. ২০৪ প্র.) কর্তৃক সংরক্ষিত তাঁহার আত্মজীবনীর মাধ্যমে তাঁহার বংশ পরিচয় ও নিম্নলিখিত জীবন বৃত্তান্ত জানা যায়। তিনি ২৮৮/৯০১ সনে ভ্যান হ্রদের উত্তরে মানাযিজিরদ (দ্র.)-এ জন্মগ্রহণ করেন। ৩০৩/৯১৫ সনে তিনি বাগদাদ যাত্রা করেন, দীর্ঘদিন মাওসিল-এ অবস্থান করার পর কালীকালার (আরদরূম = Erzerum) সীমান্ত শহর হইতে লোকজনসহ তিনি ৩০৫/৯১৭ সনে সেখানে পৌঁছেন এবং সীমান্ত প্রদেশের লোক হিসাবে তাঁহার অধ্যায়নে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় তিনি 'আল-কালী' নিসবাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাগদাদে তিনি তাঁহার সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি, যথা, ইব্ন দুরায়দ, ইব্নু'ল-আম্বারী, নিফতাওয়ায়হ, ইব্নু'স-সাররাজ, আল-যাজ্জাজ, আল-আখফাশ আল-আসগার, ছালাম-এর ক্রীতদাস আল-মুতাররিম প্রমুখের ভাষা ও ইতিহাস অধ্যায়ন করেন। ইব্ন দুরুসতাওয়ায়হ-এর পরামর্শক্রমে তিনি আল-মুবাররাদ-এর ভাষ্যসহ সীবাওয়ায়হ-এর আল-কিতাব গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে অধ্যায়ন করেন। তিনি ইব্ন কুতায়বা-র গ্রন্থাবলী গ্রন্থকারের পুত্র আবূ জা'ফার-এর নিকট এবং য়াহ্য়া আল-মুনাজ্জিম-এর গ্রন্থাবলীও গ্রন্থকারের পুত্র আহমাদ প্রমুখের নিকট অধ্যায়ন করেন। সুবিখ্যাত হাদীছবেত্তা আবূ বাক্র 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী দাঊদ আস-সিজিস্তানী এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আরদি'ল 'আযীয আল-বাগাবী-র তত্ত্বাবধানে তিনি হাদীছশাস্ত্র অধ্যায়নেও নিজেকে উৎসর্গ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইমামু'ল-কুররা' ইব্নু'ল মুজাহিদ-এর নিকট কুরআন-এর তাজবীদ শিক্ষা করেন। ৩২৮/৯৩৯ সনে তিনি দৃশ্যত ৩য় 'আবদু'র-রাহমান-এর পুত্র শাহ্যাদা আল-হাকাম-এর আমন্ত্রণক্রমে আল-আন্দালুস-এর উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং ২৭ শা'বান, ৩৩০/১৭ মে, ৯৪২ সনে কার্ডোভা পৌঁছেন। আয-যুবায়দী-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি সেখানে সম্মানজনক জীবন যাপন করেন এবং রাবী'-২, ৩৫৬/মার্চ-এপ্রিল ৯৬৭ সনে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ইব্নু'ল-ফারাদী (১খ, ৬৫ প., সংখ্যা ২২১; কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ১খ ৮৪, সংখ্যা ২২৩)-র বর্ণনানুযায়ী তিনি শনিবার ৭ জুমাদা'ল-আওওয়াল, ৩৫৬/২০ এপ্রিল, ৯৬৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন (এই নির্দিষ্ট তথ্যটি সম্ভবত আল-কালী-র পুত্র জা'ফারের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ইব্নু'ল-ফারাদী ইহা অন্যজনের কাছে প্রচার করেন (দ্র. ইব্ন বাশ্কুওয়াল, পৃ. ১২৯, সংখ্যা ১৮৯; কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫, পৃ. ১২৭, সংখ্যা ২৯২)।

আল-কালী প্রায়ই আবূ 'আলী আল-বাগদাদী নামেও উল্লিখিত হইতেন এবং তিনি পাশ্চাত্যে ইরাকী ঐতিহ্যের প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কার্ডোভা গমনকালে তিনি তাঁহার গ্রন্থাগারের একটি বিরাট অংশ সঙ্গে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেই সমস্ত পুস্তক তাঁহার ছিল না অথবা যাহা কায়রাওয়ান-এর পথে হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার পরিচিত ইরাকী ঐতিহ্যের অনুসরণ ও অন্য ঐতিহ্যের উদাহরণসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাঁহার নূতন আবাসভূমিতে তাঁহার স্মৃতিশক্তি হইতে সেইগুলির পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করেন অথবা ইহার ভাষ্য ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেন। (দ্র. ইব্ন খায়র, পৃ. ৩৯৫ স্থা.; যুবায়দী, পৃ. ২৩০; কিফ্তী, ১খ, ২০৫; সেহেইস, ৯৫ প.)। একজন বৈয়াকরণ হিসাবে তিনি বসরা ও কূফাবাসীদের মধ্যে প্রখ্যাত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আল-মুবাররাদ ও ছা'লাব-এর সময় হইতে বিভিন্ন মতপার্থক্যের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই; বরং তিনি স্বীয় বিবেচনার উপর স্থির থাকিতেন—যদিও তিনি বসরার ব্যাকরণবিদগণের অভিমতের সহিত মোটের উপর একমত ছিলেন (তু. কিফ্তী, ১খ, ২০৫)।

আদ-দারবী, ইব্ন রাশকুওয়াল এবং ইব্নু'ল-আব্বাস-এর মতানুযায়ী তাঁহার শাগরিদগণের জন্য দ্র. ফুলটন, পৃ. ৯-এ উদ্ধৃত প্রবন্ধসমূহ।

তাঁহার বহু সংখ্যক রচনার মধ্যে মাত্র কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায় (কিফ্তী, ১খ, ২০৬; য়াকূত, উদাবা, ২খ, ৩৫২; ফুলটন, ৬ প.)। তন্মধ্যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত গ্রন্থটি হইল কিতাবু'ল-আমালী, যাহাতে আরবী ভাষাতত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি উপযুক্ত প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে ; তু. 'উমার আদ-দাক্কাক, MMIA-G, ৪৪ (১৯৬৯ খৃ.) ৫১৫-৩৭; ইহার দারু'ল-কুতুব সংস্করণটি সর্বোত্তম, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৬ ; ইহার তৃতীয় খণ্ডটিতে বাকরী-এর তান্বীহসহ যায়লু'ল-আমালী ওয়া'ন-নাওয়াদির সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। মোটকথা বাকরী-এর ভাষ্যটি সিমৃতু'ল-লা'আলী ফী শারহ আমালি'ল-কালী শিরোনামে 'আবদু'ল-'আযীয আল-মায়মানী (Memon) কর্তৃক নির্ঘণ্টসহ তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, কায়রো ১৩৫৪/১৯৩৬। আল-কালী-এর বিখ্যাত অভিধান, কিতাবু'ল-বারি' ফি'ল-লুগাত স্বরধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী বিন্যাস করা হইয়াছিল যাহা আল-খালীল ইব্ন আহ্মাদ রচিত কিতাবু'ল-'আয়ন-এর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ এবং খুব সম্ভব ইহা ৪,৫০০ পত্রসম্বলিত ছিল। দ্র. A. facsimile of the manuscript of al-Kitab al-

Bari fi' l-Lugha, by Isma`il al-Kali, মুখবন্ধসহ A. S. Fulton কর্তৃক সম্পাদিত, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ. [তু. হাশিম আত-তা'আন-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ (M. A.) আল-বারি' লি-আবী 'আলী আল-কালী, বাগদাদ ১৯৭২ খৃ. (?); J. Kraemer in Oriens, ৫খ. (১৯৫৩ কৃ.) ২১২ প.; S. Wild, Das Kitab al-`Ain und die arabische Lexikographie, Wiesbaden 1965, 65ff.। তাঁহার কিতাবু'ল-মাক্সূর ওয়া'ল-মামদূদ-এর দুইটি পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. ফিহরিসত আল-কুতুবি'ল'আরাবিয়্যা, দারু'ল-কুতুব, ২খ, কায়রো ১৩৪৫/১৯২৬, ৪০ ; কায়রো সং. ১৩৯২/১৯৭২। কিতাবু'ল-মাসা'ইল আশ-শীরাযিয়্যা, ব্রোকেলম্যান কর্তৃক তাঁহার নামে তালিকাভুক্ত হইলেও সম্ভবত গ্রন্থটি আল-কালীর রচনা নহে (পরিশিষ্ট, ১খ, ৯৪৪, ১৬)। অনুরূপভাবে কায়রোর দারু'ল-কুতুব-এর পাণ্ডুলিপির তালিকায় কিতাবু'ল আমছাল গ্রন্থটি আল-কালীর নামে তালিকাভুক্ত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি হামযা আল-ইস্ফাহানী রচিত (দারু'ল-কুতুব, ১৯৩৬-৫৫, ১খ, কায়রো ১৯৮০/১৩৬১. ৭৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয্-যুবায়দী, তাবাকাতু'ন-নাহ্বিয়্যীন ওয়া'ল-লুগবিয়্যীন, কায়রো ১৯৫৪, পৃ. ১৩২, ২০২-৫; (২) ইবনু'ল-ফারাদী, তা'রীখ 'উলামা'ল-আনদালুস, মাদ্রিদ ১৮৯১ খৃ., ১খ, ৬৫ প., সংখ্যা ২২১; (৩) কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ১খ, ৮৩ প., সংখ্যা ১২৩; (৪) আল-হুমায়দী, জায্ওয়াতু'ল-মুকতাবিস, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, পৃ. ১৫৪-৮, সংখ্যা ৩০৩; (৫) আস-সাম'আনী, পত্রক ৪৩৯b; (৬) ইব্ন খায়র, ফাহরাসা, সারগোজা ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ৩৯৫-৭, নির্ঘন্ট; (৭) আদ-দাব্বী, বুগয়্যা, ২১৬-৯, সংখ্যা ৫৪৭; (৮) য়াকূত, উদাবা', ২খ, ৩৫১-৪, সংখ্যা ১২২, ও মুজাম, নির্ঘন্ট; (৯) আল-কিফ্তী, ইনবাহ'র-রুওয়া 'আলা আন্বাহি'ন-নুহাহ, কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ১খ, ২০৪-৯ সংখ্যা ১৩০; (১০) আল-মাররাকুশী, আল মু'জিব ফী তালখীস আখবারি'ল-মাগরিব[2], লাইডেন ১৮৮১ খৃ. পৃ. ১৬ অনু. ফাগনান. আলজিয়ারস ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ২০; (১১) ইবন খাল্লিকান দ্র.; (১২) ইবনু'ল-'ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগ্রিব, লাইডেন ১৮৫১ খৃ., ২খ, ২৬৬, ১৯৫১, ২খ, ২৫০, অনু. ফ্যাগনান, আলজিয়ারস ১৯০৪ খৃ., ২খ, ৪১৩; (১৩) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জানান, হায়দরাবাদ ১৩৩৮/১৯১৯, ২খ, ৩৫৯; (১৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া , কায়রো ১৩৪৮/১৯২৯ প., ১১খ, ২৬৪ প.; (১৫) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ৪খ, ১৪২, ১৪৬, বৈরূত ১৯৫৮ খৃ., ৪খ, ৩০৯, ৩১২; (১৬) আস-সুয়ূতী, বুগয়া, পৃ. ১৯৮; (১৭) আল-মুয্হির, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮, নির্ঘন্ট; (১৮) আল-মাককারী, Analectes, ২খ, ৪৮-৫২, নির্ঘন্ট, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৯, ৪খ, ৭০-৫; (১৯) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১৮; (২০) TA, দ্র. কালা ; (২১) ইসমা'ঈল পাশা, হাদিয়্যাতু'ল-'আরিফীন, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ,. ১খ ২০৮; (২২) G. Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, Liepzig ১৮৬২ খৃ., ১১২-৪; (২৩) F. Pons Boigues, Ensayo, ৭১ প., সংখ্যা ৩৩; (২৪) ব্রোকেলম্যান, ১খ, ১৩২, পরিশিষ্ট-১, ২০২ প., ৯৪৪, পরিশিষ্ট-৩, ১১৯৬; (২৫) M. Ben Cheneb, L'Idjaza du Cheikh `Abd el-Qadir el Fasy, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ৪৩৮ প., সংখ্যা ২৪২ (Actes du XIVe Congr., Intern des; (২৬) O. Rescher, Abriss der arabischen Litteraturgeschichte Stuttgart ১৯৯৩ খৃ., ২খ, ২৩৯-৪১; (২৭) R. Sellheim, Die klassisch-arabischen Sprichworter-sammlunger,' s-Gravenhage ১৯৫৪ খৃ., ৯৫ প. সূচী, আরবী অনু., বৈরূত ১৯৭১ খৃ., ১৩৮ প., নির্ঘন্ট; (২৮) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, কায়রো ১৯৫৪ খৃ, ১খ, ৩১৯ প.; (২৯) 'উবায়দু'র-রাহমান কাহহালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, দামিশ্ক ১৩৭৬/১৯৫৭, ২খ, ২৮৬ প.; (৩০) S. A. Bonebakker, in Actas del Primer Congreso des Estudios Arabes Islamicos, মাদ্রিদ ১৯৬৪ খৃ. ৪৫৩-৬৬।

R. Selheim (উ. I.[2])/এ. বি. এম. আবদুর রব

কালীম আবূ তালিব (كليم , ابو طالب) ঃ ইরানী বংশোদ্ভূত কবি। তাঁহার প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমনকি তিনি কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাও জানা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত। তাহির নাস্র আবাদী তাঁহাকে হামদানের অধিবাসী বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি কাশানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। এইজন্য তাঁহাকে কাশী (কাশানী) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। (তায্কিরা-ই নাস্র আবাদী, পৃ. ২২০, তেহরান ১৩১৭ হি.)।

লুতফ 'আলী বেগ আযার লিখিয়াছেন ঃ জীবনীকারদের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি সম্পর্কে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে হামাদানী, আবার কেহ কেহ কাশী (কাশানী) বলিয়া লিখিয়াছেন। আযারের মতে তিনি ছিলেন কাশানী (আতিশ্কাদাহ, সম্পা. মুহাম্মাদ 'আলী 'ইলমী, তেহরান, পৃ. ২৫২; আরও দ্র. 'আবদু'ল হামীদ, পাদ্শহনামাহ, ১খ. ৩৫৩)। সমসাময়িক ইরানী সাহিত্যিক পারতু বায়দা'ঈও তাঁহাকে কাশানী বলিয়াই লিখিয়াছেন (দীওয়ান-ই কালীম ভূমিকা ইরান সং,)। অতএব তাঁহাকে কাশানী বলিয়া মনে করাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, যদিও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন শীরাযে ('আবদু'ল-হামীদ, পাদশহানামাহ, পৃ. ৩৫৩)। এবং কিছু কাল হামাদানেও অতিবাহিত করিয়াছেন। (আতিশ্কাদাহ, পৃ. ২৫২)।

আবূ তালিব কালীম জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বকালে (১০১৪/১৬০৫–১০৩৭/১৬২৮) এই উপমহাদেশে ১০২৭/১৬১৭ সালে আগমন করেন। কারণ ভারতের মুগল বাদশাহগণ ছিলেন ফারসী ভাষা-ভাষী। এইজন্য তাঁহাদের কাছে ফারসী কবিদের মর্যাদাও ছিল। পক্ষান্তরে রিদা যাদাহ শাফাকের ভাষায় ইরানের সাফাবী শাসকগণের কাসীদা ঃ ও গাযাল-এর প্রতি কোনও ঝোঁকই ছিল না (শাফাক, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান, পৃ. ৩৬৩)। এইজন্য ইরানী পণ্ডিত ও কবিগণ ভারতবর্ষে আসিয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য সর্বদাই লালায়িত থাকিতেন। কালীম ভারতবর্ষে আসিয়া আমীর শাহ নাওয়াব সাফাবী (আওরাঙ্গযীব-এর শ্বশুর)-এর দরবারে স্বীয় স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কবি কালীম গোলকুণ্ডায় চলিয়া যান এবং মীরযা মুহাম্মাদ আমীন মীর জুমলার দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। কিন্তু পরবর্তী বৎসরই (১০২৮ হি.) তথা হইতে প্রস্থান করেন (তাযকিরা-ই নাস্র আবাদী, পৃ. ২২০)। তাঁহার গোলকুণ্ডা হইতে প্রস্থানের কারণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর কবি তালিব আমুলী-কে মালিকু'শ-শু'আরা (কবি-সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করেন। শাহী দরবারে তাঁহার কাব্য প্রতিভার জয়জয়কার ছিল, অন্যদিকে

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কবি কালীমের কবি প্রতিভার প্রতি তেমন অনুরক্ত ছিলেন না (শের খান লোধী, মির্‌আতু'ল-খায়াল, পৃ. ৯০)। এইজন্য তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন, অবশ্য এই কারণটি তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তালিব আমূলীর কবি-সম্রাট উপাধি লাভে তাঁহার হতাশ হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। নূতন কর্মস্থলে তাঁহার পদার্পণ মাত্রই তিনি কেমন করিয়া আশা করিতে পারিতেন, যে কবি তালিব আমুলীকে বাদ দিয়া তাঁহাকেই 'কবি-সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করা হইবে? এতদ্ব্যতীত আমরা যখন দেখি, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে এই দেশ ত্যাগের জন্য তাঁহার জীবনে মনঃকষ্ট হইতেছে তখন এইরূপ মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তৎকালে লিখিত তাঁহার একটি গাযালে তাঁহার মর্মবেদনা এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

زشوق هند زان سان چشم حسرت بر قفا دارم
که روهم گر براه آرم نمی بینم مقابل را

এই পংক্তি দুইটিতে তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "দেশে ত যাইতেছি, কিন্তু চক্ষু যুগল আমার পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে।"

তাঁহার এই কাব্যাংশ নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে না। মাত্র দুইটি বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই ভারতবর্ষের মাটির আকর্ষণে আবার তিনি এই দেশে ফিরিয়া আসেন। এবার তিনি প্রথম যান দাক্ষিণাত্যে। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় দিনের পর দিন তিনি দাক্ষিণাত্যের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। সেইখানে তাঁহাকে অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হয়। বিজাপুরের রাস্তা অতিক্রমকালে গোয়েন্দা সন্দেহে তিনি ধৃত হন। ইব্‌রাহীম 'আদিল শাহ (৯৮৭/১৫৭৯-১০৩৫/১৬২৬)-এর স্তুতিতে রচিত কবি কালীম তাঁহার একটি কাসীদাতে এবং অন্য এক স্থানে তাঁহার বেদনাময় কারাবাস স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর উপরিউক্ত মীর জুমলার মাধ্যমে শাহ জাহানের দরবারে উপনীত হন এবং কবি মুহাম্মাদ জান কুদসীর মৃত্যুর (১৬৪৬ খৃ.) পর তিনি মালিকু'শ-শু'আরা' (কবি-সম্রাট) খিতাবে ভূষিত হন (শেরখান, মির্‌আতু'ল-খায়াল, পৃ. ১১৯)।

কালীম ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, স্বল্পে তুষ্ট এবং সুভাষী ব্যক্তি। মুহাম্মাদ তাহিরের বর্ণনানুসারে সম্রাটের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকনাদি তিনি গরীব-মিস্‌কীনদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন (তাযকিরা-ই নাস্‌র আবাদী, পৃ. ২২০)। পার্থিব পদমর্যাদার প্রতি তিনি এতই উদাসীন ছিলেন যে, একবার শাহ জাহান তাঁহাকে 'মুহ্‌রদারী'-র পদ প্রদানের প্রস্তাব দিলে তিনি কবিতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহার অসম্মতি প্রকাশ করেন। ঐ শ্লোকটির দ্বিতীয় পংক্তি ছিল ঃ

مرا مهر داری به از مهر داری

"সম্রাটের মিহরদারী (অনুগ্রহপ্রাপ্তি)-ই আমার জন্য মুহরদারীর পদ হইতে উত্তম।" সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকগণের সহিত কালীমের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কবি সা'ইবের একটি খণ্ড কবিতা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সা'ইব ও মীর মা'সূমের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কুদসী ও মালিক কুম্মীর সহিতও তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মালিক কুম্মীর ইনতিকালের পর কালীম "তারকীব-বন্দ" পদ্ধতিতে তাঁহার শোকগাথা রচনা করেন, যাহাতে তাঁহার গভীর মর্মবেদনার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

কালীম ছিলেন বহু কাব্য রচয়িতা কবি। প্রতিটি শাহী অনুষ্ঠানে তিনি উচ্চাঙ্গের কবিতা পাঠ করিয়া বড় বড় উপঢৌকন পাইতেন। তৎকালীন সম্রাটগণ সমসাময়িক ইতিহাস রচনার ভার জ্ঞানীগুণী কবি-সাহিত্যিকগণের উপর অর্পণ করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গদ্যে "পাদ্‌শাহনামাহ" রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয় 'আবদু'ল-হাকীম এর উপর। পদ্যে উহা রচনার জন্য মনোনীত হন কবি কুদ্‌সী। তিনি বহু পরিশ্রমে "জাফার-নামাহ" রচনার কাজ শুরু করেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁহার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করিতে দেয় নাই। অবশেষে কবি কালীম 'মাছনাবী জাফার নামাহ-ই শাহজাহান" সমাপ্ত করেন (বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। শাহজাহানের এই মাছনাবীখানা অত্যন্ত পছন্দ হয় এবং তিনি কালীমকে মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। কালীম "পাদশাহনামাহ" রচনার জন্যও অনুরুদ্ধ হন। তখন তাঁহার শাহজাহান সমভিব্যাহারে কাশ্মীর গমনের সুযোগ হয়। সেইখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া তাঁহার উপর এমনই যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কাশ্মীরে চিরতরে থাকিয়া যাওয়ার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শাহজাহান তাঁহার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং তাঁহার জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন। (তাযকিরা-ই নাস্‌র আবাদী, পৃ. ২২০)। কালীম তাঁহার কাশ্মীর অবস্থানকালে "মাছনাবী পাদ্‌শহানামাহ" রচনা সমাপ্ত করেন এবং সেইখানেই ১০৬১ হি. ইনতিকাল করেন। গানী কাশ্মীরী তাঁহার মৃত্যু তারিখ নির্দেশক একটি চরণ রচনা করেন ঃ

طور معنی بود روشن ار کلیم

এই চরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির দ্বারা ১০৬১ সংখ্যাটিই পাওয়া যায় (কালিমাতু'শ-শু'আরা', শায়খ মুবারাক 'আলী কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ. ১৬)। শেরখান লোদী তাঁহার মৃত্যু ১০৬২ হিজরীতে হয় বলিয়া লিখিয়াছেন (কিন্তু উহা ভ্রমমুক্ত নহে)। তিনি কবির সমাধি লাহোরের উপকণ্ঠে কোন একটি গ্রামে বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন (মির্‌আতু'ল-খায়াল, পৃ. ১১৯)। তবে উহাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আতিশকাদা'র লেখক তাঁহার কবর কাশ্মীরেই রহিয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন (আতিশকাদাহ, ইরানী সং, ১৩৩৭, সৌর, পৃ. ২৫৪)।

রচনাবলী ঃ "জাফারনামাহ-ই শাহজাহান"-কুদসী উহা রচনার কাজ শুরু করেন এবং কালীম তাঁহার সেই আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিক্ষিপ্ততাও উলট পালট লক্ষ্য করা যায়। কেননা এইগুলি তদীয় দীওয়ান-এও পাওয়া যায় এবং কোনও কোনও অংশে পুনরাবৃত্তি একাধিকবারও ঘটিয়াছে; অবশ্য এই পুনরাবৃত্তিকালে কিছু হেরফেরও ঘটিয়াছে –সব ক্ষেত্রে হুবহু পুনরাবৃত্তি নহে।

(১) উহার প্রথম অধ্যায় জালালু'দ-দীন মুহাম্মাদ তাবাতাবাঈর ভূমিকা সম্বলিত; (২) এই অধ্যায় "একাদশ বর্ষের কাহিনীর আরম্ভ" এই শিরোনাম শুরু হইয়াছে; (৩) উহাতে রাদীফ-এর ধারা অনুযায়ী কাসীদাসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে; (৪) উহা জাফারনামার সুদীর্ঘ ও সংশ্লিষ্ট অংশ। উহাতে শাহজাহানের অভিষেক ও রাজত্বের সূচনাকালের কোনও কোনও ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে;(৫) সাকীনামাহ; (৬) কাশ্মীরের প্রশংসাসম্বলিত মাছনাবী; (৭) সাকীনামারই পুনরাবৃত্তি–ঈষৎ পরিবর্তনসহ; (৮) উহা জাফার নামারই আর একটি অংশ–যাহা চতুর্থ ভাগের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উহাতে ঐ সমস্ত ইমারত, বিশ্লেষত দিল্লীর জামি' মসজিদ (প্রতিষ্ঠা সাল ১০৬৪ হি.)-এর কথা বিবৃত হইয়াছে, যেইগুলি দাক্ষিণাত্য অভিযান

সমাপ্ত করিয়া শাহজাহানের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর তৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। উহার পত্রক ১ক-এ ১৭৪২ হি. সালসম্বলিত একটি সীলমোহরও অঙ্কিত রহিয়াছে।

"পাদশাহনামাহ" শাহজাহান কবি কালীমকে তাঁহার রাজত্ব কালের ইতিহাস মাছনাবী কাব্যে রচনার জন্য আদেশ করেন। কবি তাঁহার কাশ্মীর অবস্থানকালে উহা রচনা করেন। এই মাছনাবী কাব্যখানা পাঁচটি অধ্যায়সম্বলিত ঃ (১) শাহজাহানের প্রাথমিক জীবন বা বাল্যকালের বিবরণ; (২) গ্রন্থের ভূমিকার কতক অংশ এবং শাহজাহানের পিতৃপুরুষ অর্থাৎ আমীর তায়মূর হইতে শুরু করিয়া হুমায়ূন পর্যন্ত বিবরণ; (৩) শাহজাহানের রাজত্বকালের সূচনাপর্ব অর্থাৎ তাঁহার অভিষেক হইতে জাফার খানের তিব্বত অভিযান (১০৪৬-৪৭ হি.) পর্যন্ত কালের বিবরণ; (৪) ভূমিকাপর্ব যাহা নবীজীর মি'রাজ হইতে শুরু করিয়া শাহজাহানের জন্মকাল পর্যন্ত বিস্তৃত কালের বিবরণসম্বলিত; (৫) কাশ্মীর প্রশস্তি।

মাছনাবী-ই পাদশাহনামার নাম Sprenger-Gi অযোধ্যা ক্যাটালগের ৪৫৪ পৃষ্ঠায় "শাহান-শাহ নামা-ই কালীম"-রূপে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়া মিউনিক ক্যাটালগ, পৃ. ৯৪ দ্রষ্টব্য। হুসায়ন পারতাত-ই বায়দা'ঈ লিখিয়াছেন যে, এই মাছনাবীখানা ইরানের জাতীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। উহাতে প্রায় পনের সহস্র শ্লোক রহিয়াছে (দীওয়ান-ই কালীম, ভূমিকা, মুদ্রণে চাপ্-খানাহ-ই হায়দারী, ইরান ১৩৩৬ হি. সৌর, পৃ. (يد =১৪)।

উপরিউক্ত বৃহৎ কলেবরের মাছনাবী গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও কবি কালীম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কলেবরের মাছনাবীও লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

তা'রীফ-ই আক্‌বার আবাদ ঃ কবি কালীম কোনও এক সময় আকবার আবাদে (আগ্রায়)-ও অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব আকবার আবাদের গুণগান করিয়াও তিনি 'মাছনাবী' কাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, আকবার আবাদের গলিগুলি আঁকাবাঁকা। বসতি অত্যন্ত ঘন। হর্ম্যমালা কঠিন প্রস্তরে নির্মিত। প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড অপূর্ব কারুকার্যখচিত। কারুকার্যের এই বাহার দেখিয়া আকবার আবাদের গলিগুলিকে প্রবাদখ্যাত পারস্যের প্রসিদ্ধ শিল্পী মানীর বিখ্যাত চিত্রাঙ্কন গ্রন্থ "আরঝাঙ্গ'-এর শিল্পকর্মসমূহের মূর্ত রূপ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রতিটি প্রাসাদের দরজার স্তম্ভদৃষ্টে মনে হয়, ফার্হাদের আত্মা যেন এক ঠায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ঃ

بپاے ہر بناے اکبر آباد
بیک پا ایستاده روح فرهاد

"প্রতিটি প্রাসাদ খিলান আকবার আবাদের
এক ঠায় দাঁড়াইয়া যেন রূহ ফরহাদের।"

উক্ত মাছনাবীতে কবি কালীম আগ্রার সমসাময়িক পরিবেশের সার্থক চিত্রায়ণ করিয়াছেন। পেশাজীবীদের মধ্যে মহাজন, বস্ত্র ব্যবসায়ী, আতর বিক্রেতা, পান বিক্রেতা, পোদ্দার, দর্জি ও ধোপা-প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। জনৈক পান বিক্রেতা সম্পর্কে আছে ঃ

قرارے نیست بر اقرار ایشان
ورق گرداندن آمد کار ایشان

কবি কালীম উপমহাদেশের অধিবাসীদের মেহমানদারী দর্শনে অভিভূত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং উহাও তাঁহার রচনায় স্থান পায়। শাহী দরবারের সহিত সংশিষ্ট ছিলেন বিধায় এইরূপ বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যদ্দারা সেইকালের ইতিহাস মূর্ত হইয়া উঠে।

"বাগ-ই জাহান আরা" ঃ এই মাছনাবীখানা শাহ্যাদী জাহান আরার বাগান ও প্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ণনায় রচিত। শাহ্যাদীর মহলের সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি উহাকে "ভাগ্যবানের নাসীব যথা" এবং উহার উচ্চতা বর্ণনা করিতে গিয়া উহাকে "মহৎজনের উদার মানস হেন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ঃ উহাতে যেই পাথর বসান হইয়াছে উহা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ, পরিষ্কার। সুগন্ধিময় লতাপাতার চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত। এ যেন স্বর্গপুরীর প্রাসাদ কোনও ! উহার তিনদিকে উদ্যান। সম্মুখ দিয়া বহমান স্রোতস্বিনী। উহার প্রতিটি ঢেউয়ের দোলা যেন প্রেমাস্পদের যুলফি হেন চিত্তহারী ও আনন্দদায়ক।

কাশ্মীরের **'বাগ-ই ফারাহ বাখ্শ'** ঃ শাহজাহানের আমলের বাগ-বাগিচা দর্শনে সেই কালের সৌন্দর্য প্রেম ও উন্নত রুচিবোধের পরিচয় মিলে। লাহোরের মত কাশ্মীরেও তিনি "শালামার বাগ" নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই উদ্যানটিরই নামকরণ করা হয় "বাগ-ই-ফারাহ বাখ্শ" বা আনন্দদায়িনী উদ্যান। "ব্যাগ-ই ফারাহ বাখ্শ" গ্রন্থখানায় কালীম সেইখানকার সুদৃশ্য চানার বৃক্ষ (Plane-tree), প্রশস্ত কৃত্রিম হ্রদসমূহ এবং ইহাদের প্রান্তের বর্ণনা দিয়াছেন।

"কাহাত-ই দাকান" (দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষ) ঃ নিজামু'ল-মুলকের আমলে খরার দরুন দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অধিবাসীদের অনেকেকেই অভুক্ত অবস্থায় দিনপাত করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় মহামারী। এই প্রসঙ্গে কবি কালীম তাঁহার এই মাছনাবীতে দাক্ষিণাত্যবাসীদের করুণ অবস্থা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন।

"তা'রীফ-ই জাঙ্গ-ই ফীল" (হস্তীর সহিত যুদ্ধের ইতিকথা) ঃ শাহ্যাদা আওরাঙ্গযীবের হাতীর সহিত যুদ্ধের কাহিনী সুবিদিত। কবি কালীম ঐতিহাসিক যুদ্ধটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি সেই যুদ্ধের বিশদবিবরণ দিয়াছেন।

এইগুলি ছাড়া আরও কতিপয় মাছনাবী গ্রন্থ ("দাওলাত খানা-ই আক্‌বারাবাদ', "দাওলাত খানা-ই পাদশাহী", "সু'উবাত-ই রাহ্-ই কাশ্মীর" প্রভৃতি) তাঁহার রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

শাহজাহানের আমলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যেই সংস্কৃতির প্রভাব আজও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, কবি কালীমের মাছনাবীসমূহে উহার চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ক্ষুদ্র কলেবর মাছনাবী কাব্যসমূহে তিনি যেই দক্ষতার সহিত হিন্দী শব্দসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেন ঐ শব্দগুলিও ফারসী ভাষায় বেশ পরিচিত ও স্বাভাবিক। আমরা দেখি, কবি 'উরফী আজীবন ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একমাত্র হিন্দী শব্দ "ঝকড়" (جهکڑ) নিঃসৃত হইয়াছে। ইহাও তিনি এমনভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যে, মনে হয় যেন কোন ফারসী শব্দই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। কবি তালিব আমুলী জাহাঙ্গীরের উদ্ভাবিত একটি মাত্র শব্দ "রামরাঙ্গী" (رام رنگی) তাঁহার একটি কবিতায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কালীম ভারতবর্ষের কোনও কোনও পেশার শব্দসমূহ নিজ ভাষার সাথে একীভূত করিয়া স্বীয় কবিতায় এমনভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যে, শব্দগুলি যে অপরিচিত বা দুর্বোধ্য এমন কিছু মনে হয় না। যেইসব হিন্দী শব্দ তাঁহার মুখে বা কলমে ব্যবহৃত হইয়াছে ঐগুলি যেন ফারসী ভাষারই বহুল পরিচিত শব্দ। যেমন–মহাজন, তাম্বুলী (পান

বিক্রেতা), ধোবী (ধোপা), নীম, কেওড়া, বিড়ি, পান, কাটারা, আবরী প্রভৃতি।

শিব্লীর মতে কালীমের মাছনাবীসমূহ নিম্নমানের এবং সাধারণ পর্যায়ের (শি'রু'ল-'আজাম, লক্ষ্ণৌ সং, ৩খ, ২১০ পৃ). । কিন্তু তাঁহার মতের সহিত দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ রহিয়াছে। কালীমের মাছনাবীসমূহের গুরুত্ব এইদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার এই কবিতাগুলির মাধ্যম সেইকালের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কতিপয় সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সত্য কথা এই যে, তাঁহার কবিতাসমূহের সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী না হইলেও একেবারে ফেলিয়া দেওয়ার মতও নহে।

কবি কালীম কিছু কিছু কিত'আ (খণ্ড কবিতা) জাতীয় কবিতাও রচনা করিয়াছেন, যেইগুলি শাহী স্মৃতিচিহ্নসমূহের গায়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার একটি কিত'আ শাহজাহানী আমলের একটি বিশেষ স্মারক "মুরাক্কা'-ই গুল্শান"। উহার অপর নাম "মুরাক্কা'-ই শাহজাহানী" বা শাহজাহানী এল্বাম। নাদির শাহ তাঁহার ভারত আক্রমণের পর যেইসব মহামূল্যবান দ্রব্য ইরানে লুণ্ঠন করিয়া নিয়া যান, তন্মধ্যে এই মহামূল্য স্মারকটি অন্যতম। এখন উহা রাজকীয় যাদুঘরে (موزهٔ سلطنتی) সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহাতে ইরান ও ভারতের অনেক বাদশাহ, মুগল শাহযাদাহ, শাহযাদী, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ ও শিল্পী-সাহিত্যিকের চিত্র রহিয়াছে। মুহাম্মাদ ফাকীরুল্লাহ, মীর মুহাম্মদ হাশিম নাদির সামার-কান্দী প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পী এই চিত্রগুলি অঙ্কন করেন। চিত্রগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। চিত্রগুলির চতুষ্পার্শ্বে সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত সোনালী হাশিয়ার উপর অঙ্কিত কোনও কোনও রেখা এতই সূক্ষ্ম যে, খালি চক্ষে তাহা দেখাও দুষ্কর। মনুষ্য চিত্রগুলিতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যুদ্ধাস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্রাদির খুঁটিনাটি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। চিত্র ছাড়াও যশস্বী চিত্রকরদের হস্তলিপির নমুনাও উহাতে রহিয়াছে। এই এলবামটির প্রশস্তি বর্ণনায় কবি কালীম দুইটি খণ্ড কবিতা রচনা করেন। একটি কবিতার সর্বশেষ পংক্তি দুইটি হইল ঃ

چندین هزار نقش بدیع انتخاب کرد
دوران که شد مرقع شاه جهانش نام

"অপূর্ব সহস্রকর চিত্র সমাহার
নির্বাচিত। শাহজাহানী এলবাম নাম তার।"

অপর কবিতাটির দুইটি শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, জাহাঙ্গীরের আমলে এলবামটির নির্মাণকার্য শুরু হইয়াছিল এবং শাহজাহানের আমলে উহা সমাপ্ত হইয়াছিল।

ফরমায়েশী কবিতা রচনায় কালীম ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কোনও শাহী মহল বা কোনও আমীরের নূতন ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হইলে, বাদশাহী প্রাসাদের পর্দা বা শাহী ঢাল নির্মিত হইয়া আসিলে, কোনও কাল্‌মদান বা বৃহৎ কলেবরের পুস্তক শাহী দরবারে পেশ হইলেই কবি কালীমের ডাক পড়িত। তিনি তাঁহার স্মারকলিপি লিখিয়া দিতেন [সারখোশ-এর বর্ণনা অনুসারে শাহী দরবারের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য বস্তুর উপরই তাঁহার কবিতা খোদাই বা অঙ্কিত হইত (কালিমাতু'শ-শু'আরা', লাহোর ১৯৪২ খৃ., লাহোর ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৯৪)।

ফরমায়েশী কবিতা লেখার কৃতিত্বের জন্য শাহজাহান দুই দুই বার তাঁহাকে স্বর্ণ দ্বারা ওযন করাইয়া সেই পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন (ঐ, হাশিয়া ঃ, পৃ. ৯৪)।

সন তারিখ নির্দেশক বাক্য রচনায়ও কবি কালীম অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই জাতীয় বাক্যসমূহের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাদের অনেকগুলি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তির ইঙ্গিতবহ। নিম্নে কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হইল ঃ

দারা শুকোহ্-এর জন্ম উপলক্ষে তিনি লিখেন ঃ

گل اولین گلستان شاهی (۱۰۲٤ ﻫ)

"শাহী উদ্যানের প্রথম কুসুম।" উল্লেখ্য, শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারা শুকোহ্-ই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই বাক্যের ইঙ্গিত ছিল ১০২৪ হিজরীর প্রতি।

মৃগয়া ক্ষেত্রে কাজ সমাপ্ত হওয়া উপলক্ষে তিনি লিখেন ঃ

صید گاه نشاط و مسکن عیش (۱۰٤٦ ﻫ)

"প্রমোদের মৃগয়া ক্ষেত্র, বিলাসপুরী।" ১০৪৬ হি. নির্দেশক। কাশ্মীরের শাহী ইমারত নির্মাণের সাল নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি লিখেনঃ

راحت آباد اهل عرفان (۱۰٥٤ ﻫ)

"তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রমোদ ভবন।" নির্দেশিত সন ১০৫৪ হি.। কবি মালিক কুম্মী-র ইনতিকাল উপলক্ষে তাঁহার রচিত পংক্তিটি ছিল।

بگفتا : "او سر اهل سخن بود" (۱۰۲٥ ﻫ)

কবি বলেন "তিনি ছিলেন কথাশিল্পী কবিকুলের সর্দার।" নির্দেশিত সন ১০২৫ হি.।

আওরাঙ্গযীবের বিবাহ তারিখ নির্দেশক ঃ

دو گوهر بیك عقد دورن کشیده (۱۰٤۷ ﻫ)

"দুইটি মণি কালের এক সূত্রে গাঁথা হইল।" (নির্দেশিত সন ১০৪৭ হি.)।

কালীমের গাযালসমূহে আমরা এমন এক উপস্থাপনী রীতি ও চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাই যাহা ছিল সম্রাট আকবরের যুগের কবিদের বৈশিষ্ট্য। সেই যুগটি ছিল দর্শন ও দার্শনিকতার যুগ। কবিগণ উহা দ্বারা প্রভাবিত হইবেন—ইহা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে কল্পনার জটিল জাল বুনা এবং হেঁয়ালীপূর্ণ কথার মালা গাঁথার মধ্যেই এই দার্শনিকতার অভিব্যক্তি ঘটিবে কেন? মালিকু'শ-শু'আরা' বাহার-এর অভিমত ইহাই (সাবৃক শিনাসী, ৩খ, ২৫৯, ২৬৬; শিহাবী, রাওয়াবিত)। যাহাই হউক, দার্শনিক বিষয়বস্তু ও বিচার বিশ্লেষণের যেই প্রকাশভঙ্গি কবি কালীম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিরাভরণ হওয়াটা ছিল অসম্ভব। এই বৈশিষ্ট্য কালীমের কাব্যেও পাওয়া যায়। দার্শনিকসুলভ চিন্তাধারা ও বর্ণনাভঙ্গি ছাড়াও তিনি কবিসুলভ রূপক ব্যবহার করিয়াছেন অনেক। তাই অনেক আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশে তিনি বাস্তব রূপের আশ্রয় নিয়াছেন। শাহজাহানী আমলের কবিদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালীমের কবিতাসমূহে উহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যথা ঃ

ماز آغاز و زانجام جهان بے خبریم
اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است

"আদি অন্ত এই পৃথিবীর আমার কিছুই নাইকো জানা,
পাই না খুঁজে এই গ্রন্থটির আদি অন্তের পাও দু'খানা।"

এইখানে এই বিশ্বভুবনকে কালীম এই গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং উহার আদি ও অন্তকে গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্লোকটি দার্শনিক চিন্তার সহিত রূপক ব্যবহারেরও একটি উত্তম নমুনা বটে।

উচ্চতর কল্পনাশক্তিও এই উপমহাদেশের কবিদের একটি বৈশিষ্ট্য। কবি কালীমের কবিতাসমূহ পাঠে বুঝা যায় যে, এই রূপ-রস-রঙ্গভরা বসুন্ধরার প্রতিটি বস্তুর উপরই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। তাঁহার উচ্চতর কল্পনা শক্তির ফলে এইখানকার প্রতিটি দৃশ্যই তাঁহার কল্পনা ক্ষেত্রে নূতন নূতনরূপে ধরা দিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

بعد ازیں تاریکی شبها بخود خوش کن کلیم
شکوه کم کن ذز چراغ اختران روغن نماند

কবি কালীম ও তদীয় সমসাময়িক কবিগণ এই বিশেষ ধারার অনুসরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দার্শনিকতার স্থান দখল করিয়া লয় বাস্তববাদিতা। বর্ণনাভঙ্গি সরল ও সহজবোধ্য হইয়া যায়। জাহানগীর ও শাহজাহানের আমলের কবিদের বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল ইহাই। কবি কালীমও জনপ্রিয়তা লাভের জন্য এই পদ্ধতি অলম্বন করেন।

کز متاع سخن امروز کساد است کلیم
تازه کن طرز کـه در چشم خریدار آید

কালীমের কবিতায় রূপক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত লক্ষণীয়। উচ্চতর ভাব প্রকাশের জন্য ইহার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন যুগের কবিগণ রূপক ও কাহিনীর আশ্রয় নিতেন। ধীরে ধীরে উহা এমনই রূপ পরিগ্রহ করে যে, রূপক ও উপমা একটি শ্লোকে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কবি সা'ইব ও কালীম ছিলেন এই ধরনের রূপক ও উপমা আশ্রয়ী কবি, বিশেষত কালীম উপমা প্রয়োগের রীতির উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণত তিনি কোনও শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে উপমা প্রয়োগে তিনি উহার যথার্থতার প্রমাণ করেন। উদাহরণস্বরূপ ঃ

قطع امید کرده نخواهد نعیم دهر
شاخ بریده را نظرے بر بهار نیست

এই পংক্তিদ্বয়ের প্রথম পংক্তিতে বলা হইয়াছে যে, হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি পার্থিব প্রাচুর্য ও সম্পদ সম্পর্কে মাথা ঘামায় না; দ্বিতীয় পংক্তিতে উহার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করিতেছেন ঃ কাণ্ড হইতে কর্তিত বৃক্ষশাখা বসন্তের শ্যামলিমার আশা করিতে পারে না।

কালীমের মাছনাবী ও গাযালসমূহের বাক্যবিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার, বাগধারা প্রয়োগ অত্যন্ত সার্থক। অনবদ্যতা তাঁহার কবিতাসমূহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইরানী কবিগণের জীবনীকারগণ যেই সমস্ত জীবনী লিখিয়াছেন, সেইগুলি দেখিলে একটি কথা স্পষ্টতই নজরে পড়ে যে, কোনও ইরানী কবি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করা মাত্রই জীবনীকারগণ যেন ইরানী কবিদের কাতার হইতে তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া বসিয়াছেন। এমনকি 'উরফী নাজীরী, সা'ইব ও কুদ্সীর মত যশস্বী কবিগণের নাম ছাড়া আর কিছুই তাঁহাদের আলোচনায় স্থান পায় নাই।

কবি কালীম সম্পর্কে রিদা যাদাই শাফাক দুই চার ছত্র লিখাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক অন্য কেহই তাঁহার সম্পর্কে কোনও আলোচনা করেন নাই। অবশ্য মুগল সম্রাট মুহাম্মাদ শাহের সমসাময়িক জনৈক ইরানী জীবনীকার 'আলী কুলী ওয়ালাহ্ দাগিস্তানী তদীয় আলোচনা গ্রন্থে (রিয়াদুশ-শু'আরা', পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নং PFI ১৭) তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার কতিপয় নির্বাচিত গাযাল ও মাছনাবী উদ্ধৃত করিয়াছেন (পত্রক ১৬৬খ হইতে ১৭৫ ক পর্যন্ত)। এতদ্ব্যতীত তাযকিরা-ই নাস্‌র আবাদীতেও কালীমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পাইয়াছে, যাহার বরাত এই নিবন্ধে রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হামীদ, পাদ্শাহনামাহ, কলিকাতা ১৮৭২ খৃ., ১খ, ৩৫৩-৩৫৬; (২) আহমাদ 'আলী সান্দীলাবী, তাযকিরা-ই মাখযান আল-গারা'ইব. সম্পা. মুহাম্মাদ বাকির, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত; (৩) মীরযা মুহাম্মাদ তাহির, তাযকিরা-ই নাস্‌র আবাদী, তেহরান ১৩৩৭ হি.; (৪) মুহাম্মাদ আফ্দাল সারখোশ, কালিমাতু'শ-শু'আরা', লাহোর সং.; (৫) শেরখান লোধী, মিরআতু'ল-খায়াল,বোম্বাই ১৩২৪ হি.; (৬) 'আলী কুলী ওয়ালাহ্ দাগিস্তানী, রিয়াদু'শ-শু'আরা', পাণ্ডু পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লাহোর, নং PFI ১৭) (৭) লুতফ্ 'আলী বেগ আযার, আতিশকাদা-ই আযার, ইরান ১৩৩৭ সৌর, নির্ঘণ্ট; (৮) শিব্লী নু'মানী, শি'রু'ল-'আজাম, লক্ষৌ সং., ৩খ, ২০৫-২৩০; (৯) তারীখ আদাবিয়্যাত-ই মুসলমানান-ই পাকিস্তান ওয়া হিন্দ, ৪খ, ফারসী আদাব, সম্পা. মাকবূল বেগ বাদাখ্শানী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭১ খৃ.; (১০) Rieu, Catalogue of the Persian Mss. in the British Museum; (১১) Ethe, Catalogue of the Persian Mss. in the Library of India Office; (১২) Sprenger. A Catalogue of the Mss ... of the Libraries of the Kings of Oudh.

মাক্বূল বেগ বাদাখশানী (দা. মা. ই.)/ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

কালীমী (দ্র. য়াহূদ)

কালীমুল্লাহ (দ্র. য়াহূদ)

কালীমুল্লাহ্ জাহানাবাদী (شاه کلیم الله جهان ابادی)ঃ(শাহ) ইব্ন নূরুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ-আলমি'মার (স্থপিত), আস-সিদ্দীকী, তাঁহার সময়কাল চিশ্তী ওয়ালীগণের অন্যতম প্রধান। তিনি পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের এই তারীকার পুনরুজ্জীবনের এমন এক সময়ে অবদান রাখেন যখন মুসলিম সমাজ চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। তিনি শাহজাহানাবাদে (দিল্লী) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার জাহানাবাদী নিস্‌বা-র উৎস। তিনি ২৪ জুমাদা'ল-আখিরা, ১০৬০/২৪ জুন, ১৬৫০ সালে আওরাঙ্গযীবের সিংহাসনে আরোহণের আট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা, যাঁহারা পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রী, মূলত খোজান্দ (خجند) (দ্র.) হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই বিখ্যাত লাল কেল্লা ও রাজকীয় দিল্লী জামি' মসজিদ নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। অনেকগুলি উৎকীর্ণ লিপি, যেগুলির অধিকাংশই কুরআনের আয়াত ও আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম [আল-আসমা'উ'ল-হুসানা দ্র.] মসজিদ অলংকৃত করিবার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেইগুলি তাঁহার পিতা উস্তাদ নূরুল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তিনি শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দিহ্লাবী (দ্র.)-এর পিতৃব্য আবু'র্ -রিদা মুহাম্মাদসহ বহু স্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তির নিকট তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মদীনায় হিজরতকারী এবং তথায় বসতি স্থাপনকারী চিশ্তিয়া তারীকার অনুসারী য়াহ্য়া ইব্ন মাহ্মূদ আল-গুজরাতীর (মৃ. ১১০১/১৬৮৯) নিকট চিশতিয়া তারীকায় বায়'আত প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি হাজ্জ পালন ও যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে হিজাযে চলিয়া যান এবং তথায় বহুকাল যাবত বাস করেন। হিজাযে অবস্থান কালে তিনি মীর মুহতারাম ও শায়খ

মুহাম্মাদ গিয়াছ কর্তৃক নাকশ্বান্দী ও কাদিরিয়্যা তারীকার সহিত পরিচিত হন (তু. নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৬খ, ২৪০-১)। দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি খানিম কা বাযার নামক স্থানে লাল কিল্লা ও জামি' মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি মসজিদে বাস করিতে থাকেন। সেখানে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসায় বহু সংখ্যক ছাত্র ভীড় জমায় এবং বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। সূফী মির্যা মাজহার জান-ই জানান একদা ঐ মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে সাহীহ আল-বুখারী পড়াইতে দেখিয়াছেন। এই মাদ্রাসাটি সম্ভবত যে মসজিদের হুজরায় তিনি বাস করিতেন তাহার অংশবিশেষ ছিল। মির্যা মুহাম্মাদ আখতার গুরগানীর মতে (তাযকিরা-ই আওলিয়া-ই হিন্দ ওয়া পাকিস্তান, লাহোর ১৯৫৪ খৃ. (?) ২খ, ২৭২) পরবর্তীকালে সম্রাট আওরাঙ্গযীব তাঁহার জন্য একটি খানকাহ নির্মাণ করিতে আদেশ দেন। ইহা ছিল 'ইবাদাতখানা, মাজলিসখানা, লঙ্গরখানা ও ব্যক্তিগত বাসস্থানসম্বলিত ইমারতের সমষ্টি। একই লেখকের মতে সম্রাট মুহাম্মাদ মু'আজ্জাম বাহাদুর শাহ ১ম (দ্র.) বান্দা বাইরাগীর বিদ্রোহী শিখদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার সময় তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে (১১২৩/১৭১১)। তাঁহার শাগরিদ হন। কালীমুল্লাহ প্রধানত ভক্ত ও শাগরিদদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকনের উপর নির্ভর করিয়া কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া ফাররুখ সিয়ার (দ্র.) তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল শাসনামলে তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত আমীরু'ল-উমারা' হুসায়ন 'আলী খানের হস্তে শাস্তির ভয় করিয়া সেই সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। হুসায়ন 'আলী খান ভারতের ইতিহাস সায়্যিদ বংশের একজন বাদশাহ হিসাবে পরিচিত।

তিনি সাধারণত তাঁহার অনুসারীদিগকে শাসক ও বাদশাহদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করিতেন এবং এমনকি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত না করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আমলে সামা'-র প্রতি তাঁহার কোন সমর্থন ছিল না যদিও তিনি নিজে উপভোগ করিতেন। তাঁহার একটি চিঠিতে (নং ১১০) তিনি অপরিপক্ক ও কৃত্রিম সূফীদিগকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এই সুফীদিগকে তিনি "শারী'আত পরিত্যাগকারী মুলহিদ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অমুসলিমদের সহিত ভালো সম্পর্ক বজায় রাখাকে সমর্থন করিতেন এইজন্য যে, তাহারা এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের শিক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হইবে। একইভাবে তিনি লোকসঙ্গ এড়াইয়া চলেন নাই, বরং তাহাদের সঙ্গ পসন্দ করিতেন। তিনি ওয়াহ্দাতু'ল-উজূদের জটিল সমস্যার অবিমৃষ্য আলোচনা নিরুৎসাহিত করিতেন। সারা জীবন তিনি ইসলামের গৌরব ও বিস্তৃতির জন্য জিহাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তরসূরি শাহ্ ওয়ালিয়ুল্লাহ্ দিহ্লাবীর মতো তাঁহার প্রচেষ্টাও স্বল্প পরিমাণেই সফলতা লাভ করে।

তিনি ২৪ রাবী'উ'ল-আওওয়াল ১১৪২/১৭ অক্টোবর, ১৭২৯ স্যালে অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত খানকাহর সীমানার ভেতরেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার ইনতিকালের সাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে : ১১৪০/১৭২৭, ১১৪১/১৭২৮ (তু. নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৬খ, ২৪১), ১১৪২/১৭২৯ (সাওয়া' আস্-সাবীল, তির ৬, ২৪১-এর পরিশিষ্ট) এবং গুলাম 'আলী আযাদ বিলগ্রামীর মতে ১১৪৩/১৭৩০ (তু. মা'আছিরু'ল-কিরাম, হায়দরাবাদ ১৯১৭ খৃ., ৪২), ১১৪২/১৭২৯ সালটিকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং অধিকাংশ সূত্রই এই ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছিয়াছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর তাঁহার খানকাহ যেই স্থানে অবস্থিত ছিল সেই স্থানটি বৃটিশদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। তাঁহার কবরটিকে কেবল রেহাই দেওয়া হয়। কয়েক দশকের জন্য ইহা অবহেলা ও মেরামতবিহীন অবস্থায় থাকে এবং পরে বাহাওয়ালপুর (দ্র.)-এর আধ্যাত্মিক নেতা খাজা গুলাম ফারীদ ইহার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। পরবর্তীকালে তাঁহার এক উত্তরসূরি ইহা মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি তাঁহার কবরের চারিদিকে একটি সুন্দর খোদাইকৃত পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করেন এবং ইহার মেঝে মর্মর পাথর দ্বারা বাঁধাই করিয়া দেন। কবরটির অস্তিত্ব এখনও বিরাজমান এবং লাল কেল্লা ও জামি' মাসজিদের মধ্যে ইহা একমাত্র অবশিষ্ট ইমারত। তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রতি বৎসর তাঁহার মাযারে 'উরস্ হয়। শেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফার (দ্র.) এবং রাজপরিবারের অন্যান্য যুবরাজ নিয়মিতভাবে এই 'উরসে হাযির থাকিতেন।

তাঁহার প্রধান খলীফা ছিলেন নিজামু'দ-দীন আওরাঙ্গাবাদী। তাঁহার নিকট তিনি তাসাওউফের সমস্যা আলোচনাসম্বলিত বেশ কিছু চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্রগণ অবশ্য সকলেই তাঁহার ইনতিকালের সময় নাবালক ছিল।

তিনি ২০টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে করা হয়। তন্মধ্যে রহিয়াছে; (১) সাওয়া'উ'স-সাবীল (সম্পা. দিল্লী ১৩৪৩/১৯২৫), মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত। এতদ্‌সঙ্গে উর্দূ ভাষায় বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সমস্যার আলোচনা রহিয়াছে; (২) ইরশাদাত-ই কালীমী (সম্পা. দিল্লী ১৩৪৬/১৯২৭), তাঁহার প্রধান খলীফা নিজামু'দ-দীন আওরাঙ্গাবাদীর নিকট লিখিত চিঠিপত্র। ইহার সহিত উর্দূ অনুবাদ রহিয়াছে; (৩) কাশকূল (ফরাসী ভাষায় রচিত, দিল্লী n. d.)। ইহা তাঁহার ৪১ বৎসর বয়সে ১১০১/১৬৯০ সালে রচিত এবং তাসাওউফ সংক্রান্ত আলোচনা বলিয়া বর্ণিত; (৪) মুরাককা' (উর্দূ অনুবাদসহ ফারসী ভাষায় রচিত, দিল্লী n. d.)। ইহা ৩ নম্বরে উল্লিখিত রচনার সহিত অতিরিক্ত সংযোজন। ইহাতে আছে চিশ্তিয়া তারীকার অনুসারীদের দৈনিক যিক্র; (৫) মাকতূবাত (দিল্লী n. d.) সংখ্যায় ১৩২টি । ইহা তাঁহার প্রধান সাগরিদদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন নিজামু'দ-দীন আওরাঙ্গাবাদী; ইহাতে ব্যক্তিগত ও একান্ত বিষয়সমূহেরও আলোচনা আছে; (৬) তিলকা 'আশারাতু'ন কামিলা, আরবী ভাষায় রচিত (সম্পা উর্দূ অনুবাদসহ, দিল্লীতে n. d.); ইহাতে রামাদানের ইতিকাফের (দ্র.) সময় সমাধানকৃত বলিয়া দাবী করা তাসাওউফের দশটি সমস্যা আলোচিত হইয়াছে; (৭) মালাবুদ্দা ফি'ত-তাসাওউফ (সম্পা. দিল্লী n. d.উর্দূ অনুবাদসহ আরবী ভাষায় রচিত) ইহাতে সুলূক ও তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে; (৮) তাঁহার পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া তিনি রিসালা তাশরীহু'ল-আফলাক-ই 'আমিলী, মুহাশ্শা বি'ল-ফারিসিয়া নামে জ্যোতিযশাস্ত্রের উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (পাণ্ডুলিপি, দিল্লীর নাযীরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীতে রহিয়াছে)। তিনি ইব্ন সীনা'র কানূনের উপরেও টীকা ও ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, যাহার একটি পাণ্ডুলিপি রামপুরের রাযা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। কুর'আনুল-কুরআনে নামে কুরআনের একটি সুন্দর টীকা ও ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছেন;

ইহা কুরআনের পৃষ্ঠার প্রান্তে মুদ্রিত হইয়াছিল (সম্পা. মীরুত ১৯২০ খৃ.)। তাঁহাকে কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা'শ-শী'আ বা রিসালা রাদ্দ-ই রাওয়াফিদ ও তাসনীমের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি তাসাওউফের কতিপয় সমস্যা লইয়া রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতু'ল-আসফিয়া', কানপুর ১৯১৪ খৃ., ১খ, ৪৯৪-৫; (২) মুহাম্মাদ হুসায়ন মুরাদাবাদী, আনওয়ারু'ল-'আরিফীন, বেরিলি ১২৯০/১৮৭৩; ৪২৯-৩০; (৩) গুল মুহাম্মাদ আহ্মাদপুরী, তাকমিলা-ই সিয়ারু'ল-আওলিয়া', দিল্লী ১৩১২/১৮৯৪, ৭৯-৮৫; (৪) নাজমু'দ-দীন, মানাকিবু'ল-মাহ্বূবীন, রামপুর ১২৮৯/১৮৭২, ৪৫-৬; (৫) আযাদ বিলগিরামী, মা'আছিরু'ল-কিরাম, হায়রাবাদ ১৯১০ খৃ., ১খ, ৪২; (৬) আহমাদ আখতার মীরযা, মানাকিব-ই ফারীদী, দিল্লী ১৩১৪/১৮৯৬, ৩৪; (৭) ঐ লেখক, তাযকিরা-ই আওলিয়া'-ই হিন্দ (ওয়া পাকিস্তান), লাহোর ১৯৫৪ খৃ. (?), ২খ, ২৭১—২; (৮) রাহ্মান 'আলী, তাযকিরা-ই 'উলামা'-ই হিন্দ, লক্ষ্ণৌ ১৮৯৪ খৃ., ১৭২ (আইয়ূব কাদিরী কর্তৃক উর্দূ অনুবাদ, করাচী ১৯৬১ খৃ., ৩৯৭-৯, সংযোজনসহ); (৯) ফাকীর মুহাম্মাদ, হাদা'ইকু'ল-হানফিয়্যা, লক্ষ্ণৌ ১৯১৪ খৃ., ৪৮৩-৯; (১০) যায়নু'ল-'আবিদীন, তায্কিরাতু'ল-মু'ঈন ফী যিকরি'ল-কামিলীন, বেরিলি ১৮৯০ খৃ., ১৪২-৪; (১১) বাশীরু'দ-দীন আহমাদ, ওয়াকি'আত-ই দারু'ল-হুকুমাত-ই দিল্লী, আগ্রা ১৯০৯ খৃ., ৩খ, ১১৬-৭; (১২) সায়্যিদ আহমাদ ওয়ালিয়ুল্লাহ, য়াদগার-ই দিহ্লী, দিল্লী n. d, ৪৩; (১৩) খালীক আহমাদ নিজামী, তা'রীখ-ই মাশা'ইখ-ই চিশ্ত্, দিল্লী ১৯৫৩ খৃ., ২৩১-২, ৩৬৬-৪২৬ (একটি অত্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ); (১৪) 'আবদু'ল-কাদির, ওয়াক'ই-ই 'আবদু'ল-কাদির খানী, (আইয়্যুব কাদিরী কর্তৃক "ইলম ও 'আমাল" নামক উর্দূ তরজমা, করাচী ১৯৬০ খৃ., ২২২); (১৫) মাকতূবাত-ই কালীমী, দিল্লী ১৩১৫/১৮৯৭ (ব্যক্তিগত ও গোপন বিষয়ের বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গাদি); (১৬) List of Muhammadan and Hindu monuments (ভারত সরকারের একটি প্রকাশনা), কলিকাতা ১৯১৯ খৃ., ১খ, ১৫০ (তাঁহার কবরের স্থাপত্য সম্পর্কিত একটি পরিপূর্ণ বিবরণ); (১৭) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, নুয্হাতু'ল-খাওয়াতির, হায়দরাবাদ ১৩৭৬/১৯৫৮, ৪খ, ২৪০-১; (১৮) দা.মা.ই. ১৭খ, ৩৭৯-৮২।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.²)/ পারসা বেগম

কালীলা ওয়া-দিম্না (كليلة و دمنة) ঃ একটি গ্রন্থের নাম, যাহা রাজপুরুষদিগের জন্য গল্পকারে লিখিত একটি উপদেশমূলক ভারতীয় গ্রন্থ। উহার মুখ্য চরিত্রে দুইটি শৃগাল (কারাতাকা ও দামানাকা) (প্রাচীন সিরীয় অনুবাদে এখনও শব্দ দুইটি কালীলা ও দামনাগ হিসাবে উল্লিখিত)। সংস্কৃত মূল শব্দের বিকৃতির ফলে আরবীতে এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা সংস্কৃত হইতে পাহ্লাবী ভাষায় এবং তাহা হইতে আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। মুসলিম ও খৃস্টীয় উভয় সাহিত্যেই ইহা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিয়াছিল।

১. মূল রচনা ঃ Hertel-এর মতে ভারতীয় মূল গ্রন্থটি জনৈক অজ্ঞাতনামা বিষ্ণোপাসক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সম্ভবত ৩০০ খৃস্টাব্দের দিকে কাশ্মীরে রচিত হইয়াছিল। অবশ্য denarius-এর 'দীনারা'-রূপে অনুলিখন-সম্পর্কিত ইহার সপক্ষে উপস্থাপিত প্রধান যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কারণ সংশ্লিষ্ট গ্রীক বর্ণটির 'i'-এর ন্যায় উচ্চারণটি Hertel-এর ধারণার তুলনায় প্রাচীনতর (আরও দ্র. A. Berriedale Keith, JRAS, 1915, 505)। ইহা একটি ভূমিকা ও পাঁচটি খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিটি খণ্ডই 'তন্ত্র' অর্থাৎ "উত্তম জ্ঞানের উপলক্ষ" নামটি বহন করিত। গ্রন্থটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জীবজন্তুর গল্পের সাহায্যে যুবরাজদিগকে রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। মূল রচনাটির প্রাচীনতম উত্তরসূরীয় সংস্করণ হইতেছে J. Hertel কর্তৃক পুনরাবিষ্কৃত তন্ত্রাখ্যায়িকা (দ্র. Tantrakhyayika, die alteste Fassung des Pacatantra, ভূমিকা ও টীকাসহ সংস্কৃত হইতে অনুবাদে J. Hertel, 2 parts, Leipzig-Berlin 1909)। মূল রচনাটির দ্বিতীয় আরেকটি সমালোচনামূলক সংস্করণ আন্‌কাতন্ত্র (Ancatantra) নামে অভিহিত। J. G. L. Kosegarten একটি সমালোচনাবিহীন মিশ্রণে প্রকাশ করেন (Bonn 1848)। Th. Benfey ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার অনুবাদ সম্পন্ন করেন ঃ Pants-chatantra, funf Bucher indischer Fabeln, Marchen und Erzalungen; ইহা ভূমিকা ও টীকাসহ সংস্কৃত হইতে অনূদিত, দুই খণ্ডে (Leipzig 1859)। এই রচনার ভূমিকায় সর্ব প্রথমে য়ূরোপে ভারতীয় সাহিত্যিক ভাবধারার বিস্তার বিশদভাবে সমীক্ষিত হইয়াছে।

২. পাহ্লাবী অনুবাদ ঃ সাসানী সম্রাট খুসরাও আনূশার-ওয়ান (৫৩১-৫৭৯ খৃ.)-এর আদেশক্রমে তাঁহার চিকিৎসক বুরযোএ পঞ্চতন্ত্রের প্রথমদিকের একটি সংস্করণ সংস্কৃত হইতে পাহ্লাবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং অন্যান্য ভারতীয় সূত্র হইতে গৃহীত একগুচ্ছ উপকথাও সংযোজন করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি (অধ্যায় ১১-১৩, de Sacy) উপকথা মহাভারতের (ঐ, অধ্যায় ১৩৮, ১৩৯, ১১১) দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে। অপর পাঁচখানির (de Sacy-এর ১৪, ১৫ ও ১৮ অধ্যায়ে এবং de Sacy-এর গ্রন্থে অনুপস্থিত মূষিক রাজ্যের কাহিনী, নিম্নে দ্রষ্টব্য) সন্ধান অদ্যাবধি ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। তবে তাহাদের ভারতীয় উৎপত্তি সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। বুরযোএ তাঁহার অনুবাদের প্রারম্ভে একটি আত্মকথামূলক ভূমিকা উপস্থাপন করিয়াছেন যাহা লেখকের প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ উযীর বুযুরমিহ্র স্বহস্তে স্বীয় নামে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন (দ্র. Burzoe's Einleitung zu dem Buch Kalila wa-Dimna, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, Th. Noldeke, Schriften der wissensch. Gesellsch. in Strassburg, fasc. 12, Strasbourg 1912)।

৩. প্রাচীন সুরয়ানী অনুবাদ ঃ বুরযোএ-র পাহ্লাবী অনুবাদটির আর অস্তিত্ব নাই। তবে ৫৭০ খৃস্টাব্দের পূর্বেই ইহা Periodeut Bud কর্তৃক সুরয়ানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদটি মাত্র একটি পাণ্ডুলিপির আকারে টিকিয়া রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে মার্দীনের আশ্রমে এবং পরে মাওসিলের উর্ধ্বতন প্রধান ধর্মযাজকের দফতরে (Patriarch) সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সময়ে প্যারিসে Mgr. Graffin-এর হাতে আসে। Socin কর্তৃক আনীত ইহার একটি ত্রুটিপূর্ণ অনুলিপি হইতে Bickell তাঁহার প্রথম সংস্করণটি প্রস্তুত করেন (Kalilag und Damnag, alte syrische Ubersetzung des indishen Furstenspiegels মূল ও জার্মান অনুবাদে G.

Bickell, ভূমিকা, Th. Benfey, Leipzig 1876)। Sachav কর্তৃক মাওসিলে প্রস্তুতকৃত তিনটি নূতন অনুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে F. Schulthess একটি অনেক অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংস্করণ রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন (Kalila und Dimna, Syriac and German, Berlin 1911)।

৪. আরবী অনুবাদ ঃ প্রায় দুই শতাব্দী পর 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-মুকাফ্‌ফা' [ইব্‌নু'ল-মুকাফ্‌ফা' দ্র.] বুরযোএ-র পাহ্‌লাবী সংস্করণটিকে আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি গ্রন্থটির একটি মৌলিক ভূমিকা লেখেন, সম্ভবত বুরযোএ-র ভূমিকায় ধর্মের অনিশ্চয়তা সংক্রান্ত অংশটি অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পঞ্চতন্ত্রের প্রথম খণ্ডের পরে দিমনা-র বিচার সম্পর্কে একটি স্বলিখিত অধ্যায় সংযোজন করেন (Chapter 6, de Sacy) যাহাতে বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি প্রদান করিয়া এই গ্রন্থের নৈতিকতাহীন শিক্ষার দ্বারা আহত বিচারবোধকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে। স্পষ্টত তিনি মঠবাসী ও অতিথি শীর্ষক অধ্যায়টিও (de Sacy-এর গ্রন্থে ১৬ নং) সংযোজন করেন। ইব্‌নু'ল-মুকাফ্‌ফা'-র সংস্করণটি মূলত সাহিত্যের সমঝদারদের উদ্দেশে নিবেদিত একটি শৈলীময় শিল্পকর্ম ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর ধরন-ধারণের কারণে অল্প সময়েই ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং ফলত হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় অনেকটা দূষিত হইয়া পড়ে। এমনকি ইব্‌ন কুতায়বার "উয়ূনু'ল-আখবার"-এর অসংখ্য উদ্ধৃতি হইতেও ইব্‌নু'ল-মুকাফ্‌ফা'র মূল রচনাটির শাব্দিকভাবে বিশুদ্ধ রূপটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। গ্রন্থটির প্রায় অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সব কয়টি পরবর্তীকালের। sylvestre de Sacy-র সংস্করণটি (Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, Paris 1816) একটি নিম্নমানের পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মোটামুটিভাবে পরিমার্জিত হইয়াছিল (দ্র. Noldeke, Gottinger Gelehrte Anz., 1884, 676)। de Sacy-র গ্রন্থে ইব্‌নু'ল-মুকাফ্‌ফা'র ভূমিকা পূর্বে জনৈক অজ্ঞাত বাহ্‌নূদ ইব্‌ন সাহ্‌ওয়ান বা 'আলী ইব্‌নু'শ-শাহ আল-ফারিসী কর্তৃক লিখিত একটি নূতন ভূমিকা স্থান পাইয়াছে, যাহাতে তিনি ভারতে গ্রন্থটির ইতিহাসের বর্ণনাসহ গ্রন্থটিকে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বুরযোএ-র ভারত যাত্রার উপর বুযুরজমিহ্‌র কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত একটি প্রতিবেদনও উপস্থাপন করিয়াছেন। কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে ইহার পরে একটি অলৌকিক উদ্ভিদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বুরযোএ-কে প্রেরণের একটি কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে (দ্র.) J. Derenbourg, Directorium vitae humanae, ৩২৩) অদ্যাবধি অজ্ঞাত অন্যান্য সূত্র হইতে শেষে আরও দুইটি কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে; যথা ঃ বক ও হাঁসের কাহিনী এবং ঘুঘু, খেঁকশিয়াল ও বকের কাহিনী। শেষোক্ত গল্পটি de Sacy-র সংস্করণের প্রাচীনতম প্রাচ্যদেশীয় পুনর্মুদ্রণেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বূলাক ১২৪৯ হি. (Chauvin; পৃ. গ্র. পৃ. ১৩)। এখান হইতেই ইহা কায়রো, মাওসিল ও বৈরূতে মুদ্রিত অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সংস্করণসমূহে চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য Cheikho, পৃ. ৬ অনুসারে Chauvin-এর গ্রন্থের ১৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। I. Guidi-কৃত Studii sul testo arabo del Libro di Calila e Dimna, Rome 1873 গ্রন্থে ইতালীয় পাণ্ডুলিপি হইতে de Sacy-র রচনা সম্পর্কিত আলোচনায় মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। মূষিককুলের রাজা ও তাহার মন্ত্রীবর্গের প্রসঙ্গে de Sacy-র রচনায় অনুল্লিখিত যে কাহিনীটি সুরয়ানী সংস্করণে পাহ্‌লাবী রচনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। তাহার মূল পাঠ ও অনুবাদ Noldeke কর্তৃক Abhandl. der Konigl. Gesellsch der Wissensch. zu Gottingen, xxv/4 (1879)-এ প্রকাশিত হয়। Zotenberg JA. Ser. 8, vii (1886), 116-23-তে সাধক ও ভগ্ন জলপাত্র বিষয়ক কাহিনীর জন্য প্যারিসের ১৬টি পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত সম্পূর্ণ উপকরণ সরবরাহ করিয়াছেন।

প্রাচ্যের অসংখ্য মুদ্রিত সংস্করণে (বূলাক, ১২৪৯/১৮১৭, কায়রো ১২৯৭/১৮৩৫; বায়তু'দ-দীন ১৮৬৯ খৃ.; মাওসিল ১৮৭৪ খৃ., বৈরূত ১৮৮০ খৃ., ১৮৮৪ খৃ.) প্রধানত de Sacy ও Guide-এর মূল পাঠই পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। তবে A. N. Tabbara (Kalila et Dimna, trad. arabe copiee d'apres un ancien manuscrit trouve' a Damas, avec notes, Beirut 1904) মূল পাঠ সম্বন্ধীয় সমালোচনার জন্য একটি নূতন উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডুলিপি (১০৮০/১৬৭৫ সনের) নূতন উপকরণ সরবরাহ করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রাচীন নহে। তদুপরি অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পাঠযোগ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সংস্করণটি হইতে কিছু কিছু বিষয় বর্জনও করা হইয়াছে (bowdlerized)। পক্ষান্তরে I. Cheikho লেবাননের দায়রু'শ-শীরের আশ্রমে ৭৪৯/১৩৩৯ সনের একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং La version arabe de Kalilah et Dimnah d'apres le plus ancien manuscrit arabe date, Beirut 1905 (পরবর্তী বহু সংস্করণ) শীর্ষক একটি চমৎকার সংস্করণে তাহা উপস্থাপন করিয়াছেন। খালীল আল-য়াযিজীকৃত একটি নূতন সংস্করণের (ঐ, ১৯০৮ খৃ.) পরে সালীম ইব্‌রাহীম সাদির ও শাহীন 'আতীয়া (ঐ, ১৯১০ খৃ.) বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আরও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। আয়া সোফিয়া হইতে প্রাপ্ত ৬১৮/১২২১ সনের একটি পাণ্ডুলিপির (যাহা স্বাভাবিকভাবেই Cheikho-এর পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাচীনতর) উপর ভিত্তি করিয়া রচিত টি. হুসায়ন ও 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব 'আয্‌যামের (কায়রো ১৯৪১ খৃ.) সংস্করণটি হইল সাম্প্রতিকতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। De Sacy-র মূল পাঠ হইতে কৃত আধুনিক য়ুরোপীয় অনুবাদসমূহ Hertel (পূ. গ্র. পৃ. ৩৯৩) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সহিত M. Moreno-কৃত Kalilah et Dimna, fables de Bidpai (প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.)-এর অন্তর্ভুক্ত La versione araba de Kalilah e Dimnah শীর্ষক ইতালীয় অনুবাদ ও (Sana Remo 1910) উল্লেখযোগ্য। A. Miguel মারসাফীর রচনা (৪র্থ সং. কায়রো ১৯৩৮ খৃ.) ও Derenbourg-এর Directoriun হইতে কতিপয় অধ্যায়ের সংযোজনসহ 'আয্‌যামকে অনুসরণ করেন।

৫. আরবী কাব্যরূপ ঃ ইব্‌নু'ল-মুকাফ্‌ফা' কর্তৃক অনুবাদটি তিনবার আরবী কাব্যে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণটি তাঁহার বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন লেখক আবান আল-লাহিকী (দ্র.) কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল [আরও দ্র. A. E. Krymski, Aban al-Lahiqi, le Zindiq (envrion 750-815), versificateur arabe des recueils des apologues indo-persans. Essai sur

sa vie et ses ecrits, tire de l'unique manuscrit de Souli, Bibl. Khed. No. 594, et d'autres sources primitives. Appendices : a. Barlaam et Joasaph, essai litteraire-historique; b. Texte arabe intact d'al-Awraq par Souli, ed. en collaboration avce Mirza Abdoullah Ghaffarov (ইহা রুশ শিরোনাম সহকারে রুশ ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল) Moscow 1913; পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে তু. Horovitz, Mitt. des Seminars fur Orient. Sprachen, Westeas, Stud, x, 35]। বর্তমানে এই সংস্করণটির কোন অস্তিত্ব নাই। ইহার সাহায্য লইয়া ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র মূল পাঠের উপর ভিত্তি করিয়া ১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে ইব্নু'ল-হাব্বারিয়া (দ্র.) দশ দিনে চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় "নাতা'ইজু'ল-ফিতনা ফী নাজমি কালীলা ওয়া-দিম্না" শীর্ষক একটি কাব্য সংস্করণ রচনা করেন, (লিথো. বোম্বাই ১৩১৭ হি.) [দেখুন Houtsma, in Orient Stud. Th. Noldeke... gewidmet, i, 91-6]। 'আবদু'ল-মু'মিন ইব্নু'ল-হুসায়ন আস-সাগানী ৮০ দিন পরিশ্রম করিবার পর ২০ জুমাদা, ৬৪০/১৫ নভেম্বর, ১২৪২ তারিখে গ্রন্থটির "দুরারু'ল-হিকাম ফী আমছালি'ল-হুনুদ ওয়া'ল-'আজাম" শীর্ষক তৃতীয় একটি কাব্যরূপ সমাপন করেন। ইহার অস্তিত্ব ভিয়েনায় রক্ষিত একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ (দ্র. Flugel, Die arab., pers. und turk. Hss. der... Hofbibliothek zu Wien, i, 469, no. 480)।

৬. পরবর্তী সিরীয় অনুবাদ ঃ দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীর একজন সিরীয় যাজক ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র রচনাটিকে পুনরায় স্বীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচলিত নয় এমন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিকে একটি খৃষ্টীয় বর্ণদানের প্রয়াসে তিনি ইতিমধ্যে পাহ্‌লাবী ভাষায় অনূদিত বহুল বিকৃত মূল ভারতীয় রচনাটির শ্লোকসমূহকে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর নীতিকথামূলক ধারায় পরিবর্ধিত করেন। অনুবাদ কর্মেও তিনি প্রচুর ভুল করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহৃত রচনাটি আমাদের অন্যান্য অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির তুলনায় অধিক মূলানুগ ছিল বলিয়া এই অনুবাদটি ইহার ত্রুটিসমূহ সত্ত্বেও মূল পাঠগত সমালোচনার জন্য যথেষ্ট মূল্যবান। ইহা W. Wright, The book of Kalliah and Dimnah transl. from Arabic into Syriac নামে লণ্ডন হইতে ১৮৮৪ খৃ. সম্পাদনা করেন। উক্ত সংস্করণের ইংরেজি অনুবাদে Keith-Falconer (Cambridge 1885) মূল রচনাটির স্বাভাবিকতার বিপরীতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। মূল রচনা ও অনুবাদের জন্য দ্র. Noldeke, in the Gottinger Gelehrte Anz., 1884, 673 প., 1885, 753 প.।

৭. ফারসী গদ্য ও পদ্য অনুবাদসমূহ ঃ শাহনামায় (দ্র. de Sacy in Not. et Extr. X (1818), i, 140 প.) উল্লিখিত ফিরদাওসীর মত অনুসারে সামানীয় সুলতান নাস্র ইব্ন আহমাদ (৩০২-৩১/৯১৪-৪৩)-এর আমলে তাঁহার উযীর বাল'আমী-র আদেশক্রমে ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'-র গ্রন্থখানি ফারসীতে অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুবাদ কখনও সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। একই সুলতানের আদেশে কবি রূদাকী (মৃ. ৩০৪/৯১৬) গ্রন্থটিকে ফারসী পদ্যে রূপান্তরিত করেন। অবশ্য ইহার মধ্যে মাত্র ১৬টি পদ্য আসাদীর "লুগাত-ই ফুরস"-এ টিকিয়া রহিয়াছে (সম্পা. Horn, পৃ. ১৮ প.)। ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র রচনা সম্ভবত ৫৩৯/১১৪৪ সনের পরে নিজামু'দ-দীন আবু'ল-মা'আলী নাসরুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-হামীদ কর্তৃক ফারসী গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল (দ্র. Rieu, Cat. of the Pers, পাণ্ডু. Brit. Mus. এ, নং ৭৪৫-৬)। তিনি তাঁহার রচনাটি গাযনার বাহরাম শাহ (দ্র.)-কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নাসরুল্লাহ একটি নূতন মুখবন্ধে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে মূল্যবান প্রতীয়মান হইয়াছে সেইরূপ সারগর্ভ বাক্যাবলী এবং কৃত্রিম গদ্যের সকল বাঙ্ময় অলঙ্করণ সমেত পুনরায় প্রণয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি শুধু বুরযোএ-র ভূমিকাটিরই সাধারণ গদ্যরূপ দান করেন। কারণ ইহার বিষয়বস্তুর সহিত কোনপ্রকার কৃত্রিম শৈলী সংগতিপূর্ণ ছিল না। এই রচনাটি ১২৮২/১৮৬৪, (ইহা Chauvin-এর সন্দেহ নিরসন করে, পৃ. ৪৬/৭) ১৩০৪ ও ১৩০৫ সনে তেহরানে লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয় (তু. de Sacy, Not. et Extra. X. i, 96 প.; E. G. Browne, A literary history of Persia, ii, London 1906, 349)।

কোনয়ায় জালালু'দ-দীন রূমীর একজন সমসাময়িক আহমাদ ইব্ন মাহমূদ আত-তূসী কানি'ঈ, সুলতান 'ইয্যু'দ-দীন কায়কা'উস (৬৪১-৬২/১২৪৪-৬৩)-এর সম্মানে ছন্দোবদ্ধ গদ্যে গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন। মোঙ্গলদের আগমনের পূর্বেই আহমাদ স্বীয় জন্মভূমি তূস হইতে কোনয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবত নাসরুল্লাহ-এর অনুবাদের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। অবশ্য তিনি ইহা কোথাও উল্লেখ করেন নাই (দ্র. Rieu, Cat. of the Pers, Mss. in the Brit. Mus., 582 প.; E. G. Browne, A history of the Pers. literature under Tartar dominion. Cambridge 1920, 111)।

অবশ্য হেরাতের হুসায়ন বায়কারা-র [দ্র. হুসায়ন মীর্যা] দরবারী মুবাল্লিগ হুসায়ন ওয়া'ইজ কাশিফী (মৃ. ৯১০/১৫০৪) [দ্র. কাশিফী]-কৃত নাসরুল্লাহ্‌র অনুবাদের সংশোধিত সংস্করণের কারণে উক্ত রচনাটি সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়িয়া যায়। হুসায়নের মন্ত্রী আহমাদ সুহায়লীর সম্মানে তিনি তাঁহার রচনার নামকরণ করেন, "আনওয়ার-ই সুহায়লী"। তিনি নাসরুল্লাহ-এর অলঙ্কারসমৃদ্ধ কৃত্রিম গদ্যের একটি নূতন রূপ দান করিয়া ইহা অধিকতর সহজবোধ্য করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেও বস্তুতপক্ষে তিনি আরও অধিক অলঙ্কার ভারাক্রান্ত ও বাকবহুল একটি সংস্করণ উদ্ভাবন করেন যাহা ছিল "অর্থহীন অতিশয়োক্তি, প্রহেলিকাময় শব্দাবলী, নিরর্থক বিশেষণ, দূরপ্রলম্বিত উপমা ও নিরস শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ এবং তীমূরীয়গণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল অলঙ্কার-সর্বস্ব লেখক সৌভাগ্যের মুখ দেখিয়াছিলেন ইহা তাহাদেরই নিকৃষ্ট শৈলীর এক নিখুঁত পরিচয় বহন করে" (E. G. Browne, A Literary history of Persia, n. 352)। কিন্তু এই শৈলী পারস্যে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে আধুনিক কালের সূচনালগ্ন পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছিল বলিয়া রচনাটি অতুলনীয় সাফল্য লাভ করে এবং ইহা ইংল্যাণ্ডেও মুদ্রিত হয় (প্রথম সম্পূর্ণ সংস্করণ, লন্ডন ১৮৩৬ খৃ.)। সেখানে ইহা ভারতে প্রেরিত ইংরেজ কর্মচারিগণের ফারসী পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা ভারত ও পারস্যে বহুবার সাধারণভাবে ও লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং পুশতু ও কতিপয় ভারতীয় উপভাষায় এবং জর্জীয় ও য়ুরোপের

সকল প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল (দ্র. Chauvin, 26-43)। হুসায়ন, ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র ভূমিকা চতুষ্টয়ের স্থলে অদ্যাবধি অসনাক্ত একটি উৎস হইতে একখানি সূচনা যোগ করেন। de Sacy (Not. et Extr. x/i, 59) ইহার মধ্যে প্রাচীনতর জাবীদান খিরাদ-এর উপস্থিতি অনুভব করেন, যাহা আত-তুরতূশী তখনও তাঁহার 'সিরাজু'ল-মুলূক'-এ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (বূলাক ১২৮৯ হি., পৃ. ৯৭, ১৮৫)। চীনের সম্রাট হুমায়ূন-ফাল-কে তাঁহার উযীর সিংহাসন ত্যাগ করার বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে ভারতীয় রাজা দাবশালীম কিভাবে স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া একটি গুহামুখে উপস্থিত হন এবং সেখানে কিভাবে জনৈক বৃদ্ধ তাঁহাকে বিপুল সম্পদ দান করেন তাহা বর্ণনা করেন। দাবশালীম এই সম্পদের মধ্যে শুধু পারস্যের রাজা হোশাং-এর ইচ্ছাপত্রটিই সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, যাহাতে শাসকদিগের জন্য চৌদ্দটি উপদেশ খণ্ড ছিল। এইগুলি লইয়া তিনি সিংহলে যান এবং সেখানে ব্রাহ্মণ বিদপাই (বিদ্যাপতি?) বা পিলপাই প্রতিটি উপদেশ গল্পের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এই গল্পসমূহ গ্রন্থটির পৃথক পৃথক অধ্যায়রূপে বিন্যস্ত।

আনওয়ার-ই সুহায়লীর অমিতাচারী ও বিলাসবহুল শৈলীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) তাঁহার উযীর আবু'ল-ফাদল-কে গ্রন্থটির একটি নূতন সংস্করণ প্রণয়নের আদেশ দেন। "ইয়ার-ই দানিশ" শিরোনামে এই গ্রন্থটি ৯৯৬/১৫৭৮ সনে সমাপ্ত হয় ইহাতে আনওয়ার-ই সুহায়লীর বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখিয়া ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র ভূমিকা এবং বুরযোএ-র সূচনা পুনরুদ্ধার করা হয়। এই রচনাটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তবে হাফীজু'দ-দীন প্রণীত "খিরাদ আফরোয" শিরোনামের একটি হিন্দুস্তানী অনুবাদ ললিত বাচনভঙ্গীর সুবাদে Th. Roebuck (কলিকাতা ১৮১৫ খৃ.) এবং Eastwick (Hertford 1857. London 1867) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

৮. তুর্কী অনুবাদসমূহ : ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'-র রচনাটি নাসরুল্লাহ্‌র অনুবাদ হইতে দুইবার পূর্বীয়-তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। দ্র. Dresden-এর পাণ্ডু. Fleischer, Cat. Codd. Mss. orient. Bibl. Regine Dresdensis (Lipsiae 1831), 19, 136 এবং Munich-এর Aumer, Die pers. und turk. Hdss. der K. Hof-und Staatsbibliothek, 54।

আয়দিন-এর শাহযাদা 'উমার বেগের (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৭) জন্য মাস'উদ, নাসরুল্লাহ্‌র সংস্করণটি প্রাচীন 'উছমানী তুর্কীতে (Hertel, p. 407 বর্ণিত পূর্বীয় তুর্কীতে নয়, যাহা তিনি পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে Ethe-এর একটি বিভ্রান্তিকর উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া ধারণা করেন) অনুবাদ করেন (Bodleian, Marsh, 180-তে একটি পাণ্ডু. রহিয়াছে)। এই গদ্য রচনাটি জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক পদ্যে রূপান্তরিত করেন এবং উহা সুলতান ১ম মুরাদ (৭৬১/১৩৫৯-৭৯২/১৩৮৯)-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ইহার মাত্র অর্ধাংশ একটি Gotha পাণ্ডুলিপিতে টিকিয়া রহিয়াছে (দ্র. Pertsch, Verz. der turk, Handschr. d. Herz. Bibl. 168, 189)। একটি আধুনিক 'উছমানী গদ্য সংস্করণ, যাহা অবশ্যই ৯৫৫/১৫৪৮ সনের পূর্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে, Bodleian পাণ্ডুলিপি Marsh, 61-এ টিকিয়া রহিয়াছে। তু. H. Ethe, On some hitherto unknown Turkish Versions of Kalilah and Dimnah in the Actes du 6^{e} Congr. internat, des Orientalistes, 2nd sect., i, 241 প.।

'আলী ইব্ন সালিহ, যিনি 'আলী ওয়াসি' বা 'আলী চেলেবী নামেও পরিচিত, আনওয়ার-ই সুহায়লীর ছন্দোবদ্ধ গদ্যে একটি অনুবাদ রচনা করেন এবং এই রচনাটি "হুমায়ূন-নামা' শিরোনামে সুলতান ১ম সুলায়মান (১৫১২-২০ খৃ.)-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। ইহা বূলাক ও ইস্তাম্বুলে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছিল (দ্র. Chauvin, p. 50)। হুমায়ূন-নামার য়ুরোপীয় অনুবাদসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হইল Galland-কৃত ফরাসী অনুবাদটি যাহা তাঁহার মৃত্যুর পর Gueuette কর্তৃক প্রকাশিত হয় (প্যারিস ১৭২৪ খৃ.)। ইহা বহুবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৭৭৮ খৃ ও D. Cardonne ইহার মুদ্রণ অব্যাহত রাখেন (দ্র. 'আবদু'ল-হালীম, Antoine Galland, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৮০-৮, ২৫৪-৯)। ইহা জার্মান ওলন্দাজ, হাঙ্গেরীয় ও সুইডিশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। Gonggrijp (Batavia 1866) ইহা মালয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি শেষোক্ত অনুবাদটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া Kramaprawira ইহার একটি জাভানীয় (Javanese) অনুবাদ করেন যাহা জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি জাভানীয় পদ্যে রূপান্তরিত করেন। হুমায়ূন-নামার যে ভাষাবিলাস ইহার মূল ফারসী রচনাকেও হার মানাইয়াছিল, তাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মুফতী য়াহয়া এফন্দী ও উছমানযাদে, যিনি ১১৩৯/১৭২৬ সনে কাদীরূপে কায়রোতে ইনতিকাল করেন, ইহা হইতে উদ্ধৃতি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন (দ্র. Ethe, পূ. গ্র., ২৪২)।

মুহাম্মাদ মূসা বায় বাচ্চার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ফাদলুল্লাহ ইব্ন 'ঈসা তাশকান্দী আপাতদৃষ্টিতে হুমায়ূন-নামার সাহায্যে আনওয়ার-ই সুহায়লী আধুনিক পূর্বদেশীয় তুর্কী গদ্যে (আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে পুস্তকের শেষে লিখিত প্রকাশনার স্থান ও তারিখের তথ্যানুযায়ী (Colophon) তাশকেনত ও ফারগানার ভাষায় অথবা শিরোনাম অনুযায়ী তুর্কীস্তান ও ফারগানার ভাষায়) অনুবাদ করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ হস্তলিপিকার মীরযা হাশিম খোঁজান্দীর দ্বারা Colophon-এর বর্ণনা অনুসারে ১৩০৬/১৮৮৮ সনে গ্রন্থটিকে লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত করান। শিরোনাম অনুযায়ী গ্রন্থটি ১৮৯৩ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র গ্রন্থটি 'আবদু'ল-'আল্লাম ফায়দ খান 'ওগলূ কর্তৃক আরবী হইতে কাযান তুর্কীতে অনূদিত হইয়াছিল এবং ১৮৮৯ খৃ. কাযানে (University Press, Orient; Bibliogriphie, iii, 1421) একই বৎসর Wjatschakof-এ (ঐ, ৪খ, সংখ্যা ৩৯৩৫) এবং ১৮৯২ খৃ. Cirkova-তে (ঐ, ৬খ, ১৬৭, সংখ্যা ৩১৬৬) মুদ্রিত হইয়াছিল। অবশ্য ভূমিকাটি আনওয়ার-ই সুহায়লী হইতে ধার করা হইয়াছিল।

৯. মোঙ্গল অনুবাদ : মুহাম্মাদ বাকরী-র বংশধর মালিক ইফতিখারু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী নাসর, কাযবীনে যে মোঙ্গল অনুবাদ প্রণয়ন করেন তাহা টিকিয়া থাকে নাই (দ্র. হামদুল্লাহ মুসতাওফী, তা'রীখ-ই গুযীদা; সম্পা. Browne, Gibb Mem., ১৪খ, ৮৪৪-৫, অনু. ২৩৩; Browne, A History of Persian literature under Tartar dominion, 93 এবং Hammer-Purgstall, JA, 3rd Ser., i, 580-তে ইহা সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে)। হাজ্জী খলীফা (৫খ, ২৩৯) এই বর্ণনা কিছুটা বিভ্রান্তিকর করিয়া পূর্বপুরুষ

মুহাম্মাদ বাকরীর প্রতি একটি তুর্কী অনুবাদ (লুগাতুত-তুরক) আরোপ করেন (দ্র. de Sacy, Not. et Extr. X, 175; Ethe, পূ. গ্র. পৃ. ২৪৩, von Hammer-এর সঠিক বিবৃতিটির প্রতি নজর দেন নাই)। Flugel যেমন in linguam Taterorum-এর ভুল অনুবাদ করেন তেমনি Hertel (পৃ. ৪১৪) এই কথিত তাতারীয় অনুবাদটিকে Chauvin, (78, n.)-এ উদ্ধৃত উপরোল্লিখিত কাযান তুর্কী (তথাকথিত তাতার) অনুবাদ বলিয়া ভ্রম করেন।

১০. ইথিওপীয় অনুবাদ ঃ ইব্নু'ল-মুকাফ্ফার আরবী গ্রন্থটির একটি মিসরীয় সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়া যে একখানি ইথিওপীয় (ইথিওপীয় ভাষায়) সংস্করণ প্রণীত হইয়াছিল তাহাও আজ হৃত। ১৫৮২ খৃ. লিখিত একটি রচনায় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. Wright, Cat. of the Ethiop. Mss. in the Brit. Mus., 616; আরও দ্র. Noldeke, Gott. Gelehrte Anz. 1884, 876, n. 5)।

১১. হিব্রু ও প্রাচীনতর য়ুরোপীয় অনুবাদসমূহ ঃ ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক য়াহূদী পুরোহিত Jo'el ইবনু'ল-মুকাফ্ফা-র রচনাটি একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি হইতে হিব্রুতে অনুবাদ করেন [দ্র. S. de Sacy, Notes et Extraits, ix (1813), 397-466]। অবশ্য এই পাণ্ডুলিপিতে ইতিমধ্যেই বুরযোএ-র অভিযানের মিথ্যা কাহিনী এবং শেষাংশে বক ও হাঁস এবং খেঁকশিয়াল, ঘুঘু ও বকের অপ্রামাণিক গল্পসমূহ সংযোজিত হইয়াছিল। প্রারম্ভেই অত্যধিক মাত্রায় দূষিত এই একমাত্র পাণ্ডুলিপি হইতে J. Derenbourg খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর Jacob b. Eleazar-এর অনুবাদটিসহ স্বীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন (Deux versions hebraiques du Livre de Kalilah et Dimnah" in the Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 49, Paris 1881)। Jacob-এর সংস্করণটি Jo'el-এর সংস্করণের মতো অনুরূপ রচনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও তাহা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ, ললিত ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত ও বাইবেলীয় বাকধারায় পরিপূর্ণ।

পুরোহিত পণ্ডিত Jo'el-এর সংস্করণটি অতঃপর খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত য়াহূদী John of Capus কর্তৃক Cardinal Ursinus-এর জন্য ১২৬৩ ও ১২৭৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে Directorium vitae humanae শিরোনামে অনূদিত হয় (তু. Johannes de Capua, Directorium vitae humanae, publ. and annot by J. Derenbourg in the Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 72, Paris 1887)। একটি পুরাতন স্পেনীয় সংস্করণ (যাহাতে John de Capua-এর অপেক্ষা অনেক অধিক বিশ্বস্তভাবে পণ্ডিত Jo'el-এর রচনাটি উপস্থাপিত হইয়াছে) ব্যতীত (দ্র. Clifford G. Allen, L'ancienne Version espagnole de Kalila et Digna texte des Mss. de l'Escorial, precede d'un avant-prosos et suivi d'un glossaire, thesis, Paris-Macon 1906) পরবর্তী সকল পশ্চিম য়ুরোপীয় অনুবাদসমূহ (অবশ্য আধুনিক অনুবাদসমূহও ইহার ব্যতিক্রম) John of Capua-এর লাতিন রচনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে (দ্র. Chauvin, 59-72; Hertel, 366-400)। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে Firenzuola (Discorsi degli animali ragionanti tra loro, Florence 1548) ও Deni (La filosofia morale del Doni, Venice 1552)-কৃত ইতালীয় সংস্করণদ্বয় এবং G. Pottier (Plaisants et facetieux discours sur les animaux, Lyons 1566) ও P. de la Rivey (Deux livres de philosophie fabuleuse, Lyons 1579)-কৃত ফরাসী অভিযোজনদ্বয় (adaptations)।

১৬৬৪ খৃ. G. Gaulmier আরবী সংস্করণ হইতে Livres des lumieres... শিরোনামে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন যাহাতে তিনি ইহার ব্যাখ্যা "David Sahod d' Ispahan-এর প্রতি আরোপ করেন। P. Poussine ১৬৬৬ খৃ. গ্রীক অনুবাদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত রচনা দুইটি La Fontaine-কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল (Roman de Renart-এর, বিশেষ করিয়া La Fontaine-এর উপর কালীলা ও দিমনার প্রভাবের জন্য দ্র.) M. F. Ben Ghazi, 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-মুকাফ্ফা অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ১৫৩-৮২)।

১২. গ্রীক অনুবাদসমূহ ঃ খৃষ্টীয় ১১শ শতকের শেষের দিকে Seth-এর পুত্র Symeon এমন একটি পাণ্ডুলিপি হইতে' ইবনু'ল-মুকাফ্ফা'-র রচনা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন যাহা অদ্যাবধি নবতর সংযোজন হইতে মুক্ত থাকিলেও মূষিককুলের রাজা ও তাহার মন্ত্রীবর্গ সম্পর্কিত অধ্যায়টি তাহাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি 'কালীলা'-র মধ্যে আরবী শব্দ 'ইক্লীল' ও দিম্নার মধ্যে 'চিহ্ন'-এর আরবী প্রতিশব্দ আবিষ্কার করেন (দ্র. Quattro recensioni della versione greca del Kitab Kalilah wa-Dimna, pubbl. da Vittorio Puntoni, Publibcazioni della Soc. Asiat. Ital, ii (1889)। এই সংস্করণটিও পালাক্রমে লাতিন, জার্মান এবং কতিপয় স্লাভোনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

১৩. হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ ঃ পঞ্চতন্ত্রের পরবর্তীকালে সংস্কৃত সংস্করণ হিতোপদেশ সম্ভবত আকবরের রাজত্বকালে জনৈক তাজু'দ-দীন কর্তৃক মুফাররিহু'ল-কুলূব শিরোনামে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে ফারসীতে অনূদিত হয় (দ্র. de Sacy, 'L'electukire des coeurs, ou traduction persane du livre indien Intitule Hitoupadesa par Tadj-eddin, ms. persan de la Bibl. du Roi, N 380, in the Not. et Extr. X, i, 226-64)। অতঃপর বহুল সম্মানিত হিন্দুস্তানী লেখক মীর বাহাদুর 'আলী হুসায়নী ১২১৭/১৮০২ সনে এই রচনাটি তাঁহার মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন (দ্র. Garcin de Tassy, Hist. de la Liter, hindouie ou hindoustaie[2], i, 699)। এক বৎসর পর শেষোক্ত রচনাটি Gilchrist কর্তৃক সম্পাদিত হয় (Ukhlaqi Hindee অথবা Indian Ethics, transl. from the Version of the celebrated Hitoopao'es or Salutary Counsel by Meer Buhadoor Ulee... শিরোনামে, কলিকাতা ১৮০৩ খৃ.-এ. তু. J. Hertel, Die Akhlaq-e Hindi und ihre Quellen, in the Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Gesellsch.) lxxii, 65-86, lxxiv, 95-117, lxxv, 129-200।

১৪. প্রাচীন মালয় অনুবাদ ঃ Hikayat Kalila dan Damina শীর্ষক মালয় সংস্করণটি ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র রচনা ও পঞ্চতন্ত্রের একটি তামিল ভাষ্যের সংমিশ্রণে রচিত। Werndly তাঁহার Maleische Spraakkunst, (Amsterdam 1736)-এ সর্বপ্রথম ইহা সকলের দৃষ্টিগোচর করেন এবং Gonggrijp ১৮৭৬ খৃ. ইহা Leiden-এ প্রকাশ করেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯২ খৃ.; তু. J.J. Brandes, in the Feestbundel aan Professor M. J. de Goeje, Leiden 1891, পৃ. ৭৭ প.)। পরবর্তী সময়ে এই রচনাটি জাভানীয় ভাষায় (বাটাভিয়া ১৮৭৮ খৃ.) ও মাদুরীয় ভাষায় (ঐ, ১৮৭৯ খৃ.) অনূদিত হয়।

১৫. কালীলা ওয়া-দিমনা-র অনুকরণসমূহ ঃ "হাজার এক রজনী"তে অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ বাদ দিলেও ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা'র রচনাটি তিনবার ইসলামী সাহিত্যে অনুকৃত হইতে দেখা যায়। ইব্নু'ল-হাব্বারিয়া (উপরের দ্র.) রচনাটি পদ্যে রূপান্তরিত করিয়া একই সঙ্গে তাঁহার কিতাবু'স-সাদিহ ওয়া'ল-বাগিম (কায়রো ১২৯৪ হি.)-ও রচনা করেন। ইহা ছিল জীবজন্তু আশ্রিত গল্পগুচ্ছটির একটি অনুকরণ মাত্র। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন জা'ফার আস-সাকালী (মৃ. ৫৬৫/১১৬৯ বা ৫৬৮/১১৭২) তাঁহার সুলওয়ানু'ল-মুতা'-য় কালীলা ওয়া-দিমনার ন্যায় রাজপুরুষদিগের জন্য একটি উপদেশ দর্পণ সৃষ্টির প্রয়াস পান। গ্রন্থটিতে জীবজন্তু আশ্রিত গল্পসমূহ ছাড়া ঐতিহাসিক উপাখ্যানও স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থটি তিনি প্রথমে ৫৪৫/১১৫০ সনে রচনা করেন এবং ৫৫৪/১১৫৯ সনে একটি নূতন সংস্করণ সিসিলির কা'ইদ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-কুরাশীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটি ১২৭৮ হি. সনে কায়রোতে লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয় এবং ১২৭৯ হি. সনে তিউনিসে ও ১৩০০ হি. সনে বৈরূতে মুদ্রিত হয়। ইহা কারা খালীল যাদে (মৃ. ১১৬৮/১৭৫৪) ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইতালীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন M. Amari, Solwan, al-mota ossiano conforti politici di Ibn Zafer, arabo siciliano del XII secolo, Florence 1851, 1882 (ইংরাজী অনু. লন্ডন ১৮৫২ খৃ.)।

৪র্থ/১০ম শতকের শেষের দিকে তাবারিস্তানের শাহযাদা ইসপাহবায মারযুবান তাঁহার দেশের আঞ্চলিক ফারসী ভাষায় রাজ-পুরুষদিগের জন্য অপর একটি রূপক উপাখ্যান রচনা করেন, যাহাতে পাঠকের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে জীবজন্তু আশ্রিত গল্পগুলির সহিত ঐতিহাসিক কাহিনীও সংমিশ্রিত হইয়াছিল। এই মূল রচনাটি টিকিয়া নাই। তবে ৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে ইহা দুইবার প্রাচীন ফারসীতে অনূদিত হইয়াছিল। এশিয়া মাইনরের সালজূক শাসক সুলায়মান শাহের দরবারে তাঁহার উযীর মালাতয়ার মুহাম্মাদ ইব্ন গাযী প্রথম অনুবাদটি করেন। "রাওদাতু'ল-'উকূল" শীর্ষক তাঁহার রচনাটি লাইডেন ও প্যারিসে দুইখানি পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে। ৬০৭/১২১০ ও ৬২২/১২২৫ সনের মাঝামাঝি সময়ে রচিত সা'দু'দ-দীন-ই ওয়ারাবীনী-র "মারযুবান-নামাহ্" অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহা মীরযা মুহাম্মাদ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (Gibb Mem. Ser., Vol. viii)।

ওয়ারাবীনীর সংস্করণটি জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক 'উছমানী তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল (৮৪৮/১৪৪৪ সনের একটি কপি বার্লিনে রহিয়াছে, দ্র. Pertsch, Verz. der Turk. Hdss. no. 444) এই তুর্কী সংস্করণটি পুনরায় বেনামে আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল (পাণ্ডু. Berlin, দ্র. Ahlwardt, Verz, no. 8472)। ইব্ন 'আরাব শাহ (দ্র.) অপর একটি আরবী অনুবাদ প্রণয়ন করেন এবং Gotha Ms. (দ্র. Pertsch, Die Arab, Hdss. der Herz. Bibl., no. 2692) অনুসারে ইহাও তুর্কী সংস্করণটির ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছিল। অপর একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে প্যারিসে (de Slane, Catal. no. 3524), যাহা ১২৭৮ সনে কায়রোতে লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়। একই প্রণেতা ফাকিহাতু'ল-খুলাফা' ওয়া-মুফাখারাতু'জ-জুরাফা' নামক গ্রন্থে কৃত্রিম গদ্যে তাঁহার রচনা পুনরায় লেখেন এবং কয়েকটি নূতন গল্প যোগ করেন।

ইতিমধ্যে 'উছমানী তুর্কীতে অনূদিত এবং ওয়ারাবীনীর vulgate (জেরোম, ল্যাটিন বাইবেল)-এর রচনা হইতে এবং রাওদাতু'ল-'উকূল হইতেও ইহার "দার বায়ান-ই যিয়াদাত-ই 'উম্র ওয়া-দাওলাত ওয়া-যিন্দাগানী-কার্দান বা দোস্ত ও দুশমান" শীর্ষক দশম (সমাপনী) অধ্যায়ের জন্য স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ এই সংশোধিত সংস্করণটি মুহাম্মাদ বেক-এর পুত্র সুলায়মান বেক কর্তৃক কাযানী তুর্কীতে অনূদিত হয় এবং "কিতাব দেসতূরি শাহী ফী হিকায়াতি দূদিশাহি" শিরোনামে ১৮৬৪ খৃ. কাযানে মুদ্রিত হয়।

১৬। মুসলিম শিল্পে কালীলা ওয়া দিমনা ঃ মোঙ্গল-পূর্ব ও মোঙ্গলোত্তর সময়ের ইরানী এবং অনুরূপভাবে বাগদাদের মুসলিম শিল্পিগণ যে সকল গ্রন্থ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন কালীলা ওয়া-দিমনা উহাদের অন্যতম। সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির উপর আলোকপাতকারী যে ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি চিত্রাদি অঙ্কিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়ার জন্য একটি পৃথক প্রবন্ধ প্রয়োজন এবং উহা অত্র নিবন্ধের পরিধি-বহির্ভূত। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. K. A. Creswell, A bibliography of painting in Islam, কায়রো ১৯৫৩ খৃ. এবং কতিপয় মৌলিক গ্রন্থ (১) F. R. Martin The miniature painting and painters of Persia, India and Turkey from the VIIIth to the XVIIth C., লন্ডন ১৯১২ খৃ.; (২) A. B. Sakisian, La miniature persane du XX^{e} s., প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (৩) I. Stchoukine, La peinture indienne... au Musee du Louvre, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (৪) B. Gray, Fourteenth century illustrations of Kalilah and Dimnah, in Ars. Islamic, vii (1940), 134-40; (৫) Blochet. Les enluminures de mss. orientaux..., de la B. N., প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (৬) M. S. Diwand, A handbook of Mohammedan decorative arts, New York 1958; (৭) যেড. হাসান, আত-তাসবীর ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৩৬ খৃ.; (৮) Kuhnel, A Bidpai Ms. of 1343-4 in Cairo, Am. Inst. Iranian Art and Arch., v (1937); (৯) Talbot-Rice, The Paris exhibition of Iranian art, in Ars Islamica, v (1938), 282-91; (১০) এম. মুহরিয, রুসূম কালীলা ওয়া-দিমনা, অপ্রকাশিত থিসিস, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes ou reliefs aux Arabes etc., ii,

Kalilah, Leige-Leipzig 1897; (২) J. Hertel, Das Pancatantra, eine Geschichte und seine Verbreitung, Leipzig-Berlin 1914.

C. Brockelmann (E.I.[2])/ আবূ মুহাম্মদ আসাদ

কালূদিয়া (দ্র. কালাওযিয়া)

কালে খাঁ মসজিদ (كالى خان مسجد) ঃ পটুয়াখালী জেলার একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি পটুয়াখালী জেলা সদর হইতে ৮ কি. মি. উত্তরে শ্রীরামপুর গ্রামের মিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। কোনও শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাণকাল নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। অত্র অঞ্চলের জমিদার কালে খাঁ (কালাই খান) ১৭৩১ খৃ.-এর কয়েক বৎসর পর মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। কালে খাঁ ১৭৩১ খৃ. তৎকালীন দ্বীপের রাজা উদয় নারায়ণের নিকট হইতে পটুয়াখালীর এই অঞ্চল বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলমানদের সালাত আদায়ে সুবিধার জন্য এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। কালে খাঁর নামানুসারে পরবর্তীতে এই মসজিদের নামকরণ হয় কালে খাঁ মসজিদ।

বাহ্যিকভাবে দ্বিতল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি একতলাবিশিষ্ট মসজিদ। ইষ্টক নির্মিত বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২২ ফুট এবং ভূমি হইতে গম্বুজের চূড়া পর্যন্ত উচ্চতা ৩০ ফুট। চার কোণায় চারটি ষষ্টভুজাকৃতির বুরূজ রহিয়াছে। বুরূজগুলি কার্নিশের উপর উঠিয়াছে এবং ইহাদের শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা আবৃত। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রাচীরে রহিয়াছে একটি করিয়া খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথগুলি এক একটি আয়তকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। প্রবেশ পথ ও জানালার উভয় কাঠামো প্রাচীর গাত্র হইতে বাহিরের দিকে একটু বর্ধিত করিয়া নির্মিত। প্রত্যেকটি কাঠামোর দুই পার্শ্বে রহিয়াছে দুইটি করিয়া সরু মিনার যাহা মসজিদের কার্নিশ পর্যন্ত উঠিয়াছে। কার্নিশগুলি সোজা এবং প্যারাপেট (parapet) মার্লন (merlon) নকশায় অলংকৃত। বুরূজ ও মিনারগুলির মধ্যবর্তী অংশের প্রাচীরগাত্রে খিলানাকৃতির কুলুঙ্গি দ্বারা সুশোভিত। সম্মুখের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা প্রাচীরে একটি মাত্র মিহরাব। মসজিদের ছাদ একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। মাসজিদের স্থান সংকুলান না হইবার কারণে পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজন করা হইয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার করিবার ফলে ইহা পরিপূর্ণ ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে। সংস্কারের সময়ে ইহার বহু অলংকরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৩৮৫; (২) দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ২৯-১১-২০০৪ খৃ.; (৩) দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ১৫-০৩-২০০৫ খৃ.; (৪) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, পটুয়াখালী ১৯৮৬ খৃ.। উক্ত গেজেটিয়ারের আলোকচিত্র অংশ হইতে কালাই খাঁ মসজিদ এর ছবিটি সংযোজন করা হইল।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

কালেনদের (দ্র. কালান্দার)

কালেন্দের ওগলী মেহ্মেদ (قلندر اوغلى محمد) ঃ (মৃ. ১০১৮/১৬০৯) আনাতোলিয়া-র জালালী বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন এবং আঙ্কারা জেলায় (Sandjak) য়াসৃসীভীরান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই জেলায় তিনি একটি জায়গীর লাভে সমর্থ হন এবং লালা মুহাম্মাদ পাশা (দ্র.) যখন আনাতোলিয়ার গভর্নর (beglerbegi) ছিলেন তখন তিনি চাবুশ (cavush) বা সেনাপতির পদে উন্নীত হন। মেযো-কেরেসতেস [দ্র.] (Mezo-Keresztes ১০০৫/১৫৯৬)-এর যুদ্ধে সংকটময় সময়ে যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছিল সেই ফেরারীদের (ferari) অন্যতম বলিয়া তিনি তাঁহার জায়গীর হইতে বঞ্চিত হন। তিনি এই ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার আবেদন করিলে তাঁহার পদচ্যুতি চূড়ান্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহাকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এই অবস্থায় তিনি 'পলাতক'-রূপে ঘোষিত অন্য বহু ব্যক্তির ন্যায় জালালী আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের নেতা কারা য়াযীজী তখন ছিলেন আনাতোলিয়ার প্রকৃত শাসক। কারা য়াযীজী ১০১০/১৬০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার স্থলে তাঁহার ভ্রাতা দেলি হাসান নেতা হন। ১০১১/১৬০৩ সালের বসন্তকালে দেলি হাসান ইস্তাম্বুলের সরকারী পক্ষের সহিত আপোসে উপনীত হন ও বোস্‌নার গভর্নর (beglerbegi)-রূপে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রূমেলী গমন করেন। কিন্তু কালেন্দের ওগলী, কারাকুশ আহমাদ এবং কারা সা'ঈদ-এর মতো অপরাপর নেতার সহিত আনাতোলিয়ায় থাকিয়া যান এবং আঙ্কারা-আকশেহির-কুতাহয়া অঞ্চলে তাঁহাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। বলভাদিন (১০১৪/১৬০৫)-এর নিকটে উযীর নাসূহ পাশার সেনাবাহিনীকে অতির্কিত আক্রমণে পর্যুদস্তকারী তাবীল খালীলের একজন অফিসাররূপে তিনি সম্মুখ সারিতে আসেন। ফলে সুলতান (১ম আহ্‌মাদ) যখন জালালী নেতৃবৃন্দের সহিত সমঝোতায় উপনীত হইতে চেষ্টা করেন তখন কালেন্দের ওগলী-কে কারামান-এর গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হয় (এবং এইভাবে তিনি পাশা উপাধি লাভ করেন)। অবশ্য তিনি তাঁহার পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে আরপালিক (দ্র.) বা যায়গীররূপে আঙ্কারা প্রদান করা হয়। তাঁহার সমর্থক ও রক্ষক লালা মুহাম্মাদ পাশার মৃত্যু এবং প্রধান উযীররূপে মুরাদ পাশা (কুয়ূজু দ্র.) ১০১৫/১৬০৬-এর নিয়োগের ফলে তাঁহার অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে। উপরন্তু আঙ্কারার অধিবাসিগণ তাঁহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে; তিনি তাঁহার জনৈক অফিসারকে তাঁহার পক্ষে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া নিজে পূর্বাভিমুখে সরিয়া যান।

ইতিমধ্যে মুরাদ পাশা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান আরম্ভ করেন ও কালেনদের ওগলীকে আলেপ্পোতে জানপুলাতোগলী 'আলী পাশা-র বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের সহিত যোগদান করিতে আহ্বান জানান। তাঁহাকে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র বলিয়া সন্দেহ করিয়া, কালেনদের ওগলী এই আদেশ অমান্য করেন এবং ইহার মাধ্যমে নিজে বিদ্রোহীরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়েন। মুরাদ পাশা আলেপ্পো অভিমুখে অগ্রসর হইলে কালেনদের ওগলী অগণিত সেগবানস (দ্র.) দলের অধিনায়করূপে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন এবং এজিয়ান উপকূল ভূমি ও বুরসা এলাকা অধিকার করিয়া স্বয়ং ইস্তাম্বুলের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সরকারী বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং এমনকি বুরসা শহরের উপর অবরোধ আরোপ করেন। তিনি শহরটি অধিকার করিতে ব্যর্থ হন, কিন্তু শহরের উপকণ্ঠ ভস্মীভূত করেন। ১০১৬/১৬০৭ সালে মুরাদ পাশার হস্তে জান্‌পুলাতোগলী-র চূড়ান্ত পরাজয়ে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া কালেনদের

ওগলী সকল জালালী নেতাকে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে নির্দেশ দেন। মুসলু চাবুশ যিনি সিলিফ্‌কে (Silifke) অঞ্চলে যুদ্ধরত ছিলেন এবং স্বয়ং জানপুলাতোগলী যিনি ইস্তাম্বুলে আশ্রয় লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন— এই দুইজন ব্যতীত প্রায় সকলেই তাঁহার নির্দেশ মান্য করেন। মার্‌'আশ-আলেপ্পো অঞ্চলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে কালেনদের ওগলীর প্রস্তাব অল্প সংখ্যকের বিরোধিতার সহিত গৃহীত হয়। সম্পূর্ণভাবে কাপূ কুল্লারী এবং দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়া ও আরব এলাকা হইতে সংগৃহীত বিশ্বস্ত উপজাতীয়দের সমন্বয়ে গঠিত মুরাদ পাশার বাহিনী গোক্‌সুন (দ্র.)-এর চারণভূমি (Yayla)-তে ৭০,০০০ জন সৈন্যের সেগ্‌বান বাহিনীকে পরাজিত করে (২২ রাবী'উ'ল-আখির, ১০১৭/৫ আগস্ট, ১৬০৮)। পারস্যে নিরাপদে পৌঁছার আশা কালানদারওগলী ও তাঁহার সহযোগিগণ পলায়ন করেন। তাঁহাকে দ্রুত অনুসরণ করা হয়। তিনি শাহ 'আব্বাস-এর আশ্রয় লাভে সমর্থ হন, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামাপূর্ণ স্বভাব ত্যাগ না করায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Akdag, Celali isyanlarindan Buyuk Kacgunluk (১৬০৩-১৬০৬), ১খ, Tarih Arastirmalari Dergisi-তে, ২খ, ২-৩ (আঙ্কারা, ১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ১-৪৯; (২) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi; ৩খ, ১, আঙ্কারা ১৯৫১ খৃ., ১০২-১৭; (৩) না'ঈমা, ইস্তাম্বুল ১২৮০, ২খ, ৪-১০; (৪) পেচেভী, ইস্তাম্বুল ১২৮৩ হি., ২খ, ২৭০; (৫) মুহাম্মাদ এদিরনেভী, নুখবাতু'ত-তা'রীখ, ওয়া'ল-আখ্‌বার, কায়রো ১২৮৪ হি., পৃ. ২৩০; (৬) কাতিব চেলেবী, ফেদলেকে, ইস্তাম্বুল ১২৮৭ খৃ., পৃ. ২৮৯; (৭) Hammer-Purgstall, ৪খ, পৃ. ৩৯৭-৪১০; মহাফেজখানা ও পাণ্ডুলিপি উৎস ঃ (৮) Basbakanlik Arsivi, Muhimme Defteri, ৭৬ ও ৭৮ খ.; (৯) Ankara Etnografya Muzesi, Ankara Ser'iyye Sicilleri, ৭, ৯, ১০ খ.; (১০) 'আবদু'ল-কাদির, ওয়াকায়ি'নামাহ, সুলায়মানিয়া লাইব্রেরী, ইস্তাম্বুল, Ms. Esad Ef. ২১৫১; (১১) হাসান বেগ যাদাহ, নূর উছমানিয়্যা লাইব্রেরী, ইস্তাম্বুল, Ms. ৩১৩৪; (১২) মুনশি'আত, Ms. Esad Ef. ৩৩৮৪।

M. Akdag (E.I.²)/ মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাশ (كش) ঃ আধুনিক শাহর-ই সাবয (شهر سبز সবুজ শহর"), ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের উর্বরতার জন্য এইরূপ নামকরণ। ইহা উযবেকিস্তান-এর একটি শহর, ইহার মধ্য দিয়া সামারকান্দ হইতে বাল্‌খ-গামী বিরাট বাণিজ্যিক রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে। চীনদেশীয় প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ অনুসারে, কাশ (চীন দেশীয় প্রতিলিপি ক'ইআ-শা বা কিঈ-শুয়্যাং-না, আরও ক'ইউশা শহররূপে কি-শী) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল [তু. J. M. Marquart, Chronologie der altturkischen Inschriften, Leipzig 1898, 57; ঈরানসাহ্‌র ইত্যাদি, বার্লিন ১৯০১ খৃ., ৩০৪; E. Chavannes, Documents sur les Toukiue (Turcs) occidentaux, St. Peterburg ১৯০৩ খৃ., ১৪৬। ৩৭২/৯৮২ সনে হুদূদু'ল-'আলাম গ্রন্থে ১১৩ উল্লেখ করা হয় যে, (শা. ২৫, ১৫) ইহাতে উত্তম সেচ ব্যবস্থা আছে এবং ইহা একটি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত; এখান হইতে খচ্চর, মান্না (Manne) ও লাল লবণ রফতানী করা হইত। ইব্‌ন মাকূলা (মৃ. ৪৭৩/১০৮০ খৃ.)-এর গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া য়াকূত বলেন যে, ট্রান্স অক্সানিয়া-এর সর্বত্র এই নামটি কিস (كس)-রূপে উচ্চারিত হইত। এই বর্ণনায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। পরবর্তীকালে কেশ (কিশশ) উচ্চারণ প্রতিনিয়ত পুনঃপুনঃ কেশ-ই দিলকেশ উচ্চারণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আরব বিজয়ের বর্ণনা Marquart দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে (ঈরানসাহর, সূচীপত্র দ্রষ্টব্য)। আরবীয় ভূগোলবিদগণ (আল-ইসতাখরী, ৩২৪, ইব্‌ন হাওকাল, ৫০১; আল-মুকাদ্দাসী, ২৮২) কর্তৃক সামানীয় যুগের 'কেশ' সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময় শহরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক ফারসাখ (প্রায় এক মাইল)-এর এক-তৃতীয়াংশ ছিল। পুরাতন নগর (মদীনা ফার্সী, শাহরিস্তান) এবং দুর্গ (কুহানদিয) পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং কেবল বহির্ভাগের শহরটিতে (রাবাদ) লোক বসতি ছিল; পূর্বকালীন কাশ-এর নিকটে একটি নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে যেখানে কাশ অবস্থিত ছিল, সেখান হইতে পৃথক স্থানে আধুনিক শহরটি গড়িয়া উঠিতেছিল। নির্দিষ্ট স্থানের পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। মোঙ্গল বিজয়ের ইতিহাসে কাশ-এর কথা কখনই উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ বিনা বাধায় ইহা নিশ্চয়ই মোঙ্গলদের নিকট (৬১৭/১২২০) সমর্পণ করা হইয়াছিল। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথম শাহর-ই সাব্‌য মুদ্রার উপরেও দেখা গিয়াছিল। তায়মূর কর্তৃক কাশ-এ অনেক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। তায়মূর ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিরা কাশ জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তদুপরি (তু. W. Barthold in Zapiski vost. otd. arkh. obshc., xxiii, If.) বিশেষভাবে ৭৮২ সনের শেষে/১৩৮০ সনের প্রারম্ভে খওয়ারাযম হইতে আগত নির্মাতাদের দ্বারা নির্মিত আকসারায় রাজপ্রাসাদটি বিশেষভাবে বিখ্যাত (তু. শারাফু'দ-দীন য়াযদী, জাফারনামা, কলিকাতা ১৮৮৭-৮, খৃ. ১খ, ৩০১ প. এবং নিজামু'দ-দীন শামী ও 'আবদু'র-রায্‌যাক সামারকান্দী কর্তৃক Barthold-এ প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিসমূহ, Ulugbeg i ego vremya, Petrograd ১৯১৮ খৃ., ২৩, ইং. অনু. Minorsky, in Four studies on the history of Central Asia, ii, Leiden ১৯৫৮ খৃ., ২৬); এই প্রাসাদের অতি সামান্য অংশ টিকিয়া আছে (তু. N. Sitnyakowskiy in Protokoli Turk. Kuruzka Lyub. Arkh. v, 114f.)। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে হাফিজ-ই তানিশ কর্তৃক ('আবদুল্লাহ-নামা, Ms. of the Asiatic Museum, 574 age, f. 87b) কাশ বা শাহর-ই সাবযকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সাধারণত ইহা শাসক পরিবারের কোন যুবরাজ কর্তৃক শাসিত হইত। অন্যদিকে নাসাফ বা কারশী [দ্র.]-এর শাসনভার একজন সামরিক কর্মকর্তা (দারোগা)-এর উপর ন্যস্ত করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে বুখারা-র আমীর নাসরুল্লাহ (১৮২৬-৬০ খৃ.) তাঁহার সমস্ত রাজত্বকাল ধরিয়া ঐ শহরটি দখল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ১৮৬০ খৃ. কৃতকার্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৬৫ খৃ. দিকে কাশ তাঁহার উত্তরাধিকারীর হাতছাড়া হইয়া যায়। ১৮৭০ খৃ. রুশ কর্তৃপক্ষ বুখারার আমীরের কাছে ইহা সমর্পণ করে। বর্তমানে পরিস্থিতি বিপরীত হইয়া গিয়াছে এবং ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শাহর-ই সাব্‌য কারশী-র সাথে তুলনায় একটি গুরুত্বহীন শহরে পরিণত হইয়াছে। শাহর-ই সাব্‌য জিলাটি উত্তরে হযরত সুলতান পাহাড়শ্রেণী,

দক্ষিণে বে সানটওয়া পাহাড়শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং কারা দরিয়া ও ইহার উপনদীসমূহ দ্বারা ইহা সিক্ত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, 469 f.; (২) Barthhold, তুর্কিস্তান, সূচীপত্র, esp. 134 f.; (৩) ঐ লেখক, K Istorii orosheniya Turkestana, St. Petersburg 1914, 125 f.; (৪) B. Spuler, Iran, index ; (৫) ঐ লেখক, Geschichte Mittelasiens, Leiden 1966, index (শিরোনামে শাহর-ই সাব্য); (৬) দা.মা.ই., ১৭খ, ২৭৮-৯।

W. Barthold/B. Spuler (E.I.[2])/ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

কাশকায় (قشقای) ঃ ইরানের অন্তর্গত ফারস প্রদেশে বসবাসকারী একটি তুর্কী জাতির নাম। ফারসী ভাষার গ্রন্থাবলী ও রচনায় ইহাদের কাশকা'ঈ নামে অভিহিত করা হয়। নামটির প্রকৃত উৎপত্তি-মূল অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। পশ্চিম তুর্কী ভাষায় কাশকা শব্দ দ্বারা অশ্ব, মেষ বা গবাদি পশুর ন্যায় প্রাণীর কপালে জন্মগতভাবে প্রাপ্ত অগ্নিচ্ছটার ন্যায় শ্বেতচিহ্ন নির্দেশ করা হয়। চাগাতায় ভাষায় শব্দটি দ্বারা 'মেধাবী' অথবা "মহৎ বীর" অর্থ প্রকাশ করা হয়। একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যারূপে বলা হইয়া থাকে যে, কাশকায় নামটি এই সকল অর্থের যে কোনটির বিশেষভাবে প্রথমটি অর্থাৎ অগ্নিচ্ছটার সহিত সম্পর্কিত। কাজার যুগের বিভিন্ন কালপঞ্জীকারের দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যায় যে শব্দটি কাচমাক, বাঁচিয়া যাওয়া' হইতে উদ্ভূত, এই দাবীর সহিত একমত পোষণ করা সম্ভব নয়। কাশকায় জাতি তুলনামূলকভাবে একটি সাম্প্রতিক জনগোষ্ঠী এবং ১৮ শতাব্দীর পূর্বেকার কোন গ্রন্থ বা সূত্রে ইহাদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খালাজ তুর্কী (দ্র.) গোষ্ঠীর একটি শাখা, যাহাদের মূল আবাস ভূমি ছিল সাওয়া অঞ্চলে, ১৯ শতাব্দীর সময়কালে ফারস অঞ্চলে বসবাস করিত। ঠিক কি পরিস্থিতিতে কাশকায় গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে আমাদের কোনপ্রকার তথ্য জানা না থাকিলেও ইহা একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা যে, ফারস অঞ্চলে বসবাসকারী বহুসংখ্যক তুর্কোমান গোষ্ঠী আফগান আক্রমণের সময়কালে খালাজ জাতিভুক্ত শক্তিশালী শাহিলু গোত্রের ছত্রছায়ায় সমবেত হয় এবং এইভাবে এই গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, লুর্স, কুর্দ এবং গুল-এর ন্যায় বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র উপগোত্র এই মিশ্রসংঘে যোগদান করিয়াছিল।

কাশকায় জাতির অধ্যুষিত এলাকা ফারস-এর উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহা শাশ নাহিয়া, চাহার দানকে, কামফীরূয, আরদাহান, কাযারূন, ফাররাশবান্দ, মাহাল্ল আরবা'আ, ফীরূযাবাদ, মায়মান্দ, আফরায, খুঞ্জ ও মাহুর মিলানী লইয়া গঠিত ছিল। এই সকল এলাকার মধ্যে প্রথম পাঁচটি ছিল তাহাদের পশুচারণ এলাকা, অন্যদিকে অবশিষ্ট এলাকাসমূহ ছিল তাহাদের শীতকালীন আবাসভূমি। খানগণ সাধারণত ফীরূযাবাদে শীতকাল অতিবাহিত করিতেন। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কাশকায় জাতির অধ্যুষিত এলাকা বিলায়াত-ই কাশকাঈ নামে পরিচিত হইয়া একটি পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চলরূপে বিবেচিত হইত। কাশকায় জাতির গোত্র সংগঠন ও কাঠামো, অন্যান্য তুর্কী জাতি উদ্ভূত জনগোষ্ঠীর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাতিগোষ্ঠী প্রথমে কতিপয় বোয় (তা'ইফা)-এ বিভক্ত হইত। প্রতিটি বোয় কতিপয় ওবা (তীরা) এবং প্রতি ওবা কতিপয় পরিবার (ওজাক) লইয়া গঠিত হইত। গোত্রের অধিপতি ছিলেন একজন ঈলখান, অন্যদিকে বোয়-এর প্রধান ছিলেন কালানতার (বোয় বেগি) এবং ওবা-এর প্রধান কাতখুদা। ঈল-বেগী পদাধিকারী ছিলেন সহকারী ঈলখান এবং প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন। তাহাকে ঈলখানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ, যথা ঃ তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতাবর্গের মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হইত। ঈল-খান পদে শাহ নিয়োগ প্রদান করিতেন এবং তিনি সব সময়েই ক্ষমতাসীন খান পরিবারের একজন সদস্য হইতেন। কাশকায় জাতির অন্তর্গত বহুসংখ্যক বোয় ও ওবাসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত গোত্রসমূহ সর্বাধিক ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। বায়াত (ওগুয গোত্র হইতে উদ্ভূত), ইগদির (ওগুয গোত্র), বেগদিলি (ওগুয গোত্র), চারীখলু (চারিকলু, একটি ওগুয গোত্র ?), শামলু, আগাচ-এরি (কারা-কোয়ুনলু অঞ্চলের), খালাজ মুসুল্লু (আক-কোয়ুনলু অঞ্চলের) এবং ওরয়াদ (মঙ্গোল ?), এই সকল উপ-গোত্রসমূহ খুব বেশী জনবহুল ছিল না। কাশকায় জাতির একটি সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাদের একটি কঠোর গোত্রীয় আচরণ তথা নৈতিক বিধি ছিল, যাহা দ্বারা সকল কার্যকলাপ বিচার করা হইত এবং যাহা খান হইতে শুরু করিয়া গোষ্ঠীর সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন সাধারণ সদস্য পর্যন্ত সকল সদস্যকে কোনপ্রকার ব্যতিক্রমহীনভাবে মান্য করিতে হইত।

কাশকায় গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্য অশ্ব, উট ও গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে যাযাবর শ্রেণীর জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। এই সকল যাযাবর জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অবশ্য তাহাদের চারণ-ভূমির সন্নিকটে অবস্থিত কৃষি-ভূমির অধিকারী ছিল; এই সকল কৃষি জমি, এলাকার নিকটে বসবাসকারী কৃষকশ্রেণী কর্তৃক সেচপ্রাপ্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইত। এই ধরনের সেবা প্রদানের বিনিময়ে চাষীশ্রেণী, যাহারা বা'ইয়্যাত-ই কাশকা'ঈ নামে পরিচিত ছিল, প্রতি বৎসর দুইটি মেষ এবং উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ লাভ করিত। কাশকায় গোষ্ঠীর অধীনে ভৃত্যরূপে কর্তব্য পালনের সুযোগ লাভ ফারস্-এর কৃষকশ্রেণীর নিকট সৌভাগ্যরূপে বিবেচিত ছিল। কারণ ইহার মাধ্যমে তাহারা কাশকায় গোষ্ঠীর সাহায্য ও নিরাপত্তাপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিত এবং সরকারী কর্মকর্তা শ্রেণীর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। কাশকায়গণ মেষ, বুখারা অঞ্চলের কারা-কুল মেষের ন্যায় অনুরূপ দীর্ঘলোম মেষ-চর্ম, পশম, গালিচা ও কম্বল রফতানী করিত। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পশু-লোম দ্বারা বয়নকৃত এবং ঐতিহ্যবাহী নক্সা দ্বারা অলংকৃত ও প্রাকৃতিক রং দ্বারা সজ্জিত কাশকায় গালিচাসমূহ অদ্যাবধি ইরান ও বিদেশে সমভাবে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন।

কাশকায় গোত্রের মহিলা সদস্যগণ তাঁহাদের সমাজের সামাজিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিলেন এবং প্রাচীন তুর্কীগণের ন্যায় কাশকায়গণ বিবাহের সময় বাশলীক (বাশলূক) দাবী করিবার নিয়ম পালন করিত।

কাশকায় তুর্কী ভাষা ওগুয অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষার একটি উপভাষা। ওগুয গোত্রের ওযান সম্প্রদায়ের ন্যায় কাশকায় জাতির নিজস্ব 'আশিক' সম্প্রদায় ছিল, যাহারা প্রেম ও সাহসিকতা বিষয়ক গান শুনাইত এবং কোরাগলু-র কিংবদন্তী আবৃত্তি করিত।

Dupre (১৮০৭-৯) ইহাদের সংখ্যা ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ বলিয়া উল্লেখ করেন (Voyage en Perse, প্যারিস ১৮১৯ খৃ., ২খ, পৃ. ৪৩৩-৪)। অন্যদিকে Lady Sheil (মধ্য ১৯শ শতাব্দী)-এর লেখা হইতে দেখা যায় যে, ইহাদের ৩০,০০০ হইতে ৪০,০০০ তাঁবু ছিল

(Glimpses of life and manners in Persian, লন্ডন ১৮৫৬ খৃ., ৩৯৮-৯)। অপর পক্ষে Curzon (১৮৮৯ খৃ.) ইহাদের সংখ্যা ২৫,০০০-রূপে উল্লেখ করেন (Persia and the Persian Question, লণ্ডন ১৮৯২ খৃ., ২খ, ১১২-৩)। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, পূর্বতন সময়ে ইহাদের বসতি ৬০,০০০ তাঁবু লইয়া গঠিত ছিল এবং তাঁহারা ১,২০,০০০ অশ্বারোহী সমাবেশ করিতে সমর্থ ছিল। এই সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত, কারণ বাস্তবে কাশকায়গণ কখনও ১৫,০০০-এর অধিক অশ্বারোহী সমাবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে তাহারা বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫০০০ অশ্বারোহী যোদ্ধাকে রণক্ষেত্রে সমাবেশ করিয়াছিল।

ইহাদের প্রথম গুরুত্বসম্পন্ন নেতাদের মধ্যে ছিলেন হাসান খান এবং তাহার ভ্রাতা ইসমা'ঈল খান। ইঁহারা উভয়ে কারীম খান যান্দ (দ্র.) (মৃ. ১১৯৩/১৭৭৯)-এর সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে হাসান খানের হাত কাটিয়া ফেলা হয় এবং যান্দ যুগের শেষ পর্যায়ে ইসমা'ঈল খানের চক্ষু উৎপাটিত করা হয়। ১৯ শতাব্দীর সময়কালে কাশকায় নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র জানী খান (মৃ. ১২৩৯/১৮২৩-৪) এবং জানী খানের পুত্র মুহাম্মাদ 'আলী খান (মৃ. ১২৬৮/১৮৫১-২), তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ কুলী খান (মৃ. ১৮৬৭-৮) এবং তাঁহার পুত্র সুলতান মুহাম্মাদ খান। ইঁহাদের মধ্যে মুহাম্মাদ 'আলী খান এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর খান কাজার গোত্রীয় মহিলা বিবাহ করেন। কাশকায় শাসক বংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শীরায নগরীতে বসবাসকারী হাজ্জী ইবরাহীম পরিবার। এই পরিবারটি সরকারী সমর্থনপুষ্ট হইয়া ফারস-এর পাঁচটি বৃহৎ গোত্রের (খামসা) উপর প্রভুত্ব করিত। কাশকায় জাতির অপর শত্রু ছিল তাঁহাদের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী বাখতিয়ারী গোষ্ঠী। ইরানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আইনগতভাবে সংসদে কাশকায় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন শাসক পরিবারের সদস্য হাজ্জী কারীম খান। কাশকায়গণ যদিও সরকারের পক্ষ হইতে গোপনে উৎসাহ লাভ করিয়া ১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ফারস অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়। অপরাপর সকল গোত্রের ন্যায় ১৯৩০ খৃ. কাশকায় গোষ্ঠীও রিদা শাহ কর্তৃক নিরস্ত্রীকৃত হয় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত সামরিক অভিযানের সময় ঈল-খান সাওলাতু'দ-দাওলা-কে তেহরানে আনয়ন করা হয় এবং তথায় কারারুদ্ধ করা হয়; তাঁহার পুত্রদের ইরান ত্যাগে বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালে এবং সিংহাসন হইতে রিদা শাহ-এর অপসারণের পর সাওলাতু'দ-দাওলার পুত্রগণ নির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন; তিনি স্বয়ং কারারুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পুত্রদের মধ্য হইতে নাসির ঈল-খান পদে নির্বাচিত হন এবং তিনি কাশকায় গোষ্ঠীর প্রশাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রাচীন গোষ্ঠী-ঐতিহ্য সমুন্নত রাখিয়া কাশকায় গোষ্ঠী তাহাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী জার্মান এজেন্টদিগকে বৃটিশ বাহিনীর হাতে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি সামরিক অভিযানের সম্ভাব্য ফলে চরম বিপর্যয় এমনকি ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে তুর্কী দূতের হস্তক্ষেপের (১৯৪৩ খৃ.) দ্বারা তাহারা এই বিপদ হইতে রক্ষা পায়। ১৯৬৩ খৃ. ইরান সরকার কাশকায় এলাকায় ভূমি সংস্কার পরিচালনা এবং কাশকায় জাতিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের অধীনে আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাশকায় গোষ্ঠীর প্রতিরোধ বল প্রয়োগে নিষ্ক্রিয় করা হয়, গোত্রের সদস্যবর্গকে নিরস্ত্র করা হয় এবং খান পরিবারসমূহ দ্বিতীয়বারের মতো ইরান ত্যাগে বাধ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাশকায় জাতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১) F. Sumer, Kacarlar devrinde Turk oymaklari, in Selcuklu Arastirmalari Dergisi, ৫খ, আঙ্কারা ১৯৭৩ খৃ.; (২) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ১৬৫-৬।

F. Sumer (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাশ্কূল (کشکول) ঃ ধাতু, কাষ্ঠ অথবা নারিকেল (কালাবাশ) হইতে প্রস্তুত এক প্রকার ডিম্বাকার পাত্র নির্দেশক একটি ফারসী শব্দ; স্কন্ধ হইতে একটি শৃঙ্খল দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় পরিহিত এই পাত্রে দরবেশগণ প্রাপ্ত ভিক্ষাসামগ্রী এবং তাহাদিগকে প্রদত্ত খাদ্য ইত্যাদি বহন করিয়া থাকেন। শব্দটির উৎপত্তিগত শব্দ-প্রকরণ অস্পষ্ট; পারস্যবাসিগণের দ্বারা প্রদত্ত একটি জনপ্রিয় প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতেছে ঃ কাশ 'আহরণ' (অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াপদ) এবং 'কুল' স্কন্ধ ঃ "যাহা কোন ব্যক্তি তাহার স্কন্ধে বহন করে"। কিন্তু যেহেতু প্রাচীনতর কবিগণের দ্বারা ব্যবহৃত অপর একটি রূপ খাচকূল আমাদের জ্ঞাত রহিয়াছে (আনওয়ারী, সায়ফ ইসফারান্গী), এই ব্যাখ্যাটি সেইজন্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। বিভিন্ন অভিধানে ইহার অর্থবোধক প্রথম ভাব রূপ 'ভিক্ষুক' এবং অতঃপর "ভিক্ষুকের পাত্র" দেওয়া হইয়াছে; এই প্রদত্ত অর্থ ঠিক কতটা যথার্থ তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

তুলনামূলকভাবে বহুকাল পরে এই শব্দটি আরবী ভাষায় প্রবেশ করে এবং তাহা বাহা'উ'দ-দীন আল-'আমিলী (৯৫৩-১০৩০/১৫০৭-১৬২১) প্রণীত কিতাবু'ল-কাশ্কূল-এর শিরোনামে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (দ্র. আল-'আমিলী)। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন উৎস হইতে গৃহীত রচনাংশের একটি সংকলন। আধুনিক আরবী ভাষায় শব্দটি মাঝে মাঝে এই অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়, যাহাতে "ভিক্ষুকের পাত্র" অর্থ প্রকাশ ব্যতীত একই সঙ্গে ইহা দ্বারা এক প্রকার এ্যালবাম অথবা সংবাদপত্রের কর্তিত অংশবিশেষের সংগ্রহ নির্দেশ করা হয়। আলজিরিয়ায় স্থানীয় আরবী ভাষায় ইহা "ভিক্ষা পাত্র, কাষ্ঠ অথবা এসপার্টো তৃণ দ্বারা নির্মিত পাত্র"-বোধক অর্থটি অব্যাহত আছে (Beaussier, দ্র. শিরো.); Dozy, Supplement (দ্র. শিরো.) গ্রন্থে আমরা অধিকন্তু কাশকুল ও কাশকালা রূপদ্বয় দেখিতে পাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফারহাঙ্গ-ই রাশীদী, দ্র. খাচকূল; (). বুরহান-ই কাতি', দ্র. কাশ্কূল; (৩) R. du Mans, Estat de la Perse en 1660, সম্পা. Schefer, পৃ. ২১৭; (৪) Ricaut, Present State of the Ottoman Empire, ১৭শ অধ্যায়ে চিত্র; (৫) Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, ১খ, ৩৩৭; (৬) A von Kremer, Topographie von Damascus, ২খ, ৪; (৭) E. G. Browne, A Year amongst the Persians, ৫২।

Cl. Huart (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাশ্গার (کاشغر) ঃ চীনা তুর্কিস্তানের একটি শহর (সিনকিয়াং); চীনা সরকারী দলীল-দস্তাবেজে অদ্যাবধি এই নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাশগাড় নামটি সর্বপ্রথম চীনা T'ang-shu প্রতিলিপিতে দৃষ্টিগোচর হয় (K'iu-cha); তু. E. Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux, St. Petersburg 1903, 121 প.। ইসলামের তথায় অনুপ্রবেশের পূর্ব-যুগের কাশ্‌গাড় এবং ইহার পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধদের প্রাসাদসমূহের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য দ্র. A. Stein, Ancient Khotan, Oxford 1907, i, 52 প. ঐ লেখক, Serindia, Oxford 1921, 80 প.। আরব সেনাদল কাশ্‌গাড় পর্যন্ত পৌঁছে নাই। H. A. R. Gibb (in BSOS, ii, 1923, ৪৬৭-৮ প.) দেখাইয়াছেন, ৯৬/৭১৫ সালে আরব বিজয়ী কুতায়বার সামরিক অভিযানের বিবরণ একটি লোককাহিনীমাত্র। আনুমানিক ১৩২/৭৫০ সাল হইতে কাশ্‌গাড় কারলুক শাসনাধীনে ছিল এবং কারলুকগণ কাশ্‌গাড়ের তুর্কীকরণ করে। খলীফা আল-মানসূর (১৩৬-৫৮/৭৫৪-৭৫)-এর শাসনকালে ফারগানার একজন শাহযাদার কাশ্‌গাড় পলায়ন সম্পর্কে 'ফারগানা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। সামানীদের শাসনকালে তুগান তিগীন (Tughan Tigin) নাম বা উপাধিসহ একজন দিহকান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (ইব্নু'ল-আছীর, ৮খ, ৩৭)। বিদ্রোহী শাহযাদা ইলয়াস ইব্ন ইসহাক তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দিহকান ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না সেই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে সাতুক বোগরা খান কাশ্‌গাড়-এ ১ম মুসলিম খান (শাসক) ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনতম তথ্যাবলী তাঁহার সম্বন্ধে পাওয়া যায় (Berthold, Turkestan[2], পৃ. ১৫৫, ২৫৭ জামাল কুরাশী)-তে। তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৩৪৪/৯৫৫-৫৬ সাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কাহিনীতে এমন সমস্ত উপাদান রহিয়াছে যাহা লোক কাহিনীমাত্র। কাশ্‌গাড়ে নির্মিত ১ম মসজিদের দালান সম্পর্কিত বিবরণে সুপরিচিত প্রাচীন লোক ঐতিহ্য ষাঁড়ের চামড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। F. Grenard (JA, Ser, 9, vol, xv, 1 প.) কর্তৃক বিবৃত পরবর্তী লোককাহিনীতে এই কাহিনী নাই; কিন্তু ইহাতে অন্যান্য লোককাহিনী বর্ণিত হইলেও তারিখ সবই মিথ্যা। ৩৪৯/৯৬০ সালে অসংখ্য তুর্কীর (২০,০০০ তাঁবু) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্ভবত কাশ্‌গাড়ের তুর্কীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই হিসাবে ৩৪৪/৯৫৫ সালের কথা কল্পনাপ্রসূত। এই বর্ণনা ইব্নু'ল-আছীর (৮খ, ৩৯৬) ও ইব্ন মিসকাওয়ায়হ্, উভয়ের গ্রন্থেই পাওয়া যায় (The Eclipse of the 'Abbasid Caliphate, সম্পা. Margoliouth and Amedroz, Oxford ১৯২১ খৃ., মূল পাঠ, ২খ, ১৮১, অনু. ৫খ, ১৯৬)। এই বর্ণনার মূল উৎস সম্ভবত ছাবিত ইব্ন সিনান আস্-সাবী' (তু. ইব্নু'ল-আছীর, ৮খ, ৪৭৬, ৪৯১; The Eclipse, etc. নির্ঘণ্ট)। সাতুক বোগরা খানের সমাধি কাশ্‌গাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে আরতূচ (Artuc) নামক স্থানে (বর্তমানে ইহার উচ্চারণ করা হয় আরতুশ=Artush) অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইল্গি খানদের শাসনকালে (দ্র. ইলেক খান), যাহারা আনুমানিক ৯৫০ খৃ. হইতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, কাশ্‌গাড় রাজনৈতিকভাবে তারিম অববাহিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল; সম্ভবত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৫ম/১১শ শতাব্দীতে আবু'ল-ফুতহ্ 'আবদু'ল-গাফির (অথবা 'আবদু'ল-গাফ্ফার) ইব্ন হুসায়ন আল-আলমা'ঈ আল-কাশ্‌গারী (sic) আরবী ভাষায় এই শহরের (কাশ্‌গারের) ইতিহাস প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকারের পিতা পুত্রের মৃত্যুর পর (আস-সাম'আনীর মতে প্রায় ১০ বৎসর) ৪৮৬/১০৯৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। পিতা, পুত্র ও শেষোক্ত কার্যকলাপের জন্য দ্রষ্টব্য আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, সম্পা. Margoliouth, Leiden-London 1912, ff. 470a, 472a; জামাল কুরাশী in Barthold, Turkestan, i, 123 প.। শাসকগণের সমাধি ছিল (তাঁহারা ১১৩০ খৃ. হইতে কারাখিতায় সুলতানদের অধীন ছিলেন) তুমেন (Tumen) নদীর তীরে একটি বিশিষ্ট জাঁকাল সমাধিতে (আরবী আল-জুন্বাযা আল-খাকানিয়া)। ঐ স্থানে ১ম যুবরাজ সমাধিস্থ হন, মুহাররাম ৪২৪/৭, ডিসেম্বর, ১০৩২ সালে এবং শেষ জন রাজাব ৬০১/২২ ফেব্রুয়ারী অথবা ২৩ মার্চ, ১২০৫ সালে। তাঁহাদের শাসনকালে মাহমূদ আল-কাশ্‌গাড়ী (দ্র.) বাগদাদে তুর্কী ভাষায় তাঁহার বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন এবং য়ূসুফ খাস হাজিব, কাশ্‌গাড়ে তাঁহার "কুতাদগু বিলিগ" গ্রন্থ রচনা করেন। মঙ্গোল শাসনকালে মাস'উদ বেগ কাশ্‌গাড়ে [বুখারা দ্র.] একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে আল-জাওহারী'র সিহাহ রক্ষিত ছিল। জামাল কুরাশী তাঁহার অনুবাদ কর্মের জন্য এই গ্রন্থ ব্যবহার করেন (E. Sachau and Ethe, Cat. of the Persian ... Manuscripts of the Bodlein Library, Oxford 1889, Col. 983)। কাশ্‌গাড় পরবর্তীকালে দূগলাত আমীরদের (দুগলাত দ্র.) শাসনাধীন ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ শাসক আবূ বাক্র ৯২০/১৫১৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার আত্মীয় হায়দার মীর্যা (দ্র.)-র বিবরণ অনুযায়ী তিনি ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন (মীর্যা হায়দার দূগলাত, তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. E. Eenison Ross, London 1895, পৃ. ২৫৩, ৩২৬)। কিন্তু গ্রন্থকার নিজেই ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কাশ্‌গাড় ৮৮৫/১৪৮০-৮১ সাল পর্যন্ত আবূ বাক্র কর্তৃক বিজিত হয় নাই। আবূ বাক্র আধুনিক কাশ্‌গাড় শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রাচীন দুর্গসমূহ ধ্বংস করেন এবং তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে নূতন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। অপরদিকে তুমেন নদীর তীর এবং কীযীল-সূ-এর মধ্যবর্তী স্থানেও তিনি দুর্গ নির্মাণ করেন (ঐ, পৃ. ২৮৬-৭, ২৯৫)।

মঙ্গোল খানদের শাসনকালে (তু. চাগাতায় খান সম্পর্কিত গ্রন্থাপঞ্জী) এবং পরবর্তীকালে কালমূক [Kalmuck] ও চীনা শাসনামলে (১৭৫৯ খৃ. হইতে) কাশ্‌গাড় অধিককাল সন্নিহিত অঞ্চলের (জেলার) রাজধানী ছিল না। ঐ সময়ের রাজধানী ছিল য়ারকান্দ। ১৮৭৭ খৃ. চীনদের দ্বারা এই অঞ্চল পুনরায় বিজিত হওয়ার পর হইতে কাশ্‌গাড় পুনরায় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে তাও তাই (Tao T'ai)-এর বাসস্থান হিসাবে, যিনি চীনা তুর্কীস্তানের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চল, এমনকি চারচেন (Cercen) মরূদ্যান অঞ্চলেরও শাসনকর্তা ছিলেন। তাহা ছাড়া এক সময় কাশ্‌গাড়ে রুশীয় ও ইংরেজ কনসালদের বিশেষ সময়কালীন বাসভবন ছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কাশ্‌গাড় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য H. W. Bellew, in Sir T. D. Forsyth, Mission to Yarkand in 1873, London 1875; বর্তমান শতাব্দীর আবর্তনে কাশ্‌গাড়ের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য L. Kornilow, Kashghariya, Tashkent 1903 (Review by Barthold, in Zopiski vost. Otd. arkh. Obshc. xv, 131 প.); এতদ্সঙ্গে ২৬৮ পৃষ্ঠার কাশ্‌গাড়ের পরিকল্পনা বিধৃত রহিয়াছে এবং M. Hartmann, Chinesisch-

Turkestan, Halle a/S. 1908, বিশেষত পৃ. ৪৫ প., ৮৯ প. এবং Kornilow-এর কাশ্গাড় শহরের পরিকল্পনাসহ। কাশ্গাড় শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অট্টালিকার নাম হাদরাত আপাক (Hadrat Apak)। ইহা ১১শ/১৭শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত দরবেশের সমাধিসৌধ। প্রবন্ধ রচনাকালে কাশ্গাড়ের আনুমানিক লোকসংখ্যা ৭০,০০০ ছিল (শহরের অধিকাংশ অধিবাসী সুন্নী উয়্গূর তুর্কী = Sunni Uyghur Turks)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হুদূদু'ল-'আলামী, পৃ. ৯৬ (শা. ১৩/১), ২৮০ প.; (২) য়াকূত, বৈরূত (১৯৫৭ খৃ.), ৪খ, ৪৩০ প.; (৩) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, পৃ. ২৫৮; (৪) Barthold, Turkestan, নির্ঘণ্ট; (৫) B. Spuler, Iran, নির্ঘণ্ট; (৬) এ লেখক, Geschichte Mitteilasiens, Leiden 1966, নির্ঘণ্ট; (৭) A. Schultz, in Mitteilungen aus dem Seminar fur Geographie der University Hamburg, 1921।

W. Barthold (B. Spuler) (E.I.[2])/ সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আল-কাশ্গারী (الكاشغرى) ঃ মাহমূদ ইবনু'ল-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ, তুর্কী 'আলিম এবং ৫ম/১১শ শতকের অভিধান রচয়িতা। তাঁহার গ্রন্থ দীওয়ান লুগাতি'ত-তুর্ক তুর্কী ভাষাসমূহের পরিচিতিমূলক তথ্য গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা তুর্কী অধিবাসিগণের ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ। তাঁহার জীবনীবিষয়ক একমাত্র তথ্য পাওয়া যায় তাঁহার নিজেরই লেখা হইতে এবং তাহাও বিচ্ছিন্নভাবে। মনে হয় যে, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইসিক-কুল-এর দক্ষিণ তীরবর্তী বারস্গানের (দ্র. হুদূদু'ল-'আলাম, অনু. Minorsky, পৃ. ৯৮, ২৯২-৩) একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে যাঁহারা কারা-খানীদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন (দ্র. ইলেক খানগণ)। ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে কাশগারীর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, তিনি ব্যাপকভাবে সফর করিয়াছিলেন এবং বাগদাদ গমনের পূর্বে তুর্কী এলাকার বহু স্থানে তিনি ভ্রমণ করেন। এমনও হইতে পারে যে, কারা-খানীদের গোত্রীয় সংগঠনগুলির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই তাঁহাকে এই সকল স্থান ভ্রমণ এবং বাগদাদ গমন করিতে হইয়াছিল। শেষোক্ত শহরে তিনি পণ্ডিত সমাজে মেলামেশা করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, তুর্কী অধিবাসী ও তাহাদের ভাষা বিষয়ে সেখানে যথেষ্ট আগ্রহ রহিয়াছে। এইভাবে তিনি তাহাদের অর্থাৎ তুর্কীদের সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহী হন। তিনি ৪৬৪/১০৭২ সালে দীওয়ান লুগাতি'ত-তুর্ক সংকলন আরম্ভ করেন। খোদ বইটি হইতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি ৪৬৪-৭৬/১০৭৫-৯৪ সালের মধ্যে উহার চারিখানি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। দীওয়ানের মূল গ্রন্থখানি হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু ২৭ শাওওয়াল, ৬৬১/১ আগস্ট, ১২৬৬ তারিখযুক্ত যে অত্যন্ত চমৎকার পাণ্ডুলিপিখানি অদ্যাবধি টিকিয়া আছে, সেইখানি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হইলেও সুন্দর অনুলিপি। কাশগারীর দ্বিতীয় গ্রন্থ কিতাব জাওয়াহিরি'ন-নাহ্ও ফী লুগাতি'ত-তুর্ক নামক একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ বর্তমানে আর পাওয়া যায় না; বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং লেখকের উল্লেখ হইতে উহার কথা জানা যায়।

কাশগারীর রচনাবলী, বিশেষ করিয়া তুর্কী ভাষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস, ভূগোল ও তুর্কী জনগণের লোককাহিনীর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই ভাষাতত্ত্বগত গ্রন্থ শুধু একটি বিশেষ তুর্কী ভাষার ভাবসংলগ্ন পাঠের সংগ্রহ নহে, বরং ইহা তুলনামূলক সঠিক অভিধান এবং ভাষার মোটামুটি ব্যাকরণগত বিশ্লেষণও বটে। বস্তুত এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম এই জাতীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং সেই হিসাবে ইহা এই ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর বিশেষ পদ্ধতিগত বিবরণ। একই সঙ্গে ইহার ভূমিকা এবং প্রতিটি আলাদা আলাদা শব্দের অন্তর্ভুক্তি, এই উভয় ক্ষেত্রেই কাশগারীর গ্রন্থে কিছুসংখ্যক তথ্য ও মন্তব্য রহিয়াছে যেগুলির মধ্যে কোন কোনটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ এবং যেগুলি দ্বারা তুর্কী ভাষার বিভিন্ন রূপের উদ্ভব ও বিকাশকে প্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে, যাহাতে ৫ম/১১শ শতকের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যায়। তুর্কী জনগণের লিখন-রীতি সম্বন্ধে (যেমন উয়্গূর লিপি) তিনি যেই সকল তথ্য প্রদান করিয়াছেন সেইগুলিও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যদিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল তুর্কী ভাষাসমূহের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান এবং যদিও স্বীয় অভিধানে তিনি কয়েকটি ভাষা অন্তর্ভুক্তও করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে যেসব ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন সেগুলি মূলত ৫ম/১১শ শতকের উপাদান অর্থাৎ কাশগার অঞ্চলের কথ্য ভাষার রূপ, যাহাকে তিনি বলিয়াছেন খাকানী তুর্কী ভাষা। কাশগারীর গ্রন্থাবলী মূলত কারাখানী ভাষাতাত্ত্বিক বিবরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাশগার সম্পর্কিত বিষয় ছাড়াও ওগুয ও কিপচাকগণের সময়কার ভাষার বিবরণ যথেষ্ট মূল্যবান। এই অভিধানখানি মূলে পরিকল্পিত হইয়াছিল বাগদাদী পণ্ডিত ব্যক্তিগণের ভাষা-সহায়িকারূপে — বিশেষ করিয়া সেই সকল পণ্ডিতের যাঁহাদের সঙ্গে তুর্কী জনগণের কোনওরূপ যোগাযোগ ছিল। সেই কারণেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু বর্ণনা করিবার কালে আরবী ব্যাকরণ ও অভিধানের উপস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরবী ব্যাকরণ কতকাংশে অনুসরণীয়রূপে কাজ করিয়াছে। অন্যদিকে আরবী আভিধানিক সাহিত্য হইতে তিনি পূর্ণাঙ্গ শব্দ-তালিকা লাভ করেন। উহা কতকটা আভিধানিক প্রশ্নোত্তর রূপেও কাজ করিয়াছে। উহার সাহায্যে তিনি তাঁহার নিজ মাতৃভাষা তুর্কীর শব্দসম্ভারের মুকাবিলা করেন। ইহা খুবই সম্ভব যে, এইভাবে শুরু করার ফলে তাঁহার গ্রন্থের শব্দ-সম্ভার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তুর্কী ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুসমূহকে আরবী ব্যাকরণের রীতিপদ্ধতির মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া নিতে হইয়াছিল বলিয়া কাশগারীকে অবশ্যই নিজের বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। তথাপি গ্রন্থখানি বাগদাদে সঙ্কলন করিতে হইয়াছিল বলিয়া আর বাগদাদ তুর্কী অধিবাসিগণের মাতৃভূমি হইতে বহু দূরে অবস্থিত— তাই তিনি তাঁহার ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুসমূহের পরিপূর্ণ অভাব পূরণ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে অপর যে একটি বিষয়ে যথেষ্ট জিজ্ঞাস্য রহিয়াছে তাহা হইল এই যে, অনুরূপ নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি তৎকালীন বাগদাদে প্রাপ্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলির কতটুকু সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য যে, সম্ভাব্য বারবার সংক্ষেপিতকরণ বা সম্পাদনার ফলে গ্রন্থখানির ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যের মৌলিকত্বের হানি বা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কতটা, স্বয়ং লেখকের স্বাক্ষরিত কোন কপি যেহেতু এখন আর আমাদের নিকট নাই এবং অনুলিপিকারও যেহেতু তুর্কী ছিলেন না, কাজেই অনুলিপিতে মূল্যের প্রামাণিকতা কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে তাহাও অনুরূপ জিজ্ঞাস্য বিষয়। কাশগারীর অভিধানে, বিশেষ করিয়া স্থান-নাম, গোত্রীয় নাম, নামপদ,

পদবী ও পদমর্যাদা প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে তুর্কী লোকগাঁথা, কবিতা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি — যাহার ফলে গ্রন্থখানি এই শেষোক্ত বিষয়গুলির একটি বড় উৎস হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ এবং তুর্কী পাঠের জন্যও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তদুপরি উহার ঐতিহাসিক লোকগাথার মূল্য তো রহিয়াছেই। কাশগারীর তুলনামূলক মন্তব্যসমূহ খুবই শিক্ষামূলক, যদিও সেই বিষয়ে তাঁহার উপাদানসমূহ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান। গ্রন্থকারের মাতৃভাষার যতটুকু এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা স্থানীয় পণ্ডিতগণের কথিত মনের রূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কেন না পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কাশগারীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী ভাষাকে আরব পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত করিয়া তোলা। যথার্থভাবেই তিনি নিজ মাতৃভাষাকে সেই ভাষাগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বকারীর অন্যতম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একই সঙ্গে এবং বোধগম্য কারণেই যেই সকল ধার করা আরবী শব্দ তিনি এই প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন সেইগুলি অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকার করেন। তবে সে সকল শব্দ ইতিমধ্যেই সে আমলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য কীর্তি বলিয়া পরিচিত কুতাদগু বিলিগকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল এবং খুব সম্ভবত সে সকল শব্দ কথ্য ভাষাকেও প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। কাশগারীর গ্রন্থের একটি প্রধান প্রশংসনীয় দিক হইতেছে এই যে, তিনি "প্রাত্যহিক দিনে"র তুর্কী কথ্য ভাষার উপরেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। সেই কারণেই তাঁহার অভিধান কারাখানী ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব পূরণ করে অথচ আমাদের এতকালকার জ্ঞান ছিল প্রধানত কুতাদগু বিলিগভিত্তিক।

বিভিন্ন তুর্কী ভাষার মধ্যকার পার্থক্য বিষয়ে কাশগারীর জ্ঞান কয়েকটি বিষয়গত সীমার মধ্যে বিচরণ করিলেও এবং তাঁহার মন্তব্যসমূহ কখনও কখনও স্ববিরোধী হইলেও স্বীয় গ্রন্থে তুলনামূলক বিচারবোধের পূর্ণতম ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে কৃতিত্ব প্রদান করিতেই হয়। তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কাশগার, ওগুয ও কিপচাক অঞ্চলের ভাষা। এই দুইটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যকার তফাতের সত্যতা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন; এতদবিষয়ক তথ্যাবলীকে সেগুলির সর্বপ্রথম টিকিয়া থাকা প্রমাণরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। লিখিত রূপবিহীন কয়েকটি লুপ্ত ভাষার বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত তথ্যাবলীই হইতেছে একমাত্র প্রামাণিক উপাদান।

কাশগারীর প্রদত্ত ঘটনাবলী ও তথ্যাবলীর মূল্যায়ন করিবার কালে সব সময়েই কিছু কিছু ত্রুটির কথা (পাণ্ডুলিপির পশ্চাৎপট, লেখকের জ্ঞান ইত্যাদি) বিবেচনা রাখিতে হইবে, তথাপি তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক, লোককাহিনী ও লোকগাথাভিত্তিক, ঐতিহাসিক ও ভূগোল বিষয়ক অনুশীলন প্রায়শই এই গ্রন্থখানিকে তথ্য উৎস হিসাবে বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছে। তাঁহার অভিধান প্রথম যুগের আরব তুর্কী মিশ্রণজাত বুদ্ধিজীবী মহলের পরিবেশের সৃষ্টি যখন আরবী ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিসমূহ তুর্কী ভাষাসমূহের বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত— যাহা তখন পর্যন্ত সামান্য প্রামাণ্যরূপ লাভ করিয়াছিল। ফলে ইহা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের জন্য এবং সমসাময়িক কালের তুর্কী জনগণের ইতিহাসের পঠন-পাঠনের জন্য অভূতপূর্ব উৎস হিসাবে গণ্য। প্রাথমিক যুগের তুর্কীগণের শব্দ-সম্ভার এবং বিভিন্ন তুর্কী ভাষার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখা ছাড়াও তাঁহার এই গ্রন্থখানি প্রাথমিক যুগের তুর্কী ঘটনাক্রমের মূল্যবান নির্দেশিকা। এই বিষয়ক অধিকাংশই হইতেছে ঘটনাপঞ্জীর দিক হইতে অনিশ্চিত উয়গুর পাঠ। অন্যান্য কারাখানী রেকর্ডপত্রের ন্যায় কাশগারীর অভিধানকে কালানুক্রমিকভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয় মধ্য-তুর্কীরূপে; এই পরিভাষাটি সাধারণ তুর্কী ভাষাতাত্ত্বিক দলীলাদির বাস্তব শ্রেণীবিভাগ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং সেই শ্রেণীকরণের ভিত্তি হইতেছে প্রাচীন টিউটনিক বর্ণমালায় লিখিত শিলালিপিসমূহ, প্রাথমিক যুগের উরগুর পাঠসমূহ এবং পরবর্তীকালের তুর্কী ভাষাতাত্ত্বিক প্রামাণিক নথিপত্রের মধ্যে ইহার কালানুক্রমিক স্থান।

গ্রন্থপঞ্জী : ১. দীওয়ানের পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক অনুবাদসমূহ : (১) মাহমূদ ইব্‌নু'ল-হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কাশগারী, কিতাব দীওয়ান-ই লুগাতি'ত-তুর্‌ক, সম্পা. কিলিসলি মু'আল্লিম রিফ'আত বিলজে, ইস্তাম্বুল ১৯১৪-৭ খৃ.; (২) B. Atalay, Divanu Lugat-it-Turk tercumes'i, আঙ্কারা ১৯৩৯-৪১ খৃ., দ্র. A. B. Taymas, TM-এ, ৭-৮খ, (১৯৪০-২ খৃ.), পৃ. ২১২-৫২; ১১খ. (১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ৭৫-১০০; (৩) ঐ লেখক, দিভানু লুগাত-ইত-তুর্‌ক দিযিনি, আঙ্কারা ১৯৪৩ খৃ.; (৪) ডি. দিলচিন, আরাপ আলফারাসিনে গোরে দিভানু লুগাত-ইত-তুর্‌ক দিযিনি, আঙ্কারা ১৯৫৭ খৃ.; (৫) মাহমূদ কোশগারিয, তুরকিজ সুযলার দেভোনি, (দেভোনু লুগাতি'ত-তুর্‌ক, সম্পা. এস. এম. মুতাল্লিবোভ, তাশকেন্ত ১৯৬০-৬৩ খৃ.; (৬) জি. 'আবদু'র-রাহমোনোভ ও এস. মুতাল্লিবোভ, দেভোনু লুগোতি'ত-তুর্‌ক (ইনডেক্সলুগাত), তাসকেন্ত ১৯৬৭ খৃ.; (৭) মুতাল্লিবোভ, "দিভানু লুগাত-ইত-তুর্‌ক মাখ্‌মূদা কাশাগারসকোগো (Perevod, kommentarii, issledovanie), থিসিস, তাশকেন্ত ১৯৬৭ খৃ.।

২. অভিধানসমূহ ও দীওয়ানের শব্দসম্ভার : (৮) C. Brockelmann, Mittelturkiseher wortschatz nach Mahmud al-Kasgaris Divan lugat-at-Turk, বুডাপেস্ট-লাইপযিগ ১৯২৮ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, Zu meinem mittel-turkischen Wortschatz. (Eine Erklarung), KCsA-তে প্রকাশিত, ২খ. (১৯২৬-৩২ খৃ.), পৃ. ৩৯০-১; (১০) Sir Gerard Clauson, An etymological dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, অক্সফোর্ড ১৯৭২ খৃ.; (১১) V. M. Nadelyaev এবং অন্যগণ, Drevnetjurkskij slovar', লেনিনগ্রাড ১৯৬৯ খৃ.।

৩. সাধারণ গ্রন্থাবলী : (১২) W. Barthold, Orta Asya Turk ta'rikh hakkinda dersler, ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ. পৃ. ৮৩-৮৫ Zwolf Vorlesungen uber die Geschichte der Turken Mittelasiuns, বার্লিন ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৯২-৫; (১৩) A. Bombaci, Storia della letteratura turca, মিলান ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৮১-১০৬; ফরাসী অনু. Histoire de la litterature turque, প্যারিস ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৬৮-৭৬; (১৪) এম. এফ. কোপরুলু, তুর্‌ক দিলিভে এদেবিয়াতি হাক্‌কিন্‌দা আরাসতিরমালার, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৩৩-৪; (১৫) এ লেখক, চাগাতায় এদেবিয়াতি, in I A, কাপেরোগলু II তুর্‌ক দিলি তারিহি নোতলারি, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৪২-৫; (১৬) ঐ লেখক, ইল্‌ক তুর্‌ক দিলসিম কাশগারলি

মাহমূদ, আঙ্কারা ১৯৩৮ খৃ.; (১৭) ঐ লেখক, কাশগারলি মাহমূদ, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.; (১৮) ঐ লেখক La litterature de l'epoque des Karakhanides, in Philologiae Turcicae fundamenta, ২খ, Wiesbaden, ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২৬৭-৭৫; (১৯) Brockelmann, Osttrukische Grammatik der islamishen Literatursprachen Mittelasiens, লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (২০) এম. মানসূরুগলু, Das Karakhanidische, in Philologiae Turcicae fundamenta, ১খ, Wiesbaden ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৮৭-১১২; (২১) উলকুতাসির; বুয়ুক তুরক দিসিলিসি কাশগারলি মাহমূদ, আঙ্কারা ১৯৭২ খৃ., পৃ. ১২৪-৫৬, বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী।

৪. দীওয়ান বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা সম্পর্কীয় ঃ (২২) Brockelmann, Mahmud al-Kasgharis Darstellung des turkischen Verbalbaues, KSz-এ, ১৮শ সংখ্যা, ১৯১৮-১৯ খৃ., পৃ. ২৯-৪৯; (২৩) ঐ লেখক, Altturkestanische Volksweisheit, Ostasiatische Zeitschr.-এ প্রকাশিত, ৮ম সংখ্যা, ১৯১৯-২০ খৃ., পৃ. ৫০-৭৫; (২৪) ঐ লেখক, Mahmud al-Kasgari uber die Sprachen und Stamme der Turken im XI, Jahrh., in KCsA, ১/১খ, (১৯২১ খৃ.), পৃ. ২৬-৪০; (২৫) G. Bergstrasser, Das Vorbild von Kasgari's Divan lugat at-turk, OLZ-এ প্রকাশিত, ২৪তম সংখ্যা, (১৯২১ খৃ.), পৃ. ১৫৪-৫; (২৬) Brockelmann, Altturkestanische Volkspoesie i-ii, Asia Major-এ প্রকাশিত, সংখ্যা ১, (১৯২৩ খৃ.), পৃ. ১-২২, (১৯২৪ খৃ.), পৃ. ২৪-৪৪; (২৭) F. Hommet, Zu den altturkischen Sprichwortern, in ঐ, পৃ. ১৮২-৯৩; (২৮) Brockelmann, Naturlaute im Mittelturkischen, in Ung Jb, সংখ্যা ৮ (১৯২৬ খৃ.), পৃ. ২৫৭-৬৫; (২৯) ঐ লেখক, Hofsprache in Altturkestan, Donum natalicum Schrijnen-এ প্রকাশিত, Nijmegen-Utrecht, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ২২২-৭; (৩০) A. Z. Validi Togan, Divan-i Lugat at-Turk'un telif senesi hakkinda, Atsiz mecmuasi-তে প্রকাশিত, ২খ., নং ১৬ (১৯৩২ খৃ.), পৃ. ৭৭-৮; (৩১) ঐ লেখক, Mahmud Kasgari ye ait notlar, এ, ২খ, নং ১৭, (১৯৩২ খৃ.), পৃ. ১৩৩-৬; (৩২) O. Pritsak, Karachanidische Streitfragen I-4, Oriens-এ প্রকাশিত, সংখ্যা ৩, (১৯৫০ খৃ.), পৃ. ২১০-২৮; (৩৩) ঐ লেখক, Mahmud Kasgari kimdir ?, TM-এ প্রকাশিত, সংখ্যা ১০ (১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ২৪৩-৬; (৩৪) E. Rossi, A note to the Manuscript of the Diwan Lugat at-Turk, Charisteria Orientalia praecipue ad Persiam Pertinentia (Joanni Rypka... sacrum)-এ প্রকাশিত, প্রাগ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২৮০-৪; (৩৫) L. Bazin, Les dates de redaction du "Divan" de Kasgari, Acta Or. Hung-এ প্রকাশিত, সংখ্যা ৭ (১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ২১-৫; (৩৬) S. Ahally, Slovar' Makhmuda Kashgarskogo i turkmenskij jazik, আশখাবাদ ১৯৫৮ খৃ.; (৩৭) T. Banguoglu, Kasgariden notlar : I-III, Turk dili arastirmalari Yilligi belleten প্রকাশিত (১৯৫৮ খৃ.), পৃ. ৮৭-১১৩; (১৯৫৯ খৃ.), পৃ. ১-২৬; (১৯৬০ খৃ.), পৃ. ২৩-৪৮; (৩৮) Kh. Khasanov, Makhmud Kashgarskij (Zizn' t geograficeskoe nasledie), তাশকেন্ত ১৯৬৩ খৃ.; (৩৯) T. A. Borovkova, Otnositel'no pervogo izdaniya slovarya Makhmuda Kashgarskogo, Narodi Azil i Afriki-তে প্রকাশিত, (১৯৬৪ খৃ.), নং ৫, পৃ. ১৩৩-৫; (৪০) ঐ লেখক, Grammaticeskiy ocerk yazika "Divanu lugat-it-turk" Mahmuda Kasgari, থিসিস, লেনিনগ্রাড ১৯৬৬ খৃ.; (৪১) K. Czegledy, Kasgari foldrajzi neveihez, Tanulmanyok a magyar nyelv eletrajza korebol, বুডাপেস্ট ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৬০-৫; (৪২) J. M. Kelly, On defining Dhu ath-Thalatha and Dhu al-Arba'ah, JAOS-এ প্রকাশিত, সংখ্যা ৯১ (১৯৭১ খৃ.), পৃ. ১৩২-৬; (৪৩) ঐ লেখক, Remarks on Kasgari's Phonology, I. Linguistic terminology, UAJb-তে প্রকাশিত, সংখ্যা ৪৪ (১৯৭২ খৃ.), পৃ. ১৭৯-৯৩; (৪৪) Z. Korkmaz, Kasgarli Mahmut ve Oguz Turkcesi, TD-তে প্রকাশিত, ২৭খ, নং ২৫৩ (১৯৭২ খৃ.), পৃ. ৩-২৬; (৪৫) জি. জি. মুসাবায়েভ, কাশগারলি মাহমূদ-উন য়াসামি উযেরিনে য়েনি ভেরিলের, ঐ, পৃ. ১১০-২০ = Nekotoriye svedeniya o zizni Machmuda Kasgari, in Issledovaniya po tyurkologii, আলমাআতা ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৪৮-৬২। The Soviet Turcological Journal (Sovetskaya Tyurkologiya), ১৯৭০ খৃ.-এ এই দীওয়ান সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

G. Hazai (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

কাশ্তালা (قشتالة) ঃ স্পেনের Castile, Castilla-এর আরবী নাম। খৃ. ৯ম শতক হইতে ইহাকে Castilla বলা হয়। এই স্থানটির আদি নাম কি ছিল তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। নামটি ল্যাটিন castellum হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয় এবং অঞ্চলটিতে যথেষ্ট সংখ্যক দুর্গ বা সুরক্ষিত স্থান ছিল বলিয়াই সেই নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে। আরবী আল-কিলা' শব্দ সম্ভাব্য অনূদিত রূপ, কিন্তু বিভিন্ন সূত্র হইতে (য়াকূত আল-ইদ্রীসী, আল-'উযরী, আল-হিময়ারী, ইব্ন 'ইযারী, আল-মাক্কারী প্রমুখ) ইহার নাম কাশতালা, কাশতীলা বা কাশতীলা, এইভাবে উল্লিখিত পাওয়া যায়। সর্বোপরি আর-রাযী একাধিক স্থানে শত্রুকে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মিন্ আকসা বানবালুনা ওয়া আলাবা ওয়া'ল-কিলা' ওয়া-আহ্ল কাশতীলিয়্যা" (তু. আল-'উযরী মাসালিক, তিনিও আল-কিলা' ও কাশতীলা ব্যবহার করিয়াছেন)। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের লেখাতে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আল-কিলা' ও কাশতীলিয়াকে একই স্থান বোঝানো হয়, ইহাতে তাহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে (তু. Levi-Provencal, Hist. Esp. musul-mane, ১খ, পৃ. ১৪৩, ২০৪)। অতএব স্পেনীয় শেষ যুগের ল্যাটিন (যেখানে মূল শব্দরূপ প্রধানত castrum-কে

গ্রহণ করা হইয়াছে) হইতে ভিন্নতর কোন ব্যুৎপত্তি সন্ধান করিবার জন্য ইহা আরব-ইসলামী শব্দ হইতে ধার করা কিনা তাহা দেখিতে হয়।

প্রথমে স্বভাবতই তিউনিসীয় কাসতীলিয়্যা (দ্র.) শব্দটির কথা মনে পড়ে এবং মনে হয় যেন J. Oliver-Asin তাঁহার Entorno a los origenes de Castilla, su toponimia en relacion Con los arabes y bereberes (মাদ্রিদ ১৯৭৪ খৃ.) গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করা উচিত। তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্য দেখাইয়া কোন একটি এলাকাতে আরবী ও বারবার স্থান নামের মিল দেখাইয়াছেন; সেই এলাকার প্রাচীন কেন্দ্রকে বলা হইত মাদীনা কাশতেলা (Medina Castella)। এই ধারণার আংশিক সত্যতা লক্ষ করা যায় আল-আন্দালুসের স্থান-নামসমূহের মধ্যে 'ইফরীকিয়া'-র বহুল উপস্থিতির মধ্যে (দ্র. ঐ, Les Tunisiens en Espagne a travers la toponomie, Cahiers de Tunisie-এ প্রকাশিত, ১৮শ সংখ্যা, ১৯৭০ খৃ., পৃ. ১৫-২০)। অতএব Oliver-Asin-এর মতে অঞ্চলটির অবশ্যই "আফ্রিকীয় ল্যাটিনীকরণ" করা হইয়া থাকিবে এবং তাহা সম্ভবত করিয়াছিল তিউনিসের ল্যাটিন ভাষাভাষী বারবারগণ (যাহা হইতে এই Castilian-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে, যাহা অন্যান্য হিস্‌পানীয় রোমান আঞ্চলিক ভাষা হইতে ভিন্নতর)।

আর-রাযীর বর্ণনায় কাউন্ট ফারনান গঞ্জালেয (Fardhiland Gundishalb)-এর শাসনামলে আল-কিলা এবং কাশতিলিয়ার অবস্থান পাশাপাশি দেখানো হইয়াছে, সেই কারণে দুইটি স্থান-নামের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয়। খৃস্টান তথ্যসূত্রে জানা মতে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৮০০ খৃ. পাদ্রী Vitula কর্তৃক মেনা উপত্যকাতে সম্পাদিত একটি কাস্তিলীয় দলীলে, যেখানে territorio Castelle কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আর Cronica Albeldense-তে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে Bardulia qui nunc vocatur Castella কথাগুলি। একটি অঞ্চল যাহা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইয়াছে, ইহা Oviedo রাজ্যের ভৌগোলিক ও আইনগত সীমানার প্রান্তে একটি স্বদেশীয় রাজ্য-সংস্থারূপে সংগঠিত হইয়াছে। উহা হইতে S.de Moxo ইহাকে একটি "স্বায়ত্তশাসিত এলাকা" (autonomous territory) বলিয়াছেন (Castilla, principado feudal ?, RUM-এ [১৯৭০ খৃ.], পৃ. ২২৯-৫৭)। রাজকীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হইতে দূরে অবস্থানের ফলে ইহার গঠনতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় "সীমান্তের অগ্রভূমি" এবং তখন comes বা Count-আকারে একটি তাৎক্ষণিক ও স্থানীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন অনুভূত হয় (Alava, Mijangos, Oca, Barga, Pancorbo, Cellorigo, Castrogeriz, Lara, Cerezo)। ৮৫২ খৃ. territorio Castellense-এ সম্পাদিত একটি দলীল বর্তমানে পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে Rodericus, comite in Castelle-এর উল্লেখ রহিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়া Castile-এর সম্প্রসারণ হয়। এই যুদ্ধ ছিল প্রধানত আক্রমণাত্মক, কিন্তু আবার ৯১৭ খৃ., ৯২০ খৃ. এবং ৯২৪ খৃ. পরিচালিত বানূ কাসী (দ্র.) ও বানূ যু'ন-নূনগণ (দ্র.)-এর এবং ৩য় 'আবদু'র-রাহমান (দ্র.)-এর আক্রমণসমূহের প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল (দ্র. San Esteban de Gormaz, Mitonia, Valdejunquera)। অপর দিকে ৯৩৯ খৃ. যে বিখ্যাত গায্‌ওয়াতু'ল-খান্দাক পরিচালিত হইয়াছিল তাহা বিপুল ক্ষতির বিনিময়ে প্রতিরোধ করা হইয়াছিল, লিওনীয় (Leonese), কাশতিলীয় (Castilians) ও নাভারীয় (Navarrese) বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি দ্বারা। এই সময়েই ফারনান গঞ্জালেয comes totius Castelle, হয় কাশতিলীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বা নিজেই সেই ধারণা সৃষ্টি করিয়া, লিয়নের রাজার নিকট হইতে নিজ দেশের উত্তরাধিকার তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে নির্দিষ্ট রাখিবার অধিকার আদায় করিয়া লন। ইব্‌ন আবী 'আমির (দ্র.)-এর অভিযানের ফলে লিয়ন-এর এলাকা ও ক্যাটালোনীয়— আরাগনীয় এলাকা হস্তচ্যুত হইয়া যায়, কিন্তু কাশ্‌তিল (Castile)-এর অধিকাংশই রক্ষা পায়। উহা তখন Garci Fernandez-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহরত ছিল এবং কর্ডোভার সামন্ত ছিল। ইহা হইতে একটি আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, কোন 'আমিরিগণের পতনের পরে প্রারম্ভিক কার্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই এই অঞ্চলের দায়িত্বে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সুপ্রাচীন অঞ্চল বারদুলিয়া (Bardulia), কাশতেলা (Castella), ভেতুলা (Vetula) শুধু তাহাদের স্পেনীয় আঞ্চলিক ভাষা এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানই প্রতিবেশী অঞ্চলের (সর্বোপরি New Castile) নিকটে হস্তান্তর করে নাই, বরং একটি বিজয়াভিযানের আদর্শকেও ("chansons de geste"-তে যাহার প্রতিফলন দেখা যায়) প্রত্যর্পণ করে, যাহা শেষ পর্যন্ত হিস্পানো-আরবগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধকেও কার্যত একচেটিয়া করে এবং একটি রাজনৈতিক প্রভুত্ব আরোপ করে। ফলে আরাগনে (Aragon) মুদেজার (mudejar) (দ্র.) সহনশীলতা নির্বাপিত হইয়া যায়। ঠিক একই সময়ে কাশতিল স্বীয় সুবিধার্থে স্পেনে ঐক্য আনয়ন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র. (১) J. Perez de Urbel, Historia del Condado de Castilla, মাদ্রিদ ১৯৪৫ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Los primeros siglos de la reconquista, Historia Espana of Menendez Pidal-এ, মাদ্রিদ ১৯৬৪ খৃ., ৬খ, পৃ. ৩-৩৪৮; (৩) J. Mª Ruiz Asensio, La rebelion de Sancho Garcia, heredero del condado de Castilla, Hispania Sacra-তে, ১৭খ, (১৯৬৯ খৃ.), পৃ. ৩১-৩৭; (৪) Cl. Sanchez-Albornoz, Alfonso III yel perticularismo castellano, CHE-তে, সংখ্যা ১৩ (১৯৫০ খৃ.), পৃ. ১৯-১০০; (৫) P. Chalmeta, The clash between 'Abd al-Rahman III and the Christians at Simancas-Alhandega : a new interpretation, Islam and the Medieval West-এ বিংহামটন, নিউইয়র্কে ১৯৭৫ খৃ. অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

P. Chalmeta (E.I.²)/ হুমায়ুন খান

কাশ্‌ফ (كشف) ঃ যবনিকা উন্মুক্ত করা, পর্দা উন্মোচন করা, ছিঁড়িয়া ফেলা (যাহা-মানুষ ও অদৃশ্য জগৎ এই উভয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়)। আল-জুরজানির তা'রীফাত (সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৪৫ খৃ, ১৯৩)-এ বিবৃত হইয়াছে যে, আরবী অভিধান অনুযায়ী কাশ্‌ফ-এর অর্থ হইল আবরণ বা পরদা দূরীভূত করা, কিন্তু ব্যবহারিক পরিভাষায় (ইসতিলাহ) ইহার অর্থ হইল যবনিকার অন্তরালের নিগূঢ় রহস্য ও ভাবধারার

একটা সম্পূর্ণ ও যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, (নিম্নে দ্রষ্টব্য) এই সংজ্ঞা আল-জুরজানীর প্রায় বিশ বৎসরের বড় ইমামী পণ্ডিত হায়দার আমূলীর মূল রচনার হুবহু অনুকরণ। কাশ্‌ফের অভিজ্ঞতা অন্তরের অভ্যন্তরে কাজ করে এবং মুকাশাফা ঘটায় যাহা 'আলোকিতকরণ অথবা খৃষ্টানদের নিকট 'মহাপুরুষের প্রকাশ' অর্থে আবরণ উন্মোচনরূপে অনুবাদ করা যায়। 'কাশ্‌ফ'-এর বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য প্রতিশব্দ হইল সিত্‌র (ستر) = আচ্ছাদন ও ইস্‌তিতার (استتار) = আচ্ছাদন করা। আল-জুরজানীর বিশ্লেষণানুযায়ী শব্দটির ব্যবহারিক পরিবেশ হইল মূলত তাসাওউফ এবং শী'আ ধর্মতত্ত্ব। কাশাফা ক্রিয়া (তবে মাসদার কাশ্‌ফ নয়) পদটির প্রচলিত অর্থ উন্মোচন করা (দেহের কোন অংশ) এবং দূরীভূত করা (দুঃখ, অমঙ্গল, বিবাদ, যন্ত্রণা) এই অর্থে ইহা পবিত্র কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক উভয় মূল বচন ভবিষ্যৎ বিবরণের জন্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "আমরা তোমার আবরণ তোমার সম্মুখ হইতে উন্মোচন করিয়াছি, (কাশাফনা) এবং অদ্য তোমার দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ" (৫০ ঃ ২২) এবং "কিয়ামত আসন্ন, আল্লাহ্ ব্যতীত উহার অপসারণকারী কেহই নাই" (৫৩, ৫৭-৮)। এই দুইটি মূল বচনের প্রথমটি আল-গাযালী (র) কর্তৃক তাঁহার রচিত মুনকিয গ্রন্থের প্রারম্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সূফী বিবরণাদির কয়েকটি উদাহরণ ঃ (ক) আল-কালাবাযী ঃ প্রাথমিক শতাব্দীতে (যথা ঃ আল-হাল্লাজ-এর সময়) সিত্‌র (ستر) এবং ইসতিতার (استتر) শব্দের বিপরীত রূপে 'কাশ্‌ফ' শব্দের তুলনায় 'তাজাল্লী, (تجلي) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উদ্ভাসন শব্দের ব্যবহার অধিক ছিল। আল-কালাবাযী স্বীয় কিতাবু'ত-তা'আররুফ (সম্পা. Arberry, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩, ৯০) গ্রন্থের ৫৮ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়াছেন ফি'ত-তাজাল্লী ওয়া'ল-ইসতিতার। তিনি তিন প্রকার তাজাল্লীর কথা বলিয়াছেন। যথা ঃ (১) মূল সত্তার তাজাল্লী; (২) মূল সত্তার বিশেষণ (صفات الذات)-এর তাজাল্লী এবং (৩) মূল সত্তার অবস্থার (হুক্‌ম) তাজাল্লী। তারপর তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, মূল সত্তার তাজাল্লীই হইল মুকাশাফা।

(খ) আল-কুশায়রী ঃ আল-কুশায়রী সর্বশেষ এই ধারণাটি অধিকতর স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং পৃথক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা পরবর্তীকালে সর্বোত্তম মতবাদে পরিণত হয় (আর-রিসালা আল-কুশায়রিয়া, n. d., 39-40)। তিনি বলেন যে, সত্যের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইবার তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি মুহাদারা যাহা নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের মুখামুখী একটা অবস্থায় উপস্থাপন করে। ইহা পর্দার আড়ালে থাকে এবং পূর্ব হইতেই আত্মার উপস্থিতি ও প্রমাণ উপস্থাপনের কথা ধরিয়া লয়। যে ব্যক্তি নিজেকে বুদ্ধিমত্তার ('আকল) নির্দেশনায় সীমাবদ্ধ রাখে, কেবল আল্লাহ্‌র অলৌকিক নিদর্শনের (আয়াত) মাধ্যমে সে তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরটি হইল মুকাশাফা (مكاشفة) অর্থাৎ পর্দা উন্মোচন, পথের সন্ধান করার আর কোন দরকার নাই। সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ (বায়ান) বিচার শক্তির (বুরহান) স্থান অধিকার করে এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সমক্ষে তাঁহার অপ্রত্যক্ষ নিদর্শন অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এই স্তরটি এখন পর্যন্ত মধ্যস্তর মাত্র, এই রহস্যময় পৃথিবীর পর্দা উন্মোচনমাত্র। ইহার মাধ্যমে তৃতীয় স্তরে পৌছান যায়। এই তৃতীয় স্তর মুশাহাদা প্রত্যক্ষ দর্শনের হাকীকা বা বাস্তবতার উপস্থিতির দিকে প্রমাণের মাধ্যমে এমনকি স্বজ্ঞাত ব্যাখ্যা (বায়ান) ছাড়াই পৌছিয়া যায় এবং ইহাই খোদাঈ বৈশিষ্ট্যের পথ উন্মুক্ত করে।

(গ) আল-আনসারী ঃ কাশ্‌ফ ও মুকাশাফা হইল একটি আলোকপ্রদ পথে প্রবেশ দ্বারের ন্যায়। এই জাতীয় একটি মধ্যবর্তী স্তর অথবা একটি প্রবেশ দ্বারের কথা অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এইভাবে আল-আনসারীর মানাযিল-এ প্রতিটি বিরতির স্থান (মানযিল) অথবা প্রায় সকল মানযিলেই তিনটি উন্নয়নশীল পর্যায় অন্তর্ভুক্ত। অনেক স্থানেই দ্বিতীয় পর্যায়ের সহিত কাশ্‌ফ উল্লিখিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এমনভাবে তাবাত্তুল (আল্লাহ্‌র প্রতি উৎসর্গ)-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে সে "পর্দা উন্মোচনের বিদ্যুৎ ঝলকানর জন্য (শায়মা বারক আল-কাশ্‌ফ) প্রহরা" হইতে ফিরিয়া আসে (কিতাব মানাযিল আস-সা'ইরীন, সম্পা. ও ফরাসী অনু. S. de Laugier de Beaurecueil, কায়রো ১৯৬২ খৃ., ২৫/৬৭)। তৃতীয় পর্যায়টি ইহাকে ছাড়াইয়া যায়। তবে তাসলীম (সার্বিক আনুগত্য) সম্পর্কে অনুরূপ কিছু মন্তব্য (ঐ, ৩৭/৬৭ ; ৫৪/৯০ ; ৬৪/৯৭), উনস (ঘনিষ্ঠতা) ও ফিরাসা (বিজ্ঞতা) আছে। কিন্তু 'আয্‌ম (সংকল্প) সম্বন্ধে কাশফ প্রথম পর্যায়ের (ঐ, ৫১/৮৭) সঠিক মনে হয়। কেননা উন্মোচনের বিদ্যুৎ ঝলকানি দেখা ছাড়া প্রাথমিক 'আয্‌ম হইতে পারে না। অপর পক্ষে কাশফ য়াকীনের (নিশ্চয়তা) তৃতীয় পর্যায়ে উন্নতির পথ নির্দেশ করে। যেহেতু নিশ্চয়তার প্রথম পর্যায় (অথবা নিশ্চিত জ্ঞান) হইতেছে আল্লাহ্‌র বাণীর স্বীকৃতি দ্বিতীয় পর্যায় (অথবা নিশ্চিত দর্শন) যুক্তির বাহিরে চলিয়া যায় কিন্তু তৃতীয় পর্যায় বা প্রকৃত নিশ্চয়তা উন্মোচনের প্রভাতের (সুবহ) আকস্মিক আবির্ভাবকে পূর্ব হইতে স্বীকার করা হয়, যাহা মনে হয় যে, এই তৃতীয় পর্যায়ের (ঐ, ৫৪/৯০) তিনটি অবস্থার প্রথম পালা বিদ্যুৎ ঝলকানো অথবা প্রভাত সর্বদা বাহির হইতে আগত একটা আকস্মিক প্রবেশের মতো যাহা এইভাবেই কাশফ-এর আশ্চর্যজনক বস্তুর আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ইহা বাস্তবতা বোধগম্য হওয়ার জন্য নূতন রীতি নির্দেশনা। এই উৎকৃষ্ট খোদাঈ তাজাল্লী-র ফল একটি তাৎক্ষণিক এবং নিশ্চিত জ্ঞান যাহা সকল অপ্রাসঙ্গিক অথবা ঐতিহ্যগত সকল বিতর্কমূলক প্রমাণের অতীত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত।

L. Gardet (E.I.²)/ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

কাশ্মীর, কাশ্‌মীর (كشمير) ঃ আরবী রচনাসমূহে قشمير বানানেও পাওয়া যায়, সংস্কৃত কাশ্মীরা, ফারসীতে ঃ কাশ্‌মীর ; কাশ্মীরী ভাষায় কাশীর।

১। ভৌগোলিক বর্ণনা ঃ স্থানটি হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রস্তর হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চে। ৩৩°৩০ ও ৩৪°৪০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৪°/৭৫°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। ইহা উপবৃত্তাকার বিশিষ্ট। ইহার মধ্যস্থলের সমতল উপত্যকাও অনুরূপ উপবৃত্তাকার। ১৮০০ অথবা ১৯০০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট এই উপত্যকাটি প্রাচীন কাল হইতেই কাশ্মীর নামে পরিচিত। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৪ মাইল ও উত্তর-পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহার প্রস্থ প্রায় ২০ হইতে ২৫ মাইল। ইহার আয়তন ন্যূনাধিক ৮৫৩৯ বর্গমাইল। স্থানটি উচ্চ পর্বতশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। পীর পাঞ্জালের পর্বতমালা জম্মু, রাজৌড়ী এবং পুঞ্চ-এর

বাহির্ভাগের পাহাড়সমূহ ইহতে ইহাকে পৃথক করিয়াছে যাহার কতিপয় শৃঙ্গ ১৮,০০০ ফুটেরও অধিক উচ্চ। উপত্যকাটির সন্নিকটে অবস্থিত পাহাড়ের চূড়াসমূহের উচ্চতাও যথাক্রমে গুশ বারারী (১৭,৮০৫ ফুট), অমর নাথ (১৭,৩২১ ফুট) এবং হরমুখ (১৬,৯০৩ ফুট)। ইহার অপর প্রান্তে এক বিস্তৃত পার্বত্য এলাকা রহিয়াছে, যাহার দুর্গম গিরিপথসমূহ ইহাকে লাদাখ, সিন্ধু উপত্যকার উপরিভাগ এবং মধ্য এশিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

লাদাখ অঞ্চলের সহিত যোগাযোগের উত্তম ব্যবস্থা যাজী গিরিপথ (১১,৩০৫ ফুট) এবং 'উসতুর" ও 'সাকারদু'-র সহিত 'বারযীল" সংযোগ স্থাপনের সর্বাপেক্ষা সোজা পথ সেই রাস্তাটি যাহা ভিম্বর গিরিপথ হইয়া পীর পাঞ্জাল (১১,২০৫ ফুট)-এর উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুগম ও সারা বৎসর যাতায়াতযোগ্য রাস্তাটি বারামুলা (বরাহামুলার আধুনিক নাম), যাহা ঝিলাম নদী (বিতস্তা) হইতে প্রবাহিত হইয়া উন্মুক্ত মাঠে প্রবেশ করিয়াছে। কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছিবার সহজতর চমৎকার সড়কটি (দেশ বিভাগের পূর্বে) রাওয়ালপিন্ডি হইতে মারী হইয়া ঝিলাম নদীর উপত্যকার পাশ দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় রাস্তাটি এবটাবাদের রাস্তা, যাহা ঐ সড়কটির সহিত মুজাফ্‌ফারাবাদে (অর্থাৎ কৃষ্ণ গঙ্গা) (=নীলাম এবং ঝিলাম নদীর মিলনস্থল) মিলিত হইয়াছে। এখানে প্রাকৃতিক সুবিধা রহিয়াছে প্রচুর। প্রাথমিক যুগে এই রাস্তাটি সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইত। উপত্যকাবেষ্টিত উচ্চ পর্বতমালা ভেদ করিয়া গিরিপথ যুগ যুগ ধরিয়া বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথসমূহ যথাক্রমে বানিহাল, বুদিল, পীর পাঞ্জাল, তোশমাইদান, হাজ্জী পীর, যূজীলা ইত্যাদি। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন এই উপত্যকাটির ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে Drew, Lydekker, Oestreich প্রমুখ ঐতিহাসিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তারিত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনা করিয়াছেন Cunningham ও Steain।

উপত্যকাটি সমুদ্রস্তর হইতে পাঁচ হইতে ছয় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানকার ভূমি মোটামুটি সমতল ও উর্বর। মনে হয় যেন প্রাচীনকাল হইতেই এখানে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজমান। উপত্যকাটি বেশ দূরে অবস্থিত এবং যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম বলিয়া উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে সংঘটিত অনেক আক্রমণ হইতে নিরাপদ। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ দৈহিক গঠনে সুডৌল ও সুঠাম হইয়া থাকে। কতিপয় পর্যটক ও লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ করেন না যে, কাশ্মীরবাসিদের উপর নিরন্তর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়াছে। এতদসত্ত্বেও কাশ্মীরবাসিগণ নিজেদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সংগ্রামে লিপ্ত এবং অদ্যাবধি তাহা অব্যাহত আছে। পক্ষান্তরে এখানকার অধিবাসীদিগের অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরের বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী নওজোয়ানগণ তাহাদের প্রতিপক্ষের উৎখাতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে। দৈহিক সৌন্দর্যের দিক হইতেও কাশ্মীরীগণ বিখ্যাত। কাশ্মীরের সুশিক্ষিত জনগণ তাঁহাদের প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও অন্যান্য গুণের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, গবেষক, উচ্চাঙ্গের চিন্তাবিদ, কবি ও সাহিত্যিকও জন্মলাভ করিয়াছেন। কাশ্মীরীদের শিল্পের নিদর্শন শাল ও আখরোট কাঠের সুন্দর কারুকার্য সম্বলিত আসবাবপত্র, যাহা কমনীয়তা ও স্থায়িত্বের জন্য ভুবনবিখ্যাত। কাশ্মীরের অতি প্রাচীন ইতিহাস যদিও আমাদের জানা নাই, তবুও বিগত দুই হাজার বৎসরের কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কিত যে সকল উৎস সংরক্ষিত রহিয়াছে সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে Kalhana কর্তৃক বর্ণিত লোককাহিনী অন্যতম। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, একদা কাশ্মীর ছিল একটি হ্রদ। হ্রদের নিম্নে পলির তলানী পাললিক মালভূমির সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার একটি ভূতাত্ত্বিক সত্যতাও রহিয়াছে। লোককাহিনী সম্বলিত এই কাব্য খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে রচিত এবং Stien কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ ও পাদটীকাই আমাদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উৎস। অন্যান্য উৎসের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (১) চৈনিক পর্যটক হুয়াংচুয়াং (হিউয়েন সাং), ৭ম শতাব্দীতে (৬৩১-৬৩৩ খৃ.) কাশ্মীরে আগমন করেন ; (২) ১১শ শতাব্দীতে আল-বীরূনী (দ্র.) রচিত গ্রন্থ তাহ্‌কীক মালি'ল-হিন্‌দ ; (৩) আবু'ল-ফাদ্‌ল রচিত আ'ঈন-ই আকবারী ; (৪) শাহানশাহ জাহাঙ্গীরের তুযাক ; (৫) বর্তমান যুগের কতিপয় পর্যটকের বিবরণ, যথা ঃ ফরাসী চিকিৎসক Bernier-এর ভ্রমণ কাহিনী, যিনি শাহানশাহ আওরাঙ্গযীব-এর সহিত কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুদ্রাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কালানুক্রমিক বিদ্যমান, যদ্দারা কাশ্মীরের ইতিহাসের অনেক বিষয় জানা যায়। [অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত, যাহাতে শ্বেতাঙ্গ হুন (Ephthalites), হিন্দু রাজা, মুসলিম সুলতান, মুগল বাদশাহ, আফগান পাঠান এবং শিখগণের রাজত্বকাল ছাড়াও ইংরেজ শাসনামলে জম্মুস্থ হিন্দু ডোগরা শাসকগণের প্রতিপত্তির যুগও অন্তর্ভুক্ত]।

কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস ইহতে ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উপত্যকাটি বহু ঐতিহাসিক দিগ্বিজয়ীর করাল গ্রাস হইতে নিরাপদ ছিল। আলেকজাণ্ডার এখানে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুলতান মাহমূদ গাযনাবী কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রতিহত করা হইয়াছিল। চিঙ্গীয খান (দ্র.) ও তৈমূরলঙ্গ এই দিক দিয়া অতিক্রম করেন এবং অতিক্রম করেন সম্রাট বাবুরও (দ্র.)। কিন্তু সম্রাট আকবর যখন উত্তর ভারতে স্বীয় ক্ষমতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন কাশ্মীর অতি সহজেই তাঁহার করতলগত হয়। মুগলদের পর নাদির শাহের আক্রমণে যখন মুগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তখনও তিনি ইহাকে আক্রমণ করেন নাই। যাহা হউক, এই দেশ আহমাদ শাহ দুররানীর আক্রমণের ফলে অবদমিত হয়। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরই দুররানীগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং শিখগণ অতি সহজেই কাশ্মীর দখল করিতে সক্ষম হয়।

কাশ্মীর নামটি বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। পাণিনির ব্যাকরণে ইহার প্রাথমিক উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তীকালে মহাভারত ও পুরাণেও এই মত প্রকাশিত হইয়াছে। টলেমীর পূর্বে (Ptolemy) কখনও কশ্মীর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কেননা সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শাসনামলে যুরোপীয় ঐতিহাসিকগণও ইহার কোনও প্রকার উল্লেখ করেন নাই। টমেলী (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর শেষার্ধে) ইহাকে একটি সুবৃহৎ রাজত্ব বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন—উপত্যকার বাহিরেও ইহার সীমা বিস্তৃত ছিল। প্রকাশ থাকে যে, ইহা উত্তর ভারতে অবস্থিত কুশান বংশের সুবিশাল রাজত্বের একটি অংশ। টলেমী ইহাকে 'Kaspeiria' বলিয়াছেন। তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে, ইহা Bidaspes,

Sandabal ও Adris অর্থাৎ বিতস্তা (=বিহাত, বায়হাত বা ঝিলাম), চন্দ্রভাগ (=চিনাব) ও ইরাবতির (=রাবী) উৎপত্তিস্থলের (প্রস্রবণ) নিম্নদেশে অবস্থিত এবং ইহাই সঠিক বর্ণনা।

চৈনিকগণ কখন হইতে কাশ্মীর শব্দটি ব্যবহার শুরু করিয়াছে তাহা পরিষ্কার বোঝা যায় না। কিন্তু ৬৩১ খৃ. হিউয়েন সিয়াং-এর কাশ্মীর ভ্রমণকালে তিনি ইহাকে Kia-shi-mi-lo রাজ্য বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আবু'ল-ফিদা এবং ইব্ন বাতূতার মত মুসলিম ঐতিহাসিক এবং ভূগোলবেত্তাগণ কাশ্মীর সম্পর্কে কোনও কিছুই উল্লেখ করেন নাই। আল-মুকাদ্দাসী এবং আল-ইদ্‌রীসী কেবল ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। আল-মাস'উদী কাশ্মীর এবং উহার রাজধানীকে "শহর কাশ্মীর" আখ্যা দিয়া দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু উহা নির্ভরযোগ্য নয়। যাহা হউক, কেবল আল-বীরূনীই ইহার বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দিয়াছেন। যদিও তিনি কখনও কাশ্মীর ভ্রমণ করেন নাই তবুও তিনি পাঞ্জাব ও গাযনী হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাশ্মীরের জনগণের আচরণ এবং রীতিনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দান করেন। তিনি উপত্যকা হইতে বহির্গত গিরিপথের এবং সম্ভবত ঝিলাম নদীর গতিপথের সঠিক সন্ধান দান করিয়াছেন। কাশ্মীরের আদি অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কাশ্মীরের বর্তমান অধিবাসীগণ সম্ভবত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, যথা- আর্য্য, মঙ্গোলীয় তুর্কী এবং আফগানী প্রভৃতি। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা ২৪,৩৫,৭০১ জন, ইহাদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা, ২২,৮৯,৫৩০ জন। কাশ্মীর জনগণের প্রধান খাদ্য চাউল, প্রধান ফসল ধান, কাশ্মীরে প্রবল শীত পড়ে, কিন্তু মে হইতে অক্টোবর মাস অত্যন্ত মনোরম। উপত্যকার চিত্রকল্পও মনোরম দৃশ্য সারা বিশ্বের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Grierson-এর ভাষ্যে, কাশ্মীরের ভাষা দার্দিক ভাষাবর্গের অন্তর্গত; (উত্তর ভারত, পাকিস্তানের এবং আফগানিস্তানে প্রচলিত), যদিও ইহা বহুলাংশে সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত ; পরবর্তীকালে ইহা উর্দূ ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় ; বর্তমানে ইহা ফারসী লিপিতে (যাহা আরবী লিপির অনুকরণ) লিখিত হয়। ৯/১৫ সালে সুলতান যায়নু'ল-'আবিদীন কর্তৃক পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরের অফিস আদালত, সৃষ্টি সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। তৎকালে ফারসী ভাষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে, কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উর্দূকে সরকারী ভাষা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়, যদিও কাশ্মীরী ভাষার উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, তবুও অফিস আদালত ও সংস্কৃতিতে উর্দূ ভাষাই প্রচলিত থাকে।

২. চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস ঃ কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস লোককাহিনী মাত্র। ইহা ব্যতীত সমকালীন অন্য কোনও অভিজ্ঞতা বিদ্যমান নাই। তবে সঙ্গত কারণেই এ কথা বিশ্বাসযোগ্য যে ২৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে কাশ্মীর মহারাজ অশোকের করতলগত হয়। যখন চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করেন, তখন মৌর্য্য বংশের রাজ্যের সীমা উত্তর দিকে প্রসারিত হয়। যুগ যুগ ধরিয়া ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। সুতরাং সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার সাধনার পথ সুগম হয়। তাঁহার ফরমানাদির কোনও লিখিত দলীল বা শিলালিপি কাশ্মীরে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মান্‌সাহ্‌রাহ্‌-এর উৎকীর্ণ লিপি 'পাখলী' মাঠ হইয়া 'বারমুলা' গামী রাস্তার নিকটবর্তী স্থানেই অবস্থিত ছিল। এই মাঠটি ছিল 'উরসার' (হাযারা) অন্তর্গত। চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাং-এর ভাষ্যে প্রকাশ, মহারাজা অশোক এই উপত্যকায় চার শত বৌদ্ধ স্তূপ এবং মঠ নির্মাণ করেন। লোক কাহিনী (১খ, ১০৪) হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, এই বর্ণনা পণ্ডিত কল্‌হান-এর আমলেও প্রচলিত ছিল। ইহাতে সম্রাট অশোককে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ স্তূপ ও শ্রীনগর শহরের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পুরাতন রাজধানীস্থ (পুরাতন দাহিস্থানা=কাদীম দারু'স-সালতানাত) মন্দিরের নিদর্শন দৃষ্টে এই শহরের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় যে, ইহা শ্রীনগরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত। যাহা হউক, কাশ্মীরের মধ্যযুগীয় ঘটনাপঞ্জীর লেখকগণ শ্রীনগরকে "শহর-ই কাশ্মীর" বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা ব্যতীত এই ইতিহাসে কণিষ্ক, জিশকা ও হিশকা নামীয় বাদশাহগণের বিবরণসম্বলিত আরও একটি বর্ণনা উল্লিখিত হইয়াছে। উহারা ছিলেন উত্তর ভারতের কুশান শাসক ও কণিষ্ক, ওয়াসিশক ও হুশাক-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মুদ্রাব্যবস্থা ও শিলালিপিতে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈনিক ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্যান্য উৎস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা কণিষ্ক কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করান। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে এই আলোচনা সঠিক বিবেচিত হইলে ইহা নিশ্চিত যে, এই সম্মেলন বুদ্ধের মৃত্যুর ৪০০ শত বৎসর পর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। মহান কুশান রাজত্বের পতনের পর এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, কাশ্মীর কুশান বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতির শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শ্বেতকায় 'হুন' জাতীয় শাসকগণ উহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। সমগ্র প্রাথমিক যুগ ব্যাপী কাশ্মীর অথবা উহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোনও নাম বরাবরই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। Stein প্রমাণ করিয়াছেন যে, টলেমীর Kaspeiria শব্দটি প্রাকৃত ভাষার Kasvira শব্দের অনুরূপ। এই দেশের নূতন নাম কাশ্মীর, ইহার কাশির নাম হইতে উদ্ভূত। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত রূপ কাস্‌মিরা (Kasmira) তেমন কোনও পরিবর্তন ব্যতিরেকেই এই দেশের নাম হিসাবে উপমহাদেশে ও ইরানে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। Wilson স্থির করিয়াছেন যে, কাশ্মীর নামটি Kasyaoa-Pura শব্দের রূপান্তর। কিন্তু ইহা সাধারণ্যে গ্রহণীয় নয়। আবার হেরোডোটাসের "Kas-Patyros"-এর কাশ্মীর নয়। বরং ইহা সিন্ধু নদের উপকূলবর্তী এক প্রান্তের কোনও এক স্থানের নাম। এই স্থানকে তিনি Paktyike-এর একটি প্রদেশের নাম বলিয়া ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে ইহাকে অবশ্য পাখ্‌লী বলা হইত অর্থাৎ ইহা সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি পাহাড়িয়া অঞ্চল। মুগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কাশ্মীরে এই নামে একটি সরকার ছিল। Hekataios বলেন, কান্দাহারে Kaspapyros নামে একটি শহর ছিল। ৭ম খৃষ্টাব্দে চীনের পর্যটকগণ কাশ্মীরের নাম বলিয়াছিল Kipui। ১৭৮ খৃ. গোনন্দ বংশের শাসকগণ কুশান শাসকগণের স্থলাভিষিক্ত হন। এই বংশের কতিপয় শাসক ধর্মবিশ্বাসের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে।

'হুন' জাতি কর্তৃক কাশ্মীর অধিকৃত হওয়ার ফলে ভারতে তাহাদের সরাসরি আক্রমণের সূত্রপাত হয় এই কথা সঠিক নহে। তাহাদের রাজা মিহিরগুলা ৫৩০ খৃ. সিয়ালকোটে অবস্থান করিতেন। চীনের তীর্থযাত্রী

সুংইউ-এর উপস্থিতিতেই সেই সময় কাশ্মীর আক্রমণ করেন। মিহিরগুলা কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় নাই। কিন্তু তিনি ৫২৮ খৃ. ভারতে পরাজয়বরণ করার পর প্রকাশ্যত কাশ্মীরে চলিয়া যান এবং ধীরে ধীরে ঐ দেশ অধিকার করেন। এখান হইতেই তিনি তাঁহার ভাইয়ের উপর আক্রমণ শুরু করেন, যিনি কান্দাহারে বলপূর্বক তাঁহার সিংহাসন দখল করেন। অনুমান করা হয় যে, তিনি তাঁহাকে ভারতভূমিতে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাশ্মীরেও গিয়াছিলেন এবং মুদ্রাও চালু করিয়াছিলেন। কিন্তু মিহিরগুলা প্রকাশ্যত যথারীতি কাশ্মীরে থাকেন। কাশ্মীরী পদ্ধতিতে মুদ্রা প্রচলন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কুহেংগাল ও তুরমান-এর নামেও দৃষ্ট হয়। হিউয়েন সাং বলেন, মিহিরগুলা ছিলেন একজন অত্যাচারী রাজা। তিনি বৌদ্ধগণের উপর প্রচুর অত্যাচার করিতেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে নিরুৎসাহিত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদকে উৎসাহিত করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরের শাসনকর্তা মাতৃগুপ্ত (Matrgupta) উজ্জয়নস্থ হর্ষবর্ধন ও বিক্রমাদিত্যের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু ইহা ছাড়া কাশ্মীরের সহিত হর্ষবর্ধনের সম্পর্কের ব্যাপারে আর কিছুই জানা যায় না।

তৎকালীন রাজা পর্যটক হিউয়েন সাংকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু হিউয়েন সাং সেই রাজার নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি সেখানে এক শত বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান, যেগুলি তখন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ইহার কিছুদিন পরই কনৌজের নৃপতি হর্ষবর্ধন কাশ্মীর হইতে বুদ্ধের দাঁতের প্রাচীন পবিত্র স্মারক চিহ্ন লাভ করেন। কিন্তু তিনি এই দেশের উপর আক্রমণ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে চীনের সহিত কাশ্মীরের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। সুতরাং ৭১৩ খৃ. চীনের এক প্রতিনিধি দল আগমন করে। ৭২০ খৃষ্টাব্দের পর চীনের সম্রাটগণ কাশ্মীরের রাজাগণকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। চীনের সর্বশেষ প্রতিনিধি দল (যাঁহাদের বর্ণনা সামনে আসিবে) ৭৫৯ খৃ. আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় কাশ্মীরে কারকুটা বংশের রাজত্ব ছিল। ৭১৩ খৃষ্টাব্দের চৈনিক প্রতিনিধি দল বাহ্যত রাজা চন্দ্র পীঠের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি আরবদের বিরুদ্ধে (যাঁহারা প্রথমবারের মত দৃশ্যপটে আগমন করেন) সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের পর হিমালয় পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি আর অধিক সম্মুখে অগ্রসর হন নাই। কাশ্মীরের প্রচলিত মুদ্রা পরবর্তী কুশান রাজাদের মুদ্রার অনুরূপ ছিল (যদিও উহার নক্সা ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল)। ইহা কারকুটা বংশ হইতেই শুরু হয় এবং খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর হিন্দু রাজাগণের উপর মুসলিম বাদশাহগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের সময়কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এই গোষ্ঠীর পূর্ববর্তী প্রাচীন রাজাগণের শাসনাধীনে কাশ্মীরের বাহিরেও বহু দূর পর্যন্ত ইহাদের সীমা বিস্তৃত ছিল, যাহার মধ্যে পাখলী, পুঞ্চ, রাজপুরী, তক্ষশীলা এবং লবণের পার্বত্য এলাকাও অন্তর্ভুক্ত (Salt range)। ৬২৭ খৃ. দুর্লভ বর্ধন কারকুটা বংশের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন (যদিও এই বংশের পদবীর মূল উৎস সম্পর্কে সুনিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না)। দুর্লভ বর্ধন ছিলেন ইতিহাসে এক অখ্যাত বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। হিউয়েন সাং তাঁহার শাসনামলেই কাশ্মীরে পৌছান এবং ব্যক্ত করেন যে, "ঐ সময় বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হইতেছিল সত্য, কিন্তু দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

ললিতাদিত্য ছিলেন কারকুটা রাজবংশের মহান শাসক। তিনি কাঙ্গরা, পুঞ্চ, রাজৌড়ী এবং জম্মুর অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহার বিজয় সম্পর্কে কলহনের লোককাহিনী সারা ভারতে পরিচিত। ৭১৩-৫৫ খৃ. ললিতাদিত্য চীনের সম্রাট হুয়ান সুয়াং-এর নিকট আরবদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। আরবগণ দক্ষিণ দিক হইতে এবং তিব্বতবাসিগণ ও তুর্কীগণ উত্তরদিক হইতে চাপ সৃষ্টি করিতেছিল। তিনি ছিলেন একজন মহান (ইমারত) নির্মাতা। তাঁহার মহৎ নির্মাণ কার্যের মধ্যে মার্তণ্ড মন্দির অন্যতম। ইহার শিল্পকর্মের জন্য তিনি গান্ধারা গোষ্ঠীর নিকট ঋণী এবং তাঁহার এই শিল্পকর্ম উপত্যকার সকল মন্দিরের জন্য একটি আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ললিতাদিত্য ব্যাপক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। আবাদযোগ্য বিশাল ভূখণ্ড উদ্ধার করেন এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ললিতাদিত্যের অল্প কয়েক বৎসর পরই ঔ-কং (OU-K'ong) কাশ্মীর পরিদর্শন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধি লক্ষ করেন। তিনি বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁহার সুদক্ষ প্রকৌশলী সুয়্যা (Suyya)-এর নাম সোপুর (Sopur) শহরে (পুরাতন নাম সূয়্যাপুরা=Suyyapura) আজও স্মরণ করা হয়। তিনি পানি সেচের জন্য নর্দমা (ড্রেন) নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং পতিত জমি উদ্ধার করিয়া কাশ্মীরকে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলেন। হিউয়েন সাং-এর মাধ্যমে জানিতে পারা যায় যে, এই সমস্ত নির্মাণকার্যের নমুনা লবণের পাহাড় অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরসমূহে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। কাশ্মীরে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম একই বিস্তার লাভ করে। ১২শ শতাব্দীতে পণ্ডিত কলহনের গ্রন্থ রচনা পর্যন্ত এই অবস্থায় বিরাজিত থাকে। খুব সম্ভব হিন্দু মন্দিরসমূহের নির্মাণ পদ্ধতি বৌদ্ধ বিহারসমূহের নির্মাণ পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। (Foucher, L' Art Greco-Bouddhique, পৃ. ১৩৬-১৪৫)। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কান্দাহারে অট্টালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে ইহার সূত্রপাত হয়। একগম্বুজ (গাজরাকৃতি)-বিশিষ্ট ছাদ তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। অদ্যাবধি ইহা কাশ্মীরের মসজিদসমূহে বিরাজমান। শ্রীনগরের শাহ হামদানী মসজিদেও একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কলহনের ইতিহাসে কান্দাহারের বাদশাহগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। ললিতাদিত্যের উত্তরাধিকারিগণ অযোগ্য ছিল। ফলে উৎপলবংশ উহার স্থান দখল করে, যাহা অভন্তিভর্মন কর্তৃক (৮৫৫-৮৩ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অভন্তিভর্মন উৎপলের পৌত্র ছিলেন। তাঁহারা কারকুটার সহিত বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত ছিলেন। অভন্তিভর্মন অভন্তিপুর শহর স্থাপন করেন। এখানে তিনি বড় বড় মন্দিরও স্থাপন করেন। এই সমস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়।

স্পষ্টত ইসলামের প্রসার লাভই কাশ্মীর ও কান্দাহারের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। সিন্ধুতে মুসলিমদের বিজয় ছাড়াও কাবুল প্রান্তে কান্দাহারের সীমানায় আক্রমণ হইতেছিল। তাবারী বলেন, হি. ১৩ সনে 'আসিম ইব্ন 'আম্র কান্দাহার ও ভারতীয় সীমান্তে পৌছান। বালাযুরীর মতে সিন্ধুর গভর্নর হিশাম ইব্ন 'আম্র আত-তাগলাবী খলীফা আল-মানসূরের শাসনামলে (১৩৬/৭৫৪–১৫৫/৭৭৫) কাশ্মীর ও মুলতান জয় করেন এবং তিনি কান্দাহারে আগমন করেন ও উহাও জয় করেন। আল-য়া'কূবীও ইহার সত্যতা সমর্থন করেন। কাশ্মীরের যে অঞ্চল এই ভাবে জয় করা হইয়াছিল নিঃসন্দেহে উহা দেশের অনাবাদী পতিত অঞ্চল

ছিল। ইহা কাশ্মীর উপত্যকায় নয়, বরং ইহা সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা শুধু একটি আক্রমণ অভিযানই ছিল, কাশ্মীরের উপর তাহার কোনও স্থায়ী প্রভাব পড়ে নাই। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু রাজা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত রাজত্ব করেন।

অভন্তিভর্মনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শ্যামকর ভর্মন (৮৮৩-৯০২ খৃ.) উচ্চহারে কর ধার্য করেন এবং বাধ্যতামূলক শ্রমনীতি (বেগারী) প্রবর্তন করেন। এই প্রথা কাশ্মীরীদের জীবন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী শাসকগণ তান্ত্রিল অথবা অত্যন্ত দুর্বল সামন্তদের হাতের পুতুল ছিলেন। গোপালভর্মন (৯০২-৯০৪ খৃ.) একজন বিদ্রোহীর কবল হইতে তাঁহার রাজধানী ফিরাইয়া আনিতে তুরমান অথবা কামালুকার (কামালুওয়া, আল-বীরূনীকে) সাহায্য করেন। ৯৫০ খৃ. ক্ষেম গুপ্ত (৯৫০-৯৫৮ খৃ.) সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি কামালুকার স্থলাভিষিক্ত ভীমের দৌহিত্রী দিদ্দাকে বিবাহ করেন। তবে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন এবং প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তাঁহার স্ত্রী 'দিদ্দা'। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর একের পর এক স্বীয় পুত্র ও পৌত্রকে খতম করিয়া দিয়া ৯৮১ খৃ. তিনি স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁহার ভাগিনেয় শ্যামগ্রাম রাজাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং ১০০৩ খৃ. পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি পুঞ্চস্থ লোহারা রাজ বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাঁহারই ছত্রছায়ায় এই বংশের লোকজন কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

৪০৪/১০১৩ সালে সুলতান মাহমূদ গাযনাবী এই 'রাজ'বংশ ধ্বংস করিয়া দেন। কাশ্মীরী সেনাবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট এই বংশের সর্বশেষ শাসক "তারলোচন পাল" পরাজয় বরণ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু সুলতান মাহমূদ কাশ্মীর প্রবেশ করার চেষ্টা করিয়া লোহারায় পাহাড়িয়া কিল্লা পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া যান। আল-বীরূনী বলেন, স্থানটি ছিল 'লাহোর' এবং তিনি আরও বলেন, এইরূপ সুদৃঢ় স্থান তিনি আর কখনও দেখেন নাই। এই রাজত্বের পতনের পরও ঐ বংশের রাজপুত্রগণ কাশ্মীরে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। গাযনাবী সালতানাতের আমলে লোহারা বংশীয়গণ আগাগোড়াই শাসক ছিলেন। কলহনের ভাষ্যানুযায়ী নীমপাগল রাজা হর্ষদেব (১০৮৯-১১০১ খৃ.) মুসলমানগণের প্রভাবাধীন ছিলেন। তিনি তুর্কী সৈন্যগণকে চাকুরী দিয়াছিলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তিসমূহ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তুর্কী সৈন্যগণকে চাকুরী প্রদানের হেতু হয়ত কাশ্মীরীগণের অযোগ্যতাই ছিল। প্রকাশ থাকে যে, এই সময়ে সামাজিক অন্যায়-অনাচারের ফলে দেশ প্রায়ই ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ-বিক্ষোভে জর্জরিত থাকিত। সম্ভবত ইহা বিদেশী সৈন্য নিয়োগের অন্যতম কারণ। পণ্ডিত কলহনের ইতিহাস ১১৪৯ খৃ. সমাপ্ত হয়। জৌনরাজ রচিত সম্পূরক হইতে প্রকাশ, দৈনন্দিন অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। পর্যায়ক্রমে ইসলাম প্রচারের কাজও অব্যাহত ছিল।

লোহারা রাজাদের আমলে তাঁহাদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে কাশ্মীরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে ; জনগণ বেগারী শ্রম দিতে এবং সর্বপ্রকার উৎপীড়নমূলক কর দিতে বাধ্য থাকিত। 'দামারাস' অথবা সামন্তবাদী প্রভুরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং তাহাদের অবিরাম বিদ্রোহের ফলে দেশে নানা ধরনের অরাজকতা বিরাজমান ছিল। এই বংশের সর্বশেষ শাসক রামদেব (১২৫২-৭৩ খৃ.)-এর কোনও সন্তান ছিল না ; লক্ষণদেব নামীয় জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্রকে তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লক্ষণদেবের পুত্র সূহাদেব (১৩০১-১০ খৃ.)-এর আমলে যুলজুরের নেতৃত্বে মঙ্গোলগণ ৭২০/১৩২০ সনে বসন্তকালে কাশ্মীর আক্রমণ করে। যুলজুরের পূর্বপুরুষগণের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে মনে হয় তিনি তুর্কিস্তানের মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। ঝিলাম উপত্যকার দিক হইতে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করেন, সূহাদেব কোনও প্রকার প্রতিবন্ধকতা না করিয়া 'কিশ্‌তওয়ার'-এ পলায়ন করেন। মঙ্গোলগণ সুদীর্ঘ আট মাস যাবৎ উপত্যকায় তাহাদের ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং শীতের পূর্বেই অভিযান প্রত্যাহার করে। মঙ্গোলদের আক্রমণের পর এবং তাহাদের প্রত্যাহারের পর যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়, তাহাই ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দেয়।

৩. সালতানাত প্রতিষ্ঠা ঃ ২য়/৮ম শতাব্দীতে প্রথমবারের মত কাশ্মীর মুসলমানদের করতলগত হয়। সিন্ধুর দুইজন গভর্নর 'জুনায়দ' ও হিশাম ইব্‌ন 'আমর আত-তাগলিবী কাশ্মীর আক্রমণে উদ্যত হন, কিন্তু তাঁহারা হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন মাত্র।

গাযনীর সুলতান মাহমূদ ৪০৪/১০১৫ ও ৪১২/১০২১ সালে পুনরায় কাশ্মীর জয়ের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নয়, বরং রাজপ্রাসাদ বিপ্লবের ফলেই কাশ্মীরে চূড়ান্তভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুগলগণের প্রত্যাগমনের পর দেশের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া লাদাখী প্রধানের পুত্র Rinchana (Lhachen rgyalbu Rinchana) কাশ্মীরে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং নিজেই দেশের পরিচালক বনিয়া যান। সাধক সুহ্‌রাওয়ার্দী ও বুলবুল শাহ নামে পরিচিত সায়্যিদ শারাফু'দ-দীন-এর প্রভাবে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সাদরু'দ-দীন নাম ধারণ করেন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের সর্বপ্রথম সুলতান।

রিঞ্চানা-র মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী কোতারাণী দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে সুহাদেবের ভ্রাতা উদয়ন দেবকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে রাজা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণী স্বয়ং শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৭৪০/১৩৩৯ সনে সম্ভবত তুর্কীর একজন ভাগ্যবান সৈনিক শাহমীর কর্তৃক তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্তির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে তুর্কী অভিযাত্রিগণ উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের সেনাবাহিনীতে তাহাদিগকে চাকুরী প্রদান করেন। শাহমীরও সুনাম ও সৌভাগ্যের সন্ধানে আসিয়াছিলেন এবং সূহাদেব কর্তৃক চাকুরীতে নিয়োজিত হন। ক্রমান্বয়ে তিনি এমন পরাক্রমশালী হইয়া ওঠেন যে, উদয়ন দেবের মৃত্যুর পর কোতারাণীর কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি রাণীকে পরাজিত করিয়া ৭৩৯/১৩১৯ সালে সুলতান শামসু'দ-দীন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইরূপে তিনি নিজ বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বংশ ৯৬৮/১৫৬১ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরের শাসন কার্য পরিচালনা করে।

৪. সালতানাত আমল ঃ সুলতান শামসু'দ-দীন-এর দুইজন উত্তরাধিকারী জামশীদ ও 'আলা'উ'দ-দীন সম্পর্কে সামান্যই জানিতে পারা যায়। শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র শিহাবু'দ-দীন (৭৫৫-৭৫/১৩৫৪-৭৩) একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেশে তাঁহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি জম্মু, পুঞ্চ, রাজৌরী, চাম্বা, বালতিস্তান ও লাদাখ-এর অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন ; কিন্তু কাশ্মীরের ঘটনাপঞ্জীতে

যে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি মুলতান, কাবুল, বাদাখশান ও সামারকান্দ জয় করিয়া ফিরূয শাহ তুগলাককে পরাজিত করেন তাহা সন্দেহজনক। কুব্‌রাবী সাধক সায়্যিদ 'আলী হামাযানীর কাশ্মীর আগমনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয় এখানকার সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে—একবার তাঁহার রাজত্বকালে রাবী'উল-আওওয়াল ১৭৭৪/সেপ্টেম্বর ১৩৭২ সালে, পুনরায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী কুতবু'দ-দীন-এর রাজত্বকালে ৭৮১/১৩৭৯ এবং ৭৮৫/১৩৮৩ সালে। কথিত আছে, সায়্যিদ 'আলী ৭০০ জন সায়্যিদসহ আগমন করিয়া কাশ্মীরীদের ব্যাপক হারে ইসলামে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন।

কুতবু'দ-দীনের পুত্র সিকান্দার শাহের শাসনামলে (৭৯২-৮১৬/১৩৮৯-১৪১৩) সায়্যিদ 'আলী হামাযানীর পুত্র সায়্যিদ মুহাম্মাদ তথায় আগমন করেন। তাঁহার প্রভাবে সিকান্দার শারী'আতের অনুশাসন বাস্তবায়ন এবং "শায়খু'ল-ইসলাম" সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণ এবং তাহাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিতে শুরু করেন। কিন্তু মন্দিরসমূহের ধ্বংসযজ্ঞের এই ঘটনাপঞ্জী অতিরঞ্জিত। মার্‌তান্দ অভন্তিপূরের বৃহৎ মন্দিরসমূহ ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংস হয় বলিয়া প্রমাণিত, সিকান্দার শাহ কর্তৃক নয়। কেননা ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে কাশ্মীরে গোলাবারুদের ব্যবহার ছিল অজানা (গুলাম মুহয়ি'দ-দীন সূফী কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ কাশ্মীর-এ উল্লেখ করেন যে, কাশ্মীরের নও-মুসলিমগণ ভাবাবেগে এই কাজ করিয়াছিল)। অবশ্য নওমুসলিম সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী মালিক সায়ফু'দ-দীনকে এই বিষয়ে কিছু দায়ী করা যায়।

সিকান্দার শাহ কর্তৃক ধর্মের ক্ষেত্রে আরোপিত বাধ্যবাধকতা তাঁহার পুত্র যায়নু'ল-'আবিদীন (৮২৩-৭৫/১৪২০-৭০) রহিত করিয়া দেন, তিনি 'বাদশাহ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সর্বদিক হইতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার শাসনামলে সাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের জনগণ তাঁহার শাসনামলকে কাশ্মীরের জন্য 'স্বর্ণযুগ' বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকে। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ার, খাল খনন এবং সেতু নির্মাণ করেন। তিনি জিয্‌য়া কর প্রদান প্রথা রহিত করিয়া দিয়া হিন্দুগণকে তাহাদের মন্দিরসমূহ পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং যাহাদিগকে বল প্রয়োগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি প্রদান করেন। মোটকথা, তিনি সর্বদিক দিয়াই দেশে সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতি বিধান করেন। যাহা হউক, ইহার জন্য ইসলামের উন্নতি বিঘ্নিত হয় নাই। কারণ যদিও যায়নু'ল-'আবিদীনের উত্তরসুরিগণ ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংযম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবুও পুণ্যবান ও সূফী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ধর্মান্তর ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। ফলে ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষার্ধে কাশ্মীরের অধিকাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু সমকালীন যুগেই ইসলাম ধীরে ধীরে স্থানীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বর্তমান কাল পর্যন্তও এই বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান।

বিভিন্ন শিল্পকলা যাহা প্রবর্তন করার ফলে কাশ্মীর হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে তাহার কৃতিত্ব ইতিহাস উপাখ্যান যায়নুল-'আবিদীনকে প্রদান করে। তিনি কাশ্মীরীগণকে বই বাঁধান, কাঠের কারুকার্য, কাগজের মণ্ড তৈয়ারী, জাল বুনন, কার্পেট ও কাগজ তৈয়ারীসহ বিভিন্ন শিল্পকলা শিক্ষাকল্পে ইরান এবং তুর্কিস্তানে প্রেরণ করেন। তিনি স্বদেশী জনগণকে বিভিন্নভাবে নৈপুণ্য অর্জনে পরামর্শ প্রদানের জন্য উপরিউক্ত দেশের শিল্পিগণকে আমন্ত্রণ জানান। যে সমস্ত শিল্পকর্মে কাশ্মীরীগণ সবিশেষ গৌরব অর্জন করে, তন্মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বই বাঁধানো এবং কাগজ তৈরী বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য শিল্প উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে এবং একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কর্মের সংস্থান করে। হিন্দু রাজগণ পাথরের মন্দির নির্মাণ করিত, তবে মুসলমান সুলতানগণ কাঠের সাহায্যে নির্মাণ কার্য জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। সিকানদার কাঠ দ্বারা দুইটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন ঃ একটি খানকাহ্-ই মু'আল্লা (শাহ হামাযানের মসজিদ) এবং অপরটি জামি' মসজিদ। অপরপক্ষে যায়নু'ল-'আবিদীন নির্মাণ কার্যে কাঠ ও ইট দুই-ই ব্যবহার করেন। তাঁহার আমলে নির্মিত মাদানীর মসজিদ কাঠের তৈয়ারী, কিন্তু তাঁহার মাতার সমাধি (মাযার) এবং মাদানীর মাযার স্থাপত্যরীতির প্রতীক এবং উহার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার অবয়ব গঠনে পারস্যের টালিসমূহ ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, পিরামিড আকৃতির ছাদবিশিষ্ট সম্পূর্ণ অবয়বে অভিক্ষেপণ করিয়া তিন স্তরে নির্মাণ করা হইয়াছে এবং মুআয্‌যিনের জন্য একটি উন্মুক্ত চত্বর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত স্থান, যাহার গম্বুজ, তাহার চূড়া উত্তোলিত হইয়াছে। যায়নু'ল-'আবিদীনের শাসনামলে বংশের ক্ষমতা ও যশ চরমে পৌঁছায়। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিরোধ, অযোগ্য প্রশাসক এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের অবাধ্যতা ও ষড়যন্ত্রের ফলে অরাজকতা ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহার পতন ঘটে। ফলে কাশ্মীর বৈদেশিক আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়।

লরেন্স-এর ভাষ্যে প্রকাশ, চক গোত্রের শী'আগণ সম্ভবত দারদিস্তান হইতে আগমন করিয়া প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত আইনসিদ্ধ স্বত্বাধিকারী বংশের পরবর্তী বাদশাহগণের স্থান দখল করিয়া লয়। গাযী খান চক্‌ কোনও বাদশাহ ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাসন পরিচালনা করিতেন। তবুও হুসায়ন শাহ, মুহাম্মদ 'আলী ও য়ূসুফ, তাঁহাদের পূর্ববর্তী শাসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সুলতান উপাধির সুলতান উপাধির পরিবর্তে মুগল বাদশাহগণের ন্যায় বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন। ইহা তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা হইতে প্রতীয়মান হয়। সম্রাট বাবুর যখন উত্তর ভারত জয় করেন, তখন মুগল বাদশাহগণের দৃষ্টি পতিত হয় কাশ্মীরের উপর। সেখানে শীতল আবহাওয়া, প্রবহমান নদ-নদী এবং সুসজ্জিত বাগ-বাগিচার সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত এক জাতির জন্য মনোরম আকর্ষণ বিরাজমান ছিল। সম্রাট বাবুর স্বয়ং কাশ্মীরে সেনাদল প্রেরণ করিয়া ব্যর্থ হন।

রাজাব ৯৪৭/নভেম্বর ১৫৪০ সালে অর্থাৎ সেই বৎসর শের শাহের বিদ্রোহের কারণে হুমায়ূন ক্ষমতাচ্যুত হন, বাবুরের চাচাত ভাই হায়দার মীর্যা দুগলাত যিনি কাশগড়ের শাহী বংশের লোক ছিলেন এবং একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক ছিলেন (দ্র. হায়দার মির্যা)। তিনি হুমায়ূনকে কাশ্মীর আক্রমণ এবং শত্রুর কবল হইতে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণে চেষ্টা চালাইতে উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু হুমায়ূন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে পারেন নাই। তবুও হায়দার মীর্যা স্বীয় কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং এই কারণে তিনি স্থানীয়ভাবে বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা প্রাপ্ত হন। তিনি হুমায়ূনের নামে কাশ্মীরে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সফলতা অর্জন করেন। প্রথমত দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজ্য শাসন করেন, অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি কাশ্মীরীগণকে মুগলদের স্বেচ্ছাচারিতা

হইতে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। উপরন্তু তিনি শী'আ মতবাদের উপর এবং সকল প্রকার সূফীবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং প্রত্যেক মুসলমানকে হানাফী মাযহাব-এ বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করেন। ফলে কাশ্মীরের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ঐকমত্য গঠন করেন এবং তিনি বিদ্রোহের শিকারে পরিণত হইয়া পরাজিত হন ও রামাদান ৯৫৮/অক্টোবর ১৫৫১ সালে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার রাজত্বও ঐ বৎসর পর্যন্তই স্থায়ী ছিল। সম্ভবত সূরী বাদশাহগণই এই বিদ্রোহের হোতা ছিলেন। কেননা আমাদের জানা আছে যে, ইসলাম শাহসূরীর একটি মুদ্রা ৯৫৭ হিজরীতে কাশ্মীরে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; কারণ রায়না, মাগরে ও চক পরিবারের উচ্চপদস্থ লোকজনের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরিশেষে চকগণই বিজয়ী হয় এবং রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকে। তাহারা মীর শামসু'দ-দীন কর্তৃক শী'আ মতবাদে দীক্ষিত হয়। শামসু'দ-দীন ছিলেন নূর বাখশিয়্যা তারীকার একজন দরবেশ। তিনি পারস্য হইতে ৮৮৬/১৪৮১ এবং ৯০৭/১৫০২ সালে কাশ্মীর ভ্রমণে আগমন করেন। চকগণ ৯৬৮/১৫৬১ হইতে ৯৯৪/১৫৮৬ সাল পর্যন্ত উপত্যকাটি শাসন করে। ইহার পর কাশ্মীরের ক্ষমতা দ্বিধা বিভক্ত হইতে থাকে। য়া'কূব শাহের পুত্র য়ূসুফ শাহ সাংঘাতিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৯৯৪/১৫৮৬ সালে সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে এবং কাশ্মীর মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুগল শাহানশাহগণ এক মনোরম বিনোদন ভূমি লাভ করিলেন। মুগল সম্রাটগণ সম্রাট বাবুর ও হুমায়ূন-এর শাসনামলে কাশ্মীর আক্রমণ করেন। মীর্যা হায়দার, হুমায়ূনের পক্ষ হইতে কাশ্মীর জয় করেন বিধায় আকবর কাশ্মীর দাবী করেন এবং ৯৬৮/১৫৬১ গ্রীষ্মকালে কাশ্মীর দখল করার নিমিত্ত সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু সুলতান গাযী শাহ চক (৯৬৮-৭০/১৫১৬-৩) কর্তৃক তাঁহারা পরাজয় বরণ করেন। ৯৯৩/১৫৮৫ সাল নাগাদ সম্রাট আকবর ঝামেলামুক্ত হইয়া কাশ্মীরে পুনঃদৃষ্টি নিক্ষেপের সুযোগ লাভ করেন। ৩ মুহাররাম, ৯৯৪/২০ ডিসেম্বর, ১৫৮৫ সালে রাজা ভগবান দাসকে উপত্যকা আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কাশ্মীরী সৈন্যগণ বুলিআসা-র পথে কঠোর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কিন্তু সুলতান য়ূসুফ শাহ যেহেতু দুর্বল ও অলস ছিলেন, সেহেতু তিনি ভাবিলেন, মুগলদিগকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই ৩ রাবী'- ১, ৯৯৪/১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৫৮৬ সালে সংগোপনে মুগল সৈন্য শিবিরে গমন করেন এবং ভগমান দাসের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিবলে তাঁহারা সিংহাসন রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু দেশে প্রচলিত মুদ্রা বাতিল ঘোষিত হয় এবং বাদশাহর নামে খুতবা পাঠ শুরু হয়। যাহা হউক, সম্রাট আকবর এই সন্ধি অমান্য করেন এবং য়ূসুফ শাহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। ইত্যবসরে য়ূসুফ শাহের এই ভীরুতা প্রদর্শনের কারণে কাশ্মীরের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার পুত্র য়া'কূব শাহকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করান। য়া'কূব শাহ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও সুদক্ষ, তাঁহার ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল। তাই তিনি সূফী মতবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করার প্রয়াস পান। য়া'কূব শাহের অসহনীয় কার্যকলাপের ফলে একদল সুন্নী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি য়া'কূব সারফীর নেতৃত্বে সম্রাট আকবরের নিকট গমন করেন এবং কাশ্মীর অধিকার করিতে অনুরোধ করেন। সম্রাট আকবর প্রথমত কাসিম খান এবং তৎপর য়ূসূফ খান রিদবীর নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। য়াকূব খান এক শৌর্যপূর্ণ জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার অনুগামিগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া তিনি ৯৯৬ হি. রামাদানের প্রারম্ভে/১৫৮৮ খৃ.-এর জুলাই মাসের শেষার্ধে আত্মসমর্পণ করেন। সেই সময় সম্রাট আকবর জুমাদা'ল-উখরা ৯৯৬/মে ১৫৮৮ সালে উপত্যকায় উপনীত হন।

৫. মুগল আমল ঃ সম্রাট আকবর তিনবার কাশ্মীর পরিদর্শন করেন। (১) প্রথমবার তিনি স্বয়ং ৯৯৭/১৫৮৯ সালে পীর-পাঞ্জাল-এর পথে কাশ্মীর গমন করেন। তাঁহার এই ভ্রমণকালে তিনি জিয়্যা কর ও বেগারী শ্রম প্রদান প্রথা বিলোপ করেন এবং ভূমি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত জরিপ কার্যের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। যেহেতু জরিপ কার্য অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, সেইহেতু চকগণ মুগলগণ প্রণীত নীতিমালার সহিত সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (২) ১০০০-১০০১/১৫৯২ সালে দ্বিতীয় বার কাশ্মীর গমন করেন। সেই সময় তাবাকাত-ই আকবারীর রচয়িতা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নিজামু'দ-দীন তাঁহার ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন। তিনি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন এবং কর হ্রাস করিয়া দিয়া কাশ্মীরবাসিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও চকগণ বিরূপ ও বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া ওঠে। (৩) তিনি তৃতীয় বার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অর্থমন্ত্রী টোডরমল ('তুদরমল')-এর সাহায্যে ভূমি বন্দোবস্তের কার্য সম্পাদন করেন এবং শ্রীনগরের পাহাড়ী এলাকাকে সুবিন্যস্ত করেন, বর্তমানে যে স্থানে 'হরিপর্বত' নামে একটি দুর্গ অবস্থিত। আবু'ল-ফাদল তাঁহার "আ'ঈন-ই আকবারী" গ্রন্থে সম্রাট আকবরের শাসনামলে কাশ্মীর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহযাদা থাকাকালে পিতার সহিত কাশ্মীর যাতায়াত করিতেন এবং সিংহাসনে আরোহণের পর সেই দেশ ভ্রমণ ও চিত্তবিনোদন পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। তিনি কিছু সংখ্যক প্রাসাদ নির্মাণ করেন ও উদ্যান তৈরী করেন, যেগুলির মধ্যে নিশাতবাগ, 'ডাল' নদীর তীরে অবস্থিত, "আচ্ছিবল' ঝিলাম নদীর এক শাখার কংকরময় প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত নদীতীরে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বীরী নাগ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তদীয় প্রিয়তমা বেগম নূরজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার বাসভূমি ইরান ইহতে 'চিনার' বৃক্ষ আনিয়া বপন করেন, বৃক্ষরাজির মনোরম কানন এবং রাস্তার দুই ধারে সারিবদ্ধ বৃক্ষ অদ্যাবধি কাশ্মীরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা স্ত্রী বেগম নূরজাহান কাশ্মীরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি আটবার কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। সাম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে চকগণ দুই বার তাহাদের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয় এবং পরিণামে প্রায় নির্মূল হইয়া যায়।

সম্রাট শাহজাহানও কাশ্মীরে কয়েকটি বাগান তৈরী করেন। তাঁহার শাসনামলে 'আলী মারদান খান পীর পাঞ্জালের রাস্তার উপর পান্থশালা স্থাপন করেন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শুকোহ্ (দ্র) 'ডাল' নদীর উপর পাহাড়ের ধারে পীর মহল নির্মাণ করেন। উহার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ১০৪৪/ ১৩৬২ সালে সম্রাট শাহজাহান জা'ফার খানকে কাশ্মীরের গভর্নর নিয়োগ করেন। জা'ফার খান বাগান স্থাপন করেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

তিনি সম্রাটের নিকট হইতে যাবতীয় অবৈধ কর রহিতকল্পে এক ফরমান লাভ করেন এবং উহা প্রস্তরফলকে খোদাই করত শ্রীনগরের জামি' মসজিদের দক্ষিণ ফটকে স্থায়ীভাবে আটকাইয়া দেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কিশ্‌তওয়ার দখল করা হয়, আর জা'ফার খান বালতিস্তান ও লাদাখ জয় করেন। সম্রাট আওরাঙ্গযীব মাত্র একবার কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত সেখানকার মসজিদ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার শাসনামলে সাম্রাজ্যের আড়ম্বর যথারীতি বজায় ছিল। আওরাঙ্গযীবের সহিত কাশ্মীরে আগত Berneir সবিস্তারে কাশ্মীরের উত্তম অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। মহান মুগল সম্রাটগণের শাসন সম্রাট আকবর হইতে আওরাঙ্গযীর পর্যন্ত মোটামুটি ন্যায়পরায়ণতার সহিত পরিচালিত হয়। মুগল সম্রাটগণ কাশ্মীরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা এবং কৃষি ক্ষেত্রেসমূহ উন্নতির সাধন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে ধর্মীয় বিরোধ এবং সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ শুরু হয়। নাদির শাহ যদিও কাশ্মীরাভিমুখী হন নাই, তবুও তাঁহার আক্রমণে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এখানকার শাসনকর্তা নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। যাহা হউক কাশ্মীর উহার নিজস্ব পৃথক ঐতিহ্য হারাইয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের মতোই হইয়া যায়। কাশ্মীরে শাসকগোষ্ঠীর চক, Magre ও Raina-গণের স্থান উচ্চপদস্থ মুগল কর্মকর্তাগণ দ্বারা পূর্ণ হয় এবং তাঁহারা দেশের শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু সুলতানদের শাসনামলে কাশ্মীরে যে উন্নত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক, কবি, চিত্রশিল্পী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উপত্যকা পরিত্যাগ করেন এবং মুগল দরবারে চাকুরী প্রার্থী হন।

৬। আফগান ও শিখ শাসনামল ঃ সম্রাট আওরাঙ্গযীবের ইনতিকালের পর মুগল প্রশাসন অচল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ১১৬০/১৭৪৭ সালে কাশ্মীরের কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আহমাদ শাহ আবদালী দুর্‌রানী (দ্র.)-কে কাশ্মীর দখল করার জন্য আহ্বান জানান। ১১৬৫/১৭৫২ সালে যথারীতি তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মুগলদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি কাশ্মীর জয় করেন। কাশ্মীর অধিকার করিয়া তিনি বুলান্দ খান সুদেবযাঈকে কাশ্মীরের সুবাদার নিযুক্ত করেন। তথাপি শাহানশাহ ২য় 'আলামগীরের নামে দেশের মুদ্রা প্রচলিত থাকে। আহমাদ শাহের প্রথম মুদ্রা প্রচলনকাল ১১৭৬ হি. (১১৬২ হিজরীতে প্রচলিত যে মুদ্রা সম্পর্কে Rodgers বর্ণনা করিয়াছেন, উহা মুগল বাদশাহ আহমাদ শাহ প্রচলিত, না আহমাদ দুর্‌রানী কর্তৃক প্রচলিত, White head তাহা প্রমাণ করিয়াছেন)। আফগানের শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর, নির্যাতনমূলক এবং করভার অত্যধিক ছিল। আফগানগণ কর্তৃক শী'আগণ সর্বদা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইত বলিয়া সর্বদা শী'আ সুন্নী দাঙ্গা লাগিয়াই থাকিত। দুররানী শাসনামলে কাশ্মীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইহাদের সম্পর্কে জনগণ ভাল ধারণা পোষণ করিত না। রাজত্বের দাবীদার, বিশেষ করিয়া মাহমূদ শাহ ও শুজা'উ'ল-মূলক-এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রকৃত প্রতিচ্ছবি মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে দৃষ্ট হয়। ১২২৭/১৮১৪ সালে ফাতহ খান বারিকযাঈ পাঞ্জাবের শিখ শাসক রণজিৎ সিং-এর সহযোগিতায় কাশ্মীর অধিকার করেন। মাহমূদ শাহ নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন (ইহার পর আয়্যূব শাহ) কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল বারিকযাঈ নেতৃবর্গের, বিশেষত মুহাম্মাদ আজাম শাহের হাতে। সম্ভবত তিনি মুহাম্মদ (১২২৭-১২৩২ হি.) নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। ১২২৩-১২২৫ হি. সময়কালে দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তৎকালে কোনও বাদশাহের নামের পরিবর্তে নূরু'দ-দীন নামীয় একজন নিবেদিত ওয়ালীর নামে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। এই সুযোগে পাঞ্জাবের শিখ শাসক রণজিৎ সিং ১২৩৪/১৮১৯ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করেন এবং কাশ্মীরকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। শিখ সুবাদার হরি সিং জুলুম ও অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত ছিল। অবশ্য মিয়া সিং কিছুটা ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। পর্যটক Moorcroft ঐ সময় কাশ্মীরে আগমন করেন এবং তিনি শিখ শাসনের যে চিত্র বর্ণনা করেন, তাহা মোটেই ভাল ছিল না। রণজিৎ সিং-এর আমলে জম্মুস্থ ডোগরা বংশের তিন ভ্রাতা, ধ্যান সিং, গোলাব সিং ও সুজিৎ সিং, গোলাব সিং ও সুজিৎ সিং খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিখ ছিলেন না, ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। ডোগরাগণ ছিল কাশ্মীরের নিকটবর্তী পাহাড়িয়া রাজপুত বংশোদ্ভূত, উপত্যকার অধিবাসী নয়। ধ্যান সিংকে শিখ শাসনভুক্ত এক উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং গোলাব সিংকে জম্মুর শাসনভার প্রদান করা হয়। রণজিৎ সিং আনু. ১৮২০ খৃ. উহা অধিকার করিয়া নিয়াছিলেন। গোলাব সিং রণজিৎ সিং-এর বরাত ধিয়া একের পর এক কতিপয় শাসনভার অধিকার করিয়া কাশ্মীরে স্বীয় ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। এইভাবে তিনি কিশ্‌তওয়ার ও লাদাখ শিখ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৩৯ খৃ. রণজিৎ সিং-এর বিয়োগ এবং তৎপর প্রাপ্তব্য সম্মানী লইয়া ঝগড়াঝাটির কারণে ধ্যান সিং কিছুদিনের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী হন এবং তাঁহার সহযোগিতায় পাহাড়ী আঞ্চলে গোলাব সিং-এর ক্ষমতা সুদৃঢ় করার সুযোগ আসে। অজীত সিং সন্ধাতাওয়ালিয়ার হাতে ধ্যান সিং ও মহারাজা শের সিং-এর হত্যার (১৮৪৪ খৃ.) পর গোলাব সিং কিছুদিনের জন্য স্বীয় অধিকৃত পাহাড়িয়া অঞ্চলে চলিয়া যান। তাঁহাকে এক বিদ্রোহ দমন করার জন্য কাশ্মীরে প্রেরণ করা হয়, সেই বিদ্রোহে কাশ্মীরের শাসনকর্তা মিয়া সিং মৃত্যুবরণ করেন (১৮৪২ খৃ.)। তিনি সফলতার সহিত এই কার্য সম্পাদন করেন, কিন্তু দেশ আরেকবার দুর্নীতির (নর্তকী, বেশ্যাবৃত্তি) কবলে পতিত হয় এবং বিদ্রোহী গোত্র বমবা শিখ সৈন্যদের মুকাবিলা করিতেছিল। ১৮৪৫ খৃ. যখন এক বিশেষ সৈন্য দল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে, গোলাব সিং তখন অংশগ্রহণ করেন নাই, বরং যুদ্ধের পর মহারাজা দিলীপ সিং-এর প্রতিনিধি হিসাবে ইংরেজদের সহিত আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। লাহোরে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রে দুই নদীর উপকূলবর্তী স্থান জলন্ধর ইংরেজদের হাতে অর্পণ করা হয়। শিখদের উপর পনর লক্ষ আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) জরিমানা ধার্য করা হয় এবং মহারাজা দিলীপ সিং-এর ইংরেজ শিক্ষক হেনরী লরেন্স-এর উপর ইহা আদায়ের ভার ন্যস্ত করা হয়। কোষাগারে জরিমানার টাকা পাঁচ লক্ষের অধিক পাওয়া যায় নাই। গোলাব সিং দশ লক্ষ আশরাফী দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্তে কাশ্মীরের শাসনভার লাভ করেন। গোলাব সিং সহজে নূতন দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। কাশ্মীরের শাসনকর্তা ইমামু'দ-দীন বমবা গোত্রের সহানুভূতি ও সাহায্যে গোলাব সিং-এর সৈন্য সামন্তকে পরাজিত করেন। তৎপর তাঁহাকে উপত্যকার উপর অধিকার প্রদানের জন্য ইংরেজ সৈন্য প্রেরণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাহারা জয়যুক্ত হয়। গোলাপ সিং-এর রাজত্ব মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, (কিন্তু তাঁহার শাসনামলে মুসলমানদের

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রাষ্ট্রের ছোট বড় সকল প্রকার পদ ছিল ডোগরা পরিবারের অথবা কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের হাতে। মুসলমান কৃষকগণের জন্য পুঁজি সরবরাহ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। মুসলমানদের উপর জবরদস্তিমূলক কর ধার্য করা হইত। কর্ণেল টুর্নেয লিপিবদ্ধ করেন, "গোলাব সিং তাঁহার কোষাগার সম্পদে পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত লোভী")। জুলুমবাজ ও স্বৈরাচারী শিখ প্রশাসন ১৮১৯ হইতে ১৮৫৭ খৃ. পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। জম্মুর বিখ্যাত জামি' মসজিদে জনসাধারণের সালাত আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং অধিকন্তু কতিপয় মসজিদকে সরকারী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হয়। গরু যবেহ করা মৃত্যু দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হয়। কসাইখানা, রুটিওয়ালা, নৌকার মাঝি, ঝাড়ুদার, এমনকি পতিতালয়ের পতিতাদের উপরও কর আরোপ করা হয়। শিল্পের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপিত হওয়ায় উহা ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইয়া যায়। ইহার ফলে জনসাধারণ দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয় এবং পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের দিকে যাইয়া বসতি স্থাপন করিতে থাকে।

১৮১৯ হইতে ১৮৪৬ খৃ. পর্যন্ত প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ শিখেরা কাশ্মীরে রাজত্ব করে। ইহা ছিল অন্যায়, অনাচার, জুলুম, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার এক অন্ধকার যুগ (The history of the freedom movement, ১খ, ৯৭)। শিখগণ মুগলদের নিকট যে করুণ পরাজয় বরণ করিয়াছিল, তাহারাই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল নিরীহ ও দুর্বল মুসলমানগণের উপর (The Nations and Kashmir, পৃ. ২০); তাহাদের নিকট একজন মুসলমানের মর্যাদা জীবজন্তুর অপেক্ষা অধিক ছিল না। এমনকি একজন মুসলমানকে কোনও শিখ কর্তৃক হত্যা করা হইলে মাত্র ২২ টাকা জরিমানা দিতে হইত (The Princes of India পৃ. ১২১)। মুসলমানদিগকে অত্যন্ত দীনহীনভাবে জীবন যাপন করিতে হইত। তাহাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে হরণ করা হইয়াছিল, এমনকি তাহারা জামা'আতে সালাত পর্যন্ত আদায় করিতে পারিত না (Kashmir in sunlight and shade, পৃ. ৭৮)।

৭। ডোগরা প্রশাসন ও আধুনিক কাশ্মীর ঃ প্রথম এ্যাংলো-শিখ যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর কাশ্মীর হইতে শিখ শাসনের অবসান ঘটে। ১৬ মার্চ ১৮৫৬ সালে রাজা গোলাব সিং ও ইংরেজদের মধ্যে অমৃতসরে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ সরকার পঁচাত্তর লক্ষ টাকার বিনিময়ে সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চল (পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ), যাহা সিন্ধু নদের পূর্বে রাবী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত, মহারাজা গোলাব সিং তাঁহার সকল সন্তান-সন্ততিকে হস্তান্তর করিয়া দেয়। চুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল যে, চুক্তি সম্পাদনের সময় পঞ্চাশ লক্ষ এবং ২১ অক্টোবর ১৮৪৬ সালে অথবা তৎপূর্বে পঁচিশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

মহারাজা গোলাব সিং ছিলেন একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ডোগরা বংশীয় ব্যক্তি। শিখ অপেক্ষা তাঁহার শাসনপদ্ধতি উন্নত ধরনের ছিল বটে, তাহাতে জনগণের ভাগ্যের কোনও উন্নতি হয় নাই। ডোগরা প্রশাসকগণ ব্রাহ্মণদের সহিত সম্মিলিত ক্ষমতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলটির উপর জুলুম ও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানগণ বিত্তহীন কুলি-মজুরে পরিণত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়ে। জবরদস্তি কর আদায়ের মাধ্যমে তাহাদের শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত শুষিয়া লওয়া হয়। তাহারা সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ধান চাউলের উচ্চ মূল্য, একচেটিয়া সরকারী ব্যবসা এবং সরকারী কর্মকর্তাগণের দৌরাত্ম্য জনগণের এই দুর্দশার কারণ ছিল। ৯০% জনেরও অধিক মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরে মুসলমানদিগকে ধর্মার্থ বা হিন্দু ধর্মীয় ট্রাস্টে চাঁদা দিতে হইত। মহারাজা কর্তৃক এই ট্রাস্ট গঠিত হয়। গবাদি পশু কুরবানী করা নিষিদ্ধ ছিল, কিছু মসজিদও সরকারী সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, মুসলমানগণের এই দুঃখ দৈন্য অভিযোগাকারে ব্যক্ত করার অনুমতিও ছিল না। যদি কোনও মুসলমান কোনও পর্যটকের নিকট ক্রন্দন বা বিলাপ করিত, তবে তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত (বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. Karbel, Danger in Kashmir, পৃ. ১৫ ; Mahaffe, Road to Kashmir, পৃ. ১৬৮ ; Torrens, Travels, পৃ. ৩০১ ; History of the Freedom Movement, ১খ, ১১৯ ; Younghus-band. Kashmir, পৃ. ১৭৯ ; Walter Lawrence, The India we Served, পৃ. ১২৮ এবং The Valley of Kashmir, ২২৯ ; সারদার মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, The Kashmir Sage পৃ. ১৪ ইত্যাদি)। এই অবস্থার যদি কোন সময় ইংরেজ ডোগরা প্রশাসনকে ভীতি প্রদর্শন করিত, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অমৃতসরের চুক্তির বাধ্য-বাধকতার কথা উল্লেখ করা হইত, যেখানে কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খৃ. গোলাম সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রনবীর সিং পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক (তিনি পূর্বের ন্যায় কর বৃদ্ধি করিয়া উহা কঠোরভাবে আদায় করেন)। তিনি ধ্বংসপ্রায় শালশিল্পকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। তিনি শ্রীনগর ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে জন্তু চালিত যানবাহন চলাচলের জন্য একটি রাস্তা নির্মাণ শুরু করেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে অপর একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। যাহা হউক, তিনি মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কোনও প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ১৮৮৫ খৃ. ভূমিকম্পে দেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় এবং ১৮৮৯ খৃ. দুর্ভিক্ষে দেশটি প্রায় ধ্বংস হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। রনবীর সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা প্রতাপ সিং সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃ. তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (তাঁহার আমলেও মুসলমানদের উপর ডোগরা রাজাদের প্রবর্তিত বেগারী শ্রমের আকারে জুলুম ও অত্যাচারের রীতি প্রচলিত ছিল এবং তাহা আইনসিদ্ধ ছিল)। ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের পর ১৮৯৩ খৃ. কাশ্মীরের ইতিহাসে নামিয়া আসে এক সর্বনাশা প্লাবন। প্রতাপ সিং ছিলেন একজন মূর্খ (নপুংসক) ব্যক্তি। ভারতে রুশীয় হুমকি প্রতিহত করার জন্য একটি শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন ছিল। তাঁহাকে আইনগত সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং তাঁহার রাষ্ট্রের ভার অর্পিত হয় বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন অন্তরবর্তীকালীন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের উপর। ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীনে ভূমি বন্দোবস্ত দানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ১৮৮৭-১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ভূমি বন্দোবস্তের ন্যায় কাশ্মীরে বৃটিশ ভারতের পদ্ধতি প্রচলিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই রীতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। মার্চ ১৯২১ খৃ. নাগাদ প্রতাপ সিং পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই সময় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের নির্দেশক্রমে বহু সংস্কারমূলক কার্য সম্পাদিত হয়। পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়। ঝিলাম উপত্যকা অতিক্রম করত বারামুলার পথে শ্রীনগর পর্যন্ত এক

সুন্দর সড়ক নির্মিত হয়। কিন্তু তাঁহারা মুসলমান স্বার্থকে সর্বদা উপেক্ষা করিতে থাকেন। ফলে মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশার কোনও পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। পাঞ্জাবে শিখদের দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিয়াছিলেন এবং ১৮৫৭ খৃ. স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী প্রেরণপূর্বক মহারাজা গোলাব সিং ইংরেজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন—এই কারণে বৃটিশ প্রশাসন তাঁহাদের সংঘটিত সকল জুলুম অত্যাচারকে উপেক্ষা করিত। মুসলমানগণ প্যান-ইসলামিক, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত এবং রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের অধিকারের দাবী উত্থাপন করে। মুসলমান নওজোয়ানগণ ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার আবেগে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। ১৯২৪ খৃ. ভাইসরয় লর্ড রিডিং (Reading) শ্রীনগর ভ্রমণে আগমন করিলে মুসলিম জাতির কতিপয় সদস্য এক স্মারক লিপি প্রদানের মাধ্যমে দাবী উত্থাপন করেন, "সংখ্যাধিক্য মুসলমানদিগকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ এবং সরকার কর্তৃক দখলকৃত মসজিদগুলি প্রত্যর্পণ করা হউক।" ইহার জবাবে মহারাজা স্মারক লিপিতে স্বাক্ষরদানকারিগণকে নির্বাসন প্রদান করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে। ফলে ১৩ জুলাই, ১৯৩১ সালে হরি সিং (১৯২৫ খৃ. তাঁহার চাচা প্রতাপ সিং-এর স্থলাভিষিক্ত হন)-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন হইতে শায়খ 'আবদুল্লাহ্ কাশ্মীরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকেন। হরি সিং সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেত্রাঘাত, ধর-পাকড় এবং গোলাগুলীর মাধ্যমে ইহার জবাব দেন।

ভারত হইতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নওজোয়ানগণের মধ্যে চৌধুরী গুলাম 'আব্বাস ও শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। তাঁহারা কাশ্মীরী মুসলমানদিগকে রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩১ খৃ. দুইজন পুলিশ কর্মচারী ধর্মান্তরকরণ পবিত্র আল-কুরআন-এর অবমাননার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে এবং গোটা রাজ্যে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয়। ১৩ জুলাই, ১৯৩১ খৃ. শ্রীনগরে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, যাহা 'আবদু'ল-কাদির নামক জনৈক বিদ্রোহী যুবকের মুকদ্দমাটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে শ্রবণের পরিবর্তে প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে গ্রহণ করার দাবীতে বাহির করা হইয়াছিল। এই গুলীর ফলে ২২ জন মুসলমান শহীদ এবং শত শত আহত হয়। সমস্ত দিন নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে গুলী বর্ষিত হইতে থাকে, মুসলমানগণকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করা হয়, ধন-সম্পদ লুট করা হয়, যুবতী নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়। কাশ্মীরের বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে গ্রেফতার করা হয়, দেশে বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে এবং দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়। যদিও মহারাজা স্বীয় ক্ষমতাবলে এই আন্দোলন দমন করেন, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীরী মজলুম জনগণের মধ্যে নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবীতে ত্যাগ স্বীকার করার মতো মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। অক্টোবর ১৯৩২ খৃ. "জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরের বৎসর (১৯৩৪ খৃ.) মার্চ মাসে একটি শাসনতান্ত্রিক সরকারের দাবীতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। তখন মহারাজা B. J. Glancy-র সভাপতিত্বে একটি "শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন কমিশন" গঠন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই কমিশনের সুপারিশও মুসলমানদের সন্তুষ্টি অর্জন করিতে ব্যর্থ হয়। ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যেই শায়খ 'আবদুল্লাহ্ ও তাঁহার সহযোগী নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কাশ্মীরের হিন্দু ও শিখ জনগণকে বাগে আনিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা মুসলিম কনফারেন্সকে "National Conference বা জাতীয় কনফারেন্স"-এ রূপান্তর করেন। তাহার ইতিবৃত্ত নিম্নরূপ ঃ অবশ্য কেহ কেহ ইহা অনুমোদন না করিয়া "All India Muslim League" (সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ) গঠনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন। আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক সংস্কারের নিমিত্ত ১৯৩৪ খৃ. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি আসনের মধ্যে "মুসলিম কনফারেন্স" ১৬টিতে জয়লাভ করে, দুই বৎসর পর পুনঃনির্বাচনের সময় মুসলিম কনফারেন্সের আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯টি। পরিষদে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা দুষ্কর হওয়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে "মুসলিম কনফারেন্স" উহার আন্দোলন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তখনই হিন্দু ও শিখদের সমর্থন লাভের আশায় ১৯৩৯ খৃ. "অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স"-এর নেতৃত্বে শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে "ন্যাশনাল কনফারেন্স" প্রতিষ্ঠা করেন। চৌধুরী গুলাম 'আব্বাস ইহাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। কারণ দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধার করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। প্রথম হইতেই হিন্দুরা এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইয়া আসিতেছিল। সুতরাং তাঁহারা মুসলিম কনফারেন্সকে পুনর্বিন্যাস করেন। অপরদিকে মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তানের দাবী উত্থাপিত হয়। মুসলিম কনফারেন্স ভবিষ্যত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের সহিত সংযোগ স্থাপন করে। ন্যাশনাল কনফারেন্স কার্যকরীভাবে প্রথম হইতেই কংগ্রেসের অনুগামী ছিল।

কাশ্মীরের মুসলমানগণ রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করিলে "ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রভাব দৈনন্দিন ক্ষীণ" হইতে থাকে। ১৯৪৬ খৃ. শায়খ 'আবদুল্লাহ্ "Quit Kashmir" বা কাশ্মীর ছাড়া আন্দোলন শুরু করিলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে গ্রেফতার হন। মুসলিম কনফারেন্স "Direct Action" গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে চৌধুরী গুলাম 'আব্বাসকে তাঁহার সহযোগী অন্য নেতৃবৃন্দসহ গ্রেফতার করা হয় এবং দেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। ১৯৪৭ খৃ. পুনরায় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। "মুসলিম কনফারেন্স" মুসলমানদের ২১টি আসনের ১৫টিতেই জয়লাভ করে এবং অন্য ৬টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, "মুসলিম কনফারেন্স"-ই ছিল মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন।

ব্যবস্থাপনার মৌলিক দৃষ্টিকোণ হইতে কাশ্মীর ও মুজাফ্ফরাবাদের জিলাসমূহ। প্রথম দুইট জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল কাশ্মীর উপত্যকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অধ্যুষিত উপত্যকা এবং তৎসংলগ্ন পাহাড়ের ঢালসমূহ। তৃতীয় জিলা বারামূলার নিম্নে ঝিলাম উপত্যকা এবং কৃষ্ণ গঙ্গা-উপত্যকা উহার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে (সেপ্টেম্বর-১৯৭৬) কাশ্মীরের দুইটি অংশ, যথা (১) আযাদ কাশ্মীর ও (২) অধিকৃত কাশ্মীর।

(১) অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অধীনস্থ। ইহার জিলা চারটি, রাজধানী শ্রীনগর।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের জনসংখ্যা ছিল ১২,৯৫,২০১ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৯৪% মুসলমান, ৬% হিন্দু, নগণ্য সংখ্যক শিখ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, সাধারণত তাহাদিগকে পণ্ডিত বলা হইয়া থাকে—তাহাদের পেশা যাহাই হউক। প্রাচীন কৃষিজীবীদের সকলেই মুসলমান ছিল। বিদেশীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কাশ্মীরীগণের মধ্যে প্রাচীন জাতিসমূহ আজও রহিয়াছে। বংশীয় নামই উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (১৯৪১ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী সংযুক্ত উপমহাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারীতে কাশ্মীর প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৭,২৭,৭০৫ ; তন্মধ্যে মুসলিম ছিলেন ১৬,১৫,৪৭৮ জন অর্থাৎ মাত্র ৬% অমুসলমান ছিল)।

কাশ্মীরী জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত কর্মদক্ষতা প্রচুর দেখা যায়। প্রাচীন শাল বুনন শিল্প, যাহার জন্য কাশ্মীর এক সময়ে বিখ্যাত ছিল, তাহা এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। তিব্বতের মেষ হইতে প্রাপ্ত পশম দ্বারা বুনান সাদা গরম কাপড় পশমী শালের স্থান কিছুটা দখল করিয়াছে। অন্যান্য শিল্পও বেশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যেমন, কাপেট, সূচীকর্মখচিত বিছানার চাদর ও টেবিলের ঢাকনা প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। কাঠের কারুকার্যখচিত দ্রব্যাদি লাক্ষা (লোহিত বর্ণ বৃক্ষ বিশেষ দ্বারা তৈরী), তৈল নকশা খচিত কাষ্ঠ, সুটকেস, বাক্স, ট্রে প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত কাগজের মণ্ড, রৌপ্য এবং তাম্রের তৈজসপত্রাদি য়ূরোপীয় পর্যটকগণের বিশেষ পসন্দনীয়। কাশ্মীরে বেশ কিছু সংখ্যক লোক নদীতে এবং বিলে-ঝিলে নৌকার উপর বসবাস করে। উহাদিগকে মাঝি বা মাল্লাহ বলা হয়। জনসংখ্যার বিশেষ এক অংশ মৌলিক উপাদানের সাহায্যে নানাবিধ পণ্য তৈয়ার করে। কাশ্মীরে আগমনের জন্য পর্যটকদের মধ্যে সর্বদা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগের সংস্কার ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত অবস্থানরত য়ূরোপীয় স্থানীয় জনগণ ব্যতীত সারা পৃথিবীর পর্যটকদের নিকট কাশ্মীর একটি উষ্ণ আনন্দদায়ক ভ্রমণের স্থান। এখানে ভ্রমণকালে কাঁবু অথবা ঘরের ন্যায় ছইবিশিষ্ট এক ধরনের নৌকা ব্যবহৃত হয়। গুলমার্গ উপত্যকা উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় স্থান। ইহা সমুদ্রপীঠ হইতে ৮,০০০ ফুট উপরে অবস্থিত। এক সময় পাহাড়ের উপত্যকায় ছোট বড় শিকারসমূহ শিকারীদের আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রাচুর্য আর নাই। এখন কেবল স্মরণীয় বস্তুর সন্ধানীগণই মাঝে মধ্যে কাশ্মীরে আগমন করিয়া থাকে। উপরোল্লিখিত খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর পূর্বেকার বর্ণনার সহিত কাশ্মীরের বড় বড় পর্যটকের বর্ণনাও পাঠ করা আবশ্যক। তাঁহাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ (১) Franciscoavier, তিনি সম্রাট আকবরের সহিত কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিলেন ; (২) Francois Bernier, ইনি সম্রাট আওরাঙ্গযীবের সহিত ১৬৬৪ খৃ. আগমন করিয়াছিলেন ; (৩) George Forster ১৭৮৩ খৃ. তীমূর শাহ দুর্‌রানীর শাসনামলে এখানে আগমন করেন ; (৪) William Moorcroft ও George Trebeck উভয়ই লাদাখ রণজিৎ সিং-এর আমলে (১৮১৯ হইতে ১৮২৫ খৃ.) আসেন ; (৫) Victor Jacquemant (১৮৩১ খৃ.) ; (৬) Von Hugel (১৮৩৫ খৃ.) ও (৭) Wain Vigne (১৮৩৫ খৃ.); অতি সম্প্রতিকালের বর্ণনার জন্য Drew, ও Lawrence এবং পুরাতন ইতিহাসের জন্য Stein-এর রচনা উত্তম।

(২) কখনও কখনও শ্রীনগরকেও কাশ্মীর বলা হইত। ইহা ছিল কাশ্মীরের সর্বপ্রথম রাজধানী (বর্তমানে অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী)। মুসলমান সুলতান, মুগল শাহানশাহ এবং বাদশাহগণ-এর আমলেও তক্ষশীলাভুক্ত শহরকেও কাশ্মীর বলা হইত। ১৮৩৫ খৃ. শেষের দিকেও Von Hugel কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত কালাহান-এর ভাষ্যে শ্রীনগরের প্রাচীন নাম অশোক কর্তৃক রাখা হইয়াছিল, হিন্দু শাসকগণ পুনঃ এই নাম ব্যবহার করা শুরু করে এবং বর্তমানে সাধারণ্যে ব্যবহৃত হয়।

(৩) জম্মু ও কাশ্মীরের বিশাল অঞ্চলের অধিকাংশই মানচিত্রে এবং সরকারী প্রচারপত্রে কাশ্মীর নামে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ১৯৪৭ খৃ. উপমহাদেশ বিভক্তির পর এইরূপ বলা উচিত নয়। আযাদী লাভের পর কাশ্মীরের দুইটি অংশ ঃ আযাদ কাশ্মীর, আর ভারতভুক্ত কাশ্মীর। কাশ্মীর ও জম্মুর সংকীর্ণ সীমার বাহিরে বিশাল অঞ্চলের অধিকাংশই পাহাড়ী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ; ইহার জনসংখ্যা মাত্র ২,৬৫,০৬০। এই এলাকায় রহিয়াছে লাদাখ, স্কারদু, বালতিস্তান, চিলাস, গিলগিট, হুনযা, নাগির এবং য়াসীন অঞ্চল। উপমহাদেশের বিভাজনের প্রভাব এই সমস্ত অঞ্চলের উপরও পতিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ভৌগোলিক ও সাধারণ বর্ণনা (১) F. Drew, The Jummoo and Kashmir Territories, লন্ডন ১৮৭৫ খৃ. ; (২) W. R. Lawrence, The Valley of Kashmir, লন্ডন ১৮৯৫ খৃ. ; (৩) F. E. Younghusband, Kashmir, লন্ডন ১৯০৯ খৃ. ; (৪) M. A. Stein, The Ancient Geography of Kashmir, JASB, কলিকাতা ১৮৯৯ খৃ. ; (৫) Census of India, ২০ খ, ; Kashmir, লক্ষ্ণৌ ১৯১২ খৃ. ; (৬) Lydekker, Kashmir Geological Survey of India, ২২খ. ; (৭) Oestreich, Die Taler des Nordwestlichen Himalaya, গুথা ১৯০৭ খৃ. ; (৮) A. Cunningham, Ancient Geography of India, লন্ডন ১৮৭১ খৃ. ; (৯) C. E. Bates, Gazetteer of Kashmir, কলিকাতা ১৯৭৩ খৃ. ; (১০) J. H. Knowles, Folk Tales of Kshmir, ইংরেজী অনু., দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৮৯২ খৃ. ; (১১) H. W. Bellew. Kashmir und Kashgar, লন্ডন ১৮৭৫ খৃ. ; (১২) আল-বিরূনী, হিন্দ (India). সম্পা. Sachau, পৃ. ১১, ৬৫, ৮২, ৮৩, ১০১ প., ১০৩, ১৬৩, ১৯৬, ২০৬, ২৮৭, ২৮৯ ; অনু., ১খ, ৬১, ১৩৫, ১৭৩, ১৭৪, ২০৬-২০৮, ২১১, ৩১৭, ৩৯১, ৩৯৩ ও ২খ, ৮, ৯, ১৭৮, ১৮১ ; (১৩) Relations de Voyages et Textes Geogr, ইত্যাদি অনু. G. Eerrand প্যারিস ১৯১৩ খৃ. ১খ, ২ ; (১৪) Elliot-Dowson, The History of India ৭খ ; (১৫) Hist. of India, সম্পা. A. V. Williams Jackson, ২, ৩, ৪, ৫খ.।

ইতিহাস ঃ (১) Walters, Yuan Chwang, প্রকাশনায় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯০৪ খৃ. ; (২) আল-বীরূনী, India, Sachau-এর অনু. লন্ডন ১৯১০ খৃ. ; (৩) পণ্ডিত কলহন, লোক কাহিনী, অনু. ও টীকা M. N. Stein, দুই খণ্ডে, ওয়েস্টমিনিস্টার ১৯০০ খৃ. ; (৪) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, অনু. Sprenger, লন্ডন ১৮৪১ খৃ. ; (৫) আবু'ল-ফাদল, আঈ'ন-ই আকবারী, অনু. Jarret,

২ খণ্ডে, কলিকাতা ১৮৯১ খৃ. ; (৬) The India of Awrangzeb, অনু. খুলাসাতু'ত-তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৯০১ ; (৭) Cathay and the Way Thither, ২য় সং., লন্ডন ১৯১৫ খৃ. ; (৮) Mc Crindle, Ancient India as Described by Ptolemy, বোম্বাই ১৮৮৫ খৃ., ; (৯) Sir A. Cunningham, Coins of Mediaeval India, লন্ডন ১৮৯১ খৃ. ; (১০) Rodgers, Coinage of Kashmir, Hindu and Muhammadan, JASB, কলিকাতা ১৮৭৯ খৃ. ; (১১) Lane-Pole, Catalogue of Indian Coins, Muhammadan States (British Museum), লণ্ড ১৮৮৫ খৃ. ; (১২) Whitehead, Catalogue of Coins of Mughal Empire, Lahore Museum, অক্সফোর্ড ১৯১৪ খৃ., ; (১৩) Rodgers, Catalogue of Coins of Lahore Museum, কলিকাতা ১৮৯৩ খৃ. ; (১৪) H. H. Wilson, Essay on the History of Kashmir, কলিকাতা ১৮৮৫ খৃ. ; (১৫) নিলাত ঃ পুরান ঃ সম্পা. K. S. J. M. De Vreese, লন্ডন ১৯৩৬ খৃ. ; (১৬) ক্ষেমেন্দ্র, লোক প্রকাশ, সম্পা. যগাধর যাদু শাস্ত্রী, শ্রীনগর ১৯৪৭ খৃ. জার্মান অনু. A. Weber, in Indische Studien, ১৮খ, ২৮৯-৪১২ ; (১৭) আল-বীরূনী, তাহকীক মালিল-হিন্দ, অনু. E. G. Sachau as Al-Biruni's India, লন্ডন ১৮৮৮ খৃ. ; (১৮) M. A. Stien, Notes on Ou-Kong's Account of Kashmir, Vienna 1896 ; (১৯) S. Khosla, History of Buddhism in Kashmir, দিল্লী ১৯৭২ খৃ. ; (২০) J. C. Chatterjee, Kashmir Shaivism, শ্রীনগর ১৯১১ খৃ. ; (২১) S. C. Ray, The Early History and Culture of Kashmir, কলিকাতা ১৯৫৭ খৃ. ; (২২) R. C. Kak, Ancient Monuments of Kashmir, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ. ; (২৩) জোনারাজ, রাজতরঙ্গিনী, সম্পা. S. Kaul, হুশিয়ারপুর ১৯৬৭ খৃ. ; (২৪) Shrivara এবং Shuka, Rajatarangeni, সম্পা. S. Kaul, হুশিয়ারপুর ১৯৬৬ খৃ., Jonaraja, Shrivara এবং Shuka সংস্কৃত কাহিনীসমূহ কাশ্মীরের সুলতানদিগের ইতিহাস এবং সম্রাট আকবরের কাশ্মীর বিজয়ের ঘটনাসমূহ আলোচনা করিয়াছে। এইগুলি "Kings of Kashmir নামে J.C. Dutt কর্তৃক অনূদিত হয়, ৩খ, কলিকাতা ১৮৭৯-৯৮ খৃ. ; (২৫) আবু'ল-ফাদ্‌ল, আকবারনামাহ, অনু. H. Beveredge, ৩খ; লন্ডন ১৯৩৯ খৃ. ; (২৬) নিজামুদ্দীন, তাবাকাত-ই আকবরী, ৩খ., কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ. ; (২৭) মীর্যা হায়দার দুর্গ, তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. E. D. Ross, সম্পা. N. Elias লন্ডন ১৮৯৫ খৃ. ; (২৮) মুহাম্মদ আ'জাম, তা'রীখ-ই আজামী, মুহাম্মদী প্রেস, লাহোর ১৩০৩-১৮৮৫, উর্দূ অনু. মুনশী আশরাফ 'আলী, দিল্লী ১৮৪৬ খৃ.; (২৯) G. M. D. Sufi, কাশ্মীর, লাহোর ১৯৪৮ খৃ. ; (৩০) মুহিব্বু'ল-হাসান, Kashmir under the Sultans, কলিকাতা ১৯৫৯ খৃ. ; (৩১) R. K. Parmu, A History of Muslim Rule in Kashmir, নূতন দিল্লী ১৯৬৯ খৃ. ; (৩২) P. Brown, Indian Architecture (ইসলামী আলম), লন্ডন ১৯৪২ খৃ. ; (৩৩) W. H. Nicholls, Muslim Architecture in Kashmir (Archeological Survey of India Report 1906-7), কলিকাতা ১৯০৯ খৃ. ; (৩৪) G. Grierson, The Wise Sayings of Lalla-Valyani, লন্ডন ১৯২০ খৃ. ; (৩৫) P. N. K. Bsmzai, A History of Kashmir, দিল্লী ১৯৬২ খৃ. ; (৩৬) P. N. Bazaz, The History of Struggle for Freedom in Kashmir, নূতন দিল্লী ১৯৫৪ খৃ. ;(৩৭) W. H. Lawrence, The Valley of Kashmir, লন্ডন ১৮৯৫ খৃ. ; (৩৮) J. Erwin, The Kashmir Shawl, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ. (৩৯) M. A.Stein, Memoir on Maps Illustrating the Anceint Geography of Kashmir, JASB, ৬৮খ, ১৮৯৯ খৃ. ; (অতিরিক্ত সংখ্যা-২), ১-২৩২ ; (৪০) H. De Terra ও T. T. Paterson, Studies on the Ice Age in India Associated Human Cultures, ওয়াশিংটন ১৯৩৯ খৃ.।

ভ্রমণ কাহিনী ঃ (১) Hajus de rebus japonicis Indicis ect. ? ১৬০৫ খৃ.; (২) F. Bernier, Voyages, এ্যামস্টারডাম ১৭২৩-১৭২৪ খৃ. ইংরেজী অনু. A. Constable, দ্বিতীয় মু. J. A. Smith কর্তৃক সংশোধিত, অক্সাফোর্ড ১৯১৬ খৃ. ; (৩) G. Forster, A. Journey from Bengal to England Through ...Kashmir, দুই খণ্ডে, লন্ডন ১৮০৮ খৃ. ; (৪) Moorcroft ও Trebeck : Travels .... in Ladakh and Kashmir, দুই খণ্ডে, লন্ডন ১৮৪১ খৃ. ; (৫) G. T. Vigne, Travels Kashmir, Ladakh etc. দুই খন্ডে, লন্ডন ১৮৪২ খৃ. ; (৬) V. Jacquemont, Journey in India, লন্ডন ১৮৩৫ খৃ. ; (৭) C. V. Hugel, Kashmir und das Reich der Siek, ৪খ, Stutgart ১৯৪০-১৮৪৪ খৃ. ও ইংরেজী অনু. Travels in Kashmir and the Punjab, লন্ডন ১৮৪৫ খৃ. ; (৮) Torrens, Travels, লন্ডন তা. বি., পৃ. ৩০১।

প্রাচীন নিদর্শনসমূহ ঃ (১) H. H. Cole, Illustration of ancient buildings in Kashmir, লন্ডন ১৮৬৯ খৃ. (২) A. Foucher, L' Art. Geco-Bouddhique du Gandhara, প্যারিস ১৯০৫ খৃ.।

ভাষা ঃ (১) Grierson, Kacmiri Grammar, লন্ডন ১৮৯৯ খৃ. ; (২) ঐ লেখক, The Pisaca Languages of N. W. India, RAS, লন্ডন ১৯০৯ খৃ. ; (৩) Rev. J. H. Knowles, Dictionary of Kashmiri Proverbs, বোম্বাই ১৮৮৫ খৃ.; (৪) Sir Aurel Stien, (পাণ্ডিত গোবিন্দ কাওল-এর সহযোগিতায়) Hatim's Tales, সম্পা. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন, লন্ডন ১৯২৩ খৃ.।

M. Longworth-Dames (E.I.^{2}, দা.মা.ই.)/
মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

২. ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর ঃ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩ জুন, ১৯৪৭-এ ঘোষিত ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় বলা হয় যে, পুরাতন দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে পারিবে; তথাপি ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন (Lord Mountbatten) ২৬ জুলাই, ১৯৪৭ দেশীয় নৃপতিগণকে এই মর্মে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব রাজ্যের জনসংখ্যায় বিভিন্ন ধর্মীয়

সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতে ও জনসাধারণের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া ভারত অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আবেদন করেন।

কাশ্মীরের ব্যাপারে দুইটি কারণ ইহার পাকিস্তান-ভুক্তির পক্ষে গুরুত্ব বহন করে ঃ ইহার জনসংখ্যায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগুরু (১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৭৭% ভাগ) এবং ইহার ভৌগোলিক অবস্থান। কাশ্মীরের মহারাজা ভারত বা পাকিস্তান কোনও রাষ্ট্রে যোগদান করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তবে তিনি পাকিস্তান সরকারের সহিত ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ হইতে বলবৎ হওয়ার শর্তে একটি অস্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হইলেন। অক্টোবর ১৯৪৭-এ পাকিস্তান হইতে আগত কতিপয় পাঠান উপজাতি কাশ্মীরের পুঞ্চ এলাকার বিদ্রোহী মুসলমানদিগকে সহায়তা দিতে শুরু করে। তাহারা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের খুব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭-এর কাশ্মীরের মহারাজা ভারতের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান এবং কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ভারত সরকার ভারতের সহিত যোগদানের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এই শর্তে যে, ভারতের সহিত এই সংযোজন শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের জনসাধারণের মতামতের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে। তথাপি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই জনমত যাচাই কোনদিনই করা হয় নাই।

কাশ্মীরের মহারাজা কর্তৃক ভারতের সহিত সংযোজন চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই বিমানযোগে ভারত শ্রীনগরে সৈন্য প্রেরণ করে। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীও যুদ্ধে নামে। এই যুদ্ধ চলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষ অবধি। অতঃপর জাতিসংঘ কাশ্মীর কমিশনের মধ্যস্থতায় ১ জানুয়ারী, ১৯৪৯ সনে যুদ্ধ-বিরতি হয়। ১৭ জুলাই, ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নির্ধারণ সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর বিভক্ত হইয়া কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণে এবং অবশিষ্ট অংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে যায়। ভারত কাশ্মীর সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন করে। সেখানে উভয় পক্ষের পরস্পরবিরোধী দাবী-দাওয়া লইয়া মাঝে মাঝে আলোচনা বৈঠক হয়। এদিকে কাশ্মীরে দুই পক্ষের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইতে থাকে।

কাশ্মীরের ভারত নিয়ন্ত্রিত অংশে অক্টোবর ১৯৫১ সনে একটি গণ-পরিষদ নির্বাচিত হয়। কাশ্মীরী নেতা শায়খ 'আবদুল্লাহ্র সুযোগ্য পরিচালনার ফলে এই গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র পরিকল্পনায় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনাধিকার সংরক্ষিত হয়। তবে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ৯ আগস্ট শায়খ 'আবদুল্লাহ্-কে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁহার মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিয়া বাখশী ও গুলাম মুহাম্মাদের নেতৃত্বে কাশ্মীরে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। গুলাম মুহাম্মাদ ভারতের সহিত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করিতে সচেষ্ট হন। ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৬ সনে কাশ্মীর পরিষদ রাজ্যটির চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র পাস করে। ইহাতে রাজ্যটিকে ভারতের অঙ্গীভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় ভারত সরকার এই শাসনতন্ত্র মানিয়া লন এবং ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫৭ হইতে ইহা বলবৎ হয়। অক্টোবর ১৯৬৩ সনে ভারত সরকার বাখ্শী গুলাম মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যাপারে অযোগ্য পরিচালনার অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জি. এম. সাদিক কাশ্মীরে ক্ষমতাসীন হন এবং শায়খ 'আবদুল্লাহ্কে মুক্তি দেওয়া হয়।

কাশ্মীরের পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশে (আযাদ কাশ্মীর) সারদার মুহাম্মাদ ইবরাহীম ২৪ অক্টোবর ১৯৪৭ সনে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মে ১৯৫০ সনে গুলাম 'আব্বাস তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে কর্নেল শের আহমাদ খান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কর্নেল শের জুন ১৯৫৬-এ পদত্যাগ করেন এবং মীর ডব্লিউ, য়ূসুফ খান স্বল্পকালের জন্য আযাদ কাশ্মীর সরকারের প্রেসিডেন্ট হন। অতঃপর ১৯৫৬ খৃ. হইতে 'আবদু'ল-কায়্যূম, ১৯৫৭ খৃ. হইতে সারদার মুহাম্মাদ ইবরাহীম এবং ১৯৫৯ খৃ. হইতে কে. এইচ. খুরশীদ আযাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব লাভ করেন।

চীনের সিনকিয়াং ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আযাদ কাশ্‌মীরের মধ্যকার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬২ সনে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরেরের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে। ১৯৬৪ খৃ. উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি কিছুটা হ্রাস পাইলেও ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের গোড়া হইতে পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে। এপ্রিল ১৯৬৫ সনে কচ্ছ উপসাগর (Rann of Kutch) সংলগ্ন ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে ঘোরতর লড়াই শুরু হইয়া যায়; পরে এই যুদ্ধ কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে সম্প্রসারিত হয়। আগস্ট মাসে কাশ্মীরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ভারত অভিযোগ করে, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা পুনরায় কাশ্মীরে হানা দিতেছে। পাকিস্তান দাবী করে যে, ঐ সমস্ত লোকজন কাশ্মিরী মুক্তিযোদ্ধা। ভারত কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারাখার পাকিস্তানী পার্শ্বের কতিপয় সামরিক ঘাঁটি দখল করিয়া লইলে পাকিস্তান উহার জওয়াবে ট্যাঙ্কবহর যুদ্ধে নামায়; ভারত পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য বিমানবাহিনী নিয়োগ করে। সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সনে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলে এবং উভয় পক্ষ স্থলপথে একে অপরের এলাকায় বড় ধরনের আক্রমণ চালাইলে কাশ্মীর লইয়া দ্বিতীয়বার পাক-ভারত যুদ্ধ বাধে। পুনরায় জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধমান দুই পক্ষ জাতিসংঘের নির্দেশিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মানিয়া লওয়ায় ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সনে লড়াই বন্ধ হয়। অতঃপর সোভিয়েত রাশিয়ার বারংবার চেষ্টার ফলে ভারত ও পাকিস্তান ১০ জানুয়ারী ১৯৬৬ সনে তাসখন্দ চুক্তি (Tashkent Agreement) স্বাক্ষর করে। ইহাতে এই শর্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় যে, উভয় পক্ষ তাহাদের স্ব স্ব সেনাবাহিনী ৫ আগস্ট ১৯৬৫ তারিখের পূর্বেকার অবস্থায় সরাইয়া লইবে এবং এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, যে সমস্ত মতপার্থক্য ভারত ও পাকিস্তানকে কাশ্মীরের ব্যাপারে পরস্পরের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে ঐ সমস্ত মতপার্থক্য মীমাংসার জন্য দুই পক্ষ আলাপ-আলোচনায় মিলিত হইবে। ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয় নাই এবং দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিরও কোনও পরিবর্তন হয় নাই।

কাশ্মীরের পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশ আযাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট 'আবদু'ল-হামীদ খান, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ সনে আযাদ কাশ্মীরের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন। ইহাতে আযাদ কাশ্মীরের সরকার প্রধান নির্বাচন ও মন্ত্রী পরিষদ গঠন পদ্ধতি স্থির করিয়া দেওয়া হয়। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সরকার-প্রধান জি.এম. সাদিককে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে পদচ্যুত করিয়া এস. এম. কাসিমকে প্রধান মন্ত্রীরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ভারতের ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যে পরিণত ভারত

নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন মারহুম শায়খ 'আবদুল্লাহর পুত্র ডকটর ফারূক 'আবদুল্লাহ।

ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে; তবে ইহাতে কাশ্মীর সমস্যার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই বলিলেই চলে। বর্তমানে কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে কারাকোরাম পর্বতমালা অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি রেখার নিকটে অবস্থিত সিয়াচেন (Siachen) হিমবাহের দখল লাইয়া ভারতীয় ও পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে গত ৫ বৎসর যাবৎ মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইতেছে। তথ্য-মাধ্যমে সিয়াচেন পৃথিবীর উচ্চতম (১৭,২০০ ফুট) রণক্ষেত্ররূপে আখ্যায়িত হইয়াছে। এখানে দুই পক্ষের সৈন্যরা সারাক্ষণ পরস্পরের প্রতি নজর রাখিতেছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাটির মীমাংসার জন্য আলোচনা অব্যাহত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Aziz Ahmad, The Kashmir Dispute, করাচী ১৯৫৯ খৃ. ; (২) Prem Nath Bazaz, Azad Kashmir : a democratic socialist conception, লাহোর ১৯৫১ খৃ. (৩) ঐ লেখক, The History of struggle for freedom in Kashmir, নূতন দিল্লী ১৯৫৪ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, The Shape of things in Kashmir, নূতন দিল্লী ১৯৬৫ খৃ.; (৫) Lord Birdwood, Two Nations and Kashmir, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ.; (৬) A Guimbretire, Le Problime du Caschemire, in Orient, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., ; (৭) Sisir Gupta, Kashmir, a study in India-Pakistan relation, নিউইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ.; (৮) M. M. R. Khan, The United Nations and Kashmir, জাকার্তা ১৯৫৫ খৃ. ; (৯) J. Karbel, Danger in Kashmir, প্রিন্সটন ১৯৫৪ খৃ. ; (১০) B. L. Sharma, The Kashmir story, বোম্বাই ১৯৬৭ খৃ.। সিয়াচেন হিমবাহ বিরোধ সম্পর্কে দ্র. ঃ (১১) The Daily New Nation, Dhaka, dated 22 August, 1989 ; (১২) The Bangladesh Observer, Dhaka, dated 12 July and 18 July 1889 ; (১৩) মুহাম্মাদু'দ-দীন যাওক, মুকাম্মাল তা'রীখ কাশ্মীর, ১খ, লাহোর ১৯৩১ খৃ. এবং ৩খ, লাহোর ১৯১২ খৃ. ; (১৪) গুলাম মুহ্যিদ'-দীন সূফী, Kashir, ১খ, লাহোর ১৯৪৮ খৃ. এবং ২খ, লাহোর ১৯৪৯ খৃ. ; (১৫) মুহিব্বু'ল-হাসান, কাশ্মীর, সালাতীন কে 'আহাদ মেঁ, অনু. 'আলী হাম্মাদ 'আব্বাসী, আজমগড় ১৯৬৭ খৃ. ; (১৬) মুমতায আহমাদ, মাস'আলা-ই-কাশ্মীর, লাহোর ১৯৭০ খৃ.; (১৭) সাফদার মাহমুদ, Pakistan affairs, লাহোর ১৯৭০ খৃ.; (১৮) Twenty years of Pakistan, করাচী ১৯৬৭ খৃ. ; (১৯) কে. কে. 'আযীয, Discovery of Pakistan, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (২০) আকবার খান, Raiders in Kashmir, করাচী ১৯৭০ খৃ.; (২১) মুশতাক আহমাদ গুরমানী, মাস'আলা-ই কাশ্মীর কাজা'ইয়া, লাহোর তা. বি.; (২২) কাশ্মীর ইলহাক কে বাদ, লাহোর তা. বি.; (২৩) মুশতাক আহমদ, জিহাদ-ই কাশ্মীর, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (২৪) মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ কুরায়শী, আদনা-ই কাশ্মীর, লাহোর তা. বি. ; (২৫) মাকবূল বেগ বাদাখশানী, তারীখ আদাবিয়্যাত মুসলমানান-ই পাকিস্তান ওয়া হিন্দ, ৪খ, ফারসী আদাব, লাহোর ১৯৭১ খৃ.; (২৬) গুলাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আসফিয়্যা, ১খ, কানপুর তা. বি. ; (২৭) মুহাম্মাদু'দদীন, যিকরে-হাবীব, পিন্ডী বাহা'উ'দ-দীন ১৯২৩ খৃ. ; (২৮) 'আবদু'ল-গানী, আমীর হিযবুল্লাহ, জালালপুর ১৯৬৫ খৃ. ; (২৯) জাহুরুদ'দীন আহমাদ, পাকিস্তান মেঁ ফারসী আদাব, ১খ, লাহোর তা. বি. ; (৩০) মুহাম্মাদ সাদিক কাসূরী, আকাবির তাহরীক পাকিস্তান, গুজরাটি ১৯৭২ খৃ., পৃ. ২৬৪।

A Guimbretiere (E.I²)/শায়খ ফজলুর রহমান ও মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম

কাশ্মীরী ভাষা ও সাহিত্য (کشمیری زبان و ادب) ঃ দারদ গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের সহিত মৌলিক সম্পর্ক সত্ত্বেও কাশ্‌মীরী ভাষা উহার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ইসলামী প্রভাবের কারণেই। ইহা জম্মু-এর কোনও কোনও অঞ্চলে, কাশ্‌মীর উপত্যকায় এবং আযাদ কাশ্মীরে প্রচলিত। প্রকাশভঙ্গী ও সাহিত্যিক দিক হইতে উহাকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) কাশির (کاشر) সেই কাশ্মীরী ভাষা যাহা খাস কাশ্মীর উপত্যকায় প্রচলিত এবং উহাকেই প্রামাণিক কাশ্‌মীরী ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ; (২) কাশতুয়াড়ী (کشتواری) এই কাশ্‌মীরী ভাষা জম্মু প্রদেশে প্রচলিত এবং জম্মু প্রদেশের কাশ্‌তুয়াড়ী অঞ্চলের সহিত সম্পর্কিত; (৩) গুন্দূর কাশ্মীরী (گندور کشمیری) ঃ এই ভাষায় শহরের শিক্ষিত লোকেরা কথাবার্তা বলিয়া থাকেন; (৪) গামী কাশ্মীরী (گامی کشمیری) ঃ এই কাশ্মীরী ভাষা গ্রামীণ চাষী-কৃষক ও শ্রমিকরা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইহাকে ঠেট (ٹھیٹ) অথবা খুরদুরী (کھر دوری) বলা অধিক সমীচীন ; (৫) হিন্দু কাশ্মীরী ঃ এই কাশ্মীরী ভাষায় সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ ও বাগধারার প্রভাব বেশী ; (৬) মুসলমানী কাশ্মীরী ঃ এই কাশ্মীরী ভাষার প্রচলন মুসলিম পরিবারে দেখা যায় এবং উহাতে আরবী ও ফারসীর শব্দ, পরিভাষা ও বাগধারার বিপুল প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

এমন এক যুগ ছিল যখন ভাষা বিশেষজ্ঞগণ কাশ্মীরী ভাষাকে সংস্কৃতভাষার কন্যা মনে করিতেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণা উক্ত ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরী ভাষা সংস্কৃতের তুলনায় প্রাচীনতর এবং আর্যদের আগমনের পূর্বেও উপত্যকায় ইহা প্রচলিত ছিল। আর্যদের আগমনের পূর্বে কাশ্মীরে নাগা জাতির বাস ছিল; তাহাদিগকে নায়ার (Nayar)-ও বলা হইত। সুতরাং বলা যায়, কাশ্মীরী ভাষা নাগা এবং নায়ারদেরই ভাষা। তাহাদের পরে আগমনকারী আর্যদের ভাষা নহে। ইহার প্রমাণ স্বয়ং 'কাশ্‌মীর' শব্দটি। কাশ্মীরের প্রাচীন নাম (ستی سر) সাতীসর বা উচ্চ পুকুর। এই প্রাচীন নামটির ভাষান্তর করিয়া কাশ্মীর নামটি গৃহীত হয়। 'কা' পানিকে বলা হয় এবং 'সামীরা' অর্থ বাতাস, এই দুইটি প্রাকৃত শব্দ মিলিত হইয়া কাশমীরা অথবা কাশ্‌মীর শব্দ অস্তিত্ব লাভ করে। ইহার অর্থ সেই ভূমি যেখানে বাতাস দ্বারা পানি বাহির করা হইয়াছে। কাশ্‌মীর শব্দের অন্য ব্যাখ্যা হইল ঃ প্রাকৃত ভাষায় খাল বা নদীকে 'কাস্' বলা হয় (পাঞ্জাবী ভাষায়ও নদী ও খালের জন্য 'কাসী' শব্দের প্রচলন আছে) এবং মীর-এর অর্থ হইল পাহাড় (যেমন শারহি মীর অথবা পালমীর পর্বত)। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাস্‌মীর অথবা কাশ্‌মীর হইল সেই নদী বা খাল যাহা পাহাড়ের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছে। ভৌগোলিক দিক দিয়া কাশ্মীর প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট নদী বা ঝিল, যাহার চতুর্দিকে পাহাড়ের প্রাচীর দণ্ডায়মান। কাশ্মীর উপত্যকার দৈর্ঘ্য দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ৮৪ মাইল এবং ২০ হইতে ২৫

মাইল প্রশস্ত। আয়তন ১৮০০ হইতে ১৯০০ বর্গ মাইল। কাশ্মীরবাসী কাশ্মীর উপত্যকাকে কাশ্মীরের স্থলে কাশীর বলে। এই ভাষাগত রূপান্তরও কাশ্‌মীর শব্দের মূল প্রাকৃত রূপের প্রতি ইঙ্গিত করে। এম. এ. স্টেইন (Stein)-এর মতে 'কাশীর' শব্দটি কেবল কাশ্‌মীর শব্দের স্বরগত পরিবর্তন। কাশ্‌মীরের জনগণ কাশ্‌মীর শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় 'মীম' বর্ণটি বাদ দেয়। ভূগোল বিশেষজ্ঞদের মতে কাশ্‌মীর শব্দের প্রচলন হইয়াছে ২৩০০ বৎসরের অধিককাল পূর্ব হইতে।

অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর বর্মা কাশ্মীরী ভাষা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরী ভাষার বৈশিষ্ট্য হইল ইহার জটিলতা ও সূক্ষ্ম শব্দাবলীর বিন্যাস ; উহাতে এমন সব সূক্ষ্ম শব্দাবলী আছে যাহা কেবল কথকই অনুভব করিতে পারে, শ্রোতা উহা শুনিতে পারে না। চেষ্টা ও মনোযোগের পরই সে ইহা শুনিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইহার স্বরগত প্রকৃতি এমন রহস্যপূর্ণ যে, ইহাকে ধ্বনিগত চিহ্নের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা এবং ইহার রহস্য উপলব্ধি স্বর বিশেষজ্ঞের জন্যও খুব কঠিন।"

কাশ্মীরী ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করিয়া কাব্য চর্চাকে ঐতিহাসিক দিক দিয়া পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথম যুগ ঃ গীত সংগীত অর্থাৎ প্রাচীনতম কাল, ধর্মীয় ও নৈতিক লোকগীতিসংবলিত।

দ্বিতীয় যুগ ঃ সতীকান্ত হইতে শায়খ নূরু'দ্‌-দীন নূরানী পর্যন্ত।

তৃতীয় যুগ ঃ হাব্বাঃ খাতুন (حبہ خاتون) হইতে আরতীমা'ল (ارتیمال) পর্যন্ত।

চতুর্থ যুগ ঃ মাহমূদ গামী (گامی) হইতে 'আমীমুল্লাহ্ হাক্কানী পর্যন্ত।

পঞ্চম যুগ ঃ গুলাম আহমাদ মাহজূর হইতে তা'উস বানহালী (بانہالی) পর্যন্ত।

অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের ন্যায় কাশ্মীরী সাহিত্যেরও সূচনা হইয়াছে লোকগীতি দ্বারা। এই লোকগীতি হাম্‌দ ও ভজনের সহিত খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এই লোকগীতিসমূহে আল্লাহ্, রাসূল ও বিভিন্ন দেব-দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে স্বীকার করা ছাড়াও অন্তর ও আত্মার পরিশুদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহা আধুনিক ধারণায় কম লোকগীতি এবং অধিক ভজন। এই সকল নৈতিক ও আত্মিক লোকগীতিতে বিশ্বলোক, সূর্য, চন্দ্র, নদী, ঝিল, ঝর্ণা, পাহাড়, বৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র একত্ব, স্বাধীন চিন্তা এবং আত্মার পরিত্রাণের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। এই সকল বর্ণনায় নাগামত, শৃমত ও বৌদ্ধ মতের বিশেষ শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, লোকগীতির পরবর্তী কালের সর্বপ্রথম কবি সতীকান্তও আত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে কবিতা রচনা করেন এবং তাঁহার সেই সকল বিষয় ও ধ্যান-ধারণা সংস্কৃত-মিশ্রিত কাশ্মীরী ভাষায় উপস্থাপন করেন।

কাশ্মীরী সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের প্রধান কবি একজন মহিলা। ইনি লাল্লাহ 'আরিফা নামে খ্যাত। লাল্লাহ 'আরিফা-কে লাল দিদ Lal Ded-ও বলা হয়। তাঁহার প্রকৃত (হিন্দুয়ানী) নাম পরমাবতী। (অনেকের মতে লাল্লাহ 'আরিফা যোগিনী এবং শৃমত-এর অনুসারী ছিলেন)। তিনি স্বীয় যোগসিদ্ধ উস্তাদের নিকট হইতে যোগ শিক্ষা করেন। অতঃপর উহার ব্যাপক বিস্তারের জন্য অলি-গলিতে ফিরিতে থাকেন এবং কবিতাকে তিনি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার কবিতাসমূহ আশ্লূক (শ্লোক) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যাহাকে সামগ্রিকভাবে লাল ওয়াকাহী (لل وکھی) অর্থাৎ লাল্লাহ্ 'আরিফার কাহিনী বা কথা বলা হয়। তিনি মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের নিকট শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তিনি চতুর্দশ খৃ. শতকে মধ্যভাগে কাশ্‌মীরের তৃতীয় মুসলমান বাদশাহ সুলতান 'আলা'উ'দ-দীনের আমলে (১৩৪৩-১৩৫৪ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। সেই যুগে ইসলামের অবদান ও প্রভাবের ফলে হিন্দু এবং কাশ্মীরের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছিল। লাল্লাহ্ 'আরিফাও মুসলিম প্রচারকবৃন্দের, বিশেষ করিয়া সায়্যিদ 'আলী হামাদানী (র)-র কাছে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি শেষোক্ত মনীষী কর্তৃক আধ্যাত্মিক দিক দিয়া খুবই প্রভাবিত হইয়াছিলেন; এই প্রভাবের ফল তাঁহার কাব্যেও পরিলক্ষিত হয়।

কাশ্মীরী কাব্য সাহিত্যের তৃতীয় যুগ জুড়িয়া আরও দুইজন মহিলা, হাব্বা খাতূন (حبہ خاتون)'ও আরনী মালে (ارنی مال)-এর অবস্থান লক্ষণীয়। তাঁহাদের গীতসমূহ কাশ্মীরী ভাষার উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যে উচ্চ স্থান দখল করিয়া আছে। "আরনী মাল ও হাব্বা খাতূন-এর ব্যক্তিগত দুঃখ, বেদনা, গূঢ় দর্শন ও জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে এতদূর সাদৃশ্য আছে যে, যদি আমরা কবিদ্বয়ের একজনের কথা ভাবি তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অন্যজন আমাদের চিন্তা জগতে উপস্থিত হন। তাঁহাদের প্রেম ও ভালবাসার গানসমূহের গুরুত্ব এই বিষয়ে নিহিত যে, তাঁহাদের কাব্য কাশ্মীর উপত্যকার সাধারণ মেয়েদের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিৎকার ও আর্তনাদের চিত্র তুলিয়া ধরে। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাহা যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল তবুও তাঁহাদের জাতীয় গুরুত্বের হেতু এই যে, হাব্বা খাতূন ও আরনী মালের ন্যায় সকল কাশ্মীরী রমণীকে সেই সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, যাহা দ্বারা জীবন মর্যাদাপূর্ণ হয়। অন্য কথায়, তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছিল। তাঁহারা অসহায়, নির্যাতিতা ও নিপীড়িতা ছিলেন; তাঁহারা নিজেদের আঁচল আগামী দিনের আশায় বাঁধিয়াছিলেন (প্রেমনাথ রাম্যায়, Daughters of the vitasta, পৃ. ১৭৮)। চতুর্থ যুগে কাশ্মীরী কাব্য ফারসী কাব্য দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়। এই যুগের প্রধান কবি মাহমূদ গামী (گامی); ইনি ১৮৫৫ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন (কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ১৮৮৫ খৃ. উল্লেখ আছে)। এই যুগের অন্য প্রসিদ্ধ কবি মাকবূল শাহ্ কারালা ওয়ারী (کرال واری) ও রাসূল মীর।

কাশ্মীরী কাব্যের আধুনিক কাল ১৯০০ খৃ. হইতে আরম্ভ হয়। এই যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি পীরখাদা গুলাম আহমাদ মাহজূর (জ. ১৮৮৮ খৃ.) কাশ্মীরী ভাষা ছাড়া ফারসীতেও কবিতা রচনা করিতেন। মাহজূর প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জনগণের কবি। তিনি স্বদেশ প্রেমে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মানুষের প্রতি প্রেম, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু। তাঁহার কবিতা চর্চার ভিত্তি সংগীত এবং তিনি যেই কথাই বলেন উহাতে মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহিতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার দুইটি কাব্য সংকলন কালাম-ই মাহজূর ও পায়াম-ই মাহ্জূর প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৭ খৃ. হিন্দু ডোগ্‌রা সৈন্যদের "সংগীনের নীচে দণ্ডায়মান হইয়া মাহজূর ধ্বনি দিয়াছিলেন "মেরা দিল পাকিস্তানকে সাথ হায়"। কাশ্মীরের ডোগ্‌রা সরকার তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া জেলখানায় পাঠায় এব তিনি জেলখানাতেই কারা-কষ্ট সহ্য করিয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাহজূরের সমসাময়িক 'আবদু'ল-আহাদ আযাদও নিপীড়িত দুঃস্থ মানবতার কবি এবং মন-মানসিকতার দিক দিয়া ছিলেন বিপ্লবী। তবে মাহজূরের ন্যায় তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, বরং গণবিপ্লব ঘটাইতে চাইয়াছিলেন। কোনও কোনও সমালোচক তাঁহার বিপ্লবী কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে আযাদকে মাহজূর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন।

মাহজূর বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মধ্যে উত্তেজনা ও বিচক্ষণতা পাশাপাশি দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উত্তেজনা উন্মাদনার এমন সীমা স্পর্শ করে যেখানে বাস্তবতা কল্পনায় রূপান্তরিত হইয়া কর্মের অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্বাধীন কাশ্মীর এবং পাকিস্তান কাশ্মীরী ভাষায় বেশ কিছু শক্তিমান কবির আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে আহমাদ শামীম ও তা'উস বানহালী (بانہالی)-র নাম সকলের উপরে। এই দুই কবির কাব্যে নূতন অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার গভীরতাও দৃষ্ট হয়। ইঁহারা কাব্যের বিষয়সমূহকে চিন্তা স্পর্শ দ্বারা গভীরতা ও সুশৃঙ্খলা প্রদান করেন।

সংযোজন ঃ কাশ্মীরী ভাষা ইহা বর্তমান অবস্থার জন্য ইসলামের নিকট ঋণী। ইসলাম কাশ্মীরে খৃ. চতুর্দশ শতাব্দীতে বিস্তার লাভ করে। তখনকার সরকারী ভাষা ছিল সংস্কৃত, সুলতান শিহাবু'দ-দীনের শাসনকাল (১৩৫৪-১৩৭৩ খৃ.) হইতে ফারসী ভাষা উহার স্থান দখল করিতে শুরু করে (দ্র, মুহিব্বু'ল-হাসান, 'কাশ্মীর সালাতীন-কে 'আহাদ মে', আজমগড় ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৩৯৮, ৪০২)। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, কাশ্মীরী সুলতানগণ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু ফারসী রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ভাষায় পরিণত হওয়ার দরুণ সংস্কৃতের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। দরবারের বাহিরে চতুর্দশ শতাব্দীতেও জনসাধারণ কাশ্মীরী ভাষাই বলিত। ইহার প্রমাণ কবি লাল্লাহ 'আরিফা, যিনি ১৩৩৫ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন, কাশ্মীরী ভাষায় কাব্যচর্চা করিতেন ; শায়খ নূরু'দ-দীন রীশী-র (১৩৭৭-১৪৩৮ খৃ.) নূর নামা নামে যে রচনা সংকলন পাওয়া যায়। উহা কাশ্মীরী ভাষায় লিখিত। লাল্লাহ 'আরিফা ও শায়খ নূরু'দ-দীন পুরাতন কাশ্মীরী ভাষা ব্যবহার করিতেন, যাহা খৃ. চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। ভাষাবিদগণ এই বিষয়ে একমত যে, কাশ্মীরী ভাষার ভিত্তি দারদী ভাষার একটি শাখা। উহাকে সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী ঐ সকল ব্রাহ্মণের প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় যাঁহারা সর্বদা কাব্য দরবারে অবস্থান করিতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাহ হামাদানী (র)-এর আগমনের পর নূন্যাধিক দেড় শতাব্দীর মধ্যেই কাশ্মীরে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। সেই সময় উক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের যে ভাষা ছিল তাহা বর্তমানের কাশ্মীরী ভাষা, যাহাকে হিন্দু লেখকগণ "মুসলমানী কাশ্মীরী ভাষা" নাম দিয়াছেন। হিন্দুরা যে কাশ্মীরী ভাষা ব্যবহার করেন, উহাতে সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং উহাকে হিন্দু কাশ্মীরী বলা হয়, কিন্তু একদিকে যেমন অনেক হিন্দু মুসলমানী কাশ্মীরী ভাষা ব্যবহার করেন, অপর দিকে হিন্দু কাশ্মীরী ব্যবহারকারীর সংখ্যা এতই নগণ্য যে, আমাদের বিচারে উহার তেমন কোন গুরুত্বই নাই। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা অর্থাৎ মুসলমানী কাশ্মীরীর প্রতিই অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে।

কাশ্মীরে ইসলাম প্রচার আরম্ভ হইলে মসজিদসমূহ নির্মিত হয়, খানকাহ ও মকতবসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু কাশ্মীরের লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাই সকল তাহযীবী ও তামাদ্দুনী পরিবর্তন অতি দ্রুত সংঘটিত হয়। 'আলিম ও সূফী সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাবলীগ ও প্রচারের দায়িত্ব খুবই নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। ইসলামের সকল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পদ আরবী ও ফারসী ভাষায় মওজুদ ছিল। উহার প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিকাংশ সূফী ও প্রচারক তুর্কিস্তান হইতে আগমন করিতেন; ইঁহাদের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী। তা আরবী ও ফারসীর সহিত তুর্কী শব্দসমূহ ও ব্যাপকভাবে কাশ্মীরী ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়। কাশ্মীরী ভাষায় যখন ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয় তখন সা'দী, রূমী, জামী, আমীর খাসরূ ও হাফিজ-এর কবিতা তথায় বিপুলভাবে পঠিত হইত। ইহারই ফলস্বরূপ ফারসী কবিদের অনুসরণ করিয়া য়ূসুফ-যুলায়খা, লায়লা-মাজনূন, শীরীন-খাসরূ ও ওয়ামিক-'আযরা ইত্যাদি কাশ্মীরী ভাষায় রচিত হয়। মুসলমানদের কারণে কাশ্মীরী ভাষা কেবল নূতন শব্দ ভাণ্ডারই লাভ করে নাই এবং উহার কাব্য কেবল শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই; মুসলমানগণ উহাকে ফারসী হরফেও লিখিতে আরম্ভ করেন। কাশ্মীরী ভাষার জন্য শারাদা অক্ষরও ব্যবহৃত হইতে থাকে, যাহা উক্ত ভাষার প্রাচীন স্থানীয় অক্ষর এবং নাগরীর সহিত যাহার মিল রহিয়াছে, উহার অক্ষরসমূহ বেশীর ভাগ পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবহৃত টুকরী অথবা ভূগরীর সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। হিন্দুরা বেশির ভাগ নাগরী অক্ষরে লিখিত। কিন্তু কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ মুসলিম ফারসী বর্ণমালাই ব্যবহার করিত। এই ব্যাপারে অবশ্যই এক জটিলতা দেখা দেয় এবং তাহা ছিল 'স্বরবর্ণ'সমূহ যেইগুলির সংখ্যা কাশ্মীরী ভাষায় অধিক। এইজন্য নূতন স্বরচিহ্ন নির্ণয় করা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কাশ্মীরী লেখকগণ দেশ বিভক্তির পর নাসতা'লীক লিপির আরও পরিবর্তন সাধন করেন এবং কাশ্মীরী স্বরবর্ণের সকল উচ্চারণগত অভাব পূরণ করেন [দ্র. تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند , ১৪ (কাশ্মীরী আদাব) ঃ ১৫০]। কাশ্মীরী ভাষার মানদণ্ডের ক্ষেত্রে ভাষাগত পার্থক্যের কারণ জম্মু ও কাশ্মীর এবং সংলগ্ন অঞ্চলসমূহে মুসলমান ও হিন্দুদের সহ-অবস্থান। গ্রামবাসী ও শহরবাসীদের ভাষায়ও পার্থক্য রহিয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলেও প্রভাব পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া স্থানীয় প্রভাবের দরুন, বিশেষ করিয়া উচ্চারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরে ইসলামের আগমনের পূর্বে কাশ্মীরী ভাষায় কোনও সাহিত্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিচিত্র লোকসংগীত, নানা প্রকারের লোক কাহিনী, ধাঁধা ও বাগধারার প্রচলন সমাজে অবশ্যই ছিল, তবে সুবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল না। কাশ্মীরী ভাষার সাহিত্য মুসলমানদের আগমনের ফলে শুরু হয়। এই ভাষায় কাব্যচর্চার সূচনা হয়। কাশ্মীরের মনোরম পরিবেশে বিরাজমান সৌন্দর্যের প্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী পরিবেশে আবেদনপূর্ণ গীত সহসা মুখে আসিয়া যাইত। কাশ্মীরী ভাষার কোনও কোনও কবিতা খুবই হৃদয়গ্রাহী। এই প্রসঙ্গে মাকবূল শাহ্-এর 'গলরীয' (گلریز), মাহমূদ গামীর শীরীন খাসরূ, ওয়ালীয়্যুল্লাহ মাসতু-এর হায়া! মাল (চামেলীর হার)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরী সাহিত্য ও কাব্যকে চারিটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম যুগ ঃ ইহা ছিল সতীকান্ত, লাল্লাহ্ 'আরিফা ও শায়খ নূরু'দ-দীন (র) রীশীর যুগ। কাশ্মীরী ভাষার প্রথম কবি ছিলেন সতীকাণ্ড। ইনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। মাহানিয়া প্রকাশ ইহার কাব্য সংকলন। ইঁহার ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও হিন্দু ধর্মের নানা ভাবধারা

লক্ষণীয়। লাল্লাহ্ 'আরিফার কথা তাসাওউফ, দর্শন ও সংস্কৃত প্রভাবিত হইলেও উহাতে মুসলিম সূফীদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। শায়খ নূরু'দ-দীন রীশীর কবিতা যাহাকে আশলুক (শ্লোক) বলা হয়, সূফী প্রকৃতির, অবশ্য তাঁহার লেখা খুবই উপদেশপূর্ণ। এই তিন কবির রচনায় কাশ্মীরী ভাষায় যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে উহার অধিকাংশই এখন বর্জিত। এই যুগে সোম পণ্ডিত 'যায়ন চারতার' ও যুওয়াধ বাট 'যীনা ওয়ালাসী' রচনা করেন। এই দুই ব্যক্তি কাশ্মীরী সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগেও জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয় যুগের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে হাববা খাতূন, হাবীবুল্লাহ নাওশাহরী, রূপা ভাওয়ানী, সাহিব কোল, প্রকাশ বাট, মুল্লা ফাকীর ও মীর 'আবদুল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমুসলিমদের লিখন-পদ্ধতি ঠেট কাশ্মীরী ছিল ; কিন্তু মুসলিম কবিগণ ফারসী ছন্দপ্রকরণের প্রভাব গ্রহণ করেন। হাববা খাতূন কাশ্মীরের বাদশাহ য়ূসুফ শাহ চক-এর স্ত্রী ছিলেন ; তিনি আধুনিক কাশ্মীরী গাযালের প্রতিষ্ঠাতা।

কাশ্মীরী সাহিত্যের তৃতীয় যুগ মাহমূদ গাযী হইতে আরম্ভ হয় এবং 'আযীযুল্লাহ হাক্কানী পর্যন্ত শেষ হয়। ইহা ছিল সেই যুগ যখন মুসলমানেরা কাশ্মীরের উপর প্রায় পাঁচ শত বৎসরের শাসনকাল অতিবাহিত করিয়াছে; ততদিনে কাশ্মীরী ভাষার উপর ফারসীর গভীর ছাপ পড়িয়াছে এবং উহাতে সাবলীলতা, স্পষ্টতা ও ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই যুগে কাশ্মীরী ভাষা যথারীতি জ্ঞান ও সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়। এই সময়ে জটিল ও বর্জিত শব্দসমূহ ব্যবহারের রীতির বিলুপ্তি ঘটে এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষার প্রচলন শুরু হয়। শিখ ও ডোগুরাদের কালও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। উহাদের প্রভাবে কাশ্মীরী কাব্যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়।

কাশ্মীরী সাহিত্যের চতুর্থ যুগের (আধুনিক যুগ) বড় কবি পীর যাদা গুলাম আহমাদ মাহজুর। এই যুগে কাশ্মীরবাসিগণ ডোগরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করে। এই কারণে এই যুগের পদ্য ও গদ্যে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির উল্লেখ দেখা যায়; ইহা ছিল "জীবনের জন্য সাহিত্য" এই নীতির যুগ। মাহজুর কাশ্মীরী ভাষায় যথারীতি বীর রসাত্মক কাব্যের সূচনা করেন। 'আবদু'ল-আহাদ আযাদ কাশ্মীরের বিদ্রোহী কবি। ইনি মানবতার কবি ছিলেন। বর্তমান যুগেই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশের বিভক্তিকালে কাশ্মীরে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কাশ্মীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ইহা সত্ত্বেও অধিকৃত কাশ্মীর ও স্বাধীন কাশ্মীর—উভয় স্থানে কাশ্মীরী সাহিত্যের উন্নতি যথারীতি অব্যাহত থাকে। দীননাথ নাদিম, 'আবদু'র-রাহমান রাহী, গুলাম নাবী খিয়াল, গুলাম রাসূল নাযকী প্রমুখ অধিকৃত কাশ্মীরের কবি সাহিত্যিক। আযাদ কাশ্মীরেও কাশ্মীরী সাহিত্যের অবস্থা খুবই আশাব্যঞ্জক। গুলাম আহমাদ নায, আহমাদ শামীম, 'আলী মুহাম্মাদ কানূল, শামসু'ল-'আয়ন বুখারী, গুলাম মুহাম্মাদ মুরজী, গুলাম মুহাম্মাদ মাসরূর, আহমাদুল্লাহ দিলনাওয়ায, তাহসীন জা'ফারী প্রমুখ এই যুগের বিশিষ্ট কবি। আহমাদুল্লাহ দিলনাওয়াযের কয়েকটি কাব্যসঞ্চয় প্রকাশিত হইয়াছে ; যথা ঃ 'রিসালা-ই দিল, 'ইশ্কা বাগ, 'কালাম-ই উলফাত' 'কালাম-ই 'উমার খাজা, 'জুহুর-ই গুলশান, সুরূর-ই 'ইশক। গুলাম আহমাদ কাশফী কাশির যারান' নামে কাশ্মীরী ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাশ্মীরী কথোকথন সম্বন্ধে একটি পুস্তক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ কুরায়শী ও খাজা গুলাম নাবী গুলকার প্রকাশ করেন। কয়েকটি সাহিত্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কাশ্মীরী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করিয়া আসিতেছে। আযাদ কাশ্মীর বেতার হইতে কবিতা, ফিচার ও খবরও কাশ্মীরী ভাষায় প্রচার করা হয়। সাম্প্রতিক কাশ্মীরী সংবাদপত্র উর্দূ ভাষার ব্যাপক প্রচলনের কারণে তেমন উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। তথাপি কয়েকটি কাশ্মীরী সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ছাড়া উর্দূ সাময়িকীতে কাশ্মীরী কবিতা ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মীর 'আবদু'ল-'আযীয,, তা'রীখ আদিয়াত মুসলমান-ই পাকিস্তান ওয়া হিন্দ-এ লাহোর ১৯৭১ খৃ., ১৪খ ১৩৫-২০৯ ; (২) মাহবূবু'ল-হাসান, কাশ্মীর সালাতীন কে 'আহ্দ মে, আজমগড় ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৪০৪-৪০৬ ; (৩) গুলাম মুহয়ি'দ-দীন সূফী, Kashmir, লাহোর ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩৯৫-৪৪৬ ; (৪) G. A. Grierson, A manual of the Kashmiri language, Oxford 1911; (৫) Braj B. Kachru, A reference grammar of Kashmiri, Illinois, 1969; (৬) B. A. Zakhar'in and D. I. Edel'man, Yazuik Kashmiri, Moscow 1971; (৭) দা. মা. ই., ১৭খ, ৩০৭-১৩।

আবদু'ল-গানী (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গনী

আল-কাশ্শাফ (الكشاف) ঃ প্রসিদ্ধ তাফ্সীর গ্রন্থ। পূর্ণ নাম আল-কাশ্শাফ 'আন-হাকা'ইকি'ত-তান্যীল ওয়া 'উয়ূ'নি'ল-আকাবীল ফী উজূহি'ত-তা'বীল (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل) অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের রহস্যের অত্যুৎঘাটক ও ইহার ব্যাখ্যায় উৎকৃষ্ট মতসম্ভার। রচয়িতা আবু'ল-কাসিম মাহ্মূদ ইব্ন 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-খাওয়ারিযমী আল-মু'তাযিলী (ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى المعتزلى) [৪৬৭-৫৩৮ হি.]। সাধারণত জারুল্লাহ (আল্লাহ্র প্রতিবেশী) আয-যামাখ্শারী (جار الله الزمخشرى) নামে খ্যাত। তিনি ধর্ম বিশ্বাসে একজন কট্টর মু'তাযিলা এবং ফিক্হী বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র)-র অনুসারী ছিলেন। মুতাযিলা ধর্মমতের প্রচার-প্রসারে তাঁহার যথেষ্ট অবদান আছে। আল-কুরআনের ব্যঞ্জনারীতি ও সাহিত্যালংকার উদ্ঘাটন, ইহার শব্দচয়ন ও বাক্য বিন্যাসের বৈয়াকরণিক পর্যালোচনা, মোহনীয় বাগধারা ও নীতিবাক্যের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা প্রদান এবং আদেশ-অনুজ্ঞার প্রাথমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহার ই'জায (অলৌকিকত্ব) ফুটাইয়া তোলার দিক হইতে আল-কাশ্শাফ একখানি অতুলনীয় তাফ্সীর গ্রন্থ। 'আকীদার ব্যাপারে কিছু মতবিরোধের বিষয় বাদ দিলে সে কালের কোনও মুফাস্সির আল-কাশ্শাফের ন্যায় সফল সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারেন নাই, এই কথা সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থকার শুরুতে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা উহার বিষয়ের মূল্যমান, রচনার কারণ, রচনারীতি ও উহার বৈশিষ্ট্যাবলী জানা যায়। তিনি বলেন (সংক্ষেপে), যে সকল জ্ঞান দ্বারা অনুসন্ধিৎসু মন পূর্ণ হইয়া ওঠে, তন্মধ্যে 'ইলমু'ত-তাফ্সীর সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন ফাকীহ 'ইলমু'ল-ফাতাওয়ায় (আইনশাসস্ত্র) যতই পারদর্শী হউক, একজন মুতাকাল্লিম (ধর্মতাত্ত্বিক) ধর্মতত্ত্বে যতই অগ্রগামী হউক, একজন ঐতিহাসিক ইতিহাস ও কাহিনী জ্ঞানে যদি কালজয়ীও হয়, ওয়া'ইজ (উপদেশদাতা) যদি আল-হাসান আল-বাস্রী (র)-কেও ছাড়াইয়া যায়, কোন নাহ্বী (ব্যাকরণবিদ) যদি সীবাওয়ায়হ (سيبويه)-এর অপেক্ষাও 'ইলমু'ন-নাহউ'র বড় দিকপাল হয়, কোনও ভাষাবিদ যদি হয় ভাষাবিদগ্ধ,

তথাপি তাঁহাদের কেহই গতিপথে অগ্রগামী হইতে পারে না এবং উহার রহস্য-প্রবাল উত্তোলন করিতে সক্ষম হয় না—একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে আল-কুরআনের জন্য নির্দিষ্ট জ্ঞানদ্বয় "ইল্মু'ল-মা'আনী ও 'ইল্মু'ল-বায়ানে (علم المعانى والبيان) ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহার সুদীর্ঘকালীন তত্ত্বানুসন্ধানে সাধনা-ক্লিষ্ট হইয়াছে, তদুপরি সে অন্যান্য জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে পর্যাপ্ত অংশ লাভ করিয়াছে, গবেষণা ও মেধার সমন্বয় সাধন করিয়াছে, বিপুল পরিমাণে অধ্যয়ন ও আলোচনা পর্যালাচনা করিয়াছে, "ইল্মু'ল-ই'রাবের ময়দানে হইয়াছে সুযোগ্য অশ্বারোহী, বই-পুস্তক সংগ্রহে থাকিয়াছে সকলের সম্মুখভাগে। গদ্য ও পদ্যের রচনারীতিতে সে একজন সাহসী যোদ্ধা, কিভাবে কথামালার গাঁথুনি গাথিতে হয় এবং কিভাবে ছন্দ বিন্যাস করিতে হয় সেই সম্পর্কে সে সম্যক্ অবগত।

আমি লক্ষ করিলাম যে, আমার দীনী ভ্রাতৃবর্গ বিভিন্ন সময়ে আমার নিকট আয়াতে কুর্আনীর তাফ্সীর জিজ্ঞাসা করিত। আমি তাহাদিগকে পর্দার অন্তরাল হইতে তদসম্পর্কত নানা রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিতাম। ফলে তাহারা ইহার সপ্রশংস মন্তব্য করিত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িত। অবশেষে তাহারা আমার নিকট সমবেত হইয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল যেন আল-কুর্আনের রহস্য উদ্ঘাটন শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করি। আমি ক্ষমা চাহিলাম। তাহারাও পুনরাবৃত্তিতে নিরত রহিল এবং আল-'আদ্ল ওয়া'ত-তাওহীদপন্থী (মু'তাযিলা) 'আলিমগণের দ্বারা আমার উপর চাপ সৃষ্টি করিল। সুতরাং আমি সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারা-এর কিয়দংশের তাফ্সীর প্রণয়ন করিলাম। প্রচুর প্রশ্নোত্তরের সমন্বয়ে ইহার আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হইয়াছিল। অতঃপর আমি বায়তুল্লাহ্-র সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটাইবার উদ্দেশ্যে যখন তথায় উপনীত হইলাম তখন সেখানে হাসান (রা)-এর বংশধর একজন মহান সায়্যিদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন হামযা ইব্ন ওয়াহ্হাস। উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ ছিল সকলের অধিক। আমি কোনক্রমেই তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। অতএব, পূর্বাপেক্ষা কিছু সংক্ষিপ্তাকারে রচনা কার্য আরম্ভ করিলাম। তবে ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকারী আলোচনার সমাবেশ ঘটিয়াছে (আল-কাশশাফ, ভূমিকা)।

উক্ত গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার বয়স ছিল ষাট-সত্তরের মাঝামাঝি। ইহার রচনাকার্যে তাঁহার ভাষায় আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালের সমপরিমাণ সময় লাগিয়াছে [দুই বৎসর চার বা তিন মাস নয় দিন]। অথচ ইহা অনূ্যন ত্রিশ বৎসর সময়ের কাজ ছিল। নিঃসন্দেহে ইহা "পবিত্র গৃহেরই বরকত"। ৫২৮ হি. ২ রাবী'উ'ল-আওয়াল, সোমবার দ্বিপ্রহরে রচনাকার্য সমাপ্ত হয়।

আস-সুয়ূতী বলেন, 'ইল্মু'ল-বালাগাতের মাধ্যমেই আল-কুরআনের ই'জায (আলৌকিকত্ব) উপলব্ধি করা যায়। এই বিষয়ে আল-কাশ্শাফের রচয়িতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। ফলে তাঁহার এই গ্রন্থ উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্যন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়াছে। বস্তুত ই'তিযাল (اعتزال) সম্পর্কিত বিচ্যুতিকে বাদ দিলে আল-কুরআনের ই'জায ফুটাইয়া তুলিতে এবং ইহার যাদুময় বালাগাত অবারিত করিয়া তুলিতে এই গ্রন্থের কোনও বিকল্প নাই। ইহাতে আরবী ভাষার সাহিত্য-ঝংকার, আরবদের কাব্য-জৌলুস, আল-কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য অর্থগত ব্যাপ্তি ও অতলান্তিকতা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অন্য কোনও গ্রন্থে পায় নাই। আয-যামাখশারী স্বয়ং তাঁহার এই গ্রন্থকে সার্থক সৃষ্টি হিসাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বলেন ঃ

ان التفاسير فى الدنيا بلاعدد

وليس فيها لعمرى مثل كشافى

ان كنت تبغى الهداية فالزم قراءته

فالجهل كالداء والكشاف الشافى

"দুনিয়ায় অসংখ্য তাফসীর-গ্রন্থ রহিয়াছে। আমার জীবনের শপথ! ইহাদের মধ্যে আমার কাশশাফের মতো একটিও নাই। যদি তুমি হিদায়াতের সন্ধানী হও তবে আমার এই কাশ্শাফ পাঠ করো। কেননা অজ্ঞতা একটি ব্যাধিসদৃশ। আর আল-কাশ্শাফ যেন ইহার নিরাময়কারী।"

কথিত আছে যে, প্রথমত তিনি তাঁহার তাফসীরের ভূমিকা এই বাক্য দ্বারা শুরু করিয়াছিলেন ঃ الحمد لله الذى خلق القرآن "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আল-কুরআন সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে মু'তাযিলাদের এই বিশ্বাসের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইহা আল্লাহ্র সৃষ্টি, মাখ্লূক)। হিতাকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাকে বলিল ঃ আপনি এই বাক্য যতদিন রাখিবেন, ততদিন কেহ ইহা স্পর্শও করিবে না। তখন তিনি خلق -এর স্থলে جعل শব্দ বসাইলেন। جعل শব্দটি মু'তাযিলাদের নিকট خلق -এর সমার্থক। আহ্লু'স-সুন্নাহ্র নিকট এই দুইটি শব্দ সমার্থবোধক নহে। অবশ্য বর্তমানে চালু সংস্করণে جعل-এর স্থলে انزل শব্দ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত ইহা পরবর্তীকালের প্রকাশক বা অনুলিখকদেরই হস্তক্ষেপ। এই পরিবর্তন তিনি নিজে করেন নাই।

আত-তাজ, আস-সুব্কী, ইব্ন খালদূন, আবূ হায়্যান, ইব্ন বাশ্কুওয়াল তথা আহ্লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ও বাহিরের সকল 'আলিম ইহার বিশিষ্ট গুণাবলী স্বীকার করত ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে সাথে সাথে ইহার বিচ্যুতিগুলিও দিক নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার কঠোর সমালোচক হায়দার আল-হারাবী পর্যন্ত বলেন, আল-কাশ্শাফ একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ। ইহার মর্যাদা অতি উচ্চে। প্রাচীনদের রচনায় ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। উত্তরকালেও এইরূপ কোনও গ্রন্থ সংকলিত হয় নাই। ইহার সুগঠিত ও প্রাঞ্জল বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের ঐকমত্য সাধিত হইয়াছে। ইহার সুদৃঢ় ও উন্নত ব্যঞ্জনাভঙ্গী জ্ঞানী-গুণী ও পারদর্শীদের প্রশংসা কুড়াইয়াছে। তাফ্সীরের নীতি-নির্ধারণে, দলীল-প্রমাণ পরিবেশনে, সূত্রাবলীর বিন্যাসে, দাবী ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়করণে ইহাতে কোনও প্রকার ত্রুটি নাই। ....উক্ত কারণে গ্রন্থখানি সকলেই হাতে হাতে লুফিয়া লইয়াছে। ফলে ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

লক্ষ করিলে দেখা যায় যে, আয-যামাখশারী আল-কুর্আনের প্রচ্ছন্ন বালাগাতের অসীম ঐশ্বর্য উদ্ঘাটনের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। কেননা 'ইল্মু'ল-বালাগাতই আরব সাহিত্যিকদিগকে কুরআনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ প্রমাণিত করিয়াছিল। তিনি বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব রূপকার্থ (مجازات), গৌণার্থ (استعارات) এবং বালাগাতের অন্যান্য রীতিনীতির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখামাত্র যে কেহ স্বীকার করিবে যে, আল-কুরআনের ব্যঞ্জনারীতি ও ভাষার জৌলুস এক অনন্য রীতিতে প্রকাশ করিতে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। ভূমিকার ইঙ্গিত অনুসারে 'ইলমু'ল-মা'আনী ও বায়ানের মহামূল্যবান সম্পদ আহরণের প্রতিই তিনি সমধিক জোর দিয়াছেন।

কিন্তু আল-বালকীনী (البلقيني) তাঁহার এই নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন, 'সাহাবা ও তাবি'ঈ যুগের পর যেই বিষয় দুইটি (علم المعانى والبيان) উদ্ভাবন করা হইয়াছে, সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা যাহা ধারণ করিতে সক্ষম, তাহা কি করিয়া অন্যান্য বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব পাইতে পারে ? 'আব্‌দু'ল-কাহির ও তাঁহার অনুবর্তী আস-সাক্‌কাকী কর্তৃক উদ্‌ভাবিত কিছু পরিভাষা মানুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তাফ্‌সীর তো আখ্‌বার [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছ ও সাহাবা—তাবি'ঈনের মতামত]-এর ভিত্তিতেই নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

হাজ্জী খালীফা, আয-যামাখ্‌শারী ও আল-বাল্‌কীনীর দ্বিবিধ মতের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, বস্তুত তাঁহাদের মতদ্বৈততার প্রসঙ্গ এক নহে। আয-যামাখ্‌শারী হাদীছ ও আছার (সাহাবা ও তাবি'ঈনের মতামত)-এর দ্বারা তাফ্‌সীর সম্পাদনাকে অস্বীকার করেন নাই। বরং তাঁহার উদ্দেশ্য হইল যে, আয়াত হইতে সূক্ষ্ম রহস্য উদ্‌ঘাটন করা, ইহার ঐ সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্ম উদ্ধার করা যাহা চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে আকর্ষিত করে এবং আল-কুরআনে কী কী প্রকারের বর্ণনা রীতি আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা। তাফসীরের এই অতিরিক্ত বিষয়গুলি একমাত্র ঐ ব্যক্তিই নিষ্পন্ন করিতে পারে যে ব্যক্তি এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। কেননা প্রতিটি বিষয়ের কিছু নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম আছে। একটি বিষয়কে অন্য বিষয়ের নীতিমালা দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। ফাকীহ ও মুতাকাল্লিম বালাগাতের রহস্য সুধা কী করিয়া আহরণ করিবে ? নাহবী (ব্যাকরণবিদ) ও লুগাবী (ভাষাবিদ)-এর তো ঐ একই অবস্থা। সাহাবাদের ব্যাপার ছিল ভিন্ন। কেননা তাঁহারা স্বভাবজাত যোগ্যতা দ্বারাই বালাগাতের রহস্য-কথা আয়ত্ত করিতে পারিতেন, যেমন পারিতেন ব্যাকরণতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে। এই দুইটি বিষয়ের জন্য তাঁহাদের নীতি-নিয়ম বর্ণনার প্রয়োজন হইত না। কেননা তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহাদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে সেই স্বভাবজাত গুণ ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। কাজেই ইহার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক হইয়া পড়ে। পূর্ববর্তিগণ স্বভাবজাত যোগ্যতা দ্বারা যাহা আয়ত্ত করিয়া লইতেন, আজ তাহা উদ্ভাবিত নীতিমালার অবলম্বনেই আয়ত্ত করিতে হয়। সুতরাং 'ইলমু'ল-মা'আনী ও বায়ানের ব্যাপার 'ইল্‌মু'ল-ই'রাবেরই অনুরূপ।

সাহিত্যের প্রতি আয-যামাখ্‌শারীর অত্যধিক ঝোঁক ও তাঁহার গোঁড়া ই'তিযালী মতাদর্শ স্বভাবতই আল-কাশ্‌শাফের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফলত উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাথে এই গ্রন্থে নানা বিচ্যুতিরও সমন্বয় ঘটিয়াছে। পরবর্তী মুহাক্কিকগণ সেইসব ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে আশ-শায়খ হায়দার আল-হারাবীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আয-যামাখশারী যেহেতু সাহিত্যসুলভ মনোভাব লইয়া পথ চলিয়াছেন এবং এই দিকের পরিমার্জনার দিকেই তিনি অধিক যত্নবান ছিলেন, সেই অবকাশে তাঁহার মাঝে সাহিত্য-বৃত্তি শিকড় গাড়িয়াছে। আর মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে তিনি গুণীদের শুভদৃষ্টি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার গ্রন্থে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যাহা গ্রন্থের ঔজ্জ্বল্য ম্লান করিয়া দিয়াছে। ফলে ইহার পরিচ্ছন্ন গতি পথ পরিচ্ছন্ন থাকে নাই এবং ইহার প্রশস্ত প্রবেশ পথ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে গ্রন্থের বিচ্যুতিগুলি সংক্ষেপে তুলিয়া ধরা হইল ঃ

(ক) এই গ্রন্থে মু'তাযিলী চিন্তাধারা প্রমাণের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। মু'তাযিলাগণ নিজেদের আস্‌-হাবু'ল-'আদ্‌ল ওয়া'ত-তাওহীদ (ন্যায় ও একত্বের অনুসারী) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, এই মতের অনুসারিগণই সত্যিকারের ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহারা এই মতের অনুসারী নহে তাহাদের দীন আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। তাহারা আখিরাতে মুক্তি পাইবে না। সুতরাং

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনও ইলাহ নাই। ফেরেশ্‌তাগণ ও জ্ঞানিগণও ; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোনও ইলাহ নাই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৩ ঃ ১৮)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, 'জ্ঞানিগণ' দ্বারা কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে ? কাহাদের এত মর্যাদা যে, আল্লাহ্ স্বীয় একত্ব ও ন্যায়ের সাক্ষ্যে তাহাদিগকে নিজের এবং ফেরেশ্‌তাদিগের সহিত একত্রে উল্লেখ করিলেন ? আমি বলিব যে, তাঁহারা ঐসব লোক যাঁহারা আল্লাহ্‌র একত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেন। বস্তুত তাঁহারাই হইলেন আল'-আদল ওয়া'ত-তাওহীদের 'উলামা'। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, পরবর্তী আয়াত اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই একমাত্র দীন" (৩ঃ১৯) এই আয়াতের বিষয়বস্তুকে এত দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপন করা হইল কেন ? আমি বলিব যে, পূর্বের আয়াতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনও ইলাহ নাই) হইল তাওহীদ (একত্বের সাক্ষ্য) এবং قَآئِمًا بِالْقِسْطِ (ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত) হইল তা'দীল (তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ঘোষণা)। ইহার অব্যবহিত পরে "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই একমাত্র দীন" এই কথা দ্বারা যেন ঘোষণা দেওয়া হইল যে, আল-'আদল ওয়াত-তাওহীদই হইল ইসলাম। ইহাই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহার নিকট দীন নহে। সুতরাং যে কেহ তাশ্‌বীহে বিশ্বাস করিবে (মানুষের মধ্যে যেইসব গুণাবলী আছে, যথা ঃ দর্শন, শ্রবণ, কথন ইত্যাদি আল্লাহ্‌র মধ্যেও আছে বলিয়া জানিবে) অথবা এমন কোনও কথা বলিবে যাহা তাশবীহে পৌঁছায়, যেমন আল্লাহ্‌কে দেখা যাইবে বলিয়া ধারণা করিবে, এমনিভাবে যাহারা আল-জাব্‌র (الجبر। অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের ভাল-মন্দ সকল কাজের স্রষ্টা—মানুষ স্বয়ং তাহার কর্মের স্রষ্টা নহে ; সব কিছু তাক্‌দীর দ্বারা পরিচালিত হয় ইত্যাদি)-এর আকীদা পোষণ করিবে যাহা নিছক জুলুম বৈকি—তাহারা আল্লাহ্‌র দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না।

আল-কুরআনের কোনও আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যদি মু'তাযিলা চিন্তাধারার সমর্থনে না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য মু'তাযিলার ন্যায় আ'য-যামাখশারীও বাহ্যিক অর্থ বর্জন করত কোনও রূপক অর্থের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাহা তাঁহার 'আকীদার অনুকূলে হয়। হায়দার আল-হারাবী বলেন, "ইহা নিঃসন্দেহে আল-কুরআনের তাহ্‌রীফ। যদি তিনি প্রয়োজন পরিমাণ লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন তবুও কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস হইল এইরূপ স্থানে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করা, যাহাতে পাঠকের কাছে কোনরূপ দুর্বলতা ধরা না পড়ে।... তাঁহার এই ভ্রান্তি একমাত্র বিদগ্ধজন ব্যতীত অন্য কেহ ধরিতে সক্ষম হয় না। বলা বাহুল্য ইহা একটি

মহাবিপদ। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হইতে দূরে সরিয়া রূপক অর্থ গ্রহণের একটি উদাহরণ এই,

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন কোনও কোনও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে" (৭৫ ঃ ২২, ২৩)। ناظرة (তাকাইয়া থাকিবে) দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আখিরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করিবে। ইহাই আহ্‌লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা। কিন্তু মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হিসাবে ইহা তাওহীদের পরিপন্থী। তাহাদের মতে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন সম্ভব নয়। সুতরাং আল-কাশ্শাফ গ্রন্থে ناظرة অর্থ করা হইয়াছে আশা-আকাঙ্ক্ষা (التوقع والرجاء)। মর্ম হইল যে, তাহারা আল্লাহ্র দিকেই তাকাইবে অন্য কাহারও দিকে নহে... অর্থাৎ অনুগ্রহ ও দয়ার আশা আল্লাহ্রই কাছে করিবে। যেমন পার্থিব জীবনে আল্লাহ্কেই ভয় করিত এবং তাহারই নিকট যাঞ্চা করিত।

(খ) এই গ্রন্থে আহ্‌লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করা হইয়াছে। তাহাদিগকে অশালীন উক্তির সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-হারাবীর ভাষায়, "যাহা মূর্খ ব্যতীত কোনও 'আলিমের কাজ হইতে পারে না।" কোনও আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনওরূপ সুযোগ আসিলে আয-যামাখশারী সেখানে তাহাদের উপর ক্ষণিক রোষানল নিক্ষেপ না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন নাই। তাহাদিগকে আল-হাশাবিয়্যা (দ্র.) আল-জাবারিয়্যা (দ্র.), আল-কাদ্‌রিয়্যা (দ্র.) আল-মুশাব্বিহা (দ্র.) বিভিন্ন নামে ভূষিত করা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ

"আর ছামূদ জাতি—আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা হিদায়াতের উপর পথভ্রষ্টতাকেই পসন্দ করিল। ফলে তাহাদিগকে মহানাদ শাস্তি আঘাত হানিল" (৪১ ঃ ১৭)। এই আয়াতের আলোকে প্রমাণ করার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কাদ্‌র-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই হইল আল-কাদ্‌রিয়্যা (القدرية)। যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ القدرية مجوس هذه الامة "কাদ্‌রিয়্যা সম্প্রদায় এই উম্মাতের অগ্নিপূজক।" রাসূলুল্লাহ্ (স) এই হাদীছ দ্বারা কাদ্‌রিয়্যাদের নিন্দা না করিলেও উল্লিখিত আয়াতটিই তাহাদের নিন্দার জন্য যথেষ্ট।

(গ) আওলিয়া'-ই কিরাম সম্পর্কেও এই গ্রন্থে অত্যন্ত অশোভনীয় মন্তব্য করা হইয়াছে। আর-রাযী يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারাও আল্লাহ্কে ভালবাসে) আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, আল-কাশ্শাফ প্রণেতা এই স্থানে আল্লাহ্র ওয়ালীগণের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য লিখিয়াছেন যাহা কোনও বুদ্ধিমান অশালীন পুস্তকে পর্যন্ত উল্লেখ করিতে সমীচীন মনে করে না।

(ঘ) এমন কি নিম্নের আয়াত দুইটির ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শানেও অসৌজন্যমূলক উক্তি করা হইয়াছে ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ

"আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে" (৯ ঃ ৪৩)?

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তাহা তুমি নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদিগের সন্তুষ্টি চাহিতেছ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৬৬ ঃ ১)।

(ঙ) ইহাতে এমন অনেক কবিতা ও প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে যাহার ভিত্তি নিছক হাস্য-রসের উপর। আল-কুরআনের তাফ্‌সীরের জন্য যাহা আদৌ শোভনীয় নহে।

আয-যামাখশারী ফিক্‌হী মাস্'আলায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-র অনুসারী ছিলেন। তবে আল-কাশ্শাফে এই সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন। পক্ষে-বিপক্ষে উভয় দিকের দলীল-প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। কাহারও সম্পর্কে কোনওরূপ কটূক্তি করেন নাই। উদাহরণত এই সম্পর্কিত একটি আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করা হইল ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ-

"লোকেরা তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, উহা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করিবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করিবে না। অতএব তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন" (২ ঃ ২২২)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আয-যামাখশারী বলেন, ফুকাহা-ই কিরামের মধ্যে ই'তিযাল (সঙ্গ বর্জন) সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) ইযার (নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র) দ্বারা আবৃত অংশ হইতে দূরে থাকা জরুরী মনে করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) শুধু যৌনাঙ্গের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ আরোপ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আ'ইশা (রা)-র হাদীছে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 'উমার (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পুরুষ কি তাহার স্ত্রী রজঃস্রাবকালে সঙ্গম করিতে পারে? তিনি বলিলেন ঃ সে তাহার নিম্নাঙ্গে ইযার পরিধান করিবে। অতঃপর পুরুষ ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত মিলিতে পারে। তাহা ছাড়া যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রীর রজঃস্রাবকালে আমি তাহার সহিত কি করিতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন, সে তাহার নিম্নাঙ্গে ইযার পরিধান করিবে। অতঃপর তুমি তাহার ঊর্ধ্বাঙ্গে যাহা ইচ্ছা করিতে পার। অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইহাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। তবে 'আ'ইশা (রা) হইতে ইহার তুলনায় শিথিল মতও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, স্রাবস্থল পরিহার করত অন্য যে কোনও স্থান ব্যবহার করা যাইতে পারে। يطهر শব্দটি তাশদীদ (يطهرن) ও তাখফীফ (يطهرن) উভয়ভাবেই পড়া যায়। প্রথম কিরাআতে ইহার অর্থ গোসল করা। দ্বিতীয় কিরাআতে ইহার অর্থ স্রাব বন্ধ হওয়া (انقطاع لدم)। উভয় কিরাআতই আমলকে আবশ্যক করে। আবূ হানীফা (র) দুই কিরাআতকে দুই অবস্থার উপর গ্রহণ করিয়াছেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে রজঃস্রাব বন্ধ হইলে সে অবস্থায় তাশদীদের কিরাআত গ্রহণ করেন (অর্থাৎ গোসল করিতে হইবে ; স্রাব বন্ধ হওয়া যথেষ্ট নহে)। আর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর স্রাব বন্ধ হইলে তাখ্‌ফীফের কিরাআত গ্রহণ করেন (অর্থাৎ গোসলের প্রয়োজন নাই ; রক্ত বন্ধ হওয়াই যথেষ্ট)। ইমাম শাফি'ঈ (র) উভয়

কিরাআতের সমন্বয়ে বলেন যে, রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল করিতে হইবে। ইহার পূর্বে স্ত্রীগমন বৈধ নহে। পরবর্তী يطهرون দ্বারাও এই কথা স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

আল-কাশ্‌শাফে ইস্‌রা'ঈলী রিওয়ায়াত স্বল্পই স্থান পাইয়াছে। কদাচিৎ যেসব রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে হয়ত روى (বর্ণিত হইয়াছে) শব্দ যোগ করা হইয়াছে। ইহা বর্ণনার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে অথবা ইহার সত্য-মিথ্যার জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে—যদি তাহা এমন বিষয়ভুক্ত হয় যে, উহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সহিত দীনের কোনও সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে যাহার সহিত দীনের কোনও রূপ সম্পর্ক আছে, তাহা উল্লেখ করার পর তিনি উহার শুদ্ধ-অশুদ্ধ সম্পর্কেও আলোকপাত করিয়াছেন।

আল-কাশ্‌শাফের দুনিয়া জোড়া খ্যাতির কারণে মুহাক্কিক 'আলিমগণ ইহার উপরে বিভিন্নরূপে কলম ধরিয়াছেন। কেহ ইহার ই'তিযাল সম্পর্কিত বিষয়গুলি সনাক্ত করিয়াছেন। কেহ ইহার ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে লড়াই করিয়াছে। অনেকে টীকা লিখিয়াছেন। অনেকে ইহাতে বর্ণিত হাদীছগুলি সনদসহ সংকলন করিয়াছেন। আবার কেহ ইহার সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন। নিম্নে এইরূপ রচনাবলীর তালিকা পেশ করা হইল।

(১) নাসীরু'দ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নি'ল-মুনায়্যির আল-ইস্‌কান্দারী আল-মালিকী (মৃ. ৬৮৩/১২৮৪), আল-ইন্‌তিসাফ মিনা'ল-কাশ্‌শাফ—ইহা আল-কাশ্‌শাফের ভ্রান্তি খণ্ডনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। قال احمد দ্বারা তিনি ইহাতে আলোচনা আরম্ভ করেন। কখনও আয-যামাখ্‌শারীর কথা একাধারে নকল করিতে থাকেন। একদিকে তিনি যেমন ই'তিযালের খণ্ডন ও 'উলূমু'ল-ই'রাব সম্পর্কে দ্বিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ উক্ত গ্রন্থের ও গ্রন্থাকারের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করিয়াছেন। যেমন সূরা আল-আন্'আম-এর ৯১নং আয়াতের তাফসীরে আয-যামাখ্‌শারীর মত খণ্ডনের পর মন্তব্য করেন, ইহাও আল-কুরআনে তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটনে গভীর অভিজ্ঞানের দলীল। (২) 'আলামু'দ-দীন 'আবদু'ল-কারীম ইব্‌ন 'আলী আল-'ইরাকী (মৃ. ৭০৪ হি.), আল-ইন্‌সাফ, ইহাতে আল-কাশ্‌শাফ ও আল-ইন্‌তিসাফ-এর মধ্যে মীমাংসামূলক আলোচনা করা হইয়াছে ; (৩) জামালু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ৭৬২ হি.), তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়কে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করিয়াছেন। উল্লিখিত ৩ খানি গ্রন্থ ছাড়াও অনেকে উহার টীকা লিখিয়াছেন, যেমন (৪) কুত্‌বু'দ-দীন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মাস্'উদ আশ-শীরাযী (মৃ. ৭১০ হি.) ; তিনি দুই খণ্ডে আল-কাশ্‌শাফের টীকা রচনা করিয়াছেন; (৫) ফাখ্‌রু'দ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাসান আল-জারবারদী (মৃ. ৭৪৬ হি.), (৬) শারাফু'দ-দীন আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত-তীবী (মৃ. ৭৪৩ হি.), তিনি ফুতূহু'ল-গায়ব ফি'ল-কাশফ 'আন কানা'ই'র-রায়ব নামে ছয় খণ্ডসংবলিত বৃহদাকারের ভাষ্য লিখিয়াছেন। আল-কাশ্‌শাফের ইহাই সর্বোত্তম ভাষ্য ; (৭) আক্‌মালু'দ-দীন মাহ্‌মূদ আল-বারারতী (মৃ. ৭৮৬ হি.) ; (৮) সা'দু'দ-দীন মাস্'উদ ইব্‌ন 'উমার আত-তাফ্‌তাযানী (মৃ. ৭৯২ হি.), তিনি আত-তীবী রচিত ভাষ্যের সারসংক্ষেপ লেখেন। কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। সূরা আল-ফাত্‌হ পর্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হন ; (৯) কুত্‌বুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত-তাহ্‌তানী আর-রাযী (মৃ. ৭৬৬ হি.)। ইহা ব্যতীত আরও অনেকে ভাষ্য এবং ভাষ্যের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন যাহা আস-সুয়ূতী ও হাজ্জী খালীফা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে আল-কাশ্‌শাফের কোনও কোনও স্থানে কিছু অংশ সংযোজন করিয়াছেন, যেমন (১০) কামালু'দ-দীন ইস্‌মা'ঈল আল-কির্‌মানী ; (১১) শামসু'দ-দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (=ইব্‌ন কামাল বাশা আল-মুফ্‌তী) (মৃ. ৯৪০ হি.), তৎকৃত সংযোজন অতি উচ্চমানের ; (১২) আল-মাওলা মাহ্‌দী আশ-শীরাযী (মৃ. ৯৫৬ হি.) ; অনেকে ইহাকে সংক্ষিপ্তাকারে (مختصر) সংকলন করিয়াছেন, যেমন (১৩) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-আন্‌সারী (মৃ. ৬৬২ হি.), তিনি ইহাকে ই'তিযাল হইতে মুক্ত করিয়াছেন; (১৪) কুত্‌বু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাস্'উদ ইব্‌ন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন আবি'ল-ফাত্‌হ আস-সাররাফী, তাক্‌রীবু'ত-তাফ্‌সীর ; (১৫) আল-কাদী নাসিরু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার আল-বায়দাবী (মৃ. ৬৯২ হি.), আন্‌ওয়ারু'ত-তান্‌যীল, ইহা আল-কাশ্‌শাফের সর্বোৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ। ইহাতে তিনি ই'তিযালকে খণ্ডন করত অতিরিক্ত অনেক তত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন। মোটকথা একখানি বৈশিষ্ট্যময় তাফ্‌সীর গ্রন্থ হিসাবে ইহা জগদ্বিখ্যাত ; অনেকে ইহার হাদীছসমূহ সংকরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ; (১৭) জামালু'দ-দীন 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন য়ূসুফ আয-যায়লা'ঈ আল-হানাফী (মৃ. ৭৬২ হি.), ইহার সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন ; (১৮) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-কাফি'শ-শাফী ফী তাখ্‌রীজি আহাদীছি'ল-কাশ্‌শাফ। ইহা ছাড়া আল-কাশ্‌শাফে উল্লিখিত কবিতা, প্রবাদ, ইহার ভূমিকা ইত্যাদির উপরও অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ হুসায়ন আয-যাহাবী, মিসর ১৩৯৬/১৯৭৬, ১খ, ৪২৯—৪৮২; (২) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ ; (৩) ইব্‌ন খাল্‌দূন, আল-মুকাদ্দিমা; (৪) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৪খ, ১২০; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, বৈরূত ১৩৯৭/১৯৭৭, ৫খ, ১৭০ ; (৬) হাজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, বৈরূত ১৪০২/১৯৮২, ১৪৭৫-১৪৮৪ ; (৭) দা.মা.ই., ১০খ, ৪৮৭-৯২ ; (৮) স.ই.বি., ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., ২খ, ২৮৬-৭।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাশ্‌শী (الكشى) ঃ আবূ 'আম্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয, ইমামী হাদীছবেত্তা, ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। তিনি অন্যতম মৌলিক একখানি ইমামী রিজাল গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে ইমামগণ হইতে বর্ণিত হাদীছসমূহের বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা। জীবনী গ্রন্থসমূহে তাঁহার জন্মস্থান বিশেষভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও উহা নিঃসন্দেহে ট্রান্স অক্সানিয়ার কিশ্‌শ বলিয়া নির্ধারণ করা যায় (দ্র. কাশ)। কেননা যেই সকল রাবীর নিকট হইতে তিনি হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ট্রান্স অক্সানিয়ার এই শহর বা নিকটবর্তী কোনও শহর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অতএব তাঁহার সঠিক নিস্‌বা হওয়া উচিত আল-কিশ্‌শী, যদিও পরবর্তীকালে শহরটির নামের অপেক্ষাকৃত অশুদ্ধ উচ্চারণ কাশ্‌শ-এর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহার নিস্‌বা পাঠ করা হয় আল-কাশ্‌শী। তিনি সামারকান্দে পড়াশুনা করেন। সেইখানে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন সুবিখ্যাত ইমামী 'আলিম এবং ৪র্থ/১০ম শতকের গোড়ার দিকে ট্রান্স অক্সানিয়াতে ইমামী মতবাদের প্রচারক মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাস্'উদ আল-'আয়্যাশী। এইরূপও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ইরাক সফর

করিয়াছিলেন। তিনি সরাসরি কতিপয় পশ্চিম পারস্য ও ইরাকী রাবীর নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বাগদাদের কয়েকজন ইমামী 'আলিম তাঁহার গ্রন্থখানা কোনও ব্যক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁহার নিকট হইতে সরাসরি বর্ণনা করিয়াছেন।

শিক্ষক আল-'আয়্যাশীর ন্যায় আল-কাশ্শীও পরবর্তী কালে ইমামী পণ্ডিতগণ কর্তৃক দুর্বল রাবীগণের (ضعفاء) ও অ-শী'আগণের (عامة) বর্ণনার উপরে নির্ভর করিবার অভিযোগে সমালোচিত হন। তাঁহার কিতাব মা'রিফাতু'ন-নাকিলীন 'আনি'ল-আ'ইম্মাতি'স-সাদিকীন (كتاب معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين), অন্যান্য রিজাল গ্রন্থ হইতে ভিন্নতর এই কারণে যে, ইহাতে পূর্বেকার সূত্রসমূহের রাবীগণের জীবনীর বর্ণনার ও তাঁহাদের ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থখানা সংক্ষেপিত ও বিশোধিতরূপে প্রকাশ করেন শায়খু'ত-তা'ইফা আবূ জা'ফার আত'-তূসী (মৃ. ৪৬০/১০৬৭)। গ্রন্থখানার এই সংক্ষেপিত সংস্করণই বর্তমানে পাওয়া যায়। শায়খ আত-তূসীর কিতাবু'র-রিজাল, কিতাব ফিহ্ইরস্ত কুতুবি'শ-শী'আ এবং আন-নাজাশীর কিতাবু'র-রিজাল সমবায়ে এই গ্রন্থখানা চারটি মৌলিক ইমামী রিজাল গ্রন্থের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তূসী, ফিহ্রিস্ত কুতুবি'শ-শী'আ, সম্পা. Sprenger, 'আবদু'ল-হাক্ক ও গুলাম কাদির, কলিকাতা ১৮৫৫ খৃ., পৃ. ৩০৯ ; (২) ঐ লেখক, আর-রিজাল, সম্পা. মুহাম্মাদ সাদিক আল-বাহ্রু'ল-'উলূম, আন-নাজাফ ১৩৮১/১৯৬১, পৃ. ৪৯৭ ; (৩) আন-নাজাশী, আর-রিজাল, তেহরান, তা. বি., পৃ. ২৮৮ ; (৪) ইব্ন শাহ্রাশূব, মা'আলিমু'ল-'উলামা', সম্পা. 'আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৩৫৩ হি., পৃ. ৯০-১; (৫) ইখতিয়ার মা'রিফাতি'র-রিজাল আল-মা'রূফ বি-রিজালি'ল-কাশ্শী সম্পা. হাসান আল-মুস্তাফাবী, মাশ্হাদ ১৩৪৮ হি. (সমালোচনামূলক সংস্করণ)।

W. Madelung (E.I.²)/হুমায়ুন খান

কাশাদ আল-জুহানী (كشد الجهني) ঃ (রা) সাহাবী। তিনি জুহায়না গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মালিক বলিয়া অনুমিত হয়। বদ্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরায়শ দলপতি আবূ সুফ্য়ানের গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর সংগ্রহের জন্য মহানবী (স) তাল্হা ইব্ন 'উবায়দিল্লা (রা) ও সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আম্র ইব্ন নুফায়ল (রা)-কে প্রেরণ করিলে তাঁহারা কাশাদ (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার দর্শন লাভ করেন। ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের রচিত সাহাবীদের জীবনী সংকলন গ্রন্থে এবং 'উমার ইব্ন শিববাহা তাঁহার "আখ্বারু'ল-মাদীনা গ্রন্থে তাঁহার আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (২) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৯৪, সংখ্যা ৭৪০৪ ; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা. বি., ২খ, ১১; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ২৪০।

লিয়াকত আলী

কাশান (كاشان) ঃ (কাসান, কাশান, ৩৩°৫৯' উত্তর অক্ষাংশ, ৫১°২৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ), মধ্য ইরানের প্রাচীন উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী অক্ষীয় (axial) বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত, জিবাল-এর একটি শহর; মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশের (উস্তান-ই মারকাযী) একটি শাহ্রিস্তান-এর প্রধান শহর, উত্তর-পূর্ব পূর্বদিকে অবস্থিত দাশ্ত-ই কাবীর-এর সহিত সংলগ্ন একটি মরূদ্যান। ইহার নামানুসারে কাশান নামে পরিচিত, মধ্য ইরানের কেন্দ্রীয় পর্বতমালা (৩৯০০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন, কুহ্-ই কার্কাস) প্রতিবন্ধকতা (buffer)-স্বরূপ শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা রুদ্ধ করে। উচ্চতায় (৯৪৫ মিটার) অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শহরটির আবহাওয়া উষ্ণ (১৮৮১-৪ সালের পর্যবেক্ষণমতে জুলাই মাসের গড় ৩৮° সেন্টিগ্রেড); বৃশ্চিকপূর্ণ বলিয়া শহরটির কুখ্যাতি আছে এবং পানি সরবরাহ অপ্রতুল। শহরটির পানি সরবরাহ হইতেছে 'ফীন'-এর সাংবাৎসরিক ঝর্ণাধারা হইতে এবং বহু যুগ অবধি চালু কানাত (قنات = সচল খাল) এবং আব্ আন্বার (জলাধার)-সমূহের মাধ্যমে ; মহান শাহ 'আব্বাস কর্তৃক নির্মিত 'কুরূদ' বাঁধ (dam) হইতেও পানি সরবরাহ হইত ; একইভাবে সাফাবী আমল হইতে শুরু করিয়া ১৯৫৮ সালের বন্যা পর্যন্ত 'কামসার' বাঁধ সেচের ব্যবস্থা করিত। বর্তমানে গভীর নলকূপ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়াতে শহরের পানীয় ও সেচের পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কারুনৈপুণ্য ও বস্ত্রশিল্পের কথা বাদ দিলেও শহরটি ইহার প্রকৃতিগত পণ্যসমূহের জন্য বিখ্যাত (যথা ঃ ফীন-এর ডুমুর ও ডালিম, কাম্সার-এর গোলাপ পানি, তরমুজ, আঙ্গুর ইত্যাদি)।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম নির্গমন পথে অবস্থিত Tepe Sialk/Sialge-এর অবস্থান সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালে এই মরূদ্যানে জনবসতি ছিল (খৃ. পূ. ৫ম হইতে ৩য় শতাব্দীর মধ্যে তিনটি যুগ ; আনুমানিক খৃ. পূ. ৮ম শতাব্দীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র ইন্দোয়ূরোপীয় 'রাষ্ট্র'; ফ্রান্সের Louvre Museum ও তেহরান যাদুঘরে রক্ষিত দ্রব্যাদি, দ্র. R. Ghirshman, Fouilles de Sialk, i-ii, প্যারিস ১৯৩৮-৯ খৃ. ; ঐ লেখক, l'Iran des origines a l'Islam, প্যারিস ১৯৫১ খৃ.)। এলাকাটি সাসানী আমলের স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ (Niyastar/Niyasar ও Natanz-এর চাহার তাক)। যদিও ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর পূর্বে কাসান/কাশান-এর নামের সত্যায়ন সম্ভব হয় নাই এবং ইহার উৎপত্তি অদ্যাবধি অনির্ণিত রহিয়াছে, তবুও সাসানী শহরটির গুরুত্ব প্রমাণিত, বিশেষত আরব আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য (বৃশ্চিক কাহিনীর জন্য দ্র. আল-মুকাদ্‌দাসী, ৩৯০) সাসানী সেনাবাহিনীতে এই শহর সৈন্য সরবরাহ করিত দ্র. H. Naraki, তা'রীখ-ই ইজতিমা'ঈ, ২৮ ; কাশান ত্যাগ করিয়া ম্যাগীয় রাজাগণের জেরুসালেম অভিমুখে গমন সংক্রান্ত কিংবদন্তী প্রাচীন কাল হইতেই সম্প্রসারিত হইয়াছিল (দ্র. Monneret de Villard, Le leggende orientali sui magi evangelici, ভ্যাটিক্যান ১৯৫২ খৃ., ৮৩ প. ও নির্ঘন্টে দ্র. কাসান)। বিভিন্ন গ্রন্থকারের মতে ইসলামী শহরটি প্রতিষ্ঠা (অথবা সুরক্ষিত) করেন হারূন'র-রাশীদের স্ত্রী যুবায়দা খাতূন ; অতঃপর ইমামী শী'ঈগণ শহরটি দখল করে। তাহারা দায়লামী আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য একটি সুরক্ষিত বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে বলিয়া কথিত আছে (দ্র. মির'আত-ই কাশান, ৬-৭)। পরবর্তীকালে ইহা সংযুক্ত হয় ইস্ফাহান-এর গভর্নরের এলাকার সঙ্গে। অতঃপর কুম্ম-এর সহিত একত্রে ইহা একটি স্বতন্ত্র গভর্নরের প্রদেশের অথবা কোনও কোনও সময়ে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রদেশের রূপ গ্রহণ করে। সালজূক আমল হইতেই শহরটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কারণ ছিল এই শহরের মাদ্রাসাসমূহ, জ্ঞানিগণ, লিপিকার

(Calligrapher)-গণ, দক্ষ প্রশাসকগণ [যাহারা কাশী, কাশানী, ফীনী বাওয়ানৃদী ইত্যাদি আখ্যায় (নিসবা) পরিচিত ছিল] এবং ইহার চীনা মাটির চকচকে (glazed) তৈজসপত্র (হাফত রান্‌গ অথবা মিনা'ঈ)-এর জন্যও সমভাবে সুপরিচিত ছিল। ঈলখানী, তীমূরী ও তুর্কোমানী আক্রমণের সময়ে ইহা অধিকতর অক্ষত থাকে এবং উহারা সকলেই শহরের কারু-শিল্পিগণের (মৃৎপাত্র, পিতলশিল্প, বস্ত্রশিল্প) দক্ষতায় লাভবান হয়। সাফাবীদের আমলে এই শহর সর্বাধিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। ১০ম/১৬শ শতকে ইসলামী ইরানের প্রকৃত সাংস্কৃতিক রাজধানীরূপে ইহা শাহ 'আব্বাস এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের আনুকূল্য লাভ করে। তাঁহারা একটি প্রাসাদ, বিভিন্ন বাগান, রাজপথ ও আবৃত বাজারাদি নির্মাণের মাধ্যমে ইহাকে সুসজ্জিত করেন। ১৫২৪ খৃ. ৪০০০ হইতে ৫০০০ (hearlh) গৃহস্থালী (Tenreiro) হইতে ১৫৬৫ খৃ. গৃহস্থালীর সংখ্যা ৫০০০ হইতে ৬০০০-তে (Mestre Afonbo) উন্নীত হয় এবং Chrrdin-এর গণনায় ১৬৭৩ সালে এই সংখ্যা ৬৫০০-তে দাঁড়ায় (প্রতি গৃহে ৫ হইতে ৬জন সদস্য)। এই সময়ে শহরটি সুপ্রসিদ্ধ ছিল ইহার স্বর্ণ-কিংখাব (যার বাফ্‌ত, যারী), রেশম (সূতা ও বস্ত্র), ভেলভেট (মখমল), পশমী বা রেশমী গালিচা (কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত), রঞ্জন শিল্পী ও হস্তলিপিকারগণ, পণ্ডিত ও ধর্মতাত্ত্বিকবর্গ এবং সর্বোপরি ইসলামী বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত ইহার বিখ্যাত কাশী (দ্র.) ইত্যাদির জন্য। আফগান ও আফশারী শাসনের অধীনে নিপীড়িত এবং উহাদের হত্যাকাণ্ড ও করভারে জর্জরিত হইবার পর ১১৯২/১৭৭৯ সালে কারীম খান যান্দ-এর শাসনামলে এক ভূমিকম্পে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদিও কারীম খান ইহার পুনঃনির্মাণ এবং ফাত্‌হ 'আলী শাহ কাজার ইহার "সৌন্দর্য বর্ধন" করেন, তবুও সাম্প্রতিক কালেই শহরটি ইহার পূর্ব গৌরব আংশিকভাবে (বস্ত্রশিল্পের আধুনিকায়ন, সড়ক ও রেলপথের উন্নয়ন, তেহরান-যাহিদান রেলপথের সমাপ্তি) পুনরুদ্ধার করিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর মন্দার (depression) পর (১৯শ শতকের প্রারম্ভে আনুমানিক জনসংখ্যা ১৫,০০০) এই শহরে পুনরায় জনপদ গড়িয়া তোলা হয় (১৮৪০ খৃ. জনসংখ্যা আনু. ৩০,০০০ ও ১৯০৮ খৃ. আনু. ৫০,০০০)। তথাপি মরূদ্যান এলাকার ক্রমোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে ; প্রধান কারণ উত্তর-দক্ষিণগামী অক্ষরেখাসদৃশ (প্রধান) সড়কটিকে মধ্যাঞ্চলের পাহাড়শ্রেণী (Median chain)-র পশ্চিম পার্শ্বে স্থানান্তর করা হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃ.-র আদমশুমারীতে তেহরান অভিমুখে জনগণের দলবদ্ধ দেশত্যাগ (ezodus) প্রতিফলিত হয় (জনসংখ্যা আনু. ৪৬,০০০)। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীতে পরিস্থিতির কিছু উন্নতি লক্ষ করা যায়। (জনসংখ্যা ৫৮,৪৬৮)। শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি কাশী শাসকগণের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও তাহাদের কর্মচাঞ্চল্য এবং সর্বোপরি তাঁহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন বহুসংখ্যক গ্রন্থকার। সালজূকী আমল হইতে আহ্‌ল-ই বায়ত ও বার ইমামের প্রতি কাশীদের অনুরাগ (অর্থাৎ শী'আ মাযহাব) সাধারণভাবে সনাক্ত করা যায়। তথাপি শাহ ইসমা'ঈল কর্তৃক অধিকৃত হইবার সময়ে জিলার অধিকাংশ লোক ছিল সুন্নী ; শহরের অধিবাসীবর্গের মাযহাব কি ছিল তাহা নির্ধারণে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে (দ্র. B. Scarcia Amoretti, in AIUON (১৯৬০ খৃ.), ২৬৩-৮; M. Mazzaoui, The origins of the Safawids, Si'ism. Sufism and the Gulat, Wiesbaden, ১৯৭২ খৃ., ৩১, নং ৩)। শহরের যেই প্রাচীন য়াহূদী সম্প্রদায় নাদির শাহ-এর আমলে ইরানের য়াহূদীদের নিরাপদ আশ্রয়রূপে গণ্য ছিল, সেই সম্প্রদায় এখন ক্ষয়িষ্ণু (১৯০৭ খৃ. জনসংখ্যা ২০০০, ১৯৫৬ খৃ., ৫২৫)। ইরানের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় এই এলাকাতেও প্রকৃতপক্ষে কাজার শাসনামলের সমাপ্তি পর্যন্ত ধর্মীয় দলাদলি সমাজকে বহুধাবিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বারংবার লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শহরটি ইহার ঐতিহাসিক স্থাপত্য রূপ বহুলাংশে অটুট রাখিয়াছে। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সৌধসমূহের মধ্যে রহিয়াছে সালজূকী আমলের ৪৬৬/১০৭৪ সালে নির্মিত জুমু'আ মসজিদের মিনার, নিঃসঙ্গ যায়নু'দ-দীন মিনার, উচ্চতা ৪৭ মিটার, জালালী দুর্গের অবশেষ এবং দুর্গ সজ্জিত দ্বৈত বেষ্টনী প্রাচীরের অংশ বিশেষ, মঙ্গোল আমলের খাজা তাজু'দ-দীন-এর সমাধি-সৌধ (৮৬৭/১৪৬৩ সালে নির্মিত), মাসজিদ-ই মীর 'ইমাদ বা মাস্‌জিদ-ই মায়দান-ই ফায়দ (অধিকতর প্রাচীন একটি ভবনের উপর নির্মিত, যাহার ৬৩২/১২৩৫ সালে নির্মিত মিহরাবটি বার্লিন যাদুঘরে রক্ষিত)। সাফাবী আমলের স্থাপত্য কীর্তি, যথা ঃ ইমামযাদা হাবীব ইব্‌ন মূসার আশ্রয়ে স্থাপিত শাহ 'আব্বাস-এর সমাধি-সৌধ (৬৬৮/১২৭০-এর প্রাচীন সমাধি সৌধের মিহরাব তেহরান যাদুঘরে রক্ষিত) ; কাজার আমলের স্থাপত্য যথা মাদ্‌রাসা-ই সুলতানী বা মাসজিদ-ই শাহ্ আকা বুযুরগ (মসজিদ ও মাদ্‌রাসা), বর্তমান ফীন-এর বাগিচা-প্রাসাদ। বহুসংখ্যক ইমামযাদার মধ্যে এই শহরে রক্ষিত আছে উল্লেখযোগ্য শী'ঈ কবি মুহতাশাম কাশানী (মৃ. ৯৯৬/১৫৮৮) [দ্র.] ও শী'ঈ অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ (lheosophist) মুল্লা মুহ্‌সিন-ই ফায়দ কাশানী (মৃ. ১০৯১/১৬৮০) এতদুভয়ের মাযার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত আরব ভূগোলবিদগণের জন্য দ্র. (১) Schwarz, Iran, পু. মুদ্রণ Hildesheim, New York ১৯৬৯ খৃ., ৫৬৮-৭৬ ও নির্ঘণ্ট ; (২) Le Strange, ২০৯ ; (৩) Barbier de Meynard, Dict. de la Perse, ৪৩৪-৫। ফারসী ভাষায় উৎসসমূহ ঃ (৪) তা'রীখ-ই কুম, সম্পা. সায়্যিদ জালালু'দ-দীন তিহ্‌রানী, তেহরান ১৩১৩ শ., ৭৪ প. ও নির্ঘণ্ট ; (৫) হুদূদু'ল-'আলাম, অনু. Minorsky, ১৩৩ ; (৬) হামদুল্লাহ্ মুসতাওফী, নুযহা, ৬৭-৮ ও নির্ঘণ্ট ; (৭) আমীন আহ্‌মাদ রাযী, হাফ্‌ত ইক্‌লীম, সম্পা. জাওয়াদ ফাদিল, তেহরান, ২খ, ৪৪৫-৬ ; (৮) আবদু'ল-জালীল কাযবীনী রাযী, কিতাবু'ন-নাকদ, সম্পা মুহাদ্দিছ, তেহরান ১৩৩১ স., ১৬৮-৭০ ও নির্ঘণ্ট (কিলীদ-ই নাকদ, তেহরান ১৩৩৬ স.) ; (৯) মীযা 'আবদু'ল-কারীম দাররাবী, মির'আত-ই কাসান য়া তা'রীখ-ই কাশান, সম্পা ঈরাজ আফ্‌শার, তেহ্‌রান ১৩৪১ স.।

পর্যটকগণ ঃ (১০) A. Baiao, Itinerarios de India a Portugal po terra, Coimbra ১৯২৩ (Tenreiro), ২৩ ; (১১) Mestre Afonso, ১৬৪ ; (১২) Michele Membre, Relazione di Persia (১৫৪২), সম্পা. G. Scarcia ইত্যাদি, Naples ১৯৬৯ খৃ., ৫২; (১৩) T. Herbert, Some years travels...., লন্ডন ১৬৬৫ খৃ., ২৩২-৩ ; (১৪) Chardin, Voyages, সম্পা, Langles, প্যারিস ১৮১১ খৃ., ২খ, ৪৬১-৩, ৩খ, ১-১১ ; (১৫) Olivier, Voyage, প্যারিস ১৮০৭ খৃ., ৩খ, ৯৪-৭ ; (১৬) Ouseley, Travels, London ১৮১৯-২৩ খৃ., ৩খ, ৮৬-৯৪ ; (১৭) Morier, Second Journey, London ১৮১৮

খৃ., ১৬১-২ ; (১৮) Mme. Dieulafoy, La Perse, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ১৯১-২১২ ; (১৯) De Sercey, La Perse en ১৮৩৯-১৮৪০, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ২২৬-৯ ; (২০) Watson, A History of Persia, লন্ডন ১৮৬৬ খৃ., ১৩০-১ ; (২১) E. Aubin, La Perse d'aujourd'hui, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ২৬৩-৮।

গবেষণাসমূহ ঃ (২২) L. Lockhart, Persian Cities, London ১৯৬০ খৃ., ১২০-৬; (২৩) Minorsky, Calligraphers and Painters, Washington ১৯৫৯ খৃ., ৩০-১ ও নির্ঘণ্ট ; (২৪) ফারহাংগ-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান তেহরান, ৩খ, ২২২-৪ ; (২৫) এইচ নারাকী, তা'রীখ-ই ইজতিমা'ই কাশান, তেহরান ১৩৪৫ স ; (২৬) ঐ লেখক, আছার-ই তা'রীখী-ই শাহরিসতানহা-য়ি কাশান ওয়া নাতানয, তেহরান ১৩৪৮ স.।

J. Calmard (E. I.²)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাশানী (کاشانی) ঃ আয়াতুল্লাহ আবু'ল-কাসিম, একজন ইরানী মুজতাহিদ। তিনি ২য় মহাযুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দিকের ঘটনাবলীতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে জন্মগ্রহণকারী কাশানী বাল্যকালে নাজাফ-এ গমন করেন। সেখানে তিনি ইরানী সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতার পক্ষে সমর্থনদানকারী প্রসিদ্ধ মুজতাহিদগণের দুইজন, যথা ঃ মুহাম্মাদ কাজিম খুরাসানী ও মীর্‌যা হুসায়ন খালীলী তিহরানী-র নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইরাকে ব্রিটিশ শাসনের অধিকারের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ১৯১৯ খৃ. তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ; কিন্তু তিনি ইরানে পলায়ন করেন। রিদা শাহ-এর শাসনামলের সম্পূর্ণ সময়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার করিয়া চলেন। কিন্তু জার্মান চরদের সহিত কথিত যোগাযোগের দায়ে তিনি ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৪২ সালের জুন মাসে নির্বাসিত হন। ফিলিস্তীনে একটি য়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তেহরানের একটি সংগঠনের সহিত যুক্ত থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে ১৯৪৮ খৃ. তাঁহার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তৈলশিল্প জাতীয়করণের জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কাশানীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ড. মুহাম্মাদ মুসাদ্দিক-এর জাতীয় ফ্রন্টের পক্ষে গণ সমর্থনে প্রধান সংগঠকদের অন্যতম হিসাবে তিনি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাজলিস-এ তাঁহার নিজেরও কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি ছিলেন যাঁহাদিগকে মুজাহিদীন-ই ইসলাম নামে অভিহিত করা হইত। কাশানী ও মুসাদ্দিক-এর মধ্যে ব্যক্তিগত মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু মুসাদ্দিক শাসনের শেষ দিনগুলিতে প্রবল অধার্মিকতা দর্শনে কাশানী শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তিনি অতঃপর ১৯৫৩ সালের ১৯ আগস্ট-এ সংঘটিত রাজতন্ত্রের প্রতি-অনুগত বিদ্রোহকে সমর্থন দান করেন যাহা মুসাদ্দিককে শাসনক্ষমতা হইতে উৎখাত করে। কাশানীর অবশিষ্ট জীবনকাল ঘটনাবিহীন এবং ১৯৬২ খৃ. তাঁহার মৃত্যু সাধারণ্যের অগোচরে থাকিয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগা বুযুর্গ আত-তিহ্‌রানী, তাবাকাত আলামি'শ-শী'আ, নাজাফ ১৩৭৫/১৯৫৬, ১/১খ, ৭৫-৭৬ ; (২) L. P. Elwell-Sutton, Persian Oil " A Study in Power Politics, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৯৫-৬ ; (৩) Richard W. Cottam, Nationalism in Iran, পিটার্সবুর্গ ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৫২-৫ ; (৪) হামিদ আলগার, The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth Century Iran, in Saints, Scholars and Sufis, সম্পা. Nikki R. Keddie, Berkeley S Los Angeles ১৯৭২ খৃ., পৃ. ২৩১-৫৫।

H. Algar (E.I.²)/আবু মুহম্মদ

আল-কাশানী (القاشانى) ঃ আল-কাশী (القاشى), আবু'ল-আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন 'আলী তাঁহাকে ইব্‌ন বাবা অথবা বাবা বলিয়া ডাকা হইত। তিনি সালজূক যুগের একজন ইরানী গ্রন্থকার এবং পেশাগতভাবে নাদীম অর্থাৎ সমমনা অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। ইহা আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং তৎপরবর্তী শতাব্দীর প্রারম্ভিক সালগুলিতে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাগদাদে ইসমা'ঈল পাশা (ঈদাহু'ল-মাকনূম, ১খ, ৫৪৬) বর্ণনা করেন যে, তিনি ৫১০/১১১৬-৭ সালে ইনতিকাল করেন এবং ইহাকে য়াকূত যথার্থরূপে নিশ্চিতকরণকরত বলেন যে, তিনি Marw-তে ইনতিকাল করেন। একমাত্র সাম'আনী (আনসাব, প. ৮০-এ, ৪৩৭ বি) ও য়াকূত (বুলদান, সম্পা. বৈরূত, ১খ, ৪১২, ৪খ, ২৯৬-৭) তাঁহার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করিয়াছেন। অনুমিত হয় যে, তিনি তাঁহার মাতৃভূমি জিবাল-এ কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ সফর করেন এবং খুরাসান-এ সম্ভবত সালজূক আমীর সানজার-এর শাহী দরবারে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার রচিত একমাত্র বিদ্যমান গ্রন্থটি হইতেছে "কিতাব রা'স মালি'ন-নাদীম (كتاب رأس مال النديم) "অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের মূলধন"। বইটি যথাসম্ভব একজন অজ্ঞাতনামা পৃষ্ঠপোষক ও সানজার-এর রাজদরবারের একজন সভ্য আমীর ও রা'ঈস সা'দু'ল-মুলক আবু'ল-ফাতহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাহরাম-এর উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়। এই শৈল্পিক গ্রন্থটি সমরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ও গল্পকারদের জন্য উপযোগী বস্তুসম্ভারে পরিপূর্ণ এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব, ইব্‌ন কুতায়বা, কুশাজিম ও ছা'আলিবী-র ন্যায় প্রাচীন লেখকগণের উৎস হইতে প্রভূত সমৃদ্ধ হইয়াছে। যাহাই হউক, গাযনাবীদের সম্পর্কে সুদীর্ঘ অজানা ঐতিহাসিক তথ্যসংবলিত অধ্যায়টিতে মূল্যবান এবং একমাত্র প্রাপ্ত তথ্যাবলী রহিয়াছে [অনু. ও টীকা, Bosworth, The later Ghaznawids " splendour and decay (আগত)]। য়াকূত-এর মতে ইব্‌ন বাবাও শী'আ সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যে গ্রন্থটি যথাসম্ভব অবলুপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া (১) V. A. Hamdani, Some rare manuscripts in Istanbul, in JRAS (1938), ৫৬২-৩ ; (২) C. E. Bosworth, Early sources for the history of the first four Ghaznavid Sultans (977-1041), in IQ, ৭খ, (১৯৬৩ খৃ.), ১৭-১৮ ; (৩) GAL, I, 140, S. i, 586 (এই স্থলে ভুলবশত ইব্‌ন বানী বলা হইয়াছে); (৪) এম. এস. বাদাবী কর্তৃক রচিত কিতাব রা'স মালি'ন-নাদীম-এর মুখবন্ধসহ সমালোচনাপূর্ণ সম্পা. মানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, পি. এইচ. ডি. গবেষণা প্রবন্ধ, ১৯৭৫ খৃ. (অপ্রকাশিত)।

C. E. Bosworth (E.I.²)/মুহাম্মদ সায়ফুল ইসলাম

কাশানী (كاشانى) ঃ হাজ্জী মীরযা জানী, বাবী, ঐতিহাসিক, কাশান-এর একজন ব্যবসায়ী। তিনি তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে দুইজন

অর্থাৎ হাজ্জী মীরযা ইসমা'ঈল যাবীহ ও হাজ্জী মীরযা আহমাদ সহ মীরযা 'আলী মুহাম্মাদ বাব-এর প্রথম শ্রেণীর অনুসারী ছিলেন। ১৯৪৭ খৃ. যখন বাব-কে ইসফাহান হইতে মাকূ-র কারাগারে প্রেরণ করা হইতেছিল, তখন ঐ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার প্রহরীকে ঘুষ দিয়া দুই দিন ও দুই রাত্রের জন্য তাহাদের কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করে। এক বৎসর পর কাশানী, বাহা'উল্লাহ, সুবহ-ই আযাল ও বাব-এর অন্যান্য ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া মাযানদারান-র অন্তর্গত বারফুরূশ নামক স্থানে শায়খ তাবারসীর বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর হাতে বন্দী হইয়া কিছুদিনের জন্য আমুল-এ কারারুদ্ধ থাকেন। শেষে কাশান-এর দুইজন ব্যবসায়ী মুক্তিপণ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করে। "তাঁহাকে সর্বদা এক বিশেষ ধর্মীয় প্রেরণা ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত থাকিতে দেখা যায়।" "কখনও বারফুরূশ-এ, কখনও মাশহাদে এবং কখনও বা তেহরানে।" ৯ জুলাই, ১৮৫০ খৃ. বাব-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অতঃপর কাশানী দুই বৎসর যাবত বাবী আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় লিপ্ত থাকেন। তিনি এই কাজের জন্য যোগ্যও ছিলেন বটে। কেননা তিনি কেবল বাব-এর সঙ্গেই নয়, বরং সুবহ-ই আযাল, বাহা'উল্লাহ ও বাবী মতবাদের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং এই আন্দোলনের প্রথম আট বৎসরে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয় উহার সম্পর্কে তাঁহার বিস্তারিত ও সঠিক জ্ঞান ছিল। তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে [যাহার নাম তিনি রহস্যবাদের ভিত্তির উপরে, যাহা সহজে বোধগম্য নহে, "নুক-তাতু'ল-কাফ" (نقطة الكاف) রাখিয়াছেন] সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তিনি মামদূহ (যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে)-এর জন্য মাত্রাতিরিক্ত এবং প্রায় মূর্তিপূজার অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার উপরে নির্যাতন ও উৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে যে জিঘাংসা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দরুন উক্ত গ্রন্থ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যখন কাজার শাহ নাসিরু'দ-দীন এই নূতন ধর্মের অনুসারীদের প্রতিহত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন কাশানীকে শাহ 'আবদু'ল-'আযীম-এর খানকাহ হইতে—যাহা তেহরানের ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং যথায় তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, জোরপূর্বক বাহির করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। এইখানে তিনি বাহা'উল্লাহ্র সাথে একই কক্ষে থাকার সুযোগ লাভ করেন। ১৫সেপ্টেম্বর, ১৮৫২ খৃ. তাঁহাকে তাঁহার ১৭ জন স্বধর্মীয়দের সহিত তেহরানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কৌশলগত কারণে শাহ তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য বিভিন্ন দলের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন, যাহাতে স্বয়ং তিনি ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ প্রতিশোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত না হন। কাশানীকে আকা মাহ্দী মালিকু'ত-তুজ্জার-এর নিকট সোপর্দ করা হয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহাকে ধনুকের রশির সহিত বাঁধিয়া হত্যা করা হয়। অপর বর্ণনামতে শহরের ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে ইসমা'ঈল তেহরানে ইনতিকাল করেন এবং আহমাদ, যে বাব-এর মৃত্যুর পর সুবহ-ই আযালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত মানিয়া লইয়াছিল, বাহা'উল্লার অনুসারী কতিপয় বাহা'ঈদের হাতে বাগদাদে নিহত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাজ্জী মীরযা জানী, নুকতাতু'ল-কাফ, সম্পা. E. G. Browne,গীব স্মৃতি সিরিজ (Gibb Memorial Series) ; (২) Browne, A Traveller's Narrative written to illustrate the Episode of the Bab, ক্যাম্ব্রিজ ১৮৯১ খৃ. ; (৩) ঐ লেখক, The Tarikh-i Jadid, অথবা New History of Mirza Ali Muhammad The Bab, ক্যাম্ব্রিজ ১৮৯৩ খৃ.।

T. W. Haig (দা. মা.ই.)/ বোরহান উদ্দীন

কাশিফ (کاشف) ঃ মুহাম্মাদ শারীফ ইব্ন শামসু'দ-দীন আশ-শীরাযী (আনু. ১০০১/১৫৯২ পরবর্তী (?) ১০৬৩/১৬৫৩), ফারসী গদ্য লেখক ও কবি। তাঁহার তাখাল্লুস (কবিনাম) ছিল কাশিফ (এই কবিনামের ভিন্নরূপও বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ কাশিক-ই কুমায়্‌ত, দ্র. Rosen, পৃ. স্থা., এবং শারীফা কাশিফ, তু. তায্‌কিরা-ই নাসরাবাদী, যাহা A. Sprenger-কৃত সংক্ষেপিতরূপেও অন্তর্ভুক্ত, ক্যাটালগ আউদ, নং ৯১। তিনি ইস্‌ফাহানে বসবাস করিতেন, পরে রায়-র বাস করেন। সেখানে ১৫ বৎসর যাবত তিনি কাদী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দুই ভাই ইসমা'ঈল মুনসিফ ও মুকীমাও কবিরূপে পরিচিত ছিলেন। কাশিফ-এর মাত্র দুইখানি বই অদ্যাবধি টিকিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। সেই দুইখানিতে নৈতিকতা বিষয়ক লেখা স্থান পাইয়াছে এবং সাফাবী আমলের প্রচলন অনুযায়ী অলঙ্কৃত রীতিতে রচিত। সিরাজু'ম-মুনীর ১০৩০/১৬২১ সালে বা ইহার সামান্য কিছুকাল আগে রচিত। উহা সা'দীর গুলিস্তান-এর ঢং-এ রচিত। তবে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ধর্মনির্ভর। খাযান উ বাহারকে প্রধানত হুসায়ন ইব্ন আস'আদ আল-মু'আয়্যাদী আদ-দিহিস্তানী (৭ম/১৩শ শতক)-এর আত-তানুখীকৃত ফারসী সংস্করণের নূতনতর উপস্থাপনা। এই বইগুলি ১৩শ/১৯ শতক পর্যন্ত প্রায়শ অনুলিপিকৃত হইতেছিল এবং ইরান ও ভারত উপমহাদেশ উভয় স্থানেই কয়েকবার লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয় [দ্র. খানবাবা মুশার, ফিহরিস্ত-ই কিতাভা-ই কাপি-ই ফারসী, তেহরান ১৩৩৭-১৩৪২ (ইরানী সাল)। ১খ, পৃ. ৯৪৫, ২খ, পৃ. ২১৩৮]। তাঁহার অন্যান্য খাযান উ বাহার-এর খাতিমাতে উল্লিখিত রচনাকর্ম হইতেছে দুরর-ই মাকনূন, হাওয়াস্‌স-ই বাতিন, মাছনাবী-র লায়লা উ মাজনূন, হাফ্‌ত পায়কার, 'আব্বাস-নামা কাব্য এবং একখানি গীতিকাব্য গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খাযান ও বাহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে (খাতিমা) পদ ও আত্মজীবনীমূলক অংশে দ্র. বর্ণনা অংশ V. Rosen, Les manuscripts persans de l'Institut des langues orientales, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৮৬ খৃ., ২৮৫ প.; (২) Ch. Rieu. Cat. of the Persian Manuscripts in the British Museum, ২খ, ৮৬১ প. Supplement, ২৫০ প. ; (৩) আশ-শায়খ আকা বুযুর্গ আত-তিহরানী, আয-যারী'আ ইলা তাসা-নীফ আশ-শী'আ, নাজাফ-তেহরান ১৩৫৫ হি.,৭খ, ১৫১ প., ৮খ, ১০৮ প., ১২খ, ১৬১ প. ; (৪) আহমাদ মুনযাবী, ফিহরিস্ত-ই নুসখাহা-ই খাত্তী-ই, ২/২খ, তেহরান ১৩৪৯ ইরানী সাল, পৃ. ১৬০১, ১৬২৮।

J. T. P. de Bruijn (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

কাশিফু'ল-গিতা' (كاشف الغطاء) ঃ বিখ্যাত ইমামী 'আলিম শায়খ জা'ফার ইব্ন খিদ্‌র ইব্ন য়াহ্‌য়া আল-মালিকী আল-জানাজী আন-নাজাফী-র পদবী। শায়খ জা'ফার ১১৫৪/১৭৪১ বা আরও সম্ভাব্য ১১৬৪/১৭৫১ সালে আন-নাজাফে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার জন্ম তারিখ বিষয়ক তথ্য পরস্পর বিরোধী। তাঁহার পিতার বংশ আরবীয় গোত্র বানূ মালিক-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আল-হিল্লা এলাকার জানাজিয়া (বা কানাকিয়া) নামক গ্রাম হইতে আন-নাজাফে আগমন করিয়াছিলেন।

এইখানে ধর্মকর্ম, ধর্মবিষয়ক শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তিনি অত্যন্ত সর্বজনশ্রদ্ধেয় হন। শায়খ জা'ফার আন-নাজাফে ও কার্‌বালা'তে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামী 'আলিমগণের নিকট পড়াশুনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন আকা মুহাম্মাদ বাকির আল-বিহ্‌বিহানী ও সায়্যিদ মাহ্‌দী বাহরু'ল-'উলূম আত-তাবাতাবা'ঈ। ১২১২/১৭৯৭ সালে শেষোক্তজনের মৃত্যুর পরে শায়খ জা'ফার ইমামী সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

শায়খ জা'ফার আন-নাজাফের স্থানীয় বিষয়াদির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আবার সামগ্রিকভাবে ইমামী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং বাগদাদে 'উছমানী কর্তৃপক্ষ ও পারস্যের কাজার শাসক ফাত্‌হ 'আলী শাহ (১২১২-৫০/১৭৯৭-১৮৩৪) এই উভয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেন। ওয়াহ্‌হাবী বাদশাহ আল-'আযীয ইব্‌ন সা'উদ (১২১৮/১৮০৩) ওয়াহ্‌হাবী মতবাদের সপক্ষে এবং শী'আ মতবাদকে আক্রমণ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করিলে তিনি উহার একখানি জবাব, যথা ঃ "রিসালা মান্‌হাজু'র-রাশাদ লি-মান আরাদা'স্‌-সাদাদ" রচনা করেন। ওয়াহ্‌হাবীগণ ১২২০/১৮০৫ সালে আন-নাজাফ অবরোধ করিলে তখন তিনি স্থানীয় অধিবাসিগণের এক সফল প্রতিরোধ গঠন করেন। ১২২১/১৮০৬ সালে পারস্য বাহিনী বাগদাদ শহরের অভিমুখে অগ্রসর হইলে তিনি বাগদাদে নিযুক্ত 'উছমানী গভর্নর 'আলী পাশার দূতরূপে সাফল্যের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। ফাত্‌হ 'আলী শাহ-এর শাসনামলে তিনি ঘন ঘন পারস্য সফর করেন। নিজ রচিত ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ের সাধারণ গ্রন্থ কাশ্‌ফু'ল-গিতা' 'আন্ মুব্‌হামাতি'শ-শারী'আতি'ল-গার্‌রা' তিনি তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। ইমামী শাস্ত্রের ছাত্রগণের নিকট বইখানি জনপ্রিয় হয়। ইহা হইতেই তাঁহার জনপ্রিয় পদবি হয় কাশিফু'ল-গিতা'। ফাত্‌হ 'আলী শাহকে তিনি বারবার জিহাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রদান করেন।

বিভিন্ন রচনায় এবং ইরাক ও পারস্যব্যাপী বিভিন্ন বিতর্কে তিনি আখবারীগণের বিরুদ্ধে উসূলী ইজতিহাদী (দ্র.) মতবাদকে প্রবলভাবে সমর্থন প্রদান করিতেন। ফলে তিনি আখবারী নেতা মীরযা মুহাম্মাদ আন-নায়সাবূরী আল-আখবারীর সঙ্গে গুরুতর সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়েন। শেষোক্ত ব্যক্তি যখন ১২২৩/১৮০৮ সালে ফাত্‌হ 'আলী শাহ-এর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে অসম্মানিত করিতে চেষ্টা করেন তখন তিনি কাশ্‌ফু'ল-গিতা' 'আন মা'আয়িব মীরযা মুহাম্মাদ 'আদুব্বি'ল-'উলামা' নামক একটি আক্রমণাত্মক বই লিখিয়া তাহা শাহ-এর নিকটে প্রেরণ করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি আন-নাজাফ-এর অধিবাসিগণের মধ্যকার দুইটি দল যুকুর্‌ত ও শিমির্‌তগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জিড়ত হইয়া পড়েন। সেই সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত শতাব্দী অধিককালব্যাপী বিবাদে পরিণত হয়। তিনি রাজাব মাসের শেষভাগে ১২২৭/১৮১২ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে ইনতিকাল করেন এবং আন-নাজাফে সমাহিত হন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কয়েকজনই বিশিষ্ট 'আলিমরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাওয়ান্‌সারী, রাওদাতু'ল-জান্নাত, তেহরান ১৩৬৭ হি., পৃ. ১৫২-৪ ; (২) আন-নূরী আত-তাবারসী, মুস্‌তাদরাকু'ল-ওয়াসা'ইল, তেহরান ১৩১৮ হি., ৩খ, পৃ. ৩৯৭ প. ; (৩) তুনাকাবুনী, কিসাসু'ল-'উলামা', তেহরান তা.- বি., পৃ. ১৮৩-৯৮ ; (৪) মুহ্‌সিন আল-আমীন আল-'আমিলী, আয়্যামু'শ-শী'আ ১৫খ, দামিশ্‌ক ১৩৫৯/১৯৪০, পৃ. ৪১৩-৪৭ ; (৫) H. Algar. Religion and state in Iran 1785-1906, বার্কলে ও লস-এঞ্জেলেস ১৯৬৯ খৃ., নির্ঘণ্ট, শিরো, নাজাফী, শায়খ জাফার।

W. Madelung (E.I.²)/হুমায়ুন খান

কাশিফী (کاشفی) ঃ কামালু'দ-দীন হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ; আল-ওয়া'ইজ (ধর্ম প্রচারক') ডাক নামে অভিহিত, পারস্যের লেখক ও ধর্ম প্রচারক। বায়হাক অথবা সারযাওয়ার-এ তাঁহার জন্ম এবং তথায় তিনি তাঁহার কৈশোরের কিছুকাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর কাশিফী নিশাপুর, মাশহাদ ও আবু'ল-গাযী সুলতান হুসায়ন বায়কারা (দ্র.)-এর রাজত্বকালে প্রায় ২০ বৎসর হারাত-এ বসবাস করেন। তথায় তিনি সুলতান ও 'আলী শীর নাওয়া'ঈ [দ্র.]-র নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠের অধিকারী একজন বাগ্মী ধর্ম প্রচারক এবং একজন উচ্চ মাত্রায় সৃষ্টিশীল ফারসী কবিরূপে সুপরিচিত ছিলেন। কাশিফী দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ৯১০/১৫০৪-৫ সালে হারাত-এ ইনতিকাল করেন। যেহেতু তিনি একটি শী'ঈ কেন্দ্ররূপে পরিচিত বায়হাকে' জন্মগ্রহণ করেন সেইজন্য হারাতে তিনি শী'ঈরূপে বিবেচতি ছিলেন। কিন্তু জামী-র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ও 'আলী শীর নাওয়া'ঈ-র সহিত তাঁহার সাহচর্যের কারণে বায়হাকে তাঁহাকে একজন সুন্নীরূপে বিবেচনা করা হইত। তাঁহার প্রখ্যাত পুত্র ফাখরু'দ-দীন 'আলী সাফী (মৃ. ৯৩৯/১৫৩২-৩) তাঁহার প্রণীত রাশাহাত 'আয়নি'ল-হায়াত (লিথো., লক্ষ্ণৌ, ১৩০৮/১৮৯০) তাঁহার পিতা নাকশবান্দী মতবাদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন; ইঁহারা সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তথাপি কাশিফীর কতিপয় গ্রন্থ, উদাহরণস্বরূপ তাঁহার রাওদাতু'শ-শুহাদা' সাক্ষ্য প্রদান করে যে, গ্রন্থকার একজন ইমামী শী'ঈ ছিলেন। যাহা হউক, ফাখরু'দ-দীন 'আলী সাফী প্রণীত লাতা'ইফু'ত-তাওয়া'ইফ (তেহরান ১৩৩৬/১৯৫৭) এবং কাশিফীর প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থ আহ্‌লু'ল-বায়ত (দ্র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের প্রতি গ্রন্থকারের গভীর ভক্তি প্রকাশ করে। আর-রিসালাতু'ল-'আলিয়্যা ফি'ল-আহাদীছি'ন-নাবাবিয়্যা (তেহরান ১৯৬৬ খৃ.) ফুতুওয়াতনামা-য়ি সুলতানী (তেহরান ১৯৭১ খৃ.)-এর ন্যায়, কাশিফী-র রচিত কিছু গ্রন্থে, সূফীবাদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। হুসায়ন ওয়াইজ কোনও কোনও সময় কাশিফী ছদ্মনামে ফারসী কাব্য রচনা করিতেন। তাঁহার একমাত্র জ্ঞাত সন্তান ছিলেন উপরে উল্লিখিত ফাখরু'দ-দীন 'আলী সাফী। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা তাঁহার এই পুত্র একজন প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারকরূপে হারাতে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

নিম্নে প্রদত্ত কাশিফী প্রণীত রচনাবলীর তালিকাটি কালক্রমিকভাবে সজ্জিত নয়। কারণ তাঁহার বহু সংখ্যক রচনার সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থকারের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক হইতেছে আনওয়ার-ই সুহায়লী ও রাওদাতু'শ-শুহাদা' ঃ (১) প্রথম গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে কাশিফীর খ্যাতি গড়িয়া ওঠে। ইহা আবু'ল-মা'আলী নাসরুল্লাহ কর্তৃক ফারসীতে অনূদিত কালীলা ওয়া-দিম্না (দ্র.)-র একটি নূতন সংস্করণ। সুলতান হুসায়ন-এর দরবারের একজন সভাসদ তুর্কী আমীর নিজামু'দ-দীন আমীর শায়খ আহমাদ আস-সুহায়লী (মৃ. ৯০৭ অথবা ৯০৮/১৫০১-৩)-এর উপদেশ অনুসারে সম্পাদিত এই গ্রন্থে কাশিফী

কর্তৃক রূপক কাহিনীসমূহের পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্য ছিল আ'বুল-মা'আলী-র কঠিন লিখনীর ধারা সরলীকরণ করা। কাশিফী তাঁহার ভাষ্যে আবু'ল-মা'আলী-র প্রথম অধ্যায় দুইটি বর্জন করেন। ফলে পুস্তকটি ১৪টি অধ্যায়ে সংকুচিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ স্টাইলে লিখিত আনওয়ার-ই সুহায়লী, "ক্যানোপাস নক্ষত্রের আলো" বা সুহায়লী-র আলো কালীলা ওয়া-দিমনা-র ফারসী অনুবাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না এবং কাশিফী তাঁহার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন। পুস্তকটি কয়েকবার প্রকাশিত হইয়াছে ঃ কলিকাতায় ১৮০৪ খৃ. ইত্যাদি; হার্টফোর্ড (Ch. Stewart কর্তৃক) ১৮০৫ খৃ. ; (J. W. Ouseley কর্তৃক) ১৮৫১ খৃ.; বোম্বাই ১৮৫৩ খৃ. এবং ইহার পর হইতে ভারতে, ইরানে ও য়ুরোপে ক্রমাগতভাবে। শাকারিস্তান নামে আমীর খুসরাও দারা'ঈ কর্তৃক গ্রন্থিত ইহার একটি কাব্য ভাষ্য রহিয়াছে (তেহরান ১৯৪৭ খৃ.)। 'আলী চেলেবী (মৃ. ৯৫০/১৫৪৩-৪ কর্তৃক হুমায়ুননামা শিরোনামে প্রণীত ইহার 'উছমানী তুর্কী অনুবাদ ইউরোপে বিস্তৃত পরিচিতি লাভ করে। ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ La Fontaine's Fables-এর একটি অন্যতম উৎস। ইহা ভিন্ন আনওয়ার-ই সুহায়লী ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (E.B. Eastwick, Hertford ১৮৫৪ খৃ. এবং A. N. Wollaston, লন্ডন ১৮৭৮ খৃ.)। য়ূরোপের বিভিন্ন স্থানে পুস্তকটির অংশবিশেষ মূল ভাষ্য ও অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে (দ্র. Ethe. Cat, Pers, Mss., India Office, নং ৭৫৭)। ভারতে খ্যাতি অর্জন করিবার পর এই রচনাটি একজন অনুকরণকারী পায়। সম্রাট আকবরের একজন মন্ত্রী ও আঈন-ই আকবারী-র প্রণেতা আবু'ল-ফাদ'ল ইব্‌ন মুবারাক ইহার অনুকরণে 'য়ার-ই দানিশ সংকলন করেন (৯৯৬/১৫৮৮) ; (২) রাওদাতু'শ-শুহাদা', "শহীদগণের বাগিচা", সায়্যিদ মীরযা নামে পরিচিত যুবরাজ মুরশিদু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ-এর ইচ্ছানুযায়ী ৯০৮/১৫০২-৩ সালে রচিত, বিশেষত ইমাম হুসায়ন (রা)-সহ হযরত 'আলী (রা) ও তাঁহার পরিবারের সম্পর্কে একটি ফারসী শোকগাথা ; ইহাতে ১০টি অধ্যায় (বাব) এবং একটি সমাপ্তি পর্ব (খাতিমা) রহিয়াছে। বহুবার প্রকাশিত এই গ্রন্থের দাহ্ মাজলিস ও মুনতাখাব-ই রাওদাতু'শ-শুহাদা' নামক দুইটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সহজলভ্য (দ্র.) Storey, ১খ, ২১২, ১২৬১)। শী'ঈগণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং মুহাররাম-এর স্মারক বক্তৃতাসমূহে ব্যবহৃত এই গ্রন্থ রাওদা নামে পরিচিত শোক অনুষ্ঠানে ইহার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। বাগদাদ-এর ফুদূলী (মৃ. ৯৭০/১৫৬২-৩ কর্তৃক ইহা হাদীকাতু'স-সু'আদা' নামে সংযোজনসহ তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয় Storey, ১খ, ২১৩, Gibb, Ottoman Poetry, ৩খ, ৯০)। দাখানী-র রচনায় ইহার একটি ছন্দোবদ্ধ সরলীকৃত শব্দান্তর রহিয়াছে ঃ ১১৩০/১৭১৮ সালে রচিত ওয়ালী প্রণীত রাওদাতু'শ-শুহাদা' (Storey, ১খ ২১৩)। উর্দু এবং হিন্দী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে (দ্র. হায়দার বাখ্‌শ হায়দারী, গুল-ই মাগফিরাত, লাহোর ১৯৬৫ খৃ., নাযির হাসান যায়দী কর্তৃক ভূমিকা, ৮, ৯, ১৯)।

অন্যান্য রচনার মধ্যে রহিয়াছে ঃ (৩) জাওয়াহিরু'ত-তাফসীর লি-তুহফাতি'ল-আমীর, ৮৯০/১৪৮৫ সালে 'আলী শীর নাওয়া'ঈ-এর অনুরোধে রচিত ফারসী ভাষায় কুরআন-এর একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কাশিফী মোট চার খণ্ডে ইহা সংস্করণ করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইবার পর তিনি এই প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন। প্রথম খণ্ডে প্রথম তিনটি সূরা ও চুতর্থ সূরার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। জাওয়াহিরু'ত-তাফসীর-এর বিস্তৃত ভূমিকায় কুরআনী বজ্ঞানের ২২টি শাখা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিসমূহ বিভিন্ন সংগ্রহে বর্তমান (দ্র.) Reiu, Cat. Pers, Mss., British Museum, ১খ, ১১; Ethe, নং ২৬৮০; Storey, ১খ, ১২, ১১৯৫ ; আহমাদ মুনযাবী, ফিহ্‌রিস্‌ত-ই নুসখাহা-য়ি খাত্তী-য়ি ফারসী, তেহরান ১৯৬৯ খৃ., ১খ, ৪২) ; (৪) মাওয়াহিব-ই 'আলিয়্যা হইতেছে কুরআন-এর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ৮৯৭-৯/১৪৯১-৪ সালে রচিত এই গ্রন্থ 'আলী শীর নাওয়া'ঈ-র প্রতি উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং তাঁহার নাম হইতেই এই গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামানুসারে ইহা তাফসীর-ই হুসায়নী নামেও পরিচিত। পুস্তকটি ভারত ও ইরানে কয়েকবার লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইয়াছে (Storey, ১খ, ১৩) এবং ১৯৩৮-৫০ খৃ. তেহরানে ৪ খণ্ডে মুদ্রিত সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করে। তুর্কী ভাষায় আবু'ল-ফাদল মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস বিদলীসী (মৃ. ৯৮২/১৫৭৪-৫) প্রণীত ইহার একটি অনুবাদ এবং মেওয়াকিব তেফসীরি নামে ইসমা'ঈল ফেররুখ এফেনদী (মৃ. ১২৫৬/১৮৪০), ইস্তাম্বুল ১৯৫৯ খৃ., প্রণীত একটি রূপান্তর প্রচলিত আছে। উর্দূ ও পাশ্‌তু ভাষাতেও ইহার অনুবাদ বর্তমান (Storey), পৃ. স্থা.)। (৫) আখলাক-ই মুহসিনী, —নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে প্রণীত এই গ্রন্থটি সুলতান হুসায়ন-এর এক পুত্র আবু'ল-মুহসিনকে উপহার প্রদানের জন্য ৯০০/১৪৯৪-৫ সালে সমাপ্ত করা হয়। ৪০ অধ্যায় বিন্যস্ত এই গ্রন্থ ভারত, তেহরান, হার্টফোর্ড, লন্ডন ইত্যাদি স্থানে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদসমূহের মধ্যে রহিয়াছে H. G. Keene কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ, হার্টফোর্ড ১৮৫১ খৃ. ; আনীসু'ল-'আরিফীন নামে 'আজমী কর্তৃক তুর্কী অনুবাদ, ৯৭৪/১৫৬৬-৭ এবং শেষোক্ত হইতে গৃহীত সংক্ষিপ্তসারের জার্মান অনুবাদ, R. Peiper, ব্রেসলৌ ১৮৪৮ খৃ., Das Kapitel von der Freige-bigkeit ইত্যাদি; (৬) আর-রিসালাতু'ল-'আলিয়্যা ফি'ল-আহাদীছি'ন-নাবাবিয়্যা, ৮৭৫/১৪৭০-১ সালে সংকলিত, ৮ অধ্যায়ে সমাপ্ত ৪০টি হাদীছ-এর একটি ফারসী ভাষ্য। ইহা শী'ঈ 'আলিমগণের অন্যতম আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্‌নু'ল-হুসায়ন আস-সাব্‌যাওয়ারী (মৃ. ৮৫৪/১৪৫০) প্রণীত মাসাবীহু'ল-কুলূব দ্বারা প্রভাবিত এবং শামসু'দ-দীন আবু'ল-মা'আলী 'আলী আল-মুখতার আন-নাস্‌সাবা আন-নাকীবকে উৎসর্গিত। সুলতান ১ম আহমাদ-এর জন্য কামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ তাশকোপরুযাদে (মৃ. ১০৩০/১৬২০-১) একট তুর্কী অনুবাদ প্রণয়ন করেন, দ্র. OM, ১খ, ৩৪৯-৫০; A. Karahan, Islam-Turk edebiyatinda Kirk Hadis, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ., ১০৯-১১ ও নির্ঘণ্ট, দ্র. হুসায়ন ভা'ইয ; (৭), (৮) রূমী প্রণীত মাছনাবী হইতে সংকলিত দুইটি সংগ্রহ ঃ প্রথমটির নাম লুবাব-ই মা'নাবী ফী ইনতিখাব-ই মাছনাবী ও দ্বিতীয়টি ইহার একটি পুনর্বিন্যাস সংস্করণ যাহার নাম লুব্ব-ই লুবাব-ই মা'নাবী। শেষোক্ত গ্রন্থটি হারাত-এর রাজকীয় সভার একজন অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা মুসায়্যিব-এর প্রদত্ত উপদেশ অনুযায়ী ৮৭৫/১৪৭০-১ সালে সংকলিত হয় (লিথো, বোম্বাই ১৮৮৫ খৃ., লক্ষ্ণৌ মুদ্রিত, তেহরান ১৯৪০ খৃ.) ; (৯) রিসালা-য়ি হাতিমিয়্যা, ৮৯১/১৪৮৬ সালে সুলতান হুসায়ন বায়কারা-এর জন্য সংকলিত এবং হাতিম তা'ঈ (দ্র.) সংক্রান্ত গল্পসমূহসহ একটা

সংক্ষিপ্ত ফারসী প্রবন্ধ গ্রন্থ (মুদ্রিত.Ch. Schefer, Chrest, Pers, প্যারিস ১৮৮৩ খৃ., ১খ, ১৭৪-২০৩, তেহরান ১৯৪১ খৃ.) ; (১০) মাখযানু'ল-ইন্শা', ফারসী পত্র লিখনবিদ্যা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ যাহাতে একজন সচিবের জন্য যাহা কিছু জানা প্রয়োজন তাহার সকল বিষয় ঃ সম্ভাষণের প্রকারভেদসমূহ, উত্তর প্রদানরীতি, অবশ্য প্রদেয় বিষয়সমূহ, পত্রে ব্যবহৃত আবেদনের রূপভেদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুলতান হুসায়ন ও গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক মীর 'আলী শীর নাওয়া'ই-র নামে ৯০৭/১৫০১-২ সালে ইহা সমাপ্ত করা হয়। (১১) সাহীফা-য়ি শাহী, সুলতান হুসায়নকে উৎসর্গিত অপর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, যাহাতে কতিপয় ফারসী এবং সামান্য সংখ্যক আরবী ভাষায় পত্র লিখন সংক্রান্ত রচনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (লিথো. লক্ষ্ণৌ ১৮৪৮ খৃ., কানপুর ১৮৪৮ খৃ.) ; (১২) বাদা'ই'ই'ল-আফকার ফী সানা'ই'ই'ল-আশ'আর রূপক বাক্য ব্যবহার এবং ভ্রান্তি সংক্রান্ত একটি রচনা (দ্র. আ. মুনযাবী, ৩খ, ২১২৬); (১৩) ফুতুওয়াত নামা-য়ি সুলতানী, ১৯৭১ খৃ., তেহরানে মুদ্রিত, কাশিফী প্রণীত অন্যতম প্রধান গুরুত্বসম্পন্ন পুস্তক। সাবলীল লিখনরীতি সম্পন্ন এই গ্রন্থটি ফুতুওয়া (দ্র.) প্রসঙ্গে রচিত আরবী ও ফারসী গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশদভাবে লিখিত। কাশিফী ফিত্য়ান প্রসঙ্গে পূর্বতন প্রজন্ম হইতে প্রাপ্ত অথচ কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই এইরূপ সকল তথ্য সংকলিত করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উৎসসমূহ ব্যবহার করেন। ইরানের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উদাহরণস্বরূপ ফিত্য়ান ও ইহাদের সামাজিক সংগঠন প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে ; (১৪) আস্রার-ই কাসিমী ডাকিনীবিদ্যা, মন্ত্র ও আলকেমী (রসায়ন) সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত ফারসী পুস্তক। পাঁচ অংশে বিভক্ত এই পুস্তকটি এই সময়ের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আমীর সায়্যিদ কাসিম-এর নামে লিখিত (লিথো, বোম্বাই ১৮৭২ খৃ., ইত্যাদি)। কাশিফী-র পুত্র এই গ্রন্থটির একটি ভাষ্য রচনা করেন, যাহার শিরোনাম কাশফ-ই আসরার-ই কাসিমী (লিথো., বোম্বাই ১৮৯৪ খৃ., ১৯১০ খৃ., বার্লিনে মুদ্রিত); (১৫) তুহফাতু'স-সালাত, আট অধ্যায় ও সমাপ্তি পর্বসহ সম্পূর্ণ ; (১৬) মারসাদু'ল-আসনা ফী ইস্তিখরাজি আসমা'ই'ল-হুসনা' (লিথো, বোম্বাই ১৮৯৩, ১৯০৫ খৃ.) ; (১৭) যাদু'ল-মুসাফিরীন (মাছনাবী, লিথো., লক্ষ্ণৌ ১৮৮৫ খৃ.) ; (১৮) সাবআ কাশিফিয়্যা, ৮৭৮/১৪৭৩-৪ সালে সমাপ্ত ; মাওয়াহিবু'ল-যুহাল, মায়ামিনু'ল-মুশতারী, কাওয়াতি' (অথবা সাওয়াতি') আল-মিররীখ, লাওয়ামি'উ'শ-শাম্স, মাবাহিজ (অথবা মাফাতীহ) আয-যুহরা, মানাহিজু'ল-উতারিদ ও লাওয়া'ইহু'ল-কামার (অথবা ইখতিয়ারাত-ই নুজূম) শিরোনামে জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত সাতটি প্রবন্ধ লইয়া গঠিত ; (১৯) আল-তুহফাতু'ল-'আলিয়্যা ফী 'ইলমি'ল-হুরূফ ওয়া-বায়ান আসরারিহা, শায়খ 'আবদুল্লাহ্ নাকশবান্দী-র নামে সংকলিত ; (২০) , (২১) কুরআন সম্পর্কে অপর দুইটি ভাষ্য গ্রন্থ, প্রথমটি মুখতাসারু'ল-জাওয়াহির, "জাওয়াহিরু'ত-তাফসীর হইতে সার-সংক্ষেপ" এবং দ্বিতীয়টি জামি'উস-সিত্তীন নামে পরিচিত, কাশিফী সূরা য়ূসুফ (১২শ অধ্যায়)-এর একটি ভাষ্য দান করিয়াছিলেন, যাহা সম্ভবত তূস নগরীর তাজু'দ-দীন আবূ বাক্র আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ প্রণীত তাফসীর-ই সূরা য়ূসুফ-এর সহিত অভিন্ন (তেহরান ১৯৬৭ খৃ., দ্র. Storey, ১খ, ২৯, ১১৯৫, ১২১০ ; আ. মুনযাবী, ১খ, ৩৮) ; (২২) শারহ-ই মাছনাবী ; (২৩) রিসালাতু'ল-'উলবিয়্যা ; (২৪) রিসালা দার 'ইলম-ই আদাদ; (২৫) রিসালা দার আওরাদ-উ আদ'ইয়া ; (২৬) ফায়দু'ন-নাওয়াল ফী বায়ানি'য-যাওয়াল ; (২৭) মাফাতীহু'ল-কুনূয [আলকেমী (রসায়ন) প্রসঙ্গে] ; (২৮) মায়ামিনু'ল-ইকতিসাব ফী কাওয়া'ইদি'ল-ইহতিসাব; (২৯) আ'ঈনা-য়ি ইসকান্দারি অথবা জাম-ই জাম ; (৩০) মা লা বুদ্দাফি'ল-মাযহাব ; (৩১) মিনহাজু'ল-বিলায়া ; (৩২) ফাদলু'স-সালাত 'আলা'ন-নাবী (স); (৩৩) মির'আতু'স-সাফাফী সিফাতি'ল-মুসতাফা ; (৩৪) শারহ্-ই কিতাবুস'-সুরূর ফী 'ইলমি'স-সান'আ, সুফয়ান আছ্-ছাওরী প্রণীত (লিথো বোম্বাই) ; (৩৫) আন-নাকাওয়া ফী আদাবিত-তিলাওয়া, কুরআন পঠনের রীতি পদ্ধতি প্রসঙ্গে (আ. মুনযাবী, ১খ, ১২০) ; (৩৬) দীওয়ান-ই কাশিফী (ঐ. ৩খ, ২৪৯০) ; (৩৭) তাবাকাত-ই খাওয়াজাগান-ই নাকশ বানদিয়্যা (ঐ. ২খ, ১২৭৪) ; (৩৮) মা'আরিফু'ল-য়াকীন (ঐ, ২খ, ১৩৯৪ হি.) ; (৩৯) মানাকিবু'ল-আওলিয়া' (ঐ. ২খ, ১৪২৩ ; Storey, ১খ, ২১৩) ; (৪০) মাজালিস-ই ওয়া'জ (আ. মুনযাবী, ২খ, ১৬৭৮) ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত রচনাবলী ও উৎসসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) 'আলী শীর নাওয়া'ঈ, মাজালিসু'ন-নাফা'ইস, ফারসী অনু., তেহরান ১৯৪৪-৯৩ খৃ. পৃ. ২৬৮-৯ ; (২) খাওয়ানদমীর, হাবীবু'স-সিয়ার, তেহরান ১৩৭৩/১৯৫৩-৪, ৪খ, ৩৪৫-৬ ; (৩) হাজ্জী খালীফা সম্পা. Flugel, ১খ, ১৯৯, ২০৪, ২খ, ২৩০, ৩১৯, ৩৬০, ৩৬৩, ৬৪১-২, ৩খ, ৪৩, ৪২১-২, ৪৬১-২, ৫০০-১, ৪খ, ৪৮৫, ৫খ, ২৩৯, ৩৫৩, ৩৭৬, ৪৬৬, ৪৮৩, ৬খ, ২৪৪, ২৮০-১, ৬৪৩ ; (৪) ন. শূশতারী, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, তেহরান ১৩৭৫/১৯৫৬, ১খ, ১১৩-৪, ৫৪৭-৮ ; (৫) মা'সূম 'আলী শাহ, তারা'ইকু'ল-হাকা'ইক, তেহরান ১৯৬০-৬৬ খৃ., ৩খ, ১১৪; (৬) Browne, ৩খ, ৪৪১-৪, ৪৬৩, ৫০৩-৪ (ফারসী অনু. সা'দী জামী, আ. আ. হিকমাত প্রণীত, তেহরান ১৯৬০ খৃ., ৬৩৯-৪১, ৬৪৩-৫, ৭৩৪-৮) ; (৭) আগা বুযুরগ আত-তিহরানী, আয-যারী'আ ইলা তাসানীফিশ-শী'আ, নাজাফ এবং তেহরান ১৯৩৬ খৃ., ইত্যাদি তু. প্রাসঙ্গিক শিরোনামসমূহ ; (৮) এম. আর. জালালী না'ঈনী, ভূমিকা, মাওয়াহিব-ই 'আলিয়্যা, ৭-১৩২ ; (৯) আ. আ. দিহখুদা, 'কাশিফী, লুগাতনামা-তে, তেহরান ১৯৪৬ খৃ., ইত্যাদি' (১০) আ. খায়্যামপুর, ফারহাঙ্গ-ই সুখানওয়ারান, তাবরীয ১৯৬১ খৃ., ৪৭৯ ; (১১) খ. মুশার, মু'আল্লিফীন-ই কুতুব-ই চাপ্‌পী, "ফারসী-য়ু 'আরাবী", তেহরান ১৯৬১ খৃ., ২খ. ৮১০-১৬; (১২) J. Rypka, Iranische Literaturgeschichte, লাইপযিগ ১৯৫৯ খৃ., নির্ঘণ্ট দ্র. হুসায়ন ওয়া'ইজ ও পৃ. ৬০০ (bibl.), ইংরাজী অনু. History of Iranian literature, Dordrecht ১৯৬৮, নির্ঘণ্ট, দ্র. শিরো, এবং পৃ. ৭৮৯।

Gholam Hosein Yousofi (E.I.^{2})/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাশিয়ানী (کشینی) ঃ [ভিন্ন বানানে কাসিয়ানী (Kasiani), বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ১১০], গোপালগঞ্জ জিলার (বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার) পশ্চিম প্রান্তবর্তী উপজিলা, আয়তন ১১৭ বর্গমাইল (৩০৩ বর্গকিলোমিটার)। তন্মধ্যে ৫ বর্গকিলোমিটার নদী এলাকা, ১৪টি ইউনিয়ন ও ১৬০টি গ্রাম লইয়া গঠিত। ২৩°৫' ও ২৩°১৯' উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৮৯° ৪১' ও ৮৯° ৫৬' পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। উত্তরে বোয়ালমারী উপজিলা, পূর্বে মুকসুদপুর উপজিলা, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ

উপজিলা ও পশ্চিমে মধুমতী নদী ও অপরপারে মাগুরা জিলা। জনসংখ্যা (১৯৮১ খৃ. গণনা) ২,০৩,৬৪৮। তন্মধ্যে ১,৩১,০৯২ জন মুসলমান, ৭০,২৪৭ জন হিন্দু, ৪২ জন বৌদ্ধ, ১০৩ জন খৃষ্টান এবং ১৭১ জন উপজাতীয়। প্রতি বর্গমাইলে ১,৭৩৮ জন (প্রতি বর্গ কি. মি. ৬৭১ জন) লোক বাস করে। শিক্ষিতের হার ২৮%। এই উপজিলাটি (সাবেক থানা) পূর্বে সংলগ্ন মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত ছিল এবং যশোর জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ১৮৫৯ খৃ. পূর্ণাঙ্গভাবে ফরিদপুর জিলা গঠিত হইলে তখন ইহাকে ফরিদপুরের সঙ্গে দেওয়া হয় (নিম্নে ইতিহাস অংশ দ্র.)। এলাকাটির নামকরণ সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একমতে জনৈক স্থানীয় হিন্দু রাজা ভারতের বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থান কাশীর নামে এই স্থানটির নাম করিয়াছিলেন কাশিয়ানী (বা কাশীয়ানী) ; অপর মতে নাওয়াব 'আলী বর্দী খান-এর আমলে এই গ্রামের বাবু দর্পণারায়ণ সেন কাশীনাথ দেবের ৫টি মূর্তি গ্রামের পাঁচটি দালানে স্থাপন করেন এবং সেই দেবতার নামে গ্রামটির নাম রাখেন কাশিয়ানী।

সমগ্র উপজিলা এলাকাটি নীচু সমভূমি এবং নদী-নালা, নদীর মরা খাত ও বিল অঞ্চল লইয়া গঠিত। উপজিলার পশ্চিম দিকে গঙ্গা বা পদ্মা নদীর শাখানদীসমূহ এবং বর্ষার প্লাবন-বাহিত বিপুল পরিমাণ পলি দ্বারা ভূমি গঠিত হইয়াছে। এই মাটি বাদামী বর্ণের। পূর্ব দিকের ভূমি মেঘনা খাড়ির বন্যা প্লাবনের পলিবাহিত, গাঢ় বাদামী মাটি। অধিকাংশ এলাকাই বিল ও জলা নিম্ন অঞ্চল। বৎসরে প্রায় নয় মাস জলমগ্ন থাকে। ফলে একদিকে বিলে নূতন পলি জমিয়া ভূমি গঠিত হয় এবং অপর দিকে আবার অনেক মাটি ধুইয়া যায়। এখানকার অনেক অঞ্চলই ১০০ বৎসর আগে মাত্র গঠিত হইয়াছে। ফলে সামগ্রিকভাবে মাটি খুব উর্বর। আবহাওয়া মৃদুমন্দ, বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে। বর্ষকালে তাহা আরও বেশী হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৬৮°৫৫"। তাপমাত্রাও সহনশীল। গ্রীষ্মে ৭৫° ফা. হইতে ৯৪° ফা. পর্যন্ত, আর শীতে ৭৭° ফা. হইতে ৪৬° ফা. পর্যন্ত নামে। ইহা বন্যা ও কালবৈশাখী উপদ্রুত অঞ্চল। ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৭০ ও ১৯৭৩ খৃ. মারাত্মক বন্যা হয়। অতঃপর ১৯৮৮ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসের ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত ও আংশিকভাবে গঙ্গা নদীবাহিত অপরিমিত পানির সর্বনাশা বন্যায় যখন সমগ্র বাংলাদেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা ডুবিয়া যায়, তখন এই কাশিয়ানী উপজিলা অঞ্চলটিও প্রায় সম্পূর্ণই তলাইয়া গিয়াছিল। বহু প্রাণহানি হয় এবং সম্পদের বহু বিনাশ সাধিত হয়। ১৯১২, ১৯১৯ ও ১৯৬৯ খৃ. ঘূর্ণিঝড়েও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৪৩ খৃ. বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতেও এই অঞ্চলটির অনেক প্রাণহানি ঘটিয়াছিল।

মরা নদী-খাল ও অসংখ্য বিল থাকিবার কারণে এবং অত্যন্ত ডুবা এলাকা বলিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভাল নহে। পশ্চিম প্রান্ত দিয়া মধুমতী এবং উহার শাখা বারাসিয়া নদী প্রবাহিত। এইগুলি সারা বৎসর নাব্য থাকে। নদী পথে লঞ্চ চলাচল করে, বর্ষা ও শরৎকাল ব্যাপিয়া অভ্যন্তরীণ চলাচল ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা। উপজিলার ৩৫% লোকের নিজস্ব নৌকা রহিয়াছে। শুষ্ক মওসুমে গরুর ও মহিষের গাড়ী চলে। ৪% লোকের এইরূপ গাড়ী রহিয়াছে। উপজিলা এলাকাতে মোট পাকা সড়ক রহিয়াছে ৩৪ কি. মি.; কাঁচা সড়ক ১২৭ কি. মি. ; কিছু এলাকাতে বাস ও রিকশা চলে। ব্রড গেজ রেল সড়ক আছে ৯ কি. মি.। রেল দ্বারা উত্তরে পাংশা ও সেখান হইতে রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দ হইয়া ফরিদপুর শহরের সঙ্গে যুক্ত। কাশিয়ানী হইতে রেল সড়ক সামান্য দক্ষিণে ভাটিয়াপাড়াতে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই উপজিলা এলাকাতে রেল স্টেশন আছে তিনটি। কাঁচা মাটির ও ইট বিছানো পথগুলি ইউনিয়ন অফিসগুলির সঙ্গে উপজিলা সদরকে যুক্ত করিয়াছে এবং একটি মোটামুটি ভাল সড়ক জিলা শহর গোপালগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে। এই উপজিলাতে ২৯টি ডাকঘর এবং ১টি টেলিগ্রাফ অফিস রহিয়াছে। কাশিয়ানী গ্রামে টেলিফোন এক্সচেঞ্জও রহিয়াছে।

এখানে কোনও একটানা বনভূমি নাই—বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জঙ্গল রহিয়াছে। কাঠের গাছের মধ্যে নীম, কড়ই ও বকুল প্রধান। বাঁশ ও শণ জন্মে। প্রধান ফল আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, নারিকেল ও সুপারী। বিল অঞ্চলের পানিতে এবং পার্শ্ববর্তী স্থলে নানা জলজ উদ্ভিদ ও ঘাস জন্মে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে শিয়াল, বনবিড়াল, কচ্ছপ ও কয়েক জাতের মারাত্মক বিষধর সাপ দেখা যায়। উর্বরা জমির প্রধান ফসল ধান। সাম্প্রতিক কালে পাওয়ার পাম্পের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা জমিতে সেচ দিয়া কয়েক জাতের ইরি ধানের চাষ করা হইতেছে। বর্ষর প্রধান ফসল আমন ধান। বসন্তে বিলাঞ্চলে বোরো ধান করা হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে পাট, গম, ইক্ষু, সরিষা, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন ও তামাক জন্মে। এখানে ভাল পানও হয়। ইংরাজ আমলে খৃ. ১৯ শতকব্যাপী এখানে বাধ্যতামূলক নীলের চাষ করানো হইত। সেজন্য নীল বিদ্রোহ হয়। নদীতে, খালে-বিলে ও পুকুরে প্রচুর মাছ হয়, বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলের বিলে কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছ এক সময়ে প্রচুর পাওয়া যাইত। বর্তমানেও জেলেগণ অনেক মাছ ধরিয়া থাকে ; বিভাগপূর্বকালে এখানকার মাছ কলিকাতা শহরেও যাইত।

এখানকার অধিকাংশ বাড়ীঘর বাঁশের ও শণের বেড়ার তৈরী, উপরে শণের ছাউনি। অনেক ঘরেই বাঁশ নানাভাবে ফাড়িয়া বেড়া দেওয়া হয়। কিছু কিছু রহিয়াছে ঢেউ টিনের ঘর, পাকা দালান খুবই কম। লোকেরা অধিকাংশই নলকূপের পানি পান করে। কিন্তু বহু লোক নদী, পুকুর, কূপ এমন কি বিলের পানি পান করে। বিভাগপূর্বকালে এখানে মুসলমান-হিন্দুর হার ছিল প্রয় ৬০ ঃ ৪০ ; ১৯৪৭ খৃ. পরে উচ্চ শ্রেণীর এবং অবস্থাপন্ন হিন্দুগণের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলায় চলিয়া যায়। বর্তমানে কিছু সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দু এবং নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু মিলিয়া মুসলমানগণের সঙ্গে হার প্রায় ২ ঃ ১। অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিকাজ করে। মাছ ধরা হিন্দু জেলেগণের প্রায় একচেটিয়া পেশা। তাহা ছাড়া রহিয়াছে কুমার, কামার ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত কুটির শিল্পে নিয়োজিত কুমার, কামার ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোক। তন্মধ্যে অধিকাংশই বাঁশ-বেতের কাজ করে, অনেকে পাট ও কাঠের কাজ করে, কিছু লোক তাঁত শিল্পে নিয়োজিত আর কিছু নিয়োজিত পরিবহনের কাজে। এই এলাকায় মেয়েরা কিছু কিছু নকশী কাঁথাও তৈরী করে। স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যবসা করেন এবং চাকুরীতে নিয়োজিত রহিয়াছেন। বিভাগপূর্বকালে এখানে হিন্দু ব্যবসায়ী অনেক ছিলেন, বিশেষ করিয়া ধনাঢ্য সাহাগণ। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই পরে পশ্চিম বাংলাতে চলিয়া যান। ১৯৮১ খৃ. পর্যন্ত উপজিলা সদর সমেত ৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করা হয়। ক্রমে ক্রমে পুরা উপজিলাই বিদ্যুতায়িত হইবে।

উপজিলা এলাকাতে ২টি কলেজ, ২০টি হাই স্কুল ও জুনিয়ার হাই স্কুল, ১০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩টি মাদরাসা রহিয়াছে। মসজিদ

আছে ২৬৫টি, হিন্দু মন্দির ৪৪টি এবং খৃষ্টান গির্জা ১টি। এক সময়ে ইহা ছিল হিন্দু প্রভাবিত এলাকা। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সাহা, বণিক ও নমশূদ্র অনেক ছিল। তন্মধ্যে বৈদ্যগণ সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও প্রভাবশালী ছিলেন। বিখ্যাত বৈদ্যনাথ সেন ইংরেজ আমলে বিচারপতি (জজ) হইয়াছিলেন, অপর বৈদ্য জমিদার গিরিশচন্দ্র সেন ১৯০২ খৃ. এখানে নিজ নামে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। বর্তমানে মুসলমানগণ ধীরে ধীরে শিক্ষা-দীক্ষায় ও ব্যবসাতে অগ্রগতি অর্জন করিতেছে। এখানকার সংস্কৃতিতে, জারী, সারী, কবিগান, পালাগান (প্রশ্নোত্তরের সঙ্গীতানুষ্ঠান), কিস্সা-কাহিনী এবং বাউল ও ভাটিয়ালী গানে, মুসলিম ইতিহাস, কিংবদন্তী ও বিভিন্ন ঘটনা ফল্গুস্রোতের মত প্রবহমান রহিয়াছে (নিম্নে ইতিহাস অংশ দ্র.)।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ এই এলাকা প্রাচীন সমতটের অংশ ছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্য এখান পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। নিকটবর্তী এলাকাতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে দুইজন স্থানীয় রাজার নামও পাওয়া যায় ঃ ধর্মাদিত্য ও গোপীচন্দ্র। আরও জানা যায় যে, রাজা চন্দ্রবর্মণ ৩১৫ খৃ. এখানে রাজত্ব করিতেন। খৃ. ৪র্থ শতকের শেষদিকে সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত তাঁহাকে পরাজিত করিয়া এই এলাকা দখল করেন। এখান হইতে কাছাকাছি দুইটি গ্রামে ২য় চন্দ্রগুপ্ত ও সন্ধ্যাগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ৬১৫-২০ খৃ. এখানে সমাচার দেব-এর রাজত্ব ছিল। অতঃপর তাঁহার বিখ্যাত পুত্র শশাঙ্ক রাজা হন। শশাঙ্কের পরে ইহা মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃ. ৮ম-১১শ শতকে পাল রাজাগণ এবং ১২শ শতকে সেন রাজাগণ এই অঞ্চল শাসন করেন। বাখ্তিয়ার খালজী ১৩০১ খৃ. নবদ্বীপ, তথা উত্তর ও পশ্চিম বাংলা জয় করিলেও রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আরও অনেক বৎসর যাবত বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অংশ শাসন করিতে থাকেন। মুসলিম অধিকার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এই অঞ্চলটি ১৩৩০ খৃ. পর্যন্ত হিন্দু শাসনাধীনে ছিল। অতঃপর সেই বৎসর মুহাম্মাদ তুগলাক-এর বাহিনী এখানে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর একটানা মুসলিম শাসনাধীনে থাকে। তুগলাক-এর গভর্নর বাহরাম খান-এর মৃত্যুর পরে ফাখরু'দ-দীন মুবারাক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাতে সুলাতানী আমলের সূচনা করেন। শামসু'দ-দীন ইল্য়াস শাহ এবং তাঁহা বংশধরগণ ১৪১০ খৃ. পর্যন্ত শাসন করেন। অতঃপর সুলতান শিহাবু'দ-দীন বায়াযীদ-এর নিকট হইতে রাজা গণেশ সিংহাসন দখল করিয়া নেন। তাঁহার বংশধরগণ ১৪৪২ খৃ. পর্যন্ত শাসন করেন। এই সময়ে এই অঞ্চলে আরাকানীদের উৎপাত খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। ১৪৪৫ খৃ. আবার ইল্য়াস শাহী বংশের মুহাম্মাদ শাহ এখানে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশ ১৪৮৭ খৃ. পর্যন্ত শাসন করেন। ১৪৮৭-১৪৯৩ খৃ. পর্যন্ত হাবশী শাসকগণের অরাজক শাসন চলিতে থাকে। অতঃপর হুসায়ন শাহ এবং তাঁহার বংশধরগণ এই অঞ্চল সমেত বংলা শাসন করেন। এই সময়ে এখানকার শাসনকেন্দ্র ছিল ফতেহাবাদে। সেই ফতেহাবাদই পরবর্তীকালে ফরিদপুর (দ্র.) নামে পরিচিত হয় (Bangladesh District Gazetteers, Faridpur, p. 1)।

এই সময়ে কাশিয়ানী ছিল যশোর ও নদীয়ার সঙ্গে সরকার মাহমূদাবাদের অংশ। আকবর সমগ্র বাংলা জয় করিয়া (১৫৭৬ খৃ.) এই সুবাকে ৩৩টি সরকারে বিভক্ত করেন। তখন ফতেহাবাদকেও অর্থাৎ ফরিদপুরের বাকী অংশকেও সরকার মাহমূদাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আকবারনামাতে উল্লিখিত আছে যে, ফৌজদার মুরাদ খানকে সম্রাট এই অঞ্চলে প্রেরণ করেন (১৫৭৪ খৃ.)। মুরাদ খান ফতেহাবাদ ও সরকার বাকলা (বাকেরগঞ্জ) অধিকার করিয়া খান খালাসপুর হইতে (আধুনিক ফরিদপুর শহরের ১৬ মা. দূরে) ফতেহাবাদ শাসন করিতে থাকেন। আঈন-ই আকবারীতেও এই অঞ্চলের উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, ইহা একটি জলা বিল অঞ্চল, সে কারণেই মাহমূদাবাদ কিল্লা বিশেষভাবে সুরক্ষিত। মুরাদ খান-এর মৃত্যুর পরে (১৫৮০ খৃ.) রাজা মুকুন্দ রাম তাঁহার পুত্রগণকে নিজ রাজধানীতে মিত্ররূপে নিয়ন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেন। অতঃপর দীর্ঘকাল যাবত এখানে মুগল-পাঠান তথা বাংলার বারো ভূঁঞাগণের সঙ্গে মুগল শক্তির সংগ্রাম চলিতে থাকে এবং এলাকাটির শাসনক্ষমতার ঘন ঘন পরিবর্তন হইতে থাকে। কখনও মুগল সুবাদার মানসিংহের (দ্র.) অধিকারে, কখনও চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের এবং তাঁহাদের মিত্র সুলায়মান-এর অধীনে থাকে। কেদার রায়ের পতনের পর ফতেহাবাদ-এর পাঠান শাসক হন মাজলিস কুত্ব (দ্র.) ১৬০৯ খৃ. ঈসা খান-এর পুত্র মূসা খান (উভর দ্র.)-এর নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত পাঠান বাহিনীতে যোগ দিয়া মাজলিস কুত্ব নারায়ণগঞ্জ শহরের দক্ষিণে সংঘটিত যুদ্ধে নওয়াব ইসলাম খান-এর বাহিনীর নিকটে পরাজিত হন। অতঃপর এখানে স্থায়ীভাবে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুরশিদ কুলী খান-এর আমলে সমগ্র বাংলাকে তেরটি চাকলায় বিভক্ত করা হয়, তখন এই কাশিয়ানী অঞ্চল ছিল চাকলা ভূষণার অন্তর্গত। খৃ. ১৮শ শতকের শেষভাগে এই অঞ্চলে রাজা সীতারাম রায়ের উথান ঘটে। তিনি নওয়াব শাইস্তাই খান-এর নিকট পাঠানগণকে দমন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নলদী পরগণার (বৃহত্তর যশোর জিলা, বর্তমান কাশিয়ানী উহার অন্তর্গত ছিল) জমিদারী লাভ করেন। পরে মুরশিদ কুলী খান-এর আমলে সীতারাম রায় মুগল সরকারের খাজনা পাঠানো বন্ধ করিয়া দিয়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারী দখল করিয়া রাজ্য গঠন করেন এবং লুণ্ঠনও শুরু করেন। তিনি ভূষণার মুগল ফৌজদার আবূ তুরাবকে সম্ভবত ভুলবশত হত্যা করেন। অতঃপর এক শক্তিশালী মুগল বাহিনীর নিকট সীতারাম রায় পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার রাজধানী মুহাম্মাদপুর বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয় (১৭১২ খৃ.)। তাঁহার জমিদারী দিয়া দেওয়া হয় নাটোরের রাজ পরিবারকে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ১৭৬৫ খৃ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র বাংলার দীওয়ানী বা রাজস্ব শাসনের অধিকার লাভ করিলে এই অঞ্চলটি ঢাকা নিয়াবতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৩ খৃ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে গোয়ালন্দও এই এলাকা অর্থাৎ কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর যশোর জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ফরিদপুর জিলার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় (উপরে দ্র.)। ১৯০৯ খৃ. মাদারীপুর মহকুমা হইতে অংশ আলাদা করিয়া গোপালগঞ্জ (দ্র.) মহকুমা সৃষ্টি করা হইলে কাশিয়ানী গোপালগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া একটি বড় ইসলামী আন্দোলন হয় খৃ. ১৯ শতকে। ইংরেজ শাসন, নীলকরগণের জুলুম-নির্যাতন এবং জমিদারগণের শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে সচেতন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্য হাজী শরীঅতুল্লাহ (দ্র.) ফরিদপুর হইতে সমগ্র দেশব্যাপী ফরযী (বা ফরায়েযী) (দ্র.) আন্দোলনের ডাক দেন (১৮২০ খৃ.)। পরে তাঁহার

পুত্র মুহাম্মদ মুহসিন (দুদু মিঞা) সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইংরেজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু জমিদারগণ সংগ্রাম করিয়া দুদু মিঞাকে দমন করেন। কাশিয়ানী অঞ্চলের সকল মানুষ শেষবারের মতো স্বাধীন চেতনা ও শক্তির পরিচয় দেয় ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে। পাঞ্জাবী সৈন্যগণ এখানে জুলুম-হত্যা সীমাহীনভাবে চালায়। পরে স্থানীয় মুক্তিবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহার প্রতিশোধ নেয় এবং পাঞ্জাবীদিগকে পরাজিত ও বন্দী করে।

আধুনিক কাশিয়ানী উপজিলা সদর ফরিদপুর হইতে ৪৬ মা. (৭৪ কি. মি.) দ. প. অবস্থিত, রেল ও সড়ক দ্বারা ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত, সড়ক ও নৌপথে মধুমতী নদী দ্বারা জিলা শহর গোপালগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত। ভাটিয়াপাড়া হইতে গোপালগঞ্জ শহর পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করে। কাশিয়ানী হইতে ঢাকা পর্যন্ত নিয়মিত বাস যোগাযোগ রহিয়াছে। কাশিয়ানী গ্রাম কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ঘাট শাখা রেলপথের (৪৪ মা.) স্টেশন, মধুমতীর শাখা বারাসিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান উপজিলা পর্যায়ের অফিসসমূহ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস, কলেজ, স্কুল, মাদরাসা, ডাকঘর, হাসপাতাল, পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাব রেজিস্টারী অফিস, মুসলিম বিবাহ রেজিস্টারী অফিস, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ইত্যাদি রহিয়াছে।

উপজিলা এলাকার কয়েকটি বিখ্যাত ও একদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম হইতেছেঃ ওরাকান্দি—এখানে রেল স্টেশন, হাই স্কুল ও ডাকঘর রহিয়াছে। এখানে আগে শিক্ষিত হিন্দু অনেক ছিলেন। এখনও বেশ কিছু রহিয়াছেন। এখানে অস্ট্রেলীয় ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি শাখা আছে। চৈত্র মাসে বড় মেলা হয়। রামদিয়া গ্রাম ও রেল স্টেশন ; ইহা বেথুরি ইউনিয়নের অন্তর্গত। এখানে একটি ডিগ্রী কলেজ (স্থাপিত ১৯৪২ খৃ.), সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ (ইহা হাই স্কুল), জুনিয়ার হাই স্কুল, ডাক্তারখানা, ডাকঘর ও ডাকবাংলা আছে। রাজপুত ও সাজাইল গ্রামের হাই স্কুল (স্থাপিত যথাক্রমে ১৯৩০ ও ১৯৪২ খৃ.), ডাকঘর, ডাক্তার-খানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসসমূহ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ১১০, নিবন্ধ কাশিয়ানী, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৫ খৃ. ; (২) নব-জ্ঞান ভারতী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স ১৯৫৮ খৃ., নিবন্ধ ঃ কাশিয়ানী ; (৩) মুহাম্মাদ আবুল হাশেম মিয়া, নিবন্ধ ঃ ঐতিহাসিক দুর্গ ভূষণা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ-এর পত্রিকা, ইতিহাস-এ প্রকাশিত, দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ/শ্রাবণ ১৩৯৫; (৪) Bangladesh District Gazetteer, Faridpur, Establishment Division, Cabinet Secretariate, Govt. of Bangladesh, Dhaka 1977. pp. 356-57 ; (৫) Population Census of Bangladesh 1974, District-Census Report, Faridpur, Bangladesh Bureau of Statistics, Min. of Planning. Dhaka 1979; (৬) Bangladesh Population Census 1981, District Faridpur, Bangladesh Bureau of Statistics, Min. of Planning, Govt. of Bangladesh 1984; (৭) Bangladesh District Census 1981, Community Tables of all Thanas, Faridpur District, pl. II, Bangladesh Bureau of Statistics, 1985।

হুমায়ুন খান

কাশী (كاشى) ঃ একটি ফারসী শব্দ, অর্থ সাইজ করা টালি যাহা প্রধানত শোভা বর্ধনের জন্য, কখনও বা আর্দ্রতা হইতে দালান রক্ষার উদ্দেশ্যে দালানের বহির্গাত্রকে আচ্ছাদিত করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়; এই টালি চকচকে ও চিত্রিত; মাটি বা চীনামাটির দ্বারা নির্মিত হয়। তুর্কী ভাষায়ও এই পরিভাষাটির ব্যবহার রহিয়াছে এবং ইহা 'কাশানী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ; কাশান (দ্র.) নগরটি বাস্তবে ইরানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ইহার প্রসিদ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। ইতিপূর্বেই এই বিষয়ের (আনু. ৭০০/১৩০০) প্রথম নিবন্ধকার আবু'ল-কাসিম-এর লেখায় এই নামটি দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি "কাশী-গারী (আক্ষরিক অর্থ কাশী নির্মাণ কলা)-রূপে শব্দটির ব্যবহার করেন। তিনি ব্যতীত সকলেই ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ মসৃণ, চিত্রিত পোড়ামাটির শিল্প (art of faience) বুঝাইবার জন্য এই নামটি ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. J. W. Allan, Abu'l-Qasim's Treatise on ceramics in Iran, ১১খ, ১৯৭৩ খৃ., ১১১-২০)। আরবী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে এই নামটি কাশী (য়াকূত, ৪খ, ১৫) অথবা কাশানী (য়াকূত, ঐ ; ইব্ন বাত্তূতা, ১খ, ৪১৫, ৪৬৩, ২খ, ১৩০, ২২৫, ২৯৭, ৩খ, ৭৯)-তে পরিণত হইয়াছে।

'কাশী-সমূহের উৎপত্তি মৃৎশিল্প ও পোড়া ইটের কলাকৌশলের সহিত। সুতরাং একটি অতি প্রাচীন শিল্পকলার সহিত সম্পর্কযুক্ত। চুগা-যানবিল (খুযিস্তান)-এর খননকার্যে (খৃষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দী) চাকা চাকা দাগে শোভিত (dappled) কয়েক প্রকার টালি পাওয়া গিয়াছে (দ্র. P. Amiet, Elam, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., প্লেট ২৬১)। Susa-তে (ঐ, প্লেট ৩৮৩-৩৯২) আরও কিছু Polychrome আচ্ছাদিত এবং zoomorphous অলংকৃত টালী আবিষ্কৃত হইয়াছে (খৃষ্টপূর্ব ৮ম ও ৭ম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে)। বিখ্যাত Frieze of the Archers (Frieze=যে কারুকার্যময় অংশ স্তম্ভের কার্নিশ ও স্তম্ভ শীর্ষের মধ্যবর্তীতে থাকে) (Louvre, খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) Achaemenian-দের মীনা করা ইটের একটি সুপরিচিত উদাহরণ (M. Rutten, Les arts du Moyen Orient ancien, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., pl. xxx) যাহার সম্পর্কে আসিরীয়া ও বেবিলনবাসিগণও জ্ঞাত ছিলেন (আসিরীয় Palace of Khorsabad, খৃষ্টপূর্ব ৭২২-৭০৫ সাল; বেবিলনের (Gate of Ishtar, খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। পরবর্তীকালে পাথিয়ান ও সাসানীদের আমলে এই শিল্পকলার কিছুটা অবনতি ঘটে এবং ইহা শুধু মোজাইকের মধ্যেই প্রকাশ লাভ করে (Bishapur, ৩য় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, দ্র. R. Ghirshman, Parthes et Sassanides, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., pls. ১৮০-৬)।

অধিকন্তু এই কলাকৌশলই মুসলিম আমলের শুরুতে প্রচলিত ছিল এবং এই যুগের মোজাইক গ্রীক ও বায়যানটীয় অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট হইয়াছিল। এই মোজাইক যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত মেঝের জন্য (Khirbat'ul-Mafdjar-এর স্নাগারর বিশ্রাম কক্ষ ; D. and J. Sourdel, La civilisation de l'Islam classique, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., প্লেট ১২৪), যেমন ব্যবহৃত হইত দেওয়ালসমূহে (Dome of the Rock,

৬৯১ খৃ., পূর্বোল্লেখিত art Architecture, pls. iv-vi; Sourdel, Great Mosque of Damascus, dated 775) (পৃ. গ্র. প্লেট ৪)। কিন্তু যে আকারে কাশীর ব্যবহার পরবর্তীতে প্রসার লাভ করে সম্ভবত উহার উদ্ভব ঘটে ৫ম/১১শ শতাব্দীতে। ইহার সাময়িক অভ্যুদয়ের প্রথম নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি দৃষ্ট হয় দাম্গান-এর জামি' মসজিদে (৫ম/১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, C. Adle and A. S. Melikian Chirvani, Les Monuments du Xie s. du Damqan, in Studia Iranica, ১/১খ, (১৯৭২ খৃ.), pl. xxvii)Ç A. Godard (L' Art de l' Iran, প্যারিস ১৯২৬, ৩৬৬)-এর মতে দালানের বহির্ভাগের উৎকীর্ণ লিপির অক্ষরগুলিকে অধিকতর দৃশ্যমান অর্থাৎ অধিকতর পঠনযোগ্য করার উদ্দেশ্যে enamel (কালাই)-এরও ব্যবহার হইত (আরও তু. ঐ. pl. 132 ; M. B. Smith, Th Manars of Isfahan, in AI, ১৯৩৬/২, চিত্র ২১২)। প্রায় একই সময়ে turquoise মণির রংয়ের মতো নীল কালাইকৃত ফুটকি (point)-সমূহ দালানে ব্যবহৃত হয় (গুম্বদ-ই সুরুখ ; ১১৪৭ খৃ.; মারাগা-তে A. u. Pope, A Survey of Persian Art পুনর্মুদ্রণ টোকিও ১৯৬৪, ৮খ, প্লেট ৩৪১)। দেয়ালগাত্রে বেশ ক্ষুদ্র কলাইকৃত ফলকের এই নূতন ধরনের সন্নিবেশ ৫ম/১১শ শতাব্দীর দালানসমূহে পূর্ব হইতে ব্যবহৃত বুটিখচিত (embossed) প্লাস্টারের সংযোগ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। সন্নিবেশিত এই ক্ষুদ্র ফলকগুলির বিন্যাস ঐ সময় হইতে অব্যাহতভাবে বিকাশ লাভ করে এবং বিভিন্ন অলংকরণ পদ্ধতি গৃহীত হয় (Nakhdjavan-এ মু'মিনা খাতূন-এর সমাধিসৌধ, ১১৮৬ খৃ., ঐ, প্লেট ৩৪৫ ; সামারকান্দ-এর গূর-ই আমীর , ১৪০৫ খৃ., ঐ, ৯খ, প্লেট ৫৪১-৩)। এই সকল প্রাথমিক উৎপাদন হইতে উদ্ভূত দুইটি কলাকৌশল প্রকাশ লাভ করে ; একটি ছিল মসৃণ, চকচকে মাটি বা চীনামাটির মোজাইক অথবা কাশী-ই মু'আররাক কারী এবং আরেকটি মসৃণ চকচকে মাটি বা চীনামাটির টালী অথবা কাশী কারী। "কাশী-ই মু'আররাক-কারী" (সংক্ষেপে মু'আররাক কারী) এই কলাকৌশলের মধ্যে রহিয়াছে বিভিন্ন রঙের মনোক্রোম নিখুঁত আকৃতিতে কর্তন করা যাহাতে পলিক্রোম নক্শা তৈরী হয় (Godard বর্ণিত কলাকৌশল, পৃ. গ্র., ৩৮৩-৪; H. E. Wulff, The traditional crafts of Persia, Cambridge Mass. ১৯৬৬ খৃ., ১২১-২৫, চিত্রসমূহ ; Pope, পৃ. গ্র., প্লেট ৫৪৬)। ইরানে এই পদ্ধতির প্রথম ব্যবহারের অন্যতম উদাহরণ ইসফাহানের ইমামযাদা জাফার (১৩২৫ খৃ.) (Godard, ৩৮৪)। একই নগরে (ঐ, ৩৮৬) অবস্থিত ইমামযাদা দারব-ই ইমাম (১৪৫৩ খৃ.), বিশেষভাবে তাবরীয-এর নীল মসজিদ (মাসজিদ-ই-কাবূদ, ১৪৫৩)-এ এই পদ্ধতির পূর্ণত্বপ্রাপ্তি ঘটে (ঐ প্লেটসমূহ ১৪৫, ১৪৬, Pope, পৃ. গ্র., ৮খ, প্লেট ৪৫২-৬)।

কাশী-কারী ঃ উপরে বর্ণিত পদ্ধতির বিপরীতে এই পদ্ধতিতে পোড়ামাটির টালির উপর নক্শাটি অনুকৃত করা হয় এবং এই টালিকে পরে পলিক্রোমবিশিষ্ট করার লক্ষ্যে সাধারণত বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড-এর সাহায্যে চিত্রিত করা হয়, তৎপর পুনরায় পোড়ানো হয়। স্থান ও কালভেদে এই পদ্ধতিতে ব্যাপক বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা দুইটি মতবাদের জন্ম দিয়াছে ঃ একটি কাশী-ই ফালায্যিরানূগ (glazed-চকচকে) এবং আরেকটি কাশী-ই হাফ্ত রানূগ (পলিক্রোম/সাত রং)।

৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে বাগ্দাদ ও সামাররা-তে প্রথমটির নক্শাগুলি প্রচলিত ছিল। প্রধান মসজিদে (আনু. ৮৬২) ব্যবহারের নিমিত্ত সুদূর কায়রাওয়ান (দ্র.) (D. Talbot Rice, Islamic Art, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ. চিত্র ৩৫) পর্যন্ত এই টালি রফতানী করা হইয়াছিল। কিন্তু ৭ম/১৩শ হইতে ৯ম/১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানত কাশান-এ নির্মিত কাশীগুলি ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। চুল্লীতে এনামেলের উপর প্রযুক্ত ধাতব অক্সাইড-এর পরিমাণ হ্রাস করার ফলে সৃষ্ট ধাতুর একটি পাতলা আস্তরণ (Film) দ্বারা ইহাদের ধাতব প্রভা উৎপন্ন করা হয় (দ্র. J. Sauvaget, Introduction a l'etude de la ceamique musulmane, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., ৩৬-৮ ; Wulf, পৃ. গ্র. ১১৯-২০। দুই প্রকারের মসৃণ টালির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ঃ প্রথমটি চেপ্টা কাশী যাহা তারকা বা ক্রস-এর আকৃতিবিশিষ্ট (তু. Panel of the Louvre, ১২৬৭ খৃ. ; Art de l'Islam, Catalogue de l'expostion de l' Orangerie des Tutleries, প্যারিস ১৯৭১ খৃ., প্লেট এবং নম্বর ৫৮) এবং পরে অপেক্ষাকৃত সুবৃহৎ কাশী যাহা প্রায়শ মিহ্রাব নির্মাণের উপাদানরূপে ব্যবহারের উপযোগী মডেলে নির্মিত হইত (তু. মাশ্হাদ-এ অবস্থিত ইমাম রিদা-র দরগাহ-এর মিহ্রাব, নির্মাণকাল ১২১৫ এবং কাশান-এ মাসজিদ-ই মায়দান-এর মিহরাব নির্মাণকাল ১২২৬ ; M. Bahrami, Recherches sur les Carreaux de revetement Lustre dans la ceramique persane du XIII^{e} au XV's., প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; Pope, পৃ. গ্র., ৪খ, ১৫৬৯-৯০, ১০খ, প্লেট ৭০২, ৭০৪, ৭২১-৭)।

কাশী-ই হাফ্ত রানূগ প্রথম শাহ 'আব্বাস-এর রাজত্বকাল (১৫৮৮-১৬২৯) হইতে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। একজন বড় নির্মাতা এই শাহ-এর মতে কাশী-ই মু'আররাক-এর নির্মাণকার্য ছিল শ্লথগতি ও ব্যয়বহুল। তিনি কোন কোন দালানে উহার পরিবর্তে চিত্রিত টালি ব্যবহার করেন (ইসফাহান-এর মাস্জিদ-ইশাহ্-এর অভ্যন্তরভাগ, নির্মাণকাল ১৬১২-২৮ ; Godard, পৃ. গ্র., ৩৯৩-৪ ; ইরান-শাহ্র, ২খ, ১৮২৭-৩১; Pope, পৃ. গ্র., ৯খ, প্লেট ৫৪৭-৯; A. Lane, Later Islamic Pottery[2], লন্ডন ১৯৭১ খৃ., প্লেট ৬৩)।

১৭শ-১৮শ শতাব্দী হইতে কাশী উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং উল্লেখযোগ্য প্রকারের উৎপাদনও যথেষ্ট সংখ্যক ছিল না (মাদ-রাসা মাদার-ই শাহ ইসফাহান, নির্মাণকাল ১৭০৬-১৪; মাসজিদ-ই সিপাহ্সালার, তেহরান, নির্মাণ শুরু ১৮৭৯ খৃ.)। বর্তমানে ইরানে এই শিল্পকলার কিছুটা পুনর্জাগরণ ঘটিয়াছে। কতিপয় স্থপতি কখনও কখনও স্বার্থকভাবে, দেশের নূতন স্থাপত্যে ইরানী অলঙ্করণের এই মৌলিক উপাদান সন্নিবেশিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন (নিশাপুর-এ সায়হুন নির্মিত খায়্যাম-এর সমাধিসৌধ)।

পারস্যবাসিগণ সিরিয়ায়ও এই শিল্পের আমদানী করে। এই কীশানীসমূহ দামিশক-এ নির্মিত হয়। যাহা হউক, তুর্কী রাজ্যেই এই শিল্পকলার বিপুল উন্নতি সাধিত হয়; কুবাদাবাদ-এর সালজূকী প্রাসাদে (৭ম/১৩শ শতাব্দী) তারকা এবং ক্রস আকৃতির অতি সুন্দর কাশী টালি ছিল (দ্র. Talbot Rice, পৃ. গ্র., চিত্র ১৮৫; Cl. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, লন্ডন ১৯৬৮ খৃ. চিত্র ৬১-২)। কোন্য়া-র 'আলা'উদ-দীন মসজিদে (নির্মিত ১২২০) পোড়ামাটির মোজাইক-এর

বিস্তর কলাকৌশল দৃশ্যমান (Lane, পৃ. স্থা:, ৩৯)। 'উছমানী সুলতানগণ শুরু হইতেই এই শিল্পকলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন (Yesil, Cami at Bursa, ১৪১৯-২৪; Talbot Rice, পৃ. গ্র., চিত্র ১৮৯)। ইযনিক-এ সর্বোৎকৃষ্ট কাশী উৎপাদিত হইত। ১৪৯০ খৃ. হইতে ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ইযনিক ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্মব্যস্ত কেন্দ্র (নমুনাস্বরূপ দ্র. ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সুলতান সুলায়মানের সমাধিসৌধ, নির্মিত ১৫৬৬ খৃ.); (ঐ. চিত্র ১৯৪-৫; আরও দ্র. Lane, পৃ. গ্র. ৩৯-৬৫, প্লেট ৩২; C. E. Arseven, Les arts decoratifs turcs, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ১৪৮-৭৫; O. Aslanapa, Turkish Art and Architecture, লন্ডন ১৯৭১ খৃ., ২৭০-৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের মধ্যে প্রদত্ত।

C. Adle (E. I.[2])/ মোঃ শহীদুল্লাহ্

আল-কাশী (الكاشى) ঃ অথবা আল-কাশানী, গিয়াছু'দ্-দীন জাম্‌শীদ ইব্‌ন মাস'ঊদ ইব্‌ন মাহমূদ; পারস্যদেশীয় গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ফারসী ও আরবীতে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার জীবনীসম্পর্কিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় তিনটি চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পান, যাহার প্রথমটি কাশান-এ দৃষ্ট হয় ১৪ যু'ল-হিজ্জা, ৮০৮/২ জুলাই, ১৪০৬ সনে। তাঁহার গ্রন্থসমূহে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত তারিখগুলি তাঁহার জীবনের কয়েকটি অধ্যায়ই নির্দেশ করে। ৮০৯/১৪০৭ সালে তিনি আর-রিসালাতু'ল-কামালিয়্যা অথবা সুল্লামু'স-সামা' (سلم السماء)/আকাশ-সোপান) সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থটিতে সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্ররাজির আকার ও দূরত্বসম্পর্কিত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ৮১৬/১৪১৩ সালে তিনি যীজ-ই খাকানী (زيج خاقانى) সমাপ্ত করেন। গ্রন্থখানি সম্ভবত হারাত-এ শাহ রাখ-কে উৎসর্গ করা হয়। এই গ্রন্থে তিনি বুহুত্ (buht)-এর সংযোজনের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় বিন্যাসে পার্থক্যের ভিত্তিতে নাসীরু'দ্-দীন-তূসী-র ঈলখানী তালিকাসমূহের উন্নতি সাধন করেন (দ্র. ক্ষণ. E. S. Kenneyed-র Studies in honour of S. H. Taqizadeh, লন্ডন ১৯৬২ খৃ., ১১৭-২০)।

৮১৯/১৪১৯ সনটি তাঁহার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সময়েই তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রাদির উপর একটি নিবন্ধ রচনা শেষ করেন। (E. S. Kennedy সম্পাদিত ও অনূদিত JNES-এ, ২০/২ ১৯৬১ খৃ., ৯৮-১০৮)। নিবন্ধটি কারা কয়ূনলু-এর যুবরাজ ইস্‌কান্দার-কে উৎসর্গিত এবং ইহাতে সংক্ষিপ্ত হইলেও নির্ভুলভাবে তিনি Almagest (৫, ১; ৫, ২, ইত্যাদি)-এ বর্ণিত যন্ত্রাদিসহ পূর্বতন মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ উদ্ভাবিত অন্যান্য যন্ত্রের বর্ণনা দিয়াছেন। একই বৎসরে তিনি তাঁহার নুযহাতু'ল-হাদা'ইক-এর প্রথম সংস্করণ শেষ করেন এবং সম্ভবত কাদী যাদা আর-রূমীর অনুপ্রেরণায় উলুগ বেগ (দ্র.)-এর আমন্ত্রণে তিনি সামারকান্দে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। রাজসভায় জীবনযাত্রা প্রণালী, উলুগ বেগ ও কাদী যাদা আর-রূমী-র সহিত তাঁহার সম্পর্ক এবং শেষোক্ত জনের বিশেষ বিশেষ সমস্যার বর্ণনা দিয়া শহর হইতে তিনি তাঁহার পিতার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন [ইংরেজী অনুবাদ E. S. Kennedy, Orientalia, ২৯/২ (১৯৬০ খৃ.) ১৯১-২১৩]। এই লেখা ব্যতিক্রমধর্মী বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ছিল। কোনও কোনও অনুচ্ছেদে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে রাজসভায় প্রবেশ লাভের জন্য কবিদের যে সমস্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইত তাহা উল্লেখ করেন। উলুগ বেগ-এর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তালিকা (Astronomical table) প্রণয়নে তিনি সহায়তা করেন এবং সামারকান্দে বৃহৎ মানমন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। এই মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় এবং Sayili-র ক্ষমতানুসারে সম্ভবত ইহা প্রথম য়ুরোপীয় মানমন্দিরসমূহকে প্রভাবিত করিয়াছিল (The Observatory in Islam, আঙ্কারা ১৯০৬ খৃ., ২৬০-৮৯)।

৮২৬/১৪২৩ সালে তিনি আর-রিসালা আল-মুহীতিয়্যা সমাপ্ত করেন (জার্মান অনুবাদসহ P. Luckey অনূদিত Der Lehrbrief uber den Kreisumfang, বার্লিন ১৯৫৩ খৃ.; B. A. Rosenfeld. V. S. Sigal এবং A. P. Yushkevic কর্তৃক রুশ অনুবাদ, মস্কো ১৯৫৬ খৃ.)। এই পুস্তকে তিনি অনন্যসাধারণ সঠিকতার সহিত X-এর মান প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেখান যে, sexagesimal প্রতীকে 2x=6 ঃ ১৬, ৫৯, ২৮, ১, ৩৪, ৫১, ৪৬, ১৪, ৫০, এবং দশমিক প্রতীকে ৬.২৮৩১৮৫৩০৭১৭৯৫৮৬৫। Algorithmie পদ্ধতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে পুনরোল্লেখকারী পদ্ধতির সাহায্যে sin 1^2-এর মান নির্ধারণ (তুলনামূলক আলোচনার জন্য দ্র. A. Aaboe-র Scripta Mathematica, ২০খ, ১৯৫৪ খৃ. ২৪-৯)। কাদী-যাদাও এই সমস্যা লইয়া বিব্রত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র মীরাম চেলেবী কর্তৃক উলুগ বেগ-এর জ্যোতির্বিদ্যার তালিকার উপর লিখিত দাসতূরু'ল-'আমাল ওয়া-তাসহীহু'ল-জাদওয়াল শিরোনামের এক ভাষ্যে এই সমস্যা বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাষ্যে দেখা যায় যে, আল-কাশী যে সমীকরণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে ঃ sine d=3 sine d—4 sine 3d, যাহা পাশ্চাত্য জগতে F. Viete কর্তৃক ব্যবহৃত হয় (১৫৪০-১৬১৩ খৃ.) এবং মান প্রতিষ্ঠিত হয়। sine 1°=0.017452 406 437 283 571।

৮২৯/১৪২৬ সালে তিনি নুযহাতু'ল-হাদা'ইফ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ করেন। এই সংস্করণে তিনি Chaucer-এর equatorium-এর বর্ণনা দিয়াছেন (দ্র. D. J. Price, The equatorie of the planets, ক্যাম্ব্রিজ ১৯৫৫ খৃ.)। ইহাকে তিনি তাবাকু'ল-মানাতি'ক নামে আখ্যায়িত করেন এবং ইহার লক্ষ্য ছিল হস্ত দ্বারা গ্রহের অবস্থান নির্ধারণ করা। এইরূপ একটি যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় Hispano-Arab Azarquiel-এর লেখায় [দ্র. আয-যারকালী] একই বৎসর তিনি রচনা করেন লাওহু'ল-ইত্তিসালাত, যাহার ফলে রৈখিক সংযোজনের দ্রুত হিসাব সম্ভব হইয়াছিল। এই দুইটি লেখা ১৯৬০ খৃ. প্রিন্সটনে The Planatory equatorium শিরোনামে E. S. Kennedy কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হয়।

৮৩০/১৪২৭ সালে তিনি তাঁহার মিফতাহু'ল-হিসাব গ্রন্থখানি উলুগ বেগ-এর গ্রন্থাগারে উৎসর্গ করেন (রুশ অনু. B. A. Rosenfeld V. S. Segal A. P. Yushkevic, মস্কো ১৯৫১ খৃ.)। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি তাঁহার লিখিত গ্রন্থের একটি তালিকা (অসমাপ্ত) প্রদান করিয়াছেন, বিশ্লেষণাত্মক অংশে গাণিতিক নীতিমালা প্রচার করিয়াছেন এবং বর্তমানে Ruffini-Horner-এর নামানুসারে চালু পদ্ধতির সাহায্যে তিনি মূল বাহির করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি Tartiglian ত্রিভুজের হিসাব করিয়াছেন [দ্র. আল-কারাজী] এবং ঘোষণা দিয়াছেন যে, তিনি ৯-এর সাহায্যে প্রমাণ জানেন, পাকৃতিক সংখ্যার চতুর্থ শক্তি পর্যন্ত

সংখ্যার সিরিজের যোগফল বাহির করিয়াছেন (তু. F. Woepcke, Sommations de series, in Journal de mathemtiques pures et appliquees, ১০/২ প্যারিস ১৮৬৫ খৃ., ৩২-৬)। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের মতো চূড়ান্ত Sexagesimal পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং দশমিক ভগ্নাংশের উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা Emmanuel Bonfils of Tarascon (চতুর্দশ শতাব্দী)-এর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও Stevin of Bruges-এর পূর্বে (১৮৮৫ খৃ.) য়ুরোপে স্বীকৃত হয় নাই। তিনি এক পদ্ধতি হইতে অন্য পদ্ধতিতে যাইবার নিয়মও নির্দেশ করেন, বিভিন্ন হিসাবের জন্য সহায়ক তালিকা প্রদান করেন এবং কিছু অমীমাংসিত পদ্ধতির সমাধান করেন [দ্র. আল-কারাজী]।

১৯ রামাদান, ৮৩২/২২ জুন, ১৪২৯ সনে সামারকান্দ-এ আল-কাশী ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও (১) Brockelmann ২,২৩১, S II, ২৯৪; (২) Suter, ১৭৩, নং ৪২৯; (৩) কাহহালা, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৩খ, ১৫৮, ৮খ, ৪৩।

J. Vernet (E. I.²)/মোঃ শহীদুল্লাহ্

কাশীনা, কাশনা (দ্র. কাতসিনা)

কাস্কার (كسكر) ঃ ইরাকের একটি প্রাচীন শহরের নাম। খলীফা 'আবদু'ল-মালিক নিযুক্ত ইরাকের স্থানীয় শাসনকর্তা আল-হাজ্জাজ (দ্র.) যখন ঐ এলাকার একটি বিদ্রোহ দমন করেন তখন তিনি ৮৩-৬/৭০২-৫ সালে একটি নূতন শহর নির্মাণ করিতে শুরু করেন। যেহেতু এই নূতন শহরটি এই এলাকার অপর দুইটি প্রাচীনতর আরব রাজধানী উত্তর দিকে আল-কূফা এবং দক্ষিণ দিকে আল-বসরা-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, তাই ইহার নামকরণ করা হয় আল-ওয়াসিত (الواسط-কেন্দ্র)। এই শহরের নির্মাণ স্থান হিসাবে তিনি তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী কাসকার-এর পার্শ্বস্থ এলাকা নির্বাচন করেন। কাস্কার শহরটি সাসানীয় যুগে যে ভূমিকা পালন করে তাহা মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। নূতন এই মুসলিম শহরটি নির্মাণ করা হয় তাইগ্রীস নদীর পূর্বতীরে। কাসকার-এর অবস্থান ছিল ঠিক ইহার বিপরীত দিকে নদীর পশ্চিম তীরে। শহরের এই দুই অর্ধাংশ একটি নৌকা দ্বারা নির্মিত সেতুর মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। ওয়াসিত অথবা কাসকার-এর কোনটিই বর্তমানে টিকিয়া নাই এবং অতি আধুনিককাল পর্যন্ত উহাদের সঠিক অবস্থান ছিল অনিশ্চিত। কারণ তাইগ্রীস নদীর গতিধারা পরিবর্তনের ফলে নদীটি শহর দুইটি হইতে বহু দূরে সরিয়া যায় ও ৮ম/১৪শ শতকের মধ্যে শহর দুইটি হৃতসর্বস্ব ও গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। কাসকার ও ওয়াসিত-এর মধ্যবর্তী সুনির্দিষ্ট সম্পর্কটি সুস্পষ্ট নয়। ওয়াসিত-এ সম্পাদিত সাম্প্রতিক খনন কার্যে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হইতে উমায়্যা শাসনের কেন্দ্র রূপে শহরটির প্রশাসনিক গুরুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (F. Safar, The Sixth Season's excavations, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.)। প্রশাসনিক ভবনসমূহের সহিত বাগদাদ-এর 'গোলাকার নগরী'র প্রশাসনিক ভবনসমূহের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য (O. Grabar, Al-Mushatta, Baghdad and Wasit, in the World of Islam, Studies in Honor of Phillip K. Hitti, লন্ডন ১৯৫৯ খৃ., ৯৮-১০৮) যে প্রশ্নের সৃষ্টি করে তাহা হইতেছে, কাস্কার সম্ভবত মৌলিকভাবে সাধারণ নাগরিকের জন্য আবাসিক এলাকারূপে ব্যবহৃত হওয়ার লক্ষ্যে নির্মিত হইয়াছিল; অপরপক্ষে ওয়াসিত সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সম্ভবত সামরিক ছাউনির জন্য ব্যবহৃত হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি আর-রাক্কাতু'র-রাফিকা (য়াকূত, মু'জাম, ২খ, ৭৩৪) শহরেও বিরাজমান ছিল। কালের আবর্তনে কাস্কার ক্রমশ অধিকতর খ্যাতিমান স্থানের আড়ালে বিস্মৃত হইয়া যায়। ওয়াসিত সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য উক্ত প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কাস্কার সম্ভবত আসিরীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত সম্ভবত আসুর-বানিপালের সময় কালের একটি শিলালিপির একটি খণ্ডাংশে (ك-س-ك-ر) নামের একটি ব্যাবিলনীয় শহরের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয় ([১৮]. ৮২ ঃ ৩-২৩ ঃ ১২৮; দ্র. Bezold, Catalogue, ১৮২৪; তু. Streck, Assurbnipal, Leipzig ১৯১৬ খৃ., পৃ. ৮৮, ৭৯০। সম্ভবত ব্যাবিলনীয় তালমুদে এই স্থানটি সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। [য়োমা, পত্রক Ioa, ইহাতে উল্লিখিত 'বাশকার' সম্ভবত শুদ্ধ করিয়া 'কাসকার' পড়িতে হইবে। দ্র. Marquart, Eransahr, Abh. G. W. Gott., New Series, ৩/২, বার্লিন ১৯০১, খৃ.১৬৪)। তবে যেকোন ক্ষেত্রেই কাস্কার, যাহা সিরীয় ও খৃস্টীয় আরব সূত্রসমূহে কাস্কার নামে উল্লিখিত হইয়াছে—ব্যাবিলনিয়ার খৃষ্টান শহরসমূহের মধ্যে অন্যতম ও প্রাচীনতম। এই অঞ্চলের যাজক সংক্রান্ত ইতিহাসে প্রায়শই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নামধারী এপিসকোপালীয় এলাকাটি নেস্টোরীয় মতবাদী গির্জাসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হইত। ইহার অধিকর্তা ছিলেন সেলেউসিয়া-টেসিফন (দ্র. আল-মাদা'ইন]-এর ধর্মগুরুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধি।

৪১০ হইতে ৭৯০ সন পর্যন্ত সময়কালে সিরিয়াক পরিষদসমূহের প্রণীত বিধানসমূহে স্বাক্ষরদাতাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাসকার-এর বিশপবর্গ [Guidi in ZDMG, ৪৪খ, ৪১১ এবং Chabot in Notices et extraits, ৩৭; (প্যারিস ১৯০২ খৃ.), ৬৭৫]। সিরিয়াক কালপঞ্জী "Chronicle of Arbela" অনুযায়ী খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধের মতো অতি প্রাচীনকালেই কাস্কার অঞ্চলে একজন বিশপ নিযুক্ত ছিলেন। খৃষ্টীয় আরব "Chronicle of Se'ert"-তেও খৃষ্টাব্দ ৪১০-এর পূর্বের সময়কালে উক্ত এলাকার ধর্মীয় প্রশাসনে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। কাস্কার-এর ধর্মীয় প্রশাসন ও ইহার দায়িত্বে নিযুক্ত বিশপগণের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য J. Labourt, Le Charistianisme dans l' empire Perse sous la Dynastie Sassanide, প্যারিস ১৯০৪ খৃ., Passim (নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য); Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien (=Abh. Pr. Ak. Wiss., ১৯১৯ খৃ., নং ১), ৩০-১।

কাস্কার শহর, ইহার নাম বহনকারী বিশপ এলাকার ন্যায়, বহুসংখ্যক ধর্মীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার আবাসস্থল ছিল। ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় ৮ম শতকে য়েশূ'দেনাহ কর্তৃক সংকলিত কিতাবা de নাখপূর্তা নামক গ্রন্থে (সম্পা. Chabot in Melange d'archeol. et d'histire de l'Ecole Francaise de Rome, ১৬খ, (প্যারিস ১৮৯৬ খৃ., ২২৫ পৃ.); ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রখ্যাত ছিলেন মহান আবরাহাম (মৃ. ৫৮৮), (দ্র. য়েশূদেনাহ, নং ১৪; Labourt. পৃ. গ্র. ৩১৫; A. Baumstark, Gesch. der syrisch. Litteratur, বন্ন

১৯২২ খৃ., ১৩০)। সাসানীয় রাজন্য খুসরাও ২য় পারভেয (৫৯০-৬২০)-এর দরবারে অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন কাস্কার নগরীর আবা, তাঁহার প্রসঙ্গে দ্র. Baumstark, পূ. গ্র., ১২৩। কাস্কার-এর অধিবাসী ছিলেন এরূপ অপরাপর সিরিয়াক গ্রন্থকার সম্পর্কে ('আবদীশো', গ্রিগো, এলিয়া) দ্রষ্টব্য Baumstark পূ. গ্র. ৩০, ১২৮, ৪২০। কাসকার সম্পর্কে সিরিয়াক সূত্রসমূহের জন্য, Wright, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum লন্ডন ১৮৭০ খৃ. এবং ঐ গ্রন্থকারের, Cat. of the Syriac Manuscripts in Cambridge, ক্যামব্রিজ ১৯০১ খৃ., ১২৮৪ ও সেই সঙ্গে Sachau, Katalog der Syrisch. Handschr. in Berlin, বার্লিন ১৮৯৯ খৃ., ৯২৩, গ্রন্থসমূহে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ।

আরসাচীয় (Arsacid) যুগে কাস্কার নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়। এই রাজ্যটি প্রথম সাসানীয় সম্রাট ১ম আরদাশীরের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (তু. Noldeke, Gesch. der Arab. und Perser zur Zeit der Sasaniden, লাইডেন ১৮৭৯ খৃ., ১৩ নং ৫)। সাসানীয় প্রদেশ ইরাক প্রসঙ্গে কাস্কারকে ৭২ টি প্রশাসনিক এলাকার একটিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য Streck, পূ. গ্র. দ্র. গ্রন্থপঞ্জী, ১৫, ১৮)। পরে মুসলিম শাসনকালের ন্যায় দাজলা ঃ (তাইগ্রীস) নদীর পূর্ব তীরস্থ এলাকা লইয়া গঠিত ছিল; উত্তরে আধুনিক কূতু'ল-আমারা ঃ হইতে দাজলা নদীর মোহনা পর্যন্ত এলাকাটি বিস্তৃত ছিল। কখনও কখনও ইহাকে মায়সান (দ্র.) এলাকার সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (এই প্রসঙ্গে তুলনীয় Schaeder in Isl. ১৪খ, ১৯২৪খৃ., ১৭ প্.)। কাস্কার-এর ধর্মীয় প্রশাসনিক এলাকাটি নিশ্চিতভাবেই ঐ একই নামধারী সাসানীয় এলাকার সহিত প্রায় সর্বাংশে এক (তু. Sachau, Die Chronik von Arbela, ১৬-তে অন্তর্ভুক্ত মানচিত্র)।

কস্কারকে দায়লাম-এর রাজধানীর নামরূপেও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করা হইয়াছে। শেষোক্ত স্থানটি সাধারণত দুলাব নামে পরিচিত (তু. G. Le Strange, The Lands of the East. Cal., ১৭৪; de Morgan, Mission scientifique en Perse ১খ, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., ২৭৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) B G A, স্থা.; (২) আল-বালাযুরী, ফুতূহ, ৫৮২; (৩) য়াকূত, মু'জাম, ৪খ, ২৭৪; (৪) আল-কায্বীনী, আছারু'ল-বিলাদ, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ২৯৯; (৫) হাম্দুল্লাহ্ মুস্তাওফী, নুয্হাতু'ল-কুলূব, G. M. S., ২৩/১, ১৬২, ৬; (৬) G. Le Strange, the Lands of the Eastern Caliphate, কেম্ব্রিজ ১৯০৫ খৃ., ৩৯, ৪৩, ৮০; (৭) ঐ লেখক, in JRAS (১৮৯৫ খৃ.), ৪৪ প.; (৮) M. Streck, Babylonien nach den arab, geograph. ২খ. লাইডেন ১৯০২ খৃ., ৩১৮ প., ৩২১ প.; (৯) Ritter, Erdkunde, ১০খ, ১৯১; (১০) দা. মা. ই., ১৭খ, ২৬৮।

M. Streck [J. Lassner] (E. I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাস্তামূনী (قسطمونى) ঃ আধুনিক তুর্কী ভাষায় কাস্তামোনু (Kastamonu), উত্তর তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শহর (জনসংখ্যা ১৯৭০ খৃ., ২৯, ৩৩৮ ; অবস্থান ঃ ৪১°২২ উ. ৩৩°৪৭ পূ.), প্রাদেশিক রাজধানী (il Merkezi) এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি ব্যস্ত বাণিজ্য শহর। কাস্তামোনু প্রদেশটি (il) মোটমুটি প্রাচীন প্যাফ্লাগোনিয়া (Paphlagonia)-র স্থলে অবস্থিত এবং বর্তমানে ইহা চৌদ্দটি প্রশাসনিক উপবিভাগে (ilce) বিভক্ত। ইহা উত্তরে কৃষ্ণসাগর এবং অন্যান্য দিকে যোঙ্গুল্দাক, চাঙ্কিরি (কান্গ্রী) চোরুম ও সিনোপ প্রদেশগুলি (ils) দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার জনসংখ্যা ছিল (১৯৭০ খৃ.) ৪,৪৬,৬০১।

কাস্তামোনু শহরটি একটি সংকীর্ণ উপত্যকা (Kastamonu deresi বা Kara-comak deresi)-র উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। উপত্যকাটি গোকিরমাক নদীর উপরিভাগের একটি ক্ষুদ্র উপনদী দ্বারা গঠিত। শহরের কেন্দ্র স্থল নদীর বাম (পশ্চিম) তীরে অবস্থিত এবং সেইখানে খাড়া চূড়াবিশিষ্ট নগর দুর্গটি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। ইব্ন সা'ঈদ বর্ণিত "তুর্কোমানদের অত্যুচ্চ সুরক্ষিত দুর্গ" এইটিই এবং ইহা বায়যান্টাইন, সাল্জূক', চান্দারিদ ও 'উছমানী যুগের কর্মসমষ্টি। শিলালিপিবিহীন এই দুর্গটি ২য় মাহ্মূদের রাজত্বকাল হইতে সৈন্যমুক্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং সর্বশেষ ১৯৪৩ খৃ. ভূমিকম্পে ইহা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কাস্তামোনু নামের উৎপত্তির রহস্য অস্পষ্ট। দীর্ঘকাল পূর্বে র‍্যাম্যে (Ramsay)-র নির্দেশনা অনুসারে যদি ও কাস্তামোনু "এশিয়া মাইনরের উত্তরে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রোমক সড়ক" (অর্থাৎ Nicomedia Iznikmid/Izmit)-পমপেইওপলিস (তাশকোপরু, কাস্তামোনু-র নিকটে) আমাসিয়া (আমাস্য়া)-এর নিকটে অবস্থিত ছিল এবং পরবর্তী বায়যান্টাইন আমলে স্পষ্টত একটি প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছিল, তবুও রোমক কিংবা প্রাথমিক বায়যান্টীয় দলীলপত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ফলে কাস্তামোনুকে, উদাহরণস্বরূপ, জারমানিকোপোলিস (Ainsworth, Bore এবং বহু পরবর্তী লেখক) অথবা সোরা (Doublet, Bull, Corr, Hell., ১৮৮৯ খৃ.)-র সহিত সনাক্ত করার প্রয়াস কিংবা এমনকি Hittites হইতে (Gas Tumanna Kastamonu) (Yucel, ৭ম অধ্যায় অথবা Comneni-র সহিত উহার জ্ঞাত সংস্পর্শ হইতে কোন প্রশস্ত উৎপত্তি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অবশ্যই এই বাস্তবতার নিরিখে হইতে হইবে যে, ১১শ শতাব্দীতে শব্দটির বায়যান্টীয় Khastamon-এর ব্যবহারের পূর্বেকার কোনও রূপের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই রূপটি হইতেই [অথবা বরং যেমন এই সকল প্রত্যক্ষ পরিবর্তনে হইয়া থাকে, গ্রীক শব্দের কর্মকারক Khastamona হইতে তু. P. Wittek, BZ [১৯৩৫ খৃ.) পৃ. ৪৯-৫০] আরবী ও তুর্কী ভাষায় বিভিন্ন রূপের ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে। অতি সাধারণভাবে সাল্জূক আমল হইতে আরম্ভ করিয়া 'উছমানী যুগের শেষ পর্যন্ত সময়কালে কাস্তামূনী নামটি প্রচলিত থাকে। তু. যাহা হউক, ইহার বিভিন্ন রূপ, যথা ঃ কাশ্তামূনী (ইদ্রীসী, তু. Miller, Mappae Arabicae ১/২, শীট ৪ ; ৩/১, পৃ. ৪) ; কাস্তামূনিয়া (আদ-দিমাশ্কী, কিতাব নুখ্বাতু'দ্-দার, সম্পা. Mehren, পৃ. ২২৮) ; কাস্তামুনিয়া (আল-'উমারী, সম্পা. Quatremere পৃ. ৩৮০ ; সম্পা. Taeschner, পৃ. ২৩, ৩৯-৪০) এবং অধিকন্তু বিভিন্ন পাশ্চাত্য অপভ্রংশ ঃ Civitas Constamnes (Albrtus Aqunsis). ; Caslamea (Clavijo) ; Castamina, Castamena (Promontorio

de Campis (আনু. ১৪৭৫ খৃ., সম্পা. Babinger) ; Chastarmina, Casstimana (Benedetto Dei) ; Castemol (Menavino) ; ১৯শ শতাব্দীর জন্য ঃ Castemboli, Castemouni (Bore, ১৮৩৮ খৃ.) ; Costambone (Murray, Handbook for Asia Minor [আনু. ১৮৭০ খৃ.])।

মান্যিকার্ট (৪৬৩/১০৭১)-এর পরিণামের পর তুর্কীগণ কর্তৃক এই নগরীর প্রথম দখল হইতে শুরু করিয়া আনাদোলু ইয়ালেত (প্রদেশ)-এর অন্যতম সান্জাক (জিলা) হিসাবে ইহার দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত 'উছমানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ পর্যন্ত (৮৬৬/১৪৬১-২) চারি শতাব্দী ব্যাপিয়া কাস্তামোনুর রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায়শই বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ এবং Cl. Cahen ও অন্যদের প্রয়াস সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতার সঠিক ধারাবাহিকতা সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় নাই। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রথমাংশ 'উছমানী রাজ্যের বিস্তৃতি ও পরিণামে দারু'ল্-ইসলাম ও দারু'ল্-হার্ব-এর মধ্যবর্তী পশ্চিমের সীমান্তের পরিবর্তন পর্যন্ত কাস্তামোনু শহর ও দুর্গটি একটি বিশাল প্রদেশের কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল এবং সেইখানে উজ্-এর তুর্কোমানগণ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বায়যান্টাইন, দানিশ্মান্দ্ ও সাল্জূক শাসকদের এবং কমবেশী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী বিভিন্ন বংশের—তন্মধ্যে ইস্ফানদিয়ার-ওগুল্লারী বা চান্দারীগণ [দ্র.] ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, পরস্পরবিরোধী ও ক্রমাগত দাবীর ইহা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

১০৭৩-৪ খৃষ্টাব্দের দিকে বায়যান্টাইন সম্রাট আলেক্সিস কম্নেনাস (Alexis Comenus)-কে কাসতামোনুর উপকণ্ঠে কতিপয় তুর্কোমানের নিকট হইতে পলায়নের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। একটি সন্দেহজনক কাহিনী অনুসারে এই নগরটি দানিশমান্দ মালিক আহ্মাদ গাযীর অন্যতম সেনানায়ক জনৈক 'উছমানজীক বেগ কর্তৃক পূর্বোক্তজনের ইনতিকালের অল্পকাল পূর্বে বিজিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে [হুসায়ন হেযারফেন, তানকীহু'ত্-তাওয়ারীখ, অনু. A. D. Mordtmann, ZDMG,৩০খ, (১৮৭৬ খৃ.) ৪৭০]। এই কাহিনীতে কাসতামোনুর পূর্ববর্তী নাম আক্লানোস উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে সামান্য ভিন্নতর বর্ণনা কাতিব চেলেবী তাঁহার জাহান-নুমা গ্রন্থে (পৃ. ৬২৯) প্রদান করিয়াছেন। ১১০১ খৃ. লম্বার্ডগণ ও তুর্কীগণ কাসতামোনু শহরে ও উহার সন্নিকটে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ; জন কমনোনাস-এর প্যাফ্লা-গোনিয়া আক্রমণ (? ১১২৬ অথবা ১১৩২খৃ.) পর্যন্ত তথায় দানিশ্মান্দ শাসন অক্ষুণ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। ১১৩২ খৃ. শীতকাল নাগাদ কাসতামোনু পুনরায় মুসলিমদের হস্তগত হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ নাগাদ কাসতামোনু রূমের সাল্জূকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া যায়। স্পষ্টত কাসতামোনু সেই বংশের মালিকানা যাহারা সেইখানে সম্ভবত ৬০৮/১২১১ সনে এবং নিশ্চিতরূপে ৬২৫ হিজরী সনে এক দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্ব হুসামুদ্-দীন চুপান (চোবান)-কে নিজদের বেগ্লার বেগী (بیگلر بیگی=প্রধান নৃপতি)-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময় তুর্কোমানদের রাজনৈতিক ভূমিকা কি ছিল তাহা অনুমান সাপেক্ষবিষয় ; একটি সম্ভাবনা এই যে, সাল্জূকদের প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতার ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছিল, যাহারা নগরটি নিয়ন্ত্রণ করিত ; অপরটিকে প্রদেশের অধিকাংশ পশ্চাদভূমি ছিল তুর্কোমানদের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে। নিম্নস্তরে ইহা স্পষ্ট যে, একটি গ্রীক কিংবা গ্রীক আচরণে অভ্যস্ত (এবং খৃষ্টান) জনগোষ্ঠী সালজূক শাসনাধীনে বিরাজমান ছিল। অধিকন্তু প্রদেশটি ছিল গ্রীক ক্রীতদাস সরবরাহের একটি উৎস। এই সকল ক্রীতদাস উজ্-এর লুণ্ঠন অভিযানসমূহে সংগৃহীত হইয়া সাল্জূক সেনাবাহিনীর জন্য প্রেরিত হইত।

পূর্ব ও মধ্য আনাতোলিয়ার ঈলখানী শাসনামলের কাসতামোনুর ইতিহাসও সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট নহে। প্রথমে বেগ্লারবেগীরূপে জনৈক য়াভতাশের শাসনামলে আনু. ৬৬০/১২৬২ সনের দিকে শহরটি মঙ্গোল বংশীয় জনৈক তাজু'দ্-দীন মু'তাযয্ -এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ইহা তখন একটি ইক্তা' (জায়গীর)-রূপে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ৬৭৬/১২৭৭ সনে তাঁহার ইনতিকাল হইলে তাহার পুত্র মুজীরু'দ্-দীন আমীর শাহ্ (মৃ. ৭০১/১৩০২) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এই আমলেও কাসতামোনু কখনও কখনও এবং অল্প সময়ের জন্য হুসামু'দ্-দীন চুবানের পুত্র (হুসামু'দ্-দীন আল্প য়োরুক) ও কথিত পৌত্র (মুজাফ্ফারু'দ্-দীন য়াভলাক্ আরস্লান)-এর অধিকারভুক্ত ছিল। পৌত্র নিঃসন্দেহে কাসতামোনুর দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিদ্যমান মুসলিম কীর্তি তথাকথিত আতাবেগ জামি'ই নির্মাণ করেন। (৬৭২/১২৭৩) যিনি ৬৭৯/১২৯০ সনের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং ৬৯১/১২৯২ সনে ইনতিকাল করেন। অধিকন্তু ৬৭১/১২৭১ সনের পূর্বে পেরবান (Pervane) মু'ঈনু'দ-দীন-এর এক পুত্র কাসতামোনু শাসন করিতেন, যাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ বেগ ১২৯৫-৯ খৃ. উহা পুনরায় অধিকার করেন।

ক্যাহেন (Cahen)-এর মতে চুপানের বংশধরগণ এবং যেই পরিবারটি রূমের ছায়াবৎ সাল্জূক সালতানাতের শেষ বৎসরগুলিতে কাসতামোনুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শাসক বংশ ইস্ফান্দিয়ার ওগুল্লারী চান্দারী বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল উহাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না। ৭১৫/১৩১৪ সনের পূর্বেই কানদার-এর পুত্র সুলায়মান পাশা কাসতামোনুর অধিপতি হন এবং তাহা হইয়াছিলেন দৃশ্যত ঈল্খানী শাসক আবূ সা'ঈদের সামন্তরূপে। ৭২৫/১৩২৫ সনে সেইখানে নিশ্চিতরূপে ইল্খানী মুদ্রা চালু করা হয়। [Lane Poole, Cat B. M., ৬খ, (অনিশ্চিত) ; য়ামান ১খ, ১০৫] এবং দৃশ্যত উহা ৭৪০/১৩৩৯ সন পর্যন্ত চালু থাকে (Zambaur, Munzpragung পৃ. ১৯৫)। প্রায় এই সময়েই ইব্ন বাত্তূতা কাস্তামোনু ভ্রমণ করেন (১৩৩১/২ অথবা ১৩৩৩/৪ খৃ. শীতকালে)। সেইখানে তিনি চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেন এবং উহাকে (রূমের) বৃহত্তম ও সুন্দরতম শহরগুলির অন্যতমরূপে বর্ণনা করেন। এইখানে দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং মূল্যও কম। ইব্ন সা'ঈদত (আল-কাল্কাশান্দী সহ, সুবহ্, ৫খ, ৩৪২) কাস্তামোনুর বর্ণনা দিয়াছেন ঃ ইহা একটি প্রস্তরনির্মিত মাঝারি আকারের শহর, মসজিদ, বাজার ও স্নানাগারসমৃদ্ধ, কিন্তু প্রাচীরবিহীন এবং নদী-নালা ও প্রচুর উদ্যানসমৃদ্ধ এলাকায় অবস্থিত এই শব্দগুলি অধিকাংশ মুসলিম পর্যটক এবং তাঁহাদের পাশ্চাত্যের উত্তরসূরিগণ ২০শ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন।

১ম বায়াযীদ কর্তৃক ৭৯৪/১৩৯২ সনে কাসতামোনুকে 'উছমানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তীমূর কর্তৃক আঙ্কারা অধিকারের পর উহাকে আবার স্থানীয় শাসক বংশের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হয় এবং ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক ৮৬৬/১৪৬২ সনে উহা পুনর্বার বিজিত হয়। রাজাব ৮৭৩/জানুয়ারী ১৪৬৯ সনে জেম সুলতানকে কাস্তামোনুর প্রাদেশিক গভর্নররূপে নিয়োগের

মাধ্যমে পুরাতন শাসক বংশের বিলুপ্তি ঘোষিত হয়। জেম সুলতান মধ্য শা'বান ৮৭৯/১৪৭৪-এর শেষভাগ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। 'উছমানী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আমলে যাহা কাস্তামোনুর সর্বপ্রথম উল্লেখ (আনু. ১৪৬৯-৭৪ খৃ.) বলিয়া মনে হয় Capitaneati dui di Castamina তাহা জেনোয়ার অধিবাসী Promontorio de Campis-এর দেয়া বর্ণনা। তদনুসারে উহার রাজস্ব আয় ছিল ১৪,০০০ দুকাত এবং উহার প্রতি ২৫৫০ জন লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল।

'উছমানী সামরিক ও যোগাযোগ সড়কসমূহের প্রেক্ষিতে কাস্তামোনুর ভৌগোলিক অবস্থান সম্ভবত 'উছমানী শাসনাধীনে উহার আপেক্ষিক অখ্যাতি ও ১৯ শতাব্দ পর্যন্ত সেইখানে পর্যটকের স্বল্পতার জন্য অংশত দায়ী। উস্কুদার হইতে পূর্বগামী এবং গেরেডে (Gerede), তোস্যা (Tosya) ও 'উছমানজীক (Osmancik) সংযুক্তকারী মহাসড়ক ওরটা কোল (orta Kol)-এর উত্তরে ইহার অবস্থান। ফলে কাস্তামোনু অত্যুচ্চ ইল্গায (Olygassus) পর্বত-মালার সুদূর প্রান্তে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। শহরটি সম্পর্কে আওলিয়া চেলেবির বর্ণনা এখন আর পাওয়া যায় না এবং ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে কাস্তামোনুতে প্রধান কোনও পর্যটকের আগমন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদিও জানা যায় যে, আহ্মাদ পাশা বোন্নেভালকে সেইখানে ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি অল্প সময়ের জন্য নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল।

পাশ্চাত্যের কোন পর্যটকের এই শহর সম্পর্কে প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় J. M. Knneir-এর দেয়া প্রতিবেদনে। তিনি ১৮১৪ খৃ. এই শহরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার হিসাব অনুযায়ী শহরটিতে ৩০টি মসজিদ (মীনারসহ), ২৫টি স্নানাগার (حمام), ৬টি সরাইখানা (خان) ও একটি গ্রীক গির্জা ছিল। বাজারগুলিতে দ্রব্য সরবরাহ ছিল প্রচুর, কিন্তু অধিবাসিগণ প্রায়ই দুর্ভিক্ষকবলিত হইত, বিশেষ করিয়া প্রচণ্ড শীতে স্থানীয় কৃষিকার্য বিনষ্ট হইলে। আরও বিশদ বিবরণ দিয়াছেন ফরাসী পর্যটক Eugene Bore (১৮৩৮ খৃ.)। তিনিই প্রথম কিল্লা সম্পর্কে বিবরণ "elevant hardiment dans les airs ses tours et ses remparts en Lambeau", লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তিনি স্থানীয় প্রশাসন তান্জীমাত নূতন লোকদের হাতে দেখিতে পাইয়াছেন। Bore-এর পরবর্তী বৎসরে W. F. Ainsworth আরও সতর্কতার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি সেইখানকার দুর্গের একটি নকশা অঙ্কন করিয়াছেন।

কাস্তামোনুর জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ, অন্তত পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ছিল মুসলিম। Ainsworth-এর মতে খৃষ্টান অধিবাসীদেরকে আনু. ১৭৩০ খৃ. Gokirmak নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামে বিতাড়িত করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাদেরকে আবার ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দেওয়া হয়। Ainsworth আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সর্বমোট ১২,০০০ পরিবার ও দৃশ্যত অতিরঞ্জিত ৪৮,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৬০টি গ্রীক ও ২০টি আর্মেনীয় পরিবার বর্তমান ছিল। সিকি শতাব্দী পূর্বে Kinneir ১২,০০০ লোকসংখ্যার মধ্যে ৩০০ গ্রীক ও ৪০টি আর্মেনীয় পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন ১৯ শতাব্দীর শেষে Cuinet প্রকাশিত 'উছমানী পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, ১৩,২০০ মুসলিম, ১,৭৯৫ গ্রীক ও ৫৭২ আর্মেনীয় জনসংখ্যার হিসাব দিয়াছেন।

১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'উছমানী সাম্রাজ্যের এশীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থানের ন্যায় কাস্তামোনু অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হয়। Kinneir-এর মতে বাণিজ্য ছিল 'যৎসামান্য' এবং তিনি উৎপাদকের অভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন; অনুরূপভাবে Bore অধিবাসীদের "দারিদ্র্য ও দৈন্য"-এর এবং ব্যবসায়ে দারুণ অবনতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেবল চামড়া পাকা করার কাজ সক্রিয়ভাবে চালু ছিল। অন্য দিকে এক বৎসর পর Ainsworth কাস্তামোনুকে "জনাকীর্ণ ও কর্মব্যস্ত নগরী" হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তখন প্রায় আঙ্কারার সমতুল্য মানের পশমের এবং তাম্র পাত্র ও কার্পাস বস্ত্রের বিরাট ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তুলা আদানা হইতে আনা হইত এবং শহরে উহা দ্বারা বস্ত্র তৈরী করা হইত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের ফলে কাস্তামোনুর ভাগ্য নিম্নমুখী হয়। কোনও রেলপথের উপর অবস্থিত না হওয়ায় ১৯শ শতাব্দীর শেষদিকে বহির্জগতের সহিত আনাতোলিয়ার যোগাযোগ স্থাপনে ইহার কোনও অংশ ছিল না। অতি সাম্প্রতিককালে আনাতোলিয়া সড়ক পরিবহনের ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে কাস্তামোনুর নূতন করিয়া সমৃদ্ধি সূচিত হইয়াছে। ফলে ইহার বর্তমান দৃশ্য Ainsworth-এর বিবরণকে মনে করাইয়া দেয়, অবশ্য ইহার প্রেক্ষিতে সেই আমল হইতে এই পর্যন্ত খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত (১) মুহাম্মাদ বেহীত, কাস্তামোনি আছার-ই কাদীমেসি, ইস্তাম্বুল ১৩৪১ হি. ; (২) ত. ম. য়ামান, কাস্তামোনু তারিখি ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ. ; (৩) A. Gokoglu, Paphlagonia....eski eserleri ve arkeolojisi, ১খ, কাস্তামোনু ১৯৫২ খৃ. ; (৪) V. Cuinet, La Turquie d' Asie, প্যারিস ১৮৯৪ খৃ., ৪৬২ প ; (৫) J. M. Kinneir, Journey through Asia Minor.....লন্ডন ১৮১৯ খৃ. পৃ. ২৮ প. ; (৬) Eugene bore, Memoire d'un voyageur en Orient, প্যারিস ১৮৪০ খৃ. পৃ. ২৭৩-৮২ ; (৭) W. F. Ainsworth, Travels and researches in Asia Minor, ১৮৪২ খৃ., ১খ, ৭৬ প.।

কাস্তামোনু সানজাকের একটি মানচিত্র এবং ১৯শ শতাব্দীর শেষদিকে শহরটি যেইরূপ ছিল উহার একটি পূর্ণ দৃশ্য আলোকচিত্র (৮) Kastamuni vilayet sal-namesi 1310 (কাস্তামোনু, তা. বি.)-এ উল্লিখিত কতকগুলি উদাহরণের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

কাস্তামোনুর কীর্তিসমূহের কোনও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত জরিপের অবর্তমানে (তু. এই গ্রন্থপঞ্জীর শুরুতে দেয়া তুর্কী ভাষার তিনটি গ্রন্থ এবং তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ B. Darkot কর্তৃক স্বীয় প্রবন্ধ 'কাস্তামোনু'-তে প্রদত্ত কীর্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) অপ্রকাশিত উৎসসমূহের অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। সকল ঐতিহাসিক স্থানের বিশদ উল্লেখসহ ১ ঃ ১০০০ মাপের একটি আধুনিক জরিপ (তিন প্রস্ত কাগজ) কাস্তামোনু বেলেদিয়ে (পৌর কর্তৃপক্ষ)-র নিকট সংরক্ষিত আছে। অধিকন্তু তু. (৯) তুর্কী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের Eski-Eserler ve Muzeler শাখার জন্য তৈয়ারী কাস্তামোনুর (মুসলিম) পুরাকীর্তি ইস্তাম্বুল সম্পর্কিত একটি অপ্রকাশিত Rapor of 20 Ocak 1975। কীর্তিসমূহের একটি ব্যাপক আলোকচিত্রজরিপ ইস্তাম্বুলের (১০) Besim

Cecener, Guzel Sanatlar Enstitusu, Findkili কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। (১১) Dogan Kuban-এর একটি রিপোর্টও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য (Kastamonunun tarihi yapisi....ilgili rapor, ইস্তাম্বুল ১৯৬৭ খৃ., ২১খ, ৮ প., অনুলিপিকৃত)। এই সকল সামগ্রী বায় হুসায়ন আয়দিন, Fen isletleri muduru, Belediye Sarayi, Kastamonu-এর নিকট সংরক্ষিত আছে, যিনি অনুগ্রহপূর্বক উহার উল্লেখ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

অধিকন্তু তু. (১২) RCEA, ১২খ, ১৭৮, ১৮৮ ; ১৩খ, ৪৬ ; ১৬খ, ৪৩, ১৩৩, ১৮৩-৪ (সকলগুলি বেহ্‌ষীত ও য়ামান হইতে গৃহীত) ; (১৩) C. Cahen, Pre-Ottoman Turkey লন্ডন ১৯৬৮ ('উছমানী-পূর্ব যুগ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণাকে সুসংহত করিয়াছেন), এবং গ্রন্থপঞ্জী সংযোজনী হিসাবে দ্র. (১৪) Candar, M. Yasar Yucel রচিত প্রবন্ধসমূহ, AUDTCFD, ২৩/১-২ (১৯৬৬ খৃ.) ও Belleten, ৩৪ (১৯৭০ খৃ.)।

C. J. Heywood (E. I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আল্-কাসতাল্লানী (القسطلانى) ঃ আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-খাতীব শিহাবু'দ্-দীন আশ-শাফি'ঈ, ধর্মবেত্তা ও হাদীছ বিশেষজ্ঞ। ১২ যু'ল্‌কা'দা, ৮৫১/২০ জানুয়ারী, ১৪৪৮ কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকালের জন্য দুইবার মক্কায় অবস্থান ব্যতীত তিনি বাকী জীবন কায়রোতেই ধর্ম প্রচারকরূপে অতিবাহিত করেন এবং ৭ মুহার্‌রাম, ৯২৩/৩১ জানুয়ারী, ১৫১৭ শুক্রবার তথায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতির মূলে রহিয়াছে আল-বুখারী প্রণীত সাহীহ সম্পর্কে তাঁহার বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ইরশাদু'স্ সারী ফী শারহি'ল-বুখারী'। ইহা কতিপয় পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কপিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবত প্রাচীনতম হইতেছে ১২৬৭ সালের বূলাক এবং পরবর্তীটি ১৮৭৯ সালের লক্ষ্ণৌ সংস্করণ (অপরাপর সংস্করণের জন্য দ্র. Brockelmann, ২খ, ১৬৫, S I, ২৬২-৩)। ১৩২৫-২৬ সালের কায়রো সংস্করণে য়াহ্‌য়া আল্-আনসারীর এবং ১২৭৯ সালের কায়রো সংস্করণে হাসানু'ল-'ইদবী (মৃ. ১২০৩/১৮৮৭)-এর শব্দকোষসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। হাদীছ-এর ক্ষেত্রে তিনি একটি মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) রচনা করেন যাহা 'আবদু'ল-হাদী আল্-আব্‌য়ারী (মৃ. ১৩০৫/১৮৮৩)-এর ব্যাখ্যাসহ কায়রোতে মুদ্রিত হয় (মুদ্রণকাল অজ্ঞাত)। মুসলিম জগতে তাঁহার রচিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনেতিহাস আল্-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা ফি'ল-মিনাহি'ল-মুহাম্মাদিয়্যা (المواهب اللدنية فى المنح المحمدية) অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৫ শাবান, ৮৯৯/২১মে, ১৪৭০ সালে তিনি ইহা সমাপ্ত করেন এবং ইহার জন্য আস্-সুয়ূতী তাঁহাকে নকলের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। ইহা বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে ; উদাহরণস্বরূপ কায়রো ১২৮১ যাহা কয়েকটি সমালোচনাসহ (উদাহরণ আয্-যুর্‌কানী, মৃ. ১১২২/১৭১০), ৮ খণ্ডে মুদ্রিত, বূলাক ১২৭৮, ১২৯১ হি, এবং 'আবদু'ল-বাকী কর্তৃক তুর্কীতে অনূদিত, ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত, ১২৬১ হি.; আন্-নাবহানী, আল-আন্‌ওয়ারু'ল-মুহাম্মাদিয়্যা মিনা'ল্-মাওয়াহিবি'ল-লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত ১৩১০-১২ হি. নামে ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। এই একই বিষয়ে তিনি আত্-তিরমিযী প্রণীত কিতাবু'শ-শামা'ইল সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা রচনা করেন (Brockelmann, ১খ, ১৭০, SI ২৬৮)। হাদীছ সংক্রান্ত গবেষণা ছাড়াও তিনি কুরআন গঠন সম্পর্কেও গবেষণা করেন। এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ হইতেছে লাতা'ইফু'ল-ইশারাত লি-ফুনূনি'ল-কিরা'আত। কুরআন গঠন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আবু'ল-কাসিম আশ-শাতিবী সম্পর্কে তিনি একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন (Brockelmann, I ৫২০ SI, ৭২৫) এবং তাজ্‌বীদ সম্পর্কে আল-জাযারীর মুকাদ্দিমা-এর একটি ব্যাখ্যা (পূ. গ্র, II, ২৫৯) রচনা করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সূফীবাদ প্রসঙ্গে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কেও পুস্তক লিখিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে মাকামাতু'ল-'আরিফীন; মাসালিকু'ল-হুনাফা' ইলা মাশারি'ই'স-সালাত 'আলা'ন-নাবিয়্যি'ল-মুসতাফা এবং আল্-বুসীরী প্রণীত কাসীদাতু'ল-বুর্‌দা সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যা, (Brockelmann ১খ, ৩১০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতু'ত-তাওফীকিয়া, বূলাক ১৩০৬ হি., ৬খ, ১১ ; (২) Wustenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber নং ৫০৯; (৩) Brockelmann, ২খ, ৮৭-৮, S II, ৭৮-৯ ; (৪) দা. মা. ই., ১৬/২খ, পৃ. ১৪১-২।

C. Brockelmann (E. I.[2])/আবদুল বাসেত

কাস্‌তাল্লানী (قسطلى) ঃ (কেস্‌তেলী, কেস্‌তেল্লী), মুসলিহু'দ-দীন মুস্‌তাফা, 'উছমানী আমলের কালামশাস্ত্রবিদ ও হানাফী ফকীহ (মৃ. ৯০১/১৪৯৫-৬)। তিনি বুর্‌সার নিকটস্থ কেস্‌তেল (ল্যাটিন Castellum) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই স্থানে জীবনের শেষ দিকে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই গ্রামের নাম হইতেই তাঁহার নিস্‌বাত 'কেস্‌তেল (ল্লী)' অথবা অধিকতর গুরুগম্ভীর 'কাস্‌তাল্লানী'-এর উদ্ভব হয়। বুরসাতে তিনি প্রখ্যাত 'আলিমও তথাকার সুল্‌তান মাদ্‌রাসা-র মুদার্‌রিস খিদ্‌র বেগ-এর নিটক অধ্যায়ন করেন এবং কালাম ও ফিক্‌হশাস্ত্রে অধ্যায়ন সমাপ্তির পর তিনি স্বয়ং মুদুর্‌নু (Mudurnu) দিমেতেকা (ডিমুটিক)-তে অবস্থিত উরুজ পাশা মাদ্‌রাসায় এবং তৎপরে ইস্তাম্বুলে ২য় মুহাম্মাদ-এর নব প্রতিষ্ঠিত "অষ্ট মাদ্‌রাসা"-র একটিতে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি বুর্‌সা-র, তৎপর Edirne-এর এবং ৮৮৬/১৪৮১ সালে ইস্তাম্বুলের কাদী (قاضى)-র পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর সেই বৎসরেই তিনি রুমেলি-তে কাদী 'আসকের [দ্র.]-এর পদ প্রাপ্ত হন ; এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর তিনিই প্রথম এই পদে নিযুক্ত এবং একই সঙ্গে হাজ্জী হাসানযাদা মুহাম্মাদ আফেনদি আনাতোলিয়া-র কাদী আসকের নিযুক্ত হন। ২য় বায়াযীদ-এর শাসনামলে ৮৯১/১৪৮৬ সালে তাঁহাকে অবসর ভাতা প্রদান করিয়া বরখাস্ত করা হয় এবং ৯০১/১৪৯৫-৬ সালে রাজধানীতে তিনি ইনতিকাল করেন। আয়্যুব গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

কাস্‌তাল্লানী কয়েকটি উচ্চপ্রশংসিত ফিক্‌হ সংক্রান্ত আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, তন্মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) নাজমু'দ-দীন আন-নাসাফী-র 'আকা'ইদ গ্রন্থের উপর আত্-তাফ্‌তাযানী-র ব্যাখ্যা গ্রন্থের টীকা (তু. হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ২২৬ ; Brockelmann I, ৫৪৯) ; (২) আল-ঈজা প্রণীত কিতাবু'ল-মাওয়াকিফ ফী 'ইলমি'ল্-কালাম সম্পর্কে জুরজানীকৃত ব্যাখ্যায় সাতটি কঠিন সমস্যা (আশ্‌কাল) সম্পর্কে তাঁহার একটি গ্রন্থ (হাজ্জী খালীফা, ৬খ, ২৪০); (৩) কিবলা-র দিকনির্দেশনা

সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ তথা রিসালা ফী জিহাতি'ল-কিব্‌লা (ঐ, ৩খ, ৩৮৭) এবং য়াকাযা যাবী'ল-ই'তিবার নামক অপর একটি গ্রন্থ (ঐ, ৬খ, ৫১২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাশ্‌কোপরুপযাদে, শাকা'ইকু'ন-নু'মানিয়্যা, মেজদী সম্পাদিত, তুর্কী সং., ইস্তাম্বুল ১২৬৯/১৮৫৩, ১৬১ প.; (২) মুহাম্মাদ ছুরিয়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ৪খ, ৪৯১ প.; (৩) 'আশিক পাশা যাদে তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩৩২/১৯১৪, ২২৪।

F. Babinger (E. I.[2])/ আবদুল বাসেত

কাস্‌তীলিয়্যা বা কাস্‌তীলিয়া বা কাস্‌তীলা (قسطيلية বা قصطليي قسطيله) ঃ

২. তিউনিসিয়ার একটি জায়গার নাম। মধ্যযুগে ইহা কখনও একটি শহরের (তাওয়ার বা তূযার (توزر) নামরূপে ব্যবহৃত হইত। বেশীর ভাগ সময়ই ইহা ছিল একটি জিলার নাম, আর এই শহরটি ছিল উহার প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানটি আধুনিক জারীদ অঞ্চল (بلاد الجريد) যাহা বর্তমানে কাফ্‌সা [দ্র.] প্রশাসনিক ইউনিটের অংশবিশেষ (জনসংখ্যা ঃ ৩,২১,০০০, জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৭.৪৫, ১৯৬৬ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) এবং শটদের (Shotts) এলাকাভুক্ত অতীতের ন্যায় বর্তমানেও এই অঞ্চলের প্রধান সম্পদ খেজুর গাছ। বর্তমানে সেখানে দশ লক্ষ খেজুর গাছ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩১%-ই হইতেছে উচ্চ মানের 'দেগ্‌লা' শ্রেণীর (১৯৬২ খৃ. তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী)। হোটেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যাহার কোনও কোনওটি অত্যন্ত বিলাসবহুল, সাহারার পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন কিছুটা অবহেলিত এই অঞ্চলের বর্তমানে কিছু অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

ইতিহাস ঃ কাসতীলিয়া সম্ভবত সর্বপ্রথম 'উক্‌বা ইব্‌ন নাফি (দ্র.) কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং সুনির্দিষ্টভাবে ইহা ইসলামের জন্য হাস্‌সান ইব্‌ন আন্‌-নু'মান [দ্র.] সুলহ্‌ দ্বারা বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিনা প্রতিরোধে জয় করেন। তখন হইতে উহার খৃষ্টান অধিবাসিগণকে তুলনামূলকভাবে অনুকূল মর্যাদা প্রদান করা হয়। ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে ইহা স্বভাবতই সেই সকল গোলযোগে আক্রান্ত হয় যদ্দ্বারা অবশিষ্ট ইফ্‌রীকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সকল গোলযোগ ও আন্দোলনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২য়/৮ম শতাব্দীর খারিজী বিদ্রোহ, আগ্‌লাবীদের অধীনে জুন্দ বিদ্রোহ, ফাতিমী দা'ঈ-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আবূ য়াযীদ আন্‌-নুক্কারী [দ্র.]-র উত্থান। এই সকল গোলযোগের কারণে সেইখানে ইবাদী ও শী'আ মতবাদের যথেষ্ট প্রসার ঘটে, বিশেষত নাফ্‌তা (نفطـه) এলাকায় সাফল্য অর্জিত হয়। মধ্য ৫ম/১১শ শতাব্দীতে বানূ হিলালের আক্রমণ সেখানে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। কিন্তু কাফ্‌সা-র বানু'র-রান্দ-এর আক্রমণে শীঘ্রই উহার স্বাধীনতা লোপ পায়। কাসতীলিয়া ঃ তখন একটি বিতর্কিত রাজ্যে পরিণত হয় এবং তথাকার আল-মুওয়াহ্‌হিদ অবস্থান দুঃসাহসিক অভিযানকারী কারাকূশ ও বানূ গানিয়া (দ্র.)-র আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। হাফ্‌সীদের অধীনে ৮ম/১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেখানে অপর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বানূ য়াম্‌লূল্‌ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি সভা (মাশ্‌য়াখা) উহার শাসন কাজ পরিচালনা করিত এখানে অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করিতে থাকে এবং অবশেষে অন্যান্য স্থানীয় শাসক বংশের মতো একই সময়ে আবূ ফারিস (৮০২/১৪০০) কর্তৃক উহার বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯শ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থার কারণে এলাকার দুঃখ দুর্দশার অনেক অবনতি ঘটে এবং প্রকৃতপক্ষে উহা বেদুঈনদের অত্যাচার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিপীড়নমূলক করারোপের বিরুদ্ধে অরক্ষিত অবস্থায় পতিত হয়।

ঐতিহাসিক ভূগোল ঃ কাস্‌তীলিয়া নামের স্থান একমাত্র তিউনিসিয়ায় যে রহিয়াছে এমন নহে। Castile-এর সমার্থক বিভিন্নরূপী কাশ্‌তালা ব্যতীতও য়াকূত, ৪খ, ৩৪৭-৮, স্পেনে কাসতাল্লা ও ইল্‌ভিরা জিলায় কাস্‌তীলিয়া নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন [দ্র. পূর্ববর্তী প্রবন্ধ]। তিনি আলেপ্‌পো ও দামিশকের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্থানের নাম হিসাবে আল্‌-কাস্‌তাল-এর উল্লেখ করিয়াছেন। থুবুনা (Thubunae) বিস্‌কিরা (Vescera)-র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মেসারফেল্‌টা (Mesarfelta)-র প্রাচীন দুর্গটি কাস্‌তীলিয়া নাম বহন করিত। এখানে স্পষ্টরূপে, ল্যাটিন মূল শব্দ Castella, castellum-এর বহুবচন, অর্থ দুর্গ, হইতে উদ্ভূত জায়গার নামের সন্ধান পাওয়া যায়। বহিরাগত আরব বিজয়ীগণ সর্বপ্রথম এলাকার প্রধান দুর্গ তূযার (تـوزر-Thusuros)-কে বুঝাইবার জন্য শব্দটি ব্যবহার করিত। তারপর ক্রমে উহার প্রতি নির্ভরশীল সমগ্র এলাকাটিই এই নামে পরিচিতি লাভ করে।

আল্‌-য়া'কূবীর (মৃ. আনু. ২৮২-৯২/৮৯৫-৯০৫) মতে এই এলাকাটি বারোটি মরূদ্যান লইয়া গঠিত ছিল ঃ "প্রধানটির নাম ছিল তূযার এবং সেখানে গভর্নরদের বাসস্থান ছিল, দ্বিতীয়টি হাম্মা, তৃতীয়টি তাক্‌য়ূস্‌ এবং চতুর্থটি নাফ্‌তা (অনু. Wiet, Les Pays, ২১২)। একমাত্র তাক্‌য়ূস্‌ (-Thiges) বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানে দেগাচে (Degache)-র পত্তন হইয়াছে। পরবর্তীকালের অধিকাংশ আরব ভৌগোলিক, বিশেষত আল-বাক্‌রী ও য়াকূত এইরূপ বিভক্তির বর্ণনা দিয়াছেন। ইব্‌ন হাওকাল, আল্‌-মুকাদ্দাসী ও আল-ইদ্‌রীসী এলাকাটির পরিধি ও সীমানা সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য প্রদান ব্যতীত কেবলমাত্র শহরগুলির বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের লেখকদের বর্ণনায় কাস্‌তীলিয়া যাহা বর্তমানে বিলাদু'ল-জারীদ (بلاد الجريد) নামে পরিচিত, উত্তরে কাফ্‌সা (قفصه) এবং শটস-এর দক্ষিণে নাফ্‌যাওয়া (نفزاوه) এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (ইব্‌ন খাল্‌দূন, 'ইবার, ৬খ, ১৯৯) ; এমনকি বিস্‌কিরা, গাবিস্‌ ও জেরবা দ্বীপও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল (John Leo Africanus, Description de l'Afrique ২খ, ৪৪২-৩)।

স্থানটির নাম বিলাদু'ল্‌-জারীদ (খেজুর গাছের দেশ) বা শুধু আল্‌-জারীদ, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের পরে, সর্বপ্রথম ইব্‌ন খাল্‌দূনের লেখা হইতে প্রকাশ পায়, যিনি তখন হইতে ঐ এলাকার নাম হিসাবে কাস্‌তীলিয়ার মতই অথবা তদপেক্ষা বেশী ব্যবহার করিতে থাকেন। প্রাচীন নাম কাস্‌তীলিয়ার ক্রমে বিলুপ্তি ঘটে এবং বর্তমানে একমাত্র বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অন্য সকলের নিকট এই নাম সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। পূর্বেই আত্‌-তীজানী (রচনাকাল আনু. ৭০৬/১৩০৬), ইব্‌ন আবী দীনার (আনু. ১১১০/১৬৯৮) এবং আল্‌-ওয়াযীর আস-সাররাজ (১১৪৯/১৭৩৭) কেবল যখন পূর্ববর্তী কোনও লেখকদের লেখা হইতে কোনও বিষয়ের উল্লেখ করিতেন তখনই ঐ নামটি ব্যবহার করিতেন। জন-লিও আফ্রিকানাস্‌ (John-Leo Africanus) যিনি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিউনিসিয়া ভ্রমণ করেন, শব্দটি সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না।

৩য়/৯ম শতাব্দী পর্যন্ত কাস্‌তীলিয়ায় কোনও উল্লেখযোগ্য আরব জনবসতি ছিল না। আল-য়াকূবী লিখিয়াছেন যে, সেখানকার "আদিবাসিগণ ছিল অনারব, প্রাচীন রোমক, বারবার ও আফারিকার বংশধর" (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ ল্যাতিনী ও খৃষ্টীয় বারবার। ইব্‌ন খাল্‌দূন ২২৪/৮৩৯ সালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার বর্ণনা দিতে গিয়া যুওয়াগা, লুওয়াতা ও মিক্‌নাসা বারবারদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ('ইবার, ৪খ, ৪২৮)। ৫ম/১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর মানচিত্রের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। ঐ সময় হিলালী অভিযানের ফলে এলাকাটিতে সুলায়ম ও বিশেষ করিয়া উহার কু'উব শাখার লোকদের আগমন ঘটে। এই সময় হইতেই এলাকার জনগোষ্ঠীগত চিত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করে এবং এই পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তারকারী খৃষ্টধর্ম লোপ পাইতে আরম্ভ করে। ৭০৬/১৩০৬ সালে আত্‌-তীজানী বহুসংখ্যক ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত গির্জার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (রিহ্‌লা, ১৬২)। তিনি কুকুর ভক্ষণ প্রথা সম্বন্ধে, যাহা তখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, ভয়াবহ মন্তব্যও রাখিয়াছেন।

মধ্যযুগীয় আরব লেখকগণ সকলেই কাস্‌তীলিয়াকে একটি ধনী ও সম্পদশালী দেশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্‌-বাক্‌রীর মতে ৫ম/১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে কাফ্‌সার রাজস্ব আয় ছিল মাত্র ৫০,০০০ দীনার। সেখানে কাস্‌তীলিয়ার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০০,০০০ দীনারে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে ইব্‌ন খাল্‌দূন সেখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন (মুস্‌তাব্‌হিরাতু'ল্‌-'উম্‌রান, 'ইবার, ৬,১৯৯)। এলাকার উন্নত সেচব্যবস্থা দর্শকদিগকে অবাক করিয়া তুলিত এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হইত। আল্‌-য়া'কূবী একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল জলপাই চাষের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইব্‌ন হাওকালের মতে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে এলাকার অন্যতম প্রধান ফসল ছিল আখ। কিন্তু আল্‌-বাক্‌রী বলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে শুধু মাঝারী ধরনের ফসল উৎপন্ন হইত, কলার উৎপাদনও খুব ভাল ছিল না। অন্যদিকে লেবু জাতীয় ফল (আল্‌-মুহাম্মাদাত) এবং সর্বোপরি জামীর (আল-উত্‌রুজ) ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। সেখানে আরও উৎপন্ন হইত শন, মেহেদী, জিরা এবং শা-জিরা; আর পশমের জন্য বিখ্যাত এক প্রকার খেকশিয়াল ফাঁদ পাতিয়া ধরা হইত। ইব্‌ন হাওকাল আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে কাসতীলিয়া দেশ-বিদেশ হইতে আগত ব্যবসায়ীদের কর্মব্যস্ততায় মুখর একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ইহার প্রধান আমদানী দ্রব্য ছিল যাহা ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। খেজুর, পশম ও সকল প্রকার পশমের তৈরী জিনিসপত্র এইখান হইতে রফ্‌তানী হইত। আল্‌-মুকাদ্দীর বর্ণনানুযায়ী এক উটের বোঝা খেজুরের মূল্য ছিল দুই দিরহাম। পশম রফ্‌তানী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে মেষ পালনের বহুল প্রচলন ছিল। কৃষ্ণ আফ্রিকার দেশগুলিতে আন্ত-সাহারা বাণিজ্য নিঃসন্দেহে মধ্য যুগে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে, আবূ য়াযীদ আন্‌-নুক্‌কারীর পিতা, যিনি মূলে তাক্‌য়ূস বা তূযার হইতে আসিয়াছিলেন এবং ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্‌ন খাল্‌দূন 'ইবার, ৪খ, ৮৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) উৎস (কালক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত) ঃ (১) ইব্‌ন 'আব্‌দু'ল্‌-হালীম, ফুতূহ, সম্পা. ও আংশিক অনু. A. Gateau, Conquete de l' Afrique du Nord et de l' Espagne, আল-জিয়ার্স ১৯৪২ খৃ., ৬৪/৬৫ et নং ৬৬, পৃ. ১৫৬ ; (২) ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ্‌ মাসালিক ; (৩) ইব্‌নু'ল-ফাকীহ বুল্‌দান, সম্পা. ও আংশিক অনু. Hadj-Sadok, Description du Maghreb... আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ., ৬/৭খ. ৩১; (৪) য়া'কূবী, বুল্‌দান, অনু. G. Wiet, Les Pays, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ২১২ ; (৫) ইব্‌ন হাওকাল, সূরাতু'ল্‌-আর্‌দ্‌, বৈরূত. তা. বি. ৯২ ; (৬) আল-মুকাদ্দাসী, আহ্‌সানু'ত্‌-তাকাসীম, সম্পা. ও আংশিক অনু. Ch. Pellat, Description de l'Occident...., আলজিয়ার্স ১৯৫০ খৃ. ৪/৫, ২৬/২৭, ৬০/৬১, ৬৪/৬৫ ; (৭) আল-বাক্‌রী, মাসালিক, সম্পা. ও অনু. de Slane, Description de l'Afrique Septentrionale, প্যারিস[২] ১৯৬৫ খৃ., ১৪/৩৫, ৪৮-৯/১০২-৫, ৭১/১৪৬, ৭৪-৫/১৫২-৩, ১৪৮/২৮৪ ; (৮) আল-ইদ্‌রীসী, নুয্‌হা, আংশিক সম্পা. H. Peres. আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., ৭৫ ; (৯) য়াকূত, বুল্‌দান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ৫৭-৮, ৪খ, ৩৪৭-৮ ; (১০) আত-তীজানী, রিহ্‌লা তিউনিস ১৯৫৮ খৃ. index s. v. আল্‌-জারীদ; (১১) ইব্‌ন খাল্‌দূন, আল-'ইবার, বৈরূত ১৯৫৬-৯, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডের নির্ঘণ্ট, দ্র. কাস্‌তীলিয়া, বিলাদু'ল্‌-জারীদ ও আল্‌জারীদ ; (১২) JohnLeo Africanus, Description de l' Afrique অনু. A. Epaulard, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., ২খ, ৪৪২-৩, ৪৭০ ; (১৩) ইব্‌ন আবী দীনার মু'নিস, সম্পা. ম. শাম্মান, তিউনিস ১৯৬৭., নির্ঘণ্ট দ্র. কাস্‌তীলিয়া ও আল্‌-জারীদ; (১৪) আল্‌-ওয়াযীর আস্‌-সার্‌রাজ, হুলাল, সম্পা. M. H. al-Hila, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., নির্ঘণ্ট দ্র. আল্‌-জারীদ ; (১৫) V. Gueriu, Voyage archeologique dans la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৬২ খৃ. ১খ, ২৫০-৭০ ; (১৬) V. Mayet, Voyage dans le Sud de la Tunisie, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ১৮৭-২৪৩।

(খ) গবেষণা কর্ম ঃ (১৭) H. Attia, Modernisation agricole et structures sociales, Exemple des Oasis du Djerid, in Rev. Tunisienne de Sc. Sociales, নং ২ (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫), ৫৯-৯৩ ; (১৮) R. Brunschvig, Hafsides নির্ঘণ্ট দ্র. Qastiliya, Djerid ও Tozeur ; (১৯) S. Ferchiou, Differentiation sexuelle de l'alimentation au Djerid, in L'Homme (১৯৬৮); (২০) J. Ganiage, Les Origines du Protectorat francais en Tunisie, প্যারিস ১৯৫৯ খৃ. নির্ঘণ্ট দ্র. Djerid ; (২১) H. R. Idris, Zirides index ; (২২) Ch. A. Julien Histoire de l' Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ২খ, নির্ঘণ্ট দ্র. Djerid et Qastiliya; (২৩) A. Laroui, L' histoire du Maghreb, প্যারিস ১৯৭০ খৃ. ১১৭ খৃ., ১২৫, ১৩৫-৬, ২১৬ ; (২৪) M. N. Lejri, Le recensement general dc la population (মে ১৯৬৬), in Rev, Tunisienne de Se. Sociales নং ১৭-১৮ (জুন ১৯৬৯), ১২৭-৭১ ; (২৫) A. Martel, Les confins saharo-tripolitains de la Tunisie (১৮৮১-১৯১১), প্যারিস ১৯৬৫ খৃ. নির্ঘণ্ট দ্র. Chott et Djerid ; (২৬) M. Rouissi Le fait migratoire au Djerid in Rev Tunisienne de Se. Sociales, নং ১৭-১৮ (জুন ১৯৬৯), ৫৬৭-৮৬ ; (২৭) M. Seklani, La mobilite interieure dans le Sud tunisien in Rev. Tunisienne de Se. Sociales (ডিসেম্বর ১৯৭০), ১৬৩-৭৪; (২৮) S. M. Stern.

Three North-African Topographical Notes (Islamic-Roman), in Arabica ১ (১৯৫৪ খৃ.) ৩৪৩-৫ ; (২৯) M. Talbi, Emirat aghlabide, নির্ঘণ্ট; (৩০) Ch Islamic-Roman Tissot, Geographie comparee de la province romaine d' Afrique, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ., ২খ, ৩০-১, ৬৮২-৪; (৩১) দা. মা. ই. ১৬/২, পৃ. ১৪৫-৬।

M. Talbi (E. I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

কাস্‌তীলিয়া (قسطيلية) ঃ ১. একটি জিলার নাম এবং মূলে মুসলিম স্পেনের ইল্‌বীরা নামক কূরা (kura)-এর শেফ্‌লু (chefliеu, প্রধান স্থান?)। ইহাকে গ্রানাডা (ইল্‌বীরা)-রূপে সনাক্ত করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা উচিত নহে। গ্রানাডা, ইল্‌বীরা ও কাস্‌তীলিয়া (হাদিরাত ইল্‌বীরা) সম্পর্কে বর্ণনাকারী আরব লেখকগণ স্থানটির ভূমির উর্বরতার উপর জোর দিয়া থাকেন এবং উহাকে দামিশ্‌কের গূতার সহিত তুলনা ও সেখানে মর্মর প্রস্তরখানি থাকার কথা উল্লেখ করেন। এই বর্ণনা উত্তরে সিয়েরা ইলভিরা (Siera Elvira) দ্বারা পরিবেষ্টিত গ্রানাডা ও উহার ভেগা (Vega)-সহ অঞ্চলটির প্রতি পুরাপুরি প্রযোজ্য। ইব্‌ন হায়্যান, ইব্‌নু'ল-খাতীব, এবং তাঁহাদের ও পূর্বে সম্ভবত আর্‌-রাযী কর্তৃক হাদিরাত ইল্‌বীরা নামে অভিহিত কাস্‌তীলিয়ার সঠিক পরিচয় ১৯শ শতাব্দী হইতে তীব্র বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে [দ্র. Fray Angel Custodio Vega, in Espana sagrada, ৫৩ ও ৫৪ ঃ De la Santa Iglesia Apostolica de lliberri (Granada), মাদ্রিদ, ১৯৬১ খৃ., বিশেষত ৬৩-৪ পৃ. উল্লিখিত উপসংহার]। আমাদের বিশ্বাস কাস্‌তীলিয়া ছিল একটি প্রাচীন দুর্গ। উহা ইল্‌বীরা কূরার ওয়ালী বা আমিল-এর প্রথম বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা ৪০০/১০১০ সন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। ঐ সময় বারবারদের হাতে দুর্গটি বিধ্বস্ত এবং কূরার রাজনৈতিক কেন্দ্র গ্রানাডায় স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং উহার অবস্থান অবশ্যই আতারফে (Atarfa) এবং পিনোস পুএন্‌তে (Pinos Puente)-এর মধ্যবর্তী সিয়েরা ইলভিরা (Sierra Elvira)-র পাদদেশে বা পার্শ্বে যে কোনও স্থানে হইবে।

ইফ্‌রীকিয়া [নীচের ২ দ্র.] ও আল্‌-আন্দালুস-এর কাস্‌তীলিয়া নামক অঞ্চলগুলিকে কাশ্‌তালা, কিংবা কাশ্‌তীলিয়া, খৃষ্টানদের ক্যাস্‌টীলের-সহিত [দ্র. কাশ্‌তালা] বিভ্রম না ঘটাইয়া অবশ্যই ল্যাটিন castella (Pl. of Castellum) শব্দের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। কারণ কুসূর-এর স্থান জারীদ-এ কতিপয় দুর্গের অবস্থান ছিল, ঠিক যেরূপ Municipium Florentinum Iliberritaneem-এ ছিল, যাহা পরে ইলিবেরী (গ্রানাডা)-র বিশপ এলাকায় পরিণত হয়। Dozy তাঁহার Recherchez[3], ১খ, ৩৩৫, গ্রন্থে Iberian শব্দমূলের যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত সূত্রগুলি, বিশেষত Fray Angel Custodio vega-র গ্রন্থ ও উহাতে সন্নিবেশিত গ্রন্থপঞ্জীর অতিরিক্ত) (১) Razi-Levi-Provencal, La "Description de l'Espagne", in And, ১৮খ, (১৯৫৩ খৃ.) ৬৬-৭ ; (২) ইব্‌নু'ল-খাতীব, ইহাতা, সম্পা. 'ইনান, কায়রো, তা, বি., ১খ, ৯৯, ১০৪ ; (৩) য়াকূত, ৪খ, ৯৭ ; (৪) ইব্‌ন হায়্যান, মুক্‌তাবিস, সম্পা. M. M. Antuna [পৃ. ৫৫-এ Kastila (তথ্য) এবং পৃ. ১০০-এ কাস্‌তীলা, হাদিরাত ইল্‌বীরা-র উল্লেখ রহিয়াছে] (৫) F. J. Simonet, Descripcion del Reino de Granada, মাদ্রিদ ১৮৬১ খৃ. ২৭-৩৭ ; (৬) যদিও কাস্‌তীলিয়ার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবুও দ্র. হিময়ারী-Levi-Provencal, আর্‌-রাওদু'ল-মিতার মূল পাঠ ২৪, অনু. ৩০ প্রবন্ধ GHARNATA ; (৭) আল-আনদালুস ও তিউনিসিয়া উভয় দেশের কাস্‌তীলিয়্যা-র জন্য এখন বিশেষভাবে দ্র. J. Oliver Asin, En torno a los origines de Castilla : su toponimia en relacion con los arabes y los bereberes, in And., ৩৮ খ, (১৯৭৩ খৃ.) নির্ঘণ্ট।

J. Bosch Vila (E. I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

কাস্‌ব (كسب) ঃ অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি। ইসলামের মূল প্রবণতাগুলি হইতে উত্তমরূপেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম পার্থিব জগতকে পরিহার করিবার মতবাদ নহে ; বরং যে আদেশসমূহ আল্লাহ্ মানুষের উপকারের জন্য দিয়াছেন, সেইগুলির প্রতি জাগতিক ব্যাপারে প্রয়োজন অনুসারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার একটি মতবাদ। সুতরাং মানুষের নিজের ও তাহার পোষ্যদের জীবনের উন্নতির জন্য যতক্ষণ আইনানুগ উপায়ে মানুষ যে বৈধ ধন-সম্পদ লাভের চেষ্টা করে, ততক্ষণ তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ (স) ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাথে তিনি তাঁহাদের ভাষাতেই কথা বলিতেন। তিনিও ব্যবসা করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও তাঁহার জীবনের এই সময়কে তিনি নিন্দা করেন নাই। তাঁহার সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন, নব্য সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাঁহাদের আয় বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কার কুরায়শদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি আঘাত হানিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহা করিয়াছিলেন তাহাদের অহমিকার জন্য এবং তাঁহার আনীত দীনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবার জন্য, তাহাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের নিন্দা করিবার জন্য নহে। এই সাধারণ নিবন্ধটি শিক্ষা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকের নির্দেশনা এবং মুনাফা অর্জন করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

ইব্‌ন খালদূন সর্বোত্তম মুসলিম যুগের শেষ ভাগে অর্থ উপার্জন বা মুনাফা অর্জনের সমস্যা বিবেচনা করিয়া ইহা অর্জন করার বিভিন্ন উপায় এবং ইহা যে দুইটি আকার ধারণ করিতে পারে তাহার বিবরণ দিয়াছেন (tr. de Slane, ii, 223f=Rosenthal, ii, 311 f.)। এই দুইটি আচার হইল ঃ কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করা অথবা প্রকৃত লাভ, পারিতোষিক—ইহার প্রতিটি হইল প্রকৃতির দানের উপর মানুষের প্রচেষ্টার ফল। বল প্রয়োগ অথবা সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত (ট্যাক্স) কৃষিকার্যের দ্বারা, শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বারা ঐগুলি অর্জন করা যায়। ইসলামে শেষোক্ত উপায়টি অপর পদ্ধতিগুলি অপেক্ষা অনেক গুণে সম্মানজনক। অনুমান করা হয় যে, ৩য়/৯ম শতাব্দীতে অর্থনৈতিক উন্নতির যখন চরম অগ্রগতি হইয়াছিল, তখন হইতে মুনাফার বৈধতা সম্পর্কে চিন্তা অতি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। বস্তুত বাণিজ্যিক লাভের বিষয়ই প্রায় সব সময় বিবেচনা করা হইয়াছিল, সংসারে অনাসক্ত আধ্যাত্মিক দলসমূহের কঠোর সংযমী মনোভাবের ফলে সৎভাবে পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ আয়ের বৈধ্যতা নিশ্চিত করার জন্য চিহ্নিত করা হইয়াছিল। ইসলামের মধ্যে বর্ধিষ্ণু সূফী মতবাদ কঠিন আদর্শ

দারিদ্র্যের পক্ষে ধর্মোপদেশ দিত এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিতে বলিত। এই প্রসঙ্গে বহুল প্রচারিত হাদীছের উল্লেখ করা হইয়াছে "দুই প্রকারের খাদ্যের স্বাদ সর্বোত্তম ঃ যেই খাদ্য তোমার স্বহস্তে প্রস্তুত করা এবং যেই খাদ্য স্বপৃষ্ঠে বহন করা।" এখানে জীবিকার প্রশ্ন আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কঠোর বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকিলেও প্রকৃত মুনাফার পক্ষে অনুমোদন আছে। H. Ritter সম্প্রতি এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া আল-গাযালীর লেখার প্রতি (৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষে)। অনুমান করা যায় যে, আল-গাযালী (র) আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি জোর দিয়াছেন এবং অসৎ ব্যবসায়ীর নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সৎ ব্যবসায়ীকে জিহাদের যোদ্ধার সমকক্ষ মনে করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য উৎস হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইসলামের শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। Ritter ও Plessner স্পষ্টরূপে Neopy thagorean Bruson-এর ধারণাগুলির গুরুত্ব দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ বেশ পূর্বে উভয় সুন্নী শী'য়াদের অর্থনীতি বিষয়ক ইসলামী চিন্তার ও য়াহূদী ধর্মমতের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আরবীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থগুলির মাধ্যমে প্লেটো (Plato) ও এরিস্টোটল (Aristotle)-এর কিংবদন্তীসমূহের সহিত এক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে যে, ইহা তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নয়, ইখওয়ানু'স-সাফাও স্বীকার করে যে, কর্মই মুনাফার উৎস, অন্ততপক্ষে জীবিকা নির্বাহের জন্য (তু. Y. Marquet, in Arabica, vii, ১৯৬১ খৃ., ২২৫ প.)।

এই দিকের উপর বেশী জোর দিবার ইচ্ছা না করিয়া (কারণ অন্যত্র ইহা যথেষ্ট আলোচিত হইবে) আমরা মতবাদের পাশাপাশি কার্যত কি করা হয়, তাহাই বিবেচনা করিব। বলা হইয়াছে যে, ইহা বাণিজ্যের সহিত অধিক সম্পৃক্ত। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বণিকদের ধারণা এখানে একটি স্থায়ী সংযোজন, যাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীনকাল হইতে অনুসৃত হইতেছে ঃ তাবাস্‌সুর বি'ত-তিজারা-এর লেখক (৩য়/৯ম শতাব্দী, ইরাক) আবু'ল-ফাদ্‌ল আদ-দিমাশকী (সম্ভবত ৫ম/১১শ শতাব্দী, ফাতিমী রাজত্বকাল) এবং ইব্‌ন খাল্‌দূন কর্তৃক যেমনভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হইতেছে এক স্থানের ক্রয়মূল্য এবং অন্য স্থানের বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই লাভ বলিয়া গ্রহণ করা।

সুতরাং ইহার নিশ্চিত একটি ঝুঁকিপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে; বাণিজ্যের অবশ্যই উৎপাদনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহাকে উৎসাহ প্রদান করা বাণিজ্যের সজ্ঞান উদ্দেশ্য নয়, এমনকি যদিও কেবল কৃষিকার্য ও শ্রমশিল্প বস্তুগত বিবেচনায় রীতিমত উৎপাদনশীল। এইখানে আমরা অবশ্য মূল সম্পর্কে ইসলামে যেই সমস্ত ধারণা বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহাই আলোচনা করিব ঃ এক হিসাবে এইগুলি আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, সুতরাং এইগুলিকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিতে হইবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একজন মুসলমান শাসনকর্তা, বিশেষত মৌলিক পণ্যদ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে, ঠিক যেমন উৎপাদন, ওজন ও পরিমাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য, তেমনি তাঁহাকে অধিক মূল্যে বিক্রয়ের আশায় দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইতেও তাহাদের নিবারণ করিতে হইবে।

সকল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে সুদে ধার দেওয়া, তাহা তৎকালীন প্রচলিত যে নামেই হউক, অত্যন্ত নিন্দিত ও সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামে রিবাকে নিন্দা করা হইয়াছে। ইহা স্পষ্টত নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে নিন্দা উৎপাদন করিত, যাহারা অপরের দুর্ভোগের মাধ্যমে ধনী হইত। প্রদত্ত ঋণ কোনক্রমেই ঋণ গ্রহণকারীর প্রয়োজন পুরা করিত না, যেমন একজন উপবাসী ব্যক্তিকে খর্জুর ধার দেওয়া ইত্যাদি। যাহা হউক, পবিত্র গ্রন্থগুলির অবস্থা যখন প্রায়ই এইরূপ, ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় অবিকল প্রয়োগ করা হইয়াছিল, বিশেষত পরবর্তীকালে ইসলামের আর্থিক অবনতির যুগেও। সুতরাং আধুনিককাল পর্যন্ত ইহাই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে যে, সুদে প্রদত্ত সকল ধনই নিষিদ্ধ। বস্তুত অর্থনৈতিক প্রসারতার যুগে অন্য স্থানের ন্যায় ইসলামী জগতে ঐ নিষেধাজ্ঞার বক্র অর্থ করিয়া অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি আরোপ করা হইয়াছিল। এইরূপে ইহা সাধারণত স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, সমধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সুদে ধার প্রদান নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এক ধর্মাবলম্বীর অপর ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে ইহা নিষিদ্ধ ছিল না। ইহা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মিলিত সমাজে ব্যবহারিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল (দ্র. রিবা)। সর্বোপরি ইসলামে ব্যবহারিক ও সরকারীভাবে সমর্থিত প্রথাগুলির লক্ষ্য হইতেছে অর্থ কাজে লাগাইয়া প্রধানত বাণিজ্যিক বা ভূ-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অর্থের বিনিয়োগ দ্বারা কিছু মুনাফা অর্জন করা। ইহা যৌথ কারবারের দ্বারা করা যায়, শিরকা (দ্র.) অথবা ঋণী বণিক হিসাবে বাকিতে মাল দেওয়া, কিরাদ, মুদারাবা (উভয় দ্র.) বা অর্থ দ্বারা যে সুযোগ প্রদান করা হয়, তাহার বিনিময়ে অথবা যে ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ লাভের একটি অংশ গ্রহণ করা যায়। ইসলামী ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতির পিছনে মূল কারণ যাহাই থাকুক, সকল ধর্মমতের বণিক কর্তৃক পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলি অপেক্ষা উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল (A. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam Princeton 1969)। প্রচলিত রীতির মধ্যে এই সত্য প্রকাশিত হইত যে, মুসলিম অর্থনীতি অবশ্যই লাভের উপর নির্ভর করিত। ইহা যেই রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা শীঘ্রই বহুল পরিমাণে ভূমধ্যসাগরীয় ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচলিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের শেষে কেবল পরবর্তীটি মুসলিম অর্থনীতিকে ক্রমশ পশ্চাদপদ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিষয়টি এত বেশী আলোচিত হইয়াছে, এইখানে সাধারণভাবে উহার গ্রন্থপঞ্জী নির্ণয় করা অসম্ভব, (১) বিশেষভাবে অবধারিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য, বিশেষত তিজারাত (Heffening-এর, E.I.⁴-এর মধ্যে); রিবা, কিরাদ, বায়' ইত্যাদি; (২) প্রথমটিতে নূতন সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করা পর্যন্ত যোগ করিতে হইবে); (৩) E. Bussi, Il concetto di commercio e di commerciante nel pensiero giuridico musulmano, in Studi in memoria di Aldo Albertoni, iii (1938), 7-53; (৪) A. K. S. Lambton, The merchant in medieval Islam, in A locust's leg, Studies in honour of S. H. Taqizadeh, London 1962, 121-130; (৫) সম্পূর্ণ সাধারণ ধরনের গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ C. Becker, Islam und Wirtschaft, in Islamstudien, i, 54-65; (৬) H. Ritter, Ein

arabisches Handbuch der Handelswissenschaft, in Der Islam 1917; সেখানে গ্রন্থকার বিভিন্ন লেখকের বর্ণনা আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষত আল-গাযালী (র)-র অর্থনীতিবিষয়ক; (৭) M. Plessner, Der Oikonomikos des neupythagoriers Bryson, 1928; (৮) S. D. Goitein. The rise of the Middle Eastern bourgeoisie, in Cahiers d' Histoire mondiale/Journal of World history (1957) ; (৯) ঐ লেখক, in Studies in Islamic history and institutions, 1966 ; (১০) M. Rodinson, Islam et Capitalisme, 1966 (Chs. ২-৪); (১১) Subhi Labib, Capitalism in mediaeval Islam in Journal of Economic History (1969); (১২) Studies in the Economic history of the Middle East. ed. M. A. Cook London 1970 (1967 symposium); (১৩) W. Ule. Islam und Wirtschaft, in Der Islam. (1971), 136-67 (on its Origin) Cl. Cahen (E.I.[6]).

ধর্মতত্ত্ব ঃ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শব্দ হিসাবে কাস্‌ব-এর অর্থ 'অর্জন', "বিশেষ কার্যে নিয়োগ"। কাসাবা ক্রিয়াটি সাধারণত প্রথম ও কখনও কখনও ৮ম রূপ (ইকতাসাবা)-এ প্রায়ই কুরআন-এর শব্দ কোষের মধ্যে দেখা যায়। ইহা প্রধানত আমাদের নৈতিক কোনও কাজের ফলে পুরস্কার বা শাস্তি 'অর্জন' করা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং শিথিল অনুবাদের ফলে কাসাবা এখানে "কোনও কাজ সম্পন্ন করা" অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাজেই "প্রতিটি আত্মাকে সুবিধা হিসাবে যাহা তাহার উপর আপতিত করা হইয়াছে, তাহার জন্য একটি ভাল মূল্য দেওয়া হয়" (কুরআন, ২ ঃ ২৮১; তু. interalia; xiv, 51, xL, 17, Lxxiv, 38 etc.)। মূল গ্রন্থানুসারে জগৎ সৃষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কার্যানুসারে ফল পাইতে পারে (৪৫ ঃ ২২)। কাসাবা পরোক্ষভাবে প্রতিটি কাজের জন্য 'অর্জন'-কে (ফল-এর) বোঝায়, তাহা ভাল বা মন্দ হউক; ইকতাসাবা-র অর্থ প্রায় একই। কুরআন শারীফে ইহার দ্বারা কেবল সাধারণভাবে মানুষের কার্যকলাপকে বোঝানো হইয়াছে, (৪ ঃ ৩৬) অথবা সেই সমস্ত কার্যকলাপকে বোঝানো হইয়াছে, যাহা শাস্তি ও পুরস্কারের যোগ্য। ২ ঃ ২৮৬ আয়াতে বলা হইয়াছে, "সে যেই পুণ্য উপার্জন করে তাহা তাহারই এবং যে পাপ সে উপার্জন করে তাহাও তাহারই প্রাপ্য।"

এই দুইটি ক্রিয়াঘটিত রূপের, কাসব (বহুবচন আকসাব) এবং ইকতিসাব মাসদারগুলির 'ইলমু'ল-কালামে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, বিশেষ করিয়া আশ'আরী মতবাদে। তাহাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই দুইটি শব্দ সেই সকল কার্যের ফলাফল নির্দেশ করে, যাহা 'স্বাধীনভাবে' সাধিত এবং যাহা নৈতিক গুণসম্পন্ন সংকীর্ণ অর্থ প্রদান করে। ইহা আশ'আরী কাসব-এর আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট কার্য এবং মানুষের দায়িত্বের মাধ্যমে সম্পর্ক নির্দেশ করে। এই মতবাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের "স্বাধীন নির্বাচন" (ইখতিয়ার দ্র.) এবং কার্যের প্রতিদান সম্পর্কে কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে, উহার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। কোনও কোনও লেখক ইকতিসাব শব্দটি ব্যবহার করিতে পছন্দ করেন (আল-গাযালী)। অধিকাংশ লেখক কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া যে কোনও একটি শব্দ ব্যবহার করেন। আয-যামাখ্‌শারী-র মতানুসারে কুরআনের ২ ঃ ২৮৬ আয়াতের ব্যাখ্যা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইকতিসাব-এর প্রত্যাবর্তিত অর্থ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়া প্রমাণিত সত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কাসব সম্বন্ধে আলোচনাগুলি উহাদের অত্যন্ত উন্নত যুক্তি সম্পন্নতার জন্য প্রশংসিত। কিন্তু যদি প্রদত্ত যুক্তিগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে সম্ভবত এই সূক্ষ্মতা বা দুর্বোধ্যতা পরিষ্কার হইয়া যায়।

১। আশ'আরী-পূর্ব কালাম ঃ বস্তুত আল-আশ'আরী কোন কার্যের 'অর্জন'-ই কাস্‌ব, এই ধারণা তাঁহার পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন (দ্র. W. Montgomery Watt. The Origin of the Islamic doctrine of acquisition. in JRAS, ১৯৪৩ খৃ., ২৩৪-৭; idem. Free will and predestination in early Islam, London ১৯৪৮ খৃ., passim, idem. the formative period of Islamic thought, Edinburgh ১৯৭৩ খৃ. সূচীপত্র)।

অনুমান করা হয় যে, গায়লান-এর শিক্ষায় এবং মুরজি'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, কা-স-ব মূল শব্দটি প্রথমে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইত ঃ মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা 'অর্জিত' জ্ঞানের ('ইলম মুকতাসাবী) এবং স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ('ইল্‌ম দারূরী)-র পার্থক্য নির্ণয় করিবার জন্য। এইখানে কাস্‌ব ইহার আদি অর্থ, অর্জন করার খুব কাছাকাছি রহিয়াছে। মুকতাসাবি (নাজারী 'বিতর্কিত, চিন্তিত-এর সম্পর্কযুক্ত) এবং দারূরী ('প্রত্যক্ষ' ও 'স্বতঃসিদ্ধ'-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত) জ্ঞানের উৎসসমূহ বা 'প্রণালীসমূহ' (আসবাব) পাঠের পরম্পরাগত পার্থক্যে পরিণত হইয়াছিল (তু. Gardet and Anawati, Introductiona la theologie musulmane[2], Paris ১৯৭০ খৃ., ৩৭৫-৮৩)।

দিরার ইব্‌ন 'আম্‌র মানুষের কার্য বিশ্লেষণ করিতে মূল শব্দ কা-স্-ব প্রথম ব্যবহার করেন এবং ইহাকে খোদাঈ সর্বশক্তিমত্তার নিকট মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারেও প্রয়োগ করেন। দিরার-এর মতানুসারে মানুষের কাজের উৎপত্তি "দুইটি শক্তি" হইতে — আল্লাহ্, যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষ, যে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে (দ্র. মূল গ্রন্থ আল-আশ্'আরী, মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, সম্পা. 'আবদু'ল-হামীদ, কায়রো ১৩৬৯-৭৩/১৯৫০-৪, ১খ, ৩১৩)। দিরার দুইটি কর্মশক্তির (ফা'ইলান) উপর যে জোর দিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বুঝাইবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই 'অর্জন' উৎপন্ন হইয়াছে মানুষের কাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা হইতে, কিন্তু ইহা এমনই একটা জিনিস যাহা সেই মুহূর্তে খোদাঈ শক্তির পরিচালনা ছাড়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিছু কাল পরে আন্-নাজ্জার এই কারণগুলির সমন্বয়ের ফলে এইরূপ ঘটে, এই ধারণা পরিত্যাগ করেন এবং খালিক (সৃষ্টিকর্তা, সর্বদা আল্লাহ্) এবং ফা'ইল 'শক্তি' (একই স্থানে, ১খ, ৩১৫)-এর বিরোধিতা করেন। এই অর্থে কার্য আল্লাহ্‌র শক্তি হইতে আসে যে, আল্লাহ্ সেই মুহূর্তে ইচ্ছা করেন যে, ইহা সাধিত হউক এবং যখন ইহা সাধিত না হয়, তখন তিনি ইহা সাধিত হইবার ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ইহার প্রকৃত সম্পাদন মানুষের অধিকারভুক্ত থাকে। সুতরাং মানুষের 'কাস্‌ব-এর উপর ক্ষমতা" আছে (কাদির 'আলা'ল-কাস্‌ব, ২খ, ২১৮)। আন-নাজ্জার-এর শাগরিদগণের মধ্যে একজন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আল-বুরগূছ আল-কুরআনের মূল অংশগুলির

উপর ভিত্তি করিয়া জোর দিয়া বলেন যে, একই কথা মানুষ এবং আল্লাহ্‌র উপর আরোপ করা যায় না। (২খ, ১৯৮) ঃ যদিও মাকালাত গ্রন্থসমূহের নির্দেশানুসারে মনে হয়, ফি'ল ভুখণ্ড মানুষের স্বাধিকারভুক্ত। "আল-ফারক বায়না'ল ফিরাক" গ্রন্থে (সম্পা. কায়রো ১৩২৮ হি., ১৯৭) আল-বাগদাদীর কথিত মতে আল্লাহ্‌-ই শক্তি, তবুও যে মানুষ তাহার কাজের ফল 'অর্জনকারী', মুক্‌তাসিব ছাড়া বেশী কিছু হইতে পারে না, তাহার সম্পর্কেও ঐ একই শব্দ ব্যবহার করা চলে না। রাফিদী হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকান এবং তাহার পরে জা'ফার ইব্‌ন হারবও মানুষ ও তাহার স্বেচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য কাস্‌ব ও ইকতিসাব ব্যবহার করিয়াছেন ঃ ইহা বলা যায় যে, মানুষের কাজ 'স্বাধীন' (ইখতিয়ারী), এই অর্থে যে, মানুষ ইহা ইচ্ছা করে এবং ইহা অর্জন করে (ইকতিসাবী); কিন্তু ইহা 'দমিত' (ইদতিরারী) থাকে এই অর্থে যে, মানুষ ইহাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কোনও ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা আল্লাহ্‌ করেন (১খ, ১০০)।

সুতরাং প্রাথমিক যুগের এই সমস্ত মুতাকাল্লিমুন কাস্‌ব ('অর্জন')-এর ধারণা ব্যবহার করিয়া সম্পাদিত কার্যে মানুষের স্বীয় ভূমিকা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দিরার-এর নিকট এই অংশ চূড়ান্ত ধনাত্মক কাজ হিসাবে রহিয়া গিয়াছে, সৃষ্টিকর্তার কাজে মানুষ একজন অংশগ্রহণকারী এবং ইহার অধীন, আন্‌-নাজজার ও আল-বুরগূছ স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন এবং এইরূপ একটি ধারণা তাহারা সমর্থন করিতেন না। যাহা হউক, তাহাদের মতে কাজের অর্জনের উপর মানুষ একটি 'ক্ষমতা (কুদ্‌রাত)-র অধিকারী ছিল। এই প্রমাণ হইতে বিচার করিয়া আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী তাঁহার কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল (সম্পা. বাদরান, কায়রো ১৩৭০ হি./১৯৫১ খৃ., ১৩৮-৯)-এ এইরূপ মনীষীদিগকে জাবারিয়া উপাধি প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই পুনঃপরীক্ষণীয়।

মানুষ 'অর্জনকারী' (মুকতাসিব) এই ধারণাটি মানুষ তাহার কাজের 'স্রষ্টা' (খালিক), মানুষ সম্পর্কে মু'তাযিলী এই ধারণা অবশ্যই বিরোধিতা করা হইয়াছিল। আল-জুব্বা'ঈ কাস্‌ব সম্পর্কিত ধারণাটির উপরই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। মাকালাত-এর সর্বত্র এবং অধিকতর সংক্ষিপ্তাকারে 'আবদু'ল-জাব্বার-এর লেখাগুলির মধ্যে, (শারহু'ল-উসূলি'ল-খাম্‌সা, সম্পা. 'আবদু'ল-করীম 'উছমান, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৫, ৩৬৩-৭৯) তাহাদের মতবাদ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২। আশ'আরী কালাম-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য ঃ অপরদিকে আল-আশ'আরী কাসব (অর্জন)-কে তাহার অন্যতম ভিত্তিরূপে ইতেযাল-এর বিপক্ষে তাহার মতবাদকে ক্রমবিকশিত করিয়াছিলেন। অবশ্য মাকালাত বা ইবানা-এর বিশ্বাস সংক্রান্ত বর্ণনার মধ্যে ইহার উল্লেখ নাই। উহা হইতে অনুমিত হয় যে, কাস্‌ব মতবাদটি আল-আশ'আরীর নিজের নহে, বরং তাঁহার শাগরিদের। যাহা হউক, ঐ ধারণাটি মাকালাত ও ইবানা-এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং কিতাবু'ল-লুমা'-তে ৫ম অধ্যায়ে (কাদ্‌র) বহুবার এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের (ইসতিতা'আ, প্রারম্ভে পুনরায় দৃষ্ট হয়); তু. R. Mc Carthy's সম্পা. ও ইংরেজী অনু. The Theology of al-Ash'ari, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ. ৩৭-৫৮/৫৩-৮১, Passim)। ইহা পণ্ডিত সম্প্রদায়ের একটি অপরিবর্তনীয় বিষয়বস্তু ছিল এবং যখন 'আবদু'ল-জাব্বার (ঐ স্থানে উদ্ধৃত) আল-জুব্বা'ঈ-এর প্রতিকূল সমালোচনা প্রচার করিলেন, তিনি প্রথম পর্যায়ে আশ'আরী প্রকাশিত সাধারণ সূত্রের সহিত নিজের খণ্ডনকারী মতগুলিও প্রকাশ করেন। আল-বাকিল্লানী ৪০৩/১০১৩ সনে ও 'আবদু'ল-জাব্বার ৪১৫/১০২৫ সনে ইনতিকাল করেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত আশ'আরী "কাস্‌ব মতবাদ"-কে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং ইহার প্রতি মু'তাযিলীদের প্রতিবাদগুলি তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলিতে (আল-জুওয়ায়্‌নী আল-গাযালী, আল-জুরজানী, ইত্যাদি) এবং তাঁহাদের মৌলিক পুস্তকগুলিতে (আস-সানূসী, আল-বাজূরী, ইত্যাদি) খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ মনে হয় সর্বদা কুদরাত হাদিছাত (আল্লাহ্‌র সৃষ্ট 'দৈবশক্তি') এবং ইস্‌তিতা'আ [দ্র.] কাজ করিবার সামর্থ্যের ধারণার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

আল-আশ'আরীর কাস্‌ব ও ইকতিসাব নিঃসন্দেহে 'ইলমু'ল-কালামের প্রথম প্রবণতা যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পূর্বপুরুষের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, যাঁহাদেরকে আহ্‌লু'ল-ইছবাত বলিতে তিনি পছন্দ করিতেন। ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-র ন্যায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক আশ'আরী কাস্‌ব-এর প্রতি আরোপিত চরম সূক্ষ্মতা বা অস্পষ্টতা সম্ভবত এই সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল যে, স্বাধীনভাবে সম্পাদিত একটি কাজের প্রত্যক্ষ উল্লেখের মধ্যে মূল শব্দ ক-স-ব-এর মৌলিক অর্থ ছিল, যাহা অভ্যন্তরীণ কোন সত্যতা মনস্তাত্ত্বিক সাদৃশ্য ছাড়া অধিক কিছু বিবেচিত হইত না। দিরার ও আন-নাজ্জার-এর কাস্‌ব ও ইক্‌তিসাব-এর অনুবাদ এখনও 'অর্জন' বা বিশেষ কার্যে 'প্রয়োগ' করা হয় ; কিন্তু প্রকৃত আশ'আরী মতবাদে "অনাবশ্যক আরোপ" ও "বৈধ আরোপ"-এর পার্থক্য করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, আশ'আরীর কাস্‌ব বা ইক্‌তিসাব কার্য করিবার "দৈবাধীন শক্তি" এবং সম্পাদিত কার্যের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। কিন্তু দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটির আনুষঙ্গিকভাবে কোন কার্যকারিতা নাই। (দৃষ্টান্তস্বরূপ আল-জুওয়ায়নী, ইরশাদ, সম্পা. ও ফরাসী অনুবাদ Luciani, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., ১১৯/১৯১২)। শক্তি, কাজ ও কাসব মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যাহা আল-জুরজানী-র বর্ণনানুসারে (শারহু'ল-মাওয়াকিফ, সম্পা. কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ৮খ, ৪৮) আধার, স্থান (মাহাল্ল) ছাড়া আর কিছুই নহে ঃ এই সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলিতে এইরূপ প্রকাশ প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে কাস্‌ব সম্বন্ধে ধারণা করা হইয়াছিল যে, উহা উৎপাদিত ফল এবং যে উৎস হইতে উহা উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে প্রকৃত 'সংযোগ', (তা'আল্লুক', আস্‌-সানূসী, মুকাদ্দিমা, সম্পা. ও ফরাসী অনুবাদ Luciani, Algiars ১৯০৮ খৃ., ৭০-১) অথবা ইব্‌ন হাযম-এর অনুসরণে "সংযোজনের অবস্থান" হিসাবে (ইসতিদাফা, তু. আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল, সম্পা. কায়রো ১৩৪৭ হি., ৩খ, ৪৮), মানুষের স্বীয় কাজের উপর কোনও ক্ষমতা থাকিবে না, "এমনকি সেই কাজের ফল সম্বন্ধেও তাহার কোনও নিশ্চিত ধারণা থাকিবে না।" (আল-বাজূরী, হাশিয়া 'আলা.... জাওহারাতি'ত-তাওহীদ, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৪,৬১)। অতি কঠোর 'আশ'আরী মতবাদ অনুসারে এই কাস্‌ব-এর মত সম্পূর্ণরূপে দুর্বোধ্য, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন 'অর্জন'-এর উপর 'আরোপ'-এর ধারণা আনিয়া দেয়। অন্যান্য বিশ্লেষক প্রবন্ধগুলি সম্ভবত দিরার-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যাখার প্রভাবে অথবা আন-নাজ্জার বা আল-মাতুরীদী প্রদত্ত ব্যাখ্যা (নিম্নে দ্রষ্টব্য) ইঙ্গিত প্রদান করে যে, কাস্‌বকে একটি 'ইচ্ছা'

(ইরাদা) হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, যাহা দৈবক্রমে ('আরাদ) সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু সর্বদা ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে তিনটি গুণ বর্তমান থাকিবে—দৈবাধীন ইচ্ছা, দৈবাধীন শক্তি ও উৎপাদিত ফল-প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং উহাদের মধ্যে অপরের অধীন এমন কোনও অভ্যন্তরীণ সংযোগ থাকিবে না। মু'তাযিলীরা আপত্তি তুলিয়াছিল যে, একটি দৈব ঘটনা (কাস্‌ব) অপর একটি দৈব ঘটনা (মানুষের কার্য)-এর সহজাতভাবে থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে ইব্‌ন হায্‌ম প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, এইরূপে সহজাতভাবে থাকা সম্ভব (গ্রন্থে উদ্ধৃত, ৩খ, ৫১-২)। আল-বাজূরী উভয় মত ও উভয়ের ব্যাখা আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয় মতই তিনি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাস্‌ব ইচ্ছা মতবাদটি কাস্‌ব সম্পর্ক মতবাদ অপেক্ষা কম 'বিশ্বাসযোগ্য'।

৩। হানাফী-মাতুরীদী মতবাদ (কয়েকজন আশ'আরী চিন্তাবিদসহ)ঃ প্রাথমিক আলোচনাসমূহ যাহা মাতুরীদী মতবাদের ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কাস্‌ব-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (আল-ফিকহু'ল-আকবার, ১ম আল-ফিকহু'ল-আসগার) কিংবা ওয়াসিয়াত আবূ হানীফা-য় ইহার উল্লেখ নাই। তবে আল-ফিক্‌হু'ল-আকবার ২য় (a, 7; Eng. tr. A. J. Wensinck, The Muslim creed, Cambridge 1932. 191) নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষের কাজই তাহাদের 'অর্জন' (কাস্‌ব)। আল-ফিকহু'ল-আকবার নামক আশ্-শাফি'ঈ লিখিত গ্রন্থ যাহা ফিক্‌হ আকবার ৩য় নামে Wensinck দ্বারা সম্পাদিত (a, 18, Ibid, 266) অনুসারে "আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে কাস্‌ব-এর শক্তি সৃষ্টি করেন"।

যেমনভাবে খোদাঈ সর্বশক্তিমত্তা এবং মানুষের স্বাধীনতাবিষয়ক সাধারণ সমস্যা সংক্রান্ত ঐ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মতের সহিত আশ'আরীর কাস্‌ব-এর সম্পর্ক ছিল, তেমনিভাবে কাস্‌বসম্পর্কিত ধারণা কালাম বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আল-মাতুরীদী তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি মানুষের কাজ সম্পর্কীয় তাঁহাদের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে একটি কাজের (তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক) মূল আল্লাহ্‌র শক্তি (কুদ্‌রাত) হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহার (নৈতিক) যোগ্যতা, তাহা আল্লাহ্‌র আইন মান্য করুক বা না করুক, উৎপন্ন হয় ব্যক্তির ক্ষমতা (কুদ্‌রাত) হইতে (তু. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আবদু'র-রাহীম ইব্‌ন 'আলী নাজমু'ল-ফারা'ঈদ, কায়রো ৭৩-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ)। কাস্‌ব সুনিশ্চিতভাবে এই যোগ্যতাকে বোঝায়, সুতরাং ইহা মানুষের শক্তি' হইতে উদ্ভূত। পরবর্তীকালে মানুষের কাজের ফলের জন্য মানুষের গৃহীত কোন পদ্ধতি অনুমোদিত হইয়াছিল, ইহা আল-আশ'আরীকে ত্যাগ করিয়া দিরার ও নাজ্জার-এর পুরাতন মতের দিকে প্রত্যাবর্তন। কাস্‌ব-কে সিফাত বা একটি নৈতিক গুণ হিসাবে ব্যাখ্যা মাতুরীদীর ধারণার প্রতি স্বাভাবিক সাড়া বোঝায় (তু. আন-নাসাফী, আত-তাফতাযানী, আল-লাকানী ইত্যাদি)। কতিপয় আশ'আরী মানুষের কার্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, বিশেষত "কার্য সম্পাদনে দক্ষতা" (ইস্তিতা'আত) সম্বন্ধে তাহাদের দর্শনের প্রতি অনুরক্ত থাকিতে কাস্‌বকে সিফাতের অতি নিকটবর্তী একটি মতবাদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পুরবর্তীকালের চিন্তাবিদদের মধ্যে হানাফী মাতুরীদীগণ আল-বাকিল্লানী হইতে উদাহরণ দিতে পছন্দ করিতেন, ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী (মুহাস্‌সাল, কায়রো ১৪৩)-কেও এইখানে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এইরূপে তিনটি অনুধাবনযোগ্য পৃথক মত পাওয়া যাইতেছে, আর তিনটিতেই 'ইলমু'ল-কালামের সরকারী মতের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে ঃ কাস্‌ব 'সম্পর্কে' (খাঁটি আশ'আরী মতবাদ) কাস্‌ব 'ইচ্ছা' (গৌণ আশ'আরী প্রবণতা) এবং কাস্‌ব-সিফা (মাতুরীদী ও কতিপয় আশ'আরী)। ইহা লক্ষ করিতে হইবে যে, তাঁহাদের কাস্‌ব মতবাদের মধ্য দিয়া যদিও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, আশ-আরীরা, মাতুরীদী-হানাফীদের ন্যায় সুবিবেচিতভাবে জাবারিয়্যা ও মু'তাযিলাদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপর মানুষের কার্যসমূহের জন্য নিজ দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পবিত্র সম্পর্ক, দৈবাধীন ইচ্ছা বা নৈতিক গুণ যাহাই হউক, কাস্‌ব-এর অনুপাতে আল্লাহ্ বিচারের দিনে কৃতকর্মের জন্য মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধের মধ্যে প্রদত্ত, ইহার সহিত যোগ করা যায় ঃ (১) ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী মাফাতীহু'ল-গায়ব, ২খ, ২৮৬ ; (২) H. Stieglecker, Die Glaubenslehren des Islam. Munich, Paderborn. Vienua 1959-62, 103 ff.; (৩) L. Gardet, Les grands problemes de la theologie Musulmane : Dieu et la destinee de l'homme, Paris 1967, 60-4; (৪) দা. মা. ই., ১৭খ, ২৬৬-৬৭।

L. Garden (E. I.[2])/মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী

কাস্‌ব (الكسب) ঃ আভিধানিক অর্থ উপার্জন, রোজগার, অর্জন, লাভ, জমা, প্রাপ্তি। জীবিকা অন্বেষণ অর্থে সাধারণত শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সীবাওয়ায়হ্ বলেন, কাস্‌ব অর্থ অর্জন করা, পাওয়া। শব্দটি বাব ইফতি'আল (باب افتعال) হইতে ব্যবহৃত হইলে অর্থ হয় কাজ করা, আচরণ করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা (ইব্‌ন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, ৫খ, পৃ. ৩৮৭০)।

পবিত্র কুরআনে কাস্‌ব ও ইকতিসাব শব্দদ্বয় এইগুলির বিভিন্ন রূপান্তরের সহিত দুইটি অর্থে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ১. মন্দ কর্ম, মন্দ আচরণ, মন্দ কথা, মন্দ বিষয়। এই অর্থে বলা হইয়াছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ٠

"সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের" (২ ঃ ৭৯)। পবিত্র কুরআনে প্রায় সাতাইশটি আয়াতে কাস্‌ব ও ইকতিসাব শব্দ উপরোক্ত অর্থে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। আয়াতগুলি হইল ঃ ২ ঃ ৭৯, ২ ঃ ৮১, ৪ ঃ ৮৮, ৪ ঃ ১১১, ৪ ঃ ১১২, ৫ ঃ ৩৮, ৬ ঃ ১২০, ৬ ঃ ১২৯, ৭ ঃ ৩৯, ৭ ঃ ৯৬, ৯ ঃ ৮২, ৯ ঃ ৯৫, ১০ ঃ ৮, ১০ ঃ ২৭, ১০ ঃ ৫২, ১৮ ঃ ৫৮, ২৪ ঃ ১১, ৩০ ঃ ৪১, ৩৫ ঃ ৪৫, ৩৬ ঃ ৬৫, ৩৯ ঃ ২৪, ৩৯ ঃ ৪৮, ৩৯ ঃ ৫১, ৪১ ঃ ১৭, ৪২ ঃ ৩৪, ৮৩ ঃ ১৪, ১১১ ঃ ২।

২. ভাল বা মন্দ কাজ বা কথা। এই অর্থে বলা হইয়াছে ঃ

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٠

"সেই ছিল এক উম্মাত, তাহা অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হইবে না" (২ ঃ ১৩৪)।

পবিত্র কুরআনে এই অর্থে কাস্‌ব ও ইকতিসাব প্রায় আঠারটি আয়াতে ব্যবহার হইয়াছে। আয়াতগুলি হইল ঃ ২ ঃ ১৩৪, ২ ঃ ১৪১, ২ ঃ ২২৫, ২ ঃ ২৮১, ২ ঃ ২৮৬, ৩ ঃ ২৫, ৩ ঃ ১৬১, ৪ ঃ ৩২, ৬ ঃ ৭০, ৬ ঃ ১৬৪, ১৩ ঃ ৩৩, ১৪ ঃ ৫১, ৩৩ ঃ ৫৮, ৪০ ঃ ১৭, ৪২ ঃ ৩০, ৪৫ ঃ ১৪, ৫২ ঃ ২১, ৭৪ ঃ ৩৮।

ভাল কর্ম, ভাল কথা, ভাল বিষয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর" (২ ঃ ২০২)।

لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

"যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই" (৬ ঃ ১৫৮)।

মনের নিয়ত ও নিয়তের দৃঢ়তা অর্থে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করিবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করিবেন (২ ঃ ২২৫)।

সম্পদ উপার্জন অর্থে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ -

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর" (২ ঃ ২৬৭)।

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ.

"উহার ধন-সম্পদ ও উহার সন্তান উহার কোনও কাজে আসে নাই" (১১১ ঃ ২)।

কাস্‌ব (كسب) শব্দটি প্রসঙ্গে রাগিব ইসফাহানী বলেন, মানুষ নিজের অংশ প্রাপ্তি ও কল্যাণ অর্জনে যাহা কিছু অন্বেষণ করে তাহাকেই কাস্‌ব বলা হয়, যেমন সম্পদ অন্বেষণ। কখনও মানুষ যাহাতে নিজের কল্যাণ জ্ঞান করে অথচ তাহাতে সাধিত হয় অনিষ্ট, এইরূপ কাজকেও কাস্‌ব বলা হয়। ইহা ছাড়া কোন কিছু নিজের জন্য ও অপরের জন্য গ্রহণ করিলে তাহাকেও কাস্‌ব বলা হয়। তবে ইকতিসাব শব্দটি শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যেখানে মানুষ নিজের জন্য কিছু প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সকল ইকতিসাবের মধ্যে কাস্‌ব রহিয়াছে, তবে সকল কাস্‌বের মধ্যে ইকতিসাব নাই (আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৪৩৩, দ্র. كسب)।

ইব্‌নুল আছীর বলেন, কাস্‌ব অর্থ অন্বেষণ; জীবিকা ও জীবনোপকরণের অন্বেষণে চেষ্টা চালানো। তবে হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, اطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه "মানুষের নিজের উপার্জিত জীবিকা হইল সর্বোত্তম জীবিকা এবং মানুষের সন্তানও তাহার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত"।

এই হাদীছে সন্তানকে নিজের উপার্জন বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেননা পিতা সন্তান কামনা করে ও উহার জন্য চেষ্টা তদবীর করে। কাস্‌ব (كسب) শব্দটি হাদীছ শরীফে কখনও এক মাফ্'উল (কর্মপদ) কখনও দুই মাফ্'উল-এর প্রতি মুতা'আদ্দী (সকর্মক ক্রিয়া) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم "নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, অসহায়ের দায়িত্ব বহন করেন এবং নিঃস্ব-দরিদ্রদের আয়-উপার্জনে সহযোগিতা করেন"। হাদীছে উল্লেখিত تكسب ক্রিয়াটি যদি এক মাফ'উলের প্রতি মুতা'আদ্দী হয় তাহা হইলে উপরোক্ত তরজমা হইবে। পক্ষান্তরে দুই মাফ'উলের প্রতি মুতা'আদ্দী হইলে تكسب المعدوم-এর মূল পাঠ হইবে انك تعطى الناس الشىء المعدوم عند هم وتوصله اليهم। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি মানুষকে তাহাদের নিকট যাহা নাই তাহা দান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট তাহা পৌছাইয়া থাকেন। এই হাদীছের মধ্যে تكسب ক্রিয়াটির দ্বারা শেষোক্ত এই উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয় (আন্-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ, পৃ. ৭৮৮, দ্র. كسب)।

ইমাম সারাখসী বলেন, "আরবী ভাষাভাষীগণের পরিভাষায় কাস্‌ব ও ইকতিসাব হইল হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। তবে শব্দ দুইটি প্রকৃত অর্থে ভাল ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে মু'মিনগণ ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর' (২ ঃ ২৬৭)। পক্ষান্তরে অপর আয়াতে বলেন, 'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা ত তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল' (৪২ ঃ ৩০)। উপরোক্ত দুইটি আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কাস্‌ব শব্দটি ভাল-মন্দ কথা ও কাজ, অনুরূপভাবে হালাল ও হারাম উভয় প্রকারের উপার্জনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সাধারণভাবে ব্যবহার ও আলোচনায় কাস্‌ব ও ইকতিসাব সম্পদ উপার্জনের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আল-মাবসূত, ৩০খ, পৃ. ২৪৪, দ্র. কিতাবুল কাস্‌ব, ২. কিতাবুল কাস্‌ব, তাহ্কীক ও 'ই'তিনা 'আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ, পৃ. ৭০, দ্র. মা'নাল ইকতিসাব লুগাতান)।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মসমূহ কাস্‌ব বা উপার্জনের কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করে নাই বা উপার্জনের জন্য উৎসাহও প্রদান করে নাই, বরং উপার্জন যথাসাধ্য বর্জন করার উৎসাহই দিয়াছে। ঐ ধর্মসমূহে উপার্জনকে ইবাদতের পরিপন্থী, বরং বৈরাগ্য সাধনকেই 'ইবাদত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ইয়াহূদী মতবাদ ঃ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও 'ঈসায়ী ধর্মের ন্যায় যদিও ইয়াহূদী ধর্মে বৈরাগ্যের শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, তবুও ইয়াহূদী ধর্মে বর্তমানে যেই অনুশাসন রহিয়াছে তাহাতে বিশ্বের অধিকাংশ জিনিস হইতেই ফায়দা গ্রহণ না করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এখানে দুই-চারটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইল। (ক) তোমরা গাভী, ষাঁড়, ভেড়া ও বকরীর সর্বপ্রথম যেই নর বাচ্চা হইবে তাহাকে আপন খোদার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দাও। তুমি তোমার ষাঁড়ের প্রথম বাচ্চা দ্বারা কোনও কাজ নিবে না এবং ভেড়ার প্রথম বাচ্চার পশমও কাটিবে না (বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ : ১৯ অবলম্বনে, পূর্বোক্ত, ১খ., পৃ. ১২২)। (খ) তুমি মিশ্র বুনটের কাপড়, যেমন উল এবং মখমল মিশ্রিত কাপড় কখনও পরিবে না (পূর্বোক্ত, ২২ ঃ

৯)। (গ) যদি কোন ষাঁড় কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে শিং-এর আঘাতে মারিয়া ফেলে তাহা হইলে ঐ ষাঁড়কে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহার গোশ্তও খাওয়া চলিবে না (পূর্বোক্ত, যাত্রাপুস্তক, ২১ ঃ ৮)। ইয়াহূদীগণ শূকর ছাড়াও উট এবং খরগোশের গোশ্ত খাইত না। ইহা ছাড়া ষাঁড় ও ভেড়া-বকরীর চর্বিও তাহারা ব্যবহার করিত না (পূর্বোক্ত, অধ্যায় ৭)।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ্য মত, বৌদ্ধ মত, ঈসায়ী মত প্রভৃতি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনও সমাধানই দিতে পারে নাই আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১খ., পৃ. ১২৬; দ্র. ভগবৎ গীতা; অধ্যায় ৩, শ্লোক ৩৮, অনুস্মৃতি, অধ্যায় ২, শ্লোক ৯৪, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৮৮, ঐ, শ্লোক ২৬; এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৪খ., পৃ. ৯৭৮ ইনজীল, ১ম অধ্যায়, ১৭; মথি, অধ্যায় ১৯ : ২৩-২৪, সূত্র, মুহাম্মদ ইউসুফউদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১খ.; ড. হামীদুল্লাহ্, জাদীদ কানূন বাইনাল মামালিক কা আগায, অধ্যায় ১৮, পৃ. ২৮০]।

ইসলামে উপার্জনের গুরুত্ব

ইসলামে উপার্জনের গুরুত্ব অনুধাবনের সুবিধার্থে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয় ঃ (১) বৈরাগ্যের অনুপস্থিতি ঃ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও ঈসায়ী ধর্মসমূহের ন্যায় ইসলামে বৈরাগ্য নাই। ঈসায়ীগণকেও আল্লাহ্ তা'আলা বৈরাগ্যের নির্দেশ দেন নাই (দ্র. ৫৭ : ২৭); উহা ছিল তাহাদের মনগড়া ইবাদত।

বিভিন্ন হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (স) তথাকথিত মানবরচিত বৈরাগ্য ব্যবস্থা বর্জন করিয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মাবলী অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

"আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আমি বলিলাম, তুমি যেইভাবে আমার নিকট আসিয়া কিছু উপদেশ চাহিতেছ, আমিও সেইভাবে একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হাজির হইয়া উপদেশ চাহিয়াছিলাম। শোন, তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা সমস্ত ইবাদতের সারমর্ম ইহাই এবং জিহাদে অবশ্যই অংশগ্রহণ করিবে, কেননা ইহাই হইল ইসলামের বৈরাগ্য ... (আহমাদ, মুসনাদ, ৩খ., ৮২, পৃ. হাদীছ নং ১১৩৪৯)।

عن أنس بن مالك أن النبى قال لكل نبى رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله عز وجل.

"আনাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে বিশেষ ধরনের সন্ন্যাসবাদ ছিল আর এই উম্মাতের সন্ন্যাসবাদ হইল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ" (পূর্বোক্ত, ৩খ, ২৬৬ পৃ., হাদীছ নং ১৩৩০৬)।

عن سعد بن أبى وقاص قال لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذى كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله ﷺ فقال : ياعثمان إنى لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتى قال لا يا رسول الله .

"সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন জানিতে পারিলেন যে, উছমান ইব্ন মাজউন দিন-রাত্র ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন এবং বিবাহ বর্জন করেন, তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন : হে উছমান ! আমি বৈরাগ্যের জন্য আদিষ্ট হই নাই। তুমি কি আমার সুন্নাতকে বর্জন করিতে চাও ? তিনি বলেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্। ... (দারিমী, কিতাবুন্নিকাহ, বাব : নাহি 'আনিত্ তাবাত্তুল, হাদীছ নং ২০৭৫)।

কর্মবিমুখ তাওয়াক্কুল স্বীকৃত নহে

জীবিকা উপার্জনের নিমিত্তে কোনরূপ উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করিয়া শুধুমাত্র তাওয়াক্কুল করিয়া হাত-পা গুটাইয়া রাখার অনুমতিও ইসলাম দেয় না। তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতার অর্থ হইল, শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী আয়-উপার্জনের জন্য হালাল পন্থায় পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। আর এই চেষ্টার পর ফলাফল যাহাই হউক তাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মনে করিয়া সবর ও শোক্র আদায় করা। নবী-রাসূলগণের চাইতে বড় তাওয়াক্কুলকারী আর কেহই হইতে পারে না। অথচ তাঁহারা জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনও না কোনও পেশা অবলম্বন করিয়াছেন।

عن أبى هريره قال رسول الله ﷺ ما بعث الله نبيا إلا راعى غنم، قال له أصحابه وأنت يا رسول الله ! قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করেন নাই যিনি বকরী চরান নাই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনিও ? বলিলেন, আমিও কয়েক কীরাতের (নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার) বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরী চরাইয়াছি (বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাব রা'য়িল গানাম 'আলা কারারীত, হাদীছ নং ২১০২; ইব্ন মাজা, কিতাবুত্ তিজারাত, বাবআস্-সানা'আ, হাদীছ নং ২১৪০)।

عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ أن داود النبى عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, নবী দাউদ (আ) নিজ হস্তের উপার্জন ব্যতীত আহার করিতেন না" (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব কাস্বির রাজুল ওয়া 'আমালুহু বিয়াদিহ, হাদীছ নং ১৯৩১)।

عن ابى هريرة أن رسول الله ﷺ قال كان زكريا نجارا.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, নবী যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ করিযা জীবিকা নির্বাহ করিতেন" (মুসলিম, কিতাবু'ল ফাদাইল, বাব ফী ফাদাইলি যাকারিয়া, হাদীছ নং ৪৩৮৪ ইব্ন মাজা, কিতাবুত্ তিজারাত, বাব-আস্-সান'আ, হাদীছ নং ২১৪১)।

আর যেই হাদীছের বাহ্যিক অর্থের প্রতি খেয়াল করিয়া তাওয়াক্কুলের কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। হাদীছটি হইল ঃ

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর প্রকৃত্ই ভরসা করিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদেরকে ঐভাবেই জীবিকা দান করিতেন যেইভাবে তিনি পক্ষীকুলকে দান করিয়া থাকেন। পক্ষীকুল সকাল বেলা খালি পেটে বাহির হয় এবং বিকাল বেলা ভরা পেটে ফিরিয়া আসে" (তিরমিযী, আবওয়াবুয্ যুহদ, বাব মা জাআ ফিয্-যাহাদাতি ফিদ্-দুনয়া, হাদীছ নং ২২৬৬)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা 'আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তোমরা যদি এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল কর (حق توكله) তোমরা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই বিশ্বাস কর যে, সকল কর্ম সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্, যাহা কিছু দেওয়া হয় একমাত্র তিনি দিয়া থাকেন, আর যাহা কিছু দেওয়া হয় না তাহা তিনিই দেন না, অতঃপর জীবিকা অন্বেষণে আত্মনিয়োগ কর এবং তোমাদের মনে থাকে

ভরসা ও চেহারায় থাকে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা পাখির মতই জীবিকা লাভ করিবে। ... 'আল্লামা মুনাবী বলেন, উপায়-উপকরণ আর উপার্জন রিযিকদাতা নহে; রিযিকদাতা হইলেন একমাত্র আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (স) এই হাদীছে এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তাওয়াক্কুলের অর্থ উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করিয়া হাত-পা গুটাইয়া সম্পূর্ণ কর্মহীন অবস্থায় বসিয়া থাকা নহে; বরং তাওয়াক্কুলের জন্য কোনও না কোনও পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। কেননা পাখি অন্বেষণ ও পরিশ্রমের পরেই কেবল রিযিক পাইয়া থাকে। আর এই কারণেই ইমাম আহমাদ (র) বলিয়াছেন, কামাই-রোজগার ছাড়িয়া দেওয়ার প্রতি হাদীছে কোনরূপ ইঙ্গিত নাই, বরং ইহাতে জীবিকা অন্বেষণের প্রতি জোর তাগিদ রহিয়াছে। তাহা হইলে হাদীছে তাওয়াক্কুল বলিয়া কি বুঝানো হইয়াছে ? এই প্রশ্নের জবাব হইল, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উদ্দেশ্য হইল, মানুষ জীবিকা অন্বেষণের জন্য যেই দৌড়-ঝাঁপ, চেষ্টা-তদবীর ও উদ্যোগ-আয়োজন করে তাহাতে যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখে এবং মনে-প্রাণে এই বিশ্বাস রাখে যে, কল্যাণ একমাত্র তাঁহার হাতেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রচেষ্টা সফল হইবে এবং পাখির মতই সে রিযিকপ্রাপ্ত হইবে (তুহফাতুল আহওয়াযী শারহুত-তিরমিযী, ৭খ, পৃ. ৭)।

আনাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম নহে, যে আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করে অথবা দুনিয়ার জন্য আখিরাত ত্যাগ করে। বরং উত্তম তো সেই ব্যক্তি, যে উভয়টিকে গ্রহণ করে। কেননা দুনিয়ার মাধ্যমেই আখিরাতে পৌঁছা যায়। সুতরাং দুনিয়া ত্যাগ করিয়া তোমরা মানুষের বোঝা হইও না (কানযুল 'উম্মাল, ৩খ, পৃ. ২৩৮, নং ৬৩৩৪)। মহানবী (স) বলেন ঃ

فی اخر الزمان لابد للناس فیها من الدراهم والدنانیر یقیم الرجل بها دینه ودنیاه.

"যখন আখিরী যমানা আসিবে তখন মানুষের জন্য অর্থ-সম্পদ জরুরী হইয়া পড়িবে; ইহার দ্বারা মানুষ তাহার দীন ও দুনিয়া উভয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৬৩৩৩)।

(৪) অবৈধ পন্থা গ্রহণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও পরনির্ভরশীলতা বাঞ্ছনীয় নহেঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য হালাল কোন পন্থা অবলম্বন না করিয়া অবৈধ পন্থায় কিংবা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করিয়া কিংবা ভিক্ষা করিয়া অথবা পরনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহের পথ অবলম্বন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلاَ تَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْابِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া-শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না" (২ ঃ ১৮৮)।

عن أبي أمامة ان رسول الله ﷺ قال من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من اراك.

আবূ উমামা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনও মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করিবে আল্লাহ্ তাহার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি সামান্য কোনও জিনিস হইয়া থাকে ? তিনি বলিলেন, পিলুগাছের ছোট একটি ডালই হউক না কেন (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব-ওয়া'ঈদু মান্ 'ইকতাতা'আ হাক্কা মুসলিম..., হাদীছ নং ১৯৬)।

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال یاكعب بن عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت.

"জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা)-কে বলিলেন, হে কা'ব ইব্ন 'উজরা ! যেই মাংস হারাম উপার্জনের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে উহা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না (দারিমী, কিতাবুর রিকাক, বাবফী আকলিস্ সুহতি, হাদীছ নং ২৬৫৭)।

عن عبد الله بن عمر قال قال النَّبی ﷺ ما یزال الرَّجُل یسألُ النَّاسَ حَتّٰی یَاْتِيَ یَوْمَ الْقِیَامة لیس فی وجهه مزعة لحم.

'আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যাহারা মানুষের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় কিয়ামতের ময়দানে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার চেহারায় কোন মাংসখণ্ড থাকিবে না (মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাবমান সাআলান্ নাস, নং ১৭২৫)।

عن انس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النَّبی ﷺ يسأله فقال لك فی بیتك شیء. قال بلى حلس تلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فیه الماء. قال ائتنی بهما. قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بیده ثم قال من یشتری هذین. فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال : من یزید علي درهم. مرتین أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمین. فأعطاهما إیاه وأخذ الدرهمین فأعطاهما الأنصاری وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالاخر قدوما فأتنی به. ففعل فأخذه رسول الله فشد فیه عودا بیده وقال اذهب فاحتطب ولاأراك خمسة عشر یوما. فجعل یحتطب ویبیع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال هذا خیر لك من أن تجیء والمسألة نكتة فی وجهك یوم القیامة إن المسألة لاتصلح إلاّ لذی فقر مدقع أولذي غرم مفظع أودم موجع.

"আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার নিকট কিছু যাঞ্চা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়িতে কি কিছু আছে ? সে বলিল, হাঁ, একটি চাদর যাহার একাংশ বিছাই এবং অপরাংশ গায়ে দেই। একটি পাত্র রহিয়াছে যাহাতে আমরা পানি পান করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, সেই দুইটি আমার নিকট লইয়া আস। লইয়া আসিলে ঐ দুইটি জিনিস নিজ হাতে লইয়া উপস্থিত সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন, কে আছ এই দুইটি খরিদ করিবে ? এক ব্যক্তি বলিল, এক দিরহামে আমি লইতে পারি। বলিলেন, কে আছ ইহার অধিক দিবে ? কথাটি তিনি ২/৩ বার বলিলেন। অপর এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি দুই দিরহামে লইতে পারি। তিনি তাহার নিকট জিনিস দুইটা দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দিরহাম দুইটি ঐ আনসারীকে দিয়া বলিলেন, এক দিরহাম দ্বারা খাবার খরিদ করিয়া বাড়িতে লইয়া যাও এবং অপর দিরহাম দ্বারা একটি কুঠার কিনিয়া আমার নিকট লইয়া আস। ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজ হাতে কুঠারে হাতল লাগাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহা লইয়া গিয়া জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া বিক্রি কর এবং পনর দিন পর্যন্ত আমি যেন তোমাকে না দেখি। লোকটি তাহাই করিল; কাঠ

কাটিয়া বিক্রি করিতে করিতে দশ দিরহাম হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, এইবার উহার কিছুটা দিয়া খাবার ও কিছুটা দিয়া কাপড় খরিদ করিয়া লও। এইভাবে কর্ম করিয়া খাওয়া তোমার জন্য ভিক্ষা করার তুলনায় অনেক উত্তম। কেননা এই ভিক্ষাই কিয়ামতের ময়দানে তোমার চেহারায় অপমানের ছাপ হইবে ... (ইবনে মাজা, কিতাবুত্ তিজারাত, বাববায়িল মুযায়াদা, হাদীছ নং ২১৮৯)।

অপর এক হাদীছে অন্যের মাল নিজের জন্য হালাল হওয়ার বিধান বর্ণনা হইয়াছে এইভাবে ঃ

عن ابى حرة الرقشى عن عمه قال ... ثم قال اسمعوا منى تعيشوا الا لاتظلموا الا لاتظلموا الا لاتظلموا انه لايحل مال امرئ إلابطيب نفس منه.

"আবূ হাররা আর-রাকাশী আপন চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমার কথা শোন, তাহা হইলে বাঁচিতে পারিবে এবং শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারিবে। সাবধান, তোমরা যুলুম করিও না, সাবধান তোমরা যুলুম করিও না, সাবধান তোমরা যুলুম করিও না কাহারও মাল তোমার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হইবে না যতক্ষণ না সন্তুষ্টচিত্তে তোমার নিকট অর্পণ করে"... (আহমদ, মুসনাদ, ৫খ, ৭৩ পৃ., হাদীছ নং ১৯৭৭৪)।

(৫) হালাল জীবিকা অন্বেষণের তাকীদ

ইসলাম হালাল পন্থায় জীবিকা অন্বেষণের প্রতি তাকীদ প্রদান করিয়াছে, উপরন্তু উহার বহুবিধ ফযীলাত ও উপকারিতা উল্লেখ করিয়াছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে— যাহাতে তোমরা সফলকাম হও" (৬২ ঃ ১০)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু" (৪ ঃ ২৯)।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

"ইহা এইজন্য যে, তাহারা বলে, "ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন" (২ ঃ ২৭৫)।

عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة.

"আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরযসমূহের পর আরেকটি ফরয"।

ইহার ব্যাখ্যায় আল-মুনাবী বলেন, প্রথম পর্যায়ের ফরয হইল পাঁচ ওয়াক্তের সালাত অথবা ইমাম গাযালীর ভাষ্যমতে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ (আবদুর রাউফ মুনাবী, ফায়যুল কাদীর শারহু জামি'ইস্ সাগীর, ৪খ, পৃ. ২৭০)। এইগুলির পরবর্তী ফরয হইল হালাল জীবিকা উপার্জন।

عن ابى سعيد عن النبى ﷺ التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء.

"হযরত আবূ সা'ঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর হাশর হইবে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে" (তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু মা জাআ ফিত্-তুজ্জার, হাদীছ নং ১১৩০; দারিমী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব আত্-তাজির আস্-সাদূক, হাদীছ নং ২৪২৭)।

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ ثلاث فيهن البركة البيع إلى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع.

"সালিহ্ ইব্ন সুহায়ব আপন পিতার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিসে বরকত রহিয়াছে ঃ বাকীতে বিক্রি করা, চুক্তির ভিত্তিতে মুদারাবা ব্যবসা করা ও গমের সহিত জব মিশ্রিত কেবল বাড়ির জন্য, বিক্রির জন্য নহে (ইবন মাজা, কিতাবুত্ তিজারাত, বাবুশ্ শিরকা ওয়াল-মুদারাবা, নং ২২৮০)।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের নিকট বিক্রিত মাল ফেরত লইবে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তাহার পদস্খলনগুলি ক্ষমা করিয়া দিবেন (ইবন মাজা, কিতাবুত তিজারাত, বাবুল ইকালা, হাদীছ নং ২২৮৩)।

عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من باع دارا أوعقارا فلم يجعل ثمنه فى مثله كان قمنا ان لايبارك فيه.

"সা'ঈদ ইবন হুরায়ছ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, বাড়ী-ঘর কিংবা জমি-জমার বিক্রয়লব্ধ অর্থকে অনুরূপ বাড়ি-ঘর কিংবা জমি-জমার মধ্যে না লাগাইলে উহাতে বরকত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক" (পূর্বোক্ত, কিতাবুল আহ্কাম, বাব মানি বা'আ 'আকারান ওয়া লাম য়াজ'আল..., হাদীছ নং ২৪৮১)।

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال خير الكسب كسب يد العامل إذ نصح.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন হইল নিষ্ঠাবান শ্রমিকের উপার্জন" (আহ্মাদ, মুসনাদ, ২খ, ৩৩৪ পৃ., হাদীছ নং ৮০৬০)।

عن ابن عمر عن النبى ﷺ إن الله يحب المؤمن المحترف.

"ইবন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পেশাজীবী মু'মিন বান্দাকে ভালবাসেন (আল-হায়ছামী, মাজমা'উয্ যাওয়াইদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব-আয়্যুল কাসবি আত্য়াব, ৪খ, পৃ. ৬০)।

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من امسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له.

'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি সারাদিন নিজ হস্তদ্বয়ের সাহায্যে কর্ম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সে বিকালেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া যায় (পূর্বোক্ত)

وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها.

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও হাতে যদি একটি গাছের চারা এমন সময়ও আসে যখন কিয়ামত শুরু হইয়া যায়, তবুও উহা আগে রোপন করিয়া লইবে" (পূর্বোক্ত)।

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل السبع منه فهو صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولايرزؤه أحد إلاكان له صدقة.

"জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, কোন মুসলমান গাছ রোপণ করিলে উহা হইতে যাহাই ভক্ষণ করা হইবে তাহা তাহার জন্য সদাকাস্বরূপ। অনুরূপভাবে উহা হইতে যাহা চুরি হইবে তাহাও সদাকাস্বরূপ। জীব-জন্তু যাহা খাইবে তাহাও সদাকা। পক্ষীকুল যাহা খাইবে তাহাও সদাকা। কেহ উহা হইতে যাহা ক্ষতি করিয়া ফেলিবে, তাহাও সদাকাস্বরূপ হইবে" (মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, বাব-ফাদছিল্ গারসি, হাদীছ নং ২৯০০)।

কুরআনুল কারীম ও হাদীছ শরীফে যেভাবে সকল হালাল পন্থায় প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ উপার্জনের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে, অনুরূপভাবে উপার্জন ব্যতীত হালাল পন্থায় প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ প্রত্যাখ্যান না করার প্রতিও অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে। যেমন,

أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه منى فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.

'আবদুল্লাহ্ 'ইবন উমার (রা) বলেন, আমি আমার পিতা 'উমার (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) মাঝেমধ্যে আমাকে অর্থ-সম্পদ দান করিতেন। একদা আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রয়োজন নাই; আমার চেয়ে অধিক অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন। তিনি বলিলেন, হে 'উমার! চাওয়া কিংবা চাওয়ার ভান করা ব্যতীত কোন মাল আসিলে উহা গ্রহণ করা", অন্যথায় উহার পিছনে পড়িও না (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত, বাব মান 'আ'তাহুল্লাহ শাইয়ান মিন গায়রি মাস্আলা, হাদীছ নং ১৩৮০)।

عن عمرو بن العاص يقول قال لى رسول الله ﷺ ياعمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني ففعلك فجئته وهو يتوضأ وصعد فى البصر وثوبه وقال ياعمرو إنى أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال قلت يارسول الله إنى لم أسلم رغبة فى المال إنما أسلمت رغبة فى الجهاد والكينونة معك قال ياعمرو نعما بالمال الصالح للرجل الصالح.

'আম্র ইব্নুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, তোমার অস্ত্রসস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমার নিকট আস। আমি সবকিছু প্রস্তুত করত তাঁহার নিকট আসিয়া দেখি, তিনি উযূ করিতেছেন। তিনি আমার প্রতি চক্ষু তুলিয়া আপাদমস্তক অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে 'আমর! আমি তোমাকে একদিকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পাঠাইতে চাহিতেছি। আশা করি আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখিবেন ও গনীমাতের মাল দান করিবেন। আমি একান্তভাবেই কামনা করি যে, তোমার সৎ উপায়ে কিছু সম্পদ হইয়া যাক। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সম্পদের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আপনার সংস্রবে থাকিবার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হে 'আমর! ভাল মানুষের জন্য ভাল মাল কতই না ভাল" (আহমাদ, মুসনাদ, ৪খ, ২০৩ পৃ., হাদীছ নং ১৭১৩৪)।

(৬) জীবিকা উপার্জন ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে একটি উত্তম কাজ। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ফকীহগণের ঐকমত্য অনুসারে যেই পরিমাণ উপার্জন না করিলেই নয়, সেই পরিমাণ উপার্জন করা সকলের উপরই ফরয (শামসুল আইম্মা আস্-সারাখসী, আল-মাবসূত, কিতাবুল কাস্ব, ৩০খ, ২৫০ পৃ.)।

উপার্জনের কয়েকটি স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম স্তরটি হইল ফরয। আর তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই পরিমাণ যাহা ব্যতীত সে ফরয কাজ আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ এই পরিমাণ জীবিকা ব্যতীত কোন ব্যক্তি ফরয ইবাদত করিতে সমর্থ হইবে না। আর যাহা ব্যতীত ফরয ইবাদাত সম্পন্ন করা যায় না তাহাও ফরযই হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত উপার্জন করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬)।

ঐ গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে, "আর ঋণগ্রস্ত হইলে যেই পরিমাণ উপার্জনের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় তাহা উপার্জন করাও ফরয। কেননা ঋণ পরিশোধ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন যে, ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। আর উপার্জনের মাধ্যমেই তাহা সম্ভব। অনুরূপভাবে স্ত্রী-পুত্র থাকিলে তাহাদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করাও ফরয। কেননা স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ الاية "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস কর তাহাদেরকেও (স্ত্রীদিগকেও) সেইরূপ গৃহে বাস করিতে দিবে" [৬৫ ঃ ৬] এই আয়াতের উদ্দেশ্য ইহাও যে, তোমরা নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবে (পূর্বোক্ত)।

পরিবারের ভরণ-পোষণের পরিমাণ উপার্জন করার পর নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত উপার্জন করারও অবকাশ আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে যদিও নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি নিজেই স্বীয় পরিবারবর্গের খোরাকীর জন্য এক বৎসরের সামগ্রী সঞ্চয় করিয়াছিলেন (পূর্বোক্ত)।

আর যদি পিতা-মাতা বার্ধক্যাবস্থায় অসচ্ছলতার দরুন কষ্টে দিনাতিপাত করে তাহা হইলে তাহাদের প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ উপার্জন করাও ফরয। কেননা পুত্র উপার্জনে সক্ষম হইলে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তাহার, যদিও সে নিজে অসচ্ছল থাকে। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত জিহাদে গমনের অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার কি পিতামাতা আছে? সে বলিল, হাঁ, আছে। তিনি বলিলেন, বাড়ি ফিরিয়া যাও এবং তাঁহাদের সেবার মাধ্যমেই জিহাদ কর। অর্থাৎ উপার্জন করিয়া তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, صاحبهما فى الدنيا معروفا "পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে" (৩১ ঃ ১৫)। সুতরাং পুত্র উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি পিতা-মাতা অন্নকষ্টে থাকে তাহা হইলে তাহাদের প্রতি "সদ্‌ভাব প্রদর্শন" করা হইল না।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি স্তরের পরবর্তী স্তরে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আরও উপার্জন করিয়া সম্পদ সঞ্চয় করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারে। কেননা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্যে কেহ কেহ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ করেন নাই। সুতরাং বোঝা গেল, ঐ পর্যায়ে উপার্জন করা না করা দুইটিরই অনুমতি রহিয়াছে (পূর্বোক্ত)।

(৭) সম্পদ উপার্জন মৌল উদ্দেশ্য নহে।

ইসলাম কখনও অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানবজীবনের একমাত্র মৌলিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নতিকেই জীবনের পরম উন্নতি বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং অর্থ-সম্পদকেই যাবতীয় কার্যক্রমের চালিকাশক্তির স্থান প্রদান করে না। বরং আখিরাতের অর্জনই হইল মানবজীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের উদ্দেশ্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও অন্যান্য অর্থব্যবস্থার মধ্যে যেই বিষয়টি মৌল পার্থক্য সৃষ্টিকারী তাহা ইহাই (মুফতী তাকী 'উছমানী, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, কিতাবুল বুয়ূ'-এর ভূমিকা দ্র., ১খ, পৃ. ৩০০)।

আল-কুরআনে অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে দুই ধরনের উক্তি পরিলক্ষিত হয়। একটি হইল, অর্থ-সম্পদ, উহার উপার্জনের মাধ্যম ও উহার দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধার প্রশংসামূলক আলোচনা। যেমন ঃ

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে" (৬২ ঃ ১০)।

এই আয়াতে সম্পদকে فَضْلُ اللّٰه (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু আয়াতে সম্পদকে خَيْرٌ (কল্যাণ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ২৮ ঃ ২৪, ২ ঃ ২৭৩, ১০০ ঃ ৮)। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিককে طَيِّبَاتٌ (ভাল, উৎকৃষ্ট, পবিত্র) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (দ্র. ২০ ঃ ৮১, ৭ ঃ ৩২) এবং পোশাক-পরিচ্ছদ যাহা অর্থের মাধ্যমে লাভ হইয়া থাকে زِيْنَةُ اللّٰه (আল্লাহ প্রদত্ত শোভা) বলা হইয়াছে (দ্র. ৭ ঃ ৩২)। আর বসবাসের গৃহকে سَكَنٌ (শান্তির সামগ্রী) বলা হইয়াছে (দ্র. ১৬ ঃ ৮০)।

পক্ষান্তরে বহু আয়াতে অর্থ-সম্পদের নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন কোন কোন আয়াতে مَتَاعُ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ ছলনাময় "ভোগসামগ্রী" (দ্র. ৩ ঃ ১৮৫, ৫৭ ঃ ২০) এবং কোন কোন আয়াতে মাল-সম্পদকে فِتْنَةٌ (বিপর্যয় সৃষ্টিকর বস্তু) বলা হইয়াছে (দ্র. ৮ ঃ ২৮, ৬৪ ঃ ১৫)। অনুরূপভাবে কোন কোন আয়াতে উহাকে عَدُوٌّ (শত্রু, দুশমন) বলা হইয়াছে (দ্র. ৬৪ ঃ ১৪)।

অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উক্ত উভয় বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বিরোধি নহে; বরং মাল সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই এই পার্থক্যকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আখিরাতের সফলতাকে স্বীয় লক্ষ্য স্থির করিবে এবং সম্পদ উপার্জন, ব্যয়করণ ও সঞ্চয়করণ তথা যাবতীয় বিষয়ে আখিরাতের সাফল্য অর্জনই মূল লক্ষ্য নির্ধারিত করিবে, তাহার জন্য এই সম্পদ "আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কল্যাণ, পবিত্র রিযিক ও শান্তির উপকরণ" ইত্যাদি হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রশংসিত হইবে। পক্ষান্তরে সম্পদ উপার্জন করিয়া শুধু পার্থিব ভোগ-বিলাস ও দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়াই হইবে যাহার মূল লক্ষ্য এবং এই সম্পদই যাহার আখিরাতের জন্য বাধা হইবে, তাহার জন্য ইহা "ছলনাময়ী ভোগসামগ্রী, বিপর্যয়, পরীক্ষার বস্তু ও শত্রু হইবে" (প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইবন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪১৬/১৯৯৫; (৩) মুহাম্মাদ নাইফ মা'রূফ, আল-মুজামুল মুফাহরাস লিমাওয়াদী'ইল কুরআনিল কারীম, দারুন্ নাফায়িস, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪২০ /২০০০; (৪) রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, আল-মাকতাবা আত্-তাওফীকিয়্যা, কায়রো, তা.বি.; (৫) ইবনুল আছীর, আন্-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ, ই'তিনা-রাইদ ইব্ন সাবারী, বায়তুল আফকার আদ্-দুয়ালিয়া, রিয়াদ, তা.বি.; (৬) শামসুল আইম্মা আস্-সারাখসী, কিতাবু'ল-মাবসূত, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি; (৭) প্রাগুক্ত, তাহ্কীক ওয়াই'তিনা-'আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবাতুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়া, হালাব ১৪১৭/১৯৯৭; (৮) ড. মুহাম্মাদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, অনু. মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪/১৯৮০; (৯) ইব্ন কাছীর, তাফসীরু'ল কুরআনিল-'আযীম, দারুল জীল, বৈরূত, তা.বি.; (১০) ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুআস্সাসা কুরতুবা, মিসর, তা.বি.; (১১) দারিমী, আস্-সুনান, দারুল কিতাব আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪০৭ হি. মুহাক্কিক-ফাওয়ায আহমাদ যামরালী; (১২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, আস্-সাহীহ্, (ফাতহুল বারীসহ), দারুর-রায়্যান লিত্-তুরাছ, কায়রো ১৯৮৭; (১৩) ইব্ন মাজা, আস্-সুনান, দারুল ফিক্র লিন্-নাশ্র, বৈরূত তা.বি.; (১৪) মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস্-সাহীহ্, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৪; (১৫) তিরমিযী, আস্-সুনান, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি; (১৬) আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা.বি.; (১৭) নাসাঈ, আস্-সুনান, মাকতাবাতুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়্যা, হালাব ১৪০৬/১৯৮৬; (১৮) নবাবী, শারহুন্ নাবাবী 'আলা সাহীহ্ মুসলিম, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৩৯২; (১৯) 'আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযুল-'উম্মাল, মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ্, বৈরূত ১৪১৩/১৯৯৩; (২০) 'আবদুর রাঊফ আল-মুনাবী, ফায়দুল কাবীর শারহু জামি'ইস-সাগীর, আল-মাকতাবাহ আত-তিজারিয়্যা আল-কুব্রা, মিসর ১৩৫৬; (২১) আল-হায়ছামী, মাজমা'উয্ যাওয়াইদ, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত ১৪০৭; (২২) শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী, কিতাবুল-মাবসূত, দারুল মা'রিফাহ্, বৈরূত, তা.বি.; (২৩) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী, কিতাবুল কাস্ব উহার শরাহ মাবসূতসহ, ই'তিনা-'আবদুল-ফাত্তাহ্ আবু গুদ্দাহ, মাকাতীবুল মাতবূআত আল-ইসলামিয়্যা, হালাব ১৪১৭/১৯৯৭; (২৪) মুফতী তাকী 'উছমানী, তাক্মিলাতু ফাতহিল-মুলহিম, মাকতাবা দারুল 'উলূম, করাচী ১৪১৪/১৯৯৪; (২৫) মাওলানা মুহাম্মাদ 'আবদুল 'আযীয, কুরআনের অভিধান (বাংলা), ফয়যুল্লাহ্ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০৬ খৃ.।

নূর মুহাম্মাদ

কাস্‌র (كسر) ঃ ك-س-ر মূল হইতে উদ্ভূত, আরবীতে "ভাঙিয়া ফেলা" অর্থে ব্যবহৃত হয়; অনুরূপভাবে গণিতশাস্ত্রে ইহা 'ভগ্নাংশ' বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। ইবনু'ল-বান্না' (দ্র.) তাঁহার প্রণীত তাল্খীস আ'মালি'ল-হিসাব গ্রন্থে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ঃ "ভগ্নাংশ দুইটি সংখ্যার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক, যখন ইহা একটি বা একাধিক অংশ গঠন করে। অংশ ও একই নামে সংখ্যাটির মধ্যকার সম্পর্ককে ভগ্নাংশ বলা হয়। অংশ অথবা লব বাস্ত নামে পরিচিত; যে সংখ্যাটির সহিত ইহা সম্পর্কিত (সামী) তাহাকে বলা হয় ইমাম (তালখীস্ কাশ্ফু'ল-জিলবাব)। আল-কাশী-এর মতো বাহা'উদ্-দীন আল-'আমিলী (৯ম/১৫শ শতক) সূরা ও মাকাম শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন (পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ২০৩৯, f. 7a) এবং নিম্নোক্ত প্রকাশনাটি Revue de l' Academie du Caire ১৯৫৭; ভগ্নাংশ সংক্রান্ত ধারণার সহিত বিভাজন প্রক্রিয়ার (খারিজ,

শব্দটি বিশেষভাবে 'ভাগফল' অর্থে ব্যবহৃত হয়), ধারণার সংযুক্তি সাধন করিয়া মাখরাজ বা মুখরাজ শব্দদ্বয়ের ব্যবহারও দেখা যায় (ইখওয়ানু'স-সাফা')। সংজ্ঞা অনুসারে পূর্ণ সংখ্যা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতররূপে অংশের ধারণা, আরব গ্রন্থকারগণকে ভগ্নাংশকে পূর্ণ একক সংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃতিগতভাবেই নিকৃষ্টতররূপে বিবেচনা করিতে প্রভাবিত করে। ইহার মূলে রহিয়াছে কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাকে ভাগ করার সুনির্দিষ্ট ধারণাও এই প্রসঙ্গে ইবনু'ল-বান্না' অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন। "ভগ্নাংশের যোগ প্রক্রিয়া তখনই বন্ধ হইয়া যায়, যখন কেহ এমন একটি ভগ্নাংশে উপনীত হয় যাহার লব ইহার হর অপেক্ষা এক একক কম"। আল-কালাসাদী অত্যন্ত যথাযথভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "চার চতুর্থাংশ বা পাঁচ পঞ্চমাংশ এরূপ বক্তব্য কেহ ব্যবহার করে না" (কাশফু'ল-আসতার পাণ্ডুলিপি, তিউনিস, ৩২৯২, পত্রক 39b)।

যে সকল ভগ্নাংশের হর ৩ হইতে ১০-এর মধ্যে সেগুলিকে নির্দেশ করিতে ফু'ল অথবা ফু'উল শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর ভগ্নাংশকে বলা হয় মুনতাক 'উচ্চরণযোগ্য' অথবা মাফ্‌তূহ্ 'উন্মুক্ত (তু. আল-কাশী, মিফ্‌তাহু'ল-হিসাব, পাণ্ডু. তিউনিস ১০৩০১, পত্রক 73b-74a)। ইহা ভিন্ন অপরাপর ভগ্নাংশকে বলা হয় আসাম্ম 'বধির'; ইহাদের বর্ণনা করিতে "জুয্' মিন"...কথাটি ব্যবহৃত হয় ("...এর এক অংশ"..... এর মধ্যে এক অংশ")।

ভগ্নাংশ নির্দেশক চিহ্ন হিসাবে আজ পর্যন্ত যে সংকেত ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ হর সংখ্যাটির উপর লব সংখ্যাটি লিখিয়া সংখ্যাদ্বয়কে একটি আনুভূমিক রেখা দ্বারা বিভক্ত করা—ইহা প্রথম ব্যবহার করেন আল-কালাসাদী (কাশফু'ল-আসরার, পত্রক 17b)। এই প্রতীকটি যেহেতু একটি নূতন প্রবর্তন ছিল বলিয়া আল আলাসাদী ইহার ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি 'আলা রা'সিহি ("ইহার উপরে স্থাপন করা") এবং মা ফাওকা'ল-খাত্‌ত ("যাহা দাগের উপর অবস্থিত") শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। তালখীস সম্পর্কে বিবরণী দ্রষ্টব্য পাণ্ডুলিপি তিউনিস, ৩০৭ R, পত্রক 111b।

ইবনু'ল-বান্না'-এর সময় এবং তৎপরবর্তীকালে আরব গণিত শাস্ত্রবিদগণ পাঁচ প্রকার ভগ্নাংশ স্বীকার করেন ঃ (১) সরল বা সাধারণ ভগ্নাংশ (মুফ্‌রাদ)।

(২) সম্পর্কযুক্ত ভগ্নাংশ (মুনতাসিব), যথা ঃ আল-কালাসাদী হইতে গৃহীত এই উদাহরণটি

$\frac{৩.১.৪.৫}{৪.৩.৭.৯}$ যাহা আধুনিক চিহ্নের মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ

$$\begin{array}{l} ১+\frac{৩}{৪} \\ ৪+\overline{৩} \\ ৫+\overline{৭} \end{array}$$

$$= \begin{array}{cccc} ৫\times৭\times৩\times৪ & ৪\times৩\times৪ & ১\times৪\times৩ & ৪৮০ \\ ৯ \quad \times & ৭ & \times৩\times৪ & ৭৫৬ \end{array}$$

(৩) বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশ (মুখতালিফ), যাহাদের হর অভিন্ন নয়।

(৪) পুনঃবিভাজিত ভগ্নাংশ (মুবা'আদ) অথবা ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ, আল-কালাসাদী যাহার প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন $\frac{৬}{৭}\frac{৪}{৫}\frac{১}{৩}$ অথবা $\frac{৬}{৭}\times\frac{৪}{৫}\times\frac{১}{৩}=\frac{২৪}{১০৫}$, হর ও লববোধক সংখ্যাসমূহের প্রতিটি পরস্পর পৃথক, কিন্তু ও ক্ষেত্রে কোন বিন্দু ব্যবহৃত হয় নাই।

(৫) বাদ দেয়া ভগ্নাংশ (মুস্‌তাছনা), বিয়োগচিহ্ন দ্বারা পৃথকীকৃত।

জ্যামিতিতে ভগ্নাংশ সংক্রান্ত ধারণা প্রকাশ করিতে সাধারণত কাস্‌র শব্দের স্থলে নিস্‌বাত (সম্পর্ক অথবা তাস্‌মিয়া মূল্যবান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য মূল হইতে উদ্ভূত শব্দাবলী ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশে ব্যবহৃত হয় কাস্‌সারা, তাক্‌সীর "ক্ষেত্রফল" মুকাসসার "রৈখিক পরিমাপের এককের বর্গ" (আল-খাওয়ারাযমী, কিতাবু'ল-জাবর ওয়া'ল-মুকাবালা, ৫৫; মুরসিদা, পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ২০৪২, পত্রক ২৫ b; রাসা'ইল ইখ্‌ওয়ানি'স্‌-সাফাও ৬০)। এই ব্যবহারটি ভগ্নাংশের ধারণার সহিত সম্পর্কিত করা যাইতে পারে ; এইভাবে, প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করিবার জন্য, তাহা কতিপয় বর্গক্ষেত্র ভাগ করিয়া নেওয়া হয়, ইহাদের মোট সংখ্যা দ্বারা ক্ষেত্রফল পরিমিত হয়। এই সঙ্গে এইখানে লক্ষ করা যায় যে, আরব গ্রন্থকারগণ ক্ষেত্রফলের ধারণা (সংখ্যা, পাটিগণিতীয় ধারণা) এবং উপরি তলের ধারণা (জ্যামিতিক ধারণা)-এর মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করিতেন।

আল-কাশী (মৃ. ৮৪০/১৪৩৬)-এর রচনা, আল ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা ফি'ল-কাওয়াইদি'ল হিসাবিয়া যাহা মাকালাত নামেও পরিচিত (পাণ্ডুলিপি তিউনিস ১৬৯, ২০৩৯), আমরা প্রথমবারের মত দশমিক ভগ্নাংশ (কুসূর আ'শারিয়া) সংক্রান্ত ভাষ্য দেখিতে পাই। W. Hartner-এর ভাষায় আল-কাশী "এক শত পঞ্চাশ বৎসর কাল পূর্বেই এই সকল ভগ্নাংশের তত্ত্ব অনুধাবন করিয়াছিলেন, যাহা য়ূরোপে প্রবর্তন করেন নিঃসন্দেহে স্বাধীনভাবে Flemish পণ্ডিত Simon Stevin ১৫৮৫ সালে"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উল্লিখিত রচনাবলীর অতিরিক্ত (১) আল-খাওয়ারাযমী, কিতাবু'ল-জাবর ওয়া'ল-মুকাবালা, কায়রো ১৯৩৯ খৃ.; (২) ইবনু'ল-বান্না', তালখীস আ'মালি'ল-হিসাব, সম্পা. M. Souissi, তিউনিস ১৯৬৯ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, রাফ'উ'ল-হিজাব 'আন 'ইলমি'ল-হিসাব, পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ১০৩০১, ২০৬ক, ১৮৪ক; (৪) ইব্‌ন হায়দূর, রিসালা ফী উসূলী 'ইল্‌মি'ল-হিসাব, পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ৯০R; (৫) কাশী, মিফ্‌তাহু'ল-হিসাব, পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ১০৩০১; (৬) ঐ লেখক, মাকালাত জাম্‌শীদ, পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ১৬৯,২০৩৯; (৭) কালাসাদী, কাশ্‌ফু'ল-আসতার 'আন হুরূফি'ল-গুবার, পাণ্ডুলিপি, প্যারিস ৫৩৫০, পাণ্ডুলিপি, তিউনিস ৩২৯২, ৩৯৩৪, ৪৭৭৫ ; (৮) ঐ লেখক, তালখীস সম্পর্কে বিবরণী, পাণ্ডুলিপি, প্যারিস ২৭৬৪; (৯) J. Ruska, Zur altesten arabischen Algebra, হাইডেলবার্গ ১৯১৭ খৃ. ২০, ৫৪; (১০) M. Souissi, La langue des mathematiques en arabe, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ. ৩০৩-৭। (১১) দা. মা. ই. ১৭খ, ২৬৭-৮।

M. Souissi (E. I.²)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাস্‌র (قصر) ঃ মহল, দুর্গ, প্রাসাদ, বৃহদাকার ভবন, তাঁবুর আকারের অট্টালিকা এবং ঐ সকল অর্থে তুর্কী শব্দ 'কূশাক'-এর প্রতিশব্দ কুরআন মাজীদে এই শব্দটি তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। একবার একবচনে

ও দুইবার বহুবচনে (قصور)। উহার ব্যবহার দুইবার জাগতিক ভবনসমূহের ক্ষেত্রে এবং একবার ঐ সকল বেহেশতী বালাখানাসমূহের ক্ষেত্রে হইয়াছে যেখানে মু'মিনগণ অবস্থান করিবেন। রাজধানীতে বাদশাহ-এর বাসভবন এবং প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে সেখানকার কর্মকর্তাদের বাসভবনের জন্য এই শব্দ সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন কাসর কাজার অর্থাৎ কাজারীদের প্রাসাদ; যাহা তেহরানের সন্নিকটে অবস্থিত। স্পেনীয় ভাষায় শব্দটি alcazar রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং মূরদের ভবনসমূহের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে, যেমন কাস্‌র শাকূবিয়া (Alcazar of segovia) এবং কাস্‌র ইশ্‌বীলিয়া (Alcazar of Seville)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon, ঐ শব্দের অধীন; (২) Stanley Lane Poole, The Moors in Spain লন্ডন ১৮৮৭ খৃ. [আরও দ্র. তা, মীর (নির্মাণ) বিষয়ক প্রবন্ধ]।

T. M. Haig (দা. মা. ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

কাস্‌র (قصر) ঃ কাস্‌রু'স-সালাত (قصر الصلوة) কাস্‌র-এর আভিধানিক অর্থ হইল ছোট হওয়া।

শরী'আতের পরিভাষায় কাস্‌র (কাসরু'স-সালাত) উক্ত সংক্ষিপ্তকরণের নাম যাহা মুসাফিরের সালাতের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। কুরআন মাজীদ ও হাদীছে কাস্‌র শব্দটি সালাতের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সংক্ষিপ্তকরণের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরআন মাজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

"এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করিবে তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোনও দোষ নাই" (৪ ঃ ১০১)। সালাত সংক্ষিপ্তকরণকে শরী'আতে ব্যতিক্রম এবং অনুগ্রহ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং শত্রুর ভয়ভীতি কিংবা যুদ্ধাবস্থা না থাকিলেও সফরকালে কাস্‌র-এর হুকুম বিদ্যমান থাকিবে। সাহীহ্ মুসলিম-এর একটি হাদীছ দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায়।

عن يعلي بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب "ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا" فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذالك فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"

(মুসলিম, كتاب الصلوة المسا فرين وقصرها ১ম অধ্যায়), অর্থাৎ "য়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হযরত 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ 'যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের ক্ষতি করিবে তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করায় তোমাদের কোন দোষ নাই', এখন লোকেরা নিরাপদে আছে (অতঃপর কাসর-এর প্রয়োজন কি?)। হযরত 'উমার বলিলেন, "যে বিষয়ে তুমি আশ্চর্য হইয়াছ, আমিও উহাতে আশ্চর্য বোধ করিয়াছি। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ ইহা (কাস্‌র) আল্লাহ্‌র একটি দান যাহা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব তোমরা উক্ত দান গ্রহণ কর।" মুসাফির শব্দটিও শার'ঈ হুকুমসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রবিদগণ মুসাফিরের সংজ্ঞা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ هو من قصد سيرا وسطا ثلثة ايام ولياليها وفارق بيوت بلده (সাদরু'শ-শাদী'আ, শারহু'ল-বিকায়া, পৃ. ২৩৪)। অর্থাৎ শার'ঈ সফর (যাহা সালাত সংক্ষিপ্তকরণ এবং অন্যান্য শার'ঈ লঘুকরণসমূহ, যেমন রোযা ভঙ্গ ইত্যাদির স্থানে পরিণত হয়) প্রমাণিত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্তারোপ করা হইয়াছে ঃ (১) সফরের ইচ্ছা পোষণ অর্থাৎ যদি কেহ সফরের উদ্দেশ্য ব্যতীত বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে শারী'আতে তাহাকে মুসাফির বলা হইবে না; (২) সফর এক নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমের উদ্দেশ্যে হইতে হইবে (যেমন হানাফীদের নিকট সাধারণত তিন দিনের পথ অতিক্রম করা হইল অপরিহার্য কাল) এবং শারী'আত নির্ধারিত কালের উদ্দেশ্য করিয়া বাহির হইবে। যদি শারী'আত নির্ধারিত সময়ের কম পথ অতিক্রম করিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এই সফর শারী'আতের সফর হিসাবে গণ্য হইবে না, এমনিভাবে সফরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যদি শারী'আত নির্ধারিত কাল হইতে কম সময় সফর করিবার ইচ্ছা পোষণ করে তাহা হইলে এই ব্যক্তি শারী'আতের পরিভাষায় মুসাফির হইবে না; (৩) সফরের হুকুমসমূহ তখন হইতে কার্যকর হইবে যখন স্বীয় শহর বা গ্রামের সীমা অতিক্রম করিবে; (৪) যতক্ষণ নিজ জনপদে ফিরিয়া না আসে অথবা কোনও লোকালয়ে পনর দিন অথবা উহার অধিক সময় অবস্থানের নিয়্যত না করে ততক্ষণ সফরের শার'ঈ হুকুমসমূহ কার্যকর থাকিবে।

উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে মুসাফির চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয নামায (জুহর, 'আসর, ও 'ইশা')-এর কেবল দুই রাকা'আত আদায় করিবে। এই সংক্ষিপ্তকরণকে "কাসরু'স-সালাত" বলা হয়। কাস্‌র প্রমাণের জন্য কুরআন (৪ [আন-নিসা'] ঃ ১০১) এবং বুখারী, মুসলিম, প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে সালাতু'ল-মুসাফির অধ্যায়ে স্পষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার উপর ইজমা'ও রহিয়াছে (আল-জাযীরী, কিতাবু'ল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল আরবা'আ, পৃ. ৪৭১)। হানাফী ফাকীহদের নিকট কাস্‌র উজূবের (অপরিহার্যতা) অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মুসাফিরদের জন্য চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয নামাযের দুই রাক'আত আদায় করা অপরিহার্য। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাক'আত আদায় করে তাহা হইলে গুনাহগার হইবে। অবশ্য যদি মধ্যবর্তী ও শেষের উভয় বৈঠক আদায় করা হয় তাহা হইলে প্রথম দুই রাক'আত ফরয হিসাবে আদায় হইবে এবং অবশিষ্ট দুই রাক'আত নফল হিসাবে গণ্য হইবে। (আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, ১খ, ১৪৬)। মালিকী ফাকীহগণ কাস্‌রকে সুন্নাত মু'আক্‌কাদা" বলিয়াছেন যাহার গুরুত্ব জামা'আত সহকারে নামায আদায় করা হইতে অধিক। শাফি'ঈ ও হাম্বালী মতে কাসরকে বৈধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ কাস্‌র অথবা পূর্ণ নামায আদায় করা মুসাফিরের ইচ্ছাধীন। অবশ্য কাস্‌র করা উত্তম (আল-জাযীরী, কিতাবু'ল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, পৃ. ৪৭২)।

কাস্‌র-এর দূরত্ব ঃ কাস্‌র সম্পর্কিত আলোচনায় কাসরের দূরত্ব নামে একটি অধ্যায় রহিয়াছে। শাফি'ঈ, মালিকী ও হাম্বালী ফিকহশাস্ত্রে ষোলো ফারসাখ দ্বারা উহার সীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে (তিন মাইলে এক ফারসাখ; পূ. গ্র., পৃ. ৪৭২)। আল-জাযীরী এই দূরত্বকে ৮০$\frac{১}{২}$ কিলো. এবং ১৪০ কিলোমিটারের সমান মনে করেন। হানাফী ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রে

সফরের দূরত্ব মৌলিকভাবে পরিমাপের স্থলে সময় দ্বারা নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহা বৎসরের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দিনসমূহের হিসাবে তিন দিনের সফরের সমান হইবে। দিন দ্বারা দিনের বেশিরভাগ বোঝায় অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে অতিবাহিত হওয়ার সময় বাদ দিয়া স্বাভাবিকভাবে একদিনে যতদূর সফর করা সম্ভব তাহা বোঝায়। পরবর্তীকালের কোনও কোনও হানাফী ফাকীহ্ তিন দিনের সফরকে তিন মান্‌যিলের দূরত্ব ধারণা করিয়া মাইলের হিসাব অনুযায়ী উহার পরিমাণ ৫৭ মাইল ৩ ফারলং-এর সমান মনে করিয়াছেন, (দ্র. আমজাদ 'আলী, বাহার-ই শারী'আ, ৪খ, ৭৫, ৭৬ ; আহমাদ রিদা খান বিরীলাবীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী ঃ (العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية) ফাতাওয়া দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ-এ বলা হইয়াছে যে, যে সকল হানাফী ফাকীহ্ ফারসাখসমূহের হিসাব করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ১৫ ফারসাখের দূরত্ব বোঝায় যাহা ইংরাজী মাইলের (১৭৬০ গজের এক মাইল) ৪৫ মাইলের সমান, তথাপি ৪৮ মাইলের হিসাব অধিক নিরাপদ (দ্র.'আযীযু'র-রাহমান ঃ ফাতাওয়া দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ, ১খ, ২১০, ২১১)। অন্যদিকে আল-জাযীরীর (১খ-৪৩৭) বর্ণনা হইল, যে সকল হানাফী ফাকীহ্ ফারসাখ দ্বারা দূরত্বের হিসাবে করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট দূরত্ব হইল ২৪ ফারসাখ যাহা তিন মান্‌যিলের সমান। আল-জাযীরীর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে ফারসাখের দূরত্ব মাইলে প্রকাশের জন্য ৫৭$\frac{৩}{৮}$-এর হিসাব অধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। জা'ফারী ফিক্‌হ্ গ্রন্থে দূরত্ব আট ফারসাখ (বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দ্র.) নির্ধারণ করা হইয়াছে।

সফরের নিয়্যাত ঃ এই ব্যাপারে সকল ফাকীহ্ একমত পোষণ করেন যে, সফরের শুরুতেই সফরের পূর্ণ রাস্তা অতিক্রম করিবার ইচ্ছা থাকিতে হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি নিয়্যত ছাড়াই বাহির হইয়া পড়ে কিম্বা উল্লিখিত দূরত্ব হইতে কম রাস্তা অতিক্রম করিবার নিয়্যত করিয়া বাহির হয় তাহা হইলে কাস্‌র হইবে না, যদিও সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসে। ইহা ছাড়া এই শর্তও আরোপ করা হইয়াছে যে, পূর্ণ শারী'আতসম্মত দূরত্বের সফরের ইচ্ছা শুরু হইতে থাকিতে হইবে। নিয়্যতের ব্যাপারে অন্য দিক হইল, সফরকালে যদি ইকামাত-এর নিয়্যত করা হয় তাহা হইলে কাস্‌র-এর হুকুম রহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু হানাফীদের নিকট কেবল ইকামাতের নিয়্যত দ্বারা নহে, বরং কার্যত ইকামাত গ্রহণ করিবার পর কাস্‌র-এর হুকুম রহিত হইবে (আল-জাযীরী, ১খ, ৪৭৪)।

কাস্‌র কোন স্থান হইতে কার্যকর হয় ? সফরের ইচ্ছা করিবার পর যতক্ষণ না নিজ লোকালয় হইতে কার্যত বাহির হয় ততক্ষণ কাস্‌র-এর হুকুমসমূহ কার্যকর হয় না। এই সম্পর্কে হানাফী ফাকীহদের ব্যাখ্যা হইল, লোকালয়ের যেদিক দিয়া বাহির হউক, যখন সেইদিকের সকল বাড়ী-ঘর হইতে এবং এমন সকল অট্টালিকা হইতে যাহা লোকালয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়, সম্মুখে অগ্রসর হইবে তখন কাস্‌র কার্যকর হইবে। অন্যদিকে শাফি'ঈ ফাকীহগণ উহার বিশ্লেষণ এইরূপ করিয়াছেন যে, যখন নিজ লোকালয় হইতে এত দূর চলিয়া যাইবে যেখানে সাধারণত মুসাফির গণ্য করা হয় তখন কাসর শুরু হইয়া যাইবে (আল-জাযীরী, ১খ, ৪৭৫)।

কাস্‌র সালাতের নিয়্যাত ঃ মালিকী ফিক্‌হ্ মতে সফরের প্রথম সালাতের কাস্‌র-এর নিয়্যত অপরিহার্য। অবশিষ্ট সালাতসমূহে প্রয়োজন নাই। হানাফী ফাকীহদের মতে কেবল সফরের শুরুতে কাস্‌র-এর নিয়্যত অপরিহার্য। ইহার পর প্রতিটি সালাতের জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। অবশ্য শাফি'ঈ ও হাম্বালী ফাকীহগণ প্রতিটি কাস্‌র সালাতের কাসর-এর নিয়্যত অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন (আল-জাযীরী, *ঐ গ্রন্থ*)।

প্রকৃত বাসস্থান, অবস্থানস্থল ঃ কাস্‌র ও সফরের মাস'আলাসমূহের ব্যাপারে বাসস্থানের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রকৃত বাসভূমি হইল যেখানে কোনও ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এবং বসবাসও করে অথবা যেখানে বিবাহ করিয়া বসবাস শুরু করিয়াছে অথবা যেখানে উপার্জনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে। অবস্থানস্থল হইল [অস্থায়ী বাসস্থান পনর দিন অথবা উহার অধিককাল অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ করা হয়। প্রকৃত বাসভূমির হুকুম হইল, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বসবাস এলাকায় প্রবেশ করিবামাত্র কাস্‌র পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবস্থানের নিয়্যত করা হউক বা না করা হউক। অন্যদিকে অস্থায়ী অবস্থানস্থলে সফর হইতে প্রত্যাবর্তনমাত্র কাস্‌র-এর হুকুম রহিত হয় না, যতক্ষণ না তথায় পনর দিন অথবা উহা হইতে অধিক দিন অবস্থানের ইচ্ছা করা হয়।

সফরের প্রকারভেদ ঃ ফাকীহগণ এই বিষয়েও চিন্তা করিয়াছেন যে, সকল প্রকারের সফরের ক্ষেত্রে বৈধ কাজের জন্য সফর সংঘটিত হউক কিংবা অবৈধ কার্যের জন্য (চুরি, ডাকাতি) হউক, কাস্‌র-এর সুবিধা পাওয়া যাইবে কি ? শাফি'ঈ ও হাম্বালী ফাকীহগণ অসদুদ্দেশ্যের সফরে কাস্‌র-এর অনুমতি প্রদান করেন না। তবে হানাফীদের মত হইল কাস্‌র-এর প্রমাণ বহনকারী শার'ঈ দলীলসমূহ সাধারণতভাবে সফরে কাস্‌র-এর অনুমতি প্রমাণিত করে। অতএব এই অনুমতি সাধারণ থাকিবে, সফর যে প্রকারেরই হউক (আল-জাযীরী, ঐ গ্রন্থ)।

জা'ফারী ফিক্‌হ্ গ্রন্থে (ইছনা 'আশারী) কাস্‌রের অনুমতি আটটি শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হয় : (১) দূরত্ব শার'ঈ, আট ফারসাখ (২৭ মাইল ২ ফার্লং ৪০ গজ) হইতে কম হইবে না, (২) সফরের শুরুতেই আট ফারসাখের নিয়্যত করিতে হইবে; (৩) সফরের মধ্যপথ হইতে ইচ্ছাকৃত প্রত্যাবর্তন না করা; (৪) শার'ঈ দূরত্বের মধ্যপথে এমন অবস্থানস্থল থাকিবে না, যেখানে ইতঃপূর্বে ছয় মাস বসবাস করিয়াছে ; (৫) সফর বৈধ কাজে হইবে ; (৬) মুসাফির বেদুঈন (ভবঘুরে) হইবে না। (৭) সফর তাহার স্বভাব ও পেশার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। (৮) লোকালয় হইতে এত দূর যাইতে হইবে যেখান হইতে শহরের সীমানা দৃষ্টিগোচর হইবে না (তুহ্‌ফাতু'ল-'আওওয়াম ; তাওদীহু'ল-মাসা'ইল, পৃ. ২০৮-২৩৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-জাযীরী, আল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ ৩য় সং, কায়রো, ১খ, ৪৭১-৪৮০; (২) ইবনু'ল হুমাম, শারহু ফাত্‌হি'ল-কাদীর, কায়রো ১৩১৫ হি. পৃ. ৪০৩; (৩) আদ-দারদীর, الشرح الصغير على اقرب المسالك الى المذهب الامام مالك (৩খ, কায়রো ১৩৯২ হি.; (৪) মুসলিম, আস-সাহীহ (তাহকীক ফুওয়াদ 'আবদু'ল-বাকী)., কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (৫) আমজাদ 'আলী, বাহার-ই শারী'আত, লাহোর; (৬) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখ্‌নাবী, 'উমদাতু'র-রি'আয়া, দিল্লী; (৭) 'আযীযু'র-রাহমান, ফাতাওয়া দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ, করাচী ১৯৭০ খৃ.; (৮) মুহাম্মাদ কাজিম. রিসালা-ই তাওদীহু'ল-মাসা'ইল, তেহরান ১৩৪৯ হি., পৃ. ২০৮-২২৩ ; (৯) মানজূর হুসায়ন নাকাবী, তুহ্‌ফাতুল-'আওওয়াম, লাহোর ১৯৬৭ খৃ. ; (১০) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া,

১খ, বাবু সালাতি'ল-মুসাফির]।

কাদী 'আবদু'ন-নাবী কাওকাব (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

কাস্‌র-ই শীরীন (قصر شیرین) ঃ আরদিলান জিলার (দ্র. ار‌دلان) অথবা ইরানী-কুর্দিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের একটি শহর, ৩৪°৩০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪৫°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে (গ্রীনউইচ) হুলওয়ান রূদ (নদী)-এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পশ্চিমে ও কাস্‌র-ই শীরীন-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল আগ-দাগ পাহাড়শ্রেণী বিদ্যমান ঃ দক্ষিণ-পূর্বে ও নদীর বাম তীরেও সুদৃশ্য পর্বতশ্রেণী প্রলম্বিত। কাস্‌র-ই শীরীন সুপ্রাচীনকাল হইতেই মরুযাত্রীদলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা-বিরতি স্থল (মানযিল) ছিল। কাস্‌র-ই শীরীন হইয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথ, বাগদাদ হইতে পারস্যের মালভূমিগামী অতি প্রাচীন সড়ক, মধ্যযুগীয় আরবদের তারীক-খুরাসান। কাস্‌র-ই শীরীন দক্ষিণ-পশ্চিমে খানিকীন (দ্র.) এবং পূর্বে সার্‌-ই পুল (মধ্যযুগীয় হুল্‌ওয়ান, সার্‌-ই পুলের দক্ষিণে) এই দুই মানযিলের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাস্তা এখান হইতে শাখারূপে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্বে গিয়াছে।

আধুনিক কাস্‌র-ই শীরীন (সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৬০০ ফুট উর্ধ্বে) মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি অখ্যাত শহর। প্রাচীরের বাহিরে পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত সরাইখানা অবস্থিত। পশ্চিমদিকে আধুনিক রীতির একটি দুর্গ যাহা Aubin (op. cit., in Bibl)-এর বর্ণনা অনুসারে ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে জওয়ান মীর নির্মাণ করেন এবং কার্‌বালা'গামী তীর্থযাত্রী এবং ব্যবসায়ীদিগের সম্পদ আহরণে ব্যবহার করিতেন। শহরের বিপরীত দিকে নদীর বাম তীরে অবস্থিত বাগ-ই শাহ ["রাজকীয় উদ্যান"] এবং খেজুর, কমলালেবু ও বেদানা বৃক্ষের একটি পার্ক রহিয়াছে, যাহা কার্‌বালা'য় তীর্থ যাত্রাকালে নাসরু'দ-দীন শাহ রচনা করেন।

কাস্‌র-ই শীরীনের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য যাহা ইহাকে ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিকট পারস্যের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থানে পরিণত করিয়াছে, তাহা ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাসানী যুগ হইতে বিদ্যমান ব্যাপক সারিবদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। কাস্‌র-ই শীরীন (শীরীনের প্রাসাদ) নামটি সাসানী সাম্রাজ্যের শেষ যুগের। শীরীন ছিলেন খৃষ্টান এবং ২য় খুস্‌রাও পারবেয (৫৬০-৬২৮ খৃ.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী, গ্রীষ্মকালীন নিবাস হিসাবে খুসরাও ২য় পারবেয যে সুবিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তাহার নামকরণ তিনি শীরীনের নামানুসারেই করেন। কাস্‌র-ই শীরীন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল শীরীন ও রাজকীয় স্থপতি ফার্‌হাদ-এর বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনীর দৃশ্যপট (দ্র. ফারহাদ ওয়া-শীরীন)। কাস্‌র-ই শীরীনের দক্ষিণে একটি প্রস্তরনির্মিত সমাধি উদাক-ই ফার্‌হাদ ["ফারহাদের কক্ষ"] নামে সাধারণভাবে পরিচিত (দ্র. Sarre and Herzfeld, Iranische Felsreliefs, ১০)। বিখ্যাত বীণাবাদক বার্‌বুদ (দ্র. Vullers, Lexicon Persico-Latinum, ১খ, ১৬৮ এবং Justi, Iranisches Namenbuch, 63) কাস্‌র-ই শীরীনের রাজকীয় দরবারে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কাস্‌র-ই শীরীন-এর খ্যাতির যুগ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় খুসরাও-র মৃত্যুর দশ বৎসর পর সাসানী সাম্রাজ্য আরবদের পদানত হয় এবং মুসলিম যুগে কাসর-ই শীরীনের প্রাসাদসমূহে কেহ বাস করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রাসাদসমূহ দ্রুত ধ্বংসে পতিত হয়। য়া'কূবী, (বুলদান, ২৭০), বহু পূর্বে ২৭৮/৮৯১ সালে এই ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করেন। ইব্‌নু'ল আছীর (৮খ, ৩৮৮) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৩৪৫/৯৫৬ সালে এক ভূমিকম্পের ফলে কাস্‌র-ই শীরীনের প্রাচীরে ফাটলের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ আরব ও পারস্য দেশীয় লেখকগণ যেমন ইব্‌ন রুস্তা, য়াকৃ'ত, আল-কায্‌বীনী ও হামদুল্লাহ মুস্তাওফী গুরুত্বারোপ করিয়াছেন, কাস্‌র-ই শীরীনের বিশালতা, ইহার দরবার হলসমূহ, উপাসনা কক্ষগুলি (hermitages), রত্নভাণ্ডার ইত্যাদি এবং বিরল প্রজাতির জীবজন্তু অধ্যুষিত ইহার চমৎকার উদ্যানসমূহের উপর কিন্তু তাঁহারা ইহাদের বিশদ বিবরণ প্রদান করেন নাই। য়াকৃত ও আল-কায্‌বীনী বিশেষভাবে প্রাসাদের উৎপত্তি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন; য়াকৃত (৪খ, ১১৩) ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় মনে করেন।

আধুনিক কালের ধ্বংসাবশেষের নিখুঁত বিবরণের জন্য J. de Morgan পরিচালিত ফরাসী অভিযানের নিকট আমরা ঋণী। প্রধান ধ্বংসাবশেষ বর্তমান শহরের উত্তর-পূর্বে এক প্রশস্ত মালভূমিতে অবস্থিত। শহরের নিকটেই পরিখাবেষ্টিত এবং পার্শ্বদিকে ছয়টি বৃত্তাকার বুরুজ সন্নিবেশিত আয়তাকার দুর্গ [কাল্‌'আ (দুর্গ) অথবা কাস্‌র-ই খুস্‌রাও কাল্‌'আ-খুস্‌রাবী নামেও পরিচিত] অবস্থিত। কালা'আর উত্তরে ধ্বংসাবশেষের আরও স্তূপ রহিয়াছে যেগুলির উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। প্রায় ৫০০ গজ উত্তর-পূর্বে একটি সুবিশাল উদ্যান-প্রাচীর অবস্থিত, যাহা প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের গ্রীষ্মাবাসকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। de Morgan-এর মতে উদ্যানটির আয়তন ৩০০ একর। এই বেষ্টনী-প্রাচীর যাহা কৃত্রিম পানি প্রণালীর কাজও করিত, উহার উচ্চতম অংশ ২৫ ফুট এবং ব্যাপ্তি ৬,০০০ কাদাম ছিল। অন্য একটি জলনালী-প্রাচীর উদ্যানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই সকল উদ্যানের সেচের পানি হুলওয়ান-রূদ হইতে আনা হইত। এই নালার নমুনা এখনও হুল্‌ওয়ান-রূদ উপত্যকায় চিহ্নিত করা যায়, যে পর্যন্ত না ইহা হাওশ্‌কুরী-এর ধ্বংসাবশেষের গোলক ধাঁধায় বিলীন হইয়া যায়। সমগ্র নক্সার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত প্রধান প্রাসাদ যাহা বর্তমানে 'আমারাত-ই খুস্‌রাও (খুস্‌রাও-এর আবাস) নামে অথবা হাজ্জী কাল্‌'আসি ('হাজ্জীদের প্রাসাদ') নামে পরিচিত। প্রাসাদের সম্মুখে ৬০০ গজ দীর্ঘ, দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র সামিয়ানা ঢাকা Kiosk (দোকান বা ব্যান্ড বাজাইবার স্থান) শোভিত কৃত্রিম পানিপ্রণালীর বিস্তৃতি এখনও বিদ্যমান। আমারাত-ই খুস্‌রাও-এর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্রতর, অনুরূপ খিলান ছাদযুক্ত দালান রহিয়াছে যাহাতে চারিটি দরজা এবং বর্গাকার প্রধান কক্ষ বিদ্যমান। ইহা এখন চুআর কাপু বা চার দার্‌ওয়ায ("চার দরজা") নামে অথবা কাল্‌'আ-ই চুআর কাপু ("চারদ্বারী প্রাসাদ") নামে পরিচিত। এই ইমারতের উদ্দেশ্য অজ্ঞাত।

কাস্‌র-ই শীরীনের প্রায় ৩ মাইল পূর্বে আরও একটি সাসানী শেষ আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ বিদ্যমান। সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ইহাতে ছিল কাস্‌র-ই শীরীন প্রাসাদের অধিকারভুক্ত আস্তাবল। এই সকল ধ্বংসাবশেষ এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ৬০০ ফুট দীর্ঘ প্রাসাদ, annexes (সংযোজনাদি) এবং আরও একটি ধ্বংসস্তূপে, পার্‌বেযনির্মিত এই যাবত জ্ঞাত প্রাসাদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ প্রাসাদ।

কাস্‌র-ই শীরীন নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীনতর পুরাকীর্তি স্থান। কিন্তু এইখানে কোন্ প্রাচীন নগরী অবস্থিত ছিল তাহা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) BGA, passim, বিশেষত ৭খ, ১৬৪ (ইব্‌ন রুস্তা); (২) য়াকূত, ৪খ, ১১২ প.; (৩) আল-কায্‌বীনী, আছারু'ল-বিলাদ, সম্পা. Wustenfeld, ২৯৫-৭; (৪) হামদুল্লাহ মুস্তাওফী, নুযহা, ৪৩ প.; (৫) Le Strange, ৬৩; (৬) Pietro della Valle, Reise-Beschreibung, জেনেভা ১৬৭৪ খৃ., ২খ, ৪; (৭) Olivier, Voyage dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Persia, ৫খ, প্যারিস ১৮০৭ খৃ., ৮; (৮) Kinneir, A geographical memoir of the Persian Empire, লণ্ডন ১৮১৩ খৃ., ৩০৫-৬; (৯) Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia, লন্ডন ১৮৩০ খৃ., ১খ, ৬৪-৭৮; (১০) Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, লণ্ডন ১৮২২ খৃ., ২খ, ২১২-১৯; (১১) G. Keppel, Personal narrative of travels in Babylonia, Assyria, লন্ডন ১৮২৭ খৃ., ২৯৭ প., ২খ, ৩০৬ প.; (১২) C. J. Rich, Narrative of a residence in Koordistan, লন্ডন ১৮৩৬ খৃ., ২খ, ২৬৩-৭২; (১৩) Ritter, Erdkunde, ৯খ, ৪৩৮-৮৮, ৫০৯; (১৪) J. B. Fraser, Travels in Koordistan, Mesopotamia..., লন্ডন ১৮৪০ খৃ., ২খ., ১৭৫ প.; (১৫) J. de Morgan, Mission scientifique en Perse, ২খ, ৮১ প., ১১১; ৪খ, ৩৪১-৫৯ (ধ্বংসাবশেষের একটি সাধারণ নক্‌শা Plate xl এবং কাস্‌র-ই শীরীনের তিনটি প্রাসাদের নক্‌শা যথাক্রমে Pl xlii, xlvi, xlix এবং হাওশ কুরীর নক্‌শা Pl, li, অধিকন্তু সুন্দর আলোকচিত্রসমূহ); (১৬) Justi, in Gr. I. Ph. ২খ, ৫৪০; (১৭) E. Aubin, La Perse d'aujourd'hui, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., ৩৫১ প.; (১৮) E. Herzfeld, in Pet. Mitt. ৫২খ, ৫২-৩; (১৯) ঐ লেখক, in Sarre and Herzfeld, Iranische Felsreliefs, বার্লিন ১৯১০ খৃ., ১৩১, ২৩৬-৪০; (২০) ঐ লেখক, Die Aufnahme des Sasanidisch. Denkmals von Paikult (=Abh. Pr. Ak. W., 1914, no. 1, 6-8; (২১) Mrs. Bishop. Journey in Persia and Kurdistan, লন্ডন ১৮৯১ খৃ., ১খ, ৭৯; (২২) দা. মা. ই., লাহোর ১৯৭৮ খৃ., ১৬/২খ, ১৮৮।

[M. Streck-(J. Lassner)] (E.I.[2])/ মোঃ রেজাউল করীম

কাস্‌র ইব্‌ন হুবায়রা (قصر بن هبيرة) ঃ ইরাকের একটি শহর, কূফা ও বাগদাদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, ইরাকের শেষ উমায়্যা গভর্নর য়াযীদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন হুবায়রা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (বালাযুরী, ফুতূহ, ২৮৭; মুকাদ্দাসী, ৫৩, ১১৫, ১২১, ১৩০; ইস্‌তাখরী, ৮৫; আরও দ্র. ইব্‌ন হাওকাল, ১৬৬, সম্পা. Kramers, ২৪৩; য়াকূত, মু'জাম, ৪খ, ৯৪৬ (মাদীনাতু-ইব্‌ন হুবায়রা-র সহিত তালগোল পাকান হইয়াছে, Reitemeyer, Die Stadteg-runddungen der Araber im Islam, Leipzig 1912, 49)। কাস্‌র ইব্‌ন হুবায়রা-র অবস্থানটিকে মাদীনাতু ইব্‌ন হুবায়রা বলা হয় ভুলভাবে। শেষোক্ত অবস্থানটি কূফা-র অধিকতর নিকটবর্তী। উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় মার্‌ওয়ান-এর নির্দেশে এই স্থান পরিত্যাগে বাধ্য হইবার পূর্ব পর্যন্ত একই য়াযীদ এই স্থানে ইমারত নির্মাণে রত ছিলেন (বালাযুরী, ফুতূহ, ২৮৭; তাবারী, ৩খ, ৮০, ১৮৩; য়াকূত, ১খ, ৬৮০, ৩খ, ২৮০; ৪খ, ১২৩, ৯৪৬; আরও দ্র. Le Strange, বাগদাদ, 6n. I, Lands. 71) য়াকূতের মতে 'আব্বাসী খলীফা আস্‌-সাফ্‌ফাহ কাস্‌র ইব্‌ন হুবায়রা-তে য়াযীদ কর্তৃক আবদ্ধ নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহার নামকরণ করেন আল-হাশিমিয়া। কিন্তু জনসাধারণ শহরটিকে ইহার মূল নামে অভিহিত করিবার পক্ষে অটল থাকায় তিনি স্থানটি পরিত্যাগ করার বাধ্যতা অনুভব করেন এবং অদূরে অন্য একটি স্থান নির্বাচন করেন। দৃশ্যত এই বিবরণ বালাযুরীর বর্ণনাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বালাযুরীর বর্ণনায় আস্‌-সাফ্‌ফাহ মাদীনাতু ইব্‌ন হুবায়রাতে বসবাস করেন (য়াকূত, ৪খ, ৫৪৬; বালাযুরী, ২৮৭; আরও দ্র. আল-হাশিমিয়া, যাহাতে য়াকূতের বিবরণকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলা হইয়াছে)। ৪র্থ-৫ম/১০ম-১১শ শতাব্দীর ভূগোলবিদগণের মতে কাস্‌র ইব্‌ন হুবায়রা ছিল বাগদাদ ও কূফার মধ্যস্থলে সর্বাপেক্ষা বড় শহর, য়ূফ্রেটিস নদীর সন্নিকটে এবং অনেকগুলি বাজারে পণ্যবাহী খালগুলি যেখানে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় সে স্থানের নিকট অবস্থিত ছিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের কিছুকাল পূর্বে এই শহরের অধঃপতনের সময়ে আল-হিল্লা অত্র এলাকার প্রধান শহরে পরিণত হয় [দ্র. Al-Hilla]।

J. Lassner (E.I.[2])/ মোঃ রেজাউল করীম

কাস্‌র য়ানী (দ্র. কাসরয়ান্নিহ্‌)

কাস্‌রা (كسرة) ঃ স্বরবর্ণ 'ই' নির্দেশক আরবী ব্যাকরণের পারিভাষিক চিহ্নের নাম। কাস্‌রা দ্বারা লিখিত চিহ্নটিই নির্দেশ করা হয়, আর কাস্‌র (كسر) বলা হয় ধ্বনিটিকে (Wright, Ar. Gr.[3], ১খ, ৮A)। এই পার্থক্যকরণ উদাহরণস্বরূপ, আদ-দানী প্রণীত আল-মুহকাম ফী নাক্‌তি'ল-মাসাহিফ, দামিশ্‌ক ১৩৭৯/১৯৬০, পৃ. ৪২, ছত্র ৪-৭ এবং কিতাবু'ন-নাক্‌ত (Bibl. Isl., ৩, ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১৩৭, ছত্র ৮-১১-তে প্রদত্ত ভাষ্যের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু কাস্‌র-এর অপর একটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ক্রিয়াপদ কাসারা (كسر-ই) 'ভাঙা'— এই শব্দটিকে "[একটি হারফ্‌]-এ কাস্‌রা দেওয়া" অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কারণ কাস্‌রা উচ্চারণের সময় মুখ 'ভাঙিতে' হয় বলিয়া মনে করা হয় (আবু'ল-আস্‌ওয়াদ আদ-দু'আলী-র মতানুযায়ী, নিম্নে দ্রষ্টব্য)। কাস্‌র ক্রিয়াভাব প্রকাশক শব্দ (مصدر infinitive)-ও হইতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, বংশক্রম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে, আস্‌-সুয়ূতী, লুব্বু'ল-লুবাব, লাইডেন ১৮৪০ খৃ., পৃ. ২১১, ছত্র ১১ ঃ আল-কিফ্‌তী, বি'ল-কাস্‌র ওয়া সুকুনি'ল-ফা' (بالكسر وسكون الفاء), "আল কিফ্‌তী, [কাফ-এর নীচে] কাস্‌রা এবং ফা'-তে সুকূন"। ফাতাহা (فتح, আ) "উন্মুক্ত করা" ও দাম্মা (ضم, উ) "বিভিন্ন অংশকে (কোনও বস্তুর) একত্র করা"— এই ক্রিয়াপদদ্বয় একইভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে, প্রথমটি ফাত্‌হা-এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি দাম্মা-এর জন্য, তৎসঙ্গে ফাত্‌হ ও দাম্মা-এর জন্য একই মন্তব্য প্রযোজ্য এবং পূর্বের ন্যায় ইহাও আবু'ল-আসওয়াদ-এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

কাস্‌রা ও অপর দুইটি হারাকাত, ফাত্‌হা ও দাম্মা-এর সর্বপ্রথম চিহ্নের ব্যবহার পূর্ণ বিন্দু দ্বারা করা হইত (আদ-দানী, মুহকাম, পৃ. ২৩, ছত্র ১১; পৃ. ৪২, ছত্র ১২)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কুরআনী লিপির উচ্চারণে পূর্ণতা প্রদান করা এবং প্রথম পর্যায়ে ইরাব (إعـــراب) নির্দেশ করা। কোনও প্রকার মতভেদ ছাড়াই ইহার আবিষ্কারের কৃতিত্ব আবু'ল-আসওয়াদ

আদ-দু'আলী (মৃ. ৬৯/৬৮৮-৯ [দ্র.])-এর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ঃ "যখন তোমরা দেখিতে পাইবে যে, আমি কোনও একটি হারফ-এর উচ্চারণে আমার মুখ উন্মুক্ত (فتحت) করিয়াছি, তখন হারফ-এর উপর একটি বিন্দুচিহ্ন প্রদান কর। যদি আমি আমার মুখ [ওষ্ঠদ্বয়] পরস্পর সংযুক্ত (ضممت) করি তবে হারফ-এর পূর্বে [বাম পার্শ্বে, মধ্য স্থলে] একটি বিন্দুচিহ্ন প্রদান কর। যদি আমি [আমার মুখ] ভঙ্গ করি (كسرت), তবে হারফ-এর নীচে বিন্দু চিহ্ন প্রদান কর। এবং যদি আমি ইহাদের যে কোনও একটির পর অনুনাসিক ধ্বনি (গুন্না = غنة) [তান্‌বীন = تنوين] উৎপাদন করি তবে একটির স্থলে দুইটি বিন্দু প্রদান কর" (আস-সীরাফী, আখবারু'ন-নাহ্‌বিয়্যীন, Bibl. Arabica, ৯খ, আলজিয়ার্স ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১৬, ছত্র ৮-১২)। কিংবদন্তীমূলক এই বর্ণনা অন্ততপক্ষে হারাকাত-এর উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সময় মুখের শরীরবৃত্ত সংক্রান্ত রূপান্তরসমূহের পর্যবেক্ষণের মাত্রা সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রদান করে এবং এই প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির শব্দসমূহের সম্পূর্ণভাবে আরবী ভাষাভিত্তিক উৎপত্তির অনুকূলে রায় প্রদান করে [দ্র. হারাকা ওয়া-সুকূন]। স্বর চিহ্নসমূহের (حركات)-এর আবিষ্কারকরূপে বসরার কুরআন পাঠক (قارى)-দ্বয় নাস্‌র ইব্‌ন 'আসিম ও য়াহ্‌য়া ইব্‌ন য়া'মূর-কে কৃতিত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলিম উৎসসমূহ ঐকমত্য পোষণ করে (দ্র. R. Blachère, Introduction au Coran[2], প্যারিস ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ৮০-২, ৮৯-৯০)। এই অভিনব মতামত অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের সম্মুখীন না হইয়া আরোপ করা যায় নাই (ঐ, ৯৫-৯৮); কিন্তু আদ-দানী-র সময়কালে (মৃ. ৪৪৪/১০৫৩)-ও ইহা প্রচলিত ছিল (ঐ, ৯৮)।

কুরআনী লিপির লিখনক্ষেত্রে স্বরচিহ্নসমূহের পার্থক্য চিহ্নিত করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। লোহিত বর্ণের বিন্দু ব্যবহারের দ্বারা এইগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে; সবুজ বর্ণের বিন্দু দ্বারা হাম্‌যা (অনুচ্চারিত শ্বাসরন্ধ্র অবরোধক) চিহ্নিত হইয়াছে এবং তাশ্‌দীদ (যুগ্মকরণ)-এর জন্য হলুদ বিন্দু ব্যবহার করা হইয়াছে (আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মুজাহিদ, আদ-দানী কর্তৃক উল্লিখিত মুহ্‌কাম, পৃ. ২৩, ছত্র ৯ প.; আরও দ্র. ঐ, ১৯-২০, বিভিন্ন রং ব্যবহারসংক্রান্ত অন্য প্রাচীন প্রথাসমূহের জন্য)। এই সকল প্রকার বিন্দুচিহ্নই আশ-শাক্‌লু'ল-মুদাওওয়ার (গোল চিহ্ন)-এর অন্তর্গত। কিন্তু হুরূফ বা অক্ষরসমূহের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন সংক্রান্ত বিন্দু (নুক্‌তা = نقطة) কুরআনী লিপির ন্যায় বি'ল-সাওয়াদ (بالسواد) "কৃষ্ণ বর্ণে" প্রদত্ত হয় (ঐ, পৃ. ২২, ছত্র ১১, পৃ. ৪৩, ছত্র ১৫) এবং আদ দানী-র মতে (পৃ. ৪৩, ছত্র ১৬) এইগুলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন (নুক্‌তা)-সমূহ এবং হারাকাত এর মধ্যে পার্থক্যকরণ নিশ্চিত করা হয়; বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন (নুক্‌তা)-সমূহ সংক্রান্ত তাঁহার অধ্যায়টি (৩৫-৪১) দ্রষ্টব্য। ই'রাব (إعراب) সংক্রান্ত বিষয়ে কাস্‌রা হইল জার্‌র جر (অথবা খাফ্‌দ = خفض)-এর চিহ্নবিশেষ [দ্র. ই'রাব]। কাস্‌রা ও অন্যান্য হারাকাত-এর প্রকৃতি সম্পর্কে, দ্র. হারাকা ওয়া-সুকূন। ইদাফা (إضافة)-র দ্বিতীয় পর্বে কাসরা-র উপস্থিতি যেই প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে তাহার জন্য দ্র. ইদাফা।

কিছু অতিরিক্ত বিন্দুচিহ্ন ঃ (১) এ পর্যন্ত আলোচিত বিন্দুসমূহ আল-হারাকাতু'ল-মুশ্‌বা'আতি (الحركات المشبعات), অর্থাৎ সাধারণ (আক্ষরিক অর্থে 'সন্তুষ্ট') হারাকাত। এইগুলি মুশ্‌বা'আত নয়— এইরূপ হারাকাত হইতে ভিন্ন ঃ শেষোক্ত ক্ষেত্রে উচ্চারিত শব্দ ইখ্‌তিলাস (اختلاس) অথবা রাওম (روم) দ্বারা (দ্র. H. Fleisch, Traité, ১খ, ৩৬ প., ৪৯ g) অথবা ইশ্‌মাম (إشمام)-এর মাধ্যমে বিচ্যুতি দ্বারা উদ্ভূত হয় ঃ ইন্নামা হুওয়া ইমালাতু'ল-কাস্‌রা নাহ্‌ওয়া'দ-দাম্মা কালীলান (إنما هو إمالة الكسرة نحو الضمة قليلا) (আদ-দানী, কিতাবু'ন-নুকাত, পৃ. ১৩৬, ছত্র ১৩), "ইহা হইতেছে কাসরা-কে দাম্মা-র দিকে একটু বাঁকাইয়া আনয়ন মাত্র", অর্থাৎ 'উ'-এর দিকে 'ই'-এর ঝোঁক (আরও দ্র. H. Fleisch, ঐ, ১খ, ৩৬ g, ৪৯ h)। এই বিশেষ উচ্চারণ ধ্বনিসমূহের জন্য ব্যবহৃত চিহ্নের জন্য দ্র. আদ-দানী প্রণীত অধ্যায়, মুহ্‌কাম, পৃ. ৪৪-৮; অধিকতর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় ঃ কিতাবু'ন-নুকাত, পৃ. ১৩৬, ছত্র ১০, পৃ. ১৩৭, ছত্র ৩।

(২) মুহ্‌কাম গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ে (পৃ. ২-১৩) আদ-দানী, কুরআন লিপির লিখন পদ্ধতির প্রথম রূপ, স্বর-চিহ্নসমূহের আবিষ্কার এবং এই নব প্রবর্তিত ধারার প্রতি বৈরিতা অথবা সমর্থন সম্পর্কে পরম্পরাগত মুসলিম কাহিনীসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন।

(৩) বিন্দুসমূহ কেন ব্যবহার করা হইল ? আল-ঈজায ওয়া'ত-তাক্‌লীল (الايجاز و التقليل), "সংক্ষেপণ ও সংকোচন" ছিল ইহার উদ্দেশ্য (আদ-দানী, মুহ্‌কাম, পৃ. ৪৩, ছত্র ১৭)। প্রকৃতপক্ষে খুব সম্ভবত অ-মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের প্রচলিত প্রয়োগরীতির প্রভাব এই ক্ষেত্রে বর্তমান ছিল (দ্র. R. Blachère, পূ. স্থা., পৃ. ৭৯)। সিরীয় ভাষার ক্ষেত্রে "স্বর-চিহ্ন কিংবা অক্ষরসমূহের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন, যাহা ৪র্থ শতক হইতে পরিচিত ছিল, অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই তাহা স্বর সংযোজনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে" (L. Costaz, Grammaire syriaque[2], বৈরূত ১৯৬৪ খৃ., শা ১১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে প্রদত্ত।

H. Fleisch (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাস্‌রিয়ান্নিহ (Kasryannih) ঃ মধ্যযুগীয় সিসিলীর একটি স্থানের নাম, Castrum Ennae-এর আরবী রূপ। স্থানীয় কথ্য রীতিতে এই নাম (Castrum Ennae)-টি ইতিপূর্বেই বিকৃত হইয়াছিল। আরবায়িত রূপটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, Castrum Iohannis নামটি এবং উহা হইতে ইটালীয় ভাষায় হইয়াছে Castrogiovanni (আধুনিক Enna)। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২,৯৫০ ফুট/৯৮৮ মিটার উর্ধ্বে সিসিলী দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই শহরটি দ্বীপের সর্বোচ্চ শহর। আরবী সূত্রসমূহে এই শহরের নামের অনেকগুলি রূপ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে Kasrynnih মনে হয় সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য। নির্দিষ্ট দ্বিত্ব নূন (ن)-এর সহিত ইহার প্রকৃত উচ্চারণ য়াকৃত-এর গ্রন্থ মুশ্‌তারিক-এ পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাঁহার গ্রন্থ মু'জাম-এ এই নামের উল্লেখ নাই। ২১৪/৮২৯ সালের পর হইতে বরাবর এই শহরটিকে আসাদ ইব্‌নু'ল-ফুরাত-এর আরব-বার্‌বার বাহিনী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। আসাদ দুই বৎসর পূর্বে মাযারা (Mazara)-তে অবতরণ করিয়াছিলেন। রাজাব ২১৬/আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৮৩১ সনে পালেরমো (Palermo)-র শর্তাধীন আত্মসমর্পণের পর দ্বীপের এই সুরক্ষিত শিলাটি খৃষ্টানদের প্রতিরোধের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ৩০ বৎসর কাল এই শহর ও দুর্গটি নানা উত্থান-পতনের মধ্যে কালাতিপাত করিয়াছে এবং রামাদান ২৪৩/জানুয়ারি ৮৫৯ সনে এই শক্ত বায়যানটাইন ঘাঁটিটির আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্ত যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে উভয়পক্ষের হার-জিত

চলিতেছিল। চূড়ান্ত সামরিক অভিযানগুলি সিসিলীর আমীর আল-'আব্বাস ইবনু'ল-ফাদ্‌ল (২৩৬-৪৬/৮৫১-৬১)-এর তত্ত্বাবধানে সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে অবিরাম আক্রমণের মাধ্যমে তিনি দুর্গরক্ষী বাহিনীর প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, একজন খৃষ্টান বন্দী নিজ জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিমদিগকে দুর্গে প্রবেশের একটি গুপ্তপথ প্রদর্শনের ফলেই ইহার পতন ঘটে। কোনও কোনও আরবীয় ঘটনাপঞ্জীতে উল্লেখ রহিয়াছে, আল-'আব্বাস Castrogiovanni-তে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া বিজয় উৎসব পালন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটির রক্ষা ব্যবস্থার নবায়ন করেন।

আনু. ৪৩১/১০৪০ সনে কাল্‌ব বংশের আমীরদের শাসনকাল শেষ হইবার ফলে তথায় যে ব্যাপক অরাজকতা শুরু হয় তাহাতে নরমানদের আগমনের সময় পর্যন্ত দ্বীপটি বরাবর বিপর্যস্ত থাকে। সেই সময়ে Girgenti ও Castronuovo-সহ কাসারয়ান্নিহ্ কা'ইদ ইব্‌নু'ল-হাওওয়াস (দ্র.)-এর অধীনস্থ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিসিলীতে নরমানদের অবতরণ (মুহাররাম ৪৫৩/ফেব্রুয়ারী ১০৬১)-এর কয়েক মাস পর Robert Guiscard দুর্গটিকে অবরোধ করেন। ইতিমধ্যে যীরি বংশের (Zirids) শাসকগণ কর্তৃক আফ্রিকা হইতে প্রেরিত নূতন সৈন্যদল দুর্গরক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল, কিন্তু নানা অসুবিধায় তাঁহাকে অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য করে। ইহার পর Count Roger নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কয়েকটি অস্থায়ী বিজয় লাভের পর অবশেষে ইহাকে শর্তাধীন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। Altavilla-র কল্যাণে পাশ্চাত্যে কালপঞ্জীকারগণ দুর্গটি দখলের তারিখ নির্দেশ করেন ৪৮০/১০৮৭ সনের মাঝামাঝি হইতে ৪৮১/১০৮৮ সনের প্রাথমিক মাসগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে, অথচ আরব কালপঞ্জীকারগণ ইহাকে তিন বৎসর পরের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থানীয় শাসনকর্তা ইব্‌ন হামমূদ বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করেন এবং নরমান ঐতিহাসিক Malaterra-র মতে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরবী সূত্রগুলি একমত যে, কাসারয়ান্নিহ্ সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য একটি দুর্গ ও মযবুত ঘাঁটিই কেবল ছিল না বরং উর্বর ও উত্তম সেচ ব্যবস্থাসম্বলিত এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরও ছিল, যাহাতে কয়েকটি প্রশস্ত বাজার, প্রাণবন্ত বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা ও প্রচুর খাদ্য সম্ভারের মজুদসহ একটি সুন্দর পৌর সংস্থাও বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Amari, Biblioteca arabo-sicula, Ar. text, Leipzig 1857, Ital. tr. Turin-Rome, i-ii, 1880-1, ইহাতে তিনি Kasryannih সম্পর্কীয় তথ্যপূর্ণ প্রায় সকল আরবী সূত্রকে একত্র করিয়াছেন। (২) Amari, Storia dei musulmani di Sicilia[2], Catania 1933-9, index; (৩) U. Rizzitano, L'Italia nel Kitab ar-rawd al-mi'tar fi habar al-aqtar di Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari, Cairo 1958, also in Bull. of the Fac. of Arts, Cairo University, xviii/1 (May 1956), 170-1.

U. Rizzitano (E.I.[2])/ মকবুল আহমদ

কাস্‌রাবী তাব্‌রীযী, সায়্যিদ আহ্‌মাদ (کسروی تبریزی سید احمد) ঃ ইরানী ইতিহাসবেত্তা, ভাষাবিদ, আইনশাস্ত্রজ্ঞ ও ভাববাদী। তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাব্‌রীয-এ শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯১০ খৃ. কাস্‌রাবী ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানে যোগদান করেন, কিন্তু নিজের উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও আধুনিকতাসুলভ প্রবণতার কারণে অচিরেই এই পেশা ত্যাগ করেন। ১৯১৯ খৃ. তিনি বিচার মন্ত্রণালয়ের চাকুরীতে যোগ দেন। ১৯২৯ খৃ. রিদা শাহের শাসনামলে একটি বিরোধীয় ব্যাপারে এক কৃষক গোষ্ঠীর পক্ষে শাহী প্রাসাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়া অল্পকাল পরেই তিনি আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার উদ্দেশ্যে চাকুরী ছাড়িয়া দেন। কাস্‌রাবী তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনাও করেন, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নে ১৯৩৪ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ত্যাগ করেন।

কাস্‌রাবী ইতিহাস, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে আছে ইরানের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস যে বিপ্লবে তিনি নিজেও শরীক হন; উত্তর-পশ্চিম ইরানের সালজূক-পূর্ব আমলের শাসক বংশগুলির একটি বিস্তারিত সমীক্ষা (শাহ্‌রিয়ারান-ই গুম্‌নান, ৩ খণ্ডে, তেহরান ১৯২৮ খৃ.) এবং আযারী ভাষা সম্পর্কে একখানি একক নিবন্ধ-গ্রন্থ। তিনি ফারসী ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দ ভাণ্ডারের সংস্কার সম্পর্কেও তাঁহার নিজস্ব মতামত ব্যাখ্যা করেন।

১৯৩৩ খৃ., কাস্‌রাবী জীবন ও সমাজ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক গবেষণাকর্ম শুরু করেন; ইহাতে ইরানীদের সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁহার দৃষ্টিতে সমকালীন ইরানীরা ছিল ক্ষয়িষ্ণু, নৈতিকভাবে কলুষিত এবং নাগরিক হিসাবে অযোগ্য। তিনি মনে করিতেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিরাজিত 'কুশিক্ষা' (বাদ-আমূযী)-এর প্রভাবে ইরানবাসী "জীবনের মহাসত্যসমূহ" সম্বন্ধে অজ্ঞই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার ক্ষতিকর ফলাফল তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সত্য উপলব্ধিকরত মুক্তির সন্ধান পাইতে পারে। 'পায়মান' (৭ খণ্ডে, ১৯৩৩-৪২ খৃ.) ও 'পারচাম' (১৯৪১-২ খৃ.) শিরোনামের দুইখানি সাময়িকী, প্রায় ৬০খানি গ্রন্থ এবং ঘন ঘন বক্তৃতা দানের মাধ্যমে তিনি এই কর্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট হন। "ওয়ার্‌জাওয়ান্দ বুন্‌য়াদ" শিরোনামে ৪ খণ্ডের একখানি গ্রন্থে তাঁহার মতাদর্শের সারসংক্ষেপ প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু উহার মাত্র ৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয় (তেহরান ১৯৪৩ খৃ.)।

কাস্‌রাবীর সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ পরিচালিত হয় শী'আ মতবাদের বিরুদ্ধে; ইহাকে তিনি বহু অনর্থের মূল বলিয়া মনে করিতেন। কারণ ইহা তাকিয়া (দ্র.) ও তাবার্‌রু' (দ্র.) শিক্ষা দেয়। ইহা ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকট ইমামের সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে এবং এক চিরঞ্জীব গুপ্ত ইমামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেও শিক্ষা দেয়। বর্তমান জীবনের জন্য অপ্রয়োজনীয় অতীত সমস্যা ও ঘটনাবলীর প্রতি অত্যধিক ও ধ্বংসাত্মক গুরুত্ব প্রদান করে— যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উত্তরাধিকার এবং ইমাম হুসায়ন (রা) ও অন্যদের শাহাদাত বরণ; এবং যেহেতু ইহা ইমাম ও অন্যদের মাযার যিয়ারাত ও মুহাররামের অনুষ্ঠানাদির ন্যায় ক্ষতিকর কার্যকলাপে উৎসাহ দেয়। তিনি বলেন, এইসব বিষয় শী'আদিগকে উপকারী ও গঠনমূলক জীবন যাপনের অনুপযুক্ত করিয়া তোলে। অনুরূপ বিভিন্ন কারণে তিনি বাহা'ই মতবাদ, সূফীবাদ, বস্তুবাদ (অর্থাৎ "কেবল সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিরই বাঁচিবার অধিকার আছে" এই মতবাদ ও ইহার নিহিতার্থ) এবং কুসংস্কারের (ভাগ্য গণনা, শুভাশুভের পূর্বলক্ষণে বিশ্বাস, 'তাবীয',

ভবিষ্যৎ কথন, ইত্যাদি) বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যান। কাস্‌রাবী ফারসী কবিতারও বহুলাংশে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তাঁহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল 'উমার খায়্যাম, সাদী, রূমী, বিশেষত হাফিজ-এর কবিতা। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত কবিতা অদৃষ্টবাদ, সূফীবাদ ও খারাবা তীগারী (যেমন খায়্যামের ধ্যান-ধারণায় দৃষ্ট হয়) মতবাদে, সুরা পানের অত্যধিক প্রশংসায় এবং সমকামিতা সম্পর্কে নির্লজ্জ আলোচনাপূর্ণ। তাঁহার মতে ইহা ভিক্ষাবৃত্তি, চাটুকারিতা, কাপুরুষতা, কপটতা প্রভৃতি বদ গুণে উৎসাহিত করে।

দোষ স্বীকারের একটি নিদর্শন হিসাবে এবং জনসাধারণের মনোযোগ নিজেদের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাস্‌রাবী ও তাঁহার সমর্থকগণ তাঁহার দলে যোগদানের পূর্বে তাঁহাদের নিকট মওজুদ ক্ষতিকর রচনাদি নষ্ট করিয়া ফেলার জন্য শীতকালের প্রথম দিনটিতে একটি উৎসবের আয়োজন করিতেন। "জাশ্‌ন-ই কিতাব-সুযান" নামে অভিহিত এই উৎসব বেশ শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

কাস্‌রাবীর মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি বা 'যারগুণ' (গাওহার বা সিরিশ্‌ত) বিদ্যমান। ইহার একটি 'জান', ইহা হইতেছে স্বার্থপরতার উৎস ঃ ইহা হইতেই ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ, অবিচার, ঈর্ষা ইত্যাদি জন্ম নেয়। আর একটি হইতেছে 'রাওয়ান', ইহা পরার্থপরতার উৎস ঃ ইহা হইতে সৃষ্টি হয় আত্মত্যাগ, ন্যায়বিচার, সহানুভূতি, সততা, সত্যানুসন্ধিৎসা ইত্যাদি গুণ। রাওয়ান-এর সহিত সম্পর্কিত হইতেছে 'খিরাদ বা ন্যায় অন্যায় ও ভাল-মন্দ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা। 'জান' ও 'রাওয়ান' — এই দুই শক্তি অবিরাম পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ধর্ম ও অনুরাগ অন্যান্য বিধানের কর্তব্য হইতেছে রাওয়ান বা পরার্থপরতার উৎস-শক্তিকে আরও মযবুত করা। ধর্মের অর্থ হইতেছে জীবনের "মহাসত্যসমূহকে জানা", এবং 'খিরাদ' বা ভাল-মন্দ চিনিয়া লইবার শক্তির নির্দেশমত জীবন যাপন করা। ধর্মকে 'জান' বা স্বার্থপরতার উৎস-শক্তিকে প্রদমিত করিয়া যুগের সন্ধান পাইতে মানুষের সহায়ক হইতে হইবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাম্প্রতিক কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলাইয়া 'জীবন ব্যবস্থায়', বিশেষত ধর্মে অনুরূপ অগ্রগতি হাসিল করিতে হইবে। তাঁহার মতে ইসলাম ইহার কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই কারণে ইহা আধুনিক যমানার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করিতে পারিতেছে না এবং ইহার আধুনিকায়নের প্রয়োজন।

কাস্‌রাবীর গঠনমূলক শিক্ষার মধ্যে আছে সরকার, অর্থনীতি, শিক্ষা ও নারী সমাজের মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা। তিনি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা ও সংশোধিত পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাকে তাহার নিজস্ব মেধা ও শ্রমের অনুপাতে বাস্তব পুরস্কারসহ জীবনের সকল আনন্দের অংশীদার করিতে হইবে। ব্যক্তির কার্যকর মূলধন সীমিত রাখিয়া অন্যায় প্রতিযোগিতা রোধ এবং অর্থের তুলনায় মেধার অগ্রগণ্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রেই সম্ভব সেখানে যন্ত্রপাতি এতটা ক্ষুদ্রাকৃতি করিতে হইবে যাহাতে উহার মালিক নিজেই উহা চালাইতে সক্ষম হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হইবে কেবল অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। "ভূমির মালিক হইবে চাষী, সে সর্বদা জমি আবাদ রাখিবে।" ইহাতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে হয় উহা বিক্রয় করিতে হইবে অথবা অন্যদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইবে। উৎপাদক ও খাতকের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ক্রেতা-বিক্রেতা থাকিতে পারিবে। সরকারের কার্যকলাপ প্রধানত আইন প্রণয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সরকার নিজে কৃষিকার্য, বাণিজ্য ও সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হইবেন না।

কাসরাবীর মতে শিক্ষার অর্থ হইতেছে জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং 'রাওয়ান' বা পরার্থপরতার উৎস-শক্তিকে জোরদার করা। বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাক্ষরতা ও বুনিয়াদী বিজ্ঞান এবং পৌরবিজ্ঞানসহ "জীবনের মহাসত্যসমূহকে" অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহার পরই স্থান পাইবে কারিগরী ও পেশাজীবী শিক্ষা, 'কুশিক্ষা' (বাদ-আমূযী) যে ক্ষতিকর তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করিয়া কোন অবস্থাতেই উহা পড়ানো যাইবে না।

আইন, প্রকৌশল ও রাজনীতির ন্যায় কতিপয় পেশায় মহিলাদের যোগদান করা উচিত নহে, তবে তাহাদের ভোটাধিকার থাকিতে হইবে। কেবল প্রথমা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে। যেসব নারী-পুরুষ কোনও ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত তাহাদের বিবাহ করা উচিত নহে। 'কাবীন' ("দায়ন মাহ্‌র") "শীর্‌বাঙ্গা' (কনে পক্ষকে দেয় পণ) ও জাহীয (বরকে দেয় 'যৌতুক') প্রথা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই একই কারণে 'তালাক' দেওয়ার অধিকার থাকিতে হইবে।

কাস্‌রাবী নবী (পয়গাম্বর) হওয়ার দাবী করিতেছেন এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি তাঁহার মতাদর্শকে পাকদীনী অর্থাৎ "ধর্মের পবিত্রতা" (কখনও কখনও 'আযাদিগী') বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং ইহাকে একটি রাহ্ অর্থাৎ "রাস্তা-পথ" বলিয়া অভিহিত করিতেন দীন বা 'ধর্ম' নহে। তিনি বলেন, "পাকদীনী হইতেছে ইসলামের উত্তরাধিকারী ও উহার ক্রমপ্রসারক", তবে এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁহার কোনও সুস্পষ্ট মন্তব্য অতীব বিরল।

কাসরাবীর রচনাবলী এক ব্যাপক বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের জন্ম দেয়, বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে। তিনি 'পাকদীনান' অর্থাৎ "পবিত্র ধার্মিক" বা 'আযাদিগান' নামে একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করেন এবং ধর্মপ্রচারকসুলভ উদ্দীপনা লইয়া তীব্র বিরোধিতার মুখে মতাদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। তবে তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা জানা যায় না।

কাসরাবীর দুঃসাহসী ও স্পষ্টবাদী মতামত, বিশেষত ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক মতামত তীব্র ও সহিংস বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং তাঁহার সমর্থকগণ প্রায়ই নির্যাতনের শিকার এবং সামাজিকভাবে 'একঘরে' হন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের অবমাননার অভিযোগ আনা হয়। ১১ মার্চ ১৯৪৬ সালে তেহরানের প্যালেস অব্ জাস্টিস (Palace of Justice)-এ অনুষ্ঠিত উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক শুনানীর শেষ বৈঠক চলাকালে ফিদা'ইয়্যান-ই ইসলাম (দ্র.) সংস্থার এক আক্রমণে তিনি নিহত হন (ইতিপূর্বে এপ্রিল ১৯৪৫ এই সংস্থার আক্রমণে তিনি আহত হন)। তবে তাঁহার অনুসারীরা এখনও সক্রিয় রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কাস্‌রাবীর জীবনের একমাত্র বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার স্বরচিত (১) "যিন্দিগানী-য়ি মান" (তেহরান ১৯৪৫ খৃ.) ও (২) "দাহ সাল দার্ 'আদ্‌দিলয়্যা" (তেহরান ১৯৪৫ খৃ.) গ্রন্থদ্বয়ে; এই গ্রন্থগুলিতে ১৯২৯ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার জীবন-কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; (৩) খান বাবা

মু'আল্লিফীন-ই কুতুব-ই চাপী য়িফারসী ওয়া 'আরাবী আয আগায-ই চাপ তা কুনূন, ১খ, তেহরান ১৯৬১ খৃ., কলাম ৪৩৭-৪৬-এ তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা (অসম্পূর্ণ ও সর্বত্র ঠিক নহে) দেওয়া হইয়াছে; ইহা ছাড়া ভাষা ও ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলির একটি আংশিক তালিকার জন্য দ্র. (৪) ঈরাজ-আফশার, Index Iranicus, ১খ, তেহরান ১৯৬১ খৃ, কাসরাবীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর একটি সংকলন প্রণয়ন করিয়াছেন; (৫) য়াহ্য়া যুকা', চিহির মাকালা-য়ি কাসরাবী, তেহরান ১৯৫৬ খৃ.।

M. A. Jazayery (E.I.[2]) শায়খ ফজলুর রহমান

আল-কাসরু'ল-কাবীর (القصر الكبير) ঃ Alcazar-quivir, উত্তর মরক্কোর একটি শহর। তানজিয়ার (طنجة)-এর প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ওয়াদি'ল-কাওস (وادى القوس) নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এক সময়ে এই নদী শহরের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইত। কিন্তু প্লাবন প্রতিরোধের জন্য স্রোতের গতি পরিবর্তন করা হয়। পূর্বদিকে প্রাধান্যপূর্ণ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিসহ শহরটি এক বিরাট সমতলে অবস্থিত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তরদিকে আশ-শারী'আ এবং দক্ষিণে বাবু'ল-ওয়াদ, এতদুভয়ের মাঝে বাজার এলাকা বিদ্যমান। গুরুত্বের দিক হইতে একমাত্র ইমারতসমূহ হইতেছে আল-মুওয়াহহিদ পূর্বযুগীয় জামি' মসজিদ, সীদী আল-আযমীরী এবং ১১০০/১৬৮৯ সালে সমাপ্ত জামি' আস্-সায়দা। শহরের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানীয় দরবেশদের নামে উৎসর্গিত বহু কুব্বা (মাযার) রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় দরবেশগণ হইতেছেন আবু'ল-হাসান আল-কুরাশী (কুরায়শী), স্পেনের বাসিন্দা, তাঁহার জীবনের শেষদিকে শিক্ষা দানের জন্য তিনি আল-কাসরে আগমন করেন এবং ৫৬৮ অথবা ৫৭৩/১১৭২-৭৩ অথবা ১১৭৭-৭৮ সালে ইনতিকাল করেন; সীদী ইব্ন আহ্মাদ, সীদী আলী ইব্ন খালিফ ইব্ন গালিব, সাধারণত মাওলায় 'আলী বুগালেম নামে প্রসিদ্ধ এবং শহর-কুত্ব হিসাবে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা হইত। সর্বশেষ সীদী বেল-'আব্বাস, যিনি আসলে ছিলেন একজন য়াহূদী রাব্বী, য়ুদা য়াবালায় (Yuda Yabalay)।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯০০০। ইহাদের অধিকাংশই ছিল খলুত, তিলিক ও জিবালা গোত্রের। ইহাদের মধ্যে রীফের অধিবাসী এবং কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকও ছিল যাহারা মূলত তিতুওয়ান (تطوان) ও ফাস হইতে আগমন করিয়াছিল এবং কিছু সংখ্যক আলজিরীয় পরিবারেরও লোক ছিল, যাহারা ফরাসীদের কর্তৃত্ব লাভের পর তিলিমসিন ও ওরান (وهران) হইতে হিজরত করিয়া আসিয়াছিল। য়াহূদীদের সংখ্যা ছিল ২০০০। কল-কারখানা এক সময়ে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতেছিল। বর্তমানে ইহা স্থানীয় প্রয়োজনে বস্ত্র তৈরীতে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে সারা দেশের কৃষি শহরবাসী ও গোত্রবাসীদের মধ্যেকার সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে সমৃদ্ধ ছিল। ফলে আল-কাসর ছিল খাদ্যশস্য, বার্লি, ডালজাত ও তৈল বীজের একটি ব্যস্ত বাজার।

ইতিহাস ঃ আল-কাস্র-এর অবস্থানস্থলটি সম্ভবত রোমান শহর (Oppidum novum ?)-এর সঙ্গে অভিন্ন ছিল, মুসলিমগণের বিজয়ের বহু পূর্বেই যাহা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ২য়/৮ম শতকে কুতামাদের একটি শাখা দানহাজা-গণ কর্তৃক এই এলাকায় একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। আল-যিয়ানী-এর মতে ইহা ১০২/৭২০-৭২১ সালে আমীর 'আবদু'ল-কারীম আল-কুতামী কর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছিল, যেই কারণে কয়েক শতাব্দীকাল যাবত শহরটি কাস্র 'আবদু'ল-কারীম (আল-ইদরীসী, Description de l'Afrique, ed. Dozy and De Goeje, text 78; tr. 89; কিতাবু'ল-ইসতিবসার, ed. von Kremer, Vienna 1852, 78; tr. Fagnan, Constantine 1900, 140; আরও ইব্ন খালদুন, Hist. des Berberes, ed. de Slane, i, 401, tr. ii, 323) অথবা কাস্র কুতামা নামে পরিচিত ছিল। আল-বাক্রী সুক কুতামা ও কাস্র দানহাজা-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। সূক কুতামা বলিতে লুককুস নদীর তীরবর্তী একটি জামি' মসজিদ এবং খুবই ব্যস্ত বাজারসহ একটি বিরাট জাঁকাল শহরকে বুঝাইয়াছেন এবং কাস্র দানহাজা বলিতে একটি বিরাট নদীকে নিয়ন্ত্রণকারী পাহাড়ের উপরে নির্মিত দুর্গকে বুঝাইয়াছেন। অন্যদিকে ইব্ন খালদুন (op. cit., text, i, 188, tr, ii, 291) কাস্র কুতামীকে দানহাজা-এর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন। সূক কুতামী ছিল ইদ্রীস ইবনু'ল-কাসিম ইব্ন ইব্রাহীম শাসিত রাজ্যের রাজধানী। আল-মুকাদ্দাসী, ২১৯, সম্পা. অনু. Pellat, 7, সূক আল-কুতামীকে ফাস (আস-সূক আল-আদনা)-এর উপর নির্ভরশীল শহরসমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ফাস-এর দ্রুত উন্নয়নের ফলে নিষ্প্রভ হইলেও সম্ভবত আল-কাসর একটি নির্দিষ্ট মানের বাণিজ্যিক গুরুত্ব টিকাইয়া রাখিয়াছিল। আল-ইদ্রীসী ইহার অত্যন্ত ব্যস্ততাপূর্ণ বাজারসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শহরটি শুধুমাত্র আল-মুওয়াহ্হিদদের শাসনামলে ইহার প্রায় অখ্যাত এবং ক্রমান্বয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হওয়া হইতে মুক্তিলাভ করে। য়া'কূব আল-মানসূর একটি শক্তিশালী প্রাচীরের সাহায্যে ইহাকে সুরক্ষিত করেন এবং একটি শিকার-ভূমি ও হারাতু'ল-মুজারীন নামে একটি হাসপাতাল তৈরী করেন। এই কারণেই সম্ভবত লিও আফ্রিকানাস ও মারমোল তাঁহাকে আল-কাস্র-এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করেন। মারীনী বংশীয়দের শাসনাধীনে আবূ 'ইনান কর্তৃক এই শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা বহু শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে এবং ১০ম/১৬শ শতকেও এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। আল-কাসর ৬২০/১২২৩-২৪ সাল হইতে পরবর্তীতে মারীনীদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ৬৮৭/১২৮৮-৮৯ সালে মারীনীগণ কর্তৃক রা'ঈস আবু'ল-হাসান ইব্ন আশ্কীলালাকে ইহার গভর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছিল, যাহার বংশধরগণ দীর্ঘদিন যাবত শহরটির উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই স্থানীয় বংশের সদস্যবৃন্দ গ্রানাডার বানু'ল-আহমারদের সহযোগিতায় পবিত্র ধর্মযুদ্ধে স্বতন্ত্ররূপে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাদের স্মৃতি আজিও অম্লান।

বানূ আশ্কীলাল নামক বংশের বিলুপ্তির পরবর্তী সময়টি ছিল বিপর্যয়পূর্ণ। উপকূলভাগে পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠা লাভ শহরটিকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। অধিবাসিগণ নগর প্রাকার হইতে ছয় মাইলের দূরবর্তী এলাকায় ভূমি চাষের সাহস করিত না। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে আচিলা (Aclia)-র গভর্নর ডন জুয়ান ডিমিনিয়েয (Don Juan de Menecz) ইহা অধিকারের প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হন। পরবর্তী শতাব্দীতে আল-কাস্র বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবীদের (মুজাহিদীন) অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে পরিণত হয়, যাহারা উপকূলে বসতি স্থাপনকারী খৃষ্টানদের নাকাল করিয়া ছাড়ে। 'আলাবী বংশের প্রতিষ্ঠা পূর্বকালীন অরাজকতার সময়ে শহরটি কা'ইদ ও গীলান-এর আবাসস্থলে পরিণত হয়, যিনি সমগ্র পশ্চিম (গারব) অধিকার করিয়াছিলেন। মাওলায় আল-রাশীদ কর্তৃক ১০৭৮/১৬৬৮ সালে তাঁহার রাজধানী হইতে

বিতাড়িত হইয়া গীলান এই যুবরাজের মৃত্যুর পর পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। তিনি ১০৮৪/১৬৭৩ সালে মাওলায় (মাওলা) ইসমা'ঈল কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হওয়া পর্যন্ত সেখানেই স্বীয় অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন। আল-কাসূর পুনরায় শেষবারের ন্যায় শারীফের হস্তে ন্যাস্ত হয়, যিনি ইহার প্রাচীর উঠাইয়া দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বাক্‌রী, Description de l' Afrique, ed. de Slane, text 110, tr. 250; (২) Leo Africanus, Description de l'Afrique, tr. Epaulard, 252-4; (৩) Description of Africa, Hakluyt Society, London 1896, 496; (৪) Marmol, Africa, ii; (৫) Moulieras, Le Maroc inconnu, ii, 358 ff.; (৬) Ch. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 14 প.; (৭) de Cuevas, Estudio general Sobre geografia del bajalato de Larache, n. p. 1882; (৮) J. Costa, El-Ksar el-Acabir, Tangier, 1887; (৯) G. Le Chatelier, Notes sur les villes et tribus de Maroc en 1890, Paris 1902; (১০) Budgett Meakin, The Land of the Moors, 333 প.; (১১) Frances Mac Nab. A Ride in Morocco, London 1902, 83-110; (১২) Michaux-Bellaire and Salmon, El-Qcar el-Kebir, Une Ville de province au Maroc Septentrional, in Arch. Marocaines, 1904; (১৩) A. Peretie, Le rais el-Khadir Ghailan in ibid, 1911.

G. Yver (E.I.²)/ মোঃ রেজাউল করিম

কাসূরু'ল-হায়র আল্-গারবী (قصر الحير الغربي) ঃ উমায়্যাদের দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ। সিরীয় মরুভূমিতে পাল্‌মীরা (তাদ্‌মুর)-এর ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে, কার‌্য়াতায়ন (قريتين) হইয়া এই মরূদ্যানটিকে দামিশ্‌কের সঙ্গে সংযোগকারী পথের উপর এবং হিম্‌স (দ্র.) হইতে হার্‌বাকা গিরিপথের মধ্য দিয়া আল্-জাওফ (দ্র.)-গামী রাস্তার উপর এই প্রাসাদ অবস্থিত।

উমায়্যা আমলের সমগ্র ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে একটি হাম্মাম, একটি খান (সরাই), একটি বৃহৎ উদ্যান (بستان), আবাদযোগ্য জমির একটি এলাকা [যাহা একটি بركة (জলাধার) এবং হারবাকা-র রোমান বাঁধ (dam)-এর সহিত সংযুক্ত সেচ খালগুলির মাধ্যমে সেচের পানি লাভ করিত], আর একটি আবাসিক প্রাসাদ যাহা উমায়্যা স্থাপত্যের ইতিহাসে নিকট প্রাচ্যে উমায়্যা পরিবেশের নমুনা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

এই বাদিয়া (দ্র.) (بادية = বেদুঈন নিবাস) সংগঠনের পূর্বেই রোমান যুগে স্থানীয় লোকগণ সেইখানে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। খৃ. ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব খৃষ্টান গোত্র গাসসানী ফাইলার্ক (Phylarch = গোত্র প্রধান) আল্-হারিছ একটি Jacobite মঠ নির্মাণের আদেশ দেন, বাঁধটির সংস্কার করান। এলাকাটি পুনরায় বসতিপূর্ণ হয়। হিশাম ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মালিক (দ্র.) খিলাফাতে সমাসীন হইবার চার বৎসর পর ১০৯/৭২৮ সালে এই এলাকায় হিম্‌স-এর কারিগরদের সাহায্যে এই স্থানে একটি আবাসিক প্রাসাদ নির্মাণ করান। সম্ভবত এই স্থানটিই আয-যায়তূনা (الزيتونة = জলপাই বাগান)। তাদ্‌মুরের পূর্বদিকে কাসূরু'ল-হায়র আশ্-শারকী (দ্র.)-র নির্মাণের পূর্বে তিনি সেখানে বসবাস করিতেন। 'আব্বাসী যুগে এলাকাটি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু আয়্যূবী ও মামলূকদের আমলে এলাকাটিতে পুনরায় বসতি স্থাপিত হয়।

খৃ. ১ম শতাব্দীতে রোমানদের নির্মিত হার্‌বাকাস্থ বাঁধটি একটি সমৃদ্ধ মরূদ্যানের বিকাশ ঘটায়। রোমানদের ইমারতাদি ছিল জাবালু'র-রাওয়াক-এর উত্তর ঢালের প্রায় ১৬ কি.মি. দক্ষিণে এবং 'আয়ন বার্‌দা কূপের ১৫০০ মি. দূরত্বে অবস্থিত পর্বতাদি হইতে নিম্নগামী পানিপূর্ণ, ১৫৫০ মি. দীর্ঘ ও ৮০০ মি. প্রশস্ত একটি হ্রদকে ধারণ করা হয়। একটি ঋজুরেখ (Rectlilineal) বিশাল প্রাচীরের পশ্চাতে, ভিত্তিস্থল হইতে শীর্ষ পর্যন্ত উর্ধ্বগামী, বিরাট বিরাট পাথর খণ্ডে নির্মিত দুইটি বৃহদাকার সিঁড়ির দুই মুখের মধ্যস্থানে প্রাচীরটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই কৃত্রিম জলাধারটি বর্তমানে ভরাট হইয়া গিয়াছে। তিনটি অন্তঃমুখী প্রবেশ পথের সাহায্যে একটি প্রধানত ভূগর্ভস্থ নালা পানি সরবরাহ করিত একটি কৃষিযোগ্য এলাকায়। এই এলাকায় প্রাসাদ হইতে প্রায় ৬০০ মি. পশ্চিমে আবিষ্কৃত হইয়াছে ৬০ মি. দীর্ঘ, ৩.৬৫ মি. গভীর একটি 'বির্‌কা' যাহা একটি বাঁধ (Embankment) দ্বারা বেষ্টিত এবং নালাবাহী পানিতে পূর্ণ। আরও কিছুদূরে এই পানি প্রবাহিত হইত বুস্তান (উদ্যান)-এ যাহার পূর্বদিকে ছিল একটি বাঁধ, যাহা পানি আটকাইয়া রাখিত। এই বুস্তান-এর পরিসর ছিল প্রায় ৪৫ হেক্টর। একটি দীর্ঘ ইষ্টকনির্মিত বেষ্টনী দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত ছিল। এই বেষ্টনীর কাঠামো ছিল চুনাপাথরের এবং ইহার বাহির ভিতর উভয়দিকে পর্যায়ক্রমভাবে নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার দেওয়াল-সংলগ্ন স্তম্ভ (Buttress) ছিল। পানি বিতরণ ও পানি নিরোধন (স্লুইস) এই উভয়বিধ ব্যবস্থাসম্বলিত সেচ সিস্টেমসমৃদ্ধ এই উদ্যানের দুইটি প্রবেশ পথ ছিল। প্রহরীর বাসকক্ষের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। স্রোতের উজানে পার্শ্ববর্তী একটি নালার উপরে পানি মিলের (Watermill) ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বির্‌কা-এর সন্নিকটে একটি প্রায় চতুষ্কোণ, প্রায় ৫৫ মি. দীর্ঘ ইমারতের উর্ধ্বগামী চিহ্নসমূহ বিদ্যমান; এই ইমারতের একটি কোণও সমকোণ নহে। ইহাই খানু'ল-মিল্‌হ (Khan al-milh) "যাহার প্রাচীরসমূহ স্থাপিত ছিল কাঁচা ইটের তৈরী এবং সুষ্ঠুরূপে কর্তিত প্রস্তরসমূহের দ্বারা নির্মিত ভিত্তির উপর।" পূর্বদিকে ছিল একটি সুবৃহৎ প্রবেশ দ্বার যাহা বর্তমানে দামিশ্‌কের জাতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাই লিন্টেল-এর উৎকীর্ণ লিপিতে প্রদত্ত তারিখ হইল রাজার ১০৯/অক্টোবর-নভেম্বর ৭২৭। দক্ষিণ ও উত্তর প্রাচীরের সংলগ্ন সম্মুখভাগ (Facade) হইতে ১৮ মি. দূরত্বে উর্ধ্বগামী দুইটি বাহু প্রবেশদ্বারের কাঠামো রচনা করিয়াছে। এখনও বিদ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভসম্বলিত মিহ্‌রাব ইহার প্রমাণ করে যে, দক্ষিণ বাহুতে একটি মসজিদ ছিল; উত্তর বাহুতে পানীয় জলের একটি আধার (Trough) বিদ্যমান। ইমারতের অভ্যন্তরে রহিয়াছে ২২.৫০×২৩ মি. পরিমাপের একটি কেন্দ্রীয় আঙিনা যাহা ২.৫০ মি. গভীরতা বিশিষ্ট স্তম্ভশ্রেণী (Portico) দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণ দিকে ৪৮ মি. লম্বা ও ৪.৮০ মি. চওড়া তিনটি কক্ষ সম্ভবত আস্তাবল অথবা পশুশালারূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্বদিকে রহিয়াছে বিভিন্ন মাপের ৬টি কক্ষ এবং একটি পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠ (Vestibule)।

প্রাসাদের ৩০ মি. উত্তরে রোমান-বায়যানটাইন আমলের একটি ক্লাসিকাল ধরনের হাম্মামখানা ছিল। ইহাতে ছিল চারিটি শীতল কক্ষ,

দক্ষিণের কক্ষটিতে ছিল একটি মিহরাব এবং তিনটি উষ্ণ কক্ষের একটি সারি যাহা তলদেশস্থ উষ্ণীকরণ প্রকোষ্ঠাদি (Hypocausts)-র উপর নির্মিত। বহির্ভাগের বিবেচনায় প্রাসাদটি ছিল সমচতুর্ভুজ আকৃতির ইমারত, ৭০ মি. লম্ব (রোমান ফুটের মাপে ২০০ ফুট) দুই মি. মাপের চুনা-পাথরের দেওয়াল, যাহা পোড়া-ইটের গাঁথুনীযুক্ত একটি অংশের (Zone) উপর সৃষ্ট কাঁচা ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের পূর্বদিক ব্যতীত অপর প্রতিটি দিকের মধ্যস্থলে অর্ধবৃত্তাকার মযবুতী স্তম্ভ (buttress) রহিয়াছে; পূর্বদিকে প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে দুইটি অন্ধকার মিনার অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম কোণটি ব্যতীত বাকী কোণগুলি গোলাকার বুরুজ (Tower) দ্বারা সুরক্ষিত। উত্তর-পশ্চিম কোণের বেষ্টনীভুক্ত রহিয়াছে একটি বায়যানটীয় বুরুজ, যাহার দক্ষিণভাগে ফটক রক্ষার জন্য একটি Machicolation (উপর হইতে হামলাকারী শত্রুদের উপর প্রস্তর ইত্যাদি নিক্ষেপের ব্যবস্থা) রহিয়াছে। পরবর্তীকালে এই বুরুজকে ব্যবহার করা হইত প্রহরার কাজে এবং Bayda ও Karyatayn-এর মধ্যে অগ্নি-সংকেত প্রেরণের (relay) জন্য। রোমান ও বায়যানটীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গোলাকার Buttress-এর ব্যবহার অজানা ছিল; ইহা ছিল সাসানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান।

প্রাসাদটি একটি দ্বিতল আবাসগৃহ। নীচতলা স্বতন্ত্র ছয় সেট কক্ষ (bayts)-সম্বলিত, প্রবেশ পথ portico-র মধ্য দিয়া। Creswell-এর মতে ইহাদের বিন্যাস-পদ্ধতি বসরা-র রোমান গভর্নরের প্রাসাদ হইতে উদ্ভূত। দ্বিতলের নকশা নিচতলার অনুরূপ এবং দুইটি সিঁড়ির মাধ্যমে তলদ্বয় সংযুক্ত। Balustrades এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ (column) সারি দ্বারা শোভিত একটি গ্যালারিতে প্রাসাদটি পরিবৃত। আবাসগৃহের বহির্দিকে কোনও জানালা ছিল না, আলোর ব্যবস্থা ছিল দরজার মাধ্যমে এবং দরজার উপরিভাগের জাফরী (stucco grilles)-এর সাহায্যে। খননকার্য পরিচালনাকালে এইগুলির কোনটিকেই সরেজমিনে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। এই গবাক্ষ জাফরী window-grilles (claustra)-এর অনেকগুলি stucco-তে নির্মাণ এবং trepan-এর সাহায্যে ছিদ্র করিয়া পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। এইগুলি এখন জ্যামিতিক ও লতিকা-পল্লব-পুষ্প শোভিত অলংকরণ উপাদান (floral motif)-এর বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের কিছুটা ধারণা প্রদান করে। Creswell মন্তব্য করেন, মুসলিম স্থাপত্যে কাস্রু'ল-হায়রই পলেস্তরা অলংকরণ ব্যবহারের সর্বপ্রথম উদাহরণ।

প্রতিকৃতিমূলক শিল্পকলার বহু উপাদানের পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছে, যেমন, bas-relief (পটভূমিতে গ্রথিত প্রায়)-এ মনুষ্য অথবা পশুমূর্তি যাহা প্রবেশদ্বারের অর্ধ-বুরুজের একটি শ্রেণীতে এবং অভ্যন্তরভাগের ক্ষুদ্র স্তম্ভসারির প্যানেলের উপর স্থাপিত। কতিপয় অকৃত্রিম ভাস্কর্যও এই প্রাসাদে রহিয়াছে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হয় একটি মনুষ্য-মূর্তি প্রায় স্বাভাবিক আকারে (life-size) গঠিত, রাজাসনে উপবিষ্ট, মস্তকে মুকুট (তাজ) পরিহিত, হাঁটু দুইটির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, গোড়ালিদ্বয় একত্র। মূর্তিটিকে হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিকের বলিয়া সাধারণত সনাক্ত করা হয়। প্রাসাদের দুইটি সিঁড়ি ঘরের মেঝেতে, প্রাচীরগাত্র-চিত্র (fresco) পদ্ধতিতে অংকিত বৃহৎ চিত্রকর্মগুলিতে (large compositions) ও মনুষ্য ও পশুর প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫×৪.৫৮ মি. সাইজের একটি চিত্রকর্মকে দিকচক্রবালের সহিত সমান্তরালভাবে (horizontally) তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উপরের ভাগে দুইজন সংগীতজ্ঞ চিত্রিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে একটি শিকারের দৃশ্য, তীর ধনুকসহ "খলীফা অশ্বপৃষ্ঠে ঘোড়ার জীনের রেকাব (stirrups) ব্যবহারে রত, সম্ভবত ইহা (জীবনের রেকাব ব্যবহারের) প্রাচীনতম জ্ঞাত রেকর্ড" [দ্র. Architecture, I, 613a], নিম্নভাগের চিত্রটিতে অযত্নরক্ষিত পরিষ্কার দেখা যায় কয়েকটি পশু এবং একজন মানুষ গো-জাতের একটি পশুকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। ৫.২৪×৪.৪৩ মিটার মাপের দ্বিতীয় চিত্রের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে একটি বিরাট পদক (medallion) যাহার পত্র-পল্লব-পুষ্পশোভিত পটভূমিতে একটি বৃহৎ আবক্ষ নারীমূর্তি বিদ্যমান। ইহার উপরিভাগে চিত্রিত হইয়াছে সামুদ্রিক নৃ-ঘোটকসমূহ (centaurs) এবং নিম্নভাগে কতকগুলি পশু তন্মধ্যে একটি শৃগাল ও দুই ঝুঁটিবিশিষ্ট কতকগুলি জলচর পাখী অন্তর্ভুক্ত।

নীচতলার কক্ষগুলির মধ্যে প্রাচীর গাত্রে সাধারণ জ্যামিতিক নক্শা (motifs)-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের মধ্যে হীরকাকার চতুর্ভুজ (lozenge)-এর প্রাধান্য দেখা যায় এবং সম্মুখে মর্মর ব্যবহারের অনুকৃতি (imitations of marblefacing) fresco রঙে রঞ্জিত এবং ceheme অনুযায়ী সম্পাদিত। প্রাসাদের সর্বাধিক অলংকরণযুক্ত পূর্ব বাহুর প্রধান অংশ দামিশকের জাতীয় যাদুঘরে পুনর্নির্মিত হইয়াছে।

কাস্রু'ল-হায়র সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই কারণেই নহে যে, ইহাতে উমায়্যা দুর্গ-প্রাসাদের বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত। A Henri Stern (Note, 81) উমায়্যা দুর্গ-প্রাসাদের বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ঃ ইহা একটি গোলাকার প্রাচীরবেষ্টিত আয়তাকার fence যাহার অভ্যন্তরে buttressed towers এবং bayts-সহ একটি মসজিদ — এইগুলি একযোগে একটি বৃহৎ বাঁধ (dam)-এর সাহায্যে পানিসেচিত কৃষিযোগ্য এলাকার কেন্দ্রস্থল রচনা করে। বরং এই বিভিন্ন স্থাপত্য উপাদানের বৈচিত্র্য এবং সুসমৃদ্ধ অলংকরণের কারণে উমায়্যা আমলের শিল্প ও সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণার জন্য এই প্রাসাদ একটি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণিক নিদর্শনে পরিণত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Poidebard, La Trace de Rome dans le Desert de Syrie, in BAH, xviii (1934), 187-9; (২) D.Schlumberger, Les fouilles de Qasr el-Heir el-Gharbi (1936-38), Rapport preliminaire, in Syria, xx/3-4 (1939), 195-238, 324-73; (৩) ঐ লেখক, Deux fresques omeyyades, in Syria, xxv (1946), 86-102; (৪) H. Stern, Note sur l'architecture des ehateaux omeyyades, in Ars Islamica, xi-xii (1946), 72-97; (৫) এস. 'আবদু'ল-হাক্ক; Reconstruction of a wing of Kasr al-Hayr al-Gharbi in the Damascus Museum (in Arabic), in Annales Archelogiques de Syrie, i (1951), 5-57; (৬) M. Dunand, De l'Amanus au Sinai, Sites et Monuments, Beirut 1956, 142-5; (৭) H. G. Franz, Die Stuckfenster im Qasr al-Hair al-Gharbi, in Wissenschaftliche Annalen, v (1956), 465-83; (৮) V. Strika, Sull' interpretazione da hayr net

periodo ommiade, in AIUON (1968), 139-49; (৯) K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, Oxford 1659, i/2, 506-21; (১০) A. F. al-'Ush, Catalogue du Musee National de Damas, Damascus 1969, 155-64; আরও দ্র. নিবন্ধ Architecture.

N. Elisseeff (E.I.[2])/ মোঃ রেজাউল করিম

কাস্‌রু'ল-হায়র আশ-শারকী (قصر الخير الشرقي) ঃ সিরীয় মরুভূমিতে জাবাল বিশ্‌রী বা বিশ্‌রী পাহাড়ের পাদদেশে গুরুত্বপূর্ণ উমায়্যা কৃষি আবাসভূমি, পালমীরার প্রায় ১০০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে এবং রুসাফা-সেরগিয়পোলিসের ৬৫ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ফুরাত নদীর কূলবর্তী মায়্যাদীন হইতে পালমীরা ও হিম্‌সগামী সড়ক ও হালাব হইতে রুসাফাগামী সড়ক যাহার সাহায্যে পরস্পর ছেদকারী সংযোগস্থলে অবস্থিত। তায়্যিবি গ্রামটিকে সাধারণত Assurbanipal-এর বিবরণীয় (মধ্যযুগীয় 'উর্‌দ্') ওরিয়া হিসাবে সনাক্ত করা হয়।

চতুর্দশ শতক হইতে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভের মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত পথে চলাচলকারী বহু পরিব্রাজক কাস্‌রু'ল-হায়র-এর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছেন। পরবর্তীকালে ১৮৪০ খৃ.-র দিকে ভারতে গমনাগমনের মরুভূমির রাস্তা স্থলপথের পক্ষে পরিত্যক্ত হয় এবং ইহার পর উক্ত স্থান আর উল্লিখিত হয় নাই।

উক্ত ধ্বংসাবশেষটি ১৯৬৪, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ খৃ. ওলেগ গ্রাবার (Oleg Graber) কর্তৃক খননের পূর্বে ১৯০৮ খৃ. A Musel পরিদর্শন করেন। ১৯২৫ খৃ. এলবার্ট গাব্‌রিয়েল কর্তৃক ইহা পুনঃআবিষ্কৃত এবং (খনন ছাড়াই) উপরিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় এবং ১৯২৮ ও ১৯৩০ খৃ. K. A. C. C. Creswell কর্তৃক ইহা পরীক্ষিত হয়।

এই সমগ্র আবাসস্থলটি ৬/৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়িয়া বিদ্যমান; এবং ১৭ কি. মি. দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণাংশ একটি অদ্ভুত নালা ব্যবস্থা (Canalization)-সম্বলিত এবং প্রবেশ-দ্বার সমন্বয়ে গঠিত, যাহা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একটি বৃহৎ কৃত্রিম ওয়াদী'র নিম্নস্রোত ধারায়, উত্তর কোণে দুইটি চতুষ্কোণ আবেষ্টনী, অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভ দ্বারা মযবুতিকৃত, ক্ষুদ্রটি আল-কাসর এবং বৃহৎটি আল-মাদিনা নামে পরিচিত। তাহাদের (সদর দিক) প্রবেশ দ্বারসমূহ (চতুর্দিকের ভিত্তিতে) পূর্ব-পশ্চিমে খাড়াভাবে সংস্থাপিত। অবশ্য পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকের অক্ষরেখা পরস্পর সরলরেখায় বিদ্যমান নয়, উভয়ের মাঝে ১০ মি.-এর ব্যবধান রহিয়াছে। এইগুলিই বিদ্যমান (টিকিয়া থাকা) প্রাচীনতম মুসলিম প্রতিরক্ষা আবেষ্টনী বা দুর্গ।

ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর ৭০ মি. একটি প্রশাখা আছে; পূর্ব সদর (সম্মুখভাগ) পশ্চিম সদরের একেবারে সমান্তরাল নয়, কেবল ইহারই একটি মাত্র প্রবেশপথ আছে। প্রাচীরটি ২.০৩ মি. পুরু ও প্রায় ১৪ মি. উঁচু চুনাপাথরে নির্মিত, প্রতিটি গাঁথুনি সরি ০.৩৫ মি. পুরু এবং শক্তভাবে জিপসাম দ্বারা সংযুক্ত। প্রাচীরের প্রতি কোণে ৪.৪৩ মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার স্তম্ভ সংযোজন এবং প্রতিদিকে দুইটি অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভ সংযোগ করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সর্বমোট ১২টি স্তম্ভ, সবগুলিই ইষ্টকনির্মিত, ক্ষুদ্র কিউপোলা বা গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত পশ্চিম দিকে সুবিশাল প্রবেশ দ্বার থাকার জন্য— যাহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে ৪.১৫ মি. ব্যাসবিশিষ্ট এবং ২.৯৫ মি. বহির্দিকে অভিক্ষিপ্ত দুই অর্ধ-বুরুজ, সেই দিকের ব্যবস্থা কিছুটা ভিন্নতর। ৩ মি. প্রশস্ত প্রবেশপথের শীর্ষদেশে একটি গাঁথুনিযুক্ত বৃত্তাকার খিলান রহিয়াছে। বুরুজগুলির ঊর্ধ্ব দিকে ইটের এবং ফুল, লতা-পাতার বিষয়যুক্ত পলেস্তারার অলংকরণ রহিয়াছে, যাহা ইসলামে অনুরূপ প্রাচীনতম অলংকরণের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রবেশদ্বারের উপর দিকে মধ্যস্থলে তিনটি দেওয়ালের কুলুজী-সদৃশ Console সমন্বয়ে গঠিত একটি রেলিং বিদ্যমান, যাহা মুসলিম ম্যাশিকোলেশনের (সাক্‌কাতা) (দুর্গটির প্রবেশ পথের উপরস্থ স্থান হইতে শত্রুদের উপর গরম পানি ইত্যাদি নিক্ষেপের ব্যবস্থা) প্রাচীনতম নিদর্শন, যাহা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত, কোনক্রমেই যাহা পায়খানা নয়।

প্রাচীরের ভিতর দিকে প্রস্তর ফলক নির্মিত ৫.৩০ মি. প্রশস্ত ও ৭ মি. গভীর প্যাসেজ (Vestibule) যাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি কক্ষ রহিয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া ৩৭ মি. পার্শ্ববিশিষ্ট আঙিনায় পৌঁছা যায়। এই আঙিনা চতুর্দিকে ৫ মি. প্রশস্ত খিলান শ্রেণী শোভিত পোর্টিকো দ্বারা পরিবেষ্টিত। খিলানগুলির ব্যাস ০.৫৫ মি. ৩.৭০ মি. দণ্ডবিশিষ্ট এবং এক্যানথাস বৃক্ষের পত্রযুক্ত চিহ্নিত শীর্ষস্তম্ভশোভিত থামের উপর স্থাপিত। এই পোর্টিকোর সাহায্যে দুই খিলানযুক্ত (Nanlt) অসংখ্য কক্ষে প্রবেশের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কক্ষগুলি ১২ মি. গভীর, কিন্তু প্রশস্ততার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রহিয়াছে। গ্যালারীর নীচে দ্বিতলে কাঠের সমতল ছাদযুক্ত নীচ তলার নক্‌শার অনুরূপ কক্ষসমূহ রহিয়াছে। এই সকল কক্ষের ব্যবহার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ইমারতটি দুইটি যুগে (Period) নির্মিত ঃ খলীফা হিশামের (নিম্নে দ্র.) সময়ে ইহার শুরু এবং 'আব্বাসী যুগের প্রারম্ভে ইহা সমাপ্ত হয়। মৃৎশিল্পের খণ্ডিতাংশসমূহ নির্দেশ করে যে, ইহা ৫ম-৭ম/১১শ-১৩শ শতাব্দীতে জনবসতিপূর্ণ ছিল।

১৬০ মি. পার্শ্ববিশিষ্ট বৃহৎ আবেষ্টনীর ২.১২ মিটার প্রশস্ত প্রস্তর প্রাচীর আছে যাহার অবস্থা খুবই করুণ। প্রতিটি দিকে বুরুজ বিদ্যমান, কোণেরগুলি ৪ মি. ব্যাসবিশিষ্ট এবং বৃত্তাকার; প্রতিটি দিকে দুই কোণের মধ্যবর্তী অংশে ৬টি করিয়া অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ রহিয়াছে; সর্বমোট ২৮টি বুরুজ। প্রতিটি বুরুজ কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রে ২৬.২৫ মি. দূরত্বে অবস্থিত। শুধুমাত্র প্রতি দিকের মধ্যস্থলের প্রবেশ দ্বারের পার্শ্ববর্তী বুরুজদ্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রহিয়াছে। পূর্ব দিকের সম্মুখস্থ দুইটি জরুরী মুকাবিলাস্থল এবং কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ সোপানশ্রেণী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যাহা প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ সম্মুখভাগের একদা বিরাজিত গ্যালারীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বুরুজগুলির শীর্ষে ইষ্টকনির্মিত ক্ষুদ্র গম্বুজশোভিত একটি করিয়া কক্ষ রহিয়াছে, যাহার সম্মুখ ও দুই পার্শ্বে শত্রুর উপর আক্রমণোপযোগী বানকির বা ছিদ্র রহিয়াছে। প্রবেশদ্বারগুলির প্রতিটি একই রূপ কিছুটা ভগ্ন খিলানশোভিত ৩ মি. প্রশস্ত দ্বার পথ। খিলানের নীচের অর্ধবৃত্তাকার অংশ (Tympanum) গাঁথুনির সাহায্যে নির্মিত এবং একটি দ্বিমুখী রেলিংবিশিষ্ট। উত্তর দিকের দ্বারে পার্শ্ববর্তী দুইটি বুরুজের মধ্যস্থল জুড়িয়া পাঁচটি ম্যাশিকোলেশন বিদ্যমান; আবেষ্টনীর মধ্যস্থলে একটি বিরাট ফাঁকা স্থান বা মীদান (ময়দান) রহিয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ৮টি বৃহৎ স্তম্ভের চিহ্ন বিদ্যমান। ইহাদের কোনও কোনটি খিলানের সঙ্গে সংযুক্ত। ক্রেসওয়েল সেখানে একটি মসজিদ আবিষ্কার করিয়াছেন, দামিশ্‌কের জামি' মসজিদের নক্‌শার সহিত যাহার নকশা প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ। এই উপাসনালয়ের তারিখ ১১০/৭২৮-৯ সালের

একটি শিলালিপি দ্বারা ধার্য হইয়াছে। ৩৭ মি. প্রশস্ত ও ২২ মি. গভীর প্রার্থনা-গৃহের 'T' আকৃতির স্তম্ভশোভিত একটি কেন্দ্রীয় অংশ (Nave) রহিয়াছে। বাকী খিলানশ্রেণী তিনটি সারি নির্দেশ করে। প্রার্থনা-গৃহের সম্মুখে জলাধারসহ একটি প্রাঙ্গণ রহিয়াছে এবং নালার সাহায্যে এই চৌবাচ্চার পানি সরবরাহের খিলানের ব্যবস্থা বিদ্যমান।

প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের খিলানটি সামান্য ভগ্ন এবং আকৃতিতে নরওয়ে দেশীয় খিলানের মত; প্রকৃতপক্ষে ইহাই জ্ঞাত এই ধরনের প্রাচীনতম নিদর্শন।

ওলেগ গ্রাবার (O. Grabar)-এর মতানুসারে মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে একটি দাপ্তরিক ইমারত, পোর্টিকোবেষ্টিত আঙ্গিনাসহ কক্ষশ্রেণী ও একটি অভ্যর্থনা হলসহ দারু'ল-ইমারা রহিয়াছে যাহার পশ্চাৎ দেওয়াল-আবেষ্টনী প্রাচীরের বিপরীতে অবস্থিত। মসজিদের উত্তরে পশ্চিম দেওয়ালের বর্ধিতাংশে, ৩.৫০ মি. প্রশস্ত একটি সড়ক বিদ্যমান। ইহার পূর্বদিক সংলগ্ন চুল্লি, ছাপাখানা ইত্যাদির সংস্থাপন সাবান কারখানার অস্তিত্ব প্রকাশক। এই একই এলাকায় ময়দানমুখী একটি স্নানাগার রহিয়াছে, তবে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নয়। এই এলাকায় একটি বিশাল জলাধারও চোখে পড়ে।

আবেষ্টনীর উত্তর-পশ্চিম অংশের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা চতুর্থ/দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কারামাতী আক্রমণের সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

৪২ মি. ফাঁকা স্থানে যাহা উভয় আবেষ্টনীকে পৃথক করিয়াছে ১০ মি. উঁচু ও ২.৯৪ মি. পার্শ্ববিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ মীনার (Tower) অবস্থিত। এই মীনারের দক্ষিণ দিকের একটি প্রবেশ পথ দিয়া ঘূর্ণায়মান সিঁড়িতে পৌছার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নির্মাণ বিশ্লেষণ হইতে ইহার নির্মাণ কাল, উমায়্যা পরবর্তী পুনঃনির্মাণসহ, আবেষ্টনীর নির্মাণকালের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। মীনারটি বিচ্ছিন্ন কেন ? মসজিদের সঙ্গে কোনও মীনার সংযোজিত হয় নাই, ফলে ইহা উভয় আবেষ্টনীর মীনার হিসাবেই কাজ করিত। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে ইহা ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞাত এই ধরনের তৃতীয় মীনার।

কাস্র ও ময়দানের দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট বহুকোণবিশিষ্ট আবেষ্টনী, ১৭ কি. মি. দীর্ঘ এবং ৮৫০ হেক্টর ভূমি লইয়া গঠিত। পানি ধরিয়া রাখার জন্য একটি প্রাচীরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়, পর্যায়ক্রমিকভাবে (প্রাচীরের) উভয় দিকেই ০.৩০ মি. উচ্চ চার সারি প্রস্তর (গাঁথুনি) দ্বারা ইহাকে শক্তিশালী করা হইয়াছে, যাহার উপরে ২ মি. উচ্চতা পর্যন্ত কাঁচা ইটের গাঁথুনি সারি রহিয়াছে। ইহা পুনরায় এক সারি প্রস্তর গাঁথুনি দ্বারা সংরক্ষিত। কন্টকগাটের (লক-গেটের) জন্য আরও একটি প্রাচীর আছে, যাহার সংযোগ-স্তম্ভ (ঠেকনা-Buttress) ২ মি. ব্যাসযুক্ত এবং একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব ১০ মি.। এইগুলি ১.১১ মি. প্রশস্ত ও ১.৫৫ মি. উচ্চ ইষ্টকনির্মিত ডবল ভল্টসম্বলিত ৪টি লকের একটি সিরিজ গঠন করে। এই লকগুলি পার্শ্বদিকে সরাইবার ব্যবস্থা সম্বলিত পাল্লার সাহায্যে কাজ করিত। তায়্যিবি এলাকা হইতে দুইটি ভূগর্ভস্থ কৃত্রিম নালার সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হইত। এই আবেষ্টনীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে সমস্যা রহিয়াছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, কৃষি কাজের নিমিত্ত পানি সংরক্ষণের জন্য ইহা ছিল একটি 'লেক' বা জলাশয়। অন্যরা মনে করেন যে, ইহা ছিল পশু সংরক্ষণের স্থান। H. Seyrig ইহাকে বেদুঈন রায্যিয় (Razzias)-র বিরুদ্ধে একটি সংরক্ষিত বিরাট উদ্যান মনে করেন।

অতি সংক্ষেপে এই এলাকার ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর একটি স্থাপনা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমসাময়িক ইতিহাস যাহার উল্লেখ রহিয়াছে, পালমিরীয় যুগে রোমান অধিগ্রহণের পরে আসে খৃষ্টান যুগ (কথা জানা যায়), তাহার পরে উমায়্যা নির্মাণকাজ এবং অবশেষে 'আব্বাসী যুগের প্রারম্ভকালের ইমারত নির্মাণ। ২৮৯/৯০২ সালে কারামাতীদের দ্বারা ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই কমপ্লেক্স হিম্স-এর আমীর শীরকূহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইকতা ('নিম্নে দ্র.)-এর অংশে পরিণত হয়। রাজাব ৭০২/মার্চ ১৩০৩ সালে মোঙ্গলদের দ্বারা ইহা বিধ্বস্ত হয়। ১০৪৮/১৬৩৮ সালের ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্বে বেদুঈন বিদ্রোহীদের কেন্দ্র তৈরির প্রতিরোধ হিসাবে ৪র্থ মুরাদের নির্দেশে নিশ্চিতভাবেই ইহা পুনঃঅধিগ্রহণ করা হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে সম্মুখদিকে এই ধ্বংসাবশেষ বেদুঈন শিবির স্থাপনের আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।

কাস্রু'ল-হায়র-এর অবস্থানস্থল সনাক্তকরণে সমস্যা রহিয়াছে; অধিকাংশ লেখক ওরিয়া-'উরদ্সহ তায়্যিবিকে চিহ্নিত করেন; অন্যদিকে টলেমী একটি প্রাচীন রোমান শিবির (Camp) আদাদাকে কাস্রু'ল-হায়র হিসাবে চিহ্নিত করেন; এ. মুসিলের মতও অনুরূপ। ১৯৩৯ সালে J. Sauvage এই ধ্বংসাবশেষকে সুনির্দিষ্টভাবে আয-যায়তুনা এলাকায় নির্মিত রুসাফাত হিশাম হিসাবে সনাক্ত করেন। পরে তিনি এই মত পরিত্যাগ করেন, যাহা K. Otto-Dorn কর্তৃক ১৯৫২-এর রুসাফা সারগিওপোলিস (Sergipolis)-এর খননের ফলে ইতিমধ্যেই দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। O. Grabar স্থানটিকে 'উরদ' হিসাবে এবং দুর্গের (Castle) প্রাসাদের চিহ্নকে মরুযাত্রীদের জন্য সরাইখানা হিসাবে সনাক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সেইক্ষেত্রে ইহা মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম খান (Khan দ্র.) হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Gabriel, Kasr el-Heir, in Syria viii (১৯২৭), ৩০২-২৯; (২) R. Dussaud, Topographie Historique de la Syrie, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., ২৪৭ প.; (৩) A. Musil, Palmyrena, A Topographical Itinerary, New York 1928, 72-9; (৪) H. Seyrig, Les jardins de Kasr al-Heir, in Syria, xii (1931), 316-8; (৫) ঐ লেখক, Retour aux jardins de Kasr el-Heir, ibid, xv (1934), 24-32; (৬) A. Gabriel, A Propos de Kasr el-Heir, in Syria, xiii (1932), 317-20, (৭) K. A. C. Creswell, Another word on Qasr al-Hair, in Syria, xviii (1937), 232-3; (৮) J. Sauvaget, Remarques surles Monuments omeyyades, in JA, ccxxxi (1939), 1-13; (৯) ঐ লেখক, Notes de topographie omeyyade, in Syria, xxiv (1944), 96-112; (১০) M. Dunand, De l'Amanus au Sinai, Sites et Monuments, Beirut 1953, 145-6; (১১) O. Grabar, Qasr al-Hayr, Preliminary Report, in Ann. Arch. Syrie, xv (1965), 107-20; xvi (1966),

29-46; (১২) ঐ লেখক, Preliminary Report on the Third season of excavations at Qasr al-Hayr (1969), in Ann. Arch. Syrie, xx (1970), 45-54; (১৩) K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture², Oxford 1969, i/2, 522-44।

N. Elisseeff (E.I.²)/ মোঃ রেজাউল করিম

আল-কাসরু'স-সাগীর (القصر الصغير) ঃ মরক্কোর একটি শহর, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। শহরটি জিব্রাল্টার প্রণালীর দক্ষিণ তীরে সিউটা (Ceuta)-র ১৪ মাইল পশ্চিমে, তাঞ্জিয়ার (Tangier)-এর ২৩ মাইল পূর্বে একটি নাব্য নদীর মোহনায় এবং জাবাল গোমারী পর্বত (Djebel Ghomari)-এর পার্শ্বশাখা দ্বারা সুরক্ষিত একটি উপসাগরের প্রান্তে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে সম্ভবত এই স্থানটি জুড়িয়া একটি ফিনিসীয় ফ্যাক্‌রী, অতঃপর একটি রোমক শহর (Lissa অথবা টলেমীর Exilissa) অবস্থিত ছিল। ৯০/৭০৮-৯ সালে মুসলিম অধিকারের প্রারম্ভিক কালে এখানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল (আয-যিয়ানীর বিবরণ অনুসারে in Archives Marocaines, ৬খ, ৪৯৪) মাসমূদা রাজ্যে যে কারণে কিতাবু'ল-ইস্তিব্সার-এর রচয়িতা এবং আল-ইদ্রীসী ইহার নামকরণ করিয়াছে কাসরু মাসমূদা (তু. ইব্ন খাল্দূন, Hist. des Berberes, ed. de Slane, i, 280; 13, tr. ii, 134)। আল-বাক্রী ইহাকে আল-কাস্রু'ল-কাবীর (দ্র.) হইতে পৃথক করিবার জন্য আল-কাস্রু'ল-আওওয়াল বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে বসতি করিত বানূ তারীফ এবং ইহা বড় বড় শস্যক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। আল-মুওয়াহ্হিদগণের আমলে ইহা স্পেনে যাইবার জন্য জাহাজে আরোহণের বন্দর হিসাবে মারসা (مرسى) মূসা-র স্থান অধিকার করে। এই কারণে অনেক লেখক ইহাকে কাস্রু'ল-মাজায (Geogr. d' Aboul-feda, tr. Reinaud, II/i, 185; ইব্ন খাল্দূন, পূ. স্থা.) অথবা কাস্রু'ল-জাওয়া "পারাপারের প্রাসাদ" (Castle of The Crossing) [ইব্ন আবী যার', রাওদু'ল-কির্তাস, ed. Tornberg, 138, 143, 146] নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল-মুওয়াহ্হিদগণ এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইমারত নির্মাণ এবং নৌ-পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। কিন্তু স্পেনের উপর আল-মাগরিবের শাসকগণের কর্তৃত্ব ঘুচিবার অনুপাতে এই শহরের সমৃদ্ধি হ্রাস পায়। সেনা পরিবহণের নিশ্চিত আয় হইতে বঞ্চিত হইয়া ইহার অধিবাসীবৃন্দ নৌ-দস্যুতার দিকে মনোনিবেশ করে। ফলে যে শহরগুলি অধিকার করিবার ইচ্ছা পর্তুগীজগণ পোষণ করিত তাহাদের মধ্যে আল-কাসর অন্যতম শহররূপে গণ্য হয়। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ৫ম আল্ফন্সো ৮০টি জাহাজ ও ১৭০০ সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া আক্রমণ করেন; দুইটি অভিযান প্রতিহত করিবার পর মুসলিমগণ খৃষ্টান গোলন্দাজ বাহিনীর অদম্য আক্রমণে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদিগকে অস্ত্র ও মালামালসহ পশ্চাদপসরণের অনুমতি দেওয়া হয়। ৫ম আল-ফনসো ১৪৫৮ সালের ১৯ অক্টোবর উক্ত শহরে প্রবেশ করেন। শহরের প্রধান জামি' মসজিদকে গির্জায় পরিণত করা হয়, রক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় এবং Don E. de Minecez-এর অধিনায়কত্বে একটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। ১৪৫৮ ও ১৪৫৯ সালে ফাস-এর সুলতানের শহরটিকে পুনঃঅধিকারের দুইটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৪৬৩ সালে আনজেররা-এর গোত্রসমূহ পর্তুগালের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ১৪৭১ খৃ. সুলতান মূলায় (মাওলা) সা'ঈদ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আল-কাস্রকে পর্তুগালের রাজার নিকট হস্তান্তর করেন।

১৫৪০ খৃ. পর্যন্ত আল-কাস্র খৃষ্টানদের অধিকারে ছিল কিন্তু এই ময়দানের মধ্যে ইহা মুরদের দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হইতে থাকে। ফলে ৩য় John পূর্বাহ্নে শহরটির ধ্বংস সাধন করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পর (১৫৫৯ খৃ.) এক চুক্তি অনুসারে Navarre-র রাজা, ফরাসী রাজন্য Antoine de Bourbon ফাস-এর শারীফা-কে সশস্ত্র লোক সরবরাহের অঙ্গীকারের পরিবর্তে আল-কাস্র লাভ করেন। কিন্তু স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ফলে এই চুক্তি কার্যকর হইতে পারে নাই। সেই সময় হইতে এই শহরটির পুনঃনির্মাণের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দ ইহা পরিত্যাগ করে এবং পোতাশ্রয়টি পলি জমিয়া বন্ধ হইয়া যায়; চোরাচালানকারিগণ ব্যতীত কেহই ইহা ব্যবহার করে নাই। স্থানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও অদ্যাবধি কর্তৃত্বব্যঞ্জক পর্তুগীজ দুর্গ, পরিখা, দুর্গ প্রাকার ও ফটক, যাহা দুর্গের সংগে মূল নগরের সংযোগ সাধন করিত, ইত্যাকার আড়ম্বরপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ দ্বারা চিহ্নিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাক্রী Descr, de l'Afrique, ed. de Slane, 104-105. tr. 243; (২) ইদ্রীসী, Descr, de l'Afrique etc., ed. Dozy and de Goeje, text 166, 167, 168; tr 199, 200, 201; (৩) কিতাবু'ল-ইসতিবসার, ed. von Kremer, Vienna 1852, 24; transl. Fagnan, Constantine 1900, 48; (৪) Ruy de Pina, Chronica de Sennor Rey D. Alfonso V. ch. lxxxviii; (৫) Colleciao de livors ineditos de historia Portugueza, i, 454-467, Lisbon 1790; (৬) Pienot Deseilligny, Traite d' Antoine de Bourbon avec le cherif de Fez, Maroes 1891; (৭) Leo Africanus, Description de l'Afrique, tr. Epaulard, 265; (৮) Description of Africa, Hakluyt Society, London 1896, 508, 514, 629; (৯) E. de La Primaudaye, 'Villes maritimes du Maroc, in Revue Africaine, 1872; (১০) Michaux-Bellaire and Peretie, El-Qcarec-Ceghir, in RMM (1916), 329 প.।

G. Yver (E.I.²)/ মোঃ রেজাউল করিম

আল-কাসস (القاص) ঃ (আরবী), বহুবচন কুস্সাস (قصاص) "জনপ্রিয় গল্পকার অথবা প্রচারক, ধর্মীয় বক্তা"; যাহার কার্যাবলী বহু শতাব্দীর পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, আল-কুরআনের ব্যাখ্যাসহ মসজিদে ধর্মালোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিছক বাগাড়ম্বর পর্যন্ত। এই শব্দটি আল-কুরআনে নাই, যদিও ক্রিয়াপদ 'কাস্সা' প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. Flugel, Concordantiae), ৬ ঃ ৫৭ আয়াত ব্যতীত সর্বত্রই নিম্নবর্ণিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ "বর্ণনা করা, আলোচনা করা, বিবৃত করা"— বিশেষ করিয়া কোনও উপদেশমূলক কাহিনী (দ্র. কিস্সা) এবং প্রায়ই প্রথম পুরুষ— যখন বর্ণনাকারী স্বয়ং। আল্লাহ্ লিসানুল-'আরাব (ধাতু قص) কতকগুলি হাদীছ উপস্থাপন করিয়াছে,

যাহাতে কাস্‌স শব্দটি (আল-কাসস য়ানূতাজিরু'ল-মাক্‌ত) এবং ক্রিয়াপদ কাস্‌সা দেখা যায়। অন্যান্য প্রয়োগে এই অর্থে 'গল্প বলা, বর্ণনা করা' এবং "ধর্ম প্রচার করা" (কাসূসা 'আলা'ন-নাস)। বলা হয় যে, নবী কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ "কোনও আমীর, তাহার অধস্তন কর্মকর্তা অথবা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ ধর্মোপদেশ প্রদান করিবে না" (লা য়াকুস্‌সু ইল্লা আমীরুন আও মা'মুরুন আও মুখতাল)। যেখানে আমরা কাস্‌সা শব্দটির অনুবাদ "ধর্মোপদেশ প্রদান" করিয়াছি, কারণ সম্ভবত উহা খুত্‌বা (দ্র.) সম্পর্কিত "জনপ্রিয় গল্পকারের কাজ সম্পন্ন করা" অথবা "ধর্মোপদেশ প্রদান করা" এই অর্থে ক্রিয়া পদটি যে প্রচলিত হইয়াছিল (দ্র. আল-জাহিজ, হায়াওয়ান, ৩খ, ২৪-৫ এবং বায়ান, ১খ, ৩৬৭-৯), ঠিক কখন হইতে তাহা অকর্মক ক্রিয়া হিসারে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ যে হাদীছগুলি লিসান-এ উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি পরবর্তীকালের হইতে পারে এবং সেই সময়ের হইতে পারে যখন হইতে ধর্মবিষয়ক পণ্ডিতগণ এবং সাধকগণ কুস্‌সাসদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করিতে শুরু করেন।

বস্তুত যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রথম দিকে সংখ্যাগুরু অজ্ঞ লোকগণের ধর্মভাব উন্নত করাকে সকল ধার্মিক মুসলমানই তাহাদের কর্তব্য মনে করিতেন— তথাপি দেখা যায় যে, নবী কারীম (স)-এর সময়ে কাস্‌সাসের পেশা তখনও বিদ্যমান ছিল না। আল-মাক্‌রীযীর মতে (খিতাত, ২খ, ২৫৩-৪) বেসরকারী কাস্‌স এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রবর্তিত সরকারী কাসসের মধ্যে পার্থক্য ছিল, যেখানে ফজরের সালাতের পরে, বিশেষ করিয়া ইসলামের শত্রুকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণকে লা'নত (অভিশাপ) দিতে এবং শুক্রবারে খুতবার পরে কুরআন শারীফের ব্যাখ্যা করিতে হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। যাহা হউক, শুধু মিসরেই এই পেশার নিদর্শন রহিয়াছে যাহা প্রথমে কাদী কর্তৃক গৃহীত হয়, পরে ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। ৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে এই কাস্‌সের স্থান দখল করে মুযাক্কির ও ওয়া'ইজ।

অন্যদিকে এই পদটির সংজ্ঞা দেওয়া হইত হালকাভাবে। প্রথমদিকে ধরিয়া লওয়া হইত যে, ইহা নিহিত ছিল বিলুপ্ত জাতিসমূহের ভাগ্য সম্বন্ধে আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনীতে, বাইবেলে বর্ণিত চরিত্রসমূহে এবং মোটের উপর কুরআনের সূরাগুলিতে ছড়ানো উপদেশমূলক অংশগুলিতে এবং কোনও কোনও উপদেশদাতা ইহাকে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যাও লইয়া যাইত। যে ইতিকথা অনুযায়ী তামীম আদ-দারী (মৃ. ৪০/৬৬০) প্রথম কাসস বলিয়া কথিত হন যিনি নিজেকে এই কাজে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উহা সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা তামীম (দ্র.) লৌকিক কাহিনীর একনায়কে পরিণত হন। অন্যদিকে ইব্‌ন কুতায়বা তাঁহার আওয়া'ইলের উপর এক প্রবন্ধের পরিচ্ছেদে (মা'আরিফ, ৫৫৭ ; ইব্‌ন রুস্তাওয়ায়হ্‌ কর্তৃক প্রতিলিপি করা, ২২৫) 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র আল-লায়ছী (মৃ. ৬৮/৬৮৭-৮) এবং আল-আসওয়াদ ইব্‌ন সারী আত-তামীমী (মৃ. ৩৬/৬৫৬) এই দুই জনের মধ্যে দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে আল-জাহিজ কুস্‌সাস (বায়ান, ১খ, ৩৬৭-৯)-এর ব্যাখ্যা পুস্তকে প্রধানত উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম জনপ্রিয় বক্তাগণকে অবশ্যই তাহাদের কার্যাবলী চালাইয়া যাইবার জন্য মসজিদে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত, বিশেষ করিয়া ইহাকে হযরত 'আলী ইব্‌ন তালিব (রা) বসরার একটি মসজিদ হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। কিন্তু হাসান আল-বাসরীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন (আল-মাক্কী, কূতু'ল-কুলূব, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ, ২১, ২৫, ২৮ ; ইবনু'ল-হাজ্জ, মাদ্‌খাল, কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ, ১৩,১৪৫)। এই শেষ বিবরণটি কিন্তু সংশয়জনক। কেননা হযরত 'আলী (রা) যখন বসরা প্রবেশ করেন তখন আল-হাসানের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। সম্ভবত পরবর্তী সূফীগণ যাহারা তাঁহাকে তাহাদের ইমাম বলিয়া উদ্ধৃত করে, কিন্তু যেই কারণেই হউক, তাঁহাকে কুস্‌সাসদের তালিকাভুক্ত করে না (যাহাদিগকে তাহারা ঘৃণা করিত)। তাহারা এই সুযোগ-সুবিধা-সম্বলিত পদে তাঁহার অধিকতর মর্যাদা ও ধর্মোপদেশের উচ্চমান সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, ইহা বোধগম্য যে, হযরত 'আলী (রা)-র সিদ্ধান্তের কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে উহা ঐ ইচ্ছা দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিল যাহাতে সরকারী ধারণা কোনক্রমেই ইসলামের সহিত অসঙ্গত না হয়। এমনকি, ঐ সকল কুসসাস প্রথম ধর্মীয় ইমামদের ধারণাগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইরানী পৌরাণিক কাহিনীসমূহের ধ্যান-ধারণার প্রতি আবেদন জাগানোর পূর্বে তাহারা সদিচ্ছায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের ভাষ্যের সঙ্গে কুরআন হইতে গৃহীত উপদেশমূলক কাহিনীসমূহ, য়াহূদী ও খৃস্টীয় উপাখ্যানমালা এবং জাহিলিয়্যার গল্পরাজি মিশ্রিত করিত (তু. তাহা হুসায়ন, মিন হাদীছি'শ-শি'র ওয়া'ন-নাছির, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ৪৮-৯)। অবশেষে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হইল (দ্র. আল-মাক্কী ও ইবনু'ল-হাজ্জ, পূ. গ্র.) এবং ২৭৯/৮৯২ ও ২৮১/৮৯৪ সালে ইহার আরও সাক্ষ্য রহিয়াছে (আত-তাবারী, ৩খ, ২১৩১, ২৬৫)। ঐ সময়ে যখন ইহা সত্য যে, কাস্‌সের কার্যাবলীর প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছিল।

সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের পুনরাবৃত্তি হইতে বিশ্বাস করিতে হয় যে, উহা নিষ্ফল ছিল। তাহারা মসজিদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও "ধর্মীয় বক্তাগণ" অশিক্ষিত জনসাধারণের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এবং ফুকাহা ও অন্যান্য পণ্ডিত অপেক্ষা তাহাদের চতুর্দিকে অধিকতর উৎসাহী ও অধিকসংখ্যক শ্রোতাদের সমাবেশ ঘটাইত। ঐ সমস্ত ফুকাহা ও পণ্ডিতবর্গ তাহাদের প্রতি ঘৃণাসূচক মনোভাব পোষণ করিতেন, বিশেষ করিয়া যখন কোনও আলোচনা সভায় তাঁহারা তাঁহাদের সহজ সাবলীল ভাষার বদৌলতে বিজয় লাভ করিত। যাহা হউক, তাঁহাদের মধ্যেও অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইবনু'ল-জাওযী তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়াও এই কথার উপর সঠিকভাবেই জোর দিয়াছেন (তালবীস ইবলীস, কায়রো ১৩৪০ হি., ১৩১)। আল-জাহিজ যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন (বায়ান, ১খ, ৩৬৭-৯; যাহা ব্যবহার করিয়াছেন, L. Massignon, Essai, ১৪১ এবং Ch. Pellat, Milieu, ১০৮) তাহা এই দিক দিয়া শিক্ষাপ্রদ। অন্যান্যের মধ্যে ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন হাসান আল-বাসরী, তাঁহার ভাই সা'ঈদ এবং তাঁহার পুত্র জা'ফার, ইবরাহীম আত-তায়মী, বিশেষ করিয়া মূসা ইব্‌ন সায়্যার আল-উসওয়ারী (দ্র. লিসানু'ল-মীযান, ৪খ, ১২০, ১৩৬; আস-সাম'আনী, আনসাব, ৩৭) যিনি আরবী ও ফারসীতে কুরআন শারীফের ব্যাখ্যা করিতেন। আরও একজন কাসস আবূ 'আলী আল-উসওয়ারী (মৃ. ২০০/৮১৫-এর পরে, দ্র. লিসানু'ল-মীযান, ৪খ, ৩৭২-৩), যিনি ৩৬ বৎসর বয়সে তাহার

ভাষ্যের প্রবাহ নিঃশেষ করিতে পারেন নাই এবং তদুপরি যিনি নিজেকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতেন। এই দুইজনকে কাদারী বলিয়া বর্ণনা করা হয় (দ্র. কাদরিয়্যা), যেমন করা হইত আরেক জন সুপরিচিত কাস্‌স সালিহ আল-মুররীকে (মৃ. ১৭২/৭৮৮-৯; তু. আবূ নু'আয়ম, হিল্‌য়া, কায়রো ১৩৫১-৬/১৯৩২-৭, ৬খ, ১৬৫-৭৭); রাকাশীগণও সমভাবে নিজদিগকে এই ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিভার বলে বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল।

L. Massignon (Essai, ১৪৩-৪) মনে করেন যে, ২য়/৮ম শতাব্দী বিশেষ করিয়া বসরাতে "ধর্মীয় বক্তাদের" যুগ, যাহারা কোনও সরকারী ফরমান ছাড়াই এবং শুক্রবারের খুতবার জন্য 'আব্বাসীদের নিয়ম-কানূন চালু হইবার পূর্বেই মু'মিনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার জন্য খুতবা প্রদান করিত। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন... ইসলামের আত্মশুদ্ধিমূলক শিক্ষা দানের মূল, সম্ভবত প্রথম দিকে বহুসংখ্যক কুসসাসের কার্যাবলী বেশ নিরপেক্ষ ছিল, প্রত্যেক যাহিদ ও নাসিক ধর্মোপদেশ প্রদান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহারা এতদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন যে, পরবর্তীতে সূফী ধর্মতত্ত্ব তাঁহাদের কয়েকজনকে তাঁহাদের দলভুক্ত বলিয়া দাবী করিয়াছিল কিন্তু কেহ কেহ যদি তাহাদের বিবৃতি দ্বারা মু'মিনদিগকে শিক্ষা দিতে এবং তাহাদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে, অন্যরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের, যাহা এই সময়ে উদ্ভূত হইতেছিল, সমর্থকদের দ্বারা অনতিবিলম্বে নিয়োগপত্র লাভ করিত।

৬৫/৬৮৫ সন হইতে তাওওয়াবূন (দ্র.)-দের ঘটনাপ্রবাহের সময়ে হযরত হুসায়ন (রা)-এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণে যে ভিড় হয় তাহাতে তিন জন ছিল কাস্‌স। আত-তাবারী (২খ, ৫৫৯) তাহাদের নাম ও যোদ্ধাদের উদ্দীপনা অব্যাহত রাখিতে তাহারা যে ভাষণ দিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; অন্যান্য দৃষ্টান্ত Goldzeher কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে (Muh. St., ২খ, ১৬২), তবে তিনি মনে করেন (২খ, ১৬৮-৯) যে, এই ধর্মীয় বক্তাদের কোন দলীয় প্রবণতা ছিল না। আবার ৪র্থ-৫ম/১০ম-১১শ শতাব্দীতে শী'আ ও হাম্বালীগণ জনসাধারণের নিকটে পৌঁছিবার এই কার্যকর পন্থাকে অবহেলা করে নাই (তু. জি. মাকদিসী, ইব্‌ন 'আকীল দামিশ্‌ক ১৯৬৩ খৃ., ৩২৩)। ইহা সত্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় দুইটির প্রতিনিধিগণ কোনও কোনও সময়ে একত্র হইত এবং লাভের অংশ গ্রহণ করিত (Muh. St., ২খ, ১৬৫-৬)। উপরে তিন জন কাদারীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কথা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, ২য়/৮ম শতাব্দী হইতে স্বয়ং মু'তাযিলীরাও তাহাদের মতবাদ চতুর্দিকে প্রচার করার জন্য এই "ধর্মীয় বক্তাগণকে" ব্যবহার করিয়াছে। আল-জাহিজ কেন তাহাদের প্রতি যে মনোযোগ প্রদান করিতেন ইহা হইতে তাহা আংশিক বুঝা যায়। তিনি সাধারণ লোকের বাগ্মিতাকেও প্রশংসা করিতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন।

অতএব বিরোধী দলসমূহ মুখের কথা দ্বারা যে প্রচারকার্য চালাইত তাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃপক্ষ যে সতর্কতা অবলম্বন করিত তাহা হইতে (কুসসাসের কার্যাবলীর উপর) এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আরও জানা যায় যে, এই সমস্ত অপব্যবহার অবসান করিতে প্রথমত উদ্বিগ্ন ধর্মবেত্তাদের নালিশ তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিল। বস্তুত কাসসগণ তাহাদের কিসসা কাহিনী প্রাণবন্ত করিবার মানসে ভূয়া হাদীছ উল্লেখ করিতেও ইতস্তত করিত না (এবং সম্ভবত বিভিন্ন ধরনের বিবিধ খণ্ড খণ্ড উৎস হইতে একত্র করিয়া হাদীছ প্রচার করিতে তাহারা অবদান রাখিয়াছিল), কাল্পনিক কর্মকাণ্ড ও বিস্ময়কর গল্প বলিতেও তাহারা ইতস্তত করিত না— যেইগুলিকে বিশ্বাসপ্রবণ শ্রোতারা ধর্মগ্রন্থের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত। এইভাবে তাহারা প্রামাণিক ইসলামী হাদীছকে প্রকৃত বিপদে ফেলিয়াছিল। এই ব্যবহারের জন্য তাহারা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক নিন্দাভাজন হইয়াছিল। আল-গাযালী (য়াহ্‌য়া, xix/৩) কুসসাস ও ওয়া'ইজগণ, যাহারা তাহাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মত মিশ্রিত করিত— তাহাদের নিন্দায় (ওয়া'ইজ, দ্র.) কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ইব্‌নু'ল-জাওযী (তালবীস, ১৩১) ও সূফীগণ দৃঢ় উপদেশ প্রদান করিতেন, যাহা'তে লোকজন তাহাদের ধর্মসভায় যোগদান না করে। কারণ তাহাদের সততা ছিল না। স্পেন, যেখানে তাহাদের সংখ্যা কম ছিল (আল-মাকদিসী, ২৩৬), কারণ মালিকী মতাবলম্বীরা কদাচিৎ তাহাদিগকে সহ্য করিত। সেখানে কাস্‌স শব্দটি 'গল্পকারদের' সমার্থক হইয়া পড়িয়াছিল এবং হিস্‌বার রচনাবলীর রচয়িতাগণ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই যে, কাসসদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ করা উচিত। ইব্‌ন 'আবদুন (তু. Levi-Provencal, Seville Musulmane, প্যারিস, ১৯৪৭ খৃ., শা. ৫৪) তাহাদিগকে গোরস্তানে দাফন করিতে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন, যেইরূপ ভাগ্য-গণনাকারীদিগকে বাধা দেওয়া হইত এবং তাহাদিগকে এইরূপ গল্প বলিতেও নিষেধ করা হইত যাহাতে নবী কারীম (স)-এর উল্লেখ থাকিত। ইব্‌ন 'আবদি'র-রা'উফ (তু. R. Arie in Hesperis-Tamuda, ১/৩খ, ১৯৬০ খৃ., ৩৬২) বলিয়াছেন, কাসসগণ রাস্তার গল্পকার ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই সময়ে ও পরবর্তীকাল হইতে প্রাচ্যে দীর্ঘকাল যাবত "ধর্মীয় বক্তা' এবং মাস'উদী যাহাদের কথা বলিয়াছেন (মুরূজ, ৫খ, ৮৬; ৮খ, ১৬১) সেই সমস্ত গল্পকারদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। আল-জাহিজ স্বয়ং (রাসা'ইল, সম্পাদিত সান্দূবী, ১২৯) দেখাইয়াছেন, মিসকীন ও কাসসগণ মসজিদের দরজায় ভিক্ষা করে; অপরদিকে ইব্‌ন হাম্বাল "কাস্‌স ও ভিক্ষুকগণকে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক" বলিয়াছেন। (আল-মাক্কী, কূত, ২খ, ২৫; ইব্‌নু'ল-হাজ্জ, মাদ্‌খাল, ২খ, ১৪৬)। "কিতাবু'ত-তাজ" গ্রন্থের লেখক (৪০; অনু. Le livre de la Couronne, 68) "কুসসাস এবং যে সমস্ত লোক খেলা দেখায় ও বানর লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়" "তাহাদের ধূর্ততার কথা" বলিয়াছেন। এইভাবে আল-কুরআনের জনপ্রিয় ভাষ্যকার ও ধর্মীয় বক্তা হওয়ার পরে কাসস এক প্রকারের ভাঁড়ে পরিণত হয়, যাহারা প্রধানত উপদেশমূলক কাহিনীর স্থলে হাস্যকর এবং প্রায়শ অশালীন গল্প বর্ণনা করিত, বিশেষভাবে বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্রকে বিদ্রূপ করিত [দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় সেই নেকড়ে বাঘের গল্প যে য়ূসুফ ('আ)-কে খায় নাই; ইব্‌ন আবি'ল-হাদীদ, শার্‌হ নাহ্‌জু'ল-বালাগা, ৪খ, ২৬০)। তাহাদের কেহ কেহ প্রকৃতপক্ষে বাকপটু হাতুড়ে ঔষধ বিক্রেতায় পরিণত হয়, যাহারা "গ্যালারী শো প্রদর্শন করিত" যদি আদায়কৃত অর্থ পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত পারিতোষিকরূপে দেখা দিত। এই সমস্ত প্রহসন-অভিনেতাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহা হইতে এই মুওয়াল্লাদ প্রবাদের উৎপত্তি হয়ঃ "এক কাস্‌স আরেক কাস্‌সকে ভালবাসে না" (আল-মায়দানী, ২খ, ৭৬)। অতএব বুঝা যায় যে, একটি সম্মানজনক

বৃত্তির উপর যে দুর্নাম নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহাই জনপ্রিয় ধর্মোপদেশের ভাবগম্ভীর প্রচারকদের উপর প্রতিঘাত করে এবং তাহারা অল্পবিস্তর সরকারী ধর্মপ্রচারকদের স্থলাভিষিক্ত হয়। সর্বদিক বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, উপদেশমূলক কাহিনী হইতে অধর্মীয় গল্পে চলিয়া যাওয়া খুবই সহজ ছিল এবং রাবী (দ্র.) অথবা মিদ্দাহ, যাহারা "আলফ লায়লা" গল্প অথবা আদর্শ বীরযোদ্ধা সম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ গল্পকাহিনী বলিয়া থাকে, সুযোগমত রাজনৈতিক এজেন্টের ভূমিকা পালন করে না এমন নয়। তাহাদিগকে সহজেই পরবর্তী কাসসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অপরদিকে মুকাদ্দী (দ্র.) যে নিজের দুঃসাহসিক কর্মের বর্ণনা প্রদান করেন এবং স্পেনীয় পিকারো (Picaro)-র পূর্বাভাস প্রদান করেন, তিনিও ইহা হইতে বহু দূরে নহেন (মাকামা দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আলোচনায় বহুলাংশে প্রদত্ত ঃ (১) I. Goldzeher (Muh. Studien, ২খ, ১৬১-৭০; অনুবাদ L. Bercher, ১৯৮-২০৮) ইবনু'ল-জাওযীর কিতাবু'ল-কুসসাস প্রচুর কাজে লাগাইয়াছেন এবং যে সমস্ত পৃষ্ঠা "ধর্মীয় বক্তাদের" জন্য নিবেদিত করিয়াছেন তাহা এই সামাজিক সংঘের সর্বাধিক ব্যাপক আলোচনার প্রতিনিধিত্ব করে। আরও (২) L. Massignon, Essai sur les Origines du lexique technique de la mystique Musulmane, Ch. Pellat, Milieu (বসরার কুসসাসদের উপরে); (৩) A. Mez, Rennaissance, index; (৪) M. S. Swartz; ইবনু'ল-জাওযী, কিতাবু'ল-কুস্‌সাস ওয়া'ল-মুযাক্কিরীন, সম্পা., ইংরাজি অনুবাদ ও ভূমিকা, বৈরূত ১৯৭১ খৃ.; (৫) C. E. Bosworth, The Mediaeval Islamic underworld, i, The Banu Sasan in Arabic society and literature, Leiden ১৯৭৬ খৃ., ২৪ et seqq; (৬) আরও দ্র. সুয়ূতী, তাহযীরু'ল-খাওয়াসস মিন আকাযিবি'ল-কুসসাস, সম্পা. মু. সাব্বাগ, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ.।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মুঃ আবদুল আজিজ

কাস্‌সাম (قسام) ঃ একটি পদবী, 'উছমানী আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এই পদবীতে পরিচিত ছিলেন। 'উছমানী আইনে দুই শ্রেণীর কাস্‌সাম-এর স্বীকৃতি ছিল, এক শ্রেণী কাদী 'আস্‌কের (দ্র.)-এর অধীনে এবং অন্য শ্রেণী স্থানীয়ভাবে প্রত্যেক কাদীর আদালতে নিযুক্ত হইত (কানূন নামে, ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আফেনদী, ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৬৬ ক-খ)। উক্ত পদটির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে।

সম্পত্তি রক্ষণ ও বণ্টনমূলক সেবার বিনিময়ে কাস্‌সামগণ উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে রেসূম-ই কিস্‌মেত নামে অভিহিত ফিস্ উসূল করিতেন। সামরিক শ্রেণীর (আস্‌কারী দ্র.) সদস্যদের নিকট হইতে আদায়কৃত রেসম-ই কিস্‌মাত কাদী 'আসকারের তহবিলে জমা হইত। যে সকল এলাকায় সামরিক শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ছিল তথায় কাদী 'আসকার নিয়োজিত কাস্‌সামগণ উত্তরাধিকার বণ্টন করিতেন (কানূন নামে-ই আল-ই 'উছমান, TOEM, Suppl., ইস্তাম্বুল ১৩২৯/১৯১১, ৪০)। এই সামরিক কাস্‌সামগণ তাঁহাদের সম্পাদিত লেনদেন কাস্‌সাম রেজিস্টার (কাস্‌সাম দাফতারলেরি) নামক পৃথক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতেন (O. L. Barkan, Edirne askeri Kassamina ait tereke defterleri, ১৫৪৫-১৬৫৯, Belgeler, in Turk Tarih Belgeleri Dergisi, ৩খ, ৫-৬, আনকারা ১৯৬৬ খৃ.)। শেহ্‌রী বা বেলেদী নামে অভিহিত স্থানীয় কাস্‌সামগণ কাদীর পক্ষে দায়িত্ব পালন করিতেন এবং বেসামরিক নাগরিক ও গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে আদায়কৃত উক্ত রাসম-ই কিসমাত, প্রতিটি কাদী এলাকার জন্য রক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন কাসসাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতেন। উত্তরাধিকার বণ্টনের বেলায় কাসসামগণ আইনত য়াতীমদের অধিকার রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য নির্ধারণ বা বে-আইনী রাস্‌ম-ই কিস্‌মাত আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল (কানূন নামে, ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আফেন্দী, ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৬৬ প., তু. কানূন নামে-ই 'আবদুর-রাহমান 'আব্‌দী পাশা, MTM, iii, ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৩, ৫৪১)। বুর্‌সা আদালতের ৯২৪/১৫১৮ সালের কাস্‌সাম রেজিস্টারে উত্তরাধিকার বণ্টনের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে একজন কাস্‌সাম-এর উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পরীক্ষা করা এবং রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করা হইত। একজন বিশেষজ্ঞ অতঃপর প্রতিটি বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করিতেন এবং মূল্য দফাওয়ারী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হইত। ইহার পর কাস্‌সাম স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতি উত্তরাধিকারিগণের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করিতেন। মোট সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য হইতে কাস্‌সাম-এর প্রাপ্য এবং মৃতের কাফন-দাফনের ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা উত্তরাধিকারগণের হস্তে অর্পণ করা হইত (I. H. Uzuncarsli, Osmanli devletinin ilmiye teskilati, আনকারা ১৯৬৫ খৃ., ১২৪)।

সামরিক কাস্‌সামগণের কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করিবার এবং কাদী আস্‌কারের নামে আদায়কৃত রাস্‌ম-ই কিস্‌মাত সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝে মাঝে সরকার পরিদর্শক নিযুক্ত করিতেন। ঘোড়-সওয়ার (Suvari) বাহিনীর তিনটি বিভাগ হইতে কাস্‌সামগণকে এই উদ্দেশ্যে আনাতোলিয়া ও Rumelia-তে প্রেরণ করা হইত। এই সকল ঘোড়সওয়ার পরিদর্শক-কাস্‌সাম আদায়কৃত রাস্‌ম-ই কিস্‌মাত-এর অর্থ কাদীর কোষাগার হইতে গ্রহণ করিতেন এবং যে কাদী অথবা ডেপুটি উক্ত অর্থ হস্তান্তর করিতেন, তাঁহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারের হিসাব সীলমোহর করাইয়া লইতেন। কোনও স্থানীয় সামরিক কাস্‌সামকে পদচ্যুত করা এবং তাহার পদে অন্য কাহাকে নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন এই ঘোড়সওয়ার কাস্‌সামগণ (I.H. Uzuncarsili, পৃ. গ্র., ১২১ প.)।

রাস্‌ম-ই কিস্‌মাত-এর উপর অধিকার কাহার, এই প্রশ্নে মাঝে মাঝে স্থানীয় কাস্‌সাম ও কাদী আস্‌কারের কাস্‌সাম-এর মধ্যে বিবাদ দেখা যাইত। সামরিক কাস্‌সামগণ যাহারা কাদী 'আসকারের পক্ষে কাজ করিতেন তাঁহাদের প্রবণতা ছিল সামরিক শ্রেণীকে সম্প্রসারিত করা। উদ্দেশ্য ছিল অধিকতর রাজস্ব আদায় এবং ইহাই ছিল বিবাদের অন্যতম প্রধান হেতু। এই প্রবণতা বন্ধ করিবার জন্য "সামরিক শ্রেণী"-র সংজ্ঞা প্রকাশকমূলক ফরমান জারী করিত সরকার মাঝে মাঝে, কিন্তু সম্প্রসারণের চেষ্টা কখনও বন্ধ করিতে পারা যায় নাই (Basbakanlik Archives, ইস্তাম্বুল, দীওয়ান-ই হুমায়ূন মুহিম্মে দেফতেরী, ৪খ, ১২০; ৭০খ, ৩৫)। ইস্তাম্বুলের ছাদযুক্ত বাজারে একজন এবং গালাতা অঞ্চলে একজন কাস্‌সাম নিযুক্ত ছিলেন, যাঁহাদের দায়িত্ব ছিল রূমেলিয়ার কাদী 'আসকারের অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম যে, আমার পেট শুকাইয়া গিয়াছিল এবং আমার দেহ কৃশ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দৃষ্টি নিচু করিয়া নিলেন অতঃপর আবার দৃষ্টি উত্তোলন করিলেন। আমি বলিলাম ঃ আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন

নাই ? আমি কাহ্মাস আল-হিলালী, এক বৎসর পূর্বে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে এইরূপ (কৃশ) দেখিতেছি কেন ? তোমার কি হইয়াছিল ? আমি বলিলাম ঃ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর হইতে আমি এক রাত্রিও ঘুমাই নাই। প্রতিটি রাত্রি 'ইবাদাতে কাটাইয়াছি এবং প্রতিদিন রোযা রাখিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ নিজের দেহকে শাস্তি দেওয়ার এইরূপ নির্দেশ তোমাকে কে দিয়াছে ? ধৈর্যের মাসে (রমযানের মাসে) রোযা রাখ এবং প্রতি মাসে এক দিন করিয়া রোযা রাখ। আমি বলিলাম ঃ আরও বাড়াইয়া দিন, আমার ইহার অধিক রোযা রাখার শক্তি আছে। তিনি বলিলেন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখ এবং প্রতিমাসে দুই দিন করিয়া (নফল) রোযা রাখ। আমি বলিলাম, আরও বাড়াইয়া দিন, ইহারও অধিক রোযা রাখার শক্তি আমার আছে। তিনি বলিলেন ঃ রমযান মাসের রোযার পর প্রতি মাসে তিনদিন করিয়া (নফল) রোযা রাখ।

মু'আবিয়া ইব্ন কুররা আল-মুযানী (معاوية بن قرة المزنى) বলেন ঃ আমি পনির ও ঘি-এর মৌসুমে মদীনায় আসিলাম। এই সময় বেদুঈনরা গম লইয়া মদীনায় আসে। আমি এক ব্যক্তিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়া লোকদের দিকে তাকাইতে দেখিলাম। আমার মনে হইল তিনি গরীব। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি কি শহরের বাসিন্দা ? আমি বলিলাম ঃ হাঁ। আমি তাঁহার নিকট বসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আপনি কে ? তিনি বলিলেন ঃ আমি হিলাল গোত্রের লোক এবং আমার নাম কাহ্মাস। তিনি পুনরায় আমাকে বলিলেন ঃ আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদীছ বলিব যাহা আমি 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-র সাক্ষাতে লাভ করিয়াছি ? আমি বলিলাম ঃ হাঁ। তিনি বলিলেন ঃ একদা আমরা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিল ঃ হে আমীরু'ল-মু'মিনীন ! আমার স্বামীর দোষত্রুটি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সদগুণ কমিয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার স্বামী কে ? সে উত্তর দিল ঃ আবূ সালামা। তিনি বলিলেন ঃ সে তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ও সত্যবাদী। অতঃপর 'উমার (রা) তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এইরূপ নহে কি ? সে বলিল ঃ হে আমীরু'ল-মু'মিনীন ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমিও তদ্রূপই জানি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৮, ৪খ, ৯৩-৪; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩২১); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৫৬; (৪) 'আবদুর-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১৭০; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা.বি., ৭খ, ৪৬।

মুহাম্মদ মূসা

কাসাম (قسم) ঃ শপথ, হলফ, কসম, কাসাম-এর মৌলিক অর্থ 'ভাগ করা'। ইহার অন্য অর্থ 'বিচ্ছিন্ন করা' ও 'ফায়সালা করা' অন্যদিকে হিলফা (ক্রিয়াপদ হালাফা) কসম করার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দটি বিশেষ অর্থেরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (দ্র. য়ামীন)। আল-কিসামাতু ওয়া'ল-কাসম=কোন জিনিস বণ্টন করা; তাকাসামা, ইকতিসাম আল-কাসামা—একই মূল হইতে উদ্ভূত, য়ামীন ও হালাফ-এর অর্থের সহিত উহা সম্পৃক্ত; আল-মুকাসিম=আর-রাজুলু'ল-হালিফ)।

আকসামা-র অর্থ হইল, সে শপথ করিয়াছে [কাসামা সেই সকল অংশ (বস্তু?) যাহা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও উত্তরাধিকারীদের উপর বণ্টন করা হয়]। এই শব্দটি বিভিন্ন আকারে কয়েকবার আসিয়াছে (দ্র. মুফরাদাত; আরও দ্র. লিসান)।

এই শব্দটি সাধারণত য়ামীন ও হালাফ-এর সমার্থক। কিন্তু অভিধানবিদ ও ফাকীহগণ উহার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর ফলপ্রসূ আলোচনা করিয়াছেন। আত-তাহানাবী কাশ্শাফ গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, য়ামীন ও হালাফ-এর মুকাবিলায় কাসাম ব্যবহারের দিক দিয়া সীমিত। আহমাদ-নাগারীর মতে য়ামীন সেই কসমকে বলে যাহাতে কসমকারী ব্যক্তি কোনও কাজ করা অথবা না করার জন্য স্বীয় ইচ্ছার দৃঢ়তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে (দাসতূরু'ল-'উলামা, য়ামীন শব্দাধীন)। সাধারণ অবস্থায় আপন আল্লাহ্‌র সহিত এই চুক্তি হয় একতরফা যাহার ফল কসমকারীর উপর ব্যক্তিগতভাবে বর্তায়। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্যের উপর ইহার দায়িত্ব প্রসারিত হয়। শুধু কাসাম দ্বারা ঐ শপথ বুঝায় যাহা কোনও বিবরণের যথার্থতা (অস্তিত্ব, নাস্তি, সত্য কিংবা মিথ্যা) প্রমাণিত করে এবং তাকীদ দানের জন্য করা হইয়া থাকে। ইহাতে কোন কাজের দুই দিকের (সত্য অথবা মিথ্যা ইত্যাদি) মধ্যে হইতে এক দিকের নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। য়ামীন-এর সাধারণ উদ্দেশ্য সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ এবং কাসাম-এর সাধারণ উদ্দেশ্য বার্তার তাকীদ ও দৃঢ়করণ (আত-তাহানাবী, কাশ্শাফ, ইসতি লাহাতি'ল-ফুনূন)। হালাফ মূলত অন্য ব্যক্তি বা দলের চুক্তি (মীছাক) সম্পাদনের অর্থে ব্যবহৃত হয়; তবে সাধারণ ব্যবহারে ইহাও য়ামীন-এর অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে য়াহ্‌লিফূনা বিল্লাহি, হাল্লাফুম-মাহীন (আত-তাহানাবী, জামিউ'র-রুমূয-এর সূত্রে)। ফাতহু'ল-কাদীর অনুসারে য়ামীন শব্দ দ্বারা শপথ এবং যাহার নামে শপথ করা হয় উভয়কে বুঝায় (কাসাম য়ামীন অর্থের জন্য য়ামীন দ্র.) য়ামীন তিন প্রকারের, য়ামীনু'ল-গামূস, য়ামীনু'ল-লাগবি ও য়ামীনু'ল-মুন'আকিদা"। ইহা ব্যতীত য়ামীন-ই শার'ঈ ও য়ামীন-ই 'উর্‌ফী-র জন্য একই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এমনিভাবে হালাফু'ল-মুওয়াক্‌কাত, হালাফু'ল-মুওয়াব্বাদ ও হালাফু'ল-মাজ্‌হূল-এর জন্যও।

বারজানদীর সূত্রে তাহানাবী লিখিয়াছেন যে, শারী'আতে বার্তার তাকীদ ও দৃঢ়তার ভিত্তি দুইটি, প্রথম এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার সিফাতসমূহের নামে দৃঢ়তা ঘোষণা করা; দ্বিতীয়ত শর্ত-সাপেক্ষ কসম খাওয়া এবং উহা পূর্ণ না হইলে ইহার জন্য কসমকারী পুরস্কৃত হইবে অথবা শাস্তি পাইবে (তালীকু'ল-জাযা'.... বিশ-শার্‌ত)। ইহাদের প্রথমটি কাসাম ও দ্বিতীয়টিকে য়ামীন বলে (পূ. গ্র., য়ামীন শব্দের অধীন)।

কাসাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমূহ ঃ (১) কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলার কসমসমূহ; (২) কুরআন মাজীদের আলোকে কসম (আয়মান)-এর শারী'আতী গুরুত্ব; (৩) ইসলামী শারী'আত কাসাম-এর পবিত্রতা (তামাদ্দুন, মানবিক মর্যাদা ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দৃষ্টিকোণ হইতে। ইহাতে এই বিষয়ও বর্ণিত হইবে যে, ইসলাম জাহিলী যুগে আরবে প্রচলিত কসম প্রথার কিভাবে সংস্কার সাধন করিয়াছে)।

কুরআন মাজীদে কাসাম (ও ব্যুৎপন্ন) শব্দের সহিত অনেক আয়াত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোনও কোনও আয়াতে সেই পূর্ববর্তী এবং সমকালীন লোকের উল্লেখ আছে যাহারা বড় বড় কসম করিয়া (আল্লাহ্‌র নামে শপথ

করিয়া) উহা বাস্তবায়িত করে নাই ঃ

اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ - اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ .

"দেখ, ইহাদিগেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতেছ যে, আল্লাহ্ ইহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না ; ইহাদিগকেই বলা হইবে—তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদিগের কোনও ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না" (৭ ঃ ৪৯)।

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ-

"তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদিগের কোনও পতন নাই " (১৪ ঃ ৪৪)।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ - اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ - حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ

"এবং মু'মিনগণ বলিবে, ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা তোমাদের সঙ্গেই আছে ? তাহাদের কার্য নিষ্ফল হইয়াছে; ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে" (৫ ঃ ৫৩)।

দ্বিতীয় প্রকার হইল, আল্লাহ্র তরফ হইতে কসমসমূহ, যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বলোক ও সৃষ্টি জগতের দৃশ্যাবলী, কিয়ামতের দিন, শাফাক ও রাত্রি প্রভৃতির নাম লইয়া কসম করিয়াছেন।

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ

"আমি এই শহরের কসম করিতেছি" (৯০ ঃ ১)।

فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ - وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ - وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ

"অতএব আমি শপথ করিতেছি অস্তরাগের ও রাত্রির আর উহা যাহা কিছুর ঘটায় তাহার এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণ হয়' (৮৪ ঃ ১৬-১৮)।

কুরআন মাজীদে, বিশেষ করিয়া প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাতে সৃষ্টির দৃশ্যাবলীর শপথ করিতে দেখা যায় (৫৬ ঃ ৭৪ ; ৮১) ঃ ১৫-১৮; ৮৬ ঃ ১; ৮৯ ঃ ১-৪; ৯০ ঃ ১-৭ ইত্যাদি) কুরআনের শপথের উদাহরণও আমরা দেখিতে পাই (৩৬ ঃ ২, ৩৮ ঃ ১ ও ২; ৪৪ ঃ ২; ৫০ ঃ ১)। এবং ফিরিশ্তাদের নামে শপথের (৩৭ ঃ ১) এবং কিয়ামতের দিনের শপথের (৭৫ ঃ ১) ইত্যাদি। ইবলীস আল্লাহ্র 'ইয্যাতের কসম করে (ফাবি 'ইয্যাতিকা, ৩৮ ঃ ৮২ প.) যায়দ ইব্ন 'আলী সং, Griffin পৃ. ২৮৬,.....৭ প.)। একটি হাদীছ কুদরীতে আল্লাহ্ স্বীয় 'ইয্যাত ও জালাল-এর কসম করিয়াছেন ঃ

فَقَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْكَ .

কুরআনে বর্ণিত কসমসমূহের উপর দ্র. ইবনু'ল-কায়্যিম, আকসামু'ল-কুরআন, মক্কা ১২৩১ হি. হামীদু'দ-দীন ফারাহী, আকসামু'ল-কুরআন।

আল্লাহ্ যে সকল বস্তর কসম করিয়াছেন তাহা উহাদের গুরুত্বের দরুন, যেমন ঃ

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

"শপথ সিনাই পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর" (৯৫ ঃ ২ ও ৩ ; অথবা উহাদের উপকারিতার দরুন, যেমন, وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا (৯১ ঃ ১), "শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের", وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ "শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'-এর" (৯৫ ঃ ১)।

আল্লাহ্র শপথ (কাসাম) তিন প্রকারের—নিজ সত্তা (যাত)-এর কাসাম (অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের কসম করিয়াছেন) অথবা নিজ কর্মের (অর্থাৎ নিজের কোনও হিকমাতের) অথবা নিজের সৃষ্টির (নিজের কল্যাণকর ও রহস্যময় সৃষ্টির)। নিজ যাতের কাসাম, যেমন فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (৫১ ঃ ২৩) নিজ কর্মের যেমন وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا (৯১ ঃ ৫) "কসম সেই আসমানের এবং সেই সকল বস্তুর, যাহা তিনি তৈয়ার করিয়াছেন", নিজ সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের যেমন– وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ "কসম কলমের এবং সেই জিনিসের, যাহা তাহারা লিখে" (৬৮ ঃ ১)।

ইবনু'ল-কায়্যিম আল্লাহ্র নির্দর্শনের কসমের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টিজগত হইল আল্লাহ্র বিরাট আয়াত, এই সকল কসম প্রকাশ্য হইয়া থাকে, যেমন " (১) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (৫১ ঃ ২৩), "কসম আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের" এবং فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (১৫ ঃ ৯২), "তোমার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্যই তাহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিব"; অথবা গোপন হইয়া থাকে, লাম অক্ষর দ্বারা যাহা নির্ণয় করা হয়, যেমন – لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ (৩ ঃ ১৮৬), "তোমাদের সম্পদ ও জীবনের ক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষা করা হইবে"; অথবা অর্থের মধ্য দিয়া উহার প্রকাশ ঘটে, যেমন- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا (১৯ ঃ ৭১) "তোমাদের প্রত্যেকে অবশ্যই উহা অতিক্রম করিবে" (বিস্তারিত বর্ণনায় জন্য দ্র. আয-যারকাশী, আল-বুরহান, সং ১৯৫৮ খৃ., ৩খ, ৪২)। এমনিভাবে তাফসীরবিদগণ يقسم بها ও ويقسم عليها-এর পার্থক্যও নির্ণয় করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, কসম ঘোষণামূলক বাক্যে কিংবা নির্দেশসূচক বাক্যে হইয়া থাকে। মুতাকাল্লিমদের গ্রন্থসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হইল আল্লাহ্ স্বীয় 'ইয্যাত এবং জালালাতের কসম করিবার প্রয়োজনীয়তা কেন অনুভব করিলেন ? উহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু কুরআন মাজীদ হইল মানুষের ব্যবহারিক জীবন (আরবদের দৈনন্দিন জীবন) অনুযায়ী, এই কারণে বর্ণনা পদ্ধতি মানুষের (আরবের) অভ্যাস অনুযায়ী গ্রহণ করা হইয়াছে। আবু'ল-কাসিম আল-কুশায়রী লিখিয়াছেন যে, ان الله ذكر القسم لكمال الحجة او تاكيدها; কোন সমস্যার ক্ষেত্রে সম্বোধিত ব্যক্তির আস্থার জন্য দুইটি পদ্ধতি হইতে পারে। একটি হইল সাক্ষ্য প্রমাণ এবং অপরটি হইল কসম (কুরআনে এই উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে)। কসম-এর উদাহরণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে; শাহাদাত বা সাক্ষ্যের উদাহরণ হইল ঃ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ (৬৩ ঃ ১) "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

কসম-এর আইনগত (শার'ঈ) গুরুত্ব ঃ (কসম-এর আইনগত গুরুত্বের বিস্তারিত বর্ণনায় জন্য দ্র. আল-য়ামীন)। এইখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যথেষ্ট হইবে যে, বিবাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ ব্যতিরেকে মীমাংসা সম্ভব নহে। প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতি তিনটি ঃ (১) মৌলিক স্বীকৃতি; (২) লিখিত সাক্ষ্য, মৌলিখ সাক্ষ্য, ও (৩) য়ামীন (=কসম)। যদি বিবাদী স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইল ব্যাপারটির সমাধান হইয়া যায়, আর যদি স্বীকার না করে তাহা হইলে প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর উপর বর্তায়। হয় সে কোনও লিখিত প্রমাণ নিজ দাবীর সমর্থনে পেশ করিবে অথবা মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করাইবে। কিন্তু ইহা যদি তাহার নিকট না থাকে সেই ক্ষেত্রে বাদীর অধিকার আছে যে, সে বিবাদীর নিকট হইতে কাসাম গ্রহণ করিবে। যদি সে কাসাম করে তাহা হইলে ফয়সালা বাদীর বিপক্ষে

যাইবে। কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, বিবাদী অস্বীকার করিবে অথবা বাদীর কাসাম দাবী করিবে, এইসব অবস্থার জন্য ও হুকুম রহিয়াছে [বিস্তারিত বর্ণনায় জন্য দ্র. 'ফালসাফাতু'ত-তাশরী' ফি'ল-ইসলাম' যাহাতে কানূন-ই 'উছমানী (মাজাল্লাতু'ল-আহ্কামি'ল-'আদালিয়্যা (দ্র.) এবং অন্যান্য ফিকহ গ্রন্থের হাওয়ালা প্রদান করা হইয়াছে; আরও দ্র. আল-য়ামীন)]। কসম খাওয়ার পর বাদীর তরফ হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে কি হইবে না, ইহা বিতর্কিত বিষয়। কোনও কোনও নূতন আইন অনুযায়ী বিচারকও আস্থার জন্য কোনও এক পক্ষের তরফ হইতে কসম গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ইহা কেবল পরিপূরক কসম হইবে, চূড়ান্ত (অকাট্য প্রমাণ) কসম (কাসাম-ই হাযিমা) হইবে না। ফাকীহগণ এইরূপ কসমকে উৎসাহিত করেন নাই। তথাপি এই পদ্ধতির বৈধতার পক্ষেও কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। আল-মাহমাসানী (المحمصانى) লিখিয়াছেন যে, কসম-এর পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। উহা মাযহাবী সর্তকতার মর্যাদা রাখে, যাহার উদ্দেশ্য সাধারণত ইহাই হইয়া থাকে যে, কসমকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে সত্য বলিবে এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করিবে (ঐ গ্রন্থ)। আধুনিক কালের বিচার কার্যের অভিজ্ঞতা কসমকে এক দুর্বল দলীল বলিয়া গণ্য করে। কেননা বর্তমানে দিয়ানাত ও সততা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং কোনও বস্তুর মাযহাবী ও আত্মিক মর্যাদা নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। এই অবস্থায় কসম-এর পবিত্রতায় দুর্বলতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইহা সত্ত্বেও ইসলামে কসম এক শারী'আতসঙ্গত আত্মিক 'আমল, ইসলাম যে সমাজের রূপরেখা প্রদান করিয়াছে উহার মূল ভিমি তাক্ওয়া ও আল্লাহ্-ভীতি। সুতরাং ইসলামের অধিকাংশ হুকুমের সকল রহস্য ইহাতে নিহিত আছে যে, উহার পশ্চাতে আল্লাহ্‌র ভয় এবং মানুষের এমন এক আত্মিক আগ্রহ কার্যকর আছে, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করে এবং এমন বক্তিত্ব গঠন করে যাহাতে ন্যায় ও হাক্ক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। লিখিত সাক্ষ্য এক অনুপম দলীল; কিন্তু কোনও কারণে উক্ত লিখিত প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকারও আশংকা রহিয়াছে। এই অবস্থায় কসম-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কারণে মিথ্যা কাসামকে ইসলামে নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং কসমকে লঘুভাবে গ্রহণের অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত কসমের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হইবে। উহাতে কোন দৃঢ় প্রত্যয় কিংবা নীতির ঘোষণা থাকিবে। তবে কসমের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক কর্তব্যকে ক্রোধ, জাহিলিয়াতের (পক্ষপাতদুষ্ট) চেতনা, প্রতিশোধ এবং অনিষ্ট সাধনের সকল সন্দেহ আশংকা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস এমন অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায় যখন সত্য কসমের কারণে অথবা মিথ্যা কসম অস্বীকার করিতে বাধ্য করিবার কারণে বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তথাপি তাকওয়া, দিয়ানাত ও ন্যায়নিষ্ঠার গুণাবলী ক্রমশ বিলীন হওয়া এবং বস্তু পূজা নৈতিকতাবিবর্জিত দর্শনসমূহ প্রচলিত হওয়ার পর ইসলামী সমাজও রক্ষা পায় নাই এবং অতঃপর কসম আর পূর্বের ন্যায় নির্ভরযোগ্য মাধ্যম থাকে নাই।

ইসলামের পূর্বেও আরব সমাজে কসমের বিরাট গুরুত্ব ছিল (ইসলামী যুগে কোনও কোনও অবাঞ্ছিত তাকীদমূলক ব্যক্তিগত কসম নিষিদ্ধ হইয়া যায়; অবশ্য যে কসম শিরক এবং অন্যান্য সন্দেহ হইতে মুক্ত ছিল সেগুলি অবশিষ্ট থাকে এবং শারী'আতে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়)। যুহায়র উহাকে নিফার মীমাংসার জন্য বিচারকের আশ্রয় গ্রহণ) এবং জালা (=পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে সত্য প্রমাণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গণ্য করিয়াছেন (কাসীদা নং ১, চরণ ৪০)। কসম এমন শব্দ যাহাতে কসমকারী তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেহেতু গোত্র ছিল একটি নৈতিক একক, যাহার দায়িত্ব হইত অভিন্ন ও সম্মিলিত, এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তির কসম গোটা গোত্রের কসমে পরিণত হইত। এই অবস্থায় উহাকে কাসামা বলা হইত এবং উহাতে গোত্রের পঞ্চাশ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কসম করিত যে, উহা সত্য হইতে পারে যে, কসম অভিযোগকারী ব্যক্তি করিবে (হামাসা, সং. Freytag. পৃ. ২৫; ইব্‌ন হিশাম, সংWustenfeld, পৃ. ৭৭৭ পৃ. ইত্যাদি) অথবা বারা'আত (براءت=নির্দোষিতা)-এর (যায়দ ইব্‌ন 'আলী, সম্পা. Griffini, পৃ. ২৩০, ৯ প.; আল-বুখারী মানাকিবু'ল-আন্‌সার, অধ্যায় ২৭)। এই কসমে অংশ গ্রহণকারিগণ সাক্ষী হিসাবে নহে, বরং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইহাও অপরিহার্য নহে যে, তাহারা বিবাদের স্থানে উপস্থিত থাকিবে। কসমকারী যে তাঁহার কথার উপর স্বীয় প্রাণপণ করিয়া থাকে তাহা অধিকাংশ কসম-এর শব্দে স্পষ্টভাবে বলা হইয়া থাকে। সে তাহার নাফ্‌স অথবা জীবনের কসম খাইয়া থাকে (বি-নাফ্‌সী, বি-হায়্যাতী, লা'আমরী কিংবা কেবল 'আমরী) অথবা স্বীয় সম্ভ্রম ও শক্তির অথবা এবম্বিধ কোনও বস্তুর কসম খাইয়া থাকে, যাহার সহিত সম্ভ্রম সম্পৃক্ত, যেমন নাসিয়া (=মাথার চুল) অথবা বর্শা (হামাসা, পৃ. ৪৪১, পঞ্চম কবিতা)। এই কসম ঠিক গোত্র কিংবা নিকটতম আত্মীয়ের কসম-এর অনুরূপ, (সূরা ৪ ঃ ১; এই আয়াতে কেবল রক্ত সম্পর্কিত পারস্পরিক আত্মীয়তার উল্লেখ আছে ; আরও দ্র. Ahlwardt, The Diwan of the six ancient Arabic Poets-এ তারাফা-র দীওয়ান, ৩য় তাসীদা চরণ ৭২, ইত্যাদি) অথবা যেমন বাপ-দাদার কসম (ওয়া আবী, ওয়া জাদ্দিকা ইত্যাদি) যাহা ব্যাপক ব্যবহৃত অথবা সেই মাবূদের কসম যিনি কসমকারী ব্যক্তির জীবনের সহায়। হিজাযে, বিশেষত মানাত, আল-'উয্‌যা ও আল-লাত-এর কসম খাওয়া হইত (Wellhausen, Reste arab Heid, দ্বিতীয় সং.,পৃ. ২৬-৩৪; ইব্‌নু'ল-কালবী, কিতাবু'ল-আসনাম, সম্পা. আহমাদ যাকী পাশা, কায়রো ১৩৩২/১৯১৪, পৃ. ১৪, ১৬ প. ১৯)। মুসলমানদের নিকট ঈমানের কসমও খাওয়া হইয়া থাকে। কসমকারী ব্যক্তি স্বীয় সমস্ত প্রিয় বস্তু, নিজের যাবতীয় জিনিস তাহার কথার উপর যুক্ত করিয়া দেয় এই বিশ্বাসে যে, মিথ্যা ও অত্যাচার বাতিল শক্তি, সুতরাং কোনও মিথ্যা কসম জীবনকে (তাহার প্রতিটি প্রিয় বস্তুকে) বিপন্ন করিয়া তোলে। কসম আল্লাহ্‌র সহিত এক চুক্তি ('আহ্দুল্লাহ্, মীছাকুল্লাহ্, যিম্মাতুল্লাহ্) এবং কসমকারী ব্যক্তি যদি মিথ্যা বলে কিংবা তাহার ওয়াদা পূরণ না করে তাহা হইলে সে তাহার রূহকে বিপন্ন করিয়া তোলে এবং তাহার মা'বূদকে অসন্তুষ্ট করে। অতএব, কসম-এর রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ হয় যে, উহাতে কসমকারী ব্যক্তি শর্তসাপেক্ষে ঐ সকল বস্তু হইতে মুক্ত থাকিবার (বারা'আত) ঘোষণা করিয়া থাকে, যাহা তাহার খুবই প্রিয়, যেমন انا برىء من حول الله وقوته ان فعلت (দ্র. আত-তাবারী, আত-তাফসীর, ৩খ, ৬১৮, ছত্র ১০, ৬২২ ছত্র ৫, ৯প. আল-মাস'উদী, ৬খ, পৃ. ২৯৬, সং প্যারিস ; আল-য়া'কূবী, ১খ, পৃ. ৫৫ প., ৫০৯ প.; সং. Houtsma)। এই প্রকারের নির্ধারিত বাক্যাবলী (Formulae) মামলূকদিগের (রাজত্বকালে) বিভিন্ন পদাধিকারীদের পদ সংক্রান্ত কসম-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত

ছিল (আল-'উমারী, আত-তা'রীফ বি'ল-মুস্তালাহ আশ-শারীফ, পৃ. ১৪৬-১৬৪, ১৩১২ হি.; আল-কালকাশান্দী, সুবৃহ'ল-আ'শা, ১৩খ, ২০৫ প., ১৩৩৭/১৯১৮, কায়রো)।

বারা'আত (নিরপরাধিত্ব)-এর কসমের সম্পর্ক অন্য এক প্রকার কসমের সহিতও রহিয়াছে অর্থাৎ কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিজের জন্য বদদু'আ' করা। এই ধরনের বাক্যের উদাহরণ হইল "যদি আমি তোমাকে হত্যা না করি তাহা হইলে আল্লাহ্ যেন আমাকে মৃত্যু দেন", "যদি আমি অমুক কাজ না করি তবে যেন আমি রক্ত পান করি।" ব্যাপক ব্যবহৃত আর একটি বাক্য, "যদি আমি এইরূপ করি (অথবা এইরূপ না করি) তাহা হইলে আমার হাত যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়" (আন-নাবিগা, কাসীদা ৫, চরণ ৩৯; ইব্ন হিশাম, পৃ. ৮৩০ লাইন ১৮)। এমনিভাবে ইবনু'ল-ফারিদ চিৎকার করিয়া কসম খান— هذا يدى "এই আমার হাত" (তা'ইয়্যাতু'ল-কুবরা, চরণ ২৬৪, কায়রো ১৩১৯ হি.)। রাসূলুল্লাহ্ (স) এক স্থানে ইরশাদ করেন قد خبت وخسرت اذا لم اكن اعدل অর্থাৎ 'আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে (আল্লাহ্ করুন) আমি যেন অকৃতকার্য এবং ক্ষতির সম্মুখীন হই' (আল-বুখারী, ২খ, ৪০৬, লাইন ৮, সং লাইডেন)। এই কসম লি'আন-এর সময় লওয়া থাকে, যিনার অভিযোগ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে (২৪ ঃ ৬-৯ ; Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, পৃ. ১৯২)। বদ-দু'আ' (কেবল বিস্ময় প্রকাশের জন্য)-ও হইতে পারে, যেমন বলা হইবে ঃ قاتله الله ما اشجعه অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করুন সে কেমন বাহাদুর!" এইখানে বদ-দু'আ'র প্রয়োগ বিস্ময় প্রকাশের জন্য হইয়াছে, যেমন ৭৪ ঃ ১৯, ২০-এ রহিয়াছে (দ্র. ঐ সকল আয়াতের উপর আল-বায়দাবীর তাফসীর)। এমনিভাবে সেই বাক্য যাহার উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে অর্থাৎ "আমার হাত যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়" এইভাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

নাযার ঃ নাযার (মানত) মানিবার পদ্ধতি হইল, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষ নিজের উপর বিশেষ বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এই জাতীয় নাযার আরবদের নিকট বিশেষ করিয়া প্রতিশোধের কসম হিসাবে খুবই ব্যাপক ছিল। এই কারণে ইমরা'উ'ল-কায়স বলেন যে, তিনি গোশ্ত খাইবেন না, মদ্য পান করিবেন না, নিজ দেহে তৈল মর্দন করিবেন না, নারী স্পর্শ করিবেন না এবং নিজ মস্তক হইতে যৌনসংগমজনিত অশুচি ধৌত করিবেন না। যতক্ষণ না তিনি (নিজ পিতৃ) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন (আল-আগানী, ৮খ, ৬৮, লাইন ১৭; পৃ. ৮৬, লাইন ২; ৯খ, পৃ. ১৪৯, লাইন ২; ১৩খ, পৃ. ৬৯, লাইন ৮; ইব্ন হিশাম, পৃ. ৯৮০, লাইন ৩ প. ; পৃ. ৫৪৩, লাইন ৫ প. ইত্যাদি)। এই কসমে বিশেষ কার্য করিবার জন্য শপথ করা হয়। ইহা দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদন করিবার জন্য নিজকে বাধ্য করিয়া লয় এবং এক অতিরিক্ত 'শপথ' গ্রহণ করে। এই ধরনের কসম যুদ্ধকালের পূর্বে করা হইত (হামাসা, পৃ. ৩০১ ; আনতারা, কাসীদা ২৯, চরণ ৮৪ ইত্যাদি)। উহার বিপরীত ইহাও হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি তাহার কথায় তাকীদ দানের জন্য এই মর্মে বিশেষ শপথ করিবে যে, যদি সে উক্ত কথা রক্ষা না করে তাহা হইলে উহার পরিবর্তে অমুক কাজ করিবে; এই শপথ বাতিল করা যাইবে না। উহার পদ্ধতির এই তিন পদ্ধতির একটি হইয়া থাকে ঃ কুরবানীর জন্য উট প্রদান, দাস কিম্বা দাসী মুক্ত করা অথবা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। এই জাতীয় শপথের ক্ষেত্রে কখনও আতিশয্য করা হয় এবং কখনও অপর্যাপ্তি। সুতরাং এই শপথ করিতে পারে যে, সে তাহার বর্তমান স্ত্রীদের সহিত সেই সকল স্ত্রীদেরও তালাক প্রদান করিবে যাহাদিগকে আগামীতে বিবাহ করিবে এবং বর্তমান দাস-দাসী ছাড়া সেই সকল দাসদাসীকেও মুক্ত করিবে যাহারা ভবিষ্যতে তাহার মালিকানায় আসিবে (যেমন আল-য়াকূবী, পৃ. ৫০৫ প. এবং উহার উদাহরণ সেই সকল কসমেও পাওয়া যায়, যাহা মামলূকদিগের আমলে সরকারী কর্মকর্তাদের করিতে হইত)। এই জাতীয় কসমকে ইমাম শাফি'ঈ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন; তথাপি উহার ব্যাপক ব্যবহার হইয়া থাকে (দ্র. يخلف بامر آنه যায়দ ইব্ন 'আলী. মুসনান, মাজমূ'উ'ল-ফিক্হ-এ, সং. H.Griffini, পৃ. ২০৫, লাইন ১০ প.)। কসম করিবার কালে স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, ইহা অত্যন্ত পবিত্র এবং বিরাট দায়িত্বপূর্ণ বাক্য। প্রাচীনকালে আনসাব (বেদী) এবং মূর্তিদের নিকট গিয়া কসম করা হইত (আল-আগানী, ৯খ, পৃ. ৯ প.)। আরবে ইসলাম প্রচারের পূর্বে এবং ইসলাম পরবর্তীকালেও কসম খাওয়ার জন্য কা'বা বিশেষভাবে পসন্দনীয় স্থান ছিল (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩১৭ লাইন ১৮; ইবনু'ল-কাল্বী, পৃ. ১৯; আত-তাবারী, ৩খ, পৃ. ৮৬১), লাইন ৪ প.), বিশেষ করিয়া আল-হাতীম-এর নিকট (আত-তাবারী পৃ. ৩৪৬৪, লাইন ১০)। যে কসম কা'বা-র নিকট করা হইয়া থাকে আজও উহাকে খুবই মযবূত (অলংঘনীয়) বলিয়া জ্ঞান করা হয় (Snouck Hurgronje, Mecca, ২খ, পৃ. ৩০৬; আল-বাতানূনী, আর্-রিহ্লাতু'ল-হিজাযিয়্যা, ১২৭, কায়রো ১৩২৯ হি.)। এইভাবে কিছু লোক ওয়ালীগণের সমাধিতে গিয়া এবং কবরের উপর হাত রাখিয়াও কসম করিয়া থাকে (Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de moab, পৃ. ৩১১; Musil, Arabia petraea, ৩খ, পৃ. ৩৩৮, ৩৪২)। কসম করিতে গিয়া রাওদা মুবারাকের উমর দরজার উপর হাত রাখা হয় (শিবাকু'ততাওলা, যেমন দ্র. আল-বাতনূনী, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৪৬)। কসম মসজিদে (নাবাবী)-তেও করা হইয়া থাকে, বিশেষত মিম্বরের উপর (যেমন আত-তাবারী, ২খ, পৃ. ৯২, লাইন ১৮ প.)। এমন অনেক সময় আছে যে সময়ে কৃত কাসাম অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়, বিশেষত যাহা সালাতু'ল-'আসর-এর পর কোন সময় হইয়া থাকে (Goldziher, in Archiv fur Religionswiss, ৯খ, পৃ. ২৯৭ প.)। কুরবানীর ক্ষেত্রে কাসাম করার সাক্ষ্য ইসলাম-পূর্ব যুগে পাওয়া যায় (যুহায়র, কাসীদা ১, চরণ ৫০ (হামাসা, পৃ. ৪২৩, লাইন ১০)। (জাহিলী যুগে) কুরবানীর জন্তুর কসম খাওয়া সাধারণ প্রথা ছিল এবং সর্বোপরি রাব্বু'র-রাকিসাত ইলা মিনা (কুরবানীর জন্তুর প্রতিপালক)-এর কসম খাওয়ার প্রথা ছিল (হামাসা, পৃ. ৭১৫, চরণ ৬)। কসম খাওয়ার ঐতিহ্যগত পদ্ধতিসমূহের একটি ছিল হাওলা (حولا = অগ্নি চক্র বা কূপ), আল-জাওহারী অনুযায়ী (সিহাহ, হাওল মূলের অধীন) উহাতে লোকেরা গোত্রীয় অগ্নির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কসম খাইত এবং উহাতে লবণ নিক্ষেপ করিত। এই প্রথা যাহার প্রতি আল-কুমায়ত ইঙ্গিত করিয়াছেন (আল-হাশিমিয়্যাত, সম্পা. Horovitz, কাসীদা ৪, চরণ ৩৬ ঃ (كما شب نار الحالفين المهول) আজও প্রচলিত আছে (Landberg, Arabica, ৫খ, ১৩৩)। (ইসলাম-পূর্ব কালে) যাদুচক্র অধিক ব্যবহৃত হইত (কোনও কোনও স্থানে এখনও ব্যবহৃত হয়)। এই চক্র কখনও সমকোণে কর্তনকারী রেখা দ্বারা বিভক্ত করা

হইত এবং তাহার উপর প্রায়ই কিছু না কিছু বস্তু রাখা হইত, যেমন গোবর, ছাই অথবা কাপড়ের নেকড়া। কসমের এক নির্দিষ্ট রূপ এই ছিল যে, চক্রের কেন্দ্রবিন্দুর উপর একটি তরবারী প্রোথিত করা হইত এবং উহার চতুর্দিকে পিপীলিকা রাখা হইত। এই কসমকে শামলা ও নামলা বিশিষ্ট কসম বলা হইত। কখনও হাতে এক খণ্ড কাঠ লইয়া বলা হইত ঃ বি-হায়াতি হাযা'ল-'উদ" (এই কাষ্ঠখণ্ডের জীবনের কসম)। উহাকে 'দীনু'ল-'উদ' বলা হইত। জনপ্রিয় অন্য প্রথারও উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন তাঁবুর খুঁটির উপর হাত রাখা, রুটি ও কফি হাতে নেওয়া, কিবলা'র দিকে মুখ করা ইত্যাদি (দ্র. Hardt, Burck, Landberg. Jaussen Musil এবং Doughty-এর গ্রন্থসমূহ)। কসম-এর পবিত্রতা বৃদ্ধির কোনও কোনও পন্থা ইসলামী যুগেও স্বীকার করা হয়। এবং উহাকে তাগ্‌লীজুলয়ামীন বা তা'জীমু'ল-য়ামীন (শপথকে শক্তিশালী বা মর্যাদাবান করা) বলা হয় যেমন কসম করিতে গিয়া কুরআন মাজীদ কিংবা সাহীহ বুখারী বক্ষে ধারণ করা (Goldziher, Die zahiriten, পৃ. ১১৫; Lane, Manners and Customs, তৃতীয় সং, ১খ, ১২৮, ৪৭০)। বড় বড় কসমকে আয়মান বালিগা বলা হয় (৬৮ ঃ ৩৯ ; ৫ ঃ ৫৩; ৬ ঃ ১০৯; ১৬ ঃ ৩৮)।

কসম-এর বাক্যসমূহ কসম-এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া থাকে। লা'ন (لعن) ও নাযার ব্যতীত যে সকল বিশেষ ধরনের কসম আছে উহাদের সাধারণ পদ্ধতি এই যে, যাহার কসম খাওয়া হয় তাহার নামের পূর্বে কাসামসূচক অক্ষর আনিতে হয়। এই ক্ষেত্রে সাধারণত ب ،ت অথবা و লওয়া হয় (بالله، تالله، والله)। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির ন্যায় শেষের দুইটি অধিক ব্যবহৃত হয় না। ب অক্ষরটির এমন সাধারণ হারফে জার, যাহা 'সঙ্গ'-এর অর্থ প্রকাশ করা ت সাধারণত কোনও বাক্যের শেষ অক্ষর, যেমন امانت ও حيلت শব্দে; و হইল তাকীদ জাতীয় অক্ষর. যেমন ل যাহা, বিশেষ করিয়া لعمرت لعمرى "আমার তোমার জীবনের কসম"-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি।

কসম-এ অন্যান্য ইশারাসূচক অক্ষরের ব্যবহারও পরিদৃষ্ট হয়, যেমন يا، ها، آ কখনও নাসাবী অবস্থা হইতেও কসম-এর অর্থ গ্রহণ করা হয়, ايمن-এর সংক্ষিপ্ত যেমন آم، ايم، آيم ইত্যাদিও কখনও কসম-এর অক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কসম-এর নির্দিষ্ট বাক্যসমূহের সহিত কয়েকটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত রহিয়াছে, যেমন কসম-এর পর 'না' জাতীয় চিহ্ন রহিত করা যাইতে পারে। আল-মুফাসসাল (কায়রো ১৩২৩ হি)-এ উহার উদাহরণ এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে تا لله يبقى على الايام مبتقل يعنى لا يبقى উহার বিপরীত কুরআন মাজীদের কোনও কোনও স্থানে কসম-এর পূর্বে না-সূচক لا -এর ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, যেমন فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ (৫৬ ঃ ৭৫); فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ (৬৯ ঃ ৩৮) فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ (৭০ ঃ ৪০)। উল্লিখিত আয়াতসমূহে لا অক্ষর 'না' বুঝাইবার জন্য নহে, বরং তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বাহ্যত বিশেষ তাকীদ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। কসম-এ অতিরিক্ত তা'কীদের প্রকাশ কর্মের পূর্বে ل-এর সংযুক্তির দ্বারাও করা হয় [ব্যাকরণের এই সকল দিকের উপর (দ্র.) আল-মুফাস্‌সাল, সম্পা. Brock, পৃ. ১৬৩ প.; ইব্‌ন য়া'ঈশ, সম্পা. Jahn, পৃ. ২৮৯ প.]।

(আরব) যেমনভাবে কোনও পবিত্র স্থানে অথবা কুরবানীর স্থলে কসম করা হইত, অনুরূপভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পবিত্র স্থান অথবা কুরবানীর (অথবা কুরবানীর প্রভুর) কসম খাওয়া হইত। কা'বা ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় এবং এমনিভাবে হাজ্জ-এর কসমের ব্যবহারও বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত তারকীবসমূহে পাওয়া যায়। প্রাচীন আরবেরা বিশেষভাবে নিজেদের উপাস্য এবং বাপ-দাদাদের কসম খাইত, গণকে অধিকাংশ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কসম করিত ঃ قال نعم و الشفق و الغسق والفلق اذا اتسق (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১১, লাইন ৫)। ইসলামে কেবল আল্লাহ্‌র নামে কসম করিবার অনুমতি আছে। মহানবী (স) বিশেষ করিয়া পিতার কসম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (রিওয়ায়াতের শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم আল-বুখারী, ৪খ, ২৬৩, লাইন ৬)। কখনও উক্ত বাক্যসমূহে এমন শব্দাবলী যুক্ত হয়, যাহাতে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী হিসাবে আহ্বান করা হয়। যেমন "আল্লাহ্ জানেন যে, আমি মিথ্যা বলিতেছি না।" "আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন যে, আমি সত্য বলিতেছি" ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র প্রতি ইশারা প্রায়ই কোনও গুণবাচক শব্দাবলীর মাধ্যমে করা হয়, যেন শপথ সেই আল্লাহ্‌র যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে হাক্ক সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন এবং য়াহূদীগণ তাহাদের শপথে মুহাম্মাদ (স)-এর স্থলে মূসা ('আ)-এর নাম লইত। কসম-এর গঠন বাক্য পদ্ধতি বিশেষ অবস্থা অনুযায়ীও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিছু লোকের নিজস্ব পসন্দনীয় কিছু কসম আছে যাহা স্বভাবত তাঁহারা ব্যবহার করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স) এই কসম করিতেন ঃ والذى نفسى بيده (সেই স্রষ্টার কসম যাঁহার হাতে আমার জীবন ইত্যাদি)। কসম-এর বাক্য তিন অথবা অধিক বার উচ্চারণে কসম দৃঢ়তর হয়।

যখন কোনও ব্যক্তি কোনও নাযার (মানত) পূর্ণ করিবার কসম করে তখন সে উক্ত ওয়াদা পুরা করিবার পর উক্ত কসম হইতে মুক্তি লাভ করে। কসম 'ইনশাআল্লাহ্' জাতীয় কথা দ্বারা বা কাফফারা দান দ্বারা ভঙ্গ হইতে পারে (ابرا و حلل يمينا) تحلة القسم মূলত تحليل قسم "খুবই কম পরিমাণে" অথবা "খুব কম সময়"-এর অর্থেও ব্যবত হইতে পারে। উহার শাব্দিক অর্থ হইল, "যাহা কসমকে মুক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।" لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الاتحلة القسم (আল-বুখারী, ১খ, ৩১৬, লাইন ১১) এবং لايموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار الاتحلة القسم (আল-বুখারী, ৪খ, ২৬৫, লাইন ১২)। এই সকল হাদীছের অর্থ এই যে, মুসলমানদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গিয়াছে, তাহাকে অগ্নি স্পর্শ করিবে না, তবে কসম পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে। অর্থাৎ যাহার তিনটি সন্তান মারা গিয়াছে, সে কেবল এই ওয়াদা অনুযায়ী দোযখ অতিক্রম করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে যেরূপ সকল পুণ্যবান ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

যখন কোনও ব্যক্তি কসম করিয়া অন্য কোনও ব্যক্তির সহিত ওয়াদা করে, সেক্ষেত্রে যাহার ওয়াদা করা হইয়াছে তাহার ইখ্‌তিয়ার আছে যে, সে ওয়াদাকারী ব্যক্তিকে কসম হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। ইসলাম ও জাহিলিয়্যাত উভয় যুগ হইতে এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, মানুষ (تحلة القسم-এর ক্ষেত্রে ওয়াদা ভঙ্গ করিতে গিয়া) নিজের পরিধেয় কোনও বস্ত্র খুলিয়া অথবা ছিঁড়িয়া ফেলিত (আল-ওয়াকিদী, অনু. Wellhausen. পৃ. ১৯৭ ; আততাবারী, ৩খ, পৃ. ৮৬২, লাইন ১৪ প. الا انى اشهدكم انى قد خلعت محمد بن هارون من الخلافة كما خلعت قلنسوتى هذه من

(رأسى وخلع قلنسوته عن رأسه)। আধুনিক কালে বেদুঈনদের নিকট কুরবানীর মাধ্যমে কসম হইতে মুক্তি লাভ করা হইয়া থাকে।

অপরকে কসম দিয়া তাহাকে কসম-এর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। উহার জন্য প্রধানত এইরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে نشدتك الله (আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিতেছি)। অথবা ذكرتك الله (আমি তোমায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাইতেছি)। কিন্তু এই কসম হইল কসমকারীর এবং অপর যে ব্যক্তিকে কসম দেওয়া হইয়াছে সে উহা পূর্ণ করিবে কি না তাহা নির্ভর করিবে তাহার এবং কসম প্রদানকারীর সম্পর্কের উপর। অধিকাংশ স্থলে এই জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বন্ধুত্ব অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় (যেমন লিসান, ২খ, পৃ. ৪২৮, লাইন ৭ প.; হামাসা, পৃ. ২৫৪; আল-কুরআন, ৪ ঃ ১)। আল্লাহ্‌র কসম দিয়া কোনও কিছু কামনা করিবারও অনুমতি আছে ঃ ان من عباد الله من اقسم على الله لابره (আল-বুখারী, ২খ, পৃ. ১৬৮, লাইন ১৯; পৃ. ২০৪, লাইন ২)। "আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি আল্লাহ্‌র উপর কোন কসম করিলে আল্লাহ্ তাহার কসম পূর্ণ করিয়া দেন।" এই প্রসঙ্গে তাওয়াস্‌সুল-(ওয়াসীলা গ্রহণ)-এর উল্লেখও দেখা যায় (অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট বান্দার ওয়াসীলা করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা)। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ওয়াসীলা করিয়া (=তাওয়াস্‌সুল বি'ন-নাবিয়্যি)। কসমের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে খুবই সর্তকতার তাকীদে দেওয়া হইয়াছে, যেমন সূরা ৫ ঃ ৮৯ ও সূরা ২ ঃ ২২৪। পরে বলা হইয়াছে যে, না বুঝিয়া করা কসম ভঙ্গ করা যায় এবং উহার কাফ্‌ফারা দেওয়া যাইতে পারে। উহা দ্বারা এমন কসম বুঝায় যাহার মাধ্যমে মানুষ নিজের উপর (কোনও হালাল ও বৈধ বস্তু সম্পর্কে) কোনও বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়া লয়, যেমন কখনও খাদ্য এবং কখনও স্ত্রীদের সম্পর্কে (এই প্রকারের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যবাধকতা আরোপের জন্য খুবই শক্তিশালী কারণ থাকা দরকার, কেবল হাসি খুশী কিংবা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এইরূপ কসম খাওয়া ঠিক নহে)। স্ত্রীদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যবাধকতাকে 'ঈলা' বলে; উহার সময়কাল চার মাস পর্যন্ত নির্ধারণ করা হইয়াছে (সূরা ২ ঃ ২২৪-২২৬)। (এবং এই সময়কাল অতিবাহিত হইবার পূর্বেই কাফ্‌ফারা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর আপনা হইতে তালাক বা'ইন সংঘটিত হইয়া যায়)। এই প্রকারের এক বিশেষ কসম জিহার, যাহাতে স্বামী নিজ স্ত্রীকে (নিজের কোনও মুহরিম স্ত্রীলোক (মা, ভগ্নী, কন্যা ইত্যাদি)-এর সহিত কিংবা তাহার কোনও অঙ্গের সহিত তুলনা করে, যেমন এইরূপ বলে—আজ হইতে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠের ন্যায় (انت على كظهر امى)। কুরআন মাজীদে এই ধরনের উক্তি বিশেষভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে (৩৩ ঃ ৪; ৫৮ ঃ ২ ও ৪ প.) (দ্র. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, লাইডেন-লাইপযিগ ১৯১০ খৃ., পৃ. ২২৪ প.; Sachau Mul Recht, ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১৩ ও ৬৮ প.)।

কুরআন মাজীদ ও হাদীছ অনুসারে কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্‌ফারা প্রদান করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে (৫ ঃ ৮৯)। তথাপি কোন কল্যাণের জন্য কসম ভঙ্গে কোনও দোষ নাই; তবে কাফ্‌ফারা প্রয়োজন হইবে। অন্যদিকে ইহারও তাকীদ রহিয়াছে যে, যদি কেহ কসম করে তবে যেন সে উহা পূরণ করে (১৬ ঃ ৯১, সূরা ৫ ঃ ৮৯ ইত্যাদি)। বুখারী (৩য়, ৯৯, লাইন ৩) ইব্‌রারু'ল-মাকসাম (কসম পূর্ণকরণ)- কে সাতটি অপরিহার্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, তবে কসম-এর মুকাবিলায় কোনও উচ্চতর বিষয়ের বিবেচনা আসিয়া পড়িলে কসমকে স্বীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই কারণে বলা হইয়াছে যে, কসমও ইসতিছনা ব্যতীত করা যাইবে না অর্থাৎ উহার সহিত ইন্‌শাআল্লাহ্ এই শব্দাবলী অবশ্যই উচ্চারণ করিতে হইবে (আল-বুখারী, ৪খ, ২৮০; আন-নাবাবী, শারহ্ মুসলিম, ৪খ, ১০৬, যায়দ ইব্‌ন 'আলী, সং Griffini, পৃ. ৪৬৩)।

এই বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের এই সব বর্ণনা ফিক্‌হ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কসমকারী ব্যক্তিকে অব্যশই 'মুকাল্লাফ' হইতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া স্বইচ্ছায় কথা বলে এবং সত্যিকারভাবে কসমের নিয়্যাত রাখে। কিন্তু কোনও পাপ কাজ করিবার জন্য কসম করা কখনও বৈধ নহে। এই প্রকারের কসম মূলত কসম হিসাবে বিবেচিত হয় কি না এই প্রশ্নে মতপার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি অধিকাংশের মত এই যে, যদি কেহ এইরূপ কসম করিয়া বসে তবে উহা কার্যকর হইবে। তবে কসমকারীকে উক্ত কসম ভঙ্গ করিতে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

কসম কেবল আল্লাহ্‌র, তাঁহার সত্তার অথবা তাঁহার নাম বা সিফাতের কোনও একটির করা যাইতে পারে (আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত ব্যতীত অন্য জিনিসের কসম করার ব্যাপারে হাদীছসমূহে নিষেধ আসিয়াছে (দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু'ল-আয়মান ওয়া'ন-নুযূর ও অন্যান্য হাদীছ ও ফিকহ-এর গ্রন্থসমূহ)। নিরপরাধ হওয়ার কসম—যাহার উল্লেখ পূর্বেই আসিয়াছে—ফিক্‌হ অনুমোদিত নয়। কোনও কোনও অবস্থায় যখন কেহ কোনও পাপ করিবার কসম করে, সে ক্ষেত্রে উহা ভঙ্গ করা (حنث) তাহার জন্য ফরয মনে করা হয়। 'ঈলা', যাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা এই যে, ঈলাকারীকে চার মাসের মধ্যেই উহা ভঙ্গ করিতে হইবে (অন্যথায় চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার স্ত্রী আপনা হইতেই তালাক হইয়া যাইবে)। জিহারের পর হয় স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দিবে, অন্যথায় কসম-এর কাফ্‌ফারা প্রদান করা অপরিহার্য হইবে।

সূরা ৫ ঃ ৮৯ অনুসারে কাফ্‌ফারার পদ্ধতি এই যে, একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে অথবা দশজন মিসকীন খাওয়াইতে হইবে কিংবা উহাদিগকে পোশাক পরিধান করাইতে হইবে এবং যে ব্যক্তি উহার সামর্থ্য না রাখে সে উহার পরিবর্তে তিন দিন রোযা রাখিবে। কাফ্‌ফারা আদায়ের ব্যাপারে আর যাহা করণীয় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে দেওয়া হইয়াছে। ঈলা-র কাফ্‌ফারা অন্যান্য কসম-এর মতোই। তবে জিহারের কাফ্‌ফারায় একজন মুসলিম দাস মুক্ত করিতে হয় অথবা দুই মাস রোযা রাখিতে কিংবা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াইতে হয় (সূরা ৫ ঃ ৮৯)। ইসলামী কানূন উক্ত কসমও অনুমোদন করে, যাহা কোনও বর্ণনার সত্যতা প্রমাণের জন্য করা হইয়া থাকে— এবং সেই কসমকেও— যাহা কোনও কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য করা হইয়া থাকে। প্রথমোল্লিখিত কসম কেবল মুকদ্দমার বিচারে প্রয়োগ হয়। কাসামা, যাহার উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে এবং যাহা প্রাচীন 'আরবদের নিকট হইতে গৃহীত, উহা এক বিশেষ পদ্ধতি। ইসলামে ইহা হত্যার মুকদ্দমার জন্য, নির্দিষ্ট, পঞ্চাশটি কসমের সমন্বয়, যাহা এক অথবা একের অধিক ব্যক্তি করিয়া থাকে। এই কসম অভিযোগকারীর উপর আরোপ করা হয়। অবশ্য কেবল (মৃত্যুর জন্য) সন্দেহমুক্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে যথারীতি প্রমাণ অপরিহার্য। যদি অভিযোগকারী কসম করিতে অস্বীকার করে তাহা

হইলে পঞ্চাশ কসমই অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর আরোপ করা হইবে এবং যদি সেও উহা অস্বীকার করে, তাহা হইলে উক্ত কসমসমূহ আবার অভিযোগকারীর উপর আরোপ করা হইবে (ইহা শাফি'ঈদের নীতি, আল-হিদায়া, ৩খ, পৃ. ৬১৮)। হানাফীদের মত এই যে, যে অঞ্চলে নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায় সেখানে তাহার হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া না গেলে উক্ত এলাকার পঞ্চাশ জন শীর্ষস্থানীয় লোককে কসম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি উক্ত এলাকায় লোকের সংখ্যা পঞ্চাশের কম হয়, তাহা হইলে উক্ত সংখ্যা করিবার জন্য কোনও কোনও লোকের নিকট হইতে পুনরায় কসম গ্রহণ করা যাইতে পারে (আল-হিদায়া, ২খ, ৬১৮)। হত্যা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ইসলামের নীতি এই যে, প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর উপর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কসম করিতে হয়। সাক্ষী সাধারণত কসম করে না। তবে বিদেশে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির ওয়াসীয়াতের সাক্ষী, এই ব্যাপারে মুক্ত (৫ ঃ ১০৫)। যদি অভিযোগকারী ব্যক্তির নিকট দুইজন অপরিহার্য সাক্ষীর মধ্য হইতে কেবল একজন থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের একজনের কসম অপর সাক্ষীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে (আল-বুখারী, ২খ, পৃ. ১৫৮ প.)। [এই বাক্যের অর্থ স্পষ্ট নহে। প্রবন্ধকার বুখারীর যে পাঠের উদ্ধৃতি দিয়া ইহা লিখিয়াছেন উহার মূল বক্তব্য এই যে, ধন-সম্পদ ও শাস্তির (হুদূদ) ক্ষেত্রে কসম অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর অরোপিত হয় এবং ফয়সালার জন্য অভিযোগকারীর নিকট দুইজন সাক্ষী হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় ফয়সালা অভিযুক্ত ব্যক্তির কসমের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদান করা হইবে]। যদি অভিযোগকারীর নিকট সঠিক প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কসম করিতে বলা হয়, যদি সে কসম করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে অভিযোগকারীকে কসম (য়ামীনু'র-রাদ্দ) করিতে বলা হয়। কোন পাপ কার্যে মিথ্যা কসম করা মুসলমান 'আলিমদের নিকট 'য়ামীনু'ল-গুমূস। ইহার প্রকৃত অর্থ এমন কসম; যাহা কঠোরভাবে পালন করা হয়। বর্ননায় সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কৃত কসম যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে শাফি'ঈদের নিকট উপরে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ দ্বারা উহার কাফ্ফারা প্রদান করা যাইতে পারে। অন্যদের নিকট উহার কাফ্ফারা প্রদান করা যায় না, শেষোক্তগণ এই 'আকীদা পোষণ করে যে, কাফ্ফারা কেবল সেই সকল কসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাহা কোনও শপথ করিতে গিয়া করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাদীছের গ্রন্থসমূহ, মিফতাহু কুনূযি'স-সুন্না গ্রন্থের সহায়তা; আল-আয়মান শব্দের নীচে; (২) মু'জামু ফিক্হিল-হাম্বালী, কাসামা ওয়া'ল-আয়মান শব্দদ্বয়ের অধীন ; (৩) معجم فقه ابن حزم الظاهرى কাসামা শব্দের অধীন; (৪) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, কিতাবু'ল-আয়মান ওয়া বাবু কাসামা-এর অধীন; (৫) J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, দ্বিতীয় সং. ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১২৮ প., ১৮৬ প. ; (৬) I. Goldziher, Abhandlungen-zur arabischen philologie. ১৮৯৬ খৃ., ১খ, ১-১২০; (৭) G. Jacob, Altarabisches Beduinenleben দ্বিতীয় সং. ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১৭৪, ২১৯; (৮) Th. W. Juynboll. Handbuch des Islamischen Gesetzes, ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৯২, ২২৫ প., ২৬৬-২৭০, ৩১৫ প.; (১৯) E. Sachau, Muhammadanisches Recht ১৮৯৭ খৃ., নির্ঘণ্ট Johs Pedersen, Der Eid bei densemiten.... sowie die stellung des Eides in Islam, ১৯১৪ খৃ.।

Johs. Pedersen ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)।

মুহম্মদ ইসলাম গণী

কাসামা ইব্ন যুহায়র আল-মাযিনী (قسامة بن زهير المازنى)ঃ ইব্ন শাহীনের মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন। আল-'আজালী, ইব্ন হিব্বান, আল-হায়ছাম ও খালীফা তাঁহাকে ছিকা (বিশ্বস্ত) তাবি'ঈ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন, তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী ও আবূ হুরায়রা (রা)-র সূত্রে এবং কাতাদা-'ইমরান ইব্ন হুদায়া, হিশাম ইব্ন হুসাসান প্রমুখ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ৮০ হিজরীর পরে ইনতিকাল করেন। তিনি 'উতবা ইব্ন গাযওয়ান-এর সঙ্গে উবাল্লা (ابلة) বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ইবন শাহীন-এর মতে তিনি সাহাবী ছিলেন এবং মু'মিনের হত্যাকারী সম্পর্কে তৎকর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছেন। তবে অধিকাংশের মতে হাদীছটি মুরসাল (مرسل)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল'-আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৬৯-৭০ ; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীর, ২খ, ১২৬; (৩) ইবনু'ল-আছীর উসদু'ল-গাযা, ৪খ, ২০৪।

মুহাম্মদ মূসা

কাসালা (كسلة) ঃ [প্রাঠান্তর, কাসালা (كسلا), প্রচলিত বানান কাস্সলা (كسلة)] সূদান প্রজাতন্ত্রের পূর্বে অবস্থিত একটি শহর ও প্রদেশ। ইহা মিসর সীমান্ত হইতে ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইরিত্রিয়া সীমান্ত হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রদেশটি ৫টি ভিন্ন প্রকারের ভৌগেলিক অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে (১) দক্ষিণাঞ্চলে রেল সড়ক, রাহাদ নদী ও ইথিওপীয় সীমান্তবেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতির অসমতল অঞ্চল, যাহা সূদানের পলি গঠিত ভূমির পশ্চিমমুখী বিস্তৃত অংশ। ইহার প্রাদেশিক শহরের নাম আল-কাল্লাবাত [গাল্লাবাত]। (২) ইহার উত্তরে মূল নীল নদ এবং আত্বারা নদীর মধ্যখানে বুনীল অঞ্চলে অবস্থিত বুআনা নামক সমভূমি। ইহা আরব উপজাতিগুলির বেদুঈন ও অর্ধ বেদুঈন গোত্রগুলির চারণভূমি, যাহাদের শুকরিয়্যা গোত্র সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল ও পূর্বোক্ত অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত আল-কাদারিফ (গেদারিফ) শহরটি শুক্রিয়্যা গোত্রের বাজার হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছে। উপজাতি প্রধান আবূ সিন্ন-এর নামানুসারে ইহাকে আবূ সিন্ন-এর বাজার বলা হইত। ১২শ/১৮শ শতাব্দী হইতে পূর্ব বুতানা (بطانة) ও আতবারা নদীর তীরে বিশারীন (দ্র.)-এর বেজা উপজাতির একাংশ বসতি স্থাপন করে। (৩) 'আত- বারা নদীর পূর্ব ও উত্তরে অবস্থিত সমতল ভূমি ও লোহিত সাগরের পাহাড়শোভিত অঞ্চল লইয়া গঠিত 'আতবায়। উত্তরে উম্মারার (আমারার) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশারীন হাদানাদুওয়া-র মধ্য দিয়া দক্ষিণে বানূ 'আমির পর্যন্ত বিস্তৃত যাযাবর অঞ্চল। সেখানে বেজা উপজাতীয়রা বসবাস করে। কাশ নদীর তুলা উৎপাদনকারী উর্বর ব-দ্বীপ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাশ নদীর মাথায় সুদৃশ্য বিচ্ছিন্ন কাসালা পাহাড়ের (২৭ ঃ ৯১ ফিট) পাদদেশে প্রাদেশিক রাজধানী কাসালা শহর অবস্থিত। হালান্কা উপজাতির বেজা গোত্র অধ্যুষিত এই অঞ্চলকে পূর্বে আল-তাকা নামকরণ করা হইয়াছিল, যাহা বর্তমানে অবলুপ্ত। (৪) ইথিওপীয় মালভূমির উত্তর দিকের বর্ধিতাংশ লোহিত সাগর পাহাড়ের অঞ্চল যাহা রেজা ও সিনকাত (বেজা ও কাক) উপজতি অধ্যুষিত ইহা একটি বাজার শহর

এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র। নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী এই পথ [বর্তমানে রেল সড়ক] সামরিক দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। (৫) উপকূলীয় সমতল ভূমি যাহা বেজা গোত্রের বেদুঈনদের বসতি। ইহা পর্যায়ক্রমে বাদী, 'আয়যাব (দ্র.), সাওয়াকিন [সুয়াকিন] এবং সূদান বন্দরের এলাকা ছিল। বারাকা নদীর ব-দ্বীপে তূকার (তোকার) শহর অবস্থিত। ইহা ঐতিহ্যগতভাবে এতদঞ্চলের শস্যভাণ্ডার। বর্তমানে এইখানে তুলা উৎপাদিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বর্তমানের কাসালা প্রদেশ ছিল উপজাতীয় অঞ্চল। লোহিত সাগরের বন্দরসমূহের মাধ্যমে ব্যবসায় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রতি ইহা ছিল উন্মুক্ত। ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে ইহা সিন্নার সালতানাতভুক্ত ফুনূজ-এর প্রভাব বলয়ের [কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে] অন্তর্ভুক্ত ছিল। সূফী সাধকগণ এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। মাগরিব হইতে আগত একজন অধিবাসীর পৌত্র হাসান ইব্ন হাস্‌নূসা [মৃ. ১০৭৫/১৬৬৪-৫] সিন্নার ও অন্যান্য সূদানী প্রদেশে অশ্ব রফতানী ও মেষ পালনের ভিত্তিতে মধ্য বুতানা-য় একটি পিতৃতান্ত্রিক শাসক পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেনাবাহিনী ও ক্রীতদাস পোষণ করিতেন [দ্র. য়ূসুফ ফাদ্‌ল হাসান. (সম্পা.) মুহাম্মাদ আন্‌-নূর ইব্‌ন দায়ফুল্লাহ্ (كتاب الطبقات فى خصوص الاولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان) খার্তুম ১৯৭১ খৃ., ১৩৩-৪৮; তু. S. Hillelson, Sudan Arabic texts, Cambridge 1935, 194-99]। শাযিলিয়্যা তারীকার প্রচারক মাজাযীব নামক ধার্মিক গোত্র ১২শ/১৮শ শতাব্দীতে 'আতবারা ও নীল নদের মোহনায় অবস্থিত তাহাদের আদ্‌-দামির কেন্দ্র হইতে পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতিদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। আদ্‌-দামির ও সাওয়াকিন-এর মধ্য দিয়া ভ্রমণরত পরিব্রাজকদের জন্য তাহারা যে নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন Burckhardt ১৮১৪ সালে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন [J. L. Burckhardt, Travels in Nubia, London 1819, 268]। ১৮২২ খৃ. তুর্কী মিসরীয় সেনানায়ক মুহাম্মাদ বে খুসরাও আদ-দাফতার কর্তৃক আদ-দামির-এর ধ্বংসযজ্ঞ এবং গোত্র প্রধানের সাওয়াকিন অভিমুখে পলায়ন, হাদানদুওয়াদের উপর মাজযূবীদের প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তোলে। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে ফুনূজ্ সালতানাত সংহতি হারাইলে শুক্‌রিয়্যাগণ বুতানায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (দ্র. H. A. Mac-Michael, A History of the Arabs in the Sudan, Cambridge 1922, i. 250-3)।

নদী সান্নিহিত অঞ্চলে তুর্ক-মিসরীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠা বেদুঈন উপজাতিগুলিকে পরাজিত করা সম্ভব করিয়াছিল। যদিও ১৮২৩ খৃ. ও পুনরায় ১৮৩১ খৃ. হাদানদুওয়া-র উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কার্যকর আনুগত্য লাভ করেন হুকুমদার [গর্ভনর জেনারেল] আহমাদ পাশা আবূ বিদান, যিনি ১৮৪০ খৃ. আত-তাকা আক্রমণ করিয়া সেখানে একটি সেনাছাউনী স্থাপন করেন, যাহা হইতে পরবর্তীকালে কাসালা শহরের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরসূরী আহমাদ মানিকলী পাশা অবশেষে ১৯৪৪ খৃ. এক দণ্ডবিধায়ক অভিযানের মাধ্যমে হাদানদুওয়ার প্রতিরোধ ভেদ করেন। ইতিমধ্যে বেজা উপজাতীয়দের মধ্যে খাত্‌মিয়্যা নামক সূফীতারীকার প্রচার শুরু হইয়াছিল। এই তারীকার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ 'উছমান আল-মিরগানী-র পুত্র আল-হাসান বেজাদের মধ্যে ইহার প্রচার শুরু করেন। কাসালা শহরের নিকট আল-খ্যাতিমিয়্যা নামক স্থানে তিনি তাঁহার সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। সেইখানেই তিনি ১৮৬৯ খৃ. ইনতিকাল করেন এবং তথায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। ১৮৬৪-৫ খৃ.কাসালায় সূদানী অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের মারাত্মক বিদ্রোহের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন [দ্র. J. S. Trimingham, Islam in the Sudan, London 1949, 231-5]।

লোহিত সাগরের উপকূল, বিশেষ করিয়া সাওয়াকিন ও মাসাওওয়া' বন্দরগুলি ১০ম/১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪৬ খৃ. এই দুইটি শহর মুহাম্মাদ 'আলী পাশাকে ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৯ খৃ. ইহা হিজায-এর বিলায়াত-এ পুনরার্পণ হয়। ১৮৬৫ খৃ. উক্ত শহর দুইটি খেদিব ইসমা'ঈল-কে যাবজ্জীবনের জন্য দান করা হয়। পরবর্তী বৎসর হইতে ইহাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পর্যবসিত করা হয়। এই দান ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণে তুলার মূল্য বৃদ্ধি যুগপৎ ঘটে। ফলে সাওয়াকিন-এর খেদীব' গভর্নর তূকার অঞ্চলে একটি পরীক্ষামূলক তুলাচাষ প্রকল্প স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে লোহিত সাগর উপকূলের [অর্থাৎ সাওয়াকিন, মাসাওওয়া', সোমালী উপকূল ও আত্‌-তাকা] সাধারণ গভর্নর নিযুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় প্রদেশে তুলা উৎপাদন উন্নয়নের নিমিত্ত একটি ব্যাপক প্রকল্প প্রণয়ন করেন, যাহা প্রথমে খেদিব-এর উৎসাহ সৃষ্টি করিলেও অবাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মাহ্‌দিয়্যা শাসনের প্রথম ভাগে এতদঞ্চলে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই। আরবী ভাষীদের উদ্যোগে সৃষ্ট আন্দোলনের প্রতি বেজাবাসিগণ প্রাথমিকভাবে উৎসাহী ছিল না। তখন শুকরিয়্যাগণ ও খেদিবী প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাহাদের গোত্র প্রধান [নাজির] 'আওয়াদ আল-কারীম আহমাদ আবূ সিন্ন প্রশাসনকে আনুগত্যের সমর্থন প্রদান করেন। সাওয়াকিন-এর বণিক পরিবারের সদস্য এবং অংশত বেজা বংশধর 'উছমান ইব্‌ন আবী বাক্‌র দিকনা আস-সাওয়াকিনী [উছ'মান দিগনা]-কে ১৮৮৩ সালের মে মাসে মাহদী স্বীয় দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। মাজাযীব ও খাত্‌-মিয়্যাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাকে পূর্বোক্ত দলের প্রধান অংশে মৈত্রীর সূত্রে যুক্ত করিয়াছিল। হাদানদুওয়া-দের মধ্যে অনুগত ব্যক্তিগণকে মাহদীদের স্বার্থে স্বপক্ষে আনয়ন করেন শায়খ আত্‌-তাহির আত্‌-তায়্যিব আল-মাজযূব। সিনকাত ও তূকার ১৮৮৪ খৃ.অবরোধ করা হয় এবং উহার পতন ঘটে। নৌ-শক্তির অভাবে 'উছমান দিকনা সাওয়াকিন দখলে ব্যর্থ হন। বৃটিশদের সেনা-ছাউনী ও সেনা পরিচালনার অধীনে উহা মাহ্‌দী শাসিত অঞ্চলের ছিটমহল হিসাবে থাকিয়া যায়। অভ্যন্তরস্থ মিসরীয় সেনাছাউনীগুলির ১৮৮৪ খৃ. আল-কাদানারিফ্ ও ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে দীর্ঘ অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে। আবিসিনিয়া সীমান্তবর্তী আল-কাল্লাবাত ও আজ্‌-জীরা সেনাছাউনী সাফল্যের সাথে মুক্ত করা হয়।

তূকার-এর সন্নিকটে 'আফাফীত ও আল্‌-কাল্লাবাত [পরবর্তীকালে আল-কাদারিফ]-এ প্রধান কার্যালয় বিশিষ্ট দুইটি সামরিক প্রদেশ মাহ্‌দী শাসিত রাজ্যের মূল ভূ-খণ্ডগুলিকে শত্রুতাপূর্ণ বহিঃসীমা সাওয়াকিন-এ বৃটিশ, ইরিত্রিয়ায় ইতালিয়ান এবং আবিসিনিয়ার খৃস্টান শক্তি হইতে রক্ষা করে। মাহ্‌দী বাহিনীর কার্যকারিতা প্রথমত, 'উছমান দিকনা ও তাঁহার বেজা অনুসারিগণের মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত, আরব সেনাধ্যক্ষের ও যোদ্ধাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে নিঃশেষ হইয়া যায়। হামদান আবূ 'আনজার

অধীনে গোনদার পর্যন্ত চালিত সফল মাহ্দী আক্রমণ (জানুয়ারী ১৮৮৮) এবং আল-কাল্লাবাতের (মার্চ ১৮৮৯) যুদ্ধের পর অবিসিনীয় শাসক ৪র্থ জন (John)-এর মৃত্যু সত্ত্বেও মাহ্দীদের আমলে এই সীমান্তে অচলাবস্থা বিরাজমান ছিল। অন্যান্য সেক্টরে মাহ্দীদের অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'উছমান দিক্‌নাকে উচ্ছেদ করিয়া বৃটিশ 'আফাফীত অধিকার করিয়া সাওয়াকিন-এর প্রতি হুমকির অবসান ঘটায়। বৃটিশদের সহিত পূর্ব-চুক্তি মতে ১৮৯৪ খৃ. ইতালী কাসালা দখল করে। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শহরটি মিসরীয়দের হাতে প্রত্যর্পণ করে। আল-কাদারিফ হইতে আহমাদ ফাদীল এই অঞ্চলের সর্বশেষ কার্যকর মাহদী সৈন্যগণকে প্রত্যাহার করেন। কারারী-র স্পষ্ট পরাজয়ের পর (সেপ্টেম্বর ১৮৯৮) তিনি খলীফা 'আবদুল্লাহ্-এর সহিত যোগদান করেন এবং ১৮৯৯ সালের ২৪ নভেম্বর খলীফার সঙ্গে দিওয়ায়কারাতে নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

যৌথ শাসনের (১৮৯৯-১৯৫৫) এবং সূদানের স্বাধীনতা গণপ্রজাতন্ত্রের অধীনে অঞ্চলটির ইতিহাস দেশের সার্বিক উন্নতি ও আধুনিকীকরণের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। ১৯৩০ খৃ. কাসালা প্রদেশ লোহিত সাগর প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পূর্বে ইহার আদি গঠনে উত্তরাঞ্চলীয় ও উপকূলীয় জিলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তখন শাসকগণের জন্য অদম্য বেজা উপজাতি একটি কঠিন সমস্যা হিসাবে বিরাজমান ছিল। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাহাদিগকে সূদানী জনগোষ্ঠীর সহিত মিশিয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছিল। এই প্রদেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়গুলির মধ্যে রহিয়াছে বন্দর সূদানের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬-৯) এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর কাশ ও বারাকা ব-দ্বীপসমূহে তুলাচাষ সম্প্রসারণ। পরবর্তী উন্নয়নের সহিত সহশক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে কাসালা ও বন্দর সূদানের মধ্যে রেল সড়ক সংযোগ (১৯২৪ খৃ.) এবং পরবর্তীতে সিন্নার পর্যন্ত এই সড়কের সম্প্রসারণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বেজা-র গ্রন্থপঞ্জী দ্র. এবং ইহার সহিত আরও দ্র. (২) K. M. Barbour, The republic of the Sudan, London 1961; (৩) Richard Hill, Egypt ih the Sudan, 1820-1881, London 1959 ; (৪) P. M. Holt, The Mahdist state in the Sudan, 1881-1998[2], Oxford 1970; (৫) D. C. Cumming, A history of Kassala and of the province of Taka, in Sudan Notes and Records, xx/1 (1937), 1-45; xxiii/1-2 (1940), 1-54, 225-69; (৬) দা. মা. ই. ১৭খ, ৭১-৩।

P. M. Holt (E. I.[2])/মুহা. সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

আল-কাসাস (القصص) ঃ আভিধানিক অর্থ বর্ণিত কথা (কিংবা বর্ণনা করা, বক্ষে পশম উদিত হইবার স্থান, দ্র. লিসানু'ল-'আরাব, শিরো)। ইহা কুরআন মাজীদের ২৮তম সূরার নাম। উক্ত সূরটি কুরআনের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সূরা নাম্‌লের পরে এবং সূরা 'আনকাবূতের পূর্বে সন্নিবেশিত আছে। কুরআনের সূরাসমূহের অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ২৭ তম সূরা নাম্‌ল-এর পরে এবং সূরা বানূ ইসরা'ঈলের পূর্বে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে (দ্র. আল-ইতকান, পৃ. ১১)। এই সূরায় ৮৮ আয়াত, ৪৪১ শব্দ এবং ৫,৮০০ অক্ষর আছে (তানবীরু'ল-মিক্‌য়াস, পৃ. ৩৯)। হযরত হাসান বাসরী, 'ইকরিমা ও 'আতা'র বর্ণনা মতে এই পূর্ণ সূরা মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, শুধু ৮৫নং আয়াত মাদানী, যাহা হিজরতের সময় আল-জুহ্‌ফা নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে। মুকাতিল হইতে বর্ণিত আছে যে, ৫২ হইতে ৫৬ পর্যন্ত এই চারিটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে (দ্র. আল-জামি'লি-আহ্‌কামি'ল-কুরআন, ১৩খ, পৃ. ২৪৭)। আল-আলূসীর (রূহু'ল-মা'আনী, ২০খ, পৃ. ৪২) বর্ণনা অনুযায়ী কুরআন কারীমের ৩টি সূরা যথা ঃ আশ-শু'আরা', আন-নাম্‌ল ও আল-কাসাস যে অনুক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই অনুসারেই কুরআন কারীমেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপরিউল্লিখিত ৩টি সূরার মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র এই যে, সূরা আশ্-শু'আরা'য় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ('আ)-র জন্ম, লালন-পালন এবং কিবতী হত্যার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা নাম্‌লে হযরত মূসা ('আ)-র মাদয়ান হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে সায়না' (সিনাই) পর্বতে আল্লাহ্‌র নূর দর্শন এবং নুবূওয়াত প্রদানের ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই সূরার মধ্যে উল্লিখিত দুইটি সংক্ষিপ্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দান করত হযরত মূসা ('আ)-র ঘটনাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন ফির'আওন কর্তৃক বানী ইসরা'ঈল গোত্রের সদ্যপ্রসূত পুত্র সন্তানদের হত্যা। অথচ তাহারই প্রাসাদে হযরত মূসা ('আ)-র প্রতিপালন এবং কিবতী হত্যার দায় হইতে তাঁহার পরিত্রাণ লাভ। অতঃপর হযরত শু'আয়ব ('আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধন, তূর পর্বতে তাঁহার নুবূওয়াত প্রাপ্তি এবং পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে।

সূরা আল-কাসাসের পূর্বে বর্ণিত সূরা নাম্‌ল-এর মধ্যে অবিশ্বাসীদের বারংবার প্রশ্নের প্রতিউত্তরে তাহাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন এবং ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। এই সূরায় উপরিল্লিখিত বিষয়টির ব্যাপক ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে। এইরূপভাবে পূর্বে বর্ণিত সূরার মধ্যে হযরত সালিহ ও হযরত লূত ('আ)-এর গোত্রদ্বয়ের ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহার সারমর্ম অত্র সূরায় উপদেশ গ্রহণকল্পে বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. রূহু'ল-মা'আনী, ২খ, পৃ. ৪১, তাফসীরু'ল-মারাগী, ২খ, পৃ. ৩০)।

এই সূরায় সর্বপ্রথম অভিশপ্ত ফির'আওনের ঔদ্ধত্য এবং বানী ইসরা'ঈলের উপর তাহার অমানুষিক অত্যাচার, নিপীড়ন, লোমহর্ষক করুণ ঘটনাবলী ফির'আওনের সেনাবাহিনীকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন এবং অবশেষে বানী ইসরা'ঈলদিগকে নিষ্কৃতি দানে আল্লাহ্ তা'আলার মহান অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতঃপর হযরত মূসা ('আ)-র জন্ম, তাঁহার লালন-পালন, কিবতীকে হত্যা করার পরে মাদয়ানের দিকে সফর, হযরত শু'আয়ব ('আ)-এর কন্যার সহিত বিবাহ, মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর সিনাই পর্বতে নুবূওয়াতে প্রদান, ফির'আওনকে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান, তাঁহার লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের অলৌকিক ঘটনাবলী, হারূন ('আ)-এর নুবূওয়াত এবং ফির'আওনের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের আলোচনা রহিয়াছে।

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নুবূওয়াতের প্রতিষ্ঠা, মক্কার কাফিরদিগের অস্বীকৃতি এবং আহলে কিতাবগণের কুরআনু'ল-কারীমের প্রতি আনুগত্যের আলোচনা করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, হিদায়াত মহান আল্লাহ্ তা'আলার হস্তে। অতঃপর কুরায়শদের অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নুবূওয়াত প্রাপ্তি মানুষের ইখ্‌তিয়ার-বহির্ভূত, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাঁহাকেই নবী কিংবা রাসূল হিসাবে

দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। এই ব্যাপারে মক্কার মুশরিকদের পসন্দ কিংবা অপসন্দের কোনও মূল্য নাই। অতঃপর মূসা ('আ)-র সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য কারূনের শিক্ষামূলক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মুসলিমগণের বিজয় সফলতার ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়া এই পার্থিব জগতের অসারতা এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলা যে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী উহা বর্ণনা করা হইয়াছে (রূহু'ল-মা'আনী, ২খ, ৪২; তাফ্সীরু'ল-মারাগী, ২খ, ১০৭)।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাসাস' তিলাওয়াত করিবে, সে মূসা ('আ)-এর উপর ঈমান আনয়ন ও বিরুদ্ধাচরণকারী সকল মানুষের সমসংখ্যক পুরস্কার লাভ করিবে এবং কিয়ামত দিবসে ফেরেশতাগণ তাহার সততার সাক্ষ্য প্রদান করিবে" (দ্র. বায়দাবী, ২খ, পৃ. ৯১)। কাদী আবূ বাক্র, ইবনু'ল-'আরবীর মতে এই সূরার ৮টি আয়াত (৮, ১০, ১৫, ২৩, ২৫, ২৭, ৫৫, ৭৭) দ্বারা ৪৩টি বিভিন্ন ফিক্হী মাস'আলা এবং শারী'আতের বিশেষ গরুত্বপূর্ণ আহকাম আহরণ করা সম্ভব (আহ্কামু'ল-কুরআন, পৃ. ১৪৫২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস্-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, লুবাবু'ন্-নুকূল ফী আস্‌বাবি'ন্-নুযূল, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (৩) আবূ বাক্র ইব্‌নু'ল-'আরাবী, আহকামু'ল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (৪) আল-বায়দাবী, তাফসীর, লাইপযিগে মুদ্রিত; (৫) শায়খ মুহ্‌য়ি'দ্-দীন ইবনু'ল-'আরাবী, তাফসীর ইবনিল-'আরাবী, কায়রোতে মুদ্রিত; (৬) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্‌কামি'ল্-কুরআন, কায়রো ১৯৪৪ খৃ.; (৭) আয-যামাখ্‌শারী, আল-কাশ্‌শাফ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৮) সিদ্দীক্ হাসান খান, ফাতহুল-বায়ান, কায়রোতে মুদ্রিত; (৯) আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, কায়রোতে মুদ্রিত; (১০) আল-মারাগী, তাফ্সীরু'ল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (১১) আবু'ল-আ'লা মাওদূদী, তাফহীমু'ল-কুরআন, লাহোর ১৯৮২ খৃ., ৩খ, ৬১০-১২।

জাহূর আহ্‌মাদ আজহার (দা. মা. ই.)/ রহমাতুল্লাহ

কাসিদ (দ্র. সাফীর)

কাসিম (قاسم) ঃ কতিপয় 'উছমানী শাহযাদার নাম। ১। কাসিম, 'উছমানী রাজবংশের দ্বিতীয় শাসক ওরখান-এর পুত্র। তাঁহার সম্পর্কে যাহা জানা যায় তাহা হইতেছে তিনি ৭৪৮/১৩৪৭ সালে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

২। প্রথম বায়াযীদের সাত পুত্রের একজন ছিলেন কাসিম চেলেবী অথবা কাসিম য়ূসুফ, জ. ৭৯২/১৩৯০। অল্প বয়সের কারণে তিনি আঙ্কারা যুদ্ধে (১৪০২) অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই; তখন তাঁহাকে বুরসায় অবস্থান করিতে হয়। যুদ্ধে তাঁহার পিতা পরাজিত ও বন্দী হন। অতঃপর তাঁহার বয়স্ক পুত্র সুলায়মান, 'ঈসা, মুহাম্মাদ ও মূসার মধ্যে ক্ষমতার অধিকার লইয়া সংঘর্ষ বাঁধে। সুলায়মান বলকানস্থ উছমানী অঞ্চল অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন এবং বুরসা অতিক্রমকালে কাসিম ও তাঁহার ভগিনী ফাতিমাকে সঙ্গে লইয়া যান। কিছুদিনের মধ্যেই কাসিম বায়যান্টাইন সম্রাট ২য় ম্যানুয়েলের নিকট জামিনস্বরূপ প্রেরিত হইলেন এবং ৮২০/১৪১৭ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কনস্টান্টিনোপলে ছিলেন। প্রামাণিক বর্ণনানুযায়ী তিনি স্টুডিয়নের সেন্ট জনের আশ্রমের গির্জায় সমাহিত হন [যাহা 'উছমানী বিজয়ের পরে ইমরাহোর-এর জামি' (Imrahor jami') পরিণত হইয়াছিল]।

৩। কাসিম সুলতান ১ম মুহাম্মাদ-এর পুত্র, মাত্র এক অথবা দুই বৎসর বয়সে ৮০৯/১৪০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৪। কাসিম শাহ্যাদা আহমাদের পুত্র এবং ২য় বায়াযীদের দৌহিত্র ছিলেন। আনুমানিক ৯০৬/১৫০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ৯২৪/১৫১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার সংহাসন লাভের পরপরই ১৫১২ সালের মার্চ মাসে ১ম সেলিম তাঁহার ভ্রাতাদের হত্যা করেন। কিন্তু তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আহমাদের পুত্র মুরাদ ও কাসিম তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা দ্রুত বিদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। মুরাদ, পারস্য শাসক শাহ ইসমা'ঈল ১ম-এর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। প্রথম সেলিমের পারস্য অভিযানের কারণগুলির মধ্যে ইহা ছিল অন্যতম এবং তিনি চালদিরান যুদ্ধের পর পলায়ন করিয়া তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পান এবং ১৫১৭ খৃ. বিষ প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেন কিংবা নিহত হন। কতিপয় বর্ণনা মতে তিনি 'উছমানী সিংহাসনের দাবীদার হিসাবে ১৫১৯ খৃ. আমাসয়াতে আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপরদিকে কাসিম (Von Hammer-এর মতে তাঁহার নাম 'আলাউ'দ-দীন কায়রো পৌছানোর পর পরই প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করেন) মিসরের মামলূক সুলতানের নিকট পলাইয়া যান। মিসর বিজয়ের পর সেলীম কাসিমকে গ্রেফতার করিতে চেষ্টা করেন এবং সাময়িকভাবে তিনি উছমানী সুলতান-এর দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৫১৮ খৃ. তিনি বন্দী হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

৫। কাসিম, ১ম আহমাদের নয় পুত্রের অন্যতম। তিনি ১০২২/১৬১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও সুলতান মুরাদ ৪র্থ, সুলতান ইবরাহীম ১ম, এবং খ্যাতনামা কাসিম মাহপায়কার একই মায়ের গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে অন্তরিন অবস্থায় কাটান। ৪র্থ মুরাদ, তিনি ভাইদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হইবেন অথবা বিদ্রোহের মাধ্যমে তাঁহারা ক্ষমতা লাভ করিবেন— এই আশংকায় ইবরাহীম ব্যতীত অপরাপর সকল ভাইকে হত্যা করেন। কাসিমকে ২ শাওওয়াল, ১০৪৭/১৭ ফেব্রুয়ারী ১৬৩৮ সালে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Von Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, অনু. Dochez, প্যারিস ১৮৪৪ খৃ., bk, ৮, ১৪৯, bk, ২২, ৪১০, ৪১৪, bk, xlviii, ৪৭৯; (২) ইসমা'ঈল হামি দানিশমান্দ, Izahli Osmanli tarihi kronolojisi, i, ইস্তাম্বুল ১৯৪৭ খৃ., ১৩১, ১৩৩, ১৩৫-৬, ১৪৮, ১৫৩, ২খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪৮ খৃ., ৫, ৮, ৫০-১; ৩খ, ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ., ২৬৯, ৩১২, ৩২৫, ৩৫৩, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৮৭; (৩) A. D. Alderson, The structure of the Ottoman dynasty, অক্সফোর্ড ১৯৫৬ খৃ., সূচী।

R. Mantran (E.I.[2])/ এস. এম. হুমায়ূন কবীর

আল-কাসিম ইব্ন মা'আন (القاسم بن معن) ঃ ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মাস'উদ আল-মাস'উদী আল-হুযালী আল-কূফী, প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ-এর প্রপৌত্র, হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ, আরবী ভাষা ও কাব্য সাহিত্যের ইমাম এবং কূফার কাদী হিসাবে সর্বজন প্রশংসিত। কুন্য়া আবূ 'আবদিল্লাহ। ইতিহাস ও আরব কুলজীশাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি সমকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। ফিক্হশাস্ত্রে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদ এবং তাঁহার মাযহাবের অনুসারী

ছিলেন। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার শায়খদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ঃ আল আ'মাশ, 'আসিম আল-আহ্ওয়াল, 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'উমায়র, মানসূর ইব্ন আল-মু'তামির, তালহা ইব্ন য়াহ্য়া, দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া এবং য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ প্রমুখ। তাঁহার বর্ণিত বহু হাদীছ সুনান গ্রন্থসমূহে সংকলিত হইয়াছে। হাদীছবেত্তাগণ তাঁহাকে একজন বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার নিকট হইতে যে সকল মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রহিয়াছেন ঃ ইব্ন মাহ্দী, 'আলী ইব্ন নাস্র, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু'ল-ওয়ালীদ, আবূ গাস্সান, আল-ফাদ্ল ইব্ন দাকীন। কুফার কাদী হিসাবে তিনি কোনও বেতন বা ভাতা গ্রহণ করিতেন না। তিনি সূফী সাধকসুলভ নিরাসক্ত, আড়ম্বরশূন্য জীবন যাপন করিতেন এবং ইসলামী আদব-কায়দার অনুসরণে তিনি অত্যধিক নিষ্ঠাবান ছিলেন।

আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আন-নাওয়াদির ও গারীবু'ল-মুসান্নিফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে তাঁহার খ্যাতনামা শাগরিদ হইলেন ঃ আল-লায়ছ ইব্ন মুজাফ্ফার।

'আল্লামা য়াকূত বলেন ঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্য, হাদীছ, ফিক্হ' কাব্য ও ইতিহাসে তাঁহার সমকক্ষ কোন 'আলিম কূফায় ছিলেন না। বর্ণনার নির্ভুলতার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান থাকিতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁহাকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'তোমরাই ত আমার অন্তরের আনন্দ দানকারী এবং আমার চিন্তা-ভাবনা অপসারণকারী।" শায়খ আল-কাসিমের মৃত্যুসন সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় ঃ ১৫৫/৭৭১, ১৭৫/৭৯১ এবং ১৮৮/৮০৩।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহ্যীব, নির্ঘন্ট; (২) সুয়ূতী, বুগয়া; (৩) আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, মিসর, ১ম সং., ১৩২৪ হি., পৃ. ১৫৪।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

কাসিম আগা (قاسم اغا) ঃ তিনি কূজা (قوجه) (বৃদ্ধ) নামে পরিচিত। 'উছমানী আমলের একজন প্রধান সরকারী স্থপতি। তাঁহার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ কাসিম, জন্ম আনু. ৯৭৮/১৫৭০। তাঁহাকে ১০৩২/৫ নভেম্বর, ১৬২৬ সালে খ্যাতনামা স্থপতি মুহাম্মাদ আগা, যিনি ইস্তাম্বুল-এর আহমাদ মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন (তাঁহার সম্পর্কে দ্র. জা'ফার আগা', রিসালা-ই মি'মারিয়্যা, পাণ্ডু.)-এর স্থলে রাজ-স্থপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে ১০৫৩/২২ মার্চ, ১৬৪২ সালে তাঁহার দায়িত্ব হইতে অবসর দেওয়া হয় (দ্র. J. Von Hammer, GOR, ৫খ, ৩৩৫) এবং এই পদে মুসতাফা আগাকে নিযুক্ত করা হয়, যিনি মিরাম্মাত জী (আভিধানিক অর্থ মেরামতকারী) উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কয়েক মাস পরই একটি স্বল্প ব্যয়ের পরিকল্পনা পেশ করায় পুনরায় কাসিম আগাকে পুরাতন পদে বহাল করা হয় (দ্র. না'ঈমা, তা'রীখ, ২খ, ৪৬, J. Von Hammer, পূর্ব গ্রন্থ, ৫খ, ৩৩৮ প.)। অক্টো. ১৬৫১ খৃ. ওয়ালিদা সুলতানা মাহপায়কার (কূসিম ওয়ালিদা, দ্র.) তাঁহার সততায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের পরিচালক — অর্থাৎ কাতখুদা নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে যখন তিনি কোপরু'ল মুহাম্মাদ পাশাকে, যিনি পরবর্তীকালে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন— বীরত্বপূর্ণভাবে সহায়তা করেন তখন তিনি স্বীয় পদ এবং যাবতীয় সম্মান হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহাকে বারীদী কুল্লা-য় বন্দী করা হয় এবং পরে সাইপ্রাসে (কুবরাস) নির্বাসন দেওয়া হয় (না'ঈমা, পূ. গ্র., ২খ, ৩৩৩ প.)। পরবর্তীকালে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর অবশেষে ১৬৫৫ খৃ. গ্রীষ্মকালে মুহাম্মাদ পাশার প্রধান সচিব পদপ্রাপ্তির ব্যাপারে তিনি সফলকাম হন (না'ঈমা, পূ. গ্র., ২খ, ৫৫১)। কাসিম আগা ১০৭০/১৮ সেপ্টে., ১৬৫৯ সালে দীর্ঘ জীবন লাভের পর ইনতিকাল করেন। বাহ্যত তাঁহার নির্মিত কোনও প্রাসাদ বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং মনে হয় তিনি সরকারী ভবন নির্মাণে কোনরূপ অংশগ্রহণ করেন নাই। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ১৬৫১ খৃ. তাঁহাকে য়াকী ওয়ালিদা জামি' (ولدة جامع)-এর নির্মাণ কার্যে নিয়োগ করা হয়। আর তাহাও প্রধান স্থপতি হিসাবে নহে। 'উছমানী ইতিহাসে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক না'ঈমা তাঁহার বিশদ জীবনী লিখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) না'ঈমা, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১১৪৭ হি., ২খ, বহু স্থা.; (২) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ৪খ, ৫৯; (৩) J. Von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, ৫খ, ৩৩৫, ৩৩৮ প., ৫৫৬, ৫৭৬, ৬৩৬, ৬৫৫; (৪) F. Babinger, Quellen zur Osmanischen Kunstlergeschichte, in Jahrbuch der Asiatischen, Kunst-লাইপযিগ ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৩৭; (৫) E. I.^{2}, Vol. iv, p. 719-20।

F. Babinger (দা. মা. ই.)/ আবদুল জলীল

আল-কাসিম আল-আনসারী (القاسم الانصارى) ঃ (রা) মদীনার আনসার দলভুক্ত জনৈক সাহাবী। বুখারী ও মুসলিম শরীফ-এর উভয় গ্রন্থে সালিম ইব্ন আবি'ল-জা'দ-এর সূত্রে জাবির হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আন্সার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তিনি ছেলের নাম আল-কাসিম রাখিলেন। আনসারগণ ঐ ব্যক্তিকে বলিল, "আমরা তোমাকে 'আবু'ল-কাসিম বলিয়া ডাকিব না।" আন্সারগণ নবী কারীম (স)-এর নিকট এই কথা বলিল। ইহা শ্রবণ করিয়া নবী কারীম (স) বলিলেন, "হে আনসারীগণ, তোমরা আমার নামে তোমাদের ছেলেমেয়েদের নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনয়া (উপনাম) রাখিও না। নিশ্চয় আমি কাসিম। আমি তোমাদের মধ্যে সব কিছু বন্টন করিয়া দিই।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৫, সংখ্যা ৭২৭০; (২) ইব্নু'ল-'আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, পৃ. ১৮৮।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

কাসিম 'আবদু'ল-কারীম (قاسم عبد الكريم) ঃ (১৯১৪-৬৩) একজন ইরাকী অফিসার ও ডিক্টেটর। তিনি বাগদাদে এক দরিদ্র পিতা-মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সুন্নী আরব ছিলেন এবং মাতা সম্ভবত ফায়লী (শী'ঈ-কুর্দী) বংশের, তবে কাসিম খাঁটি আরব বলিয়া দাবী করিতেন। শিক্ষক হিসাবে কাজ করিবার পর কাসিম সামরিক কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ খৃ. কমিশন লাভ করেন। ১৯৫৫ খৃ.-র মধ্যে তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন। ১৯৫০ দশকের গোড়ার দিকে সম্ভবত মিসরীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণে ইরাকের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত রাজতন্ত্রের

বিরুদ্ধে গোপন প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি গোপন সংঘ (cell) স্থাপন করেন যাহা তৎকালে সেনা-বাহিনীতে ক্রমান্বয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতেছিল। তাঁহার বিচক্ষণতা, প্রবঞ্চনা (প্রকৃত অবস্থা গোপন করার সহজাত গুণ) এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁহার স্বাধীনভাবে সেনাবাহিনী (বাগদাদের নিকট একটি বিগ্রেড গ্রুপ) পরিচালনার সুযোগে তিনি ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ফ্রি অফিসার্স সেন্ট্রাল কমিটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন, যদিও কর্মজীবনের তুলনীয় পর্যায়ে 'আবদু'ন-নাসির-এর মর্যাদায় উপনীত হইতে তিনি কখনও সক্ষম হন নাই। জর্দানের সমর্থনে সেনাবাহিনী পরিচালনার একটি অংশে কাসিমকে তাঁহার ঈপ্সিত সুযোগ প্রদান করে। ১৯৫৮ সালের ১৩-১৪ জুলাই-এর রাত্রে কাসিমের আশ্রিত (protege) 'আবদু'স-সালাম 'আরিফ একটি ব্রিগেডের কর্তৃত্ব লাভ করিয়া প্রায় বিনা প্রতিরোধে রাজধানী দখল করেন। বাদশাহ ২য় ফায়সাল, শাহ্যাদা 'আবদু'ল-ইলাহা একদিন পর নূরী আস-সা'ঈদ নিহত হন এবং ইরাক প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই এক প্রজাতান্ত্রিক হুকুমনামা (Republican Decree) বলে কাসিমকে প্রধান সেনাপতি, প্রধান মন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং 'আরিফকে সহযোগী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণা প্রকাশিত হয়। কাসিমের মন্ত্রীসভা প্রধানত বেসামরিক ছিল এবং প্রায় সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বশীল ছিল যাহাতে বিপ্লবের প্রাথমিক জনপ্রিয়তার প্রমাণ মিলিত। তারপর হইতে তাঁহার নিহত হওয়ার সময় পর্যন্ত কাসিম প্রকৃতপক্ষে একনায়ক ছিলেন, যদিও বিপ্লবের পক্ষকালের মধ্যেই একটি অস্থায়ী সংবিধানের ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছিল।

আরব ঐক্যের প্রেক্ষিতে ইরাকের স্বাধীনতার জন্য সযত্ন উৎকণ্ঠা ছিল কাসিমের একটি অনমনীয় রাজনৈতিক নীতি। ১৯৫৮ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এই নীতির অর্থ যেমন ছিল, তাঁহার সহযোগীর নেতৃত্বাধীন ইরাকী জনমতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে হতাশ করা, তেমনি ছিল 'আবদু'ন-নাসিরকে সাতিশয় ক্ষুব্ধ করা, যিনি ছিলেন কর্মজীবনের সর্বোচ্চ সোপানে উপনীত। আগস্ট মাসের মধ্যে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ পরিষ্কার হইল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে 'আরিফ-কে তাঁহার সকল পদ হইতে অপসারিত করা হইল (তিন মাস পর তাঁহাকে স্থগিত মৃত্যু দণ্ডাদেশের অধীনে রাখা হয়)। ধাপে ধাপে আরব জাতীয়তাবাদী ক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধির পরিণামে ১৯৫৯ সারের মার্চ মাসে একটি বিদ্রোহ ঘটে এবং মাওসিল গ্যারিসনের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব আশ-শাওওয়াফ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেন। প্রধানত কম্যুনিস্টদের সহিত একটি কার্যোপযোগী মৈত্রী (working alliance) স্থাপন করিয়া কাসিম এই ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। অতীতের সিরিয়া নজীর দৃষ্টে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত ইরাকের আত্মীকরণে কম্যুনিস্টগণ সব কিছুই হারাইত। বিদ্রোহ দমন এবং জাতীয়তাবাদের সংকট সাময়িকভাবে অবদমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্টদের উচ্চাকাংক্ষা কাসিমের শাসন ক্ষমতার জন্য ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে যে যুদ্ধংদেহি অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাতে কাসিম তাঁহার দৃঢ়তা ও সমরকৌশলগুণে কম্যুনিস্টদিগের তুলনায় সীমাহীন যোগ্যতা প্রমাণ করেন। অধিকন্তু এই দ্বন্দ্বে তিনি সেনাবাহিনীর অটুট সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পর কম্যুনিস্টদের অবস্থানের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে। উত্থানকালে কম্যুনিস্টগণ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করিয়াছিল তাহা হইতে তাহাদিগকে প্রান্তসীমায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা অবশেষে কেবল একটি সহনযোগ্য প্রান্তিক দলে পরিণত হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলির বৈধতা স্বীকৃত হইবে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রথমে কাসিম কম্যুনিস্টদের বিরক্তিকর অনুরোধ-উপরোধ ঠেকাইয়া রাখেন। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে যথারীতি আইনও জারী করা হয়। কিন্তু এই আইনের স্বল্পস্থায়ী প্রভাব অচিরেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে এবং কাসিমের পক্ষে সহনযোগ্য কেবল একটি ছদ্ম কম্যুনিস্টদের মায়ামূর্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন দলই বৈধভাবে কর্মরত ছিল না। ১৯৬০ খৃস্টাব্দের বসন্তকাল হইতে প্রকৃত রাজনৈতিক জীবনধারা হতাশাব্যঞ্জক জড়ত্বে অথবা চক্রান্তে পর্যবসিত হয়, তবে কুর্দীদের ক্ষেত্রে ১৯৬১ সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। পররাষ্ট্র ব্যাপারে তেল কোম্পানীগুলির সহিত বিরোধ সৃষ্টি এবং জুন মাসে কুয়েতের স্বাধীনতা লাভের পর তাহা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা কাসিম পশ্চিমা জগতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কম্যুনিস্টদের সহিত আচরণের কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত কাসিমের সম্পর্ক শীতল হইয়া উঠে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সমরাস্ত্র দ্বারা স্বীয় সেনাবাহিনীকে পুনঃসজ্জিত করিবার পূর্বে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। জাতীয়তাবাদের শত্রু হিসাবে কাসিম তাঁহার সুনামকে আরবদের সম্মুখে কখনও ক্ষুণ্ন হইতে দেন নাই। সেনাবিদ্রোহ (coup) সংঘটিত হইবার বহু পূর্বেই কাসিমকে মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক দেউলিয়া বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই বিদ্রোহের সংগঠক ছিল কম্যুনিস্টবিরোধী জাতীয়তাবাদী কর্মকর্তা এবং বাথপন্থী (Bathist) অফিসারদের (যাঁহাদের অনেকে 'আবদু'ন-নাসিরের প্রতি অনুগত ছিলেন না) একটি জোট যাহা ১৯৬৩ সালের ৮-৯ ফেব্রুয়ারীতে কাসিম ও তাঁহার সরকারের রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটায়।

কাসিমের সকল ব্যর্থতা সত্ত্বেও একজন তুচ্ছ ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার নাম একেবারে খারিজ করা যাইবে না। বল প্রয়োগে তুলনামূলকভাবে তিনি সাবধানী ছিলেন। তাঁহার শাসনের অন্তত প্রথম দিকে তিনি অকৃত্রিমভাবে সামাজিক অগ্রগতিতে উৎসাহিত ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে কৃষি-সংস্কার-আইন জারী ইরাকের সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত থাকিবে। সাম্প্রতিক কালে আরব বিশ্বের শাসকদের মধ্যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। কখনও কখনও তিনি ইসলামের পরমোৎকর্ষতার বুলি আওড়াইতেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার কর্ম পরিকল্পনায় ধর্মের কোনও স্থান ছিল না। ধর্মের প্রবক্তাগণের প্রতি আচরণে এবং ধর্মীয় বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাভাবিক বিচক্ষণতা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত। তাঁহার এই প্রবণতা সর্বজনবিদিত ছিল। ইহা একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার যে, কাসিমের তথাকথিত 'নাস্তিকতা' খুব সম্ভব বিস্তৃততর পরিমণ্ডলে গভীরতর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল কেবল অধিকতর 'আধুনিক'-দের গণ্ডীতে নহে। ১৯৫৯ খৃ. জারীকৃত তাঁহার ব্যক্তি মর্যাদা সংক্রান্ত আইন যাহা সুন্নী ও শী'আদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য ছিল, তাঁহার উৎখাতের পর বাতিল করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-কারীম আল-জিদ্দা, ছাওরাতু'য-যা'ঈমি'ল-মুনকিয, বাগদাদ ১৯৬০ খৃ. (প্রশংসাসূচক); (২) U. Dann, Iraq under Qassem, জেরুসালেম ১৯৬৯ খৃ.; (৩) এম. খাদ্দুরি, Republican Iraq, লন্ডন ১৯৬৯ খৃ.।

U. Dann (E.I.[2])/ আবু মুহম্মদ

কাসিম আনওয়ার (قاسم انوار) ঃ ইরানের একজন সূফী, কবি ও অন্যতম সাফাবী দা'ঈ, মু'ঈনু'দ-দীন 'আলী হুসায়নী সারাবী তাবরীযী-এর উপাধি।

মু'ঈনু'দ-দীন 'আলী ৭৫৭/১৩৫৬ সালে আযারবায়জান-এর অন্তর্গত তাবরীয-এর সারাব (سراب) জিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সেই সাফাবী তারীকাপন্থী শায়খ সাদরু'দ-দীন মূসা [দ্র.]-র মুরীদ হন। তাঁহার এই মুরীদের একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিণামে তিনি তাঁহার মুরীদকে "কাসিম-আনওয়ার" ("আলোক বিতরণকারী") উপাধিতে ভূষিত করেন। মু'ঈনু'দ-দীন 'আলী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এক পর্যায়ে আরদাবীল-এর মাসজিদ-ই জামি'-তে একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত মোমবাতি হস্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং উহা হইতে জামা'আতের অন্য সদস্যবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করিতেন। মোমবাতিগুলির আলোকে সম্পূর্ণ মসজিদটি আলোকিত হইয়া উঠিত (এই অভিজ্ঞতার একটি ভিন্নতর ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য মাজালিসু'ল-'উশ্শাক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; দ্র. নাফীসী, ২৩ প.)। সাদরু'দ-দীন মূসা অতি প্রাথমিক পর্যায়েই কাসিম আনওয়ার-এর রূহানী শক্তির অসাধারণ তীব্রতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উপরে উল্লিখিত সূফী অভিজ্ঞতা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁহার মুরীদ নিজে যে আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলেন তাহার জন্য অন্যান্য দীক্ষিত মুরীদের মধ্যে উহার বিতরণ ছিল পূর্ব নির্ধারিত।

আরদাবীলে তাঁহার প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত হইলে কাসিম আনওয়ার শায়খ সাদরু'দ-দীন মূসার হস্ত হইতে একটি খিরকা লাভ করেন। ইহা দ্বারা তিনি কোন ব্যক্তিকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা অথবা আত্মিক পথ-নির্দেশনা (ইরশাদ) প্রদানের অধিকার লাভ করেন। জামী (দ্র.) ও জামীভিত্তিক কতিপয় সূত্র অনুযায়ী ইহার পরবর্তী পর্যায়ে কাসিম আনওয়ার জনৈক সাদরু'দ-দীন 'আলী য়ামানী-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (এই প্রচলিত বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার হেতু সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য— গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত Savory-কৃত প্রবন্ধ)। গীলান অঞ্চলে কিছুকাল সেবামূলক কার্য পরিচালনার পর কাসিম আনওয়ার খুরাসান গমন করেন। 'আলিমগণের বিরোধিতার কারণে তিনি নীশাপূর হইতে হারাত-এ গমন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে হারাত তাঁহার পরবর্তী অর্ধশতাব্দী কালের ক্রিয়াকাণ্ডের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। তাঁহার নিজ বক্তব্য অনুযায়ী কাসিম আনওয়ার ৭৭৯/১৩৭৭-৮ সালের মধ্যে হারাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন এবং ৮৩০/১৪২৬-৭ সালে উক্ত শহর হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

ঐ বৎসর আহমাদ নামক জনৈক হারূফী (দ্র. হুরূফিয়্যা) কাসিম আনওয়ারকে তীমূরী শাসনকর্তা শাহরুখ (দ্র.)-এর হত্যা প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করে। কাসিম আনওয়ার নিজে প্রচলিত মত-বিরোধী হারূফী সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন না। ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, হত্যা প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার কথিত সংস্রব, তীমূরী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের স্বার্থে তাঁহাকে উৎখাত করিবার একটি সুবিধাজনক উপলক্ষ মাত্র ছিল। কারণ তাঁহার কার্যক্রম তাহাদের জন্য একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। বিভিন্ন সূত্রে হারাত হইতে কাসিম আনওয়ারকে বহিষ্কার করার পশ্চাতে পর্যায়ক্রমে যে সকল অভিযোগ আরোপ করা হয় তাহার মধ্যে ছিল এইগুলি ঃ (ক) মীরযা বায়সুনকুর ইব্ন শাহরুখ (দ্র. বায়সুনগার, গিয়াছু'দ-দীন), তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করিতেন; (খ) শাহরুখ ও তাঁহার পুত্রদের প্রতি তিনি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; (গ) হারাত-এর তরুণ অধিবাসীদের অধিকাংশ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই বিশেষ গোষ্ঠীতে তাঁহার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা একটি সম্ভাব্য বিপদের উৎসরূপে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। উল্লিখিত হেতুসমূহের প্রথম দুইটি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে; সম্ভবত তৃতীয় হেতুটির বাস্তব পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুর নিকটস্থ ছিল (এই সকল তরুণ নাগরিকের সহিত তাঁহার সাহচর্য প্রসঙ্গে কাসিম আনওয়ার-এর বিরুদ্ধে নৈতিক অবক্ষয়ের যে অভিযোগ আনয়ন করা হয় তাহা তাঁহার বহিষ্কারের পশ্চাতে সক্রিয় একমাত্র হেতু হওয়ার আশংকা হিসাবে যথেষ্ট জোরালো নয়)। কাসিম আনওয়ার-এর বিরুদ্ধে তীমূরী কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; কারণ দা'ঈরূপে তাঁহার কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত সফল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং শাহরুখ একটি সম্ভাব্য বিদ্রোহের ভয়ে ভীত ছিলেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কাসিম আনওয়ার হারাতে অবস্থান কালে খালওয়াতী (দ্র.) তারীকার অনুসারিগণের সহিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নি'মাতুল্লাহী, নাকশ্-বানদী এবং অন্যান্য সূফী তারীকার অনুসারিগণের সঙ্গে সঙ্গে খালওয়াতীগণও সাফাবী বিপ্লবের জন্য যথোপযুক্ত পশ্চাদপট নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (অদ্যাবধি এ বিষয়ে যথোপযুক্ত গবেষণা হয় নাই)। এইরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, একজন ইসলামে দীক্ষাদানকারীরূপে কাসিম আনওয়ার-এর সাফল্য কেবল হারাত-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; নগরীর বহু অভিজাত ব্যক্তি এবং তীমূরী আমীরগণের বহু শাহযাদা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অবশ্যই ইহার ফলে শাহরুখ চিন্তিত ও শংকিত হওয়ার নূতনতর হেতুর সন্ধান পান।

হারাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর কাসিম আনওয়ার, শাহরুখ-এর পুত্র উলুগ বেগ-এর রাজধানী সামারকান্দ-এ বসবাস করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পর তিনি খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৮৩৭/অক্টো-নভেম্বর ১৪৩৩ সালে খারজিরদ-এ ইনতিকাল করেন।

কাসিম আনওয়ার কতিপয় সূফীবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গাযাল, রুবা'ঈ, কতিপয় মাছনাবী ও কতিপয় প্রবন্ধ সমন্বয়ে একটি দীওয়ান সংকলন করেন। তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যে কতিপয় তুর্কী ভাষায় এবং অন্যগুলি গীলান-এর স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় রচিত। E. G. Browne তাঁহার কবিতাবলীর একটিতে হারূফী প্রভাবের 'অভ্রান্ত' চিহ্নের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহার কাব্য সংগ্রহ হইতে এইরূপ কোন সংস্রব প্রমাণ করা যায় না। এই সকল কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা বস্তুত সূফীগণের ব্যবহৃত সাধারণ ভাষ্য এবং তাঁহার কাব্য শৈলী পাঠককে জালালু'দ-দীন রূমী (দ্র.)-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রূমীর ন্যায় তিনিও ভাষার সৌকর্যের তুলনায় বক্তব্যের অর্থবহতার সম্পর্কে বেশী যত্নবান ছিলেন। কাসিম আনওয়ার সাধারণত তাঁহার তাখাল্লুস (কবি ছদ্মনাম)-রূপে কাসিম অথবা কাসীমী (শব্দদ্বয়) ব্যবহার করিতেন; তবে মাঝে মাঝে তাঁহার উপাধির পূর্ণাঙ্গ রূপ কাসিম-ই আনওয়ার ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্র. (১) R. M. Savory, A 15th

century Safavid Propagandist at Harat, in the Semi-Centennial Volume of the Middle Western Branch of the American Oriental Society, ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা ১৯৬৯ খৃ. ১৮৯-১৯৭। ফারসী সূত্রসমূহের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যের একটি মূল্যবান বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (২) সা'ঈদ নাফীসী প্রকাশিত কাসিম-ই আনওয়ার-এর কাব্য সংগ্রহের (কুল্লিয়্যাত) ভূমিকা, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮। কাসিম-ই আনওয়ার-এর তুর্কী কবিতা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ঃ (৩) G. M. Meredith-Owens, The Turkish verses of Qasim al-Anvar, in BSOAS, ২৫/১খ. (১৯৬২ খৃ.), ১৫৫-৬১; (৪) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ৩৫-৩৭।

R. M. Savory (E.I.²)/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম আমীন (قاسم أمين) ঃ একজন আরব প্রাচ্যবিদ এবং সামাজিক বিষয়ের লেখক। তিনি মিসের আরব-নারী মুক্তি ত্বরান্বিত করার অন্যতম প্রবক্তা। তিনি একাধারে যেমন উনবিংশ শতকের শেষে সূচিত আরব ইসলামী বিশ্বের নব জাগরণে— রেনেসাঁয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসী ছিলেন, তেমনই ঐ অধিকারের সহিত সংশ্লিষ্ট নারীর দায়-দায়িত্বের পক্ষেও সোচ্চার ছিলেন।

তাঁহার জন্ম ১৮৬৩ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়ায় [তু. আহমাদ বাহা'উ'দ-দীন, তাহরীরু'ল-মার'আ (দারু'ল-মা'আরিফ সং, কায়রো ১৯৭০ খৃ., পৃ. ১০)-গ্রন্থের মুখবন্ধ; তবে তাঁহার জন্মের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে সকল সূত্র একমত নয়]। তাঁহার মাতা মিসরীয় ও পিতা তুর্কী বংশোদ্ভূত। তাঁহাদের পরিবার কায়রোতে বসতি স্থাপন করে। কায়রোতেই মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি খোদিভের আইন মহাবিদ্যালয়ে (مدرسة الحقوق الخديوية) ভর্তি হন। তিনি ১৮৮১ খৃ. আইন বিষয়ে ব্যবহারজীবী হিসাবে ব্যবসায়ের জন্য 'লাইসেন্স' প্রাপ্ত হন। মিসরের রাজধানীতে একজন যশস্বী আইনবিশারদের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি আইন বিষয়ে তাঁহার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করার জন্য প্যারিস গমন করেন।

১৮৮২ খৃ. ইংরাজ শক্তি মিসর দখল করে এবং 'উরাবী পাশা (দ্র.)-এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। মিসরের রাজনৈতিক গগনে এই ধরনের লক্ষণ প্রথম পরিস্ফুট হওয়ার কাল হইতে যেই সকল বাস্তব, নূতন ঘটনা ঘটিতে থাকে তাহাতে কাসিম আমীনের চিত্ত প্রথম হইতেই আলোড়িত হইয়াছিল। প্যারিসে গিয়াও তাঁহার সেই আবেগ, সেই চিত্ত-চাঞ্চল্য বজায় থাকে।

মিসরে সংস্কার কার্যক্রমের অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই বলবৎ করা হইয়াছিল। শুধু মিসরেই নয়, আরব-ইসলামী বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর অঞ্চলে সংস্কার কার্যক্রমের কিছু কিছু বলবৎ হইয়াছিল। কাসিম আমীন ঐ সংস্কার কার্যক্রমে তাঁহার প্রথম অবদান রাখেন। তিনি ইহা করেন কায়রোয় তৎকালে আধুনিক ইসলামের দুই মহান সংস্কারক জামালু'দ-দীন আল-আফগানী (দ্র.) ও তাঁহার শাগরিদ মুহাম্মাদ 'আবদুহু (দ্র.)-র সহিত ইতিমধ্যে স্থাপিত যোগাযোগ নূতন করিয়া উজ্জীবিত করিয়া। এই দুই সংস্কারক প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে তাঁহারা আরবী সাপ্তাহিক আল-'উরওয়াতু'ল-উছকা নামে এক সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার জন্য অর্থ সংস্থান করিত ঐ পত্রিকার নামেরই এক গুপ্ত মুসলিম সংগঠন। পত্রিকার মাত্র ১৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশনায় কাসিম আমীন সহযোগিতা করেন।

প্যারিসে থাকাকালে তিনি যেই পরিবেশের আওতায় আসেন তাহা সর্বদাই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত ছিল। কোনও কোনও সূত্র অনুসারে সম্ভবত সমান গুরুত্ব সহকারে এই কথাও বলা যায়— এক ফরাসী তরুণীর সহিত আবেগজড়িত সম্পর্কের প্রভাবে তাঁহার এই বিশ্বাসও পরিপক্ব হইয়া ওঠে যে, মিসর ও সাধারণভাবে গোটা আরব সমাজের অন্যতম সর্বাপেক্ষা জরুরী নারীদের জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নয়ন ও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এই বিষয়ে জনমত গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রতিটি প্রয়াসে দেশে প্রচলিত চিরাচরিত ঐতিহ্যের পক্ষপাতীদের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, লড়িতে হইয়াছে যে কোনও পরিবর্তনের দুশমনের বিরুদ্ধে—ঐ পরিবর্তনের পরিষ্কার সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও। কারণ ঐতিহ্যবাদীদের বিবেচনায় প্রতিটি নব উদ্ভাবনই ঐতিহ্যের জন্য এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতির প্রতি আঘাতস্বরূপ ও অবমাননাকর বিষয়।

কাসিম আমীন এই কাজের কঠিন সমস্যাগুলি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবল আইন ও বিচারের অস্ত্রকেই কাজে লাগান নাই যে অস্ত্রেশস্ত্রে পেশাদার আইনজীবী হিসাবে পর্যাপ্তভাবে সুসজ্জিত ছিলেন, বরং তিনি আরও কাজে লাগাইয়াছিলেন আবেগ ও নৈতিকতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যুক্তিতর্ককে যাহা তাঁহার স্বকীয় স্বভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হইত। তাঁহার এইসব কর্মতৎপরতার লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার, পুরুষের সহিত নারীর সম-অধিকার, পর্দা প্রথার বিলোপ এবং বহুবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের আইনের সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে নারীদের জন্য অধিকতর মর্যাদাকর পরিবেশ নিশ্চিত করা। ইসলামী ঐতিহ্যের বিরোধিতা করিয়া তিনি পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হইয়া এই আন্দোলন করেন।

তবে মিসরে রক্ষণবাদ এতই প্রবল ও অনমনীয় ছিল যে, আনু. ১৯২২ খৃ. ("তাহরীরু'ল-মার'আ" প্রকাশের প্রায় সিকি শতাব্দী পর, তাহাও কেবল উচ্চতর সামাজিক শ্রেণীতে) পর্দা প্রথা তুলিয়া দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯২৫ খৃ. বালিকাদের জন্য প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং বালকদের অনুরূপ বিষয়াবলী সম্বলিত পাঠ্যসূচীও চালু করা হয়।

তাঁহার Les Egytiens (প্যারিস ১৮৯৪ খৃ.) নামক গ্রন্থে তাঁহার দেশপ্রেমমূলক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐ গ্রন্থে ফরাসী ভাষায় Due d' Harcourt-এর মিসর ও মিসরবাসী সম্পর্কিত বক্তব্যের জওয়াব দেন। Duc d' Harcourt তাঁহার L'Egypt et les Egytiens (১৮৯৩ খৃ.) নামক গ্রন্থে মিসর দেশ, বিশেষত উহার সামাজিক গঠন সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তবে তাঁহার ঐ বিচার-বিশ্লেষণ ছিল অতিরঞ্জিতভাবে 'উপনিবেশবাদী' দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। কাসিম আমীন তাঁহার ঐ গ্রন্থের বক্তব্য খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান। তবে কাসিম আমীন তাঁহার দুই গ্রন্থ ঃ তাহরীরু'ল-মার'আ (تحرير المرأة = নারী মুক্তি) ও আল-মার'আতু'ল-জাদীদা (المرأة الجديدة = আধুনিক ঐতিহ্যশীল নারী) নারী সমাজের প্রগতির একান্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। প্রথম গ্রন্থটির বক্তব্য মিসরের রক্ষণবাদী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এইসব রক্ষণবাদী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ঃ তাল্'আত হার্ব ও 'আবদু'ল-মাজীদ গার্য়ান। এই ব্যক্তিদ্বয়ের প্রথম জন তাঁহার গ্রন্থ ঃ ফাস্লু'ল-খিতাব ফি'ল-মার'আ

ওয়া'ল-হিজাব (কায়রো তা. বি.) ও দ্বিতীয়জন তাঁহার আদ-দাফ'উ'ল-মাতীন (কায়রো তা.বি.) গ্রন্থের মাধ্যমে ইহার সমুচিৎ জওয়াব দেন। যে কোনও পরিবর্তনের জওয়াব কাসিম আমীন তাঁহার অন্য যেই রচনার মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছিলেন সেই রচনার পাল্টা জবাব কেবল ঐ একই তাল্'আত হারবের 'তারবিয়াতু'ল-মার'আ ওয়া'ল-হিজাব' শীর্ষক গ্রন্থের মাধ্যমেই আসে নাই, বরং মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদীর মত পণ্ডিত ও প্রচারবিদও তাঁহার আল-মার্'আতু'ল-মুসলিমা (কায়রো ১৩১৯/১৯০১)-এর মাধ্যমে উহার জওয়াব দিয়াছিলেন। বস্তুত কাসিম আমীনের উল্লিখিত দুইটি রচনার কারণেই প্রগতিবাদীরা তাঁহাকে নারী অধিকারের অন্যতম পুরোধা হিসাবে গণ্য করে। এই ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত তাঁহার প্যারিসে থাকাকালীন রচনাটি (যেই বিষয়ে ইতিপূর্বে এই নিবন্ধে আলোচিতও হইয়াছে) সেই তুলনায় নিষ্প্রভ প্রতিভাত। এইরূপ তিনি একটি নানা চিন্তাভাবনা ও নীতিমূলক বিষয়বস্তুসম্বলিত সংকলনও গ্রন্থনা করিয়াছিলেন। এই সংকলনের নাম আস্‌বাব ওয়া নাতা'ইজ ওয়া আখ্‌লাক ওয়া মাওয়া'ইজ, কায়রো ১৮৯৮ খৃ. (কালিমাত ফি'ল-আখ্‌লাক নামে যাহা ইব্ন হাযমের রিসালা ফী মুদাওয়াতু'ন-নুফূস গ্রন্থের সংস্করণের পরিশিষ্টে ১৯১৩ খৃ. পুনর্মুদ্রিত হয় (তু. Brockelmann, ৯৬-৯৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাহ্‌রীর'ল-মার্'আ, কায়রো ১৮৯৯ খৃ. (জার্মান অনু. O. Rescher, স্টুটগার্ট ১৯২৮ খৃ.,; (২) আল-মার্'আতু'ল-জাদীদা, কায়রো ১৯০১ খৃ.; এই দুই গ্রন্থের আরও নানা ভিন্ন সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং সেইগুলির মুখবন্ধে কাসিম আমীনের জীবনী ও তাঁহার সমাজকর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইসলামে নারীর সামাজিক পরিস্থিতির ঐতিহাসিক বিবরণসম্বলিত যে মৌলিক রচনা তথা গ্রন্থ অতি অবশ্য পাঠের ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ বাহুল্য তাহা হইতেছেঃ (৩) R. Paret, Zur Frauenfrage in der arabischislamischen Welt, স্টুটগার্ট ১৯৩৪ খৃ., Brockelmann, পরি. ৩, ৩৩০-১-এ উল্লিখিত প্রায় সকল রচনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গ্রন্থপঞ্জীগত তথ্যাদির জন্য দ্র. ঃ (৪) I. Y. Krackovskiy, Kasim Amin, Sovetnik Appellyutsionnogo suda. Novaya Zenshcina. Perevod so 2-go arabskogo izdaniya i Predislovie, in Mir Islama, ১খ, (১৯১২ খৃ.), পরি. ১১৯ প.; (৫) OM, ৫খ. (১৯২৫ খৃ.), ৬০৬, ৯খ. (১৯২৯ খৃ.), ২৩৭-৪২, স্থা.; (৬) হুসায়ন হায়কাল, তারাজিম মিস্‌রিয়্যা ওয়া গারবিয়্যা, কায়রো ১৯২৯ খৃ.; (৭) Doria Ragai (Shafik) La femme et le droit religieux de l'Egypte contemporine, প্যারিস ১৯৪০ খৃ.; (৮) এ. খাকী, কাসিম আমীন, কায়রো ১৯৪৪ খৃ.; (৯) এফ. এস. ফু'আদ, তা'রীখ্‌ হায়াতি'ল-মারহুম কাসিম আমীন, কায়রো তা.বি.; (১০) U. Rizzitano, La funzione della donna orientale, in Oriens, 44, সম্পা. J. T. L. O., রোম ১৯৪৫ খৃ.; (১১) তাহ্‌রীরু'ল-মার্'আ-এর কিছু পৃষ্ঠার অনুবাদ অতঃপর উল্লিখিত গ্রন্থে অনূদিত হইয়াছে; (১২) আনওয়ার 'আবদু'ল-মালিক, Anthologie de la litterature Arabe contemporaine, ২খ. (Les essais), প্যারিস ১৯৬৫ খৃ.।

U. Rizzitano (E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

কাসিম ইব্ন আবদিল্লাহ (قاسم بن عبد الله) ঃ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনি'শ-শাত আল-আনসারী, আস-সাব্‌তী, মালিকী মাযহাবের একজন সুবিজ্ঞ মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও উসূল-শাস্ত্রবিদ। জন্ম, জিব্রাল্টার প্রণালীর দক্ষিণ তীরে আল-মাগরিবের তিতওয়ান প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ বন্দরনগরী সাব্‌তা (سبتة = Ceuta)-য় ৬৪৩/১২৪৫ সালে। তিনি এই শহরেই লালিত-পালিত হন ও খ্যাতনামা অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদদের নিকট হাদীছ, ফিক্‌হ ও অন্যান্য ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রখ্যাত শিক্ষকবৃন্দ হইলেনঃ আল-হাফিজ আল-মুহাসিবী; আবু'ল-কাসিম ইবনু'ল-বারা'; আবি'দ-দুনয়া ইবনু'ল-গাম্মায; আবূ জা'ফার আত-তাব্বা' ও আবু'ল-হাসান ইব্ন আবি'র-রাবী।

তিনি অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। মুসলিম স্পেন ও আল-মাগরিব-এর তৎকালীন খ্যাতনামা বহু 'আলিমই তাঁহার নিকট বিভিন্ন ইসলামী বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। আরবী ভাষা ও যুক্তিবিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার খ্যাতনামা শাগরিদবৃন্দের কয়েকজন হইলেন ঃ আবূ যাকারিয়্যা ইব্ন হুযায়ল, আবু'ল-হাসান ইবনি'ল-হুবাব ও কাদী আবূ বাক্‌র ইব্ন সীরীন প্রমুখ।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ উসূলু'ল-ফিক্‌হ বিষয়ে—আনওয়ারু'ল-বুরূক ফী তা'আক্‌কুবি মাসা'ইলি'ল-কাওয়া'ইদ ওয়া'ল-ফুরূক ফি'ল-উসূল (انوار البروق فى تعقب مسائل القواعد و الفروق فى الاصول) ও ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে গুনয়াতু'র-রা'ইদ ফী 'ইলমি'ল-ফারা'ইদ (غنية الرائض فى علم الفرائض)। তিনি ৭২৩/১৩২৩ সালে সাবতায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন মাখলূফ, আশ-শাজারাতু'য-যাকিয়্যা, কায়রো ১৩৪৯ হি., পৃ. ২১৭; (২) ইব্ন ফারহূন, আদ-দীবাজু'ল-মুযাহ্‌হাব, কায়রো ১৩৭৯ হি., পৃ. ২৩৫; (৩) 'আবদুল্লাহ্ মুসতাফা আল-মারাগী, আল-ফাত্‌হু'ল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ২খ, ১২৩।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

আল-কাসিম ইব্ন আসবাগ (القاسم بن اصبغ) ঃ পূর্ণ নাম আল-কাসিম ইব্ন আসবাগ ইবন মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন নাসিহ ইব্ন 'আতা' আল-বায়্যানী আবূ মুহাম্মাদ। স্পেনীয় উমায়্যাগণের এই মিত্র (মাওলা) একাধারে একজন প্রসিদ্ধ হাদীছবেত্তা, ভাষাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও কুলজিবিশারদ ছিলেন। তিনি ২৪৪/৮৫৯ সালে মতান্তরে ২৪৭/৮৬২ সালে কর্দোভার 'কূরায়' অবস্থিত বায়েনা (বায়্যানা) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৪০/৯৫১-২ সালে রাজধানীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কর্দোভায় মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াদ্দাহ, আল-খুশানী প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২৭৪/৮৮৭ সালে প্রাচ্যদেশে এক দীর্ঘ সফরে গমন করেন এবং মক্কা, বাগদাদ, কায়রাওয়ান প্রভৃতি নগরে হাদীছ, কুরআন বিষয়ক শাস্ত্র, কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন আহমাদ ইব্ন হাম্বালের এক পুত্র, ছা'লাব, আল-মুবাররাদ ও বাক্‌র ইব্ন তাহার্‌তী। তিনি ইব্ন কুতায়বা-রচিত বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার স্পেন প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার উপদেশবাণী শ্রবণের উদ্দেশে দলে দলে চতুর্দিক হইতে লোকজন আসিয়া তাঁহার নিকট ভীড় জমাইত। খলীফা ৩য়

'আব্দু'র-রাহ্মান ও তদীয় পুত্র আল-হাকাম ছিলেন তাঁহার অসংখ্য ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

কাসিম ইব্ন আসবাগ ইব্ন কুতায়বা প্রণীত গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য সাহিত্য (আদাব) গ্রন্থ স্পেনে প্রচলিত করেন। এই গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল—মা'আরিফ, আদাবু'ল-কুত্তাব নামক উচ্চ প্রশংসিত ও সমধিক ব্যাখ্যাত গ্রন্থ এবং "গারীবু'ল-কুরআন" ও "মুশ্কিলু'ল-কুরআন" নামক গ্রন্থদ্বয়। তিনি নিজে আবূ দাউদের 'সুনান' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া এবং ইব্নু'ল-জারূদের আল-মুনতাকা ও উহার সারসংক্ষেপ আল-মুজতানা-র বিন্যাস পদ্ধতি (আব্ওয়াব) অনুসরণ করিয়া মুসাওওয়াফ নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং আল-হাকামের নামে উহা উৎসর্গ করেন। ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই সংকলনে ২,৪৯০টি হাদীছ স্থান পায়। তিনি উমায়্যা, কুরায়শ ও কিনানা গোত্রের সম্মানসূচক খিতাবীদের একটি উৎকৃষ্ট কুলজিগ্রন্থ, "কিতাব ফি'ন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ" এবং মালিক ইব্ন আনাসের যেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য হাদীছ মুওয়াত্তা' গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত হাদীছের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোনটিই সংরক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের জন্য তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে Orosius-এর "Historiarum libri septem adversus Paganos-এর অনুবাদ যাহা তিনি জনৈক মোযারাব (মুরাদের আমলে সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণীর খৃস্টান স্পেনবাসীদের নাম)-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন করিয়াছেন। ইতিহাস ও ভূগোল—এই উভয় শাস্ত্রের তথ্যসম্বলিত এই অনুবাদ গ্রন্থটি আল-আন্দালুসের ভৌগোলিক সাহিত্য বিকাশের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কাসিম ইব্ন আস্বাগের ছাত্র আহ্মাদ আর-রাযী এই গ্রন্থটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাক্কারী, Analectes, i, 491-3 ও নির্ঘণ্ট; (২) ইব্নু'ল-ফারাদী, সংখ্যা ১০৬৮; (৩) দাব্বী, সংখ্যা ১২৯৮; (৪) য়াকূত, ইরশাদ, ৪খ, ১৫৪; (৫) ইব্ন বাশকুওয়াল, পৃ. ৯৬; (৬) Ben Cheneb, Etude... Idjaza (ইজাযা), পৃ. ২৮১; (৭) হুমায়দী, জায্ওয়া, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., সংখ্যা ৭৬৯; (৮) ইব্ন ফারহূন, দীবাজ, পৃ. ২২২; (৯) Pons Boigues, 59-61; (১০) H. Mu'nis, আল-জুগরাফিয়া ওয়া'ল-জুগরাফিয়্যূন ফি'ল-আন্দালুস, মাদ্রিদ ১৩৮৬/১৯৬৭, পৃ. ৩০-১, ৫৫-৭, ৪১৮; (১১) H. Mones, St., Isl, xx (1964), 71; (১২) Ch Pellat, Ibn Hazm..., in al-And., xix (1954), 77-8, 86 (=অনু. মাককারী, ২খ, ১১৬, ১১৮-১৯; (১৩) G. Levi della Vida, La traduzione... di Orosio, in al-And. xix (1954), 257-93; (১৪) মুহাম্মাদ 'আলী মাক্কী, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espana musulmana, Madrid 1968, বিশেষত পৃ. ১৯৯-২০০, ২০৭-৮, ২৭২-৪।

J. Bosch-Vila (E.I.[2])/ আবদুশ শুকুর

আল-কাসিম ইব্ন 'ঈসা (القاسم بن عيسى) ঃ একজন বীর সেনাপতি, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং স্বগোত্রের নেতা। তিনি সাধারণত আবূ দুলাফ আল-'ইজলী নামে পরিচিত। ১৯৫/৮১১ সালে খলীফা আল-আমীন যখন 'ঈসা ইব্ন মাহান-এর নেতৃত্বে আল-মা'মূন-এর সেনাপতি তাহির ইব্নু'ল-হুসায়ন-এর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন তখন আবূ দুলাফ তাঁহার সঙ্গে যান। ইব্ন মাহান-এর মৃত্যুর পর আবূ দুলাফ হামাদান-এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আল-মা'মূন-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও তাহির তাঁহাকে আল-কারাজ-এ শান্তিতে থাকিতে দেন। আল-কারাজ এলাকাটি তিনি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১৪/৮২৯-৮৩০ খৃ. মা'মূন যখন রায়্যি-এ আগমন করেন তখন তিনি আবূ দুলাফকে তলব করেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া খলীফার খিদমতে হাযির হইলেন। খলীফা তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে স্বাগত জানান। আল-মুসতা'সিম-এর সময়ে আফশীন (দ্র.) যিনি আবূ দুলাফ-এর বীরত্বে ও বাগ্মিতার কারণে তাঁহাকে হিংসা করিতেন—তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। আল-আফশীন তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যা ও বিদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং মিথ্যা প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রধান বিচারপতি (قاضى القضاة) আহমাদ ইব্ন আবী দাউদ (দ্র.)-এর হস্তক্ষেপে এই দণ্ড কার্যকর হয় নাই। বলা হইয়া থাকে যে, কাদী যখন জানিতে পারিলেন যে, আবূ দুলাফ-এর জীবন বিপন্ন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আল-আফশীন-এর নিকট পৌছিয়া বলিলেন যে, খলীফা আবূ দুলাফকে মুক্তি দিতে আদেশ দিয়াছেন। আবূ দুলাফ ছাড়া পাইতেই আহমাদ খলীফার খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন যে, তিনি একটি নিরপরাধ অভিযুক্তের জীবন রক্ষার্থে এই কথা বলিয়াছিলেন। আল-মুসতা'সিম ইহা শুনিয়া তাঁহাকে মাফ করিয়া দিলেন এবং আবূ দুলাফকেও মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন। আবূ দুলাফ ২২৫/৮৩৯ অথবা ২২৬/৮৪০ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন এবং স্বরচিত গীতি কবিতা নিজেই গাইতেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'সিয়াসাতু'ল-মুলূক' ও আল-বুযাতু ওয়া'স-সায়দ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্পর্কে আবূ তাম্মাম (দ্র.)-সহ কতিপয় কবি, স্তুতি-কাসীদা রচনা করিয়াছেন। ইব্ন হায্ম-এর বর্ণনামতে আবূ দুলাফ আল-'ইজলীর পর তাঁহার বংশধর তেত্রিশ বৎসরাধিক পর্যন্ত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিতে থাকে। তাঁহার পরবর্তী বংশধরদিগের ইতিহাস ও জীবন চরিতের জন্য দ্র. ইব্ন হায্ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, ৩খ, ৭৯৮, ৮০০, ১১৫৩; (২) আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য-যাহাব, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., ৭খ, ৪-৭, ১৩৯-১৪২; (৩) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল (সম্পা. Tornberg), ৬খ, ১৬৫, ২৯১প. ৩৩০, ৩৬৮; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৩১ এবং ৯৫৪ (অনু. De Slane, ১খ, ৬১প. এবং ২খ., ৫০২-৫০৭); (৫) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, ৩খ, ২৫৫; (৬) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ, ২৬৮প., ৩৩২ প.; (৭) আল-আগানী, ৮খ, ২৪৮ (আদদার সং); (৮) সিমতু'ল-লা'আলী, সম্পা. 'আবদু'ল-'আযীয আল-মায়মানী, ৩৩১; (৯) তা'রীখ বাগদাদ, ১২খ, ৪১৬; (১০) য়ূসুফ আল-বাদী'ঈ, হিবাতু'ল-আয়্যাম, পৃ. ৯৩-১০৩, মিসর ১৯৩৪ খৃ.; (১১) ইব্ন হায্ম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৩১৩; (১২) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, শিরো.; (১৩) Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden 1978, 718.

K. V. Zeitersteen E.I.[2] ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা.ই.)/ ড. আবদুল জলীল

আল-কাসিম ইব্ন উমায়্যা (القاسم بن امية) ঃ ইব্ন আবি'স্-সালত আছ-ছাকাফী। কথিত আছে যে, তাঁহার পিতা প্রায় সময়ই নুবুওয়াত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের আলোচনা করিতেন। অথচ তাঁহার জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই; বরং সারা জীবন বিভিন্নভাবে ইসলামের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট ছিল। বদরের যুদ্ধে উদ্দীপনাময় কবিতা আবৃত্তি করিয়া সে কুরায়শ সৈন্যদের উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র কাসিমকে ঐতিহাসিক মারযুবানী মু'জামু'শ-শু'আরা' গ্রন্থে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে বিদায় হজ্জের সময় মক্কা ও তা'ইফে মুসলমান হয় নাই (কুরায়শ ও ছাকীফ গোত্রের) এমন কেহই বাকী ছিল না। সুতরাং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কাসিম শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, সংখ্যা ৭০৫০।

রুহুল আমীন সিরাজী

আল-কাসিম ইব্ন মা'আন (القاسم بن معن) ঃ (র) আল-মাস্'উদী, একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও তাব'উ তাবি'ঈন, উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-র প্রপৌত্র। বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ আল-কাসিম ইব্ন মা'আন ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি কূফায় বসবাস করিতেন এবং তথাকার কাদী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আল-কাসিম স্বীয় পিতামহ 'আবদু'র-রাহমান ছাড়াও আল-আ'মাশ, 'আসিম আল-আহওয়াল, 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'উমায়র, মানসূর ইবনু'ল-মু'তামির, তালহা ইব্ন য়াহ্য়া ইব্ন তালহা, দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আলকামা, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া ও য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রচুর সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অসংখ্য শাগরিদের মধ্যে ইব্ন মাহদী, আলী ইব্ন নাস্র আল-জাহ্দামী আল-কাবীর, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু'ল-ওয়ালীদ আল-'আদানী, আবূ গাস্সান আন-নাহ্দী, আল-মু'আফী ইব্ন সুলায়মান আর-রাস্'আনী ও আবূ নু'আয়ম আল-ফাদ্ল ইব্ন দুকায়ন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একজন বিশ্বস্ত রাবী হিসাবে আল-কাসিম ইব্ন মা'আন সর্বস্বীকৃত ব্যক্তি। আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আবূ হাতিম, য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈন, ইব্ন হিব্বান, আবূ দাউদ, ইব্ন সা'দ প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতার প্রত্যয়ন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় যুগের শা'বী (দ্র.) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কুতায়বা তাঁহার বিশ্বস্ততা স্বীকার করিয়া বলেন যে, তবে কোনও কোনও ব্যাপারে তিনি মুরজি'আ মতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

আল-কাসিম ইব্ন মা'আন (র) হাদীছশাস্ত্র ছাড়াও 'ইলমু'ন-নাহও, 'ইলমু'ল-ফিক্হ, কাব্য ও ইতিহাসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি রাখিতেন। আবূ হাতিম তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁহার তুলনা ছিল না।

আল-কাসিম ছিলেন একজন দানশীল ও নির্লোভ ব্যক্তিত্ব। কূফার বিচার বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও ইহার বিনিময় গ্রহণ করেন নাই। আমরণ তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। হিজরী ১৭৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী ও ইমাম আন-নাসা'ঈ তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে আল-কাসিম ইব্ন মা'আনের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ৩০৩, ৩০৪; (২) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১ ভাগ, ১৭০; (৩) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশকী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ২৮৬; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২০, ১২১; (৫) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৩৯, ২৪০।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাসিম ইব্ন মাখ্রামা (القاسم بن مخرمة) ঃ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন 'আবদি মানাফ ইব্ন কুসায়্যি আল-কুরাশী আল-মুত্তালিবী। কায়স ও সালত্-এর স্বগোত্রীয় বলিয়া জানা যায়। ইব্ন ইস্হাক উল্লেখ করিয়াছেন, কাসিম ঐ সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই সম্পদ বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, সংখ্যা ৭০৫২; (২) যাহাবী, তাজরীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৯, সংখ্যা ৯৯।

রুহুল আমীন সিরাজী

আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা (القاسم بن مخيمرة) ঃ আল-হামদানী (র) জনৈক তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ, উপনাম আবূ 'উরওয়া, বানু'ল-হামদান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল কূফায়। তিনি তথাকার মু'আল্লিম ছিলেন। অতঃপর সিরিয়ায় গমন করেন এবং দিমাশ্কে বসবাস শুরু করেন। একজন সৈনিক হিসাবে তিনি দিমাশ্কে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনি'ল-'আস (রা), আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) ও আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আদ-দাওরী য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈনের উদ্ধৃতিতে বলেন যে, আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা কোনও সাহাবীর নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। ইব্ন হিব্বানের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আ'ইশা (রা)-র নিকট মুহ্রিমের পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর-সংখ্যক তাবি'ঈ হইতেও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ মারয়াম আল-আয়দী, 'আলকামা ইব্ন কায়স আল-মুগীরা (রা)-র ব্যক্তিগত কাতিব ওয়াররাদ, আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা আল-আশ'আরী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উকায়ম, শুরায়হ ইব্ন হানী', সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা, আবূ মায়সারা ও আবূ 'আম্মার আল-হাম্দানীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইব্ন হিব্বান ধারণা করেন যে, তিনি আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা আল-আশ'আরী-র নিকট হইতে কোনও হাদীছ শ্রবণ করেন নাই।

আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা-র সূত্রে মুহাদ্দিছগণের একটি বিরাট দল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ, সিমাক ইব্ন হারব, 'আলকামা ইব্ন মারছাদ, 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন য়াযীদ ইব্ন জাবির, আল-হাকাম ইব্ন 'উতায়বা, সালামা ইব্ন কুহায়ল, হাসান ইব্ন হুর, হাস্সান ইব্ন 'আতিয়্যা, মূসা ইব্ন সুলায়মান, য়াযীদ ইব্ন আবী

মারয়াম আশ-শামী, হিলাল ইব্ন য়াসাফ, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, আল-আওযা'ঈ প্রমুখ তাঁহার উল্লেখযোগ্য শাগরিদ।

আল-কাসিম একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্লোভ ব্যক্তি ছিলেন। হাদীছ বর্ণনায় তাঁহার বিশ্বস্ততা সর্বজনস্বীকৃত। ইব্ন সা'দ, ইব্ন মু'ঈন, আল-'আজালী, ইব্ন খিরাশ, আল-আওযা'ঈ, আবূ হাতিম, ইব্ন হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্ন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন কূফার একজন সৎ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ বলেন ঃ আমরা আল কাসিমের অনুলেখক ছিলাম। তিনি আমাদিগকে হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোনও বিনিময় গ্রহণ করিতেন না। আল-আওযা'ঈ বর্ণনা করেন যে, একদিন আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর নিকট আগমন করেন। খলীফা তাঁহার জন্য ভাতা নির্ধারণ করিলেন ও একটি ক্রীতদাস উপঢৌকনস্বরূপ দান করিলেন। কিন্তু তিনি এই বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন যে, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা দ্বারা আমাকে ভালভাবেই চালাইতেছেন, অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই। উল্লেখ্য যে, আল-কাসিম খলীফা উমার ইব্ন 'আবদি'ল-আযীয (র)-এর ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। লাভের অর্থ উভয়েই বন্টন করিয়া লইতেন। উক্ত অর্থে যতদিন সংসার চলিত, ততদিন আল-কাসিম গৃহ হইতে বাহির হইতেন না। তিনি 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর শাসনামলে ইনতিকাল করেন। কাহারও মতে তিনি হিজরী ১০০ সালে এবং কাহারও মতে ১০১ সালে ইনতিকাল করেন। সিহাহ সিত্তায় তাঁহার বর্ণিত হাদীছ উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ৩০২, ৩০৩; (২) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৯/১৯৭৯, ৫খ, ৩০৭; (৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১ম ভাগ, ১৬৭; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২০; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৬খ, ৩০৩; (৬) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১২২।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (القاسم بن محمد) ঃ (র) ইব্ন আবী বাক্র আস-সিদ্দীক, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাবি'ঈ। হযরত আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর পৌত্র। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, মতান্তরে আবূ 'আবদি'র-রাহমান। পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। আল-বুখারী তাঁহার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁহার যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। আল-কাসিমের জননীর নাম সাওদা। তিনি উম্মু ওয়ালাদ ছিলেন। পিতা মুহাম্মাদ তাঁহার শৈশবেই ইনতিকাল করেন। ফলে তিনি য়াতীম হিসাবে ফুফু 'আ'ইশা সিদ্দীকা (রা)-র যত্নে লালিত-পালিত হন। এই সুবাদে তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীনের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিপুল অংশ আহরণে সক্ষম হন।

কাসিম মদীনায় বসবাস করিতেন। অসংখ্য সাহাবা হইতে তিনি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আ'ইশা সিদ্দীকা (রা), পিতা মুহাম্মাদ (রা), ইব্ন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্র ইবনি'ল-'আস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়র (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফার (রা), আবূ হুরায়রা (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব, মু'আবিয়া (রা), রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা), সালিহ ইব্ন খাওওয়াত (রা), আসলাম মাওলা 'উমার (রা) ও ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর সূত্রে তিনি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার সূত্রে তাবি'ঈ ও তাবউ তাবি'ঈনের একটি বিরাট দল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম হইল ঃ আশ-শা'বী, সালিম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উমার (ইঁহারা দুইজন তাঁহার সমসাময়িক), য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইব্ন আবী মুলায়কা, নাফি', আয-যুহ্রী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, আয়্যুব আস-সুখতিয়ানী, ইব্ন 'আওন, রাবী'আ, আবু'য-যিনাদ, আফলাহ ইব্ন হুমায়দ, ছাবিত ইব্ন 'উবায়দ, হানজালা ইব্ন আবী সুফয়ান, রাবী'আ ইব্ন 'আতা', 'আব্বাদ ইব্ন মানসূর, 'ইকরামা ইব্ন 'আম্মার, মূসা ইব্ন সারজিস, আবূ বাক্র ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আম্র ইব্ন হায্ম, মালিক ইব্ন দীনার, 'ঈসা ইব্ন মায়মূন আল-ওয়াসিতী ও আল-কাসিমের পুত্র 'আবদু'র-রাহমান।

হাদীছ শাস্ত্রে কাসিমের ব্যুৎপত্তি সর্বজনস্বীকৃত। তিনি অবিসংবাদিত বিশ্বস্ততার সাথে সাথে বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ইব্ন সা'দ, আবূ'য-যিনাদ, ইব্ন মু'ঈন, মালিক ইব্ন আনাস, আল-বুখারী, ইব্ন সীরীন, খালিদ ইব্নু'ন-নিযার, ইব্ন হিব্বান, ইব্ন ইসহাক, য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-আনসারী প্রমুখ মুহাদ্দিছ, সমালোচক ও ঐতিহাসিক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, মহিমান্বিত, বিদগ্ধ, ইমাম, ফাকীহ, আল্লাহ্ভীরু ও হাদীছশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। ইব্ন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন তাবি'ঈ শ্রেষ্ঠ, 'ইলম, শিষ্টাচার ও ফিক্হশাস্ত্রে সমকালের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয যেইদিন আমীরু'ল-মু'মিনীন নিযুক্ত হন, সেইদিন মদীনাবাসী মন্তব্য করিয়াছিল, আজ লজ্জাবতী কুমারী (আল-কাসিম)-এর মুখ খুলিবে। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয বলিতেন ঃ যদি সম্ভব হইত, আল-কাসিমের হাতেই খিলাফাতের দায়িত্বভার ছাড়িয়া দিতাম।

ফিক্হশাস্ত্রেও আল-কাসিম ছিলেন সকলের শীর্ষ। ইমাম মালিক বলিতেন, আল-কাসিম ছিলেন এই উম্মা-র এক ফাকীহ্। তবে তিনি ফাত্ওয়া প্রদান করিতেন কমই। তিনি হাদীছও অল্প রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিতেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন—কেহ হাজ্জ করিলে তাহাকে বলিতেন ঃ আল-কাসিমের হাজ্জ দেখিয়া দেখিয়া 'আমল করিও। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ একদিন আমি দেখি যে, কাসিম সালাত আদায় করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি বড় 'আলিম, না কি সালিম ? তিনি বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ। কয়েকবার এইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর তিনি বলিলেন ঃ ওই তো সালিম আছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আসলে তিনি নিজেকে বড় বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে সালিমকে বড় বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। তাই প্রশ্নটি এড়াইয়া চলিয়াছেন। বস্তুত তিনিই বড় 'আলিম ছিলেন। য়াহ্য়া ইব্ন

সা'ঈদ বলিতেন ঃ মদীনায় বর্তমানে এমন কেহ নাই, যাঁহাকে কাসিমের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। আয়্যুব আস-সুখ্তিয়ানী বলিতেন, কাসিমের চাইতে বড় কোনও ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নাই। গঠন প্রকৃতিতে কাসিম পিতামহ আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আয-যুবায়র বলেন ঃ এই যুবকের মত আবূ বাক্র (রা)-র আর কোনও সন্তান তাঁহার সহিত এত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযের ইনতিকালের পর কাসিম ইনতিকাল করেন। মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। রাজা' ইব্ন জামীলের মতে ১০১ বা ১০২ হি.; খলীফার মতে ১০৬ বা ১০৭ হিজরী; ইব্ন মু'ঈন ও ইবনু'ল-মাদীনীর মতে ১০৬ হি.। ইব্ন সা'দের বর্ণনামতে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ১১২ হি. সাল। ইহা ছাড়া আরও অনেক মতামত রহিয়াছে। ইব্ন মু'ঈন ও ইবনু'ল-মাদীনীর মতে ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৭০ বৎসর। সিহাহ সিত্তাহ্র সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ২৯৯, ৩০০, ৩০১; (২) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৯/১৯৭৯, ৫খ, ৩০২; (৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১ম ভাগ, ১৫৭; (৪) ইবনু'ল-জাওযী, সিফাতু'স-সাফওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৯/১৯৬৯, ২খ, ৪৯, ৫০; (৫) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশকী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ১৩৫; (৬) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১২০; (৭) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত তা. বি., ৫খ, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩; (৮) আয-যাহাবী, তায্কিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ৯৬, ৯৭।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

আল-কাসিম ইব্ন য়ানখুসরুহ্ (القاسم بن ينخصره) ঃ (রা) য়ামান-এর অধিবাসী। আবূ আহমাদ আল-'আসকারীর মতে তিনি নবী (স)-এর যুগ পাইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) নিজস্ব সনদ-পরম্পরায় উল্লেখ করিয়াছেন, আল-কাসিম (রা) বলেন ঃ আমি 'উমার ফারূক (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে খোশ আমদেদ জানান এবং নিজের পাশে বসাইয়া নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ "আল্লাহ্ আরও এমন অনেক লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা হইবে আল্লাহ্র প্রিয় এবং আল্লাহ্ হইবেন তাহাদের নিকট প্রিয়। তাহারা মু'মিনদের প্রতি হইবে নম্র ও বিনয়ী আর কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর। তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করিবে না" (৫ ঃ ৫৪)। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে য়ামানের অধিবাসী ! এই আয়াত তোমাদের সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে বলিয়া আমি ধারণা করিতেছি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৬৭।

মুহাম্মদ মূসা

আল-কাসিম ইব্ন রাসূলিল্লাহ (স) (القاسم بن رسول الله ﷺ) ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম সন্তান। এইজন্য মহানবী (স)-এর কুন্য়া (উপনাম) ছিল আবু'ল-কাসিম। কাসিম জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে এবং বাল্যকালেই মক্কায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কাসিম বিচার বুদ্ধির বয়স হইবার পর মারা যান। যুবায়র ইব্ন বাক্কার নিজস্ব সনদসহ বর্ণনা করেন যে, খাদীজা (রা)-এর গর্ভে কাসিম জন্মগ্রহণ করেন এবং চলাফেরা করিতে পারেন এমন বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাতাদা-ও এই মত সমর্থন করেন। ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্'ইম-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাসিম মাত্র দুই বৎসর বয়সে মারা যান। আয্-যুহরীও তদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাসিম মাত্র সাত দিন জীবিত ছিলেন। আল-ফাদ্লু'ল-'আলা'ঈ বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নুবুওয়াত লাভের পর কাসিম সতের মাস জীবিত ছিলেন। য়ূনুস ইব্ন বুকায়র, যিয়াদাতু'ল-মাগাযী (زيادات المغازى)-তে নিজস্ব সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ননি'ল-হুসায়ন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়িয়া ভ্রমণ করিবার মত বয়সে কাসিম-এর মৃত্যু হইয়াছিল। কাসিম ইনতিকাল করিলে আল্-'আস ইব্ন ওয়া'ইল বলিল ঃ মুহাম্মাদ (স) নিঃসন্তান বা লেজকাটা হইয়া গেল। বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)-এর পুত্র কাসিম-এর মৃত্যুর পর আরব-এর বহু কাফির, মুশরিক ও কুরায়শ বংশের অনেকেই এই বলিয়া তিরস্কার করিল যে, মুহাম্মাদ-এর বংশ শেষ হইয়া যাইবে। ইব্ন আবী হাতিম সুদ্দী হইতে এবং বায়হাকী মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আরব দেশে কোন ব্যক্তির ছেলে সন্তান মারা গেলে 'আরববাসী তাঁহাকে আব্তার (লেজকাটা) বলিয়া নিন্দা করিত। এই সময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে সূরা আল-কাওছার নাযিল করিলেন, "আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার দান করিয়াছি। সুতরাং স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন; নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।"

কাহারও কাহারও মতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিতীয় পুত্র 'আব্দুল্লাহ (যাঁহার ডাকনাম ছিল তায়্যিব ও তাহির)-এর মৃত্যুর পর শত্রুরা এই কথা বলিলে এই সূরা নাযিল হয়। এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরেই কাসিম মারা যান। ইব্ন মাজা, আত-তায়ালিসী ও আল-হারাবী, ফাতিমা বিনতু'ল-হুসায়ন-এর সূত্রে এবং তিনি (ফাতিমা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাসিমের মৃত্যুর পর খাদীজা (রা) বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি দুগ্ধবতী জননী, কাসিমকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা দুগ্ধ পান শেষ করা পর্যন্ত জীবিত রাখিতেন তবে কতই না ভাল হইত ! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ জান্নাতেই তাহার দুগ্ধপান সম্পন্ন হইবে।" আবূ নু'আয়ম বলিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের কেহই কাসিমকে সাহাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। ইমাম বুখারী (র)-ও তা'রীখুল-আওসাত (تاريخ الاوسط) গ্রন্থে সুলায়মান ইব্ন বিলাল-এর সূত্রে হিশাম ইব্ন 'উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাসিম ইসলাম-পূর্ব যুগেই মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, পৃ. ২৬০ সংখ্যা ৭২৬৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১৮৮; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, ১খ, পৃ. ১৩৩; (৪) মুফ্তী শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, ৮খ, পৃ. ৮২৭; (৫) আবু'ল-বারাকাত 'আবদু'র-রা'উফ দানাপুরী, আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ১১।

এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

আল-কাসিম ইব্নু'র-রাবী' (القاسم بن الربيع) ঃ ইব্ন 'আবদি শামস্, ইহা আবু'ল-আস-এর প্রকৃত নাম বলিয়া অনেকের ধারণা। তিনি নিজের কুনয়া (উপনাম) আবু'ল-'আস-এ সর্বাধিক পরিচিত। অন্যান্য সূত্রে তাঁহার নাম লাকীত, মাহ্শাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২২০, সংখ্যা ৭০৫১।

রুহুল আমীন সিরাজী

আল-কাসিম ইব্নু'ল-হুসায়ন (القاسم بن الحسين) ঃ ইব্ন আহমাদ আল-খুওয়ারিযমী, খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ, ব্যাকরণবেত্তা, গ্রন্থকার ও কবি। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, উপাধি মাজদু'দ-দীন, তিনি সাদরু'ল-আফাদিল নামেই বিশেষ পরিচিত। জন্ম ৯ শাওওয়াল, ৫৫৫/১১৬০, আরবী ভাষা ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন খাওয়ারিযম-এর তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ফাকীহ ও ভাষাবিদ শায়খ বুরহানু'দ-দীন নাসির ইব্ন 'আবদি'স-সায়্যিদ আল-মুতার্রিযী (মৃ. ৬১৬/১২১৯)। শায়খ আল-কাসিম ফিক্হশাস্ত্রে হানাফী মাযহাবের এবং 'আকা'ইদে 'ইমাম আল-মাতুরীদীর অনুসারী ছিলেন।

তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানা বিশেষভাবে খ্যাত ঃ (১) 'আল্লামা যামাখশারীর আল-মুফাস্সাল গ্রন্থের ভাষ্য আত-তাদমীর; (২) আবু'ল-'আলা আল-মা'আররী-র সুবিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ সাক্তু'য-যানদ-এর ভাষ্য; (৩) আত-তাওদীহ, 'আল্লামা হারীরী-র আল-মাকামাত গ্রন্থের ভাষ্য; (৪) শারহু'ল-আনুমূযাজ; (৫) শারহু'ল-আব্নিয়া; (৬) আয-যাওয়ায়া ফি'ল-খাবায়া (الزوايا فى الخبايا) আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র; (৭) আল-মুহাসসাল ফি'ল-বায়ান, অলংকারশাস্ত্র।

'আল্লামা সুয়ূতী ও ঐতিহাসিক য়াকূত তাঁহার গভীর ভাষা জ্ঞান, কাব্য প্রতিভা, বাগ্মিতা, ধর্মনিষ্ঠা ও মহৎ চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ৬১৭/১২২০ সালে বাষট্টি বৎসর বয়সে এই মহান শায়খ তাতারীদের আক্রমণে শহীদ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জালালু'দ-দীন সুয়ূতী, বুগয়াতু'ল-উ'আত ফী তাবাকাতি'ল-লুগাবিয়্যীন ওয়া'ন-নুহাত (بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة), নির্ঘণ্ট; (২) 'আল্লামা আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-হানাফিয়্যা, মিসর, ১ম সং., ১৩২১ হি., পৃ. ১৫৩-৪।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

কাসিম কাদী যাদাহ্ আর-রূমী (قاسم قاضى زاده الرومى) ঃ তুরস্কের ৯ম/১৫শ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও কাদী। পিতার নিকট তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। শারী'আত সম্পর্কিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ছিলেন। প্রথমে তিনি এশীয় তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কাসতামুনী শহরের কাদী নিয়োজিত হন এবং পরে সুলতান মুহাম্মাদ খান ইব্ন মুরাদ খান তাঁহাকে তুরস্কের একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে আবার কাদী পদে নিয়োগ করা হয়।

সুলতান বায়াযীদ খান ইব্ন মুহাম্মাদ খান (১৪৮১-১৫১২ খৃ.) তাঁহাকে বুরসা শহরের কাদী নিযুক্ত করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে সুনামের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৩ রামাদান, ৮৯৯/১৪৯৩ তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-হানাফিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ১৫৪।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

কাসিম খান চিশ্তী (قاسم خان چشتى) ঃ (১৬১৩-১৭ খৃ.) বাংলার সুবাদার। ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঙ্গেরের শাসনকর্তা কাসিম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি সেপ্টেম্বর ১৬১৩ খৃ. সুবাদার নিযুক্ত হইলেও পরবর্তী বৎসর ১০২২ হি./ মে ১৬১৪ সালের পূর্বে কার্যভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরূপ যোগ্যতা, উদ্যম, সততা ও কর্মদক্ষতার অভাব ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন বদমেজাজী, ক্ষমতালোভী এবং দাম্ভিক। স্বজনপ্রীতির জন্যও তাঁহার শাসন আমল কলঙ্কিত ছিল, যেই কারণে তিনি অনেক অভিজ্ঞ কর্মচারীর সহযোগিতা, উপদেশ ও সহানুভূতি লাভ করেন নাই। ফলে তাঁহাকে নিজস্ব কতিপয় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে তাঁহার শাসনের তিন বৎসর কাল তিনি অভ্যন্তরীণ কলহ, বিদ্রোহ ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। নব অধিকৃত কামরূপের বিদ্রোহ দমনে তাঁহাকে বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়। আসাম ও আরাকানের বিরুদ্ধে অভিযানও চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

দীওয়ান মীরযা হুসায়ন বেগের সহিত কলহ তাঁহার শাসন আমলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীওয়ান ইতিপূর্বে সুবাদারের কিছু কাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং রাজধানী শহরের কোতওয়ালের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন। ইহাতে কাসিম খান কর্তৃক নিযুক্ত নূতন কোতওয়ালের সহিত দীওয়ানের বিবাদ অনিবার্য হইয়া উঠে। ফলে দুই জনের মধ্যে যেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতে সুবাদারের কয়েকজন লোক দীওয়ানের পুত্রগণ কর্তৃক হতাহত হইয়াছিল। কাসিম খান ব্যাপারটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আনিয়া দীওয়ান ও তাঁহার পুত্রদের কারারুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যস্থতায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেও দীওয়ানের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। এই ঘটনাটি তদন্ত করিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর সা'আদাত খান নামে তাঁহার এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তদন্তে কাসিম খান দোষী প্রমাণিত হওয়ায় দীওয়ানকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে এবং সুবাদারকে উপরন্তু এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।

কাসিম খান কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াও চরম অদূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই দুই রাজাকে ইসলাম খান যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া কাসিম খান তাঁহাদিগকে বন্দী করেন। ইহাতে উভয় রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ দমন করিতে বহু ক্ষতি সাধিত হয়। অতঃপর কাসিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন (নভেম্বর ১৬১৪)। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন মুগলদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কাসিম খান মুবারিয খানের অধীনে কাছাড়ে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন (১৬১৪ খৃ.)। মুবারিয খান প্রতাপগড় ও আশুবাতেকর দুর্গদ্বয় দখল করিয়া রাজা শত্রুদমনকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পর মুগল সেনাপতি মুবারিয খানের আকস্মিক ইনতিকালে তাঁহার কর্তব্যবিমূঢ় সহ-সেনাধ্যক্ষ মীরার

বাহাদুর সিলহটে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা সহজেই দুর্গ দুইটি পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। ইহাতে কাছাড়ে মুগল আধিপত্য বিনষ্ট হয়। শত্রুদমন বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর বীরভূম পাচেট, হিজলী ও চন্দ্রকোণার জমিদারগণ মুগলদের অধীনতা অস্বীকার করেন। কাসিম খান তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়াও বিশেষ কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পর আরাকানের মগ রাজা মেঙ্গবেঙ্গ-এর সন্ধীপের অধিপতি জলদস্যু সিবাস্টিয়ান গোওগ লেস ১৬১৪ খৃস্টাব্দে একযোগে ভুলুয়া অঞ্চল আক্রমণ করিলেন। তবে মগ রাজার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ফিরিঙ্গীরা দলত্যাগ করিলে এই আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। পরবর্তী বৎসর ১৬১৫ খৃ. আরাকানের রাজা পুনরায় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রাজা স্বয়ং জলাভূমিতে আটক পড়ায় মুগলদের হাতে বন্দী হন এবং সমস্ত লোকজন ও ধন-সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

কাসিম খান আসাম জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অসময়োচিত রণপ্রস্তুতি ও সেনাপতি আগা বারিক-এর অসতর্কতার জন্য এই অভিযান ব্যর্থ হয়। তাঁহার চট্টগ্রাম অভিযানও ব্যর্থ হয়। এইরূপে পরাজয়, অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফলে কাসিম খানের আমলে বাংলার মুগল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট তাঁহাকে ১৬১৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিলে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন এবং ইবরাহীম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জে. এন. সরকার (সম্পা.), History of Bengal, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), ২খ, ২৮৯-৯৮; (২) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ), পৃ. ১৪৫-৪৬; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১০৯-১০; (৪) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু'স-সালাতীন (আকবর উদ্দিন অনূদিত, বাংলার ইতিহাস), পৃ. ১৪৩ ও ৪৬০।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

কাসিম খান জুওয়ায়নী (قاسم خان جوینی) ঃ (১৬২৮-৩২ খৃ.), জুওয়ায়নের (বায়হাক বিলায়াতের অন্তর্গত) মীর মুরাদের পুত্র। মীর মুরাদ সেই স্থানের একজন নেতৃস্থানীয় সায়্যিদ ছিলেন। তিনি জুওয়ায়ন ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সাহসী ও দক্ষ তীরন্দায ছিলেন। বাদশাহ আকবর তাঁহাকে শাহযাদা খুররামের শিক্ষক নিয়োগ করেন। আকবরের রাজত্বের ৪৬তম বৎসরে তাঁহাকে লাহোরের বাখশী নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার পুত্র কাসিম খান ছিলেন একজন মার্জিত ব্যক্তি ও সাহিত্যসেবী। বাংলায় জাহাঙ্গীরের ভাইসরয় ইসলাম খান চিশ্তী ফারূকীর অধীনে কাসিম খান বাংলার প্রধান খাজাঞ্চী ছিলেন। তাঁহাকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য ইসলাম খান বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর কাসিম খান সৌভাগ্যক্রমে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভগ্নী মানীযাহ (منیزه) বেগমকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে কাসিম খানের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দরবারিগণ অনেক সময় রসিকতা করিয়া তাঁহাকে কাসিম খান মানীযাহ বলিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে আগ্রার সুবাদার নিযুক্ত হন। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম বৎসরে বাদশাহ তাঁহাকে পাঁচ হাযারী মান্সাবে উন্নীত করিয়া ফিদাঈ খানের স্থলে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করেন (৪ ফেব্রুয়ারী, ১৬২৮)। এইজন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কাসিম খান সম্রাটকে ৩৩টি হাতি, ২৭টি পার্বত্য ঘোড়া, ৪০ মণ মুসব্বর (Aloe)-সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার উপঢৌকন প্রেরণ করেন (১৬ জানুয়ারী, ১৬৩২)।

তাঁহার শাসনামলের প্রধান ঘটনা হুগলীতে অবস্থানরত পর্তুগীজদের দমন। য়ুরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম বাংলায় আসে। তাহারা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বন্দরের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ভাগীরথী নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে যখন সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি ঘটে তখন হুগলী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে গড়িয়া উঠে। সেইখানে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৫৭৮ খৃ. সম্রাট আকবর হুগলীর পর্তুগীজদের প্রধান পেড্রো-টেভারিজের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সেইখানে বসতি ও গির্জা নির্মাণ ও ধর্ম প্রচার করিবার অনুমতি দেন। ফলে হুগলী বন্দরে পর্তুগীজদের একটি বড় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।

নানা কারণে বাংলার জনসাধারণ ও শাসকশ্রেণী পর্তুগীজদের প্রতি রুষ্ট হয় এবং সুবাদার কাসিম খানের সময় তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

প্রথমত, পর্তুগীজরা বাণিজ্যের নামে ব্যাপকভাবে জলদস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে এবং আরাকানের মগ দস্যুদের সহিত মিলিয়া বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়শই লুটতরাজ করিত। ইহাদের সহিত হুগলীর পর্তুগীজদের যোগাযোগ থাকায় তাহারা স্থানীয় জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজরা জোরপূর্বক এই দেশের লোকদের খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাহজাহান যখন বাংলায় ছিলেন, তখন তিনি হুগলীতে পর্তুগীজদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন। শাহজাহান জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হুগলী বন্দরের নিকটবর্তী পরগণাসমূহ অবৈধভাবে বন্দোবস্ত লইয়া পর্তুগীজরা সেইখানকার দরিদ্র প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচার করিত। ভয় ও লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত, এমনকি য়ুরোপেও পাঠাইয়া দিত। তৃতীয়ত, হুগলীতে পর্তুগীজদের সংখ্যা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদের উন্নত ধরনের গোলাবারুদ ও শক্তিশালী নৌবাহিনী থাকায় হুগলীতে পর্তুগীজদের অবস্থান রাজনৈতিকভাবে শংকার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পর্তুগীজরা দাস ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। আফ্রিকা মহাদেশ হইতে দাস আমদানী ছাড়াও এই দেশের নর-নারীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া বাজারে দাস হিসাবে বিক্রি করিত। তাহাদের এইরূপ গর্হিত আচরণ, জলদস্যুবৃত্তি ও জোরপূর্বক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টার ফলে পর্তুগীজদের সম্পর্কে এই দেশীয় জনসাধারণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

উপরন্তু শাহজাহান যখন বাংলায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন হুগলীর পর্তুগীজদের আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পর্তুগীজ নেতা ম্যানুয়েল টেভারিজ ও মিপোলেয় রত্তরিগিজ তাহাদের নৌবহর লইয়া শাহজাহানের সহিত এলাহাবাদে অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু পর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাঁহাকে অভিযান বন্ধ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পর্তুগীজরা ফিরিবার পথে পাটনা হইতে মুমতায মহল বেগমের দুইজন পরিচারিকাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। এই সমস্ত কারণে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সুবাদার কাসিম খানকে নির্দেশ দেন। কাসিম খান খুব দক্ষতার সহিত হুগলীর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা করেন। তিনি তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে অবরোধ করিবার ব্যবস্থা করেন।

বর্ধমান হইতে একটি মুগল সেনাবাহিনী হুগলী ও সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী হলদিপুরে অবস্থান নেয়। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ হইতে আরও একটি সেনাদল ইহাদের সহিত যোগ দেয়। শ্রীপুর হইতে মুগল সেনাবাহিনী নদীপথে কলিকাতার নিকটবর্তী সাংকরাইল নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইহার পর নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়া হলদিপুরের সেনাবাহিনী নদীপার হইয়া সাংকরাইল নৌ-বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। সুবাদার কাসিম খান তাঁহার পুত্র 'ইনায়াতুল্লাহ খানের সহিত আল্লাহ য়ার খান ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষকে হুগলী প্রেরণ করেন এবং পর্তুগীজরা যাহাতে নৌপথে পলায়ন করিতে না পারে সেইজন্য ঢাকায় অবস্থিত মুগল নৌ-বহরের একাংশ চট্টগ্রামে পাঠান। অবশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় যে, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল হিজলী। মুগল বাহিনী ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন হুগলী আক্রমণ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই শহরের উপকণ্ঠ দখল করে। ইহার পর মুগল সৈন্যরা হুগলী শহর অবরোধ করিয়া রাখে এবং কামানের সাহায্যে শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে।

পর্তুগীজরা স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের দক্ষিণ ভারতের ঘাঁটি গোয়া ও অন্যান্য স্থানের পর্তুগীজদের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করিয়াছিল। কিন্তু কোন সাহায্য না আসায় তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। অবরুদ্ধ অবস্থায় হুগলীর অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। পর্তুগীজরা গোপনে নদীপথে পালাইতে চেষ্টা করিলে মুগলদের গোলাগুলীর আঘাতে ও নৌকাডুবিতে অনেকের মৃত্যু হয়। কিছুসংখ্যক নৌকা সাগরদ্বীপে পৌঁছাইতে সমর্থ হয় এবং সেখান হইতে পর্তুগীজরা জাহাজ যোগে গোয়ায় চলিয়া যায়। প্রায় তিনমাস কাল অবরোধের পর ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৬৩২ খৃ. মুগল সৈন্যরা হুগলী অধিকার করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক 'আবদু'ল-হামীদ লাহোরীর বিবরণ অনুসারে হুগলী যুদ্ধে দশ হাজার পর্তুগীজ নিহত হয় এবং ৪৪০০ জন বন্দী হয়। এক হাজার মুগল সৈন্য নিহত এবং পর্তুগীজরে হাতে বন্দী দশ হাজার ভারতীয়কে মুক্তি দেওয়া হয়।

হুগলী জয়ের কয়েক দিন পরই ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৬৩২ খৃ. (১০৪১ হি.) কাসিম কান রোগাক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন।

আগ্রায় আঙ্গাখানের বাজারে কাসিম খান একটি জামি' মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন (মা'আসিরু'ল-উমারা', ৩খ, ৭৮)। তিনি অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ-কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিরাট মুগল বাহিনী দ্বারা তাহাদিগকে প্রথম হইতেই কোণঠাসা করা, যাহাতে তাহারা বহিঃসমুদ্রে পালাইতে না পারে এবং বাহির হইতে নৌকাযোগে যাহাতে কোন সৈন্য সরবরাহ না আসিতে পারে তাহা নিশ্চিত করা। দেশীয় সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে য়ুরোপীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ তাঁহার যুদ্ধ কৌশল নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু'স-সালাতীন (আকবর উদ্দিন অনূদিত, বাংলার ইতিহাস), পৃ. ৪৮৫-৮৭; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ১১০; (৩) জে. এন. সরকার (সম্পা.), History of Bengal (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), ২খ, ৩১৬-২৮।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

কাসিম নানূতূবী (দ্র. মুহাম্মাদ কাসিম নানূতূবী)

কাসিম পাশা (قاسم پاشا) ঃ আওলিয়া, ৯ম/১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উছমানী কর্মকর্তা। ধারণা করা হয় যে, তিনি প্রখ্যাত আলবেনীয় অভিজাত তোদোর মুযাক (Todor Muzak)-এর পুত্র ছিলেন ('আশিক পাশা যাদে, সম্পা. 'আলী, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., ১৯১; নেশরী, সম্পা. Taeschner, ১খ, ২৩০; H. Inalcik, Fatih devri uzere tetkikler ve vesikalar, আঙ্কারা ১৯৫৪ খৃ., ১৬২)। 'উছমানী সরকারী দফতরে নিয়োগের জন্য কবে তাঁহাকে দেওশিরমেতে কর্তৃক আনীত হয় তাহার সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তবে যেহেতু তিনি ২য় মুহাম্মাদ-এর রাজত্বকালে খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করেন, তাই মনে হয় ১ম মুহাম্মাদের রাজত্বকালের শেষের দিকে এই ঘটনা ঘটে। তিনি যে সমস্ত পদে কার্যরত ছিলেন তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল রূমেলির বেগলেরবেগী (بیگلر بیگی) পদ; তিনি এদিরনে (Edirne) শহরে তাঁহার জীবনের একাংশ কাটাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ৮৮৩/১৪৭৮ সালে তিনি তুনজা নদীর তীরে সেলখানে অঞ্চলের নিকটে একটি গম্বুজযুক্ত মসজিদ, একটি পান্থশালা ('ইমারেত) এবং একটি জোড়া হাম্মাম নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন [হিবরী, আনীসু'ল-মুসামিরীন, সম্পা. S. Ilgurel, অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. সন্দর্ভ, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ৩৩, ৪১, ৬৭; এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ১ শা'বান, ৮৮৩/২৮ অক্টোবর, ১৪৭৮ তারিখের ওয়াকফিয়্যার জন্য (দ্র.) Topkapi Sarayi Muzesi Arsivi, N. E. ৭৭৪৪/খ]। কাসিম পাশা ৮৯০/১৪৮৫ সালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার নির্মিত মসজিদের নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এদিরনেতে তিনি ইতোপূর্বে দারবীশগণের জন্য একটি বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এই ঘটনাটির সহিত তাঁহার 'আওলিয়া' উপাধিটি সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) Oral Onur, Edirne kitabeleri, ইস্তাম্বুল ১৯৭২ খৃ., ১২৯; (২) Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ., ৬৬, ৬৭, ১৪৫; (৩) M. Tayyib Gokbilgin, XV-XVI asirlarda Edirne ve Pasa livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ৪৮ (নং ৫৮), ৪৩৪ (নং ৬৮৮), ৫২৪; (৪) Basbakanlik Arsiv Genel Mudurlugu, Topu-tahrir defteri, নং ৩৭০-পৃ. ৫৪৬।

C. Orhonlu (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম পাশা (قاسم پاشا) ঃ গুযেলজে মহান সুলতান সুলায়মানের রাজত্বকালে 'উছমানী উযীর; তাঁহার নামে ইস্তাম্বুলের একটি মহল্লার নামকরণ করা হয়। ঐতিহাসিক নথিপত্রে তাঁহার জীবনী সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য অত্যন্ত অপ্রতুল ও বিক্ষিপ্ত। তাঁহার সম্পর্কে প্রথম ঐতিহাসিক নির্দেশনা পাওয়া যায় মারজ দাবিক-এর বিজয়ের পর হামা অঞ্চলের সানজাক বেগরূপে তাঁহার নিযুক্তি প্রসঙ্গে। এই পদে নিযুক্ত থাকা কালে কাসিম পাশা জনৈক বিদ্রোহী আরব আমীর ইব্ন হাফ্শ-এর বিদ্রোহ দমন করেন। সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করিলে কাসিম পাশা আনাদোলু বেগলেরবেগী পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি রোডস-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে (৯২৮/১৫২২) অংশগ্রহণ করেন; ৯৩০/১৫২৪ সালে তিনি মিসরের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি অকৃতকার্য প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়, কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁহাকে প্রথমে কাপুদান-ই দারয়া (নৌ-বাহিনীর অধিকর্তা) ও পরে ৯৩২/১৫২৬ খৃ. হাঙ্গেরীয় অভিযানের সময় ইস্তাম্বুলের প্রশাসক (মুহাফিজ) নিযুক্ত করা

হয়। ইহার পরবর্তীকালে তিনি রুমেলী বেগলেরবেগী এবং ৯৩৫/১৫২৯ সালে তৃতীয় উযীর নিযুক্ত হন। এই পরিস্থিতিতে তিনি একই বৎসর ভিয়েনা অবরোধে এবং ৯৪১/১৫৩৫ সালে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার মর্যাদা অবশ্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত উচ্চ অবস্থানে স্থায়ী হয় নাই। অজ্ঞাত কারণে তাঁহাকে তৃতীয় উযীরের পদ হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং ৯৪৪/১৫৩৭ সালের পূর্বে তাঁহাকে তুলনামূলকভাবে কম মর্যাদাসম্পন্ন পদে, মোরিয়া অঞ্চলের সানজাক বেগরূপে নিযুক্তি প্রদান করা হয়। ৯৪৮/১৫৪১ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত কাসিম পাশা এই পদে বহাল থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। ইহাতে অনুমিত হয় যে, তখনও পর্যন্ত তিনি সুলতানের অসন্তুষ্টি হইতে মুক্তি পান নাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার মৃত্যুর সাল উল্লেখ করেন নাই, সম্ভবত তিনি ৯৫৯/১৫৫২ সালের পরে ইনতিকাল করেন। যদিও তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক গ্রন্থকারগণ দাবী করেন যে, তাঁহাকে গেলিবোলুতে (গ্যালিপোলি) দাফন করা হয়। তাঁহার সমাধির আজ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কাসিম পাশা মর্যাদার দিক দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিক ছিলেন না। সরকারী পদে তাঁহার উন্নতি ছিল অতি দ্রুত, কিন্তু তাঁহার পতন ছিল সমানভাবে আকস্মিক ও দ্রুত। অবশ্য নির্মাণ এবং সেবামূলক কার্য উভয়ের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। তৃতীয় উযীররূপে তাঁহার নিযুক্তি কালে ইস্তাম্বুলের যে অংশটি তাঁহার নাম বহন করে তিনি তাঁহার পুনঃনির্মাণ কার্য শুরু করেন। একই সময়ে তিনি স্থপতি সিনান-কে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা, একটি ধর্মীয় ইমারত, একটি স্নানাগার নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন তিনি বোযবুরুন অঞ্চলে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নাফীস খানুম নামে তাঁহার এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁহার পিতার নামানুসারে প্রদত্ত নগরীর অংশে একটি মসজিদ ও একটি বিদ্যালয় নির্মাণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত ঃ (১) সিজিল্ল 'উছমানী, ৪খ, ৪৬ প. (ভুলবহুল ও অসম্পূর্ণ); (২) Geofroy, L'Estat de la Court dn Grand Ture, Paris 1546, ১০ প.; (৩) Gniml Postel, La Tierce Partic des Orientales Histoires, Poitiers, 1560, ৬১ প.; (৪) দা. মা. ই., ১৬/১খ, ৩৭-৮।

F. Sumer (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম পাশা (قاسم پاشا) ঃ জাযারী, ৯ম/১৫ শতাব্দীর 'উছমানী কবি ও কর্মকর্তা। তিনি যে পরিবারের সদস্য ছিলেন তাহা মিসর হইতে আগমন করে এবং 'উছমানীদের অধীনে কার্য গ্রহণ করে। তাঁহার পিতা মুহাম্মাদ জাযারী রাজকীয় দীওয়ানে কর্মরত ছিলেন এবং ৮৬৯/১৪৬৪-৫ সালে নিশানজী পদে অধিষ্ঠিত হন (কুল্লিয়াত-ই দীওয়ান-ই কাবুলী, সম্পা. ঈ. হিকমেত এরতায়লান, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০৪ প.)। তাঁহার পিতার ন্যায় কাসিম নিজেও দীওয়ান-ই হুমায়ূন-এ প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন দফ্তরে চাকুরী করেন। তিনি কালক্রমে দফতরদার-এর পদে উন্নীত হন। তিনি কিছু সময়ের জন্য ২য় বায়াযীদের (তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বে) সহিত আমাস্য়াতে অবস্থান করেন ও তাঁহার দাফতারদাররূপে কার্য সম্পাদন করেন। জাযারী কাসিম, ৮৮৬/১৪৮১ সালে নিশানজী পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং উযীরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই পদে তিনি তিন বৎসর বহাল ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কিছু কালের জন্য স্যালোনিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ৮৮৭/১৪৮৫ সালে ইনতিকাল করেন এবং বুরসায় আমীর সুলতানের কবরের নিকটে তাঁহার নিজের নির্মিত মাদ্রাসার পার্শ্বে তাহাকে দাফন করা হয়।

জাযারী কাসিম পাশা তাঁহার কালেই একজন যোগ্য কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 'সাফী' কবিনাম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতাবলী একটি দীওয়ান (সংকলন)-এ সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। উহার কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। অবশ্য তাঁহার পদ্যে বর্ণিত আলোচনাসমূহের একটি অসম্পূর্ণ ভাষ্য ইস্তাম্বুলের 'আলী আমিরী গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (মানবুম এসেরলের, নং ১০০০/১)। 'আশিক চেলেবি (দ্র.)-র বক্তব্য অনুসারে তিনি আহমাদ পাশা (দ্র.) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তিনি যথার্থ গাযাল রচনা করিয়াছিলেন (সম্পা. G. M. Meredith-Owens, লন্ডন ১৯৭১ খৃ., পৃ. ২১৪ ক)।

তিনি কতিপয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন, যেমন ঃ ইস্তাম্বুলের চাগালোগলু এলাকায় একটি মসজিদ (Istanbul vakiflari tahrir defteri, ৯৫৩/১৫৪৬ তারিহলি, সম্পা. O. L. Bar-kan এবং E. H. Ayverdi, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৫৩), বুরসা শহরে আমীর সুলতান অঞ্চলে একটি মাদরাসা ও একটি হাম্মাম (guldeste, ৬৬); কেফে এলাকায় একটি মসজিদ (Basbakanlik Arsiv Genel Mudurlugu, Kefe tahrir defteri, নং ৩৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গ্রন্থপঞ্জীমূলক রচনাবলীতে "কাসিম পাশা" নামধারী তিন ব্যক্তির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে ঃ জাযারী, আওলিয়া ও কোজা (শেষোক্ত জনের জন্য দ্র. 'আতাঈ', ১০৪); (২) দেখা যায় যে, মোহাম্মদ ছুরায়্যা, জাযারী কাসিমকে ৯৫০ হিজরী পর্যন্ত জীবিত দেখাইয়াছেন (So, ৪খ, ৪৭; তু. খাওয়ানসারী, হাদীকা, ১খ, ৭৯, ৮০, ২৮০)। সেহী-এর মতে (২৪), জাযারী কাসিম স্যালোনিকায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

নিম্নোক্ত রচনাবলীতে অতিরিক্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; (৩) 'আশিক পাশা-যাদে, সম্পা. 'আলী, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ খৃ., পৃ. ১৯২, ১৯৩, (৪) নেশরী, সম্পা. Taeschner, ১খ, ২৩১; (৫) সা'দু'দ-দীন, তাজু'ত-তাওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৭৯ হি. ১খ, ২১৬; (৬) কোজা হুসায়ন, বাদায়ী আল-ওয়াকায়ি সম্পা. I. S. Tveritinova, মস্কো ১৯৬১ খৃ., ২খ, পত্রক ৪১৪ক; (৭) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত-নামাহ, ১খ, ৩৩৫, ৩৪০, ২খ, ১৭; (৮) ম. তায়্যিব গোকবিলগিন, XV-XVI. asirlarda Edirne ve Pasa livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১৫৩, ৪৩৩, ৪৩৪; (৯) কোয়ুনলুওগলু মেমদুহ তুরগুত, Iznik ve Bursa Tarihi, বুরসা ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১৫৫, ১৬৪, ১৯৬।

C. Orhonlu (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিম ফারিশতা (দ্র. ফিরিশ্তা)

কাসিমিয়্যা (قاسمية) ঃ ১১শ/১৭শ এবং ১২শ/১৮শ শতকের 'উছমানী মিসরের একটি নব্য-মামলূক পরিবার ও উপদল। যাঁহার নামানুসারে ইহা গঠিত সেই দাফ্তারদার কাসিম বে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত তিনি ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যদিও অপর একটি কিংবদন্তীতে আল-জাবারতী তাঁহাকে সুলতান ১ম সেলীমের শাসন আমলের ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই পরিবারটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু বস্‌নীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয় এবং ইঁহারা ১১শ/১৭শ শতকের মধ্যভাগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যকর ও প্রভাবশালী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন; ইঁহাদের ক্ষমতার উৎস ছিল বহুকালের সংগৃহীত ধন-দৌলত এবং প্রাচীনতর স্থানীয় উপদলীয় গোষ্ঠী হারাম-এর সহিত সম্পাদিত একটি মৈত্রীচুক্তি। একইভাবে ইঁহাদের বিরোধী যু'ল-ফাকারিয়্যা (দ্র.) গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বী সা'দ উপদলের সহিত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। দুই উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ প্রকাশ্য রূপ লাভ করে ১০৫৭/১৬৪৭ সালে, যখন 'উছমানী শাসনকর্তা কাসিমিয়্যাগণের দুই নেতা কানসাও বে এবং মামায় বে-এর সহযোগিতায় শক্তিশালী আমীরু'ল-হাজ্জ রিদওয়ান বে আল-ফাকারীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

যু'ল-ফাকারিয়্যাগণ অবশ্য একটি পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটাইতে সমর্থ হন এবং ইহার যে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তাহাতে কানসাওহ এবং মামায়কে হত্যা করা হয়। ১০৬৬/১৬৫৬ সালে রিদওয়ান-এর মৃত্যুর পর তাহাদের নেতা বস্‌নীয় আহমাদ বে-এর নেতৃত্বে কাসিমিয়্যাগণের ভাগ্য পুনরায় ক্রমে ক্রমে সুপ্রসন্ন হইতে থাকে। ১০৭১/১৬৬০ সালে যু'ল-ফাকারিয়্যাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আহমাদ বে শাসনকর্তা গুরজু মুসতাফা পাশাকে জোরালো সমর্থন প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকারপ্রাপ্ত তিনজন বে-কে হত্যার ব্যাপারে দায়ী ছিলেন। তিনি নিজে পরবর্তী শাসনকর্তার চক্রান্তে নিহত হন (১০৭২/১৬৬২)। ইহার পর হইতে ১২শ/১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কাসিমিয়্যা ও যু'ল-ফাকারিয়্যাগণের মধ্যে সংঘটিত উপদলীয় সংঘাত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, ১১২৩/১৭১১ সালে কায়রোতে অবস্থানরত 'উছমানী সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মধ্যে একটি সংঘর্ষ ঘটে। জেনিসারী ও 'আযাব ('আযেবান)-গণের মধ্যকার এই সংঘর্ষে মামলূক উপদল জড়াইয়া পড়ে। কাসিমিয়্যাগণ 'আযাবগণকে সমর্থন প্রদান করে। এই সেনাবিদ্রোহে তাহাদের বিজয় লাভের মাধ্যমে তাহারা মিসরে তাহাদের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু একই সঙ্গে তাহা যু'ল-ফাকারিয়্যাগণের সহিত তাহাদের বংশানুক্রমিক তিক্ত প্রতিশোধ স্পৃহা পুনরায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। কাসিমিয়্যাগণের নেতা ইসমাঈল বে ইব্‌ন ঈওয়ায বে গোত্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারীরূপে (আর-রি'আসা) "কায়রোর সেনাপ্রধান" খেতাবের অধিকারী ছিলেন (আমীর মিসর)। এই পদবীটি অধিকতর সুপরিচিত পদবী শায়খু'ল-বালাদ-এর সমার্থক।

ঈওয়াযিয়্যাপন্থী ইসমা'ঈল-এর অনুসারীবৃন্দ ও অপর একটি বিরোধী কাসিমী পরিবার শানাবিয়্যাগণের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের ফলে ১১৩৬/১৭২৪ সালে ইসমা'ঈল নিহত হন এবং ইহার ফলে যু'ল-ফাকারিয়্যাগণ পুনরায় আধিপত্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করে। ১১৪২/১৭৩০ তাহারা চূড়ান্তভাবে কাসিমিয়্যাগণের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। এই গোষ্ঠীর যে সকল সদস্য রক্ষা পায় তাহারা হাওওয়ারা-এর শায়খ হুমাম (দ্র.)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। শায়খ হুমাম এই সময়ে উত্তর মিসরে ক্ষমতাশালী ছিলেন। কাসিমিয়্যাগণ ক্রমশ তাঁহার উপজাতির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। উল্লেখ করার মতো শেষ কাসিমী ব্যক্তিত্ব সালিহ বে, যিনি ইমাম ও 'আলী বে (দ্র.)-এর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'আলী বে ১১৮২/১৭৬৮ সালে তাঁহার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ যু'ল-ফাকারিয়্যা প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য; তৎসহ নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী সংযোজনীয় ঃ

(১) ইবরাহীম ইব্‌ন আবী বাক্‌র আস্‌-সালিহী আল-হাম্বালী, তারাজিমু'স-সাওয়া'ইক ফী ওয়াক'আতি'স-সানাজিক, Bibiliotheque nationale, প্যারিস, MS. arabe ১৮৫৩ খৃ.। ইহাতে ১০৭১/১৬৬০ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে; (২) P. M. Holt, The beylicate in Ottoman Egypt during the seventeenth century, in BSOAS, ২৪/২খ, (১৯৬১ খৃ.), ২১৪-৪৮; (৩) ঐ লেখক, Al-Jabarti's indtroduction in the history of Ottoman Egypt, in BSOAS, ২৫/১খ, (১৯৬২ খৃ.), ৩৮-৫১; (৪) ঐ লেখক, The career of Kucuk Muhammad (১৬৭৬-৯৪), in BSOAS, ২৬/২খ, (১৯৬৩ খৃ.), ২৬৯-৮৭; (৫) ঐ লেখক, Egypt and the Fertile Crescent, ১৫১৬-১৯২২, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ., ৮০-৯৫।

P. M. Holt (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিমভ (قاسموف / Kasimov) ঃ রিয়াযান (সোভিয়েট ইউনিয়ন) প্রদেশের একটি জেলার প্রধান শহর; ইহা একটি খানাত-এর রাজধানী ছিল এবং খানাতটির সার্বভৌম শাসকগণ রুশ প্রথানুযায়ী 'জার' অথবা 'জারেভিচ' উপাধি ব্যবহার করিতেন। এই সকল শাসকের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকের কৌতূহলের বিষয়।

কাসিমভ খানাত প্রতিষ্ঠিত হয় ৮৫৬/১৪৫২ ও ৮৬০/১৪৫৬ সালের মধ্যেই। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাসিম ছিলেন কাযান-এর খান উলুগ মুহাম্মাদ-এর পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা মাহমূদেক ৮৫০/১৪৪৬ সালে তাঁহাকে তাঁহার উলুস (উপজাতি) হইতে বিতাড়িত করিলে কাসিম মস্কোতে পলায়ন করেন এবং তথায় গ্রান্ড প্রিন্স ২য় ভাসিলির অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ভাসিলি তাঁহাকে ক্ষুদ্র শহর গরোদেত্‌স (অথবা গরোদক মেশচেরস্কি) উপহার দেন। এই শহরটিই পরে তাঁহার সম্মানে কাসিমভ (তাতার ভাষায় খান কারমান) নাম ধারণ করে। ইহা ছিল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—মস্কোর করদ একটি সামন্ত তাতার রাজ্য। মস্কোর জার ইহার খানদের নিযুক্তি প্রদান এবং চূড়ান্ত অনুমোদন দান করিতেন। মস্কোর সহিত তাহাদের ব্যবহারিক সম্পর্কের তুলনা করা যায় ক্রিমিয়ার খানবৃন্দ তাহাদের 'উছমানী পাদিশাহ্‌-এর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের সহিত। কিন্তু ইহাদের স্বায়ত্তশাসনের পরিসর ছিল অধিকতর সংকীর্ণ। বস্তুত খানাত-এর অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন 'প্‌সোল- স্কিয়ে প্রিকায" উপাধিধারী একজন রুশ 'ভয়োদা' (Voyvoda বা নওয়াব)। খানবৃন্দ মস্কো হইতে নির্ধারিত মাসোহারা লাভ করিতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে য়াসাক সংগ্রহ করিতেন। অধিবাসীদের মধ্যে ছিল প্রধানত ফিন, মর্দভিন এবং মেশ্চেরা গোষ্ঠীর লোক ও কিছু সংখ্যক রুশ ঔপনিবেশিক; মুসলিম তাতারগোষ্ঠী ছিল সংখ্যালঘু। কাসিম একজন মুসলিম ছিলেন; কিন্তু তিনি মস্কোর গ্রাণ্ড প্রিন্সকে বিশ্বস্ততার সহিত সেবা করিতেন; এই প্রথম কোন চেঙ্গীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি গ্রাণ্ড প্রিন্সের আধিপত্য স্বীকার করেন। ইহার পর হইতে বরাবরই নিজের উলুস হইতে বিতাড়িত বিভিন্ন চেঙ্গীয় বংশীয় রাজন্যের জন্য আশ্রয় স্থলরূপে কাসিমভ ব্যবহৃত হয়। কাযান ও সোনালী বাহিনী (Golden Horde)-এর বিরুদ্ধে রুশগণ তাহাদের স্বধর্মী ও নিকটাত্মীয় এই সকল খানদের ব্যবহার করে।

৮৭২-৩/১৪৬৮ সালে কাযানে মাহমূদেক-এর ইনতিকাল হইলে কাসিম একটি মস্কো বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করিয়া কাযানে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হন। তাঁহার পুত্র দানিয়ার ৮৭৩/১৪৬৯ সালে তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন ও ৮৯১/১৪৮৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গোলডেন হোর্ডের নেতা আহমাদ খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে মস্কো-বাহিনীর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৩য় ইভান, খান নূর দাওলাত গিরায়কে কাসিমভ-এর উলূস গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। শেষোক্ত খান ৮৮৩/১৪৭৮ সালে ক্রিমিয়া হইতে বিতাড়িত হন। নূর দাওলাত ৯০৩/১৪৯৮ সালের মাঝামাঝি তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাসিমভে রাজত্ব করেন। কাসিমের ন্যায় তিনিও মস্কোর গ্রাণ্ড প্রিন্সের একজন অনুগত মিত্র ছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের পর কিছু সময়ের জন্য কাসিমভের সিংহাসন তাঁহার পুত্রদ্বয় সাতিলগান ও জানায়-এর অধিকারে ছিল। আনুমানিক ৯১৮/১৫১২ সালে গিরায় বংশকে পরিবর্তন করিয়া অপর একটি চেঙ্গীযীয় শাখাকে নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের প্রথম শাসক ছিলেন শায়খ আওলিয়্যার [ওরদা বংশোদ্ভূত, বাতু-এর ভ্রাতা খান কুচুক মুহাম্মাদের পৌত্র এবং 'শ্বেত' (বা 'নীল') বাহিনীর প্রথম খান ও খান সায়্যিদ আহমাদ-এর জ্ঞাতি ভ্রাতা]। ৯২২/১৫১৬ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ 'আলী (রুশ সূত্রসমূহে 'শিগালী'রূপে উদ্ধৃত) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১০ শাওওয়াল, ৯৭৪/২১ এপ্রিল, ১৫৬৭ সালে তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি সাময়িক বিরামসহ কাসিমভ-এর খান পদে ক্ষমতাসীন ছিলেন।

৯২৭/১৫২১ ও ৯৫৯/১৫৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল ছিল কাযান উলূস-এর মালিকানা লাভের জন্য মস্কো ও ক্রিমিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়।

এই সংঘাতের সময় শাহ 'আলী অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দুইবার রুশগণ তাঁহাকে কাযানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে ৯২৫/১৫১৯ ও ৯২৭/১৫২১ সালের মধ্যে এবং পুনরায় ৯৫৩/১৫৪৬ সালে। তিনি যে সময়ে কাযানে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাসিমভ-এর শাসনভার প্রদান করা হয় তাঁহার ভ্রাতা জান 'আলীকে ৯৩৮/১৫৩২ এবং ৯৪১/১৫৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কাযান-এর খান পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি এক গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হন।

শাহ 'আলী পুত্রহীন অবস্থায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার দূর সম্পর্কের ভ্রাতা সায়্যিন বুলাত। তিনি ছিলেন গোল্ডেন হোর্ডের অধিনায়ক খান আহমাদের প্রপৌত্র। ৯৮১/১৫৭৩ সালে অর্থডক্স খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সিমেয়ন বেকবুলাতোভিচ নাম গ্রহণ করিয়া ৯৯১/১৫৮৩ সাল পর্যন্ত কাসিমভে রাজত্ব করেন। ৯৮২/১৫৭৪ সালে জার "ভয়ানক ইভান" (Ivan the terrible) তাঁহাকে নিজের স্থলে "সমগ্র রাশিয়ার জার ও গ্রান্ড প্রিন্স"রূপে ঘোষণা করেন। পরবর্তী দুই বৎসরকাল ছিল রুশ ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও তুলনাহীন। একজন চেঙ্গীয বংশোদ্ভূত প্রিন্স এই সময়ে রাশিয়া শাসন করেন।

সিমেয়ন বেকবুলাতোভিচ ১৬১৬ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন; কিন্তু ৯৮১/১৫৭৩ ও ৯৯১/১৫৮৩ সালের মধ্যে কাসিমভের শাসকরূপে তাঁহার স্থলে অপর একজন চেঙ্গীয প্রিন্স মুসতাফা 'আলীকে নিযুক্ত করা হয়। তিনিও গোল্ডেন হোর্ডের অধিনায়ক খান আহমাদ-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান থাকাকালে অপরাপর চেঙ্গীয বংশোদ্ভূত প্রিন্সগণ কাসিমভের সিংহাসন দখল করেন ঃ প্রথমে কিরগিয কাযাক বংশের খানগণের পরিবারের সদস্য উরাস মুহাম্মাদ সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৬১০ সালে নিহত হন; ইহার পর সিংহাসন লাভ করে রোমানভগণের অধীনে সাইবেরিয়ার সর্বশেষ খান কুতুম-এর উত্তরসুরিগণ। তাঁহার পৌত্র আরসলানকে ১০২৩/১৬১৪ খৃ. কাসিমভের 'জার'রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র সায়্যিদ বুরহান ১০৩৬/১৬২৭ সালের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই প্রিন্স ভাসিলি নামে ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৬৭৮ সালে আকস্মিকভাবে তাঁহার ইনতিকাল ঘটা পর্যন্ত তিনি শাসন করেন। কাসিমভ-এর সার্বভৌম শাসকগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শেষ সদস্য। তাঁহার ইনতিকালের পর ১০৯২/১৬৮১ সাল পর্যন্ত তাঁহার মাতা ফাতিমা সুলতানাকে কাসিমভ-এর 'প্রিন্সেস'রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি তখনও পর্যন্ত মুসলমান ছিলেন। ইহার পর শহরটি প্রশাসনিক দিক হইতে রাজকীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Velyaminov-Zernov, Issledovaniya Kasimovskikh tsaryakh io, tsarevicakh, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৩-৮৭ খৃ. ৪খণ্ডে; (২) N. I. Shishkin, Istorya goroda Kasimova s drevneyshihk vremen[2], রিয়াযান ১৮৯১ খৃ.; (৩) Zambaur, Manuel, ২৪৯; (৪) Resid Rahmeti Arat, Kasim Hanligi রচিত প্রবন্ধ, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, ৩৮০-৬।

A. Bennigsen (E.I.[2])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

কাসিয়ূন (قاسيون) ঃ দামিশকের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়। ইহার চূড়াসমূহ কঠিন প্রস্তরময়। বৃষ্টির ধারায় ইহাদের উপরিভাগ সমতল হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগ (অর্থাৎ মেরুদণ্ড) অনুরূপ কঠিন প্রস্তর দ্বারা গঠিত। এই কঠিন অংশের চতুষ্পার্শ্বে নরম চুনা পাথরের আস্তরণ রহিয়াছে যাহা দামিশকের দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু হইয়া আসিয়াছে এবং ইহার গায়ে কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। কৃত্রিম উপায় ব্যতীত এখানে রোপণ সম্ভব নহে। পাহাড়ের কেবল একটি অংশে বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে।

নাহ্‌র য়াযীদ এই পাহাড় হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার নিম্নের সমতল ভূমিতে পানি সরবরাহ করে যাহা নাহ্‌র য়াযীদ-এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পাহাড়ের এই সমতল ভূমি শ্যামল-সবুজ এবং সুসংগঠিতভাবে এইখানে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

পাহাড়ের মধ্যবর্তী উচ্চতায় যে মালভূমি অবস্থিত উহার অধিকাংশই শুষ্ক। কেবল নাহ্‌র য়াযীদ সংলগ্ন এলাকা ইহার ব্যতিক্রম। অতএব পাহাড়ের এই অংশেই দায়র মুররান, মাগারাতু'দ-দাম ওয়া'ল-জূ' (রক্ত-ক্ষুধার গুহা) এবং কাহ্‌ফ জিবরীল প্রভৃতি গুহা অবস্থিত।

দায়র মুররান-এর কারণেই ১ম শতাব্দীতে এই পাহাড় প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতএব উমায়্যা খলীফাগণ সাগ্রহে এইখানে আগমন করিতেন। খলীফা হারূনুর-রাশীদ ও খলীফা আল-মা'মূনও নিজ নিজ শাসনামলে যখন দামিশকে আগমন করিয়াছিলেন তখন এখানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। খলীফা আল-মা'মূন মিন্‌লিন হইতে এই দায়র অভিমুখে একটি খাল (নাহ্‌র) খনন করিয়াছিলেন এবং এই পাহাড়ের উপর মহাকাশের

নক্ষত্ররাজির গতিবিধি পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত একটি মানমন্দিরও স্থাপন করিয়াছিলেন। খুমারওয়ায়হ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন তূলূনও দায়র মুররান-এর নিকট একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তিনি এইখানেই নিহত হন। ফাতিমীদের যুগে দামিশকের ওয়ালী (গভর্নর)-গণ এই পাহাড়ের উপর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই অবস্থান করিতেন।

অতঃপর ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে এই পাহাড়ের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। ইহার পৃষ্ঠোপরি আস-সালিহিয়া বসতি গড়িয়া তোলা হয়। কুদামার বংশধরগণ এই শহর আবাদ করেন। ইহারা ছিলেন কুদ্স-এর অধিকারী। ক্রুসেড যোদ্ধাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা দামিশকে পালাইয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর অল্পকালের মধ্যেই ইহার লোক-বসতি অনেক বৃদ্ধি পায়। এইখানে বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকিয়্যা, মুসাফিরখানা ও খানকাহ নির্মিত হয় এবং কাগজ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হয়।

কাসিয়ূন পাহাড়ের উপর দুইটি খৃস্টান মঠ (কুব্বা) পরিদৃষ্ট হইত; তন্মধ্যে কুব্বাতু'ন-নাসর ছিল পর্বতের শীর্ষদেশে। সিরিয়ার নাইব বারমূক ৮৭৭/১৪৭২ সালে সাওয়ারীক বিজয়ে আনন্দিত হইয়া স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা ছিল ১১৪৮ মিটার। দ্বিতীয় মঠটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহাকে কুব্বা সায়্যার বলে। কুব্বাটি মামলূক আমীর সায়্যার আস-শুজাঈর সহিত সম্পর্কিত। ইহার উচ্চতা প্রথমটির তুলনায় কম।

প্রথম কুব্বাটি বিগত যুদ্ধে সামরিক কার্যক্রমের কারণে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কুব্বাটি অদ্যাবধি বর্তমান।

এখানে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত দিক হইতে কাসিয়ূন-এর গুরুত্ব বর্ণনা করা সমীচীন মনে হয়। ইহার সম্পর্কে বহু বিবরণ ও কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন কথিত আছে যে, পাহাড়ের পাদদেশে যেই ঘর রহিয়াছে উহার মধ্যে মানব জাতির পিতা হযরত আদাম ('আ)-এর একটি আবাস ছিল। মাগারাতু'দ-দাম-এ কাবীল স্বীয় ভ্রাতা হাবীলকে হত্যা করিয়াছিল। কাহ্ফ জিবরীল-এ ফেরেশতাগণ আগমন করিয়া হযরত আদাম ('আ)-এর খেদমতে তাঁহার পুত্রের ইনতিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

পাহাড়ের পূর্ব অংশে যেই সমতল ভূমি বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া আছে সেইখানে ইব্রাহীম ('আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং পশ্চিম দিকের উচ্চ মালভূমিতে হযরত 'ঈসা ('আ) এবং তাঁহার সম্মানিত মাতা য়াহূদীদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেন।

হযরত ইব্রাহীম, মূসা, 'ঈসা, আয়্যূব ('আ) সকলেই এইখানে 'ইবাদাত করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক নবী এইখানে সমাহিত আছেন এবং আসহাব কাহ্ফও এইখানে চিরনিদ্রায় শায়িত।

এই পাহাড়ের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যেই সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির প্রায় সকলই মাওদূ' (অলীক)। কতকগুলি য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত এবং কতকগুলি বানূ উমায়্যার খিলাফাত আমলে দামিশকের ফযীলত প্রকাশের উদ্দেশ্যে মনগড়াভাবে রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান (সম্পা. Wustenfeld), ১খ, ৫৫৭, ২খ, ৫৮৮, ৩খ, ২৬২, ৪খ, ১২-১৫; (২) ইব্ন তূলূন, আল-কালা'ইদু'ল-জাওহারিয়্যা, (দাহমান সং., দামিশ্ক), ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১৮-২৪, ৪২; (৩) আর-রাব'ঈ-ফাদা'ইলু'শ-শাম ওয়া দিমাশ্ক, আল-মুনজিদ সং. দামিশ্ক ১৯৫০ খৃ., ভূমিকা; (৪) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ মাদীনাত দিমাশ্ক' (আজ-জাহিরিয়্যার পাণ্ডু.), শিরো. 'আবদুল্লাহ্ আল-মা'মূন ও হারূনু'র-রাশীদ ; (৫) দাহমান, জাবাল কাসিয়ূন, (দামিশক ১৯৪৬ খৃ,); (৬) মুখাত্তাতু'স-সালিহিয়্যা (স্কুল ১=৫০০০), ১৯৪২ খৃ.; (৭) Thoumin, Geographie humaine de la Syrie Centrale, প্যারিস ১৯৩৬ খৃ.; (৮) Dubertret, Notes et Memoires, প্যারিস ১৯৩৩-১৯৪০ খৃ.; (৯) E. I.^{2}, ৪খ, ৭২৪।

সালাহু'দ-দীন আল-মুনাজ্জিদ (দা. মা. ই)/
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

(বানূ) কাসী (بنو قسي) ঃ আল-আন্দালুসের (স্পেন) ইতিহাসে অতি বিখ্যাত মাওয়ালী পরিবারগুলির অন্যতম। বানূ তাবীল পরিবার ও তুজীবী (উভয় দ্র.) পরিবারের সঙ্গে ইহারা আরাগনের কার্যকর ক্ষমতা বণ্টন করিয়া নিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ইতিহাস শুধু তখনই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যখন কেন্দ্রাভিমুখী এবং কেন্দ্রবহির্মুখী সংগ্রামের আলোকে উহাকে বিশ্লেষণ করা যায়। স্পেনের ইতিহাসে এই উভয়মুখী সংগ্রামের ঘটনা ক্রমাগতই ঘটিয়াছে। বানূ কাসী বংশীয়গণ নিজেদের নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁহারা আবার উমায়্যাগণের প্রতি তুলনামূলকভাবে অনুগত ছিলেন। খৃস্টান পুনর্বিজয়ের প্রথম দিকে উত্তর দিক হইতে খৃস্টানগণের আক্রমণ কালে এবং ক্যারোলিঞ্জীয়গণের আক্রমণকালে সেই চাপ হইতে তাহাদিগকে প্রকৃত ঢালের মত রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের গৌরবের কাল ছিল ৩য়/৯ম ও ৪র্থ/১০ম শতক।

ইব্ন হায্ম-এর মতে (দ্র. জামহারাত আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৫০২) কাসী ছিলেন গথদের আমলে (উচ্চ) মার্চ-এর [(upper) March] কাউন্ট। মুসলিমগণ আল-আন্দালুস জয় করিলে তিনি সিরিয়া গমন করেন এবং সেখানে আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই পৃষ্ঠপোষকতার বন্ধন সম্বন্ধে তিনি অতিশয় গৌরব বোধ করিতেন। এই কারণেই কাসী বংশীয়গণ মুদার ও য়ামানীগণের মধ্যকার সংঘর্ষসমূহে সব সময়েই মুদারগণের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। এই কাসীই হইলেন ফারতূন-এর জন্মদাতা...। এই পরিবারের প্রথম প্রকৃত খ্যাতিমান সদস্য হইলেন মূসা ইব্ন ফারতূন। ইনি ১ম হিশাম-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সা'ঈদ ইবনু'ল-হুসায়ন আনসারীকে ১৭২/৭৮৮-৯ সালে তরতোসা ও সারাগোসা অঞ্চলে পরাজিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা স্ত্রী পুনরায় পামপ্লোনার প্রথম শাসক ঈনিগো আরিসতাকে বিবাহ করেন। এই মিলন হইতে সৃষ্ট যোগাযোগের মধ্যে মূসা ইব্ন মূসা, যিনি বাস্কদের আত্মীয় ছিলেন এবং যিনি নিজেকে "স্পেনের তৃতীয় সম্রাট" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যবর্তী ভূমিকা পালনের একটি প্রধানতম কারণ সহজেই লক্ষ করা যায় [তাঁহার বিষয়ে দ্র. (১) Cl. Sánchez Albornoz, La autentica batalla de Clavijo, CHE- তে, ৯ম খণ্ড (১৯৪৮ খৃ.) পৃ. ৯৬-১১৬, এবং (২) ঐ লেখক, El tercer rey de Espana, CHE-তে, ৪৯-১খ, ১৯৬৯ খৃ., ৫-৪৯]।

আনুমানিক ২২৬/৮৪০-১ মূসা ইব্ন মূসা যখন আরনেদোতে (গভর্নররূপে?) ছিলেন তখন সারাগোসা ও তুদেলার ওয়ালীগণ তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করেন এবং (আল-'উযরীর মতানুসারে) তিনি বিদ্রোহ করিয়া সেনাপতি হারিছ ইব্ন বাযী'-কে বন্দী করেন। ২য় 'আবদু'র

রাহমান কর্তৃক একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তিনি আরনেদোর অধিকার রক্ষা করেন এবং সেই শান্তি চুক্তিতে আমীর তাঁহার সৎভাই ইয়াননাকো ইব্‌ন ইয়াননিকোকে (-ঈনিগো ঈনিগুয়েয) বার্ষিক ৭০০ দীনার কর প্রদানের অঙ্গীকারে স্বীয় ভূখণ্ড রক্ষা করিবার স্বীকৃতি প্রদান করেন; ইহার দ্বারা সঙ্গতভাবেই পামপিওনা রাজ্যের সৃষ্টির সূচিত হয়। তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য যে অভিযানসমূহ প্রেরিত হয় সেগুলি পরিকল্পিতভাবে তাঁহার বাস্ক মিত্রগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, যাহা দ্বারা উহাদের সমর্থনের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। ২৩০/৮৪৪ সালে মূসা তাঁহার সেনাবাহিনীসহ সেভিল্লি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নর্থম্যানগণের (Northmen) অভিযান প্রতিহত করেন। আনুমানিক ২৩৬/৮৫১ সালে তিনি কাউন্ট অব পেরিগর্ড ও ডিউক অব গাসকনি, এমেননকে বন্দী করেন; উভয়ের মধ্যকার সেই যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী এবং ক্রুসেডতুল্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হইতে ইহা যথেষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, ২৩৮/৮৫২ সালে সুলতান ১ম মুহাম্মাদ-এর উত্তরাধিকার লাভ দ্বারা কেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক নূতন সম্পর্কের অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল আর মূসাই বা কেন হুয়েসকা (Huesca), তুদেলা (Tudela) ও সারাগোসার গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২৪২/৮৫৬ সালে আমীরের আদেশে তিনি বারসেলোনো অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং তারাসা (Tarrasa) জয় করেন। এই সময়েই তিনি নিজেকে স্পেনে 'তৃতীয় সম্রাট' বলিয়া অভিহিত করেন। Cronica de Alfonso III অনুসারে ২৪৩/৮৫৭ ও ২৪৫/৮৫৯ সালে টলেডোর বিদ্রোহিগণ মূসার সহায়তা কামনা করে, তিনি তখন তাঁহার পুত্র লুবকে গভর্নর করিয়া সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু আনুমানিক ২৪৫/৮৫৯ সালে তিনি লিওন-এর ১ম আরডোনোর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং নবনির্মিত আলবেলদা দুর্গ হারান। তখন ২৪৬/৮৬০-১ সালে আমীর তাঁহাকে উচ্চ মার্চের গভর্নর পদ হইতে অপসারিত করেন। মূসা স্বীয় জামাতা আযরাক ইব্‌ন মানতীল-এর হাতে মারাত্মক আহত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন; ইবনু'ল-কূতিয়্যা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

২৪৮/৮৬২-৩ সালের পর হইতে দশ বৎসর কাল পর্যন্ত বানূ কাসীগণ সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। অতঃপর ২৫৭/৮৭০-১) সালে লুব ইব্‌ন মূসা সারাগোসা, তুদেলা ও হুয়েসকা (Huesca) জয় করেন। ২৫৮/৮৭২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাই ইসমা'ঈল ইব্‌ন মূসা শহর অধিকার করেন আর ফারতূন ইব্‌ন মূসা তুদেলা অধিকার করেন। আমীর মুহাম্মাদ তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করিয়া ব্যর্থ হন। ২৭০/৮৮৩ সালে মুহাম্মাদ ইব্‌ন লুব বিদ্রোহীকে বন্দী করেন এবং অতঃপর নিজেই তাহার স্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু পরের বৎসর তিনি উমায়্যাগণের নিকটে শহরটি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হন। কারণ স্বয়ং আমীর কর্তৃক উস্কানি লাভ করিয়া তুজীবীরা যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা তিনি সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শহরের পরিবর্তে তিনি আরনেদো (Arnedo), তারাযোন (Tarazone) ও জারীশের গভর্নর পদ লাভ করেন। পরে তিনি তুদেলা ও (Tudela) গভর্নর হন। ২৭৬/৮৯০ সালে সারাগোসা অবরোধ কালে তিনি নিহত হন। বলা হইয়া থাকে যে, তিনি 'উমার ইব্‌ন হাফসূন (দ্র.)-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু আল-'উযরী সেই সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার পুত্র লুব ইব্‌ন মুহাম্মাদ তুদেলা ও তারাযোনের গভর্নর হইয়াছিলেন। তিনি ২৯৪/৯০৭ সালে নাভারীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে নিহত হন। উহার পর হইতে কাসী বংশীয়গণের পতন ত্বরান্বিত হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন লুব লেরিদা (Lerida) দখল করেন। কিন্তু ৩১৫/৯২৭ সালে তিনি তথাকার অধিবাসিগণ কর্তৃক বিতাড়িত হন এবং ৩১৭/৯২৯ সালে তাঁহার ভগ্নিপতি লর্ড অব পাল্লারস রেমন্ড-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুন নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃপ্রবন্ধে উল্লিখিত উৎসগুলি ব্যতীত দ্র. (১) ইবনু'ল-কূতিয়্যা, ইফতিতাহ; (২) ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান; (৩) Garcia Gomez ও Levi-Provencal, Textos ineditos del "Muqtabis" de Ibn Hayyan sobre los origenes del reino de Pamplona, And- তে, সংখ্যা ১৯ (১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ২৯৫-৩১৫; (৪) ইবনু'ল-আছীর; (৫) আফীফ তুর্ক. El reino de Zaragoza en el s. xi, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ.; (৬) M. Ocana Jimenez, Banu Qasi, Diccionario historia de Espana-তে এবং সর্বোপরি (৭) আল-'উযরী, নুসূস মাসালিক, আংশিক অনুবাদ F. Granja, La Marca Superior en la obra de al-Udhri, Est. E. M. Aragon-এ, সংখ্যা ৮, ১৯৬৬ খৃ.।

P. Chalmeta (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

কাসীদা ঃ (قصيدة) ঃ আরবী শব্দ। ইহা ق-ص-د শব্দমূল হইতে গঠিত। قصد শব্দের অর্থ নিরেট ও পরিপূর্ণ, মস্তিষ্ক বা মজ্জা (দ্র. লিসানু'ল-'আরাব; কাশ্‌ফু'ল-লুগাত, ফারহাঙ্গ-ই আসাফিয়াহ)। قصد শব্দের আর এক অর্থ ইচ্ছা করা। পরিভাষায় কাসীদা এমন কবিতাকে বলা হয়, যাহাতে কোনও প্রিয়জনের প্রশংসা বর্ণিত হয়। তবে কাসীদার বিষয়বস্তুর পরিধি কার্যত অনেক বিস্তৃত। উহাতে সৌন্দর্য ও প্রেম, সময়ের উত্থান-পতন, বসন্ত ও উদ্যান, নৈতিকতা ও জ্ঞান এবং দু'আ' ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও স্থান পাইয়া থাকে। যে সকল পণ্ডিত কাসীদার অর্থ নিরেট কিংবা মস্তিষ্ক বলিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন যে, কবি স্বীয় উদ্দেশ্য (বক্তব্যের মজ্জা) বিশেষ পদ্ধতিতে কবিতায় উপস্থাপিত করেন কিংবা তাঁহারা বলেন যে, তিনি (কবি) অধিক পরিমাণে পূর্ণাঙ্গ বিষয় বস্তুর অবতারণা করিয়া থাকেন (ফারহাঙ্গ-ই আসাফিয়াহ)। এই হিসাবে উহাকে মজ্জা বা মস্তিষ্ক (মূল বক্তব্য) বলা হয়ত সমীচীন। নিয়মানুসারে একটি কাসীদার শ্লোক সংখ্যা কমপক্ষে পনেরো হইতে হইবে, তবে ইহার উর্ধ্ব সংখ্যার জন্য কোনও সীমা নির্ধারিত নাই। উল্লেখযোগ্য সংখ্যকে দীর্ঘ কাসীদাও রচিত হইয়াছে। কোনও কোনও কাসীদার শ্লোক সংখ্যা এক শতেরও অধিক পাওয়া যায় (E. G. Browne, A Literary History of Persia, ii, 29)। কাসীদার প্রথম শ্লোকটিকে—যাহার উভয় পংক্তি (শ্লোকার্ধ) অন্ত্যমিলযুক্ত হইয়া থাকে—মাত্‌লা (مطلع) বলা হয়। মাত্‌লা'র পরে আর কোনও মাত্‌লা' (আর্থাৎ একই অন্ত্যমিলযুক্ত উভয় পংক্তির কোনও শ্লোক) আসিলে তাহাকে দ্বিতীয় মাত্‌লা' বলা হইয়া থাকে। কাসীদার সকল শ্লোক একই অন্ত্যমিলবিশিষ্ট হয়।

কাসীদা আরবী কাব্য হইতে অন্যান্য ভাষায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। ফারসী, তুর্কী ও উর্দূ ভাষায়ও নিজ নিজ পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী কাসীদা রচিত হইয়াছে। কাসীদা দীর্ঘ কবিতার নাম। জাহিলী যুগের আরব কবিগণ ইহার সূচনা করিয়াছিলেন। এইসব কবিতায় কবিগণ স্ব স্ব গোত্রের প্রশংসা ও শত্রুদের কুৎসা রটনা করিতেন। পরবর্তীকালে কবি

কাসীদার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোত্রবিশেষের প্রশংসা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পুরস্কার ও সম্মান লাভের প্রত্যাশাও করিতেন। মনে হয়, শোকগাথা (মারছিয়া)-কে প্রথম হইতেই কাসীদা বলিয়া গণ্য করা হইত না। আবার বিদ্রূপাত্মক কবিতা (হিজা')-কে প্রাচীন কবিরা প্রায়শ কাসীদা নামে অভিহিত করিতেন। অথচ এইসব (বিদ্রূপাত্মক) কবিতায় অধিকাংশ সময়ে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অনুপস্থিত থাকিত, যেগুলিকে একটি খাঁটি কাসীদা রচনার জন্য অপরিহার্য মনে করা হইত। এই সম্পর্কে সঠিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রয়োজন কেবল সেই সব কবির কবিতাসমূহকে নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে স্থির করা, যাঁহারা হিজরী প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন,—সেইসব কবিতাকে নহে যাহা জাহিলী যুগ হইতে অপরিবর্তিতরূপে চলিয়া আসিতেছিল এবং যাহাকে উপরিউক্ত কবিগণ নমুনাস্বরূপ নিজেদের সামনে রাখিয়াছিলেন।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কাসীদায় অপরিহার্য তিনটি অংশ বা স্তর থাকিতে হইবে। প্রথমত, 'নাসীব' বা প্রণয়মূলক মুখবন্ধ (দ্র. নিবন্ধ 'গাযাল'), যাহাতে কবি সেই স্থান পর্যন্ত তাঁহার সফরের উল্লেখ করেন যেখানে পূর্বে তাঁহার প্রেমিকা বাস করিত। অতঃপর ঐ স্থান হইতে প্রেমিকা ও তাঁহার গোত্রীয় লোকজন চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া স্বীয় অনুরাগ ও অস্থিরতা প্রকাশ করেন। ইহার পর আসে দ্বিতীয় স্তর, যেখানে কবি সেইসব লোকের উদ্দেশে তাঁহার ভ্রমণের বৃত্তান্ত পেশ করেন, যাহাদের তিনি প্রশংসা করিতে চান। এই পর্যায়ে তিনি মরুভূমির ভীতিজনক দৃশ্যাবলী বর্ণনার এবং মরুভূমির অন্যান্য পশুদের সহিত তাঁহার উটের (ক্ষেত্রভেদে অশ্বের) প্রতিদ্বন্দ্বিতার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। সবশেষে আসে কাসীদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশে কবির ঈপ্সিত ব্যক্তি বা গোত্রের প্রশংসা কিংবা নিন্দা স্থান পায়। এই পর্যায়ে কোনও কোনও কবি নৈতিক কোন শিক্ষার অবতারণা করিয়া কবিতার ইতি টানিয়া থাকেন।

আরবী (কিংবা ফারসী ইত্যাদি) কাসীদায় খাঁটি হৃদয়াবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা চিন্তা পরিস্ফুট। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য নহে। কারণ আরবী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দু—এই চারি ভাষাতেই উচ্চমানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাসীদা রচিত হইয়াছে। জাহিলী যুগের আরবী কাসীদাসমূহে স্বপক্ষের গৌরব ও প্রতিপক্ষের নিন্দা-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকিলেও উহাতে প্রকৃত কবিতার প্রথম শর্তরূপে বিবেচিত বেশ কিছু কাব্যিক অনুভূতিও পাওয়া যায়। প্রকাশ-ভঙ্গিতে অতিরঞ্জন ও কল্পনাবিলাস গ্রীক কবিদের রচনায় এবং ইংরেজীতে মিলটন প্রমুখের কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়। এরিস্টোটল তাঁহার 'ইলমু'ল-বালাগা (Rhetoric) সম্পর্কিত গ্রন্থে কতিপয় ক্ষেত্রে ইহাকে বৈধ বলিয়াছেন। আরব কবিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গোত্রের জন্য সহজাত আবেগ প্রদর্শন করিতেন। তাহা ছাড়া কাসীদার মুখবন্ধে সৌন্দর্য ও প্রেম, বসন্ত ও উদ্যান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র তুলিয়া ধরা হইত। উট ঘোড়া কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা কাসীদায় বহুল পরিমাণে স্থান পাইত। ফারসী, উর্দু ও তুর্কী ভাষায় ঈমান ও 'আকীদাভিত্তিক বিষয়বস্তুসংবলিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কাসীদাও রচিত হইয়াছে। অবশ্য কোনও কোনও কাসীদায়, বিশেষ করিয়া অবক্ষয়ের যুগের কাসীদাসমূহে (বিশেষত ফারসী ও উর্দূ ভাষায়) অন্তঃসারশূন্যতা, অবাস্তবতা, কল্পনাবিলাস ও অতিরঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায় (দেখুন সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ্‌র নিবন্ধ "কাসীদে কা ফান্না", মাবাহিছ, মাজলিস-ই তারাক্কী-ই আদাব, লাহোর) আরও দেখুন কালীমু'দ-দীন আহ্‌মাদ, উর্‌দূ শাইরী পার এক নাজার, নামী প্রেস লাহোর; শায়খ চান্‌দ, সাওদা, আনজুমান-ই তারাক্কী-ই উর্‌দূ, পাকিস্তান ১৯৬৩ খৃ.। কাসীদার সমালোচনায় যদি বলা হয় যে, কাব্যের এই ধারাটি পূর্ণাঙ্গ নহে, কেননা ইহাতে কোনও একক বিষয়ের পরিবর্তে একাধিক বিষয়বস্তু, যেমন প্রেম, স্তুতি, প্রত্যাশা ইত্যাদি স্থান পাইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা একটি মিশ্র ধারা, তবে তাহার জবাবে বলা যায়, আধুনিক কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচারে এই রচনারীতি কোনও ত্রুটি নহে, বরং একটি গুণ হিসাবেই বিবেচিত। তথাপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রুচির পার্থক্য একটি বাস্তব সত্য (সায়্যিদ 'আব্‌দুল্লাহ্)।

সমালোচকগণ কাসীদার কতিপয় শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন—কবিতাটি যতই দীর্ঘ হউক, উহার সকল শ্লোক একই অন্ত্যমিলবিশিষ্ট হইতে হইবে। তাহা ছাড়া গোটা কবিতাটি একটিমাত্র ছন্দে রচিত হইবে এবং কবিকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই কারণে কাসীদায় কোনও উন্নত মানের কাব্য রচনা প্রায় দুরূহ। প্রথম প্রথম মরুভূমি, সেখানকার জীবজন্তু ও ভীতিপূর্ণ দৃশ্যাবলীর বর্ণনা খানিকটা আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হইলেও এইসব বিষয় যখন কাসীদাসমূহের অবিরাম ধারায় একই পদ্ধতিতে কেবল শব্দের বিভিন্নতায় বর্ণিত হইতে থাকে, তখন উহা একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। কবিরাও এই অসুবিধা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণেই অধিকাংশ কাসীদা একাধিক কিস্তিতে রচিত হয়। কেননা উহা সমাপ্ত করিতে অনেক সময় লাগিয়া যাইত।

কবি যু'র-রুম্মার যে কাসীদাটি আজকাল খুব প্রসিদ্ধ (দীওয়ানের প্রথম কাসীদা) যে সম্পর্কে তিনি নিজে বলিয়াছেন ঃ প্রথম শ্লোকটি রচনার পর অনেক দিন যাবৎ তিনি আর একটুও অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং অনেক পরে ইস্‌ফাহানে অবস্থানকালে তিনি অবশিষ্ট শ্লোকগুলি (দীওয়ানের কপিতে ১২৮টি) অনায়াসে রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (আয্-যামাখ্‌শারী, আসাসু'ল-বালাগা)। তদ্রূপ কবি জারীরের হৃদয় জান্‌দালের নিন্দা-ভর্ৎসনায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাহার জওয়াবে তিনি প্রথমদিকে কেবল আশিটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট কাসীদা পরে সমাপ্ত করেন (নাকা'ইদ, সং Bevan, পৃ. ৪৩)। ঠিক তেমনই আত-তিরিম্মাহ (الطرماح) বানূ তামীম ও ফারায্‌দাকের নিন্দায় রচিত তাঁহার বিখ্যাত কবিতার কেবল একটি অংশ প্রথমবারে লিখিয়াছিলেন এবং ঐ কবিতায় বিভিন্ন সময়ে যে অতিরিক্ত শ্লোকসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা স্বয়ং কবিরই রচনা, অন্যের রচনা সংযোজন নহে। কাসীদা সমাপ্ত হওয়ার পর সুযোগ পাইলেই কবি তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। কখনও নিজেই কিছু কিছু শ্লোক সংযোজিত করিতেন, কখনও আবার কিছু কিছু বাদ দিতেন—বিশেষ করিয়া সেইসব ক্ষেত্রে যখন তাঁহার কাসীদার জওয়াব হইতে নূতন নূতন আক্রমণ ও প্রতিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হইত।

একথাও ঠিক যে, অনেক কবি তাঁহাদের রচনায় সকল অংশ অন্তর্ভুক্ত করিতেন না। সেই কারণে যদি কোন কাসীদার কেবল কয়েকটি অংশ হস্তগত হয়, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা ঠিক হইবে না যে, উহার অমুক অংশটি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার রচনা সমাপ্ত করিবার পূর্বেই এই জাতীয় কবিতা প্রসিদ্ধি লাভ করিত এবং ইহা একটি

বাস্তব সত্য যে, নিকৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনার সময় কাসীদার সকল চাহিদা সামনে রাখা অত্যন্ত কঠিন হইত।

প্রাচীনকালে এমন সব কবিতাও রচিত হইত, যেগুলিকে কাসীদা বলা হইলেও উহাতে কাসীদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রশংসা কিংবা নিন্দা থাকিত না। এই রকম উদাহরণ আমরা 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-র কবিতায় (দ্র. নিবন্ধ 'গাযাল') ও আত-তিরিম্মাহ্র কোনও কোনও কাসীদায় দেখিতে পাই।

আত-তিরিম্মাহ্র কোনও কোনও কবিতা কেবল কোনও ঘটনা, দৃশ্য কিংবা অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য বলা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং কবিরও কাসীদা রচনার ইচ্ছা ছিল না।

স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য ভাষায় কাসীদা রচয়িতাগণ আরবী কাসীদার চর্চা করিয়াছেন। ফারসীতে (গায্নাবী আমলের বিশিষ্ট কাসীদা রচয়িতা ফাররুখী, 'উন্সুরী ও মানূচেহরীর পর) আন্ওয়ারী ও খাকানী এই ধারায় সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন (ফারসী কাসীদা সম্পর্কে স্বতন্ত্র নিবন্ধ পরে আসিতেছে)। আরবীতে কাসীদা আধুনিক যুগেও এক বিশেষ স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে এই সব নূতন কাসীদায় বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। কেবল কিছু সংখ্যক আরব কবিকে কাসীদার সেই রীতিটির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চালাইতে দেখা যায়, যাহা কাসীদার স্বর্ণযুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহার বিষয়বস্তু এই যুগের জন্য অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়, যেমন রেলগাড়িতে ভ্রমণকারী কবি উষ্ট্র পৃষ্ঠে তাঁহার ভ্রমণের বর্ণনা করিলে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হইয়া থাকে (সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ্)।

কাসীদাগুলিতে ব্যক্তিবর্গ ও ঘটনাবলীর উল্লেখও পাওয়া যায়। এই কারণে তাহা আমাদের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর উৎসরূপেও গণ্য হইয়া থাকে। তথাপি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উহাদের যাচাই করা প্রয়োজন; কেননা উহাতে অনেক ভুল তথ্যও বর্ণিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ কোনও কাসীদায় যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা থাকিলেই যে স্বয়ং কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহা অপরিহার্য নহে। উদাহরণস্বরূপ দুইজন কবির কথা উল্লেখ করা যায়। একজন 'আবীদ ইব্ন বিশ্র ও অন্যজন আবূ খাযিম। দুইজনের মধ্যে ব্যবধান এক শতাব্দীকাল। কিন্তু উভয়ই দাবী করেন যে, তাঁহাদের গোত্র 'আন-নিম্নার ও আল-জিফার-এ বিজয় লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', বৈরূত; (২) আল-মুফাদ্দালু'দ-দাব্বী, আল-মুফাদ্দালিয়্যাত; (৩) কুদামা ইব্ন জা'ফার, নাক্দু'শ-শি'র; (৪) ইব্ন রাশীক, কিতাবু'ল-'উমদা, কায়রো; (৫) 'আব্দু'র-রাহমান, মিরআতু'শ-শি'র; (৬) শিব্লী নুমানী, শি'রু'ল-'আজাম; (৭) আয-যামাখ্শারী আসাসু'ল-বালাগা, কায়রো; (৮) নিবন্ধ 'আল-আরাবিয়্যা' (আরবী ভাষা ও সাহিত্য)।

F. Krenkow (E. I.[2] ও দা. মা. ই., সম্পাদনা পরিষদ)/ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

(আরবী) কাসীদা ঃ কাসীদা শব্দটি এ. ব. (ব. ব. কাসা'ইদ ও কাসীদ)। আরবী কাব্যের পরিভাষায় কাসীদা পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ পরিমাপের শ্লোকমালায় রচিত বিশেষ দৈর্ঘ্যের এক প্রকার কবিতার নাম। আল-কাস্দ শব্দের অর্থ ইচ্ছা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। কাসীদা যেহেতু কবির স্বগোত্রের প্রশংসা ও শত্রু গোত্রসমূহের নিন্দার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তাই উহা এই নামে অভিহিত। অধিকন্তু আল-কাস্দ শব্দের অন্যান্য অর্থের মধ্যে রহিয়াছে ন্যায়, সমতা, মধ্যপন্থা, সঠিকতা, পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদি। যেহেতু কাসীদার শ্লোকসমূহ আগাগোড়া একই ছন্দের সুবিন্যস্ত বন্ধনে আবদ্ধ, শব্দসমূহ সুষম ও যথাযথ এবং শ্লোকার্থ বা মিস্রা'গুলি ছন্দঃশাস্ত্রীয় পরিমাপের অধীনে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণাঙ্গ, তাই আল-কাস্দ শব্দ হইতে কাসীদা নামকরণ চমৎকারভাবে সার্থক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাসীদার ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত আর একটি ব্যাখ্যায় বাগানের গাছপালা ছাঁটিয়া কাটিয়া বিন্যস্তকারী মালীকে যেমন 'মুকাস্সিদু'ল-আশ্জার' বলা হয়, তেমনি নির্বাচিত শব্দ ও বিষয়বস্তু দ্বারা একটি শ্লোক সমষ্টি বা কাব্যকাঠামো নির্মাতা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনপূর্বক উহাকে পরিমার্জন সাধক কবিকে 'মুকাস্সিদু'ল-কাসীদ' বলা হইয়া থাকে (আল-জাওহারী, আস-সিহাহ, শিরো ; লিসানু'ল-'আরাব, শিরো.; তাজু'ল-'আরূস, শিরো.; তাহানাবী, কাশ্শাফু ইস্তিলাহতি'ল-ফুনূন, ২খ, ১১৭৫; ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র-ওয়া'শ-শু'আরা' পৃ. ২০)। কাসীদা রচনাকালে কবি যেহেতু ইচ্ছাপূর্বক চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাকেন, সেই কারণেও উহার এই নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে (লিসানু'ল-'আরাব; তাজু'ল-'আরূস, শিরো)।

আরব পণ্ডিতদের মতে কাসীদার শ্লোক সংখ্যার কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ কিংবা সীমা নাই। এমনকি ইব্ন মান্জূর (লিসানু'ল-'আরাব, শিরো.) আবু'ল-হাসান আল-আখ্ফাশ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার মতে তিনটি শ্লোক হইলেও কাসীদা হইতে পারে। কিন্তু ইব্ন জিন্নী (তাজু'ল-'আরূস, শিরো. লিসানু'ল-'আরাব, শিরো.) মনে করেন যে, তিন হইতে দশ বা পনেরো পর্যন্ত সংখ্যার শ্লোক সমষ্টিকে 'কিত্'আ' বলা হয়, আর পনেরর অধিক হইলে বলা হয় কাসীদা তাহানাবী (কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ২খ, ১১৭৫-৭৬) মাজ্মা'উ'ল-ফুসাহা'র উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন, আরব পণ্ডিতগণের মতে কাসীদার শ্লোক সংখ্যা পাঁচ শতরও অধিক হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ আরব কবিদের কাসীদায় শ্লোক সংখ্যা ষাট ও এক শতর কাছাকাছি হয়। তবে পঁচিশ শ্লোক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় (C. J. Lyall, Translation of the Ancient Arabic Poetry)।

প্রাচীন আরবী কাসীদাসমূহের শ্রেষ্ঠ সংকলন "আল-মু'আল্লাকাতু'স-সাব'উ" যে সাতটি কাসীদা নিয়া গঠিত, সেইগুলির শ্লোক সংখ্যার গড় আশির কাছাকাছি। দীর্ঘতম কাসীদাটির রচয়িতা তারাফা ইব্নু'ল-'আব্দ এবং তাহার শ্লোক সংখ্যা এক শত সাত (সায়্যিদ আবু'ল-হাসান, হাল্লু'ল-মুগ্লাকাত লি'স-সাব্'ই'ল-মু'আল্লাকাত, পৃ. ৫৪, দিল্লী ১৮৮৮ খৃ.) পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র কাসীদাটি হইল যুহায়র ইব্ন আবী সুল্মা-র রচনা যাহাতে শ্লোক রহিয়াছে কেবল চৌষট্টিটি (ঐ. পৃ. ৯৯)। অন্যগুলির মধ্যে 'আন্তারা ও ইম্রু'উ'ল-কায়সের কাসীদা দুইটিতে একাশিটি করিয়া, লাবীদের কাসীদায় ঊনাশিটি, হারিছ ইব্ন হিল্লিযা-র কাসীদায় চৌরাশিটি এবং 'আম্র ইব্ন কুলছূমের কাসীদায় এক শত চারিটি শ্লোক রহিয়াছে (ঐ, পৃ. ৩. ১১৫, ১৬৪, ১৯২, ২১৭; C. J. Lyall, Ancient Arabic Poetry, ভূমিকা, পৃ. ২০)।

আধুনিক আরবী কাসীদাসমূহের ন্যায় প্রাচীন আরব কবিদের কাসীদার শ্লোকগুলিতে ধারাবাহিকতা, অনুক্রম কিংবা পারম্পরিক সাদৃশ্যের প্রতি তেমন কোনও মনোযোগ দেওয়া হইত না। প্রতিটি শ্লোক এক একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এককরূপে রচিত হইত। ফলে কাসীদার শ্লোকগুলিকে আগে পরে স্থাপন করিলে কিংবা কোথাও কোনও সংযোজন-বিয়োজন করিলে তাহাতে বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় কোনও বিঘ্ন ঘটিত

না। এই কারণে কোনও কবির কাসীদায় এক-আধটি ভুয়া শ্লোক সংযোজন করা কিংবা উহার কোনও শ্লোক ছাটাই করা বেশ সহজ ছিল। এইজন্যই প্রাচীন আরব সমালোচকগণ গোটা কাসীদাকে একটি একক মনে করিয়া কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন নাই; এক একটি শ্লোককে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একক ধরিয়াই উহার সমালোচনা করা হইত। ঐসব সমালোচকদের দৃষ্টিতে কোনও কাসীদার একটি শ্লোক স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনায় অন্য কোনও শ্লোকের মুখাপেক্ষী হইলে ইহাকে একটি ত্রুটি হিসাবে দেখা হইত। নাবিগা যুবয়ানীর একটি কাসীদার দুইটি শ্লোক সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। (আস-সুবা'ঈ বি-য়াওমী, তারীখু'ল-কিসসা ওয়া'ন-নাক্দ, পৃ. ৬৩ পৃ. কায়রো ১৯৬২ খৃ.; 'উমার আদ-দাসূকী, ফি'ল-আদাবি'ল-হাদীছ, ২খ, ২২৬; আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তা'রীখু'ল-আদাবি'ল 'আরাবী, পৃ. ৩২)।

জাহিলী যুগ হইতে উমায়্যা শাসনামলের শেষভাগ পর্যন্ত আরবী কাসীদার ছন্দ (ওয়াযন) ও অন্ত্যমিল বিষয়ে কোনও রীতিগত পরিবর্তন হয় নাই। প্রাচীন আরবদের ব্যবহৃত যে সব ছন্দ স্বভাবই উন্নতির শিখর অতিক্রম করিয়া প্রচলিত ও জনপ্রিয় হইয়াছিল, পরবর্তী আরব কবিগণ সেইসব ছন্দেই কাসীদা রচনা করিতে থাকেন। প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ও বিকশিত এই ধরনের ছন্দের সংখ্যা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাবিশেষজ্ঞ খালীল ইব্ন আহমাদ আল-ফারাহীদী (দ্র.)-এর মতে পনেরোটি। তিনি এই ছন্দসমূহকে বুহূর (ব. ব. بحور এ. ব. بحر) নামে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে তাঁহার এক শাগরিদ সা'ঈদ ইব্ন মুস্'ইদা আবু'ল-হাসান আল-আখ্ফাশ (দ্র.) উপরিউক্ত পনেরোটি বাহ্রের সহিত আর একটি বাহ্র যোগ করিয়া মোট ষোলটি বাহ্রের তালিকা চূড়ান্ত করেন। এই ষোলটির মধ্যে তিনটি বাহ্রের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত হয়। এইগুলি হইল ঃ তাবীল (طويل), বাসীত (بسيط) আর কামিল, (كامل)। মু'আল্লাকাত (المعلقات السبع)-এর সাতটি কাসীদার মধ্যে তিনটি তাবীল, দুইটি কামিল, একটি ওয়াফির (وافر) ও একটি খাফীফ (خفيف) বাহ্র-এ রচিত। কোনও কোনও কবি কেবল বহুল ব্যবহৃত এই তিন বাহ্রেই কবিতা রচনা করিতেন (লিসানু'ল-আরাব, শিরো. 'বাহ্র' ও 'কাস্দ'; 'আব্দু'ল-মুন্'ইম খাফাজী, আশ্-শি'রু'ল 'আরাবী আওযানুহু ওয়া কাওয়াফীহি, পৃ. ৩১-৪৬; আল-ওয়াসীত, পৃ. ৫২; হাল্লু'ল-মুগাল্লাকাত লি'স-সাব্'ই'ল-মু'আল্লাকাত, পৃ. ৫৪, ৯৯, ১২৫)। আরব কবিগণ একটিমাত্র কাফিয়া বা অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে কাসীদা রচনা পসন্দ করিতেন। খালীল ইব্ন আহ্মাদের মতে কাফিয়া হইল কোন শ্লোকের শেষ দুই সাকিন হরফের পূর্ববর্তী হারাকাতযুক্ত হরফটি (উদাহরণস্বরূপ কোনও শ্লোকের শেষ শব্দ যদি حرير হয়, তাহা হইলে উহার কাফিয়া হইবে প্রথম 'ر'। অবশ্য যদি উহা কাস্রা বা যেরযুক্ত হয়, যথা ঃ سرير , غدير। উল্লিখিত উদাহরণসমূহে 'ی'-কে رديف (রাদীফ) ও শেষ 'ر'-কে روى (রাবী) বর্ণ বলা হইবে এবং এই রাবী বর্ণের ভিত্তিতে কাসীদাকে রা'ইয়্যা (رائية) বা লামিয়্যা (لامية) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে (দেখুন লিসানু'ল-'আরাব, শিরো রাদীফ, রাবী, কাফী ; আরও দেখুন 'আব্দু'ল-মুন্'ইম খাফাজী, আশ্-শি'রু'ল-'আরাবী আওযানুহু ওয়া কাওয়াফীহি, পৃ. ৮৬-৯০)। কাসীদায় যদি কিছু কিছু কাফিয়াগত ত্রুটি পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত কাসীদা মনে করা হয়। এইসব ত্রুটির মধ্যে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) ইক্ফা' (اكفاء) ইহা কাফিয়াসমূহে ই'রাবের বিভিন্নতার ফলে সৃষ্টি হয়। যেমন একটি লামিয়্যা (লাম অন্ত্যমিলবিশিষ্ট) কাসীদার ভিত্তি রচিত হইল পেশযুক্ত লাম (لُ) কাফিয়ার উপর; কিন্তু কোনও স্থানে কবি যেরযুক্ত লাম (لِ) কাফিয়া ব্যবহার করিয়া বসিলেন। (২) ইক্ওয়া' (اقواء) অর্থাৎ কোনও শ্লোকে কাফিয়ায় ব্যবহৃত শব্দের হরফ কম হওয়া (উদাহরণস্বরূপ, যেখানে متشرب শব্দটি ব্যবহার যথাযথ ছিল, সেখানে ছন্দ পতনের আশংকায় একই শব্দমূল হইতে উদ্গত (مشروب) শব্দটি ব্যবহার করা হইল) (৩) সিনাদ (سناد) ইহার অর্থ রাদীফের বিভিন্নতা। যেমন কবি কাফিয়ার ভিত্তি ঠিক করিলেন যের পরবর্তী ی (فينا , سينا ইত্যাদি), কিন্তু কোথাও তিনি যবর পরবর্তী ی ব্যবহার করিয়া বসিলেন (رمينا , علينا) (ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', পৃ. ৩৯-৪৮; ইব্ন রাশীক, কিতাবু'ল-'উম্দা, ৪০২; আশ-শি'রু'ল-'আরাবী আওযানুহু ওয়া কাওয়াফীহি, পৃ. ১০৪-১০৭; শাওকী দায়ফ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিশ-শি'রি'ল-'আরাবী, পৃ. ১৪)।

প্রাচীন আরব কবিদের কাসীদায় বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা বিদ্যমান। তন্মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ের বর্ণনা কিংবা দৃশ্যাবলীর চিত্রণ সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রেমিকার বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ বর্ণনা অথবা নিজের বাহন, ভ্রমণ ও শিকার কিংবা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী চিত্রণ। এই ক্ষেত্রে জাহিলী কবিদের মধ্যে ইম্রু'উ'ল-কায়স শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত। আরবী কাসীদার উল্লেখযোগ্য অংশ এই বর্ণনামূলক কবিতা অথবা দৃশ্যাবলীর বর্ণনা জুড়িয়া রহিয়াছে (কিতাবু'ল-'উম্দা পৃ. ২৮৭, 'উমার ফার্রূখ, তা'রীখুল-আদাবি'ল 'আরাবী, ১খ, ৮০)। ইহা ছাড়া গৌরব, বীরত্ব প্রশংসা, শোক, প্রেম-প্রীতি, সাহিত্য, দর্শন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রাচীন কাসীদার উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু (আল-ওয়াসীত ফি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, ৪৬-৫১)।

প্রারম্ভিক আরব কবিগণ আরবী কাসীদার কাঠামো ও বিন্যাসপদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ রীতি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী আরব কবিরা সাধারণত সেই রীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। একটি প্রণয় চিত্রের সাহায্যে কাসীদার সূচনা হইত। কবি সেখানে তাঁহার অতীত প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিতেন। প্রেমিকার পুরাতন স্মৃতি ও তাহার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাস্তুভিটার বিভিন্ন উপাদান, যথা পানির কূপ, তাঁবু বাসস্থান প্রভৃতির আলোচনা এই সূচনা-পর্বে স্থান পাইত। ইহার কারণ আরবের বেদুঈনেরা খাদ্য ও পানির সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কাসীদার সূচনায় এই যাযাবর জীবনের চিত্রণ একটি নৈমিত্তিক ও চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। কবি তাঁহার প্রেমিকার সহিত তাঁহার মিলন ও বিরহের স্বাদ ও যন্ত্রণা বর্ণনা করিতেন। বিরহের আগুন এবং কালচক্রের নিষ্ঠুরতা বর্ণনা করিয়া নিজে ও অন্যদের কামনার আগুন উদ্দীপিত করেন। কাসীদার সূচনায় এই সব বিষয় উল্লেখ করিবার মধ্যে একটি কৌশল নিহিত থাকিত। তাহা হইল, প্রতিটি মানুষ জীবনের কোনও না কোনও স্তরে প্রেম করিয়া থাকে। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই প্রেম, ভালবাসা এবং আবেগ ও টানাপোড়েন বিদ্যমান। সেই কারণে স্বভাবতই প্রেম ও বেদনার কাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলেই স্পর্শকাতর হয় এবং কবির কথা শুনিবার জন্য আগ্রহী হইয়া ওঠে (কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', পৃ. ২০ প.; C. J. Lyall, Ancient Arabic Poetry, xix; ইব্ন রা'শীক, কিতাবু'ল-'উম্দা পৃ. ১৩৭)। এই বর্ণনার

পর কবির পক্ষে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ করা সহজ হইত। তাঁহার সঙ্গী-সাথী ও শ্রোতৃবর্গ থামিয়া যাইত ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে মনোযোগী হইত। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রিয়জন ও অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছিবার কাল্পনিক অভিযাত্রার যে সকল বাধা-বিপত্তি ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেন। নিজের ক্লান্তি দুঃখ-কষ্ট, নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা, রাত্রির অন্ধকার ও ভয়াবহতা, দিনের রৌদ্র ও তাপের প্রচণ্ডতা বর্ণনা করিতেন কিংবা দীর্ঘ সফরের কারণে প্রিয়জন দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ধাবমান বাহনটির (সাধারণত উষ্ট্রী) ক্লেশ ও ক্লান্তির চিত্র তুলিয়া ধরিতেন (আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, পৃ. ১৮ ; আশ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', পৃ. ২১)। যেসব কাসীদা শোকগাথা হিসাবে রচিত হইত, তাহাতে গাযাল ও প্রণয়-গাথা ইত্যাদির এইসব প্রচলিত রীতির বালাই থাকিত না) K. J. Lyall, Ancient Arabic Poetry ভূমিকা, পৃ. ১৯)। এই দুই প্রাথমিক স্তরের পরে কবি তাঁহার কাসীদার তৃতীয় স্তর শুরু করিতেন। ইহাই তাঁহার মূল ও প্রকৃত লক্ষ্য এবং বাকী বিষয়গুলি মূলত আনুষঙ্গিক অর্থাৎ এই স্তরে কবি নিজের প্রিয়জনের প্রশংসা আরম্ভ করেন, তাহার গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং তাহার প্রতি নিজের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা ব্যক্ত করেন। ইহাতে প্রশংসিত প্রিয়জনের দানশীলতার চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় এবং মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি কবিকে পুরস্কৃত ও যথাযথ সম্মানে ভূষিত করেন (কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ২১; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ১৪, ১৮)। ইব্ন কুতায়বার মতে (কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ২১-২২) কবিকে অবশ্যই এইসব বিভিন্ন ও নির্দিষ্ট স্তরসমূহের মধ্যে ভারসাম্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে এবং আতিশয্য কিংবা শৈথিল পরিহার করিতে হইবে। লক্ষ রাখিতে হইবে, যেন একটি স্তর কিংবা বিষয়বস্তু অহেতুক দীর্ঘ হইয়া শ্রোতাদের বিরক্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটায় কিংবা কোনও বক্তব্য মাত্রাতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে শ্রোতাদের হৃদয় যেন অতৃপ্ত না থাকে। এই পর্যায়ে ইব্ন কুতায়বা উদাহরণস্বরূপ জনৈক কবির একটি ঘটনা পেশ করিয়াছেন। উক্ত কবি তাঁহার এক কাসীদায় প্রাথমিক স্তরসমূহের (প্রণয়, ভ্রমণ ইত্যাদি) জন্য একটি শতটি শ্লোক রচনা করেন এবং আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসার কাজটি শুধু অবশিষ্ট দশটি শ্লোকে সম্পন্ন করেন। ইহাতে তাঁহার প্রশংসিত জন অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "তুমি তো সেরা শব্দ ও বক্তব্যগুলি নিজের প্রণয় উপাখ্যান বর্ণনাতেই ব্যয় করিয়া ফেলিলে, আমার জন্য রাখিলেটা কি ?" কবি লজ্জিত হইয়া আর একটি কাসীদা রচনা করেন। এবারে তিনি প্রারম্ভিক স্তরসমূহ বর্ণনার কাজ মাত্র একটি শ্লোকে সারিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট গোটা কাসীদা জুড়িয়া প্রশংসা আর গুণ বর্ণনা করিলেন। তখন তিনি কবিকে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষার পরামর্শ দিলেন।

কাসীদায় কবির প্রশংসার পাত্র কখনও কোনও ব্যক্তি (রাজা কিংবা সর্দার) কখনও কোনও গোত্র বা সম্প্রদায়। কখনও তিনি নিজের যুদ্ধ-তৎপরতার প্রশংসা করেন। আবার কাসীদার-বিষয়বস্তু কখনও কোনও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কিংবা যুদ্ধ বা লুটতরাজের বিবরণ সংবলিত, কখনও আবার কৈফিয়ত ও সতর্কীকরণমূলক (C. J. Lyall, Ancient Arabic Poetry, ভূমিকা, xix)। আরব কবিগণ সাধারণত জ্ঞানীসুলভ কোনও সারগর্ভ ব্যক্তব্য কিংবা পরামর্শ দ্বারা তাঁহাদের কাসীদার পরিসমাপ্তি টানিয়া থাকেন (ঐ)। তাহানাবী (কাশশাফ ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ২খ, ১১৭৫) মাজ্‌-মা'উ'ল-ফুসহা'-এর গ্রন্থকারের সূত্র উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কাসীদায় গাযাল ও প্রণয় সংক্রান্ত শ্লোক থাকে তাহাতে 'ভণিতা' বা 'আত্মগোপন' প্রয়োজন হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রণয়-বর্ণনা (مخلص) হইতে প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসায় সুন্দরভাবে প্রত্যাবর্তন করা। যে কাসীদায় ভণিতা নাই পরিভাষায় তাহাকে মুক্তাদাব (مقتضب কর্তিত) বলা হয়। আবার যে কাসীদায় প্রণয়-বর্ণনা থাকে না তাহাকে মুজাররাদ কাসীদা বলে।

প্রাচীন আরব কবিদের দীর্ঘ কাসীদাগুলি (বিশেষত মু'আল্লাকা রচয়িতাদের দীর্ঘ কাসীদাসমূহ) অধ্যয়ন করিলে একটি জিনিস পরিষ্কার লক্ষ করা যায় যে, সকল কাসীদা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণে রচিত। সবগুলির একই রকম ধ্বনি, একই রকম পদ্ধতি ও বর্ণনাভঙ্গি এবং একই রকম শব্দ ও গঠনপ্রণালী। একজন কবি একটি শব্দ কিংবা এক ধরনের প্রণালী ব্যবহার করিলে পরবর্তীকালে ইহাই একটি প্রচলনরূপে থাকিয়া যায়। এই কারণেই দেখা যায়, ইমরু'উ'ল-কায়স, যুহায়র ইব্ন আবী সুল্মা, 'আন্তারা প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি এই গতানুগতিক প্রচলন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন (আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরবী, ১৯; ইব্ন রাশীক, কিতাবু'ল-'উম্দা, ৫৪)।

প্রাচীন আরবী কবিতা রচনা-রীতির ক্ষেত্রে প্রায়শ একটি সীমিত বৃত্তে আবর্তিত হইয়াছে; তথাপি সকল কবিই কাসীদা রচনার ক্ষেত্রে একই রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন এমন কথা বলা মোটেই সঙ্গত নহে।

অবশ্য 'উকাজ' মেলার বিচারকগণ সেই কাসীদাগুলিই পসন্দ করিতেন, যেগুলি নির্দিষ্ট সেই প্রচলিত রীতিতেই রচিত হইত। অধিকন্তু সেই রীতির কাসীদা রচনা কেবল সমালোচকদের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি ও সাফল্যের গ্যারান্টিই ছিল না; বরং যাহাদের প্রশংসার উদ্দেশ্যে কাসীদা রচনা করা হইত, তাহারাও ঐ রীতির কাসীদা পসন্দ করিতেন। তথাপি সকল কবির কাসীদা প্রচলিত রীতির শৃঙ্খলে বন্দী ছিল না। জাহিলী যুগের একজন দীওয়ান রচয়িতা কবি 'উরওয়া ইবনু'ল-ওয়ারদ-এর দীওয়ানে একটি কাসীদায় শুধু এই একটি কথারই উল্লেখ আছে যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে অভাব ও দারিদ্র্যের জন্য তিরস্কার করিয়া থাকে। স্বয়ং মু'আল্লাকা-কবিদের মধ্যে 'আম্র ইব্ন কুলছূম আত-তাগ্লিবীর কাসীদাটি বাস্তুভিটা ও প্রেমিকের পুরাতন স্মৃতিচিহ্নের নিকট কান্নাকাটির পরিবর্তে সুরাপাত্রের উল্লেখ দ্বারা শুরু হইয়াছে—যদিও মু'আল্লাকাতের অধিকাংশ কাসীদা প্রচলিত রীতির অনুকরণে রচিত। কবিগণ প্রথমত বিজন বাড়িঘর ও প্রেমিকার পতিত ও বিধ্বস্ত নিদর্শনাবলীর উদ্দেশ্যে কান্নাকাটি এবং বিরহের দহন-জ্বালা চিত্রণের মধ্য দিয়া কাসীদা শুরু করেন। তারপর স্বীয় ভ্রমণ ও বাহনের বিবরণ দিতে দিতে আসল উদ্দেশ্যে উপনীত হন। এই আসল উদ্দেশ্য ইমরু'উ'ল-কায়সের কাসীদায় প্রণয়-উপাখ্যান, 'আনতারা ও 'আম্র ইব্ন কুলছূমের মু'আল্লাকায় গৌরব ও বীরত্ব এবং যুহায়রের কতিপয় উপদেশ বাক্যের সাহায্যে কাসীদার পরিসমাপ্তি টানা হয়। নাবিগা আয-যুব্য়ানীর যে কাসীদাটি আল-মু'আল্লাকাতু'ল-'আশ্র (দশ মু'আল্লাকা)-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহার বিষয়বস্তু, নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা কৈফিয়ত প্রদান ('উমার ফার্রূখ, তারীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, ৮৪-৮৬)।

আরব কবি ও কাব্য-সমালোচকদের নিকট নির্দিষ্ট গুণাবলীর ভিত্তিতে আরবী কাসীদাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। বিরল কাসীদাসমূহকে আল-য়াতীমা বলে এবং প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় কাসীদাগুলি আস-সুমূত নামে অভিহিত। আবার যেসব কাসীদা রচনায় কবিগণ অনেক পরিশ্রম করেন এবং প্রাথমিক রচনার পর আবার কাট-ছাঁট ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পর চূড়ান্ত রূপ দান করেন, সেগুলিকে আল-হাওলিয়্যাত (এক বৎসর বয়সী), আল-মুকাল্লাদাত (হারস্বরূপ, কণ্ঠে পরিধানের যোগ্য), আল-মুনাক্কাহাত (সংশোধন করিয়া প্রস্তুত) এবং আল-মুহ্কামাত (দৃঢ়ীভূত) বলা হইয়া থাকে। যে কবি এই ধরনের কাসীদা রচনা করেন তিনি একজন দক্ষ শিল্পী ও গুরু বলিয়া স্বীকৃত হন। প্রখ্যাত কবি আল-হুতায়'আ বলিতেন, আল-হাওলিয়্যু'ল-মুহাক্কাক (এক বৎসর যাবত সংশোধন করিয়া প্রস্তুত কবিতা) হইল শ্রেষ্ঠ কবিতা (ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ২৩প.; আল-জাহিজ, কিতাবু'ল-বায়ান ওয়া'ত-তাব্য়ীন, ২খ, ৯; খাফাজী, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহূ ফি'শ্-শি'রি'ল-'আরাবী, ২০-২৩)।

আরবী কাসীদার সূচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। কেননা আরবী সাহিত্যের ইতিহাসবিশারদগণ এই ব্যাপারে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসেন নাই। অবশ্য দুইটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত ঃ (১) আরবী কবিতা যেভাবে প্রথমত সাজ্' ও কাফিয়া এবং পরে রাজায হইতে কবিতার স্তরে পৌঁছিয়াছে, আরবী কাসীদাও একইভাবে সংক্ষিপ্ত খণ্ড-কবিতা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। (২) আরবী সাহিত্যের সংরক্ষিত ইতিহাস অনুযায়ী 'তাবীল' ছন্দে সর্বপ্রথম কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন মুহাল্হিল ইব্ন রাবী'আ আত-তাগ্লিবী। তিনি স্বীয় ভ্রাতা কুলায়ব ইব্ন রাবী'আ-র মৃত্যুতে শোকগাথাস্বরূপ ত্রিশ শ্লোকবিশিষ্ট এক কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন (ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ২৫৬ প.; আবু'ল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, কিতাবু'ল-আগানী, ৪খ, ১৪৬; তাবাকাতু ফুহূলি'শ শু'আরা ৩৩ ; খিযানাতু'ল-আদাব, ১খ, ৩০২)। তথাপি একথাও ঠিক যে, আরবী কাসীদা মুহাল্হিলের হাতে একবারে জন্মলাভ করে নাই। বিভিন্ন প্রকার বাহ্র, ওয়ায্ন ও কাফিলা ছাড়াও মার্জিত পদ্ধতি, বহুমুখী বিষয়বস্তু এবং চমৎকার উপমা ও রূপকসমূহ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, আরবী কাসীদা মুহাল্হিল ইব্ন রাবী'আ আত-তাগলিবী ও তৎপরবর্তী কবি ইম্রু'উল-কায়স, 'আল্কামা, 'উবায়দ ইব্নু'ল-আবরাস প্রমুখের বহু পূর্বে পরিচ্ছন্নতা ও দৃঢ়তার স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, প্রেমিকার বসতবাড়ী ও পরিত্যক্ত নিদর্শনাবলীর নিকট দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করার রীতিটি ইম্রু'উল কায়স অনেক পূর্বের জনৈক কবি ইব্ন খায্যাম (ابن خذام) এর সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন (যে সম্পর্কে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছে); তেমনিভাবে জাহিলী কবিদের মধ্যে 'আন্তারা ও যুহায়র ইব্ন আবী সুলমাও আরবী কাসীদার রীতিকে একটি অতি প্রাচীন ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন (কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা, ৫৩, ৮৬, ২০৪; আল-ওয়াসীত ফি'ল-আদাবি'ল-আরাবী ওয়া তা'রীখিহি. ৪৪-৭৫; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহূ ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ১৮)।

ইসলামের আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণের পর আরবী কাসীদার আঙ্গিক কিংবা বিন্যাসে বড় রকম কোনও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। তেমনই শাব্দিক ও বিষয়বস্তুগত অলঙ্কার পদ্ধতিতেও কোনও হেরফের হয় নাই। তবে কতিপয় নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজন ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, ইসলামের প্রারম্ভকালীন কবিরা স্তুতিকাব্যে অতিরঞ্জন এবং ব্যঙ্গ কাব্যে অশ্লীলতা পরিহার করিয়াছেন। অথচ জাহিলী যুগের কবিদের কাব্যে এই সব উপাদান বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে গাযাল ও প্রণয় কাব্যেও শালীনতার প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইসলাম-পূর্ব কালের কবিদের, বিশেষ করিয়া ইম্রু'উ'ল-কায়স ও তাঁহার ন্যায় অন্যান্য কবিদের প্রণয়মূলক কবিতায় যে নগ্ন অশ্লীলতা পাওয়া যায় তাহা সুস্থ রুচির নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। দৃশ্যাবলী চিত্রণ কিংবা বর্ণনামূলক কাব্যে যুদ্ধের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনুরূপভাবে জিহাদে অনুপ্রেরণা দান ও ইসলামী 'আকীদা সম্প্রসারণের ন্যায় নূতন নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজনও ঘটিয়াছে (আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ৩২ প.; ডক্টর ইহ্সান 'আব্বাস, মুকাদ্দামাতু দীওয়ানি লাবীদ ইব্ন রাবী'আ আল-'আমিরী, কুয়েত ১৯৬২ খৃ.)। জাহিলী যুগে আরবী কাসীদার যেসব ওয়ায্ন ও বাহ্র (ছন্দ) প্রচলিত ছিল, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও তাহা অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য এই সময়ে 'রাজায' ছন্দে দীর্ঘ কাসীদা রচনার প্রচলন শুরু হয়। জাহিলী যুগে এই ছন্দটি উষ্ট্র চালকদের উদ্দীপনামূলক গান ও যুদ্ধের ময়দানে রণ-সঙ্গীত রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পর 'রাজায' ছন্দে রচিত নূতন কাসীদাসমূহকে কাসীদার সাধারণ বিষয়সমূহ— যেমন প্রণয়, বিদ্বেষ ও প্রশংসা ইত্যাদি অতর্ভুক্ত হইতে থাকে (আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহূ ফি'শ-শি'রিল-আরাবী, ৩৫, ৩৯; তা'রীখু'ল-কিস্সা ওয়া'ন্-নাক্দ ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, ১০৫; আল-ওয়াসীত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, ১৪১ প.) ইহার আগে এবং পরবর্তীকালেও রাজায ছন্দের কবিতাকে এক প্রকার নিম্নমানের কবিতা মনে করা হইত (আবু'ল-'আলা' আল-মা'আর্রী, রিসালাতু'ল-গুফ্রান, ৯০প., কায়রো ১৯০৭ খৃ.)।

উমায়্যা যুগে আরবী কাসীদার বিষয়বস্তু ও রীতিনীতিতে জাহিলীও প্রারম্ভিক ইসলামী যুগের কবিদের ছাপ অবশিষ্ট থাকিলেও এই যুগে আমরা কতিপয় পরিবর্তনও লক্ষ করিয়া থাকি। যেমন ঐ যুগের নাকা'ইদে (একবচনে নাকীদা, এমন এক ধরনের কাসীদা যাহাতে এক কবি আর এক প্রতিপক্ষ কবির কাসীদার জওয়াব দিয়া উহা খণ্ডনের প্রয়াস পাইতেন, দেখুন ঃ লিসানু'ল 'আরাব, শিরো. নাক্দ; আবূ 'উবায়দা, কিতাবু'ন-নাকা'ইদ)। ইহাতে আরবী কাসীদার এক নূতন রং পরিলক্ষিত হয়। জারীর ও ফারায্দাক এবং জারীর ও আখতালের মধ্যকার নাকা'ইদ প্রসঙ্গে দেখুন ঃ কিতাবু'ল-আগানী, ৭খ, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ৪৫৫। বিভিন্ন গোত্র, রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় নূতন নূতন বিষয়বস্তুর সাথে কাসীদায় এক নূতন চালিকাশক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছে (আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তা'রীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, ৭৫ প.; তা'রীখু'ল-কিস্সা ওয়া'ন-নাক্দ ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, ১২৬ প.; 'উমার ফাররূখ, তা'রীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, ৩৬১-৩৬৭)। ইতঃপূর্বে গাযাল বা প্রণয়ের প্রসঙ্গ কেবল কাসীদার ভূমিকায় স্থান পাইত এবং একই সাথে ইহা কবির কাব্য-প্রেরণা জাগ্রত করিত ও শোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হইত। কিন্তু উমায়্যা যুগে এই গাযাল কাসীদা একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। এই নূতন ধারাটি গাযালের দুই শ্রেণীর কবির জন্ম দেয়। একদিকে ছিলেন 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-র ন্যায় স্বাধীনচেতা কবিগণ, যাঁহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি চরিতার্থ করিবার

জন্য গাযালকে ভাব-প্রকাশের মাধ্যমে বানাইয়াছিলেন। আর অন্যদিকে ছিলেন জামীল ও বুছায়না এবং কুছায়্যির ও 'আয্যা-র ন্যায় কবিগণ, যাঁহারা পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার প্রেরণায় গাযাল রচনা করিয়াছেন (ইব্ন রাশীক, কিতাবু'ল-'উম্দা, ১৩৭; আশ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ২০; 'উমার ফাররূখ, তা'রীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, ৩৬৭; Charles Lyall, Ancient Arabic Poetry, ভূমিকা, xix)।

'আব্বাসী যুগে আরবী কাসীদায় অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। শব্দ প্রয়োগ-পদ্ধতি, ভাব ও বিষয়বস্তু এবং ছন্দ সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ এসবের অন্তর্ভুক্ত। তখন হইতে কাসীদা রচয়িতাগণ প্রাচীন আরব কবিদের দুর্বোধ্য ও অপরিচিত শব্দাবলী বর্জন করিয়া তদস্থলে বিভিন্ন আরবী ভাষাবহির্ভূত শব্দ ও পরিভাষা চালু করেন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের শব্দ প্রয়োগ-পদ্ধতিতে সাবলীলতা ও সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। অর্থগত দিক হইতে যে একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তাহা হইল ঃ কাসীদায় ভাব ও বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়। সুন্দর সুন্দর উপমা ও রূপক ব্যবহারের সাথে সাথে কল্পনা-মাধুর্যও ব্যাপকতা লাভ করে। কাসীদার বিষয়বস্তুতে শাসক ও খলীফাদের স্তুতি ও প্রশংসা আতিশয্য, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পক্ষপাত এবং গৌরব প্রকাশ, মদের বর্ণনা, প্রবৃত্তি পরায়ণতা এবং পার্থিব সুখ-শান্তি বর্জনের চিন্তা-ভাবনা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ছন্দের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীন আরব কবিদের ব্যবহৃত ছন্দ হইতে সরিয়া আসিয়া হাল্কা ও সহজ-সরল ছন্দ, যেমন مقتضب ও مجتث প্রভৃতি কবিতার মাধ্যম স্থির করা হয়। মুসলিম ইব্নু'ল-ওয়ালীদ, আবূ-নুওয়াস ও আবু'ল-'আতাহিয়া এমন কতিপয় ছন্দে কাসীদা রচনা করিয়াছেন, যেগুলি পূর্বে প্রচলিত কিংবা পরিচিত ছিল না (কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ৬৪৩-৬৭৭ ; কিতাবু'ল-আগানী, ৪খ, ২প.; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ৯১ প.; আল-ওয়াসীত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, ১৪৫ প.)।

'আব্বাসী যুগের কবি বাশ্শার ইব্ন বুর্দ সেই যুগের কবিদের জন্য সংস্কারক সমতুল্য। ইব্ন কুতায়বা তাঁহাকে-কবিদের মধ্যে গণ্য করেন এবং আশ'উরু'ল মুহ্দিছীন (আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি) আখ্যা দেন। তিনি তাঁহার কাসীদায় পাহাড় ও ধ্বংসাবশেষ এবং পরিত্যক্ত নিদর্শনাবলী ও ঘরবাড়ীরও উল্লেখ করিয়া থাকেন তবে তা যাযাবর জীবন-পদ্ধতির স্থলে নাগরিক জীবন-পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া। তাহা সত্ত্বে তাঁহার কাসীদাসমূহে যুহায়র ও নাবিগা এবং ফারায্দাক ও জারীরের কাসীদার ন্যায় অলঙ্কার (ফাসাহা ও বালাগা) ও দৃঢ়বদ্ধ রচনার নীতি বিদ্যমান (কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ৬৪৩ প.; কিতাবু'ল আগানী, ৩খ, ২০ প.; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ১৫২-১৫৭)। ঐ যুগেরই আরেকজন কবি আবূ নুওয়াস (বাশ্শার ইব্ন বুর্দ-এর পর) ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত। টিলা ও পাহাড় পর্বতের উল্লেখ দ্বারা শুরু না করিয়া তিনি মদের উল্লেখ দ্বারা কাসীদা শুরুর নূতন রীতি প্রবর্তন করেন। মদ ও সম্ভোগ-প্রীতি তাঁহার অধিকাংশ কাসীদার মূল প্রতিপাদ্য ও প্রধান বিষয়বস্তু। তাহা ছাড়া শিকারের দৃশ্য বর্ণনায় তাঁহার রাজায ছন্দে রচিত কাসীদাসমূহ বেশ প্রসিদ্ধ (কিতাবু'ল-আগানী, ৭খ, ৩২০; কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ৭৭০ প; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ১৫৯; আল-ওয়াসীত ফি'ল আদাবি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, ২৫৮)। আবু'শ-'আতাহিয়া আরবী কাসীদায় ধার্মিকতা ও সূফীবাদ, দুনিয়ার নিন্দা ও সংসার ত্যাগ এবং উপদেশ বিতরণের মানসিকতা চালু করেন। পরবর্তীকালে একই যুগের কবি আবু'ল-'আলা' আল-মা'আররী তাঁহার কাসীদা সংকলন আল-লুযূমিয়্যাত (বা লুযূম মা লা য়াল্যাম)-এ এইসব বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ সাধন করেন (কিতাবু'ল-আগানী, ৪খ, ৩৭ প.; আশ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', ৭৬৫ প.; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ১৬৪ প. ও ৩৮২ প.; তাজ্দীদ যিক্রা আবি'ল-'আলা', ১৭২ প.)। দীর্ঘ কাসীদা রচনার ক্ষেত্রে ইব্নু'র রূমী ও মিহ্য়ার আদ-দায়লামী এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আদ-দায়লামী পত্র লিখনের ভঙ্গিতে দীর্ঘ কাসীদা রচনা করিয়াছেন, যেইগুলির দৈর্ঘ্য বিশেষজ্ঞ ও সামলোচকগণ পসন্দ করেন নাই (আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ২০৭ ও ৩৫৫ প.)।

স্পেনীয় কবিগণ আরবী কাসীদার বিকাশে যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ ব্যতীত আমাদের আলোচনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। একথা সত্য যে, স্পেনের কবিগণ অধিকাংশ বিষয়বস্তুতে পূর্বাঞ্চলীয় আরব দেশসমূহের কবিদের অনুকরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আলোচ্য বস্তুই নিজেদের কবিতায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও স্পেনীয় কাসীদাসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু দিক অস্বীকার করিবার উপায় নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুদৃশ্য লীলাভূমি স্পেনে আরব কবিদিগকে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য বর্ণনার উপকরণ সরবরাহ করিয়াছে। এই কারণে বর্ণনামূলক কাব্যে স্পেনের কাসীদা রচয়িতাগণ চমৎকার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের অনুপম কাসীদাসমূহে তুষারাবৃত পর্বতরাজি, সুন্দর সুন্দর উপত্যকা, বন-জংগল ও উদ্যানরাজি হইতে শুরু করিয়া সুন্দর সুন্দর জনপদ ও সামুদ্রিক তরী পর্যন্ত সব কিছুর চমৎকার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্পেনীয় কবিগণ মুসলমানদের বহিষ্কারের পর পরিত্যক্ত শহর ও অঞ্চলসমূহের মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করিয়া এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করেন। স্পেনীয় কবি সালিহ আর-রান্দীর 'নূন' (ن) অন্ত্যমিলযুক্ত কাসীদাটি বহুল প্রচলিত এক অনবদ্য সৃষ্টি, যাহাতে তিনি স্পেনীয় ভূখণ্ডে মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন ও তাহাদের অসহায়ত্বের এক করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কবিতায় বিন্যস্ত করার প্রথাও স্পেনীয় কবিগণ চালু করিয়াছিলেন। ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্র ছন্দশাস্ত্রের ('ইল্মু'ল-'আরূদ) কাসীদা, ইব্ন মালিকের ব্যাকরণ ('ইল্মু'ন-নাহ্ও) বিষয়ক আলফিয়্যা এবং সপ্ত কিরাআত (কিরাআত সাব্'আ) ও পবিত্র পাণ্ডুলিপি (মাস্হাফ মুবারাক)-এর লিখন-পদ্ধতি সম্পর্কিত আশ-শাতিবীর কাসীদাসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (আল-মাক্কারী, নাফ্হু'ত-তীব, ৬৪২; ইব্ন খাল্দুন, মুকাদ্দিমা, ৪২৫; আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরবী, ৪৩১ প.; আল-ওয়াসীত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, ৩৮৫ প.; জাওদা আর-রাক্কাবী, আল-আদাবু'ল-আন্দালুসী, ৩২৭)।

স্পেনীয় কবিগণ আরবী কবিতার দুইটি নূতন রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, যেগুলি পূর্বে ছিল না (এইগুলিকেও কাসীদার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে, যদিও সেগুলির আকার ও ছান্দস কলা-কৌশল রীতিসিদ্ধ গতানুগতিক কাসীদা হইতে ভিন্নতর ছিল)। উহাদের একটি মুওয়াশ্শাহাত (একবচনে ঃ মুওয়াশ্শাহ), যাহা ইব্ন খাল্দূনের বক্তব্য অনুযায়ী (মুকাদ্দিমা,

৪২৫) আস্‌মাত (একবচনে ঃ সিমৃত অর্থাৎ হার) ও আগ্‌সান (একবচনে ঃ গুস্‌ন, অর্থাৎ শাখা)-এর আকারে গ্রন্থিত (রচিত) হয়। মুওয়াশ্‌শাহাত-এর বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু ছিল (ঐ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, ৪৫০-৪৫৫) গাযাল ও প্রণয়-গাথা এবং স্তুতি ও শোকগাথা। মুওয়াশ্‌শাহাতের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার পর স্পেনীয় কবিগণ আরবী কাব্যের আর একটি নূতন সংস্করণ আবিষ্কার করেন। ইহা 'আয্‌জাল' (একবচন যাজাল) নামে অভিহিত। যাজালের শব্দ ও গঠন-পদ্ধতি সাধারণ মানুষের ভাষার অধিকতর নিকটবর্তী। সাফিয়্যু'দ-দীন আল-হিল্লীর বর্ণনা অনুযায়ী এইসব যাজালী কাসীদা সাধারণ মানুষের ভাষার কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও আরবদের ছন্দ ও অন্ত্যমিল মুতাবিক হইত ('আবদু'ল-'আযীয আল-আহ্‌ওয়ানী, আয-যাজাল ফি'ল-আন্দালুস, ৩-৮)। আরবী কাসীদা এই উভয় রূপ স্পেন ব্যতীত আল-মাগ্‌রিবেও (অর্থাৎ তিউনিসিয়া, মরক্কো ও আলজিরিয়ায়) বহুদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল (আন-নুবূগু'ল-মাগ্‌রিবী, ৩খ, ৩৯৭)।

আধুনিক আরবী কবিতার নব জাগরণের (আন-নাহ্‌দাতু'ল-হাদীছা) পূর্ববর্তী যুগসমূহে আরবী কাসীদায় স্থবিরতা বিরাজমান ছিল। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। অবশ্য ঐ সময়ে শাব্দিক কারুকার্য ও সাজসজ্জার লৌকিকতা বেশ গুরুত্ব পাইতেছিল (আল-ওয়াসীত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, ৩০৬-৩১০)। নব জাগরণের (আন-নাহ্‌দা) কবিগণ (আল-বারূদী, হাফিজ ও শাওকী) আরবী কাসীদাকে নূতন কমনীয়তা ও শোভা দান করেন। আহ্‌মাদ শাওকী প্রশংসা-কাব্যে আর হাজিফ ইব্‌রাহীম শোকগাথা রচনায় প্রাচীন কবিদের মহান ঐতিহ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। এইসব কবিদের কাসীদাসমূহে প্রাচীন আরব কবিদের কাসীদার ন্যায় প্রেমিকার প্রণয়বিরহ কিংবা প্রাচীন বাস্তুভিটার নিকট ক্রন্দন বিলাপের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আহমাদ শাওকী কতিপয় উপাখ্যানকে আরবী কাসীদার ছাঁচে পেশ করিয়াছেন (আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শশি'রি'ল-'আরাবী, ৫১৪ প.; আল-আদাবু'ল-'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিস্‌র, ২৩২; ফি'ল আদাবি'ল-হাদীছ, ২খ, ২৩২ প.)। নূতন পর্যায়ের কবিগণ ('আব্বাস মাহ্‌মূদ আল-'আক্কাদ, 'আব্‌দু'ল-কাদির আল-মাযিনী ও আব্‌দু'র-রাহ্‌মান শুক্‌রী প্রমুখ) আরবী কাসীদাকে এক নূতন সৌষ্ঠব দান করিয়াছেন। তাঁহারা একদিকে প্রাচীন কবিদের বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ রচনা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং অন্যদিকে ইংরেজী ভাষার কবিদের কবিতাসমূহ সামনে রাখিয়াছেন। পুরাতন গতানুগতিক বিষয়বস্তু পরিহার করিয়া নূতন পদ্ধতিতে ধারাবাহিক ক্রম বজায় রাখিয়া কাসীদা রচনা করিয়াছেন (ঐ)। আরবী কাসীদার পুরাতন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর প্রতি সর্বাধিক অনীহা ব্যক্ত করিয়াছেন সিরিয়া ও লেবাননের খৃষ্টান কবিরা। ইঁহারা উষ্ট্রীকে লইয়া প্রেম কবিতা রচনা, পুরাতন স্মৃতিচারণ করিয়া ক্রন্দন-বিলাপ, প্রশংসায় সূর্যকে পৃথিবীতে আনা এবং চন্দ্রকে গয়না দান করার পুরাতন রীতির বিরুদ্ধতা পোষণের জন্য গর্বিত। তাঁহারা গৌরব ও বীর্যগাথা স্তুতি ও শোকগাথা এবং অন্যান্য পুরাতন কাসীদা-রীতি বর্জন করিয়া চলিয়াছেন (ফি'ল-আদাবি'ল-হাদীছ, ২খ, ২৩২) এবং পাশ্চাত্যের কাব্য-রীতি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন মান্‌জূর, লিসানু'ল-'আরাব, শিরো.; (২) আয-যুবায়দী, তাজু'ল-'আরূস, শিরো., (৩) আল-জাওহারী, আস-সিহাহ, শিরো.; (৪) তাহানাবী, কাশ্‌শাফ ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.; (৫) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা', বৈরূত ১৯৬৪ খৃ. ও কায়রো ১৩৬৯ হি.; (৬) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান, হাল্লু'ল-মুগ্‌লাকাত লি'স্‌-সাব্'ঈ'ল-মু'আল্লাকাত, দিল্লী ১৮৮৮ খৃ.; (৭) আস-সিবা'ঈ বায়ূমী, তা'রীখু'ল-কিস্‌সা ওয়া'ন-নাক্‌দ ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.; (৮) 'উমার আদ-দাসূকী, ফি'ল-আদাবি'ল-হাদীছ, কায়রো; (৯) আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত তা'রীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (১০) 'আব্‌দু'ল-মুন্‌ইম খাফ্‌ফাজী, আ'শ-শিরু'ল-'আরাবী আওযানুহু ওয়া কাওয়াফীহি, কায়রো ১৯৪৮ খৃ.; (১১) ইব্‌ন রাশীক, কিতাবু'ল-'উম্‌দা, কায়রো; (১২) শাওকী দায়ফ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, আল-আদাবু'ল-আরাবী আল-মু'আসির ফী, মিস্‌র কায়রো; (১৪) ঐ লেখক, আর-রিছা 'ফি'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (১৫) 'উমার ফার্‌রূখ, তা'রীখু'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, হাকীমু'ল-মা'আররা, বৈরূত ১৯৪৮ খৃ.; (১৭) আহমাদ আল-ইস্‌কান্দারী, আল-ওয়াসীত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি, কায়রো ; (১৮) ইম্‌রু'উ'ল-কায়স, দীওয়ান, কায়রো (১৯) আল-জাহিজ, কিতাবু'ল-বায়ান ওয়া'ত-তাব্‌য়ীন, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (২০) আবু'ল ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানী, কিতাবু'ল-আগানী, বূলাক ও কায়রো; (২১) 'আব্‌দু'ল-কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো; (২২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাতু ফুহুলি'শ-শু'আরা', বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; (২৩) লাবীদ ইব্‌ন রাবী'আ আল-'আমিরী, মুকাদ্দিমা দীওয়ান, কুয়েত ১৯৬২ খৃ.; (২৪) আবু'ল-'আলা' আল-মা'আর্‌রী, রিসালাতু'ল-গুফ্‌রান, কায়রো ১৯০৩ খৃ.; (২৫) ঐ লেখক, আল-লুযূমিয়াত, বৈরূত; (২৬) আবূ 'উবায়দা, কিতাবু'ন-নাকা'ইদ, বৈরূত; (২৭) আল-মাক্‌কারী, নাফ্‌হু'ত-তীব, কায়রো; (২৮) ইব্‌ন খাল্‌দূন, মুকাদ্‌দিমা, সালাহু'দ-দীন মুনাজ্‌জিদ-এর টীকা-টিপ্পনীসহ, বৈরূত; (২৯) ড. জাওদা আর-রাককাবী, আল-আদাবু'ল-আন্দালুসী, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (৩০) 'আবদু'ল-'আযীয আল-আহ্‌ওয়ানী, আয-যাজাল ফি'ল-আনদালুস, কায়রো; (৩১) 'আবদুল্লাহ্ কানূন, আননুবৃগু'ল-মাগ্‌রিবী ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী, কায়রো; (৩২) ইব্‌নু'ল-মুতায্য, তাবাকাতু'শ-শু'আরা;, কায়রো; (৩৩) C. J. Lyall, Ancient Arabic Poetry, London 1930; (৩৪) A. K. H. Kinany, The Development of Gazal in Arabic Literature, London 1950; (৩৫) আব্‌দু'র-রাহ্‌মান দিহ্‌লাবী, মির্‌আতু'শ-শি'র, লাহোর ১৯৫০ খৃ.; (৩৬) জুর্‌জী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৯০২ খৃ.; (৩৭) R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, London 1907; (৩৮) E. G. Brown, A Literary History of Persia, iv, London 1902.

জাহূর আহমাদ আজ্‌হার (দা. মা. ই.)/ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

(ফার্সী কাসীদা), পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কাসীদা আরবদের নিজস্ব সাহিত্য-প্রকরণ। ফার্সী, তুর্কী ও উর্দূতে কাসীদা রচনার সূচনা হইয়াছিল আরবদেরই অনুকরণে। উল্লিখিত তিন ভাষায় কাসীদাসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আবশ্যিকভাবে রক্ষিত হইয়াছে ঃ (১) তাশ্‌বীব বা মুখবন্ধ ঃ কাসীদার প্রথম কয়েকটি শ্লোকে রূপ যৌবনের উল্লেখ করা

হইয়া থাকে। ইহাকে তাশ্বীব নাসীব কিংবা তাম্হীদ (ভূমিকা) বলা হয়। ক্রমশ প্রেমের শ্লোকগুলির ভাষায় নমনীয়তা দেখা দিলে এই তাশ্বীব গাযাল নামে আখ্যায়িত হয় (এক দিক হইতে 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-র ন্যায় কবিগণকে আরবী গাযাল-রচয়িতা বলা হইয়া থাকে)। (২) তাখাল্লুস বা প্রসঙ্গ পরিবর্তন ঃ তাশ্বীবের পর কবি মূল বিষয়ের দিকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া প্রশংসিত জনের প্রশংসা শুরু করেন। কবির এই প্রসঙ্গান্তর যদি স্বাভাবিকভাবে হয় এবং মনে হয় যে, কথা প্রসঙ্গে কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ কাসীদা সফল রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। (৩) মাদ্হ বা স্তুতি ঃ প্রসংগান্তর পর্যায়ের শ্লোকে কবি প্রশংসিত জনের গুণাবলী বর্ণনা কিংবা তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাই কাসীদার আসল উদ্দেশ্য। (৪) তালাব বা কামনা ঃ প্রশংসা-পর্বের পর সুন্দর ভঙ্গিতে কবির ব্যক্তিগত কামনা ও ইচ্ছার বিবরণ থাকে। কামনা ও ইচ্ছার বিবরণ হৃদয়গ্রাহী, ওজস্বী ও যথোপযুক্ত হইলে তাহা কাসীদার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়করূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। (৫) দু'আ' বা প্রার্থনা ঃ কাসীদার উপসংহারে আসে প্রার্থনামূলক শ্লোকমালা। ফার্সী কাসীদা এই ধরনের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এক সুশৃঙ্খল শিল্পকলায় পরিণত হইয়াছে।

বিষয়বস্তু হিসাবে কাসীদা কয়েক প্রকার, যথা ঃ (১) মাদ্হিয়া বা প্রশংসামূলক ঃ ইহাতে প্রশংসিত জনের প্রশংসা করা হয়। (২) হিক্মিয়্যা বা জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক ঃ ইহার বিষয়বস্তু দার্শনিক। (৩) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ঃ ইহাতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়াদির বিবরণ রহিয়াছে। (৪) বাহারিয়া বা বাসন্তিক ঃ এই শ্রেণীর কাসীদার পুষ্প, ঋতু ও বসন্তকাল, বাগ-বাগিচা এবং সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বিবরণ স্থান পাইয়াছে। (৫) হালিয়া বা অবস্থামূলক ঃ ইহাতে যুগের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির উল্লেখ রহিয়াছে। (৬) শিতা'ইয়্যা বা শীতকাল বিষয়ক ঃ ইহাতে শীত-কালীন অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। (৭) খাযানিয়া বা হৈমন্তিক ঃ যে কাসীদায় হেমন্ত কালের চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। (৮) মুনাজারানা (বিতর্কমূলক) বা প্রশ্নোত্তর আকারে কাসীদা যেমন দিন ও রাত্রির বিতর্ক ইত্যাদি।

ফারসী কাসীদা রচনার কালকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রতিটি যুগের পদ্ধতি অন্য যুগ হইতে ভিন্নতর।

প্রারম্ভিক যুগের (সামানী যুগ ঃ ২৬১/৯৭৪ হইতে ৩৮৯/৯৯৯ পর্যন্ত) কবিদের মধ্যে রাওদাকী (رودکی দ্র.)-র নাম তালিকার শীর্ষে। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় নাস্র ইব্ন আহ্মাদ (৩০১/৯১৩-৩৩১/৯৪২)-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই কবি ফার্সী কাসীদায় কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) কাসীদাগুলির সুদীর্ঘতা, তাশ্বীব বা প্রণয়মূলক শ্লোকের স্বল্পতা; (২) বিশুদ্ধতা বা বাক্যালংকার (ফাসাহাত); (৩) কৃত্রিমতা ও অভিনবত্বের অনুপস্থিতি; (৪) প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা ; (৫) স্বভাবসুলভ ও সহজবোধ্য উপমা; (৬) অতিরঞ্জনশূন্যতা; (৭) সহজ ভাষায় সহজ ও পরিচ্ছন্ন ভাব প্রকাশ। প্রাচীনদের যুগের শেষভাগে এমন কবিরাও ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের রচনায় সরলতার পরিবর্তে কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। সমালোচকগণ রাওদাকীকে ইরানের প্রথম বড় কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ — তিনিই সর্বপ্রথম ফার্সী কাব্যে একটি নিজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন (রিদা যাদাহ্ শাফাক;, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, ১খ, ৪৫; আরও দ্র. Browne, A Literary History of Persia, i, 455)। তাঁহার সমকালীন কবি শাহীদ বাল্খী ও মা'রূফী বাল্খী তাঁহার রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পরবর্তীকালের বড় বড় কবিও রাওদাকীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, তিনি একজন সৎসাহসী ও সুদৃঢ় চিন্তার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষা দেন, মানুষকে প্রস্তরভূমির ন্যায় স্বাধীনচেতা হইতে হইবে, যাহাতে সে নির্ভীকচিত্তে যাবতীয় প্রতিকূলতার মুকাবিলা করিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اندر بلائے سخت پدید رند + فضل بزرگ مردی وسالاری

"কঠিন বিপদে মহৎ ও সর্দার ব্যক্তির কার্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।" শেষ বয়সে (বিভিন্ন মতে শৈশবে, 'আওফী) রাওদাকী দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন (সা'ঈদ নাফীসী, আহ্ওয়াল ওয়া আশ্'আর-ই রাওদাকী, তেহরান, ২খ, ৪০৭)। সেই অবস্থায় তাঁহার সহনশীলতা ও দৃঢ়চিত্ততা ছিল আরও প্রশংসনীয়। স্বীকার করিতে হয় যে, বাহ্যিক অন্ধকারে অভ্যন্তরীণ আলো তাঁহার কাজে আসিয়াছিল। কাসীদায় তিনি প্রফুল্লতা ও পার্থিব সুখ-শান্তি হইতে বিরত থাকিতে আহ্বান জানান। অন্যদিকে এই কথাও বলেন যে, পার্থিব সুখ-শান্তিতে একেবারে হারাইয়া যাওয়া উচিত নয়। কৃত্রিমতা, দ্বিমুখিতা ও কপটতাকে তিনি দারুণ ঘৃণা করিতেন।

কবিতায় উৎকর্ষের সাথে তিনি সঙ্গীত-শিল্পেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি আমীর নাস্র ইব্ন আহ্মাদের দরবারে বীণার সুর বাজাইয়া স্বীয় কাসীদা গাহিয়া শুনাইতেন। তাঁহার কাসীদার অলৌকিক প্রভাব সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার উক্ত আমীর (নাস্র ইব্ন আহ্মাদ) বুখারার বাহিরে ভ্রমণরত থাকিয়া নিজের বাড়ীঘর ও স্বজনদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দরবারের লোকজন ও সঙ্গী-সাথীরা প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল ছিল। কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলার সাহস কাহারও ছিল না। অবশেষে তাহারা রাওদাকীর শরণাপন্ন হইল। রাওদাকী রাত্রিতে একখানি কাসীদা রচনা করিয়া প্রভাতে আমীরের নিকট গমন করেন, হাতে বীণা তুলিয়া নেন এবং "পারদা-ই 'উশ্শাক" রাখে কাসীদাখানি গাহিয়া শোনান। কাসীদার প্রথম লাইনটি ছিল ঃ

بوی جوی مولیان آید همی + یاد یار مهربان آید همی

অর্থাৎ "মুলিয়ান প্রস্রবণের গন্ধ আমি পাইতেছি, দয়ালু বন্ধুর কথা আমার মনে পড়িতেছে।" আমীরের বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে (বর্ণনা অতিরঞ্জিতও হইতে পারে), মোজা না পরিয়াই বুখারার পথে রওয়ানা হইলেন (নিজামী 'আরূদী সামারকান্দী চাহার মাকালা, সং মুহাম্মাদ কায্বীনী, লাইডেন ১৩২৭ হি., পৃ. ৫২। পুস্তকটি রাওদাকীর কাসীদাসমূহের একটি সুন্দর পর্যালোচনা)।

ঐ যুগে দাকীকী তূসী নামক আর একজন কবি দ্বিতীয় নূহ ইব্ন মানসূর সামানী (৩৬৬/৯৭৬-৩৮৭/৯৯৭)-এর প্রশংসায় প্রাচীনদের পদ্ধতিতে কতিপয় কাসীদা রচনা করেন।

গায্নাবী আমলে (৩৫১/৯৬২-৫২৮/১১৮৬) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। সুলতান মাহ্মূদ কবি-সাহিত্যিকদের প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিতেন। কথিত আছে যে, গায্নীর দরবারে চারি শত কবি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন কাসীদা রচয়িতা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

'উনসুরী (عنصری) ঃ আবু'ল-কাসিম হাসান ইব্ন আহ্মান 'উনসুরী (৩৫০/৯৬১-৪৩১/১০৩৯) (দ্র.) মাহ্মূদ গায্নাবীর দরবারের খ্যাতিমান কবি ছিলেন, যাঁহাকে মালিকু'শ-শু'আরা' (কবিকুল-সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। অধিকন্তু এই মর্মে নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল যে, যে কবি কাসীদা রচনা করিবেন, তিনি উহা পাঠ করিবার পূর্বে 'উন্সুরীকে দেখাইয়া লইবেন। এইভাবে মাহ্মূদ 'উন্সুরীকে খ্যাতির আসমানে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 'উন্সুরী যে বিপুল পরিমাণ উপহার-উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ভারতের এক যুদ্ধ-বিজয় উপলক্ষে 'উন্সুরী একটি কাসীদা পাঠ করিয়াছিলেন, যাহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে একশত থলি আশ্রাফী (স্বর্ণমুদ্রা) ও দশটি ক্রীতদাস দেওয়া হইয়াছিল।

'উন্সুরী কাসীদার প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। সাধারণত তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দ্বারা কাসীদা শুরু করিতেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া মূল প্রশংসায় ফিরিয়া যাইতেন। তিনি নূতন নূতন ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্প্রণালী খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গি সহজ-সরল ও গতিশীল। নৈতিক বিষয়াদি সংবলিত 'উন্সুরীর কিছু কিছু কাসীদা রহিয়াছে। প্রশংসিত জনের প্রশংসার অধীনে তিনি জ্ঞান, দানশীলতা ও বীরত্বের প্রতিও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

'উন্সুরী সুলতান মাহ্মূদের অভিযানসমূহে তাঁহার সহযোদ্ধা ছিলেন। তাই কোনও কোনও অভিযান সম্পর্কে তাঁহার কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক চিত্র বলিয়া মনে হয়। তিনি মাহ্মূদের প্রশংসায় খাওয়ারিযম বিজয়ের ১৭২ শ্লোকের একটি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। 'উন্সুরী যদিও প্রশংসামূলক কাসীদার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কাসীদায় কতিপয় নৈতিক বিষয়ও বর্ণনা করিয়াছেন।

ফার্রুখী (فرخی) ঃ সীস্তানী আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন জূলুগ (মৃ. ৪২৯/১০৩৭) সুলতান মাহ্মূদ গায্নাবীর আর একজন প্রখ্যাত দরবারী কবি। শাহী দরবারে স্থান লাভের পূর্বে তিনি সীস্তানের একজন কৃষক ছিলেন। নিজামী 'আরূদী সামারকান্দী লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বভাব কবি ছিলেন, সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং বীণা বাজাইবার পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি আবু'ল-মুজাফ্ফার আমীর চাগানিয়ার দান-দক্ষিণার খ্যাতি শুনিতে পাইয়া তাঁহার প্রশংসার "কারওয়ান-ই হুল্লা" শীর্ষক কাসীদা রচনা করেন এবং চাগানিয়ার দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন (চাহার মাকালা, সং মুহাম্মাদ কায্বীনী, লাইডেন ১৩২১ হি. পৃ. ৫৭)। নিজামী 'আরূদী আরও লিখিয়াছেন যে, ফার্রুখী যখন দরবারে উপস্থিত হন, তখন আমীর 'দাগগাহ'-তে ছিলেন। কবি তাঁহার কাসীদা আবু'ল-মুজাফ্ফারের প্রধান সহকারী আস্'আদকে শোনান। আস্'আদ একজন সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন। একজন কৃষকের মুখে এই রকম বিশুদ্ধ, অলংকারপূর্ণ ও গতিশীল কাসীদা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং কবিকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করেন। গদ্যে দাগ গাহ-এর দৃশ্য বর্ণনা করিয়া তিনি কবিকে তাহা কবিতায় প্রকাশ করিতে বলেন। ফার্রুখী সারা রাত ধরিয়া দাগ গাহের কাসীদা রচনা করেন এবং সকালে আমীরের সহকারী আস্'আদকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শোনান। আস্'আদ এই কাসীদা শ্রবণ করিয়া আরও মুগ্ধ হন এবং কবিকে নিজের সঙ্গে করিয়া দাগগাহে নিয়া যান। ফার্রুখী উভয় কাসীদা আমীরকে পড়িয়া শোনান। আমীর শিল্পের সমঝদার ছিলেন। তিনি কাসীদাদ্বয়ের জন্য কবিকে পুরস্কৃত করিলেন এবং মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনে ভূষিত করিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৫৮)। ইহার পর ফার্রুখী গায্নীর দরবারে গমন করেন। সুলতান মাহ্মূদ এই কবিকেও অনেক সম্মান করেন। তাঁহার দরবারে কবি বিশেষ এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার কাসীদাসমূহ আনন্দ, স্ফূর্তি ও বস্তুগত উপভোগ-সামগ্রীর উল্লেখে পরিপূর্ণ। সঙ্গীতে পারদর্শিতার কারণে তাঁহার কবিতায় সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। বীণা ও বেহালার তারে তারে সুরের যে আনন্দ আর স্বাদ বিরাজমান, তাঁহার কবিতায় তাহা বিদ্যমান (মক্বূল বেগ বাদাখ্শানী, আদাবনামা-ই ঈরান, ২য় সং., ১৩৯, ১৩৮)।

অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত এবং যথাযথ শব্দ ব্যবহারে ফার্রুখীর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি প্রাচীন কবিদের রীতিতে কাসীদা রচনা করিয়াছেন। 'উন্সুরীর ন্যায় তিনিও সুলতান মাহ্মূদের অধিকাংশ অভিযানে তাঁহার সহযোদ্ধা ছিলেন। যেসব দৃশ্য ও ঘটনা তিনি যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া ঐ কাজের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করিয়াছেন। একইভাবে সুল্তান মাহ্মূদের সভা-সমিতির রীতিনীতি ও শিকারের দৃশ্যাবলীর পূর্ণ চিত্রও তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ কাসীদা ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী। ইহাতে সমসাময়িক প্রথা ও রীতিনীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

ফর্রুখী তাঁহার কাসীদাসমূহে সুন্দর সুন্দর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। হেমন্ত ঋতুর প্রশংসায় রচিত তাঁহার 'খাযানিয়া কাসীদাটি উপমা ব্যবহারের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একই যুগে যীনাতী 'আলাবী (زینتی علوی) মাহমূদী, মান্শূরী সামারকান্দী এবং মাস্'উদী গায্নাবীও প্রাচীনদের রীতিতে কাসীদা রচনা করিয়াছেন।

প্রাচীন ফার্সী কবিদের মধ্যে কোনও কোনও কবি আরব কাসীদা রচয়িতাদেরও অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মানূচেহ্রী (منوچهری) মৃ. ৪৩২/১০৪০) শীর্ষস্থানীয়। উক্ত রচনারীতির (আরব ছাঁচের) কাসীদাসমূহ পাঠ করিলে অভিযাত্রীদলের ভ্রমণ, অরণ্যের বিশালতা, প্রস্থান-ধ্বনি, স্থান ও দৃশ্যাবলীসমেত সমগ্র চিত্রটি দৃষ্টিপটে ভাসিয়া ওঠে। আরব কবিদের কাসীদাসমূহে, যেমন উষ্ট্রী ও উষ্ট্র-চালক, ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, কাফেলার বিবরণ ও মরুভূমির বর্ণনা ইত্যাদি উল্লেখ বহুল প্রচলিত ছিল, মানূচেহ্রীর কবিতায়ও প্রায়শ তাহা পরিলক্ষিত হয়। (আদাব্নামা-ই ঈরান, ১৭৬, ১৭৭)। মানূচেহ্রী আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নিজের কথায় من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر 'আমার অনেক আরবী কবিতা কণ্ঠস্থ আছে।" এই কারণেই তাঁহার কবিতায় বহু সংখ্যক আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও কোনও কাসীদা এমন সব ছন্দে রচনা করিয়াছেন, যাহা শুধু আরবী কবিতার জন্যই নির্দিষ্ট। কাককে আরবের অধিবাসীরা অশুভ মনে করিত। তাই কুলক্ষণসমূহ প্রকাশ করিবার জন্য অধিকাংশ আরব কবিদের কাব্যে কাক (আরবীতে গুরাব = غراب) ও তাহার কা কা ধ্বনির উল্লেখ দেখা যায়। মানূচেহ্রীও "গুরাব-ই বায়ন" (غراب البين =গুরাবু'ল-বায়ন, বিরহের দুঃসংবাদবাহী কাক) কথাটি ব্যবহার করিয়া আরবদের অনুকরণ করিয়াছেন। মানূচেহ্রী কোনও কোনও আরব কবির অনুসরণেও কাসীদা রচনা করিয়াছেন।

মানূচেহ্রীর কাসীদায় বসন্তের আগমন, ফুলের রং সুবাস, পাখির কলকাকলি এবং প্রেমিকদের গুঞ্জরণের কথা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে

বর্ণিত হইয়াছে। মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা ও চমৎকার উপমাদির প্রয়োগ তাঁহার কাসীদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইসব দৃশ্য ও উপমার অধিকাংশই অনুভূতি-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মানূচেহ্রীর কাব্যে জীবনের উদ্যম ও আনন্দের জয়গান সপ্রভাবে বিদ্যমান। তাঁহার কবিতায় একমাত্র 'শামা' কাসীদাটি ছাড়া আর কোথাও দুঃখ-বেদনার উল্লেখ নাই।

সালজূকদের যুগকে (৪২৯/১০৩৭-৫৫২/১১৫৭) এই কাসীদা রচনার স্বর্ণযুগ বলা হইয়া থাকে। এই যুগে বেশ কয়েকজন উঁচু স্তরের কাসীদা রচয়িতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সর্বপ্রথম হাকীম নাসির খুস্রাও (৩৯৪/১০০৩-৪৮১/১০৮৮)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি জ্ঞানগর্ভ কাসীদা বেশী লিখিয়াছেন, তাঁহার কাসীদায় দর্শন ও নৈতিকতার বিবরণ রহিয়াছে। তিনি ইস্মা'ঈলী 'আকীদার অনুসারী ছিলেন। এই কারণে তিনি গোপন মতবাদ শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার কাসীদা তাঁহার ধর্মবিশ্বাস প্রচারের মাধ্যমরূপেও কাজ করিয়াছে।

মাস্'উদ সা'দ সাল্মান (আনু. ৪৩৮/১০৪৬-৫১৫/১১২১) কাসীদা রচনায় প্রথম সারির ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষদের দেশ ছিল হামাদান। পিতার নাম সা'দ ও পিতামহ সাল্মান। সুল্তান মাহ্মূদ গায্নাবীর আমলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তিনি লাহোর আগমন করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। মাস্'উদ সা'দের সম্পর্ক এই লাহোরের সঙ্গেই ছিল। প্রথম যৌবনে সুলতান ইব্রাহীম ইব্ন মাস্'উদ গায্নাবীর (৪৫০/১০৫৮-৪৯২/১০৯৮) দরবারের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি সুলতান ইব্রাহীম ও যুবরাজ সায়ফু'দ্-দাওলা মাহ্মূদের প্রশংসায় কাসীদা লিখিতে থাকেন। প্রথম প্রথম ঐ দরবারে তিনি অনেক মর্যাদা ও প্রভাব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার বিপক্ষে চলিয়া গেলে কারা-জীবনের সূচনা হয়। কমবেশী আঠারো বৎসর কারাগারে কাটে। বন্দীদশায় রচিত কাসীদাসমূহ 'হাব্সিয়্যাত'-এর অন্তর্গত। এইগুলি কাব্যাঙ্গনে উচ্চ স্থান লাভ করে। কাসীদা রচনায় প্রাচীন কবিদের অনুসরণ করিলেও ভাব ও বিষয়বস্তু এবং নূতন নূতন প্রকাশভঙ্গি ও উপমার সাহায্যে তিনি স্বীয় কাসীদাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

হাকীম সিনা'ঈর ন্যায় সাধক পুরুষ মাস্'উদের মৃত্যুর পর তাঁহার দীওয়ান (কাব্য-সংকলন) বিন্যস্ত করেন এবং সেই সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র কবিতাও (কিত্'আ) লেখেন (দ্র. দীওয়ান-ই মাস্'উদ সা'দ সাল্মান, সম্পা. রাশীদ য়াস্মী, ৭৩২, ৭৩৩)।

কাত্রান তাবরীযী, আবূ মান্সূর (মৃ. ৪৬৫/১০৭২)-ও কাসীদা রচনা করিয়া সাল্জূক যুগের কবিদের মধ্যে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি আযারবায়জানের শাসকদের প্রশংসায় বহুসংখ্যক কাসীদা রচনা করিয়াছেন। ঐ শাসকদের মধ্যে তাবরীযের প্রশাসক মীর ওয়াহ্সূদান (মৃ. ৪৫০/১০৫৮) বিশেষভাবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীরের মৃত্যুর পর আবূ নাস্র মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াহ্সূদান তাব্রীযের প্রশাসনক হইলে তাঁহার প্রশংসায়ও কাত্রান কাসীদা রচনা করেন। কাত্রান বেশীর ভাগ খুরাসানের কবিদের রীতিতে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। একথাও ঠিক যে, তিনিই প্রথম কবি, যাঁহার কবিতায় খুরাসানী রচনারীতি বর্জনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কাসীদায় নূতন নূতন প্রকাশভঙ্গি ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার সমূহে নূতনত্ব রহিয়াছে। বাকভঙ্গীতে কারুকার্য ও অলংকার-নৈপুণ্য দেখা যায়। কাফিয়্যা বা অন্ত্যমিলযুক্ত কাসীদা রচনায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কাত্রান ঘটনা বর্ণনা ও দৃশ্য চিত্রণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহার একটি উত্তম উদাহরণ "যাল্যালা-ই তাব্রীয'বা "তাব্রীযের ভূমিকম্প"। এই ভূমিকম্প ৪৩৪/১০৪২ সনে হইয়াছিল (দ্র. মাকবূল বেগ বাদাখ্শানী, আদাব্নামা-ই ঈরান, ২য় সং., লাহোর ২৫৫, ২৫৬)। এই কাসীদাটি পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, কাত্রান প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়াছেন এবং তাহা বর্ণনার উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও গতিশীল পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিউক্ত কাসীদাটিকে 'হালিয়্যা' (অবস্থা বর্ণনাসূচক) কাসীদা বলা যায়।

৪৩৮ হিজরীতে নাসির খুসরাও যখন তাব্রীয আগমন করেন, তখন কাত্রানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কবিতা পসন্দ করেন।

আমীর মু'ইয্যী (মৃ. ৫৪২/১১৪৭)-এর কাসীদাসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে মালিক শাহ্ সাল্জূকী (৪৬৫/১০৭২-৪৮৫/১০৯২) ও সুল্তান সান্জার (سنجر) [৫১১/১১১৭-৫৫২/১১৫৭]-এর আমলে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সুল্তান সান্জারের আমলে তিনি মালিকু'শ-শু'আরা' বা "কবিকুল-সম্রাট" হইবার সম্মানও লাভ করেন। ৫১০/১১১৬ সনে গায্নী অধিকৃত হইলে মু'ইয্যী সুলতানকে কাসীদা পড়িয়া শোনান। সুলতান সান্জার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং মুক্তা দ্বারা কবির মুখ ভরিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। আমীর মু'ইয্যী প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি 'উন্সূরী, ফাররুখী ও মানূচেহ্রীর রচনা দ্বারা অনেক প্রভাবিত ছিলেন।

মানূচেহ্রীর ন্যায় মু'ইয্যীও কোনও কোনও কাসীদায় আরব কবিদের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করেন। যেমন ঃ

ای ساربان منزل مكن جز در ديار يار من

تايك زمان زارى كنم بر ربع و اطلال و دمن

"হে উষ্ট্রচালক, কেবল আমার বন্ধুর এলাকায় যাত্রা স্থগিত কর, যাহাতে আমি বন্ধুর বাড়ির ধ্বংসাবশেষের সামনে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করিতে পারি।"

আরও কতিপয় কাসীদা রচয়িতা ফারসী কবির মোটামুটি বিবরণ এইরূপ ঃ রাশীদু'দ-দীন ওয়াত্ওয়াত (৪৮১/১০৮৮-৫৭৮/১১৮২-৮৩)-এর কাসীদাসমূহ খাওয়ারিয্ম শাহের যুদ্ধ ও অভিযানসমূহ সম্পর্কিত। তাঁহার রচনায় কৃত্রিমতার ছাপ সুস্পষ্ট। আদীব সাবির (মৃ. ৫৪৬/১১৫১) কাসীদার মুখবন্ধে প্রেমের গভীর আমেজ সৃষ্টি করিয়া থাকেন (বাদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফার, সুখান ওয়া সুখান্ওয়ারান, তেহ্রান ১৩০৮ সৌর, ১খ, ২৩৬-২৪৫)।

'আবদু'ল-ওয়াসি' জাবালী (মৃ. ৫৫৫/১১৬০) কারুকার্য ও অলংকরণকে কাসীদার গুণ মনে করিতেন। আবু'ল-ফারাজ রূনী ও মুখতারী গাযনাবীও (মৃ. ৫৫৪/১১৫৯) ঐ যুগের কাসীদা রচয়িতা ছিলেন। ইঁহাদের রচনায় এই মাধ্যমটির কতিপয় সেরা বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।

আন্ওয়ারী, আওহাদু'দ-দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) রিদা যাদাহ শাফাক, (তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, ১৮২) ঃ আনওয়ারীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কাসীদার বিষয়বস্তুতে ব্যাপকতা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কাসীদাসমূহে অংকশাস্ত্র, দর্শন, সঙ্গীত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্ঞানের বিভিন্ন

দিক নানাভাবে স্থান পাইয়াছে। তখন আর কাসীদা কেবল ব্যক্তির প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, বরং উহা জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াদি প্রকাশের একটি মাধ্যমে পরিণত হইল। তিনি তাঁহার কাসীদায় স্বাধিকার, স্বাবলম্বিতা ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেন; সাথে সাথে জ্ঞানের অমর্যাদা এবং লোভ ও ভিক্ষাবৃত্তিরও নিন্দা করেন। তাঁহার কাসীদাসমূহ বিভিন্ন অভিযোগে পরিপূর্ণ। "আশ্‌ক হা-ই খুরাসান" কাসীদাটি একটি সামাজিক ঘটনার চিত্র তুলিয়া ধরে। উহাতে খুরাসানের প্রতি তাঁহার ভালবাসার গভীর আবেগ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। আন্‌ওয়ারীর রচনা ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে ঝোকোসকী (ژو کوسکی) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম Materials for a Biography and characteristic sketch.

প্রাচীনদের সারিতে আর একজন প্রখ্যাত কাসীদা রচয়িতা কবি জামালু'দ্-দীন ইস্‌ফাহানী (মৃ. ৫৮৮/১১৯২)। তাঁহার কাসীদায় কারুকার্য ও অলংকার প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও অস্পষ্টতা কিংবা দুর্বোধ্যতা নাই। তাঁহার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে আন্‌ওয়ারী, খাকানী, নিজামী গানজাবী ও রাশীদু'দ-দীন ওয়াত্‌ওয়াত প্রমুখ রহিয়াছে। তিনি তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

জামালু'দ-দীন ইস্‌ফাহানীর কাসীদাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কাসীদা ও গাযালের মধ্যকার ভাষাগত তারতম্য হ্রাস করিয়াছেন। তিনি সচরাচর এমন সব শব্দ ও বাকরীতি ব্যবহার করেন, যেগুলি কেবল গাযালেরই উপযোগী। তাঁহার কোনও কোনও কাসীদার বিষয়বস্তু নৈতিকতা ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত। তিনি প্রায়শ পাঠকের মাঝে এইরূপ অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন যে, যেহেতু এই পৃথিবী নশ্বর, তাই উহাতে নিমজ্জিত হওয়া কিংবা উহাকে লইয়া কোনও প্রকার গর্ব করা অর্থহীন। জ্ঞানী লোকদের উচিত পৃথিবীর ধন-সম্পদকেও পৃথিবীর মতো অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল মনে করা।

জামালু'দ-দীনের কাসীদাসমূহের মধ্যে সেইসব শ্লোক অধিকতর হৃদয়স্পর্শী যাহাতে তিনি কালচক্র, মানুষের অবহেলা ও অমনোযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় তিনি সৎসাহস, বাহ্যিক জগৎকে পরিহার করা এবং আত্মিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ দেওয়ারও পরামর্শ দিয়াছেন।

জাহীর ফারয়াবী (মৃ. ৫৯৮/১২০১) বিষয়বস্তুর অলংকরণ সূচিত করেন। (অর্থাৎ কোনও রূপকের কোনও এক শাখার উপর ভিত্তি করিয়া অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু সৃষ্টি করেন)। মধ্যযুগ ও আধুনিককালের কাসীদা রচয়িতাদের সূক্ষ্ম কল্পনা-বিলাস তাঁহারই নমুনার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে (শি'রু'ল-'আজাম, সং লাহোর, ৫খ, ৭)। তবে তিনি অতিশয়োক্তিকে— যাহা কাব্য রচনায় বৈধ বলিয়া বিবেচিত— বাড়াবাড়ির সুদূর স্তরে লইয়া গিয়া কবিতাকে বাস্তব হইতে অনেক দূরে সরাইয়া নিয়াছেন। যেমন ঃ একটি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, কল্পনা সপ্ত আসমান ও আরশ-কুরসীকে পদতলে রাখিয়া (অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া) এমন স্তরে উন্নীত হইয়াছে, যেখান হইতে সে কিযিল আরসালানের' সওয়ারীর নাগাল পাইয়া তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম। উদ্দেশ্য ছিল শুধু এতটুকু বলা যে, 'কিযিল আর্‌সালান' একজন সম্মানিত বাদশাহ। কিন্তু কবি যে চিত্রটি অংকন করিলেন, তাহা জ্ঞান ও যুক্তিগ্রাহ্য নহে, যদিও শ্রোতা কিংবা পাঠক উহাতে অবশ্যই প্রভাবিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা অনুধ্যান বা কল্পনার চরম সীমা যেখানে বাস্তবতা একেবারে অদৃশ্য হইয়া কাল্পনিক স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

খাকানী (আনু. ৫২০/১১২৬-৫৯৫/১১৯৭; দ্র. রিদা যাদাহ শাফাক, তারীখ-ই আদাবিয়াত-ই ঈরান, তেহরান ১৩৪২ সৌ., ২০৫, ২১১) আরবী ভাষা, ইসলামী ইতিহাস ও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষা ও ইঙ্গিতসমূহ সহজাতভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাঠক ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ না হইলে তাঁহার বেশির ভাগ রচনা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার কাসীদার অধিকাংশ বাকরীতি প্রাচীনদের রচনায় দেখা যায় না। থাকিলেও তাহা নিতান্ত বিরল। যেমন—শাহ-ই তুগান-ই 'আক্‌ল, দার'-ই হিক্‌মাত, নুক্‌তা-ই দোশীযাহ, খাক-ই বীযান-ই হাসান, রোয-ই কুরান-ই হাওয়া, হিন্দ-ই মা'না, চায়ন-ই সূরাত ইত্যাদি। খাকানী খৃষ্ট ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করিবারও সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই কারণে খৃষ্টানদিগের পরিভাষাসমূহ ও তাহাদের ধর্মীয় বর্ণনাগুলি অনায়াসে উল্লেখ করিয়া থাকেন। খৃষ্টান মায়ের কোলে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে খাকানী এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঐ কারণেই তাঁহার বাক্য-বিন্যাস বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। খাকানী বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়াও কাসীদা রচনা করিয়াছেন। ঐ সব কাসীদায় তিনি সুন্দরভাবে ঘটনাবলীর চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। হাজ্জে গমনকালে তিনি যখন মাদা'ইন পৌঁছেন এবং কিস্‌রার প্রাসাদের ধ্বংসলীলার দৃশ্য অবলোকন করেন, তখন তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় এবং তিনি ঐ সম্পর্কে অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী কাসীদা "আয়ওয়ান-ই মাদা'ই'ন" রচনা করেন।

কাসীদার মুখবন্ধে তিনি সাধারণত ঊষার আলো, সূর্যোদয় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি অনেক দীর্ঘ কাসীদা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসুলভ শক্তির কোথাও ঘাটতি হয় নাই। খাকানী ফারসী ও আরবী ভাষায় না'তিয়া [রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রশংসাসূচক] কাসীদাও লিখিয়াছেন এবং ঐসব কাসীদা রচনার জন্য তিনি নিজেকে "হাসসান-ই 'আজাম" বলিয়া থাকেন। একই কারণে হাকীম কাআনী তাঁহার একটি শ্লোকে খাকানীকে "হাস্‌সানু'ল-'আজাম" অভিহিত করিয়াছেন (দ্র. রাফাকাতুল্লাহ্ খান, Khaqani His Life and Works, No, 6, TP.f III, পৃ. ৮, ৯, ৩৪)। তাঁহার রচিত খণ্ড কবিতাও (কিত্‌আত) রহিয়াছে, যাহাতে নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায়। মোটকথা খাকানী ফার্সী ভাষায় কাসীদা রচয়িতা বড় বড় কবির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ রচনা নীতির অধিকারী।

এবারে আযারবায়জানেরই অন্যান্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য কাসীদা রচয়িতা কবি যেমন—মুজীরু'দ-দীন বীলকানী, ফালাকী শীরওয়ানী প্রমুখের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগে (মঙ্গোল আলম) ঃ এই যুগের সূচনা 'ইরাক-ই 'আজাম (আযারবায়জান, ইস্‌ফাহান, শীরায ইত্যাদি) হইতে। এই যুগের কবিগণ প্রাচীনদের পদ্ধতি হইতে ভিন্নতর এক নূতন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন। এই পদ্ধতিকে "সুবক-ই 'ইরাকী" বলা হইয়া থাকে, ঐ যুগেই ইহার উন্নতি সাধিত হয়।

কাসীদায় এই পদ্ধতিকে যিনি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন জামালু'দ-দীন ইস্‌ফাহানীর পুত্র কামালু'দ-দীন ইসমা'ঈল (মৃ. ৬৩৫/১২৩৭)। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় আল-ইসা'ইদ ও আল-ই

খুজান্দ'-এর প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও তিনি খাওয়ারিয্‌ম, ফারিস ও তাঁবারিস্তানের শাসকদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করিয়াছেন। সাধারণত তিনি মুখবন্ধ ছাড়াই কাসীদা রচনা করিতেন। কোনও কোনও কাসীদায় স্বদেশের প্রতি তাঁহার গভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসফাহান যখন আক্রমণকারীদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইল এবং সেখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলিতে লাগিল, তখন তিনি স্বীয় কাসীদায় সকরুণ আবেগ ব্যক্ত করেন। কামাল ইস্‌মা'ঈল মঙ্গোলদের হাতে মারা যান। তাঁহাকে "খাল্লাকু'ল-মা'আনী" (বিভিন্ন অর্থের স্রষ্টা) বলা হইয়াছে। কেননা তিনি কাল্পনিক বিষয়বস্তু দ্বারা তাঁহার কাসীদাসমূহকে অলংকৃত করিয়াছেন। এই পদ্ধতিই ক্রমে নূতন নূতন বিষয়বস্তু সৃষ্টির এক স্বতন্ত্র রীতির ভিত্তি সূচিত করে। 'আলী কালীওয়ালাহ্ দাগিস্‌তানী লিখিয়াছেন ঃ 'ফাসাহাত' রীতি তাঁহার মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে আর "বালাগাত' পদ্ধতি তাঁহারই কারণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে (তায্‌কিরা-ই রিয়াদু'শ-শু'আরা', পাণ্ডু., পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নং P. F. t 17, পৃ. ১৫৯)। একই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "খাল্লাকু'ল মা'আনী" আরবের বাহিরে হাসসানের সমতুল্য। আরবের অংলকারশাস্ত্রবিদগণ তাঁহাকে এই শাস্ত্রের গুরু মনে করেন (উল্লিখিত পাণ্ডু., পৃ. ১৬০ প.)। তিনি ছিলেন অনারব বিশ্বের ব্যস্ততম কাসীদা রচয়িতা কবি এবং ইরাকী পদ্ধতির যথার্থ প্রতিনিধি।

কামালু'দ-দীনের পর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ আমরা শায়খ সা'দীর (মৃ. আনু. ৬৯১/১২৯১) রচনায় দেখিতে পাই। তিনি আতাবিক সা'দ ইব্‌ন যাংগী (৬২৩/১২২৬-৬৬৮/১২৬৯)-র প্রশংসায় যে সকল কাসীদা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে প্রাচীন কবিদের সরলতা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং অন্যদিকে পরবর্তীকালের কবিদের ন্যায় বিষয়বস্তু উদ্ভাবনের দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। এই দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ দ্বারা সা'দী ভাষা ও বর্ণনার নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং কাসীদা রচনার ক্ষেত্রে নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন।

সা'দী একজন স্বাধীনচেতা কবি ছিলেন। তিনি তাঁহার কাসীদায় তোষামোদ ও চাটুকারিতামূলক স্তুতি বর্ণনা করেন নাই বরং কাসীদাকে তিনি উপদেশ ও সত্য প্রচারের মাধ্যম বানাইয়াছিলেন। যখন আতাবিকদের রাজত্বের পতন ঘটে এবং হালাকূ খানের পুত্র আবাকা খানের পক্ষ হইতে আমীর আনকিয়ানূ পারস্যের শাসক নিযুক্ত হন তখন সা'দী তাঁহার কাসীদা লিখিলেন, যাহাতে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

بس بگر دید و بگردد روز گار
دل بدنیا در نه بندد هوشیار
اے که دستت می رسد کاری بکن
پیش ازاں کزقو نیاید هیچ کار

"কালের পরিবর্তনে তোমাদেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সাবধান! দুনিয়াতে পূর্ণ মনোযোগ দিও না। কাজ করিবার ক্ষমতা লোপ পাইবার পূর্বেই কাজ করিয়া লও।"

সা'দীর সকল কাসীদা উপদেশবাক্যে পরিপূর্ণ। তিনি পৃথিবীর অস্থায়িত্ব, সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি, আত্মশুদ্ধি ও সৎকার্যাবলীর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। সা'দীর পূর্বে আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ, আর প্রশংসা ও বর্ণনায় অতিরঞ্জন কাসীদার শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু সা'দীই সেই যুগের প্রথম কবি, যিনি কাসীদা রচনায় নিষ্ঠা ও সততার পথ বাহির করেন। শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের তুলনায় ভাব ও বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁহার মনোযোগ অধিক ছিল। তিনি যাহা কিছু বলিতে চাহিয়াছেন, স্পষ্টভাবে, সরাসরি এবং সহজ সরল ভাষায় তাহা বলিয়াছেন। সরলতার মাঝে আকর্ষণ এবং বর্ণাঢ্যতার মাঝে সততা সা'দীর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

উপমহাদেশে আমীর খুস্‌রূ (৬৫১/১২৫৩-৭২৫/১৩২৫) গাযাল ও মাছ্‌নাবীতে চিরন্তন খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি কাসীদাও লিখিয়াছেন। আবার তাঁহার রচনায় মধ্যযুগীয় কবিদের অনুকরণও লক্ষ করা যায়। কোনও কোনও কাসীদায় উপদেশবাণীও রহিয়াছে। কোথাও কোথাও আধ্যাত্মিক আলোচনাও স্থান পাইয়াছে। "বাহ্‌রু'ল-আব্‌রার" কাসীদাটি আধ্যাত্মিক আবেদনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাসীদায় তিনি গতানুগতিক প্রশংসা করিয়াছেন; তবে তাঁহার প্রশংসা অনেকটা স্বাদবিহীন মনে হয়। অবশ্য মুখবন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রতিভার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ওয়াহীদ মিরযা, Life and Works of Amir Khusrau), সা'দীর ন্যায় হাফিজ শারীযীও (মৃ. ৭৯১/১৩৮৯) কাসীদা লিখিয়াছেন। তবে তাঁহার প্রধান কীর্তি তাঁহার গাযাল।

সাল্‌মান সাওয়াজী (মৃ. ৭৭৮/১৩৭৬) তাঁহার সময়ের শীর্ষস্থানীয় কবিদের অন্যতম ছিলেন। কাসীদা রচয়িতা হিসাবে বিভিন্ন দরবারের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। কাসীদায় তিনি প্রাচীন কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন। কামাল ইসমা'ঈল ও জাহীর ফারায়াবীর নিকট হইতে ভাষার পরিশীলন রপ্ত করেন এবং বিষয়বস্তু আবিষ্কারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিষয়বস্তু বিন্যাসের যে পদ্ধতি মধ্যযুগীয় ও পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা কামাল ইসমা'ঈল কর্তৃক সূচিত হইলেও সালমানই ইহার অধিকতর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সালমানের মুখবন্ধ সাধারণত খুবই শক্তিশালী। তাঁহার ব্যবহৃত উপমারাজি বেশ নূতন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মাক্‌বূল বেগ বাদাখ্‌শানী, আদাব নামা-ই ঈরান, ২য় সং., ৪৭৬)। সালমান কাসীদার বিষয়বস্তুতে আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। ঐ যুগের আর একজন কাসীদা রচয়িতা হুম্মাম তাব্‌রীযী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪)। ইনি সা'দীর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। আওহাদী মারাগীও (মৃ. ৭৩৮/১৩৩৭) ঐ যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কাসীদা রচয়িতা।

সাফাবী যুগে (৯০৭/১৫০২-১১৪৪/১৭৩১) চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও ঐ যুগের নামকরা কবিদের সংখ্যা তুলানামূলক কম দেখা যায়। ইরানী জীবনীলেখক রিদা যাদাহ্ শাফাক ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

صفریان تشیع را مذهب رسمی قرار دادند ، ازیں رو نظم ونثر مذهبی دریں عصر ترقی کرد - شعرا بجائے مدح شاهان به نعت انبیا و اولیا بداختند و مدح آل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را موضوع قرار دادند -

"সাফাবীগণ শী'আ মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেইহেতু ধর্মীয় চিন্তাধারা সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুগে কবিগণ বাদশাহদের প্রশংসার পরিবর্তে নবী, রাসূল ('আ) ও ওয়ালী-দরবেশদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। প্রায়শ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বংশধরদের প্রশংসা তাঁহাদের কবিতার বিষয়বস্তু হইত" (তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ২৬৩)। রিদা কুলী হিদায়াত "মাজ্‌মা'উ'ল-ফুসাহা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

সাফাবী বাদশাহদের, বিশেষ করিয়া শাহ তাহ্মাসূপ ও 'আব্বাস-ই আ'জামের নির্দেশ ছিল যেন তাঁহাদের জন্য কাসীদা রচনা করা না হয় এবং শুধু ইমামগণের জন্যই কাসীদা রচনা করা হয়। ফলে যেখানে কবিদের পুরস্কার-সম্মানীর সূত্র শেষ হইয়া গিয়াছে, সেখানে ঐ যুগে কাসীদা রচনার প্রতি আর তেমন আগ্রহ প্রকাশ করা হয় নাই।

পাক-ভারতে মুগল যুগ ঃ উপমহাদেশে মুগল বাদশাহ ও শাসকদের দরবারে কাব্য ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। রত্নরাজি দ্বারা কবিদিগকে তুষ্ট করা হইত। এই কারণে কোনও কোনও নামকরা কবি ইরান-ভূমি ত্যাগ করিয়া উপমহাদেশের উদ্দেশ্য পাড়ি জমান। এইভাবে 'উরফী নাজীরী, জাহূরী, ওয়াহ্শী, য়ায্দী, সা'ইব, কুদসী, কালীম প্রমুখ কবি মুগল দরবারে কাব্যচর্চা করিতে থাকেন। এই কাজে তাঁহাদের সহিত উপমহাদেশের স্থানীয় কবিগণও যোগ দেন।

উপমহাদেশীয় পদ্ধতি ঃ এই বিশেষ পদ্ধতিকে কোনও কোনও ইরানী সমালোচক "সূবুক-ই হিন্দী" বা ভারতীয় পদ্ধতি নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

জালালু'দ-দীন আকবরের আমলে ফায়দী (৯৫৪/১৫৪৭-১০০৪/১৫৯৫) রাজ-দরবারের মালিকু'শ-শু'আরা' বা কবিকুল সম্রাট ছিলেন। তিনি কাসীদাও লিখিয়াছেন। তাঁহার কাসীদায় নূতন কয়েকটি বিষয় দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুখবন্ধ সর্বদাই কাসীদার প্রধান অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ফায়দীর কাসীদায় সাধারণত ইহা দেখা যায় না। এই কারণে 'গুরীয' বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনেরও পালা আসে নাই। তিনি যখন আকবরের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করেন, তখন সরাসরি আকবরের গুণাবলী দ্বারাই শুরু করেন। তবে প্রশংসার পর তাঁহার কাসীদা দু'আর মাধ্যমে সমাপ্ত হইয়া থাকে।

ফায়দী ফাখ্রিয়া (গৌরব বর্ণনামূলক) কাসীদাও লিখিয়াছেন। কোনও কোনও কাসীদা তিনি নিজের প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিয়া থাকেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দার্শনিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে কাসীদা রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজস্ব অনুভূতিও ঐ রকম। তাই গৌরব প্রকাশের ভঙ্গিমায় তিনি বলেন ঃ

امروز نه شاعرم حکیم + دانندة حادث و قدیم

"আজ আমি কবি নই দার্শনিক, আমি অস্থায়ী ও চিরন্তন বিষয় জ্ঞাত আছি।"

ফায়দীর নূতন নূতন উপমা ও অভিনব রূপক ব্যবহারের বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তাঁহার নিজের বর্ণনায়, "আমি আমার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার সাহায্যে অগ্নিশিখা কর্তন করিয়া অক্ষর (বিষয়বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছি। আমার ক্রন্দনশালা অন্ধকার রাত্রিতে অনেক ঘুমন্ত বক্তব্যকে জাগ্রত করিয়াছে।"

আকবরের আমলের দ্বিতীয় বড় কাসীদা রচয়িতা কবি ছিলেন 'উরফী (৯৬৩/১৫৫৫-৯৯৯/১৫৯১)। তাঁহার কাসীদারও নিজস্ব রীতি রহিয়াছে। মুখবন্ধে তিনি গৌরব বর্ণনামূলক শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। সৎসাহস তাঁহাকে বাসনা-কামনার প্রতি আকৃষ্ট হইতে দেয় নাই। তাঁহার কাসীদা অবশ্যই দু'আর মাধ্যমে সমাপ্ত হইয়া থাকে। 'উরফী ও ফায়দীর পূর্বে সাধারণ কাসীদা রচয়িতাদের অভীষ্ট ব্যক্তির প্রশংসার সাথে নিজের মর্যাদা ব্যক্ত করিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু 'উরফী যেখানেই নিজের কাব্য-মহিমা ব্যক্ত করিবার সুযোগ পান, প্রাণ খুলিয়া তিনি তাহা করিয়া থাকেন।

'উরফী বিরল রচনাশৈলীর উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁহার কাসীদায় এমন সব বিরল রচনা-শৈলী পরিলক্ষিত হয়, যদ্দ্বারা ফারসী ভাষা ও ফারসী কবিতায় সম্পদ ভাণ্ডারে মূলবান সংযোজন ঘটিয়াছে। তিনি জীবন বিধানের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করিয়াছে এবং সৎসাহস, অহংবোধ এবং মানবতার মর্যাদার ন্যায় বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত সংবেদন শীলতার সহিত পেশ করিয়াছেন। 'উরফী কাসীদাকে কেবল অভীষ্টজনের প্রশংসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাহাতে জীবনের বাস্তবতাসমূহ বর্ণনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মসচেতনতার শিক্ষাও দিয়া থাকেন ঃ

سر روحانیان داری ولی خود را تدیدستی
بخواب خود در آتا قبلة روحانیان بینی

"আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের গোপন কথা জানে অথচ নিজেকে চেনে না। তুমি নিজেকে চিনিলে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের কিব্‌লা কী, তাহা জানিতে পারিবে।"

তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, নিজেই তাহার ভাগ্যের রচয়িতা। তিনি বলেন ঃ তোমরা সৃষ্টির নিয়ম সম্পর্কে অবহিত নহ বলিয়া দুর্বিপাককে গ্রহ-নক্ষত্রের বিবর্তনের ফল বলিয়া ধারণা করিয়া থাক। তোমরা সৃষ্টির নিয়ম সম্পর্কে অবহিত হইলে জানিতে পারিতে যে, সকল দুর্বিপাক মানুষেরই কৃতকর্মের ফল। কাসীদায় তিনি প্রয়াস-প্রচেষ্টার শিক্ষাও দিয়াছেন। তাঁহার কাসীদাসমূহ দার্শনিক বিষয়াদিতে পূর্ণ, যাহা তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

নাজীরী (মৃ. ১০২৩/১৬৪১) 'উরফীর সমসাময়িক। তিনি জাহাঙ্গীরের প্রশংসায় কাসীদা লিখিয়াছেন এবং পুরস্কারও লাভ করিয়াছেন। তবে স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন গাযাল-রচয়িতা। ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে গাযালের অবদানই সর্বাধিক।

মুগল যুগের আর একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি কুদ্সী মাশ্হাদী (মৃ. ১০৫৬/১৬৪৬)। ইনি সম্রাট শাহজাহানের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিও কাসীদা রচনা করিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। ওয়ালাহ দাগিস্তানী লিখিয়াছেন যে, তাঁহাকে মালিকু'শ–শু'আরা' উপাধিও দেওয়া হইয়াছিল (তায্কিরা-ই রিয়াদু'শ শু'আরা', পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নং P. F. T. 17, পৃ. ১৫৭ক)। কুদ্সী কাসীদা রচনার ক্ষেত্রে যে সকল উস্তাদের পদাংক অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন ফায়দী, 'উরফী ও আমীর খুস্রূ। তাঁহার কাসীদা পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি আধ্যাত্মিক পথে বিচরণকারীর ন্যায় আল্লাহ্প্রেমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি যে সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহার কাসীদায় সে সবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্তরের ভাব ও মনের অবস্থানসমূহ খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

তালিব আমিলী সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১০১৪/১৬০৫-১০৩৭/১৬২৮) দরবারের মালিকু'শ-শু'আরা' ছিলেন। তিনি খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠের কবি ছিলেন। তিনি লাহোরের শাসক কীলীজ খানের প্রশংসায় ৮৪ শ্লোকের কাসীদা এক রাতেই রচনা করিয়াছিলেন। লাহোর সম্পর্কে তাঁহার রচিত কাসীদায় প্রমাণিত হয় যে, এই শহরের প্রতি তাঁহার গভীর টান ছিল। সেই কাসীদায় তিনি আবু'ল-মা'আলী (র)-এর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। লাহোর ছাড়াও তাঁহার কাসীদায় দিল্লী, সুলতান ও সিরহিন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কান্দাহারে অবস্থানকালে পাঞ্জাবের স্মৃতি তাঁহাকে ব্যথিত করে।

তালিবের কাসীদাগুলিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত সম্রাট জাহাঙ্গীরের অভিযানসমূহের বিবরণ এবং রাজ্যের সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিতও তাঁহার কাসীদায় লক্ষণীয়। গাযালকে তিনি বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং চমৎকার ও উন্নত মানের কাসীদা রচনা করেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক যুগ (কাজারী আমল) ঃ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফারসী কাসীদার আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। ইরানী কবিগণ কাজারী আমলে (১১৯৩/১৭৭৯-১২৬৪/১৮৪৮) রাওদাকী, ফাররুখী ও মানূচেহ্রীর অনুকরণ করিয়াছেন এবং প্রাচীন কবিদের পদ্ধতি পুনর্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে 'আব্দু'ল-ওয়াহ্হাব নিশাত (১১৭৫/১৭৬১-১২৪৪/১৮২৮), মিরযা শাফী' বিসাল (১১৯৩/১৭৭৯-১২৬২/১৮৪৫), কা'ইম মাকাম ফারাহানী (১১৯৩/১৭৭৯-১২৫১/১৮৩৫) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ফাত্হ 'আলী সাবা (মৃ. ১২৩৮/১৮২২) প্রাচীন কবিদের পদ্ধতি পুনর্জীবিত করিবার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুসরণে কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন। কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় (১২৩৩/১৮১৭) তিনি খুরাসানবাসীদের দুরবস্থার বিবরণসংবলিত একটি কাসীদা ফাত্হ 'আলী শাহ্ কাজার সমীপে পেশ করিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সাবা আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার কাসীদায় আরবী শব্দ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

এই যুগের বিখ্যাত ও স্বতন্ত্রধর্মী কবি ছিলেন হাবীবুল্লাহ্ কাআনী (১২২২/১৮০৭-১২৭০/১৮৫৩)। কাসীদা রচনার মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। তবে বিরল উপমাদি ছাড়াও কবিতার মিল ও কবিসুলভ শিল্প নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও তিনি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি অশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কাআনীর উপমাগুলি সাধারণত প্রাকৃতিক ও শাব্দিক কারুকার্যের দিক হইতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। দৃশ্য বর্ণনায় কাআনীর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। দৃশ্য বর্ণনামূলক কাসীদাগুলি তাঁহার গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচায়ক। তিনি দীর্ঘ ঘটনাবলী ছন্দোবদ্ধ করিতে করিতে এমন কিছু কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করেন, যাহাতে তাঁহার গভীর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু, ইতিপূর্বে বর্জিত ছন্দবিষয়ক কিছু কিছু ব্যতিক্রম কাআনীকে অনায়াসে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া শব্দের প্রাচুর্য ও সমার্থবোধক শব্দের ধারাবাহিক ব্যবহারসহ অলংকার শাস্ত্রীয় বিভিন্ন কলাকৌশলের সুন্দর ও সার্থক কাআনীর কাসীদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কাআনী তাঁহার কবিতার জন্য সাধারণত এমন সব ছন্দ বাছিয়া লইয়াছেন, যাহাতে কবিতার মিল সমন্বিত হইয়া থাকে। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দরাজিও ধ্বনিগত নিদর্শনাবলীর বাহক। কবিতার মিলের খাতিরে কাআনী কিছু কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেমন একটি অতিরিক্ত শব্দ "بر"-কে অন্ত্যমিল করিয়া গোটা কাসীদা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। একটি চরণ এইরূপ ঃ

آمد به برم دوش یکے شاده پسر
زو مشك فر پسر هشته دو گیسو به بر

কাআনী ছাড়াও তাঁহার সমসাময়িক কবি ফারূগী বিস্তামী (১২১৩/১৭৯৮-১২৭৪/১৮৫৭), সারুশ ইস্ফাহানী (১২২৯/১৮১৩-১২৮৫/১৮৬৮) ও মুহাম্মাদ শাহ কাজার ১২৫০/১৮৩৪-১২৬৪/১৮৩৭)-এর মালিকুশ-শুআরা (দরবারী প্রধান কবি) মাহ্মূদ খান (মৃ. ১৩১১/১৮৯৩) কাসীদা রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীনদের অনুকরণ করিয়াছেন।

আবারও উপমহাদেশের কাসীদা চর্চার প্রসঙ্গে আসিতে হয়। সম্রাট শাহ্জাহানের আমলে কালীম আবূ তালিব (মৃ. ১০৬১/১৬৫০) মালিকুশ-শুআরা' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার কাসীদাসমূহ অত্যন্ত উন্নত মানের বলিয়া বিবেচিত হইত। অন্যান্য কবির মত কালীম তাঁহার কাসীদার মুখবন্ধে প্রেমের বিষয়বস্তুর অবতারণা করিতেন না। ইহার পরিবর্তে তিনি দেশের সুপরিচিত পারিপার্শ্বিকতা (যেমন গ্রীষ্ম, শীত, পাহাড়, দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল) দ্বারা কাসীদার সূচনা করিতেন। তাঁহার কাসীদায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও স্থানীয় অবস্থানসমূহের বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যায়। রাজ-দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া তিনি এমন অনেক ঘটনা ছন্দোবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যদ্দারা ঐ যুগের ইতিহাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্রাট শাহজাহান যখন ফাত্হপুর জয় করেন, তখন কারীম একটি কাসীদা লিখিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ অভিমান সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়াদি আলোচিত হয়। প্রতিটি রাজকীয় অনুষ্ঠানে কাসীদা পাঠ করিয়া কালীম বহু উপহার-উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। যেমন সম্রাট শাহজাহান যখন নয় কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ময়ূর সিংহাসন তৈয়ার করিলেন এবং আগ্রায় নববর্ষ উৎসবের দিন উহাতে তাঁহার অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হইল, তখন কালীম কাসীদা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ময়ূর সিংহাসনের বিবরণ শাহজাহানের এতই পছন্দ হইয়াছিল যে, তিনি কালীমকে ৫,৫০০ টাকা পুরস্কার দান করিয়াছিলেন (শিব্লী নু'মানী, শি'রুল-আজাম, ২য় সং, ৩খ, ২০৮)।

কালীমের দিন-তারিখ বলিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। অধিকাংশ রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি দিন-তারিখ বাহির করেন। রোমান সম্রাট কায়সার সম্রাট শাহজাহানের নিকট প্রেরতি এক পত্রে জানিতে চাহিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া কেন শাহজাহান (বিশ্ব-নৃপতি) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। কালীম এই কথা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ কাসীদা লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ কাসীদায় উল্লিখিত উপাধির ব্যাখ্যা ছিল এইরূপ ঃ

هند وجهان زروے عدد هر دو چوں یکسیت
شه را خطاب شاهجهانی مبرهن است

"আবজাদ (দ্র.)-এর হিসাবে হিন্দ ও জাহান-এর সংখ্যা একই, সুতরাং বাদশাহ্র জন্য 'শাহজাহান' উপাধি সঙ্গত হইয়াছে" (কালীমের কাসীদাসমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন শিরো. কালীম)।

ভারতবর্ষের আর একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন আসাদুল্লাহ খান গালিব (৮ রাজার, ১২১২/২৭ ডিসেম্বর, ১৭৯৭-১৮৬৯ খৃ.)। নূতনত্বের প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল। এজন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়দের অনুকরণ সত্ত্বেও তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা শুধু যে বজায় রাখিয়াছেন তাহাই নহে, উহাতে উন্নত মানের নূতন নূতন বৈচিত্র্যও আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কাসীদাসমূহে সৃষ্টিজগতের নিগূঢ় রহস্য, দর্শন, সূফীবাদ, নীতিশাস্ত্র, ঘটনা-বিন্যাস, কাজ-কর্মে উৎসাহ প্রদান, দৃশ্য চিত্রণ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিদ্যমান। একটি কাসীদায় কার্যকর বুদ্ধি (عقل فعال)-র সহিত কথোপকথন রহিয়াছে, যাহাতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়াদি (প্রশ্নোত্তর আকারে) বর্ণনা করিয়াছেন।

গালিব প্রতিটি কাসীদায় নূতন নূতন বক্তব্য চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে পেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ কাসীদায় আত্মগরিমা হিসাবে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক। অধিকাংশ সমালোচক লিখিয়াছেন যে, গালিবের স্বভাবে আমিত্ববোধ পুরাপুরি ছিল এবং আত্মগরিমা তাহারই একটি অংশ।

গালিবের পরে কাসীদা চর্চার প্রায় সমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইংরাজ যুগে গুলাম কাদির গারামী কিছু কিছু কাসীদা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দীওয়ানে (কাব্য সংকলন) মাত্র চারটি কাসীদা আছে। উহাদের মধ্যে দুইটি বেশ সংক্ষিপ্ত। অবশ্য অবশিষ্ট দুইটি কাসীদা, যাহা তিনি হায়দরাবাদের নিজাম মাহ্বূব আলী খানের জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এই কাব্যধারায় তিনি প্রাচীনদেরই অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাসীদায় ক্লাসিক কাসীদার সৌন্দর্য বজায় রহিয়াছে।

ইংরাজ যুগে নু'মানীও (১৮৫৭-১৯১৪ খৃ.) কিছু কিছু কাসীদা লিখিয়াছেন, যাহা তাঁহার দীওয়ানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐসব কাসীদায় রাজনৈতিক চিন্তাধারার ছাপ রহিয়াছে। মুখবন্ধ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বিবরণ ও ঘটনা বর্ণনার পদ্ধতি চমৎকার। তবে প্রাচীনদের ন্যায় বাচন-বলিষ্ঠতা তাঁহার কাসীদায় অনুপস্থিত, তথাপি গতিশীলতা ও তাৎক্ষণিকতা রহিয়াছে এবং বিন্যাস-প্রণালীও হৃদয়গ্রাহী। প্রশংসা বিষয়ক শ্লোকগুলি সাধারণত গতানুগতিক ধরনের।

এবারে ইরানের বর্তমান যুগে আসা যাইতে পারে। পাহ্লাবী যুগে মালিকুশ-শুআরা বাহার (মৃ. ২১ এপ্রিল, ১৯৫১) একজন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী কবি ছিলেন। তিনি কাজার আমলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইলে তিনিও স্বাধীনতাকামীদের কাতারে শামিল হন। তিনি কাসীদা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার প্রশংসা পসন্দ করিতেন না।

কাসীদায় দেশপ্রেমের গান গাহিয়াছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতেছিল। বাহার সেইসব চাহিদার সহিত কাসীদার মাধ্যমে জাতিকে পরিচিত করান। মনের স্বাধীনতা, ইরানের মর্যাদা পুনরুজ্জীবন, নারী স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সমাজ সংস্কারের জন্য কাসীদাকেই প্রচার মাধ্যম করিয়া লইয়াছিলেন। কাসীদার বাহ্যিক আকৃতির ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক রঙ পরিহার করিয়া প্রাচীনদের অনুকরণ করিয়াছেন এবং বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি কাসীদাকে নূতন নূতন বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম বানাইয়াছেন।

বাহারের পর সাদিক সারমাদ-এর নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি মুহাম্মাদ রিদা শাহ্ আরিয়া মিহ্র পাহ্লাবীর রাজ-দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং প্রাচীনদের অনুকরণে কাসীদা রচনা করেন। সময়ের চাহিদাকে তিনিও ভুলিয়া যান নাই। নিজের জাতিকে ঐ চাহিদার সহিত ক্রমাগত পরিচিত করাইতে থাকেন। এইভাবে যুগের চাহিদার সাথে সাথে তাঁহার কাসীদার পরিধিও বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ফারসী কাসীদা চর্চায় ফারসী ভাণ্ডারে মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়াছে এবং উহার কল্যাণে মার্জিত, জোরালো, দার্শনিক ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য এক বিরাট সম্পদ অর্জিত হইয়াছে। অতএব "কাসীদা সাহিত্যের একটি নিষ্ফল ধারা ছিল" এই ধারণা ঠিক নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শিব্লী নু'মানী, শি'রুল-'আজাম, আজমগড়, ৫খ; (২) যাবীহুল্লাহ সাফা, তারীখ-ই আদাবিয়াত দার ঈরান, তেহরান, ১খ; (৩) বাদীউয-যামান ফারূযআনফার সুখান ওয়া সুখানওয়ারান, তেহরান, ১খ ; (৪) বাহার, সুবুকশিনাসী, তেহরান, ৩খ ; (৫) শিহাবী আলী আকবার, রাওয়াবিত আদাবী ঈরান ওয়া হিন্দ ; (৬) 'আলী কুলী ওয়ালাহ দাগিস্তানী, রিয়াদু'শ-শুআরা', পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নং PFT 17 ; (৭) সা'ঈদ নাফীসী, আহ্ওয়াল ওয়া আশ্'আর-ই রাওদাকী; (৮) নিজামী 'আরূদী সামারকান্দী, চাহার মাকালা, সম্পা. মুহাম্মাদ কায্বীনী, লাইডেন ১৩২৭ হি. ; (৯) R.G. Browne, A Literary History of Persia, ১ ও ২খ ; (১০) R.A. Nicholson A Literary History of Arabs ; (১১) মাক্বূল বেগ বাদাখ্শানী, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭১ খৃ. ; (২) ঐ লেখক, আদাবনামা-ই ঈরান, লাহোর।

মাক্বূল বেগ বাদাখ্শানী (দা. মা. ই.) ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

তুর্কী কাসীদা ঃ প্রাচীন বা ক্ল্যাসিক যুগের তুর্কী কাব্যে অন্যান্য ধারার ন্যায় কাসীদার সূচনাও ঘটে ফার্সী কাব্যের প্রভাবে। ইহার ফলে তুর্কী কাসীদায় ফার্সী কাসীদার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব গঠন কাঠামোর দিক দিয়া তুর্কী কাসীদাও দুইটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি তাম্হীদ্ বা মুখবন্ধ (আরবী পরিভাষা অনুযায়ী নাশীব বা তাশ্বীব)। আর দ্বিতীয়টি কাসীদার মূল বিষয়বস্তু, যাহাকে তুর্কী কবিরা মাক্সাদ অথবা মাক্সূদ বলিতেন। সাধারণত একটি কাসীদা ন্যূনপক্ষে ৩০ আর সর্বাধিক ৯৯ শ্লোক সম্বলিত হইত এবং সারা কাসীদায় অন্ত্যমিল ও অন্ত্যানুপ্রাস অপরিহার্য মনে করা হইত। কোন একটি কাসীদায় একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি দূষণীয় হইত। অগত্যা কখনও একটি অন্ত্যমিল দুই জায়গায় ব্যবহারের প্রয়োজন পড়িলে লক্ষ রাখা হইত, যাহাতে উভয়ের মাঝে অন্তত সাতটি শ্লোকের ব্যবধান থাকে। কাসীদা প্রশংসামূলক হইলে মুখবন্ধের পর কাসীদার শুরুতেই অভীষ্ট জনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইত। কবি তাঁহার নিজের নাম (তাখাল্লুস অথবা মাখ্লাস) কাসীদার শেষভাগের কোন এক শ্লোকে উল্লেখ করিতেন। কবির নামসম্বলিত এই শ্লোকটিকে বলা হইত 'তাজ'। প্রথম শ্লোকটিকে মাত্লা' বলা হইত। কখনও কখনও কাসীদায় একাধিক মাত্লার ব্যবহারও দেখা যাইত। মাত্লাকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করিবার চেষ্টা করা হইত। মুখবন্ধ অংশটি যে কোন বিষয় সম্পর্কিত হইতে পারিত। তবে উহাতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত। যেমন কোন কাসীদা রামাদান মাসে রচিত হইলে উহার মুখবন্ধে রামাদান মাসের ফযীলাত ও ঈদের বর্ণনা থাকিত। কোন প্রাসাদ কিংবা উদ্যান নির্মাণ উপলক্ষে কাসীদা রচিত হইলে কবি তাহাতে বসন্তের শোভা বর্ণনা করিতেন। আবার কোন যুদ্ধ চলাকালে কাসীদা রচিত হইলে মুখবন্ধে প্রশংসিত জনের অশ্ব কিংবা তরবারির প্রশংসা স্থান পাইত। এতদসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে কাসীদার মূল বিষয়বস্তুর সহিত মুখবন্ধের সম্পর্ক থাকিত না। কবি কখনও উহাতে নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করিতেন। কখনও আবার (যদিও আরবী-ফার্সী কাসীদার তুলনায় কম) কোনও কাল্পনিক প্রিয়জনের রূপ-সৌন্দর্যের প্রশংসাও বর্ণনা করা হইত। কোন কোন সময়ে এই ধরনের প্রণয়মূলক শ্লোক কাসীদার মধ্যভাগেও আসিয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ বাকী-র কাসীদা দ্রষ্টব্য (Gibb, vi, 157)। মুখবন্ধ হইতে মূল বিষয়বস্তুর

দিকে প্রত্যাবর্তনকে তুর্কী কবিরাও 'গুরীয' বলিতেন। কখনও আবার উহাকে 'গুরীযগাহ'-ও বলা হইত, যদিও কখনও কখনও এই নামটি গোটা মুখবন্ধের জন্য ব্যবহার করা হইত। ফার্সী কবিদের ন্যায় তুর্কী কবিরাও মুখবন্ধ হইতে মূল বিষয়ের দিকে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেন যাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে না পারেন যে, মুখবন্ধ কোথায় শেষ হইল, আর কোথা হইতে মূল কাসীদা আরম্ভ হইল।

ফার্সী প্রভাবিত 'উছমানী তুর্কী কাব্য তখন হইতে শুরু হয়, যখন মধ্য-এশিয়ার প্রখ্যাত কবি মীর আলী শের নাওয়াঈ-র তুর্কী দীওয়ান (কাব্য সংকলন) পাশ্চাত্যে গিয়া পৌঁছে। ফার্সীর এই প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উছমানী কাব্যের প্রথম যুগেই তুর্কী ভাষায় কাসীদা চর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল, যে যুগকে এক হিসাবে সাংগঠনিক যুগ বলা যাইতে পারে এবং ইহা ১৩০০ হইতে ১৪৫০ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যদিও কৃর্তী কাসীদার উৎকর্ষ উছমানী কাব্যের দ্বিতীয় যুগে সাধি হইয়াছিল। ১৬০০ খৃ. বাকী-র মৃত্যুতে এই যুগের সমাপ্তি ঘটে। বাকী নিঃসন্দেহে এই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় কবি ছিলেন। তাঁহার বহু কাসীদা সংরক্ষিত আছে। কাসীদা-ই সুন্‌বুলিয়্যা বলিয়া অভিহিত একটি কাসীদা তিনি স্বীয় উস্তাদ কুর্‌রাহ মানীযাদে মুহাম্মাদ আফিন্‌দীর প্রশংসায় রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ শ্লোকের এই কাসীদার অন্ত্যানুপ্রাস 'সুনবুল' (سنبل), যাহা তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে ও চমৎকার পদ্ধতিতে সমস্ত কাসীদায় ব্যবহার করিয়াছেন। ঐ যুগের অন্যান্য বিখ্যাত কাসীদা রচয়িতার মধ্যে নাফ'ঈ ও ওয়ায়সীর নাম উল্লেখ করা যায়। তবে তুর্কী কাসীদার প্রথম বড় উস্তাদ ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তৃতীয় যুগের (১৬০০-১৭০০ খৃ.) কবি নাফ'ঈ (মৃ. ১৬৫৩ খৃ.)। ইনি আরযে রূম-এর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার আমলে ফার্সী প্রভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। নাফ'ঈর কয়েকটি কাসীদা খুব বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। যেমন শায়খুল-ইসলাম মুহাম্মাদ আফিন্‌দীর প্রশংসায় রচিত 'বাহারিয়া' নামক কাসীদা অথবা তাঁহার 'ایار' অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত কাসীদা। প্রায় একই যুগে আর একজন বিখ্যাত কবি নাবী (মৃ. ১৭১২ খৃ.) সমসাময়িক ইরানী কবি সাইব-এর উপদেশ ও নৈতিকতা শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়াছিলেন (তাঁহার কাসীদা খায়রিয়্যা দ্রষ্টব্য (Gibb, A History of Ottaman Poetry, vol. vi, 231)।

নাফ'ঈর পর তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের (অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত) কাসীদা রচয়িতা তুর্কী কবিদের মধ্যে সাব্‌রী, ফাহীম, জাওরী, না'ইলী (মৃ. ১৬৬ খৃ.), ছাবিত নাদীম (মৃ. ১৭২৭ খৃ.), সায়্যিদ ওয়াহ্‌বী (মৃ. ১৭৩৬ খৃ.), কানী, সুন্‌বুল যাদে, ওয়াহবী ও আকিক পাশা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ছাবিতের কাসীদা মিরাজিয়্যা সুবিখ্যাত।

কাফী-র একটি বিখ্যাত প্রণয়মূলক কাসীদার মুখবন্ধও অতি চমৎকার। তেমনিভাবে 'আকিফ পাশার (মৃ. ১৮৪৮ খৃ.) কাসীদা আদামিয়্যা-ও বেশ জনপ্রিয়। চতুর্থ যুগে সার্বিকভাবে বিভিন্ন প্রভাব কাজ করে এবং কবিরাও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

তুর্কী কবিতার এই চারিটি যুগেই কাসীদা রচয়িতাগণ যে সকল ফার্সী কবির বেশী বেশী অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জামী, 'উরফী ফায়দী ও সাইব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ফার্সী প্রভাব কমিতে শুরু করে। তাহার একটি কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে কোন বড় ফার্সী কাসীদা রচয়িতারই জন্ম হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ কতিপয় তুর্কী কবি, উদাহরণস্বরূপ ছাবিতের কথা উল্লেখ্য—ইতিপূর্বেই তুর্কী কবিতায় ফার্সী উপাদান হ্রাস করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। চতুর্থ যুগের শেষে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্লাসিক তুর্কী কবিতার যুগও শেষ হইয়া যায়। তাস্‌বীর-ই আফকার পত্রিকার পরিচালক শিনাসী আফিন্‌দী কাব্যের এক নূতন ধারার সূত্রপাত করেন, যাহাতে খাঁটি তুর্কী ভঙ্গির সহিত য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। তুর্কী কাব্য জগতের কাসীদার আর কোন স্থান রহিল না। নূতন ধারার কবিগণ তখন হইতে কাসীদাকে একটি অপ্রয়োজনীয় কৃত্রিম বস্তু এবং সময়ের অপব্যয়ের মাধ্যম মনে করিতে লাগিলেন। শিনাসী আফিন্‌দীর শাগরিদ নামিক কামাল বে ও 'আবদুল-হাক্ক বে তাঁহার চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ঘটান। পরে তুর্কী স্বদেশী আন্দোলনের সহিত ইরান ও য়ুরোপ উভয়ের প্রভাবের বাহিরে এক প্রকার খাঁটি তুর্কী কাব্যধারা বিকশিত করিবার চেষ্টা শুরু হয়। ফলে ঐ সময়ে গণসঙ্গীতের প্রতি যাহা 'তুর্কী' বা 'তুরকূ' নামে অভিহিত হইত—নূতনভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং তাহার প্রচার ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, তুর্কী কাসীদা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিক দিয়া ফার্সী কাসীদার নিকট বহুলাংশে ঋণী হইলেও তাহার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে এবং তাহাতে আনাতোলীয় ও ইস্তাম্বুলে বিকশিত তুর্কী সভ্যতার প্রতিফলন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তুর্কী ভাষার বিরাট শব্দভাণ্ডার, কোন বাক্যের ব্যাকরণিক বিন্যাসে প্রয়োজনমত রদবদলের অবকাশ এবং তুর্কী শব্দসমূহের সুরেলা ধ্বনি-ব্যঞ্জনাকে কাসীদা রচয়িতা তুর্কী কবিগণ পুরাপুরি কাজে লাগান। তাঁহাদের সেরা কাসীদাগুলি শাব্দিক আড়ম্বর, সুন্দর গঠন, গতিশীল রচনারীতি এবং হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য চিত্রণের দিক দিয়া ফার্সীর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। অথচ তুর্কীরা দৃশ্যত কাসীদার প্রতি সেই পরিমাণ মনোযোগ দেয় নাই, যে মনোযোগ আরব ও ইরানী কবিগণ দিয়াছিলেন। তুর্কী কবিরা কতিপয় অন্যান্য রচনাধারা, যেমন মাছ্‌নাবী তারকীববান্দ তারজীবান্দ, মুরাব্বা, মুখাম্মাস, মুসাদ্দাস ও একটি বিশেষ তুর্কী ধারা 'শার্‌কী' (দ্র.)-এর প্রতি অধিক মনোযাগী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, i, London 1900, 83-87; (২) মু'আল্লিম নাজী, ইস্‌তিলাহাত-ই আদাবিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৩০৭/১৮৮৯-৯০, পৃ. ১৬১-৬৮ ; (৩) তান পাকক্বার, 'আস্‌র-ই তুরক আদাবিয়্যাত-ই তারীখী, ইস্তাম্বুল ১৯৬৫ খৃ.; (৪) J. W. Redhouse, On the history, system and variety of Turkish Poetry [আরও দ্রষ্টব্য 'তুরক' (তুর্কী সাহিত্য)]।

মুহাম্মাদ ওয়াহীদ মিরযা (দা. মা. ই.)/ড. মুহাম্মাদ ফজলুল রহমান

(উর্দূ) কাসীদা ঃ উর্দূতে কাসীদা বেশীর ভাগই কবিতার অন্যান্য ধারার ন্যায় ফার্সী হইতে আসিয়াছে। অন্যান্য ধারা, যেমন মাছ্‌নাবী গাযাল, মার্‌ছিয়া প্রভৃতির ন্যায় উর্দূ কাসীদার সূচনাও দাক্ষিণাত্যে হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কবিরা গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজ-দরবারের সহিত সম্পর্কই তঁহাদের কাসীদা রচনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল। ভাষার প্রাথমিক অবস্থাও মাছ্‌নাবীর ব্যাপক প্রচলনের কারণে দাক্ষিণাত্যে সাহিত্যিক দিক হইতে কাসীদার

তেমন উৎকর্ষ সাধিত না হইলেও রচনায় কাসীদার নিদর্শন পাওয়া যায়। সুল্তান মুহাম্মাদ কুলী কুত্ব শাহের রচনাবলীতে "না'ত, মানকাবাত", "ঈদ-ই নাওরোয", "ঈদ-ই মীলাদুন-নাবী", "শাহী বাগ", "বাসান্ত" ইত্যাদি শিরোনামে বারটি কাসীদা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যেগুলি দাক্ষিণাত্য-কাসীদার প্রাচীনতম নমুনা। দাক্ষিণাত্যের কাসীদা রচয়িতাদের মধ্যে গাওয়াসীর নাম তালিকার শীর্ষে। "কুল্লিয়াত-ই গাওয়াসী" (গাওয়াসী-রচনাবলী) সাম্প্রতিক কালে উর্দূ সাহিত্য পরিষদ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য-এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ভূমিকায় মুহয়িদ-দীন কাদিরী যোর লিখিয়াছেন, "এত দীর্ঘ, এত অধিক ও এত সুন্দর কাসীদা আজ পর্যন্ত কোন দাক্ষিণাত্যের কবির হাতে রচিত হয় নাই।" গাওয়াসী ছাড়াও মালিকুশ-শুআরা নুস্রাতী ও হাশিমী বিজাপুরী কাসীদা রচনা করিয়াছেন। ওয়ালীর কাসীদাসমূহ এই ধারার সর্বশেষ রচনা। ওয়ালী হামদ, না'ত ও মানকাবাত বিষয়ে কয়েকটি কাসীদা লিখিয়াছেন। ওয়ালীর কাসীদাগুলির ভাষা দাক্ষিণাত্যের সাধারণ কাসীদাসমূহের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ হইলেও তাহাতে বর্ণনার আড়ম্বর এবং মুখবন্ধ ও প্রসঙ্গ পরিবর্তনের শৈল্পিক সৌন্দর্য অনুপস্থিত।

উত্তর ভারতের উর্দূ কবিতার প্রথম যুগ ছিল কল্পনাবিলাসী কবিদের যুগ। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ কল্পনাবিলাস লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা কাসীদার ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ের চাহিদাসমূহের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। উর্দূতে কাসীদা রচনার প্রথম যুগ দাক্ষিণাত্যের ওয়ালী হইতে হাতিম ও আবরূ পর্যন্ত। কাসীদার দ্বিতীয় যুগের সূচনা হইয়াছিল সাওদার যুগে। এই যুগে সাওদা ছাড়া মীর তাকীও কষ্ট করিয়া কয়েকটি কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন। তবে মানসিকতার দিক দিয়া তিনি কাসীদার প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। ফলে তাঁহার কাসীদাসমূহ শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইত না। দাক্ষিণাত্যে সাওদার সমসাময়িকদের মধ্যে মাফ্তূন আওরাঙ্গাবাদী একজন সুভাষী কবি ছিলেন। তাঁহার দীওয়ানে সাতটি কাসীদা পাওয়া যায়। সাওদার রচনা দ্বারা মাফ্তূন দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন; কিন্তু কাসীদা রচনায় তিনি সাওদার ব্যর্থ অনুকরণকারী প্রমাণিত হইয়াছেন। সাওদাই ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাসীদা রচয়িতা ছিলেন। সাওদাকে (মাস্হাফীর উক্তি অনুযায়ী) কাসীদার "প্রথম ভাস্কর" বলিবার কারণ এই যে, তিনিই কাসীদাকে প্রকৃত অর্থে কাসীদা বানাইয়াছিলেন। কাসীদার সহিত তাঁহার স্বভাবগত সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রাণময়, পার্থিব সুখ-শান্তিকামী ও জাঁকজমকপ্রিয় মানুষ, যে দিক দিয়া মীর-এর সহিত তাঁহার সুস্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলা ও ক্ষমতাসীনদের মর্জি রক্ষার এক বিশেষ কৌশল সাওদার জানা ছিল। রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও নানারকম পট পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি দিল্লী, ফারখাবাদ ও লাখনৌ-এর বিভিন্ন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। এইসব শাসকচক্রের প্রশংসায় তিনি উন্নত মানের কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন। শায়খ চাঁদের প্রতিপাদন অনুযায়ী সাওদার কাসীদার সংখ্যা পঞ্চান্ন। উর্দূ ভাষার আর কোন কবি এতগুলি কাসীদা রচনা করেন নাই। তাঁহার কাসীদার বিষয়বস্তুতেও বেশ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সাধারণ প্রশংসামূলক কাসীদা না'ত ও মানকাবাত ছাড়া সাওদা বিদ্রূপাত্মক কাসীদাও লিখিয়াছেন এবং ব্যঙ্গ রচনাকে তিনি একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারার মর্যাদা দিয়াছেন। কয়েকটি কাসীদায় সাওদা অত্যন্ত কঠিন পটভূমি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সুনিপুণ রচনা-শৈলীর গুণে কঠিন হইতে কঠিনতর শব্দমিলেও রচনার শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। কাসীদা রচয়িতা হিসাবে সাওদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁহার ঘটনা চিত্রণ। যে সকল কাসীদায় সাওদা তাঁহার যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন কিংবা সামাজিক বিভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত করিয়াছেন (উদাহরণস্বরূপ "কাসীদা-ই শাহ্র আশূব"-এর কথা উল্লেখ করা যায়) তাহা আমাদের প্রাচীন কাব্যে বর্ণনামূলক কবিতার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা। শীর্ষস্থানীয় ফার্সী কাসীদা রচয়িতাদের, বিশেষ করিয়া আনওয়ারী, খাকানী ও 'উরফীর রচনা হইতে সাওদা অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুকরণে উর্দূ কাসীদাকে তিনি ফার্সীর সমপর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। আনওয়ারীর সহিত তাঁহার একটি বিশেষ সামঞ্জস্য আছে এবং আনওয়ারীর ন্যায় তাঁহাকেও উর্দূ ভাষার প্রখ্যাত কাসীদা রচয়িতা বলা যায়।

সাওদার পরে আসে ইন্শা' ও মাস্হাফীর যুগ। মাস্হাফীর রচনাবলীর যে সংগ্রহ রামপুর রাজ্যের সরকারী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, তাহাতে একটি কাসীদার দীওয়ানও রহিয়াছে। এই দীওয়ানের অন্তর্ভুক্ত কাসীদার সংখ্যা ছাব্বিশ। চতুর্থ দীওয়ানের শুরুতেও সাতটি কাসীদা আছে। মাস্হাফী তাঁহার নিপুণ রচনা-শৈলী সত্ত্বেও কাসীদায় কোন উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার চরিত্রের মন্থরতা ও গাম্ভীর্য কাসীদার জন্য উপযোগী ছিল না। তাঁহার কাসীদায় শৈল্পিক কলাকৌশল তো আছে, কিন্তু আযাদ-এর কথায় "শব্দবিন্যাসের চমৎকারিত্ব ও আবেগ-উত্তেজনার প্রভাব কম।" ইন্শা' তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবসুলভ ভঙ্গি ও প্রাণময়তার দিক দিয়া সাওদার ন্যায় কাসীদার সহিত এক বিশেষ সম্পর্কে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি গুরুত্বের সহিত এই কাব্যধারার প্রতি মনোযোগী হইলে সম্ভবত সাওদাকেও ছাড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ও অসংযত মেযাজ কাসীদা কিংবা গাযাল কোন ক্ষেত্রেই তাঁহাকে সরল পথে চলিতে দেয় নাই। ইন্শা আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ছাড়াও ভারতের কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং কতিপয় কাসীদায় ভাষাগত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কয়েকটিতে আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষার ছড়াছড়ি দেখা যায়। কোথাও কোথাও কঠিন পটভূমিতে স্বভাবসুলভ বলিষ্ঠতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ফলকথা, সর্বত্র নূতন নূতন রূপে তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ও বিলাসপ্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁহার "কাসীদা-ই নূনিয়্যা" (ن অন্ত্যমিলযুক্ত কাসীদা) প্রেম-বন্দনা ও প্রশংসার নব নব পদ্ধতি ও নূতন এক সৌন্দর্য দ্যোতনার অভিব্যক্তি।

লাখনৌ-এর মধ্যযুগীয় কবিগণ অর্থাৎ আতাশ, নাসিখ প্রমুখ কাসীদার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। অবশ্য দিল্লীর শীর্ষস্থানীয় কবিদের মধ্যে যাওক, গালিব ও মু'মিন তিনজনই কাসীদা রচনা করিয়াছেন। তবে ইহাদের মধ্যে যাওক—তিনি সাওদার কাব্যাংগনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতেন—এই ক্ষেত্রে সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শুরু হইতেই যাওক শাহী দরবারের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজদরবারের সহিত বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি অনেক কাসীদা লিখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে বর্তমানে ২৮টি পূর্ণাংঙ্গ কাসীদা তাঁহার দীওয়ানে দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয়োক্তির আধিক্য, বর্ণনার সৌন্দর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষার বহুল ব্যবহার যাওকের কাসীদাসমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাসীদার জন্য অপরিহার্য বলিয়া গণ্য সকল গুণাবলী তাঁহার কাসীদায় রহিয়াছে। তবে সাওদার কাসীদায় যেরূপ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমাহার দেখা যায়,

যাওকের কাসীদায় তাহা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া সাওদার ন্যায় ঘটনা বর্ণনা ও দৃশ্য চিত্রনের কাজেও তিনি তাঁহার কাসীদাকে ব্যবহার করেন নাই। সাওদার তুলনায় তাঁহার ভাষা অধিকতর স্বচ্ছ এবং শব্দবিন্যাস অনেক চমৎকার। তবে ইহার কারণ যুগ ও সময়ের ব্যবধান। ইহা সত্ত্বেও যাওককে সাওদার সবচেয়ে সফল অনুকরণকারী অবশ্যই বলা যাইতে পারে। যাওকের সমসাময়িকদের মধ্যে মীর্যা গালিব ফার্সী ভাষায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে ও চিন্তা-ভাবনা করিয়া কয়েকটি কাসীদা রচনা করেন এবং তাহাতে আপন কল্পনাশক্তির চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। উর্দূ ভাষায় তাঁহার কাসীদার সংখ্যা মাত্র চার। কিন্তু এই চারটি কাসীদারও একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রহিয়াছে এবং এখানে গালিবের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় ভাস্বর রহিয়াছে। বাহাদুর শাহ জাফার-এর প্রশংসায় রচিত তাঁহার 'মীম' অন্ত্যমিলযুক্ত কাসীদাটি উর্দূ ভাষার শ্রেষ্ঠ কাসীতদাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। মু'মিন তাঁহার স্বাধীন মনোভাবের জন্য দুনিয়াবাসীদের প্রশংসা পসন্দ করেন নাই। তাঁহার নয়টি কাসীদার মধ্যে সাতটি হাম্‌দ, না'ত, খুলাফা-ই রাশিদূন ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর গুণাবলী বর্ণনায় রচিত এবং শুধুমাত্র দুইটি কাসীদা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে লিখিত। শেষোক্ত এই দুইটি কাসীদাও কোন প্রকার দান-দক্ষিণা বা পুরস্কার লাভের আশায় রচনা করেন নাই, বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাগিদেই তাহা রচিত হইয়াছিল। কাসীদা রচনায় তাঁহার এই অনীহা সত্ত্বেও তিনি কাসীদার সকল শৈল্পিক কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁহার কাসীদাগুলির চমৎকার মুখবন্ধে কোথাও প্রেম-ভালবাসার আলেখ্য, আবার কোথাও কালচক্রের প্রতি অভিযোগ-অনুযোগ বিধৃত হইয়াছে। কতিপয় কাসীদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষা ও সূক্ষ্ম শব্দাবলীর সমাহার সমৃদ্ধ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সাহিত্যের অংগনেও নূতন নূতন আন্দোলন জোরদার হইতে থাকে। হালী ও আযাদের প্রচেষ্টায় আধুনিক উর্দূ কবিতার সূচনা হয়। কিন্তু তখনও প্রাচীন কবিতার পতাকাবাহীদের মধ্যে দাগ, আমীর জালাল, আসীর, তাস্‌লীম, মুহ্‌সিন ও মুনীরের ন্যায় প্রতিভাবান কবিগণ অবশিষ্ট ছিলেন। পরবর্তী এই কবিগণ প্রাচীন কবিতার বর্ণনাসমূহ বহাল রাখিয়া কাসীদাতেও এক নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করেন। সেই যুগে রামপুর ও হায়দরাবাদ এই দুইটি স্থান কবিদের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। রামপুরে নওয়াব য়ূসুফ 'আলী খান ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নওয়াব কালাব আলী খানের সাহিত্য সেবার ফলে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কবিতার লড়াইয়ের আন্দোলন একটির পর একটি চলিতেই থাকিত। হায়দরাবাদ ও রামপুরের দরবারী পরিবেশে দাগ, আমীর ও তাঁহাদের সমসাময়িক কবিগণ নিজেদের উদ্যমী প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন। এইসব প্রতিভাবান কবির কাসীদায় সজীবতা, উপযোগিতা ও শব্দের জাঁকজমক প্রশংসার যোগ্য। মুনীর শিক্‌ওয়াহ আবাদী ও মুহ্‌সিন কাকুরাবী না'তিয়া কাসীদা হৃদয়ের আবেগ ও ভক্তি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং যাবতীয় শৈল্পিক সৌন্দর্যে সজ্জিত। না'ত রচয়িতা হিসাবে মুহ্‌সিন কাকুরাবীর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁহার না'তসমূহ, মাছনাবী কাসীদা, পঞ্চপদী, ষষ্ঠপদী ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে রচিত। তাঁহার প্রখ্যাত লামিয়্যা ('ل' অন্ত্যমিলযুক্ত) কাসীদাটি উর্দূ কাসীদা কাব্যের জন্য গর্বের বস্তু। এই ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে আরও অনেক কাসীদা রচিত হইলেও উল্লিখিত কাসীদাটি আজও সর্বশ্রেষ্ঠ না'তিয়া কাসীদা বলিয়া বিবেচিত।

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে 'আযীয লাখ্‌নাবী, মাওলানা জাফার 'আলী খান ও মাওলানা সুহায়ল ব্যতীত কোন ভাল কবি কাসীদা কাব্যধারায় পদচারণা করেন নাই। 'আযীয কাসীদার একটি দীওয়ান বিন্যস্ত করেন। কিন্তু তাঁহার সকল কাসীদা না'ত, মান্‌কাবাত ও ইমামগণের প্রশংসায় রচিত। জাফার 'আলী খানের হাম্‌দ ও না'তগুলিকেও কাসীদারূপে গণ্য করা হয়। এই শ্রেণীর কাসীদাগুলির সহিত সাধারণ কাসীদার প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, এইগুলিতে পার্থিব পারিতোষিকের পরিবর্তে ধর্মীয় ভক্তি বিশ্বাসের নিষ্কলুষ আবেগই প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। এমনিভাবে সুহায়লও কিছু কিছু কাসীদা লিখিয়াছেন এবং সেইগুলিও না'তিয়া কাসীদা। ইসমা'ঈল মীরাঠীর দীওয়ানেও কাসীদা শিরোনামে কয়েকটি কবিতা আছে। কিন্তু সেইগুলিকে নিয়মিত কাসীদা বলা যায় না। এমনিভাবে শিব্‌লীর উর্দূ রচনাবলীতে লামিয়্যা ('ل' অন্ত্যমিলবিশিষ্ট) কাসীদা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই কাসীদা তিনি সায়্যিদ মাহ্‌মূদের বিবাহ উপলক্ষে লিখিয়াছেন। আসলে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে কালের এমন পরিবর্তন ঘটে এবং নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নূতন নূতন চিন্তাভাবনা ও অবস্থার প্রভাবে সমাজে এমন এক বিপ্লব সূচিত হয়, যাহার ফলে দরবারী জীবনের সহিত সম্পৃক্ত মূল প্রেরণা হইতে উদ্ভূত এই কাসীদা কাব্যের ধারাটি চিরতরে শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রশংসা ব্যতীত অন্যান্য বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর প্রকাশ ও প্রচারের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। কাসীদার বিষয়বস্তুগত অসুবিধাগুলিও উহার জনপ্রিয়তা হারাইবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। উহার বিষয়বস্তুগত শর্তাবলী ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াদি উপলব্ধি করিবার জন্য যে মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন মানুষ এখন আর তাহা করিতে রাজী নহে। কেননা এই শেষ যুগে কাসীদা একটি অকালের ফল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই শতাব্দীর শুরুতে সাধারণ কাব্যচর্চার জন্য কখনও কখনও কাসীদা বাহ্যিক আকৃতিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু এখন একমাত্র গাযাল ছাড়া অন্য কোথাও উহার বাহ্যিক আকৃতিটুকু পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) পুস্তক ও পত্রিকা ঃ (১) মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ, আব-ই হায়াত; (২) 'আবদু'স-সালাম নাদাবী, শি'রু'ল-হিন্দ, ২খ; (৩) হাফিজ জালালু'দ-দীন জা'ফারী, তারীখ-ই কাসা'ইদ-ই উর্দূ; (৪) শায়খ চান্দ, সাওদা; (৫) যি-য়া' আহ্‌মাদ বাদায়ূনী, মাজ্‌মূ'আ-ই কাসা'ইদ-ই মু'মিন (ভূমিকা); (৬) মুহ্‌য়ি'দ্‌-দীন কাদিরী যোর, কুল্লিয়াত-ই গাওয়াসী (ভূমিকা); (৭) 'নিগার' পত্রিকা, লাখনৌ, "আস্‌নাফ-ই আদাব" সংখ্যা; (৮) ঐ, 'মুমিন' সংখ্যা; (৯) ঐ, 'মাস্‌হাফী' সংখ্যা। (খ) নিবন্ধ ঃ (১) মুহাম্মাদ তাহির ফারূকী, উর্দূ কাসীদা, উর্দূনামাহ্‌ (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ৬০-৬১); (২) সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ্‌, কাসীদা এক ফান্ন সাত রাঙ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৬; (৩) সায়্যিদ মুহ্‌য়ি'দ্‌-দীন যোর, দীওয়ান-ই মাফ্‌তূন, উর্দূনামাহ্‌, নভেম্বর ১৯৬৬; (৪) নিয়ায ফাত্‌হপুরী, কাসা'ইদ-ই মু'মিন মেঁ উনসূর-ই তাগায্যুল, নিগার, মে ১৯৬২ খৃ.।

ইফ্‌তিখার আহমাদ সিদ্দীকী (দা. মা. ই.)/ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

কাসীদাতু বানাত সু'আদ (قصيدة بانت سعاد) ঃ আরবী কাব্য সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর মুখাদ্‌রাম (জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ প্রাপ্ত) কবি কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (দ্র.) (মৃ. ২৪ হি.) (রা) রাসূলুল্লাহ

(স)-এর প্রশংসায় 'বানাত সু'আদ' নামক কাসীদা রচনা করেন। ইহা আরবী সাহিত্য জগতে এক অনন্য সংযোজন। সুদীর্ঘ চৌদ্দ শত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইহার সুখ্যাতি অম্লান ও অক্ষুণ্ণ আছে। বিশ্বের যে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে আরবী সাহিত্য চর্চা বিদ্যমান, সে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ও প্রতিষ্ঠানে এই কবিতাটি অতি আগ্রহ সহকারে পঠিত হয়।

কবিতাটি তিনটি নামে পরিচিত। ১. قصيدة بانت سعاد ২. قصيدة البردة ৩. قصيدة اللامية। কবিতার দুইটি আদ্য শব্দ হইতে 'বানাত সু'আদ' নামকরণ করা হইয়াছে। এই কাসীদার প্রতি শ্লোকের শেষাক্ষর 'লাম' বর্ণ হওয়ার কারণে ইহাকে 'কাসীদাতুল লামিয়্যাহ নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা কবি কা'বের অনবদ্য সৃষ্টি। কবিতাটি মহানবী (স)-এর যথাযোগ্য প্রশংসায় ভরপুর। আবূ বাকর আল-আমবারীর এক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইহা 'কাসীদাতু'ল-বুরদা নামেই সুপরিচিত। কারণ এই কাসীদা শ্রবণ করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) কবিকে স্বীয় চাদর দান করেন। ডক্টর শাওকী দায়ফও ইহাকে 'কাসীদাতু'ল বুরদা উপাধি দিয়াছেন (ডক্টর শাওকী দায়ফ, তারীখু'ল-আদাবু'ল-'আরাবী, আল-'আসরুল ইসলামী, পৃ. ৮৫)। অবশ্য ইহা ছাড়া আরও একটি কাসীদাতু'ল-বুরদা আছে যাহা রচনা করেন ইমাম শারাফুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদ আল-বূসীরী (র) (১২১২-১২৯৬ খৃ.)।

কবি কা'বের কাসীদাটি সর্বমোট আটান্ন শ্লোকে আগাগোড়া একই ছন্দ অর্থাৎ 'বাহরুল-বাসীত' এবং একই অন্ত্যমিলের মাধ্যমে রচিত। মাওলানা নিছার 'আলী স্বীয় ব্যাখ্যাকৃত 'মিসবাহু'র-রাশাদ' গ্রন্থে উনষাটটি শ্লোক উল্লেখ করেন।

এই কাসীদা রচনার এক বিশেষ ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট আছে। কবির পিতা যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা মৃত্যুর পূর্বে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন, একটি মনোরম আলোকরশ্মি, তিনি তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা ধরিতে পারেন নাই। তিনি এই স্বপ্নের তাৎপর্য নির্ণয় করিলেন যে, অচিরেই একজন সত্য নবীর আবির্ভাব হইবে কিন্তু তিনি তাঁহার নবুওয়াতের যুগ পাইবেন না। এইজন্য স্বীয় পুত্রদ্বয় কা'ব ও বুজায়রকে উপদেশ দিলেন, অচিরেই একজন নবীর আবির্ভাব হইবে, তখন তোমরা (জীবিত থাকিলে) তাঁহার উপর, ঈমান আনিবে। (আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম, শারহু কাসীদাতি বানাত সু'আদ, মাতবায়াতু মুহাম্মাদ 'আলী সাবীহ, মিসর ১৩৪৬ হি., পৃ. ৩-৪)।

কবি যুহায়র মৃত্যুর পর মহানবী (স)-এর আবির্ভাব হয়। নবূওয়াত প্রাপ্তির পর মহানবী (স) আরববাসীকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান, তাঁহাদের অনেকেই এই দাওয়াত গ্রহণ করেন নাই, বরং তাঁহাদের পক্ষ হইতে চরম বিরোধিতা আরম্ভ হয়। তখন কবি কা'বও ইসলামের কুৎসাপূর্ণ কাব্য রচনা করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু মহানবী (স)-এর অভূতপূর্ব বিজয় দেখিবার পর তাহার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং মহানবী (স)-এর ভয়ে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করে। অবশেষে মদীনা হইতে ২০ মাইল দূরে মদীনা ও রাবাদার মধ্যবর্তী স্থান 'আবরাকুল আয্যাফ' নামক এক ঝিলের নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, 'মহানবী (স) কা'ব ও তাঁহার ভাই বুজায়রের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়াছেন।

পিতা যুহায়রের অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী বুজায়র স্বীয় ভাইকে বলিলেন, "তুমি এখানে অবস্থান কর, আমি মদীনায় যাইয়া তাঁহার [রাসূলুল্লাহ (স)-এর] গতিবিধি লক্ষ্য করি মহানবীর (স) অবস্থা ও কার্যকলাপ সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করিবার পর যদি মনে হয় যে, তিনিই সেই মহান ব্যক্তি, যাঁহার উপর ঈমান আনার জন্যে আমাদের পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন, তবে আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিব। নচেৎ তাঁহাকে পরিহার করিব'। মদীনায় পৌঁছিবার পর হযরত আবূ বাকর (রা) বুজায়রকে মহানবী (স)-এর খেদমতে হাযির করেন এবং তাহার অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য ও স্বর্গীয় সৌম্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বুজায়র পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষালাভ করেন (ইবরাহীম আল-বাজুরী, ইসআ'দ, পৃ. ০৩)।

কবি কা'ব এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৩৫)। তাই বুজায়রকে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুরোধ জানাইয়া কবিতাকারে একটি পত্র পাঠান (ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা, বৈরূত, দার ইহ্য়া আল-উলূম, ১৪১৪/১৯৯৪, ৫ম সং., পৃ. ৭৬)। কবি কা'বের পত্র পাওয়ার পর হযরত বুজায়র (রা) খুবই ব্যথিত হন এবং তাঁহার পত্র মহানবী (স)-এর সামনে উপস্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) কা'বের সংবাদ শুনিয়া ঘোষণা করেন ঃ من لقى منكم كعب بن زهير فليقتله "তোমাদের যে কেহ কা'বের সাক্ষাত পাইবে, তাহাকে হত্যা করে (আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা পৃ. ৫০২)।

কা'ব এই খবর শুনিয়া 'আবরাকুল 'আয্যাফ' হইতে পলায়ন করেন। ইতোমধ্যে হযরত বুজায়র (রা) ভাই কা'বকে এই মর্মে একখানা পত্রের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান যে, মহানবী (স) তোমার হত্যার বৈধতা ঘোষণা করিয়াছেন। আর ইসলামের পূত-পবিত্রতার উপর যে সকল কবি কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব তুমি সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই পাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি জীবনের প্রতি মায়া পোষণ কর, তবে অবিলম্বে মদীনায় মহানবী (স)-এর পদতলে আত্মসমর্পণ কর, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স) তোমাকে ক্ষমা করিবেন।

কা'ব ভাইয়ের পরামর্শ প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বীয় গোত্র মুযায়নার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেখানে তাহার পক্ষে আত্মগোপন করা সম্ভব হয় নাই। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচনা করেন 'কাসীদাতু বানাত সু'আদ। অতঃপর মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সাথে মদীনায় মসজিদে নববীতে পৌঁছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামাযশেষে সাহাবীদের সমাবেশে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। এই সময় কা'ব নবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! কবি কা'ব ইব্ন যুহায়র অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার আশ্রয়প্রার্থী। যদি আমি তাহাকে আপনার খেদমতে উপস্থিত করি আপনি কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই করিব। অতঃপর তিনি অপরাধীর ন্যায় করজোড়ে বলিলেন, আমিই সেই পাপিষ্ঠ কা'ব। হে দয়ালু নবী ! দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

অতঃপর তিনি মহানবী (স)-এর প্রশংসায় রচিত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (স) মুগ্ধ হইয়া কবি কা'বকে স্বীয় চাদর বা বুরদাখানা উপহার স্বরূপ দান করেন। শুধু তাই নয়, ইব্ন রাশীক 'আল- কায়রাওয়ানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কা'বকে এক

শত উট প্রদান করিয়াছিলেন আল-'উমদাহ, ১খ, পৃ. ৮০)। এই কবিতাই কবি কা'বের ইতিহাস বিখ্যাত ও অবিস্মরণীয় 'কাসীদাতু বানাত সু'আদ'। ইহা মহামূল্যবান ঐতিহাসিক এক বিরাট কবিতা। (আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫)। কাসীদাটি তিনটি বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হইয়াছে (ইব্‌রাহীম আল-বাজূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭)।

প্রথম স্তর ঃ প্রথম আটত্রিশ শ্লোক 'গযল' বা প্রেমমূলক কবিতা। কবি কা'ব (রা) জাহিলী কবিদের অনুকরণে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী প্রণয়গীতির মাধ্যমে কাসীদাটি শুরু করেন। প্রথমেই তাঁহার প্রেমিকা সু'আদ নাম্নী মহিলার বিরহ-বেদনার বর্ণনা দেন।

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول + متيم عندهالم يجز مكبول

"সু'আদ বিদায় নিয়াছে। সুতরাং আমার মন আজ শুধু অস্থির ও পীড়িতই নয় বরং আমি তাহার নিকট এমন বন্দী ক্রীতদাসের মত হইয়াছি, যাহার কোন মুক্তি মূল্য নাই" (যাকী মুবারাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১)।

প্রেমিকার আলোচনার পরপরই তিনি তাঁহার প্রেমিকার উষ্ট্রীর গুণাগুণ বর্ণনা করেন। মূলত প্রেমিকা সু'আদই তাঁহার মূল লক্ষ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্তুষ্টি হাসিল করাই মূল লক্ষ্য। কবিতাটি মূলত মহানবী (স)-এর সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রশংসায় রচিত। যদিও জাহিলী যুগের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী 'নাসীব' বা প্রণয় বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হইয়াছে কিন্তু আলোচ্য 'নাসীব' জাহিলী যুগের অপরাপর কাসীদা সমূহে বিবৃত 'নাসীব' অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের। কারণ, সে সকল কাসীদায় 'নাসীব' বর্ণনায় জৈবিক প্রেমের বিবরণ দেওয়া হয়।

ইব্‌ন কাছীর এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বর্ণনার অবতারণা করেন যে, সু'আদ কোনও কল্পিত নারী নয়, সে কবি কা'বেরই স্ত্রী ছিল। কেননা কা'ব 'বানাত সু'আদ' নামক কাসীদার প্রারম্ভিক চরণটি আবৃত্তি করিলে মহানবী (স) তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, সু'আদ কে ? কা'ব বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সে আমার স্ত্রী'। অতঃপর কবি দয়িতার অভিসারে তাঁহার ভ্রমণ-যন্ত্রণা এবং স্বীয় বাহন উষ্ট্রীর দীর্ঘ বর্ণনা দেন। ব্যক্তিগত শোক ও অক্ষমতার ফলে কবির মানসিক যাতনার বর্ণনা দেন। মহানবী (স)-এর পদতলে আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণ করিয়া কবির অন্তর্জ্বালা শীতল হয় এবং মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়া সুদীর্ঘ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় কবিতা। উনচল্লিশতম চরণ হইতে বায়ান্নতম চরণ পর্যন্ত ১৪টি চরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচনা করা হয়। এই অংশকে ইসলামী স্তরও আখ্যায়িত করা যায়। কেননা অপরাপর অংশ অপেক্ষা এই অংশ ভিন্নধর্মী। কবি কুরআন-হাদীছের ভাবধারায় ইসলামী শব্দাবলীর দ্বারা মহানবীর ভূয়সী প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য এই প্রশংসা অপরাপর কবিগণের রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। কবি কা'ব মহানবী (স)-এর নবূওয়াত, মিশন ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেন। কবিতার এই অংশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে হিদায়াতের নূর ও শত্রুদের উপর শাণিত তরবারি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ان الرسول لنور يستضاء به + مهند من سيوف الله مسلول

"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স) এমনই এক জ্যোতি যাহা দ্বারা আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহ্‌র তরবারিসমূহের অন্যতম ভারতীয় তরবারি যাহা সতত নিষ্কোষিত" (বানাত সু'আদ, শ্লোক - ৫২)

কবি কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে নূর বা জ্যোতি হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন পবিত্র কুরআনেও যাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يا يها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بأذنه وسراجا منيرا ٠

"হে নবী ! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, ভয়প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী এবং আলোকিত প্রদীপ হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি" (আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৪৫)

উল্লেখ্য যে, অন্য এক বর্ণনায় لنور এর পরিবর্তে سـيـف উল্লেখ আছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে উজ্জ্বল তরবারির সাথে উপমা দেওয়া হইয়াছে। কারণ প্রাচীন আরব সমাজে একটা নিয়ম প্রচলিত ছিল, যখন তাহারা তাহাদের গোত্রের কাহাকেও আহবান করিত, ধারালো উজ্জ্বল তরবারি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিত, যে কারণে আলোকরশ্মি ছড়াইয়া পড়িত এবং এই আলো অনুসরণ করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া যাইত। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (স) যখন স্পষ্ট নূর ও প্রকাশ্য মু'জিযা লইয়া আসিলেন, মানব জাতিকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিলেন, মানুষ তাঁহার এই উজ্জ্বল আলোতে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিল (ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫১২, টীকা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩)।

আলোচ্য শ্লোকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে مهند (ভারতীয় তরবারি) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা ভারতের তরবারিগুলি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম (প্রাগুক্ত)। উক্ত চরণের ২য় অংশে কবি من سيوف الله না বলে من سيوف الهند বলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) ইহা শুনিবার পর من سيوف الهند পরিবর্তন করিয়া من سيوف الله সংশোধন করেন (ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫১২, টীকা; আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩)।

তৃতীয় স্তর ঃ তিপ্পান্নতম চরণ হইতে শেষ চরণ পর্যন্ত মুহাজিরদের প্রশংসা। রাসূল করীম (স)-এর প্রশংসার পরপরই মুহাজিরদের প্রশংসা করেন, যাহারা ইসলাম রক্ষার্থে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন এবং নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকেন। বস্তুত তাহারা শক্তিশালী ও সাহসী। রাসূলুল্লাহ (স) কবিতাটি শুনিয়া সন্তুষ্ট হন। কা'বকে ক্ষমা করেন, স্বীয় চাদর দ্বারা তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এবং বলেন ঃ ألا ذكرت الأنصار بخير فإن الأنصار لذلك اهل 'তুমি কি আনসারের কোন উত্তম দিক উল্লেখ কর নাই ? নিশ্চয়ই তাহারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য'। অতঃপর কবি কা'ব আনসারের প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করেন।

এই কবিতার বৈশিষ্ট্য ঃ ভাষাশৈলীর আশ্চর্য গতিশীলতা, শব্দ সম্ভারের অতুলনীয় বিন্যাস-ভঙ্গী এবং রচনারীতি ও বর্ণনার অপূর্ব সাবলীলতা। অর্থাৎ ইহার ভাষাশৈলী ও বর্ণনা রীতির মাঝে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে একটি শিল্প-সৌকর্য এবং আবেগময় প্রাণময়তা। অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়াও কবিতাটি শিল্প ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। বর্ণিত আছে, যখন কবি কবিতাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে আবৃত্তি করিলেন তখন তিনি (স) কবির সুন্দর বর্ণনা, চমৎকার কাব্য-প্রতিভা ও পরিপূর্ণতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলিলেন ঃ إسمعوا! (তোমরা কাসীদাটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর (মাওলানা নিছার 'আলী, মিসবাহুর-রাশাদ

ফী শারহি বানাত সু'আদ, দিল্লী, মাতবু'আয়ে 'ইলমী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৩৫১ হি., পৃ. ৫)।

আলোচ্য কাসীদায় মহানবী (স) ও তাঁহার প্রাণ-প্রিয় সাহাবীদের প্রশংসা এমন নিখুঁত ও নিপুণভাবে করা হইয়াছে যে, তাহা এক পবিত্র স্বর্গীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মূলত আলোচ্য কবিতাটি একটি প্রশংসা গাঁথা। এই কবিতাকে সুবিখ্যাত মাদহিয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সাহিত্য সমালোচক ডক্টর যাকী মুবারাক আলোচ্য কাসীদাকে প্রশংসা গাঁথা বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, কা'ব স্বীয় লামিয়াহ কাসীদাটি মুসলিম সূফী সাধকদের প্রাণশক্তি স্বরূপ ঈমানী জোশ ও ইসলামী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রচনা করেন নাই। নিশ্চয় হত্যা ও নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড হইতে রেহাই পাওয়ার মানসে নিছক উছিলা হিসাবেই তিনি এই কাসীদা রচনা করেন। সুতরাং ইহা রাসূল-প্রশস্তিমূলক কবিতা-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না (যাকী মুবারক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩)।

উক্ত যুক্তির জবাব এই যে, কাসীদা 'বানাত সু'আদ' রচনার নেপথ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ছিল একথা সত্য, কিন্তু এ কাসীদা যদি রাসূল-প্রশস্তি না হইত তবে রাসূলুল্লাহ (স) কবি কা'বের মুখে ইহা শ্রবণান্তে খুশী হইলেন কেন এবং তিনি কবিকে স্বীয় চাদর মুবারক দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন কেন ? তাই একথা সুস্পষ্ট যে, উপলক্ষ্য যাহাই হউক না কেন কবি কা'বের এ কাসীদা মুসলিম সমাজে মহানবী (স)-এর প্রশস্তিমূলক কাসীদাগুলির মধ্যে আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। ইহার প্রতিটি চরণই পৃথকভাবে রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি লাঘবের প্রতিষেধক হিসাবেও কাহারও কাহারও নিকট বিবেচিত (কবি ইব্ন যুহায়র, পৃ. ৫৮)।

পরিশেষে বলা যায়, 'বানাত সু'আদ' কাসীদাটি একটি সফল ও সার্থক কবিতা। অধিকন্তু ইহা 'মাদীহুর-রাসূল' বা রাসূল-প্রশস্তিমূলক কবিতা হিসাবেও স্বীকৃত। কারণ—

১. কবিতাটি জাহিলী যুগের বহুল পরিচিত মু'আল্লাকা ধারার বৈশিষ্ট্যে রচিত। মূলত ইহাই কবি কা'বের কাব্যের স্বাভাবিক ধারা। তাঁহার পিতা যুহায়রও সেকালের একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতায়ও কতিপয় ইসলামী বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায়।

২. মূলত কাসীদাটি ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির বর্ণনাবিশেষ। বস্তুত ইহাতে রহিয়াছে অপরাধী মনের অনুতাপের বহিঃপ্রকাশ ও ক্ষমার আবেদন যাহা কবিতাটিকে এক বিশেষ নূতনত্ব দান করিয়াছে।

৩. কবি কা'বের ইসলাম গ্রহণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য এক বর্ধিত সম্পদ ছিল। কা'ব (রা) ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার ফলে পেশাগত সুপ্রতিষ্ঠিত এক কবিকে ইসলাম লাভ করে, যাঁহার কবিতা এই মানবতাবাদী ইসলামী আন্দোলনের জন্য সহায়ক ছিল।

মহানবী (স) প্রদত্ত এহেন অমূল্য উপহারকে কবি কা'ব মহামূল্যবান সম্পদ মনে করিয়া জীবনের শেষলগ্ন পর্যন্ত যক্ষের ধনের মত তাহা সংরক্ষণ করেন। দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমীর মু'আবিয়া (রা) ইহা ক্রয় করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিধেয়ের উপর কিছুকেই প্রাধান্য দিব না" এই কথা বলিয়া কবি কা'ব উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কবির মৃত্যুর পর আমীর মু'আবিয়া (রা) কবি কা'বের বংশধরদের নিকট বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বুরদা মুবারকখানা ক্রয় করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন (আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা বিল-মিনাহিল মুহাম্মদীয়া, ১খ, পৃ. ৩৪৫)। ইবন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) দিরহামের কথা উল্লেখ করেন (ইবন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, আল-'উমদাহ, ১খ, পৃ. ৮০)। স্বীয় খিলাফত আমলে মু'আবিয়া (রা) জুমু'আ, ঈদ এবং অপরাপর ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়ার সময় বরকত লাভের প্রত্যাশায় খিলাফাতের বিশেষ পোশাকের উপর এই চাদর ব্যবহার করিতেন। অতঃপর পুরুষানুক্রমে ইহা 'আব্বাসীয়দের কোষাগারে সংরক্ষিত ছিল। অবশেষে বহু হস্তান্তরের পর এই চাদরখানা 'উছমানী তুর্কীদের হস্তগত হয় এবং কনষ্টান্টিনোপলের এক বিশেষ কক্ষে সশস্ত্র পাহারায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ পর্বের অনুষ্ঠানে জনসাধারণের দেখিবার উদ্দেশ্যে তাহা বাহিরে আনা হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন, তুর্কী সুলতানের কোষাগারে এই চাদরখানা আদৌ সংরক্ষিত নাই। বরং বাগদাদ নগরী ধ্বংস হওয়ার সময় ১২৫৮ খৃ. হালাকু খাঁ ও তাহার লোকজন অগ্নিসংযোগ করিলে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় (আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাকী মুবারাক, আল মাদাইহুন নাবাবিয়্যা ফিল আদাবি'ল 'আরাবী, কায়রো, দারুন শা'ব, তা.বি., পৃ. ২১; (২) ইব্ন কাছীর আদ-দিমাশ্‌কী, আল-বিদায়া ওয়া-নিহায়া, কায়রো, দারুদ দায়্যান লিত-তুরাছ, ১৪০৮/১৯৮৮, ১ম সং., ৪খ, পৃ. ৩৬৭-৩৭৪; (৩) মাওলানা নিছার 'আলী, মিসবাহুর রাশাদ ফী শারহি বানাত সু'আদ, দিল্লী, মাতবু'আয়ে 'ইলমী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৫১ হি.; (৪) আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম, শারহু কাসীদাতি বানাত সু'আদ, মিসর, মাতবা'আতু মুহাম্মাদ 'আলী সাবীহ, ১৩৪৬ হি.; (৫) আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন আবিল খাত্তাব আল-কারশী, জামহারাতু আশ'আরিল-আরাব, বৈরূত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ১ম সং., ১৪০৬/১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৩৬৫-৩৭১; (৬) আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা বি'ল-মিনাহি'ল-মুহাম্মাদিয়া, বৈরূত, লেবানন, দারু'ল-কুতুবি'ল-'ইলমিয়্যা, ১ম সং., ১৪১৬/১৯৯৬, ১খ, পৃ. ৩৪৩-৩৪৬; (৭) ইব্ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, আল-'উমদাহ, বৈরূত, দারুল মা'রিফাহ, ১ম সং., ১৪০৮/১৯৮৮, ১খ, পৃ. ৭৭-৮১; (৮) ডক্টর শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবি'ল-'আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, কায়রো, দারুল-মা'আরিফ বিমিসর, ১৯৭৩, ৭ম সং., পৃ. ৮৫; (৯) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়া, কায়রো, দারুল হিলাল, তা.বি., ১খ., পৃ. ১৬২-১৬৩; (১০) ঐ লেখক, তারীখু'ত-তামাদ্দুনি'ল ইসলামী, দারুল হিলাল, তা.বি., ১খ, পৃ. ১১৫; (১১) দায়রাতু'ল-মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ৩খ, ৫২৮-৫২৯; (১২) আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, আল-আগানী, পৃ. ৬৩৫৮-৬৩৭০; (১৩) ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়া'শ শু'আরা, বৈরূত, দার ইহয়ায়িল 'উলূম, ১৪১৪/১৯৯৪, ৫ম সং., পৃ. ৮৪-৮৬; (১৪) 'আবদুল কাদির ইব্ন 'উমার আল-বাগদাদী, খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো, মাকতাবাতু'ল-খান্‌জী, তা.বি., ২খ, পৃ. ৩৩৬; (১৫) ইব্নুল আছীর, উসদু'ল-গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, বৈরূত, দারু ইয়াহয়া আত-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি., ১ম সং., ৪খ, পৃ. ২৪০-২৪১; (১৬) মুহাম্মাদ আবুল ফাদল ইবরাহীম ও আলী মুহাম্মাদ আল-যাকী, আয়্যামুল 'আরাব ফি'ল ইসলাম, বৈরূত, দারুল জীল, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ১৬৬-১২২; (১৭) ইব্ন আবিদল বার,

আল-ইস্তী'আ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১৫/১৯৯৫, ১ম সং., ৩খ, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪; (১৮) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, বৈরূত, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছি'ল 'আরাবী, ১৩২৮ হি., ১ম সং., ৩খ, পৃ. ২৯৬; (১৯) ইব্রাহীম আল-বাজুরী, আল-ইস'আদ 'আলা বানাত সু'আদ, মাতবা'আতু মুহাম্মাদ 'আলী সাবীহ, ১৩৪৬ হি.; (২০) আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৮২, প্রথম সং., পৃ. ১৩৫-১৩৭; (২১) আবুল ফয়েজ মুহাম্মাদ আমিনুল হক, কা'ব ইব্ন যুহায়র ও তাঁর অনবদ্য কাব্য বানাত সু'আদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ (কলা অনুষদ), ৪খ, ১৯৮৮, পৃ. ৫২; (২২) আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স) ও সাহাবীদের মনোভাব, ঢাকা, ইফাবা ১৪১৬/১৯৯৫, পৃ. ৬৩-৭২; (২৩) মোহাম্মদ আবদুল মালেক, আরবী কাব্যে রাসূল (স) প্রশস্তি ঃ স্বরূপ ও শিল্প বিশ্লেষণ (পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ ২০০১ খৃ., পৃ. ১৯৫-১৯৬ (অপ্রকাশিত)।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

কাসীদাতুল-বুরদা (قصيدة البردة) ঃ কবি শারাফুদ-দীন আল বূসীরী (দ্র.) রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। তদ্রূপ যুগশ্রেষ্ঠ তিনটি কাসীদার অন্যতম হইল কাসীদাতু'ল-বুরদা, যাহা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পটভূমিতে রচিত হয়। এই কবিতার প্রকৃত নাম الكوكب الدرية فى مدح خير البرية (সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীবের প্রশংসায় উজ্জ্বল নক্ষত্র), ইহার অপর নাম قصيدة البردة (কাসীদাতুল বুরদা) এবং এই নামেই ইহা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে (হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি', পৃ. ১০৪৬; মুহাম্মদ আবদুর রাশীদ, কাসীদা-এ বুরদাহ, ঢাকা, বাগে হালিমা, ১৪০৮/১৯৮০, পৃ. ৫)। বুরদা শব্দের অর্থ নকসাযুক্ত চাদর। চাদরের ন্যায় নকসাযুক্ত এই কাসীদায়ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালবাসা ও প্রীতি, কু-প্রবৃত্তির তাড়না হইতে নিজকে মুক্ত রাখা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা সম্পর্কিত বিষয়, তাঁহার মু'জিযার বর্ণনা, তাঁহার জিহাদ ও মি'রাজের আলোচনা এই কাসীদায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে এই কাসীদার সহিত হরেক রকমের নকসা খচিত চাদরটির সাদৃশ্য থাকায় ইহার নাম 'কাসীদাতু'ল-বুরদা' রাখা হয়। তবে কাসীদাটি قصيدة البرأة না হইয়া قصيدة البردة (রোগ নিরাময় কবিতা) নামে অভিহিত হওয়াই ছিল অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা এই কবিতায় কোথাও البردة (আল-বুরদা) শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ৮৭তম শ্লোকে 'বারাআত' শব্দটি উল্লিখিত আছে।

কাসীদার উসিলায় কবি দূরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তরে স্বস্তি পাওয়ার কারণে সম্ভবত ইহার নাম البردة দেওয়া হয়। কেননা আরবী 'বুরদুন' (برد) শব্দের অর্থ শীতলতা। বুরদা শব্দের অপর একটি অর্থ বুটিদার চাদর। এই কাসীদার নামকরণে 'বুরদা'-কে প্রতীকী শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। বুটিদার চাদর যেমনভাবে বিচিত্র আঙ্গিকে শোভা পায়, অনুরূপ বিচিত্র ভাবধারা ও বিষয় সম্বলিত দশটি অধ্যায় এই কাসীদায় সন্নিবেশিত আছে (এ. এফ. এম. আমীনুল হক, কাসীদা আল-বুরদা-এর কাব্য-স্বরূপ ও তার প্রভাব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, কলা অনুষদ, একাদশ খণ্ড, ১৯৯৫ খৃ., পৃ. ৪৫)।

এই নামে আখ্যায়িত হওয়ার পিছনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, কবি রোগমুক্তির আশায় এই কাসীদা পাঠ করেন এবং কাসীদা পাঠরত অবস্থায় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার রচিত কাসীদা আবৃত্তি করিতেছেন এবং বিশ্বনবী (স) তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিতেছেন। যখন তিনি কাসীদার كم أبرأت وصبا এই অংশটুকু পাঠ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পূত-পবিত্র হস্ত দ্বারা ইমাম বূসীরীর (র) সারা দেহ মুছিয়া দিলেন এবং তাঁহার ইয়ামনী চাদর মুবারক দ্বারা ইমাম সাহেবের দেহ আবৃত করিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর বূসীরী (র) দেখিলেন যে, তাঁহার দেহে রোগের কোন চিহ্নই নাই, পূর্বের মত সুস্থ-সবল মানুষ এবং তাঁহার দেহের উপর স্বপ্নে দৃষ্ট চাদর সত্যি সত্যিই বিদ্যমান। ইহাতে ইমাম বূসীরী (র) আনন্দে অভিভূত হন এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করেন (হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি', পৃ. ১০৪৬)। উল্লেখ্য যে, এই কাসীদাকে 'কাসীদাতু মীমিয়্যা'ও বলা যায়। যেহেতু ইহার কাফিয়া বা অন্ত্যমিলে "মীম" বর্ণ রহিয়াছে।

কাসীদাতু'ল-বুরদা রচনার একটি প্রেক্ষাপট আছে, কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার দেহের একাংশ অবশ হইয়াছিল এবং নড়াচড়া করিতে অক্ষম ছিলেন। পার্থিব চিকিৎসায় নিরাশ হইয়া কবি সংকল্প করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়া ইহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিবেন। ইমাম বূসীরী (র) এই কাসীদা লিপিবদ্ধ করিয়া এক জুমু'আ রাত্রিতে একা একা নির্জন ঘরে পূর্ণ ইখলাসের সাথে মহান আল্লাহর দরবারে রোগমুক্তির আশায় এই উহা পাঠ শুরু করেন এবং পাঠরত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়েন। তখন তিনি উপরে বর্ণিত স্বপ্নটি দেখেন। নিদ্রাভঙ্গের পর ইমাম বূসীরী (র) দেখিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইলে স্বীয় বন্ধু শায়খ আবূ রাজার সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি কবিকে বলিলেন, জনাব ! আপনার সেই কাসীদাটি দিন, যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় রচনা করিয়াছেন এবং সেই কাসীদার প্রথম শ্লোক এইঃ

أمن تذكر جيران بذى سلم + مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

কবি বলিলেন, হে আবূ রাজা ! আপনি কোথা হইতে এই কবিতা মুখস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি গতকাল শুনিয়াছি, আপনি ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আবৃত্তি করিয়াছেন আর ইহা তাঁহার পছন্দ হওয়ায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া কবি কাসীদাটি তাঁহাকে দিয়া দেন। তখন এই কাসীদার কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

'কাসীদাতু'ল বুরদা' একটি বরকতময় কবিতারূপে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। এই কাসীদা বিশ্বের এক বিস্তৃত অঞ্চলসহ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রায় সর্বত্র প্রিয় নবীর ভক্ত অগণিত পাঠক, শ্রোতা এবং কবি-সাহিত্যিকের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাঙ্গনে ইহা আজও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিয়মে এই কাসীদা পাঠ অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলিয়া স্বীকৃত।

কথিত আছে, অনেকে এই কাসীদার বরকতে দূরারোগ ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। রোগ নিরাময় ও বরকত লাভের আশায় অনেক মুসলমান বিশেষ নিয়মে এই কাসীদা বা ইহার অংশবিশেষ পাঠ করেন। তবে ইমাম ইবন তায়মিয়া ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব এই কাসীদার বরকত সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা সমর্থন করেন না

(ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, কাছীদাতুল বুরদাহ, কাব্যানুবাদ, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৯, ১০)।

এই কবিতায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য স্তুতি ও প্রশংসার ভিত্তিতে মহানবীর নিকট তাঁহার শাফআত কামনা এবং সেই উসীলায় পার্থিব রোগমুক্তি অর্জন। বিষয়বস্তু তাশ্‌বীব, মাদ্‌হ ও দু'আ। ইহার শ্লোক সংখ্যায় মতভেদ আছে। হান্না আল-ফাখূরী ইহার শ্লোক সংখ্যা ১৬২টি উল্লেখ করেন। যাকী মুবারক ১৮২টি উল্লেখ করেন এবং অপর এক বর্ণনায় ১৬৫টি। কাসীদাটি আরবী ছন্দমালার অন্যতম ছন্দ 'বাহরুল-বাসীত' ওযনে রচিত (আমীনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; যাকী মুবারাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১)।

কাসীদাতুল বুরদার অধ্যায় সংখ্যা দশটি। প্রথম অধ্যায়ে প্রেমের আকুতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। কবি নিজেকে তৃতীয় পুরুষ নির্ধারণ পূর্বক কিছু কৌতুহল উদ্দীপক প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং নিজ প্রেমাকুতি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি হিজাযের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করেন। মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী কিছু ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ করেন। ইহাতে আছে প্রেমিকার কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক ও বাহ্যিক আচার-আচরণের প্রকাশ। তিনি প্রেমের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন প্রেমিকের রক্তাশ্রু বর্ষণ, শারীরিক কৃশতা, গাল-গণ্ডে অশ্রুর চিহ্নরেখা, বিবর্ণগাত্র ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণাকে প্রেম পথে প্রতিবন্ধক শক্তি হিসাবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি আত্ম নিয়ন্ত্রণের কিছু ফলপ্রসূ পদ্ধতিরও উল্লেখ করেন। তাহা হইলো ঃ কুপ্রবৃত্তির অবাধ্য হওয়া, দৃষ্টি সংযত করা, স্বল্প আহার করা, শয়তানী প্ররোচনা ত্যাগ করা, নাফ্‌ল ইবাদত করা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে মহানবী (স)-এর প্রশংসা। অধ্যাত্ম-সাধনা, নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব, জ্ঞানগরিমা, উদারতা ও দানশীলতায় অপরাপর নবী-রাসূলগণের উপর তাঁহার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, নির্মল ও নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির মনোরম উপমাসহ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় কবিতাটি সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে কবি প্রথমেই নিজের অপরাগতা স্বীকার করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা সম্পর্কে বর্ণনা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) উভয় জগতের নেতা ও শাফাআতের আধার। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দেওয়া কঠিন। যেমন কবির ভাষায় ঃ

فإن فضل رسول الله ليس له   حدفيعرب عنه ناطق بفم

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কোনও সীমা নাই, কাজেই কোন বক্তা মৌখিক আলোচনায় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা শেষ করিতে পারিবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থান বর্ণনায় কবি বলেন ঃ

فمبلغ العلم فيه أنه بشر   وأنه خير خلق الله كلهم

"সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও গবেষণার সীমা এতটুকুই যে, তিনি একজন মহামানব। তিনি আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টির সেরা"।

কবির এই কাব্যাংশটুকু কবির নিজস্ব উক্তি নয়, ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এরও বাণী। কবি যখন কবিতা পাঠ করা অবস্থায় ঘুমাইয়া ছিলেন তখন স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সামনে কবিতার চরণ পরপর আবৃত্তি করিতেছিলেন, যখন তিনি فمبلغ العلم فيه أنه بشر পাঠ করিলেন, কবিতার দ্বিতীয় চরণ আবৃত্তি করিতে সক্ষম হন নাই। কথিত আছে তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন ঃ إقــرأ (পড়)। কবি উত্তরে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! দ্বিতীয়াংশ সংযুক্ত করিতে সক্ষম নই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় অংশ বলিয়া দিলেন— أنه خيــر خلق الله كلهم । ইহার পর এই অংশটুকু প্রত্যেক চরণের পর বার বার পাঠ করা উত্তম বলিয়া কবি ঘোষণা দিলেন। ফলে সূফী-সাধকবৃন্দ কাসীদা বুরদার প্রতিটি শ্লোক পাঠের পরপরই নিম্নলিখিত চরণটি পাঠ করা উত্তম মনে করেন।

مولاى صل وسلم داءما أبدا + على حبيبك خير الخلق كلهم

চতুর্থ অধ্যায় মহানবী (স)-এর জন্মকালীন ঐতিহাসিক ও অলৌকিক ঘটনাবলীর বিবরণ সমৃদ্ধ। তাঁহার জন্মকালে অলৌকিক ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে হাজার বৎসর অবধি পারস্যের অগ্নিপূজকদের মন্দিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নির্বাপিত হওয়া, পারস্য রাজপ্রাসাদের গগনস্পর্শী চৌদ্দটি মিনার খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া, নদী পানিশূন্য হওয়া, মহাজগতের উল্কাপাত, জ্যোতিষীদের আচরিত ধর্মের পরিসমাপ্তি এবং তদস্থলে নূতন ধর্মের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে মহানবী (স)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম ও ইহা পরিচালনায় তাঁহার সীমাহীন কষ্ট-সহিষ্ণুতার বর্ণনা উল্লেখ করা হয়। এই পর্যায়ে তাঁহার নবুওয়তের সত্যতার সমর্থনে পাথরের সাক্ষ্য প্রদান, ভ্রমণকালে মেঘের ছায়াদান ও অনুসরণ, বৃক্ষসমূহের তাঁহার সামনে সিজদাবনত হওয়া, তাঁহার আহ্বানে বৃক্ষের কাণ্ডে ভর করিয়া আসা, হাতের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, তাঁহার নিরাপত্তার জন্য গুহামুখে মাকড়সা ও কবুতরের গৃহীত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবি কুরআনকে মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও জীবন্ত মু'জিযা হিসাবে চিত্রিত করেন। সপ্তম অধ্যায়ে মহানবী (স)-এর মি'রাজ কাহিনী উল্লেখ করা হয়। সশরীরে মি'রাজ রজনীতে কা'বা হইতে বায়তু'ল-মাকদিস ভ্রমণ এবং তথা হইতে উর্ধ্বলোকে গমন, আল্লাহর দীদার লাভ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে মহানবী (স) ও সত্যপথে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণের বীরত্বগাঁথার বর্ণনা করা হয়। মহানবীর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অসীম জ্ঞানবান এবং অনাথ হইয়াও ভাষা, সাহিত্য বিদ্যা ও শিষ্টাচারে অনন্য হওয়ার বিষয়টি অবতারণা করা হয়। নবম অধ্যায়ে মহানবী (স)-এর শাফা'আত কামনা ও পাপমুক্তির প্রার্থনা করা হয়। দশম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিকভাবে আবেগ প্রকাশ ও পাপ হইতে মুক্তি কামনা করা হয়।

এই কাসীদায় উন্নত চরিত্র, মার্জিত ও নম্র স্বভাবের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান, ইহা শিল্প-সৌকর্যে ভরপুর, এই কবিতার জন্যে কবি আল-বূসীরীকে মাদ্‌হিয়্যা-কাব্যের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কাসীদা আল-বুরদায় জাহিলী যুগের আরবী সাহিত্যের ভাবধারারও অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। প্রারম্ভে প্রশ্ন উত্থাপন কবি যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমার কাব্যরীতির অনুকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সমসাময়িক যুগের সাহিত্য ধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে আল-বূসীরীর কাসীদায় কিছুটা ত্রুটিও বিদ্যমান। তিনি অধিক হারে প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দগত ও অর্থগত অলংকার প্রয়োগ করিয়াছেন। কবিতাটিতে সরলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়ের দৈন্য

পরিলক্ষিত হয়, তবে কবি এ কবিতাকে শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ ও গতিময় করিয়া তোলেন। মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, প্রচলিত প্রবাদ বাক্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, নীতিবিজ্ঞান এবং সূফীতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করিয়া কবি ইহার সৌন্দর্য আরও বর্ধিত করেন। তদুপরি এ কবিতায় আঞ্চলিক ও কথ্যরীতি সমৃদ্ধ কিছু বাক্য ও শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। নিকলসন বলেন, যদিও আল-বুরদার কাব্যিক সৌন্দর্য তেমন উচ্চাঙ্গের নয়, তথাপি ইহার চমৎকার ও মাধুর্যপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গী এবং মহানবী (স)-এর উন্নত ও মহান জীবন চরিত্রের উদ্দীপিত ব্যঞ্জনার জন্য এই কাসীদা আগ্রহ সহকারে অধীত হওয়ার যোগ্য। ইসলাম ও মহানবী (স)-এর প্রতি অসীম অনুরাগের স্ফুরণঘটিত কাসীদাতু'ল-বুরদা কবির অন্যান্য রচনাকে ম্লান করিয়া দেয়। এই কাসীদার বদৌলতে কবি আল-বূসীরী মাদ্‌হিয়্যা কাব্যে অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত।

আধুনিক যুগেও এই কাসীদা, 'মাদ্‌হিয়্যা' রচনার স্বীকৃত আদর্শস্বরূপ গৃহীত। ইহার রীতি, ছন্দ-বিন্যাস ও আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনায় যুগে যুগে কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কাসীদাতু'ল-বুরদার প্রভাব আছে ঃ জনপ্রিয়তা, প্রকাশনা, কাব্য, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে।

জনপ্রিয়তা ঃ এই মরমী কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে। মুসলিম বিশ্বে কাসীদাতুল বুরদার মত অন্য কোন কবিতা এত ব্যাপক হারে সংরক্ষিত হয় নাই। কোনও কোনও অঞ্চলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মীলাদ মাহফিল এবং শবযাত্রায় সুললিত ও মধুর স্বরে ইহা আবৃত্তি করা হয়। শিশুদের গলায় কবচাকারে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এমনকি শুধু সম্পূর্ণ কাসীদা নয়, বরং পৃথকভাবে প্রতিটি পঙক্তিই নানারূপ কল্যাণ ও পুণ্যের কারণ বলিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস করা হয়। কতিপয় আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত কল্যাণ লাভের কারণ হিসাবে এই কাসীদা মর্যাদা পায়। যেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী সাহিত্য চর্চার ব্যবস্থা আছে তথাকার উচ্চতর শ্রেণীতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাসীদার পাঠদান করা হয়।

প্রকাশনা ঃ মক্কা, কায়রো, প্যারিস, ভিয়েনা, ইস্তাম্বুল, ফ্লোরেন্স, গ্লাসগো, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া তথা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্র কাসীদাতুল বুরদার একাধিক মুদ্রণ কর্ম ও প্রকাশনা সম্পাদিত হইয়াছে। একমাত্র কায়রো নগরীতেই ইহা পঞ্চাশবার মুদ্রিত হয়। চাহিদানুযায়ী দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত নরম ধাতুর মুদ্রিত ছাপে সযত্নে সংরক্ষণ করা যায়। মিসরের জাতীয় গ্রন্থাগারে স্বর্ণাক্ষরে অলংকৃত একটি কপি সংরক্ষিত আছে।

কাব্য রচনা ঃ কাসীদাতুল বুরদার ধারা অনুকরণে পরবর্তীকালের মাদ্‌হিয়্যা রচিত হয়। ইহার ছন্দের অনুকরণে, মূলপাঠ সংরক্ষণ করত শুরুতে চরণ বৃদ্ধির এবং অলংকার রীতি অনুসরণে কবিতা রচনার প্রয়াস পাঠককুল এবং বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই হিসাবে কাব্য জগতে এই কাসীদার বিশেষ স্থান আছে।

ছন্দানুকরণ ঃ কবিতার ছন্দানুকরণ করাকে মু'আরাদা (معارضة) বলে। কাসীদাতু'ল-বুরদার ছন্দানুকরণ করে মোট দশজন কবি কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হইল ঃ ১. মাহমূদ সামী আল-বারূদী (মৃ. ১৯০৪ খৃ.)। কাসীদার নাম কাশ্‌ফুল-গুম্মাহ ফী মাদহি সায়্যিদিল উম্মাহ; ২. আহমাদ শাওকী বেগ পাশা (মৃ. ১৯৩১ খৃ.) কাসীদার নাম নাহ্‌জু'ল বুরদা। রচনাকাল ১৩২৭ হি.; ৩. শায়খ আহমাদ আল-হামলাবী। কাসীদার নাম মিনহাজু'ল-বুরদা। কথিত আছে যে, তিনি হজ্জে গমন পথে এই মু'আরাদাটি রচনা করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩)।

আলঙ্কারিক অনুকরণ ঃ আল-বূসীরীর মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ (অপর নাম ইব্‌ন জাবির) কাসীদা আল-বুরদার ক্ষেত্রে শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি একজন জন্মান্ধ ও প্রতিভাধর স্পেনীয় পণ্ডিত। কাসীদাতু'ল বুরদার মাত্রা ও অলংকার অনুকরণ করিবার সময় তিনি এক স্বতন্ত্র কাব্য-রীতিরও উদ্ভাবন করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত কাব্যরীতি আল-বাদী'ঈয়া (البديعية) নামে খ্যাত। ইহার প্রতিটি পঙক্তিতেই অলংকার শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি পরিভাষা আছে। উক্ত বাদী'ঈয়্যাটি পরবর্তী যুগে অনেক কবিকে অনুপ্রাণিত করে। যাঁহারা ইহার অনুকরণে বাদী'ঈয়্যা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হইল ঃ ১. সাফীউদ্দীন আল-হিল্লী (মৃ. ৭৫০ হি.); ২. জামালুদ-দীন ইব্‌ন নুবাতা আল-মিসরী (মৃ. ৭৬০ হি.); ৩. ইয্‌যুদ-দীন আল-মাওসিলী (মৃ. ৭৮৯ হি.); ৪. জালালুদ-দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.); ৫. সায়্যিদা 'আইশা আল-বা'উনিয়্যা (মৃ. ৯৩০ হি/১৫২৩ খৃ.) (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫)।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ কাসীদাতু'ল-বুরদা বিভিন্ন উন্নত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই কাসীদা দেশ কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সিংহভাগ কাব্যামোদীর মনে আসন লাভ করে। আরবী ব্যতীত ফার্সী, উর্দু, বাংলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ল্যাটিন, সওয়াহেলী, জার্মান, ফরাসী, তুর্কী, ইংরেজি, পশতু, পাঞ্জাবী এবং জাবী ভাষায়ও এই কবিতার অনুবাদ, সংকলন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টিকা-টিপ্পনী রচিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাকী মুবারাক, আল-মাদাইহুন নাবাবিয়্যাহ ফি'ল-আদাবি'ল 'আরাবী, কায়রো, দারুল শা'ব, তা. বি.; (২) সায়্যিদ মুহাম্মাদ 'আবদুল হাই, আছ-ছাফাআতু'ল-ইসলামিয়্যা, ফিল হিন্দ, আযমগড়, দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৬৯ খৃ.; (৩) যুল-ফিকার আলী, 'ইতরু'ল-ওয়ারদা ফী শারহিল বুরদা, হাটহাজারী, নু'মানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৭ হিজরী; (৪) ড. আহমাদ মুহাম্মাদ আল-হুফী, আল-ইসলাম ফী শি'রি শাওকী, কায়রো ১৩৮২/১৯৬২; (৫) ড. শাওকী দায়ফ, ফুসূল ফিশ-শি'র ওয়ান-নাকদিহ, কায়রো ১৯৭১ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ আবদুর রশিদ, কাসিদা-এ বোরদাহ, ঢাকা, বাগে হালিমা, ১৪০৮/১৯৮০; (৭) হান্না আল-ফাখূরী, আল-মু'জায ফি'ল আদাবি'ল আরাবী ওয়া তারীখিহি, বৈরূত, দারুল জীল, ২য়-সং, ১৪১১/১৯৯১, ৩খ, পৃ. ৪৯০; (৮) হান্না আল ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখি'ল আদাবি'ল আরাবী, বৈরূত, দারুল জীল, ১ম সং., ১৯৮৬ খৃ., ১খ, পৃ. ১০৪৯; (৯) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি'ল-লুগাতি'ল আরাবিয়্যা, কায়রো, দারুল হিলাল, তা.বি., ৩খ, পৃ. ১৩৯-১৪১; (১০) গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃ.; (১১) ইয়াসীন আল-আয়্যূবী, সাফিয়্যুদ্দীন আল-হিল্লী, বৈরূত, দারুল কুতুব লিল-লুবনানী, ১৯৭১ খৃ.; (১২) সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলাবী, আল-মাদহ আন-নাবাবী, কায়রো, তা.বি.; (১৩) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, কাসীদাতুল বুরদাহ, কাব্যানুবাদ, ঢাকা ২০০১ খৃ., পৃ. ৯১০; (১৪) এ. এফ. এম. আমীনুল হক, কাসীদা আল বুরদা-এর কাব্য-স্বরূপ ও তার প্রভাব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, কলা অনুষদ, একাদশ খণ্ড, ১৯৯৫; (১৫) মোহাম্মদ আবদুল মালেক, আরবী কাব্যে রাসূল (স) প্রশস্তি ঃ স্বরূপ ও শিল্প বিশ্লেষণ (পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ, ২০০১ খৃ. (অপ্রকাশিত);

(১৬) R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1930।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

আল-কাসীম (القصيم) ঃ সা'উদী আরবের মধ্যাঞ্চলে উত্তর নাজ্দ প্রদেশের একটি জিলা। তুওয়ায়ক পর্বতের সুদীর্ঘ খাড়া ঢালের উত্তর প্রান্তের পশ্চিমে এই জিলাটি অবস্থিত। ওয়াদী'র-রুমাহ নামক বৃহৎ মরুনদীটির পূর্বাঞ্চলের বিশাল মরুর বালুকায় হারাইয়া যাইবার কিছু পূর্বেই উহার নিম্নাংশ জিলাটিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে।

প্রাচীন আরবীতে কাসীম শব্দটি (কাসীমা) বলিতে এমন বালুকাময় এলাকা বুঝায়, যেখানে গাদা (ঝাউবিশেষ) নামক উদ্ভিদের প্রচুর ঝোপঝাড় আছে। নামটি জিলার জন্য খুবই উপযুক্ত। জিলার উত্তরে ('ইর্কু'ল-মাযহূর), পূর্বে (নাফূদু'ছ-ছুওয়ায়রাত) ও দক্ষিণে (নাফূদু'স-সির্‌র) বিস্তীর্ণ বালুকাময় অঞ্চল রহিয়াছে যাহা আরবীয় বর্ম (Arabian Shield) (দ্র. জাযীরাতু'ল-'আরাব) নামে পরিচিত, দীর্ঘ পার্বত্যাঞ্চল ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই জিলায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিছু বালুকাময় এলাকা রহিয়াছে যেগুলি ঐ বর্ম অঞ্চলের বিপরীত দিকে, যেমন নাফূদ আল-গামীস। এই বালুকাময় এলাকাটি পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত।

বুরায়দা (বর্তমান রাজধানী শহর) ও 'উনায়যা (দ্র.) শহর দুইটি আল-কাসীম জিলার প্রাণকেন্দ্র। ওয়াদী'র-রুমাহ-এর আরও উজানে অবস্থিত রহিয়াছে আর-রাস্‌স। ইহা আল-হিজায প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় জিলার প্রধান বহিঃচৌকি শহর। আর-রাস্‌সের উত্তরে রহিয়াছে আল-খাবরা', আল-বুকায়রিয়্যা ও উহার সংলগ্ন আল-হিলালিয়্যা (দুইটিই মূলত সুবায়' গোত্রের উপনিবেশ), আল-'উয়ূন ('উয়ূনু'জ-জিওয়া') ও কুসায়বা' নামক জনপদগুলি। আল-কাসীম জিলার পূর্ব প্রান্তে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি রেখায় অবস্থিত রহিয়াছে আবাদ-দূদ, আত-তান্‌নুমা ও 'আয়ন ইব্‌ন ফুহায়দ নামের মরূদ্যান জনপদগুলি। এই জনপদগুলি অন্য আরও কিছু জনপদের সহিত একত্রে আল-আসয়াহ (সমভূমি) নামে পরিচিত। জনপদগুলির কাতার আরও দক্ষিণে আশ্-শামাসিয়্যা আল-আওসাজিয়্যা" (বা আল-'আওশাযিয়্যা) ও আল-মিযনাব নামে আরও কিছু জনপদ রহিয়াছে।

নাজ্দ প্রদেশের জিলাগুলির মধ্যে আল-কাসীম প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের দিক দিয়া সমৃদ্ধতর। আরবে যখন পশুপালন প্রধান জীবিকা ছিল তখন এই আল-কাসীম জিলা বিদেশে উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল, যাহা মরুচারী যাযাবর পালকগণ এখানকার বাজারে বিক্রয় করিতে আনিত। কুসমানগণ (কাসীমী-র ব. ব.) খুবই প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী যাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর মিসর ও ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে ইহারাই নাজ্দ প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া সর্বাপেক্ষা বিশ্ব নাগরিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত ছিল (আল-কাসীমের কাফেলা সওদাগরদের সম্পর্কে দ্র. 'উকালায়)।

আরব ভৌগোলিক ও প্রাচীন কবিদের বিভিন্ন উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে, জিলাটি প্রাক-ইসলামী আমল হইতেই আল-কাসীম নামে পরিচিত ছিল। আরবে ইসলামের অভ্যুদয় হইতেই আল-কাসীমের অধিবাসীগণ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের পক্ষ সমর্থন করেন। এই জিলায় একদা যে সকল গোত্র ঘুরিয়া বেড়াইত ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে ঃ গাতাফান-এর 'আব্‌স, বানূ আসাদ ও তামীম (দ্র.)। উহাদের মধ্যে আজ এখানে কেবল তামীম গোত্রেরই প্রবল অস্তিত্ব বজায় আছে। অন্য গোত্রগুলির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে (কোনও কোনও ক্ষেত্রে বসতি স্থাপনের সুবাদে) সুবায়', মুতায়র, হার্‌ব ও বানী খাদীর প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা।

৫ম/১১শ শতকে আর-রাস্‌সের দারিম নাজদ-এর অন্যান্য অংশসহ এখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহার ইনতিকালের পর উহার দ্রুত পতন ঘটে। এই জিলায় বিদ্যমান বড় শহরগুলি ১০ম/১৬শ শতকের আগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমন কোনও প্রামাণিক ঐতিহাসিক দলীল পাওয়া যায় না। এই জিলাটিতে ১১৮২/১৭৬৮ সন অবধি নানা স্থানীয় বিবাদ ও তুচ্ছ জাতীয় সংঘাত চলিতে থাকে। ঐ সময় দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত আল-'আরিদ (দ্র.)-এর আদ-দির'ইয়্যার আলু সু'উদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব প্রচারিত একত্ববাদী মতবাদের প্রতি অবশিষ্ট আরবের অধিবাসীদের আনুগত্য প্রয়োজনে অস্ত্রের সাহায্যে আদায় করিতে সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি আল-কাসীমে প্রথম সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলে বহু কুসমান আগ্রহ সহকারে ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের ইসলামের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যরা তাহাদের পুরাতন বিশ্বাস ও আচার-রীতিতে অটল রহিয়া যায়। তাহাদের বিরুদ্ধে যিনি চূড়ান্ত জয়লাভ করেন এবং আল-কাসীমের সকল লোককে ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব ঘোষিত একত্ববাদের (আদ-দা'ওয়া ইলা'ত-তাওহীদ) পক্ষে আনয়নে সক্ষম হন তাঁহার নাম তামীম গোত্রের 'আনাকির-এর হুজায়লাম ইব্‌ন হামাদ বুরায়দায় আলু সু'উদের গভর্নর। তিনি নাজ্দে মিসরের ইব্‌রাহীম পাশার আক্রমণ অভিযানের আগে ১২শ/১৮শ শতকের শেষাবধি বুরায়দার গভর্নর ছিলেন। ১২৩৪/১৮১৮ সনে ইব্‌রাহীম পাশা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় হুজায়লামকে মদীনায় লইয়া যান এবং সেখানেই অশীতিপর হুজায়লাম ইনতিকাল করেন।

ইবরাহীমের বাহিনী আলু সু'উদের রাজধানী আদ্-দির'ইয়্যা ধ্বংস করার পর উহার স্থলে আর-রিয়াদ (দ্র.) নূতন রাজধানী হয়। ইহার পরে প্রায় এক শতাব্দী যাবত মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জিলা হিসাবে আল-কাসীম আর-রিয়াদের আলু সু'উদ ও সু'উদের নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী আলু রাশীদের মধ্যে বিবাদের বিষয় হইয়া থাকে। আলু রাশীদের ক্ষমতার ঘাঁটি ছিল আল-কাসীমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জাবাল শাম্মার (দ্র.)-এর হা'ইল-এ। বিবদমান যে পক্ষ যখন আল-কাসীমের নিয়ন্ত্রণে থাকিত তখন সেই পক্ষেরই আধিপত্য বহাল হইত। দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলাফল দোদুল্যমান থাকায় কখনও এক পক্ষ জয়ী, কখনও আবার পরাজিত হইতে থাকে। এদিকে আল-কাসীম জিলা বুরায়দা ও 'উনায়যা শহরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ চলিতে থাকায় আল-কাসীম উক্ত দুই প্রবল রাজশক্তিকে কখনও কার্যকরভাবে প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় নাই, যদিও উহার সম্পদের অভাব ছিল না। তবে ঐ দুই রাজশক্তির চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয় ১৪শ/২০শ শতকের গোড়ার দিকে। এই সময়ে 'উছমানী বাহিনীর সমর্থন সত্ত্বেও আলু রাশীদ আল-কাসীমে 'আবদু'ল 'আযীম আলু সু'উদের নিকট পরাজিত হন।

সাম্প্রতিক কালে কুসমানগণ, বিশেষ করিয়া বুরায়দার অধিবাসীরা ইব্‌ন 'আবদিল-ওয়াহ্‌হাবের তাওহীদবাদের সর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ প্রবক্তা। এই জিলার যোগাযোগ, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় কুসমানদের ধর্মীয় উগ্রতা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে, ঈষৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাজু'ল-'আরূস, দ্র. কসম; (২) য়াকূত (আল-কাসীম, বুরায়দা, 'উনায়যা, আর-রাস্‌স, আর-রুম্মা = আর-রুমাহ); (৩) হুসায়ন ইব্‌ন গান্নাম, রাওদাতু'ল-আফ্‌কার, বোম্বাই, তা.বি.; (৪) 'উছমান ইব্‌ন বিশ্‌র, 'উনওয়ানু'ল-মাজ্‌দ, কায়রো ১৩৭৩ হি.; (৫) হামাদ ইব্‌ন লা'বূন, তা'রীখ, মক্কা ১৩৫৭ হি.; (৬) ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'ঈসা, 'ইকদু'দ-দুরার, কায়রো ১৯৫৪-৫ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, তা'রীখ বা'দিল-হাওয়াদিছ, আর-রিয়াদ ১৯৬৬ খৃ.; (৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন বুলায়হিদ, সাহীহু'ল-আখবার, কায়রো ১৯৫১-৩ খৃ.; (৯) 'আবদু'র-রাহমান আশ্‌-শারীফ, মিনতাকাত 'উনায়যা, কায়রো ১৯৬৯ খৃ.; (১০) G. Rentz, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব-এর উপর অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, Berkeley ১৯৪৭ খৃ.; (১১) C. Guarmani, Northern Najd, London 1938; (১২) C. Doughty, Travels in Arabia Deserts, London 1936; (১৩) A. Blunt, A Pilgrimage to Najd, London 1881; (১৪) A. Musil, Northern Negd, New York 1928; (১৫) H. Philby, Arabia of the Wahhabis, London 1928; (১৬) ঐ লেখক, Saudi Arabia, London 1955; (১৭) M. v. Oppenheim et al., Die Xeduinen, Leipzig-Wiesbden 1939-68; (১৮) দা. মা. ই., ১৬/২খ, লাহোর ১৯৭৮ খৃ.।

G. Rentz (E. I.[2])/আফতাব হোসেন

কাসীল ইব্‌ন জালিম (قصيل بن ظالم) ঃ (রা) সাহাবী, তাঈ গোত্রের লোক, তাঁহার নাম কাসলী (قصلي) ও কাদীল (قضيل) বলিয়াও উল্লেখ আছে। তিনি নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে নবী কারীম (স)-এর নিকট আসেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, পৃ., ২৩৬, নং ৭১১২; (২) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, ৪খ, ২০৫; (৩) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ইস্‌-সাহাবা, ২খ, ১৫।

মুহাম্মদ মূসা

কাসূর (قصور) ঃ বিভাগোত্তরকালে পাঞ্জাব প্রদেশের একটি শহর, যাহা পরবর্তীতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শহর লাহোর হইতে দক্ষিণে ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে শতদ্রু ও উত্তরে রাবী নদী প্রবাহিত [বর্তমানে (১৯৭৬ খৃ.) এখানে কাসূর জিলার সদর দফতর স্থাপন করা হইয়াছে]।

কাসূরের নামকরণের কারণ ও বাসিন্দাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অধিবাসীদের মুখে শ্রুত নিম্নোক্ত বর্ণনা বিখ্যাত। বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্রের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম ছিল লব এবং অন্যজনের নাম কূসা। লব যেই শহরের পত্তন করে সেই শহরের নাম 'লাহাওয়ার' এবং কূসা যেই শহরের পত্তন করে সেই শহরের নাম 'কূসাওয়ার' (Kusawar) রাখা হয় (Cunninghum: Ancient Geography of India, পৃ. ২২৮)। কানিংহাম মনে করেন যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত পর্যটক Hiuen Tsiang যেই সকল শহর পরিভ্রমণ করেন, তন্মধ্যে কাসূরও অন্তর্ভুক্ত ছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯)। এই এলাকার বাসিন্দাদের মুখে অপর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা এই যে, উক্ত শহরে ইমারতের (কাসর=قصر অর্থ প্রাসাদ, ব. ব. কাসূর = قصور) সংখ্যা অত্যধিক থাকায় ইহা কাসুর নামে বিখ্যাত। উপরিউক্ত দুইটি বর্ণনাই লোকমুখে শ্রুত। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে অনুরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

কাসূরের প্রাথমিক ইতিহাস জানা যায় নাই। আমরা কেবলমাত্র পাক-ভারতের মুসলিম যুগের ইতিহাসে 'কাসূর'-এর উল্লেখ পাই। ইহার পূর্বে এই শহরের নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতি এই শহরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলিম অধিকারের পূর্বে কাসূর রাজপুতদের অধীনে ছিল (ইম্পেরিয়েল গেজেটিয়ার ১৫, পৃ. ১৪৯)। মুগলদের পূর্বে কাসূর সম্পর্কে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, বাবা ফারীদু'দ-দীন গাঞ্জে শাকার (র)-এর দাদা কাদী শু'আয়ব সম্ভবত গুয্য জাতির আক্রমণের ফলে আনুমানিক ৫৫২/১১৫৭ সালে কাবুল হইতে লাহোর আগমন করেন এবং তথা হইতে কাসূরে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। কাসূরের কাদী তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁহার পরিবারের দুর্দশা ও বিপর্যয় সম্পর্কে বাদশাহকে অবহিত করেন। ঐ সময়ে কাসূরের কাদী ন্যায়বিচার ও অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার যুগের কাদীদের জন্য গৌরবের কারণ ছিলেন (আমীর খোর্‌দ, সিয়ারু'ল-আওলিয়া', পৃ. ৪৯)। ঐতিহাসিক বারানী গিয়াছু'দ-দীন তুগলাকের (১৩২০-১৩২৪ খৃ.) নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সিরাজু'দ-দীন কাসূরীর উল্লেখ করিয়াছেন (যি-য়া'উদ-দীন বারানী, তারীখে ফীরূযশাহী, পৃ. ৪২৪)।

য়াহ্‌য়া সিরহিন্দী ৮৩৪/১৪৩০ সনের ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় কাসূরকে একটি বিখ্যাত শহর বলিয়া বর্ণনা করেন (য়াহ্‌য়া সিরহিন্দী, তারীখ মুবারাকশাহী, পৃ. ২১৭-২১৮)। আমীর খসরু পাঞ্জাবে মুগল আক্রমণের দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন ঃ

از قدم شوم مغل آن بلاد
نام و نشانے ز عمارت نداد
ز حد سامانه و تا لاهور
هیچ عمارت نه مگر در قصور

"শহরে মুগলদের আক্রমণের ফলে
কোন ইমারতের চিহ্নমাত্র ছিল না,
সামানা হইতে লাহোর পর্যন্ত
কাসূর ছাড়া সকল ধ্বংস হইয়াছিল"।

(কিরানু'স্‌-সা'দায়ন, নাওল কিশোর সংস্করণ, ১২৮৭ হি., পৃ. ৪৯)। অর্থাৎ মুগল আক্রমণের ফলে সামানা হইতে লাহোর পর্যন্ত কাসূর শহর ছাড়া অন্য কোথাও ঘর-বাড়ী বা জন-মানুষের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না [উপরিউক্ত বর্ণনা এই নিবন্ধ লেখকের। কিন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, "দার কাসূর"-এর অর্থ এই যে, এমন কোন ইমারত বাকী ছিল না যাহা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয় নাই]। ইহার পরে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা কাসূরের রাজনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানি না। বাদশাহ বাবুর খেশ্‌গীদেরকে কাসূর অঞ্চলের নির্ধারিত কর গ্রহণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। বাবুরের স্বাক্ষরিত দানের এই নির্দেশনামা ১০৭৭/১৬৬৬ সন পর্যন্ত 'জামনাদ' গোত্রের নিকট কাসূরে সংরক্ষিত ছিল ('আবদুল্লাহ্‌ খেশ্‌গী কাসূরী, আখবারু'ল-আওলিয়া, পৃ. ১৪১ ক)। এই সময় হইতে কাসূরের নেতা সায়্যিদ 'আলী হামাদানীর বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কোট মুরাদ খান ও কোট 'উছমান খান নামক মহল্লায় বসবাস করিতেছেন (এ. আর. হামদানী "হাম আওর হামারে আসলাফ," লাহোর ১৯৬৯ খৃ.)। তাহা ছাড়া শায়খ গোত্রের বহু লোকও এই স্থানে বসবাস করে।

কাসূর দখলকারী জাতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতি খেশ্‌গী, যাহারা আফগান জাতির একটি শাখা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে তাহারা কাসূরে বসতি স্থাপন করে, তজ্জন্য কাসূরকে খেশগীদের আবাসস্থলও বলা হয় (সামসামু'দ-দাওলা, মা'আছিরু'ল-উমারা', ৩খ, ৮১৮)। এই বংশে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু নেতা 'আলিম ও মাশা'ইখ ছিলেন, প্রতি যুগেই তাঁহারা অত্যন্ত সংস্কৃতিবান জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। তাহাদের আবাসগৃহ পাকা ইট দ্বারা তৈরী ছিল (আখবারু'ল-আওলিয়া', পাতা ১৪১ ক)।

কাসূরসহ রাজ্যের সমগ্র এলাকায় খেশ্‌গী নেতাদের রাজনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। তাহাদের মধ্যে 'নাজ্‌র বাহাদুর' প্রথমে শাহযাদা পারভেযের নৈকট্য লাভ করেন এবং পরে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের পারিষদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি ১০৬২/১৫৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র শামসু'দ্দীন, কুত্‌বু'দ-দীন ও আসাদুল্লাহ্ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (মা'আছিরু'ল-উমারা', ৩খ, ৮১৮-৮২০)। সুলতান আহমাদ খালাফ, নাজর বাহাদুরের পৌত্র, শাহ্‌যাদা আ'জাম শাহের কর্মচারী ছিলেন (প্রাগুক্ত, ১খ, ৬০০; ৩খ, ২৬)। তাঁহার চার পুত্র হুসায়ন খান, 'আলী খান, পীর খান ও কুত্‌বু'দ-দীন 'উরফে বায়াযীদ খানও মুগল শাসনামলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন (প্রাগুক্ত, ৩খ, ১২৬)। শামসু'দ-দীন ইব্‌ন নাজার বাহাদুরের জামাতা ইসমা'ঈল খান হুসায়ন যা'ব 'উরফে জান্‌বায খান আওরাঙ্গযীবের কর্মচারী ছিলেন (প্রাগুক্ত, ৩খ, ৭৭৭)।

শাম্‌স খানের ভগ্নিপতি 'আবদু'র রাহীম 'উরফে শাহ্‌দাদ খান খেশ্‌গী পাঞ্জাবে শিখদের মুকাবিলা করেন এবং বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় তিনি (১৭৩৯ খৃ.) খান দাওরানের সঙ্গে করনালের নিকটে নাদির শাহের মুকাবিলা করেন। হুসায়ন খান ইব্‌ন সুলতান আহমাদ খেশ্‌গী কাসূরের একজন স্বাধীনচেতা শাসক ছিলেন। তিনি লাহোরের শাসনকর্তা 'আবদু'স-সামাদ খানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন।

তিনি কখনও খারাজ প্রদান করিতেন না। চূনিয়া নামক স্থানে জুমাদা'ল-উখ্‌রা ১১৩৩/১৫ এপ্রিল, ১৭২০ উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং হুসায়ন খান নিহত হন (মাআছিরু'ল-উমারা', ১খ, ৫১৯)। হুসায়ন খান শহরের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, প্রাচীরের মধ্যে স্থাপিত ফটকের অভ্যন্তরের শহরও তিনি নির্মাণ করেন। তিনি একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করান। এই মসজিদকে নওয়াব হুসায়ন খান জামি' মস্‌জিদ বলা হয়।

হুসায়ন খানের পতনের পর জাল্লী খান কাসূরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। নাদির শাহের ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় শিখদের উত্থান হয়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে সরদার জাস্‌সা সিং লাহোরের গভর্নর নওয়াব যাকারিয়া খানের মৃত্যুর পর স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং কাসূর অধিকার করেন। আহমাদ শাহ্ আবদালী যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি শিখদের পর্যুদস্ত করত পাঞ্জাব অধিকার করেন এবং জাল্লীখান আফগান কাসূরিয়াকে (দ্র. মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী, An Afghan Colony at Qasur, ইংরেজী পরিশিষ্ট, আওলিয়ায়ে কাসূর, পৃ. ১৬) প্রথমে কাসূরের কালেক্টর এবং পরে লাহোরের গভর্নর নিয়োগ করেন (সোহান লাল সূরী, 'উমদাতু'ত্-তাওয়ারীখ, ১খ, ১২৩)। কিন্তু আহমাদ শাহ্ আবদালীর ভারত হইতে প্রস্থানের পরই শিখেরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠে।

১৭৬২ খৃ. আহমাদ শাহ্ আবদালী ৬ষ্ঠ বারের মত পাঞ্জাবে হামলা করিয়া পুনরায় শিখদের পরাজিত করেন। কিন্তু বৎসরের শেষভাগে তিনি আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জাস্‌সা সিং শিখ বাহিনী লইয়া কাসূর আক্রমণ করে। ফলে চারি সহস্র আফগান নিহত হয়।

কাসূর অধিকারের পর শহরটি অগ্নিদগ্ধ করা হয় (দ্র. ইবরাহীম খান, সায়রিস্তান, মুলতান ১৮৫৪ খৃ., পৃ. ১৩) এবং তাহা নিম্নশ্রেণীর মেথরদের অধিকারে চলিয়া যায়। শিখদের ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ আফগানিস্তানে পৌঁছিলে যামান শাহ্ হিন্দুস্তান অভিযান করেন। যখন তিনি পাঞ্জাব পৌঁছেন মেথররা কাসূর ছাড়িয়া পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করে। এই সুযোগে ১২১১/১৭৯৬ সনে নিজামু'দ-দীন খান কাসূর অধিকার করেন। এই সময় যামান শাহের ভ্রাতা মাহ্‌মূদ শাহ হিরাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে যামান শাহ্ দ্রুত আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন (দ্র. 'আযীযু'দ-দীন ওয়াকীলী, দুর্‌রাতু'য্-যামান, কাবুল ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৮১-৮৬)। যামান শাহ্ আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করায় রঞ্জিত সিং লাহোর দখল করিয়া বসেন। রঞ্জিত সিং সমগ্র পাঞ্জাবে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একাধিকবার কাসূর আক্রমণ করেন। পরিশেষে আফগানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কাসূর অধিকার করিতে সক্ষম হন। ইংরেজগণ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী প্রথমবারের মত কাসূর অধিকার করে (দ্র. Muhammad Latif, History of the Punjab, পৃ. ৫৪৮)। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কাসূর পুনরায় পাঞ্জাবের ইংরাজদের অধিকৃত এলাকার সহিত সংযুক্ত হয়। ইংরাজ শাসনামলে কাসূরের বিখ্যাত আফগান সরদার ছিলেন মুবারিযু'দ-দাওলা, পীর ইব্‌রাহীম খান বাহাদুর। কাসূর পাঞ্জাবের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পর তাঁহার পিতা ও বংশের অন্যান্য ব্যক্তি মামদুট নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন এবং তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী ও বংশের বৃত্তান্ত সম্পর্কে 'সায়রিস্তান' নামে ফার্সীতে একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। ইহা ১৮৫৪ খৃ. মুলতান হইতে প্রকাশিত হয় (দ্র. মুহাম্মাদ শাফী লাহোরী, An Afghan Colony at Qasur, in Islamic Culture, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) জুলাই ১৯২৯, পৃ. ৪৭২; অনুরূপ ইংরাজী পরিশিষ্ট, Saints of Qasur, পৃ. ৩)। কাসূর জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বাসস্থান হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থানে খ্যাতিমান 'উলামা ও মাশা'ইখ জন্মগ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় প্রচারে জীবনাতিবাহিত করিয়া এখানেই কবরস্থ হন। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) শায়খযাদা শাহ কামাল চিশ্‌তী (বাবা ফারীদু'দ-দীন গাঞ্জে শাক্‌র), মৃ. ৬৬৪/১২৬৫-এর একজন আত্মীয় ; (২) শায়খ আদহিয়্যাহ্ চৌহান (শায়খ 'আবদু'ল-জালীল চৌহাড় বন্দেগী লাহোরীর খলীফা, মৃ. ৯১০/১৫০৪, দ্র. জামালু'দ-দীন আবূ বাক্‌র তাযকিরায়ে কুত্‌বিয়া, পৃ. ৬৫-৬৬); কাসূরের চৌহানগণ তাহার বংশধর। তিনি শের শাহ সূরীর মীনসাবদার ছিলেন। তিনি লক্ষী জংগলের ডাকাতদের হাতে নিহত হন (দ্র. আখবারু'ল-আওলিয়া', মুহাম্মাদ তায়্যিব হামদানী কাসূরী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, পত্রক ১৪৫ ক, খ); (৩) শায়খ নূর, মুরীদ, শায়খ 'আলামু'দ-দীন

চুনীওয়াল (চুনিয়া নামক স্থান কাসূরের সহিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চল), মৃ. ৯১৬/১৫১০ (দ্র. আযকার-ই কালান্দারী, পৃ. ১৪৫; তারীখ জালীলা, পৃ. ৩৫৭); (৪) হাজ্জী গগন ওয়াতূযা'ঈ, শায়খ 'ঈসা মাশ্ওয়ানীর মুরীদ; (৫) মিয়াঁ আখুন্দ সাঈদ হুসায়ন যা'ঈ; (৬) শায়খ মুহাম্মাদ ওয়াতূযা'ঈ, আখবারু'ল-আওলিয়া; (৭) মাওলানা মুহাম্মাদ মুকীম, মুরীদ, মুজাদ্দিদ আল্ফ ছানী (মাক্তূবাত, ৩খ, মাকতূব নং ৬৬, মাক্তূবাতে মা'সূমিয়্যা, ১খ, মাক্তূব নং ৫১); (৮) পীর রাহ্মাত ওয়াতূযা'ঈ, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক; (৯) শায়খ যূসুফ বাটকযা'ঈ, বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বাদশাহ শাহ্জাহানের সমসাময়িক; (১০) শায়খ 'আবদু'ল-খালিক, শায়খ আদাম বিন্নূরীর মুরীদ (মৃ. ১০৫৩/১৬৪৩ খৃ.); (১১) বায়াযীদ খান (মৃ. ১০৯৬/১৬৮৪, দ্র. খাফী খান, মুন্তাখাবু'ল্-লুবাব, ২খ, পৃ. ৫৫১-৫৫২); (১২) ফাতহ্ খান, মৃ. ১১০৮/১৬৯৬; শায়খ সা'দী লাহোরীর মুরীদ, জাওয়াহির, শীরানী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; (১৩) মাওলানা 'উমার খান, শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (দ্র.)-এর অন্যতম ভক্ত (খালীক আহ্মাদ নিজামী, শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র রাজনৈতিক রচনাবলী, কাওলু'ল-জালী ওয়া আসরারু'ল-খাফী'র-উদ্ধৃতিসহ, পৃ. ২৬, এবং হাফিজ সিদ্দীক, হাফিজ সা'দুল্লাহ্, হাফিজ ইসমা'ঈল প্রমুখ, পীর মুহাম্মাদ সাচীয়ার নওশাহীর (মৃ. ১১২০/১৭০৮) শাগরিদবৃন্দ (শারাফাত নওশাহী, শারীফু'ত্ তাওয়ারীখ, শারাফাত নওশাহী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, ২খ, ১৬২-১৬৩; ৩খ, ১৯, ২২২-২২৪)।

'আবদুল্লাহ্ খেগ্শী কাসূরী, আখবারু'ল-আওলিয়া' নামক গ্রন্থে (১০৭৭/১৬৬৬) এমন অনেক মাশা'ইখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু কাসূরেই হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের কবরের চিহ্ন পর্যন্ত এখন পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপঃ ইসমা'ঈল 'আযীয যা'ঈ, আল্লাহ্দাদ ওয়াতুযা'ঈ, হাজ্জী আহমাদ বাটকযা'ঈ, হাজ্জী মিয়াঁ 'আযীয যা'ঈ, ভূগী 'আযীয যা'ঈ, হুসায়ন বাটকযা'ঈ, হুসায়ন পীর রাহীম দাদ ওয়াতুযা'ঈ, মুহাম্মাদ খাঁন ইব্ন খাজা খিদির বাটকযা'ঈ, মাওলানা 'আবদু'ল-ওয়াহিদ, হাজ্জী আবীস ওয়াতুযা'ঈ; শায়খ জাল্লু ইব্ন মিসরী খান, হাজ্জী রহীমদাদ হুসায়ন যা'ঈ, য়ার মুহাম্মাদ বাটকযা'ঈ, শায়খ মারদান বাটকযা'ঈ ও শায়খ মুবারক খালাফ বাটকযা'ঈ।

কাসূরের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকারের নাম প্রদত্ত হইল ঃ সাওয়ালাত আহমাদী...(১) প্রণেতা ঃ মাওলানা আহমাদ গুরয়ানী (মৃ. ১০৩০/১৬২০) ['আবদুল্লাহ্ খেশ্গীর মূল সারাংশসহ মা'আরিজু'ল বিলায়াত আয'র পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রক্ষিত, পত্রক ৩৬৯-৩৭৪ "ক"]; (২) আবদুল্লাহ্ খেশ্গী (১০৪৩-১১০৬/১৬৩৩-১৯৬৪) (দ্র.) আখবারু'ল-আওলিয়া' ও মা'আরিজু'ল-বিলায়াত প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার; (৩) মুহাম্মাদ পানাহ্ খেশ্গী, প্রণেতা ঃ মাজমূ'উ'দ-দা'ওয়াত ফী হুসূলি'ল্-মুরাদাত" প্রণেতা, ৯ শা'বান, ১১০৪ হি., পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, মির্যা কাসিম 'আলী বেগ, লাহোর; (৪) শাহ্ 'ইনায়াত কাদিরী কাসূরী, পরে লাহোরী (মৃ. ১১৫০/১৭৩৭ পর), প্রণেতা ঃ গায়াতু'ল-হাওয়াশী; (৫) হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ (মৃ. ১১৫৩/১৭৪০), প্রণেতা ঃ আন্ওয়ার খামসা ও 'রাদ্দু রাওয়াফিয [গুলাম রাসূল কাসূরীর গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ, শাজারাতু'ল-আনসাব, লাহোর ১৯৩৫]; (৬) আবূ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল ইব্ন খোদাদাদ খান খেশ্গী নাক্শবান্দী (শায়খ সা'দী লাহোরীর মুরীদ), প্রণেতাঃ 'ইরশাদু'ল-'ইরফান, পাণ্ডু. শীরানী গ্রন্থগারে সংগৃহীত, দানিশ্গাহ পাঞ্জাব, নং ৬২০৩; (৭) মুহাম্মাদ মুনীর, প্রণেতা, তাযকিরাতু'ল-ইরশাদ (হাজ্জী মুহাম্মাদ লাহোরীর খলীফা, মৃ. ১১৬২/১৭৪৮), মুহাম্মাদ রাফী'র উদ্ধৃতিসহ, কিরানু'স-সা'দায়ন, মুহাম্মাদ ইকবাল মুজাদ্দিদী সংগৃহীত, পাণ্ডু. পত্রক ১৩৩ 'বা')। (৮) আহমাদ ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ কুরায়শী, প্রণেতাঃ সিরাজু'ত্ তালিবীন, পাণ্ডু. সংগ্রহ গাঞ্জবক্স গ্রন্থাগার, ইসলামাবাদ (তাসবিহী মুহাম্মাদ হুসায়ন, পাণ্ডু. তালিকা গঞ্জবক্স গ্রন্থাগার, লাহোর ১৯৭১ খৃ., ১খ, পৃ. ২২৮); (৯) শের 'আলী 'উরফে শের হামলাহ্, প্রণেতাঃ ইন্শায়ে ফায়েদ' বাখ্শ, শীরানী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি; (১০) গুলাম হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ হাসান ইব্ন হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ; প্রণেতা ঃ শাজারাতু'ল-আনসাব, ১১৯২ হি., পাণ্ডু. মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী গ্রন্থগার; (১১) মাওলাবী গুলাম রাসূল ইব্ন মুহাম্মাদ হাসান, প্রণেতা শাজারাতু'ল-আনসাব" (বানূ হুমায়র গোত্রের বংশতালিকা, বিশেষত হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ কাসূরীর জীবন বৃত্তান্ত, মৃ. ১১৫৩ হি.), রচনা ১২২৭ হি., উর্দূ অনু. লাহোর ১৯৩৫ খৃ.; (১২) মাওলানা গুলাম মুহ্য়ি'দ-দীন (১২০২-১২৭০/১৭৮৭-১৮৫৩), প্রণেতা ঃ তুহ্ফায়ে রাসূলিয়্যা, মাকতুবাত, যাদু'ল্-হাজ্জ রিসালা-ই নিজামিয়্যা ইত্যাদি [দ্র.] (১৩) মাওলানা 'আবদু'র-রাসূল ইব্ন মাওলানা গুলাম মুহ্য়ি'দ-দীন; (১৪) মাওলাবী গুলাম দস্তগীর, প্রণেতাঃ তাকদীসু'ল্-ওয়াকীল, সং লাহোর ১৮৭৩ খৃ.। (১৫) মাওলাবী গুলামুল্লাহ্ (মৃ. ১৩৪১/১৯২৩) এবং সাম্প্রতিক কালের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের মধ্যে মাওলাবী 'আবদু'ল কাদির, মাওলাবী গুলাম মুহ্য়ি'দ-দীন এবং গবেষকদের মধ্যে ডাঃ মাওলাবী মুহাম্মাদ শাফী' মারহূম ও ডঃ মুহাম্মাদ ইকবাল মারহূম (অধ্যাপকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল কলেজ) লাহোর, এবং ডঃ আহ্মাদ বাশীর, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত গ্রন্থকারগণ ব্যতীত কাসূরের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে আল্লাহ্দাদ ছদ্মনাম কাসূরী ['আবদু'ল-হায়্যি হুসারীর মুরীদ, মৃ. ১০৭০/১৬৫৯, যিনি মুজাদ্দিদ আল্ফ ছানী (র)-র খলীফা], তাঁহার কাব্যগ্রন্থ "দীওয়ানে কাসূরী" অযোধ্যার নওয়াবদের গ্রন্থগারে রক্ষিত ছিল (Sprenger, The Cat of Libraries of Kings of Audh, নম্বর ১৫১), দ্বিতীয় কপি রামপুরের রিদা গ্রন্থাগারে রক্ষিত; হযরত বাবা বাল্লাহী শাহ্ কাসূরী পাঞ্জাবের বাল্লাহী শাহ্ কলেজের প্রধান (পাঞ্জাব সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর ১৯৬৭ খৃ.), মৃ. আনু. ১১৮১/১৭৬৭; হাফিজ মুরতাদা ইব্ন মুহাম্মাদ খান শিহাব যা'ঈ, 'গুলরীয' (উর্দূ কাব্য) গ্রন্থের প্রণেতা, ১২০৬/১৭৯১ লেখকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, শীরানী সংগ্রহ নম্বর ৬২০৯, "মুজাররাবাত-মুরতাদা'ইয়্যা" লেখকের পাণ্ডুলিপি, মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ তায়্যিব শাহ্ হামাদানী কাসূরী সংরক্ষিত; তাসলীম সালামুল্লাহ্ খান, ফার্সী কবি ও রাফীক নওয়াব শের জাঙ্গ ও নওয়াব আসাফু'দ-দাওলা (রোয রাওশান, ভূপাল সংস্করণ ১২৯৭ হি., ১৩১), আল্লাহ্ ওয়াহিদ-এর লেখক 'আবদু'র-রাহমান, শীরানী সংগ্রহ পাণ্ডুলিপি, নম্বর ৯৮৯।

বর্তমান কাসূর দুই অংশে বিভক্ত ঃ অভ্যন্তরীণ অংশ ও বহিরাংশ। অভ্যন্তরীণ অংশে কোট 'উছমান খান, ফটক মুহতামান ওয়ালাহ্ ফটক পাত্ওয়ান ওয়ালা, মোরী ফটক, কোট বদরে দীন খান এবং লোহারবী ফটকে বসতি রহিয়াছে। কাসূরের বহিরাংশে কোট মুরাদ খান, কোট হালীম খান, কোট রোকনু'দ-দীন খান, কোট 'আজাম খান, কোট ফাতহ্

দীন খান, কোট গুলাম মুহ্য়ি'দ-দীন খান, কোট পায়রাঁ ওয়ালাহ্, কাতাল গাড়হী, কোট মাওলাবী 'আবদু'ল-কাদির, কিল্'আয়ে নও এবং ইলৃগড়হ প্রভৃতি স্থানে বসতি রহিয়াছে।

মাশা'ইখগণের মাযারের মধ্যে শাহ্ কামাল চিশ্তী (র), বাবা বাল্লাহী শাহ্ (র), হাজ্জী 'আবদু'ল-মালিক, হাজ্জী আখুন্দ সা'ঈদ (র) হাজ্জী গগন গুর্‌য়ানী (র), শায়খ মীরাক (র), মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম 'উরফে পীর বোল্না (র), হাজ্জী মুহাম্মাদ শারীফ, পীর দাওলাত 'আজামী (র) প্রমুখের মাযার কাসূরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ মসজিদের হুসায়ন খান জামি' মসজিদ, হাওদ ওয়ালী মসজিদ, হালীম খান মসজিদ, গাম্বাদ ওয়ালী মসজিদ, কোট মুরাদ খান মসজিদ, খোদাদাদ খান মসজিদ (ধোপসিঁড়ী নামে পরিচিত) ইত্যাদি বিখ্যাত।

কাসূর একটি রেলওয়ে স্টেশন। এতদ্ব্যতীত লাহোর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে। এই শহর শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবেও বিখ্যাত। লায়ালপুরের (বর্তমান ফয়সালাবাদ) পরেই ইহা কাপড়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে ডিগ্রী কলেজ আছে। এই শহরের অধিবাসিগণ তাহাদের উন্নত চরিত্রের জন্য বিখ্যাত। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান সরল। এইখানে ধর্মীয় উৎসবাদির বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। ইহা নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হয়। কাসূরে একাধিক সাহিত্য সংসদ ছিল। তন্মধ্যে আঞ্জুমানে কাসূর উল্লেখযোগ্য। উক্ত সংসদের পক্ষ হইতে আঞ্জুমান কাসূর নামে একটি পত্রিকা নিজস্ব প্রেস হইতে প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রিকায় স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ খান, হালী ও মাওলানা আযাদের লেখা প্রকাশিত হইত (দ্র. আঞ্জুমান কাসূর, 'ইলমী সাময়িকীর নিবন্ধ, লাহোর, ১ম খণ্ড, নং ১), কিন্তু বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব নাই। কাসূরের আয়তন পাঁচ বর্গমাইল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল্লাহ্ খেশ্গী কাসূরী, আখবারু'ল-আওলিয়া' (১০৭৭ হি.), সায়্যিদ মুহাম্মাদ তায়্যিব হামাদানী কাসূরীর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি; (২) ঐ লেখক, মা'আরিজু'ল-বিলায়াত, ১০৯৬ হি., পাঞ্জাব বি. বি., লাহোর পাণ্ডুলিপি, নং H ২৫; (৩) মুহাম্মাদ 'উমার চুমুকনী মিয়াঁ, জাওয়াহির (১১১২ হি.), শীরানী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বি. বি. নম্বর ৩৮৮; (৪) শারাফাত নাওশাহী সায়্যিদ, শারীফু'ত্-তাওয়ারীখ, তিন খণ্ডে, সায়্যিদ শারাফাত নাওশাহী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি; (৫) আবূ ইসমা'ঈল ইব্ন খোদাদাদখান, ইর্শাদু'ল্-'ইরফান, শীরানী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি নম্বর ৬২০৩; (৬) মুহাম্মাদ রাফী'ঈ আখুন্দ, কিরানু'স্-সা'দায়ন (১১৬২ হি.), মুহাম্মাদ ইকবাল মুজাদ্দিদী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, লাহোর; (৭) মুরতাদা হাফিজ কাসূরী, গুলরিয (১২০৬ হি.), শীরানী সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, নম্বর ৬২০৯; (৮) মুহাম্মাদ ইকবাল মুজাদ্দিদী, তারীখ-ই কাসূর; (৯) দিয়া'উ'দ-দীন বারানী, তারীখ ফীরূযশাহী, স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ খান সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৬২১৮৬২ খৃ.; (১০) আমীর খোর্দ, সিয়ারু'ল-আওলিয়া', দিল্লী ১৩০২ হি.; (১১) আমীর খসরু, কিরানু'স্-সা'দায়ন, নওলকিশোর ১২৮৭ হি.; (১২) য়াহ্য়া সাহ্রান্দী, তারীখ-ই মুবারক শাহী, কলিকাতা ১৯৩১ খৃ.; (১৩) জামালু'দ-দীন আবূ বাক্র, তায্কিরায়ে কুত্বিয়্যা, শায়খ 'আবদু'ল-জালীল চৌহাড় বন্দেগী লাহোরীর জীবনী, গুলাম দাস্তগীর নামী সম্পাদিত, লহোর ১৯৫২ খৃ.; (১৪) মুহাম্মাদ মা'সূম খাজাহ্ সিরহিন্দী, মাকতুবাত মা'সূমিয়্যা, ১ম খণ্ড, কানপুর ১৩০২ হি.; (১৫) খাফী খান, মুন্তাখাবু'ল্-লুবাব, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৮৮৪ খৃ.; (১৬) গুলাম রাসূল কাসূরী, শাজারাতু'ল-আনসাব, উর্দূ, লাহোর ১৯৩৫ খৃ.; (১৭) বাল্লাহী শাহ্ বাবা, বাল্লাহী শাহ কলেজ, লাহোর ১৯৬৭ খৃ.; (১৮) সামসামু'দ-দাওলা শাহ্ নাওয়ায খান, মা'আছিরু'ল-উমারা', তিন খণ্ড, কলিকাতা ১৮৮৮-১৮৯১ খৃ., মুহাম্মাদ আয়্যুব কাদিরী কর্তৃক উর্দূ অনু. লাহোর ১৯৬৮-১৯৭০ খৃ.; (১৯) সোহান লাল, 'উমদাতু'ত্-তাওয়ারীখ, লাহোর ১৮৮৮ খৃ.; (২০) ইবরাহীম খান পীর, সায়রিস্তান, মুলতান ১৮৫৪ খৃ.; (২১) 'আযীযু'দ-দীন ওয়াকীলী, দুররাতু'য্-যামান, কাবুল ১৯৫৮ খৃ.; (২২) খালীক আহ্মাদ নিজামী, শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র রাজনৈতিক রচনা, দিল্লী ১৯৬১ খৃ.; (২৩) মুফতী গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতু'ল-আস্ফিয়া', লক্ষ্ণৌ ১৮৭৩ খৃ.; (২৪) প্রাগুক্ত, তারীখ মাখযান-ই পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ ১৮৭৭ খৃ.; (২৫) প্রাগুক্ত, হাদীকাতুল্-আওলিয়া', সম্পা. মুহাম্মাদ ইকবাল মুজাদ্দিদী, লাহোর ১৯৭৬ খৃ.; (২৬) সাবা, মুহাম্মাদ মুজাফ্ফার হুসায়ন, রোয-ই রাওশান, ভূপাল ১২৯৭ হি.; (২৭) 'আলিয়্যু'দ-দীন লাহোরী, 'ইব্রাতনামা, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (২৮) তাসবীহী মুহাম্মাদ হুসায়ন গঞ্জবখ্‌শ গ্রন্থগারের পাণ্ডুলিপি তালিকা, ইসলামাবাদ, ১ম খণ্ড, লাহোর ১৯৭১ খৃ.; (২৯) নামী, গুলাম দাস্তগীর, তারীখ জালীলাহ্, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৩০) মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী, আওলিয়া'য়ে কাসূর, লাহোর ১৯৭২ খৃ.; (৩১) হামাদানী, এ. আর., হাম আওর হামারে আসলাফ, লাহোর ১৯৬৯ খৃ.; (৩২) Cunningham, Ancient Geography of India, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.;(৩৩) Sprenger, Cat. Lib. of the Kings of Audh কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ. (৩৪) মুহাম্মাদ লাতীফ, History of the Punjab, দিল্লী ১৯৬৪ খৃ.; (৩৫) Imperial Gazetteer of India, অক্সফোর্ড ১৯০৮ খৃ., ১৫ খ.; (৩৬) মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী, An Afghan Colony at Qasur, Islamic Culture, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), জুলাই ১৯২৯ খৃ. [মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী লিখিত পরিশিষ্টে, দ্র. আওলিয়ায়ে কাসূর, লাহোর ১৯৭২ খৃ.]।

মুহাম্মাদ ইকবাল মুজাদ্দিদী (দা. মা. ই.)/ সিরাজ উদ্দীন আহ্মদ

কাহ্ওয়া (قهوة) ঃ আরবী, তবে ইহার মূল ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। ইহা বিভিন্ন ভাষায় কফি অর্থবোধক শব্দের ভিত্তি। মূলত মদ বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হইত এবং প্রাচীন আরবী কাব্য রচনাবলীতে এই ব্যবহার দেখা যায় (দ্র. Landberg, Etudes, ২খ, ১০৫৭ এবং আল-আগানী, প্রথম সং, ৬খ, ১১017, ৮খ, ৭৯.6 ২০খ, ১৮03)। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে শব্দটি য়ামান অঞ্চলে কফি গাছের ফল হইতে প্রস্তুত পানীয় নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হওয়া শুরু করে। কিছু সংখ্যক গবেষকের মতে শব্দার্থের এই য়ামানী রূপান্তর গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁহাদের মতে অন্ততপক্ষে কফি নির্দেশক ক্ষেত্রে শব্দটির উৎস আফ্রিকীয় এবং তাঁহারা কফি গাছের মূল উৎপত্তিস্থল কাফ্ফা-এর সহিত ইহার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তাঁহারা মূলত মদ অর্থে ব্যবহৃত কাহ্ওয়া শব্দের অর্থের এই বিবর্তনও অস্বীকার করেন না (দ্র. Ritter, Erdkunde, ১৩খ, ৫৫৬; Vollers, in ZDMG, ১খ, ৬৫৭; Hobson-Jobson; Landberg, পূ. গ্র., ২খ, ১০৫৭-৬৬)। অপরপক্ষে ইহা লক্ষণীয় যে, উক্ত মতবাদের সমর্থকগণ ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই যে, ১৪০০ সাল বা তাহার পূর্বে 'কাফ্ফা' হইতে কফি রফতানী করা হইত এবং ইথিওপিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহের ভাষায় এইরূপ কোন শব্দের উপস্থিতিও তাঁহারা উদ্ধৃত করেন নাই।

অপরদিকে এই এলাকায় কফির জন্য ব্যবহৃত সাধারণ শব্দটি (গাছ, ফল ও পানীয়ের জন্য বুন্ন; দ্র. Armbruster, Initia, Amharica, ২খ, কেমব্রিজ ১৯১০ খৃ., ৫৮; Coulbeaux ও Schreiber, Dict. de la langue tigrai, ভিয়েনা ১৯১৫ খৃ. ৪০৮; I. Reinisch, Die Kafa-Sprache etc., ২খ, in Sitzungsber. der Kais. Akad. der Wiss. zu Wien, Phil-hist. Cl., cxvi, 1888. 273; অতিরিক্ত দ্র. Landberg, পৃ. গ্র., ২খ, ১০৫৫ প.)। বুনন্‌রূপে (ছন্দের ক্ষেত্রে বূনরূপে) আরবীতে গাছ ও ইহার ফলের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সম্ভাব্য যে, য়ামানে কফি পানের অভ্যাস বিস্তার লাভ করে সূফীগণের মাধ্যম। মরমী গোষ্ঠীর কাব্যিক ভাষায় মদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, তাই শব্দের কাব্যিক নামটি নূতন প্রচলিত পানীয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার মোটেই অসম্ভব নয়।

কফি বৃক্ষ দক্ষিণ আরবের স্থানীয় উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সম্ভবত ইহা ইথিওপিয়ার উচ্চ অঞ্চল হইতে আনীত হয়; এই অঞ্চলে, বিশেষত কাফ্ফার জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু হিজরী সনের এক শতাব্দী পূর্বেই , হিময়ার রাজ্যের পতন ও ইথিওপীয় বিজয়ের কালে য়ামানে কফির প্রচলন শুরু হইয়াছিল। এই মর্মে প্রদত্ত ধারণার (Deflers এবং Handbook of Arabia) কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য সমর্থন পাওয়া যায় না। ইহা সঠিক হইলে প্রাচীন সাহিত্যে ইহা অনুল্লিখিত থাকিত না।

এই পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কফি সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ১০ম/১৬শ শতাব্দীর আরবী রচনাসমূহে। 'আবদুল-কাদির আল-জাযীরী তাঁহার প্রবন্ধে (নিম্নে দ্রষ্টব্য, গ্রন্থপঞ্জী) উল্লেখ করিয়াছেন যে, (আহ্‌মাদ) ইব্‌ন 'আবদিল-গাফ্ফার-এর মতে একটি পানীয়রূপে য়ামান অঞ্চলের কাহ্ওয়া-এর জনপ্রিয়তার কথা কায়রোতে সর্বপ্রথম জানা যায় ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। সেখানে ইহা বিশেষত সূফীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কারণ ইহা সেবনে রাত্রিকালীন আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় নিশি জাগরণ সম্ভব হইত। এই উৎসের মতে এডেনে ইহার আগমন ঘটে আইনবেত্তা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আয-যাবহানী (মৃ. ৮৭৫/১৪৭০-১)-এর মাধ্যমে। তিনি আফ্রিকীয় উপকূলে তাঁহার অনিচ্ছাকৃত উপস্থিতির সময়ে ইহার সহিত পরিচিত হন এবং প্রত্যাবর্তনের পর মরমীবাদে নিজকে নিবেদিত করেন। পরে খুব শীঘ্রই এই পানীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আল-জাযীরীতে প্রাপ্ত অপর একটি তথ্যে পানীয়টির প্রবর্তকরূপে 'আলী ইব্‌ন 'উমার আশ-শাযিলীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। আশ-শারজীর মতে দা'সায়ন পরিবারের সদস্য আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন 'উমার ৮২১/১৪১৮ সালে ইনতিকাল করেন। তিনিও সম্ভবত ইথিওপিয়াতেই কফি পানের সহিত পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন; কারণ শাযিলিয়া তরীকার অনুসারী গোষ্ঠীতে যোগদানের পর তিনি কিছুদিন পর্যন্ত রাজা সা'দুদ-দীন-এর পারিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (অর্থাৎ ৭৮৮/১৩৮৬ ৮০৫/১৪০১-২ অথবা ৮০৭/১৪০৪-৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে; তু. মাকরীযী, আল-ইলমাম বি-আখবারি মান বি-আরদি'ল-হাবাশ মিন মুলূকি'ল-ইসলাম, সম্পা. Rinck, লাইডেন ১৭৯০ খৃ., ২৪; Paulitschke, Harar, লাইপযিগ ১৮৮৮ খৃ., ৫০৪ প. দ্র.) এবং তাঁহার ভগ্নিকে বিবাহ করেন। আল-মাখা-তে যাবিয়া স্থাপনের পরেও (আশ-শারজী অনুসরণে) ইথিওপিয়া হইতে তাঁহার ভক্তবর্গের প্রেরিত উপঢৌকনাদি তাঁহার নিকটে আসিতে থাকে।

'আবদুল-কাদির (ইব্‌ন) আল-'আয়দারূস প্রণীত একটি প্রবন্ধে (নিম্নে দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। 'আলী ইব্‌ন 'উমার, আল-মাখা-এর দরবেশকেই কাহ্ওয়া নামক পানীয়ের একমাত্র প্রবর্তকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (মুহ্দিছুল-কাহ্ওয়া, পত্রক ৩৪১ বি; ওয়াদি 'উহা, পত্রক ৩৪৭ বি., শায়খ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ আল-'আয়দারূস [মৃ. ৯৯০/১৫৮২] প্রণীত একটি কবিতায়)। এই ব্যাপারে যে তাঁহার খ্যাতি ছিল উহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নোক্ত টীকাটি উল্লেখযোগ্যঃ "তাঁহার পূর্বে পানীয়টি প্রস্তুতিতে কেবল বীজের অন্তঃস্থ শাঁসটি অর্থাৎ বুনন্ ব্যবহৃত হইত এবং ইহার বহিঃস্থ আবরণটি পরিত্যক্ত হইত" (পৃ. ৩৪২ ক)। তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত একটি কবিতায় যিনি কাহ্ওয়াতু'ল-বুননকে নিদ্রা বিদূরক ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সহায়করূপে প্রশংসা করিয়াছেন (পত্রক ৩৪২ ক)। যদিও আশ-শারজী কফির সহিত তাঁহার যোগাযোগ সম্পর্কে একটি শব্দও উল্লেখ করেন নাই, 'আবদু'ল-কাদির আল-'আয়দারূস এই পানীয়টির প্রবর্তনকে তাঁহার কৃত অলৌকিক কার্যাবলীর অন্যতমরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন (কারামাত, পত্রক ৩৪২ ক)।

হাজ্জী খলীফা বিবৃত কাহিনীতে আপাতদৃষ্টিতে 'আলী ইব্‌ন 'উমার-কে কেন্দ্র করিয়া দুইজন পৃথক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ শাযিলিয়্যা তরীকার প্রবর্তক আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮, দ্র. আশ-শা'রানী, লাওয়াকিহু'ল-আনওয়ার, কায়রো ১২৯৯ হি., ২খ, ৫) এবং তাঁহার শাগরিদ আল-মাখা (মুখা)-এর ওয়ালী 'উমার। আবু'ল-হাসানের জানাযায় শেষোক্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করিতে আগমন করিলে তাঁহার শিক্ষক তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া আদেশ করেন যে, তাঁহাকে প্রদত্ত কাষ্ঠগোলকটি যেখানে গিয়া থামিবে তিনি যেন সেই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এইভাবে তিনি মুখায় আগমন করেন। তাঁহার নিকটে চিকিৎসার জন্য আগত রাজার কন্যার সহিত অসদাচরণ করার অভিযোগে তাঁহাকে উসাব পর্বতে নির্বাসিত করা হয় (উসাব, যাবীদ-এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত)। তিনি ও নির্বাসনে তাঁহার সহগামী শাগরিদবৃন্দ এই সময়ে কাহ্ওয়া (এই ক্ষেত্রে বৃক্ষের ফল) আহারের মাধ্যমে জীবন ধারণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইহা হইতে একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। মুখা অঞ্চলে মহামারীরূপে চুলকানী রোগগ্রস্ত বহু দর্শনার্থী কফি সেবনের পর আরোগ্য লাভ করে এবং ইহার মাধ্যমে দরবেশ পুনরায় সসম্মানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ করেন।

তৃতীয় যে ব্যক্তিকে কফি প্রবর্তনের জন্য কৃতিত্ব প্রদান করা হয়, তিনি হইতেছেন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ আল-'আয়দারূস। 'আলাবী আস-সাক্কাফ প্রণীত একটি প্রবন্ধে (নিম্নে দ্রষ্টব্য, গ্রন্থপঞ্জী) আন-নাজমু'ল-গাযযী প্রণীত তা'রীখ (অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে নাজমু'দ-দীন আল-গাযযী প্রণীত আল-কাওয়াকিবু'স-সা'ইরা বি-মানাকিব 'উলামা' আল-মি'আতা আল-'আশিরাতা, Brockelmann, ২খ, ৩৭৬) হইতে উদ্ধৃত একটি বক্তব্য রহিয়াছে; উহা অনুসারে এই সূফী, যাঁহাকে এখানে একজন শাযিলীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার ভ্রমণের এক পর্যায়ে কফি বৃক্ষের সহিত পরিচিত হন এবং ইহার ফল ভক্ষণ করেন। ইহার উজ্জীবক ক্ষমতা লক্ষ করিয়া তিনি ইহা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে

থাকেন এবং তাঁহার শাগরিদদের নিটক ইহার গুণাগুণ ব্যক্ত করেন। এইভাবে তাহা বিভিন্ন দেশে পরিচিতি লাভ করে। এখানে প্রদত্ত নির্দেশনাটি সম্ভবত একই নামধারী একজন সূফীর যিনি ৯১৪/১৫০৮-৯ সালে এডেনে ইনতিকাল করেন (আবূ মাখরামা, লাইডেন পাণ্ডু., ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৮৮; আন-নাব্হানী, জামি' কারামাতি'ল-আওলিয়া', কায়রো ১৩২৯ হি., ১খ, ২৬৩) এবং তাঁহার মাযার এখনও শ্রদ্ধার স্থানরূপে স্বীকৃত। 'আবদুল-কাদির (ইব্ন) আল-'আয়দারূস কেবল তাঁহার কফিপ্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার প্রশংসায় তাঁহার কাসীদা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপরদিকে আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ আল-বাক্রী তাঁহার প্রবন্ধ ইসতিফা'উ'স-সাফওয়া লি-তাসফিয়াতি'ল-কাহ্ওয়া (পত্রক ২খ)-তে আবূ বাক্র আল-'আয়দারূসকে কাহ্ওয়া-এর প্রবর্তক (মুনশি')-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

Glaser-এর মতে (Mitt. der Geogr. Gesellsch. in Wien, ৩০খ, ২৫) একটি তুর্কী উৎসে বর্ণিত আছে যে (উৎসটির তিনি নাম উল্লেখ করেন নাই), ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে ওয়ালী ওযদেমির (তু. আহমাদ রাশিদ, তা'রীখ-ই য়ামান ওয়া সান'আ', ১খ, ৮৩ প.) আফ্রিকা হইতে য়ামান-এ কফি বৃক্ষ আনয়ন ও রোপণ করেন।

একটি পানীয়রূপে কফির প্রবর্তক হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে কৃতিত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই ব্যাপারে আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানীয় ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। মুখা সংক্রান্ত কাহিনীটি সর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুল প্রচারিত। সুতরাং 'আলী ইব্ন 'উমার আশ-শাযিলী, যাঁহাকে ভুলক্রমে প্রায়ই শাযিলিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয় (d'Ohsson, von Hammar, Rim), তিনি কফি উৎপাদন, কফি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এবং কফি পানকারিগণের নিকট কফি প্রবর্তকের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন রহিয়াছেন (তু. Goldziher, Abhandl. zur arab. Philologie, ২খ, পৃ. ৮৮)। আল্জেরিয়াতে তাঁহার নামানুসারে কফিকে বলা হয় শাযিলিয়া (Beaussier, Dict, pratique arabe-francais, আলজিয়ার্স ১৮৭১ খৃ.)।

সাধারণভাবে তাঁহাকে মুখা শহরটির প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা হয়। এই কথাটি আল-হামাদানী (৭৪১৬, ৮৭৫, ১১৯১৮) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহার এই খ্যাতি অর্জনের পশ্চাতে ছিল কফি। তাঁহার মাযারের উপর নির্মিত একটি মসজিদ, একটি তোরণ এবং একটি কূপ মুখা শহরে আশ-শাযিলীর স্মৃতি বহন করে (Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien, ১খ, কোপেনহেগেন ১৭৭৪ খৃ., ৪৩৮-৪০; তু. হাজ্জী খালীফাতে অন্তর্ভুক্ত কিংবদন্তী এবং 'আবদু'ল-কারীম কাশমীরী, বায়ান-ই ওয়াকি', ফরাসী অনু. Langles, এই নামে Voyage de l'Inde a la Mekke par Abdoul Kerym, প্যারিস ১৭৯৭ খৃ., ২০২ প.)।

আশ-শাযিলী ও আল-'আয়দারূস (de Sacy, Chrest. Arabe, ১খ, ৪৬১-এর ধারণামতে, হায়দার সম্ভবত সঠিক নয়) Naironi প্রদত্ত কিংবদন্তীতে Sciadli ও Aidrus নামক খৃষ্টান পুরোহিতে পরিণত হইয়াছেন। উট ও ছাগলের মধ্যে কফির উজ্জীবক গুণাবলী প্রথম লক্ষ করা হয়। এই প্রসঙ্গটি এই পর্যন্ত কোন প্রাচ্য উৎসে পাওয়া যায় নাই। একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তী অনুসারে সেই দরবেশ ছাগলের মল জমিতে ছিটাইয়া দিলে উহা হইতে কফি গাছ জন্ম নেয় (Snouck Hurgronje, The Atchehnese, লাইডেন ১৯০৬ খৃ., ১খ., ২৬০)।

কিংবদন্তীসমূহ সম্ভবত এই মর্মে সঠিক যে, আরবে প্রথমে কফি পানের অভ্যাস শুরু হয় য়ামানী সূফীগণের মধ্যে। এই পানীয়টি তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কারণ ইহার প্রভাব তাহাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে সহায়ক ছিল। ফলে তাঁহারা ইহাকেই কফি পানের মূল 'লক্ষ্য' (মাওদূ' আস্‌লী)-রূপে বিবেচনা করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়া শুভ এবং মরমী ভাবাবেগ আনয়নে সাহায্য করে (ফাতহ) [সাফওয়াতু'স-সাফাওয়া, পত্রক ৩৪২ খ]। এই মহৎ উদ্দেশ্যে ইহা গ্রহণ করা হইত বলিয়া কফি পান একটি পুণ্য কর্মরূপে (তা'আ) বিবেচিত হইত। তথাকথিত রাতিব-এর আবৃত্তি সহযোগে ইহা একটি আনুষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই রাতিবটি ছিল "য়াকাবী" (یا قوی) নামটি ১১৬ বার উচ্চারণ করা। কাহ্ওয়া ও কাবী-র মধ্যে উচ্চারণগত সাদৃশ্য ছাড়াও এই শব্দ দুইটির সংখ্যাতাত্ত্বিক মান অর্থাৎ ১১৬, ইহাই উল্লিখিত আনুষ্ঠানিক রূপের ভিত্তি। কাবী (শক্তিশালী) আল্লাহ্র সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম (দ্র. আল-আসমাউল-হুসনা)। শায়খ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-'আয়দারূস-এর মতে ইহার পূর্বে সূরা ফাতিহা (দ্র.) পাঠ করিতে হইবে। আশ-শিহ্র-এর শায়খ ইব্ন ইসমা'ঈল 'আলাবী প্রদত্ত ব্যবস্থামতে সূরা য়া-সীন (সূরা ৩৬)-এর চারবার তিলাওয়াত এবং তৎসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এক শতবার 'তাসলিয়া' (দরূদ) পাঠ রাতিবরূপে পড়া উচিত (সাফ্ওয়াতু'স-সাফ্ওয়া, পত্রক ৩৪৪ খ, নিম্নে দ্র., পত্রক ৩৪৫ খ, ৩৪৭ ক)। সুতরাং সদিচ্ছা, ভক্তি ও যথার্থ ধর্মীয় বিশ্বাসের সহিত কফি পান করা হয় তখন কাহ্ওয়া মা'নাবিয়্যা অর্থাৎ "আদর্শ কাহ্ওয়া" উপভোগের পথ উন্মুক্ত করে। ইহা কাহ্ওয়াতু'স-সূফিয়া নামেও পরিচিত। ইহার ব্যাখ্যায় বলা যায়, আল্লাহ্-প্রেমিকগণ (আহ্লুল্লাহ) লুক্কায়িত রহস্য দর্শনে, বিস্ময়কর প্রজ্ঞা প্রাপ্তিতে (মুকাশাফাত) এবং অদৃশ্য জগতের উন্মোচনে (ফুতূহাত) যে অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ করেন, ইহা হইতেছে সেই কাহ্ওয়া মা'নাবিয়্যা (পূ. গ্র., পত্রক ৩৪১ খ, ৩৪৫ ক, উপরে, ৩৪৫ খ নিম্নে, প.)। কথিত আছে যে, 'আলী ইব্ন উমার আশ-শাযিলী বলিয়াছেন যে, কফি যামযামের পানির ন্যায়, যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় তাহা সাধিত হয় (পূ. গ্র., পত্র ৩৮৪ ক, তু. উপরিউল্লিখিত ২খ, ৫৮৮ ক, নিম্নে) এবং এই উক্তিটি আহ্মাদ ইব্ন 'আলাবী বা জাহদাব (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৫-৬৬; তু. আন-নাবহানী, পূ. গ্র., ১খ, ৩৩০) পর্যন্ত চালু ছিল। কথিত আছে, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরসমূহে কফি ব্যতীত অন্য কিছু পান করিতেন না ঃ "মৃত্যুকালে যাহার শরীরে কিছু পরিমাণ কাহ্ওয়া থাকে সে নরকের আগুনে প্রবেশ করিবে না" (সাফওয়াতু'স-সাফওয়া, পত্রক ৩৪৪ খ)।

পানীয়রূপে কফি সম্ভবত ৮ম/১৪শ শতাব্দীর পূর্বে দক্ষিণ আরবে পরিচিত ছিল না। কফি বৃক্ষ ইহার বেশীদিন পূর্বে আরবে প্রবেশলাভ করিয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহপূর্ণ। ইব্ন হাজার আল-হায়ছামী (দ্র.) তাঁহার ঈ'আব গ্রন্থে (আল-'উবাব-এর ভাষ্যবিশেষ, সম্ভবত 'আলী ইব্ন 'উমার আস-সায়ফী প্রণীত; তু. Brockelmann, ২খ, ৫৩১) একটি পানীয় সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যাহা ১০ম/১৬শ শতাব্দীর সামান্য পূর্বে প্রচলিত হয় (উদাহরণস্বরূপ মক্কায়) এবং যাহা কফি বীচির খোসা হইতে প্রস্তুত করা হইত। এই গাছটি যায়লা' অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং কাহ্ওয়া নামে পরিচিত ছিল ('আলাবী, আস-সাককাফ-এ প্রদত্ত

উদ্ধৃতি, পৃ. ৯)। কফির পক্ষে প্রদত্ত মতামত প্রদানকারী আইনবেত্তাগণের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছেন জামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ কাব্বিন আল-'আদানী (মৃ. ৮৪২/১৪৩৮, এডেনে, তু. আবূ মাখরামা, পত্র ১৪৯খ প., আন-নাবহানী অনুসরণে, পৃ. গ্র., ১খ, ১৫৫, ৮২৯/১৪২৫-৬)।

শারাফু'দ-দীন আল-'আমরীতীর একটি উর্‌জূযা-তে মক্কার ঘরে ঘরে কফি প্রচলনের তারিখরূপে ৮১৭/১৪১৪-৫ সালের উল্লেখ রহিয়াছে (Pertsch, Die Arab. Handschr, zu Gotha, ৫খ, নং ২১০৭)। অবশ্য 'উমদাতু'স-সাফওয়া-র মতে কফি বীচির খোসা হইতে প্রস্তুত পানীয় পান করার অভ্যাস প্রথম আবির্ভূত হয় ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে। পূর্বে কেবল উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। কিছু কালের জন্য কফির ব্যবহার পানীয় হিসাবে হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় ইহার প্রচলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এমন কি মসজিদের ন্যায় পবিত্র স্থানেও কফি পান চলিত এবং যিক্র ও মাওলিদ অনুষ্ঠানেও উত্তেজক পানীয়রূপে সমাদৃত হইত। শীঘ্রই কফিখানা (بيت القهوة)-র আবির্ভাব ঘটে এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সেইখানে সঙ্গীত শ্রবণের জন্য এবং বাজি রাখিয়া দাবা বা অনুরূপ খেলার জন্য সমবেত হইত। এই সকল প্রথা এবং মদের ন্যায় কফি পরিবেশনের প্রচলন স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ঠাবান ধর্মানুসারিগণের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করে; ইহাদের অধিকাংশই প্রারম্ভ হইতে এই পানীয়টিকে একটি আপত্তিকর নব প্রবর্তনরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

খাইর বে-এর মধ্যে তাঁহারা একজন আর্দশ সমর্থক লাভ করেন; কানসাওহ আল-গাওরী (দ্র.) ৯১৭/১৫১১ সালে তাঁহাকে মক্কায় পুলিশ বাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ করেন। একই বৎসর বিভিন্ন মাযহাবের ফাকীহগণের এক সমাবেশে তিনি কফি পানকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব পাস করেন। দুইজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের প্রদত্ত বিরূপ মতামত এবং ইহার মাদক ও বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কতিপয় কফি পানকারীর প্রদত্ত সাক্ষ্য শেষ পর্যন্ত এই রায়ের পক্ষে কাজ করে। কাদীগণ এই সম্মেলনের বক্তব্যে স্বাক্ষর করেন। কেবল মক্কায় তদানীন্তন মুফ্‌তী তাঁহার সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের সাহস প্রদর্শন করেন এবং ইহার ফলে তিনি সন্দেহজনক ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হন। এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন অত্যন্ত চতুরভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁহারা এই সঙ্গে কায়রোর ফাকীহগণের নিকট হইতে কফিকে নিন্দা করিয়া একটি অভিমত লাভে সমর্থ হন। কায়রোতে প্রেরিত খসড়া বিবৃতির প্রত্যুত্তরে কানসাওহ যে ফাতওয়া প্রেরণ করেন তাহা কফি বিরোধিগণের আশা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিতে পারে নাই। কারণ ইহাতে স্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, শুধুমাত্র ইহার আনুষঙ্গিক ধর্মবিরোধী কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি ছিল। ৯৫০/১৫৪৩ সালেও ইব্ন হাজার আল-হায়ছামী একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে (ওয়ালীমাত 'উরস) প্রচণ্ড বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় মেহমানদেরকে কফি পানে আপ্যায়িত করা হয় এবং তিনি একজন বিশিষ্ট মুফ্‌তীর সহিত এই পানীয় সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হন। মুফ্‌তী ইহাকে মাদক ও নিষিদ্ধরূপে ঘোষণা করেন। ইব্ন হাজার উল্লিখিত জনসমাগমে ইহার গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী ও যে পদ্ধতিতে এই সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার তীব্র নিন্দা করেন (সাফওয়াতু'স-সাফওয়া, পত্র ৩৫২খ-৩৫৬ক, মু'জাম মাশা'ইখিহি)।

এই রায়ের প্রেক্ষিতে খাইর বে কফি বিক্রয় ও ইহার পান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কতিপয় বিক্রেতাকে শাস্তি প্রদান করিয়া তাহাদের মওজুত কফি পোড়াইয়া দেন। ফলে কফি ফলের খোসা (কিশ্‌র) বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু কানসাওহ-এর প্রদত্ত রায় পনুরায় কফি পানকারিগণকে সাহস যোগায় এবং পরবর্তী বৎসর যখন জনৈক নেতৃস্থানীয় কফি বিরোধী মিসর হইতে আগত কর্মকর্তাদের হাতে আইনভঙ্গ জনিত শাস্তিপ্রাপ্ত হন এবং খাইর বে-এর স্থলে যিনি বদলী হইয়া আসেন তিনি কফি পানে মোটেই অনভ্যস্ত ছিলেন না, তাহারা পুনরায় নিঃশঙ্ক হইয়া কফি পান শুরু করে। গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ফলে এই পানীয়ের প্রতি জনগণের দৃষ্টি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়। ইহার পর কফিগৃহে অসদাচরণমূলক কার্যাবলীর জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ কেবল মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ৯৫০/১৫৪৪ সালের হজ্জ চলাকালীন 'উছমানী সুলতান কফি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া যে ফরমান জারী করিয়াছিলেন তাহা তেমন প্রতিপালিত হয় নাই।

কায়রোতে কফি প্রথমবারের মত পরিচিতি লাভ করে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথম দশকে। য়ামান হইতে আগত সূফীবৃন্দ কায়রোর আযহার এলাকায় মক্কা ও মদীনা হইতে আগত তাঁহাদের সহযোগীদের সহিত কফি পান করিতে করিতে মসজিদে যিকির অনুষ্ঠান করিতেন। তথায় কিছুকাল ইহা প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় ও পান করা হয়। পরে ৯৩৯/১৫৩২-৩ সালে ফাকীহ্ আহমাদ ইব্ন 'আবদি'ল-হাকক আস-সুনবাতী ইহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইনি একজন ধর্ম প্রচারকরূপে খ্যাতিমান ছিলেন। দুই বৎসর পর আযহার মসজিদে বক্তৃতা প্রদানকালে তিনিই এই পানীয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে এত বেশী উত্তেজিত করিয়া তোলেন যে, তাহারা কফিগৃহসমূহ আক্রমণ করে, ইহার অভ্যন্তরস্থ সামগ্রীসমূহ নির্বিচারে ধ্বংস করে এবং ইহার সদস্যবর্গকে লাঞ্ছিত করে। এইভাবে বিভিন্ন মতপার্থক্য কাদী মুহাম্মাদ ইব্ন ইল্‌য়াস আল-হানাফীকে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। কফি হইতে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হইতে তিনি যে সকল ব্যক্তি এই পানীয়টিকে বৈধরূপে গণ্য করেন তাহাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। যদিও ইহার পরবর্তী বৎসরসমূহে কায়রোতে কফি মাঝে মাঝে নিষিদ্ধ হয়, তথাপি ইহার ভক্ত সংখ্যা এমন কি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যেও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কতিপয় প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক কফির পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ যাকারিয়া আল-আনসারী (মৃ. ৯২৬/১৫২০), আহমাদ ইব্ন 'উমার আস-সায়ফী (মৃ. ৯৩০/১৫২৩-৪), আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ আল-বাক্‌রী আস-সিদ্দীকী (মৃ. ৯৫০ ও ৯৬০/ ১৫৪৩-৫৩-এর মধ্যে), যিনি কফির প্রশংসায় রচিত কবিতায় একই সঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, ইব্ন 'আবদি'ল-হাকক-এর মতামত অগ্রাহ্য করা এবং আবু'ল-হাসানের ফাতওয়া অনুসরণ করা উচিত (সাফওয়াতু'স-সাফওয়া, পত্র ৩৪৯ ক, খ; তু. বাহাউদ-দীন আল-'আমিলী কাশকূল-এ অন্তর্ভুক্ত আস-সিদ্দীকীর কবিতাসমূহ, বূলাক ১২৮৮ হি., ১খ, ১৯), 'আবদুর-রাহমান ইব্ন যিয়াদ আয-যাবীদী (মৃ. ৯৭৫/১৫৬৭-৮) এবং অন্যান্য (সাফওয়াতু'স-সাফওয়া, পত্র ৩৪৮ খ)। ক্রমশ এই মতামতটি জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, কফি সার্বিকভাবে বৈধ (মুবাহ), তবে কতিপয় বিশেষ পরিস্থিতিতে ইহার প্রসঙ্গে অন্যান্য আইনগত অবস্থা প্রযোজ্য হইতে পারে।

মক্কা, মদীনা ও মিসরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টির ফলে কফি সিরিয়া, পারস্য ও তুরস্কে প্রবেশ লাভ করে। ১৫৭৩ খৃ. Rauwolf এই পানীয়টিকে সিরিয়াতে (আলেপ্পো) বহুল প্রচলিত দেখিয়াছেন। ইস্তাম্বুল ও রূমেলী অঞ্চলে কফির সর্বপ্রথম প্রচলন হয় প্রথম সুলায়মান (৯২৬/১৫২০-৯৭৪/১৫৬৬)-এর শাসন আমলে। ৯৬২/১৫৫৪ সালে আলেপ্পো হইতে আগত জনৈক ব্যক্তি এবং দামিশ্ক হইতে আগত অপর এক ব্যক্তি ইস্তাম্বুলে সর্বপ্রথম কতিপয় কফিখানা (কাহ্ওয়াখানে) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত কফিখানা শীঘ্রই প্রমোদবিলাসী ও বিনোদনপ্রিয় সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে। তাঁহারা কফি পানের সঙ্গে পুস্তক পাঠ, দাবা খেলা বা এই ধরনের খেলার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করিতেন এবং কবিগণ পরিচিত কবিদের কাছে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে স্বরচিত সর্বশেষ কবিতাটি পেশ করিতেন। এই কাহ্ওয়াখানেগুলিকে রসিকতা করিয়া মাঝে মাঝে মাকতাব-ই 'ইরফান (জ্ঞানীদের আস্তানা) বলিয়াও অভিহিত করা হইত। কফিখানাসমূহ এতই জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, দ্রুত ইহা সরকারী কর্মকর্তা, কাদী ও অধ্যাপকবর্গকেও আকৃষ্ট করে (তা'রীখ-ই পেচেভী, ১খ, ৩৬৩গ; ইংরেজী অনুবাদের জন্য দ্র. B. Lewis, Istanbul and the civilization of the Ottoman Empires, Norman, Oklahoma ১৯৬৮ খৃ., ১৩২ প.; চেলেবী, The balance of truth, অনু. G. L. Lewis, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ., ৬০-২)। মামিয়া আর-রূমী (তু. বাহাউদ-দীন আল-'আমিলী, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৭) এবং পরে বেলীগীর ন্যায় কবিও কফির প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন এবং ৯২৮/১৫২২ সালে সুলায়মান-এর দরবারের চিকিৎসক বাদরু'দ-দীন আল-কুসূমী কর্তৃক প্রদত্ত মতামত কফির বিপক্ষে ছিল না (লাইডেন পাণ্ডুলিপি ৯৪৫, পত্র ৫৮)। কফিখানার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উচ্চবিত্ত পরিবারসমূহে কাহওয়েজী (কফি পরিচারক) নামে একজন বিশেষ পরিচারক থাকিত, তাহার দায়িত্ব ছিল কফি প্রস্তুত করা; রাজদরবারে তাহারা একজন কাহওয়েজীবাশী-র অধীনস্থ ছিল (Gibb Bowen, ১/১, নির্ঘণ্ট)। কফিখানাসমূহ মসজিদের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ধার্মিক ব্যক্তিগণ মনে করিতেন এবং 'আলিমগণ মত প্রকাশ করেন যে, কফিখানাসমূহ মদ্যপানশালা হইতেও বিপজ্জনক। ধর্ম প্রচারকগণ কফিখানা নিষিদ্ধ করিতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। মুফ্তীগণের নিম্নোক্ত অভিমতটিও তাঁহাদের পথে সহায়তা করিয়াছিল (d'Ohsson-এর মতে আবু'স-সু'উদ)। তাঁহারা অভিমত দিয়াছিলেন যে, (ভাজা) কফি অঙ্গারাম্লজানযুক্ত বিধায় তাহা নিষিদ্ধ [এই একই যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় মুহাম্মাদ ('আলী?) দেদে-এর প্রবন্ধে, লাইডেন পাণ্ডু., ৬৮২, ১খ, পত্রক ৪খ]। কফিখানাসমূহে সমকালীন রাজনীতি আলোচিত হইত, সরকারী কার্যাবলী সমালোচিত এবং ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করা হইত। মূলত এই সকল কারণেই কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। ৩য় মুরাদ (৯৮২/১৫৭৪ ১০০৩/১৫৯৫) ও ১ম আহমাদ (১০১২/১৬১৩-১০১৬/১৬১৭)-এর রাজত্বকালে ঘোষিত আদেশসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই এবং তাহা তেমন প্রতিপালিতও হয় নাই। জনমতের প্রতি লক্ষ করিয়া ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, অঙ্গারাম্লজান যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কফিপান অবৈধ নয়।

৪র্থ মুরাদ (১০৩২/১৬২৩-১০৪৯/১৬৪০) কফি (ও তামাক) নিষিদ্ধ করিয়া একটি কঠোর আদেশ জারী করেন। তিনি সমস্ত কফিখানা ধ্বংস করার আদেশ দান করেন। কফির কারণে বহু প্রাণহানিও ঘটে। ৪র্থ মুহাম্মাদ (১০৫৮/১৬৪৮-১০৯৯/১৬৮৭)-এর আমলে রাস্তায় কফি বিক্রয়ের অনুমতি দান করা হয়। পরে প্রধান মন্ত্রী কোপরুলু ইহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই বাস্তব ক্ষেত্রে বলবৎ থাকে নাই। পরবর্তী কালে আমরা এমন ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদ পাঠ করি, যাহার মাধ্যমে সরকার কফির উচ্চমূল্য হ্রাসের চেষ্টা করেন। সুলায়মান-এর সময় হইতে কফির উপর একটি কর নির্ধারিত হয়, ইহার হার ছিল মুসলিম ক্রেতাদের জন্য প্রতি ওককা ৮ আসপার এবং খৃস্টান ক্রোতাদের জন্য ১০ আসপার; ১১০৯/১৬৯৭ সালে উভয় সম্প্রদায়ের উপর প্রতি ওককা ৫ পারাস হারে কর ধার্য হয়, ইহাকে বলা হইত বিদ'আত-ই কাহবি। Hammer-Purgstall, GOR, ৫খ, ৭১৩ অনুসারে কাহওয়া-এর শুদ্ধ বানান প্রসঙ্গে তুরস্কে বিতর্ক বর্তমান ছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল বানানে ব্যবহৃত অক্ষরটি হ (ہ) অথবা হ (ح) হইবে। বাস্তবিকপক্ষে কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে কাহ্ওয়া-এর সন্ধান পাওয়া যায়, যথা উপরে উল্লিখিত আল-কূসূনী।

কফি বৃক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব আরবে ভাল জন্মে। ইহার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণী পাওয়া যায় সারাত-এর পশ্চিম পার্শ্বে ১১০০ হইতে ২২০০ মিটার উচ্চতায়। এখানে উপত্যকার গভীরে এবং পার্শ্বদেশে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর, ভেজা জমি এবং উষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। চত্বরে সাজানো পাহাড়ের ঢালের বাগানসমূহে ইহার চারা লাগান হয় (Handbook of Arabia-তে চিত্রসমূহ দ্র., প্লেট ১৪), অবশ্য নিয়মিত পানিসেচের প্রয়োজন হয়। তিহামা হইতে ঘন মেঘের আকারে কুয়াশার ('উমা', সুখায়মানী) মাধ্যমে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প লাভ হয়। সূর্যের প্রখর তাপ ও পঙ্গপাল হইতে রক্ষা করার জন্য কফি চারাগুলিকে ছায়াদার গাছ, যেমন তেতুল অথবা carob বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া রাখা হয়। বীজ হইতে জন্মানো গাছের উচ্চতা হয় দুই হইতে পাঁচ মিটার এবং কাণ্ডের পরিধি হয় ৫ হইতে ৬ সে. মি.; ইহা চতুর্থ বৎসরে ফল প্রদান করে। ইহা একটি চিরহরিৎ বৃক্ষ এবং বৎসরের সকল সময়ই ইহা ফুল ও ফল উভয়ই ধারণ করে এবং ফল বিভিন্ন পর্যায়ের পরিপক্কতায় থাকে; এই কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার ফসল তোলার নির্দিষ্ট কোন ঋতু নাই। অবশ্য শ্রেণী ও স্থানবিশেষে প্রধান ফসল তোলা হয় মার্চ হইতে জুন মাসের মধ্যে। সাবধানতার সহিত বীজ সংগ্রহ ও শুষ্ক করার পর কলে ইহার খোসা ছাড়ান হয়। অতঃপর খোসা ও বিচি দ্বিতীয় বার রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়।

কফি বৃক্ষ উত্তরে 'আসীর (দ্র.) অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং বলা হয় যে, ইহা এইখানের যুহরান (ওয়াদী দাওকা-এর উত্তরে Stieler-এর মানচিত্রে Doka) অঞ্চলের শ-য-য় (শাযা?) পাহাড়ে খুবই ভাল জন্মে (শারাফ 'আবদু'ল-মুহ্সিন আল-বারাকাতী, আর-রিহ্লা আল-য়ামানিয়্যা, কায়রো ১৩৩০ হি., পৃ. ১৬; তু. J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, লন্ডন ১৮২৯ খৃ., ২খ, ৩৭৭; 'আসীর-এর অন্যান্য স্থানের জন্য দ্র. Handbook of Arabia, পৃ. ১৩৬, ১৩৭)। কফি চাষ হয় এইরূপ সর্বদক্ষিণ এলাকা হইতেছে বিলাদু'ল-হুজরিয়্যা, ওয়াদী ওয়ারাযান ও ওয়াদী বানা। পূর্ব অঞ্চলে আমরা য়াফি' ও জাওফ-এ কফির চাষ দেখিতে পাই। তবে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানের কফির জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত স্থান হইতেছে বানূ মাতার-এর আল-ফারশ

উপত্যকা ও হারায পর্বত, জাবাল রায়মা এবং 'উদায়ন-এর চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. Grohmann-এর পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জী। ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

য়ামানে সব সময়েই প্রচলিত প্রথা ছিল, সম্ভব হইলে খোসা হইতে প্রস্তুত একটি পানীয় গ্রহণ। খোসার ন্যায় ইহাও কিশর (قشر) নামে পরিচিত এবং বহু সংখ্যক কফিখানা (মিকহায়া)-তে পাওয়া যায়। কিশর ও বীজ হইতে প্রস্তুত কফি উভয়ের সহিত প্রায়ই সুগন্ধিরূপে দারুচিনি, আদা, লবঙ্গ ইত্যাদি মিশ্রিত করা হইত। তাজা পরিপক্ক ফল উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর। হামযা ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আন-নাশিরী তাঁহার একটি কাসীদায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রদ গুণাবলীর কারণে বুন্ন (কফিদানা) আহার বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। গাল্লা ও কাফ্ফা-এর কফিচূর্ণের সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া কফি সেবনের রীতি প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ আরবেই এই ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল কি না এই সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পারস্যে চূর্ণিত কফি আহার করা অস্বাভাবিক নহে।

উপরে উল্লিখিত ও গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত রচনাবলী ব্যতীত কফি সম্পর্কে আরবী ও ফারসী রচনাবলীর জন্য দ্র. Ahlawardt, Verzeichn. der arab. Handschr...zu Berlin, নং. ৫৪৭৬-৫৪৮০; Pertsch. Die arab. Handschr,...zu Gotha, নং. ৯৪ (৯), ২১০৫-২১০৯, ২৭৭৭; Cat. Cod. Orient. Bibl. Acad. Lugduno-Batavae, ৩খ, নং ১৪০১; Brockelmann, ২খ, ৪১৪ এবং ৪৩৭, নং ১৬।

যে কক্ষে কফি পরিবেশন করা হয় তাহার নামও কাহ্ওয়া। এই অর্থে শব্দটি অভ্যর্থনা কক্ষ বা কফিখানা বুঝায়। শব্দটি 'উপহার' ও 'বখশিশ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রাচ্যের কফিখানাসমূহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের রচনাবলী দ্র. Olearius, Chardin, Russell von Hammer, Snouck-Hurgronje, কফির পত্র সম্পর্কে দ্র. Lane, Snouck-Hurgronje, von Oppenheim, Socin Euting, Landberg.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের অতিরিক্ত (১) 'আবদুল-কাদির ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-জাযীরী, 'উমদাতু'স-সাফওয়া ফী হিল্লি'ল-কাহ্ওয়াও আংশিক সম্পা. in De Sacy, Chrestomathie arabe, ২য় সং, প্যারিস ১৮২৬ খৃ., ১খ, মূল পাঠ ১৩৮ প., ৪১২.; (২) আবদু'ল-কাদির ইব্ন শায়খ ইব্ন আল-'আয়দারূস, সাফওয়াতু'স-সাফওয়া ফী বায়ানি হুকমি'ল-কাহওয়া, পাণ্ডু. বার্লিন, Ahlwardt, Verzeichnis, নং. ৫৪৭৯ (Brockelmann, ৫৩৬-৭); (৩) আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ আল-বাকরী আস-সিদ্দীকী (পুস্তকটি যে তাঁহারই রচিত তাহা প্রমাণিত হয় পাণ্ডু. দ্বারা, লাইডেন পত্রক ১০৮ ক), ইসতিফা' (var ঃ আস্ফা) আস-সাফওয়া লি-তাসফিয়াতি'ল-কাহ্ওয়া, পাণ্ডু. লাইডেন (Cat. Cod. Orient, ৪খ, ১৬১); (৪) দাউদ আল-আনতাকী, তাযকিরাতু উলি'ল-আলবাব ওয়া'ল-জামি' লি'ল-'আজবি'ল-'উজাব, কায়রো ১২৯৪ হি., ১খ, ১২১ প. (দ্র. bunn), তু. ৩৬৯ (দ্র. কাহ্ওয়া); (৫) T. A., ৯খ, ১৪৫ প. দ্র, ১০খ, ৩০৮ প. দ্র. ; (৬) কিতাবু'য-যাখা'ইর ওয়া'ত-তুহাফ, Goldziher-এর Abhandl. z. arab. Philol-এ উদ্ধৃত, লাইডেন ১৮৯৯ খৃ., ২খ, ৮৮; (৭) আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ আশ্-শারজী, তাবাকাতু'ল-খাওয়াসস, কায়রো ১৩২১ হি., ১০০; (৮) 'আলাবী ইব্ন আহমাদ আস-সাক্কাফ (১২৯৫/১৮৭৮-এ প্রণীত), রিসালা ফী কাম'ই'শ-শাহ্ওয়া 'আন তানাউলি'ল-তুন্বাক ওয়া'ল-কাফতা ওয়া'ল-কাতওয়া'ল-কাহ্ওয়া, কায়রো ১৩০২ হি., ৮-১০; (৯) হাজ্জী, জিহান্নুমা, ইস্তাম্বুল ১১৪৫ হি., ৫৩৫-৬ (ফরাসী অনু. in De Sacy, Chrest., ১খ, ৪৮০-৩, তু. আরও Hammer-Purgstall, Literatur gesch. der Araber, ৭খ, ভিয়েনা ১৮৫৬ খৃ., ৪৩৫); (১০) Pecewi, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮৩ হি., ১খ, ৩৬৩-৫; (১১) না'ঈমা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১১৪০ হি., ১খ, ৫৫১-৪; (১২) রাশিদ, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., ২খ, ৪২৫ প., ৫খ, ১৪৪ প.; (১৩) মুহাম্মাদ হাফীদ ইব্ন মুসতাফা, আদ্-দুরারু'ল-মুনতাখাবাতি'ল-মানছুরা ফী ইসলাহি'ল-গালাতাতি'ল-মাশহূরা, ইস্তাম্বুল ১২২১ হি., ৩৬৭ প; (১৪) আল-ফীরূযাবাদী, কামূস, তুর্কী অনু. 'আসিম এফেন্দী, ইস্তাম্বুল ১২৩০-৩৩ হি., ৩খ, ৯১১ ; (১৫) আহমাদ রাশিদ, তারীখ-ই য়ামান বি-সান'আ', ইস্তাম্বুল ১২৯১ হি., ২খ, ৩১২-৫ (তু. Barbier de Meynard, Notice sur l'Arabie meridionale in Publ. de i' Ecole des Langues oriert, viv, 2nd Ser., ৯ খ., ১০৩-১৯৫); (১৬) L. Rauwolf, Aigentliche beschreibung der Raisz... [Laugingen], ১৫৮২ খৃ, ১০২; (১৭) Prosper Alpinus, De Plantis Aegypti Liber etc., Venice ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৬, Cap. ১৬ খ.; (১৮) ইহার সম্পর্কে Veslingius-এর পর্যালোচনা Padua সংস্করণে, ১৬৪০ খৃ.; (১৯) P. Della valle, Viaggi, Brighton ১৮৪৩ খৃ., ১খ, ৫১, ৭৪-৭৬; (২০) A Olearius, Offt beg ehrte Beschreibing der neuen orientalischen Reise etc. Schlesswig ১৬৪৭ খৃ., ৪২১, ৪২২ প.; (২১) Thevenot, Relation d'un voyage fait au Levant, প্যারিস ১৬৬৪ খৃ., ৬২-৬৪; (২২) ঐ লেখক, Suite du Voyage de Levant, প্যারিস ১৬৭৪ খৃ., ৪০, ৭১; (২৩) Chardin, Voyages en Perse, সম্পা. Langles, প্যারিস ১৮১১ খৃ., ২খ, ২৭৯-৮১, ৪খ, ৬৭-৬৯; (২৪) Kaempfer, Amoenitates exoticae, Lemgo ১৭১২ খৃ., ১২৩; (২৫) La Roque, Voyage de l'Arabie Heureuse, Amsterdam ১৯১৬ খৃ., ২৩৪ প. (Memoire concernant l'arbre et le fruit du cafe এবং Traite historique de l'origine et du Progres du cafe etc.); (২৬) Niebuhr, Beschreibung von Arabien, কোপেনহেগেন ১৭৭২ খৃ., ৫৫ প., ১৪৪, ২২১ প., ২২৬ প., ২২৮ প., ২৩৪-৫৮ স্থা., ২৮১ প. দ্র.; (২৭) ঐ লেখক, Reisebeschreibung nach Arabien, কোপেনহেগেন ১৭৭৪ খৃ., ১খ, ১৪৫, ১৪৬ প., ১৭৩ প., ৩০৫ প., ৩১৩, ৩১৮ প., ৩২৪ প., দ্র. ৩২৪, ৩৩৬, ৩৪৩, ৩৫৪, ৪৩৩, ৪৩৮ প.; (২৮) A. Russell, The Natural History of Aleppo, দ্বিতীয় সং, লন্ডন ১৭৯৪ খৃ., ১খ, ২৩, ১১৯ প., ১৪৬ প., ৩৭২ প. ; (২৯) M. d'Ohsson, Tableau general de l'empire othoman, ২খ, প্যারিস ১৭৯০ খৃ., ১২৩-৬; (৩০) Hammer-Purgstall, GOR, ১খ,

১৫৩, ৩খ, ৪৮৬, ৪৮৭ প., তু. ৭৪৬ প., ৪খ, ৬০৬, তু. ৫খ, ১৬১ প., ৫খ, ১৭১ প., ৪৬৪, ৫২৯, তু. ৭১৩, ৬খ, ২১৯, ৬৪৪ প. ৭খ, ২৪২; (৩১) ঐ লেখক, Constantinopolis und der Bosporos, Pest ১৮২২ খৃ., ১খ, ৫২৭ প.; (৩২) E. W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, তৃতীয় সং., লন্ডন ১৮৪২ খৃ., ১খ, ২০৫-৭, ২খ, ৩৬-৩৯; (৩৩) Ch. J. Cruttenden, Narrative of a Journey from Mokha to San'a, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London, ৮খ. (১৮৩৮ খৃ.), ২৬৮, ২৭২, ২৭৭ প., ২৮৪, ২৮৫; (৩৪) J. E. van der Trappen, Specimen historico-medicum de Coffea (Diss. Trajecti ad Rhenum (Utrecht) ১৮৪৩ খৃ.; (৩৫) C. Ritter, Die Erdkunde, ১২খ, বার্লিন ১৮৪৬ খৃ., ৭৭১ প., ৮৭৪ প., ১৩খ. (১৮৪৭ খৃ.), ৫৩৫ প.; (৩৬) Haneberg, in ZDMG, ৭খ, ২৫প.; (৩৭) J. E. Polak, Persien, Leipzig ১৮৬৫ খৃ., ২খ, ২৬৬প.; (৩৮) Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia, লন্ডন ১৮৬৫ খৃ., ১খ, ৪৯ প.; ৪২৩ প.; (৩৯) R. Manzoni, El Yemen, রোম ১৮৮৪ খৃ., ৯ প., ২১৯ প., ৩৫০ প., ৩৮২-৪; (৪০) L. W. C. van den Berg, Le Hadhramount etc., Batavia ১৮৮৬৩ খৃ., ৬৮প; (৪১) E. Glaser, Von Hodeida nach San'a in Mitt., ১৮৮৬ খৃ., ৩৩ প., ৩৬. ৩৯; (৪২) ঐ লেখক, Uber meine Reisen in Arabien. Mitt., d. K. K. Geogr. Gesellsch., in Wien, ৩০খ, (১৮৮৭ খৃ.), ২৫; (৪৩) Snouck Hurgronje, Mekka, ২খ, The Hague ১৮৮৯ খৃ., ৩৫, ৩৯, টীকা ৫৯, ৬৭. ৮৩. ৯৬, ১৩৭, ১৪০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৮, ১৭৪, ১৭৮, ১৮২, ১৯১, ১৯২, ২২০, ; (৪৪) ঐ লেখক, Mekkanische Sprichworter etc., The Hague ১৮৮৬ খৃ., ৩৩; (৪৫) ঐ লেখক, in Feestbundel and Prof. M. J. de Goeje, লাইডেন ১৮৯১ খৃ., ২৯; (৪৬) ঐ লেখক, in Intern, Arch f. Ethnographie, ১খ, ১৮৮৮ খৃ., ১৪৮ প., ১২-১৪; (৪৭) Doughty, Travels in Arabia Deserta, কেমব্রিজ ১৮৮৮ খৃ., ১খ, ২২৩, ২৪৪-৫০, ২খ, ৩০৩ এবং নির্ঘন্ট, দ্র. Coffee; (৪৮) A. Deflers, Voyage au Yemen, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ., ১৪৩-৫; (৪৯) J. Euting, Tagbuch einer Reise in Inner Arabien, ১খ, লাইডেন ১৮৯৬ খৃ., ৮৩-৫, ১২৭, ১২৮, টীকা ২, ১৭৮, ১৭৯; (৫০) Von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, Berlin ১৮৯৯-১৯০০ খৃ., ১খ, ৭৪, ২খ, ৪৬-৪৮; (৫১) Diwan aus Centralarabien, coll. by A. Socin, publ. by H. Stumme (Abhandl. d. k. Sachs. Gesellsch. d. Wissench. phil-hist. Cl ১৯ খ., ১৯০০-১খৃ.), ১খ., Nr 22 and Excurs Q; (৫২) Landberg, Etudes sur les dialectes de l'Arabie Meridionale, লাইডেন ১৯০১-১৩ খৃ., ১খ, ৩৩৭, ৩৭৬, ৪৬০, টীকা, ২খ, ৫৬-৬১, ২১২-২৬, ১০৫৫-৮১, ১০৮৭প.; (৫৩) ঐ লেখক, Arabica, Nr. v, লাইডেন ১৮৯৮ খৃ., ১৬০ প.; (৫৪) W. Schmidt, Das sudwestl. Arabien, Frankfurt on M. 1913, 88 প., ৭৯ প., ৮২-৪, ১০৩ প., ১২০ প.; (৫৫) A. Handbook of Arabia, comp. by the Geogr. Section of the Naval Intelligence Division, লন্ডন তা. বি., ১খ, ১৩৬, ১৫৫ প., ১৫৮, ১৭২ প., ১৮৩, ১৮৯, ১৯০ ও নির্ঘন্ট; (৫৬) A. Grohmann, Sudarabien als Wirtschaftsgebiet, ভিয়েনা ১৯২২ খৃ., ২৩৯ প.; (৫৭) H. Welter, Essai sur l'histoire du cafe, প্যারিস ১৮৬৮ খৃ.; (৫৮) E. Jardin, Le cafeier et le cafe, প্যারিস ১৮৯৫ খৃ.; (৫৯) Z. Kamerling, in K. W. v. Gorkom, Oost-Indische Cultures, publ., by H. C. Prinsen Geerlings, দ্বিতীয় সং., Amsterdam ১৯১৭-১৯ খৃ., ২খ, ১৮৩ প.; (৬০) F. J. Bieber, Kaffa, ১খ., Munster i, W. 1920, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ৩৭৬ প.; (৬১) R. Dozy, Oosterlingen, The Hague ১৮৬৭ খৃ. ৫৫; (৬২) H. Lammens, Remarques sur les mots derives de l'Arabe, বৈরূত ১৮৯০ খৃ., ৬৫ প.। প্রবন্ধকার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ব্যবহার করিতে পারেন নাইঃ (৬৩) A. F. Naironi, De saluberrima potione cahue seu cafe nuncupata discursus, রোম ১৬৬১ খৃ.; (৬৪) L. F. Marsigli, Bevanda asiatica...l'istoria medica del cave o sia caffe, ভিয়েনা ১৬৮৫ খৃ.; (৬৫) A. Galland, De l'origine et du progres du caffe, Caen (৬৬) J. Ellis, A historical account of coffee, লন্ডন ১৭৭৪ খৃ.।

C. Van Arendonk (E. I.^{2})/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

য়ুরোপের সহিত বাণিজ্য ঃ সাধারণভাবে মুখা ও লোহিত সাগর অঞ্চলে য়ুরোপীয় বণিকগণের আগমন কফি ব্যবসায়ের জন্য একাধিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই পর্যন্ত দক্ষিণ য়ামান ও তৎসহ ইথিওপিয়ার কিছু অঞ্চল সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে কফি বীজের সরবরাহ প্রদান করিয়া আসিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে য়ামানী শাসকবর্গ বিদেশী আগন্তুকদের দ্বারা কফি বীজ ও চারা বাহিরে পাচারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করেন (দ্র. Ellis, ২৯)। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে য়ুরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কফি পানের অভ্যাস অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িলে তাহা বিপুল চাহিদার সৃষ্টি করে। ফলে লোহিত সাগর এলাকার কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহের একচেটিয়া সুবিধার অবসান ঘটে এবং কফি চাষ শ্রীলংকা, জাভা, ক্যারিবিয়ান ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রসার লাভ করে (India Office Records, লন্ডন ২২ আগস্ট, ১৭৩২-এর পত্র ঃ Factory Records Egypt, ২খ, নং ৩০১, ১৬০)। অপর একটি তথ্যের উৎস, যে দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহা হইতেছে বাণিজ্যের পরিমাণ ও বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কে দলীলাদির প্রাপ্যতা যাহা ইসলামী উৎসসমূহে প্রায় অনুপস্থিত। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকদের প্রদত্ত বিবরণসমূহ এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় কোম্পানীসমূহের দলীলপত্রে কেবল কফি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রদ্বয় মুখা ও বায়তু'ল-ফাকীহতে বিরাজমান

বাণিজ্য পরিস্থিতির সাধারণ বর্ণনাই প্রদত্ত হয় নাই, অধিকন্তু একই সঙ্গে তাহাতে বিভিন্ন দেশের রফতানী, মূল্য, কফি উৎপাদনের এলাকা, ক্রয়ের পদ্ধতিসমূহ বাণিজ্যিক প্রবিধান এবং বুনন সংক্রান্ত অর্থনীতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মধ্যপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য সামগ্রীর মধ্যে কফি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছিল এবং য়ূরোপ হইতে ভারতে রৌপ্য মুদ্রার নির্গমন স্রোত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহার মাধ্যমে যে সমস্ত অঞ্চলের তেমন সম্পদের উৎস ছিল না সেইগুলি দ্রুত সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে।

য়ূরোপে বৃক্ষ ও পানীয়রূপে কফি প্রথম প্রচারিত হয় খৃস্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। Jean de La Roque, যিনি কফির উৎপত্তি সম্পর্কে নিকট প্রাচ্য ও য়ূরোপে সর্বপ্রথম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন তাঁহার ধারণায় ইহার সর্বপ্রথম উদ্ভিদতাত্ত্বিক তথ্য পাওয়া যায় Prosper Alpinus-এর রচনায়, যাঁহার গ্রন্থ ১৫৯২ খৃ. ভেনিসে প্রকাশিত হয়। Alpinus-এর রচনাটি সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েক সংস্করণে প্রকাশিত হয় এবং ইহার পরবর্তীকালে Philip-Sylvester Dufour, Nicholas de Blegny ও John Ray রচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। আরবীয় কফি য়ূরোপের বিজ্ঞানী মহলে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করে। ফলে ইহার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতে বণিকগণ সক্ষম হন। ১৬০৯-১০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই ইংরেজ পূর্ব ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজসমূহ বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য মুখায় প্রেরিত হয় এবং ষষ্ঠ যাত্রার অধিনায়ক Sir Henrey Middleton সান'আ' পর্যন্ত গমন করিতে সফল হন (The first Letter Book, ২৪০)। ১৬১৬ খৃ. ওলন্দাজ বণিক Pieter van den Broecke মুখায় কফি সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) নিকট হইতে অত্যন্ত সুবিধাজনক ব্যবসায়িক শর্তাবলী আদায়ে সমর্থ হন, যাহা সান'আতে অবস্থানরত আরবীয়, পারস্যবাসী ও ভারতীয় বণিক মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি করে (F. de Haan, Priangan, ৩খ, ৮০৪; K. Glamann, ১৮৩; E. Macro, ৩৭)। কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে সম্ভবত উত্তমাশা অন্তরীপ পথে য়ূরোপে নিয়মিত কফি আমদানী শুরু হয় নাই। ১৬৬০ খৃস্টাব্দে ইংরেজ পূর্ব ভারতীয় কোম্পানীর উন্মুক্ত বিক্রয়ে লণ্ডনে কফি বিক্রিত হইত "coho seeds" নামে, অন্যদিকে আমস্টারডামের ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় কোম্পানীর নিলামে প্রথমবারের মত "cauw de Mocha"-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৬১-৬২ খৃ. (A Calendar, 27; Glamann, ১৮৩)।

যদিও ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় কোম্পানীর চাকুরিয়াগণ মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যে কফির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং প্রায়ই তাহা মুখা হইতে অন্যান্য এশীয় বন্দরে নিয়মিত রফতানী করিতেন, কিন্তু ইহা য়ূরোপে আমদানী করার লক্ষ্যে ১৬৯০ খৃস্টাব্দের আগে তাহাদের তেমন উদ্যোগী হইতে দেখা যায় নাই (Dagh-Register 1664, ৩১১)। পক্ষান্তরে এই একই সময়ে ইংরাজ আমদানী ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী এবং ১৬৬৪ হইতে ১৭০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে এমন কোন বৎসর ছিল না যখন লণ্ডনে কফি আমদানী ও বিক্রয় করা হয় নাই। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দের হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ পরিমাণের মাত্রা ছিল ৪৪,৯১২ পা. যাহার মূল্য ছিল ১১৩৮ স্টার্লিং পাউণ্ড, অপরদিকে ১৬৯০ খৃ. আমদানী সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে, সেই বৎসর আমদানীর পরিমাণ ও মূল্য ছিল যথাক্রমে ২,৯৮,৮১৬ পাউণ্ড এবং ৯,৮২১ স্টার্লিং (India Office Records, লন্ডন, ২৬খ, ইত্যাদি)। পরবর্তী শতাব্দীর প্রথমার্ধে গড় বার্ষিক আমদানী এক মিলিয়ন পাউণ্ডের ঊর্ধ্বে পৌঁছায় এবং ১৭২৪ খৃ. ইহার সর্বোত্তম মাত্রায় ২.৬৭ মিলিয়ন পাউণ্ড আমদানী হয়। ইংরেজ উৎসসমূহ ইহা ব্যতীত য়ামান হইতে রফতানীকৃত মোট কফির পরিমাণ ও বিভিন্ন বাণিজ্যগোষ্ঠীর মোট বাণিজ্য কত অংশ ছিল সেই সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ ১৭২৬ খৃ., আনুমানিক সর্বমোট ১৯,২৬৭ বেল রফতানীর মধ্যে (প্রতি বেল আনুমানিক ২৮০ পা.) আরব ও তুর্কী বণিকেরা ১০,৩৩০ বেল হস্তান্তর করে অর্থাৎ ৫৪ শতাংশ। ইহার পরে ছিল ইংরাজ কোম্পানী ও ব্যক্তিগত বণিক, ৫০২০ বেল (২৬ শতাংশ), তাহাদের পরে ওলন্দাজ ২০০০ বেল (১০ শতাংশ), ফরাসী (১৩০০ বেল বা ৭ শতাংশ) এবং পারস্য ও ভারতীয় বণিকগোষ্ঠী (৬১৭ বেল বা ৩ শতাংশ)। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, এই সকল পরিমাপ নির্ভুল নহে, প্রকৃত দর অপেক্ষা কম দর দেখান হইয়াছে অথবা এই মওসুমটি ছিল অস্বাভাবিকভাবে খারাপ। কারণ ১৭৩১ খৃ. ইংরাজ কারখানার প্রধান বণিক উল্লেখ করেন যে, ভাল বৎসর কফির রফতানীর পরিমাণ ৬০ হাজার হইতে ৭০ হাজার বেল পর্যন্ত হইত যদিও কোম্পানীর কর্মচারিগণের প্রেরিত রিপোর্টসমূহের কোনটিতেই রফতানীর পরিমাণ ৪০ হাজার বেলের ঊর্ধ্বে উল্লেখ করা হয় নাই (Factory Records Egypt, ১খ, নং ২০১, পৃ. ৫১৮; ২খ, নং ২৬১, পৃ. ৭৯-৮০)। পরিমাণের এই পার্থক্যের কারণ হইতেছে ইংলিশ বেল ও স্থানীয় বেল-এ পরিমাণের তারতম্য, স্থানীয় বেলের পরিমাণ ইংরেজ বেলের তুলনায় অনেক কম ছিল (মুখায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাণের জন্য দ্র. Factory Records Egypt, ২খ, নং ২০৯, পৃ. ১১, নং ৩১১, পৃ. ১০৬)। এই সকল ও অন্যান্য তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, য়ামানে য়ূরোপীয় বাণিজ্যের চরম উন্নতির কালেও কফি ভোগকারী দেশসমূহের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ছিল প্রধান, কিন্তু য়ূরোপের চাহিদা ছিল মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ, ইহার ফলে কফি চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং কফির মূল্য বৃদ্ধিও ঘটিতে থাকে। ১৬৭২ খৃ. মুখায় অধিক চাহিদার দরুন কফির মূল্য প্রতি বাহার (অনু. ৪৫০ পাউন্ড) ৪৫ স্পেনীয় ডলারে উঠিয়াছিল। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কফি প্রায়ই ১০০ ডলারে বিক্রিত হইত এবং খারাপ উৎপাদনের বৎসরে এই মূল্য প্রতি বাহার ১৭০ ডলার ছাড়াইয়া যাইত (Factory Records Surat ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৬৭২, ৩খ, পত্র ১৬; Ovington, পৃ. ২৭১ ; Factory Records Egypt, ১খ, নং ২৯, পৃ. ৫৬ ; ২খ, নং ৩৩৪, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৮ প., ৩০২, ৩২৪, ৩৩০, ৩৪২, Abstract, ৪৪৯খ, পৃ. ৪৯৬)। তুর্কী ও আরব বণিকেরা মনে হয় তাঁহাদের ক্রয় করা সমস্ত কফি বায়তু'ল-ফাকীহ্ [দ্র.]-এর প্রখ্যাত অভ্যন্তরীণ বাজার হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং খুব কমই মুখায় আসিতেন। কফি উটের পিঠে উপকূল পর্যন্ত বহন করা হইত। লুহায়্যা ও আল-হুদায়দা বন্দরদ্বয় হইতে জাহাজের মাধ্যমে রফতানী করা হইত। Ovington-এর মতে লুহায়্যা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ১৬৮৭-৮৮ খৃ. যখন মুগল সম্রাটের সহিত স্বল্পকালীন যুদ্ধের সময় মুখা-র বাণিজ্য কর্মে ইংরাজ রণতরীর ব্যবহার বাধাপ্রাপ্ত হয় (Ovington, ২৭৩) ; অবশ্য ইহাও সম্ভাব্য যে, হুদায়দা ও লুহায়্যা উভয়েই জুদ্দা (জিদ্দা)-র নিকট অবস্থিত ছিল এবং

জুদ্দা ছিল মধ্যপ্রাচের কফির প্রধান মধ্যবর্তী পণ্য কেন্দ্র বাজার। সেইজন্য মুসলিম বণিকেরা মুখা-র তুলনায় উক্ত বন্দরদ্বয়কে পসন্দ করিত। 'উছমানী সাম্রাজ্যে কফি প্রধানত দুইটি বাণিজ্য পথে পরিবেশিত হইত। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথটি ছিল জুদ্দা, সুয়েজ ও কায়রো ; কিন্তু বসরা হইয়া ইউফ্রেটিসের পথেও যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য সরবরাহ হইত। ভারত ও পারস্যে চাহিদার পরিমাণ ছিল সামান্য এবং কদাচিৎ তাহা ৫০০ বেলের উর্ধ্বে উঠিত। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত যদি সূরাটের বণিকগণ য়ুরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাসমূহের নিকট হইতে তাহাদের পক্ষে কফি ক্রয়ের বিশেষ অধিকার লাভ করিত। অবশ্য খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষ দিকে য়ুরোপে কফি বৃদ্ধি পাইলে, তবে বিধিবদ্ধ কোম্পানীসমূহ সরাসরি মুখা হইতে কফি ক্রয় করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। মুখায় ওলন্দাজ কোম্পানীর কফি কারখানা ছিল যাহা ১৬৮৪ খৃ. বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৬৯৬ খৃ. পুনরায় চালু করা হয় (Glamann, ১৮৬, ১৮৮)। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য মৌসুমে মুখায় সুরাট হইতে তাহাদের কর্মচারীদের প্রেরণ করিত এবং লন্ডন হইতে সরাসরি জাহাজ প্রেরণ করা হইত যাহার মাল তদারককারীর প্রধান দায়িত্ব ছিল য়ামান হইতে কফি ক্রয় করা। ১৭১৬ খৃ. বোম্বাই কাউন্সিল মুখায় একটি স্থায়ী কারখানা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাহার লক্ষ্য ছিল বৎসরের সব সময়ে কফি ক্রয় করা এবং ইহার মাধ্যমে প্রধান বাণিজ্য মৌসুমের উচ্চ মূল্য পরিহার করা (Bombay Public Proceedings, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৭১৬, ৪খ, Abstract, ৪৪৯খ, প্যারা ৪৯, পৃ. ২২৯)। মুখা হইতে বায়তু'ল-ফাকীহ্ ছিল অল্প দূরত্বে অবস্থিত এবং ১৮শ শতাব্দীর শুরুতে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকেরা নিয়মিতভাবে আরব, তুর্কী ও ভারতীয় বণিকদের পাশাপাশি অভ্যন্তরস্থ এই কফি বাজারে আবির্ভূত হইতে থাকে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ মুখায় কোন নিয়মিত বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের পূর্বে ইতস্তত করার পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার আশংকা। য়ামানের প্রকৃত পরিস্থিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কোম্পানীর কর্মচারীদের মতে এই স্থানে সাধারণ য়ুরোপীয়দের প্রতি ব্যবহার এবং খৃষ্টানগণের প্রতি ব্যবহারের মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না (Factory Records Egypt, ১খ, নং ৫, পৃ. ২৩)। বাস্তবিকপক্ষেই মুখা ও বায়তু'ল-ফাকীহ্-এ য়ুরোপীয়গণকে যে বাণিজ্যিক শর্তে ব্যবসা করিতে অনুমতি দান করা হইত সকল সময়েই স্থানীয় অথবা ভারতীয় বণিকগণকে প্রদত্ত শর্তাবলীর তুলনায় তাহা সুবিধাজনক ছিল। য়ুরোপীয়দের বেলায় রফতানী শুল্ক ছিল পণ্যমূল্যের তিন শতাংশ অথচ ভারতীয় ও স্থানীয়দের জন্য উহা ছিল ৫ শতাংশ (Hamilton, ১খ, ৩৬)। ১২৭০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে য়ামানের গৃহযুদ্ধ অবসানের পর নূতন ইমাম য়ুরোপীয় কোম্পানীসমূহকে প্রতি বৎসর ৫০০ বেল কফি শুল্ক-মুক্তভাবে রফতানী করার অনুমতি প্রদান করেন (Factory Records Egypt, ২খ, নং ২১২, পৃ. ১৯)। তবে ইহা সত্য যে, সান'আতে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যিক সুবিধা প্রায়ই স্থানীয় প্রশাসকগণ লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহারা বিক্রেতার নিকট অতিরিক্ত পাওনা দাবী করিতেন। কফি বিক্রেতারা তাঁহাদের ক্ষতি পোষাইয়া নেওয়ার জন্য য়ুরোপীয় ক্রেতাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিতেন। উদাহরণস্বরূপ ১৭২১ খৃ. মুখা হইতে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হয় যে, উক্ত মৌসুমে বাজারে আনীত কফির পরিমাণ অতি নগণ্য ছিল। কারণ স্বাভাবিক আবগারী কর প্রতি বাহার এক ডলারের স্থলে হঠাৎ করিয়া ৫ ডলারে বৃদ্ধি পায় (Abstract, ৪৪৯খ, প্যারা ৮, পৃ. ৪০৬)। La Roque-এর অনুসারে বায়তু'ল-ফাকীহ্তে কেবল বিক্রেতা এই কর প্রদান করিতেন (La Roque, ১০৫)। মক্কা ও জুদ্দা-এর প্রশাসক এবং মিসরের পাশা তাঁহাদের অঞ্চলের উপর দিয়া চলাচলকৃত কফি পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কফি ব্যবসায় স্থানীয় শাসকদের জন্য একটি লোভনীয় আয়ের উৎসে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৯৯ খৃ. ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১২½ শতাংশে দাঁড়ায় (Alg. Rijksarchief, The Hague, Koloniale Arch. Oost-Indie en de Kaap, no. 1810, 7 এবং জুলাই ১৭১৯; Glamann, ১৯২)।

ইহা ছাড়াও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, তুর্কী সম্রাট তুর্কী বণিকদের ব্যবসায়ের উপর য়ুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষতিকর প্রভাবের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং য়ামানে কতিপয় দূত প্রেরণের মাধ্যমে ইমামকে য়ুরোপীয়দের জন্য কফি রফতানী নিষিদ্ধকরণে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ইমাম প্রাপ্ত কর ও ক্ষতিপূরণ আয় এবং য়ুরোপীয়দের প্রদত্ত মোট ক্রয়মূল্য যে ক্ষতি হইবে তাহা পোষাইয়া নেওয়ার দাবী জানাইলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (ঐ)। ইহা উল্লেখ করা অতিরঞ্জিত হইবে না যে, এক সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে গোলমরিচ ও মসলার যে স্থান ছিল কফি অনেকাংশে সেই স্থান দখল করে।

আন্তর্জাতিক চাহিদা ও সফরকারী বণিকগণের ব্যবসায়িক দক্ষতার ফলে কফি ব্যবসায় মোটামুটি উন্নত মানের সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। ইহা চাষের পশ্চাদপটের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্যই জানা যায়, তবে মনে হয় কফি প্রধানত ক্ষুদ্র কৃষকেরাই চাষ করিত এবং নিজেরাই পরিপক্ব ও শুষ্ক ফল বাজারজাতকরণের জন্য আনয়ন করিত; অবশ্য কতিপয় বৃহৎ উৎপাদকও ছিল যাহারা তাহাদের উৎপন্ন বিপণনের জন্য বায়তু'ল-ফাকীহ্-এর বড় ব্যবসায়িগণের সহায়তা লাভ করিত (Factory Records Egypt, ১খ, নং ১৬৬, পৃ. ৪৮১)। মুখা ও বায়তু'ল-ফাকীহ্-এর বাজারদ্বয়ে পৃথক উৎপাদন এলাকা হইতে কফি সরবরাহ করা হইত। মুখা-এর সরবরাহ আসিত দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রামসমূহ হইতে। বায়তু'ল-ফাকীহ্-এর সরবরাহ এলাকা ছিল অনেক বেশী বিস্তীর্ণ এবং দূরত্ববিশেষে তাহা দেড় দিন হইতে ছয় দিন পর্যন্ত চলাচলের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। উন্নত মানের কফি আহরণ করা হইত ওসাব ও সাফফাল হইতে। কিন্তু এই উন্নত মানের কফির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সাধারণত স্বল্প। ইহা অপেক্ষা সামান্য নিম্নমানের কফি উৎপন্ন হইত হাররাস্স, রিমাহ্, হিম্মাহ্ ও দোরান-এ যাহা য়ুরোপীয়গণ ক্রয় করিতেন। অপর পক্ষে সেলবা, সিনান ও এডেন হইতে আনীত কফি ছিল অত্যন্ত ধূলি ময়লা মিশ্রিত এবং কদাচিৎ তাহা য়ুরোপের জন্য ক্রয় করা হইত (Factory Records Egypt, ১খ, নং ১৯, পৃ. ৪২)। কফি দানা প্রায় সময়েই শুষ্ক ও পরিষ্কার করিয়া বিক্রয়ের পূর্বেই প্রাথমিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হইত, যদিও উচ্চ চাহিদার বৎসরে ইহা 'অশোধিত' অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইত এবং এইরূপ বাজারজাতকরণের রীতির বিরুদ্ধে ইংরাজ ও ওলন্দাজগণের প্রতিবাদের উত্তরে প্রশাসকগণ জানাইতেন যে, তুর্কী ও অন্যান্য বণিক যেখানে বাজারে যেরূপ কফি পাওয়া যায় তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত, সেখানে তাহারা বিশেষ একটি অবস্থায় কফি বিক্রয়

করিতে চাষীদের বাধ্য করিতে পারেন না (Factory Records Egypt, ২খ, নং ৩১৯, পৃ. ২২৭)।

মুখা ও অন্যান্য বন্দরে প্রধান বাণিজ্য মওসুম মার্চ হইতে আগস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই সময়ে জাহাজসমূহ সুয়েজ, জুদ্দা (জিদ্দা) ও সুরাট হইতে কফি ক্রয় করিতে আগমন করিত এবং বিনিময়ের জন্য খাদ্য সামগ্রী, ভারতীয় মালামাল ও য়ূরোপীয় পশমী সামগ্রী লইয়া আসিত। কফির বাজার জাহাজের আগমন ও নির্গমন সময়ের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল। সমুদ্রবক্ষে কোন য়ুরোপীয় বা তুর্কী বাণিজ্য জাহাজ দেখার জনরব উঠা মাত্রই বায়তু'ল-ফাকীহ-এর বাজারে কফির মূল্য বাড়িয়া যাইত অথবা অধিক মুনাফা লাভের আশায় বাজারে কফি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। কয়েকবার এইরূপ ঘটনা ঘটে যে, ওলন্দাজ কর্মচারিগণ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কফি ক্রয় করিয়া লইবার ফলে তাহারা কফি ক্রয়ে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পরবর্তী সময়ে ইংরাজ কর্মচারিগণ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, য়ামানী কফির মূল্য বৃদ্ধির জন্য ইহা ছিল একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা, যাহাতে জাভায় অবস্থিত তাহাদের নিজস্ব বাগানের কফি নিজ দেশের বাজারে উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করা যায় (Factory Records Egypt, ২খ, নং ২১৬, পৃ. ৯)। সার্বিকভাবে মুখা ও বায়তু'ল-ফাকীহতে মূল্য নিয়ন্ত্রকরূপে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল জুদ্দা ও কায়রোতে প্রাপ্তব্য পাইকারী মূল্য; য়ামানী বণিক সম্প্রদায় এই ব্যাপারে তাঁহাদের নিয়োজিত স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইতেন। কফি ব্যবসায়ের অন্যতম আনুষঙ্গিক বাণিজ্য পণ্য হিসাবে লোহিত সাগর অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে মূল্যবান ধাতু প্রধানত রৌপ্যের আগমন ঘটিত। ইহার মাধ্যমে বণিকগণ ভারত ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে সৌখিন দ্রব্যাদি আমদানী করিতে সমর্থ হইত এবং সুরাটে প্রত্যাবর্তনকারী ভারতীয় জাহাজসমূহ প্রধানত মূল্যবান ধাতু বহন করিত। ইহা ব্যতীত একটি কার্যকর ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। য়ুরোপীয় কোম্পানীসমূহ প্রায়ই তাহাদের আমদানীকৃত মূল্যবান পণ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্য (বিল অব এক্সচেঞ্জ) হুণ্ডির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করিত এবং উক্ত হুণ্ডির প্রতিশ্রুত অর্থ সুরাট বন্দরে পরিশোধ করিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) India Office Records, London, General Ledgers and Commerce Journal, খণ্ড ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪২ (১৬৬৪ খৃ. হইতে সিরিজের আরম্ভ); (২) Factory Records Egypt and the Red Sea; (৩) J. Ellis, An historical account of Coffee, লন্ডন ১৭৭৪ খৃ.; (৪) Jean de La Roque, A Treatise concerning the Tree and Fruit of Coffee, in A Voyage to Arabia Foelix through the Eastern Ocean and the Red Sea being the first made by the French in the years 1708, 1709 and 1710 (১৭১৬ খৃ. আমসটারডাম-এ ফরাসী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়); (৫) Prosperi Alpini De Plantis Aegypti liber...accessit etiam liber de balsamo alias editus, ভেনিস ১৫৯২ খৃ.; (৬) Philip-Sylvester Dufour, Traitez du Cafe, du The et du Chocolat, Lyon ১৫৮৫ খৃ.; (৭) Nicholas de Blegny, Le Bon Usage du the, du caffe et du chocolat pour la preservation et pour la guerison des maladis, প্যারিস ১৬৮৭ খৃ.; (৮) John Ray, Universal History of Plants, লন্ডন ১৬৮৭ খৃ.; (৯) The First Letter Book of the East India Company 1600-1619, সম্পা. George Bird-wood and William Foster, লন্ডন ১৮৯২ খৃ. (Sir Henry Middleton-এর সান'আ ভ্রমণের বিবরণের জন্য দ্র. La Roque, A Voyage to Arabia, ১৭৪২ খৃ. সং); (১০) F. de Haan, Priangan, De Preanger-regentschappen onder het Nederlands Bestuur tot 1811, ৪ খণ্ডে, Batavia ১৯১০-১২ খৃ.; (১১) Kristof Glamann, Dutch Asiatic Trade 1620-1740, Copenhagen-The Hague 1958; (১২) Eric Macro, Bibliography on Yemen and Notes on Mocha, Floriad ১৯৬০ খৃ.; (১৩) A Calendar of the Court Minutes of the East India Company 1660-1663, সম্পা. Ethel Bruce Sainsbury, অক্সফোর্ড ১৯২২ খৃ.; (১৪) Dagh-Registar gehouden in't Casteel Batavia, anno 1664, সম্পা. I. A. van der Chijs, Batavia's-Gravenhage, ১৮৯৩ খৃ.; (১৫) John Ovington, A Voyage to Surat in the year 1689, সম্পা. H. G. Rawlinson, লন্ডন ১৯২৯ খৃ.; (১৬) Astract of Letters received from Bombay; (১৭) Alexander Hamilton, A new account of the East Indies, সম্পা. Sir William Foster, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৩০ খৃ.।

K. N. Chaudhuri (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

কাহ্‌তান (قحطان) ঃ তাঁহাকে ইসলামী যুগের আরবেরা য়ামানীদের আদি পুরুষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ১খ, ৪; আল-মাস্‌'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, প্যারিস ১৮৬১-১৮৭৭ খৃ., ১খ, ৭৯; Die auf Sudarabien bezuglichen Angaben Naswan's im Sams-ul-Ulum, সম্পা. 'আজীমু'দ-দীন আহমাদ, পৃ. ৮৩, স্থা.) অর্থাৎ দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য সাধারণভাবে অনেক সময় তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বানূ কাহতান (কাহতানের বংশধর কাবা'ইল-ই কাহতান অথবা সংক্ষেপে কাহতান) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার বিপরীতে উত্তর আরবের গোত্রসমূহের পরিচয়জ্ঞাপক নাম হইল 'আদনান। আরব পণ্ডিত, কুলজী বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ— ইঁহাদের সকলেরই এই বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায় (দ্র. উদাহরণস্বরূপ Wustenfed, Genealog. Tabellen Regieter এবং der arab. stamme und Familien; অনন্তর Reiske Primae lineae historiae regnorum ঃ arabicorum, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১৩২ প.)। আরবের সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচলিত রচনায় (দ্র. Doughty, Travels in Arabia Deserta, পৃ. ২৮২) এবং প্রাচীন কাহিনীতে, বিশেষ করিয়া কবিতায় উক্ত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় (দ্র. আবূ হানিফা আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত-তিওয়াল, পৃ. ৩৪৮; আত-তাবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ১০৮৭

এবং ২খ, ১৬৭২, ১৯৮৫; আল-মাস'উদী, ঐ, ২খ, ১৪২; আরও দ্র. আত-তাম্বীহ ওয়া'ল-ইশরাফ = Bible, Geogr. Arab, ৮খ, ১০৯ ইত্যাদি)। প্রচলিত সাধারণ ধারণাসমূহে কোন কোন ক্ষেত্রে কাহতানের বিপরীত 'আদনান-এর স্থলে তাঁহার পুত্র মা'আদ-এর (দ্র. আবূ হানীফা, আদ্-দীনাওয়ারী, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৮১; আত-তাবারী, ঐ গ্রন্থ, ২খ, ১০৫৬; আল-মাস'উদী, আত-তানবীহ, ১খ, ৮৮), কোন কোন বিবরণে তাঁহার পৌত্র নিযার-এর (দ্র. আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৫খ, ২২৩ এবং ৬খ, ৪২ প. ৪৬, ১৪৩, ১৫০; ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, ৪খ, ২৭৩)। আবার কোন কোন বর্ণনায় তাঁহার পৌত্রদ্বয় মুদার ও রাবী'আ (আত-তাবারী, পূ, গ্র., ২খ, ১৯৬৯, ১৯৮৫ প.)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আরবী উৎসসমূহে কাহতানের বংশ বিবরণ এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 'আবার, ('আবির নহে, কামূস, দ্র. শিরো. শালাখ অথবা শালাহ), আরফাখ্শায (অথবা আর-ফাখাশাদ), সাম, নূহ (আ)। ঐ সমস্ত উৎসে তাঁহার এক ভ্রাতা ফালাগ-এরও উল্লেখ আছে (বংশ লতিকা এই কাহতান ইব্ন ফালাগ ইব্ন 'আবার ইব্ন শালাখ, যাহা আত-তাবারী, পূ. গ্র., ৩খ, ২৪০০ এবং আদ-দিমাশকী, নুখবাতু'দ-দাহ্র, সম্পা. Mehren, পৃ. ২৪৯, ২৫২-তে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য উহা স্পষ্টত কোন ভুল ধারণারই ফল। তদুপরি এই সমস্ত নাম 'আহাদ নামাহ্-ই 'আতীক (ওল্ড টেস্টামেন্ট) গ্রন্থে রহিয়াছে Eber, Shelah, Arphaxad, Shem, Noah এবং Peleg (আদি পুস্তক, বাব ১০; সিফ্রু'ল-আখবার—১, বাব ১)। ইহাতে বুঝা যায় যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের য়ুকতানই হইতেছেন কাহ্তান যিনি 'আবায়ের পুত্র, ফালাগ (ফালাজ)-এর ভ্রাতা এবং দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ (সিফরু'ত-তাকবীন, অধ্যায় ১০, শ্লোক ২৫ প.; সিফ্রু'ল-আখবার প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৯প.)। য়ুকতান, অর্থ ছোট অর্থাৎ নিজ ভ্রাতা ফালাগ হইতে ছোট, সম্ভবত কুলজীবিশারদগণ এই নামের উদ্ভাবক; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে হিব্রুদের সহিত আরবদের বংশগত সম্পর্ক স্থাপন করা। আরব বংশ কুলজী বিশেষজ্ঞগণ ঐ দুই গোষ্ঠীর এক বংশীয় হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই মনে করেন যে, য়াক্তান য়ুকতান ও কাহ্তান একই ব্যক্তি (আল মাস'উদী, আত-তানবীহ, পৃ. ৩১ ঃ আরও মুরূজ, ৩খ, ১৪৩; ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৭; তাজু'ল-'আরূস, দ্র. শব্দমূল قحط, আরও দ্র. Doughty, পূ. গ্র., পৃ. ২২৯)। তবে কখনও কখনও সন্দেহবশত য়ুকতানকে কাহতানের ভ্রাতা অথবা পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১৪; আল-মাস্'উদী, মুরূজ, ১খ, ৭৯ প; তাজু'ল-'আরূস, ঐ; আত-তাবারী, পূ. গ্র, ১খ, ২১৭)। কোন কোন আরব পণ্ডিত কাহ্তানকে য়ুকতানের আরবী রূপ বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন (আল-মাস'উদী, মু'রূজ ৩খ, ১৪৩; তাজু'ল-'আরূস, পূ. স্থা.)। Von Kremer (Altarabische Gedichte uber die Volkssage von Jemen, পৃ. ৭ প.)-ও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু য়ুকতান স্বরবিজ্ঞান বিধি অনুযায়ী কাহতান হইতে পারে না। য়ুকতান ও কাহ্তান একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করার কারণ সম্ভবত এই যে, হয়ত কোন এক প্রাচীন য়ামানী আরব কুরজীবিদ দুই নামের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ধ্বনিজ্ঞান বিধির অনুসরণ ছাড়াই দুইটি শব্দের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করিয়াই বাইবেল-এর য়ুকতানকে দক্ষিণ আরবের কাহতান-এর সঙ্গে এক করিয়া দিয়াছেন। কাহতান-এর শহর (যাবীদ ও সান'আ'-এর মধ্যে) যাহার বর্ণনা আল-মাকদিসী-র (আহসানু'ত-তাকাসীম, Bibl. Gegr. Arab., ৩খ, ৮৭, ৯৪) গ্রন্থেও রহিয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দক্ষিণ আরবে কাহতান নামে একটি গোত্র বসবাস করিত (দ্র. আল-কাহতান যাহার উল্লেখ ঐ গ্রন্থে পৃ. ১০৪-এ আছে এবং সেখানে তাঁহাকে য়ামানের প্রাচীনতম রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে)। সর্বশেষ ইহা বলাও অযৌক্তিক নহে যে, বর্তমানের কাহতান গোত্রের বংশধারা জাহিলী যুগ পর্যন্ত পৌছে।

সুবিশাল কাহতান গোত্র ইসলামী যুগে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ অপেক্ষাকৃত ছোট গোষ্ঠীটি ছিল হিম্য়ার এবং অপর বৃহৎটি ছিল কাহ্লান। নির্ভরযোগ্য কুলজীবিষয়ক পুস্তকে এই দুইজন (হিম্য়ার ও কাহ্লান)-কে ভাই হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহতানের সহিত তাহাদের বংশক্রম ছিল নিম্নরূপ ঃ য়া'রুব, য়াশ্জুব, সাবা', হিম্য়ার, কাহ্লান (Wustenfeld, Tabellen, পৃ. ১; আল-মাস'উদী, আত-তান্বীহ, পৃ. ৮০, লাইন ৬, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ২৯ ও স্থা.; ইব্ন 'আবদি রাব্বিহি, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ, কায়রো ১৩০৫ হি., ২খ, ৫৭-তে অপর দুইটি বংশধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন)। বাইবেলের আদি পুস্তক, ১০ম অধ্যায়, শ্লোক ২৬ প.-এর সহিত যাহার একটির সম্পর্ক। আদি পুস্তক-এ উল্লিখিত বংশ তালিকায় সাবা' (shaba)-কে সরাসরি য়াকতানের পুত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু আরবের কুলজীবিজ্ঞানিগণ সাবা' ইব্ন য়াশ্জুব ইব্ন য়া'রুব ইব্ন কাহ্তান এইরূপ বংশলতিকা উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. ইব্ন হায্ম, জামহারাতু আন্সাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৩২৯; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২খ, ১৬১; লিসান; তাজু'ল-'আরূস; উমার রিদা কাহ্হালা, মু'জাম কাবা'ইলি'ল-'আরাব)।

হিম্য়ার যাহারা ছিল মু'ঈনী সাবা'ঈ ও হিম্য়ারী রাজবংশের অযোগ্য উত্তরাধিকারী, তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তাহাদের অধিকাংশ ছিল শহরের অধিবাসী। ইহাদের বিপরীত কাহলানদের অধিকাংশ ছিল সম্ভবত বেদুঈন অথবা অর্ধ-বেদুঈন। Landberg (Arabica, ৫খ, ১১৬ প.)-এতে হিম্য়ার ও আরব য়ামানীদের মধ্যে "য়ামানের হিম্য়ার ও অন্য গোত্রসমূহ" এবং এই ধরনের আরও যে সকল বাক্য পাওয়া যায় সেইগুলি দ্রষ্টব্য। দক্ষিণ আরবের সহিত সম্পর্ক রাখে এমন গোত্রসমূহের মধ্যে যাহারা হযরত রাসূল আকরাম (স)-এর যুগে উত্তর আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি সিরিয়া ও ইরাকেও বসবাস করিত তাহাদের বেশীর ভাগই কাহ্লানের সহিত সম্পর্কিত।

স্পষ্টত কাহতান ও মা'আদ জাহিলী যুগেই গোত্রীয় রেষারেষির কারণে পরস্পর পৃথক হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবত উহার আসল কারণ মরুভূমি এবং শস্যক্ষেত্রের বিভিন্নতা। ইসমা'ঈলীদের উপর য়ামানীদের বারবার আক্রমণের কারণে এই শত্রুতা তীব্রতর হইয়া পড়ে। অন্যান্য বহু কারণে এই বিরোধিতা আরও বৃদ্ধি পায় যাহার প্রকাশ মাঝে মাঝেই হইতে থাকে যাহা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দুই শত বৎসর কাল পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। সম্ভবত এই গৃহযুদ্ধই য়ামানী ও ইসমা'ঈলীদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে। খ্যাতি ও মর্যাদা লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। এই সকল বিষয় লইয়া তাহারা নিজ নিজ গৌরবের বিবরণ সম্বলিত কবিতা (মুফাখারা)-ও রচনা করে (আল মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ, ১৩৬ এবং ২খ, ১৪২, স্থা.)। দক্ষিণ

আরবের প্রাচীন রাজ্যসমূহের শান-শওকতের প্রতি লক্ষ করিলে প্রতীয়মান হয় শুরুতে কাহ্তানীদের প্রাধান্য ও মর্যাদা ছিল অধিক। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব মা'আদ গোত্রীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। য়ামানীরা উহার বিরোধিতা করার চেষ্টা করে। প্রথমে তাহারা য়ামানী গোত্রসমূহের অতীত সম্পর্কে একটি গৌরবোজ্জ্বল কল্পিত কাহিনী রচনা করে (দ্র. নিম্নে গ্রন্থপঞ্জী)। তাহারা কাহ্তানকে হযরত হূদ (আ)-এর পুত্র বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হূদ ও 'আবারকে অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে (নাশওয়ান, আল-কাসীদাতু'ল-হিময়ারিয়া, সম্পা. von Kremer, পৃ. ৪; Die auf sudarabien bezuglichen Angaben Naswan's, পৃ. ৮৩; আল-য়া'কূবী, তা'রীখ, সম্পা. Houtsma, ১খ, ২২০; ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহি, পূ. গ্র., ২খ, ৫৭; আল-মাস'ঊদী, আত্-তান্বীহ, পৃ. ৮১; Doughty, পূ. গ্র., ২খ, ৩৭ ও স্থা.)। অতঃপর তাহারা নিজেদের বংশ লতিকাকে আদনানের সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা করে, তাহারা প্রাচীন গোত্র জুরহুম (দ্র.) [যাঁহারা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর স্ত্রীর দিক দিয়া সম্পর্কিত ছিলেন]-কে কাহ্তানের বংশের বলিয়া সাব্যস্ত করে (ইব্ন-হিশাম, পূ. গ্র., পৃ. ৪; আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারী, পূ. গ্র., পৃ. ৯; ইব্ন 'আবদি রাব্বিহি, পূ. গ্র., ২খ, ৫৭; আল-মাস'ঊদী, আত-তান্বীহ, পৃ. ১৮৫, আবু'ল-ফিদা', মুখতাসার তা'রীখি'ল-বাশার, যাহার কিছু অংশ Fleischer, Historia Anteislamica নামে প্রকাশ করেন, পৃ. ১৩০৭)। তদুপরি কতিপয় কুলজীবিশারদ কাহাতানের বংশ ধারাবাহিকভাবে সরাসরি হযরত ইসমা'ঈল (আ)-র সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। ফলে হযরত ইসমা'ঈল ('আ) সমগ্র আরবদের পিতা বলিয়া পরিচিত হয় (ইব্ন হিশাম, পূ. গ্র., পৃ. ৫; আত-তাবারী, পূ. গ্র., ৩খ, ২৪০০; আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৩খ, ১৪২; আরও আল-মাস'উদী, আত-তানবীহ, পৃ. ৮১; আদ-দিমাশকী, পূ. গ্র., পৃ. ২৪৬, ২৫২; আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, পত্রক ৪৪৩খ, ইত্যাদি)। সম্ভবত এই কুল্জীবিজ্ঞান এই দৃষ্টিভঙ্গিরও উদ্ভাবক যে কাহতান, 'আদ (দ্র.), ছামূদ, তাসাম, 'ইমলীক (দ্র. 'আমালীক), জাদীস (দ্র. তাসাম ইব্ন লাওয) প্রভৃতি গোত্রই আল-আরাব আল-বা'ইদা নাম দ্বারা পরিচিত অর্থাৎ ইহারাই খাঁটি প্রাচীন আরব (আল-'আরাবু'ল-'আরিবা)। পক্ষান্তরে মা'আদি দ্বিতীয় স্তরের আরব অর্থাৎ আল-'আরাবু'ল-মুস্তারিবা (বহিরাগত আরব)। অনুরূপ আর একটি মতবাদ হইল ঃ শুধু 'আদ, ছামূদ, ইত্যাদি আল-'আরাবু'ল-'আরিবা, কাহতান হইল আরাব মুতা'আর্‌রিবা এবং মা'আদ্দ হইল 'আরাব মুস্তা'রিবা (দ্র. Land, Lexicon, দ্র. আল-'আরাব, Knobel, পূ. গ্র., পৃ. ১৭৯ প.; আত-তাবারী, পূ. গ্র., ১খ, ২১৫; আল-মাস'ঊদী, আত-তান্বীহ, পৃ. ১৮৮)। কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের সহিত সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণিত আছে যাহার সনদ দক্ষিণ আরাবীয় ঃ ভবিষ্যতে একজন নেককার ও শারীফ কাহতানী শাসকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে [দ্র. মুতাহ্হার ইব্ন-তাহির আল-মাকদিসী, আল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, সম্পা. Huart, ২খ, ১৮৩ প. এবং Snouck-Hurgronje, Der Mahdi, পৃ. ১২ (=Verspreide Geschriften, ১খ, ১৫৬)]।

প্রাচীন আরবী অভিধানসমূহে (লিসানু'ল-'আরাব; কামূস ও তাজু'ল-'আরূস, قحط শব্দের অধীন) কাহতান-এর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া দুইটি বংশের উল্লেখ রহিয়াছে, উভয়টি দ্বারা সম্ভ্রান্ত আরব বুঝান হয়। কাহতানী (বিশেষ লক্ষণীয় পরিভাষা হইল আকহাতী) একটি গোত্র এখনও বর্তমান, উপরে যাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গোত্রটি সম্পূর্ণ বেদুঈন গোত্র এবং উভয় য়ামান ও দক্ষিণ হিজাযে (১৮° ও ২৩° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর) পূর্ব সীমান্তে নিজেদের তাঁবু পাতিয়া বসবাস করে। এই গোত্রের কতিপয় ক্ষুদ্র দল নাজ্দের দূর প্রান্ত পর্যন্ত, এমনকি ওয়াশাম ও কাসীমের জিলা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের জনসংখ্যা অনেক, পশু সম্পদও বেশী এবং উহারা শক্তিশালী, দক্ষিণ আরবের শ্রেষ্ঠ শারীফ বংশ বলিয়া তাহারা গৌরব করে (বর্তমান কাহতান গোত্রসমূহের বেশীর ভাগ নাজ্দ ও আসীর এলাকায় বসবাস করে)। কাহ্লান নামীয় একটি গোত্র এখন পর্যন্ত বর্তমান (দ্র. আল-'আরাব)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত উৎসসমূহ ব্যতীত ঃ (১) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, বূলাক ১২৮৪ হি., ২খ, ৪৬ প.; (২) আস-সুওয়ায়দী, সাবা'ইকু'য-যাহাব ফী মা'রিফাতি কাবা'ইলি'ল-'আরাব, বোম্বাই ১২৯৬ হি., পৃ. ১১৬; (৩) মুতাহ্হার ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী, আল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, সম্পা. Huart, ৪খ., ১০৫ প., ১১৬ নিম্নে প.; (৪) ইব্ন বাদরূন, শারহ্ কাসীদাতি ইব্ন 'আবদূন, সম্পা. Dozy, পৃ. ৭৬ প.; (৫) আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, দ্র. শব্দমূল; (৬) ইব্ন হাযম, জাম্হারাতু আন্সাবি'ল-'আরাব, নির্ঘণ্ট; (৭) আল-কালকাশান্দী, নিহায়াতু'ল-আরাব, দ্র. শব্দমূল; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২খ, ১৬১; (৯) 'উমার রিদা কাহ্হালা, মু'জাম কাবা'ইলি'ল-'আরাব, শব্দমূল দ্র.; (১০) von kremer, uber Sudarabische Sage, লাইপযিগ ১৮৮৬ খৃ.; (১১) Altarabiche Gedichte Uber die Volkssage von Jemen, লাইপযিগ ১৮৭৬ খৃ.; (১২) D. H. Muller, Sudarabische studien, ২য় সং. Sitzungslees d. Phil.-hist. Klasse der Wiener Akad d. Wiss, ৮৬খ, ভিয়েনা ১৮৭৭ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, Die Burgen und Schlosser Sudarabiens nach dem Iklili, des Hamdani, প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ (উপরে উল্লিখিত Sitzungsber দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৪ ও ৯৭খ, ভিয়েনা ১৮৭৯ খৃ., ১৮৮১ খৃ.; (১৪) E. Griffini, Il Poemetto di Qudam ben Qadim. Nuova versione della Saga Jamenica del regente 'Abd Kulal (400-480 di Cristo), আরবী পাঠ, অনু. এবং ভাষ্যসহ, Riv. degli Studi Orient, ৭খ, (রোম ১৯১৬ খৃ.)।

বর্তমান যুগের কাহতানের জন্য ঃ (১৫) Niebuhr, Beschreibung von Arabien, পৃ. ২৭৫; (১৬) Burckardt, Reisen in Arabien, পৃ. ৬৭২, ৬৮০ প.; (১৭) ঐ লেখক, Notes on the Beduins and Wahabys, ২খ, ৪৬; (১৮) Sprenger, Zeitschr. d. Deutsch Morgenl Gesellsch, ১৭খ, ২১৬; (১৯) ঐ লেখক, Post-u. Reiserouten des orients, পৃ. ১৩০ প.; (২০) Euting, Tagebuch einer Reise in Inner-arabien, ১খ, ১৪২, ২০৮, ২খ, ২; (২১) Landberg, Etudes sur les dialectes de 'l' Arabie Meridionale, ২খ, Datinah, ৩১৪, ৫৫০ প.; (২২) J. J. Hess, Kahtanische Beduinenlieder, in Verhandl. des xiii Internat. Orientalisten,

Kongresses, পৃ. ৩০২ প.; (২৩) ঐ লেখক, Beduinennamen aus Zentralarabien (Sitzungsber. der Heidelberger Akad. d. Wiss, ১৯১২ খৃ., সংখ্যা ১৯), পৃ. ১০ প.; (২৪) Doughty, Travels in Arabia Deserta, নির্ঘণ্ট, কাহ্তান-এর অধীন, (২৫) H. St. J. B. Philby, The Heart of Arabia, লন্ডন ১৯২২ খৃ., দুই খণ্ডে, নির্ঘণ্ট, কাহ্তান-এর অধীনে; (২৬) A Handbook of Arabia, Geogr. Saction of the Naval Intelligence Division. কর্তৃক সংকলিত নির্ঘণ্ট, কাবা'ইল কাহতান-এর অধীনে; (২৭) আল-বাতানূনী, আর-রিহলাতু'ল-হিজাযিয়্যা, ২য় প্রকাশ, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ৫৩-৫৪; (২৮) আল-আলূসী, তা'রীখু নাজ্দ, পৃ. ৮৯; (২৯) হাফিজ ওয়াহ্বা, জাযীরাতু'ল-'আরাব, পৃ. ৫৩; (৩০) আল-বারাকাতী, আর-রিহ্লাতু'ল-য়ামানিয়্যা, পৃ. ৪৯।

A. Fischer (দা. মা. ই.)/ মোহাম্মদ হোসাইন

কাহ্তাবা ইব্ন শাবীব আত-তা'ঈ (قحطبة بن شبيب الطائى)ঃ একজন আরব সেনাপতি যাঁহার আসল নাম যিয়াদ ছিল। কাহ্তাবা-র উল্লেখ প্রথমবার ১০০/৭১৮-৭১৯ সালে 'আব্বাসীদের খুরাসানী বারজন নেতৃবর্গের অন্যতম, যাঁহাদিগকে কূফার দূত 'আব্বাসী আবূ ইকরিমা আস্-সাররাজ 'আব্বাসীদের পক্ষে প্রচারের কাজ জোরদার করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন গ্রীষ্ম ঋতুতে ১২৯/৭৪৭ সালে এই বিপ্লবের সূচনা হয় যাহার প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতেছিল; এই বৎসর হাজ্জের সময় কাহ্তাবা 'আব্বাসীদের পরিচালক মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (দ্র.)-এর সহিত নিজে মিলিত হওয়ার জন্য মক্কায় গিয়াছিলেন। ১৩০/৭৪৭-৪৮ সালে ইবরাহীম কর্তৃক সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া তিনি খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ মুসলিম (দ্র.) উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সর্বপ্রধান সেনাপতিত্বের দায়িত্ব কাহ্তাবাকে প্রদান করেন এবং তিনি তূস নামক স্থানে খুরাসানের শাসনকর্তা নাস্র ইব্ন সায়্যার-এর পুত্র তামীম ইব্ন নাসরকে পরাজিত করেন। তামীম যুদ্ধে নিহত হন এবং নাস্রকে নীশাপুর ত্যাগ করিয়া জুরজানে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। য়াযীদ ইব্ন 'উমার দুবায়রা যখন নুবাতা ইব্ন হান্জালা আল-কিলাবীর অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী জুর্জানে প্রেরণ করেন তখন কাহ্তাবা তাঁহার মুকাবিলা করেন। ১ যি'লহাজ্জ, ১৩০/১ আগস্ট, ৭৪৮-এ নুবাতা পরাজিত ও নিহত হন। নাস্র পুনরায় আরও একবার পলায়ন করেন। যে কোনভাবে হামদানে পৌছিয়া যাওয়াই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাবী'উ'ল-আওওয়াল ১৩১/নভেম্বর ৭৪৮-এ তিনি পথেই মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় কাহতাবা পাশ্চাত্য দেশসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ঐ দিকে তাঁহার পুত্র হাসান নাহাওয়ান্দ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইখানে নাস্রের অবশিষ্ট খুরাসানীদের সৈন্য হামাযানের শাসকের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া সিরীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। এইদিকে কাহ্তাবা, ২৩ রাজাব, ১৩১/১৮ মার্চ, ৭৪৯-এ ইসফাহানের নিকট জাবালুক নামক স্থানে 'আমির ইব্ন দু'বারা আল-মুররীর মুখামুখি হন যিনি একটি বিরাট সিরীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আসিতেছিলেন। 'আমির রণক্ষেত্রে নিহত হন। কাহ্তাবা নিজ পুত্রের সহিত আসিয়া মিলিত হন, তখন নাহাওয়ান্দের অবরোধ প্রবলতর হইয়া উঠে। কয়েক মাস অবরোধের পর সিরীয় সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। তাহাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক খুরাসানী সৈন্যও ছিল, তাহাদের প্রায় সকলকেই হত্যা করা হয়। অতঃপর কাহ্তাবা হুলওয়ান ও খানুকীনের পথ দিয়া রওয়ানা হন। ইব্ন হুবায়রা একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, কাহ্তাবা আত্মরক্ষার্থে তাইগ্রীস নদী সাঁতরাইয়া অপর পাড়ে গমন করেন। তৎপর আম্বারের সন্নিকটে তাঁবু সন্নিবেশিত করেন। যখন ইব্ন হুবায়রা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ফুরাত নদীর পশ্চিম প্রান্তে ফুরাতের মোহনায় বাদাক্লা নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন, তখন কাহ্তাবা নদী অতিক্রম করিয়া উহার পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া চলিতে থাকেন এবং শত্রু সৈন্যবাহিনীর একেবারে সম্মুখে পৌছিয়া যান। ৮ মুহাররাম, ১৩২/২৭ আগস্ট, ৭৪৯-এর রাত্রে কাহ্তাবা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া আবার নদী সাঁতরাইয়া অতিক্রম করেন এবং ইব্ন হুবায়রা-র উপর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসেন যিনি কোনমতে জীবন লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করেন। যুদ্ধের হাঙ্গামার পর কাহ্তাবার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকিলে কিভাবে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-য়া'কূবী, সম্পা. Houtsma, ২খ, ৩৯২, ৩৯৮ প. ৪১০-৪১২; (২) আত-তাবারী, সম্পা. de Goeje, ২খ, ১৩৫৮, ১৭২৭, ১৭৬৯, ১৯১৬, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৮৮, ২০০০-২০০৬, ২০১৬ এবং ৩খ, ১-৯, ১২-১৯; (৩) ইবনু'ল-আছীর সম্পা. Tornberg, সংশ্লিষ্ট শব্দ দ্রষ্টব্য; (৪) ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, ৩খ, ১১৭, ১২৪ প.; (৫) Weit, Gesch. d. Chalifen, ১খ, ৬৯৮ প.; (৬) Wellhausen, Das arabische Reich, পৃ. ৩১৫, ৩১৯, ৩২৫, ৩৩৫ প.।

K. V. Zettersteen (দা. মা. ই.)/ মোহাম্মদ হোসাইন

কাহ্তাম বিন্ত 'আলকামা (قحطم بنت علقمة) ঃ (রা) জনৈকা সাহাবিয়া। সালীত ইব্ন 'আম্র (রা)-এর পত্নী। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনানুসারে তিনি ও তাঁহার স্বামী সালীত (রা) হাব্শায় হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কাহ্তাম (রা)-এর বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কোনও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে কি না জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ, ৫৩৫; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ৩৯১; (৩) আয্-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২৯৮।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

কাহ্ফ (দ্র. আসহাবু'ল-কাহ্ফ)

কাহ্মাস আল-হিলালী (كهمس الهلالى) ঃ (রা), কুন্য়া আবূ সালামা (أبو سلمة), পিতার নাম মু'আবিয়া ইব্ন আবী রাবী'আ, তিনি বসরায় বসবাস করিতেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি আত-তায়ালিসী ও সামাওয়ায়হ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মু'আবিয়া ইব্ন কুররার সূত্রে কাহমাস (রা) হইতে। তিনি বলেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা জানাইলাম। ইহার পর দীর্ঘ এক বৎসর (তাঁহার নিকট হইতে) অনুপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তাঁহার নিকট এমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম যে, আমার পেট শুকাইয়া গিয়াছিল এবং আমার দেহ কৃশ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দৃষ্টি নিচু করিয়া নিলেন অতঃপর আবার দৃষ্টি

উত্তোলন করিলেন। আমি বলিলাম ঃ আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন নাই ? আমি কাহ্মাস আল-হিলালী, এক বৎসর পূর্বে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে এইরূপ (কৃশ) দেখিতেছি কেন ? তোমার কি হইয়াছিল ? আমি বলিলাম ঃ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর হইতে আমি এক রাত্রিও ঘুমাই নাই। প্রতিটি রাত্রি 'ইবাদাতে কাটাইয়াছি এবং প্রতিদিন রোযা রাখিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ নিজের দেহকে শাস্তি দেওয়ার এইরূপ নির্দেশ তোমাকে কে দিয়াছে ? ধৈর্যের মাসে (রমযানের মাসে) রোযা রাখ এবং প্রতি মাসে এক দিন করিয়া রোযা রাখ। আমি বলিলাম ঃ আরও বাড়াইয়া দিন, আমার ইহার অধিক রোযা রাখার শক্তি আছে। তিনি বলিলেন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখ এবং প্রতি মাসে দুই দিন করিয়া (নফল) রোযা রাখ। আমি বলিলাম, আরও বাড়াইয়া দিন, ইহারও অধিক রোযা রাখার শক্তি আমার আছে। তিনি বলিলেন ঃ রমযান মাসের রোযার পর প্রতি মাসে তিনদিন করিয়া (নফল) রোযা রাখ।

মু'আবিয়া ইব্ন কুররা আল-মুযানী (معاوية بن قرة المزنى) বলেন ঃ আমি পনির ও ঘি-এর মৌসুমে মদীনায় আসিলাম। এই সময় বেদুঈনরা গম লইয়া মদীনায় আসে। আমি এক ব্যক্তিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়া লোকদের দিকে তাকাইতে দেখিলাম। আমার মনে হইল তিনি গরীব। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শহরের বাসিন্দা ? আমি বলিলাম, হাঁ। আমি তাঁহার নিকট বসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ? তিনি বলিলেন, আমি হিলাল গোত্রের লোক এবং আমার নাম কাহ্মাস। তিনি পুনরায় আমাকে বলিলেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদীছ বলিব যাহা আমি 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-র সাক্ষাতে লাভ করিয়াছি ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, একদা আমরা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিল, হে আমীরু'ল-মুমিনীন। আমার স্বামীর দোষক্রটি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সদগুণ কমিয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কে ? সে উত্তর দিল, আবূ সালামা। তিনি বলিলেন, সে তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ও সত্যবাদী। অতঃপর 'উমার (রা) তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ নহে কি ? সে বলিল, হে আমীরু'ল-মুমিনীন ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমিও তদ্রূপই জানি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৩০৮, ৪খ, ৯৩-৪; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব (উক্ত ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ৩২১); (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৪খ, ২৫৬; (৪) 'আবদুর-রাহমান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জার্হ ওয়া'ত-তা'দীল, ৭খ, ১৭০; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত তা.বি., ৭খ, ৪৬।

মুহাম্মদ মূসা

কাহ্য়া ঃ (কেতখুদা) বা জেনাযে-হাসান পাশা, 'উছমানী সুলতান তৃতীয় সেলিমের অধীনে 'উছমানী উযীর। সারকাসীর বংশোদ্ভূত একজন দাস; তিনি মেলেক মেহমেদ পাশা (দ্র.)-র কাহ্য়া (কেতখুদা) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চপদস্থ 'উছমানী আমীর-উমারা-র অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তী কালে তিনি কেতখুদা হাসান পাশা নামে পরিচিত হন। মোরিয়ায় গ্রীক বিদ্রোহের সময় তাঁহার সামরিক দক্ষতা প্রথমবারের মত প্রকাশ পায়; তিনি ত্রিপোলিতযার একজন মুতেসেল্লিম (mutesellim) হিসাবে ২৩ যি'ল-হাজ্জ, ১১৮৩/১৯ এপ্রিল, ১৭৭০ সালে অবরোধকারী বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করেন। তিনি মুহার্রাম, ১২০২/নভেম্বর ১৭৮৭ সালে উযীর উপাধিসহ ভিদীন দুর্গের অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং মেলেক মেহমেদ পাশা ঐ সময় ভীদিনের সেরাসকার (ser'asker) পদমর্যাদা লাভ করেন। রাবী'উছ-ছানী ১২০২/ জানুয়ারী ১৭৮৮ সনে মেহমেদ পাশা পদচ্যুত হওয়ার পর হাসান পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। রুশ ও অস্ট্রীয় যুদ্ধ চলাকালে ১৭৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে অস্ট্রীয়ানদের বিরুদ্ধে আরসোবা, মেহাদিয়া ও সেবেস বিজয়ের পর তিনি এতই সুনাম অর্জন করেন যে, নূতন সুলতান তৃতীয় সেলীম [দ্র.] তাঁহাকেও রামাদান, ১২০৩/২৮ মে ১৭৬৯ প্রধান-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। গুরুতর অবস্থায় অসুস্থ রাসবুকের সেনা সদর দফতরে তাঁহাকে খাঁটিয়াযোগে আনা হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার দ্বিতীয় উপনাম জেনাযে (লাশ) লাভ করেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রীত্ব কাল খুব সুখের হয় নাই। বস্তুত ৯ যু'ল-কা'দা/১ আগস্ট কেমানকেশ মুসতাফা পাশার নেতৃত্বাধীনে 'উছমানী সৈন্যদল অস্ট্রোরুশ যৌথ বাহিনীর নিকট ফকশানী-তে পরাজিত হয়। উপরন্তু তাঁহার নেতৃত্বাধীন পরিচালিত মূল বাহিনী ২ মুহাররাম, ১২০৪/২২ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ তারিখে রিমনিক নদীর তীরবর্তী মারতিনেশতি নামক স্থানে পরাজয় বরণ করে। অতঃপর অস্ট্রীয়দের দ্বারা বেলগ্রেড ও বুখারেস্ট এবং রুশদের দ্বারা আক্‌কেরমান ও বেনডার অধিকৃত হইলে ৫ রাবী'- ১/২৩ নভেম্বর হাসানকে প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে পদচ্যুত করা হয় এবং জেযা'ইরলি গাযী হাসান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনি রুশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হইতে সফলতার সহিত ইসমা'ঈল-কে রক্ষা করেন। জুমাদা-১/ জানুয়ারী ১৭৯০ তারিখে রাসচকের অধিপতি মনোনীত করিয়া তাঁহাকে বজযা-আদাতে নির্বাসন দেওয়া হয়। ইহার দুই বৎসর পর যু'ল-কা'দা, ১২০৬/ জুন ১৭৯২ তিনি সিলিসটর-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। পরে ক্রীটে বদলী হন। ১ জুলাই, ১৭৯৮ সালে ফরাসী বাহিনী যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করে তিনি তখন মোরিয়ার গভর্নর ছিলেন। অতঃপর ইয়েগি-শেহিরে (লারিসা) কিছুকাল অবসর জীবন যাপনের পর তিনি বেনডার দুর্গের অধিনায়ক হন। কিন্তু ২৭ রামাদান, ১২২১/৮ ডিসেম্বর, ১৮০৬ সালে এক আকস্মিক আক্রমণে তিনি দুর্গটি রুশদের কাছে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং যুদ্ধবন্দীরূপে রাশিয়ায় নীত হন। সেখান হইতে মুক্তি পাইবার পর ১২২৫/১৮১০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইয়েগি-শেহিরে বসবাস করেন। একজন সাহসী যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও সমরনায়ক হিসাবে অথবা দক্ষ শাসক রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) de Salaberry, Histoire, de l'Empire Ottoman, Paris 1824, ৪খ, ১২৮ প.; (২) আহমেদ জাবীদ, হাদীকাতু'ল-উযারা', পরিশিষ্ট ২, ৪০ প.; (৩) Zinkeisen, ৬খ, ৬৬৬ প.; (৪) জেওদেত, তা'রীখ^{2}, ৪খ, ৩৩, ৬০-৬৮, ৩০৬-৩৯, ৫খ, ৪-৬, ২৭৩, ৬খ, ৩৩০, ৮খ, ৯৫-৯; (৫) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ২খ, ১৬৪; (৬) I. H. Uzuncarsili Osmanli Tarihi, Ankara 1956-59, ৪/১-২খ, নির্ঘণ্ট; (৭) S. J. Shaw, Between old adn new; the Ottoman Empire under Sultan

Selim III, 1789-1807, Cambridge, Mass. 1971, Index.

E. Kuran (E.I.²)/ নুরুল আমিন

কাহরামাননামা (قهرمان نامه) ঃ দাসতন-ই কাহরামান (داستان قهرمان) ফারসী ভাষায় গদ্যাকারে রচিত এক বীরত্বমূলক কাহিনী রমন্যাস। দারাবনামা, কিরান-ই জাবাশী, হুশাংনামা, ফাগ্কুরনামা, তাহ্মুরাছনামা প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানা নিজস্ব বিষয় ভিত্তিক গদ্যাকারে রচিত মহাকবি ফেরদাওসীকৃত শাহনামার (شاهنامه) সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রথমোক্ত দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় ইহাও আবূ তাহির তারতূসীর (তারতূসী দ্র.) প্রতি আরোপিত। প্রাচীন ইরানী বাদশাহগণের মধ্যে হুশাং-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময় হইতেই এই বীরত্বমূলক কাহিনী প্রচলিত। কাতিল (ঘাতক) উপাধিপ্রাপ্ত বীর কাহরামানের কৃতিত্বের বর্ণনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী তুর্কী জনগণের পছন্দনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। আট খণ্ডে প্রকাশিত এই সুদীর্ঘ গ্রন্থখানা মাত্র এক খণ্ডে সংক্ষিপ্তাকারে প্রণীত হইয়াছে। ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভারতীয় মুসলমান ও অগ্নিপূজকদের এক বিশেষ আকর্ষণীয় চিত্র অংকন করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও ইহাতে অনেক গল্প ও কাল্পনিক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানার তুর্কী সংস্করণে কোন কোনও স্থানে গদ্যের সহিত পদ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও রণ গাথার ক্ষেত্রে (Ballads) সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণীয় বর্ণনাভঙ্গিই বইটিতে সাধারণত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু বিদ্রূপাত্মক, কৌতুকপূর্ণ কাহিনীও দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রশংসাকারিগণের ঘটনা প্রবাহ, হাস্যরসাত্মক কাহিনী ও স্তুতি বাক্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রোমান্স গ্রন্থের বহু স্থানে চাতুর্যপূর্ণ, প্রতারণামূলক এবং মল্লবীরের ব্যক্তিত্বকে দ্বিতীয় পদমর্যাদা প্রদান করায় প্রকৃত নায়ক বীর কাহ্রামান-এর ব্যক্তিত্ব মলিন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহার বোকামী দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছে (দ্র. দীওয়ান-ই বাকী, লিথু প্রেস, কুসতুনতিনিয়া, হি. ১২৫৬, কাসীদা ১)।

এই রমন্যাসের সারসংক্ষেপ হইল ঃ ইরানের শাহ তাহ্মাসপ-এর তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র কাহরামানকে একদা এক দৈত্য লইয়া যায় এবং ককেসাস পর্বতের দৈত্য তাহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করে। একমাত্র পুত্রের বিরহ ব্যথায় মুহ্যমান তাহ্মাসপ-এর অকাল মৃত্যু ঘটে। কাহরামানের চাচাতো ভাই কাহ্তারাসপ (قهتراسپ) ভাবী যুবরাজ এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করেন। হুশাং (هوشنگ) বাদশাহ নিযুক্ত হন এবং কাহ্তারাসপ মল্লযোদ্ধা হিসাবে তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই কাহিনীতে এই ধারণা ব্যক্ত করা হইয়াছিল যে, রাজত্ব হইতে বীরত্ব উত্তম। কেননা, রাজতখ্ত বীর সৈনিকদের তরবারির শক্তিতেই টিকিয়া থাকে।

হুশাং ভারত বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে কাহ্রামানের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। বড় হইয়া তিনি এক দুধর্ষ মল্লযোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। দৈত্যের বন্দীদশা হইতে পলায়ন করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একজন স্বাধীনচেতা বীর সৈনিকের ন্যায় তিনি নিজের জন্য এক আবাসস্থল অন্বেষণ এবং ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাপৃত হন। স্বীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া কাহরামান হুশাং-এর মল্লযোদ্ধার সহিত কয়েকবার বীরদর্পে প্রাণপণে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। পরিশেষে কাত্রান (قطران)-এর মধ্যস্থতায় তাঁহার পূর্ণ পরিচিতি ঘটে। তৎপর তিনি অকপটে হুশাং-এর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার বীর সৈনিকদের বাহিনীভুক্ত হইয়া ভারতে চলিয়া আসেন। তথায় দীর্ঘকাল যাবত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে অতিবাহিত করেন। সেই সময় কয়েকবার অবস্থান পরিবর্তন করেন, শেষ পর্যন্ত ইরানী রণ-কৌশল অবলম্বনে রাজধানী অধিকার করেন, যুদ্ধে ভারতের শাহ্ মারা যান। ইরানীগণ বিজয়ের গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে কাহরামান গৌরবদীপ্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং এই মহাসমরে বিজয়ের মুকট অর্জন করেন।

তাঁহার ঘোড়া ছিল একটি সামুদ্রিক দৈত্য, ইহার ছয় খানা পা, চারিটি চোখ এবং একটি শিং ছিল। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে ইহাকে বশীভূত করেন। তাঁহারা বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দর্শন করিয়া ভারতের শাহ-এর তনয়া, যিনি স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া অপরাজিত থাকেন এবং কখনও হেয় বিবেচিত হন নাই, তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন (এই কাহিনীর অন্যত্রও বীরঙ্গনাদের কৃতিত্বের কাহিনী আছে)। কাহ্রামান শীঘ্রই আরেকবার হুশাং-এর অন্যতম পাহ্লাওয়ান বাহ্রামের মাতাকে এক দৈত্যের খপ্পর হইতে উদ্ধারকল্পে যাত্রা করেন। দৈত্য এই মহিলাকে এক অনতিক্রম্য বেলোয়ারী পাহাড়ের গুহায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল। কাহরামান তখন কারূনের যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রথমে নিজের অপহৃতা নববধূকে উদ্ধার করেন এবং পরে বাহ্রামের মাতাকেও মুক্ত করিতে সক্ষম হন। ইরানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ভারতীয় শাহযাদীকে বিবাহ করেন এবং হুশাং-এর স্থলাভিষিক্ত শাহ তাহ্মূরাছ (طهمورث)-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিরদাওসী, শাহনামা, ফরাসী অনু. J. Mohl, Le Livre des Rois, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., পৃ. ৮৭ প.; (২) H. Ethe, Neupersische Litteratur, in Grundr. der Iran. Phil., ২খ., পৃ. ৩১৮; (৩) Gibb, History of Ottoman Poetry, ৩খ, পৃ. ১৪৯, টীকা ৬; (৪) Fleischer, Cat. libr. Manuscr. qui in Bibl. Senatoria Civitatis Lips. asservantur, পৃ. ৫২২ প., সংখ্যা ২৮০; (৫) Cat. Cod. Manuscr. Bibl. Regiae, প্যারিস ১৭৩৯ খৃ., Codices Turcici, সংখ্যা ৩২০, ৩২১, ৩৪৩, ৩৪৪; (৬) Flugel, Die arab. pers. u. Turk. Handschr. ...Zu Wien, ২খ, সংখ্যা ৭৯৯; (৭) Pertsch, Die Turk. Handschr ... Zu. Gotha, সংখ্যা ২৫৪-২৫৭; (৮) ঐ লেখক, Verz. der Turk. Handschr...Zu Berlin, সংখ্যা ৪৭৬; (৯) Verz. der Pers. Handschr ... Zu Berlin, সংখ্যা ১০৩৯; (১০) Rieu, Cat. of the Turkish Mss. in The Brit. Mus, পৃ. ২২০ (الف); (১১) কাহরামাননামা, তুর্কী অনু. মুহাম্মাদ আমীন য়ামানী আস্-সাল্‌মানীবী (লিথো ইস্তাম্বুল, ১২৮৫ হি.); (১২) দা. মা. ই., ১৬/২খ, ৫০১-৩।

Th. Menzel (E.I.²)/ মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

কাহ্রুবা (كهربا) ঃ (কাহ্রাবা'-রূপেও লিখিত হইয়া থাকে; ইহার অন্যান্য শব্দরূপ জানিবার জন্য দেখুন Worterbuch der Klass.

arab. Sprache, দ্র. كهربا ও W. Schmucker, Die Pflanzliche und mineralische Materia Medica im Firdaus al-Hikma des Tabari, বন ১৯৬৯ খৃ., ৪১৪), হলুদ বর্ণ আম্বর। শব্দটি ফারসী ভাষা হইতে উদ্ভূত [পাহলাবী উদ্ধৃতিসমূহ দেখুন, G. Jacob, ZDMG, xliii (১৮৮৯ খৃ.), ৩৫৮], ইহার অর্থ এক ধরনের খড় আকর্ষণকারী বস্তু। E. Teres সম্পাদিত Dioscorides-এর আরবী অনুবাদে (তেতুয়ান ১৯৫২ খৃ., বার্সিলোনা ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৮৪, দ্র. Diyslops (মূল গ্রীক হইতে Wellmann কর্তৃক সম্পাদিত, ১খ, ৮২) শব্দটি দৃষ্ট হয়। যেহেতু Stephanos b. Basileios কর্তৃক মূলত অনূদিত গ্রন্থটি হুনায়ন ইব্ন ইসহাক কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে, অধিকন্তু গ্রন্থটির সম্পাদনাকালে কর্ডোভার তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের জন্য প্রণীত নামসমূহের ব্যাপারে অন্য একটি সর্বজনজ্ঞাত অনুবাদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে কি না তাহার কোন ইঙ্গিত নাই [দ্র. M. Meyerhof, Die Materia Medica des Dioskuides bei den Araben (Index Islamicus, নং ৫৩৫১), সেইহেতু শব্দটির উল্লিখিত ব্যবহারই সর্বপ্রাচীন কি না তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক ৩য়/৯ম শতাব্দীর দুইজন আরব লেখক কর্তৃক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ (১) 'আলী ইব্ন সাহ্ল রাব্বান আত-তাবারী কর্তৃক ২৩৬/৮৫০ সালে লিখিত ফির্দাওসু'ল-হিকমা (এই সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, Worterbuch, পৃ. স্থা. এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য Schmucker, পৃ. স্থা. ['কূর্ত'=Qurt অর্থাৎ মূসা ইব্ন মায়মূন (১১৩৫-১২০৪)-এর অনুসারী, শারহ আসমা' আল-'উক্কার, সম্পা. Meyerhof, ১৯৪০ খৃ.] এবং (২) আল-কিন্দী, আকরাবাযীন (দ্র. M. Levey, The Medical Formulary, ১৯৬৬ খৃ., নং ২২৪, পৃ. ৩২০)। অধুনা শব্দটি বিদ্যুৎ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়।

ইসলামী গ্রন্থাদিতে এই জিনিসটির একটিমাত্র নাম ব্যবহারের ফলে কোন স্থান হইতে এই আম্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান ইসলামে পৌঁছিয়াছে তাহা ধারণা করা যায়। আল-মুকাদ্দাসী খাওয়ারাযম হইতে বুলগারস্ (দ্র.)-এর পথে আমদানীকৃত পণ্যাদির তালিকায় ইহা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। Theophrastus ও Pliny কর্তৃক লিখিত Scythia-তেও ইহার অনুরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল হইতে এই আম্বরের আমদানী হইত।

অধিকাংশ মুসলিম লেখক উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আম্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। আল-বীরূনী তাঁহার কিতাবু'ল-জামাহির ফী মা'রিফাতি'ল-জাওয়াহির (২১০-২১২) গ্রন্থে বলেন যে, তিনি এই বস্তুটি সম্পর্কে চর্চা করেন, কারণ পূর্ব তুরস্কে ইহা খুবই জনপ্রিয়, তাহারা ইহাকে বিভিন্ন প্রকার শৃংগের (খুতূ) মত সংগ্রহ করিয়া রাখে। যেসব লেখক ইহার অ-খনিজ উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত নহেন তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলেন, তাহারা যেন এইগুলির মধ্যে আবদ্ধ পাতা ও কীটসমূহ দেখেন নাই। সিন্দুক ও আম্বরের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রতিও সব সময়েই গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে।

মণিমুক্তা, অলংকার ও যাদু-কবচে ইহার ব্যবহার ছাড়াও আম্বর ঔষধরূপে, যেমন ঃ চূর্ণীকৃত অবস্থায় ইহা সংকোচক ও রক্তক্ষরণ, রোধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আম্বরের বাণিজ্যপথ সম্পর্কে Jacob অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃ. স্থা. ও খণ্ড x l v (১৮৯১ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উদ্ধৃত বরাত ছাড়াও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের উদ্ধৃতির জন্য দেখুন (১) ইব্নুল-বায়তার, ৪খ, ৮৮ প. এবং (২) আল-আনতাকী, তাযকিরা, ১৩৪৩/১৯২৩, ১খ, ২৫৩ প.; (৩) আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ কাশানী, 'আরা'ইসু'ল-জাওয়াহির ওয়া নাফা'ইসু'ল-আতা'ই, সম্পা. আফশার (ফারসী), তেহ্রান ১৩৪৫/১৯৬৬-৭, ১৪৬; (৪) G. C. Williamson, The book of amber, 1932 (দেখা হয় নাই)।

M. Plessner (E.I.[2])/ মোঃ নুরুল আমিন

আল-কাহ্হাল (দ্র. 'আলী ইব্ন 'ঈসা)

কাহারোল (كهرول) ঃ দিনাজপুর জিলার (সাবেক বৃহত্তর দিনাজপুর জিলার সদর মহকুমার) একটি উপজিলা, ৬টি ইউনিয়ন ও ১৫৩টি গ্রাম লইয়া গঠিত। আয়তন ২১৮.৬ বর্গ কি. মি. (৮৪.৪ বর্গ মা.), তন্মধ্যে ২ বর্গ কি. মি. অংশ নদী। দিনাজপুর শহর হইতে ১২ মা. উত্তরে এই উপজিলা। ২৫°৪৪ ও ২৫°৫৩ উত্তর দ্রাঘিমাংশ ও ৮৮°৩০ ও ৮৮°৪৩ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। ১৯৬১ খৃ. জনসংখ্যা ছিল ৪৯,৩৫৬ জন, ১৯৮১ খৃ. জনসংখ্যা ৯৩,৪২৩ জন, তন্মধ্যে মুসলমান ৪৬,৪৪২ জন, হিন্দু ৪৪,১৪১ জন, বৌদ্ধ ৫২ জন, খৃষ্টান ৪৩১ জন, প্রকৃতিপূজারী ১,৬১৭ জন। প্রতি বর্গ কি. মি. ৪২৭ জন (প্রতি বর্গ মা. ১,১০৭ জন) লোক বাস করে, শিক্ষিতের হার ১৬.৭% জন। এই উপজিলার পূর্বাংশ দিয়া ঢেপা নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গিয়া পুনর্ভবা নদীতে পতিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরও দুইটি ছোট নদী এখান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কাহারোলের উত্তরে বীরগঞ্জ উপজিলা, পূর্বে খানসামা ও চিরির বন্দর উপজিলা, দক্ষিণে বিরোল উপজিলা ও পশ্চিমে বোচাগঞ্জ উপজিলা। এই উপজিলাটি (থানা) ১৯১৫ খৃ. সৃষ্টি করা হয়।

দিনাজপুর জিলার ঐতিহাসিক মেহরাব আলী বৃহত্তর দিনাজপুর জিলার ভূমিরূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাহা এই উপজিলার ক্ষেত্রে হুবহু খাটে। "কিছুটা নগর-বন্দর বাদে জিলার প্রায় সবটাই গ্রামদেশ। গ্রামমাত্রই অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, কিন্তু এই সৌন্দর্য বৈচিত্রহীন ও ছিন্নভিন্ন। গ্রামমাত্রেরই কাছাকাছি ছড়াইয়া আছে বিভিন্ন শস্যের আবাদের সুসমতল শস্য-শ্যামল চিরউর্বর বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র। ভূতাত্ত্বিকভাবে দিনাজপুর জিলার মাটি দুইভাগে বিভক্ত, খিয়ার ভূমি ও পলিভূমি। খিয়ার ভূমির মাটি শক্ত, আঠাল, ধূসর বর্ণ ও কর্দমপূর্ণ। এই মাটি প্রচুর উর্বরা শক্তিসম্পন্ন। পক্ষান্তরে পলি অঞ্চলের মাটি পলি ও বালিমিশ্রিত ঈষৎ পঙ্কিলময়। ইহাও বিশেষ উর্বরা শক্তিসম্পন্ন মাটি। মোটামুটিভাবে জিলার পূর্ব-দক্ষিণাংশ খিয়ার এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ পলি মাটির অন্তর্ভুক্ত। উভয় অঞ্চলের গ্রাম-প্রকৃতি ও মাটি চাষের মত বাসেরও নিতান্ত উপযোগী। ... বৃহৎ কোন নদনদী নাই, কিন্তু আছে অসংখ্য ছোট নদী ও নালা। ইহার নদীমাত্রই দক্ষিণ গামিনী। ... এসব নদীর ধারা-বিধৌত দিনাজপুরের মাটি স্বাভাবিকভাবে উর্বরা, সুজলা, সুফলা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রসূ। বস্তুতপক্ষে নদী এই জিলার অভিশাপ নহে, আশীর্বাদ" (দ্র. মেহরাব আলী, দিনাজপুরের আদিবাসী)। হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল বলিয়া এখানকার ভূমি গঠিত হইয়াছে বহু লক্ষ বৎসর আগে, ইহাই বিখ্যাত বরেন্দ্রভূমি। মাটির অনেক গভীরে অগণিত পাথর পাওয়া যায়। সেগুলির কিছু এখানে সৃষ্টি হইয়াছে, আর কিছু হিমালয় হইতে সুপ্রাচীনকালে নদীবাহিত হইয়া আসিয়া জমা হইয়াছে। ঢেপা নদীর পানি শীতকালে পরিষ্কার টলটলে থাকে, পরিশোধন

ছাড়াই পান করা যায়। তাহা ছাড়া এখানকার আরেক বৈশিষ্ট্য হইল যে কোন স্থানে মাত্র কয়েক হাত খুঁড়িলেই পানি পাওয়া যায়, নলকূপের নল এখানে কোনখানেই ১০ ফুটের বেশী দীর্ঘ নহে। পানির সহজলভ্যতার জন্য যুগে যুগে এখানে অসংখ্য দীঘি পুকুর খনন করা হইয়াছে। দিনাজপুর জিলা যে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শস্যভাণ্ডার, এই কাহারোল উপজিলা তাহার অন্তর্গত।

কর্কট ক্রান্তিরও তিন ডিগ্রী উত্তরে অবস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলের আবহাওয়া কতকটা চরম ভাবাপন্ন। বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের মত না হইয়া এই আবহাওয়ায় বরং বিহারের সঙ্গেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। বৃহত্তর দিনাজপুরের পশ্চিমেই ছিল বিহারের পূর্ণিয়া জিলা, দেশ ভাগ হইবার পরে ভারত সরকার সেই অংশকে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে মিলাইয়া প্রদেশটিকে উত্তরে-দক্ষিণে একটানা করিয়া পুনর্গঠিত করিয়া দিয়াছে। কাহারোল অঞ্চলে মার্চ-জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল, তখন প্রচণ্ড গরম পড়ে। জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল হইলেও বায়ুতে পানিকণা বেশী থাকিবার কারণে দিনের বেলাতে গরম বেশী থাকে। নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী শীতকাল, তখন আবার প্রচণ্ড শীত পড়ে। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপের গড় ৯১.২° ফা. এবং সর্বনিম্ন গড় ৭০.৬° ফা., মে মাসে কখনও কখনও ১১০° ফা. পর্যন্ত উত্তাপ বাড়ে; শীতকালে সর্বোচ্চ তাপের গড় ৭৮.৩° ফা. এবং সর্বনিম্ন গড় ৫৬,৫° ফা.। অসহ্য গরম ও প্রচণ্ড শীতে মাঝে মাঝেই মানুষ মারা যায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৭০.৫৫।

যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম সড়ক পথ। পাঠান আমলে নির্মিত বিখ্যাত দার্জিলিং সড়ক (পূর্বনাম কিষাণগঞ্জ সড়ক) দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও হইয়া বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বাংলাবান্ধা পর্যন্ত প্রসারিত। এই সড়কটি এখন সম্পূর্ণ পাকা এবং অত্যন্ত সুন্দর। কাহারোল উপজিলার পূর্ব প্রান্ত দিয়া মোট প্রায় ৩৯ কি. মি. গিয়াছে, ৯ মাইল উত্তর হইতে একটি পাকা শাখাসড়ক কান্তনগর হইয়া সৈয়দপুরে গিয়াছে। এইগুলি দিয়া নিয়মিত বাস, রিক্সা, সাইকেল চলে। পাকা সড়ক হইতে কাঁচা সড়ক প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রসারিত। উপজিলাতে এরূপ কাঁচা সড়ক রহিয়াছে ৫৮৩ কি.মি.। গ্রামাঞ্চলে নৌকা প্রায় অপরিচিত। তবে বর্ষাকালে নদীপথে কিছু কিছু নৌকা চলে। তাহা ছাড়া সমগ্র এলাকাটি কোনও বড় বর্ষাতেও প্লাবিত হয় না, শুষ্কই থাকে। গরুর গাড়ী গ্রামে চলাচলের জন্য এখন পর্যন্ত বড় মাধ্যম। এক সময়ে ইহাই ছিল প্রধান মাধ্যম। এই অঞ্চলের এক ধরনের ব্যয়সাধ্য সুসজ্জিত গরুর গাড়ী এককালে আরোহীর সামাজিক মর্যাদা বহন করিত, সেরূপ গাড়ি এখনও কিছু কিছু রহিয়াছে। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মিটার গজ রেলপথ এই উপজিলার পশ্চিম প্রান্তের সামান্য বাহির দিয়া গিয়াছে। ১৯৮১ খৃ. পর্যন্ত এই উপজিলার সদর এলাকাসহ মোট ৯টি গ্রাম পল্লীবিদ্যুৎ কর্মসূচীর অধীনে বিদ্যুতায়িত করা হয়, বিদ্যুৎ ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত করা হইতেছে। উপজিলা এলাকাতে ৭টি ডাকঘর এবং ১টি টেলিফোন অফিস রহিয়াছে।

এক সময়ে এই অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ একটানা বনভূমি ছিল। বর্তমানে সেরূপ বন নাই, তবে বিচ্ছিন্নভাবে বন-জঙ্গল রহিয়াছে। স্বাভাবিক বন্য-উদ্ভিদ এবং পরিকল্পিতভাবে লাগানো উদ্ভিদের মধ্যে শাল, সেগুন, বট, শিশু, কুরচি, সোনালু, মহুয়া, পলাশ, শিরিশ, জারুল ও ছাতিম প্রধান। দিনাজপুরের মহারাজা রামনাথ দিনাজপুর হইতে একেবারে ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত পাঠান আমলের বড় সড়কটির ডান পাশ দিয়া যে একটি সুদীর্ঘ খাল খনন করিয়াছিলেন। উহা স্থানে স্থানে মজা অবস্থায় এখনও রহিয়াছে, উহার নাম রামদাড়া। এই খালটির এক পার্শ্বে বন দফতর একটানা সেগুন গাছ লাগাইয়াছে। এখানকার বাঁশ স্থানীয় অধিবাসিগণের বড় সম্পদ। দুই জাতের বাঁশ হয় — বড় বাঁশ ও জাতি বাঁশ। পূর্বে এখানকার বনভূমিতে বন্য হাতী ও গণ্ডার ছিল, বর্তমানে নাই। এখন চিতাবাঘ, বনবিড়াল, শিয়াল, খরগোশ এবং সরীসৃপের মধ্যে অজগর, অত্যন্ত বিষধর গোক্ষুর ও কেউটা সাপ রহিয়াছে। বহু জাতের পাখীর মধ্যে সবুজ পায়রা, সবুজ ঘুঘু, হরিয়াল, তিতির ও কাল তিতির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পানিতে কয়েক জাতের বক এবং জল মুরগী ছাড়াও বড় বড় দীঘি-পুকুরগুলিতে স্থানীয় বালি হাঁস, নারিকেলী ইত্যাদিসহ শীতকালে বহু জাতের হাঁস ও অন্যান্য পাখী আসে। মহাভারতে যে এই অঞ্চলটিকে মৎস্য দেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা তৎকালীন অনার্য অধিবাসিগণের প্রতি তাচ্ছিল্যভরে না হইয়া সম্ভবত এই কারণে হইতে পারে যে, সে সময়ে এই অঞ্চলটিতে মৎস্যের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাছের সেই প্রাচুর্য নাই, নদীতে সামান্য এবং দীঘি-পুকুরে যে মাছ উৎপাদিত হয়, রুই, কাতলা, মৃগেল, কৈ, শিং, মাগুর ও অন্যান্য ছোট মাছ, তাহা অধিবাসিগণের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হয় না, বাহির হইতে মাছ আমদানী করিতে হয়। ফলমূলের জন্য আবার অঞ্চলটি বিখ্যাত। আম—তন্মধ্যে গোপালভোগ আম বিখ্যাত, সুস্বাদু ও রসালো লিচু ছাড়াও কাঁঠাল, কলা, কুল, পেঁপে, আনারস ও তরমুজ, তাল ও খেজুর জন্মায়, বিশেষ করিয়া এখানকার আম ও লিচু ঢাকা শহর পর্যন্ত রফতানী হয়।

অধিবাসিগণের প্রধান পেশা কৃষি এবং অঞ্চলটি ঘাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গরু ও মহিষের সাহায্যে হালচাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করা হয়। সাম্প্রতিককালে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পানিসেচ দ্বারা ইরি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে, উৎপাদনও অনেক বাড়িয়াছে। দিনাজপুরের যে অঞ্চল বিখ্যাত মিহি কাটারিভোগ ও দাদখানি চাউল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত, কাহারোল উহার অন্তর্গত। কাটারিভোগ স্বাদের জন্য বাংলাতে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর দাদখানি চাউলের নামটি প্রচলিত হইয়াছে খুবই সম্ভবত বিখ্যাত পাঠান শাসক দাউদ খান-এর নাম হইতে। এই উভয় জাতের চাউলই দেশের রাজধানী শহর ঢাকা সমেত অন্যান্য শহরে রফতানী হয়। এখানে উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের মধ্যে রহিয়াছে সরিষা, রাই, ইক্ষু, পাট, কয়েক জাতের ডাল, গম, যব, জোয়ার, বাজরা, গোল আলু, মরিচ, পিঁয়াজ ও রসুন। খৃ. ১৯শ শতকে এখানে নীল-এর চাষ হইত। এখানকার চিড়াও প্রসিদ্ধ, উৎকৃষ্ট মানের চিড়া ঢেঁকিতে তৈরি করা হয়। সাম্প্রতিক কালেও চিড়া তৈরী হইতেছে। অধিবাসিগণের প্রায় ২% লোক বিভিন্ন রকমের ব্যবসাতে নিয়োজিত রহিয়াছে, অন্যরা বিভিন্ন রকমের কুটির শিল্প ও ছোট ছোট প্রকল্পের সঙ্গে (যথা : সেলাই প্রকল্প ইত্যাদি) জড়িত।

কাহারোল উপজিলাতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তি মালিকানায় এবং বিদেশী সাহায্যে সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তায় ১৭টি ব্যবসা শিল্প এবং ছোট মাঝারী মোট ৪৪০টি কুটির শিল্প চালু রহিয়াছে। এখানকার কুমারদের মৃৎ শিল্প বিখ্যাত। পাট দ্বারা বুনাইয়া এক ধরনের মাদুর তৈরী করা হয়। স্থানীয়ভাবে উহাকে বলা হয় ঢোকরা, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই ঢোকরা বোনে। মেয়েরা এক ধরনের নকশী কাঁথা তৈরী করে, উহাকে বলা হয় গুভরি।

উপজিলা এলাকাতে ১টি কলেজ, ১১টি হাই স্কুল ও জুনিয়ার হাই স্কুল, ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৫টি মাদরাসা রহিয়াছে। মসজিদ আছে ১৯৮টি 'হিন্দু মন্দির ৮৬টি এবং খৃষ্টান গির্জা ৮টি। মুসলমান হিন্দুর অনুপাত প্রায় ৫৫ : ৪৫, খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় সকলেই আদিবাসিগণ হইতে ধর্মান্তরিত—প্রধানত সাঁওতাল। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ সাঁওতাল ও তাতী ও আদিবাসিগণ প্রকৃতিপূঁজারী। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, উপজাতীয় রাজবংশী ও পালিয়াগণ, এক সময়ে বৌদ্ধ ছিল, পরে হিন্দু শাসনামলে চাপে পড়িয়া হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াছে। মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশই সুন্নী হানাফী, বেশ কিছুসংখ্যক রহিয়াছে আহল-ই হাদীছ। মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (দ্র.) ও মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী (দ্র.) এই দুই ভাইয়ের আজীবন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এখানে আহল-ই হাদীছ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের এবং সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের হিন্দুগণের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসিগণের প্রভাব এবং মুসলমানগণের মধ্যে পীরগণের প্রভাব খুব বেশী। অনেক হিন্দুর দান করা দেবস্থান ও দেবোত্তর জমি রহিয়াছে, আবার বহু মুসলমানের দেয়া ওয়াকফ জমি রহিয়াছে। পীরগণের মধ্যে বিখ্যাত হইতেছেন সত্য পীর, পাঁচ পীর, বড় পীর ও মাদার পীর। উল্লিখিত মসজিদগুলি ব্যতীত এই উপজিলা এলাকার মুকুন্দপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামে অনেক প্রাচীন একটি মসজিদ রহিয়াছে।

এই অঞ্চলের ঘরবাড়ীর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সাধারণভাবে পাকা বাড়ির সংখ্যা কম, প্রায় ৩২% বাড়ী কাঁচা এবং ৬৬% বাড়ী আধাপাকা ধরনের। সাঁওতালদের এবং সকল সাধারণ গৃহস্থদেরই বাড়ীগুলি ছড়ানো ছড়নো, ঘরগুলি ছোট ছোট, পরিচ্ছন্ন নহে। চাল ঢালু করিয়া দেওয়া একটিই দরজা, তাহা আবার খুবই নীচু। জানালা প্রায়ই নাই, থাকিলেও খুবই ছোট এবং বেশ উপরে নির্মিত। সাঁওতালদের এরূপ ঘরগুলি আবার বেশ পরিচ্ছন্ন। সাঁওতাল মেয়েরা গেরুয়া মাটি দিয়া ঘরের দেওয়ালে ও মেঝেতে বেশ সুন্দর কারুকাজ করে। হিন্দু মুসলমান ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর অধিবাসিগণ দেশের অন্যান্য স্থানের মতই পোশাক পরেন। যেমন মেয়েরা শাড়ী এবং পুরুষগণ লুঙ্গী, পায়জামা, ধূতি এবং শার্ট ও পাঞ্জাবী, কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর কৃষকগণ মাঠে কাজ করিবার সময়ে নিঃসঙ্কোচে কোমরে শুধু একটি লেংটি (স্থানীয় নাম কোপনি) এবং মাথায় হয় গামছা বাঁধিয়া বা বাঁশের তৈরী মাথাল বা ঝাঁপি পরিয়া থাকে। দরিদ্র মেয়েরা, বিশেষ করিয়া রাজবংশী মেয়েরা বুকনি বা ফাতা পরিয়া মাঠে কৃষিকাজ করে। উহা বুকের উপরে বাঁধিতে হয়, হাঁটুর নীচু পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। সাঁওতাল মেয়েরা এবং অন্য আদিবাসী মেয়েরাও সচরাচর দুই প্রস্থ কাপড় পরে। সেই মোটা কাপড়কে বলা হয় ফাতা। এক খণ্ড ফাতা তাহারা কোমর হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত পরে। আরেক খণ্ড দিয়া বুক ঢাকিয়া বাম কাঁধের উপর দিয়া পিঠে ঝুলাইয়া রাখে। খৃ. ৭ম শতকের চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশের এই পোশাকের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। আজকাল সকল মেয়েদের মধ্যেই শাড়ীর প্রচলন ধীরে ধীরে বাড়িতেছে।

এই অঞ্চল আদিবাসিগণের আদি বাসভূমি; এই অঞ্চল যেমন প্রাচীন এই অধিবাসিগণও তেমনই প্রাচীন। ইহারা চিরকাল কৃষিজীবী ও শিকারী এবং সভ্য ও স্থায়ী অধিবাসী। অস্ট্রিক নৃগোষ্ঠীয় এই আদিবাসিগণ সুপ্রাচীনকালেই নিষাদ, পুত্র, সুদা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। ইহাদের বর্ণ কালো, আকৃতি খাটো, মুখে সামান্য দাড়ি এবং গড়ন মজবুত। ইহাদের নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে, তন্মধ্যে সাঁওতাল ওঁরাঙ, মুশহর, মুণ্ডারী, মালো, মালপাহাড়ী, মাহালী, ভূমিজ—এইগুলি প্রধান। সাঁওতালই এককভাবে সংখ্যায় সর্বাধিক। প্রাচীন অধিবাসী ছাড়াও দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ (শাসনকাল ১৯১৯ খৃ. পর্যন্ত) পতিত জমি আবাদ করিয়া কৃষি উন্নয়নের জন্য সাঁওতাল পরগণা হইতে বেশ কিছুসংখ্যক সাঁওতালকে আনাইয়া এই কাহারোল ও অন্যান্য উপজিলাতে বসত করাইয়াছিলেন। ১৯৭৮ খৃ. সংগৃহীত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই উপজিলাতে মোট ৫২৩টি উপজাতীয় পরিবার ছিল, তন্মধ্যে ৪১১টি পরিবার ছিল সাঁওতাল। তাহাদের সংখ্যা ছিল ২,১০০। ইংরাজ আমলে একবার নির্যাতন বৃদ্ধি পাইলে নিকটবর্তী বিরল থানার সাঁওতাল সর্দার পাড়ুরাজা অন্য সাঁওতালগণকে সংগঠিত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজগণ প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করে। পরবর্তীকালে ১৯৩৬ খৃ. দিনাজপুর শহরে "নিখিল ভারত সাঁওতাল সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতির সন্তান আদিবাসিগণ সাধারণত বনের কাছে কঙ্করময় স্থানে বাস করিতে পসন্দ করে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং ভাল কৃষক হইলেও দলবদ্ধ হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শিকার করা তাহাদের চিরদিনের রীতি। এখনও তাহারা তীর-ধনুক দিয়া পশু-পাখী শিকার করে। খৃষ্টান পাদ্রীগণ বহু যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া বেশ কিছু আদিবাসীকে খৃষ্টান করিলেও এখন পর্যন্ত অধিকাংশই প্রকৃতিপূজারীই রহিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের জীবন যাপন পদ্ধতির অতি সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নাচ-গান ইহাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু আদিবাসী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কথ্য মাতৃভাষা ছাড়া ইহারা কিছু কিছু বাংলা বলিতে পারে, শিক্ষিতগণ ভালভাবেই পারে। কাহারোল ও বৃহত্তর দিনাজপুর জিলায় বিভিন্ন স্থানে যে রাজবংশী কোচ এবং পালিয়াগণ রহিয়াছে তাহারা মঙ্গোলীয়, আকারে খাঁটি, প্রশস্ত বক্ষ, চক্ষু ছোট, নাক চ্যাপ্টা, প্রলম্বিত চোয়াল, স্বল্প দাড়িযুক্ত এই উপজাতীয়দের গায়ের বর্ণ ধূসর হলুদ, ইহারা হিন্দু ও মুসলমান। পালিয়াগণের মেয়েরা বুকের উপর হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত প্রলম্বিত কাপড় পাতানী বা বুকান পরে। এই উপজিলা ও সমগ্র জিলারই বৃহত্তর যে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ তাহারা যুগে যুগে আগত মিশ্র আর্য।

এই অঞ্চলের ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। লিখিত ভাষা শুদ্ধ বাংলা হইলেও সর্ব সাধারণের যে কথা বাংলা তাহা নিকটবর্তী বিহারের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। বিহারী টান অতি সুস্পষ্ট; তাহা ছাড়া মধ্যযুগের মৈথিলী ভাষার অনেক শব্দ এখানে এখনও অবিকৃতভাবে রহিয়া গিয়াছে, যেমন আমি=হামি, মোহ; আমাকে=হামাক, ইত্যাদি। নিম্নস্তরে রাজবংশী ও পালিয়াগণ আবার ভিন্নরূপের বাংলাতে কথা বলে, আর উপরে বলা হইয়াছে যে, সাঁওতাল, ওঁরাঙ ইত্যাদি আদিবাসী দ্বিভাষী, অর্থাৎ স্ব স্ব ভাষা ছাড়াও অনেকেই বাংলা বলিতে পারে। এখানকার আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে, বিশেষ করিয়া কবিগান ও পল্লীগীতিতে ইসলামী ভাবধারার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কাহারোল উপজিলার অতি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতেছে সুন্দরপুর ইউনিয়নের কান্তপুর গ্রামের কান্তজীর মন্দির। ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে উহাতে সম্পূর্ণ এক সারি মুগল চিত্রকলার রূপায়ণ। দিনাজপুর শহর হইতে ১২ মা. উত্তরে দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও বড় সড়কের

ধারে এবং ঢেপা নদীর তীরে দেশবিদেশে বিখ্যাত, উভয় বাংলাতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সমগ্র উপমহাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোড়ামাটির নকশাশোভিত এই বিষ্ণু মন্দিরটি অবস্থিত। বিশাল আকারের দ্বিতল এবং আগাগোড়া রক্তবর্ণের ইটের উপরে চিত্রকারে সম্পূর্ণ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিলালিপি অনুযায়ী মন্দিরটির নাম নবরত্ন মন্দির। ১৭০৪ খৃ. দিনাজপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক রাজা প্রাণনাথ এই মন্দিরটির নির্মাণকাজ শুরু করেন, তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন আওরাঙ্গযীব। দীর্ঘদিনে মন্দিরটি নির্মিত হয়, প্রাণনাথের পুত্র মহরাজা রামনাথ (শাসনকাল ১৭২২-৬০ খৃ.) ইহার নির্মাণকাজ শেষ করেন। ইহার কারিগরগণের বংশধরেরা অদ্যাবধি মন্দিরের নিকটবর্তী গ্রামে বাস করে।

ইতিহাস ঃ বিখ্যাত বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত কাহারোল উপজিলার ইতিহাস দিনাজপুর জিলার ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন। বিস্তারিত জানিবার জন্য দ্র. নিবন্ধ দিনাজপুর, এখানে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইল। মহাভারতে এই অঞ্চলকে মৎস্য দেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (উপরে দ্র.)।

এই উপজিলাতেই প্রাচীন কারের বিরাট রাজার দুর্গ ছিল (উপরে দ্র.)। দক্ষিণের ঘোড়াঘাট উপজিলাতে (দ্র.) সেই বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল। মুগল আমলে সেখানে ফৌজদারের কিল্লা ও শাসনকেন্দ্র ছিল। ঐতিহাসিক কালে ইহা বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল। খৃ. পূ. ৪র্থ শতকে ইহা মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খৃ. পূ. ৩য় শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উপজিলার নিকটবর্তী এলাকাতে গুপ্ত যুগের তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে। খৃ. ৬ষ্ঠ শতকে গুপ্ত শক্তির অবসান ঘটে। ৭৫০ খৃ. বিখ্যাত পাল বংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই অঞ্চল পাল রাজ্যভুক্ত হয়। পাল বংশ প্রায় ৪০০ বৎসর যাবত বাংলা শাসন করেন। খৃ. ১২শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক হইতে আগত সেনগণ হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বল্লাল সেন। তাঁহার পুত্র লক্ষণ সেনকে পরাজিত করিয়া ইখতিয়ারু'দ-দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী (দ্র.) সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ (এই এলাকা সমেত) দখল করেন এবং বাংলাতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (১২০১ মতান্তরে ১২০৪ খৃ.)। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ জয় করিয়া বাখতিয়ার খালজী দেবকোট বা বানগড় হইতে দিল্লী বিজয়ী মু'ইয়্যু'দ-দীন ইব্ন শাম (মুহাম্মাদ গুরী)-এর নামে খুতবা পাঠ করান এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। সেই মুদ্রা গৌড়ের টাঁকশাল হইতে তৈরী করা হয়। অতঃপর ছয় শত বৎসর কাল প্রায় একটানা এখানে মুসলিম শাসন স্থায়ী হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ১৭৬৫ খৃ. ক্লাইভ দিল্লীর মুগল বাদশাহ ২য় বাহাদুর শাহ-এর নিকট হইতে বাংলার দীওয়ানী বা রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৭৫ খৃ. এখানে ইংরাজ কালেক্টর নিযুক্ত হন, ১৭৮৬ খৃ. ইংরাজগণ ফৌজদারী ক্ষমতাও লাভ করে। ইতিমধ্যে ১৭৮০ খৃ. মহারাজ বৈদ্যনাথের মৃত্যু হইলে রাণী সরস্বতী বালক রাধানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই সুযোগে ইংরাজগণ দেবী সিংহ নামক জনৈক শিখ ধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারী ব্যক্তিকে উত্তর বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাহার নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ব্যাপিয়া মানুষের হাহাকার উত্থিত হয়। পরাধীনতার গ্লানি এবং ইংরাজদের জুলুম হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্যই খৃ. ১৯শ শতকের শেষভাগ ব্যাপিয়া, বিশেষ করিয়া মধ্য ও উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফকিরগণের নেতা ছিলেন বিখ্যাত মজনু শাহ।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই অঞ্চলের লোকেরা অংশগ্রহণ করিয়াছে। শায়খ আহমাদ বেরেলাবীর জিহাদ, খিলাফাত আন্দোলন, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে কোন না কোনভাবে এই অঞ্চলের মুসলিমগণ শরীক হইয়াছে। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানেই পাঞ্জাবী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়। আধুনিক কাহারোল গ্রাম উপজিলা সদর, দিনাজপুর শহর হইতে ২৯ কি. মি. (১৮ মা.) উত্তরে অবস্থিত। সড়কপথে ইহা দিনাজপুর ও সমগ্র উত্তরবঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত, দিনাজপুরের সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগাযোগ রহিয়াছে। বিস্তারিত তথ্যাবলীর জন্য দ্র. নিবন্ধসমূহ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও ঘোড়াঘাট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মেহরাব আলী, দীঘির নাম রামসাগর, ২য় মুদ্রণ, উম্মে কুলসুম লাইব্রেরী, দিনাজপুর ১৯৮৪ খৃ.; (২) ঐ লেখক, দিনাজপুরের আদিবাসী, আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমী, দিনাজপুর ১৯৮০ খৃ.; (৩) Bangladesh District Gazetter Dinajpur, Establishment Division Min. of Cabinet Affairs, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka 1975, pp. 41, 42, 44, 68, 77, 126, 146,; (৪) Population census of Pakistan 1961, District Census Report Dinajpur, pts. 1-v, Ministry of Home and Kashmir Affairs, Govt. of Pakistan, Karachi; (৫) Population Census of Bangladesh 1974, D. C. R. Dinajpur, Bangladesh Bureau of Statistics, Mins. of Planning, Dhaka 1979; (৬) Bangladesh Population Census 1981, Community tables of All Thanas of Dinajpur District, pt. 1, Bangladesh Bureau of Statistics, Min. of Planning, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka 1985; (৭) মুহাম্মাদ নিজামু'দ-দীন, A Critical study of the Coinage and metrology of the Sultans of Dehli (from the beginning down to 1320 A.D.), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. সন্দর্ভ, ১৯৮৯ খৃ.।

হুমায়ুন খান

কাহালু (كهلو) ঃ বগুড়া জিলার একটি উপজিলা, আয়তন ২৩৮ বর্গ কি. মি. (৯৩ ব. মা.), ৯টি ইউনিয়ন ও ১৬৬টি গ্রাম লইয়া গঠিত, জনসংখ্যা (১৯৮১ গণনা) ১,৪১,২৯৮; তন্মধ্যে মুসলিম ১,৩১,২৫৮ জন বা ৯২.৯%, হিন্দু ৯,৯০৬ জন বা ৭%, হিন্দুগণের মধ্যে —-এর বেশী বর্ণহিন্দু, বৌদ্ধ মাত্র ৩ জন, কোন খৃষ্টান নাই, অন্যান্য ১৩১ জন, তন্মধ্যে আদিবাসী ১৪ জন। অধিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষিতের হার ২২.৯%। ইহার উত্তরে শিবগঞ্জ উপজিলা, পূর্বে বগুড়া কোতোয়ালী উপজিলা, দক্ষিণে নন্দীগ্রাম উপজিলা, পশ্চিমে নাগর নদী ও পরপারে দুপচাচিয়া উপজিলা। করতোয়া নদীর শাখা নাগর এই উপজিলার পশ্চিম সীমান্ত

রচনা করিয়াছে এবং সেই অঞ্চলটিকে উর্বরা করিয়াছে। নদী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত, বর্ষাকালে নাব্য হয়। সমগ্র এলাকাটি সমতল। ইহা পশ্চিম বগুড়ার অন্তর্গত। খুবই প্রাচীন অঞ্চল, বিখ্যাত বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। পলি দ্বারা গঠিত জমি, শক্ত জমাট কাদা, সাধারণ বর্ণ লাল, বর্ষায় নরম কাদা হইয়া যায়। শীতে আবার খুবই শক্ত হয়, উর্বর জমি, স্থানীয়ভাবে বলা হয় খিয়ার বা খায়ের জমি। কিছু কিছু উঁচু জায়গা রহিয়াছে। একটানা কোন বনভূমি নাই, তবে বিচ্ছিন্ন বনজঙ্গল রহিয়াছে। এখানে তিনটি ঋতু অত্যন্ত প্রকটভাবে অনুভূত হয়—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। এপ্রিল হইতে জুন গ্রীষ্মকাল, জুলাই হইতে অকটোবর বর্ষাকাল, অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত শীতকাল। গ্রীষ্মে শুষ্ক গরম, বর্ষায় গরম বর্ষণ, শীতে শুষ্ক। সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩১° সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৬° সেলসিয়াস। সামগ্রিকভাবে গ্রীষ্মে বেশী গরম এবং শীতে বেশী শীত অনুভূত হয়। কখনও অত্যধিক শীতে মানুষ মারা যায়। সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত জুলাই মাসে রেকর্ড করা হয় ৩৭৮ মি. মি.। বর্ষাকালে সাধারণ বন্যায় কোন এলাকাই নিমজ্জিত হয় না অর্থাৎ সাধারণভাবে বন্যামুক্ত এলাকা। গ্রীষ্মকালে পানির অভাব অনুভূত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্বচিৎ অনুভূত হয়; ১৮৬৪ ও ১৮৮৬ খৃ. এখানে বড় রকমের ঘূর্ণিঝড় হইয়াছিল। ১৯১৮, ১৯১২, ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৮৮ খৃ. প্রবল বন্যা হইয়াছিল। শেষোক্ত বৎসরে সর্বনাশা বন্যায় সমগ্র দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই যখন ডুবিয়া গিয়াছিল তখন এই এলাকাটিরও বহু ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। ১৯৪৩ খৃ. মহা দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানকার বহু লোক মারা গিয়াছিল।

অতীতে একটানা বনভূমি যখন বেশি ছিল তখন নানা জাতীয় বন্য প্রাণীও ছিল। বর্তমানে বনজঙ্গল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে বন্য প্রাণীও তেমন দেখা যায় না। বনবিড়াল, শিয়াল, নানা জাতের বিষাক্ত সাপ ও গুঁইসাপ দেখা যায়। স্থানীয় পাখী দেশের অন্যান্য স্থানেরই মতো। শীতকালে নদীর চরে, বিলাঞ্চলে ও দীঘি-পুকুরে নানা জাতীয় হাঁস এবং অন্যান্য শীতের পাখী আসে। ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা ও তরমুজ প্রচুর জন্মে। তাহা ছাড়া পেয়ারা, জাম, আতা, লিচু ও আনারস কিছু কিছু জন্মে, তাল ও খেজুর কম। এই অঞ্চলে বগুড়ার পূর্বাঞ্চলের মতো বিলের প্রাচুর্য নাই। সেই কারণেই এখানে মাছ পরিমাণে কম। দীঘি-পুকুরের মাছের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। বর্ষাকালে নাগর নদীতে চলন বিলের মাছ আসে, তখন কিছু সময়ের জন্য মাছ বেশী পাওয়া যায়।

কৃষিজ উৎপাদনের মধ্যে ধান প্রধান। কয়েক জাতের ধানই উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে বগুড়া বালাম উৎকৃষ্ট। ইহা উপজেলা ও জেলার বাহিরে রাজধানী শহর ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে যায়। পানি সেচ দ্বারা শীতকালে ইরি ধানের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য ফসলের মধ্যে পাট, গম, রাই, সরিষা, ইক্ষু, ডাল ও তামাক প্রধান। গোল আলু ও পটল এবং মরিচ ও পিঁয়াজ উৎপাদনের জন্য এই অঞ্চল বিশেষ বিখ্যাত। উন্নত জাতের এই সকল তরকারী ও মসলা দেশের বিভিন্ন স্থানে রফতানী হয়।

সান্তাহার-বগুড়া-বোনারপাড়া মিটার গজ রেলপথ এই উপজেলার মাঝামাঝি দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বে গিয়াছে। এই রেলপথ ১৯০১ খৃ. নির্মিত হয়। কাহালু একটি বড় ষ্টেশন; সান্তাহার হইতে কাহালু ১৮ মাইল এবং কাহালু হইতে বগুড়া ৬ ৩/৪ মাইল। উপজেলাতে মোট পাকা সড়ক রহিয়াছে ১৫ মা. (২৪ কি. মি.)। আর কাঁচা সড়ক রহিয়াছে ৫৬১ মাইল (৯০৩ কি. মি.)। একটি পাকা সড়ক বগুড়া হইতে উপজেলার মাঝামাঝি দিয়া গিয়া পশ্চিমে দুপচাচিয়া হইয়া অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যুক্ত; আর একটি পাকা সড়ক দুপচাচিয়া হইতে তালোরা হইয়া উপজেলা এলাকার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে গিয়া নাটোর-বগুড়া-রংপুর বড় সড়কের সঙ্গে মিশিয়াছে। আরও একটি সড়ক উল্লিখিত উভয় সড়ককে কাহালুর উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে যুক্ত করিয়াছে। পূর্বে সড়কপথে ঘোড়ায় টানা টমটম গাড়ী চলিত। বর্তমানে সেগুলি আর নাই। এখন বাস, জীপ, রিক্সা ও সাইকেল চলাচল করে। এক সময়ে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত গরু ও মহিষের গাড়ীর প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে সংখ্যায় কম, তবুও বেশ কিছু রহিয়াছে। লোকজনের চলাচল এবং পণ্যাদি পরিবহন—উভয় কাজেই বিশেষ করিয়া শুষ্ক মওসুমে গরুর গাড়ী বড় নির্ভর। ১৯৮১ খৃ. এই উপজেলাতে মোট ২,৯৩৫টি গরুর গাড়ি ছিল। নাগর নদী শুধুমাত্র বর্ষাকালে নাব্য হয়। অন্যান্য অঞ্চল বর্ষাতে সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয় না। কাজেই নৌ-চলাচল খুবই কম; সমগ্র উপজেলাতে মোট নৌকার সংখ্যা মাত্র ৫৮টি (১৯৮১ খৃ.); সেগুলি বর্ষাকালে প্রধানত নদী পথেই চলে। ডাকঘর আছে মোট ১২টি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১টি।

কাহালু উপজেলার মোট ২৬,১৩৮টি ঘরের মধ্যে ৩৩টি পাকা, ৬৮৫টি ইটের টালির ছাওয়া, টিনের ঘর আছে ১০,১৮৬টি, আর বাদবাকী ১৫,২৩৪টি বাঁশের ও শনের বেড়া ও চালের। সমগ্র জেলার তুলনায় এখানে অধিবাসীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সমগ্র দেশের তুলনায় এখানে ঘরবাড়ীর অবস্থা অনেকখানি সন্তোষজনক। পূর্বে অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত বর্ণহিন্দু অনেক ছিল। ১৯৪৭ খৃ. দেশ ভাগ হইবার পরে তাহাদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলাতে চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ প্রায় সকলেই হানাফী মাযহাবপন্থী সুন্নী, কিছু রহিয়াছে আহল-ই হাদীছ অনুসারী। অল্প কয়েকজন আদিবাসী প্রকৃতিপূজারী। কাহালু উপজেলাতে মসজিদ আছে মোট ২৯৫টি, হিন্দু মন্দির আছে ৪টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলেজ ১টি, হাই স্কুল ও জুনিয়ার হাই স্কুল ১৬টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৩টি আর মাদরাসা আছে ১৩টি। অধিবাসিগণের প্রধান পেশা কৃষি হইলেও এখানে কৃষি-সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কুটির শিল্প বেশ যথেষ্ট রহিয়াছে; অকৃষি শিল্প আছে ২টি আর কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কুটির শিল্প রহিয়াছে ৬৯টি। এখানে তাঁতী আছে ৯০২ জন, কুমার ৬২ জন, বাঁশ-বেতের কাজ করে ৬০৭ জন এবং বিভিন্ন পাটের কাজ ও কাঠের কাজ করে ২০৫ জন লোক।

ইতিহাস ঃ কাহালু উপজেলার ইতিহাস বস্তুত বগুড়া জেলার ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন। বিস্তারিত তথ্যাবলী জানিবার জন্য দ্র. নিবন্ধসমূহ বগুড়া, মহাস্থান গড়, জয়পুরহাট।

ইহা বহু প্রাচীন অঞ্চল, মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত মহাস্থানগড় সেই প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অংশ এবং মহাসমতটাধিপতির শাসনকেন্দ্র। কাহালু মহাস্থানগড় ও বৃহত্তর বগুড়ার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। পাল আমলেই বিখ্যাত বৌদ্ধ দোহা বা গীতি কবিতাগুলি রচিত হয়; অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দোহাঁ রচয়িতা কাহ্ণপা এই এলাকারই অধিবাসী ছিলেন। পাল রাজা ২য় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০ খৃ.) অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার সময়েই এই কাহালু ও বগুড়া এলাকার কৈবর্ত প্রধান দিব্যক বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হন, সেই

কৈবর্ত শাসন স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল। দিব্যক-এর পুত্র ভীম (১০৮২-১১২৪ খৃ.) ২য় মহীপাল-এর ভাই রামপাল-এর নিকটে পরাজিত হন এবং পুনরায় গৌড় হইতে পাল রাজাগণ বাংলা শাসন করিতে থাকেন। কাহালু উপজেলার পূর্ব প্রান্তের নিকটে ভীম-এর জাঙাল নামক কৈবর্ত রাজার একটি রক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। ১১৫০-১২০১ (১২০৪ ?) খৃ. পর্যন্ত হিন্দু সেন রাজাগণ গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী ও বিক্রমপুরের রামপাল হইতে বাংলা শাসন করেন। অতঃপর তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ারু'দ-দীন মুহাম্মাদ বাখ্‌তিয়ার খালজী (দ্র.) নবদ্বীপে (বা মতান্তরে রাজশাহী জেলার নওদিয়াতে) আকস্মিক আক্রমণে শেষ সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ জুড়িয়া প্রথম মুসলিম শাসন কায়েম করেন। এখানে একটি ভিন্নমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বগুড়ার ইতিহাস প্রণেতা শতীশচন্দ্র সেন বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন এবং District Gazetteer ঃ Bogra (পৃ. ৩১)-তেও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে কতকটা প্রশ্নবোধকভাবে। বিখ্যাত দরবেশ শাহ্ সুলতান বালখী মাহীসাওয়ার ও তাঁহার সঙ্গে আগত দরবেশ ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম (উভয় দ্র.) যখন মহাস্থানগড়ে আগমন করেন তখন সেখানে স্থানীয়ভাবে ভোজ-গৌড় বংশীয় শাসক নরসিংহ বা পরশুরাম রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাপতি চিন্থন দরবেশের নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেন। উহার ফলে রাজার সঙ্গে দরবেশের যুদ্ধ বাধে। সেনাপতি হরপাল বিশ্বাসঘাতকতা করিবার ফলে যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও নিহত হন (১০৪৩ খৃ.) এবং অন্তত আঞ্চলিকভাবে হইলেও মহাস্থানগড়কেন্দ্রিক এই বগুড়া-কাহালু সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন কায়েম হয়; ইহা বাখতিয়ার খালজীর বিজয়েরও দেড় শত বৎসর আগেকার ঘটনা।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ দুর্বল মোগল সম্রাট ২য় শাহ 'আলাম-এর নিকট হইতে সমগ্র বাংলার দীওয়ানী সনদ আদায় করিলে উহার বলে ইংরাজগণ সমগ্র বাংলার রাজস্ব শাসনের অধিকার লাভ করে। তখন হইতে ঘোড়াঘাটের মোগল ফৌজদার ক্ষমতাহীন হন এবং নূতন ইংরাজ শাসন ক্রমে ক্রমে বলবৎ হইতে থাকে। সে সময়ে বগুড়া নামে কোনও জেলা ছিল না এবং এই কাহালু এলাকাটি ছিল রাজশাহীর অন্তর্গত; ১৮২১ খৃ. নূতন বগুড়া জেলা গঠন করা হয় এবং কাহালু থানা (উপজেলা) গঠিত হয় ১৯০৭ খৃ. পরে।

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এই দেশবাসী যে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করিয়াছে উহাদের প্রতিটির ঢেউ এই এলাকাতে আসিয়া লাগে এবং জনগণ সর্বতোভাবে সেগুলিতে যোগদান করে। ফকীর মজনু শাহ (দ্র.) ভাওয়াল হইতে শুরু করিয়া রংপুর পর্যন্ত যে ফকীরগণকে সংগঠিত করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে উৎখাত করিতে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন এই অঞ্চলে তাঁহার অনেক সমর্থক ছিল। সমগ্র ১৯শ শতক ব্যাপী ইংরাজগণ জবরদস্তিমূলকভাবে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিয়া কৃষকগণের উপরে অত্যাচার চালায়, কাহালু এলাকাও তাহা হইতে মুক্ত ছিল না। এই অঞ্চলেও নীলকরদের জুলুম হয় এবং পরিণামে নীল বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮২০ খৃ. হাজ্জী শারী'আতুল্লাহ (দ্র.) যখন ফারাইজী আন্দোলনের (দ্র.) ডাক দেন, তাহাতেও এই অঞ্চলবাসিগণ সাড়া দেন। সায়্যিদ আহমাদ বেরলাবী (র) (দ্র.)-এর নেতৃত্বে জিহাদ আন্দোলন শুরু হইলে এই এলাকা হইতে অনেকে তাহাতে যোগদান করে। অনেক চাঁদাও এখান হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। পরবর্তী খিলাফাত আন্দোলনের সময় (দ্র.) এই অঞ্চলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ধুনটের মাওলাবী আশরাফ আলী এবং ডাঃ শের 'আলী। বৃহত্তর আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন সায়্যিদ 'আবদু'ল-কারীম দাউদী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও এই অঞ্চলের অধিবাসীগণের ভূমিকা ছিল। কৃষক আন্দোলনকালে স্থানীয় হযরত 'আলী, ইসহাক গোকুলী প্রমুখের নেতৃত্বে কৃষককুলের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়েও এই অঞ্চলের মুসলমানগণ তাহাদের যথার্থ ভূমিকা রাখে। সবশেষে ১৯৭১ খৃ. পাঞ্জাবী জালিম শোষকগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে কাহালুর অধিবাসীগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে। এই উপজেলা এলাকাতে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

উপজেলার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম হইতেছে নরহাট্টা ইউনিয়নের ঐ নামীয় গ্রাম। সেখানে হাই স্কুল, ডাকঘর, ডাকবাংলা, পুলিশ ফাঁড়ি, চিকিৎসালয় ও ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস রহিয়াছে। মালঞ্চ ইউনিয়নের অন্তর্গত অঘোর গ্রামে তাই স্কুল, ডাকঘর, ডাকবাংলা, চিকিৎসালয় এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস রহিয়াছে। মহেষপুর গ্রাম বিখ্যাত লেখক প্রভাস চন্দ্র সেনের জন্মস্থান। তিনি ১৯২২ খৃ. বগুড়ার ইতিহাস রচনা করেন। উপজেলা সদর কাহালু সান্তাহার-বোনারপাড়া রেল পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এখানে উপজেলা পর্যায়ের সকল অফিস রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ১টি কলেজ, ১টি হাই স্কুল, ২টি মাদ্‌রাসা—১টি 'আলিম ও ১টি দাখিল মাদ্‌রাসা, হাসপাতাল, কয়েকটি ডাক্তারখানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, টেলিফোন এক্সেচেঞ্জ, থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস রহিয়াছে। রেল ও সড়ক পথে ইহা বগুড়া শহরের সঙ্গে (প্রায় ৭ মাইল) যুক্ত। তাহা ছাড়া অন্যান্য স্থানের সঙ্গেও যুক্ত। এখানে কয়েকটি চাউলের কল রহিয়াছে। কৃষিজ পণ্যাদির বড় হাট। ইহা বিশেষ করিয়া চাউল ও তামাক ক্রয়-বিক্রয়ের এক বড় কেন্দ্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Disrtict Gazetteer, Bogra, Establishment Division, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka 1979, pp. 144, 147, 179, 226, 227, 241, 273, 291, 328-9; (২) Population census of Pakistan, 1961, District Census Report, Bogra, pts. I-v, Ministry of Home and Kashmir Affairs Govt. of Pakistan, Karachi, n.d.; (৩) Population Census of Bangladesh, District Census Report, Bogra. Bangladesh, Bureu of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka 1979; (৪) Bangladesh Population Census 1981, District Bogra, Bangladesh Bureau of statistics. Ministry of Planning, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম সং., ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ., ১১১।

হুমায়ুন খান

কাহিন (كاهن) ঃ এই শব্দটির উৎস বিতর্কিত (তু. T. Fahd, Divination arabe, 91 প.)। কাননী, আরামী ও আরবী প্রচলিত

কাহিনী-কিংবদন্তীতে এই শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা যে আদি পর্যায়ে আমরা এই শব্দটি ব্যবহারের সহিত পরিচিত সেই অনুসারে বলা যায় যে, "পশ্চিমাঞ্চলীয় সেমিটিক বা সামী জাতির লোকেরা" এই কাহিন বলিতে একটি একক কার্য সম্পাদনের কর্তৃত্বসম্পন্ন লোককে বুঝাইত যাহার কিছু আনুষঙ্গিক অধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা ছিল। এই কাহিনগণ তাহাদের জনগোষ্ঠীর নামে হয় ধর্মীয় ভক্তি নিবেদনমূলক (বলি, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি ধরনের) অনুষ্ঠান করিত কিংবা দেবতার ইচ্ছা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিত বা দেবতার সম্মুখে সে ঐ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করিত। এই সঙ্গে কাহিন তাহার আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধামূলক অধিকার হিসাবে দেবতার ইচ্ছা মানুষকে জ্ঞাপন করিত ও দেবতার ঐসব ইচ্ছার ভবিষ্যদ্বাণীও করিত। কাহিনগণের উল্লিখিত কাজ ও তাহার অধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধাগুলি খোদ ঐ তিন শ্রেণীর কাহিনগণের সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয় অর্থাৎ জনসমাজের পশুচারণমূলক যাযাবর সভ্যতা হইতে কৃষি সভ্যতায় উত্তরণের সহিত দেবতা সম্পর্কে তাহাদের ধারণা ও ঐ দেবতাদের প্রতি তাহাদের কর্তব্যগুলিও দৈনন্দিন জীবনের পরিস্থিতির সহিত অনুকূল করিয়া খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া হয়। জাহিলী যুগের আরবেরা ছিল সর্বশেষ পশুচারক যাযাবর জীবনযাত্রার অনুসারী। আর সেই কারণে পুরোহিত বা যাজকবৃত্তি সম্পর্কিত তাহাদের ধারণাগুলিও সম্ভবত কম-বেশী আদিতম যাজকীয় কার্যভূমিকাকে বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিবিম্বিত করিয়াছে। অবশ্য আমাদের এই ধারণার ভিত্তি আমাদের হাতে থাকা এই সম্পর্কিত ইসলাম পরবর্তী কালের উপাত্ত ও পরিসংখ্যানসমূহ। তাই আমাদের উক্ত ধারণাগুলির আপেক্ষিক প্রামাণিকতা উল্লিখিত উপাত্তগুলি, উহাদের মৌখিক ও লিখিত উৎসের প্রতি কতখানি বিশ্বস্ত উহার উপর নির্ভরশীল।

এই ক্ষেত্রে কাহিন সংক্রান্ত বর্ণনা বা আখ্যানগুলি অলীক ও কল্পনাশ্রয়ী মনে হইলেও ইহা সত্য যে, উল্লিখিত আখ্যান বা কাহিনীগুলির একটা যথার্থ প্রাসঙ্গিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্ববিরোধিতা এড়াইবার জন্য যাহারা এই কাহিনীগুলি পরিবেশন করে ও যাহারা এইগুলিকে কাজে লাগায় তাহারা নিশ্চয়ই কাহিনীগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া আদি পারিভাষিক শব্দাবলী সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়া থাকিবে, বিশেষ করিয়া যাহারা সামী জাতির কল্যাণের প্রতিভূ দেবতা ও অশুভ শক্তির ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা সম্পর্কে অবহিত, তাহাদের নিকট বহু দেবতাবাদে বিশ্বাসীদের দেবদেবীসমূহের ও একত্ববাদের প্রভুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন নাম ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশক নাম আরোপ ও তদ্দ্বারা ধর্মতত্ত্বের বিশদায়নের গুরুত্ব ও প্রয়াসটি সুস্পষ্ট। এই ক্ষেত্রে সর্বোপরি এই বিষয়টিও খেয়ালে রাখিতে হইবে যে, মুতাকাল্লিমূন-এর রচনায় নয় বরং আসমা'উ'ল-হুস্না (দ্র.)-র বিবরণে প্রকৃত মুসলিম ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নাম ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের ধারণা, ঐ একই যুক্তি কাহিনদের আমলের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের আওতায় উহার যাজকীয় কর্মকর্তাদের পদবীসূচক পারিভাষিক শব্দাবলী ও উহাদের বিশেষ পরিচ্ছেদের নামকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর এই কারণে আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে কাহিনগণের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অধিকতর পরিষ্কার চিত্র লাভের আশায় ঐ কাহিনগণের কার্যাবলী ও অধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধার পরিচয়মূলক বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী হইতেই আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করিব। ইহার যুগপৎ উদ্দেশ্য আরবের অধিকাংশ অঞ্চলের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে কাহিনগণকে আবশ্যিকভাবেই যে চেহারায় দেখা হইত তাহারও একটি চিত্র লাভ করা। ইহার কারণ, তৎকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের ও শাসক শ্রেণীর লোকজন কাহিনদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করিত সেই বিষয়ে যথেষ্ট প্রামাণিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত দলীলপত্রের অভাব রহিয়াছে।

লাতিন Sacerdos ও উহার গ্রীক প্রতিপক্ষের মত আরবী কাহিন যুগপৎ ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশে কোনও কিছু ভক্তিমূলক নিবেদন হিসাবে ধর্মীয় কর্মকর্তা এবং ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষকের ভূমিকা পালন করিত; সেই সঙ্গে তাঁহারা যাজক ও ভবিষ্যদ্বক্তার কাজও করিত। আর তাই কাহিন কথাটির প্রতিশব্দ আমরা 'যাজক' বা পুরোহিত এই ধারণায় ধরিতে পারি যে, তিনি সাধারণ্যে প্রচারিত ধর্মের (আনুষ্ঠানিক) এজেন্ট বা প্রতিনিধি। তবে যাযাবর জীবনযাত্রার প্রাধান্যের কারণে কাহিনের প্রথমোক্ত ভূমিকাটির গুরুত্ব হ্রাস পায়। বরং দ্বিতীয় অর্থাৎ গণকের ভূমিকাটির বিকাশ আনুকূল্য লাভ করে যাহা সংশ্লিষ্ট বেদুঈন বা যাযাবর গোত্রের প্রায় সকল লোকের প্রত্যাশার অধিকতর পরিপূরক। যাযাবর সমাজে, তাওরাতে যেমন গোত্রপিতা বা গোষ্ঠী-পিতার প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল তেমনি পরিবার বা গোত্রপ্রধানই ধর্মীয় ত্যাগ স্বীকারভিত্তিক আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ভক্তিমূলক নিবেদন অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেন। আর একই সমাজ ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠীর ঘন ঘন স্থানান্তরের কারণে আনুষ্ঠানিক ধরনের কোনও উপাসনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইত। বস্তুত এই কারণে কাহিন কথাটির অনুবাদ 'ভবিষ্যদ্বক্তা' করা কার্যত জরুরী হইয়া উঠে (যেহেতু আমাদের নিকট এই শব্দের কোনও যথার্থ প্রতিশব্দ নাই) যাহার লাতিন 'divinus'-এর মতই দ্বৈত অর্থ থাকিবে অর্থাৎ কাহিন বলিতে যেমন একজন (দৈব) অনুপ্রেরিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে তেমনি উহা যুগপৎ ভবিষ্যদ্বক্তাকেও বুঝাইবে এবং একই সঙ্গে ঐ অর্থগুলি হইতে সামাজিক পরিস্থিতি অনুমোদন করিলে কড়াকড়ি অর্থে কাহিনের যাজকীয় ভূমিকাটিও বাদ যাইবে না, বরং অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যেমন ছিল মক্কা ও তা'ইফে এবং আরবের আরও কতকগুলি অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র ধর্মীয় স্থানে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, য়ু'ল-খালাসা, আল-জালসাদ, আল-ফাল্‌স; তু. বিস্তারিত T. Fahd, Le Pantheon de l'Arabic centrale a la veille de l'Hegire, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ.)।

আমরা যাহা সাক্ষ্য-প্রমাণ পাইয়াছি তাহা অনুযায়ী সকল বাস্তব ক্ষেত্রেই কাহিনের ভবিষ্যদ্বক্তা ও গণকের ভূমিকাই কেবল স্বীকৃত। আর ঐসব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে মূলত লোকগাথামূলক আখ্যান হইতে। কাহিন যেসব অসংখ্য বিশেষ প্রকৃতির ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের কার্য সম্পাদন করিতেন সেইগুলির সহিত আমরা কেবল ঐসব নামের দ্বারা পরিচিত যে নামগুলির মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর পরিচয় পরিস্ফুট। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া তোলা যাইতে পারে। এই নামগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই কাহিনের সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় [দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভবিষ্যদ্বক্তা ও তাঁহার স্ত্রীবাচক প্রতিপক্ষের জন্য 'গণক', "ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পশুভিত্তিক ভবিষ্যদ্বক্তা", "ঐন্দ্রজালিক যাজক", (magus), "গ্রীক নারী ভবিষ্যদ্বক্তা পুরোহিত", "pythoness" (নারী ভবিষ্যদ্বক্তা), স্ফটিক গোলকের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বক্তা ইত্যাদি]। কাহিন সম্পর্কে আমরা যাহা জানি তাহা কার্যত উল্লিখিত নামগুলি দ্বারা যাহা বুঝায় এবং ঐগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক কাহিনী হইতে যাহা বুঝা যায় তাহার বেশী কিছু নহে। এই পরিভাষার আরও সমার্থক আরবী শব্দগুলি এই ঃ আফ্‌কাল, হাযী, য়ু, ইলাহ, সাদিন, 'আর্‌রাফ, 'আ'ইফ, যাজির,

কা'ইফ, নাশিদ ইত্যাদি। কাহিন সম্পর্কে আমরা যাহা জানি তাহা কার্যত উল্লিখিত নামগুলি দ্বারা এবং ঐগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক কাহিনী হইতে যাহা বুঝা যায় তাহাতেই সীমিত।

প্রথমে খোদ কাহিন কথাটি লইয়াই আলোচনা শুরু করা যাইতে পারে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট ইহার সামী শব্দমূল ঃ ك-و-ن যাহার অর্থ থাকা (হওয়া), দাঁড়ান এবং আক্কাদী শব্দমূল (ك-ن-ن = যাহার ভাবার্থ সিজদা করা বা আনত হওয়া)। হইতে পারে। কিন্তু ه নামক ব্যাঞ্জনবর্ণের অস্বাভাবিক ভিন্ন বিন্যাস তথা পরিবর্তনের বিষয়টির এখনও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। অবশ্য মনে হয়, এই কাহিন কথাটি পশ্চিমাঞ্চলীয় সামী জাতির লোকদের আদিতম ধর্মীয় পারিভাষিক শব্দাবলীর অন্যতম শব্দ ছিল, যেমন মারি-তে ও আক্কাদ-এ ছিল বারূ কথাটি। বারূর মতই কাহিন যুগপৎ পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলি রক্ষা, ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার, ঈশ্বর কিংবা দেবতাকে ভক্তিস্বরূপ কোনও কিছু নিবেদন এবং দৈব আলামতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজ করিতেন। বাইবেল কিতাবে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা (তু. H. Ringgren, Israelite Religion, 1966) বর্ণিত আছে ঐ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে হিব্রু Kohen ঠিক এই কাজগুলিই করিতেন।

আরবে ইসলামের আগমনকালে আরব কাহিন বা গণক-যাজক ঠিক এই অবধিই বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যাযাবর সমাজের অস্তিত্ব লোপের সহিত কাহিনতন্ত্রেরও অবলুপ্তি ঘটে। একটি স্থিতিশীল রাজতন্ত্রের অভাবও ইহা বিলোপের অন্যতম কারণ, আরবের পার্শ্ববর্তী কোনও কোনও রাজতন্ত্রের মতো আরবে ঐ ধরনের রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকিলে ঐ কাহিন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য হইলেও সেখানে ঐ কাহিন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিয়া তোলা হইত। এই সংগঠনের অভাবেই কাহিনগণ আধিভৌতিক জ্ঞানের একমাত্র ও একক আধার হইয়া উঠে। ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতিতেই ইসরাইলে কোহেন ও নাবী আধিভৌতিক জ্ঞানবিষয়ক চর্চা ও ঐ জ্ঞান বিতরণের একমাত্র অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী ও ভাবাবিষ্ট আচার-অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিতে থাকেন। আর এমন করিয়াই প্রাচীন মারি নগরীর বারূম (তু. A. Finet, La place du devin dans la societe de Mari, in La Divination en Mesopotamie ancienne dt dans les regions voisines, Paris 1966, 93) ও প্রাচীন আরবের আলোচ্য কাহিনগণ শান্তি ও যুদ্ধ উভয় পরিস্থিতিতেই তাহাদের গোটা গোত্রের নিয়তি ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। নারী কাহিনদের মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করার ও তুরীয় আচার-অনুশীলনের বিষয়গুলি অধিকতর প্রকাশ্য হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এই কাহিনগণ মারি-র তুরীয় নারী নাবীগণের (মুহহুতুম, তু. G. Dossin. Sur le prophetisme a Mari, প্রাগুক্ত, ৮০) মত ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ গণনা ও নির্ণয়ের ক্ষমতা রাখিতেন (রাবূবাত বায়ত ঃ তু. Divination arabe, 98 প.-এ প্রদত্ত দৃষ্টান্ত ও সূত্রনির্দেশ)। এ ধরনের নারী কাহিনদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী ছিলেন ত্যারীফা (জারীফা)।

কাহিনদের বেলায় উল্লিখিত বিষয়গুলি, বিশেষ করিয়া কাহিনতন্ত্রভুক্ত দুই নাম বা পদবীধারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহারা হইতেছে ঃ আফকাল ('আমর ইব্নু'ল-জু'আয়দ, রাবী'আদের সায়্যিদ) ও হাযী (যুহায়র ইব্ন জানাব, কাল্ব-এর সায়্যিদ)। বস্তুত আজকাল এই নামটি আসিয়াছে সুমেরীয় আক্কাদী আপকাল্লু শব্দ হইতে এবং শব্দটি কয়েকটি সেমিটিক ভাষায় সংরক্ষিত আছে যাহার অর্থ উচ্চপদস্থ যাজক বা পুরোহিত (তু. Divination arabe, 103 প.) এবং এই আফকাল পদবীধারী যাজক আরবদের সমাজে একটা তুরীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেন (পৃ. স্থা.) যাহার সহিত হাযী (আরামীয় ভাষাসম্ভূত) ও হিব্রু ভাষার ro'eh-এর তুলনা চলে। হিব্রু ro'eh নামক যাজকীয় পদবীটি 'নাবী' পদবীর পূর্বসূরী এবং উল্লিখিত ro'eh আদিতে নিশ্চয়ই "স্ফটিক গোলক মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বক্তা" ছিল, কেননা পদবীটির নামেই উহার আভাস পাওয়া যায়। তবে এই যাজক ক্রমান্বয়ে লক্ষণসমূহের পর্যবেক্ষক হইয়া উঠেন এবং হাযী পদবীটি বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যত গণনা ও ঐন্দ্রজালিক অনুশীলনকারী ব্যক্তিদের পরিচয়সুলভ শব্দাবলীর জাতিবাচক সাধারণ পরিভাষা হইয়া উঠে (পৃ. স্থা., ১১২ প.) (কাহিনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কথাবার্তা ও কাহিনা সম্পর্কে দ্র. সাজ')।

ধর্মীয় পবিত্র স্থান ও উপাসনাস্থলের রক্ষক ও ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশে ভক্তিমূলক নিবেদনের আনুষ্ঠানিকতা পালনকারী ধর্মীয় কর্মকর্তা কাহিনকে নিম্নবর্ণিত নানা নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে ঃ রাব্ব উগারিতের rb ও কাতাবানীর rbp-এর মতে ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহের গোটা বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনা (এলাকা ও প্রবেশপথসমূহ) করিতেন; যূ ইলাহ এই পদবীধারী ব্যক্তি bethel তথা খোদ "পবিত্র প্রস্তরের" রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে কর্তব্য পালন করিতেন। এই ব্যক্তি স্বয়ং সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকজনের স্থানান্তর গমন কালে কিংবা স্থানান্তরে থাকাকালে ঐ পবিত্র প্রস্তর স্বীয় হেফাজতে রাখিতেন এবং একই সঙ্গে দেবতা (উপাস্য) ও উপসনাকারী 'দাস' বা বান্দাদের মধ্যে নৈকট্যের কারণে ঐ যূ ইলাহ উপাস্য ও উপাসনাকারীদের মধ্যে সংযোগসূত্রের ভূমিকা পালন করিতেন (তু. 'আব্দ, তায়ম, ইম্রু' ও উহাদের সমুদয় প্রতিশব্দ)। সাদিন ও হাজিব এই দুইটি প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় স্থানসমূহের অভিভাবক-রক্ষকের ভূমিকার অর্থ প্রকাশ করে, তদুপরি সেই স্থান যেখানে কোনও গোত্র, জনগোষ্ঠী বা গোত্রসমূহের পবিত্র নিদর্শন হেফাজতে রাখা হয়। ইহাতে বুঝিয়া লইতে হয় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানূন, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও সংগঠনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অর্থে উল্লিখিত পদবীসমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে এক ধরনের নিষ্পত্তিতে পৌঁছাইবার প্রয়াস চলিয়াছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয় ও প্রতিষ্ঠানে ঐ সময় কী চলিতেছিল (দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আম্র ইব্ন লুহায়্যি হেলেনীয় এক প্রস্রবণস্থলে থাকার পর তিনি যেসব সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং খৃস্টীয় ৫ম শতকে যেসব প্রতিষ্ঠান চালু করা হইয়াছিল সেগুলির তুলনা করা যায়) উহার পর্যবেক্ষণ হইতে দেখা যায়, ঐসব ঘটনা বিকাশ সাদিনের পদটি সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এবং একই কারণে যে স্থিতিশীলতা আসে তাহার সুবাদে বিভিন্ন কাহিন-আখ্যান সৃষ্টি এবং ঐসব অতিকথা, কিংবদন্তী ও কাহিনী সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়। তবে সাদিনের কর্মভূমিকা কেবল ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও অভিভাবকত্বে সীমিত ছিল না। তিনি কাহিনের ভূমিকাটিও গ্রহণ করেন এবং কাহিনের মতোই তিনি উগারিত ك-ه-ن-এর অনুসরণে উপাস্য বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমূলক নিবেদনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার আচার-অনুষ্ঠান করিতেন (তু. Mesha' stela হিব্রু nokedh) (দ্র.

Divination arabe, 111)। কাহিনের কার্যাবলীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিকটি জাতিবাচক বিবেচনায় 'আর্‌রাফ—এই পরিভাষায় এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাহিন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও উপলক্ষে যেসব বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনুষ্ঠান অনুশীলন করিতেন, যেমন আ'ইফ ও যাজির (দ্র. 'ইয়াফা), কা'ইফ (দ্র. কিয়াফা) নাশিদ ও আরও কিছু গৌণ পরিচয়বাচক নামগুলি ('আর্‌রাফ পরিভাষার আওতাভুক্ত), আর কাহিনের ঐ কাজগুলি ও পরিচায়ক নামগুলির ভূমিকা পালিত হইয়া থাকে হাকাম (মুনাফারার সময় সালিসী), খাতীব (মুখপাত্র ও বার্তাবাহক), শা'ইর (যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উস্কানিমূলক কাব্যকর্ম), তাবীব (চিকিৎসক) ও খাবীর (মূল্য নিরূপক) ইত্যাদি পদবী তথা লোকের মাধ্যমে।

'আর্‌রাফ কার্যত স্বয়ং কাহিন, যদিও 'আর্‌রাফ বাস্তবিকপক্ষে (স্ফটিক গোলকে) ভবিষ্যত দ্রষ্টাদের মর্যাদা যোগানের অপেক্ষাকৃত নীচু মর্যাদার অধিকারী। ইহার কারণ 'আর্‌রাফ কাহিনের কেবলমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করার সুবিধাটিই অনুশীলন করিয়া থাকেন, অন্য কিছুই নয়। অবশ্য যাযাবর জনসমাজে এই ভবিষ্যৎ গণনামূলক বিষয়গুলির প্রাধান্য থাকায় পরিণামে 'আর্‌রাফ ও কাহিন অভিন্ন ব্যক্তি হইয়া উঠেন।

'ইরাফা ঃ দর্শনযোগ্য বা উপস্থিত বস্তুসমূহের ভিত্তিতে অদৃশ্য বস্তু, বিষয় কিংবা আগামী বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানবিশেষ। ইহা দ্বারা অনেকাংশে মরমী বা গুপ্ত জ্ঞানকেও (তু. মা'রিফা ও 'ইল্‌ম) বুঝান হইয়া থাকে। আর এই একই কারণে এই ধরনের জ্ঞান কেবল দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমিত। 'আর্‌রাফের আক্কাদী ও হিব্রু সমার্থক শব্দাবলী, যেমন মূদূ ও ইদ্দে'ওনীর মাঝেও ঐ তাৎপর্যটি প্রচ্ছন্ন। এই কারণে 'ইরাফা মূলত ভবিষ্যৎ গণনা বা বলার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা ইন্দ্রজাল ও সম্মোহনের অনেকখানি নিকটবর্তীও।

'আর্‌রাফ ও আর্‌রাফা তাবি' বা তাবি'আ (পরিচিত অশরীরী অস্তিত্ব) বা রা'য়্যি বা রি'য়্যি (কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেরণাদাতা) দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়। এই কারণে 'আর্‌রাফকে মাতবূ' (পাশে একজন অপদেবতা দণ্ডায়মান) নামে অভিহিত করা হয় এবং 'ইরাফাকে কোনও কোনও সময় যাদুটোনা ও শা'বাযার (হাতের ভোজবাজি, যাদু) সহিত মিলাইয়া দেখা হয়। 'আর্‌রাফ ও কাহিনের সর্বনিম্ন স্তরের ভূমিকাটি নাশিদ—এই পদবীতে বিধৃত।

এই নামটির অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একই সঙ্গে ঝাড়ফুঁক দিয়া দুষ্ট অশরীরী অস্তিত্ব বিতাড়নকারী (মুনাশাদা) এবং নিখোঁজ গবাদি পশু ও অন্যান্য জিনিসের সন্ধানদাতার ভূমিকা পালন করে। আর প্রধানত এই লেবাসেই কাহিন ও 'আর্‌রাফ আদি পর্যায়ের ইসলামের তথাকথিত গল্প-কাহিনীতে আবির্ভূত হয়।

ইসলাম আগমনের আগে মধ্য আরবে কাহিন ছিলেন একটি গোত্রের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথপ্রদর্শক। সর্বকালে সর্বসময়ে যে কোনও অবিকশিত সমাজের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সকল প্রতিনিধি এই ভূমিকাটি পূরণ করেন বলিয়া দেখা যায়। কাহিন যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার মাঝে তাঁহার কার্যানুশীলন করেন উহার কারণেই তিনি তাঁহার গ্রীক প্রতিপক্ষের মত একজন স্বাধীন সাধুপুরুষ হইয়া উঠেন, যদিও কোনও কোনও সময় তাঁহাকে কোনও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির সরকারী চাকুরীর আওতায় না থাকিয়া কোনও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বা গণক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া লক্ষ করা যায়। আর কাহিনের এই ব্যাপারটি তাঁহার আসীরীয়, ব্যাবিলনীয় ও রোমক প্রতিপক্ষ হইতে ভিন্ন হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবেন্ধর মূল পাঠে প্রদত্ত সূত্রনির্দেশ ছাড়াও, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন সূত্রনির্দেশ, যৌক্তিকতামূলক ব্যাখ্যা ও সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী সম্বলিত রচনা ঃ (ক) (১) T. Fahd, La divination arabe, Leiden 1966 ছাড়াও প্রধান সূত্রনির্দেশ ও অধ্যয়নযোগ্য গ্রন্থাবলী ঃ (২) ইব্‌ন হিশাম; (৩) ইব্‌ন সা'দ; (৪) তাবারী; (৫) মাস'উদী, মুরূজ; (৬) ইবনুল-আছীর; (৭) আযরাকী, আখবার মাক্কা, সম্পা. Wustenfeld, ইবনু'ল-কালবী, কিতাবু'ল-আসনাম, সম্পা. ও অনু. W. Atallah, প্যারিস ১৯৬৯ খৃ.; (৯) বুহতুরী, হামাসা, সম্পা. Cheikho, in MFO, iii-v (1909-1); (১০) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশতিকাক, সম্পা. Wustenfeld; (১১) আগানী১; (১২) জাহিজ, হায়াওয়ান; (১৩) ঐ লেখক, কিতাবু'ত-তারবী', সম্পা. Pellat, দামিশক ১৯৫৫ খৃ.; (১৪) ইব্‌ন কুতায়বা ঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, সম্পা. 'উকাশা; (১৫) য়াকূত ; (১৬) কাযবীনী, (১) 'আজাইবুল-মাখলূকাত ওয়া আছারু'ল-বিলাদ (২) সম্পা. Wustenfeld; (১৭) ইবশীহী, মুসতাতরাফ, ১-২, কায়রো সংস্করণ ১৩৫২/১৯৩৩, ফরসী অনু. G. Rat, Paris-Toulon 1902। (খ) (১৮) J. Wellhausen, Reste[2]; (১৯) H. Lammens, Le culte des Betyles et les processions religieuses chez les Arabes preislamites, in BIFAO, xvii (1919-20), 39-101; (২০) ঐ লেখক, Les sanctuaires preislamites dans l'Arabie occidentale, in MUSJ, xi/2 (1926), 39-173; (২১) E. Dhorme, La religion des Hebreux nomades, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; (২২) A. Haldar, Associations of cult prophets among the ancient Semites, Uppsala 1945; (২৩) J-M. Lagrange, Etudes sur les religions semitiques[2], প্যারিস ১৯০৫ খৃ.; (২৪) W. Robertson Smith, Lectures on the religion of the Semites[3], লণ্ডন ১৯২৭ খৃ.; (২৫) ঐ লেখক, On the forms of divination and magic enumerated in Deut, XVII, 10-11, in The Journal of Philology, xiii (1885), 273-87, xiv (1885), 113-28; (২৬) T. Witton-Davies, Magic, divination and demonology among the Hebrew and their neighbours..., লণ্ডন ১৮৯৯ খৃ.; (২৭) G. Ryckmans, Les religions arabes preislamiques[2], Louvain 1953; (২৮) E. O. James, The nature and function of Priesthood, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (২৯) A. Jamme, La religion sud-arabe preislamique, in Histoire des Religions, Paris, Blood et Gay, iv (1947) 239-397; (৩০) J. Starcky, Palmyreneens, Nabateens et Arabes du nord avant l'Islam, ঐ, 201-37; (৩১) H. S. Nyberg, Bemerkungen zum "Buch der Gotzenbilder" von Ibn al-Kalbi, in Skrifter utg.

av. Svenska institutet i Rom, Ser. 2/I (1939), 346-66; (৩২) Ed. Doutte, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.; (৩৩) I. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, i-ii, Leiden 1896-99; (৩৪) I. Engnell, Studies in divine kignship in the aneient Near East, Uplsala 1943.

T. Fahd (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

আল-কাহিনা (الكاهنة) ঃ মায়াবিনী, এই মহিলা কার্থেজ নগরীর পতনে বায়যানটীয় আধিপত্যের অবসান হইলে হাসসান ইবনু'ন-নু'মান (দ্র.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত আরব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যে বার্বার প্রতিরোধ গড়িয়া ওঠে তাহার মূল চালিকাশক্তি ছিলেন (৭৩/৬৯২-৩)। তাঁহার প্রকৃত ব্যক্তি-পরিচয়, যাহা অবশ্যই খুব জটিল ছিল, নিরূপণ করা খুবই কঠিন। কারণ তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত গল্প-কাহিনীতে তাঁহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের কেবল বিকৃত চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। এমন কি তাঁহার প্রকৃত নাম সম্পর্কেও কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ আল-কাহিনা আরবগণ কর্তৃক প্রদত্ত তাঁহার উপনাম মাত্র। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম ছিল দিহ্য়া, যাহা কেবল বানানের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে, যেমন দাহ্য়া দাহিয়া দাম্য়া দামিয়া অথবা দাহ্য়া। তাঁহার বংশপরিচয় সম্পর্কেও একই সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি তাতীত-এর কন্যা, আবার কখনও কখনও বলা হয় তিনি তীফান (Theophanus)-এর পুত্র মাতিয়া (=ম্যাথিয়াস, ম্যাতথিউ)-এর কন্যা। ইহার দ্বারা আল-কাহিনা মিশ্র বিবাহের ফল, মিশ্র রক্তের বারবার গোষ্ঠীর বংশধর ছিলেন, বুঝাইলে তাঁহার স্বদেশবাসীর উপরে ছাড়াও বায়যানটীয়দের উপরেও তাঁহার কর্তৃত্বের একটা ব্যাখ্যা সহজে পাওয়া যাইতে পারে। আরও কতিপয় লক্ষণ এই অনুমানকে সমর্থন করে। আল-কাহিনা নিজে একজন গ্রীককে বিবাহ করেন বলিয়া বর্ণিত আছে। আমরা জানিতে পারি তাঁহার দুইটি পুত্র ছিলঃ একজন বার্বার পিতার ঔরসজাত এবং অন্যজন এক গ্রীক (য়ূনানী) পিতার সন্তান। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক হইতে তিনি সাধারণের ধারণার বিপরীত খৃষ্টান ছিলেন, য়াহূদী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বেদুঈন গোত্র জারাওয়া বুত্র-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত যানাতা গোত্রের একটি উপশাখা প্রথমে য়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক গোত্র, যেমন নাফুসা ইত্যাদির মতই খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। আল-কাহিনা যখন ইতিহাসের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন, তখন তিনি একজন বিধবা এবং নিশ্চিতভাবেই খুব বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার সম্পর্কে প্রচলিত উপকথা অনুযায়ী তিনি ১২৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে ৩৫ বৎসর তিনি ছিলেন আউরেসের (the Aures) 'রাণী' (মালিকা), যেখানে ৪৭৭ খৃ. ভানডালদের বিরুদ্ধে একটি সফল বিদ্রোহের পর রাজা ইআদ্দাসের শাসনাধীনে একটি স্বাধীন বারবার রাজ্য ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। টি. ফাহ্দ কর্তৃক উল্লিখিত (Divination arabe, 98) সেই সমস্ত "আরব রাণীদের" মতই তিনিও স্পষ্টতই একজন ভাবাবিষ্ট মহিলা ছিলেন। অনুপ্রেরণা লাভের মুহূর্তে তিনি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, তাহার চুল বিবস্ত্রভাবে বাতাসে উড়িতে থাকিত এবং তিনি তাহার বক্ষ চাপড়াইতে থাকিতেন। ইহা ছাড়াও তিনি ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য গণনার অনেক গোঁড়া কলা-কৌশলের চর্চা করিতেন, যেমন কংকরের সাহায্যে ভবিষ্যৎ গণনা করা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের প্রধান কারণই ছিল তাহার ভবিষ্যৎ কথনের ক্ষমতা।

আল-কাহিনা কুসায়লা কর্তৃক প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি স্থানীয়ভাবে বসবাসকারী বারানিসগণকে বিশেষভাবে সংগঠিত করিয়াছিলেন। প্রথমে আল-কাহিনাই বিজয় লাভ করেন। কার্থেজ নগরী দখল এবং সুসংগঠিত বায়যানটীয় শক্তিকে ধ্বংস করার পর হাস্সান বারবার প্রতিরোধের শক্তিশালী ঘাঁটি আউরেস (Aures)-এর দিকে অগ্রসর হন। তিনি মেস্কিয়ানা নদীর তীরে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করিয়া আক্রমণ পরিচালনা করেন। আল-কাহিনাও বাগায়া ধ্বংস করার পর একই কাজ করেন, যে বাগায়া সম্ভবত তাহার রাজধানী ছিল এবং তিনি চাহিয়াছিলেন ইহা আক্রমণকারীদের হাতে যেন না পড়ে, ইহার জন্য দুই পক্ষের চূড়ান্ত মুকাবিলা ঘটে ওয়াদী নীনী (Oued Nini)-র তীরে যাহা সম্ভবত একই নামের রেলস্টেশন হইতে খুব বেশী দূরে নয়, যে স্টেশনটি বর্তমানে খেন্‌চেলাগামী রেলপথের উপরে, আঈন- বেঈদা হইতে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই যুদ্ধ হাস্সানের জন্য এইরূপ মারাত্মক হইয়াছিল যে, ইহার পরে বহু বৎসর যাবত আরবরা এই যুদ্ধের স্থান ওয়াদী (oued)-কে নাহ্রু'ল-বালা' (মুসিবতের নদী) নামে এবং অন্য কোন স্বল্প জ্ঞাত কারণে ওয়াদি'ল-'আবার (কুমারীদের উপত্যকা) নামে অভিহিত করিত। এই যুদ্ধাভিযান যাহা ছিল হাস্সানের প্রথম বিপর্যয়, চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিক্রমায় গাবেস (Gabes) ভূখণ্ডে এমন এক উপসংহার টানিয়া দেয় যাহা আক্রমণকারিগণকে ইফরীকিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়।

হাস্সানকে ত্রিপোলী হইতে চারি মনযিল পূর্বে তাঁহার পশ্চাদপসরণ থামাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়; এখানে তিনি তাঁহার শিবির (কুসূর হাস্সান) স্থাপন করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। আল-কাহিনা তাহার কর্তৃত্বের এলাকা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা সমগ্র মাগরিবের উপর অবশ্যই বিস্তৃত হয় নাই, এমনকি সমগ্র ইফ্রীকিয়া-র উপরেও নয়, যেমন কোন কোন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে (ইব্‌ন 'ইযারী বায়ান, ১খ, ৩৬; আন্-নুওয়ায়রী, নিহায়া, in de Slane, Berberes i, 340)। তিনি আরব বন্দীদের সহিত ভাল ব্যবহার করেন। তাহাদের মধ্যে একজনকে দুগ্ধপোষ্য সন্তান হিসাবে গ্রহণের বারবার ধর্মীয় আচার অনুযায়ী তিনি আপন পরিবারে গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল খালিদ ইব্‌ন য়াযীদ (কখনও য়াযীদ ইব্‌ন খালীদ নামেও অভিহিত হইত)। তাঁহাকে হাস্সানের শিবিরের একজন গুপ্তচর হিসাবে গণ্য করা হইত। সম্ভবত তিনি আরবদের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ইহাও চাহিয়াছিলেন যে, আরবরা যেন তাহাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, যে বিষয়ে তিনি তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি অপেক্ষাও অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্রের সাহায্যে নিঃসন্দেহে পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। সম্ভবত তাঁহার এই নীতির ব্যর্থতাই তাঁহাকে দারুণ হতাশার মধ্যে একটি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর মুকাবিলায় "পোড়া মাটি" নীতি গ্রহণ করিয়া দেশটিতে চরম ধ্বংসযজ্ঞ চালাইতে প্ররোচিত করে। এই পোড়ামাটি নীতি ইতিপূর্বে ৫৩৯ খৃ. সোলোমান রাজা ইআবদাসের বিরুদ্ধে অনুসরণ করিয়াছিলেন, যখন তিনি ছিলেন আউরেসে পরিখাবেষ্টিত (Ch. E.

Dufourcq, Berberie et Iberie .... in Rev. Historique, fasc, 488, p. 300, উদ্ধৃত procopius)।

এইসব কথিত ধ্বংসযজ্ঞ বহু বৎসর যাবত বিতর্কিত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন আধুনিক ইতিহাসবিদ এইগুলিকে একেবারেই অস্বীকার করেন; অন্যদিকে আরব ইতিহাসবেত্তারা এইগুলিকে অতি মাত্রায় অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন। বস্তুত মনে হয়, এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যাইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া এইগুলিকে ভয়ানক কোন মহাবিপর্যয় হিসাবে দেখাও উচিত হইবে না। এইসব ধ্বংসকার্য ইফ্রীকিয়ার কতিপয় অঞ্চলের বাহিরে ছড়াইয়া যাইতে পারে নাই ; কিন্তু তথাপি এইগুলি স্থায়ী বসতকার জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশকে বিদ্রোহীমনা করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই বিদ্রোহীরা হস্তক্ষেপ করিবার জন্য হাস্সানকে আমন্ত্রণ জানাইতে প্রস্তুত ছিল, বিশেষভাবে যখন তাহারা ভূমধ্যসাগরীয় কোন দ্বীপে, এমন কি স্পেনেও আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

হাস্সান, যিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেকে সম্যক অবহিত রাখিয়াছিলেন এবং নূতন সৈন্য লাভ করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আরেকবার সম্ভবত ৭৮/৬৯৭-৯৮-এ ইফ্রীকিয়া আক্রমণ করেন (ঘটনার কাল সুস্পষ্ট নয়) এবং সম্ভবত কোন কোন বারবার সেনাদলের সমর্থন লাভ করিয়া তিনি এই আক্রমণ করেন। এই সব বারবার সৈন্য আল-কাহিনার নীতির বিরোধী ছিল। ইহার পর হইতে দেশের জনগণ আর কোন কাজে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। তখন হইতে আউরেস-এ একটি পরাজয়ের ভাব বিরাজ করিতে থাকে এবং ইহাই আল-কাহিনাকে তাহার এলোমেলো, বিবস্ত্র চুল উড়াইয়া ভাবাবেশে (নাশিরাতান শা'আরাহা) তাহার মরিয়া হইয়া সেই সমস্ত ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিতে অনুপ্রাণিত করে, যেগুলি শুধুমাত্র হতাশারই হুঁশিয়ারী ছিল, যাহার অনেকগুলিই দৈববাণী হিসাবে আমাদের নিকট পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথম সংঘর্ষ ঘটে গাবেস এলাকায় এবং তাহার ফল যায় আল-কাহিনার প্রতিকূলে। ইহাই সম্ভবত উপযুক্ত মুহূর্ত যেখানে সেই নাটকীয় ঘটনাকে স্থাপন করা যায়, যাহা অসম্ভব মনে হইলেও সম্ভবত সত্য, যখন এই 'রাণী' তাঁহার আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাহার পুত্রদিগকে খুব বেশী দেরী হইয়া যাইবার পূর্বেই পক্ষ পরিবর্তন করিবার জন্য উপদেশ দেন। তিনি নিজে আশ্রয়ের জন্য আউরেস-এর পর্বতমালায় পলাইয়া যান এবং হাস্সান তাড়া করিয়া তাহার পশ্চাদগমন করেন। যে স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধটি সংঘটিত হয়, আল-মালিকীর বর্ণনায় (রিয়াদ, ১খ, ৩৬) তাহার নাম তারফা আল-বাকরী (মাসালিক, ৫৭, অনু.১২১), ইব্ন নাজী (মা'আলিম, ১খ, ৬১) এবং ইব্ন আবী দীনার (মু'নিস, ৩৫) প্রমুখের বর্ণনায় ইহার যে তাবারকা রূপটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতভাবেই 'তারফা' শব্দের লৈখিক অপভ্রংশ। সম্ভবত এখানে তোব্না হইতে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উত্তরে জাবাল নেশ্শার-এর বহির্গমন পথে আল-কাহিনা তাহার শেষ যুদ্ধ করেন। একটি কূপের পার্শ্বে নিঃশেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উভয় পক্ষ মনে করিত যে, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই কূপ আল-কাহিনার নামের স্মৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার উদ্যম ও দৃঢ় সংকল্প সকলের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক তাহার মধ্যে এক ধরনের বার্‌বার জোয়ান অব আর্কের সাক্ষাত পাইয়া থাকেন (de Lartigues, Monographie, 182)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কালানুক্রমিকভাবে (১) ইব্ন 'আবদিল-হাকাম, ফুতূহ, সম্পা. এবং অনু. A Gateau, আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খৃ., ৭৬-৮; (২) বালাযুরী, ফুতূহ, সম্পা. রিদওয়ান মুহাম্মাদ রিদওয়ান, কায়রো ১৯৩২ খৃ., ২৩১; (৩) মালিকী, রিয়াদ, সম্পা. H. Mones, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ১খ, ৩২-৬; (৪) বাক্রী, মাসালিক, সম্পা. এবং অনু. de Slane, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., মূল গ্রন্থ, ৭-৮, ২০, ৩১, ৫৭, ১৪৫, ১৮২, অনু. ২২-৩, ৪৮, ৬৯, ১২১, ২৭৭, ৩৪০; (৫) ইবনু'ল-আছীর, কামিল, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮-৩৯, ৪খ, ৩১-৩৩; (৬) য়াকূত, বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৫খ, ৩৩৯, দ্র. নীনী; (৭) 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ ইব্ন 'আবদি'ল-হালীম, ফাত্হু'ল-'আরাব লি'ল্-মাগরিব, সম্পা. E. Levi-Provencal, in RIEEI, Madrid 1954, ii, 222-3 (অনু. in Arabica, i, 40-41); (৮) ছদ্ম-ইব্নু'র-রাকীক, তা'রীখ, সম্পা. আল-কাবি, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., ৫৫-৬৪; (৯) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, সম্পা. G. S. Colin এবং E. Levi-Provencal, লাইডেন ১৯৪৮ খৃ., ১খ, ৩৫-৯; (১০) তীজানী, রিহ্লা, তিউনিস ১৯৫৭ খৃ., ৫৮; (১১) নুওয়ায়রী, নিহায়া, অনু. de Slane, আল-ওয়াযীরু'স সার্রাজ, হুলাল, সম্পা. এম. এইচ আল-হীলা, তিউনিস ১৯৭০ খৃ., ১খ, ৫৩৩-৩৭ ; (১২) in Berberes, Algiers 1852, i, 340-2; (১৩) ইব্ন খালদূন, 'ইবার, বৈরূত ১৯৫০ খৃ., ৬খ, ২১৪, ২১৮-১৯; ৭খ, ১৭-১৮, অনু. de Slane, Berberes, ১খ, ২০৮-৯, ২১৩-১৫; (১৪) ইব্ন নাজী, মা'আলিম, তিউনিস ১৯০২ খৃ., ১খ, ৫৫-৬১; (১৫) ইব্ন আবী দীনার, মু'নিস, তিউনিস ১৯৬৭ খৃ., ২১, ৩৪-৫; (১৬) আল-মাওলা আহ্মাদ, রিহ্লা, ফেয তা. বি., ৪৮-৫১ (অনু. Berbrugger, voyages, প্যারিস ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ২৩৪-৪১); (১৭) আল-উত্ছিলানী, নুয্হা, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮, ১০১-৪; (১৮) ইব্ন আবি'দ-দিয়াফ, ইত্হাফ, তিউনিস ১৯৬৩ খৃ., ১খ, ৮২-৩; (১৯) নাসিরী, ইস্তিক্সা, রাবাত ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ৫৮, ৮২-৩।

আধুনিক গবেষণাবলী ঃ (২০) S. W. Baron, A social and religious history of the Jews; (২১) M. Dall Arche, Scomparsa del Cristianismo ed espansione dell' Islam nell' Africa Settentrionale, Rome 1967, 125-32; (২২) Ch-E. Dufourcq, Berberie et Iberie medievales: un Probleme de rupture, in Rev Historique (Paris 1968), fasc. 488, 297-302, 311; (২৩) H. Fournel, Berbers, Paris 1875-81, i, 215-25; (২৪) Masquerary, Traditions de l'Aures in Bull de corr. Afr. 1885, 1-2, 80-3; (২৫) E. Mercier, Hist. de l'Afrique Septentrionale, Paris 1888, i, 212-6; (২৬) de Lartigues, Monographie de l'Aures, Constantine 1904, 182; (২৭) E. F. Gautier, Le Passe de l'Afrique du Nord, Paris 1952, 270-80; (২৮) G. Marcais, La Berberie musulmane et l'Orient au Moyen Age, Paris 1946, 29, 34-5; (২৯) H. Mones, ফাতহু'ল-'আরাব লি'ল-মাগরিব, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ২৪২-৫৯; (৩০) A

Gateau, Conquete de l'Afrique du Nord, Paris 1948, 161, n. 106; (৩১) E. Levi-Provencal, Un nouveau recit de la conquete de l'Afrique du Nord par les Arabes, in Arabica, i (1954), 32-3; (৩২) H. Z. Hirschberg, Ha-kahina ha-berberit, in Tarbitz, xxvi (1957), 370-83; (৩৩) T. Lewicki, Prophetes, devins et magiciens chez les Berberes medievaux, in Folia Orientalia, vii (1956), 4, 6; (৩৪) ঐ লেখক, Survivanceschez les Berberes medievaux d'ere musulmane de cultes anciens et de croyances paiennes, in Folia Orientalia, viii (1967), 7 ; (৩৫) সা'দ যাগলূল আবদু'ল হামীদ, তা'রীখু'ল-মাগরিব আল-'আরাবী, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., ১৮২-৯৫; (৩৬) H. Simon, Le Judaisme berbere dans l'Afrique ancienne, in Rev. d'Hist. de Phil. Religieuses, Strasburg 1946, 6, 8; (৩৭) T. Fahd, Divination arabe, Leiden 1966, 92-3, 97-8,100; (৩৮) M. Talbi, Un nouveau fragment de l'Histoire de l'Occident in Musulman (৬২-১৯৬/৬৮২-৮১২), l'epopeed' al-kahina, in CT, 1971, no. 73.

M. Talbi (E. I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

আল-কাহির বিল্লাহ্ (القاهر بالله)ঃ ১৯তম 'আব্বাসী খলীফা, তাঁহার ভ্রাতা আল-মুক্তাদির (দ্র.)-এর উত্তরাধিকারী, রাজত্বকাল ৩২০/৯৩২–৩২২/৯৩৪। ইহার পূর্বেও মুহার্রাম ৩১৭/মার্চ ৯২৯-এর ব্যর্থ প্রাসাদ বিপ্লবের পরে তিনি অস্থায়ীভাবে খলীফা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ৩২০/৯৩২-এ আমীর মু'নিস (দ্র.) কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার পর আল-মুকতাদির আপন বাহিনীসহ প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করেন। ইহার পর তিনি ইনতিকাল করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যখন একজন নূতন খলীফা মনোনীত করিত আসেন, তখন আল-মুকতাদিরের পুত্র আহমাদের পক্ষে প্রদত্ত মু'নিসের অভিমত উপেক্ষিত হয় এবং ২৭ শাওওয়াল, ৩২০/৩১ অকটোবর, ৯৩২-এ আল-মু'তাদিদ-এর পুত্র মুহাম্মাদকে খলীফা ঘোষণা করা হয়।

তিনি আল-কাহির বিল্লাহ নামে পরিচিত হন। এই নূতন খলীফা ছিলেন একগুঁয়ে ও প্রতিশোধপরায়ন। তাঁহার এই ব্যক্তিত্ব বিরাজমান চরম অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলে। আল-কাহির তাঁহার মাতার সহিত অসম্মানজনক ব্যবহার এবং পূর্ববর্তী খলীফার পুত্র ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁহার আচরণের জন্য তাঁহার রাজত্বের একেবারে প্রথম হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার মাতার সম্পত্তি তিনি জবরদখল করেন। সরকারের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ছিল উযীর ইব্ন মুকলা (দ্র). এবং আমীর মু'নিস-এর হাতে; তাঁহাদিগকে আল-মুকতাদিরের পূর্ববর্তী সমর্থকদের বিরোধিতা এবং আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। খলীফা নিজেই তাঁহার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করেন; তিনি প্রাসাদ অধ্যক্ষ ইব্ন য়ালবাক-এর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে সক্ষম হন এবং মু'নিস বন্দী হন। কিন্তু উযীর পালাইয়া যান (শা'বান ৩২১/জুলাই ৯৩৩)।

নূতন উযীর মুহাম্মাদ ইব্নুল-কাসিম ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্ খলীফার শী'আ বিরোধী নীতি সমর্থন করেন। তিনি ইব্ন য়ালবাক ও মু'নিসকে মৃত্যুদণ্ড দেন, নিজেকে আল-মুনতাকিম মিন্ আ'দা' দীনিল্লাহ্ ঘোষণা করেন এবং এই উপাধিটি মুদ্রায় অঙ্কিত করেন। আল-কাহির মোটেই কালক্ষেপণ না করিয়া তাঁহার উযীরকে সরাইয়া আহমাদ আল-খাসীবীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন; কিন্তু তিনিও শীঘ্রই নিজেকে অনতিক্রম্য আর্থিক সমস্যায় নিপতিত দেখিতে পাইলেন। অন্যদিকে পূর্ববর্তী উযীর ইব্ন মুকলা খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া 'সাজী' রক্ষীদেরকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে সক্ষম হন, যাহারা ৬ জুমাদা'ল উলা, ৩২২/২৪ এপ্রিল, ৯৩৪-এ বিদ্রোহ করিয়া খলীফাকে বন্দী করে।

আল-মুকতাদিরের পুত্র আর-রাদী নাম গ্রহণ করিয়া নূতন খলীফা ঘোষণা করেন। চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও আল-কাহির সিংহাসন ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আর-রাদীর সমর্থনপুষ্ট 'সাজী' রক্ষীবাহিনীর প্রধান তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দেন। এগার বৎসর পর পরবর্তী খলীফা আল-মুস্তাকফী-এর নির্দেশে আল-কাহির মুক্তিলাভ করেন এবং জুমাদাল-উলা ৩৩৯/অকটোবর ৯৫০-এ ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. Sourdel, Vizirat, 471-8; (২) ইব্নুল-আছীর, নির্ঘণ্ট।

D. Sourdel (E. I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

আল-কাহিরা (القاهرة) ঃ কায়রো, মিসরের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর এবং মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহের অন্যতম। শহরটি নীল নদের উভয় তীরে অবস্থিত ; ভৌগোলিক অবস্থান ৩০০৬ উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৩১০.২৬ পূর্ব অক্ষাংশ; আল-মুকাততাম পাহাড় যেখানে প্রায় নীল নদ পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে সেই বদ্বীপ হইতে আনুমানিক ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে। অবস্থানের দিক দিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানটি নিম্ন মিসরের প্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে।

আদিকাল হইতেই এখানে জনবসতি গড়িয়া উঠে; কিন্তু ২২/৬৪৩ সালে বিখ্যাত আরব সেনাপতি 'আমর ইবনুল-'আস (রা) দেশটি জয় করিয়া আল-ফুসতাতে স্থায়ী সেনানিবাসের ভিত্তি স্থাপন করিলে তখন ইহা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। শহরটির প্রকৃত নাম মিসরু'ল-কাহিরা হইতে গৃহীত। বর্তমান শহরটি ৩৫৯/৯৬৯ সালে ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে উহা চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে। আল-ফুসতাতের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কায়রো শহরের অন্তর্গত পুরাতন কায়রো নগরের মিস্রু'ল-'আতীকা নামে পরিচিত অংশে অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় (দ্র. বাবালিয়ূন, আল-ফুসতাত, মিস্র, আর-রাওদা)।

সম্পাদকমণ্ডলী (E. I.²)

সৌধসমূহ ঃ এই প্রবন্ধে সৌধের নামের পরে দ্বিতীয় বন্ধনীতে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি হইতেছে Index to the Mohammedan monuments in Cairo (Survey of Egypt 1951) প্রদত্ত সংখ্যা। সৌধের নামের পরে যেখানে তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, সৌধটির ভিত্তিপ্রস্তরের গায়ে যে তারিখ অংকিত আছে (অনেক সময়ে একই ভবনে একাধিক ভিত্তিপ্রস্তরও রহিয়াছে) ইহা সেই তারিখ।

নামকরণ নীতি ঃ সৌধগুলির সঠিক পরিচিতির বড় অসুবিধা বানানের; কেননা কোন একটি নামের বর্তমান যে উচ্চারণ (যেমন সারগাতমিশ) [২১৮], সাহিত্য-তথ্য হইতে উহার নাম পাওয়া যায় সারগীতমিশ) [Budagov] সুয়ুরগুতমুশ [Moritz, Arabic Palaeography]) সৌধফলকের গায়ে লেখা সিরগিতমিশ, সযত্নে উল্লিখিত, এগুলির বিভিন্নতা অত্যন্ত লক্ষণীয়। সুবিধার জন্য শিল্পকলার ইতিহাসের পণ্ডিতদের মানের পরিপ্রেক্ষিতে আরবীকৃত তুর্কীর কথ্যরূপের একটি সংশোধিত রূপ গ্রহণ করা হইয়াছে (কূসূন [২২৪] কিন্তু মসজিদের বারান্দাতে লিখিতরূপ কাওসাওন নহে); তবে যেসব ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ব্যুৎপত্তিতে নাম এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে (তাগরীবিরদী/তানরীরিদী [২০৯] হইয়া গিয়াছে সাগারীবিরদী) যে, মূল উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করা কঠিন, সেখানে ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে।

ভৌগোলিক বর্ণনা ঃ বর্তমান কায়রো শহরের বিস্তৃত পরিসরের জন্য ইহার সৌধসমূহের ইতিহাস আলোচনা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য শহরের ব্যতিক্রম। ইহার ঘটিয়াছে আনুভূমিক বিস্তার, উর্ধ্বমুখী বৃদ্ধি নয়। এই অর্থে বলা যায়, শহরটির ব্যাপকতা রহিয়াছে, গভীরতা নাই। আদি আল-কাহিরা মূল শহর আল-ফুসতাত, আল-'আসকার ও আল-কাতা'ই' সমন্বিত শহরাঞ্চলসমূহের বেশ উত্তরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার কালে মূল উদ্দেশ্য ছিল উহাকে সরকার পরিচালনার কেন্দ্র করা, যে কারণে উহার অবস্থান ছিল প্রধান জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের বাহিরে; সেখানে অর্ধ-শহর ধরনের দালানকোঠা ছিল, যেমন ফাতিমী সৈন্যদের ছাউনী এবং নবনির্মিত জামে' মসজিদ আল-আযহার (৯৭), কিছু কালের জন্য দেওয়ালবেষ্টিত পুরাতন কায়রো শহর, কাসরু'শ-শাম', বাবালায়ূন ও আল-ফুসতাত শিল্পকেন্দ্র হিসাবে উহাদের স্ব স্ব গুরুত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় এবং নীল নদের তীরবর্তী প্রধান প্রধান বন্দর-সংস্থার সঙ্গে এবং প্রধান প্রধান আবাসিক এলাকার সঙ্গে ইহা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে।

যাহা হউক, নীল নদ ক্রমেই পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইবার ফলে এবং আল-কাহিরাতে সরকারী দফতরসমূহ স্থানান্তরের আকর্ষণ হেতু জনবসতি খুব বেশী উত্তরমুখে ধাবিত হয়। ফলে সেনাপতি জাওহার (৩৫৮/৯৬৯ পরবর্তী) নির্মিত মূল মাটির (লাবিন) দেওয়াল দুইবার সম্প্রসারিত করিতে হইয়াছিল ঃ একবার ৪৮০/১০৮৭-১০৯১" বাদরু'ল-জামালী কর্তৃক (৬, ৭, ১৯৯) এবং দ্বিতীয় বার সুলতান সালাহুদ-দীন-এর আদেশে ৫৭২/১১৭৬-৫৮৯/১১৯৩। ৫ম/১১শ শতকে শহরের যে বিস্তৃতি ঘটে, বলা হইয়া থাকে যে, সালজূক আতসীযের আক্রমণের ভয়ে উহা ঘটিয়াছিল, যাহা পরবর্তীটি অপেক্ষা কম ব্যাপক ছিল; পরবর্তীটির অন্তর্ভুক্ত ছিল জাওহারের প্রাচীর ও নীল নদের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা (দ্র. Fig. i), সেই ঘটনার স্মৃতি বহন করিতেছে আধুনিক কায়রোর কোন কোন মহল্লা, যেমন বাবু'ল-হাদীদ, বাবু'ল-খালক (খারক) ইত্যাদি। এই উত্তরমুখী জনপ্রবাহ চলিতে থাকায় কালক্রমে আল-ফুসতাতের বিস্তীর্ণ এলাকা জনশূন্য হইয়া যায়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বস্তুত ইহা পতিত এলাকায় (খারাবা) পরিণত হয়। ৫৭২/১১৭৬ সালের মধ্যে ইহা জনবসতিপূর্ণ এলাকার সঙ্গে একটি দেওয়াল দ্বারা আংশিকভাবে যুক্ত হয়। সুলতান সালাহু'দ-দীন-এর মৃত্যুর ফলে উহার নির্মাণকার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ফাতিমী আমলের পর হইতে ইব্ন তূলূন মসজিদের দক্ষিণস্থ আল-কাতাই'র এলাকাসমূহ ক্রমেই দক্ষিণের এলাকার সঙ্গে যুক্ত হইতে থাকে (কারাফাতু'ল-কুবরা, নিম্নে দ্র.)। ফাতিমী রক্ষাব্যবস্থার বাহিরে প্রথমে যে সম্প্রসারণ ঘটে তাহা হইল সুলতান সালাহু'দ-দীন-এর কিল্লা, ৫৭২/১১৭৬ হইতে যাহার নির্মাণকার্য শুরু হয়, নগর-রক্ষার জন্য নহে, বরং নগরবাসীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

কিল্লাতে নির্মিত একটি পানি নালার সাহায্যে নীল নদ হইতে পানি সরবরাহ করা হইত [৭৮] (কানাতির)। বর্তমানে উহার যে অংশ বিদ্যমান তাহা নির্মিত হইয়াছিল সুলতান নাসির মুহাম্মাদ-এর আমল হইতে (Creswell, MAE, ২খ, ২৫৫-৯)। তিনি কিল্লার পানি প্রণালী হইতে পানি উত্তোলনের উদ্দেশ্যে ৭১২/১৩১৩ সালে নীল নদে চারিটি সাকিয়্যা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ৭৪১/১৩৪১ সালে উহার সঙ্গে সালাহু'দ-দীন-এর দেওয়ালের ভগ্নাবশেষের সংযোগ করিয়া দেন। উক্ত দেওয়াল নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল আল-ফুসতাতের খারাবাকে বেষ্টন করিয়া দেওয়া। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে ইহার সংস্কার করা হয় এবং ইহাকে সম্প্রসারিত করা হয়, বিশেষ করিয়া কা'ইত বে এবং কানসাওহ আল-গাওরী (দ্র.)-এর শাসনামলে। এই শেষোক্তজন সম্ভবত নীল নদ তীরবর্তী বিশাল জলাধার, যাহা বর্তমানে সাবা' সাওয়াকী নামে পরিচিত, নির্মাণ করিয়াছিলেন [৭৮]।

আয়্যূবী আমলের দ্বিতীয় আর একটি কিল্লার নাম ছিল কালা'আতু'র-রাওদা; কালা'আতু'ল-মিকয়াস। উহা মামলূক আমলে কয়েকবার ধ্বংস হইয়া যায় এবং কয়েক বারই পুনর্নির্মিত হয়। বর্তমানে আর ইহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। আল-মালিকু'স-সালিহ রাওদা দ্বীপে উক্ত কিল্লাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, যদিও জিযার (Giza) ন্যায় উহাও ছিল একান্তভাবে একটি আবাসিক এলাকা। ফলে স্থাপনের দিক হইতে অন্তত কিছুটা গুরুত্ব আছে এইরূপ খুব কম সৌধই বর্তমানে সেখানে টিকিয়া আছে।

বাহরী মামলূকদের (দ্র.) আমলে সম্প্রসারণ কার্য হয় প্রধানত ফাতিমী প্রাচীরের বহির্ভাগে, প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগের নির্মাণসমূহ প্রায় সকলই ছিল মাযার সৌধ ও রাজকীয় ভবন। কিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালু এলাকাসমূহ যেগুলি আয়্যূবী আমলে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, সেইগুলি আন-নাসির মুহাম্মাদ দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করেন। কিন্তু সেই এলাকাতে প্রধানত সুলতানের প্রাসাদ এবং উচ্চ পদস্থ আমীরগণের বসবাস ছিল। এই আমলে বিরাট বিরাট সড়ক নির্মিত হয়, যেমন দারবু'ল-আহমার, ইহা কিল্লা হইতে বাব যুওয়ায়লা (১৯৯) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। শারি'উ'স-সালীবা' ইহা কিল্লা হইতে ইব্ন তূলূন মসজিদ পর্যন্ত গিয়াছিল এবং তথা হইতে খালীজ পর্যন্ত , যাহা আদিতে ছিল একটি খাল (বর্তমানে শারি' পোর্ট সা'ঈদ)। প্রাচীরবেষ্টিত শহর আল-কাহিরার উত্তরে সম্প্রসারণ তত উল্লেখযোগ্য ছিল না; কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি মাত্র ইমারত পাওয়া যায়, সেইগুলি হইল মায়দান দাহির (জাহির) অবস্থিত বায়বারস মসজিদ [১], ৬৬৫-৭/১২৬৬-৯, যাহা সুলতানী পলো ময়দানে অবস্থিত (দ্র. প্লেট নং ২) এবং কুব্বাতু'ল ফাদাবিয়্যা [৫], Cresswell ইহার নির্মাণকাল নির্ধারণ করিয়াছেন ৮৮৪-৬/১৪৭৯-৮১।

'উছমানী আমলে কায়রোর সম্প্রসারণ ভিন্ন দিকে হইয়াছিল। প্রাচীরবেষ্টিত শহর আল-কাহিরা পশ্চিম দিকে, বিশেষ করিয়া বূলাক এলাকাতে যাহা তখন কায়রোর প্রধান নদী বন্দর ছিল, সম্প্রসারিত হয়।

এই এলাকাতে প্রাক-'উছমানী আমলের মাত্র দুইটি সৌধ টিকিয়া আছে, কাদী য়াহ্য়া-এর মসজিদ [৩৪৪], ৮৫২-৩/১৪৪৮-৯, ও আবু'ল-'ঈলা-এর মসজিদ [৩৪০], নির্মাণকাল আনুমানিক ৮৯০/১৪৫৮। বৈসাদৃশ্যজনকভাবে এই অংশেই রহিয়াছে সিনান পাশার মসজিদ (কুয়িল্লা) [৩৪৯], ৯৭৯/১৫৭১, ১৭শ ও ১৮শ শতকের অনেক সৌধের ভিত্তি এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আকর্ষণীয় খান (বিকালা) এবং ইস্তাম্বুলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাঠের বাড়ী। এই এলাকাটিতে এখন পর্যন্ত শুধু দ্রুততার সঙ্গে জরীপ করা হইয়াছে, এই কারণে ইহার বিস্তারিত জরীপের প্রয়োজন রহিয়াছে। 'উছমানীগণ যে দিক পরিবর্তনের সূচনা করেন তাহা আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; নীল নদের পশ্চিম তীরে জীযা (গিযা) 'ইমবাবা ও শুব্রা, যেখানে মুহাম্মাদ 'আলী পাশা ১৮৫০ খৃ.-এ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন (E. Pauty, L'architecture au Caire depuis la Conquete ottomane, 52-8) তাহার আকর্ষণে সেই এলাকাতে একটি আবাসিক শহরতলী গড়িয়া উঠে 'আব্বাসিয়াতে এবং শেষ পর্যন্ত ঐখানে উদ্যান নগরী ও হেলিওপোলিস উপশহর গড়িয়া উঠে।

আল-কাহিরার জনবসতির ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, সাধারণভাবে উহা উত্তরমুখী অগ্রসরমান হইয়াছে আল-ফুস্তাত হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আল-কাতা'ই' পর্যন্ত। মূল আল-কাহিরা অন্তত সালাহু'দ-দীন কর্তৃক নির্মিত দেওয়াল ঘেরা এলাকা সরকারের দফতরসমূহ থাকিবার কারণে প্রধান গুরুত্ব লাভ করে এবং ১৯শ শতকে ইযবেকিয়্যা এলাকাতে য়ূরোপীয় নগর পরিকল্পনা চাপাইয়া দেওয়ার ফলে উহা বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থলরূপেও পরিগণিত হয়। মাযার সৌধগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু এই উন্নয়ন অনুসৃত হয় নাই। মাযার বর্তমানে বস্তুত সমগ্র শহরকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং মাযার সৌধগুলির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্যগুলিই বর্তমান কায়রো শহরে পর্যটকগণের দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করে।

মাযারসমূহ ঃ দক্ষিণের বিশাল গোরস্তান (আল-কারাফাল-কুবরা') একেবারে 'আমর ইব্নু'ল-'আস (রা)-এর বিজয়ের পর হইতে শুরু করিয়া ফাতিমী আমল পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। সেই সময়ে ইহা বেশ কয়েকটি ইসলাম ধর্মীয় দলের কেন্দ্র ছিল। আয়্যূবীগণ কর্তৃক মিসর বিজয়ের অল্পকাল পরেই ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মাযারের পার্শ্বে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া সেই সকল বিভিন্ন মতাদর্শীকে নিষ্ঠাবান সুন্নী মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় (বর্তমান সমাধি সৌধটি [২৮১], ৬০৮/১২১১-এ নির্মাণ করিয়াছিলেন আল-মালিকু'ল-কামিল)। গোরস্তানের দক্ষিণে রহিয়াছে বেশ কিছু ফাতিমী মাশ্হাদ, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল য়াহ্য়া আশ-শাবীহীর মাশহাদ [২৮৫] আনুমানিক ৫৪৫-৬/১১৫১-এ ইমাম আল-লায়ছ (র)-এর মাযার [২৮৬], আল-গাওরী কর্তৃক ৯১১/১৫০৫-এ পুনর্নির্মিত এবং ১২০১/১৭৮৬-৭-এ সংস্কারকৃত শাহীন আল-খালাওয়াতী-র খানকাহ ও সমাধিসৌধ [২১২], ৯৪৫/১৫৩৮-এ এবং সীদী 'উকবা-এর মাযার, মুহাম্মাদ পাশা সিলাহদার কর্তৃক ১০৬৬/১৬৫৫-৬ সালে পুনর্নির্মিত এবং ১০৯৯/১৬৮৮ সালে সংস্কারকৃত [৬০৮]; ইহা সাদাতু'ল-ওয়াফাইয়্যা নামেই অধিক পরিচিত। এই এলাকাতে মামলূক আমলের স্মৃতিচিহ্ন খুবই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়, যদিও বিস্তারিতভাবে খোঁজ করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে মাকরীযী এবং অন্যান্য কর্তৃক উল্লিখিত অসংখ্য মাযারের ভিত্তির সন্ধান প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মাযারের পিছনে রহিয়াছে বিগত রাজ-পরিবারের সদস্যগণের মাযার, হাওশু'ল-পাশা।

গোরস্তানের উত্তরাংশে রহিয়াছে আরও বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাতিমী মাশ্হাদসমূহ, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সায়্যিদা নাফীসার মাযার [বর্তমানে উহার শুধু সংস্কারকালীন শিলালিপি, যাহা আল-হাফিজ-এর শাসনামলের, টিকিয়া আছে, D. Russell যে পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন, A note on the cemetery of the Abbasid Caliphs and the shrine of Sayyida Nafisa, in Ars Islamica, ৬খ (১৯৩৯ খৃ.), ১৬৮-৭৪, তাহা বাস্তবায়নের খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে] সায়্যিদা রুকায়্যা-এর মাযার [২৭৩], ৫২৭/১১৩৩] এবং সায়্যিদা 'আতিকা-এর মাযার [৩৩৩]। আনুমানিক ১১২৫ খৃ. এই নির্মাণ ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। আয়্যূবী বংশীয় ও বাহ্রী মামলূক বংশীয় সুলতান ও সম্রাজ্ঞিগণকে এখানে কবর দেওয়া হয়, যাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাজারাতু'দ-দুরর (شجرة الدر) [১৯], আনুমানিক ৬৪৮/১২৫০, 'আব্বাসী খলীফাগণের হাওশ ও মাযার সৌধ [২৭৬] যাহা ৬৪০/১২৪২-৩ সালে নির্মিত এবং এখানে সমাহিত সর্বশেষ মামলূক সুলতান আশরাফ খালীল-এর মাযার [২৭৫], ৬৮৭/১২৮৮ নিঃসন্দেহে এই একই গোরস্তানের অংশ, ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কয়েকটি মাযার। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নির্মিত মাযারটি সহজেই চিহ্নিত করা যায়, মুসতাফা পাশার মাযার [২৭৯], (?) ৬৬৬/১২৬৭-৬৭২/১২৭৩, এইগুলিরই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে কূসূন-এর মাযার ও খানকাহ [২৯০-১], ৭৩৬-৭/১৩৩৫-৭ এবং মিনারযুক্ত একটি অতি লক্ষণীয় মাযার, সুলতানিয়্যা [২৮৮-৯]; ইহার গম্বুজগুলির সঙ্গে বাহ্যত সামারকান্দ ও হিরাতের তায়মূরী সৌধসমূহের গম্বুজের সাদৃশ্য লক্ষ করিয়া Cresswell এই শেষোক্তটির তারিখ নির্ধারণ করিয়াছেন ৯ম/১৫শ শতকের মধ্যভাগ বলিয়া, কিন্তু এইগুলি হয়ত আরও এক শতাব্দীকাল আগেরও হইতে পারে।

দক্ষিণের গোরস্তানের কিনারার দিকগুলি বিশেষ আকর্ষণের দাবিদার, খৃষ্টান গোরস্তান এখনকার মতই তখনও কাসরু'শ-শা'ম-এর কাছে অবস্থিত ছিল, যদিও সেখানে এখন আর সুপ্রাচীন কালের কিছুই অবশিষ্ট নাই (কায়রোর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জাবালু'ল-আহমারে অবস্থিত কবরগুলি বর্তমান শতাব্দী কালের বলিয়াই মনে হয়)। য়াহূদী গোরস্তানগুলি আরও দক্ষিণে বাসাতীনু'ল-ওয়াযীর এলাকাতে অবস্থিত ছিল। এই পার্শ্বের মাযার সৌধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর হইতেছে মাশহাদু'ল-জুয়ূশী [৩০৪], ৪৭৮/১০৮৫, বাদরু'ল-জামালীর মাযার, যাহা বর্তমানে সম্পূর্ণ একাকী মুকাত্তাম পাহাড়ে দণ্ডায়মান, যদিও সাহিত্য গ্রন্থসমূহে প্যাভিলিয়ন ও অন্যান্য দালানের উল্লেখ করা হইয়াছে (যথা মাসজিদু'ত-তানূর যাহা ফিরআওন-এর বলিয়া কথিত স্থানটিতে নির্মিত হইয়াছে) যেগুলি আর বর্তমানে টিকিয়া নাই। তবে ইহাই এই এলাকাটিতে বিদ্যমান একমাত্র সমাধি ভবন।

কিল্লার উত্তর ও উত্তর-পূর্বস্থ বাবুল-ওয়াযীর গোরস্তান সুলতান সালাহুদ-দীন-এর দেওয়ালের উত্তরে ঠিক বহির্ভাগেই অবস্থিত। সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আবার সর্বপ্রাচীনও সমাধি সৌধ হইতেছে মানজাকু'ল-য়ূসুফী [১৩৮], ৭৫০/১৩৪৯, Index-এ উহাকে একটি মসজিদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ব্যতিক্রমীভাবে উহাতে একটি

আলাদা প্রবেশ পথ রহিয়াছে এবং মসজিদের সংলগ্নই রহিয়াছে একটি মাযার যাহা দেখিতে একটি মাদরাসা আকৃতির। অন্যান্য সৌধও ৮ম/১৪শ শতকের, শায়খূ-এর সাবীল [১৪৪] ৭৫৫/১৩৫৪ কায়রোর স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে প্রাচীন এককভাবে দণ্ডায়মান সাবীল, শায়খ নিজামু'দ-দীন-এর মসজিদ ও খানকাহ (১৪০], ৭৫৭/১৩৫৬, এবং তানকিযবুগা-র মাযার ও খানকাহ, কিছুটা দূরে এক নির্জন স্থানে মুকাত্তামের [৮৫] একটি নীচু বর্ধিতাংশের উপরে অবস্থিত, ৭৬৪/১৩৬২। এখানকার সমাধি সৌধসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক কালের হইতেছে য়ূনুস আদ-দাওয়ার-এর মাযার [১৩৯], ইহা ৭৮৩/১৩৮২-এর পূর্বেকার। এই সৌধসমূহের মধ্যে কোনটিই রাজকীয় নহে। সানজাকের সৌধ যেহেতু বাহরী মামলূক সুলতানগণের মাযার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নহে, কাজেই এই ছোট গোরস্তানটির সৃষ্টি জমির উপরে চাপ সৃষ্টি হেতুই হইয়া থাকিবে; সেই চাপের কারণ মামলূক সুলতানগণ কর্তৃক দেওয়ালের অভ্যন্তরভাগে এবং কিল্লা হইতে কেন্দ্রের দিকে আগত প্রধানত সড়কসমূহে গোরস্তান নির্মাণ।

উত্তরের ও উত্তর-পূর্বদিকের বিশাল গোরস্তান যাহা ভুলক্রমে খলীফাগণের মাযার নামে পরিচিত। যদিও বা বাবু'ল-ওয়াযীরের প্রায় সন্নিহিত এবং আপাতদৃষ্টিতে শুধু একটি সাম্প্রতিক সড়ক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতেছে শারি' সালাহ সালিম, উহাকে মনে হয় যেন (দ্র. আল-মাকারীযী, ২খ, ৩৬৩) একটি ভিন্ন গঠনের।এই এলাকাতে প্রথম মাযার নির্মিত হয় য়ূনুস আদ-দাওয়াদার-এর [১৫৭], ৭৮৩-৪/১৩৮২ (এলাকাটি তৎকালে 'আওয়ামিদু'স-সিবাক নামে পরিচিত ছিল);কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইখানে সমাহিত করা হয় বারকূক-এর পিতা আনাসকে। এইখানে সামান্য ভূ-সংস্থান গঠিত সমস্যা রহিয়াছে। বাবু'ল-ওয়াযীরের সংলগ্ন এই গোরস্তানের দক্ষিণের অংশে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাহরী ইমারত রহিয়াছে, তাশতীমূর-এর মাযার [৯২], ৭৩৫/১৩৩৪, তায়বুগা আত-তাবীল-এর মাযার ৭৬৮/১৩৬৬-এর আগে [৩৭২], খাওয়ান্দ তুগায়-এর মাযার [৮১], স্থানীয়ভাবে উম্ম আনূক নামে পরিচিত, ৭৪৯/১৩৪৮-এর আগের (দ্র. আল-মাকরীযী, ২খ, পৃ. ৬৬-৭)। ইহা একটি মাযার ও খানকাহ, এখানকার টিকিয়া থাকা গম্বুজটির গোড়ায় অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় পলেস্তারার কারুকার্যে এবং কিছু আকর্ষণীয় উজ্জ্বল মোজাইক করা রহিয়াছে। এই মাযারসমূহের উত্তরে যে সকল সৌধ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে সেইগুলি বুরজী (যদিও বা সকল মানচিত্রেই কোন নম্বর না দিয়ে বাহরী ধ্বংসাবশেষ বলিয়া দেখান হইয়া থাকে); এখানকার সবগুলিই বড় আকারে নির্মিত এবং ইহাদের অনেকগুলিই সুলতানী পরিবারের সদস্যগণের মাযার। ঐগুলির মধ্যে রহিয়াছে ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর খানকাহের ভবনসমূহ [১৪৯] ৮০৩/১৪০০-৮১৩/১৪১১ কা'ইত বায়-এর মাযার [৯৪, ৯৯, ১০১, ১০৪], ৮৭৭-৯/১৪৭২-৪ এবং সুলতান ঈনাল-এর [১৫৮], ৮৫৫/১৪৫১-৮৬০/১৪৫৬ ও আমীর কুরকুমাস-এর [১৬২], ৯১১-৩/১৫০৬-৭. যৌথ মাযার সৌধসমূহ।

আল-কাহিরার (কায়রো) স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের নির্দেশিকা [পরবর্তী মানচিত্র দ্র.]

১। আজ-জাহির বায়বারস-এর মসজিদ (H1)
২। আল-মালিকু'ল-'আদিল তূমানবায়-এর মাযার (K1)
৫। আল-কুব্বাতু'ল-ফাদাবিয়্যা (K1)
৬। বাবু'ল-ফুতূহ (H3)
৭। বাবু'ন-নাসর (H3)
৯। কা'ইত বায়-এর খান (H3)
১১। কূসূন-এর খান (H3)
১৫। আল-হাকিম-এর মসজিদ (H3)
২০। মুসাফিরখানা প্রাসাদ (H4)
২১। আবদু'র-রাহমান কাতখুদা-এর সাবীল-কুত্তাব (H4)
২২। আয়দুমুর আল-পাহলাওয়ান-এর যাবিয়া (H4)
২৩। আয-যুকানদার-এর মসজিদ(H4)
৩১। কারা সুনকুর-এর মাদরাসা (H4)
৩২। রুকনু'দ-দীন বায়বারস আল-জাশেনকীর-এর খানকাহ (H3)
৩৩। আল-আকমার-এর মসজিদ (H3)
৩৪। বেশতাক-এর প্রাসাদ (H4)
৩৫। জামালু'দ-দীন আল-উসতাদার-এর মসজিদ (H4)
৩৭। জাহিরিয়্যা মাদরাসা (H4)
৩৮। আস-সালিহ নাজমু'দ-দীন আয়্যুব-এর মাযার ও মসজিদ (H4)
৪৩। আল-মানসূর কালা'উন-এর মাদরাসা ও হাসপাতাল (G4)
৪৪। আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর মাদরাসা (H4)
৪৯। কাদী আবূ বাক্র মুজহির-এর মসজিদ (H3)
৫০। মুহাম্মাদ মুহিব্বু'দ-দীন-এর কা'জা (ওয়াক্ফ 'উছমান কাতখুদা) (H4)
৫১। মাক'আদ মামায় (বায়তু'ল-কাদী) (H4)
৫২। খুসরাও পাশা-এর সাবীল-কুত্তাব (H4)
৫৩। বাবু'ল-বাদিস্তান (আল-গাওরী) (H4)
৫৪। বিকালাতু'ল-গাওরী-এর সম্মুখভাগ (Facade) (H4)
৫৬। আল-গাওরীর তোরণ (H54)
৬১। আল-আশরাফ ঈনাল-এর স্ত্রী রিবাত (খাওয়ান্দ যায়নাব) (G4)
৬২। মুহাম্মাদ বে আবূ যাহাব-এর হাওদ ও সাবীল (H5)
৬৪। বিকালাতু'ন-নাখ্লা (H5)
৬৬, ৬৭। আল-গাওরীর মাযার, মাদরাসা ও খানকাহ (G H5)
৭৫। কা'ইত বায়-এর খান (H5)
৭৬। কা'ইত বায়-এর সাবীল-কুত্তাব (H5)
৭৮। পানিপথ Aqueduct (D10)
৮১। খাওয়ান্দ তুগায় (উম্ম আনূক)-এর মাযার ও খানকাহের ধ্বংসাবশেষ (K7)
৮৫। তানকিযবুগা-এর মাযার, খানকাহ ও মাদরাসা (K7)
৯২। তাশতীমূর-এর মাযার (K5)
৯৪। ইব্ন গুরাব-এর মাযার (K5)
৯৬। গান্নামিয়্যা মাদরাসা (K5)
৯৭। আল-আযহার মসজিদ (K5)
৯৮। মুহাম্মাদ বে আবূ যাহাব-এর মসজিদ (K5)
৯৯। কা'ইত বায়-এর মসজিদ ও মাযার (K5)
১০১। কা'ইত বায়-এর মাক'আদ (K5)
১০৪। কা'ইত বায়-এর রাব' (K5)
১০৯। আল-ফাকিহানীর মসজিদ (G5)
১১২। আসলাম আল-বাহাঈ'ল-এর মসজিদ (H6)

১১৪। কিজমাস (কাচমায) আল-ইসহাকীর মসজিদ (G6)
১১৫। আহমাদ আল-মিহমানদার-এর মসজিদ (G6)
১১৬। আস-সালিহ তালা'ই'-এর মসজিদ (G6)
১২০। আলতিনবুগা আল-মারিদানীর মসজিদ (G6)
১২১। আল-আশরাফ বারসবায়-এর খানকাহ (L4)
১২৩। আকসুনকুর (ইবরাহীম আগা মুস্তাহফিজান)-এর মসজিদ (H7)
১৩০। আলমাস (yilmaz)-মসজিদ (F7)
১৩২। কুব্বাত 'আসফূর (L4)
১৩৩। সুলতান হাসান-এর মসজিদ (G8)
১৩৫। আল-মাহমূদিয়্যা মসজিদ (G8)
১৩৮। মানজাক আল-য়ূসুফী-র মসজিদ (H8)
১৩৯। য়ূনুস আদ্-দাওয়াদার-এর মাযার (H7)
১৪০। শায়খ নিজামু'দ-দীন ইসহাক-এর মসজিদ ও খানকাহ (H7)
১৪১। য়াহ্য়া যায়নু'দ-দীন-এর রিবাত (G4)
১৪২। খাদিম সুলায়মান পাশার মসজিদ (H8)
১৪৩। আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর মসজিদ (H8)
১৪৪। শায়খূ-এর সাবীল (H7)
১৪৬। যাবিয়াতু'ল-'আব্বার (F8)
১৪৭। শায়খ আল-'উমারীর মসজিদ (F8)
১৪৯। ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর খানকাহ (L4)
১৫২। শায়খূ আল-'উমারীর খানকাহ ও মাযার (F8)
১৫৩। খুশকাদাম আল-আহমাদীর মাদরাসা (F8)
১৫৭। আনাস (য়ূনুস আদ-দাওয়াদার)-এর মাযার (L4)
১৫৮। সুলতান আল-আশরাফ ঈনাল-এর মাযার, রিবাত ও মসজিদ/খানকাহ (L3)
১৬২। আমীর কুরকুমাস-এর খানকাহ ও মাযার (L3)
১৬৪। কানসাওহ আবূ সা'ঈদ-এর মাযার (L8)
১৬৯। শাজার আদ-দুরর-এর মাযার (F9)
১৭৭। মুকবিলুয-যিমান আদ-দা'উদীর খানকাহ (G4)
১৮৭। সুলতান বারকূক-এর মসজিদ ও মাদরাসা (H4)
১৯০। আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর মসজিদ (G5)
১৯৯। বাব যুওয়ায়লা (G5)
২০০। মালিকা সাফিয়্যার মসজিদ (F6)
২০১। আল-বুরদায়নীর মসজিদ (G6)
২০২। কূসূন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (F6)
২০৫। বেশতাক মসজিদের মিনার ও তোরণ (E7)
২০৯। তাগরীবিরদীর মাদরাসা (F8)
২১১। আযবাক আল-য়ূসুফীর মাযার (E8)
২১৭। লাজীন আল-সায়ফীর মসজিদের সম্মুখভাগ (E8)
২১৮। সারগাতমিশ-এর মসজিদ ও মাদরাসা (E8)
২২০। আহ্মাদ ইব্ন তূলূন-এর মসজিদ (E F 8,9)
২২১। সালার ও সানজারু'ল-জাওবিলী-এর মাযারসৌধ (E8)
২২৩। কা'ইত বায়-এর মাদরাসা (E8)
২২৪। কূসূন মসজিদের তোরণ (G7)
২২৫। আত-তাকিয়্যা আস-সুলায়মানিয়্যা (G7)
২২৮। কা'ইত বায়-এর 'প্রাসাদ' (G6)
২৪৪। বেশতাক-এর গোসলখানা (G7)
২৪৭। মানজাক আল-সিলাহদার-এর তোরণ (G4)
২৪৮। খায়র বেগ-এর মসজিদ (H7)
২৪৯। খায়র বেগ-এর প্রাসাদ (H7)
২৫৭। আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর মারিস্তান (হাসপাতাল) (G8)
২৬৩। সুনকুর সা'দী হাসান সাদাকা-এর মাযার ও মাদরাসা (F8)
২৬৬। আমীর য়ুশবাক-এর প্রাসাদ (F8)
২৬৭। আমীর তায-এর প্রাসাদ (F8)
২৭৩। সায়্যিদা রুকায়্যা-এর মাশহাদ (F9)
২৭৫। আল-আশরাফ খালীল-এর মাযার ((F10)
২৭৬। 'আব্বাসী খলীফাগণের হাওশ এবং মাযারসমূহ (F10)
২৭৯। মুসতাফা পাশার মাযার (G10)
২৮৮। সুলতানিয়্যা ও উত্তরের মিনার (G10)
২৯০। কুসান মিনার (G10)
২৯১। কূসূন-এর খানকাহ (G10)
২৯৮। তানকিযবুগার মাযার ও মাদরাসা (H10)
৩০১। কুব্বাত ইখওয়ান (ইখওয়ান (ইখওয়াত) য়ূসুফ (J10)
৩০৪। আল-জুয়ূশীর মাশহাদ (J10)
৩০৬। সুলতান মাহমূদ-এর তাকিয়্যা ও সাবীল (F6)
৩২১। বায়তু'ল-কিরিদালিয়্যা (F9)
৩২৪। কা'ইত বায়-এর সাবীল-কুত্তাব (G8)
৩৩০। মালিকা সাফিয়্যার তোরণ (F6)
৩৩৩। সায়্যিদা 'আতিকার মাশহাদ (F9)
৩৫৬। হারাতু'ল-মাবয়াদা তোরণ (H4)
৩৬০। কানসাওহ আবূ সা'ঈদ-এর মাযার (G8)
৩৭২। তায়বুগা আত-তাবীল-এর মাযার (K6)
৩৮২। সুলায়মান আগা আস-সিলাহদার-এর মসজিদ ও সাবীল কুত্তাব (H3)
৪০৬। রাদওয়ান বে-এর রাব' (G6)
৪১০। আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর গোসলখানা (G5)
৪৫৫। মুহাম্মাদ 'আলীর কিল্লা (J9)
৪৬৩। আস-সাদাতু'ল-ওয়াফা'ইয়্যা (E7)
৪৭২। দাউদ পাশার মসজিদ (E7)
৫০৩। মুহাম্মাদ 'আলীর মসজিদ (G8.9)
৫০৫। আল-জাওহারার প্রাসাদ (GH 9)
৫১১। কুব্বাত বাদরু'ল-জামালী (J2)
৫৫৫। বাবু'ল-'আযাব (G8)
৪৬১। আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর সাবীল (H4)
৫৯৯। যায়নু'ল-'আবিদীন-এর মাযার (CD 9.10)
৬০৫। মাহাফিজখানা (H8)
৬০৬। টাকশাল (H9)
৬১২। হারীম প্রাসাদ (H8)

সৌধসমূহের জন্য প্রদত্ত সংখ্যা এবং মানচিত্রের ঘরসমূহের সংখ্যা ও অক্ষরসমূহ Map of Cairo showing Mohammedan, Survey of Egypt, 1950 (যাহা K. A. C. Creswell তাঁহার The Muslim architecture of Egypi, i, অক্সফোর্ড ১৯৫২ গ্রন্থে সংযোজন করিয়াছেন) এবং Index of Muhammedan monuments in Cairo, Survey of Egypt, 1951-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবার মূল শহর এলাকাতে জনবসতি এবং তাহাদের বসতবাড়ী নির্মাণের চাপ বৃদ্ধি পাইবার ফলেই এই গোরস্তান এলাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহজ। ইহার আরও বড় কারণ এই যে, জমির মালিকানা লোপ করাকে নিরুৎসাহিত করা হইত এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিকল্প জমি (তাবদীল) প্রদান করিতে হইলে বিশেষ ফাতওয়ার প্রয়োজন হইত। ইব্‌ন ইয়াসের মতে এই রীতি ৯ম/১৫শ শতকেই সাধারণভাবে প্রচলিত হয়। যাহা হউক, এই গোরস্তানের বৃহত্তর রাজকীয় স্থাপত্যসমূহের মধ্যে রহিয়াছে রাব' (বহুবচনে রুবূ')-এর ন্যায় একান্তই সওদাগরী ধরনের সৌধ এবং এইরূপ প্রমাণ রহিয়াছে (Van Berchem, CIA, পৃ. ৩১৬-৩১) যে, ফারাজ ইব্‌ন বারকূক আশা করিয়াছিলেন যে, সূকু'ল-হারীরকে তাঁহার খানকাহের নিকটবর্তী কোন স্থানে লইয়া যাইবেন। এলাকাটি সাম্প্রতিক কালে মাত্র জনবসতিপূর্ণ হইয়াছে এবং ইহার বহুলাংশ মূল কায়রো হইতে বারকিয়্যা নামে পরিচিত আবর্জনা স্তূপ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। কাজেই গোরস্তানের প্রবেশের পথ সম্ভবত বাবু'ল ওয়াযীর দিয়া ছিল না, ছিল বাবু'ল-বারকিয়্যা দিয়া, যাহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং শতাব্দীর পঞ্চ দশকের শেষদিকে এবং একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, উহার নির্মাণ তারিখ ছিল ৪৮০/১০৮৭ (দ্র. G. Wiet, Une nouvelle inscription fatimide au Caire, JA-তে, ২৪৯ খ, ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৩-২০)।

কায়রোর নগর প্রাচীরের উত্তরে অবস্থিত গোরস্তান যাহা বর্তমানে বাবু'ন-নাস্‌র নামে পরিচিত, সেখানে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন একটি মাত্র মাযারসৌধ রহিয়াছে। উহা কুব্বাত শায়খ য়ূনুস [৫১১], আনু. ৪৮৭/১০৯৪। আল-মাকরীযী (৩খ, ৪১৪) বলেন যে, এই এলাকাটিতে, বিশেষ করিয়া ৭০০/১৩০০ সালের পরে লোকের সমাগম হইতে থাকে এবং ইহাও বলেন যে, মামলূক অভিজাত ব্যক্তিগণ সেখানে এমন কি বসতবাটি পর্যন্ত তৈয়ার করেন। আল-আশরাফ শা'বান-এর আমলে (৭৭৬/১৩৭৫-৬) যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সূকু'ল-লিফত অপসারিত হইতে বাধ্য হয় তখন ইহাও পরিত্যক্ত হয়। বসবাসের দিকেই গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় এবং মাযার-সৌধেরও সংখ্যাল্পতা হেতু বুঝা যায় যে, গোরস্তান হিসাবে এলাকাটির গুরুত্ব খুবই কম ছিল এবং ইহার বিকাশের প্রধান সময়টি ছিল বিগত এক শত বৎসর। এই গোরস্তানের সঙ্গে সম্ভবত দুইটি বিচ্ছিন্ন বুরজী মামলূক মাযার সৌধকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। আল-কুব্বাতু'ল-ফাদাবিয়্যা (৫) সম্ভবত কা'ইত বায়-এর জনৈক আমীর য়ুশবাক আদ-দাওয়াদার-এর মাযার-সৌধ, ৮৮৪-৬/১৪৭৯-৮১ এবং আল-মালিকু'ল-'আদিল তূমান বায়-এর মাযার-সৌধ [২], ৯০৬/১৫০১, এই উভয়টিই হুসায়নিয়্যা এলাকাতে অবস্থিত। এই দুইটি সৌধ আল-কাহিরার নগর-প্রাচীর হইতে এত বেশী দূর উত্তরে অবস্থিত যে, এইগুলিকে সহজে কোন বিশেষ গোরস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কিন্তু প্রথমোক্তটি কায়রোতে 'উছমানী আমলের স্থাপত্যশিল্পে এত বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, নিতান্ত অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য উহাদের স্থাপত্যের গুরুত্বের ক্ষেত্রে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

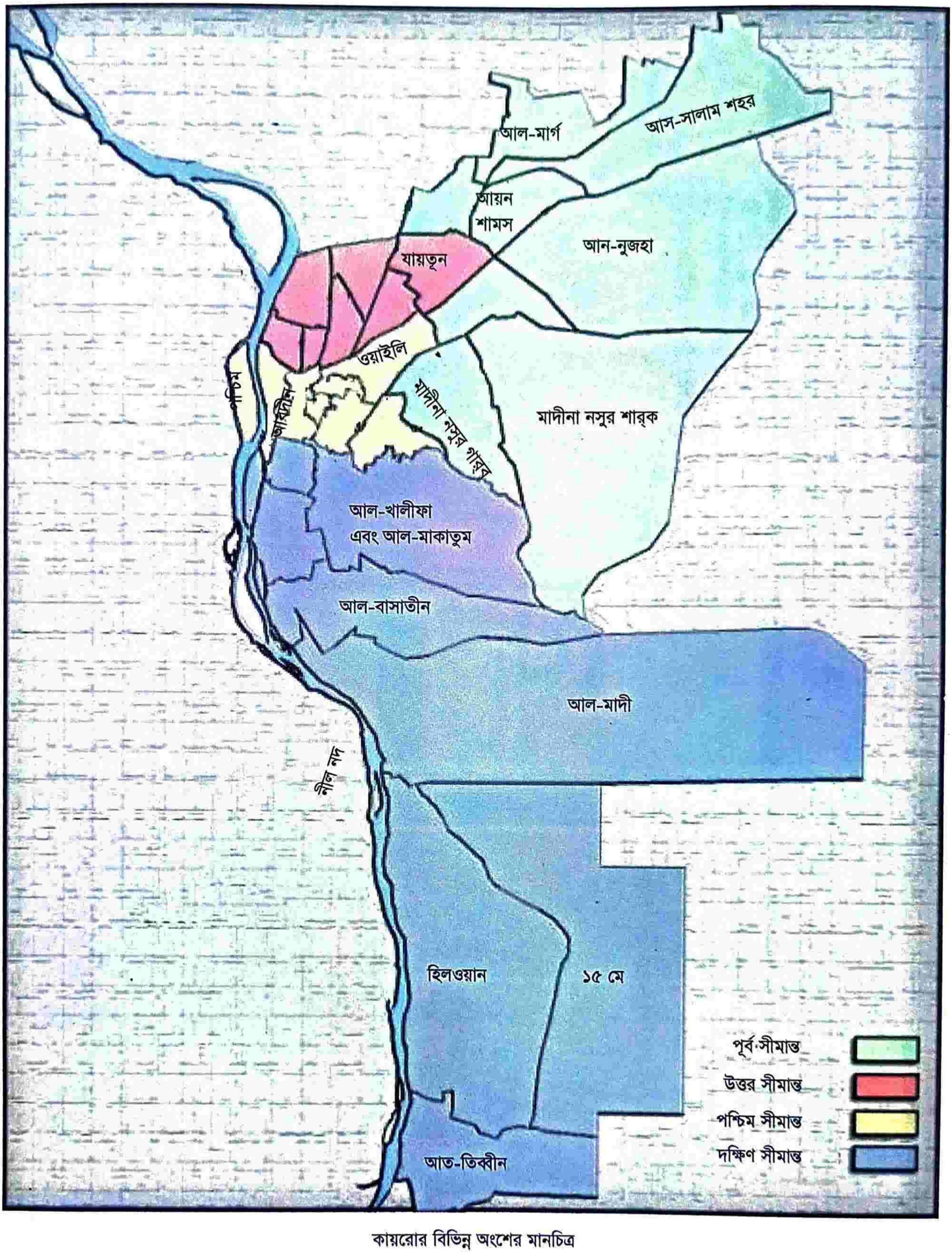
'উছমানী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোরস্তানগুলির কালানুক্রমিক বিকাশ সমাপ্ত হয়। ইস্তাম্বুলের যে রীতি, শহরের ভিতরেই কোন ধর্মীয় বা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট গোরস্তান নির্মাণ করা, তাহা কায়রোতে গৃহীত হয় নাই। যেই সকল তুর্কী মিসরে মারা যান ইতিপূর্বেই বর্তমান মামলূক গোরস্তানের হাওশে দাফন করা হয়। 'উছমানী গোরস্তানের প্রস্তরলিপিসমূহ সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত করা হয় নাই। তদুপরি ৩০০ বৎসরের শাসন আমলের পরিচয়বাহী মাযারসৌধও খুব কম সংখ্যক রহিয়াছে এবং এই আমলের যে একমাত্র সৌধ উল্লেখযোগ্য তাহা হইতেছে খোদ ইসমা'ঈল-এর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুলায়মান পাশার মাযার। এই মাযারটি রাওদার সর্বদক্ষিণ প্রান্তরে ঠিক বিপরীত দিকে নীল নদের পূর্বতীরে একটি ঢালাই লোহার তৈরী শামিয়ানার নীচে অবস্থিত।

ইতিহাস

ফাতিমীগণ

শাহী মহল ঃ ৪র্থ/১০ম হইতে ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতক পর্যন্ত সময়কালে আল-কাহিরার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে ফাতিমী রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্নও বর্তমান দেখা যায় না, যদিও আল-মাকরীযীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি পুনর্নির্মাণের রূপ দিয়াছেন Ravaisse। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উহা বিভিন্ন রকমের কয়েকটি আলাদা বাসগৃহ নিয়া গঠিত ছিল, প্রতিটিতেই একটি কেন্দ্রীয় কা'আ (একটি দীর্ঘ হলঘর, তন্মধ্যে দুইটি কেন্দ্রীয় ঈওয়ান [আরবী লিওয়ান] এবং একটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চল সাধারণত চতুষ্কোণাকার, উহাকে বলা হইত দুরকা'আ এবং প্রতিটির সঙ্গেই সংলগ্ন কক্ষসমূহ ছিল। উহাদের মধ্যে একটির ধ্বংসাবশেষ (খুব সম্ভবত উহাকে দারু'ল কুতবিয়্যা বলিয়া চিহ্নিত করা যায়) সম্প্রতি কালা'উন মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণ খননকালে আবিষ্কৃত হয় ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহার যে কা'আ তাহাও ফাতিমী আমলের কায়রোর নিজস্ব স্থাপত্য রীতির পরিচয়বাহী বলিয়া মনে হয়। উহা কা'আতু'দ-দারদিরেরই অনুরূপ (Creswell, MAE, ১খ, ২৬১-৩)। উহাতে ব্যতিক্রমধর্মীভাবে গতানুগতিক সমতল ছাদের পরিবর্তে খিলানযুক্ত ঈওয়ান ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈওয়ানগুলিকে কখনও কখনও দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দুরকাআ হইতে আলাদা করিয়া ফেলা যাইত, যেরূপ দেখা যায় পুরাতন কায়রোর সেন্ট জর্জ ইউনানী অর্থডক্স গির্জার (কাসরু'শ-শাম) কা'আ-তে (দায়রু'ল-বানাত); উহার নির্মাণকাল অনির্ণীত রহিয়াছে, কিন্তু উহাতে ব্যবহৃত দরজা দেখিতে ফাতিমী আমলের বলিয়া মনে হয় এবং উহাদেরই অনুরূপ একজোড়া দরজা পাওয়া গিয়াছিল কালা'উন-এর মাযারসৌধ খননকালে। সেগুলি এখন কায়রোর ইসলামী আর্ট যাদুঘরে রক্ষিত আছে [অন্তর্ভুক্তি নং ৫৫৪ (Pauty, Bois sculptes, প্লেট নং ৬০)]।

কিল্লাসমূহ ঃ জাওহারের কাদামাটি ও ইটের তৈরী লাবিন দুর্গসমূহ আল-মাকরীযীর আমলে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই বিলুপ্তি নির্মাণ-সামগ্রীর অস্থায়িত্বের কারণে ঘটে নাই, বরং আল-কাহিরার চত্বরের উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির কারণেই তাহা ঘটিয়াছিল। এই কিল্লা এলাকা হইতে



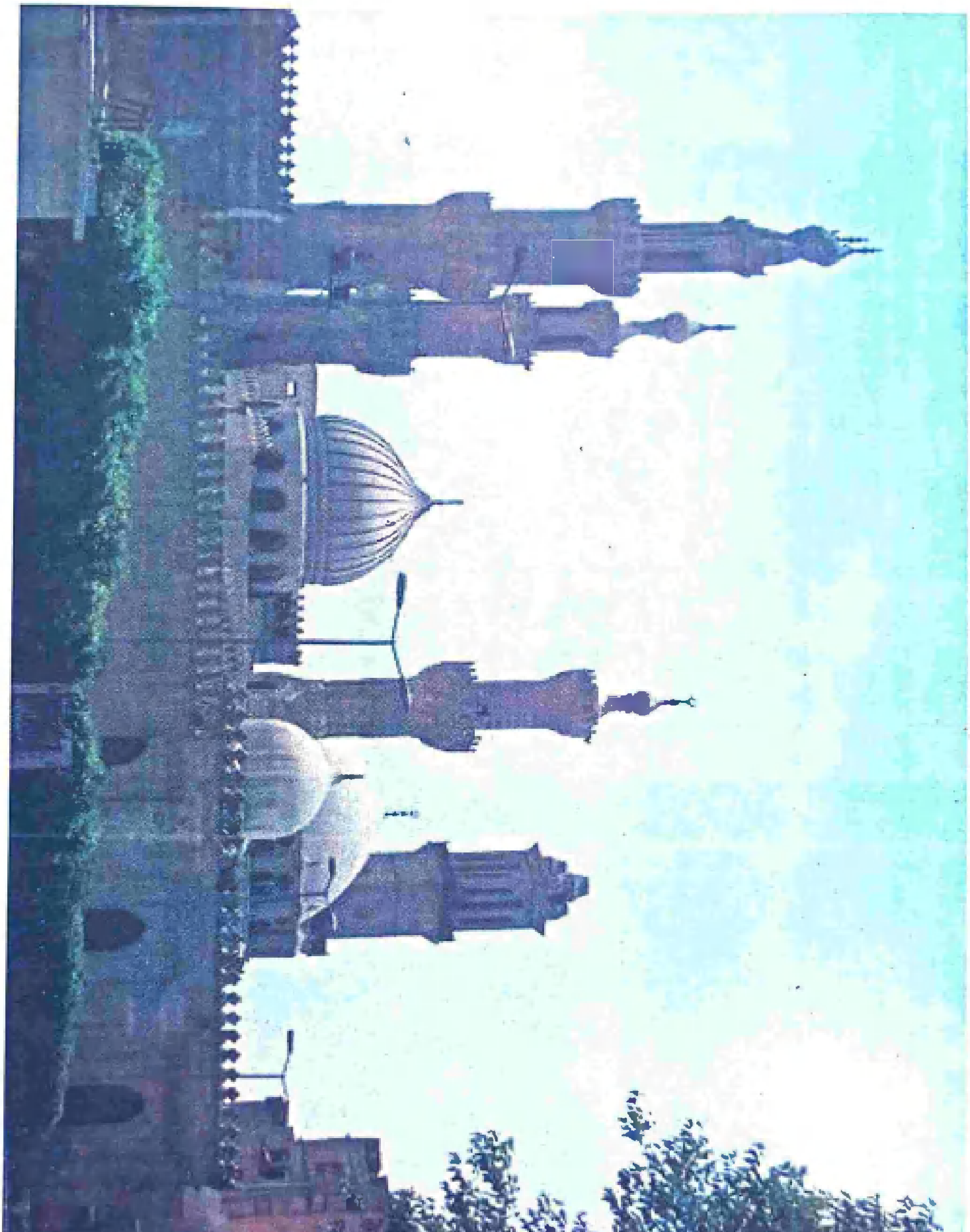
কায়রোর বিভিন্ন অংশের মানচিত্র



পিরামিড



পিরামিড ও স্ফিংকস-এর দৃশ্য



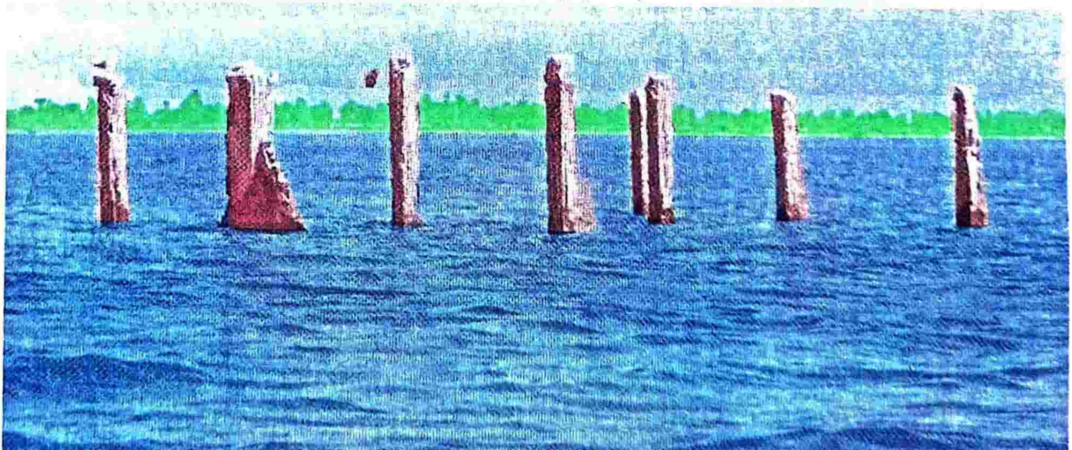
আল-আজহার মসজিদ (কায়রো)



সুলতান হাসান-এর মসজিদ, কায়রো



আর-রিফাই মসজিদ (কায়রো)



কারূন হ্রদের পানিতে নিমজ্জিত পুরাতন ভবনের অবশিষ্টাংশ



কারূন হ্রদের জলপ্রপাত

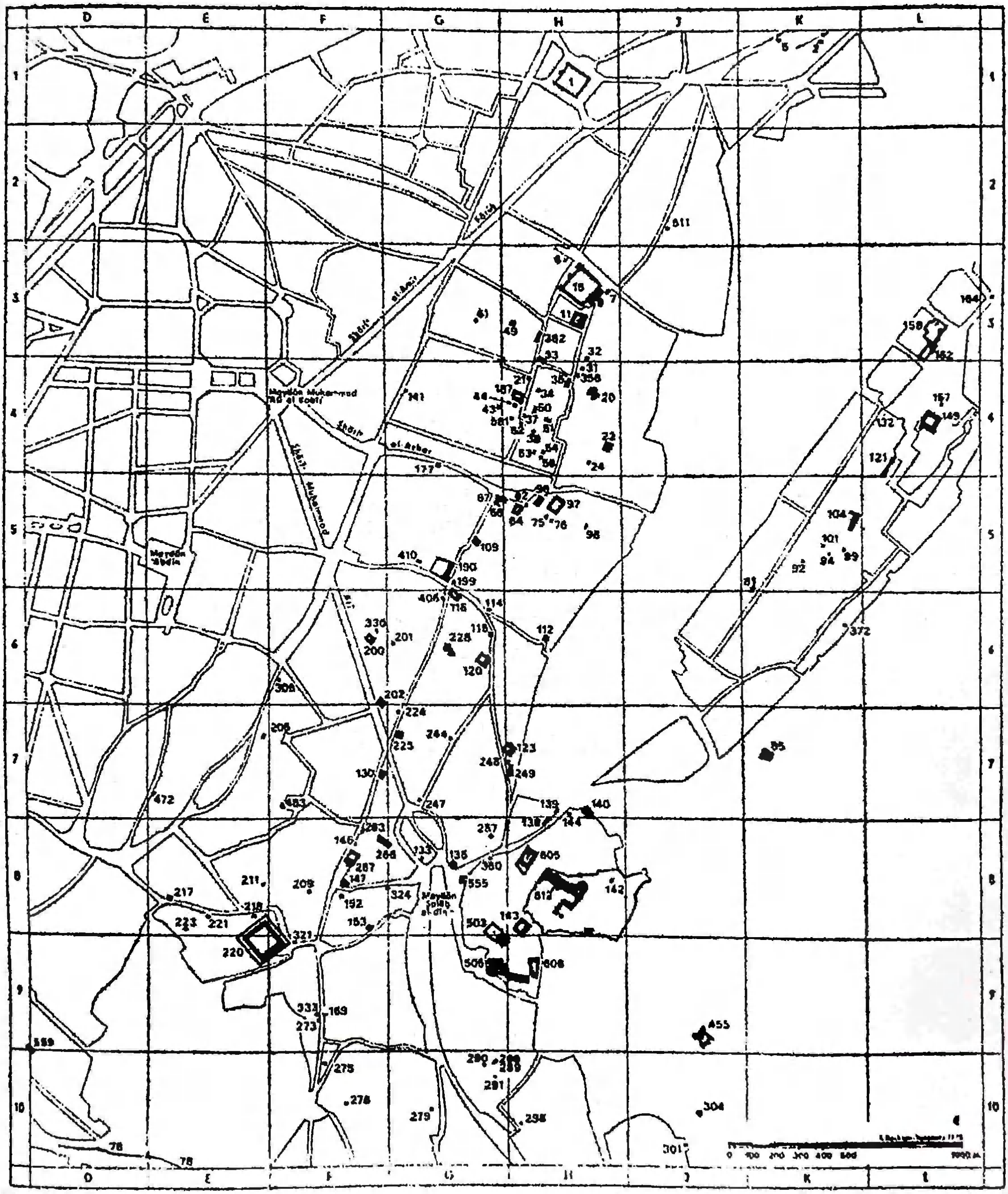


কারূন হ্রদের উত্তর দিকস্থ দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ



কায়রো শহরের সান্ধ্যকালীন দৃশ্য

আল-কাহিরার (কায়রো) স্থাপত্য সৌধসমূহের মানচিত্র



সৌধসমূহের জন্য প্রদত্ত সংখ্যা এবং মানচিত্রের ঘরসমূহের সংখ্যা ও অক্ষরসমূহ Map of Cairo showing Mohammedan monuments, Survey of Egypt, 1950 (যাহা K. A. C. Creswell তাঁহার The Muslim architecture of Egypt, i, অক্সফোর্ড ১৯৫২ গ্রন্থে সংযোজন করিয়াছেন) এবং Index of Muhammedan monuments in Cairo, Survey of Egypt, 1951-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জনসাধারণকে দূরে সরাইয়া রাখিবার সকল প্রচেষ্টা বিফল হয় (সাদাতু'ল-ওয়াফা'ইয়্যার নিকটে অবস্থিত আল-কারাফাতু'ল-কুবরা'র কাদামাটি ও ইটের তৈরী মুসাল্লা বা মসজিদটি প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ড বহির্ভূত, ইহা নিশ্চিতভাবেই ফাতিমী আমলে নির্মিত)। অতএব আল-কাহিরাতে অবস্থিত বর্তমানে ফাতিমী আমলের যেসব দুর্গ রহিয়াছে তাহা খলীফা আল-মুনতাসির-এর আমলের, এমন কি সালাহু'দ-দীন কর্তৃক বিভিন্ন অংশে ব্যাপক মেরামতের পূর্বেও ইহা কায়রোর স্থাপত্যরীতি অপেক্ষা উত্তর সিরিয়ার স্থাপত্যেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। উহাতে চতুষ্কোণাকৃতির পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং খামগুলি আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিয়া উহাকে অধিকতর মযবুত করা হইয়াছে। উত্তরের দেওয়ালের যে অংশ বর্তমানে আছে অর্থাৎ যেখানে দেওয়াল ও আল-হাকিম-এর মসজিদের উত্তরের বারান্দা একটি অপরটির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে—উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বাবু'ল-ফুতূহ ও বাবু'ন-নাস্‌রের মধ্যে [৬, ৭], ৪৮০/১০৮৭ [দ্র. বাব]। পূর্বদিকে রহিয়াছে একই তারিখবিশিষ্ট বাবু'ল-বারকিয়্যা (সৌধসমূহের মানচিত্রে ইহা উল্লিখিত হয় নাই) আর দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে বাব যুওয়ালা, ৪৮৪/১০৯১ (দ্র. আল-মাকরীযী , ১খ, ৩৮১)। আল-কাহিরার দেওয়ালের পুনর্নির্মাণের বিষয় জানিবার জন্য চিত্র ১ (E.I.^{2}) দ্র., সেখানে জাওহার বাদরু'ল-জামালী ও সালাহু'দ-দীন-এর কিল্লা দেখান হইয়াছে।

মসজিদসমূহ ঃ আল-কাহিরার মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রাচীন হইতেছে আল-আযহার [৯৭]। ইহা রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে অবস্থিত, নির্মাণকাল ৩৫৯-৬১/৯৭০-২ (আল-মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ২৭৩)। ইহা নির্মাণরীতির দিক হইতে ইব্‌ন তূলূন-এর মসজিদের সহিত অভিন্ন ধারার; চতুর্দিকে সাহন এবং রিওয়াকসমূহ দ্বারা বেষ্টিত আর কিবলার দিকে সেগুলির সংখ্যা বহু গুণ বেশী (দ্র. মসজিদ)। মসজিদটির মূল নির্মাণের খুব কম অংশই এখন পর্যন্ত টিকিয়া আছে (মূলের ধারণা পুনর্গঠনের জন্য দ্র. Creswell, MAE, ১খ, ৫৮-৬০, Fig. ২০)। প্রথমে ইহা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত হয় নাই, যদিও স্থাপনের বৎসর কালের কিছু পরেই ইহা ফাতিমীগণের দা'ওয়া (প্রচারের) কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই ব্যবহারের পরিবর্তন এবং সেই একই সঙ্গে আল-কাহিরা নগর সীমানার ভিতরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু নিঃসন্দেহে স্বল্প কালমাত্র পরে আল-হাকিম-এর মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয় [১৫]; ভিত্তি স্থাপন করেন আল-'আযীয ৩৮০-১/৯৯০-১ সনে এবং আল-হাকিম কর্তৃক ৪০৩/১০১২ সনের পূর্বে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। স্থানটি ছিল জাওহার-এর দেওয়ালের বহির্ভাগে, উত্তরে। Creswell মনে করেন যে, আযহারের কিবলা রিওয়াকের সম্মুখের পলেস্তারার যে সকল অংশ ১৯শ শতকের উদ্ভাবন নহে, সেগুলি হয়ত একেবারে স্থাপনের আদি সময়কালের হইতে পারে। কিন্তু সম্মুখের উদ্যানের দিকের অংশ এবং প্রবেশপথের গম্বুজ ও চাঁদওয়া তলের অংশ, যেখান হইতে মিহরাবের সম্মুখ পর্যন্ত যাইতে হয়, সেই অংশগুলি আল-হাফিজ লি-দীনিল্লাহ্‌-এর শাসনামল (৫২৬/১১৩১-৫৩৪/১১৪৯)-এর পূর্বেকার হইতে পারে না। মসজিদটির আদৌ কোন সংস্কারকার্য গৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আয়্যূবী আমলের শুধুমাত্র 'আলী পাশা মুবারাক-এরই (পৃ. ৪, ১৬) সাক্ষ্য রহিয়াছে। বলা হয়, আল-মালিকু'ল কামিল একটি কিবলা সাগীরা মিন খাশাব বিক্‌রব রিওয়াকিশ-শারকাবিয়্যা নির্মাণ করিয়াছিলেন (৬২৭/১২৩০)। তবে এই সন্দেহজনক শাসন আমল ব্যতীত আল-কাহিরার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শাসকই আল-হাফিজ হইতে শুরু করিয়া কা'ইত বায় পর্যন্ত আল-আযহারের পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ বা সংযোজন করিয়াছেন। শেষোক্ত শাসক একটি মিহরাব ও একটি মিনার সংযোজন করেন (উভয়টিরই তারিখ অনির্ণীত রহিয়া গিয়াছে) এবং একটি বিশাল বারান্দাও (বাওওয়াবা) নির্মাণ করেন। আল-গাওরী কর্তৃক সংযোজিত দ্বিতীয় মিনারটিরও তারিখ নির্ণয় করা হয় নাই। সংলগ্ন বায়বারস ও আকবুগার মাদ্‌রাসা (৭০৯/১৩০৯-১০ এবং ৭৩৪/১৩৩৩-৩৪ হইতে ৭৪০/১৩৩৯) মসজিদ ভবনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যখন কা'ইত বায় ৮৭৩/১৪৬৯ ইহার সঙ্গে বাওয়াবা (বাবু'ল-মুযায়্যিনীন)-টি সংযোজিত করেন যদিও বর্তমান প্রবেশ- তোরণটি 'উছমানী আমলের ১১৬৭/১৭৫৩-৪, সম্ভবত 'আবদু'র-রাহমান কাতখুদা ইহা নির্মাণ করেন, যিনি সেই সময়ে মসজিদটির পরিসর যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আল-হাকিমের মসজিদ আরও বেশী ঐতিহ্যবাহী ছিল, যেমন ইহার অন্তত একদিকে একটি গৌরববাহী যিয়াদা (Temenos) ছিল (Creswell ইহাকে চিহ্নিত করেন, MAE, ১খ, ১১৫-৭ এবং নির্মাণ-তারিখ নির্ণয় করেন ৪১১/১০২১-৪২৭/১০৩৬), যদিও ইহাতে দুইটি মিনার সংযোজিত হয়, একটি পশ্চিমের ভিত্তি কোণ হইতে এবং অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিমের ভিত্তিকোণ হইতে এবং তিনটি বিশালকারের তোরণ-দ্বারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উত্তরের মিনারটি পরে বাদরু'ল-জামালীর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হয়। ৭২০/১৩০৩-এ ভূমিকম্পে মসজিদটির খুব বেশী ক্ষতি হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বায়বারস আল-জাশেনকীর (চাশনেগীর) উহার সংস্কার সাধন করেন, তিনি তখন দুইটি পাথরের মিনারাতে পিরামিডের ন্যায় বহিরাবরণ এবং প্রতিটির চূড়াতে মাবখানা নির্মাণ করান। পরে পুনরায় একটি সংস্কার সাধন করা সত্ত্বেও আল-মাকরীযীর (খিতাত, ২খ, ২৭৭) মতে সেই সংস্কার করিয়াছিলেন সুলতান হাসান, মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে এবং S. Flury ইহার অলংকরণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও (Die Ornamente der Hakim-und Ashar Moschee, হাইডেলবার্গ ১৯১২ খৃ., পৃ. ৯-২৬, ৪৩-৫০) বর্তমানে ইহা খুঁজিয়া পাওয়াই প্রায় দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

কায়রোতে ফাতিমী আমলের অপর যে দুইটি মসজিদ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে, উহাদের উভয়টিই সাহন পরিকল্পনার সংস্কারকৃত রূপ এবং অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উযীর মা'মূন আল-বাতা'ইহী কর্তৃক নির্মিত আল-আকমার মসজিদ [৩৩], ৫১৯/১১২৫ কায়রোর সকল মসজিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সম্মুখভাগ লতাপাতা ও অলংকৃত লেখার দ্বারা অলংকৃত করা হয়। কিন্তু স্থাপত্যগতভাবে ইহা একইরূপ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, মসজিদটি কিবালামুখী (অন্তত মোটামুটিভাবে) হওয়া সত্ত্বেও ইহার সম্মুখভাগ রাস্তার সমান্তরাল করিয়া নির্মিত এবং তাহা আবার কিবলা-প্রাচীরের সমান্তরাল নহে। ইহাই ছিল প্রথম উদাহরণ, পরে ইহা কায়রোর সাধারণ গৃহীত রীতিতে পরিণত হয়। উযীর আস-সালিহ তালা'ই'-এর মসজিদ [১১৬], ৫৫৫/১১৬০, কায়রোর ফাতিমী ভবনসমূহের মধ্যে সর্বশেষ নির্মাণ (বর্তমান শতকের ভুল জ্ঞানে ইহার সংস্কার সাধন করা হয়)। ইহার যথেষ্ট স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সম্মুখভাগে সারি সারি থাম, নীচে দোকানের সারি (দাকাকীন), ভিতরে পলেস্তারার চমৎকার কারুকাজ, এগুলির আংশিক সংস্কার সাধন করেন আমীর বেকতিমুর আল-চুকান্দার (৬৯৯/১৩০০ বা ৭২০/১৩০২)। এই মসজিদটি

অযৌক্তিকভাবে বাদ্‌রু'ল-জামালীর দেয়ালের বাহিরে, বাব যুওয়ায়লার বিপরীত দিকে অবস্থিত। ইমাম হুসায়ন (রা)-এর খণ্ডিত শির দাফন করিবার জন্য প্রথমে এই স্থান নির্বাচন করা হইয়াছিল। পরে উহা আল-কাহিরার একটি মাযার-মসজিদে দাফন করা হয়। বর্তমানে ইহা সায়্যিদিনা আল-হুসায়ন মসজিদ নামে পরিচিত। ১৯শ শতকে জনৈক অজ্ঞাত স্থপতি মসজিদটি নির্মাণ করেন। য়ুরোপে গথিক স্থাপত্য রীতির পুনরুজ্জীবনকালে যে রীতিতে রেল-স্টেশনসমূহ নির্মাণ করা হইয়াছিল ইহাতে সেই রীতির প্রভাব দেখা যায়।

মাযার ও মাশহাদসমূহ ঃ ফাতিমী খলীফাগণের মাযার সৌধসমূহ নির্মাণ করা হইয়াছিল রাজপ্রাসাদের ভিতরে খান আল-খালীলীর প্রকৃত এলাকাতে [৫৩-৪, ৫৬]। ফলে রাজবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলা হয় (একমাত্র টিকিয়া থাকা প্রস্তরলিপির অংশবিশেষ RCEA ২১০৪-এ প্রকাশিত হইয়াছে; দ্র. G. Wiet, Inscriptions Historiques sur Pierre ৩৪-৫, নং ৫১)। আরও অনেক মাযার-শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে (দ্র. Index), সেইগুলির অধিকাংশই কায়রোর বৈশিষ্ট্যময় হাওশ হইতে গৃহীত। এই হাওশ হইতেছে উপরে খোলা, ছোট দেওয়াল ঘেরা গোরস্তান; উহার কিবলামুখী দেওয়ালে হয়ত এক বা একাধিক মিহরাব থাকে, ভিতরে কবরসমূহ সবই পাকা বা কোন কোন ক্ষেত্রে উপরে গম্বুজযুক্ত মাযার, সাধারণত কিবলামুখী করিয়া নির্মিত, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কালক্রম অনুযায়ী নির্মিত নহে। কোনও কোনও ব্যক্তিবিশেষের গম্বুজযুক্ত মাযারও টিকিয়া আছে। তন্মধ্যে রহিয়াছে সাব' বানাত, চার মাযার, সবগুলিই মিহরাববিহীন, আল-ফুসতাতের ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণে অবস্থিত। Creswell খিতাতের (২খ, ৪৫৯) ভিত্তিতে অনুমান করেন যে, এইগুলি হয়ত উযীর আবু'ল-কাসিম আল-হুসায়ন্ ইব্ন 'আলী মাগরিবীর পরিবারের যেসব সদস্যকে আল-হাকিম (৪০০/১০১০) প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন, তাহাদেরই মাযার। কায়রোর আরও বৈশিষ্ট্যময় নিদর্শন হইতেছে ১১শ-১২শ খৃ. শতকে তথাকথিত 'আলী পরিবারের সদস্য-সদস্যাগণের কবরের উপর নির্মিত মাশহাদসমূহ। এইগুলি দক্ষিণের গোরস্তানে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া নির্মিত। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে সুসংরক্ষিত হইতেছে ইখওয়ান (ইখওয়াত) য়ুসুফ [৩০১], আনু. ৫০০/১১০০, সায়্যিদা 'আতিকা [৩৩৩] আনু. ৫২০/১১২৫, সায়্যিদা রুকায়্যা [২৭৩], ৫২৭/১১৩৩, (সবগুলির মধ্যে একমাত্র এইটিরই সঠিকভাবে তারিখ নির্ণীত), য়াহ্য়া আশ-শাবীহী [২৮৫], আনু. ৫৪৫/১১৫০ ও নিকটেই উম্মে কুলছূম (সৌধাবলীর মানচিত্রে দেখানো হয় নাই), ৫৫০/১১৫৫ পূর্বেকার। ছোট ছোট মাযার-সৌধ কখনও কখনও উহাদের মাঝখানে উঠানযুক্ত, এই মাশহাদগুলি উহাদের উপরে খিলানোপরি গম্বুজসমূহ তাহাতে খোদাইয়ের অতি সুন্দর কারুকার্য করা আস্তরের ঘুরানো আবরণ এবং মিহরাবসমূহ প্রায় ক্ষেত্রেই তিনটি একসঙ্গে, এক বা একাধিকটিতে বাঁধানো প্রতীকী কবর (Cenotaph) যেইগুলি সম্ভবত একটি মাকসূরা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এইগুলিকে সম্ভবত একান্তই যিয়ারাতের স্থানরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। তবে ফাতিমী আমলের সকল মাযার-সৌধই যে হুবহু এই একই আকারের ছিল তাহা নহে। আল-কারাফাতু'ল-কুবরা-এর রহস্যময় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে "কবর লু'লু' বিনতু'ল-মুকাওকিস" একটি তিনতলা সৌধ, প্রতিটি তলাতে একটি করিয়া মিহরাব রহিয়াছে; মুকাত্তামের উপরে মাশহাদু'ল-জুয়ূশী [৩০৪, ৪৭৮/১০৮৫, বাদরু'ল-জামালীর অতি সুন্দর আস্তরের কারুকার্যময় মাযার-সৌধ কেন যে কুব্বার আকারের না হইয়া মাশহাদের আকারে করা হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি ব্যাখ্যাত হয় নাই। মুকাত্তামের বরাবর নীচে যে গুহামাগাওরি বা কাহ্ফু'স-সূদান, যাহাকে Massignon (দ্র. Index) আসহাবু'ল-কাহ্ফ (দ্র.)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন এবং আরবী সংস্করণের বিশেষ ১ :৫০০০ স্কেল মানচিত্রে যাহাকে ফাতিমী ধ্বংসাবশেষ বলিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা এত দীর্ঘকালব্যাপী সামরিক এলাকারূপে রহিয়াছে যে, উহাও যে কোনও ধরনের একটি মাশহাদ বলিয়া একটি ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

আয়্যূবী আমল

কিল্লাসমূহ ঃ সালাহুদ-দীন-এর কিল্লা ও নগর প্রাচীর যথার্থভাবে বর্ণনা ও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন Creswell (MAE, ২খ, ১-৪০ প.)। প্রথমোক্তটি অর্থাৎ কিল্লাটি ছিল সর্ববৃহৎ আয়্যূবী রক্ষা ব্যবস্থা; উহা মুকাত্তাম পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্ধিত অংশে অবস্থিত দক্ষিণ অংশ কৃত্রিমভাবে নির্মিত সমতল ময়দান। আয়্যূবী ধ্বংসাবশেষ উত্তর দিকের প্রায় চতুষ্কোণাকার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহার চারিটি তোরণ ছিল ঃ বাবু'ল-মুদার্‌রাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন আমীর কারাকূশ ৫৭৯/১১৮৩, বুরজু'ল-মাতার ও বুরজু'ল-ইমাম দুইটি তোরণ এবং বাবু'ল-কুল্লা। প্রাথমিক আমলের এই কীর্তিসমূহের সঙ্গে আরও যোগ করা যায়। দীর্ঘ-বিস্তৃত একটি পরদা প্রাচীর, তাহাতে বেশ সমদূরত্বে নির্মিত গোলাকার মিনারসমূহ, যেইগুলি শুরু হইয়াছে বুরজু'ল-মুকাত্তামে এবং বেষ্টিত অংশের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দিক ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রাচীরগুলির একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত এবং গোলাকৃতির সরু পথযুক্ত। Creswell মনে করেন যে, এই রক্ষাব্যবস্থাসমূহ সুলতান সালাহু'দ-দীন-এর মৃত্যুর সময়ে অবশ্যই সমাপ্ত হইয়া থাকিবে, পরে আল-মালিকুল-'আদিল ৬০৪/১২০৭-৮ সনে সেইগুলিকে অধিকতর মযবুত করেন এবং তখন তিনি তিনটি বিশাল চতুষ্কোণাকার মিনারও নির্মাণ করেন, বুরজু'স-সুফ্ফা , বুর্‌জ কারক্য়ালান ও বুর্‌জু'ত-তুরফা; সবগুলিই দেওয়ালসমূহের দক্ষিণের অংশে আড়াআড়িভাবে তৈরী এবং Chemin de ronde ভেদ করিয়া গিয়াছে, যাহাতে প্রয়োজনের সময়ে প্রতিজন সৈনিক আত্মরক্ষামূলক আশ্রয়স্থল করিয়া নিতে পারে। বুরজু'ল-ইমামের বাবু'ল-কারাফাকেও মযবুত করা হয় এবং আরও অন্যান্য নির্মাণ কার্যের মধ্যে পূর্ব এলাকার দুইটি মিনারকে বুরজু'ল-হাদ্দান (হাদীস?) ও বুর্‌জু'র-রামল-গোলাকার বেষ্টনীতে পরিণত করেন। এই নির্মাণ কাজগুলি সমাপ্ত করিয়া আল-মালিকু'ল-'আদিল সেইখানেই প্রাসাদে গিয়া বাস করিতে থাকেন। মাকরীযী বলেন, কিল্লাটি নির্মাণ করা হইয়াছিল জীযার (গীযা) পিরামিড হইতে পাথর আনিয়া। কিন্তু ইহার অধিকাংশ পাথরই অপেক্ষাকৃত নরম মুকাত্তাম চুনাপাথর, যাহা সেখান হইতেই খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছিল। Creswell -এর মতে সাদামাটা ধরনের নির্মাণরীতি হইতে সহজেই ইহাকে আল-'আদিল-এর আমলে নির্মিত বলিয়া ধরা যায়। কেননা ইহা ছাড়াও তিনি বসরা, দামিশক ও অন্যান্য স্থানের রক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে একই নির্মাণরীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কিল্লাটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ রক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা, সম্ভাব্য ফাতিমী প্রতি-আক্রমণ রোধ করা বা আল-কাহিরার

অধিবাসিগণের বিদ্রোহ দমন করা। এই একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় একটি আয়্যূবী কিল্লা, একটি নিরাপদ সুরক্ষিত প্রাসাদ ও সংলগ্ন ভবনসমূহ, কাল'আতু'র-রাওদা আস-সালিহ্ নাজমু'দ-দীন আয়্যূব কর্তৃক রাওদার এলাকায় নির্মিত হয় ৬৩৮/১২৪০-১ সনে। উহার মধ্যে ছিল একটি কা'আ (Creswell, MAE, ২খ, পৃ. ৮৪-৭), সেই সঙ্গে একটি প্রলম্বিত দুরকা'আ যাহার উপরে সম্ভবত কাঠের একটি একক দণ্ডায়মান গম্বুজ ছিল। ইহাতে গথিক স্থাপত্য রীতির একটি দরজাও ছিল, যাহা আস-সালিহ-এর সিরিয়া অভিযানকালে বন্দীরূপে নীত ফ্রাংক সূত্রধরগণের দ্বারা সেই স্থানেই নির্মিত হইয়া থাকিবে। বর্তমানে সেই ষাট মিনারযুক্ত কিল্লার কিছুই যদিও টিকিয়া নাই তথাপি ধ্বংসাবশেষটি আকর্ষণীয়। কেননা এইখানেই আস-সালিহ তাঁহার মামলূক সেনাবাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। নীল নদের তীরে (বাহরু'ন-নীল) নিয়োজিত ছিল বলিয়া এই বাহিনী বাহরী নামে পরিচিত হয়। এই বাহিনীই শেষ পর্যন্ত আয়্যূবী রাজবংশের অবসান ঘটাইয়া ক্ষমতা অধিকার করিয়া নেয় (আল-মাকরীযী, সুলূক, যিয়াদা, ১খ, পৃ. ৩৪১)।

মসজিদসমূহ ঃ কায়রোতে আয়্যূবী আমলের কোন মসজিদ বর্তমানে টিকিয়া নাই এবং ইব্ন তূলূন-এর মসজিদ বা হযরত 'আম্র-এর মসজিদ কোনটিরই আয়্যূবী আমলে সংস্কারকৃত প্রস্তরলিপিও পাওয়া যায় না। শেষোক্ত মসজিদটিতেই একমাত্র তাঁহাদের দখলকৃত আমলে খুতবা পাঠ করিতে দেওয়া হইত, যাহাতে ফাতিমী প্রচারকার্যের কেন্দ্রস্বরূপ আল-আযহার মসজিদের গুরুত্ব লোপ পায়। আশ্চর্যের বিষয়, ফাতিমী উযীর আল-আফদাল যে ইব্ন তূলূন-এর মসজিদটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং একটি মিহরাব সংযোজন করিয়াছিলেন (আনু. ৪৮৭/১০৯৪) উহাকে কিন্তু বরাবরই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হইত। কেননা 'আলীপন্থিগণের যেই শাহাদা উহার উপরে লেখা রহিয়াছিল তাহা কখনও বিলুপ্ত করা হয় নাই।

মাদরাসাসমূহ ঃ একটি বিষয় খুবই সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, ফাতিমী দা'ওয়াসমূহের মুকাবিলা করিবার জন্য আয়্যূবীগণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উপর অধিক জোর দিয়াছিলেন। তবে সেইগুলি বর্তমানে টিকিয়া নাই। সালাহু'দ-দীন-এর মিসর বিজয়ের পরে অন্যতম প্রথম নির্মাণ কাজ ছিল দক্ষিণের গোরস্তানের ইমাম আশ-শাফি'ঈ-এর মাযারের নিকট একটি শাফি'ঈ মাদ্রাসা নির্মাণ (শুরু ৫৭২/১১৭৬-৭)। উহার প্রায় কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নাই। শুধু ইমাম শাফি'ঈ-এর মাযারের উপরে নির্মিত সেগুন কাঠের অতি সুদৃশ্য বহিরাবরণটি (নির্মাণ ৫৭৪/১১৭৮-৯) এবং নাজ্জার 'উবায়দ ইব্ন মা'আলীর কৃত কাজ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধা লাভকারী মাযারের সঙ্গে মাদ্রাসার একত্রীকরণ নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিমগণের জন্য ফাতিমী মাশহাদের ধারণার এক চমকপ্রদ প্রয়াস ছিল। মাদ্রাসার কিছু কিছু অংশ সম্ভবত ১২শ/১৮শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল; কিন্তু ইমামের মাযারের এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করা হয় যখন আল-মালিকুল-কামিল ৬০৮/১২১১ সনে [২৮১] এক বিশাল কাঠের গম্বুজযুক্ত মাযার সৌধ নির্মাণ করিয়া দেন। নির্মাণের পরে তাহার ঘন ঘন সংস্কার সাধন করা হইলেও এখন পর্যন্ত উহা কায়রোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় মাযার-সৌধ (কালানুক্রমের জন্য দ্র. G. Wiet, Les inscriptions du mausolee de Shafi`i, BIE-তে, ১৫খ. [১৯৩৩ খৃ.], পৃ. ১৬৭-৮৫)। সূক্'ন-নাহহাসিনে একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ হইতে আল-কামিল-এর দ্বিতীয় একটি ইমারত 'কামিলিয়্যার পরিচয় পাওয়া যায় [৪২৮], ৬২২/১২২৫ (খিতাত, ২খ, পৃ. ৩৭৫)। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সংরক্ষিত হইতেছে ফাতিমী কায়রোর প্রধান সড়ক কাসাবার উপরে একটি দ্বিতল দুই-ঈওয়ান মাদরাসা। ইহা নির্মাণ করেন আস-সালিহ্ নাজমু'দ-দীন আয়্যূব [৩৮], ৬৪১/১২৪৩-৪। ইহাতে একটিমাত্র মিনার, উহার চূড়াতে একটি মাবখারা, মিনারটি সম্মুখভাগের মধ্যখানে বারান্দার উপরে নির্মিত হইয়াছে এবং অপর পার্শ্বে রাস্তা, যাহার মধ্যে দুইটি ভবন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সড়কমুখী অলংকৃত সম্মুখভাগ ব্যতীত এই অলংকরণে আল-আযহারের খোলা চত্বরের সম্মুখের অংশের অলংকরণের প্রভাব লক্ষণীয়। মাদরাসা দুইটির বাদবাকী সব অংশই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও বাম দিকের মাদরাসার পশ্চিমের ঈওয়ানের অভ্যন্তরীণ কক্ষের ছাদের নীচে ইটের গাঁথুনির মধ্যে পাথরের মযবুত গড়ন রহিয়াছে এবং সেইগুলি উচ্চ মিসর অঞ্চলের ভবনসমূহের ন্যায় কোনরকম কাঠামো নির্মাণ ব্যতীতই স্থাপন করা হইয়াছে। স্থাপত্যগত এই রীতিটি কায়রোর পুরাতত্ত্বের বিষয় পর্যবেক্ষণকারিগণের দৃষ্টি সামান্যই আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ ৭ম/১৩শ-৮ম/১৪শ শতকের নির্মাণ রীতিতে ইহা প্রায়শই দেখা যায়। এই নির্মাণ রীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইতেছে আস-সালিহ-এর মাযার-সৌধ [৩৮], ৬৬৭/১২৪৯, কিন্তু নির্মাণ সমাপ্ত হয়, (দ্র. খিতাত, ২খ, পৃ. ৩৭৪) ৬৪৮/১২৫০ সালে। নির্মাতার মৃত্যু পরবর্তীকালীন নির্মিত সর্বশেষ মাযারসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহাই আবার সর্বপ্রথম সর্বজনদৃশ্যমান মাযার-সৌধ যাহা কিবলামুখী করিয়া নির্মিত, রাস্তার ঠিক সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং উহাই এই সৌধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই রীতিটি মামলূক কায়রোর স্থাপত্য রীতির এমনই একটি মানগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় যে, কখনও কোনও ভবন কিবলামুখী কিংবা রাস্তার দিকে সম্মুখভাগ করিয়া নির্মিত হইবে এরূপ প্রশ্ন দেখা দিলে সচরাচর শেষোক্তটিই গৃহীত হইত।

মাযার-সৌধসমূহ ঃ অধিকতর ঐতিহ্যবাহী ধরনের সমাধি সৌধের নিদর্শন হইতেছে সায়্যিদা নাফীসার নিকটবর্তী "আব্বাসী খলীফাগণের মাযার-সৌধ"। এইগুলি সম্ভবত ৬৪০/১২৪২-৩ সালের পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত। এইগুলিতে খোদাই করা এবং রঙের কারুকাজ করা আস্তরের অতি সুদৃশ্য নকশাসমূহ রহিয়াছে। বাগদাদে খিলাফাতের পতন ঘটাইয়া তখন যে সকল খলীফা মামলূকগণের আশ্রিত পুতুলরূপে মিসরে বসবাস করিতেন তাঁহাদের অনেকেরই কবর এইখানে রক্ষিত আছে। গম্বুজওয়ালা মাযার একটি বিশাল হাওশ দ্বারা বেষ্টিত। কিবলামুখী দেওয়ালে সাতটি মিহরাব এবং সুবিশাল তোরণের ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। আয়্যূবী পরবর্তী আমলে এই ধরনের নাম খোদাইবিহীন, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। মাযার- সৌধের উদাহরণ খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। আয়্যূবী আমলের খুব কম পুরাকীর্তিই অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। আয়্যূবীদের সময়কার যে পানির নালা শহরে পানি সরবরাহ করিত, উহার যতটুকু বর্তমান ছিল তাহা আন-নাসির মুহাম্মাদের নির্মাণকার্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হয়। তবে জিযা (গীযা) সড়কের উপরে দুইটি পুল সুলতান সালাহু'দ-দীন-এর সময়কালীন কারাকূশ-এর নাম ধারণ করিয়া আছে (দ্র. Van Berchem, CIA, পৃ. ৪৬৫ প.), পুল দুইটিতে আন-নাসির মুহাম্মাদ, ৭১৬/১৩১৬, কা'ইত বায়, ৮৮৪/১৪৭৯ ও হুসায়ন পাশা, ১০৮৭/১৬৭৬ যে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহাও লিখিত রহিয়াছে।

মামলূক আমল

কিল্লাসমূহ ঃ কায়রোতে মামলূক আমলের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য কিল্লা বা রক্ষাব্যবস্থা নাই। কাসরু'র-রাওদা বায়বারস-এর আমলে সংস্কার করা হইয়াছিল এবং কিল্লার গায়ে আন-নাসির মুহাম্মাদের যে প্রস্তর লিপি খোদিত আছে তাহাতে লেখা আছে, দক্ষিণ দিকে একটি অনিয়মিত দুর্গপ্রাকার নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং নূতন একটি পানির নালা নির্মাণ করা হইয়াছিল যাহা নীল নদ হইতে কিল্লাতে পানি বহনের জন্য ব্যবহৃত হইত যাহার এক অংশের মধ্যে সুলতান সালাহু'দ-দীনের দেওয়াল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। সেই দেওয়াল নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল ঃ আল-ফুসতাতের খারাবার সঙ্গে আল-কাহিরার সংযোগ সাধন করা। কিন্তু উহার নির্মাণকার্য কখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পানির নালাটির নির্মাণ কাজ শুরু হইয়াছিল বেশ আগে ৭১২/১৩১২ (দ্র. খিতাত, ২খ, পৃ. ২২৯; Casanova-এর অনুবাদে ভুলক্রমে তারিখ দেখানো হইয়াছে ৭১১/১৩১১; Creswell, MAE, ২খ, ২৫৫-৯ পানিপথটির পরবর্তীকালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে)। কিল্লার ভিতরে আন-নাসির মুহাম্মাদের যে সৌধসমূহ রহিয়াছে তন্মধ্যে সাহ্‌ন (উন্মুক্ত চত্বর) সমন্বিত বিশাল মসজিদ [১৪৩] অন্যতম। ইহাতে ভিত্তি স্থাপনের তারিখ প্রস্তর লিপিতে ৭১৮/১৩১৮* উল্লিখিত রহিয়াছে; পরে ৭৩৫/১৩৩৫ সালে উহার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করা হয় (দ্র. খিতাত, ২খ, পৃ. ২১২, ৩২৫), আর নিঃসন্দেহে তখনই আসোয়ান গ্রানাইট পাথরের দশটি খামের উপরে নির্মিত বিশাল কাঠের গম্বুজটি নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই মসজিদের দুইটি মিনার রহিয়াছে। বলা হয় যে, তাবরীযের কারিগরগণ এই দুইটিতে কারুকার্য করিয়াছিলেন। আর এই বিবরণ যদি সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতে হয় তবে বলিতেই হয় যে, সেই কারিগরগণ তাবরীয হইতে কায়রো আসিবার পথে নিজেদের শিল্পকুশলতা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর প্রাসাদ কাসরু'ল-আবলাক (এইরূপ নামকরণ হইয়াছে; কারণ ইহার প্রধান কা'আ-এর খিলানসমূহের অংশবিশেষ দুই-রঙ্গা পাথর ব্যবহার হইয়াছে)। ইহা আবার বায়ত য়ূসুফ সালাহু'দ-দীন নামেও পরিচিত; ১৮২৪ খৃ.-এ ইহা ধ্বংস হইয়া যায়। তবে শিহাবু'দ-দীন আল-'উমারীর বর্ণনা (মাসালিকু'ল-আবসার, Bibliotheque Nationale MS Arabes, 583, folio 190 a) এবং আল-মাকরীযীর বর্ণনা (খিতাত, ২খ, পৃ. ২০৯-১০) অনুসরণ করিয়া এই ধারণা সংশোধন করা সম্ভব হইয়াছে; শেষোক্ত গ্রন্থে ইহার নির্মাণ তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৭১৩-৪/১৩১৩-৫। প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি বিরাট ঈওয়ান (দ্র. Creswell, MAE, ২খ, পৃ. ২৬০-৪) এবং একটি কেন্দ্রীয় কা'আ যাহার ছাদ সমতল ছিল বলিয়া মনে হয়, আর ছিল কাঠের তৈয়ারী একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজ। আমীরগণের যেসব প্রাসাদ মাকরীযীর আমলে কিল্লার দক্ষিণে ঢালু অঞ্চল জুড়িয়া ছিল, সেইগুলি এখন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে; যে কয়েকটি বিদ্যমান ছিল সেগুলিও মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক ১২২৯/১৮১৪ সালে আল-জাওহারা প্রাসাদ [৫০৫] নির্মাণকালে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

মসজিদসমূহ ঃ বাহ্‌রী মামলূক মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রাচীনটি হইতেছে মায়দান দাহির-এ অবস্থিত বায়বারস-এর মসজিদ [১], ৬৬৫/১২৬৬* (দ্র. প্লেট ২), যাহার নির্মাণ শেষ হয় দুই বৎসর পরে। ইহা ফাতিমী দেয়াল ঘেরা শহরের বেশ খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে একটি পলো খেলার মাঠের মধ্যে অবস্থিত। ইহা আল হাকিম-এর মসজিদের পরিকল্পনা অনুসারেই নির্মিত, তবে ইহাতে যিয়াদা নাই এবং মিনার দুইটি নাই। এই মসজিদের তিনটি বিশাল তোরণ রহিয়াছে। সেইগুলির কারুকার্যের মধ্যে উত্তর সিরীয় নকশা এবং ফাতিমী আল-আকমার মসজিদের (উপরে দ্র.) কারুকার্যের অদ্ভূত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মসজিদ ভবনটির বিরাট অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বায়বারস ইহার নির্মাণকালে জাফফা হইতে যে কাঠ ও মর্মর পাথর আনাইয়াছিলেন সেগুলি এখন আর নাই। আর জানালার ফ্রেমের মধ্যে যে অতি সুদৃশ্য আস্তরের কারুকাজ করাইয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশ মাত্রই অবশিষ্ট আছে। এই মসজিদের সবচেয়ে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য হইতেছে মিহরাবের সম্মুখে একটি বিরাট চতুষ্কোণাকার মাকসূরা। নিঃসন্দেহে প্রথমে ইহা কাঠের গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল এবং কায়রোর মসজিদ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আকারের দিক হইতে ছিল তুলনাহীন। লাজীন কর্তৃক ইব্‌ন তূলুন-এর মসজিদের সংস্কারকার্য ব্যতীত (নিম্নে সংস্কার কাজ দ্র.) কায়রোর মসজিদ নির্মাণের প্রধান সময় ৭১৫/১৩১৫ পর হইতে ছিল বলিয়া মনে হয়। কতকটা কিল্লাতে আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের পর হইতে এবং কতকটা কায়রো শহর এলাকার ভিতরে খুব সীমিত সংখ্যক মসজিদের উপর হইতে খুতবা পাঠের নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নিবার পর হইতে। ভিত্তিসমূহ প্রায়ই বড় আকারের হইত। সবই আমীরগণের নির্মিত, সুলতানগণের নহে এবং সেইগুলি প্রধানত ফাতিমী দেওয়ালের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিল্লার অভিমুখে প্রসারিত প্রধান চলাচল পথের উপরে অবস্থিত। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে আল-মালিক (?) আল-চূকান্দার [২৪], ৭১৯/১৬১৯*, আহমাদ আল-মিহমানদার [১১৫], ৪২৫/১৩২৪-৫*, আলমাস [য়ীলমায, তবে সম্ভবত ওলমেয (Olmez) নহে] [১৩০], ৭৩০/১৩২৯-৩০*, (খিতাত, ২খ, পৃ. ৩০৭), কুসূন [২০২], ৭৩০/১৩২৯-৩০*, ইহার পূর্বদিকে, মূল মসজিদ হইতে সামান্য দূরে এক বিশাল বারান্দা রহিয়াছে, বেশতাক [২০৫], ৭৩৫/১৩৩৫* এবং আলতিনবুগা আল-মারিদানী [১২০], ৭৩৯-৪০/১৩৩৯-৪০; ইহা সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এবং ইহার নির্মাণে যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তিরও পরিচয় রহিয়াছে; আসোয়ানের গ্রানাইট পাথরের অগণিত থাম, প্রতিটির উপরে টলেমী আমলের স্তম্ভ-শীর্ষ, জানালার মধ্যে উজ্জ্বল চীনামাটির কারুকাজ খোদাই করা কাঠের মাশরাবিয়্যা পর্দা দ্বারা সাহ্‌ন হইতে কিবলা রিওয়াক আলাদা করা এবং দারবু'ল-আহমারে এক আশ্চর্য ধরনের সম্মুখভাগ। এই একই আমলের আরও তিনটি মসজিদ রহিয়াছে (ক) আসলাম আল-বাহা'ঈ [১১২], ৭৪৫-৬/১৩৪৪*, (খ) আকসুনকুর [১২৩], ৭৪৭-৮/১৩৪৬-৮*— সংস্কারের পর (১০৬২/১৬৫২) ইহা বরং ইব্‌রাহীম আগা মুস্‌তাহফিজান নামেই অধিক পরিচিত, তিনি অভ্যন্তরভাগের অংশবিশেষ নিম্নমানের নীল-সাদা টালি দ্বারা ঢাকিয়া দেন এবং মসজিদটিকে "নীল মসজিদ" নামে পরিচিত করান এবং (গ) শায়খু'ল-'উমারী [১৪৭], ৭৫০/১৩৪৯* (খিতাত, ২খ, ৩১২-৩ পৃষ্ঠায় নির্মাণ তারিখ দেওয়া আছে ৭৫৬/১৩৫৫-৬)। এই ইমারতসমূহ আকার ও আয়তনের দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের; কিন্তু প্রতিটিরই সম্মুখভাগ নির্মাণস্থলের রাস্তার সারি বরাবর; তাহা করিতে গিয়া মিম্বরকে কাবামুখী করিবার জন্য ভিতরের দিকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ইহাদের কোনটিই মূলত মাযার-সৌধরূপে পরিকল্পিত নহে এবং কোনওটিই অবশ্যই সেইরূপ নহে ঃ যেমন কূসূনের মসজিদ, যিনি দক্ষিণের গোরস্তানে একটি মাযার-সৌধ এবং খানকাহ নির্মাণ করিয়াছিলেন [২৯০-১], ৭৩৬/১৩৩৫ (খিতাত,

২খ, ৪২৫) এবং শায়খু-এর মসজিদ, যাহার খানকাহ্ ও মাযার-সৌধ মসজিদের ঠিক বিপরীত দিকেই অবস্থিত [১৫২], ৭৫৬/১৩৫৫*।

সুলতান হাসান-এর আমল হইতে শুরু করিয়া কায়রোর মসজিদসমূহ আকারে বিশাল হইলেও সংখ্যায় কম নির্মিত হইতে থাকে এবং এমনকি সুলতানগণ নির্মাণ করাইলেও সাধারণত মসজিদ অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে নির্মিত হইয়াছে। সাহিত্য-উপাদানের ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যেও ইহার প্রতিফলন পাওয়া যায়; সেই শব্দাবলীও অধিকতর ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুলতান হাসান-এর মসজিদকে [১৩৩], ৭৫৭/১৩৫৬-৭৬৪/১৩৬৩* উহার ওয়াকফিয়্যাতে উল্লেখ করা হইয়াছে "হাযা'ল-মাসজিদু'ল-জামি' ওয়া'ল-মাদারিস" বলিয়া আবার আল-মাকরীযী উহাকে বর্ণনা করিয়াছেন মাদরাসা ও জামি' বলিয়া। বস্তুত ইহার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে একটি বিশাল ক্রুশাকার মাদ্‌রাসা। চারিটি মাযহাবের জন্য—সামনে খোলা উঠান, সেখানে গম্বুজ ঢাকা ফোয়ারা। প্রধান ঈওয়ানে হানাফী মাযহাবপন্থিগণের শিক্ষা দানের জন্য নির্ধারিত, সেখানে মর্মর পাথরের একটি মিম্বর এবং বিশালাকার একটি মিহ্‌রাব রহিয়াছে, যাহা হইতে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, সেখানে শুধুমাত্র মসজিদ বা শুধুমাত্র মসজিদ জামি'-ই ছিল না, উভয়ই ছিল। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, কিবলা ঈওয়ান হইতে রাজকীয় সমাধি-সৌধের দিকে পথ গিয়াছে। উহা আদিতে একটি কাঠের গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। প্রধান খোলা চত্বরের প্রতিটি কোণাতে রহিয়াছে একটি করিয়া মাদ্‌রাসা; সেইগুলি একটি অভ্যন্তরীণ ছোট চত্বরের চতুর্দিকে বহুতলবিশিষ্ট ছোট ছোট কক্ষবিশিষ্ট। ইহার সংশ্লিষ্ট করিয়া যে একটি মীদাত বা উযূখানা নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহা অদ্যাবধি রহিয়াছে (কায়রোর স্থাপত্য শিল্পে মসজিদ বা মাদ্‌রাসার চত্বরে নির্মিত ফোয়ারাতে উযূ করিবার রীতি সচরাচর ছিল না, 'উছমানী আমলের শেষদিকে সেই রীতি প্রচলিত হয়); তাহা ছাড়া রহিয়াছে উঁচু একটি পানির মিনার, একটি কায়সারিয়া। সেখানে দোকানসমূহের চিহ্ন রহিয়াছে এবং একটি রাব', যাহা সম্ভবত একটি হাসপাতালরূপেও ব্যবহৃত হইত। ইহার অন্তর্ভুক্ত ও সংলগ্ন বিভিন্ন অংশগত এক শত বৎসরকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির ওয়াকফিয়্যা প্রকাশিত হইলে বিস্তারিত জানা যাইবে। শুধু আল-কাহিরারই নহে, ৮ম/১৪শ শতকের সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে সুলতান হাসান-এর মসজিদ উহার পরিকল্পনার বিশালতা ও আকারের জন্য অদ্বিতীয়, বিশেষ করিয়া উহার উচ্চতার জন্য উল্লেখযোগ্য। Max Herz Bey-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে ইহার স্থাপত্য ইতিহাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণভাবে অগ্রসর হয় নাই; শুধু অসমর্থিতভাবে অনুমান করা হয় যে, ইহার বারান্দা-অংশ হয়তো বা আনাতোলীয় অনুপ্রেরণা হইতে নির্মিত হইয়া থাকিবে এবং সেই অনুমান সম্প্রতি তুলনামূলক উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা সিভাসের সালজূক গোক মাদ্‌রাসার দুই মিনারযুক্ত বারান্দার অনুপম (দ্র. সালজূকগণ স্থাপত্য), ৬৭০/১২৭১-২ [J. M. Rogers, Seljuk influence on the Monuments of Cairo, in Kunst des Orients, ৭/১ খ. (১৯৭২ খৃ.), পৃ. ৪০-৬৮]। সুলতান হাসান-এর মৃত্যুকালে ভবনটি অসম্পূর্ণ ছিল। প্রথম দিককার মামলূক সুলতানগণের আমলে ইহার ইতিহাস ঘটনাবহুল এবং বিশাল আকারের কারণে ইহা অনুকৃত হইবার উপযোগী ছিল না। তবে সম্মুখভাগে অনুকৃত হইয়াছিল আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর মসজিদে, উহার অন্যান্য সংলগ্ন অংশেরও সঙ্গে— যেমন বাব যুওয়ায়লার উপরে স্থাপিত দুইটি মিনার [১৯০], ৮১৮/১৪১৫-৮২৩/১৪২০ (খিতাত, ২খ, পৃ. ৩২৮-৩০), এবং তিনি স্বীয় মসজিদের জন্য সুলতান হাসান-এর মসজিদের অনুকরণে পিতলের বিশাল প্রবেশ-তোরণ এবং ভিতরের পিতলের একটি ঝাড়বাতি স্থাপন করিয়া উহার প্রতি আরও সম্মান প্রদর্শন করেন।

আল-মু'আয়্যাদ-এর মসজিদ, মামলূক কায়রোর শেষ গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। ইহার সাহ্‌ন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত এবং ইহার চত্বরমুখী সম্মুখভাগের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহাতে শেষবারের ন্যায় আবদ্ধ খিলান এবং লতাপাতা ও গোলাপের নক্সাযুক্ত কারুকার্য করানো হয় যেইগুলি আল-হাফিজ লি-দীনিল্লাহ কর্তৃক ইব্‌ন তুলূন-এর মসজিদের অনুকরণে তৎকর্তৃক নির্মিত আল-আযহার মসজিদের সম্মুখ চত্বরের খাবার ঘরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিবলার দেওয়াল অলংকৃত করিবার জন্য বহু রঙ্গের ফোঁটাযুক্ত মর্মর পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয় এবং মাযার-সৌধটিতে, এমনকি ঈখশীদীয় কবরাবরণের অংশও ব্যবহৃত হয়। এইরূপ ব্যয়বহুল ও সুদৃশ্য অলংকরণ পরবর্তীকালের মামলূক আমলের স্থাপত্য শিল্পে আর করা সম্ভব হয় নাই। কায়রোর পরবর্তী কালের ৯ম/১৫শ শতকের মসজিদসমূহ এমনকি দারব সা'আদাতে অবস্থিত জাঁকজমকের ন্যায় রাজকীয় নির্মাণও (৮৫৩/১৪৪৯*) তুলনামূলকভাবে খুবই ছোট আকারে নির্মিত হইয়াছে। ক্রমেই উহাদের পরিকল্পনা বেশী করিয়া মাদ্‌রাসার অনুরূপ হইতে থাকে, প্রধানত দুই ঈওয়ান ধরনের ক্ষুদ্রতর সাহ্‌নসমেত—যাহা কালক্রমে একটি কাঠের তৈয়ারী আলো-হাওয়া চলাচলের প্রকোষ্ঠ সমেত ছাদযুক্ত হয় এবং পরিকল্পনার প্রায় যথাযথ বাস্তবায়ন যে সম্ভব হয় তাহা নিঃসন্দেহে এই কারণে যে, মসজিদ তখন সমগ্র নির্মাণ-কাজের একটি অপ্রধান অংশমাত্রে পরিণত হয়। কা'ইত বায়, যিনি বুরজী মামলূক আমলের নির্মাতাগণের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন—তিনি এমন কোনও মসজিদই নির্মাণ করেন নাই যাহা মূলত একই সঙ্গে ভিন্ন কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তাঁহার শাসনামলের অল্প কয়েকটি ভবনের প্রধান আকর্ষণ—যেগুলিকে মূলত মসজিদ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, যেমন কিজমাসুল (কাচমায) ইসহাকী [১১৪], ৮৮৫-৬/১৪৮০-১*— সেইগুলি, উহাদের ন্যায় বিশালাকারের বা ধারণাগতভাবে সে অনুপাতের নহে; বরং সেইগুলি স্থাপত্যগত সমস্যারই সমাধান করিয়া থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি দ্বীপকে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং উযূখানার চত্বর, শায়খ-এর বাড়ী এবং একটি সাবীল-কুত্তাব (নিম্নে 'উছমানী আমল দ্র.), যাহা একটি সড়কের অপর পারে অবস্থিত, একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইয়াছে। নির্মাণ ভিত্তির বিভিন্ন লক্ষণীয়ভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে এবং রাস্তার সমান্তরাল সম্মুখভাগ এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ কারুকার্য—এই উভয়েরই সর্বাধিক সম্ভব সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে শহর এলাকার ভিতরে জমির উপর অধিবাসিগণের এবং নিঃসন্দেহে আল-কাহিরার বিভিন্ন মহল্লাতে যথেষ্ট সংখ্যক মসজিদের কারণে বাহ্‌রী মামলূকগণের ব্যয়সাধ্য ও বিশালাকার সৌধ নির্মাণ অসম্ভব বা অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

মাদরাসাসমূহ ঃ খোদ আল-আযহার ও উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদরাসা এই সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ব্যতীত মামলূক আমলে কায়রোতে নির্মিত অন্যান্য মাদ্‌রাসা, যেমন তায়বারস-এর মাদরাসা, ৭০৯/১৩০৯-১০, আকবুগার

মাদরাসা ৭৩৪-৪০/১৩৩৩-৩৯*-গাওহার (জাওহার)-এর মাদরাসা ৮৪৪/১৪৪০* (Wiet, CIA, ১১৮, নং ৫৭২) এবং সম্ভবত গান্নামিয়্যা মাদরাসা [৯৬]। ৭৭৪/১৩৭২-৩ এইগুলির ইস্তাম্বুলের 'উছমানিয়া মাদ্রাসাসমূহের সঙ্গে কার্যগতভাবে তুলনীয় ছিল না; তুরস্কের ইস্তাম্বুলের মাদরাসাগুলির উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদসমূহ পূরণের জন্য কর্মকর্তা তৈয়ার করা। কায়রোর মাদ্রাসাগুলি প্রায়ই খ্যাতনামা 'আলিম ও সাধকদের মাযারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে।

মাযার-সৌধের সংশ্লিষ্ট নহে এইরূপ স্বাধীন মাদ্রাসার ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুইটি মাদরাসা রহিয়াছে, দুইটি বুরজী আমলের কা'ইত বায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কালা'আতু'ল-কাবশের উপরে [২২৩] ৮৮০/১৪৭৫* এবং অপরটি রাওদা দ্বীপে, যেইটিকে ইব্ন ইয়াস একটি মসজিদরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন (মূল ২খ, পৃ. ২০৫, ২১১, ২৭১, ৩০১) এবং যাহার নির্মাণ সমাপ্ত হয় ৮৯৬/১৪৯১ সালে দ্বীপটিতে উহাই একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধরূপে দণ্ডায়মান)। কোনও একটি মাযার সংলগ্ন মাদ্রাসা অবশ্য অন্যান্য মাদরাসার মাযার সংলগ্ন হইবার সম্ভাবনাকে বাতিল করিবার কারণ হিসাবে যথেষ্ট নহে। আমীর কারাসুনকুর ৭০০/১৩০১-এ কায়রোতে একটি মাদরাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন [৩১], স্বীয় জীবদ্দশাতে আলেপ্পোতে না'ইব থাকাকালীন সেইখানে স্বীয় মাযার সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি সমাহিত হইয়াছেন উত্তর-পশ্চিম ইরানের মারাগা (দ্র.)-তে গুনবায-ই গাফফারিয়্যাতে, যেখানে ৭১২/১৩১২ সনে তিনি পলায়ন করিয়া গিয়াছিলেন। আমীর তানকীযবুগা প্রকৃতপক্ষে কায়রোতে দুইটি মাযার-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন— একটি দক্ষিণের গোরস্তান [২৯৮], আনুমানিক ৭৬০/১৩৫৯ (Creswell কর্তৃক নির্ণীত তারিখ) এবং অপরটি কিল্লার পূর্বে মুকাততাম পাহাড়ের একটি বর্ধিতাংশের উপরে [৮৫], ৭৬৪/১৩৬২*। এইটিতে উপরে চন্দ্রাতপশোভিত মাযার (চাহার তাক) রহিয়াছে, যাহা তাঁহার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে সম্পূর্ণ নির্মিত হয়। এমনকি বারকূক, যিনি নগর প্রাকারের ভিতরে একটি মাযার-সৌধ সন্নিহিত মাদরাসা স্থাপন করিয়াছিলেন [১৮৭], ৭৮৬-৮/১৩৮৪-৬*, তিনিও মৃত্যুকালে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন অতি সম্মানিত শায়খগণের সঙ্গে একটি কুব্বাতে দাফন করা হয়। আল-মাকরীযী (খিতাত, ২খ, পৃ. ৪৬৪) উহাকে ফারাজ-এর খানকাহ [১৪৯], ৮০৩/১৪০০—৮১৩/১৪১০* মরুভূমিতে অবস্থিত হইবার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেখানে বারকূক বাস্তবিক সমাহিত রহিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রতিষ্ঠানগতভাবে দেখিতে গেলে মাদরাসা ও খানকাহ একেবারে বিশেষার্থবোধক শব্দ নহে, তবে খানকাহ্তেই লোকে সমাহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। সে যাহা হউক, বারকূক যে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহা তায়মূর ও তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক সামারকান্দ (দ্র.)-এর শাহ্‌র-ই সাব্‌য (কিশ, কিশ্‌শ) ও শাহ-ই যিন্দাকে পারিবারিক গোরস্তানরূপে গড়িয়া তোলার ইচ্ছার সঙ্গে বেশ চমকপ্রদভাবে মিলিয়া যায়।

কায়রোর মাদ্রাসাসমূহের, বিশেষ করিয়া শূলাকৃতি মাদ্রাসা-ভবনসমূহের নির্মাণরীতির বিবর্তনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন Creswell (MAE, ২খ, পৃ. ১০৪-৩৪)। এই নির্মাণ রীতি আয়্যূবীগণ কর্তৃক সিরীয়া হইতে আনীত হয়, কিন্তু মিসর বা সিরিয়াতে বর্তমানে টিকিয়া থাকা কোনও আয়্যূবী সৌধই পরিকল্পনার দিক হইতে শূলাকৃতির নহে এবং দামিশকের ৬৯৫/১২৯৫ পর্যন্ত ও কায়রোর ৬৩৯/১২৪২ পর্যন্ত সময়ের পরিচিত মাদরাসা যেইগুলির অধিকাংশই শাফি'ঈ অথবা হানাফী মতাবলম্বীদের। সেইগুলির তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সেইগুলির মধ্যে খুব কমই দুইটি মাযহাবের জন্য নির্মিত হইয়াছিল; আর চারটি মাযহাবের জন্য নির্মিত হইয়াছিল এরূপ একটিও নাই। বাগদাদের আল-মুসতানসিরিয়্যা মাদরাসা (৬৩১/১২৩৩) চারটি মাযহাবের উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু Creswell দেখাইয়াছেন যে, উহা শূলাকৃতির ছিল না; অথচ বায়বার্স যে সর্বপ্রথম কায়রোর শূলাকৃতির মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন জাহিরিয়্যা মাদ্রাসা [৩৭], ৬৬০/১২৬২* তাহা একযোগে চারিটি মাযহাবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উহা গতানুগতিক রীতিরও ছিল না, কেননা উহা ঠিক মাযার সৌধরূপে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বায়বারস দামিশকের আজ-জাহিরিয়্যা মাদরাসাতে তাঁহার মাযার নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্র. দিমাশ্‌ক)। মাদ্রাসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবেই শূলাকারের ভবন নির্মাণরীতি গৃহীত হয় নাই। কালায়ূন-এর মাদ্রাসাতে [৪৩], ৬৮৩-৪/১২৮৪-৫* মাত্র একটি ঈওয়ান এবং তিন স্তম্ভসমন্বিত একটি উপাসনা কক্ষ রহিয়াছে। চারিটি মাযহাবের জন্য কায়রোতে প্রথম শূলাকৃতির মাদ্রাসা হইতেছে আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর মাদ্রাসা [৪৪], ৬৯৫/১২৯৫-৭০৩/১৩০৪* এবং আল-মাকরীযী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আর মাত্র দুইটির কথা সুলতান হাসান-এর মাদরাসা [উপরে দ্র.] এবং জামালু'দ-দীন আল-উসতাদার-এর মাদরাসা (খিতাত, ২খ, পৃ. ৪০১) [৩৫], ৮১১/১৪০৮*। শূলাকারের পরিকল্পনা অবশ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা এই উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়— যদিও লম্বালম্বিভাবে নির্মিত ঈওয়ানগুলি দুই পার্শ্বেরগুলি অপেক্ষা দীর্ঘতর করিবার একটি প্রবণতা ছিল। এই রীতির সর্বাপেক্ষা দৃশ্যমান প্রয়োগ দেখা যায় কায়রোর বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া থাকা দুইটি হাসপাতালে (মারিস্তান)-কালায়ূন-এর মারিস্তান [৪৩], ৬৮৩/১২৮৪ এবং আল-মু'আয়্যাদ-এর মারিস্তান [২৫৭], ৮২১-৩/১৪১৮-২০ (খিতাত, ২খ, পৃ. ৪০৮)। এই উভয়টিরই সম্মুখভাগের নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে মধ্য আনাতোলিয়ার দিবরিগির মেনগূজূদিক হাসপাতালের (৬২৬/১২২৮) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আল-মু'আয়্যাদ-এর হাসপাতালটিকে পরে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় (৮২৫/১৪২১-২)।

মামলূক আমলে কায়রোতে যে সকল মাদ্রাসা নির্মিত হয় সেইগুলির অধিকাংশই দুই ঈওয়ান ধরনের কিছুটা মার্জিত রূপ। Creswell বলিয়াছেন যে, এই ধরনের মাদ্রাসার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কায়রোর স্বকীয় রীতির দ্বারা প্রভাবিত—বিশেষ করিয়া কা'আ-এর পরিকল্পনা। তাঁহার মত যদি আমরা গ্রহণ নাও করি তবুও আমরা হয়ত একটি বিষয় সঙ্গে সঙ্গেই মানিয়া নিতে পারি যে, মামলূক আমলের অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য ও মাদ্রাসাসমূহ একই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এমনকি এইরূপ মাদ্রাসাও রহিয়াছে যেইগুলির প্রস্তরলিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেইগুলি আদিতে বসতভবন ছিল, যেমন আল-গান্নামিয়্যা মাদ্রাসা [৯৬], ৭৭৪/১৩৭২-৩* এবং খুশকাদাম আল-আহমাদী মাদ্রাসা যাহা পূর্বে তাশতিমুর আদ-দাওয়াদার-এর প্রাসাদ ছিল [১৫৩], ৭৬৮/১৩৬৬-৭ বা ৭৭৮/১৩৭৬-৭। এইগুলিকে মাদ্রাসাতে রূপান্তরিত করা হয় বেশ বিলম্বে। প্রথমোক্তটি অবশ্যই ৮২৭/১৪২৩-এর মধ্যে মাদ্রাসাতে রূপান্তরিত হইয়া

থাকিবে, যখন খিতাত রচনা সমাপ্ত হয়। কিন্তু ইব্ন ইয়াস-এর মতে শেষোক্তটিতে সর্বপ্রথম খুত্বা পাঠ করা হয় ৮৯১/১৪৮৬ সালে। রূপান্তরের কাজ অবশ্যই সাদাসিধা ছিল, কিবলার দিকে শুধুমাত্র খোদাই করিয়া মিহরাব নির্মাণ করা হয় এবং একটি একটি মিনারা নির্মাণ করা হয়; এই উভয়টিই কায়রোর মসজিদের জন্য অপরিহার্য ছিল।

খানকাহসমূহ ঃ মামলূক আমলে কায়রো ধর্মীয় আস্তানা ধরনের ভবনসমূহ নির্মাণ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, সেইগুলি হইতেছে যাবিয়া, খানকাহ (ব.ব. সাধারণত খাওয়ানিক বা খানকাহাত) ও রিবাতসমূহ। প্রথম দিকে এইগুলি ছিল সাধারণত ছোট পাকা ঘর। সেইখানে শায়খ বাস করিতেন আর ছাত্রগণ তাঁহার চতুর্দিকে গোল হইয়া বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিত। সেইগুলির তেমন কোনও স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য নাই এবং অনেক সময় শায়খগণই সেইগুলিকে কোনরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করিতে নিষেধ করিতেন। Creswell-এর Brief Chronology-তে উল্লিখিত দুইটির মধ্যে যাবিয়াতু'ল-'আব্বার [১৪৬] (আনুমানিক ৬৮৪/১২৮৫-৬, খিতাত, ২খ, ৪২০) দুই গম্বুজবিশিষ্ট মাযার-সৌধ—ইহা খান্কাতু'ল-বুনদুক দারিয়্যা ও যাবিয়াত আয়দুমুর (Ay-demir) আল-পাহ্লাওয়ান [২২], যেইখানির নির্মাণ তারিখ নিয়া বিতর্ক রহিয়াছে (দ্র. Van Berchem, CIA, ১২৫), এইগুলির ন্যায়ই সুবিখ্যাত এবং প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, ইহা ছিল একটি মাদ্রাসা। বিভিন্ন তথ্য-উৎস অন্যান্য যাবিয়া সম্বন্ধে যেখানে যথেষ্ট বর্ণনা ও বিবরণ দিয়াছে, এইগুলি সম্বন্ধে শুধু এতটুকুই বলিয়াছে যে, এইগুলি এক রুকনবিশিষ্ট বা এক রিওয়াক বিশিষ্ট এবং সেই কারণেই স্থাপত্যগতভাবে এইগুলিকে চিহ্নিত করা দুষ্কর।

মিসরে স্থাপিত সর্বপ্রাচীন খানকাহ ছিল আয়্যূবী আমলের ৫৬৯/১১৭০-৪) আল-মুসতানসির কর্তৃক আযাদকৃত গোলাম সা'ঈদ আস-সু'আদা-এর প্রাসাদে (দ্র. খিতাত, ২খ, ৪১৫-৭, ৪২২)। এই স্থানটি এখনও চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু ভবনটির এত ঘন ঘন পরিবর্তন করা হইয়াছে যে, আদিতে যে ইহা কিরূপ ছিল তাহা আর এখন ধারণা করা যায় না। একটি বিষয় বড় চমকপ্রদ যে, একেবারে 'উছমানী বিজয়কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে নির্মিত মাত্র সাতটি ভবন পাওয়া যায়, যেইগুলির ভিত্তিপ্রস্তর খানকাহ বলিয়া চিহ্নিত দেখা যায়, সেইগুলি হইল বায়বারস আল-জাশেনকীর খানকাহ (Cashnegir) [৩২], ৭০৬-৯/১৩০৬-৯*, শায়খু'ল-'উমারীর খানকাহ [১৫২], ৭৫৬/১৩৩৫, নিজামু'দ-দীন ইসহাক-এর খানকাহ (১৪০), ৭৫৭/১৩৫৬*, মুকবিলু'য-যিমাম আদ-দা'উদীর খানকাহ (১৭৭), ৭৯৭-৮/১৩৯৫* এবং পূর্বদিকের মাক্বারা অঞ্চলে তিনটি ঃ ফারাজ ইবন বারকূক-এর খানকাহ [১৪৯], ৮০৩/১৪০০-৮১৩/১৪১০*, আল-আশরাফ বারসবায়-এর খানকাহ [১২১], ৮৩৫/১৪৩২*, এবং আল-আশরাফ ঈনাল-এর খানকাহ [১৫৮], ৮৫৪-৬০/১৪৫০-৬*। আলাদা ভবন হিসাবে যে খানকাহ নির্মাণের ধারণা যাহার সঙ্গে থাকিবে রান্নাঘর, গোসলখানা, থাকিবার ঘর—একটি গোলাকার চত্বরের চারিপার্শ্বে বা ভিন্ন ভিন্নভাবে—যেরূপ ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর খানকাহ্তে রহিয়াছে, সে বিষয়টি সম্বন্ধে যথার্থতার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন মাকরিযী, ইব্ন তাগরীবিরদী, ইব্ন ইয়াস ও আস-সাখাবী। কিন্তু খানকাহ এর সংখ্যা সম্বন্ধে তাহাদের বর্ণনাতে বিভিন্নতা দেখা যায়— প্রথমোক্ত জন বলিয়াছেন উনত্রিশটি আর শেষোক্তজন বলিয়াছেন মাত্র চারিটি—এবং তদুপরি আবার প্রত্যেকেই কিঞ্চিত ভিন্নতর তালিকাও দিয়াছেন। তাহা হইতে মনে হয়, মাদ্রাসার ন্যায়ই এই খানকাহও কায়রোর স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে কোনও বিশেষ অর্থজ্ঞাপক আলাদা কিছু ছিল না। বুরজী আমলে খানকাহ সম্বন্ধে সাধারণ প্রবণতা এইরূপ ছিল যে, শিলালিপিতে এইগুলিকে মাদ্রাসা বা জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইত, যদিও এই প্রসঙ্গে মাশয়াখাত তাসাওউফ বা মাশয়াখা সূফিয়্যা (সূফী সাধকগণ)-এর উল্লেখও করা যাইতে পারে। উপরিউক্ত আল-আশরাফ বারসবায়-এর ইমারতের ক্ষেত্রে, যেমন [১২১] শিলালিপিতে লিখিত 'খানকাহ', ওয়াকফিয়্যাত 'মাদরাসা' হইয়া উঠিতে পারে (দ্র. A. Darrag, L'Egypte sous le regne de Barsbay, দামিশক ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৫০)। আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর রাজত্বের অন্তিম সময় পর্যন্ত তথ্য গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত অধিকাংশ খানকাহ প্রতিষ্ঠার কালের সমসাময়িক সেই সময়ে সূফীগণের জন্য খানকাহতে বসবাস করাই রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়, হয় কোনও চত্বরের চতুর্দিকে নির্মিত আস্তানা-কক্ষে, যেরূপ দেখা যায় উপরিউক্ত রুক্নু'দ-দীন বায়বারস আল-জাশেনকীর (Cashnegir)-এর খানকাহ ভিত্তিতে [৩২] এবং সালার ও সানজার আল-জাবিলীর খানকার ভিত্তিতে [২২১], ৭০৩/১৩০২-৪*; (উভয়ই জাবাল য়াশকুরের উপরে অবস্থিত) অথবা সংলগ্ন ভবনে সাধরণত শূল বা ক্রুশ আকারের বা সবশেষে বলা যায় যে, ঈনাল, কা'ইত বায় ও কুরকুমাস-এর খানকার ভিত্তির ন্যায় একটি রাব-এর মধ্যে অর্থাৎ প্রধান ঘেরের ভিতরেই, যেখানে একের পর এক বাসকক্ষসমূহ নির্মিত কিন্তু গঠনগতভাবে উহা হইতে আলাদা। শেষোক্ত দুই ধরনের খানকাহতে মূল ভবন এবং সংলগ্ন অংশের মধ্যে তেমন কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না।

৯ম/১৫শ শতকের প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে শহরের ভিতরের অংশে নির্মিত খানকাহ-এর বসবাসের স্থান নূতন ভিত্তিভূমি অপেক্ষা নিম্নতর করিয়া নির্মাণ করা হইত, যদিও তাহা স্থানাভাব হেতু অথবা সূফী দরবেশের ইচ্ছা অনুসারে করা হইত, তাহা জানা যায় না। বাহ্রী মামলূক আমলের খানকাহসমূহের মধ্যে বসবাস করিবার কথা অনেক সময়ে ওয়াকফিয়্যাতে উল্লেখ করা থাকিত (দ্র. 'আবদু'ল-লাতীফ ইবরাহীম 'আলী, দিরাসাত তা'রীখিয়্যা ওয়া আছারিয়া ফী ওয়াছা'ইক মিন 'আসরি'ল-গূরী, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬৮-৯)। কেননা বায়বারস আল-জাশেনকীর-এর ওয়াকফিয়াতে উল্লিখিত আছে যে, সূফীগণ দয়াদাক্ষিণ্য ও দারিদ্র্যের শপথ গ্রহণ করিতেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে বা কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইতে বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বাহরী মামলূক আমলে কোনও কোনও বিশেষ অবস্থায়, যেমন বিবাহিত সূফীগণের ক্ষেত্রে খানকার বাহিরে তাসাওউফ চর্চার অনুমোদন ছিল। কিন্তু এই আমলে স্থাপিত খানকাহসমূহ একান্ত ব্যক্তিগত যিক্রের স্থান ছিল এবং সেইখানে বাহিরের লোকের অবস্থানের ব্যবস্থা থাকিত না। আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর আমল হইতে ('আলী পাশা মুবারাক কর্তৃক উদ্ধৃত ওয়াকফিয়্যা, ৫খ, ১২৮) সমবেত যিক্রের প্রচলন হয়। পূর্বে পর্যায়ক্রমে সূফীগণকে কোনও পদে নিয়োগ করিবার যে কড়াকড়ি রীতি ছিল তাহা শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হইতে থাকে এবং তাসাওউফের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শিক্ষার জন্য শায়খের মজলিসে দৈনিক উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পরবর্তী কালের বুরজী আমলের খানকাহসমূহ মাযার-সৌধসমূহের সংলগ্ন অংশে পরিণত হয় এবং কখনও কখনও সেইগুলি মাক'আদ হইতে ভিন্ন কিছু ছিল না, যেইরূপ ছিল আল-গূরীর

মাক'আদ [৬৬-৭], ৯০৮-১০/১৫০৩-৪*—মস্ত বড় হলঘর সেখানে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে কতগুলি যিক্র জামা'ঈ বা হুদূর ওয়াজীফাতু'ত-তাসাওউফ অনুষ্ঠিত হইত।

মামলূক আমলের মিসরে খানকাহ্-এর স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের বিষয়ে তথ্যের জন্য আরও অনেক গ্রন্থ রচনা ও আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে (এই বিষয়ে জরীপ সম্বন্ধে দ্র. S. Mehrez, The Ghawriyya in the urban context, an analysis of its from and function. IFAO, কায়রো)। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, সূফীগণের আস্তানাসমূহ আবাসিকের পরিবর্তে যে অনাবাসিক হইয়া উঠে তাহা অন্তত আংশিকভাবে ৯ম/১৫শ শতকে মিসরে সূফী তারীকার অবক্ষয়েরই ফল। এই অনুমান সঠিক হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ তারীকার জন্য কোন্ খানকাহ বরাদ্দ ছিল বা কোন্ তারীকাপন্থিগণ কর্তৃক খানকাহ অধিকৃত হয় সেই সম্বন্ধে উক্ত তথ্যসূত্র সম্পূর্ণ নীরব। সূফী তারীকার মধ্যে আচরণের বিভিন্নতা দেখা দেওয়ার কারণে ৮ম/১৪শ-৯ম/১৫শ শতকে ইরান ও 'উছমানী তুরস্কে খানকাহ্র স্থাপত্যরীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই বিষয়ে কায়রো যে কোনও প্রকার ব্যতিক্রম ছিল তাহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। মনে হয় এই প্রশ্নটির পরিষ্কার মীমাংসার একমাত্র সম্ভাবনা রহিয়াছে মিসরের মামলূক ওয়াকফিয়্যাসমূহ প্রকাশের মধ্যে [যেমন, বারসবায়-এর ওয়াকফিয়্যা আহমাদ দাররাজ, হুজ্জাত ওয়াকফু'ল-আশরাফ বারসবায়, ৭৩, ৭৪)] হইতে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মরুভূমিতে অবস্থিত তাহার খানকাহ্র পশ্চিমে সূফীগণের (রিফা'ইগণের) কল্যাণার্থে একটি যাবিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন অথবা ৮ম/১৪-৯ম/১৫শ শতকের বিভিন্ন খানকাহ্র শায়খগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে।

রিবাতসমূহ ঃ রিবাতসমূহ (সব সময়েই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, খান অর্থে নহে) কায়রোর দুর্লভ স্থাপত্য কীর্তি এবং প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত রহিয়াছে এইরূপ সৌধগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে বুরজী য়াহ্য়া যায়নু'দ-দীন-এর [১৪১], ৮৫৬/১৪৫২* (CIA, ৭৪৬, নং ২৭০) এবং দুইটি আল-আশরাফ ঈনাল—তন্মধ্যে একটি মরুভূমিতে তাঁহার মাযার-সৌধ সংলগ্ন, [১৫৮], ৮৫৪/১৪৫০-৮৬০/১৪৫৬* এবং অপরটি আল-কাহিরার মধ্যে খুরুনফীশে অবস্থিত [৬১], ৮৫৭/১৪৫৩-৮৬৫/১৪৬১*। এই ইমারতগুলিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুজাহিদূনের রিবাতের (দ্র. রিবাত) সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত করা হইয়াছিল এইরূপ প্রমাণ খুব অল্পই পাওয়া যায় এবং ঈনালের রিবাতে [১৫৮] যে দ্বিতীয় একটি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে উহাকে একটি খানকাহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (Van Berchem, CIA, ৩৯৯, নং ২৭৪)। ইহা হইতে ধরিয়া নেওয়া যায় যে, শব্দটি সেই সময়ে বস্তুত সমার্থকই ছিল।

মাযার-সৌধসমূহ ঃ মামলূক আমলের সবচেয়ে সুন্দর ও বিশাল মাযার-সৌধসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কালা'য়ূন-এর মাযার-সৌধ, আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর সৌধ, নগর দেওয়ালের ভিতরে বারকূক এর সৌধ এবং ফাবাজ ইব্ন বারকূক-এর সৌধ—এইগুলি পূর্বদিকের গোরস্তান এলাকাতে অবস্থিত। যদিও C. Kessler-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী উহা প্রকৃতপক্ষে মাযারের সংশ্লিষ্ট সৌধ ছিল এবং স্বীয় যৌক্তিকতা নিয়াই বিদ্যমান ছিল। যৌক্তিকতা এই কারণে যে, মাযার স্মৃতিসৌধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লোকের মনোভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিলে সৌধের মধ্যে মূল মাযার অংশ ক্রমেই বেশী গুরুত্ব লাভ করিতে থাকে, এমনকি সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে অধিকতর কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিতে থাকে। অপর পক্ষে এই আমলের কতগুলি ছোট মাযার সৌধ রহিয়াছে যেইগুলিকে বিবেচনা বহির্ভূতভাবে না রাখিয়া বরং গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করাই অধিক সঙ্গত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, কুচুক-এর সমাধি-সৌধের কথা বলা যায়। ইহা আকসুনকুর-এর মসজিদের [১২৩], ৭৪৭-৮/১৩৪৬-৭ সঙ্গে একত্রীভূত এবং ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা স্থাপত্যগতভাবে কোনও বিশেষ রীতির অনুসারী নহে এবং ইহাতে কোনও মিহরাবও ব্যবহৃত হয় নাই। আযবাক (উযবেক) আল-য়ূসুফীর মাযার-সৌধ সহজ সরল, তাহার দুই-ঈওয়ান মাদরাসার [২১১], ৯০০/১৪৯৪-৫* এক পার্শ্বে অবস্থিত, একটি কাঠের মাশরাবিয়্যা কাজ দ্বারা দুরকা'আ হইতে আলাদা করা। গোরস্তানের পূর্ব দিকের এলাকার কুব্বাত 'আসফূর [আল-'আসফূর ?] [১৩২], ৯১৩/১৫০৭ পরবর্তীকালীন, শুধুমাত্র একটি সাবিলের সঙ্গে যুক্ত। আল-গূরী এতই সচেতন ছিলেন যে, তাঁহার মাযার-সৌধ [৬৭] (নির্মাণ সমাপ্ত হয় ৯০৯/১৫০৪) যাহাতে কাসাবাতে নির্মিত হয় সেজন্য উহার আর প্রায় সকল সংশ্লিষ্ট অংশই বাদ দেওয়া হয় এবং সৌধটি একেবারে রাস্তা হইতে কিবলার দেওয়াল পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। খায়র বেগ-এর মাযার-সৌধ তাঁহার প্রাসাদ-সংলগ্ন [২৪৯], উহা ৯১০/১৫০৫ সালের পূর্বে নির্মিত এবং উভয়ের মাঝখানের খালি জায়গা একটি মসজিদ নির্মাণ দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। মামলূক আমলের চাদোয়াসমন্বিত কয়েকটি মাযার রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া তানকিযবুগার মাযার [৮৫], ৭৬৪/১৩৬২* এবং মরুভূমিতে আল-আশরাফ বারসবায়-এর খানকার মধ্যে অবস্থিত একটি মাযার-সৌধ [১২১] ৮৩৫/১৪৩২* উল্লেখযোগ্য, যদিও মামলূক আমলের অধিকাংশ মাযারই গম্বুজযুক্ত কয়েক কক্ষবিশিষ্ট (যে কারণে সাধারণভাবে মাযার-সৌধের নাম হইয়াছে কুব্বা)। এই সকল বিচ্ছিন্ন ইমারতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইতেছে 'আব্বাসিয়্যাতে অবস্থিত আল-কুব্বাতু'ল-কাদারিয়্যা [৫], উচ্চ ভিত্তের উপরে নির্মিত বিশাল গম্বুজযুক্ত সৌধ, যাহার নির্মাণকাল ৮৮৪-৬/১৪৭৯-৮১* বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, ইহার একাংশ মুসাল্লারূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার একতলাতে কোনও বারান্দা নাই এবং বাহির দিকে অবস্থিত একটি বিশাল সিঁড়ি দিয়া ইহাত প্রবেশ করিতে হয়।

সাধারণ বিবেচ্য বিষয়াবলী ঃ একটি কথা প্রায়শই বলা হইয়া থাকে যে, কায়রোর স্থাপত্য বাহ্‌রী আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বুরজী আমল পর্যন্ত ক্রমাবনতির লক্ষণাক্রান্ত। পরবর্তী আমলে নিশ্চয়ই রুচির একটি পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল, যখন অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ এই উভয় দিকেই অলংকরণের ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। মর্মর পাথরের বহিরাবরণ সৃষ্টিতে, কাঁচের ব্যবহারে বা শুধুমাত্র পাথরের খোদাই কার্যে, বড় বড় রাজকীয় সৌধের গম্বুজের বহির্ভাগে, বিশেষ করিয়া ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর মাযার-সৌধ নির্মাণের পর হইতে শুরু করিয়া সূক্ষ্ম কারুকার্যময় রিলিফ-নক্সার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কাঠ দুর্লভ ছিল, আমদানী করিয়া আনাও ব্যয়সাধ্য ছিল। বায়বানটীয় আমলের পর হইতে কোনও মর্মর পাথর খনি হইতে উত্তোলন করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ৯ম/১৫শ শতকের মধ্যে পূরাকীর্তি সামগ্রীর সকল সরবরাহ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এই অভাব পূরণের জন্য যেসব পদ্ধতি

অবলম্বন করা হয়, যেমন সাদা মর্মর পাথরের খাঁজ কাটা নকশার স্থান ভরাট করিবার উপকরণরূপে বিটুমিন বা লাল আস্তর ব্যবহার এবং এইভাবে বহু বর্ণচ্ছটাময় মর্মরের বহিরাবরণ সৃষ্টি (কাদী আবূ বাক্র মুজাহির-এর মাদরাসা [৪৯], ৮৮৪/১৪৭৯-৮০*, কিজমাসুল [কাচমায' ইসহাকী [১১৪], ৮৮৫-৬/১৪৮০-১*; কা'ইত বায়-এর মাযার সংলগ্ন মাদ্রাসা [৯৯], নির্মাণ সমাপ্ত হয় ৮৭৯/১৪৭৪* [দ্র. প্লেট ৩]; আল-গূরীর মাদ্রাসা [৬৬], নির্মাণ সমাপ্ত হয় ৯১০/১৫০৪*) সালে এইগুলি ক্রমাবনতি অপেক্ষা বরং কারুশিল্পগত আবিষ্কার ধর্মিতারই পরিচয় বহন করে। আল-কাহিরার এলাকার মধ্যস্থ স্থানে যে চাপ পড়ে তাহা হইতেই আনুষংগিক অংশগুলিকে স্থান দেওয়ার জন্য গোরস্তানগুলির আকারে ছোট হইবার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং সমতল ভূমি হইতে উচ্চ ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। মামলূক স্থপতিগণের মধ্যে একটি ভ্রান্তপূর্ণ ধারণাও ছিল বলিয়া মনে হয়, কোনও নির্মাণ পরিকল্পনা বা উচ্চতাকে দুই বা চারের হিসাব দ্বারা কমান যাইতে পারে। তাহার ফলে ভবনের কার্যকারিতা হ্রাস পায় না এবং এই আকারের ক্ষুদ্রতাহেতু ভবনের বহিরঙ্গে সর্বত্রই নকশা ও কারুকাজ অনেক বেশী চোখে পড়ে। তবে যেইখানেই স্থান পাওয়া গিয়াছে—যেরূপ পূর্বদিকের গোরস্তান এলাকাতে ছিল—সেইখানে সমগ্র ৯ম/১৫শ শতাব্দী ব্যাপী যে সকল বুরজী সৌধ নির্মিত হইয়াছে, সেগুলি সবই স্থাপত্যগতভাবে বিশাল আকারের। সেই আমলে পাথরের কাজেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বাহরী আমলের যে কয়টি পাথরের গম্বুজ দেখা যায় সেইগুলি সবই ছোট আকারের এবং প্রধানত ছিল পরীক্ষামূলক ইমারত ঃ যেইখানে সৌধ অনেক বড় স্থান ব্যাপিয়া নির্মিত হইত সেইখানে গম্বুজ অবশ্যই কাষ্ঠনির্মিত হইত (যেমন ইমাম আশ-শাফি'ঈ-এর মাযার-সৌধ বা সুলতান হাসান-এর মাযার সৌধ। ঘটনাক্রমে এই উভয়টিরই মূল নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা সংস্কার সাধন করেন কা'ইত বায়) অথবা ইহা ইটের হইত, যেমন সারগাতমিশ-এর মাদরাসার মধ্যে অবস্থিত মাযার-সৌধ [২১৮], ৭৫৭/১৩৫৬*। বুরজী আমলের ফারাজ ইব্‌ন বারকূক-এর খানকাহ-এর গম্বুজসমূহ ছিল বিশালায়তন; সেইগুলি সম্ভবত মিসরে মামলূক আমলের স্থাপত্যশিল্পে পাথরের কাজের চূড়ান্ত গৌরবের পরিচয়বাহী। কিন্তু স্থপতিগণের এই দক্ষতা একেবারে মামলূকগণের পতনের কাল পর্যন্ত বজায় ছিল। খায়র বেগ-এর প্রাসাদ ও মাযার-সৌধে তাহা পরিলক্ষিত হয় [২৪৮-৯], ৯০৬-৮/১৫০১-২*। এইগুলি অবক্ষয়রূপে উল্লেখ করার কোনও যুক্তি নাই।

অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য ঃ কায়রোর মাদ্রাসাসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আল-কাহিরার অনবদ্য অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কা'আ-এর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আলোকপাত করিয়াছি। অনেক ক্ষেত্রেই ঈওয়ানের দেওয়ালে সালসাবিল নির্মাণ করা হইত। উহা হইতে ফোটা ফোটা পানি নির্গত হইয়া দুরকা'আ-এর মধ্যস্থলে তৈয়ারী একটি হাওযে গিয়া সঞ্চিত হইত (মুহাম্মাদ মুহিব্বু'দ-দীন-এর কা'আ [৫০]; ইহা উছমান কাতখুদার ওয়াক্‌ফ নামেও পরিচিত। নির্মাণের তারিখ ৭৫১/১৩৫১*; Cresswell—Brief Chronology গ্রন্থে যে নির্মাণ তারিখ ৬৫১/১২৩৩ দেখাইয়াছেন তাহা সঠিক নহে। ভিতরে বায়ু চলাচলের জন্য হাওয়া-মিনার তৈয়ারী করা হইয়াছিল (মালূকায, বহুবচনে মালাকিয), সন্ধ্যার হাওয়া যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য ঐগুলির মুখ ছিল উত্তর দিকে। কোনও কোনও ধর্মীয় ইমারতেও ঐগুলি দেখা যায় (যেমন আস-সালিহ তালা'-এর মসজিদে [১১৬], ৫৫৫/১১৬০*, যাহাতে আবর্তনশীল চালক দণ্ডটি (shaft) অসুবিধাজনকভাবে মিম্বরের উপরের দিকে উন্মুক্ত দেখা যায় এবং বায়বার্‌স আল-জাশেনকীর-এর খানকাহতে [৩২], ৭০৬-৯/১৩০৬-৯*। প্রধান কা'আটি নীচতলায় না-ও হইতে পারে এবং বেশতাক-এর প্রাসাদে যেইরূপ ([৩৪], ৭৩৮ বা ৭৪০/১৩৩৭ বা ১৩৩৯) উপরের তলায় পৌঁছাইতে হয় একটি খোলা কক্ষের পাশ দিয়া তোলা সিঁড়ি দিয়া; সেই খোলা কক্ষে ছিল আস্তাবল এবং তাহার সঙ্গে রাস্তার দিকে মুখ করা দোকানের সারি, সেইগুলি গিয়া ফাতিমী আমলে নির্মিত একটি মসজিদ, মাসজিদু'ল-ফিজিলের দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়াছে। কা'আ-এর উপর তলা বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত। কখনও কখনও কাঠের মাশরাবিয়া পর্দার মধ্য দিয়া সেখানে তাকাইতে হইত যেই কারণে, কায়রোর কোনও কোনও বৃহৎ ভবনকে খুব উঁচু করিয়া নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই প্রাসাদগুলির অধিকাংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে (সানজাকু'স-সিলাহদার নামে পরিচিত) বিশালাকারের বারান্দা [২৪৭], ৭৪৭-৮/১৩৪৬-৭*; আমীর তায [২৬৭], ৭৫৩/১৩৫২, ইহা শারি'উ'ল্লা-সুয়ূফিয়্যার পার্শ্বে নির্মিত), কিন্তু এক সময়ে ইহা আমীর যূশবাক-এর প্রাসাদ ছিল। ৮৮০/১৪৭৫-৬ সালের একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে, তিনিই এই প্রাসাদটির সর্বশেষ অধিকারী ছিলেন। ইহার প্রায় সম্পূর্ণই সুরক্ষিত রহিয়াছে [২৬৬]। ইহার অপর প্রচলিত নাম হাওশ-বারদাক হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহাই ছিল কূসুন কর্তৃক নির্মিত আস্তাবল ও বাসস্থান উভয়ই। ইহা তিনি সানজারের একটি প্রাসাদের বর্ধিতাংশরূপে নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহা ৭৪২/১৩৪১-২ সালে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ৮৮৭/১৪৮২ উইশবাকের মৃত্যুর পরে কা'ইত বায় প্রাসাদটি আকবরদী নামক অপর একজন আমীরকে প্রদান করেন। জানামতে তিনিই ছিলেন ইহার শেষ বসবাসকারী ব্যক্তি; ৯০৪/১৪৯৮-৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মালিকানার যে পর্যায়ক্রম পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, এই প্রাসাদটি এবং সম্ভবত অনুরূপ অন্যান্য প্রাসাদ সরকারী বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং ইহা যে ক্রমাগত এইভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার কারণ সম্ভব এই যে, অতি উচ্চ পদস্থ আমীরগণের জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত বাসভবন ছিল না। বাস্তবে এইরূপ একটি রীতিই হইয়া গিয়াছিল যে, পুরাতন কোনও প্রাসাদকে নূতন সংযোজিত প্রাসাদের সঙ্গে একত্রীভূত করিয়া দেওয়া, বা সংলগ্ন সকল নূতন পুরাতন ভবনের একীকরণ করা, যাহাতে শেষ পর্যন্ত সেইগুলি কা'আ ও মাক'আদের রূপ নিত। উত্তরমুখীন উপরে ছাদযুক্ত খোলা চত্বর, সাধারণত ভিত্তি হইতে উঁচুতে ভাণ্ডারঘর বা চাকরদের ঘরের উপরে (যেমন মামায়-এর প্রাসাদ [৫১], ৯০১/১৪৯৬* যাহা বর্তমানে বায়তু'ল-কাদী নামে পরিচিত) অসম আকৃতির চত্বরের চতুর্দিকে নির্মিত হইত। বাব যুওয়ায়লার নিকটস্থ রাব' রাদওয়ান বে [৪০৬] এবং বায়তু'ল-কিরীতলিয়্যা, যাহা ইব্‌ন তূলূন-এর মসজিদের সংলগ্ন [৩২১] উভয়ই ১১শ/১৭শ শতকের ইমারত, এই দুইটিই পূর্ববর্তী প্রাসাদকে সংযুক্ত করিয়া নির্মিত হইয়াছে এবং ৯ম/১৫শ শতকের ইমারতসমূহের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া মনে হয়, যেমন দারবু'ল-আহ্‌মার-এ অবস্থিত কা'ইত বায়-এর 'প্রাসাদ [২২৮], ৮৯০/১৪৮৫*।

একটি কা'আ-এর চতুর্দিকে পুরাতন প্রাসাদকে একত্রীভূত করিয়া নূতন বৃহত্তর প্রাসাদ নির্মাণের ঐতিহ্যগত রীতি ফাতিমী আমলের পর

হইতে সামান্যই পরিবর্তিত হয়। 'উছমানী বিজয়ের পরেও নিশ্চিতভাবে সেই রীতির ন্যূনতম পরিবর্তন ঘটে এবং আল কাহিরার স্থাপত্য শিল্পের এই ক্ষেত্রটিকে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। মুসাফিরখানা প্রাসাদে [২০], (১১৯৩/১৭৭৯-১২০৩/১৭৮৮) যে ইস্তাম্বুলী রীতির নির্মাণ বৈশিষ্ট্য অধিক লক্ষণীয়, সেই বিষয়ে খুব একটা বিতর্কের অবকাশ নাই; পক্ষান্তরে আল-জাওহারাতে নির্মিত মুহাম্মাদ 'আলীর প্রাসাদে [৫০৫], (১২২৯/১৮১৪] ফরাসী স্থাপত্য রীতিরই প্রাধান্য বেশী। কিন্তু কায়রোর অপেক্ষাকৃত কম শিল্প কুশলতাময় ভবনসমূহ স্থানীয় রীতিতেই নির্মিত হইতে থাকে।

বাণিজ্যিক স্থাপত্য ঃ ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা বসবাসের উদ্দেশ্যে নির্মিত কায়রোর ভবনসমূহ বা রাব'সমূহ একটি আলাদা বিষয় হিসাবে কোনদিন স্থাপত্যগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই (Index-এ ইহাদের অধিকাংশকেই "ওয়াক্ফ-ঘর"-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে)। এক সময়ে শহরে মামলূক আমলের অসংখ্য হাম্মামখানা ছিল। বর্তমানে সেইগুলি আদৌ টিকিয়া নাই বলিলেই চলে। মামলূক আমলের যে দুইটি মাত্র ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায় সেইগুলি বেশতাক-এর হাম্মামখানার ফটক [২৪৪], ৭৪২/১৩৪১ পূর্বেকার এবং আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পত্তির অংশ, একটি হাম্মামখানার কেন্দ্রীয় খোলা কক্ষ [৪১০], (দ্র. 'আলী পাশা, ৫খ, ৩৫-৩৬, ৬খ, ৭১)। মামলূক আমলের খানগুলি কিছুটা সুরক্ষিত। ফাতিমী আমলের পর হইতে খানগুলির আড়ম্বরপূর্ণ প্রামাণ্য বর্ণনা প্রদান করা হইলেও (এইগুলিতে বিদেশী সওদাগরগণ আসিয়া থাকিতেন এবং বহু উচ্চপদস্থ মামলূক আমীর নিজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন) বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাহ্‌রী মামলূক আমলের মাত্র একটি খান টিকিয়া আছে। কায়রোতে সর্বপ্রাচীন, জামালিয়্যা মহল্লাতে অবস্থিত কাসূন-এর খান [১১], ৭৪২/১৩৪১ তাঁহার মৃত্যুর তারিখের পূর্বেকার, কা'ইত বায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুইটি খান সংরক্ষিত রহিয়াছে (প্রস্তরলিপিতে খান শব্দটি লিখিত আছে, যদিও সাহিত্যে প্রায় অবধারিতভাবেই বিকালা শব্দটি ব্যবহার করা হয়) একটি আল-আযহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সাবীল-কুত্তাব [৭৫-৭৬], ৮৮২/১৪৭৭* এবং অপরটি বাবু'ন-নাসরে [৯], ৮৮৫/১৪৮১। তবে সবচেয়ে সুরক্ষিত বিকালাতু'ন-নাখলা [৬৪], উহাতে আল-গূরীর নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, ৯০৬/১৫০১-৯২২/১৫১৬।

ইহার সম্মুখে একটি খোলা চত্বর রহিয়াছে, একটি বিশাল তোরণ দিয়া সেইখানে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণের চতুর্দিকে ঘেরা একতলায় দোকাকিন (দোকানঘরসমূহ) বা মাখাযিন (গুদামসমূহ) আর দোতলা ও তিন তলাতে থাকিবার ঘর। আদিতে সম্ভবত আরও একতলা ছিল। সমসাময়িক কালের আলেপ্পো ও দামিশ্‌কে যেই সকল খান ছিল সেগুলি হইতে কায়রোর এই খানগুলির পরিকল্পনা সামান্য ভিন্ন রকমের। যদিও এখানকার রনগুলি নীচের ভূমি এলাকার তুলনায় অনেক বেশী উঁচু এবং রাস্তার দিকে মুখ করা অংশে একতলার উপরে প্রতি তলাতেই জানালা রহিয়াছে। এই মামলূক বিকালাসমূহ সিরিয়ারগুলিরই ন্যায়, ব্যবসায়ের প্রকৃতি এবং বসবাসকারী সওদাগরগণের জাতীয়তা অনুযায়ী সংগঠিত হইত। 'উছমানী শাসন প্রতিষ্ঠার পরেও এইগুলির সামান্যই পরিবর্তন হইয়াছে, বর্তমানে বিদ্যমান অধিকাংশ খান ১০ম/১৬শ-১২শ/১৮ শতকে নির্মিত হইয়াছিল।

আল-গূরী একটি কায়সারিয়্যাও নির্মাণ করিয়াছিলেন [৫৩-৪, ৫৬] (নির্মাণ তারিখ জানা যায় না), বর্তমানে উহা খানু'ল-খালীলী নামে পরিচিত; বস্তুত উহা ছিল ৮ম/১৪শ শতকের একটি খান (দ্র. 'আলী পাশা মুবারাক, ৫খ, পৃ. ৯০, ৩০১)। অনেকেই অনুমান করেন যে, আল-গূরী এই খানটির শুধু সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নামে পূর্ণাঙ্গ ভিত্তিপ্রস্তর থাকাতে (দ্র. von Berchem, CIA, ৫৯৬, নং ৪০৬) আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, উহা একটি নূতন ইমারতই ছিল।

'উছমানী আমল ঃ 'উছমানী বিজয়ের ফলে কায়রোর স্থাপত্য কীর্তিসমূহের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, এইরূপ একটা ভিত্তিহীন ধারণার মূলে রহিয়াছে সেইগুলির বিষয়ে অজ্ঞতা বা ভাসা ভাসা জ্ঞান। যেই ঐতিহ্য বুরজী মামলূকগণের আমলে বিবর্তনের ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছিল 'উছমানী আমলে তাহা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অনুসৃত হয় এবং দামিশ্‌কের বিপরীত 'উছমানী রাজধানীর স্থাপত্যরীতি ঐতিহ্য ধারায় বিচ্ছিন্নভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে খাদিম সুলায়মান পাশার আমলে (৯৩১/১৫২৪-৯৪১/১৫৩৪)। সর্বপ্রথমে ধার্যকৃত খাজনা, ইরসালিয়্যা খাজিনেসি (দ্র. ইরশালিয়্যা) হইতে 'উছমানী ওয়ালীগণের এত কম অর্থাগম হইত যে, তাহা দ্বারা কোনও দালান কোঠা নির্মাণ আদৌ সম্ভব হইত না এবং তাঁহাদের অধিকাংশই বরং বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ রাখিয়া মিসর ত্যাগ করিতেন। ১১শ/১৭শ ও ১২শ/১৮শ শতকের শেষভাগে মামলূক বে-গণ যখন ইস্তাম্বুলে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন তখনই বড় বড় স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণ শুরু হয়, যেমন বুলাক মুসতাফা শুরবাগী (Corbadji) মীর্যার মসজিদ ও তৎসংলগ্ন ভবনসমূহ [৩৪৩], ১১১০/১৬৯৮*, আল-আযহারের ব্যাপক সংস্কার কার্য, ১১৬৭/১৭৫৩ এবং মুহাম্মাদ বে আবূ যাহাব-এর মসজিদ, হাওদ (পানির আধার) ও সাবিল [৬২-৯৮], ১১৮৭/১৭৭৪*। তবে এই পরিবর্তনগুলি সবই যে শুধু অর্থনৈতিক চাপের কারণে হইয়াছিল তাহা নহে। সাধারণত মিসরে স্বল্পকালের জন্য নিযুক্ত 'উছমানী গভর্নরগণ সচরাচর ইস্তাম্বুলেই বিশাল সব মাযারের কুল্লিয়্যা (কুল্লিয়েঃ) ভবনসমূহ নির্মাণ করা পসন্দ করিতেন, সেইখানে শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ভবন নির্মাণের জন্য তখনও বিনামূল্যে বা সুলভে জমি পাওয়া যাইত। পারতপক্ষে তাহাদের মধ্যে কেহ মিসরে মৃত্যু হউক এইরূপ চাহিতেন না। মামলূকগণের প্রবণতার ন্যায় তাঁহারা একাধিক মাযার-সৌধ নির্মাণ করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না (শেষ যে মামলূক কায়রোতে এইরূপ দুইটি মাযার-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন কানসূহ আবূ সা'ঈদ [৩৬০, ১৬৪] (উভয়টিরই নির্মাণকাল ৯০৪/১৪৯৯*) এবং তদুপরি এইখানে আসামাত্রই তাঁহাদের এই ধারণা সৃষ্টি হইত যে, কায়রো ইতিমধ্যেই প্রায় পরিপূর্ণভাবে নির্মিত হইয়া গিয়াছে, আর জমি পাওয়া দুষ্কর বা অত্যধিক ব্যয়সাধ্য। তাই তাঁহারা বিশালাকার ইমারত নির্মাণ করিতে নিরুৎসাহিত হইতেন। যাহা হউক, প্রথম দিকের দুইজন গভর্নর তাঁহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন এবং তাঁহারা ইস্তাম্বুলে ইমারত না গড়িয়া মিসরেই সৌধ নির্মাণ করেন। খাদিম সুলায়মান পাশা (ওয়ালী ৯৩১/১৫২৪-৯৪১/১৫৩৪) 'উছমানী পরিকল্পনা কিন্তু মামলূক শিল্পকুশলতা অনুযায়ী কিল্লাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন [১৪২], ৯৩৫/১৫২৮* [প্রস্তর লিপির পাঠ উদ্ধারক্রমে]। উহার পিছনে অতি অদ্ভুতভাবে পরিকল্পিত একটি তাক্কা (তাকিয়্যা) রহিয়াছে; ইসকান্দার

পাশা (গভর্নর ৯৬৩/১৫৫৬-৯৬৬/১৫৫৯) বাবু'ল-খালূক (খারক)-এ একটি মসজিদ, তাকিয়্যা ও সাবীল নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সেইগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত জন ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি। তিনি সরকারী দায়িত্ব পরিত্যাগ করিবার পরেও মিসরে ইমারত নির্মাণ অব্যাহত রাখেন। তিনি বূলাক-এ একটি বিকালা [৫৩৯], ৯৪৮/১৫৪১ এবং আস-সুলায়মানিয়্যাতে একটি তাকিয়্যা (নগর প্রাচীরের ভিতরে) নির্মাণ করেন [২২৫], ৯৫০/১৫৪৩-৪* (যদিও ভিত্তি প্রস্তরে ইহাকে মাদ্রাসা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে)।

সাবীলসমূহ ঃ কায়রোর 'উছমানী আমলের ও মামলূক আমলের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যকার পার্থক্য সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশী বুঝা যায়—সাবীলগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে। সেইগুলির মধ্যে অদ্যাবধি টিকিয়া থাকা প্রাচীনতম নিদর্শন আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর নামে পরিচিত সাবীল (৫৬১), ইহা কালা'উন নির্মিত ইমারতের বারান্দাতে অবস্থিত। পানির আধারটি (হাওদ) বর্তমানে চিহ্নিত করা যায় না এবং কায়রোর সাবীলের পরবর্তীকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ, একটি পাথর খোদাই করা সালসাবীল বা শাযিরওয়ান, যাহা বাহিয়া পানি প্রবাহিত হইয়া নীচে একটি আধারে জমা হইত এবং পিতলের খোলা কাঠামো (grille), যাহার মধ্য হইতে একটি পাত্রের সাহায্যে পানি তোলা যাইত, সেইগুলির অস্তিত্ব আর নাই। নির্মাণ তারিখ বিতর্কিত ঃ খিতাতে, ২খ, পৃ. ৯৭ (Creswell উহাই অনুসরণ করিয়াছেন, MAE, ২খ, পৃ. ২৭৪-৫) উল্লিখিত আছে ৭২৬/১৩২৬, কিন্তু পরবর্তীকালে যে আবার সংস্কার করা হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে, আর সেই সময়ে উহার উপরে সম্ভবত একটি কুত্তাব (কুরআন শিক্ষা দানের পাঠশালা) নির্মিত হইয়াছিল। শায়খু-এর নির্মিত একটি স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান বাহ্রী সাবীল [১৪৪], ৭৫৫/১৩৫৪* মনে হয় যেন কুত্তাববিহীনভাবেই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাথমিক বুরজী আমলের মধ্যে এই যুগ্ম ইমারত—সাধারণত সম্মুখভাগের এক কোণে নির্মাণ করা হইত যাহাতে দুই বা তিন দিক হইতেই সেখানে প্রবেশ করা যাইত—বৃহত্তর ইমারতসমূহের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, যেমন শায়খুর খানকাহের সম্মুখভাগ [১৫২] নির্মিত হয় মূল ভবন নির্মাণের (৭৫৬/১৩৫৫*) পরে এবং মরুভূমিতে নির্মিত ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর খানকাহের সম্মুখভাগের উভয় প্রান্তে [১৪৯], ৮০৩/১৪০০-৮১৩/১৪১১*। তবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক-সংযোগস্থলে স্থান পাওয়া গেলে, বুরজী আমলের শেষদিকে, সাবীল কুত্তাব স্বতন্ত্র ভবনরূপেও নির্মিত হইত, যেমন কা'ইত বায়-এর সাবীল কুত্তাব [৩২৪], ৮৮৪/১৪৮০ উহাতে অতি সুদৃশ্য মর্মর পাথরের বহিরাবরণ এবং পিছনে অনেকগুলি ছোট কক্ষ রহিয়াছে।

'উছমানী আমলে যত রকম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয় তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী নির্মিত হয় এই সাবীল কুত্তাব। নিঃসন্দেহে ইহার মূলে আছে অর্থনৈতিক কারণ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এইগুলি একক ইমারতরূপে নির্মাণ করা হয়—এমনকি পুরাতন কোনও ভবনের স্থলে নির্মাণ করা হইলেও সেই এককভাবেই উহাকে নির্মাণ করা হইত। খুসরাও (দ্র.) (Husrev) পাশার সাবীল কুত্তাব [৫২], ৯৪২/১৫৩৫* এই রীতির এবং সাধারণ 'উছমানী রীতি-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ৯৪০/১৫৩৪ হইতে ৯৪২/১৫৩৬ পর্যন্ত মিসরের গভর্নর ছিলেন। তিনি দিয়ার বাক্র (৯২৫-৩৫/১৫১৯-২৯), সারাজেভোতে [প্রকৃতপক্ষে ইহা কুল্লিয়ে (দ্র. Mayer, Architects ..., পৃ. ৫০) ৯৩৮/১৫৩২] এবং ভানে (৯৭৫/১৫৬৭) মসজিদ নির্মাণ করেন আলেপ্পোতে একটি মসজিদ এবং যুগ্ম মাদ্রাসা-খুসরাবিয়্যা (৯৫৩/১৫৪৬-৭) এবং ইস্তাম্বুলে একটি তুরবা নির্মাণ করেন—শেষোক্ত তিনটিরই স্থপতি ছিলেন তুরস্কের বিশ্ববিখ্যাত সিনান—ভানে একটি চন্দ্রাতপ শোভিত মাযার (৯৮৯/১৫৮১) এবং ভান-বিতালিস সড়কের পার্শ্বে একটি খানও তিনি নির্মাণ করেন। কায়রোতে 'উছমানী গভর্নরগণ এতকাল যে অবহেলা করিয়াছিলেন সেইখানেই ইঁহার স্থাপত্যগত কীর্তিসমূহ গৌরবময় নিদর্শনরূপে বিরাজিত। এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, দুইবার মিসরের গভর্নর সিনান পাশা, যিনি সিরিয়া ও ইস্তাম্বুলে অসংখ্য ইমারত নির্মাণের কৃতিত্বের অধিকারী, যদিও কায়রোতে তাঁহার একমাত্র কীর্তি হইতেছে বূলাকের মসজিদ [৩৪৯], ৯৭৯/১৫৭১*। যদি নিতান্ত অর্থাভাবই খুসরাও পাশার অজুহাত হইয়া থাকে (না হইবারই কথা), তথাপি 'উছমানী শাসনামলব্যাপী কায়রোতে সাবীল কুত্তাব নির্মাণ একের পরে এক চলিতেই থাকে। সবচেয়ে বিখ্যাত সাবীল কুত্তাবের নির্মাতা ছিলেন 'আবদু'র-রাহমান কাতখুদা [২১], ১১৫৭/১৭৪৪* একটি সুদৃশ্য মিশ্র মামলূক ধরনের ইমারত, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ কেন্দ্রে নির্মিত হওয়া হেতু ইহাতে অবস্থানের সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়। তবে স্থাপত্যের দিক দিয়াও ইহা আদৌ বৈশিষ্ট্যহীন নহে; ১১শ-১২শ/১৭শ-১৮শ শতকের ইস্তাম্বুলের চেশমে (কূপ)-গুলিকে মোটেই অনুকরণ করা হয় নাই আর ইস্তাম্বুলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধনুকের আকৃতির বাঁকানো কাঠের নির্মিত, প্রলম্বিত সম্মুখভাগ যুক্ত সাবীল (সিবয়ান মেকতেবলেরী নামে পরিচিত) ১৯শ শতকের আগে কায়রোতে অনুকৃত হয় নাই (উদাহরণ, সুলায়মান আগা সিলাহদার-এর মসজিদ [৩৮২], ১২৫৫/১৮৩৯)।

কিল্লাসমূহ ঃ 'উছমানী আমলের কিল্লার রক্ষাব্যবস্থা কখনই প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ক্রুসেড যুগের রোমান্টিক স্থাপত্যকীর্তির পুনরুদ্ধার কাজ বাবু'ল-'আযাব [৫৫৫], ১১৬৮/১৭৫৪, মুহাম্মাদ 'আলী কিল্লাটি দখল করিয়া পরে সংস্কার করান এবং সেখানে টাঁকশাল [৬০৬], ১২২৭/১৮১২, দুইটি প্রাসাদ জাওহারা ও হারীম [৫০৫, ৬১২], ১২২৯/১৮১৪ ও ১২৪৩/১৮২৭, মুহাফিজখানে [৬০৫], ১২৪৪/১৮২৮ এবং সবশেষে মুহাম্মাদ 'আলীর মসজিদ [৫০৩], ১২৬৫/১৮৪৮ নির্মাণ করেন।

এই মসজিদটির পরিকল্পনা করা হয় ইস্তাম্বুলের ইয়ানী জামি'-এর অনুসরণে, যদিও এই বিষয়ে প্রায়শই ভিন্নতর মত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিল্লা শহরটি তখন সঠিক অর্থে আর দুর্গ রহিল না এবং মুকাততাম পাহাড়ে নির্মিত মুহাম্মাদ 'আলীর পূর্বেকার নির্মিত একটি কিল্লা [৪৫৫], ১২২৫/১৮১০ ও একটি সুড়ংগ দ্বারা এই কিল্লার সঙ্গে যুক্ত করা হয়, কিন্তু উহা এমনই উন্মুক্ত যে, কোনও কালেই তাহা শোভা বর্ধন ব্যতীত অন্য কোনও কাজে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আল-কাহিরার নগর-প্রাকারের ভিতরে বিভিন্ন মহল্লার অনেক তোরণ (হারাত) রহিয়াছে, যেইগুলি 'উছমানী আমলের। মামলূক আমল হইতেই এইরূপ তোরণের অস্তিত্ব ছিল, যদিও ঠিক সেই আমলের বলিয়া এখন পর্যন্ত কোনটিকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নাই।

মসজিদসমূহ ঃ 'উছমানী আমলে কায়রো শহরের প্রধান ধর্মীয় ইমারত ছিল মসজিদ, মাদরাসা নহে; তথাপি বর্তমানে একটিমাত্র রাজকীয়

ইমারত পাওয়া যায়, মালিকা সাফিয়া-এর মসজিদ [২০০], ১০১৯/১৬১০। ইহাকে ভুলক্রমে রাজকীয় স্থাপত্য বলা হয়, কেননা ইহার স্থাপয়িতা দারু'স-সা'আদাত আগাসী 'উছমান আগা ক্রীতদাস অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই। আর সেই কারণেই স্থাপত্য-ভিত্তিটিকে তাঁহার মনিব মালিকা সাফিয়ার নামে অভিহিত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। ইহার মূল নির্মাণ কাজ ও অলংকরণের অধিকাংশই কায়রোর প্রভাবিত হইলেও মসজিদের পরিকল্পনা কায়রোর যে কোনও 'উছমানী ভবন অপেক্ষা ইস্তাম্বুলের নগর জামি' মসজিদের সঙ্গেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহার চতুর্দিক দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল; উহার একটি তোরণ [৩৩০], ১০১৯/১৬১০* অদ্যাবধি রহিয়াছে। ইহা একটি উচ্চ ভিত্তির উপরে স্থাপিত, কোনও দোকান করা হয় নাই; একটি খোলা চত্বর ঘেরা, চতুর্দিকের থামযুক্ত খিলান একটি ছয়কোণাবিশিষ্ট কক্ষে গিয়া মিশিয়াছে। কক্ষের উপরে রহিয়াছে একটি গম্বুজ। পরিকল্পনার দিক হইতে ইহা এদিরনে-এর শারীফ 'আলী মসজিদের অনুরূপ।

আকারের দিক হইতে পরবর্তী মসজিদ হইতেছে বূলাকের সিনান পাশার মসজিদ [৩৪৯], ৯৭৯/১৫৭১*; পরবর্তীকালে ইহার অনুকরণে মুহাম্মাদ বে আবু যাহাব-এর মসজিদ [৯৮], ১১৮৭/১৭৭৪* নির্মিত হয়। গম্বুজের ব্যবহার যাহা আল-কুব্বাতু'ল-ফিদাইয়্যার অনুরূপ [৫], ৮৮৪-৬/১৪৭৯-৮১*, কিন্তু ইস্তাম্বুলে বিবর্তিত যেই ধরনের গম্বুজ সেইরূপ নহে। উভয় মসজিদের নমুনারূপে প্রথম দৃষ্টিতে বিশেষ আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হয়—যদিও হাসান 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব (তারীখু'ল-মাসাজিদ, ১খ, পৃ. ৬৭১) এইরূপ আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন যে, ১১/১৭শ শতকের শেষভাগের মধ্যে অন্তত এই মামলূক সৌধটি কায়রোর পর্যটকগণের নিকটে অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এই উভয় মসজিদেই ১০ম/১৬শ-১১শ/১৭শ শতকের অন্যান্য মসজিদের ন্যায় কতগুলি নূতন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়, যেগুলি ইস্তাম্বুলের 'উছমানী স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্যময় মিহরাব সমেত এক পার্শ্বে বর্ধিত অংশ যেইখানে বিলম্বে জামা'আতে আসা মুসল্লীগণ দাঁড়াইতে পারেন এবং ভিতরে প্রবেশ দরজার উপরে একটি ব্যালকনি (সব সময়ে ঠিক বুঝা যায় না যে, উহা রাজপরিবারের সদস্যগণের জন্য অথবা মহিলাদের জন্য ছিল) এবং মাটিতে গভীর করিয়া নির্মিত মসজিদে আড়াআড়িভাবে প্রবেশ করিবার একটি পথ, যাহা সম্ভবত ইস্তাম্বুল রীতির একটি সুসামঞ্জস্য গৃহীত রূপ। এই পথ দিয়া রাস্তা হইতে সরাসরি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু কায়রোর রীতি হইল সাহ্ন বা মীদাতের মধ্য দিয়া প্রবেশ করা। মসজিদের প্রবেশমুখের উপরের ব্যালকনি বা ঝুলানো প্রকোষ্ঠ কায়রোর স্থাপত্যরীতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় কিল্লার ভিতরে আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর মসজিদে। সেই সময়ে সম্ভবত কার্যত উহা ছিল শাহী পরিবারের সদস্যদের সালাতের স্থান; মহিলাগণের জন্য একটি আলাদা সালাতের স্থান নির্মাণের পর হইতে এইরূপ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আসলাম আল-বাহা'ঈ মসজিদে [১১২], ৭৪৫-৬/ ১৩৪৪-৫* প্রথম হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। মসজিদের ভিতর দিয়া আড়াআড়ি মাটিতে গভীর করিয়া পথ নির্মাণ বিভিন্ন বুরজী সৌধেই লক্ষ্য করা যায়, যেমন মরুভূমিতে নির্মিত আল-আশরাফ বারস্‌বায়-এর খানকাহতে নির্মিত মসজিদ [১২১], ৮৩৫/১৪৩২। এই ধরনের 'উছমানী সংযোজন ছিল প্রধানত ধর্মীয় সংস্কারগত, ঠিক স্থাপত্য নহে।

এই সাধারণ বিষয়টি কায়রোর অন্যান্য 'উছমানী মসজিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেমন মাহমূদিয়্যা মসজিদ [১৩৫], ৯৭৫/১৫৬৮ নির্মাণ রীতির দিক হইতে ইহা বুরজী মামলূক ভবন, কিন্তু বিপরীত দিকের সুলতান হাসান মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। দাঊদ পাশার মসজিদে [৪৭২], ৯৫৫/১৫৪৮ এই মিশ্রণ ঘটিয়াছে, ৯ম/১৫শ শতকের ধরনের অসম আকারের মুসাল্লার সঙ্গে যাহার প্রবেশদ্বারটি অনেকটা কা'আ আকৃতির যাহাতে অশোভনভাবে একটি সিঁড়িঘর যোগ করা হইয়াছে এবং রিবাতু'ল-আছার [৩২০], (১০৭৩/১৬৬২-১২২৪/১৮০৯), যাহা একটি বহুল সংস্কারকৃত ভবন, বর্তমানে রাজকীয় প্রাসাদ সংলগ্ন মসজিদ, উহার সংশ্লিষ্ট কুব্বা রহিয়াছে, যাহা কোনও সমাধি নহে, বরং এখানে মহানবী (স)-এর পদচিহ্নসম্বলিত দুইটি প্রস্তর আছে বলিয়া মনে করা হয় এবং উহা এখন আছারু'ন-নাবাবিয়্যা জ্ঞানে বিশেষ শ্রদ্ধাভরে দেখা হয় (দ্র. কাদাম শারীফ) (ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর ও কানসূহ আল-গূরীর নামে পূর্বে যে সংস্কার কাজ করা হইয়াছিল সেইজন্য দ্র. Wiet, Inscriptions historiques sur Pierre, পৃ. ৭৯-৮০, নং ১০৭, ১২৯)। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মসজিদ নির্মাণের একটি সাধারণ প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়; কখনও মসজিদের কেন্দ্রস্থলে মুসতাফা শুরবাগী (Corbadji) মীর্যার মসজিদের অনুরূপ একটি বড় ঝাড়বাতি দেওয়া হইত [৩৪৩], ১০১০/১৬৯৮। ফলে খোলা সাহ্নযুক্ত ইমারতের পরিবর্তন ঘটে এবং খোলা সাহ্নযুক্ত মসজিদের সর্বশেষ উদাহরণ হইতেছে আল-ফাকাহানীর মসজিদ [১০৯], ১১৪৮/১৭৩৬; কিন্তু ইহাও আবার বুরজী উন্নয়ন ধারারই ধারাবাহিকতা মাত্র। মামলূক পরিকল্পনার ও ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রীর প্রচলন যে সাধারণভাবে হইতেই থাকে তবে তাহা অত্যন্ত দৃশ্যমান এবং অদ্যাবধি বিদ্যমান ভবনসমূহকে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কোনও কোনও 'উছমানী ভবনে ও সৌধে, যেখানে দ্যুতিময় মর্মর পাথরের ব্যবহার প্রয়োজনীয় ছিল, সেইখানে নিম্নমানের টালির কাজ করা হইয়াছে এবং সেই কাজ স্থানীয় কারিগরগণের দ্বারা সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব ছিল (আল-বুরদায়নীর মসজিদ [২০১, ১০২৫/১৬১৬-১০৩৮/১৬২৯)।

মাদরাসা ও তাকিয়্যা ঃ 'উছমানী আমলের কায়রোতে নির্মিত মসজিদ প্রায় নাই বলিলেই চলে। তাকিয়া সুলায়মানিয়্যা [২২৫], ৯৫০/১৫৪৩-৪ এবং উহার প্রায় অনুরূপভাবে পরিকল্পিত সুলতান মাহমূদ-এর তাকিয়্যা ও সাবীল এই দুইটি সম্বন্ধে ভিত্তিপ্রস্তরে লিখিত আছে যে, এইগুলি মাদরাসা। কিন্তু এতদ্ব্যতীত জানা মাদরাসা আর খুব কমই থাকার কথা। এই প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য কায়রোতে 'উছমানী আমলের প্রস্তর লিপিসমূহের পূর্ণাঙ্গ জরীপ করা প্রয়োজন। এই উভয় ভবনই ইস্তাম্বুলের একটি মাদরাসার পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত, উঁচু চত্বর, চতুর্দিকে খিলান শোভিত, তন্মধ্যে কক্ষসমূহ ও একটি বর্ধিত চূড়াকৃতির ঈওয়ান (দারসখানা)। তবে ইস্তাম্বুলের অনুরূপ এইগুলিতে এমন কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাতে দারসখানা আবার মসজিদরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এইগুলি যদি তাকিয়া হইয়া থাকে তবে কোন্‌টি যে কোন্ তরীকার জন্য ছিল তাহা আর এখন জানা যায় না। 'উছমানী আমলের খানকাহ-এর ভিত্তি অপেক্ষা এখানকার পরিস্থিতি কিঞ্চিত ভাল। হাসান সাদাকার (সুনকুর সা'দী) মাযার-সৌধ ও মাদরাসা সংলগ্ন মাওলাবিয়্যা তারীকার একটি তাকিয়্যা রহিয়াছে [২৬৩], ৭১৫/১৩১৫*-৭২১/১৩২১*; উহার উপর তলায় ১২শ/১৮শ শতকের শেষভাগে নির্মিত একটি কাঠের সামা'খানা

রহিয়াছে এবং রিফা'ইয়্যাগণের একটি তাকিয়া রহিয়াছে [৪৪২], ১১৮৮/১৭৭৪। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান 'উছমানী আমলের তৃতীয় একটি তাকিয়্যা হইতেছে একটি বেকতাসী খানকাহ্। উহা মুকাততাম পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ১০ম/১৬শ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত এই ভবনটি বেশ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দীর্ঘদিন হইতেই উহা সম্পূর্ণ দুর্গম রহিয়াছে এবং কখনই ইহা জরীপ করা হয় নাই।

বাণিজ্যি স্থাপত্য ইত্যাদি ঃ ইতঃপূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, কায়রোর বাণিজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য শিল্প মামলূক আমল হইতে 'উছমানী আমল পর্যন্ত খুব সামান্যই পরিবর্তিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে প্রায় সকল প্রধান পরিবর্তন ঘটিয়াছে মুহাম্মাদ 'আলীর শাসনকাল হইতে। তবে এই বিষয়ে ও ১৯শ শতাব্দীর শহরের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ এখনও রচিত হয় নাই।

সংস্কার কার্য ঃ আল-কাহিরার স্থাপত্যশিল্পের যে কোনও বিবরণই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি সৌধগুলির প্রধান প্রধান সংস্কারকার্য সম্বন্ধে কিছু বলা না হয়। বর্তমানে যেই সকল সৌধ ও ভবন বিদ্যমান আছে সেইগুলির প্রায় সবই আরব স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ কমিটি (Comite de conservation des monuments de l'art arabe) কর্তৃক বিগত নব্বই বৎসর সময় কালের মধ্যে ব্যাপকভাবে সংস্কার সাধিত হইয়াছে। পূর্বেকার সংস্কার কার্যগুলি কোনভাবেই যথাযথভাবে প্রস্তরলিপিতে লিখিয়া রাখা হয় নাই বা সাহিত্যিক তথ্য-সূত্রেও সেইগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হয় নাই (উদাহরণস্বরূপ কা'ইত বায় কর্তৃক সুলতান হাসানের মাযার-সৌধের এবং ইমাম আশ-শাফি'ঈ-এর মাযার-সৌধের সংস্কার কার্যের কথা বলা যাইতে পারে)। কায়রো শহরের ইসলামী স্থাপত্য শিল্পসমূহ যে তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার কারণ সৌধগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট আয়ের ওয়াক্ফ সম্পত্তি নির্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যেই ক্ষেত্রে এইরূপ করা হয় নাই, অন্তত মামলূক আমলে হয় নাই, তাহা হইলে সৌধ বা ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ দ্বারা সাধারণত নূতন ভবন নির্মাণ করিয়া নির্মাতার নাম অমর করিয়া রাখার চেষ্টা করা হইত, অন্যের ভবন বা সৌধ মেরামতের চেষ্টা কমই হইত। আল-কাহিরার প্রধান প্রধান স্থাপত্য শিল্পের সংস্কার কার্যের প্রস্তরলিপি যে দুর্লভ তাহার কারণ একমাত্র এইভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে, জরাজীর্ণ কোনও ভবনকে সংস্কার দ্বারা পুনর্নির্মাণ করা অপেক্ষা উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার প্রবণতাই বেশী দেখা যায়।

অতএব প্রধান প্রধান যে সকল সংস্কার কার্য সাধিত হয় তাহা বিশেষ বিবেচনায় করা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। ফাতিমী আমলে যে 'আমর ইব্ন তূলূন ও আল-আযহার মসজিদের সংস্কার করা হইয়াছিল তাহার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাহা ছাড়া দাওয়াতের কাজ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলারও প্রয়োজন ছিল। মামলূক ও 'উছমানী আমলের কিল্লা, পানি প্রণালী এবং কায়রো এলাকার প্রধান প্রধান পুলের সংস্কার কাজের কারণ সহজেই বুঝা যায় যে, তাহার লক্ষ্য ছিল জনগণের বা রাজকীয় প্রয়োজন সাধন। বাহরী ও বুরজী সুলতানগণ যে আল-আযহারের সংস্কার বা পরিবর্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া একের পর এক প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ৮ম/১৪শ-৯ম/১৫শ শতকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার গুরুত্বই প্রমাণ করে। লাজীন কর্তৃক ইব্ন তূলূন মসজিদের সংস্কার, ৯৬৯/১২৯৬-৭ a, যাহা সমগ্র আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বিবেচনার দাবী রাখে— দুইটি মিহরাব, চত্বরের মাঝখানে একটি গম্বুজযুক্ত ফোয়ারা, একটি সূর্যঘড়ি, বস্তুত মিনারটির পুনর্নির্মাণই এবং তদুপরি অবশ্যই অনুল্লেখিত বিভিন্ন গঠনগত মেরামত—এইগুলি সবই করা হইয়াছিল একটি প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য। এই প্রতিজ্ঞা পূরণের বিষয় লিখিত আছে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের মাত্র এক পক্ষকাল পরে নির্মিত (৬৯৬/১২৯৬) একটি মিম্বরের নির্মাণ তারিখের মধ্যে। ৭০২/১৩০৩ সারের ভূমিকম্পে সৌধ ও ভবনসমূহের যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহার ফলে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। আল-হাকিম এর মসজিদ মেরামত করেন বায়বারস আল-জাশেনকীর, আস-সালিহ ও তালা'ঈ-এর মসজিদ [১১৬] মেরামত করেন বেকতিমোর আল-চুকানদার এবং 'আমর-এর মসজিদ মেরামত করেন আমীর সালার, যিনি সম্ভবত প্রধান দরজার সংলগ্ন বাহিরের দেওয়ালের মিহরাবটিও নির্মাণ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য মামলূক মেরামত কাজ কতকটা যেন যৌক্তিকতাহীন বলিয়াই মনে হয়; সুলতান হাসান কর্তৃক আল-হাকিম-এর মসজিদের পুনঃসংস্কার, ৭৬০/১৩৫৯ (খিতাত, ২খ, পৃ. ২৭৭), য়িলবুগা আস-সালিমী কর্তৃক আল-আকমার মসজিদ মেরামত [৩৩], ৭৯৯/১৩৯৭*, সুলতান জাকমাক-এর নামে দেওয়ালের ভিতরে বারকূক-এর মাদ্রাসার একটি মিম্বর মেরামত [১৮৭], মরুভূমিতে অবস্থিত ফারাজ ইব্ন বারকূক-এর খানকাহ-তে কা'ইত বায়-এর নামে একটি মিম্বর সংযোজন (৮৮৮/১৪৮৩) এবং বারসবায় কর্তৃক যু'ন-নূন আল-মিসরীর হাওশের জন্য একটি পুনঃ ওয়াকফনামার প্রস্তরলিপি (৮৩৮/১৪৩৫) (Wiet, CIA, 90, নং ৫৬৫)। সেইগুলির সংখ্যা যে কেন এত কম বা কেন এমন বিভিন্ন ধরনের তাহা আমাদের জানা নাই।

কোনও বিশেষ গুরুত্বহীন পুরাতন ভবন সম্বন্ধে সাধারণ অনীহার আলোকে বলা যায় যে, 'উছমানী মেরামত কাজের স্মারক প্রস্তরলিপির অপ্রতুলতা অনেক কম আলোচ্য বিষয়। কোনও কোনও মেরামত কাজ অবশ্যই বেমানান বলিয়া মনে হয় ঃ যেমন ইবরাহীম আগা মুসতাহ্ফিজান কর্তৃক আকসুনকুর-এর মসজিদ মেরামত (১০৬২/১৬৫১-২*) বা হাসান আগা কর্তৃক সুলতান হাসান-এর মসজিদ মেরামত (১০৮২/১৬৭১-২*)। শেষোক্তটির শুধুমাত্র সামনের চত্বরে অবস্থিত ফোয়ারাটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। অন্যান্য 'উছমানী মেরামত কাজের শিলালিপি হইতে ফাতিমী মাশহাদসমূহের বিষয়ে আগ্রহ পুনরায় জাগরূক হইবার বিষয়ই যেন মনে করাইয়া দেয়। মাশহাদু'ল-জুয়ূশী, যাহার সঙ্গে একটি তারিখবিহীন 'উছমানী তাকিয়্যা, সায়্যিদা নাফীসা, যাহা 'উছমানী বিজয়কালে 'আলী পাশা হেকিমোগলু কর্তৃক ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ সংযুক্ত রহিয়াছে; উল্লিখিত 'আলী পাশা পরে দুইবার মিসরের পাশা নিযুক্ত হন (১১৭০/১৭৫৭); ইমাম আল-লায়ছ (১২০১/১৭৮৬-৭) সীদী 'উকবার মাযার-সৌধ মেরামত করেন মুহাম্মাদ পাশা সিলাহদার। প্রথম পুনর্নির্মাণ ১০৬৬/১৬৫৫-৬ এবং বর্তমানে আস-সাদাতু'ল-ওয়াফা'ইয়্যা নামে পরিচিত [৪৬৩]; এবং ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন-এর মাযার সৌধ [৫৯৯], উহার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে (৫৪৯/১১৫৪) একটি ভিত্তিপ্রস্তর লিপির কতকটা ত্রুটিপূর্ণ 'উছমানী প্রতিলিপি যাহার সংস্কার করেন 'উছমান আগা মুসতাহ্ফিজান (১২২৫/১৮১০ দ্র. 'আলী পাশা মুবারাক, ৫খ, পৃ. ৪)।

পূর্বেকার দুইটি ফাতিমী ভবন সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মাণ করা হয়; আমীর আবূ মানসূর কুসতাহ, ৫৩৫/১১৪১ (সীদী সারিয়্যা) কর্তৃক কিল্লাতে নির্মিত একটি মসজিদ, যাহা খাদিম সুলায়মান পাশা মসজিদ নামে পুনঃপরিচিতি লাভ করিয়াছে [১৪২] (৯৩৫/১৫২৮) এবং আজ-জাফির ইব্‌ন নাসরুল্লাহর-এর মসজিদ (৫৪৩/১১৪৮) আহমাদ কাতখুদা মুস্‌তাহফিজান খারপূতলু কর্তৃক (১১৪৮/১৭৩৫) পুনর্নির্মিত এবং বর্তমানে আল-ফাকাহানীর মসজিদ নামে পরিচিত [১০৯], পুনর্নির্মাণকালে ফাতিমী মসজিদের কাঠের দরজাগুলি সংযোজন করা হয়।

আল-আযহারের 'উছমানী প্রস্তরলিপি (মেহরেন, ২খ, পৃ. ৫৯, গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) প্রধানত 'আবদু'র-রাহমান কাতখুদা কর্তৃক মসজিদটির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ধনের সঙ্গে অভিন্ন। আর যে একটি প্রস্তরলিপি জনকল্যাণমূলক কার্যরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল বিশাল এবং সুদীর্ঘ পানি প্রণালীর যাহা 'আবদী পাশা (১১৩৯/১৭২৭) সংস্কার করেন। সেইখানে সংস্কারের তারিখ দেওয়া আছে ১১৪০/১৭২৮ (Van Berchem, CIA, পৃ. ৫৯১)।

আল-কাহিরার স্থাপত্য কীর্তিসমূহের প্রায় সাত শত বৎসরকাল ব্যাপী কৃত সংস্কার কার্যের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রধানত মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত শিলালিপিসমূহের উপরে নির্ভর করিয়া লিখিত কোনও কোনও বিষয়ে ইহা প্রতীকী। আবার পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, ইহাতে আরও আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। ইহা খুবই সম্ভব যে, এইরূপ অনেক প্রস্তরলিপি রহিয়াছে যেইগুলি ভবনের নির্মাণকাল-সূচক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সংস্কারকার্যেরই লিপি। যাহা হউক, 'উছমানী আমলের সংস্কারকার্যের পরিমাণ বা সংখ্যা যদি কমও হয়, তথাপি তাহা আল-কাহিরার পূর্বতন আমলের মেরামতসমূহের তুলনায় আদৌ নগণ্য নহে। বিষয়টি সম্বন্ধে পরিসমাপ্তি টানিবার পূর্বে বলা যায় যে, অপরের নির্মিত স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আগ্রহান্বিত হওয়া কায়রোর বৈশিষ্ট্য নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত) ঃ আল-কাহিরার সৌধসমূহের গ্রন্থপঞ্জী এত বিক্ষিপ্ত যে, উৎস-গ্রন্থসমূহের পূর্ণাঙ্গ জরীপ করা সম্ভব হয় না। কায়রোর এমনকি ইসলামী স্থাপত্যের একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ করিতে গেলেও দেখা যায় যে, অনেক কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং বর্তমান সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে যে, সাধারণভাবে গৃহীত মতামতসমূহের ভিত্তি কতটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশনার হিসাব অনুযায়ী নহে, মোটামুটি পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক। সবচেয়ে সাম্প্রতিক কালে এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী হইতেছে (১) K. A. C. Creswell-এর A bibliography of the architecture, arts and crafts of Islam to 1st January, 1960 (American University in Cairo Press 1961), Supplement, to 1st January, 1970। ৭২৬/১৩২৬ সন পর্যন্ত আল-কাহিরার সৌধসমূহের সম্পূর্ণ কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যাইবে; (২) The Muslim Architecture of Egypt (সংক্ষেপে বলা হয় MAE), ১খ, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ., ২খ, অক্সফোর্ড ১৯৫৯ খৃ.। ৩৫৮/৯৬৯ পূর্বে নির্মিত সৌধসমূহের গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যাইবে— (৩) Early Muslim architecture, (EMA), ২খ, অক্সফোর্ড ১৯৪০ খৃ.; ইহাতে আল-কাহিরা নগর প্রতিষ্ঠার পর হইতে যত মেরামত কার্য ও সংযোজন হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে। কায়রোর সর্বাধুনিক সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিয়াছেন ঃ (৪) 'আবদুর-রাহমান যাকী, A bibiliography of the literature of Cairo, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ইহাতে আরবীতে লিখিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধসমূহ পাওয়া যাইবে, যদিও সাধারণভাবে উহা Creswell-এর উপরিউক্ত কোনও গ্রন্থকেই অতিক্রম করিতে পারে নাই।

প্রাপ্ত তথ্যাদিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) মানচিত্রসমূহ; (২) সেগুলির উপরে সরাসরি ভিত্তি করিয়া প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যাদি ও বিবরণীসমূহ, কিন্তু সৌধগুলির উপরে নহে; (৩) সৌধসমূহের বিস্তারিত প্রকাশনাসমূহ; (৪) প্রস্তর লিপিসমূহ; (৫) সাধারণ পঠন-পাঠন, তন্মধ্যে পুরাপুরি এই উদ্দেশ্যেই রচিত গ্রন্থ না-ও হইতে পারে, যেমন অংশত গাইড বই; (৬) গাইড বইসমূহ। বিবরণীর শেষে এই বিষয়ে রচনাধীন বইসমূহের কথা বলা হইবে।

(১) মানচিত্র ঃ ৩৫৮/৯৬৯—১২৭২/১৮৫৬ এই সমগ্র কালের জন্য দ্র. (৫) কায়রোর বিশেষ ১ ঃ ৫,০০০ স্কেল মানচিত্র, ২, শীট, (সার্ভে অব ঈজিপ্ট ১৯৫১ খৃ.), ইংরাজী ও আরবী সংস্করণ প্রকাশিত, প্রতি ভাষাতেই মুসলিম স্মৃতিসৌধসমূহের সংখ্যা অনুযায়ী। কালক্রম অনুযায়ী এবং বর্ণনাক্রম অনুযায়ী নির্দেশিকা দেওয়া আছে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উৎস এবং (৬) Max Herz Bey-কৃত কায়রোর স্মৃতিসৌধসমূহের পূর্বেকার মানচিত্র অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ (Egyptian Department of Antiquitis 1914)। ১৯৫০ খৃ. আগে শ্রেণীবহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত এবং ১৮৫৬ খৃ. পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধসমূহ ইহাতে দেখানো হয় নাই। এই কারণেই কায়রোর কোনও কোনও মহল্লা, যেগুলি বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে—যেমন রাওদা দ্বীপ— সেগুলিকে ভ্রান্তিজনকভাবে গুরুত্বহীন বলিয়া মনে হয় এবং মধ্যযুগ পরবর্তীকালে তাহাদের গঠন বিষয়ে আরও সঠিক ধারণা লাভের জন্য (৭) M. Jomard-এর Description de l'Egypte. Etatmoderne, 1809-22, ২খ, পৃ. ৫৭৯-৭৮৮-এর মানচিত্রসমূহ দেখা উচিত।

১৯৫১ খৃ. কৃত মানচিত্র এবং MAE, i-ii-তে সংযুক্ত মানচিত্রসমূহের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদির অনেক তফাত রহিয়াছে; বেশী পার্থক্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শেষোক্তখানি বেশী নির্ভরযোগ্য। Index আরবী ও ইংরাজী সংস্করণে একইরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, বানানের বা এমনকি শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও বিভেদ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া 'উছমানী আমলের জন্য যে মানচিত্র, তাহাতে মূল মানচিত্রে যেখানে সৌধের জন্য নম্বর দেওয়া হইয়াছে Index-এ সেই নম্বর দেখান হয় নাই। এই তুলনামূলক পাঠের এবং মার্জিত সংস্করণের মূল যে কাজ তাহা বর্তমানে কায়রোর American University-র একটি সেমিনারে গ্রহণ করা হইয়াছে, পরিচালনা করিতেছেন C. Kessler।

(২) প্রাথমিক তথ্যাদি ও বিবরণীসমূহ ঃ আন-নাসির ইব্‌ন কালা'উন-এর শাসনামলের জন্য দ্র. (৮) D. P. Little, An Introduction to Mamluk Historiography, Wiesbaden ১৯৭০ খৃ., ইহা প্রাপ্ত তথ্যাদির একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা। পরিতাপের বিষয় যে, আল-কাহিরার অন্য কোনও আমলের ইতিহাসের জন্য অনুরূপ কোনও প্রচেষ্টা গৃহীত হয় নাই। সকল প্রাথমিক তথ্যাদির জন্য ঃ (৯) আল-মাকরীযীর মাওয়া'ইজ (খিতাত), আল-

মু'আয়্যাদ শায়খ-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং প্রায়শই প্রাথমিক তথ্য-উৎসরূপে কাজে লাগে [সংস্করণ বূলাক ১২৭০/১৮৫৩, সম্পা. G. Wiet, MIFAO-তে, ৩০, ৩৩, ৪৬, ৪৯, ৫৩ (কায়রো ১৯২৭ খৃ.), ইহাতে বূলাক সংস্করণ ১খ, পৃ. ১-৩২ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে]; (১০) অনুবাদ U. Bouriant, MMAF-এ, ১৭, ১-২ খণ্ডাংশ (প্যারিস ১৮৯৫-১৯০০ খৃ.) বূলাক সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত, ১খ, পৃ. ১-২৫০; (১১) অনুবাদ P. Casanova, MIFAO, ৩খ, (কায়রো ১৯০৬ খৃ.), বূলাক সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত, ১খ, পৃ. ২৫১-৩৪৭)। ইহার সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে পাঠ করিতে হইবে ঃ (১২) আল-মাকরীযী, সুলূক, সম্পাদনা এম. যিয়াদা, ১-৩খ, কায়রো ১৯৩৪-৭০ খৃ.; (১৩) অনুবাদ E. Quatremere, Histoire des Sultans mamlouks, ১-২, প্যারিস ১৮৩৭-৪৪; অনুবাদ কার্য করিয়া যাইতে থাকেন ঃ (১৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান আস-সাখাবী, আত-তিব্‌র'ল-মাস্‌বূক ফী যায়লি'স-সুলূক, সম্পা. এ. যাকি বে, Revue d'Egypte, ২-৩খ, বূলাক, ১৮৯৬-৭ খৃ.; (১৫) E. Gaillardot (কায়রো ১৮৯৭ খৃ.); আরও দ্র.; (১৬) আস-সাখাবী, তুহফাতু'ল-আলবাব, ১খ, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.। প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য তথ্য-উৎসের মধ্যে রহিয়াছে (১৭) ইব্‌ন দুকমাক, কিতাবু'ল-ইনতিসার লি-ওয়াসিতাত 'ইকদি'ল-আমসার, বূলাক ১৩০৯/১৮৯১-২; (১৮) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, কায়রো (দ্র. আবু'ল-মাহাসিন); (১৯) ইবনু'য-যায়্যাত-এর কারাফার সহায়ক বই, আল-কাওয়াকিবু'স-সায়্যারা ফী তারতীবিয-যিয়ারা ফি'ল-কারাফাতায়ন আল-কুবরা ওয়া'স সুগরা, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭; (২০) এবং ইব্‌ন ইয়াস, বাদা'ই'উ'য-যুহূর, বূলাক ১৩১১-১৪/১৮৯৩-৭ [অন্যান্য সংস্করণের জন্য দ্র. ইব্‌ন ইয়াস], অনুবাদ করিয়াছেন ঃ (২১) G. Wiet, Histoire des Mamlouks Circassiens, IFAO, কায়রো ১৯৪৫ খৃ., ইহা ১৪৬৭-১৫০০ সাল পর্যন্ত সময়কালের; এবং (২২) Journal d'un bourgeois du Caire-রূপে, ১, প্যারিস ১৯৫৫-৬ খৃ., ইহা ১৫০০ হইতে ১৬০০ খৃ. পর্যন্ত সময়কালের, প্যারিস ১৯৬০ খৃ., ইহা ১৫১৬-২২ খৃ. সময়কালের।

'উছমানী আমলের জন্য প্রধান তথ্য-উৎস হইতেছে ঃ (২৩) 'আলী পাশা মুবারাক, আল-খিতাতু'ত-তাওফীকিয়্যা আল-জাদীদা কায়রো ১৩০৬/১৮৮৮-৯ (নূতন সংস্করণ, কায়রো ১৯৬৯ খৃ.); (২৪) আহমাদ দাররাজ L'Acte de waqf de Barsbay (Hudjdjat wakf al-Ashraf Barsbay), কায়রো ১৯৬৩ খৃ.; ব্যতীত এবং (২৫) L. A. Mayer-এর মূল্যবান পর্যবেক্ষণ, The buildings of Qaytbay as described in his endowment deed, খণ্ড ১ (সবগুলিই প্রকাশিত), লন্ডন ১৯৩৮ খৃ. ব্যতীত কায়রোর ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ে রক্ষিত মূল্যবান ওয়াকফিয়্যা সংগ্রহ সবই এখন পর্যন্ত অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে, উহাদের কোনও প্রকাশিত ক্যাটালগও নাই। কিছু সংখ্যক ওয়াকফিয়্যা হইতে অংশ-অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে আল-মাকরীযী, 'আলী পাশা মুবারাক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক, কিন্তু কায়রোর ওয়াকফিয়্যা বিষয়ক একমাত্র পঠন-পাঠন করিয়াছেন ঃ (২৬) 'আবদু'ল-লাতীফ ইব্‌রাহীম, আল-ওয়াছা'ইক ফী খিদমাতি'ল-আছার, আল-মু'তামারু'ছ-ছানী লি-'আছারি'ল-বিলাদি'ল-'আরাবিয়্যা গ্রন্থে, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (২৭) ঐ লেখক, সিলসিলাতু'ল-ওয়াছা'ইকু'ত-তা'রীখিয়্যা আল-কাওমিয়্যা, ১খ, ওয়াছীকাত আমীর আল-আখূর আল-কাবীর কারাকুজা আল-হাসানী, B. Fac. Ar., -তে, ১৮/২খ, (১৯৫৯ খৃ.), পৃ. ১৮৩-২৫১; (২৮) এ লেখক, আত-তাওছীকাতু'শ-শার'ইয়্যা ওয়া'ল-ইশহাদাত ফী যুহ্‌র ওয়াছীকাতি'ল-গূরী, B. Fac. Ar.-তে, ১৯/১খ, (১৯৬০ খৃ.), পৃ. ২৯৩-৪২০। এই দুইটি প্রবন্ধে যথাক্রমে ৮৪৬/১৪৪২-৩ এবং ৯১১/১৫০৫ (আওকাফ নং ৮৫৩) দলীল দেখানো হইয়াছে।

যে সমস্ত ভৌগোলিক বিবরণমূলক গ্রন্থ সাহিত্যিক তথ্যাদি-নির্ভর সেগুলির মধ্যে উল্লেখ করিতে হয় প্রথমেই (২৯) C. H. Becker, Cairo, E.I.[1]-এ, এবং (৩০) A. Breccia ও E. Kuhnel, Cairo, Encyclopedia Italiana-তে, ৮খ, পৃ. ২৮১-৭। এই ধরনের আরও বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে ঃ (৩১) A. R. Guest ও E. T. Richmond, Misr in the fifteenth century, JRAS-তে (১৯০৩ খৃ.), পৃ. ৭৯১-৮১৬; (৩২) G. Salmon, Etude sur la topographie du Caire, le Kal'at al-Kabsh et la Birkat al-Fil, MIFAO-তে, ৭খ, কায়রো ১৯০২ খৃ.; (৩৩) P. Ravaisse, Essai sur l'histoire et la topographie du Caire d'apres Maqrizi, MMAF-এ, ১/৩খ, ৩/৪খ, প্যারিস ১৮৮৭-৯০; (৩৪) P. Casanova, Histoire et description de la Citadelle du Caire, MMAF-এ, ৬খ, প্যারিস ১৮৯১-২। (৩৫) W. Popper-এর Systematic notes to Ibn Taghribirdi's Chronicles, i, The Cairo Nilometer, বার্কলে ১৯৫১ খৃ. এবং ii, Egypt and Syria under the Circassian Mamluks, লস এঞ্জেলস ১৯৫৭ খৃ., এইগুলিতে যথেষ্ট মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্যাদি রহিয়াছে। (৩৬) Massignon-এর La cite des morts au Caire (Qarafa Darb al-Ahmar), in BIFAO, ৫৭খ, (১৯৩৮ খৃ.), পৃ. ২৫-৭৯, একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অদ্যাবধি অপ্রকাশিত বহু তথ্য, অবশ্যই সব নহে, কায়রো শহরের প্রতি সমরূপ প্রযোজ্য, পাওয়া যাইবে এক সিরিজের অন্তর্গত অনুবাদের মধ্যে (প্রধান সম্পাদক, S. Sauneron), IFAO (Cairo) কর্তৃক প্রকাশিতব্য উক্ত গ্রন্থসমূহে থাকিবে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের চোখে মিসরের ভ্রমণ বিবরণী, সংগ্রহে গ্রন্থের নাম হইবে (৩৭) Collection des Voyageurs occidentaux en Egypte। নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশিত হইবে ঃ (৩৮) Pierre Belon (১৫৪৭ খৃ.); (৩৯) Jean Paleche (১৫৮১ খৃ.), Jean Coppin (১৬৩৮ খৃ.); (৪০) দুইখানি অজ্ঞাত ফ্লোরেন্সবাসী ও ভিলানোভীয় পর্যটকের বিবরণী (১৫৮৯-৯০) এবং Lichtenstein, Kiechel, Fernberger, Von Teufel, Lubenau ও Miloite-এর ভ্রমণ বিবরণী (১৫৮৭-৮ খৃ.)।

(৩) স্মৃতিসৌধ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রকাশনা ঃ ৭২৬/১৩২৬ পর্যন্ত স্মৃতিসৌধ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রকাশনার জন্য (৪১) K. A. C. Creswell-এর EMA, ২খ, এবং MAE, ১-২খ, হইতেছে মৌলিক গ্রন্থ; শেষোক্ত দুই খণ্ডে কায়রোর বিচ্ছিন্ন সৌধসমূহ বা স্থাপত্য রীতি বিষয়ে লেখকের পূর্বেকার প্রকাশনাও সংযোজিত হইয়াছে এবং পূর্বে তিনি যে সমস্ত সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার সাম্প্রতিক মতামতসমূহ রহিয়াছে। বর্তমানে টিকিয়া নাই এরূপ সৌধসমূহের

পরিকল্পনা ও বিবরণের জন্য দ্র. (৪২) M. Jomard, Description de l'Egypte, Etat moderne [উপরে (১) উল্লিখিত] কখনও কখনও কাজে লাগে। ৭২৬/১৩২৬-৯২৩/১৫১৭ সময়ের জন্য (৪৩) K. A. C. Creswell, A brief chronology of the Muhammadan monuments of Egypt to 1517, BIFAO-তে, ১৬খ (১৯১৯ খৃ.), পৃ. ৩৯-১৬৪, যে সকল সৌধের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলি বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। MAE, ১-২খ.-তে আলোচিত হয় নাই এইরূপ সৌধসমূহের বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ— কোন কোনটির নিতান্তই প্রাথমিক আলোচনা হইতেছে ঃ (৪৪) হাসান 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব, মসজিদ আসলাম আস-সিলাহ দার, আল-হানদাসাতে, ১৬খ, (১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ৪৬৯-৮০; (৪৫) ঐ লেখক, মাদ্‌রাসাত আবী বাক্‌র মুজহির, আল-হানদাসা-তে ১৫ (১৯৩৫ খৃ.), পৃ. ১৭-২৩; (৪৬) M. Herz Bey, La masquee du Sultan Hassan au Caire, কায়রো ১৮৯৯ খৃ.; (৪৭) ঐ লেখক, La masquee de l'emir Ganem al-Bahlaouan au Caire, কায়রো ১৯০৮ খৃ.; (৪৮) Franz Pasha, Die Grabmoschee des Sultans Kait-Bai bei Kairo (=Die Baukunst, i/3), বার্লিন/স্টুটগার্ট ১৮৯৭ খৃ.; (৪৯) R. L. Devonshire, Abu Bakr Muzhir et sa mosquee au Caire, in Melanges Maspero, ৩খ (MMAF, ৬৮), কায়রো ১৯৪০ খৃ., পৃ. ২৫-৩১; এবং (৫০) সালেহ লামেই মুসতাফা, Kloster und Mausoeum des Farag ibn Berquq in Kairo (=Abhandlungen des Deutschen Archaologischen Instituts Kairo, Islamische Reihe, ২খ, Gluckstadt ১৯৬৮ খৃ., দ্র. K. Brische-কৃত আলোচনা ; (৫১) Kunst des Orients, ৬/২খ, (১৯৭০ খৃ.), পৃ. ১৮২-৩, কায়রোর পূর্ব গোরস্তানের ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত একমাত্র বিস্তারিত আলোচনা। এগুলির সঙ্গে যোগ করা উচিত ঃ (৫২) M. Meinerke Das Mausoleum des Qala'un in Kairo. Untersuchungen zur Genese der mamlukischen Architekturdekoration, in Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts. Abteilung Kairo, ২৭/১ (১৯৭১ খৃ.), পৃ. ৪৭-৮০, মামলূক স্থাপত্য কারুকার্যের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের ইহাই প্রথম সার্বিক উদ্যোগ। (৫৩) কামালু'দ-দীন সামিহ্‌কৃত অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস (পরিকল্পনা ভাল, কিন্তু পাঠ দুর্বল) যাহা ১৮শ শতকের পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাতা 'আবদু'র-রাহমান কাতখুদার কীর্তিসমূহের উপরে রচিত (ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি, ১ম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.); এবং (৫৪) A Raymond, Les constructions de 'Abd al-Rahman Katkhuda au Caire, in Melanges Islamologiques de l'IFAO, ১০, ১৯৭৩ খৃ., ব্যতীত ৯২৩/১৫১৭ পরবর্তী আমল সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা এখনও হয় নাই, কায়রোর স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা মাত্র হইয়াছে [নিম্নে (৫) দ্র.]। সেই আমলের জন্য এবং অন্যান্য আমলেরও জন্য দ্র. (৫৫) Comptes rendus du Comite des monuments de l'art arabe (কায়রো ১৮৮২ খৃ. পর হইতে; অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থ, ১৯৫৪-৬১ খৃ. পর্যন্ত সময়কাল আলোচিত হইয়াছে। কায়রো ১৯৬৩ খৃ. [১৯৫৬ খৃ. লিখিত বিবরণী আরবীতে বিধায়]; (৫৬) ১৯১৪ খৃ. পর্যন্ত কালের নির্ঘন্ট, সম্পাদনা M. Herz Beg, কায়রো ১৯১৫ খৃ.; (৫৭) ১৮৮২-১৯৪০ খৃ. পর্যন্ত খণ্ড অনুসারে বিষয়বস্তুর যে তালিকা K. A. C. Creswell-এর গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হইয়াছে (উপরে উল্লিখিত), কলাম ৮৯-৯৬, তাহা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস। ১৯শ শতক হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী সময়ের জন্য (৫৮) E. Pauty-কৃত L'architecture du Caire depuis la conquete ottomane [নিম্নে (৫) দ্র.] ব্যতীত আর মাত্র দুইটিই যথেষ্ট প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ রহিয়াছে; (৫৯) 'আবদু'র-রাহমান যাকী, মাবানিয়ু'ল-কিল্'আ ফী 'আস্‌র মুহাম্মাদ 'আলী পাশা, আল-'ইমারা-তে প্রকাশিত, ৩/৩-৪খ (১৯৪১ খৃ.), ৮৯-৯৮; এবং (৬০) J. Fleming, Cairo Baroque, Architectural Review-তে প্রকাশিত, ৯৭খ (১৯৪৫ খৃ.), পৃ. ৭৫-৮২।

মধ্য যুগের আল-কাহিরার অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশিল্পের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্য সাম্প্রতিক কালে ক্ষুদ্র আকারে হইয়াছে এবং সে সকল বিবরণীর অধিকাংশই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ঃ (৬১) G. T. Scanlon-এর তৈয়ারী আল-ফুসতাতে পাঁচ মওসুম ব্যাপী অনুসন্ধান কার্যের প্রাথমিক রিপোর্ট, Journal of the American Research centre in Egypt (১৯৬১ খৃ. হইতে), বেশ যথেষ্ট সংশোধনীর জন্য সেগুলি (৬২) A. Bahgat ও A. Gabriel-এর Fouilles d'al-Foustat, প্যারিস ১৯২১ খৃ. এবং (৬৩) A. Gabriel-এর Les fouilles d'al-Foustat et les origines de la maison arabe en Egypte, প্যারিস ১৯২১ খৃ. গ্রন্থ দুইটির অসমাপ্ত অংশ পূর্ণ করিয়াছে। মধ্যযুগীয় কায়রোর পুনর্নির্মাণের কাজ চলাকালে সংরক্ষণমূলক খননকার্য কদাচিত করা হইয়াছিল, সেই দুঃখজনক ঘটনাটির কারণে আল-ফুসতাতের তূলূনী-ফাতিমী-আয়্যূবী অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য শিল্প এবং আল-কাহিরার নগর প্রাকারের অভ্যন্তরে মামলূক স্থাপত্যের মধ্যকার যে অদ্ভুত আপাত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তাহা অদ্যাবধি অব্যাখ্যাত রহিয়া গিয়াছে, যদিও আশা করা যায় যে, R. Mantran ও পরলোকগত A. Lezine-এর প্রকাশিতব্য (৬৪) Etude scientifique des Palais et maisons du Caire et de Rosette (xvi^{e} xviii^{e} siecles) এই সাধারণ নামে প্রকাশিত গ্রন্থ সমস্যাটির উপরে আলোকপাত করিবে। (৬৫) E. Pauty-এর Les Palais et les maisons d'epoque musulmane au Caire, MIFAO,৬২ (কায়রো ১৯৩২ খৃ.) এবং (৬৬) Les hammams du caire, MIFAO, ৬৪ (কায়রো ১৯৩৩ খৃ.) খুবই সাধারণ পর্যালোচনা প্রামাণিক তথ্যাদি কম, কয়েকটিমাত্র পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে এবং কায়রোর অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাও সামান্যই দেওয়া হইয়াছে।

ইসলামী আমলে কায়রোর কিবতী (Coptie) স্থাপত্যশিল্পের জন্য দ্র. (৬৭) A. J. Butler, Ancient Coptic churches of Egypt, i-ii, অক্সফোর্ড ১৮৮৪; Butler কর্তৃক সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয় অক্সফোর্ড হইতে ১৯৭০ খৃ., ইহার পরিপূরকরূপে পাঠ করিতে হইবে (৬৮) M. Simaika Pasha, A brief guide

to the coptic Museum and to the Principal ancient coptic churches of Cairo, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.। অন্যান্য অমুসলিম সংখ্যালঘুর স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে— সেই সকল কীর্তিই খৃ. ১৮শ শতকের বা তাহার পরের— প্রকাশিত কোনও গ্রন্থই না বলিয়া মনে হয়।

(৪) শিলালিপিসমূহ ঃ কায়রোর সৌধসমূহের শিলালিপিগুলি সৌধের ইতিহাস সন্ধানের অতি মূল্যবান উৎস। এইগুলির বিষয়ে আলোচনাকালে এই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, বিশেষ করিয়া বুরজী (দ্র.) মামলূক আমলের ভিত্তিপ্রস্তর লিপি দ্বারা হয়তো এক স্থানে নির্মিত সৌধাবলীর মধ্যে মাত্র একটির ইতিহাস পাওয়া যাইবে, সবগুলির নহে। এই রীতির কারণেই অংশত কায়রোর ১ ঃ ৫,০০০ স্কেলে অঙ্কিত বিশেষ মানচিত্রের (উপরে (১) দ্র.) আরবী ও ইংরাজী নির্দেশিকাতে ভুল বর্ণনা বা অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে। অদ্যাবধি অসম্পূর্ণ একটি গৌণ সঙ্কলন; (৬৯) RCEA এখনও (৭০) M. Van Berchem-এর Materiaux Pour un Corpus Inscriptionum Arabecatum (CIA) Premiere Partie, Egypte, i, প্যারিস ১৯০৩ খৃ.-কে অতিক্রম করিতে পারে নাই; এইখানির ২য় খণ্ড (G. Wiet কর্তৃক গৃহীত) MMAF, lii, কায়রো ১৯২৯-৩০ খৃ.। এই দুই খণ্ডে 'উছমানী আমলের শুধু নির্বাচিত কিছু প্রস্তরলিপি স্থান পাইয়াছে। CIA, ১ম ও ২য় খণ্ড; (৭১) Van Berchem-এর Notes d'archeologie arabe, JA-তে 8e serie, ১৭ (১৮৯১ খৃ.), পৃ. ৪১১-৯৫ (১৮৯১ খৃ.), পৃ. ৪৬-৮৬; ১৯ (১৮৯২ খৃ.), পৃ. ৩৭৭-৪০৭-কে অতিক্রম করিতে পারে নাই। CIA বর্তমানে; (৭২) G. Wiet, Inscriptions historiques sur pierre (catalogue general du Musee de l'Art Islamique du Caire) কায়রো ১৯৭১ খৃ. প্রকাশের সঙ্গে সম্পূর্ণ হইয়া থাকিব। (৭৩) Catalogue general du Musee Arabe du caire-এর কোনও কোনও খণ্ডও প্রয়োজনীয়, বিশেষ করিয়া কায়রোর সকল আমলের সৌধের স্থাপত্যগত কারুকার্যে কঠোর অতি দৃষ্টি আকর্ষক ব্যবহার বৈচিত্র্যের জন্য; (৭৪) J. David-Weill, Bois a epigraphes, i, Jusqu'a l'epoque mamlouke, কায়রো ১৯৩১ খৃ., i, ii, Depuis l'epoque mamlouke, কায়রো ১৯৩৬ খৃ. (৭৫) E. Pauty, Bois sculptes d'eglises coptes (epoque fatimide), কায়রো ১৯৩০ খৃ. এবং (৭৬) ঐ লেখক, Les bois sculptes Jusqu'a l'epoque ayyoubide, কায়রো ১৯৩১ খৃ.। কায়রো ইসলামী যাদুঘরে রক্ষিত মাযারলিপি বিষয়ক যে (৭৭) Catalogue general রহিয়াছে (Steles funeraires, i-ix, কায়রো ১৯৩২ খৃ. হইতে পরবর্তীকালীন) যে ক্যাটালগ রচনাতে হাসান আল-হাওওয়ারী, হুসায়ন রাশীদ ও G. Wiet সকলেই সহায়তা করিয়াছেন, উহার খুব বেশী মূল্য নাই; আংশিক কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাযার-লিপিগুলি খুব অসংলগ্ন বা অস্পষ্ট তথ্য-উৎস এবং অংশত এই কারণে যে, কায়রোর রীতি হইতেছে পূর্বেকার কোনও পাথরের ইমারতকে পরবর্তী কালের তারিখযুক্ত কোনও মাযার-সৌধরূপে নির্মাণ করা; (৭৮) C. Prost-এর Les revetements ceramiques dans les monuments musulmans de l'Egypte, i (সবগুলিই প্রকাশিত), MIFAO-তে, ৪০খ, (কায়রো ১৯১৬ খৃ.) হইতেছে এই অদ্ভুত সমস্যাটি সমাধানের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা, লিপি বিষয়ক এবং প্রযুক্তিগত উভয়ই যে সমস্যা মামলূক এবং 'উছমানিয়া স্থাপত্যসমূহে চীনামাটির আস্তরের বিকল্প ব্যবহারের কারণে সৃষ্টি হয়। (৭৯) হাসান 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব তাঁহার তাওকী'আতু'স-সুন্না' 'আলা আছার মিসর, in BIE, ৩৬খ (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ৫৩৩-৫৮-তে কায়রোর প্রস্তর লিপিসমূহের কারিগরগণের— সাধারণত নিম্নপদস্থ কারিগর বা ওস্তাগরের এবং মূল স্থপতির নহে—খোদিত নামসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইসলামী স্থাপত্য শিল্পে সেগুলির সবিশেষ দুর্লভতা বিষয়ে মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন (৮০) Mayer তাঁহার Architects গ্রন্থের জন্য প্রধানত এইখানির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন; (৮১) Mayer-এর Saracenic heraldry, অক্সফোর্ড ১৯৩৩ খৃ. গ্রন্থে কায়রোর স্থাপত্যে মামলূক blason-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ঃ তালিকা বর্তমানে আর সম্পূর্ণ অবস্থায় নাই, কিন্তু তথাপি উহা আল-কাহিরার প্রস্তর লিপিসামগ্রীর মৌলিক সংযোজক।

মামলূক নাম ব্যবহার হইতে যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সেই বিষয়ে একটি প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন ঃ (৮২) J. Sauva get তাঁহার Noms et surnoms des Mamelouks গ্রন্থে, in JA, ২৩৮ (১৯৫৩ খৃ.)-এ প্রকাশিত, পৃ. ৩১-৫৮। তুর্কী নামের বিষয়ে ইহার পরিপূরক গ্রন্থ (৮৩) P. Pelliot, Notes sur l'histoire de la Horde d'Or, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., এবং (৮৪) L. Rasonyi, Sur quelques categories de noms de personnes en turc গ্রন্থে, Acta linguistica Academiqe Scientiarum Hungaricae-তে প্রকাশিত, ৩খ, (বুডাপেস্ট ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩২৩-৫১ যদিও তুর্কী উদ্ভূত অনেক মামলূক নাম সমস্যাপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যের আলোক পাওয়া যাইতে পারে ঃ (৮৫) G. Doerfer, Turkische und mongolische Elements im Neupersischen, ১-৩খ, হইতে, Wiesbaden ১৯৬৩ খৃ., ১৯৬৫ খৃ., ১৯৬৭ খৃ., ইহার বরং অধিকতর এই কারণে যে Sauvaget ঘোষিত (সেই প্রবন্ধ দ্র.) L. Hambis ও G. Dumezil কর্তৃক মঙ্গোল ও ককেশীয় মামলূক নামের পঠন-পাঠন বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

(৫) সাধারণ গ্রন্থাদি ঃ (৮৬) C. H. Becker কৃত E.I.[1]-এ লিখিত এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কায়রোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যতীত কায়রোর স্থাপত্যকীর্তি বিষয়ক আর কোন তথ্যসমৃদ্ধ সাধারণ গ্রন্থ নাই। এই পর্যন্ত যেগুলি লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে (৮৭) 'আবদুল-ওয়াহ্হাব-এর তারীখু'ল-মাসাজিদি'ল-আছারিয়্যা আল্লাতী সাল্লা ফীহা ফারীদাতু'ল-জুমু'আ হাদরাত সাহিবু'ল-জালালা আল-মালিকু'স-সালিহ ফারূকু'ল-আওওয়াল (১-২খ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.) গ্রন্থখানিতে, নাম হইতেই যেমন বুঝা যায়, বাছাই করা বিষয়সমূহ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক, শিলালিপি বিষয়ক এবং স্থাপত্য সম্বন্ধীয় তথ্যাবলীতে অতি সমৃদ্ধ; (৮৮) L. Hautecoer ও G. Wiet, Les moesquees du Caire (প্যারিস ১৯৩২ খৃ.) পাঠের ভল্যুম প্লেটের অ্যালবামসহ এইখানিতে সৌধগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইবার অসময়োপযোগী একটা চেষ্টা করা হইয়াছে,

দ্রুততার সঙ্গে এবং কিছুটা সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়া সংকলন করা হইয়াছে। ফলে সহানুভূতির উদ্রেক সামান্যই হইয়াছে (দ্র. R. A. C. Creswell-কৃত সমালোচনা, JRAS-এ প্রকাশিত, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৯৯-২০৩)। যাহা হউক, উহাদের অনেক সাধারণীকরণ অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হইলেও বিশেষিত জ্ঞান বা টেকনোলজি সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায়, বিশেষ করিয়া মর্মর পাথরের জোড়া কাজের প্রতি মামলূকগণের রুচিবোধের বিষয়ে একেবারে সঠিকভাবে প্রামাণিক না হইলেও মূল্যবান তথ্যাদি রহিয়াছে। ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় হইতে প্রকাশিত বহু চিত্রশোভিত গ্রন্থে (৮৯) The mosque of Egypt from 641 to 1946, i-ii, যীজা ১৯৪৯ খৃ., একটি ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, কিন্তু উহা ছোট বিধায় ইহাতে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না; (৯০) আহ্মাদ ফিকরীর গ্রন্থ মাসাজিদু'ল-কাহিরা ওয়া মাদারিসুহা, ১ ও ২খ, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., বস্তুত ফাতিমী ও আয়্যূবী আমল নিয়া রচিত। (৯১) D'Brandenburg-এর Islamische Baukunst in Egypten, বার্লিন ১৯৬৬ খৃ. গ্রন্থের নাম প্রধানত কায়রোর সৌধসমূহ নিয়া আলোচিত দেখাইলেও বিশেষ বিশেষ সৌধ নির্বাচনের বিষয়ে কতকটা পক্ষপাত ছিল এবং MAE, i, ii-এর উপরে খুব বেশী নির্ভর করিয়াছে, ফলে ৭২৬/১৩২৬ সালের পরের আমলের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এবং Hautecoeur ও Wiet-এর গ্রন্থের উপরেও নির্ভর করিয়াছে যাহা সমালোচনামূলক পাঠের জন্য সব সময়ে গ্রহণযোগ্য হয় না। কায়রোর সৌধসমূহের উপরে রচিত অতি সাম্প্রতিক কালের সাধারণ গ্রন্থ ঃ (৯২) 'আবদু'র-রাহমান যাকী রচিত মাওসূ'আতে মাদীনাতু'ল-কাহিরা ফী আলফ-'আম, কায়রো ১৯৬৯ খৃ., যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ বিশেষ করিয়া ১৮শ-১৯শ শতকের কায়রোর স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য, যাহা অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেইখানি খুবই ক্ষুদ্রাকারের বিধায় পূর্ণাঙ্গ নহে এবং পূর্বেকার সৌধসমূহের আলোচনা খুবই সীমিত। বাস্তবিক ইহা কায়রোর সৌধসমূহের উপরে সাম্প্রতিক কালে রচিত গ্রন্থাবলীর অপ্রতুলতা বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য যে, এখন পর্যন্ত ৭২৬/১৩২৬ পরের আমলের জন্য দুইখানি শ্রেষ্ঠতম সাধারণ গ্রন্থ হইতেছে ঃ (৯৩) এ. এফ. মেহরেন, Cahirah og Kerafat i, Gravmonumenter Paa Kerafat eller de Dodes Stad undenfor Cahirah; ii, Religieuse Monumenter i Cahirah, কোপেনহ্যাগেন ১৮৬৯-৭০ খৃ., যাহাতে অন্যত্র অপ্রকাশিত সৌধসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং (৯৪) M.S. Briggs, Muhammedan archtecture in Egypt and Palestine, অক্সফোর্ড ১৯২৪ খৃ.।

সাধারণভাবে ইসলামী মিসরের ইতিহাস বা প্রত্নসম্পদ বিষয়ে সাম্প্রতিক যেমন সংগ্রহ লেখা হইয়াছে সেগুলিতে সরাসরি কায়রোর স্থাপত্যশিল্প বিষয়ক কিছু তথ্য রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া (৯৫) Melanges Maspero, iii,-MMAF, ৬৭ (কায়রো ১৯৪০ খৃ.), এবং (৯৬) Studies in Islamic art and architecture in honour of Professor K. A. C. Cresswell, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত যে, অতি সাম্প্রতিক কালে কায়রো সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে যেমন (৯৭) Annales Islamologiques, viii, Volume commemoratif du Millenaire du Caire 969-1969, IFAO, কায়রো ১৯৬৯ খৃ., এবং (৯৮) Colloque international sur l'histoire du Caire, Ministry of Culture of the ARE, বার্লিন ১৯৭৩ খৃ., সেই সব সাম্প্রতিক গবেষণাতে [এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইতেছেন (৯৯) M. Clerget, Le Caire, Etude de geographie urbaine et d'histoire geographique, i-ii, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., এইখানি কেহ পাঠ করিলে এখনও উপকৃত হইবেন] জোর দেওয়া হইয়াছে কায়রোর নগরায়নের সমস্যার উপরে এবং মধ্যযুগীয় শহরের স্থাপত্য কতটা সাফল্যের সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিল তাহার উপরে। এই ধরনের সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক রচনা হইতেছে ১৮শ-২০শ শতকের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ লেখা ঃ (১০০) জে. আবূ লুগোদ-এর Cairo, One thousand and one years of the City Victorious, প্রিন্সটন ১৯৭২ খৃ., সৌধসমূহের বিষয়ে ভারসাম্যহীন প্রকাশনার আলোকে এইরূপ আলোচনার মূল বিষয়বস্তু পরিবর্তন অসময়োপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমরা আশা করিতে পারি যে, ইহার ফলে মূল স্থাপত্যগত সমস্যা সম্বন্ধে হয়তো নূতন করিয়া আগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে।

আল-কাহিরার সৌধসমূহ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বর্ণনাত্মক তথ্যবহুল গাইড বইয়ের মধ্যে (১০১) D. Russell রচিত Mediaval Cairo (লন্ডন ১৯৬২ খৃ.) সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত এবং মোটামুটিভাবে ইহার কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে (শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কালানুযায়ী বা সামঞ্জস্যপূর্ণ মহল্লা অনুযায়ী নহে, পর্যটকগণের দর্শনীয় গুরুত্ব অনুযায়ী)। যেমন, স্থানে স্থানে অসঙ্গতি বা অযথার্থতা, পরিকল্পনার অভাব এবং সম্ভবত ফাতিমী আমলের সৌধসমূহের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন। একই ধরনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ (কায়রোর অধিকতর সীমিত এলাকা নিয়া রচিত) হইতেছে (১০২) মাহমূদ আকূকুশ, তা'রীখ ওয়া-ওয়াসফু'ল-জামি' আত-তূলূনী, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৭; (১০৩) R. L. Devonshire, Rambles in Cairo[2], কায়রো ১৯৩১ খৃ.; (১০৪) E. Pauty, La masquee d'Ibn Touloun et ses alentours, কায়রো ১৯৩৬ খৃ.; (১০৫) মাহমূদ আহমাদ, Concise guide to the Principal Arabic monuments in Cairo, (বূলাক ১৯৩৯ খৃ.) এবং (১০৬) হাসান 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব, জামি' আস-সুলতান হাসান ওয়া-মা হাওলাহু (কায়রো ১৯৬২ খৃ.)।

কায়রোর উছমানী স্থাপত্যের অধিকাংশের জন্য এই সাধারণ গ্রন্থগুলিই একমাত্র তথ্যের উৎস, যদিও সেইগুলির পরিপূরক হইতে পারে ঃ (১০৭) E. Pauty রচিত L'architecture au Caire depuis la Conquete ottomane, Vue d'ensemble, BIFAO-তে, ৩৬খ (১৯৩৬ খৃ.), পৃ. ১-৬৯, ইহা একটি সাধারণ আলোচনা গ্রন্থ। নামটি বাহ্যত আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইলেও রাজধানীর 'উছমানী স্থাপত্যের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের অভাবহেতু এবং কায়রোর মাত্র স্বল্প সংখ্যক সৌধ সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া এই সাধারণ ধারণা প্রচলিত হইয়াছে (যদিও সেই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত) যে, কায়রোর স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে 'উছমানী আমল ছিল ক্ষয়িষ্ণুতার এবং কর্মতৎপরতা-হীনতার যুগ। পরবর্তী কালের গবেষণা এই ভুল সংশোধন করিবে। দ্র. (১০৮) A. Raymond, Artisans et

Commercants au Caire au XVIII[eme] siecle, ২ খণ্ড, দামিশ্‌ক ১৯৭০ খৃ., এবং (১০৯) G. Wiet, Cairo, city of art and Commerce, নর্মান, ওকলাহোমা ১৯৬৪ খৃ.।

(৬) গাইড বইসমূহ ঃ (১১০) Guide Bleu-এর পাঠ কায়রোর মধ্যযুগীয় সৌধসমূহের বিষয়ে রচিত এবং প্রথম সংস্করণের পর হইতে (M. Baud কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৫০ খৃ. প্যারিস হইতে প্রকাশিত) অপরিবর্তিত, উহা সুবিখ্যাত ইসলামী সৌধসমূহ ব্যতীত অন্যগুলির বিষয়ে কমই কাজে আসে। (১১১) Murray's Handbook for travellers in Egypt (বহু সংস্করণ হইয়াছে ঃ আমি ১০ম সংস্করণের উল্লেখ করিব, সম্পাদনা M. Brodrick, লন্ডন ১৯০০ খৃ.) বহুলাংশে S. Lane-Poole এবং ১৯শ শতকের শেষভাগের অন্যান্য লেখকের রচনার উপরে নির্ভরশীল এবং ইহার সাহিত্যে পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ এবং কম বিভ্রান্তিকর, আর ১৮শ-১৯শ শতকের যে সকল সৌধ বর্তমানে আর টিকিয়া নাই সেইগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট তৃথ্য-সমৃদ্ধ। (১১২) K. Baedeker, Handbuch fur Reisende, Agypten und der Sudan, ৮ম সংস্করণ, ১৯২৮ খৃ., K. A. C. Creswell লিখিত সৌধসমূহের উপরে লিখিত ভূমিকাসম্বলিত, বিশেষ করিয়া কায়রোর বহির্ভাগে অবস্থিত সৌধসমূহের বর্ণনার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, সেইসবের মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ ১ ঃ ৫,০০০ স্কেলে অঙ্কিত কায়রোর মানচিত্রে দেখানো হয় নাই, তদুপরি সৌধসমূহে পৌঁছিবার পথও নির্দেশ করা হইয়াছে।

বর্তমানে যে সকল গ্রন্থ রচনার কাজ চলিতেছে ঃ উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য (১১৩) G. T. Scanlon কর্তৃক গৃহীত আল-ফুসতাতে' খননকার্যের উপরে চূড়ান্ত রিপোর্ট (Final Report) এবং (১১৪) R. Mantran ও পরলোকগত A. Lezine কর্তৃক কায়রোর ভবন ও প্রাসাদসমূহ সম্বন্ধে প্রকাশনা। এতদ্ব্যতীত প্রকাশিতব্য প্রধান প্রধান গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে (১১৫) C. Kessler কর্তৃক কায়রোর ফাতিমী এবং মামলূক আমলের মাযার-সৌধসমূহের স্থাপত্য শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ, যাহা Abhandlungen des Deutschen Archaologischen Instituts Kairo, Islamische Reihe-এর এক খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইবে, ইহাতে ১৪শ শতকের মামলূক সৌধ-ভিত্তিসমূহের উপরে লায়লা 'আলী ইবরাহীম-এর প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এই সকল লেখক-লেখিকার লেখা এবং সেই সঙ্গে M. Meinecke, শাহীরা মিহরিয, জে. রাগিব এবং M. Keane—ইঁহাদের লেখা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়; তখন আল-কাহিরার সৌধসমূহ এবং উহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞানও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

J. M. Rogers (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

আধুনিক শহর

সাধারণ বর্ণনা ঃ আধুনিক কায়রো রূপ লাভ করে মুহাম্মাদ 'আলী পাশার শাসন আমলে (১৮০৫-৪৯)। তাঁহার সময়েই নূতনতর প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রথম সূচনা হয়, যদিও বা তাহা সাধারণ আকারের। একবার আধুনিকায়ন শুরু হইলে তাহার গতি আর রোধ করা যায় না। নগর পরিকল্পনা, সংবাদ পত্র এবং মিসরীয় জাতীয়তাবোধের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, খেদিব ইসমা'ঈল (দ্র.)-এর শাসন আমলে (১৮৬৩-৭৯ খৃ.) যুগসন্ধিক্ষণ ছিল। এই আমলেই কায়রো আধুনিক শহরের আকার লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের ফলে (১৮৬১-৫) তূলা উৎপাদন হ্রাস পাইলে মিসর সহজেই বহির্বিশ্বে তূলার বাজার লাভ করে এবং ফলে বিপুল অর্থাগম হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ১৮৬৯ খৃ. নভেম্বর মাসে সুয়েজ খাল উদ্বোধন করা হইলে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি মিসরের উপর পতিত হয়; এই অঞ্চলটির উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাকে, এমনকি বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ ও মীমাংসিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই কারণেই খেদিবগণের কৃত ঋণকে উপলক্ষস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রথম বিদেশী হস্তক্ষেপ শুরু হয় এবং কালক্রমে এই কারণেই ইংরাজগণ মিসর দখল করিয়া নেয় (১৮৮২ খৃ.)।

এই সকল ঘটনা চলিতে থাকাকালীনই শহর গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং জনকল্যাণমূলক কার্যাদি, যথা ঃ গ্যাস সরবরাহ, পানি সরবরাহ এবং ট্রামলাইন স্থাপন করা হয়। বিদেশিগণ ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে লোকেরা আসিয়া এইখানে বসতি স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে মিসর একেবারে নিশ্চিতভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ১৯১৮ খৃ. যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ঠিক পরেই কায়রোতে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহার ফলে মিসরীয় জাতীয়তাবাদ সত্যিকারের জনপ্রিয় আন্দোলনে রূপ লাভ করে এবং ওয়াফদ পার্টির মধ্যে দিয়া তাহার বাস্তব প্রকাশ ঘটে। তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিকেই স্বাধীনতা অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং স্বাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ের গুরুত্বকে সামান্যমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯২০ খৃ.-এ ব্যাংক অব ইজিপ্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তাহা করা হয় জাতীয় পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে। বাদশাহ ফু'আদ-এর নেতৃত্বে (১৯২২ খৃ.) স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৯২৫ খৃ.-এ কায়রো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্বোধন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং (১৯৮৮ সালে উপন্যাসে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) নাজীব (নাগীব) মাহফূজ তাঁহার উপন্যাসসমূহে এই ঘটনাটিকে মিসরীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহের ইতিহাসে নবযুগের সূচনাকারী বলিয়া পেশ করেন।

একের পর এক বড় আধুনিক শহরের উপযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হয়। ফ্রি অফিসার্স রিভল্যুশনের (সামরিক অভ্যুত্থান) (২৩ জুলাই, ১৯৫২ খৃ.) ফলে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং পুরাতন শাসকশ্রেণীটি বহিষ্কৃত হয়। নূতন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সূচনা হয়; সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রাম উন্নয়ন, স্কুল প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের আবাসিক গৃহাদি নির্মাণ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কারখানা স্থাপন, রেডিওর উন্নয়ন ও প্রসার এবং নূতন মসজিদ স্থাপন ইত্যাদি। অক্টোবর ১৯৫৬ হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক অভিযানকালে দেশের সকল ইংরাজ ও ফরাসী সামরিক সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা হয়। সিরিয়ার সঙ্গে গঠিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র জোট তিন বৎসর পরে ভাঙ্গিয়া গেলে ১৯৬১ খৃ. হইতে দেশটি আরব সমাজতন্ত্রের পথ ধরে এবং তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম সমস্যা অর্থনৈতিক মুক্তির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সর্বশেষে ১৯৬৭ খৃ. ফিলিস্তীন যুদ্ধ শুরু হইলে মিসর রাজনৈতিক ও সামরিক— এই উভয় দিক দিয়াই ইহাতে গুরুতরভাবে জড়িইয়া পড়ে। ফলে কায়রোর উপরে যে বোঝা আসিয়া পড়ে তাহা হইয়া দাঁড়ায় অত্যন্ত ভারী।

বর্তমান কায়রো নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাণচঞ্চল রাজধানীগুলির অন্যতম। শহরটির দ্বিবিধ রূপ রহিয়াছে ঃ খাঁটি মিসরীয় রূপ এবং একই সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক রূপ; শেষোক্ত রূপটি শহরটির ভৌগোলিক অবস্থান হইতে উদ্ভূত।

খাঁটি মিসরীয় রূপটি প্রকটিত হইয়াছে জাতির অভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে, যে জাতি জনসংখ্যার চাপের ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আধুনিক চিকিৎসার সুফলহেতু উপরিউক্ত চাপ ও পরিবর্তন সাধনের কারণে বহু প্রাচীন রীতিনীতি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ের কর্তৃপক্ষ যে এক নূতন মিসর গঠনের চেষ্টা করিতেছেন তাহা এই জনসংখ্যা ঘটিত চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করিবারই উদ্দেশ্যে। শহরটি যে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করিয়াছে তাহা সাবেক আমলের ন্যায় বর্তমানেও আংশিকভাবে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আগত ছাত্র ও শিক্ষকগণের কারণে; আবার একের পর এক বিদেশী শাসকগণেরও কারণে (মামলূক, তুর্কী ও বৃটিশ)। বর্তমানে কায়রো মিসরীয়গণ কর্তৃক শাসিত হইতেছে বিধায় বৈদেশিক উপাদান— পর্যটন, বিশেষ ধরনের বৈদেশিক সাহায্য ও 'সহযোগিতা' এইগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

নগর পরিকল্পনা ঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিসর অভিযানকালে প্রণীত মানচিত্রে দেখা যায় যে, কায়রো শহর পশ্চিমে উযবেকিয়া দ্বারা সীমাবদ্ধ, শস্যক্ষেত্র ও মাঠ ইহার ও বূলাকের মধ্যে অবস্থিত। মহান নির্মাতা মুহাম্মাদ 'আলী নগরের সম্মুখভাগ সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন করেন এবং উযবেকিয়ায় পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিল্লার মধ্যে একটি রাজপ্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ (১৮৩০-১৮৪৮ খৃ. মধ্যে) এবং শুবরাতে একটি বড় রাজপ্রাসাদ ব্যতীত (১৮০৮ খৃ. পুনঃনির্মাণ ১৮২৩ খৃ.) অন্য ইমারত অল্পই নির্মাণ করেন। মাঠের মধ্য দিয়া তিনি একটি সড়ক নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে শেষোক্তটির সঙ্গে একটি সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় (বর্তমান নাম শারি' শুবরা)। শহরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়, যেমন একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় ১৮২৭ খৃ. আবূ যা'বালে স্থাপিত হয় এবং ১৮৩৭ খৃ. উহা শারি' কাসরু'ল-'আয়নীতে স্থানান্তরিত করা হয়। সিক্কা জাদীদা নির্মিত হয় ১৮৪৫ খৃ.-এ, ইহার উদ্দেশ্য ছিল আল-আযহার মহল্লার উপর হইতে চাপ কমানো। বূলাক (দ্র.)-এ ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করা হয়। M. Clerget লিখিয়াছেন, "এই অগ্রগতি সত্ত্বেও কায়রোর সীমানা, এলাকা ও সাধারণ চেহারা ১৮শ শতকে যেইরূপ ছিল ১৮৪০ খৃ. ঠিক সেইরূপই ছিল।" P. Marthelot পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় আরেকটি শহর জন্মলাভ করে। মুহাম্মাদ 'আলীর পৌত্র উগ্রপন্থী 'আব্বাস ১৮৪৯ খৃ. হইতে ১৮৫৪ খৃ. রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে স্বনামে আল-'আব্বাসিয়া জিলার নামকরণ করেন। পূর্বে উহা সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিগণের বাসস্থান সমবায়ে একটি ছোট শহরমাত্র ছিল।

সাঈদ রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে (১৮৫৪-৬৩) বাবু'ল-হাদীদ রেলপথ নির্মাণ করা হয় (১৮৫৬ খৃ.)। ফলে কায়রো শহরের সাথে রেলপথে আলেকজান্দ্রিয়ার সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খৃ. রেলসড়ক সুয়েয খাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ১৮৫৭ খৃ. হইতে ভারতবর্ষে সিপাহী বিপ্লব (প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম) দমনের জন্য প্রেরিত অতিরিক্ত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া হইতে সুয়েয পর্যন্ত মিসর অতিক্রম করে, পথের বাকী অংশ তাহারা পায়ে হাঁটিয়া যায়। সৈন্যঘাঁটি রাজপ্রতিনিধির (viceroy) প্রাসাদ কাসরু'ন-নীল ১৮৬৩ খৃ. নদীর তীরে নির্মিত হয়। ১৯৪৭ খৃ. বৃটিশ বাহিনী মিসর ত্যাগ করিলে এই ঘাঁটি ও প্রাসাদ উভয়ই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

রাজপ্রতিনিধি [পরে খেদীব = خديب] ইসমা'ঈল-এর শাসন আমলে (১৮৬৩-৭৯) 'আবিদীন শাহী প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়; ইহার নির্মাণ শুরু হয় ১৮৬৩ খৃ.-এ; শাসক সেখানে বাস করিতে থাকেন ১৮৭৪ খৃ. হইতে, শেষ পর্যন্ত তিনি কিল্লা পরিত্যাগ করেন; কারণ পূর্বে উহা তুর্কী পাশাগণের শাসনস্থান ছিল। নীল নদ হইতে খালিজ পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হয়, উহা বূলাক ও উযবেকিয়া পর্যন্ত গিয়া, অতঃপর বাবু'ল-হাদীদ পর্যন্ত এবং শেষে গামরা পর্যন্ত গিয়াছিল; ১৮৯৭ খৃ.-এর অল্প পরে উহা ভরাট করিয়া ফেলা হয়। কুব্বা প্রাসাদ নির্মাণের তারিখ ১৮৬৩ খৃ. হইতে। ১৮৬৭ খৃ. খেদীব ইসমা'ঈল Haussman-এর এই প্যারিস নগরী দেখেন। তিনিও নূতন মহল্লার পত্তন করেন ঃ ইসমা'ঈলিয়া জিলার রাস্তাসমূহ, উযবেকিয়া হইতে বূলাক পর্যন্ত সড়কের দক্ষিণের অংশ, তিনি যেইরূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন বর্তমান কালেও তদ্রূপ রহিয়াছে (দ্র. কায়রোর ১৮৭৩ খৃ. নগর পরিকল্পনা)। সুয়েয খাল উদ্বোধনের সময়ে (১৮৬৯ খৃ.) অনুষ্ঠানসমূহের জন্য যে অপেরা মিলনায়তন নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহা ছিল উযবেকিয়ার নিকটে, ১৯৭২ খৃ.-এ অগ্নিকাণ্ডে উহা ভস্মীভূত হইয়া যায়; জাযীরা দ্বীপে (আল-জাযীরা) খেদীবের প্রাসাদের সঙ্গে একটি ভবন সংযোজন করা হয়। পরে উহাঁকে 'উমার খায়্যাম হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়। জিযা (আল-জীযা) হইতে পিরামিডসমূহ পর্যন্ত সড়কটিকে দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী পরিশোভিত একটি অতি চমৎকার প্রশস্ত সড়কে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৭১ খৃ. নীল নদের উপরে একটি আধুনিক পুল নির্মিত হয় কাসরু'ন-নীল (বর্তমান নাম কূবরী'ত-তাহ্‌রীর, ১৯৩১ খৃ. পুলটি পুনঃনির্মিত হয়)।

নদীর অপর বাহুর উপরে আরও একটি পুল নির্মিত হয় (১৯১৪ খৃ. উহা পুনঃনির্মিত হয়)। ১৮৭২ খৃ. দুইটি বড় রাস্তা দুই পার্শ্বে আচ্ছাদিত দোকানপাট সমেত তৈয়ারী করা হয় ঃ একটি রাস্তা কালাত বে, ইহা স্টেশন হইতে উযবেকিয়া পর্যন্ত, অপরটি মুহাম্মাদ 'আলী সড়ক, ইহা আল-'আতাবা আল-খাদরা' হইতে কিল্লা পর্যন্ত গিয়াছে। আধুনিক যানবাহন চলাচলের প্রতিষ্ঠা শহরতলী এবং উহার বাহিরের এলাকার উন্নয়নে এক অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে। তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীয় জিলাসমূহ যেমন তাওফীকিয়া (খেদীব তাওফিক-এর নামানুসারে, ১৮৭৯-৯২ খৃ.) বা ফাগ্‌গালা (ফাজ্‌জালা) যাহা আনুমানিক ১৮৮০ খৃ.-র দিকে শুরু হয় বা আবাসিক এলাকাসমূহ, যেমন গার্ডেন সিটি আর-রাওদা (নির্মাণ তারিখ ১৯০৫ খৃ.), এইগুলিতে ট্রেন যোগাযোগ স্থাপন বা ট্রামলাইন স্থাপন না করিয়াই জনবসতিপূর্ণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু শহরতলী এলাকাতে যায়তূন ও মাতারিয়া উপশহর গড়িয়া উঠে Pont Lemoun (কুবরী লিমূন) হইতে মাতারিয়া এবং আল-মারজ পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের পরে (১৮৮৯-৯০ খৃ.)। এই একই কথা খাটে ১৮৯৬ খৃ. ট্রামলাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে আল-'আতাবা আল-খাদরা'র সঙ্গে ফাগ্‌গালা হইয়া 'আব্বাসিয়ার সংযোগ সাধনের ফলে (১৮৯৬ খৃ.) বা শুবরার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির ফলে (১৯০৩ খৃ.) [শুবরাতে প্রথম ব্যাপক আকারে উন্নয়ন সাধিত হয় ১৮৯৮ খৃ.]। খালীজ যে জনবসতিপূর্ণ হয় তাহা সম্ভবত ১৮৯৭ খৃ. কায়রো পরিকল্পনা অনুযায়ী হইয়াছিল; উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয় ১৮৯৯ খৃ.-এ

এবং দাহের (আজ-জাহির) হইতে সায়্যিদা যায়নাব পর্যন্ত ট্রামলাইন সম্প্রসারিত হয় ১৯০০ খৃ.-এ।

যামালিক উপশহর (আয-যামালিক, নামটি আসিয়াছে কতগুলি কুঁড়েঘর হইতে, এখানকার নিকটেই সেই কুঁড়েঘরে সৈন্যরা প্রহরারত থাকিত) জনবসতিপূর্ণ হইতে থাকে ১৯০৫-১০ খৃ. সালের দিকে। ১৯১০ খৃ.-এর একটি পরিকল্পনাতে বর্তমান সালের সড়কগুলি সবই দেখানো হইয়াছে। আবু'ল-'আলা' সড়ক যে দ্বীপের সঙ্গে বূলাকের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে উহার নির্মাণকাল ১৯১২ খৃ.। শহরের উত্তর-পূর্ব মরুভূমিতে হেলিওপোলিস (Heliopolis-মিসরু'ল-জাদীদা) গড়িয়া উঠে ১৯০৬ খৃ.-র পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯০৫ খৃ. বেলজিয়ামের একটি কোম্পানীকে উহা নির্মাণের চুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। 'মেট্রো' নামে একটি দ্রুতগামী ট্রামলাইন মিসরু'ল-জাদীদা-এর (হেলিওপোলিস) সঙ্গে কায়রোর সংযোগ স্থাপন করে [দ্র. উক্ত কোম্পানী কর্তৃক (১৯০৬ খৃ. হইতে সেই কোম্পানীটি জাতীয়করণ করা হইয়াছে) প্রকাশিত স্মরণিকা অ্যালবাম, দাহিয়াত মিসর আল-জাদীদা, মাদীহা ওয়া মুসতাকীবলুহা, ১৯৬৯ খৃ.]। দক্ষিণের শহরতলী সীমানা হইতে হেলওয়ান (আল-হুলওয়ান) পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা বর্তমান মাআদী (আল-মা'আদী)-এর এলাকা, শহর হইতে ১১ কিলোমিটার দূরে, উন্নয়নের জন্য একটি কোম্পানীকে দেওয়া হয় ১৯০৭ খৃ.-এ, তবুও হেলওয়ান অনুন্নত থাকিয়া যায়। উহা ১৯৫২ খৃ. বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সেইরূপই থাকে। অতঃপর ইহাকে একটি শিল্পনগরীরূপে গড়িয়া তোলা হয়। বর্তমানে এখানে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, অস্ত্র কারখানা ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্বে উল্লিখিতগুলি ব্যতীত কায়রোর উল্লেখযোগ্য পুল হইতেছে ইমবাবা রেলসেতু (১৮৯০-৯১ খৃ. পুনঃনির্মাণ ১৯২৫ খৃ.); জিযাপুল (পূর্বনাম 'আব্বাস, ১৯০৭ খৃ., পুনঃনির্মাণ ১৯৬৬-৭ খৃ.) এবং সামালিক হইতে পশ্চিম তীর পর্যন্ত পুল (১৯১২ খৃ.)। এইগুলির সঙ্গে ১৯৫৮ খৃ.-এর নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় পুলের নামও সংযোজন করা যাইতে পারে।

কায়রোর এই সমস্ত উন্নয়নেরই কাজ করে বিভিন্ন কোম্পানী, বিশেষ করিয়া বিদেশী কোম্পানী, যেইগুলিকে এই সকল কাজের চুক্তি দেওয়া হয়। জনসেবা বা জনকল্যাণমূলক কাজগুলিও অ-মিসরীয়দের দ্বারা করান হয় ঃ পোস্ট অফিস করা হয় ১৮৪৩, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ১৮৬৫ খৃ.-এ; গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ১৮৭৩ খৃ. হইতে ১৯৪৮ খৃ. পর্যন্ত পরিচালনা করে Le Bon কোম্পানী, টেলিফোন ১৮৮১ খৃ.-এ, ট্রাম ১৮৯৬ খৃ. ইত্যাদি।

অনেক পরে মিসরীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরাধিকার করে, কতকগুলির চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পরে, কিছু মালিকানা ক্রয় করিয়া বা জাতীয়করণের মাধ্যমে। এই সকল ইমারতের মধ্যে বিদেশী স্থপতিগণের যে ভূমিকা ছিল তাহা ইটালীয় রীতিতে করা কিছু সংখ্যক ভবনের সম্মুখভাগে লক্ষ্য করা যায়। রেল লাইন স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাফ যোগাযোগও স্থাপিত হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেই সমুদ্র তলদেশস্থ কেবল লাইন দ্বারা কায়রোর সঙ্গে বোম্বাই, এডেন, মাল্টা, জিব্রাল্টার ও গ্রেট ব্রিটেনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

কায়রোর স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা, বাসগৃহের ধরন এবং জনসংখ্যা বিষয়ক অধ্যয়ন Clerget বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। বিভিন্ন দলের নাগরিকগণ বিভিন্ন জিলাতে গিয়া বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছে ঃ ইউনানী বা গ্রীসীয়গণকে আল-আযহারের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখা যায়, য়াহূদীগণকে দেখা যায় খরনফিশের (Khoronfish) দক্ষিণে, পরে সাকাকীনীতে য়ুরোপীয়গণকে দেখা যায় রজেটি গার্ডেনের এবং মুস্কী-এর চতুর্দিকে, যেখানে বিভিন্ন ক্যাথলিক গির্জাও গড়িয়া উঠে। পরে উহারা গার্ডেন সিটি বা যামালেক এলাকাতে গমন করে। কপটিকদের দেখা যায় কালাত বে গির্জা এলাকাতে ও পরে শুবরাতে। সিরীয়-লেবাননী খৃষ্টানগণ, বিশেষ করিয়া নূতন এলাকা ফাগ্গালার প্রতি আকৃষ্ট হয়; সেইখানে গির্জা ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় (জেসুইট স্কুল খোলা হয় ১৮৮৫ খৃ.)। পরবর্তীকালে অনেকে হেলিওপলিস ও যামালিক-এ গমন করে এবং কপটিকগণ সেইখানে বসতি স্থাপন করে। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এখনও বিভিন্ন প্রাসাদে এবং ঐতিহ্যবাহী ভবনসমূহে বসবাস করিতেছেন। হিলমিয়্যাতে বা অধিকতর ঠাণ্ডা জিলাসমূহে স্থানান্তর প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত ব্যাপক হয় নাই। গামালিয়্যার (বা জামালিয়্যার) মহল্লা সম্বন্ধে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করিতেছেন J. Berque।

১৯১৪-১৮ মহাযুদ্ধের পরে শহরের সম্প্রসারণের কাজ চলিতে থাকে। পূর্বে যেইখানে বাগিচা ও ভিলাসমূহ নির্মিত হইত সেইগুলির স্থলে তখন বৃহৎ আধুনিক ব্লকসমূহ নির্মিত হইতে থাকে। ১৯২৬-২৮ খৃ.-এর দিকে দুইটি প্রশস্ত সড়ক নির্মিত হয়। একটির দ্বারা আল-'আতাবার সঙ্গে আল-আযহারের (শারি' আল-আযহার) সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্যটির দ্বারা আল-'আতাবার সঙ্গে আল-'আব্বাসিয়া সংযুক্ত হয়।

১৯৩৭ খৃ.-এ খালীজ স্ট্রীট প্রশস্ততর করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ১৯৫৬ খৃ.-এ বিপ্লবের পরে বাস্তবায়িত হয়। নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত জীযাকে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে গড়িয়া তোলা হয়, যদিও যামালেকের বিপরীত তীরস্থ এলাকা ১৯৪৫ খৃ. পর্যন্ত কৃষিক্ষেত ছিল। কিন্তু ২৫ বৎসরের মধ্যে (১৯৪৫-৭০ খৃ.) এই সকল উন্মুক্ত স্থানে একটি যথার্থ শহর গড়িয়া উঠে এবং উহার এলাকাগুলিকে একান্তভাবেই বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বাসস্থানের জন্য গড়িয়া তোলা হয়। ফলে সেখানে শিক্ষকগণের এলাকাও ইঞ্জিনিয়ারগণের এলাকা গড়িয়া উঠে।

নীল নদের পূর্ব তীরে ১৯৪৬ খৃ.-এ বৃটিশ বাহিনীর অপসারণ এবং কাসরু'ন-নীল ব্যারাকসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে একটি বিরাট ও সুন্দর স্কোয়ার নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ১৯৫২ খৃ. হইতে ইহাকে মীদানু'ত-তাহ্রীর বলা হয় এবং পুরাতন ইসমা'ঈলিয়্যা স্কোয়ারকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইখানে এক বিশাল সরকারী ও প্রশাসনিক অঞ্চল নির্মাণ করা হইয়াছে। উহার নাম মোগাম্মা' ('আল-মুজাম্মা', আনু. ১৯৫০ খৃ.) এবং এখানেই আরব লীগের অধিবেশনের স্থান নির্মিত হইয়াছে (নির্মাণ ১৯৬১ খৃ.)। নীল নদের তীরে একটি Corniche নির্মাণের পুরাতন স্বপ্নও বিপ্লবের পরে বাস্তবায়িত হয়। সেই প্রথমবারের মত শহরের নদীমুখী দিক সৃষ্টি হয়।

আধুনিক ফ্লাটবাড়ী ন্যায্য ভাড়াতে পাওয়া যায়। কায়রো শহরের বিভিন্ন স্থানে নূতন ধরনের ঐ সকল বাড়ী বিপ্লবের পরে গড়িয়া উঠিতে থাকে; আল-মুকাততাম পাহাড়ের পাদদেশে শুবরাতে ও অন্যত্র, বিশেষ করিয়া ইব্ন তূলূন মহল্লার দক্ষিণে অবস্থিত তিলু'য-যাইনহোমের পরিত্যক্ত মাঠ অঞ্চলে— বর্তমান সময়ে সেইখানে একটি যথার্থ উপ-শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, যাহা ১৯৩০ খৃ. হইতে বিশেষভাবে শুরু হয়, কায়রোকে বড় বড় আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বিমান বন্দরে পরিণত করে। বহু বৎসর যাবত ব্যবহৃত হইবার পরে আলমাযা বিমান বন্দর (যাহা হেলিওপলিসের খুবই নিকটবর্তী ছিল) আরও দক্ষিণ-পূর্বে মরুভূমিতে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দররূপে নির্মিত হয়। ১৯৬৩ খৃ.-এ ইহার সঙ্গে একটি নূতন টারমিনাল যুক্ত করা হয়।

নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির অধিক চাপ কমাইবার জন্য বিপ্লবী সরকার শহরে নূতন গৃহনির্মাণ প্রকল্পসমূহ কার্যকর করেন, যেমন আন-নাস্র এলাকা যাহা হেলিওপলিস ও 'আব্বাসিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সামরিক এলাকা হিসাবে গড়িয়া উঠে; উহা বেসামরিক ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং আশা করা যায় সেইখানেই সরকারী দফতরসমূহের বড় অংশ স্থানান্তরিত হইবে; এইখানে ১,০০,০০০ দর্শকের সংকুলান হয় এমন একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হইয়াছে। একটি বড় মহাসড়ক বিমান বন্দর আন-নাস্র হইয়া কিল্লার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। অতঃপর নীল নদের তীরে ফুসতাত পর্যন্ত গিয়াছে। ১৯৫৪-৬ খৃ.-এ আল-জুয়ূশীর মাযার সৌধের দক্ষিণের সমতল অঞ্চলে আল-মুকাততামের পাদদেশীয় অঞ্চলে একটি আধা-পর্যটন এলাকা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সময় উপযোগী না হওয়া হেতু সেই প্রচেষ্টা অচল হইয়া থাকে।

বর্তমানে কায়রো শহর কোন্ অভিমুখে গড়িয়া উঠিবে? বর্তমান মুহূর্তে বিভিন্ন কমিটি বিষয়টি আলোচনা করিতেছে। কিন্তু এদিকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অভাবে অনেক ঐতিহাসিক স্থান নোংরা ধরনের ঘরবাড়ী তৈয়ারীর কারণে আবর্জনাময় হইয়া পড়িয়াছে এবং অতীতের অতি দর্শনীয় সব সৌধ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে বা ভস্মীভূত হইতেছে বা পরিত্যক্ত হইতেছে।

কিন্তু কিছু কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিসরীয় সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে যেন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দ্বারা অতীতের কিছু কিছু গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করা যায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে যানবাহন, পয়ঃপ্রণালী ও সড়কজাল সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেই সকল সমস্যা ক্রমেই জটিল হইতেছে সেইগুলি মুকাবিলা করিতে গিয়া জনস্বার্থে নিয়োজিত দফতরগুলিকে হিমসিম খাইতে হইতেছে।

জনসংখ্যা ও পেশা ঃ Clerget (১খ, পৃ. ২৪১) অনুমান করেন যে, ১৮শ শতকের শেষভাগে কায়রো শহরের অধিবাসী ছিল ২,৪৫,০০০। ১৮৮২ খৃ.-এর আদমশুমারী অনুযায়ী তিনি জনসংখ্যা দেখাইয়াছেন ৩,৯৬,৬৮৩ এবং ১৯০৭ খৃ.-এ ৬,৭৮,৪৩৩ জন। তাঁহার অতি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সমাপ্ত করেন P. Marthelot (Le Caire, nouvelle metropole, Annales Islamologiques গ্রন্থে, কায়রো, IFAO, ৮খ, ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১৮৯-২২১)। তাঁহার লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৯২৭ খৃ.-এ জনসংখ্যা ছিল ১০,৭০,৮৫৭ ও ১৯৬০ খৃ.-এ জনসংখ্যা ছিল ৩৩,৪৮,৭৯৯ জন; শেষোক্ত সংখ্যাওয়ান ও মাতারিয়া সমেত কায়রোর সমগ্র মেট্রোপলিটন এলাকার। ১৯৪৭ খৃ. কায়রোর জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। শহরতলী এলাকার অধিবাসিগণ উহার বহির্ভূত ছিল কিন্তু 'আবিদীন কিসমের দুক্কি ও আগূযার অধিবাসিগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল (দ্র. Janet Abu-Lughed ও ইয়ুয়্'দ-দীন আত্তিয়া, Cairo Fact Book, কায়রো, The American University in Cairo Social Reserch Centre, ১৯৬৩ খৃ.)। ১৯৭০ খৃ.-এর মধ্যে জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়াইয়া যায়। শহরে লোক এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার কারণ গ্রাম এলাকা হইতে লোকেরা আসিয়া শহরে ভীড় করিবার অত্যধিক প্রবণতা।

M. Clerget যেই সকল কারুশিল্পী ও কারখানার বর্ণনা করিয়াছেন সেইগুলির সাথে অবশ্যই নূতন প্রতিষ্ঠিত কারখানাসমূহের নাম যোগ করিতে হয়; P. Marthelot সেইগুলির নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯৫২ খৃ. বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কায়রোর ব্যাঙ্কসমূহের ভূমিকা এবং ১৯৫৬-৬১-এর মধ্যে উহাদের জাতীয়করণ। উত্তরের শহরতলী অঞ্চলের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান কাপড়ের কলসমূহের পাশাপাশি তূরা-র সিমেন্ট কারখানা, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বৈদ্যুতিক কারখানাসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের সংযোজন কারখানাসমূহও যোগ করিতে হইবে।

নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, বিশেষ করিয়া দক্ষিণের শহরতলী এলাকার হেলওয়ানের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঃ একটি মোটর গাড়ী সংযোজন কারখানা, একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ব্লাস্ট ফারনেস বা লৌহ-চুল্লী এবং ইস্পাত কারখানা, একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ কারখানা, একটি সার কারখানা, একটি চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত কারখানা ইত্যাদি।

রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। বহু বৎসর যাবত হোটেল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃ.-এর হিসাব অনুযায়ী (P. Marthelot-এর বিবরণী) কায়রো শহরের সক্ষম অধিবাসীগণের ৬৫% বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞাবহির্ভূত পেশা বা কার্যে নিয়োজিত ছিল; ২৩.৫% প্রশাসন ব্যবস্থাতে বিভিন্ন নিয়মিত চাকুরী করিত এবং মাত্র ৭.৫% শিল্প কারখানাতে নিয়োজিত ছিল। এইরূপ প্রাপ্ত সংখ্যা হইতে আমরা বেকারত্বের অবস্থা সম্বন্ধে অনুমানমাত্র করিতে পারি, সেই সংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট হইবে, যদিও সম্পূর্ণভাবে বেকারের সংখ্যা কমই হইবে।

জনগণের বসবাসের প্রশ্ন সব সময়েই জটিল ছিল। ১৯৬১ খৃ. সূচিত আরব সমাজতন্ত্রবাদের ফলে এবং ১৯৬৫ খৃ. গৃহ সংস্থান ও জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় সৃষ্টির ফলে রাষ্ট্রই বৃহৎ আকারের ভবন নির্মাতা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রটিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগও অব্যাহত থাকে, তবে তাহাদিগকে বেশ অসুবিধার সঙ্গেই পুঁজি-প্রবাহের মুকাবিলা করিতে হয়।

P. Marthelot লিখিয়াছেন (পৃ. ১৯৭), "তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অনেক শহরের ক্ষেত্রে যেইরূপ, কায়রোর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা সত্য। এই শহর গ্রামীণ পশ্চাদপটের মুখে অবস্থিত, জনসংখ্যাজনিত চাপের প্রতিক্রিয়া এইখানে পড়ে এবং গঠনগত ত্রুটি ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে যাহাদের জীবন কোনও না কোনও রকম বিঘ্নিত হয় তাহারা সকলে আসিয়া ভীড় করে এই শহরে, সেই চাপ বহনের ক্ষমতা শহরের থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু ইহা হইয়াছে জনসংখ্যার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে খুবই নিম্নমানের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হওয়ার ফলে।"

Clerget ও Marthelot— এই উভয়ের গ্রন্থে নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধে অগণিত তথ্য রহিয়াছে — জনসংখ্যার ঘনত্ব যাহা বিভিন্ন জিলার ভিত্তিতে খুবই ভিন্ন ভিন্ন (দ্র. আত-তালী'আ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৭০; সেখানে দেখানো হইয়াছে যে, বূলাকে ৬০% বেশী পরিবার এক

ঘরে বাস করে) শহর সম্প্রসারণ, যানবাহন ইত্যাদি। এই সকল তথ্য সরকারী দফতর কর্তৃক সঙ্কলিত পরিসংখ্যান হইতে গৃহীত। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কায়রোতে প্রতি ৯১০ জন অধিবাসীর জন্য একজন করিয়া ডাক্তার আছে; নিম্ন মিসর এলাকাতে আছে প্রতি ৩,৪২০ জনে একজন এবং উচ্চ মিসরে প্রতি ২,৯৯০ জনে একজন। অনুরূপভাবে শহরে প্রতি ২৩৩ জন অধিবাসীর জন্য একটি হাসপাতাল শয্যা রহিয়াছে; আর নিম্ন ও উচ্চ মিসরে আছে যথাক্রমে ৫৮৪ জনে এক শয্যা এবং ৬৩৬ জনে এক শয্যা।

প্রতি ২৭ জন শহরবাসীর মধ্যে একটি করিয়া টেলিফোন আছে আর নিম্ন ও উচ্চ মিসরে টেলিফোন আছে যথাক্রমে ৩৬২ জনে একটি ও ৩০১ জনে একটি করিয়া (দ্র. আত-তালী'আ, ঐ, পৃ. ৭৪-৫)। এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন আর এই কারণে সমাজতান্ত্রিক আইন পর্যন্ত বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সাংস্কৃতিক বিষয়ে বলিতে গেলে কায়রোর দুইটি দিক রহিয়াছে, একদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধন— স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অপর দিকে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কংগ্রেসসমূহের আয়োজন। বহু সংখ্যক স্কুল খোলা হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ.-এর দিকে মিসরের মাত্র ৪০% শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত; ১৯৭০ খৃ.-এর মধ্যে এই সংখ্যা সমগ্র দেশের জন্য ৭৫%-এ উন্নীত হয় এবং কায়রো সম্বন্ধে বলা হয় যে, সেইখানে এই সংখ্যা ৯০% ছাড়াইয়া গিয়াছে (দ্র. Cairo Fact Book, ১৯৪৭ খৃ. শিক্ষা কিসম-এর একটি শাখা শিয়াখা কর্তৃক তালিকাভুক্ত)।

উচ্চ শিক্ষার উদাহরণ দিতে গেলে বলিতে হয়, দারু'ল-উলূম (দ্র.) কায়রোর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯০৮; ১৯২৫ খৃ. ইহাকে ফু'আদ আল-আওওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়, বর্তমানে উহাই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) এবং 'আয়ন শামস্ (১৯৫০) বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। শেষোক্তটি ছিল আল-আযহার (দ্র.)-এর সংলগ্ন ধর্মীয় শিক্ষার সাবেক প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ খৃ. কৃত আইন দ্বারা আল-আযহারের শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে; শিক্ষাক্রম পুনর্গঠন করা হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়াদি শিক্ষা দানের জন্য নূতন অনুষদ (Faculty) খোলা হইয়াছে, চিকিৎসাশাস্ত্র, পলিটেকনিক ইত্যাদি যোগ করা হইয়াছে; এইগুলি পূর্ব হইতেই চালু তিনটি অনুষদের (কুল্লিয়াত) অতিরিক্ত। কায়রোতে উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষার বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে (এই বিষয়ে দ্র. 'আবদু'র-রাহমান যাকী, মাওসূ'আ, দ্র. মা'হাদ), সেইগুলিতে বিজ্ঞান, কলা, নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দান করা হয়।

এইগুলির অধিকাংশই মিসরীয় (দ্র. ফুআদ আল-আওওয়াল, Institut d'Egypte), কিন্তু কয়েকটি বিদেশীয় (উদাহরণস্বরূপ Institut Francais d'Archeologie Orientale প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮০ খৃ.)। আরবী ভাষা একাডেমী (মাজমা'উ'ল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যা) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ খৃ., এই একাডেমী ভাষা বিষয়ের উপরে লক্ষ রাখে।

কায়রোতে ২০টিরও বেশী যাদুঘর আছে (প্রধান প্রধান যাদুঘরের তালিকার জন্য দ্র. 'আবদু'র-রাহমান যাকী, মাহ্‌তাফ অংশ)। Mariette কর্তৃক বূলাকে প্রতিষ্ঠিত মিসরতত্ত্বের বিখ্যাত যাদুঘরটি ১৯০২ খৃ.-এ মীদানু'ত-তাহ্‌রীর বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালার মধ্যে রহিয়াছে কিবতী বা কপটিক যাদুঘর (Coptic Museum) [১৯১০ খৃ. ব্যক্তিগত সংগ্রহশালারূপে প্রতিষ্ঠিত, ১৯৩১ খৃ. হইতে ইহা জাতীয় জাদুঘর], ইসলামী শিল্পকলার যাদুঘর (Museum of Islamic Art, ১৯০৩ খৃ. হইতে ইহা মীদান বাবু'ল-খালকের বর্তমান ভবনে রহিয়াছে), কৃষি যাদুঘর, সামরিক যাদুঘর ইত্যাদি।

বিশেষ করিয়া ১৯৫২ খৃ.-এর পর হইতে খোদ কায়রোতে নূতন নূতন মসজিদ নির্মিত হইতেছে। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের মধ্যে কয়েকটি হইল মীদানু'ত-তাহ্‌রীরে অবস্থিত 'উমার মাকরাম। এইখানেই সাধারণত সকল রাষ্ট্রীয় জানাযা সম্পন্ন হয় এবং কুবরী'ল-কুব্বা মসজিদ ইহার সংশ্লিষ্ট জামাল 'আবদু'ন-নাসের-এর মাযার সৌধ (নাসের ইনতিকাল করেন ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Clerget, Le Caire, etude de geographie urbaine et d'histoire economique, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., গ্রন্থটি ও সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জী উভয়ই; (২) 'আবদু'র-রাহমান যাকী, A. bibliography of the literature of the City of Cairo, কায়রো (Egyptian Geographical Society), ১৯৬৪ খৃ.। এই দুইখানি মৌলিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত ঃ (৩) Annales Islamologiques, ৮খ, কায়রো শহরের হাজার বৎসর পূর্তি উপলক্ষে (৯৬৯-১৯৬৯) প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, কায়রো (IFAO), ১৯৬৯ খৃ.; (৪) The Millennium of Cairo, 969-1969, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কায়রো ১৯৬৯ খৃ. (একটি অ্যালবাম, ইহাতে রহিয়াছে প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রের ফটোগ্রাফ, শহর, শহরের প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে মতামত, ছয় সংস্করণে প্রকাশিত, প্রতিটি সংস্করণের পাঠ বিভিন্ন, কিন্তু ফটোগ্রাফ অভিন্ন, আরবী, ইংরাজী, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ); (৫) J. W. Mcpherson, The Moulids of Egypt, কায়রো ১৯৪১ খৃ. (৬) 'আবদু'র-রাহমান যাকী, মাওসূ'আত মাদীনাতু'ল কাহিরা ফী আলফ 'আম, কায়রো ১৯৬৯ খৃ.; (৭) J. Berque, L'Egypte, imperialisme et revolution প্যারিস ১৯৬৭ খৃ. (ইংরাজী অনুবাদ, Egypt, imperialism and revolution, লন্ডন ১৯৭২ খৃ.); (৮) M. Berger, Islam in Egypt today, social and political aspects of popular religion, কেমব্রিজ ১৯৭০ খৃ.; (৯) G. Baer, Egyptian guilds in modern times, জেরুসালেম ১৯৬৪ খৃ.; (১০) P. J. Vatikiotis, The Modern history of Egypt, লন্ডন ১৯৬৯ খৃ.; (১১) আনওয়ার 'আবদুল-মালিক, Egypte, Societe militaire, প্যারিস ১৯৬২ খৃ.। ১৯৫৪ খৃ. পর হইতে কায়রোর সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ দিকসমূহ জানিবার জন্য দ্র. MIDEO সিরিজে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ, কায়রো।

J. Jomier (E.I.[2])/ হুমায়ূন খান

কাহীদ ইব্‌ন মুতার্‌রিফ (قهيد بن مطرف) ঃ (রা) মতান্তরে কাহীদ ইব্‌ন আবী মুতার্‌রিফ। ইব্‌ন হিব্বান ও ইব্‌নু'স-সাকান বলেন, তিনি সাহাবী বলিয়া কথিত আছে। ইব্‌নু'স-সাকান আরও বলেন, তিনি মদীনার অধিবাসী হইলেও সাহাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ নহেন। তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছের সনদ লইয়া মতভেদ আছে। ইব্‌ন সা'দ তাঁহাকে খান্‌দাক

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বাগাবী বলেন, তাঁহার সূত্রে একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত আছে এবং তিনি সাহাবী কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে। কাহীদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও ব্যক্তি শত্রুতামূলকভাবে আমার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আমি কি করিব ?" তিনি বলিলেন, "তুমি তাহাকে তিনবার বিরত থাকিতে বলিবে।" প্রশ্নকারী বলিল, সে যদি বিরত থাকিতে অস্বীকৃতি জানায় ? তিনি বলিলেন, "তুমি তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের ব্যাপারটি কি রকম হইবে ?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "সে যদি তোমাকে হত্যা করে তাহা হইলে তুমি জান্নাতবাসী হইবে, আর তুমি যদি তাহাকে হত্যা কর তাহা হইলে সে দোযখবাসী হইবে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ২৪২; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৫ হি., ৪খ, ২০৯।

মুহাম্মদ মূসা

কাংড়া (کنڑا) ঃ ভারতের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মাঝে মাঝে নগরকোটকে কাংড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় পাঞ্জাবের এই নামের তহসীলের সদর দফতরও ইহা। কাংড়া ৩০°৫ উত্তর ও ৭৬°১৬ ডিগ্রীর মাঝে অবস্থিত। কাংড়ার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটি অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী। ইহার উত্তর ঢাল এলাকায় কাংড়া জনপদটি অবস্থিত। কাংড়ার প্রায় মুখামুখি অবস্থিত আছে ধরমশালা নামে একটি চমৎকার গ্রীষ্মকালীন পার্বত্য বিনোদন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য নিবাস। এখান হইতে নীচে শ্যামল কাংড়া উপত্যকার চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মুগল ইতিহাসের আগে এই শহরের ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। অবশ্য ইহা কাটোচ রাজাদের অন্যতম ১ম সানসার রাজপুত রাজাদের একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই রাজপুত রাজারা গোটা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এই রাজাদের অন্যতম ১ম সানসার চানদ-এর কথা আনুমানিক ১৪৩০ খৃস্টাব্দের এক সংস্কৃত লিপিতে উল্লেখ রহিয়াছে। উৎকীর্ণ লিপিটি স্থানীয় অগ্নিদেবী হিসাবে পূজিত জ্বালামুখীকে নিবেদিত ব্রজেশ্বরী দেবী মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিক উৎকীর্ণ লিপিটি ১৯০৫ খৃস্টাব্দের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ফিরিশতা ফীরূয তুগলুকের বিভিন্ন অভিযানের বিবরণ দানকালে (তু. আনু. Briggs, i, 454-5) নগরকোটের বর্ণনা দিয়াছেন। নগরকোট মন্দিরের বিপুল ধনরত্ন তথা ঐশ্বর্যের কাহিনী ইহার আগে গাযনার মাহমূদকে নগরকোট আক্রমণে প্রেরণা দিয়াছিল। তিনি ৩৯৯/১০০৮ সনে এই উপত্যকায় অভিযান চালাইয়া শহরের দক্ষিণে পাহাড়ের এক চমৎকার সানুদেশে অবস্থিত ও অন্য তিনদিকে অত্যন্ত খাড়া কতগুলি দুর্ভেদ্য পাহাড় পরিবেষ্টিত দুর্গটি দখল করেন। কথিত আছে, এই অভিযানে মাহমূদ অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য, রত্নাদি, হীরা, চুনি ও মুক্তা লইয়া যান।

অবশ্য আওরাঙ্গযীবের আমলের হিন্দু ঐতিহাসিক সুজন রায় ভানডারী (তু. খুলাসাতু'ত-তাওয়ারীখ, দিল্লী ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৭১-২) কিংবা ফারহাতু'ন-নাজিরীন (উদ্ধৃতিসমূহের প্রকাশক ঃ আয়্যুব কাদিরী, করাচী ১৯৭২ খৃ., পৃ. ২২২-৩)-এর লেখক কেহই মাহমূদের এই লুণ্ঠনের ঘটনার উল্লেখ করেন নাই যদিও শেষোক্ত গ্রন্থে কাংড়ায় 'মাকান-ই সবুকতিগীন নামে একটি দুর্গের উল্লেখ রহিয়াছে। ব্রজেশ্বরী নামে যে মন্দিরটিকে এখনও হিন্দুরা পবিত্র বলিয়া গণ্য করেন। মাহমূদ উহাতে আক্রমণ চালান নাই, বরং সেই মন্দিরটির অবস্থান ছিল দুর্গের অভ্যন্তরে বর্তমানে যাহার অস্তিত্ব নাই।

৪৩৬/১০৪৪ সনে হিন্দুরা কাংড়া শহর ও উহার দুর্গটি পুনরুদ্ধার করে। তাঁহারা মাহমূদের লইয়া যাওয়া কিংবা ধ্বংস করা বিগ্রহের অনুরূপ মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করে। ফীরূয তুগলুক ৭৬২/১৩৬০ সনে কাংড়া শহর দখলের পর মন্দিরটি আবার লুণ্ঠন করেন তবে ইহাতে মন্দিরের যেসব ধনরত্নের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহা ঐ মন্দিরে তীর্থযাত্রায় আগত পুণ্যার্থী ও মন্দিরের সমর্থকদের দান ও প্রসাদ নৈবেদ্যে তাহা পূরণ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ১,৩০০-এর মত প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসম্বলিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপিগুলিও সুলতানের করায়ত্ত হয় এবং তিনি ঐসব পাণ্ডুলিপির কোনওটি ফারসীতে অনুবাদ করান। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি ছিল দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ভবিষ্যদ্বাণী ও লক্ষণাভাস সংক্রান্ত রচনা। এই পাণ্ডুলিপিটিকে ফারসী কাব্যানুবাদ করা হয় ও ইহার নাম দেওয়া হয় দালা'ইল-ই ফীরূযশাহী (তু. ফিরিশতা, গুলশান-ই ইবরাহীমী, লক্ষ্ণৌ ১২৮২ হি., পৃ. ১৪৮)।

মুহাম্মাদ তুগলুক যখন দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় ও খাদ্যের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন (৭৯৬-৮১৪/১৩৯৪-১৪১১) তখন সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার কিছুকাল আগে তিনি কাংড়ার পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় লন। ৯৯০/১৫৮২ সনে আকবর সিন্ধুতে যাইবার পথে এক বিরাট সেনাদল লইয়া কাংড়ায় আগমন করেন। শহরটিকে (দুর্গ প্রাসাদসহ) 'খালিসা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া আশপাশের পাহাড়ী অঞ্চলগুলি দেশীয় প্রধান জয় চানদকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তবে হিন্দুরা দৃশ্যত তাহাদের মন্দির অপবিত্র করার জন্যে মুসলমানদের ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাহারা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে দুইবার বিদ্রোহ করে। শাহযাদা খুররামের সৈনাপত্যে মুগল রাজকীয় বাহিনী তাহাদের দমন করিতে (১০৩০/১৬২১) সক্ষম হয়।

জাহাঙ্গীর খুররামের (পরে শাহজাহান) কাংড়া বিজয় সম্পর্কে লিখিতে গিয়া গর্বের সহিত উল্লেখ করেন, তিনিই মুগল সম্রাট যিনি প্রথমবারের মত গোটা কাংড়া উপত্যকাকে মুসলিম শাসনাধীনে আনিয়াছেন (তু. তূযুক-ই জাহাঙ্গীরী, উর্দূ অনু., লাহোর ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৬৫৪-৬)। এই বিজয়ের শোকরানা হিসাবে জাহাঙ্গীর দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন; আযান দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। শুক্রবার জুমু'আর সালাতে খুতবা পাঠ এবং দুর্গাভ্যন্তরে হিন্দুদের নিকট পরম পবিত্র গো-যবেহের নির্দেশ দেওয়া হয় (তু. তূযুক, উর্দূ অনু., ৬০৭)। জাহাঙ্গীর নিজের জন্য কাংড়া উপত্যকার শীতল, চমৎকার আবহাওয়ায় গ্রীষ্মাবাস নির্মাণেরও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যদিও তাহার বাস্তবায়ন সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহার স্পষ্ট কারণ, বিনোদন স্থল হিসাবে কাশ্মীর ছিল আমোদ-বিলাসী সম্রাটের পসন্দনীয় স্থান। শাহজাহানের রাজত্বকালে নূরপুরের জমিদার ও কাংড়ার ফৌজদার জগৎ সিং বিদ্রোহ করেন। তবে অচিরেই তাঁহাকে দমন করা হয়। তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার পদমর্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে মুগল সম্রাটের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়। নূরজাহানের পিতা ই'তিমাদু'দ-দাওলা

জাহাঙ্গীরের সফরসঙ্গী হিসাবে কাংড়ায় ইন্তিকাল করেন। শায়খ ফারীদু'দ-দীন মুরতাদা খান বুখারীও লাহোরের শাসক থাকাকালে এখানেই ইনতিকাল করেন।

নগরকোট ১১৬৭/১৭৫৩ সনে দিল্লীর দুর্বল প্রশাসন কর্তৃক আহমাদ শাহ দুররানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুগলদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১১৮৮/১৭৭৪ সনে জয় সিং নামে এক শিখ সর্দার কৌশলে কাংড়ার দখল লইলেও কাংড়ার অধিকারচ্যুত রাজপুত শাসকদের উত্তরাধিকারসূত্রে সানসার চান্দ কাংড়ার অধিকার লাভ করেন। ১২২১/১৮০৬ সনে গুর্খাগণ সানসার চান্দকে বিলাসপুর আক্রমণকালে পরাজিত করিয়া উপত্যকা দখল করে। গুর্খারা স্থানীয় জনগণের উপর অবিশ্বাস্য রকমের অত্যাচার নিষ্ঠুরতা চালায়। ১২২৪/১৮০৯ সনে সানসার চান্দের মনিব রণজিৎ সিং কাংড়া দখল করেন। প্রথম শিখ যুদ্ধের পর কাংড়া ১২৬২/১৮৪৬ সনে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লবের সময় কাংড়ায় কিছু গোলযোগ ঘটে। তবে অচিরেই উহা কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

কাংড়া এখন ভারত প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ। প্রতি বৎসর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ইহার পবিত্র জ্বালামুখী মন্দিরে তীর্থে যান। কথিত আছে, আওরাঙ্গযীব বিপাশা নদী হইতে কাংড়া পর্যন্ত একটি খাল খনন করিয়াছিলেন। খাল খননের পর খালের পানিতে একটি জলন্ত মশাল ফেলিলেও উহা নাকি নির্বাপিত হয় নাই (তু. মুহাম্মাদ আসলাম আনসারী, ফারহাতু'ন-নাজিরীন, উদ্ধৃতিসমূহ, করাচী ১৯৭২ খৃ., পৃ. ২২২-৩)।

১৯০৫ সনের এপ্রিলের ভয়াবহ ভূমিকম্পে কাংড়া দুর্গ, মন্দির এবং সেই সঙ্গে কাংড়ার অন্যান্য স্থাপত্যগত গুরুত্বসম্পন্ন ইমারত ও ভবনগুলিরও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। কাংড়া একটি সুন্দর পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। ইহা ছাড়াও এখানে বিভিন্ন জাতের সুন্দর পাখি, তিতির ও কাদাখোঁচা পাখি ও হরিণ বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায়। এখানে বন্যভাবে প্রচুর আম জন্মে। তবে ঐ ফল নিকৃষ্ট ধরনের। উপত্যকায় মুষ্টিমেয় মুসলমানের বসতি ছিল। উহারা ছিল প্রধানত গরীব শ্রেণীর। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ও দেশ বিভাগের সময় তাহাদিগকে বহিষ্কার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিরিশ্তা, গুলশান-ই ইবরাহীমী (তা'রীখ), লক্ষ্ণৌ ১২৮১ হি., পৃ. ১৪৭ প., অনু. Briggs, ১খ, ৪৮-৯, ৪৫৪-৫; (২) মুহাম্মাদ নাজিম, The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, Cambridge 1931, 90-1 (এই গ্রন্থে ফিরিশতা ছাড়া আরও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে); (৩) তূযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ইং. অনু. Rogers ও Beveridge, ii, 183, 223; (৪) সামসামু'দ-দাওলা শাহনাওয়ায খান, মা'আছীরু'ল-উমারা', উর্দূ অনু., লাহোর ১৯৬৮-১৯৬৯ খৃ., ১ম ও ২খ, নির্ঘণ্ট (কাংড়া অংশ); (৫) Imperial Gazetteer of India, xiv, Oxford 1908, 382-6, 397-8 (ঘটনাপঞ্জী সঠিক নয়); (৬) সুজন রা'ই ভানডারী, খুলাসাতু'ত-তাওয়ারীখ, দিল্লী ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৭১-২; (৭) মুহাম্মাদ আসলাম আনসারী, ফারহাতু'ন-নাজিরীন, Bodl. Ms. ১১৯ উদ্ধৃতি প্রকাশিত, আয়্যুব কাদিরী, করাচী ১৯৭২ খৃ., পৃ. ২২২-৩ (ইহাতে মা'আছীরু'ল-উমারায় প্রদত্ত কাংড়া উপত্যকার বর্ণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে); (৮) Cambridge History of India, iii, iv, নির্ঘণ্ট; (৯) Cyclopaedia of India, London 1885, ii, 494-5; (১০) জালালু'দ-দীন তাবাতাবা'ঈ, জাফারনামা-ই কাংড়া বা শাশ ফাতহ্-ই কাংড়া, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে (লাহোর) রক্ষিত পাণ্ডু; (১১) রাযা হুসায়ন, The Zafarnama-i Kangra or an account of the conquest of Kangra during the reign of Jahangir, in Journal of the United Provinces Historical Society, ii (1919), 56-62; (১২) শাম্স সিরাজ 'আফীফ, তা'রীখ-ই ফীরূযশাহী, কলিকাতা ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৩২, ৯০, ১৮৬-৭; (১৩) মুহাম্মাদ সালিহ কানবু, 'আমাল-ই সালিহ, লাহোর ১৯৫৮ খৃ., ১খ, ৯০ প.; ২খ, ২৬৬ প.; (১৪) Banarsi Prasad Saksena, History of Shahjahan of Delhi, Allahabad 1958, 93-102; (১৫) কাফী খান, মুনতাখাবু'ল-লুবাব, কলিকাতা ১৮৬৯ খৃ., ১খ, ২৯৭, ৩০৬, ৩২৫-৬, ৫৮৩।

এ. এস. বায্মী আন্সারী (E.I.[2])/ আফতাব হোসেন

কিত'আ (দ্র. মুকাত্তা'আ)

কিতফীর (قطفير) ঃ 'আযীয-মিস্র নামে পরিচিত, প্রাচীন মিসর সরকারের প্রধান অমাত্য। বাইবেলে যাহার নাম ফূতীফার (فوطيفار = Potiphar) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; মুসলিম কিংবদন্তীতে সেই ব্যক্তিই কিত্ফীর নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিত্ফীর 'ফিত্ফীর' (فطفير)-এর বিকৃত রূপ, যেমন সাবা সম্রাজ্ঞীর নাম নাকালীস (نقليس) হইতে পরিবর্তিত হইয়া 'বিলকিস' হইয়াছে। অতঃপর 'কিত্ফীর পরিবর্তিত হইয়া "ইতফীর" হয় (আত্-তাবারী ও আছ-ছা'লাবীতেও সাধারণত এই রূপই আসিয়াছে)। ইহার পর 'ইত্ফীর' পরিবর্তিত হইয়া ইতফীন ও পরে ইতফীন হইতে কিত্তীন-এ রূপান্তরিত হয় (আত্-তাবারী, ১খ, পৃ. ৩৭৭)। অতঃপর (কিত্তীন হইতে) 'কিত্তীফীন' হয় (আত্-তাবারী, তাফসীর, ১২খ, ৯৮)।

পক্ষান্তরে আল-কিসা'ঈ সর্বদা 'কাতীফার' লিখিয়াছেন, যাহা সরাসরি বাইবেলের Potiphar হইতে গৃহীত হইয়াছে। 'কিত্ফীর'কে ইব্ন রুহায়ব (ابن رحيب) বলা হইয়াছে (কিন্তু ইহার কোনও উৎস পাওয়া যায় না)। কুরআন মাজীদে (১২ ঃ ৩০, ৫১) আল-'আযীয শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি মিসর সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তাফসীরকারগণ তাঁহাকে ফিতফীর বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। তিনি হযরত 'য়ূসুফ' ('আ)-কে ক্রয় করিয়া স্বীয় স্ত্রীর উপর তাঁহার লালন পালনের ভার অর্পণ করেন এবং তাঁহাকে (য়ূসুফ) ক্রয় করিয়া বলিলেন, "সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিব" (আল-কুরআন, ১২ ঃ ২১)। 'কিত্ফীর'-এর স্ত্রী (امرأة عزيز = আযীয-এর স্ত্রী) য়ূসুফ ('আ)-এর সৌন্দর্যে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য অপচেষ্টায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু হযরত য়ূসুফ ('আ) পদস্খলিত হন নাই। পরবর্তীতে দীর্ঘ কারাভোগের পর য়ূসুফ ('আ)-কে মিসর সরকারের কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। কিতফীর-এর মৃত্যুর পর য়ূসুফ ('আ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্-তাবারী, সূরা য়ূসুফের তাফসীর; (২) অন্যান্য তাফসীরকারদের সূরা য়ূসুফ-এর তাফসীর; (৩) আছ-ছা'লাবী, কিসাসু'ল-

আম্বিয়া, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮০ প.; (৪) আল-কিসাঈ, Eisenberg সং., পৃ. ১৬১, ১৬২, ১৬৮।

B. Heller ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/
মোঃ তৈয়বুর রহমান নিযামী

কিতমান (দ্র. তাকিয়্যা)

কিতমীর (قطمير) ঃ আস্হাবু'ল-কাহ্ফ (দ্র.)-এর সঙ্গী কুকুরের নাম। এই নাম কুরআনে নাই। কুরআনে এই শব্দের অর্থ খর্জুর বীজের উপরিস্থ আবরণ (লিফাফ) (দ্র. সূরা ৩৫ ঃ ১৩, বায়দাবীর তাফসীর)। কুকুরটি কিতমীর নামে অভিহিত ছিল— এই উক্তি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বিবৃতিতে পাওয়া যায়। কুকুরটির অন্যান্য আরও নামের উল্লেখ দেখা যায়। উহাদের কতকগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে (কিতমার, কানতূর কাতমূন, হাম্রান, নাসীফ ইত্যাদি)। আস্হাবু'ল-কাহ্ফের নামগুলি হাদীছরূপে কথিত যে সকল বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহাতে কুকুরের এই নামগুলিও পাওয়া যায়। আসলে এই বর্ণনাগুলি য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত। কিতমীর নামক কুকুরটি এক শ্রেণীর সরল বিশ্বাসী মুসলিমের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইরানে যদি কেহ কোনও কুকুরের ভয়ে ভীত হয় তবে সে ১৮ ঃ ৮ আয়াত ("এবং তাহাদের কুকুর সম্মুখের পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া গুহা দ্বারে উপবিষ্ট") পাঠ করে (Mass, Croyances et Coutumes persanes, Paris 1938, পৃ. ২০৫)। কিতমীর নামটি কোনও কোনও অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক বরকত ও অলৌকিক রক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করে। এই কারণে রাশিয়ার তাতারগণ এবং ককেসাসের মুসলিমগণ চিঠিপত্রের উপর এই নামটি লিখিয়া দেয় যাহাতে তাহা হারাইয়া না যায়, ইহা রেজিস্টার্ড চিঠির মত গণ্য হয় (তু. Weyh, in ZDMG, lxv, পৃ. ২৮৯)। এই একই প্রকার ব্যবহার ইন্দোনেশিয়াতেও দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আছ-ছা'লাবী, আরাইস, কায়রো ১২৮২ হি., পৃ. ৪৬২; (২) আদ-দামীরী, হায়াতু'ল-হায়াওয়ান, কায়রো ১২৭৫ হি., দ্র. কাল্ব, পৃ. ৩২০।

J. H. Kramers (S.E.I.)/ আবূ বকর সিদ্দীক

পরিশিষ্ট

কমোরোস দ্বীপপুঞ্জ (جزرالقمر) ঃ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আফ্রিকার একটি দ্বীপদেশ কমোরোস দ্বীপপুঞ্জ। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কারের মধ্যবর্তী স্থানে ১১.৫৫ দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং ৪৪.৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে তিনটি দ্বীপের সমন্বয়ে এই দ্বীপ রাষ্ট্রটির অবস্থান। ঐ দ্বীপ তিনটি হইতেছে গ্রান্ড কমোরো, আনজুয়ান ও মোহেলী। তন্মধ্যে গ্রান্ড কমোরো আয়তনে সর্ববৃহৎ। আয়তনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইলেও আনজুয়ান দ্বীপ সম্পদে সমৃদ্ধতর এবং সুযোগ-সুবিধার দিক হইতেও দ্বীপটি প্রাগ্রসর। রাজধানী মরোনী ঐ দ্বীপেই অবস্থিত। রাষ্ট্রটির আয়তন ১৮৬২ বর্গমাইল (২২৩৫ বর্গ কিলোমিটার) এবং জনসংখ্যা ৫,০৩০০০ (অক্সফোর্ড স্কুল এটলাস, ২৮ সং., ১৯৯৩ খৃ.)।

দীর্ঘ পনের বৎসরের ব্যবধানে এই সংখ্যা এখন ছয় লাখে উপনীত হইয়াছে। অধিবাসীদের ৮৬% সুন্নী মুসলিম এবং ১৪% রোমান ক্যাথলিক। শিক্ষার হার ৫৯.২ এবং মাথাপিছু আয় ৭০০ ডলার। প্রধান মুদ্রার নাম ফ্রাঁ যাহার মূল্যমান ১ ডলারে ৪৫২.৬১। অধিবাসীদের গড় আয়ু মহিলা ৬১.৫ এবং পুরুষ ৫৬.৮ (আজকের বিশ্ব : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, পৃ. ২৮৮)।

সুদীর্ঘকাল ফরাসী উপনিবেশরূপে থাকার পর ১৯৭৫ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐ বৎসরই ১২ নভেম্বর তারিখে উহা জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। স্বাধীনতার পর এই পর্যন্ত দেশটিতে কুড়িবার পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থান ঘটে।

স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে। নির্বাচনে মুহাম্মাদ তাকী 'আবদুল-কারীম বিজয়ী হইয়া একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেন। এক পর্যায়ে তাকীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হইলে আনজুয়ান ও মোহেলী দ্বীপ দুইটি কমেরো হইতে পৃথক হইয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। ১৯৯৭ খৃ. কমোরোস সরকারী বাহিনী দ্বীপ দুইটিতে অভিযান পরিচালনা করে। সৈন্যদের অনেকেই এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া নিহত হয়। ১৯৯৮ খৃ. প্রেসিডেন্ট তাকীর মৃত্যু হইলে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টলটলায়মান লক্ষ করিয়া সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল আজালী আসুওমানি ক্ষমতা দখল করেন। এক পর্যায়ে আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় ২০০১ সালে গণভোটের মাধ্যমে দেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়।

উক্ত সংবিধানে বলা হয়, তিনটি দ্বীপেই নিজেদের স্বায়ত্তশাসন থাকিবে। প্রেসিডেন্টের অধীনে তিনটি দ্বীপের শাসনকার্য পরিচালিত হইবে। দুইজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট শাসনকার্যে তাঁহাকে সহযোগিতা করিবেন। ঐ দুইজন অন্য দুই দ্বীপের শাসকের দায়িত্বও পাশাপাশি পালন করিবেন। তবে দ্বীপ তিনটি হইতেই পালাক্রমে চার বৎসর পরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ থাকিবে।

সর্বশেষে ২০০৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কর্নেল মুহাম্মাদ বাক্র নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করিলে দেশে পুনরায় সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ২৫ মার্চ, ২০০৮ তারিখে আফ্রিকান ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী ঝটিকা আক্রমণ চালাইয়া কর্নেল মুহাম্মাদ বাক্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে। বাক্র তদীয় এগারজন সঙ্গীসহ স্পীডবোটে আরোহণ করিয়া পার্শ্ববর্তী ফরাসী শাসিত মাওত্তী দ্বীপে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

২০০৭ এর নির্বাচনে আনজুয়ান দ্বীপের কর্নেল বাক্র নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করিলেও সরকারীভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় কমোরোসের প্রেসিডেন্ট আহমাদ সাম্বি তাঁহাকে অপসারণের পথ খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে আফ্রিকান ইউনিয়ন তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে। ঐ সংস্থাটির সামরিক সাহায্য গ্রহণেই কর্নেল বাক্রকে উৎখাত করা সম্ভব হয়।

কর্নেল বব ডেনার্ড নামক একজন দুর্ধর্ষ ভাড়াটে ফরাসী সেনা কর্মকর্তা কমোরোসের অভ্যুত্থানসমূহের নায়করূপে আগাগোড়া সক্রিয় ছিল। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসন হইতে রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের পর সংঘটিত অধিকাংশ অভ্যুত্থানেই ঐ ব্যক্তিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৮ সালে ডেনার্ড কমোরোসের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আলী সোয়েলীহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ঐ অভ্যুত্থানে 'আলী সোয়েলীহ্ নিহত হন। আবার ক্ষমতায় আসীন হন আহমাদ 'আবদুল্লাহ। ডেনার্ড স্থায়ীভাবে অভিবাসিত হয়। সরকার তাহাকে যথারীতি কমোরোসের নাগরিকত্ব প্রদান করে। ইহার পর ডেনার্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সা'ঈদ মুসতাফা মাহজুব নাম ধারণ করেন। সেই অবধি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাঁহার সক্রিয় তৎপরতা ছিল।

ডেনার্ডের সর্বশেষ অভ্যুত্থান ছিল আহমাদ আবদুল্লাহর উত্তরসুরি প্রেসিডেন্ট সা'ঈদ যোহাবের বিরুদ্ধে। সেই অভ্যুত্থানটি সফল হইলেও নও মুসলিম ডেনার্ডের অপ্রতিহত দাপটকে আরও অধিককাল টিকাইয়া রাখাকে ফ্রান্স আর সুবিধাজনক বিবেচনা করে নাই। তাই ফরাসী সরকার ৩০০০ সেনা সম্বলিত একটি শক্তিশালী বাহিনী তাহাকে ফ্রান্সে উঠাইয়া লইয়া যায়। তাহারা তাহাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দেয়। ২০০৬ সালে বিচারে তাহার পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষিত হয়। বার্ধক্যে উপনীত কর্ণেল ডেনার্ড তথা সা'ঈদ মুসতাফা মাহ্‌জুব তখন দুরারোগ্য আলজেইমার রোগে আক্রান্ত। তাই মানবিক বিবেচনায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাহার মৃত্যুর পর সংঘটিত সর্বশেষ অভ্যুত্থানদৃষ্টে ধারণা করা হয়, কমোরোসের এই মুসলিম দ্বীপ রাষ্ট্রটি এখনও কর্ণেল ডেনার্ডের প্রদর্শিত পথেই আগাইয়া চলিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Oxford School Atlas, 24th ed.; 1993; (২) গোলাম মোস্তফা কিরণ, আজকের বিশ্ব : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী; (২) দৈনিক প্রথম আলো, ৪ এপ্রিল, ২০০৮; (৩) তারিক হাসান ও এস এম আবদুল হাই, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, আদিত্য প্রকাশনালয়, কোলকাতা, ২য় সং., ২০০৪।

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

করিমুন নেছা খানম চৌধুরানী (كريم النساء خانم) ঃ (১৮৫৫-১৯২৬ খৃ.), তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক অভিজাত মুসলিম জমিদার পরিবারে তাঁহার জন্ম। করিমুন নেছার পিতার নাম জহির উদ্দিন মুহাম্মদ আবু আলী সাবের এবং মাতার নাম রাহাতুন নেছা সাবের চৌধুরানী। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাংলার নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২ খৃ.) করিমুন নেছার ছোট বোন।

উর্দুভাষী পরিবারে-লালিত পালিত হইয়া তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় ভাইদের পড়াশোনা শুনিয়া বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সমকালীন রক্ষণশীল মুসলিম জমিদার পরিবারের রীতি অনুযায়ী করিমুন নেছাকে কঠোর পর্দা প্রথায় থাকিতে হইয়াছে। সেই সময়ে একমাত্র পবিত্র কুরআন শরীফ ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চারিত্রিক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান অর্জনের এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইয়েরা যখন তাহাদের শিক্ষকদের নিকট হইতে ফারসী কবিতার সবক নিত তখন করিমুন নেছা পর্দার আড়াল হইতে সেইগুলি শুনিয়া মুখস্ত করিতেন। করিমুন নেছা পবিত্র কুরআন শরীফের অর্থ জানা ও বোঝার জন্য ৬৭ বৎসর বয়সে আরবী শিক্ষা শুরু করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার জমিদার পরিবারের সন্তান আবদুল হাকিম খান আজনবি-এর সহিত মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে করিমুন নেছার বিবাহ হইয়াছিল। দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সন্তানসহ তিনি ২৩ বৎসর বয়সে বিধবা হন। করিমুন নেছা একজন প্রগতিশীল মহিলা হইবার কারণে কতিপয় আত্মীয়-স্বজনের মতের বিরুদ্ধে তাঁহার পুত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি তাঁহার ছেলেদেরকে কলকাতায় রাখিয়া পড়াশোনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃ. মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে করিমুন নেছার বড় পুত্র আবদুল করিম গজনবি (১৮৭২-১৯৩৯)-কে ইংল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ছোট ছেলে আবদুল হালিম গজনবিকেও কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করান। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরবর্তীকালে তাঁহার দুই ছেলেই অবিভক্ত বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে শওকত আলী ও মুহাম্মাদ আলী ভ্রাতৃদ্বয় রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের কল্যাণে যে ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, বাংলার গজনবি ভ্রাতৃদ্বয়ও সেই একই ভূমিকা রাখিতে সক্ষম হন। গজনবি ভাইদের এই সাফল্যের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের মায়ের কাছে ঋণী। করিমুন নেছা তাঁহার ছোট বোন বেগম রোকেয়ার বিদ্যাশিক্ষা লাভের ব্যাপারেও উৎসাহ দিয়াছিলেন। রোকেয়ার শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরের লোকজনের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও করিমুন নেছা তাঁহাকে সাহস ও উৎসাহ দ্বারা সমর্থন প্রদান করেন। করিমুন নেছা নিজেও একজন কবি ছিলেন। তিনি "দুঃখ তরঙ্গিনী" ও 'মানস বিকাশ" নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হয় নাই। তিনি পারিবারিক ঘটনা ও সামাজিক বিষয় লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। বেগম রোকেয়া (দ্র.) তাহার বড় বোন করিমুন নেছাকে স্বভাব কবি মনে করিতেন। রোকেয়া তাঁহার "লুকানো রত্ন" প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন যে, করিমুন নেছা কবিতা লিখিতেন।

করিমুন নেছা তাঁহার সমকালীন সময়ে প্রগতিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জাই কর্তৃক সম্পাদিত "আহাম্মদী" নামক একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সম্পূর্ণ তাঁহারই অর্থানুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হইত। ১৮৮৬ খৃ. দেলদুয়ার হইতে প্রথম প্রকাশিত আহাম্মদী পত্রিকাটিই প্রথম ম্যাগাজিন যাহা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কামনা করিত এবং মুসলমানদের সামাজিক-রাজনৈতিক কৃষ্টি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (দ্র. মীর মোশাররফ হোসেন) ১৮৮৪ হইতে ১৮৯২ খৃ. পর্যন্ত দেলদুয়ার জমিদারী এষ্টেটের ব্যবস্থাপক ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনকে তাঁহার সাহিত্য কর্মের ব্যাপারে করিমুন নেছা পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। মীর মশাররফ হোসেন রচিত অমর গ্রন্থ "বিষাদ সিন্ধু" (১৮৮৫ খৃ.) প্রথম সংস্করণ করিমুন নেছার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বেগম রোকেয়াও তাঁহার বিখ্যাত 'মতিচুর' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২১ খৃ.) বড় বোন করিমুন নেছার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। করিমুন নেছা চৌধুরানী ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ খৃ. ইন্তেকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩ খৃ., ২খ., পৃ. ১৬৬-১৬৭; (২) চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ৬২-৬৩; (৩) রংপুর জেলার ইতিহাস, জেলা প্রশাসন, রংপুর ২০০০ খৃ., পৃ. ৬৫৪; (৪) মোঃ আঃ রাজ্জাক সম্পা., বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী ১৪০০-১৯৮৫ খৃ., ২খ., মতিহার, রাজশাহী ১৯৮৮ খৃ., পৃ. ৮।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

কাওছার নিয়াযী (كوثر نيازى) ঃ মাওলানা, কবি, সাংবাদিক, লেখক, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ, ২১ এপ্রিল, ১৯৩৪ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সেই তিনি রাজনীতিতে জড়িত হইয়া পড়েন। কিছুকাল তিনি মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকরূপেও দায়িত্ব পালন করেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোরের প্রাচ্য ভাষা বিষয়ক বিভাগ হইতে বি.এ. সম্মান পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি উর্দূ, আরবী ও ফার্সীতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি সাংবাদিকতার সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি লাহোর হইতে প্রকাশিত উর্দূ দৈনিক তাসলীম ও কাওছারের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬০ খৃ. তিনি সাপ্তাহিক শিহাব নামক উর্দূ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। ঐ সময়ে তিনি মওলানা মওদূদী ও জামা'আতে ইসলামীর রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। মওলানা মওদূদী, নাসরুল্লাহ খান আযীয প্রমুখ উর্দূ সাহিত্যের মশহুর লেখক ও কবিগণের রচনা তাহাতে প্রকাশিত হইত। এক পর্যায়ে তিনি জাম'আতে ইসলামী লাহোর ডিভিশনের আমীর হিসেবে বিপুল সাংগঠনিক প্রতিভার ছাপ রাখেন। তখন তাঁহার সম্পাদিত সাপ্তাহিক শিহাব ছিল জামা'আতে ইসলামীর অফিসিয়েল মুখপত্র।

১৯৭০ খৃ. তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যখন আয়্যূব বিরোধী উত্তাল গণবিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতেছিল ঠিক ঐ সময় কাওছার নিয়াযী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টিতে যোগদান করেন এবং ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তাধারা হইতে তাঁর চির বিচ্যুতি ঘটে। ঐ পর্যায়ে তাঁহার সম্পাদিত সাপ্তাহিক শিহাব পিপল্‌স পার্টির মুখপত্ররূপে শীর্ষস্থানীয় উর্দূ সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং উক্ত দলের মুখপত্ররূপে হানীফ রাযের সম্পাদিত উর্দূ সাপ্তাহিক 'মুসাওয়াত'-কেও ডিঙ্গাইয়া যায়, কেননা কাওছার নিয়াযীর বক্তব্যে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ইসলামী ভাবধারার যে সংমিশ্রণ ছিল সমাজতন্ত্রী নেতা হানীফ রাযে-এর বক্তব্যে তাহার অভাব ছিল। ইনি ছাড়া ইতঃপূর্বেই শিহাব খ্যাতির তুঙ্গে পৌছিয়াছিল বিধায় পিপল্‌স পার্টির সমর্থকগণের কাছে উহা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

একজন উচ্চমানের বাগ্মী হিসাবেও কাওছার নিয়াযীর স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টরূপে জুলফিকার আলী ভুট্টো মাওলানা কাওছার নিয়াযীর ৭২৪ পৃষ্ঠা কলেবরের বক্তৃতামালা ও বক্তৃতা সংক্রান্ত পুস্তকের পরিচিতিতে লিখেন ঃ

"কোন গণআন্দোলনের সাফল্যের পেছনে গণ-ভাষণের উজ্জ্বল ভূমিকার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হইতেছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ইয়াহ্ইয়া খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনটি। এ আন্দোলন কয়েকজন নূতন জননেতা ও বাগ্মী পুরুষের জন্মদান করিয়াছে। মওলানা কাওছার নিয়াজী বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিসহ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি তাঁহাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের এক নূতন পরিকল্পনার সহিত পরিচিত করে। জবাবে ১৯৭০ খৃ.-এর নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে এবং পরবর্তীতে তিনি এমন এক ভাষা ও আঙ্গিকে সেই পরিকল্পনা জনসাধারণের এক বিরাট অংশের সম্মুখে ব্যাখ্যা করেন— যাহা তাহাদের নিকট বোধগম্য" (১ জুলাই, ১৯৭৫ তারিখে লিখিত জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরিচিতি, দ্র. আন্দাযে বয়ান, পৃ. ১১)।

১৯৭০ খৃ.-এর নির্বাচন পূর্বকালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানে তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দলত্যাগী প্রভাবশালী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি বিপুল শক্তির অধিকারী। মওলানা কাওছার নিয়াযী তখন ঐ দলের প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ইয়াহইয়া খানের সামরিক সরকার মওলানার অনলবর্ষী বক্তৃতা এবং তেজোদীপ্ত রচনাবলীর জন্য তাঁহাকে পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কিন্তু ১৯৭০ খৃ. পাকিস্তান ব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার কারারুদ্ধ অবস্থায়ই এক লক্ষ ভোট লাভ করিয়া পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহার সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সকলেরই জামানত বাজেয়াফ্‌ত হয়।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো যখন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন ১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে মওলানা কাওছার নিয়াযী প্রেসিডেন্টের তথ্য, প্রচার এবং হজ্জ ও ওয়াকফ বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম ধর্মমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হইলে তিনিই হন সর্বপ্রথম ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী। এক পর্যায়ে পাকিস্তানের আটটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

উর্দূ ভাষায় তাঁহার রচিত এক ডজনেরও অধিক পুস্তক রহিয়াছে। তাহাতে যেমন কবিতা ও সাহিত্য রহিয়াছে, তেমনি আছে ধর্মতত্ত্ব, তুলানামূলক ধর্মীয় আলোচনা, বক্তৃতা ও বক্তৃতা বিষয়ক প্রবন্ধমালা, জীবনীপুস্তক, ভ্রমণ কাহিনী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা। শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স পাবলিশার্স (লাহোর-হায়দরাবাদ-করাচী) প্রকাশিত তাঁহার পুস্তকাবলীর তালিকা ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) ইসলাম হামারা দীন — ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিষয়াদি সংক্রান্ত প্রবন্ধমালার সংকলন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০০।

(২) বাসীরাত — আল-কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যাভিত্তিক গ্রন্থ যেগুলি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পৃক্ত।

(৩) বুনিয়াদী হাকীকাতে — ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির তাৎপর্য এই পুস্তকে চমৎকারভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৪) আয়নায়ে তাছলীছ — ত্রিত্ববাদের দর্পণস্বরূপ যাহাতে খৃষ্টবাদের মধ্যে প্রচলিত ত্রিত্ববাদের স্বকপোলকল্পিত 'আকীদা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

(৫) তাখলীকে আদাম — ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের সেই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন কুরআন-হাদীছের আলোকে এমনভাবে এই গ্রন্থে করা হইয়াছে যে, মানবজাতি সৃষ্টি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বানর হইতে মানবে পরিণত হওয়ার ধারণা যে একান্তই অলীক তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

(৬) ইসলাম হামারা রাহনুমা হ্যায় — ইসলামের শিক্ষাবলীর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

(৭) মুতালা'আয়ে তারীখ — পাশ্চাত্যের ইতিহাস-দর্শনকে কুরআন হাদীছ এবং মুসলিম ঐতিহাসিকগণের রচনাবলীর আলোকে এই পুস্তকে অসার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

(৮) যরে গুল — মওলানা কাওছার নিয়াযীর কবিতা, গযল ও না'ত, নবী প্রশস্তিমূলক ভক্তি অর্ঘের সমাহার।

(৯) যিক্‌রে হুসায়ন — কারবালার ময়দানে হযরত হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত সংক্রান্ত গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ।

(১০) আন্দাযে বায়ান — ৭২৪ পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের এই গ্রন্থের ভূমিকা ভাগে ১১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী বক্তৃতার প্রস্তুতি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তারপর মাওলানার ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পার্লামেন্টারী ভাষণ এবং জনসভায় প্রদত্ত ভাষণসমূহ স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকে মুসলিম বাংলা ও পাকিস্তান শীর্ষক, এমনকি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণও রহিয়াছে যাহা মাওলানা ১৯৭৩ সালের ৯ জুলাই তারিখে বাংলাদেশকে অবিলম্বে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলিয়া দীর্ঘ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যখন গোটা পাকিস্তানে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশী জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত তিক্ত মনোভাব বিরাজ করিতেছিল।

(১১) রাহনুমায়ে হজ্জ — হজ্জ সংক্রান্ত নির্দেশনা পুস্তক, যাহাতে ধর্মীয় মাস্আলাসমূহের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব দিকনির্দেশনাও রহিয়াছে।

(১২) এক হপ্তাহ চীন মেঁ — গণচীন লোকের ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

(১৩) মীলাদুন্নবী আওর উস্কে তাকাযে — ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ঈদে মীলাদুন্নবী সংক্রান্ত আলোচনা-সমালোচনা।

(১৪) ইসলাম কে মা'আশী তাসাওউরাত — (ইসলামের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সংক্রান্ত একটি ভাষণ)। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে মাওলানা জোরালো যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের ভ্রান্তি নিরসনের যথেষ্ট খোরাক উক্ত ভাষণে রহিয়াছে। মাওলানা কাওছার নিয়াযী বলিয়াছেন, ইয়াহ্ইয়া সরকার বাংলাদেশের সহিত যে স্বৈরাচারী আচরণ করিয়াছে তাহা খুবই আপত্তিকর। মুসলিম বাংলার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় তবে বাঙালী মুসলমানদের মনমগজে ইহার সুদূরপ্রসারী খারাপ পরিণতি দেখা দিবে। তিনি তাঁহার এই দীর্ঘ বক্তৃতা স্বাধীন বাংলাদেশের অনিবার্য অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া সত্বর ইহার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রস্তাব রাখেন (দ্র. আন্দাযে বায়ান, মাওলানা কাওছার নিয়াযীর বক্তৃতা সংকলন, পৃ. ৬১২-২০)।

অবশেষে অনেক বিলম্বে হইলেও পাকিস্তান সরকার বাস্তবতা মানিয়া লইয়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশের জনগণের পরম সুহৃদ এই প্রাজ্ঞ আলিম রাজনীতিবিদ বিগত নব্বুইয়ের দশকের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

কানপূর (کانپور) ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্যতম জনাকীর্ণ বিভাগীয় শহর। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কানপূর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এক সময় ইহা ভারতের ম্যানচেষ্টার নামে সমধিক পরিচিত ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৬ মিটার উর্ধ্বে ইহার অবস্থান। কানপূরের উপর দিয়া দিল্লী-কোলকাতা আন্ত-নগর রেল চলাচল করে। এক হাজার চল্লিশ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট কানপূরের জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী প্রায় ৪.১৩ মিলিয়ন। ৬টি জিলা লইয়া কানপূর প্রশাসনিক বিভাগ গঠিত। জিলাসমূহ হইতেছে কানপূর নগর, কানপূর দিহাত, ইটাওয়া, আওরাইয়া, ফররোখাবাদ ও কনৌজ। ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে এইখানে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের শাখা কার্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও রেজিষ্ট্রার অব কোম্পানীজ শাখাও এইখানে অবস্থিত (http:kanpuranagar.nic.in/ geography)।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ঃ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ হইতে ৮০ কিলোমিটার দূরে কানপূর অবস্থিত। কানপূরের তিন দিকে দুইটি নদী প্রবাহিত। উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা ও দক্ষিণে যমুনা নদী দ্বারা কানপূর পরিবেষ্টিত। কানপূরের দক্ষিণে হামিদপুর, উত্তর-পশ্চিমে উন্নাও, উত্তরে ফররোখাবাদ এবং পশ্চিমে ইটাওয়া জিলা অবস্থিত। প্রবহমান নদী, তৃণমূল আচ্ছাদিত বন ও শ্যামল উপত্যকার কারণে কানপূর বহু স্বদেশী-বিদেশী অতিথি পাখির নিরাপদ বিচরণস্থল। বিথুর, আই.আই.টি ক্যাম্পাস (Indian Institute of Technology) ও গঙ্গা নদীর উভয় তীর বিভিন্ন প্রজাতির বর্ণিল পাখির কলকাকলিতে মুখর থাকে সর্বক্ষণ। জানুয়ারী মাসে কানপূরে তাপমাত্রা স্থিত থাকে গড়ে প্রায় ১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। শীতকালে শৈত্যপ্রবাহ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যখন তাপমাত্রা মাইনাস তিন ডিগ্রী হইতে ১২-১৪ ডিগ্রীতে উঠানামা করে। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে কুয়াশার চাদরে গোটা এলাকা ঢাকা পড়িলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-জুন) ধূলিঝড়সহ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৭.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছে (www. en.wikipedia.org/ kanpur; India, Edited by a group of Scolars and Published by Lonely Planet, Australia, 2005, p. 317)।

নামকরণ ও ইতিহাস ঃ কানপূরের নামকরণ লইয়া নানা মত প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন কর্ণপূর হইতে কানপূরের উদ্ভব। মহাভারতের অন্যতম যোদ্ধা 'কর্ণ'-এর নামানুসারে ইহার নামকরণ। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী কানপূর শব্দটি কন্যাপূর হইতে উদ্ভূত। শ্রী কৃষ্ণের কর্মপ্রয়াসের সহিত 'কন্যা' শহরের নাম বিযুক্ত। প্রাচীন সাচেন্দী রাজ্যের তৎকালীন রাজা শ্রী হিন্দু সিংহ কর্তৃক কানপূর বিকাশ লাভ করে। বৃটিশ আমলে ইংরেজরা কানপূরকে উচ্চারণ করিত Cawnpore রূপে। কনৌজের সিংহাসনের মালিক প্রয়াগের রাজা শ্রী কান্দি দেও ১২০৭ খৃ. 'কোহনা' গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা পরবর্তীতে কানপূর নামে পরিচিতি লাভ করে। তৎকালীন শাসক মিহির, ভোজ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কানপূর কনৌজের অধীনে শাসিত হইত। পরবর্তীতে জৈনপূর ও শূর বংশের শাসকগণ কানপূর শাসন করেন। ১৫৭৯ সালে শের শাহের শাসনামলে কানপূর নামটি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কানপূর ছিল গুরুত্বহীন এক গ্রাম। ক্রমান্বয়ে কানপূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান কানপূরের সন্নিহিত আট মাইল পূর্বে 'জাজমাউ' নামক স্থানে বৃটিশ বাহিনীর হস্তে অযোধ্যার নবাব ওয়াযীর পরাজিত হন। তখন হইতে বৃটিশ বাহিনী কানপূরের কৌশলগত গুরুত্ব অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ক্রমশ নিজেদেরকে কানপূরে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। ব্যবসায়ীদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে অযোধ্যার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কানপূরে স্থানান্তরিত করা হয়। অযোধ্যার তৎকালীন নওয়াব সা'আদাত 'আলী খান এক চুক্তি অনুযায়ী ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কানপূর বৃটিশদের হস্তে তুলিয়া দেন। কানপূরের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা (Turning Point) হিসাবে চিহ্নিত। তখন হইতে কানপূর ছোট্ট গ্রাম

হইতে বৃটিশ-ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র ও বৃহৎ শিল্পাঞ্চলরূপে পরিগণিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কানপুরকে জিলা ঘোষণা করা হয়।

ভাষা ও ধর্ম ঃ কানপুরের ভাষাসমূহের মধ্যে রহিয়াছে হিন্দী, ইংরাজী ও উর্দূ। হিন্দী ও উর্দূভাষীর সংখ্যা সবচাইতে বেশী। ইহা ছাড়াও এতদঞ্চলের কিছু মানুষ বাংলা ও পাঞ্জাবী ভাষায় কথোপকথনে অভ্যস্ত। অভিজাত হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্যে ইংরাজীর প্রচলন অধিক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগুরু হইলেও অন্যান্য বড় ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। জনসংখ্যার দিক দিয়া হিন্দুদের পরে মুসলমানদের অবস্থান। সাময়িক বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ছাড়া সারা বৎসরই সব ধর্মাবলম্বী স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ পায়। সুপ্রাচীন কাল হইতে কানপুরে বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অধিবাস। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অসহিষ্ণু ও বৈরী আচরণের ফলে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ অন্যত্র চলিয়া গেলেও এখনও তাহাদের উপস্থিতি গণ্য করিবার মত। প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের অবস্থান অবস্থিতিও কম নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ হইতে মিশনারীগণ কানপুরে আসিয়া ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করে। অভাব, দরিদ্রতা ও পশ্চাদপদতার সুযোগ লইয়া তাহারা কানপুরে ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় ধর্মান্তরকরণে তাহাদের সফলতা চোখে পড়িবার মত। শতাব্দীর ব্যবধানে All Souls Cathedral-এর মত কানপুরে বহু সুদৃশ্য গীর্জা গড়িয়া উঠে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঃ কানপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালনে কেহ আইনগত বাধার সম্মুখীন নহে। পড়া-লেখা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নাই। কানপুরের সার্বিক উন্নয়নে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠীর নিরলস শ্রম ও অবদান রহিয়াছে। তবে মাঝে-মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হইলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ভারত বিভাগ-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বহু মুসলমানের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৪৮ সালে কানপুরের ফুলবাগে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

রত্নগর্ভা কানপুর ঃ কানপুর যুগে যুগে বহু সংখ্যক স্বর্ণসন্তানের জন্ম দিয়াছে, যাহারা সমাজ হিতৈষণা, রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ধর্মপ্রচার, ব্যবসা, বৈদেশিক বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ও ঐতিহ্য লালনে বিপুল অবদান রাখিতে সক্ষম হন। হিন্দী এবং উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও বিকাশ ধারায় কানপুরের বুদ্ধিজীবীদের সবিশেষ অবদান ইতিহাস স্বীকৃত। তাঁহাদের মধ্যে নানা রাও পেশোয়া, তাঁতিয়া তোপ, সরদার ভগত সিংহ, চন্দ্র শেখর আযাদ, শ্যামলাল গুপ্ত প্রসাদ, আচার্য মহাবীর প্রসাদ, গনেশ শংকর বিদ্যার্থী, প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র, কবি গোপাল দাস নিরাজ, আচার্য গয়া প্রসাদ, শুক্লা ও বলকৃষ্ণ শর্মার নাম উল্লেখ করিবার মত। 'ঝান্ডা উঁচা রাহে হামারা' নামক দেশাত্মবোধক কবিতার জন্য শ্যামলাল গুপ্ত প্রসাদের খ্যাতি ভারত জোড়া। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (মৃ. ১৯২৭ খৃ.) কানপুরের সন্তান (মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আল-হাসানী, সীরাতে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী, পৃ. ৭)।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কানপুরের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন কানপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কানপুরে অনুষ্ঠিত মাদরাসায়ে ফয়যে 'আম-এর বার্ষিক সম্মেলনে ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের উপস্থিতিতে 'নাদওয়াতুল উলামা' নামক আলিমদের একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠিত হয়। এই সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (র), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (র), মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (র) ও মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী। 'নাদওয়াতুল উলামা'-এর ব্যবস্থাপনায় কানপুরে 'দারুল উলূম' নামক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইহা বৃহত্তর পরিবেশে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা' এশিয়া মহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দীনি শিক্ষানিকেতন।

শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঃ বহু মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গোটা ভারত জুড়িয়া কানপুরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। কানপুরের নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিদ্যমান ঃ ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজী (IIT), চন্দ্র শেখর আযাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট (HBTI), গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রাল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট (GCTI), গভর্ণমেন্ট লেদার ইনষ্টিটিউট (GLI), ন্যাশনাল সুগার ইনষ্টিটিউট (NSI), ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পালসেস রিসার্চ (IIPR), গনেশ শংকর বিদ্যার্থী মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজ (GSVMC), ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (IET), ইনষ্টিটিউট অফ বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট (IBM), ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী (UIETK) ও ছত্রপতি শাহ্ জী মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়। মাদ্রাসায়ে ফয়যে 'আম ও জামিউল উলূম কানপুরের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষায়তন। এই দুই প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখ্যক দীনদার আলিম, সমাজসেবী ও মেধাবী লেখকের জন্ম দিয়াছে।

শিল্প-কারখানার বিকাশ ঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে কানপুর চামড়াজাত সামগ্রী ও টেক্সটাইল শিল্প কারখানার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৬০ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেনাবাহিনীর জন্য জুতা, বেল্ট ও ব্যাগসহ চামড়াজাত সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশে বৃটিশ সরকার যথাক্রমে Harness & Saddler Factory, The Elgin Mills, Cooper Allen & Co, Moire Mills প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ, ঋণ সুবিধা, কারিগরী পরামর্শ, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় বৃটিশ ইন্ডিয়া কর্পোরেশন (BIC)। ১৯৩০ সাল হইতে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তারা কটন, টেক্সটাইল, ষ্টিল রিরোলিং, চা প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন।

পরিবেশ দূষণ ঃ বিপুল সংখ্যক চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট, লেদার ফ্যাক্টরী, ষ্টিল ও টেক্সটাইল মিলসহ ভারী শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে কানপুর পরিবেশ দূষণের শিকার হয়। কারখানার বর্জ্য ও চিমনি হইতে নির্গত ধোঁয়া প্রতিনিয়ত বায়ু দূষণ করিয়া চলিয়াছে, যাহা বর্তমানে বিপদ সীমার পর্যায়ে উন্নীত। যথাযথ নগর পরিকল্পনার অভাবে দিল্লীর

পর ভারতের উত্তরাঞ্চলের এই নগরী জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে স্বাভাবিক পরিবেশ বিপর্যস্ত। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ বান্ধব নগরায়ন বাধাগ্রস্ত হইতেছে।

সিপাহী বিপ্লবে কানপুর ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে কানপুর ছিল বৃটিশ সেনা ছাউনী। সাত হাজার সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থান করিত। ১৮৫৭ সালের ৭ জুন নানা সাহিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বৃটিশ আন্ডার কমান্ডার Huge Wheeler পশ্চাদপসরণ করিয়া ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটি অগভীর পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইহা Wheeler Entrenchment নামে পরিচিতি লাভ করে। নানা সাহিবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের হস্তে ৯০০ বৃটিশ সৈন্য ২২ দিন যাবত সেনানিবাসে অবরুদ্ধ থাকে। তাহারা এই মর্মে আত্মসমর্পণ করে যে, পার্শ্ববর্তী ছুতী ছাউরা ঘাটে যাওয়ার সুযোগ দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বজরাযোগে এলাহাবাদে পৌছিতে পারে। যেইমাত্র বৃটিশ সেনাদল নৌকায় আরোহণ করে, সমবেত দর্শকদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি রণশিঙ্গা বাজায়, ফলে অস্থিরতা দেখা দেয়। মাঝি-মাল্লারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পানিতে ঝাপ দেয় এবং বৃটিশ সেনাদল সোজা ক্যান্টনমেন্টে প্রত্যাবর্তন করত অস্ত্র লইয়া জনতার উপর চড়াও হয়। বিদ্রোহীগণ ধৈর্য হারাইয়া এলোপাতাড়ি গুলি চালাইতে থাকে। ফলে বহু বৃটিশ সৈন্য প্রাণ হারায় এবং দুই শত বৃটিশ নারী-পুরুষকে সিপাহী জনতা নদীর তীরে লইয়া আসে এবং বিবিঘর নামক এক ভবনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিছুদিন পর জেনারেল Henry Havelock-এর নেতৃত্বে বৃটিশ সেনাবাহিনী পুনরায় কানপুরের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য আগাইয়া আসিতেছে—এই সংবাদ প্রচারিত হইবার পর বন্দীদের হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৫৭ সালের ১৮ জুলাই বৃটিশরা কানপুর শহরে প্রবেশের মাত্র তিনদিন পূর্বে বাছাই করা চারজন কসাই সব বন্দীদের হত্যা করে। তাহাছাড়া খণ্ড বিখণ্ড দেহ পার্শ্ববর্তী গভীর কূপে নিক্ষেপ করা হয়। বৃটিশ সেনাদল জেনারেল Neill-এর নেতৃত্বে শহরের দায়িত্বভার গ্রহণ পূর্বক বিদ্রোহী সেনা, নারী, পুরুষ, শিশুসহ সাধারণ জনগণের প্রতি প্রতিশোধ জিঘাংসায় মাতিয়া উঠে। একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাইতে থাকে (Alfred Knop, The Fall of a Dynasty, 1857; Dalrymple, W., The Last Mughal)। কানপুর পুনঃদখলের পর বৃটিশরা বিবিঘর ধ্বংস করিয়া দেয়, স্থানটি লৌহ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখে এবং কূপের পাশে ক্রুশ স্থাপন করে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্যার কলিন ক্যাম্বেল পুরাপুরিভাবে কানপুর জয় করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে All souls cathedral নির্মিত হয় (ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, পৃ. ৩৫৯)।

দর্শনীয় স্থান ঃ দর্শক ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করিবার মত বহু দর্শনীয় স্থান রহিয়াছে কানপুরে। জাজমাউ একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৫৭-৫৮ খৃ. পরিচালিত ব্যাপক খনন কার্যের ফলে জাজমাউ-এর টিপি হইতে ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ—১৬০০ খৃষ্টাব্দ নির্মিত বহু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে জাজমাউতে সিদ্ধনাথ এবং সিদ্ধদেবীর মন্দির রহিয়াছে। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ তুঘলক কর্তৃক নির্মিত বিখ্যাত সূফী সাধক হযরত মাখদুম শাহ আলাওল হক (র)-এর সমাধি সৌধ জাজমাউ-এর একটি বাড়তি আকর্ষণ। ইহা ছাড়াও ১৬৭৯ সালে কুলিছ খান কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদও রহিয়াছে। জাজমাউ এলাকায় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বৈদিক যুগের স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন চন্দ্রফানসী বংশের জনৈক রাজা জৈয়াতী কর্তৃক এই দুর্গ নির্মিত হয় বলিয়া কথিত আছে। কানপুরের শিবরাজপুর হইল অন্যতম ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান। ইহা কানপুরের রেলওয়ে ষ্টেশনের ২০ কি.মি. দূরে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। চান্দেল রাজা সতী প্রসাদ তাঁহার রানীর স্মৃতিকে অম্লান রাখিবার জন্য এই দুর্গ নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে, বিপুল সংখ্যক শ্রমিক মাত্র একদিনে এই মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করে। এই মন্দিরটি চমৎকার স্থাপত্য কৌশল ও উৎকৃষ্ট নকশা শৈলীর জন্য বিখ্যাত।

হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য জে. কে. মন্দির অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপাসনাগার। প্রাচীন ও আধুনিক সমন্বিত পরিচর্যায় এই মন্দির ভক্ত-পূজারীদের নিকট অতি পবিত্র। শ্রী কৃষ্ণের নামে উৎসর্গিত এই মন্দির কানপুরের পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা কানপুর হইতে ২৭ কি. মি. দূরে কনৌজ সড়কে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। বিথুর-এর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান। এইখানে ৪৮ ধাপবিশিষ্ট একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার রহিয়াছে। ৮১৯ হইতে ১৮১১ খৃ. পর্যন্ত বিথুর পরগনা রাজ্যের রাজধানী ছিল। নওয়াব সুজাউদ্দৌলার শাসনামলে (১৭৫৩-৭৫) বিথুর-এর প্রশাসনিক দায়িত্ব আলমাছ আলী খানের উপর ন্যস্ত করা হয়, যিনি লক্ষণঘাটের সন্নিকটে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কানপুরের 'ম্যাসাকার ঘাট' একটি ঐতিহাসিক স্থান, যেইখানে ১৮৫৭ সালে নানা রাও পেশোয়া, দেশমুখ ও তাঁতিয়া তোপের নির্দেশে বৃটিশ সৈনিকদের হত্যা করা হয়। ইহা সুতী ছাউরা ঘাট নামেও পরিচিত। মোঘল স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত কানপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ভবন কানপুর শহরের শোভা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। গম্বুজবিশিষ্ট লাল বর্ণের সুপরিসর এই ভবন ও প্লাটফরম হাজার হাজার আন্তঃজিলা যাত্রীর গমনাগমনে সর্বদা মুখরিত থাকে। অপরাপর দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এলেন ফরেষ্ট চিড়িয়াখানা, ফুলবাগ, মতিঝিল, কৃষি গার্ডেন, কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নানা রাও পার্ক, গ্রীণ পার্ক ও ষ্টেডিয়াম রহিয়াছে।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঃ কানপুরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং জনসংখ্যার দিক দিয়া মুসলমানদের অবস্থান দ্বিতীয়। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানদের রহিয়াছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও কীর্তিময় বর্তমান। কানপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টিতে বহিরাগত সূফী-দরবেশদের বিরাট অবদান রহিয়াছে। শত বৎসরের পথ পরিক্রমায় কানপুরের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মারকায ও খানকাহ। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ধর্মীয় সংবাদ সাময়িকীর মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। কানপুর বহু প্রথিতযশা আলিম, সূফী-দরবেশ, লেখক ও সাংবাদিকের জন্ম দিয়াছে, যাহারা নিজ নিজ পরিমণ্ডলে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখিতে সক্ষম হন। এলাকার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সংখ্যক উলামা-মাশায়েখ কানপুরে আসিয়া ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত হন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) প্রায় দেড় যুগব্যাপী মাদ্রাসা ফয়যে 'আম ও জামিউল উলূমে কুরআন, হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি অবসর সময়ে তিনি পরিকল্পিতভাবে কানপুরের সর্বত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ওয়ায মাহফিল, পাঠচক্র ও ইল্‌মী মজলিসে বয়ান পেশ করিতেন। তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ এই খিদমতের ফলে

কানপূরের বহু মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং বিপুল সংখ্যক মুসলমানের আকীদা ও চরিত্র সংশোধিত হয়। পরবর্তী সময়ে থানভী (র) তাঁহার জন্মস্থান মুযাফ্ফরনগর জিলার থানাভূনে প্রত্যাবর্তন করিলে কানপূরের ইসলাহী কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব বর্তায় তাঁহার খলীফা হাকিম নূর আহমাদ কানপূরীর উপর (আশরাফুস সাওয়ানিহ, ১খ-৩খ)।

কানপূর অঞ্চলে অধ্যাত্ম সাধনা ও ইসলাহে বাতিনের কাজ শত বৎসরের ঐতিহ্য ধারায় নানা দিক দিয়া অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে। শায়খুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানী (র) বহুবার কানপূর সফর করিয়া সাধারণ মানুষকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন এবং আত্মসংশোধনের উপর জোর দেন। পরবর্তী সময়ে তাঁহার খলীফা করীম বখশ এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। মাওলানা সায়্যিদ আস'আদ মাদানীর তিনজন খলীফা কানপূরে ধর্মপ্রচার ও চরিত্র সংশোধনমূলক তৎপরতার সহিত জড়িত। তাঁহারা হইলেন : কর্ণেলগঞ্জের হাজী মুহাম্মাদ হাসান, মাওলানা যফরুল হাসান ও আকবরপূরের সায়্যিদ বিশারত আলী (সাপ্তাহিক আল-জমিয়ত, নয়া দিল্লী ১৯৫৮, পৃ. ১৭; সাপ্তাহিক আল-জমিয়ত, নয়া দিল্লী, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৫৭৮)।

কানপূরে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, মুসলিম পারিবারিক আইনের হিফাযত ও সমাজে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাওলানা মুফতী মানযূর আহমদ জৌনপূরী (র)-এর সবিশেষ অবদান রহিয়াছে। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরিয়া তিনি কানপূর জামিউল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, বায়যাবী ও হিদায়া'র পাঠদান করেন। তাঁহার আকর্ষণীয় দরসে অংশ লইবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যাইত। তিনি দারুল উলূম, দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপূরের মজলিশে শূরা-এর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। মাওলানা মুফতী মানযূর আহমদ জৌনপূরী (র) শরয়ী আদালত (ইদারাতুল কাদা আশ-শরয়ীআহ) কানপূর বেঞ্চের সভাপতি হিসাবে বিবাহ, খোরপোষ, দেনমোহর, তালাক, খুল'আ, শিশুর অভিভাবকত্ব, নারী নির্যাতন, স্বামীর অবাধ্যতা, পরকিয়া প্রেম ও দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার বিষয়ক বহু মামলায় যুক্তিগ্রাহ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ রায় ও অভিমত (Ruling/Judgement) প্রদান করেন। তাঁহার লিখিত 'তিন তালাক কা মাসআলা' এতদঞ্চলে আহলে ইলমদের নিকট বেশ জনপ্রিয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-৪)। মাওলানা মুফতী আবদুল মু'ইয কানপূরী বেকনগঞ্জস্থ মাযহারুল উলূম মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন এবং কুরআন-হাদীছের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে কানপূরের শায়খ কালান ওয়ালী গলিতে আশরাফুল মাদারিস এবং ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে ইদারায়ে দাওয়াতুল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ নামে দুইটি মাদ্রাসা কায়েম করেন। মাওলানা মুফতী আবদুল মু'ইয কানপূরী মাযাহির উলূম সাহারানপূর হইতে দাওরায়ে হাদীছ সনদ লাভ করিবার পর কানপূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উর্দূ সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সমাজ হইতে লটারীর নামে জুয়া এবং মাদকাসক্তি হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য তিনি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন।

মাওলানা আবদুল কাইয়ূম কানপূরী (র)-এর সবচাইতে বড় অবদান হইল ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে 'ইদারায়ে মা'আরিফ মিল্লী কানপূর' নামক গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার নিজের লিখিত 'ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী' ও 'তারীখে মাশায়েখে নকশবন্দী' ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। মাওলানা আবদুল কাইয়ূম কানপূরী (র) শর'য়ী আদালত (ইদারাতুল কাদা আশ-শরঈআহ) কানপূর বেঞ্চের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ২০৬-২০৮)।

কানপূরে জন্মগ্রহণকারী আলিমগণ যাঁহারা ইসলামের বিভিন্ন দিক লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ যায়দ কানপূরীর নাম শীর্ষস্থানীয়। তিনি গোটা জীবন জ্ঞানসাধনা, গবেষণা, সম্পাদনা ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার সম্পাদিত ও লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮২টি। তিনি লক্ষ্ণৌর দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শরী'য়া অনুষদের উস্তাদ ছিলেন। কানপূরে সহীহ 'আকীদার বিকাশ ও ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁহার রচনাবলীর বিশেষ অবদান স্বীকৃত। তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) রচিত ৪৭টি গ্রন্থকে বিষয় ভিত্তিক বিন্যস্ত করিয়া সম্পাদনা করেন (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৪৩-১৫৬)।

কানপূর হইতে বহু ইসলামী গবেষণা ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। এইগুলির মধ্যে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (র) সম্পাদিত 'মানশূরে মুহাম্মাদী', মাওলানা মুফতী মানযূর আহমাদ জৌনপূরী সম্পাদিত মাসিক 'পায়ামে সুন্নাত' এবং মাওলানা আবদুল কাইয়ূম কানপূরী সম্পাদিত মাসিক 'নিযামে কানপূর' উল্লেখযোগ্য। মাওলানা মুফতী আবদুল মু'ইয কানপূরীর সম্পাদনায় ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে মাসিক 'মাতা'য়ে আখিরাত' ১৯৯২ সালে সাপ্তাহিক, ১৯৯৬ সালে পাক্ষিক এবং ১৯৯৯ সালে দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কানপূরের মুসলমানগণ কালো বর্ণবিশিষ্ট মখমল কাপড়ে (Velvet sheet) তৈয়ারী এক ধরনের টুপী পরিধান করিয়া থাকেন, যাহা পুরা উপমহাদেশে 'কানপূরী টুপী' নামে সমধিক খ্যাত। এই টুপী যুগ যুগ ধরিয়া কানপূরের মুসলিম আভিজাত্যের প্রতীক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (মৃ. ১৯২৭ খৃ.) কানপূরের সন্তান। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কানপূরে জন্মগ্রহণ করেন। কানপূরের মাদরাসায়ে ফয়যে আমে প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করিয়া তিনি মাওলানা লুতফুল্লাহ্ আলীগড়ীর নিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কিতাবসমূহের পাঠ সমাপ্ত করেন। পরবর্তী সময়ে 'সিহাহ সিত্তা'-এর দরস সম্পন্ন করেন মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপূরী (র)-এর নিকট। কানপূরের দুলারী মসজিদ ও মাদরাসায়ে ফয়যে আমে পর্যায়ক্রমে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁহার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা। ভারতের প্রখ্যাত সাধক মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর সান্নিধ্যে থাকিয়া তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হন এবং পরবর্তীতে খিলাফত প্রাপ্ত হন। ভারতে খৃষ্টান মিশনারী ও কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি রীতিমত প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন। উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুরা ভারতবর্ষে ২৫০টি মিশনারী গ্রুপ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে মাঠে নামে। দলে দলে ইউরোপীয় দেশ হইতে মিশনারীগণ আসিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে পাঞ্জাবে স্কটল্যান্ড ব্রেজীট্রেইন গীর্জা, রাজপুতানাসহ ভারতের অপরাপর রাজ্যে আয়ারল্যান্ডের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা এবং ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে আমেরিকার মেথোডিষ্ট গীর্জা গড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষে সাধারণ জনগণের দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব ও পশ্চাদপদতাকে

পুঁজি করিয়া মিশনারীগণ অর্থভাণ্ডার লইয়া তাহাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশেষত অনাথ ও য়াতীম শিশুরা মিশনারীদের টার্গেটে পরিণত হয়। অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিয়া পিতৃ-মাতৃহীন বালক-বালিকাদের অনাথ আশ্রমে লইয়া যায় এবং মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ংকরী দুর্ভিক্ষের পর ধর্মান্তরের এই প্রক্রিয়া বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করিয়া মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (র) কানপুর কেন্দ্রিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। তখন কেবল কানপুরে নয়টি মিশনারী সংস্থা তৎপর ছিল। ভারতীয় জনগণকে মিশনারীদের ব্যাপারে সতর্ককরণের উদ্দেশ্যে তিনি কানপুর হইতে 'মানশুরে মুহাম্মাদী' নামক একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান জনগোষ্ঠীর অনাথ বালক-বালিকারা যাহাতে মিশনারীদের খপ্পরে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কানপুরে একটি য়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক উত্থাপিত নানা অভিযোগের প্রামাণিক জওয়াব দানের জন্য তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং এই প্রেস হইতে ১০০টি ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি একাই ৫০টি পুস্তক রচনা করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (র)-এর সংস্কার আন্দোলনের ফলে কানপুর অঞ্চলে মুহররমের শোক মিছিলে (তাযিয়া) সুন্নী মুসলমানের অংশগ্রহণ হ্রাস পায়। তাঁহার ঐকান্তিক মেহনতের ফলে মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটে। হিন্দু রীতির প্রভাবে সেই কালে মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ দূষণীয় হইয়া পড়ে (সীরাতে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (র), পৃ. ৩-৪২১)।

মাওলানা আবদুর রায্যাক কানপুরী (মৃ. ১৯৪৮ খৃ.) লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বারামাকা' ও 'ইয়াদে আয়্যাম' এতই জনপ্রিয় যে, বিষয় বিন্যাস ও রচনাশৈলীর দিক দিয়া এইগুলিকে শিবলী নু'মানীর রচনার সহিত তুলনা করা হয়। মাওলানা ফয্লুল্লাহ্ কানপুরী (মৃ. ১৯৭৯ খৃ.) হায়দরাবাদের উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর। তিনি ইমাম বুখারী রচিত 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর শরাহ্ লিখেন, যাহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় (তাযকিরায়ে মাশাহিরে হিন্দ (কারওয়ানে রাফ্তা), পৃ. ১৯, ১৬১, ২১২, ২৩৫; তাহ্রীকে আযাদিয়ে হিন্দ মে মুসলিম উলামা আওর আওয়াম কা কিরদার, পৃ. ২০৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) India, 11th ed., Published by Lonely Planet, Australia ২০০৫; (২) মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ শাহিদ, উলামায়ে মাযাহির উলূম সাহারানপূর, উনকি ইলমী ওয়া তাসনিফী খিদমাত, সাহারানপূর, ইউ. পি. ভারত, ২য় সং., ২০০৫ খৃ., ১-৫ খ.; (৩) Alfred Knop, The Fall of a Dynasty, 1857, Dalrymple, W., The Last Mughal; (৪) Microsoft Encarta Reference Library, CD. No. 2; (৫) সাপ্তাহিক আল-জমিয়ত, নয়া দিল্লী, এপ্রিল ২০০৭; (৬) সাপ্তাহিক আল-জমিয়ত, নয়াদিল্লী ১৯৫৮; (৭) আযিযুল হাসান মাজযুব, আশরাফুস সাওয়ানিহ, থানাভূন, ইউ. পি., ভারত ১৩০৮ হি., ১-৩খ.; (৮) আবদুর রশীদ রাশেদ, বিশ বড়ে মুসলমান, লাহোর ২০০১ খৃ.; (৯) মাওলানা আসীর আদরভী, তাযকিরায়ে মাশাহিরে হিন্দ (কারওয়ানে রাফ্তা), হায়দরাবাদ, ভারত ১৯৯৪ খৃ.; (১০) মুহাম্মাদ সালমান মানসূরপূরী, তাহরীকে আযাদিয়ে হিন্দ মে মুসলিম উলামা আওর আওয়াম কা কিরদার, দেওবন্দ, ভারত ২০০৪ খৃ.; (১১) মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল-হাসানী, সীরাতে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (র), লক্ষ্ণৌ, ভারত ২০০৫ খৃ.; (১২) ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ২য় সং., ঢাকা ২০০৬ খৃ.।

ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

কাযী আদুদুদ্দীন ই'জী (قاضى عضد الدين اعجى) ঃ তাঁহার নাম আহ্মাদ এবং পিতার নাম আবদুর রহমান। তিনি হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর বলিয়া কথিত আছে। ইরানের শীরায এলাকায় অবস্থিত ই'জ নামক স্থানে ৬৬০ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ও নামীদামী আলিমগণের নিকট তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন। আল্লামা বায়যাভীর শাগরিদ শায়খ যায়নুদ্দীন হান্কী ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান উস্তাদ।

কাযী আদুদুদ্দীন ই'জী তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই সুলতানীয়ায় অতিবাহিত করেন। তিনি আবূ সাঈদের শাসনামলে গোটা রাষ্ট্রের কাযী বা প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন কিন্তু পরবর্তীতে কিরমানের গভর্ণরের কোপানলে পতিত হইয়া দারিমিয়ান দুর্গে বন্দী হন। সেই বন্দী দশায়ই ৭৫৬ হি. সনে উক্ত কিল্লায়ই তিনি ইনতিকাল করেন।

কাযী আদুদুদ্দীন ই'জী তাঁহার সমসাময়িক কালে মা'কুলাত তথা হিক্মত-দর্শনের ইমাম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এতদ্ব্যতীত উসূলে ফিক্হ, ইলমুল কালাম, মা'আনী ও ইলমুল বায়ান, নাহ্ব (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র) এবং ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলিম ছিলেন। তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া খ্যাতির শীর্ষে আরোহণকারীগণের মধ্যে রহিয়াছেন শামসুদ্দীন কিরমানী, যিয়াউদ্দীন 'আফীফী, সা'দুদ্দীন তাফতাযানী প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই শেষোক্ত তাফতাযানী লিখিত শারহুত তাহযীব প্রভৃতি গ্রন্থ এতই কালজয়ী প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দীর্ঘ সাত শতাব্দীর ব্যবধানে অদ্যাবধি তাহা বিশ্বের দেশে দেশে পাঠ্য বইয়ের মর্যাদা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

তিনি অত্যন্ত বিত্তশালী ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তাই আপন শিষ্য-শাগরিদগণের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক বিখ্যাত দার্শনিক আলিম আছীরুদ্দীন উভরী (মৃ. ৭৩৩ হি.)-এর সহিত তাঁহার প্রায়ই বাহাছ-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইত।

কাযী আদুদুদ্দীন ই'জী রচিত গ্রন্থসমূহ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইল্মুল কালাম বিষয়ক তাঁহার কিতাব মাওয়াকিফ (مواقف) সেই কালজয়ী গ্রন্থ যাহার ভাষ্যগ্রন্থ শারহুল মাওয়াকিফ রচনা করিয়া শারীফ জুরজানীও বিশ্বব্যাপী সুনামের অধিকারী হইয়াছেন। উক্ত ভাষ্য পুস্তকটি মুসলিম বিশ্বের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র পাঠ্যপুস্তকরূপে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। উসূলে ফিক্হ বিষয়ক তাঁহার রচিত গ্রন্থ শারহ্ মুখতাসার আল-হাজিব (شرح مختصر الحاجب), ইলমুল মা'আনী ও বায়ান বিষয়ক তাঁহার রচিত قواعد البيانية-ও অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা, খ. ৬; (২) দুরার কামিনা (دررکامنه), খ. ২; (৩) মওলানা আবদুস সালাম নদবী, হুকামা-ই ইসলাম, খ. ২, মাতবা মা'আরিফ, আজমগড়, ভারত ১৯৫৬ খৃ.।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

কাশগড় ঈদগাহ মসজিদ (كاشغر عيدگاه مسجد) ঃ চীনের পশ্চিমাঞ্চলের কাশগড় শহরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। কাশগড়

শহরের (দ্র. কাশগার) কেন্দ্রীয় স্কোয়ারে ইহার অবস্থান। চীনের জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত মসজিদটি কিছু ইসলামের স্থাপনার সমষ্টি। ইহাতে সাংস্কৃতিক রীতি ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাহারও মতে মসজিদটি ৯৯৬ খৃ. প্রতিষ্ঠিত। মসজিদটির বর্তমান স্থাপনা মাকসিজ মির্জা ১৪৪২ খৃ. নির্মাণ করিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে ইহাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করায় মসজিদটির গঠন, বর্তমানে এই মানদণ্ড ও নির্মাণ শৈলীতে পৌছিয়াছে। ইহা চীনের অন্যতম বড় মসজিদ। ইহা বিশ্বের সুন্দরতম স্থাপনাগুলির একটি। ইহা আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিচিত। কাশগড় ঈদগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের আয়তন ১৬ হাজার ৮০০ ব. মিটার। প্রাচীর ঘেরা অঙ্গন, ইবাদতখানা, ফটক বুরূজ এবং অন্যান্য স্থাপনা মসজিদ কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদের ফটক পার হইলেই একটি বড় অঙ্গন অবস্থিত। এইখানে রহিয়াছে পপলার গাছের সারি ও একটি পুকুর। এই অঙ্গনের বৈশিষ্ট্য মসজিদটিকে একটি শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। অঙ্গনের পশ্চিম প্রান্তে একটি উচ্চ মঞ্চের উপরে রহিয়াছে মূল ইবাদতখানা। হালকা নীল থামের উপর মোহনীয় ভঙ্গিমায় রহিয়াছে ইহার ছাদ। থাম ও ছাদ মিলিয়া আয়তাকার একটি সুন্দর স্থাপনার সৃষ্টি হইয়াছে। থাম ও ছাদের চারিদিক খোদাই করা নকশা দ্বারা অলংকৃত। মসজিদ অঙ্গনে প্রবেশ করিতে প্যার হইতে হয় একটি ইষ্টক নির্মিত ফটক বুরূজ (Gate tower)। খিলানাকৃতির ফটকটি একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে প্যানেল (panel) এবং অন্যান্য কারুকার্য খচিত নকশা দ্বারা শোভিত। ফটক কাঠামোর বাম প্রাচীরে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে দুইটি খিলানাকৃতির কুলুঙ্গী রহিয়াছে। ফটক কাঠামোর উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে দুইটি গোলাকার বুরূজ (corner tower)। বুরূজ দুইটি ফটক কাঠামোর বেশ উপরে উঠিয়াছে এবং ইহাদের শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা আবৃত। প্রতিদিন হাজার হাজার মুসল্লী এই ঈদগাহ মসজিদে নামায আদায় করিয়া থাকেন। মসজিদে একসঙ্গে দশ হাজার মুসল্লী নামায পড়িতে পারেন। ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিশেষ করিয়া ঈদের সময় বিশ হাজার লোকের এক সাথে নামাযের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রতি দিন এক ঘণ্টা সাধারণ দর্শকদের জন্য কাশগড় ঈদগাহ মসজিদ উন্মুক্ত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৭, পৃ. ৪৬১ (১ম সং ১৯৮৯ খৃ.); (২) দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খৃ.; (৩) দৈনিক মুক্ত খবর, ঢাকা, ২৯ নভেম্বর, ২০০৭ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

(মাওলানা) কাসেম (مولانا محمد قاسم) ঃ মোহাম্মদ, ১৮৯৩ সালের ২৫ জানুয়ারী রোজ শুক্রবার বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলাধীন হরিসোনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলভী ছাদেক খলীফা। শৈশবকালেই তাঁহার মাতা ইনতিকাল করেন। গৃহশিক্ষক কুমিল্লা নিবাসী কারী মোহাম্মদ নকীব উল্লাহর হাতে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি উক্ত উস্তাদের পরামর্শ মতে নোয়াখালী জেলার রায়পুর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯১৮ খৃ. উক্ত মাদরাসা হইতে প্রথম বিভাগে জামাতে উলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খৃ. তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসা হইতে ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার পিতা তাহাকে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হইবার জন্য উপদেশ দেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম দীনী কর্মকাণ্ড ছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করা তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, বরিশাল পৌরসভা কমিশনার, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সদস্য, নন অফিসিয়াল জেল পরিদর্শকসহ প্রায় ২১টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নিজ এলাকায় ও অন্যান্য এলাকায় অনেক মাদরাসা, মসজিদ ও লিল্লাহ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পীর দুদু মিয়ার বিশিষ্ট খলীফা গৌরনদী উপজেলাধীন গেরাকুল গ্রামের মৌলভী মফীজুদ্দীন সরদারের একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুর একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলীতে তাঁহার শ্বশুরের অনেক অবদান ছিল।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীর ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (র)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার নিকট হইতে খিলাফতও লাভ করেন। বৃহত্তর বরিশাল জেলায় তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা মাওলানা দুদু মিয়া (দ্র.) এই দেশে জুমু'আর নামায জায়েয নহে বলিয়া ফাতওয়া প্রদান করেন। পক্ষান্তরে ফুরফুরার পীর সাহেব জুমু'আর নামায জায়েয বলিয়া ফাতওয়া প্রদান করেন। এই বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ফুরফুরার পীর সাহেবের অত্র এলাকার খলীফা মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম দুদু মিয়া ও তাঁহার মুরীদানদের সহিত বাহাছ করেন এবং বাহাছে যুক্তি-তর্ক দিয়া তিনি এই দেশে জুমু'আর নামায আদায় করা যাইবে সাব্যস্ত করেন, যাহার প্রেক্ষিতে এই এলাকায় প্রথম জুমু'আর নামাযের প্রচলন হয়। তিনি তাঁহার সহযোগীগণকে লইয়া টরকী, বাটাজোর, গৌরনদী, কাসেমাবাদ ও গেরাকুল তাঁহার শ্বশুরালয়সহ বিভিন্ন স্থানে জুমু'আর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করিতেন। তিনি সুন্নাতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। যে সকল মরদে মুজাহিদ পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে বৃটিশ শাসন উৎখাত করিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন— মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে হরিসোনা ছিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য তিনি নেছারিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং নামে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ছাড়া তিনি মাদরাসা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাব পোস্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, কাসেমাবাদে অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ এবং কাসেমাবাদ বাংলা বাজার নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গৌরনদী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাছেমের কর্মতৎপরতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সমাজসেবা স্থানীয় জনগণের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল।

অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব হরিসোনা মাদরাসা পরিদর্শনে আসেন। এই উপলক্ষে সেইখানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় শেরে বাংলার প্রস্তাবক্রমে উপস্থিত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে আল্লাহু আকবার ধ্বনি সহকারে হরিসোনা গ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া কাসেমাবাদ নামকরণ করা হয়।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁহার পীর সাহেবের নির্দেশে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। পীর সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কেবল পীর-মুরিদী লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আইন পরিষদে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিবার দায়িত্বও পালন করিতে হইবে। মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম ১৯৪৬ খৃ. হইতে ১৯৫৪ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বৎসর পাকিস্তানের প্রথম আইন পরিষদের সদস্য (এম. এল. এ.) ছিলেন এবং জাতীয় পরিষদে তিনিই সর্বপ্রথম মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এই দেশে কুরআন হাদীছের আলোকে রাজনীতি পরিচালনার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি উত্তর বাখরগঞ্জ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম নামে আরও একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম কাসেমাবাদ সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় পাকা মসজিদ, বিজ্ঞানাগার, ছাত্রাবাস, ইয়াতীমখানা, কুটির শিল্প সংস্থাসহ অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক চরিত্রের এবং সদালাপী। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার চালচলন ও আচার-ব্যবহারে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার মুত্তাকী ও বুযুর্গ ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাঁহার ভরসা ছিল সুদৃঢ়, বিপদে-আপদে তিনি ধৈর্যহারা হইতেন না। ১৯৩২ খৃ. তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করেন। ১৯৭৬ খৃ. ১ ফেব্রুয়ারী/ ১৮ মাঘ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন চার পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক। তাঁহার নিজ বাড়ীর সম্মুখে মাদরাসা প্রাঙ্গনে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঃ (ক) মাওলানা মোহাম্মদ কাছেমের ২য় পুত্র ও গদ্দীনশীন পীর আলহাজ্জ মাওলানা শাহ আ.ফ.ম. অহীদ; (খ) মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার চাখারী, সাবেক পরিচালক ও মহাপরিচালক (চ. দা.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও কাসেমাবাদ মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র; (গ) তালুকদার ওমর আলী, বিশিষ্ট আইনজীবি। (২) কাসেমাবাদ দরবারের মরহুম পীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সম্পাদনায় অধ্যক্ষ মাওলানা গাজী শামসুল হক, তা.বি., প্রচারে কাসেমাবাদ দরবার শরীফের ঢাকা মহানগর খানকা পরিচালনা কমিটি; (৩) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান ও মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুল হক প্রমুখ প্রাক্তন ছাত্রের প্রদত্ত তথ্য। (৪) সরকারী গৌরনদী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এ কর্মরত) জনাব মুহাম্মদ আবদুল হালীম প্রদত্ত তথ্য।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া